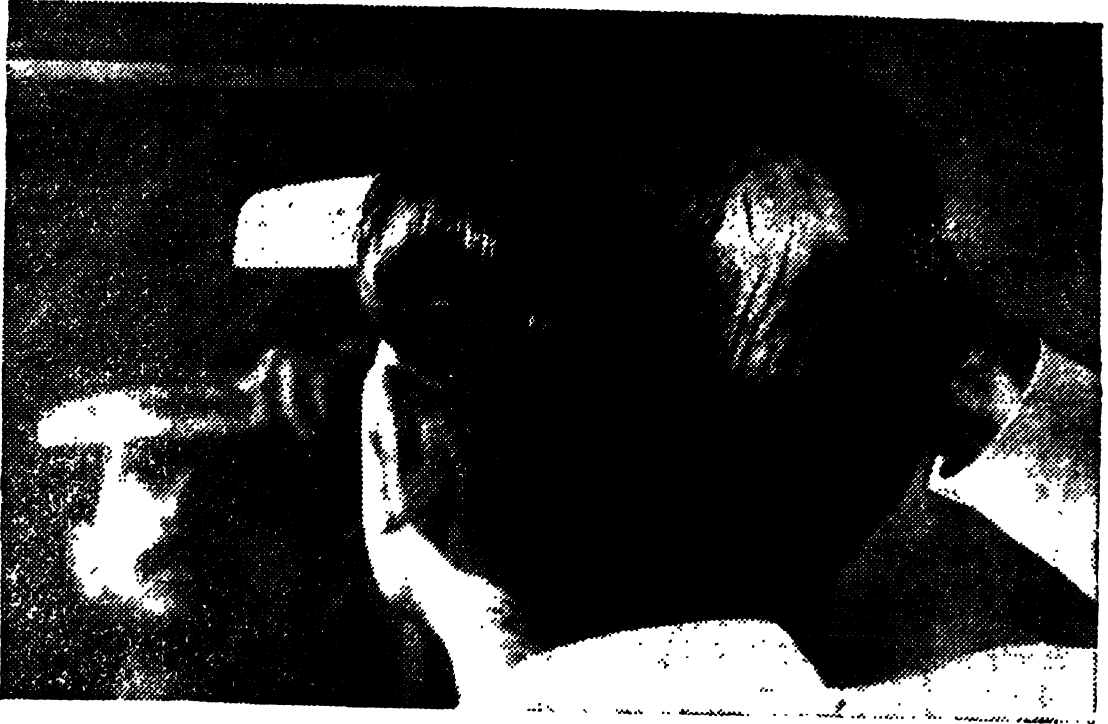
চুল উঠে যাওয়ার জন্য বিব্রত?



আজ থেকে সিলভিক্রিন ব্যবহার করে
চুলের পুনর্জীবন ফিরিয়ে আনুন

বিপদের এই সব সঙ্কেত অবহেলা করবেন না

চুল উঠে যাওয়া। মাথার তালুতে চুলকানি। নির্জীব শুকনো চুল। এই সব লক্ষণ থেকেই বুঝা যায় যে আপনার চুল বেড়ে ওঠার জন্য যে জীবনদায়ী খাদ্যের প্রয়োজন তার অভাব হচ্ছে। এর ফলে অকালে আপনার মাথায় টাক পড়তে পারে। তাই এই সব লক্ষণ দেখা দিলেই বুঝতে হবে আপনার চাই--সিলভিক্রিন—যেটি চুলের জীবনদায়ী স্বাভাবিক খাদ্য।

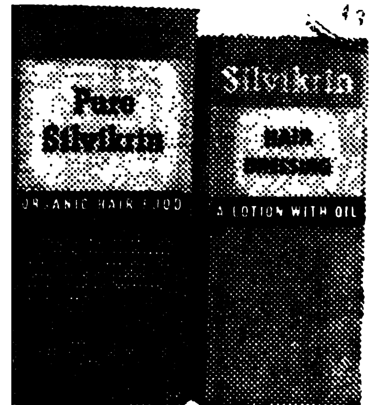
সিলভিক্রিন কি ভাবে কাজ করে?

চুলের গঠনের জন্য যে ১৮টি অ্যামিনো অ্যাসিড দরকার হয়, প্রকৃতি তা জোগায়। একমাত্র সিলভিক্রিনেই রয়েছে সেইসব অ্যামিনো অ্যাসিডের মূলতত্ত্বের নির্যাস। এটি চুলের গোড়ায় গিয়ে, তাকে খাদ্য জোগায় ও শক্তিশালী করে তোলে ও সুস্থ চুল বেড়ে ওঠায় সাহায্য করে।

ব্যবহার-বিধি

প্রত্যহ দুমিনিট করে মাথার তালুতে পিওর সিলভিক্রিন মালিশ করুন। চুলের অবস্থার উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত পিওর সিলভিক্রিন ব্যবহার করে চলুন। একবার চুলের স্বাস্থ্য ফিরে এলে তাকে অটুট রাখবার জন্য নিয়মিতভাবে সিলভিক্রিন হেয়ারড্রেসিং মাখুন—এটি পিওর সিলভিক্রিন মেশানো একটি অয়েল বেস্।

বিনামূল্যে 'অল অ্যাবাউট হেয়ার' শীর্ষক পুস্তিকার জন্য এই ঠিকানায় লিখুন—ডিপার্টমেন্ট A-7 পোস্টবক্স ১২৭, বোম্বাই-১।



সিলভিক্রিন উৎপাদন পুরুষ ও মহিলা সকলেরই ব্যবহার উপযোগী।

সিলভিক্রিন

চুলের জীবনদায়ী স্বাভাবিক খাদ্য

LPE—Aiyars S. 1 BEN.

সর্বশ্রেষ্ঠ বাংলা মাসিক পত্রিকা

গল্প-ভারতী

পৌষ সংখ্যার কয়েকটি বিশেষ আকর্ষণ ঃ

স্বামী অভেদানন্দ *শতবার্ষিকী উপলক্ষে* **শ্রদ্ধাঞ্জলি**	নবীন বাংলার আদর্শ। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রপথিক। সংগ্রামী স্বামী অভেদানন্দ। জীবনের খণ্ডচিত্র।
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী উপলক্ষে স্বামী অভেদানন্দের ভাষণ গ্রামোফোন রেকর্ডে (রেকর্ডের প্রতিলিপিসহ)	জাতীয় জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ প্রতি ঘরে সযত্নে স্থান পাবার মত
স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশের গুপ্ত সমিতির অবদান	মনোরঞ্জন গুপ্ত
নাটমঞ্চ— *স্বদেশীযুগের রঙ্গালয়*	মন্মথ রায়
বন্দী বিধাতা—	প্রভাত মুখোপাধ্যায়। ঘটনাবহুল চমকপ্রদ উপন্যাসের শেষাংশ। পূর্ব প্রকাশিত অংশের সারসহ।
বন্যাকন্যা—	অচিন্ত্য সেনগুপ্ত। পূর্ব প্রকাশিত অংশের চুম্বক-সহ ধারাবাহিক মনোরম উপন্যাস।
ধর্মঠাকুরের কাহিনী—	ডঃ অমলেন্দু মিত্র
নার্সিং হোম—	ডাঃ গোরাচাঁদ নন্দী ব্যঙ্গরসাত্মক রম্যরচনা
মেয়ে মজলিশ—	বিকল্প খাদ্য—বেলা দে পৌষ পার্বণ (সচিত্র)—ঊষা ভট্টাচার্য
বিভিন্ন স্বাদের ৫টি সুখপাঠ্য গল্প	নিয়মিত বিভাগ, ব্যঙ্গচিত্র, ভাববার কথা, ব্যাপার যা চলছে, খেলাধুলা, চলতি দুনিয়া, পুরাতন পাতা প্রভৃতি।

মাঘ সংখ্যার নূতন আকর্ষণ

স্মৃতিচারণ—প্রবীণ সাহিত্যিক নরেন দেব। **অন্ধের মন্দির** (ভ্রমণ কাহিনী)—সুবোধকুমার চক্রবর্তী **মধুপর্ক** (স্মৃতি ঃ প্রমথেশ বড়ুয়া)—প্রভাত মুখোপাধ্যায়। **নরমেধ যজ্ঞ** সম্পূর্ণ রহস্য উপন্যাস—জয়দ্রথ

আজই সংগ্রহ করুন। দাম ১, বার্ষিক ১৫, (সডাক)

সর্বত্র সম্ভ্রান্ত এজেণ্ট আবশ্যক।

গল্প-ভারতী· ২৭৯বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা ৬

৭ম বর্ষ
৩য় খণ্ড

অমৃত

৩৫শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 5th January, 1968 শুক্রবার, ২০শে পৌষ, ১৩৭৪ 40 Paise

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতের' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতের' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতের' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

		কলিকাতা		মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা	২০-০০	টাকা	২২-০০
ষান্মাসিক	টাকা	১০-০০	টাকা	১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা	৫-০০	টাকা	৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

সূচীপত্র

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের

বিচিত্র কাহিনী

(৪র্থ সংস্করণ)

নবীন ও প্রবীণদের সমান আকর্ষণীয়
অজস্র চিত্র সম্বলিত বিচিত্র গল্পগ্রন্থ। মূল্য : দুই টাকা

লেখকের আর একখানা বই

আরও বিচিত্র কাহিনী

অসংখ্য ছবিতে পরিপূর্ণ। দাম : তিন টাকা

প্রকাশক :
এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
সকল পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।



'গৌরাঙ্গ পরিজন প্রসঙ্গে' লেখকের বক্তব্য

আমি 'শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভুকেই বিশ্বরূপ সাব্যস্ত' করতে চেষ্টা করি নি। আমি আমার 'নিত্যানন্দ' নিবন্ধের প্রথমেই বলেছি বীরভূমের একচক্রা গ্রামের হাড়াই পণ্ডিত ওরফে মুকুন্দ 'বন্দ্যোপাধ্যায়' নিত্যানন্দের পিতা। নিত্যানন্দ জগন্নাথ মিশ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বরূপ হবে কেন?

তবে আমি লিখেছি, যে-সন্ন্যাসী হাড়াই পণ্ডিতের কাছে নিত্যানন্দকে ভিক্ষা করতে এসেছিল সে স্বয়ং বিশ্বরূপ আর বিশ্বরূপ নিত্যানন্দের 'অভিন্নস্বরূপ'। বিশ্বরূপের সন্ন্যাস-নাম শঙ্করারণ্য পুরী। আমি আরো লিখেছি, দাক্ষিণাত্যে পাণ্ডুরপুরে শঙ্করারণ্য নিত্যানন্দকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করে তার সত্তার মধ্যে বিলীন হয়ে যান।

উপরি-উক্ত তথ্য আমি পণ্ডিতপ্রবর দ্বিজপদ গোস্বামী ভাগবতশাস্ত্রীকৃত গ্রন্থ শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু (সংক্ষিপ্ত লীলামৃত) থেকে সংগ্রহ করেছি। প্রাসঙ্গিক উক্তি উদ্ধৃত করে দিচ্ছি :

"এক নবীন সন্ন্যাসী আসিয়া শ্রীহাড়াই পণ্ডিতের অতিথি হইলেন।...সেই সন্ন্যাসী অপর কেহ নহেন, শ্রীনিত্যানন্দের অভিন্ন-স্বরূপ শ্রীবিশ্বরূপ। শ্রীজগন্নাথ মিশ্রনন্দন গৌরসুন্দরের জ্যেষ্ঠ সহোদর।...সর্বতীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে প্রভু নিত্যানন্দ ও শ্রীশঙ্করারণ্য পুরী দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানে পাণ্ডুরপুরে আগমন করিলেন। সেই স্থানে হইল অপরূপ মিলনরঙ্গ। শ্রীশঙ্করারণ্য পুরী প্রভু নিত্যানন্দকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।...কবি কর্ণপুর এই নিগূঢ়লীলা নিজগ্রন্থ শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায় বর্ণনা করিয়াছেন।"

হরিদাস ঠাকুরের জন্ম যে বূঢ়ন গ্রামে তা তো চৈতন্যভাগবতেই বলা আছে। "বূঢ়ন-গ্রামেতে অবতীর্ণ হরিদাস। সে সৌভাগ্যে সেসব দেশে কীর্তন প্রকাশ।' বৈষ্ণববিদগদর্শনীও বলছে, হরিদাসের জন্ম বূঢ়ন গ্রামে।

'কি করে যে মুসলমানের ছেলে হরিদাস হল, সংসারবন্ধন ছিন্ন করে বিরাগী হল কেউ বলতে পারে না—' আমার এ উক্তির ভিত্তি দীন রামকিঙ্কর দাস সঙ্কলিত শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুর মঠ, স্বর্গদ্বার পুরী থেকে প্রকাশিত 'ঠাকুর হরিদাস' গ্রন্থ। রামকিঙ্করদাস লিখছেন :

"হরিদাস ঠাকুর বূঢ়ন গ্রামে মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বাল্যকালের কোন ঘটনাই বৈষ্ণব মহাজনগণ উল্লেখ করেন নাই। তিনি কত কাল পিতৃগৃহে ছিলেন, কিরূপে কোন স্পর্শমণির স্পর্শে তিনি সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া শ্রীহরির পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন সেকথা এখন কাহারও জানিবার সাধ্য নাই।...ঠাকুর হরিদাসের পিতা-মাতার সঙ্গে কিরূপ সম্পর্ক ছিল, কিরূপে তিনি গৃহত্যাগ করেন, এ সম্বন্ধে বৈষ্ণব মহাজনগণ নির্বাক।"

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
কলিকাতা-২৬

সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে

চলচ্চিত্র বিভাগে আমার সঙ্গে যে সাক্ষাৎকারের বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে, তা প্রথম থেকেই ভুলে ভরা। বিজয়াদিদের সঙ্গে নৃত্যনাট্য করিনি। তাঁদের বাড়ীতে স্টেজ করে রবীন্দ্রনাথের 'শেষরক্ষা' অভিনয় করেছিলাম শ্রদ্ধেয় রেণু চক্রবর্তী প্রমুখদের সঙ্গে — শ্রীঅর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায়। এতে ইন্দুমতীর ভূমিকা দেখে আমাকে গোপার ভূমিকার জন্যে নির্বাচন করা হয়। এ ছাড়া, হেমচন্দ্র (দা?) সুবোধ মিত্র (দা?) এঁদের সঙ্গে কোন কাজ আমি করিনি—সাহায্য পাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। শ্রীনীতিন বসুকে চিত্র-জগতের বাইরে ছাড়া দেখি নি। চিত্র-জগতের কথা লিখতে গেলেই ভাষা-ভাব এত ঢিলেঢালা হয় কেন বুঝিনে। উদয়ের পথের গোপা মহিলা ছিল না। অল্পবয়সী একটি মেয়ে ছিল। ১৯৪২ সালে আমার বয়স ছিল ১৪ বছর।

বিনতা রায়
কলিকাতা : ৩৩।

'কেদার রাজা' ছবির সমালোচনা প্রসঙ্গে

'কেদার রাজা' প্রসঙ্গে আপনাদের সিনেমা-সমালোচক যা লিখেছেন ছবিটি দেখার পর সে সম্পর্কে একমত হতে পারলাম না বলেই এ চিঠি, শুধুই তাই নয়, অনেক জায়গায় সমালোচকের মন্তব্য সঙ্গতিবিহীন এবং অস্পষ্ট।

আপনাদের সমালোচক লিখেছেন, 'কেদার রাজা কাহিনীটির যতই সাহিত্যগুণ থাকুক না কেন, তার মধ্যে এমন কোন বৈচিত্র্যময় 'নাটকীয়তা' নেই, যার বলে কাহিনীটি একটি সার্থক চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত হতে পারে।' 'নাটকীয়তা' ছাড়াও যে সার্থক চলচ্চিত্র হতে পারে তার জ্বলন্ত প্রমাণ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালি' ও বিমল করের 'খড়কুটোর 'ছুটি' নামে সার্থক চলচ্চিত্রায়ণ। ছবি দুটি কি শিল্পের বিচারে, কি ব্যবসায়িক সাফল্যে ব্যর্থ হয়েছে কি? এ ছবি দুটি থেকে অনেক বেশী নাটকীয়তা আছে 'কেদার রাজা'য়। সমালোচক ছবিটিতে 'নাটকীয়তা' নেই বলে আক্ষেপ করেছিলেন অথচ যেখান থেকে নাটকীয়তা শুরু ছবির সেই অংশটুকুই সমালোচকের মতে, 'এক সরলা পল্লী বিধবার সর্বনাশসাধনের জন্য কয়েকজন শয়তানের আপ্রাণ চেষ্টার ন্যক্কারজনক ঘটনা-বলীই কাহিনীটিকে জুড়ে বসে এবং ছবির প্রায় শেষ পর্যন্ত তার তিক্ত স্বাদ দর্শককে রীতিমত উৎপীড়ন করে।' এখানে, এক সরলা পল্লী বিধবার সর্বনাশসাধনের জন্য কয়েকজন শয়তানের 'আপ্রাণ চেষ্টা'ই 'ন্যক্কারজনক' না সেই ঘটনাবলী চলচ্চিত্রায়ণই 'ন্যক্কারজনক' বুঝতে পারলাম না। সমালোচকের পরবর্তী কথায় শেষের মন্তব্যটুকুই ধরতে হয়। কয়েকটি শয়তানের ন্যক্কারজনক ঘটনা চলচ্চিত্রায়ণ কি সত্যই নিন্দনীয়? কিন্তু এর চেয়ে হাজারো গুণ অধিক ন্যক্কারজনক ঘটনার চলচ্চিত্রায়ণ তো আকছারই হচ্ছে। বরং আমি বলব, এ ছবিতে ন্যক্কারজনক ঘটনাগুলি দেখাতে গিয়ে পরিচালক এবং চিত্রনাট্যকার যে সংযমের পরিচয় দিয়েছেন তা যথার্থ প্রশংসনীয়। আর দশটি হিন্দী বা বাংলা ছবির মত এতে নায়িকার উপর শয়তানদের বলাৎকারের চেষ্টা, মদ খাওয়া ইত্যাদি বিষয়গুলো সযত্নে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। ফলে ছবিটি সপরিবারে দেখবার মত হয়েছে। প্রথম অংশ সম্পর্কে সমালোচক বলেছেন, '(কেদার রাজার) সারল্যে-ভরা চরিত্রটির মাধুর্য ছবিটিকে উপভোগ্য করে রাখে।' এই অংশে শুধু কি কেদার রাজার চরিত্রটিই উপভোগ্য? আর ভাল কিছুই নেই! ছবি শুরুর প্রথম সটটিই আশ্চর্য সুন্দর। নির্জন ভাঙা বাড়ির পরিবেশ যেমন সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তা পরিচালকের রুচিবোধ ও শৈল্পিক রসবোধের পরিচয়ই বহন করে। এই অংশে ছবিটি শুধু ছবি না হয়ে শিল্প হয়ে উঠেছে। স্বাভাবিক আলো-আঁধারি ছবিটিকে মাধুর্যমণ্ডিত করেছে। চাঁদনী রাতে যখন কেদার রাজা বেহালা বাজাচ্ছিলেন অমন আশ্চর্য কাব্যিক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য পরিচালক উচ্চপ্রশংসার দাবি করতে পারেন। এই অংশে অসিতবরণের অভিনয় প্রশংসার দাবি রাখে। রাজলক্ষ্মীর চরিত্রটিও কম আকর্ষণীয় নয়।

সত্যি কথা, প্রথম অংশের মতো দ্বিতীয় অংশ ততো সুন্দর নয়। তাই বলে অনেক ছবির থেকেই ভালো একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। ছবিতে পরিচালকের সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব ছবি কোথাও একঘেয়ে হয়ে পড়েনি। বাংলা ছবির (শিল্পের বিচারে) এই দুর্দিনে এ ধরনের যা সপরিবারের উপভোগ করার মতো একটি ভালো ছবি (সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি বাদ দিলে) উপহার দেবার জন্য পরিচালক শ্রীবলাই সেন অবশ্যই ধন্যবাদার্হ।

গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়
কলকাতা-১২

সম্পাদকীয়

নববর্ষের চিন্তা

বর্ষচক্রের আবর্তে আরেকটি বৎসর অনন্তকালে মিলিয়ে যেতে না যেতেই নতুন বৎসর তার অনুদ্ঘাটিত ভবিষ্যৎ নিয়ে উপস্থিত। নববর্ষের প্রারম্ভে সকলকে শুভেচ্ছা জানাই। যদিও বাংলা নববর্ষ এর চেয়ে স্বতন্ত্র, তবু ইংরেজি নববর্ষই আন্তর্জাতিক জগতে স্বীকৃত। হিন্দীওয়ালারা যতই আংরেজি হটাবার জন্য উঠেপড়ে লাগুন না কেন, আন্তর্জাতিকতার ভাবধারা থেকে আজকের যুগের মানুষকে সরিয়ে আনা যাবে না। কারণ, আন্তর্জাতিকতার সঙ্গে দেশপ্রেমের মূলত কোনো বিরোধ নেই। বিরোধ আছে প্রগতির সঙ্গে সংস্কারের, সংকীর্ণতার সঙ্গে উদারতার। আমরা নববর্ষের সূচনায় আন্তর্জাতিক মানুষকে স্মরণ করেই সকলকে জানাই শুভকামনা।

বিগত বৎসরটিতে বিশ্বশান্তি বা সমৃদ্ধির পথে কোনো উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি না হলেও বিশ্বের মানুষ শান্তির জন্য সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছে। ভিয়েৎনামের যুদ্ধের সমাপ্তির কোনো আশা দেখা না গেলেও বৎসরের শেষ দিকে ঘটনার গতি দেখে মনে হয়েছে যে, হয়তো আগত বৎসরে শান্তির আলোচনার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুতি চলবে। অন্যদিকে গত বৎসর পশ্চিম এশিয়াতে শান্তি নষ্ট হয়েছিল ইস্রায়েল-আরব যুদ্ধে। এই যুদ্ধ বৃহত্তর যুদ্ধের আকার নেয়নি বটে, কিন্তু ইস্রায়েলীরা অধিকৃত আরব এলাকা ছেড়ে না যাওয়ায় ভবিষ্যৎ অশান্তির বীজ সেখানে রয়েই গেল।

রাষ্ট্রসংঘের পক্ষ থেকে পৃথিবীর অশান্ত কেন্দ্রসমূহে শান্তি স্থাপনের জন্য আগেকার মতোই চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু বিশেষ কোনো ফল লাভ হয়নি। ক্রমশই রাষ্ট্রসংঘের নিষ্ক্রিয়তা ক্ষুদ্র ও দুর্বল রাষ্ট্রসমূহের কাছে প্রকট হচ্ছে। কারণ, গত বাইশ বৎসরের ইতিহাসে দেখা গেছে যে, বৃহৎ শক্তিবর্গের স্বার্থ জড়িত রয়েছে এমন কোনো সমস্যা সমাধানে রাষ্ট্রসংঘ কৃতকার্য হয়নি। যদিও বৃহৎ-শক্তি-নিরপেক্ষ অন্যান্য সমস্যার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসংঘ তার শান্তির দূতের ভূমিকা সার্থকভাবে পালন করতে সক্ষম হয়েছে।

নববর্ষে রাষ্ট্রসংঘের ভূমিকার ওপর জোর দিচ্ছি এই কারণে যে, আদর্শের ও স্বার্থের সংঘাতে রাষ্ট্রসমূহ আজ পরস্পর থেকে এতটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে যে, সামান্য ভুল বোঝাবুঝিতে যেকোনো সময়ে বিরোধের আগুন জ্বলে উঠতে পারে। এই সম্ভাব্য বিপদ থেকে পৃথিবীকে রক্ষার জন্যই বিশ্বসংস্থার প্রয়োজন। বিশেষত পারমাণবিক অস্ত্রের ভয়াল ছায়ার তলায় বাস করছে পৃথিবীর মানুষ। পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ এবং পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত মানুষ স্বস্তি পাবে না। রাষ্ট্রসংঘ এর জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সাফল্য এখনও অনায়ত্ত।

ভারতবর্ষে বিগত বৎসরটি বিশেষ কোনো আশার আলোকরেখা রেখে যায়নি ভবিষ্যতের জন্য। বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছিল খরাজনিত দুর্ভিক্ষ। খাদ্যশস্যের ঘাটতি হেতু বিদেশ থেকে আমদানী-করা অপ্রতুল খাদ্যই ছিল বিপদের দিনে সম্বল। তাতে হয়তো দুর্ভিক্ষ কাটিয়ে ওঠা গেছে, কিন্তু দুঃখের ক্ষত শুকোয়নি এখনও। তার সঙ্গে সঙ্গে ছিল অর্থনৈতিক মন্দা। পরিকল্পনার পুনর্বিন্যাসের কথাও উঠেছে। চতুর্থ পরিকল্পনা আপাতত মুলতুবী। কবে এই ছুটি কাটবে বলা যাচ্ছে না। শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বাড়ছে হু হু করে। ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে মন্দার দরুণ হাজার হাজার তরুণ ইঞ্জিনিয়ার পাশ করে বেরিয়েও জীবিকার সন্ধান করতে পারছেন না। নিঃসন্দেহে সামাজিক স্বস্তির পক্ষে এ চিত্র বিষাদাচ্ছন্ন। অনেক তরুণ প্রতিভা বিদেশে পাড়ি দিচ্ছেন। যাঁরা বিদেশে রয়েছেন তাঁরা দেশে আসতে চাইছেন না। পরিকল্পিত অর্থনীতির এই ব্যর্থতা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। পরিকল্পনা রচনায় কোনো ত্রুটি ছিল কিনা তা অবশ্যই দেখা দরকার। কারণ, এভাবে অনিশ্চিত অন্ধকারের দিকে মুখ করে মানুষ, বিশেষত তরুণ সমাজ অপেক্ষা করতে পারে না।

এ ছাড়া বিগত বৎসরে ভারতের আভ্যন্তর অবস্থাও ঠিক স্বাভাবিক ছিল না। ভাষা নিয়ে বিরোধ বেধেছে, কেন্দ্র ও রাজ্যসমূহে বিভিন্ন ধরণের সরকার প্রবর্তিত হওয়ায় তাদের মধ্যেও খুব একটা সহজ স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। এমনিতেই ভারতের নানা প্রান্তে নানা ধরণের সংকীর্ণতাবাদী বিভেদপন্থী আন্দোলন যখন-তখন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। তার ওপরে যদি রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে সমঝওতার মনোভাব সুদৃঢ় না থাকে তাহলে দেশের পক্ষেই তা ক্ষতিকর। এই অতীত চিত্র পেছনে রেখেই নতুন বৎসর আসছে। সে কোন উজ্জ্বল ভবিষ্যতের বার্তা নিয়ে আসছে জানি না। তবু দুঃখী দেশের মানুষ আমরা এই আশা নিয়েই তাকে সাদরে বরণ করি যে, সমস্ত বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে ভারতবর্ষ তার অভীষ্ট লক্ষ্য খুঁজে পাবে। তার দুঃখ, তার অস্থিরতা সাময়িক। প্রশস্ত উজ্জ্বল ভবিষ্যতেরই তা প্রস্তুতি। এই আশা যেন আমাদের পূর্ণ হয়।

প্রতিধ্বনি

প্রতিধ্বনি

পল্লী বাঙলার দার্শনিক কবি হাছন রাজা

শীতাংশু পাজা

উদাস বা দার্শনিক কবি হাছনরাজা চৌধুরী ধর্মে মুসলমান। ১২৬১ বঙ্গাব্দে শ্রীহট্ট জেলার রামপাশা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কারো কারো মতে সুনামগঞ্জ থানার অন্তর্গত 'লক্ষণশ্রী' গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ও রামপাশা গ্রামে জমিদারী ছিল। একথা সত্য হাছন-রাজার বিরাট জমিদারী। তিনি অগাধ ধন-সম্পত্তির মালিক—তথাপি তিনি ফকিরি নিলেন বা মুসলমান হয়ে হিন্দু দেব-দেবী প্রভৃতি নিয়ে গান রচনা করলেন কেন—এ ধরণের বহু প্রশ্ন উঠে। তবে অনেক পণ্ডিতদের মতে হাছনরাজার পূর্বপুরুষ ছিলেন কায়স্থ হিন্দু।

হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করে যেসব হিন্দুরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তাদের অন্তরে ফল্গুধারার মত প্রাচীন সংস্কার প্রবাহিত ছিল—তা' ক্ষণে ক্ষণে বিকাশ হবার চেষ্টা করেছে; এর প্রমাণ হাছনরাজা কেন আরও বহু মুসলমান বৈষ্ণবভাবাপন্ন কবির মধ্যে পাওয়া যায়।

সুফীসম্প্রদায়ের মুসলমান কবিরা জীবাত্মা ও পরমাত্মার কথা বলতে গিয়ে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকাহিনীকেই অবলম্বন করেছেন যদিও মুসলমান প্রবাদে প্রবচনে বহু প্রেমো-পাখ্যান আছে। কারণ সুফী ধর্মপ্রণালীর গোড়ার কথা ঈশ্বরের শুধু যে সত্য অস্তিত্ব আছে তাই নয়—কল্যাণ এবং সৌন্দর্যও তাঁহার গুণ।

সুফী ধর্ম উদ্ভূত হয় প্রথমে তাঁহাদের মধ্যে যাঁরা ছিলেন আর্যসংস্কৃত ভাবাপন্ন এবং বেদান্ত মতবাদ দ্বারা পরিচালিত। তাই সুফী মতবাদীরা প্রেম সাধনার জন্য ব্যাকুল। তাই অনেকের মোক্ষপ্রাপ্তি হয় লৌকিক প্রেম-কাহিনীর সঙ্গে জীবাত্মা ও পরমাত্মার রূপ দেখে।

কবি হাছনরাজার প্রায় দুই শতাধিক গানের সংকলন 'হাছন উদাস' গ্রন্থের বিভিন্ন গানে রাধাকৃষ্ণ কোথাও বা জীবাত্মা পরমাত্মা রূপে বা দেহে প্রাণে আত্মারূপে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি ঈশ্বর আরাধনার বিভিন্ন সোপানে অবতীর্ণ হয়েছেন। ইহজগতের নশ্বরতা উপলব্ধি করা; তাকে অস্বীকার করা—এ জগত তো চিরনিবাসস্থল নয় এতো পান্থনিবাস মাত্র—এই জ্ঞান থেকে মায়ার আবদ্ধজাল থেকে মানুষ মুক্তি পায় প্রেমের পথে। এবং প্রেমের সোপান শীর্ষে আরোহণ করে 'সোহহং' (অনল হক) অবস্থা প্রাপ্ত হয়। কবি হাছনরাজা সাধনার স্তরভেদে সেই 'অহং ব্রহ্মে'র অধিকারী বা 'ব্রহ্ম নির্বাণে'র অধিকারী। যেমন গীতায় আছে—

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরহোপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যানি
সংযাতি নবানি দেহী।"

মনুষ্য যেমন জীর্ণ বস্ত্র সকল পরিত্যাগ করে নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে ঠিক সেরূপ আত্মাও জীর্ণ শরীর ত্যাগ করে নূতন শরীর প্রাপ্ত হয়। ক্ষুদ্র মানবআত্মাই অবিনশ্বর পরমাত্মার প্রতীক এ সত্য উপলব্ধি করে হাছনরাজা গান গেয়েছেন—

"মরণ জীবন নাইরে আমার,
ভাবিয়া দেখ ভাই।
ঘর ভাঙিয়া ঘর বানানি,
এই দেখতে পাই।।"

এতো গেল বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে ক্ষুদ্র খণ্ড একাত্মতা অনুভূতির কথা। কিন্তু জীবাত্মা পরমাত্মা যে একাত্ম লীন এ তত্ত্ব-ভূত হাছনরাজার গানে পাওয়া যায়। সীমা ও অসীমের লীলা, মর্ত ও অমর্তের লীলা যদি বুঝতে হয়—তবে রাধাকৃষ্ণের রূপের লীলা বুঝতে হবে। বাহিরের রূপ রাধা আর ভিতরের স্বরূপ কৃষ্ণ—তাই রূপ চায় স্বরূপে বিলীন হতে—তাই রাধার কৃষ্ণান্বেষণ। নিজের ঘরে যদি নিজের প্রভুকে খুঁজে বের না করা যায় তবে ঘরেরই বা সার্থকতা কি? এই ঘরে জীবাত্মা হলো রাধা আর পরমাত্মা হলো কৃষ্ণ। কৃষ্ণ যতই অভিসন্ধি বা নানা ছল-চাতুরীর খেলা খেলুন না কেন যদি ভালো করে প্রদীপ জ্বালিয়ে অন্বেষণ করা যায় তবে জীবাত্মা পরমাত্মার তত্ত্ব উদ্ঘাটন করা যায়। তাই হাছনরাজা গান গেয়েছেন--

"বাত্তি জ্বালাইয়া দেখ শ্যাম
রাধার ঘরে করে কাম।
কেহই বলে রাধার কানু
হাছনরাজায় বলে দিলারাম।।
প্রেমের বাত্তি জ্বালাইয়া দেখ
তারে নিরখিয়া।
হৃদ-মন্দিরে বিরাজ করে
হাছনরাজা ধরে নাম।।

প্রেমপন্থী কবি হাছনরাজা রাধাকৃষ্ণের প্রেমে নিজের স্বরূপ খুঁজে পেয়েছেন। এবং নানা ক্রীড়াচ্ছলে অন্বেষণ করে মনে করেছেন যে কৃষ্ণ ও তিনি অভিন্ন।

"আমি ই মূল নাগর রে।
আসিয়াছি খেইড় খেলিতে ভবসাগরে রে।
আমি রাধা আমি কানু আমি শিবশংকরী।
অধরচান্দ হই আমি আমি গৌর হরি।
খেলা খেলিবারে আইলাম এ ভবের বাজারে।
চিনিয়া না কোনজনে আমায় ধরতে পারে।"

অন্যত্র—কানাই তুমি খেইড় খেলাও কেনে।
রঙ্গের বলিয়া কানাই ।।ধু।।
কানাই তুমি খেইড় খেলাও কেনে।
হাছন রাজায় জিজ্ঞাস করে
কানাই কোনজন।
ভাবনা চিন্তা করে দেখি
কানাই যে হাছন।

বাঙ্গালী চিত্তের উপর রাধাকৃষ্ণের প্রেম কাহিনী ও বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রভাব ঐতিহ্য-গতভাবে বিস্তার করেছে। আর পদরচয়িতারা প্রেমধর্মের প্রভাবে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে বিভিন্ন ভাবে রচনা করেছেন। অনেকে রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে অবলম্বন করে সোজা-সুজিভাবে ভগবানকে আরাধনা করেছেন। ইহা অবশ্য চলিত ভঙ্গী। তবে এই ভঙ্গীই প্রভাবিত করেছে মানুষের ধর্ম ও দর্শনকে।

মরমী কবি হাছনরাজা রাধাকৃষ্ণের মধ্যে ভগবানের কোন পার্থক্য দেখেন নি ধর্মের মূলতত্ত্ব অভিন্ন। তিনি গান গেয়েছেন—

"আমি তোমার কাঙালী গো সুন্দরী রাধা
আমি তোমার কাঙালী গো।
তোমার লাগিয়া কান্দিয়া ফিরে
হাছন রাজার কাঙালী গো।।
হিন্দুয়ে বলে তোমায় রাধা আমি বলি খোদা,
রাধা বলিয়ে ডাকিলে মোল্লা মুন্সীয় দেয় বাধা।
হাছন রাজা বলে আমি না রাখিব জুদা।
মোল্লা মুন্সীর কথা যত সকলই বেহুদা।।

হাছনরাজা রাধা অনুরাগী। রাধা ও খোদার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। যে যে নাম ডাকে সে সেই নামেই পায়। যে তোমায় যেভাবে ডাকে, তাতে তুমি হও মা বাবা। 'রাম ও খোদা, শিব ও শক্তি একই'। কবির অন্যত্র গানে আছে—

"সোনা বন্ধে, সোনা বান্ধ গো।
আমায় মন কেনে হোল কাঙালিনী।
শুন শুন এগো রাধা তুমি জগৎরাণী।
রাধা বলিয়ে হিন্দুয় ডাকে আমি নাহি
মানি।
আল্লা বিনা কিছু নাই আর সব ফাঁকি।
হাছনরাজার ডাকে তোমায় রহিম রব্বানি।
রহিম রব্বানি ডাকে আর ডাকে ছুবহানি।
আল্লা আল্লা বলিয়ে ডাকে এক বিনে না
জানি।।"

বৈষ্ণব কবি হাছনরাজার বৈষ্ণবভাবাপন্ন পদসমূহও পাওয়া যায় 'উদাস হাছন' গ্রন্থে। রাধার পূর্বরাগ, অভিসার, মিলন, বিরহ প্রভৃতি বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন কবিতা আছে। এ' পদগুলির রচনার উৎকর্ষতার দিক থেকে বিচার করতে গেলে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের মনোরম পদের মত হয়ত বা নাও হতে পারে তবে গ্রাম্যভাষায় এ' সবের মূল্যায়নও কম নয়। লৌকিক প্রেমকাহিনী অবলম্বনে একান্ত ঘরোয়াভাবে প্রেমপন্থী কবি হাছনরাজা এসব গান লিখে গেছেন। তাই তা' আজ বিভাগোত্তর বাঙলায়ও একেবারে মরে না গিয়ে অত্যন্ত ক্ষীণধারায় বাঙালী জনচিত্তে ফল্গুধারার মত প্রবাহিত রয়েছে।

"এগো সুন্দরী দিদি কথা শুনিয়া যা গো।
প্রাণবন্ধু মোর কোথা আছে বলিয়া
মোরে দে গো।।

মা হেরিয়া বন্ধু মম হইয়াছি মৃত সম।
এখনে কি করি করি করি গো।।
করিয়া আমার মনচুরি কোথা গেল
প্রাণহরি।
ধরতে গেলে না যায় ধরা কেমনে তারে
ধরি গো।।
হাছনরাজা বলে দিদি মনকে আমি
কত সাধি।
মন হইয়াছে বিবাদী সে বিনে
মানে না গো।।

হাছনরাজার বিভিন্ন গানে দার্শনিক তত্ত্ব যেভাবে পরিস্ফুট হয়েছে অন্য কোন গ্রামকবির গানে এতো বলিষ্ঠভাবে তা পরিস্ফুট হয়নি। তিনি পল্লীবাঙলার দার্শনিক কবি। কবিগুরুর উক্তিতে যথার্থ প্রমাণ রয়েছে তাঁর দেহতত্ত্ব, ফকির, বাউল, ভাটিয়াল প্রভৃতি গানের পদে পদে।

(সংঘর্ষ ।। আশ্বিন ১৩৭৪)

সেগেই আইজেনস্টাইন

সমর বন্দ্যোপাধ্যায়

আইজেনস্টাইনের প্রথম চলচ্চিত্র সৃষ্টি 'স্ট্রাইক'। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের এই নির্বাক চিত্রটিই আইজেনস্টাইনের মন্টাজরীতির অন্যতম সার্থক নিদর্শন হিসাবে আজও চিহ্নিত। চলচ্চিত্র-ক্ষেত্রে পালাবদলের এক নতুন পালা হিসেবে ছবিটি আজও স্মরণীয়। চলচ্চিত্র-সম্পর্কে পূর্বের ধ্যান-ধারণার আমূল সংশোধন হোল যেন এই ছবিটির মাধ্যমেই। জার আমলের এক কারখানার ধর্মঘটের ঘটনাকে অবলম্বন কোরে প্রস্তুত স্ট্রাইক ছবিটি বোধ হয় পূর্বেই চলচ্চিত্র-চিন্তাতেও স্ট্রাইক (আঘাত) হেনেছিল। তার অধিকাংশ চলচ্চিত্র ছিল কেবল 'ভিসুয়াল এনটারটেনিং' আর ফ্ল্যাট শটের সমাহার— না ছিল সেসব ছবিতে কোন কাটিং-এর নাটকীয় প্রয়োগ না দ্বন্দ্ব সংঘাত সৃষ্টির কোন সংবেদন প্রয়াস।

পরের বছর ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে আইজেনস্টাইন সৃষ্টি করলেন তাঁর বিশ্ববিখ্যাত ছবি 'ব্যাটেলশিপ পোটেমকিন'। অদ্যাপি 'পোটেমকিন' ছবিটি বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র সৃষ্টি রূপে গণ্য হয়। 'মন্টাজ' পদ্ধতি এই ছবিতে আরও সুন্দর আর শক্তিশালী কোরে প্রযুক্ত হোল। দৃশ্যধর্মী ছবি আশ্চর্য মননধর্মিতায় হোল ভাস্কর। এই একই বছরে বিশ্বচলচ্চিত্রে আর এক মহান সৃষ্টির প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে। সেই সাড়া জাগানো ছবিটি হোল চার্লি চ্যাপলিনের 'গোল্ডরাশ'।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দের বিপ্লবকে অবলম্বন করে নির্মিত 'পোটেমকিন' ছবিটি সোভিয়েট রাশিয়ার কম্যুনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি সসম্মানে অনুমোদন করেন ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ১৯শে মার্চ তারিখে। এই বিপ্লবকে অবলম্বন করে আর যে সব ছবি তৈরী হয় এবং কেন্দ্রীয় কম্যুনিস্ট পার্টির অনুমোদন লাভ করে, সে-সবের মধ্যে ম্যাক্সিম গোর্কি রচিত ও পুডভকিন পরিচালিত 'মাদার' ছবিটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। পুডভকিনের 'মাদার' ছবিটিও চলচ্চিত্রাকাশে ধ্রুব জ্যোতিতে ।।

আইজেনস্টাইনের পরবর্তী ছবি 'অকটোবর'। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের অকটোবর বিপ্লবকে কেন্দ্র করে সেগেই বিপ্লবের দশবছর পর ছবিটি তৈরী করেন। কিন্তু এই ছবি নির্মাণে তিনি এক প্রচন্ড সমস্যার মুখোমুখী হন। দশবছরের মধ্যে রাশিয়ার যে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটে, তা ছিল কিছুটা অভাবিত এমনকি সেগেইয়েরও কল্পনার বাইরে। সেগেই তাঁর 'অকটোবর' ছবির নায়ক হিসাবে ট্রটস্কিকেই এঁকেছিলেন, কারণ 'অকটোবর' বিপ্লবের মূল নায়ক ছিলেন ট্রটস্কি। জারতন্ত্রের অবসানের জন্যে ট্রটস্কি যে গুপ্ত কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন, পরবর্তীকালে স্ট্যালিনকে ক্ষমতাচ্যুত করবার জন্যে সেই একই পদ্ধতি অনুসরণ করেন তিনি। কম্যুনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধাচরণ করার জন্যে শেষ পর্যন্ত ট্রটস্কি পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হন। এখন কম্যুনিস্ট পার্টির একজন শত্রুকে ছবির নায়ক হিসাবে ঠিক রাখা চলে না। তাই সেগেইকে নতুন কোরে সম্পাদনা করতে হয় 'অকটোবর' ছবিটি। ইতিহাসের সংগে যতটা সম্ভব সংগতি রেখে আবার বর্তমানের সংগে যথাসম্ভব খাপ খাইয়ে ছবিটিকে সাজাতে বেশ কিছুটা দেরী হোয়ে যায়। যার ফলে বিপ্লবের দশম বার্ষিক অনুষ্ঠানে পূর্ব ঘোষিত 'অকটোবর' ছবিটি আর প্রদর্শিত হতে পারে না এবং পরিবর্তে পুডভকিনের 'দি এন্ড অফ সেন্ট পিটার্সবার্গ' ছবিটি দেখানো হয়। সেগেই তখন তাঁর অসমাপ্ত আর একটি ছবি 'জেনারেল লাইন' সম্পূর্ণ করতে অগ্রসর হন। কিন্তু এখানেও নানা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের দরুণ সেগেই তাঁর চিত্রনাট্য পরিবর্তন করতে বাধ্য হলেন। চিত্রের নতুন নামকরণ হল 'ওল্ড অ্যান্ড নিউ'।

ইতিমধ্যে 'অকটোবর' ছবির কাজ শেষ করে ফেলেন সেগেই। এই ছবিতে বলিষ্ঠ চিত্রধর্মিতা আর রূপকল্প সকলের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পরবর্তী ছবি 'ওল্ড অ্যান্ড নিউ' ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে মুক্তি লাভ করে এবং এটিই সেগেইয়ের শেষ নির্বাক ছবি। মানুষ কিভাবে পশুর মত জীবন যাপন করে এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে গ্রামাঞ্চলে সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তন ছবির মাধ্যমে তুলে ধরে প্রগতিশীল চিন্তাধারার নতুন করে পরিচয় দিলেন সেগেই আইজেনস্টাইন। এ ছবিতেও ফর্ম আর কনটেন্টের অদ্ভুত সাযুজ্য লক্ষ্য করবার মত। 'আলেকজান্ডার নেভস্কী' ছবিটিও শিল্পকর্মের বিচারে বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।

আইজেনস্টাইনের পরবর্তী শেষ উল্লেখযোগ্য চিত্র 'আইভ্যান দি টেরিবল'! জার আইভ্যানের অত্যাচারী রূপটি সেগেই এবার ভিসুয়াল এক্সপেরিমেন্টে জীবন্ত করে তুললেন। ছবিটি সবাক এবং এই ছবিতে আইজেন্সটাইনের অভিনয় অবিস্মরণীয়।

সেগেই আইজেনস্টাইনের এইসব ক্লাসিক চিত্র সৃষ্টির মধ্যে কয়েকটি বিষয় বিশেষ করে উল্লেখ করতে হয়। নাটকীয় গল্পের পরিবর্তে মহাকাব্যের বর্ণনারীতি গ্রহণ, ব্যক্তি-চরিত্রের বদলে জনতার ব্যবহার, বড় বড় দৃশ্যের পরিবর্তে ছোট ছোট খন্ড খন্ড শট ব্যবহার এবং এই শটগুলিকে ডাইনামিক্যালি কাটিং-এ এক জায়গায় আনা বক্তব্য প্রকাশের জন্যে ইত্যাদি তাঁর মৌলিক কৃতিত্ব হিসাবে চিরস্মরণীয়। ডিটেলের প্রতি তাঁর নজর বিস্ময়কর হলেও ব্যক্তি-চরিত্রের মনস্তত্ত্বকেও সূক্ষ্মভাবে রূপায়িত করতে ওস্তাদ ছিলেন তিনি। 'mass hero'কে খাড়া করতে গিয়ে ব্যক্তিকে তিনি অবহেলা করেন নি। 'স্ট্রাইক' ছবিতে কারখানায় মারামারির দৃশ্য দেখাতে দেখাতে হঠাৎ 'কাট্' করে একটা শটে দেখানো হয় একজন কর্মীর সার্ট ছিঁড়ে উড়ে গেছে— ক্লোজে আবার দেখানো হয় সেই কর্মীটি ছেঁড়া সার্টেই বোতাম লাগাচ্ছে। আবার ধর্মঘটীদের ঘরোয়া জীবনের আশা-নিরাশা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ছবি নিপুণভাবে দেখাতেও সেগেই ভুল করেন না। ক্যাভেলরি চার্জ আর হোস পাইপ চার্জের দৃশ্যে আবার আমরা ব্যষ্টি ও সমষ্টি চিত্রণের চঙ্ দেখি। আশ্চর্য Crowd Scene-এর সংগে হঠাৎ intercut করে করে এক একটি যন্ত্রণা বিকৃত মুখ দেখানো হয়। টপ্ লং শটে ভয়ার্ত জনতার দৌড়ের দৃশ্যের পরেই দেখি দেয়ালের গায়ে ঠেস দেওয়া একটি মেয়ের মুখ। লং শটে পিঁপড়ের মত জনতার সারির পলায়ন দৃশ্য দেখানোর মাঝে মধ্যে 'কাট' কোরে এই সব individual মুখের ক্লোজআপ সন্নিবেশে abstract আর concrete-এর সংঘাতকেই স্পষ্ট করে তুলেছেন আইজেনস্টাইন।

নন্দনতত্ত্বের বিচারে শ্রেষ্ঠ চিত্রকর্মগুলির কয়েকটি অবিস্মরণীয় দৃশ্যের উল্লেখ করা যায়। 'স্ট্রাইক' ছবির শেষ দৃশ্যে জনতার ওপর পুলিশের নির্মম গোলা বর্ষণে জনতার মৃত্যুতে একটি মৃতকর্মীর চোখের ক্লোজ-আপের সংগে ইনটারকাট করে দেখানো হয় কসাইখানায় একটি গরু জবাইয়ের দৃশ্য, রক্তক্ষরণ এবং শেষে মৃত পশুটির চোখের বিরাট ক্লোজ আপ।...'পোটেমকিন' ছবির সেই বহু প্রশংসিত ওডেসা সিঁড়ির দৃশ্য এবং ওডেসায় নিষ্ঠুর রক্তপাতের প্রতিবাদে যখন পোটেমকিনের কামান গর্জে ওঠে, তখন তিনটি প্রস্তর নির্মিত সিংহ মূর্তি পর পর 'কাট্' করে দেখানোর দৃশ্য।...'অকটোবর' ছবিতে প্রলেতারিয়টদের আলাদা করে দেবার জন্যে নিভা নদীর পারে ব্রীজ দুভাগ করে দেবার অনন্যসাধারণ দৃশ্য ও উইন্টার প্যালেস অভিযানের আশ্চর্য চিত্রকল্প।...'ওল্ড অ্যান্ড নিউ' ছবিতে ফসল পেকে ওঠার সময় আকাশের স্তূপীকৃত ঘনকালো মেঘের সংগে বৈপরীত্য রচনা কোরে বায়ুর দুরন্ত গতিবেগের রূপকল্প সৃষ্টি। ...'আলেকজান্ডার নেভস্কী' চিত্রে বরফ যুদ্ধের ঠিক আগে টিউটনিক নাইটদের আগমন কালে দিগন্তে সারিবদ্ধ ঘোড় সওয়ার মূর্তির অগ্রগতির সংগে সংগে অশ্বখুরের শব্দতরংগ ও ধ্বনিব্যঞ্জনা এবং দৃশ্যধর্মিতা। 'আইভ্যান দি টেরিবল' ছবিতে মস্কোবাসীদের মধ্যে আইভ্যানের বিরুদ্ধতায় উত্তেজনা ক্রমে ক্রমে ছড়িয়ে পড়ার দৃশ্য বা কাজান যুদ্ধের প্রাক্ পর্বে আইভ্যানের উপস্থিতিতে কামানের বিস্ফারণ মুহূর্তের দৃশ্য।...ইত্যাদি, ইত্যাদি।

(মধ্যাহ্ন ।। শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৪)



'শতবর্ষের আলোয় আলোয়'

Amrita Bazar Patrika

যাত্রা হ'ল সুরু

পুলকেশ দে-সরকার

বলাবাহুল্য, ১৮৬৮ থেকে ১৮৯১ অবধি আর দ্বিতীয় একটি পত্র-পত্রিকা শতবর্ষের আয়ু নিয়ে জন্মলাভ করে নি, শতবর্ষোত্তীর্ণ হওয়া তো দূরের কথা। বাংলা দেশের বিভিন্ন অংশে এই সাময়িকীগলো ছড়িয়ে ছিল। ঠিক পলুয়া-মাগুরা অথবা অমৃতবাজারের মতো গ্রামও নয়, কয়েকটির জন্ম হয়েছিল মফস্বলীর শহরাঞ্চলে এবং কয়েকটির ভবানীপুর-টালা-টালীগঞ্জ ছাড়াও খাস কলকাতায়। বঙ্গবাসী, হিতবাদী, সঞ্জীবনী তো রীতিমত প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি লাভ করেছিল। সর্বপ্রথম অমৃতবাজার পত্রিকাতেই ১৮৭৫ খৃস্টাব্দে ১৪ বৎসর বয়স্ক রবীন্দ্রনাথের নামস্বাক্ষরিত একটি কবিতা বেরিয়েছিল বটে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাপ্তাহিক হিতবাদীরই ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ ছিল।

রবীন্দ্রনাথের জীবনীকার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় অবশ্য লিখেছেন যে, "হিতবাদীর সহিত রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে মাসতিনেকের বেশি ছিল না; কর্মকর্তাগণের ফরমাশ হইয়াছিল যে, গল্পগুলি আরও লঘুভাবে লিখিলে ভাল হয়। তাঁহারা সাপ্তাহিকের জন্য বোধহয় হাল্কা গল্প চাহিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় আর্টিস্টের পক্ষে ফরমাইশি গল্প লেখা অসম্ভব; অল্পদিনের মধ্যে হিতবাদীর সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন হইল।" (বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় প্রকাশিত শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত রবীন্দ্রজীবনী, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৮১) বলা নিষ্প্রয়োজন, সম্বন্ধ ছেদের কারণ রবীন্দ্রনাথ বলেন নি, ওটি নিতান্তই জীবনীকারের অনুমান। সে বিতর্ক এখানে প্রাসঙ্গিকও নয়; এখানে হিতবাদীর উদ্যোগপর্বটিই লক্ষ্যণীয়।

১৮৬১ খৃস্টাব্দের মে মাসে রবীন্দ্রনাথের জন্ম, ১৮৬৮ খৃস্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী অমৃতবাজারের জন্ম। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন সাত। আরও বছর সাতেক পর অমৃতবাজার পত্রিকায় 'হিন্দুমেলার উপহার' শীর্ষক কবিতাটি সর্বপ্রথম রবীন্দ্র-স্বাক্ষরে বেরোয়। তিনি কবিতাটি হিন্দুমেলায় নিজে আবৃত্তি করেছিলেন। কিন্তু এটি যে অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল রবীন্দ্র-জীবনীতে তার উল্লেখ নেই। (ঐ, পৃঃ ৪৭)

'হিতবাদী'র আবির্ভাব হয় ১৮৯১; অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন ৩০ এবং অমৃতবাজারের ২৩; এবং ৩০ বছরের যুবক সাপ্তাহিক হিতবাদীর সঙ্গে সংযুক্ত হচ্ছেন, ২৩ বছরের যুবক তখন সাংবাদিকতার পূর্ণ পরিণতি দৈনিকে রূপান্তরিত হচ্ছে। এ সময়ে সাংবাদিকতাও অনেকখানি অগ্রসর হয়েছে। বঙ্গবাসী (১৮৮১) এবং সঞ্জীবনী (১৮৮৩) চলছে।

রবীন্দ্র-জীবনী লেখক লিখেছেন:

"বোধহয় ১২৯৭ সনের চৈত্র মাসের কোনো সময়ে রবীন্দ্রনাথ জমিদারি হইতে কলিকাতায় ফিরিলেন। তখন সাহিত্যিক মহলে 'হিতবাদী' নামে এক সাপ্তাহিক প্রকাশের জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে।...

"১৮৯১ সালের গোড়ার দিকে 'হিতবাদী' প্রচারের জন্য একটি যৌথ কারবার গঠিত হয়। নবীনচন্দ্র বড়াল, প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় ৫০০৲ টাকা করিয়া দেন; ভূপেন্দ্রনাথ বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ রাজেন্দ্রলাল দত্ত, বৈকুণ্ঠনাথ সেন, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, জানকীনাথ ঘোষাল প্রভৃতি ১৫ জন ২৫০৲ টাকা করিয়া দিলেন; কয়জন ১০০৲ টাকা দেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর নামকরণ করেন ও motto দেন 'হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ।' রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বন্ধু শ্রীশচন্দ্রকে লিখিতেছেন 'আমাদের হিতবাদী বলে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বেরোচ্ছে। একটি বড় রকমের কোম্পানি খুলে কাজে প্রবৃত্ত হওয়া যাচ্ছে। ২৫,০০০৲ টাকা মূলধন। ২৫০৲ টাকা করে প্রত্যেক অংশ এবং একশ অংশ আবশ্যক। প্রায় অর্ধেক অংশের গ্রাহক ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে। কৃষ্ণকমলবাবুকে (ভট্টাচার্য) প্রধান সম্পাদক, আমাকে সাহিত্য বিভাগের সম্পাদক এবং মোহিনীকে (চট্টোপাধ্যায়) রাজনৈতিক সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়েছে। বঙ্কিম রমেশ দত্ত প্রভৃতি অনেক ভাল ভাল লোক লেখায় যোগ দিতে রাজি হয়েছেন।" (রবীন্দ্রজীবনী, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৮০-৮১)

নিঃসন্দেহে এটি একটি বৃহৎ আয়োজন এবং 'বঙ্গবাসী' ও 'সঞ্জীবনী' থাকা সত্ত্বেও তৎকালীন সর্বাগ্রগণ্য বিদগ্ধ ব্যক্তিরা তাঁদের মনঃপূত আর-একটি সাপ্তাহিকের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। শ্রেষ্ঠ যোগ্য ব্যক্তিদের উদ্যোগ তো ছিলই, অর্থাভাবও হয় নি। অমৃতবাজার পত্রিকা তখন বাংলা সাপ্তাহিক তালিকায় নেই; দ্বিভাষীও নয়, পুরোপুরি ইংরিজী, সুতরাং সেদিক থেকেও কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল না; অমৃতবাজার পত্রিকার মতো সূচনাকাল থেকে অর্থাভাব, উপকরণের অপ্রতুলতা, রাজরোষ ও অন্যান্য ভৌগোলিক, প্রাকৃতিক ও রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়ও হিতবাদীর প্রতিবন্ধক হয় নি। তবু, দুর্ভাগ্যবশত, হিতবাদী শতায়ু লাভ করতে পারে নি। বলিষ্ঠ সুস্থ জীবনে উত্তীর্ণ হবার সকল অনুকূল পরিবেশই ছিল।

সুতরাং, এটি অনুমান করা অসংগত নয় যে, কোন একটি সংস্থা সংগঠনে তার প্রাণপ্রবাহ সঞ্চারিত ও অব্যাহত রাখতে যে সব উপকরণের প্রয়োজন, অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় তার অভাব ঘটেছিল, পক্ষান্তরে তার সবকিছুই অমৃতবাজার পত্রিকার মধ্যে সঞ্জীবিত ও সক্রিয় ছিল। সে উপকরণ ও উপাদানগুলো কি তা অমৃতবাজার পত্রিকার শতবর্ষব্যাপী সহস্র সহস্র পৃষ্ঠা থেকে আহরণযোগ্য। জনচিত্তে উদ্বেলিত আকুতি প্রকাশ করাই দীর্ঘায়ুর প্রতিশ্রুতি নয়, সাংগঠনিক জীবনীশক্তিও সমান্তরালে অক্ষুণ্ণ রাখা অপরিহার্য; এই দুইয়ের সমন্বয়ে গতিচক্র যদি দূরদৃষ্টির ছন্দ রেখে চলে তবেই শতায়ু আশীর্বাদ সত্য হয়ে উঠতে পারে।

সুতরাং, অমৃতবাজার পত্রিকার অন্তর্নিরীক্ষা দুর্বার প্রাণশক্তির পরিচিতিতে জীর্ণ বিবর্ণ প্রাচীন পত্র থেকে শুরু করে চলিষ্ণু কাল পত্র-পরিক্রমা অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

কলকাতা থেকে সত্তর-সাতাত্তর মাইল দূরে এক গ্রামে আজ থেকে কিঞ্চিদূন একশ বছর আগে অমৃতবাজার পত্রিকার যে প্রথম সংখ্যাটি বেরোয় তারই মধ্যে বর্তমান মহীরূহের বীজ নিহিত ছিল। এদিক থেকে প্রথম সংখ্যাটি শতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে সর্বাধিক তাৎপর্যময়।

প্রথম সংখ্যায় যে আত্মপরিচয় বা প্রতিশ্রুতি ছিল তার কথা উল্লেখ করেছি। এটি প্রথম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় বেরিয়েছিল। দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে প্রথম পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন সন্নিবিষ্ট হত, নিজেদের এবং বাইরেকার। কিন্তু প্রথম সংখ্যার আত্মপরিচিতির লেখাটি প্রথম পৃষ্ঠা থেকে শেষ হয়েছে দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়। সাধারণত প্রত্যেকটি সংখ্যার মোট পৃষ্ঠা আট, কোন কোন সময় ক্রোড়পত্র দেওয়া হয়েছে। পৃষ্ঠাসংখ্যা অবিচ্ছিন্ন; প্রথমটি আট পৃষ্ঠায় শেষ হয়ে দ্বিতীয়টিকে ন' পৃষ্ঠায় ধরিয়ে দিয়েছে; এমনি চলেছে সপ্তাহের সপ্তাহ।

প্রথম সংখ্যায় প্রথম রচনাটির পর একটি মূল্যবান সামাজিক সমীক্ষার রচনা আছে। এটিতে শতবর্ষ পূর্বে আমাদের সমাজের একটি অতিগভীর সমস্যা প্রতিফলিত হয়েছে, যার বিষময় ফল আজও আমরা বহন করে চলেছি। কালটা রামমোহন পরবর্তী বিদ্যাসাগরের কাল; বাল্যবিবাহ, বালবৈধব্য এবং সমাজবহির্ভূত গণিকাবৃত্তির কাল এবং অশ্চর্য, বহুবিবাহেরও কাল। একটি যেন আর একটির সঙ্গে এক সূত্রে গ্রথিত; অথবা এগুলো একই সমাজব্যাধির একাধিক উৎকট লক্ষণ।

আজ বাল্যবিবাহ অভাবনীয়, কল্পনাতীত; এত বড় ভারতবর্ষে কোথাও কোথাও আছে বলেও শুনতে পাই। বাংলা দেশে শিক্ষিত ভদ্রলোকের মধ্যে কেবল হয় না তা নয়, হতেই পারে না, লেখাপড়ার জন্যও বটে, অর্থাভাবের জন্যও বটে। পক্ষান্তরে সেকালে ভদ্রসম্প্রদায়ের মধ্যে লেখাপড়ার রেওয়াজও ছিল না, দীর্ঘকাল 'স্ত্রীশিক্ষা' তো একরকম পাপকার্য বা অনাচার বলেই গণ্য হত,—কিন্তু 'গৌরীদান ছিল সর্বজনীন। ক' বছরের গৌরী? ন' বছরের তো বটেই, কেননা তারপরেই 'অরক্ষণীয়া' এবং সে কি দারুণ অশাস্ত্রীয় অসামাজিক ব্যাপার, শুধু অশাস্ত্রীয় অসামাজিক ব্যাপার নয় নিষ্ঠুর—তা শরৎ চট্টোপাধ্যায় সাহিত্যে অবিস্মরণীয় করে রেখে গেছেন।

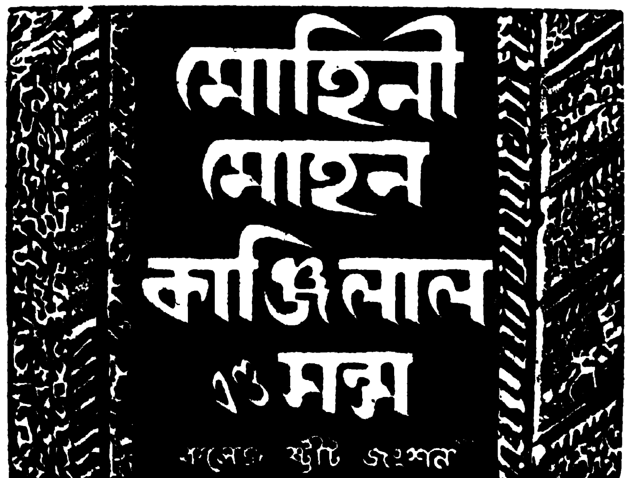
কিন্তু মৃত্যু কোন শাস্ত্র অশাস্ত্র বিচার করে না। বাল্যবিবাহ মরণের হাত থেকে বাঁচবার রক্ষাকবচ নয়; ফলে বালবৈধব্য অবধারিত এবং তাদের সংখ্যাও রোমহর্ষকর। বিধবা পঞ্চবর্ষীয়া বালিকা হোক কি অশীতিপর বৃদ্ধাই হোক — নিয়ম এক। সেখানেও শাস্ত্রের নিশ্ছিদ্র শাসনের বেড়াজাল। — তখন একমাত্র উপায় এই বেড়াজালে মাথা কুটে মরা অথবা ক্লেদ পঙ্কিলময় সুড়ঙ্গপথে মুক্তি। সে মুক্তিতে আনন্দ নেই, তৃপ্তি নেই, মনের ভেতর সৌন্দর্যের স্পর্শ নেই, তা সমাজের বিরুদ্ধে আক্রোশে বিদ্রোহে উত্তপ্ত। শাস্ত্রকারেরা যতটা নির্মম হতে পারেন তার চাইতেও অনেক বেশী নির্মম দৈহিক জৈবিক নিয়ম; সদাউদ্যত সামাজিক চাবুকের আস্ফালনে পঞ্চবর্ষীয়ার ষোড়শী হবার প্রকৃতি সংযত করা যায় না এবং তারও অন্তরে যে আকুতি তা নিরুদ্ধ করা যায় না।

ঐ একই সমস্যার সঙ্গে জড়িত বহুবিবাহ এবং তারই পরিণতি এক পুরুষ থেকে বহুপুরুষে গতি। সেকালে সমাজের যে কাঠামো ছিল তাতে গণিকাবৃত্তির প্রসার ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু সর্বাংশে অবাঞ্ছিত। এরই একটি সমীক্ষা বেরিয়েছিল অমৃতবাজারের প্রথম সংখ্যায়; প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যসাবুদ নিয়ে একটি পরিপূর্ণ তদন্ত। ঢক্কানিনাদে রাষ্ট্রিক ঘোষণার তদন্ত নয়, বহু অর্থব্যয়ের বিরাট সেক্রেটারীয়েট নয়, অথচ সরেজমিনে জিজ্ঞাসাবাদের একটি পূর্ণাঙ্গ সমাজতত্ত্ব এই সমীক্ষাটি। রচনাটির শিরোনামা হচ্ছে 'বেশ্যাবৃত্তি'।

আর একটি রচনার নাম 'অন্তঃপুর-স্ত্রী'। বলাবাহুল্য, আমাদের শতবর্ষ প্রাচীন সমাজে অন্তঃপুরচারিণী স্ত্রীলোকের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মর্যাদা আদৌ সুখকর ছিল না। সবরকমেই তাদের মূক পশু অথবা অন্যান্য নিষ্প্রাণ আসবাবের মত মনে করা হত। পুরুষ সমাজেও বিশেষ লেখাপড়ার রেওয়াজ ছিল না বটে, মেয়েদের লেখাপড়া একেবারেই কল্পনাতীত ছিল (আজও আছে)। স্বামীর ধর্মই স্ত্রীর ধর্ম, এর মধ্যে কোন ব্যত্যয় ছিল না। কোনো প্রশ্নের অধিকার ছিল না—'সাবধান, গার্গী' এ যুগেই সত্য হয়ে উঠেছিল। সুতরাং, যে ক্ষেত্রেই বা যে পরিবারেই এই নিয়মের ভঙ্গ হত সেখানেই অভিশাপের তুমুল বর্ষণ হত। সমাজচ্যুতির দণ্ড হত। শিক্ষিতা মেয়েদের মেম বিবি খৃস্টান প্রভৃতি আখ্যায় পরিচয় করে রাখা হত; এমন কি বৈধব্যের একটা শাস্ত্রীয় হেতুও সমাজ পণ্ডিতেরা এর মধ্যে আবিষ্কার করেছিলেন।

কিন্তু বসন্ত-হেমন্ত-শিশির অপরিমেয় মনোবলে এই নিয়ম ভঙ্গ করেছিলেন। স্থিরসৌদামিনী এই কল্যাণকর পরিবর্তনে স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তাঁর কাছে স্ত্রীলোকে পত্র লেখে এটি ছিল এক আকস্মিক আবিষ্কারের মতো। তাই দেখে তাঁর মনেও লেখাপড়ার ইচ্ছে জাগে। পরিবেশ ছিল অনুকূল। ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী বসন্ত-হেমন্ত-শিশিরকুমারের সহোদরা তিনি, তাঁর শিক্ষা-গ্রহণের সঙ্কল্পপথে কোন বাধা ছিল না।

'প্রভাত হইলেই আমি পাঠশালায় গুরু-মহাশয়ের নিকট গিয়া বসিলাম, গুরু-মহাশয় আমাকে ক খ শিখাও। এই আমার প্রথম বিদ্যাশিক্ষা। তখন আমাদের দেশে মেয়েমানুষের লেখাপড়া করা একটা বিষম দোষের বিষয় ছিল। এমন কি, মেয়েমানুষ লেখাপড়া শিখিলে বিধবা হয় লোকের এই একটা বিষম ধারণা ছিল। আমি কিন্তু এ সমস্ত বাধাবিঘ্ন গ্রাহ্য না করিয়া পাঠশালায় প্রবেশ করিয়াছিলাম। দাদার প্রথম হইতেই আমাকে লেখাপড়া শিখাইতে ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তখন এ প্রথা প্রচলিত ছিল না বলিয়াই তিনি সাহস করিয়া এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে পারেন নাই। যাহা হউক, বাবা একথা শুনিয়া পরম সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। সেই সময়ে 'এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষা' বলিয়া একখানি



পুস্তক বাহির হইয়াছিল। বাবা কলিকাতা হইতে সেই পুস্তকখানি আমার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। ছয়মাসকাল গুরু-মহাশয়ের পাঠশালায় পড়িয়া লেখাপড়ার সমাপ্ত হইল।' (অমৃতবাজার ঘোষ পরিবার, স্থিরসোদামিনী, আষাঢ় ১৩২০, পৃঃ ২৭)

ঘোষ-ভ্রাতারা স্বগ্রামে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং তা মেয়েদের মধ্যে কি উৎসাহের সৃষ্টি করেছিল স্থির-সোদামিনী তারও একটি সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন। সুতরাং, অন্তঃপুরচারিণী মেয়েদের সমস্যাগুলো সম্পর্কে ঘোষভ্রাতারা এমনই সচেতন ছিলেন যে, প্রথম পত্রিকা প্রকাশের সুযোগে এ'রা এটি বিস্মৃত হতে পারেন নি।

প্রথম সংখ্যার পাঁচের পৃষ্ঠায় দেশ-বিদেশের নানাবিধ সংবাদ আছে এবং তার শিরোনামা হচ্ছে 'সংবাদাবলী', তখনও বিস্তার সংবাদ পরিবেষণ করতেন এবং সে সংবাদ অমৃতবাজারে স্থান পেত। একটি গ্রামের পত্রিকার মধ্যে কেবল বাংলা নয়, শুধু ভারতবর্ষ নয়, সমগ্র পৃথিবীকে সমাবেশ করতে কেবল তাঁরাই পারেন যাঁদের দৃষ্টিপথে কোন বাধা নেই; অথচ লোক-শিক্ষার জন্য যাঁরা সকল স্থান থেকে উপকরণ সংগ্রহে প্রস্তুত।

সরকারী কাজে নিয়োগ ও বদলির খবর আজ মাঝে মাঝে সংবাদপত্রে বেরোয়, যাকে বলা হয় গেজেটের খবর। এই রীতিটি দীর্ঘকালের, কিন্তু অন্যান্য সংবাদের প্রাচুর্যহেতু অনেক ক্ষেত্রেই এই রীতিটি পরিত্যক্ত হচ্ছে, বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলে কোন কোন নিয়োগ বা বদলি প্রকাশ করা হয়। কিন্তু সেকালে এই নিয়োগ ও বদলির যে তাৎপর্য ও গুরুত্ব ছিল তা আজ নেই। তখন রাজকর্মচারীদের মধ্যে শতকরা নব্বইজনই ছিলেন 'সাহেব', সাহেবদের গতিবিধি সম্পর্কে এক ধরনের এবং মুষ্টি-মেয় বাঙালীর নিয়োগ-বদলি সম্পর্কে আর এক ধরনের কৌতূহল থাকত। অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রথমাবধি এই সংবাদ বিস্তারিত বেরোত। সাহেব ও বাঙালী মিলিয়ে এই যে এক আমলাতন্ত্র গড়ে উঠেছিল তার প্রভাব ও প্রতিপত্তি পড়েছে তৎকালীন সমাজে— যে সমাজের নেতৃত্বে নীলকর ও জমিদারদের দ্বন্দ্ব চলছিল। নীলচাষী বিদ্রোহের পর নীলকরদের দাপট কিছু কমেছিল বটে কিন্তু তার জায়গায় এসেছিল জমিদার-আই সি এস-দের বিরোধ। এমন অনেক সাহেব আই-সি-এস এসেছিলেন যাঁরা নীলকরদের অত্যাচারে সায় দিতে পারতেন না এবং সাহেব হয়েও সাহেবদের বিরুদ্ধে লড়তেন, আবার অনেকে এসেছিলেন যাঁরা এদেশীয় জমিদারদেরও বন্ধু হতেন না, প্রজাদের রক্ষার নামে হোক বা জমিদারী প্রভৃত হ্রাসের জন্যেই হোক, ও'দের অস্তিত্ব বিশেষ বরদাস্ত করতেন না। এরই সংমিশ্রণে একটা বাঙালী সমাজ গড়ে উঠেছিল। নীলকরদের চাষী এবং তাগিদদার, লাঠিয়াল এদেশের; জমিদারদের প্রজা নায়েব গোমস্তা, পাইক বরকন্দাজ এদেশের; নীলকরেরা বিদেশী,, জমিদারেরা এদেশী; সাহেব ম্যাজিস্ট্রেট, জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট, দেশী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, সেরেস্তাদার, দারোগা-- এই হচ্ছে মোটামুটি সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক কাঠামো; এরই মধ্যে প্রাচীন আধুনিক সংস্কার সংঘর্ষে নতুন বৃত্তি ও শাসনের সমন্বয়ে আমাদের পূর্ব-পুরুষের বাঙালী সমাজ মন্থিত হয়ে উঠছে। নিঃসন্দেহে এ সমাজে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি আগ্রহের লক্ষ্য ছিল আই-সি-এস হবার, নিদেন ডেপুটি ম্যাজি-স্ট্রেট। ফলে, একটি বিশেষ শিক্ষিত সম্প্রদায় সাধারণ দেশবাসী, চাষী-কামার-কুমোর-ছুতোর-মাঝিমাল্লা প্রভৃতি বৃত্তির সাধারণ মানুষের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ও পৃথক হয়ে যেতে লাগল; সুতরাং, সাহেব রাজপুরুষদের পাশাপাশি এই দেশীয় রাজপুরুষেরাও জমিদার-প্রজার সমাজ থেকে দূরে এক পৃথক কক্ষে বিচরণ করতে লাগলেন।

বস্তুত, এই নতুন স্রোতের দিকে তাকিয়ে কারও কারও মনে কি রকম আশংকা জেগেছিল অমৃতবাজার পত্রিকায় তা প্রতিফলিত হয়েছিল। OUR DEPUTY MAGISTRATES এই শিরোনামায় লিখেছিলেন :

> "The late Hon'ble Dawarka Nath used to say that when he accepted the post which the Government bestowed upon him he considered himself a man lost to himself and his country — he sacrificed himself for the benefit of his country; he smothered his feelings and aspirations, smoothed all the prominence in his character and made himself into a machine in the hands of the Government". (June 25, 1874)

সুতরাং সেকালের "রাজকর্মনিয়োগ" সংবাদ বহুজনের প্রতীক্ষার বিষয় ছিল।

"বিবিধ" শিরোনামায় অসংখ্য উপভোগ্য স্যাটায়ার বেরিয়েছে অমৃতবাজার পত্রিকায় এবং তার আরম্ভ হয়েছে একেবারে প্রথম সংখ্যা থেকেই। প্রথম বছরের ৫ম সংখ্যায় একবার এই সম্পর্কে পত্রিকা লিখলেন :

'আমরা বিবিধ শিরোনামা দিয়া যাহা কিছু লিখি তাহা লইয়া মহা গোল উপস্থিত হইয়াছে। অনেকে বলেন যে; আমরা অনেক অত্যুক্তি করিয়া থাকি—কেহ কেহ বলেন যে, আমরা রচনা করিয়া মিথ্যা কথা লিখি—কেহ কেহ আবার তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছি বলিয়া মহা অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। এমতস্থলে আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে, এই স্তম্ভে আমরা যাহা কিছু লিখিয়াছি কি লিখিব, তাহা সমুদায় মিথ্যা, সম্পূর্ণ মিথ্যা, ও মিথ্যা ভিন্ন সত্য নহে, অতএব আমরা যদি ইংরাজদিগকে স্বার্থপর-অর্থপ্রিয়-সিম্পাঞ্জি বলি ও যবনতুল্য অত্যা-চারী বলি, কি এতদ্দেশীয়দিগকে অলস, অকর্মণ্য মেষ বলিয়া নিন্দা করি, তবে সর্ব-সাধারণ বুঝিবেন যে, সে সমুদায়ই মিথ্যা।"...

প্রথমাবধি নানা জায়গা থেকে 'প্রেরিত পত্র' অমৃতবাজার পত্রিকার এক বৈশিষ্ট্য ছিল। পত্রগুলো সুনির্বাচিত এবং এদের ভেতর দিয়ে বহুবিধ সমস্যাজড়িত বাংলা দেশের একটা বাস্তব চিত্র ফুটে উঠত। কোনো কোনো পত্র আবার ছন্দবন্ধ কবিতার আকারেও আসত, স্তোত্রাকারেও। তবে সামাজিক সমস্যাই এদের মধ্যে মুখ্য হয়ে উঠত।

বিজ্ঞাপনের মধ্যে প্রথম সংখ্যাটিতে ছিল অমৃতবাজারের নিজস্ব কিছু বিজ্ঞাপন শেষ পৃষ্ঠার, তাতেরে পৃষ্ঠা। একখানি বইয়ের বিজ্ঞাপন--সঙ্গীতশাস্ত্র, প্রথম ভাগ ৷৷০, নীলচন্দ্র ভট্টাচার্য, যশোর অমৃতবাজার।

এবং পত্রিকাটি—'যশোহর অমৃতবাজার অমৃতপ্রবাহিনী যন্ত্রে প্রতি বৃহস্পতিবারে শ্রীচন্দ্রনাথ রায় দ্বারা প্রকাশিত।'

কিন্তু যে রাজনৈতিক জিজ্ঞাসা অমৃত-বাজার পত্রিকায় চিরপ্রবাহমানা তারও সূত্রপাত এই প্রথম সংখ্যায় :

'১৮৬৭ সালের ইণ্ডিয়ান আডমিনি-স্ট্রেসন অ্যানালস ১ বলমে ৩৬৮ পৃষ্ঠায় রাজপুতনা রাজ্যশাসন প্রণালীর উল্লেখ করিয়া সংগ্রাহক ইহাই উক্তি করিয়াছেন 'যদিও রাজপুতনা অপেক্ষা আমাদের অধিনস্থ দেশ সর্বাংশে উত্তমরূপে শাসিত হইতেছে তত্রাচ বোধহয় সেখানকার প্রজারা এদেশস্থ প্রজাপেক্ষা অধিক সন্তোষ আছে, ইহার কারণ, বোধহয় যে বিদেশীয় অপেক্ষা স্বদেশীয় দ্বারা রাজ্য শাসিত হইলে মনুষ্য-মাত্র সন্তুষ্ট থাকে যে হেতু এটা মনুষ্যের স্বাভাবিক ইচ্ছা।' ওগো স্বার্থশূন্য রাজ-পুরুষেরা তোমরা তাহা কি জ্ঞাত আছ? জ্ঞাত আছ বই কি, সকল জান এটা জান না এমন বোধ (হয়) না, ফল অজ্ঞাত আছ তাহাই দেখান তোমাদের স্বার্থ।'

এই। এই সুর। ১৮৬৮ খৃস্টাব্দে এই সুরে কথা বলা কত কঠিন ছিল আজকের স্বচ্ছন্দ জীবনে তা ধারণারও অতীত। একশ' বছর আগে!

পঞ্চম জাম্বুরী



নিখিল ভারত পঞ্চম জাম্বুরীর অধিবেশন শুরু হয় কল্যাণীতে ২৭ ডিসেম্বর থেকে। 'জাতীয় সংহতি দিবস' দিয়ে এই জাম্বুরীর কর্মসূচি শুরু। ৩১ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতির 'স্কাউট ও গাইড' দিবস হয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি।

উপ-প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই জাম্বুরীর উদ্বোধন করে বলেছেন, স্বেচ্ছাসেবা ও আত্মশৃঙ্খলাবোধই নবীনদের জীবনের ক্ষেত্রে উদ্দীপিত করতে পারে।

তিনি আরও বলেছেন, জনগণের স্বেচ্ছাসেবা ও আত্মশৃঙ্খলা জাতিকে মহৎ করে তোলে। সুতরাং এক ঐক্যবদ্ধ জাতীয় সমাজ ও পরিণামে এক ঐক্যবদ্ধ পৃথিবী গড়ে তোলার জন্য যুব-সমাজকে স্বেচ্ছাসেবা ও আত্মশৃঙ্খলাবোধে উদ্দীপিত হওয়া উচিত।

উপ-প্রধানমন্ত্রী একটি মঞ্চে দাঁড়িয়ে জাম্বুরীর উদ্বোধন ঘোষণা করলে পাঁচবার পটকা বিস্ফোরণের দ্বারা এই ঘোষণাকে স্বাগত জানান হয়। একটি সামরিক জীপে উপ-প্রধানমন্ত্রী সমগ্র 'এরেনা'টি প্রদর্শন করেন।

ভারতের সব কটি রাজ্য ছাড়াও বারটি বিদেশী রাষ্ট্রের প্রায় ১১ হাজার তরুণ-তরুণী পশ্চিমবাংলায় প্রথম অনুষ্ঠিত এই জাম্বুরীতে অংশ গ্রহণ করেন। ভারত স্কাউট ও গাইডের সর্বভারতীয় সভাপতি স্যর চন্ডুলাল ত্রিবেদী উপ-প্রধানমন্ত্রীকে ও জাম্বুরীতে অংশগ্রহণকারী স্কাউটদের স্বাগত জানিয়ে এক ভাষণ দেন।

উপ-প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, তরুণদের মধ্যে স্বেচ্ছাসেবা ও আত্মশৃঙ্খলাবোধ আনবার ব্যাপারে ভারত স্কাউট অ্যান্ড গাইড অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। প্রতি স্কাউট ও গাইড যাতে ভবিষ্যতে জাতির সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে পারে সেইজন্য তাকে প্রতিদিন একটি করে কল্যাণমূলক করা উচিত। প্রতিদিন এই কাজের মধ্য দিয়ে স্কাউটদের স্বেচ্ছাসেবা, দেশসেবা ও আত্মশৃঙ্খলাবোধ জাগবে। তিনি আশা করেন যে, যে সকল স্কাউট জাম্বুরী শিবিরে আছেন তাঁরা শান্তিপূর্ণ জীবন ও সমাজ গড়ে তুলতে সাহায্য করবেন।

'সৌভ্রাত্র দিবস' ২৮ ডিসেম্বর নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের স্বামী লোকেশ্বরানন্দ হস্তশিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন।

'আন্তর্জাতিক দিবস' উপলক্ষ্যে রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর কল্যাণীর জাম্বুরী এরেনায় উপস্থিত হন। তিনি উপস্থিত তরুণদের স্কাউটদের আদর্শ, আত্মবিশ্বাস ও সংগঠনে উজ্জীবিত হতে আহ্বান জানান।

বিশ্বের অন্যান্য দেশের স্কাউটদের স্বাগত জানিয়ে শ্রীধর্মবীর আরও বলেন বিদেশী স্কাউটরা এই সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করার ফলে বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলির সঙ্গে ভারতবর্ষের আত্মিক যোগাযোগ বৃদ্ধি পাবে। পঞ্চম জাম্বুরীর সকল সদস্যকে তিনি আত্মত্যাগের দ্বারা দেশসেবার আদর্শ গ্রহণের আহ্বান জানান।

ঐ দিন জাম্বুরী এরেনায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য স্কাউট দল এক প্রদর্শনীর মাধ্যমে ভারতবর্ষের ইতিহাস, সমাজ, সভ্যতা ও আধুনিক জীবনের প্রতিফলন তুলে ধরেন। পশ্চিম রেলওয়ের তোজি-কা-চাঁদ থেকে শুরু করে নাগাভূমির প্রচলিত নৃত্যদৃশ্য পর্যন্ত স্কাউটদের পোশাক, সংগীত, মিছিল ইত্যাদি এক আকর্ষণীয় দৃশ্যের সৃষ্টি করে।

একটি বিশেষ মঞ্চে রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর ও ইউনিয়ন কার্বাইডের ম্যানেজিং ডাইরেক্টার শ্রীজে ডব্লিউ এং উপস্থিত ছিলেন। মাইকে ঘোষিত হচ্ছিল বিভিন্ন রাজ্য স্কাউট দলের প্রদর্শনীর বিষয়বস্তু। বিদেশী স্কাউটদের কাছে অখন্ড ভারতের এক সামগ্রিক দৃশ্য যেন চোখে পড়ছিল এই প্রদর্শনীতে। বাংলার উৎসবমুখর ঋতুবর্ণনা, উত্তরপ্রদেশের শিবজী-কা-বরাত, রাজস্থানের ঘুঙ্গোর, পাঞ্জাবের বিবাহ-মিছিল, উড়িষ্যার বরযাত্রা, নেফার বিবাহধারা, আসামের ঋতু-উৎসবকে উপস্থিত দর্শকবৃন্দ ঘন ঘন করতালিতে স্বাগত জানিয়েছেন। এই অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন শ্রীসুকমলকান্তি ঘোষ।

অন্যান্য দিনে রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকীর হোসেন, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ত্রিগুণা সেন, মেজর জেনারেল পি এস লাম্বা স্কাউটদের স্বেচ্ছাসেবা বিষয়েও বক্তৃতা করেছেন।

কল্যাণী স্টেশন থেকে তাকালেই চোখ পড়ে দূরে সারি সারি অজস্র তাঁবু। এক একটি সারির মোড়ে মোড়ে স্ট্যান্ডের সংগে স্কাউটদের নিজস্ব পতাকা। যতদূর চোখ যায় সারি সারি সুশৃঙ্খল তাঁবু আর তাঁবু। যেন স্কাউটদের আদর্শ ও নীতির প্রতীক : স্বেচ্ছাসেবা ও সৌভ্রাতৃত্ব।

—প্রতিনিধি



ক্যাম্প-ফায়ার প্রজ্বলন

অস্তমিত

Omkar nath Thakur 13-1-57

সঙ্গীত মার্তণ্ড



১৯৬৩ সলের সদারঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন। সমাপ্তি রজনীর সারারাত্রিব্যাপী অনুষ্ঠান শেষে ভোরের লগ্ন। আসরে বসলেন পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ। পরিবেশন করলেন "দেবগিরি"। সদ্যস্নাত পরণে সেই রাজকীয় জোব্বা। প্রসন্ন প্রশান্ত দীপ্তি। মনে হোল যেন কোন ঋষি বসেছেন তপস্যায়। 'তপস্যা'ই বটে। বয়সের বাধা, শারীরিক অসুস্থতা বিদীর্ণ করে আবেগদীপ্ত মধুর কণ্ঠ থেকে যে সুর মুক্ত হোল, ওজস্বিতা, তেজ ও শক্তি, গৌরবে তা যেন যৌবনকে হার মানায়।

রসিক কবি ওঙ্কারনাথ এক একবার অল ইণ্ডিয় মিউজিক কনফারেন্সে "কোমল আশাবরী"—গেয়েছিলেন তখনই ভোরের লগ্নে। এমন কোনো শ্রোতা ছিলেন না কোমল কারণ্যে যাঁর চোখ দিয়ে জল গড়ায়নি।

ওঙ্কারনাথজীর গায়কীর বৈশিষ্ট্যই ছিল এই। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সকল তাত্ত্বিক ভাব ছিল তাঁর মুঠোয়। স্বরশ্রুতির সূক্ষাতিসূক্ষ্ম অংশ তাঁর অতুলনীয় স্বরবৈভবে সঙ্গীতশাস্ত্রের পাণ্ডিত্যে তিনি শ্রুতকীর্তি কিন্তু গাইতে বসলেই সব জ্ঞান পাণ্ডিত্যের আবরণ ভেদ করে তাঁর অন্তরের ধ্যানী, স্রষ্টা যেন কথা বলে উঠতেন। রাগের মর্মভাব যেন সরল লালিত্যে, তাঁর কাছে ধরা দিত। তার সেই ভাব তিনি পরতে পরতে সঞ্চারিত করতেন শ্রোতাদের মর্মমূলে। 'এই সহৃদয়-হৃদয়সংবেদ্যতাই তাঁর গায়কীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। আর এক বৈশিষ্ট্য হোল 'হিন্দুয়ানী'। তিনি ভারতীয়, হিন্দু এবং ব্রাহ্মণ। অপরিহার্য অংশের মত এই তিনের গৌরব তিনি অন্তরে সযত্নে লালন ও করতেনই। তার সঙ্গে মিশেছিল তাঁর বংশগত রাজপুত শৌর্য। এই ভাবসম্পদ, পাণ্ডিত্য ও ধ্যান এই তিনের সম্মিলনেই হলেন ওঙ্কারনাথ। তাই দেখছিলাম ওঙ্কারনাথ পণ্ডিত, সাধক, শিল্পী সবই সত্য। কিন্তু সকলের চেয়ে বড় সত্য যে তিনি রসিক স্রষ্টা। সরগমের চক্রজাল এবং টেকনিকের কাঠিন্য দুঃসহ অন্তর্বেগে চূর্ণ করে রসের বন্যা প্রবাহিত করবার দুর্লভ শক্তির অধিকারী। তার এই প্রেরণার শক্তিধারণ করতেন বলেই তিনি স্রষ্টা।

ভাবুক শিল্পীর সেই সঙ্গীতমুখর কণ্ঠ চিরদিনের জন্য নীরব হয়ে গেল—এই সংবাদ যখন ছড়িয়ে পড়ল ভারতের এক প্রান্ত থেকে তার এক প্রান্ত অবধি—মনে হোল মহাকাল 'বুঝি' ক্ষণিকের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল। সেই ঋষিতুল্য শিল্পীর উদাত্ত কণ্ঠে সেই উচ্ছল 'আধ্যাত্মিক' ধ্বনি আর বাজবে না। "যোগী মত যা"র উদাস রেশে আর কোন সঙ্গীতাসরের ভোরের সভায় রাত্রিজাগরণক্লিষ্ট শ্রোতাদের অন্তরে আর শান্তিবারি সিঞ্চিত হবে না। নাম ও কর্ম ধ্যান ও স্বপ্নের মহামিলনদীপ্ত ওঙ্কারনাথের সম্মোহনকারী ব্যক্তিত্বের কাছে আর মাথা নোয়ানোর সুযোগ ঘটবে না। এ ক্ষতির কোনো সান্ত্বনা আছে কি?

ওঙ্কারনাথের জীবনীতেই তাঁর সঙ্গীতবৈশিষ্ট্যের বীজ সুপ্ত। বরোদা স্টেটের ক্যাম্বে ডিস্ট্রিক্টে ঝাঝাগ্রামে পণ্ডিত ওঙ্কারনাথের জন্ম। গুজরাটের এক গ্রাম তাঁর আপন দেশ। রাজপুত শৌর্যের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যব্যাপী ওঙ্কারনাথের মধ্যে তাই যেমন তাঁর দেশপ্রেম ছিল উজ্জ্বল, তেমনি ছিল অনমনীয় আত্মসম্মান। ব্রাহ্মণ্যধর্মের সঙ্গে ক্ষাত্রতেজের সমন্বয় এই পরিবারের জন্মগত সম্পদ। তাঁর পিতা পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর ঠাকুর ছিলেন বরোদাস্টেটের মহারাণী যমুনাবাঈয়ের রাজত্বকালের বীর যোদ্ধা। উত্তরকালে আলুখীবাবা নামে এক সাধুর সংস্পর্শে এসে জীবনের ধারা বদলে গেল। তিনি হলেন প্রণবো সাধনার সাধক। ঠিক এই সময়েই জন্ম হওয়ায় পুত্রের নাম রাখেন ওঙ্কারনাথ। পিতা পারমার্থিক সাধনায় রত সুতরাং জাগতিক সম্পদে অনাসক্তি। তারই ফলশ্রুতি ওঙ্কারনাথের অসহনীয় দারিদ্র্য ও সংগ্রামের মধ্যে শৈশব ও কিশোর যাপন।

১৯১০ খৃঃ ওঙ্কারনাথের মনের কোণে এল আজন্মলালিত গোপন বাসনা সফলের মাহেন্দ্রলগ্ন। পিতার মৃত্যুর পর পণ্ডিত বিষ্ণু দিগম্বরের গান্ধর্ব মহাবিদ্যালয়ে যোগদান এই যোগীগুরুর শিষ্যত্বগ্রহণ ও অল্পদিনেই অক্লান্ত পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও অসাধারণ প্রতিভায় সঙ্গীতশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন। ১৯১৬ খৃঃ লাহোরে গন্ধর্ব মহাবিদ্যালয় অধ্যক্ষপদে গুরু তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

ভারতীয় সঙ্গীতের আচার্যরূপে তিনি স্বীকৃত হলেন সারা ভারতে তাঁর "গ্র্যাজুয়েটের কোর্স" রচনা করে। এই যুগান্তকারী সৃষ্টি ছাড়াও 'সঙ্গীতাঞ্জলি' নামে ছয় খণ্ড পুস্তক এবং 'প্রণবভারতী' প্রকাশন সঙ্গীতজগতে তাঁর অমূল্য অবদান। প্রতিভাবান নাট্যস্রষ্টা ও পরিচালকরূপে তাঁর উজ্জ্বল কীর্তি হোল 'কমায়নী ও 'কামনা'। সারা উইরোপে, তিনি চারবার সাংস্কৃতিক সফর শুধু করেননি, ওদেশের প্রতিটি মুগ্ধ শ্রোতাদের মনে ভারতীয় সঙ্গীতের আধ্যাত্মিক ছাপ মুদ্রিত করে এসেছেন।

নেপাল ও আফগানিস্থানও তাঁর সঙ্গীতে বিজিত। ওঙ্কারনাথ বিশ্বশান্তি পরিষদের সভ্য, সর্বভারতীয় শান্তি পরিষদের চেয়ারম্যান, ভারতীয় আফ্রো-এশিয়ান সলিডারিটির ভাইস-চেয়ারম্যান সঙ্গীত-নাটক আকাদামির সভ্য।

অসংখ্য সম্মানভূষিত পণ্ডিত ওঙ্কারনাথের কয়েকটি বিশেষ উপাধি ছিল—(১) ভারত সরকার প্রদত্ত পদ্মশ্রী, (১৯৫৫), সরকারী সংস্কৃত কলেজ প্রদত্ত সংগীতমার্তণ্ড (১৯৪০), নেপালরাজ প্রদত্ত সঙ্গীত মহামহোপাধ্যায় (১৯৩০), বেনারসের বিশুদ্ধ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীতসম্রাট (১৯৪৩)।

বেনারসে মিউজিক ও ফাইন আর্টস কলেজের তিনিই প্রথম অধ্যক্ষ এবং এই পদে ১৯৫০ থেকে ১৯৫৭ অবধি অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সময়েই তিনি ডীন অফ দি ফ্যাকালটি অফ মিউজিক অ্যান্ড আর্টস উপাধিভূষিত হন।

পণ্ডিতজীর গাওয়া প্রসিদ্ধ রাগ ছিল ললিত ভৈরববাহার, স্বরচিত প্রণবোঙ্কার, দেবগিরি, মালকোষ, দরবারী কানাড়া, বাগেশ্রী-কানাড়া, কোষি-কানাড়া।

—সন্ধ্যা সেন

ফাদার ঘনশ্যামের রোমাঞ্চ কাহিনী

উড়ুক্কু মাছের গান

অদ্রীশ বর্ধন

দূর থেকে দেখলে মনে হবে যেন ঝিলমিলে কতকগুলো সোনালী মাছ হেলছে আর দুলছে বিরাট একটা কাঁচের বর্তুলের মধ্যে।

কাছে এলেই ভুল ভাঙে। দেখা যায় মস্ত একটা কাঁচের ফানুস। দিশি কাঁচ নয়, দুষ্প্রাপ্য ভেনিসিয়ান কাঁচ। ঠুনটুনে পাতলা; ফিকে গোলাপী রঙের আভা তার মধ্যে। বিচিত্র সুন্দর এই গোধূলির রক্তাভার মধ্যে দিয়ে ফানুসের মধ্যে সত্যিই হেলছে আর দুলছে কতকগুলো মাছ। সোনালী মাছ।

জীবন্ত নয়; কৃত্রিম। শুধু সোনালী নয়, সোনার। খাঁটি আর নিরেট সোনার। চোখের জায়গায় বসানো মূল্যবান চুনী। রক্তাভ ভেনিসিয়ান কাঁচের ফানুসের যাদুতে তা আশ্চর্য উজ্জ্বল।

কোন্ নৃপতির খেয়ালে কিম্ভুত-কিমাকার এই মৎস্যকুলের সৃষ্টি, শিল্পীই বা কে, তা জানা যায় না। অনেক হাতবদলের পর মহীশূরের এক কিউরিও শপ থেকে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে বস্তুটি সংগ্রহ করেন সারদাচরণ মিত্র।

সাজিয়ে রাখেন আপন সংগ্রহশালায়। দেশবিদেশের কতশত চমকলাগানো বস্তুর মধ্যে এটিও স্থান পায়।

শখের সংগ্রহশালা। কিন্তু সংগ্রহগুলি স্যালারজঙ্গ বা রাজারাজড়ার মিউজিয়ামের সংগ্রহকেও ম্লান করে দেয়।

সব সংগ্রহের সেরা সংগ্রহ ছিল এই সোনার মাছ। যে এসেছে, সে-ই তারিফ করেছে। বিমুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে থেকেছে, মোহাবিষ্ট অন্তরে প্রশান্তি পেয়েছে। আর বারবার সারদাচরণকে হুঁশিয়ার করেছে, এমন একটি বস্তুকে যেন আরও নিরাপদে রাখার ব্যবস্থা করা হয়।

সারদাচরণ কিন্তু প্রতিবারেই হেসেছেন। বলেছেন, তাঁর সংগ্রহশালায় হানা দেবার মত শৌখীন চোরের অভাব আছে এদেশে।

কিন্তু অচিরেই তাঁর ভুল ভাঙল। হাসিও মিলালো।

সোনার মাছরা উধাও হল তার সংগ্রহ-শালা থেকে। এবং সমস্ত ঘটনাটি ঘটল রীতিমত অলৌকিকভাবে।

অবশেষে সেই বিচিত্র প্রহেলিকার সমাধান করল ফাদার ঘনশ্যাম মণ্ডল।

সেই কাহিনীই শোনাই এবার।



রাঁচী শহরের উপকণ্ঠে একটি বর্গাকার তৃণভূমির একদিকে সারদাচরণের সংগ্রহশালা এবং বাসগৃহ। বর্গক্ষেত্রের প্রায় পুরো দাক্ষিণদিকটা জুড়ে তাঁর বাড়ী—এক কোণে একটা টালির শেড দেওয়া একটা ভিলা। রিটায়ার্ড কর্নেল সিংহ থাকেন সেখানে। একটা পা তাঁর নেই, সুতরাং ভিলা থেকে বেরোন না।

বর্গক্ষেত্রের পূর্বদিকে গুটিতিনেক দোকান। ছোট্ট গ্রামটির চাহিদা মেটাবার পক্ষে তা যথেষ্ট। এক কোণে হোটেল হিন্দুস্থান। হোটেলে সে সময় আস্তানা নিয়েছিলেন কলকাতার নামী ব্যাংকার ঊষাকিংকর মল্লিক। ঊষাকিংকর প্রৌঢ়, স্বল্পভাষী, এবং অতিশয় বিচক্ষণ।

বর্গক্ষেত্রের উত্তরদিকে সারি সারি তিনটি পাকা বাড়ী। একটি ভাড়া নিয়েছেন কুমারবাহাদুর জয়সিং জয়সওয়াল। দ্বিতীয়টি নিয়েছেন ডক্টর অশোক মিত্র—স্বনামধন্য পদার্থবিজ্ঞানী। তৃতীয়টি তালাবন্ধ—শূন্য।

বর্গক্ষেত্রের পশ্চিমদিকে ব্যাংক। পাশেই ব্যাংকের ম্যানেজার গিরিশ সাহার কোয়ার্টার আর গ্যারেজ।

বর্গক্ষেত্রের চারিপাশে মাইলের পর মাইল জুড়ে ধু-ধু শূন্যতা। তারই মাঝে চতুষ্কোণ তৃণ-সবুজ এই লোকালয়টি। যেন বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন মহাশূন্যের মাঝে ভাসমান একটি সবুজ গ্রহ।

সেই কারণেই ছোট্ট গাঁয়ের মুষ্টিমেয় কয়েকজন প্রতিবেশীর মধ্যে মনের অমিল নেই। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের অন্তরঙ্গ। দেখা-সাক্ষাৎ রোজই হয় সারদাচরণের বৈঠকখানায়। গানবাজনাও চলে। সংগীতে অংশগ্রহণ করেন ব্যাংক ম্যানেজার গিরিশ সাহা। ভদ্রলোক কণ্ঠসংগীতে ও বেহালাবাদনে সমান পারদর্শী। কিন্তু আলোচনা যা দিয়েই শুরু হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত তা সোনার মাছের প্রশস্তিতে এসে ঠেকে এবং তখনি বোঝা যায় সযত্নে সঞ্চিত এতগুলি কিউরিওর মধ্যে সোনার মাছ সারদাচরণের কতখানি প্রিয়।

সেদিন দুপুরের দিকেই আড্ডা বসেছিল। আসরে উপস্থিত ছিলেন একজন নবাগত। ভদ্রলোক এসেছেন বোম্বাই থেকে।

হাওড়া কুষ্ঠ কুটির

৭২ বৎসরের প্রাচীন এই চিকিৎসাকেন্দ্রে সর্ব-প্রকার চর্মরোগ, বাতরক্ত, অসাড়তা ফুলা, একজিমা, সোরাইসিস, দূষিত ক্ষতাদি আরোগ্যের জন্য সাক্ষাতে অথবা পত্রে ব্যবস্থা লউন। প্রতিষ্ঠাতা : পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা কবিরাজ, ১নং মাধব ঘোষ লেন খুরুট, হাওড়া। শাখা : ৩৬ মহাত্মা গান্ধী রোড কলকাতা—৯। ফোন : ৬৭-২৩৫৯

জাতিতে ইহুদী। নাম, জুডা। মিঃ এইচ জুডা। উদ্দেশ্য, সারদাচরণের বিখ্যাত সোনার মাছ স্বচক্ষে দেখা এবং যদি সম্ভব হয়, দরদস্তুর করা। জুডার ব্যবসাই হল তাই। বিশাল ভারতের অতি গণ্ডগ্রাম থেকে জলের দামে কিনে আনেন বিচিত্র দুষ্প্রাপ্য বস্তু এবং চড়া দামে বিক্রি করেন বিদেশী টুরিস্টদের কাছে।

জুডাকেও যথারীতি স্বর্ণমৎস্যের খানদানী মহিমা শুনিয়ে দিলেন সারদাচরণ। তারপর হৃষ্টকণ্ঠে বললেন, "সবাই বলে আমার নাকি আরও সাবধান হওয়া দরকার। দরজার খিল--টিলগুলো ঠিকমত লাগানো দরকার। আরে মশাই, তাহলে তো বাড়ীটা একটা কেল্লা হয়ে গেল। এই তো মান্ধাতা আমলের ভিটে, সদর দরজার হুড়কো লাগালেই বা কি না লাগালেই বা কি? কি বল হে গৌরাঙ্গ?"

গৌরাঙ্গ অর্থাৎ সারদাচরণের সেক্রেটারী পাশেই কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ দাঁড়িয়ে ছিল একগাদা কাগজপত্র হাতে নিয়ে। কর্তার কথা শুনে কিঞ্চিৎ হে-হে করে চুপ করল। মাস ছয়েক আগে চাকরীতে বহাল হওয়ার পর থেকেই সারদাচরণের 'এলানে' স্বভাব নিয়ে প্রথম থেকেই হুঁশিয়ার করে আসছে গৌরাঙ্গ। কর্তার পুরোনো বাজার-সরকার বুড়ো নিতাইচরণও উঠতে-বসতে খিট-খিট করছে। এমন কি বুড়ি পিসি গিরিবালাও সকাল সন্ধ্যে এই নিয়ে গজ-গজ করছেন। কিন্তু তবুও চৈতন্য হয় না সারদাচরণের।

কুমারবাহাদুর জয়সিং জয়সওয়াল দাঁতের ফাঁকে একটা হ্যাভানা চুরুট রেখে স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে তাকিয়েছিলেন কড়িকাঠের দিকে। সেই 'পোজে' থেকেই—স্বপ্নকথা বলার মত বললেন গুরুগম্ভীর কণ্ঠে, "পৃথিবীর সেরা হুড়কো দিয়েও সবসময়ে সব চোরকে আটকে রাখা যায় না। শুনেছি মোগল আমলে এক সাধু তিন-তিনটে সৈন্যবাহ ভেদ করে সুলতানের উষ্ণীষ থেকে গজমোতি নিয়ে চলে এসেছিলেন, কিন্তু কেউ তাঁকে দেখতে পায়নি।"

বিরস বদনে নীরস স্বরে বললেন ডক্টর অশোক মিত্র, "আধুনিক বিজ্ঞান এসব ভোজ-বিদ্যার অনেক বুজরুকি ধরে ফেলেছে। সম্মোহনে কিনা হয়।"

অবিচলকণ্ঠে কুমারবাহাদুর বললেন, "কিন্তু সাধুকে একই রকম দেখতে একশটি তাঁবুর মধ্যে থেকে সুলতানের তাঁবু চিনে বার করতে হয়েছে।"

"টেলিপ্যাথিতে সবই সম্ভব।" কাটা-কাটা স্বরে জবাবটা নিক্ষেপ করলেন ডক্টর মিত্র। "বিশেষ করে ভারতের মত কুসংস্কারাচ্ছন্ন দেশে।"

ব্যংগটা গায়ে মাখলেন না কুমারবাহাদুর। নির্বিকার মুখে বললেন, "ভারত ছাড়াও অলৌকিক ঘটনা ঘটে। কায়রোর আধুনিক ইংলিশ ব্যারাকে বেশ কয়েক বছর আগে এমনি একটা অপ্রাকৃত ঘটনা ঘটেছিল। লোহার রেলিংয়ের ভেতরে একজন শান্ত্রী দাঁড়িয়েছিল বন্দুক হাতে—চোখ ছিল রাস্তার দিকে। হঠাৎ সে দেখল রাস্তায় দাঁড়িয়ে একজন ভিখিরী। কৌপিনধারী, খালি পা। লোকটা খাঁটি ইংরেজিতে শান্ত্রীকে বললে, ব্যারাকের মধ্যে অমুক জায়গায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা দলিল কড়া পাহারায় রাখা হয়েছে। সেটি যেন এখুনি তাকে এনে দেওয়া হয়। শান্ত্রী হুংকার দিয়ে বললে, 'খবরদার ভেতরে এস না।' মোলায়েম হেসে লোকটা বললে, 'ভেতর কাকে বলে? বাইরে কাকে বলে?' শান্ত্রী তখনও রক্তচক্ষু মেলে তাকিয়েছিল। আচম্বিতে তার খেয়াল হল সে তখনও তাকিয়ে আছে বটে, কিন্তু ভেতর থেকে বাইরে নয়—বাইরে থেকে ভেতরে। রেলিংয়ের ভেতরে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা, আর সে দাঁড়িয়ে রাস্তায়। লোকটা আবার হাসল। বলল, 'ভেতর কাকে বলে? বাইরে কাকে বলে?' কথাটার মানে ভাল করে বোঝবার আগেই শান্ত্রী দেখল সে রেলিংয়ের ভেতরেই দাঁড়িয়ে। লোকটা দাঁড়িয়ে বাইরে—রাস্তায়। এবার তার হাতে রয়েছে একটা কাগজ—সেই মূল্যবান দলিলটা।"

শেষ হল গল্প। সবাই নীরব। এমন কি পদার্থবিজ্ঞানী ডক্টর অশোক মিত্রও সেই মুহূর্তে বিদ্রূপতীক্ষ্ণ কোনো মন্তব্য খুঁজে পেলেন না।

কাঠের পুতুলের মতো ঠায় দাঁড়িয়েছিল সারদাচরণের সেক্রেটারী। হঠাৎ সেদিকে নজর পড়তেই নৈঃশব্দ ভঙ্গ করে সারদাচরণ জিজ্ঞেস করলেন, "কি ব্যাপার?"

"কতকগুলো চিঠি সই করতে হবে।"

"নিয়ে এস।"

*

ঘণ্টাখানেক পরের কথা।

একে একে বিদায় নিয়েছেন সব প্রতিবেশী—একজন ছাড়া। ব্যাংক ম্যানেজার গিরিশ সাহা বসেছিলেন কোণের সোফায়। অপর কোণে দাঁড়িয়ে সেক্রেটারী গৌরাঙ্গ আর বাজার-সরকার নিতাইচরণ।

সারদাচরণ বললেন, "নিতাই, গৌরাঙ্গ, তোমরা শোন। আজ তোমাদের ওপর একটা গুরুদায়িত্ব দিয়ে যাচ্ছি। এখন পাঁচটা বাজে। সন্ধ্যের ট্রেনে আমি আর গিরিশবাবু একটু বেরোচ্ছি। ফিরব কালই। এই একটা রাত আমার সোনার মাছের ভার রইল তোমাদের ওপর।"

"সোনার মাছ!" একই সঙ্গে চমকে উঠল গৌরাঙ্গ ও নিতাইচরণ।

"হ্যাঁ। এস আমার সঙ্গে। গিরিশবাবু, আপনিও আসুন।"

সারদাচরণের পিছু পিছু তিনজনে উঠে এলেন দোতলার বারান্দায়। বারান্দার ঠিক মাঝের ঘরটিতে ঢুকলেন। ঘরের চার-দেওয়ালে এবং মেঝেতে সাজানো বিস্তর কিউরিও। কিন্তু সোনার মাছ এ ঘরে থাকে না—থাকে এ ঘরের ভেতরেই আর একটি ঘরে। সারদাচরণ একাধারে পাকা অভিনেতা এবং অতিশয় হুঁশিয়ার মানুষ। সেকেলে দরজার পুরোনো হুড়কোর ওপর তাঁর বিশ্বাস নেই--বিশ্বাস নিজের ওপর। তাই ঘরের মধ্যে ঘর সৃষ্টি করেছেন সোনার মাছের জন্য। বারান্দা দিয়ে সামনের ঘরে ঢুকলে আরও দুটি ঘর দেখা যায়। একটি ডাইনে—ছোট্ট ঘর। এ ঘরেই রাত্রে বালিশের

নীচে রিভলবার নিয়ে শয়ন করেন সারদাচরণ। আর একটি ঘর বারান্দা দিয়ে ঢুকেই সামনে পড়ে।

এই ঘরেই সদলবলে প্রবেশ করলেন সারদাচরণ। ক্ষুদ্র একটি প্রকোষ্ঠ। জানলা নেই, ঘুলঘুলি নেই। সুইচ টিপতেই অত্যুজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোয় ঝলমল করে উঠল গোটা ঘরটি। ঘরের কেন্দ্রে একটি নিচু তিনপায়া টেবিল। টেবিলের ওপর রক্ষিত ঈষৎ রক্তাভ ভেনিসিয়ান কাঁচের ফানুস। ফানুসের মধ্যে ঝুলছে কাঞ্চন-মীনবাহিনী--যাদের অক্ষিকোটরে রয়েছে চুনীর চক্ষু এবং সেই কারণেই দ্যুতিময়।

অপরূপ দৃশ্য। সারদাচরণের ঘাড়ের ওপর দিয়ে একদৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন ব্যাংক ম্যানেজার গিরিশ সাহা। ফসফরাসের মত জ্বলতে লাগল তাঁর দুই চোখ।

সারদাচরণ নির্দেশ দিলেন, রাতে এই ঘরেই শয়ন করবে নিতাইচরণ।

ফস করে গিরিশ সাহা বললেন—"আপনার যদি রিভলবার থাকে তো এঁদেরকে দিয়ে গেলে পারতেন।"

প্রস্তাবটার কোনো জবাব দিলেন না সারদাচরণ।

*

ঘটনাটা ঘটল সেই রাতেই।

মাঝের বড় ঘর আর শোবার ঘরের মাঝে দরজা খোলা রেখেই শুয়েছিল নিতাইচরণ। গৌরাঙ্গ শুয়েছিল মাছের ঘরের সামনে। এ ঘরে দরজার বালাই নেই। তাই উন্মুক্ত প্রবেশপথের সামনেই ফোল্ডিং ক্যাম্পখাট পেতে নিয়েছিল গৌরাঙ্গ। বালিশের নীচে রেখেছে রিভলবার। সারদাচরণের রিভলবার। বিস্তর কাকুতিমিনতি করে মনিবের কাছ থেকে নিকষ মারণাস্ত্রটি সংগ্রহ করেছে জোয়ান সেক্রেটারী।

নিতাইচরণ বুড়ো মানুষ। ঘুম আসে দেরীতে। এলেও গাঢ় হয় না। তাই নাসিকা-গর্জনের সংগে সংগে বিবিধ স্বপ্নদর্শন করে চলল নিতাইচরণের ভীরু মন। অপরাহ্ণে কুমারবাহাদুর বর্ণিত অলৌকিক চৌর্য-কাহিনী শাখাপ্রশাখা মেলে ছড়িয়ে পড়েছিল অবচেতন মনে। তাই ভাসা ভাসা ছাড়া ছাড়া কত ভয়াবহ স্বপ্নই না দেখল নিতাইচরণ।

আর, তার পরেই বহুদূর থেকে, স্বপ্ন-লোকের ওপার থেকে তার কর্ণরন্ধ্রে ভেসে এল কার সুরেলা সংগীত!

কে যেন গান গাইছে। যেন অনেক চেনা কিন্তু তবুও অচেনা সেই কণ্ঠস্বর। মধুর, কিন্তু রহস্যময় সেই সঙ্গীত। হৃদয়ের সমস্ত কান্না কে যেন উজাড় করে দিয়েছে সেই সঙ্গীতের মধ্যে। অন্যলোক থেকে ভেসে আসা সেই অপার্থিব সঙ্গীত শুনতে শুনতে রোমাঞ্চিত হল নিতাইচরণ, শিহরন জাগল প্রতিটি রোমকূপে।

কিন্তু তবুও স্তব্ধ হল না রোমাঞ্চকর সেই সঙ্গীত; মায়াবী ঊর্ণনাভের বিস্তৃত মায়াজালের মতই তনু মনকে অবশ করে তুলল স্বপ্নকুহেলীর মায়াসঙ্গীত।

মাটির সীমানা ছাড়িয়ে,
সাগরের নীল পেরিয়ে
মীন বিহঙ্গ মম আসবে পাখনা ছড়িয়ে—
যে সুরে মাধুরী ধ্বনিতে
তন্দ্রা গিয়েছে হারিয়ে
মর্ত নয় সে ভূলোক,
সে যে......

ধড়মড় করে উঠে বসল নিতাইচরণ। দেখল গৌরাঙ্গর ঘুম আগেই ভেঙেছে। বারান্দার বন্ধ দরজার পাশেই গরাদ দেওয়া জানলায় দাঁড়িয়ে সামনের উঠোনে কাকে যেন দেখছে।

তারপরেই হেঁকে উঠল গৌরাঙ্গ, "কে? কে ওখানে?"

ভীতকম্পিত কণ্ঠে নিতাইচরণ বললে—"কি হয়েছে গৌরাঙ্গবাবু?"

চকিতে ঘুরে দাঁড়াল গৌরাঙ্গ।

বলল, "কে যেন ঘুর ঘুর করছে রাস্তায়। গতিক সুবিধে মনে হচ্ছে না। যে যাই বলুক, আমি চললাম।"

"কোথায়?"

"সদর দরজায় হুড়কো দিয়ে আসি। সাবধানের মার নেই।"

বলতে বলতেই বেগে অন্তর্হিত হল গৌরাঙ্গ। দরজা খুলেই বারান্দা দিয়ে ছুটে গিয়ে হুড়মুড় করে নেমে গেল সিঁড়ি বেয়ে। অচিরেই ঝনাৎ শব্দ শুনল নিতাইচরণ। সদর দরজা খিল তুলে দিল গৌরাঙ্গ।

ভয় পেয়েও বারান্দায় বেরিয়ে এল নিতাইচরণ। আকাশে শুক্লপক্ষের দ্বাদশীর চাঁদ। ফিকে চন্দ্রকিরণে মায়াময় ধরিত্রী। সবুজ তৃণভূমিতে সে মায়া বুঝি আরও প্রকট আরও ভয়াবহ।

বিচিত্র এই পরিবেশে আশ্চর্য এক দৃশ্য দেখল নিতাইচরণ।

দেখল এবং ভাবল বুঝি এখনও স্বপ্নের ঘোর কাটেনি।

সবুজ তৃণভূমির ওপর দিয়ে যে সংকীর্ণ পথটা ছোট্ট গাঁয়ের মধ্যে থেকে বেরিয়ে বাইরের ধু ধু মাঠের দিকে গিয়েছে, অকস্মাৎ সেই পথের মাঝে আবির্ভূত হল এক ছায়ামূর্তি।

চাঁদের আলোয় কিছু দেখল, আর কিছু অনুমান করে নিতে হল। তনুদেহ মূর্তি দীর্ঘকায়। মাথায় বিশাল পাগড়ি। সমুদ্রের মত নীলাভ পাগড়ির রঙ। সমুদ্র-নীল বস্ত্র-খণ্ড শুধু মাথাই আবৃত করেনি, গালের ওপর দিয়ে নেমে চিবুক ঘিরে পিঠের ওপর এলিয়ে পড়েছে। ফলে, যেখানে মুখ থাকার কথা, সেখানে একতাল অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। পুঞ্জীভূত এই অন্ধকাররাশি হেঁট হয়ে ছিল হাতে ধরা অদ্ভুতদর্শন একটা বাদ্যযন্ত্রের ওপর। কিম্ভূতকিমাকার যন্ত্রটি রুপো অথবা ইস্পাতে তৈরী; আকারে ভাঙাচোরা বেহালা বা গীটারের মত। শ্বেতবস্ত্রাবৃত নগ্নপদ এই ভৌতিক মূর্তিই পায়ে-পায়ে এগিয়ে আসছিল বারান্দার দিকে। রুপোর চিরুনির মত একটা কিছু দিয়ে আলতো ঘা দিচ্ছিল বাদ্যযন্ত্রের তারে--সংগে সংগে যেন গুমরে গুমরে উঠছিল আকাশ আর বাতাস।

বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে আতংকে নীল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল নিতাইচরণ। এ কী নিছক স্বপ্ন? না, কুমারবাহাদুর বর্ণিত অলৌকিক শক্তিধর কোনো মায়াবী মানুষ?

অশরীরীর অশ্রুর মতই আবার গুঙরে উঠল সেই সুর, আর সেই গান:

যবে বিহঙ্গ-কনক কিশলয়ে ভেসে যায়
মম যূথ-মীন-সোনালী
আমারেই ফিরে চায়
আমারেই তারা চায়......

একটা ভয়ংকর সন্দেহ কিলবিল সরীসৃপের মতই পেঁচিয়ে ধরল নিতাই-চরণের অন্তরকে।

তাই আর ঠুঁটো জগন্নাথের মত দাঁড়িয়ে না থেকে হেঁকে উঠল ত্রাসকম্পিত বিকট স্বরে, "কে? কে ওখানে?"

"আমি...সোনার মাছেদের প্রভু!"

"কি চাই তোমার?"

"সোনার মাছেদের।"

"না...না...না...যাও, যাও এখান থেকে!"

"শুধু হাতে যাওয়ার জন্যে তো আমি আসিনি। আমি এসেছি আমার সোনার মাছেদের নিয়ে যেতে। আমার ডাক তারা শুনেছে......ওরা আসছে......আসছে......আসছে...!"

বলার সংগে সংগে হাতের বিচিত্র তারের যন্ত্রে রুপোর চিরুনি দিয়ে জোরে আঘাত করল আগন্তুক। এবার আর গুঙিয়ে ওঠা নয়, যেন ককিয়ে কেঁদে উঠল বাদ্যযন্ত্র। তীক্ষ্ণ তীব্র শব্দলহরী বাতাস চিরে আছড়ে পড়ল নিতাইচরণের কর্ণরন্ধ্রে...আর্তীর সেই বিলাপধ্বনিতে যেন তার অন্তরাত্মাও ফালা-ফালা হয়ে গেল।

পরমুহূর্তেই সাড়া এল ভেতরের ঘর থেকে—যে ঘরে সোনার মাছেরা বন্দী কাঁচের কারাগারে—সেই ঘর থেকে।

অস্পষ্ট একটা শব্দ...খুবই ক্ষীণ যেন কম্পিত ফিসফিসানি...চাপা দীর্ঘশ্বাস!

সচমকে ঘুরে দাঁড়াল নিতাইচরণ এবং সেই মুহূর্তেই শব্দটা বাধা পেল...একটানা টিন্ টিন্ টিন্ টিন্ টিন্ আওয়াজ...যেন ইলেকট্রিক ঘণ্টাধ্বনি...আর তার পরেই ঝনঝন শব্দে কি যেন ভেঙে পড়ল। মিলিয়ে গেল দীর্ঘশ্বাস।

হাঁপাতে হাঁপাতে সিঁড়ির গোড়ায় তখন এসে পৌঁছোলো গৌরাঙ্গ তখন বারান্দা শূন্য।

"দরজা বন্ধ করে দিলাম, নিতাইদা," বলল গৌরাঙ্গ।

"কিন্তু খাঁচার দরজা খুলে গেল," নিতাইচরণের জবাব এল ভেতর ঘর থেকে—যে ঘরে আছে কাঁচের ফানুস আর সোনার মাছ।

"তার মানে?"

"ভেতরে আসুন।"

তিন লাফে ভেতর প্রকোষ্ঠে গিয়ে পৌঁছোলো গৌরাঙ্গ এবং দেখল সেই আশ্চর্য দৃশ্য।

শত খণ্ডে ভেঙে যাওয়া রামধনুর মতই টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে ভেনিসিয়ান কাঁচের বর্তুল।

আর, যেন মায়াবলে শূন্যে মিলিয়ে গেছে সোনার মাছেরা!

"কী সর্বনাশ! দৌড়ে গেলেও লোকটাকে ধরা যাবে!" পাংশু মুখে বলল গৌরাঙ্গ।

"বৃথা চেষ্টা। তার চাইতে বরং পুলিশকে ফোন করে দিন, ওরা আরও তাড়াতাড়ি জাল ফেলতে পারবে।"

গৌরাঙ্গ দৌড়ালো ফোন করতে। নিতাইচরণ এসে দাঁড়াল বারান্দায়।

আলোটা চোখে পড়ল তখনই। স্বর্ণ-



আচম্বিতে সেই পথের মাঝে আবির্ভূত হল এক ছায়ামূর্তি।

বিন্দুর মতই টিমটিমে একটা আলোকবিন্দু। জ্বলছে বহুদূরে। উষার আসন্ন সোনালী আভায় তা ক্রমশ স্তিমিত হয়ে এলেও এখনও দেখা যাচ্ছে। উত্তেজনায় এতক্ষণ চোখে পড়েনি—কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট।

না। ভুল হয়নি নিতাইচরণের। এ আলো জ্বলছে সেই বাড়ীতে যে বাড়ীতে সাময়িকভাবে আস্তানা নিয়েছেন কুমারবাহাদুর জয়সিং জয়সওয়াল।

রহস্যময় আগন্তুকের আবির্ভাবের পূর্ব থেকেই জ্বলছে এ আলো এবং জ্বলছে এখনও!

*

পুলিশ এল। কিন্তু তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হল। মরুভূমির দেশ থেকে আচম্বিতে উড়ে এসেছে এক আরবী ফকির। বিদঘুটে ভাবের যন্ত্র বাজিয়ে গান গেয়েছে। অর্থহীন কবিতা আবৃত্তি করেছে। সঙ্গে সঙ্গে নাকি বোমার মত বিস্ফোরিত হয়েছে কাচের ফানুস এবং শূন্যপথে চম্পট দিয়েছে সোনার মাছেরা।

অসম্ভব. এ মামলা কি পুলিশের আওতায় পড়ে?

সারদাচরণও যথাসময়ে ফিরে এলেন। ব্যাংক ম্যানেজার গিরিশ সাহা সব শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। চোখ দুটি কিন্তু বারেক জ্বলে উঠল। জুড়া এসেছিলেন সোনার মাছ কিনতে—কিন্তু রাতারাতি মাছেরা শরীরী রহস্যের মতই অশরীরী মনিবের কাছে ফিরে গেছে শুনে হতাশ হওয়া দূরে থাকুক, বরং আরো চঞ্চল হয়ে উঠলেন। ঊষাকিংকের মল্লিক স্বর্ণমৎস্যের অন্তর্ধান কাহিনী শুনে খুব দুঃখিত হয়েছেন বলে মনে হল না। ডক্টর অশোক মিত্র গম্ভীর হয়ে গেলেন এবং কুমারবাহাদুর এমন ভাব করলেন যেন এরকম একটা ঘটনা ঘটবে, আগে থেকেই তা জানতেন।

সবচাইতে বিস্ময়কর, সারদাচরণ নিজেও প্রিয় মৎস্যের বেইমানি শুনে তেমন বিচলিত হলেন না।

কুমারবাহাদুর বিজ্ঞের মত একবার বলতে গেছিলেন, "কতটুকুই বা আমরা জেনেছি বলুন। বিজ্ঞান কি আর সব জানতে পারে।"

খেঁকিয়ে উঠে বললেন ডক্টর অশোক মিত্র. "অন্তত এটা জানতে পারে।"

"যথা?"

"শব্দ কী? কতকগুলো কাঁপনের তরঙ্গ। আর বিশেষ কতকগুলো কাঁপন কাঁচ ভেঙে দিতে পারে—যদি সে কাঁচ আর শব্দ দুটোই বিশেষ ধরনের হয়। উঠোনে দাঁড়িয়ে রাতের আগন্তুক অকারণে বাজনা বাজায়নি। তারের যন্ত্রে বিশেষ একটা কড়া সুর বাজিয়েছে, আর তাইতেই কাঁচের ফানুস ভেঙেছে। বেহালার ছড়ি টেনে বিশেষ কম্পোজিশনের কাঁচের জিনিসপত্র ভাঙার নজির তো আর নতুন কিছু নয়।"

"ঠিক বলেছেন," ব্যঙ্গবঙ্কিম স্বরে বলেছেন কুমারবাহাদুর। "সে বাজনা এমনই বাজনা যে শুধু কাঁচই ভাঙেনি, কয়েক তাল নিরেট সোনাও নিমেষে পঞ্চভূতে মিলিয়ে গেছে!"

রক্তচক্ষু মেলে অশোক মিত্র বলেছেন, "ও সমস্যার সুরাহা করবে অপরাধবিশেষজ্ঞ। কিন্তু কাঁচভাঙা ব্যাপারে যে তন্ত্রমন্ত্র ভূত-প্রেত নেই, সেটাই শুধু আপনাকে বুঝিয়ে দিলাম।"

*

রঙ্গমঞ্চে ফাদার ঘনশ্যাম মন্ডলের আবির্ভাব ঘটল ঠিক এই মুহূর্তে।

হিন্দু হলেও বুড়ো নিতাইচরণের সঙ্গে ঘনশ্যাম পাদরীর পরিচয় দীর্ঘদিনের। ধর্ম ভিন্ন, কিন্তু তা আত্মিক সম্পর্কের পথে অন্তরায় হয়নি।

পুলিশ এ গাঁয়ের সবাইকেই সন্দেহ করছে, এমন কি নিতাইচরণকেও। এ কথা শোনার পর থেকেই নার্ভাস হয়ে গিয়েছিল বৃদ্ধ। তাই দীর্ঘদিন পর কুশলাদি জিজ্ঞেস করতে ফাদার ঘনশ্যাম আসতেই হাঁফ ছেড়ে বাঁচল বেচারী।

রাস্তা দিয়ে পাশাপাশি হাঁটতে লাগল কুব্জদেহ নিতাইচরণ আর বামনদেহ ফাদার ঘনশ্যাম। ফাদারের বগলে তালিমারা ভাঙা ছাতা, পরনে ধূলিমলিন কালো আলখাল্লা, মাথায় বিশাল টাক আর চোখে ডাঁটিভাঙা সেকেলে চশমা। সব মিলিয়ে অত্যন্ত গোবেচারা অত্যন্ত নির্বোধ চেহারা।

কিন্তু এই নির্বোধাকৃতি খর্বকায় মানুষটির ওপর নিতাইচরণের আস্থা অপরিসীম। তাই কোনো কথাই সে গোপন করল না। কথা বলতে বলতে দুজনে এসে পৌঁছেছিল কর্নেল সিংহর ভিলার সামনে।

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল ঘনশ্যাম পাদরী। চশমার ফাঁক দিয়ে মিটমিট করে তাকিয়ে বললে, "এখানকার রাস্তাটা ভিজে মনে হচ্ছে?"

"হ্যাঁ, ধোওয়া হয়েছে," বলল নিতাইচরণ।

"তাই নাকি? তাই নাকি?" বলে বার-কয়েক ভিলা আর রাস্তার ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে কাষ্ঠহাসি হেসে বলল ফাদার, "আমি বরং ঝাঁ করে কর্নেলের সঙ্গে একবার দেখা করে আসি।"

বলার সঙ্গে দরজা ঠেলে অন্তর্হিত হল সে। পুনরাবির্ভাব ঘটল মিনিট কয়েক পরেই। মুখে একই রকম বোকা-বোকা হাসি। বলল, "চল।"

আবার মাথা হেঁট করে নিতাইচরণের কাহিনী শুনতে লাগল ঘনশ্যাম পাদরী।

বেশ খানিকদূরে এসে আচমকা বলল, "এইটাই ডক্‌টর মিত্রের বাড়ী না?"

চমকে উঠেছিল নিতাইচরণ।

বলল, 'হ্যাঁ'

"চল, এবার ফেরা যাক," স্থূলোদর বপু নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ঘনশ্যাম পাদরী।

সারদাচরণের সদর দরজা পেরিয়ে আসবার আগেই নিতাইচরণ ভয়াবহ সেই রাতের রহস্য-নাটিকার খুঁটিনাটি বৃত্তান্ত দ্বিতীয়বার শুনিয়ে দিল ফাদারকে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ঘনশ্যাম জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, গৌরাঙ্গ যখন দৌড়ে নেমে গেল দরজা বন্ধ করতে, তখন তুমি আবার ঘুমে ঢুলছিলে না তো? হয়তো সেই ফাঁকে কেউ বারান্দা টপকে উঠে এসেছিল?'

'না, না', প্রতিবাদ জানাল নিতাইচরণ। 'গৌরাঙ্গর হাঁক-ডাকেই ঘুম ভাঙে আমার। ও নিচে নেমে যেতে না যেতেই আমি তিন লাফে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিলাম।'

অন্য কোনো পথে গৌরাঙ্গ ফিরতে আসে নি তো?'

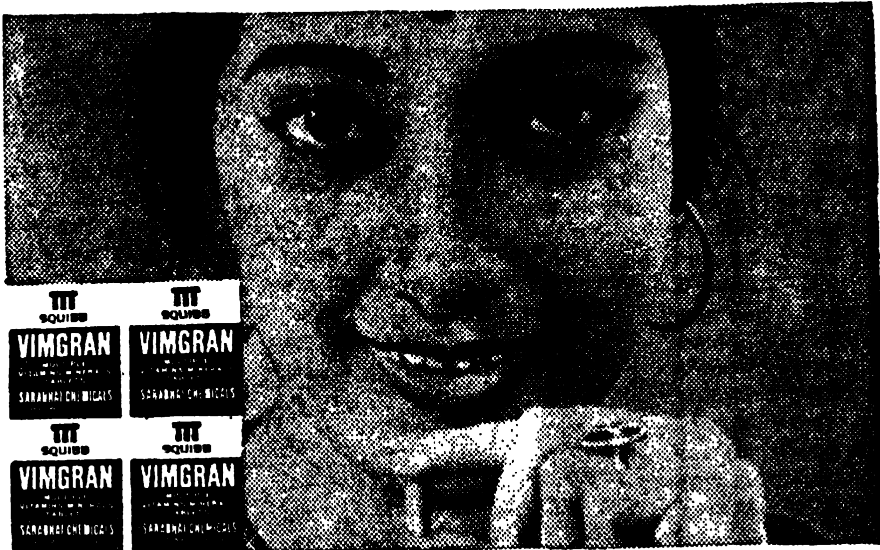
'আর কোনো পথ নেই', গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলল নিতাইচরণ।

'তাহলেও আমি সন্দেহভঞ্জন করে আসি', বলে অপ্রস্তুতের হাসি হাসল ঘনশ্যাম পাদরী এবং খুট খুট করে নিজেই নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে। ফিরে এল কিছুক্ষণ পরেই।

কাঁচুমাচু মুখে বলল, 'ঠিকই বলেছ

ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ আপনার পরিবারের সকলের স্বাস্থ্যের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়

ওঁরা কি তা যথেষ্ট পরিমাণে পাচ্ছেন?



নূতন! ভিমগ্র্যান® বিবিধ ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ সমন্বিত ট্যাবলেট

ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের অভাব আপনার পরিবারের সকলের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করতে পারে। অবসাদ, সর্দি, ক্ষুধালোপ, ঘাড়াঘাড়ি, চর্মরোগ ও দাঁতের ব্যথা—এসব সাধারণতঃ ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের অভাব থেকেই ঘটে।

তবুও ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ সম্পর্কে প্রায়ই শৈথিল্য দেখা দেয়, এমনকি খুব যত্নের সঙ্গে পরিকল্পিত আহার্যেও। সব পুষ্টিকর খাদ্য সবসময় পাওয়া যায় না এবং বহু প্রকারের আহার্যের মধ্যেই ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের ঘাটতি থাকতে পারে। তাহলে আপনি কেমন ক'রে নিশ্চিত হতে পারেন যে আপনার পরিবারের সবাই একান্ত প্রয়োজনীয় যাবতীয় ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ ঠিকমত এবং ঠিক-ঠিক অনুপাতে পাচ্ছেন?

আপনার পরিবারের প্রত্যেকেই যাতে তাঁদের প্রয়োজনের অনুপাতে এইসব একান্ত প্রয়োজনীয় পুষ্টিকারক পদার্থ নিশ্চিতভাবে পেতে পারেন, সেইজন্যেই ওদের খেতে দিন ভিমগ্র্যান—নূতন বিবিধ ভিটামিন ও খনিজ পদার্থযুক্ত ট্যাবলেট—প্রতিদিন একটি ক'রে। এই স্বাস্থ্যকর অভ্যাসটি আজ থেকেই শুরু ক'রে দিন না কেন?

ভিমগ্র্যানে এগারটি প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও আটটি খনিজ পদার্থ, পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে। লাল রক্ত কোষ গড়ে তোলবার জন্য ও শক্তি ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করবার জন্য লৌহ—হাড় ও দাঁত শক্ত রাখবার জন্য ক্যালসিয়াম—সর্দি প্রতিরোধ করবার ক্ষমতার জন্য ভিটামিন সি—ভাল দৃষ্টিশক্তি ও সুস্থ চর্মের জন্য ভিটামিন এ—ক্ষুধাবৃদ্ধি ও রক্তাল্পতার জন্য ভিটামিন বি ১২—এছাড়াও আপনার পরিবারের সকলের স্বাস্থ্যের জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় অত্যাবশ্যক পুষ্টিকারক পদার্থ আছে।

ভিমগ্র্যানের একটি ট্যাবলেটের দাম প্রায় ১০ পয়সা মাত্র। আপনার পরিবারের সকলের স্বাস্থ্যের জন্য এ দাম অতি সামান্য। আজই ভিমগ্র্যান কিনুন—প্রতিদিন ভিমগ্র্যান খেতে থাকুন।

ভিমগ্র্যান®

একটিমাত্র ভিমগ্র্যানে আপনাকে সারাদিন কর্মঠ রাখবে

SQUIBB® SARABHAI CHEMICALS

Shilpi-SC.486 Ben

তুমি, দোতলায় আসার পথ এই একটাই। তাহলে তো ব্যাপারটা বড়ই গোলমেলে হয়ে দাঁড়াল।'

'ফাদার, আপনার কি মনে হয় এ ব্যাপারে কুমারবাহাদুরের বা কর্ণেলের কারচুপি আছে? না, স্রেফ অলৌকিক ব্যাপার?'

'অলৌকিক তখনি হত যদি কুমারবাহাদুর, বা কর্ণেল সিংহ, বা অন্য কেউ বেদুইন ফকিরের ছদ্মবেশে এ বাড়ীতে হানা দিত।'

'বুঝলাম না', বিমূঢ়ভাবে বলল নিতাইচরণ।

'না বোঝার কিছু নেই। তোমার বেদুইন নিশাচরের কোন পায়ের ছাপ রাস্তায় পড়ে নি। তোমার সব চাইতে কাছের প্রতিবেশী হল দুজন। একদিকে ব্যাঙ্ক ম্যানেজার, আর ওদিকে কর্ণেল সিংহ। এ বাড়ী আর ব্যাঙ্কের মধ্যে রয়েছে লাল মাটি। সুতরাং ওদিক থেকে খালি পায়ে কেউ এলে তার পায়ের ছাপ রাস্তায় থাকতই। কিন্তু নেই। কর্ণেল সিংহের ভিলার সামনের রাস্তা এখনও ভেজা। কর্ণেলের হুংকার হজম করে আসল খবরটি জেনে নিলাম তাঁর কাছে। অর্থাৎ রাস্তায় জল দেওয়া হয়েছে গতকাল সন্ধ্যায়। সুতরাং ওদিক দিয়েও খালি পায়ে কেউ এলে তার পায়ের ছাপ থাকত ভিজে রাস্তায়। কিন্তু নেই। বাকী রইল কুমারবাহাদুর, ডক্টর মিত্র আর হোটেলের দিক। কিন্তু ওদিকটায় কাটাঝোপের এমন প্রতাপ দেখে এলাম যে, খালি পায়ে যে-ই আসুক না কেন, তার পা রক্তাক্ত হত এবং রাস্তায় ছাপ পড়ত। কিন্তু কোন ছাপ নেই। ঘটনাটা অপ্রাকৃত হলে অবশ্য পায়ের ছাপ না পড়াই উচিত।' একনাগাড়ে যেন স্বগতোক্তি করে গেল ফাদার ঘনশ্যাম।

'তাহলে?' নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে প্রশ্ন করল নিতাইচরণ।

'একটা পরম সত্য কিন্তু আমাদের সকলেরই চোখ এড়িয়ে গেছে। সবচেয়ে কাছে যা, তা আমরা দেখেও দেখি না। যেমন মানুষ নিজেকে দেখে না। এ কেসের হানাদার বেদুইন যদি রাস্তার অপর প্রান্ত থেকে আসত, তাহলে বুঝতাম ইহজগৎ নয়, আরও দূর থেকে আবির্ভাব হয়েছিল তার। কিন্তু তা নয়। আগন্তুককে দেখা গেছিল মাঝামাঝি জায়গায়। আর একবার বাইরে এস, দেখাচ্ছি।'

বলে উঠে দাঁড়াল ফাদার। পা বাড়ল সিঁড়ির দিকে। অগত্যা নিতাইচরণকেও উঠতে হল। সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল দুজনে।

আর, তারপরেই থমকে দাঁড়াল নিতাইচরণ।

বলল বিস্মিত কণ্ঠে—'এ কী! দরজায় খিল দেওয়া কেন?'

'আমি দিয়েছি। আওয়াজ শোন নি?' নিরীহ কণ্ঠে বলল ফাদার।

'না তো, কখন দিলেন?'

'সদর দরজা পেরিয়েই। তুমি ওপরে উঠতে লাগলে, আমি টুক করে খিলটা তুলে দিলাম। খট করে খুবই চাপা একটা শব্দ হল। এত ক্ষীণ শব্দ যে, সিঁড়ির ওপরেও তুমি শুনতে পাও নি। কিন্তু খিলটা যদি খোলা হয়, তাহলে ঝনাৎ করে একটা শব্দ হয়। ঠিক এমনিভাবে', বলে ঘাঁটি থেকে খিল তুলে পাশে ঝুলিয়ে দিল ঘনশ্যাম পাদরী। ভারী হুড়কো দেওয়ালের গায়ে লাগতেই আওয়াজ হল ঝনঝন ঝনাৎ।

চোখ তুলল ফাদার। মৃদু কণ্ঠে বলল, 'কি বুঝলে?'

গলা শুকিয়ে গেছিল নিতাইচরণের। ঢোক গিলে বলল, 'কিন্তু কাল রাতে গৌরাঙ্গ যখন দরজা দিয়েছিল, এই আওয়াজই শুনেছিলাম।'

'তাহলে বুঝতেই পারছ, সে আওয়াজ দরজা দেওয়ার নয়, দরজা খোলার। চল, দরজা খুলেই এবার বেরোন যাক।'

আবার রাস্তায় এসে দাঁড়াল দুই মূর্তি। একঘেয়ে মৃদু কণ্ঠে বকবক করে চলল ফাদার ঘনশ্যাম। শান্ত নিরুত্তেজ কণ্ঠ শুনে মনে হল ক্লাস রুমে কেমিক্যাল লেকচার হচ্ছে।

'সবচেয়ে কাছে যা থাকে, তা আমরা দেখি না। বিশেষ করে সে জিনিসটা যদি হুবহু নিজের মতই হয়, তাহলে নজরই পড়ে না। বারান্দা থেকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা আগন্তুককে দেখেও তুমি একটা জিনিস লক্ষ্য করো নি।'

'কী?'

'তার খালি পা। সেই মুহূর্তে তুমিও খালি পায়ে ছিলে। কেন ছিলে? না, বিছানায় ছিলে বলে। বিছানায় গৌরাঙ্গও ছিল।'

'হ্যাঁ, গৌরাঙ্গ শুয়েছিল। তারপর ধুতি গেঞ্জি পরেই বেরিয়ে পড়েছিল রাস্তায়—ঠিক তখনি তুমি এসে দাঁড়িয়েছিলে বারান্দায়। রাস্তায় পা দেওয়ার আগে এমন দুটি জিনিস সে বগলদাবা করে নিয়ে যায় যা তুমি হাজার বার দেখেছ, কিন্তু মনে করতে পারো নি। একটা হল দরজার নীল পর্দা। আর একটা বহু কিউরিওর মধ্যে সাজিয়ে রাখা একটা মিশরীয় তারের যন্ত্র। নীল পর্দাটা সে মাথায় চিবুকে জড়িয়ে বেদুইন সাজে। পরনের ধুতির কোঁচা খুলে গায়ে জড়িয়ে নেয়। বাকী রইল পরিবেশ সৃষ্টি করা আর অভিনয় করা। দুটোতেই সমান দক্ষ শ্রীগৌরাঙ্গ। কেননা, অপরাধ আর্টে পাকা আর্টিস্ট সে।'

'গৌরাঙ্গ!' বিমূঢ় কণ্ঠে বলল নিতাইচরণ।

'হ্যাঁ, গৌরাঙ্গ।'

'কিন্তু ওরকম মিষ্টি স্বভাবের ছেলে যে আজকাল হাজারে একটা দেখা যায় না!'

'সেইটাই তার অভিনয় দক্ষতা। পুরো ছমাস নিয়েছে সে এই ধারণাটাই তোমাদের মনে গেঁথে দিতে।'

'উদ্দেশ্য সোনার মাছ লোপাট করা। সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। এই ছ মাসে বহু সুযোগ সে পেয়েছে। কিন্তু ঝানু ক্রিমিন্যালের মতই লোভ সামলেছে। নইলে তোমরাই তাকে সন্দেহ করতে। তারপর এসেছে চরম সুযোগ। কুমারবাহাদুর অলৌকিক চুরির গল্প শুনিয়ে পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। তারই সুযোগ নিয়েছে গৌরাঙ্গ। ছদ্মবেশ, গান আর অভিনয়ের মাধ্যমে তোমাকে বুঝিয়েছে, সোনার মাছ যে নিয়েছে সে সাধারণ মানুষ নয়, সুদূর আরবের কোন রহস্যলোকের অতিমানুষ। তোমাদের অসাড় মন তখন আরব্য রজনীর অলৌকিক কাহিনী নিয়ে মশগুল হয়েছে, ভুলেও কেউ ভাবতে পারো নি আসল মানুষ রয়েছে কাছে, খুবই কাছে।'

'সেই কারণেই আরব ফকিরের কথা যতক্ষণ শুনেছি, গৌরাঙ্গর গলা পাই নি।' বলল নিতাইচরণ। 'আশ্চর্য। ওর কথা একদম মনেই পড়ে নি আমার।'

'আমরা সবাই ভুল করি সেইখানেই। যার কথা আমাদের একেবারেই মনে পড়ে না, তার কথাই সবার আগে মনে পড়া উচিত। গৌরাঙ্গ নিজেও মানুষ তো। তাই এ ভুলটা সে নিজেও করেছে।'

'কি রকম?'

'পিসি গিরিবালার কথা ওর মনেই ছিল না। দরজা বন্ধ করা উচিত—এ হুঁশিয়ারী লক্ষবার সারদাচরণবাবুকে শোনান হয়েছে কিন্তু তিনি হুঁশিয়ার হন নি। কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে হয় ঠিক তার উল্টো। যেমন হুঁশিয়ার হয়েছেন গিরিবালা। শুতে যাবার আগে তিনি নিজেই খিল তুলে দিতেন কাউকে না জানিয়ে। স্ত্রী-চরিত্রের এই ছোট্ট সাইকোলজিটা ভুলে গিয়েছিল বলেই গৌরাঙ্গকে খিল খুলে বেরোতে হয়েছে।'

'তাই আওয়াজ হয়েছে', বলল নিতাইচরণ।

'আমারও তাতেই সন্দেহ হয়েছে। তা না হলে শ্রীগৌরাঙ্গকে আমি সন্দেহই করতে পারতাম না।' বলল ফাদার ঘনশ্যাম মণ্ডল।

বলে চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বিষণ্ণ কণ্ঠে বললে—'কিন্তু নিতাই, কেন এমন হয়? মানুষকে প্রবঞ্চনা করার প্রবৃত্তি নিয়ে মানুষ তো জন্মগ্রহণ করে না। তবুও কেউ হয় প্রবঞ্চক, কেউ হয় প্রবঞ্চিত। কেউ বিশ্বাস করে, কেউ তার সুযোগ নেয়। কিন্তু কেন এমন হয়? কেন? কেন?'

---

*বিদেশী ছায়ার।

চিত্রকল্পের পৃথিবী : অবনীন্দ্রনাথ

শ্যামাপ্রসাদ সরকার

"আরও একটি শব্দ, সেটি এখনও থেকে থেকে কানে বাজে। দুপুরে সব যখন শোনশান, কোনো সাড়াশব্দ নেই কোথাও, তখন শব্দ কানে আসে 'কুয়ো-র ঘটি তোলা'। মনে হয় ঠিক যেন অদ্ভুত কোন একটি পাখি ডেকে চলেছে। রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে জানলা দিয়ে দেখি ঘনকালো তেঁতুল গাছের মাথা। দাসীরা বলে, বংশের সকলের নাড়ী পোঁতা আছে তার তলায়, মাঝে মাঝে ছাতের উপরে ভোঁদড় চলে বেড়ায়, সেই চলার শব্দে গল্প তৈরি হয় মনের ভিতরে; ব্রহ্মদত্যি হাঁটছে, জটেবুড়ি কাসছে। জটেবুড়ি সত্যিই ছিল, লাঠি ঠক-ঠক করে আসত; ময়ূরে তার চোখ উপড়ে নিয়েছিল। 'ক্ষীরের পুতুল'এ যে ষষ্ঠীবুড়ি এঁকেছি ঠিক সেই রকম ছিল সে দেখতে।"

(জোড়াসাঁকোর ধারে। অবনীন্দ্রনাথ)

শিশুকাল থেকে যে একজন শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের মনে বাসা বেঁধেছিলেন তাঁর প্রকাশ শুধুমাত্র অবনীন্দ্রনাথের চিত্রগুলিতেই সমাপ্ত নয়, সাহিত্য ও আত্মকাহিনীর বিভিন্ন বিচিত্র বর্ণমায় সেই শিল্পী বার বার ধরা পড়েছেন।

জন্মলগ্নে প্রথম চোখ মেলে তাকিয়ে যে পৃথিবীর সাক্ষাৎ মেলে, জাতকের গ্রহণ ক্ষমতার উপরেই সেই পৃথিবী তেমনিভাবে তাকে ধরা দেয়। একটি অনিন্দ্য অনুভব শৈশবের ঊষালগ্নে অবনীন্দ্রনাথকে শিল্পজ্ঞান দান করেছিল। তাই তাঁর জীবন ও রচনায় এক চিত্রকল্পের পৃথিবী বার বার ধরা পড়ে যেখানে সহজেই কাছারিঘরের কর্মচারী মহানন্দকে নিয়ে ছড়া আওড়ানো যায়।

মহানন্দ নামে এ কাছারি ধামে
আছেন এক কর্মচারী,
ধরিয়া লেখনী লেখেন পত্রখানি
সদা ঘাড় হেঁট করি।

কিংবা ভূতপত্রীর দেশের বর্ণনায় বলা চলে:

এই মাঠ ভেঙে দুপুর রাতে
পিসির বাড়ি চলেছি।
চলেছি তো চলেইছি:
হুঁইয়া মারি খপরদারি!'
'বড়া ভারি খপরদারি!'

মাঠের মাঝে একটা শেওড়াগাছের ঝোপ, অন্ধকারে কালো বেরালের মতো গুঁড়ি মেরে বসে আছে। তারই কাছে ঘোড়ার গোর, তার পরেই তেপান্তর মাঠ! হাটের ঘাট ওই শেওড়া-তলা পর্যন্ত তারপরে আর হাটও নেই, বাটও নেই; কেবল মাঠ ধু-ধু করছে। এই শেওড়া-তলায় পালকি এসেছে কি আর যত ঝিঁঝিঁপোকা তারা বলে উঠেছে — 'চললে বাঁচি?' 'চললে বাঁচি!' কেনরে বাপু, একটু না হয় বসেছি, তাতে তোমাদের এত গায়ের জ্বালা কেন?' 'চললে বাঁচি!' চলতে কি আর পারি রে বাপু? অমনি ঝিঁঝিঁ পোকার সর্দার দুই লম্বা-লম্বা ঠ্যাং নেড়ে বলছে, 'ওই আসছে চিঁ চঁ ঘোড়া চিঁচিঁ!' ফিরে দেখি গোরের ভিতর থেকে ঘোড়া-ভূত মুখ বার করে পালকির দিকে কটমট করে তাকাচ্ছে! ওঠা রে পালকি, পালা রে পালা! আর পালা! ঘোড়া-ভূত তাড়া করেছে—ঘাড় বেঁকিয়ে, নাক ফুলিয়ে আগুনের মত দুই চোখ পাকিয়ে! ভয়ে তখন ভূতপত্রীর লাঠির কথা ভুলে গেছি। কেবল ডাকছি—জগবন্ধু রক্ষে কর, মাসিকে বলে তোমার খইয়ের মোয়া ভোগ দেব। বলতেই আমার খুঁটে বাঁধা খইগুলি রাস্তায় ছড়িয়ে পড়েছে। মাসির বাড়ির খই—জুঁইফুলের মত ফুটন্ত ধবধব করছে খই—রাস্তা যেন আলো করে। ঘোড়া-ভূত কি সে-লোভ সামলাতে পারে? খই খেতে অমনি দাঁড়িয়ে গেছে। বেচারা ঘোড়া-ভূত খই খেতে মুখটি নামিয়েছে কি, অমনি তার ভূতুড়ে নিঃশ্বাসে খইগুড়ি উড়ে পালাচ্ছে! যেমন খইয়ের কাছে মুখ নেওয়া অমনি খই উড়ে পালায়। খইও ধরা দেয় না, ঘোড়াও ছাড়তে চায় না। ঘোড়া-ভূত চায় খই খায়, খই কিন্তু উড়ে-উড়ে পালায়।

ঘোড়া চলেছে খইয়ের পছে, খই উড়েছে বাতাসের আগে, আমি চলেছি পালকিতে বসে ঘোড়া-ভূতের ঘোড় দৌড় দেখতে মুখ বাড়িয়ে। কখন যে মাঠে এসে পড়েছি মনেই নেই। সেখানটায় বড় অন্ধকার, বড় হাওয়া—যেন ঝড় বইছে। মাসির দেওয়া একটি লন্ঠনের মিটমিটে আলো অনেকক্ষণ নিভে গেছে। অন্ধকারে আর ঘোড়াও দেখা যায় না, খইও চেনা যায় না। বেহারাদের বলি—আলো জ্বাল; কিন্তু হাওয়ার কথা উড়ে যায়; কে শোনে কার কথা! এমন হাওয়া তো দেখিনি! আমার ভূতপত্রীর লাঠিটা পর্যন্ত উড়ে পালাবার যোগাড়। লণ্ঠনটি তো গেছে, শেষে লাঠিটাও যাবে? আচ্ছা করে লাঠি ধরে বসে আছি।

●

সৃষ্টির পৃথিবীতে অবনীন্দ্রনাথ নিজেকে নিয়ে নিজে যেমন কৌতুক করেছেন তেমনি পরিচিত পৃথিবীর অতি সাধারণ জীব-জন্তুকেও রচনার গুণে অসামান্য ব্যঞ্জনা দান করেছেন।

'মাসি পিসি বনগাঁ-বাসী বনের ধারে ঘর কখনো মাসি বলেন না যে খই মোয়াটা ধর।'

শৈশবের স্মৃতির সঙ্গে দোলা লাগানো এই ছড়া কার না হৃদয়ে মানিক দিয়ে গাঁথা আছে; কিন্তু কেউ জানে না কেমন করে সেই মাসি-পিসির, কারাই বা আছে সেই গৃহস্থলীর সংসারে। ভূতপত্রীর দেশে তার বর্ণনা দিয়েছেন অবনীন্দ্রনাথ:

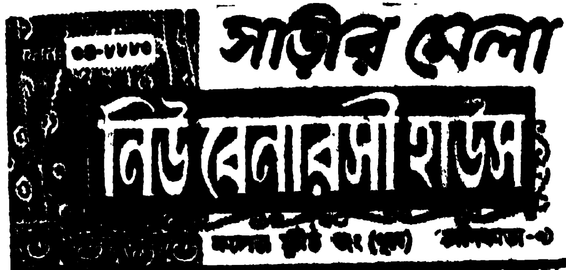
'কে হে বাপু তোমরা আমার পালকিটি নিয়ে?'

'বাবুজি, আমরা তোমার পিসির চাকর—কিচকিন্দে, কাসুন্দে, বাসুন্দে, ঝালুন্দে, মালুন্দে, হারুন্দে।'

'আচ্ছা বাপু, চলতো পিসির বাড়ি'—বলেই আমি পালকি চেপে বসেছি।

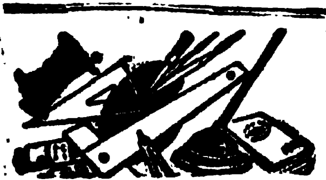
এবার চলেছি আরামে, কোনো ভয় নেই; পা ছড়িয়ে বসে পালকির দুই দরজা খুলে মনের আনন্দে চারদিক দেখতে-দেখতে চলেছি। কেমন তালে-তালে এবার পালকি চলেছে— কালকাসুন্দি, ঝালকাসুন্দি ঝাঁকুনি নেই, পালকি চলেছে—আমকাসুন্দি জামকাসুন্দি! যেন জলের ওপর দুলতে দুলতে নেচে চলেছে। পিসির পালকি চলেছে—ধর কাসুন্দে, চল বাসুন্দে, বড় ঝালুন্দে, খোঁড়া মালুন্দে। পালকির এক দরজা ধরে চলেছে হারুন্দে, আর এক দরজা ধরে চলেছে উড়েদের সর্দার—কালো কিচকিন্দে।

হারুন্দের মাথায় কালো চুলের উঁচু ঝুঁটি আর কিচকিন্দের মাথায় পাকা চুলের শণের নুটি। হারুন্দে ফরসা, কিচকিন্দে কালো মিশ—যেন বাংলা কালি! হারুন্দের চুল যেন বালির ওপরে মনসাগাছ—খাড়া-খাড়া, খোঁচা খোঁচা, আর কিচকিন্দের চুল যেন সমুদ্দুরের শাদা ঢেউ—হাওয়ায় লটপট করছে। কিচকিন্দের মাঠটাও দেখছি খানিক শাদা, খানিক



কালো, খানিক আলো খানিক অন্ধকার—একদিকে ধপধপ করছে শুকনো বালি আর-দিকে টলমল করছে কালো জল—নুনে গোলা। মাঠ দিয়ে চলছি, না শাদা কালো মস্ত একখানা সতরঞ্চির ওপর দিয়েই চলেছি!

আমার বাঁদিকে কেবল বালি—শাদা ধপধপ করছে বালি; আর আমার ডানদিকে রয়েছে কালি—গোলা সমুদ্দুর—কালো-কাজলের মতো কালো, বাঁয়ে চলেছে হারুন্দে—ডাঙার খবর দিতে-দিতে, ডাইনে চলেছে কিচকিন্দে জলের আদি-অন্ত কইতে-কইতে। আমি চলেছি পাল্কিতে শুয়ে মনে-মনে দুজনের দুটো গল্প শাদা একটা শেলেটের ওপর কালো পেনসিল দিয়ে লিখে নিতে-নিতে। কিচকিন্দের গল্পটা জলের কিনা তাই সেটা লিখে নিতে-নিতেই ধুয়ে-মুছে গেছে, একটুও আর পড়া যাচ্ছে না। কিন্তু হারুন্দের গল্পটা বালির আঁচড়ের তো একেবারে শেলেটে কেটে বসে গেছে—ধুলেও যায় না, মুছলেও যায় না—বেশ স্পষ্ট-পষ্ট পড়া যাচ্ছে।



সকল প্রকার অফিস স্টেশনারী কাগজ
প্যাকিং প্রিন্টিং ও ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্যাদির
সুলভ প্রতিষ্ঠান।
কুইন স্টেশনারী স্টোর্স
৬৩-ই, রাধাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১
ফোন: অফিস—২২-৮৫৮৮ (২ লাইন)
২২-৬০০২
ওয়ার্কশপ—৬৭-৩৬৬৪ (২ লাইন)

রসিক অবনীন্দ্রনাথ হারুন্দের পরিচয় দিয়েছেন আরও বিস্তৃত করে।

'আমার নাম হারুন্দে নয়—হারুন-অল-রসিদ, বোগদাদের নবাব খান্দা খাঁ জাহান্দর শা বাদশা। এখন হয়েছি হারুন্দে।'

বোগদাদের হারুন-অল-রসিদের কথা কে না আরব্য উপন্যাসে পড়েছে কিন্তু তার এই রূপান্তর? না, এখানেই শেষ নয়।

অবাক হয়ে হারুন্দের মুখের দিকে চেয়ে আছি—কখন আবার সে ফকির হয়, কি বাদশা হয়! আমাকে হাঁ করে থাকতে দেখে বলছে, 'আমার কথায় বিশ্বাস হলো না বুঝি? আচ্ছা দেখ!' বলেই একবার হারুন্দে দাড়িতে গোঁফে মোচড় দিয়েছে। আর অমনি দেখি, সে হারুন্দে আর নেই! ইয়া দাড়ি, ইয়া গোঁফ, মাথায় বকের পালক—গোঁজা পাগড়ি, গায়ে চিনেপোতের জোব্বা কাব্বা পায়ে ঢিলে ইজের আর দিল্লির লপেটা পরে হাতে বাঁকা এক তলোয়ার নিয়ে দেখা দিয়েছে—হারুন বাদশা! ফিক করে হেসে আমাকে সে যেমন সেলাম করেছে আর অমনি আমি ফস করে দেশলাই জেবলে ফেলেছি। বাদশার হাতে গলায় মাথায় হীরে-মাণিকের গহনাগুলো এমন ঝকঝক করে উঠেছে যে চোখে ধাঁধাঁ লেগে গেছে। কিচকিন্দে ছিল পাশে; সে অমনি ফুঃ করে আলোটা নিভিয়ে দিয়েছে। আর কোথায় বাদশা?—যে হারুন্দে সেই হারুন্দে।

আর কিচকিন্দে?

তার গল্প তো রামায়ণ মহাভারতের যুগের লোকদের নিয়ে। সত্যযুগের মানুষ যজ্ঞডুমুরের গাছের সমান লম্বা ছিল, ত্রেতাযুগে লঙ্কা গাছ, দ্বাপরে ভাণ্ডীর, আর কলিতে লজ্জাবতী। এরপর মানুষ ক্রমে এত ছোট হয়ে যাবে যে শেষে আঁকশি দিয়ে তবে তাদের বিলিতি-বেগুনের গাছ থেকে বেগুন পাড়তে হবে।

সেই ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র অবতীর্ণ হলেন—রাক্ষসবংশ ধ্বংস করতে অর্থাৎ যেখানে বাঁশবন ছিল সেখানে লংকাচারা আর বোম্বাই-আম বসাতে; যাতে মানুষ বোশেখ-জোষ্টি মাসে আমকাসুন্দি, ঝালকাসুন্দি খেয়ে বাঁচতে পারে। বিশ্বাস না হয়, কাসুন্দে আর ঝালুন্দেকে প্রশ্ন কর।

এই হলো কিচকিন্দে। যার অন্য পরিচয় সে নিজেই দিয়েছে:

Thank you Baboo, I earnestly hope and trust that the noble example of this most enlightened and public spirited Kumar Krishna Kich Kinda of Orissa will be followed by all Maharajas, Rajas, Jamindars and other wealthy people — not only in India but throughout the length and breadth of Bengal, Behar and Orissa — for the amelioration of self and friends and all the poor gentlemen at large like হারুন্দে, কাসুন্দে, বাসুন্দে ঝালুন্দে অ্যান্ড মালুন্দে।'

শুধু ভূতপত্রীর দেশই নয়, শিশুসাহিত্যের অন্যান্য রচনাগুলির মধ্যেও যে চিত্ররূপের পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন অবনীন্দ্রনাথ তা যেন আলোর ঘর আর জাফরির ছায়া, স্বতন্ত্র, স্বকীয় একটি খেয়াল-খুশির পৃথিবী। অতি তুচ্ছ এবং অতি সাধারণ বলে যাদের আমরা অবজ্ঞা করি বর্ণনার গুণে তাদের একটি ভিন্ন সত্তা দান করেছেন তিনি, সাহিত্যের পাদ-প্রদীপে তারাও আজ পূর্ণতার মর্যাদা পেয়েছে।

অবনীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা জানাতে গেলে একমাত্র রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই কন্ঠ মেলাতে হয়:

যখন মনে করি সমস্ত দেশের হয়ে কাকে বিশেষ সম্মান দেওয়া যেতে পারে তখন সর্বাগ্রে মনে পড়ে অবনীন্দ্রনাথের নাম। তিনি দেশকে উদ্ধার করেছেন আত্মনিন্দা থেকে, আত্মগ্লানি থেকে তাকে নিষ্কৃতি দান করে তার সম্মানের পদবী উদ্ধার করেছেন। তাকে বিশ্বজনের আত্ম-উপলব্ধিতে সমান অধিকার দিয়েছেন। আজ সমস্ত ভারতে যুগান্তরের অবতারণা হয়েছে চিত্রকলায় আত্ম-উপলব্ধিতে। সমস্ত ভারতবর্ষ আজ তাঁর কাছ থেকে শিক্ষাদান গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের এই অহংকারের পদ তাঁরই কল্যাণে দেশে সর্বোচ্চ স্থান গ্রহণ করেছে। এঁকে যদি আজ দেশলক্ষ্মী বরণ করে না নেয়, আজও যদি সে উদাসীন থাকে, বিদেশী খ্যাতিমানদের জয় ঘোষণায় আত্মাবমান স্বীকার করে নেয় তবে এই যুগের চরম কর্তব্য থেকে বাঙালী ভ্রষ্ট হবে। তাই আজ আমি তাঁকে বাংলাদেশে সরস্বতীর বরপুত্রের আসনে সর্বাগ্রে আহ্বান করি।

আপনার মেয়ের বিয়েতে উপহার দিন—
ইণ্ডিয়া ষ্টীল আলমারি
● মজবুত ফিটিংস ● ভাল ফিনিশ
● নকল চাবি লাগবে না, সেজন্য
গ্যারান্টি দিচ্ছি।
ইণ্ডিয়া ষ্টীল ফার্ণিচার
অ্যাণ্ড কোং
১৫, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭
'প্রেস' সিনেমার পশ্চিমে — ফোন ৩৪৭৬৯২

পাঠকের বৈঠক

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

বুদ্ধদেব বসু

বুদ্ধদেব বসু এই বছর "তপস্বী ও তরঙ্গিণী" নাটকের জন্য বাংলা সাহিত্যের তরফ থেকে রাষ্ট্রীয় আকাদেমির পুরস্কার পেয়েছেন, এই সংবাদে বাংলা সাহিত্যের যাঁরা অনুরাগী পাঠক তাঁরা বিশেষ খুশি হয়েছেন। এই সম্মান হয়ত আরো আগে, অন্য কোনো গ্রন্থকে উপলক্ষ্য করেও দেওয়া যেত, সেই গ্রন্থ বুদ্ধদেব বসু বিরচিত গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ যেকোনো বিষয়েরই হতে পারত। কারণ, বুদ্ধদেব বসু বাংলা সাহিত্যের প্রায় সকল বিভাগকেই তাঁর অনন্যসাধারণ রূপদানে পরিপুষ্ট করেছেন।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের যাঁরা নেতৃস্থানীয় তিনি তাঁদের অন্যতম: দীর্ঘকাল নিরলস ভঙ্গীতে সাহিত্যসাধনা করে আধুনিক বাংলা সাহিত্যকে একটা নতুন আকারদানে তাঁর ভূমিকা স্মরণীয়।

বুদ্ধদেব যখন ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র তখন 'কল্লোলে' তাঁর একটি কবিতা প্রকাশিত হল গোকুল নাগের স্মরণে। কবিতাটির নাম 'যৌবন পথিক'—
"তুমি নব বসন্তের সুরভিত দখিন বাতাস,
ক্ষণতরে বিকম্পিত করে গেলে
বাণীর কানন—"
সেই সালটি তেরশ বত্রিশ। আজ তেরশ চুয়াত্তরে পৌঁছে এল রাষ্ট্রীয় সম্মান। ১৯২৫ খৃস্টাব্দে জর্জ বার্ণাড শ'কে যখন সাহিত্যের জন্য নোবেল প্রাইজে সম্মানিত করা হয় তখন তাঁর যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিপত্তি। তিনি ৬,৫০০ পাউন্ড মূল্যের চেক ফেরৎ দিয়ে বললেন আমার পাঠক এবং নাটকের সমর্থকরাই আমার ভরণ-পোষণের ভার গ্রহণ করেছেন, এই চেক যেন নিরাপদে তীরে উত্তীর্ণ সাঁতারুকে লাইফ বেল্ট ছুঁড়ে দেওয়া—

"a life-belt thrown to a swimmer who has already reached the shore in safety."

বুদ্ধদেব বসুও সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে সংবাদ-পত্রের রিপোর্টারকে বলেছেন—"এই টাকাটা কয়েক বছর আগে পেলে হয়ত কাজে লাগত, তখন টাকার মূল্য বেশী ছিল।"

জীবনে পুরস্কার ও সম্মান বুদ্ধদেব পেয়েছেন অনেক, ছাত্র-জীবন থেকেই শুরু হয়েছে তাঁর পুরস্কার প্রাপ্তির পালা। প্রায় পঞ্চাশ বছরকাল ধরে সাহিত্যের রাজ্যে সক্রিয় উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

বুদ্ধদেব বসু সর্বপ্রথম বাংলাভাষায় 'কবিতা' নামক ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন, এবং বাংলা সাহিত্যে কবিতার যে নতুন রূপ তার মূলে আছে বুদ্ধদেব বসুর দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায় পরিচালিত এই কবিতা পত্রিকা। তিনি একহাতেই সেইকালে পত্রিকার সম্পাদনা থেকে শুরু করে বিলি-বন্দোবস্ত ব্যবস্থাও করতেন। এই প্রসঙ্গে একবার তিনি বর্তমান লেখককে কথা-প্রসঙ্গে বলেছিলেন :

'পরিচয়ে'র কোনো এক বৈঠকে অন্নদা-শঙ্কর রায়ের হাতে একটি পত্রিকা দেখে-ছিলাম। রোগা চেহারা, ইট রঙের মলাটের ওপর শেলীর ছবি ছাপানো, সম্ভবত আমেরিকার "পোয়েট্রি" পত্রিকা। এই প্রথম আমি কবিতার কোনো পত্রিকা চোখে দেখলাম। এর আগে অনেকদিন ধরে আমি মনে মনে অত্যন্ত পীড়া পেয়েছি আমাদের দেশে কবিতার অবমাননার কথা ভেবে। কবিতা কেবল পাদপূরণে ছাপা হত, অবশ্য রবীন্দ্রনাথের কবিতা বাদে। এই শ্রদ্ধাহীন ভঙ্গী আমার ভালো লাগত না। 'কল্লোলে' 'প্রগতি'তে কবিতা অবশ্য যথেষ্ট মর্যাদা দিয়ে ছাপা হত। আমি তাই কখনো কখনো স্বপ্ন দেখতাম একটি শুধুমাত্র কবিতা পত্রিকা প্রকাশের—এ আমার নিছক স্বপ্ন —বন্ধুদের কাছে উচ্চার্য নয়। সেই স্বপ্নের একটা বাস্তব রূপ ঐ মার্কিনি পত্রিকায় দেখে আমি মনে মনে চিন্তা করলাম, এরকম একটা বার করা যায় না বাংলায়। কবিতা বেরুল একরকম খেলা-চ্ছলেই, কোনো সম্বল বা আয়োজন ছিলো না। বিষ্ণু দে, আর একজন অ-কবি বন্ধু পাঁচ টাকা করে চাঁদা দিলেন। প্রথম দুটি সংখ্যা ছেপে দিয়েছিলেন পূর্বাশার সঞ্জয়বাবুরা। সম্পাদক হলেন প্রেমেন্দ্র আর আমি। সমর সেন সহকারী সম্পাদক।"

বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে বুদ্ধদেব পরি-কল্পিত এই 'কবিতা' পত্রিকা একটি বিশিষ্ট পথচিহ্ন। দীর্ঘকাল প্রায় পঁচিশ বছর সেই পত্রিকাকে টিকিয়ে রেখেছিলেন তিনি, এবং তার রচনার ঐশ্বর্য ও মুদ্রণ পারিপাট্য এযুগে বিরল। আজ যখন অজস্র কবিতার পত্রিকা চোখে পড়ে তখন সেই-দিনের কথা স্মরণে আসে।

বুদ্ধদেবের প্রথম উপন্যাস 'সাড়া' প্রকাশিত হয় ১৯৩০-এ। তখনকার নিরিখে সেই উপন্যাসের বিষয়-বস্তু দুঃসাহসিক, তাই 'সাড়া' সেইকালে সাড়া জাগিয়েছিল। এরপর ১৯৩২-এ প্রকাশিত হল "এরা ওরা এবং আরো অনেকে—"। সেই উপন্যাসটি অশ্লীলতার দায়ে তখনকার বৃটিশ সর-কার বাজেয়াপ্ত করলেন। এই ১৯৩২-এ প্রকাশিত হয়েছে 'অকর্মণ্য' 'মন দেয়া নেয়া', 'যবনিকা পতন', 'রডো-ডেনড্রেনগুচ্ছ' এবং 'সানন্দা' — এবং ১৯৩৩-এ প্রকাশিত 'আমার বন্ধু' বুদ্ধ দেব বসুর লেখকমনের একটি উল্লেখযোগ পর্ব। একালের পাঠকের হয়ত এইস উপন্যাস সম্পর্কে বেশী কিছু জানা নেই কিন্তু তিরিশের দশকে এইসব উপন্যা ছিল একালের ভাষায় 'সাড়াজাগানে উপন্যাস'।

১৯৩৩-এ বুদ্ধদেব বসু লিখলে "যেদিন ফুটল কমল"—যৌবনের জাগর কাহিনী। শ্রীলতা ও পার্থপ্রতিম দু অবিস্মরণীয় চরিত্র। ঠিক এই পর্বে তি লিখেছেন—'হে বিজয়ী বীর', 'ধূস গোধূলি।'

ধূসর গোধূলির আঙ্গিক নাটকীয় চরিত্রগুলি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে পাঠ মনে নাড়া দেয়। অর্চনাদি, মায়া, কল্যাণকুমার— তিনটি অবিস্মরণীয় চরি এর পরে লিখিত হয়েছে 'অনেক রক এই উপন্যাসের আঙ্গিকও নাটকীয় উত্তরকালে বুদ্ধদেব বসু যে নাটকগু লিখে দর্শক ও সমালোচকের প্রশংস অভিনন্দিত হয়েছেন তার বীজ সম্ভব এইখানে।

বুদ্ধদেবের উপন্যাসের মধ্যে আ মননশীলতা চরিত্র বিশ্লেষণ আর বিচি সংলাপ। তাঁর 'অসূর্যম্পশ্যা' 'একদা তু প্রিয়ে' 'সূর্যমুখী', 'পরস্পর', আরে পর্বের উপন্যাস তার মধ্যে আছে মনে বিশ্লেষণের সূক্ষ্ম কারুকার্য। 'পরিক উপন্যাসটিতে আবার এক সাহসিক সমস্য উল্লেখ আছে। পারস্পারিক যৌন আকর্ষ সেই দুঃসাহসিক কাহিনীর বিষয়বস্তু।

বুদ্ধদেব বসু এরপর ১৯৩৪-৩৫- লিখেছেন 'রূপালি পাখি', 'লাল মেঘ 'বাসর ঘর' 'বাড়ি বদল', 'পারিবারিক'— বুদ্ধদেব বসুর রচনা নিয়তই পরিবর্তন শীল নর-নারীর প্রেম মুখ্যবস্তু হলে তার মধ্যে আছে সমকালীন বাস্তবত ছাপ।

এরপর এসেছে 'কালো হাওয়া' এ 'তিথিডোরের' মত উপন্যাস। কালে হাওয়ার রচনা কাল ১৯৪২। স্বাভাবি কারণেই লেখকের রচনায় পরিণত মানসে ছাপ। মহামায়া অরিন্দমের সংসারটা ভে চুরে তছনছ করে দিয়েছে নাটকী ভঙ্গীতে।

'তিথিডোর' একটি মেজর উপন্যা তিনটি পর্বে সমাপ্ত। উপন্যাসের কথ

রাজেনবাবুর প্রথমা কন্যা শ্বেতার বিবাহের পর তাঁর স্ত্রী প্রসব করেছিলেন 'স্বাতী'কে আর সেই স্বাতীকে নিয়েই তিথিডোর উপন্যাসটির টানা ও পোড়েনের বিচিত্র বুনন। বুদ্ধদেব বসুর নিজস্ব ভঙ্গী এই উপন্যাসে অধিকতর সার্থকতা লাভ করেছে।

সম্প্রতি প্রকাশিত তাঁর দুটি উপন্যাস 'পাতাল থেকে আলাপ' এবং 'রাতভরে বৃষ্টি" বাংলা উপন্যাসের প্রাণে বিদ্যুৎ সঞ্চার করেছে। লেখকের উপন্যাস সম্পর্কে পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজনেই একটু বিস্তারিতভাবে তাঁর কয়েকটি উল্লেখনীয় উপন্যাসের কথা বলা হল।

বুদ্ধদেব বসুর কবিখ্যাতি আজ ভারতের ভৌগলিক সীমানা অতিক্রম করেছে। বাংলা কবিতার নতুন রীতি প্রবর্তনের তিনি অন্যতম নায়ক। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সে কথা উল্লিখিত হবে।

বুদ্ধদেব বসু সম্প্রতি কয়েকটি নাটিকা' লিখেছেন. 'কলকাতার ইলেকট্রা', 'পাতা ঝরে যায়', 'বাবু ও বিবি'। এর মধ্যে 'পাতা ঝরে যায়' এবং 'বাবু ও বিবি' লেখক স্বয়ং ইংরাজীতে অনুবাদ করেছেন এবং তা ইলাসট্রেটেড উইকলী অব ইন্ডিয়ায় প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বোম্বাই শহরে এই নাটিকা দুটির নিয়মিত অভিনয়ের আয়োজন হয়েছে।

'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' একটি সাপ্তাহিকে প্রকাশিত হওয়ার পর কলিকাতা বেতার কেন্দ্রে অভিনীত হয়। এই নাটিকা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—

"একটি পুরাণ কাহিনীকে আমি নিজের মনের মত করে নতুনভাবে সাজিয়েছি, তাতে সঞ্চার করেছি আধুনিক মনুষের মানসতা ও স্পন্দনবেদনা। বলা-বাহুল্য এ ধরণের রচনায় অন্ধভাবে পুরাণের অনুসরণ চলে না। কোথাও কোথাও ব্যতিক্রম ঘটলে তাকে ভুল বলাটাই ভুল। আমার কল্পিত ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিণী পুরাকালের অধিবাসী হয়েও মনস্তত্ত্বে আমাদেরই সমকালীন।"

বুদ্ধদেব বসু কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত পড়েছেন পরিণত বয়সে এবং মহাভারতের মধ্য থেকে প্রতীকী এবং ...কেতিক কাহিনীর কায়া সংগ্রহ করেছেন। ...ন তাঁর বয়স ছিল ত্রিশ তখন মনে মনে ঋষ্যশৃঙ্গ' কাহিনী লেখার একটা অভিলাষ ...গেছিল। এছাড়া চোখের সামনে ছিল ...ীন্দ্রনাথের কবিতা। বুদ্ধদেব বসুর ... নাটক তাঁর উত্তরসূরীদের এক নতুন ...থের সন্ধান দেবে, আর প্রায় মুমূর্ষু বাংলা নাটকের শাখাটি হয়ত পত্র-পুষ্পে পল্লবিত হয়ে উঠবে। বুদ্ধদেব বসু বলছেন—তাঁর মন এখন নাটকের দিকে ঝুঁকেছে।

—অভয়ঙ্কর

ভারতীয় সাহিত্য

পরলোকে প্রবীণ সাহিত্যিক ॥

খ্যাতনামা সাহিত্যিক রামপদ মুখোপাধ্যায় গত ২৬ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর। উপন্যাস, গল্প-গ্রন্থ ও ভ্রমণকাহিনী নিয়ে রচিত পুস্তকের সংখ্যা ত্রিশেরও বেশি।

হিন্দি কথা সাহিত্য সম্মেলন ॥

কিছুদিন আগে দিল্লিতে হিন্দি কথা-সাহিত্যিকদের ছয়দিনব্যাপী এক সম্মেলন হয়। হিন্দি সাহিত্যিকদের বিভিন্নগোষ্ঠীর লেখকরা এতে যোগদান করেন। সম্মেলনটি আয়োজিত হয় "সাহিত্যিক সংস্থা"র উদ্যোগে।

প্রথম দিনের অধিবেশনের উদ্বোধন করেন সংস্থার সভাপতি শ্রীনারায়ণ সারস্বত। তিনি সংস্থার বিভিন্ন কর্মপদ্ধতির কথা বলেন ও এর সঙ্গে সহযোগিতার জন্য সকলের কাছে আবেদন জানান। আলোচনার সূত্রপাত করেন শ্রীজৈনেন্দ্রকুমার এবং সভাপতিত্ব করেন শ্রীভীষ্ম সাহনী। সর্বশ্রী কুলভূষণ, হিমাংশু যোশী এবং নিত্যানন্দ স্বরচিত গল্প পাঠ করেন। শ্রীজৈনেন্দ্রকুমার তাঁর ভাষণে বলেন—"বেশি জ্ঞান রচনার সহায়তা করে না, বরং বাধা সৃষ্টি করে। বাইরের ঘটনাবলীকে অভিজ্ঞতার আলোকে প্রকাশ করাই লেখকের ধর্ম।"

দ্বিতীয় দিন সভাপতিত্ব করেন শ্রীবিষ্ণু প্রভাকর এবং স্বরচিত গল্প পড়ে শোনান সর্বশ্রী মনহর চৌহান, রাজেন্দ্র অবস্থী, সর্বেশ্বর দয়াল শকসেনা ও শ্যাম বিমল। তৃতীয় দিন সভাপতিত্ব করেন শ্রীমোহন সিং সেংগর এবং উদ্বোধন করেন শ্রীচন্দ্রগুপ্ত বিদ্যালঙ্কার। উদ্বোধনী ভাষণ দিতে গিয়ে শ্রীবিদ্যালঙ্কার বলেন—"আজকাল অধিকাংশ ঔপন্যাসিকই পাঠকদের মনোরঞ্জনের দিকে এত দৃষ্টি দেন যে, উপন্যাসের যথার্থ প্রয়োজন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কেবল মনোরঞ্জনই উপন্যাসের লক্ষ্য নয়।" এইদিন গল্প পাঠ করেন সর্বশ্রী জৈনেন্দ্রকুমার, বিজয় চৌহান, বিষ্ণু প্রভাকর ও কেবল গোস্বামী।

চতুর্থ দিনের অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন শ্রীমন্মথনাথ গুপ্ত ও সভাপতিত্ব করেন শ্রীবিজয়েন্দ্র স্নাতক। গল্প পাঠ করেন সর্বশ্রী মুদ্রারাক্ষস ও কৃষ্ণচন্দ্র গুপ্ত। পঞ্চম দিনের অধিবেশনের উদ্বোধন করেন 'আলোচনা' পত্রিকার সম্পাদক ও প্রখ্যাত সাহিত্যিক ডঃ নামবর সিংহ। পৌরোহিত্য করেন ডঃ মহীপ সিংহ। সভাপতি ও শ্রীবলদেব বংশ স্বরচিত গল্প পাঠ করেন। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ডঃ প্রভাকর মাচ্‌ওয়ে, ডঃ সত্যপাল চুধ, ডঃ রণবীর বাংগ্রা প্রমুখ।



এ বছরে অন্ধ্রে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী রেড্ডি প্রখ্যাত লেখক শ্রী শচীন বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'অমৃত' পুরস্কার দিচ্ছেন। ছবিতে উপরোক্ত দুজন ছাড়াও রয়েছেন শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু ও শ্রী দেবেশ দাশ।

শেষদিনের অধিবেশনে পৌরোহিত্য করেন ডঃ প্রভাকর মাচ্‌ওয়ে। গল্প পাঠ করেন সর্বশ্রী ভীষ্ম সাহনী, কিশোর গিণ্ডিওয়াল, অগ্নিহোত্রী প্রমুখ। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সর্বশ্রী রমেশ গৌর, শ্যাম বিমল, শ্রীবাস্তব, দেবেন্দ্র বর্মা, রামকিশোর দ্বিবেদী ও আরো অনেকে। এই ধরনের সাহিত্যিক অনুষ্ঠান খুব কম দেখা যায়। সাহিত্যমহলে অনুষ্ঠানটি বিশেষ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে।

অতি সাম্প্রতিক উর্দু কবিতা ॥

উর্দু সাহিত্যের ইতিহাসে কবিতাই যে এখনও পর্যন্ত প্রাধান্য বিস্তার করে আছে, সে বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত হবেন। এখনও পর্যন্ত উর্দু সাহিত্যের যা কিছু বিতর্কিত সমস্যা, তা এই কবিতাকেই কেন্দ্র করে। গল্প-উপন্যাসের বাজারও হয়ত কিছুটা সচল, কিন্তু মৌলিক প্রবন্ধ সাহিত্যের দিকটি খুবই নিষ্প্রভ। যাই হোক গত কয়েক মাসে উর্দু সাহিত্যে যে সব গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, তার অধিকাংশই কবিতা-গ্রন্থ। এই সব কবিতাগ্রন্থের মধ্যে মুনিবুর রহমান রচিত "বাজদিদ", শ্রীমাখদুম মহীউদ্দীন রচিত "বিমাত-ই-রাকুম", শ্রীখালিমুর রেহমান আজামি রচিত "নয়া আজাদ-নামা", শ্রীশাহ্‌ তামকানত রচিত "তারাশিদা", শ্রীওয়াহিদ আখতারের "পাথয়োকা মুখযাম্নি", শ্রীহামিদ হানাফির "সিন্ধবাদ" ও শ্রীমহম্মদ আলভি রচিত "খালি মাকন" বিশেষ উল্লেখ্য।

বিভিন্ন কবির রচনা হলেও, এর মধ্যে একদিক থেকে সকলের মধ্যে একটা সহধর্মিতা আছে। এই সহধর্মিতা হল বিষয়বস্তুর দিক থেকে। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর হতাশা, বেদনা প্রায় সব কটি কবিতাগ্রন্থেই উপস্থিত। চিরাচরিত মূল্যবোধের দিকে একটা পরোক্ষ কটাক্ষ যেন সব কটি গ্রন্থেই অনুরণিত।

শ্রীমাখদুম মহীউদ্দীনের নাম এখন উর্দু সাহিত্যে খুবই পরিচিত। সাহিত্যের বাইরে বিভিন্ন কারণেও তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ্য। তাঁর গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে হায়দরাবাদ থেকে। প্রথম যৌবনে তিনি যে সব কবিতা লিখেছিলেন তার কেন্দ্রভূমি মূলতঃ প্রেম আর বিষাদ। কিন্তু পঞ্চাশ আর ষাটের দশকে তাঁর কবিতায় একটা নতুন দিক লক্ষ্য করা যায়। প্রেম এবং জীবন সম্পর্কে একটা সংশয় যেন এই সময়ে তাঁর কবিতাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। আলোচ্য গ্রন্থের "অনুভবের একটি রাত", "নির্জনতা", "সময়—এক নিষ্ঠুর সংবাদদাতা" ইত্যাদি কবিতায় তাঁর দ্বিধা-জর্জর মনের পরিচয় পাই। শ্রীমুনিবুর রহমানের গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে আলিগড় থেকে। তাঁর কবিতা সম্পর্কে একজন প্রখ্যাত উর্দু সমালোচক বলেছেন—"শ্রীমুনিবুর রহমান নিজস্ব অনুভবের কবি। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখ-বেদনাই তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু। শব্দ নির্বাচন ও ছন্দ নির্দেশে তাঁর কুশলতা সত্যই প্রশংসনীয়।"

শ্রীখালিমুর রেহমানের "নয়া আজাদ-নামা" গ্রন্থটি এরই মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। তরুণ কবি শাহ তামকানতের গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে হায়দরাবাদ থেকে। তাঁর কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি কবিতার অবয়ব নির্মাণে যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, তা উর্দু সাহিত্যে সম্পূর্ণ নতুন।

সাম্প্রতিক কানাড়ি সমালোচনা সাহিত্য ॥

কানাড়ি সমালোচনা সাহিত্যধারাটি এখন বেশ সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। অথচ মাত্র এক দশক আগেও সমালোচনা সাহিত্য ছিল কানাড়ি ভাষায় খুবই দুর্বল।

বিগত দশকে অর্থাৎ পঞ্চাশের দশকেই প্রথম এই দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে থাকে। এই সময়ে শ্রী কে ডি কুর্তকোটি আধুনিক কানাড়ি সাহিত্যের উপর একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থটি কানাড়ি সমালোচনা সাহিত্যে নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছে বলা যেতে পারে। তিনি ১৯০০-১৯৫০ সাল পর্যন্ত কানাড়ি সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করেন।

ষাটের দশকে সমালোচনা সাহিত্য খুবই সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। অবশ্য এই সমৃদ্ধির পেছনে কয়েকটি পত্রিকার অবদান অস্বীকার করা যায় না। এই সব পত্রিকার মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় শ্রীকুর্তকোট সম্পাদিত "মন্বন্তর" এবং শ্রীআদিগ সম্পাদিত "সাক্ষী"র। এ ছাড়াও "লহরী", "কবিতা", "সংক্রমণ", "সমীক্ষা" ইত্যাদ কয়েকটি ছোট পত্রিকার অবদানও কম উল্লেখ্য নয়।

এই সমস্ত পত্র-পত্রিকায় এক ধরনের নতুন সমালোচনার রীতি প্রবর্তিত হয়। এর নাম দিয়েছেন এ'রা "নতুন রীতির সমালোচনা"। কিন্তু তাত্ত্বিক বা তুলনামূলক সমালোচনা কানাড়িতে এখনও দুর্বল। তুলনামূলক সমালোচনা সাহিত্যে শ্রী এস অনন্তশয়নাচার্য রচিত "কানাড়ি সাহিত্যে ইংরেজির প্রভাব" একটি উল্লেখযোগ্য অবদান। এ ছাড়াও কানাড়ি ভাষায় যে সমস্ত নতুন কানাড়ি গ্রন্থ সংযোজিত হয়েছে, তার মধ্যে ডঃ সুনকাপুর রচিত "কানাড়ি সাহিত্যে হাস্যরস' ডঃ মুগালি রচিত "কানাড়ি সাহিত্যের ইতিহাস" অন্যতম।

বিদেশী সাহিত্য

মহিলা উপন্যাসিকের সংকলিত রচনা ॥

মহিলা সাহিত্যিক হিসেবে জেন বোলস এক সময় বেশ কিছুটা খ্যাতি লাভ করেছিলেন। দারুণ হৈ-চৈ তুলেছিলেন স্বদেশী পাঠক মহলে। বিশেষ করে মহিলাদের কাছে তাঁর নাম-ডাক অন্যান্য মহিলা সাহিত্যিকের চেয়ে বেশি বৈ কম ছিল না। কিন্তু তারপর বেশ কিছুকাল তাঁর আর নাম শোনা যায়নি। তিনি যে নীরবে সাহিত্য সৃষ্টি করে চলেছিলেন তা বোঝারও কোনো উপায় ছিল না। কেননা ১৯৪৩ সালে তাঁর সেই প্রথম আলোড়নকারী রচনা "টু সিরিয়াস লেডিস" প্রকাশিত হবার পর তিনি একরকম সাহিত্যজগত থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। ঘরকন্নার কাজেই পুরোপুরি ডুবিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু সকলকে একরকম বোকা বানিয়েই সম্প্রতি বের করেছেন জেন বোলসের সংকলিত রচনা। প্রভূত আলোড়ন তুলেছেন পাঠক-পাঠিকাদের কাছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে মীর্জা গালিবের শতবার্ষিকী ॥

সম্প্রতি একটি খবরে জানা যায়, বিখ্যাত ভারতীয় কবি মীর্জা গালিবের মৃত্যু-শতবার্ষিকী (১৯৬৯ সালে) সোভিয়েত ইউনিয়নে ব্যাপকভাবে উদ্‌যাপিত হবে।

এশীয় জনগণের ইনস্টিটিউটের অধিকর্তা শ্রীববাজান গফুরভ এক সাক্ষাৎকারে বলেন, সোভিয়েত বিশেষজ্ঞরা এ উপলক্ষে কবি গালিবের শতবার্ষিকী কাব্যসংকলন সম্পাদনার কাজ শুরু করেছেন। এ কাজে তাঁরা ভারতীয় সাহিত্যকারদের সহযোগিতায় কাজ করছেন। শতবার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষ-ভাবে উর্দু, ফার্সী ও রুশ ভাষায় গালিবের রচনাবলী ও তাঁর জীবনী প্রকাশিত হবে।

এ প্রসঙ্গে শ্রীগফুরভ জানিয়েছেন যে, ভারতীয় শতবার্ষিকী কমিটি গালিবের কয়েকটি কাব্যের প্রথম সংস্করণের কপি সোভিয়েত ইনস্টিটিউটকে উপহার পাঠিয়েছেন।

সোভিয়েত শতবার্ষিকী কমিটি মস্কোস্থ ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীকেবল সিং-এর কাছ থেকে যে সহযোগিতা পাচ্ছেন, তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

অন্য জগতের দৃষ্টিভঙ্গিতে

সত্যিই বেশ অবাক হবার মতো ঘটনা। প্রায় একই ধরনের বিশ্লেষণ দুই সাহিত্যিকের দুটি উপন্যাসে দেখা যাবে এটা ভাবতে গেলেও বেশ কৌতূহল জাগে। কিছুতেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না, অথচ ঠিক তাই হয়েছে। উইলিয়াম গোল্ডিং-এর 'দি পিরামিড' এবং ক্রিস্টোফার ইসারউডের 'এ মিটিং বাই দি রিভার' বই দুটি পড়লে যে কোন পাঠকই তাই বেশ তাজ্জব বনে যাবেন। দুটি বইয়ের প্রধান চরিত্রের নাম অলিভার। বই দুটিতে শুধু বাহ্যিক সাদৃশ্যই নেই, ভেতরের বস্তুতেও রয়েছে

রায়াত্মক মিল। উভয় লেখকই ধর্ম দ্বারা অনুপ্রাণিত। দুজনেই বিশ্বাস করেন যে, ঈশ্বরবর্জিত মানবজীবন অর্থহীন এবং শূন্যগর্ভ। তবে তফাৎ হচ্ছে মিঃ গোল্ডিং-এর লেখার আকারবন্ধনীটা ক্রিশ্চিয়ান আর মিস্টার ইসারউডেরটা হিন্দু।

যে স্বল্প কয়েকজন পশ্চিমী, হিন্দু-ধর্ম সম্বন্ধে শোনবার মতো কথা বলেছেন, ইসারউড তাঁদের অন্যতম। বেদ সম্বন্ধে তাঁর গভীর জ্ঞানের কথা সর্বজনবিদিত। বহু বছর ধরে তিনি সমস্ত বেদ ভাল-ভাবে পড়েছেন। তাঁর লেখা শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের জীবনী একটি সার্থক রচনা বলে বিবেচিত।

গ্রেহাম গ্রীন এবং জেরার্ড মণ্ডানলে হইকিন্স দুজনেই ক্যাথলিক সাহিত্যিক হিসাবে প্রখ্যাত। কিন্তু অবিশ্বাসী সাধারণ মানবগোষ্ঠীকে গ্রীন তিক্ততা এবং বিরক্তির সঙ্গে বর্ণনা করেছেন তাঁর রচনায়। হপ-কিন্সের লেখায় কিন্তু এঁদের দেখান হয়েছে হতভাগ্য এবং করুণার পাত্র হিসেবে।

মিঃ গোল্ডিংকে ফেলা যায় অনেকটা গ্রেহাম গ্রীনের দলে। অত্যন্ত সুতীক্ষ্ম ভাষায় তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, মানুষ স্বভাবতই দুর্নীতিপরায়ণ ও স্বার্থপর এবং প্রায়শ্চিত্ত না করে তার চারিত্রিক উন্নতি সম্ভব নয়। একমাত্র ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং ঈশ্বরোপাসনার দ্বারাই মানুষ নিজেকে উন্নততর করে গড়ে তুলতে পারে। গোল্ডিং-এর বইটিতে মানুষ সম্বন্ধে হতাশা, নৈরাশ্য এবং ঘৃণার ভাবটাই বেশী প্রকট। বইটির শুধু একটি জায়গায় গোল্ডিং মন্তব্য করেছেন যে, মানুষ ইচ্ছা করলে চরিত্রশুদ্ধির ফলে পরস্পরকে সুখী করবার শক্তি অর্জন করতে পারে।

মিঃ ইসারউডের বইটিতে আছে মানুষের দুর্বলতার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা। কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী হচ্ছে অনেকটা সহানুভূতিসম্পন্ন। মানুষের চরিত্রের বিকৃতিগুলোকে নিষ্ঠুরভাবে পাঠকের সামনে তুলে ধরবার চেষ্টা করেন নি তিনি।

কবি জুলফিকর ঘোষ

জুলফিকর ঘোষ তথা খোজা জুলফিকর আহম্মদ গর্ডস বয়েসে নবীন। ১৯৩৫ সালে শিয়ালকোটে (বর্তমানে পশ্চিম পাকিস্তানে) তাঁর জন্ম। ইংলণ্ড প্রবাসী। কবি, উপন্যাসিক ও সাংবাদিক হিসেবে সুনাম অর্জন করেছেন। 'দি লস অব ইণ্ডিয়া' (১৯৬৪) তাঁর প্রথম কাব্য গ্রন্থ। 'কনফেসন অব এ নেটিভ এলিএন (১৯৬৫) তাঁর আত্মচরিতমূলক স্মৃতিচারণ। প্রথম উপন্যাস 'দি কনট্রাডিকসনস' (ম্যাকমিলান, ১৯৬৬) এবং সাম্প্রতিক উপন্যাস 'দি মর্ডার অব আজিজ খাঁ' ইতিমধ্যে লণ্ডনে কিছুটা আলোড়ন তুলেছে। বি এস জনসন-এর সঙ্গে ছোট একটি গল্প পুস্তকেরও তিনি রচয়িতাঃ ('স্ট্যাটমেন্ট এসেন্ট করপস')। বৃটেনের আর্ট কাউন্সিল কর্তৃক ইদানিং তিনি 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'র জন্য পুরস্কৃত হয়ে লাভ করেছেন দু হাজার পাউণ্ড। তরুণ ভারতীয় কবি ডম মোরাসও অনুরূপ পুরস্কৃত হয়েছিলেন বছর কয়েক আগে।

জুলফিকরের এই কবি-স্বীকৃতি কেবল পাকিস্তানের নয় ভারতেরও আনন্দের। কেন-না, অবিভক্ত ভারতেই তাঁর জন্ম। ধর্মে তিনি মুসলমান। কিন্তু পদবী তাঁর হিন্দুর। 'ঘোষ' তাঁর সারনেম। সর্বত্র এই নামেই তিনি পরিচিত।

কবি জুলফিকরের আত্মচরিত 'কন-ফেসনস অব এ নেটিভ এলিএন' থেকে খানিকটা অংশ অনুদিত করা গেল এ প্রসঙ্গেঃ

জন্মের পর আমার নাম হায়দর আলি রাখা হবে কিনা ভাবা হয়েছিল। কিন্তু তারপর আমার নাম আসান আখতার রাখা ঠিক হয়—সংক্ষেপে আসান। আমার এক 'চাচী'র মনে হয় আমার নামটা জুলফিকর আহমেদ রাখলে বুঝি মন্দ হয় না। এ নামটা শেষ পর্যন্ত টিকে গেল। কিন্তু 'ঘোষ' আমার নামের কোন অংশ বিশেষ নয়। আমার 'সারনেমে'র লেজুড় হিসেবে রয়ে গেছে। আমার বাবার নাম খোজা মহম্মদ ঘউস (G^hous)। তাঁর নামের শেষের অংশটা মুখে মুখে বিকৃত হয়ে পড়ে। বাবা তখন সিঙ্গাপুরে থাকতেন। বয়েস কুড়ির ঘরে। মিঃ বোস ছিলেন তাঁর বন্ধু।

একবার হয়েছে কি বোস আর ঘউস সমুদ্রে বেড়াতে গিয়েছিলেন ডিঙায় চেপে। কূল থেকে যখন তাঁরা মাইলখানেক দূরে তখন তাঁদের ডিঙাটায় দেখা দিল এক ফুটো। বাঁশের মাস্তুলটা আঁকড়ে ধরে দু বন্ধু তখন শিম্পাঞ্জীর মত ঝুলে রইলেন ত্রাহি ত্রাহি বলে। ধীবরেরা ওঁদের দেখতে পেয়ে উদ্ধার করে। সেই থেকে ওঁরা দুজন পরিচিত হয়ে গেলেন বোস আর ঘোষ বলে।

'কিন্তু সমস্যা আর এক দেখা দিল। ঘোষ হোল পরিচিত হিন্দু পদবী। কলকাতায় একবার যিনি এসেছেন তাঁর কাছে এটা অপরিচিত নয়। কিন্তু আমরা হলাম মুসলমান। স্বাধীনতা প্রাপ্তির আগে-কার ভারতে সাম্প্রদায়িক হানাহানি দ্বেষ-বিদ্বেষের অভাব ছিল না। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছে ঘোষ বলে এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের কাছে খোজা বলে নিজেদের আমরা পরিচয় দিতাম। ১৯৪৬ সালে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা যখন শুরু হয় তখন আমরা বোম্বাই-এর হিন্দু এলাকায় থাকতাম। নামের শেষের ঘোষ পরিচিতিই আমাদের নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে বাঁচিয়েছিল। এরপর থেকেই ঘোষকে আমরা আমাদের নামের পদবী হিসেবে ব্যবহার করে আসছি। খোজা জুলফিকর আহমদ বলেই আমার প্রকৃত ডাক-নাম হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা জুলফিকর ঘোষ নামেই টিকে যায় স্কুলের খাতায়, লণ্ডন মহলে, এমন কি পাশপোর্টের অনুমতিপত্রে।

'নামটা আমারও খুব পছন্দের। কেন-না, এ নাম আর্ধেক মুসলমান, অর্ধেক হিন্দুর; অর্ধ পাকিস্তানী, অর্ধ ভারতীয়। ধর্মের কোন গোড়ামি আমার নেই। নিজেকে আমি পাকিস্তানী অথবা ভারতীয় বলে অভিহিত করবো, সঠিক জানি না, যদিও আগেকার নামেই নিজেকে আমি অভিহিত করে থাকি। সে যাই হোক, আমার ধ্রুব বিশ্বাস, স্বাধীনতার সময় যদি ৪০ কোটি ভারতীয় নাম আমার মত হোত, তবে সাম্প্রদায়িক রক্তবন্যা আদৌ বইত কিনা সন্দেহ আছে। আমরা যখন লণ্ডনে আসি আর আমি যখন ল্যাটিন পড়তাম, তখন আমি আমার ছোট বোনটিকে ডাকতাম ডিভো। এটাও উল্লেখযোগ্য, কেননা আমার বোনদের ভিরগো, লিলো আর ডিডো নামেই ডাকা হোত। আর আমাকে ডাকা হোত জুলফ; কোন কোন সময় বা জুলফ, দি উলফ!'

('কনফেসন অব এ নেটিভ এলিএন'থেকে)

কবি জুলফিকর ঘোষের স্মৃতিচারণটি মাত্র ১০টি অধ্যায়ে বিভক্ত। এ কয়টি অধ্যায়ে তিনি তাঁর জন্ম, বাল্য বোম্বাই ও লণ্ডনের ছাত্রজীবনের কথা—বিশেষ করে তাঁর কবিজীবনের উন্মেষের কথা অতি সুন্দরভাবে লিপিবন্ধ করেছেন। ১৯৫২ সাল থেকে তিনি লণ্ডন প্রবাসী। পিতা লণ্ডনের জনৈক ব্যবসাদার। লণ্ডন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পাঠ করবার সময় তিনি 'ইউনিভার্সিটি পোয়েট্রি' পত্রিকার সম্পাদনা ভার গ্রহণ করেন জন ফুলার, বি এস জনসন ও অ্যান্টনী স্মিথ-এর যুগ্ম সম্পাদনায়। ডিলন টমাস, ইয়েটস, ইলিয়ট, অডেন তাঁকে কাব্য রচনায় বিশেষ করে অনু-প্রাণিত করেন। 'দি অবজারভা'র পত্রিকার ক্রিকেট রিপোর্টার-এর পদ পান। এবং বাষট্টি সালে এম-সি-সি দল যখন ভারত ও পাকিস্তান সফরে আসেন জুলফিকর ঘোষও সে সময় 'দি অবজারভারে'র তরফ থেকে টেস্ট ম্যাচ রিপোর্ট করেন।

—নিখিল সেন



আকর্ষণীয় কাহিনী

নায়িকা ধীরা মুখাজী। বাপের উপযুক্ত মেয়ে। রাখাল মুখুজ্জে মেয়েকে একেবারে হাতে ধরে গড়ে তুলেছিলেন। মানুষকে যেভাবে হোক ঠকিয়ে কেমন করে পয়সা উপার্জন করতে হয় তার একটা রীতিমত উদাহরণ হয়ে উঠলো ধীরা। আর উপকরণ হিসেবে সামান্য নাচের অভ্যাস। রূপ, যৌবন, চালচলন, কথাবার্তা সব মিলিয়ে কেবল রীতিমতো স্মার্টই নয়, পুরুষের মন ভুলিয়ে তাকে দিয়ে কাজ উদ্ধার করে নেবার কায়দাগুলোও সে পাকাপোক্তভাবে রপ্ত করেছিল। তাই যাদের দুবেলা দু মুঠো অন্নের সংস্থান ছিল না সেই ধীরা কলকাতায় নিজেদের বিরাট এবং আধুনিক সাজ-সজ্জায় সজ্জিত বাড়ির মালিক হল। হিসেবী রায় বাহাদুর নগেন্দ্রলাল রায়, তসাপুত্র হরেন্দ্রলাল রায়ও ঘায়েল হল ধীরার কাছে। নাচের মাস্টার বীরেনকুমার; পূর্ণেন্দু দেবনারায়ণ প্রভৃতিরাও ধীরার যে কোন হুকুম তামিল করার জন্যে একেবারে তৈরী হয়েই থাকতো। ফলে অর্থের জন্যে কখনো দুশ্চিন্তা বা দুর্ভাবনায় পড়তে হয়নি তাকে। কিন্তু অদ্ভুত চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ধীরার যে, সে কখনো কারোর কাছে ধরা দেয়নি। বেশ কৌশলের সঙ্গেই ওদের কামনা-বাসনার তপ্ত ছোঁয়া থেকে বাঁচিয়ে রেখেছিল নিজেকে। ওরা যা চায়, তা তার অজানা নয়। অথচ কেবলি আশ্বাস দিয়ে, বেশ দক্ষতার সঙ্গে তাদের সঙ্গে দিনের পর দিন অভিনয় করে নিজের কাজ ষোল-আনা গুছিয়ে নিয়েছে। পরে ঐ সংসারী জীবনে বিরক্ত ও বীতশ্রদ্ধ হয়ে, তার চাটুকারদের কিছু বোঝবার আগেই তাদের চমকপ্রদ ভাবে দূরে ঠেলে দিয়েছে। কেবল তাই নয়, ভবিষ্যতে তারা যাতে তার কোন ক্ষতি না করতে পারে তার জন্যে তাদের বিপদের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে এবং ব্ল্যাকমেল করার মতো রসদও হাতে রেখে কেবল বীরেন কুমারকে সঙ্গে নিয়ে সংসার ত্যাগ করে। 'জোড় পর্ব' উপন্যাসের প্রথম পর্বের কাহিনী এখানেই শেষ।

দ্বিতীয় পর্বে ধীরার আর এক ভূমিকা বেশ আকর্ষণীয় ও চমকপ্রদ। এখানে সে ধীরা নয়, মেনকা মা। একনিষ্ঠ সন্ন্যাসিনী জগজ্জননীর অংশ। দক্ষ অভিনেত্রী ধীরা 'মেনকা মা' রূপে এই পর্বেও উত্তীর্ণা। চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং জীবনধারণের উদ্দেশ্য পূর্ববৎ। কিন্তু এই পর্বে তার দুজন সমধর্মী দক্ষ প্রতিপক্ষের মোকাবিলা করতে হয়েছে। দুজন ঘুঘু জোচ্চোর সাধু সেজে নিজেদের কাজ গুছুচ্ছিল—মেনকা মার মতো। তারা হলো বাবা জগদীশ নাথ ও কিশোর ঠাকুর। একজন নিজেকে স্বয়ং রুদ্র এবং অপরজন শ্রীকৃষ্ণ বলে পরিচয় দিচ্ছিল। সেই সঙ্গে এদের দুজনের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা প্রবল ছিল। মেনকা মার মধ্যে অবশ্য তা ছিল না। ঘটনাচক্রে এই তিন মূর্তির আলাপ হবার পর থেকে উভয়েই মেনকা মাকে পাবার জন্যে ব্যাকুল হল। এবং জগদীশ নাথ ও কিশোর ঠাকুর পরস্পর পরস্পরের রাইভালে পরিণত হয়। এসব বুঝে, মেনকা মা কিছুদিন ওদেরকে নিয়ে খেলা করলো এবং যথাসময়ে ওদের কামনার চরম মুহূর্তে ব্ল্যাকমেল করার ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দিল। কিন্তু সে নিজেও ধরা পড়ে গেল শেষ পর্যন্ত। কিশোর ঠাকুর প্রত্যাখ্যাত ও অপমানিত হয়ে প্রতি-শোধ নেবার জন্যে মেনকা মা ওরফে ধীরা মুখাজীর পূর্ব পরিচয় সংগ্রহ করে ধীরাকে আঘাত দিতে উদ্যত হয়। অবশেষে পুরো খেসারত দিয়ে ধীরা কিশোর ঠাকুরের হাত থেকে নিজেকে বাঁচায়।

দুই পর্বে বিভক্ত আলোচ্য গ্রন্থটি রসোত্তীর্ণ, প্রাঞ্জল ও সুখপাঠ্য। কাহিনীর বিন্যাসে ও চরিত্র চিত্রণে, বিশেষ করে ধীরার চরিত্র অঙ্কনে লেখক যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন।

জোড়া পর্ব। (উপন্যাস) পঞ্চানন ভট্টাচার্য। বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড; ১ শংকর ঘোষ লেন, কলি-৬। মূল্যঃ দশ টাকা।

রূপসী অন্ধকার

উত্তরপাড়ার রাজ্যেশ্বর রায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও ছেলে-মেয়েদের ভবিষ্যৎ ভেবে ছেলে-মেয়ে বৌ সকলকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত কলকাতার ইন্টালি মার্কেটের কাছে তাদের নিজেদের বাড়িতে এসে বসবাস শুরু করলেন। তাঁর বড়ছেলে রূপক, যে কয়েকবার বি-এ ফেল করে নিতান্ত পিতার মন রাখতে পড়ার 'শো' চালিয়ে যাচ্ছে, ইতি-মধ্যে শহর সভ্যতার নিষিদ্ধ ফলের সন্ধান পেয়ে গেছে এবং তার আস্বাদ গ্রহণের জন্য উদগ্রীব। মেজ ছেলে শোভনও বন্ধু-কৌলিন্যে, কলকাতায় আসার অল্পদিনের মধ্যে নিষিদ্ধ জগতে আনাগোনা শুরু করতে চাইছে। ছোট মেয়ে সুমিও বাদ গেল না। কেবল বড়মেয়ে সুবির মনজগতে কোন পরিবর্তন দেখা যায়নি যদিও সে সঙ্গোপনে রূপকের বন্ধু ও তার গৃহশিক্ষক পথিককে মন দিয়েছিল।

রাজ্যেশ্বর রায় ছেলেমেয়েদের উপনিষদের আদর্শে মানুষ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর আশাকে সফল দেখার আগেই দেখলেন রূপক, শোভন ও সুবির অধঃপতন। রূপক ধাপে ধাপে এগুচ্ছিল। টাকা দিয়ে, বোনের বান্ধবীকে দিয়ে তার কামনাকে তৃপ্ত করতে না পেরে বস্তির রুক্মিনিকে নিয়ে মেতে উঠলো। সেখানেও তার অতৃপ্তি, তাই নিয়ে পড়লো রীতাকে। শোভন পালিয়ে গেল বাপের বন্ধুর বাগ-দত্তাকে নিয়ে। সুমি চরম অপমান বয়ে নিলো চন্দনের সঙ্গে অবৈধ সংসর্গ করে।

ব্যর্থতার ভারে শুধু রাজ্যেশ্বর স্ত্রী সুনয়নী ও বড়মেয়ে সুবিকে নিয়ে উত্তর-পাড়ায় ফিরে গেলেন।

অজাতশত্রুর 'রূপসী অন্ধকার' এক কথায় সেক্স-জারকিং উপন্যাস। লেখক কতকগুলি খণ্ড কাহিনী বা উপাখ্যান সৃষ্টি করে, সেগুলির মাধ্যমে যৌন বিকৃতিকেই চিত্রায়িত করেছেন। লেখার ক্ষমতা থাকলে যৌন জীবন নিয়ে কতটা এগোনো যেতে পারে তার আর একটি নিদর্শন হয়ে রইলো 'রূপসী অন্ধকার'।

রূপসী অন্ধকার (উপন্যাস) অজাত-শত্রু। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড; ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট; কলিঃ-১২। দাম-সাত টাকা।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

সাহিত্য পত্রিকা হিসেবে 'প্রতিবিম্বকে'র বর্তমান সংখ্যাটিই প্রথম। বলা বাহুল্য পত্রিকাটির চরিত্র এই সংখ্যায় এখনো তেমন-ভাবে ফুটে উঠতে পারেনি। এ সংখ্যায় লিখেছেন হরপ্রসাদ মিত্র, অলোকরঞ্জন দাশ-গুপ্ত, স্বদেশরঞ্জন দত্ত, অমিতাভ দাশগুপ্ত, শান্তি লাহিড়ী, রত্নেশ্বর হাজরা, মানস রায়চৌধুরী, সুনীথ মজুমদার, রমা ভট্টাচার্য, চিত্রা মুখোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে।

প্রতিবিম্বক (১ম সংখ্যা) সম্পাদক—শিবনাথ রায় ও রমা ভট্টাচার্য। সাহিত্য নিকেতন, ১৪ নৈনানপাড়া লেন, কলিঃ-৩৬

আলোচনা :

"বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে"

সনৎকুমার গুপ্ত

যুগপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০—৯১) ক্ষুদ্র অখ্যাত বীরসিংহ গ্রামে জন্মে কলকাতায় নিজের কর্মক্ষেত্র পরিচালনা করে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের কোন্ কাজের জন্য কোন্ সময়ে কোন্ ব্যক্তি এই গান রচনা করেছিলেন; এ বিষয়ে জানতে চাইলেও বর্তমানে কেউ জানাতে পারেন নি। সম্প্রতি দেশে-বিদেশে ইন্দ্র-বায়ু-বরুণ নানাভবে সাগর-তর্পণ করছেন। এ সব লেখাতেও কোন হদিস পাওয়া যায় না। বিদ্যাসাগরের কোন ক্ষুদ্র-বৃহৎ জীবনীতেও এর কোন সদুত্তর নেই।

১৮৫৬ সালের নভেম্বর মাসে বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হয়। এর আগেই বিদ্যাসাগরের অভিনব বিধি-ব্যবস্থা প্রবর্তনার সংবাদে সমাজে আন্দোলন হয়। এটিকে ব্যঙ্গ করে বহু খ্যাত-অখ্যাত-প্রাচীন-নবীন "বিধবা বিবাহ" নিয়ে গান রচনা করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, দীনবন্ধু মিত্র, দাশরথি রায়, রসিকচন্দ্র রায়, রূপচাঁদ দাস মহাপাত্র, প্যারীমোহন কবিরত্ন ওরফে ধীরাজ প্রভৃতির নাম করা যায়। এগুলির মধ্যে "বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে" গানটি বর্তমানে চলচ্চিত্রের কল্যাণে আমাদের কালেও গাওয়া হয়েছে। এই গানটির রচয়িতার নাম ও গানটি এখানে তুলে দিচ্ছি।

সে ১৮৫৬ সালের কথা। গৌরীশংকর তর্কবাগীশ মহাশয়ের "সম্বাদ ভাস্কর" মহাসমারোহে প্রকাশিত হচ্ছে। শিমুলিয়াবাসী তপস্বীচরণ চক্রবর্তীর একটি "প্রেরিত পত্রে" জানা যায় :

"সম্প্রতি পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়, বিধবা বিবাহের সূত্র তুলিয়াই আপনার 'বিদ্যাসাগর' উপাধিটিকে এককালে প্রভূত বিখ্যাত করিয়া লইলেন, ইদানীং প্রায় সকল স্থানে 'বিধবা বিবাহ' এই মহামঙ্গলকর বিষয়সূচক নানা কথা উদ্ভাসিতা হইতেছে, অধিক আর কি কহিব কলিকাতা মহানগরীতে এবং অন্যান্য পল্লীগ্রামের প্রকাশ্য পথে বহির্গত হইলে প্রায়শঃ দেখা যায়, যে অনেকানেক প্রাকৃত লোক, কেহ২ গরুর গাড়ী চড়িয়া, কেহ বাঁক ঘাড়ে করিয়া, কেহবা মদ্য পানে মত্ত হইয়া 'বেঁচে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে' ইত্যাকার পক্ষি রচিত গীত করিয়া আনন্দলাভ করিতেছে। কেবল এমত নহে, অনেকানেক ভদ্রলোকেরাও সবান্ধব হইয়া উপযুক্ত সময়ে পক্ষি রচিত ঐ গান করিয়া আনন্দিত হন।"

—'সম্বাদ ভাস্কর' ১৮৫৬,
১২ আগস্ট।

এখন পক্ষি ব্যক্তিটি কে তা জানা দরকার। আমাদের দেশের গ্রন্থাগারে অসংখ্য অজানা বই ছড়িয়ে আছে। এর কোন আধুনিকতম 'ডকুমেনটেশান' নেই। ফলে গ্রন্থ ও গ্রন্থকারদের সঠিক পরিচয় পাওয়া যায় না। সম্প্রতি শ্রীবিনয় ঘোষ মশায় তাঁর সম্পাদিত 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র'—চতুর্থ খণ্ডে রূপচাঁদ পক্ষীর একটি লুপ্ত-প্রায় সঙ্গীত গ্রন্থ পুনর্মুদ্রিত করেছেন। এই সঙ্গীত গ্রন্থের নাম—'সঙ্গীত রস কল্লোল'। এতে আছে নানা বৈচিত্র্যে পূর্ণ রূপচাঁদ পক্ষীর অপূর্ব জীবন-কথা। এই সঠিক তথ্যর অভাবে রূপচাঁদের কোন প্রামাণ্য জীবনী জানা যায় নি। এযাবৎ আমরা রূপচাঁদ পক্ষীকে এক বিকৃত রুচির লোক, নেশাখোর ও লম্পট বলে জেনে এসেছি। 'সঙ্গীত রস কল্লোলে'র জীবনীতে জানা যায় :—

"এইরূপে সঙ্গীত ও কবিতায় ব্যুৎপত্তি লাভ হইলে, কতকগুলি ভদ্র সন্তান জুটিয়া 'পক্ষীর জাতিমালা' নামক পালার শখের পাঁচালির দল করেন।...এই দলের স্থাপয়িতা রূপচাঁদকে রাজা বৈদ্যনাথ রায়, আশুতোষ দেব (ছাতুবাবু), ব্রজমোহন সিংহ, রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু), কাশীনাথ মল্লিক, রমানাথ ঠাকুর, নীলরতন হালদার, নকুড়চন্দ্র মল্লিক, মোহনচাঁদ বোস, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি শহরের প্রধান প্রধান মহাত্মারা পক্ষিরাজ উপাধি প্রদান করেন, তদবধি রূপচাঁদ পক্ষি নামে খ্যাত হয়েন।"

রূপচাঁদ বিদ্যাসাগরেরও অজানা লোক ছিলেন না। তিনি বিদ্যাসাগরের পরমাত্মীয় 'সোমপ্রকাশ' সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের অন্যতম বান্ধব ছিলেন। বিদ্যাসাগরের প্রথম জীবনী লেখেন তাঁর সেজো ভাই পণ্ডিত শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন। বইটির নাম 'বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত'। প্রকাশকাল ১২৯৮ সাল। এই বইতে রূপচাঁদের গান ছাপা হয়েছে। গানটি এই :

বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর
চিরজীবী হ'য়ে।
সদরে ক'রেছো রিপোর্ট,
বিধবাদের হবে বিয়ে।
কবে হবে এমন দিন,
প্রচার হবে এ আইন,
দেশে দেশে জেলায় জেলায়
বেরোবে হুকুম,
বিধবা রমণীর বিয়ের
লেগে যাবে ধুম,
আর কেন ভাবিস লো সই,
ঈশ্বর দিয়াছেন সই,
এবার বুঝি ঈশ্বরেচ্ছায়
পতি প্রাপ্ত হই,
রাধাকান্ত মনোভ্রান্ত দিলেন
না কো সই,
লোকমুখে শুনে আমরা
আছি লোক-লাজভয়ে।
একাদশী উপসের জ্বালা,
কর্ণেতে লাগিত তালা,
ঘুচে যাবে সে সব জ্বালা,
জুড়াবে জীবন,
দুজনাতে পালঙ্কেতে, করিব শয়ন
বিনাইয়া বাঁধবো খোঁপা
গুজিকাঠি মাথায় দিয়ে।
যেদিন হ'তে সহাপ্রসাদ,
শুনেচি ভাই এ সংবাদ,
সে দিন হ'তে আনন্দেতে
হয় না রেতে ঘুম
পছন্দ ক'রেছি বর,
না হতে হুকুম,
ঠাকুরপোরে ক'রব বিয়ে,
ঠাকুরঝিরে ব'লে ক'য়ে।।

এখানে রূপচাঁদের জীবনী বিস্তৃতভাবে আলোচনার স্থান সীমাবদ্ধ। অতি-সংক্ষিপ্তভাবে আমার সংগৃহীত তথ্যাদির বিবরণ দিচ্ছি।

স্বাধীন উড়িষ্যা রাজের কলকাতা প্রতিনিধি ছিলেন রূপচাঁদ দাস মহাপাত্রের বাবা গৌরহরি দাস। ১৮-১৯ শতকে তিনি কলকাতায় বাস করতেন বহুবাজার মলঙ্গায়। এই কলকাতাই রূপচাঁদের আসল দেশ। জন্ম ১৮১৪ খৃস্টাব্দ। হেয়ার স্কুলে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছাত্র ছিলেন। বড়লোকের ছেলে, গান-বাজনা, গান লেখার শখ ছেলেবয়েস থেকেই। বাহবা দেবার লোকের অভাব হয় নি। তিনি তুলনীয় হতে পারেন তাঁর ছেলের বয়সী কবি-রবীন্দ্রের স্বভাবের সঙ্গে। কোন বাঁধাধরা লেখাপড়ায় আবদ্ধ হন নি। স্পষ্টবক্তা রসিক ব্যক্তি। তবে সেটা তখনকার রুচির অনুযায়ী ছিল। সকলে শ্রদ্ধাও করতো। অপুত্রক অবস্থায় অতিবৃদ্ধ বয়সে বিগত স্বদেশী আমলে ১৯০৫ সালের স্বর্গত হন।

পূর্ণতর আলোচনার জন্য শ্রীবিনয় ঘোষ সম্পাদিত 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজ-চিত্র ৪র্থ খণ্ড' এবং বর্তমান লেখক কর্তৃক সম্পাদিত 'বিদ্যাসাগর জীবনচরিত ও ভ্রম-নিরাস' বই দুটি দেখতে অনুরোধ করি।

লোকটা

মৃগাঙ্ক রায়



লজ্জায় অপমানে একেবারে কুঁকড়ে গেল লোকটা। বসন্তখোদিত ফ্যাকাশে মুখটা গর্জমান রাস্তার দিকে ফিরিয়ে বসে রইল। আমি যে এক ট্রাম লোকের মধ্যে যাচ্ছেতাই করে অপমান করলাম ওকে, এমন কি ঘাড় ধরে নামিয়ে দেব বললাম, নরকের কীট বললাম, পশু বললাম, সমাজের কলঙ্ক বললাম—তার জবাবে একটা কথা পর্যন্ত বলতে পারল না। চোখ নামিয়ে চুপ করে রইল।

অপমান করার যুক্তিসংগত কারণ ছিল। আমার সামনের সিটে যে বৃদ্ধ ভদ্রলোক দশ পয়সার গোলাপী টিকিট হাতে নিয়ে রাস্তার দৃশ্য দেখছিলেন বসে বসে তিনি উঠে যেতেই লোকটা কোত্থেকে ছুটে এসে আমার হাতের তলা দিয়ে গলে গিয়ে একতাল ছুঁড়ে দেওয়া কাদার মতো সেঁটে বসে গিয়েছিল সেখানে। কারো বাড়া ভাতে মুখ দেওয়া যদি অন্যায় হয় তা হলে এটাও অন্যায় এক একই শ্রেণীর অন্যায়। যার ভাত তার অধিকারের প্রশ্ন তো আছেই তাছাড়া সেই ভাতের প্রতি তার মুগ্ধ মমতাও খণ্ডিত হয়ে বেদনার সৃষ্টি করছে। ভাত মুখে দেওয়ার আগেই খাওয়া শুরু হয়ে গেছে তার, মন তৈরি হয়েছে, ইন্দ্রিয় সজাগ হয়েছে, সমস্ত শরীর জুড়ে প্রতীক্ষার হা-মুখ ক্ষুধার্ত হয়ে উঠেছে। তখন ক্ষুধা ছাড়া তার অস্তিত্বের আর দ্বিতীয় কোন অর্থ নেই। তার শরীর এবং মনের এরকম তীব্র একরোখা টান হঠাৎ কেউ ছিন্ন করলে যে অন্যায় করা হয় ঐ লোকটাও ঠিক সেই একই অন্যায় করেছে। যেহেতু বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সামনে আমিই দাঁড়িয়েছিলাম অতএব ঐ সিটে যে আমারই অধিকার এ বিষয়ে তর্কের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা ঐ নরম নীলাভ আসনে আমার বহু দিনের বহু রাত্রির বহু বৎসরের অতিশয় ক্লান্ত অবসাদগ্রস্ত শরীরটাকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধশেষে অর্জুনের ছিলামুক্ত ধনুকের মতো এলিয়ে দেবার কল্পনা আমার মধ্যে প্রবেশ করেছিল। মনে মনে আমি সেই সম্ভাব্য আরামের মধ্যে নিমজ্জিত হচ্ছিলাম, তার স্বাদ আমার শরীরে সঞ্চারিত হচ্ছিল। খোলা জানালার পাশে ঐ আসনে বসে ইচ্ছে হলে একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হতে পারি। গভীর ঘুমের তুলনায় সে তন্দ্রা অনেক মধুর। কেননা মৃত্যুর মতো গভীর ঘুমও অবয়বহীন অন্ধকার ছাড়া কিছু নয়। তাকে অনুভব করা যায় না, উপভোগ করা যায় না। শরীর এবং মন দুয়েরই মৃত্যু হয় তখন। অথচ তন্দ্রা ঘুম এবং জাগরণের, জীবন এবং মৃত্যুর সীমান্তবর্তী। তার মধ্যে পৃথিবীর প্রবাহিত কোলাহল নৈঃশব্দ্য, নির্জনতা, দূরস্থিত অতীত, জলধারা, আবর্তিত আয়ু অস্বচ্ছ ছায়ার মতো প্রবেশ করে। তখন পৃথিবীর সঙ্গে পরম আলস্যের মধ্যে যে সংযোগ সাধিত হয় তার স্বাদ বড় মধুর: কেননা সেই সংযোগে কর্মের উদ্যোগ নেই, কোন দায়িত্ব গ্রহণের বা বর্জনের প্রশ্ন নেই, জয় বা পরাজয়ের শঙ্কিত প্রস্তুতি নেই।

ইতিমধ্যে ব্রীজ পার হয়ে রেসকোর্সে গিয়ে পড়েছে ট্রামটা। রেসকোর্স তখন নির্জন, শাদা রঙের গোল রেলিং দিয়ে ঘেরা। দক্ষিণপ্রান্তের সারবন্দী বাড়িগুলোর গলা অবধি সিঁড়ি উঠে গেছে। রাত্রে তাদের কোটরে কোটরে তীব্র আলো জ্বলে। তখন সেই আলোয় চারদিকের বিশাল অন্ধকারের মধ্যে বাড়িগুলোকে কোন মহারথীর অশ্বসারথীহীন পরিত্যক্ত রথের মতো মনে হয়।

রেসকোর্স ছাড়িয়ে দৌড়তে দৌড়তে ট্রামটা যখন ময়দানের মধ্যে গিয়ে পড়বে তখন জানালার পাশের ঐ নীলাভ নরম আসনে বসে থাকলে শীতের উষ্ণ রোদ আমার ছোট্ট মেয়েটার মতো গালে গলায় বুকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে। তার আদরের মাখামাখির মধ্যে কোন দাবী নেই কোন প্রার্থনা নেই। প্রচণ্ড গ্রীষ্মের শেষে ফাটা মাটির অন্ধকার মুখ যেমন করে প্রথম বর্ষার জল শুষে নেয়, আমার শরীরের সহস্র-লক্ষ কূপাবলী তেমনি করে শোষণ করবে রোদের সেই সোনালী আমেজকে। আমি কি তখন, যদি জন্মান্তর থাকে, আবার এই দৃশ্যময়, গন্ধময়, স্পর্শপ্রীত পৃথিবীতে ফিরে আসতে চাইব, আমার যৌবন চাইব, শিশুত্ব চাইব, এই চলন্ত ট্রামের এই বিশেষ আসনটিতে বসে রৌদ্রস্নাত হতে চাইব? না ট্রামলাইনের ধারে বহু বৎসরের পুরোনো প্রাচীন ঋষিদের মতো গাছগুলোর দিকে চোখ পড়লে ভাবব, আবার যদি জন্ম নিতে হয় তবে যেন গাছ হয়ে জন্মাই? কেননা পৃথিবীর সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠ আর কে—অথচ এমন নির্লিপ্ত! কে আর এমন আনন্দিত, শোকহীন, সন্তাপহীন, সংগ্রামহীন। কার যৌবন প্রতি বসন্তে এমন করে ফিরে ফিরে আসে, কার মৃত্যু এমন নিঃশব্দ, এমন আবেগহীন!

আমার চোখের দৃষ্টিতে কোন অসহনীয় উত্তাপ ছিল কিনা জানি না, তবে সেই লোকটার মুখের ওপর পড়তেই সে ফিরে তাকাল একবার এবং পরমুহূর্তেই বহির্দৃশ্যে মনোনিবেশ করল আবার। আমার আবারও ইচ্ছে হলো ঘাড় ধরে ট্রাম থেকে নামিয়ে দিই ওকে কিন্তু আগের বারের মতো এবারও সাহস হল না। অতএব সেই উদ্যত ক্রোধকে সংযত করতে হল। ও যখন বেদখল করেছিল আমাকে তখনও একটা কথা মুখ



ফুটে বলতে পারিনি। অকস্মাৎ বঞ্চিত হবার লজ্জা ক্রোধ ভেতরে ভেতরে আহত সাপের মতো ছুবলে বেড়াচ্ছিল আমাকে। আর তারই জ্বালায় মনে মনে যাচ্ছেতাই অপমান করেছিলাম ওকে। মাথা নিচু করে বসিয়ে রেখেছিলাম, একটা কথা পর্যন্ত বলতে দিইনি। ওর তখনকার করুণ অসহায় মুখের দিকে তাকিয়ে উথলে ওঠা দুধের মতো হাসির একটা ঢেউ ফুলে ফুলে উঠেছিল আমার মনের মধ্যে।

হঠাৎ কাটা ঘুড়ির মতো পাক খেতে খেতে পড়ে গেল রাগটা। মনে পড়ল, আমার কোষ্ঠীবিচার করে এক জ্যোতিষরত্ন আমার জন্মলগ্নস্থিত শনির বঙ্কিম দৃষ্টি আবিষ্কার করেছিলেন। সেই ভয়ংকর দৃষ্টির বাঁকা ফলক আমার জীবনের মধ্যে গেঁথে আছে বলেই আমার এই দুর্ভাগ্যপীড়িত অবস্থা। কোন কিছুতেই সাফল্যের নাগাল পাই না। কে যেন আমার হাতের মুঠো থেকে ছিটিয়ে নেয় সব কিছু। যেমন এই লোকটা কেবল, হুট করে কোথা থেকে এসে আমার হাতের তলা দিয়ে গলে গিয়ে বসে পড়ল আমারই অধিকৃতপ্রায় আসনে। দোষটা ওর নয়, দোষ আমার ভাগ্যের। জন্মলগ্নস্থিত শনিগ্রহের সেই বঙ্কিম দৃষ্টি। জ্যোতিষরত্নমহাশয় আমাকে সেই বিষদৃষ্টির কোপ থেকে ত্রাণ করবার জন্যে যাগ-যজ্ঞ-হোম ইত্যাদির এক লম্বা প্রেসক্রিপশন দাখিল করেছিলেন। আমার জন্য তাঁর দরদী প্রাণ যে সত্যিই কেঁদে উঠেছিল সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না আমার যদিও সেই সব শোধনাত্মক ক্রিয়াকলাপের মূল্য প্রায় তিন অংকে গিয়ে পৌঁছেছিল। আমি যে সে সব কিছুই করিনি তার অন্য কারণ ছিল। শনির বিষদৃষ্টি আবিষ্কৃত হবার পর থেকে যেন সব কিছু কেমন ওলোট-পালট হয়ে গিয়েছিল আমার মধ্যে। সব কিছুর মধ্যেই শনির দৃষ্টি দেখতে শুরু করেছিলাম। মনে হতো, শনির বলয়টা আমার গলায় পরিয়ে দিয়েছে কেউ। বলয়টা অবিশ্রাম অতিতীব্র গতিতে ঘুরছে এবং তার স্পর্শ সাপের পাকের মতো হিম, হিংস্র। মনের সেই ঘোলাটে অবস্থায় জ্যোতিষরত্নকেও শনির অনুচর বলে সন্দেহ হয়েছিল আমার। সুতরাং যাগযজ্ঞ দূরের কথা। তার ছায়াও আর মাড়াইনি আমি।

অতএব সেই বাঁকা ফলকটার যন্ত্রণা আমাকে সহ্য করতেই হবে, করছিও। চোখের ওপর দেখছি, কিছু লোক জীবনটাকে ফুটবলের মতো লাথি মেরে বেড়াচ্ছে। জীবন তাদের পায়ের নিচে লুটিয়ে লুটিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে খেলছে। তারা ভাগ্যবান। ভাগ্য বা নিয়তি কি অলক্ষ্য কোন দেবতা যার ইচ্ছা দুর্জ্ঞেয়, যুক্তিহীন? নিয়তি কি অন্ধ না একচক্ষুহীন? না মানুষেরই সৃষ্টি সে, অথবা মানুষ এবং প্রকৃতির মিলিত সৃষ্টি? বিশ্বকে ব্যাপ্ত করে মানুষ এবং প্রকৃতির যে বিশাল কর্মপ্রবাহ, তার শতলক্ষ স্রোতধারার যে পারস্পরিক সংঘাত, সংগম ও বন্ধনী, প্রবাহ প্রতিপ্রবাহ এবং প্রতিঘাতের জটিল বুনোট তারই কোন না কোন ঢেউয়ের চূড়ায় কি আমরা ভাসছি। দুর্লক্ষ্য অতীত থেকে আজ অবধি কোটি কোটি মানুষের ইচ্ছা কি আমাদের ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করছে, আমাদের ইচ্ছা কি আগামীকালের মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করবে।

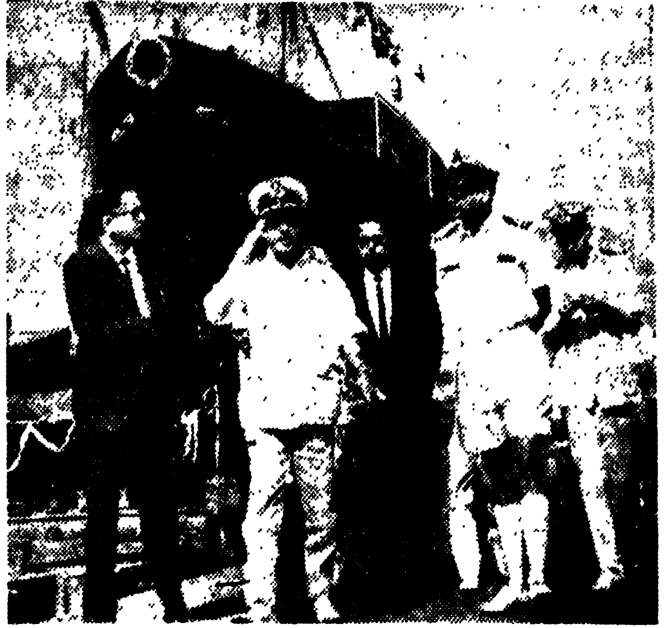
ট্রামটা জনৈক অশ্বারোহী ইংরেজ বীরের মূর্তি পার হয়ে গেলে আবার একটা আসন খালি হল। আমি বসলাম না। ভাগ্য আবার কি ফাঁদ পেতে রেখেছে ওখানে কে জানে। এমন কি হতে পারে যে আমি বসলেই ট্রামের একটা চাকা হঠাৎ উল্টোদিকে ঘুরতে শুরু করবে বা লাইন ছেড়ে সবুজ মাঠের মধ্যে নেমে যাবে ট্রামটা?

ঘাড়মুড়ে নিচু হয়ে বাইরের দিকে তাকালাম। দিগন্তের বৃত্তরেখা ধরে সারবন্দী বাড়ি, কয়েকটা রৌদ্রালোকিত আকাশচুম্বী প্রাসাদ শাদা সারসের মতো গলা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। ঐ সব বাড়িতে কারা থাকে, কারা কাজ করে জানতে ইচ্ছে করে আমার। একবার দেখতে ইচ্ছে করে তাদের, আলাপ করতে ইচ্ছে করে।

ধর্মতলায় বহু লোক নেমে গেল ট্রাম থেকে। সেই লোকটাও নামল। আমি একবার তাকালাম তার দিকে, তার বসন্তক্ষোদিত মুখের দিকে, নীল ডোরাকাটা আধময়লা সার্ট, সস্তা সরু টেরিলিনের প্যান্ট ও নৌকোর গলুইয়ের মতো সরুমুখ জুতোর দিকে। তারপর বসে পড়লাম সেখানে যেখানে আমাকে বঞ্চিত করে এতোক্ষণ বসে ছিল সে। যদিও জানি নামবার সময় হয়ে এসেছে আমারও।

দেশে বিদেশে

শেখ কি করবেন ?



নৌবাহিনীর প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ ভাইস-এ্যাড্‌মিরাল এ. কে. চ্যাটার্জি হপার বার্জ "সেবক" পরিদর্শন করছেন। ভারতীয় নৌবাহিনীর পক্ষে কলকাতার গার্ডেন রীচ ওয়ার্কশপে এই জাহাজখানি নির্মিত হয়।

গত অক্টোবর মাসে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ তাঁর মাস-পয়লা বেতার ভাষণে এক জায়গায় বলেছিলেন, "ভারতবর্ষ যদি সত্যি সত্যিই শান্তি চায় তাহলে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে সে অন্তত কারারুদ্ধ কাশ্মীরী নেতাদের মুক্তি দিয়ে স্বাধীনতার আবহাওয়া তৈরী করুক। ভারতবর্ষ যতদিন পর্যন্ত শেখ আবদুল্লা ও মির্জা আফজল বেগকে মুক্তি না দিচ্ছে ততদিন পর্যন্ত সে কি করে দাবী করতে পারে যে, কাশ্মীরের জনগণের ভাবাবেগকে সে সমীহ করে চলে?"

পার্লামেন্টের বিভিন্ন দলের আড়াই শতাধিক সদস্যও বিনাসর্তে শেখ আবদুল্লার মুক্তি দাবী করেছিলেন।

প্রেসিডেন্ট আয়ুবের বক্তৃতার ফলে না হোক, অন্তত তাঁর সেই বক্তৃতার পর, কাশ্মীরের গণভোট ফ্রন্টের সভাপতি মির্জা আফজল বেগের মুক্তি হয়েছে এবং শেখ আবদুল্লার মুক্তিও আসন্ন বলে শোনা যাচ্ছে।

ইতিমধ্যে নয়াদিল্লীতে শেখ আবদুল্লার উপর থেকে বিধিনিষেধ তুলে নেওয়া হয়েছে। তিনি নয়াদিল্লী থেকে বেরোতে পারবেন না; কিন্তু নয়াদিল্লীর মধ্যে তিনি যেখানে খুশী যেতে পারবেন, যার সঙ্গে খুশী দেখা করতে পারবেন, তাঁর চিঠিপত্র সেন্সার করা হবে না।

মুক্তির পর শেখ আবদুল্লা কি ভূমিকা গ্রহণ করবেন? ১৯৬৪ সালে ভারত-পাক মিতালির ঘটকালি করার যে ভার নিয়ে তিনি পাকিস্থান গিয়েছিলেন এবং নেহরুর আকস্মিক মৃত্যুতে যে দৌত্য অসমাপ্ত রয়ে গেছে তারই ছিন্নসূত্র জোড়া দেওয়ার কাজে তিনি কি আবার নূতন করে নিজেকে নিয়োজিত করবেন? ভারত সরকার তাঁকে কি সেই ধরনের একটি 'তৃতীয় পক্ষ'-এর ভূমিকা আবার গ্রহণ করতে দেবেন? কাশ্মীর প্রশ্ন সম্পর্কেই বা শেখ কি মনোভাব অবলম্বন করবেন?

বহু-বিতর্কিত ও অদমিত এই কাশ্মীরী নেতার আসন্ন মুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্নগুলি ১৯৬৮ সালের ভারতবর্ষের রাজনীতির উপর গভীর ছায়া বিস্তার করছে।

শেখ আবদুল্লা নিজে অবশ্য এখনও মুখ খোলেন নি। তাঁকে সাংবাদিকদের কাছে নিজের অভিমত প্রকাশ করার সেই স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে এবং ভারত সরকার আশা করেছিলেন যে, তিনি এই স্বাধীনতা গ্রহণ করে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করবেন। কিন্তু শেখ এই সুযোগ গ্রহণ করেন নি; কেননা তিনি 'সর্তাধীন স্বাধীনতা' গ্রহণ করতে প্রস্তুত নন।

সরাসরি শেখের মুখ থেকে কিছু জানা না গেলেও মুক্ত শেখ ভারতীয় রাজনীতির উপর কি ধরনের প্রভাব বিস্তার করতে পারেন তার কিছু কিছু ইঙ্গিত অবশ্য ইতিমধ্যে পাওয়া গেছে।

এক, পাকিস্তান রেডিওর এক খবরে প্রকাশ যে, পাকিস্তানে ডঃ নূর মহম্মদের কাছে এক অভিনন্দনপত্র পাঠিয়ে শেখ আবদুল্লা নাকি প্রসঙ্গত বলেছেন যে, কাশ্মীরের জনসাধারণকে তাঁদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রয়োগ করার জন্য লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।

দুই, শেখের ঘনিষ্ঠ সহযোগী মির্জা আফজল বেগ মুক্তি পাওয়ার পর শ্রীনগরে প্রথম যে জনসভায় বক্তৃতা করেছেন সেখানে বলেছেন যে, ইংরেজকে যেমন বাধ্য হয়ে শেষ পর্যন্ত 'উলঙ্গ ফকির'-এর সঙ্গে কথা বলতে হয়েছিল তেমনি ভারতবর্ষের নেতাদেরও শেখ আবদুল্লার সঙ্গে কথা বলতে হবে। কেননা, কাশ্মীরে যে রাজনৈতিক শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে তা পূরণ করতে পারেন একমাত্র শেখ আবদুল্লা। শেখের মত মির্জাও কাশ্মীরীদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের উপর জোর দিয়ে বলেছেন যে, কাশ্মীরে গণভোট গ্রহণে যদি কোন অসুবিধা থাকে তাহলে সেটা আলোচনা বৈঠকে বসে বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে এবং সেই অসুবিধাগুলি কি করে দূর করা যায় তা ভেবে দেখা যেতে পারে।

তিন, শ্রীনগরে জনসভায় ঐ বক্তৃতা দেওয়ার এক সপ্তাহ পরে নয়াদিল্লীতে শেখ আবদুল্লার সঙ্গে দেখা করতে আসার প্রাক্কালে এক বিবৃতিতে মির্জা বেগ বলেছেন, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে আর একটা যুদ্ধ বাধলে কাশ্মীরের বাঁচার কোন আশাই থাকবে না। তিনি আরও বলেন যে, একমাত্র সাংবিধানিক পথেই কাশ্মীরকে বাঁচান যেতে পারে এবং প্রয়োজন হলে গণভোটের পরিবর্তে অন্য কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গেই তিনি শেখের কথা উল্লেখ করে বলেন যে, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে একটা আপোষ ঘটিয়ে দেওয়ার পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত মানুষ হচ্ছেন শেখ আবদুল্লা।

চার, গত ২৭ ডিসেম্বর তারিখে নয়াদিল্লীতে মির্জা আফজল বেগের সঙ্গে পাকিস্তানের হাইকমিশনার আরশাদ হোসেনের দুটি রুদ্ধদ্বারকক্ষের বৈঠক হয়ে গেছে। এবং সংবাদে প্রকাশ, এই গোপন আলোচনার সময় পাকিস্তানের দূত বেগের মারফৎ শেখ আবদুল্লাকে তাঁর মুক্তির পর পাকিস্তানে ও আজাদ কাশ্মীরে সফর করতে যাবার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

মির্জা আফজল বেগ ইতিমধ্যে দিল্লীতে শেখ আবদুল্লার সঙ্গে কথা বলা ছাড়াও প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে এবং আচার্য কৃপালনী, শ্রী এম আর মাসানি, শ্রীরাজনারায়ণ, কাশ্মীর কংগ্রেসের সভাপতি মীর কাশিম প্রভৃতি বিভিন্ন দলের নেতাদের সঙ্গে কথা বলেছেন।

শেখ আবদুল্লা যদি আবার কাশ্মীরের অধিবাসীদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের প্রশ্ন তোলেন অথবা ভারত-পাকিস্তান বোঝাপড়ার জন্য দূতিয়ালি করতে চান তাহলে ভারত সরকার কি করবেন?

এ বিষয়ে এখনও কোন সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় নি বটে; কিন্তু কতকগুলি লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে, কাশ্মীর সম্পর্কে

পাকিস্তানের সঙ্গে নূতন করে আলোচনা আরম্ভ করার সঙ্গে ভারতবর্ষে কিছুটা অনুকূল মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছে।

যেমন, জেনারেল কারিয়াপ্পা, শ্রী সি সি দেশাই ও শ্রী আর পি কাপুর এক বিবৃতিতে বলেছেন যে, কাশ্মীর সমস্যা এড়িয়ে গিয়ে ভারতবর্ষের কোন লাভ হচ্ছে না। এই বিবৃতি দেওয়ার আগে জেনারেল কারিয়াপ্পা পাকিস্তানে গিয়ে প্রেসিডেণ্ট আয়ুবের সঙ্গে দেখা করে এসেছেন।

এবং গত ২২ ডিসেম্বর লোকসভায় পররাষ্ট্রনীতির উপর বিতর্কের সূচনা করে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী বলেছেন যে, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে পাকিস্তানের সঙ্গে একটা সার্থক আলোচনার সূত্রপাত করার সুযোগ ভারতবর্ষ কখনই নষ্ট করবে না।

ঘটনার পরিহাস এই যে, শেখ আবদুল্লাকে মুক্তি দেওয়া হচ্ছে পার্লামেণ্টে বেআইনী কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) বিলটি গৃহীত হবার পরই। এই বিলের ধারায় বলা হয়েছে যে, ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের কোন অংশকে প্রজাতন্ত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে প্রচার চালালে বা কাজ করলে সেটা এই আইন অনুযায়ী দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে। শেখ আবদুল্লা মুক্তি পাওয়ার পর যদি কাশ্মীরবাসীদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারে কথা বলতে থাকেন তাহলে তিনি কি এই সদ্যগৃহীত আইনের আওতায় আসবেন? এবং পরিণামে, আবার কারাগারে নিক্ষিপ্ত হবেন?

ভিয়েতনাম যুদ্ধের প্রসার?

বড়দিনের যুদ্ধবিরতি শেষ হতে না হতেই দুটি কারণে এই আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে যে, ভিয়েতনামের যুদ্ধ অদূর-ভবিষ্যতে পার্শ্ববর্তী আরও দুটি দেশ লাওস ও কম্বোডিয়ায় প্রসারিত হয়ে যেতে পারে।

লাওস সরকারের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে যে, উত্তর ভিয়েতনামের সৈনা-বাহিনী সম্প্রতি দক্ষিণ লাওসের দুটি অঞ্চলে ঢুকে পড়েছে এবং লাওসের কম্যুনিস্টপন্থী প্যাথেট লাও বাহিনীর সহায়তায় কয়েকটি ঘাঁটি দখল করে নিয়েছে। পরবর্তী সংবাদে অবশ্য দেখা যাচ্ছে যে, লাওসের সামরিক মহল মনে করছেন, এই 'আক্রমণ' তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়, জলের সন্ধানে হানাদারি মাত্র। তাহলেও নূতন রণক্ষেত্র সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা এখনও রয়েছে।

তার চেয়ে অনেক বেশী ঘোরালো হয়ে উঠেছে ভিয়েতনাম-কাম্বোডিয়ার সীমান্তের পরিস্থিতি। এই পরিস্থিতির সাম্প্রতিক ইতিহাসটা হচ্ছে এই রকম ঃ—

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন কোন সামরিক মহল থেকে কিছুকাল যাবৎ এই বলে মার্কিন সরকারের উপর চাপ দেওয়া হচ্ছিল যে, দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে তাড়া খেয়ে ভিয়েতকং বাহিনীর যে সব লোক পার্শ্ববর্তী কাম্বোডিয়ার গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করছে তাদের সেই "আশ্রয়ঘাঁটি"গুলিতে গিয়ে আক্রমণ করার অনুমতি দেওয়া হোক। অর্থাৎ কাম্বোডিয়ার সরকার কি করবেন সে ভরসায় না থেকে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে যুদ্ধ মার্কিন বাহিনীকেই কাম্বোডিয়ার মাটিতে গিয়ে ভিয়েতকং বাহিনীকে মার দিয়ে আসার অধিকার দিতে বলা হচ্ছিল।

মার্কিন কংগ্রেসের "আর্মড সার্ভিসেস কমিটি"তে এই মর্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হল যে, কম্যুনিস্টরা যাতে কাম্বোডিয়াকে আশ্রয়স্থল হিসাবে ব্যবহার না করতে পারে তার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হোক।

প্রাক্তন প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারও টেলিভিসনে এক সাক্ষাৎকারে কাম্বোডিয়ায় কম্যুনিস্ট বাহিনীকে তাড়া করে যাওয়ার নীতি গ্রহণের সুপারিশ করলেন।

এরই অব্যবহিত পরে ওয়াশিংটনে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে স্বীকার করা হল যে, কম্বোডিয়ায় ভিয়েতকং বাহিনীর আশ্রয়ঘাঁটিগুলির উপর হানা দেওয়ার কথা বিবেচনা করা হচ্ছে।

এই মার্কিন নীতির তীব্র প্রতিক্রিয়া সঙ্গে সঙ্গে দেখা ছিল কাম্বোডিয়ায়। কাম্বোডিয়ার সরকার বললেন, "দক্ষিণ ভিয়েতনামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে অসুবিধায় পড়েছে তার জন্য সে যে কাম্বোডিয়াকে দায়ী করছে এতে কাম্বোডিয়া স্তম্ভিত হয়ে গেছে।"

দুদিন পরে আর একটি তীক্ষ্ণতর বিবৃতি দিয়ে কাম্বোডিয়ার প্রধানমন্ত্রী



প্রিন্স নরোদম সিহানুক বলছেন যে, "প্রতিপক্ষকে তাড়া করতে এসে যদি কোন বাহিনী কাম্বোডিয়া আক্রমণ করে এবং কাম্বোডিয়া তার একার শক্তিতে যদি সেই বাহিনীকে হঠিয়ে না দিতে পারে তাহলে কাম্বোডিয়া তার কম্যুনিস্ট দেশগুলিকে স্বেচ্ছাসৈনিক পাঠাতে বলবে।"

কিন্তু পরবর্তী আর একটি সংবাদ যদি সত্যি হয় তাহলে দেখা যাচ্ছে, প্রিন্স সিহানুক তাঁর সুর একটু নরম করেছেন। "ওয়াশিংটন পোস্ট" পত্রিকার হংকং সংবাদদাতার প্রশ্নের উত্তরে তিনি নাকি বলেছেন যে, মার্কিন সৈন্যরা যদি ভিয়েতকং বা উত্তর ভিয়েতনাম বাহিনীর লোকের সন্ধানে কাম্বোডিয়ায় প্রবেশ করে তাহলে কাম্বোডিয়া তাদের আটকাবে না, তবে দক্ষিণ ভিয়েতনাম বাহিনীকে সর্বশক্তিতে বাধা দেওয়া হবে।

বৈষয়িক প্রসঙ্গ

পরিকল্পনা রচনার পরিকল্পনা

প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন তাঁদের চূড়ান্ত রিপোর্টে পরিকল্পনা রচনার পদ্ধতির উন্নতির জন্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেছেন।

বর্তমানে পরিকল্পনা সংক্রান্ত কাজকর্মের প্রধান দায়িত্ব পরিকল্পনা কমিশনের ওপর। প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন এই কেন্দ্রীয়িত ব্যবস্থাকে আদর্শ বলে মেনে নিতে পারেননি। তাঁরা বলেছেন, কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা সংস্থার মূল কাজ হল অর্থনীতির একটা ব্যাপক ও দীর্ঘমেয়াদী চিত্র তুলে ধরা। কিন্তু যদি অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রের ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের পর্যায়ে বিশদ পরিকল্পনা রচনার ব্যবস্থা না থাকে তাহলে সেকাজ কখনই সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব নয়।

সুতরাং সংস্কার কমিশনের সুপারিশ হল কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে একটি করে প্ল্যানিং সেল গঠন করা হোক। অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রের এবং বিভিন্ন অঞ্চলের বিশেষ আয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখবার জন্যেও এই ধরনের 'সেল' গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়া প্রত্যেক রাজ্যের জন্যে একটি বিশেষ তিনথাক ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। প্রথমত, একটি রাজ্য পরিকল্পনা বোর্ড থাকবে। এই বোর্ড গঠিত হবে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে এবং চেয়ারম্যান হবেন মুখ্যমন্ত্রী। এই বোর্ড অনেকটা পরিকল্পনা কমিশনের মতই কাজ করবে। দ্বিতীয়ত, রাজ্য সরকারের প্রত্যেকটি দপ্তরে কেন্দ্রের মতই একটি করে প্ল্যানিং সেল গঠন করা হবে। এই সেলের কাজ হবে বিভাগীয় পরিকল্পনার কার্যসূচীর সমন্বয় সাধন করা। তৃতীয়ত, প্রত্যেক জেলায় একটি করে জেলা পরিকল্পনা কমিটি থাকবে। এই সব কমিটিতে থাকবেন পঞ্চায়েৎ ও পৌর কমিটির প্রতিনিধি এবং কয়েকজন পেশাদার বিশেষজ্ঞ।

সংস্কার কমিশন বলেছেন, কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিশন মূল কাঠামো তৈরী করে দেবেন, কিন্তু বিশদ পরিকল্পনার ব্যাপারে রাজ্যগুলিকে কিছুটা বেশী স্বাধীনতা দিতে হবে।

এছাড়া কমিটির আরো কয়েকটি সুপারিশ হল:

(১) বিকল্প সম্ভাবনাগুলিও তৈরী রাখতে হবে। এখন তা করা হয় না, আর তার ফলে ধরা-বাঁধা পরিকল্পনা যদি কোন কারণে ব্যাহত হয় তাহলে সমগ্র অর্থনীতির ভারসাম্যই হারিয়ে যায়।

(২) পরিকল্পনা রচনাকে একটা অব্যাহত ভিত্তির ওপর স্থাপন করতে হবে। সংস্কার কমিশন মনে করেন বর্তমানে পাঁচ-সালা পরিকল্পনার ওপর অত্যধিক জোর দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু পাঁচ-সালা পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গে একটি ১৫ বছরের পরিকল্পনাও তৈরী করা উচিত। তাছাড়া একটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অর্ধেক সময় পার হতে না হ'তেই পরবর্তী পর্যায়ের জন্যে একটি অন্তর্বর্তী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা তৈরী রাখতে হবে, যাতে কোন সময়েই কোন ছেদ না পড়ে।

(৩) বড় বড় নীতির প্রশ্নগুলি আগে থেকেই ঠিক করে রাখতে হবে, যাতে রূপায়ণের পর্যায়ে কোন বিপত্তি না ঘটে।

(৪) পরিকল্পনা সংক্রান্ত একটি সংসদীয় কমিটি গঠন করতে হবে। এই কমিটি পরিকল্পনার অগ্রগতির ওপরে নজর রাখবে।

(৫) বে-সরকারী শিল্পক্ষেত্রের মতামতকে পরিকল্পনা রচনার সময় আরো বেশী গুরুত্ব দিতে হবে।

(৬) বিভিন্ন অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ইউনিটের মধ্যে উন্নততর বোঝাপড়া ও মত বিনিময়ের জন্যে বিভিন্ন মন্ত্রী দপ্তর ও পরিকল্পনা কমিশনের অর্থনৈতিক ও পরিসংখ্যান শাখার প্রধানদের নিয়ে একটি স্থায়ী কমিটি গঠন করতে হবে।

এই সব সুপারিশ সম্পর্কে প্রথমেই যে কথাটা মনে রাখা দরকার তা হল, ভারতীয় পরিকল্পনা সাফল্য বা অসাফল্য, কেবল পরিকল্পনা রচনার পদ্ধতির ওপরেই নির্ভর করে না। অর্থাৎ পদ্ধতির উন্নতি হলেই যে পরিকল্পনা সফল হবে এমন কোন কথা নেই। বৈদেশিক সাহায্য, দেশের ভেতরে টাকার বাজারের অবস্থা ইত্যাদি অনেক কিছুর ওপরে পরিকল্পনার ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল। তাই বলে একথাও অস্বীকার করা যায় না যে, বর্তমানে যে পদ্ধতিতে পরিকল্পনা রচিত হয় সেটাও সন্তোষজনক নয়। কারণ এর দ্বারা সরকারকে কতকগুলি সাধারণ ধ্যান-ধারণার ভিত্তিতে অগ্রসর হতে হয়। বাস্তব অবস্থার সঙ্গে ঐ সব ধ্যানধারণার স্বভাবতই খুব বেশি যোগ থাকে না।

কিন্তু কথা হচ্ছে প্রশাসনিক সংস্কার কমিশনের সুপারিশ ঐ পদ্ধতিকে কতখানি উন্নত করবে। একথা কেউই অস্বীকার করবেন না যে, অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্যে বিকল্প পরিকল্পনা তৈরী রাখা একান্ত দরকার। পরিকল্পনা রচনার কাজ যে অব্যাহত গতিতে চলা উচিত সে সম্পর্কেও কেউ দ্বিমত হবেন না। বে-সরকারী উদ্যোগকে পরিকল্পনা রচনার সঙ্গে যুক্ত করার প্রস্তাবটিও সুচিন্তিত। রাজ্যগুলিকে বিশদ পরিকল্পনা রচনার ব্যাপারে অধিকতর স্বাধীনতা দেবার প্রস্তাবও খুবই সঙ্গত। কিন্তু তারপর? সংস্কার কমিশন পরিকল্পনার মূল গতি-প্রকৃতি ও কাঠামো নির্দেশ করার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিশনের ওপরেই রেখেছেন। নিম্নতর পর্যায়ের সমস্ত প্ল্যানিং সেলই ঐ নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করবে। সুতরাং পরিকল্পনার বিকেন্দ্রীকরণ হয়নি। অথচ ঐ বিকেন্দ্রীকরণ না হলে অর্থাৎ পরিকল্পনার ধ্যানধারণা একেবারে গ্রামের পর্যায় থেকে আহরণ না করলে পরিকল্পনাকে কোনদিনই বাস্তববাদী অর্থাৎ কার্যকর করা যাবে না।

তার ওপর প্রতি পদে প্ল্যানিং সংগঠন গড়ে তোলার যে প্রস্তাব করা হয়েছে তাতে বিভ্রান্তি ও জটিলতা বাড়বে বই কমবে না। কারণ তখন সকলেই নিজের নিজের মনোমত পরিকল্পনা রচনা করতেই ব্যস্ত থাকবে এবং স্বভাবতই নিজেদের পরিকল্পনায় আটকে থাকতে চাইবে। তাতে একদিকে যেমন এই সব 'সেলে'র সঙ্গে পরিকল্পনা কমিশনের, অন্যদিকে তেমনি 'সেলের' বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে দপ্তরের আমলাদের সংঘর্ষ বাড়বে বই কমবে না। সেদিক থেকে প্রস্তাবিত সুপারিশ কাজকে সহজ করার পরিবর্তে অনেক বেশি কঠিন করে তুলবে।

বিনা অস্ত্রোপচারে
অর্শ থেকে
আরাম পাবার
জন্য

DOL-327 BEN

দৃশ্যান্তর ॥ গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

দোরে যেই কড়া নড়লো, বিপরীত দেয়ালে সে ঘুমন্ত ছবিটা
ঠিক যেন হেসে উঠলো; এবং ঘরের আবেষ্টনে
মৃদু গন্ধে বিস্ময়ে উম্বাহু হলো হাওয়া;
অথচ জানালাগুলো সব
তখনো ঘুমন্ত, স্তব্ধ। নিশ্চল প্রতিমা
সে তখন চিত্রার্পিত দরজার সামনেই।

তৃষ্ণা নেই?
ক্ষুধা নেই?
পৃথিবীর পরিচিত স্বর?
কোথায় হারিয়ে গেছে স্মৃতির বৈভব,
পরিচিত মুখগুলি একে একে মনে পড়ছে, চন্দ্রমল্লিকার
আয়ু, বিকেলে গঙ্গার ধার,
ইডেন উদ্যান, স্বপ্ন; অকথিত কথাগুলি নিয়নে সবাক
হয়নি; স্পর্শের জাদু অজ্ঞাত ভুবনে
রয়ে গেছে।

তারপর মুখর দিন—
তৃষ্ণা, পথঘাট পূরবীর সুরে
ভরে উঠলো। এবং প্রতিমা তখনই ডাকের সাজ
খুলে ফেললো ঝড়ের হাওয়ায় সারা গায়ে ধুলো মেখে।

দোরে যেই কড়া নড়লো, বিপরীত দেয়ালে তখন
কেউ যেন হেসে উঠলো, এবং ঘরের
হাওয়ায় কী মৃদু গন্ধ—হয়তো চুলের কিংবা অজানা ফুলের,
বিস্মৃত নামের, বিস্ময়ে জানালাগুলো সব
চেয়ে আছে, রোদ কি জ্যোৎস্নার আলো বাইরে নিভে গেছে,
বুকের ভিতরে ঝোড়ো হাওয়ার তাণ্ডব।

যদি ইচ্ছা কর ॥ প্রভাতকুমার দত্ত

যদি ইচ্ছা কর, মুখে মুখ রাখি হৃদয়ে হৃদয়—
নয়নে নয়নে কথা—এক সাথে হাতে-হাত হেঁটে
চলে যাই; এই সব দিনে রাতে জীবনের গানে প্রাণ
ভরে, অধরে অধর ধরে নিমেষেই উভয়ে উধাও।
যদি ইচ্ছা কর, দূরে চলে যাই, একটি শিশিরকণা
রৌদ্রতপ্ত দিবসের প্রথম প্রত্যূষে কখন সহসা শূন্যে
মিশে শূন্য হয়ে যায়; বহুদূরে জনতার ভীড়ে
বিস্মরণে লীন হয়ে তোমার নয়ন হতে নিজেরে লুকাই।

যদি ইচ্ছা কর, পাশে থেকে যাই সমান্তরাল,
কাছাকাছি তবু কিছু দূর, পাশাপাশি তবু ব্যবধান—
স্পর্শের নৈকট্যে থেকে স্পর্শাতীত শক্তির সংযমে
হৃদয়ে যন্ত্রণা বয়ে আমরণ পথ হেঁটে চলি।



তস্য তস্য অথবা সূর্য কাঁদলে সোনা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পরস্পরের সমস্ত বিবরণ শুনে মূল রহস্য সম্পূর্ণ ভেদ না করতে পারলেও নিজেদের সংকল্পে তাঁরা আরো কঠিন হয়েছেন। ত্রিয়ানায় থাকতে থাকতেই টোলেডোয় সম্রাটের দরবারে পিজারোর সসম্মানে নিমন্ত্রণের খবর তাঁদের কাছে পৌঁছেছে। ঘনরাম ও সানসেদো দুজনেই এবার যে যার নিজের পথে যাবেন স্থির করেছেন। আলাদা হবার আগে শুধু একটি দুরূহ কাজ তাঁদের সম্পন্ন করতে হবে। সে কাজ হল সানসেদোর অত্যন্ত মূল্যবান একটি সম্পদ তাঁর মেদেলীন শহরের স্পেন সরকারের বাজেয়াপ্ত বাড়ি থেকে উদ্ধার করে আনা।

এ মূল্যবান সম্পদ সোনা-দানা হীরে-মুক্তো কিছু নয়। একটি চামড়ার থলের মধ্যে রাখা কয়েকটা কাগজপত্র মাত্র। সেগুলির মধ্যে একটি কাগজ আবার কাপিতান সানসেদোর কাছে সবচেয়ে দামী।

ত্রিয়ানা ছেড়ে যে যার নিজের পথে যাবার সঙ্কল্প করবার পরই সানসেদো অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে এই কাগজটির কথা ঘনরামকে বলেন। নিজের একটা অঙ্গের বিনিময়েও এ কাগজটি উদ্ধার করতে তিনি প্রস্তুত। সানসেদোর মুখে এ কথা শোনবার পর ঘনরাম বেশ অবাক হয়েই জিজ্ঞাসা করেন,—কাগজটা কি বলুন ত? কোন দামী সম্পত্তির দলিল।

না, দলিল নয়, একটা চিঠি।—বলেন সানসেদো।

একটা চিঠি!—ঘনরাম অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেন,—একটা চিঠির এত দাম আপনার কাছে? কার লেখা সে চিঠি? কাকে লেখা? আপনাকে?

না আমাকে নয়।—বিষণ্ণ স্বরে বলেন সানসেদো,—সে চিঠি কাকে লেখা তা জানি না। যে ভাষায় লেখা তা আমার অজানা। সুতরাং সে চিঠি পড়েও কিছু বোঝবার ক্ষমতা আমার নেই। সে চিঠির দাম আমার কাছে এত বেশী যিনি লিখেছেন শুধু তাঁর জন্যে।

কে তিনি?

ক্রীতদাস হিসেবে যাঁকে কিনে মুক্তি দিতে পেরে আমি ধন্য হয়েছি, যাঁর কাছে জ্যোতিষ গণনায় যৎসামান্য পাঠ নেবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে, তিনি সুদূর উদয় সাগরের দেশের সেই অসামান্য পুরুষ।

একটু থেমে সানসেদো আবার বলেন, —তাঁর নিজের গণনা যদি সত্য হয় তাহলে তাঁর এ লিপির বাহক যথাসময়েই পাওয়া যাবে। কিন্তু তার আগে সেটি আমার হাতে থাকা ত দরকার। রাজরোষের খবর পাওয়ার পর গোপনে মেদেলীন শহরের বাড়ি ছেড়ে আসবার ব্যস্ততায় এই কাগজটি আমি ভুলে ফেলে আসি। নিজের সে অপরাধ আমি কখনো ক্ষমা করতে পারব না।

সানসেদোর কথা শেষ হবার পর ঘনরাম কিছুক্ষণ যেন উদাসীনের মত নীরব থেকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেন,—আপনার মেদেলীন শহরের বাড়ি ত সেখানকার কোতোয়ালীর জিম্মায়? অন্য কেউ সে বাড়ির দখল নিয়েছে কি না জানেন?

তা ঠিক জানি না। সানসেদো বলেন,—তবে না নেবারই কথা।

আমরা তাহলে মেদেলীন শহরেই প্রথমে যাচ্ছি। দৃঢ়স্বরে বলেন ঘনরাম। আপনার পূজনীয় গুরুর গচ্ছিত করা লিপি উদ্ধারই এখন আমাদের প্রথম কাজ।

কিন্তু......?

সানসেদোর উদ্বিগ্ন প্রশ্নটা শেষ করতে না দিয়ে ঘনরাম আবার বলেন,—কেমন করে তা সম্ভব তাই ভাবছেন? চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে দেখুন ফিকির-ফন্দি সামনে সাজান রয়েছে। এই জন্যেই মনে হচ্ছে আমাদের ত্রিয়ানায় আসার মধ্যে নিয়তির হাতই ছিল।

সেভিল শহরে কিছুকাল গা ঢাকা দিয়ে থাকবার জন্যে সানসেদোকে নিয়ে গুয়াদাল-কুইভির নদীর ওপারে চোর-ছ্যাঁচড় আর বেদেদের আস্তানা 'ত্রিয়ানা'য় ওঠার মধ্যে নিয়তির হাত আছে বলে মনে করেছিলেন ঘনরাম।

নিয়তির হাত ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ ত্রিয়ানায় গিয়ে কদিন না কাটালে সানসেদোর গুরুর গচ্ছিত করা লিপি উদ্ধারের অমন ফন্দি ঘনরামের মাথায় বোধহয় আসত না।

ফন্দিটা অবশ্য ভালোই কিন্তু তার দরুন নিয়তির হাতটা ঠিক কল্যাণের বোধ হয় বলা চলে না।

কারণ মেদেলীন শহরে এই ফন্দি খাটাতে গিয়েই ঘনরাম সানসেদোর সংগে ধরা পড়েন।

ধরা পড়েন আবার যার তার নয় একেবারে মার্কুইস গঞ্জালেস দে সোলিস- এরই হাতে!

এইখানেই বুঝি নিয়তির কারসাজি। নইলে মার্কুইস হঠাৎ মেদেলীন শহরে ঠিক ওই সময়টিতেই হাজির থাকে কি করে?

নিয়তি মানতে হলে বলতে হয় যে তার হাতের চাল অনেক আগেই শুরু হয়েছে। শুরু হয়েছে কর্টেজ যেদিন টোলেডোর মহাফেজখানায় যেতে যেতে মার্কুইসকে দেখে একটু কৌতূহলী হয়ে তার পরিচয় জানতে চেয়েছিলেন সেইদিন থেকেই।

পরিচয় শুনেও তাঁর মনের ধোঁকা পুরোপুরি যায় নি। ঠিক চিনতে না পারলেও মানুষটা সম্বন্ধে মনে কোথায় একটা যেন খোঁচা থেকে গেছে। কি যেন তার সম্বন্ধে জানলেও স্মরণ করতে পারছেন না বলে মনে হয়েছে।

মনের এ সংশয় দূর করা কিছু শক্ত নয়। মার্কুইস গঞ্জালেস দে সোলিস-এর বিশদ বৃত্তান্ত সরকারী দফতরে গিয়ে জানতে চাইলেই হয়। বংশানুক্রমে যাঁরা অভিজাত আর অসামান্য কোনো কীর্তির জন্যে সম্রাট যাঁদের আভিজাত্যে প্রতিষ্ঠিত করেন তাঁদের সকলের বিস্তারিত পরিচয় ও বিবরণ লিপিবদ্ধ করে রাখার বিশেষ দফতর আছে।

মার্কুইস ত আর যেমন তেমন পদবী নয়। এ পদবী যাঁরা পান তাঁরা হয় খানদানীদের মধ্যে বংশপরিচয়ে নৈকষ্যকুলীন, নয়ত অসামান্য কীর্তিধর।

গঞ্জালেস দে সোলিস বলে কেনো বনেদী বংশের কথা কর্টেজ মনে করতে পারেন নি। তবে সেটা এমন কিছু বড় কথা নয়, তিনি নিজে এমন কিছু খানদানী নন। অর্ধেক জীবন বিদেশে কাটিয়ে স্পেনের সব বড় ঘরোয়ানার নামও জানবার সুযোগই বা কতটুকু পেয়েছেন, সুতরাং মার্কুইস-এর কোনো বনেদী বড় ঘরোয়ানা হওয়া অসম্ভব নয়। আর তা যদি না হয় তাহলে নিশ্চয়ই স্পেনের রাজদরবারকে মুগ্ধ ও বাধিত করবার মত কিছু তিনি করেছেন।

মার্কুইস-এর সংগে দেখা হবার পর দিনই কর্টেজ আসল ব্যাপারটা কি জানবার কৌতূহলে উপযুক্ত দফতরে যাবার জন্যে রওনা হয়েছিলেন, সেখানে পৌঁছে মার্কুইস গঞ্জালেস দে সোলিস-এর বিবরণটুকু জানতে পারলেই সমস্ত রহস্য কর্টেজ-এর কাছে পরিষ্কার হয়ে যেত।

এ কাহিনীর বেশ কিছু জটও তাহলে ছেড়ে যেতে পারত এখান থেকেই।

কিন্তু তা হবার নয়। ভাগ্য এইখানেই বাদ সেধেছে।

দফতরে যাবার পথে কর্টেজ হঠাৎ বাধা পেয়েছেন। রাজদরবারের এক দূত তাঁকে ছুটে এসে খবর জানিয়েছে যে, সম্রাটের টোলেডো ছেড়ে যাবার বিশষ তাড়া থাকায় সেইদিনই কর্টেজকে রাজদর্শনের অনুমতি দিয়ে অনুগ্রহ করেছেন।

কর্টেজ-এর দফতরখানায় যাওয়া আর হয়ে ওঠেনি। ব্যস্ত হয়ে বাসায় ফিরে রাজসাক্ষাতের জন্যে তাঁকে যথোচিত পোষাক-পরিচ্ছদ আর কাগজপত্র নিয়ে তৈরী হতে হয়েছে।

সম্রাটের সংগে সাক্ষাৎটা কর্টেজ-এর পক্ষে মোটেই প্রীতিকর হয় নি। মেক্সিকোর মত রাজ্য আবিষ্কার ও জয় করে কুবেরের ভাণ্ডার যিনি সম্রাটের হাতে তুলে দিয়েছেন তাঁর যথোচিত মর্যাদা দিতে স্পেনের রাজদরবার কার্পণ্য করেছে। আশাভংগের ক্ষোভে দুঃখে কর্টেজের মন থেকে অন্য সমস্ত চিন্তা দূর হয়ে গেছে এখন।

মার্কুইস গঞ্জালেস দে সোলিস-এর সংগে টোলডোর দরবারে কি রাস্তাঘাটে এরপর এক-আধবার দেখা হলে কর্টেজের কৌতূহলটা আবার হয়ত মাথা চাড়া দিত। কিন্তু সেই প্রথম সাক্ষাতের দিনের পর টোলেডোতে মার্কুইসকে কর্টেজ কেন, কেউই আর দেখে নি।

দেখবে কোথা থেকে? কর্টেজ-এর সংগে দেখা হবার পর সে রাতটা পর্যন্ত মার্কুইস টোলেডোতে কাটায় নি। সেই সন্ধ্যাতেই পাততাড়ি গুটিয়ে টোলেডোর টাগস নদীর সান মার্টিন পোল পেরিয়ে উধাও হয়ে গেছে।

এ রকম হন্তদন্ত হয়ে টোলেডো ছাড়ার কারণ কি কর্টেজ-এর সংগে ওই আকস্মিক সাক্ষাৎ?

তাই বলেই ত মনে হয়। কর্টেজ না পারলেও এক পলকের দেখাতেই কর্টেজকে চিনতে মার্কুইস-এর ভুল হয় নি। চিনতে পেরে প্রতিক্রিয়া যা হয়েছে তা একটু অদ্ভুত। লক্ষ্য করবার কেউ থাকলে সেই মুহূর্তে মার্কুইসের ছাই মেড়ে দেওয়া মুখ দেখে একটু অবাকই হত।

কর্টেজকে এতখানি ভয় করবার কি আছে মার্কুইসের?

যাই থাক্ সে রহস্যের মীমাংসা এখন হবার নয়।

আপাততঃ কর্টেজের নজর এড়িয়ে পালিয়ে মার্কুইস ঘনরাম আর সানসেদোরই জীবনের শনি হয়ে উঠেছে।

মার্কুইস গঞ্জালেস দে সোলিস অর্থাৎ সোরাবিয়া টোলেডো থেকে সেভিল-এ ফিরে যায় নি। সেখানে ফিরে যাবার কোনো আকর্ষণও তার নেই। সেভিলের বাসা থেকে দলিত ফণিনীর মত প্রতিহিংসার জন্যে উন্মাদিনী স্ত্রীকে কোনো রকমে ফাঁকি দিয়ে সে রাত্রে যে পালাতে পেরেছে এই তার সৌভাগ্য। আনা সেখানে এখনও থাক বা না থাক সে বাড়িতে ফিরতে সে এখন আর প্রস্তুত নয়।

একদিকে কর্টেজ-এর ত্রিসীমানা ছাড়িয়ে আর একদিকে স্ত্রী আনার নাগালের বাইরে নিশ্চিন্তে কিছুদিন কাটাবার পক্ষে মেদেলীন শহরের সুবিধার কথাই সোরাবিয়ার প্রথমে মনে হয়েছে। মেদেলীন শহরে কাপিতান সানসেদোর ভিটেমাটি স্পেন সরকার রাজদ্রোহের দায়ে বাজেয়াপ্ত করেছে। সে জন্যে আর হুলিয়ার ভয়ে সানসেদো সে শহরের ধার অন্ততঃ মাড়াবে না। আনার পক্ষেও মেদেলীন শহরে যাওয়া তাই প্রায় অসম্ভব। আনা এখন সাহায্য আর পরামর্শের জন্যে তার তিও সানসেদোর সংগে দেখা করবার জন্যেই যে ব্যাকুল তা সেভিলের ক্যাথিড্রালে তার সেদিনকার ব্যাকুল ছোটাছুটি থেকেই বোঝা গেছে। সানসেদোর যেখানে যাবার সম্ভাবনা নেই সেখানে আনা সাধ করে বেড়াতে যাবে না নিশ্চয়। তার নতুন আস্তানা হিসেবে মেদেলীন শহরের সুবিধা তাই অনেক। এ শহর আস্তানা হিসেবে শুধু এই কথাটাই সোরাবিয়ার জানা ছিল না যে মেদেলীন কর্টেজ-এর জন্মস্থান।

মার্কুইসরূপী সোরাবিয়া টোলেডো থেকে একটু ঘুরপথে মেদেলীন শহরেই গিয়ে উঠেছে তারপর। সেখানে গিয়ে কোতোয়ালী থেকে খবর নিয়ে সানসেদোর বাড়ি তখনো নিলেমে ওঠেনি জেনে খুশি হয়েছে অত্যন্ত। যেখানে যেমন দরকার টাকা খাইয়ে এ বাড়ি সুবিধামত কিনে নিতে সোরাবিয়াকে খুব বেগ পেতে হয়নি।

তার সব মতলবই এ পর্যন্ত প্রায় নির্বিঘ্নে হাসিল হবার পর আরো এমন একটি ব্যাপার ঘটেছে যা যেমন সুখের তেমনি তার আশাতীত।

মেদেলীন শহরে সানসেদোর বাড়িতে সোরাবিয়া তখন সবে সাজিয়ে গুছিয়ে বসবার আয়োজন করছে। নিজে সে তখনও সে বাড়িতে এসে ওঠে নি। শহরের এক সরাই-এ থেকে ঠিকাদারকে দিয়ে বাড়িটার যেখানে যা দরকার অদল-বদল মেরামত করাচ্ছে।

সেই সময়ে একদিন একদল বেদেকে সেখানে ঘোরাঘুরি করতে দেখে ঠিকাদারই তাদের ভেতরে ডাকে।

স্পেনে বেদেদের আমদানি তখনও খুব বেশীদিন হয় নি। চুরি-চামারী করার দুর্নাম সত্ত্বেও রকমারি নাচ-গান আর ভূত-ভবিষ্যৎ বলার ক্ষমতার জন্যে সাধারণের কাছে তাদের আদর-খাতির যথেষ্ট।

ঠিকাদার প্রথমে অবশ্য বেদেদের ধমক দিয়েই সেখানে ঘুর ঘুর করার কারণ জিজ্ঞাসা করে। ধমক-ধামক দিয়ে তাদের কাছে একটু গান-বাজনা শোনাই তার মতলব ছিল বোধহয়। কিন্তু বেদেদের সর্দার গোছের একজন তার ধমকের জবাবে যা বলে তা শুনে ঠিকাদারের চক্ষুস্থির।

বেদেরা মিছিমিছি এ বাড়ির কাছে ঘোরাফেরা করছে না। এ বাড়িতে কেউ যা ভাবতে পারে না এমন গুপ্তধনের ইসারা নাকি তারা গুণে পেয়েছে।

অন্য কোথাও হলে যদি বা সন্দেহ হত, কাপিতান সানসেদোর বাড়িতে গুপ্তধন থাকা এমন কিছু আজগুবি বলে ঠিকাদারের মনে হয় না। কাপিতান সানসেদো যে সম্রাটের জন্যে মেক্সিকো থেকে পাঠানো সোনা-দানা গাপ করে ফেরারী মেদেলীন শহরের কে না তা জানে। সে চোরাই মাল সানসেদোর এই বাড়িতেই কোথাও লুকিয়ে পুঁতে রাখা অসম্ভব কিছু নয়।

ঠিকাদার লুব্ধ উৎসাহিত হয়ে বেদেদের গুপ্তধন খোঁজবার অনুমতি দেয়। খুঁজে পেলে তাদের মোটা বকশিস। মালিক সোরাবিয়া তখনও এসে পোঁছোয় নি। তার হয়ে এ আশ্বাস দিতে তবু ঠিকাদারের বাধে না।

বেদেরা গুপ্তধন খোঁজার ক্রিয়া-প্রক্রিয়া শুরু করে দেয়। গুপ্তধন তারা যে বার করবেই এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, শুধু জায়গাটা নির্ভুলভাবে খোঁজবার জন্যে তাদের একটা জিনিস দরকার।

কি জিনিস?

এ বাড়ির যে আসল মালিক তার নিজের নাড়াচাড়া জিনিস কিছু।

এ বাড়ির আসল মালিক ত ছিল সানসেদো। কিন্তু তার জিনিস এখন পাওয়া যাবে কোথায়? নাড়াচাড়া যা যায় সব ত এতদিনে 'মীরমিদন'রাই লুটপাট করে নিয়ে গেছে।

কিছুই তাহলে নেই?

হ্যাঁ আছে বটে পুড়িয়ে দেবার মত কিছু কাগজপত্রের বান্ডিল? হবে তাতে কাজ?

দেখাই যাক—বলে বেদেরা।

কাজ কিন্তু হয় না। বেদেরা সে কাগজপত্র ফিরিয়ে দিয়ে আবার খড়ি পেতে গুণতে বসে।

আর ঠিক সেই সময়ে এসে হাজির হয় নতুন মালিক মার্কুইস গঞ্জালেস দে সোলিস।

এ সব কি ব্যাপার?—জ্বলে উঠে জিজ্ঞাসা করে সোরাবিয়া।

ঠিকাদার উত্তেজিতভাবে বেদেদের গুপ্তধন খোঁজার কথা তাকে জানায়।

কিন্তু নতুন মালিককে দেখে বেদেরাই কেমন যেন গুপ্তধন খোঁজায় উৎসাহ হারিয়ে সরে পড়বার জন্যে ব্যাকুল। দুজন বাদে সবাই তারা সরে পড়বার সুযোগও পায়।

ধরা যে দুজন পড়ে প্রথমে তাদের দেখেই হিংস্র উল্লাসে চিৎকার করে লোকজনের ভিড় জমিয়ে ফেলেছে সোরাবিয়া।

তা সত্ত্বেও একজন বোধহয় ইচ্ছে করলে অনায়াসে সোরাবিয়া আর দলবলকে বুদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাতে পারত। তা সে দেখায়নি শুধু তার সঙ্গীর জন্যে। সঙ্গীটির প্রথম দিকেই পালাতে গিয়ে বেকায়দায় পড়ে একটি পা মচকে গিয়েছে। তাকে নিয়ে পালান যায় না। তাকে ফেলে যাওয়াও অসম্ভব হয়েছে দ্বিতীয় জনের। সে তাই স্বেচ্ছাতেই ধরা দিয়েছে সঙ্গীর আপত্তি সত্ত্বেও।

পা ভাঙ্গা সঙ্গীটি যে কাপিতান সানসেদো আর তারই জন্যে নিজের মুক্তির সুযোগ যিনি উপেক্ষা করেছেন তিনি যে ঘনরাম দাস তা বোধহয় বলার প্রয়োজন নেই। 'ত্রিয়ানা'র বেদেদের দিয়ে কাজ হাসিলের ফন্দি তাঁদের পক্ষে সর্বনাশা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এক সঙ্গে এই দুজনকে গারদে ভরতে পারার সৌভাগ্য সোরাবিয়া বোধহয় কল্পনাও করতে পারে নি। খুশিতে ডগমগ হয়ে কয়েদখানায় দুজনের যথোচিত সমাদরের জন্যে মেদেলীনের অ্যালগুয়াসিল অর্থাৎ নগর কোটালকে সে একদিন ভোজ দিয়েই আপ্যায়িত করেছে।

নগর কোটাল অকৃতজ্ঞ নয়। ঘনরাম আর কাপিতান সানসেদোকে এমন এক গারদে পাঠাবার ব্যবস্থা হয়েছে যা কবরখানারই সামিল। যারা সেখানে একবার গিয়ে ঢোকে তারা আর কোনদিন বার হয় না। বাইরের পৃথিবী থেকে তাদের নামই মুছে যায়।

তাদের নাম বাইরের জগৎ ভুলে গেলেও বাইরের খবর তাদের কাছে পোঁছোয়। সে রকম অনুগ্রহ থাকলে যমদূতের মত রক্ষীদের দিয়েই সে খবর সংগ্রহ অসম্ভব হয় না।

শুধু আগ্রহ নয়, তার সঙ্গে অবশ্য একটু উৎকোচও দরকার। উৎকোচ দেবার মত কিছু ঘনরাম বা সোরাবিয়ার কাছে থাকবার কথা নয়। কিন্তু ঘনরাম কি কৌশলে কে জানে বন্দী হওয়ার পরও কিছু পয়সা-কড়ি লুকিয়ে সঙ্গে রাখতে পেরেছিলেন। তাঁদের বেদের পোষাকের দরুন তল্লাসীও বোধ হয় তেমন ভালো করে কেউ করে নি। তা ছাড়া এক রকম জীবন্ত কবরই যাদের দেওয়া হচ্ছে, তাদের সঙ্গে কি রইল না রইল, তা নিয়ে মাথাব্যথা আর কিসের?

পেসোটা-আসটা ঘুষ দিয়ে ঘনরম খবর যা বাইরের জগতের পেয়েছেন তা প্রথমে খুশি হবার মতই মনে হয়েছে। একটু অস্পষ্ট গোলমেলেভাবে হলেও জানা গেছে যে পিজারো বলে কে একজন নাকি সমুদ্রপারের নতুন এক সোনার দেশ দখল করবার হুকুম পেয়েছে সম্রাটের কাছে। সে নাকি জাহাজ সাজিয়ে তৈরী হচ্ছে পাড়ি দেবার জন্যে।

সানসেদো আর ঘনরাম যেমন খুশি তেমনি একটু অস্থির হয়ে উঠেছেন এ খবরে। গারদখানায় বন্দী অবস্থায় ঘনরাম সানসেদোকে যতখানি দরকার পিজারোর অভিযান আর তার লক্ষ্য সম্বন্ধে জানিয়েছেন। পিজারোর অভিযানের বিষয়ে সানসেদো তখন আর নির্লিপ্ত উদাসীন নন।

খুশি হওয়ার সঙ্গে তাঁদের অস্থিরতা শুধু নিজেদের মুক্তির কোনো আশা না দেখে।

যে গারদে তাঁদের রাখা হয়েছে তার অন্য বিষয়ে শাসন তেমন কড়া না হলেও সেখান থেকে বার হবার কথা ভাবাও বুঝি বাতুলতা। সমুদ্রের তলায় পাতালে বন্দী থাকলে বাইরের জগতের মুখ আবার দেখবার যতটুকু আশা থাকে এ গারদখানাতেও তার বেশী কিছু নেই।

দেখতে দেখতে দুই তিন চার পাঁচ মাস কেটে গেছে। এবার যা খবর পাওয়া গেছে তা বেশ একটু ভাবিয়ে তোলবার মত।

এ খবর রক্ষীদের কাছে নয় পাওয়া গেছে নতুন এক কয়েদীর কাছ থেকে। পিজারোর নাকি দারুণ মুস্কিল হচ্ছে লোকলশকর যোগাড় করতে। আর কিছুদিনের মধ্যে তা যোগাড় করতে না পারলে তাঁকে কথার খেলাপের জন্যে কাঠগড়ায় উঠতে হবে।

এ খবর যে এনেছে সে নিজেও একজন বার দরিয়ার মাল্লা। হিসপানিওলা, ফার্নানডাইন পর্যন্ত এর আগে ঘুরে এসেছে জাহাজে। পিজারোর অভিযানের রংদার গুজব শুনে কাজ নিতে সেভিল-এ গেছল। সেখানে কিন্তু উল্টো খবর শুনেছে। ওসব খোলামকুচির মত সোনা সস্তার গালগল্প নাকি শুধু বোকাদের ঠকিয়ে জাহাজে তোলবার ফিকিরে বানানো। পিজারোর জাহাজে নাম লেখাবার চেষ্টা না করেই সে তাই ফিরে এসেছে। তারপর মেদেলীন শহরে এক শুঁড়িখানায় হল্লা মারামারি করে চালান হয়েছে এই গারদে।

পিজারোর দুরবস্থার এ খবর শোনবার পর সানসেদো হতাশ হয়েছেন, আর ঘনরাম গুম হয়ে থেকেছেন কয়েকদিন।

তারপর এক রাত্রে পাহারাদার এক রক্ষী ঘনরাম আর সানসেদোর গারদ কুঠরির পাশ দিয়ে শেষ টহল দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ চমকে থেমে গেছে। ভালো করে নজরবন্দী রাখবার জন্যে সোয়ারিয়ার পরামর্শ মতই এ দুজনকে এক কুঠরিতে রাত্রে বন্ধ রাখা হয়।

কুঠরির ভেতর থেকে চুপি চুপি কি অলাপ শোনা যাচ্ছে। চাপা গলায় হলেও কথাগুলো না বোঝবার মত অস্পষ্ট নয়।

সে আলাপের যেটুকু মর্ম রক্ষী বুঝেছে তাইতেই তার চোখ তখন ছানাবড়া। চুপিচুপি আলাপটা তারপর হঠাৎ একেবারে তুমুল ঝগড়া হয়ে উঠে তাকেও চমকে দিয়েছে।

দুজনে রাগে ক্ষেপে গিয়ে পরস্পরকে যা নয় তাই বলতে বলতে বুঝি খুনই করে ফেলে।

অন্য রক্ষীরাও ছুটে এসেছে দারুণ গোলমালে। দরজা খুলে দুজনকে ছাড়িয়ে দিয়ে কুঠরির দুপাশে বেঁধে ফেলে রাখবার ব্যবস্থা হয়েছে তারপর।

এমনিভাবে দুদিন কেটেছে ঘনরাম আর সানসেদোর।

দুদিন বাদেই কিন্তু আর তাদের দেখা যায় নি। গারদখানার পাথরের দেওয়াল যেন হাওয়ার চেয়েও সূক্ষ্মদেহে তাঁরা ভেদ করে চলে গেছেন।

তারপর শেষ পর্যন্ত যেখানে গিয়ে তাঁরা উঠেছেন পিজারোর সেই খাস জাহাজ আচমকা সেভিলের বন্দর ছেড়ে কেমন করে লুকিয়ে পালায় সে বিবরণ আমরা আগেই জেনেছি।

(ক্রমশঃ)

পাঁচমুড়া গ্রামের শিল্প

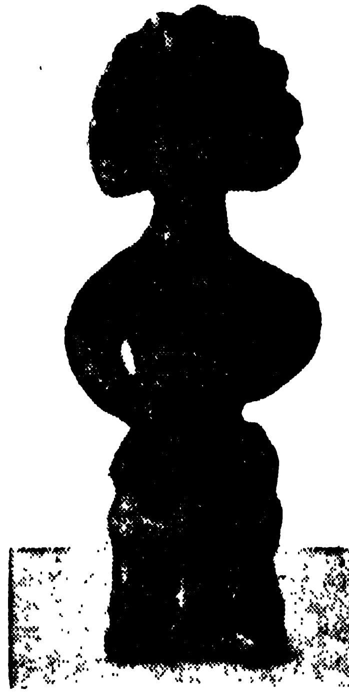
আশীষ বসু

অতীতে বাংলার ইতিহাস বিখ্যাত কনৌজ সম্রাট হর্ষবর্ধনের প্রতিদ্বন্দ্বী শশাঙ্কের কথা দিয়েই ঐতিহাসিকেরা আরম্ভ করেছেন। আরও পুরোনো দিনের সংস্কৃতির তথা ইতিহাসের কথা ক্রমেই আবিষ্কৃত হচ্ছে নানা প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কাজের ফলে। অজয় নদী বিধৌত অঞ্চলের সভ্যতা, উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ, বিহারের ছোট-নাগপুর এমন কি বাঁকুড়ার পশ্চিমেও নব্য-প্রস্তর যুগের মানুষের ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র ও নানা প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির আবিষ্কারের ফলে পশ্চিমবাংলার ইতিহাসকে আরও পুরোনো দিন থেকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। দিনাজপুরের বাণগড় অঞ্চলে শুঙ্গযুগের পোড়ামাটির পুতুল ও অন্যান্য কাজ পাওয়া গেছে। পাটনা, প্রাচীন বৈশালী ইত্যাদি স্থানেও বহু পোড়ামাটির মূর্তি পাওয়া গেছে। এই সব পোড়ামাটির কাজ, পুতুল, মূর্তি, ফলক ইত্যাদির আবিষ্কার থেকে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন যে প্রাচীন বাংলায় পোড়ামাটির পুতুলের ব্যবহার ছিল সংস্কৃতির একটা বিশেষ অঙ্গ। এই পুতুলগুলি মনে হয় দু ধরনের কাজের জন্য তৈরী করা হোত। গ্রামাঞ্চলে মেয়েরা নানারকম ব্রত পালন করতেন তার জন্য অথবা নানারূপ গ্রাম-দেবতার নিকটে আহুতি দেওয়ার কাজে এই জাতীয় মাটির পুতুলগুলি ব্যবহার করার বিশেষ রেওয়াজ ছিল। গৃহসজ্জার কাজেও সম্ভবত এই জাতীয় পুতুলগুলিকে ব্যবহার করা হোত। তাছাড়া শিশুদের খেলার জন্যও এ পুতুলের চাহিদা ছিল এমনও অনুমান করা যেতে পারে।

ক্ষুদ্রায়তন মূর্তিকেই পুতুল বলা হয়ে থাকে। এই সব ক্ষুদ্রায়তন মূর্তিগুলির পরিকল্পনার পিছনে মানুষের শক্তিকে বশ করার ইচ্ছাই প্রকাশ পায়। জঙ্গলের পোষ-না-মানা বাঘ, হাতী, সিংহ, গণ্ডার, ভালুক,



ষষ্ঠী পুতুল



মা-জননী

সাপ এগুলিই লোকশিল্পে বেশী জায়গা পেয়েছে। মানুষ তার স্বাভাবিক নিয়মে এই জন্তুগুলিকে প্রাচীনকালে নিজেদের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করেছে। এদের বশ করতে চেয়েছে। বাঘ-সিংহ শিকার করার মধ্যেই এককালে পৌরুষের পরীক্ষা হয়েছে। এই ভয় থেকেই বাঁচার জন্য মানুষ শিশুর হাতে বাঘ, ভালুক, সিংহ, হাতীর ক্ষুদ্রায়তন মূর্তিগুলিকে তুলে দিয়েছে এবং তাদের এই খেলার মধ্যেই শিশুরা বাঘ-সিংহের উপর কর্তৃত্ব করার সুযোগ পেয়ে নিজেদের আনন্দ বাড়িয়েছে। আর একটা দিকে সমাজের সে যুগে, অনুমান করতে পারি, মানুষের বিজ্ঞান চেতনা ছিল স্বল্প এবং সীমায়িত এবং সেই সময় যাদুক্রিয়া বা ম্যাজিকের সাহায্যে শত্রুর ক্ষতি সাধন করা বা নিজেকে কোনও সম্ভাব্য ক্ষতি বা অনিষ্টের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য ছিল মানুষের ঐকান্তিক চেষ্টা। এই চেষ্টার ফলেই গ্রামীণ দেবতাগুলির উৎপত্তি, ব্রত পালন, আলপনা, নানারূপ মন্ত্র, বশীকরণ এবং তন্ত্রাদির প্রচার হয়। এই সব অনুষ্ঠানের পালনের প্রয়োজনে নানারকম ক্ষুদ্রায়তন মূর্তির পরিকল্পনা হতে থাকে এবং পোড়ামাটির পুতুলের কথা ভাবা হয়। পোড়ামাটির মূর্তি ও ক্ষুদ্রায়তন পুতুলগুলিকে হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরাই তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের দেবতার স্থানে, পীরের দরগায় দিয়ে থাকেন এতো আজও আমরা দেখতে পাই। টোটেম সম্পর্কিত বিশ্বাসের বিশেষ করে অনিষ্টকারী শত্রুর ছবি বা মূর্তি প্রস্তুত করে তার উপর যাদুক্রিয়া (মন্ত্র, পূজা, যাগ-যজ্ঞ ইত্যাদি এবং ব্রত উদযাপন সবই এর মধ্যে পড়ে) অর্পণ করার নজীর সব প্রাচীন সভ্যতার মধ্যেই পাওয়া যায়। আজও ভারতবর্ষের গ্রাম-সভ্যতায় বিশেষ করে উপজাতি-আদিবাসী এবং গ্রামের সাধারণ মানুষের মধ্যে এই ভাবধারার প্রচলন এবং সেই বিশ্বাসের ধারণা পোষণ ও প্রক্রিয়াগুলি বিশেষভাবে পালিত হতে দেখা যায়।

জন্ম ও মৃত্যু মানুষের জীবনের বিস্ময়। তাই পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই মা-পুতুলের প্রচলন দেখা যায়। পশ্চিমবাংলায়ও ষষ্ঠী নামে জননী-মূর্তির পূজা ও ব্রত পালন করতে আজও মেয়েদের দেখা যায়। শহরাঞ্চলেও ষষ্ঠী-ব্রত করেন এমন মহিলার সংখ্যা কম নয়।

পুতুল নির্মাণের উপকরণ হিসাবে মানুষ সবচেয়ে আগে মাটির কথাই ভেবেছে। এছাড়া অবশ্য তামা-পিতল-রূপা, শোলা, কাঠ, পাথর, গোবর, কাগজ, ন্যাকড়া এমন কি সুতোর বা চিনির তৈরী পুতুলও তৈরী হতে দেখা যায়। তবে মাটির বিশেষ করে পোড়ামাটির পুতুলেরই প্রচলন বেশী।

পশ্চিমবাংলার বেড়াচাঁপা, তমলুক বা হরিনারায়ণপুরের আবিষ্কৃত মাটির পুতুলগুলি বেশীর ভাগই হাতে টিপে টিপে



হাতী মাহুত

তৈরী করা এবং তাতে ছাঁচের ব্যবহার নেই। মৌর্য রাজাদের রাজত্বের কিছুকাল পরেই ছাঁচেগড়া পুতুলের প্রচলন হয়েছিল। বাঁকুড়া জেলার পোখরনা বা প্রাচীন পুস্করনা, ২৪ পরগনার চন্দ্রকেতুগড় থেকে ছাঁচে গড়া পুতুল পাওয়া গিয়েছে।

বাংলাদেশে মাটির পুতুল যাঁরা তৈরী করে থাকেন তাঁদের বলা হয় কুঁচো-পটুয়া। মাটির কাজের মধ্যে নানা ভাগ যেমন মূর্তি ও প্রতিমা তৈরী, বাসনপত্র অর্থাৎ মাটির পাত্র, কলস, হাঁড়ি, গেলাস, খুরি, সরা টালী, পাতকুয়ার চোং ইত্যাদি তৈরী, ঘট, নক্সা-সরা ও পুতুল তৈরী ইত্যাদি। পোড়ামাটির পুতুল সাধারণত কুঁচোরাই করে থাকেন। বিয়ের জন্য তৈরী আই-হাঁড়ি, রঙিন সরা, মনসার ঘট ইত্যাদিও এ'দেরই কাজ। অবিভক্ত বাংলার দুই প্রান্তে পূর্ব-দিকে টাঙ্গাইল এবং পশ্চিমে বাঁকুড়া জেলার পাঁচমুড়ায় প্রাচীন বঙ্গসংস্কৃতির পোড়া-মাটির কাজের শিল্পের দুটি ম্রিয়মাণ ধারা আজও সঞ্চারিত হচ্ছে। পূর্ববাংলার টাঙ্গাইলের কুঁচো-পটুয়ারা আজ অনেকেই দেশত্যাগী। তাঁরা ছড়িয়ে পড়েছেন নানা-স্থানে। কলকাতার আশেপাশেও অনেকে নতুন ঘর বেঁধেছেন। বারাসাত অঞ্চলে এমনি একটি বসতি থেকে আমি কয়েকটি পুতুল কিনে এনেছিলাম।

পশ্চিমবাংলার বাঁকুড়া জেলার পাঁচমুড়া গ্রামটি বাঁকুড়া সদর শহর থেকে ২৩ মাইল দূরে অবস্থিত। বিষ্ণুপুর থেকে পাঁচমুড়া কাছে পড়ে। একখানি বে-সরকারী বাস বর্ষার দিনগুলি বাদ দিয়ে বাঁকুড়া শহর হয়ে পাঁচমুড়া ঘুরে বিষ্ণুপুরে যেতো। আমি বছর দুই আগে যখন এ গ্রামে যাই তখনকার কথা বলছি। রাস্তা প্রথম ষোল মাইল পীচের, সেখানে সব সময়ই বাস চলে। পরের সাত মাইলের জন্য ছিল এই একখানাই বাস।

পাঁচমুড়ার তৈরী ঘোড়া বাঁকুড়ার ঘোড়া নামে আজ প্রায় সারা ভারতবর্ষে খ্যাত। কিন্তু অনেকেই বোধহয় জানেন না যে পাঁচমুড়ায় শুধু ঘোড়া নয় আরও নানা-ধরনের পোড়ামাটির পুতুল হয়ে থাকে এবং সেগুলিও কম সুন্দর নয়।

পাঁচমুড়া গ্রামের আয়তন দেড় মাইলের মত। বেশ বড় গ্রাম। স্কুল আছে, কয়েকটি সরকারী অফিসও আছে। পাঁচমুড়ার শিল্পীদের একটি সমবায় সমিতিও আছে। প্রায় ত্রিশ ঘর পটুয়া পাঁচমুড়া গ্রামে নিয়মিত বাস করে থাকেন। এ'দের মধ্যে দশ-বারো ঘর পুতুলের কাজ করেন এবং তাঁদের কাজের যথেষ্ট চাহিদা আছে। এই অঞ্চলটিতে ধর্মঠাকুরের প্রতিপত্তি যথেষ্ট ছিল, আজও আছে। ডোম, হাড়ি, কেওড়া ইত্যাদি সম্প্রদায়ের বহু লোক এখনও ধর্ম-ঠাকুরকে মানেন এবং ঠাকুরের স্থানে নিয়মিত পূজা-পাঠ হয়ে থাকেন। রাস্তার দুপাশে যত্রতত্র—গাছের নীচে, পুকুরের পাড়ে, বেড়ার গায়ে, দেওয়ালের একটেরে ধর্ম-ঠাকুরের স্থান দেখা যায় এবং সেখানে অর্পিত পোড়ামাটির ঘোড়া হাতী ইত্যাদি চোখে পড়ে।

এখানকার আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোকেরা বণ্গা-দেবতার পূজা করে থাকেন এবং এই বণ্গামূর্তিও পাঁচমুড়ার শিল্পীরাই তৈরী করে থাকেন।

পাঁচমুড়ার শিল্পী নানাজাতীয় মূর্তি ও পুতুল তৈরী করে থাকেন। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হোল মনসার ঝাড় বা মনসাবাড়ী, ষষ্ঠী পুতুল, ঘোড়া, হাতী বাঘ ইত্যাদি ক্ষুদ্রায়তন মূর্তি, রেল-পুতুল, ছেলে কোলে জননী মূর্তি ইত্যাদি।

পাঁচমুড়ার শিল্পের বয়স কতো তা জানার উপায় নেই তবে এখানকার কুম্ভকারেরা অনেক পুরাতন বাসিন্দা তাতে সন্দেহ নেই। পাশের জয়পোন্দা নদীর অর পাঁচমুড়া খালের বালি এবং জাঁকের শোল, দেউলভরা, জামবেড়িয়া, বাপমারা প্রভৃতি স্থানের মাটি দিয়েই শিল্পীরা কাজ করে থাকেন। গদ পাওয়া যায় নতুন গ্রামের খালে, আজমোড় খালে, জামবেড়িয়া খালে। পাঁচ-ছ ফুট নীচে পাওয়া যায় উৎকৃষ্ট মাটির স্তর। শতকরা ২০-২৫ ভাগ বালি মেশালে মাটি কাজের উপযোগী হয়। গদ বা Clay dyes দিয়ে বাহার হয়।

ঘোড়ার পাগুলি কুমোরের চাকে গড়া হয়। শরীর ও মাথা চাকেই হয়। পরে সব অংশগুলি জুড়ে শুকিয়ে পোড়ানো হয় আগুনের ভাঁটিতে ৬০০-৬৫০ ডিগ্রীর মতো উত্তাপে। গ্রামের মাঝেই মাটি-খুঁড়ে ভাঁটি বসে। শুকনো পাতা ও খড় দিয়ে আগুন ধরানো হয়। প্রায় তিন ঘণ্টা এক-নাগাড়ে পোড়ানো হলে ভাঁটি চাপা দিতে হয়। বারো ঘণ্টা পরে পোড়ানো জিনিস তোলা হয়ে থাকে।

পাঁচমুড়াতে একটি দু ফুট উঁচু ঘোড়ার দাম পড়ে আড়াই টাকার মতো। তবে আনতে গিয়ে প্রায় অর্ধেকের মতো ভেঙ্গে যায়। বলে কলকাতায় এসে এগুলির দাম খুব বেশী পড়ে যায়। পাঁচমুড়ার অনেক পটুয়া-শিল্পী আজকাল টালি, খাপরি, খুরি, কলসীও গড়ছেন। তাছাড়া এখানকার কাজের আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য অংশ হোল বাদ্যযন্ত্র তৈরী অর্থাৎ খোল, মৃদঙ্গ প্রভৃতির কাজ।

কালো আর লাল দু রকমের পোড়া-মাটির কাজই পাঁচমুড়ার শিল্পীরা করে থাকেন। কাজের পদ্ধতি এক প্রকারই, শুধু পোড়াবার সময়েই যা কারসাজি করতে হয়। পোড়াবার সময় ভাঁটি থেকে গ্যাস না বের হতে দিলেই কালো রঙ হয়। সাধারণত নরম মাটির প্রলেপ দিয়েই ভাঁটির মুখ বন্ধ করা হয়।

বাংলাদেশের পোড়ামাটির কাজের যে সংস্কৃত প্রবাহমান তারই একটি মৃতপ্রায় শীর্ণ ফল্গুধারা অতীতের সাক্ষ্য হিসাবে পাঁচমুড়া গ্রামে আজও বেঁচে আছে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

সকল ঋতুতে অপরিবর্তিত ও অপরিহার্য পানীয়

চা

কেনবার সময় 'অলকানন্দার এই সব বিক্রয় কেন্দ্রে আসবেন

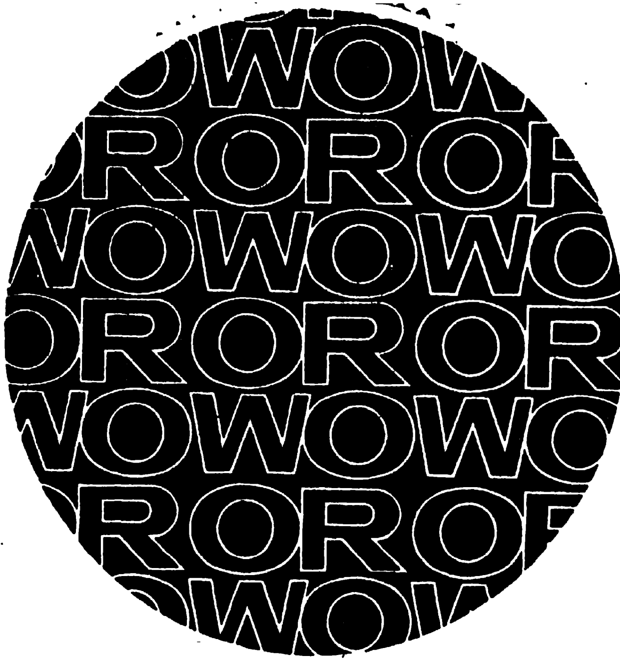
অলকানন্দা টি হাউস

৭, পোলক স্ট্রীট কলিকাতা-১
২, লালবাজার স্ট্রীট কলিকাতা-১
৫৬, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ কলিকাতা-১২

॥ পাইকারী ও খুচরা ক্রেতাদের অন্যতম বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান ॥







কোথায় আপনি থামবেন

অরুণোদয়ের অপূর্ব বর্ণচ্ছটা, শিশুর সুষমা মণ্ডিত হাসিটি, নর্তকীর পোষাকের বর্ণোচ্ছলতা; নিখুঁতভাবে (এবং কত সহজে) একটি কলার ফিলমে ধরা দেবার জন্যে উৎসুক। **ওরওকলার ফিলম** এই মুহূর্তগুলি ত্রুটিহীনভাবে ধরে দেবে কারণ এর পশ্চাতে আছে ফিলম রিসার্চের সাতান্ন বছরের ফলশ্রুতি।

ওরওকলার এবং কালো ও শাদা ফিলম, ১২০, ১২৭ এবং ৩৫ মিঃ মিঃ সাইজে এবং বিভিন্ন রকম ও স্পিডের পাওয়া যায়।

পরিবেশক ঃ ওরও ফিল্মস ইস্টার্ণ ইউনিট, মাদ্রাজ ও কলিকাতা

ওরও প্রাইভেট লিঃ, বম্বে ও দিল্লি

Manufactured by: VEB FILMFABRIK WOLFEN, THE GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC.

MAB b253c A

প্রেক্ষাগৃহ

আজকের কথা :

১৯৬৭-তে মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলা ছবি :

সদ্যসমাপ্ত ১৯৬৭ খৃস্টাব্দে বাংলা ছবির যে-তালিকা নীচে পেশ করছি, তা থেকে দেখা যাবে যে, এ-বছরে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবির সংখ্যা ক্রমেই নিম্নগামী। গেল বছরে এই সংখ্যা ছিল ২৭, তার আগের বছরে অর্থাৎ ১৯৬৫-তে ছিল ৩১ এবং তারও আগের বছরে অর্থাৎ ১৯৬৪-তে ছিল ৩৪। এ-বছরে এই সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে ২৩-এ। এই অধোগতির কারণ অনুসন্ধান করবার প্রয়োজন নেই। বেশী ছবির মুক্তিলাভের সুযোগ দেবার জন্যে যতদিন না চিত্রগৃহের সংখ্যা উপযুক্ত পরিমাণে বৃদ্ধি করা হচ্ছে এবং বাঙালী দর্শক যতদিন না আরও বেশী বাংলা ছবি দেখবার জন্যে সত্য সত্যই সক্রিয়ভাবে লালায়িত হচ্ছেন, ততদিন অধিকতর পরিমাণে বাংলা ছবি মুক্তি পাবার কোনোই আশা নেই। বরং অন্যদিকে বাংলা ছবির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশা জাগছে। দেখা যাচ্ছে, মুক্তিপ্রাপ্ত তেইশখানি ছবির মধ্যে অন্তত ০ দ্বারা চিহ্নিত ন'খানি ছবি চূড়ান্ত ব্যবসায়িক সাফল্য লাভ করেছে। এত বেশী আর্থিক সাফল্যের অনুপাত (শতকরা ৩৯ ভাগ) নিকট-অতীতে কখনও দেখা যায়নি। আমাদের সকলেরই—বাংলা ছবির প্রযোজক, পরিচালক, শিল্পী, কলা-কুশলী, পরিবেশক, প্রদর্শক, সমালোচক ও দর্শক, সকলেরই কাম্য হওয়া উচিত, প্রতিটি মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলা ছবিই যেন শিল্প হিসেবে সার্থক হয়ে উঠেও বিরাট জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারে। চিত্রগৃহের সংখ্যা না বাড়লে অবশ্য মুক্তিপ্রাপ্ত ছবির সংখ্যা এতে আরও কমে যেতে বাধ্য। তাই আমাদের উচিত, বাংলার চলচ্চিত্রজগতের সকল কলাকুশলী এবং অপরাপর কর্মী যাতে সব সময়ে কর্ম-ব্যস্ত থাকেন, তার জন্যে প্রতিটি ছবি ব্যবসায়িক সাফল্য লাভ করা সত্ত্বেও যাতে খুব বেশী সংখ্যক বাংলা ছবি মুক্তিলাভের সুযোগ পায়, তার জন্যে উপযুক্ত আন্দোলনের সৃষ্টি করা। এছাড়া বাংলা ছবির প্রদর্শনীক্ষেত্রকে ক্রমেই সংকুচিত হতে দেওয়াকে সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করে তাকে পশ্চিমবঙ্গের সীমানা ছাড়িয়ে অন্যান্য রাজ্যে, এমনকি বহির্ভারতেও বিস্তৃত করবার জন্যে সরকারী ও বে-সরকারীভাবে সক্রিয় পন্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৯৬৭ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলা ছবির তালিকা

১। ৬-১-৬৭—দেবীতীর্থ কামরূপ কামাখ্যা (পি, এ, ফিল্মস্) ভক্তিমূলক পৌরাণিক; ২। ২০-১-৬৭—৮০-তে আসিও না (রূপশ্রী ফিল্মস্) হাস্যরসাত্মক; ৩। ২৭-১-৬৭—হঠাৎ দেখা (শ্রীরাজেশ প্রোডাকসন্স) রোমান্টিক প্রেমধর্মী; ৪। ১৭-২-৬৭—বধূবরণ (ডি, ডি, এস, প্রোডাকসন্স) ঘটনাপ্রধান গার্হস্থ্য; ৫। ১৭-২-৬৭—নায়িকা সংবাদ (বি, কে, প্রোডাকসন্স) রোমান্টিক প্রেমধর্মী; ৬। ৩-৩-৬৭—সেবা (রামকৃষ্ণ ফিল্ম) সামাজিক; ৭। ১৭-৩-৬৭—অভিশপ্ত চম্বল (মঞ্জু দে প্রোডাকসন্স) রোমাঞ্চকর; ৮। ১৪-৪-৬৭—০ জীবনমৃত্যু (বি-এর্মাড মুভীজ প্রাঃ লিঃ) রহস্যমূলক ঘটনাপ্রধান প্রেমধর্মী; ৯। ১৫-৪-৬৭—ছুটি (পূর্ণিমা পিকচার্স) রোমান্টিক বিষাদান্তক প্রেমধর্মী; ১০। ৫-৫-৬৭—০ গৃহদাহ (উত্তমকুমার ফিল্মস্) রোমান্টিক প্রেমধর্মী; ১১। ২-৬-৬৭—০ বালিকা বধূ (চিত্রদীপ) রোমান্টিক; ১২। ১৬-৬-৬৭—আকাশ-ছোঁওয়া (চলচ্চিত্রায়ণ) চরিত্রপ্রধান প্রেমধর্মী; ১৩। ২৮-৭-৬৭—খেয়া (রূপছায়া চিত্র) ঘটনাপ্রধান গার্হস্থ্য; ১৪। ৪-৮-৬৭—প্রস্তরস্বাক্ষর (ছায়াছবি প্রতিষ্ঠান) সাসপেন্সধর্মী রোমান্টিক; ১৫। ১৮-৮-৬৭—মিস প্রিয়ংবদা (ইউনাইটেড টেকনিসিয়ান্স) হাস্যরসাত্মক; ১৬। ২৯-৯-৬৭—০ চিড়িয়াখানা (স্টার প্রোডাকসন্স) রহস্য রোমাঞ্চকর; ১৭। ২৯-৯-৬৭—মহাশ্বেতা (বি-কে প্রোডাকসন্স) ঘটনাপ্রধান গার্হস্থ্য; ১৮। ২৯-৯-৬৭—দুষ্টু প্রজাপতি (ললিত চিত্রম্) রোমান্টিক, হাস্যরসাত্মক প্রেমধর্মী; ১৯। ৬-১০-৬৭—০ এন্টনী ফিরিংগী (বি, এন, প্রোডাকসন্স) কল্পনামূলক ও প্রেমধর্মী জীবনী; ২০। ১০-১১-৬৭—০ হাটে-বাজারে (প্রিয়া ফিল্মস) আদর্শপ্রধান; ২১। ৮-১২-৬৭—অজানা-শপথ (সরকার প্রোডাকসন্স) আদর্শ-প্রধান গার্হস্থ্য; ২২। ১৫-১২-৬৭—কেদার রাজা (জংদেল ফিল্মস্) চরিত্রপ্রধান ও ঘটনা-প্রধান; ২৩। ২৯-১২-৬৭—পান্না (চিত্র-সংগঠন) রহস্যময় শিশু-চরিত্রপ্রধান।



নল দময়ন্তী চিত্রে রেণুকা রায় ও জহর রায়

আলোচ্য বর্ষে মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলা ছবিগুলির দিকে তাকালেই এদের কাহিনীগত বৈচিত্র্যের প্রতিই প্রথমে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। যদিও অধিকাংশ ছবিকেই রোমান্টিক ও প্রেমধর্মী চিত্রের পর্যায়ভুক্ত করতে আমরা বাধ্য হয়েছি, তবুও 'হঠাৎ দেখা', 'নায়িকা সংবাদ' এবং 'গৃহদাহ'-এর মধ্যে রোমান্স ও প্রেমের যথেষ্টই পার্থক্য আছে, এ-কথা বলাই বাহুল্য। দেখা যাচ্ছে, এমন সব বিষয়বস্তু অবলম্বন করে ছবি তৈরী হয়েছে, যা আগে অকল্পনীয় ছিল বললেও চলে। অভিশপ্ত চম্বল বা আকাশছোঁওয়ার কাহিনীকে বাংলা চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত করবার কথা সত্যিই কি চিন্তার বহির্ভূত ছিল না? এমনকি, বাল্যবিবাহ নিয়ে 'বালিকা বধূ'র মত সরস ও সর্বজনগ্রাহ্য ছবি যে তৈরী হতে পারে, এই বা কে ভাবতে পেরেছিল? অথচ আর্থিক সাফল্যের দিক দিয়ে এই ছবিখানি বাংলা চলচ্চিত্র-জগতে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে বলে শোনা যাচ্ছে। বনফুল রচিত 'হাটে-বাজারে'কে চলচ্চিত্রে রূপ দেওয়া নিশ্চয়ই দুঃসাহসিকতার পরিচয়। কাহিনী নির্বাচনের দিক দিয়ে বাংলা ছবি গতানুগতিকতাকে ত্যাগ করে বহুবিধ বৈচিত্র্য এবং অভিনবত্ব আনয়নে যে তৎপর হয়ে উঠেছে, এটা সুখের কথা।

এ-বছরে প্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত 'দেবীতীর্থ' কামরূপ কামাখ্যা'র পরিচালক মানু সেন থেকে শুরু করে শেষ ছবি 'পান্না'র পরিচালক অমিত মৈত্র পর্যন্ত কোনো পরিচালকই একখানির বেশী ছবি আমাদের উপহার দিতে পারেননি। এঁদের মধ্যে 'মিস প্রিয়ংবদা'র যুগ্ম-পরিচালক রবি বসু ও দুষ্মন্ত চৌধুরী হচ্ছেন পরিচালকরূপে নবাগত। দু'জন পুরাতন পরিচালককে বহুদিন বাদে এ বছর দেখতে পাওয়া গেছে। তাঁরা হলেন নিউ থিয়েটার্সের যশস্বী পরিচালক-সম্পাদক সুবোধ মিত্র (গৃহদাহ) ও পরিচালক-সম্পাদক ভোলা আঢ্য (সেবা)। দু'জন মহিলা পরিচালক—মঞ্জু দে এবং অরুন্ধতী দেবী বছরের দুটি সাফল্যমণ্ডিত শ্রেষ্ঠ চিত্র আমাদের উপহার দিয়েছেন—অভিশপ্ত চম্বল ও ছুটি। প্রথমজনের দুঃসাহসিকতা এবং দ্বিতীয়জনের কাব্য-ধর্মিতা আমাদের মুগ্ধ করেছে। কে কিনক্ষন পরিচালক তাঁদের ছবির সংগীত-পরি-



পিনাকী মুখোপাধ্যায় পরিচালিত চৌরংগী চিত্রে অঞ্জনা ভৌমিক। ফটো : অমৃত

চালনারও ভার গ্রহণ করেছিলেন. তাঁরা হচ্ছেন—অরুন্ধতী দেবী, সত্যজিৎ রায় ও তপন সিংহ। 'অভিশপ্ত চম্বল'-এর শুরুতে বিষয়োপযোগী শব্দ ও সংগীত সৃষ্টি (সাউণ্ড ও মিউজিক এফেক্ট) বাংলা ছবির জগতে অভিনব। 'ছুটি' ছবিতে পরিস্থিতি অনুযায়ী গানের নির্বাচন পরিচালক অরুন্ধতী দেবীর কাব্যধর্মিতার অন্যতম নিদর্শন। বছরের শেষ ছবি 'পান্না'-তে শিশুমনের বৈচিত্র্যময় কার্যকলাপ ছবির মাধ্যমে প্রকাশ করে পরিচালক অমিত মৈত্র একটি অভিনব দিগন্তের সন্ধান দিয়েছেন।

কিশোর-কিশোরীদের বিবাহকে কেন্দ্র করে 'বালিকা বধূ' চিত্র নির্মাণ করে তরুণ মজুমদার যে-অনাস্বাদিতপূর্ব রসের সন্ধান দিয়েছেন, তার তুলনা নেই।

১৯৬৭-তে বোম্বাই থেকে এসে যাঁরা বাংলা চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন, তার মধ্যে প্রথমাগতা হলেন বৈজয়ন্তীমালা ও গীতা দত্ত। 'হাটে-বাজারে' তাঁর অভিনীত ছবিগুলি বাঙালী দর্শককে খুশী করেছে। তনুজা যেভাবে 'এণ্টনী ফিরিঙ্গী'র বাঙালী স্ত্রীকে সার্থকতামণ্ডিত করেছেন, তা অকল্পনীয়; কোনো অ-বাঙালীর পক্ষে এ-রকম অভিনয় যে সম্ভব, তা আমরা ভাবতেও পারিনি। 'হাটেবাজারে'-তে অশোককুমারের সদাশিব ডাক্তার একটি অসাধারণ চরিত্রচিত্রণ। গীতা দত্ত আসলে বাঙালী মেয়ে। অবশ্য 'বধূবরণ' ছবিতে তিনি বোধহয় প্রথম চিত্রাবতরণ করলেন এবং প্রথম হিসেবে তাঁর অভিনয় মন্দ নয়। প্রদীপকুমার তিনখানি ছবিতে অবতীর্ণ হয়েছেন—বধূবরণ, অভিশপ্ত চম্বল ও গৃহদাহ। এর মধ্যে অভিশপ্ত চম্বলে 'সুলতান' ভূমিকাটি তাঁর সার্থক অভিনয়ের নিদর্শন।

যে-পাঁচটি ছবিতে উত্তমকুমার অবতীর্ণ হয়েছেন, তার মধ্যে তাঁর সার্থকতম অভিনয় দেখা গেছে 'এণ্টনী ফিরিঙ্গী' ও 'গৃহদাহ' ছবিতে। 'জীবন-মৃত্যু' ছবিতে শিখের ছদ্মবেশ কিন্তু জনপ্রিয়তা লাভ করেছে অদ্ভুতরকম। 'চিড়িয়াখানা'য় ব্যোমকেশ গোয়েন্দার জাপানী ছদ্মবেশ গ্রহণও বেশ জনপ্রিয় হয়েছে। এ-বছরের অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার হচ্ছেন মৌসুমী চট্টোপাধ্যায় (বালিকা বধূ) ও নন্দিনী মালিয়া (ছুটি)। বালক-শিল্পী রমাপ্রসাদ বণিক (পান্না) বছরের শেষ আবিষ্কার। নবাগতা যূথী বন্দ্যোপাধ্যায় (বালিকা বধূ)ও সার্থক আবিষ্কার। দু'খানি ছবিতে অবতীর্ণ হলেও এবারে মাধবী মুখোপাধ্যায়ের নাট-নৈপুণ্যের চরম বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়নি। গৃহদাহের অচলা চরিত্রে সুচিত্রা সেন বাংলা চিত্রজগতে তাঁর অপ্রতিদ্বন্দ্বি-তার দাবীকে সুপ্রমাণ করেছেন। সুপ্রিয়া দেবীকে 'জীবনমৃত্যু' ছবিতেই সকলের ভালো লেগেছে বেশী। 'আকাশ-ছোঁওয়া' তাঁর নাটনৈপুণ্যের চরমপ্রকাশে যথেষ্ট সুযোগ দেয়নি। বছরের শেষ দু'খানি মুক্তিপ্রাপ্ত চিত্রে স্মরণীয় চরিত্রাভিনয় করেছেন পাহাড়ী সান্যাল (কেদাররাজা) ও শম্ভু মিত্র (পান্না)।

'দুষ্টু প্রজাপতি' ছবিটি পুরোপুরি বোম্বাইয়ে তোলা বাংলা ছবি হলেও বাংলাদেশের আবহ ও বৈশিষ্ট্যটিকে আশ্চর্যরকমে প্রকাশ করেছে। কিশোর-কুমারের অভিনয় ও গান চমৎকার।

সংগীত-পরিচালকদের মধ্যে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় চারখানি ছবিতে এবং অনিল বাগচী ও রবীন চট্টোপাধ্যায় দু'খানি ছবিতে সুরযোজনা করেছেন। 'এণ্টনী ফিরিঙ্গী'তে অনিল বাগচী সুরের সুরধুনী বইয়ে দিতে সমর্থ হয়েছেন। 'বালিকা বধূ' হেমন্ত-কুমারের সার্থকতম সুরযোজনার নিদর্শন। রবীন্দ্রসংগীতের সুপ্রযুক্তি ঘটিয়েছেন অরুন্ধতী দেবী তাঁরই পরিচালিত 'ছুটি'তে।

প্রযোজকদের মধ্যে এক বি.কে প্রোডাকসন্স দু'খানি ছবি—নায়িকা সংবাদ ও মহাশ্বেতা—উপহার দিয়েছেন; অপর সব প্রযোজক একখানি মাত্র।

এ-বছরে বাংলার চিত্রজগৎ ব্যবসায়িক-ভাবে অধিকতর সার্থকতামণ্ডিত এবং বহু অভিনবত্বের অধিকারী, এ-কথা মানতেই হবে।

চিত্রসমালোচনা

পান্না (বাঙলা) : চিত্র-সংগঠন-এর নিবেদন; ৩,৫৮৩·১২ মিটার দীর্ঘ এবং ১৩ রীলে সম্পূর্ণ; পরিচালনা : অমিত মৈত্র ; কাহিনী ও চিত্রনাট্য : প্রশান্ত দেব ; আবহসংগীত-পরিচালনা : ভি বালসারা; চিত্রগ্রহণ : বিশু চক্রবর্তী; শব্দানুলেখন : সুশীল সরকার এবং অনিল দাশগুপ্ত; শব্দপুনর্যোজনা : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়; শিল্পনির্দেশনা : সুনীল সরকার ও গোপী সেন; সম্পাদনা : মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়; রূপায়ণ : রমাপ্রসাদ বণিক, তরুণ চট্টোপাধ্যায়, শম্ভু মিত্র, অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়, দেবতোষ ঘোষ, পঙ্কজ মিত্র, পান্নালাল চট্টোপাধ্যায়, মণি শ্রীমানী, বলাই গুপ্ত, কৃষ্ণকলি মণ্ডল—আরতি দেবী, শিখা ভট্টাচার্য, নিভাননী দেবী প্রভৃতি। ডি ল্যুক্স ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স লিমিটেড-এর পরিবেশনায় গেল ২৯-এ ডিসেম্বর, শুক্রবার থেকে উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলা এবং অন্যান্য চিত্রগৃহে প্রদর্শিত হচ্ছে।

গত বছরের ছেলে পান্না--ডাক নাম পানু। জ্ঞান হয়ে অবধি সে তার বাবাকে দেখে নি। স্কুলে ভর্তি হবার কিছুদিন পরেই সে শুনেছে—সে নাকি খুনীর ছেলে। একথা শুনতে তার ভালো লাগে নি—কোনো ছেলেরই ভালো লাগে না, ভালো লাগতে পারে না। পানু স্কুলে যেতে গররাজি হয়। কিন্তু তার মা যখন তার বাবার চিঠি দেখিয়ে তাকে বুঝিয়ে বলেন, তার বাবা খুনী নন, তাঁর মত লোক খুন করতে পারেন না, তখন থেকে সে নতুন উৎসাহ নিয়ে চলাফেরা শুরু করে, তার বাবার নিন্দা শুনলেই প্রতিবাদ করে এবং চিন্তা করতে থাকে, কেমন করে অনেক টাকার সন্ধান পাওয়া যায়, যে-টাকা খরচ করে তার বাবাকে নির্দোষ প্রমাণ করা যাবে। তার মায়ের মুখে পানু গুপ্তধনের গল্প শুনেছে; মা গুপ্তধন পাওয়ার মন্ত্রটি মুখস্থ রাখেন নি বলে তার ক্ষোভের অন্ত নেই। হঠাৎ যেন তার 'মুস্কিল আসান' করতেই গ্রামে এক ম্যাজিকওয়ালার আবির্ভাব হয়; সে এক টাকাকে দু' টাকা, একশো টাকাকে দুশো টাকা করতে পারে। কিন্তু তার পিছনে ঘুরে কোন লাভ হল না। শেষে সে গুপ্তধনের সন্ধানে এখানে-সেখানে—সাধারণ মানুষের অগম্য স্থানে ঘুরে বেড়াতে লাগল। গুপ্তধনের সন্ধানে তার এই দুঃসাহসিক অভিযানে তার সঙ্গী হল বাগ্দীদের বাপ-মা-মরা ছেলে দুলু আর স্কুলের সহপাঠিনী, বড়লোক জ্যাঠার আদরের ভাইঝি মীনু। এক রাতে তারা তিনজনেই হল নিরুদ্দেশ। পানুর মা, মীনুর জেঠা, গ্রামের বাগ্দীরা — সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল; এই ঘটনার কিছুদিন আগেই গরীব-মায়ের ছোট্ট মেয়ে পুঁটিকে কে বা কারা চুরি করে নিয়ে গেছে এবং বছর দশেক আগে গ্রামের ডাক্তার কালী চক্রবর্তী খুন হয়েছে। অতএব পুলিশবাহিনী নিয়ে সারা গ্রামের লোক মশাল হাতে ঐ তিনটি বাচ্চার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। এর পরে কেমন করে ওদের সন্ধান পাওয়া গেল এবং প্রকৃত অপরাধী ধরা পড়ায় পানুর বাবা হারানের নির্দোষিতা প্রমাণিত হল, তাই নিয়েই ছবির শেষাংশের শ্বাসরোধকারী দৃশ্যগুলি রচিত হয়েছে।



তরুণ মজুমদার পরিচালিত **রহগীর** চিত্রে সবিতা চট্টোপাধ্যায় এবং বিশ্বজিৎ।

বালক পানুর জীবনযাত্রাটিকে সার্থকভাবে চিত্রায়িত করা হয়েছে বিভিন্ন দৃশ্যের মাধ্যমে। খুনী পিতার সন্তান জেনে তার বেদনাবোধ, শিক্ষা বিষয়ে তার সহজাত প্রতিভা, মায়ের কাছ থেকে বাবাকে নির্দোষ জেনে তার মনে খুশীর ভাব, নতুন সহপাঠিনী মীনুর প্রতি তার আকর্ষণবোধ ও তার সঙ্গে মিতালি, তার সহৃদয়তা, গুপ্তধন লাভের জন্যে তার অসমসাহসিকতা, অত্যন্ত বিপদেও তার চিত্তস্থৈর্য এবং সমগ্রভাবে তার বালকত্ব—এ সমস্তই অত্যন্ত সুষ্ঠু ও চিত্তাকর্ষকভাবে প্রকাশিত হয়েছে সুনিপুণভাবে রচিত চিত্রনাট্যটির সাহায্যে। এবং এই পানু চরিত্রটিকে যথাযথভাবে বিকশিত করবার জন্যেই যে অপরাপর চরিত্রের অবতারণা, এ কথাও চিত্রনাট্যকার মোটামুটিভাবে বিস্মৃত হন নি। তবু চিত্রনাট্যটি একেবারে নিখুঁত হয়ে উঠতে পারে নি। ছবির পরিচয়লিপি অ-সবার আগে কালী ডাক্তারের হত্যা ও নির্দোষ হারানের সেই হত্যাকাণ্ডের নায়ক বলে ভ্রান্ত ধারণা হওয়ার ব্যাপারটিকে ছোট ছোট ফ্ল্যাশ-ব্যাকের সাহায্যে দেখানো অধিকতর সঙ্গত হত। এছাড়া ছবির শেষাংশে সুড়ঙ্গ-পথের সম্মুখীন ঘূর্ণীর মধ্যে নিয়ে গিয়ে অযথা উত্তেজনাপূর্ণ করবার চেষ্টায় ছবির ভারসাম্য হারিয়ে গেছে এবং তার ফলে ছবিটির চারিত্রিক গৌরব ক্ষুণ্ণ হয়েছে। মুখ্য চরিত্রের নামানুসারে ছবির পান্না নামটিও কাহিনী উপযোগী হয় নি, বরং বিভ্রান্তিকর।

শম্ভু মিত্র, মণি শ্রীমানী, নিভাননী প্রমুখ কয়েকজন ছাড়া কাহিনীর উল্লেখ্য চরিত্রগুলি নবাগত শিল্পীদের দ্বারা

অভিনয় করিয়ে পরিচালক অমিত মৈত্র যেমন দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছেন, তেমনই শিক্ষাদান বিষয়ে তাঁর দক্ষতার নিদর্শনও দেখিয়েছেন। কাহিনীর কেন্দ্রচরিত্র পান্না ওরফে পানুর ভূমিকায় নবাগত রমাপ্রসাদ বণিক বিস্ময়কর নাট্যনৈপুণ্য প্রকাশ করেছে। তার চোখের দৃষ্টি দীপ্তিময় ও ভাবপ্রকাশক। তার সংগীরূপে বান্দী বালক দলুর ভূমিকায় তরুণ চট্টোপাধ্যায় চরিত্রটিকে সর্বপ্রকারে বাস্তব করে তুলতে পেরেছে। মীনু বেশে কৃষ্ণকলি মণ্ডলও চিত্তজয়ী। ক্লাশের মধ্যে পানুর সংগে একই পেয়ারায় কামড় দিয়ে ভাব হওয়ার দৃশ্যটি সহজে ভোলবার নয়। অবিস্মরণীয় অভিনয় করেছেন দুর্বৃত্ত অঘোরের ভূমিকায় শম্ভু মিত্র। যেমন আশ্চর্য তাঁর চরিত্রোচিত রূপসজ্জা, তেমনই সাবলীল ঐ উৎকেন্দ্রিক চরিত্রটিতে তাঁর বাচন এবং অভিব্যক্তি ও গতিভঙ্গী। একটি বিশিষ্ট চরিত্রাভিনয়রূপে এটি বাঙলার চলচ্চিত্রেতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হবে। অপরাপর ভূমিকায় মণি শ্রীমানী (স্কুলশিক্ষক) পান্নালাল চট্টোপাধ্যায় (কালীডাক্তার), আরতি দেবী (পানুর মা), শিখা ভট্টাচার্য (পূর্ণির মা), নিভাননী দেবী (শোকাতুরা শিবপূজারিণী), অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় (হারান), পংকজ মিত্র (মীনুর জেঠা), দেবতোষ ঘোষ (ম্যাজিকওয়ালা), বলাই গুপ্ত (লক্ষ্মণ) প্রভৃতি উল্লেখ্য সুঅভিনয় করেছেন।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে চিত্রগ্রহণে আশ্চর্য নৈপুণ্য লক্ষিত হয়েছে কি বহির্দৃশ্যে, কি অন্তর্দৃশ্যে। বহির্দৃশ্যগুলির নির্বাচনে একটি শিল্পসম্মত রুচির পরিচয় আছে। শব্দানুলেখনে ধ্বনি-প্রতিধ্বনি সৃষ্টিতে যথেষ্ট দক্ষতার নিদর্শন পাওয়া যায়, এছাড়া বহির্দৃশ্যে বর্ণার দৃশ্যটি উল্লেখযোগ্য। ঘটনা উপযোগী আবহসংগীত রচনায় ভি বালসারা নিজের সুনাম বৃদ্ধি করেছেন।

'পান্না' একটি ভিন্নধর্মী আকর্ষণীয় ছবি — এর আবেদন বালক-যুবা-বৃদ্ধ-নির্বিশেষে সর্বজনীন।

—নান্দীকর

পরলোকে ভি এ পি আয়ার

সেই চিরহাস্যময় মুখটিকে আর দেখতে পাওয়া যাবে না। বাঙলার চলচ্চিত্র-জগতের অকৃত্রিম সুহৃদ ভি এ পি আয়ার গেল বৃহস্পতিবার ২৮-এ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেছেন। কিছুদিন ধরেই তাঁর শরীর ভাল যাচ্ছিল না। রক্তের চাপ, ক্ষুধামান্দ্য প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেওয়ায় চিকিৎসকের পরামর্শে তিনি গৃহাভ্যন্তরে বিশ্রাম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু নিতান্ত আকস্মিকভাবে তাঁর দেহে যে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন দেখা দেবে এবং তাঁর রোগ দ্রুত দুঃসাধ্য হয়ে উঠে তাঁকে ধরাধাম থেকে বিদায় নিতে বাধ্য করবে, এ আমরা কল্পনাও করি নি। কালের অমোঘ হস্ত কখন যে কোনদিকে প্রসারিত হয়, কে বলতে পারে।

কেরলের ক্রাঙ্গানুর থেকে আগত আয়ার সায়েব (এই নামেই তিনি কলকাতার চলচ্চিত্র-মহলে পরিচিত ছিলেন) বাঙলাদেশ তথা কলকাতাকেই তাঁর আপন করে নিয়েছিলেন। প্রায় বত্রিশ বছর ধরে এই শহরে বসবাস করে একজন সামান্য টাইপিস্ট থেকে তিনি নিজের অধ্যবসায় ও নিষ্ঠার গুণে নিজেকে সর্বভারতীয় প্রভাবশালী চিত্র-পরিবেশকরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। ইস্ট ইণ্ডিয়ান মোশান পিকচার অ্যাসোসিয়েশনের তিনি ছিলেন একজন সক্রিয় কর্মকর্তা। তাঁর ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স পরিবেশক প্রতিষ্ঠানের মারফৎ তিনি মাদ্রাজের বিখ্যাত চলচ্চিত্র সংস্থা এ-ভি-এম-এর সকল চিত্রের পূর্বভারতীয় পরিবেশনস্বত্বের অধিকারী ছিলেন। '৪২, জিঘাংসা, গৃহপ্রবেশ প্রভৃতি বিখ্যাত ছবির প্রযোজনাও তিনি করেছেন। 'আওরো' ফিল্ম ইস্টার্ন ইউনিটের কলিকাতা শাখার তিনিই ছিলেন পরিচালক। সর্বোপরি মাদ্রাজ ও বাঙলার চলচ্চিত্রশিল্পের মধ্যে তিনি ছিলেন যোগাযোগরক্ষাকারী সেতুস্বরূপ।

কর্মক্ষেত্রে কেতাদুরস্থ সাহেব হলেও তাঁর আর এক মূর্তির সঙ্গে আমাদের পরিচয়লাভের সৌভাগ্য হয়েছিল। সেখানে তিনি চন্দনচর্চিত ললাট, ক্ষৌমবসনধারী সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ—গীতা ও বেদে অপরিসীম আসক্তি। তাই লেক অ্যাভেনিউস্থ বেদ-ভবনের তিনি ছিলেন প্রাণকেন্দ্র। সকলের সহায়তার জন্যে সদাই তৎপর।

মাত্র সাতান্ন বছর বয়সে পরলোকগমন করে তিনি তাঁর বৃদ্ধা মা, স্ত্রী, তিন পুত্র ও দুই বিবাহিতা কন্যাকে শোকসাগরে ভাসিয়ে গেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অগণিত বন্ধুকে বিচ্ছেদব্যথায় ভরিয়ে তুলেছেন।

কলকাতা

সত্যজিৎ রায়ের পরবর্তী ছবি 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী রচিত 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'-এর চলচ্চিত্রায়ণ এ মাস থেকেই শুরু করছেন পরিচালক সত্যজিৎ রায়। ইতিপূর্বে ছবির সংগীত-গ্রহণ গৃহীত হয়েছে। গীতরচনা ও সুর-সৃষ্টি করেছেন শ্রীরায়। গায়ক আর বাদক গুপী ও বাঘার চরিত্রে মনোনীত হয়েছেন তপেন চট্টোপাধ্যায় এবং রবি ঘোষ। এছাড়া [illegible] সন্তোষ দত্ত ও জহর রায়। রজতরবারের অন্তর্দৃশ্য ছাড়া ছবির অধিকাংশ কাজই বহির্দৃশ্যে গৃহীত হবে। পূর্ণিমা পিকচার্সের তরফ থেকে ছবিটি প্রযোজনা করছেন নেপাল দত্ত এবং অসীম দত্ত। আলোকচিত্রগ্রহণে রয়েছেন সৌমেন্দু রায়।

অগ্রগামী গোষ্ঠীর পরবর্তী ছবি 'বিলম্বিত লয়'

অগ্রগামী গোষ্ঠী যে নতুন ছবিটির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন তার নাম 'বিলম্বিত লয়'। নরেন্দ্র মিত্র রচিত এ কাহিনীটির নায়ক-নায়িকা চরিত্রে মনোনীত হয়েছেন উত্তমকুমার ও মাধবী মুখোপাধ্যায়। ছবিটি পরিচালনা করছেন অগ্রগামী গোষ্ঠীর অন্যতম পরিচালক সরোজকুমার দে। সুর-সংযোজনায় দায়িত্ব নিয়েছেন নচিকেতা ঘোষ। আলোকচিত্রগ্রহণে রয়েছেন কৃষ্ণ চক্রবর্তী। চিত্রগ্রহণ শীঘ্রই শুরু হবে।

মঞ্জু দে পরিচালিত 'শজারুর কাঁটা'

অভিনেত্রী-প্রযোজিকা-পরিচালিকা মঞ্জু দে তাঁর তৃতীয় ছবি 'শজারুর কাঁটা'র চিত্রগ্রহণ বর্তমানে ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওয় গ্রহণ করছেন। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত এই রহস্যচিত্রের প্রধান কয়েকটি চরিত্রে অভিনয় করছেন মঞ্জু দে, বাসবী নন্দী, শৈলেন মুখোপাধ্যায় সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, সরযূবালা, এবং সৌমেন চক্রবর্তী। সংগীত-পরিচালনায় রয়েছেন সুধীন দাশগুপ্ত।

অজিত গাঙ্গুলী পরিচালিত নতুন ছবি 'দাদু'

'অতিথি' ছবিটির কাজ শেষ করে পরিচালক অজিত গাঙ্গুলী তাঁর নতুন ছবি 'দাদু'র চিত্রগ্রহণ সম্প্রতি শুরু করেছেন টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওয়। পরিচালক শ্রীগাঙ্গুলী রচিত এ কাহিনীর প্রধান চরিত্রে রূপদান করছেন সন্ধ্যা রায়, বিকাশ রায়, অনুপকুমার, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, অজয় গাঙ্গুলী, পদ্মা দেবী ও অনুভা ঘোষ। রঞ্জিত পিকচার্সের পক্ষ থেকে ছবিটি প্রযোজনা করছেন রঞ্জিত কাঙ্কারিয়া।

হীরেন নাগ পরিচালিত 'সবরমতী'

লোকনাথ চিত্রমের 'সবরমতী' ছবিটি পরিচালনা করছেন হীরেন নাগ। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচিত এ কাহিনীর চিত্ররূপ বর্তমানে ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওয় অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রধান চরিত্রাবলীতে রূপদান করছেন উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া দেবী, পাহাড়ী সান্যাল, কমল মিত্র, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, তরুণকুমার, প্রশান্তকুমার, রূপক মজুমদার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, ছায়া দেবী ও দীপ্তি রায়। শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স ছবিটির পরিবেশক।

টাকার লোভে

ছোটদের মন ভরে থাকতে চায় একটা উত্তেজনা ও আনন্দের ভিতর। তার উপর ভিত্তি করে মুষ্টিযোদ্ধা রবীন সরকার 'টাকার লোভে' এই নামে একটি চিত্র-কাহিনী লিখেছেন। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের শিখিয়ে নিয়ে তিনিই পরিচালনা করবেন। অবশ্য বড় বড় কয়েকজন অভিনেতাও থাকছেন ছেলেমেয়েরা কিভাবে চোর ও খুনীদের শায়েস্তা করবে তা চিত্রের মধ্যে দেখান হবে। শিশুমহলের পরিচিত

সর্বশ্রী বলাইদাস চট্টোপাধ্যায় (মোহনবাগান ক্লাব), মুষ্টিযোদ্ধা শৈলেন সরকার, সত্য দেব, শিশির চক্রবর্তী (পান্নু), ভূপেন সরকার, শ্যামু চ্যাটার্জি (সাঁতারু), বাপ্পা সরকার প্রমুখদের দেখা যাবে। ক্যামেরার কাজ ও সম্পাদনা করবেন প্রযোজক মুষ্টিযোদ্ধা রবীন সরকার নিজেই। সুদীর্ঘ ১৮ বছর পরে হলিউড ও লণ্ডনের ফিল্ম স্টুডিওতে কাজ শিখে এসে নিজেই শিশুদের জন্য পূর্ণাঙ্গ ছায়াছবি নির্মাণ কার্যে তিনি ব্রতী হয়েছেন।

অগ্নিযুগের কাহিনী ছবির সংগীতগ্রহণ

গত ২৭ ডিসেম্বর ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজ-এ দি নিউ এরা পিকচার্সের 'অগ্নিযুগের কাহিনী' ছবির সংগীতগ্রহণ করা হয়েছে। গোপেন মল্লিকের সুরে গান দুটি গেয়েছেন—সন্ধ্যা মুখার্জী ও মঞ্জুশ্রী বসু। লোকসভা সদস্য বীরেন রায় রচিত কাহিনী অবলম্বনে ছবিটির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন—বিপন্নপালক বসু। পরিচালনা করছেন—ভূপেন রায়। চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনায় আছেন—যথাক্রমে অনিল গুপ্ত ও অমিয় মুখার্জী।

চরিত্রচিত্রণে আছেন—মাধবী মুখার্জী, সুলতা চৌধুরী, বিকাশ রায়, অজয় গাঙ্গুলী, দিলীপ রায় মণি শ্রীমানি, আনন্দ মুখার্জী, শিবানী বসু, শিপ্রা চক্রবর্তী প্রমুখ।

ছবিটির চিত্রগ্রহণও দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে।

বোম্বাই

দেব আনন্দ পরিচালিত প্রথম ছবি 'প্রেম পূজারি'

দেব আনন্দ পরিচালিত প্রথম ছবিটি হবে 'প্রেম পূজারি'। এটির পরিচালনা ছাড়াও প্রযোজনা, কাহিনীরচনা এবং নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন স্বয়ং দেব আনন্দ। ছবির নায়িকা চরিত্রে মনোনীত হয়েছেন ওয়াহিদা রেহমান। এছাড়া অন্যান্য বিশিষ্ট চরিত্রে রয়েছেন জাহিদা, প্রেম চোপরা ও মদনপুরী। সংগীতপরিচালনায় দায়িত্ব নিয়েছেন শচীনদেব বর্মন। আলোকচিত্রগ্রহণ করবেন ফলি মিস্ত্রী।

'রাজা সাব' চিত্রের বহির্দৃশ্য গ্রহণ

সুরজ প্রকাশ পরিচালিত 'রাজা সাব' চিত্রের বহির্দৃশ্য সম্প্রতি বোম্বাই অঞ্চলে গৃহীত হয়। বহির্দৃশ্যাংশে কয়েকটি গান গ্রহণ করা হয়েছে। ছবির মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন শশি কাপুর, নন্দা, শাম্মি, রাজেন্দ্রনাথ, বি বি ভাল্লা, মাজ, আগা এবং কমল কাপুর। সংগীতপরিচালনা করেছেন কল্যাণজী-আনন্দজী।

'হামজোগ' চিত্রের দৃশ্যগ্রহণ

প্রযোজক-পরিচালক জগদীশ সিরুলা সম্প্রতি শ্রীসাউণ্ড স্টুডিওয় তাঁর রঙিন ছবি 'হামজোগ'-এর অন্তর্দৃশ্য গ্রহণ শুরু করেছেন। কাহিনীর মূল চরিত্রে রূপদান করছেন শশি কাপুর, শর্মিলা ঠাকুর, বি বি ভাল্লা, সুজিতকুমার, নাজির হুসেন ও মালিকা। শঙ্কর-জয়কিষণ ছবিটির সুরকার।

'উস রাত কী বাদ'-এর চিত্রগ্রহণ

শ্রীসাউণ্ড স্টুডিওয় 'উস রাত কী বাদ' ছবিটি পরিচালনা করছেন প্রযোজক-পরিচালক ওয়াই বি সিরাজ। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন সঞ্জীবকুমার, তনুজা, শৈলেশকুমার, মদনপুরী, অসিত সেন ও তরুণ বোস। সংগীতপরিচালনায় রয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

গীতাঞ্জলি পিকচার্সের পরবর্তী ছবি 'খামশী'

গীতাঞ্জলি পিকচার্সের পরবর্তী 'খামশী' ছবিটি পরিচালনা করবেন অসিত সেন। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচিত 'দীপ জেবলে যাই' অবলম্বনে এটির হিন্দী চিত্ররূপ দেবেন পরিচালক শ্রীসেন। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করবেন ওয়াহিদা রেহমান, রাজেশ খান্না, নাজির হুসেন, আনোয়ার হুসেন ও নয়না। এ ছবিটির প্রযোজনা এবং সংগীতপরিচালনায় রয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

'মুক্তি থেকে বন্দী'

দিল্লীর সিংহাসনে যখন আওরঙজেব অবতীর্ণ। বাংলার সুবাদার তখন সুজা। প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী তখন সুজার পক্ষপুটে নাসিমপুরের একচ্ছত্রাধিপতি। বিপত্নীক ইন্দ্রনারায়ণ একমাত্র কন্যা উত্তরার বাবা মা দুটি আসনই দখল করেছেন। জমিদারের কুচক্রী কুটিল দেওয়ান শিবশঙ্কর তার কুকর্মের ফলে পার্শ্ববর্তী জমিদারী থেকে বরখাস্ত হবার পরই আশ্রয় নিয়েছে ইন্দ্রনারায়ণের জমিদারীতে একমাত্র ছেলে বাসুদেবকে নিয়ে।

প্রতিবেশী রাজ্যের জমিদার একমাত্র শিশুপুত্র দেবীকান্তকে রেখে মারা গেলে ইন্দ্রনারায়ণ স্নেহবশতঃই তাকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে আসেন আর দেওয়ানের পরামর্শেই সেই জমিদারীও দখল করেন। দেওয়ানের আক্রোশ আছে দেবীকান্তের ওপর কারণ ওর বাবাই তাকে বিতাড়িত করেছিল।

ইন্দ্রনারায়ণের স্নেহের ছায়ায় বড় হয়ে উঠতে থাকে উত্তরা ও দেবীকান্ত। দুটি শিশু স্বভাবজ সারল্য ও চপলতা নিয়ে একাত্ম হয়, উত্তরা দেবীকান্তকে না দেখে থাকতে পারে না। ওদের এই ছোট্ট মনের জগতে মাঝে মাঝে শিবশঙ্করের ছেলে বাসুদেব এসে ঝড় তুলে দেয়। উত্তরা কিন্তু বাসুদেবকে সহ্য করতে পারে না।

দেবীকান্ত-উত্তরার এই শৈশব সখ্যতা দেখেই ইন্দ্রনারায়ণের মনে দেবীকান্তকে আপন করে নেবার এক গোপন ইচ্ছা জেগে ওঠে। অপরদিকে শিবশঙ্করের আশা বাসুদেবের সংগে উত্তরার বিয়ে দিতে পারলে অদূরভবিষ্যতে নাসিমপুরের জমিদারী তার দখলে আসবে। এ ব্যাপারে একদিন শিবশংকর ইন্দ্রনারায়ণের কাছে কথা তুললে সোজাসুজি স্পষ্ট করেই তিনি জানিয়ে দেন যে তা কখনই হতে পারে না। দেওয়ানের ছেলের সংগে জমিদারের মেয়ের বিয়ে কখনই হতে পারে না। নিরাশ হবার পর সব রাগ গিয়ে পড়ে জমিদারের ওপর। সে তখন থেকে পাকেপ্রকারে দেবীকান্তকে জানাতে ভোলে না যে সে এ জমিদারীর কেউ নয়। ইন্দ্রনারায়ণের পরগাছা সে। এই সকল তিক্ত অভিজ্ঞতা তার কাছে নাসিমপুরের আবহাওয়াকে বিষাক্ত করে তোলে।

তাই একদিন উৎসবের রাতে উত্তরার চোখে ফাঁকি দিয়ে দূরে দূরে অনেক দূরে চলে যায় দেবীকান্ত। শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে সে পথিমধ্যে কুখ্যাত ডাকাত ভুজঙ্গ হালদারের খপ্পরে পড়ে। সব কথা শোনার পর ভুজঙ্গ হালদার নিজের কাছেই রাখে দেবীকান্তকে। নিজের মত করেই মানুষ করে তোলে তাকে সে।

দিন গড়িয়ে বছর হয়, বছর গড়িয়ে নতুন বছর। ইন্দ্রনারায়ণ ইতিমধ্যে ব্যাপক

দক্ষিণীর নিবেদন
নৃত্যনাট্যের আংগিকে রবীন্দ্রনাথের
মায়ার-খেলা
পরিচালনা : শুভ গুহঠাকুরতা
নিউ এম্পায়ারে
২৬শে জানুয়ারী, '৬৮ : সকাল ১০॥
২৮শে জানুয়ারী, '৬৮ : সকাল ১০॥
২৯শে জানুয়ারী, '৬৮ : সন্ধ্যা ৬॥
১০, ৫, ও ৩, মূল্যের প্রবেশপত্র এখন থেকে সন্ধ্যা ৬—৯টার মধ্যে দক্ষিণীতে এবং ১২ই জানুয়ারী থেকে নিউ এম্পায়ারেও পাওয়া যাবে।

তল্লাসী করেও দেবীকান্তর কোন খোঁজ পায় না। উত্তরা এখন আর শিশু বা কিশোরী নয়, পূর্ণ যুবতী। ছোটবেলার সেই মধুর দেবীকান্তর স্মৃতি তাকে এখনও জড়িয়ে আছে, এখনও সে মনেপ্রাণে দেবীকান্তকেই ভালবাসে। সখা বিরহে বিজনে সখী ললিতাকে নিয়েই দিন কাটে উত্তরার। এদিকে বাসুদেব কিন্তু মাঝে মাঝে এখনও উত্তরার কাছে আসে প্রেম নিবেদনের জন্য। বাসুদেব সুবাদার সুজার দরবারে মনসবদারের কাজ নেয়।

একদিন ইন্দ্রনারায়ণ সপরিবারে একবার তৎকালীন বাংলার রাজধানী রাজমহলে সুজার দরবারে রওনা হয়। ওখানে লক্ষ্মী-জনার্দনের মন্দিরে পুজো দিতে যাবার পথে অন্য দুই মনসবদার চন্দ্রভান সিং আর মনসুর আলীর দ্বারা আক্রান্ত হয় উত্তরার পাল্কি। দুজনে উত্তরাকে নিজেদের আখরায় তুলে নিয়ে যাওয়ার জন্য গঙ্গার ধার দিয়ে চলতে শুরু করে। সেই সুযোগে উত্তরা পাল্কীর দরজা খুলে গঙ্গায় ঝাঁপ দেয়। মনসুর বা চন্দ্রভান কেউই তাকে আর ধরতে পারে না।

গঙ্গার অথৈ জলে একটি মেয়েকে ভেসে যেতে দেখে কুখ্যাত ডাকাত রাজাবাবুর লোকেরা উত্তরাকে উদ্ধার করে এনে নৌকোয় তোলে। সেখানে রাজাবাবু উত্তরাকে দেখে প্রথমেই চিনতে পারে। উত্তরাও জ্ঞান ফিরে আসার পর রাজাবাবুকে দেবীকান্ত বলে চিনে নিতে ভুল করে না। বহু বছরের ব্যবধানে আবার মিলিত হয় দুজনে। তবে উত্তরার কাছে দেবীকান্তের পরিচয় রাজাবাবু নামেই থেকে যায়, তার পেশা সম্পর্কে সে উত্তরাকে কিছু জানায় না।

এরপর থেকেই নাসিমপুরের বাইরে নির্ধারিত সময়মত অভিসারে মিলিত হয় নিয়মিত উত্তরা আর দেবীকান্ত। অবশ্য উত্তরার এই গোপন অভিসার বাসুদেবের চোখ এড়ায় না, তবে সে দেবীকান্তকে চিনতে পারে না রাতের অন্ধকারে। তবে যখন সে চিনতে পারে তখন উত্তরাকে সব জানায় নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য। উত্তরাও দেবীকান্তর ডাকাত পরিচয় পেয়ে তাকে প্রত্যাখ্যান করে।

বাসুদেবের প্রথম থেকেই শুধুমাত্র গড় নাসিমপুরেই নয় বাঙলার রাজত্বের ওপর দৃষ্টি ছিল। সুযোগ আসে। আওরঙজেবের হয়ে সেনাপতি মীরজুমলা সসৈন্যে আক্রমণ করে বঙ্গদেশ। সুজা পরাজিত ও বন্দী হয়, বন্দী হয় বাসুদেব, চন্দ্রভান সিং, মনসুর আলী প্রমুখ কর্মচারীবৃন্দও। একদিন মীরজুমলা ঐ তিন বন্দীকে ডেকে নিয়ে জানায় যে তাদেরকে সে একটি শর্তে ছেড়ে দিতে পারে যে তারা যদি সুজার দরবারে থেকেও তার কথামত কাজ করে অর্থাৎ দেশদ্রোহী হয়। এ কাজে মনসুর আলী গররাজী হওয়ায় তাঁর প্রাণদণ্ড হয়। চন্দ্রভান সিং রাজী হয়, রাজী হয় বাসুদেবও। তবে একটি শর্তে—মীরজুমলা সারা বাঙলা জয়ের পর বাসুদেবের কাজের পরিবর্তে তাকে গড় নাসিমপুরে জমিদারী দেবে।

রাজী হয় মীরজুমলা। নাসিমপুরের জমিদারী পেয়েই সে ইন্দ্রনারায়ণ আর উত্তরাকে বন্দী করে। পদের মোহে বাসুদেব তখন উন্মত্ত। দিল্লীর বাদশার দরজায় কোন উচ্চপদ প্রাপ্তির আশায় সে কাশীম খাঁর মেয়ে সিতারাকে বিয়ে করার প্রস্তাব করে। বাবা শিবশঙ্কর এ প্রস্তাবে রাজী হন না। পিতা-পুত্রের মধ্যে বিরোধ জমে ওঠে। বাসুদেবও তার পথের সব কাঁটা তুলে ফেলার জন্য বদ্ধপরিকর। বন্ধ ইন্দ্রনারায়ণ, উত্তরা দুজনেই বন্দী। একমাত্র বাকী দেবীকান্ত। ওকে কিভাবে নাসিমপুরে আনা যায় তার মতলব আঁটে বাসুদেব। উত্তরার সখী ললিতার সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করে তাকে বিয়ে করবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয় আর জানায় যে দেবীকান্তকে উত্তরার বন্দীর ব্যাপারে খবর দিয়ে তাকে উদ্ধার করতে আসবার জন্য। ললিতাও দেবীকান্তকে সব বলে আর জানায় যে রাত্রির নির্দিষ্ট কোন প্রহরে যখন সে প্রদীপ দেখাবে তখন যেন সে নাসিমপুরে প্রবেশ করে।

দেবীকান্ত ষড়যন্ত্র বুঝতে পেরে ভুজঙ্গ হালদারের আদেশে সদলবলে নাসিমপুর ঘিরে ফেলে অপেক্ষা করে আলোর নির্দেশে। নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই আলোর নির্দেশ পেয়ে দেবীকান্ত এগিয়ে যায়। ঘরে ঢুকে দেখা পায় সিতারার। এই সিতারাকেই দেবীকান্ত একদিন রক্ষা করেছিল মৃত্যুর হাত থেকে, আজ সিতারা তাই দেবীকান্তকে বাঁচাল। বাসুদেবের সব ষড়যন্ত্রের কথা জানল দেবীকান্ত সিতারার কাছ থেকে।

তারপর ঘটনা দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে নাসিমপুরের গড় দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। একমাত্র পুত্র বাসুদেবের মৃত্যুতে পাগলপ্রায় শিবশঙ্কর মশাল হাতে এদিক ওদিক ছুটতে থাকেন, আর তারপর ঢুকে পড়েন নাসিমপুরের দুর্গে। ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে গড় নাসিমপুর ভস্মীভূত হয়ে যায় হিংসা, দ্বেষ, প্রেম, প্রতিহিংসার আগুনে।

শুধুমাত্র বেঁচে যায় উত্তরা আর দেবীকান্ত। গঙ্গার শান্ত স্রোতে বজরায় যেতে যেতে দূর থেকে গড়ের লেলিহান শিখায় উত্তরা দেবীকান্তর মুখ লাল হয়ে ওঠে মিলনের আনন্দে।

বারীন্দ্রনাথ দাস রচিত এই 'গড় নাসিমপুর' ছবির চিত্রনাট্য লেখকের। বিভিন্ন চরিত্রে আছেন—উত্তরা—মাধবী মুখার্জি, দেবীকান্ত—বিশ্বজিৎ, বাসুদেব—দেব মুখোপাধ্যায় (বম্বে), শিবশঙ্কর—বিকাশ রায়, ইন্দ্রনারায়ণ—অসিতবরণ, ভুজঙ্গ হালদার—কমল মিত্র, চন্দ্রভান সিং—অনুপকুমার, মনসুর আলি—দিলীপ রায়, সিতারা—রুমা গুহঠাকুরতা, ললিতা—সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, কাশীম খাঁ—শেখর চট্টোপাধ্যায় ও সেনাপতি মীরজুমলার চরিত্রে উত্তমকুমার। শ্যামল মিত্রের সুরে কণ্ঠ দিয়েছেন আরতি মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, সন্ধ্যা মুখার্জি ও সুরকার নিজে এবং নেপথ্য কণ্ঠে আছেন উত্তমকুমার। ছবি পরিচালনা করছেন অজিত লাহিড়ী ও ক্যামেরায় আছেন বিজয় দে। গত সপ্তাহে অধিকরাত অবধি টেকনিসিয়াম্স স্টুডিওতে ছবির দৃশ্যগ্রহণ করা হল।


আগামী রবিবার
৭ই জানুয়ারী
সকাল ১০॥টায়
নিউ এম্পায়ারে
বহুরূপীর অভিনয়
বাকি ইতিহাস
নির্দেশনা: শম্ভু মিত্র ॥ টিকিট পাওয়া যাচ্ছে

মঞ্চাভিনয়

সাহেব বিবি গোলাম

কলিকাতা বন্দর প্রতিষ্ঠান চীফ ইঞ্জিনীয়ার্স রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভাবৃন্দ আগামী ৫ই জানুয়ারী রঙমহলে 'সাহেব বিবি গোলাম' অভিনয় করবেন।

অশান্ত বিবর
কালো মাটির কান্না

নাট্যপ্রযোজনায় স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে সম্প্রতি যেসব সংস্থার প্রয়াস নাট্যানুরাগীদের স্বীকৃতি লাভ করেছে, তাদের মধ্যে 'যাত্রিকে'র নাম উল্লেখযোগ্য। এই শিল্পীগোষ্ঠী পূর্বে যেসব নাটক উপহার দিয়েছেন, তার মধ্যে চিন্তার নতুনত্ব ছিল, আর ছিল প্রয়োগপরিকল্পনার অভিনবত্ব। কিছুদিন আগে 'মুক্ত অঙ্গন' মঞ্চে এ'রা পরিবেশন করলেন রবীন্দ্র ভট্টাচার্যের ভিন্ন পটভূমিকায় রচিত দুটি নাটক—'অশান্ত বিবর' ও 'কালো মাটির কান্না'। এবারকার প্রযোজনায়ও শিল্পিবৃন্দ পূর্বগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছেন এবং কয়েকটা দিকে আরো গভীরভাবে শিল্প-চিন্তাকে সম্প্রসারিত করেছেন।

'অশান্ত বিবরে'র পটভূমিকায় রয়েছে মিল মালিক আর শ্রমিক-জীবনের কথা। সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্ন তুলে কিভাবে শ্রমিকদের জীবনে বিপর্যয় আনা হোল এবং পরিণামে কি ঘটলো তাই নিয়েই রচিত হয়েছে এ-নাটক। শ্রমিকদের গড়ে তোলা ইউনিয়নকে মালিক পক্ষ বানচাল করে দিতে যা করলেন, তাই নিয়েই গড়ে উঠেছে নাট্য-সংঘাত। কিন্তু নাটকের মূল কথা ধ্বনিত হয়েছে আনন্দ সান্যালের মুখে। জীবনের সংগ্রাম এখনো শেষ হয়নি, যুদ্ধ এখনো তীব্রগতিতে চলছে, মানুষকে আরো দীর্ঘদিন লড়াই করে যেতে হবে, এই উদ্দীপ্ত বোধই বোধ হয় এ নাটকের মর্মকথা। এই ধরনের নাটকে আবেগকে আরো একটু সংহত করলে ভালো হোত, মাঝে মাঝে 'সেন্টিমেন্টে'র প্রাবল্য এনে কৃত্রিম 'ক্লাইমাক্স' সৃষ্টি করা হয়েছে। বক্তব্যের দিক থেকে এ-নাটকের যে বলিষ্ঠতা, তা এতে প্রতিহত হয়েছে, এ-কথা বলতে হবে।

এদিক দিয়ে 'কালো মাটির কান্না' আবেগকে অনেক সংহত রূপ দিয়েছে। কাহিনীর অন্তর্নিহিত বক্তব্যের দিক থেকে যদিও দুটি নাটকের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম

সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়, তবুও নাট্য-ধর্মের দিক থেকে দ্বিতীয় নাটক আরো প্রাণবন্ত মনে হয়েছে। কয়লাখাদের ম্যানে-জারদের স্বার্থান্ধতার সঙ্গে সাধারণ শ্রমিক-দের নিয়ত দ্বন্দ্বকে মুখর করে তোলা হয়েছে এই নাটকে। নাট্যকার এতো গভীর-ভাবে এই দ্বন্দ্বের মর্মকে উপলব্ধি করেছেন যাতে মনে হয়েছে সার্থক জীবনদ্বন্দ্বের একটা শিল্পসম্মত রূপ এ-নাটক। আমাদের প্রাত্যাহিক জীবনে যে-মানুষগুলো সুখ দুঃখের আবর্তের মধ্য দিয়ে চলেছে, তাদেরই অনুভূতিকে প্রতিধ্বনিত হতে দেখতে পাই এ-নাটকে।

দুটি নাটকের নির্দেশনায় নিখিল ভট্টাচার্য সূক্ষ্ম শিল্পমানসের ছাপ রাখতে পেরেছেন। এমনভাবে কয়েকটা মুহূর্ত সৃষ্টি করেছেন মঞ্চে যা'তে নাটকের মর্মকথা একটু স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা গেছে। অভিনয়-পদ্ধতিতে কিন্তু শিল্পীরা কোন নতুন দিকের সন্ধান দিতে পারেননি। আলোক-সম্পাতে নমেন নাথ ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য বিভিন্ন মুহূর্তকে সজীব করে তুলতে চেষ্টা করে-ছেন। এ-ব্যাপারে আবহসংগীতে নিষ্ঠার পরিচয় রেখেছেন সুশীল ঘোষ, কিন্তু মাঝে মাঝে আবহসংগীত নাটকের মূল গতির সঙ্গে তাল রাখতে পারেনি। দুটি নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেন—তুষার মজুমদার, জ্যোতিভূষণ চক্রবর্তী, অমূল্য দত্ত, সুনীল নাগ, লোকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মল চক্রবর্তী, বিমান গুপ্ত, নির্মল ভট্টাচার্য, সৌরীন্দ্র ভট্টাচার্য, রবীন্দ্র ভট্টাচার্য, প্রদীপ ভট্টাচার্য, স্বপন ভট্টাচার্য, দেবীকুমার ভট্টাচার্য, বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল বাক্সত, হরিমোহন ঘোষ, কবিতা বিশ্বাস।



সি এল টির অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করছে কুমারী রঞ্জনা এবং সুললিতা দাস।
ফটো : অমৃত

বিবিধ সংবাদ

বিচিত্রানুষ্ঠান

বাংলার ও বম্বের বিশিষ্ট শিল্পী সমন্বয়ে আগামী ১৩ জানুয়ারী সারারাত্রব্যাপী বিচিত্রানুষ্ঠান ও "গুণীজন সম্বর্ধনা" অনুষ্ঠিত হবে নদীয়ার স্বাস্থ্যোদ্ধার মঞ্চপ্রাঙ্গনে। গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, সুবীর সেন, সবিতা চৌধুরী, মানবেন্দ্র মুখার্জী, নির্মলা মিশ্র, বনশ্রী সেন-গুপ্ত, বিষ্ণুপদ দাস, অলোক বাগচী, বলাই মুখার্জী, তপন বব, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও রবি ঘোষ, এবং অর্কেস্ট্রায় ওয়াই এস মুল্কি অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করবেন।

হবি রিদম অর্কেস্ট্রা

উত্তর কলকাতার অপেশাদার বাদ্য সংস্থা হবি রিদম অর্কেস্ট্রার ষষ্ঠ বার্ষিক উৎসব সাতই জানুয়ারী মহাজাতি সদনে সকাল ৮-৩০ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত হবে। এই উপলক্ষে আয়োজিত যন্ত্রসংগীতের বিচিত্রা-নুষ্ঠানে বিশিষ্ট শিল্পিবৃন্দ অংশগ্রহণ করবেন। সভায় সভাপতিত্ব করবেন সাহিত্যিক প্রাণতোষ ঘটক এবং প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন খ্যাত-নামা শিল্পী মুকুল দাস।

মূকাভিনয়

প্রখ্যাত মূকাভিনেতা শ্রীযোগেশ দত্ত আসামে কয়েকটি অনুষ্ঠানে মূকাভিনয় পরি-বেশন করেন। কয়েকটি কলেজে শিক্ষক ও ছাত্ররা তাঁর মূকাভিনয় দেখে শ্রীদত্তকে অভিনন্দন জানান। মূকাভিনয়ের বিষয় ছিল—চলা, চোর, বাস প্যাসেঞ্জার, ফটো-গ্রাফার ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের রাজপত্র। তবুও মনরাউ পাই।

মায়ার-খেলা

শিক্ষায়তন তহবিলের সাহায্যার্থে 'দক্ষিণী' আগামী ২৬, ২৮ ও ২৯ জানুয়ারী নিউ এম্পায়ারে নৃত্যনাট্যের আঙ্গিকে রবীন্দ্রনাথের 'মায়ার-খেলা' মঞ্চস্থ করবে।

'দক্ষিণী' শিল্পীগোষ্ঠীর 'মায়ার-খেলা' পরিবেশন এই প্রথম। শ্রীশুভ গুহ-ঠাকুরতা'র পরিচালনায় দক্ষিণীর ত্রিশজনের অধিক শিল্পী এই অভিনয়ানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করবেন।

চুঁচুড়া কিশোর প্রগতি সঙ্ঘ

সম্প্রতি চুঁচুড়া কিশোর প্রগতি সংঘের ২৩তম বাৎসরিক উৎসব উৎসাহ ও উদ্দীপনা সহকারে অনুষ্ঠিত হয় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার ডঃ সুনীল-কুমার সেন। ডঃ সেন তাঁহার ভাষণে বাংলাদেশের নবজাগরণের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে চুঁচুড়ার অবদানের কথা উল্লেখ করেন ও সংঘের উন্নততর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন।

অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন সর্বশ্রী বাণী দাশগুপ্তা, জয়শ্রী সেন, দেবু চট্টোপাধ্যায় ও অনিল দত্ত, আবৃত্তিতে অংশ গ্রহণ করে কাজী সব্যসাচী।

৯ই মঙ্গলবার সাড়টায় নান্দীকার
মুক্ত অঙ্গনে
যখন একা
"....very well-produced play"
— Statesman
"নান্দীকার বাদ্ জানেন"— দেশ
"...আমরা হতবাক বিস্মিত"— আনন্দবাজার
"...দলগত অভিনয় বিস্ময়কর"— যুগান্তর
"...আমাদের চমকিত করেছে"—
দৈনিক বসুমতী
নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

গানের জলসা

ঐতিহাসিক নৃত্যনাট্যে রাজস্থান সংস্কৃতি পরিষদ

সম্প্রতি হিন্দী হাই স্কুলে রঙ্গমঞ্চে অভিনীত ঐতিহাসিক নৃত্যনাট্য 'সত্তর খান ও বাহাদুর ওমরাও' রাজস্থান সংস্কৃতি পরিষদের এক উল্লেখযোগ্য অবদান। বাদশা শাহজাহানের সময়ের রাজস্থান বীরগাথা এই নৃত্যনাট্যের বিষয়বস্তু। এই নাটকের উপাখ্যানুসারে সম্রাট শাহজাহান নাকি দেখতে চেয়েছিলেন রাজস্থান বীরদের শির কাটার পরও ধড় কেমন নাচে। আর বীরাঙ্গনারা কেমন জহরব্রত গ্রহণ করে।

শ্রীউদয়শংকরের স্নেহাশীর্বাদধন্য প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীশান্তি বোসের সুযোগ্য পরিচালনায় নৃত্যশিল্পীদের নৃত্যনিপুণ্য ও অভিনয়সৌকর্যে এবং তাপস সেনের আলোকসম্পাতে, আখ্যানবস্তু অত্যন্ত মর্মগ্রাহী হয়েছে। শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন সর্বশ্রী শম্ভু ভট্টাচার্য (গজসিং), শিবশঙ্কর (সাহজাহান), রামগোপাল ভট্টাচার্য (উজীর ও বাদরওয়ালা) শ্রীমতী শ্রীলেখা চম্পা, শিখা, সুমিত্রা ও শক্তি নাগ—আপনাপন অভিনয়ে যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। শ্রীরামগোপাল মিশ্রের কথক নৃত্য পরিচালনা মনোজ্ঞ। নৃত্যপরিচালক শান্তি বোসের রাজপুত যোদ্ধার রূপটি জীবন্ত করে তুলেছিলেন তবে সমগ্র নৃত্য-পরিকল্পনায় শ্রীউদয়শংকরের নৃত্য-আঙ্গিকের ছায়া অত্যন্ত সুস্পষ্ট। সমগ্র নৃত্যনাট্যটির রচয়িতা ও সুরপরিচালক—রাজস্থানের সুবিখ্যাত কবি শ্রীগজানন ভর্মা।

'নটনারায়নী' সঙ্ঘের ত্রৈমাসিক অধিবেশন

মতিলাল নেহরু রোডে শ্রীমতী চন্দ্রবতী দেবীর বাসভবনে অভিজাত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান "নটনারায়ণী" সংঘের ত্রৈমাসিক অধিবেশন শুরু হয় স্বামী বিবেকানন্দের একটি গান দিয়ে। এই উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশিত হয় সমবেতকন্ঠে। শিল্পী শ্রীমতী চন্দ্রাবতী দেবী, মনোমালা দেবী ও শ্রী জগন্নাথ মুখোপাধ্যায়। পরিবেশনার নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার গুণে একটি ভাব-গম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল।

এরপর শ্যামাসঙ্গীত পরিবেশন করেন সর্বশ্রী জগন্নাথ মুখোপাধ্যায় ও জিতেন্দ্রনাথ নাগ। শ্রীমুখোপাধ্যায়ের পরিশীলিত কন্ঠে এ সঙ্গীত খুবই সুখশ্রাব্য হয়েছে। জিতেন্দ্রনাথ নাগ প্রবীণ বয়সেও সঙ্গীত-চর্চার অধ্যবসায়ে তাঁর একনিষ্ঠতার উজ্জ্বল পরিচয় রেখেছেন। উচ্চাঙ্গসংগীতের আসরে ধামার পরিবেশন করেন শ্রীশীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকালী ভট্টাচার্যের শ্রীকৃষ্ণ-লীলাবিষয়ক এক মনোজ্ঞ ভাষণের পর কীর্তনশ্রী শ্রীমতী বীণা ঘোষের বিদ্যাপতি পদাবলী কীর্তন গাইবার আবেগে, কন্ঠ-লালিত্যে, বৈদগ্ধ্যে এবং ভাবগৌরবে এক সৌন্দর্য-মধুর পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। তরুণ শিল্পীর এই ভক্তিভাবের উদ্দীপন শ্রোতাদের বিহ্বল করেছে। ৪ মাত্রার চঞ্চুপুট এবং ৬ মাত্রার গড়খেমটা তালের সঙ্গতে নাটকীয় রসই ঘনীভূত হয়নি বিভিন্ন তাল-ফেরতার ও লয়ের ওপর শিল্পীর প্রশংসা-যোগ্য দক্ষতা সুপরিস্ফুট হয়েছে।

সর্বশেষ অনুষ্ঠান হয় কুমার বীরেন্দ্র-কিশোর রায়চৌধুরীর রবাবে পরিবেশিত 'খাম্বাজ'। ধ্রুপদী যন্ত্রের মাধ্যমে এই রাগ অসাধারণ শুদ্ধতা ও পাণ্ডিত্যে রসজ্ঞ শ্রোতৃবৃন্দের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে।

'শ্যামা' নৃত্যনাট্য

৬ই জানুয়ারী (শনিবার) সন্ধ্যা ৬টায় ন্যাশনাল রাবার হাউজ ক্লাবের সভ্যদের ব্যবস্থাপনায় ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের 'শ্যামা' (নৃত্যনাট্য) বালিগঞ্জ শিক্ষাসদনে অনুষ্ঠিত হবে। নৃত্যনাট্য নির্দেশনায়—নীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। নৃত্য ও সংগীতে যথাক্রমে অংশগ্রহণ করবেন—গুরুগোপাল পিল্লাই, অনুপশঙ্কর, কানাই মজুমদার, উমা দত্ত, কৃষ্ণা রায়, সুতপা দত্ত, পাপড়ি বোস, স্বপ্না সেনগুপ্তা, অরবিন্দ মিত্র, বিপুল ঘোষ, রাখাল রক্ষিত, শিখা ও বিপ্লব বক্সী এবং আরো কয়েকজন।

বীরভূমে বাউল সংগীত শিক্ষায়তন 'নামামৃতম'-এর প্রতিষ্ঠা

'নামামৃতম' নামক বাউল সংগীত-শিক্ষায়তনটির গত ২৯শে সেপ্টেম্বর (১৯৬৭ সাল) শুভ উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন করেন শান্তিনিকেতনের বিখ্যাত শিল্পী শ্রীরামকিঙ্কর বেইজ মহাশয়।

এ-প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা ও উদ্যোক্তা হলেন বীরভূমের খ্যাতনামা শিল্পী ও বাউল-গায়ক শ্রীপঙ্কজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। চৌদ্দ দফা কর্মসূচী নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানটি তৈরী হয়। বাউলদের পীঠস্থান বীরভূমে বহু সুপ্রাচীন পদ ও গানের সুরের ধারা আজো টিকে আছে। কিন্তু 'বিংশ শতাব্দীর যন্ত্রকেন্দ্রিক সভ্যতার আওতায় পড়ে সে-সব সুরের ধারা ক্রমে স্মৃতির পেছনে চাপা পড়ে যাচ্ছে। সেই আসল সুরের ধারা অনুযায়ী উৎসাহী ছাত্রদের বাউল গান শিক্ষার ব্যবস্থা করা নামামৃতের প্রধান কাজ। তাছাড়া অন্যান্য কাজের মধ্যে যে-সব বাউল আজ বেঁচে নেই বা আজও যাঁরা বয়সের শেষ কোঠায় পা দিয়ে এখনও সেই সুরের ধারা ক্ষীণ দীপশিখার মতো বজায় রেখে চলেছেন, তাঁদের জীবনী পুস্তিকাকারে প্রকাশ করা। (কিছু কিছু ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে।) তৈলচিত্র এবং স্কেচের মাধ্যমে তাঁদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে ধরে রাখার ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই করা হয়েছে। এখনও যে-সমস্ত সুপ্রাচীন পদ ও গান অবহেলিত অবস্থায় পড়ে আছে, সেগুলি বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে সংগ্রহ করে তার যথাযথ প্রচারের ব্যবস্থা করা। রেকর্ড, রেডিও ও সিনেমাশিল্পের মাধ্যমে বাউল গানের প্রচারের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করা। বিভিন্ন শহর ও গ্রামের প্রধান কেন্দ্রগুলিতে বাউল সম্মেলন আহ্বান করে তার যথাযথ প্রচারের ব্যবস্থা করা। নতুন রচয়িতাদের রচনায় উৎসাহ দেওয়া ও প্রয়োজনবোধে সেইসব পদ পুস্তিকাকারেও প্রকাশ করা। এ-প্রতিষ্ঠানের যাঁরা পৃষ্ঠপোষক, সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সভ্য হিসেবে সংশ্লিষ্ট আছেন, তাঁদের নাম যথাক্রমে:—প্রধান পৃষ্ঠ-পোষক : স্বামী সত্যানন্দ, রামকৃষ্ণ আশ্রম, বরাহনগর। অন্যান্য পৃষ্ঠপোষকদের ভিতর আছেন যথাক্রমে সর্বশ্রী বীরেন্দ্রকিশোর রায়-চৌধুরী, অন্নদাশংকর রায়, ডাঃ সুকুমার সেন, মৈত্রেয়ী দেবী, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, রামকিংকর বেইজ, ধীরেন দেববর্মন, শান্তিদেব ঘোষ, সুপ্রিয় সরকার ও আরো অনেকে।

কণ্ঠসংগীত প্রতিযোগিতা

"সংগীত ও কৃষ্টি পরিষদ" পরিচালিত নিখিল ভারত সংগীত প্রতিযোগিতায় যোগদানের শেষ তারিখ ১৫ই জানুয়ারী '৬৮। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের বয়স অনুসারে তিনটি বিভাগে বিভক্ত করা হবে। কলকাতার বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে অথবা নিম্ন নাম ঠিকানা লিখিত ১৫ পয়সার ডাক-টিকিট সম্বলিত খাম, সম্পাদক, সংগীত ও কৃষ্টি পরিষদ, পোঃ বাঁশদ্রোণী, ২৪-পরগণা, এই ঠিকানায় পাঠালে নিয়মাবলী ও আবেদনপত্র পাঠান হবে।

উচ্চাঙ্গ সংগীত শিল্পী মন্মথনাথ গাঙ্গুলীর স্মৃতিবার্ষিকী উদযাপন

গত ১৭ ডিসেম্বর শিয়ালদহ 'ক্রেম ব্রাউন ইনস্টিটিউটে' প্রখ্যাত উচ্চাঙ্গসঙ্গীত শিল্পী মন্মথনাথ গাঙ্গুলীর স্মৃতিবার্ষিকী উদ্যাপন উপলক্ষে এক মনোজ্ঞ আলোচনা সভা ও উচ্চাঙ্গসংগীত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন ডক্টর সিতাংশু মৈত্র। শিল্পীর জীবন ও সংগীতসাধনার উপর আলোকপাত করে ভাষণ দেন শ্রীজগদীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, শ্রীতারক চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীদুলাল মুখোপাধ্যায়।

উচ্চাঙ্গ সংগীতে অংশ নেন সর্বশ্রী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিহর রায়, শ্রীসুবোধ দে, হীরেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, রাজীবলোচন দে, ওস্তাদ আফাক হোসেন খাঁ ও অরুণ বসু মল্লিক।

অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন মন্মথনাথ গাঙ্গুলী স্মৃতি-সমিতি।

—চিত্রাঙ্গদা



কলকাতার রঞ্জি স্টেডিয়ামে ১৯৬৭ সালের রঞ্জি ট্রফি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার পূর্বাঞ্চলের খেলা উপলক্ষে বাংলা এবং আসামের খেলোয়াড়বৃন্দ। বাংলা ৬ উইকেটে আসামকে পরাজিত করে। ফটো : অমৃত

খেলাধুলা

দর্শক

ভারতবর্ষ বনাম অস্ট্রেলিয়া

প্রথম টেস্ট ক্রিকেট

অস্ট্রেলিয়া: ৩৩৫ রান (বব কাউপার ৯২, পল সিহান ৮১ এবং ববি সিম্পসন ৫৫ রান। আবিদ আলী ৫৫ রানে ৬ এবং প্রসন্ন ৬০ রানে ৩ উইকেট)

ও ৩৬৯ রান (বব কাউপার ১০৮ এবং ববি সিম্পসন ১০৩ রান। রুসি সুর্তি ৭৪ রানে ৫ উইকেট)

ভারতবর্ষ: ৩০৭ রান (ইঞ্জিনীয়ার ৮৯, রুসি সুর্তি ৭০ এবং বোরদে ৬৯ রান। কনেলী ৫৪ রানে ৪ উইকেট)

ও ২৫১ রান (ভি সুব্রহ্মনিয়াম ৭৫ এবং রুসি সুর্তি ৫৩ রান। রেনিবার্গ ৩৯ রানে ৫ উইকেট)

প্রথমদিন (ডিসেম্বর ২৩):

অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসের ৬ উইকেট খুইয়ে ৩১১ রান সংগ্রহ করে। বব কাউপার ৮৫ রান করে অপরাজিত ছিলেন।

দ্বিতীয় দিন (ডিসেম্বর ২৫):

অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস ৩৩৫ রানের মাথায় শেষ হলে বাকি সময়ের খেলায় ভারতবর্ষ প্রথম ইনিংসের ৮ উইকেট হারিয়ে ২৮৮ রান সংগ্রহ করেছিল।

তৃতীয় দিন (ডিসেম্বর ২৬):

ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস ৩০৭ রানের মাথায় শেষ হয়। অস্ট্রেলিয়া ২৮ রানে অগ্রগামী হয়ে দ্বিতীয় ইনিংসের ৬টা উইকেট খুইয়ে ৩০৫ রান সংগ্রহ করে।

চতুর্থ দিন (ডিসেম্বর ২৭):

অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস ৩৬৯ রানের মাথায় শেষ হলে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৩৯৮ রান তুলতে ভারতবর্ষ দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে এবং ৯টা উইকেট খুইয়ে ২৩৬ রান সংগ্রহ করে।

পঞ্চম দিন (ডিসেম্বর ২৮):

ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংস ২৫১ রানের মাথায় শেষ হলে অস্ট্রেলিয়া ১৪৬ রানে জয়ী হয়।

প্রখ্যাত এডিলেড ওভাল মাঠে আয়োজিত ভারতবর্ষ বনাম অস্ট্রেলিয়ার প্রথম টেস্ট সিরিজের প্রথম টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়া ১৪৬ রানে ভারতবর্ষকে পরাজিত করার গৌরব লাভ করেছে। চতুর্থ দিনেই খেলার চূড়ান্ত মীমাংসার জন্যে অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রা কোমর বেঁধে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ভারতবর্ষের শেষ দশম উইকেট জুটি প্রসন্ন এবং কুলকার্ণি মাটি কামড়ে দ্বিতীয় ইনিংস জিইয়ে রেখেছিলেন। ভারতবর্ষের ৯টা উইকেট পড়ে ২৩৬ রান উঠেছিল। পঞ্চম অর্থাৎ শেষদিনে ভারতবর্ষের শেষ উইকেটের জুটি ভাঙতে অস্ট্রেলিয়ার মাত্র ১২ মিনিট সময় লেগেছিল। এডিলেডের এই প্রথম টেস্ট খেলা নিয়ে উভয় দেশের মধ্যে অনুষ্ঠিত ১৭টি টেস্ট খেলার ফলাফল দাঁড়াল অস্ট্রেলিয়ার জয় ১০, ভারতবর্ষের জয় ২ এবং খেলা ড্র ৫।

অস্ট্রেলিয়া টসে জয়ী হয়ে প্রথমেই ব্যাট করার দান নেয়। প্রথম উইকেটের জুটিতে ববি সিম্পসন এবং বিল লরী চটকদার সহজ ভংগীতে দলের ৯৯ রান সংগ্রহ করেন। ইতিপূর্বে তাঁরা টেস্ট ক্রিকেটেই প্রথম উইকেটের জুটিতে ৮-বার দলের শতরান বা তার বেশী সংগ্রহ করেছেন। ভিক্টোরিয়া দলের দুই খেলোয়াড় পল সিহান এবং বব কাউপার তৃতীয় উইকেটের জুটিতে ১০০ মিনিটে ১১৮ রান তুলে দলের রান সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি করেন। চা-পানের পরের খেলায় প্রসন্নের বোলিংয়ে নাটকীয়ভাবে অস্ট্রেলিয়ার ৩টে উইকেট পড়ে যায় মাত্র ২২টা বলের খেলায়, তিন রানের বিনিময়ে। তাঁর বলে সিহান, রেডপাথ এবং চ্যাপেল আউট হন। ভারতীয় মহল তখন আনন্দে আটখানা। যেখানে অস্ট্রেলিয়ার খেলার এক সময়ে ছিল দুটো উইকেট পড়ে ২২৭ রান সেখানে দাঁড়ালো ৫ উইকেট পড়ে ২৩৫ রান। দলের ৩১১ রানের মাথায় প্রথমদিনের খেলার শেষ বলটি খেলতে গিয়ে উইকেট-কিপার জার্মান বোল্ড আউট হন (আবিদ আলীর বল)। আবিদ আলী ৪৫ রানে ৩টে এবং প্রসন্ন ৬০ রানে ৩টে উইকেট পান। ভারতীয় খেলোয়াড়দের খারাপ ফিল্ডিংয়ে অস্ট্রেলিয়া বিশেষ লাভবান হয়। অস্ট্রেলিয়ার কাণ্ডারী বব কাউপার তাঁর ৮২ রানের মাথায় চন্দ্রশেখরের হাত থেকে খুব জোর ছাড়া পেয়ে শেষ পর্যন্ত ৮৫ রান করে অপরাজিত থাকেন। অস্ট্রেলিয়ার নবাগত টেস্ট খেলোয়াড় পল সিহান (মেলবোর্ণের বিজ্ঞানের ছাত্র) দৃঢ়তার সঙ্গে ১১৬ মিনিট খেলে ব্যক্তিগত ৮১ রান (বাউণ্ডারী ১০) করেন।

দ্বিতীয় দিনে অস্ট্রেলিয়া তাদের বাকি চার উইকেটে মাত্র ২৪ রান তুলতে সক্ষম হয়েছিল। অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস ৩৩৫ রানের মাথায় শেষ হয়। দ্বিতীয় দিনে অস্ট্রেলিয়া ৫০ মিনিট ব্যাট করেছিল। এই-দিন আবিদ আলী ৫ ওভার বল দিয়ে মাত্র ২০ রানের বিনিময়ে ৩টে উইকেট পান। জীবনের প্রথম টেস্ট খেলতে নেমে তাঁর ৫৫ রানে ৬টা উইকেট পাওয়া বিশেষ সাফল্যের পরিচয়। ভারতবর্ষ এইদিন প্রথম ইনিংসের ৮টা উইকেট খুইয়ে ২৮৮ রান সংগ্রহ করেছিল। ভারতবর্ষের রান ছিল লাঞ্চের সময় ৬৫ (১ উইকেটে) এবং চা-পানের সময় ১১৪ (৩ উইকেটে)। খেলার শেষ এক-ঘন্টায় ভারতবর্ষ ৫টা উইকেট খুইয়ে মাত্র ৩৮ রান যোগ করে। কোথায় ৩ উইকেট পড়ে স্কোর বোর্ডে ২৫০ রান ছিল সেখানে দাঁড়ালো ৮ উইকেটে ২৮৮ রান—অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের ৩৩৫ রানের থেকে মাত্র ৪৭ রান কম, হাতে জমা দুটো উইকেট। ভারতবর্ষের পক্ষে প্রশংসনীয় খেলেছিলেন ইঞ্জিনীয়ার (৮৯ রান), সুর্তি (৭০ রান) এবং অধিনায়ক বোরদে (৬৯

রান)। ইঞ্জিনীয়ার ১৪টা এবং সুর্তি ৯টা বাউণ্ডারী করেন। দ্বিতীয় দিনের খেলা ছিল ভারতবর্ষের অনুকূলে।

তৃতীয় দিনে ৩০৭ রানের মাথায় ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস শেষ হলে অস্ট্রেলিয়া মাত্র ২৮ রানে অগ্রগামী হয়ে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে এবং ৬ উইকেটের বিনিময়ে ৩০৫ রান সংগ্রহ করে। অস্ট্রেলিয়ার এই ৩০৫ রানের (৬ উইকেটে) মধ্যে মোটা রান ছিল বব কাউপারের ১০৮ এবং ববি সিম্পসনের ১০৩। তৃতীয় উইকেটের জুটিতে সিম্পসন এবং কাউপার ঝটিকাবেগে ১৬১ মিনিটে দলের ১৭২ রান তুলেছিলেন। তবে তারা ব্যক্তিগত সেঞ্চুরী রান পূর্ণ করার অনেক আগে একবার করে আউট হওয়া থেকে বেঁচে যান। তার জন্য বোরদে এবং বদলী খেলোয়াড় সাক্সেনা দায়ী ছিলেন। সিম্পসন ভারতবর্ষের বিপক্ষে বর্তমান সেঞ্চুরী (১০৩ রান) করার সূত্রে প্রত্যেকটি দেশের বিপক্ষে টেস্ট ক্রিকেট খেলায় সেঞ্চুরী করার গৌরব লাভ করলেন। তাঁর টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় জীবনে পরিসংখ্যান দাঁড়িয়েছে : খেলা ৫০, মোট রান ৩৯৭৯, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ৩১১ এবং সেঞ্চুরী ৭। অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়দের মধ্যে সিম্পসনের এই মোট ৩৯৭৯ রানের মাথার উপরে আছেন মাত্র দুজন খেলোয়াড়—স্যার ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যান (৫২টি খেলায় মোট ৬৯৯৬ রান) এবং নীল হার্ভে (৭৯টি খেলায় মোট ৬১৪৯ রান)। তৃতীয় দিনে খেলার গতি অস্ট্রেলিয়ার অনুকূলে ফিরে যায়। কুলকার্ণি এবং নাদকার্নীর আঘাত এবং দুটি সহজ ক্যাচ মাটিতে পড়ার ফলে অস্ট্রেলিয়া প্রভূত উপকৃত হয়।

খেলার চতুর্থ দিনে অস্ট্রেলিয়া তাদের বাকি ৪ উইকেটে আরও ৬৪ রান সংগ্রহ করে ৯০ মিনিটের খেলায়। অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস ৩৬৯ রানের মাথায় শেষ হলে ভারতবর্ষ জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৩৯৮ রানের উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে এবং ৯ উইকেট খুইয়ে ২৩৬ রান সংগ্রহ করে। খেলার এই অবস্থায় পরাজয় থেকে অব্যাহতি পেতে ভারতবর্ষের আরও ১৬১ রান সংগ্রহ করার প্রয়োজন ছিল। এদিকে তাদের হাতে জমা ছিল মাত্র একটি উইকেট। ভারতবর্ষের এই দিনের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় উল্লেখযোগ্য রান তুলেন সুব্রহ্মনিয়াম (৭৫ রান) এবং সুর্ত্তি (৫৩ রান)। দ্বিতীয় ইনিংসে ইঞ্জিনীয়ার তাঁর ১৯ রানে এবং সুব্রহ্মনিয়াম তাঁর ৭৫ রানে রান আউট হন। ভারতবর্ষের পক্ষে চৌকস খেলোয়াড় হিসাবে কৃতিত্বের পরিচয় দেন নবাগত টেস্ট খেলোয়াড় আবিদ আলী এবং রুসী সুর্ত্তি। আবিদ আলী উভয় ইনিংসেই ৩৩ রান করেন এবং অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসে ৫৫ রানে ৬টা উইকেট পান। সুর্ত্তি প্রথম ইনিংসে ৭০ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৫৩ রান করেন। অপরদিকে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসে তিনি ৭৪ রানে ৫টা উইকেট পান।

খেলার পঞ্চম অর্থাৎ শেষদিনে ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংস মাত্র ১২ মিনিট স্থায়ী ছিল—২৫১ রানের মাথায় ইনিংস শেষ হয়। রেনিবার্গের বল খেলতে গিয়ে আহত কুলকার্ণি স্লিপে যে 'ক্যাচ' তুলেন আয়ান চ্যাপেল ঝাঁপ দিয়ে তা লুফে নিয়ে ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ করেন। দ্বিতীয় ইনিংসে ফাস্ট বোলার ডেভ রেনিবার্গ ১৪·২ ওভার বলে ২-বার মেডেন এবং ৩৯ রানে ৫টা উইকেট পান।

উভয় দলের খেলোয়াড়

অস্ট্রেলিয়া: ববি সিম্পসন (অধিনায়ক), বিল লরী, পল সেহান, বব কাউপার, আয়ান চ্যাপেল বি জার্মান, আয়ান রেডপাথ, গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জী, জি গিসসন, এ্যালান কনোলী এবং ডেভ রেনবার্গ

ভারতবর্ষ: চান্দু বোরদে (অধিনায়ক), দিলীপ সারদেশাই, ফারুক ইঞ্জিনীয়ার, অজিত ওয়াদেকার, রুসী সুর্তি, আবিদ আলী, ভি সুব্রহ্মনিয়াম, বাপু নাদকার্ণী, ই এ এস প্রসন্ন, বি এস চন্দ্রশেখর এবং উমেশ কুলকার্ণি।

রঞ্জি ট্রফি

কলকাতার ইডেন উদ্যানের রঞ্জি স্টেডিয়ামে আয়োজিত পূর্বাঞ্চলের রঞ্জি ট্রফি জাতীয় ক্রিকেট খেলায় বাংলা ৬ উইকেটে আসামকে পরাজিত করলেও তারা সুনাম অনুযায়ী খেলতে পারেনি। উড়িষ্যার বিপক্ষে বাংলা এক ইনিংস ও ৭৬ রানে জয়ী হয়েছিল।

প্রথম দিনেই ২০টি উইকেট পড়ে—আসামের প্রথম ইনিংস ৭০ রানে এবং বাংলা প্রথম ইনিংস ১৩৪ রানের মাথায় শেষ হয়।

দ্বিতীয় দিনে ১৪১ রানের মাথায় আসামের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হলে বাংলা দ্বিতীয় ইনিংসের ২ উইকেট খুইয়ে ৫১ রান সংগ্রহ করে। ফলে খেলায় সরাসরি জয়লাভের জন্যে বাংলার আরও ২৭ রানের প্রয়োজন হয়। হাতে জমা থাকে ৮টা উইকেট।

তৃতীয় দিনে বাংলা জয়লাভের জন্যে ২৭ রান তুলতে গিয়ে আরও দুটো উইকেট খুইয়েছিল। বাংলার ২য় ইনিংসের ৭৯ রানের মাথায় (৪ উইকেটে) খেলাটি শেষ হয়।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

আসাম: ৭০ রান (এইচ পি বেজবড়ুয়া ২৮ রান। সুব্রত গুহ ১৬ রানে ৪ এবং রমেশ ভাটিয়া ২৮ রানে ৩ উইকেট)

ও ১৪১ রান (কে আমেদ ৫১ রান। এস গুহ ৩২ রানে ৩ এবং আর ভাটিয়া ৪১ রানে ৫ উইকেট)

বাংলা: ১৩৪ রান (চুনী গোস্বামী ২৫ রান। এ ঘটক ৭৫ রানে ৬ উইকেট)

ও ৭৯ রান (৪ উইকেটে। পি সি পোদ্দার নট আউট ৪৮ রান। এ ঘটক ৩৩ রানে ৩ উইকেট)

ডেভিস কাপ লন টেনিস

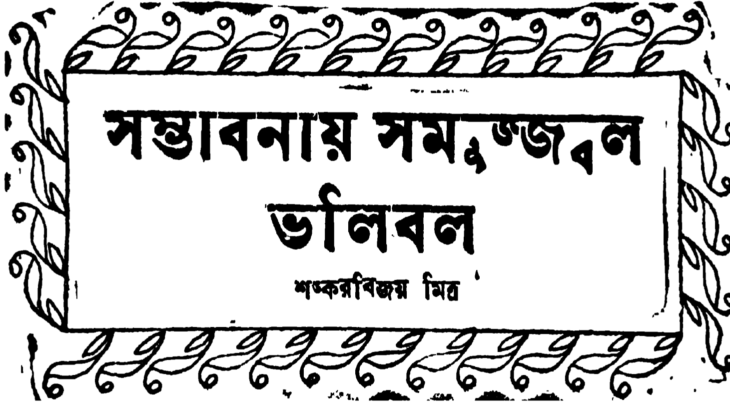
ব্রিসবেনের মিল্টন স্টেডিয়ামে আয়োজিত ১৯৬৭ সালের আন্তর্জাতিক ডেভিস কাপ লন টেনিস প্রতিযোগিতার চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে গত তিন বছরের বিজয়ী (১৯৬৪-৬৬) অস্ট্রেলিয়া ৪-১ খেলায় স্পেনকে পরাজিত করে মোট ২২ বার ডেভিস কাপ জয়ের গৌরব লাভ করেছে। এই নিয়ে অস্ট্রেলিয়া মোট ৩৬ বার চ্যালেঞ্জ রাউণ্ড খেলে ২২ বার ডেভিস কাপ জয়ী হল। অপরদিকে স্পেনের এই দ্বিতীয়বার চ্যালেঞ্জ রাউণ্ড খেলা। ১৯৬৫ সালে স্পেন ১-৪ খেলায় অস্ট্রেলিয়ারই কাছে পরাজিত হয়েছিল।

এখানে উল্লেখ্য, এ পর্যন্ত মাত্র চারটি দেশ এইভাবে ডেভিস কাপ জয়ী হয়েছে: অস্ট্রেলিয়া ২২ বার (নিউজিল্যাণ্ডের সঙ্গে অস্ট্রেলেশিয়া নামে ৭-বার), আমেরিকা ১৯-বার, গ্রেট বৃটেন ৯ বার এবং ফ্রান্স ৬ বার। শেষ ডেভিস কাপ জয়ী হয়েছে আমেরিকা ১৯৬৩ সালে, গ্রেট বৃটেন ১৯৩৬ সালে এবং ফ্রান্স ১৯৩২ সালে। ডেভিস কাপের সূচনা ১৯০০ সালে। ১৯০১ এবং ১৯১০ সালে যথাক্রমে ডেভিস কাপ বিজয়ী আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়াকে চ্যালেঞ্জ করা হয়নি অর্থাৎ প্রতিযোগিতার আসরই বসেনি। দুটি বিশ্ব যুদ্ধের জন্যে ১০ বছর খেলা হয়নি (১৯১৫-১৮ এবং ১৯৪০-৪৫)। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী কালের খেলায় অস্ট্রেলিয়া প্রতি বছরই (১৯৪৬-৬৭) ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলে মোট ২২ বারের মধ্যে ১৫ বার ডেভিস কাপ জয়ী হয়েছে এবং বাকি ৭-বার ডেভিস কাপ পেয়েছে আমেরিকা।

১৯৬৭ সালের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ড

প্রথম দিনের দুটি সিঙ্গলস খেলাতেই অস্ট্রেলিয়া জয়ী হয়ে ২-০ খেলায় অগ্রগামী হয়। রয় এমার্সন (অস্ট্রেলিয়া) ৬-৪, ৬-১ ও ৬-১ গেমে স্পেনের ম্যানুয়েল সান্তানাকে পরাজিত করেন। দ্বিতীয় সিঙ্গলসে জন নিউকম্ব (অস্ট্রেলিয়া) ৬-৩, ৬-৩ ও ৬-২ গেমে ম্যানুয়েল ওরান্টেসকে পরাজিত করেন। দ্বিতীয় দিনের ডাবলসে জন নিউকম্ব এবং টনি রোচ (অস্ট্রেলিয়া) ৬-৪ ৬-৪ ও ৬-৪ গেমে ম্যানুয়েল সান্তানা এবং ম্যানুয়েল ওরান্টেসকে পরাজিত করার সূত্রে ১৯৬৭ সালের ডেভিস কাপ জয়ী হয়। সুতরাং বাকি দুটি সিঙ্গলস খেলায় যোগদান অস্ট্রেলিয়ার কাছে নিয়মরক্ষা ছাড়া আর কোন গুরুত্ব ছিল না।

তৃতীয় দিনের প্রথম সিঙ্গলসে স্পেনের ম্যানুয়েল সান্তানা ৭-৫, ৬-৪ ও ৬-২ গেমে অস্ট্রেলিয়ার জন নিউকম্বকে পরাজিত করেন। শেষ সিঙ্গলস খেলায় রয় এমার্সন ৬-১, ৬-১ ও ৬-৪ গেমে ম্যানুয়েল ওরান্টেসকে পরাজিত করলে ১৯৬৭ সালের আন্তর্জাতিক ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতা শেষ হয়।



সম্ভাবনায় সমুজ্জ্বল ভলিবল

শঙ্করবিজয় মিত্র

ফুটবল, ক্রিকেট বা হকির মত না হলেও ভলিবল এখন খেলধুলোর জগতে একটি পরিচিত নাম। আর বেশ খানিকটা জনপ্রিয়তাও অর্জন করেছে। এই জনপ্রিয়তা এখনও আশানুরূপ হয়নি। অথচ এ-খেলাটি এত সহজ ও সার্বজনীন, এত স্বল্প বায়সাধ্য, আর এত অল্প উপকরণের খেলা যে, এর ব্যাপক প্রসার ঘটলে আমাদের মত দরিদ্র দেশে যুব-সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হতে পারে। ক্ষিপ্রতা, আত্মনির্ভরতা, পারস্পরিক সহযোগিতা সাধনে প্রতিটি অংগ সঞ্চালনে দৈহিক যোগ্যতার উৎকর্ষ বিধানে ভলিবল খেলার তুলনা নেই। ছোট্ট একটি মাঠ, একটি জাল আর ফুটবলের মত ছোট্ট আকারের বল এর উপকরণ। আর এ-খেলাতে যত সহজে শরীর গঠন হয়, এমনটি অন্য খেলায় সম্ভব নয়। শরীরকে সর্ববিষয়ে সক্ষম ও ক্ষিপ্র করে তোলে অল্প দিনেই। বাংলাদেশে স্কুল-কলেজগুলোর মধ্যে বেশীর ভাগেরই খেলার মাঠ থাকে না যেখানে ফুটবল, হকি বা ক্রিকেট খেলা চলতে পারে। সেখানে ছোট্ট জায়গাতে এই ভলিবল খেলার প্রচলন করলে সর্বদিক দিয়েই সুবিধা হতে পারে। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কর্তারা এদিকে লক্ষ্য দিলে এ-খেলাটি কালে জাতীয় ক্রীড়া হিসাবে স্থান করে নিতে পারে।

অবশ্য এরই মধ্যে ভলিবল বেশ খানিকটা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। কলকাতা বাংলার জন-জীবনের কেন্দ্রবিন্দু। বাঙালীর জীবনধারার সমস্ত দিক এখানে প্রতিভাত হয়ে থাকে—সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি থেকে খেলাধুলো পর্যন্ত। সবরকমের খেলাধুলোর স্থানই আছে এখানে। ভলিবলের ভালবাসার লোকেরও অভাব নেই।

অনেককাল আগে থেকেই বাংলাদেশে ভলিবলের প্রচলন হয়েছে, তবে তার প্রসার ঘটেছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। পশ্চিমবঙ্গ ভলিবল ফেডারেশন গঠিত হয়েছিল সেই ১৯৩৬ সালে। তারপর থেকে অনেক বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়ে চলতে হয়েছে একে। আর পাঁচটা প্রতিষ্ঠানের মত গোড়ার দিকে যাঁরা থাকেন, তাঁদের অনেক দায়-দায়িত্ব ও ঝড়-ঝাপ্টা সইতে হয়। এখানেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। ধীরে ধীরে পশ্চিমবঙ্গের মত ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এর প্রচলন হয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যের অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় ভারতীয় ফেডারেশনও গড়ে উঠেছে। রাজ্যে রাজ্যে ভলিবলের প্রতিযোগিতা চলছে। আবার সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতারও আয়োজন আছে। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতাতেও ভারত পিছিয়ে নেই। ১৯৫১ সালে ভারতীয় ভলিবল ফেডারেশন গঠিত হবার পর থেকে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এর অনুশীলন-আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে।

ছোট্ট মাঠে খালি হাতে খেলোয়াড়দের মধ্যে ক্ষিপ্র বেগে একটা বলের ঘোরাফেরা, আর মাঝখানের তিন ফুট চওড়া একটা জালের দুপাশে প্রতিদ্বন্দ্বী দু' দলের শারীরিক যোগ্যতা, ক্ষিপ্রতা, কুশলী বুদ্ধির পরিচয় দেখতে কৌতূহলী দর্শকের সমাবেশ হয়। আর এমনি করেই দেশে দেশে এই অতি-সহজ খেলাটির প্রসার সম্ভব হয়েছে। ভলিবল আমাদের নিজস্ব খেলা ছিল না, অর্থাৎ ফুটবল, ক্রিকেটের মত এরও জন্ম বিদেশে। তবুও ঐ ফুটবল বা ক্রিকেটের মত এই খেলাটিকেও আমরা নিজেদের করে নিয়েছি এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার আসরে ক্রীড়াকৃতির স্বাক্ষর রেখে এসেছি।

ভলিবলের জন্ম আমেরিকার হোলিওকে। ম্যাসাচুসেটের এই শহরের ওয়াই এম সি এ-র ফিজিক্যাল ডিরেক্টার উইলিয়াম জি মর্গ্যান এই ক্রীড়ারীতির প্রবর্তক। আমেরিকায় তখন বাস্কেটবল বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বাস্কেটবলে বেশ বড় সাইজের বল নিয়ে বিপক্ষের প্রতিরোধ কাটিয়ে জালের বাস্কেটের মধ্যে বল প্রবেশ করান খুব সহজ নয়। অথচ এতে শারীরিক কসরতের প্রয়োজন সর্বাধিক। তাই বাস্কেটবলের সংগে টেনিসের জালের মিশ্রণ ঘটিয়ে খালি-হাতের সাহায্যে বল খেলার প্রচলন করলেন তিনি। দেখতে দেখতে হলিওকে খেলাটি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠলো। বিভিন্ন জিমনাসিয়ামের সদস্যেরা দেখতে পেলেন শরীর গঠনের পক্ষে এ-খেলাটি খুব উপযোগী। তাই ক্রমে এর বিস্তৃতি ঘটতে লাগল। ম্যাসাচুসেট, স্প্রিংফিল্ড, নিউ ইংলণ্ড প্রভৃতি অঞ্চলে মাঠে মাঠে এই খেলা দেখতে পাওয়া যেত। এই সময়ে ডাঃ এ টি হলস্টেড খেলাটি দেখে মুগ্ধ হন এবং ভেবেচিন্তে এর নাম রাখলেন ভলিবল। ভলির সাহায্যেই বেশীর ভাগ খেলাটি পরিচালিত হয় বলে তিনি সম্ভবতঃ ঐ নাম রেখেছিলেন।

ওয়াই এম সি এ-র তত্ত্বাবধানে এই খেলাটি বেশ জনপ্রিয় হতে থাকে। ক্লাবে ক্লাবে, স্কুল-কলেজে, বয়স্কাউট ও গার্লগাইডদের মধ্যে এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। ১৯১৬ সালে ওয়াই এম সি এ খেলা পরিচালনার জন্যে প্রথম নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ করে। এবং ১৯২২ সালে সর্বপ্রথম টুর্ণামেণ্ট পরিচালিত হয় ওয়াই এম সি এ-রই তত্ত্বাবধানে। এই সময়ের মধ্যে আমেরিকায় প্রায় এক হাজার জনপদে এই খেলার পরিব্যাপ্তি লাভ করে।

এই আবিষ্কারের সময় থেকে প্রথম কুড়ি বছর ভলিবল প্রতিযোগিতাসমূহ ওয়াই এম সি এ-র পরিচালনাধীনে থাকে। এরপর ১৯২৯ সালে মার্কিন ভলিবল অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয়। এই আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন গঠনের পর থেকে এর জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে এবং বছর-পনেরোর মধ্যে সমস্ত আমেরিকায় এর সমাদর ঘটে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্কিন সৈন্যরা বিশ্বের সর্বত্র এর প্রসারে সহায়তা করেছে। অবসর সময়ে সেনা-শিবিরের প্রান্তরে বা অন্যান্য উন্মুক্ত স্থানে কোনক্রমে একটা নেট আর বল যোগাড় করে তারা প্রমোদবিলাসের জন্য এই খেলায় মত্ত হত। এবং এইভাবেই তারা ভলিবল প্রসারে বাহকের ভূমিকা নিয়েছে। মার্কিন সৈন্যদের মধ্যে এর জনপ্রিয়তা এতটা বৃদ্ধি পায় যে, ১৯৪৭ সালে আর্মি ভলিবল খেলোয়াড়ের সংখ্যা দাঁড়ায় পঞ্চাশ লক্ষ।

গোড়ার দিকে খেলার নিয়ম খুব সহজ ছিল বলেই এর জনপ্রিয়তা ক্রমশঃ বৃদ্ধি

নিত্যপাঠ্য তিনখানি গ্রন্থ

সারদা-রামকৃষ্ণ

—সন্ন্যাসিনী শ্রীদুর্গামাতা রচিত—

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের জনৈক সন্ন্যাসী লিখিয়াছেন :—পড়িতে পড়িতে তন্ময় হইয়া শ্রীশ্রীমায়ের ও শ্রীশ্রীঠাকুরের যেন জীবন্ত স্পর্শ অনুভব করিয়াছি।

যুগান্তর :—সর্বাংগসুন্দর জীবনচরিত...... গ্রন্থখানি সর্বপ্রকারে উৎকৃষ্ট হইয়াছে ॥

সপ্তমবার মুদ্রিত হইল—৮্

গৌরীমা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যার অপূর্ব জীবনচরিত

আনন্দবাজার পত্রিকা :—ইঁহারা জাতির ভাগ্যে শতাব্দীর ইতিহাসে আবির্ভূতা হন ॥

পঞ্চমবার মুদ্রিত হইয়াছে—৫্

সাধনা

বসুমতী : এমন মনোরম স্তোত্রগীতি-পুস্তক বাংলায় আর দেখি নাই ॥

পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ—৪্

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম

২৬ মহারাণী হেমন্তকুমারী স্ট্রীট, কলিকাতা

পেতে থাকে। প্রতি দলে ছ'জন খেলোয়াড় নিয়ে দল গঠিত হয়। ফরোয়ার্ডে তিনজন—লেফট্‌ সেণ্টার ও রাইট এবং ব্যাকে তিনজন—লেফট, সেণ্টার ও রাইট। ইন্ডোরে খেলার জন্যে ষাট ফুট লম্বা ও ত্রিশ ফুট চওড়া স্থান এবং আউটডোরের জন্যে ৮০'×৪০' স্থান হলেই চলে। মেয়েদের জন্যে কোর্ট-গুলি আরও ছোট করার বিধান দেওয়া হয়। ইণ্ডোরে ৪০ ফুট × ২০ ফুট আর আউট-ডোরে ৬০ ফুট × ৩০ ফুট স্থান। মাঝ-খানের জালটি হবে ৩২ ফুট লম্বা আর তিন ফুট চওড়া। এই জাল খাটাবার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে, মাঝখানে জালটির শীর্ষ-দেশ আটফুট উঁচুতে, আর নীচের দিকে মাটি ও জালের মধ্যে ফাঁকা থাকবে পাঁচ ফুট। মেয়েদের খেলায় জালটির মাঝখানে শীর্ষদেশ থাকবে সাড়ে ছ' ফুট উঁচুতে। বলের পরিধি হবে ২৬ ইঞ্চি থেকে ২৭ ইঞ্চি, হাওয়া দিয়ে এর প্রেসার হবে সাত থেকে আট পাউন্ড এবং ওজন হবে আট থেকে দশ আউন্স।

টেনিস বা ব্যাডমিণ্টনের মত খেলা আরম্ভ হবে 'সার্ভিস' দিয়ে। তবে টেনিসে বা ব্যাডমিণ্টনে আছে র‍্যাকেট আর এতে আছে খালি হাত। হাতের তালু দিয়েই সার্ভিস করতে হয়। হাতের তালু, পাতা, জোড়া হাত এবং দেহের ঊর্ধ্বাংশের ধাক্কাই এই খেলার অস্ত্র। হাতের ঘুঁষি ও পায়ের লাথি একেবারে নিষিদ্ধ। তাছাড়া বলটি ধরাও চলবে না। সার্ভিসের সময় নেটের ওপর দিয়ে বল দিতে হবে। মাটিতে বল না পড়ে ওপরে ওপরেই বল ঘোরাফেরা করবে। এক গণ্ডীতে বল থাককালীন তিন হাতের বেশী ছোঁয়া চলবে না এবং একজন খেলোয়াড়ও একবারের বেশি দু'বার পরপর বল ছুঁতে পারবেন না। অবশ্য তাহলে সার্ভিস বা পয়েন্ট নষ্ট হবে না। যে-দলের সার্ভিস, সেই দলের স্কোর। পনের পয়েণ্টে ব্যাডমিণ্টনের মত গেম। তবে যদি দু' দলই চোদ্দ পয়েন্ট অর্জন করে, তাহলে সেক্ষেত্রে দু' পয়েন্ট বেশি পেলে তবে গেম জেতা যাবে।

সহজভাবে এর আরম্ভ হলেও জন-প্রিয়তা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে খেলা পরি-চালনায় সুষ্ঠু ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। ১৯১৬ সালে আমেরিকায় ওয়াই এম সি এ যে নিয়মাবলী রচনা করেছিল, বিভিন্ন সময়ে তার সংশোধন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই খেলার পরিব্যাপ্তির পর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বীকৃতি পেয়েছে ভলিবল এবং রচিত হয়েছে আন্তর্জাতিক বিধিবিধান। এই তো সম্প্রতি ১৯৬৪ সালে কয়েকটি সংশোধন ঘটেছে পূর্বের নিয়মাবলীর। আর সেই পরিবর্তিত ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হচ্ছে সকল খেলোয়াড় ও পরিচালকদের (রেফারী)। আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির পর বিশ্ব ওলিম্পিকেও ভলিবলের স্থান ছিল ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত। আসছে মেক্সিকো ওলিম্পিকে সম্ভবতঃ ভলিবল আর স্থান পাচ্ছে না।

ভারতেও ভলিবলের প্রসার ঘটে ওয়াই এম সি এ-র সহায়তায়। ১৯২৫ সালে কল-কাতায় ওয়াই এম সি এ-র সদস্যরা এই খেলার প্রবর্তন করেন এবং কয়েক বছরের মধ্যেই খেলাটি বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ১৯৩০ সালে বাগবাজার জিমনাসিয়ামের উদ্যোগে এক লীগ প্রতিযোগিতা পরিচালিত হয় এবং কিছুদিন পরেই বেঙ্গল ভলিবল অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয়। ১৯৩৬ সালে এই অ্যাসোসিয়েশন বাংলার ওলিম্পিক সংস্থার অনুমোদন লাভ করে।

বাংলাদেশের মত ভারতের বিভিন্ন রাজ্যেও ভলিবল প্রচলিত হতে থাকে এবং দিনে দিনে এর জনসমর্থন বৃদ্ধি পায়। বাংলার মত অন্যান্য রাজ্যেও রাজ্য সংস্থা গঠিত হয় এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতা পরি-চালিত হতে থাকে। ওলিম্পিক অ্যাসো-সিয়েশন পরিচালিত ভলিবল চ্যাম্পিয়ান-সিপের প্রতিযোগিতাসমূহে ১৯৩৮ সাল থেকেই বাংলা অংশগ্রহণ করে আসছে।

বিভিন্ন রাজ্য সংস্থাগুলির সুষ্ঠু পরিচালনা ও ভলিবলকে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৫১ সালে ভারতীয় ভলিবল ফেডারেশন গঠিত হয়। বর্তমানে ঐ সংস্থাই ভারতের ভলিবল খেলার নিয়ামক। এই সংস্থার পরি-চালনায় ১৯৫২ সালে প্রথম জাতীয় চ্যাম্পিয়ানসিপ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সেই থেকে প্রতি বছর ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রে এই জাতীয় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এবারে সেই প্রতিযোগিতা (যা এখন ষোড়শ বর্ষে উপনীত) কলকাতাতে অনুষ্ঠিত হল ইডেন উদ্যানে গত বর্ষের ২৮ ডিসেম্বর থেকে ১৯৬৮ সালের শুভ নববর্ষের দিন পর্যন্ত।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের ভলিবল আর পিছিয়ে নেই। ১৯৫১ সালে জাতীয় ফেডারেশন গঠিত হবার পরের বছরই মস্কোতে বিশ্ব ভলিবল চ্যাম্পিয়ানসিপ প্রতিযোগিতায় ভারতীয় দল যোগদান করে এবং শ্রীহরিপ্রসাদ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে প্রথম আবির্ভাবেই কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে আসে। ভারতীয় দল বিদেশের সম্পূর্ণ নতুন পরি-বেশে এবং নতুন পরিচালন-ব্যবস্থায় খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম হয় এবং বিশ্ব চ্যাম্পি-য়ানসিপ প্রতিযোগিতায় সপ্তম স্থান দখল করে।

১৯৫৫ সালে ভারতীয় দল সর্ব-এশিয়া চ্যাম্পিয়ানসিপের প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থান নিয়ে ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করে। সেই থেকে ভলিবলে ভারতের সুনাম ছড়িয়ে পড়ে এবং এশীয় প্রতিযোগিতায় বহুবার ভারত রাণার্স হয়েছে। গত বছর ব্যাঙ্ককে অনুষ্ঠিত এশীয় প্রতিযোগিতায় ভারত তার সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেনি এবং তাকে চতুর্থ স্থান নিয়ে ফিরে আসতে হয়েছে। ক্রীড়া-জগতের অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় এখানেও আমাদের অসাফল্য বেদনাদায়ক। এই অসাফল্যের মূল উৎস সন্ধান করে ভলিবল কর্তৃপক্ষ যদি তা প্রতিকার করতে পারেন, তবে হয়ত আমরা হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হবো।

বর্তমান ভলিবলে সাফল্যের মূলসূত্র স্পীড্, যাকে বলি ক্ষিপ্রতা। এই ক্ষিপ্রতা আয়ত্ত করতে হলে গতি, দম, পটু দেহ ও উপস্থিত বুদ্ধির সুষ্ঠু প্রয়োগ প্রয়োজন। অনুশীলনের মাধ্যমেই এগুলি আয়ত্ত করা সম্ভব। এই অনুশীলন আবার বিজ্ঞান-ভিত্তিক হওয়া প্রয়োজন। এদিকে দৃষ্টি রেখে এগিয়ে চললে খেলোয়াড়েরা যেমন কুশলী হয়ে উঠবেন, দর্শক ও সমর্থকরাও তেমনি আনন্দের খোরাক পাবে।

অবশ্য বাংলাদেশে ভলিবলকে বিজ্ঞান-ভিত্তিক করবার প্রয়াস রয়েছে। ফলে, বাংলা টিমের ক্রীড়াধারার মান নিম্নস্তরের নয়। এতে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ ভলিবল ফেডা-রেশনের সক্রিয় ভূমিকা প্রশংসনীয়। ফেডা রেশন ছ' দফা কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে চলেছে—(১) ক্যালকাটা ভলিবল লীগে ৫০টি ক্লাব তিন বিভাগে যোগ দিয়ে থাকে।

(২) অফিস লীগের ২৫টি ক্লাব আন্তঃ-অফিস লীগে দুটি বিভাগে খেলে থাকে।

(৩) সিনিয়ার ও জুনিয়ার রাজ্য চ্যাম্পিয়ানসিপ।

(৪) আন্তঃঅফিস নক-আউট টুর্না-মেণ্ট—প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগ।

(৫) আন্তঃজেলা প্রতিযোগিতায় প্রায় বারটি জেলা দল যোগ দিয়ে থাকে। এছাড়া আছে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় লীগ ও অন্যান্য খেলা।

এছাড়া সেণ্ট্রাল সার্ভিসেস স্পোর্টস বোর্ড, সেণ্ট্রাল বোর্ড অফ রেভেনিউ সর্ব-ভারতীয় ভিত্তিতে প্রতিযোগিতা পরিচালিত হয়ে থাকে। পশ্চিমবঙ্গ ভলিবল ফেডা-রেশনের মাঠে প্রতিযোগিতাগুলি অনুষ্ঠিত হয়। ফলে কলকাতার দর্শকদের মধ্যে ভলি-বল বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ১৯৬০ সালে ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে ভলিবল টেস্ট ম্যাচ, ১৯৬১ সালে জাপান বনাম পশ্চিমবঙ্গ এবং ভলিবল ফেডারেশনের সভাপতির একাদশ বনাম জাপান এবং ১৯৬৬ সালে ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে ভলিবল টেস্ট ম্যাচ খেলা দেখার সৌভাগ্যও কলকাতার দর্শকদের হয়েছে।

খেলাটি আস্তে আস্তে মেয়েদের মধ্যেও প্রসার লাভ করেছে। জনপ্রিয়ও হয়ে উঠেছে বড় কম নয়। এবার জাতীয় ভলিবলের চ্যাম্পিয়নসিপের প্রতিযোগিতায় বাংলার মহিলা দলও অংশগ্রহণ করেছে।

খেলাধুলার অন্যান্য বিভাগে যতটা আগ্রহ ও উদ্দীপনা আমরা দেখিয়ে থাকি, তার খানিকটাও ভলিবলে নিবদ্ধ হলে ভারতের যুব-সমাজ উপকৃত হবে—এ-খেলায় ভারতের সম্ভাবনা সমুজ্জ্বল।



(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। ৮ ।।

সেই একবারের পর একালে মুজরো আর পায়নি সুরো, যা পাঁচ সাত টাকা মধ্যে মধ্যে পাচ্ছিল মতির সঙ্গে দোয়ার্কি করে। তাতেই খুশী ছিল সে, ভাতটা বন্ধ না হলেই হল—এই তার ভাবনা। বাবা আজকাল আর বিশেষ কিছুই আনতে পারেন না। ওর উপার্জনই চারটি প্রাণীর ভরসা।

এরই মধ্যে এ বাড়ি আসার মাস তিনেক পরে একদিন রঘুবাবু হঠাৎ খুঁজে খুঁজে ওর বাড়িতে এসে হাজির। সঙ্গে আর একটি ছাতা বগলে ভদ্রলোক, বেশভূষা ও অকারণ বিনয় দেখলে বড়লোকের বাড়ির সরকার কি গোমস্তা মনে হয়। সুরো তো অবাক।

বসায় কোথায় সে-ই তো এক সমস্যা। নিচের ঘরখানা অব্যবহার্য পড়ে থাকে, ওদের দরকারে লাগে না বলে, ঘরটা ভালও নয়, অন্ধকার স্যাঁৎসেতে মতো। বৈঠকখানা সাজাতে হলে অনেক আসবাব চাই, নিদেন একটা চৌকী আর একখানা জাজিম কি সপ্ তো বটেই। দরকারই বা কি, এরকম বাইরের লোক তো আসে না কেউ, আসবে তাও ভাবে নি।

অগত্যা ওপরেরই একটা ঘরে নিয়ে যেতে হয়। মাদুর পেতে বসতে দেয় ওদের।

'কী ব্যাপার রঘুবাবু, আপনি হঠাৎ—? এ গরিবের বাড়িতে!'

'হে' হে', তুমি তো বড়মানুষের সঙ্গে ওঠাবসা করো, আমাদের দিকে ফিরেও তাকাও না', দাঁত বার করে বলে রঘু, 'আমি মরি তোমার জন্যে ভেবে ভেবে, বলি চিরদিন কি মেয়েটার এই তাঁবেদারি করে কাটবে—এত এলেম থাকতে!... কেত্তনউলী যা লোক, কোনদিন আর তোমাকে একা ছাড়বে না, বেশ বুঝে নিয়েছে যে তোমাকে ছাড়লে তুমিই বাজার মাৎ করবে, ওর পসার মাটি!'

'ওসব কথা থাক না রঘুবাবু', বিরক্ত হয়ে ওঠে সুরো কথার পত্তনেই, 'মাসী আমার উপকার বই কখনও অপকার করেনি, ওর দয়াতেই যা হোক দু মুঠো জুটছে—দয়াই করেছে, যেচে সেধে একটা বিদ্যা শিখিয়েছে। সে আমার কখনও মন্দ করবে না।... আর বাজার মাৎ করবার কথা কি বলছেন যা তা, মাসীর মতো গাইতে আমার এখনও বিশ বছর সময় লাগবে।'

'অবিশ্যি, অবিশ্যি!' মুচকি মুচকি হাসে আর ঘাড় নাড়ে রঘুবাবু, 'তুমি যা বলেছ মানুষের মতোই বলেছ।.. তোমার উপযুক্ত কথাই বলেছ। তা বলে কথাটা তো কিছু সত্যি নয়, তুমি এখনই যা গাও, মতি কেত্তনউলী তোমার পায়ের কাছে দাঁড়াতে পারে না। শুধু নামের জোরে করে খাচ্ছে। সে কি আর মতি বোঝে না, বিলক্ষণ বোঝে।'

সুরবালা একেবারে উঠে দাঁড়ায়, 'কাজের কথা থাকে তো সারুন, এসব কথা আমি শুনতে চাই না।'

'এই যে, এই যে, কাজের কথাই তো, কাজের কথাই তো কইতে এসেছি।... চটপট সারব বলে ভদ্দরলোককে তো একেবারে সঙ্গে করে নিয়ে এলুম। এই চোরবাগান থেকে এয়েছেন ইনি, রাজা ননীলাল সিংহির জামাই কেষ্টগোবিন্দ সরকারের এস্টেটে কাজ করেন ইনি। বর্ধমানের দিকে মস্ত জমিদারী এঁদের—একটা পরগণার মালিক। আসছে রবিবার এঁদের বাড়ি একটা বায়না আছে। ভাল গান শুনতে চান এঁরা—নাম শুনতে চান না। নামের ডাকে গগন ফাটে পিঠের মাস দড়ি বাটে—এ এঁদের দরকার নেই।.. ভাল গাইবে, তার সঙ্গে চেহারাটা যেন একটু তাকিয়ে দেখার মতো হয়—এই কথাই বলে দিয়েছেন এঁদের বাবু। আমি শুনে বললুম, ঠিক এমনি লোকই আছে আমার হাতে—যেমনটি চাও। চলো নিয়ে যাচ্ছি। তাই ধরে নিয়ে এসেছি একেবারে। একশ একান্ন টাকায় রফা হয়েছে, দোয়ার বাজনদার আমি ঠিক করে দোব, সব মিলিয়ে—মায় আমার পাওনা সুদ্ধু একান্ন টাকা দিও, নিট একশটি টাকা তোমার থাকবে। বায়নার টাকা সঙ্গেই এনেছেন ভদ্দরলোক, একশটি টাকা দিয়ে যাবেন এখন।'

চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনল সুরো, রঘুর বক্তব্য শেষ না হওয়া অবধি একটা কথাও কইল না। সে চুপ করতে আস্তে আস্তে শুধু বলল, 'তা এখানে কেন রঘুবাবু, কথাবার্তা মাসীর সামনে হওয়াই তো ভাল। ওখানেই যেতে বলুন, বায়নার টাকাও তার হাতেই দেবেন।'

রঘু হাঁ করে চেয়ে রইল ওর মুখের দিকে।

'য়্যাই দ্যাখো! এতক্ষণ তোমাকে বোঝালুম কি! এ তোমার সঙ্গে আমার বন্দোবস্ত, মাসীর সঙ্গে সম্পর্ক কি। যেমন তাকে মুজ্‌রো এনে দিই, তেমনি এখন থেকে তোমাকে দোব। তার কাছে গেলে বায়না সে-ই নেবে, তোমাকে দেবে কেন?'

'কিন্তু আমি তো মাসীকে না জানিয়ে এ বায়না নিতে পারব না। টাকাও সব তাকেই দিতে হবে, সে যা হাতে তুলে দেয় দেবে।'

'এই মরেছে। ছুঁড়ি কি বোকা রে। বলি তোর এমন বুদ্ধি কেন, য়্যাঁ?' রঘু 'তুমি' থেকে 'তুই'তে নেমে আসে আত্মীয়তার চেষ্টায়, 'তোর ও মাসীর ন্যাজ ধরে থাকলে তোর আর জন্মে একালে গাওনা জুটবে না বলে দিলুম।'

'তা না জোটে—কী আর করব!' সুরো নিরাসক্ত সুরে বলে, 'বেশ তো, ওখানে নিয়ে যান, বলুন যে ও'রা আমাকেই চান, মাসী

যদি তখন আমাকে না দেয়—দেখা যাবে। তারপর যদি আমি আলাদা কারবার করি, নিজেই বায়না নিই—অধর্ম্ম কি বেইমানী করা হবে না।... কিন্তু আপনি গিয়ে বলতে পারবেন তো—যে মুজরোটা আমার জন্যেই বলে ব্যবস্থা করে এনেছেন?'

শেষের প্রশ্নটায় প্রচ্ছন্ন কামড় যথা-স্থানেই গিয়ে হুল ফোটায়। রঘুবাবুর মুখচোখ লাল হয়ে ওঠে। তবুও মুখসাপোট বজায় রেখে বলে, 'তা পারব না কেন? ইঃ, অত ভয় কিসের। বলি মতি কেত্তনউলীর অত পয়সা কার দৌলতে? আর কটা দালাল আমার মতো মুজ্‌রো এনে দেয় জিজ্ঞেস করো দিকিনি! সবকটা মিলেও এই লম্বার আদ্দেক দিতে পারে না।...... ভয় করে সে আমাকে চলবে।... তা নয়, তবে কথা হচ্ছে তখন যদি মতি বায়নাটা নিজেই নিতে চায়—এরা রাজী হবে কেন? এদের যে অন্যরকম পছন্দ। সে আবার তখন একটা ওট্‌কো খিটকেল বেধে যাবে।... দেখি চলো হে—ওঠা যাক। বাবুদের বলো গে, তাঁরা কি বলেন!'

নিস্তারিণী পাশের ঘর থেকে সব কথাই শুনেছিল, রঘুবাবুরা বেরিয়ে যেতে এ ঘরে ঢুকে তিরস্কারের সুরে বললে, 'বায়নাটা ছাড়লি কেন—যেচে এল বাড়ি বয়ে!... সত্যি কথাই তো, একটু একটু করে নিজের পথ তো করে নেওয়া দরকার—নিজের পায়ে দাঁড়ানো দরকার। তুই কোথায় চেষ্টাচরিত্তির করবি, না উলটে যাচা লক্ষ্মী ফিরিয়ে দিলি!... যা ব্যাভার করলি, আর কি আসবে তোর কাছে কোনদিন! টাকা কি বারবার সেধে আসে?'

সুরবালার মেজাজটা ওরাই যথেষ্ট খিচড়ে দিয়ে গিয়েছিল, এখন আরও বিগড়ে গেল। তিক্তকণ্ঠে বলল, 'মা, বুড়ো হয়ে মরতে চললে এখনও এটা বুঝলে না—টাকা দেখলেই হাত বাড়াতে নেই। তোমার হাতে ধরে কিনা, ধরে রাখতে পারো কিনা, সেটাও বিবেচনা করা দরকার। এটা নিলে বেইমানী করা হত, তাছাড়া ও রঘুবাবু লোকটি বড় সোজা নয়, ওকে তুমি কিছুই চেনো নি। ওকে যে মাসীই পাঠায়নি আমার মন জানতে —কী করে জানছ তুমি? তার সঙ্গে যড় করেই হয়ত এসেছে ও!'

যড় করে রঘুকে পাঠিয়েছিল কিনা মতি তা ঠিক বোঝা না গেলেও—দেখা গেল এর পর থেকেই মতি যেন হঠাৎ একটু বেশী মাত্রাতে বিরূপ হয়ে উঠেছে। কারণটা ভাল বুঝতে পারে না সুরো। হয়ত রঘুবাবুই সেদিনের ঘটনাটা উলটো করে লাগিয়েছে, হয়ত বলেছে যে 'সুরো আমার মাংস ছিঁড়ে খাচ্ছে —ওকে আলাদা মুজরো দেওয়ার জন্যে।' কিংবা মতির পরামর্শেই রঘু গিয়েছিল, ওকে ফাঁদে ফেলবার জন্যে। কিছুতেই কোনদিকে ওকে জব্দ করতে পারল না দেখে নিজমূর্তি ধরেছে এবার। এতদিন মনের মধ্যে যা-ই থাক, বাইরের আচরণে কোন ইতরবিশেষ প্রকাশ পেত না, গাওনা থাকলে সঙ্গে নিয়ে যেত, যা হয় চার পাঁচ টাকা দিতও—আগেকার মতো। এখন সে সব যেন পালটে গেল। ভাল করে কথাই কয় না, সুরবালা নিজে থেকে কথা কইলে উত্তর দেয় মাত্র; তাও যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে, দু' একটি শব্দে। তাতেও তত ক্ষতি হত না, কথা না কইলে মনোকষ্ট হতে পারে, সাংঘাতিক লোকসান কিছু হয় না। মতি এবার সে ব্যবস্থাও করল, হাতে না মেরে ভাতে মারার। সঙ্গে করে গাইতে নিয়ে যাওয়াও বন্ধ করে দিল।

প্রথম দিন সুরো অত বুঝতে পারে নি। সাধারণত আগের দিন বলে দেয় মতি, সেদিন কিছু বলে নি; তৎসত্ত্বেও, ভুল মনে করে সেজেগুজে তৈরী হয়েই এসেছিল। তবু, তখনও কিছু বলে নি মতি। আড়ে একবার দেখে নিয়ে. নিজের শোবার ঘরে ঢুকে গিয়েছিল। সুরো তার দণ্ডাজ্ঞা শুনল একেবারে শেষ মুহূর্তে। গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে যখন, যন্ত্রপাতি উঠছে—তখন ঝিকে দিয়ে বলাল মতি যে, সুরোর যাওয়া হবে না। এদের সঙ্গে কথা আছে আর কেউ যাবে না, সব গান মতিকে গাইতে হবে।

হতাশা বা ভয়ের থেকেও প্রথম যেটা বেশী করে মনে হল সেটা অপমানবোধ। যে দোহারদের সে কত লাঞ্ছনা করেছে তারা এখন টিটকারীর হাসি হাসছে, প্রবীণ যারা তারা সহানুভূতির চাউনিতে দেখছে। সে আরও যেন খারাপ। ইচ্ছে হল চিৎকার করে খানিকটা ঝগড়া করে কিন্তু মতির মুখের চেহারা দেখে আর সাহসে কুলোল না। আগের সে জোরটা যেন চলে গেছে। সে জোর ছিল স্নেহের, মতি তাকে ভালবাসে, মেয়ের মতো দেখে—তার সব কিছু অত্যাচারই সহ্য করবে এই জোর। কিন্তু সে ভালবাসাই আর যদি না থাকে তাহলে জোর খাটাবে কার ওপর? চলে আসাই হয়ত উচিত ছিল, সেইদিনই, তখনই—কিন্তু তাও পারল না। ভাত ভিক্ষে সবই যে তার এখানে, ঐ মানুষটার দয়ার ওপর নির্ভর করছে। আর কি কোনদিনই মতি নিয়ে যাবে না ওকে? কথাটা ভাবতেই যে বুকের রক্ত হিম হয়ে আসে। অথচ ওর অপরাধটা কি তাও তো বুঝতে পারে না। কী এমন করল সে। মতি নিজেই তো ছিটফিটিয়ে বেড়াচ্ছে, যত ছেলে-মানুষী কাণ্ড করছে। সুরো তো কিছুই করেনি সে জায়গায়, আজ পর্যন্ত কোন বেইমানী করেনি। তবে হঠাৎ এমন হয়ে গেল কেন? কি করবে সে এখন? রঘুই যদি মিছে করে লাগিয়ে থাকে, সে ভুল ভাঙবারই বা উপায় কি? নিজে থেকে গিয়ে সে কথা তোলাও তো যায় না। তাহলে উলটো উৎপত্তি হবে বরং, ভাববে রঘুর কথাই ঠিক, ঠাকুরঘরে কে—না আমি তো কলা খাইনি, সেইভাবে সাফাই গাইতে এসেছে।

কি করবে, এখন কি করণীয় কিছুই ভেবে পায় না সুরো।...

এ মুজরোর তিনদিন পরেই আর একটা মুজরো ছিল। তার আগের দিনও বাড়ি যাবার সময় যখন কিছু বলল না মতি, তখন সুরো আর থাকতে পারল না, লাজলজ্জার মাথা খেয়ে নিজেই কথাটা পাড়ল, 'কাল আমি যাব তো মাসী?'

'না।' সংক্ষেপে শুধু উত্তর দিল মতি।

খানিকটা আড়ষ্ট কাঠ হয়ে বসে থেকে সুরো সোজাসুজি প্রশ্ন করল, 'তুমি কি আমাকে আর কোনদিনই নিয়ে যাবে না?'

সোজা প্রশ্নের সোজা জবাব এড়িয়ে গিয়ে মতি জবাব দিলে, 'শিখিয়ে পড়িয়ে তৈরী করে দিয়েছি—আর কেন? আর কতকাল ল্যাংবোটের মতো টেনে বেড়াব! এবার নিজের পথ নিজে দেখে নাও।'

আজও সুরবালার দু'চোখ জ্বালা করে জল এসে গেল। অপমানে যত না—তার চেয়ে ঢের বেশী অভিমানে। অনেক কথা তাই মুখের কাছে এসে ঠেলাঠেলি করলেও কিছু বলা হল না। প্রাণপণে চোখের জলটা মতির কাছ থেকে আড়াল করে আস্তে আস্তে উঠে বেরিয়ে এল, শুধু তার ঘর থেকেই নয়, বাড়ি থেকেও। ওর দারোয়ানকেও ডাকল না আজ, একাই হেঁটে বাড়ি চলে গেল।

কে জানে দরোয়ানকে কিছু শেখানো আছে কিনা। সে যদি কোন ছোট বড় কথা বলে বসে! মাগো!

এর পর আর ও বাড়িতে যাওয়া যায় না। গিয়ে লাভই বা কি। অনেকজোড়া চোখের কৌতুক ও বিদ্রূপের দৃষ্টি সহ্য করা বসে বসে—এই তো।

অথচ না গিয়েই বা কি করবে তাও ভেবে পায় না। কে তকে খুঁজে এসে মুজরো দেবে, তার দলই বা কোথায়, যন্ত্র-পাতিই বা কোথায়? প্রত্যেক কীর্তনউলী বাইউলীরই কিছু কিছু দালাল থাকে, বেশির ভাগ মুজরো তাদের মারফৎ আসে। সোজাসুজি যে আসে না তা নয়—খুব নাম হয়ে গেলে খুঁজে খুঁজে আসে। মতি এমন বায়না কিছু কিছু পায়। কিন্তু ওর মতো যারা নতুন—কিম্বা বয়স হলেও যাদের নাম-ডাক তত হয়নি—তাদের সম্পূর্ণভাবেই দালালের ওপর নির্ভর করতে হয়।

দালালী দিতে অবশ্য আপত্তি নেই সুরবালার—কিন্তু তেমন দালাল কে কোথায় আছে তাও তো জানে না। রঘুবাবু ছাড়াও দু' একজনকে ওখানে দেখেছে কিন্তু তখন তাদের সঙ্গে আলাপ পর্যন্ত করেনি—নাম-ঠিকানা জেনে রাখা তো দূরের কথা। রঘু-বাবুর ঠিকানাও তো জানে না সে।

তবু, অনেক ভেবেচিন্তেও রঘুবাবু ছাড়া অন্য কোন উপায় চোখে পড়ে না। রঘু-বাবুকেই ধরতে হবে। ঠিকানা জানে না বটে, তবে তার ঠিকানা যোগাড় করা অত কঠিন হবে না। একদিন লাজলজ্জার মাথা খেয়ে ও বাড়িতে গেলেই জানা যাবে। দোহার বাজনাদার এমন কি চাকর দরোয়ানরাও রঘুবাবুর ঠিকানা জানে। চাই কি সকালের দিকে গেলে দেখাও হয়ে যেতে পারে। প্রায়ই সকালের দিকে একবার করে আসে, কেউ না থাকলে নিচের চলনে বসে একছিলিম তামাক খেয়ে যায়। রঘুবাবু অবশ্য চটে আছে মনে মনে—মতির 'শিখনে' হলে চটে থাকার

কোন কারণ নেই—তবে সুরবালা যখন কোন অন্যায় করে নি তখন তার ভয়টা কি। তখন সে বায়না নিলে বেইমানি হত, এখন সে ভয় নেই। মতিই তো তাকে পথ দেখে নিতে বলেছে।

যাবে, যেতেই হবে—তবু কোথা থেকে যেন রাজ্যের সংকোচ এসে বাধা দেয়। ভাবতে ভাবতেও দুটো একটা দিন কেটে যায় এমনি করে। শেষে যেদিন প্রায় মরীয়া হয়েই তৈরী হচ্ছে ওবাড়ি যাবে বলে, সেদিন অভাবনীয়-ভাবে স্বয়ং রঘুবাবুই এক দূত পাঠালে ওর বাড়ি। হরেকৃষ্ণ, মতির দলের বেহালা বাজিয়ে সকালবেলাই গুটিগুটি এসে হাজির হল।

হরেকৃষ্ণকে দেখে সুরো প্রথমটা প্রায় আনন্দে লাফিয়ে উঠেছিল। রঘু যে লোক পাঠাতে পারে—এ কথা একবারও ভাবেনি সে। ভেবেছিল হয়ত মতিরই সুবুদ্ধি হয়েছে, এতদিনে মনটা নরম হয়েছে হয়ত, সে-ই ডেকে পাঠিয়েছে। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই একটা খট্‌কা উঠেছিল মনে—মতিই যদি ডাকবে হরেকৃষ্ণ কেন, ঝি দরোয়ান দুজনেই তো এ বাড়ি চেনে, কতদিন পেঁছে দিতে এসেছে। তবু, অনেকখানি আশা নিয়েই সে অভ্যর্থনা করল হরেকৃষ্ণকে, 'এসো এসো, কী ভাগ্যি হরেকেষ্টবাবুর পায়ের ধুলো পড়ল! হঠাৎ—? মাসী পাঠিয়েছে বুঝি?'

'মাসী তোমার! তবেই হয়েছে। পায় তো পাঁশ পেড়ে কাটে সে তোমায়।...এখেনে এসেছি জানলেই হয়ত আর রক্ষে থাকবে না, আমারই গর্দান নিয়ে বসে থাকবে। ..না মাসী ফাসী নয়, আমাকে পাঠিয়েছে রঘু-বাবু, তার একটু কাজে।' বলে কেমন একরকম করে যেন হাসে হরেকৃষ্ণ।

হাসিটা ভাল লাগে না সুরবালার, কিন্তু সে হাসির অর্থও বুঝতে পারে না। বলে, 'রঘুবাবু পাঠিয়েছে—কেন? বায়না আছে? তা তোমাকে কেন, নিজে তো এসেছে এ বাড়িতে। না কি দালালীটা বেশী চায়—নিজের চক্ষুলজ্জা হচ্ছে সে কথাটা বলতে?'

'দালালী? হ্যাঁ তা দালালীই বলতে পারো', খ্যক্‌খ্যক্ করে হাসে হরেকৃষ্ণ, 'ঠিকই ধরেছ, এর মধ্যে চক্ষুলজ্জার কথা আছে বলেই আমাকে পাঠিয়েছে। কথাটা—তা ধরো, নিজে মুখে বলায় একটু বাধা আছে বৈকি।'

এবার সুরবালা একটু সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে, হরেকৃষ্ণর কথা বলার ধরনটা তেমন ভাল লাগে না—আর ঐ হাসিটাও।

সে একটু তীক্ষ্মকণ্ঠেই বলে, 'ব্যাপারটা কি, সাতসকালে হেঁয়ালি রেখে ঠিক করে বলো দিকি। টাকাকড়ির কি পাওনা থোওনার ব্যাপারে রঘুবাবুর লজ্জা আছে—কৈ শুনিনি তো!'

'তা মানে, টাকাকড়ি ঠিক নয় কি না। বলছি বাপু, তুমি উতলা হয়োনি, আমারও কোন দোষঘাট ধরোনি। আমাকে বলতে পাঠিয়েছে তাই বলছি। একটা টাকা দিয়েছে, সকালবেলাতেই তাই ছুটে এয়েছি। বলেছে খবর ভাল হলে আরও কিছু দেবে—মিছে কথা বলব কেন।'

এবার গলার সুর আরও কড়া হয়ে ওঠে সুরোর, বলে, 'যা বলবার চটপট বলে বিদেয় হও। আমার সময় নেই এত যে তোমার ঐ ভ্যানভ্যানানি বসে বসে শুনব।'

'ও বাবা, তুমিও যে দশবাইচণ্ডী হয়ে উঠলে!... তা, এ বেশ নিরিবিলি তো? কেউ শুনছে না তো আড়ি পেতে?'

'অতশত আমি জানি না। শুনলেই বা কি করছি। গুপ্তকথা তো এত শুনতে হয় না আমাকে যে তার জন্যে আলাদা ঘর করে রাখব—ও শখও আমার নেই। আর আমার কাছে তোমার এমন কি কথা থাকতে পারে যা আড়ালে বলতে হবে?'

ধমক খেয়ে একটু যেন হকচকিয়ে যায় হরেকৃষ্ণ, চুপ করে বসে ওর মুখের দিকে চেয়ে চোখ পিটপিট করে খানিকটা। তারপর বলে, 'নঃ, বলেই ফেলি তা হলে। আর বলতেই তো হবে—যেকালে এয়েছি। রঘুবাবু তোমার ব্যাপার সব জানে, মতি নিয়ে যাচ্ছে না, এক পয়সা রোজগার নেই—সব শুনেছে। তুমি তার কথা শোননি—শুনলে এ অবস্থা হত না। যাই হোক, সে জন্যে রাগ দুঃখু নেই তার মনে, সে তোমার ভালই চায়। ভাল করেও দেবে সে, বলেছে যে বায়নায় ডুবিয়ে দেবে একেবারে, মতি হিংসেয় ছটফট করবে তোমার রোজগার দেখে—সে ভার তার। বললে সে কাল থেকেই বায়না আনতে শুরু করবে। কেবল তার একটি শর্ত। দালালীটে—'

এই পর্যন্ত বলে চুপ করে সে। একটু যেন অপ্রস্তুত অপ্রস্তুত ভাব তার মুখে। ভাল কথা কিছু নয়। সোজাসুজি বলবার কথা হলে এত ভণিতার দরকার হত না টাকা-ঘুষ দিয়ে লোক পাঠাতে হত না। টাকা-কড়ির ব্যাপার হলে সে নিজেই আসত।

মুহূর্তে কঠিন হয়ে ওঠে সুরবালা। বলে, 'থামলে কেন, বলে যাও।... দালালীটা বেশী চাই তার, এই তো? তা কত চায় সে, আদ্ধেক?'

'রাম বলো।' এতখানি জিভ কেটে হরেকৃষ্ণ, 'ট্যাকা কড়ির কথাই নয়। এক পয়সা নেবে না সে তোমার কাছ থেকে। তার চাই অন্য জিনিস। তোমার ঘরে আসতে দিতে হবে তাকে। আগাম নয়—তুমি জবান দিলেই সে খুশী। মাসে চার পাঁচটা করে মুজরো পাইয়ে দিতে পারলে তুমি তার পাওনা দিও, তার আগে চায় না সে। তার কথায় বিশ্বাস করতেও সে বলছে না। ডান হাত বাঁ হাত, বলে দিয়েছে সে। ফেল কড়ি মাখো তেল—হে হে!'

এদের সাহস আর স্পর্ধা দেখে সমস্ত দেহ রি রি করে জ্বলতে থাকে সুরবালার—লঙ্কাবাটা লাগার মতো। ইচ্ছে করে সামনের এই লোকটাকে ধরে ঘা-কতক বসিয়ে দেয়, কান ধরে ওঠবোস করায়। বুড়ো হয়ে মরতে গেল, নিমতলার দিকে পা—এখনও একথা বলতে মুখে আটকাল না ওর! আশ্চর্য! সামান্য একটা টাকার জন্যে এই কাজ করতে এসেছে! আর রঘুবাবু, খুব কম হলেও পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বছর বয়স হয়েছে, এখনও এই রকম প্রবৃত্তি!

রাগে অপমানে ওর ফর্সা মুখখানা আগুনের মতো লাল হয়ে ওঠে। তবু সে শান্তভাবেই বলে, 'তা বেশ তো, আসবেন রঘুবাবু, তার জন্যে আর কি। অতদিনই বা হা পিত্যেশ করে বসে থাকবার দরকার কি, আজই আসতে বলো না, আজ রাত্তিরেই। জমাদার আসে উঠোন আর প্যেখানা ধুতে, তার কাছ থেকে মুড়ো ঝাঁটাটা চেয়ে রাখব'খন। আদর অভ্যর্থনার কোন খামতি হবে না, বলে দিও।'

প্রথম দিকটা অত বুঝতে পারেনি, হাসি হাসি মুখে ঘাড় নাড়ছিল আর দুলছিল বসে—শেষের কথাটাতে মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। বেশ খানিকটা থতমত খেয়ে গেল সে। যরের ঘরে হাঁড়ি চড়াব ব্যবস্থা নেই, অন্নচিন্তা চমৎকারা—তাদের কাছ থেকে এতটা তেজ আশা করে নি সে। সে বার দুই ঢোঁক গিলে মাথাটা চুলকে গলাটা আরও নামিয়ে ষড়যন্ত্র-কারীর ভঙ্গীতে বললে, 'তা দ্যাখো, হট্ করে

মনের মতন গহনা
সরকার এণ্ড সন্স
সন অব লেট এম. বি. সরকার
১২৪, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলিকাতা-১২, ফোন: ৩৪-৯২০৩



কেশুত
হোমিওপ্যাথি ভেষজ কেশ তৈল
কলিকাতা-১

অত মাথা গরম করো নি। এ ধারে তো বুঝতেই পারছি বাক্স প্যাটরা ঢ্যুঢ্যু ভাঁড়ে মা ভবানী। ট্যাকা তো চাই। বলি দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার তো আর বন্ধ রাখলে চলবে না। দালাল ছাড়া এ কারবার চলবে না, দালালকে হাতে রাখতেই হবে। অমন সকলকেই গোড়ায় গোড়ায় ওদের খোসামোদ করতে হয়, ওদের আশকারা দিতে হয়। মতিরও ছেল সেই প্রেথম দিকে, গোবিন সাঁপুই বলে একজন, তাকে বহুদিন ঘরে আসতে দিতে হয়েছে তবে কারবার জমেছে। এ আমি বেশ ভাল লোকের মুখে শুনেছি।'

'শুনেছ, বেশ করেছ।' প্রচণ্ড ধমক দিয়ে ওঠে সুরবালা, 'আমি তো মতি নই, ওরা ঐ ঘরেরই মেয়ে। ওরা যা পারে আমরা তা পারি না। সে যাক, কথা যা বলার শেষ হয়েছে তো, এখন সরে পড়ো দিকি ভালয় ভালয়। আমার মেজাজ ভাল না। কি বলতে কি বলে ফেলব, তোমারও শুনতে খারাপ লাগবে—আমারও পরে মন খারাপ হয়ে যাবে। নাও, ওঠো—'

'উঠছি, উঠছি। উঠবই তো, থাকতে কি এসেছি, তা নয়। কিন্তু কথাটা তুমি এখনও ভেবে দ্যাখো ভাল করে, মাথা ঠাণ্ডা করে। আমি বলছিলুম কি, বেশ তো—আসতে না হয় শেষ পর্যন্ত না-ই দিলে, দিনকতক খেলাতে দোষ কি, পাঁচটা সাতটা মুজরো কামিয়ে নাও না, আশায় আশায় রেখে! তাতে তো নামটাও একটু আধটু ছড়াবে, অপর দালালরাও আসতে পারে তখন খুঁজে খুঁজে। অনেক সময় দোয়ার বাজনদাররাই দালালীর কাজ করে। আর কিছু না হোক, কমাসের খরচটা তো ঘরে উঠে যাবে, কিছুদিন যোঝাবার মতো তো ক্ষ্যামতা হবে!'

'না না না,' সুরবালা চিৎকার করে ওঠে, তোমার ওসব কথা আমি শুনতে চাই না, বেরিয়ে যাও তুমি, গো টু হেল, কি জন্যে দাঁড়িয়ে আছ এখনও। ওরকম পয়সার দরকার নেই আমার, শুধু যদি পয়সাই চিনতুম তাহলে আমার আর ভাবনা থাকত না। জুড়িগাড়ি দোরে দাঁড়াত, দেউড়ীতে দারোয়ান বসত। ঐ তোমাদের মতি ঠাকরুনই এমন ঢের সাধাসাধি করেছে। সে সব ছেড়ে এখন ঐ তোমাদের পথের ভিখিরী রঘুবাবুর কাছে মানইজ্জত খোয়াব? কেন, কি জন্যে? বামুনের মেয়ে রাঁধুনীগিরি করে খেতে পারব না? তাও না জোটে লোকের বাড়ি ঝিগিরি করব।'

হরেকৃষ্ণ আস্তে আস্তে ছাতা বগলে উঠে দাঁড়ায় এবার। তারও গলার সুর বদলে গেছে, আহত হয়েছে একটু তাতে সন্দেহ নেই। তবু যাবার আগে বক্তব্য শেষ করেই যায়। বসে, 'মতি যা বলেছে তোমাকে—লম্বা লম্বা কথা—ওর আদ্দেক খুট ধরে রেখে দাও। ও শুধু তোমার মন বাজিয়ে দেখা। তবে হ্যাঁ, চেষ্টা করলে ও পয়সা-আলা লোক দুটো-চারটে জুটিয়ে দিতে পারত। অত কিছু নয়—তবে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারতে। সে দ্যাখো, যা তোমার অভিরুচি। রঘুবাবুও নিহাৎ পথের ভিখিরী নয়—আর এ তো দুদিনের। চিরদিন কি আর তার সঙ্গে ঘর করতে!...ভাল, ভাল, ধর্ম রেখে টিকে থাকতে পারো, সে তো উত্তম কথা। তবে শক্ত, খুব শক্ত এও বলে রাখছি। শত্তুর তোমার সঙ্গেই আছে, তোমার রূপ-যৈবনই তোমার শত্তুর। দেখলুম তো ঢের কিনা!... আর ঐ যে বললে ঝিগিরি রাঁধুনীগিরি—অত সহজ নয় দিদি, অত সহজ নয়। এই বয়স আর এই রূপের খাপ্রা, কেউ ঝি রাঁধুনী রাখবে না তোমাকে। কোন গেরস্ত বাড়িতে তো রাখবেই না— পাঁচটা পুরুষ নিয়ে যারা ঘর করে। রাখলেও—পয়লাদিনই মানইজ্জৎটি সেখানে রেখে আসতে হবে। চললুম!'

আস্তে আস্তে নেমে যায় সে। আর কিছু পাওনার আশা রইল না, তা না থাক, ঐ টাকাটাই না ফিরে চেয়ে বসে রঘু—এই তার ভাবনা।

॥ ৯ ॥

অর্থাৎ শেষ আশাটিও গেল। কাপড়-চোপড় আবার খুলে ফেলে সুরবালা। এরপর আর ওবাড়ি যাওয়ার কোন কারণ নেই।

কিন্তু কী করবে এখন তাহ'লে? কার কাছে গিয়ে দাঁড়াবে?

এক রাশ টাকা বাড়িভাড়া, এতগুলো লোকের খাওয়াপরা। খরচ অনেক, আয় নেই বললেই চলে। বাবা বেরোন এখনও, কিন্তু যা আনেন তা তাঁর ওষুধে আর তামাকেই চলে যায়। ভাইটার লেখাপড়া তো হলই না, রোজগারেরও কোন চেষ্টা নেই। একেবারেই বকে গেছে। কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়ায়, বলে নাকি চীনেম্যানদের কাছে ভেল্কির খেলা শিখছে। এর মধ্যে তিনদিন বাড়িই এল না, কোথায় মেটেবুরুজ না কি জায়গা আছে সেখানে বেদেদের টোল পড়েছে—সেইখানে ছিল; ভেল্কির খেলা শিখছিল তাদের কাছে। মা বকাবকি করে, আগে আগে মারধোরও করত, এখন এত বড় হয়ে গেছে যে মারা যায় না। আর মারলেও কোন ফল হয় না, বাবাও অনেক শাসন করে দেখেছেন—কোন লাভই হয় নি। গায়েই মাখে না সে কিছু। সুরোবালা কত বুঝিয়ে বলেছে, 'দু'পয়সা রোজগারের চেষ্টা দেখ, চিরদিন কি এইরকম করে কাটাবি?' তা হেসেই উড়িয়ে দেয়। বলে, 'করব, যখন রোজগার শুরু করব তখন বুঝবি। মোট মোট টাকা পাঠাব তোদের। আমি তো এখানে থাকব না, দেশে দেশে ঘুরে বেড়াব—নানান দেশ দেখব, বেড়ানোও হবে রোজগারও হবে এই আমার মতলব। কিন্তু পেটে কোন বিদ্যেই নেই, এখন গেলে তো সাহেবদের বাবুর্চি কি বেয়ারা হয়ে যেতে হয়। তাতে আমি রাজী নই, খেলাটা শিখে নিই—দ্যাখ্ না।'

অবশ্য শিখছে কিছু কিছু ঠিকই। মাঝে মাঝে হাত-সাফাইয়ের নানান খেলা দেখায় ওদের। এই করে পয়সাই কি কম নিয়েছে। বলে, 'দিদি একটা দোয়ানি বার কর, —না ও বড্ড ছোট, তোর মনে হবে মুঠোর ফাঁক দিয়ে গলে গেছে, সিকিই নে একটা। এই যে, আচ্ছা মুঠো কর, দেখিস, ভাল ক'রে মুঠো করিস, হাতে আছে বুঝতে পারছিস?...খোল্ এবার—'

খুলে দেখেছে সুরবালা হাতে কিছু নেই, গণেশ হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেছে। সে পয়সা আর পায়নি ওরা, গণেশ বলেছে, 'বা রে, আমি কি জানি, তুই মুঠো করে ধরে রইলি, সে পয়সা আমি নোব কী করে?'

আরও নানান্ রকম খেলা শিখেছে নাকি। তাস নিয়ে দেশলাই নিয়ে—কত কি খেলা দেখায়। সবচেয়ে বাঁধন—দড়ি দিয়ে বলে, 'বেশ করে বাঁধ আমাকে, যত রকম তোদের জানা আছে। খুব শক্ত ক'রে বাঁধিস, আষ্টেপৃষ্টে, পিছমোড়া ক'রে বাঁধ্। হয়েছে? আচ্ছা, একটুখানি চোখ বোজ। বুজেই খুলিস, তাতেই হবে।'

চোখ খুলে দেখেছে ওরা, গণেশ দাঁড়িয়ে হাসছে, দড়িগাছা মাটিতে পড়ে আছে।

এসব শিখছে শিখুক, সুরোর ভয় —ভয় কেন নিশ্চিতই জানে—সে এই সঙ্গে ঐসব পাড়ায় ঘুরে নেশাভাঙও করতে শিখেছে। তাই এত পয়সার কায়দার দরকার হয় ওর। তামাক তো বটেই, হয়ত গাঁজাভাঙও খায়। ওকে পয়সা যোগানো মানে সর্বনাশের পথে ঠেলে দেওয়া। জানে তা—তবু 'না' বলতে পারে না সুরো। এমন মিষ্টি মিষ্টি মুখ করে চায়, না বললে এমন আউড়ে পড়ে ওর সুন্দর হাসিভরা মুখখানা যে বড্ড মন-কেমন করে। এই করেই এই দুর্দিনেও দোয়ানি সিকি নিয়ে যায় সে প্রত্যেকদিনই। অবশ্য একটা দিব্যি গালিয়ে নিয়েছে সুরো ওকে দিয়ে—মদ না খেতে ধরে কখনও। গণেশ হেসে ওকে ছুঁয়ে বলেছে, 'এই তোর দিব্যি, মদ যদি খাই, কখনও তোর পয়সায় খাব না। রোজগার করতে না পারলে ওসব নেশা করব না।'

'ওমা, কী সর্বনেশে ছেলে রে তুই—তাই বলে রোজগার করতে শিখলে মদ ধরবি, আর সেই কথা বলছিস আমাকে।'

'ধরবই যে তা তো বলিনি। রোজগার না করে ধরব না তাই বলছি।'.. চিরাচরিত রীতিতে হেসে উড়িয়ে দিয়েছে কথাটা।

কিন্তু এবার 'না' বলতেই হবে ওকে। একটি মাত্র ছোট ভাই কার্তিকের মতো সুন্দর ছোট্ট ভাইটা। তাকে এক আনা দু আনা দেবার মতো সঙ্গতিও ওর আর নেই।......

অভাব দুশ্চিন্তা তো আছেই, সবচেয়ে বেশী অশান্তি মাকে নিয়ে। নিস্তারিণীর বিলাপের শেষ নেই। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বকছে আর কপাল চাপড়াচ্ছে। এখানে উঠে আসবার সব দায়িত্ব সে এখন মেয়ে আর মেয়ের বাপের ওপর চাপিয়ে দিতে চায়। কেবলই বলে, 'কী দরকার ছিল আমার এমন কোঠাবাড়িতে উঠে এসে, সে মাটির ঘর আমার ঢের ভাল ছিল। সেই ছিল

আমার লক্ষ্মী। মিছিমিছি এ বড়মানুষী দেখাতে এসে লোক ঢলাঢলি করার কী দরকারটা ছিল। লাভের মধ্যে বেইজ্জতি এখন। মাস পোয়ালেই তো যমদূতের মতো এসে দাঁড়াবে বাড়িওলা, তখন তাকে কী জবাব দেব? কমাস চুপ ক'রে থাকবে সে;...মালপত্তর টেনে রাস্তায় ফেলে গলাধাক্কা দিয়ে একদিন বার ক'রে দেবে। এই জন্যেই এখানে আসা, সে বেশ বুঝেছি।...হাত্তোর মেয়ের ভাত রে!...তখনই বলেছিলুম মেয়ের যে দাও, একটা সম্বন্ধ গেল আর একটার চেষ্টা দ্যাখো—তা নয়! মেয়ে রোজগার করবে, রোজগার ক'রে স্বর্গবাস করাবে একেবারে।...কী যে রোজগার, জন্মের মধ্যে কম্ম,—একদিন বই তো দেখলুম না।'...

এমনি একটানা বিলাপ চলে দিনরাত। সুরোর তো অসহ্য লাগেই, তার আরও বেশী কষ্ট হয় বাবার জন্যে। মাঝে মাঝে যখন আর সইতে পারেন না—দুহাতে কান ঢেকে বসে থাকেন ভদ্রলোক, সে সময়কার তাঁর মুখের অবস্থা দেখে চোখ ফেটে জল আসে সুরবালার। মার কি দয়ামায়া বলে কোন জিনিস নেই?

তবে নাকি ভগবান সবকূল ভাঙ্গেন না। সাংসারিক দিক থেকে না হোক, মনের দিক থেকে একটা আশ্রয় দিয়েছেন তিনি সুরবালাকে। খুব যখন অসহ্য বোধ হয়—তখন সে ছুটে চলে যায় ওদের পাশের বাড়িতে। কী শান্তি যে পায় ঐটুকু একটা দেওয়ালের ব্যবধান পার হয়ে—তা সে কাউকে বোঝাতে পারবে না। এইটুকু না পেলে সে বোধহয় পাগল হয়ে যেত।

আলাপ হয়েছে এখানে আসার পর। পাশাপাশি বাড়ি, দুটোই দোতলা—ছাদে ছাদে লাগা একেবারে, মধ্যে হাত দুই উঁচু আলসের ব্যবধান মাত্র। আগে ছাদ থেকে আলাপ হত—এখন আসা যাওয়া চলছে। যাওয়াই বেশী অবশ্য, আসাটা কদাচিত। সুরোই যায় ওদের কাছে—আগে আগে রাস্তায় বেরিয়ে ঘুরে যেত, এখন আলসে ডিঙিয়ে চলে যায়।

ও'রাও অবশ্য ভাড়াটে, চারুবাবুরা। শুধু দোতলাটা নিয়ে থাকেন দশটাকা ভাড়ায়। ছোট ছোট দুটো ঘর, ওপারে কলপাইখানা নেই, সেজন্যে প্রতিবারই নিচে যেতে হয়, অন্য ভাড়াটেদের সঙ্গে ভাগে। রান্নাঘর ছাদে, তাও ঠিক ঘর সেটা নয়, সিঁড়ির ঘর বা চিলকুঠরিতে কাজ সারতে হয়। অসুবিধা খুবই কিন্তু এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থার বাড়ি নিতে গেলে নাকি আরও বেশী ভাড়া দিতে হবে, সে সঙ্গতি ও'দের নেই।

তা তার জন্যে ও'রা কেউই খুব দুঃখিত মন—না চারুবাবু আর না তাঁর স্ত্রী শশী বৌদি। শরৎশশী নাম ভদ্রমহিলার, সুরবালা তাকে দ্বিখণ্ডিত ক'রে শশী ক'রে নিয়েছে, উল্লেখ করে শশী বৌদি বলে। চারুবাবুরা

এ'রা স্বামীস্ত্রী দুজনেই অদ্ভুত মানুষ। এ'দের দিকে চাইলেও একটা শান্তি আসে মনে। সর্বদা সন্তুষ্ট এ'রা—হাসিখুশী। চারুবাবু কী একটা সওদাগরী আপিসে কাজ করেন, ইংরেজের আপিস কিন্তু মাইনে খুবই কম। একাজে নাকি উপরির সুযোগ আছে, সেই বুঝেই সাহেবরা মাইনে অত কমিয়ে রেখেছেন—কিন্তু চারুবাবু সে সুযোগ কোনদিনই নেন না, অথবা নিতে পারেন না। অথচ তা নিয়ে গর্বও করেন না। বরং সে কথা কেউ তুললে একটু কুণ্ঠিত হয়েই পড়েন। ফলে কোনমতে সংসার চলে, যাকে বলে দিনগুজরান করা তাই করেন—টানাটানির অন্ত নেই। তা নিয়ে কিন্তু কোন নালিশও নেই যেন ও'দের মনে, কখনও কোন হাহুতাশ করতে শোনা যায় না। চারুবাবু তো রীতিমতো ঠাট্টাতামাশাই করেন, বলেন, 'মাসের কুড়ি দিন আমি চালাই, বুঝলে সুরো—বাকী দশদিন ভগবান চালায়। ও হিসেবটা আর আমি রাখি না।'......ইংরেজী মাস কাবারে মাইনে হয় ভদ্রলোকের। মাসের শেষ দিক কী রান্না হ'ল' জিজ্ঞাসা করলে শশী বৌদি কোন উত্তর দেবার আগেই চারুবাবু বলে ওঠেন, 'কী রান্না হ'ল আবার জিজ্ঞেস করছ? আজ মাসের ছাব্বিশ তারিখ না? ডাল ডালের বড়া পোস্ত চচ্চড়ি, মানে মুদীর দোকানে যা পাওয়া যায়। উটনো থাই, ধারে আসে—মাসকাবারে দাম শেষ হয়। নীলকমলের বেটাবেটি সুখে থাক, ওর দিন দিন ভুঁড়ি আর বাড়ি বাড়ুক—নীলকমল মুদী আছে তাই দুবেলা দুমুঠো জুটছে!'

বলেন আর হা হা করে হেসে ওঠেন চারুবাবু।

আরও শেষের দিকে আরও অধঃপতন। একবার ত্রিশ তারিখে সুরো জিজ্ঞেসা করেছিল, 'আজ কি রাঁধলে বৌদি?' সে জবাবও দিয়েছিলেন চারুবাবুই, 'কী আবার মধুসূদন ডাল ভরসা, তেঁতুল হ'ল তারিণী।..আজ তিরিশ তারিখ না? আজ সন্ধ্যের পর আমি অন্যমানুষ তখন চারু ঘোষই বা কে, আর রাজা তেজচন্দ্রবাহাদুরই বা কে—তখন বলো—কালিয়া-পোলোয়া যা চাও খাওয়াবো, কিন্তু এখন আর রান্না খাওয়ার কথাটা তুলো না।'

ছড়াটার মানে বুঝতে না পেরে বোকার মতো শশীর মুখের দিকে চেয়ে ছিল সুরো, শশী হেসে বুঝিয়ে দিয়েছিল ব্যাপারটা, 'বুঝলি না, আজ আর কিছুই জোটেনি, শুধু মুশুরীর ডাল পড়ে ছিল চাট্টি তাই রান্না হয়েছে, আর ঘরে ছড়া-তেঁতুল করা আছে হাঁড়ি বোঝাই—ডালের সঙ্গে টকনা দিয়ে দিব্যি খাওয়া চলবে!'

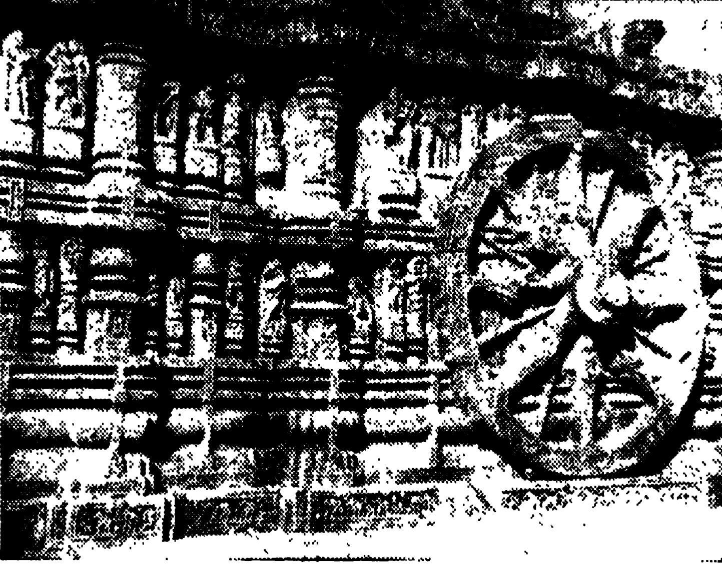
'কেন—' সুরবালা বলেছিল 'তা আপনার মুদীর দোকান কী হ'ল দাদা? সেই যে নীলকমল না লালকমল—নিত্যি যার বাড়-বাড়ন্ত বাচান।'

এইবার একটু গম্ভীর হয়ে ছিলেন চারুবাবু, বলেছিলেন, 'ভাই, ধার নেওয় তো এমনি নয়, শুধতে তো হবে একদিন। তাই যতটা পারব তার বেশী আর এগুই না। এ মাসে আমার এক বোন এসে সাত-আট দিন ছিল—তাতেই অনেক বাড়তি খরচ হয়ে গেছে, বাকী পড়েছে বেশী, হয়ত সবটা এ-মাসে দিতেও পারব না। আবার কোন সাহসে ধার বাড়াবো বল্! অত ধার করা ভাল নয়।...তাছাড়া চলে তো যাচ্ছে। উপোস তো করে নেই!'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শশী বৌদি বলেছিল, 'আর এ তো খেতে কিছু খারাপ লাগে না। ছড়া-তেঁতুল তৈরী করি—তা পাড়েই থাকে, এমনি মহাদেবের ঘরকন্না হ'লে তবু এক আধদিন কাজে লাগে। খেয়ে দেখিস না একদিন—বেশ লাগবে। তোরা যে আবার বামুন, নইলে আজই খাইয়ে দিতুম এক গরাস!'

সর্বদিক দিয়েই শান্তির সংসার ও'দের। তিনটি ছেলেমেয়ে—দুটি মেয়ে একটি ছেলে। শ্রীলেখা আর বিদুল্লেখা দুই মেয়ের পরে ছেলেটি—জগৎচন্দ্র নাম। ছেলেমেয়ে তিনটিই ভাল, যেমন শান্ত তেমনি ভদ্র। বাপমায়ের মতোই স্বভাব পেয়েছে, কোন দুঃখ বা অভাবকেই গ্রাহ্য করে না, হেসে উড়িয়ে দেয়। অত সুন্দর মেয়ে শ্রীলেখা—তার না আছে উপযুক্ত একখানা গহনা না আছে ভাল কাপড়। তবু সেজন্যে মা মেয়ে কারুরই কোন ক্ষোভ নেই। ছেলেটা এখান থেকে হেঁটে শীলেদের ইস্কুলে পড়তে যায়—ঐখানে বিনা মাইনেতে পড়তে পায়—তা তার পায়ে কোন রকম একটা জুতো পর্যন্ত নেই। কিন্তু তাও কেউ ভ্রূক্ষেপ করে না—বা কাউকে কোন বিলাপ করতে শোনা যায় না। একদিন রাস্তায় ভাঙা কাচে পা কেটে রক্তারক্তি হয়ে ফিরে এল ছেলে। মা তাড়াতাড়ি গিয়ে পা ধুইয়ে একটু চুন লাগিয়ে দিলে, রাত্রে পায়ে ব্যথা বলাতে পিদিমের সলতে পুড়িয়ে আছড়ে আছড়ে সেঁক দিয়ে দিলে—তবু ছেলে বা মা বা ছেলের দিদিরা কেউ জুতো-না-থাকার কথাটা উল্লেখ করল না। সেটা ইচ্ছাকৃত নয়—কথাটা মনেই পড়ল না কারুর।

কিন্তু ক্ষোভ বা দুঃখ প্রকাশ না করা আর আনন্দে থাকা—দুটো অবস্থায় তফাৎ আছে। সুরো ক্ষণে ক্ষণে এখানে ছুটে আসে তার কারণ এরা সর্বদা আনন্দে থাকে। কিছু না থাকলেও আনন্দ—অনেক কিছু থাকলেও তাই। হাসিখুশি হুড়া থাকে না এর। বাবা মেয়েকে ঠাট্টা করছে, মেয়ে বাবাকে করছে। ছত্রিশ বছরে আর এগারো বছরে কোন তফাৎ নেই যেন, সম্পর্ক নিয়েও কেউ মাথা ঘামায় না—বাবা মা মেয়ে ছেলে সবই সবাইয়ের বন্ধু। আরও যেটা বড় গুণ এরা কেউ অপরের দোষ দেখে না, অপরের নিন্দা করে না। ওদের সামনে কেউ পরনিন্দা করলেও চুপ করে থাকে। খুব আপনাআপনির মধ্যে কেউ কারও নিন্দা করলে—যার নিন্দা করছে তার ব্যবহার সমর্থন করার চেষ্টা করে। সুরবালা শশীর কাছে তার নিজের কোন কথাই গোপন করেনি; আগেকার কথা তো বটেই—এখনও যেদিন যা ঘটে প্রত্যেকটি



কোনারকের সূর্য-মন্দির ফটো : শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়।

এসে বলে শশীকে। বৌটির মধ্যে এমন একটি সহানুভূতিশীল স্নেহময় মনের দেখা পেয়েছে সে, মনে হয় দুঃখের কথা এর কাছে বললেও দুঃখটা কমে যায় অনেকখানি।

সহানুভূতিটা শুধুই কিন্তু সুরোর দিকে নয়। মতি রঘু সকলের দিক টেনেই বলে সে। মতির কথা উঠলে বলে, 'ভেবে দ্যাখ—ছেলে নেই পুলে নেই, ত্রি-সংসারে এমন কেউ নেই যে আপনার মনে করে দ্যাখে ওকে, রোগে সেবা করে। এত পয়সাকড়ি বাড়িঘর গয়না আসবাব—কাকে দিয়ে যাবে সেই দুঃখেই তো মানুষটা জ্বলছে অহরহ, ওর কি মাথার ঠিক আছে! কিছু না থাকত তো সে একরকম—এত ভাবনা হত না তাতে। নেই সে এক জ্বালা, থাকার যে শতেক জ্বালা। তোকে ভাল বেসেছিল, মেয়ের মতো যত্ন করে শিখিয়েছিল—ভেবেছিল কাছে কাছে থাকবি মেয়ের মতো, অসময়ে দেখবি—সেই বড় আশাটাতে ঘা পড়েছে বলেই ক্ষেপে গেছে, বুঝেছিস না? ...তুই কিছু ভাবিস নি, তোকে ও সত্যিকারের ভালবাসে, নইলে এত ছিটফিটোত না। ও আবার তোকে টানবে দেখিস।'

আশ্চর্য এই, রঘুবাবুর আচরণেরও সাফাই খুঁজে পায় শশী, বলে, 'ওর দোষ কি বল্, যা দেখেছে চিরকাল, যেভাবে জীবন কেটেছে—তার বেশী জানবেই বা কোথা থেকে? কালীয় নাগকে কেষ্ট বলেছিলেন, "তুমি এত বিষ ছড়াও কেন"—তার জবাবে কালীয় বলেছিল, "কী করব, বিষই তো দিয়েছ, বিষই তো সম্বল আমার, আর কি ছড়াবো বলো?" ...তা ওরও তাই হয়েছে। বেচাকেনার লেনদেন এই-ই দেখেছে সে চিরকাল, এইটেই বোঝে। যেমন জন্মকর্ম শিক্ষাদীক্ষা তেমনিই হয় মানুষ,—তবে সেটা ভাগ্যের হাত!'

সব বলেও শশী বলত, 'তবে হ্যাঁ, ঐ একটা কথা। সর্বদা সৎপথে থাকবি, দেখব তোর মন্দ কেউ করতে পারবে না। ওরে, দুঃখকেষ্ট বেশির ভাগ মানুষের মনে—দেখ্‌গে যা কত লোক সোনার খাটে গা রুপোর খাটে পা রেখেও হাপুসনয়নে কাঁদছে বসে। আবার যে ভিখিরী মেয়েটা ঐ মোড়ে ফুট-পথে শুয়ে থাকে—দেখবি সন্ধ্যে হলেই দিব্যি পা ছড়িয়ে বসে গান ধরে চেঁচিয়ে। দুঃখু দু'দিনের, ধম্ম চিরদিনের। ধম্ম বজায় থাকলেই মনে শান্তি থাকবে, শান্তি থাকলেই সুখ।'

আবার বলে, 'দ্যাখ্‌ সুরো—এই বয়সেই দেখেছি অনেক, তাই বলছি, তুই যেন দুষ্যু ভাবিস নি কিছু—মনের অগোচর পাপ নেই, সবাইকে ঠকাবি, নিজের মনকে ঠকাতে যাস্‌নে কখনও। যদি কখনও অসৎপথে যাস—যেতে হয় যদি, বরাতে থাকলে কেউ ঠেকাতে পারবে না—তাই বলে সেই পথটাকেই সৎ পথ বলে যেন মনকে বোঝাতে চেষ্টা করিস নি। খারাপ কাজ করছিস বুঝলে ভুল করছিস বুঝলে সামলাবার চেষ্টা করবি তবু, শোধরাবার চেষ্টা করবি—তাতে আবার কখনও বেঁচে ওঠবার আশা থাকে, নইলে ডুববি তো ডুববি ঘটিবাটির মতো—জীবনে আর ভাসতে পারবি না। শুনেছি, আমাদের গোঁদলপাড়ায়—গোঁদলপাড়ায় তো আমার বাপের বাড়ি—ওখানে ক্রেস্তান পাদরীরা আসত, রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে যীশু-কেষ্টর মহিমে ব্যাখ্যানা করত—তা কতদিন শুনেছি ওরা বলছে, অনুতাপ করো, অনুতাপ করিলে সব পাপ ক্ষমা হইবে, নহিলে নিস্তার নাই! ...কথাই তাই, পাপ করছি বুঝলে তো অনুতাপ করবে—যে অন্যায় করেও মনকে বুঝিয়েছে আমি ঠিক করছি, তার আর নিস্তার নেই!'

কথাগুলো যখন বলত শশী, সুরো অবাক হয়ে চেয়ে থাকত। সাধারণ গেরস্ত-ঘরের কোন বৌ যে এমনভাবে ভাবতে পারে অত বলতে পারে—তা শুনেও যেন বিশ্বাস হত না তার। কথাগুলো বলার সময় এমন একটি স্নিগ্ধ সুন্দর মুখের ভাব হত তার—সুরোর মনে হত সে তখনই একবার প্রণাম করে পায়ের ধুলো নেয়। নিতান্ত—এই নিয়ে জবাবদিহি করার ভয়েই সে পারত না।

এক একদিন শশীকে তার 'মা' বলে ডাকতে ইচ্ছা করত, কেবল লজ্জায় পড়ে পেরে উঠত না।

তবু মানুষকে এমনি যতই ভাল মনে হোক, স্বার্থের সম্পর্কে না এলে তাকে পুরোপুরি চেনা যায় না। স্বার্থ বলতে টাকা-পয়সার ব্যাপারটাই আসল। এটুকু জ্ঞান সুরোবালারও হয়েছে এই বয়সেই। সে পরীক্ষাতেও চারুবাবুরা উত্তীর্ণ হয়ে গেলেন সগৌরবে।

হরেকৃষ্ণ আসার পরও মাস দুই তিন কেটে গেল। যেখানে যা ছিল সামান্য গোপন সঞ্চয়—ধুয়ে মুছে বেরিয়ে গেল সংসার চালাতেই। তবু ভবতারণ অসাধ্য সাধন করছেন, অসুস্থ শরীরেই টোটো করে ঘুরছেন সারাদিন, দু' টাকা চার টাকা আনছেনও মধ্যে মধ্যে। কিন্তু তাতে কোনক্রমে নুনভাত চলে, বাড়িভাড়া দেওয়া যায় না। শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থা দাঁড়াল যে মতির দেওয়া দু'তিনখানা গহনা ছাড়া কিছু রইল না কোথাও।

মাসকাবারে তারই একটা বার করে দিল সুরবালা। হার ছড়াটা বাবার সামনে রেখে বলল, 'এটা বেচে যা পাও নিয়ে এসো বাবা।'

ভবতারণের চোখে জল এসে যায়, বলেন, 'কখনও কিছু দিতে পারলুম না—তোর গয়না বেচে খাব মা! সে আমি পারব না।'

সুরবালা পীড়াপীড়ি করে; বলে, 'বাড়িওলারা খুবই ভাল—কিছু বলবে না হয়ত—কিন্তু ও'দেরও তো অবস্থা ভাল নয় বাবা, সেইজন্যেই ভাড়াটে রেখেছেন। ও'দের ভাড়া আটকানো ঠিক হবে না। তাছাড়া ক'দিন আর ফেলে রাখবেন? যদি পাঁচ মাস ছ' মাসেই অমন না দিতে পারি, তখনও কি আর চুপ করে থাকবেন? তাছাড়া সে একগাদা টাকা জমে যাবে—সে তো আরও দিতে পারব না। মিছিমিছি একটা মন-কষাকষি নালিশ-মকদ্দমা—হয়ত আদালতের প্যায়দা ডেকে মালপত্তর সব ক্রোক করবে—নয়ত টেনে রাস্তায় ফেলে দিয়ে আমাদেরও বার করে দেবে। ...কি দরকার বাবা, তার চেয়ে সহমানে দিয়ে দেওয়াই ভাল।'

ভবতারণ তবুও ইতস্তত করেন। তাঁর শীর্ণ দুই গালের ওপর দিয়ে নিঃশব্দে চোখের জল ঝরে পড়তে থাকে। সুরবালা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে থেকে আর কোন কথা বলে না—হারটা কুড়িয়ে নিয়ে শশী বৌদির কাছে চলে যায়। বলে, 'তুমি দাদাকে বলে এইটে বিক্রী করিয়ে দাও বৌদি।'

শশী চমকে ওঠে, 'সে কি রে। এমন অবস্থা?'

মাথা হেঁট করে সুরবালা বলে, 'আর কোথাও কিছু নেই। বাড়িভাড়াটা অন্তত দিতে হবে তো। লোকে কথায় বলে—খাই না খাই বুকে হাত দিয়ে পড়ে থাকি! সেই পড়ে থাকার জায়গাটুকু নষ্ট করতে চাই না।'

চুপ করে বসে থাকে শরৎশশী। কী যেন তোলাপাড়া করে একটা মনের মধ্যে তারপর বলে, 'তা না হয় এ মাসের ভাড়াটা এমনিই আমার কাছ থেকে ধার নিয়ে যা—'

'না বৌদি', প্রবলবেগে ঘাড় নাড়ে সুরো, বলে, 'তোমার অবস্থাও তো আমি জানি। এমন কিছু তালেবর রহমান নয় দাদা, তার ওপর মেয়ের বে'র কথা হচ্ছে। এ সময় এতগুলো টাকা আটকে ফেলা ঠিক হবে না তোমার। ...না পারবে তাগাদা করতে না পারবে আদায় করতে। তাছাড়া ক'মাস তুমি এমন করে টানবে বলো? মাস তো কাটছে জলের মতো। ও তুমি বেচেই দাও বৌদি, যে কদিন এই ধুলিগুঁড়ি আছে সে কদিন তো চলুক!'

'তারপর?' ওর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে প্রশ্ন করে শশী।

তেমনিই স্থির কণ্ঠে উত্তর দেয় সুরবালা, 'তারপর মা গঙ্গা আছেন। নয়ত বুড়ো বাপের হাত ধরে রাস্তায়—যাক্ সে সব কথা। অত আর এখন থেকে ভেবে লাভ নেই।'

শশী আর কিছু বলে না। হারটা তুলে রেখে দেয়।...

সময় হিসেব করে চারুবাবুর আপিস যাবার আগেই দিয়ে এসেছিল সুরো। আপিস থেকে ফেরারও অনেক পরে আবার গেল খবরটা জানতে। চারুবাবু তখন বেরিয়ে গেছেন। কোথায় যেন তিন টাকা মাইনেতে ছেলে পড়ানো ধরেছেন—সেইখানেই গেছেন বোধহয়।

ওকে দেখে শশী বিনাবাক্যে কুড়িটা টাকা বার করে দিলেন।

সুরো চমকে উঠল, 'মোটে এই পাওয়া গেল?'

'না রে, উনি বিক্রী করতে পারেন নি। দাম ওঠে না। কেউ বলে পানে বোঝাই কেউ বলে মরা সোনা। নানান বায়নাক্কা। তাই আপাতত, যে মহাজনের কাছ থেকে মাঝে মাঝে দরকার পড়লে ধারটার করেন—তার কাছে এইটে বন্ধক রেখে এইটে নিয়ে এসেছেন। তুই তো এখন কাজ চালা। বললেন, পরে দেখা যাবে'খন।'

'কিন্তু বন্ধক মানেই তো সুদ বৌদি। সুদ শুনেছি ছারপোকার বিয়েন।... ও গয়না কি আর উধরে নিতে পারব—ও ঐ সুদেই চলে যাবে একদিন।'

'দূর পাগল। অতদিন তারাই বা ফেলে রাখবে কেন? একটু সময় পেলে উনিই কাউকে ধরে ভাল একটা পোদ্দারের দোকান থেকে বেচিয়ে দেবেন।'

তা-ই বোঝে সুরো। বিশ্বাসও করে। নিস্তারিণী যখন পরোক্ষে, স্বামীকে উপলক্ষ করে বিলাপছলে কৌতূহল প্রকাশ করেন—কে কী পরিমাণ ঠকাল তাঁর কাঠ-বোকা মেয়েকে এই গহনা বিক্রীর ব্যাপারে—তখনও চুপ করে থাকে। নিস্তারিণী স্বামীকে গঞ্জনা দেন, 'কী লাভ হল ভাল সেজে?... ও বেউড় বাঁশের ঝাড়, যা ধরেছে তা তো করবেই জানো। তবু তুমি ঠকলে একবারই ঠকা হত, যেটুকু পেতে ঘরে উঠত। এতো সাত চোরে মুশুরী বাটা হয়ে গেল—বুঝতেই পারছ।'

মনে মনে বিরক্ত হয়ে ওঠে সুরো। শঙ্কিতও হয়। কে জানে যদি শশী বৌদির কানে যায় কথাটা—না যাওয়ারও কোন কারণ নেই, মা তাঁর কথা গোপন করার কোন চেষ্টা করেন না, সে গলা সর্বদাই উচ্চতম গ্রামে বাঁধা—শশী বৌদি কি মনে করবেন!...

ইতিমধ্যে ও'দের বড় মেয়ে শ্রীলেখার বিয়ে ঠিক হয়ে যায়।

মার সঙ্গে কী একটা যোগে গঙ্গাস্নান করতে গিয়েছিল শ্রীলেখা, সেখানে কোন্ এক কায়স্থ রাজবাড়ির গিন্নী ওকে দেখেছিলেন। মেয়েটিকে হঠাৎ চোখে লেগে গিয়েছিল তাঁর। সুশ্রী শান্তশিষ্ট মেয়ে যে খুব সুলভ নয় তা তাঁর এতদিনের অভিজ্ঞতায় বুঝেছিলেন ভাল করেই। সঙ্গে সঙ্গে নেয়ে উঠে আনন্দময়ীতলা পর্যন্ত এসে ওদের পদবী পরিচয় এবং ঠিকানা সংগ্রহ করে নিয়েছিলেন। তারপর—তিনিই উপযাচক হয়ে ঘট্‌কী পাঠিয়েছিলেন বিয়ের প্রস্তাব করে।

প্রথমটা চারুবাবু রাজী হননি। অসমান ঘরে কাজ করা ঠিক নয়। তাঁর মতো লোকের অতবড় ঘরে কাজ করতে যাওয়া ঠিক নয়। তা ছাড়াও আপত্তি ছিল তাঁর। বড় ঘর, জমিদারের বাড়ি—জমিদার কেন, রাজাই তো—বহুদিনের নামকরা বনেদী বংশ ঠিকই। কিন্তু ছেলে লেখাপড়া বিশেষ করেনি, ঘরে মাস্টার রেখে পড়ানো হয়েছে, সে কতদূর কী হয়েছে কে জানে। খানিকটা ইস্কুলের পড়াশুনো থাকলেও হত। আজকাল তো একটা পাস ছেলেও কত পাওয়া যায়। ...বাপের মন খুঁৎ খুঁৎ করে, দ্বিধা যেতে চায় না। বলেন, 'চিরদিন শুনে আসছি ভাল ছেলে দেখে গাছ-তলায় দেওয়াও ভাল।... ছেলে যদি তেমন না হয় গাছতলায় দিয়েই কি সুখ হবে? তাছাড়া—রাজবাড়ি ঐ শুনতেই, এতদিনে সরিকে সরিকে ভাগ হয়ে কতটুকুই বা আছে? এরাও তো যেটের তিনটি ভাই। বাপও কিছু করে না, বসে খায়। তার ওপর বাজারে নাকি বাঁধা রাস্তু আছে শুনেছি। ...যদি যথাসম্ভব উড়িয়ে দিয়ে যায়—এদের দুর্দশার শেষ থাকবে না। মাঝখান থেকে অসমান ঘরে কাজ করতে গিয়ে আমি এখন নাটাপাটি খাব—দেনায় জড়িয়ে পড়ব।'

কিন্তু ঘটকীর মুখে পাত্রের রূপের বর্ণনা শুনে শশী বৌদি স্থির থাকতে পারেন না। রাজপুত্তুর শুধু নামে নয়—চেহারাতেও। এমনি জামাইই তো কাম্য মেয়ের মায়েদের। ঘট্‌কী বলে, 'নেই নেই করেও ওদের ঐশ্বর্য কি কম এখনও! এমন বন্দোবস্ত কোম্পানীর সঙ্গে, ছেলেমেয়ে পেটে এলেই তার মাসোহারা ব্যবস্থা হয়ে যায়। না-ই বা রোজগার করল ছেলে, তোমার মেয়ে যেদিন বৌ হয়ে ঢুকবে ও বাড়িতে সেইদিন থেকেই তার নামেও তো মাসোহারা বরাদ্দ হয়ে যাবে গো। ...তারপর ধরো যেটের পেটে যা ধরবে তারাও ধরো গে সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের মাসোহারা নিয়ে জন্মাবে। এ একেবারে বাঁধা নিয়ম, এর নাকি নড়চড় হবার যো নেই। ...ও মেয়ে কি আর সোয়ামীর হাত তোলায় থাকবে—না শ্বশুরের দয়ার ওপর নিভ্‌ভর করতে হবে ওকে? দিয়ে দাও বৌদি, এমন পাত্তর ছেড়ো না। যাচা লক্ষ্মী পায়ে ঠেললে অশেষ দুগ্‌গতি হয়। এর পর পস্তাতে হবে বলে রাখছি। কী এমন শানসা লোক তোমরা যে মোট মোট টাকা খরচ করে পাস করা পাত্তরে দিতে পারবে?'

শশীর মনে হয় অকাট্য যুক্তি। তিনি সেই কথাই বুঝিয়ে বলেন চারুবাবুকে। পীড়াপীড়ি করেন ছেলে দেখবার জন্যে। ছেলের চেহারা দেখে চারুবাবু নরম হবেন খানিকটা—স্বভাবতই এটা আঁচ করেছিলেন শশী বৌদি। হয়ও তাই। বাড়ি ঘর আসবাব, সেই সঙ্গে বাড়ির লোকজনদের চেহারা দেখে আর কথাবার্তা শুনে কতকটা অভিভূত হয়েই ফিরে আসেন চারুবাবু। তবু দেনা-পাওনার কথা তুলে নিজের অসামর্থ্য জানিয়ে কাটাবার একটা ক্ষীণ চেষ্টা করেছিলেন—কিন্তু ছেলের মা আড়াল থেকেই এককথায় চুপ করিয়ে দিলেন। বললেন, 'ও আর আপনি কি দেবেন ব্যাই মশাই, গয়না আনব আমরা। জড়োয়া গয়না ছাড়া এ বাড়ির বৌ আসবার নিয়ম নেই। সে কি আর মেয়ের বাপের ওপর বরাত দিলে চলে! আর নগদ টাকাও দিতে হবে না—আমাদের এ'দার ছেলে বেচতে বড় ঘেন্না।... শুধু নমস্কারী কখানা দেবেন একটু ভাল দেখে আর ফুলশয্যের তত্ত্বটা। এর পরের তত্ত্বতাবাস করেন ভাল, না করলেও ক্ষেতি নেই। আমাদের এ বাড়ি নিত্যি এত তত্ত্ব আসে—কার এল আর কার না এল খবরও কেউ রাখবে না।'

এর পর 'যাচা লক্ষ্মী' ঠেলতে চারুবাবুরও সাহস হল না। শশী বৌদি তো আহ্লাদে

হয়ে পড়লেন যাকে বলে। বললেন, 'না হয় এর পর না খেয়ে দেনা শুধব। না হয় ভিক্ষে দুঃখু করে চালাব। তুমি আর দুমত করো না লক্ষ্মীটি। বলছ অমন কার্তিকের মতো বর, আমার সুন্দর মেয়ে—জোড় মানাবে। তাছাড়া অত বড় ঘর, লোকে বলে বড়র আঁস্তাকুড়ও ভাল। এ পাত্তর ছাড়লে এর পর কী জুটবে তার ঠিক আছে! এধারে মেয়ের বয়সও তো বলতে নেই তেরো হয়ে গেল, আর কবেই বা বিয়ে দেবে? ...শেষে হয়ত একটা হাঘরের হাতে তুলে দিতে হবে!'

চারুবাবুও বোঝেন কথাগুলো। লোভ তাঁরও হয়েছে একটু, বিশেষ ছেলের চেহারা দেখে। উনিশ বছরের ছেলে, কন্দর্পের মতো চেহারা।...শেষ পর্যন্ত মত দেন তিনি। তারপর অবিশ্যি তাঁর আর করার কিছু থাকে না। পাত্রপক্ষই পাঁজিপুঁথি দেখিয়ে দিনক্ষণ ঠিক করে দেন, মায় পাকা-দেখার তারিখ পর্যন্ত।......

অসমান ঘরে কাজ করতে যাওয়ার ফলটা প্রথম থেকেই টের পান চারুবাবু। আশীর্বাদের দিনই তাঁর পুরো চার মাসের মাইনে খরচ হয়ে যায়। পাত্রপক্ষ বাহান্ন রকমের খাবার করে আগাগোড়া রুপোর বাসনে খাইয়েছে—অত না হোক, খানিকটা না করলে মান থাকে না। ছেলের একশ একখানা নমস্কারী চেয়েছিলেন—অনেক বলে কয়ে পায়ে হাতে ধরে সেটা পঁয়ষট্টি-খানায় দাঁড় করালেন চারুবাবু। তাতেও শান্তি নেই, হবু বেয়ান প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উত্তরপাড়ার এক তাঁতিনীকে পাঠিয়ে দিলেন, বলে পাঠালেন, তাকে বলে দিলে সে চড়ান দিয়ে ফরমাশ মতো শাড়ি করে দেবে। 'আমাদের কাপড় যোগায় বারো মাস, কী কাপড় এ বাড়িতে চলে তা ওরা সব জানে। অন্য ফ্যারফ্যারে কাপড় দিলে কেউ পরবে না, নানা কটুকেনা করবে তা নিয়ে। ও'রা এখন আমাদের কুটুম হতে যাচ্ছেন, ও'দের অপমান হলে সেটা আমাদেরও অপমান। ঘরে যা আসবে তার দোষগুণ ঢেকে নিতে পারি—নমস্কারী তো বাইরে যাবে, কার মুখে হাত-চাপা দেব?'

তা চারুবাবু এসব সহ্য করলেন—মুখ বুজে। খরচ করলেনও সব। উনি হিসেবী মানুষ। মেয়ে হবার পর থেকেই প্রতি মাসে আলাদা একটা ঘটিতে দু' টাকা তিন টাকা করে জমিয়ে আসছেন প্রতি মাসে। তবে তাতে আর কত হয়—ধারদেনা করতেই হয় নানান জায়গা থেকে—তার ভেতর কোন কোনটা বেশ চড়া সুদেই নিতে হয়। নেন আর ফিরে এসে বৌয়ের হাতে তুলে দিয়ে হেসে বলেন, 'নাও, সুদটা কষতে থাকো এখন থেকেই। মধুসূদনও আর চলবে না। শুধুই তেঁতুল দিয়ে ভাত ঠেলতে হবে।' কোনদিন বা বলেন 'শাড়ি টাড়ি যা পরবে এবার থেকে বাইরে গেলে। ঘরে এখন থেকে জোলাতাঁতির গামছা শুরু করো।'...

সুরোও প্রমাদ গণে। এত খানিস্তা অন্তত একটা টাকা দুয়েকের ভাল শাড়ি আর আটগণ্ডা পয়সার মিষ্টি দিয়েও আইবুড়ো ভাত দিতে হবে। নইলে মান থাকবে না। অথচ টাকার ব্যবস্থাও আর নিজের হাতে কিছু নেই। তাই অনেক ইতস্তত করে, লাজলজ্জার মাথা খেয়ে—এসময় শশী বৌদিদের বাজে বেগারের তাগাদায় বিব্রত করা ঠিক নয় বুঝেও—এক সময় কথাটা পাড়তে হয়।... 'তুমি সেই হারটা এবার বেচিয়ে দাও বৌদি, যা পাওয়া যায়। দাদার মাথার ঠিক নেই তো বুঝি, তবু এখন স্যাকরা বাড়িই তো ছুটোছুটি করতে হচ্ছে, এক কাজে দু' কাজ হয়ে যাবে!'

শশী বৌদিও সংক্ষেপে—'ও'কে বলব আজ', 'হ্যাঁ, ও'কে বলেছি' ইত্যাদি বলে কাটিয়ে দেন। শেষে একদিন খুব পীড়াপীড়ি করে ধরাতে পরের দিন রাত্রে ডেকে আর কুড়িটা টাকা ধরে দিয়ে বলেন, 'হারটা তো খুব ভারী নয়—পানমরা টরা বাদ দিয়ে ষোল টাকা হিসেবে দাম দিয়েছে। আরও হয়ত কিছু খুচরো পাবি তুই, সুদের দরুন কেটে রেখেছে মহাজন—ঝঞ্ঝাটটা চুকে যাক, হিসেব মিটিয়ে এর পর যা হয় তোর দাদা বুঝিয়ে দেবেন!'

অবিশ্বাসের কোন কারণ নেই। এর বেশী টাকা আশা করে নি সুরো। ওদিক দিয়ে কিছু নয়—মনটা খারাপ হয়ে যায় অন্য কারণে। তার প্রথম পাওয়া অলঙ্কার, পুরস্কারও বটে। বিক্রী করে দেওয়ার জন্যে সে-ই জেদ করেছিল কিন্তু এখন বিক্রী হয়ে গেছে খবরটা শোনার পর যেন চোখের জল চাপতে পারে না কিছুতেই।...

বিয়ের আগের দিন মাকে বলে আইবুড়ো ভাত দেওয়াল সে। ভাত ঠিক নয়—খাওয়াল এই পর্যন্ত বলা যায়। ওরা বামুন হলেও নিচু বামুন, ওদের বাড়ি ভাত খেতে বলতে সাহস হল না সুরোর। বিশেষ সে কীর্তনউলী—সে পরিচয় ও'রা পেয়েই গেছেন। নেমন্তন্ন করলে এড়িয়ে যাবেন। তবে গায়ে-হলুদের পর আর নিজেদের বাড়ি খেতে নেই, এই কারণে পরের বাড়ি খেয়ে বেড়াচ্ছে দেখে সে ভরসা করে বিয়ের আগের দিন রাত্রে খেতে বলল শ্রীলেখাকে। কুণ্ঠিতভাবেই বলল, 'বৌদি ময়দা খেলে তো দোষ হয় না শুনেছি—তা খুকী রাত্তিরে কেন আমাদের বাড়ি খাক না কাল? তাতে কারও আপত্তি হবে কি?'

'না না, আপত্তি আবার কিসের?' শশী বৌদি গলায় বেশ জোর দিয়েই বলেন, 'ভাত খেলেও আমার আপত্তি হত না। হাজার হোক বামুন তো! তোর বাড়ি তো এমনিই এটা-ওটা খেয়ে আসছে, এই তো সেদিনই রসবড়া খেয়ে এসে কত সুখ্যেত করল সেদিন।'

মাকে বলে—অনেকদিন পরে, এই কারণেই বিস্তর খোসামোদ করে মন ভিজিয়ে—পরোটা ধোঁকার ডালনা চাঁসের পায়েস করাল সুরো। সেই সময়ই কাপড়টা পরিয়ে দিল। বাবাকে দিয়ে বড়বাজার থেকে আনিয়েছিল কাপড়টা, সাড়ে তিন টাকা দাম, ভাল ধনেখালির ডুরে।

খাওয়ার পর মেয়েকে পৌঁছতে গেছে, 'শোন' বলে ওকে ডেকে নিয়ে গিয়ে সুরোর হারটা বার করে দিলেন বৌদি. বললেন, কাল পরে আসিস, গয়না নেই বলে যেন ডুব দিয়ে থাকিস না।'

অবাক হয়ে যায় সুরো।

'তার মানে? হারটা তাহলে তুমিই কিনেছ? তা, কৈ বলো নি তো!'

কোথায় একটা সূক্ষ্ম অভিমানের সুর যেন বাজে ওর গলায়।

'ওরে পাগলী, বেচাকেনা কিছুই হয় নি। তোর দাদা কিছুতেই রাজী হলেন না। ও টাকাটা উনিই দিয়েছেন, বলেছেন, সত্যি সত্যিই বেচতে গেলে এর চেয়ে এমন বেশী কিছু পেত না। কাজেই ধরে নিক এটা আমারই হার, আমিই কিনেছি, ওর কাছে গচ্ছিত রাখছি। আর যেন হাতছাড়া করার চেষ্টা না করে। আমি জানি এমন দিন ওর থাকবে না, ভাল মেয়ে, ভগবান একদিন-না-একদিন মুখ তুলে চাইবেনই। তখন শোধ দেয় যেন, যা পারবে মাসে এক টাকা, আট আনা করে দিলেও আমি নেব। সুদ লাগবে না, সেইটেই ওর লাভ!'

চোখে এক ঝলক গরম জল এসে যায় কোথা থেকে। গলা বুজে আসে কিসে। তবু সুরো অনেক কষ্টে কথাগুলো উচ্চারণ করে, 'তোমাদের এই দুঃসময়ে সুদে টাকা ধার করতে হচ্ছে চারদিক থেকে—এ সময় এতগুলো টাকা হাতছাড়া করতে গেলে কেন বৌদি, তোমাদের চলবে কোথা থেকে!'

'ওমা, দুঃসময় কী বল! ওকি অলুক্ষণে কথা! মেয়ের বে হচ্ছে, এ তো সুসময়। আর টাকা ধার? সে তো করতেই হচ্ছে, হবেও। ঐ কটা টাকাতে আর কী এসে যেত বল? বলে সমুদ্দুরে পাদ্যার্ঘ! তুই ভালবাসিস আমার মেয়েকে—হারটা সত্যি-সত্যিই গালিয়ে বিক্রি করলে তোর বুকে কতটা বাজত ভেবে দ্যাখ দিকি। তাতে কি আর আমাদেরই ভাল লাগত এই আনন্দের সময়? তোর সন্তোষে মেয়ের আমার কল্যাণ হবে। আশীর্বাদ কর—ভাল ঘর-বর হোক ওর, আমি আর কিছু চাইনে। তোর দাদা যেমন করেই হোক চালিয়ে নেবেন, দেনাও শোধ করবেন।'

সুরো আর থাকতে পারে না, বহুদিনের ইচ্ছেটা মিটিয়ে শশী বৌদি 'হাঁ-হাঁ' করতে করতে হেঁট হয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে নেয় তাঁর।

'ও কি করলি! বামুনের মেয়ে—পায়ের ধুলো নিয়ে নরকে ডোবালি?'

'তা জানি না। তবে আমার পুণ্যি হল এইটে জানি। তোমরা অনেক বামুনের চেয়ে বড়!'

কান্নায় বুজে আসা গলায় অস্ফুট স্বরে উত্তর দেয় সুরো।

(ক্রমশ)



জনসংখ্যার ভিড়ে

একটি শিশুর জন্মের সংগেই আমাদের সম্পদের একটু করে হ্রাস হচ্ছে। এ সম্পদ অর্থে ধন-দৌলত নয়—জীবনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী। সামর্থ্য সীমিত কিন্তু লোকসংখ্যা বৃদ্ধির গতি অনিরুদ্ধ। তাই দুয়ের মধ্যে সংঘাত অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে। এরকমটা অবশ্য হয়েছে জন্মহার এবং মৃত্যুহারের মধ্যে বিরাট ব্যবধানের ফলে। বর্তমানে দেশে অনেক রোগ আয়ত্বের মধ্যে এবং চিকিৎসাশাস্ত্রও উন্নত হয়েছে। তাই পঞ্চাশ বছর আগের মৃত্যুহার হাজার প্রতি ৪৮ থেকে কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ১৬ জনে। অন্য দিকে সেই সময়ে জন্মহার ছিল হাজার প্রতি ৪৯ জন, বর্তমানে এই সংখ্যা হয়েছে ৪১ জন। সে-দিন বছরে প্রতি হাজারে মোট লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেত একজন আর এখন দুয়ের মধ্যে ব্যবধান হাজারে পঁচিশজন। ফলে জ্যামিতিক হারে দেশের লোকসংখ্যা বেড়ে চলেছে। আরো জানা যাচ্ছে যে, স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত কর্মসূচীর সার্থক রূপায়ণে অনাগত বছরগুলিতে মৃত্যুহার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে। এই লোকসংখ্যা বৃদ্ধি জাতীয় উন্নয়নের সমস্ত প্রয়াসকে ব্যাহত করে আমাদের আর্থিক ও সামাজিক সর্বনাশের পথে নিয়ে যাচ্ছে।

এই আশু সর্বনাশ রোধ করার একটি মাত্র পথ খোলা আছে আমাদের সামনে। জন্মহার এবং মৃত্যুহারে সঙ্গতি স্থাপন। বর্তমানের জন্মহার হাজার প্রতি ৪১ জন থেকে কমিয়ে ২৫ জনে নিয়ে আসতে হবে। তাহলে উভয়ের মধ্যে বিরাট ব্যবধান কমে আসবে। আর তখনি জীবনের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর সংগে জনসংখ্যার সম্পর্কের সঙ্গতি বজায় থাকবে। এজন্য প্রয়োজন হবে দেশের নয় কোটি প্রজননশীল বয়সের দম্পতিকে পরিবার পরিকল্পনার আওতাভুক্ত করা। এদের ছোট পরিবারের আদর্শ গ্রহণ করতে হবে। যদি দেশের সমস্ত দম্পতি তিনজনের বেশি সন্তান কামনা না করেন তবে জন্মহার উপরে-উক্ত সংখ্যায় এসে পৌঁছুতে পারে। আরো ভাল হয় যদি এরা কেবল দুটি ছেলে-মেয়ে চান, তাহলে জন্মহার কিঞ্চিৎ লাঘব হয়ে সতেরোয় নেমে আসবে।

লোকসংখ্যাতত্ত্বের দিক থেকে আমাদের দেশে এক অদ্ভুত ধারা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সংগে সংগে লোকসংখ্যা কমে আসছে। আর আমাদের দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে সুনিশ্চিত করার জন্য লোক-সংখ্যা কমানোর দরকার হয়ে পড়েছে। গত দুই দশকে দেশে শিল্প ও কৃষির দ্রুত উন্নয়নের গতি দ্রুততর করার প্রয়াস অনেকাংশে সফল হয়েছে। অর্থনীতির দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা, খাদ্যোৎপাদন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য—সব ক্ষেত্রেই আমরা উন্নতির মাইলস্টোন অতিক্রম করতে পেরেছি। সব দিক থেকে বিবেচনা করে আশা করা গিয়েছিল, লোকসংখ্যা কমতে আরম্ভ করবে।) কিন্তু যা চিন্তা করা হয়েছিল তা হয়নি। ফলে এই কষ্টার্জিত সাফল্যগুলি আমরা উপভোগ করতে পারি নি—এগুলি আত্মসাৎ করেছে লোকসংখ্যার ব্যাপক বৃদ্ধি। ফলে আজ খাদ্যের পরিমাণ ১২·৮ আউন্স থেকে কমে গিয়ে ১২·৪ আউন্স হয়েছে। চাকুরী এবং শিক্ষার ক্ষেত্রেও অনুরূপ হতাশাব্যঞ্জক চিত্র ফুটে উঠেছে। তৃতীয় পাঁচশালা পরি-কল্পনার শেষে তিন কোটি দশ লক্ষ অতি-রিক্ত চাকরীর সংস্থান করা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও এক কোটি তরুণ-তরুণী বেকার রয়েছে। শিক্ষাগত সুযোগ সুবিধা ও গত পনেরো বছরে শত-করা ৩০০ ভাগ বাড়ানো সত্ত্বেও তৃতীয় পরিকল্পনা শেষে স্কুলে যেতে পারছে না, এমন ছেলেমেয়ের সংখ্যা হলো প্রায় সাত কোটির কাছাকাছি। সুতরাং এটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, আমরা বিরাট একটা সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি এবং সুস্থ উপায়ে ব্যূহ রক্ষা ব্যতীত এর হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই।

আগামী সাতাশ বছরের মধ্যে আমাদের গ্রাম ও শহরের একান্ন কোটি লোকের সংখ্যা কয়েক সহস্র লক্ষ গুণ বেড়ে যাবে। অসহ্য দুর্দশা ও ভয়াবহ অনশন এবং অস্বাভাবিক ক্লেশ তখন আমাদের অপরিহার্য নিয়তি। কারণ প্রতি দিন পঞ্চান্ন হাজার শিশুর জন্ম এবং প্রতি বছরে এক কোটি ত্রিশ লক্ষ করে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি আমাদের সে পথেই নিয়ে চলেছে। সমস্যাটা বিরাট। কারণ প্রায় দশ কোটি দম্পতিকে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণে প্রবৃত্ত করতে হলে আমাদের প্রায় তিন হাজার শহর এবং সাড়ে পাঁচ লক্ষ গ্রামে পৌঁছুতে হবে। চোদ্দটি ভাষায় এবং দুশোর বেশি উপ-ভাষায় আমাদের যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে। আর পরিবর্তনের পথে ঐতিহ্যগত বাধা এবং নিরক্ষরতার পাঁচিলকে ভাঙতে হবে। জনপ্রতি আমাদের এখন বাৎসরিক আয় মাত্র ৩২৫ টাকা। এ থেকেই বোঝা যায় আমাদের জীবনযাত্রার মান কত নীচু। আর জীবনযাত্রার এই নিম্নমান থেকে জন্মায় যে বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গী তার বিরুদ্ধেও আমা-দের সংগ্রাম করতে হবে। আমাদের ভবিষ্যতের সামনে জনসংখ্যার বৃদ্ধির দরুণ যে অন্ধকার নেমে আসছে তাকে কাটাতে আমাদের সংগ্রামে নামতে হবে। এ জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও আমাদের পক্ষ থেকে যথাসম্ভব অবলম্বন করা হয়েছে।



সম্প্রতি লাওসের রাজা সপরিবারে ভারত পরিদর্শন করে গেলেন। এই উপলক্ষ্যে তাঁরা মহীশুর আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটস্ সেন্টারে আসেন। রাজকুমারী ডলা ৫নং সাভাং পুতুলের সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করছেন।

স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা ... দরে জাতীয় স্তরে একটি পরিকল্পনা বিভাগ রয়েছে। কর্মসূচী পরিকল্পনা সংক্রান্ত কাজকর্মের সমন্বয়, অর্থের ব্যবস্থা এবং রাজ্যগুলিকে পরামর্শ দানের দায়িত্ব এই বিভাগের উপর বর্তেছে। রাজ্যগুলি এ ব্যাপারে ব্যয়ের জন্য ভর্তুকি পেয়ে থাকে। রাজ্যস্তরে পরিবার পরিকল্পনা ব্যুরো প্রশাসন, কর্মী এবং গণ-সংযোগ বিভাগের সঙ্গে এই কর্মসূচীর সমন্বয়কার্যে নিযুক্ত। জেলাস্তরে রাজ্য-স্তরের আদর্শে গঠিত জেলা পরিবার পরি-কল্পনা ব্যুরো কর্মসূচী সংগঠন করছে। সমষ্টি উন্নয়ন ব্লক স্তরে প্রায় আশী হাজার লোকের জন্যে প্রতিটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের একটি করে পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক রয়েছে। এই কেন্দ্র স্বাস্থ্যসেবার অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ হিসাবে প্রতি দশ হাজার লোকের জন্য আটটি উপকেন্দ্র ও সাহায্যকারী সেবিকাদের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত পরামর্শ দেয় এবং পরিবার নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাদি দিয়ে থাকে।

এসব সমস্ত প্রশাসনিক যন্ত্রের গুরুত্ব-পূর্ণ কাজ হচ্ছে শিক্ষা এবং ঔৎসুক্য সৃষ্টি। লোকের ধর্মবিশ্বাস, নীতিবোধ, বিবেক ও পারিবারিক দায়িত্বকে কোন রকম ভাবে আঘাত না করে জনগণকে এ ব্যাপারে শিক্ষিত করাই হচ্ছে লক্ষ্য। পরিবার পরি-কল্পনা প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজ হচ্ছে যাঁরা পরিবার পরিকল্পনার উপায় গ্রহণ করতে চান তাঁদের জন্য ব্যবস্থা করা এবং এই ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জনতার মধ্যে আরো ঔৎসুক্যের সঞ্চার করা।

বর্তমান কর্মসূচী রূপায়ণ করবার জন্য প্রায় এক লক্ষ পাঁচিশ হাজার কর্মীকে কোন না কোন বিশেষ ধরনের প্রশিক্ষণ নিতে হবে। এজন্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে। রাজ্য ও জেলাস্তরে কাজ করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কর্মচারীদের প্রশিক্ষা দানে নয়াদিল্লীর কেন্দ্রীয় পরিবার পরিকল্পনা ইনস্টিটিউট ও কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো এবং কলকাতার অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ হাইজিন অ্যাণ্ড পাবলিক হেলথ নিযুক্ত রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন রাজ্যে কর্মীদের প্রশিক্ষণ দানের জন্য ছেচল্লিশটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। এ পর্যন্ত এ ব্যাপারে সাফল্যও বেশ উল্লেখযোগ্য। আড়াই হাজার ডাক্তার সাড়ে দশ হাজার অন্যান্য কর্মী এবং সাড়ে সাত হাজার সাহায্যকারী সেবিকাকে প্রশিক্ষণ দান করা হয়েছে প্রায় তিনশোর কাছাকাছি উন্নয়ন প্রশিক্ষককেও শিক্ষণ দান করা হয়েছে। সমস্ত পরিকল্পনার জন্য আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে প্রায় পঞ্চান্ন হাজার সাহায্যকারী সেবিকা এবং ৬৫২ জন উন্নয়ন প্রশিক্ষক। রাজ্য ও জেলাস্তরের কর্মীদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচী পরিচালনা করে নয়াদিল্লীর কেন্দ্রীয় পরিবার পরি-কল্পনা ইনস্টিটিউট কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো এবং কলকাতার অল ইণ্ডিয়া ইন-স্টিটিউট অফ হাইজিন অ্যাণ্ড পাবলিক হেলথ। বর্তমানে সাঁইত্রিশটি রাজ্যস্তরের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রশিক্ষা কর্মসূচী চালাচ্ছে। ফোল'ট কেন্দ্রীয় পরিবার পরিকল্পনা ক্ষেত্রীয় ইউনিট রাজ্যস্তরের প্রশিক্ষণ পরি-পূরণ করছে।



কলকাতার জার্মান মহিলা ম্যাকসমূলের ভবনে বড়দিনের বাজার বসান। দুদিনব্যাপী এই বাজারে ক্রেতাদের সমাগম হয় প্রচুর। সংগৃহীত অর্থ জনকল্যাণে ব্যয় করা হবে।

পরিবার পরিকল্পনার এই কর্মসূচীর রূপায়ণদক্ষতা বজায় রাখবার জন্য সব সময় দরকার হয় জৈবচিকিৎসা, জনসংখ্যাতত্ত্ব, জনসংযোগ এবং সামাজিক বিষয়ক গবেষণা-লব্ধ তথ্য। এজন্য দেশের আটটি জৈব-চিকিৎসাকেন্দ্র, এগারটি জনসংখ্যা গবেষণা-কেন্দ্র এবং দশটি, জনসংযোগ গবেষণা প্রকল্পের গবেষণার সমন্বয়কল্পে তিনটি উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি গঠিত হয়েছে।

কেন্দ্র, রাজ্য, জেলা, গ্রাম ও ব্যক্তিস্তরে লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে এবং উৎসাহ ও পুরস্কার দানের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। ফলে এই কর্মসূচীর মধ্যেই মূল্যায়ণের প্রয়াস নিহিত। কর্মসূচীর রূপায়ণে প্রত্যেকেই তার নিজস্ব সামর্থ্য ও দুর্বলতা সম্পর্কে অবহিত। গ্রামাঞ্চলে প্রতিটি উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র এ বিষয়ে পরামর্শ দেয় এবং বিভিন্ন পরিবার নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির ব্যবস্থা করে।

যাদের কাছে পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত তথ্য জ্ঞাপন ও ঔৎসুক্য সৃষ্টির লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে তার বিশাল আকৃতি এ কাজকে আরো বিরাট করে তুলেছে। গণ-সংযোগ ও গণশিক্ষার এক কর্মসূচী তাই গ্রহণ করা হয়েছে। গণসংযোগের সমস্ত মাধ্যম এবং গণশিক্ষার সমস্ত পদ্ধতি লোকের মনে এ বিষয়ে ঔৎসুক্য সৃষ্টি এবং তাদের জন্মনিরোধক দ্রব্য ও তার ব্যবহার সম্পর্কে জ্ঞান বিতরণের জ্ঞান গ্রহণ করা হয়েছে। শিক্ষিতের হার এদেশে কম। কিন্তু দেশের লোককে পরিবার পরিকল্পনার সমস্ত পদ্ধতি ও সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে অবহিত করতে হবে।

আমাদের যে সাংগঠিক ও আর্থিক ক্ষমতা রয়েছে তার সঙ্গে জনগণের সহ-যোগিতা ও অন্যান্য প্রয়াস যুক্ত হলে জন্ম-হার ২৫-এ কমিয়ে আনা অসম্ভব হবে না আশা করা যায়।

হস্তশিল্পের প্রদর্শনী

সমাজকল্যাণ এবং সাংস্কৃতিক সংস্থা 'পাণ্ড'-এর উদ্যোগে দু দিনব্যাপী এক হস্তশিল্পের প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় ম্যাক্স-মুলার ভবনে। অল বেঙ্গল উওমেন্স এসোসিয়েশন, আর-আই সি, বেঙ্গল হোম ইণ্ডাস্ট্রীজ এবং অন্যান্য বহু সংস্থা তাঁদের নিজস্ব শিল্পের মাধ্যমে অনুষ্ঠানে অংশ-গ্রহণ করে। ব্যক্তিগত উদ্যোগে যাঁরা শিল্প-দ্রব্য প্রস্তুত করেন এবং প্রদর্শনী ও বিক্রীর সুযোগ পান না, তাঁরা এই প্রদর্শনীতে সাগ্রহে যোগদান করেন। নারী পুরুষের পোশাক, বিভিন্ন বয়সী শিশুদের রঙদার জামা-কাপড়, খেলনা, পুতুল, বাসন-পত্র ও সূচের কাজ ছিল প্রদর্শনীর আকর্ষণ। এই প্রদর্শনী থেকে সংগৃহীত অর্থ ব্যয় করা হবে দুঃস্থ ও দুর্গত মহিলাদের সাহায্যকল্পে।

'পাণ্ড'-এর এই উদ্যোগ আকুণ্ঠ প্রশংসার দাবীদার একথা মানতেই হবে।

গৌরাঙ্গ পরিজন

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

(৫৭)

স্বরূপ দামোদর

নবদ্বীপে ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত। পূর্বাশ্রমের নাম পুরুষোত্তম আচার্য। 'প্রভুর অত্যন্ত মর্ম রসের সাগর।'

প্রভু যখন সন্ন্যাস নিলেন, পুরুষোত্তম দুঃখে পাগলের মত হয়ে গেল। ছুটল কাশীতে, সন্ন্যাসী চৈতন্যানন্দকে আশ্রয় করল। বললে, আমিও সন্ন্যাস নেব।

পুরুষোত্তম গুরুর কাছ থেকে সন্ন্যাস নিল কিন্তু শিখাসূত্র ত্যাগ করল না, নিল না যোগপট্ট। স্বরূপে অবস্থান করল বলে নাম হল স্বরূপ দামোদর।

গুরু আদেশ করল, বেদান্ত পড়ো। পড়ে আর সকলকে পড়াও।

স্বরূপ বললে, নিশ্চিন্তে কৃষ্ণ ভজনা করব বলেই আমার সন্ন্যাস। কৃষ্ণ ছাড়া আমি আর কিছু জানি না, জানবার আছে বলেও মনে করি না। যদি অনুমতি করেন তো আমি নীলাচলে চলে যাই।

চৈতন্যানন্দ সম্মতি দিল।

স্বরূপ প্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ. প্রেমময় দেহ, কৃষ্ণরসতত্ত্বের জাগ্রত বিগ্রহ। এদিকে আবার পণ্ডিতের চূড়ামণি, কিন্তু থাকে নিঃশব্দে, নির্জনে, কৃষ্ণতন্ময়তার আনন্দে। স্বরূপ সঙ্গীতে গন্ধর্ব, শাস্ত্রজ্ঞানে বৃহস্পতি।

দাক্ষিণাত্য পর্যটন করে প্রভু নীলাচলে ফিরেছেন, স্বরূপ তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ল। শ্লোকবন্ধে বললে, হে শ্রীচৈতন্য, হে দয়ানিধি, আমাতে তোমার দয়া হোক। যে দয়ায় সমস্ত খেদ দূরে যায়, যা নির্মল, বিশদ, যা আনন্দবর্ধন, যা সমস্ত শাস্ত্রবিবাদ নিরস্ত করে, যা অখণ্ড ভক্তিসুখের উৎস, যার চিরন্তন মর্যাদা একমাত্র মাধুর্যে, সেই অসামান্য কৃপা আমার জীবনে প্রকাশিত করো।

'ভাল হৈল অন্ধ যেন দুই নেত্র পাইল।' প্রভু স্বরূপকে আলিঙ্গন করলেন। বললেন, আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম তুমি আসবে। তুমি না এলে কৃষ্ণকথার আনন্দ আস্বাদ করি কী করে?

তুমি সন্ন্যাস নিয়েছ জেনেও আমি তোমার সঙ্গে না এসে কাশী গিয়েছিলাম। বললে স্বরূপ, আমার অপরাধের মার্জনা নেই। কিন্তু আমি তোমাকে ছাড়লেও তুমি আমাকে ছাড়োনি, কৃপার রজ্জু গলায় বেঁধে আমাকে এখানে টেনে এনেছ।

প্রভু স্বরূপের জন্যে নিভৃত বাসস্থান ঠিক করে দিলেন। পরিচয় করিয়ে দিলেন পার্ষদদের সঙ্গে।

নীলাচলবাসী ভক্তদের মধ্যমণি স্বরূপ। প্রভুর একদিকে গোবিন্দ ও কাশীশ্বরের মত সেবক, আরেক দিকে রামানন্দ ও সার্বভৌমের মত ভক্ত, স্বরূপ এক অঙ্গে দুই রূপ, কখনো ভৃত্য কখনো অন্তরঙ্গ, কখনো পরিচারক কখনো সাধ্য-সাধনসঙ্গী। স্বরূপ পার্ষদদের শিরোমণি। 'সন্ন্যাসী পার্ষদ যত ঈশ্বরের হয়। দামোদর স্বরূপ সমান কেহো নয়।।'

স্বরূপের পাণ্ডিত্যে শুধু নয়, তার রসবোধ ও ভক্তিসিদ্ধান্তেও প্রভুর সবিশেষ শ্রদ্ধা। কেউ কোনো গ্রন্থ বা গীত বা শ্লোক রচনা করে প্রভুকে শোনাতে এলে প্রথমেই স্বরূপ পরীক্ষা করে দেখবে এতে ভক্তির কোনো বিরুদ্ধ কথা আছে কিনা, আছে কিনা রসাভাস, রচনা শুনে প্রভু আনন্দিত হবেন কিনা। যদি স্বরূপ বোঝে রচনা শুদ্ধ, ভক্তিসিদ্ধান্তের অনুকূল তবেই প্রভুকে শোনাবার অনুমতি দেয়। বিপরীত হলে প্রত্যাখ্যান করে।

তাই ভগবান আচার্যের ভাই গোপালের বেদান্তভাষ্য শুনতে চায়নি স্বরূপ, বঙ্গ-কবির নান্দীশ্লোকের ব্যাখ্যাকে অগ্রাহ্য করে দিয়েছে।

গৌড়ীয় ভক্তেরা নীলাচলে পৌঁছুলে প্রভু স্বরূপ আর গোবিন্দকে বললেন, তোমরা ওদের মালা-প্রসাদ দিয়ে অভ্যর্থনা করো।

তাই করল দুজনে। এমনি প্রতি বৎসর। মালা-প্রসাদ নিয়ে ভক্ত-সংবর্ধনার অধিকারী গোবিন্দ আর স্বরূপ।

ভক্তদের প্রসাদ-ভোজনে পরিবেশনের ভারও স্বরূপের উপর। গুণ্ডিচা-মার্জন-লীলার সঙ্গীও স্বরূপ।

'মন্দিরমার্জন তোমার কাজ নয়।' প্রভুকে বললে মন্দিরের পড়িছা।

'না, আমারই যোগ্য কাজ।' প্রভু উত্তর দিলেন।

প্রভুর তো শুধু ভগবদভাব নয়, তাঁর আবার ভক্তভাব। তিনি মন্দিরমার্জন করবেন জগন্নাথের জন্যে, জগন্নাথ আসবে বলে। এই সেবাই তো ভজন। জীবকে ভজন শেখাবার জন্যেই তো প্রভুর ভক্তভাব। যেখানে প্রীতি, সেখানে শ্রম শ্রম নয়, কষ্ট কষ্ট নয়, সে কাজে হীনতাও নেই মলিনতাও নেই।

আর ভগবদভাবে ভগবান কি শুধু সেবা নেবেনই, দেবেন না এক-আধটু? সেবা পাওয়ার চেয়ে সেবা করায় কি বেশি আনন্দ নয়? তাই অধিকতর আনন্দ পাবার লোভে প্রভু হীনসেবা মেগে নিলেন। যে বড় সেই পারে হীনতম সেবা করতে। প্রভুকে দেখে শেখ সকলে।

সুতরাং একশো নতুন ঘট আর একশো নতুন ঝাঁটা নিয়ে এস। প্রভু পড়িছাকে আদেশ করলেন।

বুঝেছি এও তোমার এক লীলা। বললে পড়িছা, রাজা হুকুমজারি করেছেন প্রভু যা ইচ্ছা করেন তাই হবে।

প্রভু নিজের হাতে ঝাঁট দিতে লাগলেন। বললেন, তৃণধূলির পরিমাণে বুঝব কে কত পরিশ্রম করেছ।

দেখা গেল প্রতিযোগিতায় কেউ প্রভুর সঙ্গে পারেনি। প্রভুর সংগৃহীত আবর্জনার ভারই সকলের চেয়ে বেশি।

এবার তবে ঘটে করে জল আনো। জল আনা-ঢালা অধিকতর পরিশ্রমের কাজ, প্রভু পাঁচজনকে রেহাই দিলেন। অদ্বৈত, পরমানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, নিত্যানন্দ আর স্বরূপ। অন্যে জল এনে ঢেলে দেবে আর তা দিয়ে তোমরা প্রক্ষালন করবে। তোমাদের পরিশ্রমের কিছু লাঘব হোক।

কে একজন এসে হঠাৎ প্রভুর পায়ে জল ঢেলে সেই জল পান করে ফেলল। প্রভু রুষ্ট হলেন, যেন সমস্ত দায়-দায়িত্ব স্বরূপের, স্বরূপকে ডেকে বললেন, দেখ এর ব্যবহার। ঈশ্বরমন্দিরে কিনা আমার পা ধোয়াল আর সেই জল নিজে পান করল! এই অপরাধে আমার কী গতি হবে?

লোকটার ঘাড় ধরে তাড়িয়ে দিল স্বরূপ।

কোথায় যাবে, সরলবুদ্ধি-সরল সেই লোক ফিরে এল প্রভুর কাছে। বললে, আমি অজ্ঞ, মূর্খ, ব্যবহার জানি না, আমাকে ক্ষমা না করলে চলে কী রে?

প্রভু তুষ্ট হলেন। ক্ষমায় ও করুণায় তার আঘাতের উপশম করে দিলেন।

প্রভু যখন মন্দিরে যান, স্বরূপ তাঁর পার্শ্বচর। রথযাত্রায় কীর্তনের প্রথম সম্প্রদায়ের প্রধান কীর্তনিয়া স্বরূপ। শুধু গানে নয় মৃদঙ্গবাদনেও স্বরূপ অদ্বিতীয়। কীর্তনের উন্মাদিনী সুরনির্ঝরিণীর উৎসও এই স্বরূপ। সবার উপরে, প্রভুর মনোমত শাস্ত্র-শ্লোক উদ্ধার করে প্রভুর কর্ণপিপাসা তৃপ্ত করার অধিকারও এই স্বরূপের।

রথের সামনে তাণ্ডব নৃত্য করছেন প্রভু। নৃত্যের শেষে স্বরূপকে বললেন, স্বরূপ, গান গাও।

প্রভুর মনোগত ভাব কী, বুঝতে পেরেছে স্বরূপ। সে গান ধরল :

'সেই ত পরাণনাথ পাইনু।
যাহা লাগি মদন-দহনে ঝুরি গেনু।।'

এ রাধিকার কথা। কুরুক্ষেত্রে যখন কৃষ্ণের সঙ্গে মিলন হল তখন শ্রীমতী ভাবল, এই আমার সেই প্রাণনাথ, যার বিরহে বৃন্দাবনে দগ্ধ হচ্ছিলাম, এখন তাকে পেয়ে আমার দেহ-মন শীতল হল।

রাধিকার বুঝি আরো কিছু কথা আছে। প্রভু হাত তুলে শ্লোক আবৃত্তি করলেন : যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরঃ। একবার নয়, বার বার বললেন। যেন রাধাভাবে বলছেন, সখি, সেই আমিও আছি, কৃষ্ণও আছে, আমাদের মিলনও হয়েছে, কিন্তু বৃন্দাবনে নিভৃতে নিকুঞ্জে সেই যে আমাদের প্রেমকৌশলকেলি হত, আমার চিত্ত তারই জন্যে পিপাসিত। এই কুরুক্ষেত্রের মিলনে সে আনন্দ অনুপস্থিত। সেই তুমি সেই আমি সে নবসঙ্গম। তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন।।'

এই শ্লোকের অর্থ স্বরূপ ছাড়া আর কারু কাছে স্বচ্ছ নয়। একমাত্র স্বরূপই জানে প্রভু কেন একথা বলছেন, কী ইঙ্গিত করছেন! স্বরূপই প্রভুর নিকটতম অন্তরঙ্গ, যেমন ব্রজলীলায় ললিতা রাধিকার।

স্বরূপ প্রভুতে আবিষ্ট হয়ে গান করে আর প্রভু রাধাবেশে মাটিতে বসে অধোমুখে নখের আঁচড় কাটেন। পাছে আঙুলে ক্ষত হয় স্বরূপ বাধা দেয়। কতক্ষণ বসে থাকবেন, উন্মাদ ঝঞ্ঝায় প্রভুর হৃদয়স্থ আনন্দসিন্ধু উত্তাল হয়ে ওঠে। ভাবপুষ্প ফুটে ওঠে শরীরে। যে দেখল সেই কৃষ্ণপ্রেমে আপ্লুত হল। অন্যে পরে কা কথা, জগন্নাথও প্রেমসুখে টলমল করতে লাগল।

স্বরূপের মুখে লক্ষ্মী আর গোপীর কথা শুনছেন প্রভু। বৈকুণ্ঠ ও বৃন্দাবনের কথা।

বৈকুণ্ঠ ঐশ্বর্যের, বৃন্দাবন মাধুর্যের ধাম। বৃন্দাবনলীলায় লক্ষ্মীর অধিকার নেই। সে অহঙ্কৃতা, ঐশ্বর্যারূঢ়া। তাই প্রেমিকা প্রেয়সী হয়েও সে রাসবিলাসে কৃষ্ণসঙ্গ পেল না। কী করে পাবে? শুধু কী রাণী হলেই চলে? শ্রীচরণের দাসীও হতে হয়।

বৃন্দাবন-লীলার সহায় ব্রজগোপী। সে শুধু কৃষ্ণসুখে সুখী। তার প্রেমে আশা নেই আকাঙ্ক্ষা নেই অভিমান নেই। তার তৃপ্ত কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী। তার সুখের পর্যবসান কৃষ্ণসুখে।

স্বরূপ আবার মানের কথা বলে। লক্ষ্মীর মানে রোষ, সত্যভামার মানে ঈর্ষা, কিন্তু রাধিকার মানে শুধু কৃষ্ণপ্রীতি। কৃষ্ণ রাধিকার কুঞ্জে না গিয়ে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গিয়েছে। তাতে রাধিকার মান হয়েছে। কিন্তু এ মান চন্দ্রাবলীর সৌভাগ্যে ঈর্ষার মান নয়, চন্দ্রাবলী কৃষ্ণকে মনোমত সেবা করতে পারবে না, সুখ দিতে পারবে না সেই শঙ্কায় মান। এ মানের তুলনা নেই। এ রসের নিধান। এই শুদ্ধতম প্রেমের প্রকাশক।

শ্রীবাস পরিহাস করে বললে, বৃন্দাবনে সম্পদ বলতে আছে কী! শুধু ফুল আর কিশলয়, গিরিমাটি আর শিখিপুচ্ছ। সেখানে কে যায় নীলাচল ছেড়ে? এই ভেবেই লক্ষ্মীর তন্ত্রবিভ্রান্ত। জগন্নাথের রুচির এমন বিকৃতি হল কী করে? তাঁকে উপহাস করবার জন্যেই সে নিজের সমস্ত ঐশ্বর্য উদ্ঘাটিত করেছে। আমাকে ছেড়ে কোথায় গেল সেই বনবাদাড়ে? তাছাড়া তোমার গোপীরা কী করে? দুধ জ্বাল দেয়, দধি মন্থন করে। আর আমার লক্ষ্মী-ঠাকরুনকে দেখ, কেমন রাণীর মত বসেছে রত্ন-সিংহাসনে।

স্বরূপ বললে, বৃন্দাবনে সম্পদের যে সিন্ধু আছে তার এক বিন্দু বৈকুণ্ঠ, এক বিন্দু দ্বারকা। বৃন্দাবনে কৃষ্ণকান্তাগণ সকলেই লক্ষ্মী, কান্ত পরম পুরুষোত্তম কৃষ্ণ, সব বৃক্ষই কল্পবৃক্ষ, সব ধেনুই কামধেনু। ভূমি চিন্তামণিময়, জল অমৃত, সহজ কথাই গান, সহজ গমনই নৃত্য। চিদানন্দই চন্দ্র-সূর্য। চিদানন্দই খাদ্য, চিদানন্দই আস্বাদ।

প্রভুই যে রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত শ্রীকৃষ্ণ এ তত্ত্বের সার্থক বোদ্ধা ও ব্যাখ্যাতা বুঝি এই স্বরূপ দামোদর।

প্রভু যখন গৌড়ে যাচ্ছেন তখনও স্বরূপ তাঁর সঙ্গী। যখন ঝারিখণ্ডের পথে বৃন্দাবন যাত্রার কথা ভাবছেন তখনও পরামর্শ এই স্বরূপের সঙ্গে। সকালে উঠে প্রভুকে না দেখে ভক্তরা যখন ব্যাকুল হয়ে অন্বেষণ করতে ছুটল তখন স্বরূপই তাদের নিবৃত্ত করলে। প্রভুর ইচ্ছা নয় কেউ তাঁকে অনুসরণ করে। স্বরূপ ছাড়া আর কার কথায় ব্যাকুল ভক্তদল নিবৃত্ত হবে?

বৃন্দাবন থেকে প্রভু নীলাচলে ফিরলে স্বরূপই নবদ্বীপে খবর পাঠাল।

তারপর চালে-গোঁজা তালপাতায় লেখা রূপ গোস্বামীর শ্লোক যখন আবিষ্কার করলেন তখন প্রভু তা পড়তে দিলেন স্বরূপকে। দেখ তো কী সুন্দর লিখেছে!

'প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি—' কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হয়ে রাধিকা সহচরীকে বলছে, দেখ এ সেই বৃন্দাবনবিহারী কৃষ্ণ আর আমিও সেই রাধা। আমাদের এই মিলনও সুখদায়ক, তবু আমার মন যমুনাপুলিনচারী কৃষ্ণকেই শুধু কামনা করছে আর কুরুক্ষেত্রের বদলে চাইছে সেই মধুবন, যেখানে কৃষ্ণ বাঁশি বাজাত আর ঘুরে বেড়াত আর যেখানে বাঁশির পঞ্চম স্বরে পুলিনকানন শিহরিত হত, ধারণ করত মধুরিমা।

আশ্চর্য, রূপ আমার অন্তর-বার্তা কী করে জানতে পারল? প্রভু জিজ্ঞেস করলেন।

শুধু তোমার কৃপাশক্তিতে। বললে স্বরূপ, তোমার কৃপা ছাড়া তোমার মনের ভাব বোঝে এমন কার সাধ্য? শ্লোকের বাচ্যার্থ প্রাঞ্জল হলেও তার নিহিত অর্থ বুঝতে তোমার কৃপা দরকার।

হ্যাঁ, প্রভু বললেন, প্রয়াগে যখন রূপকে দেখি তখন মনে হল এ যোগ্য পাত্র। তাই আমি একে কৃপা করে শক্তি সঞ্চার করেছি, ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছি। রসতত্ত্ব সম্বন্ধে যেখানে যে বিশেষত্ব আছে তুমি তাকে বুঝিয়ে দিও।

শুধু তত্ত্ব জেনে কী হবে, তোমার কৃপা ছাড়া প্রতিভা অসম্ভব।

বারো দিন পায়ে হেঁটে—তার মধ্যে তিন দিন মোটে খেতে পেয়ে রঘুনাথ পৌঁছল নীলাচলে। স্বরূপকে বললেন প্রভু, এর বাপ আর জেঠা একমাত্র বিষয়কেই সুখসেব্য মনে করে। তাদের অনেক দান-ধ্যান আছে বটে কিন্তু কৃষ্ণকামনা নেই, নেই কৃষ্ণভক্তি। বিষয়ের এমনি স্বভাব মানুষকে অন্ধ করে রাখে, এমন কর্ম করায় যাতে ভববন্ধন আরো দৃঢ় হয়। রঘুনাথকে কৃষ্ণ সেই বিষয় থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এলেন। কিন্তু দেখেছ, ছেলেটা কী-রকম কৃশ হয়ে গিয়েছে, মুখখানি ম্লান। স্বরূপ, তুমি এর ভার নাও, একে তুমি তোমার ছাত্র-ভৃত্যরূপে অঙ্গীকার করো। আজ থেকে এর নাম হল 'স্বরূপের রঘুনাথ।' বলে রঘুনাথের হাত ধরে স্বরূপের হাতে তুলে দিলেন।

স্বরূপ বললে, তাই হবে।

প্রভু রঘুনাথকে গোবর্ধনের শিলা উপহার দিলেন। বললেন, শুধু জল আর তুলসী শ্রদ্ধায় ও শুদ্ধভাবে শিলাকে নিবেদন করো তা হলেই পাবে কৃষ্ণপ্রেম।

স্বরূপই সব জোগাড় করে দিল। শিলা বসাবার জন্যে একখানি পিঁড়ি, আচ্ছাদনের জন্যে আধ হাত বস্ত্র আর জল রাখবার একটি কুঁজো।

শিলাকে কিছু ভোগ দেবে না? স্বরূপ করল রঘুনাথকে।

রঘুনাথ ব্যস্ত হয়ে তাকাল। ভোগ দেবার মত তার সঙ্গতি কোথায়?

স্বরূপ বললে, আট কড়ির খাজা সন্দেশ শিলাকে নিবেদন কোরো। যদি শ্রদ্ধা করে দাও সেই খাজা সন্দেশই অমৃত হয়ে উঠবে।

স্বরূপের আদেশে গোবিন্দই নিয়ে আসছে সেই খাজা সন্দেশ। রাজৈশ্বর্যে পালিত রঘুনাথ সর্বস্বত্যাগের পরমদৈন্যে সেই খাজা সন্দেশ দিয়েই বিগ্রহের ভোগ দিচ্ছে।

ছত্রে গিয়ে মেগে খাওয়াও ছেড়ে দিয়েছে রঘুনাথ। কেননা তাতেও পরাপেক্ষা। কতক্ষণে ভিক্ষান্ন নিয়ে আসে তার জন্যে চাঞ্চল্যভোগ!

রঘুনাথ ফেলে-দেওয়া বাসি পচা প্রসাদান্ন খেতে লাগল কুড়িয়ে।

কিন্তু প্রসাদ কি কখনো পচে, না, দুর্গন্ধ হয়? প্রাকৃতজনের কাছে যাই হোক, রঘুনাথের কাছে এ প্রসাদ বাসিও নয় বিকৃতও নয়। এ চিদবস্তু, সাত্ত্বিক সম্পদ।

একদিন স্বরূপ দেখতে পেল রঘুনাথের প্রসাদ খাওয়া।

বা, আমাকে কিছু দাও। স্বরূপ হাত বাড়াল। খেয়ে বললে, তুমি প্রত্যহ এই অমৃত খাও, আমাদের দাও না কেন? এ তোমার কেমন স্বভাব?

বল্লভ ভট্টকে স্বরূপ সম্বন্ধে বলছেন প্রভু, স্বরূপ দামোদর মূর্তিমান প্রেমরস। ব্রজের মধুর রসের সংবাদ আমি স্বরূপের কাছেই জেনেছি। জেনেছি কাকে বলে গোপীপ্রেম। কামগন্ধের লেশমাত্র নেই, কৃষ্ণসুখই একমাত্র উদ্দেশ্য আর কৃষ্ণকে মাননীয় বা মর্যাদাবান বলতে অসম্মতি। এই তো গোপীপ্রেমের লক্ষণ। ভালোবাসায় ভর্ৎসনা করতে পর্যন্ত তারা প্রস্তুত। এই সর্বাতিশয়ী প্রেমের কথা স্বরূপ আমাকে বলেছে।

,ভিতর-প্রকোষ্ঠে — গম্ভীরায় — প্রভু শুয়েছেন। দ্বারপ্রান্তে শুয়েছে গোবিন্দ আর স্বরূপ। রোজ রাত্রে কৃষ্ণনামকীর্তন

ভরে প্রভু জেগে থাকেন, আজ নিঃশব্দ কেন? কী হল?

দরজা খুলে দুজনে ভিতরে গিয়ে দেখল, প্রভু নেই। ভিতর দিকের তিন দরজা বন্ধ, প্রভু অন্তর্হিত।

মশাল জেবলে খুঁজতে বেরুল স্বরূপ। সঙ্গে আরো অনেকে। দেখল জগন্নাথের মন্দিরপ্রাঙ্গণের বাইরে সিংহদ্বারের উত্তরে প্রভু পড়ে আছেন।

কিন্তু এ কী বিস্ময়! প্রভুর দেহ পাঁচ-ছ হাত দীর্ঘ হয়ে গিয়েছে, হাত-পা প্রায় তিন হাত করে লম্বা। সমস্ত অস্থি-গ্রন্থি শিথিল, দু অস্থির মাঝে প্রায় এক বিঘৎ করে ব্যবধান। শুধু গায়ের চামড়াই দুই বিচ্ছিন্ন গ্রন্থির মধ্যে সংযোগ রেখেছে। দেহ নিশ্চেতন, নিশ্বাস পড়ছে না। চোখ শিবনেত্র হয়ে আছে, লালা ঝরছে মুখ দিয়ে।

দেখে সকলে শোকে-দুঃখে বিমূঢ় হয়ে গেল।

স্বরূপ প্রভুর কানে কৃষ্ণ-নাম বলতে লাগল। কৃষ্ণ-কৃষ্ণ—অন্যান্য ভক্তরাও যোগ দিল উচ্চারণে।

ধীরে ধীরে অনেক পরে কৃষ্ণনাম প্রভুর হৃদয়ে প্রবেশ করল। ফিরে এল বাহ্যজ্ঞান। অমনি 'হরিবোল' বলে প্রভু গর্জন করে উঠলেন।

কোথায় আর অস্থিসন্ধির ব্যবধান, কোথায় আর অতিমানুষিক দেহদৈর্ঘ্য? প্রভু স্বাভাবিক হয়ে উঠলেন। স্বরূপকে জিজ্ঞেস করলেন, এ আমরা কোথায়?

বাড়ি চলো। সব বলছি তোমাকে।

প্রভুকে ধরাধরি করে সবাই বাড়ি নিয়ে এল। বললে তাঁর অন্তর্ধানের কথা, দেহ বিস্তারের কথা।

কী আশ্চর্য, আমার তো কিছুই মনে পড়ছে না। বললেন প্রভু, শুধু এইটুকু মনে আছে, যেন দেখলাম কৃষ্ণ আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। বিদ্যুৎপ্রায় দেখলাম। দেখা দিয়েই আবার মিলিয়ে গেল।

আরেকদিন প্রভু চটক পর্বতকে গোবর্ধন ভেবে ছুটলেন প্রেমাবেশে। শীতল জলে ও শীতলতর কৃষ্ণনামে স্বরূপ প্রভুকে সুস্থ করল।

গোবর্ধন থেকে আমাকে এখানে নিয়ে এল কে? স্বরূপকে জিজ্ঞেস করলেন প্রভু। বললেন, আমার কৃষ্ণলীলা দেখা শেষ হল না। কেন তোমরা অনর্থক কোলাহল করে উঠলে? আমাকে এখন উপায় বলে দাও, কী করলে কোথায় গেলে পাব আমার কৃষ্ণকে?

আরেকদিন উদ্যান দেখে বৃন্দাবন ভাবলেন। স্বরূপকে বললেন, আমাকে গান শোনাও, যাতে আমার বিরহ-দুঃখের উপশম হয়।

স্বরূপ গীত-গোবিন্দ শোনাতে বসল। কখনো বা শোনায় বিদ্যাপতি, কখনো বা চণ্ডীদাস।

আরেকদিন মধ্যরাত্রে প্রভুর কোনো শব্দ না পেয়ে গোবিন্দ স্বরূপকে ডেকে আনল, মশাল জেবলে খুঁজতে লাগল দুজনে।

দেখল তিন-দুয়ার পেরিয়ে সিংহ-দ্বারের বাইরে যেখানে কতগুলো গরু ছিল সেখানে প্রভু মূর্ছিত হয়ে পড়ে আছেন। কিন্তু এ তাঁর কী আকৃতি! সমস্ত হাত-পা শরীরের মধ্যে ঢোকানো, কূর্মের আকার হয়ে পড়ে আছেন। গরুগুলো প্রভুর গা শুঁকছে, প্রভুকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেলেও তাঁর সঙ্গ ছাড়ছে না। প্রভুর মুখে ফেনা, অঙ্গে পুলকরোমাঞ্চ, নয়নে অশ্রুধার।

অনেক কৃষ্ণকীর্তনের পর প্রভুর বাহ্যজ্ঞান ফিরে এল, সঙ্গে সঙ্গে হাত-পা বেরিয়ে এল গা থেকে। যথাযোগ্য শরীর পেয়ে প্রভু ইতি-উতি তাকাতে লাগলেন, স্বরূপকে জিজ্ঞেস করলেন, আমাকে তোমরা এ কোথায় নিয়ে এলে? বেণুধ্বনি শুনে আমি বৃন্দাবনে গিয়েছিলাম। ব্রজেন্দ্রনন্দন রাধিকাকে সংকেত-ধ্বনিতে কুঞ্জঘরে নিয়ে যাচ্ছে, শুনতে পেলাম তার ভূষণশিঞ্জন। সখীদের সঙ্গে আমিও পিছু-পিছু যাচ্ছিলাম, তোমরা কোলাহল করে উঠলে। আমার সেই বিহার-হাস-পরিহাস শোনা হল না, শোনা হল না সেই মুরলী-আলাপ। প্রভু বিলাপ করতে লাগলেন : আমাকে তবে এবার কর্ণরসায়ন শ্লোক শোনাও।

স্বরূপ ভাগবতের শ্লোক পড়ল।

যমুনা ভেবে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন প্রভু।

স্বরূপ মাথায় হাত দিয়ে বসল, প্রভু কোথায়? কখন মনোবেগে চলে গিয়েছেন কেউ টের পায়নি। কিন্তু যাবেন কোথায়? জগন্নাথের টানে মন্দিরে, না কি চটক পাহাড়ে, না কি কোনারকে? চলো নানা দল নানা দিকে বেরিয়ে পড়ি। কোথায় প্রভু?

স্বরূপের দল গেল সমুদ্রের দিকে।

কতক্ষণ পরে দেখল এক জেলে কাঁধে জাল ফেলে এদিকে এগিয়ে আসছে। কিন্তু লোকটা হাসছে কেন, কাঁদছে কেন, হরি-হরি বলে অকারণে নাচছেই বা কেন?

তোমার কী হল? স্বরূপ জিজ্ঞেস করল।

আমাকে ভূতে ধরেছে। জাল টানতে গিয়ে দেখি বেজায় ভারী, ভাবলাম কত বড় মাছ না জানি পড়েছে। ও হরি, মাছ কোথায়, এ যে দেখি একটা মরা মানুষ। ওটাকে না ছুঁয়ে তো জাল থেকে ছাড়ানো যায় না, কিন্তু যেমনটি ছোঁয়া অমনি মড়ার ভূতটা আমার কাঁধে চেপে বসল। এমন ভূতের কথা তো শুনিনি কোনোদিন। এ আমার কী হল?

সেই দেহ তুমি কোথায় রেখে এসেছ? স্বরূপ ব্যাকুল হয়ে উঠল।

ওরে বাবাঃ, সে কী দেহ, পাঁচ-সাত হাত লম্বা হবে। হাড়ের জোড় সব আলগা হয়ে গিয়েছে, চামড়ার সঙ্গে লেগে থেকে নড়বড় করছে, দেখলেই ভয়ে প্রাণ উড়ে যায়। এ কোন ধরনের ভূত তা কে বলবে?

আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চলো।

ওরে বাবাঃ! জেলে আঁতকে উঠল : সেইখানে আবার আমি যাব? চোখ উলটে পড়ে আছে, আবার মাঝে মাঝে গোঙাচ্ছে। এ ভূত একেবারে মামুলি নয়, অসাধারণ ভূত।

তা তুমি চলেছ কোথায়?

ওঝার বাড়িতে। ভূতটাকে কাঁধ থেকে ছাড়িয়ে নিতে। তবে ভূত যা প্রচণ্ড, ওঝা পারে কিনা কে জানে।

তোমার ঐ ওঝা পারবে না। আমি ছাড়িয়ে দিচ্ছি। মন্ত্র পড়ে স্বরূপ জেলের মাথায় হাত রেখে তিন চাপড় দিল। বললে, ভূত আর নেই। তোমার ভয়ের অস্থিরতা কেটে গেল। কিন্তু তোমার আর এক অস্থিরতা যাবার নয়।

সে আবার কী?

সে প্রেমের অস্থিরতা। স্বরূপ বিহ্বল-কণ্ঠে বললে, তুমি যাঁকে জালে টেনে তুলেছ তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং কৃষ্ণচৈতন্য ভগবান।

না, না, তিনি নন। জেলে জোর গলায় বললে, আমি প্রভুকে দেখেছি, তিনি এমন বিকৃত আকার নন।

এ তাঁর প্রেমবিকার। এ বিকারে শরীর দীর্ঘ হয়, অস্থিসন্ধি শিথিল হয়ে যায়। তিনি নিশ্চয়ই প্রেমাবেশে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছেন, আর তোমার এমন ভাগ্য—'

বলেন কি! আমি প্রভুকে স্পর্শ করেছি?

তিনিই কৃপা করে এ স্পর্শ ঘটিয়েছেন আর তার ফলে তোমার কৃষ্ণপ্রেমোদয় হয়েছে। এখন চলো প্রভুর কাছে আমাকে নিয়ে চলো।

চলুন, ছুটে চলুন। সমুদ্রতীরে একা শুয়ে আছেন প্রভু। প্রেমোৎফুল্ল হয়ে ছুটল জেলে।

স্বরূপ দেখল দীর্ঘ শিথিল দেহে উত্তাল-নয়নে শুয়ে আছেন প্রভু। অনেকক্ষণ জলে থাকার দেহ শাদা হয়ে গিয়েছে, বালি লেগে আছে আদ্যোপান্ত। কিছু ভয় নেই উচ্চকণ্ঠে প্রভুকে সবাই কৃষ্ণনাম শোনাও।

কৃষ্ণনাম প্রবেশ করতেই প্রভু সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে উঠলেন।

প্রভুর মরমী ভক্ত স্বরূপ, ভাবাবেশে কখনো প্রভু তাকে সখী বলে মনে করেন। স্বরূপের নিজের ইন্দ্রিয়ে প্রভু তাঁর নিজের ইন্দ্রিয় আবিষ্ট করে স্বরূপের গীতসুধা আস্বাদন করেন। স্বরূপের কায়-বাক্য-মনও প্রভুতে আবিষ্ট। স্বরূপ প্রভুর দ্বিতীয় কলেবর।

প্রভুর শেষলীলার কড়চাকর্তা স্বরূপ। প্রভুর অপ্রকটের সঙ্গে-সঙ্গেই স্বরূপের হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ করে প্রাণ বেরিয়ে গেল।



(প্রশ্ন)

'সোলেমান অ্যান্ড সেবা'-এর নায়ক ও নায়িকা কে, কে? পরিচালকের নাম কি? মোট কত রিল এর? এই চিত্রটির নাম, ও ঠিকানা জানতে চাই। জয়ন্তকুমার
সম্বলপুর (ওড়িষ্যা)

আধুনালুপ্ত 'র‍্যাংলার' পদের অর্থ কি ছিল? প্রথম বাঙালী র‍্যাংলার কে?
বিনয়কুমার কর
ধুপগুড়ি, জলপাইগুড়ি

(উত্তর)

সপ্তমবর্ষ, ২১শ সংখ্যায় প্রকাশিত গীতা দাসের প্রশ্নের উত্তরে জানাই:—

(ক) ভারতের বৃহত্তম বাঁধ 'ভাকরা নাঙ্গাল'। এর বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৬০৪ মেগাওয়াট।

(খ) এই বাঁধটি সাতলেজ নদীর পারে (৭৪০ ফীট উঁচু) ভাকরায় অবস্থিত। এর নির্মাণ প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রহণ করা হয় এবং ২০শে নভেম্বর ১৯৬২ সালে সম্পূর্ণ হয়। স্বর্গীয় পণ্ডিত নেহরু ২২শে অকটোবর ১৯৬৩ সালে এই বাঁধ জাতির প্রতি উৎসর্গ করেন।

(গ) এই বাঁধের সাহায্যে ৫৮'৬ লক্ষ একর জমি পাঞ্জাব ও রাজস্থানে চাষের জল পেয়ে থাকে।

এই সংখ্যায় প্রকাশিত অনাময় গুপ্তের প্রশ্নের উত্তরে জানাই:—

(ক) ভারতে বর্তমানে বন (ফরেস্ট) তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। ১। রিজার্ভ ফরেস্ট। ২। প্রেটেকটিভ ফরেস্ট ও ৩। আনক্লা সফাইড ফরেস্ট। প্রথম শ্রেণীর বন সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত ও জনসাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ। দ্বিতীয় শ্রেণীর বন ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের অধীনে এবং জনসাধারণকে চুক্তির সুযোগ দেওয়া হয়। তৃতীয় শ্রেণীর বন গ্রামের সীমানার অন্তর্গত বৃক্ষাদি। এই সকল বনের মোট আয়তন প্রায় ২৭৪ হাজার বর্গমাইল এবং দেশের স্থলভাগের শতকরা ২২ ভাগ।

(খ) এই বনে বিভিন্ন জাতীয় বনজ সম্পদ লভ্য। যথা—সেগুন, জারুল, অর্জুন, কদম্ব, আবলুস, শিরিষ, পলাশ, মহুয়া, শিমুল, দেবদারু, পাইন, শিশু, ওক, চন্দন, বেত, বাঁশ ও কাঠ।

(গ) ভারতের অরণ্যে ৫০০ বিভিন্ন জাতের স্তন্যপায়ী পশু বর্তমান। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সিংহ, গণ্ডার, হাতি, ভল্লুক, চিতাবাঘ, হায়না, গজলা হরিণ ও বাইসন। পক্ষীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য তিতির spoon bill, open bill, stork grey heron, Indian darter, cormorent, egret, white ibis, night heron ও ময়ূর। ময়ূর দেশের জাতীয় পক্ষী।

—অমিতকুমার ঘোষ
কারকী, পুনা—৩

●

২১ সংখ্যায় প্রকাশিত সন্ধ্যা ঘোষ ও রাণী রায়-এর প্রশ্নগুলোর জবাব নীচে দেওয়া হোল।

(ক) ভারতীয় দল সরকারীভাবে অস্ট্রেলিয়া সফর করে ১৯৪৭-৪৮ সালে। (খ) দলনেতা ছিলেন লালা অমরনাথ। (গ) টেস্ট ম্যাচ-এর ফলাফল:—১ম টেস্ট (ব্রিসবেন): অস্ট্রেলিয়া ইনিংস ও ২২৬ রাণে বিজয়ী, ২য় টেস্ট (সিডনি): ড্র, ৩য় টেস্ট (মেলবোর্ণ): অস্ট্রেলিয়া ২২৩ রাণে বিজয়ী, ৪র্থ টেস্ট (এডিলেড): অস্ট্রেলিয়া ইনিংস ও ১৬ রাণে বিজয়ী, ৫ম টেস্ট (মেলবোর্ন): অস্ট্রেলিয়া ইনিংস ও ১৭৭ রাণে বিজয়ী। ভারতীয় দলের উল্লেখযোগ্য জিত হয়েছিল একটি চারদিনের খেলায় অর্থাৎ প্রথম টেস্টের প্রাক্কালে অস্ট্রেলিয়া একাদশের বিরুদ্ধে। এ দলের নেতা ছিলেন স্বয়ং ব্র্যাডম্যান। ভারতীয়দের জয় হয়েছিল ২০ রাণে। রেকর্ড: মোট পাঁচটিতে জিত, এর মধ্যে তিনটি হোল দুর্বল কান্ট্রি দলের সঙ্গে দুদিনব্যাপী খেলায়, এবং একটি তিনদিনের খেলায়) সাতটিতে পরাজয়, আটটি ড্র।

●

(ক) কর্ণেল সি কে নাইডু ইংল্যান্ড সফরে যান দুবার। ১৯৩২ ও ১৯৩৬ সালে।

(খ) ৭টি সরকারী টেস্ট, ১৪টি ইনিংস, মোট ৩৫০ রাণ, গড়—২৫.০০, সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত স্কোর ৮১ রাণ, নট-আউট—শূন্য। এর সব কয়টি টেস্ট ছিল ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে। পরলোকগত মিঃ সি কে নাইডুর জীবনের ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ প্রথম শ্রেণীর রাণ সংখ্যা ছিল ২০০। ইন্দোরে রনজি ট্রফিতে ১৯৪৫-৪৬ সালে হোলকারের পক্ষে খেলে বরোদার বিরুদ্ধে তিনি ঐ রাণ করেছিলেন।

(গ) মোট ৪ বার। ১৯৩২ সালে ১ বার এবং ১৯৩৩-৩৪ সালে ৩ বার। তবে এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৩২ সালে সরকারীভাবে যে ভারতীয় দলটি ইংল্যান্ডে গিয়েছিল, সে দলের অধিনায়ক ও সহঃ-অধিনায়ক ছিলেন যথাক্রমে পরোবন্দরের মহারাজা ও লিম্বডির রাজকুমার ঘনশ্যাম সিংজী। তখনকার দিনে রাজা-মহারাজাদের ভাগ্যেই জুটতো অধিনায়কের মর্যাদা, এমন কি যোগ্যতা না থাকলেও। তাই, সি কের ভাগ্যে সে সকরে দলনেতার সম্মান জোটেনি। কিন্তু তাঁর ভাগ্য সহসা পরিবর্তিত হয়ে যায় অধিনায়ক ও সহঃ-অধিনায়কের অনুপস্থিতিতে। দুজনেই লর্ডস টেস্টের আগে নাটকীয়ভাবে রাজনীতির চাল খেলে লজ্জাবশতঃ সুযোগ সি কে-কে দলনেতার দায়িত্ব দিয়েছিলেন স্বেচ্ছায়। অতএব আনুষ্ঠানিকভাবে সি কে-ই হলেন প্রথম ক্রিকেটার যিনি রাজা-মহারাজা না হয়েও ভারতকে সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক টেস্টের আসরে দলনেতা হিসেবে পরিচিত করেছিলেন।

সিন্ধু দেব।
গৌহাটি-৪, আসাম।

সপ্তমবর্ষ ৩০শ সংখ্যা অমৃতের "জানাতে পারেন" বিভাগে প্রকাশিত শ্রীরামনাথ বসুর প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে খাদ্য উৎপাদনে আমাদের দেশের সর্বকালের রেকর্ড ৮৯০ লক্ষ টন (১৯৬৪-৬৫ ইং)। ঐ সংখ্যায়ই প্রকাশিত শ্রীঅম্লান চৌধুরীর প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে ভারতে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ৩২৯৭ লক্ষ একর (১৯৬৩ ইং রিপোর্ট অনুসারে)। ঐ সংখ্যায়ই "জানাতে পারেন" ('উত্তর') বিভাগে শ্রীশুভেন্দু মজুমদার ও শ্রীচঞ্চল চক্রবর্তীর প্রশ্নের (৭ম বর্ষ ২৭ সংখ্যায় প্রকাশিত) উত্তরে শ্রীবিমলকান্তি সেন ৬৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম জানিয়েছেন। কিন্তু ভারতে সর্বমোট ৭০টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। অন্য চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম হোল জব্বলপুর, নাগপুর, বহরমপুর ও সম্বলপুর (শেষোক্ত দুইটি উড়িষ্যাতে অবস্থিত)।

২১ সংখ্যায় প্রকাশিত অনাময় গুপ্তের প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে ভারতে নিম্নলিখিত বনগুলি আছে।

(১) আসাম পার্বত্য অঞ্চলের বন, (২) তরাইএর বন, (৩) হিমালয়ের বন, (৪) সুন্দরবন, (৫) পূর্বঘাটের বন, (৬) পশ্চিমঘাটের বন, (৭) মধ্যভারতের বন, (৮) শিবালক পার্বত্যশ্রেণীর বন, (৯) ছোটনাগপুরের বন ও (১০) পশ্চিম উপকূলবর্তী অঞ্চলের বন। এদের মিলিত আয়তন প্রায় ১৩৭৪ লক্ষ একর।

ধীরাজ ভট্টাচার্য
ভুবনেশ্বর—৩।
উড়িষ্যা

●

৭ম বর্ষ, ৩০শ সংখ্যায় প্রকাশিত অরিন্দম রায়ের প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে,বর্তমানে ভারতে মোট ৯৬,৫৯৬টি ডাকঘর আছে। চিঠি ফেলার বাক্সের সংখ্যা যথাক্রমে সহরে ৪১,৭৭৬ এবং গ্রামে ১৪৫,১২৮। ভারতীয় ডাক বিভাগ প্রায় দু'কোটি চিঠি, চার লক্ষ টেলিগ্রাম এবং দুই লক্ষটি পার্সেল বিলি করে থাকে।

প্রসঙ্গক্রমে পাঠকদের অবগতির জন্য জানাই যে, বিগত পয়লা ডিসেম্বর, ১৯৬৬ থেকে কোন অন্ধকে লিখিত কোন অন্ধের চিঠির জন্য কোন প্রকার ডাকমাসুল নেওয়া হয় না। বিদেশে লিখিত পত্রের ক্ষেত্রেও এ সুযোগ দেওয়া হয়ে থাকে।

কুমারেশ সেন
স্টেশন মাস্টার,সুভাষগ্রাম
'পূর্ব রেল'



দোতলায় খেলনাটাকে নামাতেই মিঠু ছুটে এলো আমার কোলে। যে লোকটা মাথায় করে ওটাকে নিয়ে এল তাকে কিছু পয়সা দিতে সে চলে গেল। মিঠুকে কোল থেকে আলতো করে ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে লাগামের দড়িটা ওর হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললাম, 'যা ব্যাটা, যেখানে খুশি ঘুরে আয়, আমরা ততক্ষণে একটু কথা বলি।' বলেই রান্নাঘরের দিকে চোখ ফেরাতেই দেখি মীনা একদৃষ্টে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। বিশেষ করে কাঠের ঘোড়া আর মিঠুর দিকে। আমি ওর দৃষ্টির অনুসরণে তাকালাম। দেখলাম, দেখতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু আমার চোখে তেমন কিছু পড়ল না। মিঠু ঘোড়ার সামনের দিকে ঝুঁকে লাগাম দু হাতে চেপে দোল খাচ্ছে। ওর নিচের ঠোঁটটাকে উল্টে ওপরের ঠোঁট দিয়ে চেপে ধরেছে। তার পা দিয়ে কাঠের ঘোড়ার পেটে লাথি মারছে—ঘোড়াটা যেন ওর লাথি খেয়েই সামনে পিছনে দুলছে।

মীনা যেখানটায় বসে উনুনে পাখা দিয়ে হাওয়া দিচ্ছে সেখান থেকে ঘোড়ার সামনের অর্ধেকটা স্পষ্ট দেখা যায়। চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললাম, 'কি হল তোমার? তোমারি তো শখ ছিল, মিঠু দিন-রাত একা-একা থাকে, কিছু একটা খেলনা হলে ভাল হয়। অথচ মনে হচ্ছে, আমি যেন খুব একটা অন্যায় করে ফেলেছি?'

মীনা শাড়ির আঁচলে হলদে ভেজা হাতটা মুছতে মুছতে বলল, 'এক্ষুনি না আনলেও পারতে। একটু টানাটানি চলছিল। নানান খরচা, সামনে পুজোর ঝামেলা।'

টানাটানি তো লেগেই আছে। তাছাড়া আজকের দিন ফিরে আসতে আরও একটা বছর লাগত। ততদিন ওর কাঠের ঘোড়ায় চড়ার বাসনা ফুরিয়ে যেত। আমি চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে বললাম, 'বাজে ভাবনা ভেবো না। আজ তিন বছরে পা দিল, ভয়ে ভয়ে ছেলেটাকে আদর করতে পর্যন্ত ভুলে গেছ।'

আমি উঠে স্নান করতে গেলাম। ফিরে এসে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গা মুছতে মুছতে দেখলাম, যেমন চলছিল সংসার তেমনি চলছে। মিঠু কাঠের ঘোড়ায় লাগাম চেপে মৃদু শব্দ করছে 'হুট-হুট'। মীনা রান্নাঘরে বসে আমার খাবারের জায়গা করতে করতে বারবার মিঠুর দিকে তাকাচ্ছে। চোখে কেমন একটা অস্বস্তি।

খেতে বসে বলতে যাব, মীনা তুমি যে আর্থিক টানাটানির কথা বলছ তা মিথ্যে নয়, তোমার চোখ বলছে অন্য কথা। মুখ তুলতেই মীনা বলল, 'ঘোড়াটাকে আমার ভাল লাগছে না। খুব অশান্ত লাগছে, খুব ভয় ভয় করছে। মনে হচ্ছে এক্ষুনি মিঠুকে পিঠের ওপর থেকে ফেলে দেবে।'

আমি হো-হো করে হেসে উঠে মীনার দিকে চোখ ফেলতেই চমকে গেলাম। মনে হল আমার হাসি ওর কানে পৌঁছোয় নি। একটু আগে ও যে কথা বলেছে তারই সত্যাসত্য যথার্থভাবে নির্ণয় করবার জন্য ওর চোখ দুটো আমাকে ডিঙিয়ে কাঠের ঘোড়ার ওপরে স্থির। আমি ডাকলাম, 'মীনা।'

মীনা ধাতস্থ হয়ে হাত মুছে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, 'সব কথা নিয়ে অমন তামাসা করো না, আমার ভাল লাগে না।' মীনা উঠে গিয়ে মিঠুকে ঘোড়ার পিঠের ওপর থেকে নামিয়ে নিয়ে শোবার ঘরে চলে গেল। আমি বাঁ হাতের রিস্টে ঘড়ি বাঁধতে বাঁধতে দেখলাম মীনা মিঠুকে বুকের মধ্যে সজোরে আঁকড়ে ধরে চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে। আমি আফিসের পথে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে নামতে

বললাম চিৎকার করে, 'বাইরের দরজাটায় শিকল দিয়ে দাও। কাঠের ঘোড়া পালিয়ে যাবে।' বলেই সিঁড়ির শেষ ধাপগুলো দ্রুত নেমে গেলাম। নিজের কথাগুলো নিজের কানেই খুব একটা বিশ্রী অনুভূতিকে প্রশ্রয় দিল বলে মনে হল। আমি সর্বশেষ ধাপে পা দিতেই দরজায় ভিতর থেকে শিকল তোলার শব্দ কানে এল।

অফিসে সারাদিন মীনাকে মনে পড়তে লাগল। মীনার অমন বিমর্ষ হবার কোন কারণ নির্ণয়ে আমি যতই বিফল হতে লাগলাম ভিতরে ভিতরে অসহিষ্ণুতা বোধ করতে লাগলাম ততই। করিডোরে দাঁড়িয়ে মিছিল দেখলাম, বারকতক নেমে এসপ্ল্যানেড ট্রাম গুমটির বই-এর দোকানে ঘুরে এলাম, সচকিত হয়ে চলন্ত গাড়ির ভেঁপুতে কান রাখলাম, সব শেষে মন দিয়ে কাজ করতে লাগলাম নিজের চেয়ারে বসে। কিন্তু, আমি কিছুতেই বুঝতে পারলাম না, কেন একটা তীব্র বেদনায় আমি বার-বার অস্থির হয়ে উঠছি! মীনা খুশি হয় নি। মিঠুর প্রথম জন্মদিন আঁতুড়ে। দ্বিতীয় দ্বিধায়, আজ ওর তৃতীয় জন্মদিন। মীনার নিষেধ ছিল, ওকে নিয়ে আমরা কোনদিন বাড়াবাড়ি করব না। আমাদের একটা সন্তান আছে, এটা কোন মতেই যেন আমাদের মনে জায়গা করতে না পারে।

একটু সকাল সকাল বাড়ী ফিরলাম। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে মিঠুর কান্নার আওয়াজ কানে এলো। মনে হল বেশ কিছুক্ষণ ধরে কাঁদতে কাঁদতে এখন কান্নার মধ্যে একটু ঝিমুনি এসেছে। সুরের ছন্দে একটু মাত্রা বেড়েছে, মাঝে বিরতিও আছে। মীনা সিঁড়িতে শব্দ পেলেই বুঝতে পারে, কে আসছে। ভোরবেলা শুয়ে শুয়েই বলে, জমাদার এলো, ঝি এলো, ঠিকে-ঝি। কিম্বা জলওয়ালা 'এলো'। আমাদের খাবার জল রাস্তার কল থেকে আনতে হয়। বাড়ীর অন্য ভাড়াটেদের সঙ্গে সময় ভাগাভাগি করে জল তুলতে মীনার আপত্তি। কিম্বা যেদিন জলওয়ালার বদলে ঝি আগে আসে বা ঝি-এর আগে জমাদার আসে, সেদিনও মীনা ঠিক ঠিক বলে দিয়ে থাকে কে কখন এলো। যাই হোক মীনা দরজা খুলতেই মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম মা ও ছেলেতে কিছু একটা হয়ে গেছে, এবং এই কিছু একটার জন্য দায়ী আমি। মিঠুকে কোলে তুলে নিলাম। আমার বুকে মুখ গুঁজে কিছুক্ষণ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলল, 'মামণি আমাকে মেরেছে।'

'মামণি, তুমি ওকে মেরেছ কেন?' বলেই আমি মিঠুকে একটা চুমু খেয়ে বললাম 'মামণিকে বকে দিয়েছি, যাও একটু মামণিকে আদর করে দাও।' মীনার কোলে মিঠুকে দিয়ে আমি কিছু সময় এক কোণে বসলাম। সকালের কাগজটা এখনও পড়া হয় নি। কাগজের হেডিং-এ নানা-রকমের ব্যাপারে চোখ বুলোতে এক সময় লক্ষ্য করলাম মিঠু আর মীনাতে ভাব হয়ে গেছে।

ওদের বিরক্ত করতে মন চাইল না। মনে কয়েকটা কথা খুব দোল দিয়ে গেল। আজ মিঠুর জন্মদিন, ছেলেটাকে মীনা না কাঁদালেই পারত। দ্বিতীয়ত অনেক দিন পরে সকাল সকাল অফিস থেকে ফিরেছি। কম করে হলেও দু ঘন্টা আগে। অন্য দিন হলে মীনা খুশিকে তরল করে বলত, 'আজ কোন কাজ নেই বুঝি? বন্ধুদের আড্ডা, রাজনীতি, সব বুঝি আজ বন্ধ?' আজ তেমন ঘটল না। অবশ্য তেমন যে ঘটছে না, তা তো নিজের মনেই টের পেয়েছি সেই সকাল থেকে। ভিড় আর কোলাহলের মধ্যে সারাদিনই তো আলাদা হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি। মুখে-চোখে জল দিয়ে রান্না-ঘরের দিকে যেতে যেতে চোখ পড়ল পাশের ঘরে, ঘোড়াটা রয়েছে। লাগামের দড়িটা মাটিতে গড়াচ্ছে। নিজেই হিটারে চায়ের জল বসিয়ে, একটা সিগারেট ধরালাম। পুজোর বেশ কদিন দেরী এখনো। আকাশের দিকে তাকিয়ে মনে হল আলো কম, মেঘ জমেছে। বৃষ্টিও হতে পারে রাতের দিকে।

চায়ের পেয়ালা দুটো হাতে করে ঘরে গেলাম। বিছানার পাশে টেবিলের ওপর পেয়ালা দুটো রাখলাম। মনে হল মীনা ঘুমিয়ে পড়েছে। সাবধানে পিঠে হাত রাখতেই মীনা পাশ ফিরে আমার কোলের ওপর ওর মাথাটা তুলে দিয়ে, তারপর আমার হাত দুটো টেনে নিয়ে চোখ দুটো ঢাকল। আমি কোন কথা বললাম না। দেখলাম মিঠু ঘুমোচ্ছে। মৃদু আঙুলে মীনার কপালের বাঁ দিকটায়, খুব মাথা ধরলে সেদিকটার ওর শিরাটা নীল হয়ে ফুলে ওঠে, সেখানে টিপে ধরলাম। মীনা বলল, 'ওই ঘোড়াটা তুমি ফেলে দাও। কিম্বা পুরোনো দোকানে দিয়ে এসো।'

আমি ওর কথায় তক্ষুনি কোন জবাব না দিয়ে বললাম, 'চা খেয়ে নাও, জুড়িয়ে গেল। আর কি খাবে বল তো?' মীনা আরো ঘন হয়ে এলো, আমাকে দু হাতে টেনে বলল, 'কিছু না। শুধু তুমি আমার কাছে থাকো।'

আমি ওর মাথার চুলে হাত দিয়ে মুখটা কপালের ওপর ছুঁইয়ে বললাম, 'আমি কোথায় থাকি? চিরদিন কি তুমি অমনি ছোটই থাকবে মীনা!' বুঝলাম মীনা একটু হাল্কা বোধ করছে। উঠে চায়ের পেয়ালা টেনে নিল ঠোঁটের ওপর। সমস্ত শরীরটা ওর কনুইয়ে ভর দেয়া। চা ফুরোতেই আমি ওকে বুকের ওপর টেনে নিয়ে বললাম, 'চল একটু বাইরে কোথাও ঘুরে আসি।'

মীনা বলল, 'চল যাই। কবে যাবে?' ওর চোখ দুটো যেন জ্বলে উঠল। যেন এই মুহূর্তেই গেলে মীনার পক্ষে ভাল হয়। আমি মিনিট কয়েক কিম্বা ঘন্টা খানেকের জন্য ট্রামে-বাসে অথবা পায়ে হেঁটে কোথাও ঘুরে আসার কথা বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু মীনার আগ্রহ দেখে কথাটাকে ঘুরিয়ে নিলাম। বললাম, 'পুজোর পরেই চল কোথাও যাই কাছাকাছি।'

মীনা আর মিঠুকে ছেড়ে সারা সন্ধ্যা কোথাও গেলাম না। আর তাছাড়া আজকাল আমার মনে হয় ওরাই তো আমার সব। আমার অস্তিত্ব, আমার বেঁচে থাকার অর্থ সবই যেন ওই দুটো মানুষ। আসলে আমার কোন পরিচয় নেই, ওরা ছাড়া।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে গল্প করছিলাম। এক পাশে মীনা, এক পাশে মিঠু। বুঝতে পেরেছিলাম আজ মীনা ওর নিজের ওপর বিশ্বাস হারিয়েছে। সব বোঝা আমার ওপর তুলে দিয়ে মনের দিক থেকে ও একটু হাল্কা হতে চায়। সারাদিনের একটা বোবা কষ্ট কোনমতে নেমে গেছে মন থেকে। আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লাম। কতক্ষণ ঘুমিয়েছি ঠিক খেয়াল নেই। ঘুমটা ভেঙে গেল। রোজ মিঠু মীনার পাশে শোয়। আজ আমার পাশে শোয়াতে একটা চিন্তা ছিল মাথায় যে ঘুমের ঘোরে ওর কোথাও ব্যথা না লাগে পাশ ফিরতে গিয়ে। বোধহয় সেই জন্যই ওর গায়ে আমার হাতটা হঠাৎ পড়তেই ঘুমটা ভেঙে গেল। আমি এক পলক মিঠুকে দেখে নিলাম। না ঠিক আছে। ও ঘুমিয়েছে। নিচের দিকটায় হাত দিয়ে দেখলাম, না ভেজায় নি। তারপর অন্য পাশ ফিরতে গিয়েই দেখলাম মীনা তাকিয়ে আছে। আমাদের শোবার ঘরে মিঠু হবার পর থেকে সারারাত সব চাইতে কম ওয়াটের একটা নীল ডুম জ্বলে। আমি দেখলাম মীনার চোখে ঘুমের লেশমাত্র নেই। ও যে একটুও ঘুমিয়েছে, তার কোন চিহ্ন নেই। অপলক চোখে ও ওপরের দিকে তাকিয়ে আছে। কপালে চিন্তার রেখা স্পষ্ট। আমি ওকে কাছে টেনে নিলাম। পিঠের ওপর বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে ওর শিড়দাঁড়ার গাঁটগুলো খুব স্পষ্ট লাগল। মনে হল মীনা যেন খুব রোগা হয়ে গেছে। আমার অনেকরকম দুঃখ আছে মীনাকে নিয়ে। যেমন মীনা আমার হাতে পড়ে খুব কষ্টে

আছে। অর্থাৎ অন্য স্ত্রীরা স্বামীর ঘরে যেমন যত্নে থাকে, মীনাকে আমি তেমন রাখতে পারি না। এমনি আরও অনেক। হাতটা ধীরে ধীরে কাঁধের কাছে উঠে এসে একটু থামল, চুলের গোড়ায় আঙুলগুলো ডুবিয়ে দিলাম। মীনা খুব স্পষ্ট অথচ খুব ধীরে বলল, 'আমার একটা কথা রাখবে লক্ষ্মীটি?'

আমি বললাম, 'বল।'

'দিদির ছেলেটাও তো মিঠুর মতই মাস ছয়েকের বড়। আমি বলি ওই খেলনাটা ওকেই দিয়ে দাও না। ও হবার পর একটা কিছু তো দেওয়া উচিত ছিল আমাদের।' সামান্য আলোয় মীনার চোখের মণিদুটো মনে হল বড্ড করুণ। আমি বললাম 'তুমি মিছিমিছি এত ব্যাকুল হয়েছ, তোমার যা খুশি তাই হবে। আমি মিঠুকে না হয় অন্য একটা খেলনা কিনে দেব।'

পরদিন আমি যখন অফিস থেকে বাড়ি ফিরলাম তখন মিঠুর গায়ে বেশ জ্বর। মীনা বলল, আজকেও সেই কাঁদতে কাঁদতে জ্বর এসেছে। আমি যখন সকালে বাজারে যাই মীনা চেয়েছিল তখনই ঘোড়াটাকে ওখান থেকে সরিয়ে ফেলে। মিঠু ঘুম থেকে উঠেই ঘোড়ার পিঠে চেপেছিল, আর হাতের মুঠোয় লাগাম চেপে সামনে-পিছনে দুলছিল। সকালবেলাই ছেলেটাকে আর কাঁদাতে মন সরছিল না। তাই বলেছিলাম, 'দুপুরে যখন খেয়ে ঘুমাবে তখন না হয় ওটাকে সরিয়ে দিও।'

আমি দেখলাম ওটাকে মীনা ঘর থেকে সরিয়ে দেড়তলায় যেখানে সিঁড়ির ওপর একটা জঞ্জাল ফেলার খুপড়ি আছে সেখানে রেখে দিয়েছে। মীনা বলল, সেই যে ছেলে জিদ ধরেছিল, কিছুতেই থামাতে পারি না। শেষকালে মেরেছি।

মিঠু অচেতনভাবে বলল, 'মা, মাথা ব্যথা।'

'একটা পেয়ালায় একটু জল আর এক-টুকরো ন্যাকড়া দেবে এনে?' আমি বাক্স থেকে পুরোনো ধুতির একটু ছিঁড়ে মীনার হাতে দিলাম, পেয়ালায় জল এনে দিলাম।

মনটা কেমন যেন লাগল। সাংসারিক নানা ঝামেলার মধ্যে যেগুলোকে বুদ্ধি দিয়েও অতিক্রম করা যায় না, সেখানে খুব অসহায় মনে হয়। মনে হয়, যাকে সামনে দেখি সে যতই দুর্বোধগম্য হোক না কেন আমি অন্তত চেষ্টা করতে পারি, কিন্তু কতকগুলি জায়গায় আমরা তো একেবারেই অসহায়।

আবার থার্মোমিটার দিলাম। একশো তিন, সাড়ে তিন—চার। আমরা দুজনে দুজনের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। ডাক্তার এলো। ইনজেকশন দিল, ওষুধ দিল, তার-পর চলল মাথায় আইস ব্যাগ। মীনা মিঠুর মুখের ওপর মুখ নিয়ে ঠায় বসে রইল। সকালের রান্না ছিল সব। কয়েকবার মীনাকে অনুরোধ করলাম খেতে। অন্যদিন হলে জোর করে টেনে নিয়ে খেতে বসতাম, কিংবা থালায় করে মেখে এনে বলতাম খেয়ে নাও। এমন দিনও গেছে, মীনা ঘুমজড়ানো চোখে আমার হাতের ভাতগুলো চিবিয়ে চলেছে। একবার এক গরাস মিঠুর মুখে অন্যটি মীনার। আজ মীনা বলল, 'তুমি খেয়ে এসো দুটো, সারাদিন খাটাখাটুনি, রাতে না-খেয়ে থেকো না।' মুখে কিছু কথা জোগালো না। সাবধানে উঠে মিঠুর পায়ের কাছে বসলাম।

'তোমাকে একটা কথা বলব ভাবছিলাম।' মীনা জলপটিতে পাখার হাওয়া দিতে দিতে বলল।

মীনার মুখের দিকে তাকাতেই মনে হল, মীনা কাঁদছে। বলল, 'কাল সারারাত ঘুমাতে পারিনি। আমার কেবল মনে হয়েছে ও ঘরে ঘোড়ার পিঠে কে যেন বসে হুট্‌ হুট্‌ শব্দ করছে, আর দোল খাচ্ছে। একবার নিজের মনকে বোঝাতে না পেরে উঠে গিয়ে দেখে এসেছি সারা ঘরে কেউ নেই।

'আমাকে ডাকোনি কেন?'

তোমাকে বললেই কি তুমি বিশ্বাস করতে? ভেবেছিলাম মনের ভ্রম, আপনা থেকেই মিটে যাবে। সকাল থেকে রান্নাঘরে বসেও আমার তাই মনে হয়েছে। মিঠু যখন ওঘরে ছিল না তখনও তাকিয়ে মনে হয়েছে ঘোড়াটা দুলছে। লাগামটা টানা ওপরের দিকে উঠে গেছে, আর টান লাগছে সামনে পিছনে।'

কতকগুলো ক্ষেত্রে মানুষ বোধ হয় কিছু অলৌকিককেও বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়। যুক্তি তর্ক দিয়ে নিজেকে যতই বেঁধে রাখি না কেন, চৈতন্যের যেরটেপ ডিঙিয়ে স্নেহ বাৎসল্য বা প্রিয়জনকাতরতা সেই অলৌকিক ভয় বা অকল্যাণের মুখ একবার দেখেই। আমিও মীনার চোখের মধ্যে সকালের ঘোড়ার সেই সওয়ারবিহীন চলুনি প্রত্যক্ষ করলাম।

সমস্ত রাত জ্বরের ঘোরে মিঠু পড়ে রইল। দামাল ছেলেটা একেবারে নির্জীব শান্ত। যেন কখনোও এতটুকু দুষ্টুমি করে নি। কতবার ওর মুখের কথা শোনার জন্য আদর করে ডাকলাম, এটা ওটা দেখালাম। কিন্তু কোন সাড়া নেই। খুব চেষ্টা করলে একআধবার কোনও ক্রমে চোখ তুলে তাকিয়ে একটু হাসল মাত্র। সকাল হবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হল জ্বরের তাপ একটু কমের দিকে।

আস্তে আস্তে উপসর্গগুলো সরে যেতে লাগল। মিঠুকে অনেক স্বাভাবিক মনে হল। সকালের কাজ একে একে শেষ হল।

গুণে-গন্ধে অতুলনীয়......
বেঙ্গল কেমিক্যালের
ক্যান্থারাইডিন
হেয়ার অয়েল
প্রতিদিন ব্যবহারে চুল চটচটে হয় না—চুলের গোড়া শক্ত হয় ও চুল-ওঠা বন্ধ করতে সাহায্য করে।
বেঙ্গল কেমিক্যাল

জলওয়ালা, ঝি, দুধওয়ালা, জমাদার সব একে একে চলে গেল। আমি বাজারের থলে হাতে বেরিয়ে পড়লাম। একটু মাছ, সামান্য তরকারী, খবরের কাগজ সব নিয়ে যখন ফিরলাম তখন মীনা আর মিঠু ঘুমুচ্ছে। উনুনে আঁচ দিয়ে চা বানিয়ে একেবারে মীনার মুখের সামনে এগিয়ে দিলাম।

কিন্তু যতবার আমি শোবার ঘর থেকে রান্নাঘরে আর রান্নাঘর থেকে শোবার ঘরে যাতায়াত করেছি ততবারই মনে হয়েছে ঘোড়াটা এখনো ও ঘরে রয়েছে। তেমনি সামনে-পিছনে দোল খাচ্ছে। আর একটা আবছা শব্দ কানে এসে লাগছে। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়েও গেছি দরজার সামনে। পরক্ষণেই নিজের ভুল ধরা পড়েছে।

বেলা দশটার পর থেকে মিঠুর জ্বর আবার ওপরের দিকে উঠতে লাগল। এক-দুই-তিন-সাড়ে তিন চার সাড়ে চার পাঁচ। শেষ দিকটায় পারদের গতির দিকে আমি আর তাকাতে পারিনি। মীনা খুব স্থির হয়ে গেছে, কালকে যেমন ও চঞ্চল হয়ে উঠেছিল আজ সেই চঞ্চলতা থিতিয়েছে। সে জায়গায় আমার মনেই যেন কোথায় ঝড় তোলপাড় শুরু করেছে। অর্থাৎ কাল যে জায়গায় মীনা ছিল সেখানে আজ আমি, আর মীনা এসে দাঁড়িয়েছে আমার কালকের জায়গায়।

থার্মোমিটার চোখের সামনে ধরে মীনা বলল, 'একশো পাঁচ পয়েন্ট ছয়।' থার্মোমিটার জলের গেলাসের মধ্যে চুবিয়ে মীনা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'একবার ডাক্তারের কাছে গেলে হয় না? 'মীনার কন্ঠস্বরে তেমন উত্তাপ নেই। যেন আনলে ভালো হয় কিংবা আনতে হবে কিনা সেটা সম্পূর্ণই আমার বিবেচনার ওপর আজ মীনা ছেড়ে দিয়েছে। অন্যদিন হলে আমার গড়িমসি দেখলে হয়ত ও নিজেই বেরিয়ে যেত ডাক্তারের খোঁজে।

ডাক্তার এলেন, চিন্তিত মুখে বেরিয়ে গেলেন কিছু ওষুধ আর ইনজেকশন দিয়ে। বললেন, 'এ বেলাটা দেখে দরকার হলে হসপাতালে নিয়ে যাবেন।'

আমি ব্যাগ নিয়ে ডাক্তারের সঙ্গে রাস্তা পর্যন্ত গিয়েছিলাম। ফিরে আসতেই মীনা বলল, 'মিঠু আজকেও খুব কেঁদেছে সকালে। এই মাত্র আবার কাঁদছিল, তুমি ঘোড়াটাকে ওখান থেকে এনে এই বিছানার সামনেটায় রাখো।'

মীনার কোন কথারই বিশেষ প্রতিবাদ আমি করি না। একবার শুধু ওর মুখের দিকে তাকালাম, তারপর গিয়ে ওটাকে এনে মিঠুর কাছে রাখলাম। ওই জ্বরের তাড়সেও মিঠু একটু হাসল। তারপর হাত বাড়িয়ে লাগামের দড়িটা মুঠো করে নিয়ে পাশ ফিরে চোখ বুজল। মীনাও যেন একটু স্বস্তি বোধ করল। কিন্তু আমার বুকের মধ্যে কোথা থেকে একটা অজানা-অচেনা আশংকা এসে বার কয়েক পাখা ঝাপটিয়ে চলে গেল।

একটা নাগাদ সব শেষ।

শেষ সময় ছেলেটা খুব অস্থির হয়ে উঠেছিল। ঘোড়ার দিকে তাকিয়ে বার বার কাকে উপলক্ষ্য করে চেঁচিয়েছে, ধমক দিয়েছে, নামতে বলেছে। দু-একবার বিকারের ঘোরে নিজেই ঘোড়ায় চাপবে বলে বিছানার ওপর উঠে বসেছে। পৌনে একটা নাগাদ ছটফট করছে। চোখ দুটো দেখে মনে হয়েছে এখুনি ঠিকরে বেরুবে। একটা কয়েক মিনিটে সব শেষ হয়ে গেছে, সব মিটে গেছে।

ডাক্তার ডেথ সার্টিফিকেট লিখে গেছেন, টিটেনাস।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে মিঠুর কথাই ভাবছিলাম। ওর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি দিন আমার ডায়েরীর পাতায় না লেখা সত্ত্বেও স্পষ্ট মনে আছে। পাশে মীনা ঘুমিয়ে পড়েছে। দুটো রাত ও একবারে চোখের পাতা বোজেনি। ওর মুখের দিকে তাকাতে চেষ্টা করলাম একবার, ভালো দেখতে পেলাম না। ডুমটা আজ অনেকদিন পরে জ্বালাবার আর প্রয়োজন হয়নি। মিঠু এ বাড়িতে আসবার দিন থেকে ওটা সারা রাত জ্বলেছে। আজ এই প্রথম ওটা নিভেছে। আমার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু মীনাই বলল, 'না না ওটা নিভিয়ে দাও, কোন প্রয়োজন নেই। কি হবে আর!' আলনায় হাত দিয়ে সেখানে রাখা মিঠুর শোলার টুপিটা হাতে নিলাম, নাড়তে নাড়তে ওর মাথার তেলের গন্ধ নাকে এসে লাগল। সামনে দেয়ালে ওর একমাত্র ছবিটা ঝুলছে। অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু ফ্রেমের মধ্যে ওর চিরস্থায়ী হাসিতে ভরা মুখটা আমার চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠল। তারপর চোখ গেল দরজার দিকে, আর পাশাপাশি জানালায়। দরজা বন্ধ। খোলা জানালার ভিতর দিয়ে বাইরের জ্যোৎস্নার রেশ ভিতরে এসেছে। বিছানা আর জানালার মাঝখানে কিছুটা জায়গা ফাঁকা। জানালার সামনে দেয়াল ঘেঁষে কখন এক সময় কাঠের ঘোড়াটাকে ঠেলে দিয়েছিলাম। ভিতরে আসা আলোর আভাসে সেটা চোখে পড়তেই শিরশিরে একটা শিরশির ভাব আমার মাথা থেকে সমস্ত শরীরে খেলে গেল। খোলা জানালাটাকে একটা ফ্রেমের মত দেখাচ্ছে। বোধ হয় একটু ভয়ই পেয়েছি। আমি মীনাকে ডাকতে যাব, কানে এলো খুট খুট শব্দ। মনে হল, কাঠের ঘোড়াটা সামনে পিছনে দুলছে। মনে হল, ঘোড়ার পিঠে বসে লাগাম হাতে মিঠু ওর পেটের দুপাশে পা ঠুকছে জুতো শুদ্ধ। আমার চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে যেতে চাইল। কপালে হাত দিয়ে মনে হল খুব ঘেমে গেছি। সারা শরীরে দরদরে ঘাম, গেঞ্জি ভিজে উঠেছে ঘামে। মীনাকে ডাকতে পারলাম না, গলার স্বরে অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করলাম। বিছানার ওপর উঠে বসলাম। ঘোড়ার পিঠে তখন আমার চোখদুটো গেঁথে রয়েছে। মিঠুকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তার পিছনে মিঠুর মতই, একটু বড়, আর একটি ছেলে। মিন্টু —মিন্টু আমার প্রথম সন্তান। ঠিক ছ মাসের মাথায় এই টিটেনাসেই মারা গিয়েছিল। আমি চীৎকার করতে যাব, দেখলাম, স্পষ্ট দেখলাম ঘোড়াসুদ্ধ ওরা দুভাই আমাদের বিছানার দিকে এগিয়ে আসছে। ঘোড়ার খুরের শব্দ পর্যন্ত সারা ঘরে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আমি আর থাকতে না পেরে মরীয়া হয়ে বিছানা থেকে নেমে কাঠের ঘোড়াটাকে দু হাতে সজোরে তুলে মেঝেতে আছাড় মারলাম। মনে হয় একটা ঘোড়ার মৃত্যু-চীৎকার আর দুটি শিশুর সশব্দ হাসির সঙ্গে কাঠের ঘোড়াটা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে ছড়িয়ে পড়ল সারা মেঝেতে।

ঝন ঝন করে ঘরের যাবতীয় জিনিসপত্তর কেঁপে কাঁকিয়ে উঠল। মীনা ধড়মড়িয়ে বিছানায় উঠে কোন কিছু না বোঝার আগেই চেঁচিয়ে উঠল, 'কে? কে? কি হল!! তুমি কোথায়? আলো কোথায়?' নিমেষে বিছানা থেকে নেমে সুইচে হাত দিল। আলো জ্বলে উঠতেই দেখল, আমি মীনার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে উত্তেজনায় ঠকঠক করে কাঁপছি সারা মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম। সারা ঘরের বিধ্বস্ত অবস্থা। আমার হাতের আঙুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত কথা বলতে চাইছে। কিন্তু পারছি না। মীনা আমাকে পিছন থেকে দু হাতে জাপটে বিছানায় নিয়ে শুইয়ে দিল। মাথায় ঠান্ডা কিছুর স্পর্শ অনুভব করলাম। বোধ হয় মিঠুর জন্য সকালের দিকে যে বরফ এনেছিলাম তাই। সারা রাত আমি আর কিছু জানি না।

সকালবেলা ঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে মীনা আমাকে ঘোড়ার দেহাবশেষের দুটো টুকরো দেখাল। তা থেকে আমি এই সিদ্ধান্তে এলাম যে, ঘোড়াটি আসলে পুরোনো, রং করে বিক্রী করা হয়েছে।



আমার কালের আমার দেশ

সুধীরচন্দ্র সরকার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আর একজন সুপণ্ডিত সাহিত্যিক বন্ধুর নাম এখানে উল্লেখ করা দরকার—তিনি হলেন প্রমথনাথ বিশী। এ'র সঙ্গে পরিচয় আমার দীর্ঘদিনের ধরতে গেলে রাজসাহী থেকে কলকাতায় এসে যখন তিনি প্রথম সাহিত্য সাধনায় ব্রতী হন তখন থেকেই। রবীন্দ্র-সাহিত্যে ও বঙ্কিম-সাহিত্যে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য। বঙ্কিম-সাহিত্য সম্বন্ধে বর্তমানে তিনিই একমাত্র authority বলা চলে।

আগে ইনি মেট্রোপলিটান কলেজ ও সুরেন্দ্রনাথ কলেজে অধ্যাপক ছিলেন—পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যের প্রধানরূপে ছিলেন। বর্তমানে 'আনন্দবাজার' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত আছেন—'আনন্দবাজার' পত্রিকায় নিয়মিত কমলাকান্তের দপ্তর লিখে তিনি প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছেন।

সমালোচনা ও শ্লেষাত্মক রচনায় (Satire) বর্তমানে তাঁর জুড়ি মেলা ভার।

যে সব সাহিত্যিক বন্ধুর কথা আগে বলেছি তাঁরা ছাড়া আরও যাঁরা আমার স্মৃতিপটে এসে ভিড় করছেন তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেণীর লোক আছেন যেমন শিল্পী, চিত্রপরিচালক, চিত্রনট প্রভৃতি। এঁদের কারুর সঙ্গে পরিচয় হয় নিবিড়, কারুর সঙ্গে সামান্য এবং কারুর সঙ্গে হয় একদিনের আলাপ মাত্র। কিন্তু সকলেই স্মৃতির পর্দায় যে দাগ কেটে গেছেন সে দাগ হয়ত কিছু কিছু মুছে গেছে—সেটা আমার ইচ্ছাকৃত নয়। তাই এখনও অবসর মুহূর্তে যাঁদের মুখগুলি মনের পর্দায় উঁকিঝুঁকি মারে তাঁদের সম্বন্ধে দু-চার কথা না বলে আমার স্মৃতিচারণের যবনিকা টানতে পারছি না।

প্রথমে ধরা যাক ভারতীয় চিত্রজগতের একটি অতিপরিচিত ব্যক্তি—দেবকীকুমার বসু। তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ দীর্ঘ দিনের। সবাক চিত্রযুগের প্রথম দিক থেকে কিছুদিন আগে পর্যন্ত তাঁর পরিচালনায় যে সব ছবিগুলি আমরা দেখেছি সেগুলি সব দিক থেকেই স্মরণীয়—উপস্থাপনায়, বিষয়-বৈচিত্র্যে এগুলি ছিল যেমন অভিনব, তেমনি শিল্পকলা-ধর্মী। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, কবি, সোনার সংসার, ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, মীরাবাঈ, রত্নদীপ, চিরকুমার সভা প্রভৃতি। বৈষ্ণব-সাহিত্য নিয়ে তিনি প্রচুর পড়াশুনা করেছেন। রবীন্দ্রশতবার্ষিকী উৎসবে তিনি কয়েকটি রবীন্দ্রকাহিনীও প্রযোজনা করেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং রস-পরিবেশনার কৃতিত্ব আমাকে মুগ্ধ করে। বর্তমানে তিনি চিত্র-নির্মাণের ক্ষেত্র থেকে একরকম অবসর নিয়েছেন। তা হলেও বাংলা তথা ভারতীয় চিত্র-জগৎ কোনদিন দেবকীবাবুকে বিস্মৃত হবে না, তার কারণ ভারতীয় চিত্রজগৎকে পরিপুষ্ট করতে তাঁর অবদান অনেকখানি।

এই সূত্রে আর একজনের কথাও না বলে পারছি না—তিনি হলেন বাংলা চিত্র-জগতের স্বনামখ্যাত গায়ক-অভিনেতা পাহাড়ী সান্যাল। তিনি সুদর্শন, সুঅভিনেতা এবং সঙ্গীতে সুপণ্ডিত বলে সর্বজন-স্বীকৃত। তাঁর বহু ছবি আমি দেখেছি এবং মুগ্ধ হয়েছি। বাংলা হিন্দি, ইংরাজী ছাড়াও তিনি ফরাসী ও জার্মান ভাষাও খুব ভাল জানেন। প্রথম জীবনে তিনি বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে যান, কিন্তু সেখানে বিশেষ সুবিধে করতে না পারায় চলে যান লক্ষ্ণৌ-এর মরিস কলেজে সঙ্গীত শিক্ষা করতে। কবি অতুল-প্রসাদের সংস্পর্শে এসে তিনি অতুল-প্রসাদের গান খুব ভাল রপ্ত করেন।

মানুষ হিসাবে তিনি খুব আমুদে এবং আসর জমাতে ওস্তাদ। সব ব্যাপারে তিনি আনন্দের প্রয়াসী। তাঁর দিলখোলা মেজাজ এবং হাসি-খুশী স্বভাবের জন্য যে কোন লোককে সহজেই তিনি আপনার করে নিতে পারেন।

আগেকার দিনের সুলেখিকা প্রিয়ংবদা দেবীর একখানি ছেলেদের বই আমরা প্রকাশ করি তাতে নন্দলাল বসু ছবি এঁকে দিয়েছিলেন। ইনি হলেন প্রমথ চৌধুরী ও আশুতোষ চৌধুরীর ভগিনী প্রসন্নময়ী দেবীর কন্যা।

শিশুসাহিত্যজগতে খগেন্দ্রনাথ মিত্র নাম বিশেষ সুপরিচিত। ছেলেদের গল্প লিখে তিনি রাশিয়া থেকে পুরস্কার পেয়েছেন। 'মৌচাকে'র ইনি নিয়মিত লেখক। রাজশেখর বসু মহাশয়ের ইনি বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। আমাদের প্রকাশন-সংস্থা থেকে প্রকাশিত চলন্তিকার যাবতীয় প্রুফ ইনি দেখে দিয়েছিলেন।

'মৌচাকে'র আর একজন নিয়মিত লেখক হলেন বিমল দত্ত। ইনি বেশীরভাগই হাসির গল্প লেখেন। শিশুসাহিত্যজগতে এ'র লেখা 'শিং খুড়ো' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বিশ্বভারতীর ভূতপূর্ব সেক্রেটারী চারু ভট্টাচার্যের সঙ্গে আমার বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। তিনি প্রথম জীবনে ছিলেন প্রেসিডেন্সী কলেজে বিজ্ঞানের অধ্যাপক। সেই সময় আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুকে তাঁর গবেষণার কাজে যথেষ্ট সাহায্য করেন। পরে তিনি বঙ্গীয় প্রকাশক সমিতির সভাপতি হন। শেষবয়সে ইনি 'বসুধারা' মাসিক পত্রিকার সম্পাদকরূপে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অন্যতম দিক-পাল ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার আলাপ হয় বহুদিন আগে যখন তিনি সুকিয়া স্ট্রীটে বাস করতেন। সে আজ প্রায় অর্ধশতাব্দী হতে চলল। ইউ-নিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে যখন নাট্যাচার্য শিশির-কুমার অভিনয় করতেন, সেই তখন থেকেই সুনীতিবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়। 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের পোষাক-পরিচ্ছদের পরিকল্পনা তিনিই করেছিলেন। এই সুদীর্ঘ কালের ব্যবধান সত্ত্বেও তাঁর সঙ্গে আমার প্রীতির সম্বন্ধ আজও অটুট আছে।

আমার আর একজন প্রিয় বন্ধু হলেন ডাঃ নির্মল সরকার। ইনি শুধু সাহিত্য-রসিক নন, সাহিত্যিক হিসাবেও তাঁর বিশেষ পরিচিতি আছে। ডিটেকটিভ গল্প লেখাতে তাঁর মুন্সিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর একটি মহৎ গুণ হল কোন সাহিত্যিকের অসুখ বিসুখ করলে তিনি সানন্দে তার চিকিৎসা করেন, কোনরকম প্রতিদানের প্রত্যাশা না করেই।

অধুনালুপ্ত 'বাতায়ন' পত্রিকার সম্পাদক অবিনাশ ঘোষাল ছিলেন আমার আর একজন অন্তরঙ্গ সুহৃদ। অবিনাশবাবু প্রথম জীবনে ওকালতি করতেন, তারপর ওকালতি ছেড়ে দিয়ে পুরোপুরিভাবে সাংবাদিকতা এবং সাহিত্যচর্চা করেন। তাঁর সম্পাদনায় 'বাতায়ন' এক সময় অসম্ভব খ্যাতি অর্জন করেছিল।

১৯১৮ সালে আমরা Book & Bar Diary বার করি এর সম্পাদক ছিলেন দার্জিলিং-এর রায় বাহাদুর এম এন ব্যানার্জী। তারপর ১৯১৮ সালে 'ঘোষেস ডায়েরী' নাম দিয়ে একটি ডায়েরী প্রকাশিত হয়, তার সম্পাদক ছিলেন জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ এবং সেটা আমরাই প্রকাশ করি ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত। তারপর জ্ঞানবাবুর মৃত্যুর পর কয়েক বছর উপরোক্ত নামেই আমরা 'ডায়েরী' বের করি, যদিও এই 'ডায়েরী' প্রকাশ করে লাভ বিশেষ কিছুই হয়নি। তবে সুনাম যথেষ্ট পেয়েছিলাম। তারপর আমরা বের করি 'সরকারস ডায়েরী'। এই ডায়েরীটি এখন পর্যন্ত বিশেষ সুনামের সঙ্গে আমাদের প্রকাশন-সংস্থা থেকে প্রকাশিত হচ্ছে।

'মৌচাকে'র আর একজন লেখিকা হলেন ইন্দিরা দেবী। ইনি বহু পত্রিকার সঙ্গে



শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের বাগান বাড়ীতে একটি প্রীতি অনুষ্ঠানে গৃহীত চিত্রে দাঁড়িয়ে বামদিক থেকে হেমেন্দ্রকুমার রায়, প্রভাতকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, বিশ্ব মুখোপাধ্যায়, ভবানী মুখোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, সুপ্রিয় সরকার, নরেন্দ্র দেব, হিতেন্দ্রমোহন বসু, তুষারকান্তি ঘোষ, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, উদয়চাঁদ দত্ত, প্রাণতোষ ঘটক, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, সুধীরচন্দ্র সরকার। বসে আছেন বামদিক থেকে পার্বতী সরকার, অনিমা সরকার, রাধারাণী দেবী, রীতা ঘোষ এবং শুভ্রা ঘোষ।

যুক্ত। দীর্ঘদিন ধরে অল ইণ্ডিয়া রেডিওর সঙ্গেও যুক্ত আছেন। 'মধুদিদি' নাম দিয়ে 'মৌচাকে' চিঠিপত্র লেখেন।

যেসব বিখ্যাত শিল্পীদের সঙ্গে আমার হৃদ্যতা জন্মে তাঁদের বিষয় কিছু কিছু বলছি। আমি এখানে তাঁদের কারু শিল্পকলা নিয়ে আলোচনা করছি না—তাঁদের শুধু আমার অন্তরের প্রীতি জানাবার জন্যেই নামোল্লেখ করছি।

এঁদের মধ্যে প্রথমেই মনে পড়ে শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর কথা। তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয় রামকৃষ্ণ মিশনের গণেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী মহারাজের মাধ্যমে। নন্দলাল বসুর একখানা শিল্প-পুস্তক আমরা প্রকাশ করি—তার নাম 'রূপাবলী'। বইখানি খুবই জনসমাদর লাভ করে।

লক্ষ্মৌ আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ অসিতকুমার হালদার আমার বিশেষ বন্ধু। তাঁর এক মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ আমি করে দিই সৌরীন্দ্রমোহনের পুত্র সৌম্যেন্দ্রর সঙ্গে।

এঁরা ছাড়াও আর যেসব শিল্পীর সঙ্গে আমার বিশেষ অন্তরঙ্গতা জন্মে তাঁরা হলেন এলাহাবাদ আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপাল ললিতমোহন সেন, বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রচার-শিল্পী ও রাজশেখর বসুর সমস্ত বইগুলির যিনি অঙ্গসজ্জা করেছিলেন সেই যতীন সেন, পূর্ণ ঘোষ, প্রচারশিল্পী ও কার্টুনিস্ট বিনয় বসু, 'ওমর খৈয়ামের' চিত্রকর হিতেন বসু (ইনি হলেন চিত্রপরিচালক নীতীন বসুর দাদা এবং কুন্তলীন ও দেলখোস নির্মাতা এইচ বসুর পুত্র), পোর্ট্রেট-শিল্পী অতুল বসু, আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ মুকুল দে প্রভৃতি।

আমার আর একজন অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন অবনী মিত্র (কানুবাবু)। প্রতিদিন আমাদের দোকানে আসা তাঁর চাই-ই। এমন কি বৃদ্ধবয়সে পক্ষাঘাতে তিনি চলৎশক্তিরহিত হয়ে যান—কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর বাড়ীর লোকেরা ধরে ধরে নিয়ে আসতেন তাঁকে আমাদের দোকানে—এমনই ছিল তাঁর টান আমার ওপর। আজ তিনি আর ইহজগতে নেই, কিন্তু তাঁর সেই মধুর স্মৃতি আজও আমার মনে অম্লান হয়ে আছে।

স্বর্গত সুরেশচন্দ্র মজুমদারের (সুরেশবাবু) নাম রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এবং সাংবাদিক-জগতে বিশেষ সুপরিচিত। বাল্যকালে তিনি কৃষ্ণনগর থেকে চলে আসেন কলকাতায় বাস করতে। প্রথম জীবনে লক্ষ্মী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস নামে সুকিয়া স্ট্রীটের এক ছাপাখানায় কয়েক মাস কাজ করেছিলেন, সেই সময় শ্যামবাজারের বিখ্যাত উকীল কিশোরীলাল সরকারের পুস্তক প্রকাশ করে বিক্রয় করেন। আমার যতদূর মনে পড়ে ১৯১৫ সালে অমৃতবাজার পত্রিকায় মৃণালকান্তি ঘোষের সাহায্যে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসের প্রতিষ্ঠা করেন। এই শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসেই প্রথম ইংরাজী ও বাংলা লাইনো টাইপের প্রবর্তন করেন রাজশেখর বসু ও শিল্পী যতীন সেনের সহযোগে। সেই সময় থেকেই সুরেশবাবু কংগ্রেসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত একজন অতি উৎসাহী নেতা হয়ে পড়েন। সুরেশবাবু বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (বাঘা যতীন) বিশেষ বন্ধু ছিলেন। বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত থাকার দরুন তিনি কয়েকবার কারাবরণও করেছিলেন।

আজকের বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক আনন্দবাজার ও সাপ্তাহিক দেশ তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন। ইংরাজী দৈনিক হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড-এর প্রতিষ্ঠাতাও তিনি। মানুষ হিসেবে তাঁর অমায়িক ব্যবহার কোনদিনই ভুলতে পারব না।

আর একজন বিপ্লবীর নাম এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে তিনি হলেন কিরণ মুখোপাধ্যায়। ইংরাজ আমলে বহু পুলিশী নির্যাতন তিনি সহ্য করেছেন—এমন কি উৎপীড়নের ফলে পড়ে তিনি সোজা হয়ে বসতে পর্যন্ত পারতেন না। তিনি তাঁর গুরু স্বামী প্রজ্ঞানানন্দর নামে একটি লাইব্রেরী স্থাপন করে দেন সেটি এখনও আমাদের দোকানের কাছেই রয়েছে। এই পাঠগৃহটির বর্তমান পরিচালক হলেন সরস্বতী প্রেসের শৈলেন গুহরায় মহাশয়। এই লাইব্রেরী স্থাপনে আমি তাঁকে আমার সাধ্যমত বই ও অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছিলাম।

ইম্পিরিয়াল আর্ট কটেজের স্বত্বাধিকারী ধীরেন ধর, হাস্যরসিক দাঠাকুর, কবি জসীমউদ্দীন, বিপ্লবী ও সাংবাদিক মন্মথ সেন, কবি ও 'অমৃতে'র সহসম্পাদক মণীন্দ্র রায় এঁরাও আমার জীবনের চলার পথে নানাভাবে জড়িয়ে আছেন।

আর একজন চৌকষ ব্যক্তির কথা আজ আমার এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে, তিনি একাধারে ক্রিকেট-খেলোয়াড়, ভালো ফটোগ্রাফার এবং সাহিত্যিক। শিশুসাহিত্য-জগতে তাঁকে সকলেই চেনে, ইনি হলেন কুলদারঞ্জন রায়। এঁর বত্রিশ সিংহাসন, রত্নদ্বীপ, আশ্চর্য দীপ শিশুমহলে খুবই সমাদৃত—তা ছাড়া প্রাচীন সাহিত্য থেকে ছোটদের উপযোগী করে বহু গল্প লিখেছেন।

আমার দোকান এবং প্রকাশনার ব্যাপারে যাঁরা আমার যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন তাঁদের কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে। বহুভাবে তাঁরা আমার জীবনের চলার পথকে সহজ ও সরল করেছিলেন—তাঁরা হলেন অপূর্ব বাগচী, অশোক গুপ্ত, অমর দেব, নলিনী রায়চৌধুরী, পরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রভৃতি।

সকলের কথাই মোটামুটি বলা গেল বলিনি শুধু একজনের কথা—অথচ তাঁর কথাই আমার সর্বাগ্রে বলা উচিত ছিল, কারণ আমার এই পৃথিবীতে আসার মূলে তিনিই। হ্যাঁ, আমি আমার মার কথাই বলছি। তিনি ছিলেন বহরমপুরের কৃষ্ণনাথ কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক আনন্দচন্দ্র সরকারের কন্যা মনোমোহিনী দেবী। মার কথা সবশেষে বলার কারণ হোল যে মাতৃ ঋণ তো কখনও শোধ করা যায় না — আর তাঁর স্নেহ-ভালবাসা, শাসন-অনুশাসনের গভীরতার পরিমাপও করা যায় না। ৮০ বছর বয়সে তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন পৃথিবী থেকে—কিন্তু চোখ বন্ধ করে মনের গভীর অতলে খুঁজে দেখলে দেখতে পাই তাঁকে—তাঁর সেই সদাহাস্যময় স্নেহ-মধুর মূর্তিতে। আজ আমি তাঁকে প্রণাম জানাই আমার স্মৃতিচারণ শেষ করার প্রাক্কালে।

(আগামীবারে সমাপ্য)

বিজ্ঞানের কথা

শুভঙ্কর

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৫৫তম অধিবেশন

বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে এবছর (১৯৬৮) পুণ্যতীর্থ বারাণসীতে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৫৫তম অধিবেশন ৩ জানুয়ারী থেকে শুরু হয়েছে এবং ৯ জানুয়ারী পর্যন্ত এই অধিবেশন চলবে। এবারকার অধিবেশনে মূল সভাপতিপদে বৃত হয়েছেন বৈজ্ঞানিক ও শ্রমশৈল্পিক গবেষণা সংস্থার অধিকর্তা খ্যাতনামা বিজ্ঞানী ডঃ আত্মারাম। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী অধিবেশনের উদ্বোধন করেছেন এবং বিদেশের বহু বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এই উপলক্ষে সমবেত হয়েছেন।

মূল সভাপতি ডঃ আত্মারাম ভারতের অন্যতম খ্যাতনামা কৃতী বিজ্ঞানী। তিনি ১৯০৮ সালের ১২ অক্টোবর উত্তরপ্রদেশের বিজনোর জেলার পালানায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ছাত্রজীবন কৃতিত্বে সমুজ্জ্বল। ১৯৩১ সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করে এম-এস-সি ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৩৬ সালে ঐ একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আলোক-রাসায়নিক বিক্রিয়ার ভৌত রসায়ন সম্পর্কে তাঁর মৌলিক গবেষণার জন্য তিনি ডি-এস সি ডিগ্রীতে ভূষিত হন।

১৯৩৬ সালে ডঃ আত্মারাম ভারতীয় শ্রমশৈল্পিক ব্যুরোতে যোগদান করেন এবং এই ব্যুরোই ১৯৪২ সালে ভারতীয় বৈজ্ঞানিক ও শ্রমশৈল্পিক গবেষণা সংস্থায় পরিণতি লাভ করে। এখানে তিনি পেট্রোল-সঞ্জাত অগ্নি নিয়ন্ত্রণের জন্যে বায়ু-বুদ্বুদ দ্রব প্রস্তুত করা সম্পর্কে অনন্য গবেষণা করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই সমস্যাটির গুরুত্ব বিশেষভাবে অনুভূত হয়েছিল। ১৯৪৫ সালে ভারতীয় বৈজ্ঞানিক ও শ্রমশৈল্পিক গবেষণা সংস্থা ডঃ আত্মারামকে কলকাতায় কেন্দ্রীয় কাচ ও মৃৎশিল্প গবেষণা-মন্দির সংগঠনের দায়িত্ব অর্পণ করে। তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদকরূপে কাজ শুরু করেন, তারপর ১৯৪৯ সালে এর যুগ্ম-অধিকর্তা এবং ১৯৫২ সালে অধিকর্তাপদে উন্নীত হন। তাঁর উদ্যমশীল সক্রিয় নেতৃত্বে এই প্রতিষ্ঠান কাজের উৎকর্ষ ও বৈচিত্র্যের জন্যে শ্রমশৈল্পিক গবেষণা-প্রতিষ্ঠানরূপে স্বদেশে বিদেশে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে। ১৯৬৬ সালের আগস্ট মাসে তিনি ভারতের বৈজ্ঞানিক ও শ্রমশৈল্পিক গবেষণা সংস্থার অধিকর্তাপদে নির্বাচিত হন এবং বর্তমানে এই পদেই তিনি অধিষ্ঠিত আছেন। তিনি একই সঙ্গে ভারত সরকারের শিক্ষামন্ত্রকের বিজ্ঞান-বিষয়ক সচিবরূপেও কাজ করছেন।

বিজ্ঞানে ডঃ আত্মারামের অবদান মৌলিক ও ফলিত বিজ্ঞান এবং উৎপাদন-কৌশলের ক্ষেত্রে বিস্তৃত। তাঁর কৃতিত্বময় অবদানের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে



ডঃ আত্মারাম

অপটিক্যাল গ্লাসের উদ্ভাবন ও উৎপাদন। এই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উপাদানটির উৎপাদনকৌশল বিশ্বের দশটি দেশের একান্ত গোপনীয় তথ্য। তাঁর এই কাজের ফলে রসায়নিক পোর্সিলিন রঙিন কাচ, বিশেষ ধরনের তাপরোধক বস্তু ইত্যাদি বিদেশ থেকে আমদানীকৃত জিনিসগুলি এখন এদেশেই প্রস্তুত হচ্ছে। সিলিকেট বিষয়ক বিজ্ঞানে তাঁর বিবিধ মৌলিক গবেষণার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে তাম্র-লোহিত কাচের রঙের উৎপত্তি সম্পর্কিত অনুসন্ধান। এতদিন পর্যন্ত সারা বিশ্বের বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করতেন, কপার কোলায়েডের দরুন এই রঙের উৎপত্তি হয়ে থাকে। কিন্তু ডঃ আত্মারাম দেখান, কিউপ্রাস অকসাইড কোলায়েডের দরুনই এই রঙ সৃষ্টি হয়। তাঁর এই আবিষ্কারের ফলে এদেশে লাল কাচের চুড়ি প্রস্তুতের জন্যে বিদেশ থেকে সেলিনিয়াম এখন আর আমদানি করতে হয় না, তার পরিবর্তে অন্য জিনিস ব্যবহৃত হয়। দেশের অগ্রগতির জন্যে স্বদেশজাত উপাদানগুলির সদ্ব্যবহার করা উচিত বলে তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন। এ কারণে কেন্দ্রীয় কাচ ও মৃৎশিল্প গবেষণা-মন্দিরের গোড়াপত্তন থেকে কাচ ও মৃৎশিল্পের ক্ষেত্রে দেশকে স্বয়ংনির্ভর করে তোলার জন্যে তিনি এক কর্মসূচী প্রণয়ন করেন।

ডঃ আত্মারাম ৭০টির বেশি মৌলিক গবেষণা-নিবন্ধের রচয়িতা এবং ২৫টি পেটেন্টের উদ্ভাবক। 'রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস' সম্পর্কে তিনি হিন্দীতে একটি গ্রন্থও রচনা করেছেন।

তাঁর বৈজ্ঞানিক অবদানের স্বীকৃতিতে ডঃ আত্মারাম দেশ-বিদেশের বহু সম্মাননা লাভ করেছেন। তিনি ভারতের জাতীয় বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য, শেফিল্ডের সোসাইটি অফ গ্লাস টেকনোলজি, কাচ সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক কমিশন এবং আন্তর্জাতিক মৃৎশিল্পী আকাদেমির সদস্য। সম্প্রতি লেনিনগ্রাদের লেনিন সোভিয়েত টেকনোলজিক্যাল ইন্সটিটিউট তাঁকে সম্মানসূচক 'ডিগ্রী অফ টেকনোলজি' প্রদান করেছেন। ১৯৫৯ সালে তিনিই সর্বপ্রথম শান্তিস্বরূপ ভাটনগর পদক লাভ করেন। বারোদা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে কে জি নায়েক স্বর্ণপদক প্রদান করেছেন। ১৯৫৯ সালে ভারতের রাষ্ট্রপতি তাঁকে 'পদ্মশ্রী' সম্মাননায় ভূষিত করেন।

ডঃ আত্মারাম ছাড়া বিজ্ঞান কংগ্রেসের বিভিন্ন শাখায় এবার যাঁরা সভাপতিত্ব করছেন, তাঁরা হলেন গণিতবিদ্যায় কানপুরের আই-আই-টির গণিত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক জগৎ নারায়ণ কাপুর, সংখ্যায়নে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যায়ন বিভাগের রীডার শ্রীহরিশংকর নন্দী, পদার্থবিজ্ঞানে দিল্লীর জাতীয় পদার্থ-বিজ্ঞান গবেষণাগারের অধ্যক্ষ ডঃ এ আর ভার্মা, রসায়নশাস্ত্রে খড়্গপুরের আই-আই-টির ফলিত রসায়ন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক এস কে ভট্টাচার্য, ভূতত্ত্ব ও ভূগোলে নয়াদিল্লীর পরমাণু-শক্তি বিভাগের আঞ্চলিক অধিকর্তা শ্রীকে এল ভোলা, উদ্ভিদবিজ্ঞানে বসু বিজ্ঞান মন্দিরের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের প্রধান ডঃ পি এন নন্দী, প্রাণীবিদ্যা ও কীটতত্ত্বে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক এম ডি এল শ্রীবাস্তব, নৃতত্ত্ব ও

পুরাতত্ত্বে রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের প্রধান ডঃ এল পি বিদ্যার্থী, চিকিৎসা ও পশুবিজ্ঞানে বোম্বাই পশু চিকিৎসা কলেজের পরজীবিতত্ত্বের অধ্যাপক এস আর রাও, কৃষিবিজ্ঞানে নয়াদিল্লীর ভারতীয় কৃষিবিজ্ঞান গবেষণামন্দিরের অধিকর্তা ডঃ এম এস স্বামীনাথন শরীরতত্ত্বে কলকাতার স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন-এর ভেষজতত্ত্বের অধ্যাপক ডাঃ এম এল চ্যাটার্জি, মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষাবিজ্ঞানে পুনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষামূলক মনস্তত্ত্বের অধ্যাপক ভি কে কোথারকর এবং যন্ত্রবিজ্ঞান ও ধাতুবিদ্যায় বোম্বাই-এর ভাবা পরমাণু-শক্তি গবেষণা কেন্দ্রের আকর-পরিশোধন বিভাগের প্রধান ডঃ কে কে মজুমদার। অন্যান্য বছরের মতো এবারও বিজ্ঞান কংগ্রেস উপলক্ষে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি এবং বিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তকের একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের সম্মানসূচক ডিগ্রী প্রদানের জন্যে একটি বিশেষ সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হবে।

সোভিয়েত ভূখণ্ডে পতিত বৃহদাকার উল্কাপিণ্ড

পৃথিবীর বুকে প্রতিদিনই কিছু উল্কাপিণ্ড পতিত হয়ে থাকে, তবে তাদের বেশিরভাগই ক্ষুদ্রাকার। বৃহদাকার উল্কাপিণ্ড বহির্বিশ্ব থেকে ভূপাতিত হয় খুব কম। বৃহদাকার উল্কাপিণ্ড পৃথিবীর বুকে পতিত হলে বিজ্ঞানীদের কাছে তার গুরুত্ব অনেকখানি। কারণ উল্কাই হচ্ছে পৃথিবীর বুকে একমাত্র বহির্বিশ্বের বস্তু।

সম্প্রতি সোভিয়েত ভূখণ্ডের কোলিমা নদীর বাঁদিকে ইয়াসাচনায়া উপনদীর তীরে একটি বৃহদাকার লৌহ উল্কাপিণ্ড রুশ ভূবিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন। এটির ওজন ৩০০ কিলোগ্রাম। এই বৃহদাকার উল্কাপিণ্ডের পাশে আর একটি ৫১ কিলোগ্রাম ওজনের উল্কা ভগ্নাংশ পাওয়া গেছে। বৃহদাকার উল্কাপিণ্ডটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষার জন্যে মস্কোতে পাঠানো হয়েছে। সেখানে বিজ্ঞানীরা উল্কাপিণ্ডটির সর্বপ্রকার পরীক্ষা করবেন। এ পর্যন্ত সোভিয়েত ভূখণ্ডে পতিত বৃহদাকার উল্কাপিণ্ডের মধ্যে ওজনের দিক থেকে এটি হচ্ছে তৃতীয়। এর আগে ১৮৯০ সালে এবং ১৯৪৭ সালে দুটি বৃহদাকার উল্কাপিণ্ড সোভিয়েত ভূখণ্ডে পতিত হয়।



উল্কাপিণ্ড পতিত অঞ্চলে রুশ ভূ-বিজ্ঞানীরা অনুসন্ধানরত। মধ্য স্থলে তীর চিহ্নিত অংশে ৩০০ কিলোগ্রামের উল্কাপিণ্ড।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল সম্পর্কে অধ্যাপক রমনের নতুন তথ্য

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল সম্পর্কে এতদিন আমরা জেনে এসেছি, পৃথিবীর আবর্তনের সংগে বায়ুমণ্ডলও আবর্তিত হয়। কিন্তু সম্প্রতি মাদ্রাজে ভারতীয় বিজ্ঞান আকাদেমির বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে বিশ্ববিশ্রুত ভারতীয় বিজ্ঞানী ডঃ সি ভি রামন ঘোষণা করেছেন, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর সংগে আদৌ আবর্তিত হয় না। পৃথিবীর মহাকর্ষ তাকে পৃথিবীর সংগে বেঁধে রেখেছে একথা সত্য বলে মেনে নিয়েও তিনি বলতে চান বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর আবর্তনের সংগে আবর্তিত হয় না।

এতদিন আকাশের বিভিন্ন বায়ুপ্রবাহের গতিধর্মের উৎস স্থির করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর আবর্তনকেই মূল কারণ বলে ধরে নিয়েছিলেন। বিষুব রেখার উত্তর ও দক্ষিণে প্রবাহিত বাণিজ্য বায়ু, বা মধ্য নিরক্ষ রেখায় প্রবাহিত পশ্চিম বায়ু, অথবা আকাশে অতিদ্রুত বিচরণশীল জেট-প্রবাহ বায়ু—প্রত্যেকটিকেই আবহবিজ্ঞানীরা পৃথিবীর আবর্তনের সংগে একসূত্রে বেঁধে দিয়েছেন।

ডঃ রামন তাপ-তরঙ্গ প্রবাহের পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র প্রশ্নটি বিচার করতে চান। তিনি বলেন, বায়ু গ্যাসীয় পদার্থ বলে যেমন ওপরে উঠতে পারে, তেমনি নিচেও চলে আসতে, অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে একপাশেও বয়ে চলতে পারে। পৃথিবীর গতির সংগে তার গতি মিলিয়ে চলার কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

বিষুব রেখা অঞ্চলে ভূপৃষ্ঠের ঘূর্ণন গতি সেকেণ্ডে ৪৬৫ মিটার, কিন্তু উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে সে গতি শূন্য মিটার। সূর্যের বিকিরণও বিষুবরেখায় সর্বাধিক এবং মেরুতে শূন্য। এ অবস্থায় পৃথিবীর তাপতাড়িত হয়ে বায়ুপ্রবাহ 'ট্রপোপজ' নামক স্তরে উঠে যাচ্ছে এবং বিভিন্ন শক্তির সামঞ্জস্য করতে গিয়ে আপনা থেকেই নানা ভাগে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে। নিচের পৃথিবীর আবর্তনের সংগে এদের অবস্থানের কোন সম্পর্ক নেই।

১৬৮৮ সালে বিজ্ঞানী এডমণ্ড হেলি ঘোষণা করেছিলেন, পৃথিবীর আবর্তনের সংগে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলও আবর্তিত হয় এবং তারই ফলে এক মহাদেশ থেকে বায়ুপ্রবাহ আর এক মহাদেশের আকাশে গিয়ে পৌঁছয়। টরিসেলি এবং পাসকলও বায়ুর চাপ সম্পর্কে গবেষণা করতে গিয়ে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হন।

ডঃ রামন আজ যা বলছেন তাতে সমগ্র আবহ-বিজ্ঞানে এক নতুন পটভূমিকা রচিত হতে পারে। তবে সমগ্র বিষয়টি তাপগতি-বিজ্ঞানের আলোকে যাচাই করে নিতে হবে। জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন বসুর কাছে আমরা এ বিষয়ে অভিমত জানতে চাইলে তিনি ডঃ রামনের আবিষ্কৃত তথ্যের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে চান না।

'ঘটনা' না 'কল্পনা'?

ধ্রুবজ্যোতি রায়চৌধুরী

কান : ২৭ সেন্টিমিটার, মাথা : ৩১ সেন্টিমিটার, হাত : ৬৫ সেন্টিমিটার, ঊর্ধ্বাংগ : ৩৯ সেন্টিমিটার, পা : ৪৭ সেন্টিমিটার! ভাবছেন, এটা আবার কার শরীরের মাপজোখ?

শুনে তাজ্জব হয়ে যাবেন যে আজকাল এই ধরনের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ সমন্বিত আশ্চর্য জীবেরা প্রায়ই অন্য গ্রহ থেকে পৃথিবীতে বেড়াতে আসছে। এদের আবার এক এক জায়গায় এক এক রূপে দেখা যাচ্ছে। ইংল্যাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শীর মতে এরা মস্তকহীন দৈত্যাকৃতি, ক্যালিফোর্ণিয়ায় কমলালেবু-চোখ বকরাক্ষস। ভেনেজুয়েলায় এরা দুজন চাষীকে আক্রমণ করে ওদের শরীরে নাকি অদ্ভুত ধাঁচের থাবার চিহ্ন রেখে গেছে। শুনতে পাওয়া যায় ব্রেজিলে এই অদ্ভুত জীবদের দলে 'একটি মহিলা' নাকি জনৈক চাষীর কাছে বিচিত্রভাবে প্রেম নিবেদনও করেছে।

পৃথিবীর নানা জায়গায় এই জীবেরা দর্শন দিচ্ছে বলে খবর আসছে—এবং প্রত্যেকটি নতুন খবর পুরনো খবরের চেয়ে অনেক চাঞ্চল্যকর, রোমাঞ্চকর ও চমকপ্রদ, যার ফলে উড়ন্ত চাকির অস্তিত্বে অনেকেই নিঃসন্দেহ হয়ে গেছেন এবং উড়ন্ত চাকির ভক্তবৃন্দ উড়ন্ত চাকি-বাহিত অদ্ভুত জীবগুলির অস্তিত্বেও বিশ্বাসী হয়ে পড়েছেন। উড়ন্ত-চাকি-বাহিত এই জীবগুলির একটি নামকরণও হয়েছে পৃথিবী নামক এই গ্রহে। সাতাশ সেন্টিমিটারের কানওয়ালা ও পঁয়ষট্টি সেন্টিমিটার হাতওয়ালা এই সব প্রায়-দৈত্যদের নাম হয়েছে 'হিউমানয়েডস'।

প্রায়-রাক্ষস হিউমানয়েডসদের অস্তিত্বে কেউই হয়ত বিশ্বাসী হতেন না যদি না মার্কিন এয়ার ফোর্স এই হিউমানয়েডসদের গতিবিধি লক্ষ্য রাখার জন্যে একটি আলাদা 'বৈজ্ঞানিক তদন্ত শাখা' খুলে বসত। এই বৈজ্ঞানিক তদন্ত শাখাটির সংক্ষিপ্ত নাম 'ইউফো'। ইউফো-র কর্মসূচিতে জানান হয়েছে উড়ন্ত যে কোন জিনিস, বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না, সেই সব ব্যাপারে গবেষণা চালান হবে। ইউফো-দৃষ্ট উড়ন্ত বস্তু সম্বন্ধে যে সব তথ্য এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে, তাতে জানা যায়, (ক) ইউফো-র বিজ্ঞানী গোষ্ঠী আরো বেশি প্রমাণ সংগ্রহে উৎসাহী, (খ) ইউফো-ভক্তরা স্বীকার করেন যে এ পর্যন্ত পাওয়া 'প্রমাণপঞ্জী খুব সুবিধের নয়, (গ) যাঁরা উগ্র ইউফোপন্থী (ইউফোলজিস্ট!) তাঁরা দাবি করেন গ্রহান্তরের জীবেরা অনেক বেশি বুদ্ধিমান এবং এই জীবেদের সংগে ইউফোলজিস্টরা নানাভাবে যোগাযোগ করেছেন, এমন কি তাদের যানবাহনেও চড়েছেন। (এই যানবাহনগুলির কোন কোনটা চাকির মত, বোতলের মত কিংবা ফুটবলের মত!) প্রসংগত উল্লেখ্য যে শেষোক্ত ইউফোলজিস্টদের অনেকেই বিজ্ঞানী। এঁদের মধ্যে দুই রকম মত প্রচলিত আছে। প্রথমোক্ত মতে, গ্রহান্তরের জীবেরা পৃথিবীর মানুষদের সংগে বন্ধুত্ব করতে চায়, এবং দ্বিতীয় দলের মতে, এরা পৃথিবীকেই আক্রমণ করতে চায় ও প্রকৃতিতে ভীষণ, ভয়ংকর।

ইউফো-র ব্যাপারে যাঁরা অবিশ্বাসী, তাঁরা বলেন, ইউফো-দৃষ্ট উড়ন্ত ব্যাপার স্যাপারগুলো বেলুন, প্লেন, রকেট অথবা ধূমকেতু, মেঘ কিংবা খসে-পড়া তারা, নয়তো স্বকপোলকল্পিত পদার্থ।

ইউফো-ভক্তরা, ইউফো-নাস্তিকদের পাগল বলে মনে করেন এবং দরকার পড়লে বলেন বাইবেলে নাকি গ্রহান্তরের এই জীবদের পৃথিবীতে আগমন সম্বন্ধে প্রমাণ আছে।

ইউফোরা দুটি বৃহৎ সংঘও প্রতিষ্ঠা করেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। একটির নাম : অ্যাপরো, অন্যটির নাম : নিকাপ। এই সংঘ দুটি নিজস্ব পত্রিকাও প্রকাশ করে।

নিকাপ-এর সভ্যসংখ্যা ১৩,০০০। ১৯৬৪ সালে একশো চুবাল্লিশ পৃষ্ঠার একটি বই প্রকাশ করে নিকাপ। বইটির নাম 'ইউফো এভিডেনস'। বইটির মধ্যে একশো জনেরও বেশি 'প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ' আছে। এর মধ্যে সবচেয়ে সেরা বিবরণটি হোল :

১৯৬৫-র ৩ সেপ্টেম্বর, রাত দুটোর সময় নরমান মাসকারিলো, বয়স ১৮, নিউ হ্যামপসায়ারের একসিটার গ্রামের একটি মাঠ পার হতে হতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। প্রায় ৮০ ফিটের মতো চওড়া একটা ভয়ংকর লাল আলো একটু দূরে ধ্বক্‌ধ্বক্‌ করে জ্বলছে! নরমান ভয়ের চোটে একটা খানার নিচে হামাগুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে—তারপর সে দেখতে পায় ভয়ংকর সেই আলোটা একটু পিছু হটে কাছাকাছি একটি বাড়ির চারপাশে চক্কর দিচ্ছে।

সেই অবকাশে নরমান, খানা থেকে উঠে পড়ে দৌড় দেয় বড় রাস্তার দিকে—তারপর চলন্ত একটা গাড়ি থামিয়ে সে পুলিশ-স্টেশনে এসে পৌঁছয়। পুলিশ অফিসার নরমানের বিবৃতি শুনে পাহারারত অফিসার ইউজিন বার্ট্রান্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

সেই মুহূর্তে বার্ট্রান্ডও পুলিশ-স্টেশনে এসে পড়েন, এবং জানান যে একটু আগে তিনি একটি মহিলাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এসেছেন। মহিলাটি যখন গাড়ি চালিয়ে আসছিলেন, তখন একটা লাল আলোর গোলা তাঁকে তাড়া করে আসছিল—প্রায় ৯ মাইল দূর থেকে।

অতঃপর বার্ট্রান্ড ও নরমান, নরমান কথিত মাঠে পুনরায় এসে হাজির হন। এদিক ওদিক লক্ষ্য করে বার্ট্রান্ড যখন নিরাশ হয়ে পড়লেন কিছু দেখতে না পেয়ে, তখন হঠাৎ নরমান বলে ওঠে : ওই যে!

নরমানের সঙ্গে সঙ্গে বার্ট্রান্ড দেখতে পেলেন দুটো দীর্ঘায়ত পাইন গাছের ফাঁক দিয়ে একটি লালরঙের গোলাকৃতি আলো দেখা যাচ্ছে।

নিঃশব্দে এই আলোটি ক্রমশঃ এগিয়ে আসতে শুরু করল। আলোর ছটায় পুরো জায়গাটা লাল আলোয় ভরে গেল। ভয়ংকর সেই আলোটা যেন নরমান ও বার্ট্রান্ডের দিকে এগিয়ে আসার চেষ্টা করছে!

বিস্মিত বার্ট্রান্ড নরমানকে আঁকড়ে ধরে বড় রাস্তার দিকে দৌড় দিলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে ডেভিড হান্ট নামে আর একজন পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে নরমান ও বার্ট্রান্ডকে দৌড়ে যেতে দেখলেন এবং তার পরেই তার চোখ পড়ল অদ্ভুত সেই আলোটার দিকে। আলোটা তখন ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের এই বিবৃতিটি বিশ্বাসযোগ্য বলে মেনে নেওয়া হয়েছে একটি মাত্র কারণে : তা হোল ঘটনার সাক্ষী হিসাবে দুজন দায়িত্বশীল পুলিশকে পাওয়া গেছে।

ডক্টর জে অ্যালেন হিনেক, নর্থওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক এবং ইউ-এফ-ও-র পরামর্শদাতা বলেছেন, 'আমি স্বচক্ষে কোনো রহস্যময় উড়ন্ত জিনিস এ পর্যন্ত দেখিনি, তবে যে সব অসাধারণ ব্যক্তিরা এগুলি দেখেছেন তাঁদের আমি উড়িয়ে দিতে পারি না।'

যদিও কোন সুখ্যাত সৌরতত্ত্ববিদের চোখে এই উড়ন্ত ব্যাপারগুলি ধরা দেয়নি, এরিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত সৌরতত্ত্ববিদ জেমস ম্যাকডোনাল্ডের মতে : এ ব্যাপারে বর্তমানে এতে বেশি 'নির্ভরযোগ্য বিবৃতি' পাওয়া যাচ্ছে যে এগুলিকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিশ্লেষণ করা দরকার।'

নিকাপ-ও এই ধারণা পোষণ করে এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের জন্যে তারা বিজ্ঞানীদের নিয়ে একটি সমিতি স্থাপন করেছে সত্য-মিথ্যা আলোকচিত্র, বিবৃতি, প্রমাণ ইত্যাদি পরীক্ষা করার জন্যে।

মার্কিন বিমান বাহিনী এ বছর পর্যন্ত ১১,১০৮ টি বিবৃতি তদন্ত করবার পর ঘোষণা করেছেন যে ৬৭৬টি ঘটনা ভিত্তিহীন। প্রতারক কিংবা উন্মাদের প্রয়াস। এ জন্যে ইউফোরা তীব্র সমালোচনা যুদ্ধে নেমে

পড়েছেন মার্কিন বিমান বাহিনীর বিরুদ্ধে। তাঁদের বক্তব্য : জনসাধারণকে ভীত ও আশংকিত না করার জন্যে এটা প্রতিপক্ষের কারসাজি, তারা 'ঘটনা' চাপা দেবার চেষ্টা করছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বলা হয় 'সাক্ষী' উড়ন্ত কোনো বস্তু দেখেনি, দেখেছে কালপুরুষের চারটি তারা, কিন্তু এটা সম্ভব নয়, নক্ষত্র-পঞ্জী লক্ষ্য করলে অবশ্যই প্রমাণিত হবে যে 'ঘটনা'র সময় কালপুরুষের অবস্থান ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত বিন্দুতে।

উড়ন্ত বস্তু সম্পর্কে বিশ্বাস দৃঢ় হয় গত ১৯৬৫-র নভেম্বরে যখন নায়েগ্রা পাওয়ার স্টেশনের ওপর একটি রহস্যময় আলোর রেখা দেখা গিয়েছিল। এই রহস্যময় আলোর তদন্ত করার জন্যে কলরাডো বিশ্ববিদ্যালয়কে দু ক্রোর টাকা দেওয়া হয়েছে এবং অধ্যাপক ডক্টর এডওয়ার্ড কনডন এই তদন্ত পরিচালনা করছেন।

মনস্তাত্ত্বিকদের মতে : ইউফো বিশ্বাসীরা সংবাদে নিজেদের নাম দেখতে চান বলে এত হৈ চৈ করছেন।

'এভিয়েসন উইকলি' পত্রিকার সম্পাদক ফিলিপ ক্লাসের মতে : উড়ন্ত বস্তুগুলি 'বল লাইটনিং'—আকাশের কোথাও কোনো আলোজ্বলা বৃত্তের ভেতর দিয়ে বজ্রপাত হলে এই আলোজ্বলা বৃত্তটি রহস্যময়ভাবে জ্বলে ওঠে। এবং এই আলো-জ্বলা বৃত্তগুলির অবস্থান বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বিদ্যুৎকেন্দ্রের কাছে—যেখানে উড়ন্ত বস্তু দেখা যায় বলে দাবি করা হচ্ছে।

উড়ন্ত বস্তুতে যে সব জীব পৃথিবীতে পদার্পণ করেছে এবং তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের যে সব চমকপ্রদ বিবৃতি এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলির মধ্যে বহুল-প্রচারিত হোল :

(১) ১৯৬১-র সেপ্টেম্বরে আমেরিকার নর্থ হ্যাম্পসায়ারে শ্রী ও শ্রীমতী বার্ণি হিল উড়ন্ত চাকির নাবিক কর্তৃক আটক হয়েছিলেন। দৈহিক পরীক্ষার পর নাবিকেরা তাদের মুক্তি দিয়েছিল।

(২) ১৯৬৪-র সেপ্টেম্বরে ক্যালিফোর্ণিয়ার সাক্রামানটো পাহাড়তলিতে তিনজন হরিণ শিকারে গিয়েছিলেন। এঁদের একজন শ্রীএস পথ হারিয়ে ফেলেন সন্ধ্যেবেলায়। পথ হারিয়ে শুকনো কাঠ জড়ো করে তিনি আগুন জ্বালেন এবং একটি গাছের ওপর উঠে বসেন। হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ে একটি রহস্যময় আলো তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। আলোটা গাছের নিচে থেমে যায়। এবং তিনটি রহস্যময় চেহারা গাছের নিচে থেকে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকে।

দুজনের পরণে ছিল রুপালী-ধূসর পোশাক, তৃতীয় জনের চোখ ছিলো কমলালেবুর মতো গৈরিক-পিঙ্গল এবং মুখের হাঁ গহ্বরের মত।

শ্রীএস এদের দেখে ভীষণভাবে ভয় পেয়ে গেলেন এবং গাছের একটি ডালের সঙ্গে নিজেকে শক্ত করে বেঁধে ফেললেন। কমলালেবু-চোখের দৈত্যটা হঠাৎ হাঁ করল—সেই হাঁ-এর ভেতর থেকে কিছু বাষ্পীয় পদার্থ নির্গত হয়ে শ্রীএসকে আচ্ছন্ন করে দিলে। একটু পরে শ্রীএস তাদের লক্ষ্য করে তিনটি তীর নিক্ষেপ করেন। তীর লেগে তাদের শরীর থেকে আগুনের ফুলকি চকমকিয়ে উঠল।

কমলালেবু-চোখের দৈত্য আবার হাঁ করে বাষ্প নির্গত করল। শ্রীএস এবার তাঁর পরণের জাকেটটার একটা টুকরোয় আগুন ধরিয়ে তাদের দিকে ছুঁড়ে দিলেন।

সারা রাত এই যুদ্ধ চলল। ভোরবেলায় শেয়ালের মত বাষ্প নিঃসৃত করে রহস্যময় জীবেরা অদৃশ্য হোলো। শ্রীএস অতঃপর গাছ থেকে কোনরকমে নেমে পড়েন এবং চৈতন্যহীন অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন।

(৩) ১৯৫৫ সালে কেনটাকির কাছে হপকিনসভিলের একটি খামারে কাজ করতে করতে জনেক সাটন পরিবারের লোক হঠাৎ ভয়ের চোটে দৌড় দিতে শুরু করে। সে নাকি খামারে একটি মহাকাশযান নামতে দেখেছে।

কৌতূহলী কর্মীরা খামারে গিয়ে দেখল একটি আশ্চর্য জীব ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। গোল মাথা, হাতীর মত কান, চেরা মুখ, বিশাল চোখ—কিন্তু ঘাড় নেই। ঘাড়-গর্দানহীন এই দৈত্যটি উচ্চতায় তিন ফুটের মতো, হাতগুলি ভীষণ লম্বা এবং চারটে করে আঙুল দুই হাতে—আঙুলের মধ্যে আবার বিড়ালী থাবা দেখা যাচ্ছে। একটু পরে, দেখা গেল আরো কয়েকজন অনুরূপ জীব খামারের আশপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে!

এমন কি ছাদেও তারা আছে। এদের দেখে সাটন সাহেব অন্তরাল থেকে বন্দুক চালান। বন্দুকের গুলী ওদের একজনের গায়ে লাগার সঙ্গে সঙ্গে ওরা পালাবার চেষ্টা করল এদিক-ওদিক। কৌতূহলী লোকেদের কৌতূহল তখন ভয়ঙ্কর এক ভয়ে পরিণত হয়েছে। ওরা যে যেদিক দিয়ে পারল পুলিশ-স্টেশনে আশ্রয় নিতে ছুটল। পুলিশের ভাষ্যানুসারে : বুঝতে যার এখনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি—এই জাতীয় কোনো কিছু দেখে লোকগুলি ভীষণভাবে ভীত হয়ে পড়েছিল।

(৪) ১৯৫৪ সালে ভেনজুয়েলায় প্রায় একটির পর একটি এই অদ্ভুত জীবেরা হানা দিয়েছিল। ২৮ নভেম্বরে ক্যারাকাসে গুস্তাভ গনজালেস ও জোস পোনসের গাড়িটা হঠাৎ থেমে যায় অদ্ভুত একটা আলো দেখে। ব্যাপার কি দেখার জন্যে গুস্তাভ যেই গাড়ি থেকে নামে—হঠাৎ ক্ষুদ্রকায় কিন্তু রোমশ একটি দৈত্যের মতো জীব গুস্তাভকে আক্রমণ করে প্রায় জ্ঞানহীন করে দেয়।

জ্ঞান সামান্য ফিরে আসতে গুস্তাভ একটি ছুরি বার করে জীবটিকে আঘাত করার চেষ্টা করে কিন্তু গুস্তাভের মনে হল ছুরিটা যেন স্টিলের সঙ্গে ঘর্ষিত হল। এই সময় অনুরূপ আর একটি জীব ঘটনাস্থলে হাজির হয় এবং অদ্ভুত একটা আলো দিয়ে গুস্তাভকে নিস্তেজ করে ফেলে।

পুলিশ-স্টেশনে গুস্তাভ ও তার সঙ্গী শরীরের ওপর একটা লাল দাগ দেখায়, যেটা দেখতে অনেকটা নখরাঘাতের মতো।

(৫) ইংল্যাণ্ডের কেন্টে, কয়েকজন লোক হঠাৎ মাঠের মধ্যে একটা অদ্ভুত আলো দেখতে পায় সেদিকে যায়। ওরা দেখে সেই আলোর কাছে প্রায় সাত ফিট লম্বা কিন্তু মস্তকহীন জীব দাঁড়িয়ে আছে!

(৬) ১৯৫৭ সালের ১৫ অক্টোবর ব্রেজিলের সাও ফ্রানসিসকো ডা সালেস-এর একজন কৃষক আন্টনিও ভিলাস বোয়াস তার জমিতে ট্রাক্টর চালাতে চালাতে হঠাৎ থেমে যায় অদ্ভুতদর্শন একটি যন্ত্র দেখে। অদ্ভুত সেই যন্ত্রটির পেট থেকে ধূসর পোশাকের চারজন লোক বেরিয়ে এসে ভীত অ্যান্টনিকে ট্রাক্টর থেকে জোর করে তুলে এনে নিজেদের যন্ত্রের পেটে ঢুকিয়ে ফেলে। অদ্ভুত সেই যন্ত্রটির মধ্যে পাঁচ ফিট দীর্ঘ এক তরুণী অ্যান্টনিকে আলিঙ্গন করে। মেয়েটির গায়ের রং ফরসা, একটু উঁচু চোয়াল এবং চৈনিক রমণীদের মতো নীল চোখ। মেয়েটির সঙ্গে যৌন সংগম হবার পর তবে বোয়াসকে মুক্তি দেওয়া হয়!

অদ্ভুত জীবেদের সম্বন্ধে শেষের এই সংবাদটুকুই যা একটু বৈধদুষ্পূর্ণ! তবে সব কথার শেষে যে কথাটি বলা যেতে পারে তা হোল উড়ন্ত বস্তু বাহিত জীব সম্বন্ধে এখনো সপ্রমাণিত কোনো কিছু পাওয়া যায়নি বিশ বছর আগের দেখা উড়ন্ত চাকি ছাড়া।

ডাঃ প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত

আধুনিক চিকিৎসা

পুস্তক সম্বন্ধে কয়েকটি মতামত

"এই বইটি বিছানার পাশে রাখার মত ডাক্তারী বই।" —দেশ

"সাধারণের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে রচিত বলেই এই গ্রন্থের শৈলীও সহজ ও সাবলীল।" —বসুমতী

"The book will prove useful to the Bengali knowing busy Homoeopathic Practitioners".
TORCH OF HOMEOPATHY, Jaipur.

মূল্য ছ' টাকা, ডাক খরচা টাঃ ১·৭৫ পঃ

প্রকাশক ও পরিবেশক :
পি এন বি পাবলিশার্স
৩৬বি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলিকাতা—২৫
: চেম্বার :
৫৩, গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬,
(হাতিবাগান বাজারের বিপরীত দিকে)
।। ডাকযোগে ঔষধ পাঠাইবার ব্যবস্থা আছে ।।
ফোন ৫৫-৫০৮১ এবং ৫৫-২০১৮

পুরনো পাতা

স্বপ্ন না ইন্দ্রজাল

রমেশচন্দ্র দত্ত

রজনী দ্বিপ্রহর, নরেন্দ্রনাথ একখানি হিরন্ময়-খচিত আসনে উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন। সম্মুখে একটি দীপ জ্বলিতেছে। নরেন্দ্র হস্তে গণ্ড-স্থাপন করিয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন রহিয়াছেন।

যখন চিন্তারজ্জু ছিন্ন হইল একবার বদনমণ্ডল উঠাইয়া সম্মুখে চাহিয়া দেখিলেন। কি দেখিলেন? —জেলেখা নিঃশব্দে সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। জেলেখার মুখমণ্ডল ও ওষ্ঠদ্বয় পাণ্ডুবর্ণ, কেশপাশ আলুলায়িত, বদন বিষণ্ণ, নয়নদ্বয় জলে ছলছল করিতেছে। নরেন্দ্র দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে, জানি না, আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া বলুন।"

জেলেখা উত্তর করিল না ধীরে ধীরে এক বিন্দু চক্ষের জল মোচন করিল।

নরেন্দ্র আবার বলিলেন, "আপনাকে দেখিয়া বোধ হয়, কোন বিপদ্ বা ভয় সন্নিকট। প্রকাশ করিয়া বলুন, যদি উদ্ধারের উপায় থাকে, আমি চেষ্টা করিব।"

জেলেখা তথাপি নীরব; নীরবে অশ্রু-মোচন করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। নরেন্দ্র বিস্মিত হইলেন। নিশাযোগে এই সহসা সাক্ষাতের অর্থ কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তাঁহার বোধ হইল যেন, কোন ঘোর সংকট সন্নিকট। তিনি হস্তে গণ্ড-স্থাপন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, অন্যমনস্ক হইয়া, নানা বিপদের চিন্তা করিতে লাগিলেন।

সহসা গৃহের দীপ নির্ব্বাণ হইল, সেই ঘোর অন্ধকারে একজন খোজা আসিয়া নরেন্দ্রকে তাহার সঙ্গে যাইতে ইঙ্গিত করিল। নরেন্দ্র সভয়ে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। উভয়ে নিস্তব্ধে কত ঘর, কত প্রাঙ্গণ পার হইয়া গেলেন, তাহা বলা যায় না। নরেন্দ্র রাজমহলের প্রাসাদ দেখিয়াছিলেন, কিন্তু এরূপ প্রাসাদ কখনও দেখেন নাই। কোথাও শ্বেতপ্রস্তর-বিনির্ম্মিত ঘরের ভিতর সুন্দর গন্ধদীপ জ্বলিতেছে, শ্বেত-প্রস্তর স্তম্ভাকারে উন্নত ছাদ ধরিয়া রহিয়াছে, স্তম্ভে, ছাদে ও চারিদিকে বহুমূল্য প্রস্তরের ও সুবর্ণ-রৌপ্যের যে কারুকার্য, তাহা বর্ণনা করা যায় না। কোথাও প্রাঙ্গণে ঈষৎ চন্দ্রালোকে সুন্দর সুন্দর বাগান, পুষ্পলতা, তাহার উপর ফোয়ারার জল খেলিতেছে; চারিদিক দিয়া নৈশ সমীরণ নিস্তব্ধে বহিয়া যাইতেছে। কোথাও বা উদ্যান-বৃক্ষতলে আসীন হইয়া দুই একজন উজ্জ্বলবর্ণা উজ্জ্বল বেশধারিণী রমণী বীণা বাজাইতেছে অথবা নিদ্রার বশীভূতা হইয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছে। বাস্তবে খোজাগণ নিঃশব্দে পদচারণ করিতেছে আর রহিয়া রহিয়া মৃদুস্বরে নৈশবায়ু সেই ইন্দ্রপুরীর উপর বহিয়া যাইতেছে। নরেন্দ্র আপন বিপদ্ কথা ভুলিয়া গেলেন, এই সুন্দর প্রাসাদ, সুন্দর ঘর ও প্রাঙ্গণ, সুন্দর উদ্যান ও এই অপূর্ব্ব পরিবেশ-ধারিণী রমণীদিগকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি কোথায়? এ কোন্ স্থান?

কতক্ষণ পরে তিনি একটা উন্নত সুবর্ণ-খচিত কবাটের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সহসা সেই কবাট ভিতর হইতে খুলিয়া গেল। নরেন্দ্র একটি উন্নত আলোক-পূর্ণ ঘরে প্রবেশ করিলেন। সহসা অন্ধকার হইতে উজ্জ্বল আলোকে আনীত হওয়ায় কিছুই দেখিতে পাইলেন না। আলোক সহ্য করিতে না পারিয়া হস্ত দ্বারা নয়ন আবৃত করিলেন, অমনি শত শত নারীকণ্ঠ-বিনিঃসৃত হাস্য ধ্বনিতে সে উন্নত প্রাসাদ ধ্বনিত হইল।

নরেন্দ্র জীবনে কখনও এরূপ বিস্মিত হন নাই। কোথায় আসিলেন? এ কি প্রকৃত ঘটনা, না স্বপ্ন? এ কি পার্থিব ঘটনা, না ইন্দ্রজাল? নরেন্দ্র পুনরায় চক্ষু উন্মীলন করিলেন, পুনরায় উজ্জ্বল আলোকচ্ছটায় তাঁহার নয়ন ঝলসিত হইল; আবার হস্তদ্বারা নয়ন আবৃত করিলেন। পুনরায় শত-নারী-কণ্ঠ ধ্বনিতে প্রাসাদ শব্দিত হইল।

ক্ষণেক পরে যখন নরেন্দ্র চাহিতে সক্ষম হইলেন, তখন যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার বিস্ময় দশগুণ বর্দ্ধিত হইল। দেখিলেন, মর্ম্মর-প্রস্তর-বিনির্ম্মিত একটি উচ্চ প্রাসাদের মধ্যে তিনি আনীত হইয়াছেন। সারি সারি প্রস্তরস্তম্ভ উচ্চ ছাদ ধারণ করিয়া রহিয়াছে, সে ছাদে ও সে স্তম্ভে যেরূপ বিভিন্ন বর্ণের প্রস্তরের কারুকার্য দেখিলেন, সেরূপ তিনি জগতে কুত্রাপি দেখেন নাই। স্তম্ভ হইতে স্তম্ভাকারে সুগন্ধ পুষ্পমালা লম্বিত রহিয়াছে, নীচে স্তবকে স্তবকে পুষ্পরাশি সজ্জিত রহিয়াছে, শত নারীকণ্ঠ হইতে পুষ্পমালা দোদুল্যমান হইয়া সুগন্ধে ঘর আমোদিত করিতেছে, ছাদ হইতে, স্তম্ভ হইতে, পুষ্প ও পত্র রাশির মধ্য হইতে সহস্র গন্ধ-দীপ নয়ন ঝলসিত করিতেছে ও সেই সুন্দর উন্নত প্রাসাদ আলোকময় ও গন্ধপরিপূর্ণ করিতেছে। রেখাকারে শত রমণী দণ্ডায়মান রহিয়াছে, সেই রেখার মধ্যস্থানে দীপালোক-প্রতিঘাতী রত্নরাজিবিনিন্দিত উচ্চ সিংহাসনে তাহাদের রাজ্ঞী উপবেশন করিয়া আছেন। এ স্বপ্ন না ইন্দ্রজাল? নরেন্দ্র অনিমেষলোচনে দেখিতে লাগিলেন যে এক নরেন্দ্র নামক একজন দরিদ্র ব্যক্তি, একদিন নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া সহসা দেখিলেন, যেন তিনি বোগদাদের খলিফ হইয়াছেন। নরেন্দ্রের স্বপ্ন তদপেক্ষাও বিস্ময়কর, তিনি যেন সহসা স্বর্গোদ্যানে আপনাকে অপ্সরাবেষ্টিত দেখিলেন।

নরেন্দ্র সেই অপ্সরা বা নারীরেখার দিকে চাহিয়া দেখিলেন তাহারা নিঃশব্দে রেখাকারে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, সকলেই বক্ষের উপর দুই হস্ত স্থাপন করিয়া ভূমির দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, দেখিলে জীবনশূন্য পুত্তলির ন্যায় বোধ হয়। তাহাদের কেশপাশ হইতে মণিমুক্তা দীপালোক প্রতিহত করিতেছে, উজ্জ্বল বহুমূল্য বসন সেই আলোকে অধিকতর উজ্জ্বল দেখাইতেছে। তাহারা সকলেই যেন রাজ্ঞীর আদেশ সাপেক্ষ হইয়া নিঃশব্দে দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

সেই রাজ্ঞীর দিকে যখন চাহিলেন, নরেন্দ্র তখন শতগুণ বিস্মিত হইলেন; যৌবন অতীত হইয়াছে, কিন্তু যৌবনের উজ্জ্বল সৌন্দর্য্য ও উন্মত্ততা এখনও বিলীন হয় নাই, বোধহয়, যেন প্রথম যৌবনের বেগ ও লালসা বয়সে আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। রাজ্ঞীর শরীর উন্নত, ললাট প্রশস্ত, ওষ্ঠ ও সমস্ত বদনমণ্ডল রক্তবর্ণ, কৃষ্ণ কেশপাশ হইতে একটিমাত্র বহুমূল্য হীরকখণ্ড আলোকে ধক্‌ধক্ করিতেছে। নয়নদ্বয় তদপেক্ষা অধিক জ্যোতির সহিত উজ্জ্বল, মসলিনের অবগুণ্ঠনে সে উজ্জ্বলতা গোপন করিতে অক্ষম। দেখিলেই বোধহয়, নারী হউন বা অপ্সরা হউন, ইনি কোন অসাধারণ মহিলা, জগৎ বা স্বর্গপুরী শাসন করিবার জন্যই অবতীর্ণ হইয়াছেন।

কিন্তু নরেন্দ্রের এ সমস্ত দেখিবার অবসর ছিল না। সহসা যেন স্বর্গীয় বাদ্যযন্ত্র হইতে কোন স্বর্গীয় তান উত্থিত হইতে লাগিল, তাহার সহিত সেই শত অপ্সরার কণ্ঠধ্বনি মিশ্রিত হইতে লাগিল। সেইরূপ অপরূপ গীত নরেন্দ্র কখনও শুনেন নাই, তাঁহার সমস্ত শরীর কণ্টকিত হইল, তিনি নিশ্চেষ্ট হইয়া সেই গীত শ্রবণ করিতে লাগিলেন। সেই গীত ক্রমে উচ্চতর হইয়া, সেই উন্নত প্রাসাদ অতিক্রম করিয়া, নৈশ গগনে বিস্তার পাইতে লাগিল; বোধ হইল যেন, নৈশ গগনবিহারী অদৃষ্ট জীবগণ সেই গীতের সহিত যোগ দিয়া শতগুণ বর্দ্ধিত করিতে লাগিল। ক্রমে আবার মন্দীভূত হইয়া সে গীত ধীরে ধীরে লীন হইয়া গেল, আবার প্রাসাদ নিস্তব্ধ—শব্দশূন্য। এইরূপ একবার দুইবার, তিনবার গীতধ্বনি শ্রুত হইল, তিনবার সেই গীতধ্বনি ক্রমে [illegible] হইয়া গেল।

তখন রাজ্ঞী সজোরে পদাঘাত [illegible] সেই প্রাসাদের একদিকের একটি [illegible] যবনিকা পতিত হইল। নরেন্দ্র সভয়ে চাহিয়া দেখিলেন, তাহার অপর পার্শ্বে চারিজন কুঠারধারী কৃষ্ণবর্ণ খোজা রক্তবর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। রাজ্ঞী পুনরায় পদাঘাত করায় তাহাদের মধ্যে প্রধান একজন রাজ্ঞীর সিংহাসন পার্শ্বে যাইয়া দণ্ডায়মান হইল। নরেন্দ্র দেখিলেন, সে

মসরুর। নরেন্দ্রের ধমনীতে শোণিত শুষ্ক হইয়া গেল।

মসরুর রাজ্ঞীর সহিত অনেকক্ষণ অতি মৃদুস্বরে কথা কহিতে লাগিল, কি বলিতে-ছিল, নরেন্দ্র তাহা শুনিতে পাইলেন না: কিন্তু কথা কহিতে কহিতে মধ্যে মধ্যে নরেন্দ্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতে লাগিল, মধ্যে মধ্যে দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া, নয়ন আরক্ত করিয়া, যেন কি উত্তেজনা করিতে লাগিল। মসরুর কি বলিতেছিল, নরেন্দ্র তাহা জানিতে পারিলেন না, কিন্তু তাহার আকৃতি ও রঙ্গভঙ্গী দেখিয়া নরেন্দ্রের হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইতে লাগিল। নরেন্দ্রকে এই অপরিচিত দেশে জহ্লাদ-হস্তে প্রাণ দিতে হইবে, তাঁহার প্রতীতি হইল।

রাজ্ঞী পুনরায় পদাঘাত করিলেন। তৎক্ষণাৎ প্রাসাদের অন্য পার্শ্বে একটি হরিদ্বর্ণ যবনিকা পতিত হইল। তাহার অপর পার্শ্বে চারিজন পরিচারিকা হরিদ্বর্ণ পরিচ্ছদে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। দ্বিতীয়বার পদাঘাত করায় সেই পরিচারিকাগণ একজন বন্দীকে রাজ্ঞীর নিকট ধরিয়া আনিল। নরেন্দ্র সবিস্ময়ে দেখিলেন, সে বন্দী জেলেখা!

জেলেখা কি বলিল, নরেন্দ্র তাহা শুনিতে পাইলেন না, কিন্তু তাহার আকার ও অঙ্গভঙ্গী দেখিয়া বোধ হইল, সে রাজ্ঞীর অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছে, অশ্রুত্যাগ করিয়া রাজ্ঞীর পদে লুণ্ঠিত হইতেছে।

রাজ্ঞী বারবার নরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। নরেন্দ্র স্বভাবতঃ গৌরবর্ণ, তাঁহার নয়ন জ্যোতিঃ-পরিপূর্ণ, ললাট উন্নত, বদনমণ্ডল উগ্র ও তেজোব্যঞ্জক। সাহসী, অল্পবয়স্ক, সুন্দর যুবার উন্নত ললাট ও প্রশস্ত মুখমণ্ডলের দিকে রাজ্ঞী বার বার নয়ন ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন।

নরেন্দ্রের দিকে অনেকক্ষণ চাহিতে চাহিতে রাজ্ঞী নরেন্দ্রের অঙ্গুলিতে একটি অঙ্গুরীয় দেখিতে পাইলেন। হতভাগিনী জেলেখা নরেন্দ্রের পীড়ার সময়ে একদিন লীলাক্রমে সে অঙ্গুরীয়টি পরাইয়া দিয়াছিল, সেই অবধি তাহা নরেন্দ্রের হাতে ছিল। অঙ্গুরীয় রাজ্ঞীর পরিচারিকাগণ চিনিল, রাজ্ঞী স্বয়ং চিনিলেন। তখন ক্রোধে রাজ্ঞীর সুন্দর ললাট রক্তবর্ণ হইল। নয়ন হইতে অগ্নি বহির্গত হইল।

বিচার শেষ হইল। নির্দ্দয় হইয়া রাজ্ঞী আদেশ দিলেন "জেলেখা অপরাধিনী, পাপীয়সীকে শূলে দাও। কাফেরকে লইয়া যাও, হস্তিপদে দলিত করিয়া কাফেরকে হনন কর।"

একেবারে দীপাবলী নির্ব্বাণ হইল। নিঃশব্দে অন্ধকারে খোজাগণ রজ্জু দ্বারা নরেন্দ্রকে বন্ধন করিতে লাগিল।

অন্ধকারে কে নরেন্দ্রের মুখের নিকট একটি পাত্র ধারণ করিল। নরেন্দ্র বিস্ময় ও উদ্বেগে তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াছিলেন, সেই পাত্র হইতে পানীয় পান করিলেন, অচিরাৎ অচেতন হইয়া পড়িলেন। তাহার পর কি হইল, তিনি জানিলেন না, কেবল বোধ হইল, যেন সেই অন্ধকারে কে আসিয়া তাঁহার হস্ত হইতে সেই অঙ্গুরীয় উন্মোচন করিল আর কে যেন সেই অন্ধকারে রোদন করিতেছিল। তিনি স্বপ্নে দেখিলেন যে, অভাগিনী জেলেখা।

"মাধবীকঙ্কণ" থেকে গৃহীত।

*

প্রতিদ্বন্দ্বী

সরোজনাথ ঘোষ

যুদ্ধ শেষ হইয়াছে। জর্ম্মনেরা ফরাসী রাজ্য অধিকার করিয়াছে। সমগ্র দেশটা যেন আজ বিজয়ী প্রতিদ্বন্দ্বীর পদতলে শায়িত, অবসন্নদেহ মল্লের ন্যায় দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতেছে।

দীর্ঘকাল অনশনে পীড়িত, যন্ত্রণা ও নৈরাশ্যে অবসন্ন নগরবাসী আজ প্রথম ট্রেন যোগে প্যারী নগরী হইতে সীমান্ত প্রদেশে গমন করিতেছিল। রেল-গাড়ী মন্দগতিতে পল্লী ও নগরের মধ্য দিয়া চলিতেছে। আরোহীরা বাতায়নপথে দেখিতেছিলেন, শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র শত্রুসৈন্যের পদভরে বিদলিত, পল্লীকুটীর ভস্মীভূত হইয়াছে। যে সকল কুটীর ভাগ্যক্রমে অগ্নিদেবের লেলিহান রসনা হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে, তাহাদের বহির্দ্বারে চেয়ার পাতিয়া কোনও কোনও প্রুসীয় সৈনিক ধূমপান করিতেছে, কেহ কেহ অশ্বপৃষ্ঠে কুটীর-সম্মুখে বিচরণ করিতেছে। কোনও কোনও সৈনিক, যেন পরিবারের অন্তর্ভুক্ত আত্মীয়ের ন্যায় গৃহকর্ম্মে রত, কিংবা হাস্য পরিহাস ও গল্প করিয়া বেড়াইতেছে।

মঁসিয়ে ডুবিয়ে, নগরের অবরোধকালে, প্যারী নগরীতে "জাতীয় রক্ষী সৈন্যের" দলভুক্ত ছিলেন। তিনি বুদ্ধিমানের মত শত্রুর অভিযানের পূর্ব্বেই স্ত্রী ও কন্যাকে সুইজারল্যাণ্ডে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল পরে আজ তিনি তাঁহাদের সহিত মিলিত হইবার জন্য রেলযোগে গমন করিতেছিলেন।

দুর্ভিক্ষ, অনশন ও নানারূপ কষ্টেও, ঐশ্বর্য্যশালী শান্তিপ্রিয় বণিকের বিশেষত্ব সূচক মঁসিয়ে বিয়ের বিপুল উদরটির আয়তনের কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। বিগত বর্ষের ভীষণ ঘটনাবলী তাঁহার চক্ষুর উপর অভিনীত হইয়াছে। তিনি মানুষের প্রতি মানুষের পশুর ন্যায় নিষ্ঠুর ব্যবহার স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। করুণায় অনুকম্পায় হৃদয় দ্রবীভূত হইলেও ডুবিয়ে নির্ব্বাকভাবে সব সহ্য করিয়াছেন। কোনরূপ অসন্তোষ প্রকাশ করেন নাই। যুদ্ধ শেষে সীমান্ত প্রদেশে গমনকালে এই প্রথম তিনি প্রুসীয় সৈন্য দেখিলেন। দুর্গ-প্রাকারে থাকিয়া ফরাসী সৈন্য যখন নগর রক্ষা করিতেছিল, ডুবিয়ে তখন সেখানে ছিলেন বটে, কিন্তু কোনও প্রুসীয় সৈনিক কখনও তাঁহার নয়ন পথে পতিত হয় নাই।

শ্মশ্রুল, লম্বপাণি শত্রু-সৈন্যের দিকে চাহিবামাত্র তাঁহার হৃদয়ে যুগপৎ আতঙ্ক ও ক্রোধের সঞ্চার হইল। তাহারা সমগ্র ফরাসী রাজ্যে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। এ দেশ যেন তাহাদেরই স্বদেশ! এ কথা মনে করিয়া মঁসিয়ে ডুবিয়ের হৃদয়ে বন্ধ্য স্বদেশানুরাগ জাগিয়া উঠিল। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁহার আত্মরক্ষার সংকল্প ও হিতাহিতজ্ঞানও প্রবল হইয়া উঠিল। সেই কামরায় দুইটি ইংরাজ আরোহীও ছিলেন। তাঁহারা তামাসা দেখিবার অভিপ্রায়ে ফ্রান্সে আসিয়াছিলেন। আরোহীদ্বয় বলিষ্ঠ স্থূলকায়। তাঁহারা স্বদেশীয় ভাষায় আলাপ করিতেছিলেন। মাঝে মাঝে রেলওয়ে-গাইড বই লইয়া ষ্টেশনের নামগুলি উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করিয়া যাইতেছিলেন।

সহসা ট্রেন একটি পল্লী-ষ্টেশনে থামিল। জনৈক প্রুসীয় সামরিক কর্ম্মচারী লম্ফ দিয়া গাড়ীতে উঠিলেন: তাঁহার কটিবিলম্বিত তরবারী ঝম্ ঝম্ করিয়া উঠিল। লোকটি দীর্ঘাকায়, অঙ্গে সামরিক পরিচ্ছদ; তাঁহার মুখমণ্ডল অত্যন্ত শ্মশ্রুল। সৈনিক পুরুষের কেশরাজি রক্তবর্ণ, যেন সর্ব্বদাই উহাতে আগুন লাগিয়া রহিয়াছে।

ইংরাজ আরোহীরা ঈষৎহাস্যস্ফুরিত ধরে নবাগতের প্রতি সকৌতুহল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। মঁসিয়ে ডুবিয়ে সংবাদপত্র-পাঠের ভান করিলেন। পুলিস-কর্ম্মচারীকে দেখিয়া তস্কর যেমন শঙ্কিত হয়, তিনিও সেই ভাবে গাড়ীর এক কোণে বসিয়া রহিলেন।

গাড়ী ছাড়িল। ইংরাজেরা ভিন্ন ভিন্ন যুদ্ধস্থল দেখিয়া তৎসম্বন্ধে নানারূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আলোচনাকালে একজন যখন দিক্‌চক্রবালে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ-পূর্ব্বক একটি গ্রামের উল্লেখ করিলেন তখন প্রুসীয় সামরিক কর্ম্মচারী পদযুগল বিস্তৃত করিয়া ফরাসী ভাষায় বলিলেন, "ঐ গ্রামে আমরা বার জন ফরাসীকে মারিয়া ফেলিয়াছি, এবং শতাধিক লোককে বন্দী করিয়াছি।"

এক জন ইংরাজ যাত্রী কৌতুহলী হইয়া তখনই জিজ্ঞাসা করিলেন, "গ্রামটির নাম কি?"

প্রুসীয় সৈনিক পুরুষ বলিলেন, "ফারসবুর্গ।" তার পর গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আমরা এই সব ইতর ফরাসীর কান ধরিয়া ঘুরাইয়াছি।" এই বলিয়া তিনি অবজ্ঞা ও উপহাসসূচক হাস্যসহকারে মঁসিয়ে ডুবিয়ের প্রতি চাহিলেন।

বিজয়ী সেনাদলের অধিকৃত গ্রাম ও পল্লীর মধ্য দিয়া ট্রেন ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছিল। রাজপথে, শস্যক্ষেত্রে, গৃহদ্বারে সর্ব্বত্রই জর্ম্মন সৈনিক! পঙ্গপালের ন্যায় তাহারা ফরাসীদেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে।

সামরিক কর্ম্মচারী হাত নাড়িয়া বলিলেন, "যদি আমি প্রধান সেনাপতি হইতাম, তাহা হইলে প্যারী নগরী লুঠ করিয়া বাড়ী ঘরে আগুন দিয়া সব পুড়াইয়া দিতাম। একটা ফরাসীকেও জীবিত রাখিতাম না। ফরাসীর নাম পৃথিবী হইতে লুপ্ত করিতাম।"

ইংরাজ আরোহী শিষ্টতার অনুরোধে বলিলেন, "বটেই ত!"

প্রুসীয় কর্ম্মচারী বলিয়া চলিলেন, "আর বিশ বৎসর পরে সমগ্র ইউরোপ আমাদের অধিকারে আসিবে। প্রুসীয় সমবেত শক্তি-পুঞ্জকে পরাজিত করিতে সমর্থ।"

ইংরাজ আরোহীরা চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, কিন্তু এ কথার কোনও উত্তর করিলেন না। প্রুসীয় সামরিক কর্ম্মচারী হাসিতে লাগিলেন। ফরাসীর পরাজয়ে তিনি বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন। ধূলিশায়ী প্রতিদ্বন্দ্বীকে অপমানিত করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। অষ্ট্রীয়া সাম্রাজ্য সংপ্রতি অধিকৃত হইয়াছে বলিয়া, তাহার প্রতিও অবজ্ঞা প্রকাশ করিলেন। সর্ব্ববিষয়ে অবজ্ঞা ও উপেক্ষা প্রকাশ করিয়া তিনি বলিলেন যে মন্ত্রী বিসমার্ক অধিকৃত কামানপুঞ্জ লইয়া একটি লৌহময় নগর স্থাপন করিবেন। বলিতে বলিতে অকস্মাৎ তিনি তাঁহার স-বুট পদ-যুগল মঁসিয়ে ডুবিয়ের উরুদেশে প্রসৃত করিয়া দিলেন। ডুবিয়ের মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল, তিনি একবার ফিরিয়া চাহিলেন।

ইংরাজ আরোহীরা ঘটনাটা যেন লক্ষ্যই করিলেন না। তাঁহারা তখন যেন জগতের কোলাহল হইতে বহু দূরে—আপনাদের দ্বীপে বসিয়া আছেন।

সামরিক কর্ম্মচারী পকেট হইতে ধূমপানের নল বাহির করিলেন। ফরাসী আরোহীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমার কাছে তামাক আছে?"

মঁসিয়ে ডুবিয়ে বলিলেন "না, মহাশয়।"

জর্ম্মান বলিলেন "এবার গাড়ী থামিলে, নামিয়া গিয়া আমার জন্য কিছু তামাক কিনিয়া আনিবে।"

তার পর হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমি তোমাকে মদ্যপানের জন্য কিছু দিব।"

বাঁশী বাজিয়া উঠিল ট্রেনের গতি কমিয়া আসিল। এখন যেখানে ট্রেন থামিল, সে ষ্টেশনটি অগ্নিতে ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে।

জর্ম্মান সামরিক কর্ম্মচারী গাড়ীর দরজা খুলিয়া ফেলিলেন, মঁসিয়ে ডুবিয়ের হাত ধরিয়া বলিলেন, "যাও, যা বলেছি কর—শীঘ্র যাও!"

একদল প্রুসীয় সৈন্য সেই ষ্টেশনে অবস্থান করিতেছিল। এঞ্জিন হইতে শব্দ নির্গত হইতেছিল, এখনই গাড়ী ছাড়িবে। মঁসিয়ে ডুবিয়ে তাড়াতাড়ি প্লাটফরমে নামিয়া পড়িলেন, এবং ষ্টেশন-মাষ্টারের নিষেধ সত্ত্বেও পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে উঠিয়া পড়িলেন।

*

সে কক্ষে আর কেহ ছিল না। ক্ষিপ্রহস্তে তিনি ওয়েষ্ট-কোটটি খুলিয়া ফেলিলেন। তাঁহার বক্ষ দ্রুতবেগে স্পন্দিত হইতেছিল, নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। তিনি ললাট হইতে স্বেদ-ধারা মুছিয়া ফেলিলেন।

আর একটি ষ্টেশনে ট্রেন থামিল। অকস্মাৎ সেই জর্ম্মান সামরিক কর্ম্মচারী ডুবিয়ের কামরার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। এক লম্ফে তিনি কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ইংরাজ আরোহীরাও কৌতূহলপরবশ হইয়া তাঁহার পশ্চাতে সেই কামরায় উঠিলেন। ফরাসীর সম্মুখস্থ আসনে বসিয়া জর্ম্মান হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমি তোমাকে যা করিতে বলিলাম, তাহা তুমি করিতে সম্মত নও?"

মঁসিয়ে ডুবিয়ে বলিলেন, "না, মহাশয়।"

তখন ট্রেন ছাড়িয়া দিয়াছিল।

সৈনিক পুরুষ বলিলেন, "আমি তোমার গোঁফ জোড়া ছিঁড়িয়া লইয়া আমার নলে ভরিব।"

তিনি ফরাসীর মুখের দিকে হাত বাড়াইয়া দিলেন।

ইংরাজ যাত্রীরা নির্ব্বিকারচিত্তে তাঁহাদের পানে চাহিয়া রহিলেন।

জর্ম্মানটি ইতিমধ্যে মঁসিয়ে ডুবিয়ের গুম্ফ ধরিয়া আকর্ষণ করিতেছিলেন। ডুবিয়ে ঠেলা দিয়া সামরিক কর্ম্মচারীর হাত সরাইয়া দিলেন। তাঁর পর জর্ম্মান সৈনিকপুরুষের টুঁটী চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে আসনের উপর ফেলিয়া দিলেন। ক্রুদ্ধ ফরাসীর মুখমণ্ডলের শিরাসমূহ উত্তেজনায় স্ফীত হইয়া উঠিল, নয়নযুগলে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছিল। এক হস্তে তিনি সামরিক কর্ম্মচারীর গলা চাপিয়া ধরিয়াছিলেন, এবং মুষ্টিবদ্ধ দক্ষিণ হস্তের দ্বারা শত্রুর মুখ-মণ্ডলে প্রচণ্ড আঘাত করিতে লাগিলেন। প্রুসীয় বীর আততায়ীর কবল হইতে মুক্তি লাভের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তরবারী কোষোম্মুক্ত করিবার প্রয়াস পাইলেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু ফল হইল না। মঁসিয়ে ডুবিয়ে প্রকাণ্ড ভুঁড়ীর চাপে তাহাকে যেন পিষ্ট করিতেছিলেন। অবিশ্রান্ত বারিধারার ন্যায় সামরিক কর্ম্ম-চারীর উপর মুষ্টিধারা বর্ষিত হইতেছিল। জর্ম্মানের মুখমণ্ডল রক্তধারায় আপ্লুত হইয়া গেল। ভগ্নদন্ত পরিশ্রান্ত জর্ম্মান ফরাসীর কবল হইতে মুক্তিলাভের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও আত্মরক্ষা করিতে পারিলেন না।

ইংরাজেরা উঠিয়া দাঁড়াইলেন; ব্যাপারটি ভাল করিয়া দেখিবার উদ্দেশ্যে নিকটে সরিয়া আসিলেন। প্রতিদ্বন্দ্বী-যুগলকে বাধা দিলেন না। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতে লাগিলেন।

মঁসিয়ে ডুবিয়ে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি অকস্মাৎ শত্রুকে ত্যাগ করিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে আপনার আসনে উপবেশন করিলেন।

প্রুসীয় কর্ম্মচারী আর তাঁহাকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিলেন না। ফরাসীর প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাতে জর্জ্জরিতদেহ জর্ম্মান বিলক্ষণ ভীত হইয়াছিলেন। যখন তিনি একটু সুস্থ-ভাবে নিশ্বাস ত্যাগে সমর্থ হইলেন, তখন সৈনিকপুরুষ বলিলেন, "পিস্তল-যুদ্ধে আপনি সম্মত না হইলে আমি আপনাকে খুন করিব।"

ডুবিয়ে বলিলেন, "যখন ইচ্ছা, আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছি।"

জর্ম্মান বলিলেন, "এই ত ষ্ট্রাসবার্গ নগর। আমি দুই জন সামরিক কর্ম্মচারীকে আমার সহকারী নিযুক্ত করিব। গাড়ী এই ষ্টেশন হইতে যাত্রা করিবার পূর্ব্বেই কার্য্য শেষ হইয়া যাইবে।"

মঁসিয়ে ডুবিয়ের তখনও ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতে ছিল। তিনি ইংরাজ যাত্রীদিগকে বলিলেন, "আপনারা আমার সহায়তা করিবেন?"

উভয়েই সমস্বরে বলিলেন, "নিশ্চয়।"

গাড়ী থামিল। এক মিনিটের মধ্যে প্রুসীয় বীর দুই জন জর্ম্মান সৈনিক পুরুষকে খুঁজিয়া বাহির করিলেন। তাঁহাদের কাছে এক যোড়া পিস্তল ছিল। তখন সকলে প্রাকারের অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ইংরাজেরা পুনঃ পুনঃ ঘড়ি খুলিয়া সময় দেখিতেছিলেন। তাঁহারা তাড়াতাড়ি সব কাজ সারিয়া লইলেন। পাছে ট্রেন ফেল হইতে হয় বলিয়া তাঁহারা অত্যন্ত চঞ্চল হৃদয়ে উপস্থিত কার্যগুলি ক্ষিপ্র হস্তে সম্পন্ন করিলেন।

মঁসিয়ে ডুবিয়ে জীবনে কখনও পিস্তল ব্যবহার করেন নাই।

প্রতিদ্বন্দ্বীর নিকট হইতে তাঁহাকে বিশ হস্ত দূরে দাঁড়াইতে হইল।

তাঁহাকে যখন প্রশ্ন করা হইল, "আপনি প্রস্তুত?" তিনি উত্তর দিলেন, "হাঁ মহাশয়।" সেই সময় তিনি দেখিলেন, জনৈক ইংরাজ ছাতা খুলিয়া রৌদ্র নিবারণ করিতেছেন।

এক জন বলিয়া উঠিলেন, "এইবার গুলি কর।"

মঁসিয়ে ডুবিয়ে কি করিতেছেন, কোন দিকে গুলি করিতেছেন, এ সব বিষয়ে লক্ষ্য না করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে গুলিবর্ষণ করিতে লাগিলেন। সবিস্ময়ে তিনি দেখিলেন, প্রুসীয় সৈনিকপুরুষ আহত হইয়াছেন, তিনি দুই বাহু ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া সম্মুখে ভূমিশয্যা গ্রহণ করিলেন। তাঁহার গুলিতে জর্ম্মান বীর নিহত হইয়াছেন।

এক জন ইংরাজ আনন্দে অধীর হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "বেশ!" দ্বিতীয় ইংরাজ যাত্রী তখনও ঘড়ি দেখিতেছিলেন। তিনি মঁসিয়ে ডুবিয়ের বাহু ধরিয়া আকর্ষণ করিলেন, এবং দ্রুতবেগে ষ্টেশনের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

তিন জন পাশাপাশি চলিতে চলিতে সংবাদ পত্রের পঞ্চরংয়ের ছবির ন্যায়, লঘু গতিতে ষ্টেশনে পঁহুছিলেন।

তখন ট্রেন ছাড়িতেছিল। লম্ফ দিয়া তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট কামরায় প্রবেশ করিলেন। ইংরাজ যাত্রীরা টুপী খুলিয়া তিনবার মাথার উপর ঘুরাইয়া সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "হিপ্ হিপ্ হুররে!"

তার পর গম্ভীরভাবে উভয়েই একে একে তাঁহাদের হস্ত মঁসিয়ে ডুবিয়ের দিকে বাড়াইয়া দিলেন। করকম্পন শেষ হইলে যে যার নির্দ্দিষ্ট আসন গ্রহণ করিলেন। *

* গীদেমোপাসার গল্পের ইংরেজী থেকে অনূদিত।

সাহিত্য-বৈশাখ, ১৩২০।

পত্রাবলী (অংশ বিশেষ)

স্বর্ণকুমারী দেবী

দিনকতক হইল চার দিন ধরিয়া সোলাপুরে খুব বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। আমাদের টেনিস্কোর্ট এবং কম্পাউণ্ডের কোন কোন স্থান একেবারে পুকুর হইয়া পড়িয়াছিল। আমাদের মালীকে প্রাণ খুলিয়া

কখনো বৃষ্টির প্রশংসা করিতে শুনি নাই এবার তাহাকে বলিতে হইয়াছিল বেশ বৃষ্টি হইয়াছে আর ভিস্তিগুলোর তো কদিন পোয়াবারো। তাহাদের আর জল তুলিতে হয় নাই। তবে আমার মনে হয় ভিস্তির চেয়েও ভিস্তির মশকেরি আনন্দের দিন। সংবৎসর জলে ভিজিয়া এই সময়েই তাহারা শুকাইয়া বাঁচে।

এদেশের লোকের বাহ্যাকৃতি ও সাজ-সজ্জা দেখিলে মনে হয় ইহারা নীরেট সারবান লোক। অনাবশ্যক সখের সঙ্গে ইহাদের বড়ো সম্পর্ক নাই। তথাপি কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেরি এদেশে ফুলের সখ বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। ফুলের মালা খোঁপায় পরা মেয়েদের সাজগোজের একটি অঙ্গ। তবে আমাদের চক্ষে বড় বড় অদ্ভুতাকৃতি মুক্তার নথ পরা মুখের সঙ্গে ঢ্যাবা ঢ্যাবা অদ্ভুত স্বর্ণচাকা শোভিত অর্দ্ধটাক অর্দ্ধখোঁপাযুক্ত খোঁপার উপর সেই ফুলহার যেন একটু খাপছাড়া দেখায়। বাস্তবিক আমার অনেক সময় মনে হয় এদেশের মুণ্ডিতশীর্ষগণ আর নথভারে বিব্রত টানা খোঁপায় পীড়িতাগণ কি পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া আত্মহারা হইয়া মনে করেন 'দেখি দেখি আবার দেখি, দেখিবার সাধ মেটে না তো?' অবশ্য করেন, নাহলে এতদিন পুরুষদিগের ন্যাড়ামাথা চুলে ভরিয়া উঠিত আর স্ত্রীলোকের সাজ-সম্পূর্ণ স্বতন্ত্ররূপ হইয়া দাঁড়াইত।

সে যাহা হউক আপাতত একটি সু-খবর শুনা যাইতেছে; বোম্বাই নগরের একদল বণিকজাতি (বেণিয়া) পঞ্চায়েত করিয়া স্ত্রীলোকের নাকের নথ উঠাইতে চাহেন। তাঁহারা বলেন 'কাজ কি এমন কাজে যাহাতে অন্য সব দেশের লোকেরা নিন্দা করে।' এইবার হইতে যিনি নথ পরিবেন তাঁহার দশ টাকা চারিআনা করিয়া দন্ড দিতে হইবে। যদিও দশ টাকার উপর আবার চারি আনা কেন, সেটা ঠিক বুঝা গেল না। স্ত্রীলোকে পঞ্চায়েত করিয়া এখন পুরুষের ন্যাড়ামাথাটা উঠাইতে পারিলেই ঠিক হয়। তবে আপাতত অনুজ্ঞাটা এমনি ভালোয় ভালোয় পালিত হইবে কিংবা নথ খুলিবার আগে পুরুষদিগকে তাঁহারা একবার নাক-খত দেওয়াইয়া লইবেন, সেবিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। এখানকার সর্ব্বসাধারণের বিশ্বাস, বিধুত স্ত্রীলোকদিগকে নথ ধারণের আজ্ঞা দিয়াছেন। বুঝিবা সত্যযুগে সুদর্শনচক্র এ যুগের মহারাষ্ট্রললনার নাসিকার নথরূপ ধারণ করিয়াছে।

• • •

গণপতি উৎসব উপলক্ষ্যে সেদিন এক-জন ভদ্রলোকের বাড়ী আমাদের পানসুপারির নিমন্ত্রণ ছিল। নিমন্ত্রণকারী ঠিক এদেশী লোক নহেন, কর্ণাটী—বাণিজ্যব্যবসা উপলক্ষে এখানে বাস করিতেছেন। দু'এক বৎসর তাঁহার বিবাহ হইয়াছে—স্ত্রী নিতান্ত অল্পবয়স্কা নহেন, ১৬।১৭ এইরূপ বোধ হয়। আমরা কিছু আগে গিয়াছিলাম, তখনও অন্য নিমন্ত্রিতগণ আসেন নাই, নৃত্যগীতাদিও আরম্ভ হয় নাই। নিতান্ত খুবড়ির মত ঠাকুরদালানে শিব-দুর্গা গণেশ-কার্ত্তিককে লইয়া বিরাজিত, সম্মুখে নানারূপ খেলানা আর দেওয়ালগিরিতে ঝুলানো ল্যাম্প ও ভূমিস্থ বাতিতে ছোট্ট দালান আগুন হইয়া উঠিয়াছে। ঠাকুরের কাছে একটি দেওয়ালের নিকট কৌচে আমরা বসিলাম। গীত আরম্ভ হইল একজন হারমোনিয়ামে সুর দিতে লাগিল, একজন তবলা বাজাইতে লাগিল আর এক-জন কানে হাত দিয়া গান করিতে লাগিল। একটু পরে গৃহস্বামীর আহ্বানে নব-বিবাহিতা গৃহিণী সভায় সন্তর্পণে সভয়ে সমাগত হইলেন, আসিয়া নিস্তব্ধে পুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন, আমরা উঠিয়া তাঁহাকে বসিতে বলিলাম, যেন তিনিই আমাদের নিমন্ত্রিতা। কিন্তু তিনি কিছুতেই বসিবেন না। আমরা কথা কহিতে চেষ্টা করিলাম। তিনি হিন্দুস্থানী বোঝেন না, মহারাষ্ট্রীয় বোঝেন না, আমরা কেহ কর্ণাটী জানি না; সুতরাং বাক্যালাপ বন্ধ তবু ইঙ্গিতে যতদূর হয়, সমাদরে সস্নেহে পিঠে হাত দিয়া তাঁহাকে নিকটে বসাইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু এই ব্যবহারে তিনি এত আশ্চর্য ও ভীত হইয়া উঠিলেন যে, সর্ব্বাঙ্গ তাঁহার থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।—আমি তখন আর অনুনয় না করিয়া বসিয়া পড়িলাম, বুঝিলাম, তাঁহার পক্ষে ইহাই জুলুম।

হপ্তাখানেক হইল বরোদার রাজা নীল-গিরি যাইবার পথে সোলাপুরে দু'দিন অবস্থিতি করিয়া গিয়াছেন। সে দু'দিন সহরে হুলুস্থুল পড়িয়াছিল।

রাজার সঙ্গে এখানকার সম্ভ্রান্ত সকলেরই অবশ্য নিমন্ত্রণ ছিল। কিন্তু আমরা প্রথম দিন বিকালে Union Club-এর নিমন্ত্রণে মাত্র গিয়াছিলাম। আমরা গিয়া দেখিলাম, প্রতিদিন মহারাষ্ট্র যুবকেরা যেখানে টেনিস খেলে, সেই ক্রীড়াস্থল একেবারে লোকারণ্য। অত লোকের মধ্যে যাইতে কেমন লজ্জাবোধ হইতে লাগিল, কিন্তু যখন আসিয়াছি তখন আর কথা কি! ক্রীড়াস্থলে ঢুকিয়াই রাজদর্শন পাইলাম, তাঁহার নিকটেই আমাদের বসিবার স্থল, একজন মহারাষ্ট্রীয় তাঁহার সহিত তৎক্ষণাৎ আমাদের পরিচয় করিয়া দিলেন। রাজা সাদরে আমাদিগকে নিকটে বসাইয়া কথা-বার্ত্তা কহিতে লাগিলেন, সম্মুখে যুবকেরা টেনিস খেলিতে লাগিল। তাঁহাকে দেখিতে সুশ্রী, বয়স ২৫ হইতে ৩০-এর মধ্যে, সাজসজ্জা সুরুচি-সঙ্গত, সুন্দর শুভ্র বেশ, পরিধানে চোস্ত পাজামার উপর নাতিদীর্ঘ মলমল চাপকানের হাতা দুইটি গালাচুনাট—মাথায় লাল পাগড়ী আর অধিকন্তু পাগড়ীর নীচে কেশের গোছা প্রকাশ পাইতেছে। রাজার সুরুচি ও সাহসের ইহা চূড়ান্ত পরিচয়, মহারাষ্ট্র জাতি হইয়া মস্তকে কেশ ধারণ করা কম কথা নহে। গহনার মধ্যে হাতে কতকগুলি বহুমূল্য অঙ্গুরী। রাজার কথাবার্ত্তা, লোকের সহিত আচার ব্যবহার অত্যন্ত প্রীতিপদ। তিনি দুইবার বিলাত গমন করেন, সুতরাং তাঁহাতে ইংরেজী ভদ্রতা ও হিন্দু বিনয় একত্রে মিশ্রিত। আমাদের সহিত তাঁহার প্রধানতঃ ব্রাহ্মসমাজ ও তাহার তিন শাখা, বঙ্গদেশের আধুনিক অবস্থা, এইসকল লইয়াই কথাবার্ত্তা হইল। কথায় কথায় আমি বলিলাম—ব্রাহ্ম-ধর্মে দীক্ষিত না হইলেও শিক্ষিত বাঙ্গালী-মাত্রেই এখন প্রকৃত অর্থে ব্রাহ্ম কেন না তাঁহারা মনে মনে সকলেই প্রায় এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন। রাজা বলিলেন—"কিন্তু মনের বিশ্বাস বাহিরের কার্য্যের সঙ্গে এক হওয়া চাই, তবেই ত তাহার দৃষ্টান্ত সুফল হইবে।" তাঁহারই উপযুক্ত কথা। তিনি জাতিগত আচার উপেক্ষা করিয়া সস্ত্রীক বিলাত গিয়াছেন! কেবল তাহাও নহে, রাজ্যশাসনে তাঁহার উদার মত প্রকাশিত হয়।

আজকাল ভারতবর্ষের অনেক রাজা ইংরাজী শিক্ষার গুণে ইংরাজের প্রকৃত রাজগুণ লাভ না করিয়া কেবল ক্রীড়া কৌতুক, শীকারেই কালাতিবাহিত করেন। আমি ত মনে করিতে পারি না, বঙ্গদেশের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র রাজা দেশের সামান্য লোকের আহ্বানে এরূপ প্রফুল্লভাবে এরূপ বিনয় সহকারে তাহাদের মধ্যে আসিয়া তাহাদের সম্মানিত করিয়া নিজেকে সম্মানিত জ্ঞান করিবেন। তাঁহার দেশের লোকের সহিত কতটুকু সম্বন্ধ। ইংরাজের সহিতই তাঁহার আচার ব্যবহার, ইংরাজ লইয়াই তাঁহার কাজ কারবার। ইংরাজকে আমোদ দান করাই যেন তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য। বিলাত যাইয়া আর ইংরাজদের সহিত মিশিয়া তাঁহার এই হইয়াছে যে, তিনি দেশীয় লোককে অবজ্ঞা করেন আর সর্বতোভাবে ইংরাজ হইতে চাহেন, আর বরদারাজ বিলাত যাইয়া দেশীয় লোককে বিশেষ আপনার বলিয়া মনে করেন। এক-দিকে ইংরাজদিগের সু-প্রথা ও সু-শাসন অবলম্বনে রাজ্যপালন করেন, অন্যদিকে প্রজাদিগকে দেখাইতে চাহেন, তিনিও তাহাদেরই একজন; জাতিতে এক, হৃদয়ে এক, আচার ব্যবহারে এক, তিনিও যা, আর তাঁহার প্রজাগণও তাহাই; তিনি যে রাজা, তিনি বড়, সে কেবল তাহাদের লইয়াই। বাস্তবিক সে দিন রাজসভায় গিয়া যে কি আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম বলিতে পারি না চারিদিকে আনন্দপ্রফুল্ল মুখ, তাহাদের সেই আনন্দে রাজা পরিতৃপ্ত, চরিতার্থ, রাজভক্ত ও দেশীয় বৎসলতার আদান-প্রদানে চারি-দিক উথলিত। রাজ-দর্শনে যে সুখ সেই দিন যথার্থ উপলব্ধি করিলাম। লাটপত্নী মহাসমারোহময় উৎসব আসরে গিয়া তাঁহার কথাবার্ত্তায় সম্মানিত হইয়াছি। কিন্তু এই সামান্য টেনিস সভায় সামান্য জনসাধারণ বেষ্টিত রাজসভা দর্শন করিয়া যে সুখ পাইয়াছি, তাহার নিকট তাহা কিছুই নহে। রাজাকে দেখিয়া মহারাষ্ট্রী জাতির উপর শতগুণ শ্রদ্ধা বাড়িল। বাঙ্গালী উন্নতিশীল সত্য; কিন্তু তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে চলে, তাব নিজের তার অতি অল্প, কিন্তু মহারাষ্ট্র আপন ভাবে তরঙ্গ পরিচালনা করিতে পারে।

প্রদর্শনী পরিক্রমা

চিত্ররসিক

শীতের কলকাতার বৃহত্তম চিত্রপ্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন গত ১৫ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসের প্রেক্ষাগৃহে শিল্পী দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত হল। অ্যাকাডেমির ৩২ তম বার্ষিক প্রদর্শনীর উদ্বোধনে এর প্রেসিডেন্ট এবং সম্পাদকের বিবৃতি থেকে জানা যায় যে, গত আগস্টে এখানে একটি ভাস্কর্যের স্টুডিও খোলা হয়েছে এবং অবিলম্বে সেরামিকসের কাজের সুবিধার জন্য একটি কিলন্ খোলার কথা চিন্তা করা হচ্ছে। ভারতের পুরাতন বস্ত্রশিল্পের নমুনা এবং প্রাচীন পারসিক কার্পেটের একটি স্থায়ী গ্যালারী খোলারও ব্যবস্থা করা হবে। এগুলি সম্পূর্ণ হলে প্রাচীন নকসা সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালানোর সুযোগ সুবিধাও দেওয়া হবে বলে জানা গেল।

উদ্বোধনী ভাষণে শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়-চৌধুরী প্রাচীন ও আধুনিক পন্থী শিল্পী-দের শিল্প-লক্ষ্য সম্বন্ধে বিভিন্ন মন্তব্য করে বলেন যে তিনি মনে করেন প্রাচীনপন্থীদের পক্ষে অসম্ভব মূল্যে মৌলিকত্ব অর্জন করা বা চট্ করে খ্যাতি লাভের পথ নেওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া ইচ্ছা করলেই মৌলিক হওয়া যায় না। কোন না কোন রূপে অনুকরণই শিল্পের চূড়ান্ত লক্ষ্য। সেদিক দিয়ে প্রাচীন ও নবীন চিন্তাধারায় কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। তবে বিষয়বস্তুর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী এবং তার রসের আপেক্ষিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এদের প্রভেদ আছে। প্রাচীন পন্থীরা আগের যুগের শ্রেষ্ঠশিল্পীদের নির্ধারিত মানে পৌঁছতে চান এবং একটা মান সৃষ্টি করবার চেষ্টা করেন। নবীনেরা অতীত বা বর্তমানকে পরিত্যাগ করে ভবিষ্যতের জন্যেই বেঁচে থাকতে চান, তবে এই বর্তমানই একদিন অতীত হবে এবং ভবিষ্যৎ বর্তমানের স্থান নেবে এ সম্বন্ধেও অবশ্য আধুনিকেরা সচেতন।

অ্যাকাডেমির বর্তমান প্রদর্শনীতে ২৭০ খানি জল রং তেল রং ভাস্কর্য ও গ্রাফিকসের নমুনা দেখা গেল। শোনা যায় দুহাজারেরও বেশী শিল্পবস্তু প্রদর্শনীর জন্যে ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে এসেছিল। এর মধ্যে থেকে বাছাই করা দুরূহ কাজ সন্দেহ নেই। মাদ্রাজ, বোম্বাই, বরোদা, হায়দ্রা-বাদ, গুজরাট, উত্তর প্রদেশ, উড়িষ্যা প্রভৃতি বিভিন্ন রাজ্যের শিল্পীরা এখানে অংশ গ্রহণ করেছেন। প্রদর্শনীতে দেখা যায় যে প্রাচীন পন্থী শিল্পীদের চাইতে আধুনিক পন্থীদের কাজের নমুনা সবচেয়ে বেশী এবং অপেক্ষা-কৃত তরুণ শিল্পীরাই বেশী করে কাজ দেখা-বার সুযোগ পেয়েছেন—যদিও তাঁদের মধ্যে কিছু কিছু খ্যাতনামা শিল্পীরা এখানে অংশ গ্রহণ করেন নি। এবারে বাংলা দেশ ও অন্যান্য রাজ্য মিলিয়ে ১২ জনকে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। তবে প্রদর্শিত ছবি ও ভাস্ক-র্যের মান এতই সমান যে এই পুরস্কার নির্বাচন অতি দুরূহ কর্ম এবং সকলের পক্ষে সন্তোষজনক কি না তারও বোধহয় নিঃসংশয়ে বলা সম্ভব নয়।

প্রদর্শনীতে অ্যাকাডেমিক কাজের সংখ্যা খুব কম এবং তাদের নমুনা খুব উৎসাহজনক নয়। গত বছরের চাইতে মান বিশেষ উন্নত নয়। এরই মধ্যে সেলিম মুন্সীর শান্তি-নিকেতনের দৃশ্য ও এল, ভি, শেনভির দুখানি কাশীর দৃশ্য উল্লেখ করা যেতে পারে। নব্য-ভারতীয় প্রথার জল রং-এর কাজগুলি গত বছরের চাইতে নিম্ন শ্রেণীর। ইন্দ্র দুগারের একক প্রদর্শনীতে তাঁর কাজের আরো ভাল নমুনা দেখেছিলাম।

আধুনিক শিল্পরীতির বিভিন্ন ধরনের নিদর্শনের মধ্যে বাংলা দেশের শিল্পীদের মধ্যে সুনীলমাধব সেনের দুখানি নতুন ধর-নের কাজ ভাল লাগল। তাঁর 'বুল' ছবিটির ডিজাইন এবং আঙ্গিকের সরলতা প্রশংসনীয়। পরিতোষ সেনের ছোট মুখে তাঁর বড় মাপের ছবিগুলির চাইতে অনেক বেশী আবেদন আছে। রঙের হর্ষানিও অনেক সুন্দর। অজয় মুখার্জির 'লোটাস পুল' এবার রাজ্যপালের পুরস্কার পেয়েছে। শ্যামল বোসের 'দামোদর' এর দৃশ্যটি সরল ও সুগঠিত। অমরেন্দ্রলাল চৌধুরীর লোকশিল্পে অনুপ্রাণিত দু'খানি ছবি উল্লেখযোগ্য। গোপাল ঘোষ, রথীন মৈত্র প্রভৃতি প্রবীণ শিল্পীরা তাঁদের নিজস্ব ধরনের ছবি দিয়েছেন। সমর ভৌমিক, মহিম রুদ্র, গণেশ হালুই, রমেন কুন্ডা, কাত্যায়ন শাকলাত, জীবেন্দ্রকুমার সেন প্রভৃতি কয়েক-জনের ছবি ভাল লাগল। সুশীল মুখার্জির একটি ড্রয়িং ইন্টারেস্টিং। আমেদাবাদের ঈশ্বর সাগরার কতকগুলি মুখমন্ডলের ড্রয়িং সাদাকালোর কাজের মধ্যে চমৎকার হয়েছে। এখানকারই আরেক শিল্পী অশ্বিন মোদীর দুটি কম্পোজিশন "আননোন স্ক্রিপ্ট" ও "শ্রীগণেশায় নম" রঙের পরিমিত প্রয়োগ ও ডিজাইনের সংযত ব্যবহারে আশেপাশের ছবি থেকে অনেক বেশী দর্শনীয় হয়েছে। হায়দ্রাবাদের মধুসূদন রাওএর গণেশমূর্তির ভাস্কর্যসুলভ দৃষ্টিভঙ্গী বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। গঠনের চাইতে রঙকে বেশী প্রাধান্য ইনি দেন নি। ইন্দোরের জি, কে, পন্ডিতের দুটি গ্রামের দৃশ্যের অ্যাবস্ট্রাকশন রং এবং প্যাটার্নের দিক দিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণকারী। মাদ্রাজের ভি, রাজেন্দ্রনের ভারতীয় পৌরাণিক দেবদেবীকে প্রাচীন মেক্সিকোর দেবমূর্তি বলে ভুল হয়। ওয়ালা কিশোরের "স্টর্ম কিস"এর ঘোড়া দুটি ফ্রাঞ্জ মার্কের অনুপ্রেরণায় আঁকা; এছাড়া অন্যান্য কয়েকটি ছবির ভেতর বিদেশী ছবির অনুকরণ কতখানি যে রয়েছে তা নিঃসংশয়ে বলা সম্ভব নয়। কোন কোন ছবির সামনে দাঁড়িয়ে মনে হয় যে যেখানে সাদা বাংলায় কথা বললে অর্থ পরিষ্কার হয় সেখানে খামকা যেন ভুল ইংরেজীতে বোঝাবার চেষ্টা করে অর্থটা ধোঁয়াটে করে দেওয়া হচ্ছে। গ্রাফিকসের বিভাগ অত্যন্ত দুর্বল। হরেন দাসের কাজে কারুকর্মের কুশলতা দেখা গেল, কিন্তু রসের সন্ধান বিশেষ পাওয়া গেল না। অথচ বাংলাদেশে ভাল গ্রাফিকস তৈরী হয় না এমন নয়।

ভাস্কর্য বিভাগে বিভিন্ন ধরনের কাজ রয়েছে। তবে এখানেও কতকটা অ্যামেচারিশ ভাবের প্রাধান্য বেশী। কেবল মীরা মুখার্জির "বামন অবতার" মূর্তিটির বলিষ্ঠতা, ব্যক্তি-গত দৃষ্টিভঙ্গী এবং বাংলার লোকশিল্পের সঙ্গে একটা গভীর সংযোগ খুবই ভাল লাগল। প্রদর্শনী ১৫ই জানুয়ারী পর্যন্ত খোলা থাকছে।

শিল্পী দীপক ব্যানার্জি ফ্রান্সে উইলিয়ম হেটারের স্টুডিওতে শিক্ষালাভ করে বিড়লা অ্যাকাডেমিতে তাঁর এবং তাঁর বিদেশী সহকর্মীদের গ্রাফিকসের একটি ছোট প্রদর্শনী করেছেন। এখানে শ্রীব্যানার্জির প্রায় কুড়িখানির মত কাজ ও তাঁর অন্য-সাতেক সহকর্মীদের একখানি করে ছবি দেখানো হয়েছিল। অধিকাংশ কাজেই একখানি মাত্র প্লেট থেকে বহুবর্ণের ইম্প্রেশন নেওয়া হয়েছে। কারো কারো কাজে তাঁদের শিল্পগুরুর শিল্পরীতির প্রভাব প্রবল। সাদাকালোর কাজের মধ্যে রিচার্ড রয়েসের কম্পোজিশন এবং ইসোল্ডে বাউমগার্টের ছবিটি সবচেয়ে ভাল লাগল। শ্রীব্যানার্জির অ্যাবস্ট্রাক্টগুলির মধ্যে কয়েকটি ক্ষেত্রে ডিজাইনের সারল্য দৃঢ়তা এবং রঙের সংযত ব্যবহারে সুশোভন হয়েছিল। তাঁর স্টাডি ৩, ফিশ, নাইট এবং ১৪, ১০ ও ১৩ সংখ্যক ছবিগুলি এদিক দিয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রদর্শনী ১৬ থেকে ২২শে ডিসেম্বর পর্যন্ত খোলা ছিল।

সরকারী চারু ও কারু মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের বার্ষিক শিল্প প্রদর্শনী ২৩শে ডিসেম্বর থেকে ১৯৬৮-র ৬ই জানুয়ারী পর্যন্ত বিদ্যালয় ভবনে হচ্ছে।



শিল্পীঃ বন্সি পারমু

একাধারে চিত্র ভাস্কর্য এবং বিভিন্ন রকমের কারুশিল্প নিয়ে ৬০০-র ওপর নিদর্শন রাখা হয়েছে। জলরঙ বিভাগে নিসর্গ বা নগরের দৃশ্যই এবারে প্রধান। দেহাকৃতি অঙ্কন প্রায় সকলেই সযত্নে পরিহার করে গিয়েছেন। যে সব ক্ষেত্রে সে চেষ্টা করা হয়েছে সেগুলির প্রশংসা করতে পারলে আনন্দিত হওয়া যেত। কাঞ্চন দাশগুপ্তের দুটি বারাণসীর দৃশ্য সুন্দর। জ্যোতির্বিন্দু চৌধুরীর একটি ছাদের ছবি এবং অন্নদাগোপাল রায়ের পুকুর পাড়ে ও পাহাড়ের দৃশ্য মন্দ হয় নি। এ ছাড়া অমল বেরা, রথীন রায় প্রমুখ আরও কয়েকজনের জলরঙের হাত ভাল লাগল। নব্যভারতীয় প্রথার ছবি এবার আগের বারের চাইতে অনেক নিম্নমানের মনে হল। পুরোনো ধরণের সেন্টিমেন্টাল বিষয়বস্তু এবং দুর্বল চিত্র নির্মাণ এ বিভাগটিকে অনুজ্জ্বল করে রেখেছে। এরই মধ্যে বিজন সামন্ত, আশীষ মণ্ডল প্রভৃতির কয়েকখানি ছবি উল্লেখযোগ্য। গ্রাফিক ও স্কেচ বিভাগে বিমূর্ত ও ডেকরেটিভ রীতির প্রতিই পক্ষপাতিত্ব দেখা গেল। ফিগার ড্রয়িং বলতে উল্লেখযোগ্য কিছুই চোখে পড়ল না। অমলকুমার বেরার বস্তির দৃশ্যের লিথোগ্রাফ ও দীপ্তি পালের এচিংটির মধ্যে কিছুটা বাস্তব রূপ ফোটাবার চেষ্টা আছে। আধুনিক রীতির কাজের মধ্যে দু-একটি মনোপ্রিন্ট, জয়ন্ত পালচৌধুরী, গৌরীশঙ্কর মিত্র প্রভৃতি কয়েকজনের কাজ মন্দ নয়। মুরাল বা ফ্রেস্কোর কাজ মামুলী ধরনের। তৈল বিভাগেও বাস্তবানুগ কাজের নিদর্শন অল্প এবং যথেষ্ট উন্নত নয়। সলমা আব্বাস ও অনিতা রায়ের দুখানি ফিগারেটিভ স্টাডি উল্লেখযোগ্য। বিনোদবিহারী রায়ের ছাদের কাঠের সিঁড়ির ফাঁকে আলো-ছায়ার কাজটি বেশ। রথীনকুমার রায়ের ছোট একটি প্রতিকৃতি এবং ঘোড়ার ছবিটি বেশ সুঅঙ্কিত। বাসুদেব পালের প্রতিকৃতিতে একটা কাঠিন্য আছে যার জন্যে কাজটি জমে নি। গৌরাঙ্গ কুণ্ডুর একটি পার্বত্য দৃশ্য সুঅঙ্কিত। আধুনিক রীতিতে কনক মুখার্জি, ডি পি পাভরী, শক্তি চক্রবর্তী, শঙ্কর গুহ ও আরও কয়েকজন বিভিন্ন ধরনের অ্যাবস্ট্রাকশন ও আধুনিক শিল্পরীতির বিভিন্ন শৈলীর কাজের নমুনা উপস্থিত করেছেন, তবে কারও কাজেই তেমন একটা আকর্ষণীয় গুণ দেখা গেল না। কমার্শিয়াল বিভাগে কয়েকটি ভ্রমণ পোস্টার এবং প্যাকেজিং ও কভার ডিজাইনের কতকগুলি কাজ সুন্দর দেখা গেল। পেপার স্কালপচারে একটি উইণ্ডো ডিসপ্লের কাজ উল্লেখযোগ্য।

ভাস্কর্য বিভাগেও প্রতিকৃতি বা ফিগারেটিভ কাজ বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছু নেই। শমিতা কুণ্ডুর ফ্লাইং বার্ড এবং প্রি দাশের পাখীটি সুন্দর। কাঠের ভাস্কর্যগুলি গত বছরের মতই।

ক্র্যাফ্‌ট বিভাগের কাজ গত বছরের মতই সুন্দর হয়েছে। বাটিকের কাজই প্রধান এবং বৈচিত্র্যময়। সাধারণ শাড়ী, ভিত্তিসজ্জা, ছাতা, ল্যাম্প শেড ছাড়া কয়েকটি রুমালের কাজে খানিকটা পরীক্ষা-নিরীক্ষার আভাস পাওয়া গেল, চামড়ার ব্যাগ এবং অন্যান্য চামড়ার কাজগুলি বেশ সুরুচিসম্পন্ন। বিভিন্ন ধরনের কাঠের কাজগুলিও মন্দ হয় নি। এই বিভাগের কাজগুলির মধ্যে একটা নিম্নতম মান আছে যেটা অন্যান্য বিভাগে ততটা চোখে পড়ে না।

●

ফাল্গুনী দাশগুপ্ত যদিও দীর্ঘকাল সরকারী শিল্প বিদ্যালয় থেকে পাশ করে বেরিয়েছেন এবং মাঝে মাঝে যৌথ প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছেন তবু এত দিন একক প্রদর্শনী করেন নি। কলকাতার বাইরে পুরুলিয়ার এক গ্রামের স্কুলে তিনি শিল্প-শিক্ষকতা করছেন। গত ২৭শে ডিসেম্বর থেকে ২রা জানুয়ারী পর্যন্ত তিনি আর্টিস্ট্রি হাউসে সাতাশখানি জলরঙ-এর ছবি নিয়ে তাঁর প্রথম একক প্রদর্শনী করলেন। আজকের পাইকারী অ্যাবস্ট্রাকশনের যুগে তাঁর সরল স্বচ্ছ এবং সাদাসিধে জলরঙের কাজগুলি চোখে ভাল লাগল। শ্রীদাশগুপ্ত মনে করেন অ্যাবস্ট্রাকশনের পথ সকলের জন্যে নয়। প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে এখনো অনেক কিছু আছে যা সোজাসুজি তুলে ধরতে পারলে মানুষকে আনন্দ দেওয়া যায়। দেশের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করে নানা দৃশ্য তাই তিনি তুলে এনে সাজিয়েছেন।

প্রদর্শনীতে দার্জিলিং, কালিম্পং কেরল প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের নিসর্গ দৃশ্য সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। আলো ছায়া এবং আবহাওয়ার একটা আমেজ ধরার চেষ্টা দেখা গেল, 'পপলার', 'রেডসাইড শপিং', 'ফ্লোটিং মার্কেট', 'জিপসিজ শেলটার', 'উইন্টার মর্ণিং' প্রভৃতি ছবিগুলির সর্বসাধারণের কাছেই একটা আবেদন আছে। বিশেষভাবে ভাল লাগল তাঁর 'সিটি অব বিল্ডিং' ছবিটি। কলকাতার বাড়িঘর ও রাস্তায় শীতের আলো-ছায়ার মাধুর্য এবং সেই সঙ্গে জলরঙের ব্যবহারের পটুত্ব দুটোই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভাল রঙের অভাবে আজকাল তিন ছোট ছেলে-মেয়েদের সস্তা রং-এর বাক্স ব্যবহার করছেন। তাঁর সর্বাধুনিক ছবিগুলি তাতেই আঁকা। পুরুলিয়ার এই দৃশ্যগুলি অন্যান্য ছবি থেকে একটু ভিন্নধরনের। মনে হয় তাঁর ধরণ একটা নতুন দিক নিতে পারে।

●

গত ২৫শে ডিসেম্বর ২৮ নম্বর বেনিয়াপুকুর রোডে 'পেন্টার্স ক্যালকাটা' নামে নতুন একটি শিল্পী গোষ্ঠীর একটি নতুন গ্যালারী খোলা হল, গ্যালারী উদ্বোধন করেন শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক। এই গোষ্ঠীর শিল্পীদের মধ্যে আছেন পার্থ ভট্টাচার্য, নিতাই ঘোষ ও ব্রজগোপাল, বিভিন্ন পদ্ধতিতে এঁরা কাজ করে থাকেন। অদূরভবিষ্যতে এঁদের প্রদর্শনীর আয়োজন হবে বলে জানা যায়। আমরা এই গোষ্ঠীর সাফল্য কামনা করি।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষ শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

জরাসন্ধের সেই বিখ্যাত
লৌহকপাট (৪র্থ পর্ব) ৭:

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
দোলগোবিন্দের কড়চা ৬,

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
কালিন্দী ৭॥

গন্নাবেগম ৮, প্রতিভাধর লেখকের আশ্চর্য সৃষ্টি

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
দহন ও দাহ ৬, কাল তুমি আলেয়া ১২॥

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
শিলাপটে লেখা ৮:

মনোজ বসুর
সজবদল ৫॥

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের
বায়স্কোপের বাক্স ৬:

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের
য়া ৫॥

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
ঢেউ ওঠে পড়ে ৬,

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
আলোর অরণ্য ৬॥

সুরেশচন্দ্র সাহার জাপান ভ্রমণ
চেরী ফুলের দেশে ৪॥

দিলীপ মালাকারের জার্মানীর মর্মকথা
দুই জার্মানী ৩॥

জ্যোতিকুমার চৌধুরীর হিমালয় ভ্রমণ
ধ্যানগম্ভীর এই যে ভূধর ৪॥

প্রমথনাথ বিশীর
লালকেল্লা ১৪,

পরিতোষ মজুমদারের
সান পাঁউলির মেয়ে ৩॥০

অবধূতের
কলিতীর্থ কালীঘাট ৫॥০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের
মগ্নমৈনাক ৪॥০

ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের
ধর্মে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ৫,

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের
ত্রৈলোক্য রচনাসম্ভার ১২,

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
শুকসারী কথা ৮॥০

প্রফুল্ল রায়ের
কিন্নরী ৪॥ পূর্ব পার্বতী ১১,

মৈনাকের
সুবর্ণরেখার তীরে ৫॥ বহ্নিবলয় ৯,

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের
পূর্বাচল ১১,

সৈয়দ মুজতবা আলীর
পছন্দসই ৭,

হিরন্ময় ভট্টাচার্যের রম্য রচনা
মন্দমধুর ৪॥

কুমুদরঞ্জন মল্লিকের
কুমুদরঞ্জন কাব্যসম্ভার
॥ দশ টাকা ॥

জরাসন্ধের
লৌহকপাট ২০,
চারি খণ্ড একত্রে : শোভন সংস্করণ

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের
যতীন্দ্র কাব্যসম্ভার
॥ সাড়ে বারো টাকা ॥

জরাসন্ধের
পরশমণি ৫,

বিমল করের
যাদুকর ৫॥

শঙ্কু মহারাজের
গিরিকান্তার ৯,

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
সাঁঝের মল্লিকা ৫,

স্বামী দিব্যাত্মানন্দের
পুণ্যতীর্থ ভারত ১০,

সুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের
হিমালয়ের তিন তীর্থ ৩॥

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের
হিমালয়ের পথে পথে ৭,

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর
উপেন্দ্রকিশোর গ্রন্থাবলী ১০,
[চিত্রে চিত্রে চিত্রময়—সমস্ত মৌলিক রঙিন চিত্রসহ]

আশাপূর্ণা দেবীর
সেই সব গল্প ৬॥০
[সচিত্র গল্পসংকলন]

দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদারের
ঠাকুরমার ঝুলি (নূতন সংস্করণ) ৪॥০
ঠাকুর্দার ঝুলি ৪, কিশোর গ্রন্থাবলী ৪, দাদামশাইয়ের থলে ৪॥০

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২ ফোন : ৩৪-৩৪৯২ : ৩৪-৮৭৯১


সুপার স্পিড ৫·৯৫
সেণ্টার কোর্ট ১৩·৯৫
Bata
গতিশক্তি
সঞ্চারক
দ্রুত পদক্ষেপ আর অনুপম আরাম—এই
অভিপ্রায়ে বাটার খেলার জুতোর বৈশিষ্ট্যগুলি
দেখুন। কুশন আর্চ আর ইনসোল আকস্মিক
আঘাত থেকে রক্ষা করে। ঘনবুনোট
ক্যাম্বিসের আপার—ক্ষয়শীল সন্ধিস্থলে
টেকসই বন্ধনী। ভারী বাম্পার
টোগার্ড। আপার আর জুতোর তলির
অভেদ্য বন্ধন। ঢালাই সোল আর
হিল এমন কৌশলে তৈরি যা
পারতপক্ষে হড়কাবে না। সব
মিলিয়ে, আশ্চর্য সমর্থ সমাবেশ।
হকি ৮·৯৫

৭ম বর্ষ
৩য় খণ্ড

অমৃত

৩৮শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 12th January, 1968. শুক্রবার ২৭শে পৌষ, ১৩৭৪ 40 Paise

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

অমৃতে প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পান্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধাবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্ততঃ ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা			
বার্ষিক	টাকা	২০-০০	টাকা	২২-০০
ষান্মাষিক	টাকা	১০-০০	টাকা	১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা	৫-০০	টাকা	৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

সূচীপত্র

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক
ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায়—সম্পাদিত

দ্বিজেন্দ্রলালের **সাজাহান** ৫·০০

এতে আছে : নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল, 'সাজাহান' নাটকের ঐতিহাসিক উপাদান, ঐতিহাসিক নাটক হিসাবে 'সাজাহান', 'সাজাহান' নাটকের ট্র্যাজিডি-বিচার, নায়ক-বিচার ও নামকরণ, 'সাজাহান' নাটকে পাশ্চাত্য প্রভাব, 'সাজাহান' নাটকের সঙ্গীত, সংলাপ, গঠন-রীতি, অতিনাটকীয়তা ইত্যাদি।

দে বুক স্টোর্স। ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা—১২
ডি, এম, লাইব্রেরী। ৪২ বিধান সরণী, কলিকাতা—৬



'কেদার রাজা' প্রসঙ্গে

'কেদার রাজা' ছবির সমালোচনা প্রসঙ্গে পত্র লেখার জন্যে পত্রলেখককে ধন্যবাদ। তিনি আমাকে আমার বক্তব্য আরও পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলবার সুযোগ দিয়েছেন। অবশ্য এই ছবির প্রসঙ্গে আমি যা বলেছি, তা যে কোথাও অস্পষ্ট, এমন কথা বললে আমার প্রতি অবিচার করা হবে। 'এক সরলা পল্লীবিধবার সর্বনাশসাধনের জন্যে কয়েক-জন শয়তানের আপ্রাণ চেষ্টার ন্যক্কারজনক ঘটনাবলী'—এই কথা পড়বার পরে "সেই ঘটনাবলীর চলচ্চিত্রায়ণই 'ন্যক্কারজনক'" কিনা, এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয় কি করে, তা আমার বুদ্ধির অগম্য। আমি যে বিভূতি-ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত কাহিনীর আলোচনা প্রসঙ্গে এই আপ্রাণ চেষ্টার ঘটনাবলীকে ন্যক্কারজনক বলেছি, একথা কি বুঝিয়ে বলবার প্রয়োজন আছে?

কোনো কাহিনীর মধ্যে নাট্যবিভব না থাকলে তা চলচ্চিত্রায়িত হবার উপযোগী নয়, পৃথিবীর বহু সার্থক কাহিনীচিত্র দেখবার পরে এই প্রত্যয় আমার মনে দৃঢ়বদ্ধ। কোনো কাহিনীকে চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত করবার জন্যে যে-চিত্রনাট্য রচনার প্রয়োজন হয়, তার নামের মধ্যে (চিত্রনাট্য) নাট্যবিভবের প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকৃত। 'পথের পাঁচালি' এবং 'খড়কুটো'র কাহিনীর মধ্যে নাটকত্ব নেই, এমন কথা বলা নাট্যবোধ-হীনতারই পরিচায়ক। দারিদ্র্য বা অমোঘ নিয়তির সঙ্গে সংগ্রাম কি নাটকের উপজীব্য নয়? 'কেদার রাজা'র চারিত্রিক মাধুর্য ফুটে উঠেছে কি মাত্র একক কেদার রাজা দ্বারা? না, প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টি এবং অন্যান্য গ্রাম্য চরিত্রের সহায়তায়? কিন্তু তবু সামগ্রিকভাবে 'কেদার রাজা'র কাহিনীর মধ্যে কোনো বৈচিত্র্যময় নাটকীয়তা নেই। তা' থাকলে কাহিনীটি কেদার রাজাকে অবলম্বন করেই অগ্রসর হতে পারত, তার কন্যা শরতের শান্তিময় জীবনকে বিঘ্নিত করবার জন্যে দুর্বৃত্তগণের অপচেষ্টার কাহিনীকে প্রাধান্য দিতে হোতো না। —এই দ্বিতীয় কাহিনীটিতে কেদার রাজা হারিয়ে গেছেন। যখন এই অবস্থা দীর্ঘায়ত শয়তানী কাহিনীটির প্রায় পরিসমাপ্তি ঘটে, মাত্র তখনই আবার শোকভারে নির্জীব নিষ্ক্রিয় কেদার রাজাকে দেখতে পাওয়া যায়। এইখানেই কাহিনীর দুর্বলতা। কেদার রাজার কাহিনী কেদার রাজাকে অবলম্বন করেই গড়ে ওঠা উচিত ছিল। তা যখন হয়নি, তখন তার থেকে সার্থক চলচ্চিত্রও গড়ে ওঠা স্বাভাবিক কারণেই সম্ভব হয়নি। ছবির প্রথম অংশে যতক্ষণ পর্যন্ত কেদার রাজা আছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত ছবিটিও মাধুর্যমণ্ডিত, উপভোগ্য ও সুন্দর।

—নান্দীকর

(২)

'কেদার রাজা' ছবির যে সমালোচনা আপনার সিনেমা-সমালোচক লিখেছেন তার প্রতি-সমালোচনা লিখেছেন শ্রীগোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় (অমৃত, শুক্রবার, ২০শে পৌষ, ১৩৭৪)। আমি আবার এ সমালোচনারও প্রতি-সমালোচনা লিখবার সাহস করছি। আশা করি, আপনি এটি প্রকাশিত করে অনুগৃহীত করবেন।

পত্রলেখক লিখেছেন, সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি ছাড়া 'কেদার রাজা' সপরিবারে উপভোগ করার মতো ভালো ছবি। আমি বলবো, সপরিবারে উপভোগ্য অনেক ছবি হতে পারে, কিন্তু শিল্পবিচারের নিরিখে ক'টা ভালো ছবি আছে? আর 'কেদার রাজা'র ত্রুটি-বিচ্যুতি সামান্য নয়, অসামান্য। মোটর-গাড়ী করে তিন শয়তান যখন থেকে কেদার রাজা ও তার বিধবা কন্যাকে কোলকাতায় নিয়ে চললো, তখন থেকে গাড়ীর গতিবেগের সঙ্গে সঙ্গে ছবিটিও বাস্তব জগৎ থেকে দূরে সরে গেছে! 'কৃষ্ণযাত্রা'র প্রধান গায়ক এবং পরিচালক কেদার রাজা যেভাবে মুহূর্তে মধ্যে গ্রাম ছেড়ে সরল বিশ্বাসে কোলকাতায় চললেন তা কি আমাদের যুক্তিগ্রাহ্য? আর নিজের শরীরের অসুস্থতা-নিবন্ধন বিধবা যুবতী মেয়েকে এভাবে তিনটি পুরুষের (যাদের মধ্যে একজন পরিচিত হলেও কি পুরোপুরি বিশ্বস্ত?) সঙ্গে একা যেতে দিতে একটুও দ্বিধা করলেন না! তারপর, একটি শয়তান যেভাবে কালীঘাট থেকে হরিদ্বার পর্যন্ত ছুটোছুটি করলো তা যে হিন্দী ছবিকে স্মরণ করিয়ে দেয়!! শেষে পিতা-পুত্রীর অশ্রুসজল মিলন যতোটা আবেগধর্মী এবং নাটকীয়, ততটা বিশ্বাসযোগ্য মোটেই নয়। মোটকথা, ছবির প্রথমার্ধ যতটা শিল্পশ্রী নিয়ে গরীয়ান, শেষার্ধ তার ভগ্নাংশমাত্র বহন করছে।

আর একটি কথা। প্রতিভাবান অভিনেতা এবং সুগায়ক শ্রীখগেশ চক্রবর্তী এ ছবিতে যে ধরনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন তার চেয়ে প্রশস্ততর, মূল্যবত্তর ভূমিকায় তিনি অভিনয় করার যোগ্যতা রাখেন।

অরুণকান্তি লাহিড়ী,
কলিকাতা—৩৪।

সংখ্যা-সংখ্যা-সংখ্যা

২৮শে অগ্রহায়ণ তারিখের অমৃতে শ্রীকমল চক্রবর্তীর উদ্ধৃত ও তাঁর নিজস্ব হিসাব দুটি কৌতূহলদীপক হলেও বাস্তব ক্ষেত্রে একেবারেই যে উপেক্ষণীয় তাও নয়। তবে সম্পূর্ণ হিসাব প্রয়োজন। ব্যাংকে জমা ৫০ টাকা থেকে ৫০ টাকা তোলা হলেও ৪৯ বা ৪৭ টাকা রইল বলে যা দেখান হয়েছে তার প্রথম অংকগুলি ছাড়া অন্যান্য-গুলি সম্পূর্ণ কাল্পনিক। আবার যে টাকা তোলা হলো আর যে টাকা রইল তার সব টাকাই জমাকারীর এবং যে অংকের টাকা তোলা হলো সেই টাকা ব্যাংকের শেষ জমা টাকার বিয়োগাংক টাকা; অন্যথায় ব্যাংক কর্তৃপক্ষের দিনকতকের মধ্যেই দেউলিয়া হবার সম্ভাবনা যে সুনিশ্চিত তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। তোলার পর যে টাকাটা রইল সেই টাকা যে ব্যাংকেই রইল তাও সুনিশ্চিত। যাইহোক নির্ভুল হিসাব রাখার পক্ষে এই হিসাব দুটির অন্যান্য সমজাতীয় হিসাবে যে সার্থকতা আছে তা নিম্নে দেখান হলো :—

প্রথম হিসাব

ব্যাংকে জমা টাকা	টাকা তোলা হলো	টাকা রইল	ব্যাংকে শেষ জমা টাকা
৫০	০	০	৫০
২৫	২৫	২৫	—২৫
১৫	১০	১৫	—১০
৭	৮	৭	— ৮
২	৫	২	— ৫
	২	০	— ২

৯৯ — (৫০ + ৪৯) = ৫০—৫০=০

দ্বিতীয় হিসাব

৫০	০	০	৫০
২৫	২৫	২৫	—২৫
১৫	১০	১৫	—১০
৬	৯	৬	— ৯
১	৫	১	— ৫
	১	০	— ১

৯৭ — (৫০ + ৪৭) = ৫০—৫০=০

এই নতুন হিসাব দুটির সার্থকতা প্রমাণে আংশিক টাকা তোলার সংক্ষিপ্ত হিসাব দেওয়া হলো :—

১ম

ব্যাংকে টাকা জমা	টাকা তোলা হল	টাকা রইল	ব্যাংকে শেষ জমা টাকা
৩০	০	০	৩০
২০	১০	২০	—১০
১২	৮	১২	— ৮

৬২ — (১৮ + ৩২) = ৩০—১৮=১২

নিরাপদ চট্টোপাধ্যায়,
কোতরং, রাঁচী।

সম্পাদকীয়

সংযোগের বিড়ম্বনা

নতুন বছরে অনেক কিছুই ঘটবে, অনেক কিছু ঘটার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। এই সবেমাত্র শেখ মহম্মদ আবদুল্লাকে বন্দীদশা থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। তাঁর উক্তি এবং কার্যকলাপও রাজনৈতিক মহল সাগ্রহে লক্ষ্য করবে। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভিয়েৎনাম নিয়ে একটা শান্তির আলোচনার স্বর্ণসূত্র দেখা যাচ্ছে। উত্তর ভিয়েৎনাম থেকে বলা হয়েছে যে, আমেরিকানরা উত্তর ভিয়েৎনামের ওপর বোমা ফেলা এবং অন্যান্য আক্রমণাত্মক কাজ বন্ধ করলেই আলোচনা শুরু করা যেতে পারে।

অর্থাৎ প্রত্যেকেই চাইছে যোগাযোগের একটি সূত্র। বিচ্ছিন্নতা থেকে সংযুক্তি, বাক্যহীনতা থেকে সংলাপ—এই প্রচেষ্টাই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করে রাখছে। মাঝে মাঝে বিরোধের বাষ্পাচ্ছন্ন মেঘ এই সংযোগের প্রচেষ্টাকে আবৃত করে রাখে। অনেক সময় আলোচনার ছিন্নসূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। যেমন বলা যেতে পারে শেখ আবদুল্লার কথা। ১৪ বৎসর বন্দীদশা কাটিয়ে তিনি মুক্ত হয়েছেন। তিনি বেরিয়ে এসে অনেক ভাল ভাল কথা বলেছেন, শান্তির জন্য জীবন উৎসর্গের মহৎ আদর্শও ঘোষণা করেছেন। কিন্তু আবদুল্লার একটা মুস্কিল এই যে, মাঝখানে যে চৌদ্দ বৎসর সময় কেটে গেছে এবং কাশ্মীরের ভারতভুক্তিরও দুই দশক অতিক্রান্ত, এই সহজ সত্য তিনি স্বীকার করতে চান না। আন্তর্জাতিক দুনিয়াতেও বহু পরিবর্তন ঘটেছে। কাশ্মীর নিয়ে এত জল ঘোলা হয়েছে এবং ভারতের প্রতিপক্ষ রাষ্ট্রসমূহ এই প্রশ্নে ভারতকে যখন তখন বিব্রত করার চেষ্টাও কম করেনি। কিন্তু একথা কেউ বলতে পারেননি যে, ভারত জোর করে কাশ্মীর দখল করেছিল কিংবা কাশ্মীর পাকিস্থানের প্রাপ্য। আবদুল্লা নিজেও সে কথা জানেন। তিনি এখন চাইছেন কাশ্মীরের জন্য একটি স্বতন্ত্র মর্যাদা । তবে স্বাতন্ত্র্যবাদী আবদুল্লা কিন্তু পাকিস্থানের দখল-করা কাশ্মীর এলাকা সম্পর্কে বিশেষ উচ্চবাচ্য করেন না। পাকিস্থানের পক্ষ থেকেও কোনো সময়ে একথা বলা হয়নি যে, ওই অংশ তারা আবদুল্লার হাতে ছাড়তে রাজী। সুতরাং জট ভালভাবেই পাকিয়ে রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, কাশ্মীর সম্পর্কে সরকারের মূল-নীতির কোনো পরিবর্তন হয়নি। কাশ্মীরের জনগণ আর শেখ আবদুল্লা নিশ্চয়ই এক ন'ন। আবদুল্লা তাঁর নিজের মত প্রচার করতে পারেন, কিন্তু কাশ্মীরে নিয়মতান্ত্রিক সরকার যতদিন থাকবে ততদিন তাদের ডিঙিয়ে কোনোরূপ রাজনৈতিক সমাধানের চেষ্টা বাঞ্ছনীয় হবে না। অবশ্য সংবিধানের কাঠামোর ভেতরে পরিবর্তন ও বোঝাপড়ার সুযোগ সব সময়েই থাকবে।

নববর্ষে কাশ্মীর ছাড়া আর যে-সমস্যা নিয়ে সরকার ভাবিত তা হল ভাষাবিষয়ক। সেখানেও সংযোগেরই প্রশ্ন। সম্প্রতি মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীআন্নাদুরাই বলেছেন যে, হিন্দী নয়, তামিলকে ভারতের লিংক ল্যাঙ্গুয়েজ অর্থাৎ সংযোগরক্ষাকারী ভাষা রূপে গ্রহণ করা হক। এদিকে কেন্দ্রীয় সরকার ভাষা আইন পাশ করেছেন। আমরা আগেও এ বিষয়ে বলেছি যে, সংযোগরক্ষাকারী ভাষা নিয়ে এত মাতামাতি করা অনুচিত। ভারতবর্ষ তো রাজতন্ত্র নয়, জনসাধারণের এবং রাজ্যসমূহের স্বেচ্ছাসম্মতিতে গঠিত একটি ফেডারেল সাধারণতন্ত্র। এখানে কোনো ভাষাই জোর করে চাপানো চলে না। ইংরেজরা ছিল ঔপনিবেশিক শাসক। তারা জোর করে ইংরেজি চাপিয়েছিল। কোনো স্বাধীন সাধারণতন্ত্রে, বিশেষত যে-দেশ বহুভাষী, সেখানে এই ভাষা-নীতি দুর্বল এবং দূরদৃষ্টিহীন।

প্রতিবেশী পাকিস্থানের দিকে তাকিয়ে দেখলেই ভাষা বিষয়ে অত্যুৎসাহীরা বুঝতে পারবেন যে, সেখানে দুটি ভাষাকেই, বাংলা এবং উর্দু, সমান মর্যাদা দিয়ে সরকারী ভাষা করা হয়েছে। ভারতের মতো বহুভাষী দেশে একমাত্র হিন্দীর জন্য রাজাসন এবং তামিল, বাংলা, ওড়িয়া, মারাঠি ইত্যাদি প্রাচীন ও সমৃদ্ধ ভাষাসমূহের জন্য নীচাসন, কে মেনে নেবে? সুতরাং সংলাপ খোলা রাখতেই হবে। তা যেমন ভিয়েৎনামের ক্ষেত্রে, যেমন কাশ্মীরের ক্ষেত্রে তেমনি ভাষার ক্ষেত্রেও। দেশের ভেতরে বা বাইরে সব সমস্যার বেলাতেই খোলা মন দরকার। ভারতবর্ষে তো তার প্রয়োজন আরও জরুরী। কারণ, আমাদের সমস্যা অনেক, তার চরিত্র বিচিত্র এবং দুর্ভাগ্যবশত আমাদের ঐক্যবিধায়ক শক্তি দুর্বল এবং বিচ্ছিন্ন। তার ফলে কখনো আবদুল্লা, কখনো ফিজো, কখনো হিন্দীওয়ালা-র বেশ ধরে আমাদের ঐক্যের ভিত্তিতে আঘাত করে বিচ্ছিন্নতার শক্তি। এর মধ্যেই আমাদের খুঁজে বের করতে হবে সংযোগের, ঐক্যের এবং সংহতির ভাষা। সে ভাষা কি, তাই হবে আগামী দিনের অনুসন্ধান।

'শতবর্ষের আলোয় আলোয়'

Amrita Bazar Patrika

ধ্রুব লক্ষ্যে আপন গতিধারা

পুলকেশ দে-সরকার



প্রথম বছরের প্রথম সংখ্যার পর অমৃতবাজার পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে প্রথম পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন স্থান পেতে থাকে। প্রথম দুই কলমে বিজ্ঞাপন শেষ হয়ে গেলে অবশ্য সম্পাদকীয় প্রবন্ধও শুরু হয়েছে। প্রথম বছরের দ্বিতীয় সংখ্যাটি ঠিক এমনি। দ্বিতীয় সংখ্যাতে নিজস্ব বিজ্ঞাপনের অতিরিক্ত আর দুটি মাত্র বিজ্ঞাপন দেখা যায়। তৃতীয় কলম বা স্তম্ভ থেকে শুরু হয়েছে 'বাতুলাশ্রম' শিরোনামায় একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ। বলাবাহুল্য, এটিও সামাজিক প্রশ্নের অন্যতম।

অজ্ঞতাবশত বাতুলদের সম্পর্কে নানা রকম কুসংস্কার ছেয়ে ছিল, আজও আছে। মানসিক বিকৃতি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গি লোকপ্রিয় হতে বিলম্ব ঘটেছে। আজও এই সামাজিক—বহুক্ষেত্রে নিবার্য সমস্যা সম্পর্কে কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত অধিকাংশ ব্যক্তিই উদাসীন, অথবা এটি একটি নিষ্ঠুর কৌতুকের বিষয় মাত্র। কিন্তু একশ' বছর আগেও এই একটি সামাজিক প্রশ্ন অমৃতবাজার পত্রিকা-সম্পাদকের দৃষ্টি এড়ায় নি।

দ্বিতীয় সংখ্যার দ্বিতীয় প্রবন্ধটি মুখ্যত রাজনৈতিক, বিশেষ ক'রে প্রশাসনিক। 'মনরো সাহেব ও মুক্তিয়ারগণ' শিরোনামায় প্রবন্ধটি দশ পৃষ্ঠার তিনটি কলম ছাপিয়ে ১১ পৃষ্ঠার প্রথম কলম অবধি ব্যাপ্ত হয়েছে। প্রথম সংখ্যায় যেমন এই সংখ্যাতেও তেমনি স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে আলোচনা আছে; 'বালিকা বিদ্যালয়ে অবশ্য শিখনীয় কতিপয় বিষয়' শীর্ষক প্রবন্ধটি তিন কলম পরি-ব্যাপ্ত। এর পর 'রিউটারের (রয়টারের) টেলিগ্রাম' এবং অন্যান্য সংবাদ—'সংবাদা-বলী'। এর মধ্যে সংবাদ-বৈচিত্র্য লক্ষণীয় : কোথায় 'কৃষ্ণগড়ের মহারাজার রাজ্য মধ্য দিয়া রেলওয়ে স্থাপিত হওয়ার সর নর্থ-কোট সাহেব বার্ষিক ২০০০০ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন', হিন্দু পেট্রিয়ট সম্পাদক চৈত্র-মেলা সম্পর্কে কি লিখেছেন, ঝান্সির কোথায় তাঁবার খনি আবিষ্কৃত হয়েছে, 'সমস্ত ভূমণ্ডলে কত মাইল টেলিগ্রাফ লাইন' হয়েছে, 'রেভেনিউ বোর্ড আগামী বর্ষে লবণ হইতে কি উৎপন্ন হইতে পারে' তার কি এস্টিমেট দিয়েছেন ইত্যাদি সংবাদ সন্নিবিষ্ট আছে। এ ছাড়া, গবর্নমেন্টের নিয়োগ সংক্রান্ত খবরা খবরও আছে। ১৫ পৃষ্ঠায় 'বিবিধ', 'প্রেরিত পত্র' ও মহ্যাহ্ন স্তোত্র। ১৬ বা দ্বিতীয় সংখ্যার শেষ পৃষ্ঠায় 'অধ্যাত্মবিজ্ঞান'।

'অধ্যাত্মবিজ্ঞান'-এর আসল কথা হচ্ছে "There are more things in Heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy" —বুদ্ধিতে, যুক্তিতে, বিজ্ঞানে যার নাগাল পায় না। অধ্যাত্মবিজ্ঞানে সেইসব ঘটনার কথা থাকত যা প্রচলিত রীতি-নীতি বা বিশ্বাস দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। নিতান্ত কৌতুকাবহ নয়, ভাবোদ্রেককর। 'অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান' ছিল তৎকালীন অমৃতবাজার পত্রিকার একটি নিয়মিত ফিচার।

২৬শে মার্চ অমৃতবাজার পত্রিকার ষষ্ঠ সংখ্যায় 'অধ্যাত্মবিজ্ঞান' বিভাগে যে কাহিনীটি বেরোয় তা নানা কারণে উল্লেখ-যোগ্য :

"অনেক দিন গত হইল—কিন্তু বোধ-হয় যেন সেদিনের কথা—ভুবনবিখ্যাত শ্রীল শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পিতা পায়ে নালি ঘা হইয়া সেই নালি বরাবর উপরে উঠিয়া যায়। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার পিতার সুচিকিৎসার জন্য তাঁহাকে কলিকাতায় আনয়ন করেন। ডাক্তারেরা কিছু-দিন পর্যন্ত তাঁহার চিকিৎসা করিয়া অবশেষে ঐ ঘা বরাবর চিরিয়া না দিলে আরাম হইবার কোন সম্ভাবনা নাই ব্যক্ত করায় বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার পিতাকে নিজ বাটীতে ফিরিয়া পাঠায়া (পাঠাইয়া) দিলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এই কালে শীর্ণ হইয়া অস্থি-চর্মসার হইয়া গিয়াছিলেন—উত্থানশক্তিরহিত ও অন্তসমকাল নিকটা জানিয়া প্রায়শ্চিত্ত আদি শেষ ক্রিয়া করিলেন। এবং তাঁহার সেবায় তাঁহার পতিব্রতা সহধর্মিণী নিযুক্তা ছিলেন।

"পাঠকগণ! আপনারা কি বিদ্যাসাগর লাইব্রেরীতে কখন গিয়াছেন। সেই গৃহের উত্তর দিকে যে একটি স্ত্রীলোকের ছবি টাঙ্গান আছে সেইটি বিদ্যাসাগরের মাতার ছবি; এই রত্নগর্ভধারিণীর বয়ঃক্রম এক্ষণে ৬০।৬১ বৎসর হইবেক, ইনি গৌরাঙ্গী, বার-চৌদ্দ আনা মূল্যে ১ খানি কস্তাপেড়ে শাটী পরা, অলঙ্কারের মধ্যে কেবল হস্তেতে শাঁখা আছে। কিন্তু যদি কোন চিত্রকর নির্দোষিতা, লজ্জা ও হিন্দু সতির চিত্র করিতে ইচ্ছা করে, তবে ঐ পটের অবিকল নকল করিলে তাহার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবেক সন্দেহ নাই।

"প্রাণেশ্বরের দুর্গতিদর্শনে ঐ হিন্দু পতিব্রতা সতির মনোমধ্যে একদিনের জন্যও কিছুমাত্র সুখ ছিল না। আহার নিদ্রা ও সংসারের সমুদয় কার্য এমন কি সন্তানগণ প্রতি স্নেহ পর্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া কেবল অনবরত সেই প্রাণেশ্বরের সেবায় নিযুক্তা ছিলেন। অপরের সহিত বিস্তর কথাবার্তা কহিতেন না, দুই চক্ষু দিয়া কেবল অহর্নিশি জল পড়িত ও একান্ত মনে রোগ আরোগ্য জন্য আপন ইষ্টদেবতাকে ডাকিতেন। এইরূপে মাসাবধি গত হইল একদিন রাত্র আন্দাজ দুই প্রহরের সময়, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ খাটের উপর শয়ন করিয়া আছেন ও নীচে তাঁহার (বোধহয়) দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন শুইয়া আছেন সকলেই নিদ্রিত ব্রাহ্মণীরও নিদ্রা হইয়াছে। বৃদ্ধা হঠাৎ 'পাইয়াছি ২' বলিয়া আনন্দে চিৎকার করিয়া উঠিলেন। পুত্র—মা—কি ও। 'মাতা—বাবা—আল—লও, আমার সঙ্গে চল।' দীননাথ লাণ্টন জ্বলিয়া মায়ের সঙ্গে ২ চলিলেন। ঐ রাত্রে অল্প ২ বৃষ্টি হইতেছিল, বাবা এদিকে চল ওদিকে, এখানে চল ইত্যাদি বলিতে ২ পরে বাটীর নিকট তালপুকুর নামে একটা পুথুরের (পুকুরের ?) ধারে যাইয়া ঐ বৃদ্ধা মাটী হইতে একটা পুটলী কুড়াইয়া লইলেন এবং এক দৌড়ে বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া ঐ পোটলি খুলিয়া গঙ্গাজলের সহিত বাঁটিয়া স্বামীর পায়ে প্রলেপ দিলেন। দুই দিন মধ্যে ঐ ঘা একেবারে আরাম হইয়া গেল।

"৮।১০ বৎসর আমরা এই গল্পটি বিদ্যাসাগরের ভ্রাতার নিকট শুনিয়াছি। তখন বিশ্বাস করিয়াছিলাম কিন্তু কোন কারণ বুঝিতে পারি নাই। অধ্যাত্মবিজ্ঞান-পক্ষীয়েরা এই প্রকৃত ঘটনার কারণ কি অনুগ্রহ করিয়া দর্শাইলে বাধ্য হইব।" (ষষ্ঠ সংখ্যা, ২৬শে মার্চ, ১৮৬৮)

সেকালে ভারতবর্ষীয়দের মনে রুশাতঙ্ক (Russophobia) সৃষ্টি করে ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেদের কাজ হাসিলের চেষ্টায় ছিল এবং উদ্দেশ্য ছিল রুশ-সীমান্ত অবধি তাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা। এটি যে একটি সাম্রাজ্যবাদী সম্প্র-সারণের দ্বন্দ্ব এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের দিকে ভারতীয়দের মনে আতঙ্ক জাগরূক

রাখার চেষ্টা মাত্র অমৃতবাজার পত্রিকার সূক্ষ্ম বিচারবোধকে তা উত্তীর্ণ ক'রে যেতে পারে নি। এই কারণে, রুশ সংক্রান্ত সংবাদ অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রথমাবধিই বেরিয়েছে। আরও উল্লেখযোগ্য যে, অমৃতবাজার পত্রিকা রুশিয়ায় যেত বলে এখানকার সরকারের মাথাব্যথার অন্ত ছিল না।

অমৃতবাজার পত্রিকার প্রথম বৎসরের ৩য় সংখ্যার ২য় পৃষ্ঠা বা ক্রমিক ১৮ পৃষ্ঠায় বেরোলো :

“কয়েক বৎসর গত হইল রুসিয়ানেরা আসিতেছে বলিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট মহা ভীত হন ও সেই সম্বন্ধীয় আলাপ সকলেরই মুখে শুনা যাইত। তখন বোধ হয় রুসিয়ানেরা ভারতবর্ষাধিকার স্বপ্নেও ভাবে নাই। এবং যদি তাহাদের মনে কখন সে ইচ্ছার উদয় হইয়া থাকে তবে এইরূপ জনরব শুনিয়াই হইয়াছে। এক্ষণে রুসিয়ানেরা ভারতবর্ষের অতি সমীপবর্তী হইয়াছে। ভারতবর্ষ তাহাদের সম্মুখে, মধ্যে কেবল আফগানিস্থান। তাহাদের মধ্যে যে ভারতবর্ষ লইয়া নানাবিধ তর্ক-বিতর্ক হইতেছে তাহার সন্দেহ নাই, আফগানিস্থানে প্রবেশ করা তাহাদের পক্ষে সহজ হইবে। কোন দুই দলে বিবাদ হইলেই তাহাদের মধ্যে একদল রুসিয়ানদের সাহায্য প্রার্থনা করিবে ও তখন অবাধে রুসিয়ানগণ ভারতবর্ষের সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইতে পারিবে। আবার আফগানেরা যেরূপ চঞ্চল ও কলহপ্রিয় তাহাতে এরূপ ঘটনা অতি সত্বর হইবার বিচিত্র নাই।”........... (৩য় সংখ্যা, ৫ই মার্চ, ১৮৬৮, ২০শে ফাল্গুন ১২৭৪: পৃঃ ১৮)

অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক শিশিরকুমারের জন্মকাল অবধি আফগানিস্থানে বৃটিশ চর-অনুচর, সৈন্য-সামন্তের পাকচক্রে বিবাদ-কলহ একরকম নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা ছিল, অমৃতবাজারের জন্মকালেও তাই এবং অমৃতবাজার পত্রিকার প্রকাশের পরও দীর্ঘকাল তাই। সুতরাং রুশিয়াকে “রুখতে গিয়ে” বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের ভৌগোলিক প্রতিবন্ধক আফগানরাজ্যে রাজনৈতিক জটাজালে জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল। সূচনা থেকে ১৮৮০-৮১ পর্যন্ত এবং তার পরও আফগানিস্থানের বিস্তারিত বিবাদ-সংবাদ অমৃতবাজার পত্রিকায় পাওয়া যায়।

লোকহিতকর ক্রিয়াকলাপ মাত্রেই অমৃতবাজার পত্রিকায় স্থান পেত এবং তৃতীয় সংখ্যাতেও এমনি এক দাতব্য চিকিৎসালয়ের বার্ষিক বিবরণী আছে, কৃষ্ণদাস ব্রজবাসীর “অতিথিশালার” কথা আছে। রাজনীতি বা প্রশাসন সম্পর্কিত খবরও আছে। “বঙ্গদেশে শাসন-প্রণালী পরিবর্তন” সংক্রান্ত খবরের পরই “করবৃদ্ধি” শিরোনামায় পত্রিকা লেখেন :

“লাইসেন্স ও ইনকম টেক্সের নামে যে ভারতবর্ষীয়েরা ভয়ে কম্পন করেন তাহা গবর্ণমেন্ট উত্তম করিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন। গবর্ণমেন্ট নিতান্ত বাধ্য না হইলে আর ওরূপ ট্যাকস প্রচলিত করিবেন না।”

উল্লেখযোগ্য যে, হেমন্তকুমার ও শিশিরকুমার কিছুকাল ইনকাম-ট্যাক্স এসেসর ছিলেন এবং তৎকালীন ম্যাজিস্ট্রেট জেম্স মনরো বসন্তকুমারের পরলোকগমনের পর সাংসারিক কষ্টলাঘবের জন্য এই দুই ভাইকে এই কাজে নিযুক্ত করেন।

“করবৃদ্ধি” সংক্রান্ত বিষয়ে পত্রিকা আরও লেখেন :

“শুনা যাইতেছে ম্যাসি সাহেব ১০ই মার্চ তারিখে তাহার ষ্টেটমেন্ট দিবেন। তামাকুর উপরে কর ধার্য হইবে না। তাহা সাব্যস্ত হইয়াছে। বোম্বাই ও মান্দ্রাজে লবণের শুল্ক বৃদ্ধি করিবার কথা হইতেছে বোধ হয় পরিশেষে এইটাই স্থির হইবে। যেহেতু লবণের ব্যবসায়ে গবর্ণমেন্টের অত্যন্ত অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে। ফ্রেন্ড (ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া) সুরার শুল্ক বৃদ্ধি করিতে প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাবে বোধ হয় কেহই আপত্তি করিবেন না।” (৩য় সংখ্যা, ৫ই মার্চ, ১৮৬৮, পৃঃ ২০।

“সংবাদ” ও “সম্বাদাবলি”র মধ্যে নানারকম দেশী বিদেশী খবর আছে, বিশেষ ক'রে সেকালের পক্ষে সেসব খবর তাৎপর্যপূর্ণ এবং কোন কোনটি কালাতীত ইতিহাসের পক্ষেও মূল্যবান তথ্য।

আজকে অবশ্য স্বাধীন ভারতে 'আই-সি-এস' 'আই-এ-এস'-এ রূপান্তরিত হয়েছে, কোথাও কোথাও তার “ভগ্নাবশেষ আছে; কিন্তু বৃটিশ শাসনের অন্ত অবধি রাজপুরুষদের মধ্যে এঁদেরই প্রাধান্য ছিল; ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সঙ্গে সঙ্গে এই ইম্পিরিয়াল ক্ষমতাধিকারীরাও অক্ষুণ্ণ ছিলেন এবং এঁরাই ষ্টীল ফ্রেম নামে প্রখ্যাত বা অখ্যাত ছিলেন। বলা বাহুল্য, ইংরেজ আমলে ইংরেজদেরই প্রাধান্য ছিল। কিন্তু কালক্রমে ইংরাজী শিক্ষালাভের ফলস্বরূপ প্রথমত বাঙালী শিক্ষিত সম্প্রদায়, পরে অন্যান্য প্রান্তীয় ভারতীয়দের সঙ্গে লাগল দ্বন্দ্ব। বাঙালী তথা ভারতীয়েরাও আই সি এস হ'য়ে রাজপুরুষপদবাচ্য হ'তে লাগলেন। এর মধ্যে বাঙালী তথা ভারতীয় পরীক্ষার্থীদের পক্ষে প্রাথমিক বাধা ছিল হাজার হাজার মাইল দূরাবস্থিত “কালাপাণি” পার হ'য়ে বিভুঁয়ে বিদেশী ভাষায় পরীক্ষায় বসা। সামাজিক বাধা তো দুর্লঙ্ঘ্য ছিলই, তার ওপর ছিল এটি আয়াসসাধ্য, ব্যয়সাধ্য এবং আরও অনেক রকমে কণ্টকাকীর্ণ। এই নিয়ে মূক বেদনা কালক্রমে গুঞ্জনে পরিণত হ'তে থাকে। এই গুঞ্জনের একটি মৃদু উচ্চারিত কথা ছিল, পরীক্ষাটা ভারতবর্ষেও হোক। অমৃতবাজার পত্রিকার প্রথম বৎসরের ৩য় সংখ্যায় (৫ই মার্চ, ১৮৬৮) ঐ সম্বাদাবলির মধ্যে বেরোয় এমন একটি খবর :

“পার্লিয়ামেন্টের সভ্য ফওসেট সাহেব ইন্দিয়ান সিবিল সার্বিস পরীক্ষা কলিকাতায় হওনের কথা মহাসভায় আন্দোলনের বিষয় উত্থাপন করিয়াছেন। ফওসেট সাহেব আমাদের পরমাত্মীয়। যখন আমাদের প্রতি পার্লিয়ামেন্টে কোন অত্যাচার হইয়াছে, তিনি আমাদের পক্ষ রক্ষা করিয়াছেন।”

সেকালে লেঃ গবর্ণর গ্রে সাহেব “অচিহ্নিত কার্যকারক” (নন-গেজেটেড এমপ্লয়িজ) দের নিয়োগ সম্বন্ধে কিছু নিয়মকানুন প্রচলিত করেন; তার বিশদ বিবরণ ছিল এই সংখ্যায়। আরও অন্য সংবাদের মধ্যে নীচের সংবাদ দুটি আধুনিককালেও আগ্রহের সৃষ্টি করতে পারে।

“প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ দত্ত স্টুডেন্টসিপ শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এম-এ পাইয়াছেন ইনি বার্ষিক দুই হাজার টাকা করিয়া ৫ বৎসর পর্যন্ত পাইবেন।”

●

“এবার পঞ্চবিংশতি জন ব্যাচেলার অব আর্টস্ এম-এ পরীক্ষা দেন। তাহার মধ্যে পঞ্চদশজন উত্তীর্ণ হইয়াছেন। একজন ব্যতীত সকলে হিন্দু। বাবু আনন্দমোহন বসু গণিতে সর্বপ্রধান হইয়াছেন, তাঁহার গণিতে ব্যুৎপত্তি দেখিয়া পরীক্ষকগণ চমৎকৃত হইয়াছেন।”

এছাড়া “গিলক্রাইষ্ট পরীক্ষা”, “রামগোপাল ঘোষের স্মৃতিরক্ষা”, “ফরিদপুরের সংবাদদাতার” খবর, “লেঃ গবর্ণর কর্তৃক নিয়োগ ছুটী” ইত্যাদি, “অমৃতবাজার পত্রিকার প্রকাশ সম্পর্কে চিঠি” “নির্বিঘ”, “অধ্যাত্মবিজ্ঞান” প্রভৃতি বিচিত্র রসের সমাবেশ ঘটেছিল এই সংখ্যাটিতে।

কিন্তু যে-বিষয় নির্বাচন ও সেই বিষয়ে আলোচনা অমৃতবাজার পত্রিকাকে রাজপুরুষদের বিরাগভাজন ক'রে তুলেছিল তা চতুর্থ সংখ্যায় (১২ই মার্চ, ১৮৬৮, ৩০শে ফাল্গুন ১২৭৪) বেশ স্পষ্ট করেই উচ্চারিত হয়েছিল। প্রথম পৃষ্ঠার দুই স্তম্ভব্যাপী বিজ্ঞাপন শেষে তৃতীয় স্তম্ভে



প্রস্তুতকারক :
কিং এন্ড কোং কলিকাতা
(হোমিও কেমিস্টস, স্থাপিত—১৮১৪ সাল)

কিং কো'র
আর্ণিকা
হেয়ার অয়েল
একমাত্র পরিবেশক :
আর. ডি. এম এন্ড কোং
২১৭, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬
ফোন : ৩৪-৩৮৩৬

শিরোনামা ছিল "ইংলিশ গবর্ণমেন্ট ও ভারতবর্ষ"। দীর্ঘ প্রবন্ধ; তারই খানিকটা এখানে উদ্ধৃত করছি ঃ

"জগদীশ্বর মনুষ্যমাত্রকে স্বাধীন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব যিনি অন্যের স্বাধীনতা অপহরণ করেন কি নিজের স্বাধীনতা, স্বেচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক, অন্যের হস্তে সমর্পণ করেন, তিনি নৈসর্গিক নিয়ম লঙ্ঘনের দণ্ড প্রাপ্ত হন।

"............যে রাজ্য সমগ্র অধিবাসি দ্বারা শাসিত তাহা সম্পূর্ণ স্বাধীন। কোন রাজ্য হইতে যে পরিমাণে স্বাধীনতা অপহৃত হয়, উহা সেই পরিমাণে দুর্বল ও বিশৃঙ্খল হয় ও যাবৎ ঐ স্বাধীনতা প্রত্যর্পণ না করা হয়, তাবৎ উহা শান্তিভাব প্রাপ্ত হয় না। রাজ্য পরাধীন হইলে, হয় উহা একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়, আর নতুবা পরিণামে, যে গতিকেই হউক অবশ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়।............

".........আওরঙ্গজিব নানাবিধ অত্যাচার করিয়া ভারতের এক ছত্রাধিপতি হন, কিন্তু যে সমুদয় কুক্রিয়া দ্বারা তাহার রাজ্য সংস্থাপিত হয়, তাহাতে আবার তাহার রাজ্য বিনষ্ট হয়। সেরাজদৌলা যখন এদেশাধিপতি ছিলেন তখন কে ভাবিয়েছিল যে, সেই দোর্দ্দান্ত নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী নবাব কিয়ৎসংখ্যক বিদেশী বণিক কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত ও হত হইবেন? ১৮৫৯ সালে যশোহরে ঘোড়দৌড় হয় ও তখন শতাধিক নীল কুঠিয়াল ৭।৮ দিন পর্যন্ত আমোদ-প্রমোদ করে, পর বৎসর সেই সময় আর কয়েকটি কুঠিয়ালের আমোদ-প্রমোদের ইচ্ছা ছিল? '৫৭ সালে যে তদ্রূপ বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত হইবে তাহা কি কেহ কখন স্বপ্নেও ভেবেছিলেন? লং সাহেব যখন নীল কুঠিয়ালদিগের যত্নে কারারুদ্ধ হন তখন বলিয়াছিলেন যে, আমি কারারুদ্ধ হইয়াছি ইহাতে নীলকরেরা জিতিল না প্রজারা জিতিল? আমরাও বলি যে ড্যালহাউসি যখন অযোধ্যা ব্রিটিশ রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন তখন কি তিনি জিতিয়াছিলেন? কন্যা-কুমারী হইতে হিমালয় পর্যন্ত ভারতবর্ষের যাবৎ অধিবাসীগণের অমতে ব্রিটিশ

হাওড়া কুষ্ঠ কুটির

৭২ বৎসরের প্রাচীন এই চিকিৎসাকেন্দ্রে সর্ব-প্রকার চর্মরোগ, বাতরক্ত, অসাড়তা ফুলা, একজিমা, সোরাইসিস, দূষিত ক্ষতাদি আরোগ্যের জন্য সাক্ষাতে অথবা পত্রে ব্যবস্থা লউন। প্রতিষ্ঠাতা ঃ পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্ম্মা কবিরাজ, ১নং মাধব ঘোষ লেন খুরুট, হাওড়া। শাখা ঃ ৩৬, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯। ফোন ঃ ৬৭-২৩৫৯

গবর্ণমেন্ট যে ভারতবর্ষীয় অর্থ লইয়া তুর্কীর সুলতানের ভোজ দিলেন, কি আবিসিনিয়ার যুদ্ধে ব্যয় করিলেন তাহাতে কি ইংলিশ গবর্ণমেন্ট জিতিলেন? যদি মনুষ্যের মন দেখা যাইত, তবে ইংরেজেরা দেখিতে পাইতেন, যে এই অপমান ও গ্লানি সুশিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রের হৃদয়ে অনবরত জাগরূক রহিয়াছে। ইহা কি ইংরেজেরা বুঝেন না যে বিদেশী কর্তৃক শতবর্ষের অনুগ্রহ ও ভদ্রতা এইরূপ একটি অত্যাচারে ধৌত হইয়া যায়।.........

"পরিশেষে আমরা নিশ্চিত বলিতে পারি যে যতদিন ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট আমাদের এই প্রার্থনা গ্রাহ্য না করিবেন ততদিন সহস্র স্কুল স্থাপন কি সিবিল সার্বিস পরীক্ষার দ্বারোদ্ঘাটন অথবা অন্য কোন অনুগ্রহ প্রদর্শন দ্বারা ভারত সন্তানগণকে প্রকৃতরূপে বাধ্য করিতে সক্ষম হইবে না—ততদিন বহুতর সৈন্য রাখার ব্যয় ও ঝঞ্ঝাট সহ্য করিতে হইবে এবং ততদিন অনবরত স্থানে স্থানে বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত হইবে, সুতরাং ভারতবর্ষ হইতে ইংলন্ড প্রকৃত লাভ করিতে কখনই সমর্থ হইবে না।" (৪র্থ সংখ্যা, পৃঃ ২৫-২৬)

এই সংখ্যাতেই আবিসিনিয়ার রাজা থিওডোর, বিশ্ববিদ্যালয়, দুর্গাচরণ লাহার দান এবং অন্যান্য খবরের মধ্যে আছে ঃ

"বিগত ৩রা মার্চ কলিকাতা হইতে ৩টি যুবক ইংলন্ডে যাত্রা করিয়াছেন। সিবিল সার্বিস পরীক্ষা দেওয়াই তাহাদের উদ্দেশ্য। ইহাদের মধ্যে শুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায় কলিকাতার প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত-বাবু দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র, তিনি এই বৎসর বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। অনেকদিন পূর্ব হইতেই তিনি সিবিল-সার্বিস পরীক্ষার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছেন। ডবটন্ কলেজে লাটিন ভাষা একপ্রকার উত্তমরূপেই শিক্ষা করিয়াছেন; অপরাপর প্রয়োজনীয় বিদ্যাভ্যাসে যত্নের ত্রুটি করেন নাই। বাঞ্ছিত ফললাভে কতদূর কৃতকার্য হন জানি না।

"অপর দুইটির নাম রমেশচন্দ্র দত্ত ও বেহারীলাল গুপ্ত। ইহারা প্রেসিডেন্সি কলেজের চতুর্থ বর্ষীয় শ্রেণীর ছাত্র। এই দুই বন্ধু গুপ্তভাবে গত বৎসরান্ত হইতেই ফরাসী ও সংস্কৃত ভাষা এবং অন্যান্য অবশ্য প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষা করিতেছিলেন। আমরা শুনিলাম রমেশচন্দ্র আপনার নামে কোন ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকা লইয়া গিয়াছেন। ইনি (এবং বোধ হয়) শুরেন্দ্রবাবু বেহারীবাবুর ব্যয়ের ভার লইয়াছেন। রমেশবাবু ও বেহারীবাবু গুপ্তভাবে গিয়াছেন বলিলেও বলা যায়। বেহারীর পিতা তাঁহাদের গমন বৃত্তান্ত শুনিয়া ডায়মন্ড হারবার পর্যন্ত গিয়াছেন কোনক্রমে স্ব-পুত্রকে ফিরাইয়া আনিতে পারিলেন না। অবশেষে এই বলিয়া ফিরিয়া আসিলেন, "বাবা, সব করো, কেবল বীবী বিয়ে করো না"। আমাদের ঐকান্তিক ইচ্ছা যে ইহারা পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল করেন। কিন্তু মনমোহনবাবুর বিষয় মনে হইলে বোধ হয় না যে ইহাদের মনোবাঞ্ছা সহজেই সিদ্ধ হইবে।" (৪র্থ সংখ্যা, ১২ই মার্চ, ১৮৬৮)

সেকালের স্ত্রীশিক্ষা ও সাহিত্য-বিষয়ক একটি তথ্য পাওয়া যায় দুটি সংবাদে ঃ

(১) "এদেশে আটজন স্ত্রীলোক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাহাদের নাম এই, পাবনা নিবাসী বামাসুন্দরী দেবী, শিবপুর নিবাসী কামিনীসুন্দরী দেবী, কলিকাতা নিবাসী কৈলাসবাসিনী গুপ্ত, কালিঘাট-নিবাসী হরকুমারী দেবী, রাখালমণি গুপ্ত, বসন্তকুমারী দাসী, মার্থা সৌদামিনী দাসী ও কৃষ্ণকুমারী দাসী।"

(২) "মহারাজা কুপার আলা ইউ-রোপীয় শাস্ত্র সমুদয় এ দেশীয় ভাষায় পরিণত করিবার জন্য দশ সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছেন ও লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ে বার্ষিক ২০০০ টাকা দিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন। ইতিপূর্বে কাশ্মীরের মহারাজা লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্যের নিমিত্ত পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছেন।"

বারংবার এই কথাটি স্মরণে রাখা দরকার যে, এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটি বেরোচ্ছে কলকাতা থেকেও দূরবর্তী এক গ্রামে, পরিবহন ব্যবস্থার দিক থেকে একরকম দুরধিগম্যই; অথচ উল্লিখিত বিচিত্র সংবাদ পরিবেশণে তো কোন বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি।

'বিবিধ' 'অধ্যাত্মবিজ্ঞান প্রভৃতি ছাড়াও বরিশাল, লক্ষ্মীপাসা ও অন্যান্য জায়গা থেকে প্রেরিত পত্র স্থান পেয়েছে এই সংখ্যায়। কোন কোন পাঠকের মনে আশঙ্কার অবধি নেই। এ পত্রিকা কি টিকবে? সাহেবরা নাকি অসন্তুষ্ট হয়ে উঠছে। ৪র্থ সংখ্যায় এমনি আশঙ্কা। পত্রটি লিখেছেন যশোহরেরই এক ব্যক্তি এবং স্পষ্টতই তিনি 'অমৃত প্রবাহিনীর' আবির্ভাব ও তিরো-ভাবের খবর রাখতেন। তিনি তাই লিখছেনঃ—

"আপনার প্রকাশিত পত্রিকা পাঠে বোধ হইতেছে যে উহার পূর্বপুরুষ অমৃত প্রবাহিনীর ন্যায় অকাল মৃত্যুগ্রস্ত হইবে। পত্রিকা ইংরাজি নবিশেষও মনোযোগ পূর্বক পাঠ করেন। এটি কাগজের কম গৌরব নয়।

"আপনি বেল্লিকতন্ত্র কোথায় পাইলেন? ওটি কি আপনার সকপোল রচিত? শুনেছি সাহেবরা আপনার পত্রিকা পাঠে অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। বোধ হয় মিছে কথা, আপনি কেবল কেবল ইংরাজদের দোষ লিখেন। বাঙ্গালীগণের কি কোন দোষ নাই? সে কথা তো একবারও লিখেন না? সম্পাদকেরা পক্ষপাতী হইলে সুক্ষ্ম বিচার কোথা হইবে?" (৪র্থ সংখ্যা ১২ই মার্চ, ১৮৬৮)

নিজের পত্রে নিজের সমালোচনা সাংবাদিকতার এযুগেও বিরল। কিন্তু তখনও অমৃতবাজার পত্রিকা এমন চিঠি ছাপাতেন। বলা বাহুল্য, কেবল সাহেব নয় স্বদেশবাসী বলে অমৃতবাজার পত্রিকা সমস্ত সমালোচনার বাঙালী বা ভিন্ন প্রান্তবাসী ভারতীয়কে অব্যাহতি দেন নি।



নিদাঘ

মিহির আচার্য

প্রকৃতি যখন রাস্তায় নেমে এল তখন দুপুরের হলুদ গলে' ফিকে হয়ে এসেছে। ছেঁড়া ছেড়া রোদ এখানে সেখানে ঝলসাচ্ছে। প্রচণ্ড গুমটের পর বন্দী হাওয়া যেন এইমাত্র স্বাধীন হয়েছে, কিন্তু নিশ্চিন্ত নয়। হাওয়ায় এখনো গরম বারুদের গন্ধ। প্রায় শূন্য ট্রামগুলো ঝিমোতে ঝিমোতে রাস্তা পার হচ্ছে।

প্রকৃতি বাস স্টপে এসে দাঁড়াল।

দেহের ভেতরে একটা শিরশিরে অনুভূতি। গায়ের জামাটা এতক্ষণ ভিজে লেপটে ছিল, ঘামগুলো শুকিয়ে গেছে, কিন্তু জামার স্যাঁতসেঁতে ভাবটা যায় নি। কিংবা অনুভূতিটা এখনো মরেনি। কেননা যতদূর মনে পড়ে, তার আপাদমস্তক ঘামে ভিজে তোয়ালের মতো ফুলে উঠেছিল, এবং তখন তার দেহে কোনো আবরণ ছিল বলে মনে হয় না। শাড়িটা কোমর থেকে লুটোচ্ছিল। সদ্য পাটভাঙ্গা শাড়িটা। বেরুবার সময় লক্ষ্য করেছিল এখানে-সেখানে কুঁচকে গেছে। চেষ্টা করেও সেগুলো দূর করা যায়নি।

সে বুঝতে পারেনি এত তাড়াতাড়ি এরকম একটা পরিস্থিতির সম্মুখীন তাকে হতে হবে। তাহলে আলাদা ব্যবস্থা করত। কিংবা যেতই না। কেউ তাকে এখন লক্ষ্য না করলেও সে বুঝতে পারছে তার ঘুম-ঘুম চোখ এবং শরীরের এই দৃশ্য দুপুরের সেই ঘর্মাক্ত আন্দোলনের সাক্ষ্য বহন করছে।

অথচ ঘন্টাদুয়েক আগে পরিচ্ছন্ন হয়ে বাড়ি থেকে বেরুবার সময়ও এমন একটা অনিবার্য পরিণতির কথা সে ভাবতে পারেনি। এমনকি ওদের বাড়ির সিঁড়িতে পা দেবার সময় সমস্ত বাড়িটা কেমন ছমছমে নির্জন বোধ হলেও এগুলোকে সে সুযোগ নেবার পথ বলে মনে করেনি। বরং এই নির্জনতায় সে স্বস্তি পেয়েছিল, বাড়ির দশজন লোকের কৌতুক জিজ্ঞাসার হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়েছিল।

অনুতোষ নিজের ঘরে চুপচাপ শুয়ে ছিল। দরজায় টোকা দিতেই সে নিশ্চিন্তে বলেছিল : 'এসো।' ঘরে পরদা ঠেলে ঢুকতেই শয্যায় শায়িত অনুতোষ হাতের বইটা সরিয়ে হেসেছিল। 'ভেবেছিলাম আসবে না।' আর, তখন ওর চোখমুখ দেখে প্রকৃতির মনে হয়েছিল না এলেই ভালো হত। প্রকৃতি বলেছিল : বাড়িতে কেউ নেই নাকি?' অনুতোষ বললে, 'না, ওরা পিসিমার ওখানে গেছেন।' প্রকৃতি আর কিছু বলেনি। জানলার ধারে চেয়ারটায় স্থির হয়ে বসেছিল। তারপর দুপুর গলে' গলে পড়ছিল।

আশ্চর্য, বাড়িতে কেউ নেই এটা সম্ভব-পর ব্যাপার বলে প্রকৃতির মনে হয়েছিল এবং পুনর্বার আশ্বস্তও বোধ করেছিল। আজ দুপুরে আসবার জন্যে অনুতোষের এই সবিশেষ তাড়া দেবার পিছনে এরকম একটা উদ্দেশ্য ছিল, সেটা না বোঝার কথা তার নয়। প্রকৃতিরও ভালো লাগত না বাড়ি ভরতি লোকের মাঝখানে অনুতোষের সঙ্গে রোজকার মতো কথা বলতে।

বরং এইটেই ভালো হয়েছে. দুপুরের রোদ মাথায় করে অনুতোষের ঘরে তার এই অভিসার বাড়ির লোক কেউ জানতে পারল না। বাড়িতে সে কিছুতেই আসতে রাজি হয় না। অনুতোষের বড় বড় দুটো বোন এমন করে ওর দিকে তাকায় যে তার লজ্জা করে। কারণ ওদের চোখকে কিছুতেই ফাঁকি দেওয়া যায় না! অনুতোষ বোঝে না। তাকে তো এই অসুবিধেগুলো পার হয়ে আসতে হয় না। আসবার সময় এবং বেরুবার সময়ও পর্যন্ত ওই ধাড়ি মেয়ে দুটোর পাহারা এড়িয়ে যাবার উপায় নেই।

'অত দূরে কেন? কাছে এসো।' 'না, বেশ আছি।' অনুতোষ হাসল। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কে জানে হয়তো সদরের দরজা বন্ধ করতে গেল। ও এরপর কী কী করবে মুখস্থর মতো সব বলে দিতে পারে প্রকৃতি। অনুতোষ ঘরে ঢুকলো। হাতে দুটো কোকাকোলার বোতল। 'ভীষণ গরম।' অনুতোষ বললে। প্রকৃতির মনে হল ও আজকে তাকে একটু বেশি তোয়াজ করছে। বুঝতে পেরেও খুব খারাপ লাগল না প্রকৃতির। দেখি না, ও কতদূর এগোতে পারে। 'দেখেছ স্ট্র আনতে মনে পড়েনি।' অনুতোষ বলল। প্রকৃতি উত্তর করল না। 'এই ওখানে বসে কী করছ? কাছে এসো না।' 'না। বেশ আছি।' 'তোমরা মেয়েরা না ..' 'কজন মেয়ে দেখেছ?' অনুতোষ হাসল। 'সত্যি, রাগ করেছ?' 'রাগ করি আর না করি তাতে তোমার কী ক্ষতি?' অনুতোষ সিগারেট ধরাল। প্রকৃতি জানত এবার সে সিগারেট ধরাবে। আর সিগারেট ধরানোর সময় সে ইচ্ছাগুলোকে গুছিয়ে নেবে। অনুতোষের এই'টেই স্বভাব, না চিন্তা করে সে কথাও বলতে পারে না। ওর নীরবতাকে সবসময় প্রকৃতিকেই কথা সাজিয়ে ভরিয়ে রাখতে হয়। অনুতোষ আজ দাড়ি কামিয়েছে ওর মুখটাকে চিকন, তেলালো দেখাচ্ছে। অনুতোষ হঠাৎ শয্যা থেকে উঠে দাঁড়াল। এগিয়ে এসে প্রকৃতির হাত আকর্ষণ করল। 'এসো।' প্রকৃতি ওর মুখের দিকে বড় বড় চোখদুটো রাখল। 'হাত ছাড়ো। লাগছে।' 'আসবে না?' 'আসব। একটু পরে। এখনো রোদে শরীর

জ্বালা করছে। জানো : আজ ১০৫ ডিগ্রি।' অনুতোষ ফিরে গেল। অথচ আর-একটু জোর করলেই প্রকৃতি আসত। চেয়ারে কাঠ হয়ে বসে থাকতে তার ভালো লাগছে না। শরীরটাকে একটু গড়িয়ে দিতে পারলে ভালো লাগত। প্রকৃতি উঠে দাঁড়াল। জানালার বাইরে নারকেল গাছটাকে দেখল। তারপর ওখান থেকেই বললে : 'কী যে সব জরুরি কথা বলবে বলেছিলে?' অনুতোষ নীরব। 'জানি। কেবল ফাঁকি। আমাকে শুধু শুধু ছুটিয়ে আনবার মতলব।' 'তাহলে এলে কেন?' 'এলে কেন!' 'হ্যাঁঃ এলে কেন?' 'ন্যাকামো কোরো না।' অনুতোষ চুপ। প্রকৃতি হেঁটে এল। 'একটু সরে যাও। আমাকে একটু জায়গা দাও।' অনুতোষ সরে গেল। প্রকৃতির মাথাটা এখন বালিশের ওপর। 'আমার ভালো লাগে না। এইভাবে আসতে। কেমন চোরের মতো মনে হয়।' 'চোরের মতো! নয়? লোকে কী ভাবে? আমাদের সম্পর্কে কেউ খারাপ ভাবে আমি সইতে পারিনে।' অনুতোষ বলল : 'আমি বুঝতে পারিনি।' 'তুমি কিছুই বুঝতে পারো না। তুমি বাড়ির ছেলে তোমার কোনো দোষ হয় না, আমার হয়, আমি মেয়ে।' অনুতোষ চুপ। 'আমি জানি না-এলে তুমি রাগ করতে। আমাকে ভুল বুঝতে। তোমার দিকে চেয়ে আমাকে আসতেই হয়।' অনুতোষ বলল : 'আমি আর পারছিনে।' 'পারতে তোমাকে কেউ দিব্যি দেয়নি।' প্রকৃতি সরে এল ওর কাছে, ওর চুলে আঙুল বুলোলো। 'এইতো এসেছি। এবার খুশি তো।' অনুতোষ নিঃশব্দে প্রকৃতির শরীরের আঘ্রাণে আরক্ত হয়ে থাকে। 'কী মশায়, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?' 'না।' 'এই, কী হচ্ছে? এমন মার খাবে—' অনুতোষ ওর কথাগুলো ডুবিয়ে দেয়। 'এই তোমার জরুরি বিষয়?' প্রকৃতি শব্দ করে হাসল। ওর গলার কালো তিলটাকে নখ দিয়ে খুঁটতে লাগল : 'আমি না-থাকলে কী করে একা থাকো?' 'জানিনে। একেকসময় ইচ্ছে করে—' 'রুমালে বেঁধে রাখতে? দরকার মতো ব্যবহার করতে?' 'হ্যাঁ তাই।' 'তারপর রুমালটা ময়লা হয়ে গেলে ধোপাকে ছুঁড়ে দিতে—?' অনুতোষ আবার ওর কথাগুলো গ্রাস করে নেয়। 'ভীষণ বাড়াবাড়ি করছ আজ। দ্যাখো আমার একটা বাড়ি আছে, সেখানে ফিরতে হবে।' অনুতোষ উত্তর করল না। 'বাইরে এমন রোদ্দুর না, এবার বেরুলেই পুড়ে খাক হয়ে যাব। আচ্ছা কালকে কখন বাড়ি ফিরলে? রাত্রে কিছু খাওনি নিশ্চয়? আমি বাড়ি ফিরেই ঘুম। এই, কী হচ্ছে, সত্যি রাগ করব কিন্তু...'

বাইরে কলিং বেলের শব্দ।

ধড়মড়িয়ে উঠে বসল প্রকৃতি।

'এই—'

'তুমি যাও।'

'না আমি।'

অনুতোষই উঠল। নিচে নেমে গেল।

প্রকৃতি পরিচ্ছন্ন হয়ে চেয়ারে বই খুলে বসল।

অনুতোষ ফিরল। 'পিওন। ইলেকট্রিকের বিল।'

দুজনেই হাসল।

প্রকৃতি বললে, 'কটা বাজল? এবার আমি যাব।।'

অনুতোষ বললে, 'কেন? রোদে পুড়তে? এসো।'

'না, সত্যি দেরি হয়ে যাবে।' প্রকৃতি এগিয়ে এল তবু।

না-এগিয়েও পারত না প্রকৃতি। বস্তুত আধঘণ্টার ভেতরে এই ঠান্ডা ঘরটা তাকে নেশার মতো পেয়ে বসেছে। কিংবা প্রকৃতি বুঝতে পেরেছিল, একবার যখন এসেছে তখন এখন যাওয়া আর পরে যাওয়ায় কোনো তফাত নেই।

প্রকৃতি এই মুহূর্তে তার মনকে যেন নতুন করে আবিষ্কার করতে পারল। তার ভেতরেও একটা কৌতূহল, চাহিদা তাকে একরোখা করে তুলছে।

'তুমি অমন করলে আমার কষ্ট হয়, বোঝো না?' প্রকৃতি বললে। অনুতোষ বললে : 'কেন?' 'আমি তো একটা পুতুল নই যে যা খুশি করবে। আমি মানুষ...' 'তবে মানুষ হও।' 'না, তোমার পায়ে পড়ি আজ নয়।' 'তুমি আমাকে বিশ্বাস করো না?' 'ইয়ার্কি কোরো না। তোমার সব আবদার না শুনলেই বুঝি অবিশ্বাস করা হয়? এই না—' 'কী হল?' 'ভীষণ আলো আসছে, আমার লজ্জা করছে। তোমার মুখ দেখে আমার কষ্ট হচ্ছে।' 'জানলাটা বন্ধ করে দিই?' অনুতোষ অন্ধকারকে ডেকে আনল। আর অন্ধকারটা কেমন ভারি দেয়ালের মতো অনড় শক্ত হয়ে রইল। 'প্রকৃতি?' 'উঁ—' 'প্রকৃতি—' 'কেন?' অন্ধকারটা ঘন, ভিজে, স্যাঁতসেঁতে হয়ে নামছে। 'দ্যাখো, তুমি একটা বিরাট দায়িত্ব নিতে যাচ্ছ।' অনুতোষ উত্তর করে না। 'আমি এত দুশ্চিন্তা নিয়ে পাগল হয়ে যাব। তুমি আমাকে একটুও ভালোবাসো না।' 'বাসি।' 'তাহলে এমন জোর করতে না।' 'জোর না-করলে তুমি খুশি হও?' 'হই।' 'না। তাহলে তুমি আজকের এই নির্জনতাকে বেছে নিতে না।' 'আমি ভাবিনি, এই নির্জনতা আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। তুমি শক্ত হলে আমিও শক্ত হতে পারি।' 'এই তিন বছরে শক্ত হওয়ার অনেক পরীক্ষা দিইনি কী?' 'দিয়েছ। সুযোগের অভাবে। আরো দশ-জনের মতো আমরা এত সাধারণ হতে পারিনে। আমাদের শিক্ষা, সংযম—' অনুতোষ বললে, 'আমাদের কামক্রোধলোভগুলোকে দশজনের মতোই স্বীকার করতে চাই।' 'কী বলছ তুমি?' 'হ্যাঁ আমরা পরস্পরকে চিনি। পরস্পরের জন্যেই আমরা তৈরি হয়ে উঠেছি। পরস্পরের কামনাবাসনা ইচ্ছেগুলি উভয়ের সম্মতির জন্যে তীব্র হয়ে আছে।' 'আমার সম্মতি কী পাওনি, না কি তা আমি অস্বীকার করেছি। আমিও তো ইচ্ছায় বাঁধা মানুষ...। আমি দুর্বল বলেই বলছি আমাকে রক্ষা করো, আমাকে ভেসে যেতে দিও না।' 'আমরা কেউ কাউকেই রক্ষা করতে পারিনে...'

ওই অন্ধকারঢালা ঘরে অনুতোষের কথাগুলো যেন একটা দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তির মতো মনে হল। প্রকৃতি অমনোযোগী হবার চেষ্টা করছে, কিন্তু তার ইন্দ্রিয়গুলো যেন অধিক উদগ্র হয়ে তাকে বাধা দিচ্ছে। তারপর অনুতোষের কাজগুলো তার সঙ্গে সন্ধি করে যেন একটা দীর্ঘকালের ধাঁধাকে মোচন করবার জন্যে এক-পা এক-পা করে এগোচ্ছে। অনেক দ্বিধা সংশয়, পথ হারিয়ে যাচ্ছে। প্রকৃতি ওকে সাহায্য করতে পারত, কিন্তু তাতে অনুতোষের বীরত্ব কমবার সম্ভাবনা।

কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ পায়ের দিকের ভেজানো জানলাটা খুলে যেতেই তীরের মতন তীক্ষ্ণ রোদের ফলায় প্রকৃতির চোখদুটো ঝাঁকুনি খেয়ে স্থির হয়ে গেল। তার, নিমজ্জমান সংজ্ঞাগুলো যেন মৃদু-ধাক্কা খেয়ে ফিরে এল। এবং আলো-আঁধারি একটা দ্বিধান্বিত সত্তায় ভাসতে ভাসতে কেমন রক্তহীন কাগজের মতন ফ্যাকাশে হয়ে গেল সে। এতক্ষণ ভারি অস্তিত্বের মতন যে চেতনাটা তার ইন্দ্রিয়ে জড়িয়ে ছিল, সেটা এখন মরা পাহাড়ের মতন নির্জীব পড়ে রয়েছে। এই অনুভূতি হঠাৎ প্রকৃতিকে কেমন অসহায় করে তুলল, আর একটা রিক্ত শূন্যতা তাকে পীড়ন করতে লাগল।

প্রকৃতি সংকোচে বিমূঢ়তায় বিস্ফারিত হয়ে রইল।

কেমন এক হঠকারী নির্লজ্জতায় তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে রইল। তার মনে হল বহুদিন সে শয্যা আঁকড়ে পড়ে আছে, দীর্ঘরোগভুগে নিঃস্ব, ক্লান্ত। আর কোনোদিন শয্যা ছেড়ে উঠতে পারবে না।

দুর্বল চোখের পর্দায় সমস্ত দৃশ্যজগৎ আবছা হয়ে আসে, পায়ের দিকে একটা শাদা ধূসর দেয়াল। চারদিকে শূন্যতা, মৃত্যুর মতন হলদেটে।

প্রকৃতি চোখ বুজল। মৃত্যুর মতন শীতল ঘুম তাকে আচ্ছন্ন করে রাখল।

কে যেন ডাকছে? মৃত্যুর ওপার থেকে যেন শুনতে পাচ্ছে। গির্জের ঘন্টার মতন।

'এই, ওঠো—'

'কেন?'

'বিকেল হয়ে এসেছে।'

প্রকৃতি কিছু বুঝতে পারছে না, শুনতে।

'এই, ওদের আসার সময় হয়েছে।'

'আমি পারব না। আমাকে ঘুমোতে দাও।'

'কী পাগলামি হচ্ছে...'

প্রকৃতি এবার চোখ খুলল। চোখ লাল। সারা শরীর স্বেদে ভেসে গেছে। আর, কোথা থেকে একটা ভিজে থেঁতলানো জবাফুলের গন্ধ। সমস্ত দেহজোড়া ক্লান্তি, দীর্ঘ ব্যাধি থেকে উঠে-আসা প্রকৃতি উঁচু হয়ে বসল। হাঁটুতে মুখ গুঁজে ঠোঁট কামড়ে যেন দম নিল সে। তারপর পা টেনে উঠে দাঁড়াল। চোখ জ্বলছে। নিজের শাড়ির ওপর চোখ রাখল। ক্লান্ত হাতে টেনে টেনে শাড়িটাকে ভদ্রস্থ করবার চেষ্টা করল। তারপর কিছুক্ষণ জানালায় হেলান দিয়ে বাইরে কী দেখল। একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন রাখতে গিয়ে পারল না। পিছন ফিরে একবারও তাকাল না, ভেজানো দরজাটা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এল। সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এল। তারপর রাস্তা।

বাইরে হু-হু বাতাস। গায়ের ঘাম শুকোচ্ছে। শিরশির করছে সর্বাঙ্গ।

প্রকৃতি বাসস্টপে এসে দাঁড়াল।

'আমি এখন কোথায় যাব' প্রকৃতি নিজেকে প্রশ্ন করল : 'আমি সর্বস্বান্ত হয়ে গেছি।' সত্যি, কোথায় যাবে সে এখন? বাড়ি? না। তার কোনো বাড়ি নেই, সে বাড়ির একজন সভ্য নয়। আজ দুপুরে সে বাড়ির থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। দুপুরের সমস্ত কার্যকারণের জন্যে সে কাউকে দায়ী করতে পারে না। সে স্বাধীন ইচ্ছায় যাকিছু করেছে। অন্তত, সে তখন নিজেকে স্বাধীন ভেবেছিল। তার ইচ্ছে কামনা লোভ হিংসা, সবকিছু তারই নিজস্ব। কিন্তু, এখন বাইরে নেমে সে বুঝতে পারছে আসলে সে স্বাধীন নয়। সে একটি পরিবারের অংশবিশেষ—মেয়ে, বোন, ঠাকুরঝি।

এবং সেই পরিচয়েই তাকে বাড়ি ফিরতে হবে। অথচ সে এমন একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যার সঙ্গে বাড়ির কোনো সম্পর্ক নেই। কী করে সে ভাবল সত্যিই সে স্বাধীন। কী করে ভাবল স্বার্থপরের মতন কখনো স্বাধীন কখনো পরাধীন হওয়া যায়। 'ওদের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়েও আমি কী করে নিজেকে স্বাধীন ভাবব?' এই মুহূর্তে তার অনুতোষের ওপর প্রচন্ড রাগ হল, ঘৃণা হল। ওর লোভের জন্যেই—

লোভ শব্দটা উচ্চারণে এবার নিজেই কেমন অসহায় বোধ করল। বস্তুত, এখন দুপুরের আনুপূর্বিক সমূহ দৃশ্যপট তার চোখের সামনে অন্ধকারের ছবির মতন নড়ে উঠল। আশ্চর্য, একটু-একটু করে ঘটনাবলী একটা চূড়ান্ত পর্যায়ের দিকে উন্নীত হয়েছিল, সে পর্যায়গুলি এক সময় পরিচ্ছন্ন চেতনায় বিধৃত ছিল, তারপর হুড়মুড় করে একরাশ আরক্ত অন্ধকারের মধ্যে সমস্ত কিছু একাকার হয়ে গেল। এবং, এবং এ সকল সংযোগে প্রকৃতিরও একটা বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল বইকি। আসলে এক বিশেষ সময়ে মেয়েরা যে কত লোভী হতে পারে, প্রকৃতিই তার প্রমাণ। এখন এই মুহূর্তে তার এই ক্লান্ত ধীর চেহারা দেখে কেউ কী ভাবতে পারে এই মেয়েটির মধ্যে একটা ভীষণ ঝড় লুকিয়ে ছিল। কে বলতে পারে প্রকৃতি স্বেচ্ছায় এই আত্মদানে এগিয়ে যায়নি! কে বলতে পারে অনুতোষের ব্যবহারের আজকের এই উগ্রতা না দেখলে সে খুশি হত! 'আমি কী নিজেই দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম' : প্রকৃতি হাই তুলল, বাসটা তাকে না নিয়ে চলে গেল, 'এই দুর্বলতাই আমার আসল চরিত্র।' তাহলে অনুতোষের দোষ দেয়া যায় না। অনুতোষ ঠিকই করেছে। তাহলে প্রকৃতির চরিত্রের মধ্যেই এই দুর্বলতার বীজ লুকিয়ে রয়েছে, এবং আরো অনেকদিন সে দুর্বলতার শিকার হবে। এ ব্যাপারে তার কোনো হাত থাকবে না। বাস ধরবার জন্যেই বোধহয় তারপাশে যুবকটি এসে দাঁড়াল। ও ঘনঘন তার দেহের দিকে চোখ রাখছে। অন্যদিন হলে বিরক্ত হত প্রকৃতি, কিন্তু আজ মনে হল বিরক্ত হবারও কোনো অধিকার নেই তার, তার দুর্বলতাগুলোই তার বাধা, হয়তো এই যুবকটি এই মানসিক অবস্থায় তাকে ট্যাক্সিতে টেনে নিয়ে গেলে সে জোর করতে পারবে না। কে জানে, তার দুর্বলতাগুলি জলছবির মতন তার চেহারায় ফুটে উঠেছে কিনা। শাড়িটা কী বেশি কোঁচকানো দেখাচ্ছে, চুলগুলি উসকো। ও যদি তাকে নষ্ট মেয়ে ভাবে, কী করে সে আপত্তি জানাবে। এই অসহ্য গুমট শেষ-দুপুরটা রাস্তায় দাঁড়ানো যুবতীর পক্ষে প্রচন্ডাকারের অশ্লীল।

ভালোবাসা, প্রকৃতি যেন আঁকড়ে ধরবার মতন একটা স্তম্ভ পেল। অনুতোষ তার প্রেমিক। তার দেহমন সমস্তই প্রেমের অভিব্যক্তি। কিন্তু..... প্রকৃতির হাঁপ ধরল, দম বন্ধ হয়ে আসছে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রয়েছে বাস স্টপে, এবার একটা বাস এলেই উঠে পড়বে। আজ দুপুরে ওরা যা-যা করেছে তার মধ্যে কোথাও প্রেম নেই। এবং

বিমল মিত্রের
গল্প সম্ভার — দাম : ১৬·০০
স্ত্রী — ৫ম সং ৪·৫০
এর নাম সংসার — ৪র্থ সং ৮·৫০

শংকর-এর
রূপতাপস — ৪র্থ সং ৪·০০
পাত্র-পাত্রী — ৯ম সং ২·৫০
চৌরঙ্গী — ১৯শ সং ১২·০০
মানচিত্র — ১৩শ সং ৬·০০

এক ঝাঁক খঞ্জন ॥ বনফুল ৬·৫০
আকাশ ভরা সূর্যতারা ॥ নিমাই ভট্টাচার্য ৪·০০
সাংস্কৃতিকী ২য় সং ॥ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ৬·৫০
রবীন্দ্রায়ণ ॥ শ্রীপুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত ১ম ১২·০০, ২য় ১০·০০
নাম ভূমিকায় ॥ শ্রীপান্থ ১৫·০০

জরাসন্ধ-র
পাড়ি — ১০ম সং ৩·৫০
মসিরেখা — ৫ম সং ৯·০০
মহাশ্বেতার ডায়েরী — ২য় সং ৪·০০

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
পৌষ ফাগুনের পালা — ৪র্থ সং ১৫·০০
সমরেশ বসুর
জগদ্দল — ১৫·০০

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
দ্বিতীয় অন্তর — ২য় সং ১০·০০
চাণক্য সেনের
তিন তরঙ্গ — ২য় সং ৬·০০
মধু বসুর
আমার জীবন — সচিত্র সং ১৫·০০

জলে ডাঙায় ও অন্যান্য ৪র্থ সং ॥ সৈয়দ মুজতবা আলী ৬·৫০
আমেরিকার ডায়েরী ২য় সং ॥ দেবজ্যোতি বর্মণ ৭·৫০
বিশ্বসাহিত্যের সূচীপত্র ॥ নীলকণ্ঠ ৮·০০
সমাজ শিক্ষা প্রসঙ্গ ॥ মন্মথনাথ রায় ৩·৫০
সাহিত্য-সংস্কৃতি-সময় ॥ নন্দগোপাল সেনগুপ্ত ৪·০০

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সর্বাধ্যক্ষ স্বামী বিরেশ্বরানন্দের আশীর্বাদধন্য মালতী গুহরায়ের
ভারতী নিবেদিতা ৬·৫০
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্করীপ্রসাদ বসু ও শংকর সম্পাদিত
বিশ্ববিবেক ২য় সং ১২·০০

শাম্যাজের দিলীপকুমার রায়ের সতীনাথ ভাদুড়ীর শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের
নিশিপদ্ম — ৮ম সং ৪·০০
অভাবনীয় — দাম : ১০·০০
জলভ্রমি — ২য় সং ৩·৫০
হসন্তী — ৩য় সং ৪·৫০

বাক্-সাহিত্য ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯
দেবনারায়ণ গুপ্তের দাবী নাটক ৩·০০

এ সকল আচরণের জন্যে প্রেমেরও কোনো প্রয়োজন নেই। চিরাচরিত বদ্ধ সংস্কারগত কতকগুলি অভ্যাসসমষ্টিকেই তারা ব্যবহার করেছে মাত্র।

প্রকৃতি আবার চিন্তিত হল। চিন্তাগুলো যেন জট পাকিয়ে তুলছে। এই অভ্যাসগুলো তাকে শেখাতে হয়নি, যেন সে জানতই. জানত সে একটি মেয়ে এবং একটি পুরুষের সম্পর্কে আসাই তার একমাত্র সার্থকতা। বোধকরি প্রেম জাতীয় আবেগটি আসবার আগেই ওই সংস্কারগত অভ্যাসগুলি স্বভাবে জড়িয়ে গেছে। তাহলে অভ্যাসগুলিকে আবরণ দেবার জন্যেই প্রেম একটু রঙিন আংরাখা। এই কয়েক বছর ওদের মেলামেশা, ঘনিষ্ঠতার চিত্রগুলি পুনর্বার ভাববার চেষ্টা করল প্রকৃতি: এক বান্ধবীর বিয়ের সূত্রে হঠাৎ আলাপ অনতোষের সঙ্গে। প্রকৃতি বি-এ পড়ছে, অনুতোষ ছোটখাটো সরকারী অফিসার। তারপর সপ্তাহে দুদিন দেখা করার শর্ত। এমনি একটি শর্ত পালনে ট্যাক্সিতে ডায়মণ্ড-হারবারের পথে অনুতোষ ওর জীবনের প্রথম চুম্বনটি অর্জন করে নিয়েছিল। সে অভিজ্ঞতা এখনো রোমাঞ্চের মতন মনে করতে পারে। সে রাত্রে বাড়ী ফিরে অবাক হয়েছিল: এর আগের এত কথা, হাসি, গল্প একটিমাত্র চুম্বনের উত্তাপ-স্পন্দন-সুরভিখচিত আকাশের তলায় অনায়াসে হারিয়ে গিয়েছিল। এবং তারপরও তাদের পরবর্তী সাক্ষাতের দিনগুলিতে গল্প ছাপিয়ে চুম্বনের পর্বই অনিবার্যভাবে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। এর নাম কী? সুখ। শরীরের সীমায় তাকে ধরা যায়। তাদের ঘনিষ্ঠতার এই শারীরিকতার দিকটি কারুর কাছেই উপেক্ষণীয় ছিল না। তারা ভালোবাসার সুখকে শরীরের সীমানায় বাঁধা রেখেছিল। পরিণামে এই সুখের খুচরো খাজগুলি অজ্ঞাতে তাদের মূলধনের দিকে একটু-একটু করে উদগ্র করেছিল অবশ্যই।

প্রকৃতি এবার হতাশ হল। নিজের কাছেই যেন হেরে যাচ্ছে সে।

আজকের এই দুপুরটার জন্যে সে কাউকে অভিযোগ করতে পারলে নিশ্চিন্ত হত। কিন্তু, এ-সংসারে কেউই বিচারক নয়, আসামী। প্রকৃতি নিশ্বাস ফেলে ভাবল।

তারপর বাসটা এসে দাঁড়াতেই যেন ভাবনাগুলোর থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যেই বাসে উঠে পড়ল। বাসে ভিড় নেই। যেন প্রতিটি যাত্রী পরস্পরকে মুখস্থ রাখতে পারে। বাসটা যত এগোচ্ছে তার অধিক শব্দ করছে। ওর নড়বড়ে পাঁজরাগুলো যেন ভেঙে পড়বে। প্রকৃতি অন্যমনস্কের মতন উচ্চারণ করল: 'ভাঙ্গার গাড়ি।' ঝাঁকুনিতে সমস্ত শরীর দুলছে, বুক থেকে গড়িয়ে পড়া ঢেউটা কোমরে ধমকে ভেঙে ছড়িয়ে পড়ছে। ওর বেরিয়ে-আসার সময়ও অনুতোষ বিছানা ছেড়ে ওঠেনি, ওর চোখে বোঝাই ঘুম ছিল, অন্যদিন সে এগিয়ে দিত বাসস্টপ পর্যন্ত। আজ তার আচরণ অত্যন্ত স্বার্থপর লেগেছে। প্রকৃতি আরো একটু জিরোতে পারত, এই খাঁ-খাঁ রোদ্রে সে তাকে একরকম বাড়ি থেকে ঠেলে নামিয়ে দিয়েছে। কেন? না, ওরা এসে পড়বে! ওকে তখন অত্যন্ত সুবিধাবাদী লেগেছে এবং স্বার্থপর। সে একবারও ভাবল না প্রকৃতিকে এই অবস্থায় একলা পথে নামিয়ে দেয়া কর্তব্য কিনা। প্রকৃতির মাথা ঘুরেছে কিনা, পা টলছে কিনা, পথে পড়ে যেতে পারে কিনা, এ সমস্ত কিছুই সে ভাবল না। তার একবারও কী বোঝা উচিত ছিল না আজকের এই মত অভিজ্ঞতার পীড়নে প্রকৃতির পক্ষে অনুতোষের নিশ্ছিদ্র সাহচর্য অধিক প্রয়োজনীয় ছিল। এই অস্বাভাবিক মানসিকতা স্বাভাবিকভাবেই প্রকৃতির মনে হতাশা, অবসাদ, এমন কি আত্মনাশ পর্যন্ত আনতে পারে।

কয়েকটা স্টপ এগিয়ে এসেছে প্রকৃতি। তাড়াতাড়ি বাস থেকে নেমে পড়ল। ফুটপাথ ধরে ফিরতে লাগল।

পরিচিত গলিতে পা দিতেই হঠাৎ কান্নার মতন স্বাদে তার হৃদয় ভরে গেল। কিশোর বয়েসে একবার রথের মেলায় হারিয়ে গেলে এমন অনুভূতি হয়েছিল। গলিতে লোকজন আছে, রোজকার দোকান-পাট, এমন কি ফুটপাথের সেই মুচিটা পর্যন্ত নির্দিষ্ট জায়গায় বসে। তথাপি প্রকৃতি ভয়ানক নিরাশ্রয় বোধ করল। গলায়, কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম, মুখ লাল হয়ে উঠেছে। কে বলতে পারে এদের মধ্যে কেউ তাকে দুপুরে বেরোতে দেখে নি। 'বিকেল উৎরে ফিরে এল সেই মেয়ে! সারা দুপুর কী করছিল, কলেজ নেই, সিনেমায়?

ঘাড় হেঁট করে দরজা পার হয়ে সোজা নিজের ঘরে চটপট উঠে এল। আর, এই সময়ই কী মার কাজ পড়েছে ঘরের বিছানার চাদর পাল্টানোর।

মা ফিরে তাকালেন ওর দিকে।

'কী চেহারা হয়েছে তোর?' মা বললেন।

'মানে?' হঠাৎ বুদবুদের মতন অকারণ ফেটে পড়ল প্রকৃতি।

মা হাসলেন। 'দুপুর মাথায় করে কোথায় বেরিয়েছিলি?'

'জবাবদিহি করতে হবে নাকি?'

'মেয়ের কী কথা! অমন মেজাজ কেন? খিদে পেয়েছে বুঝি?'

প্রকৃতি লম্বা মুখ করে বললে, 'মনীষাদের ওখানে গিয়েছিলাম।'

'মনীষা' মা চোখ বড় করলেন: 'তুই বেরোবার পর মনীষা যে তোর খোঁজে এসেছিল। সারা দুপুর বউদির সঙ্গে তাস খেলে একটু আগে গেল।'

প্রকৃতির মুখ কালো হয়ে গেল। এতক্ষণ পর সে যেন শক্ত পাথরে জমে যাচ্ছে।

প্রকৃতির হঠাৎ কঠিন গলায় একটু থেমে উত্তর করল: 'এতই যদি আমার জন্যে চিন্তা তাহলে বড় হতে দিয়েছ কেন? কেন আঁতুড়ে নুন খাইয়ে মেরে ফেলোনি?'

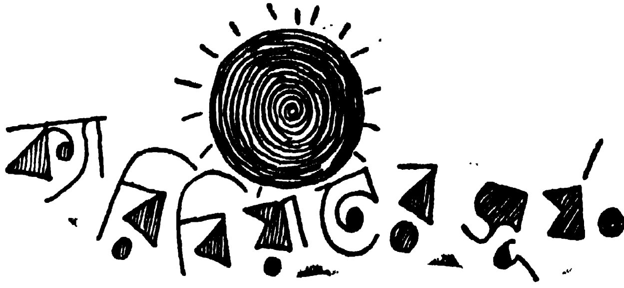
ওর আলুথালু কান্না-গলা চেহারা দেখে মা বোকার মতন স্থির হয়ে গেলেন।

সারা দুপুরের গুমটের পর অসহ্য বিরক্তি, অবসাদ, আর শূন্যতাবোধের হাত থেকে লড়াই করতে করতে প্রকৃতি এবার মাস্তুলহীন ভাঙা নৌকোর মতো চতুর্দিকে ছত্রখান হয়ে পড়ল।



আর্নিকল
আর্নিকা হেয়ার অয়েল
কেশের অকালপক্বতা ও পতন নিবারণে সহায়তা করে এবং কেশ সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।
মহেশ লেবোরেটরিজ
প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-১১

এজেন্টস
এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড
৭৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১
ফোন: ২২-২৫৩৬



ব্রজমাধব ভট্টাচার্য

পূর্বাভাষ—

"তিন সাগর"-এ পার হয়েছি ভারত মহাসাগর, ভূমধ্য-সাগর এবং অতলান্তিক।

থেমেছিলাম বারমুদায় এসে।

বারমুদা থেকে ক্যারিবিয়ানে এসে কেটে গেলো পর পর এই ন'বছর। এর মধ্যে বহু জায়গা ঘোরা হোলো, বহু সমাজে বহু জীবনে অবগাহন করা হোলো।

মানুষই চিত্র মানুষই বিচিত্র।

জীবন - রস - প্রবাহ আদি-অন্তহারা প্রবহমান।

আর বিপুলা এই পৃথিবী।

তার অন্তবাসের পরতে পরতে বিস্ময়, আরো বিস্ময়, আশ্চর্য, আরও আশ্চর্য। মোহিনী এক মায়ার ইন্দ্রজাল।

তারই কথা বলবো।

"ক্যারিবিয়ানের সূর্য" সেই কথা।

বারমুদায় সেই ১৯৫৭ থেকে তিনবার গেছি।

আবার পাই তো আবার যাই।

পৃথিবীতে সুন্দর দৃশ্য বহু। আজকাল এই প্লেনের যুগে যাযাবর-ভবঘুরে যেমন কমেছে, সৌখীন যাত্রীদের বহর তেমনি বেড়েছে। বলা হয় ট্যুরিজম। ট্যুরিজম বহু দেশেরই একটা প্রধান 'পণ্য'। বিদেশী টাকাকে ঘরে তোলার পক্ষে এ একটা বড়ো রকমের উপায়।

ভারতবর্ষে এ তথ্য এখনও তত্ত্ব হয়ে ওঠেনি। প্রভুদের হুঁস নেই তা নয়; মুরোদ সীমিত,—বহু কারণে। অন্যান্য পণ্যের মতো এ পণ্যের বেলাতেও ভারতবর্ষ পিছিয়ে আছে অনেক হোটেল, অনেক হাই ওয়ে, অনেক মোটেল, অনেক পার্ক, অনেক যান-বাহনের দলকে দলের পেছনে। অথচ গোটা পৃথিবী ঘুরে দেখেছি ভারতবর্ষের মতো 'ট্যুরিস্ট'-মাতানো দেশ আর নেই।

হলে কি হবে! আমরা দার্শনিকের জাত। অধ্যাত্মবাদের চচ্চড়ি চিবুই। দেশের হাল পানি পায় না।

অথচ ইংরেজ-দেশের ডলার যোগান দেয় বারমুদা আর বাহামা খোলা হাতে। সারা পৃথিবীতে এমন কোনো জায়গা নেই যেখান থেকে, এবং এমন কোনো তরকীব নেই যাতে করে, ইংলণ্ডের চ্যান্সেলার অব দি এক্সচেকার 'ডলার' নামক সর্বরোগহর ঔষধটি এই বিপুল জবরদস্ত-হারে ঘরে তোলেন। এবং এই অপরিমিত ডলার স্রোতের একমাত্র নালী বারমুদা এবং বাহামার ট্যুরিজমের ধাক্। তাবৎ ধনী-দুনিয়ার স্বর্গ বারমুদা এবং বাহামা দ্বীপগুলো।

ট্যুরিজমের পাল্লায় পড়ে তেলেনীপাড়ার বামনু কুলির বৌ মংলীও হয়ে ওঠে গৌহরজান, মার্লিন মনরো কিংবা ক্রীস্টিন কেলার। ট্যুরিস্টদের পিকচার পোস্টকার্ডরা সাংঘাতিক দালাল। প্রিন্সেপস-ঘাটের 'ফটেন-ওলাকেও হার মানায়। বিমান-ব্যবসায়ীদের বিজ্ঞাপন আর রংদার পোস্টকার্ডের ছবির পাল্লায় পড়ে বম্বে শহরের ধোবিঘাটাও দেখায় যেন মোহনভোগের থালা। আমার চেহারাই যে এতো সুশ্রী আর সুন্দর তা আমার ফোটোগ্রাফার আমাকে দেখিয়ে না দিলে কি বিশ্বাস করতে পারতাম?—ফোটো দেখে পাত্রী মনোনীত করতে আমরা নারাজ; কিন্তু ফোটো দেখে তোবাগো, বুনোস-এয়ার্স, সালোনাইকা কিংবা কায়রো যাবার জন্যে আমরা হা-হন্যে হয়ে উঠি।

কায়রো গেলেই মনে হয় কিছু রসুনের খোসা, মাছির জ্বালাতন, ঘুঁটে-ঘোষিত কুঁড়ে ঘরের সার, বালি আর রোদের বার, এবং চাঁই-চাঁই পাথরের স্তূপ দেখার জন্যেই কি দুদিন ধরে পেলাম চর্বিতে ভাজা শিক-কাবাব আর তন্দুরের রুটি,—তাও দৈনিক হোটেলে সতেরো টাকার ঘরের মধ্যে বাক্স-বন্ধ থেকে? কায়রো না গেলে এ সত্য উপলব্ধি করা যায় না। উপলব্ধি করতে দেয় না ঐ সর্বনেশে হাওয়াই-বিজ্ঞাপন, আর বন্ধুর পাঠানো পিকচার পোস্টকার্ড।

কিন্তু সেই পিকচার পোস্টকার্ডও বেইমানী করবে না বারমুদার বেলায়, বাহামার বেলায়। সত্যি কথা বলতে সেরা-সে-সেরা ফোটোগ্রাফারও হেথা এসে হাঁপিয়ে যাবেন। ক্যামেরায় এ দুটো জায়গার সৌন্দর্য ধরা যায় না। কারণ ক্যামেরায় আকাশ, বাতাস আর সমুদ্রের মিলিত অর্কেস্ট্রার সুর ধরা পড়ে না। ধরা পড়ে না সেই চমৎকার একটা স্নিগ্ধ-শান্ত নির্বিবাদ ব্যঞ্জনা যা মাদক অথচ নেশা ধরায় না; উৎসাহে উত্তেজিত করে তোলে, কিন্তু চঞ্চলতা আনতে দেয় না; গতিকে বাড়িয়ে বেড়ায়, তাড়িয়ে বেড়ায় না। তাড়িয়ে বেড়াবে কোথা থেকে? বারমুদার পথঘাটও স্বপ্নপুরীর পথঘাটের মতো তন্দ্রী। সব-সে-সেরা মোটরগাড়ী ঐ হিলম্যান;—তারও গতি ১২ মাইলের বেশী হতে পায় না। বারমুদা একটা দ্বীপ, যেখানে মন চুইয়ে শান্তি ঝরে; আকাশ চুইয়ে রঙ ঝরে;—আর পকেট চুইয়ে পড়ে টাকা!! যদি থাকে।

প্রথমবার যখন আমি বারমুদায় যাই, অতর্কিত। গ্যাণ্ডার থেকে বারবাডোজ হয়ে বি-ও-এ-সি বোইং যাবে ত্রিনিদাদে। পথে বারমুদা। যথারীতি এক ঘন্টার মতো সময় পাবো। ভোরবেলা। অন্ধকার লেগে আছে আকাশে। সোজা বাথরুমে গিয়ে প্রথমেই দাড়িটা কামিয়ে নিলাম। দাঁত মেজে রেস্তোরাঁয় গিয়ে বসলাম।

কফি খাচ্ছি। টেবিলে এলেন সেই সোহন পণ্ডিত। একগাল হাসি। "সকালেই কফি নিয়ে বসেছো। ভালোবাসো বটে কফি। রাতেও তো বার কয় প্লেনে বসেই খেলে।"

মাথায় শাদা পাগড়ি। গায়ে গোলাপী মেরজাই। পরনে আনকোরা হলুদ ছোপা ধুতি পশ্চিমের গাঁয়ের প্রথায় কোমরে পেঁচিয়ে পরা। বেপরোয়া চলেছে দেশের স্বাদ যতটা পারে সঙ্গে নিয়ে।

সোহন পণ্ডিতের বাড়ী ফৈজাবাদ জেলায়, অযোধ্যার কাছাকাছি গাঁয়ে, রাম-পিহুরা। তখন ওর সবে পনেরো কি ষোলো বছর বয়স। ওর দাদা ওকে বেদম প্রহার করেছিলো। দোষ অবশ্য সোহনের বৌদিরই ছিলো। সোহন তখন অতোশতো জানতোও না। কিন্তু দাদা কাজ করতো কানপুরের মিলে। মাস ছয়েক, কি বছর গেলে আসতো। আর সোহনের বৌদি প্রায় তো ওরই বয়েসী। পাকা ঝানু মেয়ে। তারই পাল্লায় পড়েছিলো সোহন। 'জানো, সে আমার ভৌজীটাই যত নষ্টের গোড়া। দাদাকে ওই বলেছিলো। আর কী বেড়ানই বিড়লো দাদা!"

সোহনের রাগ হয়েছিলো বৌদির ওপর, ধিক্কার এসেছিলো জীবনে। বাবা-মাকে বলা হয়নি কিছু, সত্য। কিন্তু জানতে তো পেরেছিলেন সবই।—

সেই সোহন গৃহত্যাগ করেছিলো।

ট্রেনেই আড়কাঠীর সঙ্গে দেখা। সেই-ই ওকে আগ্রায় নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে দিলো। বললো, 'বলবি আঠারো বছর বয়েস। আর খবরদার, বলবি না তুই বামুন।'

'তবে কী বলবো?' অবাক লেগেছিলো সোহনের। 'চিরকালের বামুন,—কৌশিক-গোত্র, আর বলবে বামুন নয়?

কিন্তু সেই যে ১৮৫৭-তে ব্যারাকপুরে কার্তুজ নিয়ে হাঙ্গামার আরম্ভ, আর তার মূলে যে সেই মঙ্গল পাড়ে, পণ্ডিত মঙ্গল পাড়ে, যার নাম থেকে,—'প্যাণ্ডি' শুনলেই ইংরেজদের পেটে মোচড় দিতো,—সেই থেকে ব্রাহ্মণ নিয়ে 'বিজনেস' করার ওপর জবর মানা ছিলো কোম্পানীর।

ব্রাহ্মণদের ওপর জবর মানার আরও দুটো বড়ো কারণ ছিলো। প্রথমটা যে যে-বে কলোনী, চা-বাগান, নীলকুঠীতে বামুন গেছে, জাত-বিচারের হাঙ্গামা প্রখর হয়ে উঠেছে। ব্রাহ্মণদের সম্মান সাধারণ কুলি-কামীনদের চোখে এতো উচ্চগ্রামে বাঁধা থাকতো যে স্বয়ং শ্বেতাঙ্গ প্রভুদেরও ব্রাহ্মণ কুলিকে বিশেষ বিশেষ বাছাই কাজ দিতে হোতো। এরা নাকি বুদ্ধিতে, দীপ্তিতে যেমন তীক্ষ্ণ, কাজে-কর্মে তেমনি অপটু। কোমল আর নরম কাজ ছাড়া বামুন-কুলিরা বিশেষ কিছু করতে পারতো না।

দ্বিতীয় কারণটাই মারাত্মক। কলোনীর আটচালা ঘেরা পাড়ার মধ্যে দলকে দল জল ছিটিয়ে বণ্টন করার [illegible] মার্কা বামুনরা। ওরা কী এক বই পড়ে সুর

[illegible] বলে—রাম রাবায়ণ। আর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ঢোলক, কাসী, করতাল এবং দাপ্তাল সহযোগে বিচিত্র গান গায় আর গাঁজা পোড়ায়। ব্যস, কী যে যাদু; সেই কুম্ভকর্ণ জাগানো শব্দের দুর্গ ভেদ করে পাদ্রী দলের শুভ-সমাচার কুলী কামিনদের কান অবধি পৌঁছতেই পারতো না।

তাই আফ্রিকা, মরিশাস, ফিজি, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ কোথাও ইন্ডেঞ্চার্ড-লেবারের গুণতির মধ্যে বামুনেরা ধরা পড়তো না। তাদের 'রুঙ্গুট' অর্থাৎ রিক্রুট করায় নিষেধ ছিলো।

তবু কতো ব্রাহ্মণই এসেছে।

এসেছে কি, ত্রিনিদাদে এবং ব্রিটিশ-গায়ানায় ভারতীয় হিন্দু পরিবারদের মধ্যে ব্রাহ্মণরাই প্রভূত উন্নতি করেছে। তারা আজও নামের পেছনে 'মারাজ', অর্থাৎ 'মহারাজ' লেখে। এদের সমাজে মারাজদের এখনও ঢের সম্মান।

বম্বের কেবলরাম শর্মা, লাহোরের বিশ্বনাথ কোন, স্বাধীন ভারতের নাগরিক। স্বাধীনভাবেই এদেশে এসে ব্যবসায় করছেন। কিন্তু নামের পেছনের সেই 'শর্মা' এবং 'কোন' কোতোল করে, 'মারাজ' লিখে এদেশের ভারতীয়কে বিবাহ করে দিব্যি যেঁপে-গেড়ে বসেছেন।

আজও ব্রাহ্মণদের দাপট দেখতে গেলে এই সব ঔপনিবেশিক সমাজেই আসতে হয়।

কলম্বোর রাঘবেন্দ্রনাথন জ্যামায়কা বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃ-তত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে একবার আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন,—এদেশে ব্রাহ্মণ-কুলী আসতো না; আইনে তাই বলে। কিন্তু বারবীসের লিওনোরা গ্রামের আশে-পাশে কেবল ব্রাহ্মণ! এতো ব্রাহ্মণ পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে এলো কোথা থেকে? সংখ্যা দেখলে সন্দেহ জাগে ব্রাহ্মণ ছাড়া কোম্পানী রিক্রুটই করতো না হয়তো?

তাকেই প্রথমে এই গভীর তত্ত্ব বোঝাই। ব্রাহ্মণ দেবতা বিপাকে পড়েছেন ধোবানীর প্রেমে, —বিধবা ব্রাহ্মণকন্যার প্রণয় ঘটেছে ছটু নাপিতের মেজো ছেলের সঙ্গে, আমাদের সোহন পণ্ডিতকে তার দাদা পিটি লাগিয়েছে, রামবল ত্রিপাঠীর ছেলেকে কে দেখেছে আবদুল গফফরের সঙ্গে স্টেশনের বেঞ্চিতে বসে জিলেপী আর দুধ খেতে,—এরা যায় কোথায়? কোথায় গেলে ধোবানী ব্রাহ্মণী হবে, ধোবানীর গর্ভে নব বেদব্যাস জন্মাবেন, কোথায় নাপিতের ঘরে জন্ম নেবে ক্ষেত্রজ ব্রাহ্মণ পরশুরাম—সে এই নতুন উপনিবেশ, নতুন সমাজে।

এই সমাজে এলেন সোহন পণ্ডিত।

পথে জাহাজেই পেয়ে গেলেন একটি অন্তঃসত্ত্বা বিধবা ব্রাহ্মণকন্যা। তার ভাবী সন্তানের জনককে গ্রামের ব্রাহ্মণ জমিদার খুন করেছে, বাহ্যতঃ 'ধর্মরক্ষা' করারই জন্য। নেপথ্যে অবশ্য মেয়েটা জিউলো ছিলো গ্রামীণ জমিদারের নৈবেদ্যের জন্যই। পালিয়ে চলে আসে আড়কাঠির। কলকাতার যেখানে ব্যারাকপুরের যাত্রী-ফাঁড়িতে সব রংরুট এক হেতো 'শ্রীনাম' নামক রামরাজ্যে সোনা-অর্জন করার আশায়,—সেইখানে সোহনের সঙ্গে দেখা কুন্তলার। সেই কুন্তলা সোহনকে দুই মেয়ে আর তিন ছেলে দিয়েছে। সবার বিয়েথাও হয়ে গেছে। কুন্তলার সেই প্রথম সন্তানের বাপও হলেন সোহন পণ্ডিতই; কাগজে তাই লেখানো হোলো। 'কিন্তু ভট্টাচারিয়া বাবু আমি সেই ছেলের নাম দিয়েছি করণ মহারাজ। কর্ণও তো অমনিই ছিলেন।' সোহন পণ্ডিত তার কটা কটা হলদে দাঁত বার করে হাসছিলো। শাদা পাগড়ি, গোলাবী মেরজাই আর হলুদে রাঙানো কোরা ধুতি পরে ওকে যেন রাজ-রাজেশ্বর দেখাচ্ছিলো: দেখাচ্ছিলো যেন সদ্য সদ্য তুলসীদাসের রামায়ণের পাতা ভেদ করে ও উঠে এসেছে।

"আপনি তো খেয়ে নিলেন। আমার চান না হলে খাওয়া হবে না।"

সেই পরিস্থিতিতে কী করা যায় ভাবছি, এমন সময় গুজব গেলো শোনা,—বি-ও-এ-সি বাধিয়েছে এক বিড়ম্বনা!

বারমুদায় প্লেন পাঁচ ঘন্টা লেট!

বললাম, চলো পণ্ডিত চান শেষ করে কিছু খাওয়া যাক। পাঁচ ঘন্টা সময় আছে হাতে।

বারমুদা দার্গ কি-না! Pretty, tiny, —Elfland এর মাপে। যেন শেক্সপীয়রের মিড-সামার নাইট'সের fairy-land—এখানকার পথঘাট অদ্ভূত ছোটো। সবার চওড়া রাস্তাও দশ থেকে বারো ফুটের বেশী হবে না; একসঙ্গে ৫০০ গজের সোজা রাস্তা নেই। আঁকা-বাঁকা, উঁচু-নীচু পথের দুধারে এলিজাবেথীয় যুগের বাড়ী-ঘর-দোর,—বারমুদার সম্পদ। বারমুদা। শান্ত-স্নিগ্ধ বারমুদা। এই স্বপ্নঘন দ্বীপের আকাশ থেকে অপলক শান্তি নীরবে ঝরে ঝরে পড়ে: W. B. Yeats -এর আইল অব ইনিস ফ্রীর সেই দুটি লাইন মনে করিয়ে দেয়—

And I shall have some peace there
for peace comes dripping slow.
Dropping from the veils of the morning
to where the cricket sings .

দু-পা বেরিয়েছি এয়ার পোর্ট থেকে, ব্যস, সামনে এক ফালি স্বর্গ। মস্ত atoll,— অর্থাৎ কোরালের মালা গলায় দিয়ে সাগরিকা আসক্ত ডুবিয়ে চেয়ে আছে ভাসা ভাসা সবুজ চোখে। ওপরে নীল আকাশে ভাসা ভাসা শাদা ধবধবে মেঘের ছোপ। দূরে দূরে দ্বীপ, দ্বীপ, দ্বীপ! চক্রাকারে বেড়ে আছে। কেউ বলে বারমুদায় একশো দ্বীপ, কেউ বলে তিনশো। সত্যি-সত্যি গোনার উৎসাহ কারুর নেই। আসল দ্বীপ একটাই। উত্তর-পশ্চিমে আয়র্লণ্ড-আইল্যান্ড। বারমুদার সঙ্গে ব্রীজ দিয়ে সংযুক্ত। উত্তর-পূর্বে আরও দুটি দ্বীপ সেন্ট জর্জ আইল্যান্ড, সেন্ট ডেভিড আই-ল্যান্ড। এই চারটি দ্বীপের দৈর্ঘ্য বাইশ মাইল। চওড়া সবচেয়ে বেশী দু মাইল, সব-চেয়ে কম দশ গজ। মোট বাইশ বর্গ মাইল জায়গায় প্রকৃত বারমুদা,—অর্থাৎ সাতটি দ্বীপ। মেলে,—আয়র্ল্যান্ড [illegible] আর স্প্যানিশ পয়েন্টের মধ্যে যে Great Sound রয়েছে তারই মধ্যে আমি চেয়ে ত্রিশটি দ্বীপ গুনেছিলাম, আর গুনিনি। নীলের শান্ত স্থির আরশি-মসৃণ বুকে ভিজে ভিজে সবুজে ঢাকা দ্বীপের পর দ্বীপ। কবি টমাস মুর এই দৃশ্য দেখেই লিখেছিলেন,—

This enchanted land,
This leafy isles upon the ocean
thrown,
Like studs of emerald over a
silver zone.

বারমুদার নয়নাভিরাম ল্যাগুন, রাউন্ড, কোরাল-ঘেরা দৃশ্যে মোহিত হয়ে, নানা কবি নানা স্বপ্ন এঁকেছেন, দেখেছেন। Edmond Waller বলেছেন

"Bermuda, walled with rocks; who does not know ? That happy island!" Andrew Muvell, Keats,

কে নয়? কিন্তু সবার সেরা, সবার মহান যে সম্মান কাব্যজগত দিয়ে গেছে বারমুদাকে তা এসেছে স্বয়ং শেক্সপীয়রের হাত থেকে। তাঁর অমর নাটক টেম্পেস্টের পটভূমি বারমুদা, মিরান্ডা-পিপাসু ক্যালিবান যেখানে বুনো শোর তাড়িয়ে বেড়ায় প্রস্পারোর দুর্দান্ত দাস হয়ে; বুনো-ফল খেয়ে জীবনধারণ করেন রাজর্ষি প্রস্পারো আর তাঁর শাকুন্তল-কন্যা মীরান্ডা।—স্যর এলেন বার্ণস লিখেছেন—

The scene of "the Tempest" is supposed to be the Bermudas; the play was written soon after the shipwreck there of Sir George Somers in 1609"

এই সমার্সের জন্যই বারমুদার অন্য এক নাম বহুকাল ধরে প্রচলিত ছিলো, সমার্স-আইল্যান্ড। সেকথা পরে হবে।

এই চারটি দ্বীপের একত্র ছবিটি বড়ই বিচিত্র। আকাশ থেকে দেখলে মনে হয় যেন মস্ত একটা বঁড়শি! তোফা বর্ণনা দিয়ে-ছিলেন বর্ণনার রাজা মার্ক টোয়েন। Bermuda looks like a fish-hook; only it is smaller ! এখন এই 'it' টি কে? এখানেই মার্ক টোয়েন, মার্ক টোয়েন!

সামনে করবী গাছের বেড়া। বিশাল বেড়া সমুদ্রের তীর আঁকড়ে আছে যেন চুপি চুপি কুঞ্জবন। গিয়ে একটু আড়ি পাতলেই টাইটানিয়া আর পাকের ফিসফিসানি শুনতে পাবো; মিরান্ডাকে লজ্জায় রাঙা করে দিতে পারবো—হঠাৎ পেয়ে যাবো পুরুরবার বাহুবন্ধনে উর্বশীকে।

এতো ফুল বারমুদায় যে ওরা অশোক, করবী আর জবার বেড়া দেয় সমুদ্রের এলো-পাতাড়ি শারদীয় ঝড়ের উৎপাতের হাত থেকে রক্ষা পেতে। করবীর বেড়া বাতাসকে নাকি শান্ত করে। তেমন তেমন জবা-করবীর বেড়া কোন্ উন্মদ-মদন-মথিত মনকেই বা সব্রীড় প্রত্যাশায় রোমাঞ্চিত করে না?

তা বলে বারমুদায় এতো ফুল ছিলো না। —ঝড় অবশ্য বরাবরই। ক্যারাবিয়ানের যে প্রখ্যাত ঝড় ফ্লরিডার বুকে বার বার হানা দেয়, সেই ঝড় বারমুদাকে নাচায়, নাজেহাল করে না। কেবল ছুঁয়ে যায়,—'দে দোল-দোল,—প্রলয় সাগরে তুফান তোল' বলে না।

বারমুদায় ফুল? জবা, করবী, প্যান-সিয়ানা, বুগেনভিলিয়া। ব্যস। ঐ বারমুদার।

কিন্তু তা বলে বারমুদার মতো ফুল দেখেছি এতো আর কোথায়? খালামারে? নিশাতে? মোগল গার্ডেনস? মৈশুরের বৃন্দাবন গার্ডেনস? কোথায়? কোথাও না। ওরা সব সাজানো; পুষে রাখা খাঁচার পাখী। পশু-শালার বাহার। তরকীব-তরীবৎ-এর সোহাগমাখা আদরেপনা। একটি জায়গার নামই করতে পারি; বড়জোর আরও আধখানা। ব্যস। স্পেনের পশ্চিমে পর্তুগীজ দ্বীপ মদীরা; এবং কিছুটা—নেপলসের পশ্চিমে কাপ্রী দ্বীপ। এই দুটি জায়গাতেই বারমুদার কথা মনে হয়েছে। কেবল ফুলের জন্যই। বহুপুষ্পিতা বারমুদার বরাঙ্গ শোভা 'ইহ হি দহতি চেতঃ'।

ব্যাপারটা খুলে এবং বুঝিয়ে বলার দরকার আছে। বারমুদাকে যুগে যুগে সাজিয়ে তুলেছে তথাকথিত বর্বর বোম্বেটে জলদস্যুর দল। জলদস্যু, বর্বর! বরাহ যেমন ধরণীকে সাজিয়ে ছিলো প্রলয়জলধি থেকে উদ্ধার করে, তেমনি এই জলদস্যুরাই 'বিকসজ্জাতি পুষ্পসুগন্ধি' বারমুদাকে আবিষ্কার করেছে, সাজিয়েছে।

বারমুদার চারধার ঘিরে ঘুম-ঘুম ঝিল-মিলে সবুজ সবুজ দ্বীপ। জলের ওপরে মাথা চাড়া দিয়ে আছে যেমন শত শত, জলের মধ্যে মাথা ডুবিয়ে আছে শত শত। তাছাড়া দ্বীপটার চারধারেই, বিশেষ করে উত্তরের উপসাগরের মুখে আর দক্ষিণের উপসাগরের মুখে বেড় দিয়ে কোরালের বলয়। সাধ্য কী সাধারণ জাহাজ হঠাৎ তার মধ্যে গিয়ে ঢোকে। সারা অতলান্তিক পার হয়ে এসে এই সবুজের হাতছানি পেয়ে কতো নাবিকই বারমুদার আশ্রয়ে নিরাপদকে পেতে ছুটে এসেছে। ধ্বংস হয়ে গেছে সংগে সংগে জলের তলায় ডুবে থাকা কোরালের চূড়ায় ধাক্কা খেয়ে। শুনতেই প্রবাল দ্বীপ কাব্যময়। কিন্তু কী যে সর্বনাশ প্রচ্ছন্ন থাকে কোরাল দ্বীপে তা নাবিক ছাড়া কে জানে। সেই সব প্রখ্যাত বোম্বেটে যুগেও কেউ কখনও সাহস করে এগুতো না এ দ্বীপে। নামই ছিলো 'ডেভিলস আই-ল্যান্ড', শয়তানের দ্বীপ!

কে কবে এ দ্বীপে প্রথম এসেছিলো? জুয়ান দ্য বারমুদেজ? স্পানিশ নাবিক? কে জানে। ১৫১১ খৃস্টাব্দের একখানা মানচিত্রে সর্বপ্রথম এ দ্বীপের নিশানা মালুম হয়। মানচিত্রে নাম লেখা 'লা-বারমুদা।'

যদি তাই সত্যি হয় এর পরে শতবর্ষ ধরে কেবল দৈব দুর্বিপাকে এখানে এসে পড়া ছাড়া কেউ কখনও এ দ্বীপের ধারে-কাছেও আসতো না। বাপ রে; বারমুদা ডেভিলস আইল্যান্ড! শয়তানের দ্বীপ! ১৫৯৪ খৃস্টাব্দে কাপ্তেন হেনরী মে সান্তো-দোমিনগো দ্বীপ থেকে এক ফরাসী জাহাজ হাতিয়ে ভেগে পড়েন। জাহাজের খোল-ভর্তি ফরাসী মদ। আপ্রাণ মদ গিলে টই-টম্বুর সারেঙ্গের দলসহ হেনরী মের জাহাজ আছাড় খেলো বারমুদার কোরাল-চোয়ালের ফাঁকে। ফলে সবার সলিল সমাধি। কেবল মে এবং আরও দু-চার জন কী করে বেঁচে গিয়েছিলো। সাঁতরে, হাতড়ে তারা দ্বীপে এলো। তখনকার দিনের বারমুদা প্রখ্যাত ছিলো সীডারের বনের জন্য। সেই সীডার কেটে নাবিকরা জাহাজ তৈরি করে প্রায় দেড় বছর পরে ফিরে যায়।

তারাই প্রথম খবর দেয় 'শয়তানের দ্বীপ' ভরতি আছে বুনো শোর আর কাহাউ পাখী। বোধহয় কোনো স্পানিশ জাহাজ ভেঙ্গে বুনো শোররা এই দ্বীপে এসে উঠে থাকবে। দ্বীপ ভরতি তখন শোরের পাল। ধরো আর খাও। তেমনি এই কাহাউ পাখী। নিরীহ শান্ত পাখী। একটা কোনো গতিকে মেরে আনলেই আরও দু-চারটে সেই মৃত পাখীটার সংগে সংগে আসবেই। কারণ একটা দৃশ্য। অকারণ হনন-শঙ্কা-হীন পাখীগুলো শান্ত জীবনে 'মানুষ' নামক ভয়ঙ্করের পরিচয় তখনও অজ্ঞাত। শিকারীরা দেখে হাসতো। মজা দেখতো। শুধু নীরবে তাদের ধরা আর শোরের চর্বিতে ভেজে খাওয়া। সুমিষ্ট মাংস। এমন খাওয়া খেয়েছিলো যে কাহাউ নির্বংশ হয়ে গিয়েছিলো। হঠাৎ এই বিংশ শতাব্দীতে কী করে জানা গেলো যে একটা ছোট্ট দ্বীপে কিছু কাহাউ বেঁচে গিয়েছিলো। এখন সরকার থেকে সেই দ্বীপে এবং সংলগ্ন কয়েকটা দ্বীপেই সমস্ত রকমের শিকার বধ করে কাহাউ এবং আরও অনেক রকম পাখীর নির্বিবাদ বসবাসের ব্যবস্থা হয়েছে। ফলে বংশ বিস্তার হয়েছে ওদের।

কাপ্তেন হেনরী মে গিয়ে শ্বেতদ্বীপে খবর দিলো যে বারমুদা নামক শয়তানের দ্বীপে বৎসরাধিক কাল সে বসবাস করেছে। শয়তানেরও ভীতি-সঞ্চারক ইংরাজ পতাকা সেই মাটিতে সে পুঁতে এসেছে। সুতরাং শ্বেতদ্বীপবাসীরা এখন গিয়ে বসত করতে পারে।

তা হলে কী হবে। বারমুদায় কেউ যেতে নারাজ। আর সব দ্বীপে জনবসতি হোলো। বারমুদায় হোলো না। তখন আমেরিকার জেমস-টাউনে দুর্ভিক্ষ। স্যর জর্জ সোমার্স নয়খানা জাহাজের কাপ্তেন হয়ে ৫০০ যাত্রী ও প্রচুর খাদ্যসহ যাত্রা করলেন জেমস্ টাউনের বাসিন্দাদের দুর্গতি নিবারণকল্পে। প্লাইমাথ্ বন্দর ছাড়লেন ১৬০৯-এ, মাসখানেক যেতে না যেতে দিনকে রাত করে এলো এক কালো অন্ধকার ঝড়। স্যর জর্জের জাহাজ 'সী-ভেঞ্চার' একদিকে বাকী জাহাজ অন্য-দিকে, কারুর সংগে কারুর যোগ রইলো না। তিন দিন ধরে Egyptian nights of horror পার করে ২৮শে জুলাই রাতে তুলকালাম ঢেউয়ের মাথায় আছাড়ি-পিছাড়ি, উথল-পুথল সেই 'সী-ভেঞ্চার'। জাহাজের তামাম লোক পাম্প করছে জল। জাহাজ চড়লো এক রাবণ ঢেউয়ের মাথায়, সংগে সংগে পাতাল দর্শন হতে না হতেই একেবারে বিপুল বিক্রমে ছুঁড়ে ফেললো কে 'সী-ভেঞ্চারকে' আকাশের দিকে। সকালে দেখা গেলো দুটি পাহাড়ের চূড়ার মধ্যে মহাদৈত্যের দাঁতের ফাঁকে ধরা যবের দানার মতো আটকে আছে খাড়া 'সী-ভেঞ্চার।' সেই ত্রিশঙ্কু পরিস্থিতি বেয়ে স্যর জর্জ সোমার্স এবং তাঁর দলের অবতরণ দিনটি,—২৮শে জুলাই—আজও বারমুদার পাঁজিতে জাতীয় দিন, ছুটির দিন।

আচ্ছা একথা যখন আরম্ভ হোলো শেষ করে এগিয়ে চলা যাক সেই ফুলের কথায়।

এর পরের অধ্যায়ে একটি কৌতুক আছে। মানুষের ইতিহাস বারে বারে আকস্মিকের চমকানিতে দীপ্ত জানি; কিন্তু আকস্মিকের চেয়েও বিস্ময়কর মানুষের মন, সেই মনে লোভ, তৃষ্ণা, দুরন্ত ধনলিপ্সা। আলাদিনের মতো হঠাৎ ধনের খবর পেয়ে মানুষ অসম্ভব সম্ভব করতে পারে। জার্মান জেনারেল রোমেল যে জাহাজে আফ্রিকার দৌলত নিয়ে ফিরছিলেন সেই জাহাজ পাছে শত্রুপক্ষের হাতে পড়ে, সেই ভয়েই তিনি ডুবিয়ে দেন। আজও তার সন্ধানে লক্ষ টাকা ব্যয় করা হচ্ছে। স্পানিশ বোম্বেটেদের ডুবন্ত জাহাজের সন্ধান আজও চলেছে। বারমুদার ইতিহাসে

বেনারসী শাড়ী
ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস
কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা

মানুষের এই লালাসিক্ত, সক্রেণী-চঞ্চল লোভাতুর একটা অধ্যায় লুকিয়ে আছে।

সেই স্যার জর্জ সোমার্স শেষ অবধি ১৬১০ খৃস্টাব্দে ভার্জিনিয়ার জেম্‌স্ টাউনে পৌঁছুলেন বারমুদার সীডার-কাঠের তৈরী জাহাজে। রেখে গেলেন দ্বীপের অভিভাবক দুই ষণ্ড ও অমর্ক! রেখে অবশ্য ইচ্ছে করে যাননি। জেম্‌স্-টাউনে গেলে যে কাপ্তেন তাদের গলায় দড়ি না ঝুলিয়ে ছাড়বে না হাড়ে-হাড়ে বুঝতে পেরেই ওরা উভয়ে জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়ে ছিলো। বেশ ছিলো, কাছাউ ধরে ধরে খেতো; মাঝে মাঝে শোর। ইতিমধ্যে সোমার্স-সাহেবও বারমুদায় ফিরবেন বলে যাত্রা করলেন। বেচারী পথেই গঙ্গালাভ করলো। তার ভাই-পোকে মরার সময়ে বললেন 'বারমুদাতেই আমার মরদেহ ভূমিজাত করবি।' তিনি তা না করে বারমুদাতে তাঁর পেট কেটে বাজে মাল এবং হৃদপিণ্ডটি পুঁতে রেখে বাকি দেহ নিয়ে ইংলন্ডে রওনা দিলেন।—

"At last his soul and body being
to part,
He here bequeathed his entrails
and his heart."

সেই ষণ্ড এবং অমর্কের সঙ্গে যোগ দিলো আরও এক পুঙ্গব। ত্রয়ানাং ধূর্ত্তানাং সমাহারঃ, এই ত্রিমূর্তি বারমুদার ত্রিমুণ্ড রাজা তখন। দিব্য রইলেন।

ফ্যাসাদ বাধলো এইবার!

দুই বন্ধু সাগরবেলায় সেদিন সন্ধ্যায় শঙ্ক খাচ্ছেন। দূরে দেখতে পেলেন কালো চকচকে কী একটা পদার্থ জোয়ারের জলে ভেসে বালিতে আটকে আছে। কাছে গিয়ে অবাক। বিশাল এক তাল এম্বারগ্রীস্। এম্বারগ্রীসের বাংলা নাম আমি জানিনে। তবে যা জানি এম্বারগ্রীসের কাছাকাছি তা গোরোচনা। কোনো কোনো জীবজন্তুর পিত্তক্ষরণের বিপরীত প্রভাব পেটের মধ্যে গোলা পাকিয়ে ওঠে একটি পদার্থ। দেখতে গভীর কালো। কিন্তু সামান্যতম মাত্রায় প্রয়োগ করলে চমৎকার সৌগন্ধ পাওয়া যায়। অতিশয় মহার্ঘ। হকিমী ও কবিরাজী ঔষধেও এর দাম আকাশজোড়া। মানুষে পায় তোলার মাপে। গরুর পেটে পেলে নাম গোরোচনা। মা-দুর্গার অভিষেক স্নানে এই মহার্ঘ বস্তুর অবশ্য প্রয়োজনীয়তা পঞ্জিকায় লিপিবন্ধ।

যা পাওয়া যায় তোলার মাপে—সমুদ্রের বালির মধ্যে তাই পাওয়া গেল এক ভীমতাল। গোরোচনার মতই তিমির পেটে এম্বারগ্রীসের তাল জমা হয়। গালার মতো; রজনের মতো এম্বারগ্রীসের শিলীভূত রূপই সুপ্রসিদ্ধ গোমেদ। এম্বারগ্রীস হাল্কা; জলে ভাসে; শিলাজতুর মতো; এ্যাল্‌কহলে ছাড়লে ভাসতে ভাসতে গলে যায়, তারের মতো রেখাপাত করে।

এক তাল এম্বারগ্রীস মানে কয়েক লক্ষ মুদ্রা। দুই বন্ধুর মাঝে এই এক তাল এম্বারগ্রীস। প্রথমে তো ওরা ঠিক করলো তৃতীয়টিকে জানানো হবে না। কিন্তু বাড়ী, অর্থাৎ ইংলন্ডে ফেরা চাই। তবেই তো দাম, টাকা। নৈলে এই দ্বীপে তো এম্বারগ্রীসও যা কচুপোড়াও তাই। দুজনে মিলে জাহাজ গড়ার পরিকল্পনা চলতে লাগলো।

বুঝলো 'কোই মতলব হ্যায়; নৈলে জেলের-চাঁদের অবকাশের খোঁজ কেন?' ইতিমধ্যে দুজনেই মনে মনে ভাবে অন্যটাকে সাবড়ে দিলেই পুরো তালটির মালিকানা একাই পাবে সে। দু-জনেই আলাদা আলাদা ভাবে তৃতীয়কে জানালো অপরটকে সাবড়ালে দ্বিতীয়টার জেল হবে না, জাহাজে ফিরে গেলে দেশে বসবাস করা যবে। ফেরার অন্তরায় ঐ অপরটি। ফলে তিনজনই তিনজনকে কোতল করার ফেরে ঘোরে। সে এক বিষম পরিস্থিতি, নাটকীয় এবং কৌতুকঠসা। ওয়াশিংটন আর্ভিংগের মজেদার নাটক আছে 'দি থ্রি কিংস্ অব্ বারমুদা!'

থাক, সে নরক থেকে পরিত্রাণ দেয় ওদের নতুন এবং জবরদস্ত গবর্নর রিচার্ড মুর। তিনি এসে তিন জনাকেই উপযুক্ত স্থানে সরিয়ে ফেলেন, এবং এম্বারগ্রীসের তালটা রাজাকে পাঠিয়ে দেন।

তারপরের গবর্নর 'টাকার'এর নামে আজও বারমুদার ইতিহাস আঁতকে ওঠে। এক টুকরো 'চীজ' চুরির অপরাধে সঙ্গে সঙ্গে ফাঁসি এই টকার-ই করেছে। তারপরে বাটলার এসে বারমুদাকে স্বস্তি দেন।

সেই থেকে বারমুদার সাজসজ্জার পত্তন। কিন্তু স্পানিশরা এই দ্বীপে এসেও বিষবৎ একে পরিত্যাগ করে গিয়েছিলো শয়তানের দ্বীপ বলে,—একথা ভুললে চলবে না। স্পানিশ-বোম্বেটে মইয়ের বাঁশে ফুঁ দিয়েও বাঁশী বাজিয়েছে, ষাঁড় দুয়েও দুধ বার করেছে। ওদের মতো সোনা-পিয়াসীরাও যাকে ত্যাগ করেছে তাকে অঙ্কশায়িনী করার হুজ্জুত বড়ো কম নয়। ত্রিশ বছর ধরে মাথার ঘাম পায়ে ফেলেও বারমুদায় কোনো ব্যবসা-বাণিজ্যই জমলো না। এখানে পানীয় জল নেই। উপনিবেশ গড়া হোলো না। আশা-ভরসার গোড়ায় ছাই ঢেলে দলে দলে ঔপনিবেশিকরা চলে যেতে লাগলো অন্যত্র। মাছ, নুন আর জাহাজ তৈরির কাঠ এই তিন মালের ওপর নির্ভর করে কিছু কিছু পরিবার রয়ে গেলো।

তখন আরম্ভ হলো ব্যবসার মতো মোটা হারে ফলাও করে 'পাইরেসী'। অর্থাৎ বোম্বেটে-গিরির কোম্পানী স্থাপিত হলো। স্বয়ং গবর্নর সেই বোম্বেটে কোম্পানীর পিঠে চড়ে মজা করেছেন, বহু লক্ষ টাকা বাগিয়েছেন। বাগাবেন না কেন? স্পানিশ রাজ্ঞী ইসাবেলা, ইংরাজ রাজ্ঞী এলিজাবেথ, কেই বা টাকা রক্তে-ভেজা বলে হাতছাড়া করেছেন। ইংরেজরা ভারি আইনভক্ত জাত!

সেই 'পাইরেসী'র যুগেই যেমন জাহাজের পর জাহাজ আটক হয়েছে, তেমন জোটানো হয়েছে ফুল। জাপানের লিউকিউ দ্বীপের প্রখ্যাত লিলিই আজকে প্রসিদ্ধ বারমুদা-ঈস্টার-লিলি নামে। এই লিলির গেঁড়ী আমেরিকার বাজারে চালান করে বারমুদার বণিক এককালে কোটী কোটী টাকা উপার্জন করেছে। আমরা যে লোকাট খাই, আসলে জাপানের মাল,—তাও বারমুদার পাচ্ছি। বোম্বেটে আর ঝড় দুই তাড়ায় পাগল জাপানী জাহাজ এই গাছের চারা সহ বারমুদায় 'আশ্রয়' পেলো, চিরকালের জন্য।

হাওয়াই থেকে জবা, মেক্সিকো থেকে পয়েনসেটিয়া, মাদাগাস্কার থেকে পয়েনসিয়ানা, জিব্রালটার থেকে বুগনভেলিয়া। বারমুদার ফুলবাগিচায় দেড় হাজার রকমের বিদেশী ফুলের বাহার সারা বছর ধরে ফোটে। একই ঋতু, বসন্ত। সারা বছর ধরেই। তবু বছরটার সদা-ঋতু ক্লান্তিতে ক্ষান্তি আনার জন্য ওরা ঋতু ভাগ করেছে তিন ভাগে। পূর্ব-বসন্ত, মধ্য-বসন্ত এবং অন্ত-বসন্ত। ফুল আর ফুল। প্রজাপতি আর প্রজাপতি, পাখী আর পাখী। পথে, ঝাড়ে, ঝোপে, পাহাড়ের গায়ে, ল্যাম্পপোস্টের চারধারে, ডাস্টবিনের চারধারে যেখানে যাও সেখানে, পোস্টাফিস, বাজার, দর্জিঘর, নাপিত-দোকান, সরকারী শৌচালয়—সর্বত্র, সর্বত্র ফুল আর ফুল। বারমুদা ফুলের রাজ্য।

তেমনি এক ফালি ফুলঘেরা রাজ্য বিমানবন্দরের ঠিক বাইরে। তার পরেই ছল-ছল-টলো-মল জল। নীল সাগরের নীল জল। পন্ডিত সোহনকে বলি, 'দেখছো কি? নেমে পড়ো জলে।'

নেমে গেলো জলে। চান সেরে উঠে কাপড় মেলে দিলো বালির ওপর।

জপ করছে। হঠাৎ বাণী শোনা গেলো কোম্পানী থেকে ব্যবস্থা করেছে আমাদের শহর দেখিয়ে আনবে। বাইশ বর্গ মাইলের দেশ। বাসে ভ্রমণ, তার আবার শহর। বোঝা গেলো বারমুদা ঘোরা যাবে।

বাস দাঁড়িয়েই ছিলো। আমরাই প্রথম যাত্রী। দেখতে দেখতে বি-ও-এ-সি বাস ভরে গেলো।

সেন্ট ডেভিড আইল্যান্ডের ওপর এয়ারপোর্ট। এতো উঁচু-নীচু কোরাল পাহাড় বারমুদায় যে বিমানবন্দর প্রায় হোতোই না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পাল্লায় পড়ে নয়কে হয় করে দুই পাহাড়ের মাথা গুঁড়িয়ে, বিপুল উদ্যমে রাশি রাশি মাটি জড়ো করে সমুদ্রের বুক ভরাট করে তবে এই বারমুদা বিমানবন্দর, যুদ্ধের সময়ে ঘাঁটি ছিলো। সেন্ট ডেভিড হোলো সপ্তদ্বীপা বারমুদার পূর্বতম বড় দ্বীপ, এর উত্তরেই সেন্ট জর্জ দ্বীপ। আর দুয়ের মাঝে এক মুঠো দ্বীপ ছড়ানো। তারই মধ্যে বড়টির নাম প্যাজেট। এয়ারপোর্ট থেকে সেন্ট জর্জ আইল্যান্ডে যাবার পুল দুটো। একটা দিয়ে গেলুম সেন্ট জর্জ শহরে। শহর তখনও ঘুমুচ্ছে। অন্যটা দিয়ে বার হয়ে ফেরী পার হলাম। হ্যামিলটনে এলাম।

আগেকার সময়ে সেন্ট জর্জই রাজধানী হলো বারমুদার। ১৯৫৭য় আমি গেছি। ১৯৫৯-এ বারমুদা তার ৩৫০তম বার্ষিকী উদ্‌যাপন করেছে খুব ঘটা করে। করবে না কেন। কোরালের জীবাণু ছাড়া বারমুদায় কোনো বাসিন্দা ছিলো না যখন ইংরেজরা পৌঁছেছে। তার আগে স্পানিশদের সময়ে কিছু আরাওয়াক ছিলো। নিরীহ জাত। মারপিট, যুদ্ধ-বিগ্রহ জানতও না; সে সবের ব্যবস্থাও ছিলো না: মনে, দেহে ভয় বলে বস্তুই ছিলো না। অস্ত্রের মধ্যে মাছের কাঁটা বা তিমির কঙ্কালের যন্ত্রাংশ, আর ছালের আঁশের সুতো, পাথরের

কোদালি, তীর-ধনুক—এই। ওদের ধরে স্পানিশরা মারলো। ৬০,০০০ মোলো। কেন মারলো? বিশ্বাস হয় না অবশ্য। স্পানিয়ার্ডদের শিকারী কুকুরদের মাংস দেবার জন্য আরাওয়াকের মাংস সেকালে প্রশস্ত খাদ্য ছিলো।

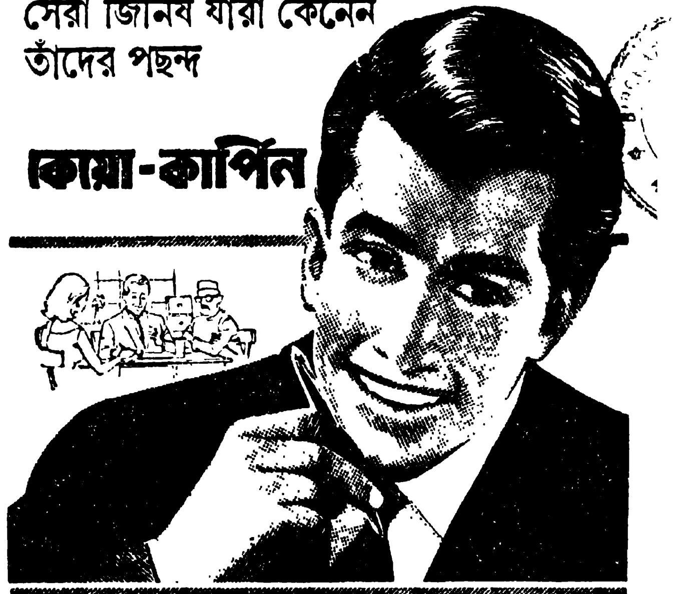
ইংরেজরা যখন দ্বীপে এলো তখন সব খাঁ-খাঁ। সেই থেকে ইংরেজরা হাতে করে গড়েছে বারমুদা, যে বারমুদায় খাবার জল নেই এক ফোঁটা; এমনকি কুয়া খুঁড়লেও জল পাওয়া যেতো না। আশ্চর্য লাগে ভাবতে আজকের বারমুদা, বারমুদানদের হাতে গড়া দেশ। হাতে-গড়া দেশ বলতে যদি সত্য কোন দেশ থাকে, তা বারমুদা। বারমুদার প্রকৃতি মানুষের দান; বারমুদার মানুষ প্রকৃতির দান নয়। তাই বলে, বারমুদা দেখতে চাও বারমুদার মানুষদের দেখো। (One can't separate Bermuda from the Bermudians)

সেই বারমুদার একটি সম্পদই মানুষকে টেনে রেখেছে; বারমুদার মনোমোহন স্নিগ্ধ আবহাওয়া,—চিরবসন্ত। বারমুদার উচ্চতম চূড়া জল থেকে ২৬০ ফুট। বারমুদার সঙ্গে তাল রেখে একই অক্ষরেখায় পাওয়া যাচ্ছে মদীরা, ক্যাসাব্লাঙ্কা, য়োকোহামা, সাউথ ক্যারোলিনা লস্ এঞ্জেলস। কিন্তু কৈ বারমুদার সেই চিরবসন্ত! যে ইকোয়েটোরিয়াল জলস্রোত মেক্সিকোর উপসাগরে পাক খেয়ে ফ্লোরিডা-চ্যানেল ধরে হু হু করে বয়ে যায় প্রীতি-উপসত্তীর্ণ প্রাণ-প্রবাহ শীত-জর্জর য়োরোপের বুকে তাকে শস্য-শ্যামলা করে দিচ্ছে, সেই সুপ্রসিদ্ধ 'গলফ্-স্ট্রীম' এর খরস্রোতা মধ্যপথে এই বারমুদা। সেই প্রাণ-উত্তপ্ত জলপ্রবাহ প্রথম আঘাত খায় বারমুদার পশ্চিমপ্রান্তে। তাই এখানে কেরালের এই উপনিবেশ। তাই এখানকার প্রাচীন বাসিন্দা আরাওয়াকেরা শ্রম, কায়িক শ্রম কাকে বলে জানতো না। প্যারাডাইজ? স্বর্গ? নন্দনকানন? কল্পবৃক্ষ? নিরাবরণ-নিরাভরণ দেহ? —এই হলো বারমুদা।

য়ুরোপ এলো; পাদ্রী এলো; (অতি-)সভ্যতা এলো। শয়তানের লেজের ঝাপটে স্বর্গচ্যুত হোলো সেই আরাওয়াকরা; মরে গেলো। বারমুদায় শয়তানের স্বর্গ নেমে এলো। আজ বারমুদায় প্রায় প্রতি ঘরে 'অতিথি' থাকে, প্রতি গ্রামে, শহরে, পাহাড়তলিতে, ঘুমন্ত দ্বীপে পর-পর নিশীথ-বাসর সাজানো; নাচো, গাও, মদিরায় বিভোল হয়ে থাকো; বিদেশ থেকে রাশি রাশি টাকা এনে দু-চার-দশ রাতে বারমুদাকে দিয়ে যাও। 'অতিথি পরিচর্যা'-ই বর্তমান বারমুদার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। প্রচুর আয় এই থেকেই। এই জাতীয় সম্পদ, কালচার, বাণিজ্য, রুজি-রুচি-কলা, শিল্প, অধ্যাত্ম, আঙ্গিক।

সেন্ট জর্জের বসতির বৈশিষ্ট্য যে এংলো-সেক্সন আমল থেকে অদ্যাবধি এক নগড়ে এ শহরের স্থাপত্য ও নগরশিল্প অব্যাহত ভাবে সংরক্ষিত। হ্যামিলটন-শহরই বর্তমান বারমুদার রাজধানী। আগে ছিলো সেন্ট জর্জ। শহরটায় প্রাচীন দেয়াল ঘেরা। এখন এই প্রাচীনতার দৌলতেই সেন্ট জর্জের দৌলত। শহরবাসীরা কী করে এই ঐতিহাসিক প্রাচীনতাকে কাল-স্রোতের বাইরে রেখে দিয়ে জীবন্ত একটি মিউজিয়াম রক্ষা করবে, এই চেষ্টায় ব্যস্ত। রাস্তাগুলো ছোটো ছোটো, সরু সরু, আঁকাবাঁকা, মুসৌরীর পথের মতো, সেকালের ছোটো সিমলার পথের মতো। বাড়ী-ঘর সব টোপর পরা টালি। পাথরের দেয়াল। কাঠে-পাথরে গড়া বারান্দা মাঝে মাঝে পথের ওপর ঝুঁকে আছে—ফুলের লতায় ঢাকা। ঘোড়ার গাড়ী ঢিমে তালে চলে। পথে বিদ্যুতের আলো বটে কিন্তু ঢিম-আলো, এবং বাতিদানগুলো সেকালের মতো চৌকো কাঁচের শার্সী দেওয়া; মাঝে মাঝে আংটায় ঝুলেনো। পথে ঘণ্টি বাজিয়ে 'টাউন ক্রায়ার', সময় বলে যায়। মাঝে মাঝে পেটা ঘণ্টা বাজে। সিনেমা হাউসগুলোও যতটা সম্ভব এলিজাবেথীয় প্রমোদশালার আঙ্গিকে ব্যবস্থিত। সবচেয়ে বাহার লাগে পথঘাটের নামে;—ওয়ানগানএ্যালী, বুকেড এ্যালী, ওল্ড মেডস লেন। পথের মাঝে পুলিশ থানা। তাতে পিলোরী। সেকালে সাজা দিতো ডুডুম ঠোকা, বাঁশগাড়ী বরা। তেমনি। একখানা কাঠে খাঁজ কেটে হাত-পা ঢুকিয়ে গলাটা অন্য কাঠে গলিয়ে বসে থাকার ব্যবস্থা। আজকাল তার ব্যবহার নেই অবশ্য। কিন্তু বহু রসিকা পতিদেবকে উক্ত অবস্থায় বাঁধিয়ে দিয়ে মনোরঞ্জক ছবি নিচ্ছেন। ইয়র্ক স্ট্রীট, সেন্ট জর্জের এসপ্লানেড-হগ্ মার্কেট পাড়া। কাছেই বিখ্যাত গির্জা। এই নতুন দেশের অর্থাৎ অতলান্তিকের পশ্চিমে এ্যাংলিকান চার্চের মধ্যে প্রাচীনতম। ১৬৮৪-তে রাজা তৃতীয় উইলিয়াম এই গির্জাকে রূপোর বাতিদান দিয়েছিলেন। আজও তার ব্যবহার হয়। তবুও এরা নাকি পৌত্তলিক নয়।

গির্জা মরুকগে যাক্, সে পরোয়া নেই; কিন্তু গির্জার বাইরে ফুলের বাজার। ঠেলাগাড়ীতে থরে থরে সাজানো ঝকঝকে রোদের ঝকমকে ফুল দেখলেই মনে হয় কিনি। কিন্তু এক দেশের ফুল অন্য দেশে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে নানা আন্তর্জাতিক বিঘ্ন পাড় তুলে অপেক্ষা করে। অতঃপর দেখা গেলো বারমুদার রাজধানী খানাঘর, গেলাব হোটেল, একালের সর্বোচ্চের প্রমাণ ছিলো।



কেয়োকার্পিন তেলে চুলে আঠা হয়না—মাথা ঠাণ্ডা রাখে আর চুলও পরিপাটি থাকে। কেয়োকার্পিন নিষ্প্রভ চুলেও স্বাস্থ্য ও উজ্জ্বলতা এনে দেয়,—আর এর গন্ধটিও সত্যি মনোরম। কেয়োকার্পিন আপনার চাই-ই; আজই কিনে ফেলুন।

কেয়ো-কার্পিন
একটি বিশিষ্ট কেশ তৈল



দে'জ মেডিকেল ষ্টোর্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা · বোম্বাই · দিল্লী · মাদ্রাজ · পাটনা · গৌহাটী
কটক · কানপুর · জব্বলপুর · সেকেন্দ্রাবাদ · আম্বালা · ইন্দোর

একটি বাড়ীর পাশে বাস দাঁড়ালো : "টাকার-হাউস্"। ১৬১৬-র সেই দানব দানিয়েল টাকার। আমেরিকা থেকে পালিয়ে এসেছিলো নাপিত দাস J. H Rainey. সে-ই হলো বারমুদার হাউস্ অব রেপ্রেজেন-টেটিভের প্রথম নিগ্রো সদস্য। তার বাসস্থান ছিলো এই টাকার হাউসেই। সাজানো বাড়ী-খানায় যতোটা পেরেছে সেকালের গন্ধ-বর্ণ-স্বাদ এনেছে, পর্যটকদের চোখ চমকে দিতে, যেমনটা আছে জেনেভা হ্রদে শিলোন-কাসল্। এই নাপিত সদস্যের নামেই বারবার্স ট্রালী।

নাম ছিলো ডিউক অব কাম্বারল্যান্ড লেন; হয়ে গেছে ওলড মেড্স লেন। এখানে ছিলেন কবি টমাস মুর। প্রতিবেশীর চারুকল্পা স্ত্রীর প্রতি প্রণয়ে প্রণয়ে গদ্‌গদ্‌ হয়ে তাঁর প্রসিদ্ধ Odes to Nea লেখেন। প্রণয়ের ভৌতামির জ্বালায় তিতি-বিরক্ত কবি রেজিস্ট্রার অব দি কোর্ট অব ভাইস এ্যাডমিরাল্টির পদ পরিত্যাগ করে বাইরে যান ঘুরতে। কোন এক বন্ধুকে দিয়ে যান বাড়ীর খবরদারির ভার দিতে। কবির মাল পাচার করে কবিকে ফাঁক করে তিনি কেটে পড়েন; কবি ঋণের জালে জড়িয়ে হাবুডুবু!...আজ আছে টম্-মুরের ট্যাভার্ণ! সেখানে বসে এক গ্লাস সীডার সেবন করা বিশ্বনাথের চরণামৃত খাবার মতো অবশ্য-পালনীয় বিধি। টম-মুরের বোদা-প্রণয়ের বোদাতর 'গপ্পো' গিলতে গিলতে সীডার পান করুন। কোণে একজন ভিখিরী সেজে পিড়িং পিড়িং গীটার বাজাচ্ছে আর গাইছে—

When he, who adores thee, has left but
the name,
Of his faults and his sorrow's behind,
Oh say will thou weep, when they
darken the fame
Of a life that for thee was resigned?

আজ কবি টমাস-মুরের নামে সবাই ঢেল ছোড়ে। এই কবিই নিজের গান নিজে গাইতেন। উচ্ছ্বসিত জনতা বলতো 'জীনিয়াস। কবি বলতে, "মিস্টার শেলী, যাই বলো, ভালো লেখেন; আমার চেয়ে তো নিশ্চয়ই।" লোকে বলতো, "আইরিশ কবি কিনা : ভারী বিনয়ী।" কিন্তু আমার মনে গুন-গুন করে টমাস-মুরের লাল্লা রুখ। কাশ্মীরের লাল্লা দীদের গল্প শুনে মুর এক লম্বা কাহিনী লিখে যান। গুন-গুন করে সেই মুক্তাধারার মতো স্বচ্ছ, নির্মল, জীবন-বিলাপ—

Oft in the stilles might
Ere slumber's chain has
bound me,
Sad memory brings the light of
other days around me

এ কবিতার অনুবাদ বাংলায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ করেছেন বলে মনে পড়ছে। ঠিক এখন স্মরণে আসছে না। কিন্তু কী কবিতা! সেই টম্ মুর!

বাস চলেছে হ্যারিংটন সাউন্ডের ধার ধরে। সারি সারি নানা রংয়ের নৌকো। সৌখীন পর্যটকদের আরামের উপচার। সকাল সকালই ছেলে-মেয়েরা সাঁতার কাটছে নীল জলে। বড়ো বড়ো ছাতার তলায় কফি, চা, স্যান্ডউইচ,—রাশি রাশি বীয়ারের বোতল। শুনলাম এক ঘন্টার নৌকোর ভাড়া সাড়ে তিন থেকে চার ডলার।

হ্যারিংটন সাউন্ড যেন মস্ত একটা পুকুর। চারধারে জমি। জায়গাটার নাম হ্যামিলটন। সত্যি কথা বলতে কি সারা বারমুদাটাই হ্যামিলটন। যেখানে যাই হ্যামিলটন জুয়েলার্স, হ্যামিলটন ব্রুয়ারী, হ্যামিলটন স্টোর্স। টেলিফোনের পাতায় হ্যামিলটনস তিন-পাতা। এরা নাকি বার-মুদার প্রাচীনতম বণিক গোষ্ঠী, অভিজাত বারমুদান। প্রাচীন অভিজাতরাই বারমুদার সম্পদ, বাণিজ্য দপ্তর, হুকুমৎ করতলগত করে রেখেছে। গরীব আছে অবশ্যই বারমুদাতে। তাদের খাতিও অপরিসীম। তাদের বলা হয়, প্রম্পরাস পুওর। তা বটে! গরীব সে গরীবের একখানা বাড়ী আছে। থাকবে না কেন! বারমুদায় বাড়ী আপসে হয়ে যায়। পাথর কাটো। কোবালের ফাঁপা শাদা, ঘষে, হাল্কা গোলাবী, ঝিনুকের পেটের লালের রং—পাথর। ইঁটের চেয়ে বড়ো করে কাটো। সাজাও। সীডারের কড়ি-বরগা লাগাও। আবার পাথর। দেয়াল, মেঝে, ছাদ,—সব ঐ পাথর। যেখানেই জমি সেখানেই পাথর। কাটবার সময়ে বুঝে-সমঝে কাটলে বাগান, সিঁড়ি, দালান বারান্দা সব হবে। আর গোলো "জল-ঘর" যা বারমুদার অবশ্য করণীয় একটি ঘর।

বলেছি তো বারমুদার পানীয় জল পৃথিবীর বুকে ওঠেনা না। আকাশ থেকে ওগড়ায়। সেই আকাশের জল ধরে রাখার জন্য প্রত্যেক বাড়ীতে একটি ঘর থাকবে, জল-ঘর। সারা ছাত, বারান্দা সব চমৎকার চুনকাম করা। বারবার চুনকাম করতে হবে। সেই চুনের স্পর্শ লেগে পরিষ্কার জল গিয়ে জমা হয়ে থাকবে জলঘরে। সেই জল পান, পাক এবং আর যা হয়,—স্নান নয়। স্নান ঐ স্নিগ্ধ, শান্ত কোমল সমুদ্রের বুকে।

বারমুদায় ভোট দেবার আইন এমন মজাদারীর কৌশলে কর্বলিত যে প্রত্যেকটি বিভাগ থেকেই ঐ হ্যামিলটনেরা, বা তারই পরিবারভুক্তেরাই গণ-ভোটে দরবারে ঠাঁই পায়। সেকালের সামন্ত-প্রথা গণ-প্রথায় অন্যত্র কুপোকাৎ হলেও গণভোটকে কলা দেখিয়ে আজও বারমুদা সামন্ত যুগেই আছে। তবে একথা সত্য বারমুদায় তোফা আরামে সবাই আছে। পথে পথে যারা মোটর ফটফট করা সাইকেল চালিয়ে দুধ, ফল, মাংস, খবরের কাগজ সরবরাহ করছে, তারাও আছে তোফা আরামে।

ফুর্তির নমুনা চাই —না মদ নয়, নাইট ক্লাব নয়, জুয়ার ফাঁড়ি নয়। ও ফুর্তি সর্বত্র আছে। ও দিয়ে বারমুদার মানুষের ফুর্তির পাত্তা পাওয়া যায় না। সে পাত্তা লাগিয়ে যা দেখেছি, বলবো, কিন্তু লোকে বলবে মিথ্যাবাদী,—যেমন বলেছিলো সেকালে মার্কোপোলোকে। "গাছে পশম হয় চীন দেশে" বলেছিলো মার্কোপোলো। তুলো বোঝাতে গিয়ে বলেছিলো বেচারী। ধাস্, আর যায় কোথা। ধুনে দিয়েছিলো মার্কোকে। আমি মার্কোর নাম করেই কথাটা বলবো। ধোনার যা যাদুধনেরা ধুনবেন। হক্কের কথা এই যে বারমুদার ফুর্তি মানে বারমুদার কোনো লোক কোনোকালে কোনো খাদ্য 'প্রয়োজন' বলে আজায় না, অর্থাৎ উৎপাদন করে না। বিস্ময় যদি গোঁফ জুল্‌ফি খাড়া হয়, পানামা ব্লেড ব্যবহার করুন, কিন্তু ওরা কিসসু বলতে কিসসু উৎপাদন করে না। অবশ্য ন্যাকা-মস্-মিসেস্‌দের কিচেন-গার্ডেনের সামস্যের ফাঁড়া বারমুদীয় স্বামীদের পেয়াতে হয় না এমন বাবা কুড়াক : অমন সখের বাগান পারেন। কিন্তু চাষবাস, ক্ষেত-খামার? তাই যদি করতে হবে, ফুল হবে কোথায়? খাদ্য বড়ো না ফুল বড়ো? ক্যানাডা আমেরিকা থেকে টিনের [illegible] আসবে। টকা বাগাও। কেঁচো দিয়ে মাছ ধরো; ঐ ডলার দিয়ে আমেরিকার খবর কেনো, খাও। এমন কি যে, বারমুদার চারিধারের সমুদ্রে আগাপাশতলা কেবল মাছ আর মাছ,—সেখানেও ওদের দেশে মৎস্যজীবী নেই। মাছ ওরা আমদানি করে কানাডা আর আমেরিকা থেকে। সৌখিন মাছ ধরার জন্য যন্ত্রপাতির তোফা তোফা দোকান আছে হ্যামিলটনের

ওদের সব কাছাকাছি [illegible] হ্যামিলটন। বারমুদার রাজধানী। হ্যামিলটনের সোজা দক্ষিণে গ্রেট সাউন্ড পার হলে [illegible], আর সোজা পশ্চিমে [illegible] দ্বীপ।

হ্যামিলটন পার দিয়ে [illegible] ধরে ধরে বাস চলে গেলো [illegible] এর শেষ সীমা পর্যন্ত। ফিরে যখন হ্যামিলটন এলাম তখন [illegible] হলো। বেলা দশটা পেরিয়েছে।

ফ্রন্ট স্ট্রীটের ওপারে আমেরিকান হাউস। [illegible] লাইব্রেরি। তাই [illegible] বাগানে সার সারি টেবিল পাতা। আমাদের [illegible] গিয়ে বসা, [illegible] করা যাবে। বাস্। [illegible] কোম্পানীর। [illegible] আমি একপাক ঘুরবো বলে [illegible] পাড়ি। চার্চ স্ট্রীটটা পাশেই। ক্যাথিড্রালটা দেখে সীডার এ্যাভেনিউ দিয়ে বারমুদার বিখ্যাত পার্কটায় ঘুরতে লাগলাম। মনে মনে ভয় বাস না ছেড়ে যায়। হঠাৎ বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি এগিয়ে এসে বললেন, "মনে হচ্ছে বি-ও-এ-সি'র যাত্রী! আপনার সঙ্গে সেই পাগড়ী-পরা শ্রদ্ধেয় পুরুষটি কোথায়?"

বয়স সত্তর পার হয়ে গেছে। তীক্ষ্ণ নাক ঝুলে পড়েছে। শাদা ভ্রূ প্রায় চোখের ওপরে এসে পড়লেও চোখের তারার দীপ্তিতে যথেষ্ট বুদ্ধি এবং সাফল্য। কথায় ওজনে এবং ব্যবহারে সংযম ও শালীনতা। আগাগোড়া লোকটা কী সৌষ্ঠবে, কী পরিচ্ছদে অভিজাত-ব্যবহার সমুজ্জ্বল।

(ক্রমশঃ)

পাঠকের বৈঠক

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

মধ্যযুগীয় প্রেমকথা

মধ্যযুগীয় জগৎ সম্পর্কে স্বপ্নলোকের মত একটা আকর্ষণ আছে আমাদের মনে। গথিক ক্যাথিড্রাল আর রোমান্সভরা প্রেম-কথা আমাদের মনকে যে কল্পলোকে নিয়ে যায়, তেমনটি আর কোন বস্তু পারে না। মানব মনে স্বপ্নবিলাস একটা স্বভাবিক প্রবণতা, স্বপ্নের বেশ নিয়েই মানুষ তার দিনযাপনের গ্লানিকে অতিসহজে অতিক্রম করতে পারে। এই মধ্যযুগীয় প্রেমকথার গভীরে প্রবেশ করার মোহ কিংবা তাকে ছাড়িয়ে আরো আরো দূরে যাওয়ার প্রচেষ্টা অন্তহীন এবং নিরর্থক।

আমাদের মধ্যে যাঁদের কবিয়ানার প্রবণতা অপেক্ষাকৃত কম এবং যাঁরা নীড়ের সঙ্গে বাঁধা তাদের মধ্যে প্রবলতর আগ্রহ থাকে সেই অতীতকে পুনর্গঠিত করার, অনেকটা কীটস যেমনটি একদা করেছিলেন অতীতকে কল্পসুখময় ও সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ করে অর্ঘ্য রচনা করে।

এ সবই নীতিবাদীর মতে হয়ত ভ্রান্ত, হয়ত শূন্যগর্ভ, কিন্তু এই মোহ বস্তুতে নয়। যে সব মানুষ গির্জা নির্মাণ করেছেন এবং গদ্যছন্দে কাহিনী ও গাথা রচনা করেছেন তাঁরা অপরিচয়ের অন্ধকারে হারিয়ে গেছেন, তাঁদের নাম অজ্ঞাত, কিন্তু তাঁদের রচনা কালজয়ী হয়ে আজও স্মরণীয়। চিরদিনই এমনটি থাকবে, পাঠকের কাছে যা ভালো লাগে তা এর অনাড়ম্বর ভঙ্গী ও অলংকারবিবর্জিত সহজ সরল পরিবেশন রীতি। এই নিরাভরণ কাহিনী বলার রীতি সাধারণ পাঠকচিত্তকে সহজে জয় করে নেয়।

'ত্রিস্ত্রান ও আইসলডে', 'অকেসিন ও নিকোলেট', 'এরিক ও এনিডে' প্রভৃতি প্রেম-কথায় আছে মানবিক প্রেমের কাহিনী আর 'সেন্ট এলেক্সিসের কাহিনী' কিংবা 'হোলি গ্রেলের কাহিনীতে আছে দিব্যজীবনের প্রেমকাহিনী। এই বিচিত্র প্রেমকথা কার মনকে না আকুল করে তোলে, অপরূপ প্রেম-মাধুরী কার হৃদয় ও মনকে না সহজে উতলা করে।

নর্মা লেরে গুডরিচ এই সব প্রেমকথার কয়েকটি আধুনিক কালের উপযোগী ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করেছেন। THE WAYS OF LOVE এই নামে এবং গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন বিখ্যাত প্রকাশক জর্জ অ্যালেন অ্যান্ড আনউইন কোম্পানী।

একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে কোন অনুবাদকই মূল পদ্যছন্দকে অনুবাদের মাধ্যমে সঞ্জীবিত করতে পারেন না, আর পদ্যছন্দও কথ্যভাষায় অনেকখানি মনোহারিত্ব অপহরণ করে।

এই সব কাহিনীর প্রায় সবগুলিই মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে এসেছে দীর্ঘকাল ধরে। জীবনের গতি যখন মন্দাক্রান্তা তালে চলত, সেই অবসরবহুল কালে অনেক সন্ধ্যায় অগ্নিকুন্ডের পাশে বসে শীতের রজনীতে উৎকণ্ঠ-আগ্রহে শ্রোতারা এই সব কাহিনীর আবৃত্তি শুনেছেন।

মধ্যযুগের এই সরলতাপূর্ণ অনাড়ম্বর রোমান্সগুলির গভীরে প্রবেশ করতে হলে একালের কেতাদুরস্ত সমাজের মনোভঙ্গী অনেকখানি বিসর্জন দিতে হবে। এবং ভদ্র এবং সরল মন নিয়ে তা গ্রহণ করতে হবে। সেই সঙ্গে একথাও ভুলতে হবে যে, আমরা একটা নিদারুণ উৎকণ্ঠ ও উদ্বেগপূর্ণ কালের মধ্য দিয়ে জীবনকে টেনে নিয়ে চলেছি। এই সব কাহিনীর যে সব পাত্রপাত্রী তাদের সকলেই আমাদের অপরিচিত এবং অনেক দূরের কালের মানুষ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আধুনিক যুগের মানুষের সঙ্গে তাদের পার্থক্য খুব বেশী নয়।

আধুনিক মানষ যে যন্ত্রণার শিকার তারাও সেই একই যন্ত্রণার জ্বালায় জ্বলছে, তবে তাদের পদ্ধতি ও প্রকরণ হয়ত বিংশ শতাব্দীর মানষের মত ছিল না।

সেই সুদূর কালেও মানুষের প্রেমই মানুষকে আকুল করে তুলেছে, দুটি আকুল নরনারীর হৃদয়ের মিলনকামনার তীব্র আবেগ মানব মনকে উৎপীড়িত করেছে। এই যে প্রেম অভিব্যক্তি তার মধ্যে আছে কিছু পরিমাণে তাৎক্ষণিকত্ব এবং তাৎক্ষণিক অভিব্যক্তিই আমাদের হৃদয়কে অতি সহজে স্পর্শ করে।

মধ্যযুগীয় কাল অবশ্য আমাদের কালের চেয়ে অনেক বেশী ধর্মপরায়ণ ছিল। তাই দিব্যজীবনের প্রেমও সেকালের মানুষের কাছে সুদূরের বস্তু মাত্র ছিল না, যেমনটি আমাদের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে মনে হতে পারে। এই সব কাহিনী প্রকৃত মানবিক পটভূমির বাইরে উপকথার ভঙ্গীতে বর্ণিত। তার মধ্যে ছড়ানো আছে পুরাণ প্রসঙ্গ এবং পৌরাণিক পদার্থ, যেমনটি পাওয়া যায় সেন্ট এলেক্সিসের বা রোমান্স অব দি হোলি গ্রেলের কাহিনীতে।

রোমান্সের একটি আবশ্যিক উপাদান যা সেটা সমকালের বা নিকটের বস্তু নয়। নৈকট্য অনেকখানি মাধুর্য অপহরণ করে নেয়, আর এই মাধুরীটুকুই যে কোনো রোমান্সের প্রাণবস্তু। সব কাহিনীই সুদূর অতীতের পটভূমিতে রচিত। মানুষ তখন সুপুরুষ, বীর্যবান এবং বীরত্বে পরিপূর্ণ ছিল, আর মেয়েরা ছিল পরমা সুন্দরী।

সেন্ট এলেক্সিসের কাহিনীর লেখকের অতীত সম্পর্কে যা বক্তব্য তা সকল কালের কাহিনীকারদের সম্পর্কে প্রযোজ্য—

> "In the days of the ancients the age was good for then there were faith, Justice and love; there was also belief of which there is hardly any left now; it is all changed now—it has lost its colour; it will never again be as it was in the days of ancients."

যে সব কাহিনী কালের ব্যবধানে জীর্ণ হয়ে পড়ে নি এবং এদিনের পাঠকের চিত্তে সাড়া জাগাবে তা হল ত্রিস্ত্রান ও আইসল্ডের কাহিনী এবং অকেসিন ও নিকোলেট প্রেমকথা। কাল এই কাহিনীকে স্পর্শ করতে পারে নি। নতুন প্রেরণা সন্ধানে লেখকরা সর্বকালে সেদিকেই তাকিয়েছেন। সেই কাহিনীই কল্পনার মনোহারিত্বে একালের লেখককেও সঞ্জীবিত করেছে। এই দুটি কাহিনীর পূর্ণাঙ্গ পরিবেশন অধিকতর উপভোগ্য হত, অনুবাদে কাহিনীর অংশবিশেষ পাওয়া যায়, অবশ্য তার মুখ্য অংশটুকুই আছে।

ত্রিস্ত্রান কাহিনীর মধ্যে আছে ব্যভিচারী প্রেমকাহিনী, এর জন্য আছে কৈফিয়ৎ এবং বিশ্লেষণ, কিন্তু তার ফলে কাহিনীর রসবস্তুর হানি ঘটে নি, বা কাহিনীর আবেদন ক্ষুণ্ণ হয় নি। মধ্যযুগীয় যে কবি এই কাহিনী বিধৃত করেছেন তিনি নিজেই সম্মোহিত হয়েছেন কাহিনীর গভীরতায় আবার স্থানে স্থানে তার অনীহার প্রকাশও লক্ষ্য করা যায়। যে ধর্মে লেখক বিশ্বাসী তারই অনুজ্ঞানুসারে এই জাতীয় প্রেম নিষিদ্ধ এবং গর্হিত, কিন্তু প্রেমিক সুগভীর প্রেমনিষ্ঠা সর্বকিছু বিধি-নিষেধ ধুয়ে-মুছে নিয়ে যায়, লেখক সেখানে নিরুপায়।

সম্রাট মার্কের প্রাসাদ থেকে লাফিয়ে ত্রিস্ত্রান ও আইসলডে যখন গহন অরণ্যে প্রবেশ করেছেন সেই ক্ষণে দর্শন মিলল সাধুপ্রবর ব্রাদার অগরিণের সঙ্গে। তিনি

অনুশাসন বিষয়ে তাঁদের সতর্ক করে অনুতাপের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব দান করায় ত্রিস্তান বলে ওঠে—

"Sir, I love Isolde marvellously much, so much that I neither sleep nor slumber. My advisement has been made from for ever. I should prefer to be a beggar as I now am and live upon grasses and acorns than possess the wealth of Saracen kingdom. Do not ask me to speak of leaving her, for to that I can not."

এর পর আইসলডে সন্ন্যাসীপ্রবরকে অনুরোধ জানায়—

Sir, by almighty God, he does not love me and I do not love him except because of that brew that I drank and he drank. There was our sin"

কবি বলতে চান যে প্রেমের বশবর্তী পান করে দুজনে এইভাবে প্রেমের ফাঁদে পড়েছে তাই তাঁদের মনে পাপ বা অনুতাপ কিছুই নেই।

কাহিনীগুলি বার বার পড়ার মতো মনোরম ভঙ্গীতে বলা হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত গ্রন্থ সুবোধ ঘোষ রচিত 'ভারত প্রেমকথা' এই সূত্রে স্মরণীয়। এই গ্রন্থটি পাঠ করে মনে হয় সুবোধ ঘোষ প্রণীত গ্রন্থটির ইংরাজী অনুবাদ হওয়া প্রয়োজন।

—অভয়ংকর

THE WAYS OF LOVE : By NORMA LORRE GOOD RICH Published by Messrs: George Allen & Unwin Price — 28 Shillings only.

ভারতীয় সাহিত্য

মার্কিন গ্রন্থ প্রদর্শনী ॥

ইউ এস আই এস-এর কালকাতা অফিসের ডিরেক্টর মিঃ ডানকান স্কট গত ২১শে নভেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় স্কুল অব প্রিন্টিং টেকনোলজিতে উৎকৃষ্ট মুদ্রণ, বাঁধাই ও ডিজাইনের নিদর্শন সম্বলিত মার্কিন গ্রন্থের একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এইচ সি গুহ সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানের পর স্কুল অব প্রিন্টিং-এর ব্যবস্থাদি ঘুরে দেখান হয়। প্রদর্শনী ২৮শে নভেম্বর পর্যন্ত রোজ সন্ধ্যে সাড়ে চারটা থেকে রাত্রি সাড়ে সাতটা পর্যন্ত খোলা ছিল।

নানা বিষয়ের গ্রন্থ প্রদর্শনীতে স্থান পায়। প্রত্যেকটি পুস্তকের মধ্যেই ব্যবহৃত কাগজ, টাইপ, ডিজাইন, চিত্রায়ণ ও বাঁধাইয়ের দিক থেকে বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। আমেরিকান ইনস্টিটিউট অব গ্রাফিক আর্টস এবং অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকান ইউনিভার্সিটি প্রেসেস এই এই পুস্তকগুলি নির্বাচন করেন। যতদূর জানা যায়, কোন বার্ষিক প্রতিযোগিতায় এগুলির চেয়ে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আর পাঠান হয় নি।

তেলুগু লেখক সভা ॥

মাদ্রাজের তেলুগু লেখক সংস্থা "সরস"-এর উদ্যোগে সম্প্রতি মাদ্রাজে তেলুগু লেখকদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল ডঃ ব গোপাল রেড্ডি। সম্মেলনে পৌরোহিত্য করেন, মাদ্রাজের প্রাক্তন বিচারপতি ও সংস্থার সভাপতি ডঃ পি ভি রাজমন্নার। সমকালীন তেলুগু সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন শ্রী কে কুটুম্বরাও, শ্রী পি পদ্মরাজু, শ্রী জি বালসুন্দররাও, "অরুদ্র" এবং আচার্য আত্রেয় প্রমুখ প্রখ্যাত তেলুগু লেখকরা। এই সম্মেলনের অন্যতম একটা আকর্ষণ হল এই যে, এতে যে সমস্ত রচনা পাঠ করা হয় তা সংকলন করে একটি গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অন্ধ্র প্রদেশ সাহিত্য আকাদমি ॥

অন্ধ্রপ্রদেশ সাহিত্য আকাদমি একটি নাটক প্রতিযোগিতা আহ্বান করেছেন। নাটকটি উর্দু ভাষায় এবং গালিবের জীবন নিয়ে রচিত হতে হবে। এই প্রতিযোগিতায়



কলকাতা থেকে প্রকাশিত গুজরাটি সাপ্তাহিক 'নওরোজ'-এর সুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসবে ভাষণ দিচ্ছেন 'অমৃত' ও 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিতেন্দ্র দেশাই (মাঝখানে), উৎসব কমিটির সভাপতি ভার, বি, শা এবং 'নওরোজে'র সম্পাদক শ্রীকাপা (সর্বদক্ষিণে), শ্রীমতী কাপা ও অন্যান্যদের দেখা যাচ্ছে।

যিনি প্রথম স্থান অধিকার করবেন, তাঁকে ১,১১৬ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। যে কোন ভারতীয় নাট্যকারই এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে পারবেন। যাঁরা পাণ্ডুলিপি জমা দিতে চান, তাঁদের ২ কপি করে জমা দিতে হবে। নাটকটি কমপক্ষে তিন থেকে পাঁচ অংকের মধ্যে হতে হবে। যাঁরা অংশ গ্রহণ করতে চান, তাঁদের সম্পাদক, অন্ধ্র সাহিত্য একাদেমি, কলাভবন, সৈফাবাদ, হায়দ্রাবাদ—৩ এই ঠিকানায় যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

প্রাচ্যবাণীর দিল্লী শাখার অধিবেশন ॥

'প্রাচ্যবাণী'র দিল্লি শাখার বার্ষিক অধিবেশন সম্প্রতি দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সংস্থাটি প্রাচ্যবিদ্যা শিক্ষার কেন্দ্র এবং পরলোকগত ডঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী এর প্রতিষ্ঠাতা। এবারের সম্মেলনে যাঁরা বিভিন্ন আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে আছেন ডঃ রমা চৌধুরী, স্বামী স্বাহানন্দ, ডঃ সরোজিনী মহিশী, ডঃ কে ডি ভরদ্বাজ, শ্রীভি জি রামচন্দ্রন ও শ্রীরতীশ ভট্টাচার্য। এবারের অধিবেশনটি খুবই সাফল্য লাভ করে।

পুস্তক প্রকাশন সম্বন্ধে আলোচনা সভা ॥

ভারতের বিভিন্ন ভাষায় অজস্র গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। কিন্তু এখনও পুস্তকের প্রকাশন শিল্প অন্যান্য প্রগতিশীল দেশের চেয়ে অনেক পেছনে পড়ে আছে। তাছাড়াও এ ব্যাপারে সমগ্র ভারতে কোন বিশেষ ধারা প্রবর্তিত নেই। এই সব অসুবিধা সম্বন্ধে আলোচনার জন্য গত মাসে হায়দরাবাদের সাতদিনব্যাপী একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় ৭০ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন। প্রতিনিধিদের মধ্যে লেখক, প্রকাশক ও মুদ্রকরা ছিলেন।

ব্রাজিলে রবীন্দ্র-স্মরণ সভা ॥

গত ৭ আগস্ট ব্রাজিলের রিয়ো-ডি-জেনারেতে ভারতীয় দূতাবাসে রবীন্দ্র-স্মরণ দিবস উদ্‌যাপিত হয়। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন 'ফেডারেল বিশ্ববিদ্যালয়ের' রেক্টর অধ্যাপক মুনিজ ডি আরাগাও। অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের কবিতার আবৃত্তি করেন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীআচার্য এবং কবি শ্রীমতী রিকার্ডিনা ইয়োন। অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তারূপে উপস্থিত ছিলেন 'ব্রাজিলিয়ান আকাদমীর' সভাপতি অধ্যাপক অস্ট্রেগেসিলো আথ্যাডে। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন—"রবীন্দ্রনাথ আমাদের সমকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী। তিনি তাঁর কবিতার শৈল্পিক প্রবচনের মাধ্যমে মানুষের সামগ্রিক মানসিকতার অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটিয়েছেন।" ভারতের বাইরে এই ধরনের অনুষ্ঠান সত্যই অভিনব।

গান্ধীজীর শতবর্ষে ॥

১৯৬৯ সালে মহাত্মা গান্ধীর জন্ম শতবর্ষ উৎসব উদ্‌যাপিত হবে। "সাহিত্য আকাদমি"-এর মধ্যে এই উৎসব উপলক্ষে জন্য কয়েকটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। তার মধ্যে একটি হল গান্ধীজীর রচনা বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থা।

গান্ধীজীর রচনা থেকে এরই মধ্যে এঁরা একটি নির্বাচিত সংকলন প্রকাশ করেছেন। গ্রন্থটির নাম "[illegible]"। এই গ্রন্থটির একটি [illegible] ভূমিকা লিখেছেন ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন [illegible] সাহিত্য [illegible] বিভিন্ন [illegible] এবং [illegible] গ্রন্থটি অনূদিত [illegible]

বিশ্ব তামিল সম্মেলন ॥

[illegible]

[illegible] সম্মেলনের [illegible] রাষ্ট্রপতি ডঃ [illegible]



সাগার অন্তরালের কাহিনী ॥

বিখ্যাত সাগা সিরিজের স্রষ্টা উপন্যাসিক জন গলসওয়ার্দির কর্মজীবনের কথা পাঠকরা পড়েছেন। এই রচনার অন্তরালের কাহিনী পাঠকদের কাছে খুবই কৌতূহলোদ্দীপক হবে মনে হয়। জন গলসওয়ার্দির জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে পেংগুইন গলসওয়ার্দির উপন্যাসের নব-সংস্করণ প্রকাশিত করছে। মলাটে থাকবে, যে সব অভিনেতা-অভিনেত্রীরা তাঁর বইয়ের চিত্ররূপে অংশ গ্রহণ করেছেন, তাঁদের রঙিন ছবি। বেশ বোঝা যাচ্ছে নতুন করে এই বইগুলো পড়ুয়াদের মধ্যে সাড়া জাগিয়ে তুলবে।

গলসওয়ার্দির জীবনী সম্পর্কে দুটি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক বই প্রকাশিত হয়েছে—একখানি হলো মার্গারেট মরিসের 'মাই গলসওয়ার্দি স্টোরি' এবং অপরটি রুডলফ সটারের লেখা 'গলসওয়ার্দি দি ম্যান'। বই দুটির প্রকাশক হলেন পিটার ওয়েন। ভাগ্যে রুডলফ সটারের বইটি এমনই আকর্ষণীয় যে, দু-চার পাতা ওল্টালেই পাঠক তাঁর কৌতূহলী হয়ে উঠবেন। এ থেকে জানতে পারা যায় যে গলসওয়ার্দির দাম্পত্য জীবন ছিল খুবই শান্তিপূর্ণ। যদিও তাঁর স্ত্রী আডা প্রায় সব সময়ই অসুস্থ থাকতেন, গলসওয়ার্দি একান্তভাবে তাঁর সেবায় বেশীর ভাগ সময় কাটাতেন।

একথা বোধহয় অনেকেই জানেন না যে, আডার সঙ্গে দশ বছরের গোপন ঘনিষ্ঠ জীবন কাটাবার পর তাঁদের বিবাহিত জীবনের সূরু হয়। আডা ছিলেন, গলসওয়ার্দির কাজিন আর্থারের স্ত্রী। আডার মতে আর্থারের ধরণ ধারণটা ছিল অত্যন্ত পাশবিক। দাম্পত্য জীবনকে তিনি মনে করতেন স্বামী-স্ত্রীর দৈহিক ক্ষুধা মেটাবার একটা সামাজিক ব্যবস্থা। স্ত্রীর মানসিক অবস্থার কথা কখনও ভেবে দেখবার সময় পেতেন না আর্থার।

'ফরসাইট সাগা'তে এ কাহিনীকে রসঘন করে বলা হয়েছে। ১৯৬৩ সালে মিস্টার ডাডলী ব্যারকার একটি সুন্দর জীবনী রচনা করেন। গত জুন মাসে এ বইটির পুনঃ প্রকাশ করেছেন মেসার্স অ্যালেন এবং আনউইন (দাম ২৮ শিলিং)। এই বইতে আর্থার গলসওয়ার্দি তাঁদের দাম্পত্য জীবনের যে বিবরণ দিয়েছেন তা থেকে জানা যায়, আডা ছিলেন অত্যন্ত ক্লান্তিকর এবং অসাড় স্বভাবের স্ত্রী। ইনি তাঁকে ছেড়ে গেলে আর্থার আবার বিবাহ করেন এবং তাঁদের সন্তান-সন্ততিও হয়।

এদিকে আডা দ্বিতীয় স্বামী জন গলসওয়ার্দিকে এই কথাই বোঝাতে চাইতেন যে, ইংলণ্ডের শীত তাঁর দুর্বল স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। অথচ গলসওয়ার্দির মৃত্যুর পর আডা দীর্ঘ বাইশ বছর—অর্থাৎ নিজে যতদিন জীবিত ছিলেন বেশীর ভাগ সময় ইংলণ্ডেই কাটিয়েছেন।

আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করলে অবশ্য বলতে হয় আডা ছিলেন সেই জাতীয় নারী, যিনি প্রথম বিবাহের ব্যর্থতাকে অতি নাটকীয় করে তোলবার জন্যে একঘেয়ে স্বভাবের প্রথম স্বামীকে পাশবিক প্রতিপন্ন করে লোকের সহানুভূতি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করতেন। দ্বিতীয় স্বামী—অর্থাৎ জনের বেলায় নিজের পূর্ণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করবার জন্য আডা স্নায়ুবিক রোগীর ভূমিকার আশ্রয় নেন। এ কথাও গলসওয়ার্দি তাঁর সাগাতে ইংগিতে বলেছেন। মিস মার্গারেট মরিস তাঁর ছোট্ট বইটিতে গলসওয়ার্দির জীবনের যে গোপন কাহিনীটি অনাবৃত করেছেন, তা এক কথায় অত্যন্ত কৌতুকপ্রদ। বইটি পড়ে আমরা স্পষ্টভাবে জানতে পারি যে, আডার থেকে থেকে নার্ভের রোগে ভোগা, ক্রমাগত বিছানায় পড়ে থাকা এবং ওষুধ খাওয়া সত্যি-সত্যিই গলসওয়ার্দিকে সর্বক্ষণ এবং সম্পূর্ণভাবে তাঁর করায়ত্ত করে রাখতে পারেনি। একদিক দিয়ে মার্গারেট মরিসের কাহিনীটি বড় মর্মস্পর্শী। তিনি ছিলেন

বিখ্যাত আমেরিকান নর্তকী। ইসাডোরা ডানকানের ছাত্রী এবং শিষ্যা। স্বচ্ছ গ্রীক স্টাইলের পোষাকে সজ্জিতা হয়ে মঞ্চের ওপর নৃত্য প্রদর্শনের জন্যে যে সময় তিনি প্রস্তুত হচ্ছিলেন, তখনই আলাপ হয় জন গলসওয়ার্দির সংগে। অবশ্য এই সাক্ষাৎকার হয়েছিল সম্পূর্ণ পেশাদারী পটভূমিকায়। মিস মরিসের বয়স ছিল উনিশ এবং গলসওয়ার্দির তখন মধ্যবয়স্ক। তাঁদের তখনকার সম্পর্ক ছিল একজন প্রথিতযশা সাহিত্যিক ও নাট্যকার, অপরজন যৌবনদীপ্তা মঞ্চযশপ্রার্থী শিল্পী। গলসওয়ার্দি তাঁকে বাড়ীতে নিয়ে যেতেন আডার সংগে বসে চা-পান করবার জন্যে। তাঁর নাটক 'দি পিজন'এ মিস মরিসের জন্যে একটি ভূমিকাভিনয়ের ব্যবস্থাও করে দিয়েছিলেন। এরপর মিস মরিস উপলব্ধি করেন যে, তাঁর সংগে গলসওয়ার্দির সম্পর্কটা যেন ব্যক্তিগত পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। ক্যাবে করে দুজনে চলেছেন। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে গলসওয়ার্দি 'মেইড এ পাস'—মিস মরিসও এর প্রত্যুত্তরে প্রশ্রয় দিয়েছেন বলেই লিখেছেন। তবে এ কথাও তিনি আন্তরিক মর্মবেদনার সংগে উল্লেখ করেছেন যে, একমাত্র ক্যাবে করে ভ্রমণ করবার সময়েই গলসওয়ার্দি তাঁর সংগে প্রেমক্রীড়ায় মত্ত হতেন। অন্য সময় সদা সন্ত্রস্ত থাকতেন তাঁর এই দুর্বলতা ধরা পড়ে যাওয়ার আশংকায়।

পাঠক-পাঠিকা কল্পনা করতে পারেন ডানকান শিষ্যা যুবতী গ্রীসিয়ান মিস মরিস এবং পেন ক্লাবের মহান সভাপতি মহাশয় ক্যাবের ভেতর আলিংগনাবদ্ধ অবস্থায় বসে আছেন—আর গাড়ীটি লাফাতে লাফাতে পিকাডেলী ধরে, গলসওয়ার্দির গৃহাভিমুখে ধাবমান।

কিন্তু এই মনোগ্রাহী সম্পর্কটি দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি। আডা ব্যাপারটা জানতে পেরে এক মিঠে-কড়া চিঠি লিখেছিলেন মিস মরিসকে তাঁর নিজের স্নায়ুরোগ বাড়িয়ে ফেলেছিলেন এবং ক্রমাগত দেশভ্রমণ করে বেড়িয়েছিলেন স্বামীকে সংগে নিয়ে। ফলে প্রেমিকযুগল দেখা শোনা করা বন্ধ করতে বাধ্য হন। গলসওয়ার্দি অবশ্য মাঝে মাঝে চিঠি লিখতেন 'মাই ডিয়ার চাইল্ড' অথবা 'মাই ডিয়ার ব্রেভ চাইল্ড' এই ধরনের সম্বোধন সহ। অর্থাৎ বুঝিয়ে দিতে চাইতেন যে, এ ব্যাপারটার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। 'দি ডার্ক ফ্লাওয়ার'এ গলসওয়ার্দি এ ব্যাপারে তাঁর মনের প্রতিক্রিয়ার কিছুটা প্রকাশ করেছেন। সেকথা আমাদের অজানা নয়।

সাহিত্যিকের দুর্ভাগ্য ॥

গ্যুন্থার গ্রাস হলেন পশ্চিম জার্মানির একজন নামজাদা ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার। বই লিখে তিনি বহু পুরস্কার পেয়েছেন, এমনকি কোন এক মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট পর্যন্ত। কিন্তু কপাল পুড়েছে তাঁর রাজনীতি করতে গিয়ে। পশ্চিম জার্মান পার্লামেন্ট সদস্যদের উপদেশ দিতে গিয়ে তিনি ভীমরুলের চাকে ঘা দিয়েছেন। সব দলের সদস্যরাই আদাজল খেয়ে তাঁকে নাজেহাল করতে লেগে গেছে। কথায় বলে, 'খাচ্ছিল তাঁতী তাঁত বুনে, সাধ গেল তার এ'ড়ে গরু কিনে।'

পরলোকে ম্যাক্স মিলার ॥

সম্প্রতি পরলোকগমন করেন নামজাদা লেখক ও সাংবাদিক ম্যাকস্ মিলার। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। ম্যাক্স মিলারের সবচেয়ে আলোড়নকারী গ্রন্থ হল 'আই কভার দি ওয়াটার ফ্রন্ট'। ম্যাকস্ মিলার ছিলেন জীবনবাদী লেখক। নিজের অভিজ্ঞতাকেই তিনি সাহিত্যের মূলধন করে নিয়েছিলেন। চোখে-দেখা কাছে-আসা মানুষের ছবিই তিনি এঁকেছেন বারবার। ম্যাকস মিলারের আরেকটি আলোড়নকারী রচনা হল 'দি বিগিনিং অব এ মর্টাল'। এটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩৩ সালে।

প্রীতির আলোকে

গালভরা যতই বুকনি দিই না কেন, আফ্রিকার সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে আগ্রহ সত্যিই খুব কম। অথচ এটা যে দুঃখের ব্যাপার তাতে কোনো 'কিন্তু' থাকতে পারে না। কারণ সত্যি সত্যিই যদি আমরা নবজাগ্রত আফ্রিকার সংগে আমাদের প্রীতির সম্পর্ক জোরদার করতে চাই তবে এ দিকটা নজর দেওয়া সবচেয়ে আগে দরকার। মনের জানালা না খুললে শত চিৎকার করলেও আফ্রিকার সংগে আমাদের বন্ধুত্ব মজবুত হতে পারে না।

অনেকের কাছেই হয়তো কথাগুলো পুরনো ঠেকবে। তা সত্ত্বেও তবু একবার নতুন করে মনে পড়ল সাইপ্রিয়ান একোয়েন্সির কথা লিখতে বসে। সাম্প্রতিক নাইজেরীয় উপন্যাসে তাঁর স্থান বোধ হয় সবচেয়ে উপরে। অন্তত অনতিতরুণ লেখকদের মধ্যে তিনি যে সবার সেরা এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। শুধু চিন্তার নতুনত্বে নয়, ঘটনা উপস্থাপনা আর চরিত্র-চিত্রণের অসামান্য মুন্সিয়ানাতেও তিনি আলাদা জাতের লেখক। এদিক থেকে গোটা আফ্রিকান সাহিত্যে একোয়েন্সি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী।

বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার অধিকারী হলেন এই লেখকটি। নানান রকম ঝড়-ঝাপটার মধ্য দিয়েই তিনি মানুষ হয়েছেন। আরো দশজন আফ্রিকান কিশোরের মতো তাঁকেও প্রথম প্রথম অমানুষিক মেহনত করতে হয়েছিল বাঁচার তাগিদে। তা সত্ত্বেও লেখাপড়ার দিকে ছিল তাঁর প্রবল ঝোঁক। বাড়ির কাজ-কর্ম সেরেও নিয়মিত লেখাপড়া চালিয়ে যান ছোটবেলা থেকেই। এতে কোন ছেদ টানেননি তিনি। ধীরে ধীরে নিজেকে ক্লাশের মধ্যে সেরা ছাত্র বলে প্রমাণ করলেন। ওঁর শিক্ষকগণ অবশ্য অবাক হয়ে গেলেন এতে অসম্ভব ডানপিটে ছেলেটা যে কী করে ফার্স্ট বয় হয়ে উঠল তা ভাবতে গিয়ে অবাক হলেন তাঁরা। দেখতে দেখতে একদিন স্কুলের গন্ডি পেরিয়ে এলেন বৃহত্তর জগতে। এই প্রথম জীবনের মুখোমুখি দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন সাইপ্রিয়ান একোয়েন্সি। মাথায় চাপল তিনি ব্যবসায়ী হবেন। কিন্তু টাকা কোথায়? অর্থের ধান্দায় কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছেন না এমন সময় ওঁর বরাত খুলে গেল। লক্ষ্মী যেন নিজের থেকেই ওঁর কাছে এসে ধরা দিলেন। ওষুধ তৈরি করবার পদ্ধতি শেখার এক সুযোগ মিলে গেল ইতিমধ্যে। পেয়ে গেলেন একটি সরকারী বৃত্তি। পাড়ি জমালেন খাস লন্ডনে। সে-ও প্রায় এক যুগের আগের কথা। সে-সব স্মৃতি বড় রোমাঞ্চকর।

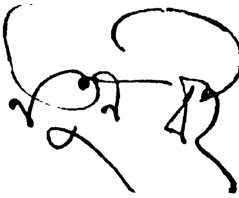
সত্যি কথাই তাই। ১৯৫১ সালটা একোয়েন্সির জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় বছর। যখন চারদিকে শুধু অন্ধকার ঘিরে ধরেছিল, হতাশার হিংস্র নখগুলো রক্তময় করে তুলেছিলো ঠিক সেই সময় দেখতে পেলেন হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো উজ্জ্বল সংকেত। হতভাগ্যের জীবন একটি মোড় নিল। হাজির হলেন নতুন জগতে। সব কিছু কেমন যেন অচেনা ঠেকতে লাগল। নিজেকে ঠিক খাপ খাইয়ে নিতে পারছিলেন না সেখানকার জল-হাওয়ার সংগে। এ নিয়ে তখন ভীষণ বিব্রত। জীবন সম্পর্কে পুনরায় শংকিত হয়ে উঠলেন তিনি। বুঝতে পারলেন তুফান-ওঠা সমুদ্রে হাল-ভাঙা নাবিক তিনি। শ্বেতাংগদের দৃষ্টিগুলো এই কালা আদমীর চোখে ভয়ংকর জ্বালা ধরিয়ে দিতে লাগল। এইভাবেই কেটে গেল বেশ কটা দিন। ধীরে ধীরে সহজ হয়ে গেলেন। মন দেয়া-নেয়ার পালা একরকম সাংগ করলেন লন্ডনের সংগে। ভালোবাসতে শুরু করলেন আশপাশের লোকদের। এতে নিজের লাভ বই ক্ষতি হল না। প্রতিবেশীদের ব্যবহারে এখন মুগ্ধতার পালা। সহপাঠীদের সংগে বন্ধুত্ব জমে উঠল। নতুন করে মুক্তির স্বাদ পেলেন। যখন একা-একা থাকতেন তখন অবশ্য খুবই খারাপ লাগত। চোখের সামনে ভেসে উঠতো হয়তো নিজের দেশের ছবি। বুকের ভিতরটা কেমন টন-টন করত, যন্ত্রণা অনুভব করতেন তিনি। কত রাত যে না ঘুমিয়ে কাটিয়েছেন আজ আর তা বলতে পারেন না লেখক। একদিন ভাবলেন এ জীবন নিয়ে কিছু লেখা দরকার। বলাবাহুল্য এর পর থেকে প্রায় রোজই লুকিয়ে লুকিয়ে লিখতে শুরু করলেন একোয়েন্সি। দেখতে দেখতে আড়াইটা বছর তাঁর কেটে গেল লন্ডনে। একটা উপন্যাসের পান্ডুলিপি তৈরি করে ফেলেছেন ইতিমধ্যে। প্রকাশকের দরজায় এবার ধর্ণা দেবার পালা। এতেও একরকম গ্রান্ড সাকসেস। ছ' মাস বাদে ছাপার হরফে বেরুলো উপন্যাসখানা। চারদিকে হৈ-চৈ পড়ে গেল। রাতারাতি ঔপন্যাসিক বনে

গেলেন। দেখতে দেখতে আরো দুটো বছর কোথা থেকে কেটে গেল। এর মধ্যে ওষুধ প্রস্তুতকারক হিসেবে নিজেকে তৈরি করে তুললেন সঞ্চয় করতে লাগলেন নানানরকম অভিজ্ঞতা। ছকে বাঁধা কাজের বাইরে আরো অনেকরকম অর্থকরী ব্যাপারে জড়িয়ে পড়লেন একোয়েন্সি। যে-সব কাজে এ সময় তিনি আত্মনিয়োগ করেন, তার মধ্যে বেতারে নানান জাতের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ আর খবরের কাগজে সাংবাদিকতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া চিত্রনাট্য রচনা, টেলিভিশনে অবতীর্ণ হওয়া এবং বই লেখা তো আছেই।

অবশ্য, এ ধরনের বিভিন্ন কাজ করলেও সাইপ্রিয়ান একোয়েন্সি সবচেয়ে খ্যাতি পান বেতারে। আজকের নাইজিরিয়ায় এমন কোন লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না, যিনি তাঁর কণ্ঠস্বর শোনেন নি। ১৯৬০ সালে নাইজিরিয়া যখন ঔপনিবেশিকতার নাগপাশ থেকে মুক্তি পেলো তখন স্বদেশের স্বাধীনতা-উৎসবে সক্রিয় অংশ নেন এই লেখকটি। তিনি এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানের বেতার-ভাষ্যকারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্বচ্ছন্দে পালন করেন।

আগেই বলেছি সাইপ্রিয়ান একোয়েন্সির প্রথম উপন্যাস বেরোয় খাস লন্ডন শহর থেকে। সেটা ১৯৫৪ সালের কথা। বইটির নাম পিপলস অব দি সিটি। ১৯৬১ সালে তিনি নাইজিরিয়ার ইনফরমেশন সারভিসের ডিরেক্টর হন। তারপর বেরোয় তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস জাগওয়া নানা। এটি অবিশ্বাস্য জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল নাইজিরিয়ায়। ফলে জনৈক চলচ্চিত্র-পরিচালক বইটিকে ছায়াছবিতে রূপান্তরিত করেন। চাষীদের নিয়ে লেখা তাঁর তৃতীয় উপন্যাস বার্নিং গ্রাস বেরোয় ১৯৬২ সালে। ঠিক এর পরের বছরেই বসন্তকালে প্রকাশিত হল চতুর্থ উপন্যাস 'বিউটিফুল ফেদার্স'। বলাবাহুল্য, আজো তিনি অবিচ্ছিন্নগতিতে লিখে চলেছেন।

—সুনীত রায়



মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের নবদিগন্ত

নামটা কথাসাহিত্য হলেও কথা বা গল্পই এর সবটুকু নয়। তাই গল্প বলাই যিনি শুধু জানেন কথারসের ফেনায় যিনি মাদকতার সৃষ্টি করতে পারেন, গল্পলোভী পাঠকের গল্প-পিপাসা মেটাতে তাঁর অসুবিধে নেই। কিন্তু উপন্যাস যেখানে মহৎ শিল্প হয়ে উঠেছে, সেখানে সে তার গল্পরসকে অতিক্রম করেছে। উপন্যাস মানবজীবনকে নিয়ে, কিন্তু ঘটনার পর ঘটনা সাজালেই সে জীবনকে পাওয়া যায় না। বরং বিশ্লেষণের তীক্ষ্ণতা ও জীবন-জিজ্ঞাসার গভীরতা যত বাড়ে, গল্পাংশ তত সংক্ষিপ্ত হয়ে আসে। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 'নগরপারে রূপনগর' পড়তে গিয়ে উপন্যাসের এই নিরীক্ষার কথা বারবার মনে হয়েছে। প্রায় ন'শো পৃষ্ঠার সুবৃহৎ উপন্যাস তিনটি খণ্ডে ভাগ করা কাহিনীর পরিধি প্রায় বিশ বছর। কিন্তু ঘটনার আয়তনে মেদবহুল নয় স্ফীতকায় তো নয়ই। এর কারণ উপন্যাসের প্রাণশক্তি—দেহভার এখানে অনাবশ্যক অনাকাঙ্ক্ষিত মেদসঞ্চয়ে নয় স্বাস্থ্যের ঔজ্জ্বল্যে, জীবনপ্রাচুর্যের দীপ্তিতে।

উপন্যাসখানির জাত-নির্ণয় করতে গেলে নির্দ্বিধায় বলব 'মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস'। এই নামকরণ শুধু সাধারণভাবেই প্রযোজ্য নয়, বিশেষভাবেও বটে। লেখকের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ও বুদ্ধিধর্মী বিশ্লেষণ মনোজগতের জট-পাকানো গ্রন্থীর উপর আলোকপাত করেছে। লেখকের বিশ্লেষণ এতো নিপুণ যে একটা অনুচ্ছেদ বাদ দিয়ে পড়লেও অনেকখানি বাদ পড়ে। বুদ্ধি সজাগ রেখে খুঁটিয়ে পড়তে হয়, খানিকদূর পড়ে এগিয়ে যাওয়ার পর সবটুকু বিশ্লেষণ পরিষ্কার করার জন্য আবার পেছনের পাতা ওল্টাতে হয়। কারণ বিশ্লেষণের প্রতিটি ধাপ ও তার তির্যক রূপ অনুধাবন করতে হয়। এ-বই এক নিঃশ্বাসে শেষ করা সম্ভব নয়। অথচ শেষ-পর্যন্ত কৌতূহল জেগে থাকে।

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় আকর্ষণ হলো জ্যোতিরাণী-শিবেশ্বরের দ্বন্দ্ব সংঘাতের বিচিত্র ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া। এই বিসদৃশ নারী-পুরুষের সংগ্রাম-জর্জরিত মনের অন্ধকার বদ্ধপথগুলিকে লেখক অসামান্য দক্ষতায় আলোকিত করেছেন। মর্যাদাময়ী ও ব্যক্তিত্বশালিনী নারীচরিত্র অংকনে লেখকের প্রবণতা ও দক্ষতার পরিচয় তাঁর পূর্ববর্তী উপন্যাসগুলির মধ্যেও একাধিকবার লক্ষ্য করা গিয়েছে। তাই জ্যোতিরাণী চরিত্র কোনো আকস্মিক সৃষ্টি নয়; লেখকের পূর্ববর্তী উপন্যাসগুলিতে তার আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু পূর্ববর্তী কোনো চরিত্রই বৈচিত্র্যে ও ভাবগম্ভীরতায় জ্যোতিরাণীর সমকক্ষ নয়। অধ্যাপক পিতার কন্যা জ্যোতিরাণীর মন যে আদর্শে তৈরী হয়েছিল তা তার বিবাহিত জীবনে বারবার আহত হয়েছে। স্বামীর সংগেও তার সুস্থ সহজ সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। চারিত্রিক দৃঢ়তা ও মর্যাদাবোধের সংগে যুক্ত হয়েছে নীরব উপেক্ষার কাঠিন্য। শিবেশ্বরই অন্য-জাতের মানুষ। নিজের বিদ্যাবুদ্ধিবলে সে প্রতিকূল পরিবেশকে অনুকূল করেছে—সরস্বতী ও লক্ষ্মীর যুগল আশীর্বাদে সে পেয়েছে প্রতিষ্ঠা ও অর্থকৌলীন্য। বিদ্যাবুদ্ধি সৌভাগ্য ও পৌরুষের সংগে যুক্ত হয়েছে কামাবেকর মদোদ্ধত দম্ভ ঈর্ষা-দিগ্ধতা ও অত্যুগ্র অধিকারস্পৃহা। শিবেশ্বর তার দেহসম্ভোগস্পৃহা ও সন্দেহবিষের দ্বারা তার স্ত্রীকে আঘাত হেনেছে। জ্যোতিরাণী কঠিন সহিষ্ণুতা ও নীরব উপেক্ষায় তা প্রতিহত করেছে। সুস্থ স্বাভাবিক দাম্পত্যজীবন এখানে অনুপস্থিত। জ্যোতিরাণীকে আঘাত করার শিবেশ্বর নিত্যনতুন উপায় উদ্ভাবন করেছে।

প্রভুত্বাধিকার প্রতিষ্ঠা কেন্দ্র করে এই মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব ও দাম্পত্য-সংকট চূড়ান্ত হয়ে উঠেছে। প্রভুত্বাধিকার প্রতিষ্ঠার পিছনে শিবেশ্বরের কোনো সক্রিয় সমর্থন না থাকলেও সে তাতে গুরুতর বাধারও সৃষ্টি করবে না, করলে প্রভুত্বাধিকার সৃষ্টির চেষ্টা অংকুরেই বিনষ্ট হত। এই প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে জ্যোতিরাণী নিজের একটি সুস্থ আশ্রয় ও আদর্শ গড়ে তুলতে চেয়েছিল। ঠিক এই মুহূর্তেই উপন্যাসের চরম সংকটকাল ঘনিয়ে এলো। মিত্রাদির সহযোগিতায় জ্যোতিরাণী যে প্রতিষ্ঠান গড়ার স্বপ্ন দেখেছিল তা ধূলিসাৎ হয়েছে। বীথির মুখে মিত্রাদির গোপন কার্যকলাপের পরিচয় পেয়ে যে সংশয় পুঞ্জীভূত হয়েছিল, তার জবাব মিলেছে শিবেশ্বরের সংগে মিত্রাদির অবৈধ সম্পর্ক আবিষ্কার করার পর থেকে। এই অংশটিই উপন্যাসের ক্লাইমাক্স।

এর পরেই উপন্যাসের গতি দ্রুততর ও মণ্ডিত নাটকীয়। জ্যোতিরাণী স্বামীর ঘর ছেড়ে ইস্কুলের চাকরি নিয়ে চলে গিয়েছে, শমীকে কেন্দ্র করে তার বাৎসল্য পিপাসা চরিতার্থ হয়েছে। জ্যোতিরাণীর সংগে বিভাস দত্তের বিবাহকে যে-ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তা যেমন মনস্তত্ত্বসম্মত তেমনি মানবিক আবেদনে অসামান্য। বিবাহ-বিচ্ছেদ ও পুনর্বিবাহ—কোনোটাতেই জ্যোতিরাণী সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেনি। প্রথমটিতে আইনের সাহায্য নিয়েছে শিবেশ্বর স্বয়ং এ-ক্ষেত্রেও জ্যোতিরাণী যেমন করুণা ভিক্ষা করেনি, তেমনি প্রতিবাদও করেনি। সেখানেও তার নীরব উপেক্ষাই কার্যকরী হয়েছে। কিন্তু পুত্র সিতুর সংগে তার নাড়ির সম্পর্ককে সূক্ষ্ম রেখায় বর্ণনা করা হয়েছে। মৃত্যুপথযাত্রী রোগজীর্ণ বিভাস দত্তের সংগে তার বিবাহ ব্যাপারটিকে নাতিদীর্ঘ সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে

উদ্ভাসিত করা হয়েছে। [illegible] উপন্যাসের নার্স ও আহত সৈনিকের সম্পর্ক-প্রসঙ্গ এনে লেখক মিতভাষণে যে সংকেতটুকু দিয়েছেন, তা অসামান্য। কিন্তু তার চেয়েও বাস্তব ও তীক্ষ্ণ হয়েছে জ্যোতিরাণীর মানসিক অবস্থার বিশ্লেষণ : "অতনু-সান্নিধ্যের প্রথম পুরুষ হিংস্র নগ্ন নির্দয় অত্যাচারী ছিল, তুলনায় দ্বিতীয় বাসরের দ্বিতীয় পুরুষের অনেক ভদ্র অনেক সদয় ভীরু সচেতন পদক্ষেপ। অথচ এই দ্বিতীয় অধ্যায়টিই ব্যভিচারের মত লেগেছিল।"—'দ্বিতীয় অধ্যায়টি' সম্পর্কে এই অনুভূতি জ্যোতিরাণী চরিত্রকে আরো সজীব ও অন্তরঙ্গ করেছে।

গোটা উপন্যাসে জ্যোতিরাণীর ব্যক্তিত্ব ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া উপন্যাসখানির প্রাণ-কেন্দ্র। উপন্যাসের শেষদিকে সিতু ও শমীকে কেন্দ্র করে তার জীবনের যে-বিচিত্র উন্মোচন ঘটেছে, তা যেমন করুণ, তেমনি মহিমান্বিত। জ্যোতিরাণীর জ্যোতি শেষ-মুহূর্ত পর্যন্ত অনির্বাণ—লেখক পূর্ব-বর্তী উপন্যাসসমূহে নারীব্যক্তিত্ব-রহস্য নিয়ে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন, এই চরিত্রটি তারই সর্বোত্তম পরিণাম। গোটা বাংলা উপন্যাসে তার সঙ্গিনী খুঁজে পাওয়া কঠিন। কিন্তু জ্যোতিরাণীর চরিত্রের এমন পূর্ণ পরিণতি সম্ভব হয়েছে শিবেশ্বরের জন্য। উপন্যাসে জ্যোতিরাণীর তুলনায় শিবেশ্বরের স্থান সংকীর্ণ। কিন্তু এই চরিত্রসৃষ্টিতে লেখক যে বলিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছেন, তার তুলনা নেই। শিবেশ্বর পাঠকের নৈতিক সমর্থন না পেলেও শিল্পকর্ম হিসেবে [illegible] আকর্ষণীয় চরিত্র। শিবেশ্বর যেন আগুনে পুড়িয়ে হাতুড়ির নির্মম আঘাতে তৈরি করা চরিত্র। জ্যোতিরাণীর চরিত্র লঘুস্পর্শ তুলির আঁচড়ে আঁকা, সূক্ষ্ম রং-রেখার সামঞ্জস্যে অপরূপ, শিবেশ্বর নিপুণ ভাস্করের রচনা, কঠিন শিলা খোদাই করে তৈরি করা। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের রচনায় জ্যোতিরাণীর সূচনা ঘটেছে অনেক কাল আগে থেকেই মনোজীবনের সুদীর্ঘ লালনে তার পরিণতি। কিন্তু শিবেশ্বর চরিত্র বিশেষ প্রেরণারই সৃষ্টি তার কোনো পূর্বপুরুষ নেই। আলোচ্য উপন্যাসে সব-চেয়ে শক্তির পরিচয় আছে শিবেশ্বর চরিত্র-রচনায়।

অপ্রধান চরিত্রের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখ-যোগ্য ভূমিকা কালীনাথের। কালীনাথ উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র হয়েও তাঁর ভূমিকা প্রধানত দ্রষ্টার। এই সদাপ্রসন্ন অনুত্তেজিত চরিত্রের আপাত-নিষ্ক্রিয়তার আড়ালে বিচিত্র মনোভঙ্গির যে ফল্গুধারা আছে, তার বর্ণনায় ও বিশ্লেষণে লেখকের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। উপন্যাসের সবচেয়ে জোরালো অংশ হলো কালীনাথের ডায়রির কয়েকটি পৃষ্ঠার বর্ণনা। ব্যঙ্গ, বেদনা ও আত্মবিশ্লেষণের এই অংশটি কালীনাথ চরিত্রের মূল্যবান ব্যাখ্যা দিয়েছে। কালী-নাথের [illegible] বিস্ময়কররূপে মৌলিক। ঐ কয়েকটি লাইনে তার গোটা চরিত্র উদ্ভাসিত হয়েছে। ব্যঙ্গ ও বেদনার মিশ্র ধারায় কালীনাথের ডায়রি অসামান্য। বক্র-তির্যক শ্লেষের তীক্ষ্ণধার ছুরির মতো ঝলসে উঠেছে। কালীনাথের ডায়রির এই অংশটি শুধু তার চরিত্র উদ্ঘাটনের পক্ষেই প্রয়োজনীয় নয়, মিত্রাদি, শিবেশ্বর, জ্যোতি-রাণী, গৌরবিমল প্রভৃতি চরিত্রের সম্পর্ক-বৈচিত্র্যকে বিচিত্র কৌশলে উদ্ঘাটিত করেছে। একটি চাপা ব্যথা ব্যঙ্গের বিচিত্র পথে শিল্পরূপ পেয়েছে।

কিন্তু এই সুদীর্ঘ উপন্যাসে গঠন-রীতিগত দুর্বলতা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তার প্রধান কারণ হলো লেখকের দ্বৈত-মানসিকতা : একদিকে জ্যোতিরাণী-শিবে-শ্বরের দাম্পত্যসংকট ও মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব, অন্যদিকে প্রভুজী আগমনের পটভূমিকা রচনা। শিবেশ্বরের পূর্বপুরুষদের দীর্ঘ বিবরণ দেওয়ার কারণ হলো প্রভুজী আগ-মনের পথপ্রস্তুতি। আর একটি কারণ থাকাও অসম্ভব নয়। তা হলো পুরুষানু-ক্রমিক চারিত্রিক উত্তরাধিকারের সম্পর্ক দেখানো। লেখকের এই দ্বৈতমানসিকতা বুঝতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু এই দ্বৈতমানসিকতা দ্বিধাগ্রস্ততারই সৃষ্টি করেছে, উপন্যাসের সামগ্রিক ঐক্য (Organic Unity) ব্যাহত হয়েছে। কাহিনীর এই দুই ধারা সমন্বয়ের চেষ্টা আছে—দুরূহ চেষ্টাই বলব। প্রভুজীর আগমন-প্রতীক্ষার স্বপ্ন বহন করে আনেন হৈমবতী, তারপর সঞ্চারিত হয় পুত্রবধূ কিরণশশীতে। বালক সিতুর মাথায় পাকা-চুল আবিষ্কারে সেই প্রত্যাশার প্রথম পদ-ক্ষেপ ধরলো, কালীনাথের ডায়রিতেও আদিত্যরাম-হৈমবতী - নীলগোপাল-সৌদা-মিনীর কাহিনীর ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু এরা বাহ্য—দুই কাহিনীর মধ্যে যে ফাঁক আছে, তাকে আর পূরণ করা সম্ভব হয়নি। উপন্যাসের তৃতীয় পর্ব সবচেয়ে দুর্বল, এর অনেকখানিই বহিরাগত, অন্তর্নিহিত অবশ্যম্ভাবী পরিণামসূত্রে গড়ে ওঠেনি। উপন্যাসের অনেকখানি উত্তাপ নষ্ট হয়েছে শিবেশ্বরের নিষ্ক্রিয়তার পর থেকে। যতটুকু উত্তাপ অবশিষ্ট ছিল, জ্যোতিরাণীর মৃত্যুর সঙ্গে তা নিঃশেষিত হয়েছে। এর থেকে আরো প্রমাণিত হবে যে, উপন্যাস-খানির কেন্দ্র জ্যোতিরাণী-শিবেশ্বরের মন-মনস্তাত্ত্বিক সংঘাত, প্রভুজীর আগমন বহিরাগত সংযোজন মাত্র—উপন্যাসের স্বাভাবিক গতিপ্রকৃতির সঙ্গে এর আত্মিক সম্পর্ক নেই।

বালক সিতুর আচার-আচরণ বিশ্লেষণে লেখকের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। কিন্তু এই চরিত্রের অসংগতি অত্যন্ত উৎকটভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। বালক-চরিত্রের বিচিত্র কৌতূহল, প্রথম তারুণ্যের উদ্দামতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা কার্যকারণ সম্পর্কের মধ্য দিয়ে চমৎকারভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। শমীর সঙ্গে তার আচরণগুলিরও যে-ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, তা যেমন প্রাসঙ্গিক, তেমনি চিত্তাকর্ষক। উদ্দাম সম্ভোগবাসনার সঙ্গে ঈর্ষার একটি আক্রমণাত্মক রূপও জড়িত ছিল। মায়ের স্নেহাসন আর একজন দখল করেছে—এ যেন তার অসহ্য। এপর্যন্ত সিতুর চরিত্র ঔপন্যাসিক বিশ্লেষণের অনু-গত। কিন্তু হরিদ্বারে যাবার পর থেকে উপন্যাসের শেষপর্যন্ত সিতু চরিত্রের বিচিত্র আচরণগুলির কোনো সংগত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। সিতু-চরিত্রের সম্ভাবনাদীপ্ত উজ্জ্বল আবির্ভাবের এই পরিণতি শিল্পের অসংগতিকে তীব্র করে তুলেছে। উপন্যাসের সবচেয়ে দুর্বল স্থান হলো এই অংশটি। গঠনরীতির অসংগতি ও সিতু-চরিত্রের অসংগতি একই কারণ থেকে উদ্ভূত। লেখক যেমন করেই হোক, প্রভুজীচেতনার জয় প্রতিপন্ন করতে চান। এই উদ্দেশ্য কোনো শিল্পরীতির সঙ্গে সমন্বিত হয়নি। মিত্রাদির মৃত্যুর মধ্যেও আকস্মিকতার চমক আছে—তাকে সরানোর প্রয়োজন ছিল। কিন্তু উপায়টির প্রশংসা করা যায় না।

এইসব ত্রুটি অসংগতি সত্ত্বেও 'নগর-পারে রূপনগর' বাংলা উপন্যাসের একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। বৃহৎ বনস্পতির কোথায় একটি পাতা পোকায় খেয়েছে, কোথায় একটি ডাল ভেঙে পড়েছে, কোথায় প্রকাশিত হয়েছে আতিশয্যের ঔদ্ধত্য—এটা প্রধান বিচার্য নয়। বনস্পতির ঐশ্বর্য সমগ্রতায়, প্রাণশক্তির বিপুলতায়, সমুন্নত ও সর্বংসহ মহিমায়। উপন্যাসখানির সতর্ক-বুদ্ধি ছিদ্রান্বেষী সমালোচকেরাও এ-সত্যটি অস্বীকার করবেন না। উপন্যাসের স্টাইলও সমালোচকের বিস্ময়মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। বুদ্ধিদীপ্ত পরিমার্জিত গদ্যরীতি, ছোট ছোট তীক্ষ্ণোজ্জ্বল বাক্যাংশ শরক্ষেপের মতো লক্ষ্যভেদী। আবেগ ও বুদ্ধির এক অদ্ভুত ভারসাম্য রক্ষিত হয়েছে তাঁর স্টাইলে।

'নগরপারে রূপনগর' উপন্যাসের সব-চেয়ে বড় গৌরব হলো লেখকের জীবন-সমীক্ষার দৃষ্টিভঙ্গি। এ-যুগের কোনো কোনো শক্তিশালী ঔপন্যাসিকও জীবনের পুঞ্জীভূত গ্লানি ও অসুস্থ মনোবিকারকেই একমাত্র সত্য বলে স্বীকার করে তার কাছে দাসখৎ লিখে দিয়েছেন। পরাজিত মানুষের মানসিক দৈন্য ও বিকৃতিকে সর্বস্ব করে তোলার প্রচেষ্টা চলেছে। 'নগরপারে রূপ-নগর' উপন্যাসের লেখক আধুনিক যুগের জটিল জীবনযন্ত্রণার স্বরূপ বোঝার চেষ্টা করেছেন, বৈজ্ঞানিকের মতো নিস্পৃহতা নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন, গভীর সহানু-ভূতির সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করেছেন। মানুষের এই পরাজিত সত্তার গ্লানিকে তিনি চরম সত্য বলে মানতে পারেননি। বলিষ্ঠ প্রত্যয়, সুস্থ জীবনবোধ ও নবীন প্রত্যাশার প্রতি-শ্রুতি এই মহাকাব্যোচিত মনস্তাত্ত্বিক কথা-চিত্রের প্রাণকেন্দ্র। —রথীন্দ্রনাথ রায়

নগর পারে রূপনগর :— (উপন্যাস) : আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। আঠারো টাকা।



তস্য তস্য অথবা সূর্য কাঁদলে সোনা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

পনেরো শ' ত্রিশ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের এক গাঢ় কুয়াশাচ্ছন্ন রাত্রে সেভিল্লের বন্দরে বাঁধা তাঁর জাহাজ বিনা হুকুমেই হঠাৎ যেন ভৌতিক নির্দেশে গুয়াদালকুইভির নদীর স্রোতে ভেসে যাওয়ায় বিমূঢ় ব্যাকুল-ভাবে তার কারণ সন্ধান করতে গিয়ে পিজারো হাল চালাবার ঢঙে কাপিতান সানসেদোকে সবিস্ময়ে আবিষ্কার করে তাঁর কাছে জাহাজ এভাবে নিঃশব্দে গোপনে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ায় অদ্ভুত কৈফিয়তের সঙ্গে আর একটি এমন কথা শোনেন যা সত্যিই কৌতূহল জাগাবার মত।

কাপিতান সানসেদো গোপনে জাহাজ ছাড়ার ব্যাপারে অবিশ্বাস্য যে সব কাণ্ড-কারখানা করেছেন তাতে তিনি পরামর্শ ও সাহায্য পেয়েছেন নাকি আর একজনের কাছে। তাঁর সে সঙ্গী সহায় নাকি সেই জাহাজেই বর্তমান।

কে সে লোকটা?—একটু রূঢ়ভাবেই জানতে চান পিজারো। কাপিতান সানসেদোর কৈফিয়ৎটা যতই মনে ধরুক, তাঁর ওপর খোদকারী করে জাহাজ নিয়ে পালাবার ফন্দির স্পর্ধাটা তখনো পিজারো পুরোপুরি বরদাস্ত করতে পারছেন না।

সে লোকটার পরিচয় আর কি দেব। দেবার মত কিছু নেই—হেসে বলেন সানসেদো, — এই জাহাজেই সে আছে, সময়মত আপনার সামনে হাজির হবে।

সময়মত মানে?—বেশ গরম হয়ে ওঠে পিজারোর গলা,—এখুনি তাকে ডাকান। নইলে সমস্ত জাহাজ আমি তালাশ করাব।

তার দরকার হবে না আদেলানটাডো!

পিজারোকে চমকে পেছন ফিরে তাকাতে হয় এবার। শুধু যে পেছনে অপ্রত্যাশিত কণ্ঠ শুনেই তিনি চমকান তা নয়, 'আদেলানটাডো' বলে সম্বোধনও তাঁকে বিস্মিত করে। যে সোনার রাজ্য তিনি আবিষ্কার ও জয় করতে যাচ্ছেন তার পুরস্কারস্বরূপ টোলেডোর রাজদরবার থেকে তাঁকে অন্যান্য সুবিধা ও সম্মানের সঙ্গে এই পদবীর প্রতিশ্রুতিও যে দেওয়া হয়েছে তা ত যার-তার জানবার কথা নয়।

লোকটাকে দেখবার পর তার মুখে এ সম্বোধন ত আরো অবিশ্বাস্য লাগে।

চেহারা পোশাক দেখে লোকটা যে জাতে বেদে এ বিষয়ে পিজারোর কোন সন্দেহ থাকে না। চুরি, হাত-সাফাই ছাড়া বেদেদের অদ্ভুত কিছু কিছু ক্ষমতা থাকার গুজব তিনি বহুকাল আগে স্পেনে থাকতে শুনেছিলেন। কিন্তু টোলেডোর রাজ-দরবারের গোপন ব্যাপার জানবার মত বিদ্যে তাদের থাকতে পারে বলে ত বিশ্বাস হয় না।

আদেলানটাডো বলছ কাকে? — ভ্রূকুটি করে জিজ্ঞাসা করেন পিজারো।

আপনি ছাড়া ও সম্বোধনের যোগ্য আর কে আছে এখানে?—সসম্ভ্রমে মাথা নুইয়ে বলে লোকটি,—শুধু আদেলানটাডো কিম্বা আলগুয়াসিলের মেয়র নয় কাপিতান জেনেরালও আপনাকে বলা উচিত...

থামো!—বেশ একটু অস্বস্তি ও অধৈর্যের সঙ্গে লোকটিকে থামিয়ে দিয়ে পিজারো বলেন, — এসব আবোল-তাবোল কথার মানে কি! কোথায় শুনেছ যে আমি কাপিতান জেনেরাল?

কোথাও শুনিনি আদেলানটাডো।—লোকটা অবিচলিতভাবে বলে,—ভর হওয়ার সময় জানতে পেরেছি, যেমন আপনার সেভিল ছেড়ে পালাবার উপায়ও জানতে পেরেছি সেই অবস্থায়।

সেই অবস্থায় জানতে পেরেছ।—হতভম্ব হলেও গলাটা কড়া রেখে জিজ্ঞাসা করেন পিজারো,—সে ভর হওয়াটা আবার কি!

কি, তা বোঝাতে পারব না আদেলানটাডো। তবে মাঝে মাঝে আমাতে আর আমি থাকি না।—চাপা গলায় যেন ভয়ে-ভয়ে বলে লোকটি,—তখন আশ্চর্য অনেক কিছু আমি জানতে পারি। আমাদের বেদেদের মধ্যে একেই ভর-হওয়া বলে। দেবতা কি অপদেবতা কেউ তখন আমার মধ্যে এসে ঢোকে।

দেবতা নয় অপদেবতাই হবে।—মুখে তাচ্ছিল্যের ভান করলেও পিজারোর অন্ধ কুসংস্কারে জড়ানো মনে লোকটা সম্বন্ধে বেশ একটু ভয়-ভক্তিই জাগে। নিজে থেকেই তাই আবার জিজ্ঞাসা করেন,—কি নাম তোমার? কোথা থেকে এখানে এসে জুটলে?

আজ্ঞে নাম আমার গানাদো।—লোকটি সবিনয়ে জানায়,—আসছি ত্রিয়ানা থেকে।

ত্রিয়ানা থেকে আসছ?—গানাদো অর্থাৎ গরু-ঘোড়া নামটা একটা বেদের পক্ষে তেমন বেয়াড়া না লাগলেও আর ত্রিয়ানাই যে স্পেনের বেদেদের বড় ঘাঁটি তা

জানলেও পিজারো একটু সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করেন,—সেখানেই ভর হয়ে আমার আর আমার জাহাজের কথা জানতে পেরে চলে এসেছ আমায় সাহায্য করবার জন্যে?

আজ্ঞে; ভর-হওয়া অবস্থার হুকুম ত অমান্য করবার জো নেই।—লোকটি অর্থাৎ গানাদোর গলায় আতঙ্ক মেশানো সম্ভ্রম ফুটে ওঠে।

ভয়ে বিস্ময়ে পিজারোরও সন্দেহ করবার মত মনের অবস্থা তখন আর নেই। একটু দ্বিধাভরেই তিনি শুধু জিজ্ঞাসা করেন,—কিন্তু কাপিতান সানসেদোকে জোটালে কি করে? তাঁকে পেলে কোথায়?

ওই ত্রিয়ানাতেই পেলাম আদেলানটাডো। তাঁকেও আমার ভর-হওয়া দশার হুকুম মেনে এখানে আসতে হয়েছে।

যত আজগুবিই মনে হোক দেবতা-অপদেবতার নামে জড়ানো কথাগুলোকে অবিশ্বাস করবার সাহস পিজারোর আর হয় না। বেশ একটু আগ্রহের সঙ্গেই তিনি এবার জিজ্ঞাসা করেন,—ক্যানারী দ্বীপপুঞ্জের গোমেরায় গিয়ে অপেক্ষা করবার হুকুমও কি তুমি ভর-হওয়া অবস্থায় পেয়েছ?

আজ্ঞে হ্যাঁ আদেলানটাডো! বেদেরূপী গানাদো গলায় সরল বিস্ময় ফুটিয়ে বলে,—নইলে ক্যানারী দ্বীপপুঞ্জ কি গোমেরার নাম আমি জানব কোথা থেকে!

এসব নামও তুমি জানতে না!—পিজারো সবিস্ময়ে অদ্ভুত বেদেটাকে ভাল করে লক্ষ্য করবার চেষ্টা করেন। লোকটা তাঁর সম্পূর্ণ অচেনা। গাঢ় কুয়াশার মধ্যে অন্ধকারে তার মুখটা সম্পূর্ণ অস্পষ্ট হলেও দেহের গড়নটা কিন্তু পিজারোকে যেন কার কথা মনে করিয়ে দেয়।

কাকে যে মনে করিয়ে দেয় সে রাত্রে ত নয়ই, তার পরে অনেক কালের সংস্রবেও পিজারো ধরতে পারেন নি।

শেষ পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন নানা খণ্ডরহস্য যখন এক সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় তখন 'সূর্য কাঁদলে সোনা'র দেশকে রক্তে ভাসিয়ে তিনি তাঁর ভয়ঙ্কর নিয়তির শেষ ধাপে গিয়ে পৌঁছেছেন।

সে অবশ্য অনেক পরের কথা।

আপাততঃ অদ্ভুত অচেনা বেদেটার কথা আজগুবি মনে হলেও কুসংস্কার জড়ানো ভয়-ভক্তিতে সব সন্দেহ চাপা দিয়ে তার নির্দেশ মেনে পিজারোর সত্যি-সত্যিই যথেষ্ট লাভ বই লোকসান হয় না।

কাপিতান সানসেদো ওই কুয়াশাচ্ছন্ন অন্ধকার রাতেই সান লুকার-এর বিপজ্জনক চড়ার পাশ কাটিয়ে বারদরিয়ায় জাহাজ এনে ফেলে তাঁর নৌবিদ্যার বাহাদুরী দেখান।

পিজারো তাঁর জাহাজ নিয়ে নির্বিঘ্নেই তারপর ক্যানারী দ্বীপপুঞ্জের গোমেরাতে গিয়ে ওঠেন। সেখানেই কাপিতান সান-সেদোর আদেশ মত পিজারোর ভাই হার্নান্ডো বাকি জাহাজ দুটি নিয়ে গিয়ে যোগ দেন কয়েক দিন বাদে। সেভিলের বন্দরে পরের দিনই কাউন্সিল অফ ইণ্ডিজ থেকে যাঁরা তদন্ত করতে এসেছিলেন তাঁদের ধোঁকা দিয়ে পালিয়ে আসা হার্নান্দোর পক্ষে শক্ত হয় নি।

ছোট-বড় বাধার এর পর অভাব না হলেও 'সূর্য কাঁদলে সোনা'র রহস্যরাজ্যের অভিযান এর পর অনিবার্যভাবেই এগিয়ে চলে।

সেই কুয়াশাচ্ছন্ন রাত্রে সেভিলের বন্দর থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে জাহাজ ভেসে যাওয়ার সময় উত্তেজনা আর আশঙ্কার মধ্যে কাপিতান সানসেদো ছাড়া আর যে লোকটির পরিচয় পেয়েছিলেন তার বিষয়ে পিজারোর কৌতূহল বেশীদিন খুব সজাগ কিন্তু থাকে নি। পরের পর আরও উত্তেজনা জোগান ঘটনায় তার মাথা-ঘোরান সমস্যায় সে কৌতূহল আপনা থেকে কিছু পরে ফিকে হয়ে গেছে। ব্যাপারটায় অলৌকিকত্বের আভাস থাকলেও বেদেদের সে রকম ক্ষমতা থাকা অসম্ভব নয়, এই বিশ্বাসে মানুষটা সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগ দেবার কোন তাগিদ আর তিনি অনুভব করেন নি। গানাদো নামে একজন বেদে আর সব মাঝি-মাল্লার মধ্যে তারপর বেমালুম মিশে গেছে। অভিযান অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে কাপিতান সানসেদো এবং সেই এক অজানা বেদের কাছে এ অভিযান সম্ভব করার জন্যে কৃতজ্ঞ থাকার কথা পিজারোর নিশ্চয় মনে থাকে নি। থাকলে বেদের ছদ্মবেশে ঘনরাম দাসই বোধহয় সবচেয়ে অসুবিধায় পড়তেন কারণ বিশেষ প্রয়োজনে সামনে আসতে বাধ্য হলেও এ অভিযানে তাঁর যা কাজ তা নেপথ্যে থেকেই সারবার।

ঘনরাম নিজেকে নেপথ্যে রাখবার সুযোগ নিয়ে পিজারোর অভিযানে যে ভূমিকা নিয়েছেন তার বিবরণ দেবার আগে আর একটি রহস্য বোধহয় না পরিষ্কার করলে নয়।

ঘনরাম আর কাপিতান সানসেদোকে যমপুরীর মত এক গারদখানার কুঠরিতে বন্ধ অবস্থায় আমরা শেষ দেখেছিলাম।

নিজেদের মধ্যে হিংস্র মারামারি করার জন্যে প্রহরীরা তখন তাঁদের হাত-পা বেঁধেই কুঠুরীর দু ধারে ফেলে রেখেছে। সেখান

সকল ঋতুতে অপরিবর্তিত ও অপরিহার্য পানীয়

চা

কেনবার সময় 'অলকানন্দার' এই সব বিক্রয় কেন্দ্রে আসবেন

অলকানন্দা টি হাউস

৭, পোলক স্ট্রীট কলিকাতা-১

২, লালবাজার স্ট্রীট কলিকাতা-১

৫৩, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ কলিকাতা-১২

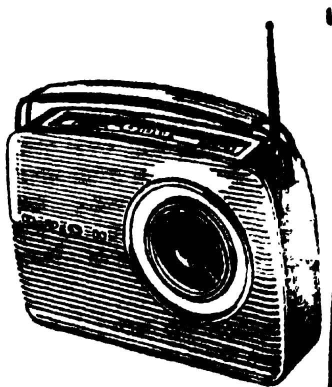
॥ পাইকারী ও খুচরা ক্রেতাদের অন্যতম বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান ॥

অনেক রকমের

রেডিও, রেডিওগ্রাম, রেকর্ড প্লেয়ার, রেকর্ড চেঞ্জার রেকর্ড রিপ্রডিউসর, গ্রামোফোন রেকর্ড, ট্রানজিসটর রেডিও, ও রেডিও-গ্রাম, টেপ রেকর্ডার, এমপ্লি-ফায়ার ইত্যাদি নগদ ও কিস্তিতে বিক্রি করা হয়।

মেরামতের সুবন্দোবস্ত আছে

ফোন : ২৪-৪৭১০



'ছন্দ' ট্রানজিসটর রেডিও।

রেডিও এণ্ড ফটো ষ্টোরস

৬৫নং গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

থেকে মুক্তি পেয়ে সেভিলের বন্দরে তাঁরা উদয় হলেন কি করে? কবরখানার মত যে কারাগারে একবার ঢুকলে আর জীবন্ত ছাড়া পাওয়া যায় না সেখান থেকে মুক্তি পাওয়াই ত অলৌকিক ব্যাপার। কেমন করে তা সম্ভব হল?

সে অলৌকিক ব্যাপার সম্ভব হয়েছে এক হিসাবে বলতে গেলে অতি সহজ একটি কৌশলে। কৌশল আর কিছু নয় মানুষের মনের একটি বিশেষ রিপুকে উস্কানি দেওয়া।

গারদখানার এক প্রহরী এক রাত্রে ঘনরাম আর সানসেদোর কুঠুরীর পাশ দিয়ে শেষ টহল দিয়ে যাবার সময় ফিস-ফিস কি আলাপ শুনে থমকে থেমে গিয়েছিল।

কি শুনে অমন চমকিত, বিস্মিত হয়েছিল সে পাহারাদার?

যা শুনেছিল তা সামান্য একজন প্রহরী কেন নেহাৎ সত্যকার সাধু-সন্ন্যাসী ছাড়া যে কোন সাধারণ মানুষের মাথা ঘুরিয়ে চক্ষু বিস্ফারিত করবার পক্ষে যথেষ্ট।

প্রহরী কাপিতান সানসেদো আর ঘনরামকে চুপি চুপি আলাপ করতে শুনেছে গুপ্তধন নিয়ে। স্বয়ং স্পেনের সম্রাটকে লুব্ধ চঞ্চল করে তুলতে পারে এমন গুপ্তধনের কাঁড়ি। এ গুপ্তধন আসলে সম্রাট পঞ্চম চার্লসেরই, আর জাহাজে মেক্সিকো থেকে আসবার সময় তা চুরি করে কাপিতান সানসেদো এমন গোপন জায়গায় লুকিয়ে পুঁতে রেখেছেন যে, তাঁর কাছে হদিস না পেলে হাজার বছরেও কেউ খুঁজে বার করতে পারবে না।

এই সব বিবরণের সঙ্গে ফিস-ফিস আলাপে প্রহরী কাপিতান সানসেদোর তীব্র আফশোষও শুনেছে। এত বড় কুবেরের ভাণ্ডার চিরকালের মত মাটির নিচেই পোঁতা থাকবে, দুনিয়ার কাউকে তার হদিস না দিতে পেরে এই গারদখানাতেই তাঁরা শেষ হয়ে যাবেন, সানসেদো আর ঘনরাম দুজনে এই দুঃখই করছেন।

নিজেদের ভোগে যখন নেই তখন কাউকে অন্ততঃ হদিসটা দিয়ে গেলে ক্ষতি কি।—বলেছেন এবার সানসেদো।

কিন্তু কাকে এ অনুগ্রহ করা যেতে পারে সে মীমাংসা কিছুতেই আর হয় নি। তা ছাড়া আর এক সমস্যার কথাও উঠেছে। হদিস ত শুধু মুখে বলে দিলেই হবে না, গুপ্তস্থানের মাপ-জোকের এমন শক্ত অঙ্ক আছে যা সেখানে গিয়ে না কষতে পারলে নয়। হদিস দিতে হলে আঁক-জোকে ভুল করবে না এমন কাউকে দিতে হয়। তা না হলে সব গুপ্ত সংকেতই বৃথা।

হদিস, যদি দিতেই হয় তাহলে কাকে দেওয়া যায় সে আলোচনা এবার প্রহরী



রুদ্ধ নিঃশ্বাসে শুনেছে। প্রহরীদের কাউকেই এ সৌভাগ্য যে দেওয়া উচিত এ বিষয়ে একমত হতে শোনা গেছে দুজনকেই। মতভেদ হয়েছে শুধু কোন প্রহরী এ হদিস পাবার যোগ্য তারই বিচার নিয়ে।

উৎকর্ণ হয়ে যে প্রহরী তাঁদের কথা শুনছে ঘনরাম তারই নাম করছেন প্রথমে। সানসেদো তাতে সায় দেন নি। সকাল থেকে দিনেরবেলা যে তাঁদের পাহারায় থাকে সে-ই তাঁর মতে গুপ্তধন পাবার যোগ্য।

দুজনে এবার নিজের নিজের বাছাই নিয়ে ওকালতি শুরু করেছেন।

ঘনরাম রাত্রের পাহারাদারের হয়ে লড়েছেন। লোকটা খুব খারাপ নয়। তার ওপর সারা জীবন এই গারদখানায় কয়েদীদের সঙ্গে একরকম বন্দী হয়েই কাটিয়ে বুড়ো হতে চলেছে। সাত রাজার ধন পেয়ে জীবনের বাকী কটা দিন তারই সুখভোগ করার সুবিধে পাওয়া উচিত।

সানসেদো তীব্র প্রতিবাদ করেছেন নিজের প্রৌঢ়ত্ব যেন ভুলে গিয়ে।

বুড়োর আবার সুখভোগ কি! তার ত জীবন ফুরিয়েই এসেছে। দিনে যে পাহারায় থাকে সে জোয়ান। রাজার ঐশ্বর্য তারই পাওয়া উচিত। পেলে সে তার মান রাখতে পারবে।

মান রাখবে, না যত রকম বদখেয়ালে উড়িয়ে-পুড়িয়ে দেবে।—ঘনরাম গলা তার খুব চাপা না রেখে বলেছেন,—জোয়ানদের হাতে টাকা মানেই পাপের প্রশ্রয়।

তাতে হয়েছে কি!—সানসেদোও জ্বলে উঠেছেন,—মঠে গীর্জায় দেবার জন্যে ত এ গুপ্তধন নয়, এ স্ফূর্তি করবার টাকা জোয়ানকেই আমি দেব। আসলে গুপ্তধন ত আমার। আমার যাকে খুশি আমি হদিস দিয়ে যাবো।

তাই দিন। বিদ্রূপে বলেছেন ঘনরাম,—দেখুন কেমন হদিস দিতে পারেন। হদিস লেখা কাগজ আছে আপনার কাছে?

নেই মানে। — সানসেদো অস্থির হয়ে উঠেছেন, — আমার জামার হাতায় তা সেলাই করে রাখা আছে।

আছে নয়, ছিল। আপনি ঘুমোবার সময় জামার সেলাই খুলে তা আমি বার করে নিয়েছি।—ঘনরাম হিংস্রভাবে হেসেছেন—আর এমন জায়গায় রেখেছি সারা কুঠুরি ভেঙে খুঁড়েও তার খোঁজ পাবেন না।

তুই বার করে নিয়েছিস? মিথ্যে কথা। —সানসেদের ব্যাকুল হয়ে গায়ের জামা খুলে পরীক্ষা করার শব্দ শোনা গেছে।

তারপর চিৎকার করে গালাগাল নিয়ে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছেন ঘনরামের ওপর।

অন্ধকারে ঘনরামেরও পাল্টা গালাগাল আর দুজনের ধস্তাধস্তি শোনা গেছে।

সে গোলমালে অন্য প্রহরীরাও আলো নিয়ে ছুটে এসে দুজনকে আলাদা করে যখন দু দিকে বেঁধে রেখেছে তখনও মুখের আস্ফালনের তাঁদের কামাই নেই।

সে মুখের লড়াই অবশ্য বেশীক্ষণ চলে নি। ক্লান্ত হয়েই দুজনকে বুঝি থামতে হয়েছে।

তাদের কুঠুরী সেই থেকে একেবারে নিস্তব্ধ।

দিন দুই বাদে সে কুঠুরি শুধু নিস্তব্ধ নয়, সকাল হবার পর একেবারে ফাঁকাই দেখা গেছে। কুঠুরির দরজার তালা খোলা। ভেতরে দুজনের কেউ নেই। সঙ্গে সঙ্গে গারদখানার দুজন প্রহরীও উধাও।

(ক্রমশঃ)

প্রেমের জীবনস্বত্ব ॥

বিষ্ণু দে

সূর্যাস্তের ইন্দ্রধনু আবার যেন বা কোনও পার্থ ধরে
সূর্যোদয়ে উপমা প্রত্যহ
দেখি আর ভাবি এই ন্যায়যুদ্ধে স্বার্থ আর অনর্থ অম্বরে
অনন্ত ব্যাপ্তিতে পায় আরোহী ও অবরোহী-উত্তরণ,
কিবা রাত্রি কিবা দিন বারোমাস্যা অহরহ।

ঘৃণার স্বরূপ দেখি সর্ববস্ত্রহরণের পর্বে পর্বে,
অথচ প্রেমের রাত্রে শুকতারায় প্রতিভাত হয় মর্ত্য।
হে পৃথিবী! দৈনিক তোমার সত্যে জীবনযাত্রার গর্বে
প্রেম পায়, যা সে চায়, চিরকাল প্রেমের জীবনস্বত্ব,
সুখবহ দুঃখসহ, প্রেয়সী! তোমায়।।

রাজেশ্বরী ॥

কমলেশ চক্রবর্তী

হঠাৎ বেজে উঠলো শেষ ভীষণ ঘন্টাধ্বনি
পথের পাশে প্রস্ফুটিত তোমার আবির্ভাব
বিপুল নয়ান আচম্বিতে রটায় ক্ষণেক্ষণে
অনেকদিনের নিশীথিনী মলিন পরিহাস,

যখন তুমি যেতে যেতে চমকে গ্রীবা তুলে
ভুবন জয়ের ইচ্ছা তোমার অলস অবহেলায়
চতুর্দিকে ফুটে ওঠে গ্রীবার পরিমলে
তখন আমি তোমায় আমি তখন ভালোবাসি,

তখন আমি তোমায় আমি প্রতীক তুলনীয়
ভেবেছিলাম রাজেশ্বরী তোমার প্রিয় মালা
তোমার আকাশ সকল আলো সকল প্রণয়বাণী
অনেকদিনের ব্যথার স্মৃতি অলস অনুরাগ,

চতুর্দিকে ঝলসে ওঠে ক্ষুব্ধ সজল ঈর্ষা
ক্ষণপ্রভা খেলে বেড়ায় আকুল চিকন কেশে
লুব্ধ হাতে আগুন জ্বালো দিকবিদিকে শূন্যে
আমার ভুবন হৃদয় তবু মৃত্যু ভালোবাসে।

দেশে বিদেশে

কংগ্রেসের বিকল্প?

দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল হিসেবে কংগ্রেসের অস্তিত্ব যদিও এখনো অবিসম্বাদী, তবু এই প্রশ্ন প্রায়ই উঠছে : কংগ্রেসের বিকল্প কে? কারণ গত সাধারণ নির্বাচনের পর কংগ্রেসের এক-শিলা ক্ষমতার ভিত্তিতে বেশ একটা ফাটল দেখা গেছে এবং একাধিক রাজ্য থেকে কংগ্রেস ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে।

সুতরাং কংগ্রেসের এখন পড়তির মুখ এটা অনেকেই ধরে নিয়েছেন। কিন্তু কংগ্রেসের বিকল্প হতে পারে এমন দল কোথায়? কম্যুনিস্ট দল? তা সম্ভব নয়, কেননা সাধারণ নির্বাচন এটাও প্রমাণ করেছে যে, দেশের লোক অ-কংগ্রেসী হতে পারে কিন্তু কম্যুনিস্ট মোটেই নয়। সুতরাং কংগ্রেস ও কম্যুনিস্টের মাঝে যে রাজনৈতিক দলগুলি আছে, বর্তমান পরিস্থিতিতে তাদেরই বিকাশের পথ প্রশস্ত যদি অবশ্য তারা অবস্থার সুযোগ নিতে পারে।

গত সপ্তাহে অন্তত তিনটি রাজনৈতিক দল এ-সম্পর্কে তাদের চিন্তাধারার কথা ব্যক্ত করেছে। কালিকটে ভারতীয় জনসংঘের, গয়ায় সংযুক্ত সোস্যালিস্ট দলের ও কানপুরে প্রজা সমাজতন্ত্রী দলের বাৎসরিক সম্মেলনে যে-সব প্রস্তাবাদি নিয়ে আলোচনা হয়েছে তাতে কংগ্রেসের বিকল্প হিসেবে নিজেদের গড়ে তোলার আগ্রহ সুস্পষ্ট।

এদের মধ্যে পরিবর্তিত অবস্থার সবচেয়ে বেশি সুযোগ নেবার আগ্রহ দেখা গেছে ভারতীয় জনসংঘের। এই দলের এতদিন এমন একটা গোঁড়া, উগ্র জাতীয়তাবাদী ও সাম্প্রদায়িক চরিত্র ছিল যা জনসাধারণের কাছে এই দলকে মোটেই গ্রহণীয় করে তোলেনি। বরং ভাষা, গো-হত্যা নিবারণ ইত্যাদি কয়েকটি প্রশ্নে এই দলের উগ্র মনোভাবের দরুণ এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে অনেকেরই গভীর সংশয় ছিল।

কালিকটে এই চরিত্রের মধ্যে একটা লক্ষনীয় পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এখানে এসে দেখা যাচ্ছে দলের উগ্রতা এখন অনেকখানি কম, সুর অনেকখানি নরম। জনসংঘ এটা ধরে নিয়েছে যে, কংগ্রেসের পড়তির ফলে যে শূন্যতা সৃষ্টি হতে চলেছে সেই শূন্যতা তার সামনে নিজের প্রভাব বিস্তারের একটা সুযোগ এনে দিয়েছে। ২৮ ডিসেম্বর দলের চতুর্দশ বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধনী দিনে প্রেসিডেন্ট শ্রীদীনদয়াল উপাধ্যায়ের ভাষণের মূল সুরই ছিল এই যে, জনসংঘ কংগ্রেসের বিকল্প হতে চলেছে।

এই সুযোগ গ্রহণ করতে হলে তাকে কিছু প্রশ্নে নমনীয় হতে হবে বইকি।

এমনি একটি প্রশ্ন হল ভাষার প্রশ্ন। জনসংঘ হিন্দীর গোঁড়া সমর্থক এটাই প্রচলিত ধারণা এবং এতদিন এটাই সত্য ছিল: এই প্রশ্নে একটা আপোষের লক্ষণ দেখা গেল ৩০ ডিসেম্বর গৃহীত এক প্রস্তাবে। তাতে বলা হল স্বেচ্ছায় গ্রহণের ভিত্তিতেই হিন্দীকে গড়ে উঠতে হবে। একই সঙ্গে বলা হল, কোন জনগোষ্ঠীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার ওপর ইংরেজী চাপিয়ে দেওয়া চলবে না। এই কথাই আরো স্পষ্ট করে বলেছিলেন শ্রীউপাধ্যায়। ইংরিজি বরাবর প্রভুত্ব করে যাবে, হিন্দী তার যোগ্য আসন পাবে না, জনসংঘ এই অবস্থা সহ্য করতে পারে না। সেই সঙ্গে এমন কোন ব্যবস্থাও গ্রহণ করা উচিত নয় যাতে অ-হিন্দীভাষী জনগণ অসুবিধায় পড়তে পারে। কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা আঞ্চলিক ভাষায় গ্রহণের সিদ্ধান্তকে শ্রীউপাধ্যায় স্বাগত জানিয়েছেন এবং বলেছেন চাকরীতে নিয়োগের ব্যাপারে কোন বিশেষ একটি ভাষার জ্ঞান থাকা আবশ্যিক করা উচিত নয়। শ্রীউপাধ্যায় সংশোধিত ভাষা বিলকেও সন্তোষজনক মনে করেন না।

এমন কি সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন, যে প্রশ্নে জনসংঘের মনোভাব এতদিন অত্যন্ত প্রখর ছিল, সেই প্রশ্নেও দলের চিন্তাধারায় এখন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। ৩১ ডিসেম্বর সম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশনে ভাষণ দিতে উঠে শ্রীউপাধ্যায় স্পষ্টই বলেছেন, যাঁরা বলেন মুসলমান মানেই বিজাতীয় তিনি তাঁদের সঙ্গে একমত নন। তিনি বলেন মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই আছেন যাঁরা উদার ও জাতীয়তাবাদী মনোভাবাপন্ন। জনসংঘ যদি এঁদের জন্যে তার দরজা খুলে না দেয় তাহলে এঁরা কোথায় যাবেন?

শ্রীউপাধ্যায় বলেন, জনসংঘ এমন একটি দল যেখানে সকলেই সমান সম্মানের অধিকারী। তিনি বলেন, এমনকি যুবকেরাও অধিক সংখ্যায় এই দলে যোগ দিচ্ছে। গত নির্বাচনে নতুন ভোটারদের মধ্যে শতকরা ৬০ জনই জনসংঘকে ভোট দেয়।

জনসংঘের পক্ষে নিজেকে সর্বভারতীয় দল হিসেবে জাহির করতে চাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু শ্রীউপাধ্যায় যা-ই বলুন, জনসংঘের মধ্যে এখনও এমন অনেকে আছেন গোঁড়া হিন্দীয়ানাই যাঁদের চিন্তাধারার নিয়ামক। এঁদের প্রভাব কতটা নিয়ন্ত্রিত রাখা যাবে তার ওপরেই এই দলের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

অন্যদিকে এস-এস-পি জনসংঘের মতুন নমনীয়তার সুযোগ পুরোপুরি গ্রহণ করবার জন্যে তৎপর। তার কণ্ঠস্বর আরো উঁচু গ্রামে বাঁধা। এস-এস-পি যদিও চায় অহিন্দীভাষী রাজ্যগুলিকে অন্তত কিছু-কালের জন্যে ইংরিজী ব্যবহার করতে দেওয়া উচিত, তবু তার হিন্দী-প্রেমের উগ্রতা তাতে ঢাকা পড়েনি। বরং এই দল একই ঢিলে হিন্দীভাষীদের মনোরঞ্জন ও কংগ্রেসকে এক হাত নেবার চেষ্টা করেছে এই বলে যে, কংগ্রেস সরকারের ভুল নীতির জন্যেই লোকে আজ হিন্দী মেনে নিতে চাইছে না।

প্রকৃতপক্ষে সংযুক্ত সোস্যালিস্ট দলের সম্মেলনের আগাগোড়া কংগ্রেস-বিরোধিতার সুরটিই প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে এবং কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে দলকে প্রতিষ্ঠিত করার কার্যক্রমই পার্টির ভবিষ্যৎ কার্যক্রম হিসেবে গৃহীত হয়েছে। ২৮ ডিসেম্বর পার্টির চেয়ারম্যান শ্রী এস এম যোশী বলেন, ভারতের অবস্থা আজ শুধু সংকটজনকই নয়, বিস্ফোরক। দুর্নীতি সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। অনগ্রসর শ্রেণীগুলি আগের মতই তথাকথিত অগ্রসর শ্রেণীর হাতে লাঞ্ছিত হচ্ছে।

শ্রীযোশী বলেন, এই "অন্যায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার" বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ বিদ্রোহ করা অত্যাবশ্যক। কেবল বিচ্ছিন্ন কয়েকটি প্রশ্ন নিয়ে আন্দোলন করলেই হবে না, সমস্ত প্রশ্নকে একত্রিত করে সংঘবদ্ধ আন্দোলন চালাতে হবে যাতে কেন্দ্র থেকে কংগ্রেসকে হটানো যায়।

১ জানুয়ারী এক প্রস্তাব গ্রহণ করে এই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ১২ দফার একটি দাবী-সনদ পেশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে এই দাবীগুলি যদি অবিলম্বে পূরণ করা না হয় তাহলে দেশব্যাপী আন্দোলন আরম্ভ করা হবে।

দাবীগুলির মধ্যে আছে, মাথাপিছু মাসিক ব্যয়ের পরিমাণ দেড় হাজার টাকায় বেঁধে দিতে হবে, ব্যাংক, সাধারণ বীমা ও বৈদেশিক বাণিজ্য জাতীয়করণ করতে হবে, রাজন্যবর্গের ভাতা বন্ধ করতে হবে, দুর্নীতি ও কালো টাকা উচ্ছেদ করতে হবে, অবৈধ কার্যকলাপ (নিরোধ) আইন ও ভারত রক্ষা আইন প্রত্যাহার করতে হবে,

গৌরাঙ্গ ভৌমিকের প্রবন্ধ গ্রন্থ

সাহিত্য সরণী ৪·৫০

প্রবন্ধসূচী : (১) বাংলা সাহিত্যের উপক্রমণিকা; (২) বাংলা সাহিত্য ও হিন্দু বৌদ্ধযুগ; (৩) চর্যাপদ; (৪) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন; (৫) জয়দেব : বাঙালির কবি; (৬) বাইশ কবির মনসামঙ্গল; (৭) গোপীচন্দ্রের গান।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোচনা ৬·০০

এ্যাকাডেমিক্স, ৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১২

অনগ্রসর শ্রেণীগুলির জন্যে আরো বেশী চাকুরীর সংস্থান রাখতে হবে, দ্রব্যমূল্য সম্পর্কে একটা নির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করতে হবে।

এই নতুন উগ্রতার প্রভাবে এস-এস-পি ইতিমধ্যেই একটি সেমসাইড গোল দিয়ে বসেছে। এস-এস-পি মন্ত্রীরা উত্তর-প্রদেশের সংযুক্ত বিধায়ক দলের সরকার থেকে বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু এই নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী দলকে কতদূরে নিয়ে যেতে পারবে সেটা একটা বড় প্রশ্ন।

জনসঙ্ঘ ও এস-এস-পি, এই দুয়ের মাঝখানে আছে পি এস পি। "কংগ্রেসী অপশাসনের" অবসান ঘটানো পি-এস-পি'রও কাম্য। কিন্তু এই কাজে সামান্য দূর অগ্রসর হবার ক্ষমতাও তার নিজের নেই। সেই জন্যে ৩০ ডিসেম্বর কানপুরে জাতীয় কার্যনির্বাহক কমিটির বৈঠক থেকে সে সমাজবাদী ঐক্যের ডাক দিয়েছে। যদি এই পথে কিছুটা সুবিধা আদায় করা যায়।

হ্যানয়ের প্রস্তাব

ভিয়েৎনামের যুদ্ধ লাওস ও কম্বোডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ যুদ্ধের অবসান না হোক তীব্রতা শিথিল হবার একটা সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে।

গত ৩০ ডিসেম্বর উত্তর ভিয়েৎনামের উপ-প্রধানমন্ত্রী নুয়েন দুই ত্রিন সরকারীভাবে ঘোষণা করেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি উত্তর ভিয়েৎনামে বোমাবর্ষণ ও অন্যান্য সমস্ত জঙ্গী কার্যকলাপ বন্ধ রাখে তাহলে উত্তর ভিয়েৎনাম তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবে।

পাঁচদিন পরে প্যারিসে নিউইয়র্কের একটি রেডিও স্টেশনের সংবাদদাতার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় এই প্রস্তাবের কথা আরেকবার ঘোষণা করা হয়। সেই সঙ্গে হ্যানয়, লাওস, কাম্বোডিয়া ও বর্মার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে জানতে চেয়েছে প্রাথমিক শান্তি আলোচনার জন্যে ঐ দেশগুলি তাদের রাজধানী ব্যবহার করতে দিতে রাজী আছে কিনা।

অনুরূপ প্রস্তাব উত্তর ভিয়েৎনাম আগেও করেছিল। কিন্তু এবারের প্রস্তাবের বিশেষত্ব হল এই প্রস্তাব অত্যন্ত স্পষ্ট। 'আলোচনা হতে পারে' নয়, আলোচনা 'হবে'। তাছাড়া এবার হ্যানয় বোমাবর্ষণ স্থায়ীভাবে বন্ধের ওপরেও জোর দিচ্ছে না। দক্ষিণ ভিয়েৎনাম প্রসঙ্গে কোন প্রশ্নও এবার সে তুলছে না। সর্বদিক দিয়েই হ্যানয়ের মনোভাব এখন অনেক বেশী নমনীয়। এত বেশী যে, দক্ষিণ ভিয়েৎনামের প্রেসিডেন্ট নুয়েন ভ্যান থিউ পর্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, সত্যি হলে এই প্রস্তাব নিঃসন্দেহে উত্তম।

এখন সবকিছু নির্ভর করছে আমেরিকা এই প্রস্তাবে সাড়া দেবে কিনা। হোয়াইট হাউস থেকে ঘোষণা করা হয়েছে যে, প্রেসিডেন্ট জনসন প্রস্তাবটি বিবেচনা করে দেখছেন।

বৈষয়িক প্রসঙ্গ

ডলারের সংকট

নূতন বছরের প্রথম দিনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট লিন্ডন বেন্টন্ স্ জনসন তাঁর টেকসাসের খামারবাড়ীতে । কিন্তু সেখানে তিনি নিশ্চিন্ত

ন যযৌ, ন তস্থৌ!



অবকাশ যাপন করছিলেন না। অন্তত আন্তর্জাতিক লেনদেনের বাজারে মার্কিন ডলারের মানরক্ষার প্রশ্নটি যে তাঁর মাথায় ঘুরছিল তার প্রমাণ পাওয়া গেল তাঁর নববর্ষের একটি ঘোষণা থেকে। "ডলারকে বাঁচাবার জন্য" প্রেসিডেন্ট জনসন কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা ঘোষণা করলেন। এই ব্যবস্থাগুলির মধ্যে আছে ঃ—

(১) বিদেশে ডলার বিনিময়ের ব্যাপারে আমেরিকান কোম্পানীগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হবে। পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি ও দক্ষিণ আফ্রিকায় নূতন করে আর মূলধন রপ্তানী করতে দেওয়া হবে না। বৃটেন, ক্যানাডায় ও অস্ট্রেলিয়ায় ১৯৬৫ ও ১৯৬৬ সালে গড়ে প্রতি বছর যে পরিমাণ মার্কিন মূলধন রপ্তানী করা হয়েছিল এবছর তার ৬৫ শতাংশ পর্যন্ত রপ্তানী করতে দেওয়া হবে। ভারতবর্ষের ন্যায় উন্নয়নগামী দেশগুলির ক্ষেত্রে ঐ দুই বছরের গড়ের সমান মূলধনের অতিরিক্ত আরও দশ-শতাংশ পর্যন্ত ডলার লগ্নী করতে দেওয়া হবে। কুয়াইট, ইরাণ প্রভৃতির ন্যায় যেসব উন্নতিশীল দেশ তেল বিক্রী করে প্রচুর বিদেশী মুদ্রা পায় তারা মার্কিন মূলধনের ব্যাপারে বৃটেন, ক্যানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার সমপর্যায়ের দেশ বলে গণ্য হবে।

(২) বিদেশে ঋণ দেওয়ার ব্যাপারে মার্কিন ব্যাঙ্ক ও অর্থসংস্থাগুলির উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হবে।

(৩) আমেরিকান পর্যটকদের আগামী দু বছর পশ্চিম গোলার্ধের (অর্থাৎ উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার) বাইরে বেড়াতে না যাওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

(৪) বিদেশে আমেরিকান কোম্পানীগুলির অর্জিত অর্থ দেশে ফিরিয়ে আনা যায় কিভাবে সেবিষয়ে পরামর্শ আরম্ভ করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।

(৫) ইউরোপে মার্কিন সৈন্য মোতায়েন রাখার দরুণ যে খরচ হচ্ছে, সেটা কমান যায় কিভাবে সেবিষয়ে "ন্যাটো"র অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রগুলির সংগে আলোচনা করার জন্য দেশরক্ষাসচিব ও পররাষ্ট্রসচিবকে অনুরোধ করা হচ্ছে।

(৬) আমেরিকান পণ্যের রপ্তানী বাড়াবার চেষ্টা করা হবে।

(৭) মার্কিন ডলারের জন্য ২৫ শতাংশ পরিমাণ সোনা মজুত রাখার যে নিয়ম আছে সেই নিয়ম বাতিল করে দেওয়া হবে।

এইসব ব্যবস্থারই এক উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্যটি হচ্ছে, আন্তর্জাতিক লেনদেনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে বিরাট ঘাটতি হচ্ছে এবং যে ঘাটতি ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে সেটা কমান। প্রেসিডেন্ট জনসন ১৯৬৮ সালের ১ জানুয়ারী যেসব ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা ঘোষণা করলেন তাতে তার বৈদেশিক মুদ্রার ব্যয় বছরে ৩০০ কোটি ডলার পরিমাণ কমবে বলে অনুমান করা হয়েছে। এই অনুমান সত্য হলেও অবশ্য আমেরিকার ঘাটতি থেকে যাবে; কেননা এই ঘাটতির পরিমাণ এখন দাঁড়িয়েছে বছরে ৩৫০ কোটি থেকে ৪০০ কোটি ডলার। কিন্তু ডলারের উপর চাপ কিছুটা কমবে বলে আশা করা যায়।

জনৈক মার্কিন শিল্পপতি অবশ্য মন্তব্য করেছেন, "এটা যেন গোটাকয়েক পটি লাগিয়ে মারাত্মক আঘাতের চিকিৎসা করার মত।" প্রকৃতপক্ষে, ডলারের বর্তমান সংকট একটা গভীর অর্থনৈতিক ব্যাধির লক্ষণ। এবং পৃথিবীর সবচেয়ে সচ্ছল দেশের অর্থনীতি এই ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে, এটা মোটা আন্তর্জাতিক অর্থনীতির পক্ষেই কিছুটা উদ্বেগজনক।

যদি শুধু আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যে লেনদেনের দিক থেকে দেখা যায় তাহলে আমেরিকার অবস্থায় উদ্বেগের কিছুই নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিদেশ থেকে যে পরিমাণ পণ্য আমদানী করে তার মূল্য শোধ করেও সে তার রপ্তানী বাণিজ্যের আয় থেকে কিছুটা উদ্বৃত্ত পায়। কিন্তু আমদানী ছাড়াও অন্যান্য অনেক সূত্রে তাকে বিদেশে বহু অর্থ ব্যয় করতে হয়। ইউরোপে সৈন্য মোতায়েন রাখার খরচ একটা বড় দায়। ভিয়েতনামের যুদ্ধ চালাতে যে অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে তাতে থাইল্যান্ড, ফরমোজা, দক্ষিণ কোরিয়া প্রভৃতি দেশ ফেঁপে উঠছে, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি বাড়ছে। মার্কিন পর্যটকরা প্রতি বছর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কোটি কোটি টাকা খরচ করছেন। আমেরিকান কোম্পানীগুলি প্রতি বছর বিদেশে অর্থ লগ্নী করছে এবং মার্কিন সরকার পৃথিবীর দরিদ্র দেশগুলিকে অর্থনৈতিক সাহায্য দিচ্ছেন। এইসব বাবদেই আন্তর্জাতিক লেনদেনে আমেরিকার ঘাটতি বাড়ছে।

তার উপর সম্প্রতি আবার একদিকে "ইউরোপের বারোয়ারী বাজার"-এর অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রগোষ্ঠী এবং অন্যদিকে বৃটেন ও আমেরিকার মধ্যে "বাজারের লড়াই" তীব্র হচ্ছে। ফ্রান্স, হল্যান্ড, জার্মানী প্রভৃতি দেশের বহির্বাণিজ্যে উদ্বৃত্ত আয় হচ্ছে, তবুও তারা শুল্কের দেওয়াল উঁচু করে তুলে আমেরিকান ও বৃটিশ রপ্তানী কমাবার চেষ্টা করছে।

এর ফলে কিছুকাল যাবৎ আমেরিকার মজুত সোনার উপর চাপ পড়ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রতি আউন্স ৩৫ ডলার (অর্থাৎ প্রতি ভরি প্রায় ১০৮ টাকা) দরে সোনা কেনাবেচা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের আমল থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেই প্রতিশ্রুতি পালন করে আসছে। বলতে গেলে, সোনার এই দর বজায় রাখার ক্ষমতার উপরই ডলারের মান (উভয়ার্থে) ও, প্রকারান্তরে, সমগ্র ধনতান্ত্রিক জগতের আন্তর্জাতিক লেনদেনের বাজারে স্থিরতা নির্ভর করছে। কেননা, আন্তর্জাতিক লেনদেনে বৃটিশ স্টার্লিং ও মার্কিন ডলার, এই দুটি মুদ্রার মর্যাদাই সবচেয়ে বেশী। যে রাষ্ট্রের বৈদেশিক মুদ্রার ভান্ডারে এই দুটি মুদ্রার সঞ্চয় সবচেয়ে বেশী সেই রাষ্ট্রই সবচেয়ে সচ্ছল বলে গণ্য হয়। ডলারের হিসাবে সোনার দাম যদি বেড়ে যায় তাহলে বিভিন্ন দেশের বৈদেশিক মুদ্রার ভান্ডারে সঞ্চিত ডলারের স্বর্ণমূল্য কমে যাবে। এতে তাদের লোকসান।

অথচ এদিকে দুনিয়ার বাজারে সোনার চাহিদা যেরকম বাড়ছে তাতে এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষেও সোনার দাম স্থির রাখা কঠিন হয়ে পড়ছে। এই চাহিদা বৃদ্ধির মুখ্য কারণ হল, আন্তর্জাতিক লেনদেনে যুক্তরাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান ঘাটতির দরুন যারা ডলারের বহির্মূল্যের উপর আর আস্থা রাখতে পারছে না তারা ডলারের সঞ্চয় সোনায় পরিবর্তিত করে নেওয়াই অধিকতর লাভজনক মনে করছে। দ্বিতীয় আর একটি গৌণ কারণও অবশ্য আছে। সেটা হচ্ছে এই যে, গহনার জন্যও ইলেকট্রিক ও অন্যান্য শিল্পের জন্য সোনার প্রয়োজন বেড়ে গেছে। সোনার এই বাড়তি চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে ফোর্ট নকস-এ মজুত আমেরিকান সোনার ভান্ডার ফতুর হবার উপক্রম। গত ৩ জানুয়ারী তারিখের মার্কিন ট্রেজারি বিভাগের একটি বিবৃতিতে প্রকাশ যে, ১৯৫৮ সালে যেখানে আমেরিকার মজুত সোনার পরিমাণ ছিল ২০০০ কোটি ডলার সেখানে এখন মজুত সোনার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৩০০ কোটি ডলার।

সোনার উপর এই চাপ চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছয় গত ১৮ নভেম্বর তারিখে বৃটিশ পাউন্ডের বাট্টার হার ১৪·৩ শতাংশ হ্রাস করার পর থেকে। বৃটিশ পাউন্ডের বাট্টা হ্রাস বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেনের বাজারে একটা প্রচন্ড অস্থিরতার আবহাওয়া সৃষ্টি করে। বৃটিশ পাউন্ডের পর মার্কিন ডলারের পালা—এই গুজব ছড়িয়ে পড়ে। আতংকিত কারবারীরা সোনা কিনে মজুত করতে থাকেন। এই চাপের ফলে লন্ডনের সোনার বাজারে যেখানে পাউন্ডের অবমূল্যায়নের আগে যেখানে দিনে সোনার নীট বিক্রীর পরিমাণ ৩০।৪০ টনের বেশী ছিল না সেখানে একমাত্র ২৩ নভেম্বর তারিখে নীট ১০০ টন সোনা বিক্রী হয়ে গেল। বৃটিশ পাউন্ডের অবমূল্যায়নের এক মাসের মধ্যে লন্ডনের সোনার বাজারে ৭৪ কোটি ডলার মূল্যের সোনা বিক্রী হয়ে গেল।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই গত ১ জানুয়ারী প্রেসিডেন্ট জনসন ডলার রক্ষার কর্মসূচী ঘোষণা করলেন।

বিস্মৃত সাংবাদিক

কমল চৌধুরী

ঊনিশ শতকের তিরিশ ও চল্লিশ দশকে বাংলাদেশের সমাজ-জীবনে এক প্রবল ভাঙন সৃষ্টি হয়। হিন্দু সমাজের সমস্ত শ্রেণীতেই খৃষ্টধর্ম গ্রহণের একটি সাড়া পড়ে যায়। এদের নেতা ছিলেন পাদ্রী আলেকজাণ্ডার ডফ। সুশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত হিন্দু যুবকরা খৃষ্টধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। মহেশচন্দ্র ঘোষ, গুরুদাস মৈত্র, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির ধর্মগ্রহণ নিয়ে আলোড়ন কম হয়নি। পাথুরিয়াঘাটার প্রসন্নকুমার ঠাকুরের একমাত্র পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি কৃষ্ণমোহনের কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। উমেশচন্দ্র সরকার সস্ত্রীক খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি পালিয়ে মিশনারীদের আশ্রয়ে গিয়েছিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন : "ইহা লইয়া হিন্দু-সমাজ মধ্যে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি ব্রাহ্ম-সমাজের অগ্রণীগণও এই আবর্তে পড়িয়া খৃষ্টীয়-বিরোধী দলের অগ্রণী হইয়া দাঁড়ান। কলিকাতার ভদ্র-গৃহস্থগণ এক মহাসভা করিয়া অনেক টাকা সংগ্রহ করেন। হিন্দু-হিতার্থী বিদ্যালয় নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং কিছুদিন মহা উৎসাহে তাহার কাজ চলিতে থাকে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাহার প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হন। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি যে, উক্ত বিদ্যালয়ের জন্য সংগৃহীত টাকা যাঁহাদের হস্তে গচ্ছিত ছিল, তাঁহাদের কারবারে ক্ষতি হওয়াতে ঐ সমুদয় টাকা নষ্ট হয়, তাহাতেই কয়েক বৎসর পরে ঐ বিদ্যালয় উঠিয়া যায়।" যুব-সমাজের মধ্যেকার এই আলোড়ন প্রতিরোধ সম্ভব হয়নি। কারণ, ইতিমধ্যে হিন্দু কলেজের বহু বিখ্যাত ছাত্র খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে।

রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ-সমাজ গ্রন্থে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন :

"১৮৩১ সালে বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর Reformer 'রিফরমার' নামে এক সংবাদ-পত্র বাহির করেন; তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া উক্ত বৎসরের মে মাসে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় Inquirer নামে এক কাগজ বাহির করেন। এই কাগজ তৎকালোচিত রীতি অনুসারে হিন্দুধর্ম ও হিন্দু-সমাজের প্রতি কটূক্তি বর্ষণ করিতে ত্রুটি করিতেন না। এই হিন্দুধর্ম ও হিন্দুজাতি-বিদ্বেষ তাঁহার অন্তরে বহুদিন ছিল।"

এই হিন্দুধর্ম বিদ্বেষের অন্য কারণও ছিল। কৃষ্ণমোহন ছিলেন ডিরোজিওর ছাত্র এবং আকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের একজন নেতা। এ সভার অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, রাধানাথ শিকদার, মাধব মল্লিক, গোবিন্দচন্দ্র বসাক, শিবচন্দ্র দেব। বলা যায় এটি ছিল স্বাধীন চিন্তার আলোচনাক্ষেত্র। হিন্দুধর্মের গোঁড়ামি, পৌত্তলিকতা নিয়ে আলোচনা হোত। মনের দিক থেকে হিন্দু-ধর্মের গোঁড়ামী ও কুসংস্কার-বিরোধী মানুষ। ডফ সাহেবের ধর্ম আলোচনায় বন্ধু-বান্ধবসহ যোগদান করতেন। এই সময় একটি ঘটনা ঘটে। কৃষ্ণমোহনের অনুপস্থিতিতে তাঁর বাড়ীতে বসে মুসলমানের দোকানের মাংস ও রুটি খান তার কয়েকজন বন্ধু। গোমাংস ভক্ষণ করা হয়েছে বলে প্রতিবেশীরা অভিযোগ করেন। দোষীর বিচার হয়ে গেল। কৃষ্ণমোহন যদিও তখন বাড়ীতে ছিলেন না। তবুও তাকে বাড়ী থেকে বের করে দেওয়া হোল। সেই রাত্রিতে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে ছিলেন। তারপর ভেসে বেড়াতে থাকেন এবং দ্বিগুণ উৎসাহে এনকোয়ারার সম্পাদনা শুরু করেন। ১৮৩২, ১৭ আগস্ট খৃষ্টধর্মে দীক্ষা নিলেন। তারপর থেকে কৃষ্ণমোহনের জীবন অগ্রগতির সোপানে গাঁথা। মনে হয় আত্মীয়স্বজনের ব্যবহারের জন্য কৃষ্ণমোহনের হিন্দুধর্ম বিদ্বেষ আরো প্রবল হয়ে উঠেছিল। প্রথমদিকে বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে রাস্তায় খৃষ্টধর্ম বিরোধী প্রচার করতেন। পাদ্রীদের দেখে বিদ্রূপ করতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি।

'এনকোয়ারার' ছিল ইয়ং বেঙ্গলের মুখপত্র। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এই পত্রিকাটি প্রকাশ করেন ১৮৩১ খৃঃ ১৭ মে। তখন তার বয়স ছিল মাত্র আঠার বৎসর। হিন্দুধর্মের গোঁড়ামীর প্রতি তীব্র আঘাত হেনেছিল 'এনকোয়ারার'। সেকালের সামাজিক প্রথা অন্যায় আচরণ নিয়ে কৃষ্ণ-মোহন বহু আলোচনা করেছিলেন। রাজ-নীতি এবং শিক্ষা একটা প্রধান স্থান অধিকার করেছিল। সতীদাহ নিবারণের জন্য কৃষ্ণমোহন বলিষ্ঠ কণ্ঠে আবেদন জানিয়েছিলেন। সেকালের শিক্ষা ব্যবস্থা, সামাজিক অনাচার, সনাতনপন্থীদের চিন্তা-দৈন্য নিয়ে আলোচনা হোত। হিন্দু কলেজের অল্পবয়স্ক ছাত্ররাই ছিল এই পত্রিকার নিয়মিত লেখক।

মাত্র চার বৎসর বেঁচেছিল; অর্থাৎ ১৮৩৫ খৃঃ ১৮ জুন পর্যন্ত পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়।

সমাচার চন্দ্রিকায় ১৮৩১ খৃঃ ১৬ মে প্রকাশিত হয় :

"নূতন সংবাদপত্র।—আড়পুলি নিবাসী শ্রীযুত রামজয় বিদ্যাভূষণ ভট্টাচার্যের দৌহিত্র শ্রীযুত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি হিন্দু কলেজে শিক্ষিত হইয়া এক্ষণে ডেবিড হ্যার সাহেবের স্কুলের গুরুমহাশয় হইয়াছেন, তাঁহার পত্রদ্বারা আমরা জ্ঞাত হইলাম তিনি 'ইনকোয়েরর' নামক এক সমাচার পত্র প্রকাশ করিবেন ঐ পত্র প্রতি সোমবারে প্রকাশ হইবেক এমত জ্ঞাত হইয়াছি......।"

সংবাদ কৌমুদী থেকে সমাচারদর্পণ ১৮৩১ খৃঃ ২৮ মে উদ্ধৃত করেঃ "গত ১৭ মে অবধি ইনকোয়েরের নামে ইঙ্গ-লণ্ডীয় ভাষায় সম্বাদপত্র এতদ্দেশীয় সু-শিক্ষিত অল্প বয়স্কেদের দ্বারা প্রকাশারম্ভ হইয়াছে, তন্মধ্যে শ্রীযুত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যো-পাধ্যায় প্রধান সম্পাদক হন, তৎপত্রের ভূমিকার শেষভাগ অবলোকনে আমরা বোধ করিলাম যে, পত্রের প্রথমভাগের লিখিত সম্পাদকের স্বীয় উক্তি ব্যতীত প্রায় সমুদয় তৎপত্রস্থিত বক্তৃতা এতদ্দেশীয় হিন্দু বালকেরদের দ্বারা রচিত হইয়াছে এবং বয়স্কেরদের বয়ঃক্রম চতুর্দশ বা পঞ্চদশ বৎসরের ঊর্দ্ধ নহে ইহাতে আমরা অবশ্যই আহ্লাদিত হইলাম এবং তাঁহারদের এতাবৎ অল্প বয়সে যে এরূপ বিদ্যা জন্মিয়াছে ইহাতে বিশেষ অনুরাগ করিলাম।"

১৮৩১ খৃঃ ৪ জুন সমাচারদর্পণ লেখে : "সংপ্রতিকার হিন্দু কালেজের ছাত্র শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত ইঙ্গরেজী ভাষায় ইনকোয়েরর নামে প্রথম সংখ্যক সম্বাদপত্র এই সপ্তাহে আমরা প্রাপ্ত হইলাম। ঐ অনুপম বিদ্যা-লয়েতে যে ঈদৃশ শুভ ফল জন্মিতেছে, তাহাতে আমরা অতি হৃষ্টচিত্ত হইলাম। ইঙ্গলণ্ডীয়েরা যেমন স্বভাষা অভ্রান্তরূপে সংগ্রহপূর্বক লেখেন তদ্রূপ ঐ বাবু যে তদ্ভাষাবিন্যাস করিবেন তাহা প্রায় সম্ভব হয় না কিন্তু যাহা তিনি লিখিতেছেন তাহাতে যে চুক সে যৎকিঞ্চিৎমাত্র। এবং তাঁহার লিখিত সদ্ভাববিশিষ্ট অতএব তদ্দ্বারা যে তাঁহার অধিক কৃতকার্যতা ও লোকেরদের উপকার ও গ্রাহক বৃদ্ধি হয় আমারদের সতত এতদ্রূপ বাঞ্ছা।"

কৃষ্ণমোহনের ইংরেজি রচনারীতি সেকালে প্রশংসিত হয়েছিল। বিভিন্ন আলোচনা থেকে তাঁর রচনারীতি, ভাষা বিন্যাস, চিন্তার সুগ্রথিত প্রকাশ বিশেষ-ভাবে চোখে পড়ে। রামমোহন রায়ের আত্মীয় সভা, ইয়ং বেঙ্গলের অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন এবং সনাতনপন্থী হিন্দুদের ধর্মসভা এবং উদারপন্থীদের তত্ত্ববোধিনীসভা সেকালে সমাজ-জীবনে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এর মধ্যে ধর্মসভা এবং ইয়ং বেঙ্গলের বিরোধ জমেছিল সব থেকে বেশি। কিন্তু ধর্মসভা শেষ পর্যন্ত লড়াই চালাতে পারেনি।

ধর্মসভা ও ইয়ং বেঙ্গলের মতবিরোধ সম্পর্কে এনকোয়ারার-এ প্রকাশিত হয়েছিল

Persecution is high, for we have deserted the shrine of Hinduism. The bigots are violent because we obey not the calls of superstition. Our conscience is satisfied, we are right, We must persevere in our career. If opposition is violent and insurmountable, let us rather aspire to martyrdom than desert a single inch of the ground we have possessed. Conspiracies are daily formed to hurt us in every possible way. Circulars stuffed with falsehoods have been issued to defame our character; and all cruelties which the rage of malice and the heat of fanaticism can invent, have been planned to be exercised upon us But we will stand persecution. A people can never be reformed without noise and confusion: the absurd prejudices of the Hindus can never be eradicated without violent persecution against the reformers We have undertaken this task".

এই সময়ের বিখ্যাত পত্রিকা সংবাদ প্রভাকরের সম্পাদক ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। তিনি ইয়ং বেঙ্গলদের বিরুদ্ধেই শুধু নয়, নানারকম প্রগতিমূলক আন্দোলনের ছিলেন প্রবল বিরোধী। নানান ব্যঙ্গাত্মক রচনায় ভরে উঠেছিল তাঁর পত্রিকা। এনকোয়ারার পত্রিকায় এই সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল :

The Probhakur has brought himself to the notice of the public by the indecencies his columns abound with, and his intemperate abuses against the Liberal Party. His example has fired others with a desire of gaining the same influence among the orthodox community pursuing the track he has pointed out....we do not know what terms to use in our notice of these people. The absurdities they advocate prevent us from being serious with them: The indecencies they bring forward disarm us and render us incapable of handling them....we patiently look out for the day when they will tire themselves and their readers, and fall off from their vulgarisms"

১৮৩৪ খৃঃ ওদেশের শিক্ষা সংস্কার নিয়ে তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। এর সঙ্গে এনকোয়ারার জড়িয়ে পড়েছিল। শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে তখন সংস্কৃত আরবী ও ফারসী প্রচলিত ছিল। এর স্থানে ইংরেজি প্রবর্তিত হবে। তাহলে পাশ্চত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে সহজেই জ্ঞান লাভ সম্ভব। আর একদল দাবী করে ইংরেজির সঙ্গে মাতৃভাষাও রাখতে হবে। কৃষ্ণমোহন ছিলেন এই দলে। এনকোয়ারারে এ নিয়ে তিনি বলিষ্ঠ ভাষায় আন্দোলন সৃষ্টি করেছিলেন।

১৮৪০ খৃঃ 'গভর্ণমেণ্ট গেজেট' প্রকাশিত হয়। এই সরকারী পত্রিকাটির সম্পাদনা ভার কিছুকাল লালবিহারীর ওপর ছিল। ১৮৫২ খৃঃ ১৭ নভেম্বর 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় লেখেঃ 'আমাদিগের পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিবেক কিয়দ্দিন গত হইল পরম্পরায় অবগত হইয়া প্রকাশ করা গিয়াছিল রেবেরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মার্সমেন সাহেব ইংলণ্ড যাত্রা করিলে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট গেজেট নির্বাহের ভারপ্রাপ্ত হইবেন সংপ্রতি নিশ্চয় অবগত হওয়া গেল গবর্ণমেণ্টের আদেশে উক্ত রেবেরেণ্ড মহাশয় ঐ বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত হইয়াছেন।"

কৃষ্ণমোহন সম্পাদিত 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' ছিল ত্রৈমাসিক পত্রিকা। এর ইংরেজি নাম ছিল Encyclopaedia Bengalensis। প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৪৬ খৃঃ জানুআরি অর্থাৎ ১৪ মাঘ ১৭৬৭ শক। ১৮৪৬ খৃঃ—১৮৫০ খৃঃ পর্যন্ত প্রকাশিত সংখ্যাগুলিতে নিম্নলিখিত বিষয় সম্পর্কে আলোচনা ছিল : রোম রাজ্যের পুরাবৃত্ত, ক্ষেত্রতত্ব, জীবনবৃত্তান্ত, ইজিপ্ত দেশের পুরাবৃত্ত, ভূগোল বৃত্তান্ত, নীতিবোধক ইতিহাস, চিত্তোৎকর্ষবিধান এবং আরো বিচিত্র বিষয়। কৃষ্ণমোহন এগুলি সংগ্রহ করে প্রকাশ করতেন। মোট তেরটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। প্রতি খণ্ডের তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হোত। ইংরেজি বাঙলা, বাঙলা এবং ছাত্রোপযোগী বাঙলা। প্রথম সংখ্যায় এই পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিজ্ঞাপিত হয় : "বঙ্গভূমির মধ্যে সাধারণের মতিভ্রম নিবারণার্থে গৌড়ীয় ভাষাতে ইউরোপীয় পুরাবৃত্ত ও পদার্থ-বিদ্যার অনুবাদ এক উত্তম উপায় বোধ হইতেছে কেননা অবিদ্যা ও ভ্রান্তির যে দুষ্ট-শক্তি দেশব্যাপিয়া প্রবল আছে, তাহা হইতে সাধারণের মন এ-উপায়ে মুক্তি পাইতে পারে কিন্তু এই প্রকারে গৌড়ীয় ভাষাতে ইউ-রোপীয় বিদ্যার অনুবাদ যত বাঞ্ছনীয়, তত সহজ নহে, অতএব অসাধ্য জ্ঞান করিয়া আমি অনেক দিন পর্যন্ত এ চেষ্টাতে বিরত ছিলাম কিন্তু সম্প্রতি বেঙ্গাল গবর্ণমেণ্ট সমীপে উৎসাহ পাইয়া উক্ত অনুবাদের প্রতিজ্ঞাতে পুনশ্চ প্রবৃত্ত হইয়া পরমেশ্বরের প্রসাদে নির্ভর রাখিয়া ইউরোপীয় পুরাবৃত্ত পদার্থবিদ্যা ক্ষেত্র পরিমাণ জ্যোতির্ষাদি সকল শাস্ত্র স্বদেশীয় ভাষাতে বিস্তার-পূর্বক পশ্চিম খণ্ডের জ্ঞান পূর্ব খণ্ডে স্থাপন করিতে চেষ্টিত হইয়াছি।

যে ২ গ্রন্থ আমি রচনা করিতে প্রবৃত্ত আছি, তাহা উক্ত বিষয়ক কোন বিশেষ পুস্তক হইতে অনুবাদ না করিয়া বরং নানা মূল হইতে সংগ্রহ করিতে কল্পনা করিতেছি...। আমার অভিপ্রায় এই যে বঙ্গভূমির সমস্ত জাতিকে আমার শ্রোতা করি, অতএব যে কেহ পাঠ করিতে পারে সকলের হৃদ্বোধক কথা ব্যবহার করিব তথাচ রচনার মাধুর্য দর্শাইয়া মনোরঞ্জক শিক্ষা বিস্তার করিতে সাধ্যক্রমে ত্রুটি করিব না কিন্তু রূপক অলংকারাদি রচনার শোভা স্পষ্টতার বোধক হইলে তাহার অনুরোধে বাক্যের সারল্য নষ্ট করিব না। জ্যোতিষ্ক পদার্থ ও নীতি বিদ্যাতে অনেক পারি-ভাষিক শব্দ ও তর্ক আছে এজন্য তাহা অবশ্য কিঞ্চিৎ কঠিন হইবে কিন্তু ব্যাখ্যা ও টীকা দ্বারা সহজ করিতে যত্ন করিব। ভূমিকা ও অনুবন্ধে সরল বর্ণনার ধারা অপেক্ষা কঠিন বিচারের ধারার প্রাবল্য প্রযুক্ত পাঠকবর্গ যৎকিঞ্চিৎ বুদ্ধিমান না হইলে তাহার অধিকারী হইতে পারিবেন না, তথাপি বঙ্গদেশীয় লোকের বোধগম্য করণার্থে সর্বপ্রকার চেষ্টা করা যাইবেক।"

রেভারেণ্ড লালবিহারী বাঙালীর কাছে প্রায় বিস্মৃত একটি নাম। অথচ ধর্মযাজক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও অধ্যাপক হিসাবে এক সময়ে তার খ্যাতি ছিল বহুব্যাপ্ত। লালবিহারী ছিলেন খৃষ্টান। তাই তার সমস্ত প্রচেষ্টার মধ্যে ছিল একটা ধর্মীয় মনোভাব। সাংবাদিক হিসাবে তার আত্ম-প্রকাশের মূলে ছিল সামাজিক 'নৈতিক ও ধর্মবিষয়ে দেশবাসীর চিত্তের উদ্বোধন। কালনায় খৃষ্টান মিশনে ধর্মযাজক হিসাবে যখন কাজ করছিলেন, তখন 'অরুণোদয়' পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা করেন। সাংবাদিক হিসাবে খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। সাংবাদিকতা তিনি পেশা হিসাবে গ্রহণ করেননি। সেরকম উদ্দেশ্যও তার ছিল না। যারা অন্ধকারে ছিল, তাদের জীবনে ধর্মের আলো জ্বালিয়ে দেওয়াই ছিল লাল-বিহারীর উদ্দেশ্য। 'অরুণোদয়' লালবিহারী সম্পাদিত শেষ বাঙলা সাময়িক পত্রিকা।

লালবিহারী কিছুকাল 'সুলভ পত্রিকার'ও সম্পাদক ছিলেন। এই মাসিক পত্রিকাটি ১৮৫৩ খৃঃ জুলাই মাসে দ্বারিকানাথ রায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু দ্বারিকানাথ সম্পাদক হিসাবে উপযুক্ত ছিলেন না। প্রায় নয় মাস সম্পাদনার পর পত্রিকা কর্তৃপক্ষ সম্পাদককে কর্মচ্যুত করেন। নতুন সম্পাদক হন লালবিহারী দে। ১৮৫৪ খৃঃ ২৭ নভেম্বর তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত হয় : "কলিকাতা নিউ প্রেস নামক যন্ত্রালয় হইতে কতিপয় মাসাবধি সুলভ পত্রিকা নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ হইয়া বহু সংখ্যক গ্রাহক-বর্গের মনোরঞ্জন করিতেছিল, পরন্তু কয়েক মাসাবধি তদীয় সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ রায় মহাশয় সম্পাদকীয় কর্মে অত্যন্ত ঔদাসন্য ও শৈথিল্য করাতে কিয়দ্দিবস ঐ পত্রিকা যথানিয়মে প্রকটিত হয় নাই, অধুনা উক্ত যন্ত্রাধ্যক্ষ মহাশয়েরা রায় মহাশয়কে ঐ কর্ম হইতে অবসর প্রদানপূর্বক শ্রীযুক্ত লালবিহারী দে মহাশয়কে সম্পাদকীয় ভারার্পণ করিয়াছেন, যে মহাশয় বিনা বেতনে ঐ গুরুতর ভার সহ্য করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।..."

'অরুণোদয়' ছিল সচিত্র এবং পাক্ষিক পত্রিকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য ছিল এক আনা। বার্ষিক গ্রাহকদের এক টাকা অগ্রিম দিতে হোত। প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৮৫৬ খৃঃ আগস্ট মাসে। ১৮৬২ খৃঃ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকার শিরোভাগে ছাপা হোত :

অপরং অস্মৎসমীপে দৃঢ়তরং ভবিষ্য-
দ্বাক্যং বিদ্যতে যূয়ঞ্চ
যদি দিনারম্ভং যুষ্মন্মনঃসু প্রভাতীয়
নক্ষত্র
স্যোদয়াঞ্চ যাবৎ তিমিরময়ে স্থানে
জ্বলন্তং। প্রদীপমিব
তম্বাক্যং সন্নন্যধেব তর্হি ভদ্রং করিষ্যথ।
পিতরসান্বিতীয়ং
সর্বসাধারণ পত্রং। ১ ।। ১৯।

পত্রিকার 'মঙ্গলাচরণ' হিসাবে প্রথম সংখ্যায় মুদ্রিত হয়ঃ "সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন যে পূর্বাপেক্ষা এইক্ষণে বঙ্গদেশে বহুবিধ বিদ্যার অনুশীলন বিশেষতঃ গোড়ীয় ভাষার বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, যে জ্ঞান পূর্বে কেবল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের মধ্যে অবস্থিতি করিত সেই জ্ঞান অধুনা সর্বসাধারণ জনগণ মধ্যে বিস্তীর্ণ হইতেছে। পূর্বে গোড়ীয় ভাষাতে প্রায় একখানিও পুস্তক ছিল না, এক্ষণে ঐ ভাষায় সহস্র পুস্তক প্রণীত হইতেছে। পূর্বে সমাচার পত্রিকার নামগন্ধও ছিল না, অধুনা অনেকানেক মাসিক পাক্ষিক সাপ্তাহিক এবং প্রাত্যাহিক পত্রিকা প্রকটিত হইতেছে, বস্তুতঃ সর্বসাধারণের বিদ্যালোচনার প্রতি অনুরাগের বৃদ্ধি হইলেই ভূরি ভূরি পুস্তক ও সম্বাদ পত্রিকা প্রকাশ হওয়া সম্ভবনীয় বটে। কিন্তু যদি এইক্ষণে গোড়ীয় ভাষাতে বহুবিধ বৈষয়িক সমাচারঘটিত পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া থাকে, তথাচ পরমার্থঘটিত অর্থাৎ সত্যধর্ম-বিষয়ক জ্ঞান প্রদানক্ষম পত্রিকা দুর্লভ, ফলতঃ নানাবিধ বৈষয়িক ও সাংসারিক জ্ঞানানুশীলন প্রচুররূপে থাকিলেও সত্যধর্ম জ্ঞানের আলোচনা না থাকিলে কোন দেশের প্রকৃত উন্নতির সম্ভাবনা নাই। অতএব এতৎ নূতন পত্রিকা কেবল সাংসারিক ও বৈষয়িক সংবাদ এবং বিজ্ঞানবার্তাদিতে পূরিত না হইয়া সত্যধর্ম অর্থাৎ খৃষ্টীয়ান ধর্ম-সূচক উপদেশে ও নানাবিধ পরমার্থঘটিত প্রবন্ধে অলংকৃত হইবে।

অপর আধুনিক পুস্তক ও সম্বাদপত্র সকলেতে অনেকানেক কঠিন ও কঠোর শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় এবং ঐরূপ দুরূহ বাক্য প্রণালী জ্ঞানবান্ ব্যক্তিদের পক্ষে বিনোদজনক হইলেও আমরা কেবল সুকোমল ও সুগম ভাষাকে অবলম্বন করিয়া ইষ্টসাধন করিব, যেহেতুক আমাদের এই নূতন পত্রিকা কি পণ্ডিত কি অপণ্ডিত সকলেরি উপকারার্থে প্রকাশিত হইতেছে।

জগদীশ্বরের প্রসাদেতে এই পত্রিকা পক্ষান্তে একবার অর্থাৎ প্রতি মাসে দুই-বার প্রকাশ পাইবে...।"

লালবিহারী ইংরেজি পত্রিকা সম্পাদনায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। অনেকগুলি পত্রিকা সম্পাদনা করেন। এদেশে বহু বিদেশীই আসেন প্রতি বৎসর। কিন্তু ভারত সম্পর্কে তাঁদের অভিজ্ঞতা মলিন এবং বিকৃত। এই সময়ে শ্রীরামপুর থেকে ইণ্ডিয়ান রিফর্মার নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হোত। পত্রিকাটির মালিক ছিলেন শ্রীনাথ দে। য়ুরোপীয়দের কাছে ভারতের সত্য পরিচয় তুলে ধরবার জন্য লালবিহারী পত্রিকাটির সম্পাদনা ভার গ্রহণ করেন। এক বৎসর সম্পাদনার পর তিনি এই দায়িত্ব ত্যাগ করেন।

লালবিহারী স্থিরভাবে বসে থাকবার মানুষ ছিলেন না। 'ফ্রাইডে রিভ্যু' পত্রিকা সম্পাদনা করতে থাকেন। এই পত্রিকা সম্পাদনে রাজশক্তির প্রতি আনুগত্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তখন উড়িষ্যায় ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। উড়িষ্যার গভর্নর ছিলেন স্যর সেসিল বিডন। তাঁর বিরুদ্ধে চারদিকে প্রবল সমালোচনার সৃষ্টি হয়। দুর্ভিক্ষ নিবারণে তাঁর অযোগ্যতা এবং অকর্মণ্যতা কারও চোখ এড়িয়ে যায় নি। লালবিহারী তাঁর পত্রিকা মাধ্যমে বিডনের প্রতি সমর্থন জানান এবং লোকনিন্দার হাত থেকে তাঁকে বাঁচান। বিডন সাহেব একথা ভুললেন না। প্রতিদানস্বরূপ তিনি লালবিহারীকে বহরমপুর কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন ১৮৬৭ খৃঃ।

এখানে পাঁচ বছর কাজ করবার পর হুগলী কলেজে বদলী হন। ১৮৭২ খৃঃ 'বেঙ্গলী ম্যাগাজিন' প্রকাশ ও সম্পাদনা করতে থাকেন। এই মাসিক পত্রিকায় রাজনীতি ও সমাজবিষয়ক প্রবন্ধ থাকত। সেগুলি ছিল গভীর ভাবপূর্ণ এবং চিন্তাদীপ্ত। কিন্তু তখনকার দিনে পাঠক আজকের মত শিক্ষিত ছিল না। ফলে অধিকাংশের কাছে পত্রিকাটির আবেদন ব্যর্থ হয়ে যায়। পত্রিকার প্রচার সংখ্যা ছিল খুবই স্বল্প। ব্যয় বৃদ্ধি এবং অবিরত লোকসান হওয়ায়, কয়েক বৎসর চলবার পর 'বেঙ্গল ম্যাগাজিন' বন্ধ হয়ে যায়। লালবিহারী এর পর কিছুকাল 'বেঙ্গলী মিসলেনী'র সম্পাদক ছিলেন। এটি ছিল মাসিক পত্রিকা।

বন্ধ হয়ে গেলেও এই পত্রিকা সম্পাদনায় লালবিহারী সাংবাদিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। শিক্ষিত সমাজে সম্পাদক লালবিহারী ছিলেন তখন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। সুবর্ণ বণিক সমাজ সম্পর্কে দুটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন বেঙ্গল ম্যাগাজিনে। ইংরেজি ভাষায় তার দখল ছিল অসাধারণ। তার প্রকাশিত গ্রন্থাদিতে এর সুস্পষ্ট পরিচয় রয়েছে। প্রবন্ধকার হিসাবেও লালবিহারী যুক্তিনিষ্ঠ মননশক্তির পরিচয় রেখে গেছেন। প্রবন্ধের ভূমিকায় লিখেছিলেনঃ

> Nothing would throw a stronger light on the nature and character of Hindu society and on its inner life, than a history of the several castes into which that vast social system is divided. Such tribal histories, if they contained accounts not only of the rise and progress of the various castes and of their subdivisions, but also of their peculiar manners, customs, and religious rites, would form a sort of natural history, or rather geology of Hindu Society, laying ledare before us the successive formation and strata of which it is composed. We know not how far-such histories are possible. Perhaps materials for such narratives have perished in the wreck of time. It can not be doubted, however, that though complete histories of Hindu castes and tribes are not possible, a great deal of interesting information may be gathered from the unwritten history, and floating traditions of of each caste We propose in the following pages to present our readers a monograph upon the Suvarna Vaniks, usually called the Banker caste of Bengal".

'সত্যযুগ' পত্রিকায় ১৩৬০ সাল ২৪ আষাঢ় সংখ্যায় যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় লেখেন ঃ "পাঠকগণের অনেকেই জানেন আমাদের সেকালে 'রোজাহল্ট' নামে একখানি ইংরাজী ব্যাকরণ প্রচলিত ছিল। হুগলী কলেজের অন্যতম ইংরাজী অধ্যাপক মিঃ রো এবং প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক মিঃ ওয়েব দুইজন মিলিয়া ঐ ব্যাকরণটি প্রণয়ন করেন। লালবিহারী দে বাংলার কৃষক জীবন অবলম্বনে "বেঙ্গল পেজেন্ট লাইফ" নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। ঐ পুস্তক মুদ্রিত করিবার জন্য উত্তরপাড়ার বিখ্যাত জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় দে সাহেবকে পুরস্কারস্বরূপ এক হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। রো সাহেব সেই পুস্তক পড়িয়া বলিয়াছিলেন "রিটিন ইন বাবু ইংলিশ"। ইহার কিছুদিন পরে রো সাহেবের ব্যাকরণ প্রকাশিত হইলে লালবিহারী দে সেই ব্যাকরণের এক সুদীর্ঘ সমালোচনা করিয়া দেখাইয়া দিয়াছিলেন যে, সেই ব্যাকরণে প্রতি পৃষ্ঠায় কিরূপ ভাষায় ভুল আছে। সমালোচনার উপসংহারে তিনি লিখিয়াছিলেন "যাঁহারা বাঙ্গালীর ইংরেজী লেখাকে বাবু ইংলিশ বলিয়া বিদ্রূপ করেন তাঁহাদের জানা উচিত যে, এই বাংলাদেশে ইংরাজী ভাষায় এমন সুলেখক আছেন মেসার্স রো ও ওয়েব কোং যাঁহার জুতার ফিতা বাঁধিবারও যোগ্য নহেন।" এই সমালোচনাটি প্রকাশিত হয়েছিল 'বেঙ্গল মিসলেনী'তে।

সম্পাদক কৃষ্ণমোহন এবং লালবিহারী দুজনই ছিলেন ধর্মে খৃষ্টান। কিন্তু এরা বাঙালী সত্তাকে কখনও বিসর্জন দিতে পারেননি। অন্ততঃ তাঁদের রচনার মধ্যে এ পরিচয়টা বেশ স্পষ্ট হয়ে আছে। লালবিহারীর তুলনায় কৃষ্ণমোহন ছিলেন অধিক যুক্তিবাদী এবং সত্যান্বেষী। শিক্ষাক্ষেত্রে এমন কয়েকজন মানুষের সংস্পর্শে তিনি এসেছিলেন, যা লালবিহারীর ক্ষেত্রে অনুপস্থিত ছিল। কৃষ্ণমোহন খৃষ্টান হয়েও যুক্তির ওপর অধিকমাত্রায় নির্ভর করেছেন। কিন্তু লালবিহারী ছিলেন অধিকমাত্রায় ধর্ম বিশ্বাসী। তা সত্ত্বেও সম্পাদক হিসাবে এরা দুজন অনেক কাছাকাছি মানুষ ছিলেন। ভবিষ্যৎ কাল এদের প্রতি সুবিচার করেনি। সংবাদপত্রের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে এদের ভূমিকা একেবারে উপেক্ষণীয় নয়। মুদ্রাযন্ত্র স্থাপনের প্রাথমিক পর্যায়ে এরা যে অকৃত্রিম চেষ্টায় সংবাদপত্র প্রকাশ করেছিলেন, তা স্মরণযোগ্য।

প্রেক্ষাগৃহ

আজকের কথা ঃ

হিন্দী ছবির মধ্যে বহির্ভারতীয় দৃশ্য ঃ

মানুষের স্বভাবের মধ্যেই অনুকরণ প্রবৃত্তি রয়েছে। কাজেই বোম্বের হিন্দী ছবিতে যদি হলিউডী অনুকরণ দেখতে পাওয়া যায়, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। হলিউডে নির্মিত ছবির মধ্যে দেখা যায়, ধনসম্পদের প্রাচুর্য, বিলাসব্যসনের ছড়াছড়ি। বোম্বের ছবিতেও তাই। দারিদ্র্যের কষাঘাত, চাষী বা শ্রমিকের জীবনবেদনা, নিম্ন-মধ্যবিত্তের প্রতিদিনের জীবনযাত্রার গ্লানি প্রভৃতির সঙ্গে হলিউড তথা মার্কিন মুলুকের সম্ভবত কোনো পরিচয় নেই; তাই হলিউডের ছবির মধ্যেও এদের ছায়াটি পর্যন্ত দেখা যায় না। কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষ গরীবের দেশ, এখানে মাথাপিছু গড় বাৎসরিক আয় ৩৭০্ টাকা মাত্র, নিরক্ষরের সংখ্যা শতকরা ৭০ জন। অথচ সেই ভারতবর্ষের বোম্বাই শহরের হিন্দী ছবিতে এই গরীব দেশের কোনো ছাপই দেখবার সম্ভাবনা নেই। এমন কি 'শহর ঔর স্বপ্ন' ছবিতেও নায়ক-নায়িকা দু'জনেই গরীব হলেও তাদের বেশভূষা পর্যন্ত গরীবের নয় এবং ছবিটির মধ্যে বিলাস ও সম্পদের দৃশ্যই বেশী। একটি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসবে আগত জনৈক বৈদেশিক প্রতিনিধি বোম্বাইয়ে তৈরী নামকরা হিন্দী ছবি দেখবার পরে প্রশ্ন করেছিলেন, এ কোন্ দেশের কাহিনী দেখলুম; নায়ক-নায়িকা কোন্ মুলুকের বাসিন্দা?

সম্প্রতি হলিউডের চলচ্চিত্রকাররা তাঁদের বহু ছবির লোকেশন শ্যুটিংয়ের জন্যে দক্ষিণ ইয়োরোপে পাড়ি দিচ্ছেন, সম্ভবত ছবির মধ্যে বৈচিত্র্য আনবার জন্যে। এরই দেখাদেখি কিনা বলতে পারি না, বোম্বাইয়ের অনেক প্রযোজকই তাঁদের রঙীন ছবির কাহিনীকে এমনভাবে তৈরী করাচ্ছেন, যাতে এই কাহিনীর বহু ঘটনা ইয়োরোপ, জাপান, হংকং বা ঐরকম কোনো বহির্ভারতীয় অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয়। দেখা যায়, এ-ব্যাপারে সরকারী ছাড়পত্র পেতেও তাঁদের কোনোই অসুবিধে হয় না। একটি প্রযোজক-সংস্থার বিদেশ সফরে যে-বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়িত হবে, তার দেড় বা দ্বিগুণ মুদ্রা ঐ সংস্থা বহির্ভারতে ছবি দেখিয়ে উপার্জন করে আনবে, এই ধরনের মুচলেকায় সই করলেই নাকি বিদেশ সফরের অনুমতি পেতে কালমাত্র বিলম্ব হয় না। অবশ্য শেষ পর্যন্ত ঐ প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হয় কিনা, তা আমাদের জানা নেই।

কিন্তু কাহিনীর ঘটনাস্থল বহির্ভারতে রাখা হয়েছে, এইটুকুই কি সদলবলে ভারতের বাইরে যাবার অনুমতি লাভের জন্যে যথেষ্ট বিবেচিত হওয়া উচিত? ঘটনাস্থলকে ইয়োরোপ, জাপান বা হংকংয়ে রাখবার কোনো যৌক্তিকতা আছে কিনা,



সলিল দত্ত পরিচালিত 'অপরিচিত' চিত্রে অপর্ণা সেন — ফটো ঃ অমৃত

তা কি বিচার করে দেখার প্রয়োজনীয়তা নেই? ঘটনাস্থলকে সুইজারল্যাণ্ডের পরিবর্তে কাশ্মীর কি দার্জিলিংয়ে পরিবর্তিত করলে কাহিনীর কোনো অপূরণীয় ক্ষতি হত কিনা, কাহিনীটিকে দাঁড় করানোই কঠিন হত কিনা, এ বিচার করে দেখাও দরকার। "সঙ্গম" থেকে শুরু করে "ইভনিং ইন প্যারিস" পর্যন্ত ছবি দেখবার পর অকুতোভয়ে বলতে পারা যায়, বৈদেশিক দৃশ্যাবলীকে ছবির অন্তর্ভুক্ত করবার জন্যেই এদের কাহিনীর ঘটনাস্থলকে বিদেশে রাখা হয়েছিল, কাহিনীর কোনো মৌলিক

প্রয়োজনে নয়। দলবল নিয়ে মহানন্দে বিদেশে ছবি তোলা হবে, নইলে প্রভাবশালী বড়ো প্রযোজক হিসেবে নাম পাব না, এই সর্বনাশা চিন্তাই যেন বোম্বাইয়ের কোনো কোনো প্রযোজককে পেয়ে বসেছে। এবং প্রয়োজন, অপ্রয়োজন বিবেচনা না করেই ব্যয়িত বৈদেশিক মুদ্রার পরিবর্তে দ্বিগুণের বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের প্রতিশ্রুতি-প্রাপ্তিকে সম্বল করেই সরকারী দপ্তর এ'দের এই উৎকট চিন্তাকে সমর্থন করে চলেছেন।

—নান্দীকর

চিত্রসমালোচনা

ডক্টর, ইউ হ্যাভ গট টু বি কিডিং (ইংরাজী) : এম-জি-এম এর নিবেদন; ১২ রীলে সম্পূর্ণ; পরিচালনা : পিটার টিউসকবেরী; চিত্রনাট্য : ফিলিপ সুকেন; প্রয়োজনা : ম্যান-লারেন্স-ওয়েসাবমান; রূপায়ণ : সান্ড্রা ডি, জর্জ হ্যামিল্টন, সিলেস্টি হোলম, বিল বিক্সবি, ডিক কারমান প্রভৃতি; গত ৪ঠা জানুয়ারী থেকে মেট্রো সিনেমায় প্রদর্শিত হচ্ছে।

মা চায় তার একমাত্র মেয়ে শো বিজনেস লাইনটাকে পেশা হিসেবে নিক, সে তাই ছোটবেলা থেকেই মেয়েকে গান শিখিয়েছে। প্রতিবেশী গায়ক বন্ধুর সহযোগিতায় সে যদিও গানটাকে মোটামুটি রপ্ত করেছে কিন্তু সে মায়ের পছন্দ করা জীবন বেছে নিতে রাজী নয়: নাইট ক্লাবে তার প্রথম প্রদর্শনীর দিনে সে তাই স্বাভাবিক কারণেই অকৃতকার্য হয়েছে (অবশ্য অন্য কারণও ছিল।) তার পছন্দ যে কোন অফিসারের সেক্রেটারী হয়। একটা কাজও জুটিয়ে নেয়, আর সেখানেই সে দয়িতের দেখা পায়। মা একথা জানার পর দুজনের মাঝে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। সাময়িক বিচ্ছেদ নেমে আসে দুজনের মধ্যে।

তারপর--তারপর সমস্যার সমাধান হয় হাসপাতালে, ওখানে দেখা যায় মেয়েটি গেছে তার সন্তান প্রসবের জন্য আর ছেলেটি গেছে আহত হয়ে কারণ সে দয়িতার বিরহ ব্যথায় ব্যাকুল হয়ে গাড়ী চালিয়েছিল উন্মাদের মত। মা অবাক হয়েছিল তার কুমারী মেয়ের মা হওয়ার জন্য শেষে জানা গেল আহত ছেলেটিই তার স্বামী।

দৈনন্দিন জীবনের ক্লান্তি দূর করার ব্যাপারে এটি একটি পরিচ্ছন্ন হাসির ছবি। প্রধান চরিত্রে সান্ড্রা ডি ও জর্জ হ্যামিল্টনের অভিনয় আকর্ষণীয়, বিশেষভাবে 'আই হ্যাভ নট গট এনিথিং বেটার টু ডু' গানটি গাইবার শেষ মুহূর্তটি স্মরণীয়। মা'র চরিত্রে সিলেস্টি হোলম সুন্দর।

কলকাতা

তপন সিংহ পরিচালিত 'আপন জন'

আজকের যুব সম্প্রদায়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং হতাশায় ন্যুব্জ-কুব্জ-খঞ্জ-অচল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রচিত 'আপন জন' ছবিটি চলচ্চিত্রে রূপ দিচ্ছেন পরিচালক তপন সিংহ। বর্তমানে এটির চিত্র গ্রহণ অনুষ্ঠিত হচ্ছে নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওর দু'নম্বরে। ইন্দ্র মিত্র রচিত এ কাহিনীর প্রধান চরিত্রাবলীতে রূপদান করছেন নির্মলকুমার, সুমিতা সান্যাল, স্বরূপ দত্ত, পার্থ মুখোপাধ্যায়, মৃণাল মুখোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, ছায়া দেবী এবং রোমী চৌধুরী।

নির্মীয়মাণ 'তিন ভুবনের পারে'

সমরেশ বসু রচিত 'তিন ভুবনের পারে' কাহিনীটির চিত্রগ্রহণ টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওয় গ্রহণ করছেন পরিচালক আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়। এ মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে পুনরায় একটানা দৃশ্যগ্রহণ শুরু হবে। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় রচিত চিত্রনাট্যে অভিনয় করছেন বম্বের জনপ্রিয় নায়িকা তনুজা, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, তরুণকুমার, পদ্মা দেবী, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, অপর্ণা দেবী, বিজন ভট্টাচার্য এবং কমল মিত্র। এ ছবির সংগীতপরিচালনায় রয়েছেন সুধীন দাশগুপ্ত। চিত্র পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন রুমা ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স।

'অদ্বিতীয়া'-র অন্তর্দৃশ্য গ্রহণ

এ আর সি প্রোডাকসন্সের 'অদ্বিতীয়া' চিত্রের সম্প্রতি বহির্দৃশ্য গ্রহণের পর গত সপ্তাহে ক্যালকাটা মুভিটন স্টুডিওয় একটানা অন্তর্দৃশ্য গ্রহণ শেষ করলেন পরিচালক নবেন্দু চট্টোপাধ্যায়। ছবিটির প্রধান চরিত্রে রূপদান করছেন মাধবী মুখোপাধ্যায়, সর্বেন্দ্র, লিলি চক্রবর্তী, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায় বিকাশ রায়, দিলীপ রায়, গীতা দে, শর্মিতা সেন, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডেইজি ইরানি। ছবিটির সুরসৃষ্টি করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

বোম্বাই

বি, আর, চোপরার নতুন ছবি
'আদমি অউর ইনসান'

বি, আর, চোপরা প্রযোজিত বি, আর, ফিল্মসের নতুন ছবি 'আদমি অউর ইনসান'-এর চিত্রগ্রহণ সম্প্রতি শুরু হয়েছে রাজকমল স্টুডিওয়। ছবির প্রধান অংশে অভিনয় করছেন সায়রা বানু, ধর্মেন্দ্র, মমতাজ এবং ফিরোজ খান। ছবিটির পরিচালক হলেন যশ চোপরা। এই রঙিন চিত্রের সুরসৃষ্টি করছেন সংগীতপরিচালক রবি।

'মহব্বৎ' চিত্রের শুভ মহরৎ

বাহার ফিল্মসের নতুন রঙিন ছবি 'মহব্বৎ'-এর শুভ মহরৎ আর, কে, স্টুডিওয় অনুষ্ঠিত হবার পর সম্প্রতি ছবির নিয়মিত চিত্রগ্রহণ শুরু করছেন পরিচালক এ, সুব্বা রাও। ছবির মুখ্য চরিত্রে অংশ গ্রহণ করেছেন রাজেশ খান্না, ববিতা, নাজিমা, প্রেম চোপরা, নানা পালসিকর, সুলচনা, রাজমেহরা, সুলোচনা চ্যাটার্জি, রণধীর এবং ওমপ্রকাশ। ছবিটির সুরকার হলেন রবি।

অসিত সেনের নতুন ছবির মহরৎ

সুচিত্রা কলা মন্দিরের নতুন ছবিটির শুভ মহরৎ সম্প্রতি আর, কে, স্টুডিওয় পালন করলেন পরিচালক অসিত সেন। ছবিটির নামকরণ এখনো ঠিক হয়নি। তবে দৃশ্যগ্রহণ শুরু হয়ে গেছে। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছেন নূতন, জীতেন্দ্র, অশোককুমার, মমতাজ ও সুজিতকুমার। লক্ষ্মীকান্ত-প্যারেলাল ছবিটির সুরকার।

'সাফারী' চিত্রে ধর্মেন্দ্র-শর্মিলা

পানছি আর্টস ইণ্টারন্যাশনালের রঙিন 'সাফারী' চিত্রের নায়ক-নায়িকা হিসেবে মনোনীত হয়েছেন ধর্মেন্দ্র ও শর্মিলা। অন্যান্য চরিত্রে থাকছেন শশিকলা, প্রেম চোপরা, জনি ওয়াকার, নাজির হোসেন এবং ললিতা পাওয়ার। ছবিটি পরিচালনা দুলাল গুহ। সংগীতকার হলেন লক্ষ্মীকান্ত-প্যারেলাল। ছবিটির চিত্রগ্রহণ শীঘ্রই শুরু হবে বলে জানা গেল।

মঞ্চাভিনয়

একটি স্মরণীয় মঞ্চাভিনয় :
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থিয়েটার-এর নিবেদন : রবীন্দ্রনাথের 'শেষকথা' :

বাংলা ১৩৪৬-৪৭ সালে লেখা রবিবার, শেষকথা ও ল্যাবরেটরি—এই তিনটি গল্প নিয়ে রবীন্দ্রনাথের 'তিন সঙ্গী' গল্প-সংকলন। এরই মধ্যে শেষকথা গল্পটিকে বেছে নিয়েছেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থিয়েটার সাধারণের সামনে তাঁদের দ্বিতীয় নাট্যনিবেদন পরিবেশনের জন্যে। এ'দের প্রথম প্রচেষ্টা ছিল 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর নাট্যরূপ এবং তার পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছিলেন তরুণ রায়।

'শেষকথা' গল্পটি আত্মকাহিনীর আকারে লেখা। কোনো একজন বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙালী খনিজবিদ্যাবিশারদ ছোটনাগপুরের কোনো এক জায়গায় একটি প্রাইভেট ফার্মের হয়ে খনিজ-সম্পদের সন্ধানে এসে কেমন করে আচম্বিতে জনৈকা বাঙালী রূপসী তরুণীর সান্নিধ্যে তাঁর

পাথরে মনে চিড় খাওয়ান এবং শেষপর্যন্ত সেই প্রেমতপস্বিনী মেয়েটিরই সাহায্যে মোহমুক্ত হয়ে নিজের আদর্শ সিদ্ধির পথে ফিরে আসেন, তারই কাহিনী তিনি নিজের জবানীতে বিবৃত করেছেন।

গল্পের নায়ক ডঃ নবীনমাধব সেনগুপ্তের এই আত্মকাহিনীটিকে নাট্যাকারে গ্রথিত করেছেন রবীন্দ্রভারতীর স্নাতকোত্তর নাট্যবিভাগের ছাত্র বিজয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। মূল কাহিনীর ভাব ও বক্তব্যকে সম্পূর্ণরূপে বজায় রেখে তিনি এগারোটি দৃশ্যের সাহায্যে যে-সুকৌশলে দর্শকচিত্তের কৌতুহলকে ক্রমবর্ধমান করে তুলে সার্থক নাট্যরূপ দিতে সক্ষম হয়েছেন, তাতে তাঁর নাট্যরচনাজ্ঞানের ভূয়সী প্রশংসা করতে হয়। তিনি রবীন্দ্রনাথের ভাষাকে যথাসম্ভব ব্যবহার করেছেন এবং যেখানেই পরিপূরক সংলাপ রচনা করেছেন, সেখানেই রবীন্দ্র-রচনারীতিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে মনে রেখেছেন। মূল কাহিনীতে আমরা প্রত্যক্ষ করি তিনটি চরিত্র : ডঃ নবীনমাধব সেনগুপ্ত, অচিরা এবং তার পিতা ডঃ অনিলকুমার সরকার। এছাড়া উল্লেখিত আছে আরও কয়েকটি নাম : দেবিকাপ্রসাদ সিংহ, ভবতোষ মজুমদার, আই-সি-এস, বঙ্কিম, কুন্দনলাল আগরওয়ালা, কলেজের সেক্রেটারী, রামশরণ এবং নবীনমাধবের মা। নাট্যরূপকে দর্শকগ্রাহ্য করবার জন্যে নাট্যরূপদাতা শ্রীচট্টোপাধ্যায় নাটকের মধ্যে শুধু যে ওদেরই আমদানী করেছেন, তা নয়; এমনকি নায়ক ও নায়িকার চরিত্রকে উদ্ঘাটিত করবার জন্যে তিনি নতুন চরিত্রের সৃষ্টি করেছেন : নবীনের অ্যাসিস্ট্যান্ট অমল, সাঁওতাল দম্পতি—সেরনা ও দুখিয়া। এছাড়া কিছু লঘু উপকরণের জন্যে এনেছেন অচিরার বাড়ীর চাকর ফটিককে। নাটকটিকে আরও সুসংবদ্ধ করবার সুযোগ আছে। বহু পুনরুক্তি বর্জন করলে এবং নবীনমাধবের অতীত ইতিহাস ও মনোবৃত্তির পরিচায়ক দ্বিতীয় দৃশ্যটিকে সংক্ষিপ্ত করলে নাটকটির অগ্রগতি আরও দ্রুতলয়যুক্ত হতে পারে।

নাটকটির মঞ্চোপস্থাপনা উচ্চ প্রশংসাযোগ্য। সংকীর্ণ মঞ্চে যেভাবে ছোটনাগপুরের শাল-মহুয়ার শোভার মধ্যে ডঃ অনিল সরকার এবং অচিরার গৃহসম্মুখটি শিল্পসম্মত রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে এবং ঘূর্ণনমঞ্চের অপরদিকে ল্যাবরেটরি ও তৎসংলগ্ন বনভূমিটি রূপ পরিগ্রহ করেছে, তাকে মঞ্চস্থাপনাকৌশলের একটি চূড়ান্ত নিদর্শন বললেও অত্যুক্তি হবে না। এরই সঙ্গে মিশিছে আলোর সার্থক ব্যবহার।

নাটকটিতে যান্ত্রিক শব্দ, কণ্ঠসংগীত এবং আবহসংগীত ব্যবহার করা হয়েছে বহুলাংশে। উদ্বোধন-অভিনয়ে সম্ভবত প্রক্ষেপণ কার্যটি যথোপযুক্ত উচ্চগ্রামে করা হয়নি; তাই এগুলির ব্যবহার কতদূর সার্থক হয়েছে, তা আমরা বলতে পারছি না।

নাটকের অভিনয় হয়েছে সামগ্রিকভাবে নিখুঁত এবং একটি সুরে বাঁধা। প্রতিটি শিল্পীই তাঁর ... চরিত্র চিত্রিত



'গুপী গাইন বাঘা বাইন' চিত্রের সংগীত গ্রহণ অনুষ্ঠানে প্রযোজক নেপাল দত্ত, পরিচালক সত্যজিৎ রায় এবং কণ্ঠশিল্পী অনুপ ঘোষাল। ফটো : অমৃত

করেছেন অত্যন্ত নিষ্ঠাসহকারে। এরই মধ্যে অসাধারণ নাট্যনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন শর্মিষ্ঠা চট্টোপাধ্যায় নায়িকা অচিরার ভূমিকায়। এমন দরদী অভিনয় নাম-করা পেশাদারী শিল্পীদের কাছেও আমরা সচরাচর আশা করি না। ডঃ অনিলকুমার সরকারের ভূমিকায় জ্ঞানতপস্বী মর্মপীড়িত অধ্যাপকের রূপটি চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন বিমল চট্টোপাধ্যায়। নায়ক নবীনমাধব-বেশে দুর্লভ মুখোপাধ্যায় চরিত্রটির সংঘাতপীড়িত রূপটিকে অনায়াসেই পরিস্ফুট করেছেন। তাঁর কণ্ঠস্বর কিন্তু মাঝে মাঝে অনমনীয় কাঠিন্য প্রকাশিত করছিল। সাঁওতাল মেয়ে দুখিয়ার ভূমিকায় নীলিমা রায় অত্যন্ত সাবলীল, অথচ চরিত্রটির সহজাত ভদ্রকন্যার সমক্ষে কুণ্ঠিতা ভাবটিকে ব্যক্ত করেছেন। তাঁর জুড়িদার সেরনাবেশে নিধির ভট্টাচার্য সহজ ও স্বাভাবিক। দেবকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ফটিক চাকর উপভোগ্য। অপরাপর ভূমিকায় মোহনলাল মুখোপাধ্যায় (সেক্রেটারী ভট্টাচার্য), ললিত কোনার (দেবিকাপ্রসাদ), সুব্রত মুখোপাধ্যায় (ভবতোষ), অনঙ্গ কুন্ডু (অমল), রণেশ বাগচি (কুন্দন), দেবেন গঙ্গোপাধ্যায় (বঙ্কিম), নীলিমা বসু (মা), মণীন্দ্র দত্ত (রামশরণ) ও সুনীল দাশগুপ্ত (হরবংশ) সু-অভিনয় করেছেন।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত নাট্য-বিষয়ক শিক্ষাদান-পদ্ধতি যে মাত্র তত্ত্বগত নয়, প্রযুক্তি ও ব্যবহারিক প্রয়োগের দিকেও তা সমান যত্নশীল, তার সার্থক প্রমাণ হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক নাট্য-নিবেদন—রবীন্দ্রনাথের 'শেষকথা'। নাট্যরসোৎসাহী সুধিবৃন্দ মঞ্চাভিনয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থী শিল্পীদের দ্বারা অভিনীত এবং উপস্থাপিত 'শেষকথা' নাট্যাভিনয় দেখে বাঙলার নাট্যশালার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যথেষ্ট আশান্বিত হবেন।

গিরিশ নাট্য সংসদের রামানুজ

গিরিশ নাট্য সংসদ কর্তৃক এঁদের নতুন নাটক শ্রীফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ রচিত রামানুজ আগামী ২৬-২-৬৮ শিবরাত্রির দিনে অভিনীত হবে। রামায়ণের লক্ষ্মণ বর্জনের বেদনাবিধুর কাহিনী এ-নাটকের বিষয়বস্তু। নাটকটিতে অংশগ্রহণ করছেন শ্রীনিখিলকুমার দাস, পুরেন্দ্রনাথ পাল, সমীর ব্যানার্জি, শশাংক চ্যাটার্জি, গৌরচন্দ্র পাল, দেবব্রত দাস, দেবজ্যোতি দাস, শৈলেন ব্যানার্জি, সুব্রত রায়, সলিল নিয়োগী, ধীরেন চক্রবর্তী ও সংসদের অন্যান্য শিল্পীরা। নাট্য-পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন শ্রীসতীশ দত্ত ও শ্রীধীরেন চক্রবর্তী। সংগীত-পরিচালনা করবেন শ্রীশশাংককুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীনলিনী করণ। এঁদের এই নূতন যাত্রা নাটকটি পূর্বের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হবে বলে আশা করা যায়।

কল্লোল গোষ্ঠীর 'রুম নম্বর টু'

পল্লতার প্রতিরূপ আয়োজিত একাংক নাটক প্রতিযোগিতায় বরাহনগরের কল্লোল গোষ্ঠী ১২ই জানুয়ারী সন্ধ্যায় তাদের মঞ্চসফল নাটক শ্রীদীপক ভট্টাচার্যের 'রুম নম্বর টু' নাটকটি মঞ্চস্থ করবেন। বিভিন্ন চরিত্রে অংশগ্রহণ করবেন অশ্রু মুখোপাধ্যায়, সন্তোষ মজুমদার, দীপক ভট্টাচার্য অরুণ সেন, গোপাল ব্যানার্জি, রমেশ রায় অমর দত্ত, গোপীনাথ মিত্র, প্রলয় ঘোষ স্বপন ঘোষ,স রতন মুখার্জি ও কুমারী রেবা দাস।

নাটকটি পরিচালনা ও প্রযোজনা করছেন দীপক ভট্টাচার্য ও 'কল্লোল গোষ্ঠী'।

রামপুরহাট রেলওয়ে জেনারেল ইনস্টিট্যুটের নাট্যাভিনয়

এবার রামপুরহাট রেলওয়ে জেনারেল ইনস্টিটিউটের শিল্পী সদস্যরা মঞ্চস্থ করলেন শচীন ভট্টাচার্যের 'সম্রাটের মৃত্যু'। দলগত অভিনয় উৎকর্ষতায় সুচিহ্নিত এই নাটকটির নির্দেশনায় ছিলেন কার্তিক ঘোষাল ও মলয় চট্টোপাধ্যায়। শিল্পীরা প্রায় সকলেই চরিত্রানুগ অভিনয়ের জন্য দর্শক প্রশংসা পেয়েছেন। এঁদের মধ্যে কার্তিক ঘোষাল, মলয় চট্টোপাধ্যায়, স্মৃতি-বিন্দু দাস, শিশির চট্টরাজ, প্রতাপ চট্টোপাধ্যায় ও গীতা দে-র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য চরিত্রগুলিতেও ভাল

অভিনয় করেছেন বীরেন ভৌমিক, কঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, তারাকুমার গোস্বামী, মুকুল ভাদুড়ী, অসক বন্দ্যোপাধ্যায়, অসীম সিংহ, সাধন দাস ও সান্ত্বনা ঘোষ।

কল্পতরুর 'নায়িকা বিদায়'

সম্প্রতি মিনার্ভা মঞ্চে কল্পতরুর নবতম প্রযোজনা বসন্ত ভট্টাচার্যের নতুন নাটক 'নায়িকা বিদায়' মঞ্চস্থ হল। জমজমাট কাহিনীটি আকর্ষণীয় হয়েছে টিম-ওয়ার্কের গুণে। যার প্রথম সারিতে আছেন রাজকুমার বসু, বিশ্বনাথ বসাক, বসন্ত ভট্টাচার্য, নীতিশ সান্যাল, শম্ভু দাঁ আর নায়িকা অঞ্জলিরূপী তৃপ্তি দাস। অন্যান্য চরিত্রে যথাযথ রূপদান করেন সুমন্ত গাঙ্গুলী, সুশীল নন্দন, অরুণ চক্রবর্তী, সাধন দত্ত, হিতব্রত সাহা কাজল বর্ধন, পুলক সেন প্রমুখ কল্পতরুর শিল্পীরা। নাটক পরিচালনার কৃতিত্ব নাট্যকারের।

সেণ্ট্রালাইজ ক্যাশ রিক্রিয়েশনের 'ফেরারী ফৌজ'

সেণ্ট্রালাইজ ক্যাশ রিক্রিয়েশন প্রমোদ সংস্থার সভাবৃন্দ প্রতিবারের ন্যায় এবারেও গত ১৭ই ডিসেম্বর বিশ্বরূপা মঞ্চে উৎপল দত্তের জনপ্রিয় 'ফেরারী ফৌজ' নাটকটি দর্শকদের উপহার দিয়েছেন।

শ্রীসত্য মৈত্র ছিলেন নাটকটির নির্দেশনায়। শিল্পী নির্বাচনে এবং অভিনয়ের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে নাটকের গতিকে পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে এগিয়ে নিয়ে গেছেন।

নাটকে বহু চরিত্রের সমাবেশ করা হয়েছে। দুই-একটি চরিত্রের অভিনয় ছাড়া এ'দের দলগত অভিনয় নাটকের একটি বিশেষ সম্পদ। বিপ্লবীদের মধ্যে মাস্টার-মহাশয়ের চরিত্রে শ্রীভবতোষ ব্যানার্জির অভিনয় একটি সার্থক সৃষ্টি। অশোকের চরিত্রে দীপেন দত্তের অভিনয় হৃদয়গ্রাহী। জ্যোতির্ময়ের চরিত্রে সুশীল ভট্টাচার্যের অভিনয় অপূর্ব। কুমুদের চরিত্রে ময়ূরী সরকার, সিয়াজুলের চরিত্রে সুকুমার কর এবং বিপিনের চরিত্রে প্রদ্যোৎ চ্যাটার্জির অভিনয় যথাযথ। ফাদারের চরিত্রে রূপদান করেছেন শ্রীনির্মল দত্ত—এর অভিনয় অনবদ্য। নীলমণির চরিত্রে সত্যজিৎ নিয়োগীর অভিনয় সর্বশ্রেষ্ঠ, তবে শান্তি রায়ের কিছু ভুল-ত্রুটি রয়েছে। হিতেন দাশগুপ্তের চরিত্রে মণিজয়ের অভিনয় একটি দৃশ্য ছাড়া বাকি সব দৃশ্যই অপূর্ব। অশোকের পিতার ভূমিকায় পি কে সেনের অভিনয় দুর্বল। প্রকাশের চরিত্রে অমর ব্যানার্জির বাচনভঙ্গী ত্রুটিপূর্ণ। কয়েকটি ছোট ছোট চরিত্রে সুন্দর অভিনয় করেছেন সর্বশ্রী নিমাই বসু, শিবদাস ব্যানার্জি, শৈলেন চৌধুরী, দেবকুমার দাস, গঙ্গা সাহা, বরুণ বিশ্বাস, প্রণব ঘোষদস্তিদার, হেম ভট্টাচার্য, দীনু ধর এবং চিত্ত মিত্র। স্ত্রী চরিত্রে রেণুকা ঘোষ ও রমা গুহের অভিনয় সুন্দর। শিশুশিল্পী গোপা ও বালকের ভূমিকায় যথাক্রমে জয়া চৌধুরী ও সমীর ভড়ের অভিনয় দর্শকদের মনে রেখাপাত করে।

সংগীত-পরিচালনায় ছিলেন শ্রীধনগোপাল ও তাঁর সম্প্রদায়।

শুভময় প্রযোজিত
একটি চিরায়ত নাটক
ফেরা
১৫ই নভেম্বর সন্ধ্যা ৭টায়
মুক্তঅঙ্গন
নির্দেশনা জ্যোতিপ্রকাশ
হলে টিকিট

শুভময়-এর 'ফেরা' নাট্যাভিনয়

'শুভময়'-এর মঞ্চসফল প্রযোজনা রতনকুমার ঘোষের 'ফেরা'র তৃতীয় অভিনয় আগামী ১৫ই জানুয়ারী সন্ধ্যা সাতটায় পরিবেশিত হবে মুক্ত অঙ্গনে। এ-নাটকটির বিষয়বস্তু ঈশ্বর ও অনীশ্বরবাদের দ্বন্দ্ব-ভিত্তিক। জ্যোতিপ্রকাশ নির্দেশিত এই নব্য-ধারার নাটকে থাকবেন পবিত্র চট্টোপাধ্যায়, অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রণজিৎ গাঙ্গুলী, প্রবীর রাহা, সতীশ চক্রবর্তী, পুতুল চক্রবর্তী প্রমুখ কুশলী শিল্পিবৃন্দ।

রামধনের বৈরাগ্য পুনরাভিনয়

বাংলাদেশে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পকার পরশুরামের বিখ্যাত ছোটগল্প 'রামধনের বৈরাগ্য' নিঃসন্দেহে সাম্প্রতিককালের একটি বিশিষ্ট প্রহসনমূলক রচনা হিসেবে দাবী করতে পারে। বর্তমানের সাহিত্য ও সাহিত্যিকের দল আজ কোন পর্যায়ে নেমে এসেছে—এবং যার ফলে সেইসব তথাকথিত সাহিত্যিকের দল যশ, অর্থ, খ্যাতি পতিপত্তি ও পুরস্কারের লোভে সাহিত্যের বাজারে আদিরসের প্লাবন ব'য়ে নিয়ে আসছেন, তারই সূক্ষ্ম ও কটাক্ষপূর্ণ বিশ্লেষণ এই গল্পের মধ্যে ধরা পড়েছে। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত উক্ত গল্পের নাট্যরূপ শক্তিশালী নাট্যসংস্থা 'পথিক' এর আগে বহুবার কলকাতার বহু বিশিষ্ট মঞ্চে অভিনয় করে খ্যাতি লভ করার পর আবার 'রামধনের বৈরাগ্যর' পুনরাভিনয়ের আয়োজন করেছেন ৮ জানুয়ারী '৬৮ মুক্ত অঙ্গন মঞ্চে সন্ধ্যা ৭টায়। কতকগুলি বিশিষ্ট চরিত্রে রূপদান করবেন যথাক্রমে মণি শ্রীমানী, সুনীল সুর, গোপাল দে, শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইলাবন্ত ঘোষ, জয়ন্ত মতিলাল, কান্তিময় রায়চৌধুরী, সনৎ বসু, রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সান্ত্বনা ঘোষ, সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। নির্দেশনায় আছেন ভাস্কর ঠাকুর।

'স্পাক' গোষ্ঠীর তিনটি নাটক

সম্প্রতি সালকিয়ার বিশিষ্ট নাট্যসংস্থা 'স্পাক'-এর শিল্পীগোষ্ঠী স্থানীয় মাইকেল থিয়েটার মঞ্চে তিনটি স্বতন্ত্র স্বাদের নাটকের সফল অভিনয় করেছেন। প্রথম নাটক বীরু মুখোপাধ্যায়ের 'অনির্বাণ' বস্তুত রূপকধর্মী। কিন্তু কুশলী শিল্পীদের অভিনয়-নৈপুণ্যে এই রূপকধর্মের মধ্যেও যথেষ্ট প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছে। অপর নাটক দুটির নাম যথাক্রমে কিরণ মৈত্রের 'কোথায় গেল' এবং রামানুজের 'আলোর নীচে'। দুটি নাটকেরই প্রজ্বলিত বাস্তব সমস্যা শিল্পীদের ব্যক্তিক ও দলগত অভিনয় স্বাচ্ছন্দ্যে দর্শকবৃন্দের অজস্র প্রশংসা লাভ করেছে। তিনটি নাটকেরই অভিনয়াংশে যাঁদের কৃতিত্ব প্রতিফলিত হয়েছে, তাঁরা হলেন অরুণ ঘোষ, রবীন দে, শিশির সরকার, উদয়শংকর পাল, বিষ্ণু চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় ঘোষ, আরতি



ঘোষ ও সন্ধ্যা রায়। যাঁর ব্যক্তিত্বমণ্ডিত অভিনয়-দক্ষতায় এবং সুষ্ঠু নির্দেশনায় সমগ্র নাট্যানুষ্ঠানটি রস-মণ্ডিত হয়েছে, তিনি হলেন উদীয়মান নাট্যকার সুদিন চৌধুরী।

রাজ্য কৃষি অধিকার সভ্যবৃন্দের নাট্যাভিনয়

গত ১৯ ডিসেম্বর '৬৭ এগ্রিকালচার ডাইরেক্টরেট রিক্রিয়েশন ক্লাব রঙমহল মঞ্চে জোছন দস্তিদারের 'দুই মহল' নাটকটি মঞ্চস্থ করে তাদের অষ্টম বার্ষিক উৎসব পালন করলেন। বহু অভিনীত এই নাটকটি পুনরাভিনয়ে তাঁরা তেমন উন্নত মান বজায় রাখতে পারেননি। অবশ্য এ'রা বৎসরান্তে একবারই নাট্যোৎসব করেন এবং অপেশাদারও বটে। সেদিক থেকে বিচার করলে এই অভিনয় বহুলাংশে সফল। অভিনয়াংশে সুবীরের ভূমিকায় শান্ত মুখার্জী, অতীনলালের ভূমিকায় নীরোদ মুখার্জী, ভজহরির ভূমিকায় কালিপদ ব্যানার্জী ও অপর্ণার ভূমিকায় বৃথিকা ভট্টাচার্যের অভিনয় প্রশংসনীয়। রঞ্জন সান্যাল ভূমিকাভিনেতা প্রভাত চ্যাটার্জী ও ছোনেরাম ভূমিকাভিনেতা শিশির সমাদ্দারের নৈরাশ্যজনক অভিনয় নাটকের সাফল্যকে ব্যাহত করেছে। অন্যান্য কারো ভূমিকা আদৌ রেখাপাত করেনি। আলোকসম্পাত যথাযথ, সংগীতাংশ নাটককে বিন্দুমাত্র সহায়তা করেনি।

ছবির সংবাদ

গত সংখ্যায় নান্দীকর তাঁর আলোচনায় ১৯৬৭ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত চিত্রগুলির একটি তালিকা দিয়েছিলেন। ঐ তালিকায় যে-ন'খানি ছবি চূড়ান্ত ব্যবসায়িক সাফল্য লাভ করে, তাদের নাম হোল : নায়িকা সংবাদ, অভিশপ্ত চম্বল, ছুটি, জীবনমৃত্যু, গৃহদাহ, বালিকা বধূ, চিড়িয়াখানা, অ্যান্টনী ফিরিঙ্গী, হাটেবাজারে।

সিনে সেণ্ট্রাল আয়োজিত জাপানী চলচ্চিত্র উৎসব

কলিকাতাস্থ জাপানী কনসালেট, ইন্দো-জাপানীজ ফ্রেণ্ডশিপ সোসাইটি ও সিনে সেণ্ট্রাল, কলিকাতার যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত জাপানী চলচ্চিত্র উৎসব আগামী ১৯শে জানুয়ারী থেকে ২৩শে জানুয়ারী নিউ এম্পায়ার প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হবে। জাপান সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রকের সৌজন্যে প্রাপ্ত তিনটি সাম্প্রতিক চলচ্চিত্র 'রিট্রীট ফ্রম কিস্কা', 'থ্রি ফেসেস অফ লাভ' ও 'অবলিগেশন টু লাইফ' এবং আরো দুটি উল্লেখযোগ্য ছবি এই উৎসবে প্রদর্শিত হবে।

উদয় ভানু সংঘের বার্ষিক উৎসব

গত ৩০শে ডিসেম্বর ব্যারাকপুরস্থ উদয় ভানু সংঘের একাদশ বার্ষিক উৎসব সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে সভাপতির স্থান অলঙ্কৃত করেন স্থানীয় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীমনবেন্দ্র রায়। প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিচারপতি শ্রীপ্রীতিকুমার রায়। উপস্থিত সকলকে সংঘ থেকে অভিনন্দন জানান সংঘের সহ-সম্পাদক শ্রীঅভিজিৎ মজুমদার। সংগীতে অংশগ্রহণ করেছেন সর্বশ্রী দীপক রায়চৌধুরী, দেবকীরঞ্জন দাস, শ্রীমতী কল্যাণী গাঙ্গুলী, রত্না দেব ও কল্পনা রায়। নৃত্য পরিবেশন করেছেন শ্রীমতী তপতী রায়। সেদিনের অনুষ্ঠানের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বস্তু ছিল সংঘ কর্তৃক অভিনীত নাটক 'পাহাড়ী ফুল'। নাটকটি দলগতভাবে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হওয়ায় 'উদয় ভানু সংঘ' পূর্ব সুনাম অম্লান রাখতে পেরেছে। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন, অমিত—নিখিল মুখার্জি, অলোক—প্রদীপ বসু, ডাক্তার—সন্তোষ দাশগুপ্ত, জং সিং—অবনীরঞ্জন সরকার, শঙ্কর—তপন চ্যাটার্জি, বিকাশ—প্রদীপ সেনগুপ্ত, নিতাই—অমিয়রঞ্জন বসু, মুখিয়া —সমর চ্যাটার্জি, ডাইরেক্টার—অভিজিৎ মজুমদার, ম্যানেজার—অমল দত্ত, বংশী—প্রণব রায়, নমিতা—অনিমা মুখার্জি, রূপা—মেনকা ব্যানার্জি। নাটকটি পরিচালনা করেছেন—অবনীরঞ্জন সরকার।

সায়ান্স-ফিকশ্যন সিনে ক্লাবের দুটি বছর

সত্যজিৎ রায় প্রতিষ্ঠিত ভারতের প্রথম এবং একমাত্র সায়ান্স-ফিকশান সিনে ক্লাব গত দু' বছরে ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের ধারায় নিঃসন্দেহে নতুন আগ্রহের সঞ্চার করেছে। এই শ্রেণীর বিশেষ ধরনের ফিল্ম ক্লাব প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার অভিনব পরিকল্পনাটি ১৯৬৫ সালে 'আশ্চর্য' গোষ্ঠী থেকে সৃষ্টি হয় এবং সত্যজিৎ রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, তুষারকান্তি ঘোষ, পাহাড়ী সান্যাল প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহযোগিতায় অচিরেই বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। বর্তমানে ক্লাবটির সদস্য-সংখ্যা প্রায় দেড় হাজার এবং গত দু' বছরে সতেরটি সুনির্বাচিত ফিল্ম প্রদর্শন করা হয়েছে। ফিল্মগুলির নাম 'ভিলেন অভ দি ড্যামড', 'চিলড্রেন অভ দি ড্যামড', 'অ্যামফিবিয়ান ম্যান', 'দি লস্ট ওয়ার্লড' 'ম্যান অভ দি ফার্স্ট সেঞ্চুরী', 'ইনক্রেডিবল শ্রিংকিংম্যান', 'ভয়েজ টু দি বটম অভ দি সী', 'সন অভ ফ্লাবার', 'ফ্যাবুলাস ওয়ার্ল্ড অভ জুলস্ ভর্ণ', 'ক্রিয়েশান অভ দি ওয়ার্লড' 'দি ম্যাজিশিয়ান', 'মেট্রোপলিস', 'ওয়ার অভ দি ওয়ার্লড্স', 'মাউস অন দি মুন', 'দি বার্ডস', 'ফাইভ উইকস ইন এ বেলুন' এবং 'জার্নি টু দি সেণ্টার অভ দি আর্থ'।

১৯৬৮ সালে ক্লাবের তৃতীয় বর্ষটি ফিল্ম প্রদর্শনী-সূচীর এক গৌরবময় অধ্যায় সূচিত হবে বলে ক্লাব-কর্তৃপক্ষ আশা করছেন; কারণ, তৃতীয় বর্ষে 'ফ্যানটাসটিক ভয়েজ' এবং 'ফারেনহাইট ৪৫১' নামে দু'খানি বিশ্ববিতর্কিত অনবদ্য ফিল্মের প্রিমিয়ার প্রদর্শনী কেবলমাত্র সদস্যদের জন্যই অনুষ্ঠিত হওয়ার আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে। এছাড়া বৎসরের প্রথম মাসেই 'দি টেমটেশ্যন অভ সেণ্ট অ্যানটৌনিও' ও 'মণিহারা' নামে দুটি প্রশংসাপ্রাপ্ত ক্যানটাস ফিল্ম দেখানো হচ্ছে। বিখ্যাত ফিল্ম 'ফার্স্ট মেন ইন দি মুন' এবং 'ডক্টর স্ট্রেঞ্জলাভ'ও দেখানো হবে।

ক্লাবের আগামী প্রদর্শনী সত্যজিৎ রায়ের 'মণিহারা' এবং ফেডেরিকো ফেলিনির 'দি টেমটেশ্যান অভ সেণ্ট অ্যানটৌনিও' ২৮শে জানুয়ারী অ্যাকাডেমী অভ ফাইন আর্টসে সকাল সাড়ে ন'টায় অনুষ্ঠিত হবে। ইতিমধ্যে ক্লাবে অল্পসংখ্যক নতুন সদস্য গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হবে বলে জানা গেছে। নতুন ধরনের ফিল্ম চর্চায় আগ্রহী ব্যক্তিরা ক্লাবের কার্যালয় ৯৭-১, সারপেনটাইন লেনে, সোম থেকে শুক্রবার সন্ধ্যা ৭-৩০ থেকে রাত ৮-৩০-এর মধ্যে যোগাযোগ করতে পারেন সেক্রেটারী শ্রীপ্রদীপ বর্ধনের সঙ্গে।

শিশু স্বর্গ

শিশু স্বর্গের নিয়মিত অনুষ্ঠান বসবে (১৪ জানুয়ারী) রবিবার সকাল ৯টায় মহাজাতি সদনে। এদিন নতুন প্রতিভার শিশু-শিল্পীরা ছাড়া চিলড্রেনস্ ন্যশনাল থিয়েটার কর্তৃক 'সোনালী শিং' আর যাদুকর এস কে সাহার যাদুবিদ্যা প্রদর্শন।

আগামী ২০ জানুয়ারী থেকে ৫ দিন, দেওঘরে শিশু স্বর্গ ও সর্বভিত্তিগার উদ্যোগে, শিশু স্বর্গের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এই পাঁচদিনের জন্য এখানে একটি অস্থায়ী শিক্ষা-শিবিরও খোলা হচ্ছে। যোগদানেচ্ছু শিশুরা সংযোগ স্থাপন করতে পারেন। শিশু স্বর্গের আপিস ২ই, বৃন্দাবন পাল লেন, কলকাতা-৩।

ভিনদেশী ছবি

একটা পোলিশ ছবি

১৯৩৯ এর এক রৌদ্রতপ্ত সেপ্টেম্বরের দিন। পোল্যান্ড হিটলার দ্বারা আক্রান্ত। সীমান্তের একটি ছোট্ট গ্রাম 'ওয়েস্টারপ্ল্যাট' রক্ষার কাজে পোলিশ সৈন্যবাহিনী অত্যন্ত তৎপর। দুর্ধর্ষ অমানুষিক তাদের প্রতিরোধ। ওয়েস্টারপ্ল্যাটের ট্রানসিট স্টোরটিকে রক্ষার জন্য এক কোম্পানী ইনফ্যান্ট্রি সৈন্য নামিয়ে দেওয়া হল। নির্দেশ আছে যদি ব্যাপক যুদ্ধ বাধে তাহলে অন্ততঃপক্ষে ছ'ঘন্টা তাদের যুদ্ধ করে প্রতিপক্ষকে ঠেকিয়ে রাখতে হবে। অল্প কিছু রসদ আর ঐ স্বল্পসংখ্যক পোলিশ সৈন্য নিজেদের ঐ ছোট্ট গ্রামখানিকে রক্ষার জন্য যে প্রাণপণ যুদ্ধ করেছিল তা পোলিশ ইতিহাসে গল্পগাথা হিসাবে স্থান পেয়েছে। 'বার্থ সার্টিফিকেট', 'নো প্লেস অন আর্থ', 'হেভেন এন্ড হেল' প্রভৃতি সাড়া জাগানো ছবির পরিচালক স্টানিসলাস রোজেইজ উপরোক্ত কাহিনী নিয়ে 'ওয়েস্টারপ্ল্যাট নামে একখানা ছবি করেছেন। ছবিখানি গত মস্কো উৎসবে উচ্চপ্রশংসিত ও পুরস্কৃত হয়েছে।

কেন্দ্রে ইওলিদার আগামী ছবি

মাসাকি ইজুমি গরীবের মেয়ে। ছোটবেলা থেকেই সে কোনো না কোন রকমে সংসারকে সাহায্য করে এসেছে। স্বচ্ছলতার

মুখ না দেখলেও সে খুব সুখী কারণ সে ভালবাসে কেন ইয়ামুচি নামে একটি ছেলেকে, ইয়ামুচিও ভালবাসে ইজুমিকে। জীবনের অনেক কিছু না পাওয়ার মধ্যে তার ঐ পাওয়াটুকুই তখন অনেক। ভাগ্য-চক্রে, অদৃষ্টের পরিহাসে ইজুমি পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়। নিজের অসুখের কথা জানতে পেরে সকলের কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে চায় ইজুমি বিশেষ করে প্রেমিকের কাছ থেকে, জাপানের প্রখ্যাত পরিচালক কেন্‌জি ইওসিদা এই কাহিনী নিয়ে তাঁর নতুন ছবির কাজ শুরু করেছেন। নিকাৎসু করপোরেশনের প্রযোজনায় এ ছবির বিভিন্ন ভূমিকায় আছেন ইওকি মোচিজুকি, মিচিও হিনো ও মন তাকাগি।

ফিওডোর চালিয়াপিনকে নিয়ে নতুন ছবি

প্রখ্যাত রুশ চিত্র পরিচালক মার্ক ডনস্কয় স্বদেশের খ্যাতনামা সঙ্গীতজ্ঞ ফিওডোর চালিয়াপিনের জীবনী অবলম্বনে নতুন ছবি তৈরীর কাজে ব্যস্ত রয়েছেন। তাস প্রতিষ্ঠানের সংবাদে প্রকাশ ছবিটি জীবনীমূলক হবে না। তাঁর কৈশোর জীবন থেকে শুরু করে মৃত্যুকাল অবধি বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলীর চিত্রায়ণ করা হবে। সঙ্গীতজ্ঞের এই ছবি তুলতে গিয়ে তৎকালীন কিছু খ্যাতনামা ব্যক্তি যেমন রাখমানিয়ভ, কোরোভিন, ভ্রুবেল, গর্কি প্রভৃতির কিছু ঘটনাবলীও ছবিতে চিত্রিত করা হবে। বিশেষভাবে গর্কির সঙ্গে চালিয়াপিনের বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছবির এক অন্যতম প্রধান ঘটনা। পরিচালক ডনস্কয় চালিয়াপিনের স্মৃতিকথা, তৎকালীন পুঁথি-পত্র ও লেখা প্রভৃতি থেকে তথ্যাদি আহরণ করে চিত্রনাট্য রচনা করেছেন। ছবির বেশীর ভাগ দৃশ্য গৃহীত হবে মস্কো, লেনিনগ্রাদ, ভোল্‌গার তীরে, ইতালী, ফ্রান্স ও আমেরিকায়।

নিগ্রো অভিনেতার জনপ্রিয়তা

কিছুদিন আগে জনপ্রিয়তা নিয়ে একটি ভোট হয়ে গেল হলিউডে। এই নির্বাচনে প্রথম স্থান পেলেন নিগ্রো অভিনেতা সিড্‌নী পোইতিয়ের, ইনি বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরস্কার অস্কারও পেয়েছেন। এ বছরে তার যে দুখানা ছবি মুক্তি পেয়েছে সে দুটি হল 'ইন দি হিট্‌ অফ দি নাইট' ও 'টু স্যার উইথ লভ্‌'। দুটো ছবিই শুধুমাত্র দর্শকসাধারণ নয় সমালোচক কর্তৃকও উচ্চপ্রশংসিত। পোইতিয়ের এর আগামী ছবি হল 'ফর লভ অফ আইভি' ও স্ট্যানলী ক্র্যামারের 'গেস্‌ হুজ কামিং টু ডিনার'। সাদা কালো চামড়ার বিরোধ নিয়েই এক সুষ্ঠু সন্দের সমাধানের ইঙ্গিত আছে এ ছবিতে। তার এই অসাধারণ জনপ্রিয়তার মূলে রাজনৈতিক কোন কারসাজি থাকতে পারে বলে কেউ কেউ অনুমান করছেন, কিন্তু তা সত্য নয়। আমরা ওর 'লিলিজ্‌ অফ দি ফিল্ড', 'দি প্যাচ অফ ব্লু' প্রভৃতি দেখেছি, সুতরাং তার অভিনয় ক্ষমতা ও জনপ্রিয়তা সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

টোকিওর এশিয়ান ছবির উৎসব

কোরিয়া, ফিলিপাইন, চীন, হংকং ও জাপান এই কটি দেশের ছবি নিয়ে কিছুদিন টোকিওয় চতুর্দশ এশিয়ান চিত্র উৎসব হয়ে গেল। এ উৎসবের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার 'গোল্ডেন হার্ভেস্ট' দেওয়া হয়েছে হংকংএর 'সুজান্না' ছবিকে। শ্রেষ্ঠ পরিচালক, অভিনেতা, অভিনেত্রীর পুরস্কার-গুলি পেয়েছেন যথাক্রমে কিম সু ইয়ং তাঁর 'ফগি টাউন' (কোরিয়া) ছবির জন্য, কো চুন্‌ সিয়াং 'লোনলি সেভেনটিন' (চীন) ছবির জন্য ও শ্রীমতী চারিতো শোলিস্‌ 'বিকজ্‌ অফ এ ফ্লাওয়ার' (ফিলিপাইন) ছবির জন্য। জাপান এ উৎসবে কোন প্রধান পুরস্কার না পেলেও নন্‌-ড্রামাটিক ছবি হিসাবে ওদেশের 'রাইকো' ছবিটা শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার অর্জন করেছে। এশিয়ায় ভারত, রাশিয়া ও জাপান ছাড়াও কম্যুনিস্ট ও অকম্যুনিস্ট দেশে যে উন্নত-মানের চলচ্চিত্র নির্মিত হয় তা এ উৎসব না দেখলে ভাবা যায় না।

গানের জলসা

কানন দেবী পরিবেশিত "জয়মালা" অনুষ্ঠান

গত ৩০শে এবং ৩১শে ডিসেম্বর বেতার-প্রচারিত জওয়ানদের জন্য আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠান "জয়মালা" পরিবেশিত হয়েছে শ্রীমতী কানন দেবীর কণ্ঠে। এর আগে বোম্বের চিত্রশিল্পী দ্বারা এই অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়েছে, কিন্তু বাংলা চিত্রজগতের মহিলাশিল্পী পরিবেশিত "জয়মালা" অনুষ্ঠান এই প্রথম। কণ্ঠমাধুর্যে, উচ্চারণ-সৌকর্যে এবং হিন্দী ভাষার বিশেষ ব্যঞ্জনায় এই অনুষ্ঠানটি সত্যি সত্যিই উপভোগ্য হয়। সায়গল, পঙ্কজ মল্লিক এবং আরো বাংলা ও বোম্বের বিশেষ বিশেষ শিল্পীদের পরিচয়দানও এই অনুষ্ঠানের অঙ্গীভূত ছিল। অনুষ্ঠান শুরু হয়েছিল কানন দেবী কণ্ঠের "জবাব" কথাচিত্রের জনপ্রিয় সঙ্গীত "তুফান মেল" দিয়ে।

শিশু রঙমহল-এর চিত্তগ্রাহী অনুষ্ঠান

কবির লড়াই-এর আসর। গাঁদাফুলের মালা-গলায় একটি মাইকের সামনে ইস্ট-বেঙ্গলের সমর্থক সর্দার। অপর মাইকের সামনে মোহনবাগানের পাণ্ডা। উভয়ের পিছনে খুদে শিশুবাহিনী। এ যদি ওকে বলে "চিংড়ীখেকো মোহনবাগান", ওপক্ষ সঙ্গে সঙ্গে জবাব "ইলিশখেকো ইস্ট-বেঙ্গল!" সঙ্গে সঙ্গে ছোটে শিশু আক্রমণকারী দল। দর্শকবৃন্দের সোল্লাস চিৎকারে সারা প্রেক্ষাগৃহ মুখর হয়ে ওঠে। অভিভাবকবৃন্দও বয়স ভুলে শিশুদের সঙ্গে মিশে গেছেন। আর এরকম চিত্তহারী উৎসবের আয়োজন করে-ছিলেন শিশু রঙমহলের কর্তৃপক্ষ।

এবারের ষোড়শ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে উপরোক্ত কৌতুকালেখ্য ছাড়াও লালচে-বুড়া, কনকবংশী নৃত্যনাট্য, আনন্দ শিশু রঙমহলের অনুষ্ঠানসূচী সমৃদ্ধ করেছে। রাজভবনসংশ্লিষ্ট অবনমহলে দর্শক-সমাগমে তিলধারণের ঠাঁই ছিল না। বর্তমান পরিস্থিতির জন্য এবার মেলা বসানো হয়নি।

এবারের পুরস্কার বিতরণী সভায় ওয়েস্ট-কোলে গভর্নর'স অ্যাওয়ার্ড, কোলে চেম্পন্স অ্যাওয়ার্ড, মেয়র'স অ্যাওয়ার্ড ছাড়াও বিভিন্ন পত্রিকা এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান-প্রদত্ত পুরস্কার লাভ করেন বিভিন্ন স্কুলের কৃতী ছাত্ররা। এঁদের পুরস্কৃত চিত্রগুলির এগ্‌জিবিশন দেখাতে দেখাতে শ্রীঅসিত মিত্র জানালেন যে বিশিষ্ট প্রতিভাবান শিশুশিল্পী ছাড়াও শিশু রঙমহলের প্রতিটি শিশুকে "টোকন প্রাইজ" দিয়ে উৎসাহিত করা হয়েছে।

৭০বি ধর্মতলায় অনুষ্ঠিত জলসাঘর'এ এবারকার অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য ছিল মহম্মদ সগীরুদ্দিনের একক সারেঙ্গী বাদন। একক বাদন শোনার সুযোগ বড় একটা ঘটে না। এখানেই শুনলাম তাঁর "যোগ" রাগের আলাপ ও গত। আলাপের প্রতিটি অঙ্গে মার্জিত রুচির সঙ্গে মিশেছে পরিণত শিল্পীমনের সংযত রসবোধ। প্রতিটি মুহূর্ত রসোদ্বেল হয়ে উঠেছিল। তেমনই আনন্দোচ্ছল হয়েছিল গতের অঙ্গের ছন্দ-বৈচিত্র্য। অন্তর না বাজলে যন্ত্র এমন বাজতে পারে না। অনুষ্ঠানের জন্য উদ্যোক্তারা অবশ্যই ধন্যবাদার্হ।

পরবর্তী শিল্পী শ্রী এ কাননের কলাবতী, মারুবেহাগ, ও ঠুংরী শ্রীঅনিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের তবলাসঙ্গতে যথেষ্ট উপভোগ্য হয়েছে।

শ্রীপ্রবীর ভট্টাচার্যর তবলালহরায় প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

সর্বশেষ অনুষ্ঠান বিশ্বনাথ বোসের তবলাসঙ্গতে শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেহালা। সব মিলিয়ে শ্রোতাদের প্রশংসা ইনি অনায়াসেই আদায় করে নিয়েছেন।

তানসেন পাণ্ডে স্মৃতি পরিষদ

শ্রদ্ধেয় ধ্রুপদী শ্রীতানসেন পাণ্ডের স্মৃতিবাসর অন্যান্যবারের মত এবারেও 'রবীন্দ্রভারতী' হলে পালিত হয়। অনুষ্ঠান শুরু হয় শ্রীমতী কল্যাণী বসুর খেয়াল দিয়ে। মার্জিতকণ্ঠের সুষ্ঠু রূপায়ণ আমাদের আনন্দ দিয়েছে। 'জয়জয়ন্তী' রাগে শ্রীমতী দীপালি গুজর চৌতাল এবং দেশ রাগের ধামারও সুপরিবেশিত।

যন্ত্রসঙ্গীতের আসরে বেহালা ও সেতারে যথাক্রমে "যোগ" ও

বাজিয়ে শোনালেন শ্রীসুনীল সিংহ ও শৈলেন পাল।

শ্রীযুক্ত উষারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের দরবারী কানাড়া ও ঠুংরী তাঁর স্বভাবানুগ দক্ষতায় পরিবেশিত।

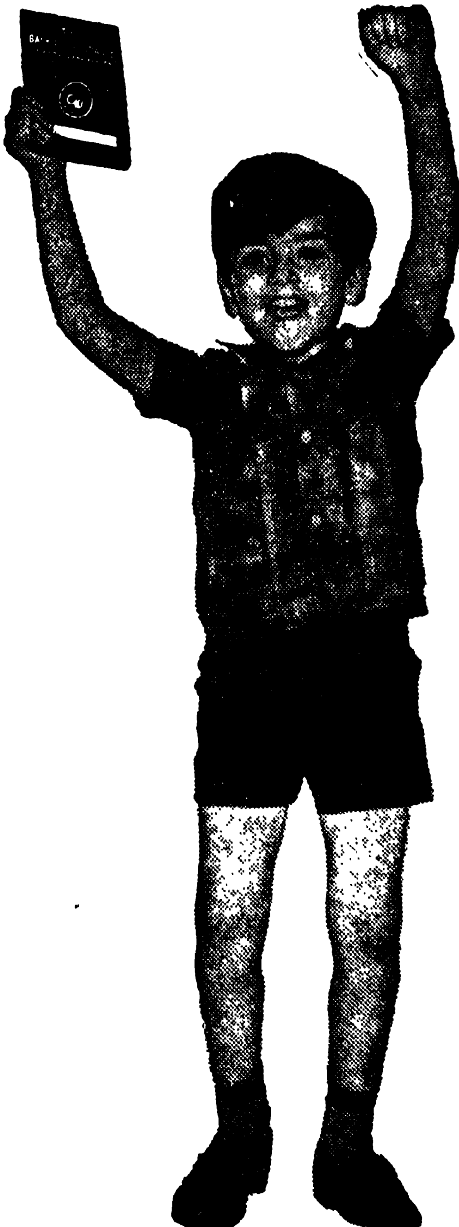
সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান হোলো শ্রীসহীউদ্দিন ও রসিমুদ্দিন ডাগরের ধ্রুপদ। রাগ "বাগেশ্রী"। ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের উৎস হোলো ধ্রুপদ। এই রাগ ঈশ্বরের স্তুতি। ধ্রুপদের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক ভাবগৌরব, গাম্ভীর্য, গভীরতা ও আঙ্গিক-কুশলতা এঁদের গানে সুবিশ্লেষিত। প্রথম থেকে শেষ অবধি এঁদের অনুষ্ঠান আসরকে এক ভাবগম্ভীর মর্যাদায় ভূষিত করেছে।

সঙ্গতে ছিলেন প্রতাপনারায়ণ মিত্র (পাখোয়াজ), প্রণব মুখোপাধ্যায় ও সমীর বন্দ্যোপাধ্যায় (তবলা)।

ছবি রিদম্ অর্কেস্ট্রা

কোলকাতার জনপ্রিয় ছবি রিদম্ অর্কেস্ট্রা গত ৭ই জানুয়ারী সকালে তাদের ৬ষ্ঠ বার্ষিকী অনুষ্ঠান করল মহাজাতি-সদনে। সভাপতির ভাষণ প্রসঙ্গে প্রাণতোষ ঘটক অর্কেস্ট্রা দলের কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন। যন্ত্রসংগীতে অংশগ্রহণ করেছিলেন সর্বশ্রী হিমাংশু বিশ্বাস, কাজী অনিরুদ্ধ, দিলীপ রায়, গৌরাঙ্গ দেব, লিটল রিচার্ড ও স্মল ফ্রাই সম্প্রদায়। গ্র্যান্ড মিউজিক্যাল ককটেল-এ বিভিন্ন সংগীত পরিবেশন হয় শ্রীঅরূপ গাইনের পরিচালনায়।

—চিত্রাঙ্গদা



মাত্র ৫ বছরের ছেলে

—আর ইতিমধ্যেই রোজকার করছে

বুদ্ধিমান ছেলে? হতে পারে। কিন্তু মা-বাবা আরো বেশী বুদ্ধিমান। কেননা, তার জন্মদিনে তাঁরা ছেলেটিকে একটি চমৎকার উপহার দিয়েছেন। আর এই উপহারটি হচ্ছে ব্যাঙ্ক অব বরোদাতে ছেলেটির নামে একটা মাইনর্স সেভিংস অ্যাকাউণ্ট।

বড় হয়ে যখন সে ডাক্তারী, আইন, ইঞ্জিনিয়ারিং এসব পড়তে চাইবে তখন তার জন্য প্রচুর টাকা জমা থাকবে।

আপনার ছেলের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করতে ব্যাঙ্ক অব বরোদা আপনাকে সাহায্য করতে পারে। আজই তার নামে ব্যাঙ্ক অব বরোদাতে একটা মাইনর্স সেভিংস অ্যাকাউণ্ট খুলে দিন।

- এমনকি এক টাকা জমা দিয়েও আপনি মাইনর্স সেভিংস অ্যাকাউণ্ট খুলতে পারেন। আর এতে ৪% হারে সুদ পাবেন।
- ছেলের ১৪ বৎসর বয়স অবধি অ্যাকাউণ্টটি পরিচালনা করতে পারেন। তারপরে সে নিজেই পরিচালনা করতে পারবে—আর এভাবে সুরু হবে তার মিতব্যয়িতার অভ্যাস।



চিরসমৃদ্ধির সোপান

দি ব্যাঙ্ক অব বরোদা লিমিটেড

স্থাপিত: ১৯০৮, রেজিস্টার্ড অফিস: মাণ্ডবী, বরোদা।
ভারত ও বহির্ভারতে তিন শতের বেশী শাখা আছে।

কাছাকাছি কোনও শাখা থেকে 'আমরা আপনাকে সাহায্য করতে পারি' নামক বিনামূল্যের পুস্তিকাটি চেয়ে নিন বা চেয়ে পাঠান।

shilpi bob 12/67A BEN

খেলাধুলা

দর্শক

ভারতবর্ষ বনাম অস্ট্রেলিয়া

দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচ

ভারতবর্ষ ঃ ১৭৩ রান (পতৌদি ৭৫ এবং সুর্তি ৩০ রান। ম্যাকেঞ্জী ৬৬ রানে ৭ এবং রেনিবার্গ ৩৭ রানে ২ উইকেট)

ও ৩৫২ রান (ওয়াদেকার ৯৯, পতৌদি ৮৫, সুর্তি ৪৩ এবং ইঞ্জিনীয়ার ৪২ রান। ম্যাকেঞ্জী ৮৫ রানে ৩, সিম্পসন ৪৪ রানে ৩ এবং রেনিবার্গ ৯৮ রানে ২ উইকেট)

অস্ট্রেলিয়া ঃ ৫২৯ রান (আয়ান চ্যাপেল ১৫১, বব সিম্পসন ১০৯, বিল লরী ১০০ এবং বেরী জার্ম্যান ৬৫ রান। প্রসন্ন ১৪১ রানে ৬ এবং সুর্তি ১৫০ রানে ৩ উইকেট)

প্রথমদিন (ডিসেম্বর ৩০) ঃ

ভারতবর্ষ প্রথম ইনিংসের ৮ উইকেট খুইয়ে ১৫৬ রান সংগ্রহ করে। অধিনায়ক পাতৌদি ৭০ রান করে নটআউট থাকেন।

দ্বিতীয় দিন (জানুয়ারী ১) ঃ

ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস ১৭৩ রানের মাথায় শেষ হলে খেলার বাকি সময়ে অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসের ৫ উইকেট খুইয়ে ৩২৯ রান সংগ্রহ করে ১৫৬ রানে এগিয়ে যায়। আয়ান চ্যাপেল (৪৫ রান) এবং উইকেটকিপার বেরী জার্ম্যান (০ রান) খেলায় অপরাজিত থাকেন।

তৃতীয় দিন (জানুয়ারী ২) ঃ

অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের খেলা ৫২৯ রানের মাথায় শেষ হলে ভারতবর্ষ ৩৫৬ রানের পিছনে পড়ে দ্বিতীয় ইনিংসে খেলতে নামে এবং ৩ উইকেট খুইয়ে ১৯০ রান সংগ্রহ করে। এইদিনের খেলায় অপরাজিত ছিলেন অজিত ওয়াদেকার (৯৭ রান) এবং প্রসন্ন (০ রান)।

চতুর্থ দিন (জানুয়ারী ৩) ঃ

ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংস ৩৫২ রানের মাথায় শেষ হলে অস্ট্রেলিয়া এক ইনিংসে ও ৪ রানে জয়লাভ করে।

মেলবোর্নে আয়োজিত ভারতবর্ষ বনাম অস্ট্রেলিয়ার পঞ্চম টেস্ট সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়া এক ইনিংসে ও ৪ রানে জয়লাভ করার সূত্রে ১৯৬৭—৬৮ সালের চলতি টেস্ট সিরিজে ২—০ খেলায় অগ্রগামী হয়েছে। বর্তমান টেস্ট সিরিজের আর দুটি টেস্ট খেলা বাকি ব্রিসবেনের তৃতীয় এবং সিডনির চতুর্থ অর্থাৎ শেষ টেস্ট।

ভারতবর্ষের অধিনায়ক পাতৌদি টসে জয়ী হন এবং আকাশ জলভরা মেঘে আচ্ছন্ন থাকা সত্ত্বেও প্রথম ব্যাট করার দান নিয়েছিলেন। ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসের গোড়াপত্তন খুবই খারাপ হয়েছিল, দলের মাত্র ২৫ রানের মাথায় ৫ম উইকেট পড়ে যায়। লাঞ্চের সময় ভারতবর্ষের ৬টা উইকেট পড়ে মাত্র ৫৯ রান দাঁড়ায়। অস্ট্রেলিয়ার ফাস্ট বোলার গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জী ২ ঘণ্টার খেলায় একাই এই ৬টা উইকেট নিয়েছিলেন। খেলার এক সময়ে তাঁর বোলিং পরিসংখ্যান ছিল ১৬ ওভার, ২ মেডেন এবং ৩৪ রানে ৬টা উইকেট। একমাত্র পাতৌদিই নির্ভয়ে ম্যাকেঞ্জীর বল খেলছিলেন। ৮ম উইকেটের জুটি সুর্তি এবং পতৌদি ১১৮ মিনিটের খেলায় দলের ৭৪ রান সংগ্রহ করে চরম বিপর্যয় থেকে দলকে রক্ষা করেন। দলের ১৪৬ রানের মাথায় সুর্তি (৮ম উইকেট) বিদায় নিলে পতৌদির সঙ্গে ৯ম উইকেটের জুটি বাঁধেন দেশাই। ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসের ১৫৬ রানের (৮ উইকেটে) মাথায় প্রথম দিনের খেলা শেষ হয়। পতৌদি ৭০ এবং দেশাই ৩ রান করে খেলায় অপরাজিত থাকেন।

দ্বিতীয় দিনে ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসের খেলা মাত্র ২৮ মিনিট স্থায়ী ছিল —১৭৩ রানের মাথায় তাদের প্রথম ইনিংস শেষ হয়। পাতৌদি তাঁর ৭৫ রানের মাথায় রিনেবার্গের বল খেলে উইকেটকিপার জার্ম্যানের হাতে ধরা পড়ে আউট হন। শেষ ১০ম উইকেট জুটি চন্দ্রশেখর (০) এবং দেশাই (নটআউট ১৩ রান) দলের ১২ রান যোগ করেন। গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জী ২১·৪ ওভার বল করে ২টো মেডেন এবং ৬৬ রানে ৭টা উইকেট পান।

দ্বিতীয় দিনের খেলার বাকি সময়ে অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসের ৫ উইকেটের বিনিময়ে ৩২৯ রান তুলে ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসের ১৭৩ রানের থেকে ১৫৬ রানে এগিয়ে যায়; এদিকে হাতে জমা থাকে আরও ৫টা উইকেট। প্রথম উইকেটের জুটিতে সিম্পসন এবং লরী মোট ১৯৫ মিনিট খেলে দলের ১৯১ রান সংগ্রহ করার সূত্রে ভারতবর্ষের বিপক্ষে টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়ার প্রথম উইকেট জুটির রেকর্ড রান করেন। পূর্ব রেকর্ড ছিল তাঁদেরই—১১৫ রান (কলকাতা, ১৯৬৪)। লরীর এই দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসের ১০০ রান ভারতবর্ষের বিপক্ষে প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরী এবং তাঁর টেস্ট খেলোয়াড়-জীবনের ৯ম সেঞ্চুরী। অপরদিকে সিম্পসনের ১০৯ রান আলোচ্য টেস্ট সিরিজে ভারতবর্ষের বিপক্ষে ২য় সেঞ্চুরী তথা তাঁর টেস্ট খেলোয়াড়-জীবনের ৮ম সেঞ্চুরী। অস্ট্রেলিয়ার বর্তমান টেস্ট খেলোয়াড়দের মধ্যে লরীই সর্বাধিক টেস্ট সেঞ্চুরী (৯টি) করেছেন।

তৃতীয় দিনে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসে ৫২৯ রানের মাথায় শেষ হলে তারা ৩৫৬ রানে এগিয়ে খেলায় বিরাট প্রাধান্য বিস্তার করে। অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসে মোট



অধিনায়ক পতৌদি

৪৯৩ মিনিট স্থায়ী ছিল। দলের শেষ খেলোয়াড় আউট হন আয়ান চ্যাপেল। তিনবার আউট হওয়ার সহজ সুযোগ দিয়ে তিনি শেষপর্যন্ত টেস্ট খেলায় তাঁর প্রথম সেঞ্চুরী (১৫১ রান) করার গৌরব লাভ করেন। অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসে তিনজন খেলোয়াড় সেঞ্চুরী করেন—আয়ান চ্যাপেল ১৫১, বব সিম্পসন ১০৯ এবং বিল লরী ১০০। এঁদের পরই উইকেটকিপার বেরী জার্ম্যানের ৬৫ রান উল্লেখযোগ্য। অফ্-স্পিনার প্রসন্ন ৩৪ ওভার বল করে ১৪১ রানে ৬টা উইকেট পান।

তৃতীয় দিনে ভারতবর্ষ প্রথম ইনিংসের খেলার ভিত্তিতে ৩৫৬ রানের পিছনে পড়ে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে এবং ৩ উইকেটের বিনিময়ে ১৯০ রান সংগ্রহ করে। ছাব্বিশ বছরের ন্যাটা খেলোয়াড় অজিত ওয়াদেকার ব্যক্তিগত ৯৭ রান করে অপরাজিত থাকেন। উইকেটের চারদিকে তাঁর দর্শনীয় খেলা দেখে মেলবোর্ন মাঠের দর্শককুল পরম তৃপ্তি লাভ করেন।

চতুর্থ দিনে ৩৫২ রানের মাথায় ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হলে খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ের দেড়দিন আগেই দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়ে যায়। ওয়াদেকারের দুর্ভাগ্য যে, তিনি মাত্র একরানের জন্যে সেঞ্চুরী করতে পারেননি। ওয়াদেকারকে 'রানার' হিসবে নিয়ে অধিনায়ক পতৌদি দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে ব্যক্তিগত ৮৫ রান (১২টি বাউণ্ডারী-সহ) করেন। ৭ম উইকেটের জুটিতে আবিদ আলী (২১ রান) এবং পাতৌদি দলের ৪১ রান এবং ৯ম উইকেটের জুটিতে পতৌদি এবং দেশাই দলের ৫৪ রান সংগ্রহ করেছিলেন। দ্বিতীয় ইনিংসে সিম্পসনের বোলিংয়ে ভারতবর্ষ খুবই কাবু হয়েছিল। ম্যাকেঞ্জী এই খেলায় ১৫১ রানে ১০টা উইকেট পান (৬৬ রানে ৭ এবং ৮৫ রানে ৩ উইকেট)।

দ্বিতীয় টেস্টে জয়লাভের গৌরব জিতেছে অস্ট্রেলিয়া; কিন্তু সেই সঙ্গে

এই খেলায় সমস্ত গৌরবই তাদের একার প্রাপ্য নয়। সেখানে যোগ্য ভাগীদার হিসাবে আছেন পরাজিত ভারতীয় দলেরই তিনজন খেলোয়াড়—বিশেষ করে অধিনায়ক পতৌদি। দলের অন্তত সঙ্কটকালে তাঁর ১৬০ রান (প্রথম ইনিংসে ৭৫ ও দ্বিতীয় ইনিংসে ৮৫) বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়, সংগ্রামী শক্তি এবং চিত্তাকর্ষক ক্রিকেট খেলার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পতৌদির এই খেলা মেলবোর্ন মাঠের টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে এক বিরল নজির। ভারতীয় দল শোচনীয় পরাজয় বরণ করলেও পতৌদি স্মরণীয় হয়ে রইলেন। দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় আউট হয়ে তিনি যখন ধীরপদক্ষেপে প্যাভিলিয়নে ফিরে যান তখন দর্শকদের পক্ষ থেকে তাঁর খেলায় উচ্ছ্বসিত প্রশংসা, আনন্দধ্বনি এবং বিদায়-অভিনন্দন মেলবোর্ন মাঠের অনেক ঐতিহাসিক টেস্ট খেলাকে ম্লান করে দিয়েছিল। বৈদেশিক ক্রীড়া-সমালোচকদের মতে, পতৌদির এই গৌরবজনক খেলা বিশ্বের প্রথম সারির ব্যাটসম্যান—গারফিল্ড সোবার্স (ওয়েস্ট ইন্ডিজ) গ্রীম পোলক (দক্ষিণ আফ্রিকা) এবং ববি সিম্পসনের (অস্ট্রেলিয়া) খেলার পর্যায়ে নিঃসন্দেহে ফেলা যায়।

এডিলেডের প্রথম টেস্টে ভারতীয় দলে যাঁরা খেলেছিলেন তাঁদের থেকে নাদকার্নী এবং কুলকার্নীকে বাদ দিয়ে বাকি খেলোয়াড়দের সঙ্গে পতৌদি এবং দেশাইকে নিয়ে দ্বিতীয় টেস্টে ভারতীয় দল গঠন করা হয়েছিল। অপরদিকে অস্ট্রেলিয়া দলের কোন পরিবর্তন হয়নি, প্রথম টেস্টের মনোনীত খেলোয়াড়রাই দ্বিতীয় টেস্টে খেলেছিলেন। পতৌদি দ্বিতীয় টেস্টের টসে জয়ী হয়েও প্রথম ব্যাট করার দান ছেড়ে দেন। অনেকের মতে, তাঁর এই সিদ্ধান্ত খুবই ভুল হয়েছে; কারণ মেলবোর্নের পীচে যথেষ্ট প্রাণ ছিল। অবশ্য পতৌদির নিজের ধারণা, তিনি ভুল করেননি, যেহেতু তাঁর ফাস্ট বোলার নেই। তাঁর সম্বল স্পিন বোলিং। তাই তিনি অস্ট্রেলিয়াকে দ্বিতীয় ইনিংস খেলাতে চেয়েছিলেন।

দুই দলের খেলোয়াড়

অস্ট্রেলিয়া : ববি সিম্পসন (অধিনায়ক), বিল লরী, পল সেহান, বব কাউপার, আয়ান চ্যাপেল, বেরী জর্মান, আয়ান রেডপাথ, গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জী, জিম্ হিসন, এ্যালান কনোলী এবং ডেভ রেনিবার্গ।

ভারতবর্ষ : পতৌদি (অধিনায়ক), চান্দু বোরদে, দিলীপ সারদেশাই, ফারুক ইঞ্জিনীয়ার, অজিত ওয়াদেকার, রুসী সুর্তি, আবিদ আলী, ভি সুব্রহ্মনিয়াম, রমাকান্ত দেশাই ই এ এস প্রসন্ন এবং বি এস চন্দ্রশেখর।

জাতীয় টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা

গৌহাটিতে আয়োজিত ২৯তম জাতীয় এবং আন্তঃ রাজ্য টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় রেলওয়ে পুরুষ বিভাগে মহারাষ্ট্র মহিলা বিভাগে এবং অন্ধ্র জুনিয়র বিভাগে দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছে। মহারাষ্ট্র তিনটি বিভাগেরই ফাইনালে খেলে শেষ পর্যন্ত মহিলা বিভাগের জয়লক্ষ্মী কাপ জয়ী হয়। পুরুষ বিভাগের ফাইনালে উপর্যুপরি গত ১৩ বারের বার্ণা-বেলাক কাপ বিজয়ী মহারাষ্ট্র ৩—৫ খেলায় রেলওয়ে দলের কাছে পরাজিত হলে তাদের দীর্ঘদিনের প্রাধান্যের অবসান হয়।

দলগত বিভাগের ফাইনাল

পুরুষ বিভাগ (বার্ণা-বেলাক কাপ) : রেলওয়ে ৫—৩ খেলায় গত ১৩ বারের বিজয়ী মহারাষ্ট্রকে পরাজিত করে।

মহিলা বিভাগ (জয়লক্ষ্মী কাপ) : মহারাষ্ট্র চ্যাম্পিয়ান (উপর্যুপরি ৪বার জয়) এবং বাংলা ২য় স্থান।

জুনিয়র বিভাগ (রামনুজন কাপ) : অন্ধ্র ৩—০ খেলায় গত দুবারের বিজয়ী মহারাষ্ট্রকে পরাজিত করে।

ব্যক্তিগত বিভাগের ফাইনাল

পুরুষদের সিংগলস : ফারুক খোদাইজী (মহারাষ্ট্র) ২১-১৪, ২১-১৫ ও ২১-১৫ পয়েন্টে মন্টি মার্চেন্টকে (মহারাষ্ট্র) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস : পাপু হালদানকার এবং এ রেঙ্গুনওয়ালা (রেলওয়ে) ২১-১৩, ২১-১৭ ও ২১-১০ পয়েন্টে আর আর চাচাদ এবং উদয় গুজ্জারকে (মহারাষ্ট্র) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস : খোদাইজী এবং কেটি চার্জম্যান (মহারাষ্ট্র) ১৯-২১, ২১-১২, ২১-১৬, ১৮-২১ এবং ২১-৯ পয়েন্টে চাচাদ এবং প্রিস্কা রোজারিওকে (মহারাষ্ট্র) পরাজিত করেন।

বালিকাদের সিংগলস : রুপা মুখার্জি (বাংলা) ২১-১০, ১৬-২১, ২১-১৫ এবং ২১-১১ পয়েন্টে আর গীতাকে (মহীশুর) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিংগলস : অবাছাই খেলোয়াড় কুমারী অলকা ঠাকুর (মহারাষ্ট্র) ১১-২১, ২১-১৭, ১০-২১, ২১-১৫ ও ২১-১৩ পয়েন্টে প্রিস্কা রোজারিওকে (মহারাষ্ট্র) পরাজিত করেন। কুমারী ঠাকুর ৩য় রাউন্ডে গত বছরের সিংগলস চ্যাম্পিয়ান উষা সুন্দররাজকে পরাজিত করেছিলেন।

বালকদের সিংগলস : সুহাস কুলকার্ণি (মহারাষ্ট্র) ১৪-২১, ২১-১৭, ২১-১২, ২২-২১ ও ২১-১৬ পয়েন্টে নাচ্চু মুখার্জিকে (বাংলা) পরাজিত করেন।

জাতীয় ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা

মাদ্রাজে আয়োজিত ২৩তম জাতীয় এবং আন্তঃ রাজ্য ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় রেলওয়ে পুরুষ বিভাগে এবং মহারাষ্ট্র মহিলা ও জুনিয়র বিভাগে দলগত খেতাব জয়ী হয়েছে। মহারাষ্ট্র পুরুষ বিভাগের ফাইনালে ১—৪ খেলায় গত দু বছরের বিজয়ী রেলওয়ে দলের কাছে পরাজিত হয়।

দলগত বিভাগের ফাইনাল

পুরুষ বিভাগ (রহিমতুল্লা কাপ) : রেলওয়ে ৪—১ খেলায় মহারাষ্ট্রকে পরাজিত করে উপর্যুপরি চারবার রহিমতুল্লা কাপ জয়ী হয়।

মহিলা বিভাগ (চাড্ডা কাপ) : গত বছরের বিজয়ী মহারাষ্ট্র ২—১ খেলায় রেলওয়েকে পরাজিত করে।

জুনিয়র বিভাগ (নারাঙ্গা কাপ) : মহারাষ্ট্র ২—১ খেলায় বাংলাকে পরাজিত করে।

ব্যক্তিগত বিভাগের ফাইনাল

পুরুষদের সিংগলস : গতবারের বিজয়ী সুরেশ গোয়েল (রেলওয়ে) ১৫-৬ এবং ১৫-৩ পয়েন্টে দীপু ঘোষকে (রেলওয়ে) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিংগলস : গতবারের চ্যাম্পিয়ান শ্রীমতী সরোজিনী গোগাতে (রেলওয়ে) ১১-৬ ও ১১-৭ পয়েন্টে কুমারী রফিয়া লতিফকে (মহারাষ্ট্র) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস : দীপু এবং রমেন ঘোষ (রেলওয়ে) ৮-১৫, ১৭-১৪ ও ১৫-৯ পয়েন্টে সুরেশ গোয়েল এবং সি ডি দেওরাজকে (রেলওয়ে) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস : দুই ভগ্নী শ্রীমতী সরোজিনী গোগতে এবং কুমারী সুনীলা আপ্তে (রেলওয়ে) ১৫-৩ ও ১৮-১৫ পয়েন্টে গতবারের চ্যাম্পিয়ান জুটি কুমারী মনদা কেলকার এবং কুমারী শোভা মূর্তীকে (মহারাষ্ট্র) পরাজিত করেন।

জাতীয় ভলিবল প্রতিযোগিতা

কলকাতার ইডেন উদ্যানের রঞ্জি স্টেডিয়ামে আয়োজিত ১৬শ জাতীয় ভলিবল প্রতিযোগিতায় পাঞ্জাব পুরুষ ও মহিলা বিভাগে খেতাব জয়ী হয়েছে। কলকাতা তথা পশ্চিম বাংলায় জাতীয় ভলিবল প্রতিযোগিতার আসর এই প্রথম। প্রতিযোগিতাটি লীগ এবং নক-আউট প্রথায় অনুষ্ঠিত হয়। পুরুষদের 'এ' গ্রুপে সার্ভিসেস 'বি' গ্রুপে পাঞ্জাব 'সি' গ্রুপে রেলওয়ে এবং 'ডি' গ্রুপে উত্তরপ্রদেশ লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল।

ফাইনাল খেলা

পুরুষ বিভাগ : পাঞ্জাব ১৫-১৩, ১৫-১০ ও ১৫-৯ পয়েন্টে গত বছরের বিজয়ী সার্ভিসেস দলকে পরাজিত করে। এই নিয়ে পাঞ্জাব ৬বার খেতাব পেল। পূর্ব জয় ১৯৫৪—৫৬ ও ১৯৬২—৬৩।

মহিলা বিভাগ : পাঞ্জাব ৮-১৫, ১৫-১১, ৮-১৫ ১৫-১৩ এবং ১৮-১৭ পয়েন্টে হায়দরাবাদকে পরাজিত করে। এই নিয়ে পাঞ্জাবের ৮ম জয়। পূর্ব জয় : ১৯৫৭—৬২ এবং ১৯৬৫ সালে।



ডেভিস কাপ : আন্তর্জাতিক লন্ টেনিস প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দলের পুরস্কার

আন্তর্জাতিক ডেভিস কাপ

ক্ষেত্রনাথ রায়

আন্তর্জাতিক টেনিস খেলার আসরে দুই প্রধান প্রতিযোগিতা—ডেভিস কাপ এবং উইম্বলেডন (সরকারী নাম অল-ইংল্যান্ড) লন্ টেনিস প্রতিযোগিতা। ডেভিস কাপ হল দলগত প্রতিযোগিতা এবং উইম্বলেডন ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নশীপের খেলা। এই দুই প্রতিযোগিতায় খেতাব জয়ের অর্থ বে-সরকারীভাবে বিশ্ব খেতাব লাভ। কারণ বিশ্ব পর্যায়ে লন্ টেনিস প্রতিযোগিতার কোন পৃথক ব্যবস্থা নেই। তার জন্য কিন্তু টেনিস খেলোয়াড়দের মনে কোন ক্ষোভ নেই। পৃথিবীর খ্যাতনামা অপেশাদার টেনিস খেলোয়াড়রা প্রতি বছর এই দুই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে প্রতিযোগিতার ঐতিহ্য এবং গুরুত্ব অক্ষুণ্ণ রেখে চলেছেন।

ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার সূচনা ১৯০০ সালে, বোস্টনের লংউড ক্রিকেট মাঠে। আমেরিকার প্রখ্যাত টেনিস খেলোয়াড় ডিউইট ফিলে ডেভিস আমেরিকা এবং ইংল্যান্ডের মধ্যে প্রতিনিধিমূলক দলগত টেনিস প্রতিযোগিতার প্রস্তাব করে একটি মূল্যবান মনোরম কাপ উপহার দেন। ডেভিসের নামেই প্রতিযোগিতার নামকরণ হয়। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন বছরে মাত্র দুটি দেশ আমেরিকা এবং গ্রেট বৃটেন (সেই সময়ের নাম বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ) অংশ গ্রহণ করেছিল। আমেরিকা ৫-০ খেলায় বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জকে পরাজিত করে প্রথম ডেভিস কাপ জয়লাভের গৌরব লাভ করে। ডেভিস কাপের এই উদ্বোধনী খেলায় আমেরিকার পক্ষে এই প্রতিযোগিতার প্রবর্তক ডিউইট ফিলে ডেভিস তিনটি খেলায় জয়ী হন (সিংগলস ২ এবং ডাবলস ১)। ছোট অবস্থা থেকে ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতা পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ করে। বর্তমান সময়ে ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী দেশের সংখ্যা ৪২টি। তিনটি জোন নিয়ে খেলা হয়— ইউরোপীয়ন ('এ' এবং 'বি' গ্রুপ), আমেরিকান এবং এশিয়ান বা ইস্টার্ণ জোন। জোন-বিজয়ী দেশগুলি মূল প্রতিযোগিতার ইন্টার-জোন সেমি-ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করে। ইন্টার-জোন ফাইনালের বিজয়ী দেশই চ্যালেঞ্জ রাউন্ড অর্থাৎ ফাইনালে আগের বছরের ডেভিস কাপ বিজয়ী দেশের সংগে মিলিত হয়। যে-দেশ ডেভিস কাপ জয়ী হয় পরবর্তী বছরের প্রতিযোগিতায় তাকে আর আঞ্চলিক খেলায় অংশ গ্রহণ করতে হয় না, সরাসরি চ্যালেঞ্জ রাউন্ড অর্থাৎ ফাইনালে খেলতে নামে। যেমন ১৯৬৭ সালের ডেভিস কাপ বিজয়ী অস্ট্রেলিয়া ১৯৬৮ সালের প্রতিযোগিতার শুধু চ্যালেঞ্জ রাউন্ডেই খেলবে। কাপ বিজয়ীর পক্ষে একটা বিরাট সুবিধা এবং সম্মান।

ডেভিস কাপ লন টেনিস প্রতিযোগিতার সুদীর্ঘ ৬৮ বছরের ইতিহাসে (১৯০০-৬৭) মোট ১২ বার প্রতিযোগিতা হয়নি। ১৯০১ এবং ১৯১০ সালে ডেভিস কাপ বিজয়ী দেশ যথাক্রমে আমেরিকা এবং অস্ট্রেলেসিয়াকে (অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডের সম্মিলিত দল) চ্যালেঞ্জ করা হয়নি। তাছাড়া দুটি বিশ্বযুদ্ধের ফলে ১০ বছর খেলা বন্ধ ছিল (১৯১৫—১৮ এবং ১৯৪০—৪৫)। ১৯২৩ সাল পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড অস্ট্রেলেসিয়া নাম নিয়ে একসংগে খেলেছিল। অস্ট্রেলিয়া ১৯২৪ সাল থেকে স্বনামে খেলছে। সুদীর্ঘ ৬৮ বছরের প্রতিযোগিতায় ডেভিস কাপ জয়ী হয়েছে মাত্র এই চারটি দেশ—অস্ট্রেলিয়া ২২ বার (অস্ট্রেলেসিয়া নামে ৬ বার), আমেরিকা ১৯ বার এবং ইউরোপ থেকে ইংল্যান্ড ৯ বার ও ফ্রান্স ৬ বার। প্রথম ডেভিস কাপ জয়ী হয় আমেরিকা ১৯০০ সালে, ইংল্যান্ড ১৯০৩ সালে, অস্ট্রেলেসিয়া ১৯০৭ সালে, ফ্রান্স ১৯২৭ সালে এবং অস্ট্রেলিয়া স্বনামে ১৯৩৯ সালে। এই চারটি দেশ ছাড়া চ্যালেঞ্জ রাউন্ড অর্থাৎ ফাইনালে খেলেছে ইতালী ২ বার (১৯৬০—৬১), স্পেন ২ বার (১৯৬৫ ও ১৯৬৭) এবং একবার করে বেলজিয়াম (১৯০৪), জাপান (১৯২১), মেক্সিকো

ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউন্ড

১৯৪৬ সাল থেকে চ্যালেঞ্জ রাউন্ডের খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল :

বৎসর	বিজয়ী			বিজিত	
১৯৪৬	আমেরিকা	৫	:	অস্ট্রেলিয়া	০
১৯৪৭	আমেরিকা	৪	:	অস্ট্রেলিয়া	১
১৯৪৮	আমেরিকা	৫	:	অস্ট্রেলিয়া	০
১৯৪৯	আমেরিকা	৪	:	অস্ট্রেলিয়া	১
১৯৫০	অস্ট্রেলিয়া	৪	:	আমেরিকা	১
১৯৫১	অস্ট্রেলিয়া	৩	:	আমেরিকা	২
১৯৫২	অস্ট্রেলিয়া	৪	:	আমেরিকা	১
১৯৫৩	অস্ট্রেলিয়া	৩	:	আমেরিকা	২
১৯৫৪	আমেরিকা	৩	:	অস্ট্রেলিয়া	২
১৯৫৫	অস্ট্রেলিয়া	৫	:	আমেরিকা	০
১৯৫৬	অস্ট্রেলিয়া	৫	:	আমেরিকা	০
১৯৫৭	অস্ট্রেলিয়া	৩	:	আমেরিকা	২
১৯৫৮	আমেরিকা	৩	:	অস্ট্রেলিয়া	২
১৯৫৯	অস্ট্রেলিয়া	৩	:	আমেরিকা	২
১৯৬০	অস্ট্রেলিয়া	৪	:	ইতালী	১
১৯৬১	অস্ট্রেলিয়া	৫	:	ইতালী	০
১৯৬২	অস্ট্রেলিয়া	৫	:	মেক্সিকো	০
১৯৬৩	আমেরিকা	৩	:	অস্ট্রেলিয়া	২
১৯৬৪	অস্ট্রেলিয়া	৩	:	আমেরিকা	২
১৯৬৫	অস্ট্রেলিয়া	৪	:	স্পেন	১
১৯৬৬	অস্ট্রেলিয়া	৪	:	ভারতবর্ষ	১
১৯৬৭	অস্ট্রেলিয়া	৪	:	স্পেন	১

(১৯৬২) এবং ভারতবর্ষ (১৯৬৬)। এশিয়া মহাদেশের পক্ষে জাপানই সর্বপ্রথম ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউন্ডে খেলবার গৌরব লাভ করে।

অস্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকার প্রাধান্য

ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়ার ভূমিকা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। ১৯৩৮ সাল থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত এই দীর্ঘ ১৬ বছরের (যুদ্ধের জন্যে মাঝে ৬ বছর খেলা হয়নি) চ্যালেঞ্জ রাউন্ডে শুধু আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়া পরস্পর খেলেছে। এই সময়ের খেলার ফলাফল অস্ট্রেলিয়ার ডেভিস কাপ জয় ৯ বার এবং আমেরিকার ৭ বার। অস্ট্রেলিয়া ১৯৩৮ সাল থেকে ১৯৬৭ সাল

মোট ২৪ বারের প্রতিযোগিতায় (যুদ্ধের দরুণ মাঝে ৬ বছর খেলা হয়নি) অস্ট্রেলিয়া ২৪ বারই চ্যালেঞ্জ রাউন্ডে অর্থাৎ প্রতিযোগিতার ফাইনালে খেলে ১৬ বার ডেভিস কাপ পেয়েছে এবং বাকি ৮ বার পেয়েছে আমেরিকা।

খেলা

ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষের প্রথম যোগদান ১৯২১ সালে। ভারতবর্ষ এপর্যন্ত একবার চ্যালেঞ্জ রাউন্ড এবং ৬ বার ইন্টার-জোন ফাইনালে খেলে পরাজিত হয়েছে। চ্যালেঞ্জ রাউন্ডের খেলায় জয়লাভের অর্থ ডেভিস কাপ জয় এবং ইন্টার-জোন ফাইনালে জয়লাভের অর্থ চ্যালেঞ্জ রাউন্ডে খেলবার যোগ্যতা লাভ।

ডেভিস কাপ চ্যালেঞ্জ রাউন্ড সংক্ষিপ্ত ফলাফল

১৯০০—১৯৬৭

	মোট খেলা	জয়	পরাজয়
অস্ট্রেলিয়া	৩৬	২২	১৪
আমেরিকা	৪৩	১৯	২৪
গ্রেট বৃটেন	১৬	৯	৭
ফ্রান্স	৯	৬	৩
ইতালী	২	০	২
বেলজিয়াম	১	০	১
জাপান	১	০	১
মেক্সিকো	১	০	১
স্পেন	২	০	২
ভারতবর্ষ	১	০	১

ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউন্ড

বিজয়ী দেশ : এপর্যন্ত মাত্র চারটি দেশ এইভাবে ডেভিস কাপ জয় করেছে—অস্ট্রেলিয়া ২২ বার (নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে অস্ট্রেলেশিয়া নামে ৭ বার), আমেরিকা ১৯ বার, বৃটেন ৯ বার এবং ফ্রান্স ৬ বার।

রানার্স-আপ : আমেরিকা ২৪ বার, অস্ট্রেলিয়া ১৪ বার, ইংল্যান্ড ৭ বার, ফ্রান্স ৩ বার, ইতালী ২ বার, স্পেন ২ বার, এবং একবার করে বেলজিয়াম, জাপান, মেক্সিকো এবং ভারতবর্ষ।

উপর্যুপরি ডেভিস কাপ জয়

উপর্যুপরি ডেভিস কাপ জয়ের রেকর্ড করেছে আমেরিকা। তারা উপর্যুপরি ৭-বার (১৯২০—২৬) ডেভিস কাপ জয় করে এই রেকর্ড করে। আমেরিকার এই রেকর্ডের পর ফ্রান্সের উপর্যুপরি ৬-বার (১৯২৭—৩২) ডেভিস কাপ জয় উল্লেখযোগ্য। ফ্রান্সের এই একটানা ৬-বার ডেভিস কাপ জয়লাভের মূলে ছিলেন এই চারজন খেলোয়াড়—কোশে, বোরোত্রা, ল্যাকস্ত এবং ব্রুনো।

চ্যালেঞ্জ রাউন্ডে শেষ খেলা

অস্ট্রেলিয়া ১৯৬৭ সালে, আমেরিকা ১৯৬৪ সালে, ইংল্যান্ড ১৯৩৭ সালে, ফ্রান্স ১৯৩৩ সালে, বেলজিয়াম ১৯০৪ সালে, জাপান ১৯২১ সালে, ইতালী



প্রথম ডেভিস কাপ বিজয়ী আমেরিকান দল (১৯০০) : ছবির বাঁ-দিক থেকে হুইটম্যান, ডিউইট ফিলে ডেভিস (দাঁড়িয়ে) এবং এইচ ওয়ার্ড।

১৯৬১ সালে, মেক্সিকো ১৯৬২ সালে, ভারতবর্ষ ১৯৬৬ সালে এবং স্পেন ১৯৬৭ সালে শেষ চ্যালেঞ্জ রাউন্ডে খেলেছে।

শেষ ডেভিস কাপ জয়

শেষ ডেভিস কাপ জয়ী হয়েছে অস্ট্রেলিয়া ১৯৬৭ সালে, আমেরিকা ১৯৬৩ সালে, ইংল্যান্ড ১৯৩৬ সালে এবং ফ্রান্স ১৯৩২ সালে।

একটি সিঙ্গলস খেলায় সর্বাধিক 'গেমস' :

৭৮টি — ১৯৪৮ সালে বোস্টনে (আমেরিকা) অনুষ্ঠিত ইন্টার-জোন ফাইনালে এই রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয় যখন জে দ্রবনি (চেকোশ্লোভাকিয়া) ৬-৮, ৩-৬, ১৮-১৬, ৬-৩ ও ৭-৫ গেমে এ কে কুইস্টকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

একটি ডাবলস খেলায় সর্বাধিক 'গেমস' :

৮১টি (দুবার) — ১৯২৩ সালে ফরেস্ট হিলসে (আমেরিকা) অনুষ্ঠিত চ্যালেঞ্জ রাউন্ডের খেলায় এই রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয় যখন উইলিয়মস টিলডেন এবং আর এন উইলিয়মস (আমেরিকা) ১৭-১৫, ১১-১৩, ২-৬, ৬-৩ ও ৬-২ গেমে জে ও এ্যান্ডারসন এবং জে বি হকসকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

১৯৫০ সালে ওয়ারশতে অনুষ্ঠিত ইউরোপীয়ান জোনের তৃতীয় রাউন্ডে এই রেকর্ড স্পর্শ করেন জে ডি হ্যাকেট এবং এম মার্ফি (আয়ারল্যান্ড) যখন তাঁরা ১০-৮, ৮-১০, ১২-১৪, ৭-৫ ও ৬-১ গেমে ভি স্কোনেং স্ক এবং জে চাইত্রভস্কিকে (পোল্যান্ড) পরাজিত করেন।

একটি 'সেটে' সর্বাধিক 'গেমস'

৪৩টি — ১৯৫৭ সালে মন্ট্রিলে অনুষ্ঠিত ব্রেজিল বনাম ইসরাইলের ডবলস খেলার পঞ্চম সেটে এই রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়।

ব্যক্তিগত সাফল্য

ইংল্যান্ডের এইচ এল ডোহার্টি ১৯০২ সাল থেকে ১৯০৬ সাল পর্যন্ত ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউন্ডের ১৩টি খেলায় (সিঙ্গলস ৮ এবং ডাবলস ৫) যোগদান করে অপরাজিত থাকেন। চ্যালেঞ্জ রাউন্ডের খেলায় এপর্যন্ত কোন খেলোয়াড় ডোহার্টির এই সাফল্য স্পর্শ করতে পারেননি।

বিচিত্র সমাধিলিপি

শৈলেন্দ্রকুমার দত্ত

চলতি কথায় বলে যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। জীবিত অবস্থায় মানুষের নানান আশা-আকাংক্ষা, সাধ-অভিলাষ থাকে। কিন্তু শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পরও মানুষের অনেক পারলৌকিক কামনা থাকে। আমাদের দেশে শ্রাদ্ধশান্তি, দরিদ্র-নারায়ণের সেবা, শবযাত্রায় হরিনাম সংকীর্তন, খই-পয়সা ছড়ানো এসব তো আছেই, তার ওপর গয়ায় পিণ্ডদান পর্ব, গঙ্গার স্রোতোধারায় নাভি নিক্ষেপ এসবও আছে। এ সমস্তই মানুষের পারলৌকিক কামনাকে রূপ দেবার প্রচেষ্টা। মৃত্যুর পর আমরা যে প্রিয়জনের স্মৃতি-রক্ষার্থে দাতব্য চিকিৎসালয়, দেবালয়, স্কুল-কলেজ স্থাপন করি—এগুলির পিছনেও এই একই আকাংক্ষা।

পাশ্চাত্য দেশে এতপ্রকার ধর্মীয় ক্রিয়া-প্রক্রিয়া নেই। ওখানকার মানুষের তাই বলে যে কোন পারলৌকিক আকাংক্ষা নেই—এমন নয়। প্রিয়জনের স্মৃতিরক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কবরে সমাহিত মানুষটিকে অমর করার জন্যে তাঁরা রচনা করেন সমাধিফলক। ইংরেজিতে যাকে এপিটাফ বলে তার অভিধানগত অর্থ যাই হোক—এসব সমাধিফলকে নানান লোকের নানান কথা লেখা হয়। হয়ত কেউ তাঁর এই সমাধিলিপি রচনা করে যান জীবিত অবস্থায়—যিনি পারেন না বা সময় পান না আকস্মিক মৃত্যুর জন্যে—তাঁর সমাধিলিপি রচনা করেন মৃতের কোন শুভানুধ্যায়ী প্রিয়জন কিংবা কোন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বিষাদের সুরে এসব লিপি যেমন কাব্যময়, তেমনি বিচিত্র ধর্মী হয়। জীবিত অবস্থায় কালের যে-পুতুলটি ব্যস্ত থাকতেন নানান কাজে, মৃত্যুর পর সমাধি-লিপিতে লেখা তাঁর জীবনকাহিনী এবং মানসিক চিন্তাধারার মলে সুরটি মূর্ছিত হতে থাকে যুগ-যুগান্তর ধরে। পরবর্তী কালের মানুষ এসব লিপি থেকে পান একটি লিখিত ইতিহাস, একটি বিষাদ-মিশ্রিত কাব্যরসের সন্ধান! নানা প্রকারে, নানা ভঙ্গিতে, নানারূপে এসব সমাধিলিপি মহাকালের সাক্ষী হয়ে থাকে।

এসব লিপিতে কোথাও মৃতের জন্ম-ইতিহাস লেখা হয়, কোথাও করা হয় নিছক প্রশংসা। কোথাও আবার তাঁর মানস-চিন্তার নানান অভিজ্ঞান থাকে। ইংরেজিতে প্রবাদ আছে—ম্যান ইজ নট আংরি উইথ দি ডেড; এজন্যেই বোধহয় মৃত্যুর পর সমাধিফলকে মৃতের অসৎ গুণের কথা লেখা হয় না। সৎ, অসৎ,ভাল-মন্দ, সব নিয়েই তো মানুষ! কিন্তু মৃত্যুর পর মানুষ তার মহৎ গুণের কথাই স্মরণ করে। মহাকালের কাছে সে বড় হয়েই থাকুক, অনাদিকালের মানুষ তাকে ভাল বলেই জানুক—সমকালীন মানুষ হয়ত এই কামনাই করে।

এ সম্বন্ধে একটি চমৎকার গল্প আছে। বিখ্যাত সাহিত্যিক চার্লস ল্যাম্ব ও মেরী ল্যাম্ব একবার এক সমাধিক্ষেত্রে বেড়াতে যান। প্রায় সমস্ত সমাধিলিপিগুলি পাঠ করার পর মেরীর বড় বিস্ময় লাগে—এতো সবই সৎ, দয়ালু এবং ধর্মপ্রাণ লোকগুলির সমাধি। তিনি তখন আর ল্যাম্ব সাহেবকে জিজ্ঞাসা না করে পারেননি—ল্যাম্ব, এতো দেখছি সবই ভাল মানুষের কবর, মন্দ লোকের কবর কোথায়? ল্যাম্ব সাহেব হেসে মেরীকে বলেছিলেন—এখানে তারাও আছে। তবে মানুষ তাদের সব দোষ ক্ষমা করে মহান করেছে!

তাই দেখা যায় ইংরেজি ভাষার বিস্ময়কর প্রতিভা ডাঃ স্যামুয়েল জনসনও তাঁর স্ত্রী এলিজাবেথের সমাধিস্তম্ভের ওপর ল্যাটিন ভাষায় লেখেন—'তিনি ছিলেন সুন্দরী, সংস্কৃতিসম্পন্না এবং বিশেষ ধর্ম-প্রাণা মহিলা।' অথচ এলিজাবেথ যে সুন্দরী মোটেই ছিলেন সেকথা জানা যায়।

মেকলে সাহেব পর্যন্ত তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন—'প্রৌঢ়বয়স্কা এই মহিলা বেশ-বাসে ও আচার আচরণে অষ্টাদশী তরুণী সাজবার চেষ্টায় প্রায়ই হাস্যকর হয়ে উঠতেন।'

প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক স্যার আইজাক নিউটন মারা যান ১৭২৭ সালের ২০ মার্চ। তাঁকে ওয়েস্ট মিনিস্টার অ্যাবীতে সমাধিস্থ করা হয় ২৮ মার্চ। কিন্তু তাঁর সমাধিফলক নির্মাণ করা হয় চার বছর পরে ১৭৩১ সালে। কবি পোপ সমাধিলিপিতে লেখেন—

Nature, and nature's laws
lay hid in night;
God said: 'Let Newton be'
and all was light.

দুটি লাইনে নিউটনের সমস্ত প্রতিভার পরিচয় রাখার এটি একটি উল্লেখনীয় নজীর।

গ্রীক বৈজ্ঞানিক আর্কিমিডিস মারা যান ২১২ খৃস্ট পূর্বাব্দে। তাঁর সমাধি স্তম্ভটি দীর্ঘকাল লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল। তাঁর মৃত্যুর প্রায় দেড়শত বছর পরে ৭৫ খৃস্ট পূর্বাব্দে পরিব্রাজক সিসেরো সির্সিলি-দ্বীপে বুনো গাছ আর নানান আগাছার আড়াল থেকে শতাব্দীর বিস্ময়কর প্রতিভার স্মৃতিস্তম্ভটি খুঁজে বের করেন। তিনি দুঃখের সঙ্গে বলেন—

"Thus would this most famous and once most learned city of Greece have remained a stranger to the tomb of one of its most ingenious citizens, had it not been discovered by a man of Arpinum!"

আর্কিমিডিসের এই সমাধি-ফলকে কোন প্রশস্তিকা ছিল না। গোলক (sphere) এবং বেলনাকার (cylinder) পাত্রের পারস্পরিক সম্পর্কের আবিষ্কর্তার সমাধিফলকেও একটি বেলনাকার পাত্রের মধ্যে একটি গোলক অংকিত ছিল। অনাদিকালের মানুষের জন্যে এমন বিচিত্র সমাধিফলক রচনা না করলে হয়ত এমন স্বতন্ত্রভাবে এটিকে আবিষ্কার করাও সম্ভব হত না।

ক্যাপ্টেন কুকের সমাধিফলকেও এমনি বৈচিত্র ছিল। তাঁর সমাধিফলকে শুধুমাত্র একটি চতুষ্কোণ ছুঁচোল অস্ত্র চিহ্নিত আছে। লিপির চেয়ে অভিজ্ঞান যে এখানে অনেক বেশি কার্যকরী হয়েছে, একথা বলাই বাহুল্য।

কবি এবং সাহিত্যসেবীরা স্রষ্টা বলেই হয়ত তাঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিজেদের সমাধিলিপি স্বতন্ত্রভাবে অথবা তাঁদের রচনার মধ্যে রেখে যান। কবি লে হান্টের মৃত্যুর পর তাঁর সমাধির ওপর—তাঁর বিখ্যাত কবিতা আবু বেন আদেম-এর চতুর্দশ লাইনটি খোদাই করা হয়— Write me as one that loves his fellowmen. শেলী-কীটস বায়রনের অকৃত্রিম বন্ধু এবং গুণগ্রাহীর চরিত্রবর্ণনা এর চেয়ে অল্প কথায় আর কি হতে পারে!

রবার্ট লুই স্টিভেনসনের সমাধির ওপরেও তাঁর বিখ্যাত কবিতা রীকুইম থেকে দুটি লাইন খোদাই করা হয়—

Home is the sailor,
home from sea
And hunter home
from the hill

কবি কীটস এদিক থেকে অনেকটা সচেতন ছিলেন! রোমে শিল্পী-বন্ধু সেভার্নের সঙ্গে থাকার সময় তিনি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন—তাঁর জীবনদীপ নিভে আসছে। মৃত্যুর অল্প আগে তাই তিনি নিজেই সেভার্নকে তাঁর সমাধিলিপি বলে যান—

Here lies one whose name was
writ in water.

রোগগ্রস্ত, প্রতিষ্ঠাহীন কবি এছাড়া আর কি বলতে পারেন! শতাব্দীর মহাকবি অজ্ঞাতেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। অত্যন্ত সাধারণভাবে নির্মাণ করা হল তাঁর সমাধি। কিন্তু প্রকৃতির স্বাভাবিক সৌন্দর্যে এটি যে কত রমণীয় ছিল, সে-বর্ণনা পরবর্তীকালে অস্কার ওয়াইল্ডের কাব্যে পাওয়া যায়—

The youngest of the
Martyrs here is lain,
Fair as Sebastian,
and as early slain
No cypress shades his
grave, no funeral yew
But gentle violets weeping
with the dew
Weave on his bones an
ever blossoming chain.

কবি শেলীর মৃত্যু যেমন আকস্মিক, তেমনি হৃদয়বিদারী। ১৮২২ সালে জুন মাসে শেলী বন্ধু লে হান্টের সঙ্গে দেখা করার জন্যে রওনা হলেন। সঙ্গে উইলিয়ম। দেখা সাক্ষাতের পর ৮ জুলাই ওরা ফিরলেন। সেদিন আবহাওয়া ছিল খুব খারাপ। সকলে তাঁকে যেতে নিষেধ করলেন। কিন্তু 'প্রমিথিউস

বিদ্রোহী স্রষ্টা সেসব তুচ্ছ করেই রওনা হলেন। কিন্তু সন্ধ্যার সময় ঝড় উঠল, প্রবল বাত্যা......।

দশদিন পরে ভিয়া রেজিওর সমুদ্র তীরে একটি দীর্ঘ মৃতদেহ তোলা হল। পরনের কোটের পকেটে পাওয়া গেল সফোক্লিসের একখানি গ্রন্থ আর কীটসের কবিতাবলী। সনাক্ত করতে দেরি হল না কারও মৃত হলেন শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি শেলী। খবর পেয়ে ছুটে এলেন লে হান্ট, বায়রন। রোমে তাঁর ভস্মাবশেষ দিয়ে সমাধি রচনা করা হল। সমাধিলিপিতে লেখা হল—

Nothing of him that doth fade,
But doth suffer a sea-change
Into something rich and strange.

কোন কবির সমাধিলিপিতে আছে তাঁর হৃদয়ের মূল সুরের মূর্ছনা, কোন কবি কাব্যের মধ্যে তুলে ধরেন তাঁর জন্ম ইতিহাসের মূল বক্তব্যটুকু।

অনেক কবি-সাহিত্যিকের জীবনে দেখা গেছে তাঁরা এমন নিখুঁত বা যথাযথ সমাধিলিপি রচনাও করেননি, মৃত্যুর পর কোন বিশেষ লিপির ওপর আগ্রহও দেখাননি। তবে তাঁদের মধ্যে অনেকে একটি বিশেষ আকাংক্ষার কথা বলে গেছেন।

কবি ভার্জিল জীবিত অবস্থায় দেশবাসীর অজস্র ভালবাসা পেয়েছিলেন বলেই হয়ত তিনি মৃত্যুর আগেই সমাধিস্থান নির্দিষ্ট করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁরই নির্দেশ মত তাঁকে নেপলসের পথিপার্শ্বে সমাধিস্থ করা হয়। চার্লস ডিকেন্স তাঁর শ্যালিকা মেরিকে ভীষণ ভালবাসতেন। সেই মেরির আকস্মিক মৃত্যুর পর তিনি ডাইরিতে লেখেন—"ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি আমি যেন তার সঙ্গে আবার মিলিত হতে পারি।"

ডিকেন্সের মৃত্যুর পর তাঁর ইচ্ছামত তাঁকে ওয়েস্ট মিনিস্টার এ্যাবীতে মেরির কবরের পাশেই সমাধিস্থ করা হয়। লর্ড টেনিসনকেও তাঁর নির্দেশমত ওয়েস্ট মিনিস্টার অ্যাবীতে তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু রবার্ট ব্রাউনিং-এর সমাধির পাশে শায়িত করা হয়।

মৃতের নিজস্ব সমাধিলিপি পাওয়া না গেলে দেখা যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাক্ষাৎ শিষ্য বা ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাই সমাধিলিপি রচনা করেন। কার্লমার্ক্সের সমাধির ওপর এঙ্গেলস রচিত লিপি খোদাই করা হয়—

His name and works will live
on through the countries.

ডিমোস্থিনিসের সমাধিলিপিও রচনা করেন তাঁর শিষ্য—

Didst thou to wisdom equal
strength unite,
Then never Greece had
bowed to conquering might.

হেমলকপানে সক্রেটিসের জীবনদীপ নির্বাপিত হলে অন্তরঙ্গ শিষ্য প্লেটো সমাধিলিপিতে অতি সাধারণ কথায় চমৎকার গুরুপ্রশস্তি রচনা করেন—

This was the end of our friend,
a man, as we may say, the best
of all of his time that we have
known, and moreover the most
wise and just.

কবি কাউপারের দেহ ডেরিহাম গির্জায় সমাধিস্থ করার পর সমাধিলিপি রচনা করেন কবিবন্ধু হেইলি। যেমন চমৎকার সে-লিপির বর্ণনা, তেমনি সুপরিস্ফুট তার বক্তব্য।

দ্বিতীয় চার্লস মারা যাবার পর তাঁর সমাধিলিপি লেখেন রোচেস্টার। চার্লসের জীবনের কথা স্মরণ রেখেই রচয়িতা হয়ত সমাধিলিপি রচনা করেছিলেন, তাই সে-লিপিতে কিছুটা শ্লেষ, কিছুটা বিদ্রুপের রেশ পাওয়া যায়—

সত্যি কথাই, সমাধিলিপি রচনায় কবি রবার্ট বার্ণস ছিলেন অদ্বিতীয়। তাঁর রচিত সমাধিলিপি সংখ্যায় যেমন অসংখ্য, আঙ্গিক এবং বর্ণনায় তেমনি বিচিত্র! পোষা কুকুর—উকুন প্রভৃতি অনেক তুচ্ছাতিতুচ্ছ প্রাণীদের জন্যও তিনি সমাধিলিপি রচনা করেন। কবিবন্ধু উইলিয়ম মিচির জন্য তিনি যে সমাধিলিপি রচনা করেন, সেটি একটি উল্লেখনীয় উদাহরণ—

Here lie Willie
Michie's banes,
O Satan, when ye
tak him,
Gie him the Schulin'
O' your weans,
For clever deils
he'll mak them!

কবি কাউপার তাঁর বন্ধু চেস্টারের মৃত্যুর পর যে সমাধিলিপি রচনা করেন সেটিও বর্ণনাভঙ্গিতে অপূর্ব।

এতো গেল সব কীর্তিমানদের সমাধিলিপি! যারা সকলের অগোচরে আসে, প্রায় সকলের অগোচরেই পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়—সেই সব অখ্যাত অজ্ঞাত লোকেদেরও কি সমাধিলিপি রচনা হয়েছে! কবি গ্রে তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতায় অনাদিকালের এই সব মানুষের জন্যে সমাধিলিপি রচনা করে সে-প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। এ সমাধিলিপি কোন ব্যক্তি বিশেষের নয়, অনাদিকালের অনন্ত মানুষের জন্য রচিত, তাই হয়ত বা এটি সমাধিস্তম্ভে খোদিত না হয়ে কাব্যে অমর হয়ে আছে—

Here rests his head upon
the lap of Earth
A youth, to Fortune and
to Fame unknown
Fair Science frowne'd
not on his humble birth
And Melancholy marked
him for her own.

আমাদের বাঙালি কবিদের মধ্যে একমাত্র মাইকেল মধুসূদনই সমাধিলিপি রচনা করেন। মধুসূদন শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ১৮৭৩ সালের ২৯ জুন। কিন্তু তাঁর সমাধিস্তম্ভ নির্মিত হয় অনেক পরে। আমেরিকান পাদ্রী ডল সাহেবের সমাধি নির্মাণ উপলক্ষে কলকাতায় ১৮৮০ সালে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাস্থ উপস্থিত ভদ্রলোকের মধ্যে সিটি কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ উমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ ছিলেন। তাঁরা জানতে পারেন যে মধুসূদনের সমাধিস্থানে কোন স্মৃতিফলক নির্মিত হয়নি। তারপরই তাঁরা 'মাইকেল মধুসূদন দত্ত স্মৃতিফলক নির্মাণ তহবিল' স্থাপন করে চাঁদা সংগ্রহ করতে থাকেন। প্রায় সাত বছর ধরে অর্থ সংগ্রহের পর কমিটির উদ্যোগে সমাধিস্তম্ভ নির্মাণ সম্ভব হয়। ১৮৮৮ সালের ১ ডিসেম্বর মহা সমারোহে এই স্তম্ভের আবরণ উন্মোচন করেন কবির অকৃত্রিম বন্ধু ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ। বাংলাদেশের ইতিহাসে এটি একটি গৌরবের দিন, একটি কলঙ্কমোচনের দিন। কবি মানকুমারী বসু তাঁর 'উচ্ছ্বাস' কবিতায় পিতৃব্য মধুসূদনের সমাধিস্তম্ভ উদ্বোধনের গুরুত্বটি চমৎকার বিবৃত করেছেন—

স্বভাবের শিশু, 'বঙ্গ-কবিকুলেশ্বর'
বাল্মীকির প্রিয়ানুজ, বঙ্গের হোমর,
আজি তাঁরে সমাদরে
বঙ্গবাসী পূজা করে।
পাষাণে চিত্রিত ওই সমাধি-উপর—
'শ্রীমধুসূদন দত্ত অক্ষয় অমর!'

(কাব্যকুসুমাঞ্জলি)

প্রসিদ্ধ লিউলিন কোম্পানী নির্মিত এই স্তম্ভটি ভাস্কর্যে অপূর্ব। স্তম্ভের একপাশে মধুসূদনের সংক্ষিপ্ত জীবনী ইংরেজিতে লেখা, অপর পার্শ্বে কবির বিখ্যাত সমাধিলিপিটি খোদাই করা—

দাঁড়াও পথিক বর, জন্ম যদি তব
বঙ্গে! তিষ্ঠ ক্ষণকাল! এ সমাধিস্থলে
(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম) মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত
দত্ত কুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন!
যশোরে সাগরদাঁড়ী কপোতাক্ষ তীরে
জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি
রাজনারায়ণ নামে, জননী জাহ্নবী।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

যুগগুরু রামমোহনকে তাঁর ইচ্ছামত বৃস্টলে তিনি যে বাড়িতে থাকতেন, তারই উদ্যানে সমাধিস্থ করা হয়। সমাধির স্মৃতিফলকে ভারতবর্ষের ইতিহাসে যুগস্রষ্টা রামমোহনের যোগ্য ভূমিকার কথাটি ইংরেজিতে লেখা হয় এবং সবশেষে এই কটি লাইন যোগ করা হয়—

THIS TABLET
RECORDS THE SORROW AND PRIDE WITH WHICH HIS MEMORY IS CHERISHED BY HIS DESCENDANTS

পরবর্তীকালে অবশ্য দ্বারকানাথ ঠাকুর রামমোহনের দেহাবশেষ তুলে নিয়ে গিয়ে আরনোস ভেল-এ একটি সুন্দর মন্দির নির্মাণ করেন।

মৃত্যুর পর পৃথিবী থেকে কেউ মুছে যেতে চান, কেউ চান মৃত্যুর পর পৃথিবীতে তাঁর স্মৃতি-চিহ্ন থাকুক। স্রষ্টাদের উদ্দেশ্যে নির্মিত এইসব সমাধিস্তম্ভ এবং উৎকীর্ণ লিপি কেউ অপ্রয়োজনীয় মনে করেন, কেউ আবার এগুলি চিরন্তন আনন্দের স্থান বলে মনে করেন। স্রষ্টার জন্যে আবার স্মৃতিফলকের প্রয়োজন কি, সৃষ্টির মধ্যে রসজ্ঞ পাঠকের হৃদয়েই তো তিনি চিরজীবী হয়ে থাকেন; এ-সব যুক্তিও কেউ কেউ দেখান।

সমাধিস্তম্ভ বা স্মৃতিফলক নির্মাণের প্রয়োজনীয়তার যুক্তিতর্কে যে-মতই শক্তিশালী হোক না কেন—এসব বিচিত্র সমাধিলিপি পাঠ করে যে আমরা আনন্দই পাই এবং সাহিত্যের বিচিত্র ধারায় এটিও যে একটি বিশিষ্ট ধারা, সেকথা বলাই বাহুল্য।



নির্মল বার সাবানে কাচালে
আপনার কাপড়-জামা হবে

ধবধবে ফরসা
হালকা সুগন্ধে ভরপুর



নির্মল বার সাবানে কাচা কাপড়-জামা দেখতে ঝকঝকে পরিষ্কার হয়, আর সদ্য ধোয়ার সুগন্ধে ভরে উঠে।

নির্মল বার সাবানে চটপট দেদার ফেনা হয় আর সেই ফেনায় তেলকালি ও ধুলোময়লা জড়শুদ্ধ বেরিয়ে যায়। আপনার কাপড়-জামা ঝকঝকে তকতকে দেখায়, সদ্য ধোপ দেওয়ার সুগন্ধে ভরে থাকে।

নির্মল দিয়ে কাচলে পয়সারও সাশ্রয় হয়। সে বেশী দিন চলে—সাবানটি শক্ত থাকে, তাড়াতাড়ি ক্ষয়ে যায় না।

নির্মল
—পূর্ব ভারতে এই বার সাবানই কাটতিতে সবার ওপরে

কুসুম প্রোডাক্টস লিমিটেড, কলিকাতা-১



মানুষের হৃদয় বদল!

দিলীপ বসু

অবশ্যই মানুষের হৃদয় বদল করতে পারলে পৃথিবীর অনেক দুঃখ-কষ্টের হয়তো সমাধান হতো। গান্ধীজীর আজীবন সাধনার তো তাই ছিল মূল কথা। এখানে আমরা কিন্তু হৃদয়, আসলে যার অর্থ অন্তঃকরণ, সে অর্থে হৃদয় বদলের কথা লিখতে বসি নি। আমরা সম্প্রতি মানুষের হৃৎপিণ্ড, ইংরাজীতে যাকে বলে হার্ট, চলতি কথায় অনেক সময় লোকে বলে থাকে 'হৃদয়', যেটা বন্ধ হলে মানুষ মারা যায়, সেই হৃৎপিণ্ড বদলের কথা বলছি।

আমাদের হৃৎপিণ্ড

দক্ষিণ আফ্রিকার কেপ টাউন শহরে ওসানাসকির ছিল পাইকারী শাক-শব্জী বিক্রীর ব্যবসা। পঞ্চান্ন বছর বয়সেই তার দুবার করোনারি থ্রম্বসিস হয়ে গেছে, প্রথম সাত তারপর দু বছর আগে।

করোনারি থ্রম্বসিস রোগের কথা আমরা আজকাল হামেশাই শুনে থাকি। আসলে আমাদের শরীরের রক্ত-চলাচলের জন্য একটি পাম্প যন্ত্র নিশ্চয়ই দরকার। বাড়ীর একতলার চৌবাচ্চায় জলকে যেমন ইলেকট্রিক পাম্পের সাহায্যে তিনতলা বা চারতলার ছাদে তোলবার দরকার হয়, তেমনি আমাদের পায়ের রক্তকেও নিশ্চয়ই মাথায় তুলতে হলে পাম্পের দরকার। (তা' না হলে হয়তো আমাদের ক্রমাগতই পা উঁচু করে মাথা নীচু করতে হতো, আবার মাথা উঁচু করে পা নীচু!)

এই পাম্প যন্ত্রটি হলো আমাদের হৃৎপিণ্ড বা হার্ট। আবার বাড়ীর ইলেকট্রিক পাম্পকে চালাবার জন্য যেমন বিদ্যুৎ-শক্তির দরকার আর সেটা আসছে বিদ্যুতের তার মারফৎ, তেমনি হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশীগুলিকে সজীব রেখে চালু রাখবার জন্য প্রয়োজন হল রক্তের, আর সেই রক্তকে হৃৎপিণ্ডে নিয়ে যাচ্ছে (পাম্পের বিদ্যুৎ-চালনার তারের মতন) দুটি বিশেষ ধমনী বা আর্টারি, যাদের নাম দেওয়া হয়েছে করোনারি আর্টারি।

এখন কোনো কারণে এই করোনারি আর্টারিতে রক্ত-চলাচল ব্যাহত হয়ে গেলে হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশী দুর্বল বা তাতে ক্ষত হতে পারে। একে বলে করোনারি থ্রম্বসিস।

ওয়াসানসকির দুবার করোনারি থ্রম্বসিসে আক্রান্ত হৃৎপিণ্ড এমনিতেই বিশেষ দুর্বল ছিল, তারপর মাস দুয়েক আগে থেকে দেখা গেল সেটা এবারে আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যাবে, কারণ তার করোনারি ধমনী মোটা ও শক্ত হয়ে যাওয়াতে তাতে রক্তচলাচল কম হচ্ছে। তার ওপর তার বহুমূত্র রোগ, এদিকে যকৃৎ বড় হয়ে যাওয়াতে শরীরে দূষিত জল জমে যাচ্ছে।

হাসপাতালে ভর্তি হবার পরে শল্য-চিকিৎসক বার্নার্ড বুঝলেন, কয়েক মাসের মধ্যেই তার মৃত্যু অবধারিত। একমাত্র উপায় হতে পারে, যদি তার ক্ষতবিক্ষত হৃৎপিণ্ডটাকেই বদলে দেওয়া যায়। দুঃসাহসিক পরিকল্পনা! হৃৎপিণ্ড বদলের জন্য চাই আর একটা মানুষের তাজা হৃৎপিণ্ড। এর পূর্বে একবার শিম্পাঞ্জীর হৃৎপিণ্ড মানুষের দেহে বসিয়ে মানুষকে বাঁচানো সম্ভব হয় নি।

হৃৎপিণ্ড বদল

এই দুরূহ প্রায়-অসাধ্য শল্যচিকিৎসা করতে হলে এমন একজন হৃৎপিণ্ড-দাতা চাই, যিনি মারা গেছেন তবে হৃৎপিণ্ডের রোগে নয়। জ্যান্ত মানুষের দেহ থেকে তো আর হার্ট কেটে আনা যায় না! দ্বিতীয়ত, ওয়াসানসকির হৃৎপিণ্ড সরালেই তো তার 'মৃত্যু' হবে, কাজেই যতোক্ষণ এই হৃৎপিণ্ড বদলের কাজ চলবে, ততোক্ষণ তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

অন্যান্য আরো অনেক আনুষঙ্গিক সমস্যা আছে, যা আমরা সাধারণভাবে আলোচনা করবো।

২৫ বছরের মেয়ে ডেনিস ডারভ্যাল মোটর-দুর্ঘটনায় ঠিক এই সময়ে অন্য এক হাসপাতালে প্রায় মৃত্যুমুখে। প্রায় বলছি এই জন্য যে, তার মাথাতে দারুণ চোট লাগাতে মস্তিষ্ক বা ব্রেন একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। একদিক থেকে দেখতে গেলে ডেনিস আর ইহলোকে নেই (সংজ্ঞা তো নেই-ই), কিন্তু তবু ডেনিসের হৃৎপিণ্ড তখনো ধুকধুক করছে। অবশ্যই ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সেটিও থেমে ডেনিসের পুরোপুরি মৃত্যু হবে।

পাঠক লক্ষ্য করবেন যে, একজন মানুষের মৃত্যু ঠিক কখন ঘটছে এ নিয়ে একটি মেডিক্যাল এবং নৈতিক সমস্যাও চিকিৎসকের সামনে উপস্থিত হচ্ছে।

ডেনিসের মস্তিষ্ক একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ, কিন্তু তবু তার হৃৎপিণ্ডের একটু সজীবতা রয়েছে, যদিও খানিকক্ষণ বাদে সেটাও থাকবে না। অথচ হৃৎপিণ্ড থেমে যাবার পরে সেটা কেটে ওয়াসানসকির দেহে পরিয়ে দিলে সেই 'থামা বা মরে-যাওয়া' হৃৎপিণ্ড নিয়ে ডাক্তারের কোন কাজ হবে না।

নীতিগত এই কূট সমস্যার সমাধান অবশ্য ডেনিসের বাবা-মাই করে দিলেন। তাঁরা ডেনিসের হৃৎপিণ্ড কেটে সরিয়ে নিতে ডাক্তার বার্নার্ডকে অনুমতি দিলেন। ওদিকে ওয়াসানসকিকেও তার হৃৎপিণ্ড বদলের অনুমতি চাওয়া মাত্র সেও রাজী হয়ে গেল, যদিও এর অর্থ এই যে, প্রথমেই যখন ওয়াসানসকির ক্ষতবিক্ষত নিজস্ব হৃৎপিণ্ডকে কেটে নেওয়া হবে, তখনই তার 'মৃত্যু' ঘটবে।



বিশ্বের প্রথম হৃদযন্ত্র বদলের ক্ষেত্রে শল্য-চিকিৎসক প্রফেসর ক্রিশ্চিয়ান বার্নার্ড-এর নেতৃত্বে দক্ষিণ আফ্রিকার শল্য-চিকিৎসকরা সমবেত হয়েছিলেন।

এখন অন্যান্য সমস্যার দিকটা দেখা যাক। আমাদের শরীরযন্ত্র অসংখ্য জীব-কোষে গঠিত, হৃৎপিণ্ড থেমে 'মৃত্যু' (যাকে ইংরাজীতে বলে ক্লিনিক্যাল ডেথ) হবার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু এরা মরে যায় না, তবে ক্ষয় ও পচন শুরু হয়।

একজনের হৃৎপিণ্ড অন্যের শরীরে বসিয়ে দিলে এই জীবকোষগুলি বাধা দেবেই, কারণ এক শরীরের প্রোটিনের বিপাকীয় (metabolism) অবস্থা অন্য শরীরের জীবাণু এবং প্রোটিন বিপাকের সঙ্গে না-মেলবারই সম্ভাবনা খুব বেশী।

প্রথমেই সেজন্যে ওয়াসানস্কি ও ডেনিসের রক্ত পরীক্ষা করে গ্রুপ ভাগ করা হোল। সুখের বিষয়, ওয়াসানস্কির রক্তের গ্রুপ হচ্ছে 'এ-পজিটিভ', ডেনিস 'ও-নেগেটিভ'। জোড় ভাল করেই মিলবে।

এদিকে যখন পাশাপাশি দুই অপারেশন-থিয়েটারে দুজনের রক্তপরীক্ষা চলছে, তখন ডেনিসের হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে যুক্ত শরীরের প্রধান ধমনী বা 'অ্যাওর্টা'-কে হৃৎপিণ্ড থেকে সাঁড়াশির মতো যন্ত্র দিয়ে বিযুক্ত করা হোল। ডেনিসের হৃৎপিণ্ড থেকে শরীরের অন্যান্য স্থানে রক্ত চলাচলকে বন্ধ করে, তারপরে হৃৎপিণ্ড থেকে ফুসফুস যন্ত্রে রক্ত নিয়ে যাবার জন্য যে 'পালমোনারী' ধমনী আছে, তেমনি প্রধান শিরা, যা থেকে হৃৎপিণ্ডে অক্সিজেন বিযুক্ত নীল রক্ত আসে, সেটাও বন্ধ করা হোল। এই অবস্থায় বলা যেতে পারে ডেনিসের 'মৃত্যু' হোল।

ডেনিসের হৃৎপিণ্ডকে কিন্তু বাঁচিয়ে রাখার জন্য কৃত্রিম যন্ত্রের সঙ্গে (heart-lung machine) জুড়ে তাতে প্রয়োজনীয় রক্ত দেওয়া দরকার। ডেনিসের হৃৎপিণ্ডকে 'বাঁচিয়ে' রাখবার জন্য ৭০ ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপমাত্রাতে রক্ত দেওয়া হতে থাকল।

এই অবস্থায় রাত্রি বা ভোর ২-১৫ মিনিটে ওয়াসানস্কির হৃৎপিণ্ডকে শরীর থেকে বার করে আলাদা করার কাজ শুরু হোল। চারজন শল্যচিকিৎসক, ক্রিশ্চিয়ান বার্নার্ড প্রধান, তাঁর ভাই ম্যারিয়াস, আর সাহায্য করছেন হিউটসন ও ডনোভাল; এবারে উপরে বর্ণিত ডেনিসের হৃৎপিণ্ডকে শরীর থেকে যেভাবে বিযুক্ত করা হয়েছিল, সেইভাবে ওয়াসানস্কির ক্ষতবিক্ষত হৃৎপিণ্ডকে আলাদ করা হোল। এই কাজটি করবার সময় শরীরের রক্তচলাচলের জন্য কৃত্রিম যন্ত্রের (heart-lung machine) সাহায্যে ওয়াসানস্কির সারা শরীরে রক্ত-চলাচল অব্যাহত রাখা হোল। কারণ তার শরীরটাকে নিশ্চয়ই বাঁচিয়ে রাখতে হবে। সাড়ে চার ঘন্টা পরে বেলা সাতটার সময় অপারেশন শেষ হোল।

অবশ্যই অনেক সমস্যা দেখা দিয়েছিল। প্রথমে ডেনিসের হৃৎপিণ্ড ওয়াসানস্কির শরীরে বসিয়ে দিতেই কাজ শুরু করে নি। ইলেকট্রড যন্ত্রের সাহায্য নিলে প্রথমবার সাড়া না দিলেও দ্বিতীয়বার বেশ ভালোভাবে কাজ আরম্ভ করে।

এক ঘন্টা পরেই ওয়াসানস্কির জ্ঞান ফিরে আসে। ৩৬ ঘন্টা পরে অপেক্ষাকৃত সুস্থ হয়ে তার ক্ষিদে পায় এবং সে প্রায় হাসপাতালের সাধারণ খাবার খায়। তার হৃৎপিণ্ডের উত্থান-পতন (heart-beat) ক্রমে মিনিটে ১০০ হয়ে স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়ায়। প্রসঙ্গত, শল্যচিকিৎসক বার্নার্ডের অপারেশনের সময় নিজের হৃৎপিণ্ডের উত্থান-পতনের হার দাঁড়িয়েছিল মিনিটে ১৪০।

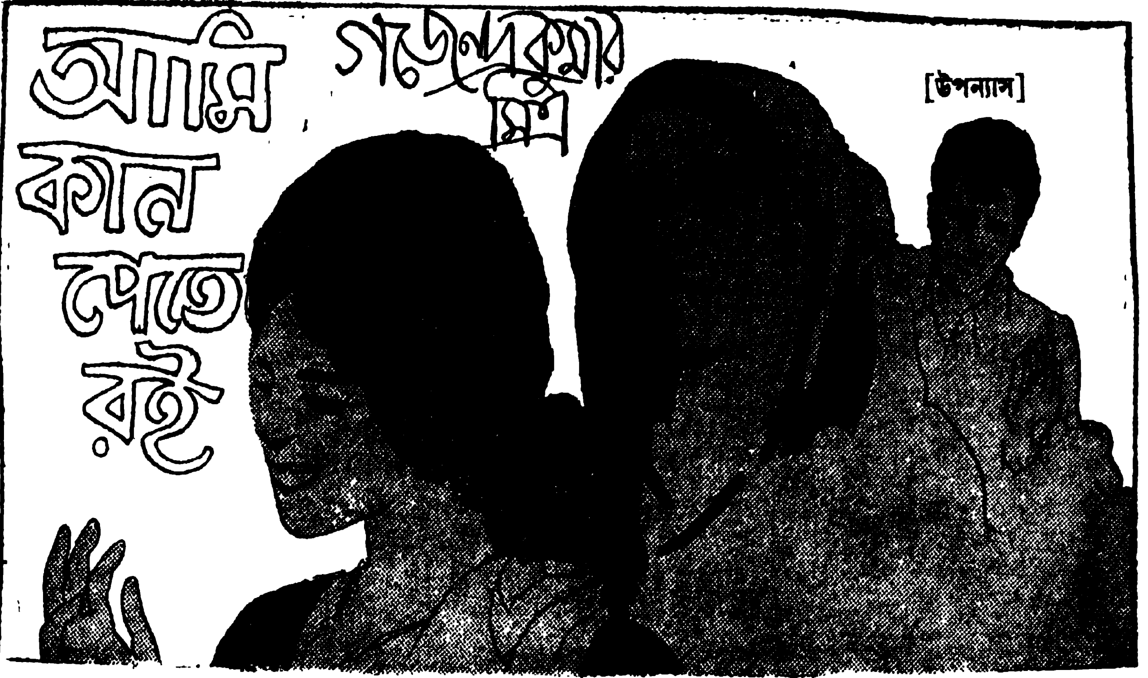
প্রোটিনের বিপাকীয় অবস্থার বদল ও জীবাণুর আক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্য রোগীকে প্রচুর এন্টিবায়োটিকস দেওয়া হয়।

চার দিন পরে রোগীর মুখে হাসি, সে বলে সে-ই নাকি নতুন ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন। আশা করা গিয়েছিল, সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে স্বগৃহে ফিরে যাবে। সম্ভব হয় নি—শেষ অবধি নিউমোনিয়াতে আক্রান্ত হয়ে সে মারা গেছে। স্পষ্টই এক দেহের জীবাণু অন্য দেহে ঠিক খাপ খেতে পারে নি। প্রোটিনের বিপাকের সকল অবস্থাও আমরা ঠিক জানি না। তাহলেও প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানুষের দুর্বার অগ্রগতির পথে এটা একটা বিশিষ্ট দুরন্ত পদক্ষেপ।

লেখার সময়ে আরো একটি হৃৎপিণ্ড বদলের খবর এসেছে—দক্ষিণ আফ্রিকার 'কালো' লোকের হৃৎপিণ্ড তার 'শাদা' লোকের দেহে। তাতে কি দক্ষিণ আফ্রিকার 'শাদা' শাসকদের 'হৃদয়ের পরিবর্তন' হয়ে এবারে দক্ষিণ আফ্রিকাতে বর্ণবিদ্বেষ (apartheid) দূর হবে?



হৃৎপিণ্ড সংযোজনের জন্য ফিলিপ ব্লাইবারকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এ'র দেহে যে কৃষ্ণকায় ব্যক্তির হৃৎপিণ্ড সংযোজন করা হলেও বর্ণবিদ্বেষের তীর্থক্ষেত্র দক্ষিণ আফ্রিকায় এখনো উত্তেজনার সৃষ্টি হয়নি।



।। ১০ ।।

কথাটা এর আগেও দু-চারজন বলেছিল। মার অলাপী—আগেকার বাড়ির রাস্তার কলে জল তোলার বন্ধু সব। তখন অত কান দেয় নি সুরো। কান দিয়ে লাভও হ'ত না। উড়ো কথায় কোন কাজ হয় না। কাকে ধরলে কোথায় যাওয়া যায়, কাজ পাওয়া যায়—তা কেউই জানে না, তারাও আবছা আবছা অস্পষ্ট জ্ঞান থেকে কথা বলে।

হঠাৎ আবার নতুন করে উঠল কথাটা। আর উঠল একেবারে সংশ্লিষ্ট মানুষের কাছ থেকে। কথা কেন — সোজাসুজি প্রস্তাবই উঠল।

ভবতারণ সেবার পূর্ণিমার দু-চার দিন আগে প্রস্তাব করলেন, 'একবার ঘোষপাড়ায় যাবি মা? মাকে একবার দুঃখু জানিয়ে আসবি? মার জন্মদিনটা—কদিন থেকেই ভাবছি তাই। যে যা বলে বলুক, এপক্ষে তোর এই মার কথাটা আমি এখন খুব মানি—সতীমাই তোকে দিয়েছেন আমাদের কোলে—তারই মেয়ে তুই। তাঁকে প্রণাম করে দুঃখু জানিয়ে এলে হয়ত এই দুর্দিন কেটে গিয়ে একটা উপায় হতে পারে।'

প্রথমটায় অত উৎসাহবোধ করে নি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাবাকে খুশী করবার জন্যেই রাজী হয়ে গেল সুরো। বাবার যা চেহারা হয়েছে—বেশীদিন আর বাঁচবেন না হয়ত, বাঁচলেও হাঁটাচলা করতে পারবেন না। শুধু ওদের মুখ চেয়েই এখনও টোটো করে ঘোরেন, মাথা ঘুরে উঠলে এক জায়গায় বসে থাকেন চোখ বুজে, নয়ত রাস্তার কলে গিয়ে মাথায় জল থাবড়ে দেন। এই করতে করতেই হয়ত একদিন সত্যিকারের চোখ বুজবেন, রাস্তাতেই হয়ত মুখ থুবড়ে পড়ে মরবেন। মা তো বোঝে না—ওর দ্বারা যদি শান্তি পায় তো পাক মানুষটা।

তবু মুখে বলে, 'কিন্তু টাকা? খরচ তো অনেক হয়ে যাবে বাবা?'

'না রে, সে ব্যবস্থা কি আর মা-বেটি না করেছে ভাবছিস? আমার এক মহাজন—ঐ বড়বাজারেরই, তার কি মানসিক ছিল—পুজো দিতে যাচ্ছে। বড় নৌকো ঠিক করেছে ভাউলে না কি বলে—বিস্তর লোকজন নিয়ে যাচ্ছে। সে-ই বলছে সঙ্গে যেতে। গাড়িভাড়াটাড়া কিছুই লাগবে না, তার রসুয়ে বামুন যাচ্ছে সঙ্গে—খাওয়ার ব্যবস্থা ওখানে, রেঁধে খেতে হবে না। নিয়ে-দিয়ে যা ঐ কর্তামশাইয়ের গদীতে জমা দেওয়া কিছু!'

নিস্তারিণী শুনে প্রথমটা বেঁকে বসল।

'কথাটা মুখে উচ্চারণ করলে কী করে! রূপের খাপরা মেয়ে—ঐ যত রাজ্যের ইতিক জাতের ভীড়ের মধ্যে কোথায় নিয়ে যাবে? তারপর একটা কিছু হয়ে গেলে তখন? বলতে নেই যদি কর্তাই সেবার জন্যে ডাকেন?'

এতখানি জিভ কেটে ভবতারণ উত্তর দেন, 'তোর মতো ছোট মন যদি দুটি দেখেছি। মার কাছ থেকে পাওয়া মেয়ে—তুই-ই তো বলিস। তাঁর জিনিস তাঁর কাছে নিয়ে যাচ্ছি, তার আবার অত ভাবনা কিসের! তিনিই দেখবেন। এই তো স্বর্ণবাঈজীর ব্যাপারটা চোখের সামনে দেখলি, তবু তোর আক্কেল হল না। মাকে ভরসা করে থাকলে কোন বিপদ হবে না—দেখিস!'

স্বর্ণবাঈজীর ব্যাপার সবটা না হোক—খানিক খানিক সুরবালাও শুনেছে বৈকি। অনেক টাকা ছিল স্বর্ণবাঈজীর, অসীম প্রতিপত্তি—সেই অহঙ্কারেই মত্ত হয়ে একেবারে বাঘের মুখে হাত দিতে গিয়েছিল, কী একটা আকচা-আকচির ফলে গুণ্ডা লাগিয়ে নাকি একটা মানুষ খুন করিয়েছিল। কিন্তু টাকাই থাক আর বড় বড় মানুষই হাতের মুঠোয় হোক—কোম্পানীর রাজত্বে খুন ক'রে পার পাওয়া সোজা নয়। বাঈজী ধরা পড়ল—গুণ্ডা দুটো সমেত। রাস্তা থেকে ধরে এনে বাঈজীর বাড়ির উঠোনে ফেলে ঠেঙিয়ে মেরেছিল লোকটাকে। তাও, যাকে মারবার কথা তাকে নাকি মারে নি—ভুল করে অন্য লোক একটা ধরে এনেছিল, এই পাড়ারই দোকানদার একজন। এক রকমের গায়ের কাপড়—অন্ধকারে অত বুঝতে পারে নি।

কাজটা একটু কাঁচাও হয়ে গিয়েছিল। পাড়ার কারও জানতে নাকি বাকী ছিল না। যাকে মারা হয়েছিল, সে নাকি চিৎকার করে বলেছিল, 'ও স্বন্ন, আমি আমি! ও স্বন্ন এ আমি—তুমি ভুল করছ।' কিন্তু তাতে কান দেয় নি স্বর্ণ, ওপরের বারান্দা থেকে বলেছে, 'একদম জানসে মার ডালো।' অবশ্য লোকটা নিথর নিস্তব্ধ হয়ে গেলে ওপর থেকে নেমে এসে আলো ধরে দেখেই বুঝেছে ভুলটা। কিন্তু তখন আর উপায় ছিল না। লাশ সরিয়ে গঙ্গায় ফেলে এসে রক্তের চিহ্ন ধুয়ে দিতে বলে গুনে গুনে দুটি হাজার টাকা তাদের ধরে দিয়ে দূর দেশে কোথাও চলে যেতে বলেছিল, কিন্তু তা তারা যেতে পারে নি, চারদিকে লোক সজাগ হয়ে উঠেছে দেখে তাড়াতাড়ি নালায় লাশটা ফেলে এসে বাঈজীর বাড়িতেই ঘুঁটে-কয়লা রাখা অন্ধকার ঘরে আশ্রয় নিয়েছিল।

পাড়ার বহু লোকই সে চিৎকার শুনেছিল। বাঈজীর হুকুমও। পরের দিন যখন সেই দোকানদারকে পাওয়া গেল না, কেউ কেউ গিয়ে থানায় খবর দিয়ে এল। লাশ জলে পড়ে নি, শহরেরই মধ্যে খুঁজে সনাক্ত করতেও দেরি হল না। বাঈজীর বাড়ি খুঁজে লোক দুটোকে পাওয়া গেল—

তখনও তাদের কাপড়-জামায় রক্তের দাগ, সে লাঠিটাও বেরোল পেছনের একটা এ'দো গলি থেকে। তাছাড়া উঠোনের রক্ত ধুলেও দেওয়ালে দরজায় যে তখনও ছিটে লেগেছিল অত কেউ লক্ষ্য করে নি—পুলিশের চোখে তা এড়াল না। একেবারে হাতে-নাতে ধরা পড়া যাকে বলে—তাই পড়ল বাঈজী।

এর পর ফাঁস অনিবার্য। না হয় তো দ্বীপান্তর নিশ্চিত। বহু হীরে-মুক্তোর মালা পরেছে বাঈজী—এবার দড়ির মালা পরতে হবে সেই কথাই জানত সকলে। উকীল ব্যারিস্টারে কৃপণতা করে নি বাঈজী—তবু মৃত্যু যে প্রায় অবধারিত—তীক্ষ্ম বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোকটির তা বুঝতে বাকী ছিল না। স্বর্ণ ঘোষপাড়ার শিষ্যা—শেষ অবধি দুই চোখে অন্ধকার দেখে সেইখানে গিয়ে পড়ল। সায়রে চান করে দণ্ড খাটতে-খাটতে এসে সত্যি-সত্যিই আছড়ে পড়ল মায়ের ঘরে—'মা বাঁচাও' 'মা বাঁচাও'! তা মা বাঁচালেনও—গুণ্ডা দুটোর দ্বীপান্তর হ'ল কিন্তু বাঈজী বেকসুর খালাস পেয়ে গেল। এর জন্যে মুঠো মুঠো টাকা খরচ করে শেষ পর্যন্ত সর্বস্বান্ত হতে হয়েছিল ঠিকই—কিন্তু গলার ফাঁশটা বাঁচল। 'মা বাঁচাও' বলেছিল, মা বাঁচিয়েছিল—টাকার প্রশ্ন তো ওঠে নি। এর পর অবিশ্যি আর মাথা তুলতে পারেনি, কারবারও আর করতে হয়নি। খুনে মেয়েমানুষের কাছে কে আসবে? কোনমতে প্রাণধারণ করে আজ এই পর্যন্ত, আগের সে বড়মানুষীও নেই, রবরবাও নেই। লোকে বলে, এই বেঁচে থাকাটাই মায়ের দেওয়া দণ্ড।

আরও অনেক গল্প শুনেছে স্বর্ণবাঈজীর। বাবার মুখেই শুনেছে। এই তো সেদিনের কথা। সুরো অবশ্য চোখে দেখে নি—কিন্তু আগে আগে যখন ফি শুক্রবারে ওদের ঘরে সমাজ বসত, তখন নাকি ওদের সেই বস্তির ঘরেই এক-একদিন বাঈজী এসেছে সশরীরে, দলের সঙ্গে বসে গানও গেয়েছে। বাঈজীর অদ্ভুত আকর্ষণ, পতঙ্গদের কাছে বহ্নির যে আকর্ষণ—কতকটা সেই রকম। ফলে বহু মানব-পতঙ্গ অকর্মণ্য ধনীর দুলাল এসে ঝাঁপিয়ে পড়ত সে আগুনে—বাঈজীও তাদের রক্ত-চোষা নিশাচর প্রাণীর মতো নিঃশেষে চুষে খেয়ে অন্তঃসারশূন্য ক'রে পায়ে ঠেলে ফেলে দিত, আবার ধরত নতুন মানুষ। এক-একটা লাখোপতিকে পথে বসাতে নাকি তার কয়েক মাসের বেশী সময় লাগত না।

হার্ণিয়া কাইলোরিয়া, একশিরা, রসবাত বাতশির, কম্পজ্বর ও আনুষাংগিক যাবতীয় লক্ষণাদি স্থায়ী প্রতিকারের জন্য আধুনিক বিজ্ঞানানুমোদিত চিকিৎসায় নিশ্চিত ফল প্রত্যক্ষ করুন। পত্রে অথবা সাক্ষাতে ব্যবস্থা লউন। নিরাশ রোগীর একমাত্র নির্ভরযোগ্য চিকিৎসাকেন্দ্র

হিন্দ রিসার্চ হোম
১৭, শিবতলা লেন শিবপুর, হাওড়া
ফোন: ৬৭-২৭৫৫

এইভাবে বহু ধনী জমিদারই পথে বসেছে বাঈজীর দৌলতে। নতুন 'বাবু' যেদিন প্রথম আসতেন—বাঈজীর শর্ত থাকত, সে তেতলার ঘরে থাকবে, বাবুকে সিঁড়ির প্রত্যেক ধাপে টাকার তোড়া রাখতে রাখতে উঠতে হবে। জীবনযাত্রার খরচও ছিল তার অসামান্য। গরমের দিনে দুপুরে বাঈজী খাটে শুয়ে থাকত, ঘরের নর্দমা এঁটে কার্ফা কার্ফা আসল গোলাপজল ঢেলে খাট সমান উঁচু করে সরোবর সৃষ্টি করতে হত, দ্বীপের মতো খাটটা জেগে থাকত শুধু। এখরচ যোগাতে হ'লে কার টাকা আর কদিন থাকে, কুবেরের ভাণ্ডার তো আর নয় কারও!

শেষ পর্যন্ত রাজা ইন্দিরচন্দরও যখন বাইজীর জন্যে দেউলে হয়ে গেলেন তখন নাকি কলকাতার বড় বড় কয়েকজন লোক মিলে বাঈজীর নামে নালিশ করেছিলেন, এ কারবার বন্ধ ক'রে দেবার হুকুম হোক, কিম্বা বাঈজীকে অন্য কোন শহরে চলে চলে যেতে বলা হোক। এইভাবে ওকে চলতে দিলে কিছুদিন বাদে কলকাতায় ধনী বলতে আর একজনও থাকবে না যে। অত বড় মানী মানুষ ইন্দিরচন্দরকে নাকি এখন তাঁর আগেকার খানসামার কাছে মাঝে মাঝে এসে হাত পাততে হয়—নিজের হাত-খরচের জন্যে।

বাঈজী আর্জির নকল আনিয়ে পড়িয়ে শুনল মন দিয়ে। উকিল-ব্যারিস্টার কিছু দিল না, মামলার দিন-কতক আগে বাবা আউলচাঁদের তিথি পড়েছিল, সেই দিন লোকলস্কর নিয়ে নৌকোয় ক'রে গদীতে কি মানত করে এল—তারপর আদালতে হাজির হয়ে নিজের জবাব নিজেই দিল। সাহেব জজ, তাঁর সামনে হাতজোড় করে বলল, 'হুজুর ধর্মাবতার, আপনারা অজ রাজা হয়ে বসেছেন — কিন্তু আসলে আপনারা বেনের জাত, কারবারীর জাত। কারবার করতেই একদিন এদেশে এসেছিলেন। আজও শুনেছি রাজত্ব করার চাইতে কারবারটাই বড় আপনাদের কাছে, দেশে-দেশে ব্যবসা ক'রে বেড়ান। কাজেই আমার কথাটা আপনি বুঝবেন। আমারও এ এক-রকম ব্যবসা, আমার মাল আমার এই দেহটা। আমার মালের দাম আমি বেঁধে দিয়েছি—যার পোষায় কিনবে, যার না পোষায় কিনবে না। জুলুম তো নেই কিছু। যাদের ক্ষমতা নেই—তারা কিনতে আসে কেন? এত চড়া দাম দিতে কে বলেছে তাদের? এর মধ্যে আমার কী অপরাধ তা তো আমি বুঝলুম না হুজুর!'

সাহেব আর্জি পড়ে আর বাঈজীর চেহারা ও চালচলন দেখে আগেই কাঠগড়াতে ফরিয়াদীর জন্যে চেয়ার দেবার হুকুম দিয়েছিলেন, এখন দোভাষী জবাবের অর্থটা বুঝিয়ে দিতে তাঁর দৃষ্টি প্রশংসায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সওয়ালের উপযুক্ত জবাব বলে বেকসুর খালাস তো দিলেনই—এই একটা অর্থহীন মামলায় ওকে টেনে এনে বিরক্ত করার জন্য দুঃখ প্রকাশও করলেন।

বাঈজীর কথাটা মনে পড়েই হোক, আর স্বামীর যুক্তিতেই হোক—নিস্তারিণী নরম হ'ল একটু। সতীমায়ের দেওয়া মেয়ে, তাঁর কাছে গেলে হয়ত সত্যিই একটা চারা হ'তে পারে—অন্তত মেয়েটার যদি একটু সুবুদ্ধিও হয় তো বাঁচা যায়।...

সে চুপ ক'রে গেল, আর তার সেই মৌনকেই সম্মতি ধরে নিয়ে ভবতারণ চেষ্টা-চরিত্র ক'রে—বাজার থেকে দু-তিনটে টাকা ধার ক'রে বেরিয়ে পড়লেন মেয়েকে নিয়ে।

সেইখানেই যোগাযোগটা হ'ল।

সায়রে চান ক'রে উঠে চুল মুছছে—মহিলাটি সামনে এসে দাঁড়াল। তাকে আগে থাকতেই লক্ষ্য করেছে সুরবালা, ভাল রঙ-করা বজরা নৌকোয় চেপে এসেছে, সংগে ঝি—তাছাড়াও দু-দুটো খোট্টা গুমখো চেহারার দারোয়ান। একা মেয়েছেলে—তার এত গয়নাগাঁটি পরা, সাধারণত এত দূরে আসতে সাহস করে না কেউ, সেই জন্যেই অত নজরে পড়েছিল। আরও একটা লক্ষ্য করার ব্যাপার ছিল। বয়স হয়েছে মেয়েটির—পঁচিশ-ছাব্বিশের কম নয়, হয়ত বেশীও হতে পারে—এক গা গয়না কিন্তু সিঁথিতে সিঁদুর কিম্বা হাতে লোহা নেই। অর্থাৎ আয়তির চিহ্ন নেই কোথাও। এ শ্রেণীর মেয়েমানুষ এখানে বিস্তর আসে—মায়ের রাজত্বে বাছবিচার নেই কারও—কিন্তু সে সবই গরীব, বস্তি কি খোলার ঘরের মেয়েছেলেই বেশী তাদের মধ্যে। এত লোকলস্কর নিয়ে, পাইক-পেয়াদা নিয়ে কেউ আসে না, এত গয়না কাপড়ের বাহারও নেই তাদের। কোন বড় মানুষের রক্ষিতা নিশ্চয়ই—কারও মুখে শুনে মানত করতে এসেছে। অবশ্য গৃহস্থ ঘরেও অনেকে কালীঘাটে শাঁখা সিঁদুর বাঁধা দেয়—মানসিক ক'রে—তবে তাদের দেখলেই চেনা যায়, বহুদিনের ব্যবহৃত করা সিঁদুরের চিহ্ন অত সহজে মিলোয় না।

অবস্থাপন্ন যে তাতে সন্দেহ নেই। ঘাট থেকে এই পথটাও পাল্কী ক'রে এসেছে। নিজের সঙ্গে দামী ঘেরাটোপ এনেছিল নিশ্চয়ই—ভাড়াটে পাল্কীতে ঢাকা দিয়ে এসেছে। তবে এখানে তো নেমে স্নান করতেই হবে, এখানে আর কোন বড়-মানষীই চলবে না। চুল মোছা হয়ে গেলে পাকানো গামছার ঝাপটায় চুল ঝাড়তে ঝাড়তে অলস চোখে চেয়ে দেখছে সুরোবালা, মানুষটা ভিজে কাপড়েই সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর, বিস্মিত সুরোর দিকে বার-দুই আপাদ-মস্তক তাকিয়ে নিয়ে বলল, 'হ্যাঁ গা, তুমি কীত্তন গাও না? ভুল করছি কিনা ভেবেই এতক্ষণ রা কাড়ি নি, কিন্তু ক্রমেশ যত দেখছি মনে হচ্ছে ঠিক ঠিক চিনেছি। বলি, তুমি তো মতি কীত্তনউলীর সঙ্গে গাইতে যেতে—না কি?'

অগত্যা ঘাড় নাড়তে হয় সুরোকে। স্বীকার করতে হয় কথাটা। চারিদিকে অসংখ্য কৌতূহলী চোখ ও কান। অস্বীকার

করতে পারলেই ভাল হ'ত। কিন্তু গুরুদ-স্থানে এসে স্নান করে উঠে দর্শন করতে যাবার আগে মিথ্যে বলতে পারল না। তাছাড়া এমনিও মিথ্যে কথা ওর সহজে আসে। না।

প্রশ্নকারিণী ভারী খুশী হ'ল অনুমানের সমর্থন পেয়ে। খুশিটা আত্মতৃপ্তির। বলল, 'হুঁ-হুঁ বাবা! এ বড় সাফ চোখ। একবার যাকে দেখব ঠিক মনে থাকবে। ঐ একবারই দেখেছি, পাকপাড়ার রাজবাড়িতে গাওনা করতে গিছলে মনে আছে? কার যেন অন্ন-পেরাশনে। ভারী পছন্দ হয়েছিল তোমার গলা। সেই জন্যেই আরও মনে করে রেখেছি। মতির চেয়েও তোমার গলা ভাল--তা মানতেই হবে। আর চেহারার তো কথাই নেই। সেই জন্যেই বোধহয় মতির এত রীষ! দেখ-সাক্ষাৎ না হোক, পরিচয় না থাক--খবর সব রাখি বাপু। মতির সঙ্গে যে তোমার ফারকৎ হয়ে গেছে--মতি আর নে যায় না সঙ্গে, আলাদা মজুরোও দেয় না--সব জানি। অবস্থা তো দেখছি সর্সেমিরে, তা হ্যাঁ ভাই, তোমার এমন রূপ, এমন দরাজ গলা--থ্যাটারে যাও না কেন? লুপে নেবে সবাই তোমাকে পেলে। থ্যাটার জানো তো? যাত্রার মতো খোলা মাঠে হয় না--ইংরেজদের মতো বাঁধা ঘরে পালা গাওয়া আজকাল, তাকে নাকি পেলে বলে। দ্যাখো নি কখনও?'

সুরো বিরক্তই হয়ে ওঠে মনে মনে এই গায়ে-পড়া আত্মীয়তায়। বলে, 'তা আপনাকে তো চিনতে পারছি না--কখনও দেখেছি বলেও তো মনে পড়ছে না?'

'না-ই বা চিনলে! আমি তো বাছা তোমার হিত বই অহিত চাই না--সে তো আমার কথাতেই বুঝলে! পরামর্শটা নিতে দোষ কি? বলে শুনেছি -- পরমহংসদেব বলেন, কে এক অবধূতের চব্বিশজন গুরু ছিল। পিঁপড়েকে দেখেও গুরু বলে মনে-ছিল তার আচরণ দেখে। তুমি বাছা থ্যাটারে যাও, মাস মাস মাইনে পাবে--কোন ঝঞ্ঝাট-ঝক্কি কিছু থাকবে না। তুমি তো তেমন নও--নইলে বাড়িতে বড়লোকের গাদি লেগে যেত। থ্যাটার অবিশ্যি জায়গা ভাল নয়--তবে তুমি যদি খাঁটি থাকো তো তোমায় নষ্ট করে কে? এই যে গোলাপ পেলে করে--গাড়ি মুফে যায়, গাড়ি মুফে ফেরে, কৈ, কারও সাহস আছে মুখ তুলে তাকায় তার দিকে দুষ্যভাবে?'

কথাটা একটু একটু করে মনে লাগে বৈকি।

এমনও মনে হয় এক-একবার--সতী-মায়ের স্থানে আসারই প্রত্যক্ষ ফল এটা। মা তো আর সশরীরে দেখা দিয়ে কথা বলবেন না, এমনিভাবেই কাউকে দিয়ে বলাবেন।

তবু মুখে একটা ঔদাসীন্য দেখিয়ে বলে, 'সে কোথায় কী ক'রে কি হয় জানিনে তো! ওদিকের কাউকে চিনিও না। আমি কেমন করে চেষ্টা করব বলুন!'

'ব্যাস ব্যাস, উটিই হবে। দয়া ক'রে যে মুখের কথাটি খসিয়েছ তাতেই কাজ হয়ে যাবে। আমার বাবুর ইয়ারবন্ধুদেরই থ্যাটার আছে যে, আমাদের ঘরেই তাদের আড্ডা। মস্ত মস্ত লোক সব, হেঁজিপেঁজি কেওকেটা নয় কেউ। আমি ফিরে গিয়েই তাদের বলব। এর আগেও খোঁজ করেছি মতির কাছে--তা বলে কি, জানিনে, কোথায় খোলার ঘরে থাকে বুঝি--হ্যাদ্দিনে হয়ত তাও নেই, ভিক্ষে ক'রেই খায় হয়ত। বোঝ মাগীর ঝালটা!...তা কোথায় থাকো বলো তো, তোমার ঠিকানাটা কি?'

ঠিকানাও বলতে হয় তখন। বেশ মন দিয়েই শোনে মেয়েমানুষটি, বার-দুই আপন মনে আউড়ে নেয়, তারপর বলে, 'আর বলতে হবে না, ঠিক মনে থাকবে। একবার যা কানে সেঁধবে তা আর বেরুবে না।...আমাদের বাবু আদর ক'রে বলেন শ্রুতিধর। একবার শুনেই যারা মনে ধরে রাখে--তাদেরই নাকি শাস্তরে ঐ কথা বলে।'

খুশী মনেই গা মুছে চুল ঝাড়তে ঝাড়তে চলে যায় মেয়েছেলেটি। ঝি শুকনো কাপড় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে--ভিজে কাপড় ছেড়ে পরবে বলে। পয়সা যে আছে তাতে সন্দেহ নেই, আর তা দেখাতেও জানে--মনে মনে স্বীকার করে সুরবালা।

তবু, সুরো ভেবেছিল নিতান্তই কথার কথা এটা। একবার শুনেই সত্যি সত্যি কি মনে ক'রে রাখতে পারবে? বিশেষ যেমন গলির নাম তেমনি নম্বর ওদের--ভারী ভজকটো। তাছাড়া -- বলেছে বলেই গরজ ক'রে ঠিকানা মনে ক'রে রেখে ওর চাকরির জন্যে সুপারিশ করবে--এতটা আশা করাও যায় না।

কিন্তু ফিরে আসার তিন-চার দিন পরে সত্যিই একদিন এক গাড়ি এসে দাঁড়াল ওদের দরজায়। নিস্তারিণী ঊর্ধ্ব-শ্বাসে ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিল, 'ওরে একটা বাবু এয়েছে--তোর নাম ক'রে খোঁজ করছে। বলছে সুরবালা কীত্তনউলী থাকে এখানে? তার সঙ্গে দেখা করব।...বাবুটার জামা-কাপড় এমন কিছু নয় অবিশ্যি--তবে গাড়িটা বড়লোকের। হয়ত সরকার গোমস্তা পাঠিয়েছে কাউকে--মুজরোর জন্যে বায়না করতে।'

সুরোও তাই ভাবল। এতদিন পরে ভগবান মুখ তুলে চাইলেন হয়ত।

ওরই মধ্যে একটু ভদ্র কাপড়-চোপড় পরে দেখা করল। যে এসেছিল, বেঁটে খাটো ধরনের--পরনে মাজা কফওয়ালা কামিজ আর চওড়া পাড় কোঁচানো ধুতি। তবু এ লোকের যে এত বড় বড় ঘোড়ায় টানা এই দামী গাড়ি হ'তে পারে না তা দেখলেই বোঝা যায়। দেখতে আদৌ ভাল নয়, তবে বয়স অল্প, আর চোখ দুটোর ভাব ভারী মিষ্টি, সর্বদাই যেন কৌতুকে উজ্জ্বল।

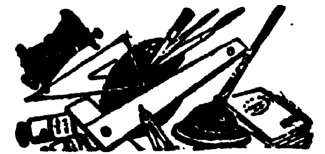
সামনে মাদুর পাতা ছিল, ভদ্রলোক ছড়িটা দেওয়ালে ঠেকিয়ে রেখে তাতে এসে দাঁড়াল, কিন্তু বসল না চারিদিকে তাকিয়ে দেখে, সুরোকে বার-কতক দেখে নিয়ে একেবারেই কাজের কথা পাড়ল। বলল, 'শোন, তোমাকে তুমি বলছি, মনে কিছু ক'রো না--বয়েসে ঢের বড় আমি, একরত্তি পুঁচকে ছুঁড়িকে আপনি-আজ্ঞে করতে পারব না--বলছি, তুমি থিয়েটারে কাজ করবে? বাবু আমাকে জিজ্ঞেস করতে পাঠালেন।'

উত্তর দিতে সময় লাগল। এ প্রশ্নটার জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না। প্রস্তুত ছিল, আশা করছিল--তার এত যত্নের শেখা বিদ্যের একটা স্বীকৃতির অর্থাৎ কীর্তনের কোন মুজরোর। এখন সেই আশা-ভঙ্গের আঘাতটা সামলে মনটা গুছিয়ে বর্তমান প্রশ্নে নিয়ে আসতে হল। ঘোষ-পাড়ার সেই গায়ে পড়া মেয়েছেলেটিই তাহলে তার কথা মনে ক'রে রেখেছে--ঠিকানাটাও সত্যিই রেখেছে মনে ক'রে!

কিন্তু লোকটির যেন ধৈর্য মানছিল না। সে বলে উঠল, 'কী হ'ল, এত ভাববার কি আছে? হ্যাঁ কি না--একটা বলে দেবে--তাতে এত সময় লাগে কিসের?'

হঠাৎ যেন রাগ ধরে গেল সুরোর। বলল, 'লাগে বৈকি। যারা কোন কাজ করে না, শুধুই পরের বৈঠকখানায় ইয়ার্কি দিয়ে আর মোসাহেবী করে দিন কাটায়--যাদের কথার কোন দাম নেই--তারাই চট ক'রে হাঁ না যা হয় একটা বলে দিতে পারে। যারা কাজের লোক, তাদের ভেবে-চিন্তে কথা বলতে হয়।'

'ও বাব্বা, এ যে ঝাঁঝ আছে দিব্যি দেখছি!' দাঁত বার ক'রে হাসে লোকটা, 'না, তুমি পারবে। বেশ গলা তোমার, তেজ দেখালে আরও খোলে, চেহারারও বেশ



সকল প্রকার অফিস ষ্টেশনারী কাগজ ন্যাডেইং ড্রইং ও ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্যাদির সুলভ প্রতিষ্ঠান।

কুইন ষ্টেশনারী ষ্টোর্স প্রাঃ লি

৬৩-ই, রাধাবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা-১
ফোন: অফিস--২২-৮৫৮৮ (২ লাইন
২২-৬০০২
ওয়ার্কসপ--৬৭-৪৬৬৪ (২ লাইন)

স্থানীয় এজেন্ট

নিম্নোক্ত এজেন্টের কাছে অতিরিক্ত এন্ট্রিফর্ম, নগদ টাকার রসিদ ও লিটকুইজ সাপ্তাহিকের কপি পাওয়া যাবে—

পি, পি, অ্যান্ড কোং

ফ্ল্যাট নং ৬, ব্লক নং ই, ১৫, বেচুলাল রোড, কলিকাতা-১৪।

বন্ধের শেষ তারিখ

ডাকে প্রেরিত সকল প্রবেশপত্র : ১৮-১-৬৮

আনন্দবাজার পত্রিকাতে সমাধান : ২১-১-৬৮

আপনি আপনার প্রবেশপত্র পাঠাতে পারেন বুধবার ১৭-১-৬৮ তারিখে, কিন্তু উহা এক্সপ্রেস ডেলিভারীতে পাঠান।

সমাধান ফেরৎ পাইবার জন্য আপনার প্রবেশপত্রসহ নিজ ঠিকানা লিখিত ৬ পয়সার পোষ্টকার্ড পাঠান।

১৲ টাকা পাঠান এবং লিট্‌কুইজ টাইকালির ৫টি সংখ্যা লাভ করুন।

সাপ্তাহিক অমৃত, সাপ্তাহিক দেশ ও রবিবারের আনন্দবাজার পত্রিকায় বঙ্গানুবাদ-সহ অনুমোদিত এন্ট্রি ফর্ম নিয়মিত প্রকাশ করা হয়।

LitQuiz No.27

Rs. 32,500

FIRST PRIZE Rs. 16,000

RUNNERS-UP (UPTO 4 ERRORS) Rs 10,000

MINIQUIZ (UPTO 2 ERRORS) Rs 5,000

PRIZES IN BOOKS (A.C.+1 ERROR,+ MINIQUIZ A C.) Rs. 500

RELIEF FUND Rs. 1,000

— ২৭ লিট্‌কুইজের সরকারী ভর্তি ফর্ম —

ADDRESS: -LITQUIZ No.27. ALANKAR, BALARAM ST., BOMBAY-7 (WB).

দ্রষ্টব্য:—(১) প্রত্যেক কলমে, আপনার বাতিল করা শব্দটি কালি দিয়ে কেটে দিন; (২) আপনি যদি শুধুমাত্র একটি কুপন পাঠান, তাহলে দ্বিতীয় কুপনটি বাতিল করে দিন; (৩) আপনি যদি মানি অর্ডারযোগে এন্‌টি ফী পাঠান, তাহলে এই এন্‌ট্রি ফর্মের সঙ্গে, ডাকঘর থেকে পাওয়া মানি অর্ডার রসিদটি অবশ্যই পাঠাবেন। মানি অর্ডার রসিদ ছাড়া এন্‌টি বাতিল করা হবে; (৪) আই-পি-ও ক্রস করবেন না। লিট্‌কুইজ নং —২৭ বোম্বাই-৭-এর টাকা অনুকূলে পাঠান।

1	Re. 1		2	Re. 1		3	Re. 1		4	Re. 1	
1	ACTIVE	INQUISITIVE	1	ACTIVE	INQUISITIVE	1	ACTIVE	INQUISITIVE	1	ACTIVE	INQUISITIVE
2	ARRESTING	INTRIGUING	2	ARRESTING	INTRIGUING	2	ARRESTING	INTRIGUING	2	ARRESTING	INTRIGUING
3	BELIEVED	SUCCEEDED	3	BELIEVED	SUCCEEDED	3	BELIEVED	SUCCEEDED	3	BELIEVED	SUCCEEDED
4	CHARITY	PIETY	4	CHARITY	PIETY	4	CHARITY	PIETY	4	CHARITY	PIETY
5	CLARITY	VARIETY	5	CLARITY	VARIETY	5	CLARITY	VARIETY	5	CLARITY	VARIETY
6	CONDEMNS	CONTEMPLATES	6	CONDEMNS	CONTEMPLATES	6	CONDEMNS	CONTEMPLATES	6	CONDEMNS	CONTEMPLATES
7	ETERNAL	UNIVERSAL	7	ETERNAL	UNIVERSAL	7	ETERNAL	UNIVERSAL	7	ETERNAL	UNIVERSAL
8	FAITH	GROWTH	8	FAITH	GROWTH	8	FAITH	GROWTH	8	FAITH	GROWTH
9	FORCES	VALUES	9	FORCES	VALUES	9	FORCES	VALUES	9	FORCES	VALUES
10	FRIENDSHIP	WORSHIP	10	FRIENDSHIP	WORSHIP	10	FRIENDSHIP	WORSHIP	10	FRIENDSHIP	WORSHIP
11	HISTORICAL	POLITICAL	11	HISTORICAL	POLITICAL	11	HISTORICAL	POLITICAL	11	HISTORICAL	POLITICAL
12	HUMILITY	UNITY	12	HUMILITY	UNITY	12	HUMILITY	UNITY	12	HUMILITY	UNITY
13	IDEAL	REAL	13	IDEAL	REAL	13	IDEAL	REAL	13	IDEAL	REAL
14	MARKEDLY	ROOTEDLY	14	MARKEDLY	ROOTEDLY	14	MARKEDLY	ROOTEDLY	14	MARKEDLY	ROOTEDLY
15	MORAL	SOCIAL	15	MORAL	SOCIAL	15	MORAL	SOCIAL	15	MORAL	SOCIAL
16	PHILOSOPHER	PRECEPTOR	16	PHILOSOPHER	PRECEPTOR	16	PHILOSOPHER	PRECEPTOR	16	PHILOSOPHER	PRECEPTOR
17	PHILOSOPHY	SPIRITUALITY	17	PHILOSOPHY	SPIRITUALITY	17	PHILOSOPHY	SPIRITUALITY	17	PHILOSOPHY	SPIRITUALITY
18	REASON	RELIGION	18	REASON	RELIGION	18	REASON	RELIGION	18	REASON	RELIGION

SEND THESE 2 COUPONS & ENTER MINIQUIZ FREE 27 SEND THESE 2 COUPONS & ENTER MINIQUIZ FREE

MiniQuiz — 12 CLUES FREE COUPON 1

ACTIVE	INQUISITIVE	FAITH	GROWTH
ARRESTING	INTRIGUING	FORCES	VALUES
BELIEVED	SUCCEEDED	FRIENDSHIP	WORSHIP
CHARITY	PIETY	HISTORICAL	POLITICAL
CLARITY	VARIETY	IDEAL	REAL
ETERNAL	UNIVERSAL	MORAL	SOCIAL

MiniQuiz — 12 CLUES FREE COUPON 2

ACTIVE	INQUISITIVE	FAITH	GROWTH
ARRESTING	INTRIGUING	FORCES	VALUES
BELIEVED	SUCCEEDED	FRIENDSHIP	WORSHIP
CHARITY	PIETY	HISTORICAL	POLITICAL
CLARITY	VARIETY	IDEAL	REAL
ETERNAL	UNIVERSAL	MORAL	SOCIAL

২৭ (অমৃত)

এই কুইজে যোগদান করবার জন্য আমি নিয়ম ও সর্তাবলী পালন করতে রাজী এবং প্রতিযোগিতা সম্পাদকের বিচার চূড়ান্তভাবে ও আইনতঃ বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ করলাম। প্রত্যেক কুপনের জন্য ভর্তি ফি : ২৲ টাকা। আমি এম-ও রসিদ/আই-পি-ও/লিট-কুইজ ক্যাশ রসিদ/প্রাইজ কার্ড ও তার নম্বর....................পাঠালাম।

CAPITAL LETT

NAME-

ADDRESS-

এখানে কার্টুন ও এই পুরো ফর্মটি পাঠান

18 CLUES

LITQUIS NO. 27

(1) **Nehru was fond of children and like children he was very Active|Inquisitive.**

(2) **The most Arresting|Intriguing fact about India is that her soil is rich and her people poor.**

(3) Psychology in India never **Believed|Succeeded in getting itself** separated from philosophy.

(4) Disinterested works of **Charity| Piety** or altruistic labour are as contributory to self-realization as spiritual effort.

(5) Science inlaid with religion and philosophy has greater **Clarity|Variety** and harmony than any one or two of them.

(6) **If** the absolute truth **should** really comprehend all, it cannot exclude the self **of the** person that Condemns/Contemplates it.

(7) The laws, themselves, **are Eternal|Universal** and immutable it is only our knowledge that progressively approaches them.

(8) **Faith|Growth in life is man's finite way of approaching the** infinite.

(9) The **Forces|Values** of ultimate reality cannot be valid for politics which **is** concerned with everyday life.

(10) Our **Friendship|Worship should be the evidence of our feelings** of gratitude and love.

(11) Rumours must be distilled in the alembic of truth before they can be crystallised into **Historical|Political** facts

(12) Education must **infuse religious Humility|Unity.**

(13) Science itself **is** an activity seeking **Ideal|Real values of** the highest sort.

(14) Rural India is **Markedly Mootedly conservative in its** outlook.

(15) **It is** difficult, **if not impossible, to determine the nature of Moral|Social good.**

(16) **The** Philosopher / Preceptor **should not don the false plumes of the shaman, the priest or the prophet.**

(17) **The main task of Philosophy/ Spirituality is to have the realisation of reality not to know the real but to be real.**

(18) **Suspicion of Reason|Religion has always been present at all stages in the history of the human race and India is no exception to this.**

দ্রষ্টব্য : ওপরের ধাধাগুলি বিভিন্ন লেখকের লেখা থেকে নেওয়া কয়েকটি প্রশ্ন। এগুলি সব সম্পূর্ণ বাক্য ও নিজস্ব সম্পূর্ণ অর্থ বহন করে। লেখক/প্রবন্ধকারের নাম ও তাঁদের রচনার নাম সরকারীভাবে সমাধানের সঙ্গে লিটকুইজ উইকলিতে প্রকাশ করা হবে।

বঙ্গানুবাদ

১। নেহরু শিশুদের ভালবাসতেন এবং শিশুদের মতই তিনিই ছিলেন সক্রিয়/ জিজ্ঞাসু।

২। ভারত সম্পর্কে সবচেয়ে কৌতূহলকর/জটিল ব্যাপার হ'ল এর মৃত্তিকা খুব দামী এবং এর অধিবাসীরা গরীব।

৩। ভারতে মনোবিজ্ঞান কখনই নিজেকে দর্শনশাস্ত্র থেকে আলাদা করায় বিশ্বাস করেনি/সফল হয়নি।

৪। দয়া/পুণ্য-র অনাসক্ত কাজ অথবা পরার্থ-পর পরিশ্রম আত্মজ্ঞানের পক্ষে ততখানি সহায়ক যতখানি আধ্যাত্মিক সাধনা।

৫। ধর্ম আর দর্শনের সমন্বয়ে যে বিজ্ঞান, সেটিতে এদের মধ্যে যে কোন একটি বা দুইটির চেয়ে বেশী স্পষ্টতা/বৈচিত্রতা এবং ঐক্য আছে।

৬। যদি পরম সত্যকে সত্যসত্যই সব কিছুকেই অন্তর্ভুক্ত করতে হয় তাহলে সে, তাঁকে যে ব্যক্তির আত্মা নিন্দা/ধ্যান করে, তাঁকেও (নিজের থেকে) আলাদা করে রাখতে পারবে না।

৭। নিয়মগুলি নিজের থেকেই শাশ্বত/ সর্বব্যাপী এবং অটল, আমাদের জ্ঞানের দ্বারা কেবল আমরা তাকে ক্রমশঃ বুঝতে পারি।

৮। জীবনে বিশ্বাস/বিকাশ অসীমের পানে পৌঁছুবার পথে মানুষের সীমিত উপায়।

৯। অন্তিম সত্যের প্রভাব/মূল্য রাজনীতির ক্ষেত্র প্রযোজ্য নয় কেননা এটি দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে জড়িত।

১০। আমাদের মিত্রতা/পূজা-য় আমাদের কৃতজ্ঞতা ও প্রেমের ভাবনার প্রমাণ থাকা চাই।

১১। ঐতিহাসিক/রাজনৈতিক সত্যে রূপান্তরিত হবার আগেই গুজবকে সত্যের দ্রাবকে পরিস্রুত করে নেওয়া দরকার।

১২। শিক্ষাকে ধার্মিক বিনম্রতা/একতা-র প্রেরণা দিতেই হবে।

১৩। বিজ্ঞান মূলে একটি ক্রিয়াপদ্ধতি যা সর্বোচ্চ স্তরের আদর্শ/সত্য-র মূল্য খোঁজে।

১৪। গ্রামীন ভারতের দৃষ্টিকোণ স্পষ্টত/মূলত রক্ষণশীল।

১৫। নৈতিক/সামাজিক মঙ্গলের প্রকৃত নির্ণয় করা অসম্ভব না হলেও কঠিন তো বটেই।

১৬। দার্শনিক/গুরু-র যাদুকর, পূজারী বা পয়গম্বরের মিথ্যা ভেক ধরা উচিৎ নয়।

১৭। দর্শন/অধ্যাত্মবাদের মুখ্য উদ্দেশ্য সত্য-জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া, সত্যকে জানা নয়, সত্যে উপনীত হওয়া।

১৮। উদ্দেশ্য/ধর্ম-র উপর সংশয় মানবজাতির ইতিহাসের সমস্ত স্তরেই উপস্থিত ছিল বা আছে এবং ভারত তার বাইরে নয়।

খোলতাই হয়, মাইরি বলছি।...এত তো চরলুম, এমন মাল চট করে মেলে না। মাগীর চোখ আছে—সেটা মানতে হবে।... তা এই তো কাজ, য়্যাকটিং করা হ্যাকে-ট্যাকো এমন কিছু নয়। তা আপত্তি নেই তো তোমার ?'

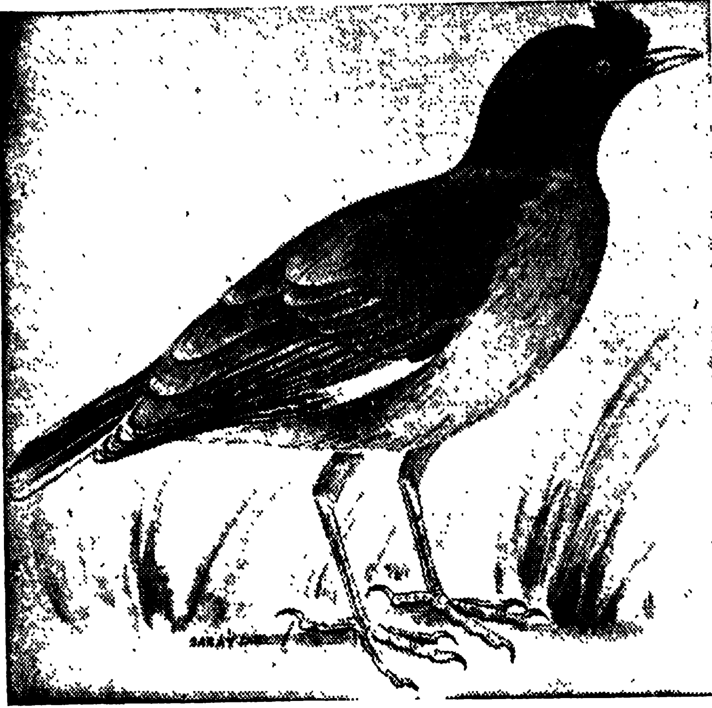
তখনও রাগ সম্পূর্ণ পড়েনি সুর-বালার। সে বলল, 'তা এখন কি ক'রে বলব ? কী কাজ, কি করতে হবে, কত মাইনে পাব—কিছুই জানলুম না, চট্ করে বলে দেব আপত্তি নেই ?'

'তা অবিশ্যি বটে। মানছি তোমার কথাটা। তবে শোন, করতে হবে নাটকে য়্যাক্‌টিং। কীরকম জানো ? ধরো তুমি যেন সীতা সেজেছ, সীতার মুখের কথাগুলো এমনভাবে বলতে হবে যাতে অডিয়েন্স মানে যারা শুনছে, তাদের মনে হয় সাক্ষাৎ মা সীতাদেবীই এসে কথাগুলো বলছেন। চলো, অন্য লোকের য়্যাকটো করা দেখলেই বুঝতে পেরে যাবে। আর, সে আমরাই শিখিয়ে নেব, তার জন্যে তোমার কোন চিন্তা নেই। একটু বাজাতেই যা আওয়াজ মারল—টং করে উঠল পোড়াহাঁড়ির মতো—তাতেই বুঝেছি তোমার এলেম আছে।... আমি নানু দত্ত, একবার হাঁ করলেই বুঝতে পারি।...আপাতক্ শুধু গান গাইতে হবে, —য়্যাক্‌টিং শিখলে তখন অন্য পার্ট। দ্যাখো যদি রাজী থাকো তো বলো—বিকেলে গাড়ী আসবে। থিয়েটারের ঝি থাকবে—বাবুর সঙ্গে দেখা করে কথা পাকা করে দিয়ে এসো—ঝিই আবার পৌঁছে দিয়ে যাবে। মাইনেপত্তর বাবুরাই ঠিক করবেন। জি সি ঘোষ আছেন—সে তাঁদের ব্যবস্থা। ওর মধ্যে আমি নেই। তাইলে ঐ কথাই পাকা রইল তো ?'

সুরবালার বয়স কম কিন্তু অভিজ্ঞতা কম নয়। সে এই বয়সেই দুনিয়া চিনেছে খানিকটা। চিনতে বাধ্য হয়েছে। সে সন্দিগ্ধস্বরে বলল, 'দাঁড়ান, এসব কথা এত তাড়ায় হয় না। আপনারা গাড়ি পাঠাবেন, সে-গাড়িতে আমি যাব—কোথায় নিয়ে গিয়ে ফেলবেন তার ঠিক কি ? যদি কোন বদ মতলব থাকে আপনাদের ? আপনাকে আমি চিনি না, ঠিক যে থিয়েটার থেকেই এসে-ছেন—তাই বা জানব কেমন করে ? মুখ-পোড়া রঘুবাবুই যে আপনাকে পাঠায়নি—সেই বা কেমন করে জানছি !'

'ও বাব্বা, এ যে বুকোড়ির মধ্যে খাসা চাল দেখছি। তবে তো বসতে হ'ল !'

এতক্ষণে সত্যিই মাদুরের ওপর চেপে বসল লোকটি, 'যা ভেবেছিলুম, তার চেয়েও টনকো দেখছি তুমি। দেখে তো মনে হয় সতেরো-আঠারোর বেশী হবে না বয়েস—এধারে কথা তো কইছ পাকা উকিলের মতো, আমাদের ভাবক পালিত কোথায় লাগে !... এতসব শিখলে কি করে চাঁদু—পুলিশের সঙ্গে ঘর করো নাকি ? রঘুবাবুটি আবার কে, কোন্ কাপ্তেন ? সেই মতির দালালটা বুঝি ? সে বুঝি গাঁথতে এসেছিল তোমাকে ?'



বাঙলার পাখী

তারপর মিনিটখানেক ওর মুখের দিকে চেয়ে আস্তে শিস দিতে দিতে বলল, মরুক গে, আমি যে আসল লোক, জাল নই—অত বোঝাতে আমি চাই না। বুড়ো-বয়সে তোমার কাছে হলপ করতে কি দিব্যি গালতে পারব না—আর তুমি যে মেয়ে—তাতেও বিশ্বাস করবে বলে মনে হয় না। বলি, যদি সন্দ থাকে—গাড়ি তো আসবে, মা কি বাবা—কিম্বা অন্য কোন গার্জেন যদি থাকে, তাকে সঙ্গে নিয়ে যেও, তাহলে তো হবে?'

সুরবালা এবার ঘাড় নাড়ে, হবে। এর চেয়ে আর ভাল প্রস্তাব কি হতে পারে! সত্যিই যদি কোন বদ মতলব থাকত, মুজরোর নাম করেও ডাকতে পারত। এ আসল জিনিসই—মায়ের তাড়নায় আপনা থেকে ছুটে এসেছে।

নানু দত্ত উঠে পড়ে এবার। চওড়া পাড়ের চুনট করা কোঁচাটা বার-দুই ঝেড়ে নিয়ে বলে, 'তুমি বাবা অনেক দূর উঠবে, তা তোমার কথাবার্তা শুনেই বুঝেছি। তখন এ-গরীবকে স্মরণ রেখো—আমিই যোগা-যোগটা করালুম।'

অবশ্য উত্তরের অপেক্ষা আর করল না, হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল।...

আড়াল থেকে নিস্তারিণী শুনছিল সব, বেরিয়ে এসে বলল, 'হ্যাঁরে, তা থ্যাটার যাবি কি রে, সেখানে তো শুনেছি নষ্ট মেয়েমানুষরাই যায়।...তাই যদি যাবি, ঐ পথেই পা বাড়াবি—ম্যাদ্দিনে তো ঢের টাকা রোজগার করতে পারতিস!'

'নিজে নষ্ট না হলে কেউ সহজে নষ্ট করতে পারে না মা।...কীর্তনের লাইনেও তো নষ্ট মেয়েমানুষের অভাব নেই। আর আমাকে নষ্ট করাবার জন্যে তুমিও তো কম চেষ্টা করোনি—এখন ভূতের মুখে রাম নাম কেন?'

একটু রূঢ়ভাবেই জবাব দেয় সুরবালা।

মেয়ের আবার রোজগারের সম্ভাবনায় নিস্তারিণী উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে, এ-আঘাত সে গায়ে মাখে না। শুধোয়, 'তা কে তোর সঙ্গে যাচ্ছে তাহ'লে?'

'কেউ না গেলেও চলবে। আমি ওকে বাজিয়ে দেখছিলুম। এর আগে মায়ের থানে একজনের সঙ্গে কথা হয়েছিল—লোক পাঠাবার কথাই ছিল।...তবু দেখি বাবা যদি রাজী হন, ও'কেই নেব।'

নিস্তারিণী আশা করছিল তাকে সংগে নেবার কথাই মেয়ে বলবে। এই সুযোগে দেখে আসবে ব্যাপারটা কি—সেদিক দিয়েই যেতে না দেখে ক্ষুণ্ণ হ'ল একটু। তবু, বেশী কিছু বলতেও সাহস করল না আর। 'মেরে তো নয়—মানোয়ারী গোরা, মেজাজ সপ্তমে চড়েই আছে একেবারে। মা-ই যেন যত শত্তুর। ওরে, এই শত্তুর না থাকলে ম্যাদ্দিন থাকতিস কোথায়? শ্যাল-কুকুরের পেটে সেঁধিয়ে বসে থাকতে হত। ঐ তো অত সোহাগের বাপ, সে তো নিতে চায়নি—এই শত্তুরই সেদিন তুলে এনেছিল, তাই—'

আড়ালে গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে গজগজ করতে থাকে।

॥ ১১ ॥

ভবতারণ প্রথমটা অবশ্য রাজী হননি। ধর্মভীরু মানুষ, বিশেষ ইদানীং নিজের ব্রাহ্মণত্ব সম্বন্ধে একটু যেন বেশীই সচেতন হয়েছিলেন। আর কেউ বললে কিছুতেই রাজী হতেন না—নেহাৎ ব্যাপারটার মধ্যে মেয়ের নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত আছে বলেই শেষপর্যন্ত তার পীড়াপীড়িতে রাজী হলেন। সঙ্গে গেলেন বটে কিন্তু অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে নীরবে একপাশে বসে রইলেন। মেয়ে ও তার হবুমনিবদের মধ্যে আলো-চনায় একটি কথাও কইলেন না।

বসতেও হ'ল অনেকক্ষণ। মনিব যে ঠিক কে তা বোঝা গেল না। একাধিক ব্যক্তি এসে সমবেত হ'তে তবে কথাবার্তা আরম্ভ হল। সবচেয়ে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'ল কে একজন জি সি ঘোষ নামক ব্যক্তির জন্যে। ভদ্রলোক কে এবং কী তাঁর পদ এখানে তা না জানলেও তিনিই যে প্রধান তা বাকি সকলের কথা থেকে টের পেল সুরবালা। তিনিই এদের মধ্যে সর্বেসর্বা প্রায়, তিনি অভিনয় শিক্ষা দেন, মস্ত অভিনেতাও। নাটক নির্বাচন থেকে নট-নটী নির্বাচন—সবেরই চরম আদালত তিনি। তিনি নাটক বা পালা রচনাও করেন প্রয়োজন হ'লেই। আর তাঁর নাটক যেমন জমে, তেমন আর কারও জমে না।..অপেক্ষা করার সময় এক ফাঁকে নানু দত্ত এসে ফিসফিস করে শুনিয়ে গেল।*

সে ভদ্রলোক এলেন রাত দশটা নাগাদ। শালপ্রাংশু মহাভুজ-দীর্ঘকায় পুরুষ। অত্যন্ত রাশভারী, সেই মতোই গম্ভীর কণ্ঠস্বর। সে-কণ্ঠ মেঘগর্জন স্মরণ করায় অথচ শুনতে ভাল লাগে। একটু ভুঁড়ি না থাকলে সুপুরুষ বলা চলত, অবশ্য মুখশ্রী যে খুব একটা ভাল তা নয়—একটু ঘাড়ে-গর্দানে ভাব আছে, গজস্কন্ধ যাকে বলে। তবে পুরুষ বটে, পুরুষসিংহ বলা চলে অনায়াসে। শুধু দশাসই চেহারাতেই নয়—চালেচলনে কথাবার্তায় সর্বদাই সম্ভ্রমের উদ্রেক করে উপস্থিত বাকি মানুষগুলোর মনে।

সুরার গন্ধ অল্পস্বল্প আগেও পাওয়া গিয়েছিল—জি সি আসতে সেটা আরও প্রকট হয়ে উঠল। তাই বলে তিনি মাতাল নন আদৌ। স্থির হয়ে বসে শুনলেন সব। তারপর তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে কিছু-ক্ষণ তাকিয়ে রইলেন সুরবালার দিকে। মিনিট দুই এমনি নিঃশব্দে চেয়ে থাকার পর পাশের লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এর গান শুনেছ তোমরা কেউ?' কে যেন উত্তর

---

* এইখানে একটা কথা বলে রাখা ভাল, যে, এই গ্রন্থের ঘটনা বা পাত্র-পাত্রী সবই কাল্পনিক। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কয়েকটি নাম ও ঘটনা—বা তার আভাস হয়ত প্রসঙ্গত এসে পড়েছে—তবে তারও মূলে আছে প্রধানত কল্পনা ও জনশ্রুতি। সুতরাং এর মধ্যে সন তারিখ ধরে ঘটনার পারম্পর্য হিসেব করতে না বসলে বা জীবনীর পাতা থেকে কোন ঘটনা মিলিয়ে নেবার চেষ্টা না করলেই বাধিত হবো। সহৃদয় পাঠকরা মহাজনবাক্য স্মরণ করবেন "উপন্যাস উপন্যাস মাত্র, ইতিহাস নহে।"

—লেখক।

দিলে, 'না, তবে কীর্তনে বেশ নাম করেছিল এককালে তা আমরা জানি।' 'বেশ, তাহলে তোমরা কথাবার্তা পাকা করে নাও। এই বলে উঠে ভেতরে চলে গেলেন।

কথাবার্তার বিশেষ কিছু ছিল না। আপাতত তাঁরা দশ টাকা মাইনে দিতে চাই-ছিলেন। সুরবালা একেবারে বেঁকে দাঁড়াল। বলল, 'জাতও যাবে, পেটও ভরবে না—তাতে আমার লাভ কি বলুন? আমার বাড়ি ভাড়াটা পর্যন্ত ওতে উঠবে না। অথচ এক জায়গায় বাঁধা নিয়মে খাটতে হবে। সে আমি পারব না।'

মনে হ'ল এঁদেরও কিছু গরজ আছে। তাই কড়া মেজাজ কেউ দেখালেন না, শুধু ক্ষীণকণ্ঠে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে, শিক্ষানবীশদের বেশী মাইনে দেওয়ার রেওয়াজ নেই এখানে—দিলে চলেও না। সে তো এখন কিছুই জানে না তাকে দিয়ে আর কতটুকু কাজ পাওয়া যাবে? সখীর দলে যারা নাবে—বেশ কিছুদিন ধরে নাচ শিখেছে যারা—তারাও এর চেয়ে কম পায়। সুরবালা এসব কিছুই জানে না, তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে নিতেও তো বেশ কিছু সময় যাবে। সে এখন এতেই রাজী হোক—পরে বরং তাঁরা বিবেচনা করবেন।

কিন্তু সুরবালার এক কথা, এত অল্পে দাসত্ব করতে রাজী নয়। বাঁধা মাইনের কিছু সুবিধা আছে সত্যি, তবে সে মাইনে যদি কোন কাজেই না এল তো তার দাম কি?... অনেক টানাটানি দর কষাকষির পর ষোলটি টাকা মাইনে সাব্যস্ত হ'ল। এরা গাড়ি পাঠিয়ে আনবেন আবার পৌঁছে দেবেন। থিয়েটারের সময় হ'ল সাড়ে নটায়—শনি ও রবি। আপাতত এই দু'দিন আসতে হবে। রবিবারটা হয়ত সাড়ে ছটায় করে ফেলতে পারেন—কিন্তু সে পরের কথা। এছাড়া রিহার্স্যাল বা মহড়া আছে—মানে সেইটেই শিক্ষার সময় সে দুপুরেও হ'তে পারে, সন্ধ্যাতেও হ'তে পারে—যেদিন যেমন হবে, বলে দেবেন তাঁরা।...

তবে আপাতত এখনই একটু কাজ দিতে পারবেন ওকে। মানে এইটেই গরজ—এতক্ষণে বুঝল সুরবালা। এখন এক বড় অভিনেত্রী চৈতন্যলীলায় চৈতন্য সাজেন—তিনি গাইতে পারেন না। গানের সময় তিনি গাইবার মতো ক'রে ঠোঁট নেড়ে যান—আর একজন ভেতর থেকে আসল গানটা গায়। তবে তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা, যে যেমন-ভাবেই গাক না কেন—তিনি সেইভাবেই হাঁ-করা ঠোঁট-নাড়াগুলো ঠিক ক'রে মানিয়ে নেন, দর্শকরা কেউ বুঝতেই পারে না যে, তিনি গাইছেন না। যে-মেয়েটি এতদিন তাঁর গান গাইছিল হঠাৎ সে গায়েব হয়ে গেছে। এসব গান যে গাইতে পারে ভুনি—সে নিতাই সাজে তার পক্ষে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সব সময় গাওয়া সম্ভব নয়। সুর-বালাকে দিয়েই সেই কাজটা চালিয়ে নেবেন তাঁরা। তাকে কাল-পরশু দুটো দিনই বিকেলে একবার করে আসতে হবে, অপেরা-মাস্টার সান্যালমশাই তাকে গানগুলো গাটিয়ে দেবেন—শনিবার থেকে গাইতে হবে তাকে। এ-কাজটা চালিয়ে নিতে পারলে ওকে নাচ শিখতে দেবেন তাঁরা—শরৎ মুখুজ্জে আছে ড্যান্সিং-মাস্টার—সেটা তাঁর জিম্মেদারী। মাস্টার দুজনেই নাকি অদ্বিতীয়—দু-এক মাসেই তৈরী করে ছেড়ে দেবেন।

কাজ ভাল নয়—তার উপযুক্ত তো নয়ই। যে-লোক একদিন গেয়ে দেড়শ'-দুশো টাকা পর্যন্ত রোজগার করেছে, তার পক্ষে এ-চাকরি তো আত্মহত্যারই সামিল। যে-শিক্ষা সে পেয়েছে—অনেক সাধনায় যে-স্তরে উঠেছে, তারপর ঐ গানের মাস্টার আর নাচের মাস্টারের কাছে মাথা নীচু ক'রে শেখা বা সখীর দলে নাচা ধেই ধেই ক'রে—ভাবতেই মাথা কাটা যায়। শশীবৌদি থিয়েটার দেখেছেন। তাঁর মুখে শুনেছে সে কিছু কিছু—মতির ওখানে থাকতেও শুনেছে অনেক। এরা কম মাইনেতে আসে—তার কারণ এখান থেকে অন্য উপার্জনের রাস্তা পায়। সে উপার্জনে রুচি নেই সুরোর। তাকে ঐ ষোলটি টাকার জন্যেই মাথা বিকিয়ে দিতে হবে—ভাবতেও যেন সারা শরীর রি-রি করে, অপমানে আর ঘেন্নায়।

তবু 'না' বলতেও সাহস হ'ল না একেবারে। হাতে আর কিছুই নেই। হার আছে—তবে সে এখন পরের জিনিস যত-দিন না দেনা শোধ করতে পারছে ও-হারে কোন অধিকার নেই তার। আর আছে দুগাছি ফঙ্গবেনে বালা, তাও খুলে কাচের চুড়ি সার করলে কারও সামনে বেরোতে পারবে না আর। উপোস ক'রে থাকতে আপত্তি নেই, তবে উপোস ক'রে পড়ে থাকারও জায়গাটা চাই। মানে বাড়িভাড়া দেবার সামর্থ্যটা থাকা দরকার অন্ততঃ।

বিষণ্ণ মুখেই এসে গাড়িতে চাপে সুরবালা। সামনেই বাবা বসে আছেন কিন্তু তার মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারে না কোনমতে। তিনি এতক্ষণের টানা-হেঁচড়া দর কষাকষির মধ্যে একটা কথাও বলেননি, তবে শুনেছেন সবই। তাঁর মনের অবস্থা সুরবালার অজানা নেই। এখনই, মুখ তুললে হয়ত দেখবে নীরবে নিঃশব্দে জল ঝরে পড়ছে তাঁর চোখ দিয়ে। এ-অপমান যে তার থেকেও ভবতারণের বেশী বাজবে তা সুরবালা জানে।

বাড়িতে পৌঁছে নামবার সময় বললেনও তিনি সেই কথাটাই, 'বাপ হয়ে বেঁচে থেকেও তোর এই দুর্দশা চোখে দেখতে হ'ল মা, এ-জন্মেই ধিক্। বিয়ে দিলে স্বামীর দায়িত্ব—শ্বশুরের দায়িত্ব ভরণপোষণ করা। তা যতক্ষণ না দিতে পারছি আমারই তো খাওয়ানো পরানোর কথা। সে জায়গায় আমাকেই খাওয়াতে কী দুঃখই না সইতিস তুই! মরে গেলে শান্তি পেতুম এসব চোখে দেখতে হত না। তাও তো নিচ্ছেন না মা!'

গান শেখাতে গিয়ে সান্যালমশাই চমকে উঠলেন। একবার মাত্র শুনে নিয়েই যখন প্রায় নির্ভুলভাবে পালটা গেয়ে শোনাল সুরবালা, তখন তিনি অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন ওর দিকে। বললেন 'তোমাকে আমি কী শেখাব মা, তুমিই আমাকে শেখাতে পারো। এমন আশ্চর্য কান তোমার এমন আশ্চর্য গলা—তুমি এলে এই আস্তাকুঁড়ে পাখা নাচাতে! অদৃষ্ট আর কাকে বলে!'...

শনিবার প্রথম পরীক্ষা তার। উইংস-এর আড়াল থেকে গাইতে গিয়ে প্রথমটা যে ভয় ভয় একটু না করেছিল তা নয়—কিন্তু তারপরই নিজের পূর্ব গৌরবের কথা স্মরণ ক'রে আর সান্যালমশাইয়ের কথাটা মনে পড়ে মনে জোর পেল খানিকটা। ভালই গাইল মনে হ'ল। প্রথম অঙ্ক শেষ হ'তে কর্তাব্যক্তি স্থানীয় দু-একজন এসে বাহবাও দিয়ে গেলেন। সবাইকে চেনে না এখনও, কে বা কার মালিক কি কর্তা তাও জানে না, ভাবে ভঙ্গীতে বা প্রতিপত্তি দেখে অনুমান করল এঁরা কর্তাস্থানীয় লোক। ফলে পরের অঙ্কগুলোয় বেশ আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গেই গাইল সে। উতরেও গেল ভাল। দর্শকদের মধ্যে থেকে এনকোর এনকোর' আওয়াজ উঠল একাধিক বার। এটা কি ব্যাপার তা তাকে আগে কেউ বলে দেয়নি। ও কে এত নতুন তা অনেকে বুঝতেও পারেনি বোধহয়। ভাগ্যে নান্ এসে ঠিক শুরুর আগে বলে সাবধান করে দিয়ে গিয়েছিল যে একটু হুঁশিয়ার হয়ে থেকো, এনকোর এনকোর আওয়াজ উঠলেই আবার অন্তরা থেকে শুরু করবে সেই গানই। এই নিয়ম। এনকোর মানেই তাই—আবার ফিরে গাইতে বলা। তুমি না ধরলে চৈতন্য অপ্রস্তুতে পড়বে।'

অবশ্য অপ্রস্তুতে একবার পড়তে হল চৈতন্যকে। অভিনয় করতে করতে এমনই আত্মহারা তন্ময় হয়ে গিয়েছিল যে প্রথম দিকের এনকোর চিৎকার কানে যায়নি ওঁদের সুরো নিয়মমতো ফিরে শুরু করতে হুঁশ হল বটে তবে বেশ কয়েক মুহূর্ত লাগল ঠোঁট নাড়া শুরু করতে। সত্যিই ভাল অভিনয় করলেন তিনি। এর আগে সুর-বালা কখনও এসব দেখেনি সে আরও বিহ্বল হয়ে পড়ল। সে গাইতে কি বারবার তার চোখে জল এসে পড়তে লাগল। পরবর্তীকালে ঐ নান্র মুখেই শুনেছিল যে পরমহংসদেব বলে এক মহাসাধক এই পালা দেখতে এসে সাক্ষাৎকারের চৈতন্য ভেবে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেছিলেন এঁকে।...

বই শেষ হ'তে বাড়ি যাবার জন্যে অপেক্ষা করছে—কে একজন এসে বলল, 'জি সি ডাকছেন তোমাকে, দেখা করে এসো।'

বুকটা একটু কেঁপেই উঠল। জি সি মানে তো সেই মানুষটি। এই বইতে অভিনয় করতে নেমে কী বেলেল্লাগিরিটাই না করলেন—কিন্তু সে তো অভিনয়। তাও যখন ভাল হলেন—তখন সেই

স্ব-রূপ। আসল মানুষটা যে বিষম রাশভারী আর তিনিই যে সর্বময় কর্তা, তা এই ক'দিনেই টের পেয়েছে ও। তবে কি ওর গান গাওয়া তাঁর ছন্দ হয়নি? ...বেশ একটু দুরু-দুরু বুকেই গিয়ে দাঁড়াল তাঁর সামনে।

জি সি একটা চেয়ারের হাতলে কনুই রেখে সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে বসে-ছিলেন—গালে হাত দিয়ে। আশপাশে আরও তিন-চারটি মেয়ে-পুরুষ। সুরবালা গিয়ে নমস্কার করে দাঁড়াতে অনেকক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললেন, 'বেশ গেয়েছ বাবা, খুব ভাল হয়েছে তোমার গান। সত্যিই তোমার শিক্ষা ভাল, বলিহারী দিই তোমার ওস্তাদকে। তবে শিক্ষাই সব নয়, তোমার ভেতরেও জিনিস আছে।...তুমি বাবা মিছেই এ-লাইনে এসেছ, এখানে তুমি থাকতে পারবে না। তবে ভেবো না—তোমার ওপর ঠাকুরের কৃপা আছে দেখতে পাচ্ছি। তাঁর কাছেই গিয়ে পৌঁছবে একদিন।'

কথাগুলো ভাল লাগল সুরবালার। ব্রাহ্মণত্বের অভিমানে গোড়াতে এসে হাত তুলে নমস্কার করেছিল শুধু—এবার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল।

আশার কথা যতই যা শুনুক—ঠাকুরের কৃপা কোথাও চোখে দেখতে পায় না সুরবালা। দিন সপ্তাহ মাস পার হয়ে যায়—অন্য কোন সুরাহা হয় না। ভাগ্য পরিবর্তনের কোন সম্ভাবনাই দেখতে পায় না। অথচ এ সংসর্গ এ কাজ একেবারেই ভাল লাগে না ওর। তাও, পেট ভরে পিঠে সইত—পেটেও খেতে পাচ্ছে না। মাইনে তো মাত্র ষোলটি টাকা, তাও একেবারে পাওয়া যায় না। মাস কাবার হয়ে যাবার বেশ কিছুদিন পরে শুনল এখানে তাগাদা না দিলে মাইনে পাওয়া যায় না। কদিন তাগাদা ক'রে পেল দশটি টাকা, বাকী ছ' টাকার চার টাকা আদায় হল পরের মাস পার হয়ে যাওয়ারও পরে। এরপর শুরু হল দু'টাকা তিন টাকা ক'রে খরচা দেওয়া। 'আজকের মতো এইতেই কাজ চালিয়ে নাও। দেখছ তো দেড়শ-দুশো টাকা বিক্রি—কাকে কি দেব বলো?' পর পর দু'তিন দিন তাগাদা করার পর সামান্য কিছু হাতে দিয়ে ক্যাশিয়ারবাবু প্রায় প্রত্যহই এই বাঁধা গৎটি ছাড়তেন। ফলে প্রতি মাসেই কিছু কিছু বকেয়া জমতে লাগল। শেষে হিসেবটাই গুলিয়ে গেল সুরোর—ঠিক কতটা যে পাওনা সে তার মনেই রইল না।

আরও মুশকিল হয়েছে এই—একথা কাউকে বলাও যায় না। নিস্তারিণী এমনিতেই ঠেস দিয়ে দিয়ে অনেক কথা শোনায়, ভাবে মেয়ে ইচ্ছে ক'রে সব টাকাটা দিচ্ছে না, অন্য কোথাও জমাচ্ছে। আবার আসল কথাটা ভেঙে বললে টিটকিরি দেবে। যাদের বলা চলত—সেই চারুবাবু কি শশী-বৌদির কাছে আর দুঃখের কান্না কাঁদতে সাহস হয় না। তাঁদের অবস্থা তো চোখেই দেখছে। ভদ্রলোকরা একবেলা খেয়ে মেয়ের বিয়ের দেনা শোধ করছেন বলতে গেলে। রাত্রে শুধু ছেলের জন্য সকালের ভাত দুটি জল দেওয়া থাকে—স্বামী-স্ত্রীর দুটি ভাত বাঁধা বরাদ্দ। জলে গুলে একটু নুন দিয়ে তাই খান হাসিমুখে। 'এতে যে শুধু চালডালের খরচা বাঁচে তাই নয়—উনুন ধরাতে হয় না, সে খরচ কি কম? রান্নার মেহনৎও নেই। আর পেটুকটাই কত!' চারুবাবু মিষ্টি ভালবাসেন, ঐ ছাতুই গুড় দিয়ে মেখে খেলে অনেক ভাল লাগত, সেটুকুও অকারণ খরচ করবার সাহস নেই আর।

ও'দের কাছে অবস্থাটা বললে এখনও হয়ত এটা-ওটা দিয়ে সাহায্য করতে আসবেন, হয়ত বা দু'একটা টাকাই দেবেন—কিন্তু সব জেনেশুনে হাত পেতে সে সাহায্য আর নিতে রাজী নয় সুরো। এমনিতেই তো সেই চল্লিশটা টাকা শোধ করতে পারছে না বলে মরমে মরে আছে। এ সময়ে চল্লিশ টাকা ও'দের চারশ টাকার কাজে দিত। কী ভাবছেন কে জানে! হয়ত ভাবছেন—চাকরি করছে রোজগার করছে তবুও এক পয়সা দেনা শোধ করছে না, মেয়েটা আসলে জোচ্চোর, দেবার মতলব নেই। সেইটে আরও লজ্জার ব্যাপার হয়ে আছে। অথচ আসল কারণটাও খুলে বলতে পারে না—ও'দের অধিকতর বিপন্ন করার বা নিজে অধিকতর লজ্জিত হওয়ার ভয়ে।

তাও, এত কাণ্ড ক'রেও যদি মেয়েটা সুখী হত—তাহলেও কিছু বলবার ছিল না। বিয়েটা নাকি আদৌ ভাল হয়নি শ্রীলেখার। বড়লোকের বাড়ি কিন্তু বৌদের না আছে খাবার সুখ না আছে শাড়ি-গয়না কিছু পরবার স্বাধীনতা। যে জড়োয়া গয়না পরিয়ে ওরা নিয়ে গিয়েছিলেন সে মোটে ঐ একটি সেটই—সব বৌয়ের সময়ই লোক দেখিয়ে পরিয়ে আনা হয়—যেন তাকে দেওয়া হল। আট দিন পরেই আবার তা গিন্নীর সিন্দুকে ফিরে যায়। সোনার গয়না অবশ্য এক প্রস্থ কেন বেশির ভাগ দু'তিন প্রস্থ করেও আছে—মানে মেয়ের বাপেরা যা দিয়েছেন তা ছাড়াও এ'রা দিয়েছেন পুরো এক সেট—যৌতুকে পাওয়া গয়নাও কম নয় কারুর—কিন্তু সে সবই থাকে শাশুড়ির জিম্মায়। কোন বিয়ে-থা ক্রিয়া-কর্ম উপলক্ষে অপর বাড়ি যেতে হ'লে তিনিই বার করে দেন—দামী শাড়ি বা গয়না কে কোন্‌টা পরবে বলে দেন, ফিরে এসে আবার প্রত্যেকটি বুঝিয়ে দিতে হয় তাঁকে। বারোমাস পরার জন্য সাধারণ তাঁতের শাড়ি নির্দিষ্ট আছে বছরে চারখানা কেউ আগে ছিঁড়ে ফেললে তাকে সেই ছেঁড়া কাপড় সেলাই ক'রে চালাতে হয়। যদি কোন দিন কোন এমন কুটুম সাক্ষাৎ কেউ আসেন যাকে অন্তঃপুরে নিয়ে আসতে হয়—ঝি এসে আগে জানায় যার ঘরে ঘরে—তখন চট করে কাপড় পাল্টে নিতে হয় সবাইকে। সেই বিশেষ প্রয়োজনে পরবার জন্য একখানা করে ভাল তাঁতের শাড়ী দেওয়া থাকে সব ঘরেই। মাঝে মাঝে শাশুড়িকে দেখিয়ে পাল্টা-পাল্টি ক'রে নেওয়া হয় অর্থাৎ এরটা যায় ওঘরে—ওরটা আসে এঘরে। পাছে কোন কুটুম্বিনী কোন দিন লক্ষ্য করেন কোন বৌ এক কাপড় পরেই বারবার তাঁর সামনে আসছে—তাই এই ব্যবস্থা। অবশ্য একটা ব্যাপারে শ্রীলেখার শাশুড়ি খুব উদার—এ ব্যবস্থা সব বৌদের জন্যেই। এ বাড়িতে মেয়ে পোষার রেওয়াজ আছে, তাই ছেলের বৌ ছাড়াও ভাগ্নে-বৌ নাৎবৌয়ের সংখ্যা কম নয়। কিন্তু কোন বৌকে কোন পক্ষপাত করেন এ অপবাদ তাঁকে কোন শত্রুও দিতে পারবে না।

এ সবেও তত দুঃখ ছিল না। এমন কিছু ভাল খাওয়া-পরায় অভ্যস্ত নয় শ্রীলেখা যে, তা না পেলে কষ্ট হবে। যা খাওয়া, সেটাও যদি পেটপুরে খেতে পেত—তাহলেও বেঁচে যেত। খাওয়া দেন শাশুড়ি মেপে, মাপের বাটি ঠিক করাই আছে—বৌদের পেটে চর্বি জমে যাবে বলে পেটভরে খেতে দেন না তিনি, যদিচ তাঁর নিজের দেহ বিশাল, সেই মাপে খোরাকও। আসলে তিনি বড়লোকের মেয়ে তাঁর বাবা নেই কিন্তু ভাইরা আজও মোটা মাসোহারা দেয়, সে টাকার অনেকখানিই এই সংসারে ব্যয় করতে হয় তাঁকে—স্বামী ও ছেলেরা তাই সর্বদা হাতজোড় ক'রে থাকে তাঁর ভয়ে—সবরকম দাপটই মুখ বুজে সহ্য করে। কেউ কোন অন্যায় হচ্ছে জানলেও প্রতিবাদ করতে পারে না।

শাশুড়িটি দজ্জাল শুধু নন, রীতিমতো বৌ-কাঁটকি। শুধু রসনা নয়—হাতও বেশ চলে তাঁর। বরং বলা উচিত হাত-পা। এর মধ্যেই, বিয়ের দু'মাস না যেতে যেতে—কোন্ নিমন্ত্রণ থেকে ফেরার সময় গাড়ির মধ্যে একটা মাকড়ি খুলে নেমে এসেছিল বলে—তাও নিজেদের গাড়ি এবং সে মাকড়ি পাওয়াও গিয়েছিল—নির্মমভাবে প্রহার ক'রে-ছিলেন। শাশুড়ি অবশ্য ইজ্জতের জ্ঞান তাঁর খুব, পাছে ঝি-চাকর কি অন্য সরিকরা কেউ জানতে পারে—এই জন্য যখনই কোন বৌকে শাসন করেন ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে দেন। মারেনও নাকি এমন কৌশলে মুখে বা হাতে অর্থাৎ যে অঙ্গগুলো অনাবৃত থাকে, কোন দাগ পড়ে না।

তবে ঝি-চাকরদের জানতে কিছুই বাকী থাকে না, বস্তুত শশী-বৌদি এক ঝিয়ের কাছ থেকেই এসব খবর সংগ্রহ করেছেন। মনিবের নিন্দা প্রচারে ওদের স্বাভাবিক তৃপ্তি, সেই কারণেই এ পাড়ায় কুটুম আছে দেখা করতে আসার অছিলায় খুঁজে খুঁজে এ'দের বাড়ি এসেছিল সে। তাকে 'বাপু বাছা' ক'রে—কুটুমের মতোই আসন পেতে বসিয়ে জলখাবার খাইয়ে একে একে সব খবর বার করেছেন। তারপর থেকে সে নিয়মিতই আসে এবং মনিবের খিটকেল ক'রে যায়। শ্রুতিসুখকর কিছু নয়—প্রত্যেকটি সংবাদই বুকের অনেকখানি ক'রে দলে পিষে দিয়ে যায়—তবু না শুনেও পারেন না শশী-বৌদি। দুঃসংবাদও সংবাদ। কিছু না পাওয়ার চেয়ে একটু পাওয়াও ভাল।

কারণ, সম্ভবত ঘরের কুচ্ছো বাইরে প্রচার হওয়ার ভয়েই বৌদের বাপের বাড়ি পাঠান না শ্রীলেখার শাশুড়ি। কদাচ কখনও,

বৌদের বাপ-মা খুব কাকুতি-মিনতি করলে কয়েক ঘণ্টার জন্যে পাঠান—তাও সঙ্গে ঝি দিয়ে। ঝিকে বলা থাকে, কোনক্রমেই যেন চোখ ছাড়া না করে বৌকে, বা শ্রুতিসীমার বাইরে না যেতে দেয়—'লাগাতে ভাঙ্গাতে না পারে।' বৌদেরও প্রায় শিক্ষা দেন ছড়া কাটিয়ে, 'আহাম্মক নম্বর চার, ঘরের কথা করে বার। এ ঘর এখন তোমাদের ঘর, আকাশের গায়ে থুথু ফেললে নিজের গায়েই এসে লাগবে—এখানে নিন্দেয় তোমাদের অপমান বই মান বাড়বে না।'

আরও বলেন, 'বড় ঘরের বৌদের বাপের বাড়ি যেতে নেই। সেকালে রামায়ণ মহাভারত কি রাজারাজড়াদের জীবনী পড়ে দ্যাখো—মেয়েরা সাত আট বছর বয়সের সময় বে হয়ে যে বাপের বাড়ি ছাড়ত—জীবনে আর ওমুখো হত না। যত দুঃখই পাক, বনে থাকত সেও ভি আচ্ছা তবু সুখভোগ করতে বাপের বাড়ি যেত না। এই তো পুটের রাণী—স্বামী নেই পুত্তুর নেই, মাথার ওপর কেউ নেই— সংসারে সর্বময়ী, শুনেছি বাপ মরছে শুনে যেতে চেয়েছিলেন, পালকী প্রস্তুত উঠতে যাবেন, বুড়ো দাওয়ান—দাওয়ানই হোক আর যা-ই হোক তাঁরই নফর বই তো নয়—কেউ নয়—এসে মাথা চুলকে বললে, আপনি মালিক যা খুশি করতে পারেন কিন্তু এ বংশের বৌদের বাপের বাড়ি যাওয়ার রেওয়াজ নেই। শোনা মাত্তর যাওয়া বন্ধ করলেন রাণী। এ তো মান্ধাতার আমলের কথা নয় বাছা, এ আমলেরই কথা!'

সবচেয়ে বেশী দুঃখ শশী-বৌদির জামাইটার জন্যেই। সেও যদি মানুষ হত বড় বড় বাড়ীতে যেমন চরিত্রদোষ প্রকট, ষোল বছর হতে না হতেই বাজারের দিকে হাত বাড়ায়—এর তা নেই। তেমনি কোন সদ্গুণও নেই। দিনরাত শুধু ঘুড়ি আর পায়রা ওড়াতেই ব্যস্ত। বলতে নেই, এর মধ্যেই শ্রীলেখা অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে, সে সম্বন্ধেও না আনন্দ না দুশ্চিন্তা, কোন সচেতনতাই নেই। নিজেই এখনও নিজেকে খোকা মনে করে। পান খেয়ে খেয়ে এই বয়সেই দাঁত কালো করে ফেলেছে—পেলে তামাকও খায়—আর সবচেয়ে বড় নেশা ঐ ঘুড়ি ও পায়রা। পয়সার জন্যে মায়ের হাতে পায়ে ধরে, মা গাল দিলে বা ধিক্কার দিলে হাসে শুধু হিহি করে। অথচ বড়লোকের বাড়ি বলেই যে এমন তাও তো নয়। ওর ওপরেই যে ভাই, সে এর মধ্যেই চোগা-চাপকান পরে কোন বিলিতি হৌসে বেরোচ্ছে, রীতিমতো রোজগার শুরু করেছে। জামাইয়ের পরের ভাইটাও রোজগার না করুক—কীই বা বয়স তার—কোন বদখেয়ালও নেই। সে একটি পয়সা খরচ করে না। হাতখরচের টাকা আর এদিক ওদিক থেকে যা পায়—জমিয়ে এর মধ্যেই নাকি কোন্ কোম্পানীর কী একখানা শেয়ার না কি কিনেছে—তাতে বছর সালিয়ানা বাঁধা আয় হয়। যতই কম হোক—আয় তো! ও ছেলে আরও জমাবে—এই তো সবে শুরু। এখনও আঠারো বছরও বয়স হয় নি বোধ হয়। শশীবৌদির কপালেই এই অপদার্থ অকর্মণ্যটি বর্সেছিল, আশ্চর্য!

অবশ্য এতেও তাঁর কোন নালিশ নেই। কাঁদেন কিন্তু অনুযোগ করেন না, অদৃষ্টকে ধিক্কার দেন না। সে দেয় বরং সুরবালাই। বলে, 'বৌদি, তোমরা তো এত ভাল—তোমাদের কী সুখটা হচ্ছে। তুমি যে কেবল উঠতে বসতে সৎপথে থাকার কথা বলো—সৎপথ থাকার কি এই পুরস্কার? ঐ তো থিয়েটারেও দেখি—দশ টাকা মাইনের এক-একটা সখী যে গয়না গায়ে দিয়ে আসে তার দামে এখনও কলকেতায় একখানা ছোটখাটো বাড়ি কেনা যায়। আর আমার দুর্দশা তো দেখতেই পাচ্ছ। বদনামকে বদনাম হ'ল, যা হবার—আর কি কোনদিন কোন ভদ্রলোক গেরস্তের বাড়ি ডেকে কথা কইবে ভাবো? অথচ বাড়িভাড়ার কটা টাকাও সব মাসে ঘরে তুলতে পারি না। তোমাদের এই দুঃসময়, অথচ তোমাদের পাওনা টাকা পড়ে রয়েছে আমার কাছে—মাসে একটা করে টাকা তাও দিতে পারছি না!'

শশী-বৌদি ওর মুখে হাত চাপা দেন, 'ও হরি! পুরস্কারের জন্যে সৎপথে থাকবি তুই! সৎপথে থাকলে যদি পুরস্কার মেলা অবধারিত হ'ত, তাহলে তো ভাবনাই ছিল না, সবাই সৎপথে থাকত রে! তাহলে সংসারে কেউই অসৎ পথে যেত না।... সৎপথে থাকার পুরস্কার আলাদা—সেটা আসে ভেতর থেকে। শান্তিই সেই পুরস্কার। অসৎপথে ঢের রোজগার হতে পারে—মনে সুখশান্তি থাকে কি?'

তারপর একটু থেমে বলেন, 'আর ঐ যে সখীদের কথা বলছিস—ওটা যে সবই অসৎ তা তোকে কে বললে? ওরা ওই ঘরে জন্মেছে—ওই ওদের বৃত্তি। অন্য কী কাজ করবে বল, স্বধর্মে নিধন হওয়াও শ্রেয়—শাস্তরে নাকি বলেছে—তা ও-ই তো ওদের স্বধর্ম—নয় কি? বাঘ যে অন্য প্রাণী ধরে খায়—মানুষ ধরে খায়—তার তাতে পাপ কি? ভগবান তার ঐ খোরাক নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন সে কি ঘাস খেতে পারে? বেশ্যা-বৃত্তিতে দোষ নেই—স্বর্গেও তো বেশ্যা আছে—তা নয়, ঐ মেয়েটা যদি একজনের কাছ থেকে টাকা খেয়ে অন্নদাতাকে লুকিয়ে আর একজনের সঙ্গে ঘর করে—সেইটেই হবে ওর পাপ। দ্রৌপদীর পতন হল পাঁচ জনের সঙ্গে ঘর করার জন্যে নয়—তাঁর সকলকে সমান চোখে দেখবার কথা, তা তিনি দেখতে পারেন নি, অর্জুনকেই বেশী ভাল-বাসতেন বলেই।'

মেয়ের কথা উঠলে বলেন, 'বিয়েটা কি জানিস সুরো একেবারে ভবিতব্য। তবু দেখলুম এই বয়সে, কতই দেখেশুনে দাও, যার যা অদেষ্টে আছে তা কেউ খণ্ডাতে পারে না। সীতা বল দ্রৌপদী বল, দময়ন্তী বল—কেউ কি তার অসৎ পাত্রে পড়েছিল? অদেষ্টের দোষে গ্রহের কোপে সবাইকেই বনবাসে গিয়ে অশেষ লাঞ্ছনা সইতে হ'ল। ও নিয়ে কাউকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। খুকীর শাশুড়ি বৌদের সঙ্গে ঐ ব্যাভারই শিখেছে কে জানে হয়ত ওরও ঐ রকম দজ্জাল শাশুড়ি ছিল। আমার মেয়েও এক-কালে শাশুড়ি হবে, তখন কি আর আজকের এই নিজের দুঃখুর কথা মনে করে তার বৌদের সঙ্গে ভাল ব্যাভার করবে? মনে তো হয় না। তখন সেও হয়ত এর শোধ তুলবে নিজের বৌদের ওপরে আজকের ঝাল মেটাবে।... না, দোষ আমি কাউকে দিই না, গেল জন্মে যা করে এসেছি এ জন্মে তারই দেনা শুধছি। বরং বলতে গেলে ঈশ্বরের দয়া, আরও খারাপ পাত্রে পড়েনি। আমাদের চেনা এক ঠাকুর বাড়ি-ঠাকুর—নিজের চেষ্টায় কর সাহেবের হাতে-পায়ে ধরে ডাক্তারি শিখে আগে বাংলায় পড়েছিল, তারপর রোজগার করতে শুরু করে মাস্টার রেখে ইংরিজী শিখে মোটা মোটা বই পড়ে ভাল ডাক্তার হয়েছে। সে মেয়ের বে দিলে রাজারাজড়ার মতো পঁচিশ হাজার টাকা খরচ করে মেয়ে-জামাইকে দুখানা গাড়ি, দুজোড়া ঘোড়া, একখানা পালকী গাড়ি আর একটি মেয়ের জন্যে কৌটো মতো—আরও কত কি দিয়েছে, কী না ছেলে লেখাপড়া জানে, বনেদী বাড়ির কেশয়ার। ওমা শেষ পর দেখা গেল জামাই ক অক্ষর গোমাংস একেবারে চাষী মুখ্যু, তায় মাতাল—চরিত্র-টরিত্র কিছু নেই। চালচুলো কিছুই নেই মামাত মহা জোচ্চোর সে-ই দালাল লাগিয়ে বড় ভাড়া বাড়ি নিজের বলে দেখিয়ে এই কাজ করেছে সব বেচে খাবে বলে। সেই মেয়েকে নিয়ে বুকের ওপর বসিয়ে খাওয়াতে হয়েছে দুবেলা চোখের জলে ভাত মেখে খেতে হচ্ছে মেয়ের মাকে। খুকীর বর আর কিছু না হোক, মাতাল, গেঁজেল কি বাড়-খোর তো নয়। যা করে বাড়িতে বসেই করে—এইটুকুই লাভ।'

(ক্রমশঃ)



দিগন্তে নতুন সমস্যা

সবকিছু নিয়েই সোরগোলের সৃষ্টি এযুগের বৈশিষ্ট্য—হুল্লোড় পাকিয়ে তুলতে না পারলে কোন কিছুতে সোয়াস্তি পাওয়া যায় না। চারদিকে প্রচণ্ড ঢক্কানিনাদ শুনে আমাদেরও অভ্যেস হয়ে গেছে সব কিছুকে গুরুত্ব না দেওয়া—একটা তাচ্ছিল্যপূর্ণ ভঙ্গিতে 'ওসব বাজে ঝামেল' বলে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার কায়দাটা সবাই বেশ আয়ত্ত করে নিয়েছি। এর ফলে ভুলের মাশুল অনেক সময়ই গুণতে হয়—কিন্তু বিস্তৃত পরিবেশে কোন কিছুই অবহেলার মধ্যে নিঃশেষ হয়ে যায় না। সবকিছুই ভুলের মাশুল চুকিয়ে নিজের পাওনা কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করে নেয়। এটাই রীতি এবং দস্তুর নীতি। এর ব্যতিক্রম সম্ভব নয়। একে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। ইতিহাস তোলপাড় না করেও এরকম নজীর মিলবে ভুরিভুরি—তোলপাড় করলে তো আর কথা নেই। তাই একটু বিরাট দিক ভেবে দেখা ভাল, দু'দণ্ড ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে নেওয়া উচিত। কারণ কে থাকার জল 'কোথায় দাঁড়াবে তা একমাত্র দৈবজ্ঞ ব্যতিরেকে অন্য কারো পক্ষে বলা অসম্ভব। অবশ্যই যদি দৈবজ্ঞের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হতে পারি। কিন্তু যুগবিশেষে ধারণ বদলায়—চিন্তাস্রোত নতুন খাতে প্রবাহিত হয়। এ কথাটি মনে রেখে আমাদের খুব সতর্ক থাকা উচিত—প্রতি পদক্ষেপের বক্তব্য এবং তার পরবর্তী প্রতিক্রিয়া সঙ্গে সঙ্গে অনুমান করে নিতে হবে। তাহলেই অনিশ্চিতের ওপর নির্ভর করতে হবে না—সমাধানের জন্য অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াতে হবে না। সকল সমাধানের সূত্র থাকবে আমাদেরই ক্ষমতার আয়ত্তে।

মেয়েরা চাকরী করছে একথা আজ আর নতুন কিছু নয়—বহুদিন ধরেই এ নিয়ে দেশে দেশে কত না তোলপাড়। বাচ্চা ছেলেকে অনির্দিষ্ট ভবিতব্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে মা চলেছেন চাকরী করতে। এর পেছনে হয়তো সঙ্গত কারণ আছে। কারো মতে একের আয়ে সংসার চলে না তাই এই ব্যবস্থা। আবার কেউ হয়তো সংসারে আরো স্বচ্ছলতার জন্য চাকরী করতে গেছেন। চাকরীজীবী মহিলাদের পক্ষে যথেষ্ট কারণ রয়েছে। আত্মপক্ষ সমর্থনের মত যুক্তি তাঁদের যে আছে সে কথা বলা-বাহুল্য মাত্র। কিন্তু এরই মধ্যে বাড়ীতে শিশু হয়তো তারস্বরে কান্না জুড়েছে, 'ফিরিয়ে দাও আমার মাকে'। সংসারের প্রয়োজন তার বুদ্ধির অগম্য। তাই প্রয়োজনের বৃহৎ তালিকার দিকে তাকিয়ে একে শিশুচিত্তের ভালবিলাস ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। অনেকেই ভুরু উঁচু করে বলবেন, এ নেহাতই ছেলেমানুষী আবদার। আবদার যে ছেলেমানুষের সত্যি কথা কিন্তু ছেলেমানুষী কিনা বিচার করে বলা বড় কঠিন। সংসারে মায়ের অবস্থান যে নিতান্ত প্রয়োজনীয় তা সর্বজনসম্মত। মায়ের দায়িত্ব সংসারের প্রতি এবং সঙ্গে সঙ্গে শিশুর প্রতি। কারণ দেশ ও জাতির তিনি পরোক্ষ নিয়ামক। সন্তান যদি মায়ের সংস্পর্শে না থাকে তবে সে নিজেকে উপযুক্তভাবে গড়ে তুলতে অক্ষম। আর অক্ষমতাকে কেন্দ্র করে বাসা বাঁধে যত সব অনাচার এবং অনাসৃষ্টি। আজকের অনেক ছেলের দিকে তাকিয়ে একথার সারবত্তা উপলব্ধি করা যায়। সন্তানের প্রতি সুগভীর দায়িত্ববোধ থেকেই সংসারে নিরন্তর মায়ের উপস্থিতি প্রয়োজন। অবশ্য সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনে এবং অর্থ-নৈতিক সমস্যার চাপে বিব্রত হয়ে অনেককেই আজ এই পথ বেছে নিতে হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশের কথা বলতে গিয়ে বলা যায় যে, অনেক চাকরীজীবী নারীর অন্তরেই একটি সংসারলোলুপ মন বাসা বেঁধে আছে। দোটানায় পড়ে সেই মন একান্তভাবে ক্ষতবিক্ষত। দু-দিকে সামাল দেওয়া তার পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব হচ্ছে না। তাই একদিকে নজর দিতে গিয়ে আর একদিক ভেসে যাচ্ছে। তার অসহায়তার বলি হচ্ছে শিশু এবং সংসার। এমন কি যে পশ্চিম দেশে মেয়েদের চাকরী ছিল জীবনের অন্যতম অঙ্গ এবং এক্ষেত্রে তাদের প্রভাবও আমাদের জীবনে কম নয়। সেই দেশের মেয়েরাও যেন আজ চাকরী থেকে পিছু হঠে আসছে। বিয়ের পর ঘর-সংসার আর ছেলেপুলে নিয়েই তারা বেশী মেতে উঠছে। একে মেতে ওঠা না বলে স্বাভাবিক কর্তব্য করছে বলাটাই অধিকতর সঙ্গত। বিয়ের আগে পর্যন্ত চাকরীতে তাদের কোন আপত্তি নেই কিন্তু বিয়ের পর আর চাকরী নয়। এমনও দেখা গেছে বিয়ের দীর্ঘদিন পর কোন কোন মেয়ে আবার চাকরীতে ফিরে আসছে। এটা অবশ্য সে দেশের তরুণীদের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। আমাদের সমস্যাটা অবশ্য অন্য ধরনের। আমাদের মতো ওঁদের এরকম অর্থ-নৈতিক চাপে বিব্রত হতে হয় না। তাই এরকম সিদ্ধান্তে আসা ওঁদের পক্ষে সহজ কিন্তু আমাদের পক্ষে এরকম সিদ্ধান্তে আসতে হলে হাজারো সমস্যার জবাবদিহি করতে হবে এবং শেষ পর্যন্ত কোন সমস্যারই সু-সমাধান হবে না। তাই বাধ্য হয়ে দু'নৌকার হাল ধরে থাকতে হবে। সে কেউ পারুক আর না-ই পারুক। কারণ প্রয়োজন তার প্রাপ্য ষোল আনা বুঝে নিতে কসুর করবে না। এই নাজেহাল অবস্থায় আমাদের বুকের পাঁজর হাঁপরের মত ওঠানামা করছে—সুস্থতার পথনির্দেশ পাচ্ছে না। কেউ কারো দাবী থেকে এক চুল নড়তে রাজী নয়। এরকম যদি অবস্থা চলে তো সমাজের নাভিশ্বাস উঠতে বাধ্য এবং তার পাল্লায় পড়ে অনেককেই গুঁড়িয়ে যেতে হবে। তাই এদিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন অচিরে যাতে সন্তান ফিরে পায় তার মাকে আর নারী-হৃদয় মুক্তি পায় তার চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা সংসারকে ঘিরে। তাহলেই শান্তি। নাহলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফলতে বাধ্য। সেদিনের ভয়াবহ পরিণতির মুখোমুখি যাতে আমাদের দাঁড়াতে না হয়, সে জন্য দেশে দেশে অনেক প্রস্তুতি চলছে। পশ্চিমের কয়েকটি দেশে কর্মক্ষেত্রে নারীর উপস্থিতি প্রয়োজন তার জনসংখ্যার স্বল্পতার জন্য না উন্নয়ন কর্মসূচীর বিশালতার জন্য। তারা কর্মী নারীদের সন্তানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছেন বেবী ক্রেশ এবং স্কুল ও হাসপাতালের মাধ্যমে। তাই তাদের দিকটা অনেক নিরাপদ। কিন্তু আমাদের মত গঠন-মূলক দেশে এখনও এতটা করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। হয়তো এসব গড়ে উঠবে কিন্তু সন্তান কি তবু মাকে একবারও নিজের কাছে ফিরে পেতে চাইবে না?

আমাদের দেশের নারীসমাজ স্বাভাবিক-ভাবেই গৃহমুখীন। তাই গৃহের প্রতি তাদের আকর্ষণ মন্তব্যের অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু এঁদের বাদ দিয়েও দেখা যায় যে, বিশ্বের মেয়েরা চাকরী জীবন সম্পর্কে স্পষ্ট দুটো শিবিরে ভাগ হয়ে গিয়েছে। এরই পরি-প্রেক্ষিতে নতুন একটা দাবী ক্রমেই সোচ্চার হয়ে উঠছে। যদিও এই দাবীর পেছনে আমাদের দেশের মেয়েদের কণ্ঠস্বর এখনও যুক্ত হয়নি। দাবীটা উঠেছে মুখ্যতঃ গ্রেট-ব্রিটেন, ডেনমার্ক, হল্যান্ড, আইসল্যান্ড, জাপান, অস্ট্রিয়া, স্পেন, তুরস্ক, বেলজিয়াম এবং পশ্চিম জার্মানীর মহিলাদের তরফ থেকে। এঁদের উদ্যোগে দাবীপত্র রচিত হয়েছে এবং সেই দাবীপত্রে বলা হয়েছে, সাংসারিক কাজকর্মে ব্যাপৃত নারীকে চাকুরীরত মহিলার সম্মান দিতে হবে এবং সেইভাবে এদের মাইনেও ধার্য করতে হবে। এজন্য এইসব দেশের মহিলাদের তরফ থেকে দীর্ঘদিন আন্দোলন চলছে, যদিও এ পর্যন্ত এর কোন সমাধানসূত্র পাওয়া যায়নি, কিন্তু তা বলে ওঁদের সংগ্রাম থেমে থাকেনি। কিছুদিন আগে অনুষ্ঠিত হয়েছে এতৎ-সংক্রান্ত মহিলা সম্মেলন। উপরোক্ত দেশের

অধিকাংশ প্রতিনিধি আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এবং নিজেদের দাবীর পক্ষে বক্তব্য রাখেন। সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বার্লিন শহরে। এই উপলক্ষে জার্মান হাউসওয়াইভস ফেডারেশন একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করে। কর্মী মেয়েদের নানাবিধ সমস্যার কথা আলোচনায় প্রাধান্য পায়। সেই সংগে সম্মেলনে এই বক্তব্যও রাখা হয় যে, জীবিকা-ধারী মহিলা এবং হাউসওয়াইফ কি একই পর্যায়ভুক্ত? এর কোন সন্তোষজনক জবাব অবশ্য পাওয়া যায়নি, তবে আগামী দিনে যে এ নিয়ে নতুন বিতর্কের সূচনা হবে তার বীজ নিহিত রইলো এই সম্মেলনের উক্ত বক্তব্যের মধ্যে।

ইতিমধ্যে দ্রুত পট পরিবর্তন হয়ে চলেছে। চাকরী এবং জীবিকার প্রতি বিদ্বেষ থাকলেও মেয়েরা ক্রমেই আরো অধিক সংখ্যায় এ সম্বন্ধে আগ্রহী হয়ে উঠছে এবং কর্মক্ষেত্রে নিজেদের সুযোগ সুবিধা আদায়ের জন্য উঠে-পড়ে লেগেছে। এটা স্বাস্থ্যের লক্ষণ। এর পেছনে রয়েছে ব্যক্তিত্বের তাড়না। সবাই স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করতে চায়। একে তো স্বাগত জানাতেই হবে। কারণ দীর্ঘ সংগ্রামের অক্লান্ত পদক্ষেপে আমরা অর্জন করেছি এই যোগ্যতা—সেখান থেকে পেছিয়ে যাবার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। অথচ আর একটা আন্দোলন দানা বাঁধছে। ঝড় উঠবে কি না পরিপূর্ণ প্রশান্তিতে এই সমস্যা উত্তীর্ণ হতে পারবো আমরা?

জীবন-সংগ্রামে নারী

রুক্ষ—দারুণ দাবদায়িত এ' ধরণীতল, যেন ওই শরীরটকে গ্রাস করে। যে শরীরে মাংসের প্রলেপ নেই, হাড়ের খাঁচায় শুধু একটা ধুক ধুক করা প্রাণ হাপরের নিঃশ্বাসের মত ওঠানামা করে, যখন তখন বোঝা দায়—এমন শরীরে—আজও একটা প্রাণের কণা পড়ে আছে।

শুধু এইটুকু আছে বলেই না এত জ্বলা! এত অন্ধকার চারপাশে। চোখেও তেমন ঠাহর হয় না। দৃষ্টি কেমন ঝাপসা. কিছুদিন আগেও পিদমের আলোয় রামায়ণ, গীতা, চন্ডীর কালো অক্ষরগুলো কালো জীবন্ত পোকার মত কিলবিল করতো। চোখে চশমা না লাগিয়ে পড়ে ফেলা যেত।

আর এখন? সত্যিই কি আজ অশীর জরাজীর্ণতা এসে খেয়ে নিয়েছে এই শরীরটাকে—চোখ দুটোকে? এত অন্ধকার কি এর আগে চোখে পড়েছে?

আজ ভবতারিণীর কাছে সেটাই যেন বিরাট বিস্ময়। অশীতিপর বৃদ্ধা ভবতারিণী দেবী আজও অবাক হয়ে ভাবেন এমন শরীরে, এমন মনে কত না যন্ত্রণার সমারোহ চলেছে। মাঝে মাঝে মনে হয়, আর কেন ঈশ্বরের ছলনা! জপের মালা নিয়ে একটু বসে হরিনাম করবার সুযোগ দিল না।

তবু এই হরিনামহীন পাতকী শরীর-টাকে শুধু খাবার জন্যে বাঁচিয়ে রাখলো—এই ক্ষুধার পৃথিবীতে। পরিজনহীন এই জগৎ-টায় যেন এক অনাহূত অতিথির মত দিন-যাপনের ইতিহাস রয়েছে এখন ভবতারিণীর জীবনে।

আর এ জীবনে অনেক ইতিহাস—অনেক দুঃখের কথা নিয়ে তার শেষ পৃষ্ঠাটা ভরিয়েছে। ছোটবেলায় বিয়ে হয়েছিল। সাত কি আট বছরে। যমের মত স্বামীটা অনেক কষ্ট দিয়ে শেষে স্বর্গযাত্রা করলো। ভবতারিণীর বয়স তখন আঠারো-উনিশ। তার মধ্যেই এসেছিল চারটি সন্তান। কিন্তু পর পর গেল তিনটি মারা, শেষ একটি, যেন এ জীবনের শেষ নিঃশ্বাসের মত ওই একটি সন্তান আজও বেঁচে। অনেক কষ্ট করেই তাকে মানুষ করে বড় করে তুলেছিলেন। বিষয় আশয় বলতে বেশ কিছু জমিজমা ছিল। কিন্তু বিধবা অসহায় ভবতারিণীকে একলা পেয়ে অনেকেই ঠকিয়ে নেয় সেসব।

শুধু ছিল একখানি মাটির ঘর। তার ওপারে একফালি আকাশ। তার নীচে রুক্ষ অকরুণ এই ধরণীতল। শুধু ভবতারিণীর অনেক চোখের জলে তা মাঝে মাঝে শীতল হয়ে উঠতো। আর তখনই বার বার মনে হতো ঐ দিনগুলো কবে কাটবে। কোলের ছেলেটা কবে বড় হয়ে উঠবে।

বড় হবার দিনটা যেন তাড়াতাড়িই এলো। ছেলেটা বড় হলো। মানুষ হলো বলে মনে হলো। কাজকর্ম শিখে মোটা টাকাই উপায় করে। তখনো অবশ্য যোগীনের বিয়ে হয় নি। পাতা হয়নি তার নিজের সংসার। শুধুমাত্র মা-ছেলের সংসার। দুঃখেও দিন যেত। সুখেও দিন যেত।

তার মধ্যেই যোগীনের বিয়ে হোল। ভব-তারিণী নিজেই সাধ করে বিয়ে দিয়েছিলেন। কতদিন ধরে যেন বিধবার সংসারটা বড় খালি হয়ে ছিল। ভাল লাগত না বলেই যোগীনের বিয়ে দেওয়া। তারপর ওদের সংসার, ওদের ছেলেপুলে, ভরা জীবনে সত্যিই এক অনাহূত অতিথির মত অবাঞ্ছিত হয়ে গেলেন ভবতারিণী।

যোগীনের আয় কমলো। ব্যয় বাড়লো। শেষে ছেলেটা কেমন যেন হয়ে গেল। বলে, এই বাজারে মাকে সে খেতে দিতে পারবে না। খেটে খেতে হবে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে। শুনে আশ্চর্য হলেন একটু।

কিন্তু এমন দশা যেন আর কখনো দেখেন নি। দারিদ্র্য তো তাঁর সারা জীবনের সংগী। সারা দেশে এর আগেও এসেছে—মন্বন্তরের অনেক ছবি। কিন্তু আজকের মত নয়। অভাবের চেহারাটা আজ বড় করুণ, বড় হৃদয়হীন। ছেলে আজ বৃদ্ধ মা-বাবাকে খেতে দিতে চায় না।

কিন্তু ভবতারিণীর মনে হয়—আজকের দারিদ্র্য শুধু জঠরের নয়। দারিদ্র্য এসেছে অনেক কিছুতেই। আমাদের মনুষ্যত্বেই আমাদের ধর্মে, আমাদের বিবেকে।

আর তারই খতিয়ানটুকু বোঝার মত নিয়ে পথে পথে ফিরছেন ভবতারিণী সমা-জ্জার। তবু বলেন, দোষ কারো নয়। যে ছেলে

টুকরো খবর

ভগিনী নিবেদিতা জন্মশতবর্ষপূর্তি উৎসবের দ্বিতীয় পর্যায়ের সমাপ্তিতে গত ২ জানুয়ারী রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের ব্যবস্থাপনায় একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা উত্তর কলকাতার বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে। সন্ন্যাসিনী-শিক্ষাব্রতী, অন্যান্য সমাজসেবী এবং মিশনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ছাত্রী ও শিক্ষিকগণ সহ প্রায় দুহাজার নরনারীর এই মিছিলটি সি-আই-টি রোডের গিরিশ ভবন থেকে যাত্রা শুরু করে। বেদমন্ত্র উচ্চারণ ও শঙ্খধ্বনির মধ্যে দিয়ে শোভাযাত্রা যখন চলতে শুরু করে তখন রাজপথে ও গৃহশীর্ষে অগণিত নরনারী নিবেদিতার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং শোভা-যাত্রীদের অভিনন্দন জানান।

বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমার পর মিছিলটি সিমলা স্ট্রীটে এসে স্বামিজীর জন্মভিটা প্রদক্ষিণ করে এবং পুনরায় যাত্রা করে বাগ-বাজার নিবেদিতা লেনে সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুলে এসে সমাপ্ত হয়। শোভা-যাত্রার নেতৃত্ব করেন প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা, প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা, প্রব্রাজিকা বেদপ্রাণা প্রমুখ নেতৃস্থানীয় সন্ন্যাসিনীগণ, ডক্টর রমা চৌধুরী ও মনীষা রায় প্রমুখ প্রবীণ শিক্ষাব্রতী এবং রামকৃষ্ণ সারদা মিশন সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুলের পরি-চালকমণ্ডলীর সদস্যাবৃন্দ।

কলকাতা ছাড়াও বাইরের নানা স্থানের শিক্ষিকা, ছাত্রী ও কর্মিগণ এবং কিছু বিদেশী-সহ বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিরাও শোভাযাত্রায় যোগদান করেন।

* * *

ইংরাজী সাহিত্যে এম-এ ক্লাশের ছাত্রী শ্রীমতী চিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ বৃত্তি পেয়ে উচ্চতর শিক্ষার উদ্দেশ্যে কেম্ব্রিজের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছেন। বাঙালী মেয়েদের মধ্যে তিনি সর্বপ্রথম এই বৃত্তি পেলেন। শ্রীমতী চিত্রা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় হিউম্যানিটিজ-এ চতুর্থ স্থান অধিকার করেন এবং ইংরাজীতে লেটার পান। বি-এ'তে তিনি প্রথম শ্রেণীর অনার্স পান।

* * *

যকৃৎ সংযোজনের রোগী জুলি রড-বিগল সম্প্রতি দ্বিতীয় জন্মদিন পালন করেছে। যকৃৎ সংযোজনের অস্ত্রোপচারের পর পাঁচ মাস বেঁচে থেকে জুলি তার মতো দুরারোগ্য যকৃতের সহজাত ব্যাধিযুক্ত আরো শিশুর বেঁচে থাকার সম্ভাবনা উজ্জ্বল করে তুলেছে।

কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্ববিদ্যা-লয় চিকিৎসা কেন্দ্রে জুলির আত্মীয়বন্ধুদের ছোট একটি দল তার জন্মদিন উপলক্ষে সমবেত হয়ে কেক ও মোমবাতিসহ তাকে অভিনন্দন জানান।

মাকে খেতে দিতে চায়না অভাবের তাড়নায় তারও দোষ নেই। দোষ এই—এই সমাজের এই দেশের।

দোষের পুরো ভাগীদারই যেন তিনি একা। তা জন্ম পোড়া এই ভাগ্যের দোষ। আর এই দোষেই আজও তিনি শুধু এই পোড়া পেটখানাকে ভরবার জন্যে হাওড়া থেকে কলকাতায় আসেন শুধুমাত্র একটি লাঠির ভরে।

কাঁধে থাকে একটি ঝোলা। তার মধ্যে থাকে নিজের হাতে তৈরী করা কিছু পৈতের বাণ্ডিল। এই শহরের পথে পথে বামুনের বাড়ী খুঁজতে গিয়ে কোনদিনের সকালটা থেকে সন্ধেটা ফুরিয়ে যায়। কোনদিন কিছু পৈতে বিক্রি করে মেলে পয়সা। না মিললে উপবাসে যায় দিন।

তবু জীবনসংগ্রামে এই অসমর্থ আশীর বৃদ্ধাও হার মানেননি।

তবু, কথা বলতে বলতে ভবতারিণীর চোখ দিয়ে জল পড়ে। ছেঁড়া-ধুলোভরা আঁচলের মধ্যে মুখ লুকিয়ে অনেক সময় ছেলেমানুষের মতও কাঁদতে দেখি। মাঝে মাঝে আবার কাশিতে বুক ফেটে যায়। আশীর জরাজীর্ণতা সারা বুকের কোথায় যেন ক্ষত বিক্ষত করেছে। আর ক্ষুধা রোগ শোক বিবর্ণতার একটি অন্ধকার সমাচ্ছন্ন সন্ধ্যা—এ জীবনের চলার পথে প্রান্তরে ছড়িয়ে থাকে। মাঝে মাঝে রাস্তা ঠাহর করতে পেরে অনেক সময় ভুল পথে চলে যান। অন্য ঠিকানায়। আবার চেনা জায়গা খুঁজে নিতে বেশ কষ্ট হয়। শুধু পথ হাঁটা, পথ হাঁটা। এ পথের যেন শেষ নেই।

ম্লান হেসে সব শেষে বললেন ভবতারিণী, জীবন-যন্ত্রণার এক আশ্চর্য তীর্থপথে যেন আমি চলেছি...। কিন্তু আর কত দূরে? কতদূরে আমার দয়ালনিধির ঠিকানাটি খুঁজে পাব? শুধু সেইটুকুর জন্য মা আমার সকল অপেক্ষা।

আমার মুখে ম্লান হাসি। চোখের কোলে দুফোঁটা জল। তার মধ্যেই দেখতে পেলাম—এক অন্তহীন পথের নিশানা। বললাম—সব কিছুরই একটা ফল আছে জানবেন। এই নিদারুণ জীবনসংগ্রামে আপনার এই মরণজয়ী যুদ্ধ নিশ্চয়ই আপনাকে দেবে সেই পথের নিশানা। আপনার দয়াল হরির ঠিকানা। — জয়শ্রী চক্রবর্তী

প্রবচনকারের চোখে প্রসাধন-প্রীতি

মানুষের মনে সুন্দরের অনুভূতি থেকেই প্রসাধনের সূত্রপাত। সুন্দর দেখা ও অন্যকে সেই সৌন্দর্য দেখানোর একটি অদম্য প্রবৃত্তিই প্রসাধনের সাধন বেগকে শক্তিশালী করেছে। এ ছাড়া সমকালের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা এবং নিজের মনের সৌন্দর্যের বিশেষ আদর্শটির বহিঃরূপায়ণও অনেক সময় প্রসাধনের ইচ্ছাকে বলবতী করে। রূপগত দৈন্য ঢাকতে এবং খোদার ওপর খোদকারি করার জন্যেই প্রসাধন এবং এটি নিপুণভাবে করাই আর্ট। নিজেকে সুন্দর-করে তোলার জন্য অল্পস্বল্প প্রসাধন কখনোই দোষের নয়। কিন্তু অত্যধিক আত্মমুখীনতা এবং বিলাসদ্রব্যের সুলভতার জন্য অনেক ক্ষেত্রেই প্রসাধনের মাত্রাতিরিক্ততা দেখা যায়। প্রসাধনের মধ্যে কিছু ভেজাল থাকবেই, কিন্তু তা যখন আসল রূপকেও অতিক্রম করে এবং সর্বস্বতায় পরিণত হয় তখনই তা দৃষ্টিকটু হয় এবং আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মেয়েদের এই প্রসাধন-পরিপাট্য মেয়েদেরই বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে।

মেয়েদের এই প্রসাধন-প্রীতি যেমন চিরকালের, এর উৎকট দিকটাও তেমনি চিরকালের। এবং এখনকার মত তা প্রাক-আধুনিককালেও সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। আমাদের দেশীয় অন্তঃপুরিক সংস্কৃতিতে 'শাঁখা, শাড়ী, কেশ, তিন নারীর বেশ' বলে কল্যাণী নারীর সহজ সুন্দর রূপের প্রতি অনুরাগ জানানো হয়েছে। শাঁখা, সিঁদুর, আলতা, টিপ কাজল প্রসাধনের এই গুলিই ছিল চিরকালের মূল উপকরণ, যেখানেই এগুলো ছাড়িয়ে মেয়েরা বাহুল্য ও নকলের দিকে অধিক মনোযোগী হয়েছেন, সেখানেই তাঁরা সমালোচিত হয়েছেন। এর একমাত্র কারণ অন্তঃপুরের কর্তব্য ও দায়িত্বের বিচ্যুতি এবং সমালোচকরা প্রসাধনসর্বস্বদের রূপগত অসম্পূর্ণতাটুকু বিশ্লেষণ করে বিতৃষ্ণা প্রকাশ করেছেন। সুন্দর চুল মেয়েদের অন্যতম স্পৃহনীয় বস্তু সন্দেহ নেই,—সেইজন্য চুলে ভেজাল একালেই নয়, প্রাগা-ধুনিক কালেও ব্যবহৃত হয়েছে এবং সমালোচিতও হয়েছে। যেমন—'চুল নেই মাগী চুলের ফাঁদে, কচুপাতার টিপসা দিয়ে ডাগর খোঁপা বাঁধে' কিংবা 'আলগা চুলে খোঁপা বাঁধা। আজকাল তো এই খোঁপা বাঁধার জন্যে নকল খোঁপা, পরচুলা কত কি ব্যবহৃত হচ্ছে। উপরের প্রবাদগুলি বর্তমানের নকল-নবীশী মনোভাবের প্রতিও সমভাবেই প্রযোজ্য। অত্যধিক বিলাসী মনোভাব অনেক সময় প্রয়োজনীয় সাংসারিক জিনিষ-পত্রের ক্রয়সীমা কমিয়ে বিলাস সামগ্রী কেনায় প্ররোচিত করে। এর ফলে পারিবারিক দায়িত্ব লঙ্ঘিত হয়ে থাকে, এই মনোভাবও কয়েকটি ব্যঙ্গাত্মক প্রবাদে সমালোচিত হয়েছে "ঘরে সওদা যেমন তেমন চাই খোঁপা বাঁধা দড়ি।" এবং এই সজ্জাবিলাস পরে অধিক অবনতির পথে নেমেছে। কিন্তু তখন লজ্জার প্রয়োজন হয়েছে এই অবনতি গোপনের জন্য। এই অসঙ্গতিতে কয়েকটি বিরূপ প্রবাদের সূত্রপাত হয়েছে যেমন, 'পেটে ভাত নেই, ঠোঁটে আলতা' বা 'উপরে কোঁচার পত্তন ভিতরে ছুঁচোর কেত্তন' কিংবা 'উপরে চিকণ চাকণ ভিতরে খ্যাড়।'

কোনো এক সময়ে পাউডার মাখা জুতো পায়ে দেওয়া বিলাসিতার নমুনা ছিল, অনেক ক্ষেত্রে এ নিয়ে ব্যঙ্গ করা হয়েছে, যেমন 'মরতে চলেছে বুড়ি ছাড়ে না শাঁখের গুঁড়ি' বা 'মাগীরা দেয় জুতো পায়, ভাত ব্যঞ্জন পুড়ে যায়।' বা 'মেজে ঘষে হলো ক্ষয়, তবু কালো ধলো নয়।' এগুলি এখন আর প্রসাধন বস্তু নয়, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যে পরিণত করা হয়েছে। তবু প্রসাধনের বাড়াবাড়ির উপর বিতৃষ্ণা বোঝানোর জন্যেই এগুলির উল্লেখ করা হলো।

অনেক ক্ষেত্রেই প্রসাধিতার গৃহকর্মে নৈপুণ্যহীনতা ও অমনোযোগের নিদর্শন পাওয়া যায়। এতে সাংসারিক কর্তব্যের ত্রুটি ঘটে। সেইজন্যে একটি প্রবাদে মন্তব্য করা হয়েছে। 'পান সাজতে জানে না দুপয়ে আলতা', এবং 'শাঁখে সেই মন সাজের বড় গুণ'। অন্য একটি প্রবাদে এই জাতীয় মেয়েদের মনোভাব সুন্দরভাবে ফোটানো হয়েছে। প্রসাধনসর্বস্বা মেয়েরা অতিমাত্রায় আত্মকেন্দ্রিক এবং কর্তব্য ও ভবিষ্যৎদর্শিনী হয়ে থাকেন। লোকে তাঁদের ভাবুনী বলে থাকে। এই প্রবাদে বলা হয়েছে—'ভাবুনী লো ভাবুনী, তোর ঘর পুড়ে যায়, যখন মেঘের পাড়ে, মোর ভাবুন বয়ে যায়।'

এই জাতীয় বিলাসে কিছু কিছু পুরুষের সমর্থন অবশ্যই ছিল। তাঁরাও প্রবাদের বক্রোক্তি থেকে বাদ পড়েন নি—'খাটো মাটো জুতো পায়, দেখ লো দিদি কেবা যায়, ভাব বঙ্গীর ভাতার যায়।'

বলাবাহুল্য এই শ্রেণীর নারী পুরুষ সমাজের ধিক্কার পাত্র হয়েছে সর্বদাই।

বাঙালী মন রূপকে অস্বীকার করে নি, কিন্তু তার চিরকালের অগ্রাহ্য গুণের প্রতি, রূপ নিয়ে কি ধুয়ে খাবে, চুল নিয়ে পোতে দেবে, গুণ থাকে তো তরে যাবে। কারণ সবাই জানে 'মেজে ঘষে রূপ, দুদিন পরেই চুপ' —কিন্তু গুণের ক্ষেত্রে তা তো নয়ই বরং অন্তর্নিহিত গুণাবলী অভিজ্ঞতা ও ব্যবহারের ফলে আরো বর্ধিত হয়।

এদেশের মত বিদেশেও এই প্রসাধন-সর্বস্বতা সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। ফ্রান্স, ইংলণ্ড বা আমেরিকার মত ফ্যাসান-সর্বস্ব দেশও এই মনোভাবের নিন্দা করেছে। সৌন্দর্যের প্রশংসা সব দেশেই সমান, যেমন ফরাসী প্রবাদে আছে, 'রূপের মেয়ে না সাজলেও চলে', বা ইটালীয়ান প্রবাদে 'আকাশের রূপ তারা-ফুল, নারীর রূপ মাথার চুল।' কিন্তু ফরাসী প্রবাদেই আবার সজ্জাবিলাসিনীর অন্তঃসারশূন্যতার কথাও বলা হয়েছে, 'বুদ্দির ঢেঁকি ষাঁড়ের গোবর, সে মেয়ের শুধুই সাজের বহর।'

—আরাধনা গোস্বামী

ফাদার ঘনশ্যামের রোমাঞ্চ

কাহিনী (২)

লাল সাহেবের দুটি দাড়ি

শীতের সকাল। পৌষের রোদ জানলা দিয়ে এসে পড়েছে চায়ের টেবিলে।

বেশ বড় টেবিল। টেবিল ঘিরে বসেছে বাজপেয়ী-ফ্যামিলির সবাই। টেবিলের মাথায় বসেছেন ফ্যামিলির যিনি মাথা—অর্থাৎ রায়বাহাদুর বিশ্বম্ভর বাজপেয়ী স্বয়ং। শ্বেতশুভ্র দাড়ি নেড়ে তিনি গজগজ করছিলেন চায়ে স্যাকারিন বেশি দেওয়া নিয়ে। পাশেই বসেছিলেন রায়-বাহাদুর-গৃহিণী রাজলক্ষ্মী দেবী। ভদ্র-মহিলা ছেলেবেলা থেকেই সোনাদানা হীরে-জহরৎ দেখে আসছেন। তবুও মণিমাণিক্যের মায়া এখনও কাটাতে পারেন নি। বছরখানেক আগে কলকাতার এক জমিদারবাড়ী থেকে নিলামে কিনে আনা হীরের নেকলেসটা নিয়ে এত বেশি পাবলিসিটি দিয়ে ফেলেছেন যে, তল্লাটের কোনো চোরেরই আর তা জানতে বাকী নেই। পাশেই কন্যা চপলা।

চপলার স্বভাবটি কিন্তু নামের ঠিক উল্টো। অত্যন্ত ধীর, শান্ত, নম্র। রায়বাহাদুরের অপর পাশে তাঁর দুই ছেলে শিবনাথ আর শম্ভুনাথ। শিবনাথ অত্যন্ত চালাক ছেলে। মোটরগাড়ী তার প্রিয় শখ। কিন্তু এই ব্যয়-সাপেক্ষ শখটিকে সে দিব্যি লাভের ব্যবসায়ে পরিণত করেছে। অর্থাৎ হরদম মোটর কেনা-বেচা করে বেশ দু পয়সা কামায় শিবনাথ। আর শম্ভুনাথ? বেচারীর এনার্জির নব্বই শতাংশ খরচ হয় জামা-কাপড়ের পারিপাট্য বজায় রাখতে। তিন ভাই-বোনদের বয়স কুড়ি থেকে ছাব্বিশের মধ্যে।

সেদিনের চায়ের আসরে হাজির হয়েছিল আরও একজন। নাম তার মানব মল্লিক। শম্ভুনাথের অফিস-বন্ধু। শম্ভু-নাথের সঙ্গে সে-ও এসেছে। শহরতলীতে কটা দিন নিরিবিলিতে কাটিয়ে যেতে।

কিন্তু তা বুঝি আর হল না। কেননা,



সেদিনের খবরের কাগজেই বেরিয়েছে একটা অতি চাঞ্চল্যকর, অতি মুখরোচক সংবাদ। বিশেষ সংবাদদাতা খবরটিকে নিয়ে একটা মস্ত প্রবন্ধ ফেঁদেছেন। শিরোনামায় লিখেছেন—লালসাহেব এখন কোথায়?

লালসাহেব! এককালের কুখ্যাত হীরে-চোর লালসাহেব! অনেক বছর শহরের ধনবানরা নাম শোনেন নি যে লালসাহেবের, তস্কর-চূড়ামণি সেই দুর্ধর্ষ লালসাহেব নাকি দীর্ঘকাল আগেই খালাস পেয়েছে জেল থেকে। তারপর থেকেই আর তার কোনো সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না।

লালসাহেব! যে লালসাহেবের নাম শুনলেই জহরৎ-প্রেমিকদের হৃৎকম্প উপস্থিত হত, যে লালসাহেবের আবির্ভাব ঘটত অশরীরীর মতই নিঃশব্দে সকলের অজান্তে, যে লালসাহেবের অমিতশক্তির কাছে পালোয়ান পুলিশপুঙ্গবরাও হার মানত, যে লালসাহেব আগে থেকে নোটিশ দিয়ে রাজা-নবাবের কোষাগার লুণ্ঠন করেছে গোয়েন্দা-দপ্তরকে চ্যালেঞ্জ করেছে এবং নাকের জলে চোখের জলে এক করেছে—সেই লালসাহেবের কারাবাসের মেয়াদ ফুরিয়েছে দীর্ঘকাল আগেই এবং তারপর থেকেই কর্পূরের মতই গেছে উবে।

লালসাহেব! লোকে বলে সে জন্মেছিল খৃস্টান হয়ে, ভালবেসেছে ছত্রিশ জাতের মেয়েকে। আর তাদের কণ্ঠশোভা বৃদ্ধি করার জন্যেই নাকি যাদুকরের মতই সে কণ্ঠহার চুরি করেছে একের পর এক।

লালসাহেব! শৃগালের মত ধূর্ত, সাপের মত পিচ্ছিল অশরীরীর মত অদৃশ্য! অথচ এমন দুরন্ত মানুষটি মানুষের রক্তে কখনও হাত রাঙায় নি। তার জীবনের ব্রতই ছিল বুঝি তাই। ধনীকে সে নির্ধন করেছে বিনাদ্বিধায়, কিন্তু কোথাও এক বিন্দুও রক্তপাত ঘটেনি। পুলিশ-পরিবৃত হয়েও সে গুলী বর্ষণ করেনি। একাই লড়েছে। অসুর-শক্তি দিয়ে সবাইকেই কুপোকাৎ করেছে। তারপর দড়ি দিয়ে খেলনার পুতুলের মত পিছমোড়া করে বেঁধে চম্পট দিয়েছে জহরতের বাক্স নিয়ে।

ভয়াবহ সেই লালসাহেবই ছাড়া পেয়েছে। কিন্তু সে এখন কোথায়?

বিশেষ সংবাদদাতার বিশ্বাস, এই শহরতলীতেই। ছদ্মনামে দীর্ঘকাল আগেই জমিজমা কিনে রেখেছিল সে এ অঞ্চলে। এখন ডেরা নিয়েছে সেখানে।

আর, তাই সরগরম হয়ে উঠেছে বাজপেয়ী-পরিবারের চায়ের আসর। বড় সহজ কথা নয়! লালসাহেবের মত স্বনামধন্য জহরৎ-লুঠেরা নিরিবিলি এই শহরতলীতেই নামধাম পাল্টে ঘাপটি মেরে রয়েছে, অথচ প্রতিবেশী হয়েও কেউ কিছু জানে না!

বলাবাহুল্য রাজলক্ষ্মী দেবী খবরটি শোনার পর থেকেই বিমনা হয়েছেন। তাঁর সদ্যকেনা হীরের নেকলেসটি দোতলার ঘরে আর নিরাপদ কিনা তাই ভাবতে ভাবতে বললেন "নিশ্চয়ই নতুন কেউ হবে। হ্যাঁ গো, তোমার কাকে সন্দেহ হয়?"

বাজপেয়ীমশায় শাদা দাড়ি চুমড়ে বললেন, "রাজপ্রসাদ চামেরিয়া ছাড়া আর কেউ এখানে এসেছে বলে তো জানা নেই।"

মুখঝামটা দিয়ে রাজলক্ষ্মী দেবী বললেন, "বুড়োবয়েসে ভীমরতি ধরেছে তোমার! রাজপ্রসাদ চামেরিয়া লালসাহেব হতে যাবে কেন?"

কথাটা সত্য। রাজপ্রসাদ চামেরিয়া নবাগত সবাই নয়। আদিবাস রাজস্থানে হলেও চামেরিয়ারা এখন খাঁটি বাঙালী। রাজগত হতে পারেন, কিন্তু চামেরিয়া ফার্মালিব প্রসাদের গৃহিণীর সঙ্গে বাজপেয়ী-গৃহিণীর সখীসম্পর্ক। দুজনেরই হীরে-মুক্তো জমানোর বাতিক।

সুতরাং রাজপ্রসাদ চামেরিয়া অবশ্যই লালসাহেব নন।

রাজলক্ষ্মী ঘোমটা ঠিক করতে করতে বললেন, "আমার কিন্তু বাপু ঐ সেক্রেটারীকে সুবিধের মনে হয় না।"

"কোন্ সেক্রেটারী?" বাজপেয়ীমশায়ের প্রশ্ন।

"চামেরিয়াদের সেক্রেটারী। ছাগলের মত দাড়ি, নাকটা আবার কি রকম লালচে। চাকরীটিও নতুন পেয়েছে।"

"অতএব সেই লালসাহেব, কেমন?"

"মনে তো হয়।"

নিবিষ্ট চিত্তে এতক্ষণ আলুভাজা দিয়ে লুচি চিবোচ্ছিল মানব মল্লিক। এবার কোঁৎ করে গিলে নিয়ে বললে, "উঁহু। উঁহু। আমি ভাবছি তারিণী দত্তর কথা। চালচলনটা কেমন জানি সন্দেহজনক। কদিনের জন্যে বেড়াতে এসেছে বটে, কিন্তু চোখ তো নয়, যেন বাঘের চোখ।"

"তারিণী দত্ত কে?" প্রশ্নটা প্লেটের ওপর দিয়ে নিক্ষেপ করলেন বাজপেয়ীমশায়।

"শিবনাথ চেনে। নটবর উকিলের বাড়ীতে পেয়িংগেস্ট হিসেবে এসেছে। খুব গাড়ি-টাড়ির শখ আছে।"

তড়বড় করে বলে উঠল শিবনাথ, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, চিনব না কেন, খুবই চৌকশ লোক। সর্বজ্ঞও বলা যায়।"

চায়ের টেবিলের কথা তো, সুতরাং কোনো প্রসঙ্গেই গভীরতা নেই। জলের ওপর দিয়ে পিছলে পিছলে যাওয়ার মতই বিভিন্ন প্রসঙ্গ ছুঁয়ে গেল আলোচনা-প্রবাহ।

কিন্তু সেইদিনই বিকেলের দিকে মানব মল্লিককে হন্-হন্ করে যেতে দেখা গেল নটবর উকিলের বাড়ীর দিকে।

নটবর উকিলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দু'কথাতেই দেওয়া যেতে পারে। ভদ্রলোক অবসরপ্রাপ্ত সরকারী উকিল। দীর্ঘকাল আগেই জমিজমা কিনে রেখেছিলেন। বাড়ী ঘর পোলট্রিও ছিল। মাঝে মাঝে আসতেন। এখন স্থায়ীভাবে আস্তানা নিয়েছেন। মুরগীর বংশবৃদ্ধি করানো তাঁর শখ এবং রীতিমত লাভজনক শখ।

নটবর উকিল অকৃতদার। কাজেই নির্ঝঞ্ঝাট সংসার। নিজের হাতেই সর্বকিছু করেন। একটি মাত্র ঠিকে-ঝি সকাল-সন্ধ্যা কাজ করে চলে যায়।

লম্বা একহারা চেহারা। যেন রস নিংড়ে নেওয়া আখের ছিবড়ে। মুখে সবসময়ে অমায়িক হাসি। কারো সাতে পাঁচে নেই। দিবারাত্র পোলট্রি নিয়ে ব্যস্ত।

এহেন নটবর উকিলের গৃহাভিমুখেই দ্রুতপদে চলেছিল মানব মল্লিক। উদ্দেশ্য তাঁর পেয়িংগেস্ট তারিণী দত্তকে একবার বাজিয়ে দেখা।

পথিমধ্যেই মুখোমুখি হল চামেরিয়াদের সেক্রেটারী নন্দলালের সঙ্গে। ভদ্রলোকের ছুঁচোলো দাড়ি অবিকল ছাগলের মতই। নাকের ডগাটিও অস্বাভাবিক লাল। সম্ভবত সোমরসের কল্যাণে।

নন্দলালের প্রকৃত নাম নন্দকান্ত লাহা। কিন্তু বিশুদ্ধ সুরেবসুরোর সঙ্গে দহরম-মহরম্ হওয়ার ফলেই নামটি কাটছাঁট হয়ে এসে দাঁড়িয়েছে নন্দলালেতে।

দেখা হতেই মানব মল্লিক বলে উঠল, "এই যে মশায়, খবর শুনেছেন?"

ভুরু তুলে নন্দলাল বললেন, "কি খবর?"

"লালসাহেব এ অঞ্চলেই ডেরা নিয়েছে, কাকপক্ষীরাও জেনে গেল, আর আপনি জানেন না?"

"তাই নাকি? তাই নাকি?"

"একটু সামলে-সুমলে থাকবেন মশায়। মিসেস চামেরিয়ার হীরে-জহরতের ওপর লালসাহেবের নজর পড়েছে কিনা কে জানে।"

বলেই হাওয়া হয়ে গেল মানব মল্লিক। থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল নন্দলাল।

কিন্তু মোড় ঘুরতে না ঘুরতেই দারুণ চমকে উঠল মানব মল্লিক। আচমকা ক্যাঁচ করে পাশেই ব্রেক কষল লাল টকটকে একখানা মোটরকার এবং সঙ্গে সঙ্গে বিকট শব্দে আর্তনাদ করে উঠল গাড়ীর হর্ণ। পরক্ষণেই গাড়ীর ভেতর চোখ পড়ল মানবের। দাঁত বার করে হাসছে শিবনাথ।

বলল, "নতুন কিনলাম। মাত্র দু বছরের পুরোনো মডেল। গাড়ী তো নয় যেন জাগুয়ারের বাচ্চা। উঠে এস! এক চক্কর ঘুরে আসা যাক।"

"আমি যাচ্ছি নটবর উকিলের বাড়ী। গাড়ীর দরকার হবে না।" বলল মানব মল্লিক।

"আহাম্মক!" বলেই দরজা খুলে ধরল শিবনাথ। "এইটুকুই বা হাঁটতে যাবে কেন। উঠে এস।"

অগত্যা উঠতে হল মানব মল্লিককে। ক মিনিটের মধ্যেই নটবর উকিলের পুষ্পোদ্যান সুশোভিত গৃহের সামনে ব্রেক কষল লাল গাড়ী এবং আর একবার প্রাগৈতিহাসিক ডাইনোসরের মত আর্তনাদ করে উঠল হর্ণ।

বাগানের মধ্যে একটা গোলাপ-চারার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন এক সুবেশ ভদ্রলোক। পরনে ঘি-রঙের কটসউলের পাঞ্জাবি আর সিল্কের পায়জামা। দাঁতের ফাঁকে সুদৃশ্য পাইপ। ভদ্রলোকের চেহারাটি সিনেমার হিরোর মত—চালচলনও সেই রকম।

গাড়ী থেকে নামতে নামতেই হাঁক দিল মানব মল্লিক—"ও মশাই, ও তারিণীবাবু, শুনছেন?"

তন্দ্রালু চোখ তুলে তাকালেন তারিণী দত্ত। মুখ থেকে পাইপটা নামিয়ে বললেন, "চেঁচাচ্ছেন কেন?"

"আপনার ধ্যান ভাঙাতে। গৃহস্বামী কই?"

"ওই তো।" পাইপের ইঙ্গিতে বাগানের আর একদিকে দেখিয়ে দিলেন তারিণী দত্ত। দেখা গেল, সেদিকে তারের জাল দিয়ে তৈরী মুরগী-ঘরের পাশে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন এক দীর্ঘদেহী লিকলিকে মূর্তি। নিঃসন্দেহে নটবর উকিল স্বয়ং। পাশেই বামনাকৃতি এক বিচিত্র মূর্তি। পরনে ঢলঢলে কালো আলখাল্লা। মাথায় চকচকে টাক। কুমড়োর মত বেঢপ বদখত চেহারা। কুৎকুতে চোখে ভণ্ডাডাঁটির চশমা।

লোকটার সারা মুখে নির্বুদ্ধিতার ছাপ। কিন্তু এ-হেন আজব মূর্তিরই বক্তৃতা শুনছিল নটবর উকিল; শুধু শুনছিল নয়—গিলছিল।

হাঁকডাক শুনে ঢ্যাঙা আর বেঁটে দুটো মূর্তিই এগিয়ে এল কাছে। মুখে হাসি টেনে এনে নটবর উকিল বললেন, "গাড়ী নিয়ে সদলবলে যে, ব্যাপার কি শিবনাথবাবু?"

শিবনাথ সাধ্যমত দন্তশোভা দেখিয়ে বললেন, "নতুন কিনলাম কিনা, তাই এক চক্কর ঘুরতে বেরিয়েছি।"

মানব মল্লিক বলে উঠল, "তারিণীবাবু, আপনি যান না ওর সঙ্গে। খানিকটা হাওয়া খেয়ে আসুন, নির্মল হাওয়া।"

"নির্মল হাওয়া এখানেও আছে," সংক্ষেপে বললেন তারিণী দত্ত।

"অ, আপনার বুঝি হাতে এখন কাজ আছে?"

"তা আছে। মুরগীগুলোকে স্টাডি করছি।"

"সন্ধ্যে তো হতে চলল, এখন মুরগী স্টাডি করবেন না তো করবেন কখন।" বেঁকা সুরে বলল মানব মল্লিক। "দেখবেন মশায়, রাতের অন্ধকারে মুরগী স্টাডি করতে যাবেন না, হিতে বিপরীত হবে।"

পলকহীন চোখে তাকিয়ে রইলেন তারিণী দত্ত। তারপর পাইপটা দাঁতে কামড়ে ধরেই চিবিয়ে চিবিয়ে জবাব দিলেন, "হুঁশিয়ার থাকবেন, অনেক মুরগী আছে যারা শুধু ডিমই পাড়ে না, ঠোকরও মারে।"

এসব হেঁয়ালী বোধ হয় ভাল লাগল না শিবনাথের। তাই ধরে বসল নটবর উকিলকে, "আপনি চলুন। একবারটি চড়ে দেখুন। খাসা গাড়ী, তোফা গাড়ী। ঘণ্টা চারেকের মধ্যেই ফিরে আসবেন।"

নটবর উকিল যাবেন না, শিবনাথও ছাড়বে না। অবশেষে নাছোড়বান্দার মতই উকিলমশায়কে টেনে হিঁচড়ে গাড়ীতে তুলে ফেলল শিবনাথ এবং পরমুহূর্তেই হুস্ করে উধাও হয়ে গেল লাল মোটর।

ঘুরে দাঁড়ালেন তারিণী দত্ত। মেঘমন্দ্র-কণ্ঠে বললেন, "তারপর?"

অর্থ অতি সুস্পষ্ট। সুতরাং ফটকের দিকে পা বাড়াল মানব মল্লিক। গেটের কাছে গিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, "আপনার মুরগীগুলোর অ্যাকটিভিটি তাহলে রাতেই দেখা যায় বলুন?"

তারিণী দত্ত মুখে কিছু বললেন না। শুধু জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে রইলেন।

মানব মল্লিকের পেছন পেছন পিগমি চেহারা নিয়ে বিটকেল বামনটাও বেরিয়ে এসেছিল।

সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে মানব জিজ্ঞেস করল, "আপনি কে চিনলাম না তো?"

"ফাদার মণ্ডল। ফাদার ঘনশ্যাম মণ্ডল।" ভাবলেশহীন সুরে জবাব দিল বিচিত্র মূর্তি। "কিন্তু আপনি আসবার সময়ে তারিণীবাবুকে ও কথাটা বলে এলেন কেন?"

"তার কারণ," বললে মানব মল্লিক, "আমার বিশ্বাস আজ রাতটা তারিণী দত্ত একাই থাকতে চান। সন্দেহজনক, তাই না?"

"তাই নাকি?"

বলে একদম বোবা হয়ে গেল ফাদার ঘনশ্যাম মণ্ডল।

সন্ধ্যার অবগুণ্ঠনে ঢাকা ঘনায়মান অন্ধকারে অকস্মাৎ চমকে উঠল চপলা। বাজপেয়ী ভবনের এ-ঘরে সে ঘর-ঘুর করছিল চপলা। সব ঘরে এখনো আলো জ্বলে নি। রঙিন কাঁচের মধ্যে দিয়ে বিচিত্র রোশনাই তাই এখনো চোখে ধাঁধার সৃষ্টি করে নি।

অথচ ঝিলমিল বাতায়নের সামনে সহসা থমকে দাঁড়াল চপলা।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে খটাখট শব্দে নড়ে উঠল সদর দরজার কড়া। আচ্ছন্নের মত এগিয়ে গিয়ে চপলা খুলে দিল দরজা। সামনেই দাঁড়িয়ে বামনাকৃতি হৃষ্টপুষ্ট এক পাদরী। মাথায় টাক। চোখে চশমা।

নিরীহকণ্ঠে বলল পাদরী, "আমার নাম ফাদার ঘনশ্যাম মণ্ডল। একটা জরুরী খবর দিতে এলাম। বাড়ীর আর সব কোথায়?"

"ভেতরে আছে। আপনি এসে ভালই করেছেন। এইমাত্র আমি ভূত দেখলাম", বিহ্বল কণ্ঠে বলল চপলা।

"তাই নাকি," অবিচল কণ্ঠে জবাব দিল ফাদার ঘনশ্যাম। "কোথায় দেখেছেন? চলুন, দেখা যাক।"

ভেতরের হলঘরে তখন আলো জ্বলেছে। বাজপেয়ী কর্তা-গিন্নী বসেছেন কুশনআঁটা চেয়ারে। একপাশে দাঁড়িয়ে মানব মল্লিক।

মলিন আলখাল্লাপরিহিত ফাদার ঘনশ্যামকে দেখে ভ্রূ-যুগল ঈষৎ তুললেন রাজলক্ষ্মী দেবী।

ভ্রূক্ষেপ না করে ফাদার ঘনশ্যাম বলল, "আমি এসেছি একটা বিশেষ সমাচার নিয়ে। চার্মেরিয়া প্রাসাদে এইমাত্র একটা কাণ্ড ঘটে গেছে।"

সিধে হয়ে বসলেন রাজলক্ষ্মী দেবী। চকিতে তীক্ষ্ম হয়ে উঠল রায়বাহাদুরের দুই চক্ষু।

ফাদার বলল, "একটা খুন। সেই সঙ্গে হীরে-জহরৎ লোপাট। খুন হয়েছে সেক্রেটারী নন্দ ল। বাগানে তাকে গুলী করে মারা হয়েছে।"

"কী সর্বনাশ! আমি তো ভেবেছিলাম, নন্দ ল-ই লালসাহেব।" অস্ফুটকণ্ঠে বললেন রাজলক্ষ্মী দেবী।

শীতল দৃষ্টি মেলে বলল ঘনশ্যাম পাদরী, "আমি ওদিকেই গেছিলাম। লাশটা আমিই আগে দেখি। পুলিশ এসে অঙ্গুলের ছাপ, পায়ের ছাপ দেখে একজনকেই সন্দেহ করছে। আমি আগে এলাম একটা বিশেষ খবর নিয়ে। আর একজন এখুনি আসছেন—"

ঠিক এই সময়ে ঝড়ের মত ঘরে প্রবেশ করল শিবনাথ। নটবর উকিলকে নিয়ে গিয়ে নাকি মহাফ্যাসাদেই পড়তে হয়েছিল তাকে। মাঝপথে গাড়ীর স্পার্কপ্লাগে ময়লা জমে ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যায়। বনেট খুলে প্লাগ সাফ করে মাথা তুলে আর ভদ্রলোককে দেখতে পায় নি শিবনাথ। রাবিশ! যত্তো সব রাবিশ!

শিবনাথ ক্ষান্ত হতেই ঘনশ্যাম পাদরী বললে, "চার্মেরিয়া প্রাসাদের জানলায় একজন চাকর একটা মুখ দেখেছে। চোখে ধোঁয়াটে কাঁচের চশমা। গালে লাল দাড়ি।"

অস্ফুট চীৎকার করে উঠল চপলা।

"কী হল?" ঘনশ্যাম প্রশ্ন করল।

"ঐ মুখ আমিও দেখেছি জানলায়। একটু আগে। ছায়ার মত দেখা দিয়েই অদৃশ্য হয়ে গেল। চোখে চশমা। গালে লাল দাড়ি।"

আবার বেজে উঠল দরজার কড়া। কয়েক সেকেন্ড পরেই হলঘরে সিনেমার নায়কের মত প্রবেশ করলেন এক সুবেশ সুদর্শন মূর্তি। দেখেই মানব মল্লিকের রক্ত ছলকে উঠল।

গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বললেন, তারিণী দত্ত "কেউ নড়বেন না। যে যেখানে আছেন থাকুন।"

মানব মল্লিকের বুক তখনই ঢিব-ঢিব করতে শুরু করে দিয়েছে। এইবার বেরুবে রিভলবার। তারপর...তারপর...!

"মানববাবু," বললেন তারিণী দত্ত। "দয়া করে আসন গ্রহণ করুন। আপনার মনোভাব আমি জানি। আপনি আমাকে কুখ্যাত হীরেচোর বলেই মনে করে আছেন।"

"তা করেছু," শুকনো গলায় বলল মানব মল্লিক।

"আসলে আমি একজন ডিটেকটিভ। লালসাহেব তার কুকাজ আবার শুরু করতে পারে, এই সম্ভাবনার খবর পেয়েই এসেছিলাম এ অঞ্চলে ছদ্মবেশে। আমার আশংকাই সত্যি হয়েছে। একটু আগেই চার্মেরিয়া প্রাসাদে যে বিরাট চুরি হয়ে গেল, তা যে লালসাহেবেরই কীর্তি, তার সব প্রমাণ পাওয়া গেছে। আপনারা জানেন শেষবার যখন হীরে চুরির সময়ে তাকে হাতে-নাতে ধরা হয়, তখন তার গালে ছিল একটা নকল লালদাড়ি, আর চোখে ধোঁয়াটে চশমা। শুধু শেষবারেই নয়, প্রতিবারেই লালসাহেবের মুখে এই একই ছদ্মবেশ দেখা গেছে।"

চপলা বলে উঠল, "এই মুখ তো আমিও দেখেছি একটু আগেই ওদিকের জানলায়।"

তারিণী দত্ত বললেন, "মুখটা চার্মেরিয়া প্রাসাদের জানালাতেও আজ সন্ধ্যায় দেখা গেছে।"

বলে, টেবিলের ওপর একটা প্যাকেট আর কিছু কাগজ রাখলেন তারিণী দত্ত। মোড়ক খুলতে খুলতে বললেন, "মুরগী স্টাডি করার ছল নিয়ে নটবর উকিলের বাড়ী এসেছিলাম লালসাহেবের ষড়যন্ত্র আগে থেকেই আঁচ করার মতলবে।"

"এক মিনিট," বলে উঠল মানব মল্লিক। "আপনি কি তাহলে নটবর উকিলকেই—"

"লালসাহেব বলে সন্দেহ করেছিলাম," সায় দিয়ে বললেন তারিণী দত্ত। "পোলটি ফিক্সনেস চোখে ধুলো দেওয়ার নতুন ছদ্মবেশ। তাই আজ বিকালে শবনথবাবু ওঁকে গাড়ী চড়াতে নিয়ে যাওয়াতে আমার সুবিধেই হয়ে গেল। গোটা বাড়ীটা সার্চ করলাম। করে কি পেলাম জানেন? এই দেখুন।"

আর চক্ষু স্থির হয়ে গেল উপস্থিত সকলের। কারণ, টেবিলের ওপর দেখা গেল ঝাড়বাতির উজ্জ্বল দীপ্তিতে ঝিকমিক করছে একটা ধোঁয়াটে কাচের চশমা। আর একটা যাত্রাদলের নকলদাড়ির মত লাল টকটকে দাড়ি।

নাটকীয়ভাবে বলে চললেন তারিণী দত্ত, "শুধু এই নয়। এছাড়াও একটা লিস্ট আমার হাতে এসেছে। লিস্টে আছে এ অঞ্চলের হীরেজহরত-মালিকদের মোটামুটি ফর্দ। প্রথমেই আছে চামেরিয়া প্রাসাদের নাম! তারপরেই বাজপেয়ী পরিবারের।"

ককিয়ে উঠলেন রত্নলক্ষ্মী দেবী এবং জ্যামুক্ত ধনুকের মত ছিটকে দাঁড়িয়ে উঠল শিবনাথ, "হীরের নেকলেস! মা'র হীরের নেকলেসটা বোধ হয় গেল! আমি চললাম দেখতে!"

বলেই খরগোসের মত তিন লাফে অন্তর্হিত হল শিবনাথ।

তারিণী দত্ত বলে চললেন, "চামেরিয়া প্রাসাদের জহরৎও লুঠ হত না যদি না আমি দেরী করে ফেলতাম। কিন্তু উপায় ছিল না। ফর্দটা লেখা ছিল সংকেতিক হরফে। মানে যখন বুঝলাম, তখন দেরী হয়ে গেছে। চামেরিয়া প্রাসাদে গিয়েই দেখলাম ফাদারকে। ওঁকে পাঠিয়ে দিলাম আপনাদের কাছে খবর দিয়ে আর আমি—"

ভয়ার্ত চীৎকারে চমকে উঠলেন তারিণী দত্ত।

ঠক-ঠক করে কাঁপছে চপলা। বিস্ফারিত দৃষ্টি অদূরস্থ কাচের জানলায় নিবদ্ধ।

"ঐ যে! ঐ যে! আবার!"

চকিতে সবারই চোখ গিয়ে পড়ল রঙিন কাচের ওপর।

কাচের ওপর নাক চেপে রয়েছে একটা বীভৎস মুখ। অন্ধকারের মধ্যে থেকে ঠেলে বেরিয়ে এসেছে শুধু একটি মুখ। ফ্যাকাশে, রক্তহীন। দুই চোখের পরিবর্তে বড় বড় ধোঁয়াটে কাচ—যেন সামুদ্রিক দানোর জ্বলন্ত চক্ষু। আড়ষ্ট ঠোঁটের চারপাশ ঘিরে রক্তরাঙা লাল দাড়ি। ঠিক যেন অন্ধকারের সমুদ্র থেকে আচম্বিতে বেরিয়ে এসেছে ভয়াবহ এক দানব—পোর্ট হোলের কাচে চোখ লাগিয়ে দেখছে ভেতরের মানুষদের।

পরমুহূর্তেই অদৃশ্য হয়ে গেল মুখটা।

রেগে জানলার দিকে ধেয়ে গেল মানব মল্লিক।

আর তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটা বিকট চীৎকারে গমগম করে উঠল গোটা বাড়ীটা।



অস্ফুট চীৎকার করে উঠল চপলা

স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে গেল মানব মল্লিক।

রুদ্ধশ্বাসে এই প্রথম বললেন রায়বাহাদুর বিশ্বম্ভর বাজপেয়ী—"শিবনাথের চীৎকার!"

চক্ষের পলকে দোরগোড়ায় আবির্ভূত হল শিবনাথ।

"নেকলেস নেই।" ভাঙাগলায় বলেই উধাও হয়ে গেল দরজার ফ্রেম থেকে।

বন্দুকের গুলির মত ডিটেকটিভ তারিণী দত্ত তেড়ে গেলেন দরজার দিকে।

আর, তার কয়েক সেকেন্ড পরেই উপর্যুপরি দুবার গুলিবর্ষণের শব্দ ভেসে এল বাগানের দিক থেকে।

হাঁপাতে হাঁপাতে শিবনাথের গিয়ে যখন দাঁড়ালেন তারিণী দত্ত, তখন সব শেষ হয়ে গেছে।

সামনেই ঘাস-জমির ওপর পড়ে একটা নিস্পন্দ মূর্তি। একহারা লম্বা চেহারা। মুখভর্তি লাল দাড়ি। চোখে ধোঁয়াটে চশমা। পাশে একটা নিকষ কালো রিভলবার।

শিবনাথের হাতেও রিভলবার। তখনও ধোঁয়া বেরুচ্ছে নলচে থেকে।

গোটা বাজপেয়ী-পরিবার তখন এসে দাঁড়িয়েছে পেছনে।

শান্ত কন্ঠে তারিণী দত্ত বললেন, "লালসাহেবের লীলাখেলা ফুরোলো। পুলিশ না আসা পর্যন্ত চলুন আমরা ভেতরে বসি। লালসাহেবের রিভলবার থেকেই যে আগে গুলি ছুটেছে, তা পুলিশ এসে রেকর্ড করুক, তারপর আমার ছুটি।"

একে একে সবাই ফিরে এল হলঘরে। ছদ্মবেশী লালসাহেবের পকেট-টিকেটগুলো হাতড়ে সবশেষে এলেন ডিটেকটিভ তারিণী দত্ত। এসে নীরবে টেবিলে রাখা জিনিসগুলো গুছিয়ে তুলতে লাগলেন।

থমথমে নৈঃশব্দ্য বিরাজ করতে লাগল বিশাল হলঘরে। নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতে সকলেই হতচকিত। নির্বাক।

ফ্রেসকো আঁকা থামের সামনে জীবন্ত থামের মতই দাঁড়িয়েছিল ফাদার ঘনশ্যাম মন্ডল। পলকহীন চোখে তাকিয়েছিল টেবিলের ওপর রাখা ডিটেকটিভের আনা জিনিসগুলির দিকে।

আচম্বিতে নড়ে উঠল জীবন্ত থাম।

বলল ফাদার ঘনশ্যাম, "তারিণীবাবু—আপনি বাহাদুর ডিটেকটিভ। এরকম একটা জটিল কেস কিরকম সহজভাবে সমাধান করে ফেললেন বলুন তো। তারিফ না করে পারা যায় না। মুরগী, দাড়ি, চশমা, সাংকেতিক হরফ, নেকলেস, নটবর উকিল আর লালসাহেবকে কেমন সুন্দরভাবে একই সুতোয় গেঁথে ফেললেন, সত্যিই চমৎকার!"

"সেইটাই আমার পেশার বিশেষত্ব"; বললেন তারিণী দত্ত।

"তা ঠিক", বলল, ঘনশ্যাম পাদরী। কিন্তু চোখ রইল টেবিলের ওপর বিচিত্র বস্তুগুলোর ওপর। অপলক, স্থির সে দৃষ্টি। বলল, "ঠিকই বলেছেন। এই জন্যেই আপনার পেশা এত সহজে লোকের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। তবে", বলে চোখ তুলল ফাদার। আচম্বিতে পালটে গেল কন্ঠস্বর। মনের সমস্ত ইচ্ছাশক্তি যেন জড়ো হল প্রশান্ত সেই কন্ঠস্বরে। বলল অস্বাভাবিক শান্তস্বরে, "তবে, আমি এ কাহিনীর এক বর্ণও বিশ্বাস করি না।"

ঈষৎ ঝুঁকে পড়ে সাগ্রহে বললে মানব মল্লিক, "অর্থাৎ আপনি বিশ্বাস করেন না নটবর উকিলই লালসাহেব, কুখ্যাত হীরে-চোর লালসাহেব?

"নটবর উকিলই লালসাহেব, অতীতের কুখ্যাত হীরে-চোর লালসাহেব। কিন্তু চামেরিয়া প্রাসাদে অথবা এ বাড়ীতে সে যে হীরে চুরি করতে এসেছিল, তা আমি বিশ্বাস করি না। হীরে চুরি করে পালানোর সময়ে গুলি খেয়েছে, এ গল্পকথাও বিশ্বাস করি না।"

"তবে সে এল কেন?" তারিণী দত্তর প্রশ্ন।

"যদি চুরি করেই থাকে তো হীরেগুলো গেল কোথায়?" সমান তেজে পালটা প্রশ্ন ছুঁড়ে মারল ফাদার ঘনশ্যাম।

বিনা অস্ত্রোপচারে
অর্শ থেকে
আরাম পাবার
জন্য
হ্যাডেনসা
ব্যবহার করুন!
DOL-337 BEN

তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে তারিণী দত্ত বললেন, "এসব ক্ষেত্রে যেখানে যায় সেইখানেই। অর্থাৎ লালসাহেবের স্যাঙাতের ঝুলিতে। এ চুরি এক হাতের কাজ নয়। আমার লোক বাগান সার্চ করলেই তার প্রমাণ পাবেন।"

রাজলক্ষ্মী দেবী বললেন, "হয়ত স্যাঙাৎ যখন নেকলেস চুরি করছিল, লালসাহেব তখন জানলা দিয়ে তাকিয়েছিল।"

"লালসাহেব জানলা দিয়ে কেন তাকিয়েছিল?" নাছোড়বান্দার মত আবার প্রশ্ন করল ফাদার ঘনশ্যাম। "জানলা দিয়ে তাকানোর কি দরকার ছিল?"

শিবনাথ বলে উঠল, "জবাবটা আপনিই দিন না।"

"আমার তো মনে হয় জানলা দিয়ে একবারও তাকাতে চায়নি লালসাহেব" বলল ফাদার।

"চায়নি তো তাকালো কেন?" প্রায় মুখ ভেংচে উঠলেন তারিণীবাবু। "আমরা সবাই দেখেছি তাকে তাকাতে আর তবুও কিনা আপনি—"

বিষণ্ণ সুরে ফাদার ঘনশ্যাম বলল, "দেখুন, ইহজীবনে আমরা সকলেই চর্মচক্ষু দিয়ে অনেকিছু দেখি, কিন্তু মর্মচক্ষু দিয়ে প্রায় কিছুই দেখি না। আমাকে কিন্তু দেখতে হয় দুভাবেই। আর তাই আমি জানি, লালসাহেব চুরি করেনি।"

"খুলে বলুন।"

"লালসাহেব খৃস্টান। তাই আজ সন্ধ্যের সময়ে আমার কাছে সব পাপ সে কবুল করেছে। আমি তখন তার মনের ভেতর পর্যন্ত দেখে নিয়েছি। দেখেছি সে মন হীরের মতই ঝকঝকে—বাইরের হীরের আর দরকার নেই।"

বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলল ফাদার ঘনশ্যাম। ঘাড় হেঁট করে তাকিয়ে রইল কার্পেটের দিকে।

মানব মল্লিক নরম গলায় বললে, "আপনার কথা মানলাম। পাপের আর অনুতাপের আগুনে পুড়ে লালসাহেব সত্যিই হীরে হয়ে গেছিল। কিন্তু এ কাজ তাহলে কার?"

"এখন তা বলতে পারব না। সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে আমার, সমস্ত গুলিয়ে যাচ্ছে", বলে দরজার দিকে ফিরে দাঁড়াতে গিয়ে অতর্কিতে তড়িতাহতের মত চমকে উঠল ফাদার ঘনশ্যাম। অপলকে তাকিয়ে রইল টেবিলের ওপর।

আর, ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হয়ে উঠল দুই চোখ। থর-থর করে কেঁপে উঠল ঠোঁট। বিড়বিড় করে বলল আপন মনে, "মাই গড. লালসাহেব তো লাল দাড়ি আর কালো চশমা পরে বাগানে শুয়ে।"

বলেই, বিদ্যুৎবেগে ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল বন্দুকের গুলির মত, "বলুন দিকি লালসাহেবের দুটো দাড়ির কি দরকার?"

জবাবের জন্য দাঁড়ালো না ফাদার। পিপের মত দেহ নিয়ে সবেগে বেরিয়ে এল বাইরে—বাগানে। পেছন পেছন এসে দাঁড়াল মানব মল্লিক।

ফাদার বলল, "এখন আর কোন প্রশ্ন নয়। এখন কিছু বলতে পারব না,...ও কি! ও কিসের শব্দ?"

"মোটরগাড়ী স্টার্ট নিচ্ছে, বলল মানব মল্লিক।

"শিবনাথ বাজপেয়ীর মোটরগাড়ী", বলল ফাদার ঘনশ্যাম। "খুব জোরে যায়, তাই না?"

"শিবনাথ তো তাই বলে", হেসে বলল মানব মল্লিক।

"আজ রাতেও এ গাড়ী খুব জোরেই যাবে।"

"তার মানে?"

"তার মানে, আর ফিরবে না। আমার এলোমেলো কথা থেকেই শিবনাথ বাজপেয়ী সন্দেহ করেছিল আমি কি বলতে চাই। সেইজন্যেই চলে গেল শিবনাথ বাজপেয়ী—সঙ্গে নিয়ে গেল সমস্ত হীরে জহরৎ।"

পরের দিন মানব মল্লিককে ফাদার ঘনশ্যাম বলল, "লালসাহেব হীরে-চোরেদের সম্রাট ছিল ঠিকই। কিন্তু মনে রাখবেন, তার একটা অহংকারও ছিল। লালসাহেব মানুষকে পথে বসিয়েছে, কিন্তু কখনো মানুষকে যমালয়ে পাঠায়নি। সেইজন্যেই অবাক হলাম। যে মানুষটা অনুতাপের আগুনে পুড়ে খাঁটি হয়ে এসেছে, সে হঠাৎ দু-দুটো মানুষ খুন করে চুরি করবে কেন। অসম্ভব নয় কি? তাই ধোঁকা লাগল। তারপরেই দেখলাম তারিণী দত্ত একটা লাল দাড়ি আর কালো চশমা নিয়ে এসেছেন। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল লালসাহেবের গালে আর চোখেও এ দুটি জিনিস দেখে এসেছি। জোড়াদাড়ি আর জোড়া চশমার কি দরকার? লালসাহেব যদি জানতই আজ রাতে ছদ্মবেশে তাকে হানা দিতে হবে, তাহলে অনায়াসেই পকেটে করে ছদ্মবেশ দুটো নিয়ে যেতে পারত। দাড়ি আর চশমা তো তার ঝোপেঝাড়ে গজায় না। দরকারের সময়ে পাওয়ার সম্ভাবনা যখন নেই, তখন রেখে গেল কেন? তবে কি একটা ছদ্মবেশ বাড়ীতে, আর একটা পকেটে ছিল? কোনো অপরাধীকে জোড়া জোড়া ছদ্মবেশ রাখতে শুনেছেন?

"যতই ভাবতে লাগলাম, ততই মনে হতে লাগল, অসম্ভব। ছদ্মবেশ পরবার জন্যে লালসাহেব শিবনাথের গাড়ী চড়ে বেরোয়নি। গাড়ী থেকে নেমেও ছদ্মবেশ পরেনি। এ ছদ্মবেশ বানিয়েছে অন্য কেউ, সেই পরিয়েছে লালসাহেবকে।"

"লাল সাহেবকে ছদ্মবেশ পরাবে কে?"

"যে তাকে গুলি করে মেরেছে গাড়ীর মধ্যে।"

"গাড়ীর মধ্যে! লালসাহেব তো গুলি খেয়েছে বাগানের মধ্যে?"

"না; গাড়ীর মধ্যে।" বাগানের মধ্যে রিভলবারের ফাঁকা আওয়াজ শুনেছেন। লালসাহেব তার অনেক আগেই ওপারে যাত্রা করেছে।"

"আঃ কি যে বলেন! আমরা সবাই তার মুখ দেখেছি জানলায়, চামেলিয়া প্রাসাদেও তার মুখ দেখা গেছে।"

"তা গেছে। তবে সে মুখে তখন প্রাণ ছিল না। শিবনাথ বাজপেয়ীই তাকে হত্যা করেছে গাড়ীর মধ্যে। তারপর গাড়ী করে লাশ নিয়ে চামেলিয়া প্রাসাদে গিয়ে বেশ-কয়েকটা জায়গায় পায়ের ছাপ আর আঙুলের ছাপ রেখে দিয়েছে, ছদ্মবেশ পরানো মুখটাও জানলা দিয়ে দেখিয়েছে। পুলিশ লালসাহেবের কুকীর্তির সব প্রমাণই পেয়েছে। বাজপেয়ী প্রাসাদেও একই ঘটনা ঘটেছে। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে শিবনাথের।"

"শিবনাথ! বলেন কি মশায়! অতিবড় দুঃস্বপ্নেও ওকে সন্দেহ করতে পারতাম না আমি!" বলল মানব মল্লিক।

"আর সেই কারণেই আমি তাকে সবার আগে সন্দেহ করেছি। মনে রাখবেন, বাজপেয়ী ভবনে তখনি লালসাহেবের মুখ দেখা গেছে যখন শিবনাথ বাজপেয়ী গিয়েছিল ঘরের বাইরে। নেকলেস আছে কিনা দেখতে গিয়ে সেই নেকলেস সরিয়েছে। তারপর লালসাহেবের মুখ জানলায় দেখিয়ে তাকে বাগানে ফেলে দিয়েছে। ছুটে আমাদের সামনে এসেছে। দেখা দিয়েই বাগানে গেছে। দুটো রিভলবার থেকেই পর-পর দুবার গুলি ছুঁড়েছে। আমরা জেনেছি, লালসাহেব আগে গুলি ছুঁড়েছে, তারপরেই গুলি ছুঁড়ে তাকে খতম করেছে শিবনাথ। কিন্তু ভুল, ভুল, সমস্তই ভুল। এ ভুল আমারও ভাঙত না যদি না জোড়া দাড়ির ধাঁধাটা মাথায় খোঁচা মারত।"

"কিন্তু লালসাহেব যদি মনে-প্রাণে সাধুই হয়ে গিয়ে থাকে তো পুরোনো দাড়িটা আর চশমাটা অত যত্ন করে রেখে দেবে কেন?"

"কুকীর্তির নিদর্শন হিসেবে—প্রতি মুহূর্তে বিবেকের দংশন অনুভব করার জন্যে।"

"আর সাংকেতিক হরফে লেখা জহরৎ মালিকদের ফিরিস্তিটা?"

চোখ মিটমিট করে ফাদার ঘনশ্যাম বলল, "সত্যিই কি ও ফিরিস্তি লালসাহেবের? তারিণী দত্ত বলেছিলেন, এসব কাজ একা হয় না, স্যাঙাৎ চাই। এক্ষেত্রে শিবনাথের স্যাঙাৎ কে?"

"তারিণী দত্ত নয় তো?" বিপুল উৎসাহে যেন ফেটে পড়ল মানব মল্লিক।

কিন্তু যেন আচমকা নিভে গেল ফাদার ঘনশ্যাম মণ্ডল। ম্লান বিষণ্ণ মুখে বলল, "কি জানি!"*

*বিদেশী ছায়ায়


মনের মতন গহনা
বি. সরকার এণ্ড সন্স
সন অফ লেট এম. বি. সরকার
১২৪, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলিকাতা-১২, ফোন: ৩৪-৯২০৩

গৌরাঙ্গ পরিজন

অচিন্তকুমার সেনগুপ্ত

(৫৮)

বেঙ্কটভট্ট

শ্রীরঙ্গম-নিবাসী বৈষ্ণব, লক্ষ্মী-নারায়ণের উপাসক।

প্রভু শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে পৌঁছুলে বেঙ্কটভট্ট তাঁকে বহুমাস নিমন্ত্রণ করে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেল। স্ববংশে তাঁর পাদোদক খেল। ভিক্ষা গ্রহণ করে প্রভু কিছুটা সুস্থ হলে ভট্ট বললে, চাতুর্মাস্য কাছে এসে পড়েছে, কৃপা করে এই চার মাস অধীনের গৃহে থাকুন। কৃষ্ণকথা শুনিয়ে আমাকে নিস্তার করুন।

প্রভু রাজি হলেন। ভট্টগৃহে সুরু হল কৃষ্ণনামগান, কৃষ্ণকথাপ্রসঙ্গ। প্রভু প্রত্যহ কাবেরীতে স্নান করে শ্রীরঙ্গ দর্শন করেন, নৃত্য করেন প্রেমাবেশে। হাজার হাজার লোক এসে সমবেত হয় প্রভুকে দেখতে, নামকথায় লুব্ধ হয়ে। প্রভুর সৌন্দর্য আর প্রেমাবেশ দেখে শোক-দুঃখ ভুলে যায়। কৃষ্ণ-নাম ছাড়া আর কোনো কথা তাদের মুখে আসে না।

একদিন শ্রীরঙ্গের মন্দিরে গিয়েছেন প্রভু, দেখলেন এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ তন্ময় হয়ে গীতা পড়ছে। অর্থ বা ব্যাকরণের ধার ধারছে না, উচ্চারণও অশুদ্ধ। যারা শুনছে উপহাস করছে কিন্তু ব্রাহ্মণের চাঞ্চল্য নেই। সে আন্তরিক আনন্দরসে ভরপুর।

দেখে প্রভুও আনন্দে ভরে উঠলেন। ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞেস করলেন, কোন শ্লোকের কোন অর্থ জেনে তোমার এত সুখ?

ব্রাহ্মণ মুগ্ধের মত তাকাল প্রভুর দিকে। বললে, আমি মূর্খ, আমি শব্দার্থও জানি না। আমার পাঠ শুদ্ধ হচ্ছে না অশুদ্ধ হচ্ছে সে বিচারেরও আমার ক্ষমতা নেই। আমার গুরু আমাকে গীতা পাঠ করতে বলেছেন তাই পাঠ করে যাচ্ছি। যতক্ষণ পড়ছি দেখছি অর্জুনের রথে শ্যামলসুন্দর কৃষ্ণ একহাতে রজ্জু, আরেক হাতে চাবুক নিয়ে বসে অর্জুনকে হিতোপদেশ শোনাচ্ছেন। পড়লেই কৃষ্ণকে দেখতে পাই বলে পড়া ছাড়তে পারি না।

প্রভু বললেন, গীতা পাঠে তোমারই সত্যিকার অধিকার। তুমিই গীতার সার অর্থ বুঝতে পেরেছ। বলে প্রভু তাকে আলিঙ্গন করলেন।

প্রভুর পা ধরে ব্রাহ্মণ বললে, অর্জুনের রথে কৃষ্ণকে দেখে আমার যে সুখ, তোমাকে দেখে তার দ্বিগুণ সুখ হচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে তুমিই সেই রথের কৃষ্ণ।

প্রভু বললেন, এমন কথা মুখেও এনো না।

কিন্তু তার মনের কথা বাইরে কারু কাছে প্রকাশ না করলেও ব্রাহ্মণ প্রভুর সঙ্গ ছাড়ল না, ছায়ার মত ফিরতে লাগল।

ভট্টের গৃহে অন্তরঙ্গ অতিথি হয়ে নিরন্তর থাকার দরুন প্রভুর সঙ্গে ভট্টের সখ্যভাব জন্মাল। আর সখ্যভাবের লক্ষণই হাস্য-পরিহাস।

ভট্টের মতে নারায়ণই স্বয়ং ভগবান আর লক্ষ্মী পতিব্রতা-শিরোমণি। তাই লক্ষ্মী-নারায়ণই তার একমাত্র উপাস্য।

কিন্তু এই লক্ষ্মীই বৃন্দাবনে কৃষ্ণসঙ্গ পাবার জন্যে বৈকুণ্ঠের সুখৈশ্বর্য ছেড়ে কঠোর তপস্যা করেছিল। সেই প্রসঙ্গের ইঙ্গিত করে প্রভু একদিন ভট্টকে প্রশ্ন করলেন, তোমার লক্ষ্মী নারায়ণের বক্ষ-বিলাসিনী, সাধ্বী-শিরোমণি আর আমার কৃষ্ণ গয়লা, গরু চরায়। তোমার লক্ষ্মী সেই কৃষ্ণের সঙ্গমলাভের ইচ্ছায় বৈকুণ্ঠের সুখ-ভোগ ছেড়ে কেন ব্রতনিয়ম ধারণ করে তপস্যা করতে বসলেন?

ভট্ট বললে, কৃষ্ণ আর নারায়ণ স্বরূপে অভিন্ন। কৃষ্ণে রূপ-লীলা বৈদগ্ধ-মাধুর্য বেশি। লক্ষ্মী যদি কৌতুকচ্ছলে সেই কৃষ্ণের সঙ্গ-সান্নিধ্য অভিলাষ করে, তাহলে তার পাতিব্রত্য ক্ষুণ্ণ হয় না।

ক্ষুণ্ণ যে হয় না তা আমি মানি। বললেন প্রভু, কিন্তু শাস্ত্র বলে লক্ষ্মী তপস্যা করেও রাসলীলায় কৃষ্ণসঙ্গ পেল না। কেন পেল না? তপস্যা করে দেবতারা পর্যন্ত পেল কিন্তু তোমার লক্ষ্মী পেল না কেন? বলো কারণ কী?

আমি ক্ষুদ্র জীব আমি তার কী জানি। তুমিই বলতে পারো কেন তুমি লক্ষ্মীকে সঙ্গ দাওনি। তোমার লীলামর্ম বুঝি আমার এমন সাধ্য কী।

প্রভু মৃদু হেসে বললেন, কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। নারায়ণ তার বিলাসমূর্তি। কৃষ্ণের এই এক অদ্ভুত স্বভাব সে নিজের মাধুর্যে সকলকে সব সময়ে আকর্ষণ করে থাকে, মানুষ থেকে স্থাবর-জঙ্গম পর্যন্ত—এমন কি নিজেকেও। এ বৈশিষ্ট্য নারায়ণে নেই। কৃষ্ণকে ব্রজজনেরা ঈশ্বর মনে করে না, আপনজন মনে করে। গোপীভাব ভজন করে গোপীদেহ প্রাপ্ত না হলে কৃষ্ণের প্রেয়সী হওয়া যায় না। কৃষ্ণের মাধুর্য লক্ষ্মীকেও আকৃষ্ট করেছে—নারায়ণের সাধ্য নেই সেই আকর্ষণ থেকে লক্ষ্মীকে বিরত করে। কিন্তু লক্ষ্মী গোপী-দেহে না চেয়ে দেবী-দেহেই কৃষ্ণসঙ্গম চেয়েছিল। তাই তার সে আকাঙ্ক্ষা নিষ্ফল হল।

ভট্টের গর্ব পরিহাসচ্ছলে খর্ব করলেন প্রভু। দেখালেন লক্ষ্মী-নারায়ণের ভজন নয়, কৃষ্ণভজনই সর্বোচ্চ ভজন।

দেখলেন ভট্টের মুখখানি ম্লান হয়ে গিয়েছে। তখন প্রভু তাঁর সিদ্ধান্তের গূঢ়ার্থ উন্মোচন করলেন। বললেন, তুমি দুঃখিত হয়ো না, শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত শোনো। কৃষ্ণ আর নারায়ণ যেমন এক, গোপী আর লক্ষ্মীও তেমনি এক। লক্ষ্মী দেবী-দেহে কৃষ্ণসঙ্গ পায়নি বটে কিন্তু গোপী-দেহে পেয়েছে। গোপীদেহে লক্ষ্মীই তো রাধিকা। নারায়ণ যেমন কৃষ্ণের বিলাস, লক্ষ্মীও তেমনি রাধিকার বিলাস। তাই রাধা যখন কৃষ্ণসঙ্গ পেল, তখন লক্ষ্মীও কৃষ্ণসঙ্গই পেল। ঈশ্বরত্বে কোনো ভেদ নেই। একই ঈশ্বর ভক্তের ধ্যান অনুরূপ একই বিগ্রহে নানা রূপ ধরেন। ভক্তের ধ্যানভেদে বিগ্রহের রূপভেদ হলেও অচ্যুত অচ্যুতই থাকেন, নিজেকে ন্যূন করেন না।

ভট্ট প্রসন্ন হল। বললে, ঈশ্বরের অগাধ লীলার আমি কী জানি। তুমিই সাক্ষাৎ ঈশ্বর। তুমি যা বলছ তাই সত্য বলে মানছি। বুঝতে পারছি লক্ষ্মী-নারায়ণ আমাকে পূর্ণ কৃপা করেছেন, তাই তোমার চরণ-দর্শন পেলাম। বুঝলাম কৃষ্ণভক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ ভজন।

চাতুর্মাস্য পূর্ণ হলে প্রভু শ্রীরঙ্গম ত্যাগ করে চললেন দক্ষিণে। সঙ্গে সঙ্গে চলল বেঙ্কটভট্ট আর তার কিশোর পুত্র গোপাল।

বেঙ্কটকে অনেক বুঝিয়ে ফিরিয়ে দিলেন প্রভু, কিন্তু গোপাল ফিরতে চায় না। সে কাঁদতে লাগল। আমি আপনার সঙ্গে যাব। সন্ন্যাসী হব।

এতদিন প্রভুর অন্তরঙ্গ সেবা করেছে গোপাল। প্রভুর কৃপায় তার মধ্যে জেগেছে প্রেমভক্তি। পিতৃব্য প্রবোধানন্দের কাছে বিদ্যাশিক্ষা করেছে। প্রবোধানন্দকেই প্রভু বলে দিয়েছিলেন যথাকালে গোপালকে বৃন্দাবনে পাঠিয়ে দিও।

কিন্তু তা এখন কী?

প্রভু তাকে বুঝিয়ে বললেন, যতদিন বাবা-মা বেঁচে আছেন ঘরে থেকে তাঁদের সেবা করো। পরে কোরো সংসার ত্যাগ।

এই গোপালই ছয় গোস্বামীর এক গোস্বামী—গোপালভট্ট গোস্বামী।

(৫৯)

বল্লভ ভট্ট

প্রয়াগের কাছাকাছি আড়েল গ্রামে থাকে—বল্লভ ভট্ট বালগোপালের ভক্ত। প্রভু প্রয়াগে এসেছে শুনে দেখা করতে এল। লোকমুখে এত কথা শুনি, স্বচক্ষে দেখে আসি।

দেখেই চক্ষুস্থির। এ কে [illegible] লাবণ্যপ্রদীপ! তক্ষুনি দণ্ডবৎ করল বল্লভ। প্রভু তাকে আলিঙ্গন করলেন।

প্রভু কিশোর-কৃষ্ণের ভক্ত। সুরু করলেন কৃষ্ণকথা। বল্লভ নতুন লোক তাই সংকোচ হওয়ায় প্রেমোচ্ছ্বাস সংবরণ করলেন। কিন্তু এই অন্তরমন্থন প্রেম কি রাখা যায় প্রচ্ছন্ন করে?

বল্লভ বিস্ময় মানল। এমনটি দেখবে যেন কল্পনাও করেনি। প্রভুকে নিজ গৃহে নিমন্ত্রণ করল।

রূপ আর অনুপম এসে হাজির। প্রভু ওদের দু ভাইয়ের সঙ্গে বল্লভের পরিচয় করিয়ে দিলেন। দু ভাই দূরে থেকে পরম দৈন্যে বল্লভকে দণ্ডবৎ করল। বল্লভ ওদের দিকে এগিয়ে যেতেই ওরা দুজন দূরে পালাল। বললে, আমরা অস্পৃশ্য পামর, আমাদের ছুঁয়ো না।

সে কী কথা! বল্লভ তাকাল প্রভুর দিকে।

দু ভাইয়ের দৈন্য দেখে প্রভু কিন্তু আনন্দিত। বললেন, ওরা ঠিকই বলেছে। তুমি বৈদিক যাজ্ঞিক কুলীন, তুমি ওদের ছুঁয়ো না। ওরা হীন জাত।

হীন জাতি! বল্লভ অবাক হল। এদের মুখে যে কৃষ্ণনাম। যার জিভে নিরন্তর কৃষ্ণনাম নৃত্য করে সে অধম হয় কী করে, অস্পৃশ্য হয় কী করে? এরা নরোত্তম।

বল্লভের কথায় প্রভু আরো আনন্দিত হলেন। বললেন, তুমি আমার প্রাণের কথাই বলেছ। যে নীচকুলে জন্মেছে সদ্ভক্তির দীপ্ত আগুনে তার সমস্ত হীনতা দগ্ধ হয়ে গেছে। ভক্তিহীন বেদজ্ঞের চেয়েও সে পূজনীয়। যার ভগবানে ভক্তি নেই তার কৌলীন্য বা শাস্ত্রজ্ঞান বা জপতপ সমস্ত নিরর্থক। প্রাণহীন দেহের বসন-ভূষণের মতই অসার।

প্রভুর প্রেমাবেশ ও ভক্তিপ্রভাব দেখে বল্লভ মুগ্ধ হয়ে গেল। নৌকো করে প্রভুকে নিয়ে চলল বাড়িতে।

যমুনার উপর দিয়ে নৌকো যাচ্ছে। যমুনার শ্যামল চিক্কণ শীতল জল দেখে প্রভু ঝাঁপিয়ে পড়লেন। জল দেখে বুঝি কৃষ্ণকে মনে পড়ল, ঝাঁপ দিলেন রাধাবেশে।

বল্লভ ভয়ে কাঁপতে লাগল। নৌকোর লোকজন তুলল প্রভুকে। কিন্তু এ-কী, নৌকোতে উঠেই প্রভু নাচতে লাগলেন। নৌকো টলমল করতে লাগল, জল উঠল ঝলকে-ঝলকে। সবাইকে নিয়ে নৌকো বুঝি এবার ডোবে। প্রভু চাইছেন ধৈর্য ধরতে, কিন্তু দুর্বার প্রেম শাসন মানছে না। কোনো রকমে ঘাটে এসে নৌকো লাগল।

বল্লভ সাবধানে প্রভুকে মধ্যাহ্নস্নান করিয়ে ঘরে নিয়ে এল। নতুন কৌপীন আর বহির্বাস পরাল। দিব্যাসনে বসিয়ে পা ধুইয়ে চরণামৃত সবংশে মাথায় ধরল। দীপে-ধূপে, গন্ধে-পুষ্পে প্রভুর পূজা করল —মহাপূজা। রূপ আর অনুপম পেল প্রভুর অবশেষ-পাত্র। মুখবাস দিয়ে শয়ন করাল প্রভুকে। বল্লভ পা টিপতে বসল।

প্রভুকে নিজের লেখা কৃষ্ণলীলা পড়ে শোনাল। ক্রমে ক্রমে বাড়তে লাগল গ্রাম্য জনতা। বল্লভ প্রভুকে আবার নৌকো করে [illegible] পৌঁছিয়ে দিল।

তারপর প্রভু যখন নীলাচলে, কয়েক বছর পর বল্লভ একদিন তাঁর চরণে এসে উপস্থিত হল। চরণবন্দনা করতেই প্রভু তাকে ভক্তজ্ঞানে আলিঙ্গন করলেন।

বহুদিন থেকে বাসনা তোমাকে আবার দেখি। বল্লভ বললে, জগন্নাথ সে বাসনা পূর্ণ করলেন। এই বলে বল্লভ প্রভুর স্তুতি করতে আরম্ভ করল। তুমিই ব্রজেন্দ্রনন্দন। তোমাকে স্মরণ করলেই লোকে পবিত্র হয় দর্শন করলে যে হবে তা আর বিচিত্র কী। তুমিই সংসারে কৃষ্ণনাম আনলে। তোমাকে যে দেখে সেই কৃষ্ণপ্রেমিক হয়ে ওঠে। একমাত্র কৃষ্ণই প্রেমদানে সমর্থ। তুমি যখন সকলের জন্যে সেই কৃষ্ণনাম এনে দিচ্ছ তখন তুমিই শ্রীকৃষ্ণ।

প্রভু বুঝলেন বল্লভ কৃষ্ণভক্তির অভিমান নিয়ে এসেছে, এইসব স্তুতি সেই অভিমানেরই ভূমিকা। তিনি তাই দৈন্য প্রকাশ করে বললেন, তোমার ভুল হচ্ছে আমি কৃষ্ণভক্ত নই, আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী। যদি কৃষ্ণভক্ত কেউ থাকে সে হচ্ছে অদ্বৈত আচার্য। তাঁর সঙ্গ করেই আমার মন নির্মল হয়েছে। আর নিত্যানন্দের কথা কী বলব? সে সাক্ষাৎ ঈশ্বর, সর্বদাই কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা। ভক্তির কথা সে বলতে পারে। আর বলতে পারে সার্বভৌম। ষড়দর্শনে সে পণ্ডিত, আবার সে ভাগবতোত্তম। সেই আমাকে বোঝাল কৃষ্ণভক্তিই সমস্ত সাধনের সার কথা। আরেক ভক্ত রামানন্দ। সে বোঝাল কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান আর প্রেমভক্তিই জীবের পরম পুরুষার্থ। আর এই প্রেমভক্তি শুধু রাগমার্গে। সে আমাকে রাগমার্গের ভজন শেখালে। কিন্তু শিখলাম কই?

বল্লভ সবিস্ময়ে তাকাল। প্রভুর আবার শিখতে কিছু বাকি আছে নাকি?

প্রভু বললেন, রামানন্দ শেখাল ঐশ্বর্য-জ্ঞানে কৃষ্ণকে পাওয়া যায় না। স্বয়ং লক্ষ্মী বক্ষবিলাসিনী হয়েও ব্যর্থ হল। সে তো গয়লার মেয়ে নয়, সে সম্রাজ্ঞী। একমাত্র ঐশ্বর্যজ্ঞানহীন শুদ্ধ প্রেমই কৃষ্ণকে বাঁধতে পারে। সে প্রেমের কথাই রামানন্দ আমাকে শিখিয়েছে। রামানন্দ তো শুধু শাস্ত্রজ্ঞ নয়, সে রসবেত্তা।

বল্লভ মথা হেঁট করল। এ বুঝি তারই প্রতি ইঙ্গিত। এর অর্থ বোধহয় এই যে, শুষ্ক শাস্ত্রজ্ঞানে কিছু হবার নয়, চাই রসানুভূতি।

আর স্বরূপ দামোদর? প্রভু বললেন বিহ্বল স্বরে, সে মূর্তিমান প্রেমরস। তার কাছ থেকেই আমি জেনেছি গোপীপ্রেম। কাম-গন্ধের লেশমাত্র নেই, শুধু কৃষ্ণসুখে আনন্দিত। কৃষ্ণকে মর্যাদা দিতে অসম্মতি, ভালোবাসায় ভর্ৎসনা করতেও প্রস্তুত। এই সর্বাতিশয়ী প্রেমের কথাই স্বরূপ আমাকে বলেছে।

বল্লভ মুগ্ধের মত তাকিয়ে রইল।

আর হরিদাস আমাকে নাম শিখিয়েছে। দিন তিনলক্ষ নাম করে হরিদাস। তার প্রসাদেই আমি জানলাম নামের কী মহিমা। [illegible],

আচার্যনিধি, গদাধর, দামোদর, জগদানন্দ শঙ্কর চক্রেশ্বর কাশীশ্বর বাসুদেব মুরারি এরাই জগতে অকুণ্ঠকণ্ঠে নাম প্রচার করল, এদের থেকেই শিখলাম কৃষ্ণভক্তি।

আশ্চর্য, বল্লভের নাম তো কোনো প্রসঙ্গেই উল্লেখ করছেন না। শুধু তাঁর পার্ষদদেরই গৌরব দিচ্ছেন। যেন বলছেন, আমি কোন ছার, আমার থেকে আমার পার্ষদেরা বেশী রসিক।

আপনার সে সব বৈষ্ণবেরা থাকে কোথায়? বল্লভ ক্ষুব্ধস্বরে জিজ্ঞেস করল।

এখানে যখন এসেছ তখন দেখতে পাবে।

দেখা পেতে দেরি হল না। প্রভুর কাছে বৈষ্ণবেরা এসে পড়ল। প্রভু সকলের সঙ্গে বল্লভের পরিচয় করিয়ে দিলেন। কী তাদের দেহ-জ্যোতি, দেখে বল্লভ বিশীর্ণ হয়ে গেল। ওদের কাছে নিজেকে মনে হল সূর্যের কাছে জোনাকি।

তবু বিদ্যার অভিমান যায় না। বল্লভের মনে প্রচ্ছন্ন অহংকার, বৈষ্ণবসংঘ তে সে ভালো জানে, ভাগবতের অর্থ ও তার মত কেউ ব্যাখ্যা করতে পারে না। বস্তুত নিজের বিদ্যাবত্তা প্রচার করতেই তার নীলাচলে আসা। সে কথাটা কিছুতেই সে ভুলতে পারছে না। প্রভু যে তার মনের কথাটা প্রারম্ভেই টের পেয়েছেন এও তার ধারণায় নেই।

বল্লভ বললে, ভাগবতের কিছু টীকা লিখে এনেছি, আপনাকে শোনাতে চাই।

প্রভু বললেন ভাগবতের অর্থ বুঝি আমার এমন সামর্থ্য নেই। আমি শুধু কৃষ্ণ-নাম নিই, তা-ও রাত্রিদিনে আমার সংখ্যা পূরণ হয় না।

সর্বজ্ঞ প্রভু বুঝতে পেরেছিলেন বল্লভের টীকা সারশূন্য। বিদ্যা-বুদ্ধির জোরে সে টীকা লিখেছে, ভজনান্বিত ভক্ত হৃদয় থেকে নয়। ভক্তিতে চিত্ত যদি নির্মল না হয় তা হলে ভাগবতের অর্থ তাতে স্ফুরিত হবে কী করে?

আমার টীকায় আমি কৃষ্ণনামের বহু অর্থ করেছি। বল্লভ অনুরোধ করল, আপনি এক-বার দয়া করে শুনুন।

প্রভু দৃঢ়স্বরে বললেন, আমি কৃষ্ণনামের বহু অর্থ মানি না। আমি শুধু এক অর্থ মানি। সে হচ্ছে শ্যামসুন্দর যশোদানন্দন। আর যদি কোনো অর্থ থাকেও, তাতে আমার দরকার নেই।

যেহেতু প্রভু উপেক্ষা করেছেন নীলচল-জন কেউ বল্লভের টীকা শুনতে রাজি হল না।

বল্লভ তখন গদাধরের শরণ নিল।

তুমি কৃপা করে আমাকে বাঁচাও। আমার নামব্যাখ্যা শোনো। অন্তত তুমি যদি শোনো তাহলেও আমার এ কলংকের স্খালন হয়।

গদাধর সংকটে পড়ল। কেউ যখন শুনল না তখন আমি শুনি কী করে? তাঁর হাঁ-না কিছু বলবার আগেই বল্লভ পড়তে সুরু করে দিল।

গদাধরের সংকট গুরুতর হল। অথচ শালীনতার খাতিরে বাধাও দিতে পারল না। মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগল, হে কৃষ্ণ রক্ষা করো। প্রভুকে আমার ভয় নেই। তিনি অন্তর্যামী, তিনি বুঝবেন আমার অবস্থা—

আমি শুনতে না চাইলেও আমাকে জোর করে শোনাচ্ছে, আমার অনিচ্ছাকে গ্রাহ্য করছে না। আমি বিনয়ী বলেই চুপচাপ আছি।

কেন চুপচাপ থাকবে? পার্ষদরা ক্ষমা করল না। কেন তুমি নিষেধ করবে না? নিষেধ করতে না পারো, স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যেতে কী বাধা ছিল? এ কেমনতর বিনয়?

গদাধর জানে এ তাদের প্রণয়রোষ, সত্যিকারের ক্রোধ নয়। তারা ছাড়া আর কে বেশি জানে প্রভুর প্রতি তার কী গভীর ভালোবাসা!

বল্লভ তবু নিরস্ত হয় না। একদিন প্রভুর সকাশেই পার্ষদদের তর্কে আহ্বান করে বসল। এস বিদ্যাবিচার করা যাক। ভক্তির কথা পরে হবে, আগে যুক্তির কথা হোক।

অদ্বৈত আচার্যকে লক্ষ্য করে বল্লভ প্রশ্ন করল, 'জীব তো কৃষ্ণের প্রকৃতি বা স্ত্রী। তাই জীব কৃষ্ণকে পতি বলে মানে। যে স্ত্রী পতিব্রতা সে পতির নাম নেয় না। তোমরা কোন ধর্মে তবে কৃষ্ণের নাম নাও?'

অদ্বৈত প্রভুর দিকে ইঙ্গিত করে বললে, তোমার সামনে যে মূর্তিমান ধর্ম বসে আছেন তিনিই এর উত্তর দেবেন।

প্রভু বললেন, পতিব্রতা স্ত্রীর ধর্মই হচ্ছে স্বামী-আজ্ঞা পালন করা। এখানে স্বামী স্ত্রীকে আদেশ করেছে, নিরন্তর আমার নাম নাও। পতিব্রতা স্ত্রী সেই আদেশ পালন করছে আর তার ফল পাচ্ছে। কী ফল? ফল প্রেম-ফল।

বল্লভের মুখে আর কথা নেই। দুঃখিত হয়ে সে আবার বাড়ি ফিরল।

তবু তার অহঙ্কার যায় না। আরেক দিন এসে বললে, আমি ভাগবতের শ্রীধর-ব্যাখ্যা খণ্ডন করেছি। আমি যুক্তি-প্রমাণ প্রয়োগ করে দেখিয়েছি তার সিদ্ধান্তে দোষ হয়েছে। পূর্বাপর সামঞ্জস্য নেই।

শ্রীধর স্বামী ভাগবতের শ্রেষ্ঠ টীকাকার ভক্তিপ্রেমের প্রচারক। ভক্তিপ্রেমই তার একমাত্র সিদ্ধান্ত।

গর্বভরে বল্লভ বলে উঠল, আমি স্বামী মানি না।

প্রভু উপেক্ষার হাসি হেসে বললেন, যে স্বামী মানে না সে তো গণিকার মধ্যেই গণনীয়া।

অর্থাৎ যে শ্রীধর স্বামীর টীকা মানে না শাস্ত্রার্থের দিক থেকে সে ব্যভিচারী।

বল্লভ স্তব্ধ হয়ে গেল।

তার গর্ব চূর্ণ করে দিলেন প্রভু। মঙ্গলে-মাধুর্যে জগতের শোধন করবেন বলেই গৌর অবতীর্ণ। তাই নানা অবজ্ঞা-উপেক্ষায় বল্লভের অভিমান নাশ করলেন। বল্লভ বুঝল আঘাতই প্রভুর হিতস্পর্শ। আগে প্রয়াগে প্রভু আমাকে কত কৃপা করেছিলেন। এখন আমার প্রতি তাঁর কেন এই বৈরূপ্য ঘটল? শুধু বিদ্যাবিচার করে অগম জয়ী হব আমার এই অন্ধ ঔদ্ধত্যের জন্যেই এই শাসন। ঠিক হয়েছে, আমাকে তিনি অপমান করেছেন। এই অপমানই আমার মঙ্গল মহৌষধ।

বল্লভ প্রভুর চরণে এসে পড়ল। বললে, তোমার সামনে পাণ্ডিত্য প্রকট করতে চেয়েছিলাম, তোমার কৃপার অঞ্জনে আমার অন্ধতার মোচন হল। আমার মাথায় তোমার চরণ রাখো।

প্রভু তাকে কৃপা করলেন। বললেন, তুমি একাধারে পণ্ডিত ও মহাভাগবত। পাণ্ডিত্য আর ভাগবতত্তা এই দুই গুণ যার মধ্যে বর্তমান, সে গর্বিত হয় কী করে? শ্রীধর স্বামীর টীকার আনুগত্য স্বীকার করেই ভাগবত-ব্যাখ্যা সম্ভব। তুমি তাঁকে নিন্দা কোরো না, অতিক্রমও কোরো না। অভিমান ছেড়ে কৃষ্ণ-ভজন করো, নিরপরাধে করো কৃষ্ণকীর্তন।

যদি আমার উপরে প্রসন্ন হলে, বল্লভ, তবে আরেকদিন আমায় নিমন্ত্রণ নাও।

প্রভু নিলেন নিমন্ত্রণ।

তারপর তিনি গদাধরকে নিয়ে পড়লেন। কেন সেদিন সে বল্লভ ভট্টের টীকা শুনেছিল? ভেবেছিলেন গদাধর বুঝি স্বপক্ষে সাফাই দেবে—আমি কী করব, জোর করে শোনালে আমার উপায় কী। কিন্তু, না, গদাধর চুপ করে রইল।

গদাধরকে বল্লভ বললে, আমাকে কিশোর-গোপাল মন্ত্রে দীক্ষা দাও।

আমি পরতন্ত্র, প্রভুর অধীন। বললে গদাধর, আমার প্রভু গৌরচন্দ্রের আদেশ ছাড়া দীক্ষা দিতে পারব না। তুমি যে আমার এখানে আস তাইতেই তাঁর অসন্তোষ।

স্বরূপ বুঝিয়ে দিল, তোমার প্রতি প্রভুর যে রোষ সেটা কৃত্রিম। তিনি দেখতে চেয়েছিলেন তুমিও ক্রুদ্ধ হও কিনা।

আমি তাঁর সঙ্গে বিবাদ করব? তাঁকে দেখাব আমার ক্রোধ? বললে গদাধর, তিনি যা দেন, প্রেম বা উপেক্ষা, ক্রোধ বা অনুরাগ, সবই শিরোধার্য করি। তিনি জানেন আমার অন্তরে কী আছে!

গদাধর প্রভুর কাছে এসে দাঁড়াতে প্রভু হাসিমুখে বললেন, আমি তোমাকে খেপাতে চাইলাম, তুমি একটুও খেপলে না। কিছু বললেও না রাগ করে। সরল ভাবেই কিনে নিলে আমাকে।

এর জন্যেই তো প্রভুর এক নাম 'গদাধর-প্রাণনাথ'। আরেক নাম 'গদাইয়ের গৌরাঙ্গ'।

গদাধর বল্লভের প্রস্তাবের কথা জানাল প্রভুকে। প্রভু সম্মতি দিলেন। বল্লভ গদাধরের কাছ থেকে কিশোর-গোপালের মন্ত্র নিল।

বল্লভ সপরিবারে বৃন্দাবনে চলে গেল। সেখানে প্রভুর শ্রীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করে নিত্য-সেবায় আত্মনিয়োগ করলে।

(ক্রমশঃ)



আলোচনা :

রাষ্ট্রভাষা

যোগনাথ মুখোপাধ্যায়

সম্প্রতি সংসদে যে ভাষাবিল উত্থাপিত হয় তাতে হিন্দীর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা হয়নি। শুধু বলা হয়েছে যে, অহিন্দীভাষী রাজ্যগুলি সম্মত না হওয়া পর্যন্ত তাদের উপর জোর করে হিন্দী চাপিয়ে দেওয়া হবে না, এবং তারা নিজরাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনা বা কেন্দ্র ও অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার কাজে ইংরেজি ব্যবহার করাতে পারবে। কিন্তু জবরদস্ত হিন্দীওয়ালারা এইটুকু সুবিধাও অহিন্দীভাষী রাজ্যগুলিকে দিতে রাজী নন। তাই তাঁরা সংসদের ভিতরে সংশোধিত ভাষা বিলের কপি পুড়িয়ে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন; হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের প্রধান ঘাঁটি উত্তরপ্রদেশের শহরগুলিতে মশাল, ইট, আলকাতরা হাতে নিয়ে মিছিল বার করে তাণ্ডব নৃত্য করেছেন। হিন্দীওয়ালাদের দুর্ভাগ্য, হিন্দী এলাকার বাইরে কোথাও হিন্দী রাজের সমর্থনে একটি কথাও উচ্চারিত হয়নি। এমন কি উত্তরপ্রদেশের বাইরে অন্যান্য হিন্দীভাষী রাজ্যগুলিতেও সংশোধিত সরকারী ভাষা বিলের বিরুদ্ধে কোন আন্দোলনের তরঙ্গ উত্তাল হয়নি। পাঞ্জাব, সিন্ধু, গুজরাট, মারাঠা দ্রাবিড়, উৎকল বঙ্গ সব আজ একমত, জনগণমন প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত হিন্দীকে অপেক্ষা করতেই হবে। সে প্রস্তুতির জন্য কোন সময় নির্দেশও কেউ করতে রাজি নয়।

দুই-তৃতীয়াংশ ভারতের হিন্দী সম্বন্ধে এই অনিচ্ছা হিন্দীভাষীদের যতই ক্ষোভের কারণ হক, এটা কোন অভিনব ঘটনা নয়। পৃথিবীতে বহু ভাষাভাষী রাষ্ট্রের সংখ্যা কম নয়, কিন্তু হিন্দীভাষীরা এমন একটি রাষ্ট্রেরও উদাহরণ দিতে পারবে না যেখানে একটি ভাষার রাষ্ট্রভাষারূপে প্রতিষ্ঠার দাবী আর সকল ভাষাভাষী গোষ্ঠী নীরবে মেনে নিয়েছে। প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানে উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষারূপে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা কম হয়নি। বুলেটের জোরে পাক সরকার বৃহত্তম ভাষাগোষ্ঠী বাঙ্গালীর কণ্ঠরুদ্ধ করতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সে চেষ্টার ব্যর্থতার ইতিহাস কারও অজানা নেই। পূর্ব পাকিস্তানের ছয় কোটি বাঙ্গালির দাবী মানতে বাধ্য হয়েছে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসন। উর্দু, বাংলা দুই-ই এখন পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। দ্বিভাষী [illegible] কানাডা ও বেলজিয়ামের ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসও একই সাক্ষ্য বহন করে।

১৯৬১ সালের লোক গণনার হিসাব অনুসারে কানাডার অধিবাসীদের মধ্যে ১ কোটি ৭ লক্ষ ইংরেজিভাষী ও ৫১ লক্ষ ২৩ হাজার ফরাসীভাষী। অবশিষ্ট কিছু লোক, যা মোট লোকসংখ্যার ১-৩ শতাংশ, দুটি ভাষার কোনটিই জানে না। ১৮৬৭ সালে কানাডা একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং তখন থেকেই ইংরেজি কানাডার একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। ফরাসী ভাষা শুধু স্বীকৃতি লাভ করে কানাডার কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টে, যুক্ত রাষ্ট্রীয় আদালতে, আর কুইবেক প্রদেশে। তারপর একশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে কিন্তু কোনদিনই ফরাসী ভাষী কানাডিয়ানরা তাদের ভাষার এই দ্বিতীয় শ্রেণীর মর্যাদা স্বীকার করে নেয়নি। বর্তমানে কানাডার মাত্র ১২ শতাংশ লোক ইংরেজি ও ফরাসী দুটি ভাষাই জানে। অবশিষ্টদের মধ্যে ৬৭ শতাংশ জানে শুধু ইংরেজি, আর ১৯ শতাংশ শুধু ফরাসী। যারা দ্বিভাষী তাদের মধ্যে আবার শতকরা ৬০ জনের বাস কুইবেক প্রদেশে। এই থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, জীবিকার প্রয়োজনে শুধু ফরাসীদেরই দুটি ভাষা শিখতে হচ্ছে, আর ইংরেজিভাষীরা ফরাসী শেখার কোন প্রয়োজনই বোধ করছে না। এই অবমাননা ও বৈষম্য কানাডার ফরাসীভাষী লোকেরা কিছুতেই মেনে নিতে রাজী নয়। এই জন্য শতাব্দীকাল অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও কানাডার ফরাসীভাষীদের বিক্ষোভ ও আন্দোলন স্তিমিত না হয়ে উত্তরোত্তর শক্তিশালী হয়ে উঠছে। আর সংখ্যাগরিষ্ঠ ইংরেজিভাষীরা শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে সে দাবী অস্বীকার করতে থাকায় আজ ফরাসীভাষী কুইবেক কানাডা যুক্তরাষ্ট্র থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর্যন্ত দাবী তুলেছে। কানাডার যুক্তরাষ্ট্র সরকার আজ একথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে ফরাসীভাষীদের দাবী যথাযথ স্বীকৃতি লাভ না করার জনাই কানাডার বিচ্ছিন্নতাকামী শক্তি প্রবল হয়ে উঠেছে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, ফরাসী ভাষা ইংরেজি ভাষার সমান মর্যাদা না লাভ করা পর্যন্ত কানাডার ফরাসীভাষীদের বিক্ষোভ প্রশমিত হবে না।

বেলজিয়ামে ভাষা বিদ্বেষ এমন তীব্র হয়ে উঠেছে যে, ভৌগোলিক ঐক্য কোন রকমে বজায় থাকলেও পশ্চিম ইউরোপের ঐ ক্ষুদ্র দ্বিভাষী রাজ্যটি এখন কার্যত দ্বিধা বিভক্ত।

বেলজিয়ামের ৯৩ লক্ষ ২৮ হাজার লোকের মধ্যে প্রায় ৫২ লক্ষ ফ্লেমিশ, আর ৪১ লক্ষ ওয়ালুন। ফ্লেমিশরা হল ওলন্দাজ, তাদের ভাষার সঙ্গে ডাচ ভাষার সামান্য পার্থক্য। আর ওয়ালুনরা ফরাসী। ফ্লেমিশরা থাকে বেলজিয়ামের উত্তর দিকে, যে অঞ্চলের নাম ফ্লান্ডার্স। ওয়ালুনদের বাসভূমি বেলজিয়ামের দক্ষিণাংশে, সে এলাকার নাম ওয়ালোনিয়া। ফ্লেমিশরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও ফরাসীদের তুলনায় অনেক পেছিয়ে ছিল এতদিন। তাই বেলজিয়াম রাষ্ট্র সৃষ্ট হওয়ার পর থেকে (১৮৩১ সালে হল্যান্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বেলজিয়াম একটি স্বতন্ত্র নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্ররূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে) শতাব্দীকাল ধরে সারা বেলজিয়াম জুড়ে কায়েম ছিল ওয়ালুনদের অবাধ প্রতিপত্তি। ফরাসী ছিল বেলজিয়ামের রাষ্ট্রভাষা, ফরাসী ভাষাতেই চলত সারা দেশের শিক্ষা-দীক্ষা, শাসনকার্য সব কিছু। ফ্লেমিশ ভাষার কোন রকম স্বীকৃতি ছিল না।

এই অবস্থার পরিবর্তন শুরু হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে। ফ্লেমিশরা একজোট হয়ে বলল, সংখ্যাগুরু হয়েও শতাব্দীকাল ধরে যে নির্যাতন ও অবমাননা তারা সয়েছে তার পুনরাবৃত্তি তারা ঘটতে দেবে না। ফলে ফ্লেমিশ-ওয়ালুন বিরোধ এমন তীব্র হয়ে উঠল যে ১৯৬৩ সালে আইন করেই বেলজিয়ামকে ভাষার ভিত্তিতে ত্রিখণ্ডিত করে দিতে হল। ফ্লান্ডার্স অঞ্চলে প্রায় ৫২ লক্ষ লোকের ভাষা হল ফ্লেমিশ, আর ওয়ালোনিয়ায় প্রায় ৩১ লক্ষ লোকের ভাষা হল ফরাসী। সাড়ে দশ লক্ষ লোক অধ্যুষিত রাজধানী ব্রাসেলস নগরীকে দ্বিভাষী এলাকা ঘোষণা করা হল। কিন্তু তাতেও বিরোধের নিষ্পত্তি হয়নি। ফ্লান্ডার্সের অভ্যন্তরে অবস্থিত লউভেইন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষা বিদ্বেষ এত তীব্র হয়ে উঠেছে যে সাড়ে চারশ বছরের প্রাচীন ও ঐতিহ্যসম্পন্ন ঐ বিদ্যা-প্রতিষ্ঠানটির অস্তিত্ব বজায় রাখাই কঠিন হয়ে পড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়টিকে ভাষার ভিত্তিতে দ্বিখণ্ডিত করেও চরমপন্থী ফ্লেমিশদের খুশি করা যায়নি। তাদের দাবী, বিশ্ববিদ্যালয়টির ফরাসী বিভাগটিকে ফ্লান্ডার্স থেকে নির্বাসিত করতে হবে।

বেলজিয়ামে '৬৬ সালের মে মাসে যে সাধারণ নির্বাচন হয় তাতে দেখা যায় যে দুই এলাকাতেই ভাষা আন্দোলনের চরমপন্থী নেতারা ব্যাপকভাবে জয়ী হয়েছেন। সেজন্য বেলজিয়ামে কোন শক্তিশালী মন্ত্রিসভা গঠন করা সম্ভব হচ্ছে না। ভাষা-বিরোধ এখন জাতিবিরোধে পরিণত হচ্ছে, আর তা সর্বাধিক বিপন্ন করেছে বেলজিয়ামের জাতীয় সংহতিকে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে শতাব্দীকালের চেষ্টাতেও কানাডা ও বেলজিয়ামে একটি ভাষাকে সর্বজনগ্রাহ্য করার প্রয়াস সফল হয়নি বরং ঐ দেশ দুটির রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা রক্ষা করাই আজ কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এসবের জনা দুটি বহু ভাষাভাষী রাষ্ট্র—সুইজারল্যান্ড ও সোভিয়েট ইউনিয়ন তাদের সবকটি ভাষাকেই জাতীয় ভাষার মর্যাদা দিয়েছে। সুইজারল্যান্ডের লোকসংখ্যার সত্তর শতাংশ জার্মান বিশ শতাংশ ফরাসী ও অবশিষ্ট দশ শতাংশ ইতালীয় ও রোমানশ ভাষাভাষী। রোমানশ ভাষা ইতালীয় ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত তাও লাতিন থেকে এর সৃষ্টি। সুইজারল্যান্ড উল্লেখিত চারটি ভাষাই জাতীয় ভাষারূপে

স্বীকৃতি লাভ করেছে। অনুরূপভাবে সোভিয়েট ইউনিয়নও স্বীকৃতি দিয়েছে ঐ রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ষোলটি ভাষাকে। সোভিয়েট ইউনিয়নে মর্যাদার দিক থেকে রুশ ভাষার চেয়ে উজবেকি বা তাজিকি ভাষা কোন ভাবে হীন নয়। এমন কি রুশভাষা বাধ্যতামূলকও নয় সকল ক্ষেত্রে। তবে পৃথিবীর সকল সভ্য দেশের নাগরিকদের মতো সোভিয়েট ইউনিয়নের লোকেরাও দুটি এবং কেউ কেউ তিনটি ভাষা শিখে থাকেন। তৃতীয় ভাষাটি প্রায় ক্ষেত্রেই ইংরেজি। সুইজারল্যাণ্ডের লোকেরাও ইংরেজি শিখছে। জাপান, চীন, ফ্রান্স, জার্মানী ও লাতিন আমেরিকার এক ভাষাভাষী দেশগুলিতেও ব্যাপকভাবে ইংরেজি শিক্ষা শুরু হয়েছে।

ইংরেজি শিক্ষার এই ব্যাপক প্রসারের কারণ অনেকগুলি। প্রথমত, অকম্যুনিস্ট দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা ইংরেজি হওয়ায় সেই দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক, বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক সংযোগ রাখতে সকল দেশেরই কিছু কিছু লোককে ইংরেজি শিখতে হয়। দ্বিতীয়ত, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি শ্বেতাঙ্গ ইংরেজিভাষী উপনিবেশগুলিতে প্রচুর কর্ম-সংস্থানের সুযোগ থাকায় বিভিন্ন দেশের অগণিত উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবক কোন রাষ্ট্রীয় বাধ্যবাধকতা না থাকা সত্ত্বেও ইংরেজি শিখছে। তারপর আফ্রিকার সম্প্রতি স্বাধীন উনিশটি প্রাক্তন বৃটিশ উপনিবেশের প্রত্যেকটি ইংরেজিকে রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করায় এ উন্নয়নশীল দেশগুলিতেও ইংরেজি জানা শিক্ষক, চিকিৎসক, ইঞ্জিনীয়ার প্রভৃতির কর্মপ্রাপ্তির বিরাট সুযোগ ঘটেছে। আফ্রিকা ও পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলিতে ঐসব পদে আবার সবচেয়ে বেশী নিয়োগের সুযোগ পায় ভারতীয়রা। আজ বাহরিন, কুয়েৎ, ইরাক, এডেন প্রভৃতি পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলি ও সুদান, ইথিয়োপিয়া, কেনিয়া, ঘানা, নাইজেরিয়া, উগাণ্ডা, তানজানিয়া প্রভৃতি আফ্রিকার দেশগুলি ভরে আছে ভারতীয় শিক্ষক অধ্যাপক ডাক্তার ও ইঞ্জিনীয়ারে। ইংলণ্ড, কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত ভারতীয়ের সংখ্যাও লক্ষাধিক। এই প্রতিভাবান শিক্ষিত যুবকরা এই অনগ্রসর দেশের বেকার সমস্যা সমাধানে সহায়তা করেছেন, আবার এই দেশের জন্য অর্জন করছেন মহামূল্য বৈদেশিক মুদ্রা। কিন্তু আমরা যদি দেশ স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশ বছর আগে ইংরেজি ভাষাকেও এদেশ থেকে নির্বাসিত করতাম তাহলে উল্লিখিত যুবকদের এক-জনের পক্ষেও বিদেশে যাওয়া সম্ভব হত না। তাঁরা কূপমণ্ডূকের মতো এদেশেই পড়ে থেকে আমাদের জাতীয় অর্থনীতির সঙ্কটকে আরও দুর্বিষহ করে তুলতেন।

তারপর, কলা ও বিজ্ঞানের যে কোন বিভাগে উচ্চশিক্ষা অর্জন করতে হ'লে ইংরেজি জানা ছাড়া উপায় নেই। যে কারণে জাপান, চীন, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশগুলিতেও ব্যাপকভাবে ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। ইংরেজি ভাষা সারা পৃথিবীতে প্রচলিত হওয়ার বিভিন্ন শাস্ত্রের যে সব প্রামাণ্য গ্রন্থ ভারতীয় মুদ্রার হিসাবে পঞ্চাশ বা একশ টাকায় বিক্রি করা সম্ভব হয়, একটি আঞ্চলিক ভাষায় অনূদিত করে সেই সব বই বিক্রি হলে সেগুলির দাম কয়েক শ টাকার কম হবে না। প্রধানত এই কারণেই আজকের দিনে আঞ্চলিক ভাষায় সর্বোচ্চ শিক্ষা সম্ভব নয়। অসমিয়া, বাংলা বা উড়িয়া ভাষায় মেডিকাল, ইঞ্জিনীয়ারিং বা আইন শাস্ত্রের সর্বোচ্চ শিক্ষার পাঠ্য ও সাহায্যকারী গ্রন্থগুলি লিখিত ও মুদ্রিত হবে এবং সেই সব গ্রন্থ পাঠ করে এদেশের শিক্ষার্থীরা সর্বোচ্চ শিক্ষা লাভ করবে—একথা অদূরভবিষ্যতে চিন্তা করা কঠিন। ওসব বই ছাপার জন্য কোন প্রকাশক পাওয়াও দুষ্কর। ইতিহাস, অর্থনীতি, রাষ্ট্র বিজ্ঞানের মতো অধিকতর প্রচলিত কোন বিষয়েও একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনার খেয়াল যদি কারও জাগে তবে প্রকাশকদের দুয়ারে দুয়ারে ব্যর্থ ধরনা দিয়ে শেষ পর্যন্ত হয়তো তাকে সে সাধুসঙ্কল্প ত্যাগ করতে হবে। প্রধানত এই কারণেই ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার অগণিত দেশে ইংরেজি শিক্ষা ব্যাপকভাবে প্রচলিত হচ্ছে। এতে কোন দেশই তার জাতীয় শ্লাঘা ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা করে না।

সাড়ে তিনশ বছর আগে ইংরেজি শুধু ইংলণ্ডের ভাষা ছিল। আজ তা ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা, এশিয়া ও ওসিয়া-নিয়ার ৩৪টি দেশের রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে। ঐ চৌত্রিশটি দেশের জাতীয় চেতনা আমাদের চেয়ে কম এ কথা ভাবার কোন কারণই নেই, বা ইংরেজরা সাম্রাজ্য বিস্তারকালে জোর করে তাদের ভাষা অন্যের উপর চাপিয়ে দেয় একথাও বলা ঠিক হবে না। এদেশে রাজা রামমোহন, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ মনীষীরা আন্দোলন করে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন করেন। আর তা করেছিলেন বলেই পঁচাত্তর বছর আগে ভারতের বীর সন্তান বিবেকানন্দ ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে অগণিত মানুষের সম্মুখে বলিষ্ঠ কণ্ঠে সনাতন ভারতের শাশ্বত বাণী শুনিয়ে আসতে পেরেছিলেন। পরবর্তীকালে দাদাভাই নৌরজী, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী, নেহরু, নেতাজী, রাধাকৃষ্ণন প্রমুখ মনীষীরা যে তাঁদের মনীষাবলে এদেশকে বিশ্বের দরবারে গৌরবোজ্জ্বল আসনে অধিষ্ঠিত করান তাতেও ইংরেজি ভাষার অবদান সামান্য নয়। ভারতের ঐ মহান সন্তানরা যদি ইংরেজি না জানতেন তবে এদেশের স্থান আজ কোথায় নির্দিষ্ট হত তা কল্পনা করাও সম্ভব নয়। সুতরাং রাষ্ট্রভাষা আমাদের যাই হক না কেন, শুধু আত্মহত্যার ঝুঁকি নিয়েই আমরা ইংরেজি ভাষার সঙ্গে সম্পর্ক-ছেদ করতে পারি। সে ভাষা হয়ত সকলের শেখার দরকার নেই, কিন্তু দেশ গড়ার-দায়িত্ব যাদের তাঁদের ইংরেজি না শিখে উপায় নেই। যা অবশ্য কর্তব্য তা উপেক্ষা করার মূঢ়তা যত শীঘ্র আমাদের যায় ততই মঙ্গল।

কিন্তু রাষ্ট্রভাষার কি হবে? ভারতের মতো সুপ্রাচীন ও সুমহান ঐতিহ্যসম্পন্ন দেশের কি নিজস্ব কোন রাষ্ট্রভাষা থাকবে না? ভারত ও আফ্রিকার সদ্যস্বাধীন দেশ-গুলির মতো একটি দেশ মাত্র নয়! আড়াই হাজার বছর আগে ভারতের শাশ্বতবাণী পৃথিবীর দেশে দেশে প্রচারিত হয়েছে, সমুদ্রের মতো গম্ভীরনাদী সংস্কৃত স্তোত্রে ভারতের তপোবন শিক্ষাভবন মুখরিত হয়েছে। সেই অমেয়, অমূল্য ও অতুলনীয় সম্পদ কি আজও উপেক্ষিত হয়ে সংগ্রহশালা ও গবেষণাগারের বিষয়বস্তু হয়ে থাকবে? একটি অপ্রচলিত ভাষার পুনরুদ্ধার যে অসম্ভব নয়, দু হাজার বছর আগে পরিত্যক্ত হিব্রু ভাষাকে পুনরুজ্জীবিত করে ইস্রায়েল তা প্রমাণ করেছে। আমাদের ক্ষেত্রেই বা তা অসম্ভব বিবেচিত হবে কেন? কোন আঞ্চলিক ভাষা যখন কোনদিনই সারা ভারতের সকল ভাষাভাষী নরনারীর কাছে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে না তখন এমন ভাষাকেই আমাদের গ্রহণ করতে হবে যা সকল ভারতীয় ভাষার আদি জননী।

এর জন্য অবশ্যই ব্যাকরণের বেড়াজাল থেকে সংস্কৃতকে মুক্ত করে আধুনিক যুগোপযোগী করে তুলতে হবে। পালির মতো সংস্কৃতকেও রোমান লিপিতে লেখা যায় কিনা সে কথা বিবেচনা করতে হবে। এটা কোন অসম্ভব প্রস্তাব নয়। সংস্কৃত বরাবরই নাগরি লিপিতে লেখা হত না। আগে সংস্কৃত লেখা হত শারদা লিপিতে। পরে সংস্কৃত শাস্ত্র পুনরায় চর্চা শুরু হওয়ার কালে পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা শারদা-লিপির বদলে অধিকতর প্রচলিত নাগরি-লিপি গ্রহণ করেন। একই সময়ে পালি ভাষা রোমান লিপিতে লেখার রীতি প্রচলিত হয়। সেটা আজ কোন পালিপাঠকের চোখেই অস্বস্তিকর ঠেকে না।

কোন ব্যস্ততার প্রয়োজন নেই। পণ্ডিত ও ভাষাবিশেষজ্ঞরা স্থিরচিত্তে বিচার-বিবেচনা করে দেখুন, কেমন করে সংস্কৃতকে সহজ, সচ্ছল, সর্বজনগ্রাহ্য ও যুগোপযোগী ভাষা করে তোলা যায়। ভারতের বিভিন্ন ভাষা ও ইংরেজি প্রমুখ বিদেশী ভাষা থেকে শব্দ চয়ন করে সংস্কৃতের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে তুলতে হবে। এ একদিনের কাজ নয়, চন্দ্রচূড় জটাজালে বন্দী মন্দাকিনীর পুণ্য-স্রোতধারা দেশে দেশে দিশে দিশে প্রবাহিত করানোর জন্য চাই ভগীরথের কঠোর সাধনা।

সংস্কৃত ভাষার যুগোপযোগী কাঠামো তৈরি হ'লে কবি ও কথাকারের সাবলীল স্পর্শে তা আরও সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠবে। তখনই সংস্কৃত হবে সারা ভারতের প্রাণের ভাষা। আট শ বছর আগে, সংস্কৃত ভাষার সব অনুশাসন মেনে কবি জয়দেব গীত-গোবিন্দ রচনা করেছিলেন। তার ভাষা-শ্রীর সমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বন-মালী'—ভারতের কোন্ প্রান্তের মানুষ বোঝে না, বা কার কানে সুধাবর্ষণ করে না?

আমার কাল আমার দেশ

সুধীরচন্দ্র সরকার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

'আমার কাল, আমার দেশ' সম্বন্ধে যা কিছু বলার তা আজ মোটামুটি শেষ হল। হয়ত আরও অনেক কিছুই বলার ছিল, লেখার ছিল—সব কথা ঠিকমত গুছিয়ে বলতে পারিনি—হয়ত স্মৃতিপথে অনেকের কথা বা অনেক ঘটনা আবছা হয়ে গেছে বলে বলতে পারিনি, বিশ্বাস করুন সে ত্রুটি আমার ইচ্ছাকৃত নয়। তবে এটা ঠিক যে, যেটুকু বলেছি বা বলতে পেরেছি—তার মধ্যে কোন-রকম ভেজাল নেই—সবটাই নির্ভেজাল সত্য।

আজ জীবনের সায়াহ্নে দাঁড়িয়ে একটি কথাই বলতে ইচ্ছা করে—'বেলা যায়'। সেই সঙ্গে মনের পর্দায় ভেসে ওঠে আর একটি প্রশ্নঃ কেন আমি সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করলাম আর কেনই বা বইয়ের ব্যবসা করতে গেলাম এত ব্যবসা ছেড়ে?

একথা এখন ভাবতেই আমার খুব আশ্চর্য লাগে। বাবা ছিলেন বিচারক, রায়-বাহাদুর খেতাবও পেয়েছিলেন তিনি। তিনি আইনের বই লিখতেন। তখনকার সাহেবরা বাবাকে ভালবাসতেন খুব। দাদা আইন পাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই বাবার একটি মুখের কথায় মুন্সেফের চাকরী পেয়ে গেলেন। আপাতদৃষ্টিতে দেখতে গেলে আমারও তাই হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা হল না।

বাবা চাকরী থেকে অবসর নেওয়ার পর বড়সাহেবরা বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেনঃ রায়বাহাদুর, বল, তোমার জন্যে আর কি করতে পারি? অর্থাৎ ইঙ্গিতটা হোল যে তোমার তো আরও ছেলে আছে, যদি তুমি বল তাহলে তাদের জন্যেও কিছু করে দিতে পারি। বাবা আমার মুখের দিকে চাইলেন। কিন্তু আমার ছোটবেলা থেকেই ঝোঁক ছিল সাহেবদের চাকরী আমি করব না। সাহিত্যিক হতে পারি আর না পারি সাহিত্যের মধ্যে ডুবে থাকা—সাহিত্যিক ও শিল্পী গোষ্ঠীর মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া—এই ছিল আমার চিরদিনের সাধ; আমি কারু কোন কথা না শুনে সাহিত্যসেবা এবং বই-এর ব্যবসা, এই পথটাই বেছে নিলাম। এই পথ তখন কণ্টকময়, অনিশ্চিতের পথ। এই অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পথ বেছে নেওয়ায় বাবা অবশ্য কিছুই বললেন না। তিনি আমার স্বাধীন মতামতকে উপেক্ষা তো করলেনই না, বরং তাঁর সস্নেহ আশীর্বাদের আলোয় আমার যাত্রাপথকে রাঙিয়ে দিলেন।

কিন্তু অনেকেই আমার পাগলামি দেখে হেসেছিলেন। অবশ্য তদানীন্তন সমাজের দৃষ্টি দিয়ে দেখলে এ কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে তখন ক'টা লোকই বা বাংলা বই পড়ত এবং বই-এর ব্যবসার জন্যে লেখা-পড়া শিখে অনির্দিষ্টের পথে পা বাড়াত? চাকুরে, বিশেষতঃ সরকারী চাকুরেদের খাতিরই তখন আলাদা। মাসান্তে একটা নিশ্চিত আয়, শেষজীবনে পেনসন, নিরুদ্বিগ্ন জীবন-যাপন এ কে না চায়? বিরাট প্রলোভন এবং প্রতিবাদের তুমুল ঝড়-ঝঞ্ঝা ভেদ করে আমায় এগিয়ে আসতে হয়েছিল। কিন্তু আমি আমার আদর্শ থেকে



সুধীরচন্দ্র সরকার কলেজ জীবনে

এতটুকু বিচ্যুত হইনি। এইভাবেই আমি সাহিত্যসেবা ও বই-এর ব্যবসায় নিজেকে উৎসর্গ করি।

আজ জীবনের পথপ্রান্তে এসে যাত্রারম্ভের দিকে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলে মনে হয় সত্যিই কি আমি অন্যায় করেছি? আমি ভুল পথ বেছে নিয়েছিলম? চাকরী করলে হয়ত চিরজীবন নিরুদ্বেগে কাটাতে পারতাম। কিন্তু নিবাতনিষ্কম্প পুষ্করিণীর জলের মত আমার জীবন-সরোবর একদিন শুকিয়ে যেত। অতিনিকট পড়শীরা ছাড়া আর কারু মনেই পড়ত না এই পুষ্করিণীটির কথা। কালক্রমে তারাও হয়ত ভুলে যেত, আর পুষ্করিণীটির উপরেও তৈরী হোত বৃহৎ ইমারত। আমি সে জীবন চাইনি; আমি চেয়েছিলাম অশান্ত সমুদ্রের মত উত্তাল হতে, যাতে তার তরঙ্গমালার উপর দিয়ে বহু তরণী জানা-অজানা বহু দেশের দিকে পাড়ি দেয়—বহু নদ-নদীর নিবিড় সংস্পর্শে এসে সমুদ্র যেন নিজেকে ধন্য মনে করে।

চাকরী করলে কি হোত। নির্দিষ্ট সময় একটা গণ্ডীর মধ্যে থেকে অপরের মতে মত দিয়ে চলা, তারপর বাড়ী ফিরে গিয়ে পান চিবোতে চিবোতে পার্কে বসে, নয় কারুর দাওয়ায় বা বৈঠকখানায় বসে পরনিন্দা পরচর্চা করা; নয়ত অবসর সময়ে তাস-পাশা-দাবা খেলে সময়টা কাটিয়ে দেওয়া। আমি ঠিক এ জীবন চাইনি।

এখনও আমার মনে হয়, আমার অনেক কাজ বাকী—অনেক লেখা বাকী। সম্প্রতি একটা ছোটদের Encyclopaedia লিখতে শুরু করেছি—কিন্তু সে কাজটা এতই বিরাট যে শেষ করে যেতে পারব কিনা জানি না। Encyclopaedia রচনার একটা ইতিহাস আছে। অনেকদিন আগে আমার ছেলেরা যখন ছোট, তখন আমি তাদের পড়াতাম। দেখতাম যে সাধারণ জ্ঞান সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণাই নেই। যেটুকু স্কুলের পড়া তার বাইরে আর তারা কিছু জানে না। যেমন হিমালয় কত উঁচু, পৃথিবীর কোন সমুদ্র কত গভীর, কোন জন্তু সবচেয়ে দ্রুতগামী, এ সমস্ত কিছুই তারা বলতে পারে না। স্কুলের পড়ার বাইরে যে একটা বিরাট জগৎ পড়ে আছে সে সম্বন্ধে তারা একেবারে অজ্ঞ। ক্লাসে কোনমতে প্রমোশন পেলেই তারা খুশী। শিক্ষকমশাইরাও তেমন কিছু ভ্রূক্ষেপ করেন না।

আমি তখন ঠিক করলাম যে ছেলেদের জ্ঞানের পরিধি বাড়াতে একটা কিছু করা দরকার। আমি তখন 'সাধারণ জ্ঞান' নাম



শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার

দিয়ে একটি বই লিখলাম, এবং সে বইখানি এত জনপ্রিয় হয় যে তার ৩৬টি সংস্করণ হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। এই থেকে আমি Hindusthan Year Book লেখার প্রেরণা পাই। এই বই যে শুধু লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রি হয়েছে। তাই নয়, আমায় বহু সম্মানও দিয়েছে।

এরপর বড় ছেলের সুব্রতের বিয়ে হল। ঘরে ফুটফুটে বউ এল। ছোট্ট মেয়ে—ক্লাস নাইন-এ পড়ে—তাকে 'মেঘনাদ বধ' পড়তে হয়। প্রচুর পৌরাণিক চরিত্রের ভীড় তাতে। আমি তাকে সব চরিত্রই বুঝিয়ে দিতাম—কিন্তু সে সব মনে রাখতে পারত না। আমার স্ত্রী সুলেখা তার জন্যে ছোট ছোট করে নোট লিখে দিতেন। আমি দেখলাম, রামায়ণ- মহাভারতে যত চরিত্র আছে এই সবগুলিকে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে একটি বই-এর মধ্যে লিপিবদ্ধ করলে তো অনেকেরই সুবিধে হয়। সেই হল আমার 'পৌরাণিক অভিধান' লেখা শুরু। এবং আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে এ বইখানি বাংলার সুধীসমাজ সাগ্রহে গ্রহণ করেছেন।

আমার ছোট ছেলে সুপ্রিয় কলেজের পড়া শেষ করে আমারই দোকানে ঢুকল, দোকানের কাজ-কর্ম সব দেখাশোনা করতে লাগল। Copyright Act সম্বন্ধে তার তখন বিশেষ কোনো জ্ঞান ছিল না এবং হাতের কাছে এই সম্বন্ধে বিশেষ কোনো ভাল বইও ছিল না। তখন Copy right সম্বন্ধে একটা আইনের বই লিখি। সে বইখানা অবশ্য অন্য নামে প্রকাশিত হয়।

এইবার আমার শেষের পালা। দেহ অক্ষম হয়ে এসেছে—দৃষ্টিশক্তিও ক্ষীণ। জীবনে অনেককিছু পেয়েছি—অনেক ভালবাসা, সম্মান, অর্থ, যশ, বন্ধু—মানুষের যা কাম্য সবই অল্পাধিকতর পেয়েছি—কিছু না-পাওয়ার আক্ষেপ আমার নেই। বিধাতার কাছে সেই দিক দিয়ে আমি অশেষরূপে কৃতজ্ঞ।

আমার জীবনী যে কোনদিন লিখতে হতে পারে একথা কোনদিনই ভাবিনি। ভাবলে হয়ত অনেক মাল-মশলা সংগ্রহ করে রাখবার চেষ্টা করতাম। আমার জীবনে কোন উত্তেজনা নেই, কোন উপন্যাসের নায়কের মত ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত নেই। এক চেয়ারে বসে আছি আজ দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর। সে চেয়ার পেরেক মারতে মারতে বেঁকে গেছে। চারিদিকে শুধু বই দিয়ে ঘেরা। নতুন আর পুরনো সব বইয়ের মাঝে আমি যেন হারিয়ে যাই।

ছোট ছোট ছেলেরা আসে—তাদের কচি হাতের লেখা নিয়ে মৌচাকে ছাপাতে। তার কিছুদিন পরেই শুনি তারা বিরাট সাহিত্যিক হয়েছে, কেউ রবীন্দ্রপুরস্কার পাচ্ছে—কেউ ডক্টরেট হচ্ছে, কেউ বৈজ্ঞানিক হচ্ছে—কেউ বা নেতা হচ্ছে। দেশে-বিদেশে তাদের যত নাম-ডাক ছড়াচ্ছে, গর্বে আনন্দে আমার বুকও তত ভরে উঠছে। আজ যারা অংকুর, কাল তারা বিরাট বনস্পতিরূপে লোকের সম্ভ্রম জাগাচ্ছে।

জীবনের দীর্ঘ পথপরিক্রমায় প্রচুর লোকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে—বহু বন্ধু আমি পেয়েছি। কেউ সাহিত্যিক, কেউ শিল্পী, কেউ অভিনেতা, কেউ শিক্ষাবিদ, কেউ বা দেশনেতা, কেউ রাজনীতিক। সকলের স্নেহ প্রীতি ও ভালবাসা আমি পেয়েছি। আমাকে কেউ ঘৃণা করেনি, অপবাদ দেয়নি বা অবহেলা করেনি। সম্মান জানিয়েছি সকলকে। সেইদিক থেকে আমি নিজেকে খুব ভাগ্যবান বলে মনে করি।

আর একটা বিষয়ের উল্লেখ করে আমার এই গ্রন্থের যবনিকা টানতে চাই আমি। সেটি হল সব শেষের কথা—অন্তরের কথা এবং দরকারী কথা। 'আমার কাল আমার দেশ' লিখতে যাঁরা আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন, সাহায্য করেছেন সর্বদিক দিয়ে তাঁদের কথা আমি স্বীকার করছি অকপটভাবে। তাঁদের সাহায্য না পেলে হয়ত এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হোত না। তাঁদের আমি অন্তরের শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ জানিয়ে এইখানেই শেষ করলাম।

শেষ

পুরনো পাতা

সৌন্দর্য কাহাকে বলে

রাজেন্দ্রলাল মিত্র

[রাজেন্দ্রলাল মিত্র ঊনবিংশ শতকের একজন কৃতী মনীষী। 'বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ' এবং এসিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে তিনি দীর্ঘকাল ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি ১৮৮৫ খৃঃ এসিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি হয়েছিলেন। 'বঙ্গভাষানুবাদক সমাজে'র আনুকূল্যে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদনায় ১৭৭৩ শকাব্দে (১৮৫১ খৃঃ) 'বিবিধার্থসংগ্রহ' নামে মাসিক পত্রিকা বার হয়। এই কাগজ সেকালের বাঙ্গালীর জ্ঞান-বৃদ্ধির ও মনোরঞ্জনে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এ পত্রিকা পড়ে আনন্দিত ও উপকৃত হয়েছিলেন, 'জীবন-স্মৃতি'তে তার বিশেষ উল্লেখ আছে। বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-জিজ্ঞাসার গুরু রাজেন্দ্রলাল। তাঁর ইংরাজীতে লিখিত 'নেপালের সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্য' থেকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনেকগুলি কাব্য ও নাট্য কাহিনীর মূল অঙ্কুর গ্রহণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পর্কে লিখেছেন, 'এ পর্যন্ত বাংলাদেশে অনেক বড়ো বড়ো সাহিত্যিকের সংগে আমার আলাপ হইয়াছে, কিন্তু রাজেন্দ্রলালের স্মৃতি আমার মনে যেমন উজ্জ্বল হইয়া বিরাজ করিতেছে এমন আর কাহারও নহে। ...কেবল তিনি মননশীল লেখক ছিলেন ইহাই তাঁহার প্রধান গৌরব নহে। তাঁহার মূর্তিতেই তাঁহার মনুষ্যত্ব যেন প্রত্যক্ষ হইত।' 'রহস্য-সন্দর্ভ' তৃতীয় পর্ব, ২৫শ খন্ড (১৮৬৫) থেকে (পৃঃ ৯-১৩) এই প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত হোলো। লেখাটির সঙ্গে ইংরাজীতেও শিরোনামা ছিল Notions of personalbeauty in different countries. লঘু রচনাতেও যে তাঁর হাত কত চমৎকার ছিল তার প্রমাণ এ লেখাটিতে পাওয়া যায়।

কি আক্ষেপ, আমাদিগের গোদাবাড়ী ও ছাগলনড়ীর সাহায্য নাই! তাহা থাকিলে আমরা এক বার ভূমন্ডলের সর্বত্র ভ্রমণ করিয়া কত দেশের কত নীতি রীতির বিবরণ প্রত্যক্ষ করত পাঠকদিগকে মনোরঞ্জন করিতে পারিতাম? কত বিদ্যা, কত কৌশল, কত নৈসর্গিক আশ্চর্য পদার্থ দেখিয়া জ্ঞান ও সাধারণের ঐহিক মঙ্গলের বৃদ্ধি করতে সক্ষম হইতাম? কিন্তু তৎসমুদয় তাদৃশ রহস্যাবহ হইত না, বিভিন্ন দেশে সৌন্দর্যের বিভিন্ন লক্ষণ-দর্শনে যাদৃশ প্রমোদ হইত। মনে করুন সকল দেশের প্রধান বরাঙ্গনা-গুলি এক চক্ষে প্রায় এক কালে দেখিতে পাইতাম, ও তাহাদের তুলনা করিয়া সৌন্দর্য কি, তাহার নির্দেশ করিতাম; ইহা হইতে কৌতুকাবহ ঘটনা আর কি আছে? সত্য যে আমরা প্রচলিত নিয়মে ভ্রমণ করিয়া অনেক দেশের সৌন্দর্য সন্দর্শন করিতে পারি: পরন্তু তাহা অত্যন্ত কষ্ট ও আয়াস-সাধ্য। অপর সভ্য দেশে প্রায় প্রতি বর্ষে বিভাবের ('ফেশনের') পরিবর্তন হইতেছে, ও অসভ্যেরাও ফেশনের পাশ হইতে মুক্ত নহে, সুতরাং আমরা ভিন্ন ভিন্ন বর্ষে যাহা দেখিব তাহা সর্বত্রের এক সময়ের বিবরণ হইবে না. অতএব ভূমন্ডলের সকল দেশের শ্রেষ্ঠা সুন্দরীদিগের এক প্রস্তাবে সমন্বয় করিতে বিরত হইয়া কোন্ দেশে কোন্ অঙ্গের কোন্ লক্ষণকে বিশেষ সৌন্দর্য-সাধক বলিয়া লক্ষিত হয় তাহার বর্ণনা করিব।

ইহা বলা বাহুল্য যে স্ত্রীর সৌন্দর্যই সৌন্দর্যের আদর্শ বলিয়া নিরূপিত করা যায়; তাহারই পরিবর্ধনার্থে মনুষ্যজাতি সর্বদা বিব্রত, সর্বোৎকৃষ্ট বস্ত্র—সর্বোৎকৃষ্ট অলঙ্কার—সর্বোৎকৃষ্ট সুগন্ধ দ্রব,—সকলই তাহাদের সেবার নিমিত্ত উৎপন্ন হইতেছে। তন্তুবায় তাহাদের নিমিত্ত দিবারাত্র পরিশ্রম করিতেছে। ডুবুরী তাহাদের ব্যবহার্য মুক্তার নিমিত্ত মকর-কুম্ভীরের ভয় পরিত্যাগ করিয়া অতলস্পর্শ সমুদ্রে নিমজ্জিত হইতেছে। খনিক পুরুষেরা তাহাদের প্রয়োজনীয় সুবর্ণের নিমিত্ত অহর্নিশ ভূগর্ভে প্রোথিত রহিয়াছে; তাহাদের নিমিত্ত এতৎ সন্দর্ভের একটি প্রস্তাবের সমস্ত বিনিয়োগ করা কোন মতে অধিক নহে। ফলে সুন্দরী স্ত্রীর মুখের সদৃশ কমনীয় পদার্থ ভূমন্ডলে কি আছে? এইরূপ প্রস্তাব করিলে লোকে কি প্রকার উত্তর দিবে তাহার প্রতীক্ষা করতে হয় না। মনুষ্য যে কোন জাতিজ্ হউক, যে কোন দেশে উদ্ভূত হউক, এবং যে কোন মতাবলম্বী বা যে কোন রূপ মানস বিশিষ্ট হউক—সকলেই এতৎ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর দিবে, সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে অনৈক্য-মত নর-জাতিতে সম্ভবে না: অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে কি কি লক্ষণ থাকিলে স্ত্রী সুন্দরী হয় একথা জিজ্ঞাসা করিলে, কোন দুই ব্যক্তি এক উত্তর দিবেন না।

মুখাকৃতি সৌন্দর্যের এক প্রধান অঙ্গ, অথচ প্রাচীন গ্রীস্ দেশীয়েরা ও নব্য ইংরাজেরা তথা হিন্দুরা অন্ডাকৃতি মুখই সর্বোত্তম বলিয়া থাকেন; কিন্তু চীনদেশীয়েরা তাদৃশ মুখবিশিষ্টাকে 'ঘোড়ামুখী' বলিয়া গোলাকার 'শরামুখীর' অনুরাগে গদ্‌গদ্-চিত্ত হয়েন, এবং এস্কুইমঃ জাতীয়েরা তদুভয়ের পরিবহণ করিয়া বর্তুলাকার 'থালসামুখীর' অনুসরণ করিয়া থাকেন।

পরন্তু মুখাবয়ববিষয়ে যে মনুষ্য-মনে ভেদজ্ঞান আছে এমত নহে। ইউরোপীয়-দিগের মধ্যে বিশ্বাস আছে যে গ্রীসদেশীয় হোমর নামক কবি কবিকুলের শ্রেষ্ঠ; তিনি তদ্দেশীয়-মত প্রসিদ্ধ যূপতরের মহিলা জুনোর রূপোবর্ণন-সময়ে তাঁহাকে 'বৃষাক্ষী' বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। তদৃষ্টান্তে ইংরাজী অনুকরণ—তৎপর কোন নব্যযুবক কোন স্বদেশীয়া ভুবনমোহিনীকে 'হে গোচুক্ষী' বলিলে কিরূপ রসাভাস হয় তাহা পাঠকবৃন্দের মনে অনায়াসেই অনুভূত হইবে। পরন্তু চীনদেশীয়েরা হোমর অপেক্ষাও অধিক রসিক; তাহারা বরাঙ্গনাননে শূকর-চক্ষুর সদৃশ ক্ষুদ্র চক্ষু থাকিলে কমণীয় বোধ করে, সুতরাং তাহাদের দেশে 'হে শূকরাক্ষি' বলিয়া প্রণয়িণীর অনুসরণ করিলে তাহার অনুরাগের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। মনে করুন ঠাকুরদাদা সম্পর্কীয় কেহ তদনুকরণে ঠাকুরণ দিদির সমাদর করিলে গৃহসম্মার্জনীর কি পর্যন্ত দুর্দশা না সম্ভব হইতে পারে। একজন চীন কবি আপন প্রিয়-সখীর প্রশংসায় লিখিয়াছেন—

"আহা মরি প্রিয়মুখ মালসা সমান
তাহে চক্ষু আছে কি না, না হয় প্রমাণ।"

আমরা প্রার্থনা করি যে আমাদিগের পাঠকবৃন্দ কেহ ভ্রমেও এই চৈনিক কবির অনুকরণ না করেন; তাহা করিলে বঙ্গীয়া মৃগাক্ষীর নয়নযুগল মৃগচক্ষের লাবণ্যের পরিবর্তে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের আধিক্য হইবে সন্দেহ নাই। পারস্য কবিরা 'কোমল অলসায়ত লোচনের প্রশংসা করিয়া থাকেন; কিন্তু স্কটলন্ড দেশে তাহা অগ্রাহ্য হইয়া 'ঘামন্ত চক্ষুর' বিশেষ সমাদর হইয়া থাকে। এই সকল নানাপ্রকার চক্ষুর মধ্যে কি যে প্রকৃত সুন্দর তাহা পাঠকদিগের অভিরুচ্যানুসারে নির্ণীত হইবে, আমরা তাহার মীমাংসা করিলে কোন না কোন পাঠক বা পাঠিকার নিকট তিরস্কৃত হইবার আশঙ্কা আছে।

মুখের গঠনে নয়নের পর নাসিকা সৌন্দর্যের এক প্রধান অঙ্গ; তাহার অবয়ব-ভেদে মুখশ্রীর বিশেষ পরিবর্তন হয়। তাহার অভাবে তিলোত্তমার মুখও ঘৃণাজনক হইয়া উঠে। পরন্তু কি প্রকার নাসিকা সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহা অদ্যাপি নিরূপিত হয় নাই। ভারতবর্ষে 'তিল ফুল জিনি নাসা' ভারত-চন্দ্রের বিশেষ প্রিয়। অন্য কবি শুক চঞ্চুর আকৃতি তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কহেন; ফলে উভয়েই ঈষৎ বর্তুল নাসিকার অনুরাগী। ফরাসী দেশেও সেইরূপ বর্তুল নাসিকার প্রশংসা আছে। কিন্তু অধুনা এতদ্দেশে 'টিকলা' সরলরেখার অবক্র তিলক হয়, এমত নাসিকাই সকলের প্রিয়; প্রাচীন গ্রীসদেশে এবং নব্য ইংলন্ডেও তাহা প্রশংসনীয়। তদ্রূপ নাসার প্রত্যাশায় ধাত্রীরা নব্য প্রসূত শিশুর নাসা প্রত্যহ টিপিয়া সেক দিয়া থাকে, এবং তাহাতে কথঞ্চিৎ নাসার উচ্চতা সিদ্ধ হয়, সন্দেহ নাই। পরন্তু ঐ ধাত্রী আফ্রিকা দেশে গমন করিলে তাহার সে আয়াস আহার অনাভাবের কারণ হইত, যেহেতু তথায় উচ্চ

নাসিকা অত্যন্ত নিন্দনীয়, এবং যাহাতে ঐ কুৎসিতের লক্ষণ না উপলব্ধ হয় এই নিমিত্ত তত্রত্য ধাত্রীরা শিশুর নাসা প্রত্যহ মর্দিত করিয়া তাহার খর্বতা সিদ্ধ করে। বস্তুতঃ সে অয়াস এ পর্যন্ত ফলবান হইয়াছে যে অধুনা অনেক হটেন্টট ভুবন-মোহিনীর নাসিকা আছে কি না তাহা সামান্য নয়নে লক্ষ্য হয় না। ন্যুজীলন্ড দ্বীপের ললনারাও এইরূপে খর্ব নাসার অনুরাগিনী, এবং তাহাদের নাসা আছে কিনা ইহা বিদেশীয়দিগের মনে কখন কখন সন্দেহ হইয়া থাকে। পারস্য দেশবাসীদিগের শুক-পক্ষীর চঞ্চুর ন্যায় 'আঁকড়াশী নাকে' বিশেষ দাক্ষিণ্য আছে।

নাসিকার পরেই অধরপল্লব; তাহার আরক্ত আভায় অভিভূত না হয়েন এমত বংগ-সন্তান প্রাপ্ত হওয়া দুর্লভ। পক্ব বিম্ব, দাড়িম্ববীজ, পদ্মারাগমণি প্রভৃতি সমুদয় আরক্তবর্ণ সকল পদার্থই তাহার প্রশংসায় বিনিযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে সেই পক্কবিম্বোষ্ঠী আরব্য দেশে নীতা হইলে 'রক্তমুখী' বলিয়া তিরস্কৃত হয়, কারণ তত্রত্য ললনারা অহর্নিশ প্রয়াস পাইয়া আপন আপন অধর পল্লব নীল বর্ণে রঞ্জিত করিয়া থাকেন; তাঁহাদের মনে এতদ্ভিন্ন শোভা হয় না।

ললাটের গঠন কিরূপ হইলে সৌন্দর্যের বৃদ্ধি হয় তাহারও নিরূপণ হইয়া উঠে নাই। বর্তুল, চেপটা, ক্ষুদ্র, বৃহৎ, উচ্চ নীচ প্রশস্ত খর্ব—সকল প্রকার ললাটেরই প্রশংসা কুত্রাপি না কুত্রাপি দৃষ্ট হইয়াছে। গ্রীসদেশীয়েরা উচ্চ প্রশস্ত কপাল স্ত্রী জাতির সৌন্দর্যের হানিকর জ্ঞান করিত এবং তদ্বিপরীতে গত শতাব্দীর ফরাসী ললনারা মস্তকের পুরো-ভাগের কেশ উৎপাটিত করিয়া প্রশস্ত ললাট সিদ্ধ করত আপন আপন সৌন্দর্যের অভিমান সন্তুষ্ট করিতেন। পরন্তু এবিষয়ে মেক্সিকো দেশীয়া রমণীদিগের আচরণ রহস্যব্যঞ্জক। তাঁহারা আজন্মকাল নানাবিধ তৈল ও প্রলেপের অনুসরণ দ্বারা সমস্ত কপালে কেশ জন্মাইবার চেষ্টায় বিব্রত আছেন, কারণ তাঁহাদের দেশে মস্তকের কেশ ভ্রূ পর্যন্ত আসিলেই তাঁহাদের মূর্তির মোহনীয়া শক্তির পরিবৃদ্ধি হয়। এতদ্দেশে সমস্ত ললাটে কেশ দেখিলে বরাঙ্গনারা বানরীর প্রতিমূর্তি অনুভব করেন; পরন্তু তাঁহারা অবৃত ললাটের অনুরাগিনী না হইলেও উচ্চ বর্তুল কপাল কোন মতে সমাদরণীয় জ্ঞান করেন না;—তাহার অপকৃষ্টতা বিজ্ঞাপনার্থে 'উচ্ কপালী চেরনদাঁতী বিয়ের রাতে খাবে পতি' ইত্যাদি বাক্য সর্বত্র প্রসিদ্ধ রাখিয়াছেন। পরন্তু উচ্ কপাল হলেই যে বিবাহের রাত্রিতে বৈধব্য ধারণ করতে হয় এমত কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই; প্রত্যুত ঔসাগী নামা এক জাতীয় মার্কিন মনুষ্য মধ্যে উচ্চ ললাট বিখ্যাত আছে, ও তাহার বিশেষ সমুচ্চতা সাধনার্থে তাহারা শিশুদিগের মস্তকের পশ্চাদ্ভাগ প্রত্যহ টিপিয়া পুরোভাগের সমুন্নতি সমাগ-রূপে সিদ্ধ করিয়া থাকে; কিন্তু তাহাতে তাহাদের বিলাসবতীদিগের যে অধিক বৈধব্য ঘটিয়া থাকে এমত কোন প্রমাণ নাই। এই জাতীয় মনুষ্যদিগের প্রতিবাসী অপর এক জাতীয় মনুষ্য তাহারা পূর্বোক্তদিগের প্রতিদ্বন্দ্ব সাধনার্থেই হউক বা সৌন্দর্যের বোধ প্রভেদবশতই হউক; শিশু জন্মাইবামাত্র তাহার কপালে একখানা কাষ্ঠফলক বাঁধিয়া দেয়, এবং প্রত্যহ তাহার বন্ধনীর কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দৃঢ়তা করিয়া অবশেষে শিশুদিগের কপাল এতাদৃশ চেপ্টে করিয়া ফেলে যে, নাসাগ্র হইতে মূর্ধা অবধি সর্বত্র এক সরল-রেখায় অবস্থিত হয়; এই প্রযুক্ত কথিত জাতীয়েরা 'উত্তান ললাট' নামে বিখ্যাত হইয়াছে। পরন্তু এতদুভয় জাতীয় মনুষ্যেরাই যে ললাট বিষয়ে স্বাতন্ত্র্যের চরম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে তাহাই নহে। এক জাতীয় আফ্রিক স্ত্রী আছে তাহারা শিশুর মস্তকের চতুষ্পার্শ্বে চারিখানি তক্তা ও উপরে আর একখানি তক্তা বাঁধিয়া মস্তক ও ললাটের চতুষ্কোনত্ব সিদ্ধ করে; তাহা না হইলে কোন বিলাসবতী রূপবতী বলিয়া অভিমান করিতে পারেন না।

স্ত্রী দিগের সৌন্দর্য দ্যোতকমধ্যে ভ্রূ এক প্রবীন অংগ; তাহার অবয়বভেদে রূপের অন্যথা হইবে ইহার অনায়াসেই অনুভূত হইতে পারে। ফলে পূর্বকাল অবধি রূপ-বর্ণনে ইহার উল্লেখ হইয়া আসিতেছে; এবং এতদ্দেশে ধনুরাকৃতি ভ্রূই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণিত হয়। পরন্তু কাশ্মীর ও জর্জিয়া দেশীয়া বরাঙ্গনা, যাঁহারা নরজাতীয়-সর্বশ্রেষ্ঠসুন্দরী বলিয়া বিখ্যাতা, তাঁহারা ঐ ভ্রূ সমাদরণীয় জ্ঞান করেন না। প্রত্যুত অত্যন্ত স্থূল উভয়সংযুক্ত যোড়া ভ্রূই তাঁহাদের প্রিয়। কিন্তু ঐ অভিরুচির নিমিত্ত তাঁহারা ইতালী-দেশীয়া বিলাসবতীদিগের নিকট তিরস্কৃতা হইয়া থাকেন; কারণ ইতালীদেশে অতি সূক্ষ্ম কৃষ্ণরেখার সদৃশ ভ্রূই প্রশস্ত, এবং যে সকল লাবণ্যবতীরা স্বভাবতঃ তদ্রূপ ভ্রূ না প্রাপ্ত হন তাঁহারা সোন্নার সাহায্য ভ্রূর কেশ উৎপাটন করত তাহার সূক্ষ্মতা সিদ্ধ করেন। কলিকাতায়ও কোন কোন বাবু আছেন যাঁহারা ক্ষৌরের সাহায্যে ভ্রূর সূক্ষ্মতা ও ধনুরাকৃতি সিদ্ধ করিয়া থাকেন। পরন্তু আমাদিগের মনোমোহিনীরা অদ্যাপি সে ভাবের অনুসরণ করেন নাই।

ভ্রূ অপেক্ষা কেশ অনেক অংশে শ্রেষ্ঠঃ ভ্রূ বিহীনা স্ত্রী বরং সহ্য হইতে পারে, কিন্তু কেশ বিহীনা কদাপি সহ্য হইতে পারে না; অতএব কেশের বিন্যাস বিষয়ে স্ত্রী জাতি মাত্রেরই সম্যক্ অনুরাগ দেখা যায়; এমত স্ত্রী কেহ নাই যে কেশের সেবায় প্রত্যহ কিঞ্চিত কাল বিনিয়োগ না করে। অশীতি পর বৃদ্ধারাও প্রত্যহ এক গাছা ফিতা দিয়া আপন পলিত কেশের কবরী বন্ধন করিতে ত্রুটি করেন না। পরন্তু সেই কেশ কিরূপ হইলে ও কি প্রকার বিন্যস্ত করিলে সর্বতো-ভাবে সৌন্দর্যের সমৃদ্ধি হয় তাহা অদ্যাপি নিরূপিত হয় নাই। ভারতবর্ষে এমত কেহ নাই যে কেশের কি বর্ণ উত্তম এ প্রশ্নের পৃথক উত্তর দিবেন; আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলে একবাক্যে কৃষ্ণ কেশই সৌন্দর্যের অবশ্য প্রয়োজনীয় বলিবেন; কিন্তু তাহা হইলে বিলাতী বরাঙ্গনাদিগের সুবর্ণাভ ও কটাভ প্রভৃতি কেশ ও তাহার প্রশংসায় গদ্‌ গদ্‌ চিত্ত নায়কদিগের দশা কি হইবে? এবং তাহাদের যে কোন প্রকারে গতি করিলে মধ্য আশিয়ার এক জাতীয় সৌন্দর্যাভিমানিনী যাঁহারা দিবারাত্র কেশের শুক্লত্ব সাধনার্থ নানা বর্ণ ব্যবহার করত শুক্ল কেশ সিদ্ধ করিয়া আপনারা অধিক সুন্দরী হইলেন অভিমান করেন তাঁহাদের দশা কি হইবেক? তিন শত বৎসর পূর্বে বেয়ুর কুন্তলের প্রশংসা বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ ছিল গত শতাব্দীতেও কবিরা তাহার অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু আমাদিগের বাল্যকালে পল্লীগ্রামে ও কলিকাতায় 'মমের পেটে পাড়া বড়া বিউনী' তুলারূপে দেখিয়াছি আমাদিগের বয়স্ক অনেও তাহা দেখিয়াছেন সন্দেহ নাই। আমাদিগের প্রাগ্‌যৌবনে তাহা রহিত হয়, এবং তৎপরিবর্তে পিঞ্চট পরা ঝাপটার প্রথা কলিকাতায় বলবতী হইয়া আইসে; তখন রূপাভিমানিনী ষোড়শী স্বরূপ ছিলেন যাঁহারা বেলা ৩টার সময় তপ্ত লৌহে কুন্তলের কুটিলতা সাধনার্থে বিরত না হইতেন ও এক ঘন্টা তদ্বিষয়ে পরিশ্রম করিতেন ঐ কুঞ্চিত কেশ কাগজে বাঁধিয়া অপর এক বা দুই ঘন্টাকাল সং সাজিয়া থাকিতেন; পরে সন্ধ্যার প্রাককালে গাত্র ধৌত করণানন্তর কাগজ খুলিয়া ঝাপটার শোভা সম্ভোগ করিতেন। কিয়ৎকাল পরে পিঞ্চট রহিত হয় কিন্তু দোলায়মান কুন্তলের কোন ব্যাঘাত হয় নাই, তাহা বিলাতে ও এতদ্দেশে তুল্য বলবৎ ছিল। পরন্তু কালে সকল বস্তুর অন্যথা হইয়া থাকে, সুতরাং কুন্তলই মার্কন্ডেয়ের পরমায়ু লাভ করিতে পারেন নাই। অধুনা সমস্ত কলিকাতায় অনুসন্ধান করিলে একটি প্রকৃত ঝাপটা পাওয়া দুষ্কর হইবে; সকলই ইংরাজী খোঁপার দৌরাত্ম্যে বিব্রত হইয়াছে, এবং আমাদিগের শৈশব-কালের 'পেটেপাড়া' পুনরুদ্ভাবিত হইয়াছে; কেবল তাহার অনুষঙ্গিনী 'বেড়া বিউনীর' বক্রী আছে, বোধ হয় তাহাও প্রত্যাগমন করিতে পারে। সত্য যে পেটে পাড়ার মম এই ক্ষণে দৃষ্ট হয় না, কিন্তু অনেক ঠাকুরণ দিদিরাও অধুনা 'পোমেটমে' সে অভাবের নিরাকরণ করিয়া থাকেন। তাহাতে মমের পরিবর্তে মেদ গ্রহণ এই মাত্র ভেদ দৃষ্ট হয়, ফলের কোন অন্যথা দৃষ্ট হয় না। আফরিকা দেশের বেচুয়ানা জাতীয়া স্ত্রী-দিগের মধ্যে মম বা পোমেটম সুপ্রাপ্য নহে, এই প্রযুক্ত তাহারা গোমেদ ও অঙ্গারের সাহায্যে কেশের জটা নির্মাণ করে, এবং তাহা মস্তকের চতুর্দিগে দোলায়মান রাখে; তন্মধ্যে যে ললনা সকল জটাগুলি সমদীর্ঘ ও কোন জটা কর্ণের নীচ পর্যন্ত দোলায়মান

না হয় এমত কেশ প্রস্তুত করিতে পারেন, তিনিই সৌন্দর্যের মুখ্য গরিমা প্রাপ্ত হন। ঐ জটাগুলি অভ্রের মাহাত্ম্যে চাকচক্য না হইত তাহা হইলে আমরা তাহার সহিত ভারতচন্দ্রের 'বেনীসাপিনীর' তুলনা করিতাম। এই জটভার বেচুয়ানা নায়কদিগের বিশেষ মোহনীয় হইলেও তাহাদের প্রতিবাসী নাটালের নায়কেরা তাহা অত্যন্ত হেয় জ্ঞান করে; কারণ তাহাদের মনোমোহিনীরা মহিষের মেদ দ্বারা সমস্ত কেশে এক স্থূলোপিণ্ড নির্মাণ করে; তাহা মস্তকোপরি ধুচুনীর ন্যায় বদ্ধ থাকে, এবং দীর্ঘকাল ও অনেক প্রযত্নে প্রস্তুত হইলে চিরকাল সমভাবে থাকে, তাহাই তাহাদের কবরীর মুখ্য আদর্শ এবং সৌন্দর্যের অদ্বিতীয় গরিমাস্থল।

গল্পের দাম

প্রকাশচন্দ্র দত্ত

(১)

উন্নততর সোপান হইতে সোপানান্তরে আরোহণ করিতে করিতে কুমারের আর্থিক অবস্থা যখন এমন স্বচ্ছল হইয়া উঠিল যে ২০০্।১০০্ টাকা বাজে খরচ করিলে তাহার গায়ে লাগে না এমন সময়ে আমরা একদিন কয় বন্ধুতে মিলিয়া কুমারকে ধরিয়া বলিলাম, 'বেশী নয়, আমাদের এক দিন ওরি মধ্যে একটু ভাল করিয়া গ্রেট ইস্টার্ণে একটি পার্টী ও আমরা যেরূপ পছন্দ করিব তোমার পরিবারকে সেইমত একখানি গয়না দিলেই সব গোলমাল মিটিয়া যায়।' কুমার এ প্রস্তাবে সম্মত হইল না। অথচ কুমার লোকটা এ দিকে বিলক্ষণ উদার ও বেশ একটু সৌখীন; অর্থাৎ, র‍্যাক্স্কিনের পম্পটি, প্লেটিনামের চেনটি, এবং 'লেডিদের প্রিয় রিস্টলেট ওয়াচটি না হইলে কুমারের চলিত না। কিন্তু কুমার সপ্তাহের অধিক সেগুলি ব্যবহার করিতেও পারিত না; কেন না আমাদের মধ্যে একজন না একজন কুমারের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ সেগুলিকে বাধিত করিত। কুমার হাসিয়া বলিত, 'জীবনে স্মৃতিচিহ্নের এত ঘটা, আমি মনে করব কি?' কুমারের স্ত্রী বলিত, 'তোমার বন্ধুগুলোর গায়ের পায়ের গায়ের মাপও কি ছাই তোমার সঙ্গের এক?' কুমার আমাদের নিকট এ কথা বলিবার আগে সূচনা করিত, 'পাগলী আজ খেপেছে।' কিন্তু সে কথা যাক। অনুনয় বিনয় করিলাম, অভিমান করিলাম, রাগ করিলাম, কিন্তু কুমার কিছুতেই উক্ত প্রস্তাবে ঘাড় পাতিল না। যখন দেখিলাম, কিছুতেই বাগ মানাইতে পারা গেল না, তখন আমরা বলিলাম, 'কিন্তু কুমার মনে থাকে যেন, প্রতিশোধ না লইয়া আমরা ছাড়িব না।' শুনিয়া কুমার বলিল, 'যে রকমে ইচ্ছা।' এই ঘটনার ২।১ দিন পরেই কুমার তাহার চাকরীস্থানে চলিয়া গেল।

(২)

'প্রমোশন' পাইয়া বদলী হইবার মুখে এক মাসের অবকাশ লইয়া তিন বৎসরের পর কুমার সে বৎসর কলিকাতায় আসিয়াছে। তখন পূজার সময়। আমাদের সঙ্গে লইয়া কুমার পূজার বাজার করিতে বাহির হইয়াছে। ভাইপোদের জন্য সিল্কের পাঞ্জাবি, ভাইঝীদের জন্য ব্রাজিকা পাট্যার্ণের শলমা-চুমকী-দার রেশমী শাড়ী, ভ্রাতৃজায়াদের জন্য অপেক্ষাকৃত সংযত রং ও প্যাটার্ণের কোষের বস্ত্র, ঝী-চাকরদের মাটাবালামের থান প্রভৃতি সবই কেনা হইল। আর কেনা হইল পিনার রকমারী গোটা কতক দামী সেন্ট। বাজার করিয়া ফিরিবার মুখে দপ্তরীপাড়ায় গাড়ী থামাইয়া কুমার এক দপ্তরীখানায় প্রবেশ করিয়া জাঁকাল রকমের বাঁধান ছোট বড় মাঝারী সব রকম কবির থান কয়েক গ্রন্থাবলী লইয়া আসিল। সেগুলি তাঁর প্রিয়তমাকে পূজার উপহার দিতেছেন। সেন্টগুলি শ্যালিকাদের জন্য। মিথ্যা কথা বলিব না আমার স্ত্রী যদিও কুমারের ভগ্নী তথাপি তাহার অদৃষ্টে একটি গন্ধ-লাভ হইয়াছিল, এবং আমিও যে তাহা ব্যবহার করিয়া বিজয়ার বাজারে শ্বশুরবাড়ী যাইবার দিন বাবু সাজি নাই, তাও বলিতে পারি না। যা লইয়া কুমারের সঙ্গে আমাদের ঝগড়া, তার কিন্তু কিছুই প্রতিকার হইল না। আমাদের পছন্দমত অলঙ্কার কুমার এ পূজার সময়ও তাহার গৃহিণীকে কিনিয়া দিল না। এই সূত্রে পূর্ব বৎসরের প্রতিশোধ লইবার কথাটা মনে পড়িয়া গেল।

(৩)

কি উপায়ে কুমারের এই গর্বের ও একগুঁয়েমীর প্রতিশোধ লওয়া যাইতে পারে তাহা স্থির করিবার জন্য আমাদের কয় বন্ধুর এক কমিটী বসিল, এবং নানা কথার পর স্থির হইল, আজ কাল গল্প লিখিয়া প্রতিশোধ লইবার 'ফ্যাশান' চলিত হইয়াছে, অতএব গল্প লিখিয়া এবং তাহা কোনও মাসিকপত্রে প্রচার করিয়া কুমারকে কাবু করিতে হইবে। গল্প লিখিবার ভার আমার প্রতি ন্যস্ত হইল।

(৪)

পূর্ব অধ্যায়ে যে দিনের কথা বলিতেছি, সেই দিন রাত্রি তিনটার পর গল্প লেখা সমাপ্ত হইয়া গেল। নায়িকা কুমারের পূর্ণবিকশিত-যৌবনা সুন্দরী পত্নী; নায়ক সংসারস্রোতে বিক্ষিপ্ত বিপন্ন বিধ্বস্ত যৌবনের ভগ্নতরী —আমি স্বয়ং। গল্পের চুম্বক এই :

কৈশরের পুণ্য শুভক্ষণে গল্পের এই নায়িকার সংস্পর্শে আমি আসিয়া পড়ি, এবং কিছুকাল যাবৎ পরস্পরের মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া জানাইবার উপায় না থাকিলেও, অব্যক্ত প্রেমের মহিমায় আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয় যে দিন দিন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল, সহজাতসংস্কারের বলে তাহার পরিচয় পাইয়া সন্তুষ্ট থাকি। ঠিক এমন সময়ে সংসারস্রোত কোথা হইতে কোন অদৃশ্য পথে বিপুল-বিক্রমে হঠাৎ আসিয়া আমাদের ভাসাইয়া লইয়া গেল, এবং জীবন-নদীর দুই বিপরীত কূলে, দু' জনকে ফেলিয়া দিল। ইহার বহু বৎসর পরে, সুখদুঃখপূর্ণ উৎসাহময় বহু বিচিত্র ঘটনার অবসানে, অকস্মাৎ এক দিন আমার এই কৈশোরজীবনের নিয়ন্ত্রী অধীশ্বরকে লীলাময়ী বিদ্যুল্লেখার ন্যায় কুমারের গৃহিণী-রূপে প্রতিভাত দেখিলাম। এবং সেই ক্ষণিকার তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল মুহূর্ত-মাত্রস্থায়ী আলোকরশ্মিতে তাহার পদ্মপলাশ-সুকুমার অথচ জলাময় নেত্রে দুই বিন্দু অশ্রুও যেন দেখিলাম বলিয়া বোধ হইল। সেও আমায় দেখিয়াছিল। যে ক্ষণিকার ক্ষণ-স্থায়ী আলোকে আবার যুগান্ত পরে আমাদের নয়নে নয়নে মিলন হইয়া দৃষ্টি ফিরিয়া আসিয়াছিল মুহূর্তের মধ্যে বাহিরের বায়ুমন্ডল হইতে সে আলো সরিয়া গেল বটে, কিন্তু তাহার বৈদ্যুতিক প্রভাব দুই হৃদয়ে পুরাতন কালের সেই সুপ্ত জ্বলা স্থায়ী করিয়া জাগাইয়া রাখিল। কৃত্রিম ঘটনাবলীর সমাবেশে অকাট্য ন্যায়ের আকারে প্রমাণ করিলাম, কুমারের ধর্মপত্নী তাহার সহধর্মিণী হইলেও কেবল একমাত্র আমারই হৃদয়ের অধীশ্বরী। এবং আবশ্যক হইলে সকল ন্যায় ধর্মের খাতিরে তাহার বিবাহিত জীবনের কর্তব্য রমণীজীবনের নিষ্ঠা অটুট রাখিয়াও সে যে তাহা স্বীকার করিতে পারে, এমন দুষ্ট ইঙ্গিতও গল্পের মধ্যে ছিল।

৫

গল্প সমাপ্ত হইলে বন্ধুমহলে মহা আনন্দ পড়িয়া গেল। ভাষার পারিপাট্যে, কৃত্রিম ভাবের অকৃত্রিম উৎসে, রসবৈচিত্র্যে ও বিচিত্র ঘটনা-পরম্পরার সমাপন্তে গল্পটি নিখুঁত হইয়াছে, বন্ধুমন্ডলী এইরূপ মত প্রকাশ করিয়া আমায় আপ্যায়িত করিলেন। বিশেষতঃ আমাদের উদ্দেশসাধনের পক্ষে গল্পের দাম নাই বলিলেও হয়, এমন কথাও বলিলেন। তখন বুঝি নাই যে, বিস্তর দামে এই গল্পের ক্রয় বিক্রয় সাধিত হইতে চলিয়াছিল। যাহা হউক কুমারকে নাকাল করিবার আগে তাহাকে একটা অবসর দেওয়া গেল,—যদি সে এখনও আমাদের প্রস্তাবে সম্মত হয়। গল্প পড়াইয়া কুমারকে শোনান হইল। আমাদের প্রস্তাবে সম্মত হওয়া দূরের কথা, সে বরং গল্পটি বিলক্ষণ উপভোগ করিল, এবং বলিল, 'তোমার লেখা ত পয়সা না দিলে ছাপিবে না, অতএব এস, চাঁদা করে সে টাকাটা তোলা যাক; এই আমি দু' টাকা দিয়া চাঁদার খাতা খুলিলাম।' আমি হাসিলাম বটে কিন্তু কুমারকে জব্দ করিবার প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল।

সেই মাসেরই '—' এ গল্প ছাপা হইয়া গেল। কাগজ তখনও বাহির হয় নাই, শেষ ফর্মা ছাপা হইতেছে। আমার গল্পের শেষ অংশটাও এই ফর্মায় পড়িয়াছে। শেষ প্রুফ দেখিয়া দিবার জন্য সে ফর্মা আমার টেবিলে তখনও পড়িয়া আছে। কুমার আসিয়া তাহা দেখিল। তখন তাহার পরিহাসের ভাব চলিয়া গিয়াছে। গল্প যাহাতে না ছাপা হয়, তাহার জন্য আমার অত্যন্ত জেদ করিতে

জানিল। অন্ততঃ তাহার নামের ও পরিচয়-জ্ঞাপক অবস্থাবলীর যে উল্লেখ আছে, তাহার পরিবর্তন করিয়া বাহির করিবার জন্য যদি বিশ পঞ্চাশ টাকা খরচ হয়, তাও সে রাজী আছে, এমন কথাও বলিল।

কিন্তু তখন আর কোনও উপায় নাই। ম্যানেজারের উপর ভার দিয়া সম্পাদক পূজার ছুটীতে দেরাদুন চলিয়া গেছেন। ম্যানেজার সম্পাদকের আদেশ না পাইলে কিছুতেই পরিবর্তন করিতে রাজী হইল না। সুতরাং 'প্রি-পেড' আর্জেন্ট টেলিগ্রাম করিলাম। কিন্তু সম্পাদক তখন দেরাদুন পরিত্যাগ করিয়াছেন। আবার টেলিগ্রাম করিলাম। একে পূজার সংখ্যা তাহাতে পত্রিকা-প্রকাশের অনেক বিলম্ব হইয়া গিয়াছে, সুতরাং ম্যানেজার ছাপিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল। যাহা হউক, এবার উত্তর আসিল, 'কেবল নায়ক নায়িকার নামের পরিবর্তন করিয়া ছাপ।' গাড়ী ভাড়া, কাগজ, ছাপা প্রভৃতি করিয়া এই উপলক্ষে কুমারের প্রায় ২৫৲।২৬৲ টাকা খরচ হইয়া গেল। কুমারেরই বা বলি কেন, সে টাকা আমারই গেল। কেননা, কুমার তখন আমার নিজের হইতে তাহা ধার লইয়াছিল, এ পর্যন্ত আর তাহা ফিরিয়া পাই নাই।

আর শুধু এই টাকা কয়টার উপর দিয়া যাইত, তাহা হইলেও বাঁচিতাম। কিন্তু মানুষে গড়ে, ভগবান ভাঙেন। আমরা ভাবিলাম, যা হউক, কুমারকে খুব জব্দ করা গিয়াছে। কিন্তু ভবিতব্যতা যে কুমারের সাহায্যে আমাদের গুরুতররূপে জব্দ করিবার জন্য ফাঁদ পাতিতেছিল, সে কথা তখন কে সন্দেহ করিয়াছিল?

বিশু বাবুদের বাড়ী আজকাল পাশার আড্ডা খুব জমিয়াছে। সেখান থেকে ফিরতে প্রায়ই রাত্রি এগারটা, এবং কোন দিন বারটা একটাও হয়। যে লোক বইয়ের পোকা হয়ে বাড়ীতেই অষ্টপ্রহর পড়িয়া থাকিত তার পক্ষে এরূপ আচরণ অধঃপাতে যাইবার লক্ষণই বটে। সুতরাং মধ্যে মধ্যে আমাকে স্ত্রীর শাসন সহ্য করিতে হইত। বিশু বাবুদের বাড়ী দরজীপাড়ায়।

তখন গ্রীষ্মকাল। রাত্রি প্রায় দশটা। সেই 'দান'টা খেলেই সে দিন ওঠা হবে—মস্ত রোকের খেলা। আমার পোয়া বারোর আড়ি মারার উপর সমস্ত খেলাটা—অর্থাৎ আমাদের পক্ষের জিৎ নির্ভর করিতেছে। দর্শকবৃন্দ, বিশেষ আমার সহযোগী কাংটি দম বন্ধ করিয়া উদ্‌গ্রীব হইয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিতেছেন—আমার হাত থেকে কি দান পড়ে। 'কথা কও পাশা? পোয়া বারো-ও!' বলে আমি ছক ফেলেছি, এবং পোয়া বারোই পড়েছে দেখে খুব একটা অট্টরোল উঠেছে এমন সময় কুমারদের বাড়ীর সরকার তাড়াতাড়ি এসে বিশু বাবুকে ডাকিয়া বলিল, 'মশাই! সর্ব্বনাশ হয়েছে, এখুনি চলুন, রাঙা বউমা বিষ খেয়েছেন।' রাঙা বউ কুমারের স্ত্রী। উক্ত সরকার আমাদের বাড়ীতেও গিয়াছিল, এবং সেখানে আমার দেখা না পাইয়া বিশুদের বাড়ীতে আসিয়াছে। আমরা যে যে অবস্থায় ছিলাম, সেই অবস্থায় উঠিয়া পড়িলাম।

পাম্প দিবার আগেই বমি করান হইয়াছিল, এবং বিষ অল্পক্ষণের মধ্যেই ধরা পড়ায় বিশেষ কিছু অনিষ্ট হইল না। প্রতিষেধক ঔষধের গুণে বিপদের আশঙ্কা একেবারেই তিরোহিত হইয়া গেল। ঘাম দিয়া যেন আমার জ্বর ছাড়িল।

শেষ রাত্রে কুমার বলিল, 'আর ভয় নাই।'

আমরা বাড়ী ফিরিব বলিয়া উঠিলাম। কুমার আমাদের সঙ্গে গলির মোড় অবধি আসিল, আমাকে একান্তে ডাকিয়া বলিল, 'তোমার বাড়ীতে টাকা আছে? শ' তিনেক টাকা পাঠাইয়া দিতে পার?'

সৌভাগ্যক্রমে সেই দিন বাড়ীভাড়ার টাকা আদায় হইয়াছিল। বাড়ীতে পঁহুছিয়াই কুমারকে তিন শত টাকা পাঠাইয়া দিলাম।

তিন দিন পরে কুমার আমাদের নিমন্ত্রণ করিল! বলিতে কি, নিমন্ত্রণ পাইয়া আমি অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িলাম। দুই দিন পূর্ব্বে কুমারের গৃহে যে প্রলয়কাণ্ড উপস্থিত হইয়াছিল, আমিই তাহার মূল। লজ্জায় ক্ষোভে অনুতাপে আমার মনে শান্তি ছিল না। এ অবস্থায় কুমারের নিমন্ত্রণ 'কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে'র মত বোধ হইতে লাগিল।

বিশুকে সব বলিলাম। কিন্তু সে ছাড়িবার পাত্র নয়। অম্লানবদনে হাসিতে হাসিতে বলিল, 'গতস্য শোচনা নাস্তি। চল!'

আমি বলিলাম, 'বল কি? আমি যাইতে পারিব না।'

অবশেষে বিশু আমাকে জোর করিয়া টানিয়া লইয়া গেল।

আহারান্তে কুমার আমাকে বলিল, 'লেখক-চূড়ামণি! এই নাও তোমার কর্ম্ম'।'

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম, 'কর্ম্ম?'

কুমার বলিল, 'যে রাত্রে তোমরা আমার বাড়ীতে বিষবৃক্ষের অভিনয় দেখিতে যাও,—যদিও সে দিন আমার স্ত্রী তাঁহার বাপের বাড়ীতে সুস্থ-শরীরে বিরাজ করিতেছিলেন,—সেই রাত্রে তুমি তিন শত টাকা পাঠাও, মনে নাই?'

আমি বলিলাম, 'তার পর?'

কুমার বলিল, 'আড়াই শত টাকায় আমার স্ত্রীর জন্য ব্রেসলেট কিনিয়াছি,—তোমার বহু দিনের সখ। বাকী পঞ্চাশ টাকার মধ্যে আজিকার আয়োজনে ছাব্বিশ টাকা দশ আনা মুদ্রালীলা সংবরণ করিয়াছে। অবশিষ্ট টাকা কয়েকটির শ্রাদ্ধ যদি আজই করিতে চাও ত ষ্টার থিয়েটারে চল,—বিষ-বৃক্ষ দেখিয়া আসি!'

অট্টহাস্যের ফলে আর কিছু আমার কর্ণগোচর হইল না। কুমার পকেট হইতে এক মরক্কো-মণ্ডিত বাক্স বাহির করিল,—বিশু বাক্সটি কাড়িয়া লইয়া খুলিয়া ফেলিল। হাসিতে হাসিতে বলিল 'বাহবা! আবার কি লেখা দেখিতেছি যে—'

আমি আলোর কাছে বসিয়াছিলাম,—বিশু আমার হাতে ব্রেসলেট দিয়া বলিল,—'দেখ ত পড়ে—'

আমি আলোয় ধরিয়া পড়িলাম,—'গল্পের দাম!'

সাহিত্য-বৈশাখ, ১৩০৯।

অভিমান

কালীপ্রসন্ন ঘোষ

মনুষ্যের মন যথার্থ অভিমানে অলংকৃত হইলে, উহার আশা এবং আকাঙ্ক্ষা ক্রমেই ঊর্দ্ধদিকে আরোহণ করে। তখন পর শ্রীতে তাহার কাতরতা হয়। হৃদয় পরের সৌভাগ্যে খিন্ন হইলে, অভিমানী আপনার নিকট আপনি অপরাধী হয়, এবং ঐ ক্ষুদ্রতা অনুভব করিয়া লজ্জায় মরিয়া যায়। যে আপনাকে অপদার্থ, অকর্ম্মণ্য এবং সর্ব্বতোভাবে সারশূন্য বিবেচনা না করে, সে অন্যদীয় সম্পদে কদাপি বিষণ্ণ হইতে পারে না। অভিমানী কাপুরুষের মত, অগোচরে আক্রমণ করে না, অন্ধকারে আঘাত করিতে জানে না, এবং একবারের পরিবর্ত্তে শতবার মরিতে হইলেও, অযোগ্যস্থলে প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে দণ্ডায়মান হয় না। কবির কল্পনা বল, আর ইতিহাস বল, মহাবাহু ভীষ্ম, শিখণ্ডীর দুর্ব্বল কর-নিক্ষিপ্ত শর-নিকরে রোমে রোমে বিদ্ধ হইয়াও তাঁহাকে ফিরিয়া আঘাত করিতে পারেন নাই। যে জাতীয় লোকেরা নীচপ্রকৃতি ও স্বার্থপর, তাহাদিগের মধ্যে সম্মুখ সংগ্রাম অপেক্ষা উপাংশুহত্যা অধিক প্রচলিত, বীরাচার অপেক্ষা ছদ্মব্যবহার ও ছলনারই অধিক আদর, এবং প্রকৃত বীরপুরুষ অপেক্ষা কপটকুশল কার্য্যসাধকেরই অধিক সম্মান। তাহারা সাধনের প্রণালীর প্রতি দৃষ্টি করে না, সিদ্ধিই তাহাদিগের সর্ব্বস্ব। পক্ষান্তরে, যে জাতীয়দিগের অন্তরে অভিমানের অগ্নি প্রজ্বলিত থাকে, তাহাদের রীতি-নীতি সর্ব্বাংশে ইহার বিপরীত। তাহারা যাহা কিছু করে, মধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ড তাহার সাক্ষী থাকেন। সিদ্ধি হউক, কি না হউক, তদর্থে তাহারা ব্যস্ত হয় না; সাধন-পদ্ধতিতে কোনরূপে কলঙ্ক-স্পর্শ না হয়, ইহাই তাহাদিগের মুখ্য চিন্তা।

'প্রভাতচিন্তা' থেকে গৃহীত।

প্রদর্শনী পরিক্রমা

চিত্ররসিক

সমকালীন অস্ট্রেলিয়ার শিল্প

আমাদের মত সাধারণ মানুষের কাছে অস্ট্রেলিয়া যেন পৃথিবীর শেষ প্রান্তের দেশ। ব্রিসবেন, এডিলেড, সিডনী বা মেলবোর্ণে ক্রিকেট ছাড়া আর কোন কিছু হয় কিনা সে সংবাদ বিশেষজ্ঞরা ছাড়া আমরা কেউ বিশেষ সন্ধান রাখি না। শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এদেশকে ব্রিটেনেরই ঔপনিবেশিক প্রসার বলেই আমরা ভাবতে অভ্যস্ত। গিলবার্ট নাথে বা ডেভিড লোর জন্ম ওশিয়ানিয়ায় হলেও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এঁরা একান্তভাবেই ব্রিটেনের সঙ্গে যুক্ত। সাংস্কৃতিক জীবনের শুরুতে অনিবার্য কারণে ব্রিটেনের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা থাকলেও গত শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি সময় থেকেই এ বন্ধন ছিন্ন করবার একটা সচেতন প্রয়াস সেখানে শুরু হয়েছিল। শিল্পক্ষেত্রে এ প্রচেষ্টার ফলাফলের যৎসামান্য নিদর্শন দেখা গেল গত ২৬শে ডিসেম্বর থেকে ৬ই জানুয়ারী পর্যন্ত অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে অনুষ্ঠিত সমকালীন অস্ট্রেলিয়ান চিত্রকলার প্রদর্শনীতে। ললিতকলা আকাদেমি, অস্ট্রেলিয়ান হাই-কমিশন এবং অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসের সহযোগিতায় এর আয়োজন সম্ভব হয় তবে দুঃখের বিষয় উদ্বোধনের দিন শহরের গণ্যমান্য অনেক শিল্পীদের অনুপস্থিতিতে উৎসবের অনেকখানি শোভাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে মনে হল।

যে কোন পাশ্চাত্য উপনিবেশের মত শ্বেত অস্ট্রেলিয়ার শিল্পকলার শুরু হয় সেখানকার ভৌগোলিক দৃশ্য এবং স্থানীয় পশুপক্ষী আর আদিম অধিবাসীদের রূপ বর্ণনা দিয়ে। পাকাপাকিভাবে উপনিবেশ স্থাপনের পর এখানে ইউরোপের সমকালীন শিল্পধারা এবং তার রীতি-নীতিই চলে এসেছে। এ যেন ব্রিটেনের চোখ দিয়ে অস্ট্রেলিয়াকে দেখবার চেষ্টা, অস্ট্রেলিয়ানের চোখে স্বদেশ ও স্বসমাজের স্বরূপ খোঁজার চেষ্টা হয়েছে অনেক পরে। এখানকার আদিম অধিবাসীদের আদিম শিল্পরীতির কোন প্রভাব অবশ্য এই শিল্পচর্চার ইতিহাসে প্রায় অনুপস্থিত। সেদিক দিয়ে বোধ হয় আমেরিকার শিল্প-ইতিহাসের সঙ্গে এখানকার শিল্পচর্চার কতকটা মিল থাকতে পারে। উভয় ক্ষেত্রেই স্থানীয় আদিম আদিবাসীদের হটিয়ে দিয়ে উপনিবেশ স্থাপন হয়। তাদের শিল্প-সংস্কৃতি সম্পর্কে কোন আকর্ষণ ঔপনিবেশিকদের মধ্যে খুব বেশী দেখা যায় না। বরং যে দেশ থেকে ঔপনিবেশিকদের আগমন সেই দেশের শিল্প-সংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণ ও তার চর্চাই প্রবল। তারপর নতুন সমাজ একটা বিশিষ্ট রূপ নেবার সঙ্গে সঙ্গে ঔপনিবেশিকদের আদি বাসস্থানের সংস্কৃতির সঙ্গে যোগসূত্র কতকটা ক্ষীণ হয়ে আসে এবং নতুন দেশে নতুন সংস্কৃতির গোড়াপত্তনের চেষ্টা চলে। মুখ্যত এর প্রথম আত্মপ্রকাশ হয় সাহিত্যের মাধ্যমে।

চিত্রশিল্পে জাতীয় বৈশিষ্ট্য আনবার চেষ্টা হয় আরো পরে। হয়ত পরোক্ষভাবে সাহিত্য সেই ক্ষেত্র তৈরী করতে সহায়তাও করতে পারে। অস্ট্রেলিয়ায় উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই জাতীয় বৈশিষ্ট্য আনবার অনুসন্ধান শুরু হয়। ফরাসী ইম্প্রেশনিজমের আমদানীতে নিসর্গ দৃশ্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেখা দেয়। এর পরবর্তী ইউরোপীয় শিল্পধারার সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার পরিচয় ঘটে আরো পরে প্রায় ১৯২০র কাছাকাছি সময়ে। অস্ট্রেলিয়ার



দি আউটিং শিল্পী: রবার্ট ডিকারসন

নতুন শিল্পীরা নিজের দেশকে নতুন করে খোঁজার চেষ্টা শুরু করলেন। কেউ তাঁদের শিল্পে সাধারণ শ্রমিক ও বস্তির বাসিন্দাদের জীবন প্রতিফলিত করলেন। কেউবা দেশের অভ্যন্তরের "বুশ" অঞ্চল এবং সেখানকার খনি-খামার চারণভূমি বা পলাতক আসামীদের কাহিনী নিয়ে যে রূপকথা গড়ে উঠেছে তাকেই ব্যক্তিগত টীকা ভাষ্য দিয়ে ক্যানভাসে উপস্থিত করলেন। কেউবা আরো গভীরে আদিবাসী জীবনের রূপের প্রতিও আকৃষ্ট হলেন। বিদেশাগত আধুনিক শিল্পের বিভিন্ন শৈলীর প্রভাবে এবং অস্ট্রেলিয়ান শিল্পীদের স্বদেশকে আবিষ্কার করার চেষ্টায় ১৯৩৫ থেকে ১৯৪৫শের মধ্যে এখানকার আধুনিক শিল্প-আন্দোলন গড়ে ওঠে। ১৯৩৭এ মেলবোর্ণে প্রতিষ্ঠিত কন্টেম্পরারী আর্ট সোসাইটির এবং পরে সিডনীর শিল্পীগোষ্ঠী এই আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়।

আলোচ্য প্রদর্শনীর ৩৪ জন শিল্পীর ৩৪খানি ছবি থেকে তাঁদের শিল্প সম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট পরিষ্কার ধারণা সম্ভব না হলেও চাক্ষুষ অভিজ্ঞতায় কতকগুলি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। আধুনিক শিল্প-রীতির বিভিন্ন বিভাগ ও মাধ্যমের অবাধ চর্চা এবং সমস্ত ছবিতেই আঙ্গিকের একটা উঁচুদরের প্রয়োগনৈপুণ্য দেখা যায়। নিসর্গ দৃশ্যের প্রতি কোন কোন শিল্পীদের একটা গভীর আকর্ষণ এবং অনেক ছবিতেই একটা মাটির কাছ কাছি থাকবার চেষ্টা দেখা পড়ে। অস্ট্রেলিয়ার অভ্যন্তরের রুক্ষ মরুপ্রকৃতির দিকেই শিল্পীদের আকর্ষণ দেখা গেল—যেখানে প্রচলিত অর্থে অসুন্দর এবং যেন সৃষ্টির আদিকালের জগতের একটা চেহারা ধরবার চেষ্টা হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার অধিকাংশ ক্ষেত্রের নিসর্গ দৃশ্যের চেহারাই হয়ত এই ধরণের। রাসেল ড্রাইসডেলের "দি বর্ণট কান্ট্রি" এবং লরেন্স ডজের 'করোনেশন রিজ'এর রক্তরাঙা খোয়াই-এর বিস্তারের রূপ থেকে এই কথাই মনে হয়। ক্লিফটন পাগএর "দি পোয়েট অ্যান্ড দি ল্যান্ডস্কেপের" পশ্চাৎপটের পাথরেও এই আদিম জগতের ছাপ দেখতে পাই। কোন কোন অ্যাবস্ট্রাক্ট ছবিতেও এই মাটির রং একেবারে উপেক্ষিত হয়নি—যেমন স্ট্যানিস্লাভ রাপোটেকের "এক্সপিরিয়েন্স ইন দি ফার ওয়েস্ট"এ। আর্থার বয়েডের নিসর্গ দৃশ্যেও প্রকৃতির রুক্ষ বিজনতাই প্রধান মনে হল। এমনকি জাকলিন হিকসের হাল্কা ইম্প্রেশনিস্টিক কাজ 'থ্রি মাইল কিড্‌স'এর মত প্রকৃতির কোলের রমণীমূর্তিগুলি পটভূমিকাও খুব একটা প্রচলিত অর্থে সৌন্দর্যমণ্ডিত নয়। কয়েকটি ছবিতে অ্যাবস্ট্রাকশন ও রিপ্রেজেন্টেশনের মধ্যে একটা সুন্দর বোঝাপড়ায় এসে পৌঁছবার চেষ্টা আমায় বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছে। যেমন অ্যান্ড্রু সিবলির "হোটেল মাউন্টগারনেট", ওয়ারেন গাইএর "এশচুয়ারি" এবং বিশেষভাবে জেমস গ্লান্টের "দি সিডার ট্রি" ছবিতে। এটি হঠাৎ দেখলে জ্যাকসন পোলকের কোন একটি ক্যানভাসের কথা মনে পড়ে যায়। পরে পত্রপুঞ্জের ফাঁকে আকাশের ইঙ্গিত চলচ্চিত্রে ক্ষণিক দৃষ্ট ক্লোজ আপের মত দেখতে লাগে। যেন এখনি মিডশটে চলে যাবে। এই চলচ্চিত্রধর্মী দৃষ্টিভঙ্গী আরো দুএকখানি ছবিতে চোখে পড়ে। যেমন লরেন্স ডজের "করোনেশন রিজের" বিস্তৃতি বা আলবার্ট টুকারের 'ট্রি'তে ক্লোজ আপ-ধর্মীতা এবং সিডনী নোলানের "নাইট—কনভিক্‌ট ইন দি সোয়াম্প'এ। বাদায় লুকানো এই পলাতক আসামীর প্রতীক্ষার একটা নাটকীয় মুহূর্তের খণ্ডিত ছবিতে একটা কাহিনীর বিশেষ মুহূর্তের স্টিল যেন দেখতে পাওয়া যায়। আধুনিক অস্ট্রেলিয়ার অন্যতম প্রধান শিল্পী সিডনী নোলান অস্ট্রেলিয়ার লোকসাহিত্যের মধ্যে থেকে শিল্পের বিষয়বস্তু বেছে নিয়ে তাকে তাঁর ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গী থেকে উপস্থিত করে অস্ট্রেলিয়ার একটা বিশেষ রূপ ফোটাবার

চেষ্টা করেছেন। যেসব শিল্পীরা অস্ট্রেলিয়ার উপকূল ত্যাগ করে আভ্যন্তরীণ রূপ ফোটাবার চেষ্টা করেছেন এবং যার মধ্যে নগরকেন্দ্রিকতা উপেক্ষিত, নোলান তাঁদের অগ্রগণ্য। ডাকাত নেড কেলীকে তিনি সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীরূপে ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রদর্শনীর ছবিটি মিসেস ফ্রেজার ও আসামীর কাহিনীর সিরিজের একটি ছবি।

প্রবীণ শিল্পীদের মধ্যে উইলিয়াম ডোবেলের "দি বিলি বয়" ছবির শ্রমিকের প্রতিকৃতিতে দমিয়ে সুলভ ক্যারিকেচারধর্মীতা দেখা যায়। কিন্তু এখানে ক্যারিকেচার বিদ্রূপের বাহন নয়, শিল্পীর মানবিকতাকেই প্রকাশ করেছে। ডোবেল বোধহয় অস্ট্রেলিয়ার প্রধান প্রতিকৃতি শিল্পী। আর্থার বয়েডের "ফিগার ইন দি ল্যান্ড স্কেপ"এ তাঁর আঙ্গিকের পারদর্শিতার নমুনা সুন্দরভাবে দেখা যায়। কিন্তু আদিবাসীদের জীবনকে প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করে তিনি যেসব ছবি এঁকেছিলেন তার নমুনা এখানে অনুপস্থিত। সে রীতির ছবি বরং ডেভিড বয়েডের "ট্রাগাম্রিজ ড্রীম অব চাইল্ডহুড"এ কতকটা উপস্থিত। চার্লস ব্ল্যাকম্যানের "থ্রি চিলড্রেন বাই দি পন্ড" এবং রবার্ট ডিকারসনের "দি আউটিং" ছবির তীক্ষ্ম রেখায় ভাগ্যবানের দেশ অস্ট্রেলিয়ার যে শিশুরা তত ভাগ্যবান নয়, তাদের জীবনের একটুকরো ধরা পড়েছে। দ্বিতীয় ছবির সঙ্গে পিকাসোর ক্লাউন সিরিজের ছবিগুলোর একটা আত্মিক যোগাযোগ আছে। মাইকেল কমিট-এর "এডা" কতকটা শাগালের ধরনে আঁকা উজ্জ্বল বর্ণাঢ্য ছবি।

অ্যাবস্ট্রাক্ট কাজের মধ্যে ইয়ান ফেয়ার ওয়েদারের ক্যালিগ্রফিক কাজ 'শালিমার' অ্যাশার বিলুর "এপ্রিল লাইট" এবং সিডনী বল-এর অপ্ ধর্মী ছবি "ক্যান্টো-রোম ২০" বিশেষ ইন্টারেস্টিং লেগেছে। লিওনার্ড ফ্রেঞ্চের "রেন অব ফিশেজ" কতকটা প্রাচীন কেল্টিক রিলিফের মত। টমাস গ্লেগহর্নের "ফার্স্ট টু ব্রিজ ইন সেন্টেনিয়াল পার্ক" রঙের বাহারে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এছাড়া লুই জেমসের "দি কিং অব দি গোল্ড কোস্ট"-এর রূপসজ্জা উল্লেখযোগ্য। জেমস গ্লীসনের "আফটার দি ফল" সুরেরিয়্যালিস্টিক পারিপাট্যের সঙ্গে অঙ্কিত কিন্তু আকর্ষণী ক্ষমতা এর কম। শিল্পীদের কেউ কেউ ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে এসে অস্ট্রেলিয়ায় স্থায়ী বসবাস করছেন। তাঁদের স্বদেশের সংস্কৃতির ছাপ কিছু কিছু ছবিতে থাকলেও সমগ্র প্রদর্শনীতে একটা মোটামোটি ঐক্যের আভাস বিশেষ ভাল লাগল। এটি অ্যাকাডেমির ১৯৬৭র শেষ প্রদর্শনী এবং উল্লেখযোগ্য প্রদর্শনী।

●

বিড়লা অ্যাকাডেমিতে ১লা থেকে ৭ই জানুয়ারী নকুল সিংহ, দিব্দি মনোজ এবং ব্রহ্মজিৎ-এর একটি চিত্রপ্রদর্শনী হল। এঁরা তিনজনেই শান্তিনিকেতনে শিল্প শিক্ষা করেছেন। এঁদের মধ্যে প্রথম দুজন অ্যাবস্ট্রাকশনের পথ বেছে নিয়েছেন। নকুল সিংহের কালিকলমের ড্রয়িং-এর দু' একটি ইন্টারেস্টিং। দিব্দির অ্যাবস্ট্রাকশনগুলি নিসর্গ দৃশ্য অনুপ্রাণিত এবং ব্রহ্মজিৎ মানুষের ভাগ্য সিরিজে কয়েকটি এক্স-প্রেশানিস্টধর্মী ফিগার দেখিয়েছেন। দুটি মুখমণ্ডলের ছোট ক্যানভাস উল্লেখযোগ্য।

●

৪ঠা থেকে ৯ই জানুয়ারী ম্যাক্সমুলার ভবনে রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের ১৭ খানি ড্রয়িং ও পেন্টিং-এর প্রদর্শনী হচ্ছে। শ্রীভট্টাচার্য নাগাল্যান্ডে শিল্পশিক্ষকের কাজ করছেন। তাঁর অনেকগুলি ক্যানভাসে আদিবাসী জীবনের পটভূমিকার আমেজ পাওয়া যায়। তবে চিত্ররচনা আরো সুগঠিত হলে সুদৃশ্য হত। বিভিন্ন প্রতীক দিয়ে সাজানো কয়েকটি ছবি মন্দ লাগলো না। ৭ এবং ৯ নম্বরের ছবি এবং দু'খানি ড্রয়িং সুদৃশ্য লাগলো।

জানাতে পারেন

প্রশ্ন

(ক) ভারতবর্ষে চিনির কলের মোট সংখ্যা কত এবং কোন রাজ্যে কয়টি আছে?

(খ) এক কুইন্টল আখ থেকে কত কিলোগ্রাম চিনি তৈয়ারী হয়?

(গ) এদেশে বিদেশ থেকে চিনি আমদানি করা হয় কি? যদি আমদানি করা হয়ে থাকে তা হলে তার পরিমাণ প্রয়োজনের কত শতাংশ?

তপনকুমার চট্টোপাধ্যায়
'অরুণালয়'
ইসলামপুর, পাটনা-১

●

১। ভারতের কোন্ কোন্ চিড়িয়াখানায় গরিলা আছে?

২। যেসব প্রাণী রাত্রে দেখতে পায়, তাদের চোখের বৈশিষ্ট্য কি?

মাধুরী দত্ত
অম্বর নাথ, মহারাষ্ট্র

●

ক) আলতা, সিন্দুর, আবির, কুমকুম প্রভৃতি কিভাবে তৈরি করা যায়?

খ) পানের মসলা, জর্দা তৈরি শিখবার উপযোগী কোনো বই আছে কি?

গ) বুক-কিপিং শিক্ষা গ্রহণের কোন কেন্দ্র পশ্চিমবাংলায় আছে কি?

অনিল মুখোপাধ্যায়
সড়কপাড়া, রাণাঘাট,
নদীয়া।

(ক) জয়হিন্দ্ কখন কোথায় কোন উপলক্ষে কার দ্বারা প্রথম উচ্চারিত হয়?

(খ) হিন্দ্ কোন ভাষা এবং এর অর্থ কী?

(গ) ভারতীয় সংবিধান সম্বলিত বাঙলা পুস্তক কোথায় পাওয়া যায় এবং দাম কত? এর কোনো ধারা বা অনুচ্ছেদ সম্বন্ধে ভারতীয় নাগরিকদের স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করবার অধিকার আছে কী? বিতর্কিত মতামতের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার দায়িত্ব কার?

(ঘ) ভারত থেকে কী কী কৃষি, খনি, বন ও অন্যান্য শিল্পজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি এবং বিদেশ থেকে ভারতে আমদানি হয়ে থাকে?

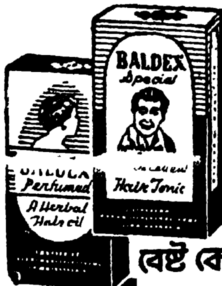
(ঙ) এই আমদানী ও রপ্তানি ভারতীয় সর্বসাধারণের দৈনন্দিন জীবিকা নির্বাহে কী পরিমাণ অনুকূল বা প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করে থাকে?

নিরাপদ চট্টোপাধ্যায়
কোডরু, পোঃ হিনু, রাঁচী

●

মোহনবাগানের প্রাক্তন খেলোয়াড় শ্রীউমাপতি কুমারের জীবনী (ব্যক্তিগত ও খেলোয়াড়) যদি জানাতে পারেন বিশেষ বাধিত হ'ন।

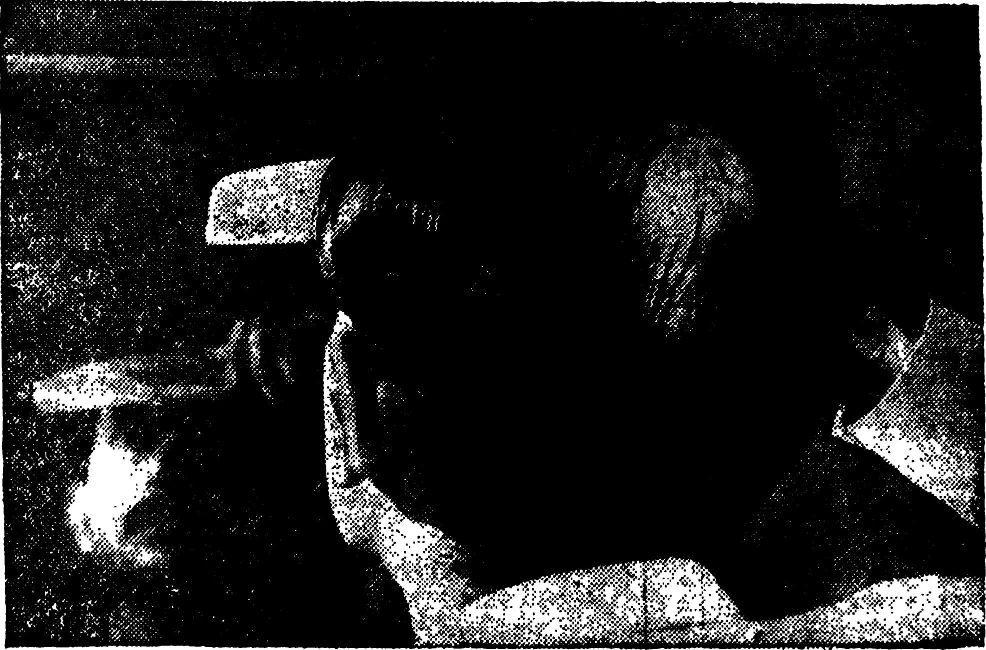
শ্রীমতী চৈতালী ঘোষ
চুঁচুড়া—হুগলী



আয়ুর্বেদীয় উপাদানে প্রস্তুত
বলডেক্স
চুল ওঠা বন্ধ করে
নতুন চুল গজায়
বেষ্ট কেমিক্যাল কর্পোরেশন• কলিকাতা-৩৭

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

চুল উঠে যাওয়ার জন্য বিব্রত?



আজ থেকে সিলভিক্রিন ব্যবহার করে চুলের পুনর্জীবন ফিরিয়ে আনুন

বিপদের এই সব সঙ্কেত অবহেলা করবেন না।

চুল উঠে যাওয়া। মাথার তালুতে চুলকানি। নির্জীব শুকনো চুল। এই সব লক্ষণ থেকেই বুঝা যায় যে আপনার চুল বেড়ে ওঠার জন্য যে জীবনদায়ী খাদ্যের প্রয়োজন তার অভাব হচ্ছে। এর ফলে অকালে আপনার মাথায় টাক পড়তে পারে। তাই এই সব লক্ষণ দেখা দিলেই বুঝতে হবে আপনার চাই—সিলভিক্রিন—যেটি চুলের জীবনদায়ী স্বাভাবিক খাদ্য।

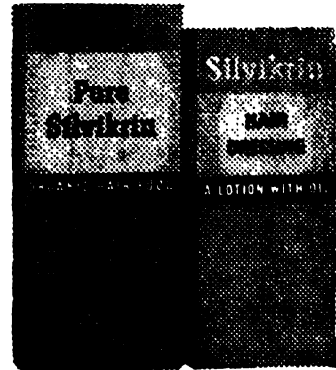
সিলভিক্রিন কি ভাবে কাজ করে?

চুলের গঠনের জন্য যে ১৮টি অ্যামিনো অ্যাসিড দরকার হয়, প্রকৃতি তা জোগায়। একমাত্র সিলভিক্রিনেই রয়েছে সেইসব অ্যামিনো অ্যাসিডের মূলতত্বের নির্যাস। এটি চুলের গোড়ায় গিয়ে, তাকে খাদ্য জোগায় ও শক্তিশালী করে তোলে ও সুস্থ চুল বেড়ে ওঠায় সাহায্য করে।

ব্যবহার-বিধি

প্রত্যহ দুমিনিট করে মাথার তালুতে পিওর সিলভিক্রিন মালিশ করুন। চুলের অবস্থার উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত পিওর সিলভিক্রিন ব্যবহার করে চলুন। একবার চুলের স্বাস্থ্য ফিরে এলে তাকে অটুট রাখবার জন্য নিয়মিতভাবে সিলভিক্রিন হেয়ারড্রেসিং মাখুন—এটি পিওর সিলভিক্রিন মেশানো একটি অয়েল বেস্।

বিনামূল্যে 'অল অ্যাবাউট হেয়ার' শীর্ষক পুস্তিকার জন্য এই ঠিকানায় লিখুন—ডিপার্টমেন্ট A-7 পোস্টবক্স ১২৬, বোম্বাই-১।



সিলভিক্রিন উৎপাদন পুরুষ ও মহিলা সকলেরই ব্যবহার উপযোগী।

সিলভিক্রিন

চুলের জীবনদায়ী স্বাভাবিক খাদ্য

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য

॥

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো

চাঁদার হার

বার্ষিক	টাকা	২০-০০	টাকা	২২-০০
ষাণ্মাসিক	টাকা	১০-০০	টাকা	১১-০০
	টাকা	৫-০০	টাকা	৫-৫০

১১/১

কলিকাতা—৩

ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)।

গ্রন্থম গ্রন্থম গ্রন্থম গ্রন্থম

'বৎসরের শেষ গান সাঙ্গ করে দিনু অঞ্জলিয়া নিশীথ গগনে'

গ্রন্থম গ্রন্থম গ্রন্থম গ্রন্থম

আমাদের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর শুভলগ্নে আমাদের অগণিত পাঠক-পাঠিকা, পৃষ্ঠপোষক ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আমাদের আন্তরিক প্রীতি ও

গ্রন্থম গ্রন্থম গ্রন্থম গ্রন্থম

এই উপলক্ষে আমরা আগামী এক মাস পর্যন্ত বিশেষ কমিশনের ব্যবস্থা করেছি। যে কেউ এই সুযোগ নিতে পারেন।

গ্রন্থম গ্রন্থম গ্রন্থম গ্রন্থম

বাংলা সাহিত্য প্রকাশনার ক্ষেত্রে গ্রন্থম যে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে তার সম্যক পরিচয় পেতে হলে নিয়মিত আমাদের গ্রন্থসূচী দেখুন।

গ্রন্থম গ্রন্থম গ্রন্থম গ্রন্থম

এখন থেকে প্রতিমাসে নিয়মিতভাবে আমরা একটি করে সুদৃশ্য ও মনোরম গ্রন্থসূচী প্রকাশ করার পরিকল্পনা নিয়েছি যাতে করে পাঠকদের সঙ্গে গড়ে ওঠে আমাদের ঘনিষ্ঠ এবং নিবিড়তম যোগাযোগ। আপনার নাম ও ঠিকানাসহ আজই আমাদের লিখুন।

গ্রন্থম গ্রন্থম গ্রন্থম গ্রন্থম

স্কুল-কলেজ, পাব্লিক লাইব্রেরীর জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত আছে।

গ্রন্থম গ্রন্থম গ্রন্থম গ্রন্থম

গ্রন্থমের বই

মানেই
সুনির্বাচিত,
সুশোভন, পরিপাটি
এবং সুরুচিসম্পন্ন

গ্রন্থম গ্রন্থম গ্রন্থম গ্রন্থম

একমাত্র পরিবেশক
পত্রিকা সিণ্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড
১২/১, লিণ্ডসে স্ট্রীট, কলকাতা-১৬
ফোন : ২৪-৭৫০১

গ্রন্থম গ্রন্থম গ্রন্থম গ্রন্থম

৭ম বর্ষ
৩য় খণ্ড

অমৃত

৩৭শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 19th January, 1968. শুক্রবার, ৫ই মাঘ, ১৩৭৪ 40 Paise

সূচীপত্র

সপ্তমবার মুদ্রিত হইল

সারদা-রামকৃষ্ণ

সন্ন্যাসিনী শ্রীদুর্গামাতা রচিত

যুগান্তর.—সর্বাঙ্গসুন্দর জীবনচরিত।... গ্রন্থখানি সর্বপ্রকারে উৎকৃষ্ট হইয়াছে।

আনন্দবাজার পত্রিকা.—ভাষ্যমতী লেখিকার সরস ও সরল বর্ণনাভঙ্গী প্রথমেই বিশেষভাবে পাঠকের চিত্তে এক অপার্থিব ভাবলোক সৃষ্টি করে। অনেক কথা আছে যাহা ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয় নাই।

অল ইণ্ডিয়া রেডিও.—বইটি পাঠক-মনে গভীর রেখাপাত করবে। যুগাবতার রামকৃষ্ণ-সারদা দেবীর জীবন আলেখ্যের একখানি প্রামাণিক দলিল হিসাবে বইটির বিশেষ একটি মূল্য আছে।

দৈনিক বসুমতী—এইরকম যুক্তভাবে রচিত জীবনকথা এই প্রথম প্রকাশিত হল। লেখিকা দেখিয়েছেন যে, তাঁরা অভিন্ন ও একাত্মা। দেশ.—তিনি জাতির মহোপকার সাধন করিয়াছেন। তিনি আমাদের জীবনকে অমৃতে অভিষিক্ত করিয়াছেন ॥

ডিমাই সাইজে ৪৫২ পৃষ্ঠা বত্রিশখানি ছবি একখানি ম্যাপ: বোর্ড বাঁধানো সুদৃশ্য মলাট।

॥ মূল্য আট টাকা ॥

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম

২৬ মহারাণী হেমন্তকুমারী স্ট্রীট কলিকাতা

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের

বিচিত্র কাহিনী

(৪র্থ সংস্করণ)

নবীন ও প্রবীণদের সমান আকর্ষণীয়

অজস্র চিত্র সম্বলিত

বিচিত্র গল্পগ্রন্থ। মূল্য: দুই টাকা

লেখকের

আর একখানা বই

আরও বিচিত্র কাহিনী

অসংখ্য ছবিতে পরিপূর্ণ

দাম : তিন টাকা

এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড

সকল পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

নির্ভরযোগ্য কয়েকখানি বই

By S. Banerjee & Revised by Prof. P. B. Sengupta

1.	P.U. & U.E. Logic Made Easy (in Bengali)	2.25
2.	Ethics Made Easy (in Bengali)	2.50
3.	Psychology Made Easy (in Bengali)	4.50
4.	H. S. Logic Made Easy (in Bengali)	4.00

বি-এ (শিক্ষা) এবং বি টি-র জন্য প্রকাশিত হল :

যতেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

ভারতের শিক্ষা সমস্যা (২য় সংস্করণ) ১২.০০



ব্যানার্জী পাবলিশার্স

৫।১এ কলেজ রো, কলিকাতা-৯ ৩৪-৭২৩৪



গৌরাঙ্গ পরিজন প্রসঙ্গে

আপনার বিখ্যাত পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রদ্ধেয় শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত মহাশয়ের লিখিত 'গৌরাঙ্গ পরিজন' পড়িয়া বেশ আনন্দিত হইয়াছি। লেখক মহাশয় শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত প্রভৃতি আকরগ্রন্থ আলোচনা করিয়া স্বীয় অনবদ্য ভাষা ও ভঙ্গীতে 'গৌরাঙ্গ পরিজনের' জীবনকথা পরিবেশন করিতেছেন। তথাপি কিছু কিছু সন্দেহ থাকিয়া যায়, শ্রদ্ধেয় লেখক মহাশয় নিম্নলিখিত বিবরণগুলিতে সন্দেহ নিরসন করিলে বাধিত হইব।

১। অমৃত, ৭ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ৪২৯ পৃষ্ঠা—

নিত্যানন্দ (ক) (৪)—নিত্যানন্দ প্রভুর পিতা হাড়াই ওঝা সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে "হাড়াই ওঝাকে কেউ কেউ হাড়াই পণ্ডিতও বলে। ভালো নাম মুকুন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়।"

চৈতন্যচরিতামৃত বা চৈতন্যভাগবতে 'মুকুন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়' নাম নাই। ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয় ঐ নাম ব্যবহার করেন নাই, তৎপ্রণীত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পরিশিষ্ট, ৪০৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। দেব সাহিত্য কুটীরের শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত চৈতন্যচরিতামৃতের ৬০৬ পৃষ্ঠারও নিত্যানন্দ প্রভুর পিতার নামে 'মুকুন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের' উল্লেখ নাই।

সুতরাং মুকুন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় নামটি লেখক মহাশয় কোথায় পাইলেন জানিলে বাধিত হইব।

২। অমৃত, ৭ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৬৯৯ পৃষ্ঠা—শ্রীবাস পণ্ডিত—লেখক মহাশয় লিখিয়াছেন শ্রীবাসের বাপের নাম "জলধর পণ্ডিত"। এ নাম চৈতন্যচরিতামৃতে নাই। ডক্টর রাধাগোবিন্দ নাথও পাত্র পরিচয়ে লিখেন নাই। চৈতন্যচরিতামৃতের পরিশিষ্ট ৪০৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। সুতরাং 'জলধর পণ্ডিত' নামের প্রামাণ্য নিদর্শন আছে কি না জানাইলে বাধিত হইব।

৩। অমৃত, ৯ কার্তিক, ১৩৭৪, পৃঃ ৯৫৫—লেখক মহাশয়ের মতে জগদানন্দ পণ্ডিতের নিবাস 'কুমারহট্টে'। ডঃ নাথের মতে 'কাঞ্চনপল্লীতে' চৈ চ পরিশিষ্ট ৩৯৮ পৃষ্ঠা। 'কুমারহট্ট'ই কি 'কাঞ্চনপল্লী'? প্রমাণ?

৪। অমৃত, ৭ অগ্রহায়ণ, ১৩৭৪, পৃঃ ২৬৫—লেখক মহাশয় লিখিয়াছেন—প্রদ্যুম্ন মিশ্র জগন্নাথের 'মহাসোয়ার' অর্থাৎ প্রধান পাচক ছিলেন। ডক্টর নাথ চৈতন্যচরিতামৃতের পরিশিষ্টের ৪১৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন "নীলাচলবাসী ব্রাহ্মণ"। প্রধান পাচক বলেন নাই। চৈতন্যভাগবতের পাত্র পরিচয়েও শ্রীল সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ইঁহাকে 'প্রধান পাচক' বলেন নাই,—৫২৬ পৃষ্ঠা। চৈতন্যচরিতামৃতের কোথাও ইনি 'মহাসোয়ার' ছিলেন লেখা নাই। মহাপ্রভুর সহিত পুরুষোত্তমবাসী বৈষ্ণবগণের মিলন প্রসঙ্গে সার্বভৌম একে একে বৈষ্ণব ভক্তগণের পরিচয় দিতে গিয়া বলিলেন—

প্রদ্যুম্ন মিশ্র ইঁহো বৈষ্ণব প্রধান।
জগন্নাথ— মহাসোয়ের ইঁহো দাসনাম ॥
—চৈ,চ, ২।১০।৪১।

ডক্টর নাথ গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকায় 'ইঁহো দাস নাম' কথার অর্থ লিখিয়াছেন—"ইঁহার (মহাসোয়ারের) নাম দাস (সম্ভবতঃ জগন্নাথ দাস)"—৪৪৮ পৃষ্ঠা। অর্থাৎ প্রদ্যুম্ন মিশ্র ও দাস পৃথক ব্যক্তি। 'দাস'ই মহাসোয়ার। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ও প্রদ্যুম্ন মিশ্রকে 'মহাসোয়ার' বলেন নাই। তৎসম্পাদিত চৈতন্যচরিতামৃত ৬০৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

স্বনামখ্যাত বৈষ্ণবাচার্য ও ঐতিহাসিক •অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয় মহাশয় শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, চতুর্থ ভাগ—জীবন বৃত্তান্ত ১১০—১১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন প্রদ্যুম্ন মিশ্র শ্রীমন্ মহাপ্রভুর জ্যেষ্ঠতাত কংসারি মিশ্রের পুত্র ছিলেন। শূদ্রাহ্নিকাচার ও 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী' নামক দুইখানি সংস্কৃত গ্রন্থ ইঁহার রচিত। ইঁহাকে মহাসোয়ার বলেন নাই।

আমার মনে হয় ডঃ নাথের অর্থই সমীচীন। প্রদ্যুম্ন মিশ্র মহাসোয়ার ছিলেন না। 'বৈষ্ণব প্রধান'ই ইঁহার পরিচয়। শ্রদ্ধেয় সেনগুপ্ত মহাশয় কি বলেন?

বিনীত
শ্রীকুমুদরঞ্জন ভট্টাচার্য,
সম্পাদক
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, শিলং শাখা।

'স্রষ্টা সার্বভৌম' প্রসঙ্গে

আপনাদের (১৪ই অগ্রহায়ণ ১৩৭৪ সাল শুক্রবারের) 'অমৃতে' প্রকাশিত শ্রীপুলিনবিহারী ভারুলের প্রবন্ধটি 'স্রষ্টা সার্বভৌম' বিশেষভাবে মননশীল ও তত্ত্ব-অনুসন্ধানী মানব মনকে আলোড়িত করবে। সারা দুনিয়ায় সাহিত্যস্রষ্টাদের বিশেষ লক্ষ্য হোল মৌলিক অবদানের দিকে। সৃষ্টির গোড়া থেকেই কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক সৃজন করে গেছেন গোটা দুনিয়ার মানবগোষ্ঠীর জয়যাত্রার জয়গানকে। স্তরে স্তরে, ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেছে এদের সৃজনের মধ্য দিয়ে মানব ইতিহাসের জয়যাত্রার পরিক্রমা। গেটে, মিলটন, শেক্সপীয়র, শেলী, বায়রন, কালিদাস, রবীন্দ্রনাথ এবং বিশ্ব সাহিত্যিকদের ভারে: অনেক মনীষী অবিরাম ঘাত-প্রতিঘাত ও বিরামহীন সংগ্রামের মধ্য দিয়েও তাঁদের চিরকাম্য পথের থেকে কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নাই। এঁদের আহ্বান চিরদিনের, চিরযুগের। এঁদের বাণী ও বার্তা অমর, এঁরা চিরদিন বেঁচে থাকবেন। এঁরা বেঁচে আছেন তাঁদের সৃষ্টির মধ্যমে—সকলেই তাই চায়। গ্যেটের সম্বন্ধে প্রবন্ধকার যা লিখেছেন সেটি সমস্ত বিশ্ব সাহিত্যিকদের বেলাতেই প্রযোজ্য। "তাঁর জীবন, তাঁর ভাবনা, তাঁর রচনা, আমাদের সন্ধান দেবে আলোর পথে 'অরো আলোর', প্রেরণা দেবে মহত্তর কর্মের, মহত্তর চিন্তার, মহত্তর সৃষ্টির, ফিরিয়ে দেবে মূল্যবোধ, আশাবাদ, মানুষের শুভশক্তর বিশ্বাস, দূর করবে স্বার্থবোধ, বিভেদ বুদ্ধি, জাগাবে মনে বিশ্বকল্যাণবোধ। মনুষ খুঁজে পাবে তাত্ত্বিক সংকট থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ।"

কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
কলকাতা-৩৯।

পর্যটন প্রসঙ্গে

১৩ই পৌষ সংখ্যার 'অমৃত' সাপ্তাহিক পত্রিকায় শ্রীযুক্ত অমলেন্দু মুখোপাধ্যায় 'পর্যটন' শিরোনামায় একটি প্রবন্ধে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের গেজেটিয়ারগুলি পরিবর্তিত পরিপ্রেক্ষিতে নূতন করে রচনা করার প্রয়োজনীয়তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে সময়োচিত দাবী জানিয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, হান্টার ও ম্যালির জেলা গেজেটিয়ারগুলির পরেও ১৯৫১ সালে সেন্সাস এর পরে প্রতি জেলার (পশ্চিমবঙ্গের) জন্য পূর্বোল্লিখিত গেজেটিয়ার ছাড়াও কোন কোন লেখকের রচিত স্থানীয় ইতিহাস, সরকারী দপ্তরের তথ্যাদি সংগ্রহ করে মোটামুটি তথ্য সমৃদ্ধ, জেলা ভিত্তিক সেন্সাস রিপোর্ট কয়েক খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল (প্রতি খণ্ড মূল্য ২৫্)। শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় এ সম্বন্ধে কোন উল্লেখ বা মন্তব্য করেন নি।

ঐ সেন্সাস রিপোর্ট সম্বন্ধেও একটি বক্তব্য আছে। রিপোর্টগুলিতে কিছু কিছু ফাঁক বোধ হয় রয়ে গিয়েছে। যেমন বীরভূম জেলার রামপুরহাট সাবডিভিসনের ৪টি থানার (রামপুরহাট, ময়ূরেশ্বর, নলহাটী ও মুরারৈ) অধিকাংশ অঞ্চল ঊনবিংশ শতাব্দীতে মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত ছিল, বর্তমানে বীরভূমের অংশ। তার ফলে মুর্শিদাবাদের সেন্সাস রিপোর্টে এই অঞ্চলের উল্লেখ না থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু পক্ষান্তরে বীরভূমের সেন্সাস রিপোর্টে ঐ অঞ্চলের অতীত কাহিনী, ঘটনা ও তথ্যের আপেক্ষিক অভাব বলে মনে হয়। এই প্রসঙ্গে কেও 'অমৃত'-এ আলোকপাত করতে পারলে ভাল হয়। সীমানা পরিবর্তন হেতু অন্যান্য জেলার সেন্সাস রিপোর্টে এ ঘটনা ঘটে থাকতে পারে।

দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়, সাঁইথিয়া, বীরভূম

অমৃত

সম্পাদকীয়

অনিশ্চিত অবস্থার অবসান

পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের কোয়ালিশন সরকারে যোগদানের সিদ্ধান্ত অপ্রত্যাশিত ছিল না, যদিও তা অযথা বিলম্বিত যুক্তফ্রণ্ট সরকারের বরখাস্তের পর ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের সংখ্যালঘু মন্ত্রিসভার নৈতিক অধিকারের ভিত্তি ছিল কংগ্রেসের সমর্থন। বস্তুত কংগ্রেসের সমর্থন ছাড়া এখানে বিকল্প সরকার গঠনের কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। কোয়ালিশনে যোগ দেবে কি দেবে না এ নিয়ে অনেক দ্বিধা প্রকাশ করেছে কংগ্রেস। বিশেষত কংগ্রেসের বিদায়ী সভাপতি শ্রীকামরাজ তো ব্যাপারটাকে এমনভাবে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন যে, নতুন অধিবেশনে নতুন সভাপতির আমলেই এর সিদ্ধান্ত নিতে হল।

অবশ্য যুক্তফ্রণ্ট সরকারের গদীচ্যুতি নিয়ে যে সাংবিধানিক বৈধতার প্রশ্ন তোলা হয়েছে তার ফয়সালা এখনো হয়নি। আশা করা যাচ্ছে যে কয়েকদিনের মধ্যেই, অন্তত বাজেট অধিবেশনের আগে বিষয়টির সম্মানজনক মীমাংসা হয়ে যাবে। কারণ, কংগ্রেস ও পি, ডি, এফ মিলে বিধানসভায় সুস্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকবে। সুতরাং এই কোয়ালিশন সরকারকে আর কোনো কারণেই সংখ্যালঘু সরকার বলা যাবে না।

লক্ষ্য করার বিষয় যে, শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয় অন্যান্য রাজ্যেও যুক্তফ্রণ্ট সরকারগুলোর আয়ু অনিশ্চিত হয়ে উঠেছে। বিহারে মহামায়াজীর সরকার কংগ্রেস-শোষিত দলের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। অবশ্য সেখানে কংগ্রেসের ভেতর উপদলীয় কোন্দল আছে। যদি মহামায়াজীর সরকার সেখানে টিকে যায় তা হবে কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে, অন্য কোনো কারণে নয়। উত্তরপ্রদেশেও চরণ সিংজীর মন্ত্রিসভার অবস্থা খুব ভাল নয়। তবে সেখানে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এখনও ক্ষমতায় ফিরে আসার জন্য কোনো সক্রিয় চেষ্টা হয়নি। কিন্তু বহুদলের কোয়ালিশনে যে স্বস্তিতে কাজ করা যায় না তার একটা পরীক্ষা হল। এর পর পাঁচমিশালী কোয়ালিশন সরকার গঠনের আগে সকল দলকেই ব্যাপারটা তলিয়ে দেখে নিতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা একটু স্বতন্ত্র। এখানে রাজনৈতিক শিবিরগুলো স্পষ্টত বিভক্ত। রাজনৈতিক চেতনাও এখানে জনসাধারণের মধ্যে বেশ জাগ্রত। সুতরাং কোনো দলের ফতোয়াই বিনা দ্বিধায় জনসাধারণ মেনে নেবে না। কাজের মধ্য দিয়ে প্রত্যেক দলকেই প্রমাণ দিতে হবে তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষার আন্তরিক প্রচেষ্টা।

পশ্চিমবাংলার সমস্যা অত্যন্ত জটিল। খাদ্য, শিল্প, শিক্ষা প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই সমস্যা পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। তদুপরি রয়েছে আইন ও শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব। যে সরকারইক্ষমতা গ্রহণ করুক না কেন এই সমস্যাগুলোর মোকাবিলা তাদের করতে হবে।

ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক পরীক্ষার একটি অধ্যায় অতিবাহিত হচ্ছে। কংগ্রেসের একচ্ছত্র শাসন-আধিপত্যের অবসান ঘটেছে দেশের ওপর। অন্য পার্টির সরকারের কাজও দেখার সুযোগ পেয়েছে জনসাধারণ। দলত্যাগীদের সমস্যা নিয়েও দেশবাসী আলোচনার সুযোগ পেয়েছে। আমাদের সংবিধানের ক্ষমতা নিয়েও পরীক্ষা চলছে। এবং এ অভিজ্ঞতাও দেশবাসীর হয়েছে যে, বহুপার্টিবিভক্ত গণতন্ত্রে বিকল্প সরকার গঠন করা এবং তাকে রক্ষা করা কত কঠিন। বস্তুত অকংগ্রেসী সরকারগুলোর মধ্যে অন্তর্বিরোধ তাদের অস্তিত্বকে বেশি বিপন্ন করেছে। সুতরাং গণতান্ত্রিক পরীক্ষার সাফল্যের জন্য দুই বা তিন পার্টির অস্তিত্বই বাঞ্ছনীয়। ছোটখাটো দল সমস্যা বাড়ায় এবং রাজনৈতিক অনিশ্চয়তায় সাহায্য করে মাত্র।

পশ্চিমবঙ্গে নতুন কোয়ালিশন সরকার গঠন বর্তমান অবস্থায় অনিবার্য। তবে ধীর পদক্ষেপে ঐকান্তিক সংকল্প নিয়ে তাকে কাজে এগোতে হবে। কংগ্রেসকেও বিনয় ও নম্রতার সঙ্গে সরকারের অংশীদার হতে হবে। বিগত নির্বাচনের শিক্ষা তাকে যেন অপ্রমত্ত রাখে। শুধু পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেই নয় সারা ভারতের ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক দলসমূহকে সতর্কভাবে ও দায়িত্বশীল ভঙ্গিতে এগোতে হবে। ভারতের বর্তমান যা দুরবস্থা তা থেকে তাকে মুক্ত করা কোনো একটি রাজনৈতিক দলের কর্ম নয়। বাংলাদেশের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে যে, চতুর্দিকে হতাশা এবং কর্মনাশা বিক্ষোভ কীভাবে দানা বেঁধেছে। এই অসন্তোষকে শান্ত করতে হলে চাই দলের ঊর্ধ্বে থেকে ঐকান্তিক কাজের সংকল্প ও তাকে বাস্তবে রূপায়ণ। যুক্তফ্রণ্ট আন্দোলন চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত করেছেন। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের অধিকার সকলেরই আছে। কিন্তু আন্দোলন প্রায়ই নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও পথ ছেড়ে অন্য পথে ধাবিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের উন্নতি ও শান্তি যাদের কাম্য তাঁরা নিশ্চয়ই চাইবেন অনিশ্চয়তার অবসানের পর এবার শান্তি ও উন্নয়ন সুনিশ্চিত হক।



প্রতিধ্বনি

প্রতিধ্বনি

বৈষ্ণব কবি মালাধর বসু

—মুহম্মদ আবুব হোসেন

বর্ধমান জেলার আদি কবি বৈষ্ণব সাধক মালাধর বসু। এই জেলার জামালপুর থানায়, শ্রীপাট কুলীনগ্রামে কবির আবির্ভাব ঘটেছিল। কুলীনগ্রাম খুব প্রাচীন গ্রাম। গ্রামের নাম হতেই এ গ্রামের কুলীনাধিক্যের পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেম ধর্মের প্লাবনে যখন শান্তিপুর ডুবু ডুবু হয়েছিল এবং নদে ভেসে গিয়েছিল, তারও বহু পূর্বে বর্ধমানের এই কুলীনগ্রামে বৈষ্ণব-ভক্তির সূচনা হয়েছিল। কবির পিতার নাম ভগীরথ। মাতার নাম ইন্দুমতী। কবির আবির্ভাবকাল আনুমানিক খৃস্টীয় পঞ্চদশ শতকের প্রথম দিকে। ইনি বসু উপাধিধারী কায়স্থ ছিলেন। বসু ছাড়া ইনি ছদ্মও লিখিতেন।

কবি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্দ অবলম্বনে বাংলা ভাষায় একটি কাব্য রচনা করে গিয়েছেন। বলা বাহুল্য ইহা বাংলা ভাষায় রচিত সন তারিখ যুক্ত প্রথম কাব্য। কাব্যটির নাম 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়'। কাব্যটিকে 'গোবিন্দ বিজয়' এবং 'গোবিন্দ মঙ্গল'ও বলা হয়। তবে "শ্রীকৃষ্ণ বিজয়" নামে ইহা সমধিক প্রসিদ্ধ। ইহা ছাড়া কবি "শ্রীরামপাঁচালী" নামেও একটি কাব্য লিখেছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ বিজয় বর্ণনাময় গীতিকাব্য। কাব্য মধ্যে বিভিন্ন রাগ রাগিণীর উল্লেখ আছে। কবি অনেক ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবেও রচনায় হাত দিয়েছেন। সেই হেতু শ্রীকৃষ্ণ বিজয় কাব্যকে শ্রীভাগবতের অনুবাদ না বলে অনুসরণ বলা চলে। কবি, পন্ডিতদের মুখে ভাগবত, হরিবংশ এবং বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি শুনেছিলেন বলে মনে হয়। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন,

"ভাগবত শুনিল আমি পন্ডিতের মুখে,
লৌকিকে কহিয়ে সার বুঝ মহাসুখে।"

তারপর একদিন ব্যাসদেব কবিকে স্বপ্নে গ্রন্থ রচনার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

"স্বপ্নে আদেশ দিলেন প্রভু ব্যাস।
তাঁর আজ্ঞা মতে গ্রন্থ করিনু রচন॥

পরবর্তীকালে বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য রচয়িতাগণ এইভাবে দেবদেবীর স্বপ্নাদেশে কাব্য রচনা করেছিলেন। কবি যে উদ্দেশ্যে কাব্য রচনা করেছিলেন তা অনুধাবনযোগ্য।—

"ভাগবত অর্থযত পয়ারে বান্ধিয়া,
লোক নিস্তারিতে যাই পাঁচালী রচিয়া।
ভাগবত শুনিতে অনেক অর্থ চাহি,
তো কারণে ভাগবত গীতিছন্দে গাহি।
কলিকালে পাপচিত্ত হব সব নর,
পাঁচালীর রসে লোক হইব বিস্তর।
গাহিতে গাহিতে লোক পাইব নিস্তার,
শুনিয়া নিষ্পাপ হব সকল সংসার।"

এই মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কবি কাব্য রচনায় হাত দিয়েছিলেন।

সমগ্র শ্রীকৃষ্ণ বিজয় কাব্য অনুধাবন করলে তার পাতায় পাতায় মিলবে কবির ভক্ত হৃদয়ের অভিব্যক্তি। সহজ, সরল, আন্তরিকতা এবং ভক্তিভাব কাব্যটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই কাব্যটির স্থানে স্থানে ভাবুকতার স্নিগ্ধতায় ভরপুর। কাব্য মধ্যে কাব্যকলা নৈপুণ্য প্রকাশের বিন্দুমাত্র প্রয়াস নাই। তাই কাব্যটি বৈষ্ণব তথা গৌড়ীয় জন মানসে অপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। কবির ভক্ত হৃদয়ের পরিচয়।

"সূক্ষ্ম রূপ ব্রহ্ম পদ ভাবিতে না পারি
সকল হৃদয়ে গোসাঞী রূপ তনু ধরি।
গোসাঞীর তনু চিন্তি পাই ব্রহ্মজ্ঞানে
একান্ত হইয়া প্রভুকে ভাব একমনে।
সবাতে আছয়ে হরি এমন ভাবিহ,
আপনা হইতে ভিন্ন কারে না দেখিহ।
নিজ আত্মা পর আত্মা যেই তাঁরে জানে,
তার চিত্ত কভু নাহি ছাড়ে নারায়ণে।
কর্ণধার বিনে যেন নৌকা নাহি যায়,
তেমতি প্রভুর মায়া সংসারে ভ্রমায়।
ইহা বুঝি পন্ডিত ভাই স্থির কর মন,
একভাবে চিন্ত প্রভু কমললোচন।

এই ভক্তি ভাবযুক্ত কাব্য মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব আস্বাদন করেছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ বিজয় কাব্য, রচনাকাল জ্ঞাপক দুই ছত্র পয়ার হতে ইহার রচনাকাল জানা যায়।

"তেরশ পচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন।
চতুর্দশ দুই শকে হৈল সমাপন॥"

অর্থাৎ ১৩৯৫ শকাব্দে কাব্য রচনা সুরু হয়ে প্রায় সাত বৎসর পরে ১৪০২ শকাব্দে এই রচনার সমাপ্তি ঘটেছিল। অর্থাৎ খৃস্টীয় ১৪৭৩-১৪৮০ অব্দে শ্রীকৃষ্ণ বিজয় কাব্যের রচনাকাল। অনেকে এই সন তারিখ সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেছেন। বৈষ্ণব কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজের "চৈতন্যচরিতামৃত" হতে জানা যায় যে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব, নীলাচলে মালাধর বসুর পুত্র ও পৌত্রদের নিকট শ্রীকৃষ্ণ বিজয় কাব্য সম্পর্কে যথেষ্ট প্রশস্তি নিবেদন করেছিলেন।

"গুণরাজ খান কৈল শ্রীকৃষ্ণ বিজয়।
তাহা এক বাক্য তাঁর আছে প্রেমময়॥
নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।
এই বাক্য বিকাইনু তাঁর বংশের হাথ॥
তোমার কী কথা গ্রামের কুকুর।
সেই মোর প্রিয় অন্যজন রহু দূরে॥"

জয়ানন্দের "চৈতন্যমঙ্গল" শ্রীকৃষ্ণ বিজয় কাব্যের উল্লেখ আছে। অতএব কাব্যটি চৈতন্যদেবের আবির্ভাব কালের অনেক পূর্বে লেখা। এ সম্পর্কে একটি পাথুরে প্রমাণও আছে। শ্রীকৃষ্ণ বিজয় কাব্যের একস্থানে আছে—

"সত্যরাজ খান হয় হৃদয় নন্দন।
তারে আশীর্বাদ করে যত সাধু জন॥"

শ্রীকৃষ্ণ বিজয় কাব্য ১৩৯৫ হতে ১৪০২ শকাব্দের মধ্যে লেখা। অতএব এই সময়ের মধ্যে কবিপুত্র লক্ষ্মীকান্ত বসু "সত্যরাজ খান" উপাধি পেয়েছিলেন। শ্রীপাট কুলীনগ্রামে একটি শিবমন্দিরে, শিববাহন একটি পাথরের তৈরী বৃষের গলায় নিম্নলিখিত শ্লোকটি উৎকীর্ণ আছে।

"শাকে বর্ণাতি বেদে খে মনৌ হি শিব
সন্নিধৌ।
খান শ্রীসত্যরাজেন স্থাপিতো হয়ং ময়া বৃষ॥

(নন্দলাল বিদ্যাসাগর সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ের ভূমিকা পৃ. ৵০)

এই উৎকীর্ণ শ্লোক হতে জানা যায় যে ১৪০৪ শকাব্দে শ্রীসত্যরাজ খান এই বৃষ-মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই বৃষ প্রতিষ্ঠার মাত্র দুই বৎসর আগে শ্রীকৃষ্ণ বিজয় কাব্য সমাপ্ত হয়েছিল. ইহা নিশ্চিত প্রমাণিত। কারণ শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ে সত্যরাজ খানের নাম উল্লেখ আছে।

শ্রীকৃষ্ণ বিজয় কাব্য প্রণেতা বৈষ্ণবকবি মালাধর বসুর উপাধি ছিল "গুণরাজ খান"। এই উপাধি তৎকালীন কোন গুণমুগ্ধ গৌড়েশ্বরের দেওয়া।

"গুণ নাহি অধম মুঞি নাহি কোন জ্ঞান।
গৌড়েশ্বর দিল নাম গুণরাজ খান॥

এই গৌড়েশ্বর কে? কেহ বলেন আলাউদ্দিন হোসেন শাহ। কেহ বলেন রুকনুদ্দিন বারবক শাহ। কেহ বলেন শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ। গ্রন্থ রচনা কাল খৃস্টীয় ১৪৭৩-৮০ অব্দের মধ্যে (শকাব্দ ১৩৯৫-১৪০২)। তাহলে আলাউদ্দিন হোসেন শাহের নাম এই প্রসঙ্গে আসতেই পারে না। কারণ তাঁর রাজত্ব-কাল খৃস্টীয় ১৪৯৩ হতে ১৫১৯ অব্দ পর্যন্ত। তাহলে দেখা যাচ্ছে সে হয় রুকনুদ্দিন বারবক শাহ কিংবা শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ দুই এর মধ্যে একজন মালাধর বসুর গৌড়েশ্বর। শ্রীকৃষ্ণ বিজয় কাব্যে প্রথম হতেই কবি "গুণরাজ খান" উপাধি ব্যবহার করেছিলেন। অতএব কাব্য রচনার (খৃঃ ১৪৭৩) বেশ কিছুকাল পূর্বেই তিনি গুণরাজ খান উপাধি পেয়েছিলেন। রিয়াজুস সালাতীন হতে জানা যায় যে বারবক শাহ ৮৭৮ হিজরী সালে (খৃঃ ১৪৭৩-৭৪) বিখ্যাত দরবেশ শাহ ইসমাইল গাজীর প্রাণদন্ড দিয়েছিলেন

এবং পরবর্তীকালে তিনি তাঁর বেগম সহ ইসমাইল গাজীর কাটাদুয়ারস্থিত সমাধিক্ষেত্রে বহুমূল্য অর্ঘ্যদান করেছিলেন। History of Bengal (Dacca University Vol. II P. 135) হতে জানা যায় যে বারবকশাহ খৃস্টীয় ১৪৫৮ হতে ১৪৭৪ অব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। হরিদাস রচিত শ্রাদ্ধ বিবেক গ্রন্থে উদ্ধৃত বাসুদেব সার্বভৌমের পিতা বিশারদের একটি বচন হতে জানা যায় যে বারবক শাহ ১৩৯৭ শকাব্দ অর্থাৎ খৃস্টীয় ১৪৭৬ অব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করে ছিলেন। অতএব ইউসুফ শাহের শিলালিপি এবং মুদ্রা যথাক্রমে ৮৭৮ হিঃ (১৪৭৩-৭৪) এবং ৮৮০ হিঃ (খৃঃ ১৪৭৫-৭৬) অব্দ পর্যন্ত হলেও তিনি তখন যুবরাজ ছিলেন এবং হিসাব প্রমাণের ভিত্তিতে তাঁর (ইউসুফ শাহ) আসল রাজত্বকাল ১৪৭৬ খৃষ্টাব্দের পর। অতএব মালাধর বসুর গৌড়েশ্বর রুকনুদ্দিন বারবক শাহ।

শ্রীকৃষ্ণ বিজয় কাব্যটি স্বর্গীয় রাধিকানাথ দত্ত সর্বপ্রথম ৪০১ চৈতন্যাব্দে (খৃঃ ১৮৮১) সম্পাদনা করেছিলেন। ইনি হারাধন দত্তের সংগ্রহ করা ১৪০৫ শকাব্দের পুঁথি অনুকরণ করেছিলেন। পরে নন্দলাল, বিদ্যাসাগর ভক্তি শাস্ত্র কাব্যতীর্থ মহাশয় কাব্যটি দ্বিতীয়বার সম্পাদন করেছিলেন (খৃঃ ১৯৪৫)। এই সংস্করণটি খুব মূল্যবান। শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্রের সম্পাদনায় ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছিল। এই সংস্করণটি ১০১৩ মল্লাব্দের (খৃঃ ১৭০৮) লেখা পুঁথি অবলম্বনে সম্পাদিত হয়েছিল।

(স্বীকৃতি ।। শারদীয় ১৩৭৪)

ইলিয়া এরেনবুর্গ

(১৮৯১-১৯৬৭)

মানস রায়চৌধুরী

মস্কোর এক সম্ভ্রান্ত ইহুদী পরিবারের ছেলে এরেনবুর্গ-এর প্রথম জীবনে যেসব রোমাঞ্চকর ও উদ্দীপক ঘটনা ঘটেছিল তা যে কোনো চলচ্চিত্রের উপজীব্য হতে পারে। শোনা যায়, যথেষ্ট মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর অমনোযোগিতার জন্য বালকবয়সে একজন সম্মোহনকারী শিক্ষক নিযুক্ত করতে হয়েছিল। বহুবার কাউকে না বলে বাড়ি থেকে পালিয়েছেন এরেনবুর্গ। আর এই পথের টান তাঁর পরবর্তী জীবনের ভ্রমণ-পিয়াসী সত্তাকে নানা ছলে দেশান্তরে টেনেছে। তাঁর সমকালীন আর কোনো সোভিয়েত লেখক এতবার বিদেশভ্রমণ করতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ। শুধু বিদেশ নয়, সোভিয়েতের মত অত বিরাট দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন। ক্ষেতে-খামারে, কলকারখানায়, সমুদ্রতীর থেকে গহন বনভূমির জনবিরলতায় সোভিয়েত মানুষের আন্তর রহস্য খুঁজেছেন।

ফ্রান্স ও বেলজিয়ামে থাকাকালীন তিনি প্রথম মার্ক্সবাদের সঙ্গে পরিচিত হন এবং তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দি এক্সট্রা-অর্ডিনারী অ্যাডভেঞ্চারস অব জুলিও জুরেনিটো অ্যান্ড হিজ ডিসাইপলস' রচিত হয়েছিল বেলজিয়ামে। উপন্যাসটি অবশ্য প্রকাশিত হল ১৯২১-এ বার্লিন-এ, তাঁর বয়স যখন তিরিশ। ইওরোপে বইটির যথেষ্ট প্রশংসা হল, কিন্তু সোভিয়েত দেশে অনেকদিন এ বই বিক্রির অনুমতি পায়নি। প্রথম জীবনে কুড়ি-একুশ বছর বয়সে সব কথাশিল্পীর মতই এরেনবুর্গ কবিতা লিখতেন। কিন্তু প্রথম উপন্যাসের সাফল্য তাঁকে দ্রুত টেনে নিল গদ্যরচনায়। প্যারিস-প্রবাসের অনুষঙ্গ আশ্রয় করে লেখা 'দি ফল অব প্যারিস' উপন্যাসের সঙ্গে হয়তো অনেক বাঙালী পাঠকেরই পরিচয় আছে। বছর কয়েক আগে উপন্যাসটির বাংলা অনুবাদের পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। তিন-খণ্ডে সম্পূর্ণ এই কালজয়ী উপন্যাসটিতে আমরা শুধু যে এক রাষ্ট্রীয় পতনের ছবি দেখতে পেয়েছি তা নয়, অসংখ্য চরিত্রের জটিল সম্পর্কের ভাঁজে ভাঁজে আদর্শ ও তার অপমৃত্যু, ভালবাসা ও তার নিষ্ফলতা, জীবনতৃষ্ণা, আত্মঘাতী বাসনা, আত্মহত্যা ইত্যাকার ঘটনা-ঘূর্ণির অমোঘ টানে যেন আমরা 'প্যারীর পতন'-এর শেষ অঙ্কে পৌঁছে গেছি। মহৎ উপন্যাসগুলির অন্যতম এই রচনায় এরেনবুর্গ দেশকালের বাধা পেরিয়ে শিল্পের চিরন্তন রূপটি উন্মোচন করতে পেরেছেন। 'দি লাইফ স্টোরী অব লাসিক', 'দি স্টর্ম', 'দি থ', 'আউট অব কেওস', 'এ স্ট্রীট ইন মস্কো' প্রভৃতি উপন্যাস ও অন্যান্য ধরনের অসংখ্য সাহিত্য-গ্রন্থ ও জীবনীস্মৃতির রচয়িতা এরেনবুর্গ-এর সাহিত্যকৃতি সম্পর্কে চরম মূল্যায়ন বোধ হয় এই মুহূর্তেই করা সঙ্গত হবে না। তাঁর ক্লান্তিহীন লেখনী গল্প-উপন্যাসে যে পরিমাণ চরিত্র সৃষ্টি করেছে তা একত্র করলে সম্ভবত একটি মাঝারি শহরের লোকসংখ্যার সমান হবে।

সাহিত্যরীতির দিক থেকে কেউ কেউ তাঁকে 'সোস্যালিস্ট রিয়েলিজম' ঘরানার অন্যতম কৃতী লেখক হিসাবে বিচার করতে চান। রাজনৈতিক বিশ্বাস তাঁর রচনাকে যেভাবেই প্রভাবিত করে থাকুক না কেন, কোনো রক্ষণশীল নীতি বা সরকারী মত-বাদ তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। দু-দুবার স্তালিন পুরস্কার পাওয়া সত্ত্বেও তিনি অত্যন্ত দুঃসাহসিক-ভাবে সরকারী শিল্প-নীতির সমালোচনা করতেন। সোভিয়েত লেখক সংসদের সম্মেলনগুলিতে একসময় সবচেয়ে জোরালো প্রতিবাদী গলা শোনা যেত এরেনবুর্গের, যদিও তাঁর গভীর স্বদেশপ্রেম সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করবার স্পর্ধা কারো ছিল না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তাঁর ফ্যাসিস্টবিরোধী রচনাগুলি খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। লন্ডনের 'সানডে টাইমস'-এর মস্কো সংবাদদাতা আলেকজান্ডার ওয়ের্থ তাঁর একটি গ্রন্থে বলছেন : 'যুদ্ধের সময় সোভিয়েত জনগণের আত্মিক বল অক্ষুণ্ণ রাখার পিছনে এরেনবুর্গ-এর ভূমিকা ছিল অনন্যসাধারণ। সেনাবাহিনীর প্রত্যেকেই এরেনবুর্গের লেখা পড়তেন। এমনও শোনা গেছে সোভিয়েত গেরিলা বাহিনীর লোকেরা এরেনবুর্গের রচনার অংশবিশেষ পাওয়ার জন্য বিনিময়ে বাড়তি স্লেট সিগারেটও দিতে প্রস্তুত থাকতেন।'

শুধু কবিতা-গল্প-উপন্যাস নয়, সাংবাদিকতাও তাঁর জীবনের অনেকখানি অংশ জুড়ে ছিল। গত কয়েক বছর তিনি যে গ্রন্থটি শেষ করার কাজে মগ্ন ছিলেন সেটি তাঁর স্মৃতিলেখ-র সপ্তম খণ্ড। আগের আর ছটি খণ্ডে তিনি ...১৯৫৩ পর্যন্ত জীবনকথা বলেছেন। শেষের খণ্ডটিতে আছে ১৯৫৪ থেকে ১৯৬৪ পর্যন্ত আত্মকথন। সমালোচকদের মতে তাঁর স্মৃতিলেখ বর্তমান পৃথিবীর এক অতি গুরুত্বপূর্ণ সময়ের সমাজবিপ্লবের দলিল। ভবিষ্যতের মানুষ এতে পাবে নতুন সমাজ গড়ে তোলার নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রতিবেদন—বিপ্লবের পরবর্তী দিনগুলি অথবা যুদ্ধের সমরকালীন সংকটমুহূর্তে সোভিয়েত নাগরিক কী পরিমাণ আত্ম-ত্যাগের ভিতর দিয়ে আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। অনেকের মতে অবশ্য তাঁর আত্মচরিত আত্মবীক্ষা নয়। হয়তো কোথাও আদর্শবাদ ও রাজনৈতিক সচেতনা তাঁর লেখনীকে ঈষৎ সতর্ক করে তুলেছে। তবু পরম তৃপ্তির বিষয় এই, আত্মকথন হয়েও তা নিতান্তই আত্মপ্রচার ও আত্মমহিমার ঢক্কানিনাদ হয়ে ওঠেনি কোনখানে। পরিবর্তে যা আছে তা এরেনবুর্গের শিল্পীসত্তারই অভিন্ন অংশ : বিনয়, কুণ্ঠা আর মৃদু আত্ম-করুণা। বিদেশী সাংবাদিককে সাক্ষী করে যে বিশ্বখ্যাত লেখক, কিঞ্চিদধিক একশ বইয়ের রচয়িতা, বলতে পারেন : 'আমি নেহাতই মাঝারি মাপের লেখক, লোকটাও আমি বিশেষ সুবিধের নই—তবু এই খারাপ লোক হয়েও কিছু ভালো কাজ করা আমার আটকায়নি'—তাঁর আত্মচরিতে এ মনোভাব আদৌ অপ্রত্যাশিত নয়।

নিজে মার্ক্সবাদী হয়েও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কে এরেনবুর্গের কোন অন্ধ মোহ ছিল না। তিনি বিশ্বাস করতেন, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সব লেখকই যে ভালো লিখবে এমন কোনো কথা নেই। সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদ সর্বরোগহর মাদুলি নয়। সমাজের নানাক্ষেত্রে বিপুল সার্থকতা সত্ত্বেও জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এরেন-বুর্গ তাঁর সৃষ্টিশীল শিল্পীসত্তাকে সক্রিয় রেখে গেছেন। তাঁর বহুমুখী কাজকর্ম, সাহিত্য-সাংবাদিকতা, আন্তর্জাতিক শান্তি সংসদ থেকে সুপ্রীম সোভিয়েতের গুরুত্ব-পূর্ণ পদ—সর্বত্রই এরেনবুর্গ অকৃত্রিম শিল্পীজীবন যাপন করেছেন। শুধু সোভিয়েত দেশের মানুষই নয়, সারা পৃথিবীর বিশেষত স্বাধীনতাকামী প্রতিটি দেশের সংগ্রামী মানুষ নানাভাবে তাঁর শিল্প ও জীবনচর্চার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর ক্ষতি তাই বিশেষত এই সব সহায়হীনদের কাছে অপূরণীয় হয়ে রইল।

[ক্রান্তি ।। অক্টোবর, ১৯৬৭]

'শতবর্ষের জাতীয় আহ্বান'

Amrita Bazar Patrika

শতবর্ষ প্রাচীন জাতীয় সংহতির আহ্বান

পুলকেশ দে-সরকার



অমৃতবাজার পত্রিকার আরম্ভকালে যশোহরের ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন মিঃ জেম্‌স মনরো। ঘোষ-ভ্রাতাদের লোকসেবা ও সর্বাঙ্গীণ গ্রামোন্নয়ন মনরোকে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করেছিল, তিনি সংসারের প্রয়োজনে বসন্তকুমারের মৃত্যুর পর হেমন্তকুমার ও শিশিরকুমারকে শুধু যে ইনকামট্যাকস-এসেসরপদে নিয়োগ করেছিলেন তাই নয়, পত্রিকা প্রকাশনাতেও সানুকূল উৎসাহ দিয়েছিলেন।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর "শিশির-কুমার ঘোষ" পুস্তিকায় লিখেছেন : "যশোহরের তৎকালীন ম্যাজিস্ট্রেট জেম্‌স মনরো শিশিরকুমারকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন।" (পৃঃ ১৪)

আর কবি নবীনচন্দ্র সেন তাঁর "আমার জীবন"-এ লিখেছেন :

"তিনি মনরো সাহেবের আন্তরিক প্রিয়পাত্র ও তাঁহার প্রধান শাসনাস্ত্র। এ হেন দুরন্ত সাহেব তাঁহার করে যেন মোমের পুতুল। সাহেব মহোদয়ের দীর্ঘ কর্ণ দুখানি শিশিরকুমারের করন্যস্ত। রাত্রি দ্বিপ্রহর সময়েও শিশিরকুমার অবাধে তাঁহার দাম্পত্য কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলি-লেন—'অমুক স্থানে একটা দাঙ্গার আয়ো-জন হইয়াছে। প্রভাত হইলে কত লোক মারা যাইবে ঠিক নাই।' সাহেব বলিলেন—'শিশির! আমি অতি প্রত্যুষে যাইব।' শিশির বলিলেন—'তাহা হইলে হইবে না। আপনাকে এখনই যাইতে হইবে।' সাহেব আর কথাটি না কহিয়া অশ্বপৃষ্ঠে ছুটিলেন এবং প্রভাতে যুদ্ধ আরম্ভ হইতেছে এমন সময় দুই পক্ষের মধ্যস্থলে অশ্বপৃষ্ঠে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"বেশ বাবা। খুব যুঢ় কচ্ছো।" আর মুহূর্তমধ্যে লাঠিয়াল সকল লাঠি ফেলিয়া পলায়ন করিল এবং উভয় পক্ষের নেতৃগণ ধৃত হইল। লোকের বিশ্বাস মনরো সাহেবই কাগজখানি খোলাইয়াছেন এবং তিনি বাধ্য করিয়া যশোহরের আপামর সাধারণকে তাহার গ্রাহক করিয়াছেন। কিন্তু শাস্ত্র বলেন,— বিশ্বাসো নৈব কর্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু

চা।" 'অতি' সবই মন্দ। অতি বন্ধুতার ইদানীং বিস্ফোরণ হইয়াছে।"

এ কথা বলার তাৎপর্য, মাত্র মাস পাঁচেকের ব্যবধানেই বন্ধুত্ব বৈরিতায় পরিণত হয়েছিল। পত্রিকা-প্রকাশে উৎসাহ দিলেও পত্রিকার লক্ষ্য ও প্রকৃতি ক্রমেই তাঁকে এবং অন্যান্য 'সুহৃদ' রাজপুরুষকে বিরূপ করে তুলেছিল। শিশিরকুমারের অন্তরে যে অগ্নিদাহের তাপ সাহেব উপলব্ধি করে-ছিলেন তা যে অসঙ্গত রাজকার্য, এমন কি সমগ্র রাজশাসনের কাঠামোকেও দগ্ধ করতে উদ্যত হতে পারে তিনি অতটা কল্পনা করেন নি। হয়তো মনে করেছিলেন দুটি-একটি দাতব্য চিকিৎসালয় অথবা সেবা-কার্যের মধ্যেই সে অগ্নিগর্ভ চিত্ত প্রশান্ত ও সুস্থির হয়ে যাবে। শিশিরকুমারের পত্রিকাও প্রচলিত পত্রাবলীর মতো নিবেদন-পত্রের আনত আচরণে নির্বিঘ্ন থাকবে। কিন্তু কালপুরুষের লক্ষ্য যে ছিল ভিন্ন, এটি প্রকাশ পেতে বেশী দেরী হল না।

কেননা, সূচনা থেকেই অমৃতবাজার পত্রিকার উপজীব্যই ছিল মুখ্যত রাজনীতি। সুতরাং, রাজশাসনের সঙ্গে জড়িত রাজ-পুরুষদের গতিধারার প্রতি অতন্দ্র দৃষ্টি-পাত করা ছিল অপরিহার্য।

অমৃতবাজার পত্রিকার ৫ম সংখ্যায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধে মন্তব্য হল :

"ইংরেজেরা শুদ্ধ বুদ্ধিবলে, কি শুদ্ধ শারীরিক বলে, কি উভয়যোগে আমাদের দেশ শাসন করিতেছেন তাহা লইয়া তর্ক করা আমাদের উদ্দেশ্য নাই। যে বলেই করুন, ফল ধর্ম-বলে নয় সেটা নিশ্চিত।

"বুদ্ধি ও শারীরিক যে রাজ্যের কর্তা, অবিশ্বস্ততা, ভীরুতা ও নিষ্ঠুরতা সে রাজ্যের মন্ত্রী। সেখানকার রাজ্যরক্ষক বন্দুক ও শান্তিরক্ষক ফাঁসি এবং শৃঙ্খলা।" (১৯শে মার্চ, ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ, ৭ই চৈত্র, ১২৭৪ সাল)

শতবর্ষ আগে বুকে হাত রেখে এমন কথা কে বলতে পারে? সমগ্র শাসনের মূল ভিৎ সম্পর্কেই একান্ত অপ্রীতিকর প্রশ্ন। আজকে যাকে Police State বলা হয়, এ তাই, শুধু বুদ্ধি বা কৌশল নয়, কূটবুদ্ধি কূটকৌশল নয়, বলপ্রয়োগের আয়োজনও যেখানে প্রস্তুত, সেখানে ধর্ম অনুপস্থিত। ধর্মের শাসন একবারই নাকি হয়েছিল যখন গদাচক্র নয় অশোকচক্র ছিল প্রতীক—সেই অশোক সাম্রাজ্যে। কিন্তু ঐ একটি ব্যতিক্রম বিস্মৃত হলে, রাষ্ট্র বলতেই বোঝা যায়, চাণক্যনীতি আর বলপ্রয়োগের উপকরণ। আধুনিক যুগে তারই চূড়ান্ত-রূপ ঘটেছে সর্বনাশা পারমাণবিক বোমায় পাহাড়ে বসে শান্তির পারাবত নিয়ে খেলা। সুতরাং রাষ্ট্র যুগে যুগে—ঐ চাল-তরোয়ালের নবসংস্করণে সুসজ্জিত। আর তা যদি বিদেশী হয় তবে তার অনাচারী ধর্মও অপরিসীম। এই কথাটিই শতবর্ষ আগে ইংরেজ রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত থাকতে প্রকাশ্যে in black and white উচ্চারণ করতে যে অবিনাশী সাহসের প্রয়োজন তার অভাব ঘটেনি পত্রিকার প্রারম্ভ পাতায়।

সেকালের জ্বরটা যে 'ম্যালেরিয়া' এটি আবিষ্কার করতে অনেক গবেষণা অনেক বিতর্ক হয়েছিল, কারণনির্ণয়ে মতা-নৈক্যের অবধি ছিল না এবং তাও শেষ পর্যন্ত রাজনীতির জালে জড়িয়ে গেছল। সচরাচর যা হয়, এমন কোন সিদ্ধান্তই সরকারের মনঃপূত হতে চাইত না যা সর-কারের গায়ে লাগে। রেলের বাঁধগুলো ম্যালেরিয়ার অন্যতম কারণ কিনা অথবা এটি এই সংক্রামক রোগবিস্তারের সহায়ক কিনা সরকারের পক্ষে তার সানুকূল অভিমত পোষণ করার দায় ছিল, কেননা, রেল কোম্পানী প্রাইভেট হলেও সাহেবে সাহেবে সম্পর্ক ছিল অবিচ্ছেদ্য— blood was thicker than water অমৃতবাজার পত্রিকার পাতায় দীর্ঘকাল এইসব তথ্য বেরিয়েছে এবং বলেছি, বিতর্কটি শেষ পর্যন্ত রাজনীতির জালে জড়িয়ে যায়।

একালে সাহেবে-বাঙালীতে সম্বন্ধটিও ক্রমশ জটিল হয়ে আসছিল। যতদিন বাঙালী জনসাধারণ শ্বেতকায় সাহেবদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার মতো শিক্ষিত ও নিপুণ হয়ে ওঠেনি ততদিন তাদের আশে-পাশে কৃষ্ণকায় বাঙালীরা কৌতুকের বিষয় ছিল। কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গের মধ্যেও যে সম-কক্ষতার দক্ষতা থাকতে পারে তা উপলব্ধির পর থেকে কৌতুক অসূয়ায় কণ্টকিত হয়ে ওঠে। ফলে উভয়ের সম্বন্ধও আর সহজ থাকতে চায় নি। এমনি একটা ঘটনার কথা পত্রিকার ষষ্ঠ সংখ্যায় বেরোয় :

"কয়েক দিবস গত হইল, কৃষ্ণনগরে প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনার শ্রীযুক্ত চাপম্যান সাহেবের গৃহে সদালেপের (সদা-লাপের) নিমিত্ত কৃষ্ণনগরস্থ কয়েকজন ভদ্র বাঙ্গালি এবং সাহেব নিমন্ত্রিত হন। এত-দ্বারা বাঙ্গালি এবং রাজদের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপিত হইবার বিলক্ষণ সম্ভব আছে। শ্রীযুক্ত মনরো ও ওকেনিলি মহোদয়ের যত্নে যশোরে এইরূপ সভার অধিবেশন মধ্যে মাঝে হইত, একণ সেটা ক্ষান্ত হইয়াছে। কি কারণে যে ক্ষান্ত ছিল তাহা আমরা বলিতে পারি না। তাহাদের নিকট আমাদের

এই অনুরোধ যে, তাহারা পুনরায় ঐ সভাটি সংস্থাপন করেন।" (ঐ, পৃঃ ৪৫)

মনরো ও ওকেনিলি একদা হেমন্তকুমার-শিশিরকুমারের বন্ধুস্থানীয়ও ছিলেন, কিন্তু সে বন্ধুত্ব থাকে নি, অনুমান করি, পত্রিকা প্রকাশের পর থেকে এর দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করে সম্বন্ধ 'বিষিয়ে' উঠতে থাকে। সামাজিকতাও রাজনৈতিক সম্পর্কের ওপর নির্ভর।

শাসকদের মনে ক্রমশ একটি একান্ত মর্যাদাবোধ (প্রেস্টিজ) ঘনীভূত হতে থাকে। এই মর্যাদাবোধ বা প্রেস্টিজ উপলক্ষ্য করে পৃথিবীতে অনেক অনিষ্ট ঘটেছে। এদেশে ইংরেজেরা যত বেশী শাসক বা শাসকশ্রেণী অথবা শ্বেতকায় হতে লাগলেন ততই ঐ মর্যাদাবোধ উগ্র ও আগ্রাসী হতে লাগল। সেকালে সাহেবে-বাঙালীতে পায়ে জুতো পরা নিয়ে কত কান্ডই না হয়েছে! সকল কাহিনী একত্র করলে তাও একটি গ্রন্থ হতে পারে। অমৃতবাজার পত্রিকায় এমন অনেক কাহিনী বেরিয়েছে। কোন কোন সময় সরকার পক্ষ থেকে একটা আপোষেরও চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু সরকারী ইচ্ছাও সব সময় ব্যক্তিস্বতবোধে প্রতিফলিত হয়ে ওঠেনি, ব্যক্তি-বিরাগই সেখানে প্রাধান্য পেয়েছে।

পূর্বোক্ত সংখ্যায়ই এমনি একটি খবর আছে :

"এদেশীয়গণ জুতা ব্যবহার করিয়া ইংরাজ রাজবিচারালয়, দরবারে কি অন্য কোন রাজকার্যস্থানে উপস্থিত হইতে পারে কি কেমন (কিনা) এ বিষয় লইয়া অনেক তর্কবিতর্ক হয়। অধুনাতন গভর্ণর-জেনারেল বাহাদুর মন্ত্রীগণের পরামর্শে এই সাব্যস্ত করিলেন যে ইহারা চর্মপাদুকা পরিধানপূর্বক যে কোন রাজবিচারস্থানে উপস্থিত হইতে পারিবে।

"রয়াল চার্টার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হাই-কোর্টে দেশীয়গণের পাদুকা ব্যবহার সম্বন্ধে সেই আদালত কর্তৃক, সাব্যস্ত হইবে।"* (২৬শে মার্চ, ১৮৬৮)

রাজনীতি-মিশ্রিত এইসব সামাজিক নব-বিন্যাস ছাড়াও প্রয়োজন-অপ্রয়োজনে প্রশাসনিক পরিবর্তন বাঙালী সমাজে কিরকম শ্রেণীবিন্যাস ঘটিয়ে চলেছিল তার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে আলোচ্য সংখ্যায় প্রকাশিত একখানি পত্রে। চিকিৎসাবিদ্যায় প্রমাণপত্র না পেয়েও ডাক্তার বলে স্বীকৃত হবার দাবীর মতো সেকালে আইনবিদ্যায় প্রমাণপত্র না পেয়েও মোক্তার বলে স্বীকৃত হবার দাবীর সঙ্গে সঙ্গে এই পত্রে তৎকালীন জমিদারী গ্রামসমাজটিরও একটি বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়, আর পাওয়া যায়, মহারাণীর সুবিচারের প্রতি সাধারণের আস্থা। পত্রলেখক লিখছেন :

"অস্মদ্দেশে আবালবৃদ্ধ সকলে চির পর্যন্ত সুখে ইংরাজাধিকারে বাস করিতে-ছেন। এরূপ পূর্বে কোন রাজার রাজ্যে শ্রুত হওয়া যায় না। কিন্তু নিম্নোক্ত বিষয়টি শ্রীমতী মহারাণীর সুবিচারের যোগ্য হইতেছে না বিশ্বাস করিয়া আমরা তাহা তাঁহার কর্ণগোচর করিতেছি।

"দেখুন বিদ্বান হউক, কি মূর্খ হউক, কি উন্মত্ত হউক, জমিদারেরা তাহাদিগকে মুক্তিয়ারনামা দিলেই তাহারা আদরপূর্বক মুক্তিয়ার বলিয়া পরিচিত হইত কিন্তু সে প্রথাটী দূরীকৃত করিয়া একটী এক-জামিনীর সৃষ্টি করিয়াছেন। সে ভালই হইয়াছে কিন্তু উহার মধ্যে একটী অনিয়মের কার্য দেখা যাইতেছে, যে তাহা-দিগের মধ্য হইতে কতকগুলি মুক্তিয়ারকে বাছাই করিয়া এবং যাহারা ১৮৬৫ সালের পূর্ব হইতে মুক্তিয়ার হইয়াছে তাহাদিগকে মনোনীত করিয়া প্রথমতঃ ১৬্ টাকা স্ট্যাম্পে সার্টিফিকেট লইতে অনুমতি দিয়াছিলেন। [illegible] পরিবর্তে [illegible] এক্ষণে নিয়ম হইয়াছে যে মুক্তিয়ার পদাকাংক্ষি ব্যক্তিগণকে প্রথম একজামিনের ফি ৫্ টাকা, রেজিস্টারি ফি ৮ টাকা ও উত্তীর্ণ হইলে ১৬ টাকা দিয়া সার্টিফিকেট লইতে হইবে অথচ তাহারা রেবেনিউ সংক্রান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে রেবেনিউতে বক্তৃতা করিতে পারিবেন না। নূতন মুক্তিয়ারগণের প্রতি এই নিয়মটী ভারী কঠিন হইয়াছে।

নিঃ শ্রীমাধবচন্দ্র রায়চৌধুরি
সাং গোয়াড়ী

যশোহরের তৎকালীন ম্যাজিস্ট্রেট "মিঃ জেমস মনরো তো বটেই, জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ওকেনিলিও যে পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন তা এই সংখ্যায় জানা যায়। পত্রিকার প্রত্যেক সংখ্যাতেই 'মূল্যপ্রাপ্তি' শিরোনামায় গ্রাহকদের নাম প্রকাশিত হত। পত্রিকার এটিও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই কারণে যে, তাতে সেকালের বিভিন্ন প্রান্তের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির এবং অধিকাংশ ইংরাজ রাজপুরুষের নাম পাওয়া যায়। এই তালিকা থেকে অমৃতবাজার পত্রিকার পাঠক-সমাজ ও সেকালের বিদগ্ধ সমাজেরও একটি বিচিত্র চিত্র পাওয়া যায়। এই সংখ্যায় ছিল :

"মূল্য প্রাপ্তি

"শ্রীযুক্ত জে ওকেনলী সাহেব জাইন্ট ম্যাজিস্ট্রেট মোং যশোহর, দশ খন্ডের মূল্য, ৮ই ফালগুণ হইতে............৫০"

এই বছরের এপ্রিল মাস থেকে অমৃত-বাজার পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠারম্ভে দুই পংক্তির একটি কবিতা ছাপা হতে লাগল। পত্রিকার নাম, তার একটি সূর্যপ্রতীক, তার নীচে সাপ্তাহিক, তার নীচে :

"পরাধীন কালকূটে যবি হায় ২
করেছে কি আর্যসুতে চেনা নাহি যায়।।"

তার নীচে এক লাইনে কত খন্ড, যেমন ১ম খন্ড, তারিখ বাংলা ও ইংরাজী, আর কত সংখ্যা। এরপর বিজ্ঞাপন, স্থান সঙ্কুলান হলে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ।

সখেদে বললেন বটে 'আর্যসুতে' চেনা যায় না পরাধীনতার বিষে এমনই সে বিবর্ণ, কিন্তু আর্যসুতের আত্মসম্বিৎ ফিরিয়ে আনার জন্য পত্রিকার নিরলস আয়াসের বিরাম ছিল না। যে-কোন ঘটনা, যে-কোন উপলক্ষে অথবা যে-কোন আলোচনাসূত্রে আর্যসন্তানকে 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' বলে চিনিয়ে দিতে ক্লান্তি বোধ করেননি। তাই শতবর্ষ আগে ১৮৬৮ খৃস্টাব্দের ৭ই মে তারিখে 'জাতি-ঐক্যতা' শিরোনামায় একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ বেরোয়। এর আগে 'ইংলিশ গবর্ন-মেন্ট ও ভারতবর্ষ' (৪র্থ সংখ্যা, ১২ই মার্চ) থেকে খানিকটা উদ্ধৃত করেছি। বলা বাহুল্য, মে মাসের এই প্রবন্ধে সেই ভাব-ধারাই অনুসৃত হয়েছে এবং আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের জন্য আত্মগৌরব বোধ জাগানোর চেষ্টা হয়েছে এটিতে। কালের বিচারে এ-সামান্য নয়। প্রবন্ধটিতে বলা হয়েছে :

"যিনি যেমন বংশোদ্ভূত তাহা দেখিলেই টের পাওয়া যায়। মর্যাদা এই জন্যে লোকের মহৎ সম্পত্তি। যাহারা ভদ্রবংশজাত, হাজার দুরবস্থায় পড়ুক না কেন, তাহাদের অন্ত-র্নিহিত মহৎ ভাব কখনই অন্তর্নিহিত হয় না। উপযুক্তের সমুচিতা-অসমুচিতা-

* ১৮৬৮ খৃস্টাব্দে গভর্ণর জেনারেল ছিলেন স্যার জর্জ লরেন্স, ১৮৬৪ ১৮৬৮; পরবর্তী লর্ড মেও ১৮৬৯ [illegible]। লর্ড মেও [illegible]

শতবর্ষ পূর্বে
যাত্রা শুরু করেছিল

অমৃত বাজার পত্রিকা

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ সম্পাদিত এই পত্রিকাটি বাঙালীর সামগ্রিক জীবনধারায় তুমুল আলোড়ন তুলেছিল। সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক প্রবাহে এর গৌরবময় অতুলনীয় মহিমা আজও অম্লান।

আগামী ২০ ফেব্রুয়ারী

অমৃত বাজার পত্রিকা

শতবর্ষে পদার্পণ করবে। বাঙালী সম্পাদিত অন্য কোন পত্রিকা আজও এই গৌরব অর্জন করতে পারেনি।

এই উপলক্ষে
বহু মূল্যবান নিবন্ধ সমাবেশে
অমৃতের একটি

বিশেষ সংখ্যা

প্রকাশিত হবে
আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারী।

প্রহারে সত্ত্বেও কি নিস্তেজ হইতে পারে নাই। ভারতবর্ষীয়দের উপর এত অত্যাচার, এত ঝড় তুফান যাইতেছে, তথাচ তাঁহাদের দেখিলেই চেনা যায় যে, তাঁহারা শ্রেষ্ঠতম আর্যবংশোদ্ভূত। আর্যদেবের সেই বিস্তৃত ললাট, উজ্জ্বল চক্ষু, সুন্দর অবয়ব ও সুঠাম, এখনো তাঁহার সন্তানগণে বিরাজ করিতেছে। তাঁহাদের আকার, প্রকার, রীতি, নীতি, সকলতাতেই তাঁহাদের বংশমর্যাদার পরিচয় দেয়। তাঁহারা পূর্বতন আর্য-সন্তানগণের ন্যায় বীর্যবান না হন, তাঁহারা যে সিংহশাবক তাহা যখন স্বদেশের জন্য খড়্গহস্ত করিয়াছেন, তখনই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সিপাইযুদ্ধ ও পাঞ্জাব যুদ্ধ ইহার সুন্দর উদাহরণ।...

"ভারতবর্ষীয়গণ যতদিন অত্যাচারী পরাধীনতা কর্তৃক নিষ্পীড়িত হইতেছেন, যদি অন্য কোন জাতি এতকাল এই অবস্থায় অবস্থিতি করিত, তবে তাহাদের চিহ্ন পাওয়া যাইত না। হয় জেতৃ জাতির সংগে মিশাইয়া যাইত, নয় নির্মূল হইত। কিন্তু আর্য-সন্তান নির্বংশ হওয়ার বস্তু নন কি জাত্যভিমানহীন নন। অত্যাচারে তাঁহাদের আন্তরিক মহত্ত্ব নিস্তেজ করিতে পারে বটে, কিন্তু বিনষ্ট করিতে কোনকালেই পারিবে না।"

সম্পাদকের লিপিকৌশল এই কারণেই লক্ষণীয় যে, আজ যাকে বলা হয়, national integration, emotional integration জাতীয় সংহতি, মানসৈক্য, তারই জন্য ভারতীয়মাত্রকেই তিনি একটি শব্দে নিবন্ধ করতে চেয়েছেন—'আর্য'। তিনি বাংলাদেশের এক গ্রামে পত্রিকা-সম্পাদনার ভার নিলেও তাঁর সম্মুখে বিস্তারিত ছিল ভারতের মানচিত্র; জানতেন, নৃতত্ত্বের সূক্ষ্ম বিচারে বঙ্গসন্তান আর্য নয়, মূখ্যত মোঙ্গল-দ্রাবিড়সম্ভূত, দাক্ষিণাত্য ও আর্যাবর্ত থেকে পৃথক এবং ভারতবর্ষে শত মানুষের ধারা লীন হয়েছে, কিন্তু ঐ বৈচিত্র্যের মধ্যেও একটি সাধারণ গৌরব এদের একীকৃত করেছে; সেটি আর্য-দ্রাবিড় সভ্যতা-বিমণ্ডিত এক অপরূপ ঐতিহ্য, বহু বিচিত্র ধর্মের সমন্বিত এক ধ্যান-ধারণা; হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা অবধি, সোমনাথ থেকে কামরূপ অবধি তীর্থে তীর্থে অবিচ্ছিন্ন পদ্মপুষ্পের একটি মালিকা। বিদেশীর কাছে হিন্দু হিন্দু বলতে, এরিয়ান, ইণ্ডিয়ান বলতে এই উপমহাদেশতুল্য এক অখণ্ড দেশের অধিবাসীদেরই বোঝাত। সেই একটি শব্দ অমৃতস্য পুত্রাঃ বা আর্য-সুত।

সম্পাদক এ-কথাও জানতেন যে, সিপাহী বিদ্রোহকে সমগ্র ভারতবর্ষ গ্রহণ করতে পারেনি, তৎকালীন বাংলার শিক্ষাভিমানী অভিজাত বঙ্গসমাজ তো নয়ই। অমৃতবাজার পত্রিকার আবির্ভাবের দশ বছর আগেও যেসব সংবাদপত্র ছিল, তাতে তা যথাযথ প্রতিফলিত হয়েছে বলা যায়।

"সম্প্রতি এতদ্দেশীয় সিপাহী সেনা দ্বারা যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার নিমিত্ত গভর্নমেণ্টের প্রতি ভক্তি ও অভিপ্রায় প্রকাশ জন্য এতদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত মহাশয়েরা গত দিবস হিন্দু মেট্রোপলিটান কালেজে যে সভা করিয়াছিলেন অহাতে শ্রীযুত রাজা রাধাকান্ত দেববাহাদুর, শ্রীযুত রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, শ্রীযুত বাবু রাজেন্দ্র দত্ত, শ্রীযুত রায় হরচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রভৃতি অনেকানেক মহাশয়েরা উপস্থিত হইয়াছিলেন......"

সভার যে ছ'টি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল তার দু'টি এখানে উল্লেখ করা যাচ্ছে ঃ

১। "এই সভা শ্রবণ করত অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন যে, এতদ্দেশীয় কয়েকজন পদাতিক সৈন্য গবর্নমেণ্টের বিরোধী হইয়া স্থানে স্থানে অত্যাচার করণে প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং তাহারদিগের এই অসচ্চরিত্র এবং ব্যবহার জন্য সভার ঘৃণা ও ভয়।

৪। "এই বিদ্রোহ সময়ে দেশের শান্তি-রক্ষা নিমিত্ত গবর্নমেণ্টের প্রতি যদ্যপি কোন সাহায্য প্রদান করিতে হয়, তবে এই সভা এরূপ অবধার্য করিতেছেন যে, মহারাণীর এতদ্দেশীয় সমুদয় প্রজা তজ্জন্য প্রাণপণে সাহায্য করা আপনারদিগের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কার্য বোধ করিবেন। (সংবাদ প্রভাকর ২৬ মে, ১৮৫৭ খৃঃ, অমৃত ৩২ সংখ্যায় পুনঃ প্রকাশিত, ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৬৭)"

"নগরির ধনি মহাশয়েরা মেট্রোপলিটন কলেজে এবং ভারতবর্ষীয় সভায় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন গবর্ণমেণ্টের সাহায্যকার্যে প্রাণপণ প্রতিজ্ঞা করিলেন সেই প্রতিজ্ঞানুরূপ যুদ্ধসজ্জা করিয়াছেন কলিকাতার উত্তর সিতির পোলের উত্তরাংশে পাইকপাড়া রাজবাড়ী অর্থাৎ শ্রীযুক্ত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর ও শ্রীযুত রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বাহাদুর আপনারদিগের বাড়ীর সম্মুখে রাজপথে ন্যূনাধিক দুই সহস্র অস্ত্রধারী লোক নিযুক্ত রাখিয়াছেন, তাহারদিগের মধ্যে ৪০।৫০ জন গোরা, অন্যেরা এতদ্দেশীয় লোক, গোরাদিগের হস্তে গুলীপোরা বন্দুক রহিয়াছে, দেশীয় সৈন্যেরা ঢাল, তলবার, বন্দুকাদি লইয়া চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিতেছে, কলিকাতার মধ্যে শোভাবাজারীয় উভয় রাজবাটীতে সিপাহীসকল বন্দুক লইয়া খাড়া রহিয়াছে, মলঙ্গানিবাসী দত্তবাবুদিগের এবং জানবাজার নিবাসিনী শ্রীমতী রাসমণির বাটীতে বাটীতে গোরা সৈন্যসকল বন্দুক সহিত হৈ-হৈ-থৈ-থৈ করিতেছে নগরের মধ্যস্থল কলুটোলা অবধি বাগবাজার পর্যন্ত সেন, শীল, দত্তমল্লিক, ঠাকুর, সিংহ, ঘোস, মিত্র, বসু দেবাদি প্রত্যেক ধনির বাড়ী বাড়ী দেশীয় সৈন্য ও গোরা সৈন্যেরা মহোদ্যমে যাদোদ্যম করিতেছে, আমরা তাদৃশ ধনী নহি তথাচ ঢাল, তলবার, লড়কী, বল্লম ইত্যাদি অস্ত্রশস্ত্রধারী কয়েকজন দেশীয় পাইক রাখিয়াছি, এইরূপ যিনি যেমন মনুষ্য তিনি সেই প্রকার সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছেন, সকল প্রজার বাড়ীতেই ছাদের উপর ঝামা ইট কাঁড়ী কাঁড়ী সাজাইয়াছে, ধনি দরিদ্র সাধারণ সকলে রাজপক্ষে হইয়াছেন..."ইত্যাদি (সংবাদ ভাস্কর, ১৮ই জুন, ১৮৫৭ খৃঃ, অমৃত, ঐ)

বাহ্যিক এই সংগ্রামী সহযোগিতার মূলে যে মানসিকতা বিরাজ করছিল, তারও আভাস পাওয়া যায় আর একটি উদ্ধৃতি থেকে ঃ

"এই স্থলে প্রণিধান করুন। ব্রিটিস অধিকার আমারদিগের পক্ষে কি প্রকার সুখের আধার হইয়াছে, অনায়াসেই অতি-সহজে নানাপ্রকার অর্থকরী বিদ্যার উপার্জন, বিদেশীয় বাণিজ্য দ্বারা ধনাহরণ, নির্ভয়ে অর্জিত ধনরক্ষণ, অর্জিত ধনের বৃদ্ধি, অর্থাৎ কোম্পানির কাগজের সুদের দ্বারা ধনবৃদ্ধিকরণ। স্বচ্ছন্দে শকটারূঢ় হইয়া নানা দেশ পর্যটন ও তীর্থাদি দর্শন, স্বাধীন রূপে ধর্মযাজন, রাজকীয় ব্যাপারে নানা কথার আন্দোলন, এবং রাজনিয়মের দোষোল্লেখপূর্বক সংশোধনের অনুরোধ-করণ ইত্যাদি অশেষবিধ বিষয়েই আমরা অশেষরূপে উপকৃত হইতেছি, অতএব সকলে একবার মুক্তকণ্ঠে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের প্রশংসা ঘোষণা করিয়া মনের সহিত জয় প্রার্থনা কর।" (সংবাদ প্রভাকর, ২০শে জুন, ১৮৫৭ খৃঃ অমৃত, ঐ)

উত্তরকালে অমৃতবাজার পত্রিকা এই মানসিকতাকেই মারাঠা ডাঁচ্ পরিবেষ্টিত নাগরিক সভ্যতা বলে উল্লেখ করেছেন, কেননা পত্রিকার আবির্ভাব ঘটেছে গ্রামীণ সামাজিক সম্বন্ধের পটভূমিকায় সুবিস্তৃত বৃটিশ ভারতের দিকে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি রেখে। দুইয়ের দৃষ্টিভঙ্গীর বৈপরীত্যে সংঘাত ঘটেছে এইখানেই। ১৮৫৭ খৃস্টাব্দ ও ১৮৬৮ খৃস্টাব্দের কালিক ব্যবধান প্রায় দশ-এগারো বৎসর কিন্তু মানসিক ব্যবধান যেন দুস্তর পারাবারসদৃশ। ১৮৫৭ খৃস্টাব্দে বহুনিন্দিত সিপাহী বিদ্রোহকেই ১৮৬৮ খৃস্টাব্দে যাঁরা 'সিংহশাবকতুল্য' 'আর্যসন্তান'গণের 'স্বদেশের জন্য' 'খড়্গ-হস্ত' বলে ঘোষণা করতে পারলেন তাঁদের সাহস যে অপরিমেয়, এ-কথা কে অস্বীকার করবে?



বহু বিতর্কিত একখানি চিত্রপট

সুধা বসু

চিত্ররচনায় বিষয়বস্তু বড় কথা, না, শিল্পীর কল্পনা, অঙ্কনপদ্ধতি, বর্ণ-বিন্যাসের বৈচিত্র্য ও ভঙ্গিমা মুখ্য বিবেচনার বিষয়, তা নিয়ে দেশে দেশে বিভিন্ন যুগে ও কালে তর্কের অন্ত নেই। এ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। কিন্তু সমস্যাটির পুরো সমাধান আজও হয়নি বলা যায়। বরং আধুনিককালে কলাশিল্প, বিশেষত চিত্রকলা এমন স্তরে পৌঁছেচে যেখানে রূপ-বর্জিত, বিমূর্ত এবং আরো কত নব নব ও অভিনব ভাবধারা এবং আদর্শের হয়েছে আমদানী ও প্রচলন। যে চিত্রে কোন বিষয়-বস্তু, আখ্যানকাহিনী বা কোন ঘটনা রূপায়ণের বালাই নেই, অথবা যেখানে কোন জানাচেনা বস্তুসামগ্রীরও চিহ্ন দেখা যায় না, তার গুণাগুণ নির্ণয়ের মাপকাঠি কি? সেখানে শিল্পীর কল্পিত জগতে তাঁরই ভাব ও ভাবনার যে প্রকাশ হয়েছে রং-এ, রেখায়, তার মধ্যে কতখানি রসসৃষ্টি হয়েছে, দর্শকের চোখ ও মনকে তা কতটা আনন্দ দিচ্ছে বা, তাঁর অন্তরে আলোড়ন সৃষ্টি করছে কিনা, সেদিকে অনুসন্ধান করা ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু যে চিত্রে শিল্পীর বক্তব্য সুস্পষ্ট, তিনি যেখানে নির্দিষ্ট কোন বিষয়বস্তুর অবতারণা করেছেন, সেখানে কি তাকে বাদ দিয়ে রসবিচার করা সম্ভব?

এ প্রশ্ন আজ জটিলতর হয়ে উঠেছে। আর এর সদুত্তর বা নির্জলা শেষ উত্তর দেওয়াও খুব সহজসাধ্য নয়। সে উত্তর সর্বসম্মত হওয়াও কঠিন এবং তা নিয়ে তর্কের ঝড় উঠবেই।

এই শতকের গোড়াতে বাংলা দেশের মধ্যেই এইরকম তীব্র মতবাদ বিনিময় ও তর্কের ঝড় দেখা গিয়েছিল বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার পাতায়। সেই শিল্পকর্মটির দোষগুণ আলোচনার চেয়েও সেদিন তার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছিল তর্কবিতর্কের মুখ্য বিষয়। চিত্রকলাবিদ্, রসবেত্তাদের আওতা ছাড়িয়ে তা পৌঁছেছিল ঐতি-হাসিক, সাহিত্যিক ও বুধমন্ডলীর গবেষণাগারে।

সেই চিত্রখানির স্রষ্টা শিল্পী আজ প্রায় অজানার কোঠায় চলে গিয়েছেন। রচনাটিও লোকচক্ষুর অগোচরে কোথায় স্থান পেয়েছে তা সঠিক বলা যায় না। কিন্তু তার বিচিত্র বিষয় নিয়ে সেদিন যে তর্কবিতর্ক ও আলো-চনা হয়েছিল, তার স্মৃতি আজও অম্লান হয়ে আছে অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কাছে। সেই আলোচনাসমূহের মধ্যে পাওয়া যায় কোন ভুবনবিখ্যাত শিল্পবিদের মতামত, ভারতীয় নবীন চিত্রকলার জনক শিল্পগুরু কর্তৃক শিষ্যকে সুরসাল উপদেশ ও সান্ত্বনা প্রদান, প্রখ্যাত ঐতিহাসিকের প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটন ও একজন উগ্রপ্রকৃতির রক্ষণশীল সাহিত্য-সমালোচকের কটুভাষায় তিরস্কার। এই সমস্ত মিলিয়ে একজায়গা করলে একদিকে যেমন অদ্ভুত একটি রসসমৃদ্ধ সাহিত্যের সন্ধান পাওয়া যায়, অন্যদিকে তেমনি পাওয়া যাবে চিত্রকলার প্রকৃত আদর্শ সম্বন্ধে চিন্তার খোরাক।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর প্রথম শিষ্য-দলের অগ্রণী নন্দলাল বসুর পাশেই আর একটি মেধাবী ছাত্র হিসাবে পেয়েছিলেন সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীকে। এই ছাত্রটির মধ্যে ভবিষ্যতের অনেক সম্ভাবনা দেখতে পেয়ে-ছিলেন শিল্পগুরু। কিন্তু মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে সুরেন্দ্রনাথ এক দুরন্ত ব্যাধির কবলে পড়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন, ১৯০৯ সালের নভেম্বর মাসে। সেই স্বল্পস্থায়ী শিল্পী-জীবনেই তিনি অনেকগুলি শ্রেষ্ঠ চিত্ররচনা করে দেশের ও বিদেশের কলারসিকদের প্রচুর প্রশংসা অর্জন করেছিলেন।

কিন্তু ১৯০৮ সালে 'লক্ষ্মণ সেনের পলায়ন' নাম দিয়ে তিনি যে ছবিখানি এঁকে-ছিলেন তা শিল্প-ইতিহাসের পাতায় ও নানা আলোচনার মধ্যে দিয়ে একটা স্থায়ী আক-র্ষণের বস্তু হয়ে রয়েছে। ছবিখানি ১৯০৮ সালের শেষভাগেই বিলাতের 'স্টুডিও' পত্রিকায় মুদ্রিত হয় ত্রিবর্ণাকারে। এই প্রকাশনার পরেই বাংলাদেশের ঐতিহাসিক মহলে তীব্র এক আলোড়ন ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল।

সর্বাগ্রে এর বিষয়বস্তুর অসারতা প্রমাণ করতে উদ্যত হন সেযুগের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। এবিষয়ে তিনি পরপর দুটি প্রবন্ধ লেখেন 'বঙ্গদর্শন' (পৌষ, ১৩১৫) ও মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় (জানুয়ারী ১৯০৯)।

মডার্ন রিভিউতে তিনি লিখেছিলেন, "লক্ষ্মণ সেনের পলায়নের কাহিনী ক্রমশঃ পাঠ্যপুস্তকে স্থানলাভ করে সমস্ত বিদ্যা-লয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে চালু হয়। তারপরে ইহা যদি নানাভাবে রূপান্তরিত হয়ে আধুনিক সাহিত্যেও স্থান পায় তাহলেও আশ্চর্যের কিছু নেই।

জনৈক শিল্পী এই বিষয়টিকে অক্ষয় রূপ দিয়েছেন চিত্রপটের বুকে। শিল্পকৃতি হিসেবে সেটি খুব খারাপ হয়নি।

কিন্তু পক্ষান্তরে ভারতীয় ও ইউরোপীয় পন্ডিতেরা বহু পরিশ্রমের পরে এমনসব উপাদান সংগ্রহ করেছেন ও আলোচনা করেছেন যার জন্য আমাদের বিষয়টি পুন-র্বিবেচনা করা দরকার; ভুল সংশোধনে কখনও বিলম্ব হয় না। বিশেষতঃ ইতিহাসের ভুলকে সর্বদা, সব অবস্থায় সংশোধন করা চলে।"

এখন প্রশ্ন হোল, বাস্তবিকই কি লক্ষ্মণ সেন তাঁর রাজধানীতে সপ্তদশ অশ্বারোহীর আক্রমণ হলে পলায়ন করেছিলেন?

এই প্রসঙ্গে মৈত্রেয় মহাশয় কাশ্মীরের ইতিহাস লেখক কল্হন কর্তৃক গৌড়ীয় শৌর্যকে প্রশংসার কথা উল্লেখ করেছেন।

এই সাধুবাদ কল্হন দিয়েছিলেন যখন ভারত সীমান্তে মুসলমানগণের আক্রমণ হয়েছিল, তখনই।

এছাড়া মৈত্রেয় মহাশয় "তবাকৎ-ই-নাসিরী"র লেখক মীনহাজ-ই-সিরাজের বক্তব্যকে নানা যুক্তির সহায়তায় আজগুবী ও গল্পগাছা বলেই প্রতিপন্ন করেছেন।

রায় লছমনিয়া নামটি ও তাঁর রাজধানী নদীয়া, কি নবদ্বীপ, এই বিষয়েও তিনি আলোচনা করেছেন। লছমনিয়া নামটি সেনবংশের রাজাদের নামের তালিকায় নেই। কিন্তু অনেকের মতে লছমনিয়া কথাটি লক্ষ্মণেরই বিকৃত রূপ এবং নবদ্বীপ থেকেই উদ্ভূত হয়েছে নদীয়া শব্দটি।

প্রখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ্ স্বর্গত রাখালদাস ব্যানার্জিও বোধগয়ায় প্রাপ্ত দু'খানি শিলা-লেখের প্রমাণে লক্ষ্মণ সেনের তথাকথিত পলায়ন কাহিনীর অসত্যতা প্রমাণ করেছেন।

তারপরে সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসবিদ্ পণ্ডিতপ্রবর ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়

তাঁর বাঙালীর ইতিহাস (১ম খণ্ড) ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত "হিস্ট্রি অব্ বেঙ্গল" গ্রন্থে মৌলপ্রমাণসহ যথেষ্ট আলোচনা ও আলোকপাত করে বিষয়টির অসারতা কোথায় তা স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন। তাঁর মতে তুর্কীরা যখন মগধের সীমান্তে উপস্থিত হয়েছিল তখন লক্ষ্মণ সেন নিজ রাজ্য রক্ষার জন্য কি ব্যবস্থা করেছিলেন তা সঠিক জানার কোন উপায় নেই। কারণ, ভারতীয় কোন লেখকের রচিত সে যুগের কোন প্রকৃত বিবরণ পাওয়া যায়নি।

এই প্রসঙ্গে ডঃ মজুমদার লিখেছেন, "ইহার (তুর্কীবিজয়) অর্ধশতাব্দী পরে তুর্কীবিজেতার সভাসদ এক ঐতিহাসিক লোকমুখে সেনরাজ্য জয়ের যে কাহিনী শুনিয়াছিলেন, তাহা অবলম্বন করিয়াই এই যুগের ইতিহাস রচিত হইয়াছে। আর সেই ইতিহাসেরও প্রকৃত মর্ম গ্রহণ না করিয়া তাহার বিকৃত ব্যাখ্যান দ্বারা কেহ কেহ প্রচার করিয়াছেন যে সতেরজন তুরস্ক অশ্বারোহী বঙ্গদেশ জয় করিয়াছিল। এবং সেই অদ্ভুত উপাখ্যানে বিশ্বাস করিয়া অনেকেই লক্ষ্মণ সেনকে কাপুরুষ বলিয়া হতশ্রদ্ধা করিয়া আসিতেছে" (বঙ্গালীর ইতিহাস, পৃঃ ৯৩)।

"তবাকৎ-ই-নাসিরী" নামক গ্রন্থেই তুরস্ক জাতি দ্বারা মগধ ও গৌড়জয়ের সর্বপ্রাচীন বিবরণ পাওয়া যায়। গ্রন্থকার মীনহাজউদ্দিন দিল্লীর সুলতানের অধীনে ছিলেন উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত। ১২৬০ অব্দের পরে তিনি এই গ্রন্থখানি রচনা করেন। গৌড় ও মগধ জয় সম্বন্ধে কোন সরকারী বিবরণ বা দলিল তাঁর হস্তগত হয়নি। মগধ জয়ের চল্লিশ বছর পরে লক্ষ্মণাবতী নগরীতে দুইজন বৃদ্ধ সৈনিকের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। তারা গৌড় আক্রমণের সঙ্গে যুক্ত ছিল না। মীনহাজ্ বলেছেন যে তিনি বিশ্বাসী লোকেদের কাছে এই ঘটনা শুনেছেন।

তাঁর বিবরণে আছে—বখতিয়ার যখন অতি অল্পসংখ্যক সৈন্যসহ শহরে প্রবেশ করেন, তখন সকলে মনে করেছিল যে তারা সম্ভবত সওদাগর; অশ্ববিক্রেতা। আক্রমণকারীরা যখন রাজপ্রাসাদের দ্বারে উপস্থিত হয়েছিল তখন বৃদ্ধ রাজা লক্ষ্মণিয়া মধ্যাহ্নভোজনে ব্যাপৃত ছিলেন। ইতিমধ্যে তারা রাজপুরীতে প্রবেশ করে হত্যালীলা শুরু করে। তখন রাজা নগ্নপদে প্রাসাদের পশ্চাৎদ্বার দিয়ে নৌকাযোগে পলায়ন করেন।

লক্ষ্মণ সেনের এইভাবে পলায়ন প্রসঙ্গে ডঃ মজুমদার বলেছেন যে তুরস্ক অভিযানের আশঙ্কায় নদীয়াবাসীরা পূর্বেই অন্যত্র চলে যান। কিন্তু অশীতিপর বৃদ্ধ রাজা লক্ষ্মণসেন রাজধানী ত্যাগ করেননি। সুতরাং তাঁর মধ্যে শৌর্যবীর্যের অভাব ছিল বলা যায় না। অকস্মাৎ প্রাসাদ আক্রান্ত হলে অতি বৃদ্ধ রাজার পক্ষে দেশত্যাগ করা ছাড়া অন্য কি উপায় ছিল? কাজেই এটাকে কাপুরুষোচিত বলা যুক্তিযুক্ত নয়।

প্রখ্যাত বাঙালী ঐতিহাসিকদের এই আলোচনা ও যুক্তি সিদ্ধান্তের বহু পূর্বে সাহিত্যের পাতায়ও মীনহাজের উক্তির সমর্থন ও প্রতিবাদ দুই-ই লিপিবদ্ধ হয়েছিল। যেমন, কবি নবীনচন্দ্র সেন বাংলা ১২৮২ সালে লিখলেন,

"সপ্তদশ অশ্বারোহী যবনের ভয়ে
সোনার বাংলা রাজ্য দিল বিসর্জন।"
(পলাশীর যুদ্ধ, চতুর্থ সর্গ)

ডঃ মজুমদার এই উক্তিকে "সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন" বলেছেন। আর ১২৭৮ সালে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁর বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা" প্রবন্ধে (বঙ্গদর্শন) লিখেছিলেন সেই চলিত মতের প্রতিবাদস্বরূপ মন্তব্য। "সতের অশ্বারোহীতে বাংলা জয় করিয়াছিল, এ উপন্যাসের ঐতিহাসিক প্রমাণ কি? মিনহাজউদ্দিন বাংলা জয়ের ষাট বৎসর পরে এই এক উপকথা লিখিয়া গিয়াছেন। ....আর উহা মিনহাজউদ্দিনের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট নহে, জনশ্রুতি মাত্র। জনশ্রুতি কি স্বকপোলকল্পিত, তাহাতেও সন্দেহ আছে। ....সাহেবরা সেই মিনহাজের কথা অবলম্বন করিয়া ইংরাজীতে ইতিহাস লিখিয়াছেন। তাহা পড়িলে চাকরী হয়। ....সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বখতিয়ার খিলিজী বাংলা জয় করিয়াছিল, একথা যে বাঙ্গালীতে বিশ্বাস করে, সে কুলাঙ্গার।"

পূর্বেই বলা হয়েছে যে সুরেন গাঙ্গুলীর চিত্রখানি প্রকাশিত হতেই স্তম্ভিত ও ক্ষুব্ধ হয়ে প্রথমে এগিয়ে এলেন 'অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। তিনি রাজসাহী সাহিত্য পরিষদেও তার প্রতিবাদ করে প্রবন্ধ পাঠ করেন। সেইটিই বঙ্গদর্শনে হয়েছিল প্রকাশিত। তাঁর ক্ষোভের প্রধান কারণ যে ঐ সময়েই (১৯০৮—৯) তিনি ও রাখালদাস ব্যানার্জ চেষ্টা করছিলেন লক্ষ্মণ সেনের জীবন থেকে সেই কলঙ্ক মুছে ফেলার জন্য। আর তখনি কিনা ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব্ ওরিয়েণ্টাল আর্ট ঐ চিত্রখানি প্রকাশ করলেন এবং তাও আবার বিলাতের একটি জনপ্রিয় কলা পত্রিকায়।

মৈত্রেয় মহাশয়ের প্রবন্ধের পরে বঙ্গদর্শনের মারফতেই স্বয়ং শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ এগিয়ে এলেন শিষ্যকে উপদেশের ছলে চিত্রের বিষয়বস্তু সম্পর্কে কিছু আলোচনা করতে। তাঁর প্রবন্ধের নাম হোল—"নামকরণ রহস্য" (বৈশাখ, ১৩১৬)। তিনি লিখেছিলেন,

প্রিয় সুরেন্দ্র,
মান করলি তো করলি,
অবকাহে রোইলি?

ছবিখানির নাম 'লক্ষ্মণ সেনের পলায়ন' দিয়া এখন দুঃখ করিবার কি কারণ? ভাবিতেছ, নামই যদি দিলাম তবে অন্য নাম দিলাম না কেন?......

শিল্পী আর কবির লক্ষ্যই হচ্ছে কটু হইতে মধু, হীনতা হইতে মিষ্টতা বাহির করা, সেটাকে পরিবর্তন করা নয়, বাস্তবের অনুরোধে পরিত্যাগ করাও নয়। এইজন্য অযথা পঙ্কে কলঙ্কিত জানিয়াও বঙ্কিম বাংলার ইতিহাসের ঠিক ঐখানটায় তাহার মৃণালিনী ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, আর তুমিও ঠিক ঐখানটায় তোমার তুলি ডুবাইয়াছ।... ...এখন তোমার মনের গতিবিচার করা যাক। জলেই জল বাধে, এ কথাটা তোমার জানা আছে। শিল্পীরই বল, কবিরই বল, মন লইয়াই কারবার। দর্শকের বা পাঠকের মন আর নিজেদের মন—দুই দিকে দুই কূল, মাঝে সংস্কার, শিক্ষা প্রভৃতির খরস্রোত দুই মনকে পৃথক রাখিয়াছে; এই খরস্রোতের উপরে বর্ণের ও ভাবের সেতু বাঁধিয়া দুই মনে সংযোগ স্থাপনেই শিল্পীর ও কাব্যের সার্থকতা।......যে কলঙ্ক ভাগবতে পায়, আর যে কলঙ্ক সাহিত্যে ও শিল্পে স্থান পাইবার মত, তাহা কলঙ্কই নয়।

উক্ত প্রবন্ধ বেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই সাহিত্য পত্রিকার মাধ্যমে পণ্ডিত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় অবনীন্দ্রনাথ ও তদীয় শিষ্যের চিত্র-প্রতিভাকে তিরস্কার করেছিলেন কঠোর ভাষায়। তাঁর রচনার অংশ হোল ঃ

"......অবনীন্দ্রনাথ ভুলিয়া গিয়াছেন—এই কল্পিত হীনতার সহিত জাতীয়তার সংস্রব আছে। যাহা সত্য নহে, জগতে তার স্থান নেই। কাব্যে বা চিত্রে মিথ্যা জাতীয় কলঙ্ক লইয়া যে প্রতিভা 'কটু হইতে মধু ও হীনতা হইতে মিষ্টতা' বাহির করে, ভদ্রলোকে দূর হইতে তাহাকে নমস্কার করিয়া থাকেন। লক্ষ্মণ সেনের তথাকথিত পলায়ন মুসলমানের পক্ষে 'মধু' হইতে পারে, আমাদের পক্ষে তাহা বিষ! এই হীনতার যে মিষ্টতা আছে, নবযুগের নূতন চিত্রকা-পিপীলিকারাই তাহার স্বাদ পাইয়াছেন; পলায়নের সৌন্দর্য দেখিয়াছেন এবং ইংরেজ মিত্র-সমাজে তাহা দেখাইয়া ধন্য হইয়াছেন।... ...সাত শত বৎসরের জুতার স্মৃতি বাংলায় নানা সত্য ঘটনায় মুদ্রিত আছে; নব্য চিত্র-প্রতিভার পক্ষে জাতীয় কলঙ্ক কাহিনীই যদি মৃত-সঞ্জীবনী হয়, অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁহার শিষ্যবর্গ তাহাই আঁকিতে থাকুন।... ...যে সুকুমার কলা জাতীয় মর্যাদায় উদাসীন, যে শিল্পী জাতীয় গৌরবে ও জাতীয়তার মহিমায় অন্ধ, বাংলাদেশেই প্রকাশ্যে তার সমর্থন চলে। হায় বাঙ্গালা, হায় বাঙ্গালী!"

ইতিমধ্যে অদ্বিতীয় ভারতশিল্পবিদ ডঃ আনন্দকুমার স্বামীও মডার্ণ রিভিউ (মার্চ ১৯০৯) মাধ্যমে এই তর্কে যোগদান করেন। তাঁর মতে সাহিত্য ও শিল্পবিচারের মাপকাঠি ও পদ্ধতি নিছক বিষয়বস্তুর উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করে না। যেমন, রামায়ণ কাব্যের মাহাত্ম্য বিচারকালে রাম, সীতা ও রাবণ বাস্তবিক কোন যুগে ছিলেন কিনা, তা বিচার্য নয়। একটি

জাতির উচ্চ আদর্শের দৃষ্টিকোণ ধরেই তার বিচার করা উচিত। তেমনি এখানেও লক্ষ্মণ সেন নামে কোন রাজা ঠিক এইভাবে পলায়ন করেছিলেন কিনা, তা দেখবার দরকার নেই। এখানে দেখতে হবে যে এই জাতীয় কোন পলায়নের সময়কার সঠিক পরিবেশটি সৃষ্টি হয়েছে কিনা। ছবিকে বিচার করার সময় চিত্রগুণই বড় কথা, কোন বিশেষ রাজার পলায়নের কথা চিন্তা না করে, যে কোন রাজাই সেই রকম বিশেষ অবস্থায় পড়লে এইভাবেই আত্মরক্ষা করবেন, এই দৃষ্টিকোণ ধরেই দেখা উচিত।

আমরাও যদি ডঃ কুমার স্বামীর পন্থানুসারে সুরেন গাঙ্গুলীর চিত্রখানিকে বিচার করি এবং লক্ষ্মণ সেনের কথা বাদ দিয়ে অবনীন্দ্রনাথের মতে কোন বিকল্প একটি নাম ধরে আলোচনা করি তাহলে আর সমস্যা থাকে না। অবনীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শনের প্রবন্ধ মাধ্যমে শিষ্যকে বলেছিলেন, ছবিখানির এই নামগুলি দিলে কেমন হয়? যেমন, বিভীষণের লঙ্কাত্যাগ, বিদুরের হস্তিনাত্যাগ, রামের নির্বাসনকালে দশরথ, দাদামহাশয়ের তীর্থযাত্রা জগৎ শেঠের গৃহ হইতে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র মন্ত্রণা আঁটিয়া ফিরিতেছেন ইত্যাদি।

অবনীন্দ্রনাথের প্রস্তাবিত একটি আখ্যা দান করে চিত্রখানি বিচার করলে চিত্র হিসেবে তাকে সার্থক ও সুন্দর বলতে হয়। তবে পালতোলা একখানি ময়ূরপঙ্খী নৌকা রয়েছে প্রাসাদের চত্বর ঘেঁষে। সুতরাং ঘটনার ভৌগোলিক অবস্থান বিচার করে যে আখ্যাটি অধিকতর উপযুক্ত মনে হবে, সেটি দেয়াই বিধেয়। চিত্রে অশীতিপর বৃদ্ধের চেহারা, তাঁর সচকিত ভাবভঙ্গী ও প্রাসাদ ত্যাগের মুহূর্তটি অতি চমৎকারভাবে রূপায়িত হয়েছে। সামগ্রিকভাবে তা নৈপুণ্যময় সৃষ্টি। স্থাপত্য সংস্থানও উচ্চাঙ্গের। পাশে নদীতে নৌকাখানির আংশিক দৃশ্য ও নদীর ওপারে মন্দিরমালার দূরাভাস চিত্রখানিকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। প্রাসাদচত্বরের শ্বেতশুভ্র রূপটি চিত্রপটে ভারসাম্য রক্ষায় ও আলোছায়ার স্বচ্ছন্দ-সৃষ্টিতে বিশেষভাবে সহায়তা করেছে। পরিচ্ছন্ন পরিপাটি রচনা, সূক্ষ্ম রেখাবর্ণের সার্থক সমাবেশ। কাজেই বিষয়বস্তুর সমস্যাকে অবনীন্দ্রনাথের নির্দেশানুসারে সমাধান করে নিতে পারলে এবং নিছক চিত্রগুণের বিচার করলে এর সাফল্য ও সৌন্দর্য সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ কম।

নৌবহরের টুকিটাকি

সুধাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

"জাতীয় স্বার্থ এবং যথাসম্ভব যুদ্ধ-দক্ষতার দিকে লক্ষ্য রেখে ভারতীয় ফৌজকে কত কম সময়ের মধ্যে জাতীয় বাহিনীতে পরিণত করা যায়"—এই ধরনের একটি প্রশ্ন উঠেছিল বলেই ১৯৪৬ সালের ৯ই অক্টোবর তদানীন্তন অন্তর্বর্তী ভারত সরকার একটি নীতি ঘোষণা করেন। যার মূল কথা হল বিভক্ত ভারতের ফৌজ কিভাবে জাতীয়করন করা হবে। বলা বাহুল্য যুক্ত দেশরক্ষা পরিষদ এবং বিভাগ-পরিষদের তত্ত্বাবধানে এই কার্য প্রথম সুসম্পন্ন হয়। ফলে নৌবাহিনীও বিভক্ত হয়ে যায় খুব ত্বরিত গতিতে। ভারতের ভাগে পড়ে সাবমেরিণ বিধ্বংসী এবং বাণিজ্য সম্ভারবাহী স্লুপ, ফ্রিগেট মাইন-সুইপার ল্যাণ্ডিং ক্রাফট অর্থাৎ স্থলাবতরণ বাহিনী ইত্যাদি—এমনি অনেক যুদ্ধসামগ্রী।

ক্রমান্বয়ে ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজ ক্রুজার 'এ্যাকিলিস'-এর ভারতীয় নামকরণ হয় "দিল্লী"। রদারহ্যাম, রেইডার ও রিডাইট নামে তিনটি ডেস্ট্রয়ারও ভারতের করতলগত হয় এবং ভারতীয় নামকরণ হয় 'রণজিৎ' 'রাণা', ও 'রাজপুত'। এমনি আরো অনেক। খণ্ডিত ভারতের ২৫০০ হাজার মাইলব্যাপী সমুদ্র-উপকূলের সীমান্তরক্ষায় স্বাধীন নৌবাহিনীর অভিনব দায়িত্ব সম্বন্ধে আমাদের সচেতন হওয়া বোধহয় আর একটু বেশি দরকার। এখানে বলে রাখা ভালো স্বাধীনতা লাভের কিছু সময় বাদেই স্থল ও বিমান-বাহিনীর মত নৌবাহিনীতেও অশেষ পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে। ১৯৪৮ সালের ২০শে জুন ইংলন্ডীয় নৌভের সর্বোচ্চপদ 'ফ্ল্যাগ অফিসার কমান্ডিং' পরিবর্তিত করে নামকরণ হয় চীফ অফ দি ন্যাভাল স্টাফ অ্যান্ড সি-ইন্-সি।" আরো পরবর্তীকালে মার্কিণ দেশের অনুসরণে একটি নূতন পদ সৃষ্টি করা হয়, "এ্যাডমিরাল এ্যাফ্লোট"।

ভারতীয় নৌবাহিনীর ক্রমবর্ধমান কৃতিত্বে গৌরব করার যথেষ্ট কারণ আছে। অবশ্য বাঙালীর পক্ষে এই সার্থকতার ইতিহাস নৌবাহিনীতে নূতন নয়। প্রাচীন বাংলার যুদ্ধপোত ও বাণিজ্যবহর সংস্কৃতির জয়-পতাকা নিয়ে নোঙর ফেলেছিল সুদূর সুমাত্রা-জাভা দ্বীপপুঞ্জে। অজন্তা গুহায় চিত্রিত বিজয় সিংহের লংকা-বিজয়ের কাহিনী আজো আমাদের মুখে মুখে উচ্চারিত। স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের গবেষণায় নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে প্রাচীন বন্দর তাম্রলিপ্ত (তমলুক) থেকে পরিব্রাজক ফা-হিয়েন জাহাজেই স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। প্রাচীন তাম্রলিপিতে প্রাপ্ত 'রামেস্ নাম্না যবনস্য' কথাটি ঈজিপ্টের রামেসিস-এর সঙ্গে বাণিজ্য বিনিময়ের কথাই প্রমাণ করে। গ্রীক 'গ্যালি'র মত বাংলার নৌশক্তি একদিন ছিল সংস্কৃতির অগ্রদূত। বাঙলার প্রাচীন মঙ্গল-কাব্যগুলিতেও নৌবাহিনীর সমুদ্রবিজয়ের কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। গাম্ভারী তমাল পিয়াল কাঁঠাল ইত্যাদি মজবুত কাঠের তৈরী বৃহদাকার জাহাজ নির্মাণ করতো বাঙালী। মকরপংখী, ময়ূরপংখী, শুকপংখী -ইত্যাদি জাহাজ নির্মাণের উৎকীর্ণ চিত্ররূপ দেখা যায় সাঁচী-স্তূপে। জাহাজের নামগুলিও শ্রুতিসুখকর—গুয়ারেখী (সিংহ মুখাকৃতি) মধুকর (ড্রাগশিপ্) রণভীম ইত্যাদি। বড় বড় রণতরীর গলুয়ের প্রান্তে আঁকা রূপচিত্রের চোখে বসানো থাকতো হীরা অথবা চন্দ্রকান্ত মণি। "শালুম" কাঠের তৈরী পালের খুঁটির পাশেই হয়তো দেখা যেত মাইঘর অর্থাৎ চিফ কেবিনের আকাশছোঁয়া উচ্চতা, —তেরতলা পর্যন্ত।

বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলে "মধুকর" রণতরীর পিছনে শিজু সিজু শংখচূড় ইত্যাদির ক্রমশৃঙ্খলায় বর্ণনা আছে। ওই মনসামঙ্গলেই অন্যত্র "নবমে 'সাগরফেনা' যে নায়ে কলিঙ্গাসেনা" ইত্যাদি পংক্তিতে প্রাচীন বাঙালী ও ভারতীয়দের রণনীতির উৎকর্ষ ঘোষিত হয়েছে। প্রাচীন বাংলার নৌজগতে আধুনিক অ্যাডমিরালকেই বলা হতো 'মীর বহর'; ক্যাপ্টেনকে 'কারারি'; এবং ওরস্-ম্যানদের বলা হতো 'মনঝি'।

আধুনিক যুগে মাদ্রাজ ও কলিকাতা বন্দর দুটো এক-একজন 'আর-এন-ও'র অধীনে। ভিজাগাপত্তনম— নৌ-শিক্ষার্থীদের কেন্দ্র। ব্রিটিশ আমলের সবচেয়ে বড়ো গোলা-বারুদের কেন্দ্রটি করাচীতে স্থানান্তরিত হওয়ায় নূতন উদ্যমে কোচিনে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এর পরে ভেংগুরলাতেও একটি হয়। এখানে এখনো ফ্রিগেট ও ফ্লোটিলা মেরামতের কাজ হয়। কাথিওয়াবাড়-এর অন্তর্গত জামনগর বৈদ্যুতিক ও যন্ত্রপাতির শিক্ষামূলক কেন্দ্র।

আরেকটি কেন্দ্র আছে কোয়েম্বাটুর। ডেরাডুনে নৌ-শিক্ষারও স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে। কিন্তু সবচেয়ে সুষ্ঠু ব্যবস্থা দেখা যায় দক্ষিণ ভারতের উইলিংডন বন্দরে। অবশ্য এই সব গৌরবের প্রথম পদক্ষেপ সূচিত হয়েছিল সর্বপ্রথম সুরাটে। এখানেই 'কুইন' নামে আধুনিক রীতিসম্মত জাহাজ তৈরী হয়েছিল নরশের ওয়ারজি ওয়াদিয়ার তত্ত্বাবধানে। পরে বোম্বাই সমুদ্র তীরে ৭০টি গোলা-বারুদবাহী জাহাজের জন্য নির্মিত হয় 'ড্রাই ডক' এবং 'ওয়েট ডক'।

জাহাজী ইতিহাস প্রসঙ্গে যুদ্ধ জাহাজের গঠনপ্রণালী সম্পর্কে কৌতূহল জাগা খুবই স্বাভাবিক। ইউরোপীয় সামুদ্রিক শাস্ত্রে জাহাজের স্থাপত্য ও কলকব্জার বিভিন্ন নাম রয়েছে। জাহাজের সামনের অংশকে বলা হয় 'ফো-কসল' এবং পেছনের অংশকে 'আফ্ট (ট) কসল'। 'রেভোলিউশন ইনডিকেটর' নামক যন্ত্রের সাহায্যে স্পীড জানা সম্ভব হয়। অলটিমিটার রুটের সামুদ্রিক চিহ্ন লেখা থাকে। গভীরতা মাপক এক ফ্যাদমে (Fathom)

ছ' ফুট গভীরতা বুঝায়। জাহাজের লগ-রোলস দেখতে অনেকটা সাইক্লোমিটার-এর মত। বিচিত্র উপায়ে জাহাজী কম্পাসের কার্ডটিও ভাসমান থাকে একপ্রকার তরল পদার্থের উপর—যে কোনো ঝাঁকুনির হাত থেকে নিরাপত্তার জন্য। পরবর্তীকালে গাইরোস্কোপ নামে একটি যন্ত্র এই কম্পাস নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত হয়। সমুদ্রপথে জাহাজের নাববরাবর গতিভঙ্গি বিশ্লেষণে ব্যবহৃত যন্ত্রটিকে বলা হয় লাবার পয়েন্ট বা লাবার-লাইন। জাহাজের ক্যাপ্টেন বা নাবিকদের দু চোখের মধ্যবর্তী দ'টি বস্তুর সঠিক কোণ নির্দেশ করতে সাহায্য করে সেক্সট্যান্ট যন্ত্রটি।

যুদ্ধ জাহাজের ঘড়িরও বিশেষত্ব আছে। অতিরিক্ত উত্তাপের ফলে যাতে ঘড়ির স্পন্দন হ্রাস না পায় তার জন্যে অনুত্তেজনীয় পদার্থ অ্যালয় জাতীয় ধাতু-নির্মিত ব্যালেন্স হুইল ও হেয়ার-স্প্রীং ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া হাইগ্রোগ্রাফ ক্রনো-মিটার ইত্যাদি নানা কৌতূহলোদ্দীপক যন্ত্র তো আছেই।

সমুদ্রপথে নির্ভুল সময় ও গতি নির্ণয়ের জন্য পৃথিবীর প্রায় সব নাবিকেরই একটি বাঁধাধরা গৎ আছে। তার ভাবার্থ অনেকটা এই রকম—

'পশ্চিম অক্ষাংশ যদি গ্রীণ উইচকে মানো।
পূর্ব দ্রাঘিমা যদি, অন্য সময় জানো'

আসলে জাহাজীদের জীবনে সব কিছুই যেন এক সুদূর রহস্যের রূপক। ফলে এদেরও আছে নানা সাংকেতিক ভাষা। এমনি ধরনের জাহাজী ভাষার মধ্যে সিং-সং উল্লেখযোগ্য। 'বাই দি মার্ক'—অথবা 'বাই দি ডীপ' ইত্যাদি রহস্য চীৎকারের মধ্য দিয়ে নাবিকরা দূরত্ব ও গভীরতার সংকেত শোনাচ্ছে নিশ্চয়। ২৪ পাউণ্ড ওজনের ভারী সীসার টুকরো দিয়ে ফ্যাদম বা গভীরতার হিসাব করা হয়। নানাধরনের আলোক নিক্ষেপের ব্যাপারেও নাবিকরা সাংকেতিকতার আশ্রয় গ্রহণ করে যেমন, জি-প অর্থে—'ফ্ল্যাশিং ইন গ্রুপস' বুঝতে হবে। শুধু 'এফ' অর্থে বোঝাবে—'স্টেডি লাইট'। 'লাইট কাটোপাষ্টিস' ও 'লাইট ডায়ো-পষ্টিস' বললে ল্যাণ্ডমার্কের বিপরীত ও বরাবর নিশানার কথাই মেনে নিতে হবে।

সমুদ্রপথের অন্যতম লক্ষণীয় ভাসমান বয়াগুলি। ঘণ্টা-বয়া, শীষ দেয়া বয়ার সমারোহ দেখা যায় কুয়াশামগ্ন ইউরোপীয় সমুদ্রপথে ঐগুলির ধ্বনির 'পরিমাপের ওপর নয় পরিমাণগত গুরুত্বের ওপরেই দিশাহারা নাবিকরা বেশী নির্ভর করে থাকে। সবুজের ওপর সাদা রং করা বয়া এদিক-সেদিক ছড়ানো থাকলে বুঝতে হবে সমুদ্রবক্ষে খুব নিকটেই কোথাও মাইন পাতা আছে।

যুদ্ধ জাহাজের একটি বিশেষ নিয়ম আছে। তা হচ্ছে, অপর দেশের বন্দরে ঢোকবার সময় সেই দেশের জাতীয় সংগীত ব্যাণ্ডে বাজাতে হবে, পরে অবশ্যই তাদের স্বদেশী সঙ্গীতটিও ধ্বনিত হবে। বন্দরে প্রবেশের পূর্বেই, মজুত গোলা-বারুদ বিস্ফোরণ করে নিঃশেষ করে নেয়াই সাধারণ নিয়ম। এটা সৌজন্যও বটে, নিরাপত্তা তো বটেই। শেষ পর্যন্ত gun salute করতে করতে বন্দরে প্রবেশের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। নাবিকদের মধ্যে একটা আকর্ষণীয় প্রথা আছে। সমুদ্র-অধিদেবতা নেপচুন স্মরণে মদের বোতলের পেছনের দিকটা গুঁড়ো গুঁড়ো করে সমুদ্রের জলে ফেলে দেয়া হয়। বিশেষ করে বিষুব-রেখা অতিক্রমণের সময় তো বটেই। এই অতিক্রমণকালে নাবিকরা দস্তুরমত নেপচুন স্তুতি করে। বিশ্ব নাবিকদের বিশ্ব প্রাতৃত্ব অটুট রাখার প্রার্থনাতেই বোধ হয় এই প্রথার সার্থকতা। মার্চেণ্ট ভেসেলের বরপুত্র বণিকরা অবশ্য এই রেখাতিক্রমকালে পাঁচ মিনিট ধরে হুইসল বাজান।

নাবিকদের সংসারে আরেকটি জিনিস মনে রাখবার মত। তা হচ্ছে,—উপস্থিত অবস্থাতেই টেস্ট আপ্যায়ন। নাবিকদের অবসর বিনোদনের জন্য জাহাজের ডেকেই ডার্ট বা তীর ছোঁড়া—জুয়াখেলার বন্দোবস্ত থাকে। জাহাজের সেলুনটি অবশ্য উপভোগ্য স্থান।

নাবিক জীবনের দৈনন্দিন তালিকায় অভিনবত্বগুলি রোমাণ্টিক, সুদূর পিয়াসী যে কোনো মনকে আকর্ষণ করবেই। তা' বলে, নৌবহরের কার্যক্রমে এতটুকু ফাঁক বা ফাঁকির সুযোগ নেই। কর্মসূচী এক-নাগাড়ে চব্বিশ ঘণ্টা। সকাল আটটায় নিয়মিত যে নৌ-পতাকা উত্তোলন করা হয়, তাকে কালারস্ বলা হয়। এর অব্যবহিত পরেই সুসম্পন্ন হয় নৌ-বাহিনীর মার্চ পাস্ট। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিতভাবে যখন নৌ-পতাকাটিকে অবনমিত করা হয়, তখন সেই পতাকারই নাম 'সানসেট'। নৌবহরের মধ্যে কোয়ার্টার-ডেক কথাটি খুবই চালু। অনুমান ইংলণ্ডীয় মহাবীর নেলসন 'কোয়ার্টার ডেক'-এই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

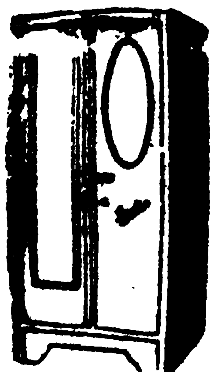
আধুনিক ভারতবর্ষের নৌবহরের কৃতিত্ব ক্রমবর্ধমান। সুদীর্ঘ ২৫০০ হাজার মাইল উপকূল রক্ষার দায়িত্ব ভারতীয় নৌবহরের সযত্ন প্রহরা ভারতবর্ষের নিরাপত্তা অক্ষুন্ন রেখে চলেছে। আমরা কি বিস্মৃত হতে পারি সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত-জাহাজ-উদ্ধারকারী 'অম্বাবতী'র কথা? জার্মাণ স্নাইডার-এর বিরুদ্ধে একদা রণ-জয়ী ভারতীয় সন্দেপ 'কৃষ্ণা'র কথা? জার্মাণ সাবমেরিণ ধ্বংসকারী 'গোদাবরী'র কথা? যুদ্ধ জাহাজ বেঙ্গল-এর বিচিত্র রণ-নৈপুণ্যও কারো অজানা নয়।

মহাসাগর,
বঙ্গোপসাগরএর নীল ঢেউ তাই শত্রু-জাহাজদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

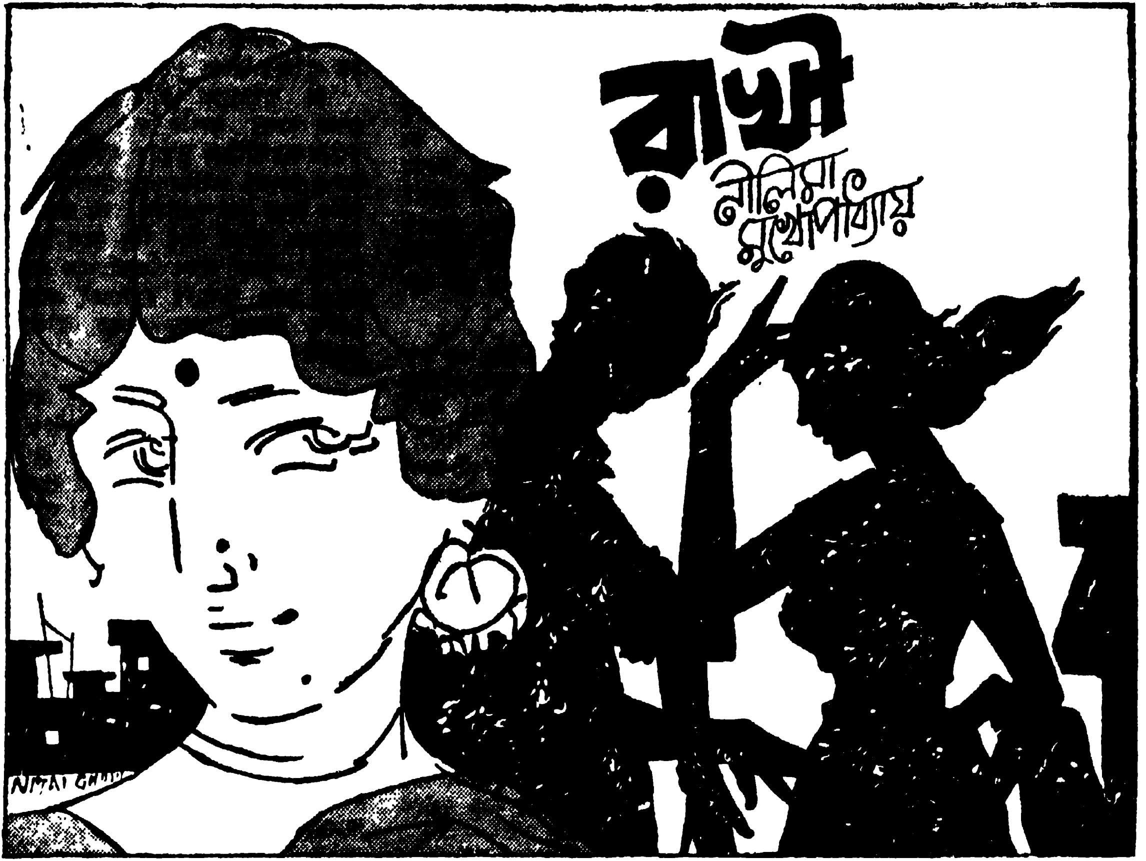
চটপট কাজ?
ম্যার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্কে
পাবেন



প্রতিটি শাখায়
প্রত্যেকের সুযোগ
সুবিধা লক্ষ্য
রাখায় জন্য সুদক্ষ
কর্ম্মচারী আছেন।



নিরাপত্তা ও সৌন্দর্যের জন্য কিনুন
ইণ্ডিয়া ষ্টীল আলমারি
• মজবুত ফিটিংস • ভাল ফিনিশ
• নকল চাবি লাগবে না সেজন্য
গ্যারাণ্টি দিচ্ছি।
ইণ্ডিয়া ষ্টীল ফার্ণিচার
অ্যাণ্ড কোং
১৫, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭
'গ্রেস' সিনেমার পশ্চিমে — ফোন ৩৪৭৫১২



সঞ্জয়,

আজকের রাতটা ঝড়ের। বাইরে প্রকৃতি এখন উত্তাল, উদ্দাম, অশান্ত হয়ে উঠেছে। এক নির্জন, নিস্তব্ধ, বিষণ্ণ ছোট্ট ঘরে বসে বাইরে হাওয়ার মাতামাতি, বৃষ্টির ঝর-ঝরানি শুনছি। মনে হচ্ছে বাইরের ঝড় যেন আমার বুকের মধ্যে তার প্রতিধ্বনি তুলেছে, নইলে আমার এতদিনের সংযম, জেদ, চলে যাচ্ছে কি করে! কেমন করে আবার তোমার নাম ধরে তোমার উদ্দেশে এই চিঠি লিখতে বসতে পারলুম!

জানি না কাল সকালে আলো ফুটলে এ চিঠি ডাকে দিতে পারব কিনা। কিন্তু ঠিক এ মুহূর্তে জেদী, অহঙ্কারী, অভি-মানিনী অপর্ণা হারিয়ে গেছে সঞ্জয়। এখন একলা ঘরে সেই পুরনো অপর্ণা বিনিদ্র-রজনী যাপন করছে, যে একদিন তোমার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ ছিল।

আজ মন উধাও হয়ে চলে গেছে সেই পাঁচ বছর আগের এক ঝড়ের রাতে—ঠিক এমনি অশান্ত আর উদ্দাম। নির্জন ঝড়ের রাত, সকলে ঘুমে অচেতন। তুমি আর আমি চুপি চুপি ছাতে উঠেছিলুম। হাওয়ায় আমার চুল উড়ছিল, আঁচল খসে পড়েছিল। তুমি খোঁপা জড়াতে দিলে না, শাড়ী অসংবৃত হয়ে রইল। বললে, 'তোমার লজ্জা, সঙ্কোচ ঘুচিয়ে দিতেই তো ঝড়ের মুখে এসেছি অপু—এবার অবগুণ্ঠন খোল—উদার বিস্তীর্ণ প্রাকৃতিক পটভূমিকায় তোমায় ভাল করে দেখি। তুমি ত আর তোমার অধীন নও, এখন শুধু আমার—[illegible]'

সঞ্জয়, সেদিন দুটি শিশুর মত যারা আনন্দে, আবেগে সারা ছাতে মাতামাতি করে বেড়িয়েছিল, একবারও কি কল্পনা করেছিল যে, তারা একদিন একেবারে নিঃসম্পর্ক হয়ে যাবে? আশ্চর্য! আমি এখন তোমার কাছে এক অনাত্মীয়া নারী, যার মুখ মনে করলে হয়ত ঘৃণায়, বিতৃষ্ণায় তোমার মন ভরে ওঠে।

এখন আলমারি থেকে তোমার ছবিটা বার করে টেবিলে রেখেছি। তুমি হাসিমুখে চেয়ে রয়েছে আমার দিকে। যেন বলছ, 'কেমন—হেরে গেলে তো অপু?'

সত্যি হেরে গেছি সঞ্জয়। জেদ, আত্ম-সম্মানের বড়াই করা অপর্ণা শোচনীভাবে পরাজিত হয়েছে। একজন অকৃতজ্ঞ, অপদার্থ পুরুষকে ভুলব বলে এই নগণ্য জায়গায় ছোট স্কুলে চাকরী নিয়ে চলে এসেছিলুম। স্ত্রীকে যে সম্মান দিতে জানে না, তাকে জীবন থেকে চিরদিনের মত সরিয়ে দেব এই ছিল সংকল্প। প্রতিহিংসায় পাগল হয়ে কোনও খুঁত রাখিনি, কোর্ট-কাছারি করে বিচ্ছেদ পাকা করেছি। ভেবেছিলুম, সময় শোককে ভুলিয়ে দেয়, আর আমাকে বিস্মৃতি দিতে পারবে না?

কিন্তু ভুল—সব ভুল হয়েছে আমার। দিনে দিনে তুমি আরও বেশী করে সর্বময় হয়ে উঠছ আমার জীবনে। দিনের বেলা কাজে ব্যস্ত থেকে ভুলে থাকি। রাতে যখন নির্জন ঘরে একলা হই তখন তুমি একান্ত কাছে চলে আস। তোমার চলাফেরা, কথার ভঙ্গী সব মনে পড়ে।

সঞ্জয়, তোমাকে আমি যে কত ভাল-বেসেছিলাম তা আমি এই তিন বছরের বিচ্ছেদে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারছি। আমি জানি তুমিও এখনও একলা আছ। ভাল চাকরী ছেড়ে সামান্য চাকরী নিয়ে মাদ্রাজের কাছে অখ্যাত এক গ্রামে পড়ে রয়েছ। মুক্তি পেয়েছ, কিন্তু নতুন বন্ধনে নিজেকে জড়াওনি। কেন এমন হল সঞ্জয়? ঝড়কে আমরা ভালবাসতুম বলেই কি জীবনেও ঝড় বয়ে গেল? সাজান খেলাঘর ধূলিসাৎ হল? নইলে তোমার সঙ্কীর্ণচেতা মা, বৌদির কথা শুনে তুমি আমায় হীন সন্দেহে দিনের পর দিন অপমানিত করলেই বা কেন—আর আমিও কেন বা এতটুকু সহাশক্তি না দেখিয়ে আগুনের মত জ্বলে উঠলুম? আমরা আধুনিক মেয়েরা এখন শিক্ষা-দীক্ষায় সেকালের মেয়েদের চেয়ে অনেক উন্নত হতে পেরেছি, কিন্তু ঠিক সেই পরিমাণে কি করে নিজে সুখী হতে হয়, শান্তি বজায় রাখতে হয়, তা ভুলতে বসেছি—তাই কি নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনছি! শাস্ত্রে বলেছে, মেয়েদের ধরিত্রীর মত সহ্যশীলা হওয়া বাঞ্ছনীয়। রামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন সহ্য করতে হবে বলেই তিনটে শ, ষ, স'এর অস্তিত্ব আছে।

আজ আমার মায়ের কথা মনে পড়ছে। হাসিখুশী ছোট্ট মানুষটি মা। এক একদিন আমার বাবা কেন জানি না কত রাগারাগি করতেন, সামান্য বিষয় নিয়ে কটূক্তি করতেন মাকে। আমি ভয়ে ভয়ে থাকতুম—মা আমায় আদর করে বলতেন, 'অপু তোর বাবার আজ মাথা বিগড়েছে সামনে যাসনি, বকুনি খেয়ে মরবি।' আবার পরে দেখতুম বাবা

হাসছেন, গল্প করছেন মার সঙ্গে—রাগ কখন অনুরাগে পরিণত হয়েছে।

সঞ্জয়, মা স্বর্গে চলে গেছেন বলেই বোধহয় আমার দুঃসাহস চরমে উঠতে পেরেছিল। মা থাকলে আমায় এ ভুল করতে দিতেন না কক্ষনো। আমার ছবির অ্যালবামে গরদের শাড়ী পরা মার ফটোটা জ্বলজ্বল করছে। তার পাশেই আমার ছবি রেখেছি। কোন্‌টা বলত সঞ্জয়? সেই যে পুরীতে তুমি যেটা তুলেছিলে। বিয়ের পর সেই প্রথম আমাদের বাইরে যাওয়া। কি আবেগ-চঞ্চল সেই দিনগুলো। দুজন দুজনের মধ্যে তন্ময় হয়ে ছিলুম। একদিন সারারাত তুমি আমায় ঘুমোতে দিলে না। অন্ধকার রাত্রে শাদা ফেনার মুকুট পরা উঁচু উঁচু সমুদ্রের ঢেউ অবিরাম কূলে আছড়ে পড়ছিল—আমাদের রক্তের মধ্যেও ছিল সাগরের কল্লোল। ভোরে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি, তুমি আদর করে জাগালে, বললে, 'মন্দিরে যাবে না অপু? চল দুজনে প্রণাম করে আসি জগন্নাথদেবকে।'

তাড়াতাড়ি স্নান সেরে আমরা মন্দিরে গেলুম। আমার পরণে ছিল চওড়া লালপাড় গরদের শাড়ী, কপালে মস্ত সিঁদুর টিপ। তুমি হাসলে, ঠাট্টা করলে, 'প্রাতে দেবীর বেশে উদিলে সমুখে এসে' বলে। কিন্তু তোমার মুগ্ধ দৃষ্টি আমার সর্বাঙ্গ ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছিল। সুখে, লজ্জায় আমি ভরে উঠছিলুম। তারপর মন্দির পিছনে রেখে তুমি আমার ছবি তুললে। এখন আমার সিঁথিতে সিঁদুর নেই। কত ভালবাসি, তবু লালপাড় গরদের শাড়ী আর পরা হল না।

রুপোর কারুকার্যকরা সিঁদুর কোটো বাক্সে তুলে রেখেছি। ওটা দিয়ে বৌভাতের দিন মা আমায় আশীর্বাদ করেছিলেন। বলেছিলেন, 'অপু-মা, মেয়েদের সবচেয়ে বড় মূলধন তোমাকে দিলাম। এই ঐশ্বর্য তোমার চিরদিন বজায় থাক এই একমাত্র প্রার্থনা।'

হায় মাগো, তোমার অপদার্থ মেয়ে স্বেচ্ছায় সে সৌভাগ্যচিহ্ন মুছে ফেলেছে। মাঝে মাঝে একা ঘরে কোটোটা বার করে দেখি, সমারোহময় সেই দিনটির কথা স্মরণ হয়। সামনে হোমের আগুন, শালগ্রামশিলা, সাতটি পদ্মের আলপনার ওপর পা ফেলে ফেলে তুমি আর আমি একসঙ্গে অগ্নিতে লাজাঞ্জলি নিক্ষেপ করছি। গম্ভীর, পবিত্র সংস্কৃত মন্ত্রোচ্চারণ করে তুমি আমার কুমারী সিঁথি নিজের হাতে রাঙিয়ে দিলে—মাথায় টেনে দিলে লজ্জা-আবরণ। সেই নতমুখী অলঙ্কারমন্ডিতা বধূটিই কি আজকের এই মিস অপর্ণা রায়। সামান্য একজন স্কুল-মিস্ট্রেস—সাদামাটা শাড়ী পরে রোজ ছাত্রী শাসন করে চাকরী বজায় রাখে।

এখানে আমার অনেক সহকর্মিণী বলে, তোর সব তাতে বাড়াবাড়ি অপর্ণা। রাগ করে ঘর ভাঙলি, এখন আবার যোগিনী সেজে সংযমের পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছিস। রূপ আছে, যৌবন আছে, নতুন করে ঘর গড়ে নে। ত্যাগের ভেক ধরে জীবনটা নষ্ট করবি কেন?'

আমার বুকে তখন কান্নার ঢেউ উত্তাল হয়ে ওঠে। যাকে একদিন সব দিয়েছি, নীড় রচনা করলে তার আসনে কাউকে বদলে বসানো কি অতই সহজ? কুমারীর হৃদয়ে যে পুরুষের প্রথম পদক্ষেপ তাকে ভোলা যায় না, অস্বীকার করা যায় না—নিজেকে বলি দিয়ে বোধহয় এই সত্য উপলব্ধি করলুম।

এখানে সুজিত চক্রবর্তী বলে এক ভদ্রলোক আছেন। আমাদের স্কুল কমিটির সদস্য। ভদ্রলোকের সম্বন্ধে নালিশ করার কিছু নেই, সভ্য, মার্জিতরুচির পুরুষ। কিন্তু আমার উপকার করতে একটু বেশী তৎপর। ও'র কৃপাতেই দু'বছরে আমার মাইনে বেড়েছে। অন্য দিদিমণিরা আমায় ঠাট্টা করে, ঈর্ষা করে। আমিও জানি মুখে কোনদিন কিছু না বললেও আমায় দেখলে সুজিতবাবুর চোখে আলো জ্বলে ওঠে। আমি মেয়ে, পুরুষের দৃষ্টির ভাষা বুঝতে আমার দেরী হবার কথা নয়। কিন্তু তাই বোধহয় ও'র জন্যই আমার এখান থেকে পালাতে হবে। তোমার ওপর রাগে, ঘৃণায় অভিমানে আমি পুড়ে যাচ্ছি সঞ্জয়। কিন্তু সে দহন শান্ত করার প্রলেপ আর কারোর হাতে নেই। তোমার আসনে আর কাউকে বসাতে পারব না আমি।

সুজিতবাবু দেখা হলেই বলেন, 'মিস রায়, আপনি নিজেকে বড় অযত্ন করেন। আত্মনিগ্রহ কি আপনার বিলাস?'

কেমন করে বলব; ভালবাসাই তো মেয়েদের সজ্জা। তখন মনের আলোয় সর্বাঙ্গ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—তাই থেকেই যদি বঞ্চিত হলুম তবে কি লাভ মেকী সাজে নিজেকে সাজিয়ে? আর ঐ 'মিস রায়' সম্বোধনটা! উঃ, আমার কানে যেন আগুনের স্পর্শ দিয়ে যায়। আমি একদিন মিসেস ছিলুম, সঞ্জয় চৌধুরীর স্ত্রী। আদালত থেকে একটা পরোয়ানা পাওয়া গেছে বলেই কি আমার কৌমার্য আবার ফিরে এসেছে? ঐ 'মিস' সম্বোধন কি দারুণ প্রহসনের। দেহে মনে কবেই দেউলে হয়ে গেছি—কুমারীর শুচিতা কোথায় পাব আমি?

মাঝে মাঝে মনে হয়, যাদের ওপর রাগে অন্ধ হয়ে নিজেকে সর্বদিক দিয়ে বঞ্চিত করেছি, আমার এই পরিবর্তনে তাদের কিছুই এসে যায়নি। তোমার সেই মুখে মধু আর অন্তরে গরলভরা বৌদিদিটি সুখে শান্তিতে ঘরসংসার করছেন। তোমার মায়েরও কোন পরিবর্তন হয়নি। আর যাকে কেন্দ্র করে তাঁরা ষড়যন্ত্র পাকিয়েছিলেন আমার দাদার বন্ধু সেই দিব্যেন্দু বোস কবে ভাল চাকরী নিয়ে বিলেত চলে গেছেন। আমার বি-এ পরীক্ষার পড়ার কিছুদিন সাহায্য করতে এসে তিনি যে এতবড় সর্বনাশের বীজ রোপণ করবেন তা কে ভেবেছিল। কারোরই কিছু এসে গেল না, শুধু আমরা দুজনেই কক্ষচ্যুত উল্কার মত দু'দিকে ছিটকে পড়লুম।

যে রাত্রিগুলো হাসিতে, কৌতুকে, প্রণয়ে, আদরে রমণীয় ছিল তারাই কি কুৎসিত হয়ে উঠেছিল শেষে। অকারণ মিথ্যা সন্দেহ তোমার ভালবাসাভরা সুন্দর মুখকে কুটিল হিংস্র করে তুলেছিল। আর অপমানে অভিমানে আমিও কণ্ঠে বিষ ঢেলে দিয়েছিলুম, শেষে চলেও গিয়েছিলুম বাড়ী ছেড়ে। সঞ্জয়, আমাদের দু'জনেরই সামান্য ধৈর্যের অভাবে সরস সুন্দর জীবনটা শুকনো জীর্ণ হয়ে গেল।

স্কুলে ছোট ছোট মেয়েদের নিয়ে যখন থাকি তখন বড় ভাল লাগে। সুন্দর কচি কচি মুখ—ওরা আমায় খুব ভালবাসে। ছোটখাট খেলনা পুতুল তৈরী করতে শেখাই ওদের। ওরা খুশীতে উপচে পড়ে। তুমিও বেশ সুন্দর ছোট ছোট জিনিস তৈরী করতে পারতে সঞ্জয়। একদিন একটা সুন্দর ছোট নৌকো তৈরী করেছিলে মনে আছে? সারা সকাল কেটে গেল, সেদিন অফিস যেতে কত বেলা হল। আমি রাগ করে বললুম; 'এ তোমার কি ছেলেমানুষী বল ত?' দুষ্টু হাসি হাসলে তুমি, বললে, 'ছেলেমানুষী নয় অপু। একটি অনাগত ছেলেমানুষের মনোরঞ্জনের জন্য তৈরী হচ্ছে—যে একদিন তোমায় মা বলবে আর আমাকে বাবা।'

আমি লজ্জায় পালিয়ে বাঁচলুম, কিন্তু বুকে সুখের তরঙ্গ তোলপাড় করতে লাগল। মা, মা—এক মিষ্টি প্রাণজুড়োন শব্দ! তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে স্নিগ্ধ সুরভিত স্বপ্নের মত একটি কোমল শিশু-মুখ, যার হাসিতে জগত আলো হয়ে যায়।

আমার ছোট ছোট ছাত্রীরা আমায় দিদি বলে ডাকে। ও ডাকে মন ভরে না সঞ্জয়। মেয়েদের সমস্ত অন্তরমন যে 'মা' ডাক শোনার জন্য তৃষিত হয়ে থাকে। কোন শৈশবের পুতুলখেলা থেকে তার প্রস্তুতি চলে, শিশু মহারাজের সিংহাসন পাতা হয়ে যায় জীবনে। আমি শুধু ছোট ছোট বাচ্চাদের সুন্দর ছবি জমিয়ে অপূর্ণ মাতৃ-হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা মেটাবার বৃথা চেষ্টা করি।

সঞ্জয়, যে শক্তিমান ভাগ্যদেবতার হাতে আমরা অক্ষম ও অসহায়, তিনিই বোধহয় পরম হতাশার মধ্যেও একটু আশার আলো জ্বালিয়ে বেদনাজর্জরিত মানুষকে স্তোক দেবার চেষ্টা করেন। এই ঝড়বাদলের রাতে সেই আলোয় আমার কল্পনা তোমার ও আমার নিঃসঙ্গ জীবনের মধ্যে মিল খুঁজতে চাইছে। দুর্যোগময় রাত্রির শেষে আলো-ঝরানো প্রভাত আসে। সংশয়ের কাঁটা মাড়িয়ে আমরা ক্ষতবিক্ষত হয়েছি, কিন্তু সত্য ও আলোর সন্ধান কি আসবে না? অনায়াসে পেয়েছিলুম তোমাকে, তাই বোধহয় হারাতে দেরী হয়নি। এই তিন বছর প্রতিদিনের প্রায়শ্চিত্তে সেই ভুলের পাপ কি ধুয়ে যায়নি? অন্ধকারের অধ্যায় কেমন করে শেষ করব?

তোমার অপর্ণা

পাঠকের বৈঠক

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

অশোকের কাল

উপকথার মধ্য থেকে তথ্যাংশটুকু নিষ্কাশিত করা এবং দুয়ের মোহকে অতিক্রম করা সহজসাধ্য নয়। শিলালিপি এবং পর্বতগাত্রে উৎকীর্ণ যে সামান্য কিছু বাণী মহারাজা অশোক ছড়িয়ে রেখেছেন তার মধ্য থেকে একটি মানুষের গরিমাময় আকৃতি প্রকাশিত হয়ে পড়ে যাঁর ধারণা ছিল যে তিনি ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র। অনেক প্রশ্ন স্বভাবত থেকে যায়। যথা, এইকালে কি তিনি পরিণত বয়সে পৌঁছেছিলেন? তাঁর মানসিকতার মধ্যে কি সমকালের চিন্তাধারার ছাপ আছে? তিনি কি ক্রুদ্ধ তরুণ এবং সহসা অন্ধকার থেকে আলোকের পারে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন? সকল প্রকার পার্থিব বন্ধন থেকে মুক্তি-লাভের বাসনা এবং প্রজাপুঞ্জকে শাসন করে রাজধর্ম পালন করার চিন্তা নিয়ে কখনো কি তাঁর মনে দ্বন্দ্ব জেগেছিল? কলিঙ্গের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম শেষে অসংখ্য মৃত মানুষের মুখ দেখে কি তাঁর মন বিষাদে ভরে গিয়েছিল না, সেই বিষাদের মূলে ছিল ধর্মান্তর গ্রহণ? কিংবা ন্যূনতম শক্তিপ্রয়োগে বিভিন্ন শ্রেণী ও জাতি নিয়ে গঠিত সাম্রাজ্যকে একসূত্রে বাঁধার এ একটা কৌশলমাত্র? শিলালিপির গায়ে উৎকীর্ণ বাণী কি জনগণের মর্মে পৌঁছেছিল এবং তার ফলে প্রকৃতই তাদের কোনো রূপান্তর ঘটেছিল? কিংবা জনগণ সন্ত্রস্ত হয়ে দান-শীলতা ও সহনশীলতার নীতি মেনে নিয়েছিল?

মৌর্য যুগের ইতিহাস অনুশীলন করেছেন কুমারী রমিলা থাপার তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত "ASOKA & THE DECLINE OF THE MAURYAS" গ্রন্থে। অশোকের জীবন এবং চরিত্র বিষয়ে তিনি বিশদভাবে গবেষণা করে এইসব প্রশ্নেরই জবাব দেওয়ার একটা চেষ্টা করেছেন। গ্রন্থ শেষ করার পর যদি মনে হয় যে তাঁর সকল শ্রম ব্যর্থ হয়েছে এবং যেসব সম্ভাব্য উত্তর তিনি উদ্ভাবন করেছেন তা কষ্টকল্পিত তাহলে লেখিকার প্রতি অবিচার করা হবে। কারণ গ্রন্থ শেষ করার পরও যদি অশোক চরিত্র ধোঁয়ায় অস্পষ্ট থেকে যায়, তাহলে সেই ত্রুটি লেখিকার নয়, সে দায়িত্ব ইতিহাসের। তথ্যপ্রমানাদি এতই সংক্ষিপ্ত যে তদ্দ্বারা কোনো একটি স্থিরপ্রত্যয়ে পৌঁছানো কঠিন। এই ক্লেশকর কর্ম কুমারী থাপার অবশ্য উত্তমরূপেই পালন করেছেন। প্রতিটি ব্যাপারে উপকথার ভেতর থেকে তথ্যকে ছেঁকে নেওয়া হয়ত সম্ভব হয়নি, তথাপি তিনি অশোককে নিঃসঙ্গ নায়কের গরিমায় দেখে ক্ষান্ত হননি। তিনি অশোককে তাঁর সমকালের পরি-প্রেক্ষিতে দেখার চেষ্টা করেছেন। যদিও লেখিকার অনেক জবাব অনুমানভিত্তিক তথাপি মনে হয় তাঁর অনুমান কোনো কোনো ক্ষেত্রে সঠিক হয়ে গেছে। যেমন তিনি বলেছেন শিলালিপিতে উৎকীর্ণ অনেক ধম্মপদ ভগবান তথাগতের মুখ-নিঃসৃত ধম্মপদ নয়, এইগুলি রাজকীয় অনুশাসন। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষকে একসূত্রে বেঁধে রাখার এ এক প্রয়াস। অনিত্য সংসার, সব জিনিসের ক্ষয় হয়, লয় হয়। অহঙ্কার ও মাৎসর্য নামক দুটি প্রবৃত্তি কামনা ও ঘৃণার অগ্নিকুণ্ডে ঘৃতাহুতির মত।

বৌদ্ধ অনুশাসন অনেক সহজ এবং সরল,—দরিদ্রকে দান কর, সাধু ও বয়-জ্যেষ্ঠদের শ্রদ্ধা করবে, অন্য ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষের প্রতি সহিষ্ণু হবে। জীবনের পবিত্রতা অক্ষুণ্ন রাখবে ইত্যাদি। এইসব উপদেশবাণী এমন সহজ ভাষায় রচিত যে গভীর অরণ্যের মানুষও তা সহজে বুঝতে পারবে। এইসব নীতিবাক্য সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের কাছে সমভাবে গ্রহণযোগ্য।

অশোক একটি নতুন সমাজব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক সূত্র দ্বারা সমগ্র সাম্রাজ্যকে বাঁধার চেষ্টা করেছিলেন। বলপ্রয়োগে সেই বিরাট অঞ্চলকে বেঁধে রাখা সহজসাধ্য নয়, রাজকোষের ওপরও প্রবল চাপ পড়ে। অবশ্য একথা সত্য নয় যে এই অনু-শাসনের ফলে জনগণের অন্তরে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে গেছে। অশোককেও বলপ্রয়োগ করত হয়নি, কারণ, কলিঙ্গ যুদ্ধের পর তাঁর নায়কত্বকে তেমন কোনো প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হতে হয়নি। গুরুতর অপরাধের জন্য শেষজীবন পর্যন্ত অশোক প্রাণদণ্ড দান করেছেন। কোনো রাষ্ট্রই আইন ও শৃঙ্খলার ব্যবস্থা না করে অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে না, এবং আইন ও শৃঙ্খলা অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে তার পিছনে চাই প্রচণ্ড শক্তি। অশোক বলেছেন, যে উপায়ে "ধর্ম"কে অগ্রসর করা যায়, তার মধ্যে অনুনয়ের কোনো মূল্য নেই, আইন রচনা করেও লাভ নেই। এই চিন্তার পিছনে কোনো বিভ্রান্তি নেই। এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অশোক যে নব্য-নীতি প্রচার করছিলেন তাকে তিনি গ্রহণযোগ্য ব্যবহারিক নীতি বলে মনে করেছিলেন।

জনগণের হৃদয়ের কি পরিমাণে পরি-বর্তন ঘটেছে সে বিষয়ে সন্দেহ থাকতে পারে, কিন্তু সম্রাট অশোকের যে হৃদয়ের রূপান্তর ঘটেছিল তার সত্যতা সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ, অনুশাসনের নম্র উক্তির পিছনে ছিল অশোকের অনুষ্ঠিত অনেক সৎকর্ম। যে অনুশাসনে তিনি নবনীতির জয়গান করেছেন তারই মধ্যে আবার জনকল্যাণে কি করা হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ আছে,—

> "On the roads I have had banyan trees planted which will give shadow to beasts and men, and I have had wells dug and rest houses built at every eight kos. I have had many watering places made everywhere for the use of beast and men".

এই উক্তি কোনো শাসকের দম্ভোক্তি নয়, বিজয়ের গর্বে গর্বিত অনেক শাসক অনেক 'লম্বা চওড়া' উক্তি করে থাকেন তার মধ্যে অহমিকা মিশ্রিত থাকে। অশোকের বাণীর মধ্যে আছে জনকল্যাণে বিশ্বাসী একজন হিতৈষী মানুষের মনের পরিচয়। ধাউলীর অনুশাসনে তাঁর মনের পরিচয় পাওয়া যায়— "All men are my children".

পুরাণ, উপকথা, রূপকথার জগতের বাইরে এই সর্বপ্রথম একজন সম্রাট তাঁর সমগ্র প্রজাপুঞ্জকে এক বিরাট একান্নবর্তী পরিবারভুক্ত বলে গ্রহণ করতে পেরেছেন। একথা বিশ্বাস করা যায় যে, তাঁর কণ্ঠ-নিঃসৃত কথামৃতের চাইতে তাঁর অনুষ্ঠিত সৎকর্মই বিশাল সাম্রাজ্যকে একটা নিবিড় বন্ধনে শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে বেঁধে রেখেছিল। জনগণের মনে অশোকের অনু-শাসন যদি কোনো পরিবর্তন আনত তাহলে তাঁর মৃত্যুর অল্পকাল পরেই সাম্রাজ্য তাসের মিনারের মত ভেঙে পড়ত না। ভ্রাতৃঘাতী অসংখ্য সংঘর্ষ দেশকে যেভাবে ছিন্নভিন্ন করেছিল যার ফলে দেশ দেশ অনেক শতাব্দী ধরে দুর্বল মুমূর্ষু প্রায় হয়ে পড়েছিল তা হয়ত হত না।

কুমারী থাপারের গ্রন্থের মুখ্য মূল্য এই যে মৌর্য যুগের পরিবর্তনশীল আব-হাওয়ার পিছনে অশোকের অনুশাসন কিভাবে সহায়তা করেছে তার একটা তুলনামূলক আলোচনা করেছেন তিনি যুক্তি এবং তথ্যের সমর্থনে। মৌর্যদের অনেক আগে থেকেই পালী [illegible]

প্রচলন হয়েছিল, কিন্তু অশোক ও তাঁর পিতৃ-পিতামহের কালে প্রসার ঘটে। অশোক আবার সকলের চাইতে ভাগ্যবান, কারণ চন্দ্রগুপ্তের অনেকখানি সময় নষ্ট হয়েছে যুদ্ধবিগ্রহে। এবং বিন্দুসারকে দক্ষিণাঞ্চলে তাঁর শক্তি প্রসারিত করতে হয়েছে।

অশোকের কালের একমাত্র সামরিক অভিযান হল কলিঙ্গ যুদ্ধ। বাকী সব সময়টুকু তিনি তাঁর সাম্রাজ্যকে সুগঠিত করার সুযোগ পেয়েছেন। তাঁর রাজত্বকালে অনেক পল্লীপত্তনী গড়ে উঠেছিল, বিশেষ করে দক্ষিণ প্রান্তে। লৌহনির্মিত যন্ত্রপাতির অধিকতর ব্যবহারের ফলে তা সম্ভব হয়েছিল। অধ্যাপক কোশাম্বী তাঁর ভারতীয় ইতিহাস গ্রন্থটির ভূমিকায় লিখেছিলেন অশোক তাঁর বহুবিধ অনুশাসনের একটিতে অরণ্যভূমি অগ্নি-সংযোগে নষ্ট করার বিরুদ্ধে বলেছেন।

"his edict against the burning of forests terminated the time-honoured Aryan method of land clearing, as completely as Asoke's ideal of the king's obligations finished the Yajurvedic king who concentrated upon animal sacrifices"

নতুন পল্লীর দ্রুত উন্নয়ন এবং সেই সঙ্গে পল্লীবাসীদেরও বৈষয়িক উন্নতি এবং নদীভিত্তিক যানবাহন ব্যবস্থার উন্নতির ফলেই অশোকের অর্থনীতি সফল্য লাভ করেছিল।

অশোকের অনুশাসন কালক্রমে ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে মিশিয়ে গেছে। একালে আমরা ধর্মের নামে প্রচণ্ড রক্তক্ষয় দেখতে বাধ্য হয়েছি। অশোকের নীতি এবং অশোকের কাল সম্পর্কে চর্চা করলে মনের গভীরে একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়।

—অভয়ংকর

ASOKA & THE DECLINE OF MAURYAS By ROMILA THAPAR. Published by Oxford University Press Price Rupees Twenty Eight only.

ভারতীয় সাহিত্য

তামিল নাট্যকারের জন্ম-শতবর্ষ ॥

তামিল নাট্য সাহিত্যে শংকরদাস স্বামীগল একটি খুবই উল্লেখযোগ্য নাম। বর্তমান বৎসরটি তাঁর জন্মশতবার্ষিকী বৎসর। সম্প্রতি তাঁর জন্ম শতবার্ষিকী উৎসব মাদ্রাজে উদ্‌যাপিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মাদ্রাজ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীএম অনন্তনারায়ণম্। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন মাদুরাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীমীনাক্ষীসুন্দরম্। ডঃ এম বরদারাজন, শ্রীমি পা সোমসুন্দরম, এম পি শিভগনামম্, ডঃ ভি রাঘবন, শ্রীএম পি পি থুরান প্রখ্যাত তামিল লেখকগণ অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন।

মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসি এন আন্নাদুরাই এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে 'তামিল রঙ্গমঞ্চ' নামক একটি গ্রন্থের উদ্বোধন করেন। এই গ্রন্থটি রচনা করেছেন প্রখ্যাত সমালোচক শ্রীটি কে শানমুগম। শ্রীআন্নাদুরাই তাঁর ভাষণে বলেন—"চলচ্চিত্রের প্রযোজকদের উচিৎ তাঁদের মোট খরচের পরিমাণ থেকে অন্ততঃ পাঁচ হাজার টাকা রঙ্গমঞ্চের উন্নতির জন্য ব্যয় করা। কেন না, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে দেশের যথার্থ সংস্কৃতি।" এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয় এবং নাট্যকারের "সাধী অনসুয়া' নাটকটির একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

আজকের গুজরাটি ছোটগল্প ॥

গুজরাটি কবিতার ক্ষেত্রটি ইদানিং যেমন সমৃদ্ধ হয়েছে, ছোটগল্পের ক্ষেত্রে ঠিক তেমনটি হয়নি একথা সত্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও আজকের গুজরাটি গল্পের ইতিহাস পরীক্ষা-নিরীক্ষা হীন নয়। বরং বলা যায়, আজকের গুজরাটি ছোটগল্প তার নতুন ক্ষেত্রের সন্ধান পেয়েছে। তরুণ লেখকরা এই পথে অবতীর্ণ হয়েই পুরোনা ধারার বিরুদ্ধে করেছেন বিদ্রোহ ঘোষণা।

'ধূমকেতু' যুগে গুজরাটি গল্পের ক্ষেত্রে যে দুই দিকপালের আবির্ভাব ঘটেছিল, তরুণ লেখকরা তাঁদের রচনা রীতি অস্বীকার করতে আরম্ভ করেছেন। ফলে ত্রিশের দশকের শ্রীরামনারায়ণ পাঠক ও শ্রীকে এম মুন্সী আধুনিকদের মধ্যে আর তেমন সাড়া জাগাতে পারছে না। যাইহোক, এখনকার গুজরাটি সাহিত্যে যাঁরা প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছে, তাঁদের মধ্যে প্রথমেই তরুণ গল্পকার শ্রীঘনশ্যাম দেশাইয়ের নাম করতে হয়। তাঁর গল্প প্রভাব বিস্তার করেছে প্রধানতঃ বিষয়ের দিক থেকে। একটি গল্পে এক বৃদ্ধা কিভাবে এক বৃদ্ধের সঙ্গে প্রণয়াবদ্ধা হলেন, তার এক নিপুণ চিত্র অঙ্কন করেছেন। শ্রীপ্রবোধ পারিখ প্রধানতঃ অবচেতন মনের ঘটনাবলীকেই ফুটিয়ে তোলায় পক্ষপাতী। এইজন্য তাঁর গল্পে সব সময় একটা অজানা রহস্য লক্ষ্য করা যায়। অন্যান্য তরুণ লেখকের মধ্যে মহম্মদ মানকড়, সরোজ পাঠক ও জ্যোতিশ জানির নাম উল্লেখ্য। শ্রীচন্দ্রকান্ত বক্সীর রচনায় সমকালীন জীবনের আশা-নিরাশার কাহিনী প্রকাশিত। তিনি সমকালীন জীবনকে তাঁর গল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন। শ্রীমধু রাই তথাকথিত গল্প রচনা করতে চান না। তাঁর রচিত গল্পরীতি গুজরাটি সাহিত্যে 'অ-গল্প' নামে স্বীকৃতি লাভ করেছে। তাঁর রচিত একটি গল্প 'বংশী নামনি এক ছোকরি'তে এক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করা হয়েছে।

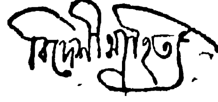
ডাকঘরের পিওন এখন প্রতিষ্ঠিত কবি ॥

কিছুদিন আগেও শ্রীনারায়ণ সার্ভে ছিলেন একজন সাধারণ ডাকঘরের পিওন। লেখা-পড়াও তেমন বিশেষ কিছু জানতেন না। কিন্তু নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শিখে তিনি একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছেন। কেন তিনি লেখাপড়া শিখতে গেলেন—তার উত্তরে তিনি জানিয়েছেন চাকরিকে তিনি অসম্ভব ভালবাসেন। কারণ চিঠি বইতে গিয়েই লেখা-পড়া শেখার বাসনা তাঁর মনে জেগে ওঠে। এখন তিনি মারাঠি কবিতার ক্ষেত্রে একটি পরিচিত নাম। সম্প্রতি তাঁর একটি কবিতাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটির নাম 'মুক্ত বিদ্যাপীঠ'। প্রকাশ করেছেন বোম্বের 'পপুলার প্রকাশণ'।

অনেকে বলেন, গ্রন্থটি হচ্ছে একজন সাধারণ মানুষের দুঃখ-বেদনার কাহিনী। এতে তথাকথিত বুদ্ধি-বৃত্তির অভিব্যক্তি নেই। পরিবর্তে আছে দুঃখ জর্জর একজন সাধারণ মানুষ দুঃখকে জয় করে কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, তার কাহিনী। আঙ্গিক বা শব্দ নির্বাচনে কবিতাগুলি তেমন অভিনবত্ব সৃষ্টি করতে না পারলেও, এর অবদান অস্বীকার করা যায় না।

উর্দু লেখিকার জরিমানা ॥

প্রখ্যাত উর্দু লেখিকা শ্রীমতী ইসমৎ চুগতাই আদালতের কাছে অভিযুক্ত প্রমাণিত হওয়ায় দু হাজার টাকা জরিমানা দিয়েছেন। এই অপরাধের কারণ তাঁর রচিত বোম্বাইয়ের 'ধর্মযুগ' পত্রিকার প্রজাতান্ত্রিক দিবসের বিশেষ ক্রোড়পত্রে প্রকাশিত একটি গল্প। গল্পটির নাম 'সাজা'। অভিযোগকারী শ্রীডি এল মোদী আদালতে অভিযোগ করে বলেন যে, এই গল্পে এমন কতকগুলি ঘটনা আছে যা অন্ধ্র সরকারের ব্যর্থতা প্রমাণ করে। এই গল্পটি একজন ভুয়া সার্টিফিকেটধারী ডাক্তারের সঙ্গে একজন ষোড়শী গুজরাটি কুমারীর অবৈধ প্রণয় কাহিনী নিয়ে রচিত। এই ডাক্তার কিভাবে একজন সরকারী কর্মচারীর (হায়দরাবাদের একজন প্রখ্যাত সরকারী কর্মচারীর নাম এখানে ব্যবহার করা হয়েছে) সাহায্যে সব বাধা থেকে মুক্ত হলেন, গল্পে তাই বর্ণিত হয়েছে। অভিযোগকারীর মতে এই রকম গল্প সরকারী ব্যবস্থার একটা মিথ্যা দিক তুলে ধরেছে। সাধারণের মধ্যে এই গল্প প্রচারিত হলে তারা বিভ্রান্তিতে পড়বে।



জার্মান স্টেট অপেরায় ব্রেখট উৎসব ॥

অক্টোবরে, যে সময়ে বিখ্যাত বার্লিন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, জার্মান স্টেট অপেরায় মঞ্চস্থ হয়েছিল হানেল এর নতুন অপেরা 'এসথার'। নাৎসী বন্দী শিবিরে দুটি তরুণ-তরুণীর প্রেম ও তার অস্বাভাবিক পরিণতি এই অপেরার উপজীব্য। তারপর নভেম্বরে মঞ্চস্থ হয়েছিল সম্পূর্ণ একটি অন্য ধরনের সংগীতপ্রধান অপেরা—পাউল ডেসাই-এর 'পুনটিলা'। অপেরাটি ব্রেখটের সুপরিচিত নাটক 'হের পুনটিলা এ্যান্ড হিজ ম্যান মাটি' অবলম্বনে রচিত। সমসাময়িক কালের সঙ্গীতনাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রে এই অপেরার বিশিষ্ট স্থান। আনন্দের সুরে বাঁধা এই অপেরা দেখে মনে হয় জগতের পরিবর্তন সাধনের কাজটিও চিত্তাকর্ষক হতে পারে।

সঙ্গীতনাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয় জার্মান স্টেট অপেরায়। সংগীতের জগতে এটি একটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা। সঙ্গীত রচয়িতা ডেসাউ-এর এটি দ্বিতীয় রচনা। এদিক থেকেও ঘটনাটির গুরুত্ব আছে। ডেসাউ-এর প্রথম রচনার নাম ছিল 'লুকুলাসের বিচার'। 'পুনটিলা' অপেরার মূল চরিত্রে রয়েছেন একজন ধনী ব্যক্তি, হের পুনটিলা। তাঁকে মানুষ বলে চেনা যায় একমাত্র যখন তিনি মত্ত অবস্থায় থাকেন। মত্ততা কেটে গেলেই জমিদারসুলভ শ্রেণীচেতনার আড়ালে আত্মগোপন করেন। অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে আছে তাঁর ভৃত্যরা, বিশেষ করে তাঁর মোটর গাড়ীর চালক মাটি। নাটকে দেখা যাবে, অনেক রকমের ঘটনার পরে মাটি তার প্রভুকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে। প্রথম রজনীর এই অভিনয় দিয়েই সুরু। তারপর 'ব্রেখট ও সঙ্গীতনাট্য' এবং আরো নটি নাটক মঞ্চস্থ হয়। মঞ্চসফল ব্রেখটের নাটকগুলি হল, 'মাহাগোনি নগরের উত্থান ও পতন', 'লুকুলাসের বিচার', 'পেটিবুর্জোয়াদের সাতটি মারাত্মক পাপ' ইত্যাদি। ১৯৬৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ব্রেখটের ৭০তম জন্মদিবসের আয়োজন হচ্ছে।

আলোড়নকারী উপন্যাস ॥

রোমান্টিক থ্রিলারস লেখক হিসেবে ম্যারি স্টুয়ার্ট সম্ভবত ইংলন্ডের সেরা লেখক। শুধু ইংলন্ডই নয়, খাস মার্কিন মুলুকেও তাঁর অনুরাগীর সংখ্যা প্রচুর। গত কয়েক বছর ধরেই তিনি 'বেস্ট সেলারের' মর্যাদা লাভ করছেন। তাঁর কোন বই বেরুলে হট-কেকের মতো তা বিক্রি হয়ে যায় মুহূর্তের মধ্যে। সম্প্রতি এই মাইনর ঔপন্যাসিকের 'দি গ্যাব্রিয়েল হাউণ্ডস' নামে একটি উপন্যাস বেরিয়েছে। সাহিত্য হিসেবে এটি উঁচুস্তরের না হলেও এক শ্রেণীর পাঠকমহলে কিন্তু আলোড়ন তুলতে সমর্থ হয়েছে।

পরলোকে প্রবীন নাট্যকার ॥

নাট্যকার হিসেবে একসময় দারুণ জনপ্রিয় ছিলেন জর্জ মিডলটন। ব্রডওয়ে থিয়েটারে তাঁর নাটকের অভিনয় দেখবার জন্য যেরকম লোকের ভিড় হত তা ভাবলেও আজ বেশ অবাক লাগে। এ পর্যন্ত তিনি ২৯টি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। পাল উইথ এ পাস্ট, অ্যাদম এবং ঈভ হল তাঁর দুটি জনপ্রিয় নাটক।

মহান সাহিত্যিকের ৮০তম জন্মোৎসব ॥

জার্মানির অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হলেন আর্নল্ড ৎসাইগ। গত ১০ নভেম্বর তিনি আশি বছর বয়সে পদার্পণ করেন। মানবতাবাদী এই মহান সাহিত্যিকের অশীতিতম জন্মোৎসব পূর্ব জার্মানিতে বেশ সাড়ম্বরে প্রতিপালিত হয়।

আর্নোল্ড ৎসাইগের প্রধান রচনা হল ছয় খন্ডের একটি মহৎ উপন্যাস-মালা 'শ্বেতকায়দের মহাযুদ্ধ'। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে এই উপন্যাসমালা রচিত।

ভাষা ও আঙ্গিকের দিক দিয়ে আর্নোল্ড ৎসাইগ নিঃসন্দেহে স্বদেশের সেরা সাহিত্যিক। উপন্যাসে ও ছোটগল্পে তিনি যে জগৎ ও যে-সব চরিত্র সৃষ্টি করেন, তার মধ্যে পাওয়া যায় সাহিত্যিকের জীবন স্পন্দন। পাঠক এই জীবনের যন্ত্রণার ও ভালোবাসার শরিক হয়ে পড়েন খুব সহজেই।

আর্নোল্ড ৎসাইগের 'সার্জেন্ট গ্রিশা সম্পর্কিত বিবাদ' উপন্যাসটি প্রথম বেরোয় ১৯২৮ সাল নাগাদ। বইটি প্রকাশের কিছুদিনের মধ্যেই দারুণ আলোড়ন তুলেছিল সাহিত্যিক মহলে। স্বদেশের গন্ডি পেরিয়ে এই গ্রন্থের নাম ছড়িয়ে পড়েছিল বহুদূর দেশেও। স্বাভাবিকভাবেই নানান ভাষায় অনুদিত হতে লাগল বইটি। মোট সতেরোটি ভাষায় এই উপন্যাসখানা অনুদিত হয়। বলাবাহুল্য, এই গ্রন্থটি পরবর্তীকালে হয়ে ওঠে ছয় খন্ডে সমাপ্ত এক মহৎ উপন্যাসমালার সূত্রপাত।

আর্নোল্ড ৎসাইগ সম্পর্কে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল তিনি একসময় দেশত্যাগ করতে বাধ্য হন। বারো বছর ধরে তাঁর বই জার্মানিতে ছিল বে-আইনী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে তিনি প্যালেস্টাইনের নির্বাসন থেকে ফিরে এলেন জার্মানিতে। বর্তমানে তিনি গণতান্ত্রিক জার্মানিতেই বসবাস করছেন।

প্রচুর সম্মানে ও পদকে বিভূষিত এই সাহিত্যিক জার্মান শিল্প আকাদমিরও সভাপতি।

স্বর্গত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত

॥ বঙ্গীয় শব্দকোষ ॥

সংশোধন সংযোজনসহ দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশ আসন্ন। প্রথম খন্ড (অ—ন) ও দ্বিতীয় খন্ড (প—হ) একত্র পঞ্চাশ টাকা। ডাকব্যয় স্বতন্ত্র।

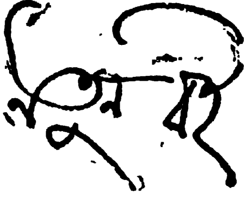
কাপড়ে বাঁধাই ক্রাউন কোয়ার্টো প্রায় ২৫০০ পৃষ্ঠার সুমুদ্রিত বাঙলা ভাষার সর্ববৃহৎ ও সর্বশ্রেষ্ঠ অভিধান।

৩১ জানুয়ারী, ১৯৬৮ পর্যন্ত রেজিস্ট্রিভুক্ত অর্ডারে কমিশন পাওয়া যাইবে।

সাহিত্য অকাদেমী

ব্লক ৫বি, রবীন্দ্র স্টেডিয়াম, কলিকাতা-২৯

ফোন ঃ ৪৬-১৩৯৯



বিশ্ব সাহিত্যের আলোয়

নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত ছত্রিশজন বিশ্বখ্যাত সাহিত্যিকের উপন্যাস ও নাটকের সংক্ষেপিত সারাংশ "বিশ্ব-সাহিত্যের রূপরেখার" প্রথম পর্বে পরিবেশন করেছিলেন নির্মলেন্দু রায়চৌধুরী, এবং তাঁর সেই গ্রন্থটি পাঠক ও সমালোচকদের অকুণ্ঠ প্রশংসালাভ করেছে। সম্প্রতি সেই গ্রন্থটির ২য় পর্ব প্রকাশিত হয়েছে। এই পর্বে প্রাচীন বা ধ্রুপদী যুগের ও আধুনিককালের আটত্রিশ জন বিশ্ববরেণ্য লেখকের শ্রেষ্ঠ রচনা সংক্ষেপিত রূপে পরিবেশিত হয়েছে। হোমরের ইলিয়াড, এসকাইলাসের 'দি হাউস অব অ্যাট্রিয়াস', ইউরিপিডাসের 'মিডিয়া', আরিস্তফেনিসের 'দি ক্লাউডস', জিওভান্নি বোকাচিও রচিত ডিকামেরণের নির্বাচিত অংশ, ফ্রাঁসোয়া রাবেলের "গার্গানতুয়া অ্যান্ড প্যান্টাগ্রুয়েল", সারভেন্টিসের "ডন কুইকসট", শেকসপীয়রের "হ্যামলেট" মলিয়েরের "তাতুর্ফে", ডিফোর "রবিনসন ক্রুসো", জোনাথন সুইফটের 'গলিভার', গ্যয়তের 'ফাউস্ত', জেন অস্টেনের 'প্রাইড অ্যান্ড প্রেজুডিস', বালজাকের 'ফাদার গোরিও', আলেকজান্দার ডুমার 'দি কাউন্ট অব মন্টিক্রিসটো',—ভিক্তর হুগোর "লা মিজারেবল", থ্যাকারের 'ভ্যানিটি ফেয়ার' ডিকেন্সের ডেভিড কপারফিলড", চার্লস রীডের "দি ক্লয়স্টার অ্যান্ড দি হার্ট", তুর্গেনেভের "ভার্জিন সয়েল", দস্তয়ভসকীর 'কারামাজভ', ফ্লবেয়ারের 'মাদাম বোভারী' ইবসেন, তলস্তয়, দানুনৎসিও, হার্ডি জোলা, ও'হেনরী, গর্কী, প্রুসত্, বোয়ার, মন, ৎসোয়াইখ, জয়েস, রেমার্ক, মোরাভিয়া প্রভৃতি দিকপালগণকে দুই মলাটের ভিতর পাওয়া বড় কম সৌভাগ্যের কথা নয়। সংকলক যে কি বিপুল পরিশ্রম করেছেন তার পরিচয়দানের জন্য লেখকবর্গের নাম উল্লেখ করা হল। বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে বাঙালী পাঠকের এমন সহজ পরিচয় সাধনের জন্য নির্মলেন্দু রায়চৌধুরী বিশেষ প্রশংসার দাবী করতে পারেন। গ্রন্থটিতে প্রতিটি লেখকের পরিচিতি, গ্রন্থপঞ্জী ও চিত্রাদি দেওয়া আছে। সমগ্র কাহিনীগুলির সংক্ষেপিত সারাংশের মধ্যে একটি করে নিটোল কাহিনী পাওয়া যায়। এই শিল্পসম্মত রূপায়ণের জন্য লেখককে অভিনন্দন জানাই। গ্রন্থটির মুদ্রণ সৌষ্ঠব উল্লেখযোগ্য।

বিশ্বসাহিত্যের রূপরেখা (২য় পর্ব) —নির্মলেন্দু রায়চৌধুরী। প্রকাশক : এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী (প্রাঃ লিঃ) কলিকাতা—১২।। দাম বারো টাকা।

প্রবন্ধ সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন

বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন পর্বের ওপর একাধিক আলোচনা গ্রন্থ আছে। গৌরাংগ ভৌমিক ও রঞ্জিত মুখোপাধ্যায়ের এই আলোচনা গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যের আদি ও মধ্য যুগের ওপর সুদীর্ঘ সাতটি প্রবন্ধের সঙ্কলন। বাংলা সাহিত্যের উপক্রমণিকা বাংলা সাহিত্য ও হিন্দু বৌদ্ধ যুগ, চর্যাপদ, জয়দেব : বাঙালির কবি, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বাইশ কবির মনসামঙ্গল ও গোপীচন্দ্রের গান। সম্পূর্ণ নতুন ও অভিনব ভঙ্গিতে লেখকদ্বয় তৎকালীন সাহিত্যের সূত্রপাত, ক্রমবিকাশ ও তার উৎকর্ষকে বিশ্লেষণ করেছেন। প্রতিটি প্রবন্ধই স্বয়ংসম্পূর্ণ। বিতর্কিত ঘটনা কিংবা কালকে এড়িয়ে না গিয়ে পূর্বসূরীদের সিদ্ধান্তসমূহের যৌক্তিকতা কিংবা ভ্রান্তির বিষয়সমূহকেও আলোচনা করেছেন। সাহিত্যপাঠকের নিকট গ্রন্থটি অপরিহার্য বলে বিবেচিত হবে।

সাহিত্য সরণী (প্রথম খণ্ড)।। গৌরাংগ ভৌমিক ও রঞ্জিত মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক: অ্যাকাডেমিকা ৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলকাতা-১২। দাম ৪-৫০ টাকা।

দুটি গল্পসংকলন

দশটি গল্পের সংকলন গ্রন্থ 'নিখোঁজ মুসাফির'-এর লেখক শ্রীভব রায় ঘরোয়া ঢঙে মজলিসী মেজাজে গল্পগুলি তাঁর পাঠকদের উপহার দিয়েছেন। দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছ ও সামান্য ঘটনাও লেখকের চোখে এক লেখ্য আবেদন নিয়ে ধরা দিয়েছে। তাকে তাই উপেক্ষা না করে তিনি তাঁর লেখার মধ্যে ধরে রেখেছেন। সেদিক দিয়ে এ রচনাগুলির সার্থকতা থাকলেও, রসোত্তীর্ণতার বিচারে গল্প হিসেবে সর্বজনগ্রাহ্য ও পাঠনীয় হয়ে উঠতে পারেনি। অনেক জায়গায় রসসৃষ্টির অভাবে লেখকের অক্ষমতা ও দুর্বলতাই ধরা পড়েছে। তাই সংকলিত রচনাগুলিতে গল্প না বলে রোজনামচা হিসেবে গ্রন্থিবদ্ধ করলেই ভাল হত। সব লেখাই লেখা ও সাহিত্য হয় না, কথাটা মনে রাখা দরকার। এর মধ্যে শুধুর কী বাঞ্ছী ও কাগজের টুকরো রচনা দুটি মোটামুটি ভাল লাগে।

সরল এবং স্বতঃস্ফূর্ত শব্দের সুষ্ঠু প্রয়োগে কাহিনীকে যে কত আকর্ষণীয় করে তোলা যায় তার নির্দশন সাহিত্যক্ষেত্রে নতুন করে রাখলেন শ্রীবুদ্ধদেব গুহ তাঁর 'বন-বাসরে'-এ। লেখকের গল্প বলার ক্ষমতা অনস্বীকার্য। গল্পের কাহিনী শুধু নয়—তার চরিত্র, পরিবেশ, আবহাওয়া, পটভূমি এবং যাদের নিয়ে এই সব কাহিনী তারা সবাই—লেখকের কথায়...'নায়ক-নায়িকারাও একটু বুনো-বুনো, এলোমেলো অন্যরকম।' প্রতিটি গল্পই বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা এবং সমুদ্রসৈকতের পটভূমিতে লেখা। এই বুনো-বুনো, এলোমেলো, অন্যরকম নায়ক-নায়িকা এবং পটভূমি এতাবৎকাল বাংলা-সাহিত্যে অপরিচিত ও অনাদৃত ছিল। সেই অপরিচিতদের পরম সমাদরে বাঙলা সাহিত্যের আঙিনায় এনেছেন বর্তমান লেখক।

শিল্পী শ্রীরূপ গুহঠাকুরতার শোভন-সুন্দর প্রচ্ছদে স্বনামখ্যাত শ্রীমনোজ বসুর নামকরণের অভিনবত্বে এবং গল্পকারের কাহিনীর বিন্যাস-কুশলতায় 'বন-বাসর' সব দিক দিয়ে হাল-আমলের বাংলাসাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

নিখোঁজ মুসাফির :(গল্প) ভব রায়। শ্রীমতী ভক্তিরাণী রায় কর্তৃক 'আনন্দ কুটীর', রাজগ্রাম, বাঁকুড়া থেকে প্রকাশিত। মূল্য—সাড়ে তিন টাকা।

বন-বাসর— (ছোটগল্প সঙ্কলন)—বুদ্ধদেব গুহ। গ্রন্থপ্রকাশ : ১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য : চার টাকা।

বিচিত্র জীবনের কাহিনী

নামকরা বড়লোক পালিতসাহেবের মেয়ে রুমা। সব দিক দিয়েই চৌখশ। গানে এবং মোটরচালাতেও ওস্তাদ। সর্বোপরি প্রেমেও। অথচ বিয়ে হল পরমেশ রায়ের সঙ্গেও। একটি মাত্র ছেলে কচি বাচ্চা রঞ্জাকে রেখেই হঠাৎ একদিন রুমা আত্মনাশ করে বসল। অভাবনীয় ঘটনা। হত্যা না আত্মহত্যা? আত্মহত্যাই যদি হয় তবে কেন? রুমার শায়িত শবদেহের সামনে একে একে এসেছে সবাই যারা রুমার বালিকাবয়সে এবং তরুণজীবনে অন্তরঙ্গ ছিল। এসেছেন জ্যোতিষী-পুরোহিত যাদব ভট্টাচার্য, তাঁর মেয়ে শুভা—যার কাজ থেকে রুমা তার প্রেমিক অরুণকে ছিনিয়ে নিয়েছিল, লেবার লিডার সুমন্ত মিত্র যাকে চেয়েও রুমা পায় নি, এসেছেন ডাঃ সান্যাল, গানের মাস্টার বুড়ো মহাদেব চট্টোপাধ্যায়, অকৃতদার ব্যারিস্টার নীহার সেন, কারখানার ডিরেক্টর দাসসাহেব, মিসেস পাকড়াশী, এডিথ, অধ্যাপক খগেন বোস, অধ্যক্ষা সুমতি, বড়ো চাকর তক্ষয়—এই সব মানুষদের মনের আয়নায় রুমা সম্পর্কে যে সব ভাবনা এবং চিন্তা সোচ্চার হয়েছিল তাই ঘিরেই রহস্যকাহিনী ঘন হয়েছে এই উপন্যাসে। শ্মশানে রুমার প্রজ্বলিত শবদেহের সামনে পাগল প্রেমিক অরুণের সঙ্গে শুভার মিলনেই কাহিনীর ওপর যবনিকা-পাত করেছেন লেখক। কাহিনী-পরিবেশনের নতুন ভঙ্গী লক্ষ্য করার মতো। ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর।

মনের আলোয় দেখা— (উপন্যাস) — সুনীলকুমার নাগ। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ। ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭। দাম পাঁচ টাকা।

শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের নবরূপ

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী বা জীবনী আজ বিশ্ববিদিত। তবু সে অমৃত আহরণে ভক্তচিত্ত আজো ব্যাকুল। তাই আলোচ্য বইখানিতে এর ছন্দরূপকার ঠাকুরের ভাব ও ধারা বজায় রেখে এর সংক্ষিপ্ত কলেবরে যে চিত্র এঁকে তুলেছেন তাতে পাঠকমাত্রেই পরিতৃপ্ত হবেন। লেখক 'অজাতশত্রু' তাঁর ছদ্মনামের মাধ্যমে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখে স্বরচিত গানের ভেতর দিয়ে যথাযথভাবেই শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ও কথামৃতকারের প্রতি প্রণামার্ঘ্য সাজিয়েছেন। ঠাকুরের কথায় "জলদুধ হংসইবা—জলটুকু ফেলে দুধটুকু থাকে।" এ যেন ঠিক শ্রীরামকৃষ্ণেরই কথার সার্থক স্বীকারোক্তি—এই "গানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত"।

গানে শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত
রূপ : অজাতশত্রু। প্রকাশক : রামকৃষ্ণ কৃষ্টি-পরিষদ, ৫১, বীডনস্ট্রীট এ্যাভেনিউ, কলিকাতা—২৮। মূল্য—৭৫ পয়সা।

মহাকাশের পথে মানুষ

শ্রীগোলকেন্দু ঘোষের 'মাটি ছেড়ে মহাকাশে' সাধারণের উপযোগী বিজ্ঞানের বই। কবে থেকে মানুষের মনে জাগল শূন্যে ওড়বার বাসনা আর নিঃসীম আলোয় ভেসে বেড়ানোর কামনা তারই সুন্দর সচিত্র বিবরণ রয়েছে এই বই-এ। এই বাসনার মধ্য থেকেই জন্ম নিয়েছিল বেলুন, জেপলিন, গ্লাইডার। আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এল বিমান। তারপর রকেট এবং লুনিকের যুগ। কি করে একদিন মানুষ গ্রহ থেকে গ্রহে গিয়ে পৌঁছাবে গ্রন্থকার তাও বর্ণনা করেছেন। বহু চিত্রে শোভিত সহজবোধ্য এই গ্রন্থখানির ভাষা মনোরম। গ্রন্থটি সমাদৃত হবে।

মাটি ছেড়ে মহাকাশে (বিজ্ঞান) গোলোকেন্দু ঘোষ। বিচিত্রা প্রকাশন। ১৮ রাজনাথ বিশ্বাস লেন। কলকাতা-৯। দাম ২-৫০ পয়সা।

ধর্মগ্রন্থ

'শ্রীআনন্দময়ী লীলামৃত' ভক্তপ্রাণের আকৃতিতে সমুজ্জ্বল। কবি শ্রীশ্রীআনন্দময়ী কালীমাতার ভক্ত এবং প্রসাদপন্থী। তিনি আনন্দ পরিপূরিত চিত্তে নিজেকে দেবীর চরণে সমর্পণ করেছেন। অজস্র দুঃখকষ্টের মধ্যেও দেবীপদ থেকে বিচ্যুত হননি। হৃদয়ের সুগভীর উপলব্ধিজাত সঙ্গীতে তিনি দেবীর বন্দনা গান করেছেন। ভক্তপ্রাণে এ-গ্রন্থ সাড়া জাগাবে আশা করা যায়।

শ্রীশ্রীআনন্দময়ী লীলামৃত—উপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী। প্রকাশক : ভক্তিতীর্থ, ভদ্রকালী, হুগলী। দাম—২.০০।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

রঞ্জন পত্রিকার বর্তমান সংখ্যায় লিখেছেন অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, অসিত সান্যাল, প্রবীর চট্টোপাধ্যায়, শেখ আমানুল্লা, দীনেশ সিংহ, ত্রিদিবকুমার বসু, পিনাকীরঞ্জন গুহ, সুকুমার রায়, কানাই ঘোষ, শিবপ্রসাদ সেনগুপ্ত, কমল বিশ্বাস, আশিস সেনগুপ্ত, চিত্তরঞ্জন সিংহ রায়, নির্মল মুখোপাধ্যায়। গল্প কবিতা প্রবন্ধের এই পত্রিকাটি বেশ আকর্ষণীয়।

রঞ্জন (চতুর্থ বর্ষ।। দ্বিতীয় সংখ্যা)— সম্পাদক চিত্তরঞ্জন সিংহরায় ও নির্মল মুখোপাধ্যায়। ১৬।২, একসাইজ কোয়ার্টার্স, বাটানগর। ২৪ পরগণা, দাম ৫০ পয়সা।

হায়দরাবাদে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন

বিগত ২৪শে ডিসেম্বর থেকে ২৬শে ডিসেম্বর পর্যন্ত হায়দরাবাদে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের ৪৩তম বার্ষিক অধিবেশন হয়ে গেল অন্ধ্রের রাজধানী হায়দরাবাদে। এই অধিবেশনের উদ্বোধন উপলক্ষে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের মূল সভাপতি শ্রীদেবেশ দাশ তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেন, "রাজনীতির বহু পূর্বেই সাহিত্যে গণজাগরণ শুরু হয়েছিল, এই হিসাবে সাহিত্য রাজনীতির বহু ঊর্ধে। তাই সাহিত্য জেগে থাকে তার অমর অবদান নিয়ে অম্লান মহাকালের দরবারে। গণচেতনার প্রভাবে তেলুগু সাহিত্য সুদূর দক্ষিণে তাঞ্জোরে, মাদুরায়, দুকোট্টায়, মহীশূরে ছড়িয়ে পড়ল নতুন রূপে, নতুন আঙ্গিকে। তাঞ্জোরে মারাঠা-শাসনের সময়ে ত্যাগরাজ তেলুগুতে তাঁর অমর সঙ্গীত রচনা করেন। তাঁর প্রহ্লাদ ও নৌকা চরিত্র পাশ্চাত্য জগতের অপেরার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

বাংলাদেশের মত অন্ধ্রেও সাহিত্যের সঙ্গে ধর্মের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ হয়েছিল। তিরুপতিকে কেন্দ্র করে বৈষ্ণব সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়। রায়সমীথা ও হায়দরাবাদ অঞ্চলে শৈব সাহিত্য প্রচারিত হয়। এই কথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে ভক্তিবাদে আসক্তিই সমগ্র ভারতে এক অখণ্ড মানস ও মানবতা সৃষ্টি করতে সহায়তা করেছে। বাংলা থেকে যখন শ্রীচৈতন্য প্রেমধর্ম ও ধর্মপ্রেম বিতরণ করতে করতে গোদাবরী তীরে প্রধানমন্ত্রী রামানন্দ রায়কে আলিঙ্গন করেন, তখন ব্রাহ্মণগণ আশ্চর্য হয়ে বলেছিলেন,

এই না ব্রাহ্মণ তেজে রেখি সর্বসম
শূদ্রে আলিঙ্গিয়া কেন করেন ক্রন্দন?

অন্ধ্র ও বঙ্গে এই প্রেমালিঙ্গনে পাই শুধু ভক্তি নয়, ভাব বেগ নয়, ভারত-আত্মার বিকাশ, —যার প্রকাশ হয়েছে একীভূত ভারত-সাহিত্যে, প্রস্ফুটন হয়েছে সমীকৃত ভারত-জীবনে।

যে রচনা জীবনের সত্যকে করে প্রকাশ আর স্বপ্নকে করে বিকাশ, বাসনাকে দেয় ব্যঞ্জনা আর ব্যক্তিকে দেয় ব্যাপ্তি, তা-ই হয় সাহিত্য। সে জন্যই সাহিত্য কখনো যায় না জীবনকে ছাড়িয়ে, জীবনকে এড়িয়ে।"

রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন, "বাংলাদেশের চিত্ত সর্বকালের সর্বদেশে প্রচারিত হোক, বাংলার বাণী সর্বজাতি সর্বমানবের বাণী হোক। আমাদের 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র বাংলাদেশের বন্দনা-মন্ত্র নয় এ হচ্ছে বিশ্ব-মাতার বন্দনা। ......আমরা মানব বিধাতার রাজপথে মহামানবের গান গেয়ে বেড়াব। মহাবিশ্বের পথকেই দেশ বলে গ্রহণ করব।" এমনি সুগভীর দ্যোতনা এই সাহিত্য সম্মেলনের। এই সম্মেলন যেন বাঙালীর হৃদয়-আঙিনায় সারা ভারতের বিচিত্র মর্ম-সুরকে প্রতিধ্বনিত করে, আবার বাঙালীর শ্যামল রূপটিকে যেন মধুর সুষমায় সারা ভারত জুড়ে প্রতিভাত করে। বাংলার বাইরে অনুষ্ঠিত এই ধরনের সম্মেলন নানাভাষী ভারতবর্ষে এক সুসংহত ঐক্যের আদর্শ এবং ভাবধারাকেই ব্যক্ত করে। ঠিক এই কথাই ব্যক্ত করেন অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীব্রহ্মানন্দ রেড্ডি নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সকল সদস্যের উদ্দেশে তাঁর স্বাগত ভাষণে। শ্রীরেড্ডি ছিলেন এই বছরের সম্মেলন উপলক্ষ্যে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। শ্রীরেড্ডি সম্মেলনের সমস্ত সদস্যের উদ্দেশে স্বাগত জানিয়ে বলেন, যদিও এইটি বাংলা সাহিত্য সম্পর্কীয় সম্মেলন, তবু ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এই সম্মেলনের অনুষ্ঠানগুলো হয় বলে এবং শুধু তাই নয় সেই সেই রাজ্যের আঞ্চলিক ভাষাতেও নানাধরনের সাহিত্যিক আলোচনা হয়ে থাকে বলে এই সম্মেলন যেন ব্যাপকভাবে ভারতের আন্ত-র্রাজ্যীয় ভাবধারাগুলোর মধ্যে মিলনের প্রতীক হয়ে ওঠে ঘনিষ্ঠতম নৈকট্যের সঙ্গমতীর্থ। এই সম্মেলন যেন ভারতের নবজাগরণের জন্য নতুন এক অধ্যায় রচনার দিশারী। এই বক্তব্যেরই আরেকবার সমর্থন পাওয়া যায় হায়দরাবাদের মেয়র আয়োজিত নহবৎ পর্বতের উপরে মনোরম উদ্যানে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে অভ্যাগতদের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে। বলা বাহুল্য, এই গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে হায়দরাবাদের প্রবাসী বাঙালীরাও যে কত বেশী অবহিত তার উল্লেখ করেন হায়দরাবাদের স্থানীয় বঙ্গীয় সমিতির সভাপতি ডক্টর এন সি মুখোপাধ্যায় সম্মেলনের সদস্যদের উদ্দেশে তাঁর স্বাগত ভাষণে। তিনি বলেন, "আমরা জানি সমস্ত দেশের মধ্যে ভাবসংহতি এবং অনুভূতি-নির্ভর ঐক্যের দৃঢ়তম বন্ধনের জন্য সাহিত্য ও সংস্কৃতির মাধ্যমে এই সম্মেলন কী উল্লেখযোগ্য কাজ করে যাচ্ছে।" তিনি আরো বলেন, "এই ঐতিহাসিক নগরী হায়দরাবাদে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের অনুষ্ঠান যেন এক নতুন ইতিহাস রচনা করলো।"

সম্মেলনের প্রস্তুতিপর্বে সমারোহের অন্ত ছিল না আর ভাষণ, অভিভাষণ, প্রতি-ভাষণ, মিতভাষণ, মিশ্রিত ভাষণ ইত্যাদি মিলিয়ে সম্মেলনের তিনদিন যেমন আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে তা এককথায় অভাবিত। তবে বলা দরকার সম্মেলনের তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠানে প্রতি সন্ধ্যার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হতে পারতো আরো সুষ্ঠু, আরো বেশী পরিমার্জিত, এবং সুপরিকল্পিত। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে অন্ধ্রের একটি লোকসংস্কৃতি সংঘ—ভারত ফোক আর্ট আকাদেমি যে অনুষ্ঠানটি পরিবেশন করেছিলেন, তা খুবই উপভোগ্য হয়। কিন্তু তা ছাড়া অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যা হয়েছে, তা বাংলার ঐতিহ্যবাহী পরম রমণীয় বৈশিষ্ট্যের যথার্থ প্রতিভূ নয়। অবশ্য ভারত ফোক আর্টস আকাদেমির অনুষ্ঠানেও রবীন্দ্রনাথের "পাগলা হাওয়া বাদল দিনে পাগল আমার মন" গানটির রূপায়ণে রবীন্দ্র-সঙ্গীতানুগ গানের সুর অব্যাহত থাকলেও গানটির কথার উচ্চারণ সঙ্গীতশিল্পীদের মোটেই নির্ভুল হয়নি। নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের কর্তৃপক্ষ এবং হায়দরা-বাদের বঙ্গীয় সমিতি এই তিনদিনব্যাপী অধিবেশনের ব্যাপক ও বহুবিচিত্র কর্য-ক্রমের পরিকল্পনায় অনেক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিষয়ের পরিবেশনা করলেও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলো এবং কাব্য নাটকের অনুষ্ঠান আরোও উচ্চতর মানের হতে পারতো। ২৪শে ডিসেম্বর বিকেল ৩টায় সম্মেলনের অনুষ্ঠানসূচীর উদ্বোধন হয় "বন্দেমাতরম্" সঙ্গীত দিয়ে। তরপর স্বাগত ভাষণ, উদ্বোধনী ভাষণ প্রারম্ভিক ভাষণ ইত্যাদির পরে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও গৌরবময় ঘটনা —শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ মহাশয়ের অর্থানুকূল্যে অনুষ্ঠিত "অমৃত" ও "যুগান্তর" সাহিত্য পুরস্কার দেওয়ার বার্ষিক ব্যাপার। তারপর বিকেল সাড়ে পাঁচটায় অন্ধ্রপ্রদেশ, সাহিত্য আকাদেমি ও তেলুগু লেখকগোষ্ঠী স্বাগত জানালেন সম্মেলনের সদস্যদের। সন্ধ্যা ৬টায় তেলুগু সাহিত্যের অধিবেশনে বাংলা ও তেলুগু সাহিত্যের পারস্পরিক সম্পর্ক ও বিষয়বস্তু অবলম্বন করে অনেক আকর্ষণীয় ও মনোজ্ঞ আলোচনার অনুষ্ঠান হয়। সেই দিনই রাত নয়টায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মানব বিজ্ঞান মন্দির-এর নটরাজ রামকৃষ্ণের নৃত্য অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। পরের দিন ২৫শে ডিসেম্বর সকাল ৯টায় বাংলা কথাসাহিত্যের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনের উদ্বোধন করেন সমরেশ বসু এবং সভাপতিত্ব করেন ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য। তাঁর ভাষণ অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক এবং মনোজ্ঞ হয়েছিল। তিনি বলেন, বাংলাদেশের যথার্থ প্রাণের রস বিদ্যমান রয়েছে বাংলাদেশের সাহিত্যে। বহু বাধা, বিঘ্ন, অসুবিধার মধ্যেও বাংলার সাহিত্য হয়ে উঠেছে জীবন্ত, আর এই সাহিত্য জুগিয়েছে অনন্ত জীবনীশক্তি, কোটি কোটি বাঙালীর প্রাণে প্রাণে সেই আবহমানকাল ধরে। তিনি আরো বলেন, "সাধারণভাবে বিভাগোত্তর বাংলাদেশের সমাজকে সবাই বিপর্যস্ত বলেই মনে করবেন এবং তার দিকে তাকিয়ে কেউ কোনরকম আশা পোষণ করবার মত শক্তি পাবেন না। কিন্তু এই বহুমুখী বিপর্যয়ের মধ্য দিয়েই কে জানে জাতির অন্তর্মুখী কোনও সাধনা জয়যুক্ত হবার পথে অলক্ষিতে অগ্রসর হয়ে চলেছে কি না।" কথাসাহিত্য শাখার অধি-বেশনের পরে দুটি সেমিনার আয়োজিত হয়েছিল; একটি "সাম্প্রতিক বাংলা কথা-সাহিত্য" সম্পর্কে, অন্যটি "বাংলা সাহিত্য ও স্বদেশী আন্দোলন" প্রসঙ্গে। তারপর বিকেল ৩টায় কাব্যসঙ্গীত ও নাটক সম্পর্কে ব্যাপক এবং বিলম্বিত অধিবেশনের অনুষ্ঠান হয়। এই অধিবেশনেও আয়োজিত হয়েছিল দুটি স্বতন্ত্র সেমিনার। রাত ৯টায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের অধিবেশন শুরু হয়; অন্ধ্রপ্রদেশের ভারত ফোক আর্ট আকাদেমির অনুষ্ঠান ছাড়াও বাংলাদেশের লোকসঙ্গীত এই অনুষ্ঠানে পরিবেশন করেন নির্মলেন্দু চৌধুরী ও তাঁর সম্প্রদায়। তার পরদিন ২৬শে ডিসেম্বর সকাল ৯টায় শিশুসাহিত্যের অনুষ্ঠান শুরু হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন "যুগান্তর" পত্রিকার সব পেয়েছির আসর-এর পরিচালক স্বপনবুড়ো। তারপর উর্দু সাহিত্যের অধিবেশন শুরু হয়। উর্দু সাহিত্যে অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হবিবুর রহমান। উর্দু সাহিত্যের অভিভাষণের শেষে উর্দু ও বাংলা সাহিত্যের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং ঐ সম্পর্কের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ও ভারতের রাষ্ট্রভাষা সমস্যা সম্পর্কে অত্যন্ত মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন "যুগান্তর" পত্রিকার বার্তা সম্পাদক প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু। বিকেল ৩টায় শুরু হয় "সংবাদ ও সাময়িক পত্র-সাহিত্য" সম্পর্কে অধিবেশন শ্রীসাগরময় ঘোষের সভাপতিত্বে। এই অধিবেশনে অনেক প্রখ্যাতনামা সাংবাদিক আলোচনায় যোগ দেন। ২৫শে ডিসেম্বর বিকেলে "আধুনিক বাংলা কবিতা" সম্পর্কে যে সেমিনারটির অনুষ্ঠান হয় তাতে "আধুনিক কবিতা" ও "সাম্প্রতিক কবিতা" সম্বন্ধে সেমিনার-এর শুরুতে উপস্থিত বক্তারা যা বলেন, বিশেষ করে "আধুনিক কবিতা" ও "সাম্প্রতিক কবিতা"র সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে প্রথম দিকে তিনজন বক্তা বা আলোচক যা বলেছেন, তাতে তাঁরা কি বলতে চান, কি তাঁরা বোঝাতে চান, তাঁদের বক্তব্যের মুখ্য সার মর্ম কি তাই স্পষ্ট করে বোঝা গেল না। এটা নিঃসন্দেহেই খুব দুঃখের এবং বেদনার।

—অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়

ফাদার ঘনশ্যামের রোমাঞ্চ
কাহিনী (৩)

ফ্যানটাসি থিয়েটারের রহস্য

সোরগোল পড়ে গেল ফ্যানটাসি থিয়েটারে।

ঘটনাটা যদিও সামান্য, তবু এই সামান্য ঘটনাই নাকি ফ্যানটাসি থিয়েটারের ইতিহাসে কখনো ঘটেনি।

নতুন নাটকের তোড়জোড় চলছিল সেখানে। ফ্যানটাসি নাটক নয়, আধুনিক নাটক। যদিও ফ্যানটাসি থিয়েটারের পত্তনই হয়েছিল ফ্যানটাসি অভিনয়াদির জন্যে। 'মাছেদের রাণী কঙ্কাবতী', 'শুক্রসুন্দরী বনাম বিশ্বসুন্দরী' নামক বিবিধ বিদঘুটে নাটক মঞ্চস্থ করে এবং শতাধিক রজনী পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে অভিনয় করে জনপ্রিয়তা এবং মুনাফা দুই-ই পেয়েছেন থিয়েটারের প্রযোজক এবং স্বত্বাধিকারী জনার্দন চৌধুরী।

কিন্তু আশ্চর্য! ব্যবসায়িক সাফল্য সত্ত্বেও জনার্দন চৌধুরীর দুর্মতি হয়েছে আধুনিক নাটক মঞ্চস্থ করার। কেন হয়েছে তা যথাসময়ে জানা যাবে।

অদ্রীশ বর্ধন



নতুন নাটকের নামটি বড়ই বিচিত্র। 'মেঘের কোলে ঝিকিমিকি'র কাহিনী অবশ্য রসিকমহলে বিশেষ অপরিচিত নয়। প্রবীণ নাট্যকার গগন দত্তর নবীন নাটকটি ইতিমধ্যেই পুস্তকাকারে বাজারে বেরিয়েছে এবং বুকিং নাম করেছে।

এ হেন বহুবিতর্কিত নাটকেরই আজ স্টেজ রিহার্সাল ছিল ফ্যানটাসি থিয়েটারে। সাজগোজ করে অবশ্য নয়, মামুলী পোশাকে। পাত্র-পাত্রীরাও হাজির হয়েছিল যথাসময়ে।

আর, তারপরেই ঘটল অঘটন।

নায়িকা উস্রী মুখার্জি অকস্মাৎ অন্তর্হিত হল।

অন্তর্হিত হল নিজেরই কক্ষে। ভেতরে ঢুকে ছিটকিনি তুলে দিলে। বিস্তর সাধাসাধি সত্ত্বেও বাইরে আসা দূরে থাকুক, সাড়াও দিল না।

অবশেষে খবর গেল জনার্দন চৌধুরীর কাছে।

*

একটি বিশাল বিকট হিপোপটেমাসকে যদি মনুষ্যরূপে কল্পনা করা যায়, তাহলে যা হয়, সংক্ষেপে জনার্দন চৌধুরী হলেন তাই।

কিন্তু এহেন চমকপ্রদ বপুর অধিকারীকে দেখে যতখানি না বিস্ময় জাগে, তার চাইতেও অনেক বেশী তাজ্জব হতে হয় চৌধুরী মশায়ের সহধর্মিণীকে দেখলে।

না, জলহস্তী-পত্নী হয়েও ভয়ংকরী কিছু নন। তিনি সাহানা দেবী। সাহানা দেবী বলতে একজনকেই বোঝায়। রূপে যিনি বিদ্যাধরী, গুণে যিনি সরস্বতী, অভিনয়-নৃত্য-সংগীতে যিনি উর্বশী-মেনকা-রম্ভাকেও ম্লান করেন—ইনিই সেই ভুবনমোহিনী সাহানা দেবী।

কিন্তু প্রশ্ন জাগতে পারে, এহেন লাস্যময়ী তিলোত্তমা জনার্দন-জলহস্তীর কণ্ঠলগ্না হলেন কিভাবে? সে আর এক কাহিনী। এখানে তা অবান্তর। সংক্ষেপে বলা যায়, কলিযুগেও রতি-পতি মদন অঘটন ঘটাতে পারে। জনার্দন-সাহানাই তার প্রমাণ।

জনার্দন পত্নী-অন্ত প্রাণ। স্ত্রীর জন্যে তিনি হেন কাজ নেই যা করতে পারেন না। উদাহরণ, উদ্ভট ফ্যানটাসি নাটক মঞ্চস্থ করে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা রোজগার করা সত্ত্বেও সাহানা দেবীর ইচ্ছায় আধুনিক নাটকের ঝুঁকি নেওয়া। সাহানা দেবী প্রথম শ্রেণীর নায়িকা। আধুনিক সংলাপের মাধ্যমে প্রতিভার হীরক-দ্যুতি দিয়ে দর্শক-সাধারণের চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়ার বাসনা তাঁর বহুদিনের। সেই সাধই পূর্ণ করতে চলেছেন স্বামী জনার্দন চৌধুরী।

হন হন করে করিডর দিয়ে আসতে আসতে এইসব কথাই মনে হচ্ছিল জনার্দনবাবুর। লম্বা করিডর। দুপাশে গাদাকরা পরিত্যক্ত সিন-সিনারী। ফ্যানটাসি নাটকের উপকরণ। এখন তা ইঁদুর আর আরশুলার ভোজের উপকরণ। মাকড়সার আড্ডা।

এসব দেখলেও দুঃখ হয়। তাই আর দেখলেন না জনার্দনবাবু। করিডরের অপর প্রান্তে দেখা যাচ্ছে জমায়েৎ হয়েছে 'মেঘের কোলে ঝিকিমিকি'র পাত্র-পাত্রীর। সাহানা দেবীও রয়েছেন। নেই শুধু নায়িকা উস্রী মুখার্জি।

এই অবসরে ফ্যানটাসি থিয়েটারের নির্মাণ-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে দু-কথা বলে নেওয়া ভাল। জনৈক বিদেশী স্থপতির প্ররোচনায় জনার্দন চৌধুরীর ফ্যানটাসি থিয়েটারের সাজঘর আর অফিস নির্মাণ করেছিলেন ভূগর্ভে। অর্থাৎ স্টেজ আর প্রেক্ষাগৃহের নীচেই ছিল সবকিছু।

স্টেজের ঠিক নীচেই জনার্দন চৌধুরীর স্পেশাল চেম্বার। সেখান থেকে টানা করিডর চলে এসেছে। দুপাশে সারি সারি ঘর। শেষ প্রান্তে নায়িকা উস্রী মুখার্জির কক্ষ।

জনার্দন চৌধুরী পৌঁছোলেন সেখানে। এবং দেখলেন এক কোণে দাঁড়িয়ে এক কিম্ভূতকিমাকার মূর্তি। অত্যন্ত বেঁটে, অত্যন্ত মোটা এবং অত্যন্ত অদ্ভুত চেহারা মানুষটির। পরণে ঝলঝলে কালো আলখাল্লা। মাথায় টাক। নিরীহ, বোকাসোকা চাউনি।

লোকটাকে এর আগেও কয়েকবার দেখেছেন জনার্দন চৌধুরী। তাঁর মাইনে-করা অভিনেতা মর্মকুমারের সঙ্গেই দেখেছেন। লোকটা পাদরী। নাম ঘনশ্যাম মণ্ডল। কিন্তু সেই মুহূর্তে নগণ্য লোকটার দিকে ফিরে তাকানোর সময়ও তাঁর ছিল না।

ভুল করলেন সেইখানেই। মারাত্মক ভুল। ফাদার ঘনশ্যামকে সেই মুহূর্তে অতখানি তাচ্ছিল্য না করলে বোধহয় এ-দুর্ঘটনাই ঘটত না।

কেননা, ঠিক তখনি ঝনঝন শব্দ ভেসে এল উস্রী মুখার্জির বন্ধঘরের ভেতর থেকে।

যেন শতখণ্ডে গুঁড়িয়ে গেল বিশাল দর্পণ!

প্রথমটা চমকে উঠলেও পরমুহূর্তে শূন্যে মুষ্টি আন্দোলন করে হুংকার ছাড়লেন জনার্দন চৌধুরী, 'কি...কি হচ্ছে? অ্যাঁ? উস্রী...বেরিয়ে এস...এখুনি বেরিয়ে এস...কাচ খুকির মত তেজ দেখানো হচ্ছে আয়নার ওপর?...অ্যাঁ?...গোসা করতে হয় বাড়ী গিয়ে করো......এখানে কি?'

যতক্ষণ না দম ফুরোলো, ততক্ষণ কড়িকাঠ কাঁপিয়ে চললেন জনার্দন চৌধুরী। তারপর স্তব্ধ হলেন। থমথম করতে লাগল ভূগর্ভস্থ অলিন্দ। কিন্তু টুঁ শব্দটিও ভেসে এল না রুদ্ধ প্রকোষ্ঠ থেকে।

নৈঃশব্দ্য ভঙ্গ করে ফিসফিস করে বলল নায়ক মর্মকুমার—'সুইসাইড—সুইসাইড করল না তো?'

ঝাঁঝিয়ে উঠল নয়নতারা—উস্রীর চব্বিশ-ঘণ্টার পরিচারিকা—'দিদিমণি সেরকম মেয়েই নয় গো। সুইসাইড করবে তাঁর শত্তুর। তিনি কেন করবেন?'

বুদ্ধিমানের মতই চুপ করে গেল মর্মকুমার।

জনার্দন চক্ষু রক্তবর্ণ করে জিজ্ঞেস করলেন, 'কিন্তু কারণটা কি?'

উত্তর দিলেন সাহানা দেবী।—'সেইটাই তো জানা যাচ্ছে না। মেন রোল ওকে কখনও দেওয়া হয় না। অথচ এ-নাটকে আমি নিজেই নায়িকার পার্টটা দিলাম ওকে। আমি নিলাম ওর সহচরীর পার্ট। তবুও যদি গোসা হয় তো আমরা নাচার।'

এসব ব্যাপারে স্ত্রীর ওপর অগাধ আস্থা জনার্দন চৌধুরীর। নাটকে কে কোন চরিত্রের উপযুক্ত তার দায়িত্ব সাহানা দেবীর ওপর ছেড়ে দিয়েই তিনি নিশ্চিন্ত।

তাই হৃষ্টকণ্ঠে বললেন,—'তা বেশ করেছো। এরকম চান্স পেয়েও যদি মিছিমিছি আয়না ভাঙতে থাকে তো ওকে বাদ দেওয়াই ভালো।' বলেই হাঁক পাড়লেন, 'উস্রী! উস্রী! তুমি বেরোবে কিনা?'

কোনো সাড়া নেই।

'রিহার্সালের দেরি হয়ে যাচ্ছে!' আবার কর্ণপটহবিদারী চিৎকার করলেন জনার্দন।

এবারেও কোনো সাড়া নেই।

সুতরাং রেগে তিনটে হয়ে বললেন জনার্দন চৌধুরী, 'ঠিক আছে। থাকো তুমি ঘরের মধ্যে। সাহানা, তুমি উস্রীর জায়গায় আর কাউকে ট্রায়াল দাও। কে পারবে?'

'তনুশ্রী'। বললেন সাহানা দেবী। 'পার্টটাও ওর মুখস্থ আছে।'

'অলরাইট। শুরু করে দাও। আর দেরি করো না। একজন শুধু এ-ঘরের সামনে বসে থাকুক। উস্রী বেরোলেই আমাকে খবর দেবে।' বললেন জনার্দন চৌধুরী। 'কে বসবে?'

'সাবিত্রী থাকুক', বললেন সাহানা দেবী।

সাবিত্রী তাঁর অষ্টপ্রহরের পরিচারিকা। ভদ্রঘরের বিধবা প্রৌঢ়া। গম্ভীর মুখ। পাথরের মতই ভাবলেশহীন। অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। পাথরের মতই কঠিন।

মণিবানির নির্দেশে একটা টুল টেনে নিয়ে উস্রী মুখার্জির ঘরের সামনে পাহারায় বসল সাবিত্রী।

*

'মেঘের কোলে ঝিকিমিকি'-র পাত্র-পাত্রীরা ফিকফিক করে হাসতে হাসতে রওনা হল স্টেজের দিকে।

এক কোণে পরিত্যক্ত আসবাবের মতই দাঁড়িয়ে রইল ফাদার ঘনশ্যাম মণ্ডল।

মর্মকুমারের চোখ পড়েছিল সেদিকে। তাই এগিয়ে এসে বলল, 'চলুন, আমাদের রিহার্সাল দেখবেন।'

'চল।'

'আজকের ঘটনা দেখে খুব ভাবিত মনে হচ্ছে? থিয়েটার মহলে এরকম মান-অভিমান কিন্তু হামেশাই ঘটে।'

'আমি ভাবছি সাহানা দেবীর কথা। সন্ন্যাসী মানুষ তো নারীচরিত্র তাই এখনও ধাঁধাই রয়ে গেল আমার কাছে।'

'ওরকম মহিলা বড় একটা দেখা যায় না', বলল মর্মকুমার। 'নিজে উঁচুদরের আর্টিস্ট হয়েও দেখলেন তো নায়িকার পার্টটাই ছেড়ে দিলেন উস্রীকে। উস্রীও বড় আর্টিস্ট, কিন্তু সাহানা দেবীর কাছে এখনও শিশু।'

মাথা হেঁট করে যেন আপনমনেই বলল ফাদার ঘনশ্যাম, 'কিন্তু তোমরা একটা কথাই ভুলে যাচ্ছ। এ-নাটকের নাম 'মেঘের কোলে ঝিকমিকি'।'

'তাতে কী?'

নিরুত্তর রইল ঘনশ্যাম পাদরী। মার্জারের মত নিঃশব্দচরণে হাঁটতে লাগল মর্মকুমারের পাশে পাশে।

গলা খাটো করে বলল মর্মকুমার,—'একটা কথা আপনাকে বলি। খুবই গোপনীয়। সবাই জানে সাহানা দেবী জনার্দনবাবুকে বিয়ে করে সুখী হয়েছেন। কিন্তু আমি জানি, হন নি। হতে পারেন না। কোন মেয়েই হতে পারেন।'

'কিন্তু কেন? জনার্দনবাবু তো স্ত্রীকে ভালবাসেন? স্ত্রীর জন্যে তাঁর যে স্বার্থত্যাগ, তা এ শহরের কে না জানে?'

'সেইটাই তো আসল রহস্য। জনার্দনবাবু ভালবাসেন ঠিকই, কিন্তু তিনি তো আর ধোয়া তুলসীপাতাটি নন।'

'চরিত্র খারাপ?'

'ঘোরতর। ভদ্রলোকের দুই বিয়ে। প্রথম স্ত্রী বর্তমান।'

এতবড় কথাটা শুনেও মাথা তুলল না ঘনশ্যাম পাদরী। শুধু বলল, 'প্রমাণ?'

'আমি নিজে দেখেছি। আমাদের স্টেজ জনার্দনবাবুর চেম্বারের ওপর তলায়। স্টেজ থেকে নেমে আমার ঘরে আসতে হলে ওর চেম্বারের সামনে দিয়েই আসতে হয়। একদিন দেখি দরজাটা সামান্য ফাঁক করা। ভেতর থেকে চাপা গলায় শাসাচ্ছে একজন স্ত্রীলোক—ভাল চাও তো যা বলি শোন। কৌতূহল হল। চারদিক নির্জন। এ সময়ে এসব ঘরে মেয়েছেলে কেন? উঁকি মেরে দেখতে পেলাম আমার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে একজন মহিলা। আপাদমস্তক কালো শাল জড়ানো। জনার্দনবাবু গজগজ করে কি যেন বলতেই আবার চাপা গলায় ফুঁসে উঠল মেয়েটা, 'মনে রেখ, আমি তোমার বউ।' বাপরে, সে কি গলা! ঠিক যেন কালনাগিনী।'

'তারপর?' ভাবলেশহীন কণ্ঠে জানতে চাইলে ঘনশ্যাম মণ্ডল।

'তারপরেও মেয়েটিকে আমি দুবার দেখেছি থিয়েটার চলার সময়ে। একবার ঘরের মধ্যেই। আর একবার করিডরে। মুখে ঘোমটা দিয়ে প্রেতিনীর মতই সাঁৎ করে কোথায় যে লুকোলে, আর দেখতে পেলাম না।'

করিডরের এক প্রান্তে এসে পৌঁছেছিল দুজনে। সামনেই ঘোরানো সিঁড়ি। দাঁড়িয়ে গিয়ে ফাদার ঘনশ্যাম বলল, 'তাহলে তোমার বিশ্বাস জনার্দন চৌধুরীকে তার প্রথম স্ত্রী ব্ল্যাকমেল করছেন?'

'আলবাৎ।'

'উনি তা জানেন?' বলে ঘোরান সিঁড়ির ওপর দিয়ে অঙ্গুলিনির্দেশ করল ঘনশ্যাম মণ্ডল।

ঠিক সেই মুহূর্তে সিঁড়ির ওপরে চাতাল পেরিয়ে যেতে দেখা গেল দুটি মনুষ্যমূর্তিকে। একজন সাহানা দেবী। অপরজন যুবাপুরুষ। সুদর্শন। ধারালো মুখের গঠন।

দুজনেই খুব উত্তেজিত। যুবাপুরুষ চাপা গলায় বললে,—'সাহানা, আর একবার ভেবে দেখো। এভাবে জীবনটা নষ্ট করো না।'

'ভেবেছি, অনেক ভেবেছি, উদয়। কিন্তু ছেলেমানুষী করো না।' বলতে বলতে দুজনেই চাতাল পেরিয়ে অন্তর্হিত হল ওপাশে।

সিঁড়ির গোড়ায় আধো-আলো আধো-অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা মূর্তিদুটো কারুরই চোখে পড়ল না।

নৈঃশব্দ্য ভঙ্গ করে ফিসফিস করে বলল মর্মকুমার, 'আপনার প্রশ্নের জবাব নিশ্চয় পেলেন?'

'পেলাম। কিন্তু পাশের ঐ ভদ্রলোকটি কে?'

'উদয়তপন লাহিড়ী। বড়লোকের ছেলে। কিন্তু অভিনয়ে দারুন ক্যালিবার। ছোঁড়া নাম করবে।'

'বটে!'

*

স্টেজ।

আটপৌরে পোশাকেই অভিনেতা-অভিনেত্রীরা আনা-গোনা করছে। প্রম্পটার জায়গা নিয়েছে একটি চেয়ারে। পরিচালকের হাঁকডাক শোনা যাচ্ছে। তারপরেই বাঁশী বাজল। পর্দা উঠল। শুরু হল অভিনয়।

উইংসের আড়ালে থলথলে বপু নিয়ে দাঁড়িয়েছিল ফাদার ঘনশ্যাম মণ্ডল। পাশে মর্মকুমার।

ফাদার বললে, 'তুমি গেলে না?'

'আমার সময় হয় নি এখনো,' জবাব দিল মর্মকুমার।

'কিন্তু উগ্রী মুখার্জি কি আর বেরোবে?'

'ভগবান জানেন। চলুন না, আর একবার দেখে আসি।'

'চল।'

ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল দুজনে। নির্জন অলিন্দ পথ। এদিকে জনার্দন চৌধুরীর অফিসঘর। ওদিকে উগ্রী মুখার্জির 'গোসাঘর'। রুদ্ধ দরজার পাশে টুল পেতে বসে সাবিত্রী।

স্টেজের ওপর থেকে ভেসে আসছে উচ্চকণ্ঠের সংলাপ। প্রতিধ্বনি আছড়ে পড়ছে সুদীর্ঘ করিডরে। গমগম করছে পাতালপথ।

পায়ে পায়ে সাবিত্রীর সামনে এসে দাঁড়াল দুজনে। মর্মকুমার প্রশ্ন করল, 'সাড়া-শব্দ পেলে, সাবিত্রী?'

'তা পেয়েছি বইকি, দাদাবাবু। চলে-ফিরে বেড়ানোর আওয়াজ তো পাচ্ছি। কিন্তু মুখে বাক্যি নেই,' মার্বেল-আননের একটি পেশীও না কাঁপিয়ে বলল সাবিত্রী।

আচমকা অমায়িক ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল ফাদার ঘনশ্যাম, 'জনার্দনবাবু কোথায়?'

'এই তো দেখলাম চেম্বারে ঢুকতে। বাঁশি বাজল, পর্দা উঠল, উনিও ঘরে ঢুকলেন। আর তো বেরোতে দেখি নি।'

'তার মানে চেম্বারের দরজা একটাই?' অন্যমনস্ক সুরে বলল ফাদার।' 'রিহার্সাল জোর কদমে চলছে দেখছি।'

সত্যিই তাই। ফ্যানটাসি থিয়েটারের নির্মাণকৌশলের এইটাই হল বৈশিষ্ট্য। অলিন্দপথের শেষপ্রান্তেও এসে পৌঁছোয় মঞ্চের প্রতিটি সংলাপ। নিজের নিজের ঘরে বসে পুরো নাটকটা অনুধাবন করতে পারে পাত্র-পাত্রীরা।

সেই মুহূর্তে শোনা যাচ্ছিল হিমাদ্রি বোসের মেঘমন্দ্র কণ্ঠ। স্বরাট গলায় দ্রিমি-দ্রিমি ডম্বরু সংকেত। যেন কালো মেঘ ফুঁসছে, ঝলসাচ্ছে, গর্জাচ্ছে।

আর তারপরেই ছন্দপতন ঘটল।

শোনা গেল আরও একটা নতুন শব্দ।

একটা চাপা আওয়াজ ভেসে এল অলিন্দের অন্য প্রান্ত থেকে। যেন ধপ করে আছড়ে পড়ল গুরুভার কিছু।

*

সঙ্গে সঙ্গে বুঝি টান-টান ধনুকের ছিলে ছিঁড়ে গেল। জ্যামুক্ত শায়কের মত বিদ্যুৎবেগে করিডর বেয়ে ছুটে গেল ফাদার ঘনশ্যাম মণ্ডল -ছুটে গেল আশ্চর্য ক্ষিপ্রবেগে—মেদপুষ্ট গুরুদেহ নিয়ে কামানের গোলার মত।

চক্ষের নিমেষে এসে দাঁড়াল জনার্দন চৌধুরীর ঘরের সামনে। হাতল ঘুরিয়েই বললে রুদ্ধশ্বাসে, 'দরজা ভেতর থেকে বন্ধ।'

'তাহলে?' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল মর্মকুমার।

'ভাঙো দরজা।' রক্তশূন্য মুখে বলল ফাদার ঘনশ্যাম।

নিমেষে কালো সন্দেহ ঘনিয়ে উঠল মর্মকুমারের মর্মর মুখে। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে

কেশুত
কেতকে পাতার রস সংযোগে
সুগন্ধি ভেষজ কেশ তৈল
কলিকাতা-১

বলল, 'দরজা ভাঙবো কেন? সেই...সেই মেয়েটা আবার এসেছে নাকি? সিরিয়াস ব্যাপার নাকি?'

'অত্যন্ত সিরিয়াস।' অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল ফাদার।

'দরজা ভাঙার দরকার নেই', বলতে বলতে পকেট থেকে একটা বহু-ফলা ছুরি বার করল মর্মকুমার। 'এসব লক খোলার কায়দা আমার জানা আছে।'

বলে ইস্পাতের আঁকাবাঁকা তীক্ষ্ণাগ্র একটা ফলা দিয়ে কিছুক্ষণ খটাখট করে তালার বাধা সরিয়ে দিল মর্মকুমার।

এক ধাক্কায় পাল্লা খুলে দিয়ে বলল,—'দেখুন।'

দেখল ফাদার ঘনশ্যাম মণ্ডল। মর্মকুমারও দেখল এবং শিহরিত হল।

কেননা, ঘরের ঠিক মাঝখানে হাত-পা ছড়িয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছিল একটা রক্তাক্ত দেহ।

বদখৎ হিপোপটেমাস-সদৃশ দেহ। ফ্যানটাসি থিয়েটারের প্রযোজক এবং স্বত্বাধিকারী স্বয়ং জনার্দন চৌধুরী!

মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল মর্মকুমার। বিস্ময় আর আতংক প্রকট হয়ে উঠল মুখের পরতে পরতে।

আর, শোকে-দুঃখে যেন অকস্মাৎ অভিভূত হয়ে গেল ফাদার ঘনশ্যাম মণ্ডল। ভাঙা চশমার আড়ালে ছোট ছোট দুই চোখে পুঞ্জীভূত হল বিশ্বের বেদনা আর হাহাকার।

শোকাচ্ছন্ন হলেও ঘনশ্যাম পাদরীর হুঁশিয়ার মন ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করেছিল কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

প্রথম, ঘরে জনার্দন চৌধুরী ছাড়া আর কেউ নেই।

দ্বিতীয়, ঘরে একটিমাত্র দরজা ছাড়া আর কোন দরজা নেই, জানলা নেই। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত নির্জন কক্ষ। মৃদু সুর ভরা।

তৃতীয়, টেবিলের ওপর প্রজ্জ্বলিত মাত্র টেবিললাম্পের নীলাভ আলোয় ঘরটি মায়াময় হয়ে উঠেছে।

চতুর্থ, জনার্দন চৌধুরীর নিষ্প্রাণ বপুর গুঁজড়ে-পড়া মুখের তলা দিয়ে গড়াচ্ছে রুধির স্রোত। যেন কয়েকটি রক্তরাঙা সরীসৃপ গা এলিয়ে দিয়েছে পাতাল-কক্ষের মার্বেল মেঝেতে।

সময়ের হিসেব ছিল না দুজনের। ক্যানভাসে আঁকা ছবির মত কতক্ষণ যে এইভাবে দাঁড়িয়েছিল, তা খেয়াল ছিল না।

সম্বিৎ ফিরে পেয়ে প্রথমেই রুদ্ধশ্বাসে বলল মর্মকুমার,—'বস্, কিন্তু আর বেঁচে নেই।'

'না নেই', রোবটের মত নিষ্প্রাণ কণ্ঠে জবাব দিল ফাদার ঘনশ্যাম।

'হত্যাকারী যখন এ ঘরে ঢুকতে পেরেছে, তখন সটকানও দিয়েছে।'

'তা দিয়েছে।'

'খুবই অদ্ভুত ব্যাপার।'

'অদ্ভুত তো অনেক কিছুই। শুধু কি এইটাই?'

'আবার কী?' মর্মকুমারের প্রশ্ন।

'এ করিডরে আরও একটা বন্ধ দরজা আছে। সেটাও কি কম অদ্ভুত?' ফাদার ঘনশ্যামের জবাব।

'কিন্তু সে দরজা তো বন্ধ, মানে, ভেতর থেকে চাবী দেওয়া।'

'তা তো বটেই। কিন্তু তুমি ভুলে যেও না সাবিত্রী মেয়েটি সাধারণ মেয়ে নয়।'

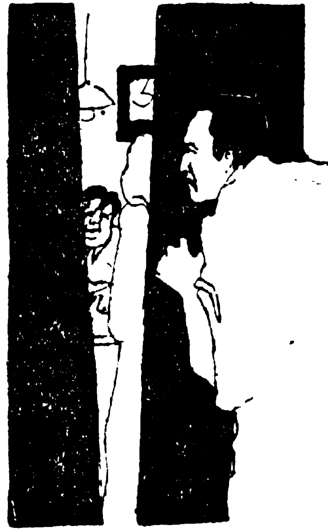
'তার মানে? তার মানে আপনি বলছেন, সাবিত্রী ব্লাফ মারছে? উশ্রী ওর সামনে দিয়েই ঘর থেকে বেরিয়েছে?'

'মোটেই তা বলতে চাই না', প্রশান্ত কণ্ঠ ফাদারের। 'আমি শুধু বলতে চাই, মেয়েদের চরিত্রের নাগাল পাওয়া তোমার আমার কাজ নয়।'

'অর্থাৎ সাবিত্রীই খুন করেছে বসকে?' মর্মকুমারের দুই চক্ষু এবার মার্বেলগুলির মতই ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইল।

'নারীচরিত্র বলতে আমি কি শুধু সাবিত্রীকেই বুঝিয়েছি? ছোরাটা চেন নাকি?'

আচমকা প্রশ্নে হকচকিয়ে গেল মর্মকুমার। তারপরেই চোখে পড়ল শোণিত-



......দেখুন?

রঞ্জিত সুদৃশ্য ছুরিকাটা। চৌকাঠ থেকে দেখা যায় নি—কিন্তু এক পা এগোতে অদূরেই দেখা গেল। কাজ শেষ করে মেঝেতেই ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেছে গুপ্তঘাতক।

মর্মকুমার বলল, 'চিনি। থিয়েটারের ছোরা। যে কেউ নিতে পারে। কিন্তু এই মুহূর্তে আমি নেব না। আঙুলের ছাপ থাকতে পারে।'

'তাহলে পুলিশ ডাকো। কিন্তু কী আশ্চর্য!' ঘরের চতুর্দিকে চোখ বুলোতে বুলোতে গম্ভীরভাবে বলল ঘনশ্যাম পাদরী। 'ভাবছি, উশ্রী মুখার্জির পক্ষে এ কাজ সম্ভব হল কিভাবে।'

'অসম্ভব। করিডরের দু প্রান্তে দুটো দরজা। দুটোই তালাবন্ধ। সাক্ষী সাবিত্রী।'

'সাবিত্রী বন্ধ দরজাই দেখেছে। কিন্তু উশ্রীর ঘরের মধ্যে যে কাচ ভেঙেছে, তা দেখে নি। আমরাও দেখি নি।'

'না দেখলেও জানি, আয়না ভেঙেছে।'

'না।' জলদ গম্ভীর কণ্ঠ ফাদারের। 'আয়না ভাঙেনি। কাচ ভেঙেছে। স্কাইলাইটের কাচ। এ পাতালপুরীর স্কাইলাইট মানেই জমির লেভেল। উশ্রী সেই পথেই পালিয়েছে অনেকক্ষণ আগে। কিন্তু আশ্চর্য তো সেটা নয়।' বলতে বলতে দু হাতে রগ টিপে ধরল ঘনশ্যাম।

'উশ্রী যদি স্কাইলাইট দিয়েই বেরিয়ে থাকে, তাহলে স্কাইলাইট দিয়েই জনার্দনবাবুর ঘরে ঢোকা তার উচিত ছিল। কিন্তু এ ঘরে তো স্কাইলাইট নেই!'

বলে, একদৃষ্টে ঘরের কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে রইল ফাদার ঘনশ্যাম মণ্ডল।

•

খবরটা শুনেই বজ্রাহত হল মেঘের কোলে ঝিকিমিকি'র পাত্রপাত্রীরা। বন্ধ হয়ে গেল রিহার্সাল।

জড়ো হল সকলে জনার্দন চৌধুরীর চেম্বারের সামনে। প্রত্যেকেই ভীত, বিস্মিত। কিন্তু ভয়-বিস্ময়ের কোন ছাপ নেই সাহানা দেবীর সুচারু আননে। অপরিসীম শোকে থমথমে সে মুখ।

কিছু দূরে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে ফাদার ঘনশ্যাম মণ্ডল। যেন অনেক অপরাধে অপরাধী।

ফিসফিস করে মর্মকুমার বললে,—'ফাদার, আমি দিব্যি গেলে বলতে পারি এ কাজ থিয়েটারের কারুর নয়। কারণ, জনার্দনবাবু আজ দুজন ভিজিটরকে ইনভাইট করেছিলেন রিহার্সাল দেখার জন্যে। তাঁরই বন্ধুর স্ত্রী আর মেয়ে। ওঁরা বরাবর বসে রিহার্সালের গোড়া থেকে দেখছেন। নয়নতারাও ছিল সেখানে। স্টেজে সবাই হাজির ছিল। বাঁশি বাজার পর বস স্টেজ থেকে নামেন। যখন ওঁর লাস আছড়ে পড়ার শব্দ পাই, তখনও রিহার্সাল চলেছে—তার পরেও মিনিট পাঁচেক চলেছে। আমরা তখন চেম্বারে দাঁড়িয়ে।'

'আজ রিহার্সালে কজনের থাকার কথা?' মৃদু কণ্ঠে প্রশ্ন করল ফাদার।

'আমি, উদয়তপন, উশ্রী, তনুশ্রী, সাহানা, হিমালয়। আমরা যখন বসের পড়ে যাওয়ার আওয়াজ শুনি, তখন হিমালয় উদয়তপনকেই ধাতানি দিচ্ছিল। তনুশ্রী আর সাহানা স্টেজেই ছিল। প্রম্পটার আর ডিরেক্টর তিন নম্বর উইংসের পাশে।'

'আর তুমি আমার কাছেই ছিলে। চাকরবাকর আজ কেউ নেই। দারোয়ান গেটেই ছিল। সাবিত্রী উশ্রীর দরজাতেই বসে ছিল। নয়নতারার সঙ্গে বাইরের দুই ভদ্রমহিলা ছিলেন অডিটোরিয়ামে। বাকী রইল শুধু উশ্রী মুখার্জি। সে তখন ঘরে ছিল না।'

'না, ছিল না', বললে মর্মকুমার। 'পুলিশ দরজা ভেঙে এই মাত্র দেখেছে, স্কাইলাইট ভাঙা। কিন্তু সে যে তারপর সিধে বাড়ীর দিকে গেছে, সে প্রমাণও আছে। সুতরাং খুন আমরা কেউ করি নি—করেছে সেই মেয়েটি।'

'কে?'

'জনার্দনবাবুর প্রথম স্ত্রী। রাতের পর রাত যে শাসিয়েছে বসকে—এ কাজ তারই।'

'আমার তা মনে হয় না।'

'কেন মনে হয় না?'

'কারণ জনার্দন চৌধুরীর আর কোন বউ নেই। সাহানা দেবীই তাঁর প্রথম ও শেষ স্ত্রী।'

'প্রমাণ?'

'তুমি যতনার রহস্যময়ী সেই স্ত্রী-লোককে দেখেছ, ততবারই থিয়েটার চল-ছিল ওপরের স্টেজে। সুতরাং সে সময়ে বাইরের কেউ অন্দরে গ্রীনরুমে যাতায়াত করতে পারে না পারলে তোমরা জানতে পারতে। অতএব সাহানা দেবীই ফুরসৎ পেলে যেতেন স্বামীর কাছে। হয়ত স্বামীর মৃত্যুর সময়ে আজও তিনি কাছেই ছিলেন। কিন্তু, তা কি সম্ভব? তখন তো তিনি ফুটলাইটের সামনে একটা মুখ্য অংশ অভিনয় করছিলেন...তবে কি...।'

বলতে বলতেই আচমকা বিপুল পরি-বর্তন এল [illegible] ঘনশ্যামের চোখে-মুখে। [illegible] ভেন্টের তড়িৎপ্রবাহ [illegible] ঘটিয়ে গেল [illegible]।

পরমুহূর্তেই [illegible] হয়ে গেল ঘনশ্যাম [illegible] মুখমণ্ডল। পরম [illegible] তাকিয়ে [illegible]।

এ লক্ষণ [illegible] মর্মকুমার। জানে, যে মুহূর্তে [illegible] ফুটে ওঠে [illegible] চোখে-মুখে, সেই [illegible] ভর করে [illegible] সামাজিক [illegible]।

[illegible] সজোরে চাপড় মেরে [illegible] করে উঠল ঘনশ্যাম পাদরী, 'উঃ, [illegible] কী বোকা আমি!'

অতিকষ্টে উত্তেজনা চেপে মর্মকুমার জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে ফাদার?'

'আমি ভুলেই গেছিলাম, এ নাটকের নাম 'মেঘের কোলে ঝিকিমিকি'।

'তার সঙ্গে বসের হত্যার কি সম্পর্ক?'

কথাটার কোন জবাব না দিয়ে ঘনশ্যাম পাদরী বলল 'একটা উপকার করবে? সাহানা দেবীকে এখানে দেখছি না। খবর পাঠাবে? তাঁর সঙ্গে এক্ষুনি আমার দেখা করা দরকার।'

মর্মকুমার নিজেই ছুটল। মিনিট কয়েকের মধ্যেই হাঁপাতে হাঁপাতে এসে জানাল—সাহানা দেবীকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না।'

*

সাহানা দেবীকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। স্টেজে নেই, গ্রীনরুমে নেই, অডি-টোরিয়ামে নেই। ফ্যানটাসি থিয়েটারের কোথাও নেই।

'না, নেই। উদয়ও উধাও হয়েছে,' আরও শুনে এল মর্মকুমার।

'বাঃ, এই তো নাটক জমেছে।' দীর্ঘ-শ্বাস ফেলে বলল ঘনশ্যাম পাদরী। 'সাহানা দেবী অশেষ বুদ্ধিমতী। আমার কথাবার্তা ধরণ-ধারণ থেকেই নিশ্চয় আঁচ করেছিলেন হাটে হাঁড়ি ভাঙতে আর দেরী নেই। তাই সময় থাকতেই গা-ঢাকা দিলেন। কিন্তু আমার দুঃখ হচ্ছে শুধু উদয়তপনের জন্যে।'

'কেন?'

'সাহানা দেবীর সঙ্গে ঘর বাঁধবার স্বপ্ন নিয়েই ও আজ ঘর ছাড়ল। কিন্তু যেদিন জানতে পারবে, ঘরণী একজন সামান্য হত্যাকারী, সেদিন তো এত সাধের স্বপ্ন টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।'

'ফাদার! ফাদার! সাহানা দেবী অসামান্যা মহিলা। তাঁকে আপনি হত্যা-কারিণী বলবেন না! জনার্দন চৌধুরী শত দোষে দোষী হলেও কোনদিন তা নিয়ে কারও কাছে অনুযোগ করেন নি তিনি। উনি মানবী নন, দেবী।'

'মর্ম, তুমি সাহানা দেবীর মর্মে প্রবেশ করার চেষ্টা করো। তাহলেই দেখবে, বাইরে দেবী হলেও ভেতরে তিনি মানবী। অতি-সাধারণ মানবী। আর একটা কথা। যে নালিশ করে না, জানবে সে সব চাইতে বিপজ্জনক।'

'প্রমাণ করুন।'

'নিশ্চয় করব, মর্ম,' ব্যথিত কণ্ঠ ফাদার ঘনশ্যামের। 'মেঘের কোলে ঝিকিমিকি' নাটক তুমিও পড়েছো, আমিও পড়েছি। কিন্তু তুমি রয়েছো নাটকের মধ্যে, আমি রয়েছি বাইরে। তাই আমি যা দেখেছি, তুমি তা দেখো নি।'

'কি দেখি নি?'

'সাহানা দেবী আর উর্শ্রী মুখার্জি যে দুটি ভূমিকায় অভিনয় করছেন, সে দুটির পার্থক্য। উর্শ্রী মুখার্জিকে নায়িকার ভূমিকা দেওয়া হয়েছে ঠিকই, সাহানা দেবী নিয়ে-ছেন সহচরীর ভূমিকা। কিন্তু উঁচুদরের যে কোন শিল্পীই বুঝবে, এ হল নিছক বাইরের ফাঁকি। অভিনয়শিল্পের সবরকম সূক্ষ্মতা সহচরীর ভূমিকাতেই আছে—নায়িকা নামেই নায়িকা—অভিনয়নৈপুণ্য দেখানোর কোন সুযোগই নেই। সাহানা দেবী তাই সুকৌশলে সহচরীর ভূমিকা নিজে নিয়েছেন। কেন নিয়েছেন? না, সাধারণ মহিলাদের মতই তিনি ঈর্ষাপরায়ণ; সাধারণ মহিলাশিল্পীর মতই তিনি ছলে-বলে-কৌশলে নাম কেনার পক্ষপাতী।'

দম নেবার জন্যে থামল ফাদার ঘনশ্যাম। ঢোক গিলে মর্মকুমার বলল, 'তা না হয় মানলাম। কিন্তু তিনি হত্যাকারিণী হতে যাবেন কোন দুঃখে? হতে চাইলেও হলেন কিভাবে? দরজা তো ভেতর থেকে বন্ধ?'

চুপ করে রইল ঘনশ্যাম মণ্ডল। চশমার কাচে বুঝি বাষ্প জমেছিল, তাই আলখাল্লার কোণ দিয়ে মুছতে লাগল। তারপর ঘাড় হেঁট করেই যেন আপন মনেই বলল, 'প্রত্যেক খুনের পেছনেই মোটিভ থাকে। এক্ষেত্রেও সাহানা দেবীর মোটিভ আছে। ভদ্রমহিলা উচ্চাভিলাষী। তাই টাকার কুমীর জনার্দন চৌধুরীকে বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু দেখা গেল স্বামীরত্নটি ফ্যানটাসির ভক্ত। শুধু ফ্যানটাসি করে যে খ্যাতির মধ্য-গগনে ওরা যাবে না, সাহানা দেবী তা বুঝেছিলেন, তাই খিটিমিটি লেগে থাকত নিয়মিত। সম্ভবত বিবাহ-বিচ্ছেদের হুমকিও দিয়েছিলেন সাহানা দেবী। দুজনের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক আদৌ ছিল না, ছিল স্বার্থের সম্পর্ক। তাই জনার্দনের জগৎ থেকে মুক্তি পাওয়ার ফন্দী আঁটলেন সাহানা দেবী। অতিকষ্টে 'মেঘের কোলে ঝিকি-মিকি' নাটক মঞ্চস্থ করার আয়োজন করলেন।

'মর্ম', নাটকের মধ্যে থেকেও একটা বিষয় তুমি কিছুতেই খেয়াল করতে পারো নি। নাটক শুরু হওয়ার কিছু পরেই পাত্র-পাত্রীরা সবাই হাজির থাকেন স্টেজে। সাহানা দেবীও। কিন্তু মজাটা কি, তা তুমিও জানো। সহচরীর সংলাপ শোনা যায় বিভিন্ন উইংসের আড়াল থেকে—কিন্তু মিনিট কয়েকের জন্যে তাঁকে স্টেজে চাক্ষুস দেখা যায় না। কিছু বুঝলে?'

মর্মকুমার আর একবার ঢোক গিলে বলল, 'এ রকম সীন তো আছেই, অডি-টোরিয়াম থেকে সহচরীকে দেখা না গেলেও কয়েক মিনিট অন্তর অন্তর তাঁর সংলাপ শোনা যায়।'

'দুটি সংলাপের মধ্যে যে সময়ের ব্যবধান, সেই কয়েকটি মিনিটের মধ্যেই কাজ সেরেছেন সাহানা দেবী। স্টেজ থেকে নেমে গিয়ে স্বামীকে পেছন থেকে ছোরা মেরে আবার এসে দাঁড়িয়েছেন উইংসের আড়ালে।'

'কিন্তু কিভাবে? কিভাবে?'

অদ্ভুত চোখে তাকাল ঘনশ্যাম মণ্ডল। বলল, 'মর্ম', তোমার মুখেই শুনেছি, উদ্ভট ফ্যানটাসি নাটক মঞ্চস্থ করার উদ্দেশ্য নিয়েই উদ্ভট প্ল্যানমাফিক এ থিয়েটার তৈরী করেছেন জনার্দন চৌধুরী। বলে-ছিলেন, স্টেজের মধ্যে অজস্র গুপ্তপথ আছে। সে পথ দিয়ে জনার্দন চৌধুরীর চেম্বার থেকে আরম্ভ করে গ্রীনরুম, অডি-টোরিয়ামেও যাওয়া যায়। কেমন, তাই কিনা?'

লাফিয়ে উঠল মর্মকুমার—'তাহলে—'

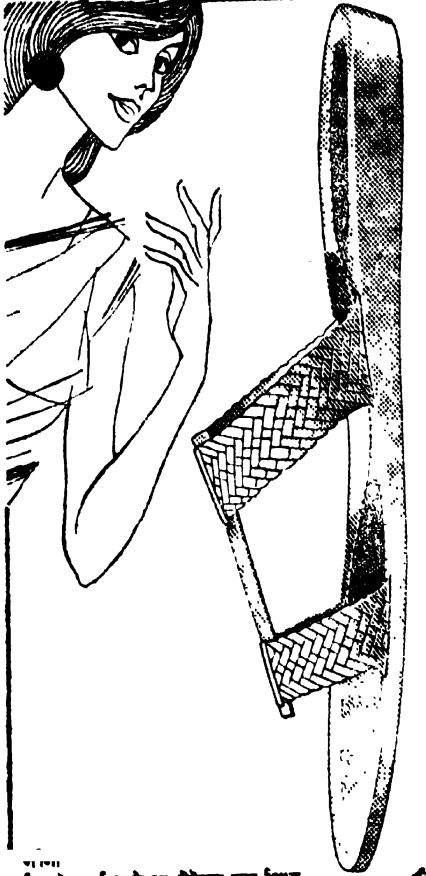
'সেই পথেই এসেছেন সাহানা দেবী। গুপ্তপথ সঙ্কীর্ণ নয়। তাই নিজেই মামুলী পোশাকে রিহার্সালের আয়োজন করেছেন। তা না হলে সহচরীর অত পোশাকের বোঝা নিয়ে সহজে আর নিঃশব্দে যাতায়াত করা যেত না। ছোরা দিয়ে পেছন থেকে মোক্ষম ঘা মেরেই ফিরে এসেছেন গুপ্তপথে। ভেবেছিলেন, দু দিনেই সব মিটে যাবে। তারপর জনার্দনের কুবেরের সম্পত্তি নিয়ে নতুন করে জীবন শুরু করবেন। সঙ্গে থাকবে উদয়তপন লাহিড়ী। কিন্তু—'

বলেই চুপ করে গেল ঘনশ্যাম।

'কিন্তু কী?' জানতে চাইল মর্মকুমার।

'আমি আজ এখানে না এলেই ভাল করতাম', বিষাদ-গম্ভীর কণ্ঠে বলল ফাদার ঘনশ্যাম মণ্ডল। মুখ দেখে মনে হল যেন অনেক অপরাধে অপরাধী তার মন।*

* বিদেশী ছায়াশ্রয়ে



স্যানডাকের এই নতুন নকশায় সারাদিনের স্নিগ্ধতা

বাটার এই স্যানডাক্ লীলা—দিনভর পায়ের পাতা স্নিগ্ধ রাখতেই তৈরি। এর গড়ন আর উপকরণ, নির্মাণ আর নকশা সব কিছুতেই সারাদিনের সজীবতা। শীতল, খোলা-মেলা 'মিউল' ফ্যাশন, আরামে পা পাতবার উপযুক্ত গোড়ালি, স্নিগ্ধ মনোরম রঙ, হাটতে চলতে খুশি হয়ে উঠবে আপনার পা-দুটি। বালিকা, তরুণী, মহিলা—সকলের জন্য স্যানডাক্ লীলা। সারাদিনের স্নিগ্ধতা।

বাটার উন্নত বিশিষ্ট সংমিশ্রণ কেমিলনে তৈরি, এতে জুতোর গড়ন আর উজ্জ্বলতা বরাবরই একরকম থাকে, সব সময়েই মনে হয় যেন নতুন কেনা, ধুলো-ময়লা-কাদায় একটুও মলিন হয় না। সদা-কেনা'র উজ্জ্বলতা ফিরিয়ে আনতে মোটেই ঝামেলা নেই, ভেজা কাপড়ের দু-এক ঝাপটা, ব্যস্, ধুলো-কাদা, ময়লা দাগ নিমেষে উধাও।

আজই আসুন বাটার দোকানে,
সবার আগে বেছে নিন আপনার স্যানডাক্ লীলা।
নতুন যুগের নতুন জুতো।

মিস্ট্ ব্লু, মিস্ট্ গ্রে, উইকার আর পিংক
সাইজ ১০ থেকে ১ : ৭.৯৫
২ থেকে ৬ : ৯.৫০



স্যানডাক্*

কেমিলন*

Bata লীলা

নতুন যুগের নতুন জুতো

* রেজিস্টার্ড ট্রেড মার্কস্। বাটা-অনুমোদিত-বিধিমতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রস্তুত





লালবাহাদুরনগরে কংগ্রেস অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বক্তৃতা করছেন।

দেশে বিদেশে

কংগ্রেসের আত্মপ্রত্যয়

হায়দরাবাদে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ৭১তম অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবে ও কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পার ভাষণে এই প্রতিষ্ঠানের এমন একটা আত্মপ্রত্যয়ের সুর শোনা গেল যেটা কতকটা অপ্রত্যাশিত ছিল।

এই আত্মপ্রত্যয় অপ্রত্যাশিত ছিল এই কারণে যে, হায়দরাবাদের অধিবেশনের প্রাক্কালে মনে হচ্ছিল কংগ্রেস নিজের ঘরোয়া সমস্যা নিয়েই বেশী বিব্রত এবং এই অবস্থায় কংগ্রেস ভারতবর্ষের রাজনীতিতে সক্রিয় হস্তক্ষেপ করার মত কোন সার্থক ভূমিকা খুঁজে পাবে এমন আশা করা যায় নি। কংগ্রেসে শ্রীকামরাজের সভাপতিত্বের আমলের শেষদিকে তাঁর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বিশেষ বনিবনা হচ্ছিল না, একথা জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। শ্রীকামরাজের পর কংগ্রেসের সভাপতি কে হবেন, সেই সমস্যাটা প্রায় একটা সংকটের মত কংগ্রেসের সামনে উপস্থিত হয়েছিল। তার পর শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পার নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যখন সেই সংকটের অবসান হল তখন আবার নূতন সমস্যা দেখা দিল কংগ্রেস অধিবেশন কোথায় হবে তা নিয়ে। কংগ্রেসের অধিবেশনের জন্য নির্বাচিত হয়েছিল মহারাষ্ট্রের সাংলি। মহীশূর ও মহারাষ্ট্রের মধ্যে সীমানা বিরোধ যে আকার ধারণ করেছে তাতে মহারাষ্ট্রে একজন মহীশূরী নেতার সভাপতিত্বে কংগ্রেস অধিবেশন করা যাবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ দেখা দিচ্ছিল। ডিসেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী (ও মহারাষ্ট্রের নেতা) শ্রী ওয়াই বি চাবন সাংলিতে কংগ্রেস অধিবেশনের জন্য নির্বাচিত স্থানটি দেখতে গেলে সম্পূর্ণ মহারাষ্ট্র সমিতির বিক্ষোভকারীরা মহীশূর-মহারাষ্ট্র সীমানা বিরোধ সংক্রান্ত মহাজন কমিশনের রায়ের বিরুদ্ধে প্রবল বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন। সাংলিতে কংগ্রেস অধিবেশন হলে সেখানে নবনির্বাচিত কংগ্রেস সভাপতি নিজলিঙ্গাপ্পার জন্য কি ধরনের অভ্যর্থনা অপেক্ষা করে আছে সেটা বোঝা গেল। কংগ্রেসের পক্ষে সুবিধা হয়ে গেল যখন কয়নার ভূমিকম্প অন্যান্য স্থানের মধ্যে সাংলিও ক্ষতিগ্রস্ত হল। এই ভূমিকম্পের অজুহাত দিয়ে শেষ মুহূর্তে কংগ্রেসের অধিবেশন সাংলি থেকে সরিয়ে নিয়ে এসে হায়দরাবাদে অনুষ্ঠিত করা হল। মাত্র পনেরো দিনের নোটিশে হায়দরাবাদের কংগ্রেস অধিবেশনের জন্য লালবাহাদুর নগর গড়ে তোলা হল।



নতুন কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা

কংগ্রেস অধিবেশনের কয়েকদিন আগেও কেউ জানতেন না এবারকার অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় কি হবে। যেহেতু চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর এই প্রথম ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন হচ্ছে সেহেতু এটুকু আশা করা হচ্ছিল যে, এই নির্বাচনের ফলাফল এবারকার কংগ্রেস অধিবেশনে বিশ্লেষণ করা হবে। কিন্তু এই বিশ্লেষণ করতে হলে অনিবার্যভাবেই পূর্ববর্তী নির্বাচনগুলির তুলনায় এবার কংগ্রেসের ব্যর্থতার প্রসঙ্গটিই বড় স্থান অধিকার করবে, একথা স্বভাবতই অনুমান করা হয়েছিল। কেন কংগ্রেস নির্বাচকদের আস্থা হারিয়েছে? কেন কংগ্রেস ভারতবর্ষের রাজ্যগুলির অর্ধাংশে ক্ষমতা নিজেদের আয়ত্তে রাখতে পারে নি? এইসব আত্ম-সমালোচনামূলক প্রশ্নই এবারকার কংগ্রেস অধিবেশনকে আচ্ছন্ন করে রাখবে, এটাই ছিল রাজনৈতিক মহলের অনুমান।

কিন্তু হায়দরাবাদের কংগ্রেস অধিবেশনে সেই আত্মসমালোচনা বা আত্মসমীক্ষার সুরটি বিস্ময়করভাবে অনুপস্থিত দেখা গেল। সেখানে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকের প্রথম দিন থেকেই দলের উচ্চতম নেতৃত্বের মধ্যে একটা আক্রমণাত্মক রণ-কৌশলের জন্য দলকে প্রস্তুত করে তোলার ব্যগ্রতা দেখা গেল। দেশ যখন অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে বিব্রত তখন সেই সমস্যা সম্পর্কে কংগ্রেসের অধিবেশনে কোন প্রস্তাব গৃহীত হল না। নির্বাচনে ব্যর্থতার কারণ নির্দেশ করে এবং সেই কারণগুলি দূর করার জন্য কোন পথের নির্দেশ দিয়ে এবার কোন প্রস্তাব গৃহীত হল না। রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর একটি মাত্র প্রস্তাব গ্রহণ করে এবার কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ করা হল।

প্রস্তাবের অধিকাংশ জুড়ে রয়েছে বিভিন্ন রাজ্যে গঠিত যুক্তফ্রন্ট সরকারগুলির

কার্যকলাপের সমালোচনা। বলা হয়েছে, "বিভিন্ন রাজ্য সরকারের অংশীদার কতক-গুলি রাজনৈতিক দলের গণতন্ত্রে অথবা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কোন বিশ্বাস নেই। এই দলগুলির একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তারা যে ক্ষমতা লাভ করেছে সেই ক্ষমতা ব্যবহার করে হিংসা ও বিশৃংখলার মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার চেষ্টা করা। কোয়ালিশন সরকারগুলির মধ্যে সক্রিয় কিছু প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিও আছে যাদের ধর্ম-নিরপেক্ষতায় কোন বিশ্বাস নেই। তারা খোলাখুলি সাম্প্রদায়িক মনোভাব গ্রহণ করেছে। এর ফলে আইন ও শৃংখলা নষ্ট হয়ে গেছে এবং সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বেড়েছে। এইভাবে, এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে জনসাধারণ অকংগ্রেসী সরকার-গুলি সম্পর্কে মোহমুক্ত হয়ে উঠছে।......... কংগ্রেস তার জনসেবার দীর্ঘ ইতিহাসে জনগণের আস্থা অর্জন করে এসেছে। বারবার কংগ্রেস জনসাধারণের কাছ থেকে ক্ষমতা লাভ করেছে। আজ কংগ্রেসের এই কর্তব্যে পরিণত হয়েছে যে, গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার জন্য ও দেশের অখন্ডতা, নিরাপত্তা ও অগ্রগতিকে সুনিশ্চিত করার জন্য সে তার যথাশক্তি নিয়োগ করবে।"

ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রে কংগ্রেসের বিশ্বাস পুনরায় ঘোষণা করে প্রস্তাবে এই বলে কংগ্রেস সংগঠন ও কংগ্রেস সরকারের কর্তব্য নির্দেশ করা হয়েছে যে, তাদের দেশের অখন্ডতা রক্ষা করতে হবে, সর্বপ্রকার বিভেদাত্মক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে, হিংসার ক্রমবর্ধমান শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে, জনসংযোগকে প্রসারিত করতে হবে এবং নূতন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হওয়ার জন্য কংগ্রেস সংগঠনের সংস্কার করতে হবে।

স্পষ্টতই এই "নূতন চ্যালেঞ্জ" হচ্ছে বিভিন্ন রাজ্যে অকংগ্রেসী সরকারগুলির, বিশেষ করে যুক্তফ্রন্ট সরকারগুলির উদ্ভব—যেটা কংগ্রেস সভাপতির ভাষায় দেশকে এমন একটা দিকে নিয়ে যাচ্ছে যেখান থেকে ফেরার আর রাস্তা থাকবে না। শ্রীনিজ-লিংগাপ্পা স্পষ্ট করেই বলেছেন যে, বর্তমানে একটি মাত্র দলই আছে যে দল কেন্দ্রে ও অধিকাংশ রাজ্যে শাসন পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে, সেই দল হচ্ছে কংগ্রেস।

অর্থাৎ হায়দরাবাদ কংগ্রেসের ফলশ্রুতি এই যে, ভারতবর্ষে কংগ্রেসী ও অকংগ্রেসী সরকারগুলির সহাবস্থানের পর্যায় শেষ হতে চলেছে, এখন থেকে কংগ্রেসের চেষ্টা হবে অকংগ্রেসী সরকারগুলিকে সরিয়ে দিয়ে শাসনক্ষমতা নিজেদের হাতে আনার।

নির্বাচনে ব্যর্থতার এত অল্প পরেই কংগ্রেস এই ধরনের আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণ করার মত আত্মপ্রত্যয় পেল কি করে সে বিষয়ে নানা ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে। এমনও হতে পারে যে, একটা দুঃসময়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে কংগ্রেসের নেতারা নিজেদের দলের সাধারণ সদস্যদের সামনে একটা আশার ছবি তুলে ধরে তাঁদের মধ্যে নূতন উদ্দীপনার সঞ্চার করতে চাইছেন।

অবশ্য এই আশার ছবি একেবারেই বাস্তব ভিত্তিহীন এমন নয়। বিভিন্ন রাজ্যে যুক্তফ্রন্ট সরকারগুলির বিভিন্ন শরিকের মধ্যে কোন্দল এই সম্ভাবনার সৃষ্টি করছে যে, পশ্চিমবঙ্গ ও পাঞ্জাবের মত আরও কতকগুলি রাজ্যে অকংগ্রেসী কোয়ালিশন সরকারের পতন আসন্ন এবং এই সরকারগুলির স্থান গ্রহণ করার জন্য কংগ্রেসকে প্রস্তুত হতে হবে। বিহারে যুক্তফ্রন্ট সরকারের ব্যর্থতার জন্য দক্ষিণপন্থী কম্যুনিস্ট পার্টি ও জনসংঘ পরস্পরের উপর চাপ দিচ্ছে। উত্তরপ্রদেশে সংযুক্ত বিধায়ক







দলের নেতৃত্ব থেকে শ্রীচরণ সিংকে সরাবার জন্য এখন কম্যুনিস্ট পার্টি ও এস এস পি-র সংগে জনসঙ্ঘ দলও যোগ দিয়েছে। কেরলের দক্ষিণপন্থী কম্যুনিস্ট পার্টিভুক্ত মন্ত্রী শ্রী টি ভি টমাস প্রকাশ্যেই মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনাম্বুদ্রিপাদের সমালোচনা করে বলেছেন যে, যুক্তফ্রন্ট সরকারের ব্যর্থতার জন্য সংবিধানের সীমাবদ্ধতার দোহাই পাড়া বা কেন্দ্রীয় সরকারকে দায়ী করা একটা অযৌক্তিক কৈফিয়ৎ।

মহাত্মা শিশির-কুমার তিরোভাব মহোৎসব

২৪শে ও ২৫শে পৌষ, মঙ্গল ও বুধবার দুইদিনসব্যাপী বাগবাজার ১৪নং আনন্দ চাটার্জি লেনে অমৃতবাজার পত্রিকা ভবনে মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের তিরোভাব মহোৎসব উদ্‌যাপিত হয়।

বিভিন্ন দিনের অনুষ্ঠানে ভ্রমণ কীর্তন, ভক্তিমূলক গান, অভিনয় প্রভৃতি পরিবেশিত হয়। দুটি দিনের অনুষ্ঠানসূচীতে ছিল : ২৪শে পৌষ, মঙ্গলবার, শ্রীগৌরপদ কীর্তনে—শ্রীসত্যরঞ্জনের মুখোপাধ্যায়; শ্রীবাণী ঘোষের পরিচালনায় দেব-গীতাঞ্জলী সঙ্ঘের ভজন-গীতি; 'মীরাবাঈ' গীতি আলেখ্য। অধ্যাপিকা শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায় কথিক-সরস্বতী কর্তৃক গৌর-কথা। নিখিল বৈষ্ণব সম্মিলনীর উদ্যোগে বৈষ্ণব সম্মেলন; সভাপতি শ্রীমৎ যোগেশ ব্রহ্মচারী। মঙ্গলাচরণ—প্রভুপাদ শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গোস্বামী। উদ্বোধক অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস। উদ্বোধন সংগীতে—শ্রীমতী মীরা ব্যানার্জি। রাত্রি সাড়ে আটটায়—রামায়ণ কণ্ঠে শ্রীঅনাথবন্ধু অধিকারী ও কুমারী গায়ত্রী অধিকারী কর্তৃক রামায়ণ গান।

২৫শে পৌষ বুধবার শ্রীঅমিয় নিমাই চরিত পাঠ করেন শ্রীগৌরী লাহিড়ী; শ্রীমদভাগবত পাঠ করেন—শ্রীপ্রমথনাথ ভাগবত শাস্ত্রী; শ্রীগৌরাঙ্গ সংগীতে—শ্রীসুবোধ দাস ও শ্রীপ্রণতি দে। কথিকা-সম্রাজ্ঞী শ্রীমতী ক্ষান্তিলতা দেবী ভাগবত ভারতী কর্তৃক কথকতা; স্মৃতি-সভা। সভাপতি—ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমৎ ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজ। উদ্বোধক—প্রভুপাদ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ গোস্বামী। প্রধান বক্তা—অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী। উদ্বোধন সঙ্গীতে—শ্রীভূপেন দাস। শিশিরায়ণ বন্দনায়—কবি শ্রীপান্না মাইতি। অমৃত সংগীত সমাজের বাউল গান। পরিচালনায়—মৃদঙ্গ-ভূষণ শ্রীগৌরাঙ্গ দাস। শ্রীলক্ষ্মণ হাজরা ও সম্প্রদায় কর্তৃক ভজন-গীতি।

বৈষয়িক প্রসঙ্গ

শ্রীদেশাইর আশ্বাস

"সঙ্কটের চরম মুহূর্ত কেটে গেছে" শ্রীমোরারজী দেশাই হায়দরাবাদে কংগ্রেস অধিবেশনের মঞ্চ থেকে জাতিকে এই আশ্বাসবাণী শুনিয়েছেন।

কংগ্রেসের বিষয় নির্বাচনী কমিটির কাছে দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বিবরণ দেবার সময় শ্রীদেশাই এই কথা বলেন। অর্থনৈতিক অবস্থা যে উন্নতির দিকে যাচ্ছে তার প্রমাণ স্বরূপ তিনি বলেন, ১৯৬৭ সালের অক্টোবরের পর জিনসপত্রের দাম প্রায় পাঁচ শতাংশ কমেছে। বাজারে ফসল ওঠার সঙ্গে সঙ্গে দাম আরো কমতে পারে। রপ্তানীর পরিমাণ বাড়তির দিকে যেতে শুরু করেছে। শিল্পের উৎপাদনও সাধারণভাবে বাড়ছে।

শ্রীদেশাই বলেন, তিনি ৯ কোটি ৫০ লক্ষ টন খাদ্য উৎপাদনের আশা করছেন। তাতে খাদ্য দুশ্চিন্তা সবটা দূর হবে না। তবে কিছুটা সুরাহা হবে। তাঁর বিশ্বাস, তিন চার বছরের মধ্যেই দেশ খাদ্যশস্যে স্বয়ম্ভর হবে। তার জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হচ্ছে। ১৯৬৬-৬৭ সালে চাষীদের মধ্যে দশ লক্ষ টন সার বিতরণ করা হয়েছিল। সে তুলনায় ১৯৬৫-৬৬ সালে হয়েছিল মাত্র পাঁচ লক্ষ টন। বেশির ভাগ সবই এখন মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে আমদানী করতে হয়। ১৯৭১-৭২ সাল নাগাদ ভারত ২০ লক্ষ ৭৫ হাজার টন নাইট্রোজেন সার উৎপাদন করতে পারবে। ফসফেট সারের উৎপাদনও সেই পরিমাণে বাড়বে।

গত চার বছরের 'কঠিন' অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পর্যালোচনা করে শ্রীদেশাই বলেন, এই সময়ের মধ্যে দুটো যুদ্ধ এবং দুটো খরা দেশের ওপর দিয়ে গেছে। তার ওপর এমন কতকগুলি ব্যাপার ছিল যা আগে থেকে হিসাব করা সম্ভব ছিল না। সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতার দরুন ১৯৬৬-৬৭ সালে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা চালু করা যায়নি। চীনা আক্রমণের পর প্রতিরক্ষার ব্যয় তিনগুণে বাড়াতে হয়েছিল, এবং বাড়ানো হয়েছিল বলেই ১৯৬৫ সালে পাকিস্থানের যুদ্ধ ততটা মারাত্মক হয়ে উঠতে পারেনি।

১৯৬৫-৬৬ ও ১৯৬৬-৬৭ এই দু' বছরে খাদ্যের উৎপাদন তিন কোটি টন হ্রাস পায়। এর ফলে প্রকৃত জাতীয় আয় ঐ সময়ে ছিল ৩·২ শতাংশের কম, আর মাথাপিছু আয় ছিল ৭·৭ শতাংশেরও কম। এর ফলে জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা কমে যায়। তার ওপর ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পে মন্দা অনেকেরই আয় সঙ্কুচিত করে, বেকার সমস্যা তীব্রতর হয়। মুদ্রামূল্য হ্রাসের পর যেমন আশা করা গিয়েছিল তেমন ভাবে রপ্তানী বাড়েনি। আমদানী মূল্য বেড়ে যাবার ফলে উৎপাদনের ব্যয়ও বেড়ে যায়। তবে বর্তমানে যে সব আশাব্যঞ্জক ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে তাতে শ্রীদেশাই মনে করেন সংকটের চরম মুহূর্ত কেটে গেছে।

শ্রীদেশাই জানান প্রতিরক্ষা ব্যয়ে কোন রকম ছাঁটকাটের আশা নেই। তবে দক্ষতা হ্রাস না করে যতটুকু সাশ্রয় করা সম্ভব তা করা হবে। বৈদেশিক সাহায্য সম্পর্কে তাঁর অভিমতঃ যদি পাওয়া যায় তাহলেও উদ্বিগ্ন হবার কিছু নেই।

তিনি বলেন, নানাবিধ অসুবিধার দরুণ সরকার এখন বাৎসরিক পরিকল্পনার পন্থা গ্রহণ করেছেন। এর ফলে অর্থনৈতিক অবস্থা আরো ভালোভাবে খতিয়ে দেখা এবং আরো অর্থপূর্ণ চতুর্থ পরিকল্পনা রচনা করা সম্ভব হবে।

এই প্রসঙ্গে বিষয় নির্বাচনী কমিটির সদস্যদের প্রশ্নের উত্তরেও শ্রীদেশাই কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেন। কংগ্রেসের দশ দফা কর্মসূচী রূপায়ণে ঢিলের অভিযোগ তিনি অস্বীকার করেন এবং ব্যাংক জাতীয়করণের দৃষ্টান্ত দিয়ে তা প্রমাণ করতে চান। তিনি বলেন, জাতীয়করণ করলে কেবল সরকারের বোঝাই বাড়তো, ব্যাঙ্কগুলির পরিচালন-ব্যবস্থার উন্নতি করতে পারতো না। তার চাইতে ব্যাংকের কার্যকলাপ সামাজিক কল্যাণে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে তার ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের ব্যবস্থাটি অনেক বেশী লাভজনক।

সদস্যদের কেউ কেউ দারিদ্র্য দূর করার জন্যে তেমন কিছু করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেন। তাঁদের প্রতি শ্রীদেশাইর বক্তব্যঃ তিনি এমন কোন সমাধানের কথা জানেন না যার দ্বারা চার-পাঁচ বছরের মধ্যে ৫০ কোটি লোকের দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব। এই ধরনের শ্লোগানবাজীকে তিনি ঠাট্টা করে বলেন, যদি কেউ তেমন সমাধান নিয়ে এগিয়ে আসতে পারেন তাহলে তিনি তাঁকে গুরু বলে স্বীকার করবেন।

বিজ্ঞানের কথা

শুভংকর

ভারতে পরমাণু শক্তির বিশ বছর

বর্তমানে আমরা যে যুগে বাস করছি সে যুগকে বিজ্ঞানের ভাষায় অভিহিত করা হয় 'পারমাণবিক যুগ।' আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে এই যুগের সূচনা, যেদিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ফের্মি 'শৃঙ্খল ক্রিয়ার' (চেন রি-অ্যাকশন) দ্বারা পরমাণুর অন্তর্নিহিত অপরিমিত শক্তির সন্ধান দেন। তারপর প্রলয়ংকর মারণাস্ত্ররূপে এবং মানব-কল্যাণকর কাজে উভয় রূপেই এই পরমাণুশক্তির বিকাশ আমরা দেখেছি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত রাশিয়া, ব্রিটেন, ফ্রান্স, চীন প্রভৃতি পৃথিবীর প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রগুলি পরমাণুশক্তি করায়ত্ত করার সঙ্গে সঙ্গে ভারতও এই শক্তির ব্যবহারে এগিয়ে এসেছে। কিন্তু শান্তির পূজারী ভারত মারণাস্ত্র নির্মাণের জন্যে এই শক্তিকে ব্যবহার করতে উদ্যোগী হয় নি, মানুষের কল্যাণকর কাজে পরমাণুশক্তি ব্যবহার করতে সে এগিয়ে এসেছে। আজ পরমাণু-শক্তি উৎপাদনে ও ব্যবহারে অগ্রগণ্য ৬টি দেশের মধ্যে ভারত অন্যতম।

আজ থেকে কুড়ি বছর আগে ১৯৪৮ সালে ভারতের পরমাণুশক্তি কমিশন গঠনের মধ্য দিয়ে ভারত বিজ্ঞানের এই নতুন রাজ্যে প্রবেশ করে। ভারতে পরমাণুশক্তি বিকাশের আশু সম্ভাবনা দুজন অগ্রগণ্য ভারতীয় বিজ্ঞানীর দূরদৃষ্টিতে পূর্বাহ্নে ধরা পড়েছিল। তাঁদের একজন ডঃ মেঘনাদ সাহা এবং অপরজন ডঃ হোমী জাহাঙ্গীর ভাবা। ১৯৪৪ সালে যখন অতি অল্প লোকেই পরমাণুশক্তির কথা শুনেছে, তখন ডঃ ভাবা তাঁর দূরদৃষ্টি নিয়ে লিখেছিলেন : আগামী কয়েক দশকের মধ্যে পরমাণুশক্তি যখন শক্তি উৎপাদনের কাজে সাফল্যজনক-ভাবে ব্যবহৃত হবে, তখন ভারতকে এ-বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের জন্যে বিদেশের দিকে তাকাতে হবে না, তাঁদের এদেশেই খুঁজে পাওয়া যাবে।

ডঃ মেঘনাদ সাহাও পরমাণুশক্তির গুরুত্ব পূর্বাহ্নে উপলব্ধি করেছিলেন। মুখ্যত তাঁরই চেষ্টায় এদেশে পরমাণুশক্তি সম্পর্কে সঠিক পাঠন ও গবেষণার উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজের প্রাঙ্গণে ইনস্টিট্যুট অফ নিউ-ক্লিয়ার ফিজিকস স্থাপিত হয়। ১৯৫০ সালে বিশ্ববিশ্রুতা মাদাম কুরীর স্বনামধন্যা কন্যা ইরিন জোলিও কুরী এই ইনস্টিট্যুটের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। ডঃ সাহার তিরোধানের পর তাঁর স্মৃতিতে এর নাম-করণ হয়েছে সাহা ইনস্টিট্যুট অফ নিউ-ক্লিয়ার ফিজিকস।

১৯৪৮ সালের বোম্বাই-এর সমুদ্রোপ-কূলে ট্রম্বেতে ভারতীয় পরমাণুশক্তি কমি-শনের কাজ যখন শুরু হয়, তখন এদেশে পরমাণুশক্তি সম্পর্কে অভিজ্ঞ বিজ্ঞানী



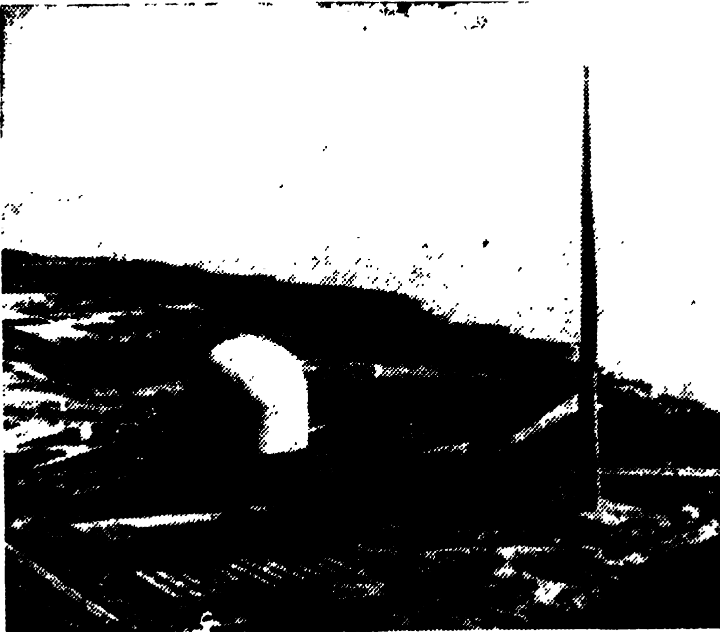
ভারতের পরমাণুশক্তি প্রকল্পের প্রধান স্থপতি ডঃ হোমী ভাবা

স্বল্প কয়েকজন মাত্র ছিলেন। প্রাথমিক পর্যায়ে কমিশনের কর্মসূচীর মধ্যে ছিল প্রয়োজনানুরূপ বিশুদ্ধ উপকরণ প্রস্তুতের জন্যে সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা, নতুন উপকরণ ও পদার্থের প্রয়োজনীয় নতুন কারু-কৌশল উদ্ভাবন এবং রিঅ্যাক্টর বা পর-মাণুচুল্লী নির্মাণের কারুকৌশল উদ্ভাবন। এ ব্যাপারে বৃটেনের পরমাণুশক্তি সংস্থা এবং অন্যান্যেরা তাঁদের অভিজ্ঞতা দিয়ে অনেকখানি সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু ডঃ ভাবা গোড়া থেকেই জোর দিয়েছিলেন কাল বিলম্ব না করে ভারতকে তার নিজস্ব অভিজ্ঞ বিজ্ঞানীদল গড়ে তুলতে হবে যাতে না অন্যের ওপর দীর্ঘকাল নির্ভর করে থাকতে হয়।

১৯৫৪ সালের মধ্যে কমিশনের বিবিধ কার্যক্রম বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপকভাবে গড়ে ওঠে। সুষ্ঠু কার্যপরিচালনার জন্যে কমি-শন কার্যধারা কেন্দ্রীভূত করে ট্রম্বেতে পরমাণুশক্তি সংস্থা স্থাপন করে। বলাই বাহুল্য, ডঃ ভাবা এই সংস্থার প্রথম অধি-কর্তা পদে বৃত হন। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এই সংস্থা আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করে। এই খ্যাতি শুধু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তার বিশেষ কৃতিত্বের জন্যে নয় ব্যাপকভাবে রচিত তার কর্মধারার জন্যেও ভারত পরমাণুশক্তিসম্পন্ন জাতিগুলির প্রথম দলে স্থান লাভ করে।

১৯৫৬ সালে ভারত গবেষণাকার্যের উপযোগী তার প্রথম পরমাণুচুল্লী নির্মাণ করে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, এই চুল্লী নির্মাণের কাজে ভারত তার নিজস্ব উপকরণ ও ব্যক্তি-সম্পদ নিয়োগ করেছিল। 'অপ্সরা' নামে অভিহিত এই প্রথম পরমাণুচুল্লীর ক্ষমতা এক মেগাওয়াট।

এরপর নির্মিত হয়েছে পরীক্ষামূলক বৃহদাকার দ্বিতীয় পরমাণুচুল্লী 'সাইরাস'। এই চুল্লীর শক্তি হচ্ছে ৪০ মেগাওয়াট।



ট্রম্বের ভাবা পরমাণুশক্তি গবেষণাকেন্দ্রের একাংশ

কলম্বো পরিকল্পনায় কানাডার সহযোগিতায় এটি নির্মিত হয়েছে। গোড়ার দিকে ক্ষার-জনিত সমস্যা এবং শীতলীকরণ যন্ত্রপাতিতে ব্যাকটিরিয়া জন্মাবার দরুণ চুল্লীর কাজ ব্যাহত হয়েছিল। শীতলীকরণ যন্ত্রপাতিতে উপসাগরের অপেক্ষাকৃত উষ্ণ জল ব্যবহার করা হয়েছিল এবং তার ফলে এই সমস্যার সৃষ্টি হয়। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই ভারতীয় বিজ্ঞানীরা ও যন্ত্রবিদেরা এই সমস্যাগুলির সন্তোষজনক সমাধান করে তাঁদের কর্মদক্ষতার পরিচয় দেন।

তৃতীয় পরমাণুচুল্লীটি হচ্ছে গবেষণা-কার্যের উপযোগী শূন্যশক্তির চুল্লী। এটি 'জারলিনা' নামে অভিহিত। তিনটি গবেষণা-মূলক পরমাণুচুল্লীর সাহায্যে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা বিবিধ প্রকার গবেষণা পরিচালনে সমর্থ হন। সেই সঙ্গে তাঁরা পরমাণুচুল্লী পরিচালনের কারুকৌশল সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন এবং ভবিষ্যতে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের জন্য বৃহদাকার পরমাণুচুল্লী কিভাবে নির্মাণ করা যাবে সে সম্বন্ধেও জ্ঞান অর্জন করেছেন।

এরপর ডঃ ভাবা ভারতে পারমাণবিক জ্বালানীর উপাদান প্রস্তুতের ব্যবস্থা করেন, যাতে বিদেশ থেকে জ্বালানী আর ক্রয় করতে না হয়। ১৯৫৮ সালে ইউরেনিয়াম ধাতুর প্লান্ট স্থাপিত হয় এবং পরবর্তী বছরে বিশুদ্ধ ধাতুপিন্ড ঢালাই হয়। এরপর ভারতীয় বিজ্ঞানীরা নিরলস প্রচেষ্টায় পারমাণবিক জ্বালানীর উপাদান প্রস্তুতে যে অনন্য সাফল্য অর্জন করেন তা তাঁদের বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক। বিদেশের ধাতুবিশেষজ্ঞরা এই উপাদান পরীক্ষা করে একে প্রথম শ্রেণীর পারমাণবিক জ্বালানী বলে অভিমত প্রকাশ করেন। এতে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের আস্থা বৃদ্ধি পায় এবং তাঁরা দৃঢ় আস্থা নিয়ে ভবিষ্যৎ কর্মোদ্যমে অগ্রসর হন।

পরমাণুশক্তিসম্পন্ন অপরাপর জাতির মতো ভারতও ধাপে ধাপে উন্নততর ধরনের পরমাণুচুল্লী নির্মাণের কর্মসূচী প্রণয়ন করেছে, যাতে এদেশে প্রস্তুত পারমাণবিক জ্বালানীর সুষ্ঠু সদ্ব্যবহার করা যায়। প্রথম শ্রেণীর শক্তি-উৎপাদক পরমাণুচুল্লী গঠিত হবে স্বাভাবিক ইউরেনিয়াম ও ভারী জল সমন্বিত প্রণালীর ওপর ভিত্তি করে। এই ধরনের চুল্লী থেকে উপজাতদ্রব্য হিসাবে পাওয়া যাবে প্লুটোনিয়াম। এই প্লুটোনিয়ামও হচ্ছে আর একটি পারমাণবিক জ্বালানী। দ্বিতীয় শ্রেণীর পরমাণুচুল্লী গঠিত হবে থোরিয়ামজাত ইউরেনিয়াম—২৩৩ এবং প্লুটোনিয়ামসমৃদ্ধ জ্বালানী ব্যবহার করে। তৃতীয় শ্রেণীর পরমাণুচুল্লীর পরিকল্পনা করা হয়েছে ইউরেনিয়াম—২৩৩ এবং থোরিয়াম ব্রীডার প্রণালীর



চিকিৎসাকার্যের জন্যে প্রস্তুত তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ পরীক্ষা করা হচ্ছে।

ভিত্তিতে, অর্থাৎ এই প্রণালীতে যত জ্বালানী ব্যবহৃত হবে তার চেয়ে বেশী পরিমাণ জ্বালানী হবে উৎপন্ন।

ব্যবহৃত ইউরেনিয়াম জ্বালানী থেকে প্লুটোনিয়াম পৃথকীকরণের মডেল প্লান্ট ১৯৬৪ সালে ভারতে চালু হয়েছে। তীব্র তেজস্ক্রিয় পদার্থ নিয়ে কাজ করার উপযোগী এই প্লানটটি সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের দ্বারা পরিকল্পিত ও নির্মিত হয়েছে। বৃহত্তর পৃথকীকরণ প্লানট নির্মাণের উদ্দেশ্যে এই মডেলটি প্রস্তুত করা হয়েছে। ভবিষ্যতে বৃহত্তর প্লান্ট থেকে প্লুটোনিয়াম জ্বালানী বাণিজ্যিক পরমাণু-শক্তিকেন্দ্রে সরবরাহ করা যাবে।

ভারতের পক্ষে সৌভাগ্যের বিষয় যে, পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ থোরিয়াম-সঞ্চয় এদেশে আছে। পরমাণু-চুল্লীতে প্লুটোনিয়াম-সৃষ্ট বিকিরণের সাহায্যে থোরিয়ামকে বিশুদ্ধ পারমাণবিক জ্বালানী ইউরেনিয়াম—২৩৩-এ পরিণত করা যায়। ট্রম্বের পরমাণুশক্তি সংস্থায় বর্তমানে ৩০০ প্রকার তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ প্রস্তুত হচ্ছে। এই সব আইসোটোপ শিল্প, কৃষিকার্য, চিকিৎসা ও গবেষণার অসংখ্য কাজে ব্যবহৃত হতে পারে এবং দেশের চাহিদার প্রায় সম্পূর্ণটাই মিটিয়ে থাকে। তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের বৈশিষ্ট্য হল, এগুলি অপেক্ষাকৃত সস্তা দরের যন্ত্রপাতিতে সহজেই ব্যবহার করা যায়। ট্রম্বের কেন্দ্র থেকে আলজিরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, ফ্রান্স পূর্ব জার্মানী ইত্যাদি দেশে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ রপ্তানি করা হয়। তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের বিবিধ ব্যবহারের একটি উদাহরণ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ট্রম্বেতে প্রস্তুত তেজস্ক্রিয় বালি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের একাধিক বন্দরে সমুদ্র গর্ভের সঞ্চালন অনুসরণের জন্যে ব্যবহৃত হচ্ছে।

ট্রম্বের পরমাণুশক্তি সংস্থার প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা ও রূপকার ছিলেন ডঃ হোমী জাহাঙ্গীর ভাবা। এই সংস্থাকে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরমাণুশক্তি গবেষণাকেন্দ্র-রূপে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি। এই সংস্থাকে ঘিরে তাঁর অনেক ধ্যান-ধারণা ও সাধ ছিল এবং অনেক প্রকল্পও তিনি রচনা করেছিলেন। তাদের মধ্যে ছিল ভূকম্পন পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা, সমুদ্রের জল লবণমুক্ত করার জন্য পরমাণু-শক্তিচালিত বৃহৎ প্লান্ট নির্মাণ, খাদ্যদ্রব্য ও চিকিৎসাদ্রব্য নির্বীজনের জন্যে বৃহদাকার প্রকল্প, ত্রিবান্দ্রামের কাছে থুম্বাতে আন্তর্জাতিক রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্রের সঙ্গে মহাকাশ বিজ্ঞান ও কারুশিল্পের একটি কেন্দ্র স্থাপন। এছাড়া হায়দরাবাদে প্লাস্টিক বেলুনের সাহায্যে উচ্চাকাশে গবেষণার প্রকল্প এবং বোম্বাই-এ টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ প্রতিষ্ঠানে বেতার জ্যোতির্বিজ্ঞানের একটি দল গঠনের বিষয়ও তিনি ভেবেছিলেন। কিন্তু এই প্রকল্প-গুলিকে তিনি রূপ দেবার পূর্বেই আক-

স্মিকভাবে মৃত্যু এসে তাঁকে তাঁর প্রিয় কর্মকেন্দ্র থেকে চিরদিনের মতো সরিয়ে নিয়ে যায়। তাঁর স্থলবর্তী অধিকর্তা ডাঃ বিক্রম সরাভাই তাঁর পথ অনুসরণ করে এই প্রকল্পগুলিকে আজ রূপ দেবার চেষ্টা করছেন।

হৃদপিন্ড সংযোজন দশ বৎসরব্যাপী গবেষণার ফল

শল্যচিকিৎসার দ্বারা একজনের হৃৎপিন্ড অন্যের দেহে সংযোজন ব্যাপারটি এতই নতুন যে এ পর্যন্ত এ ধরনের মাত্র তিনটি অস্ত্রোপচার হয়েছে। তবে এ নিয়ে গবেষণা ও পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু হয়েছে অন্ততঃ দশ বছর আগে।

দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনের ডাঃ ক্রিশ্চিয়ান বার্নার্ড এবং ক্যালিফোর্নিয়া পালো আলটোর ডাঃ নরম্যান এডওয়ার্ড শামওয়ে উভয় শল্যচিকিৎসকই এ শতাব্দীর ষষ্ঠদশকে মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে হৃৎপিন্ডের অস্ত্রোপচার সম্পর্কে কিছুটা শিক্ষালাভ করেছিলেন।

সেইসময়ে প্রখ্যাত শল্যচিকিৎসক ডাঃ ওয়েন ওয়ানগেনস্টীনের অধিনায়কত্বে মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ অব মেডিসিন তরুণ শল্য চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্ররূপে খ্যাতি অর্জন করছে।

ডাঃ বার্নার্ড ১৯৫৬ থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত এখানে হৃৎপিন্ডে অস্ত্রোপচার সম্পর্কে বিশেষ শিক্ষালাভ করেন। ডাঃ শামওয়ে ১৯৪৯ ও ১৯৫০ সালে এখানে শিক্ষালাভ করে ডি-ফিল উপাধি লাভ করেন। ১৯৫০ সালে তিনি মিনেসোটা ত্যাগ করে ক্যালিফোর্নিয়ার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন।

এখানে ১৯৬৮ সালের ৬ই জানুয়ারী তাঁর নেতৃত্বে এক অস্ত্রোপচারে এক সদ্যমৃতের দেহ থেকে হৃৎপিন্ড নিয়ে এক মুমূর্ষু বয়স্ক রোগীর দেহে সংযোজন করা হয়। এই অস্ত্রোপচারে আরও ১৪জন শল্যবিদ তাঁকে সহায়তা করেন। যাঁর দেহ থেকে হৃৎপিন্ডটি নেওয়া হয়েছিল তাঁর নাম শ্রীমতী ভার্জিনিয়া হোয়াইট। এঁর বয়স ৪৩। মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের ফলে এঁর মৃত্যু হয়েছিল।

তাঁর হৃৎপিন্ডটি দু ঘন্টা পরে ৫৪ বছর বয়স্ক ইস্পাতশ্রমিক মাইক কাসপেরাকের দেহে সংযোজিত হয়। এই অস্ত্রোপচারের দুদিন আগে ইস্পাত শ্রমিকটি মারাত্মক হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিল।

অস্ত্রোপচার শেষ করতে সাড়ে ৪ ঘন্টা সময় লাগে।

১৯৬৭ সালের ২০শে নভেম্বর জার্নাল অব দি আমেরিকান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের একটি সংখ্যায় এক প্রবন্ধে ডাঃ শামওয়ে লেখেন যে, স্ট্যানফোর্ডে দশ বছর গবেষণার ফলে তিনি এখন এই ধরনের অস্ত্রোপচার করতে সক্ষম। কি পদ্ধতিতে এই অস্ত্রোপচার করা হবে তাও তিনি বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনে প্রথম সুযোগ আসে। ডাঃ বার্নার্ড ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বরে সর্বপ্রথম এই ধরনের অস্ত্রোপচার করেন এবং তিনি ডাঃ শামওয়ের পদ্ধতিই অবলম্বন করেন। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসে হৃৎপিন্ড পরিবর্তনের এইটিই প্রথম দৃষ্টান্ত। রোগীর নাম লুই ওয়াসকানস্কি। ১৮দিন পরে তাঁর মৃত্যু হয় অন্য কারণে। তাঁর নতুন সংযোজিত হৃৎপিন্ডটি ভালভাবেই কাজ করেছিল।

পরে ১৯৬৮ সালের ৩রা জানুয়ারী ডাঃ বার্নার্ড এই পদ্ধতি অবলম্বনে অনুরূপ আর একটি অস্ত্রোপচার করেন।

১৯৫৯ সালের ডিসেম্বরে ডাঃ শামওয়ে ও তাঁর আর একজন সহকর্মী ডাঃ রিচার্ড লোয়ার একটি কুকুরের দেহে হৃৎপিন্ড সংযোজন করেন। ঐ কুকুরটি আটদিন জীবিত ছিল।

সেই থেকে ডাঃ শামওয়ে আরও অনেকগুলি কুকুরের দেহে অনুরূপ অস্ত্রোপচার করেন।

ডাঃ শামওয়ের পদ্ধতিতে অস্ত্রোপচারের বৈশিষ্ট্য এই যে, অসুস্থ হৃৎপিন্ডটি অপসারণের সময় তিনি শিরা-সম্বলিত হৃৎপিন্ডের উর্ধ্বকক্ষটি যথাযথ রেখে দেন, যাতে নতুন হৃৎপিন্ড সংযোজনের সময় শুধু টিসু ও ধমনীগুলি সেলাই করলেই চলে।

চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা মনে করছেন আগামী কয়েক বছরের মধ্যে এই ধরনের আরও অসংখ্য অস্ত্রোপচার হবে। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁরা অনেক আশা পোষণ করেন।

এবার এলো



আপনার ইচ্ছেমত সস্তা বা দামী যে' কোন কলম আপনি পছন্দ করতে পারেন ; কারণ,
কেমিঙ্ক —তাড়াতাড়ি শুকোয়, অবাধে লেখা হয় এবং জমাট বাঁধেনা। সেই জন্য কেমিঙ্ক সব রকম কলমের পক্ষে উপযোগী।
সলভেন্ট 'এ'—যুক্ত কেমিঙ্ক দিয়ে লিখে আপনার কলমের উপযুক্ত ব্যবহার করুন।
—লিখে আনন্দ কেমিঙ্কে
বেঙ্গল কেঃ কলিকাতা, কানপুর, দিল্লী, বোম্বাই।



তস্য তস্য অথবা সূর্য কাঁদলে সোনা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সানসেদো আর ঘনরামের সঙ্গে দুজন প্রহরী উধাও হওয়া থেকেই রহস্যটার কিছুটা হদিস পাওয়া উচিত।

দু-দুজন প্রহরীকে কাবু করে ঘনরাম আর সানসেদো যদি পালাতেন, তাহলে জ্যান্ত কি মরা যে-কোনো অবস্থায় তাদের পাত্তা অবশ্য পাওয়া যেত। কোনো চিহ্ন পর্যন্ত না রেখে গারদখানা থেকে তারা অমন বেমালুম লোপাট নিশ্চয় হত না।

প্রহরীরা তাহলে কয়েদীদের সঙ্গেই পালিয়েছে! শুধু তাই নয়, কয়েদীদের পালাবার সমস্ত সুযোগ নিজেরাই করে দিয়ে একরকম জোরজবরদস্তি করে তাড়িয়ে বার করেছে তারাই।

ঘনরাম সেই ফন্দিই এঁটেছিলেন। যে-প্যাঁচ তিনি কষেছিলেন তা পুরোপুরি সফল হয়েছে।

যে-প্রহরী রাত্রের টহলে কয়েদী দু-জনের গোপন ফিসফিস থেকে গলাবাজির ঝগড়া শুনেছিল এক রাত্রের বেশী নিজেকে সে সামলে রাখতে পারেনি। স্বপ্নেও যা ভাবতে পারেনি এমন গুপ্তধন বাগাবার এ-সুযোগ কি ছাড়া যায়?

সমস্ত কিছু একলা হাতাতে পারলেই অবশ্য সে খুশি হত। কিন্তু তার ত উপায় নেই।

বাধ্য হয়েই দিনের পাহারাদারকে গোপনে সব কথা জানিয়ে ভাগীদার করতে হয়েছে।

সেই রাত্রেই পাহারাদারদের শেষ পালার কিছুক্ষণ বাদে কুঠুরীর দু-কোণে মুখ গুজড়ে শুয়ে থাকা অবস্থায় ঘনরাম আর সানসেদো অতি সন্তর্পণে কুঠুরীর দরজার তালা খোলার আওয়াজ পেয়েছেন। তারপর পা টিপে টিপে কুঠুরির ভেতর ঢোকার শব্দ।

কানের কাছে তারপর ফিসফিস শোনা গেছে গায়ে মৃদু ঠেলার সঙ্গে।

এই ওঠো ওঠো, পালাতে চাও ত' উঠে পড়ো জলদি!

ঘনরাম আর সানসেদো দুজনেই যেন ধড়মড়িয়ে জেগে উঠে বসেছেন। কুঠুরীর মধ্যে আচমকা দুই প্রহরীকে দেখে আঁৎকে চিৎকারই বুঝি করে ওঠেন তাঁরা।

তাঁদের মুখে প্রায় হাত চাপা দিয়ে প্রহরীদের সে বিপদ ঠেকাতে হয়েছে। ঘনরাম আর সানসেদোকে নিয়ে তারপরও কম বেগ পেতে হয়নি। প্রহরীদের ধারণা ছিল ছাড়া পাবার নামে দুই কয়েদীই ধেই ধেই নৃত্য করে গারদঘর থেকে বেরিয়ে যাবে। তার বদলে দুজনের কারুরই যেন ছাড়া পাবার তেমন আগ্রহ নেই।

ছাড়া পেয়ে যাব কোথায়?—বলেছেন ঘনরাম,—আবার ত ধরে এনে গারদে পুরবে!

না, না, সেরকম কোনো ভয় নেই বলে আশ্বাস দিতে হয়েছে পাহারাদারদের। কিন্তু তাতেও যেন চিঁড়ে ভেজেনি। ঘনরাম যদি বা রাজী হয়েছেন, সানসেদো আপত্তি তুলেছেন। ছাড়া পেয়ে তাঁর লাভ কি!

যে-গুপ্তধন উদ্ধার করতে গিয়ে ধরা পড়েছেন, তা যখন আর উদ্ধার করা যাবে না, তখন বাইরে থাকাও যা, এই গারদঘরে থাকাও তাই।

তা কেন হবে!—একটু বেশী উৎসাহই দেখিয়ে ফেলেছে প্রহরীরা। গুপ্তধন উদ্ধার করা আটকাচ্ছে কে? দরকার হলে আমরাই সাহায্য করতে প্রস্তুত।

তোমরাও সাহায্য করতে প্রস্তুত!—ঘনরাম আর সানসেদো দুজনেই যেন খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠেছেন।

তারপরই একটু ফ্যাকড়া তুলেছেন সানসেদো,—কিন্তু উদ্ধার হলে গুপ্তধনের ভাগটা হবে কিরকম?

ঘনরামের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেছেন,—ওই ঠগটাই সিংহভাগ নেবে তা হতে দেব না।

তা আমি চাইও না।—উদার হয়ে উঠেছেন ঘনরাম,—চারজন আছি, চারজনের ভাগ হবে সমান সমান। কিন্তু তার জন্যে আমার একটা সর্ত মানতে হবে।

কি সর্ত?

সর্ত হল গারদঘর থেকে বেরিয়ে আমি যেমনটি যখন বলব, তাই করতে হবে। আমার ওপর কারুর কথা চলবে না। হদিস যার, হুকুম তার।

সানসেদো একটু যেন মৃদু আপত্তি করতে গেছেন। কিন্তু প্রহরী দুজন তাঁকে থামিয়ে দিয়েছে। হদিস যার হুকুম তার—

এ-ব্যবস্থা মানতে তাদের কোনো আপত্তি নেই।

ফিসফিসিয়ে এসব তর্ক মীমাংসার মধ্যে পাহারাদারদের সিয়ে আলা পোষাক বদল হয়ে গেছে ঘনরাম আর সানসেদোর। নতুন পোষাক আর কিছুর নয়, পাহারাদারদেরই। সেই পোষাক পরে রাতের অন্ধকারে গারদখানা থেকে যখন তারা বেরিয়েছে, তখন সন্দেহ কেউ করেনি, বাধা তাদের দেয়নি কেউ।

সে-রাত্রে কেউ কিছু না জানলেও পরের দিন হুলুস্থুল পড়ে গেছে গারদখানায়। খবর পেয়ে খাপ্পা হয়ে প্রথমেই ছুটে এসেছে সোরাবিয়া। আলগুয়াসেন মানে শহরকোটাল তার হাতের লোক। খোঁজ করবার সে আর কিছু বাকি রাখেনি। মেদেলিন শহর ত তোলপাড় করে তুলেছেই, গ্রিয়ানার বেদেদের ঘাঁটিতে পর্যন্ত পরোয়ানা দিয়ে লোক পাঠিয়েছে জায়গাটা চষে ফেলে খোঁজবার জন্যে।

কিন্তু কোথাও তাদের পাত্তা পাওয়া যায়নি।

পাওয়া যাবে কি করে? ঘনরাম আর সানসেদো এবারে বুঝেশুঝেই গ্রিয়ানার ত্রিসীমানায় যাননি মেদেলিন শহরেরও ধারেকাছে নয়।

সোরাবিয়ার লাগানো চর যতদূর পর্যন্ত তাঁদের খোঁজ পায়, তা সে ছোট্ট একটি শহর মনটরো। সেই শহরেই তাঁদের সঙ্গী পাহারাদার দুজন ধরা পড়ে। তারাও তখন অস্থির হয়ে ঘনরাম আর সানসেদোকে খুঁজে ফিরছিল। ঘনরাম আর সানসেদো তাদের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়েছেন। কি করে কোথায় যে পালিয়েছেন সেইটেই গভীর রহস্য।

পাহারাদারদের কথায় জানা যায় যে, গুপ্তধনের খোঁজে তাদের মাতব্বর হিসাবে ঘনরাম সকলকে নিয়ে কর্দোভায় আসছিলেন। পথে এই মনটরো শহরে রাতটা শুধু কাটাবার কথা। কর্দোভাও তাদের লক্ষ্য নয়। সেখান থেকে আর একটু থেমে পাসাদ'স শহরে গিয়ে গুয়াদালকুইভির—এর উপনদী গুয়াদিয়ানা মেনর ধরে আবার উত্তরে যাওয়াই নাকি তাদের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু এই শহরে প্রায় যেন তাদের চোখের ওপর দিয়ে ঘনরাম আর সানসেদো গায়েব হয়ে গেছেন।

পাহারাদারেরা ত নয়ই, সোরাবিয়া নিজেও চরেদের কাছে খবর পেয়ে মনটরোতে এসে তার দুই শিকারের অন্তর্ধান রহস্যের কোনো কিনারা করতে পারেনি। চেষ্টার ত্রুটি অবশ্য তার ছিল না। কাপিতান সানসেদো দুই ফেরারীর একজন বলে প্রথমে তাঁদের ধরাটা সহজই মনে হয়েছে। কাপিতান সানসেদো মেদেলিন শহরে বেদে সেজে নিজের বাড়িতে খোঁজাখুঁজি করতে যাওয়ার দিন সেই যে খোঁড়া হয়ে ধরা পড়েছিলেন, তারপর তাঁর পা আর পুরো-পুরি সারেনি। কখন হয়েই আছে। ঘনরাম সে-পাশে পারলেও কাপিতান সানসেদোর পক্ষে হাঁটা পায়ে তাড়াতাড়ি বেশীদূর যাওয়া অসম্ভব। বিশেষ করে উত্তরের দিকে সিয়েরা দে মোরেনার পাহাড়ী অঞ্চলে খোঁড়া পা নিয়ে তিনি যাবার সাহস নিশ্চয় করবেন না। আর ঘনরামও সানসেদোকে ফেলে একলা যে যাবেন না—এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। এইসব বিচার করে সোরাবিয়ার দৃঢ় ধারণা হয়েছে যে, পায়ে হেঁটে নয় কোনরকমে সওয়ার হবার মত ঘোড়া যোগাড় করেই তার শিকার পালিয়েছে। মনটরো শহরে খোঁজখবর করার পর অকাট্য প্রমাণও পাওয়া গেছে তার। আজকালকার দিনে স্পেনের যে-ঘোড়ার দারুণ নামডাক, সেই কার্ল্শিনার ঘোড়ার বনেদী বংশের তখনই পত্তন হয়েছে। মনটরো শহরের সেইরকম ঘোড়ার পালের এক মালিকের কাছে জানা গেছে যে, তার দুটি ঘোড়াও ঘনরাম আর সানসেদোর সঙ্গে একই দিনে নিরুদ্দেশ।

সোরাবিয়া আর একমুহূর্ত দেরী করেনি। নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করে বেশ কিছু সওয়ার সেপাই ভাড়া করে পাঠিয়েছে সিয়েরা দে মোরেনার দিকে। সেপাইদের বেশী দূর যেতে হয়নি। ফেরারীদের তারা পায়নি! পেয়েছে ঘোড়া-দুটোকে শুধু। যারাই সে দুটোকে নিয়ে গিয়ে থাক কিছুদূর গিয়েই ছেড়ে দিয়ে গেছে।

ঘোড়া ছেড়ে দুই ফেরারী কিভাবে কোথায় পালিয়েছে, প্রায় টানা জাল দেবার মত করে সিয়েরা অঞ্চল খুঁজেও সোরাবিয়া কোনো হদিস পায়নি।

হদিস পাবে কি করে? সবকিছুই সে ভেবেছে, শুধু মনটরো শহরের গা বেয়ে বওয়া সরু নদীটার দিকে তার চোখ পড়েনি। এই নদীই যে কর্দোভা ছাড়িয়ে দুই উপনদীর প্রণামী পেয়ে বিরাট গুয়াদালকুইভির হয়ে উঠেছে, সে-খেয়ালই তার ছিল না বোধহয়। চুরি-যাওয়া ঘোড়াদুটো উত্তর দিকের রাস্তায় পেয়েই তার হিসেব দিয়েছে গুলিয়ে।

ঘনরামের প্যাঁচটাই অবশ্য ছিল তাই।

ঘোড়াদুটোকে চুরি করে তাঁরা সিয়েরা দে মোরেনার দিকে রওনা হয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু কিছুদূর গিয়ে ধোঁকা দেবার জন্যে সেগুলো ছাড়বার পর আর উত্তরে পা বাড়াননি। গুয়াদালকুইভির সেখানে সবে শুরু-হওয়া দুঃখিনী একটি সরু খালের সামিল। সেই খালের মত নদীতেই একটা জেলে ডিঙি যোগাড় করে তাঁরা দক্ষিণদিকে পাড়ি দিয়েছেন। উত্তরের পাহাড়ে যখন তাঁদের তল্লাশ চলেছে, তখন তাঁরা সেই জেলে ডিঙি নিয়েই পৌঁছেছেন সেভিলের বন্দর পর্যন্ত।

সেখানে গিয়ে পিজারোর জাহাজ খুঁজে বার করতে কোনো অসুবিধাই হয়নি। কিন্তু জাহাজ পেয়ে লাভ কি? ওই বন্দরেই পিজারোর শিরে সংক্রান্তির যে-খবর পেয়েছেন, তাতে হতাশ হয়ে বুঝেছেন যে, নেহাৎ অঘটন ঘটাবার মন্ত্রে ছাড়া সে-জাহাজ আর সমুদ্রে পাড়ি দেবে না।

মন্ত্র না হোক, সেই অঘটন ঘটাবার মন্ত্রণাই ঘনরাম শুনিয়েছেন সানসেদোকে।

ঘনরামের কাছে দিনের পর দিন নানা বিবরণ শুনে কাপিতান সানসেদো আগে পিজারোর অভিযানের বিষয়ে উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন ঠিকই, কিন্তু সেভিল-এ এসে ব্যাপার-স্যাপার দেখে সমস্যার জট তাঁর অচ্ছেদ্যই মনে হয়েছে। হতাশ হয়ে ঘনরামের কাছে তিনি বিদায় চেয়েছেন। তাঁর সোরিনা আনাকে তিনি খুঁজে বার করবার চেষ্টা করবেন। তার বাড়ির দরজা থেকে সেবার ঘনরামের সঙ্গে বাধ্য হয়ে চলে আসার পর থেকে কোনো খবরাখবর আর তার পাননি। সে সেবারে ব্যাকুল হয়ে তাঁকে খুঁজেছিল কিছু যেন একটা বলবার বা কোনো সাহায্য চাইবার জন্যে। কি সে চেয়েছিল জানতে না পেরে মনটায় তাঁর একটা কাঁটা বিঁধে আছে। পিজারোর অভিযান যখন আর সম্ভব হবার নয়, তখন সব বিপদ সত্ত্বেও আনাকে তিনি খুঁজতে চান।

ঘনরাম ধৈর্য ধরে সানসেদোর সব কথা শুনেছেন। তারপর হেসে ফেলে বলেছেন,—মাপ করবেন কাপিতান। আপনার আদরের সোরিনা আনার বিরুদ্ধে কিছু বলছি না. কিন্তু আপনার সাহায্য না পেলে সরলা অবলা হিসেবে সে অকূল পাথারে পড়বে বলে ত' মনে হয় না। তাছাড়া স্পেনে তাকে খোঁজার জন্যে এখন থাকতে চাইলে এককূল-ওকূল দুকূল-ই ত' আপনার যাবে। নিজে গারদঘরে গেলে তাকে খুঁজবেন কখন?

কিন্তু স্পেন ছেড়ে যাচ্ছিই বা কোথায়!—সানসেদো দুঃখের সঙ্গে বলেছেন,—অন্য কোনো জাহাজে আমাদের মত দাগী ফেরারীদের লুকিয়েচুরিয়ে জায়গা পাওয়াও শক্ত। পিজারোর জাহাজে যদি বা যাবার আশা ছিল, সে-জাহাজই ত' আজ বাদে কাল ক্রোক করবে কাউন্সিল অফ ইণ্ডিজ।

কেমন করে করবে?—ঘনরামের মুখ গম্ভীর হলেও চোখে যেন একটু হাসির ঝিলিক দেখা গেছে।

কেমন করে করবে জানো না!—সানসেদো একটু অধৈর্যের সঙ্গে বলেছেন—পরোয়ানা এনে জাহাজে কোতোয়ালী পাহারা বসিয়ে দেবে। মেয়াদ ফুরোবার পরও লোক-লস্করের বরাদ্দ পুরো যে হয়নি, তা গুণে বার করতে ত' তাদের দেরী হবে না। তখন এ-জাহাজ ক্রোক না করে ছাড়বে!

কিন্তু জাহাজ না পেলে ক্রোক করবে কি?—এবার ঘনরামের মুখে হাসির ঝিলিক আরো স্পষ্ট।

তার মানে!—অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন সানসেদো।

মানেটা ঘনরাম বুঝিয়ে দিয়েছেন বিশদভাবে। কি যে বুঝিয়েছেন তা আমরা জানি। সানসেদোর কিন্তু মনের সংশয় তাতে কাটেনি।

দুঃসাহসিক ফন্দিটার বুদ্ধির পরিচয় আছে মনে স্বীকার করলেও তা সফল হওয়া অসম্ভব বলেই তাঁর মনে হয়েছে।

কিন্তু তা যে হতেই হবে কাপিতান,—এবার গম্ভীর হয়েছেন ঘনরাম,—নইলে যাঁর কাছে আপনি পরম দীক্ষা নিয়েছেন, আপনার সেই গুরুদেবের কথাই মিথ্যে হয়ে যাবে!

আমার গুরুদেবের কথা মিথ্যে?—সানসেদো বিমূঢ় যেমন হয়েছেন, অবান্তর কথাটায় তেমনি বেশ একটু ক্ষুব্ধও তাঁর গুরুদেবের অসম্মানে।

হ্যাঁ!—অবিচলিতভাবে বলেছেন ঘনরাম,—পিজারো যদি জাহাজ নিয়ে এ-অভিযানে যেতে না পারেন, তাহলে আমার নিয়তি যে পূর্ণ হবে না। আর নিয়তি পূর্ণ না হলে আপনার গুরুদেবের শেষ ইচ্ছা আমাকে দিয়ে পূরণ হবে কি করে?

সানসেদো এবার অবাক হয়ে ঘনরামের দিকে খানিক তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে বলেছেন,—তার মানে তাঁর শেষ ইচ্ছা পূরণের ভার নিতে যার আসবার কথা বলে গেছেন তুমি সেই!

আমার ত' তাই মনে হয়!—মৃদু একটু হেসে বলেছেন ঘনরাম,—নইলে আপনার সঙ্গে অমন আশ্চর্যভাবে আমার আবার সেভিল-এর রাস্তায় দেখা হবে কেন? আপনার গুরুদেবের শেষ লিপি উদ্ধার হবেই বা কেন আমার হাত দিয়ে। আর উদয়সাগরের তীরের যে আশ্চর্য দেশ থেকে আপনার গুরুদেব এসেছিলেন, সেই দেশে ফিরে যাওয়ার চেয়ে বড় কামনা আমার কিছু থাকবে না কেন?

ফিরে যাওয়া!—ঘনরামের সমস্ত কথার মধ্যে শুধু এইটুকুই বিশেষ করে লক্ষ্য করে কাপিতান সানসেদো সবিস্ময়ে বলতে গেছেন—তাহলে তুমি...

হ্যাঁ কাপিতান!—সানসেদোকে তাঁর বিস্ময়ের বক্তব্যটা শেষ করতে না দিয়ে ঘনরাম বলেছেন,—আমি সেই সুদূর উদয়-সাগরের দেশেরই লোক, সেখানেই ফিরে যাবার সময় আর সুযোগ হলো। কিন্তু নিয়তির সমস্ত দাবী চুকিয়ে দাপরের না হলে সে-সময় আর সুযোগও আমার হবে না। তাই বলছি আপনার গুরুদেব সত্যদ্রষ্টা হলে অজানা নিরুদ্দেশে পাড়ি দিয়ে তিনটির পর চতুর্থ এক মহাসাগর আমায় দেখতে হবে। রক্তের নদী বইবে আমার সামনে।—তার পৃথিবীর কেউ আজো যা জানে না, এমন এক অচিন রহস্যের দেশে সোনায়-বাঁধানো পথেঘাটে আমি এক রাজকুমারীর বরমালা পাব।

কাপিতান সানসেদোর মুখে একটু স্নেহের হাসি দেখা দিয়েছে এবার। বলেছেন,—কথাগুলো অক্ষরে অক্ষরে মনে রেখেছ দেখছি! কিন্তু এসব ত' আমার গুরুদেবের কথা নয়। আমি আমার অসম্পূর্ণ বিদ্যার সামান্য ক্ষমতায় তোমার ওই নিয়তি দেখেছিলাম। তখনই ত' বলেছিলাম আমার ও-গণনা অভ্রান্ত বলে মনে কোরো না। গুরুদেবের কাছে কতটুকু আর আমি শেখবার সুযোগ পেয়েছি।

কিন্তু বেটুকু শিখেছেন তাতেই আপনার গণনায় আপনার গুরুদেবের হাতের ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।—যথার্থ শ্রদ্ধার সঙ্গে বলেছেন ঘনরাম,—আমার যা বলেছিলেন, তার অনেকটা এখন অক্ষরে নিদারুণভাবে ফলেছে, শেষটাও তেমন আশ্চর্যভাবে ফলবার আশা আমি রাখি। তাই বলছি, পিজারোর অভিযান বন্ধ হতে পারে না আর গুরুদেবের কাছে আপনার সত্যরক্ষার জন্যে পিজারোর জাহাজ সেভিল থেকে লুকিয়ে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আপনাকে উপলক্ষ হতে হবেই।

সানসেদোর আপত্তির কারণ তখনো হয়ত ছিল কিন্তু তিনি নীরবে এবার নিয়তির নির্দেশ হিসেবেই যেন ঘনরামের কথা মেনে নিয়েছেন।

এত সব বোঝাপড়া সত্ত্বেও ঘনরাম আর কাপিতান সানসেদোর সব ফন্দিফিকিরই বোধহয় ভেস্তে যেত। পিজারোর জাহাজ সেভিলের বন্দরেই আটক হয়ে থাকত কাউন্সিল অফ ইণ্ডিজ-এর হুকুমে। কারণ, মনটরো শহর থেকে যে জেলে নৌকো ভাড়া করে ঘনরাম আর সানসেদো গুয়াদাল-কুইভির নদী দিয়ে দক্ষিণে পালিয়েছিলেন, একটু দেরীতে হলেও শেষপর্যন্ত সোরাবিয়া তার মালিকের কাছে সমস্ত খবর তখন পেয়ে গেছে। খবর পেয়েই জেলে-নৌকোর পেছনে ধাওয়া করতে সে দেরী করেনি। আজকালকার দিনে গুয়াদালকুইভির নদী প্রশস্ত জলপথ হিসেবে সেভিলে এসেই শেষ। কিন্তু মুরদের আমলে ত' বটেই, ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে পর্যন্ত সে-নদী দিয়ে কর্ডোভা পর্যন্ত বড় বড় জাহাজের যাতায়াত ছিল। সোরাবিয়া মনটরো থেকে একটি জেলে নৌকোতেই কর্ডোভায় এসে নেমেছিল নদীপথে তাড়াতাড়ি যাবার জন্যে একটা দ্রুতগামী পান্সী ভাড়া করবার জন্যে। সে পান্সী নিয়ে কর্ডোভা থেকে রওনা হতে পারলে পিজারোর জাহাজ অন্ধকার মুরাপার মধ্যে গোপনে ভাসিয়ে নিয়ে যাবার সুযোগ ঘনরাম আর সানসেদো পেতেন না। তার আগেই সেভিলে এসে পৌঁছে তাঁদের ধরতে পারুক বা না পারুক সোরাবিয়া সব ফন্দি ফাঁস করে দিত।

কিন্তু কর্ডোভা থেকে পান্সী নিয়ে শিকারের পেছনে ধাওয়া করা সোরাবিয়ার হয়ে ওঠেনি। তাকে নিজেকেই সন্ত্রস্ত হয়ে পালাতে হয়েছে আচমকা।

পান্সী ভাড়া করবার ঘাটে এমন একটি লোকের সঙ্গে তার অকস্মাৎ দেখা, যাঁকে এড়াবার জন্যে টোলেডোর রাজদরবারে ইনামের লোভও সে ছেড়ে এসেছে।

হ্যাঁ, হার্ণান্দো কর্টেজই সেই ঘাটে সেদিন উপস্থিত। তিনিও সেখানে সেভিল যাবার পান্সী ভাড়া করতে এসেছেন। সোরাবিয়াকে দেখে তিনি থমকে দাঁড়িয়েছেন। সোরাবিয়াও তখন তাঁকে দেখেছে। দেখেও না দেখার ভান করে সরে পড়বার সুযোগ কিন্তু তার মেলেনি।

কর্টেজ তার পথ আগলে বলেছেন,—দাঁড়ান। আপনি কি মার্কুইস গঞ্জালেস দে সোলিস?

হ্যাঁ, কেন বলুন ত'!—সোরাবিয়া বে-পরোয়া ঔদ্ধত্যের ভান করবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু গলা তার তখন শুকনো।

কি করে, কবে মার্কুইস হলেন সেইটুকু জানবার জন্যে।—কঠিন কণ্ঠে বলেছেন কর্টেজ,—আমি যেন অন্য একটা নাম জানতাম।

সে অন্য কারুর হবে!—সোরাবিয়া ছাই মেড়ে-দেওয়া মুখে পাশ কাটিয়ে ব্যস্ত হয়ে চলে গেছে। এবার কর্টেজ বাধা দেননি। কিন্তু সেভিল যাওয়া বাতিল করে তিনি আবার রওনা হয়েছেন টোলেডোতে সেই দিনই।

সোরাবিয়া তার ভাড়া-করা পান্সীর দখল নিতেও আর কর্ডোভার ঘাটে আসেনি।

(ক্রমশঃ)



প্রেক্ষাগৃহ

তিন ভুবনের পারে চিত্রে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও তনুজা। ফটো: অমৃত

আজকের কথা :

জাপানী চলচ্চিত্রে বিষয় নির্বাচন :

কলিকাতাস্থ জাপানের কনশ্যুলেট জেনারেল, ইন্ডো-জাপানীজ অ্যাসোসিয়েশন এবং সিনে সেণ্ট্রাল (কলিকাতা)র যৌথ উদ্যোগে আজ ১৯-এ জানুয়ারী থেকে ২৫-এ পর্যন্ত সাতদিন ধরে স্থানীয় নিউ এম্পায়ার থিয়েটারে একটি জাপানী চলচ্চিত্রোৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই উৎসবের পরিপ্রেক্ষিতে ছবির বিষয় নির্বাচন সম্পর্কে জাপানী চলচ্চিত্রকারদের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কেই আমাদের আজকের আলোচনা।

আমাদের বাঙলা চলচ্চিত্রজগতে বিষয়বস্তু হিসেবে কাহিনী চিত্রগুলিকে প্রধানত ভাগ করা হয় : গার্হস্থ্য, সামাজিক, রোমাণ্টিক বা প্রেমধর্মী, কৌতূহলোদ্দীপক বা সাস্পেন্সধর্মী, লঘুরসাত্মক বা হাস্যপ্রধান, ভক্তিমূলক, জীবনীবিষয়ক, ঐতিহাসিক এবং পৌরাণিক। এ ছাড়া বাস্তব, কল্পনাপ্রধান, গীতিপ্রধান, ব্যঙ্গাত্মক প্রভৃতি বিভাগও আছে।

জাপানী চলচ্চিত্রকারেরাও তাঁদের ছবির বিষয়বস্তুগুলিকে আমাদেরই মতো কয়েকটি পৃথক পর্যায়ে ভাগ করে থাকেন। এই পর্যায়কে টাইপ বলাই ভালো। ইংরাজী টাইপ-এর জাপানী প্রতিশব্দ হচ্ছে মোনো। জাপানী চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তুকে প্রথমেই যে-দুটি বড়ো ভাগে ভাগ করা হয়, সে-দুটি হচ্ছে : (১) জিডাই-গেকী বা অতীতের কোনো বিশেষ যুগে স্থাপিত ঘটনা এবং (২) জেন্ডাই-গেকী বা সমসাময়িক জীবনের ছবি। জিডাই-গেকীর বিষয়বস্তু সব সময়েই সামন্ততান্ত্রিক এবং বিগত টোকুগাওয়া যুগের গাথা—কোদান ও নানিওয়া-বুশী থেকে সংগৃহীত। আমাদের মৈমনসিংহ বা পূর্ববঙ্গ গীতিকার মতোই এই কোদান ও নানিওয়া-বুশীর অসংখ্য কাহিনীগুলি বিগত যুগে গাওয়া হত এবং অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। চলচ্চিত্রের মাধ্যমে এই গল্পগুলিকে চিত্রায়িত করা হয়, তখন ধরেই নেওয়া হয়, এর দর্শকরা এর মূল কাহিনীটির সঙ্গে পরিচিত। মাসাশি মিয়ামোটো, মাতায়েমন আরাকি, চুজি কুনিসাদা, শিমিজুর জিরোচো কোগা ভ্রাতৃবর্গ কিংবা কোমোনো মিটো প্রমুখ সামন্তবর্গের বীরত্বকে ঘিরেই কাহিনীগুলি রচিত হয়ে থাকে। "সাতচল্লিশজন অনুগত রোণিন"-নামে কাবুকী নাটক থেকে প্রতি বছরই অন্তত দুটি একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করা রেওয়াজে দাঁড়িয়ে গেছে।

এই যুগচিত্রগুলির প্রধান উপজীব্য হচ্ছে : কর্তব্য ও বিবেকের সংঘাত—গিরি-নিঞ্জো সংঘাত। কর্তব্য বলতে বিবেকের বিরুদ্ধে গিয়েও অন্যায় কাজ করা। আবার কোনো কোনো সময়ে কর্তব্য হচ্ছে

সদাচরণ এবং তার সঙ্গে বিবেক না হয়ে অন্যায় প্রবৃত্তির সংঘাত দেখানো হয়ে থাকে। সমাজের নির্দেশ বা অনুশাসনের বিরুদ্ধে বিবেকের সংগ্রামও এই ধরনের চিত্রের বিষয়বস্তু হয়ে পড়ে। গিরি-নিঞ্জো সংঘাতের একটি সাধারণ ও জনপ্রিয় রূপ হচ্ছে ঃ ইস্‌শোকু ইপ্‌পন বা 'একটি আহার এবং এক রাত্রির আশ্রয়'-এর সমস্যা। একজন সামুরাই এক রাত্রির জন্যে কোনো গৃহস্থের বাড়ীতে আশ্রয় নিল। পরের দিন প্রতিদানে যখন তাকে ঐ গৃহস্থের আক্রমণকারীকে প্রতিহত করবার জন্যে আহ্বান করা হল, তখন সে সবিস্ময়ে দেখল, আক্রমণকারী তারই একটি বিশিষ্ট বন্ধু।—এই সংঘাতের আর একটি রূপ হচ্ছে ঃ ওয়াবান-কোবান বা 'দলপতি এবং অনুচর'-এর সম্পর্কঘটিত। সামুরাই তার নিয়োগকর্তার অনুগত হতে বাধ্য, আবার অপরদিকে তার দলপতির কাছে তার আনুগত্যকে সে অস্বীকার করতে পারে না। নিয়োগকর্তা ও দলপতি যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী, সেখানে সামুরাই বেচারা তার নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে সমস্যা-জর্জর হতে বাধ্য। এখানে জেনে রাখা দরকার, সামুরাই হচ্ছে বলশালী যোদ্ধা, যে অর্থের বিনিময়ে কারুর পক্ষে যুদ্ধ করে। 'মিগাওয়ারি' হচ্ছে গিরি-নিঞ্জো সংঘাতের আর এক বিশেষ রূপ। এতে কোনো বিশেষ সময়ে একজন অপরের হয়ে অবস্থার সম্মুখীন হয়। কেউ কোনো বন্ধু বা আত্মীয়ের হয়ে প্রাণদন্ড গ্রহণে অগ্রসর হল।

বহু যুগচিত্রের কাহিনী টোকুগাওয়া যুগের শেষ অধ্যায় নিয়ে রচিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর অব্যবহিত পূর্ববর্তী এই যুগে রাজকীয় বাহিনী ও শোগুনবাহিনীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার দৃশ্যে কোনো চাম্বারাবীরকে গান গাইতে গাইতে শত্রুপক্ষের বিশ-পঞ্চাশ জনকে একাই নিধন করতে দেখলে দর্শকরা আনন্দে করতালি দিতে বাধ্য।

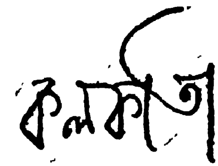
এককালে এই যুগচিত্রগুলি জাপানে প্রস্তুত চিত্রগুলির অর্ধেক পরিমাণ অংশ জুড়ে ছিল। কিন্তু সম্প্রতি অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। গত পাঁচ বছরের হিসাব থেকে জানা যায় যে, সমগ্র চিত্রসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ নির্মিত হয়েছে যুগ-চিত্র বা জিডাই-গেকী ফিল্ম।

বর্তমানের অপর দুই-তৃতীয়াংশ চিত্র হচ্ছে জেণ্ডাই-গেকী বা সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বনে নির্মিত চিত্র। এই শ্রেণীর চিত্রগুলিকে আবার কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায় ঃ (১) হাহা-মোনো বা মায়ের চরিত্র নিয়ে রচিত কাহিনী, জাপানী মাকে অবধারিতভাবে বহু নির্যাতনই সহ্য করতে হয়। বর্তমানে মায়ের চরিত্র নিয়ে শতকরা মাত্র চারখানি সমসাময়িক চিত্র নির্মিত হয়। (২) টসুমা-মোনো বা স্ত্রীর চরিত্রকে কেন্দ্র করে রচিত কাহিনী। যুদ্ধ-পরবর্তী যুগেই এই কাহিনীর চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রায় শতকরা এগারোটি জেণ্ডাই-গেকী চিত্রই স্ত্রীকে কেন্দ্র করে রচিত। এইসব ছবিতে স্ত্রী নানা অবস্থার মধ্যে নিজের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠায় ব্যগ্র। বহুক্ষেত্রে স্বামীর অন্য স্ত্রীলোকে আসক্তি স্ত্রীকে বিপর্যস্ত করে এবং সে নিজের পথ নিজে দেখতে চায়। অবশ্য শেষ পর্যন্ত ভুল বোঝাবুঝির পালা শেষ হয়ে স্বামী-স্ত্রীতে মিলনই ঘটে। দর্শকের চক্ষুকে অশ্রুসজল করা বিষয়ে হাহা-মোনো ও টসুমা-মোনো—উভয়েরই অবদান অপরিমিত, বলে কোনো কোনো সমালোচক ছবিগুলিকে 'রুমাল-ভেজানো', 'দু-রুমাল-ভেজানো' ইত্যাদির আখ্যায় ভূষিত করেন।

জাপানী ছবির মধ্যে যেমন প্রতিহিংসার প্রবৃত্তি অর্থাৎ প্রাণের বদলে প্রাণ নেওয়ার প্রবৃত্তি একটি উল্লেখ্য স্থান অধিকার করে আছে, তেমনই আছে আত্মোৎসর্গ বা আত্মহত্যার নৃশংস দৃশ্যগুলি। বহুরকম দৈহিক নির্যাতন এবং উৎপীড়নের দৃশ্যও জাপানী ছবিতে প্রায়ই দেখা যায়। মনস্তাত্ত্বিক বিপর্যয়ের ট্র্যাজিডি জাপানী ছবিতে অতি সাম্প্রতিক কালে প্রত্যক্ষীভূত হচ্ছে, যেমন দেখা গেল, 'থ্রি ফেসেস্ অব লাভ' ছবিতে বড়ো মেয়ে ফুজিওর আত্মনিপীড়নের মধ্যে। বেশীরভাগ ছবিতেই 'হিগেকী' বা 'বিষাদাত্মক' বলতে মৃত্যুপরিপূর্ণ দৃশ্যই চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

সাম্প্রতিক কালে শাকাই-মোনো বা সামাজিক সমস্যাসংবলিত চিত্র রচিত হতে শুরু করেছে, উদাহরণস্বরূপ কুরোসাওয়ার 'রেকর্ড অব এ লিভিং বিং'-এর নাম করা যায়। আত্মবিসর্জনকারিণী নায়িকাপ্রধান চিত্রকে বলা হয় 'কচুশা-মোনো'—টলস্টয়ের 'রেজারেকশান'-এর নায়িকা কাচুসার নামানুসারে। প্রথিতযশা মোরলিন মনরোর মতো কোনো ছবির নায়িকা হলে তার নাম দেওয়া হয়—মনরো-মোনো। সমানভাবে 'মেইজী'-মোনো, তাইশো-মোনো। সামাজিক এবং পারিবারিক শুভ এবং অশুভের দিকেই লক্ষ্য রেখে অধিকাংশ জাপানী ছবি নির্মিত হয়, আপেক্ষিক ভালো-মন্দ বা দার্শনিকভাবে শুভাশুভের প্রতি লক্ষ্য রেখে জাপানে চলচ্চিত্র নির্মিত হয় না বললেই চলে।

—নান্দীকর



সুধীর মুখার্জি প্রোডাকসন্স-এর 'আঁধার সূর্য' ঃ

সুধীর মুখার্জি প্রোডাকসন্স-এর নবতম প্রয়াস "আঁধার সূর্য"-এর নিয়মিত চিত্রগ্রহণ পরিচালক সুধীর মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছে। গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু রচিত আবেগপ্রধান এই প্রেমকাহিনীটির বিভিন্ন ভূমিকায় রীণা ঘোষ, দীপ্তি রায়, ছায়া দেবী, নন্দিতা দে, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, কমল মিত্র, দীপক মুখোপাধ্যায়, জহর রায়, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃণাল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি শিল্পীকে দেখতে পাওয়া যাবে। সঙ্গীত-পরিচালক রবীন চট্টোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই শ্যামল মিত্র, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলা মিশ্র প্রভৃতির কণ্ঠে কয়েকটি গান গ্রহণ করেছেন। আর-ডি-বি ছবিটির পরিবেশক।

ছায়ারূপা প্রোডাকশন্সের 'প্রথম বসন্ত'

প্রতিভা বসু রচিত ছায়ারূপা প্রোডাকশন্সের 'প্রথম বসন্ত' চিত্রের দ্বিতীয় পর্যায়ের চিত্রগ্রহণ এ সপ্তাহ থেকে পুনরায় শুরু করছেন এ ছবির পরিচালক নির্মল মিত্র। প্রধান চরিত্রাবলীতে অংশ গ্রহণ করছেন মাধবী মুখোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, অঞ্জনা ভৌমিক, অজয় গাঙ্গুলী, লিলি চক্রবর্তী, অনুপকুমার, বিকাশ রায়, পাহাড়ী সান্যাল, ছায়া দেবী, রেবতী দেবী ও ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গীত পরিচালনায় রয়েছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়। আলোকচিত্র গ্রহণে রয়েছেন বিমলেন্দু সেনগুপ্ত।

বি ডি প্রোডাকশন্সের 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'

বীরভূমের শুশুনিয়া পাহাড় অঞ্চলে বহির্দৃশ্য গ্রহণের পর বি ডি প্রোডাকশন্সের

দক্ষিণী'র নিবেদন

নৃত্যনাট্যের আঙ্গিকে রবীন্দ্রনাথের

মায়ার খেলা

পরিচালনা ঃ শুভ গুহঠাকুরতা

নিউ এম্পায়ারে

২৬শে জানুয়ারী, '৬৮ ঃ সকাল ১০॥
২৮শে জানুয়ারী, '৬৮ ঃ সকাল ১০॥
২৯শে জানুয়ারী, '৬৮ ঃ সন্ধ্যা ৬॥

১০, ৫, ও ৩, মূল্যের প্রবেশপত্র এখন থেকে সন্ধ্যা ৬—৯টার মধ্যে দক্ষিণীতে এবং ১২ই জানুয়ারী থেকে নিউ এম্পায়ারেও পাওয়া যাবে।

'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র অন্তর্দৃশ্যগ্রহণ সম্প্রতি ইন্দ্রপুরী স্টুডিওয় গ্রহণ করলেন পরিচালক রবি বসু। ছবিতে অভিনয় করছেন মাধবী মুখোপাধ্যায়, নির্মলকুমার, তরুণ মহেন্দ্র, বিকাশ রায়, দিলীপ রায়, জহর গাঙ্গুলী, সুশীল মজুমদার, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিম ঘোষ ও পদ্মা দেবী। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ছবিটির সুরকার।

মুক্তিপ্রতীক্ষিত 'ছোট্ট জিজ্ঞাসা'

বিশ্বজিৎ প্রযোজিত ও অভিনীত ট্রায়ো ফিল্মসের **'ছোট্ট জিজ্ঞাসা'** বর্তমানে মুক্তি-প্রতীক্ষিত। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার রচিত এ কাহিনীর প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন শ্রীমান প্রসেনজিৎ, বিশ্বজিৎ, মাধবী মুখোপাধ্যায়, অনুপকুমার, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, গীতা দে, সঙ্গীতা কর, প্রিয়া চট্টোপাধ্যায় ও শমিতা বিশ্বাস। সুরসৃষ্টি করেছেন নচিকেতা ঘোষ। স্কাপস ফিল্মস ছবিটির পরিবেশক।

মুক্তিপথে 'তীরভূমি'

গুরু বাগচী পরিচালিত ও শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত চিত্রভারতীর **'তীরভূমি'** ছবিটির সম্পূর্ণ চিত্রগ্রহণ শেষ হয়েছে। ছবিটি মুক্তিপ্রতীক্ষায়। বিকাশ রায় রচিত চিত্রনাট্যে রূপদান করেছেন মাধবী মুখোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, মঞ্জু দে, রুমা দেবী, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, জীবন বসু, সীতা দেবী, শ্রীমান শঙ্কর ও রবি ঘোষ। বিজন পাল ছবিটির সুরকার।

ফিল্ম ক্র্যাফ্টের 'পঞ্চশর'

অরূপ গুহঠাকুরতা পরিচালিত ফিল্ম ক্র্যাফ্টের **'পঞ্চশর'** ছবিটি বর্তমান মুক্তি-প্রতীক্ষিত। সুবোধ ঘোষ রচিত এ কাহিনীর প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন রুমা গুহ-ঠাকুরতা, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, সুমিতা সান্যাল, রবি ঘোষ, অনুভা গুপ্ত, কণিকা মজুমদার, জহর রায়, সীতা মুখোপাধ্যায় ও ব্রতীন ঠাকুর। সংগীত পরিচালনা করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।



অরূপ গুহঠাকুরতা পরিচালিত **পঞ্চশর** চিত্রে রুমা গুহঠাকুরতা ও শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়।

চিত্রসাথী গোষ্ঠীর 'শেষ থেকে শুরু'

সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত জনপ্রিয় নাটক 'শেষ থেকে শুরু'-র চলচ্চিত্রায়ণের দায়িত্ব নিয়েছেন চিত্রসাথী পরিচালকগোষ্ঠী। সাহা চিত্রপীঠের এ চিত্রে অভিনয় করছেন সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, সমীর মজুমদার, সবিতাব্রত দত্ত, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যা রাও, শ্রীমান শঙ্কর, রবীন দাশ ও গিরিশ চক্রবর্তী। সংগীতপরিচালনায় রয়েছেন অনিল বাগচী এবং নচিকেতা ঘোষ।

বোম্বাই

'আনখেন' চিত্রের দৃশ্যগ্রহণ শুরু

রামানন্দ সাগর প্রযোজিত ও পরিচালিত "আনখেন" চিত্রের দৃশ্যগ্রহণ সম্প্রতি শ্রীসাউন্ড স্টুডিওয় শুরু হয়েছে। ছবির মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করছেন ধর্মেন্দ্র, মালা সিনহা, জীবন, কুমকুম, ললিতা পাওয়ার মেহমুদ, মদনপুরী মধুমতী, জেব রহমান, সুজিতকুমার, নাজির হুসেন ও ধুমল। সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন রবি।

'কন্যাদান' চিত্রের সংগীতগ্রহণ

কিরণ প্রোডাকশন্সের **'কন্যাদান'** চিত্রের সংগীতগ্রহণ সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হল ফেমাস সিনে ল্যাবোরেটরীতে। সংগীত পরিচালনা করলেন শঙ্কর-জয়কিষণ। কণ্ঠদান করেন লতা মঙ্গেশকর। মোহন সেহগল পরিচালিত এ ছবির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন আশা পারেখ, শশি কাপুর, দিলীপ রাজ, সাঈদা খান, অচলা সচদেব, সবিতা চ্যাটার্জী, সুব্রতা, তুনতুন ও লক্ষ্মী ছায়া।

'মাই লাভ' চিত্রের দৃশ্যগ্রহণ

এস সুকদেব পরিচালিত রঙিন ছবি 'মাই লাভ'র অন্তর্দৃশ্যগ্রহণ সম্প্রতি শুরু হয়েছে আর কে স্টুডিওয়। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করছেন শশি কাপুর, শর্মিলা ঠাকুর, আজরা, লক্ষ্মী ছায়া, জয়ন্ত, নিরূপা রায়, মদনপুরী, নিরঞ্জন শর্মা ও রাজেন্দ্রনাথ। ছবিটির সুরকার দান সিং।

রুণী মজুমদার পরিচালিত 'এক একেলা'

জ্যোৎস্না পিকচার্সের 'এক একেলা' ছবিটির চিত্রগ্রহণ শ্রীসাউণ্ড স্টুডিওয় শুরু

ভারতের শ্রেষ্ঠ বেঙ্গল কেমিক্যালের
স্বচ্ছ গ্লিসারিন সাবান ব্যবহারে

আপনার ত্বক হবে
ফুলের মত কোমল·
আলোর মত উজ্জ্বল

বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা • বোম্বাই
কানপুর • দিল্লী
Progressive/BC

করেছেন পরিচালক ফণী মজুমদার। নরেন্দ্র ঘোষ কৃত চিত্রনাট্যে রূপদান করছেন ইন্দ্রাণী মুখার্জী, জীবনকলা, দুর্গা খোটে, অভি ভট্টাচার্য, আনোয়ার হুসেন, লক্ষ্মী ছায়া। সম্প্রতি সংগীত পরিচালক শচীনদেব বর্মণ এ ছবির কয়েকটি গান আশা ভোঁসলের কণ্ঠে ফেমাস সিনে ল্যাবোরেটরীতে গ্রহণ করেছেন। কিশোর সাহু ছবিটির প্রযোজক।

রঞ্জন বসু পরিচালিত 'দীদার'

রঞ্জন বসু পরিচালিত রঙিন ছবি 'দীদার'এর চিত্রগ্রহণ বর্তমানে গৃহীত হচ্ছে মর্ডান স্টুডিওয়। পরিচালক শ্রীবসু রচিত এ কাহিনীর প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন. ধর্মেন্দ্র, রাজশ্রী, শৈলেশকুমার, হেলেন ও মেহমুদ। শঙ্কর-জয়কিষণ ছবিটির সুরকার।



চেনাঅচেনা চিত্রের সংগীত গ্রহণের পর কণ্ঠশিল্পী আরতি মুখোপাধ্যায়, নায়িকা সুমিতা সান্যাল এবং সংগীত পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। ফটো : অমৃত

স্টুডিও থেকে বলছি

অফিস ফেরত মানস রায় বাড়ীর পথে যেতে যেতে ভাবে তার এই ক্লান্ত চলার কি শেষ হবে না? সেই কবে গ্রাজুয়েট হয়ে এই মার্চেন্ট ফার্মে ঢুকেছে, এ বন্দীশালা থেকে কি তার মুক্তি নেই? বাড়ীতে বিধবা মা বোন রয়েছে। এই সেদিনই তো মা বলছিল—'কইরে খোকা' মেয়েটার একটা ব্যবস্থা কর, কদিন আর ঘরে রাখবি বল। আর তাছাড়া নিজের দিকেও একবার চেয়ে দেখ দেখি কি অবস্থা হয়েছে" আয়নার কাছে না গিয়েই নিজের অবস্থা বুঝতে পেরেছিল মানস। সে তাই নির্দ্বিধায় মাকে জানিয়েছিল—মা, তোমায় অত ভাবতে হবে না আমার জন্য, আর আমি কথা দিচ্ছি বোনের একটা ব্যবস্থা না করে আমি কিছু করব না।'

পৃথিবীটা কাদের গরীবের না বড়লোকের? যাদের চাইবার ছিল অনেক কিছু পেল না, বরঞ্চ তাদের না যারা না চাইতেই হাত ভরে পেল তাদের? এসব কথা চিন্তা করতে করতে মাথা ঘুরে যেত মানসের। ধীরে ধীরে এক ধরনের ঘৃণা জমে উঠতে লাগল তার মনে বড়লোকদের সম্পর্কে। ধনী দেখলেই তার মনে এক দারুন অশ্রদ্ধা আর ঘৃণার ভাব ফুটে উঠত। তাই বুঝি কিছুদিন আগে বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন থেকে ফেরার পথে গাড়ীর সামনে এক বড়লোকের মেয়েকে দেখে চীৎকার করে উঠেছিল—'দিন দিন চাপা, মেরে ফেলুন।'

মাথার মধ্যে এইসব চিন্তার জট যখন ছাড়ানো অসাধ্য হয়ে ওঠে তখনই সে মাঝে মাঝে তামসীর কাছে চলে আসে। দিনশেষের ক্লান্তি তামসীর প্রেমের স্পর্শে দূরে চলে যায়, বলে ওঠে—'আমার পানে চাইবে ওগো অবাক তুমি নয়নে।' চোখে চোখ পড়তেই মনের ছায়া এসে হাজির হয় চোখে। পরিচয় জানাজানির পথ পেরিয়ে হাতে হাত মনে মন রেখে এগিয়ে আসে দুজনে। দুজনে হয়ত গেয়ে উঠতে চায় 'রইব দুজনে, সুখে কুহু কূজনে।'। কিন্তু তা হয়ে ওঠে না তখনই।

তামসী বিখ্যাত ব্যবসায়ী ত্রিদিব সেনের 'কেয়ার টেকার'—অন্ততঃ এ পরিচয় মানসের কাছে সে দিয়েছে। মানসও তাকে নিজের সুখদুঃখের ভাগী করে নিতে রাজি হয়েছে। ত্রিদিব সেন কিন্তু এই বাবা মা হারা মেয়েটাকে নিজের নাতনীর মতই স্নেহ করেন ভালবাসেন, আর তাছাড়া অপুত্রক বিপত্নীক মিঃ সেনের পক্ষে এ ধরনের দুর্বলতা থাকা স্বাভাবিক। অবশ্য তামসীর মানসের সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা ত্রিদিব সেন জানেন না। তাঁর অনুপস্থিতিতে বাড়ীর চাকর বৃন্দাবনকে অন্য কোন অজুহাত দেখিয়ে বেরিয়ে আসে তামসী।

তাদের এ গোপন অভিসারের কথা একদিন কিন্তু ত্রিদিব সেনের কানে ওঠে। খবরটি দেয় অরিন্দম, ত্রিদিব সেনের বন্ধুপুত্র। মিঃ সেনের মতানুযায়ী অরিন্দমই তামসীর ভাবী স্বামী। একটু অবাক হন মিঃ সেন। তামসীকে কিছু জিজ্ঞাসা করেন না অবশ্য। কিন্তু অফিস থেকে একদিন নিজের বাড়ীতে মানসকে ডেকে এনে বলেন—'কাজ নেবে ভালো মাইনে।' উত্তরে মানস জানায়—'আমার দারিদ্র্যকে কিনতে চান, পারবেন না। জানি আপনার টাকা আছে অনেক, কিন্তু এটাও আপনি জেনে রাখুন আমার দাম তার চাইতেও বেশী। আমাকে কেনবার মত পয়সা আপনার নেই। আনেক-



নান্দিক প্রযোজিত অ্যান্টনী কবিয়াল নাটকের একটি দৃশ্যে সবিতাব্রত দত্ত, কেতকী দত্ত ও জহর গঙ্গোপাধ্যায়। ফটো : অমৃত

দিন পরে সামনাসামনি একজন বড়লোকের মাস্টারকে চূর্ণ করতে পেরেছে এই গর্বে সে ... বেরিয়ে যায় মিঃ সেনের ঘর থেকে।

এদিকে অপমানে অন্ধ হয়ে ওঠেন মিঃ সেন। সামান্য একটা গরীব ছোকরা তাকে মুখের ওপর যা নয় তাই বলে গেল, এ অসহ্য। সঙ্গে সঙ্গে চাকরিটা যায় মানসের। পরদিন অফিসে গিয়ে জানতে পারে তার চাকরী নেই। ইতিপূর্বে এসব ঘটনার আগেই মানস ঠিক করেছিল তামসীকে নিয়ে এক সঙ্গীত সম্মেলনে যাবে, দুটো দামী টিকিটও কেটেছিল। তাই দেখে তামসী বলেছিল অত দামী টিকিট তুমি কাটলে কেন? উত্তরে হেসে মানস বলেছিল—গরীবের ঘোড়া রোগ, চিরদিন তো প্যান্ডেলের বাইরে দাঁড়িয়ে বা ইঁটে বসে গান শোনা অভ্যেস। একবার না হয় কিছু খরচ করেই দেখি। শেষে রাজী হয়েছিল তামসী।

নির্দিষ্ট দিনে অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে মানস। তামসী এল, কিন্তু সেই রোজকার মত সেই আটপৌড়ে সাধারণ পোশাকে নয়। বিরাট ইম্পালায় চড়ে ব্রোকেডের শাড়ি হীরে ঝলমল পোশাকে সেজে। এখানেই ভুল বুঝল মানস। তামসী কাছে আসতেই তাই সে বলল—মানস রায়, না, না আমি মানস নই, আপনি ভুল করছেন। তামসী যতই বলে যে সে মনিবের হুকুমে তার সঙ্গে এই পোশাকে এসেছে, সে যেন তাকে ভুল না বোঝে। কিন্তু মানস তার প্রতিজ্ঞায় অটল, কিছুতেই নিজেকে প্রকাশ করে না।

আহত হয়ে ফিরে আসে তামসী। মানসও বাড়ী ভাড়া বাকি পড়ায় সে বাড়ী ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে যায়। তাই তামসী খুঁজতে এসে মানসকে পায় না। কান্নায় ভেঙে পড়তে পড়তে সে তাই মিঃ সেনকে জানায় সে অরিন্দমকে বিয়ে করতে পারে। নতুন জায়গায় নতুন চাকরীতে নিজেকে ঢেলে দিতে চায় মানস। কিন্তু পারে না। বার বার শুধু ফেলে আসা সেই দিনগুলোর কথা মনে আসে। ভালো মেলে অন্ধকার অতীতে উড়ে যায় মন। মা বুঝতে পারেন ছেলের চঞ্চলতা, কিছু বলেন কিন্তু কোন উত্তর পান না ছেলের কাছ থেকে।

বিয়ের দিন সকাল থেকেই তামসী অস্থির হয়ে ওঠে। মন তো তার একটা, সে মন তো সে মানসকে দিয়ে ফেলেছে, অরিন্দমকে তাহলে সে আর কি দেবে? আর তাছাড়া মনটা তো শ্লেটও নয় যে, যখন খুশী যার নাম লিখবে আবার নতুন নাম মনে এলেই পুরোনো নাম মুছে ফেলবে।

অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয় তামসী। প্রেম বড় না প্রেমের অভিমান, ত্যাগ বড় না গ্রহণ বড়। সাধারণ মানুষ তামসী। তাই ত্যাগের পথ ছেড়ে দিয়ে গ্রহণের পথ ধরে। বাড়ী ভর্তি অভ্যাগতদের সামনে দিয়ে সে চলে আসে মানসের খোঁজে ওদের পুরোনো বাড়ীতে। ওখানেই মানসকে পেয়ে যাব সে ভাবে নি। আকস্মিকভাবে দেখা হয় দুজনের।

একথা সেকথার পর তামসী বলে—কই আমার স্বামীর নাম কি, তাতো জিজ্ঞেস করলে না!

কি লাভ তাতে?

—আমি যদি বলি হ্যাঁ লাভ আছে তাতে! আমার স্বামীর নাম শ্রীমানস রায়!

বলছ কি তুমি তামসী!

—হ্যাঁ, ঠিকই বলছি আমি।

পেছন পেছন সেই ইম্পালার হর্ন শোনা যায়। এগিয়ে আসেন ত্রিদিব সেন। তামসী এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করে, আর মানসের দিকে তাকিয়ে বলে—এনাকে চেনো, ইনি আমার—।' কথা শেষ হতেই চমকে যায় মানস। পরক্ষণেই সামলে নিয়ে মিঃ সেনকে সে প্রণাম করে।

আশাপূর্ণা দেবীর লেখা সুয়োরাণীর সাধ নামের উপন্যাস অবলম্বনে উপরোক্ত কাহিনীর চিত্রায়ন হচ্ছে 'চেনা অচেনা' নামে। পরিচালনা করছেন হীরেন নাগ। চিত্ররঙ্গের পতাকাতলে এ ছবির সুরকার হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। ক্যামেরা ও শিল্পনির্দেশনায় আছেন যথাক্রমে বিশু চক্রবর্তী ও কার্তিক বসু। বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দিচ্ছেন : মানস—সৌমিত্র চ্যাটার্জি, তামসী—সুস্মিতা সান্যাল, ত্রিদিব সেন—বিকাশ রায়, বৃন্দাবন—জহর রায়, মানসের মা—ছায়া দেবী, মানসের বোন—বিদ্যা রাও, অরিন্দম—অজয় গাঙ্গুলী।

ছবির চিত্রগ্রহণ বর্তমানে নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে।

প্রতিযোগিতার নাটক

শিশির ও গিরিশ মঞ্চে অভিনীত।

দমফাটা হাসির একাঙ্ক—

বসন্ত ভট্টাচার্যের

ডিস মিস ১·৫০

তরুণ নাট্যকার তাপস দাসের

জগদম্বা ভোজনালয় ২·২৫

॥ পরিবেশক ॥

জয় লাইব্রেরী, কলিকাতা ১২

ইণ্ডিয়ানা, কলিকাতা ১২

মুক্তাভিনয়

দর্পণ-এর নিয়মিত অভিনয়

জানুয়ারী ('৬৮) মাস থেকে প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় দর্পণ নাট্যগোষ্ঠী তাঁদের দুখানি মঞ্চসফল একাংকিকা 'স্বপনলোকের চাবি' এবং 'বিদ্যাসাগর' নিয়মিত পরিবেশন করবেন হাওড়ার মুক্ত-অঙ্গন মাইকেল থিয়েটারে (শ্রীঅরবিন্দ মার্কেট, সালিখা)। প্রথম নাটকটির রচয়িতা শ্রীঅজিত সেন, দ্বিতীয়টির হলেন ডঃ বিভূতি মুখোপাধ্যায়। ভিন্ন বিষয়বস্তুর উপর রচিত সামাজিক প্রহসন হিসাবে এ নাটক দুখানি দর্পণ ইতিপূর্বে একাধিক মঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে প্রযোজনা করেছেন এবং তাঁদের দলগত অভিনয়নৈপুণ্যেরও পরিচয় দিয়েছেন। অভিনয়ে আছেন নাট্যকার স্বয়ং, অশোক বসাক, শিব ঘোষ, শ্যামলী দাশগুপ্ত, পীতাংশু রায়, সমীর বীদ, মালা দাস, সুরেশ দাস, কালী ঘোষ, নিমাই দাস ও সুদাম রাহা। সংগীত ও মঞ্চের দায়িত্ব নিয়েছেন যথাক্রমে অশোক বসাক ও সমীর বীদ। নির্দেশনায় আছেন অজিত সেন।

'রজনীগন্ধা'র নাট্যোৎসব

বারাসতের প্রখ্যাত নাট্যসংস্থা তিনদিন-ব্যাপী এক নাট্যোৎসবের আয়োজন করেছেন। এই উৎসবে অভিনীত হবে সংস্থা-সদস্য রতন ঘোষের রূপক ট্রিলজি—'সম্রাট', 'অমৃতস্য পুত্রা', 'ফেরা'। তিনটি নাটকের নির্দেশনায় রয়েছেন দিলীপ মৌলিক, শ্যামল বিশ্বাস, সুবোধ রায়চৌধুরী। নাট্যোৎসবে অংশ গ্রহণ করেছেন সৌমেন চট্টোপাধ্যায়, শান্তি গঙ্গোপাধ্যায়, প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্তু চ্যাটার্জি, জ্ঞান গাঙ্গুলী, মণি নন্দী, শ্যামল গাঙ্গুলী, অর্জুন মজুমদার, শ্যামল বিশ্বাস, কাশী চট্টোপাধ্যায়, বিবেক চ্যাটার্জি, বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য, রতন ঘোষ, বিনয় ঘটক, সুবোধ রায়চৌধুরী, গোপা বন্দ্যোপাধ্যায়, খুকু ভট্টাচার্য ও দিলীপ মৌলিক। প্রতি সন্ধ্যায় নাটকের আগে বাংলাদেশের নাটকের গতিপ্রকৃতি নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাংলাদেশের বিশিষ্ট নাট্যকার, নাট্যসমালোচক, অভিনেতারা এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন।

'বিচিত্রিতা'র শেষরক্ষা

গত ১৬ ডিসেম্বর মহাজাতি সদনে 'বিচিত্রিতা'র সভ্য-সভ্যাবৃন্দ রবীন্দ্রনাথের 'শেষরক্ষা' পরিবেশন করেন। নাটক অভিনয়ের আগে শ্রীসলিল মিত্র ইলেকট্রিক ভায়োলিনে রবীন্দ্রসংগীতের সুর বাজান। নাটকটি পরিচালনা করেন শ্রীপ্রফুল্ল ভোস; সংগীত পরিচালনায় ছিলেন শ্রীদীপ্তিকুমার মিত্র, আলোকসম্পাতে শ্রীরাজ কুমার, রূপসজ্জায় শ্রীবীরেন দত্ত এবং মঞ্চ-ব্যবস্থাপনায় শ্রীপ্রশান্ত মিত্র। সামগ্রিকভাবে নাটকটি রসোত্তীর্ণ হয়। বিনোদের ভূমিকায় শ্রীপ্রবীর মুখোপাধ্যায়, ইন্দুমতীর ভূমিকায় শ্রীরীণা চৌধুরী এবং চন্দ্রকান্তের ভূমিকায় স্বয়ং পরিচালক নৈপুণ্যের পরিচয় দেন।

দার্জিলিং

সম্প্রতি জলঢাকার 'নতুন আওয়াজ' নাট্য-সংস্থা স্থানীয় কমিউনিটি হলে বসন্ত ভট্টাচার্যের 'সারি সারি পাঁচিল' ও রবীন্দ্র ভট্টাচার্যের 'ছেঁড়া তমসুক' মঞ্চস্থ করেন। দুটি নাটকের নির্দেশনায় সমরেন্দু বিশ্বাস নিষ্ঠার পরিচয় রাখেন এবং সেই সূত্র ধরেই দলগত অভিনয় প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেন—অরবিন্দশঙ্কর মিত্র, রঞ্জিৎ সান্যাল, দীপক ভট্টাচার্য,



নির্মল চৌধুরী পরিচালিত **চারণকবি মুকুন্দদাস** চিত্রে সবিতাব্রত দত্ত মুকুন্দদাস-রূপে **দেশাত্মবোধক যাত্রাগান গাইছেন।**

দিলীপ রায়, জগদীশ চক্রবর্তী, শ্যামলেন্দু ভট্টাচার্য পংকজ কয়াল, দেবেন মুখার্জী অমল সান্যাল, ভীম রাউত, অঞ্জলি বল ও নির্দেশক স্বয়ং। নাটক দুটির আলোক-সম্পাতে ও আবহসংগীতে ছিলেন নিখিলেশ ঘোষ ও বিশ্বজিৎ দাস, রবীন্দ্র দাস।

রায়গঞ্জ

'ছন্দম' নাট্যগোষ্ঠী সম্প্রতি অভিনয় করলেন সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শেষ থেকে শুরু' নাটক। স্থানীয় মুক্ত অঙ্গনে অভিনীত এ নাটকের প্রযোজনা উচ্চমানের হয়েছে। কয়েকটি ভূমিকায় প্রশংসনীয় অভিনয় করেছেন—সুধাংশু দে, মনোজ সরকার, কৃষ্ণা সেনগুপ্তা, পরি দাস, বীরেন দে।

জিয়াগঞ্জ

স্থানীয় প্রখ্যাত নাট্যসংস্থা 'বহুমুখী'র শিল্পীবৃন্দ সম্প্রতি অভিনয় করলেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণদ্বীপের রাজা' নাটক। আণবিক যুগের ভয়াবহ পরিণামের ওপর ভিত্তি করেই এ নাটক রচিত হয়েছে। শিল্পীদের সংঘবদ্ধ অভিনয়ের উৎকর্ষতার জন্য নাটকটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বেশ গতিশীল হয়ে থাকে। বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দেন প্রিয়নাথ রায়, রেখা সরকার আনন্দ চৌধুরী, দীপালি চৌধুরী, মৃদুল রায়, স্বপ্না রায়, রবি সেন, রাধারমণ ভট্টাচার্য, দিলীপ দত্তগুপ্ত, মনোজ চক্রবর্তী শ্যামাচরণ দাস, বিদ্যুৎ দুগার, রবি ভট্টাচার্য, রঞ্জন জৈন।

আঁধারে আলো

সম্প্রতি হাওড়ায় 'মঞ্চক' গোষ্ঠী তরুণ নাট্যকার সতীদাস চক্রবর্তীর 'আঁধারে আলো' নাটক মঞ্চস্থ করেছেন। আজকের নাট্যরচনার ধারা যেদিকে চলেছে, তার ইঙ্গিত রয়েছে নাটকের গল্পবিন্যাসে ও কয়েকটি সংঘাতমুখর মুহূর্ত সৃজনায়। অভিনয়পদ্ধতিতেও শিল্পিবৃন্দ নিষ্ঠা এবং যোগ্যতার পরিচয় রেখেছেন। নাট্যনির্দেশনায় রঞ্জিত ঘোষ প্রথম থেকে তাঁর সচেতন মনের শিল্পভাবনাকে পরিস্ফুট করে তুলতে পারার জন্য শেষমুহূর্ত পর্যন্ত নাটকটি আকর্ষণীয় হয়ে থাকে। প্রতিটি শিল্পীই চরিত্র উপলব্ধি করে অভিনয় করতে সক্ষম হয়েছেন বলে নাটকের বক্তব্য সুস্পষ্টভাবে বোধহয় ব্যক্ত হয়েছে। বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ নেন—নিমাই চক্রবর্তী, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, রঞ্জিত ঘোষ, মৃণালেন্দু ঘোষাল, সতীনাথ চক্রবর্তী, স্বপন রায়, রণধীর সেন, মানিক দাস, দিলীপ গায়েন, রবীন্দ্রনাথ ঘোষাল, তপন সরকার।

মুছেও যা মোছে না

সম্প্রতি লিলুয়ার অ্যাপ্রেন্টিস ইঞ্জিনীয়ার্স ক্লাবের সদস্যবৃন্দ জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মুছেও যা মোছে না' নাটক মঞ্চস্থ করেছেন। নাট্যনির্দেশনায় দুলাল চট্টোপাধ্যায় নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেন রথীন গঙ্গোপাধ্যায়, অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধীররঞ্জন দত্ত, কেশবলাল ভট্টাচার্য, তিমির রায়, রামেশ্বর দত্ত, দিলীপ ভদ্র, রমাব্রত চট্টোপাধ্যায়, দুলাল চট্টোপাধ্যায়, নবারুণ রায়, ডলি মুখার্জি, আরতি ঘোষ।

পিয়ারীলাল বার্জ

'শান্তর্কাণ'র শিল্পিবৃন্দ সম্প্রতি বিমল করের লেখা গল্প 'পিয়ারীলাল বার্জে'র মঞ্চরূপ পরিবেশন করেছেন। এই জীবন-নিষ্ঠ গল্পের মধ্যে মনের মণিকোঠায় চিহ্নিত করে রাখার মতো বেশ কয়েকটা নাট্য-মুহূর্ত ছিল, কিন্তু নাট্যরূপে এইসব মুহূর্তের সুষ্ঠু রূপায়ণ সর্বত্র চোখে পড়েনি। মূল কাহিনী থেকে নাট্যরূপ দূরে সরে যায়নি, কিন্তু তবুও যেন কেন মনে হয়েছে যে, গল্পের মধ্যে যে পিয়ারীলালকে দেখতে পেয়েছি, নাটক তাকে সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠতে দেখা যায়নি। ছোট ছোট অনেকগুলো দৃশ্যের মধ্য দিয়ে পিয়ারীর কর্মমুখরতাকে রূপ দেওয়ার জন্য নাটকটি একটি পূর্ণতর শিল্পসংহত রূপ পায়নি। তবে কয়েকটা মুহূর্তে পিয়ারী স্বমহিমায়

নবকল্পা

পৌষ বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হল ॥

গেট আপ * কাগজ * প্রতিটি রচনা * ছবি আর ছাপা অন্য যে কোন মাসিক পত্রিকার তুলনায় শ্রেষ্ঠ

২টি উপন্যাস—**শক্তিপদ রাজগুরু** ● **কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়**

৩টি বড় গল্প—**হরিনারায়ণ চট্টো** ● **তারাজ্যোতি মুখোপাধ্যায়**

শান্তিরঞ্জন চট্টো ॥

১টি অসাধারণ ছোট গল্প ● সুপ্রিয় শিল্পী **হেমন্ত মুখোপাধ্যায়**

২টি নাটক ● **ললিতা ॥** অনুবাদ সত্যেন মিত্র ॥ ইঙ্গিত ● জিতেন ঘোষ

বিশেষ রচনা—স্বরনারায়ণ গুপ্ত

কুমারী মায়ের আত্মহত্যা ॥ রূপক।

প্রেঃ সুকর্ণের প্রেম ॥ চিরঞ্জীব ॥

চেম্বার থেকে ॥ ডাঃ সান্যাল ॥

স্বরলিপি ॥ রবিন ঘোষ ॥

ডিভোর্স কতরকম ॥ কমলেশ মিত্র ॥

মনোজকুমারের পরিচয় ॥ অশোক রায় ॥

হায়দরাবাদের সাহিত্য সম্মেলন

সমালোচনা—রাজা সর্বাধিকারী

কুমার প্রসঙ্গে ॥ সত্যসাধী ॥

চিত্রস্থানের খবর ॥ জয়া সেনগুপ্ত

ভৈরবপ্রসাদ হালদার ॥

এজেন্সীর জন্য আজই লিখুন

আপনার হকারের কাছ থেকে

সংগ্রহ করুন ॥ গ্রাহক হোন

যোগাযোগ—

দি ক্যালকাটা ম্যাগাজিন

১/২সি, বসন্ত স্ট্রীট, কলিকাতা-৪।

ফোন : ৫৫-৯০৮৫

॥ প্রশ্নোত্তর ॥ অজস্র ছবি ॥

এই সংখ্যার দাম বাড়ানো হয়নি ॥

প্রতিফলিত হয়েছে এবং সংলাপও মাঝে মাঝে সুন্দর হয়েছে।

শিল্পীদের সামগ্রিক অভিনয়ে ঐক্য সব সময়ে অটুট থাকেনি, তার কারণ সংলাপ অনেক শিল্পীর মুখস্ত না থাকায় শৈথিল্য এসেছে নাট্যপ্রযোজনায়। সমরেশ মজুমদার পিয়ারীর ভূমিকায় মোটামুটি প্রাণবন্ত অভিনয় করতে চেষ্টা করেছেন। অন্যান্য চরিত্রে রূপ দিয়েছেন মমতা চট্টোপাধ্যায়, সুব্রত ভট্টাচার্য, রেবা কুণ্ডু, জয়ন্ত মজুমদার, বিপদতারণ সরকার, খগেন মজুমদার, নীহারকান্তি সেনগুপ্ত, তারাপদ গঙ্গোপাধ্যায়।

দুটি জন্মের মৃত্যু

নাট্যপ্রযোজনার ক্ষেত্রে যাঁদের আয়োজনচাতুর্য নাম প্রথম সারিতে না থাকলেও মোটামুটিভাবে নাট্যানুরাগীদের কাছে এঁদের কিছুটা পরিচিতি আছে। এই গোষ্ঠীর শিল্পীবৃন্দ পূর্বে যে সব নাটক উপহার দিয়েছেন তার মধ্যে বিষয়বস্তুগত বৈশিষ্ট্য ও আঙ্গিকের স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা গেছে। *সম্প্রতি 'মুক্তঅঙ্গনে' অরুণ সরকারের 'দুটি জন্মের মৃত্যু' নাটক মঞ্চস্থ করে এঁরা বলিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছেন, একথা বলতে হবে। কাহিনীটির মধ্যে খুব বেশী মৌলিকত্ব নেই, সফোক্লিসের 'ইডিপাস রেক্স'র প্রভাব রয়েছে সর্বত্র, বহু জায়গায় নিবিড় সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।* তবু বলা যেতে পারে এই বিখ্যাত গ্রীক নাটকের কাহিনীকে একটা ভিন্ন পটভূমিকায় রেখে যে নাটক এঁরা উপস্থিত করেছেন, তার জন্য অভিনন্দন এঁদের হয়তো প্রাপ্য।

একটা বাড়ীর একতলায় মেসের মতো বাস করেন চিত্র-পরিচালক জগন্ময় সামন্ত, ব্যাংকের কেরানী বিলাস চক্রবর্তী। কিছুদিন পরে গভর্ণমেন্ট আর্ট কলেজের শিক্ষকতা নিয়ে সেখানে এলেন আদিত্য সেন। বাড়ীর কর্ত্রী ছিলেন সোনালী নামে একটি নর্তকী-রত্নের মেয়ে। সোনালীর সঙ্গে আদিত্যের পরিচয় হয় এবং সেই পরিচিতি ক্রমশ নিবিড় হয়ে ওঠে। সেই নিবিড়তার সূত্র ধরে সোনালী অন্তঃসত্ত্বা হয় এবং তাই আদিত্য ও সোনালী বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হোতে চায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আদিত্যের পালক পিতা নিগুঢ়ানন্দের কাছ থেকে জানা গেল আদিত্য হোল পঁচিশ বছর আগে তারই আশ্রয়ে রেখে আসা সোনালীর ছেলে। সোনালী ও আদিত্য দুজনেরই সামনে এলো সীমাহীন গ্লানি, লজ্জা আর বিপর্যয়। শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে দুজনেই মুক্তির পথ খুঁজে নিলো।

প্রশ্ন উঠবে এই ধরনের কাহিনী আমাদের দেশের মাটিতে পরিবেশন করা নিয়ে। যদি এই নাটককে মৌলিক সৃষ্টি বলে ধরা না হোত, তা হোলে কোন প্রশ্নই সম্ভবতঃ দেখা দিত না। আজকের নাট্যকারেরা নিশ্চয়ই নতুনতর চিন্তার দিকে আলোকসম্পাত করবে, কিন্তু সেই চিন্তা কি দেশের সনাতন ধ্যান ধারণা, মানবিক মূল্যবোধ, নীতির কাঠামোর মূলে আঘাত করবে? তা বোধ হয় নয়, তার কারণ প্রতিটি দেশেই কিছু কিছু স্বকীয় চিরন্তন বৃত্তি থাকে, তাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করার মধ্যেই কিন্তু প্রগতি নেই, নতুন আলোকে তাকে আলোকিত করাতেই আছে—যা কিছু দীপ্ত। আজকের যুগের বাংলাদেশের নাট্যকারদের এ দিকটা ভেবে দেখতে হবে।

এই নাটকের মঞ্চরূপায়ণে সে সংঘাতসমৃদ্ধ মুহূর্ত সৃষ্টি হওয়ার প্রয়োজন ছিল তা খুব বেশী হয়নি, তাই শুরুতে অভিনয়ের দিক দিয়ে যে বৈশিষ্ট্য চোখে পড়েছিল শেষ দিকে তার অনুপস্থিতি মনকে বেদনা দিয়েছে। নাট্যনির্দেশনায় অরুণ সরকার প্রত্যাশিত সূক্ষ্ম শিল্পবোধের স্বাক্ষর রাখতে পারেননি সর্বত্র, 'আদিত্যে'র ভূমিকায় তাঁর অভিনয় সব সময়ে সাবলীল হয়ে উঠতে পারেনি। তবে মাঝে মাঝে উন্নত-ধরনের অভিনয় দেখাতে পেরেছেন শ্রীসরকার। সুকুমার ঘোষ (মণিময়), কল্পনা বাগ (সোমালী) অভিনয়ের মধ্যে প্রায় সব সময়েই প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। *কয়েকজন শিল্পীর মধ্যে অতি-অভিনয়ের দিকে আত্যন্তিক ঝোঁক লক্ষ্য করা গেছে, এটা পরিহার করাই কাম্য।* অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন বাদল মুখোপাধ্যায়, সুশীল পণ্ডিত, শ্রীশংকর, গৌর কর, নন্দলাল মল্লিক। আলোকসম্পাত ও আবহসংগীত নাটকের বিভিন্ন মুখর মুহূর্তগুলোকে ব্যঞ্জনাময় করে তুলতে খুব একটা সাহায্য করতে পারেনি।

বাগবাজার তরুণ ব্যায়াম সমিতি

প্রাচীতীর্থ নাট্য-সংস্থা প্রতি রবিবার বাগবাজার তরুণ ব্যায়াম সমিতির 'মুক্ত-প্রাঙ্গণ' মঞ্চে নিয়মিত অভিনয়ের আয়োজন করেছে। আসছে ২১ জানুয়ারী রবিবার সন্ধ্যায় দুটি একাংক ও একটি দলগত মূকাভিনয় নিয়ে শুভ উদ্বোধন হবে। উত্তর কোলকাতার নাট্যামোদীদের কাছে এটি একটি নাট্য সুসংবাদ।

প্রতিযোগিতা

স্টুডেন্টস থিয়েটার গ্রুপ আয়োজিত চতুর্থ বার্ষিক একাংক নাট্য প্রতিযোগিতা শুরু হচ্ছে আগামী ১০ ফেব্রুয়ারী থেকে। ২০ জানুয়ারীর মধ্যে যোগাযোগ করুন সম্পাদক স্টুডেন্টস থিয়েটার গ্রুপ শিবের পল্লী, পোঃ হালিশহর, ২৪ পরগণা।

অনর্থ

সম্প্রতি 'নবারুণে'র শিল্পীবৃন্দ বিধানশহর নেতাজী সুভাষ মঞ্চে অভিনয় করলেন সুশীল মুখোপাধ্যায়ের 'অনর্থ' নাটক। প্রথম নাট্য-প্রযোজনায় এই সংস্থার শিল্পীবৃন্দ মোটামুটিভাবে উন্নতধরনের অভিনয়-নৈপুণ্যের পরিচয় রাখতে পেরেছেন। সব কটি নাট্যমুহূর্ত অন্য মঞ্চে প্রত্যাশিত আবেদন সৃষ্টি করতে পারেনি, এর কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে প্রয়োগপরিকল্পনায় প্রতিটি শিল্পীই নাটকীয় গতির সংগে তাল মিলিয়ে অভিনয় করতে সমর্থ হননি। কিন্তু সংঘবদ্ধ অভিনয়কে একটি সুষ্ঠু পরিণতিতে উন্নীত করতে নাট্য-নির্দেশক অসীম সেন চেষ্টার কোন ত্রুটি করেননি এবং এবিষয়ে শিল্পীদেরও আন্তরিক নিষ্ঠা ছিল। যে কজনের চরিত্রচিত্রণ দর্শকদের হৃদয় স্পর্শ করতে পেরেছে তাঁরা হলেন শেফালী বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবকুমার পাইন, স্বপন চ্যাটার্জি, অসীম সেন, সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ বোস। অন্যান্য ভূমিকায় অংশ নিয়েছিলেন—সুপ্রিয় ঘোষ, প্রণব রায়, মানব ঘোষ, শ্যামল ঘোষ, তপন চ্যাটার্জি, তপন মল্লিক, অমল বোস, দীপঙ্কর দাশগুপ্ত, কমল ঘোষ, প্রণব চ্যাটার্জি, রাজ বসাক, বাণী সরকার, অমিমা চক্রবর্তী, নীলিমা চক্রবর্তী।

বিবিধ সংবাদ

মূকাভিনেতার সফর

বিহারের হিসুয়া শহরের 'কমল নাট্য সমিতির' আমন্ত্রণে (৩১ ডিসেম্বর ৬৭ ৬ জানুয়ারী ৬৮) পর্যন্ত শহরের কয়েকটি আকর্ষণীয় অনুষ্ঠানে মূকাভিনয় পরিবেশন করলেন মূকাভিনেতা বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য।

বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ভারতীয় চিন্তাধারার সূক্ষ্ম শিল্পরস দর্শকগণ গ্রহণ করতে পেরেছেন। সফরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে রাজগীর, মানপুর নবাদা, হিসুয়া ও দেনা। সর্বশেষ অনুষ্ঠানটি গয়া স্টেশন রোডে একটি ঘরোয়া পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীভট্টাচার্য পরিবেশিত মূকাভিনয়গুলির মধ্যে মূকাভিনয়ের অগ্রগতি চলার মাধ্যমে বিশেষ করে 'চলা' মার্চেন্ট সুয়ান, প্রথম প্রেম, বনভোজন, পেটুক লোচন ও বেকার যুবক।

টেলিফোন ক্লাবের 'আবর্ত'

আগামী ১৭ জানুয়ারী বুধবার সন্ধ্যায় টেলিফোন ক্লাব 'আবর্ত' নাটকটি বিশ্বরূপা মঞ্চে মঞ্চস্থ করবেন। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করবেন শচীন চক্রবর্তী, উমাশংকর বোস, মিহির দাশগুপ্ত, অমল সরকার, নবকুমার বিশ্বাস, দেবব্রত চক্রবর্তী, বীরেন বাগ, রবিশংকর মুখার্জি, বিমলেন্দু মজুমদার, বিশ্বনাথ সেন, রাহুল ঘোষ, হিমাংশু ভৌমিক, শাশ্বতী রায় ও মীরা বোস। পরিচালনায় বরুণ দাশগুপ্ত।

জাপানী চলচ্চিত্রোৎসব :

আজ শুক্রবার, ১৯-এ থেকে ২৫-এ জানুয়ারী পর্যন্ত কলিকাতাস্থ জাপানী কনসুলেট জেনারাল, কলিকাতার সিনে সেন্ট্রাল এবং কলিকাতার ইন্দো-জাপানীজ অ্যাসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে স্থানীয় নিউ এম্পায়ার থিয়েটারে যে-সপ্তাহব্যাপী জাপানী চলচ্চিত্রোৎসব অনুষ্ঠিত হবে, তাতে অন্যান্য ছবির মধ্যে প্রদর্শিত হবার জন্যে জাপানের বৈদেশিক দপ্তর এই ছবিগুলি পাঠিয়েছেন : (১) থ্রী ফেসেস অব লাভ (পরিচালক—নোবোরু নাকামুরা), (২) দি রিট্রিট ফ্রম কিস্কা (পরিচালক—শিঞ্জি মারুয়ামা) এবং (৩) ওবালিগেসন টু লাইফ (পরিচালক—শিঞ্জি মারুয়ামা)।

গানের জলসা

সমতল বাঙলায় পার্বত্য নৃত্যগীত

হিমালয়ের সুউচ্চ চূড়াভূমি থেকে বাঙলার সমতলভূমিতে নেমে এসেছিলেন প্রায় ১৬০ জন নৃত্যগীতশিল্পী। উদ্দেশ্য ডাঃ গ্রাহাম কুটীরের জন্য অর্থসংগ্রহ এবং এই উপলক্ষে সমতলভূমির অধিবাসীদের সঙ্গে সাংস্কৃতিক ভাববিনিময় নৃত্যগীতের চিরন্তন ভাষায়। ফোর্ট উইলিয়মের বক্সিং এরেনা সাংবাদিক মহলের জন্য আয়োজিত বিশেষ একটি অনুষ্ঠানে তিব্বতী, সিকিমী, ভুটানী ইত্যাদি হিমালয় প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন পার্বত্যভূমির নৃত্যগীতির নমুনা উপস্থিত করা হয়। এই অনুষ্ঠানের হোতা হলেন সস্ত্রীক মিঃ তাসি পেম্পা হিসে। গত বুধবার প্রায় ১০টি বিভিন্ন বিষয় এই অনুষ্ঠানসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। নৃত্যশিল্পীরা কালিম্পং, থার্পা মঠ, পেডাং মঠ ও লেপচা সমাজাগত। মিঃ তাসি পেম্পা সাংবাদিকদের জানালেন যে এইসব নৃত্যশিল্পীদের অনেকেই সমতলভূমিতে কোনোদিন নামেন নি। অতএব কলকাতাবাসীই যে শুধু পার্বত্যনৃত্যগীত দেখবার সুযোগ পাবেন তা নয়। পার্বত্যশিল্পীরাও নাগরিক দর্শকদের সংস্পর্শে আসতে পারছেন। পরস্পর নিকটের এ সুযোগ দুর্লভ।

নৃত্যের মাধ্যমে দুর্গম পার্বত্যজীবনের একটির পর একটি ছবি এঁকে গেলেন শিল্পীরা। কোনোটি একান্ত গার্হস্থ্যজীবনের ব্যক্তিগত ছবি গাঁথা দিচ্ছে ছোট ভুটানী ধান্যরোপণরত বধূ গান শোনাচ্ছে। কোনোটিতে লামা সন্ন্যাসী দল সেই প্রাচীন নিয়মে প্রার্থনাস্তবে রত। নেপালের একটি গুর্খানৃত্যও প্রদর্শন করেছেন।

মুখোশপরা নৃত্যশিল্পীরা বুদ্ধবতারের বিভিন্ন স্তরের একটি সুস্পষ্ট অধ্যায় সম্বন্ধে আমাদের অবহিত করলেন। আমাদের মানসচক্ষে ভেসে উঠল কত দুর্গম বন্ধুর পথ অতিক্রম করে বুদ্ধধর্মানুসারী সাধকরা তিব্বত, সিকিম, ভুটান ও নেপালের মত নিষিদ্ধ দেশেও বুদ্ধধর্ম প্রচারার্থে গেছেন। সিংহ ও ময়ূরনৃত্য রূপকের ভাষায় একাধারে শান্তি সমৃদ্ধি—প্রেম ও আনন্দের বার্তা শুনিয়ে গেল। এছাড়া বিভিন্ন দেশের ভাব ও ঐতিহ্যবাহী লোকনৃত্যও ছিল।

আর এক আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান ছিল বিভিন্ন সময়ের সজ্জাপ্রদর্শনী। পার্বত্য রমণী ও পুরুষদের প্রাচীন থেকে বর্তমানকাল অবধি যুগ পরিবর্তনের তালে তালে পরিচ্ছদের ঢং পরিবর্তন, দেখবার মত জিনিস।

মার্কিনী নৃত্যগীতানুষ্ঠান

আমেরিকার তিনটি বিশিষ্ট শিল্পীসম্প্রদায় মুরে লুইস ড্যান্স কোম্পানী, লোকসঙ্গীতশিল্পী বীয়ারস ফ্যামিলী গ্রুপ এবং ফিলাডেলফিয়া স্ট্রিং কোয়ার্টেট ২৪ থেকে ২৭ জানুয়ারী চারদিনব্যাপী এক নৃত্যগীতানুষ্ঠান আমাদের উপহার দিচ্ছেন।

মুরে লুইস ড্যান্স কোম্পানী ২৪-২৫ এবং ২৬-২৭ জানুয়ারী দুটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন আধুনিক নৃত্যানুষ্ঠান প্রদর্শন করছেন রবীন্দ্রসদনে।

ফিলাডেলফিয়া স্ট্রিং কোয়ারটেট হিন্দী হাইস্কুল মঞ্চে ২৬ জানুয়ারী তাঁদের কনসার্ট পেশ করবেন। ঐ একই প্রেক্ষাগৃহে যথাক্রমে ২৪ ও ২৫ জানুয়ারী বীয়ারস ফ্যামিলী গ্রুপ লোকসঙ্গীত গেয়ে শোনাবেন।

মুরে লুইস ড্যান্স কোম্পানীর পরিচালক মিঃ মুরে লুইসের পাঁচজন নারীশিল্পী ও তিনজন পুরুষশিল্পী গঠিত দলটি বর্তমান মার্কিন মঞ্চের সর্বশ্রেষ্ঠ নৃত্যশিল্পী এবং নৃত্যরচয়িতা রূপে ওদেশের সমালোচক কর্তৃক প্রশংসিত। এই সম্প্রদায়ের জ্যুংক ড্যান্স শীর্ষক কৌতুক নৃত্যগুচ্ছ সুবিখ্যাত।

মার্কিনী লোকনৃত্য ঐতিহ্যের ধারকরূপে বীয়ারস পরিবার সারা ইউরোপে সম্মানিত। পেনিসিলভিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকনৃত্যগীতি তাঁদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন 'দে আর দি গ্রেটেস্ট ফ্যামিলী গ্রুপ অফ ইটস কাইন্ড ইন্ আমেরিকা।' উচ্চতম পুরস্কারভূষিত এই পরিবার ৩৫টি বিশেষ উৎসবের আকর্ষণীয় শিল্পী।

ফিলাডেলফিয়া স্ট্রিং কায়ার্টেট অন্যতম দুঃসাহসিক এবং রোমাঞ্চকর সম্প্রদায়রূপে খ্যাত। ১৯৫৮ অব্দে এঁরা কনটেম্পোরারী চেম্বার মিউজিক সোসাইটি স্থাপন করেছেন। Princeton এবং Rutgers বিশ্ববিদ্যালয়ের কনসার্টেও এঁরা অংশগ্রহণ করেছেন। মিউজিক্যাল ক্লাসের স্টার্লিং পারফরমেন্স সোয়েনবার্গ বারটক প্রভৃতি সাম্প্রতিককালের সঙ্গীতানুষ্ঠানে এঁরা আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছেন। মার্গসঙ্গীত এবং সমসাময়িককালের সঙ্গীত বিভিন্ন অনুষ্ঠানেই পরিবেশিত হবে।

সম্প্রতি এক মিঃ ইভ্যানস্ আহূত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বীয়ারস পরিবারের সঙ্গে মার্কিনী নৃত্যগীতের বিষয় আলোচনা করবার সুযোগ পাওয়া গিয়েছিল।

ভারতনাট্যমে নূতন প্রতিভা

শ্রীমতী শুভলক্ষ্মী বড়ুয়া

রুক্মিণী অরুণ্ডাল, বালা সরস্বতী, এঁরা ভারতনাট্যমের অধিষ্ঠাত্রী নৃত্যলক্ষ্মীস্বরূপা, ভারতনাট্যম সুপ্রাচীনবন্ধ আঙ্গিকের প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতীক। কিন্তু দেশকাল ও আচারগত সীমার গণ্ডী ভেঙে দক্ষিণ ভারতের এই নৃত্য পৃথিবীব্যাপী জনপ্রিয়তা লাভ করেছে বালা সরস্বতীর দাক্ষিণ্যে।

শুভলক্ষ্মী বড়ুয়া

এই অভিজাত ঐতিহ্য যে এই নৃত্যসাধিকাদের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে যাবে না—উত্তরকালের প্রতিভাময়ী তরুণ শিল্পীদের নৃত্যসাধনায় বেঁচে থাকবে এ খবর পাওয়া গেল ওয়াই ডব্লু সিতে রমেন চৌধুরী আয়োজিত শ্রীমতী শুভলক্ষ্মী বড়ুয়ার ভারতনাট্যমের কয়েকটি সুনির্বাচিত নৃত্যানুষ্ঠানে। শুধুমাত্র সাংবাদিক মহলের জন্যই এই নৃত্যসভার আয়োজন।

যামিনী কৃষ্ণমূর্তি, কমলালক্ষ্মণ ও ইন্দ্রাণী রহমানেই ভারতনাট্যমের আবেগ থেমে নেই, তরুণতর শিল্পী শ্রীমতী শুভলক্ষ্মী বড়ুয়া তার উজ্জ্বল নিদর্শন।

শুধুমাত্র ক্ল্যাসিক্যাল পর্যায়ের নৃত্যেই এই তরুণ শিল্পীর অনুষ্ঠানসূচী অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রথমেই দর্শকবৃন্দকে ইনি ভারতনাট্যমের প্রাথমিক আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্য মুদ্রা, ভাববৈচিত্র্য ও গতিভঙ্গির ভাষার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন টুকরো টুকরো নৃত্য দিয়ে। তারপরই শুরু হোলো গণেশবন্দনা, যা দিয়ে ভারতনাট্যমের শুরু। ক্রমে নরনারীর চিরন্তন মিলনাকূতি। প্রণয়কলহ মধুর ঈর্ষামুখরতা, অভিমানস্ফুরিত দ্বন্দ্বের আলোছায়ায় আঙ্গিকতত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে সার্থক শিল্পমূর্তি গ্রহণ করে। ধানেশ্রী রাগে কোমল রেখাঙ্কের সকরুণ ছায়ানিবিড়তার সঙ্গে নৃত্যলালিত্যের মিলন ভোলার নয়।

পরের অনুষ্ঠান নটনাম আদিনাম—নটরাজের বিভিন্ন লীলার বৈচিত্র্যদীপ্তি।

শাড়ীর মেলা
ফোন: ৩৪-৮৮৮৩
নিউ বেনারসী হাউস
কলেজ স্ট্রীট ৬নং (পূর্ব) কলিকাতা-৭

বসন্ত রাগের সঙ্গে চৌদ্দ মাত্রার আড়া তালের ওঠান মার নাটকীয় পটভূমিকার কঠোর ও কোমলের সংঘাত, একদিকে রুদ্রের দারুণদীপ্তি অন্যদিকে তাঁর দক্ষিণ হস্তের প্রসন্ন বরদান। প্রতি পদক্ষেপের লয়দক্ষ দৃপ্ততায় মুদ্রার দ্রুতপরিবর্তনের ইঙ্গিতে চক্ষু ও মুখভাবের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাব-ব্যঞ্জনায়—শিল্পীর নিষ্ঠা ও সাধনাই নয় অনুভবনিবিড় প্রকাশব্যাকুলতাকে আমরা যেন আস্বাদন করেছি। আঙ্গিক-সীমিত নৃত্যও রসাপ্লুত হয়ে উঠেছে—শিল্পীর আবেগ-সঞ্চারী গতিবৈভবে।

সর্বশেষ অনুষ্ঠান 'তিল্লানা'। তাল-প্রধান এই উপসংহারে একদিকে 'নটভৈরবী'র গাম্ভীর্য অন্যদিকে আদিতালের আট মাত্রার বন্দে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ছেহাই অন্তে সোমে ফেরার সৌন্দর্য শুধু নয়নাভিরামই নয়—চিত্তস্পর্শীও বটে।

দৈহিক সৌন্দর্য, নমনীয়তা, শিল্পী-সুলভ সজ্জাপরিকল্পনা, নৃত্যভঙ্গির ভাস্কর্যসৌন্দর্য ভারতনাট্যমের শিল্পীদের কাছে অপ্রত্যাশিত নয়। এসবের ওপর শিল্পীর নিজস্ব সম্পদ হলো অন্তরের স্বতস্ফূর্ত আনন্দ যা প্রতিটি নৃত্যকে প্রাণোচ্ছল করে দর্শকের অন্তরকেও রসভোগের আনন্দের সরিক করেছে।

প্রথম অনুষ্ঠানেই শ্রীমতী শুভলক্ষ্মী সমালোচকবৃন্দকে খুশী করতে পেরেছেন। আবার ১৮ ফেব্রুয়ারী রবীন্দ্রসদনে প্রতিশ্রুত সর্বসাধারণের জন্য প্রদর্শিত নৃত্যানুষ্ঠানে আমরা তাঁর দীপ্তিতর বিকাশ দেখবার অপেক্ষায় রইলাম।

এই প্রসঙ্গে জ্ঞাতব্য এই যে—আসামের এক অভিজাত পরিবারের কন্যা শ্রীমতী শুভলক্ষ্মীর পিতা হলেন প্রথম অসমীয়া চিত্র 'জয়মতী'র নায়ক শ্রীযুক্ত ফনু বড়ুয়া, প্রাক্তন এম-পি শ্রীযুক্ত পি সি বড়ুয়ার ইনি ভ্রাতুষ্পুত্রী। নৃত্যকলাই শ্রীমতীর একমাত্র প্রতিভা নয়। ইনি অসমীয়ার প্রথম গ্রামোফোন শিল্পী। ভারতীয় ও অসমীয়া সঙ্গীতজ্ঞ সংগীতাচার্য লক্ষ্মীরাম বড়ুয়া এঁর পিতামহ। নৃত্যগীতের প্রতি এঁর অনুরাগ শৈশবকালেই। জীবনের স্বপ্ন বড় নৃত্যশিল্পী হবার। মণিপুরী নৃত্যগুরু শ্রীরাসবিহারী শর্মার শিক্ষাধীনে ভগ্নী জ্যেষ্ঠ বিজয়লক্ষ্মীর সঙ্গে নৃত্যপাঠ গ্রহণ করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই সারা আসামে মণিপুরী ও নাগানৃত্যে প্রচুর খ্যাতিলাভ করলেন—বিশেষ করে অল আসাম মিউজিক কন্‌ফারেন্সে। অসমীয়া নৃত্যের প্রতিভূহিসাবে এই গুণীদ্বয় অল্‌ ইণ্ডিয়া ইয়ুথ কংগ্রেস (লক্ষ্ণৌ), দিল্লী, জয়পুরে নৃত্যপ্রদর্শন করেন। ১৯৫৭ থেকে ৬৭ অবধি দিল্লীতে পাঠাজীবনে নিয়োজিত থাকায় নৃত্যজীবনে স্বল্পকালের জন্য ছেদ পড়ে।



দীর্ঘদিন আমেরিকা সফর করে দেশে ফিরে এসেছেন শ্রীপূর্ণদাস বাউল।

নৃত্যজীবন আবার শুরু হলো ১৯৬২তে প্রখ্যাতা ভারতনাট্যম শিল্পী শ্রীমতী রুক্মিণী অরুণ্ডাল পরিচালিত কলাক্ষেত্রে যোগদানকালে। এখানে শুভলক্ষ্মী ভারত-নাট্যম আত্মনিয়োগ করেন। গত এপ্রিলে গৌরবের সঙ্গে প্রথম শ্রেণীর উচ্চস্থান অধিকার করে ডিপ্লোমা কোর্স সমাপনান্তে ঐ প্রতিষ্ঠানেই ইনি পোস্ট-গ্রাজুয়েট কোর্স শুরু করেছেন। কলাক্ষেত্রের প্রেক্ষাগৃহে তাঁর প্রথম সাধারণ্যে পরিবেশিত নৃত্যানুষ্ঠান ১৯৬৭ সালে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও দর্শক-বৃন্দের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছে।

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে শ্রীমতী শুভলক্ষ্মী কণ্ঠসংগীতনিপুণা। গায়িকা-রূপেই কলাক্ষেত্রের শিল্পীদের সঙ্গে ইনি ভারত ভ্রমণ করেছেন এবং রুক্মিণী দেবীর বহু অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন। স্বরচিত নৃত্য না দেখিয়ে ক্ল্যাসিকালে নৃত্যকে সীমিত রাখার কারণ মৌলিক সৃষ্টিশক্তির অভাব নয়—এখনও গুরুর অনুমতি পাওয়া যায় নি। সৃষ্টিপ্রবণতা তাঁর জন্মগত সম্পদ—ভাবীকাল তার প্রমাণ দেবে'— বললেন পি সি বড়ুয়া।

তানসেন সংগীত সংগম

সেনী সংগীত সংগম প্রতিষ্ঠানটির নূতন নামকরণ হয়েছে 'তানসেন সংগীত সংগম' পূর্ববৎ সংগীতশাস্ত্রী শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী এর অধ্যক্ষপদে নির্বাচিত হয়েছেন, শ্রীবিজয় ভট্টাচার্য প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং আহিরীটোলা স্ট্রীটের ডাঃ অরুণ শীল সম্পাদক নির্বাচিত হন। গত ১০ জানুয়ারী শ্রীবিজয় ভট্টাচার্য মহাশয়ের ভদ্রাসনে (৮৮বি, দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রীট, যতীন্দ্রমোহন পার্কের পিছনে) এই নবপ্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন সুসম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে শ্রীভট্টাচার্য স্বর্গীয় তানসেন পাণ্ডেজীর শিক্ষানুযায়ী বেহাগ রাগের আলাপ পরিবেশন করে বিদগ্ধ শ্রোতৃবৃন্দের চিত্তে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের রসবোধ ও প্রেরণা জাগিয়ে তোলেন। তারপর তিনি একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণে যোগ-সাধনার সঙ্গে সঙ্গীতসাধনার সমন্বয় এবং সঙ্গীতের সাহায্যে মানব আধারের ত্রি-স্থানের তিনটি প্রধানচক্রের ক্রিয়া ও কুণ্ডলিনী শক্তির উদ্বোধন সম্বন্ধে পাণ্ডেজীর দীক্ষা ও শিক্ষা প্রাঞ্জলভাবে বুঝিয়ে দেন। অনুষ্ঠানের অপর আকর্ষণীয় বস্তু ছিল শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর সুর রবাব যন্ত্রে পূরিয়া রাগের আলাপ বাদন। শ্রীভট্টাচার্য ডাগর ঘরানার শিষ্য ও বীরেন্দ্রকিশোর সেনী ঘরানার শিষ্য। এই উভয় ঘরানার সমন্বয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের ক্ষেত্র প্রশস্ত করবে আশা করা যায়।

ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য ও নৃত্যবিচিত্রা

৬ জানুয়ারী সন্ধ্যা ৬টায় এল আর এস হাউস ক্লাবের বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। নৃত্যবিদ নীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের পরিচালনায় ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের দ্বারা 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য প্রদর্শিত হয়। গুরুগোপাল পিল্লাইয়ের কথাকলি (ভীম) নৃত্য দর্শকমণ্ডলীকে মুগ্ধ করে। ভারত নাট্যম পরিবেশন করেন কুমারী পাপড়ি বোস। হিমাংশু বিশ্বাসের পরিচালনায় ঐক্যতান প্রশংসনীয়। 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যে—অনুপশংকর, কানাই মজুমদার, উমা দত্ত, সুতপা দত্ত, পাপড়ি বোস, নন্দিতা চক্রবর্তী, সুচরিতা ঘোষ, মহুয়া ভৌমিক, শোভা দাস, শুভ্রা গাঙ্গুলী বিভিন্ন ভূমিকায় দর্শকবৃন্দের প্রশংসা অর্জন করে। কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীতে অংশ গ্রহণ করেন—রাখাল পণ্ডিত, বিপুল ঘোষ, বিপ্লব বক্সী, স্বপ্না সেনগুপ্তা, অরবিন্দ মিত্র, শিখা বক্সী ভারতী চক্রবর্তী, বিন্দু চৌধুরী, জাহানারা চৌধুরী, ফেলু চন্দ প্রভৃতি। অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন যথাক্রমে ডাঃ ডি ব্যানার্জী ও শ্রীকে এন মুখার্জী।

সারা বাংলা শাস্ত্রীয় সংগীত শিক্ষার্থী সম্মেলন

তৃতীয় বার্ষিক সারা বাংলা শাস্ত্রীয় সংগীত শিক্ষার্থী সম্মেলন উত্তরী সঙ্গীত সমাজের উদ্যোগে কলকাতায় শীঘ্রই অনুষ্ঠিত হবে ১২ থেকে ৩০ বছর বয়স্ক শিক্ষার্থীরা এই সম্মেলনের কণ্ঠসংগীতে, যন্ত্রসংগীতে এবং নৃত্যে অংশ গ্রহণ করতে পারেন। যোগদানেচ্ছু শিক্ষার্থীদের ২৫ ডিসেম্বর মধ্যে ৮৬।জি, গোপীমোহন দত্ত লেন, কলকাতা-৩ এই ঠিকানায় বিষয় উল্লেখ করে আবেদন করতে হবে।



১৯৬৭ সালের ডুরান্ড কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে বি এন আর দলের বিপক্ষে ইস্টবেঙ্গল দলের রাইট-ইন হাবিব দলের জয়সূচক গোলটি দিয়ে আনন্দে লাফ দিয়েছেন।

খেলাধুলা

দর্শক

ডুরান্ড কাপ

১৯৬৭ সালের প্রখ্যাত ডুরান্ড কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ১—০ গোলে বি এন আর দলকে পরাজিত করে একই বছরে রোভার্স এবং ডুরান্ড কাপ জয়ের গৌরব লাভ করেছে। ইস্টবেঙ্গল দলের পক্ষে এই নিয়ে পঞ্চমবার ডুরান্ড কাপ জয়। ইতিপূর্বে তারা ১৯৫১-৫২, ১৯৫৬ এবং ১৯৬০ সালে (মোহনবাগানের সংগে যুগ্মবিজয়ী) ডুরান্ড কাপ জয়ী হয়েছিল। এখানে উল্লেখযোগ্য, এপর্যন্ত একই বছরে রোভার্স এবং ডুরান্ড কাপ জয়ী হয়েছে এই তিনটি দল : মহমেডান স্পোর্টিং একবার (১৯৪০ সালে), হায়দরাবাদ সিটি পুলিশ তিনবার (১৯৫০, ১৯৫৪ ও ১৯৫৭ সালে) এবং ইস্টবেঙ্গল একবার (১৯৬৭ সালে)। তবে কোন দলই এপর্যন্ত একই বছরে ভারতের তিনটি প্রধান ফুটবল প্রতিযোগিতায়—ডুরান্ড, আই এফ এ শীল্ড এবং রোভার্স কাপ জয়ী হয়নি। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব আজ এই দুর্লভ 'ত্রিমুকুট' সম্মান লাভের সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। ইস্টবেঙ্গল বনাম মোহনবাগানের ১৯৬৭ সালের আই এফ এ শীল্ড ফাইনাল খেলার এখনও চূড়ান্ত মীমাংসা হয়নি, প্রথমদিনের ফাইনাল খেলাটি গোলশূন্যভাবে শেষ হয়েছিল।

১৯৬৭ সালের ডুরান্ড কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে যে ৮টি দল উঠেছিল তাদের মধ্যে কলকাতারই ছিল চারটি দল—ইস্টবেঙ্গল, বি এন আর, মোহনবাগান এবং মহমেডান স্পোর্টিং। ইস্টবেঙ্গল ২—১ গোলে মাদ্রাজ রেজিমেণ্টাল সেণ্টার এবং বি এন আর ১—০ গোলে মহমেডান স্পোর্টিংকে পরাজিত করে। অপরদিকে



কৃতী অধিনায়ক প্রশান্ত সিং (ইস্টবেঙ্গল)

মোহনবাগান ১—৪ গোলে জলন্ধরের লীডার্স ক্লাব এবং গত বছরের ডুরান্ড কাপ বিজয়ী গোর্খা ব্রিগেড ১—৩ গোলে হায়দরাবাদ অন্ধ্র পুলিস দলের কাছে পরাজিত হয়। একদিকের সেমি-ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল ০—০ ও ১—০ গোলে অন্ধ্রপ্রদেশ পুলিশকে এবং অপরদিকের সেমি-ফাইনাল খেলায় বি এন আর ১—১ ও ৩—২ গোলে লীডার্স ক্লাবকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছিল। ফাইনাল খেলার দ্বিতীয়ার্ধের ১২ মিনিটে ইস্টবেঙ্গল দলের রাইট-ইন হাবিব দলের জয়সূচক গোলটি দেন। মাত্র একটি গোলে জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হলেও ইস্টবেঙ্গল দল একাধিক গোল দেওয়ার সুযোগ পেয়েছিল এবং খেলার শেষ কয়েক মিনিট বাদে তারাই প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। ক্রীড়ামানের দিক থেকে খেলাটি খুব উচ্চাংগের না হলেও তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং উত্তেজনার কোন অভাব ছিল না। এ প্রসংগে উল্লেখযোগ্য, কলকাতা তথা বাংলাদেশ থেকে ডুরান্ড কাপ জয়ী হয়েছে এই তিনটি দল—মহমেডান স্পোর্টিং ১ বার (১৯৪০), ইস্টবেঙ্গল ৫ বার (১৯৫১-৫২, ১৯৫৬, ১৯৬০ ও ১৯৬৭) এবং মোহনবাগান ৬ বার (১৯৫৩, ১৯৫৯-৬০, ১৯৬৩-৬৫)।

ভারতবর্ষের প্রাচীনতম ফুটবল প্রতিযোগিতা এই ডুরান্ড কাপের সূচনা ১৮৮৮ সালে। সিমলার এই ডুরান্ড কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার প্রথম ৩৫ বছর একমাত্র সামরিক দলের যোগদানের অধিকার ছিল। বে-সামরিক ইউরোপীয় এবং ভারতীয় দলের



প্রথম এশিয়ান মহিলা হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে উগান্ডাকে ১—০ গোলে পরাজিত করে জাপানের অধিনেত্রী ট্রফি গ্রহণ করছেন। পুরস্কার বিতরণ করেন উপ-প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুক্ত মোরারজী দেশাই (বাঁ দিকে)

মধ্যে মোহনবাগান ক্লাবই সর্বপ্রথম বিশেষ আমন্ত্রণে ১৯২৪ সালের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে এবং সেমি-ফাইনালে সেই সময়ের শক্তিশালী শেরউড ফরেস্টার্স সামরিক দলের কাছে পরাজিত হয়। প্রকৃত-পক্ষে মোহনবাগান ক্লাবই বে-সামরিক দলের ডুরান্ড কাপ প্রতিযোগিতায় যোগদানের পথ-প্রদর্শক। প্রতিযোগিতার সুদীর্ঘ ৮০ বছরের ইতিহাসে এ পর্যন্ত মাত্র এই তিনটি দল উপর্যুপরি ৩ বছর ডুরান্ড কাপ জয়ের দুর্লভ সম্মান লাভ করেছে—হাইল্যান্ড লাইট ইনফ্যানট্রি (১৮৯৩-৯৫), ব্ল্যাকওয়াচ রেজি-মেন্ট (১৮৯৭-৯৯) এবং একমাত্র ভারতীয় দল মোহনবাগান (১৯৬৩-৬৫)।

এশিয়ান লন টেনিস প্রতিযোগিতা

বাঙ্গালোরে আয়োজিত ১৯৬৮ সালের এশিয়ান লন টেনিস প্রতিযোগিতায় রাশিয়ার খেলোয়াড়রা গত বছরের মতই সাফল্য লাভ করেছেন। পুরুষদের সিঙ্গলসে খেতাব পেয়েছেন গত বছরের বিজয়ী মেত্রেভেলী এবং মহিলাদের সিঙ্গলসে গত বছরের রাণার-আপ ইভানোভা। তাছাড়া ইভানোভা মিক্সড ডাবলস ও মহিলাদের ডাবলসের খেতাবও পেয়েছেন। ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে পুরুষদের সিঙ্গলস সেমি-ফাইনালে উঠেছিলেন জয়দীপ মুখার্জি এবং মহিলাদের সিঙ্গলস সেমি-ফাইনালে শ্রীমতী নিরুপা বসন্ত।

ফাইনাল খেলার ফলাফল

পুরুষদের সিঙ্গলস : আলেকজান্ডার মেত্রে-ভেলী (রাশিয়া) ৮—৬, ৬—৩ ও ৬—৪ গেমে আই টিরিয়াককে (রুমানিয়া) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস : কুমারী ইভানোভা (রাশিয়া) ৬—৩ ও ৬—৩ গেমে স্বদেশেরই কুমারী টুকারেসকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস : কুমারী ইভানোভা এবং কুমারী টুকারেলি (রাশিয়া) ৬—১ ও ৬—০ গেমে কুমারী লামারা (রাশিয়া) এবং শ্রীমতী জে ডাকিসকে (ভারতবর্ষ) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস : জয়দীপ মুখার্জি এবং প্রেমজিৎলাল ৩-৬, ৪-৬, ৬-২, ৬-১ ও ৬-০ গেমে টিরিয়াক এবং



শ্রীমতী নিরুপা বসন্ত

নাসতাসেকে (রুমানিয়া) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস : মেত্রেভেলী এবং কুমারী ইভানোভা (রাশিয়া) ৬-৩ ও ৬-১ গেমে শ্রীমতী নিরুপা বসন্ত এবং শ্যাম মিনোত্রাকে পরাজিত করেন।

এশিয়ান হকি প্রতিযোগিতা

দিল্লীর লেডী হার্ডিঞ্জ মাঠে অনুষ্ঠিত প্রথম এশিয়ান মহিলা হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে জাপান ১—০ গোলে উগান্ডাকে পরাজিত করেছে। প্রথম বছরের প্রতি-যোগিতায় এই ৫টি দেশ যোগদান করেছিল—জাপান, উগান্ডা, ভারতবর্ষ (ব্লু এবং হোয়াইট নামে দুটি দল), কেনিয়া এবং সিংহল। বিশেষ আমন্ত্রণে উগান্ডা এবং কেনিয়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। লীগ এবং নক-আউট প্রথায় খেলা হয়েছিল। লীগের খেলায় উগান্ডা অপরাজিত অবস্থায় মোট তিনটি খেলায় ৬ পয়েন্ট সংগ্রহের সূত্রে লীগ তালিকায় শীর্ষস্থান পেয়েছিল। জাপান এবং ভারতবর্ষের 'ব্লু' দল ২য় স্থান পায়—উভয়েরই ৪ পয়েন্ট দাঁড়ায়। ৩য় স্থান লাভ করে ভারতবর্ষের হোয়াইট দল (পয়েন্ট ৩)। সেমি-ফাইনালে জাপান ১—০ গোলে ভারতীয় 'ব্লু' দলকে এবং উগান্ডা ০—০ ও ১—০ গোলে ভারতীয় 'হোয়াইট' দলকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছিল। লীগের খেলায় উগান্ডা ৩—০ গোলে সিংহল, ২—০ গোলে জাপান এবং ২—১ গোলে ভারতীয় 'হোয়াইট' দলকে পরাজিত করে অপরাজেয় সম্মান লাভ করেছিল।

নেহরু ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা

দিল্লীতে আয়োজিত নেহরু স্মৃতি ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় জাপানের ইপি কোজিমা পুরুষদের সিঙ্গলস এবং ডাবলস খেতাব জয়লাভের সূত্রে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। মহিলাদের সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছেন ভারতবর্ষের কুমারী দময়ন্তী সুবেদার।

ফাইনাল খেলার ফলাফল

পুরুষদের সিঙ্গলস : ইপি কোজিমা (জাপান) ১০—১৫, ১৫—৪ ও ১৫—১০ পয়েন্টে মাসাও আকিয়ামাকে (জাপান) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস : কুমারী দময়ন্তী সুবেদার ১০—১২, ১২—৯ ও ১১—৭ পয়েন্টে কুমারী শোভা মূর্তিকে পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস : ইপি কোজিমা এবং মাসাও আকিয়ামা (জাপান) ১২—১৫, ১৫—৬ ও ১৫—১১ পয়েন্টে রবার্ট ম্যাককোইগীকে (স্কটল্যান্ড) এবং রিচার্ড পারসারকে (নিউজিল্যান্ড) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস : কুমারী শোভা মূর্তি এবং কুমারী রফিয়া লতিফ ১৮—১৩, ৫—১৫ ও ১৫—৫ পয়েন্টে শ্রীমতী সরোজিনী গোগতে এবং কুমারী সুনীলা আপ্তেকে পরাজিত করেন।

বল হাতে 'বিস্‌ময়াস'!

অজয় বসু



সিড্‌নী ফ্রান্সিস বার্নেস

[সিড্‌নী ফ্রান্সিস বার্নেসের জন্ম ১৮৭৩ সালের ১৯শে এপ্রিল। মৃত্যু ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৬৭।]

ক্রিকেটে সর্বকালের সর্বোত্তম বোলার কে? ফাস্ট, স্লো, স্পিন, সিম্‌ বোলিংয়ের কথা আলাদা আলাদাভাবে তুলে পরিধিটিকে সংক্ষিপ্ত না করেই প্রশ্নটির ব্যাপক আকার দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ সবরকম মিলিয়ে বোলিংয়ের যে মূল চরিত্র সেই চরিত্রের মূল্যায়নেই স্থির করতে হবে যে সর্বকালের সর্বোত্তম কোন্‌ জন।

ব্যাপক প্রশ্ন, তাই সদুত্তরের সন্ধানে ক্রিকেট অনুরাগী মহলে কাল থেকে কালান্তরে বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। নানা মুনির নানা মত হলেই মতের পিঠে অন্য মত এসে পড়েছে। একটি নামের পরে আবার অন্য নামও উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় যে আলোচনাকালে দেশবিদেশের বিশেষজ্ঞদের ঠোঁটের আগায় একটি নামই সবার চেয়ে বেশিবার এগিয়ে এসেছে। সে নাম এস এফ বার্নেসের। তাই সর্বকালের সর্বোত্তম অভিধায় তাঁকে অভিনন্দিত করতে অনেকেই, অন্ততঃ যাঁরা বার্নেসকে মাঠে দেখেছেন তাঁদের কারুরই আপত্তি নেই।

যাঁরা ওঁকে দেখেননি তাঁরা বার্নেসের মহিমা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ নাও হতে পারেন। যেমন স্যার ডন ব্র্যাডম্যান। স্যার ডন পরের যুগের মানুষ এবং বাস্তবিকও যুক্তিবাদী। তাই তিনি ওরাইলির চাতুর্য ও নিপুণতার কথা তুলে স্যার ডন তর্ক জুড়ে দিয়েছিলেন। বিশেষত্বের বা সর্বোত্তমের সংজ্ঞা দেওয়া হবে না কেন? ওরাইলি এই শতাব্দীর তিন দশকের বোলার আর বার্নেসের খেলা কেটেছে প্রথম মহাযুদ্ধেরও আগের কালে। ওরাইলির সময়ে অস্ট্রেলীয় উইকেটগুলিকে ব্যাটসম্যানদের স্বার্থে মনোমত করে দেওয়া হোতো। বার্নেসের কালে পিচ থেকে বোলাররা বাড়তি সাহায্য পেতেন। কাজেই বার্নেস ও ওরাইলির মধ্যে তুলনা করতে গেলে কি ঠিকে ভুল হয়ে যাবে না? স্যার ডনের আরও যুক্তি, বার্নেস আর ওরাইলি হরেকরকম বল করতে পারতেন। কিন্তু ওরাইলির লুকানো গুগলি এক বাড়তি হাতিয়ার। বার্নেস তো গুগলি দিতে পারতেন না?

প্রায় অকাট্য যুক্তি আর কি! কথাটা বার্নেসের কানে তুলেছিলেন স্বনামধন্য ক্রিকেট সাহিত্যিক স্যার নেভিল কার্ডাস। শুনেই বার্নেস বলেন 'কথাটা খাঁটি। সত্যিই আমি গুগলি বল করতাম না। কিন্তু তার তো কোনো দরকারই হোতো না!'

এই কথোপকথন ক্রিকেট সাহিত্যে ক্ল্যাসিকের মর্যাদা পেয়েছে। গুগলির কোনো দরকারই হোতো না। অথচ গণ্ডাগণ্ডা উইকেট পেতে বার্নেসের আটকাতোই না।

রেখে ঢেকেই বললাম, গণ্ডা গণ্ডা। নইলে না বাড়িয়েই ঠিক ঠিক হিসেবে বলা চলে যে সব মিলিয়ে বার্নেস হাজার হাজার উইকেট পেয়েছেন। টেস্ট ক্রিকেটে ১৮৯টি, গড়ে ১৬·৪৩ রানে, প্রথম শ্রেণীর খেলায় সতেরো রানের গড়ে ৭১৯টি এবং অন্য পর্যায়ের খেলায় আরও ৫৫০৬টি। সব মিলিয়ে বার্নেস তাঁর খেলোয়াড় জীবনে উইকেট নিয়েছেন ৬২২৫টি, গড়ে ৮·৩১ রানে। টেস্ট ক্রিকেটে তাঁর একটি নজীর এখনও অন্যের নাগালের বাইরে।

নজীরটি গড়েছিলেন বার্নেস ১৯১৩-১৪ সালে ইংলন্ড বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার খেলায়। পাঁচটির মধ্যে চারটি টেস্টে অংশ নিয়ে বার্নেস সেবার উনপঞ্চাশটি উইকেট পান। তারপর বহুদিন অতিক্রান্ত হয়েছে, অনেক নামী বোলারই ক্রিকেট মাঠের শোভা বাড়িয়েছেন। কিন্তু কেউই এক পর্যায়ের টেস্টে বার্নেসের মতো এক হাতে এতোগুলি উইকেট সংগ্রহ করতে পারেন নি। ইংলন্ডের জিম লেকার ১৯৫৬ সালে ছেচল্লিশটি এবং অস্ট্রেলিয়ার ক্ল্যারি গ্রিমেট তারও দশ বছর আগে এক পর্যায়ে চুয়াল্লিশটি উইকেট নিয়ে বার্নেসের দৃষ্টান্তের কাছাকাছি এগিয়ে গেলেও তাঁরা দুজনেই কিন্তু এক পর্যায়ে পাঁচটি করে টেস্টেই বল করেছিলেন। বার্নেস যদি সেবার পাঁচটি টেস্টে খেলতেন!

স্যার ডন সিড্‌নী বার্নেসকে বল করতে দেখেন নি। তাঁর কথা শুনেছেন। কিন্তু শোনা কথাকে অভ্রান্ত সত্য বলে মেনে নিতে তাঁর আপত্তি থাকতে পারে। কিন্তু যাঁরা বার্নেসকে দেখেছেন, তাঁর সঙ্গে, পক্ষে ও বিপক্ষে খেলেছেন, সব প্রশংসা উজাড় করে বার্নেসের অনুকূলে সোনার সার্টিফিকেটটি বাড়াতে তাঁদের কণামাত্র কুণ্ঠা নেই তাঁরাও সব ক্রিকেটে বিদগ্ধ জন, কেউ দিকপাল খেলোয়াড়, কেউ বোদ্ধা ও বিশেষজ্ঞ। দু একজনের অভিমত জেনে নেওয়া যাক্‌।

ক্রিকেটে ত্রিকালজ্ঞ স্যার পেলহাম লিখেছেন, 'সিড্‌ বার্নেসের চেয়ে উঁচু দরের কোনো বোলারের সঙ্গে আমি খেলিনি।' অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক মন্টি নোবলেরও সেই মত, অসঙ্কোচে বলতে পারি, বার্নেসই বিশ্বের সর্বোত্তম বোলার। বিশিষ্ট সমালোচক এ জি ময়েস (দি সেঞ্চুরী অব্‌ ক্রিকেটার্স), জিম সোয়ানটন বলেছেন, 'সিড্‌নী ফ্রান্সিস বার্নেসই বোধহয় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বোলার—'দি গ্রেটেস্ট' (দি ওয়ার্ল্ড অব ক্রিকেট)। তিন দশকের টেস্ট খেলোয়াড় ও সমালোচক অস্ট্রেলিয়ার জ্যাক্‌ ফিঙ্গলটনের বিখ্যাত ও বহুপঠিত বার্নেসের ওপর এক প্রবন্ধের শিরোনামই হলো 'ওয়ার্ল্ডস গ্রেটেস্ট বোলার।' পুরানো কাল ও পূর্বসূরীদের সম্পর্কে কিঞ্চিৎ উদারপন্থী বলে আর যাঁরই অপবাদ থাকুক না কেন, সে অপবাদ নিশ্চয়ই জ্যাক্‌ ফিঙ্গলটন বা জিম সোয়ানটনের উদ্দেশ্যে ছোড়া যাবে না। কাজেই বলতে পারা যায় যে বিশ্ববিশ্রুত ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের মধ্যে বোধহয় নামমাত্র কয়েকজন যথা স্যার ডন ব্র্যাডম্যান ছাড়া বাকী সকলেই অভ্রম প্রত্যয়ে যে সিড্‌ বার্নেসই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বোলার।

দি গ্রেটেস্ট—এই অভিধাটির পরোক্ষ

প্রতিফলন দিকপাল অস্ট্রেলীয় ব্যাটসম্যান চার্লস ম্যাকারটনি ও ক্লেম হিলের স্বীকারোক্তিতেও থেকে গিয়েছে।

অস্ট্রেলিয়ায় সিড্ বার্নেস টেস্টে প্রথম আউট করেন অনন্য ভিক্টর ট্রাম্পারকে। ম্যাকারটনি ছিলেন সেই মুহূর্তে বোলার প্রান্তে। যে বলে ট্রাম্পার বোল্ড হলেন সেই বলের বর্ণনায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ম্যাকারটনি বলেছেন, 'এ ধরনের বল মাতাল হলে অথবা স্বপ্নেই দেখা যায়! বলটি লেগ স্টাম্পে পিচ পড়ার আগেই অফের দিকে বাঁক ফিরলো। তারপর পিচ পড়া মাত্রই লেগের দিকে ছুটলো এবং ছুটতে ছুটতে ভিক্টরের লেগ স্টাম্পটিকে গুঁড়িয়ে দিলো। আশ্চর্য!'

ঠিক এরিই উল্টো প্রকৃতির বলে বার্নেস মেলবোর্নে ক্লেম হিলের স্টাম্প উপড়ে দিয়েছিলেন। হিলের নিজের কথায় 'বলটি প্রথমে বাতাসে বাঁক ফিরিয়ে লেগের দিকে আসতে থাকে। অনে আস্তে ঠেলে একটি রান নেওয়ার মতলব ভাঁজছি, এমন সময় বলটি মাটিতে পিচ খেয়েই দুরন্ত গতিতে উল্টো মুখে ছুটেই অফ স্টাম্পে ধাক্কা বসালো। সঙ্গে সঙ্গে আমিও খতম!'

স্পিন ও সুইং এক সঙ্গে মিশিয়ে সিড্ বার্নেস তাঁর অস্ত্র শানাতেন। বলের সেলাইয়ে আর মাটির সংঘর্ষে যে বলের গতি বদল হোতো তা নয়, নির্ভেজাল স্পিন ও সুইং, দুয়েরই সংমিশ্রন ঘটতো। এমন অনন্যসাধারণ নৈপুণ্য বার্নেস অধিগত করেছিলেন বল ছাড়ার কৌশলে। মাথায় তিনি ছিলেন ছ' ফুট এক ইঞ্চি লম্বা। আরও ওপরে তোলা মুঠি থেকে বল মাটিতে নেমে আসতো। উঁচু থেকে মাটিতে পড়ার দরুন বল লাফাতোও বেশি। তাছাড়া বোলিং ক্রিজটি সম্ভবমতো সবরকমেই ব্যবহার করতেন তিনি—কখনো উইকেটের গা ঘেঁষে, কখনো ক্রিজের মাঝখান থেকে আবার কখনো বা ক্রিজের অন্য ধারে এসে বলটিকে ছেড়ে দিতেন। খাড়া দাঁড়িয়ে দুরন্ত হাতটি কানের চামড়া ছুঁয়েই নামিয়ে আনতেন। বলে স্পিনের পাক্ ধরাতেন কব্জী বাঁকিয়ে নয়, আঙুলের মোচড়ে। কারণ, কব্জী বাঁকালে তাঁর কায়দাটি ব্যাটসম্যানেরা আগে-ভাগেই বুঝে ফেলতে পারতেন। বোলিং রীতির নিয়মিত রকমফেরেই বলের গতি-প্রকৃতিও ক্ষণে ক্ষণে বদলে যেতো।

এতো বড় এবং এমন জাতের বোলার বার্নেস, তবু অনেক সময় টেস্ট খেলায় তাঁর ডাক পড়তো না। কেন জানি না, ইংলণ্ডের নির্বাচকমণ্ডলী বহুবারই বার্নেস সম্পর্কে এক নিতান্ত দুর্জ্ঞেয় নীতি অনুসরণ করেছিলেন। প্রথমবার সফরে গিয়ে সেখানকার শক্ত পিচে অস্ট্রেলীয় ব্যাটসম্যানদের নাস্তানাবুদ করা সত্ত্বেও পরের মরশুমে ইংলণ্ডের টেস্ট মাঠে মাত্র একবারের জন্যে তাঁকে ডাকা হয়। সেই একবার এক ইনিংসে ৪৯ রানে ছটি উইকেট পেলেও নির্বাচকমণ্ডলী আবার তাঁকে ভুলে যান। এই বিস্মরণ বিস্ময়কর। তাই স্যার নেভিল কারডাস লিখেছেন, '১৯০২ থেকে ১৯০৭-৮ পর্যন্ত বার্নেস টেস্ট মাঠে ছিলেন না। থাকলে তিনি যে আরও কতো উইকেট পেতে পারতেন তা অনুমানেরই বিষয়।' কে বিশ্বাস করবে যে ১৯০১ থেকে ১৯১৪-র মধ্যে সিড্নী বার্নেস মাত্র সাতাশটি টেস্ট খেলার সুযোগ পেয়েছেন!

তবে বার্নেস নিজেও টেস্টে বা প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে দিনের পর দিন খেলতে তেমন আগ্রহী ছিলেন না। ১৯০১ সালে অস্ট্রেলিয়া সফরে খ্যাতির তুঙ্গে ওঠার পরও বার্নেস কাউণ্টি ক্রিকেটে নিয়মিত খেলেছেন মাত্র দু' বছর। সপ্তাহে প্রায় প্রতিদিন খেলার চেয়ে সপ্তাহ শেষে শনিবারে বা মাঝ সপ্তাহে একদিন অপ্রধান লীগ ল্যাঙ্কাশায়ার, ব্র্যাডফোর্ড, নর্থস্ট্যাফোর্ডে ক্রিকেটে খেলাটাই তিনি বেশি পছন্দ করতেন। বার্নলে, স্ট্যাফোর্ডশায়ার, রিসটন, রটেনস্টল, ব্রিজনর্থ ইত্যাদি অপ্রধান দলগুলির পেশাদার হিসেবে তিনি প্রায় পঁয়ষট্টি বছর পর্যন্ত অপ্রধান লীগ আসরে উপস্থিত ছিলেন এবং নাঁট-পূর্তির পর লীগ ক্রিকেটের এক এক মরশুমে শতাধিক উইকেট পেতে তাঁর অসুবিধে হয় নি।

অপ্রধান লীগে বার্নেসের খেলার সময়েই (১৯০১) ইংলণ্ডের অধিনায়ক এ সি ম্যাকলার্ন তাঁকে খুঁজে বার করে অস্ট্রেলিয়ায় নিয়ে যান। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে অজ্ঞাত-পরিচয় এই বার্নেসকে সফরকারী দলে ঠাঁই দেওয়ায় সেদিন ম্যাকলার্নকে তীব্র সমালোচনার সামনে পড়তে হলেও বার্নেস প্রথম সুযোগেই বিরুদ্ধবাদীদের চুপ করিয়ে দিয়েছিলেন। টেস্টে প্রথম খেলার সুযোগ আসে সিড্নীতে আর সেই সুযোগ সদ্ব্যবহার করে বার্নেস ছটি উইকেট নিয়ে নেন ১৩৯ রানের বিনিময়ে।

সবে শুরু। তাই নতুন মুখের এই সাফল্যে সেদিন ক্রিকেট মহলে রীতিমতো চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল। কিন্তু পরের টেস্টে মেলবোর্নে বার্নেস ৪২ রানে ৬টি এবং ১২১ রানে আবও সাতটি উইকেট পেতেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তাঁর নিশ্চিত আবির্ভাব মাথা পেতে সবাই মেনে নেন।

বছর দশেক পর আর একদিন এই মেলবোর্ন মাঠেই বার্নেস এমন কাণ্ড বাধিয়ে তুলেছিলেন যা টেস্ট ক্রিকেটের দীর্ঘ ইতিহাসর এক স্মরণীয় অধ্যায়রূপে অক্ষয় হয়ে আছে।

সেদিন টসে জিতে অস্ট্রেলিয়ার ক্লেম হিল প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন আর ইংলণ্ডের অধিনায়ক ডগলাস বল করতে ডাকেন ফস্টার আর বার্নেসকে। অস্ট্রেলীয় ইনিংসের গোড়াপত্তন করায় নামেন কেলিওয়ে ও বার্ডসলে। ফস্টারের প্রথম ওভারে রান হয় নি। এবার বার্নেসের বল শুরু করার পালা। খেলবেন বার্ডসলে।

বার্নেসের প্রথম বলেই বার্ডসলে বোল্ড! বলটি বাঁক ফিরে ভেতরে ঢুকে প্রথমে লাগে বার্ডসলের প্যাডে, তারপর স্টাম্পে। স্টাম্পে না লাগলেও বার্ডসলে এল বি ডব্লিউ হয়ে যেতেন। এবার এলেন ক্লেম হিল। তিনিও বার্ডসলের মতোই ন্যাটা। এসেই এক রান করলেন। এই একটি রানের বিষয় মনে রাখার মতো। কারণ পরের একঘণ্টায় অস্ট্রেলিয়ার আর কোনো ব্যাটসম্যান নামমাত্র একটি রানও করতে পারেন নি বার্নেসের বলে।

দ্বিতীয় ওভারে বার্নেস কোনো উইকেট পেলেন না, যদিও হিল একবার আউট হতে হতেই বেঁচে গেলেন। তৃতীয় ওভারে বার্নেস কেলিওয়েকে ফিরিয়ে দিলেন। এলেন আর্মস্ট্রং। আর্মস্ট্রং আর হিল শেকড় গাড়তে চেষ্টা করলেন, কিন্তু বার্নেসের বোলিংয়ের ধারে শেকড়গুলি ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেল। দলের আট রানের মাথায় হিল এবং আর্মস্ট্রং দুজনেই খতম। চার চারটি উইকেট পেলেন বার্নেসই। রান দিয়েছেন মাত্র একটি। এরপর অসুস্থ-বোধ করায় বার্নেস মাঠ ছেড়ে চলে যাওয়ায় অস্ট্রেলীয় ব্যাটসম্যানেরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। মধ্যাহ্নভোজনের পরে বার্নেস আবার মাঠে ফিরে এসে মিনেটকে যখন আউট করেন তখন তাঁর বোলিংয়ের গড় হিসেব ছিল এগারো ওভারের নটি মেডেন, উইকেট পাঁচটি, মাত্র ছ' রানের বিনিময়ে। টেস্ট ক্রিকেট বোলিংয়ের এমন সংহার মূর্তির পাশে জায়গা করে নিতে পারে এমন নজীর আর নেই।

টেস্ট ক্রিকেটের এক ইনিংসে সবকটি উইকেট পেয়ে ইংলণ্ডের জিম লেকার ১৯৫৬ সালে যে রেকর্ড গড়েছেন সে রেকর্ডে অবশ্য বার্নেসের ভাগ নেই। কিন্তু একাধিক টেস্ট ইনিংসে আটটি করে, আর একটিতে নটি উইকেটও পেয়েছেন।

সর্বকালের সেরা পর্যায়ের বোলারদের ক্রিকেট অনুরাগীমহলে এক একটি আদরে নাম আছে। যেমন অস্ট্রেলিয়ার স্পফোর্থকে বলা হয় 'দি ডেমন', টার্নারকে 'দি টেরর', গ্রিমেটকে 'ওয়ালি ফক্স', ওরাইলিকে 'দি টাইগার', ইংলণ্ডের ফাস্ট বোলার ফ্রেড ট্রুম্যানের আর এক নাম 'ফায়ার', লারউডকে বলা হয় 'জহ্লাদ', অস্ট্রেলিয়ার রে লিণ্ডওয়ালকে 'মৌনথুনী'। কিন্তু বার্নেসের এমন কোনো স্বতন্ত্র নামকরণ হয় নি। কেন জানি না। শুধু এস এফ বার্নেস নামেই তিনি চিরদিন পরিচিত।

বার্নেসের নিজের নামই মন্ত্রো। তাঁর মহিমা বোঝাতে অন্য কোনো অভিধার দরকারও পড়ে না সত্যি। তবু তাঁকে কেউ যদি কোনোদিন অন্য সংজ্ঞায় চিহ্নিত করে থাকেন তা হলে তিনি হচ্ছেন ক্রিকেট লিখিয়ে মহলের অবিসম্বাদী সম্রাট স্যার নেভিল কার্ডাস।

কার্ডাস বার্নেসকে আগ্নেয়গিরির বিসুবিয়াসের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন যে বার্নেসের মধ্যে ব্যাটসম্যান বিধ্বংসের আগুন চিরদিনই ধিক্ ধিক্ করে জ্বলতো। হঠাৎ নিজের মুডে এলেই তিনি অগ্ন্যুৎপাত ঘটিয়ে ছাড়তেন। বোলিংয়ের বিষে ব্যাটস-ম্যানেরা বিধ্বস্ত হতেন, শানানো আক্রমণের অবাধ লাভাস্রোতের মুখে পড়ে হাতের ব্যাট আর প্রতিরোধের ছক কোথায় ভেসে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো।

দক্ষিণ আফ্রিকার ম্যাটিং উইকেট বা অস্ট্রেলিয়ার শক্ত পিচে বার্নেসের সংহার মূর্তির কথা ভাবলেই মনে হবে, সত্যিই বিসুবিয়াসই বুঝি সিড্নী ফ্রান্সিস বার্নেসের সার্থক নামকরণ।



॥ ১২ ॥

আশীর্বাদি যত বড় বড় আর ভাল ভাল কথাই বলুন—সুরবালা সত্যিকারের কোন সান্ত্বনা পায় না মনে। সে নিজে যেন কোনদিকেই কোন আলো দেখতে পায় না। যেদিকে চায় অকূল অতন্দ্র অন্ধকার। হতাশ হয়ে এক-একবার ভাবে শেষপর্যন্ত রঘুবাবুকেই খবর পাঠাবে নাকি, তার সঙ্গেই মিটমাট করে নেবে? আবার লোকটার কথা—তার আকৃতি আর প্রকৃতি মনে হলে শিউরে ওঠে মনে মনে। ঐ কদাকার ক্রূরাক্ষ বিষাক্ত জানোয়ারের কাছে নিজেকে সঁপে দেওয়া মানে নিজের এই দেহ, ঐ কৃমিকীটটাকে উৎসর্গ করা। তার চেয়ে গঙ্গার জল ঢের ভাল!

আসলে তার এই বর্তমান কর্মস্থান ভাল লাগে না বলেই এত অসহ্য বোধ হয়। প্রতিটি মুহূর্ত—যেটুকু সময় সেখানে থাকতে হয়—যেন একটা অপমানের জ্বালা ভোগ করে সে।

মতির কাছে যখন শিক্ষানবিশ ছিল, আর মন যুগিয়ে চলতে হত, গালমন্দ অনেক খেয়েছে—তবু তাতে এরকম অপমান বোধ হয়নি ওর। কে জানে কেন প্রথম থেকেই তার মনে হয় সে এদের চেয়ে অনেক বড়, এদের মধ্যে এসে শিক্ষানবিশী করা উচিত হচ্ছে না। এর মধ্যে একটা বইতে ছোটখাটো একটা পার্টও পেয়েছে—খুব খারাপও করেনি অভিনয়—অন্য কোন মেয়ে হলে সেই নজীর দেখিয়ে বড় পার্ট দাবী করত, আদায়ও করে নিত, ঝগড়াঝাঁটি করে—কিন্তু সুরবালা সেদিকে কোন উৎসাহই বোধ করে না। যা করতে বলেন এঁরা তার বেশী কিছু করতে চায় না। এগিয়ে যাবার কোন চেষ্টাই করে না। কোনমতে—নিয়মিত পরিশ্রম করে যায় মাত্র।

অবশ্য চেষ্টা করলেও যে এমন কিছু সুফল হত—তা মনে হয় না।

এ এক বিচিত্র জগৎ, এখানে উন্নতি আসে এক বিশেষ পথ ধরে।

গুণের সম্মান নেই তা নয়—কিন্তু তার চেয়েও সমাদর রূপ-যৌবনের। যে-শক্তি, যে-প্রতিভা সুপ্রত্যক্ষ, যা সূর্যোদয়ের মতো উজ্জ্বল এবং অনস্বীকার্য—সে-শক্তিকে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারে না বটে—তবে তারও বহু লড়াই করতে হয়। সহজে সে পথ পায় না। এখানে মনিব বা কর্তাশ্রেণীর লোকদের কে প্রিয় হতে পারবে, বাঞ্ছিত, কি প্রেয়সী হতে পারবে—তা নিয়ে মেয়েদের মধ্যে গোপন রেষারেষি প্রতিদ্বন্দ্বিতার অন্ত নেই। সে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে স্বয়ং জি-সিও বাদ যান না। শুনল, এই মাত্র কিছুদিন আগেই ঘটনাটা ঘটে গেছে, প্রমদা বলে একটি বড় নামকরা অভিনেত্রী—এক সময়ের সম্রাজ্ঞী দীর্ঘাঙ্গী মেয়ের দিকে জি-সির পক্ষপাত লক্ষ্য করে বা অনুমান করে জি-সিকে কিছু বলতে সাহস না পেয়ে—তুচ্ছ একটা ছুতো ধরে ঝগড়া বাধিয়ে সেই নতুন মেয়েটিকে জুতো ছুঁড়ে মেরে বেরিয়ে গেছে থিয়েটার থেকে, আর আসেনি। এখন তার সে থিয়েটারও করে না—বাংলাদেশের এক একটা খেতাবধারী বড় জমিদারের রক্ষিতারূপে তাদের দেশে গিয়ে প্রকাশ্যে রাণীর মতোই বাস করছে। জমিদারটি এত মোটা যে, তাকে পাশ ফিরিয়ে দিতে দুজন চাকর লাগে। তা হোক—শাড়ি-গয়নার অভাব দুঃখ নেই। বাড়িঘর কোম্পানীর কাগজ হয়েছে—তাতেই সে খুশী। এমন সুপরিণাম নাকি অনেকেরই হয়েছে অনেক পরেও। আসলে এদের অনেক মেয়ের কাছেই থিয়েটারটা হল ধনী 'বাবু' ধরবার জায়গা।

প্রমদা তা নয় অবশ্য, তার শক্তি ছিল। ছিল বলেই বোধহয় অধিকতর শক্তির অভ্যুত্থান সহ্য করতে পারল না। নবীন অভিনেত্রীটির যারা গুণ-উপাসক, তারা অবশ্য বলে—জি-সির পক্ষপাত নয়, নিজের অক্ষমতাই প্রমদার পতনের কারণ। কী একটা বইতে রিহার্সালের সময় ওর পার্ট জি-সি যেমন দেখিয়ে দিচ্ছিলেন, কিছুতেই তেমন তুলতে পারছিল না ও। বিরক্ত হয়ে ঐ নতুন মেয়েটি একপাশে বসে একাগ্র হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে আছে লক্ষ্য করে—জি-সি তাকে ডেকে বলেছিলেন, 'এই, তুই বল্ তো এইখানটা কেমন বলতে পারিস দেখি!' অমনি সে-মেয়েটি উঠে, উপস্থিত সকলকে বিস্মিত করে একেবারে হুবহু জি-সি যেমন দেখিয়ে দিচ্ছিলেন—সেইভাবে বলেছে, এবং কোন কোন জায়গায় আরও ভাল। সে-কথা অবশ্য সবাই স্বীকার করে—শুধু গ্রহ-উপগ্রহরাই নয়—এমনকি নানু, যে এখানের সব কথা নিয়েই নিয়ত ব্যঙ্গ করে—সেও।

ফলে জি-সি সেই নতুন মেয়েটিকেই সেই পার্ট পুরোপুরি রিহার্সাল দেওয়াতে থাকেন। আর সেই কারণেই এই বিপত্তি। '[illegible] হাঁদারাম বুড়োর মন ভুলিয়ে বড় পার্ট আদায় করেছিস' বলে ধিক্কার দিয়েছিল প্রমদা। নতুন মেয়েটি শক্তিশালিনী হলেও খোলার ঘরের মেয়ে, সেও ছেড়ে কথা কয়নি। অতঃপর গালিগালাজের মাত্রা পেরিয়ে গেছে সঙ্গে সঙ্গে—শেষপর্যন্ত সেদিনের উপসংহার হয়েছে ঐ জুতো ছোঁড়াছুঁড়িতে।

এই মেয়েটিকে লক্ষ্য করেছে সুরবালা। পরবর্তী কালেও খবর রেখেছে। ওর অভ্যুত্থান লক্ষ্য করবার মতোই। পাঁচ টাকা মাইনেতে ঢুকেছিল, অনুবাদ-করা বড় একটা বিলিতী নাটকে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করে যখন বিলেতের শ্রেষ্ঠ অভিনেতাদের বাহবা পেয়েছে—তাঁরা প্রচুর মাইনে দিয়ে বিলেতে নিয়ে যাবার প্রস্তাব পর্যন্ত করেছিলেন—তখনও তার মাইনে পঁচিশ টাকার বেশী নয়। তবে অন্যদিকে উন্নতির তো কথাই নেই—সেও উল্কার মতো। বিখ্যাত [illegible]

ঠাকুরের বংশের এক নাতি, উচ্চশিক্ষিত পাক্কা সাহেব একজন—ধনী সুপুরুষ—তাকে রক্ষিতা রেখেছিলেন আমরণ। মেয়েটি আদৌ একনিষ্ঠা নয়, এ-সৌভাগ্যের মূল্য সম্বন্ধেও তার কোন সচেতনতা নেই। ভদ্রলোকও তা জানতেন, সে যে প্রায় প্রকাশ্যেই বহু মধুকরকে মধু বিতরণ করে—তা জেনেও কখনও ত্যাগ করতে পারেননি। কোন হিতাকাঙ্ক্ষী সে বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গেলে বলতেন, 'আরে মশাই, নিজের বিয়ে-করা স্ত্রীর চরিত্রই লোকে পাহারা দিতে পারে না—এ তো বাজারের মেয়েমানুষ।' 'তবে মাইনে দিয়ে পুষছেন কেন?' এ-প্রশ্নের উত্তরে জবাব দিতেন, 'আমার দরকারের সময় পাবো বলে। আমার সময়টুকু না কাটিয়ে সে কোথাও যাবে না বা অন্য কাউকে ঘরে আসতে দেবে না। আমি ওকে বাঁধা রাখিনি—ওর খানিকটা সময় বাঁধা রেখেছি—এই মনে করলেই আর কোন অসুবিধা হবে না।'

মেয়েটি ফরসা নয় বরং রীতিমতো ময়লাই। শিক্ষিত তো নয়ই—বর্ণপরিচয় পর্যন্ত হয়নি দীর্ঘকাল। অথচ এমনই আশ্চর্য আকর্ষণ ছিল তার যে, শুধু এই ভদ্রলোকই নন—বহু সম্ভ্রান্ত লোকই তার জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠতেন। বড় বড় বিখ্যাত উকিল ব্যারিস্টারের মাইফেল অচল হয়ে যেত—এই অশিক্ষিতা মেয়েটি না গেলে। খুব শিক্ষিত এক ব্যারিস্টার, যিনি ঘরেও ইংরেজী ছাড়া কথা বলেন না, তিনিও এই মেয়েটি ছাড়া মাইফেলের আয়োজন করতেন না। এর বিস্ময়কর স্নিগ্ধ রূপজ্যোতিতে (রঙ ছাড়া অবশ্য চেহারাটা দেখবার মতোই) এবং উজ্জ্বল বর্ণাঢ্য প্রতিভায় আকৃষ্ট হয়ে বহু পতঙ্গই ঝাঁপিয়ে পড়ত—নিরাশ হত না প্রায় কেউই। পরবর্তী কালে এই গোপন অভিসারীদের দলে নাকি স্বয়ং জি-সিও যোগ দিয়েছিলেন। আর তার ফলেই নাকি তার এই উন্নতি। শিখিয়ে বড় বড় পার্ট দিয়ে তার জন্যে বিশেষ নাটক রচনা করে তাকে অমর করে দিয়ে গিয়েছিলেন। প্রতিভা ছাড়া এ-আকর্ষণের আর কি কারণ থাকতে পারে, তা ভেবে পায়নি সুরবালা। বৃন্দাবনের সেই প্রায়ান্ধকার বারান্দায় বসে জীবনের প্রায় অন্তিম মুহূর্তেও সেই বিস্ময় প্রকাশ করে গেছে সে। সেই সঙ্গে নিজের অভিজ্ঞতাপ্রসূত জ্ঞান থেকে একটা সিদ্ধান্তও—রূপের দীপ্তির চেয়ে বুদ্ধির দীপ্তি, প্রতিভার দীপ্তি ঢের বেশী আকর্ষণ করে মানুষকে।

অবশ্য সেটা দুদিক দিয়েই।

এও দেখেছে সুরবালা, তেরো-চোদ্দ বছরের মেয়ে—যে পরবর্তী কালে খ্যাতিতে ঐ 'নাট্যসম্রাজ্ঞী'কেও ছাড়িয়ে গিয়েছে—কোন নাট্যকারের পক্ষপাত না পেয়েও—সে পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছরের শিক্ষক অভিনেতার প্রেমে স্বেচ্ছায় নিজেকে সঁপে দিয়ে কৃতার্থ বোধ করেছে—এ তো সবাই জানে। আবার সেই মেয়েই মাত্র ষোল বছর বয়সে নাট্য-গৌরবের শীর্ষস্থানে পৌঁছে কর্তৃপক্ষকে তথা নতুন নাটককে ডুবিয়ে এক সুদর্শন অভিনেতার সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছে—তার জন্যে হাসিমুখে অশেষ দুঃখ সহ্য করেছে। আবার সে-ই পরবর্তীকালে আর এক নট-নাট্যকারের জন্য যথাসর্বস্ব খুইয়েছে। বাড়ি-জমি-টাকা, কোম্পানীর কাগজ—বিপুল বিত্ত নিঃশেষ করে পথের ভিখিরী হয়ে সত্যি সত্যিই পথে বসেছে, অনেক দেখে-শুনে সুরবালা এইটেই বুঝেছে যে, যে-কোন শিল্পীর ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য। শুধু প্রতিভার জন্যেই সাধারণ লোক ছোটে না—প্রতিভাও ছোটে অত্যন্ত অপাত্রে নিজেকে সঁপে দিতে। লেখক কবি নটনটী গাইয়ে বাজিয়ে চিত্রকর—সকলের পক্ষেই এ-কথা সত্য—এমনকি যাদুকরেও। নিজের ভাইকে দিয়েই আরও চরম শিক্ষা হয়েছে তার, আরও ভাল করে বুঝেছে কথাটা। সাধারণ কেরানী বা খেটে-খাওয়া মানুষ থেকে যারা একটু আলাদা, তাদের প্রত্যেকেরই মনের গতি জটিল এবং বিচিত্র। আর সে-গতি কারও সঙ্গেই কারও মেলে না। সুরবালা নিজের মনেরই কি তল পেল জীবনে? মরবার দিন পর্যন্ত নিজেকে তো সেই প্রশ্নই করে গেছে বারবার।

সবচেয়ে বিপন্ন বোধ করে সুরবালা নিজের ভাইটিকে নিয়েই। সব দুঃখের চেয়ে যেন এই দুঃখটাই বেশী তার। ম্যাজিক ম্যাজিক করে পাগল—কিন্তু সেরকম পাগল তো সব লাইনেই দেখা যায়। এমন মানুষের বাইরে চলে যায় কে? যে জন্যে পাগল, সেই ম্যাজিকটাও তো নিয়ম করে কোথাও শেখে না। ঐ উপলক্ষ করেই বকে গেল শুধু—এখন তো একেবারেই শাসনের বাইরে চলে গেছে। বৃত্তি শিক্ষার যে সুপ্রশস্ত সরল রাজপথ—গুরুমুখী শিক্ষা ও সাধনার পথ—সে-পথে তো আদৌ হাঁটল না সে। উচ্ছৃঙ্খল বেপরোয়া জীবনই তার আসল লক্ষ্য—শিক্ষাটা তার পত্রাবরণ মাত্র।

বাড়িতে বাস করা বা নিয়মিত আসা-যাওয়া করা দীর্ঘকালই ছেড়ে দিয়েছে সে। কোথায় থাকে, কোথায় যায়, কেনই বা এমন সুদীর্ঘ সময় নিড়ুবি খেয়ে থাকে—তা কেউ জানে না। বাবা সে-খোঁজখবর করাও ছেড়ে দিয়েছেন, কোন কথাই কন না ছেলের সম্বন্ধে বা ছেলের সঙ্গে। যেদিন থেকে দেখেছেন ছেলেকে শাসন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়—শাসন করতে গেলেই তার মা ও দিদির অতিরিক্ত স্নেহ ও প্রশ্রয় প্রতি-বন্ধক হয়ে দাঁড়ায়—সেইদিন থেকেই ও-ব্যাপারে একেবারে নীরব হয়ে গেছেন। মা আর সুরবালা নিজে অবশ্য বিস্তর সস্নেহে মিষ্টি কথায় তথ্যটা বার করার চেষ্টা করেছে—কিন্তু পরিষ্কার কোন জবাব পায়নি কোনদিনই।

তবে একটা কথা—ওর বক্তব্যের টুকরো টুকরো বাক্যের ফাঁকে ফাঁকে ওরই মধ্যে বুঝতে পেরেছে যে, এই ইন্দ্রজাল বা যাদু শেখার জন্যে কোন অস্থানে কুস্থানে যেতেই পিছপা নয় সে। সেই কোথায় কোথায় দূর দেশে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে বেদেদের টোল পড়ে—সেখানে গিয়ে তাদের সঙ্গে মিশে তাদের তাঁবুতে বা বটপাতার ছাউনি দেওয়া ঘরে দিন কাটিয়েছে সে। তাদের ভাত খেয়েছে। সেই সঙ্গে গোপনে চোলাই-করা পচাই মদও। কোন্ ভেল্‌কি-ওলা আর্মানিটোলার এক এঁদো গলিতে কোন্ মেয়েমানুষের বাড়ি নেশার বুঁদ হয়ে পড়ে থাকে মাসের মধ্যে অর্ধেক দিন—সেখানে গিয়ে সেই মেয়েমানুষটার জন্যে রাস্তার কল থেকে বালতি বালতি জল ধরে দিয়ে—ভেল্‌কিওলার পা টিপে গা টিপে সেইখানে তাদের ভাত আর 'ছ্যালন' খেয়ে পড়ে থেকেছে—যে বাড়িতে একঘটি জল গড়িয়ে খায় না, কুটি ভেঙে দুটি করে না।

তবু এতকাল মধ্যে মধ্যে দশ-পনেরো-বিশ দিন অন্তরও আসত, এলে দু-চার দিন আবার থেকেও যেত—আবার যাওয়ার খেয়াল চাপলে এই অভাবের সংসার থেকেও কেড়ে বিগড়ে মিনতি করে মিছে কথা বলে দু-একটা টাকা সংগ্রহ করে সরে পড়ত। সেই-টুকুই ছিল এদের সান্ত্বনা। কিন্তু ইদানীং বেশ কিছুদিন হল একেবারেই নিপাত্তা হয়ে গেছে। সুরবালা থিয়েটারে চাকরি নেবার দিনকতক আগে সেই যে একদিন পঞ্চাশটি কিছু এদের কাছ থেকে আদায় করতে না পেরে রাগ করে না খেয়েই বেরিয়ে গেছে—এই ক'মাসের মধ্যে আর আসেনি। কোথাও থেকে কোন চিঠি কি কোন খবরও দেয়নি।

প্রথম দু-এক মাস সেজন্যে কেউই বিশেষ উদ্বেগ বোধ করেনি—কিন্তু এখন সকলেই চঞ্চল হয়ে উঠেছে। নিস্তারিণী প্রকাশ্যেই কান্নাকাটি করে, সে চরমটাই ধরে নিয়েছে, 'ছেলে আমার বেঁচে নেই, সে আমি বেশ জেনেছি। বেঁচে থাকলে এমন চুপ করে থাকতে পারত না। বাছা আমার অভিমানে হয়ত আত্মঘাতীই হয়েছে—কে জানে!..যে যাই বলুক—খোকার আমার মা-অন্ত প্রাণ, মাকে না দেখে এই এতটা কাল থাকতে পারত না কিছুতেই।'...

মেয়েকে শুনিয়ে স্বামীকে শুনিয়ে গলা আরও চড়িয়ে দেয়, 'ওরে এ কী অলক্ষুণে অপয়া বাড়িতেই এসেছিলুম রে! কী কুক্ষণে যে মেয়ের রোজগারে পাকা বাড়িতে বাস করার জন্যে কর্তা পাগল হয়ে উঠলেন—বাড়িতে পা দিয়ে এস্তক হাঁড়ির হাল হদ্দনাকাল হলুম, শেষপর্যন্ত ছেলেটাকে অবধি ক্ষোয়াতে হল!'

ভবতারণ মুখে কিছুই বলেন না, স্ত্রীকে যেমন সান্ত্বনাও দেন না, তেমনি নিজেও হাহুতাশ করেন না, তবে আজকাল প্রায়ই যে অনেকক্ষণ ধরে এক জায়গায় পাথরের মতো গুম খেয়ে বসে থাকেন এবং মধ্যে মধ্যে বুক-ফাটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন, সে যে কার জন্যে তা সুরবালা জানে। মজা এই—তার নিজের যে কষ্ট তা এই দুজনের মাঝখানে প্রকাশ পর্যন্ত করতে পারে না। অথচ দুঃখ এদের কারও চেয়েই কম নয় হয়ত। আপন ভাই না হোক—তা যে নয় আজও তো মনে হয় না ওর—ছোটবেলা থেকে কোলেপিঠে ফেলে মানুষ করেছে—ভাইটা তার প্রাণ। কার্তিকের মতো সুন্দর ভাই, ভাইয়ের জন্যে ছেলেবেলা থেকে গর্বের শেষ ছিল না ওর।...সেইজন্যেই কখনও শাসন করতে পারেনি, কাউকে করতে দেয়নি।...কী স্বাস্থ্যই না হয়ে উঠেছিল, বোল বছর বয়সের সময়ই পঁচিশ বছরের

জোয়ান বলে মনে হত। সেই স্বর্ণকান্তি না খেয়ে না দেয়ে স্থানে-অস্থানে ঘেড়িয়ে টো-টো করে ঘুরে কালি হয়ে যাচ্ছে, ঢলঢল সুন্দর মুখ চোয়াড়ে কঠিন হয়ে উঠছে—এই তো যথেষ্ট দুঃখ তার। তার ওপর যদি দুমাস-তিন মাস অন্তরও না দেখতে পায় তো প্রাণ বাঁচে কি করে?...

সুরবালাও হয়ত নিস্তারিণীর মতোই ডাক ছেড়ে কান্না শুরু করত কিন্তু হঠাৎ একদিন দেখা হয়ে গেল ভাইয়ের সঙ্গে, এটুকু অন্তত বোঝা গেল যে, সে বেঁচে আছে।

দেখা হয়ে গেল বলা ভুল, সে-ই দেখতে পেল। ইদানীং সে দু'-একটা ছোটখাটো পার্ট পাচ্ছে, গান গাইবার পার্টই বেশির ভাগ, তবু গানের সঙ্গে কথাও থাকে কিছু কিছু। সাধারণত গানের ভূমিকাগুলোকে নাট্যকার প্রধান করেন না—জানাশুনোর মধ্যে তেমন চৌকশ মেয়ে না থাকলে। তেমনিই একটা পার্ট নেমেছে সেদিন, অপর অভিনেতা অভিনেত্রীর কথোপকথনের ফাঁকে অলসভাবে দর্শকদের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ নজরে পড়ল—মাঝামাঝি একটা সারিতে মাঝের দিকেই বসে আছে পরেশ।

দেখে আনন্দ হবারই কথা, প্রথমটা নেচে করে উঠেছিল বুকের মধ্যেটায়—কিন্তু সে আনন্দ দীর্ঘকাল স্থায়ী হবার অবসর পেল না পেল না তার কারণ—প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নজরে পড়ল ওর দুপাশে দুটি সঙ্গিনীর দিকে। দুটিই ওর সঙ্গিনী বুঝল দুজনের সঙ্গেই হাসিগল্প চলছে। এরা যে কোন পর্যায়ের মেয়ে তা এদের বেশভূষায় খড়িমাখা মুখে এবং হাসবার বা কথা বলার ভঙ্গীতে বুঝতে বাকি থাকে না কারুরই। যারা শহরে থাকে, পথেঘাটে যাতায়াত করে—তারা সকলেই এদের দেখেছে চেনে। সুরবালারা বস্তিতে থাকত, পাড়ার যে-সব মেয়েরা রাত্রে 'বাবু' বসাত ঘরে—তারা ওদের উঠোনে দাঁড়িয়ে কথা কইত, দাওয়ায় উঠতে সাহস করত না, তারা এদের তুলনায় স্বর্গের লোক।

ঘৃণায় সারা দেহ রি-রি করে উঠল সুরবালার। যেন একটা দৈহিক যন্ত্রণা বোধ হতে লাগল তার বুকের কাছটায়। কিছু-ক্ষণের জন্যে এই স্টেজ, পাশের অভিনেতা-অভিনেত্রী, সামনের দু-তিনশো দর্শক সব যেন চোখের সামনে লেপেমুছে একাকার হয়ে গেল। এমনই বিহ্বল হয়ে গিয়েছিল যে, তার গান ধরবার সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাবার পর হুঁশ হল—বাজনা বেজে ওঠার অনেক পরে তবে গান ধরল।

তারপর আর ওদিকে তাকায়নি। তাকালে নিজেকে সামলাতে পারবেন না তা জানত। বারবারই এমনি বেহুঁশ অন্যমনস্ক হয়ে পড়বে। ঐ প্রথমবারের জন্যেই তো ভেতরে আসতে স্টেজ-ম্যানেজার ধর্মদাস-বাবুর ধমক খেয়েছে। কে নাকি দর্শকদের মধ্যে থেকে টিটকিরি করেছে—কে শিস দিয়েছে। এমন অচৈতন্য হয়ে কার দিকে চেয়েছিল সুরবালা? কোন বড়লোক বাবু-টাবু বসেছিল নাকি কেউ?...যাই হোক থিয়েটারের কাজ হিসেব-বাঁধা কাজ। এখানে হুঁকা হারালে চলে না—এখানে একজনের ওপর আর একজনকে নির্ভর করতে হয়। সকলে অপ্রস্তুত হবে একজনের গাফিলি হলে। ইত্যাদি—

একেবারে ওর কাজ শেষ হতে উইংস্-এর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল—আর একবার দেখবে বলে। যতই রাগ হোক, না এসে থাকতেও পারেনি। কিন্তু তখন কেউ ছিল না আর, তিনজনেই উঠে চলে গিয়েছিল। কে জানে—কারও মুখে শুনে ওরই অভিনয় দেখতে এসেছিল কিনা, ঐ দুটো জীবকে নিয়ে। তাই ওর কাজ শেষ হতেই উঠে চলে গেছে। হয়ত তখন ওর এই অধঃপতন প্রসঙ্গেই হাসাহাসি করছিল।

মাগো!

আবারও বুকের মধ্যে তেমনি একটা যন্ত্রণা বোধ করে সুরবালা!

বাড়িতে এসে বলতে নিস্তারিণী বিশ্বাস করল না ওর কথা। বলল, 'ওলো আমি জানি, জানি। তুই আমাকে স্তোক দিতে এসেছিস। তুই বললি আর আমি বিশ্বাস করলুম। অত নেকী আমাকে পাসনি। সে আর নেই—আমি জানি। আমার মনের মধ্যে যে বলছে নিয়তক—সে বেঁচে নেই। থাকলে এত দিন আমাকে না দেখে থাকতে পারত না কিছুতেই।'

আবার পরের দিন সকালে অন্য কথা বলে, 'আমার দুধের বালক ছেলে ঐ পথের মাগীগুলোর সঙ্গে নষ্ট হবে? কক্ষণও না—আমি বিশ্বাস করি না। তুই মিছে করে বলছিস। চিরদিন ওকে হিংসে করিস তুই —তা জানি না। যতই হোক নিজের ভাই তো নয়। তুই ওর শত্তুর, মিথ্যে করে লাগিয়ে আমার মন ভাঙাতে চাইছিস। কী ওর বয়স লা—যে দুদিকে দুটো পেঁচি খানকি নিয়ে ঘুরবে?'

সুরবালা আর কথা বাড়ায় না। দুঃখে দুঃখে মানুষটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, ওর কথা নিয়ে মাথা ঘামাতে নেই। সে ভাবে ভাইটার কথাই। কীই বা বয়স, এই বয়সে এমন বিগড়ে গেল! অত সুন্দর ভাইটা তার। আর কী ভালই বাসত তাকে। মনে হয়—অন্তত সুরোর তাই বিশ্বাস—মায়ের থেকেও সে দিদিকে ভালবাসত। সেই ছেলে এমন পর হয়ে যেতে পারে! শশীবৌদি শুনলে হয়ত বলবেন, 'ওরে, ও কি করছে, ওর গ্রহতে করাচ্ছে। একেকজনের ভূমিষ্ঠ হবার সময় এমন কুগ্রহের দৃষ্টি লাগে, নীচ সংসর্গ তাকে করতেই হয়।' শশীবৌদি সব দুঃখ সব অভিযোগেরই একটা সান্ত্বনা খুঁজে বার করতে পারেন, সুরবালা পারে না।

থিয়েটারের কাজ বা তার পরিবেশ কিছুই ভাল লাগত না—তবু চোখ-কান বুজে টিকেছিল সে একটা কারণে, অবিরাম তাগাদা দিয়ে কিছু কিছু করে আদায় হলেও বাড়ি-ভাড়ার টাকাটা উশুল হচ্ছিল তার। সংসারের শাক-ভাতের খরচটা এখনও কোনরকমে বাবাই চালাচ্ছেন, হয়ত ধার-দেনাও করতে হচ্ছে—তবু চলছে। বাড়ি-

যুগজয়ী বই

রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য
শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত

ঠাকুরবাড়ীর কথা

দ্বারকানাথের পূর্বপুরুষ থেকে রবীন্দ্র-নাথের উত্তরপুরুষদের তথ্যপূর্ণ জীবন-কথা। [১২·০০]

উপনিষদের দর্শন

উক্ত বিষয়ের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা। [৬·৫০]

রবীন্দ্র দর্শন

কবিগুরুর জীবন-দর্শন। [২·৫০]

শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত

বাঁকুড়ার মন্দির

বাঁকুড়ার তথা বাংলার মন্দিরগুলির সচিত্র মূল্যায়ন। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা; ৬৭ আর্ট প্লেট। [২৫·০০]

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত রচিত

ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য

সাহিত্য আকাদমী পুরস্কারপ্রাপ্ত বই। [১৫·০০]

সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ও সংকলিত

বৈষ্ণব পদাবলী

প্রায় চার হাজার পদের আকর গ্রন্থ। [২৫·০০]

অমলেন্দু দাশগুপ্ত রচিত

ডেটিনিউ

জাতীয় জীবনের একটি অধ্যায়।
শ্রীভূপেন দত্তের ভূমিকা। [৬·০০]

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত

বঙ্কিম রচনাবলী

১ম খণ্ডে সমগ্র উপন্যাস। [১২·৫০]
২য় খণ্ডে সমগ্র সাহিত্য অংশ। [১৫·০০]

ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত

দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী

দুই খণ্ডে সমগ্র রচনা।
১ম খণ্ড [১২·৫০] ২য় খণ্ড [১৫·০০]

ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত

মধুসূদন রচনাবলী

ইংরেজিসহ সমগ্র রচনা এক খণ্ডে। [১৫·০০]

দীনবন্ধু রচনাবলী

সমগ্র রচনা এক খণ্ডে। [১০·০০]

প্রতি রচনাবলীতে জীবন-কথা ও সাহিত্য কীর্তি আলোচিত।

সাহিত্য সংসদ

৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলি-৯

ভাড়া দেবার সামর্থ্য তাঁর নেই আর। সেইটে এখান থেকে যোগাড় হচ্ছে বলেই অপমানবোধটাকে দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করে যাচ্ছিল।

কিন্তু আর পারল না।

এখানে এসে পর্যন্তই কিছু-না-কিছু উৎপাত যে না হয়েছে তার ওপর তা নয়। কিন্তু সেটা বেশীদূর এগোতে পারেনি। সুরবালা তার চারদিকে স্বভাববিরুদ্ধ এমন একটা কৃত্রিম কাঠিন্য সৃষ্টি করে রেখেছিল—এমন একটা গাম্ভীর্য এবং ঔদাসীন্য যে, চট্ করে ওর কাছে কেউ ঘেঁষতে পারত না, ওর বয়সী অন্য মেয়েদের সঙ্গে যেমন রঙ্গরসিকতা ফাজলামি চলে ওর সঙ্গে তা চালাতে সাহস করত না। ঔদাসীন্যটা অবশ্য কপট নয়, সত্যিই এখানের কোন কাজ বা ভবিষ্যৎ উন্নতির চিন্তায় কোন আগ্রহ ছিল না ওর। সেইজন্যেই সাধারণ লোকেও যেমন সুবিধা করতে পারত না—কর্তৃস্থানীয়রাও না। তাঁদের হাতে যে অমোঘ টোপ আছে—এই বিশেষ জগতে উন্নতির চাবিকাঠি—তাতে সুরবালাকে গাঁথা যাবে না, তা তাঁরা বেশ বুঝেছিলেন। যে লোভী, তাকে অধিকতর প্রাপ্তির লোভ দেখিয়ে কাবু করা যায়, যে কিছুর প্রার্থী নয় তাকে কিসের লোভ দেখাবে?

ওর এই উপেক্ষা বা অবজ্ঞায় আহত হত পুরুষদের চেয়ে মেয়েরাই বেশী। তারা যেন এটাকে তাদের প্রতিই অবজ্ঞা বা ব্যক্তিগত অপমান বলে মনে করত। নিজেরা সর্বদা যেন ছোট হয়ে যাচ্ছে ওর কাছে, এই ভেবে অস্বস্তি বোধ করত। নানারকমে চেষ্টা করত ওকে আঘাত দিয়ে একটা কলঙ্ক জড়িয়ে ফেলতে, নিজেদের স্তরে টেনে আনতে।

সুরবালা মনে মনে হাসত ওদের এই চেষ্টা দেখে। 'দেমাকে' 'ঠেকার' 'অত অহঙ্কার কিসের? তবু যদি রূপসীর হাত না হত! পেটে ভাত জোটে না—দুটো টাকার জন্য পেত্যহ হ্যাংলামি-ন্যাংলামি করতে হয়!' ইত্যাদি মন্তব্য তার অঙ্গের ভূষণ হয়ে গিয়েছিল। কারও নাম না করলেও এ-মন্তব্য যে কার উদ্দেশে তা বুঝতে কারুরই বাকি থাকে না—তারও না। কিন্তু এ-বিষের কারণটা জানত বলেই ওরা কী জ্বালায় ছটফট করছে বুঝে আহত বোধ করত না—বরং কৌতুক অনুভব করত।

তবু একেবারে যে টানাটানি হয়নি তা নয়। বড়দরের অভিনেতারা দু-একজন কর্তাব্যক্তিও অকারণে ডেকে কাছে বসিয়েছেন, অকারণেই সদয় ব্যবহার করেছেন, অহেতুক প্রশংসা করেছেন তার হয়ত অতি সামান্য কোন ভূমিকায় সাধারণ অভিনয়ের। দু-একজন প্রশংসাচ্ছলে গায়ে হাত দেবার চেষ্টাও করেছেন। সুরবালা সবিনয়ে ও সুকৌশলে সেসব অন্তরঙ্গতার চেষ্টা এড়িয়ে গেছে। রূঢ় হয়নি—তবে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, ঐহিক উন্নতির এসব সুযোগ সে চায় না, কোন ঔৎসুক্য নেই ওর

কিন্তু সবচেয়ে জ্বালাতন যে করত—নানু দত্ত, তার ওপর সে রাগ করতে পারত না, বিরক্ত হ'তেও না।

ঐ এক আশ্চর্য মানুষ। কোন বিষয়ে কোন অনুভূতি আছে বলেই মনে হয় না। অথবা হয়ত একটাই অনুভূতি আছে, সেটা কৌতুকের। সবকিছুই তার কাছে পরিহাসের বস্তু, সবকিছুই ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিতে পারে সে।

নানু এখানকার উন্নতি বা প্রভাব-প্রতিপত্তির এই গোপন সুড়ঙ্গ পথ নিয়ে প্রকাশ্যেই ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত—পরস্পরের সম্পর্ক নিয়ে তার ব্যঙ্গশাণিত রসনা সর্বদাই মুখর ছিল—তার খোঁচা বিঁধত না এমন মানুষই ছিল না বোধহয় থিয়েটারে। তবু কেউই ঠিক যেন তার ওপর রাগ করতে পারত না। সব কথাই একটা পাগলামি—একটা ভাঁড়ামির আবরণে আবৃত থাকত বলে ততটা জ্বালা কেউ অনুভব করত না। অথবা করলেও বাকি সকলেই হেসে উড়িয়ে দেয় বলে—উড়িয়ে দিতে বাধ্য হত।

নানু নিজেই বলত, 'কী, রাগ হবে গেল? রাগ করে কি করবি বল। —পাগলা ছাগলা মানুষ আমার কি মুখের আগড়াক আছে, না আমার কথা একটা ধর্তব্যের মধ্যে? আমি কি আর অত বুঝেসুঝে হিসেব করে বলি, যখন যা মুখে আসে, যা ইচ্ছে বলে ফেলি—আমার কথা গায়ে মাখিস নি। আমার কি জানিস—সেই গোপাল ভাঁড়ের কথা—মুখখানাই অমনি বাঁকা। মনে নেই, শুনিস নি গোপাল ভাঁড় একবার বাজী রেখেছিল খোদ নবাবকে মুখ ভেংচিয়েও জান নিয়ে ফিরে আসবে? প্রথম গিয়ে জিভ ভ্যাংগাতেই তো নবাব রেগে আগুন হয়ে শূলে দেবার হুকুম দিলেন। গোপাল তাতে একটুও দমল না, জিভ্ ভেংচাতে যেতেই লাগল। কুর্নিশ করতে করতে ঢুকেছিল ঠিকই, তেমনি কুর্নিশ করতে করতেই বেরিয়ে এল—কিন্তু জিভ্ ভেংগানো বন্ধ করলে না একবারও। নবাবের তখনই খট্‌কা লাগল। তারপর, দরবার কাছে যেতে যখন শূলে চড়াবার জন্য পিছমোড়া করে বেঁধে মশানে নিয়ে যাচ্ছে, তখনও সে জিভ ভ্যাঙাচ্ছে। নবাব তখন হেসে বললেন, না, ওকে ছেড়ে দাও, ওর মুখখানাই অমনি। তারপর শুধুলেন, তুমি কেন এসেছিলে দরবারে? গোপাল সেলাম করে বললে জিভ ভ্যাংগাতেই জনাব, আজ্ঞে কিছু সাহায্যের জন্যে। নবাব তখনই হুকুম দিলেন একশ মোহর দেবার। জান নিয়ে তো ফিরলই উপরন্তু কিছু রোজগার করেও আনল নবাবকে ঠকিয়ে। তা আমারও হয়েছে তাই, মুখখানাই অমনি, কী করবি বল?'

সবাই হাসত, বরং সুরবালাই একদিন বলেছিল, 'তা তুমি তোমার দস্তুরমতই ঠকে যাচ্ছ নানুদা, গোপাল ভাঁড় তো ওটা ঠকাবার মতলবেই করেছিল। সত্যিই তো আর মুখখানা তার অমনি ছিল না—তোমারও তাই কিনা কি করে বুঝব?'

উপস্থিত অনেকেই সায় দিয়েছিল, 'ঠিকই তো—ঠিক কথাই তো। তুমিও যে অমনি মতলব নিয়ে বলো না—কি করে বুঝছি!'

সমান সুরে জবাব দিয়েছিল নানু, 'অত বোঝবারই বা কি দরকার, তোরাও নবাব সেজেই থাক না। গোপাল যতই যা হোক—ভাঁড় ছাড়া তো কিছু না। জিভ-ভ্যাংগানো তার মুখের দোষ হতে না পারে—ভাঁড়ামিরই অঙ্গ তো। নবাব নবাবই—ভাঁড়ের থেকে অনেক উঁচুতে। তোরা নিজেদের নবাব মনে কর—আমাকে ভাঁড়, দেখবি আর আমার কথা গায়ে লাগবে না।'

নানু প্রকাশ্যেই প্রেম নিবেদন করত সুরবালার কাছে—থিয়েটারী ঢঙে, বাঁদের মতোই, 'দয়া করো না মাইরি। বলি ও সুন্দরী, ফিরে কি তাকাবে না একবার গোলামের দিকে? আর কবে দয়া করবে? বুকখানা যে ফেটে চৌচির হয়ে গেল। উঃ, প্রাণ যে আর সয় না। পাচ্ছি না ঠোঁটের কাছে এসে ফিরে যাচ্ছে যে—মাইরি!'

কখনও বা বলত '...একটা গপ্প আছে শুনেছি আমি পড়িনি—বোড়ের পাতা অবধি আমার দৌড়—ভাইপোদের মুখে শুনেছি—এক জানোয়ার চাইত সুন্দরী মেয়ে বিয়ে করতে। অনেককে বলত, কাকুতি-মিনতি করত, কিন্তু কেউই রাজী হত না। কেনই বা হবে বল? শেষ অবধি এক সুন্দরীর কী দয়া হল সে রাজী হয়ে গেল। আর যেমন বিয়ে হল দেখা গেল সে জানোয়ার আসলে এক সুন্দর রাজপুত্তুর। কোন এক ডাইনী জাদুতে না কার শাপে যেন অমনি হয়ে গিয়েছিল। কথাই ছিল যে, যদি কেউ কোন সুন্দরী মেয়ে স্বেচ্ছায় তার সঙ্গে ঘর করতে রাজী হয় তবেই সে আবার মানুষ হবে, আগের চেহারা ফিরে পাবে। তা আমাকে একটু ভালবেসে দ্যাখ না—যতটা কদর্য আমাকে দেখায় ততটা হয়ত নই!'

সুরবালা বলত, 'যে ভালবাসবে তার চোখে ভালবাসার মানুষকে সুন্দর তো লাগবেই। মোদ্দা এত লোক থাকতে তোমাকে আমি ভালবাসতে যাবই বা কেন?'

'দয়া! দয়া! স্রেফ কাইন্ডনেস। ইংরিজী বুঝিস? কাইন্ডনেস মানেই দয়া। হেঁহেঁ, ভাইপোদের কল্যাণে আমি অনেক ইংরিজী শিখে ফেলেছি! ...না হয় ভিক্ষেই দিচ্ছি মনে কর।'

'ভিক্ষে দেবার মতো ঢের লোক জুটবে তোমার দাদা, সরে পড়ো। আমার আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই, তোমার মতো অপাত্রে দয়া করব।... আচ্ছা নানুদা, তোমার লজ্জা করে না? ঘরে শুনেছি তোমার সুন্দরী সতীলক্ষ্মী বৌ আছে, একটা ছেলেও হয়েছে—তুমি সেখানে না গিয়ে এর ওর তার বাড়ি—কার ঘর কবে খালি থাকবে খোঁজ নিয়ে সেইখানে গিয়ে রাত কাটাও—সাতদোরের লাথিঝাঁটা খেয়ে—না হয় তো নাকি, কোন চুলোর ঠাঁই না মিললে এই

স্টেজে পড়ে রাত কাটাও—কেন? ব্যাপারটা কি?'

কথাটা মিথ্যে নয়। বহুলোকের মুখেই শুনেছে সুরবালা। নানু দত্ত এখানে আলোচনার একটা প্রধান বিষয়বস্তু। তার সম্বন্ধে যেমন কৌতূহলেরও শেষ নেই, তেমনি বিস্ময়েরও না। নানুর সমস্ত জীবনটাই একটা দুর্বোধ্য হেঁয়ালি। কখনও মনে হয় অপদার্থ—জীবনের যেসব মূল্য মানুষ এতদিন ধরে স্বীকার করে এসেছে সে সম্বন্ধে কোন সচেতনতাই নেই তার। আবার কখনও মনে হয়—এ সমস্ত আচরণটাই ওর ছদ্মবেশ। আসলে একটা নিদারুণ অভিমানেই জীবনটাকে এইভাবে দু' হাতে বিলিয়ে ছড়িয়ে নষ্ট করছে—জেনেশুনে।

ধনী না হোক—অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে সে। বাকী সবকটি ভাই ই ভাল রোজগার করে। নানুর লেখাপড়া হয়নি কিন্তু তাই বলে সে নিজেকে যতটা মূর্খ বলে প্রচার করে ততটা নয়, সুরবালা একদিন নিজের চোখে দেখেছে নিবিষ্টভাবে বসে ইংরেজী খবরের কাগজ পড়তে। ওর স্ত্রীও নাকি সত্যিই সুন্দরী, ভাল বড় ঘরের মেয়ে। আর অমন পতিব্রতা নাকি হয় না। এই অপদার্থ অমানুষ স্বামীই তার ধ্যান জ্ঞান। এখনও প্রত্যহ সে কাউকে না কাউকে ধরে নানুর জন্যে খাবার করে পাঠায়। ইদানীং একটা কুকুর পুষেছে নানুর ছোটভাই—কাউকে না পেলে তার মুখেই পুঁটুলি করে ঝুলিয়ে দেয়—সে সোজা থিয়েটারে নানুর কাছে চলে আসে। সে কুকুরও আবার এমন ভক্ত—নানু ছাড়া অন্য কেউ সে খাবারে হাত দিতে এলে গর্জন করে ওঠে—মনে হয় ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে তাকে।

তবু নানু কিছুতেই বাড়ি যেতে চায় না। গেলেও দিনে দিনে যায়, স্নানাহারও করে হয়ত—তার পরই পালিয়ে আসে। রাত্রিবাস করে নমাসে ছমাসে একদিন—মা খুব কান্নাকাটি করলে মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করলে। এখানের অল্প মাইনের শিক্ষানবীশ মেয়ে যারা—সখীর দল বলে যারা অভিহিত তাদের সকলেরই বাড়ি ওর অবাধ গতি। তাদের কারুর মাকে মাসী বলে, কাউকে বা দিদি। অধিকাংশ দিন তাদেরই কারও কারও বাড়ি রাত কাটায়। সব সময় তার মধ্যে কোন ঘনিষ্ঠতা থাকে তাও না—সুরবালার বিশ্বাস কোনদিনই থাকে না, নানু একটু অন্য ধাতের মানুষ, সত্যিই দুর্জ্ঞেয় তার মনের গতি আর চরিত্রের গঠন—শুধু একটা জায়গায় রাত কাটাতে হবে বলেই কাটায়। যেদিন কোথাও কোন আশ্রয় জোটে না সেদিন এই স্টেজেই একটা কিছু পেতে শুয়ে পড়ে—হাজার লোকের পায়ের ধুলো বোঝাই শতরঞ্জি বা কার্পেটে!

সুরবালার প্রশ্নে নানু গম্ভীর হয়ে যায়। গলা নামিয়ে বলে, 'সেই তো হয়েছে মুশকিল। একথা আর কাউকে বলা যায় না, তুই বুঝবি হয়ত। সতীলক্ষ্মী বললে কিছু বলা হয় না—সে দেবী। শাপভ্রষ্টা যাকে বলে শাস্ত্রে, সে তাই। সেই জন্যেই তো তাকে সহ্য করতে পারি না। আমি তো এই চেহারার কথা বলছি না—আমার চেয়ে ঢের কুচ্ছিত লোক ঢের ঢের বেশী সুন্দরী বৌ নিয়ে ঘর করছে—ভগবান জোড় মেলান সাদা-কালোতেই বেশির ভাগ—তাদের বৌরা তাদেরই ভালবাসে বরং বেশী—তা নয়, চরিত্র আর স্বভাবের কথাই বলছি। কী না করেছি, কী না করছি—ওকে দেখলেই মনের মধ্যে সেই গ্লানিটা জেগে ওঠে, নিজেকে যেন বড় বেশী ছোট, ওর অযোগ্য মনে হয়, যেন কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে যাই। সেই জন্যেই পালিয়ে পালিয়ে বেড়াই রে। মনে হয় আমি ছুঁলেও সে ছোট হয়ে যাবে—আমার হাওয়া গায়ে লাগলে কষ্ট হবে তার। তারচেয়ে সে যেমন আছে থাক—তবু ... পুণ্যে যদি ছেলেটা মানুষ হয় তো সেই আমার ঢের। ছেলেটা মানুষ হলে—আমাকে দিয়ে তো সুখ হল না তবে—ছেলেকে নিয়ে শেষ জীবনটা অন্তত শান্তি পাবে।'

'ওটা তোমার ভুল নানুদা, স্বামীকে দিয়ে যার শান্তি হয় না ছেলেও তাকে শান্তি দিতে পারে না। মেয়েদের স্বামীই সব।.. তা এত যদি নীচে নেমে গেছ জানো, এ সংসর্গ ছেড়ে দাও না। এখানে তোমার কিসের স্বার্থ, কিসেরই বা টান? এ চাকরিতে যে পেট ভরে না—সেটুকু অন্তত বুঝতে পারি।'

সত্যিই বন্ধনের কোন কারণ নেই নানুর! সে সবই পারে যদিও—নাচতে পারে, মানে এখানে এসে শিখেছে, এখন সখীদের শেখায়ও মাঝে মাঝে, গাইতেও পারে কিছু কিছু, অভিনয়েও চলনসই। তবে তার যা চেহারা—বিশেষ মুখখানা এমন, আরও—নিয়ত ব্যঙ্গবিদ্রূপ করে করে মুখখানা এমন দাঁড়িয়েছে যে হাসির পার্ট ছাড়া আর কিছু দেওয়া যায় না। কখনও কখনও, কেউ না এলে কাজ চালাবার জন্যে বড় পার্টে হয়ত নামাতে হয় কিন্তু দর্শকরা ওকে সে সব পার্টে দেখতে চায় না। নানারকম ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, কোন গভীর আবেগের কথা বললেও সেটাকে ভ্যাঙচানি মনে করে হেসে ওঠে।

অর্থাৎ অভিনয়ের ক্ষেত্রে এমন কোন উন্নতির আশা নেই, হয়ত নাচে উন্নতি করতে পারে, সেদিকে ঝোঁকও আছে, বলে, 'দেখবি দেখবি—একদিন আমার নাম নিয়েও গৌরব করতে হবে, প্ল্যাকার্ডে বড় বড় হরফে নাম ছাপা হবে—"ড্যান্সিং মাস্টার—শ্রীযুক্ত বাবু নানু দত্ত"—যদি বাঁচিস তো দেখে যাবিই একদিন' কিন্তু পুরুষ নাচিয়ের আর কী কদর, কতটুকু দরকারই বা? মাইনে যা পায়—মানে যা আদায় হয় তাতে ওর হাতখরচও চলে না, এখনও, দুপুরে যেদিন খেতে যায়, মার কাছ থেকে দু' পাঁচ টাকা চেয়ে নিয়ে আসে তবে চলে। কাপড়জামা বাবাই করিয়ে দেন বৌমার মুখ চেয়ে। শ্বশুরবাড়ি থেকেও পায়। সেসব নিতে ওর কোন লজ্জা নেই, অম্লানবদনে নেয় আবার সগর্বে পাঁচজনকে দেখিয়ে বেড়ায়। এখান থেকে আর কিছু নেই—খাটুনি আছে বিস্তর। তেমন কোন কাজ নেই আর দিনরাত হাতের কাছে পাওয়া যায় বলেই থিয়েটারশুদ্ধ লোক ওকে ফরমাশ করে। ফাইফরমাশ খাটতে খাটতে এক-একদিন নিঃশ্বাস ফেলার সময় থাকে না।..

সুরবালার প্রশ্নের উত্তরে একটুখানি চুপ করে থেকে বলে, 'কী জানি, কিসের যে টান তা কি আমিই বুঝি ছাই! এমন কোন বন্ধন নেই সত্যিই—তবু না এসেও যেন থাকতে পারি না। আবার ভাবি কি জানিস, আমার মতো জন্ম-ভ্যাগাবন্ডের আর কোথায়ই বা জায়গা হত। আমাদের জন্যেই বোধহয় ভগবান এই জায়গায় সৃষ্টি করেছেন। দুনিয়ার যত বাপে তাড়ানো মায়ে খেদানো লোকের আশ্রয় এটা ভ্যাগাবন্ডের স্বর্গ।'

একটু থেমে বলে, 'ঠাকুরবাড়ির দপ্তর বলে একটা বই বেরিয়েছে পড়েছিস? তুই আর কোথা থেকেই বা পড়বি—ইংরেজী বইয়ের অনুবাদ—আগেই পড়েছি অবশ্য, ছোট করে বেরিয়েছিল অভিশপ্ত ইহুদী বলে—তাতে আছে যে, যীশুখৃষ্ট নাকি একদিন ক্লান্ত হয়ে এক মুচির বস্তুর শান দেওয়া পাথরের ওপর একটু বিশ্রামের জন্যে বসেছিলেন, সে মুচির তা সহ্য হয় নি, ঘাড়ধাক্কা দিয়ে ঠেলে উঠিয়ে দিয়ে বলেছিল, "এখানে বসতে হবে না, যাও সরে পড়ো। ঘুরে বেড়াও গে, ভবঘুরের জায়গা নেই এখানে।" সেই পাপে সে নাকি আজও অমর হয়ে আছে—হ্যাঁ, পাপেও অমর হয় মানুষ, ফলভোগের জন্যে। বেচারাকে নাকি সেই থেকে আজও প্রতিনিয়ত ঘুরে বেড়াতে হয় কোথাও একটু বসতে কি বিশ্রাম নিতে পারে না। বসতে গেলেই মনে হয় যেন কে ঠেলে উঠিয়ে দেয়। তার বংশের যে যেখানে আছে, রক্তের ছিটেফোঁটা—সকলেরই শোচনীয় পরিণাম হয়, চোখে দেখে সেগুলো কোন প্রতিকার করতে পারে না। অবিরত কোন এক শক্তি তাকে ঠেলে নিয়ে বেড়াতে থাকে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায়। আমিও বুঝি তেমনি কোন পাপে এখানে এসে পড়েছি, আর কোথাও পালাতে পারি না—কেবলই টেনে নিয়ে আসে এই পাঁকের মধ্যে। এখানেই থাকি ভাল, খাপ খেয়ে যায়। মনে হয় অন্য কোন জায়গাতে আমার দরকারও নেই, জায়গাও নেই।

'আছে বৈকি, তোমার বৌয়ের কাছে তোমার চিরদিনের দরকার—তার কাছে তোমার চিরকালের আশ্রয়।'

'কে জানে, হবে হয়ত।' চুপ করে যায় নানু। বোধহয় কয়েক মুহূর্তের জন্যে নিজের জীবনটা ফিরে দেখতে চেষ্টা করে।

(ক্রমশঃ)



ফ্যাশান কথা

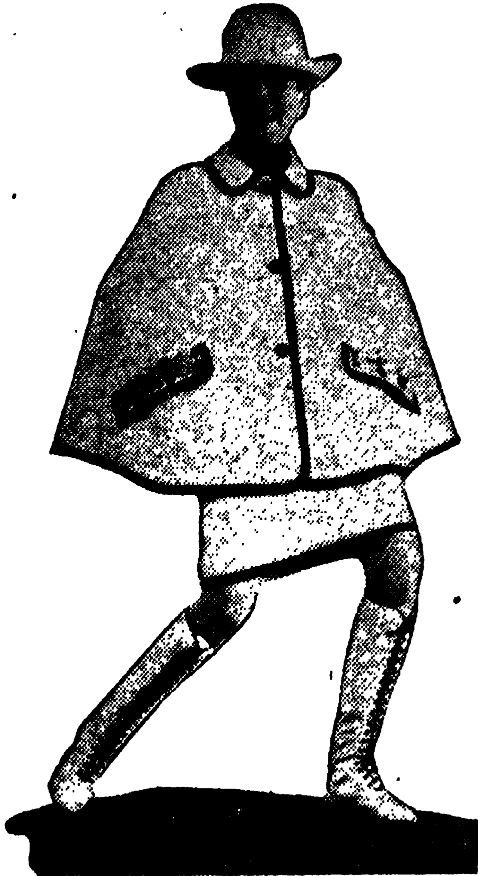
আধুনিক সভ্যতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ফ্যাশান-বৈচিত্র্য। শিক্ষা-দীক্ষা এবং শিল্পের প্রসারে সভ্যতার জয়স্তম্ভ মাথা উঁচু করে সন্দেহ নেই কিন্তু পোষাক-আশাকের রকমফের বুঝি সেই জয়স্তম্ভের ষোলকলা পূরণে সাহায্য করে। পরিশীলিত মনের নিবিড় অনুশীলন থেকে জন্ম নেয় এই ফ্যাশান। তাই এর পেছনের শ্রমসাধ্য প্রয়াসকে সভ্যতার অন্যতম উপকরণ বলে মেনে না নেওয়ার কোন যুক্তিসহ কারণ নেই। সভ্যতার অগ্রগতিতে এদের অবদান সম্মানের এবং শ্রদ্ধার। অবশ্য সভ্যতার প্রতি পদক্ষেপেই এ'রা ছিলেন এবং আজো আছেন। যদি এ'রা না থাকতেন তাহলে অবস্থা যে কি হতো সেকথা না ভাবাই ভাল। অথবা অগ্রগতির কোন স্তরে এসে অনেককিছুর মতো এ'দেরও যদি অবলুপ্তি ঘটতো তাহলে সেই অতীত দিনের ঢলঢলে পোষাক পরে সভ্যতাগর্বী সমাজে আমাদের বিচরণ সত্যি হাস্যকর হয়ে উঠতো। একটা অনেকদিনের পুরনো ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে ফ্যাশানের পাতায় এসে হঠাৎ চোখটা আটকে যাবে আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হাজার চিন্তা উথালপাথাল হয়ে ওঠানামা করবে। সঙ্গে সঙ্গে গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসবো আমাদের দুর্দিনের কথা—চিন্তার দৈন্যের কথা। ভাববো ফ্যাশানের ক্ষেত্রে আমাদের অকিঞ্চিৎকর ধ্যান-ধারণার কথা। আর মনে মনে হাসবো। লম্বা লম্বা হাত আর আগাপাশতলো ঢাকা সেই জামাগুলো বর্তমানে একমাত্র মিউজিয়মেই সসম্মানে থাকতে পারে—বরতনুর অঙ্গে অঙ্গে নয়। অথচ আলো ঝলমল সেদিনের সেই সুসভ্য পরিবেশে এই পোশাকই আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল—তুমুল এবং তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঝড় বইয়ে দিয়েছিল কার আগে কে এই সর্বাধুনিক ফ্যাশানে নিজেকে সাজবে, অন্য দশজনের ঈর্ষা উৎপাদন করে।

আজও ইতিহাস একই কথা বলে। ফ্যাশানের রাজ্যে তুমুল ঝড় বইছে। আধুনিক এবং অতিআধুনিক ফ্যাশানে বাজার ছেয়ে যাচ্ছে। আধুনিকাদের হৈ-চৈ এবং সোরগোল অনেকাংশে এই ফ্যাশানকে কেন্দ্র করে। আজানুলম্বিত পোশাক এখন মুখ লুকিয়েছে। যদিও ইতিহাসের কোন এক সময়ে এই পোশাকে ললনাদের দেহসৌন্দর্য প্রকাশ পেত সমধিক। কিন্তু তারপর ইতিহাসের উপর দিয়ে অনেক ঝড় বয়ে গেছে। নতুন নতুন অধ্যায়ের শুরু হয়েছে। আর যে যার নিজের নতুনত্ব নিয়ে আমাদের কাছে হয়ে দাঁড়িয়েছে অতীত সামগ্রী। আমরা আর তার ভাঁজ খুলতে চাই না। ওদের সমাপ্তির শেষ রেশটুকু ধরে আরো নতুন এবং আমাদের বর্তমানকে সৃজন করে চলেছি। এই চলার পথে আবার কত না দিক পরিবর্তন। কিন্তু চূড়ান্ত রূপ আজও পায়নি এবং মানবসভ্যতার ইতিহাস যতদিন ধাবমান থাকবে, ততদিন নতুন পথের সন্ধানে মানুষ উৎসুক হয়ে থাকবে। স্বাভাবিক নিয়মেই নতুনের পর নতুন পাতা খুলবে।

পোষাকে এই হালফিলেও অনেক অধ্যায় অতীত হয়ে গেল। সবই বেশ টাটকা টাটকা গরম মনে হয়। তারপর জুড়িয়ে গেলেই বিস্বাদ হয়ে যায়। তখন আর কোন চটক থাকে না—চমকও সৃষ্টি করতে পারে না। ইদানীংকালে পোষাক নিয়ে যে আলোড়ন দেখা দিয়েছিল দেশে দেশে তা নিশ্চয়ই বিরল ঘটনা—বিভিন্ন রাষ্ট্রশক্তি পর্যন্ত এ সম্বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। তারপর জনমানসের কথা তো আছেই। হাল-



সান্ধ্য পোষাকে জনৈক তরুণী।



সাদা উলের তৈরি অভিনব পোষাক

আমলের পোষাক নিয়ে অনেক কষায়-মধুর বাক্য বিনিময় হয়েছে এবং এখনও তার জের শেষ হয়ে যায়নি। এবার পোষাকের ক্ষেত্রে যা আলোড়ন এনেছে তা হলো 'মিনি' পোষাক। এসব কম দৈর্ঘ্যের পোশাক হচ্ছে সর্বাধুনিক ফ্যাশান। ফ্যাশানপ্রিয়রা এই পোষাকের প্রেমে এখন হাবুডুবু খাচ্ছে। সব দেশেই এ নিয়ে কমবেশি কিছু তোলপাড় চলছে। তবে পোষাকের ব্যাপারে বিশ্বের নারীসমাজের মধ্যে একটা ঐক্য দেখা যাচ্ছে। সবাই মোটামুটিভাবে আধুনিকতার পক্ষপাতী। যে 'মিনি' পোষাক পশ্চিমের দেশগুলিতে এত হৈ-চৈ তা সে সে দেশের মেয়েরা গ্রহণ করেছে এবং অনেকের মত রাশিয়ার নারীসমাজও এ ব্যাপারে উদার মনোভাব প্রদর্শন করেছেন। মিনি ড্রেসের ব্যাপারে তাদের আপত্তির কিছু নেই। তবে মিনি ড্রেস বলতে তারা বোঝাতে চেয়েছে 'এ ফিউ ইঞ্চেস অ্যাবাভ দি নি'। এর ফলে দেহসৌন্দর্য অনেক সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয় এবং নারীত্ব প্রকাশেও এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এদেশে অন্তত ঋতুতে একবার পোষাকে নজর দেওয়া

মস্কোর বুকে এখন বসন্তের পদধ্বনি। গাছে গাছে অঙ্কুরোদ্গম শুরু হয়েছে। শীতের সকাল পেরিয়ে সোনালী রোদভরা দিন এখন আকাশ-বাতাসে বাতুল আমেজ সৃষ্টি করছে। উজ্জ্বল ঝকঝকে রঙের এই তো দিন। সাজগোজ করে এবার পথে বেরোবে কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী এবং অন্যান্য বয়সের সবাই। ফুলের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে মন খুলে ওরা পরস্পরকে জানবে এবং শুনবে। মস্কোর মেয়েরা সাধারণতঃ সব রঙের কোটই পরে। ফ্যাশানের পাল্লায় পড়ে ছোট্ট লোমশ কলার বা বড় কলার—যার যেমন অভিরুচি। 'স্ট্রীট কস্ট্যুম'ও আজকাল বেশ জনপ্রিয় হয়েছে।

ঋতুর পরিবর্তন হয়। শীত বয়ে আনে বসন্তের বার্তা আর বসন্তের দীর্ঘশ্বাস ক্রমে ঘন হয়ে গ্রীষ্মের আসন্ন তাড়নায়। মানুষকে সবকিছুর সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে হবে। তাছাড়া উপায়ও আর কিছু নেই। বসন্তের পোষাক পাততাড়ি গুটিয়ে ফেলে। মাথায় টুপি দিয়ে এবার আর এক শোভা। মেয়েদের অঙ্গে শোভা পায় রঙবেরঙের ফ্রক। এস্ত্রয়ভার্নীর কাজে অপরূপ সব ফ্রক। এস্ত্রয়ভার্নীর খ্যাতি রাশিয়ার দীর্ঘদিনের। জামা-কাপড় সাজাতে এদের অপরিসীম আনন্দ। এ ব্যাপারে রাশিয়ার নিজস্ব ঘরানা বিশ্বের স্বীকৃতি লাভ করেছে। মন্ট্রিলে এক্সপো-৬৭'র আসর বসছে। এতে রাশিয়ার অনেকগুলি এস্ত্রয়ভার্নী প্রদর্শিত হবে। আশা করা যায় এগুলিও রসিকজনের কৌতূহল উদ্রেক করবে।

সদ্য বিগত বর্ষে ফ্যাশানপ্রিয়রা 'ওয়ান-টোন স্লিভলেশ ড্রেস' নিয়ে বেশ মেতেছিল। অবশ্য টু-টোন ড্রেসও ছিল। ওয়ান-টোন ড্রেসের বৈশিষ্ট্য এর কলার এবং সেলাই—যার মধ্যে আধুনিকতা অথচ সুরুচির মিশ্র পরিচয় বর্তমান। তাছাড়া গ্রীষ্মে ডিজাইনারদের অন্য কাজ স্পোর্টস-উয়্যার। খেলাধুলো পাহাড়ে চড়া এবং সপ্তাহান্তে পিকনিকের জন্য এর প্রয়োজন।

তারপর আসে শরৎ। বাংলাদেশে শরৎ ভুবনমোহিনী—রাশিয়ার মডেলদের কাছে শরতের বিশেষ আবেদন আছে। এ সময় কোটের বেশ চাহিদা দেখা যায়। মাথায় ওঠে উলের বেরেট টুপি, সেই সঙ্গে গলায় ছোট্ট একটি স্কার্ফ, গ্লোভস এবং হাতে ব্যাগ।

শীতের দিনে মনে পড়ে গরম কাপড়ের কথা। এই সময়ের তুষারপাত বড় মারাত্মক ব্যাপার। তাই চলতি পোষাকের সঙ্গে প্রয়োজন হয়ে পড়ে সোয়েটার বা কার্ডিগান। অন্যথায় কস্ট্যুম বা মোটা পোষাক পরতে হবে। শীতের কোটের সঙ্গে ফারের টুপি অথবা ফারের কোট। ফারের কোটটাই দেখতে সুন্দর এবং ফ্যাশানপ্রিয়াদের মানায়ও বেশ। এবার পায়ে থাকবে কস ক-জুতো এবং মিটো। এ সময়ও খেলাধুলার দিকে



আধুনিক ফ্যাশানে

লক্ষ্য দেওয়া হয়। স্কি-এর জন্য স্পোর্টস-উয়্যারের দিকে নজর দেওয়া হয়। মোজা, হাতে বোনা সোয়েটার এবং আরো অনেক কিছু।

এবার আসা যাক সান্ধ্য পোষাকের কথায়। সব সময়ে মিনি ড্রেস এ জন্য শ্রেয়। সুন্দর কাপড় এবং এম্ব্রয়ডারীর দৌলতে মিনি ড্রেস মন কেড়ে নেয়। পুঁতি, মুক্তো প্রভৃতি নানা জিনিসে এর অলঙ্করণ করা হয়। স্কার্টের নীচে এবং গলায় এম্ব্রয়ডারী বেশ নয়নমনোহর।

এতো গেল ফ্যাশানের কথা। এবার আছে ফ্যাশানের উপকরণ ব্যাগ, গ্লোভস, জুতো এবং অন্যান্য জিনিস। এ ব্যাপারেও বেশ পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে চওড়া হিল এবং কম পয়েন্টেড জুতো আজকাল সবাই চায়। ব্যাগটা একটু বড়সড় এবং হাতল-ওয়ালা হওয়া চাই। কিন্তু সান্ধ্য পোষাকের জন্য হিল তোলা জুতো প্রয়োজন। মস্কো-সুন্দরী নিশ্চয়ই এটুকু ভুল করবে না।



সেকালের প্রার্থনা : একালের উত্তর

'অঙ্গনা'য় মেয়েদের বিয়ের বয়স বাড়িয়ে একুশ করা সম্পর্কে আকর্ষণীয় আলোচনা দুটিতে একালের শিক্ষিতা মেয়েদের মনের চেহারাটা প্রতিভাসিত হয়েছে। শিক্ষিতা শহুরে মেয়েদের বিয়ের বয়স 'একুশ' দাঁড়িয়ে 'একত্রিশে' আপনা থেকেই পৌঁছে যাচ্ছে—প্রায়শই সংবাদপত্রের 'পাত্রপাত্রী'র দর্পণে সেটা বড্ড স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু শহুরে নয় যে সব মেয়ে এবং যে সব মেয়ে যে কোন কারণেই হোক সাধারণ শিক্ষাটা পায় না—তাদের এই 'একুশে আইনে' বেঁধে রাখা মানে বাপ-মা বা অভিভাবকবর্গের বিপত্তিটাকে আরও বাড়িয়ে তোলা নয় কি?

আমরা যখন বিয়ের বয়স বাড়িয়ে তোলার কথা ভাবছি তখন কিন্তু পাশ্চাত্যের দেশগুলি বিয়ের বয়স কমিয়ে আঠারোয় নামাবার চেষ্টা করছে। শুধু বিয়ের বয়সই নয়—কোন কোন বিশেষ গুণ পাত্র-পাত্রীর থাকলে বিবাহিত জীবন সুখের আগার হয়ে উঠবে সে বিষয়েও মেয়েরা এবং ছেলেরাও রীতিমত ভাবতে শুরু করেছে।

এ বিষয়ে তরুণদের মুখপাত্র 'মলাডা ফ্রন্টা' এবং মেয়েদের সাময়িকী 'ভলাসটার' ভূমিকা উল্লেখ করার মত। পত্রিকা দুটিতে চেকোশ্লোভাকিয়ার তরুণ-তরুণীদের অভিমত সংগ্রহের জন্যে 'গ্যালপ পুল'-এর ব্যবস্থা হয়। বিবাহ সম্পর্কে তরুণ-তরুণীদের ব্যক্তিগত ধারণা, পাত্র-পাত্রীর কি কি গুণ থাকা দরকার, সবচেয়ে অভিপ্রেত গুণাবলী এবং 'আদর্শ' স্বামী বা স্ত্রীর কোন কোন গুণের অধিকারী হওয়া উচিত যেমন জানতে চাওয়া হয়েছিল, তেমনি চেষ্টা হয়েছিল জানবার পাত্র-পাত্রীর লেখা-পড়া, সন্তান-সন্ততির সংখ্যা এবং সুখী বিবাহিত জীবনের প্রাথমিক শর্তগুলি। কি করলে হঠাৎ-হঠাৎ বিচ্ছেদ এসে সুখী বিবাহিত জীবনে ভাঙন ধরবে না—তাও। এমনি নানা প্রশ্ন-জিজ্ঞাসার জবাব মিলেছে এই 'পুলে'। পত্র-পত্রিকার সহায়তায় তরুণ-তরুণীদের 'মনের কথা' জানবার আয়োজন করেছিলেন। চেকোশ্লোভাকিয়ার জাতীয় জনসংখ্যা কমিশন। [ন্যাশন্যাল পপুলেশন কমিশন]।

প্রেরিত প্রশ্নাবলীর জবাব দিয়েছেন তিন-চতুর্থাংশ। শতকরা ২০·৭ জন তরুণ এবং ২৪·৬ জন তরুণীর জবাব আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছে হিতোপদেশের সেই প্রায়-কথিত শ্লোক বুদ্ধির্যস্য বলংতস্য-এর বাণীটি। পাত্রী বা পাত্রের 'বিদ্যে' ব্যাপারে এঁদের মাথাব্যথা একটুও নেই—বিদ্যের চেয়ে বুদ্ধিটাকেই এঁরা অভিপ্রেত বলে মনে করেন। মেয়েদের মধ্যে শতকরা সাতজন এবং ছেলেদের মধ্যে শতকরা তিনজন চেয়েছেন তাঁদের 'পার্টনার' যেন গ্রাজুয়েট হয়।

অবিবাহিত তরুণ-তরুণীদের সঙ্গেও বিবাহিত পুরুষ ও মহিলাদের অভিমত এঁরা সংগ্রহ করেছেন। উভয় পক্ষের চাহিদা কমবেশী একরকম হলেও গুণাবলীর ক্রমিক সংখ্যাগুলি বিশেষ করে লক্ষ্য করবার মত। সত্তরটারও বেশী গুণাবলীর মধ্যে উভয়-পক্ষের কাছ থেকে প্রথম দশটি গুণের কথাটাই বেশী করে শোনা গেছে।

আমাদের দেশের অবিবাহিত তরুণ-তরুণী এবং বিবাহিত দম্পতিরা নিজেদের মনের চেহারা এই পুলের মধ্যে দেখতে পাবেন সম্ভবত।

হবু বরের মধ্যে কোন কোন গুণ সবচেয়ে কাম্য এই প্রশ্নের জবাবে কুমারী কন্যারা জবাব দিয়েছেন : ১। বুদ্ধি, ২। আন্তরিকতা, ৩। মিতাচার, ৪। সে ভাল হবে, ৫। বিশ্বস্ততা, ৬। পরিশ্রমশীলতা, ৭। পরিহাসপ্রিয়তা, ৮। সততা, ৯। বিবেচনা, ১০। উভয় পক্ষের সর্ববিষয়ে আগ্রহ ও ঔৎসুক্য।

এই সম্পর্কে কুমার কার্তিকদের জবাব হল : ১। আন্তরিকতা, ২। বুদ্ধি, ৩। বিশ্বস্ততা, ৪। শালীনতা, ৫। সৌন্দর্য, ৬। পরিশ্রমশীলতা, ৭। উভয়ের সর্ববিষয়ে আগ্রহ ও ঔৎসুক্য, ৮। পরিহাসপ্রিয়তা, ৯। সে ভাল হবে, ১০। সততা।

বিবাহিতা মেয়েদের অভিমতে বিবাহিত পুরুষদের যে গুণগুলি থাকা উচিত তা হল : ১। পরিশ্রমশীলতা, ২। মিতাচার, ৩। বিশ্বস্ততা ৪। আপত্য ও পরিবার সম্পর্কে স্নেহ-ভালবাসা, ৫। পারিবারিক সংবেদনশীলতা, ৬। গৃহকর্মে স্ত্রীকে সহায়তা দেওয়া, ৭। আন্তরিকতা, ৮। ধূমপায়ী না হওয়া, ৯। সততা, ১০। পারিবারিক বিষয়ে দায়িত্বচেতনা।

আর বিবাহিত পুরুষদের মতে 'সংসার সুখের হয় রমণীর' যে সব গুণে তা হল : ১। পরিশ্রমশীলতা, ২। বিশ্বস্ততা, ৩। আন্তরিকতা, ৪। পারিবারিক বিষয়ে দায়িত্বচেতনা, ৫। পারিবারিক সম্পর্ক সম্বন্ধে সংবেদনশীলতা, ৬। শালীনতা, ৭। সাংসারিক কাজ সম্পর্কে দায়িত্ববোধ, ৮। মিতব্যয়িতা, ৯। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, ১০। আপত্য এবং পরিবার সম্পর্কে স্নেহ-ভালবাসা।

বিবাহিত পুরুষদের অভিমতে বিবাহিতা মেয়েদের যে বদগুণগুলি সুখী সংসার জীবনের অন্তরায় তা হল : ১। বদমেজাজ, ২। হিস্টিরিয়া, ৩। সন্দিগ্ধ-চেতনা, ৪। কলহপ্রিয়তা, ৫। প্রেম-ভালবাসা সম্পর্কে আবেগহীনতা, ৬। স্বেচ্ছাচারিতা, ৭। যুক্তিশূন্য একগুঁয়েমিতা, ৮। প্রগলভতা ৯। অস্থিরচিত্ততা, ১০। উৎসাহ-উদ্দীপনা-হীনতা ও বিষাদমগ্নতা।

এই সম্পর্কে বিবাহিতা মেয়েরা বিবাহিত পুরুষদের সম্পর্কে যে 'রায়' দিয়েছেন তা হল : ১। স্থূলতা, খেয়ালী-পনা এবং বদমেজাজ, ২। মদ্যপ্রিয়তা, ৩। সহজেই বন্ধুদের পাল্লায় পড়া ও দৃঢ়-চিত্ততার অভাব, ৪। অহংবাদিতা, ৫। ধূমপানপ্রিয়তা, ৬। সন্দিগ্ধচেতনা, ৭। অপরিচ্ছন্নতা, ৮। অসামাজিকতা, ৯। মিথ্যা কথা বলার প্রবণতা, ১০। স্নায়ুবিক দুর্বলতা।

অতীত সমাজ-জীবনের 'গৌরীদান' প্রথা, কৌলিন্য রক্ষা ইত্যাদি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়ে আমাদের দেশে নয়া-সমাজের কানুন চালু হয়েছে, যেখানে বিবাহের বয়স শুধুই বাড়েনি, বিবাহে মেয়েদের সম্মতি এবং বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার সাব্যস্ত হয়েছে। এরই প্রেক্ষাপটে অতীত দিনের 'রামের মত মত স্বামী, লক্ষ্মণের মত দেবর, কৌশল্যার মত শাশুড়ী, দশরথের মত শ্বশুর এবং সীতার মত সতী হওয়ার' প্রার্থনার চমৎকার জবাব মিলতে পারে এই ধরনের 'মনের কথা জানাবা'র যদি আয়োজন করা যায় এদেশে—'অমৃতে'র 'অঙ্গনা'য় এর আয়োজন হলে ভাল হয় না?

—গৌরী ভদ্র

গৌরাঙ্গ পরিজন

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

(৬০)

রাঘব পণ্ডিত

পানিহাটিতে ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভাব। তার কৃষ্ণসেবার পারিপাট্যে প্রভু অতিশয় সন্তুষ্ট। 'তোমার শুদ্ধ প্রেমে আমি হই তোমার বশ।'

যত দূর দেশেই হোক, যত দামই লাগুক, ভালো ফল-পাকড়ের কথা শুনলেই রাঘব তা সংগ্রহ করত আর লাগাত কৃষ্ণ-সেবায়। তার নিবেদনে যেমন প্রীতি তেমনি শুচিতা। তেমনি পারিপাট্য।

তার বাড়িতে অসংখ্য নারকেল গাছ। কত যে ফল ধরে তার লেখাজোখা নেই। তবু যদি রাঘব শোনে কোথাও মিষ্টি নার-কেল পাওয়া যায় অমনি সে তা কিনতে ছোটে। এমনিতে টাকায় পাঁচগন্ডা নারকেল পাওয়া যায়, দশ ক্রোশ দূরের সে মিষ্টি নারকেল সে এককটা চার আনা দরে কিনে আনে। তার কৃষ্ণ খাবে যে। কৃষ্ণের তৃপ্তির জন্যে ব্যয়ে বা শ্রমে রাঘব কুণ্ঠিত নয়।

প্রত্যহ পাঁচ-ছটা নারকেল ছাড়িয়ে জলে ডুবিয়ে রেখে ঠান্ডা করে। ভোগের সময় সেগুলোকে সযত্নে ছুলে শঙ্খাকৃতি করে। তারপর মুখে ছিদ্র করে নিবেদন করে কৃষ্ণকে। কোনো কোনো দিন কৃষ্ণ নারকেলের জলটুকু খেয়ে নেয়, কোনো কোনো দিন খাবার পর ফল আবার জলে ভরে রাখে। জলশূন্য ফলের শাঁস বার করে পরিচ্ছন্ন পাত্রে কৃষ্ণকে নিবেদন করে রাঘব ধ্যানে বসে, কৃষ্ণ এসে সেই শাঁস খেয়ে যায়। কখনো বা খেয়ে নিয়ে আবার নতুন শাঁসে থালা সাজিয়ে দেয়।

একদিন রাঘবের এক সেবক কতগুলো নারকেল ভোগের জন্যে তৈরি করে একটি পাত্রে সাজিয়ে তা হাতে নিয়ে মন্দিরের দরজায় দাঁড়িয়েছিল। রাঘব মন্দিরের মধ্যে সেবায় ব্যস্ত ছিল বলে তক্ষুনি হাত বাড়িয়ে তা নিতে পারছিল না। এদিকে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার দরুন ক্ষণকালের বিশ্রামের আশায় সেবক তার দুই হাতের এক হাতে ফলপাত্র রেখে আরেক হাত মন্দিরের দাওয়ার উপর রাখল। আবার সেই হাতে ধরল সেই ফলপাত্র।

রাঘব সেবককে তেড়ে গেল। বললে, তুমি দাওয়াতে হাত ঠেকিয়ে সেই হাতে আবার ফল ছুঁলে? কত লোক এখান দিয়ে [illegible] এখানে উড়ছে তুমি তা জানো না? যাও, এ ফল অপবিত্র হয়ে গেছে। এ আর কৃষ্ণযোগ্য নয়। ফেলে দাও এগুলো।

সেবক বুঝি তবু দ্বিধা করছিল, রাঘব নিজেই প্রাচীরের উপর দিয়ে ফলগুলি বাইরে ফেলে দিল।

রাঘবের সেবায় এমনি শুচিতার কঠোরতা।

যে ঋতুতে যে দ্রব্য উপাদেয়, সেই ঋতুতে সেই দ্রব্য সংগ্রহ করে বা রন্ধন করে কৃষ্ণকে নিবেদন করে রাঘব। শাক-ব্যঞ্জন, ফল-মূল তো বটেই, চিড়ে-মুড়ি, দই-দুধ, পিঠে-পায়েস সবকিছুই কৃষ্ণকে খাওয়ানো চাই। এমন কি আচার-কাসুন্দি পর্যন্ত। রাঘবের ঘরে যা-ই রান্না হয় অনুরাগের পবিত্রতায় তা সুস্বাদু হয়ে ওঠে। প্রভু বলেন, 'রাঘবের ঘরে রান্ধে রাধাঠাকুরাণী।'

নীলাচল থেকে ভক্তবিদায়ের সময় প্রভু রাঘবের কৃষ্ণভক্তি ও সেবাবিধির কথা প্রত্যক্ষে ঘোষণা করলেন, তাকে দিলেন প্রেমালিঙ্গন।

বললেন, আমি তোমার ঘরে নিত্য আবির্ভাবে আহার করব।

তবু প্রতি বৎসর নীলাচলে যাওয়া চাই রাঘবের। আর যাবে সে ঝালি সাজিয়ে। প্রভুর জন্যে বহুবিধ খাদ্যসামগ্রী, এমন কি গঙ্গাজল, গঙ্গামৃত্তিকা দিয়ে সেই ঝালি সাজানো। সেই বিপুল দ্রব্যসম্ভার একজনের পক্ষে বহন করা অসাধ্য ছিল। নানাজনে নানা বোঝা বইত। অধ্যক্ষ হত মকরধ্বজ কর।

মকরধ্বজ রাঘবেরই প্রিয় শিষ্য। প্রভুই তাকে বলে দিয়েছিলেন রাঘবের 'পদদ্বন্দ্ব' সেবা করবে।

প্রভুর নির্দেশে নিত্যানন্দ গৌড়ে এলে সর্বাগ্রে গঙ্গাতীরে পানিহাটিতে রাঘবের বাড়িতে এসে উঠলেন।

নিত্যানন্দের সর্বদা বিহ্বল অবস্থা। শুধু হুঙ্কারে-গর্জনে হচ্ছে না, নিত্যানন্দ নৃত্যানন্দ হয়ে উঠলেন। পদভরে পৃথিবী টলমল করতে লাগল। নাচতে-নাচতে যার দিকে তাকান সেই প্রেমে ঢলে পড়ে, সেই ভক্তির সুবাসে বিভোর হয়ে যায়।

রাঘবের ঘরে খট্টার উপর উঠে বসলেন নিত্যানন্দ। বললেন, অভিষেক করো। ঘটে-ঘটে গঙ্গাজল আনা হল, নানা গন্ধে সুবাসিত করে নিত্যানন্দের মাথায় ঢালতে লাগল সকলে। চতুর্দিকে উঠল হরিধ্বনি। [illegible] অভিষেক-পর্ব। নতুন বসন পরানো হল নিত্যানন্দকে, চন্দন চর্চিত হল শ্রীঅঙ্গ। সতুলসী বনমালায় সজ্জিত হয়ে নিত্যানন্দ আবার উপবিষ্ট হলেন। তাঁর মাথায় ছাতা ধরল রাঘব।

নিত্যানন্দ বললেন, কদম্বের মালা গেঁথে আনো। কদম্ব আমার প্রিয় ফুল। কদম্বের বনেই আমার নিত্য বসতি।

রাঘব কুণ্ঠিত হয়ে বললে, এটা তো কদম্বের সময় নয়।

তোমার বাড়ির মধ্যে গিয়ে দেখ কোথাও ফুটেছে কিনা কদম্ব।

অভিভূতের মত বাড়ির অঙ্গনে এসে দাঁড়াল রাঘব। একী অভাবনীয়, জাম্বীরের বৃক্ষে অসংখ্য কদম্ব ফুল ফুটে আছে। যেমন বর্ণ তেমনি গন্ধ। তেমনি শোভা-বিস্তার।

রাঘব সেই কদম্বের মালা গাঁথল। ভুবনসুন্দর নিত্যানন্দের গলায় দুলিয়ে দিল।

কদম্ব-গন্ধ ছাপিয়ে এ আবার কিসের গন্ধ নাকে লাগছে!

মনে হচ্ছে এ দমনক ফুলের গন্ধ। ভক্তদল বলাবলি করতে লাগল।

ঠিকই বলেছ, এ দমনক ফুলের গন্ধ। বললেন নিত্যানন্দ, কিন্তু এ গন্ধ এল কোত্থেকে?

সত্যিই তো, কোত্থেকে এল? ভক্তেরা চোখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগল।

তোমাদের কীর্তন শুনতে চৈতন্য গোসাঁই নীলাচল থেকে এখানে এসেছেন। নিত্যানন্দ আনন্দে গদগদ হয়ে বললেন, তাঁর গলায় দমনক ফুলের মালা। তারই গন্ধ পাচ্ছ তোমরা। সুতরাং অন্য সব কাজ ফেলে কৃষ্ণগুণগান করো। গৌরাঙ্গযশে সকলে পূর্ণ হয়ে ওঠো।

গৌরহরি নীলাচল থেকে গৌড়ে এসে নৌকাযোগে প্রথমেই পানিহাটিতে রাঘবের গৃহে এসে উপনীত হলেন।

বললেন, তুমি নিত্যানন্দকে সেবা কর, তোমার মত ভাগ্যবান কে। তোমাকে বলি এক গোপন কথা। নিত্যানন্দ ছাড়া আমার দ্বিতীয় কেউ নেই। যেই আমি সেই নিত্যা-নন্দ। 'আমার সকল কর্ম নিত্যানন্দ-দ্বারে।'

নিত্যানন্দের আড্ডাও এই রাঘবের বাড়িতে।

নিত্যানন্দ দরজা খুলে না দিলে চৈতন্য-গৃহে পৌঁছনো যায় না। তাই রঘুনাথ চৈতন্যপ্রাপ্তির আশায় নিতাইকে আশ্রয় করল।

নিত্যানন্দের সম্পত্তি গৌরচরণ চুরি করে নিতে চায় বলে নিত্যানন্দ রঘুনাথকে দন্ড দিলে। দন্ড আর কিছু নয়, আমাদের সকলকে দই-চিড়ে খাওয়াও।

রাঘব এসে দেখল গঙ্গাতীরে অগণিত ভক্ত চিড়ে-দই খেতে বসেছে।

রাঘবকে দেখে নিত্যানন্দ বললেন, আমি গোপদের নিয়ে পুলিন-ভোজন করছি। তুমিও বসে খাও।

দিন শেষে রাঘবের নিমন্ত্রণে সবাই রাঘবের ঘরে এল। কীর্তন আরম্ভ হল। নিত্যানন্দ নাচতে লাগলেন। গৌরহরি চলে

এলেন সেই নাচ দেখতে। কিন্তু নিত্যানন্দ ছাড়া গৌরহরিকে কে দেখে?

না, রাঘবও দেখল। যখন নিত্যানন্দ খেতে বসলেন তাঁর ডানপাশে আরেকখানা আসন পাতলেন। সে কী, ওখানে কে বসবে? রাঘব বিস্ময়বিহ্বল চোখে চেয়ে দেখল এ যে স্বয়ং গৌরহরি!

দু ভাইয়ের অবশিষ্ট-পাত্র রঘুনাথকে উপহার দিল রাঘব। বললে, তুমি চৈতন্য গোসাঁইয়ের প্রসাদ পেলে, তোমার সর্ববন্ধন খণ্ডন হল।

কোথায় চৈতন্য গোসাঁই! ব্যাকুল হল রঘুনাথ।

তিনি নীলাচলে। তিনি আবার ভক্তচিত্তে, ভক্তগৃহে। তিনি কখনো ব্যক্ত, কখনো গুপ্ত। তিনি যে স্বতন্ত্র ভগবান। কখনো মানুষের মত হাঁটেন, কখনো ভগবানের মত আবির্ভূত হন। তিনি সর্বব্যাপী, তাঁর ইচ্ছায় তাঁর গতি-স্থিতি। সংশয় করতে যেও না। সংশয়েই সর্বনাশ।

প্রভুর অন্ত্যলীলার শেষ দিকেও ঝালি বহন করে নীলাচলে গিয়েছে রাঘব। কিন্তু তারপর — তারপর তার আর দেখা মেলে না।

(৬১)

রামদাস বিপ্র

দাক্ষিণাত্য পর্যটনের সময় দক্ষিণ মথুরাতে এক রামভক্ত ব্রাহ্মণের সঙ্গে দেখা হল গৌরহরির। সে প্রভুকে নিমন্ত্রণ করে বসল।

কৃতমালায় স্নান সেরে প্রভু বিপ্রের ঘরে এসে উপস্থিত হলেন। মধ্যাহ্নকাল, তবু বিপ্রের ঘরে রান্নার কোনো আয়োজন নেই।

এ কেমনতরো নিমন্ত্রণ?

প্রভু জিজ্ঞেস করলেন, দুপুর হয়ে গেল, রান্না কোথায়?

রামদাস বিপ্র বললে, আমি বনবাসে আছি। বনে পাকের সামগ্রী সম্প্রতি দুর্লভ। লক্ষ্মণ বন্য অন্ন শাক-ফল আনতে গেছে। সে ফিরে এলে সীতাদেবী রান্নার জোগাড় দেখবেন।

বিপ্রের উপাসনার ভাবটি বুঝে নিলেন প্রভু। বুঝে আনন্দে ভরে উঠলেন। এমন লীলাস্মরণের ভক্তও দেখা যায় সংসারে।

প্রায় তৃতীয় প্রহরে বিপ্রের আবেশ তিরোহিত হল। তখন অতিযত্নে ভিক্ষা দিল প্রভুকে। কিন্তু নিজে কিছুই খেল না, বিষণ্ণ মনে বসে রইল।

এ কী, তুমি খেলে না? তোমার কী হয়েছে?

আমার জীবনে প্রয়োজন নেই। বললে রামদাস, আমি দেহত্যাগ করব।

কেন, তোমার কিসের দুঃখ?

রাক্ষস জগন্মাতা মহালক্ষ্মী সীতা ঠাকুরানীকে ধরেছে। রামদাস কাঁদতে লাগল। এই দুঃখে দেহ জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছে, একে আর খাদ্য দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

তুমি এমন চিন্তা মনেও স্থান দিও না। বললেন প্রভু, সীতা ঈশ্বরপ্রেয়সী, চিদানন্দমূর্তি। প্রাকৃত হাত তাঁকে ছুঁতে পারে না, দেখতে পারে না প্রাকৃত চোখ। রাবণের কী সাধ্য তাঁকে দেখে, তাঁকে ছোঁয়! রাবণকে কুটিরদ্বারে আসতে দেখেই মায়া-সীতাকে রেখে সীতা দেবী স্বয়ং অন্তর্হিত হলেন। তুমি দুর্ভাবনা কোরো না, আমাকে বিশ্বাস করো। 'অপ্রাকৃতবস্তু নহে প্রাকৃতগোচর।'

প্রভুর বাক্যে রামদাসের বিশ্বাস হল। আহার গ্রহণ করল।

ঘুরতে-ঘুরতে প্রভু রামেশ্বরে পৌঁছুলেন। রামেশ্বরে ব্রাহ্মণ-সভায় কূর্মপুরাণ পাঠ হচ্ছে, শুনতে গেলেন। পতিব্রতা-উপাখ্যান পড়ছে। কী আশ্চর্য, তিনি যেমনটি বলেছিলেন রামদাসকে, তেমনি অবিকল পাঠ।

জগতের মাতা সীতা, শ্রীরাম-গৃহিণী, পতিব্রতা-শিরোমণি, রাবণকে আসতে দেখেই অগ্নির শরণাপন্ন হলেন। অগ্নি তাঁকে পার্বতীর কাছে রেখে মায়া-সীতা দিয়ে রাবণকে বঞ্চনা করল। সেই মায়া-সীতাই হরণ করল রাবণ। রাবণবধ করে সীতাকে ঘরে এনে রাম যখন তাঁর অগ্নিপরীক্ষা করলেন, তখন অগ্নি সেই মায়া-সীতাকে গ্রাস করে সত্য-সীতাকে রাম-সকাশে এনে দিল।

গ্রন্থের যে পত্রে এ কাহিনী বিবৃত আছে তার প্রতিলিপি রেখে সে-মূল পত্র ছিঁড়ে নিলেন প্রভু। মূল পত্র নিজের চোখে না দেখলে কি রামদাস বিশ্বাস করবে?

দক্ষিণ-মথুরায় ফিরে এসে প্রভু রামদাসের গৃহে গিয়ে উঠলেন। দেখ দেখ কূর্মপুরাণ কী বলে। রামদাসকে দেখালেন সেই প্রাচীন পত্র।

আর সন্দেহ কী, দুঃখ কিসের। দশানন রাক্ষস সত্য-সীতাকে স্পর্শ করতে পারেনি, স্পর্শ করেছিল মায়া-সীতাকে। সত্য-সীতাকে অগ্নিদেব লুকিয়ে রেখেছিল।

প্রভুর চরণ ধরে কাঁদতে লাগল বিপ্র। বললে, তুমিই সাক্ষাৎ রঘুনন্দন রাম। সন্ন্যাসীর বেশে আমাকে দর্শন দিলে। তোমার কী করুণা! মহাদুঃখ থেকে আমাকে ত্রাণ করলে। পাছে তোমার মুখের কথায় আমার প্রতীতি না হয়, একেবারে প্রাচীন পুঁথির পত্র নিজের হাতে ছিঁড়ে নিয়ে এলে। প্রভু, সেদিন মনোদুঃখে তোমাকে ভালো করে খাওয়াতে পারিনি। আজ একবার পরিপূর্ণ করে ভিক্ষা গ্রহণ করো।

(৬২)

গৌরহরি ক্রমে এসে পৌঁছুলেন কূর্মক্ষেত্রে, গঞ্জামে।

সেই গ্রামে কূর্ম নামে আছে এক বৈদিক ব্রাহ্মণ, প্রভুকে নিজগৃহে নিমন্ত্রণ করে আনল। নিজে প্রভুর পা ধুয়ে দিল, সেই জল খেল সবংশে। অনেক স্নেহে, অনেক প্রকার ভিক্ষা করাল, সবংশে খেল শেষান্ন। বললে, যে পাদপদ্ম ব্রহ্মা ধ্যান করছে, সেই পাদপদ্ম আমার ঘরে অবতীর্ণ। আমার আজ সৌভাগ্যের সীমা নেই, আমার সমস্ত জন্ম-জীবন কুল-ধন ধন্য হয়ে গেল। প্রভু, তোমাকে আমি আর ছাড়ব না, বিষয়-তরঙ্গের আঘাত আর সইতে পারছি না, তুমি আমাকে তোমার সঙ্গে নাও।

এ সব কথা কখনো বলবে না। প্রভু তাকে আশ্বস্ত করলেন, ঘরে বসে নিরন্তর কৃষ্ণনাম নেবে, আর যাকেই দেখবে তাকে কৃষ্ণ-উপদেশ করবে। তোমাকে বিষয়তরঙ্গ স্পর্শ করতে পারবে না।

সর্বাঙ্গে গলিত কুষ্ঠ, বাসুদেব নামে ব্রাহ্মণ, রাত্রে শুনতে পেল, কূর্মবিপ্রের ঘরে প্রভু এসেছেন। প্রভাত হলেই তাড়াতাড়ি চলে এল কূর্মগৃহে।

প্রভু কোথায়? ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল বাসুদেব।

এই খানিক আগেই চলে গেছেন।

চলে গেছেন! বাসুদেব মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

জীবনে তার একমাত্র সঙ্গী কুষ্ঠকীট। শরীরের ক্ষতস্থান থেকে যদি একটি কীট মাটিতে পড়ে যায়, বাসুদেব আবার তাকে সযত্নে তুলে ক্ষতস্থানেই আশ্রয় দেয়। নিজের দেহের প্রতি তার বিন্দুমাত্র অভিনিবেশ নেই, নিজের দেহ দিয়ে কীটের ভরণপোষণ করে। যে ঈশ্বরতন্ময়, সে দেহের সুখ-দুঃখের কথা চিন্তা করে না।

মূর্ছা ভাঙবার পর বাসুদেব বিলাপ করতে লাগল।

হঠাৎ তার চোখের সামনে প্রভু এসে দাঁড়ালেন। শুধু দাঁড়ালেন না, তাকে বুকে টেনে নিয়ে আলিঙ্গন করলেন। দিলেন তাকে জ্যোতির্ময় নিরাময় স্পর্শ।

মুহূর্তে অভিনব কাণ্ড ঘটে গেল। বাসুদেবের কুষ্ঠ অন্তর্হিত হল। তার সর্ব-অঙ্গ নিরবদ্য হয়ে উঠল, ধরল সুবর্ণকান্তি।

এ শুধু তুমিই পারো। বললে বাসুদেব, এ জীবের পক্ষে অসম্ভব। তুমি ভগবান, জীবনিস্তার তোমার স্বভাব, তাই তোমার মধ্যে উত্তম-অধমের ভেদ নেই, উত্তম-অধম দুইই তোমার সমান প্রিয়। কিন্তু এ আরোগ্য আমার পক্ষে সর্বাংশে শুভ হল কি?

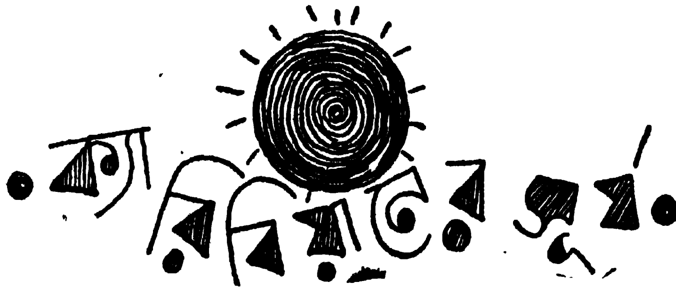
কেন এ কথা বলছ?

আমার এখন অহংকার না জন্মায়। দ্রবচিত্তে বললে বাসুদেব, আগে আমি সকলের অস্পৃশ্য ছিলাম, আমার গায়ের গন্ধে কেউ আমার কাছে ঘেঁসত না, নিজেকে ভাবতে পারতাম দীনাতিদীন বলে। তুমি এখন আমার দেহকে নিষ্কলঙ্ক করলে, রূপে-লাবণ্যে গরীয়ান করলে, এখন আমার মধ্যে দেহাভিমান না এসে যায়। অভিমানই তো ভজনের শত্রু।

প্রভু বললেন, তুমি সর্বদা কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলো, কৃষ্ণধ্বনিতেই অভিমান জন্মাতে পারবে না। কৃষ্ণই তোমাকে আত্মসাৎ করে নেবেন।

প্রভু চললেন এগিয়ে। দুই বিপ্র গলাগলি করে কাঁদতে বসল।

প্রভুর নতুন নাম হল 'বাসুদেবামৃতপদ'। অর্থাৎ যাঁর পদ বাসুদেব সম্পর্কে অমৃততুল্য হয়েছে। কিংবা বলতে পারো 'বাসুদেবামৃতপ্রদ'। অর্থাৎ যিনি বাসুদেবকে মোক্ষ-শান্তির অমৃত প্রদান করলেন।



ব্রজমাধব ভট্টাচার্য

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

"ক্যাথিড্রালে গিয়েছিলাম। পথটি বড়ো মনোরম। ওরা খাবে, অন্ততঃ পঁয়তাল্লিশ মিনিট তো বটেই। আমি পথটা গুলিয়ে ফেলেছি। এখানে গাড়ী পাওয়া হাঙ্গাম।"

আমি বললাম—"গাড়ী কি বলছেন? এই তো ব্লকটা পেরুলেই।'

"যে ব্লক পেরুনো যায় না তাইতো হিমালয়।'

আমি বৃদ্ধের সঙ্গে পা ফেলে ফেলে এগিয়ে গেলাম।

সোহন তখনও খাচ্ছে।

আমি স্যর চার্লস গাউয়েন-এর সঙ্গে সেই টেবিলটায় বসি। সোহনকে নিবেদিত করি, "পণ্ডিত সোহন ত্রিনিদাদিয়ন। সদ্য ভারত ভ্রমণ করে ফিরছেন। এ টেবিলটই আপনার মতো দুগ্ধপোষ্যের পক্ষে নির্বিঘ্ন।"

সার্ভ করছে তরুণী নিগ্রো একটি মেয়ে, রং পালটে পালটে ঘোলাটে হয়ে গেছে। চুল কিন্তু য্যাঁও-কে-তাঁও।

আমি বলি, 'আনারসের ফালিতে ক্রীম দিয়ে দাও, আর স্ট্র-বেরী আইসক্রীম। ড্রিঙ্কস্? বার্মুদায় তো পানীয় জলও আসে বৃষ্টির পথে। তোমরা আর কী ড্রিঙ্কস্ দেবে।"

স্যর চার্লস বলেন,—"সাইডার দু গেলাস।"

আমি একটা টসটসে কমলা ছাড়াতে থাকি।

"এরা সুখী" বলেন স্যর চার্লস। "আমায় তো এদেশ ঘুরতে হচ্ছে সারা জীবনই,—দেখলাম এরাই সুখী।"

"এ দেশ? আপনি তো স্কচ্।"

"স্কচ্ নামক একটা ঝোড়ো বাতাস পৃথিবীর সর্বত্র নিজেকে ওড়ায়, অপরকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। আমার শ্রোতাটির নাম সুগার,—চিনি।"

হঠাৎ টেট্ এণ্ড লায়াল কোম্পানীর কথা মনে হোলো। স্যর চার্লস। গায়ানার ডক্টর ছেদী জগনের স্বপক্ষে কী একটা ফতোয়া দেওয়ার ফলে ডলার-পাউণ্ড জগতময় একটা ত্রাহি ত্রাহি" রব উঠেছিলো বটে। ডক্টর জগন নাকি কম্যুনিস্ট। তাঁর স্বপক্ষে স্কচ্-কনজার্ভেটিভ-সুগার বেরনের সাধুবাদ! ভগবান্যাং। টমসন-গ্রুপের 'গার্জিয়ান' পেপারগুলো হৈহৈ করে উঠেছিলো।

সেই চার্লস গাউয়েন? সুগার বেরন? টেট এন্ড লায়ালের অন্যতম কর্ণধার!! কোটিপতি হাঙ্গর!!

"আপনি তো এদের প্রশংসা সর্বদাই করেন। লর্ড টমসন যে ভীর্মি খান। আপনার কি সামান্য ক্রীশ্চান করুণাও নেই?"

"আজ রোববার। আমার করুণা করবারই দিন তবে সপ্তাহে ঐ একটি। তাই শুধু বললাম, এরা সুখী। বলিনিও যে অনেক কিছু।" মিটিমিটি হাসেন। দামী একটা হ্যাভানা চুরুট জ্বালান। গন্ধে বাতাস ভরে যায়।

"কিন্তু ছোকরা, খবর তো তুমি জবর রাখো। ভারতীয় বিপ্লবী বুঝি?"

"তবু আমি প্রেসবিটেরিয়ন নই স্যর চার্লস। বিদ্রোহের ফলে নিজের রাজার গলা কাটিনি।"

মৃদু হাসেন। "তোমরা করেছো তার ঢের বেশী। ভারতবর্ষ হেন জবর হর্ন অব প্লেন্টিটী ব্রিটিশ-রাজার মাথা থেকে কেড়ে নিয়েছো। তোমরা পাপী। দাও সাইডার খাও।'

"পাপ ধুয়ে যাবে?"

"তা যাবে। সুগারের নাতি রামের ধারায় আরও সত্বর। কিন্তু তোমার তো বোধহয় ও সব চলে না।"

বিপদে পড়েছে সোহন।

সঙ্গে এখন স্যর চার্লস্। বাস থেকে সবার অলক্ষ্যে ঝুপ করে নেমে জলের কাছাকাছি টেবিলটায় বসে পড়েছিলো। মুর্গীর ঠ্যাংয়ের মতো ওর ন্যাংটা ঠ্যাং কেউ দেখেনি বলেই ওর বিশ্বাস।

...এখন ও ওঠে কী করে?

আমি ওকে তুলে নিয়ে যাচ্ছি। স্যর চার্লস চেয়ে দেখলেন। আমি বললাম, "কাপড় নেই ভাববেন না। এয়ারপোর্টের কাছে বীচে শুকুচ্ছে।"

সোহন তো লজ্জায় লাল!

স্যর চার্লস, সামনের সৈকত-মাধুরীর দিকে চোখ ঠেরে বললেন,—"ওদের দেখে মনে হচ্ছে আপনি প্রয়োজনের অতিরিক্ত আচ্ছাদনে লুক্কায়িত!!"

বাসের ভেতরে তখন আমরা। স্যর চার্লসের সিগার পকেটস্থ। "কাশ্মীরের ব্যাপারে ভারতীয়দের এতো জেদ কেন?" হঠাৎ স্যর চার্লস হাঁকলেন?

"বলেন কি স্যর চার্লস? ভারতীয়দের জেদ? রাজ্ঞী এলিজাবেথকে 'প্রথম' না বলে 'দ্বিতীয় এলিজাবেথ' বলার জেদ স্কট-দের কেন? ওয়েস্টমিনস্টার এবে থেকে করোনেশন-স্টোন চুরি করার ব্যাপারে পরেও বলবেন ভারতের জেদ? নিজে স্কট হয়ে? এ বেদনাটা তো আপনারা মর্মান্তিকভাবেই জানেন।"

আমার দিকে খানিকটা চেয়ে রইলেন স্যর চার্লস। বললেন, "কাশ্মীর তবে বলছে কেন 'আমরা ভারতীয় নই।' শেখ আবদাল্লা জেলে কেন?"

"কাশ্মীর ভারতীয় নই বলছে পাকিস্তান হবার পর। ওরা মুস্লিম, তাই পাকিস্তানে যেতে চায়।"

"তবে? জনসাধারণ যা চায়......"

"ভারতের জনসাধারণ চায় কাশ্মীর যাক, সঙ্গে সঙ্গে ভারতের তমাম মুস্লিম ভারত ছেড়ে যাক। —সেটাকে তা হলে মানতে হয়।"

"প্যালেস্টাইনও তো এই করেই ইহুদীরা পেয়েছে!" জোর দিয়ে বলেন স্যর চার্লস।

"পেয়েছে কি ঠেলে দেওয়া হয়েছে নাসেরকে এবং আরবদের জিজ্ঞাসা করুন। আসলে যদি আপনারা এবং আমেরিকা পাকিস্তানকে কম্যুনিস্টান্তিক ঘাঁটী তৈরী করার মতলবে না থাকতেন..."

অবাক হয়ে স্যর চার্লস বলেন, "সে কি বলছেন আপনি?"

"...শুনুন; বলতে দিন। শুধু পাকিস্তান নয়, কাশ্মীর নয়। আমেরিকা তাতিয়েছে; ভুটানে ঢু মেরেছে; নাগাঞ্চলে হুজ্জুৎ বাধিয়েছে। ভয়ে। ভারতবর্ষকে ঝোলে না টানতে পেরে এখন ভারতের বহিরঙ্গ থেকে খাবলে খাবলে খানিক ছিঁড়ে খুঁড়ে কী করে এমন বাফার-স্টেট করা যায় যার মধ্যে আস্রেকী কাপ্তেনী ঘোঁৎ মেরে বসে থেকে ভারতকে দাবাবে, রুশ এবং চীনকে শাসাবে। পাকিস্তানও তা বোঝে। এবং সময় ও আস্কারা পেয়ে সে ভারতকে না ছুবলে ছাড়বে না। পাকিস্তানের হোম-পলিসীর গোড়ার কথা ফরেন পলিসীতে ভারতান্তিক কার্যকলাপ বহাল রাখা। না রাখলে পাকিস্তানের হোম হালুম করবে।"

শুনে স্যর চার্লস একটু ঘোঁৎ-ঘাঁৎ করলেন। পরে বললেন, "বড়ো ঘোরালো কথা!"

"আরও সর্বনাশ এই যে ভারতীয়রা তা বোঝে। হয়তো অষ্টাদশ শতাব্দীতে তা বুঝতো না। আজ বোঝে। ঘোরালো ব্যাপার ঘোরালো করে বোঝার বুদ্ধি ভারতীয়দের নেই, এই কথাটা মেনে নেওয়ার ফলেই ভারত থেকে ব্রিটিশ রাজের গদ্দি-চ্যুতি।"

"কিন্তু ভারত কি কাশ্মীরকে রাখতে পারবে?"

"হয়তো না; হয়তো হ্যাঁ। কিন্তু স্যর চার্লস, যুদ্ধ না করেই জাতির অধিকার জাতি হারাবে কেন? আলসেস-লরেন নিয়ে, লুক্সেমবুর্গ নিয়ে, পোল্যান্ড নিয়ে এতো ঝামেলা কেন? কাশ্মীর চিরকাল ভারতের। ভারতবর্ষ মানেই কাশ্মীর।"

"তা হলে তো আফগানিস্তান, বালুখ, বার্মাও ভারতবর্ষ!" হেসে বলেন স্যর চার্লস।

"নিশ্চয়। ইংরেজ যদি আজও নর্মাণ্ডির ওপর নিজের দাবী কায়েম রাখে কাব্যে,

গাথায়; স্কটল্যান্ড যদি আজও ইংলণ্ডকে বিদেশ বলে মনে করে, কাব্যে, চিন্তায়, সমাজে,—কেন আপনারা কম্যুনিস্ট নিধন যজ্ঞে ভারতকে কোতল করার জন্য ব্যাগ্র? পাকিস্তান কি সত্যিই আমেরিকা-ইংলণ্ড ভক্তিতে গদগদ? মুসলীম ধর্মধ্বজী দেশ খৃস্টান ধর্মনিরপেক্ষ দেশকে মিতা করবে? কখনও করেছে? ইসলাম ধর্মের মধ্যে ডেমক্রাসী, কম্যুনিজম নিহিত।”

“তবে আপনি বলতে চান পাকিস্তান আমেরিকার সঙ্গে বেইমানী করবে?”

“ইমানদারের সঙ্গে ইমানদারী চলে স্যার চার্লস। বেইমানের সঙ্গে বেইমানী করাই যায় না। গেলে তাকেই বলা হয় ইমানদারী। দুটো না যেমন একটা হাঁ। পাকিস্তান ভারত-নিধন যজ্ঞে যা খুশী তাই করবে। কম্যুনিস্টের সঙ্গে ভাব করবে, আমেরিকাকে কলা দেখাবে। ...আমেরিকানরা বরাবর মেজরিটির আশা-আকাঙ্ক্ষা ধূলিসাৎ করে মাইনরিটিকে চাগিয়ে তুলে ব্রিটেনকে করছে বে-ইজ্জৎ আর পৃথিবীর সমস্ত দেশগুলোকে করছে বে-আব্রু। কোরিয়ায় তাই,—ব্রিটিশ গায়নায় তাই, ভিয়েৎনামে তাই, সীলোনে তাই, তুনিশিয়ায় তাই, ভারতবর্ষে তাই, পাকিস্তানে তাই। ভারতবর্ষ কখনও পোর্টোরিকো কিংবা ডোমিনিকান রিপাব্লিক হবে না। নিক না পাকিস্তান ঈস্ট পাকিস্তানে গণভোট?”

“তা কেন দেবে? সে তো ওদের দেশ।”

“স্যার চার্লস ইস্টবেঙ্গল পাকিস্তানের দেশ হবার ঢের ঢের আগে থেকে কাশ্মীর ভারতবর্ষের শুধু দেশই নয়, একটি অংশ, যেমন আমার হাতটা, ঘাড়টা, পাটা আমার দেহের অংশ।”

“ইংরেজদের ওপর আপনাদের খুব রাগ, নয়?”

আমি হেসে বলি,—“প্লেনে পাশাপাশি বসবো, কথা হবে। দেখুন সামনে কোরাল আইল্যান্ড। এমন সুন্দর দেশ। এতো সুন্দর। এরা সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে স্বর্গের আনন্দে ছিলো। স্যার চার্লস আপনারা পেলেন চিনি, এরা কী পেলো? অতিথি পরিচর্যা করে আরাম পেলো, সৌখীন হোলো—শান্তি? সে কী পেলো? শয্যায় পুরুষ পাওয়া যদি সম্ভব হোতো মনের মানুষের জন্য যুগে যুগে উর্বশী বিবাগিনী হতেন না।

ভারতীয়দের ঐ এক দোষ। কেবল শান্তি আর শান্তি। সুখ এবং শান্তির চুলচেরা ভাগ করতে করতে জাতটা শেষ হয়ে গেলো।”

“অশেষ এ জাত। অনন্ত এদের সাধনা। শান্তি আর সুখের পার্থক্য নির্ণয় করার জন্য আবশ্যিক যে সুসমাহিত চিন্তাধারার বিকাশ তার ক্ষেত্র, তীর্থ, ভারতবর্ষ। মানবসমাজ ভীত, কারণ? —পশ্চিমের সুখের পিপাসা, এবং সেই সুখ শিকারের চক্রে পশ্চিমের মদাতুর স্বার্থপরতা। ফল যুদ্ধ, অনিবার্য যুদ্ধ। মানবসমাজ তবু আশা রাখে! তবু জানে অশেষ দুর্গতির, অখণ্ড ভয়ের পারে তবু আছে একখণ্ড আশা; কোথায়? তার কী নাম? —ভারতবর্ষ।”

আমরা সত্যিই প্লেনে পাশাপাশি বসলাম। এবার যাবো বারবাডোজ, ব্রীজটাউন,—একেবারে হাতের তেলোর মতো পালিশ করা দেশ।

— বারবাডোজ —

আশ্চর্য এই যে একমাত্র বার্বাডোজেই সংখ্যাগরিষ্ঠ নিগ্রোরা আজও শ্বেতাঙ্গসমাজের শুচিবাইকে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে ডাকেনি। শুধু ডাকেনি নয়, মানিয়ে নিয়ে চলেছে।

ওরা সংখ্যাগরিষ্ঠ; ওরা স্বাধীন; ওরা সমর্থ; ওদের নেতাই পার্লামেন্টে প্রধানমন্ত্রী। তবু যে হোটেলে শাদা যাবে সেথা ওরা যাবে না; যে ক্লাবে শাদা খাবে সে ক্লাবে ওরা খাবে না; যে পাড়া শাদা-কিলবিলে সে পাড়া ওরা কাঠি দিয়েও নাড়বে না। কে যে কাকে আলাদা করে রেখেছে বলা কঠিন। আলাদা। কেউ কারুর তোয়াক্কা করে না।

“যা করো বাবা আস্তে ধীরে,
ঘা করো কেন খুঁচিয়ে;
পাৎলা একটা যবনিকা আছে, কাজ কি
সেটাকে ঘুচিয়ে?”

—যেন সেই বিত্তান্তো। যবনিকা ঝুলিয়ে রেখে নাটকে ওরা সীন তোলে।

মজা হয়েছিলো একবার স্যার গ্রান্টলী এ্যাডামসের বেলায়। স্যার গ্রান্টলী বারবাডোজের প্রখ্যাত ব্যারিস্টার থেকে দেশনেতা। যেবার ঠিক হোলো গোটা ওয়েস্ট ইন্ডিজ একটা রাজ্য হবে, ফেডারেশন অব ওয়েস্ট ইন্ডিজ, সেবার সঙ্গে সঙ্গে এও ঠিক হয়ে গেলো যে কৃষ্ণাঙ্গ ঐ স্যার গ্রান্টলী এ্যাডামসই ফেডারেটেড ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম প্রেসিডেন্ট হবেন। হলেনও। কিন্তু তাঁরও বিপদ ত্রিশূল হয়ে দাঁড়ায় শাদা-কালোর জাতিভেদের পাল্লায় পড়ে। সেই কৌতুক-ভরা ঘটনাটাই বলি।

প্রখ্যাত এক সাংবাদিক স্যার উইনস্টন চার্চিলের পরিচয়পত্র পকেটস্থ করে শ্বেতদ্বীপ ছেড়ে বারবাডোজে গেছেন। রাতে তখন পার্লামেন্ট চলছে। ভিজিটর্স গ্যালারীতে সাংবাদিককে বসতে দেখে স্যার গ্রান্টলী থ’। পার্লামেন্ট শেষ হতে না হতে এসে সাংবাদিককে বললেন, “আরে, আরে! আপনি হেন বাপের সুপুত্তুর কিনা ভিজিটর্স গ্যালারীতে......ইত্যাদি অনেক ডলার-গন্ধী তোয়াজ। অবশেষে,......চলুন কোথাও বসে একটু পান করা যাক।”

স্যার গ্রান্টলী সাংবাদিককে তাঁর পুরোনো ফোর্ডে চাপিয়ে নিয়ে চললেন বিখ্যাত রেস্তোরাঁ ‘গডার্ডস’এ। তখন ‘গডার্ডস’ বন্ধ হচ্ছে। স্যার এডামস সত্ত্বেও ওরা বললে, ‘সরি’। স্যার উইনস্টনের পরিচয়পত্রপুটে বর্ধিত সাংবাদিকের স্পষ্ট শ্বেততনু সত্ত্বেও দরজা বন্ধ করে দিলো। স্যার এডামস বললেন, “তাইতো; কাছে বাগে তো জংসই আর কোনো আড্ডাখানা দেখছি নে; আচ্ছা কাল দেখা হবে।

ব্যস্ স্যার এডামসের ফোর্ড অন্তর্হিত। সাংবাদিক পথে দাঁড়িয়ে। ‘জুৎসই’ খানাঘর অর্থাৎ কী, এই তত্ত্বই ভাবতে লাগলেন। তখনও বহু বহু ক্লাব খোলা। ক্লাবের মেম্বর না হলে ক্লাবে গিয়ে হৈ হল্লা বারণ। কেউ করেও না। তাই হয়ে আসছে বরাবর। কিন্তু শাদা শাদা পর্যটক, আর টুকটুকে পর্যটকী হলে চোখের ইশারায়ই মেম্বরদের স্বর্গে পৌঁছানো যায়! এ তত্ত্ব মিস্টার সাংবাদিক জানতেন। জানতেন এ হেন ‘ক্লাবে’ স্যার এডামস্ সহসা পদার্পণ করবেন না। সুতরাং তিনি লুপ্ত হয়ে গিয়ে মিঃ সাংবাদিককে গুপ্ত আছিলায় পথ হাট-মুক্ত করে দিয়ে গেলেন।

মিঃ সাংবাদিক নব্য; পোস্ট-ওয়ারের দরকোচা-মাল। বার্বাডোজ সমাজের ল্যাংমারা উন্নাসিকতা প্রত্যক্ষ করে ‘ক্লাবের নিকুচি’ করতে করতে হাঁক পাড়তে না পাড়তে ট্যাক্সি হাজির। “আমায় একটা ‘বার’-এ নিয়ে চলো।”

ট্যাক্সি-চালক ঘাবড়ায়। “সে কী বস্? বার-এ? সে তো আমা-হেন নিগ্রো-গামী ব্যাপার।”

“চোপ্‌রাও!” হাঁক-পাড়ে ব্রিৎস্-উত্তর-পুরুষ পুঙ্গবের দাপট। “তোমার যা গন্তব্য, আমারও তা গমনীয়। এ নিয়ে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন, চলো।”

কিন্তু না। নিগ্রো-বৃহস্পতি বুদ্ধি খরচ করে তাকে “ক্লাবে” এনেছে; ‘বার’-এ নয়!

চোখ রাঙিয়েছে মূর্তিমান জিদ্। ষাঁড়খাওয়া জিদ্।

“রাগো কেনে বস্? ভয় পাও কেনে? চলে যাও। দিব্যি চলে যাও।”

“আমি তো মেম্বর নই।”

“হ্যাঁ, হ্যাঁ। মেম্বর। শাদার জাত, মেম্বর নও বললেই হোলো। নিশ্চয় মেম্বর। চলে যাও না বস্। ঢুকে পড়ো। ভয় কিসে?”

ভয়-ভয় করে হাঁকাচ্ছে এ ব্যাটা। মহা খাপ্‌চুরিয়াস্ সাংবাদিক। “ভয় নয় হে ছোকরা। আমি বারে যাবো। ভয় করিনে বলেই যাবো।”

তা যাও। একেবারে যাও; বারে-বারে আর যেতে হবে না। মনে মনে বললো হয়তো কালাচাঁদ। কিন্তু এনে ফেললো এক বারে।

‘বার’ ভরতি কৃষ্ণকায় নিগ্রো দম্পতি-কম্পতি। কল-কল্লোল-কাকলী। অল্প-অল্প আলো; তীব্র ঝাঁঝক-মাদক-তামস গন্ধ। শ্রীমান সাংবাদিক কলির আতপ্ত বক্ষে ভাগীরথীর শীতলতা আনার পুণ্য গর্বে ডগমগ। শঙ্খ থাকলে হয়তো বাজাতোও। সিগারেট ছিলো; বার করে লাইটার দিয়ে জ্বালালো।

সঙ্গে সঙ্গে কল-কল্লোল স্তব্ধ। বাতি-টুস-কে যেন বিজলী আলো ওকেই দেখতে লাগলো। ওর উপস্থিতি যেন স্পষ্ট ব্যতিক্রম। কন্যাশ্রমে মৃগয়া!

বেরিয়ে এলো সাংবাদিক।

“বলেই ছিলাম বস্, ভালো লাগবে না তোমার।”

চিৎকার করে সেই সাংবাদিক Fermor বলেছিলেন, “হোয়াট দি ডেভিল দে মীন বাই সেগ্রীগেটিং মী?”

এ কথার জবাব নেই।

এর নাম বার্বাডোজ। বার্বাডোজের বিচিত্র সমাজ ওদের ভাগরভাগিতে উঁচু-নীচু

নেই। ওদের ভাগাভাগি শুধু তোমরা ও আমরা। তোমরা তোমাদের ছকে 'তোমরা', আমরা আমাদের ছকে 'আমরা'। ব্যাস্। এ ঢাক-ঢাক মাছ নয়; ছাই-চাপা আগুনও নয়। কম্বলচাপা ঘুম। ব্যাস্। যতক্ষণ স্বপ্ন, বেশ। নৈলে ঘুম। জাগিও না। কারণ জাগবো না। তার নাম বার্বাডোজ; বার্বাডোজ সমাজ। সেই সেকালের ক্রীতদাসের যুগেও বার্বাডোজের শ্বেতাঙ্গ মনিবরা ক্রীতদাসদের সঙ্গে খানদানীয়ানা ব্যবহার করেছে; নৃশংস অত্যাচারে নিজেদের মনুষ্যত্ব ভাসিয়ে দিতে পারেনি। বার্বাডোজেই এ ব্যতিক্রম। বরাবরই নিগ্রোরা শাদাদের চাকর হলেও যেন এক পরিবারভুক্ত। যেন এক অঙ্গেরই হাত আর পা; দুটোরই সেবার প্রয়োজন মাথা ঠিক রাখার জন্য। বার্বাডোজ সমাজ গঠনে ক্রীতদাসদের দান তাদের প্রভুরা সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করে। কিন্তু তা বলে ওরা বেড়া ভেঙে দিয়ে ঘাস আর ধান এক করে ফেলতে চায় না।

ক্যারাবিয়ানের সূর্য নতুন সমাজ গড়ে তুলছে; তার আরম্ভ হয়েছে। শেষ হতে এখনও ঢের দেরী। পরীক্ষা-নিরীক্ষা ইতিহাসের ধর্ম।

কি করে স্যর চার্লসের সঙ্গে কথায় কথায় এই শাদা কালোর বিসম্বাদ-তত্ত্ব এসে পড়েছিলো। আমি জোর গলায় বললুম, আধুনিকতম ঐতিহাসিক সমাজবিদ-এর অভিমত এই যে, ভবিষ্যতের সংঘাত পূর্ব-পশ্চিম অক্ষরেখায় সীমিত থাকবে না, যেমনটা এতোকাল থেকে এসেছে, ভবিষ্যত সমাজের বিপ্লবী ইতিহাস উত্তর-দক্ষিণ আত্মিক সংঘাতের ইতিহাস। সামাজিক বিপ্লবের প্রাচীন যুগে একদা মানবায়নের মহাকর্ষ স্থলীয় পৃথিবীর নাভিকেন্দ্র থেকে অপকেন্দ্রিক বেগে সমুদ্রতীরের দিকে ধাবমান ছিলো। তারপরে সামুদ্রিক যুগে সেই মানবায়নের বিস্তৃততর বেগ ভুবনের ঘাটে ঘাটে বেলাতট থেকে বেলাতটে ছড়িয়ে পড়েছে। বর্তমান আর্ণবিক বিজ্ঞানের যুগে এবং বায়ুপথের বিস্তৃতির যুগে মানুষকে আবার পৃথিবীর স্থলীয় কেন্দ্রের দিকেই অভিকেন্দ্রিক বেগ দিয়ে যেতে হচ্ছে। ভবিষ্যতের সমাজ পৃথিবীর স্থল-সমাজ, অন্তরীক্ষের পথে যে বিমান-শাসিত পৃথিবীকে ফিরিয়ে আনবে তার প্রাকৃতিক ভারকেন্দ্রিক স্বভাবে। এককালের পদাতিক সমাজ পেয়েছিলো ঘোড়সওয়ারী সমাজ, ঘোড়সওয়ারী সমাজ পেলো জল-সওয়ারী সমাজ, জল-সওয়ারী সমাজ হাত বাড়িয়েছে বায়ু-সওয়ারী সমাজ হতে—ফিরে আসবে সে পৃথিবী-জল-আকাশ জিতে আবার পৃথিবীরই বুকে। এশিয়া-আফ্রিকা ভূখণ্ডেই ভবিষ্যৎ সমাজের আশা-ভরসা। উত্তর-দক্ষিণের আত্মিক সংগ্রামই ভবিষ্যতের সংগ্রাম।

এই বার্বাডোজেই স্যর চার্লস আমাকে করেছিলেন, 'সত্যিই কি ভারতবর্ষের জন্য ইংরেজ কিছু করেনি? কোনো কিছুর জন্যই ভারতবর্ষ ইংলন্ডের কাছে ঋণী নয়?"

আমি বলেছিলাম, "দুঃখ-সত্ত্ব যেমন দুরারোহ আত্মিক স্থিতি, অন্ধতম-তম-ও তেমনি দুঃসাধ্য দুর্গম পতন। সবচেয়ে অকরুণ নিষ্ঠুরতার মধ্যেও আশা থাকে, সম্পূর্ণ আভালো সম্পূর্ণ ভালোর মতোই অবাস্তব। 'আকাশে কোথাও গান গেয়ে যায় মধুমাস'। সে আশা থাকবে না, এমন হতভাগ্য ইংরেজও নয়, ইংরেজ শাসনও নয়, আর ভারতের কুলী-কামিনও নয়। কিন্তু স্যর চার্লস, আপনি কি বলতে পারেন এমন কোনো একটি-দুটি বিষয় যার জন্য ভারতকে ইংরেজের কাছে সত্যিই ঋণ স্বীকার করা উচিত?"

সেদিন অবাক হয়ে চেয়েছিলেন বয়সপোড়া তামাটে চামড়া ঢাকা বৃদ্ধ স্যর চার্লস গাউয়েন। ক্ষণে ক্ষণে সেই বয়সস্তিমিত চোখ জ্বলে উঠছে বাতাস লাগা অঙ্গারের মতো, ক্ষণে ক্ষণে বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে কুয়াশায় ঢাকা সন্ধ্যার মতো। সেকাল-একাল, ভিকটোরীয় খানদানী কলোনিয়ালিজম আর যুদ্ধোত্তর বিপ্লবী সোস্যালিজম—এই দুই কাল—সত্য যুগের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে স্যর চার্লস চেয়ে থাকেন আমার প্রশ্নে।

নতুন যুগের বিমথিত আত্মার প্রতিবাদ বহন করে এমনিই একদিন বিপ্লবী কম্পসভ্যতা প্রশ্ন করেছিলো সাগর-পৃথিবীর সন্ধিতটে বৃদ্ধ সম্পাতিকে—"কোথায় সেই রাবণ অহংকার লুকিয়ে রেখেছে তস্কর-তণ্ডকতায় উপদ্রুত আর্য-মর্যাদা?"

স্যর চার্লস বিরক্ত কণ্ঠে বলেছিলেন, "ডাকঘর? রেলপথ? পথঘাট? শিক্ষা-বিস্তার?—কিছুই নয় এসব?"

আমি হেসেছিলুম। বুঝিয়ে ছিলুম ইংরেজ ব্যতিরেকেই জাপানে, টার্কিতে, রুশে, চীনে এ সব ব্যাপার এসেছে। ইংরেজরা যখন সভ্যতার উঠোনে উলঙ্গ শিশুর মতো ঘুরেছে, মাছ ধরছে, স্টোনহেঞ্জে বাস করছে, তখন ভারতে দীর্ঘপথ, সেনা-নৌ বিভাগ, ডাক-চলাচল সবই ছিলো। চন্দ্রগুপ্ত থেকে আকবরে পেশোয়াদের ইতিহাস এই সাক্ষ্যই দেয়। শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা, সমাজ, সংস্কৃতির কোনোটাই ভারতের অভাব ছিলো না। ইংরেজ না এলে সে পিছিয়েও থাকতো না। অন্ততঃ এখন যতোটা পিছিয়ে ততোটা তো নয়ই। এ সত্যটা বিশ্বাস করা কঠিন নয়, তবে কঠিন করে তোলা হয়েছে। পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে সম্পন্ন দেশকে হাতের মুঠোয় পেয়ে দুশো বছরেই তাকে সবচেয়ে নিকৃষ্ট দেশ করার যোগ্যতার জন্য যদি ভারতীয় ইতিহাস ইংরেজ শাসনকে একটা কটু দুঃস্বপ্ন বলে মনে করে থাকে, সেজন্য ব্যক্তিগতভাবে আপনার দুঃখ হতে পারে, চার্চিলের বিজাতীয় ক্রোধ হতে পারে, কিন্তু কালের অমোঘ অবাধ্য কেরানী শ্রীযুক্ত ইতিহাস-উদাসীন মন্তব্য করবেন, এই সত্য!

"ইংলন্ড ভারতবর্ষের জন্য কিছু করেনি? ইংলন্ডের শাসন না হলে ভারতবর্ষ থাকতো কোথায়?" আর্তনাদ করেন স্যর চার্লস।

"ভারতবর্ষেই থাকতো স্যর চার্লস। ভারতবর্ষ, পাকিস্থানে সিংহলে, ব্রহ্মে, আফগানিস্থানে, খণ্ড খণ্ড হয়ে থাকতো না। ইংরেজ শাসনের ফলশ্রুতি, ভারতবর্ষটাই আর ভারতবর্ষে নেই।......

ইংলন্ড না থাকলে ভারতবর্ষ কোথায় থাকতো ভাবছেন স্যর চার্লস, কিন্তু ভারতবর্ষ না থাকলে আজ ইংলন্ড কোথায় থাকতো কথাটা ভেবে অনেকে হাসে। আড়ালে আবডালে হলেও সে হাসি আপনারা ঠিকই শুনতে পান।"

কেন যে বার্বাডোজেই এই তর্ক উঠেছিলো জানি না। বাতাসের গুণে হয়তো। কিন্তু পরে বার্বাডোজে গিয়ে বার বার এই কথাটাই মনে হয়েছে। ইংরেজ আর সে ইংরেজ নেই, শাদাও আর সে শাদা নেই। এ যুগে শাদার বুকে কালোর ভয় ঢুকেছে। ভয় ঢুকেছে মানেই মরেছে। মৃত্যুই ভয়, ভয়ই মৃত্যু। কিন্তু বার্বাডোজে সেই প্রাক্-তুলো-চিনি-নীল-ইঞ্জিন যুগের ইংরেজ আজও ইংরেজ। সেখানকার সমাজব্যবস্থার ত্রিবেণীতে ঘোর আর শাদা জল মিশেও মেশেনি, কিন্তু যে তৃতীয় বেণীটি অন্তঃসলিলা তার ধ্যানে-জ্ঞানে শাদা ঘোর হয়েই গেছে। বার্বাডোজেই এক সেই সমাজ আছে, যেখানে শাদা-শাদা, ঘোর-ঘোর, দু পক্ষই দু পক্ষকে মানে, নির্বিবাদে মানে, দু পক্ষের গুণের দু পক্ষই অনুরাগী, অবগুণের দু পক্ষই বিরাগী। কিন্তু বিবাদ নেই।

তা বলে অসম্ভব কাব্যকথা নয়। Twin shall never meet- এর প্রতিবাদ নয়। কালো যদি শাদাকে বিয়ে করেই ফেলে, কালোই নিজেকে ধন্য মনে করে, শাদা মনে করে 'বিকিয়ে গেছি'। কালোর জুটি শাদাকে শাদা সমাজ 'পতিত' বলেই মনে করে, শাদার জুটী কালোকে কালো সমাজ 'উন্নত' বলেই মনে করে।

লন্ডনে কালো-রেভারেন্ড ফাদার জর্জকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "সত্যি খবরটা কি বলুন



সকল প্রকার অফিস ষ্টেশনারী কাগজ
প্যাকেজিং ড্রইং ও ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্যাদির

কুইন ষ্টেশনারী ষ্টোর্স
লিঃ

৬৩-ই, রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১
ফোন : অফিস—২২-৮৫৮৮ (২ লাইন)
২২-৬০০২
ওয়ার্কশপ—৬৭-৩৬৬৪ (২ লাইন)



"কুসুম বনস্পতি দিয়ে রান্নাবান্না করতে ব'লে মীনা কী-যে উপকার করেছে, বলার নয়। কুসুম খাঁটি ও টাটকা—এতে রাঁধলে খাবারের স্বাভাবিক স্বাদ মুখে লেগে থাকে। আমার সব রান্নাবান্না কুসুম বনস্পতি দিয়েই করি। এতে খাবার যেমন রুচিকর হয়, তেমনিই স্বাস্থ্যপ্রদ। কুসুমের রান্না বাড়ীর সবাই ভালোবাসে।"

আপনিও কুসুম দিয়ে রান্না ক'রে দেখুন, বাড়ীর সবাইকে তৃপ্তি দেবার কী আনন্দ।



খাঁটি স্বাদ পেতে হলে **কুসুম**

বনস্পতি দিয়ে রান্না করুন

কুসুম প্রোডাক্টস লিমিটেড, কলিকাতা-১

KPK-3886

তো? নটিংহিলের খুনোখুনীর তলাকার গূঢ়শিতভেদ কি?"

ফাদার জর্জ বলেছিলেন, "নটিংহিলের শাদারা ভালোমানুষ। ভালোমানুষই থাকতো, কিন্তু কালো কুচকুচে সুঠাম, পেশল নিগ্রোদের কন্ঠলগ্না হয়ে যখন শাদা মেয়েরা পথে, হাটে, বাজারে, পার্কে, সিনেমায় ঘুরতে লাগলো—তখন শাদা যুবকরা যেন 'মধুচক্র-লোষ্ট্রপাতে-বিক্ষিপ্ত-চঞ্চল' পতঙ্গ। হুলের পর হুল। ইতি নটিংহিল ডাকিনীতন্ত্রের গূঢ়শিতভেদ।"

আমি আশ্চর্য হই। "শাদা মেয়েগুলোই বা হুদো হুদো কালা-মাংসের তালের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে এতো হা-হন্যে কেন?"

ফাদার জর্জ তাঁর পাইপে গোটা কয় টান দিলেন। হাতের পিঠ দিয়ে দুটো কষই একটু মুছে নিলেন। মনে হোলো সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা অদম্য হাসিও মুছে নিলেন।

"অবশ্য পুরুষ হিসেবে শাদা যুবকদের তুলনায় কালো পাথরে কাটা নিগ্রো এপোলোরাই যে কামিনীর কলাতৃপ্তি বিভাগের ঢের বেশী সক্ষম-শরীক তা বোধ করি আপনাকে বাইবেল আর শেকসপীয়র আবৃত্তি করে বোঝাতে হবে না। অ ছাড়া শাদারা শাদা মেয়েদের সঙ্গে সেই বিশিষ্ট ব্যবহারটি করে না, কালো ওথেলো শাদা ডেসডিমোনার জন্য যা করে।......লক্ষ্য করেছেন কি লন্ডনে ইদানীং ওথেলো নাটকের পরিবেশন বেড়ে গিয়েছে, শুধু তাই নয়, নিগ্রো নটরাই আজকাল 'ওথেলো'-র পার্ট করছে। নিগ্রো নট নিয়ে শাদা ছবির বাজার অসকারে অসকারে ছেয়ে গেলো বলে! কালোরা শাদা ঘরণীকে স্রেফ পুজো করে এবং সে মেয়ে যদি ফষ্টি-নষ্টি করে বাসর-শয়নের পবিত্রতাকে লঙ্ঘন করে, কালো পতিদেব তাকে আবশ্যক মতো ঠেঙিয়েও থাকেন। ঠেঙানীরও নাকি একটা মোহ আছে, কোনো কোনো শাদা মেয়ের, বিশেষতঃ অশাদার হাতের ঠেঙানী। মনস্তাত্ত্বিক একে রোগ বলেন। আমরা কেই বা মানসিক রোগের জুলুমে পোয়াচ্ছি না?..."

থেমে গিয়েছিলাম সেদিন।

ফাদার জর্জ থামেন নি। এদের সমাজে মেয়েরা সংখ্যায় বেশি, মেয়েদের খাটুনির বহর এবং দায়িত্বও বেশী। কালোরা যখন শাদা মেয়ে বিয়ে করে তখন সে মেয়েকে শুধু পুজোই করে না। বাকী সব করে। বাকী মেয়েরা কী করবে? মামলার নিষ্পত্তির হোতো একাধিক বিবাহে। কিন্তু বুজ-রুকীতে তা বাধে। অথচ মানুষগুলোর মানসিক ভোজের সেরা রস বহুপতিত্ব। একটা পুরুষই বাড়ীতে স্ত্রী রেখে ক্যাবারে, হোটেল, ম্যাসাজ বুথ, সুইমিং পুলে গিয়ে নানা মিসদের পায়ে জীবন-যৌবন-অর্থ-ধর্ম অঞ্জলি দেবেন, কিন্তু সমনা সামনি বিয়ে করে পুরুষের স্বভাবগত তৃষ্ণা এবং নারীর অবশ্য প্রয়োজনীয় এই ধর্মটির একটা স্পষ্ট প্রতিকার করবেন না। ফলে এ সমাজটার ধাপ্পাবাজী দিনে দিনে ধসে ধসে পড়ছে। নটিংহিল একটা মোক্ষম ঐতিহাসিক ঘটনা।

ক্যারাবিয়নের সূর্য যেখানে যেখানে কালোয়-শাদায় রং-বাজী খেলেছে সেখানে সেখানেই কালো-শাদার দ্বন্দ্বকে কুৎসিত করে তুলেছে। কোথাও শাদার বাজী মাৎ, যেমন বাহামায়, বার্মুদায়। কোথাও কালোর বাজীমাৎ, যেমন জ্যামায়কায়, হেইতিতে, ত্রিনিদাদে এবং হয়তো গুয়ানাতে এবং যেখানে ভারতীয় এবং নিগ্রোদের মধ্যে আঁতাত হলে নিগ্রো হবে এমন ভারী যে, শাদা মাইনরিটীকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাতে পারবে, সেখানেই নিগ্রোদের পিঠ চাপড়ে ভারতীয়দের হেয় করার খেলা খেলছে। এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ ত্রিনিদাদ এবং গুয়ানা। ভারতীয়রা যেখানেই থাকুক, কী ত্রিনিদাদে, কী গুয়ানায়, কী কেনিয়ায়, তাঙ্গানাইকায়, মরিশাসে, জাঞ্জিবারে—তাদের কন্ঠ-কর্তন করার ব্যাপারে শ্বেতহস্ত ব্যগ্র। ভারতীয়েরা হুজ্জুতে জাত, হাঙ্গামা, বিপ্লব বাধবার ওস্তাদ, আর ওদের হাড়ের মধ্যে ধর্ম। ওদের নাকি কিরিস্তানী কল্মা পড়াতে জান বেরিয়ে যায়। 'পতঞ্জলি মথুরা'কে যদি বা 'প্যাট্-ম্যাট্'রা করা গেলো, ব্যাটা বাড়ী গিয়ে ঠিক রামায়ণ পড়বেই, মেয়ের বিয়ের পাকা-দেখায় সত্যনারায়ণ পুজো করবেই। কাজেই শাদা-কালোর পাশা খেলায় যে ঘুঁটি যে ঘরেই যাক না কেন আছাড় খেয়ে মোলো মুঠোর ধরা পাশা এই ভারতীয়েরা। ওদের দুর্দশার সবে আরম্ভ।

কোথাও শাদা বড়ো, কোথাও কালো বড়ো, কিন্তু এই বার্বাডোজে বড়ো যে হও, হও—আসে যায় না, শাদা শাদাই, কালো কালোই। উভয়ের ইজ্জৎ—বে-ইজ্জৎ উভয়ে মেনে নিয়ে চলে। ঝামেলা নেই। শাদাদের কালোরা 'মাসা' বলে মানে, অর্থাৎ কর্তা-ব্যক্তির সম্মান দেয় অকুন্ঠভাবে এবং কালোদের শাদারা পিঠ চাপড়ায় যত্রতত্র, যেমন খুশী।

এই অনবদ্য বার্বাডোজের অনবরোধ্য শ্বেতাঙ্গ-কৌলীন্যের ইতিহাস সুদূর-প্রসারী। ১৬৬ বর্গমাইল বিস্তৃত দ্বীপটি আইল অব ওয়াইটের আয়তন বটে, কিন্তু বাসিন্দা প্রায় ২৫ লক্ষ। সুতরাং খুব ঘন বসতি হওয়ার কথা নয়, তবু বলা হয় বার্বাডোজের মতো ঘন বসতি জায়গা পৃথিবীতে কম! প্রতি বর্গ মাইলের বসতি এখানে ৩০০০-এর মতো! কারণ এই দ্বীপটির আগাপাশতলাই হাতের চেটোর মতো পালিশ এবং বাংলাদেশের মতো উর্বর। তাই এর প্রতি ইঞ্চি জমিতে যতো পারে আখ, আখ আর আখ। নৈলে ঘোড়-দৌড়ের মাঠ, খেলার মাঠ, গল্‌ফের মাঠ ইত্যাদি। সভ্যজগতের তামাম খাস মহল। আসলে জীবনপক্ষীকে ধারণ করার জন্য কেবল শহর ও শহরতলীর খাঁচা। বার্বাডোজ দেখতে গেলে মন-মেজাজ যেন ঘুমিয়ে পড়ে। কেবল আখের ক্ষেতের পর আখের ক্ষেত।

যে কোনো জায়গা থেকেই মানুষের বসতি দেখা যায়। বোঝা যায় মানুষ উপচে পড়ছে। বোঝা যায় য়োরোপ থেকে আসার পথে ট্রেড উইন্ড বওয়া দ্বীপের প্রথম দ্বীপ বার্বাডোজ; এর উপনিবেশ, এর ক্রেতা এবং বাণিজ্য, সমৃদ্ধি। বার্বাডিয়নদের ঘরের মাথ বীথ। শব্দটার ইংরেজী ব্যঞ্জনা মালদার, শাঁসালো, মজবুত খানদানী ব্যক্তি! বার্বাডিয়ান মাত্রেই এককালে শাঁসালো শাসমন্দ ছিলো। এখানে শত শত বর্ষ ধরে কোনো বিপ্লব নেই, হাঙ্গামা নেই, এমন কি যে ক্যারাবিয়ান এলাকা জলদস্যুর উৎপাতে উৎপাতে বিভ্রান্ত, সেই জলদস্যুর উৎপাতও এই একটেরে বেমক্কা দ্বীপটির ওপর আসেনি। জবরদস্ত চিনির বাজার, জবরদস্ত জোতদারী, জবরদস্ত ক্রীতদাসের বাজার বার্বাডোজের নামকে য়োরোপের ঘাটে ঘাটে খ্যাতিমান করেছিলো।

বার্বাডোজের দাস-বণিকরাই বার্বাডোজের মালিক। সেই দাপট-রাঙা শাসন তন্ত্র আজ কালোআদমীর করতলগত। সুক্ষ্ম পালিশে ঢাকা বার্বাডোজের আভি-জাত্য ও কৌলীন্য এ অপমান ক্ষোভ বরদাস্ত করেছে নীরব স্বীকৃতি দিয়ে, গম্ভীর বদান্যতা দিয়ে। বড়দাকে ছোটোভাই যেমন মেনে নিয়ে সংসার চালাবার ভার নেয়, তেমনি। আজ বার্বাডোজ সম্বন্ধে কেউ কিছু লিখতে গেলে, বার্বাডোজ সমাজে কেউ ঢুকলে কালোরা প্রথমে সাবধান করবে, দেখবেন, ভুলেও যেন শাদাদের রং-প্রীতি নিয়ে কোনো কথা তুলবেন না। বড়ো লজ্জিত হতে হবে। ওরা এমনিতে লোক ভালো। কিন্তু শাদারা বলবে, দেখবেন ভুলেও যেন কালো চামড়া নিয়ে কোনো ঘোরালো কথা বলবেন না। বড় লজ্জিত হতে হয়। ওরা বরাবর সেবা দিয়েছে, যা একমাত্র কালোরাই দিতে পারে। আজও তেমনি বশংবদ। তাই ওদের আমরা লজ্জায় ফেলতে চাই না। আমাদেরই লজ্জা হয়।

ভারী মজার ব্যাপার এই রং-সমস্যা বার্বাডোজে! রং বিভাগটা বার্বাডোজে চরম এবং মোক্ষম। আমেরিকার চেয়েও প্রাচারিত, অথচ অর্ধেক-প্রচারিতও নয়, সিকি-স্পষ্টিতও নয়। সাউথ আফ্রিকায় যা গো-ধরা গোরের মত খণ্ড-বিক্রম, বার্বাডোজে ঠিক সেই ফলই হস্তগত নিতান্ত ঘরোয়া ইন্তজামে শোবার ঘর আর আস্তাবলের মতো নীরব ব্যবস্থার বাস্তুশিল্পের মাধ্যমে। ভণ্ডামি আর ন্যাকামিকে এরা রাজনীতির পোষাকের তলায় চাপা রেখেছে।

আজকাল তো ভ্রমণ নিয়ে নানা দেশের নানা লেখা অনবরতই বার হচ্ছে। কাজেই বার্বাডোজে তেমন তেমন কোনো লেখক এসেছে, যা কোনো পর্যটক বই লেখার জন্য মালমশলা সংগ্রহ করছে জানতে পারলেই ওরা সবিনয়ে একটি কথা নিবেদন না করে পারে না! "দেখবেন, আর যে লেখার লিখবেন। ......কেবল আমাদের এই শাদা-কালো ছক বেঁধে দাবা খেলার মৌজটাকে বিকৃত করে দেখাবেন না। বেশ আছি আমরা। আমাদের নটিংহিলও নেই, লিটল-রকও নেই; অ্যালাবামা, রডেশিয়া বা সাউথ আফ্রিকাও নেই। দেখছেনই তো কালো আদমী প্রধানমন্ত্রী, কালাই গভর্ণর, আমরা দিব্য আছি।"

বড়ো আতঙ্ক ওদের যে ওদের দেশের 'বর্ণাশ্রম' ধর্ম এবং হরিজনসমস্যা লোকের

দৃষ্টিতে না পড়ুক। আমাদের হরিদাসী বোস্টুমী যেমন বেরালের জন্য মাছ কেনে!! বাজার থেকে নিয়ে আসার বেলায়ও শাক দিয়ে ঢেকে নিয়ে যায়!

ও সব দেশেই আছে।

ইংলন্ড আর সে ইংলন্ড নেই। অনেক কারণে। জনসনের ইংরিজীও অচল হয়েছে। বীটলরা এম-বি-ই খেতাবে পালিশী মাল হয়ে দাঁড়ালো। দাড়ি রোজ না চাঁচলেও চলে, ডিনার খেতে গিয়ে টাই না বাঁধলেও হাঙ্গামা নেই। কিন্তু বার্বাডোজে এ-হেন প্রস্তাবায় অসম্ভব।

কবেকার নেলসন, কবেকার তাঁর আবিষ্কৃত তিনকোনা টুপি আর কালো-লাল য়ুনীফর্ম!! ইংরেজের দেশে ও সব আর নেই। কিন্তু বার্বাডোজের পুলিশ আজও তাই পরে। বার্বাডোজ দিব্য গরম দেশ। ওগুলো পরা অত্যন্ত কষ্টকর। ঘামের গন্ধে গাধাও বোকাপাঁঠা হয়ে যায়। তবু বার্বাডোজ নেলসনের ইংলন্ডকে বাঁচিয়ে রাখবেই। শ্রীমতী রাণীসাহেবার গার্ডসদের মতো, কিংবা লন্ডন-টাওয়ারের শাস্ত্রীদের মতো, বিকানীরের জোধপুরের উষ্ট্র রিসালার মতো মাত্র আনুষ্ঠানিক চমকের খোরাক হিসাবে নয়, রীতিমতো খানদানী আদর, শান, শৌকৎ-এর মতো পোখ্‌তভাবে বহাল। অমন যে রোমের ভ্যাটিক্যান গার্ডস—তাও বদলেছে, কিন্তু বার্বাডোজের ঝকঝকে রোদের তলায় লাল-কালো বনাতের উর্দী পরা পুলিশ—'নেলসন-টারস'—তারা বদলায় নি। বার্বাডোজ অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরিজী সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। এখানেই শত শত জাহাজ ব্রীজটাউনের বন্দরে দেখা যাবে, আজও পাল তুলে চলায় কোলীন্যে ডগমগ।

বার্বাডোজের বন্দরের পথ পার হতে গেলে দুটি পর পর সেতুতে খানিক দাঁড়িয়ে থাকার যে কেবল বেশ খানিক ঠান্ডা বাতাস খাওয়া যাবে তাই নয়, দেখা যাবে ফিট-ফাট সাহেব-মেম-নিগ্রো যেন রাণীর বিয়েতে নেমন্তন্ন খেতে চলেছে। এঁরা কুলীন সমাজ। প্লান্টার্স, মার্চেন্টস—এদেশের গায়কোবাড়, বিকানেরের নরেশ, লাহা-কুণ্ডু, শেঠ-বিড়লা! দেখা যাবে ভেনেজুয়েলান-কর্ড পানামা হ্যাট পরে হাতে ব্রীফকেস নিয়ে চলেছেন। তেলের ব্যাপারী উনি। তারপরে নিগ্রো-জায়াকে দেখতে পাওয়া যাবে বড়ো বড়ো ফুল-ছাপা রংচংয়ে পপলিনের গাউন পরে মাথায় বাঁধা রঙীন রুমালের ওপর আনারসের ডালা চাপিয়ে চলেছেন হোটেলের সামনে বা পোস্টাপিসের সামনে ঘোরাঘুরি করে আমার মতো পর্যটকদের পকেটকে কৈবল্য দিতে। পাগড়ি দেখবেন, ফেজ দেখবেন, বাবরী দেখবেন; hedge দেখবেন, ড্রেন-পাইপ পাজামা, বীটল হেয়ার-কাট, ক্যাস্ট্রো-কাট-দাড়ি, কুচকী-বাহার শর্টে সজ্জিতা আমেরিকান ললনা। দেখবেন না কেন? বার্বাডোজ তো আজকের নয়। বার্বাডোজের প্রবালে-জড়ানো লাল বালুর ওপরে কাৎ হয়ে স্যর উইলিয়ম কোর্টন যখন তাঁর জাহাজের তলায় বার্বাডোজ-জাত মানজাক্ (এক রকমের পীচ-টার) (এই থেকেই ধুড়ির মান্‌জা নাকি?—কে জানে!) পালিশ করছেন, তখনও আমেরিকার ম্যানহাটান দ্বীপে রেড-ইন্ডিয়ানরা বীরদর্পে ভুট্টা পোড়াচ্ছে আর শিকার-করা বাইসনের মাংসে দিয়ে খাচ্ছে।

১৬০৫ খৃস্টাব্দে 'অলিভ ব্লসম' বার্বাডোজে বুড়ী ছুঁয়ে চলে গিয়েছিলো; যাবার আগে রাজা পয়লা জেম্‌স-এর নামে একটা ঝান্ডা গেড়ে গিয়েছিলো। উড়ো সেই খই এক গোবিন্দকে দেওয়া হোলো রাজাজ্ঞায়। সেই গোবিন্দ আর কেউ নন, Lord Leigh, Earl of Marlbrough অর্থাৎ আমাদের 'উইনী চার্চিলের' পূর্বপুরুষ। তিনিই স্যর উইলিয়ম কোর্টনীকে পাঠিয়ে বসত করান বার্বাডোজে। এরপরে যখন আর্ল অব কার্লাইলকে ইংরেজরাজ তামাম ক্যারাবিয়নটাই দান করে ফেললেন, তখন থেকেই বার্বাডোজের খ্যাতি বাড়লো। সে খ্যাতি আরও বাড়লো ইংলন্ডের সিভিল ওয়ারের পর পরাজিত শত শত রয়্যালিস্ট যখন বার্বাডোজে এসে বসত বাঁধলেন। কেষ্টবিষ্টু নয়, চোর নয়, হ্যাঁচড় নয়, ডাকাত নয়, স্রেফ চৌধুরীর দল। খানদানী কারামাতি দল। সেই থেকে বার্বাডোজের কার্লাইল-বে। ক্রমওয়েল এই রাজকীয় দুর্বৃত্তদের হাত থেকে বার্বাডোজ উদ্ধার করতে চান। পারেন না। তারপরেই তো চার্লস দ্বিতীয়ের পুনরাগমন। তিনি তখন আর্ল-লর্ড ইত্যাদি গোবিন্দদের ঝামেলা তামাম করে স্বয়ং বার্বাডোজ শাসনের ভার নিলেন। ১৬৮৪ খৃস্টাব্দের এক মর্দুমশুমারীর খত্‌ত-সাক্ষ্য মিলছে—২০,০০০ শ্বেতাঙ্গ এবং ৪৬,০০০ কৃষ্ণকায় ক্রীতদাস। ইলফরাসী দ্বন্দ্ব-এর সময়ে বার্বাডোজের ওপর দের ধকল গেছে। আমিরকী-স্বাধীনতার যুদ্ধের সময়েও বাণিজ্য হারিয়ে বার্বাডোজের চৌধুরীরা ভারী বিপন্ন হয়েছিলেন। ১৮০৫ থেকে অদ্যাবধি বার্বাডোজের কুলকুল একই হয়ে [illegible] চলছিলো। কিন্তু গত যুদ্ধের পর বার্বাডোজ ওয়েস্ট ইন্ডিজ ফেডারেশনে ঢুকে স্বাধীনতা নামক অজব চীজটি পেয়েছিলো। কিন্তু সে ফেডারেশন টেকেনি। এখন পুনশ্চ বার্বাডোজ স্বাধীনতা পাবে পাবে এমন খবর লন্ডন থেকে পাওয়া যাচ্ছে। ছটি ছোটো দ্বীপসহ বার্বাডোজ * স্বাধীন এই বছরেই (১৯৬৬) হবে বলে সবাই ভাবছে।

স্বাধীন হবে। কে হবে? জালায়, না কালোরা? আনন্দ কাদের?

গত যুদ্ধের পর ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর থেকে 'স্বাধীনতা' নামক এক প্রপঞ্চে শিশু-রাষ্ট্রদের জড়িয়ে ওয়াশিংটন-লন্ডন-প্যারিস ত্রিমূর্তি একরকম নতুন লীলাখেলার প্রচলন করেছেন। নাচ সেই একই; পাকটা ঈষৎ উলটো। এর নাম নাকি "নিও-কলোনিয়ালিজম্"। অর্থাৎ ঔপনিবেশিক-জগন্নাথের কারাপলট। মুরারি সে দারুভূত, সেই দারুভূতই থাকবেন। আশা করার কোনো হেতু নেই যে কাঠের জগন্নাথের ঠুঁটো হাত এবং কাটা-কোমর পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠবে। এই ঠুঁটো রাষ্ট্রগুলোর ঠুঁটো স্বাধীনতা দান করে এঁরা ঠুঁটো হাসি হাসছেন। (শীতকাতুরে সজ্জ ঠোঁট তো!—কমাহ্!)

রাজ্যের শাসনভার খোকাদের দেওয়া হোলো; অশন-বসন-সুবর্ণশোষণ সবই যথারীতি রইলো; কেবল হুজ্জুৎ হাঙ্গামা পোয়াবার সামান্য ভারটুকুই খোকা রাষ্ট্রপতিদের ওপর চাপানো হোলো। দশে মিলে এ কাজ, সত্যিই লজ্জা শরমের অনেক বাইরে চলে গেছে। অবশ্য কমনওয়েলথ ক্লাব নামক একটা আড্ডাঘরে আবশ্যিক পিঠ চাপড়ানোর পালা গানের বছরকাটা পালন হয়েই থাকে। ফলে কঙ্গোও চলে, ভিয়েৎনামও চলে, রোডেশিয়াও চলে,—এবং বার্বাডোজের স্বাধীনতাও চলবে। ত্রিনিদাদে ভারতীয়েরা সংখ্যালঘু; তাই তাদের পাত্তা নেই দরবারে, যদিও সরকারকে ট্যাক্‌স গোনে তারাই মোটা হারে;—আবার গায়নায় ভারতীয়েরা সংখ্যাগুরু, তাই তারা যাতে পাত্তা না পায় সেজন্য নতুন রকমের ভোটব্যবস্থা করা হোলো। কিছুতেই নিগ্রোরা এবং ভারতীয়েরা যাতে মিলে মিলে না এক হয়ে যায় এজন্য শত শত নিখুঁত ব্যবস্থা। ফলে শ্বেতবরাহ কল্পের শ্বেতাঙ্গ-বিষ্ণু মধু আর কৈটভ উভয়কেই পিষে ফেলে মেদিনী তৈরীও করছেন, তোষণও করছেন। দুটো সবল দুরন্ত জাতকে পিষে এক করে বিদেশী শাদা-বণিকরা নিজেদের ব্যবসাটি একচেটিয়া বজায় রেখেছেন।

বার্বাডোজের সম্পূর্ণ অর্থনীতি নির্ভর করছে সমগ্র বার্বাডোজব্যাপী চিনি-শিল্পের ওপর যে চিনির একটি দানাও বার্বাডোজের কৃষকদের নয়। চিনির আনুষঙ্গিক প্রকল্প-শিল্প, যথা মোলাসেস, রম, ওয়াইন ফ্যাক্টরি-ডাইজার, শাদাল-বোতল, কাগজ কোম্পানী সবই বিদেশী লোকের নয়।

---

* এই তো বার্বাডোজ স্বাধীন হয়ে গেছে।

হাওড়া কুষ্ঠ কুটির

৭২ বৎসরের প্রাচীন এই চিকিৎসাকেন্দ্রে সর্বপ্রকার চর্মরোগ, বাতরক্ত, অসাড়তা ফুলা, একজিমা, সোরাইসিস, দূষিত ক্ষতাদি আরোগ্যের জন্য সাক্ষাতে অথবা পত্রে ব্যবস্থা লউন। প্রতিষ্ঠাতা : পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা কবিরাজ, ১নং মাধব ঘোষ লেন খুরুট, হাওড়া। শাখা : ৩৬, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯। ফোন : ৬৭-২৩৫৯

ঘর পেল বাঞ্জারা

অরুণ ঘোষ

কবে থেকে ওদের ভবঘুরে বৃত্তি চলছে তাই নিয়ে মতভেদ আছে। অনেকে বলেন, ওরা রাজপুত। মুসলমান আক্রমণ ও অত্যাচারের ভয়ে ঘর ছেড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল মহারাষ্ট্রে, মধ্যপ্রদেশে, অন্ধ্রপ্রদেশে। তারপর আর ঘর পায় নি। পালিয়ে পালিয়ে জীবন কেটেছে স্থান থেকে স্থানান্তরে। তাদের সন্তান-সন্ততি তাই পেয়েছে ভবঘুরে বৃত্তি। এক জায়গায় তারা বেশীদিন থাকতে পারে না।

বাঞ্জারাদের কথা বলছি। ভারতে নানা-ধরনের ভবঘুরে আদিবাসী আছে। বাঞ্জারা তাদের মধ্যে অন্যতম। এরা সাধারণত গরুর গাড়ীতে করে ঘুরে বেড়ায়। লবণ, রাঙ্গা-মাটি, খাদ্যশস্য ইত্যাদি বেচাকেনা করে। মেয়েদের চুল চুড়ো করে বাঁধা, পরনে ঘাঘরা, চোলি প্রায় অনাবৃত পিঠ আর প্রচুর অলঙ্কার। পুরুষের মাথায় পাগড়ি, গায়ে ফতুয়া ও ধুতি, কানে মাকড়ি। দলপতি আছে, পঞ্চায়েত আছে, সমস্ত সমস্যার সমাধানের জন্য, ঝগড়াঝাটি মেটাবার জন্য।

এমনি করেই তাদের দিন কাটছিল। গত তিনশ চারশ বছর ধরে এইভাবেই তারা জীবন নির্বাহ করছে। কিন্তু এখন তারা ঘর বাঁধছে। ভবঘুরে পেশা ছেড়ে দিয়ে মাটি-মায়ের সন্তান হচ্ছে—অর্থাৎ চাষবাসে মন দিচ্ছে।

ওদের দেখলাম মহারাষ্ট্রে, বিভিন্ন আদিবাসী গ্রামে। আদিবাসীদের পুনর্বসতি হচ্ছে। দেখলাম আকোলা জেলায়, ইয়োতমল জেলায়। তারা ঘর বেঁধেছে, জমি চাষ করছে কিংবা অন্যের জমিতে মজুর খাটছে। ওরা স্কুলে যাচ্ছে, রাস্তা বানাচ্ছে, গ্রাম পঞ্চায়েত চালাচ্ছে, ফ্যামিলি প্ল্যানিং করছে। মানে, বদলাচ্ছে। মেয়েরা রঙীন ঘাগরা ছেড়ে শাড়ী পরছে, কানের, গলার, হাতের অলঙ্কার-বাহুল্য লোপ পেয়েছে, মাথার চুড়ো অন্তর্ধান করেছে। হালকা আধুনিক খোঁপা দেখা দিয়েছে।

আর ছেলেরা ধুতি কিংবা পাজামা, ঊর্ধ্বাঙ্গে শার্ট। ওরা বদলাচ্ছে সেই সঙ্গে রঙও হারাচ্ছে। আধুনিক হওয়ার দাম দিচ্ছে। আধুনিক হওয়া মানে একাকার হওয়া, নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দেওয়া—অন্তত পোষাকে, চাল-চলনে।

ইয়োতমল জেলায় পুসাদের কাছে ছোট্ট একটা গ্রাম বস্তাপুর মানকারি। পাহাড়ের কোলে বাঞ্জারাদের পুনর্বসতি করা হয়েছে। তাদের গ্রাম, তাদের পঞ্চায়েত, তাদের ক্ষেত, তাদের স্কুল, সবই তাদের। ঘুরে ঘুরে দেখছি আর খুঁজছি কোথায় সেই বাঞ্জারা—সেই রঙীন ঘাগরা, সেই কানে মাকড়ি। এ যে সব এক, যে কোন মারাঠির মত। খুঁটিয়ে দেখলে দৈহিক বৈসাদৃশ্য চোখে পড়ে, ভাষার পার্থক্য ধরা পড়ে কিন্তু যে-কোন মারাঠির ভীড়ে ওরা মিশে যেতে পারে।

সরপঞ্চকে বললাম, কোন একটা ছোট মেয়েকে সাবেকী পোষাক, অলঙ্কার ইত্যাদি পরিয়ে নিয়ে আসুন, ছবি তুলব।

পাওয়া গেল না সেই মেয়ে। মেয়ে পাওয়া গেল কিন্তু পাওয়া গেল না হাতের চুড়ি, পাওয়া গেল না ঘাগরা। ওরা আধুনিক হয়েছে।

সবই কি হারিয়েছে আধুনিক হতে গিয়ে? তাই ভাবছিলাম। কিন্তু না। ওরা হারায়নি ওদের আসল বৈশিষ্ট্য। সরপঞ্চ বলা মাত্র ঢোলক এসে গেল। মেয়েরা এগিয়ে এসে কোমর ধরে নাচতে শুরু করল বিনা দ্বিধায়। সে গাড়ী চলি' গানের সঙ্গে সঙ্গে। ওরাই আবার ঘরে ফিরে যাইল। শহর থেকে গ্রাম পর্যন্ত স্টেট বাস চলাচল করছে। আর সেই গাড়ী বলদ বিনা চলে। অতি সাধারণ বিষয় তাদের গানে নাচে আজও প্রকাশ পায়। আজ কথায় কথায় ঢোলক বাজে, ঘুঙুরের ঝিণিঝিণি হয়, কোমর দোলে। ওরা তাহলে এখনও পুরোপুরি বদলায়নি। নাগরিকতার মোহ ওদের এখনও বৈশিষ্ট্য-চ্যুত করতে পারেনি।

বাঞ্জারা মেয়েদের পোষাক ও অলঙ্কার

পরিবর্তন যাই হোক না কেন, সবচেয়ে বড় কথা মহারাষ্ট্রে বাঞ্জারা ঘর পেয়েছে। ধীরে ধীরে ওরা এগোচ্ছে। মারাঠিদের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলছে। আজ অনেক চিকিৎসক, অনেক আইনজীবী, অনেক ব্যবসায়ী বাঞ্জারা ঘর থেকে এসেছেন। মহারাষ্ট্রের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ভি পি নায়েকও ঐ শ্রেণীর সন্তান।

রাজস্থান আজ অনেক দূর। রাজস্থান কনৌজ দূরে অস্ত। ইতিহাসের মার খাওয়া রাজস্থানীর আজ পরিচয় মারাঠি বলে।

মহারাষ্ট্রের গ্রামে গ্রামে ঘোরার সময় ওদের দেখেছি, ওদের সঙ্গে কথা বলেছি। পঞ্চায়েত নিয়ে ওদের গর্ব করতে দেখেছি। ওদের তৈরি স্কুলে গিয়েছি, ওদের তৈরি সড়কের ওপর দিয়ে আমাদের জীপ এগিয়ে গিয়েছে। তবু কেন জানি না কি যেন একটা অভাব বোধ করেছি বারে বারে। মনে হয়েছে কি যেন হারিয়ে যাচ্ছে।

পথের ধারে কোন ক্ষেতে সাবেকী পোষাকে কোন বাঞ্জারা মেয়েকে কাজ করতে দেখলেই গাড়ী থামিয়েছি, ছবি তুলেছি, কি যেন হারিয়ে যাচ্ছে তাকে ধরার চেষ্টা করেছি ক্যামেরায়।

[illegible]

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

হাজার খুঁজেও পাওয়া গেল না, কেউ কি আছো কেউ কি ছিলে?
[illegible] ঘুরেতে ঘুরেতে খামগুলি ফেরৎ এলো।
ভালবাসা ফেরৎ এলো, যাবার আনন্দ ফেরৎ এলো,
সকাল তোমার ঢুকিয়ো ঢুকিয়ো আলো আঁধার—মৃত্যু দিলে
অশোকস্তম্ভে আঁটানো যার যতটা প্রাণ
ছিল টিকিটে ভ্রমণ চেয়েও তারা এখন
ফেরৎ এলো। মানুষ লিখতে খানিকটা বোধহয় ভুল হয়েছে!
ভুল হয়নি চিনতে কবর চৌরাস্তার মোড়ে, যখন
চতুর্দিকেই রাস্তা শুধু যাবার যোগ্য বিদেশ নেই,
সেই বলেই এখন একা, একলা, ওই বদ্ধ পাষাণ
ইহজন্ম পাহারা দিচ্ছে......কেউ কি ছিলে কেউ কি আছো;

ডাকটিকিটে ভ্রমরজীবন আটকে গেছে।

হরণ ॥

অশোক চট্টোপাধ্যায়

কে তোমার সব কিছু কেড়ে নিয়ে
এমন পথিক করে দিল

নদীর ওপারে সেই পুরোনো গ্রামের মধ্যে
বহুদিন আগেকার বাড়ী
ঠিকানাবিহীন
তুমি উড়ে গেলে
তোমার রঞ্জিত সেই দিনগুলি রাত্রিগুলি
স্বপ্নের সঞ্চয়গুলি দান করে গেলে
কি গভীর দীর্ঘশ্বাসে
গভীর বিশ্রামে

গোলাপ কোটাবে বলে সুদীর্ঘিত সাধনায়
তুমি রক্তহীন হয়ে গেলে
উৎসবের আলোকিত [illegible]
মৃত্যুর আগমন
জীবনকে সৃষ্টি করে জীবনের রক্তাক্ত প্রার্থনা—
সেই গাঢ়তর আলো অলৌকিক শব্দহীন
জীবনের শ্রেষ্ঠ স্বাদ
পৃথিবীর সব চেয়ে [illegible]
তুমি কি গভীরভাবে [illegible]

তুমি কি [illegible]
[illegible] পথিক [illegible]।

পেরন সাহেবের বাড়ি

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

মুরশিদাবাদের নবাব সাহেবের নতুন রাজবাড়িটি বাদ দিলে কলকাতার বাইরে সেকালের বাংলাদেশে যে ভালো বাড়িটির কথা সেদিন প্রথমেই সজ্জনের মনে আসত সেটি আর কারো বাড়ি নয়, পেরন সাহেবের বাড়ি। এমন বাড়ি সারা ভারতবর্ষেও বোধহয় গুটি কয়েক ছিল।

সাহেবের পুরোনাম পিয়ের কুলিয়ের পেরন। পেশায় সৈনিক। হ্যাঁ, একজন সৈনিক হয়েই এদেশে এসেছিলেন তিনি। সম্ভবত সেদিনকার তারিখ হল সতেরোশ আশি সাল। সামান্য অফিসারের চাকরি। আহা উঁহু করার মতন কিছুই নয়। সে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে পরের বছর সাহেব একটি চাকরির জোগাড় করলেন। এবং সেটি গোহাড়ের রাণার চাকরি।

এ প্রসঙ্গে সেকালের ভারতের ইতিহাসটি একটু আলোচনা করা আবশ্যক। সেদিন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতি খুবই খারাপ। পূর্ব ভারতের অনেকখানিই ইংরেজদের হাতের মুঠোয় চলে গেছে। উপকূলবর্তী দক্ষিণ ভারতও তাই। দিল্লীর সম্রাট ধীরে ধীরে কলের পুতুলে পরিণত হচ্ছেন। আর যার ওপর ভরসা সেই মারাঠা শক্তি খণ্ডবিখণ্ডিত। হোলকার, সিন্ধিয়া, গাইকোয়ার, পেশোয়া সকলেই স্ব স্ব প্রধান। ঐক্যবদ্ধভাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ তৈরী করবে সে ক্ষমতাই ছিল না। তাসের ঘরের মতন এক-একটি রাজ্যপাট যেভাবে খসে পড়ছিল, সে দৃশ্য দেখে একটি অভিজ্ঞতা অন্তত এঁদের হয়েছিল, সেটি হল ইউরোপীয় যুদ্ধনীতির উৎকর্ষ সম্পর্কে নিঃসংশয়তা।

হ্যাঁ, এজন্য এঁরা নিজেদের সৈন্যবাহিনীকে আধুনিক করে গড়ে তোলায় প্রয়োজনে উঠে পড়ে লেগে গিয়েছিলেন। ইংরেজদের বিরুদ্ধেই যখন শেষপর্যন্ত লড়তে হবে তখন ইংরেজদের কাছ থেকে এ বিষয়ে সাহায্য নেওয়া যায় না। প্রতিদ্বন্দ্বী ফরাসীরা এ সুযোগে ঐ সাহায্যের জন্য হাত বাড়িয়ে দিল।

গোহাড়ের রাণার কাছে পেরন সাহেবের এ জাতীয় একটি কাজ জুটল। সৈন্য-বাহিনীর কাজ। উচ্চাকাঙ্ক্ষী পেরনকে রাণা ধরে রাখতে পারলেন না। পেরন এলেন ভরতপুরে। সাহেবের বৃহস্পতি তখন তুঙ্গী। হঠাৎ পরিচয় হয়ে গেল দ্য বোয়াগনের সঙ্গে। কাউন্ট দ্য বোয়াগনে। ফরাসী সাহেব। অনেক কীর্তিমান। বয়সের [illegible] থেকে [illegible] বছরের বড়ো। শুধু বয়সে নয়, কর্মক্ষমতাতেও পেরনের তুলনায় অন্ততঃ চারগুণ সিনিয়র। পুরো পাঁচটি বছর কেটেছিল রাশিয়ায়। এবং একদা তিনি বন্দীও হয়েছিলেন। জেলেও কেটেছিল কিছুদিন। কারাগার থেকে ছাড়া পেয়ে তিনি চলে আসেন ভারতে। আলেকজান্দ্রিয়া, কায়রো এবং সুয়েজ হয়ে তিনি এলেন মাদ্রাজে। সতেরোশ আটাত্তর সালে তিনি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সৈন্য বিভাগে যোগ দিলেন। সিক্সথ ম্যাডরাস এন-আই-তে তাঁর পোস্টিং হল। জুতের হল না বলে সে চাকরিও একদিন ছেড়ে দিলেন বোয়াগনে। ঠিক করলেন দেশের দিকেই রওনা হবেন। সব ঠিকঠাক, কিন্তু শেষপর্যন্ত যাওয়া হল না। মাধবরাও সিন্ধিয়ার কাছ থেকে ডাক এলো। তাঁর সৈন্যবাহিনীকে ইউরোপীয় কেতায় শিক্ষা দিতে হবে। মাধবরাওয়ের দেওয়া প্রস্তাবে সাহেব রাজি হয়ে গেলেন। সিন্ধিয়াও সাহেবকে খুব খাতির যত্ন করতে থাকলেন। সুতরাং বোয়াগনের কাজে মন বসল। বিস্তর মজুরি পেতেন। ধনৈশ্বর্যে ঢাকা পড়ার অবস্থা।

ঐশ্বর্যের স্বাদ পেয়ে সাহেবের আবার ব্যবসা করার ঝোঁক চাপল। একদিন সত্যি-সত্যিই চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে ব্যবসা করতে বসলেন। কিন্তু ব্যবসা জমল না। এদিকে সিন্ধিয়ার ডাকাডাকিও আছেই। তাই মঁসিয়ে বোয়াগনেকে শেষপর্যন্ত সিন্ধিয়ার চাকরিতেই আবার ফিরে আসতে হল। তবে সুযোগ পেয়ে দর কষাকষি করে মাইনে এবং প্রসার-প্রতিপত্তি দুই-ই বাড়িয়ে নিলেন।

এ যাত্রায় তিনি কিন্তু একা এলেন না। সঙ্গে একটি সাগরেদ জোগাড় করে আনলেন। আর এই সাগরেদটিই হলেন আমাদের পেরন সাহেব। পিয়ের কুলিয়ের পেরন এসে সিন্ধিয়ার কাজে যোগদান করলেন। উনিশ শতক আসতে আরো দশ বছর বাকি।

মধ্যভারতে এবং দক্ষিণদিকে সেদিন অবিরত যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগে থাকত। সতেরোশ নব্বই সালের বিশে জুন পাটানে একটি যুদ্ধ বাধল। সাহেবরা পরাক্রমের সঙ্গে যুদ্ধ করে সিন্ধিয়াকে জিতিয়ে দিলেন। কয়েক মাস পরে মেরটা নামক স্থানে আবার যুদ্ধ। এ যুদ্ধেও দ্য বোয়াগনের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ দিয়ে লড়াই করলেন পেরন। একদিকে সিন্ধিয়ার ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত নতুন বাহিনী। অন্যদিকে পাঠান, রাজপুত এবং মুঘলদের সমাবেশে বিরাট সৈন্যদল। খুব জোর লড়াই হল। কিন্তু বিজয়লক্ষ্মী শেষপর্যন্ত দ্য বোয়াগনে ও পেরনদের প্রতিই প্রসন্ন হলেন।

মাধবরাও সিন্ধিয়া এঁদের পরাক্রম দেখে ভারি খুশি। মঁশিয়ে দ্য বোয়াগনেকে তিনি তাঁর সৈন্যাধ্যক্ষের পদে উন্নীত করলেন। দ্য বোয়াগনের ডান হাত হলেন পেরন, সুতরাং তাঁর প্রসার প্রতিপত্তিও বেড়ে গেল।

পর পর ক বছর বেশ ভালোই কাটছিল। শুধু সাফল্য আর সাফল্য। ফলে এঁদের সাহসও বেড়ে গিয়েছিল খুব। একবার সিন্ধিয়া দাক্ষিণাত্যে ছিলেন না। সেই অনুপস্থিতির ফাঁকে সাহেবরা ঝগড়া বাধিয়ে বসলেন হোলকারের সঙ্গে। ঝগড়া থেকে লড়াই। তখন সেপ্টেম্বর মাস। লাখাইরি-এর যুদ্ধে হোলকারকে এঁরা হারিয়ে দিলেন। সিন্ধিয়া যখন দাক্ষিণাত্যে ফিরে এলেন, তখন তাঁকে এই অভাবিত সাফল্য উপহার দেওয়া হল। পুজোর উপহার কিনা কে জানে!

সতেরোশ চুরানব্বই সালে মাধবরাও সিন্ধিয়া পরলোকগমন করলেন। এরপর সিংহাসনে বসলো দৌলতরাও। মঁশিয়ে বোয়াগনে তখনো সক্রিয়। কিন্তু তাঁর স্বাস্থ্য খুব একটা ভালো যাচ্ছিল না। তাই পরের বছরেই তিনি সিন্ধিয়ার কাছ থেকে অবসর নিলেন। তাঁর মত যোদ্ধা সেকালে খুবই কম ছিলো। শোনা যায়, তিনি নাকি সম্রাট নেপোলিয়নকে ভারতস্থ ইংরেজদের আক্রমণ করার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন। এবং সাহায্যও করেছিলেন। —'ইট ওয়াজ অ্যালেজড দ্যাট হি অ্যাডভাইসড অ্যান্ড অ্যাসিসটেড নেপোলিয়ান বোনাপার্ট ইন হিজ ডিজাইনস এগেনসট দি ইংলিশ ইন ইণ্ডিয়া।'

যাই হোক, মঁশিয়ে দ্য বোয়াগনে ফিরে গেলেন ইউরোপে। প্রথমে ইংলণ্ডে গিয়ে উঠলেন। লণ্ডনের কাছাকাছি ছিলেন। তারপর চলে আসেন প্যারীতে। শোনা যায়, ভারতে থাকার সময় তিনি আলিগড়ে থাকতেন। পাক্কা ষোলোটি বছর তাঁর কেটে-ছিল এ শহরে। দীর্ঘকাল থাকার জন্য তিনি এ শহরে প্রায় এক নম্বর বাসিন্দা হয়ে গিয়েছিলেন।

তবে এ শহরের দু নম্বর বাসিন্দা যিনি, সেই পেরন সাহেবও দ্য বোয়াগনের থেকে কম ডাকাবুকো ছিলেন না। পাটান ও মেটরার যুদ্ধে তিনি কি প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ করেছিলেন সে কথা আগেই বিবৃত করা গেছে। সিন্ধিয়া সৈন্যবাহিনীর মনে সে শৌর্য দীর্ঘকাল গাঁথা হয়েছিল। বোয়াগনেকে বাদ দিলেও তাঁর যে আরেকটি স্বতন্ত্র বীরত্ব চিহ্ন আছে, এবার সেটি পরিস্ফুট হবার সুযোগ পেল। কনৌড় অবরোধ তাঁর জীবনের সব থেকে বড়ো কৃতিত্ব। এ লড়াইয়ে তাঁর একটি হাত উড়ে গেল।

কারণটা? সে আরেক কীর্তি। নিজামকে পরাজিত করে প্রভু দৌলতরাও-কে

জিতিয়ে দিলেন পেরন। অল্পদিনের ভেতর সিন্ধিয়া সৈন্যবাহিনীর তিনি সর্বেসর্বা হয়ে গেলেন। রাজপুতানাকে তিনি বশীভূত করলেন। আর আঠারোশ সালে লোয়ার লড়াইয়ে সিন্ধিয়ার যে জয়লাভ সে তাঁরই কৃতিত্ব। —মোটকথা পিয়ের কুলিয়ের পেরনের নাম সেদিন সকলের মুখে মুখে। তাঁর শৌর্যের গল্প সর্বত্র। নেপোলিয়ানের মত তাঁর যুদ্ধ কৌশল—এ জাতীয় কিংবদন্তীও প্রচলিত। দ্বিতীয় মারাঠা যুদ্ধের পর সম্রাট সাহ আলমকে যখন সিন্ধিয়ার কলের পুতুলে পরিণত হতে হল, তখন পেরনের শক্তি সম্পর্কে সকলে নিঃসংশয় হলেন।

গোহাড়ের রাণার কাছে কাজ করেছেন পেরন। ভরতপুরের রাজা এবং বেগম সমরুর কাছেও কাজ করেছেন। কিন্তু সিন্ধিয়া যে ঐশ্বর্য সাহেবের কাছে তুলে ধরেছিল, তার সঙ্গে কি কারো তুলনা হয়? সেকালে পেরন সাহেবের যে রুজি-রোজগার ছিল আজকের দিনে তা গল্প বলেই মনে হবে।

তাঁর পদমর্যাদার জন্য তাঁকে যে জায়গীর দেওয়া হয়েছিল, তা থেকে বছরে চল্লিশ লক্ষ টাকা করে তিনি রাজস্ব পেতেন।



বি. সরকার এণ্ড সন্স
সন অফ লেট এম. বি. সরকার
১২৪, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলিকাতা-১২, ফোন: ৩৪-২২০৭

অমৃতে অপরিবর্তিত ও অপরিহার্য পানীয়

চা

এই সব বিক্রয় কেন্দ্রে পাবেন

অলকানন্দা টি হাউস

প্রতিষ্ঠান।

শুধু এইটুকু নয়, এ ছাড়াও তাঁর আরো রোজগার ছিল। সাহেবদের ভাষায়—

> He possessed the monopoly of salt and enjoyed the extraordinary privilege of coining money: these two items alone yielding him annual revenue of Rs. 16,32,444.

অর্থাৎ, নিমক ব্যবসায়ে তিনি ছিলেন একেশ্বর এবং টাকাকে মুদ্রায় রূপায়ণও তিনি করতেন। ফলে, এ বাবদে বছরে তাঁর আয় হত ষোলো লক্ষ বত্রিশ হাজার চারশ চুয়াল্লিশ টাকা।

মোদ্দাকথা, ঋণসাপত্রে নিয়োগ করা টাকার যে সুদ পাওয়া যেত সেগুলি বাদ দিয়ে এবং জায়গীরের দরুন রাজস্বের টাকাও যদি না ধরা হয়, তা সত্ত্বেও দেখা যাবে, পেরন সাহেবের মাসিক রোজগার লাখ টাকার ওপর। এবং ঐতিহাসিকরা যে এ হিসাব দিয়েছেন তা নিতান্ত কম করে ধরে। তাহলে সব ধরে সাহেবের যে কত রোজকার হত, তার পরিমাণ কত? নাঃ, সে ফেবুলাস ওয়েলথের হিসাবে না যাওয়াই ভালো। এত টাকা যাঁর রাজস্ব, তাঁকে সেনাপতি না বলে নবাব বলাই বোধহয় শ্রেয়। বলা বাহুল্য একজন ঐতিহাসিক সে ইংগিতও দিয়ে গেছেন। পেরন সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যটি এইরকম—

> "He soon became Scindia's chief European officer and practically ruler of all the land between the Ganges, the Jumna and the Kumaon Hills".

কিন্তু অর্থের সঙ্গে নিমকহারামিরও কোথায় যেন যোগ আছে। তাই ঐশ্বর্য অর্জনের পর পেরনের চরিত্রে সেই, নিমকহারামি এবার যুক্ত হল।

আগেই বলেছি মারাঠা শক্তির সঙ্গে একদিন ইংরেজদের যে শক্তি পরীক্ষা হবে এ কথা মারাঠারাও জানত। ইউরোপীয় কেতায় সৈন্যবাহিনীকে তৈরী করার প্রয়োজন সে কারণেই এঁরা উপলব্ধি করেছিলেন। আর ইংরেজদের শত্রু ফরাসীদের বেছে নেওয়ার কারণও এখানে।

দ্বিতীয় মারাঠা যুদ্ধের পর শাহ আলম দিল্লীতে যখন বন্দীর জীবন যাপন করছেন সেই সময়ে ঐ সম্বর্ষের সম্ভাবনা তীব্র হয়ে দেখা দিল। ইংরেজরা নবাবের পক্ষ নিল। এদিকে ইংরেজ মহলায় আরেকটি গুজব ছড়িয়ে পড়ল। শোনা গেল, নেপোলিয়ন নাকি ভারতস্থ ইংরেজদের আক্রমণ করবেন বলে টিপুকে একটি চিঠি লিখেছেন। মিশর-সিরিয়া হয়ে ভারতে আসবেন তিনি।

ওয়েলেসলি এ খবর পাবার পর একটি সঙ্কল্প গ্রহণ করলেন। ভারত থেকে ফরাসীদের তাড়ানোর সঙ্কল্প। তাই এবার সকলের নজর গিয়ে পড়ল সিন্ধিয়া বাহিনী এবং তার অধিনায়ক পিয়ের কুলিয়ের পেরনের ওপর।

পিয়ের কুলিয়েরের সময় ভালোই কাটছিল। বিজয়লক্ষ্মী তাঁর প্রতি দাক্ষিণ্য দেখিয়ে আসছিলেন। কিন্তু দুগ্রহের পালা যখন এলো, তখন বিজয়লক্ষ্মী কি মুখ তুলে চান? সিন্ধিয়া বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য ইংরেজেরা সেনাপতি করে লেক সাহেবকে পাঠাল।

> ". . . Lake was directed to commence operations against the powers of Berar and Gwalior, whose chief Scindia, had in his service numerous battalions officered by Perron and other Frenchmen.

সাতই আগস্ট কানপুর থেকে যাত্রা করলেন লেক সাহেব। সিন্ধিয়া রাজ্যের সীমানায় গিয়ে পড়লেন আটাশে আগস্ট। গিয়েই ঘোষণা করলেন, সিন্ধিয়ার ইউরোপীয় অফিসাররা যদি ইচ্ছা করেন, তবে ব্রিটিশ সার্ভিসে আসতে পারেন। লেক সাহেবের এই চতুর দুরভিসন্ধি কারো আর বুঝতে বাকি রইল না। পেরনের তখন পাঁচটি ব্রিগেডে পঁয়ত্রিশ হাজার সৈন্য। এ ছাড়া আগ্রা ও আলীগড়ে পেরনের যে সুদক্ষ আর্টিলারি ছিল, তা দিয়ে যে কোনো সময়ে লেক সাহেবের আক্রমণের মোকাবিলা করা যেত।

কিন্তু মজার কথা এই, পেরন তা' করলেন না। শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য হঠাৎ কেন যে তিনি তৎপর হয়ে উঠলেন, বলা শক্ত। চতুর লেক সাহেব শান্তিপূর্ণ আলোচনার জন্য দূত পাঠালেন। কিন্তু সেই সঙ্গে ফৌজও পাঠালেন আক্রমণের জন্য। কিছু না হোক, পেরন সাহেবের হাতে তখন পনেরো হাজার সৈন্য। তারা যদি একসঙ্গে তুড়ি দিত, তাহলে সে শব্দে ইংরেজরা পালাবার পথ পেত না। কিন্তু তা হল না। কাঠের পুতুলের মতন পেরনের সৈন্যবাহিনী দাঁড়িয়ে রইল, আর ইংরেজরা সোল্লাসে দখল করে নিল আলীগড় দুর্গ। ও পক্ষ থেকে একটি গুলিও বন্দুক থেকে ছুটে এলো না।

সেদিনকার আলীগড় দুর্গে প্রভূত অস্ত্রশস্ত্র সঞ্চিত ছিল। ঐশ্বর্যও ছিল অপর্যাপ্ত। অন্ততঃ সত্তর লক্ষ টাকার মুদ্রাও ছিলই। বলা বাহুল্য, এ সবই গিয়ে পড়ল লেক সাহেবের হাতে।

এরপর যেমন যা ঘটবার তাই ঘটল। বিশ্বাসঘাতক হিসাবে পেরনের নাম সিন্ধিয়া সৈন্যবাহিনীতে ছড়িয়ে পড়ল। ক্ষোভে দুঃখে সপ্তাহখানিক পরে সিন্ধিয়া তাঁকে সেনাপতির পদ থেকে নামিয়ে দিলেন। কোনো কোনো ফরাসী জেনারেল তাঁকে খুন করার জন্য খুঁজে বেড়াতে থাকল। কিন্তু এত সত্ত্বেও পিয়ের কুলিয়ের পেরনের কোনো লজ্জা দেখা গেল না। কোনো গ্লানিই তিনি অনুভব করলেন না। বরং নির্লজ্জের মতই তিনি চলে এলেন লেক সাহেবের কাছে। তাঁর সেই ফেবুলাস ওয়েলথের অনেকখানিই তিনি সঙ্গে নিয়ে আসতে সমর্থ হলেন। একটি হাফ-কাস্ট্ বউকে তিনি নিয়ে … না। ফরাসী … একটি … ও।

কন্যা ছিল তাঁর। আসবার সময় পেরন সাহেব তাঁর ঐ পরিবার পরিজনদেরও নিয়ে এলেন।

—মঁশিয়ে কাউন্ট দ্য বোয়াগনের সঙ্গে জড়িত হয়ে সে পিয়ের কুলিয়ের পেরনের নাম একদা সিন্ধিয়া বাহিনীতে শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হত, সে নাম ঘৃণায় আর কেউ উচ্চারণ করল না। সোনার অক্ষরে লেখা বীরত্বের খ্যাতি গাঢ় কালো কালিতে লেখা হয়ে গেল।

কিন্তু পিয়ের কুলিয়ের নিজে যা চেয়েছিলেন, সে আকাঙ্ক্ষা থেকে সম্ভবতঃ তিনি বঞ্চিত হন নি। সুদূর ফরাসী দেশ থেকে তিনি এসেছিলেন ভাগ্য পরিবর্তনের আশায়। সে আশা কি তাঁর ব্যর্থ হয়েছিল? —না, ব্যর্থ হওয়াত দূরের কথা, যে অভাবিত সাফল্য তিনি অর্জন করেছিলেন তা ক'জনের ভাগ্যে জোটে?

এখন ঐ অর্জিত অর্থ নিয়ে পুত্রকলত্র-বেষ্টিত হয়ে সাহেব পরমানন্দে নবাবের মতন জীবন কাটাতে চেয়েছিলেন। এ আশা হয়ত খুব দোষের নয়, তবে তিনি যেভাবে তা চরিতার্থ করলেন, তাকে প্রশংসনীয় বলা যায় না।

যাইহোক, লেক সাহেব লোক-লস্কর দিয়ে পেরনকে পাঠিয়ে দিলেন লখনৌ। এখানে অবশ্য সাহেবকে বেশিদিন থাকতে হয় নি। নভেম্বর মাসের আট তারিখে লখনৌ ছেড়ে সাহেব চলে এলেন চন্দননগরে। শোনা যায়, তিনি কলকাতায় থাকতে চেয়েছিলেন। তারপর সুযোগ মতন চলে যেতেন ফ্রান্সে। ইংরাজরা কিন্তু সে সুযোগ দিল না। এমন কি কলকাতায় থাকায় অনুমতিও জোটে নি। তাই সাহেবকে চন্দননগরে আসতে হল। সেখানেও বেশিদিন টিকতে পারলেন না। এলেন চুঁচুড়ায়।

শহর চুঁচুড়ায় সেদিন মালিক ছিল ওলন্দাজেরা। ওলন্দাজদের কাছ থেকে তিনি অনেকখানি নিরাপত্তার আশ্বাস পেলেন। তা ছাড়া চুঁচুড়ার গঙ্গার ধারটি তাঁর ভারি পছন্দ হল। তাঁর কাছে যে বিপুল ঐশ্বর্য ছিল তারই সামান্য একটু দিয়ে তিনি একটি বিরাট প্রাসাদ তৈরী করলেন। কেউ কেউ অবশ্য বলেন, এ বাড়িটি তিনি কিনেছিলেন, তৈরী করান নি। যাই হোক, কিনলেও তিনি যে জীর্ণ বাড়িটি কিনেছিলেন, সেটি নতুন করে সংস্কার করার পর আকারে অবয়বে একবারে অন্যরকম হয়ে গেল। পেরন সাহেব যেন এটিকে তাঁর মনোমত মূর্তি দিলেন। তাই সকলের মুখে মুখে এ বাড়িটি 'পেরনের বাড়ি' বলে চিহ্নিত হতে থাকল। ইতিহাসও বলল, 'পেরন্‌স্‌ হাউস'।

ঐ 'পেরন্‌স্‌ হাউস'-এর কোল দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে গঙ্গা। স্রোতস্বিনী কল্লোলিনী ঐ নদীটিকে সাহেব কতবার দেখেছেন। যেদিন আকাশভরা জোছনা সেদিনও দেখেছেন। আবার যেদিন নিবিড় বর্ষায় নদী স্ফীত হয়ে উঠেছে, সেই জল বাদরের অন্ধকার রাতে কুলনাশিনী মূর্তিও দেখেছেন। এ সব দেখে সাহেবের মনে কোনো অনুশোচনা দেখা দিয়েছিল কি না জানা যায় না। কেননা নদীর প্রবাহে কান পেতে রাখলে নাকি কালের পদধ্বনি শোনা যায়। নাঃ, সাহেব সে সব শুনতে পেয়েছিলেন কিনা বলা শক্ত। তবে ফরাসী দেশের জন্য তাঁর মন যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল, তার প্রমাণ আছে। তা ছাড়া এ বাড়িতে থাকার সময় দুটি ঘটনা ঘটে। তাঁর প্রথম পক্ষের স্ত্রী এই বাড়িতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। চন্দননগরে নিয়ে গিয়ে তাঁকে সমাহিত করা হয়। আর এই বাড়িতেই তাঁর একটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। পেরন এই শিশুটির নাম দেন যোসেফ ফ্রাসোয়া রেনে। পুত্রসন্তানের মুখ দেখে পিয়ের কুলিয়ের পেরন হয়ত উল্লসিত হয়েছিলেন, কিন্তু তার চেয়েও তিনি হাজার গুণ ভেঙে পড়েছিলেন স্ত্রীর মৃত্যুতে। তাঁর অনেক সুখ-দুঃখের সাথী ছিল তাঁর ঐ স্ত্রী।

প্রায় দু' বছর এ বাড়িতে কাটালেন সাহেব। তারপর আকস্মিক ভাবেই একদিন এদেশ ছেড়ে চলে যাবার অনুমতি পেলেন। জন্মভূমি ফ্রান্সে ফিরে যেতে পারবেন জেনে তাঁর মন আনন্দে নেচে উঠল। সেবার আঠারোশ পাঁচ সাল। বসন্তকাল সবে শেষ হতে চলেছে। ফুলে ফুলে ভ্রমরের গুঞ্জন-ধ্বনি তখনো ক্ষান্ত হয় নি। সৈনিক পেরন সাহেবের মনও ভ্রমরের মত খুশিতে গুন গুন করে উঠল।

ইতিমধ্যে তিনি আটাশ লক্ষ পাউণ্ড ইস্ট ইণ্ডিয়া কোমপানির স্টকে নিয়োগ করলেন। আর এখানকার এস্‌ট্যাব্‌লিশমেন্ট চটপট করে যাতে গুটিয়ে ফেলা যায় তার চেষ্টা করতে লেগে গেলেন। অক্টোবরের দশ তারিখে 'ক্যালকাটা গেজেটে' একটি বাড়ি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হল। সে বাড়ির বর্ণনায় লেখা হল—'দি হাউস অ্যাট চিনসুরা, সাউ নিয়ারলি ফিনিশ্‌ড, বিল্‌ট্‌ বাই অরডার অব জেনারেল পেরন, লিভিং ফর ইউরোপ।'

জেনারেল পেরন দেশে ফিরে যাচ্ছেন। সাহেবের আদেশে শহর চুঁচুড়ায় যে বাড়িটি তৈরী হচ্ছিল, সেটি প্রায়-সমাপ্ত। সে বাড়িটি বিক্রয় হবে।

এ থেকে অন্ততঃ একটা খবর মিলছে। দু' বছর ধরে মিস্ত্রীর লাগিয়েও মঁশিয়ে পিয়ের কুলিয়ের তাঁর বাড়িটিকে শেষ করতে পারেন নি। সুতরাং সে বাড়ি যে মুর্শিদাবাদের নবাবের সমতুল্য বাড়ি হবে, তাতে আর আশ্চর্য কি।

যাইহোক, আঠারোশ ছ' সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিকেই সাহেব ইউরোপ পাড়ি দিলেন। যাবার সময় এই বাঙলাদেশের জন্য তিনি যে স্মৃতি রেখে গেলেন, তা হল ঐ বাড়িটি। বাড়িখানি কত মূল্যে যে বিক্রি হয়েছিল, সে সম্পর্কে সুনিশ্চিতভাবে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তবে এটুকু জানা যায় যে, ঐ বাড়িটি কিনেছিলেন যিনি, তিনি হলেন একজন বিখ্যাত জমিদার। সেকালে এক ডাকে যাঁর নাম জানত, সেই প্রাণকৃষ্ণ হালদার।

প্রাণকৃষ্ণ হালদার প্রকৃতই একজন ধনী লোক ছিলেন। সেই সঙ্গে খরচেও ছিলেন। তা ছাড়া পেরন সাহেবের নবাবিআনা চোখের ওপর তিনি দেখেছিলেন। এখন পেরনের বাড়িটি কেনার পর সাহেবের বিলাসিতা তাঁকে চেপে বসল। সাহেব গেলেন বটে, কিন্তু সাহেবের ভূত গেল না। তাই পেরনের বাড়িটিকে নিয়ে এক বিপর্যয় ঘেঁষে গেল।

তাঁর এ বাড়িতে প্রায়শই একটা-না-একটা অনুষ্ঠান লাগিয়ে রাখতেন। প্রচুর খানাপিনা চলত। আর সেই সঙ্গে আসত সেকালের বাঈজীরা। নাচে-গানে ভারি হয়ে উঠত পেরন সাহেবের বাড়ির বাতাস। সম্ভবতঃ সাহেবরাও এ সব অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হতেন। নচ্‌-গার্লদের নাচ দেখে, তরল পানপাত্রে চুমুক দিয়ে তাঁরা খুব খুশি মনেই পেরন সাহেবের নাম করতে করতে বেরিয়ে আসতেন। সেদিন এ প্রাসাদে চিরবসন্ত।

এ সব ঐশ্বর্য আড়ম্বরের খবর চুঁচুড়া শহরেই কেবল সীমায়িত থাকত না। রাজধানী কলকাতাতেও গিয়ে পৌঁছুত। পেরন সাহেবের মস্ত বাড়ির পূর্বদিকে ছিল হালদার মশায়ের চণ্ডীমণ্ডপ। সেখানে যেভাবে দুর্গাপুজো করা হত, তার বিবরণ ফলাও করে কাগজে কাগজে প্রকাশিত হত।

শয্যাদ্রব্যের জন্য
PHONE: 24-4328
ANANTA
CHARAN MULLICK & CO.
167/4, DHARAMTOLLA ST., CALCUTTA-13

দূরদূরান্ত থেকে দলে দলে লোক আসত প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বাড়িতে পুজো দেখতে।

কিন্তু পেরন সাহেবের বাড়িতে নির্বিঘ্নে বাস করা বোধ হয় একটু কঠিন। কেননা, যে শয়তান সাহেবকে কালো-ভূতের আচ্ছন্ন করেছিল সে তখনো সাহেবের বাড়িতে বর্তমান। সুতরাং হালদার মশাইকে কি সে শয়তান অত সহজে ছেড়ে দেয়?

হঠাৎ একদিন সেই দুর্ঘটনাটি ঘটে গেল। কারেন্সি নোট এবং কোম্পানির কাগজ জাল করার অপরাধে তিনি ধৃত হলেন। শোনা যায়, ঐ ঐশ্বর্য আড়ম্বরের পিছনে নাকি মদত জুগিয়েছিল ঐ জাল করার কলাও কারবার। শুধু তিনি নন, তাঁর ভাই নীলমণি হালদারও এ ব্যাপারে ধরা পড়লেন। নীলমণি হালদার ছিলেন কলকাতার অধিবাসী। হেঁজিপেঁজি নয়, নামকরা বাসিন্দা। তাঁর নামে কলকাতায় একটি পথও আছে। সহোদরের সহায়তাকারী বলে এ বেচারিকেও ধরা হল।

এরপর চলল মামলা-মোকদ্দমা। জলের মতন টাকাপয়সা খরচ হতে থাকল। পুঁজি-পাটা যখন ফুরোল তখন বাধ্য হয়েই টাকা ধার করতে বেরোতে হল। প্রাণকৃষ্ণ হালদার আরেকজন প্রাণকৃষ্ণের কাছ থেকে টাকা ধার করলেন। নাম এক হলেও ইনি উপাধিতে শীল। সেকালের কলকাতায় এবং চুঁচুড়া অঞ্চলে শীলদের খুবই অর্থ-খ্যাতি ছিল। প্রাণকৃষ্ণ হালদার নগদ সাঁইত্রিশ হাজার টাকা ধার নিলেন। বাঁধা দিলেন পেরন সাহেবের বাড়ি।

বিচারে হালদার ভ্রাতৃদ্বয় অভিযুক্ত হলেন। এবং এঁদের জন্য দীর্ঘ কারাবাসের আদেশ হল। পেরন সাহেবের বাড়িতে বোধ হয় সেদিন অন্ধকার নেমে এলো। আর সেই শয়তানটা নিশ্চয় অট্টহাস্যে হেসে উঠল।

আঠারোশ চৌত্রিশ সালে শীলেরা এবার মামলা নিয়ে এলো। ঋণশোধ না করার দায়ে বাড়ি দখল নেবার মামলা। প্রাণকৃষ্ণের ভাইপো বিশ্বম্ভর শীল ষোলো হাজার পাঁচশ টাকায় "পেরন সাহেবের বাড়ি"র ডিক্রি পেলেন—এবার বাড়ি চলে গেল শীলদের হাতে।

না, শীলেরা এ বাড়িতে বাস করতে চাননি। তাই খুব একটা বিভ্রাটে তাদের পড়তে হল না। সেদিনকার চুঁচুড়া শহরে নতুন একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ চলছে। সিভিল সারজেন্ট ডাঃ ওয়াইজ এর উদ্যোক্তা। হাজী মহম্মদ মহসীনের ট্রাস্ট ফান্ডের টাকা অযথাভাবে খরচ হচ্ছে দেখে তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। ইংলিশ এডুকেশনের জন্য একটি কলেজ খুললেন তিনি। কিন্তু কলেজ হবে কোথায়? সব থেকে বড়ো বাড়ি কোনটি? না, ডাঃ ওয়াইজের ভুল হয়নি। তিনি পেরন সাহেবের বাড়িটিই বেছে নিলেন। আঠারোশ ছত্রিশ সালের পয়লা আগস্ট কলেজ খোলা হল।

কিন্তু কলেজ যখন খোলা হল তখন বাড়িটি ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। পাকাপাকিভাবে যাতে কলেজ করা যায়, সেজন্য এবার কেনার চেষ্টা চলল। শীলেরাও বিক্রয় করতে ইচ্ছুক, কিন্তু একটার পর একটা বাধা আসতে লাগল। প্রাণকৃষ্ণের পুত্র নবকৃষ্ণ (না, নবীনচন্দ্র?) হালদারও আপত্তি তুলল। জেলখানা থেকে প্রাণকৃষ্ণ হালদার স্বয়ং এ বাড়ির প্রতি তাঁর দাবী জানালেন। ফলে, সে এক রীতিমত বিভ্রাট বেধে গেল। সবপক্ষকে বশীভূত করতে গেলে টাকার দরকার। সুতরাং অতিরিক্ত দাম দিয়ে ঐ বাড়িটি কেনা কি ঠিক হবে? ডাঃ ওয়াইজ থেকে সাদারল্যান্ড সবাই পিছু হটতে লাগলেন।

কিন্তু একটি মানুষ এই বাড়িটির অসাধারণ গুরুত্বের কথা সম্যকরূপে উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং লর্ড মেকলে। আধুনিক ইংরেজী শিক্ষার তিনিই হলেন রূপকার। সাদারল্যান্ডের সকল সংশয়কে উপেক্ষা করে তিনি গোপনে ডাঃ ওয়াইজকে লিখলেন,

> "I can not agree with Mr. Sutherland. I would give the 30,000 rupees at once and obtain the house. If we should find the house will do for our college, we shall save ten times 30,000 rupees, for we shall not build a new one for less than three lacs. . . ."

অর্থাৎ, আমি মিঃ সাদারল্যান্ডের সঙ্গে একমত নই। আমি এখনই তিরিশ হাজার টাকা দিয়ে দিচ্ছি, বাড়িটা জোগাড় করো। আমরা যদি বাড়িটি জোগাড় করতে পারি তবে সত্যি-সত্যিই কলেজের উপকার হবে। আমরা তিরিশ হাজারের দশ গুণ টাকা বাঁচাতে পারব। কেননা, তিন লাখ টাকার নীচে আমরা নতুন কলেজ বাড়ি তৈরী করতেই পারব না।...

না, মেকলের আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ হয়নি! শীল ও হালদারদের বিরোধ মিটে গেল। তদানীন্তন সরকার বিশ হাজার টাকা দিয়ে বাড়িটি কিনে ফেললেন। বিক্রেতার নাম, জগমোহন শীল। পেরন সাহেবের বাড়িতে পাকাপাকিভাবেই কলেজ বসে গেল। এবং বাংলা দেশের ইতিহাসে চিরকালের জন্য অমর হয়ে রইল পেরনের নাম।

এ সব যখন ঘটে পেরন সাহেব তখন আর মর্তলোকে ছিলেন না। হালদারদের কাছ থেকে শীলেদের হাতে যখন বাড়িটি আসে সেই আঠারোশ চৌত্রিশ সালে তাঁর দেহান্তর ঘটে। যে অখ্যাতির কালিমায় তিনি লিপ্ত ছিলেন, তাতে তাঁর মৃত্যুসংবাদ এদেশে পৌঁছে দেবার জন্য কেউই সম্ভবতঃ উৎসাহী ছিলেন না।

এদেশ থেকে তিনি যে ঐশ্বর্য বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন তা রীতিমত বিপুল। সেখানে গিয়ে তিনি বিখ্যাত প্রাসাদ 'স্যাটো দ্য ফ্রসেজ" ক্রয় করেন। এবং ছাব্বিশ বছর তিনি বেঁচেছিলেন। নেপোলিয়নের সঙ্গে তিনি দেখা করতে গিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যে নেপোলিয়ন তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। সেকালের ঐতিহাসিকেরা তাঁর সম্পর্কে লিখেছিল—

> "He returns to France to exhibit as a trophy of his infamy and the millions he stole from the miserable Scindia whom he betrayed".

অর্থাৎ বেচারি সিন্ধিয়ার কাছ থেকে মণিমুক্ত চুরি করে এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে সাহেব কালামুখ দেখাবার জন্যই বোধ হয় ফ্রান্সে এসেছিলেন।

কিন্তু এতদসত্ত্বেও পেরন সাহেবের বোধহয় একটি সান্ত্বনা ছিল। নেপোলিয়ন তাঁর সঙ্গে দেখা না করলেও, তাঁর একজন 'ফেমাস মার্শালের' কন্যাকে তাঁর ছেলে বিয়ে করতে সমর্থ হয়েছিল। চুঁচুড়া শহরের পেরন বাড়িতে সেই যে ছেলেটি জন্মেছিল সেই মেনেফ। ডিউক অব্ রেগিওর কন্যা ক্যারোলিনকে সে বউ করে এনেছিল স্যাটো দ্য ফ্রসেজে। নেপোলিয়ন সেদিন সম্রাট হিসাবে ফ্রান্সে ছিলেন না। তা না হলে কি ঘটত কে জানে?

তবে ভারতবর্ষ কিন্তু পিয়ের কুলিয়ের পেরনকে অতখানি আঘাত দেয়নি। বরং তাঁকে একটু বেশি খাতিরই দেখিয়েছে। বাংলাদেশ তাঁর বাড়িটিকে নিয়ে মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু মধ্যভারত? যে জনপদে তাঁর খ্যাতি-অখ্যাতির উল্লেখিত দিনগুলি কেটেছে, তারা কি পেরনের মুখে কালি ছিটিয়ে দিয়েছে?—হয়ত দিয়েছে! কিন্তু তার বাড়িটির প্রতি অন্ততঃ অবহেলা করেনি।— আলীগড়ে পেরন সাহেবের বাড়িটিতে তৈরী হয়েছে সরকারী বিদ্যালয়। মহাবিদ্যালয় নয়, বিশ্ববিদ্যালয়। [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়।

বিনা অস্ত্রোপচারে
অর্শ থেকে
আরাম পাবার
জন্য
হ্যাডেনসা
ব্যবহার করুন।



(১)

বাঙ্গালা ১১৭২ সাল। ২৮-এ পৌষের সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। রজনীর অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিয়াছে। যশোহরের তিন চার ক্রোশ উত্তরে একটি মাঠের মধ্য দিয়া তিনটি লোক হন্ হন্ করিয়া দক্ষিণ মুখে যাইতেছে। সহসা তাহারা সম্মুখে কিছু দূরে ব্যাঘ্রের গর্জন শুনিতে পাইল। লোক তিনটি মাঠের পথ ছাড়িয়ে উর্ধ্বশ্বাসে পশ্চিমদিকের গ্রামে প্রবেশ করিল। ইচ্ছা, রাত্রির জন্য গ্রামের কোনও বাটিতে আশ্রয় লইবে।

এই তিনটি লোকের মধ্যে অগ্রবর্তী ব্যক্তি ব্রাহ্মণ; নাম চণ্ডীচরণ চক্রবর্তী। পশ্চাতের দুই টি লোক হিন্দুস্থানী; নাম রামশরণ ও রঘুবীর সিং। ইহারা গ্রামে প্রবেশ করিয়াই প্রথমতঃ কয়েকটি দরিদ্র মুসলমানের বাড়ী দেখিতে পাইল, এবং এক বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া চণ্ডীচরণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "নিকটে কোন হিন্দুর বাড়ী আছে কি না?" একজন মুসলমান উত্তর করিল, "সম্মুখে কিছু দূর গেলেই একটি সম্পত্তিপন্ন বণিকের বাড়ী পাওয়া যাইবে।" চণ্ডীচরণের অনুরোধে মুসলমানটি তাহাদিগকে মধু বণিকের বাড়ী দেখাইয়া দিতে সম্মত হইল। বণিকের নাম মধু। গ্রামে সে মধু বেনে বলিয়া পরিচিত।

পথে যাইতে যাইতে মুসলমান কহিল, "আপনাদিগকে লইয়া চলিলাম বটে, কিন্তু মধু বেনের বাড়ীতে যে আপনাদিগকে জায়গা দিবে, তার তত ভরসা নাই। বণিকের পয়সা খুব আছে। দু পাঁচ গ্রামের মধ্যে ওর টাকা না ধারে, এমন লোক কম। কিন্তু খরচের হাত একেবারেই ছোট। ভগবান বসুর বাড়ী গেলে আপনারা নিশ্চয়ই যায়গা পেতেন কিন্তু সে আরও খানিকটা পশ্চিমে যেতে হয়। তাঁর পয়সা বেশী না থাক, দু-চারি জন লোক গেলে তা ফেরত যাবার কথা নাই।" চণ্ডীচরণ কহিলেন, "আমরা একটু থাকবার যায়গা পেলেই যথেষ্ট মনে করিব।" মুসলমান তাহাদিগকে মধুর দরজার পঁহুছাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

চণ্ডীচরণ দেখিলেন, মধুর বাড়ীটি ক্ষুদ্র নহে। বাহিরে কাঁচা ঘর, ভিতরে এক-তলা দালান। বাহিরের ঘরে একটি মাটির প্রদীপ জ্বলিতেছে। গৃহস্বামী একটি [illegible]

তাহাদের মধ্যে কথা হইতেছে। মধুর বাড়ীতে কিছু বেশী তামাক জন্মিয়াছিল, তিনি হুকুম দিয়াছেন, ঐ তামাক খাইয়া বাড়ীর খরচ চলিবে। চাকরটি সেই তামাক মাখিয়া কর্তাকে নমুনা দেখাইতেছে, এবং বলিতেছে, কেনা তামাক কিছু না মিশাইলে এ খাওয়া যাইবে না। মধু বলিতেছে "আমি খেতে পারি, আর তোর মুখে রোচে না?"

চণ্ডীচরণ এত কথা শুনিতে পান নাই। মধু যখন গরম হইয়া ভৃত্যকে তিরস্কার করিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে ব্রাহ্মণ এবং তাহার সঙ্গীদ্বয় বণিকের বাহিরের ঘরের দাওয়ার উঠিলেন। মধু তাহাদের পদ শব্দ পাইয়া "কে কে!" বলিয়া রুক্ষস্বরে প্রশ্ন করিল।

চণ্ডীচরণ কহিলেন, "ব্রাহ্মণ, রাত্রে থাকবার জন্য একটু স্থান চাই।"

"এখানে থাকবার স্থান হবে না।" মধুর স্বর আরও কর্কশ হইয়া উঠিল।

চণ্ডী। এ রাত্রে যাই কোথা? আমরা যাচ্ছিলাম যশোরে। ১৬ ক্রোশ রাস্তা হেঁটে এসেছি। আজই যাব ঠিক করেছিলাম। পথে বাঘের ডাক শুনে রাস্তা ছেড়ে গ্রামে ঢুকেছি। আমরা কেবল একটু থাকবার যায়গা চাই।

মধু। যায়গা টায়গা হবে না। অন্যত্র দেখুন।

চণ্ডী। এখন কোথায় যাই? গ্রামের কাকেও চিনি না। পথে বের হয়ে বাঘের হাতে মরব?

মধু। ঠাকুর! আর কতবার বলব?

মধু এই সময়ে চণ্ডীচরণের সঙ্গী দুটির প্রতি এক বক্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

চণ্ডীচরণ কহিলেন, "ইহারা হিন্দুস্থানী। আমরা মনিবের চাকর। লাটের কিস্তির খজনা দিতে যাচ্ছি। এদের কাছে হাজার বার শ' টাকা আছে।"

মধু। টাকা আপনার ন' শ' পঞ্চাশ থাক, আর দু' হাজার থাক,—সঙ্গেই আছে। আমার এখানে থাকা হচ্ছে না।

চণ্ডী। আপনার ঘর-দোর আছে—ঘরে লক্ষ্মী রয়েছেন। তিনটি অতিথিকে যায়গা দিতে এত কুণ্ঠিত হচ্ছেন? আমরা এই বাহিরের ঘরটায় পড়ে থাকব।

মধু। কড়া কথা না শুনলে আপনারা নড়বেন না। বলছি যে, বিদেশী লোককে আমি কখনও যায়গা দিই না।

চণ্ডী। স্বদেশী লোক হ'লে আর এমন ভাব আসবে কেন?

মধু। আপনার কথার ত বেশ বাঁধুনী আছে।

চণ্ডীচরণ বেগতিক দেখিয়া কহিলেন, "আমরা কোথায় গেলে রাত্রের জন্যে একটু যায়গা পাই বলতে পারেন?"

প্রশ্ন করিবার সময়ে চণ্ডীচরণ মধুর ভৃত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।

মধু উত্তর দিবার পূর্বেই ভৃত্যটি কহিল, "মশাই ভগবান বোসের বাড়ীতে যান, নিশ্চয় যায়গা পাবেন।

চণ্ডী। পথ ত চিনি না, আর এই রাত্রি।

মধুর চাকর মহেশ বলিল, "চলুন, আমি আপনাদিগকে নিয়ে আসিতেছি।"

মধু এ

করিলেন না।

পথে বাহির হইয়া চাকরটি কহিল, "এমন বাড়ীতে মানুষ আসে? কি করিব? কতকগুলি টাকা ধারি। সুদের সঙ্গে তার সুদ দিতে দিতে শোধ হয় না। গায়ে খেটে শোধ করছি। এমন চামারের ব্যবহার আর দেখি নাই। অল্প টাকা? কত লোকের গয়নাপত্র, থালা বাসন বাঁধা রেখে রেখে শেষে বেচে নিয়েছে। এখনও কত ঘরে মজুত আছে। হাত পাততেই শিখেছে;—উপুড় করতে আর শেখে নাই। চলুন ভগবান বোসের বাড়ী। টাকা-কড়ি বেশী নাই সত্য, মধ্যে মধ্যে এই বেনের টাকাও কর্জ করেন;—কিন্তু মন কত বড়। গঙ্গাস্নানের যাত্রী—ব্যারাম হয়ে পথে পড়ে আছে। খবর পেলেই বসু মহাশয় তাকে তুলে এনে বাড়ীর লোকের মতন তার সেবা করেন। অতিথ ফকীর বৈষ্ণব গেলে যেমন সাধ্য দেবেনই দেবেন। মুখের কথা শুনেই লোকে তুষ্ট।"

চণ্ডীচরণ কেবল সায় দিতেছিলেন। বণিকের ব্যবহারেই তাঁহার মনে হইতেছিল। তিনি এমন লোক অতি অল্পই দেখিয়াছেন। ভগবানের প্রশংসায় বিশ্বাসস্থাপন করিতেও যেন তাঁহার প্রবৃত্তি হইতেছিল না। সহসা মহেশ কহিয়া উঠিল, "এই সামনে বসু মহাশয়ের বাড়ী।"

তাঁহারা দেখিলেন, বাহিরের ঘরে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। কিন্তু তথায় কোন লোক নাই। মহেশ "কর্তা বাড়ী আছেন?" বলিয়া ডাকিতেই ভগবান বাড়ীর ভিতর হইতে আসিলেন। ভগবানের মুখ প্রফুল্ল নহে। চণ্ডীচরণের মনে আশঙ্কার উদয় হইল। তিনি কোন প্রশ্নের অপেক্ষা না করিয়াই অতিশয় ব্যগ্রতার সহিত তাঁহাদের গ্রামে আগমনের কারণ ও বণিকের ব্যবহার সংক্ষেপে বিবৃত করিলেন। ভগবানের গুণ-কীর্তন জ্ঞাপন করিতেও ভুলিলেন না। ভগবান "আপনি ব্রাহ্মণ, প্রাতঃপ্রণাম, বসুন" এই কথা বলিয়া বসিবার আসন দেখাইয়া দিয়া বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

চণ্ডীচরণ আশ্বস্ত হইলেন। মধু বণিকের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া তাঁহার যেমন মনে হইতেছিল যে, এমন গ্রামে আসা আর বাঘের মুখে যাওয়া প্রায় একই কথা, সেই ভাবটা মন হইতে অনেকটা দূরে হইল।

(২)

কিয়ৎকাল পরেই একটি ভৃত্য পা ধুইবার জল তামাকু আনিয়া দিল। চণ্ডীচরণের পাকে দুইটি হিন্দুস্থানী খাইবে কি না জিজ্ঞাসা করিয়া লোকটি দুইটি রন্ধনের স্থান পরিষ্কৃত করিতে লাগিল। চণ্ডীচরণ নিকটস্থ একটি পুষ্করিণীর ঘাটে মুখ-হাত ধুইয়া এবং সন্ধ্যা পড়িয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, রন্ধনের সমস্ত প্রস্তুত। গৃহস্বামীকে আর একবারও দেখিতে না পাইয়া চণ্ডীচরণের মনে কেমন কেমন বোধ হইল, কিন্তু তিনি তৎসম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করিতে সাহসী হইলেন না। জঠরানল বড়ই জ্বলিতেছিল, রন্ধন পাক উঠাইয়া দিলেন।

সহসা গৃহস্বামী চণ্ডীচরণের রন্ধন-গৃহের সম্মুখে আসিয়া চাকরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রন্ধনের সমস্ত উদ্যোগ হইয়াছে কিনা। ভৃত্য হাঁ বলিয়া উত্তর করিলে ভগবান একবার ভিতরে দৃষ্টিপাত করিলেন, এবং কোন কথা না কহিয়াই পুনরায় বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন। ভৃত্যও তাঁহার পশ্চাদ্‌গামী হইল।

কিছুকাল পরেই একটি লোক চণ্ডীচরণের সম্মুখ দিয়া বাটীর ভিতর হইতে বাহিরে আসিলেন। তাহার পরিচ্ছদ দেখিয়া চণ্ডীচরণ বুঝিতে পারিলেন যে, লোকটি হয় অন্য স্থান হইতে আসিয়াছেন, নয় অন্যত্র যাইবেন। তিনি বাহিরের ঘরে প্রবেশ করিয়া চাকরকে ডাকিয়া তামাকু চাহিলেন। চণ্ডীচরণও এই সময়ে তামাকু খাইতে বাহিরের ঘরে প্রবেশ করিলেন। চণ্ডীচরণও এই লোকটিকে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিলেন, "আমি কবিরাজ।"

চণ্ডীচরণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই বাড়ীতে কাহারও অসুখ আছে কি?"

কবিরাজ। আজ্ঞা হাঁ, ভগবান বসু মহাশয়ের একমাত্র কন্যা, তাহারই অসুখ। পীড়ার অবস্থা খুবই খারাপ। আজ বৈকাল থেকে আমি এখানে আছি। রাত্রিতে কি হয় বলা যায় না।

চণ্ডীচরণ আরও দু' চারটি প্রশ্ন করিয়া রোগের অবস্থা অনেকটা বুঝিয়া লইলেন। কবিরাজ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়া শেষে কহিলেন, "মহাশয়! মনে হইতেছে যেন আমার নিজের সন্তানের অসুখ হইয়াছে। বসু মহাশয়ের ন্যায় এমন সাধুপ্রকৃতি পরোপকারী লোক এ অঞ্চলে নাই বলিলেও চলে। এই একমাত্র পাঁচ বৎসরের কন্যাই বসুজার ও তাঁহার গৃহিণীর সংসারের অবলম্বন। ভগবান আছেন—এর চেয়ে খারাপ অবস্থা হয়েও ত দু'চারটি রোগীকে বাঁচতে দেখেছি।"

সমস্ত শুনিয়া চণ্ডীচরণের প্রাণ ভগবানের প্রতি ভক্তি ও সহানুভূতিতে ভরিয়া গেল। তিনি ভাবিলেন, এমন লোক রাস্তা থেকে ওলাউঠার রোগী কুড়াইয়া আনিবে, ইহা বিচিত্র নয়। তাঁহার মনে হইল, মধু বণিকের ন্যায় লোক যেমন তিনি অল্প দেখিয়াছেন, তেমনই ভগবান বসুর ন্যায় লোকও বোধহয় তিনি দেখেনই নাই।

কবিরাজের কথা শেষ হইলে চণ্ডীচরণ মুহূর্তমধ্যে এইরূপ চিন্তা করিয়া প্রাণের আবেগে বলিয়া উঠিলেন, "ভগবান ত আছেনই; তিনি এ বালিকাকে অবশ্যই বাঁচাইবেন।"

চণ্ডীচরণ যে ক্ষুদ্র গৃহে পাক করিতেছিল, উহা অতিথির নিমিত্ত নির্দিষ্ট রন্ধনশালা, অন্দর হইতে বাহিরের ঘরে আসিবার পথে। ভগবান পুনরায় কন্যাকে ছাড়িয়া তথায় আসিয়াছেন, এবং চণ্ডীচরণকে দেখিতে না পাইয়া চাকরকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, "ঠাকুরটি কোথায় গেলেন? তাঁর ভাত বুঝি নষ্ট হয়ে গেল।"

চণ্ডীচরণ হুঁকা ছাড়িয়া রন্ধনগৃহের দিকে আসিলেন। ভগবানের কাতর মুখ দেখিয়া তাঁহার প্রাণের আবেগ বর্ধিত হইল। তিনি কহিলেন, "আমি সমস্তই শুনিয়াছি। আপনি নিশ্চিন্ত হউন, আপনার কন্যা নিশ্চয়ই আরোগ্য লাভ করিবে। ভগবান আপনাকে কষ্ট দিবেন না। আমি একবার কন্যাটিকে দেখিতে চাই।"

ভগবান কহিলেন, "আপনি আহার করুন, তার পর দেখিবেন।"

(৩)

আহারান্তে চণ্ডীচরণ বাটীর ভিতরে গেলেন। বাড়ীর আত্মীয়ের ন্যায় তিনি একেবারে রোগিণীর শয্যাপার্শ্বে নীত হইলেন। চণ্ডীচরণ দেখিলেন, পীড়ার অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক বটে। ২১ দিনের জ্বরে কন্যাটি কঙ্কালসার হইয়াছে। এখন কঠিন বিকারের অবস্থা। বালিকা প্রলাপ বকিতেছে। তাহার মুখ ও চক্ষের অবস্থা ভীতিজনক।

ভগবানের গৃহিণী চণ্ডীচরণের শুইবার বিছানা একটি চাকরের নিকট দিতেছিলেন। চণ্ডীচরণ আসিতেছেন দেখিয়া তিনি গৃহ হইতে বাহির হইয়া যান।

ব্রাহ্মণ ঘরে আসিলেই তিনি বারান্ডায় আসিয়া দাঁড়াইলেন, এবং তিনি কন্যাটিকে দেখিতে পান—অথচ তাঁহাকে গৃহস্থিত কেহ দেখিতে না পায়, এমন স্থানে রহিলেন। সহসা দুহিতার দু' একটি অসম্বন্ধ বাক্য শুনিয়া তাঁহার লজ্জার বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি ফুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

চণ্ডীচরণ সহজেই বুঝিতে পারিলেন, বালিকার মাতাই এ ক্রন্দন করিতেছেন। ব্রাহ্মণের সহানুভূতি শতগুণ বর্ধিত হইল। ভগবানের অশ্রুসিক্ত চক্ষুর প্রতি দৃষ্টি করিয়া তিনি আর হৃদয়ের আবেগ সংবরণ করিতে পারিলেন না। অন্তঃকরণের অন্তস্তল হইতে অতিশয় দৃঢ়তার সহিত কহিয়া উঠিলেন, "আপনারা কাঁদিবেন না। আমি সর্বান্তকরণে আশীর্বাদ করিতেছি,—এই কন্যা আরোগ্য লাভ করিবে। যদি আমি ব্রাহ্মণ হই, আমার আশীর্বাদ সফল হইবে; এ বালিকা বাঁচিবেই বাঁচিবে।"

চণ্ডীচরণ কোন্ সাহসে এত বড় কথাটি বলিয়া ফেলিলেন, তাহা আমরা বুঝাইয়া দিতে পারিব না। এই পর্যন্ত বলিতে পারি যে, মানুষের ভক্তি ভালবাসা কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি বৃত্তিনিচয় পবিত্র ও অকৃত্রিম আবেগময় হইলে অনেক সময়ে তাহা পার্থিব অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখে না, যুক্তি-তর্কের ধার ধারে না, এবং অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলে।

গৃহস্বামী অতিথি ব্রাহ্মণের মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার কথা কয়েকটি ভগবানের হৃদয়ে যেন বিদ্যুতের ন্যায় কার্য করিল। চিন্তা ও আশঙ্কার তিমির অপসৃত হইয়া সহসা তথায় আশার আলো জ্বলিয়া উঠিল। তিনিও প্রাণের আবেগে কহিয়া উঠিলেন, "ব্রাহ্মণের মুখ দিয়া যখন এমন কথা বাহির হইয়াছে, তখন আমার কন্যা অবশ্যই বাঁচিবে।" চণ্ডীচরণের দিকে দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, "আপনি এই বালিকাকে বাঁচাইতেই আমার বাড়ীতে পদধূলি দিয়াছেন।"

ভগবান নত হইয়া ব্রাহ্মণের পদধূলি গ্রহণ করিয়া নিজের ও কন্যার মস্তকে লেপন করিতে লাগিলেন। স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "ঘরে এস, লজ্জা নাই; ঠাকুরকে, প্রণাম কর,—পদধূলি নাও।"

গৃহিণী স্বামীর আদেশ প্রতিপালন করিলেন, এবং তাঁহার কথামতই আর গৃহ-ত্যাগ করিলেন না; অবগুণ্ঠনে মস্তক ঢাকিয়া কন্যার পার্শ্বে বসিয়া তাহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন।

চণ্ডীচরণ চিকিৎসক না হইলেও একজন বহুদর্শী লোক বটেন। তাঁহার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। তিনি চিকিৎসকের সহিত পরামর্শ করিয়া দু'একটি ব্যবস্থার প্রস্তাব করিলেন। কবিরাজ তাহার অনুমোদন করিয়া তদনুসারে কার্য করিতে লাগিলেন। চণ্ডীচরণ বালিকার মস্তকে হস্ত রাখিয়া দু' একটি স্তব পাঠ করিলেন। রাত্রি দুই প্রহরের পরে বালিকার তন্দ্রার আবেশ হইল। চিকিৎসক কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন। ভগবান ও গৃহিণীকে বালিকার নিকটে রাখিয়া তিনি ও চণ্ডীচরণ বাহিরে আসিলেন।

(৪)

চণ্ডীচরণ শয়ন করিলেন। তাঁহার কেবলমাত্র নিদ্রা আসিয়াছে, এমন সময়ে দূরে বিষম গোল শুনিয়া তিনি জাগরিত হইলেন। দেখিলেন, সঙ্গের হিন্দুস্থানী দুই জন উঠিয়া বসিয়াছে। মানুষের চীৎকার ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। ব্যাপার কি জানিবার জন্য ভগবানের একজন সাহসী ভৃত্য যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল।

রামসেবক ও রঘুবীর সিং চণ্ডীচরণকে কহিল, "আপনি যদি টাকাটা আগুলিয়া বসিতে পারেন, তাহা হইলে আমরা একবার দেখিয়া আসি।" চণ্ডীচরণ বিশেষ আপত্তি করিলেন না। হিন্দুস্থানীদ্বয় ভগবানের ভৃত্যের সহিত দৌড়াইল।

মধু বণিকের বাড়ীতে ডাকাত পড়িয়াছে। দস্যুগণ সংখ্যায় অধিক নহে। আট দশ জনমাত্র। দুই জন মধুকে ধরিয়া রাখিয়াছে ও তাহাকে নির্যাতিত করিতেছে। অবশিষ্ট লোকেরা গৃহে প্রবেশ করিয়া সঞ্চিত অর্থের অনুসন্ধান করিতেছে। ভগবানের বাঙ্গালী ভৃত্যের সাহসে কুলাইতেছে না। কিন্তু রঘুবীর ও রামশরণের শরীরে বাঙ্গালীর রক্ত নহে। তাহারা তাহাকে পশ্চাতে রাখিয়া অসীম সাহসের সহিত প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল, এবং বিষম জোরে একটা শব্দ করিয়া মধুর সমীপস্থ আততায়ী দস্যুদ্বয়ের উপর পতিত হইল। দস্যুগণ এরূপ বাধার জন্য প্রস্তুত ছিল না। যমকিঙ্করসদৃশ দীর্ঘদেহ হিন্দুস্থানী ও তাহাদের হস্তস্থিত বংশদণ্ড দেখিয়া তাহারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইল, এবং নিজেদের মধ্যে একটি সঙ্কেত বাক্য উচ্চারণ করিয়া মুহূর্তমধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। রঘুবীর ও রামশরণের পক্ষে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করা অসম্ভব।

উপস্থিত বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া মধু প্রথমেই অনুসন্ধান করিতে লাগিল, তাহার কি কি অপহৃত হইয়াছে। সে যখন জানিতে পারিল যে, নগদ টাকা ও

মূল্যবান অলঙ্কারাদি যাহা কিছু সমস্তই গিয়াছে, তখন তাহার পরিতাপের পরিসীমা রহিল না। সে কেবল বলিতে লাগিল, "আমি কেন মরিলাম না। যখন আমার সকলই গেল, তখন আমি কেন রহিলাম। ডাকাতেরা আমাকে মারিতে আসিয়াও কেন আমাকে মারিল না?

বস্তুতঃ যখন রঘুবীর ও রামশরণ মধুর বাড়ীতে প্রবেশ করে, তখন দস্যুরা তাহাদের কাজ গুছাইয়াছে। আরও কিছু আছে কি না, তাহারা কেবল এই অনুসন্ধান করিতেছিল, এবং যখন তাহারা পালাইয়া যায়, তখন মধুর প্রায় সর্বস্বই তাহাদের হস্তগত হইয়াছিল।

দুইটি লোক আসিয়া তাহার প্রাণরক্ষা করিয়াছে, এই পর্যন্ত বুঝিতে পারিয়া থাকিলেও মধু উদ্ধারকর্তাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অবসর পায় নাই। হিন্দুস্থানীদ্বয় তাহার কৃতজ্ঞতা পাইবার প্রত্যাশীও ছিল না। মধু ঘরে আসিয়াই সমস্ত দেখিয়া মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতে লাগিল। দস্যুগণের আগমনসময় হইতেই তাহারা মনে সংস্কার হইয়াছিল যে সন্ধ্যার পর যে তিনটি লোক অতিথিভাবে তাহার বাড়ীতে আসিয়াছিল, তাহারাই ডাকাইতি করিতেছে। মধুর সে বিশ্বাস এখনও অপনীত হয় নাই। মধু কাঁদিতে কাঁদিতে একবার বলিল, "শালারা সন্ধ্যাকালে অতিথি সাজিয়া আসিয়া বাড়ী ঘর দেখিয়া গিয়াছিল। তখনই আমি জানি যে, আজ আমার সব নাশ হবে।" মধুর সেই চাকরটি নিকটে ছিল। সে দূর হইতে সমস্ত দেখিয়াছিল। মধুর কথা শুনিয়া বলিয়া উঠিল, "সেই অতিথিই তোমাকে বাঁচালে। তাদের যদি যায়গা দিতে, তা হলে আর এমন একখানা হত না।"

মধুর চমক ভাঙ্গিল। তাহার মনে হইল, যে দুইটি লোক আসিয়া তাহাকে বাঁচাইয়াছে, তাহারা সেই সন্ধ্যাকালের ব্রাহ্মণের সঙ্গের লোকের মতন বটে।

রঘুবীর ও রামশরণ ফিরিয়া যাইয়া চণ্ডীচরণকে সমস্ত কহিল। তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। ইহারা কেহই আর নিদ্রা গেল না। চণ্ডীচরণ প্রাতঃকৃত্যের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

প্রভাতে যশোহর-যাত্রার পূর্বে চণ্ডীচরণ একবার ভগবানের কন্যাটিকে দেখিয়া গেলেন। তখন তাহার অবস্থা কিছু ভাল। চক্ষের অবস্থা অনেকটা আশাপ্রদ। কবিরাজ কহিলেন, এখন জীবনের আশা করা যাইতে পারে। চণ্ডীচরণ হৃষ্টচিত্তে যশোহরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

(৫)

চণ্ডীচরণ একজন কায়স্থ জমীদারের কর্মচারী। তাঁহার সঙ্গীয় হিন্দুস্থানীদ্বয় ঐ জমিদারেরই ভৃত্য। জমীদারের নাম যোগেশচন্দ্র রায়। বার্ষিক আয় ত্রিশ সহস্র টাকা হইবে। যোগেশ নাবালক। বয়স ১৩।১৯ বৎসর মাত্র। তাঁহার মাতা জীবিতা আছেন। চণ্ডীচরণ যোগেশের পিতামহের আমল হইতে ইহাদের কর্ম করিতেছেন। চণ্ডীচরণ অতিশয় বিশ্বস্ত কর্মচারী;

জীবনে কখনও মনিবের হানিজনক কোন কাজ করেন নাই। তাঁহার প্রতি যোগেশের মাতার অখণ্ড বিশ্বাস। যোগেশ তাঁহাকে ঠাকুরদাদা বলিয়া সম্বোধন করেন। জমীদারীর সমস্ত ভারই চণ্ডীচরণের হস্তে। এবার দুই একটি মহালের প্রজা উপযুক্ত সময়ে খাজনা দেয় নাই বলিয়া পৌষ কিস্তির রাজস্ব দিতে বিলম্ব হইয়াছিল। সময় অল্প বলিয়া এবং অন্যকে বিশ্বাস করা ঠিক নহে, বিবেচনায়, চণ্ডীচরণ স্বয়ং যশোহর যাইতেছিলেন। পথে এক রাত্রিতে যাহা ঘটিয়াছে, পাঠক অবগত আছেন।

চণ্ডীচরণ বেলা এক প্রহরের পূর্বেই যশোহরে পঁহুছিলেন, এবং সমস্ত দিনে মনিবের কার্য শেষ করিয়া পুনরায় সন্ধ্যার সময়ে ইচ্ছা করিয়া ভগবানের বাটীতে আসিলেন। কন্যাটির অবস্থা তখন বিশেষ আশাপ্রদ। চণ্ডীচরণকে দেখিয়া ভগবান যেন তাঁহার একজন নিকট আত্মীয় পাইলেন বলিয়া মনে করিলেন। এক রাত্রির পরিচয়েরই তাঁহাদের আত্মীয়তা এতটা বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, ভগবান তাঁহাকে একজন মুরুব্বির ন্যায় দেখিতে লাগিলেন। ভগবানের এক খুড়ার নাম ছিল চণ্ডী, ইহার উল্লেখ করিয়া ভগবান তাঁহাকে খুড়োঠাকুর বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন।

পরদিন প্রভাতে চণ্ডীচরণ যখন বাড়ী ফিরিয়া যাইবেন, তখন কবিরাজ কহিলেন "ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ সফল হইয়াছে। বালিকা রক্ষা পাইবে, এখন নিশ্চয়ই এ কথা বলা যায়।"

বাড়ীর সকলেই চণ্ডীচরণের পদধূলি গ্রহণ করিলেন। ভগবান অশ্রুপূর্ণ লোচনে কহিলেন, "আপনার আশীর্বাদেই আমি কন্যার জীবন পাইলাম। প্রার্থনা এই যে, যখনই এ পথে আসিবেন, যেন দুটি পদধূলি পাই।"

সেদিন সন্ধ্যার পরেই চণ্ডীচরণ গৃহে ফিরিলেন। অন্যান্য কথা বলিয়া তিনি যোগেশ ও তাহার মাতার নিকট মধু বেণের কথা ও ভগবান বসুর কথা কহিলেন। রাত্রিতে তাঁহারা কিরূপ বিপদে পড়িয়া ভগবান কি অবস্থায় তাঁহাদিগকে আহার ও স্থান দেন, তাঁহার কন্যার পীড়া, ইত্যাদি সমস্ত বর্ণিত হইল।

যোগেশ দুই একটি প্রশ্ন করিলেন। কহিলেন, "মধু আপনাদের ডাকাত ঠাওরাইয়াছিল?"

চণ্ডীচরণ উত্তর করিলেন, "হাঁ।"

যোগেশ। তার যথাসর্বস্ব গেছে?

চণ্ডী। যথাসর্বস্বই প্রায়। সে রাত্রে হয় ত ডাকাতি হতই। আমাদের থাকতে না দেওয়া লোকে তার কারণ বলে বিশ্বাস করিল। ক্ষুধার্ত বা বিপন্ন অতিথিকে ফিরানো সহজ কথা নয়। তোমার ঠাকুরমা সাবিত্রী ব্রতের উপবাস করে একদিন নীচের ঘরে শুয়ে আছেন। সহসা বেলা আড়াই প্রহরের সময়ে ঘুম হইতে উঠিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আমাদের বাগিপুরের কাছারী পুড়িয়া গেল। একজন ব্রাহ্মণ অতিথি আসিয়া কাছারিতে আহার করিতে চাহিয়াছিল, তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়ায় কিছু কাল

পরেই আগুন লাগিয়াছে।" তিনি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। তখন তোমার ঠাকুরদাদা জীবিত ছিলেন। তোমার ঠাকুরমার মত পুণ্যবতী স্ত্রীলোক আজকাল দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার কথায় কেহ অবিশ্বাস করিল না। সেই দিন সন্ধ্যাকালেই সংবাদ আসিল, কাছারীবাড়ী পুড়িয়া গিয়াছে। ক্ষুধার্ত অতিথিকে ফিরাইবার কথা নায়েব অস্বীকার করিলেন বটে, কিন্তু তোমার পিতামহ অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন, কথাটা ঠিক। তদবধি নায়েবকে অতিথির খোরাকী বলিয়া বৎসরে ১২০্ অতিরিক্ত দেওয়া হইয়া থাকে। কাছারী এখন পাকা হইয়াছে।

যোগেশ মন দিয়া সমস্ত কথাগুলি শুনিয়া অবশেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যে বাড়ীতে আপনারা যায়গা পেলেন, সে বাড়ীতে সে মেয়েটি ভাল হবে ঠিক?"

চণ্ডী। নিশ্চয়ই ভাল হবে। এ যাত্রা রক্ষা পেয়েছে। মেয়েটি ত নয় যেন সোনার পুতুল।

যোগেশ। আপনি একখানা চিঠি লিখে খবর নেবেন।

চণ্ডী। তা নেব।

এই ঘটনার পর ৭।৮ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। চণ্ডীচরণ দশ বারো বার যশোহর যাইবার সময়ে ভগবানের বাড়ীতে গিয়াছেন। ভগবান তাঁহার গৃহিণী ও কন্যাটি তাঁহাকে অসীম ভক্তি করেন। চণ্ডীচরণকে বাটীতে আসিতে দেখিলেই বালিকা যাইয়া মাকে বলে, "মা, সেই দাদাঠাকুর আসিয়াছেন।" বালিকা অনেক সময় ব্রাহ্মণের পা ধুইবার জল আনিয়া দেয়, বাড়ীর ভিতর হইতে তাঁহার নিমিত্ত দুধ, জলখাবার, পান ইত্যাদি লইয়া আসে। বৃদ্ধ চণ্ডীচরণ তাঁহার মুখে ভগবানের কন্যার সুখ্যাতি ধরে না। এমন সুলক্ষণা কন্যা আমি অতি অল্পই দেখিয়াছি, যেমন রূপ তেমনিই গুণ, এ মেয়ে যে ঘরে যাবে সে ঘরের উন্নতি হবেই হবে, ইত্যাদি কত কথাই তিনি বলেন।

চণ্ডীচরণ লক্ষ্য করিতেন না যে, যখনই তিনি ভগবানের কন্যার কথা তুলিতেন, তখনই যোগেশচন্দ্র কান পাতিয়া তাঁহার কথা শুনিতেন। যোগেশের সহিত এই বালিকার বিবাহ হইতে পারে, এমন সম্ভাবনা ব্রাহ্মণের মনে আসে নাই। কেন না, উভয় পরিবারে অবস্থার অতিশয় পার্থক্য। যোগেশের মাতা পুত্রের বিবাহের কথা উঠিলেই ধনবান বৈবাহিকের কথা বলেন।

বরের দর এই সময়ে চড়িয়া উঠিয়াছে। সহরে কায়স্থের কন্যার বিবাহ বিষম ব্যয়সাধ্য ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেকে পল্লীগ্রামে পাত্র খুঁজিতেছেন। কলিকাতার কোন অবস্থাপন্ন গৃহস্থের কন্যার সহিত যোগেশের বিবাহের প্রস্তাব করিবার জন্য ঘটক তাঁহার বাড়ীতে আসিয়াছেন। চণ্ডীচরণ ঘটকের সহিত কথাবার্তা কহিতেছেন। যোগেশের মাতা অন্তরালে থাকিয়া সমস্ত শুনিয়াছেন। যোগেশচন্দ্র নিকটে নাই।

সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ঘটক উঠিয়া মুখ-হাত ধুইতে গেলেন। যোগেশচন্দ্র বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। তাঁহার আগমনের ভাব দেখিয়া চণ্ডীচরণ বুঝিলেন, তিনি যেন ঘটকের স্থানত্যাগের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। যোগেশচন্দ্র পার্শ্বের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন, এবং চণ্ডীচরণকে দেখিতে পাওয়া যায়—এইরূপ স্থানে উপবেশন করিলেন। নিজের কতকগুলি কাগজ পত্র নাড়িয়া তিনি সহসা চণ্ডীচরণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুরদাদা, আপনার সেই নাতিনীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে?"

এমন সময়ে এমন ভাবে এই প্রশ্ন? চণ্ডীচরণ মুহূর্তমধ্যে ইহার অর্থ বুঝিয়া লইলেন, এবং কহিলেন, "কেন? বিবাহ হয় নাই। পাত্রের অনুসন্ধান চলিতেছে। আমার সে নাতিনীকে বিয়ে করিবে দাদা?"

চণ্ডীচরণ যোগেশকে দাদা বলিয়া আদর করিতেন।

যোগেশকে নতমুখে উত্তর করিলেন, "আপনি যদি মাকে বুঝিয়ে রাজি কর্ত্তে পারেন।"

চণ্ডী। হীরের আংটি, সোনার ঘড়ি, এসব কিছুই কিন্তু দিতে পারিবে না।

যোগেশ। আমি কিছুই চাহি না। আপনার কাছে যতদূর শুনিয়াছি, এমন পিতামাতার সন্তান কখনও সামান্য স্ত্রীলোক হইবার কথা নহে। সংসারে আমার আপনার বলতে মা আপনি। আমি শৈশবে পিতৃহীন। আপনিই ত আমার সমস্ত রক্ষা করিয়াছেন। এ বিবাহে আপনার মত হইবে, আমি নিশ্চয় জানি। যদি মার মত কর্ত্তে পারেন। সেই রাত্রিতে বসু মহাশয় আপনাকে ও আমার লোক দুটিকে বাটীতে স্থান দিয়া যে মহত্ত্ব দেখাইয়াছেন, যে উপকার করিয়াছেন, যদি তার বিন্দুমাত্রও শোধ হয়—" চণ্ডীচরণ যোগেশের সম্মুখীন হইয়া তাঁহার মস্তকে হস্ত রাখিয়া কহিলেন, "এই বিবাহই হবে দাদা। আমার কথা মা অবহেলা করিবেন না।" ব্রাহ্মণ যোগেশের মাকে মা বলতেন।

বস্তুতঃ চণ্ডীচরণের মুখে এই বালিকার কথা শুনিয়া অবধি যোগেশচন্দ্র মনে মনে তাহার একটি ছবি আঁকিয়াছিলেন। বালিকার বয়স যত বাড়িতেছিল, চণ্ডীচরণের মুখে তাহার বর্ণনা শুনিয়া যোগেশের চিত্তে সেই ছবি উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিতেছিল। তিনি এ পর্য্যন্ত মনের কথা বলিবার সুযোগ পান নাই। সেইদিন রাত্রিতেই যোগেশচন্দ্রকে কিঞ্চিৎ দূরে রাখিয়া চণ্ডীচরণ তাঁহার মাতার নিকট এই প্রস্তাব উত্থাপিত করিলেন। যোগেশের মনের ভাব তাঁহাকে জানান হইল। জননী দু চারিটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া পুত্রের ও ব্রাহ্মণের মতে মত দিলেন।

উপসংহার

যোগেশচন্দ্রের সহিত ভগবান বসুর কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। যোগেশ এখন অর্দ্ধবয়স্ক। তাঁহার দুইটি সন্তান জন্মিয়াছে। যোগেশের মাতা কাশীতে গিয়াছেন,—জীবনের শেষকাল যাপন করিবেন। ভগবানও সস্ত্রীক সেখানে আছেন। বৃদ্ধ চণ্ডীচরণের কাশীপ্রাপ্তি হইয়াছে। তাঁহার পুত্র এখন যোগেশের প্রধান কর্ম্মচারী। ইঁহার উপর সমস্ত ভার রাখিয়া যোগেশচন্দ্র স্ত্রীপুত্র সঙ্গে কাশীতে মাকে ও শ্বশুর শাশুড়ীকে দেখিতে যাইতেছেন। ডাকগাড়ীতে একখানি গাড়ী রিজার্ভ করিয়া তাঁহারা রাত্রিতে হাবড়া হইতে রওনা হইয়াছেন। রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী। বালক বালিকা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। স্বামী স্ত্রী জাগরিত থাকিয়া মধুপুরের পাহাড় জঙ্গল দেখিতে দেখিতে যাইতেছেন। যোগেশের পত্নী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ জঙ্গলে বাঘ আছে?"

যোগেশ। বাঘ আছে বই কি?—বাঘের কথা উঠলেই আমার সেই চণ্ডী ঠাকুরদাদাকে বাঘে তাড়ানোর কথা মনে হয়। এমন উপকারী বন্ধু আর হবে না—

উভয়ের মুখ বিষণ্ন হইল। স্বর্গীয় ব্রাহ্মণের উদ্দেশে দম্পতী দু' চারি বিন্দু অশ্রুপাত করিলেন।

যোগেশচন্দ্র অশ্রুসংবরণ করিয়া কহিলেন, "চণ্ডী ঠাকুরদাদাকে বাঘে তাড়া করেছিল, আর মধু বণিক যায়গা দেয় নাই বলেই আমি এমন রত্নের অধিকারী হইয়াছি। এমন কথাটির সঙ্গে সঙ্গে যোগেশচন্দ্র অতি আদরের সহিত স্ত্রীর চিবুক ধারণ করিলেন।

স্ত্রী উত্তর করিলেন, "রত্নলাভ তোমার না আমার?"

যোগেশ। যারই হক—হয়েছে। এখন একটু ঘুমোও। রাত্রি কম হয় নাই।

সাহিত্য-বৈশাখ, ১৩০৮।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও হাফেজ

অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী

যে গ্রন্থ জ্ঞান লাভের সহায় হয়, মানুষ তাহাকে অধ্যয়নের ও চিন্তার সঙ্গী করে। যে গ্রন্থ হৃদয়ের বিকাশের সহায় হয়, প্রেম বুঝিতে ও প্রেম দিতে শিক্ষা দেয়, মানুষ তাহাকে সারা জীবনের সঙ্গী করিয়া লয়, হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখে। হাফেজের সঙ্গীত এই শেষোক্তভাবে ব্যবহার করিবার বস্তু। রাজা রামমোহন রায় ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই-ভাবেই ইহার ব্যবহার করিয়াছিলেন।......

হাফেজের গভীর ঈশ্বর প্রীতি, নির্ম্মল চরিত্র, উদার ধর্ম্মমত, বিশাল পাণ্ডিত্য, অতুল কবিত্ব তাঁহার 'দীবান' গ্রন্থে (কবিতা সংগ্রহ) প্রতিফলিত। হাফেজের কবিতা জগতের প্রেম সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ, প্রেম-ধামের যাত্রীর পথের দিব্য আলোক। প্রেম-রাজ্যের নিগূঢ়তত্ত্ব সকল তাঁহার কবিতার আলোকে উজ্জ্বল হইয়াছে। প্রেমিক-হৃদয়ের কত অব্যক্ত বেদনা তাঁহার সঙ্গীতে ভাষা লাভ করিয়াছে, তাই তাঁহার এক উপাধি 'লিসান্-উল-গায়ব্' অর্থাৎ অব্যক্তের রসনা। তাঁহার পদবিন্যাস সুললিত, শব্দ ঝঙ্কার অননুকরণীয়, অথচ ভাব অনাড়ম্বর। তিনি তাঁহার কবিতায় অনেক রূপক ও উপমা ব্যবহার করিয়াছেন; কিন্তু কোথাও দুর্ব্বোধ্যতার কালিমা আসে নাই। [illegible] তত্ত্ব [illegible] প্রীতি ও সমসাময়িক ইতিহাসের প্রতি নানা-রূপে ইঙ্গিত করিয়াছেন, কিন্তু কোথাও তাঁহার উক্তি অস্পষ্টতা দোষে কলুষিত হয় নাই। তাঁহার সঙ্গীত এমন হৃদয়গ্রাহী যে তাহা ছয় শতাব্দী ধরিয়া অবিচ্ছেদে দনিয়ুবের তীর হইতে ভাগীরথীর তীর পর্য্যন্ত সম্রাটের প্রাসাদে ও দারিদ্র্যের পর্ণকুটীরে সমভাবে গীত হইয়া আসিতেছে।

হাফেজ প্রেমকে সুরার সহিত তুলনা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার কবিতার এমনি আকর্ষণ, এমনি উন্মাদনী শক্তি যে, যে কেহ ইহার রস আস্বাদন করে, সে-ই ইহাতে একান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়ে; তাহার চিন্তা, ভাব, ভাষা, রুচি বহু পরিমাণে সে কবিতার রসে সিক্ত হইয়া উঠে। একদিকে সে হাফেজের ভাবের ভাবুক হইতে ব্যগ্র হয়, অপরদিকে তাহার নিজের ভাবতরঙ্গে সে হাফেজের সায় পাইতে উৎসুক হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রাণরাজ্যে, ভাবরাজ্যে, তাঁহার প্রেম-ভক্তির সাধনায়, হাফেজের প্রভাব এইরূপই কার্য করিয়াছিল। তাঁহার তত্ত্বচিন্তায় প্রধান সহায় ছিল উপনিষৎ, প্রেমভক্তির জীবনে প্রধান সহায় ছিল হাফেজের সঙ্গীত।

শুধু কবিত্বের গুণেই নয়, কিন্তু হাফেজের ব্যক্তিত্বের প্রভাবেও তাঁহার কবিতা মানুষের মনকে আকর্ষণ করে। তাঁহার কবিতা শুধু কবিতা নয়, ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতায় প্রদীপ্ত একটি জীবনের ছবি। এই জন্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক মণ্ডলীভুক্ত লোকদের মধ্যে হাফেস-প্রীতি সংক্রামক হইয়া উঠে। রাজা রামমোহন রায় হাফেজের ভক্ত ছিলেন। তাঁহা হইতে মহর্ষিতে এই ভক্তি সংক্রান্ত হইয়াছিল। নিশ্চয় মহর্ষি হাফেজ-চর্চা করিবার সময় নিজের হৃদয়ে রাজা রামমোহনের আধ্যাত্মিক সান্নিধ্য বিশেষভাবে অনুভব করিয়া অনুপ্রাণিত হইতেন। মহর্ষির নিকট হইতে কেশবচন্দ্র উত্তরাধিকারসূত্রে এই হাফেজ-প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন।

হাফেজের রচিত কবিতা নানা বিধ, তন্মধ্যে 'গজল'গুলিই প্রধান। গজলের রচনা-প্রণালী মোটামুটি এইরূপঃ—(১) প্রত্যেক গজলে পাঁচটি হইতে আঠারটি পর্য্যন্ত শ্লোক থাকিবে। হাফেজের কোন কোন গজলে ২১টি পর্য্যন্ত আছে। (২) আদ্যন্ত একই ছন্দ থাকিবে। (৩) প্রতি শ্লোকে দুই চরণ। প্রথম শ্লোকের উভয় চরণের ও পরবর্ত্তী শ্লোকগুলির দ্বিতীয় চরণের শেষ অক্ষর অথবা শেষ কয়েকটি অক্ষর এক হইবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রবন্ধ শেষে ৩, ১৪, ২৫ সংখ্যক শ্লোক দেখা যাইতে পারে; এই তিনটি একই গজল হইতে গৃহীত। (৪) প্রত্যেক শ্লোকের দুই চরণের মধ্যেই তাহার অর্থ সম্পূর্ণ হওয়া আবশ্যক। (৫) শেষ শ্লোকে অথবা শেষের কাছাকাছি কোন শ্লোকে রচয়িতার ভণিতা থাকিবে। দুই পংক্তির মধ্যে অর্থ সম্পূর্ণ করিতে হইলেই রচনা কিছু আড়ষ্ট ও কৃত্রিম ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে। তাহার উপর যদি আবার এইরূপ কতকগুলি অলংকার [illegible], [illegible] থাকিলে এক [illegible], [illegible] আড়ষ্ট [illegible] হইয়া [illegible]

অথচ পারস্য কবিদের মধ্যে এই প্রথা বহুল পরিমাণে অনুসৃত হইয়াছে। তাঁহাদের মতে শ্লোকগুলি মুক্তা, গজলটি মুক্তাহার। মুক্তার মূল্যাই হারের মূল্য, সূতাখানির কিছু মূল্য নাই। অর্থাৎ সব শ্লোকগুলি একটি ভাব-সূত্রে গ্রথিত না হইলেও ক্ষতি নাই। হাফেজের কবিতায় রচনারীতির এই আড়ষ্ট ও অস্বাভাবিক ভাব প্রায় লক্ষিত হয় না। তাঁহার অধিকাংশ গজলে শ্লোকগুলি অর্থ দ্বারা পরস্পরের সহিত সংশ্লিষ্ট না হইলেও তাহাদের মধ্যে আদ্যন্ত একটি ভাবের আবেগ চলিয়া গিয়াছে। যে গজল সংগ্রহে বর্ণমালার প্রত্যেক বর্ণই পর্যায়ক্রমে শ্লোকের অন্ত্য-বর্ণরূপে ব্যবহৃত হয়, তাহার নাম দীবান। হাফেজের দীবানে গজলের সংখ্যা প্রায় ছয় শত।

ভাবরসে যাহার হৃদয় পরিপূর্ণ, এমন মানুষের আত্মনিবেদন যেরূপ হয়, হাফেজের গজলগুলির ভাষা ও ভাব সেইরূপ। তাঁহার কবিতার একমাত্র বিষয় প্রেম; কিন্তু প্রেমের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করা কিংবা প্রেমের বিষয়ে উপদেশ দান তাহার লক্ষ্য নহে। প্রেমিকের জীবনের নানা অবস্থার মধ্য দিয়া হাফেজ চলিয়া যাইতেছেন, ও সেই সেই অবস্থায় তাঁহার হৃদয়তন্ত্রী যে যে সুরে বাজিতেছে, তাহাই তাঁহার কবিতায় ধ্বনিত। ভাব হৃদয়কে প্লাবিত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে, জ্ঞান-বুদ্ধির কূলরেখা লুপ্ত, এমন অবস্থায় রসনায় যেরূপ কথা আসে, কুণ্ঠিত ভাষায় হাফেজ তাহাই অনর্গল বলিয়া গিয়াছেন। তত্ত্বকথা, শাস্ত্রের বচন, নীতি উপদেশ মাঝে মাঝে মাঝে আসিয়া পড়িয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহার কবিতার স্রোত ভাবোচ্ছ্বাসেরই স্রোত, ঐ সকল তাহার উপরে ভাসিতেছে মাত্র।

পরমাত্মা যখন জীবাত্মাকে নিজের আকর্ষণে আকুল করেন, তখন জীবাত্মাতে কি কি ভাবের উদয় হয়, তাহাকে কেন্ কোন্ অবস্থা অতিক্রম করিতে হয়, তাহার ইতিহাস হাফেজ তাঁহার দীবান গ্রন্থে নিজের অবস্থা বর্ণনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। প্রেমের পথের সংগ্রাম, সংসারের কুহকজাল, প্রেমাস্পদের সৌন্দর্য, তাঁহার আকর্ষণ প্রণালী, তাঁহার আকর্ষণে প্রেমিকের হৃদয় বেদনা, দর্শনের আনন্দ, বিরহের ক্লেশ এ সকল তিনি নিজের কথায়, কখনও সখাকে, কখনও সমসাধক বন্ধুজনকে, কখনও উপদেষ্টা গুরুকে, কখনও পাঠককে সম্বোধন করিয়া অপূর্ব কবিত্বপূর্ণ ভাষায় বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সকল কবিতাই রূপক। তাঁহার ভাষায় পরমাত্মা জীবাত্মার সখা। তিনি পরম-সুন্দর, তাই মনোমোহন। তাঁহার একমাত্র কাজ জীবাত্মার-হৃদয় হরণ। তাই জীবাত্মা পরমাত্মার প্রেমিক ও তাঁহার প্রেমের আকর্ষণে আকুল। আবার হাফেজের ভাষায় প্রেমের নাম সুরা, প্রেমিকমণ্ডলীর নাম সুরাপান সভা, প্রেম-সাধনের দীক্ষাগুরুর নাম সুরা-পাত্র দাতা সাকী। ধার্মিক মহাজনগণ রূপবান পুরুষ; সখা রূপবানদিগের রাজা। জড়-জগতের ও আধ্যাত্মজগতের সকল সৌন্দর্য সখার মুখজ্যোতির ছটা মাত্র। যাহা কিছুর মধ্য দিয়া পরমাত্মা জীবাত্মার অন্তরাত্মকে উদ্দীপিত করেন, তাঁহার রূপকে নিয়া অতি-

মুখে সকলে আকর্ষণ করিয়া ব্যাকুলতায় অধীর ও ব্যথিত করিয়া তোলেন, হাফেজের ভাষায় তাহা প্রেমাস্পদের সুরভী কেশপাশ, অথবা কপোলের ঈষদুন্মিত রোমরেখা, অথবা কৃষ্ণতিল, অথবা লোহিত অধর অথবা চিবুক-কূপ, অথবা তাঁহার নয়নভঙ্গী অথবা লীলা-ময়ী গতি। এ সকলের দ্বারা সখা প্রেমিকের হৃদয় লুণ্ঠন করেন, তাই তিনি হৃদয় লুণ্ঠন-কারী দস্যু। তাঁহার মদির আঁখির ইঙ্গিত প্রেমিকের প্রাণকে কখনও ভাবে উন্মত্ত করে, কখনও বিদ্ধ করিয়া হত্যা করে, কখনও মধুর আহ্বানে আশ্বস্ত করে। প্রভাত সমীরণ তাঁহার অলকগন্ধ বহন করিয়া আনে, তাই সে সখার দূত; বিরহের দিনে সে বড় প্রিয় বন্ধু। এ সকল হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে, হাফেজের কবিতায় পরমাত্মার জন্য জীবাত্মার কাতরতাকে পুরুষ ও নারীর প্রণয়ের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধ পুরুষ ও নারীর সম্বন্ধ নয়, দুই সখার সম্বন্ধ। কিরূপ আকুল ভালবাসায় সখা সখাকে ভালবাসিতে পারে, সুফি কবিগণের রচনায় তাহার অতি উচ্চ আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়।

হাফেজ স্বয়ং এইরূপ আকুল প্রেমিক। সখার প্রেমে তিনি আত্মহারা উদ্‌ভ্রান্ত, বিষয়-বুদ্ধি বর্জিত। সখার প্রসন্নতা লাভ করিয়া যে সময়ে তিনি সুখী, তখন তাঁহার কাছে সমরকন্দ ও বোখারার সমগ্র সম্পৎ সখার একটি কৃষ্ণ তিলের সমান মূল্যবান নয়; এমন দিনে সম্রাটকেও তিনি নিজের কৃতদাস বলিয়া গণনা করেন। ধর্মের বাহিরের নিয়ম, আচার অনুষ্ঠান এ সকল তাঁহার কাছে অতি তুচ্ছ; প্রেমই একমাত্র মূল্যবান ধন। তিনি আপনাকে স্বধর্মচ্যুত পৌত্তলিক, অগ্নি পূজক, দুর্নীতি-

পরায়ণ ও মাতাল বলিয়া গৌরব অনুভব করেন। হাফেজের কবিতায় বর্ণিত প্রেম অতল, আকুল, উদ্দাম, অথচ স্বচ্ছ। সখার খাতিরে সে সব বাধা ভাঙিয়াছে, সব সীমা হারাইয়াছে, সব সম্পৎ পায়ে ঠেলিয়াছে; কিন্তু তাহাতে লালসা নাই, ইন্দ্রিয় বিকারের গন্ধ নাই।

এ দেশের বৈষ্ণব কবিতা ও হাফেজের সঙ্গীত, দুইই রূপক। অধ্যাত্মতত্ত্বের ও বাহ্য বর্ণনার দ্বিবিধ মাধুর্যের সমাবেশে ভক্তের কাছে উভয়ই অপূর্ব, অমূল্য। উভয়েরই পারমার্থিক ও পার্থিব দ্বিবিধ ব্যবহার হয়, এবং ইন্দ্রিয়সীমার মধ্যে আবদ্ধ সংসারের লোক উভয়েরই প্রচুর অপব্যবহার করিয়াছে।

হাফেজের সহিত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সম্বন্ধ কোন কোন ভাবের ও আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল, জীবনের কোন্ কোন্ দিক দিয়া মহর্ষি হাফেজকে স্পর্শ করিয়াছিলেন, তাহা চিন্তা করা যাক।

মহর্ষি প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে অনন্ত ঈশ্বরের করুণা ও মহিমা দেখিতে ভাল-বাসিতেন। তিনি যে শুধু সৃষ্টি-কৌশলে স্রষ্টার পরিচয় গ্রহণ করিতেন, তা নয়; কিন্তু নদী, পর্বত, বন, আকাশ, চন্দ্রমা—এ সকলে সেই প্রেমময়ের প্রেমের প্রকাশ অনুভব করিতে করিতে তন্ময় হইয়া যাইতেন। দেশ ভ্রমণের দ্বারা ও নির্জন প্রকৃতির সঙ্গ সম্ভোগের দ্বারা তিনি তাঁহার এই পবিত্র আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি সাধন করিয়া গিয়াছেন। হাফেজ এ বিষয়ে তাঁহার বিশেষ সহায় হইয়াছিলেন। জগতের সকল সৌন্দর্য ইহ ও পরলোকের সকল শোভা, হাফেজের মতে সেই পরম-সুন্দরের মুখজ্যোতি। তিনি বলিয়াছেন,

নিয়মিত ব্যবহার করলে
ফরহান্স টুথপেষ্ট
মাড়ির গোলোযোগ ও
দাঁতের ক্ষয় রোধ করে
ছোট বড় সকলেই ফরহান্স
টুথপেষ্টের অযাচিত প্রশংসায় পঞ্চমুখ
ফরহান্স টুথপেষ্ট—এক দন্তচিকিৎসকের সৃষ্টি
A'8

"এ উত্তর লোক তাঁহার মুখজ্যোতির এক ঝলক মাত্র; এই এক কথায় প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত সকল তত্ত্ব তোমাকে বলা হইয়া গেল।" কি সুন্দর ভাব, ও কেমন সুন্দর ভাষায় বলা হইয়াছে। মহর্ষির উপদেশে কতস্থানে ইহার অনুরূপ ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। হাফেজের মতে ভগবান জগতের সকল সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া আসিয়া ভক্তের চিত্ত হরণ করেন, তাই তিনি বলিতেছেন, "আমার চিত্তহারী সখা আমারই জন্য নিত্য নূতন ও নিত্য নবীন, নানা শোভা, নানা বেশ, নানা বর্ণ ও নানা গন্ধ বিস্তার করিতেছেন।" মহর্ষি যে চাঁদ দেখিতে এত ভাল বাসিতেন, কত রাত্রি যে তিনি শুধু চাঁদের দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া কাটাইয়া দিয়াছেন, সে কথা ভাবিলে মনে পড়ে হাফেজ ও চাঁদের মধ্যে প্রেমাস্পদের মুখশোভা দেখিয়া উল্লসিত হইতেন। হাফেজ বলিতেছেন, "ওহে সুন্দর, সুন্দর চন্দ্রমার যে দীপ্তি তাহা তোমারি উজ্জ্বল মুখের দীপ্তি; জগতে যাহা কিছু সুন্দর, তোমার মুখ শোভাই তাহার সৌন্দর্যের উৎস।" মহর্ষি যখন হিমালয়ে ছিলেন, যে রাত্রিতে ঈশ্বরের ঘনিষ্ঠ সহবাস অনুভব করিতেন, মত্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে হাফেজের এই বচন আবৃত্তি করিতেন, —(আত্মজীবনী ১৮৩ পৃঃ) "বলিয়া দাও, আজিকার এ সভাতে দীপ আনিও না, কারণ আমাদের আজিকার সভাতে সখার মুখই পূর্ণচন্দ্ররূপে উদয় হইয়াছে।"

ঈশ্বর-প্রীতি বিষয়বাসনাকে হৃদয় হইতে নির্বাসিত করে। ইহা মহর্ষির জীবনের একটি বিশেষ শিক্ষা; তাঁহার উপদেশেও তিনি এই ভাবের কথা বহুস্থানে আবেগের সহিত বলিয়া গিয়াছেন। বিষয়বুদ্ধিতে প্রবীণ হওয়া প্রেমিকের পক্ষে অসম্ভব। সর্বস্ব যায় যাক, তাহাতেও ক্ষতি নাই; প্রেমিক বরং এই চাহেন যে, যেন সংসারের সব হারাইয়া শুধু ঈশ্বরকে লইয়া থাকিতে পারেন। তাই হাফেজ বলিয়াছেন, "(তোমার প্রেমিক হইয়া) প্রার্থনাতে আমি বিদ্যুৎ ভিন্ন কিছু চাহি নাই; সেই প্রার্থনার ফলে বিদ্যুৎ পড়িয়া আমার ধনধান্য সব নিয়া যাইবে; ইহা আর বিচিত্র কি?" যেদিন দেবেন্দ্রনাথ সমুদয় প্রাপ্ত সম্পত্তি উত্তমর্ণদের হাতে সমর্পণ করিয়া রিক্ত হইলেন, সেদিনের বর্ণনায় (আত্মজীবনী ৮৮ পৃঃ) এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহার তখনকার মনের অবস্থা হাফেজের কথায় বেশ বলিতে পারা যায়,— "[illegible] ও [illegible], বন্ধুদেরই সম্পর্ক হইতে [illegible] আমার জন্য। এখন হইতে, [illegible] দ্বারের ভিখারী যে, সেই আমার রাজা।"

[illegible] পাগল হওয়া। মহর্ষি, [illegible] লিখিতেছেন, (আত্মজীবনী, পরিশিষ্ট, পৃষ্ঠা ২৫ পৃঃ) "হাফেজ [illegible] বলিয়া গিয়াছেন, কাহাকেও এমন পাই না যে আমার কথায় সায় দেয়।" তোমাকে সে পাগলা যদি পাইত, তবে তাহার প্রতি কথায় সায় দিতে সে [illegible] উঠিত, আর [illegible] হয়ে কাঁদিতে থাকত, "[illegible] আমি না যে আমার [illegible] উপস্থিত হইল।" হাফেজ বলেন, "বুদ্ধি আমি নই, প্রেমধামের মানুষ সবাই পাগল। "আমি তো মাতাল, আমার মাথা ঘুরে গিয়েছে, আমি নীতির ধার ধারি না, চোখের চাহনি নিয়েই আমার খেলা; কিন্তু এ নগরে (প্রেমধামে) আমার মত নয় কে, দেখ না দেখি।" আবার কথায় চমৎকার চাতুরী খেলিয়া বলিতেছেন, আমার লজ্জার কথা আর কেন জিজ্ঞাসা কর? নাম হতেই আমার লজ্জা (অর্থাৎ লোকে আমার নাম এত বলে বলেই আমার লজ্জা বোধ হয়)।

প্রেমাস্পদের দর্শন হইতে বঞ্চিত হইলে প্রেমিকের হৃদয় কিরূপ অধীর হয়। মহর্ষি নিজ জীবনে তাহার সাক্ষ্য দিয়েছেন। হাফেজের অনেক সঙ্গীতে এই অদর্শনে কাতরতা মর্মস্পর্শী ভাষায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার একটি শ্লোকের দ্বারা মহর্ষি এক সময়ে (আত্মজীবনী ১৮৩ পৃঃ) নিজের মনের কথা বলিয়াছেন, "যে দীপ রজনীকে উদ্ভাসিত করে তাহা (অর্থাৎ সখা) আজ কাহার (হৃদয়) ঘরে উদিত? সে দীপ আমার হৃদয় দগ্ধ করিয়া গিয়াছে, (আমার হৃদয় তাঁহাকে হারাইয়া আজ সন্তপ্ত)। জানিয়া এস, সে দীপ কাহার প্রিয় হইল, (সেই ভাগ্যবান কে, যিনি প্রেমের দ্বারা তাঁহাকে লাভ করিয়াছেন)।" হাফেজ অদর্শনের ক্লেশ সহিতে না পারিয়া বলিতেছেন, "তোমার যে দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ছুরিকার ন্যায় (আমার মর্ম বিদ্ধ করে), আজ আমি তাহারই কৃপাপ্রার্থী; তাহা দ্বারা আমার শোণিত প্রবাহিত কর, (আমার প্রাণ লও) ও আমাকে বিরহবেদনা হইতে মুক্তি দাও।" বিরহের অবিরল অশ্রুধারা বর্ণনা করিতেছেন, "আমি নয়ন হইতে শত জলধারা হৃদয়-ক্ষেত্রে প্রবাহিত রাখিয়াছি, এই আশা যে তোমার প্রতি প্রেমের একটি বীজ বপন করিব।" সখার অদর্শনে জীবন ধারণ অসম্ভব অনুভব করিয়া বলিতেছেন, "তোমার দর্শন পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠ পর্যন্ত আগত হইয়াছে, সে কি দেহে ফিরিয়া যাইবে, না বাহির হইয়া আসিবে? তোমার আদেশ কি?"

আর একটি বিষয়ে মহর্ষি হাফেজের গানে নিজের ভাবের সায় পাইয়াছিলেন। হাফেজের প্রেমাস্পদের হাত হইতে বেদনার দান লইতে সর্বদা প্রস্তুত। তাঁহার কবিতায় দুঃখ বিলাপ আছে সত্য পূর্ব-দেশীয় কবিদের প্রথানুযায়ী সংসারের অনিত্যতা ও করাল কালের নিষ্ঠুরতা বর্ণনাও যথেষ্ট আছে। কিন্তু তাঁহার প্রেম নির্ভরে সবল, একটি আনন্দের (optimistic) সুর তাঁহার সকল দুঃখ বেদনাকে অতিক্রম করিয়া জাগিতেছে। এজন্য তাঁহার সঙ্গীত শুধু প্রেম ভক্তির উচ্ছ্বাসের মুহূর্তেই উপভোগ্য নয়, জীবনের দুঃখ ও অশান্তির মধ্যেও উপভোগ্য। হাফেজ বলিতেছেন, "যদি দয়া করিয়া কাছে ডাকিয়া লও, বলিব, তোমার [illegible]; যদি [illegible] দূর করিয়া দাও, আমার হৃদয় অভিযোগে কলুষিত হইবে না।" হাফেজ [illegible] করিতে পারেন না, তাই বলিতেছেন,—"[illegible] এমন আছেন, যাঁহার অবস্থার প্রতি তিনি করুণার দৃষ্টি করেন নাই? হে ভাই, বাধা বলিয়া কিছু নাই; যদিই বা থাকে, তবে তাহার চিকিৎসকও তো আছেন।"

মহর্ষি যেমন একাকী ব্রহ্মসহবাসে নিমগ্ন থাকিতে ভালবাসিতেন, তেমনি বন্ধুসঙ্গে তাঁহার অর্চনা ও প্রসঙ্গ করিয়া সুখী হইতেন। উপাসকমণ্ডলী গঠনে তাঁহার কি উৎসাহ ও আগ্রহ ছিল। তাঁহার এ উভয় আকাঙ্ক্ষায় তিনি হাফেজের নিকট হইতে সহায়তা লাভ করিতেন। হাফেজ কখন নির্জনে একাকী সখার দর্শনপ্রার্থী, আবার কখন সখাকে প্রেমিকমণ্ডলীর বিন্দুরূপে দেখিয়া সুখী। হাফেজের কবিতায় যে উদার অসাম্প্রদায়িক ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাও মহর্ষিকে আকৃষ্ট করিত, সন্দেহ নাই। হাফেজ বলিতেছেন, "কি সতর্ক (জ্ঞানী) কি প্রমত্ত (প্রেমিক), সকলেই সখার ভিখারী, কি মসজিদ কি প্রতিমা-মন্দির, সকল স্থানই প্রেম-নিকেতন।"

জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনায় ও পরিবর্তনে মহর্ষি হাফেজের ভাষায় নিজের মনের কথা প্রকাশ করিতে ভালবাসিতেন। ষ্টীমারে পড়িয়া গিয়া অল্পের জন্য মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া হাফেজের কথায় মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবিতা স্মরণ করিয়াছেন, (আত্মজীবনী, ২০১ পৃঃ) "সংসারের ডাকাত ঘুমায় নাই, তাহা হইতে নির্ভয় হইও না। কারণ, যদি আজ সে না লইয়া গিয়া থাকে, কাল লইয়া যাইবে।" অভীষ্ট এখনও অধিগত হইল না, সময় বৃথা যাইতেছে, বলিয়া হাফেজের ভাষায় (আত্মজীবনী ১৪১ ও ১৪৩ পৃঃ) খেদ করিতেছেন,—"(আমার কাছে); এখনও প্রকাশ হইল না যে, কেন এখানে আসিলাম, কোথায় ছিলাম; কি দুঃখ, কি পরিতাপ, যে আপনার কাজ আপনি ভুলিয়া রহিয়াছি।" "স্বর্গের উচ্চতম তল হইতে তোমার আহ্বান আসিতেছে; জানি না কেন তুমি এই পাপসঙ্কুল সংসারে আবদ্ধ রহিয়াছ।" এবং দীর্ঘকাল হিমালয়ে বাসের পর গভীর চিন্তা ও ধ্যানের ফলে যখন আত্মা ও পরমাত্মার বিষয়ে বিমল জ্ঞানলাভ করিলেন, তখনকার আনন্দোচ্ছ্বাস প্রথমতঃ উপনিষদের সেই অমৃতময় 'বেদাহমেতং' বচনের ও তৎপরে হাফেজের সেই উক্তির দ্বারা প্রকাশ করিলেন, (আত্মজীবনী ১৮৫ পৃঃ) "এখন অবধি আমি আমার হৃদয় হইতে পৃথিবীতে জ্যোতি বিস্তার করিব, কারণ আমি সূর্যালোকে পহুঁছিয়াছি, ও দুঃখের অবসান হইয়াছে।"

বস্তুতঃ হাফেজের কবিতা মহর্ষির স্মৃতিতে এমনভাবে গ্রথিত হইয়া গিয়াছিল যে, সামান্য সামান্য ব্যাপারেও উপযোগী বচন সকল উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার বাক্যালাপকে স্বাদযুক্ত করিতে পারিতেন। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারক গাজীপুরনিবাসী স্বর্গীয় প্রকাশ দেবজী মহর্ষির ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থের ও ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যানের উর্দু অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন। ইহার [illegible] [illegible] তিনি মহর্ষির নিকটে [illegible]

করেন প্রার্থনা করেন, ও মহর্ষির অর্থ-সাহায্য প্রাপ্ত হন। এই অর্থ সাহায্য বিষয়ক কথাবার্তা হইবার পূর্বে মহর্ষি সংকল্প করিয়াছিলেন যে, নিজের সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের ভার আর নিজের হাতে রাখিবেন না, তাই হাসিতে হাসিতে হাফেজের কথায় প্রকাশ দেবজীকে বলিলেন, "এই দুর্জ্জল (অপর অর্থ দুঃখ) প্রাণের উপর আর সংসারের ভার রাখি নাই; সংসারের সকল কারবার বাঁধিয়া একপাশে সরাইয়া রাখিয়াছি।" "ভ্রমণযাত্রায় বাহির হইবার সময় নৌকায় বসিয়া মহর্ষি হাফেজের কথায় (আত্মজীবনী...১৪৪ পৃঃ) বলিতেছেন, "আমরা নৌকাতে বসিয়াছি। হে অনুকূল বায়ু প্রবাহিত হও, হয়ত আবার সেই সখার মুখ দর্শন করিতে হইবে।"

হাফেজভক্ত কেউ সাক্ষাৎ করিতে আসিলে মহর্ষির আনন্দের সীমা থাকিত না। কত প্রিয় শ্লোক আবৃত্তি করিয়া শুনাইতেন, ও তাহার অর্থ বলিয়া দিতেন। তাঁহার সে সময়কার ভাবপূর্ণ মুখশ্রী দেখিবার সৌভাগ্য যাঁহারা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা আর ভুলিতে পারেন নাই। শুনিয়াছি, আত্মজীবনীর ১৭৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত এই কয় পংক্তি তাঁহার অতিশয় প্রিয় ছিল,—"তোমার প্রেম আমার হৃদয় ও প্রাণের ফলক হইতে কখনও লুপ্ত হইবে না। তোমার প্রেম আমার হৃদয় ও প্রাণে এরূপভাবে স্থান অধিকার করিয়াছে, যে যদি আমার মস্তক যায় (অর্থাৎ জীবন যায়), তথাপি প্রাণ হইতে তোমার প্রেম মুছিয়া যাইবে না।" বোধহয় হাফেজের সঙ্গীতাবলীর মধ্যে মহর্ষির সর্বাপেক্ষা প্রিয় বচন এইটিই ছিল। এই বচনটি মহর্ষির সমগ্র জীবনের ভাবকে যেমন প্রকাশ করে, আর কোন উক্তি বোধহয় তেমন করে না। স্বর্গীয় প্রকাশ দেবজীর মুখে শুনিয়াছি, একদিন মহর্ষি বাষ্পগদগদ কণ্ঠে জল-ভারাক্রান্ত নয়নে ঐ কয় পংক্তি আবৃত্তি করিয়াছিলেন, নিকটে যাঁহারা ছিলেন, সকলের হৃদয়ে এক স্বর্গীয় ভাবের বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইয়াছিল। প্রকাশ দেবজী সেই-দিন হইতে ঐ উক্তিটিকে জীবনসম্বলরূপে গ্রহণ করিলেন; তদবধি আমরণ রোগে, শোকে, আনন্দে তিনি নিরত ঐ বচনটি গান করিতেন, ও বন্ধুজনের কাছে মহর্ষি-তীর্থের সেইদিনের দৃশ্য বর্ণনা করিতেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার প্রেমভক্তির সাধনায় হাফেজকে এমন সঙ্গী করিয়াছিলেন, ইহা ভাবিলে স্বভাই এই প্রশ্ন মনে উদয় হয়, যে তিনি বাংলার বৈষ্ণব কবি-দিগের সাহায্য কেন গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার সময়ে বাংলার শিষ্ট সমাজে বৈষ্ণব কবিতার তেমন আদর হয় নাই। ইহা ব্যতীত, আরও কোন কোন কারণে হয়ত তাঁহার মন বৈষ্ণব কবিতা অপেক্ষা হাফেজের সঙ্গীতের দিকে অধিক আকৃষ্ট হইয়াছিল। প্রেমিকের আকুলতা অথবা প্রেমময়ের লীলা বর্ণনা করিতে গিয়া কোনরূপে গাম্ভীর্যের হানি করা অথবা শারীরিক উপমার অত্যধিক ব্যবহার করা মহর্ষির রুচির অপ্রীতিকর ছিল। এমন কি তাঁহার প্রিয় হাফেজের কবিতা ব্যবহার করিতে গিয়াও তিনি সতর্ক হইয়া চলিতেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায়, আত্মজীবনীর ১৭৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত কথাগুলি হাফেজের একটি কবিতার প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ পংক্তি। দ্বিতীয় পংক্তিটি মহর্ষি পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাহাতে পারস্য কবিদিগের রীতি অনুসারে, বন্ধু ও উন্নত তরুণ বিশেষের সহিত প্রেমাস্পদের দীর্ঘ দেহের তুলনা, ও তাঁহার লীলাময় গমনভঙ্গির উল্লেখ ছিল।

দ্বিতীয়তঃ মহর্ষি ঈশ্বরের অনন্তত্ব ও মহিমা কখনও ভুলিতে ভালবাসিতেন না। অবতারবাদের গন্ধ পর্যন্ত, তাঁহার অসহ্য ছিল। একবার তিনি কথা প্রসঙ্গে শুনিলেন, পাঞ্জাবে শি—ঈশ্বরের মহিমা খর্ব করিয়া নিজেকে পরিত্রাণদাতা বলিয়া প্রচার করিতেছেন। শুনিবামাত্র তিনি একেবারে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন, তাঁহার মুখ-মণ্ডল আরক্তভাব ধারণ করিল, ও উত্তেজনা-পূর্ণ কণ্ঠস্বরে বলিতে লাগিলেন, "কি! এত বড় স্পর্ধা! যাঁহার সিংহাসনতলে চন্দ্রসূর্য লুণ্ঠিত, ঐ উচ্চ আকাশ যাঁর চরণতলে নতমস্তক করিয়া আছে, সেই মহান ঈশ্বরের সম্মুখে মানুষের এত দম্ভ!" এই বলিয়া হাফেজের একটি শ্লোক বলিলেন, তাহার মর্ম এই "হে অত্যুন্নত, হে রাজরাজেশ্বর, তোমার কাছে আমার এই কাতর ভিক্ষা, যেন ঐ আকাশের মত আমিও তোমার রাজমন্দিরের ধূলি চুম্বন করিতে পারি।" হাফেজ তাঁহার প্রেমসঙ্গীতে ঈশ্বরের অনন্তত্ব ও মহিমা বৈষ্ণবকবিদের অপেক্ষা অনেক অধিক মনে রাখিয়াছেন। কি বিরহের কাতরতায়, কি সঙ্গলাভের প্রগল্ভ আনন্দে, কি অভিমানে, কি বিলাপে, কোনও অবস্থায় হাফেজ অধিকক্ষণের জন্য একথা বিস্মৃত হন নাই যে, তাঁহার প্রেমাস্পদ অনন্ত ঈশ্বর।

সামান্য মানবীয় প্রেম যাহার প্রাণকে বিদ্ধ করিয়াছে, এমন মানুষের হৃদয়ের ইতিহাস হইতেও প্রেমিক কবির উক্তি সকল কত অর্থ লাভ করে। ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মধ্যান ও ব্রহ্মানন্দরস পানে নিত্য নিরত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মহৎ হৃদয়ে প্রেমিক শ্রেষ্ঠ জগদ্বরেণ্য মহাকবি হাফেজের ভাবগুলি কি গভীর অর্থ লাভ করিয়াছিল, কি মহান উচ্ছ্বাস উদয় করিয়াছিল, আমরা তাহার ধারণা কিরূপে করিব! আমরা হাফেজকে দেখি নাই ও তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনি নাই; কিন্তু মহর্ষি যখন আবেগ সহকারে তাঁহার শ্লোক আবৃত্তি করিতেন, তাঁহার সে অবস্থার ভাস্বর মুখশ্রীতে ও গম্ভীর কণ্ঠস্বরে যেন হাফেজের আবির্ভাব অনুভব করিতাম।

জানাতে পারেন

(উত্তর)

অমৃতের ৩২শ সংখ্যাতে (৭ম বর্ষ—৩য় খণ্ড) 'জানাতে পারেন' বিভাগে শ্রীমতী গৌরী বসুর প্রশ্নের জবাবে আমার অভিমত রাখছি।

আমাদের অধিকাংশ জ্ঞানই পূর্বসংস্কার জড়িত। নিজের অনুভূতি বা জ্ঞানের বাইরে যা তাকে ঘিরেই আমাদের সব সংস্কার বা কুসংস্কার। আর যতদিন মানুষ থাকবেন এবং আপন মঙ্গল-অমঙ্গল নিয়ে মানুষের মনে দুর্বলতা থাকবে ততদিন কোন-না-কোনরূপে সংস্কার মনে বাসা বাঁধবেই।

শ্রীমতী বসু যে সংস্কারগুলোর কথা লিখেছেন, সেগুলোকে বৈজ্ঞানিক (ব্যাপক) দৃষ্টিভঙ্গী অথবা যুক্তিগ্রাহ্য বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে দেখতে পারলে মানসিক দুর্বলতা অনেকটা কেটে যায়। যেমন ধরুন —শেয়াল, কুকুর, চিল, শকুন ইত্যাদির ডাক কোন কোন বিশেষ অবস্থায় মনে একটা অশরীরী অনুভূতির সঞ্চার করে। সম্ভবতঃ শ্মশান এবং নির্জন স্থানে মৃতদেহের সান্নিধ্যে এদের স্মৃতি নিজের অজ্ঞাতেই আমাদের অবচেতন মনে একটা পূর্ব-সংস্কারের জন্ম দিয়ে রাখে। অথচ প্রাণী-গুলো কিন্তু শ্মশানচারী নিছকই খাদ্য-

দ্বিতীয়তঃ কুকুর-বিড়ালের যে কান্নাকে আমাদের কাছে 'অকারণ কান্না' বলে মনে হয়—তা ঠিক সে সময়ে তাদের পক্ষে 'সকারণ'ও হতে পারে। মানসিক কোন দুর্বলতার অধ্যায়েই এমন কান্না আমাদের মনকে আক্রমণ করে। অন্য সময় এ জাতীয় কান্না হয়ত আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে না।

তাছাড়া এ জাতীয় সংস্কার দেশ, সমাজ ও ব্যক্তিভেদে ভিন্নরূপ নেয়। কোন দেশে কালো বেড়াল ভালো। কোন দেশে মন্দ। একদল বলেন—বেড়ালের এমন বীভৎস কান্নার সঙ্গে মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তি-বিশেষের মৃত্যুই যোগসূত্র। অন্যরা বলেন—শুধুমাত্র অমঙ্গল সূচনা করে এ কান্না। শ্রীমতী বসুর প্রতিবেশিনীদের মতে বাড়ীতে বেশি লাউয়ের ফলন অমঙ্গলজনক। আবার অনেকের সংস্কার গৃহে যে কোন ফলন যেকোন সব্জীর অত্যধিক ফলন গৃহস্বামীর অমঙ্গলের ইঙ্গিত দেয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে—সংস্কারগুলোর মানসিক রকমফের আছে। ঘটনার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক যোগসূত্র সত্যের ব্যতিক্রমে এমন রকমফের হতে পারে না। সংস্কারমাত্রই মানসিক দুর্বলতাপ্রসূত বলে এমনটা ঘটে। তাই এক দেশের মানুষ যাতে অমঙ্গল আশংকায় ভীতচকিত, অন্য দেশের মানুষ তাই নিয়ে দিব্বি ঘর করেন। আর লাউ ফলানো যদি অমঙ্গলই ডেকে আনে—তবে দেশের গরীব—অর্থাৎ লাউ ফলিয়ে বিক্রি করেই যাঁদের জীবিকা তাঁদের কি গতি

হবে? যে দেশের যে শ্রেণীর মানুষই হোক—সব মানুষই তো মানুষ। মঙ্গল-অমঙ্গলের আতঙ্ক সবারই আছে। তাই অনাগতপতি সম্পর্কে যে আতঙ্কের প্রশ্নটা উঠেছে—আমার মতে তাকে একেবারে কুসংস্কারের কোঠারই ভরে ফেলে দেওয়া যেতে পারে। অর্থাৎ নিজে শিকার না হয়ে মানুষের যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে ঐ সংস্কারগুলোকেই শিকার করতে হবে।

তবে প্রাণীর ক্ষেত্রে বিচারটা একটু পৃথক। কারণ প্রাণী শব্দ দিয়ে তার ভাব প্রকাশ করতে পারে। আর সে ভাবের ভাষাও আছে। অনেকদিন একনিষ্ঠভাবে অনুশীলন করলে পশু-পাখির ভয়, ক্ষুধা, আনন্দ, দুঃখ, রাগ, স্নেহ-প্রেমের ভাষা কিছুটা বোঝা যায়। আমি ব্যক্তিগতভাবে পশু-পাখি খুব ভালোবাসি এবং ওদের সঙ্গে নির্জনে বাস করে আনন্দ পাই। বাচ্চাহারা মা-বেড়ালকে আমার কোলে এসে শোক জানাতে দেখেছি। তিন-চারদিন বিছানায় শুয়ে থাকলে কুকুরকে কাঁদতে দেখেছি। এসব অভিজ্ঞতা থেকে বলছি—যার সঙ্গে ওদের বিশেষ ভালোবাসার সম্পর্ক অথবা যিনি ওদের খাবার দেন তাঁর বিপদ-আপদ সম্পর্কে ওরা খুব সচেতন। কিন্তু অন্যের ক্ষেত্রে ওদের এমন বোধ একেবারেই ভোঁতা। অসম্পর্কিত বিষয়ে মনে অমঙ্গলের ছায়াপাত হবার মতো উচ্চতর বৃত্তি নেই বলেই তারা ইতর প্রাণী। তবে আরেকটি বোধ এদের মানুষের চাইতেও তীব্র। তা হল আত্মরক্ষার বোধ। আত্মরক্ষার জন্যেই অনেক 'ইনসটিঙ্কট' ওদের মানুষের চেয়ে তীক্ষ্ণ। বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে হালে এদের এই দিকটা স্বীকৃতও হয়েছে। উড়ন্ত চাকী বা উফো ['আন-আইডেনটিফায়েড ফ্লাইং অবজেক্ট'] নিয়ে কাগজপত্রে কিছু কিছু লেখাপত্র আজকাল বেরুচ্ছে। এই উড়ন্ত চাকীর আবির্ভাব এখনো পৃথিবীর মানুষের জ্ঞানের আয়ত্তে আসেনি। অনুমান—অন্য কোন মহাজাগতিক নক্ষত্রের গ্রহ থেকে—মানুষের চেয়ে উচ্চতর বুদ্ধি ও জ্ঞানের অধিকারী কোন সমাজের হাত থেকে মহাশূন্যে উফোদের উৎক্ষেপ। বৈজ্ঞানিক মহল দেখেছেন—এই উফো পৃথিবীর কাছাকাছি এলে পৃথিবীর মানুষের আগে পৃথিবীর পশু-পাখি এদের আগমনবার্তা আগে বুঝতে পারে 'ইনসটিঙ্কট' দিয়ে। অর্থাৎ আবহমণ্ডলের কোন অজ্ঞাত কারণেও আত্মরক্ষা সম্পর্কে শংকা দেখা দিলে—যেকোন অভিনব পরিবেশেই ওদের আত্মরক্ষার সহজাত বোধ সতর্ক হয়ে ওঠে। মানুষের চেয়ে উচ্চতর কোন অনুভূতির ছায়াপাতে মঙ্গল-অমঙ্গল নির্ধারণ করার মতো প্রজ্ঞার অধিকারী এরা নয়। সেদিক থেকে মানুষের অনুভূতি বা অবচেতন মনই যথার্থ নির্দেশক। মানুষের মনে শুভ-অশুভের বা ভবিষ্যত ঘটনার এমন ছায়াপাত হতে অনেক সময় দেখা যায়।

বেড়ালের কান্না নিয়েই শিলং-জীবনের একটি ঘটনা বলছি। কেন্দ্রীয় সরকারের আসাম রাজ্যের এক বড় অফিসের কর্মিণী অবিবাহিতা বাঙালী তরুণী এক বিবাহিত সহকর্মীর প্রেমে পড়েন। প্রেমিকের দেবত্ব সম্পর্কে তাঁর মনে তখনই সংশয় জাগল, যখন তাঁর চূড়ান্ত সর্বনাশ হয়ে গেছে। প্রেমিকপ্রবর সন্তানের হত্যাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। নিরুপায় মেয়েটি আমার কাছে এসে পড়লেন শ্রীযুক্ত দেবরায়কে বলে তাঁকে বদলী করে দেবার জন্যে। সে প্রসঙ্গে তাঁর সুখ-দুঃখের এবং নিদ্রাহীন রজনীর অনেক মর্মান্তিক কাহিনী আমাকে শুনতে হয়েছিল। সে সময়ই তিনি বলেছিলেন—রাতের পর রাত দুচোখ এক করতে পারতেন না একটা কালো বেড়ালের ভয়ার্ত আর্তনাদে। ছাদের এধারে-ওধারে বেড়ালটি সারারাত কেঁদে কেঁদে ঘুরে বেড়াত। এটাকে তিনি অমঙ্গলের ইংগিত বলেই ধরে নিয়েছিলেন। তিনি কিন্তু বহাল তবিয়তে আজও বেঁচে আছেন তাঁর দুর্বহ জীবনের ভার নিয়ে। আমি তাঁর ঐ বেড়াল ভীতিতে তাঁর নিজের মনের পাপবোধের কান্নাই শুনতে পেয়েছিলাম।

কিন্তু ঘটনার যখন মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা মেলে না তখনই প্রশ্ন দেখা দেয় মনে। বাইরের দৃশ্য বা অদৃশ্য ঘটনায় মানব মন কখন কিভাবে প্রতিভাসিত হয় তার বিশ্লেষণ আমরা আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান দিয়ে সবসময় করে উঠতে পারি না।

আমার নিজের জীবনের দু-একটা ঘটনা বলছি। কোন কুসংস্কার বা বুজরুকিতে আমার বিশ্বাস নেই। ব্যক্তিগতভাবে আমি কঠোর যুক্তিবাদী। সম্ভব স্থলে বিজ্ঞান-সম্মত ব্যাখ্যায় বিশ্বাসী।

আমার ছেলে যখন আমার দেহস্থ তখন আমি এম-এ পরীক্ষা দিচ্ছি। বৈষ্ণব সাহিত্য ছিল আমার বিশেষ বিষয় এবং প্রিয় 'সাবজেক্ট'। কাঁচা বয়স তখন। আবেগ প্রবৃত্তির প্রাবল্য প্রচুর। সে সাহিত্যে প্রায় ডুবেই ছিলাম বলতে পারেন।

ক্লান্ত হয়ে একদিন দুপুরে আধশোয়া অবস্থায় বিদ্যাপতি-চন্ডিদাস পড়ছি। তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিলাম বলে মনে হয় না। বোধহয় একটু অনামনা হয়ে গিয়েছিলাম। বাড়ীখানা ছিল বাঙলো প্যাটার্ণের। উচ্চতা সাধারণ বাড়ীর চাইতে বেশি। হঠাৎ ড্রয়িংরুম এবং বেডরুমের বিরাট দরজাখানা জুড়ে অসংখ্য আনন্দিত জনতা। সামনে বিশাল এক পুরুষ। কিন্তু মুখখানা সদ্যজাত শিশুর মতো। মুখে সে কী শিশুসুলভ অপূর্ব হাসি। চকিতে উঠে বসতে না বসতে আমার বুকে এসে মিলিয়ে গেল।

তাড়াতাড়ি উঠে চোখে মুখে জল দিলাম। অনেকক্ষণ ধরে ভাবলাম ব্যাপার কি। মনে হল উত্তপ্ত মস্তিষ্কে বিদ্যাপতি-চন্ডিদাসের লীলা। পরক্ষণেই [illegible] দিলাম।

সে রাত্রেই আবার ঐ শিশুমুখটি কাছে এসে ঘুম ভাঙিয়ে দিল। হেসে হেসে ধীরে এসে আমার বুকে মিলিয়ে গেল। ভয়, আনন্দ, স্নেহ—সব মিলিয়ে সে এক অভূতপূর্ব অনুভূতি। বাৎসল্য কাকে বলে সে রাতেই আমি প্রথম বুঝলাম। 'ঐ আবার এসেছে—' আমার এই চিৎকারে শ্রীযুক্ত দেবরায় হকচকিয়ে উঠে বসেছেন। আমার শিহরন তাঁর মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছে। আমি এমন শক্ত ধাতের মেয়ে—তা জানেন বলেই বিশেষ চিন্তিত ও বিস্মিত হয়েছেন। যে ডাক্তার আমাকে দেখতেন পরদিনই তাঁকে দেখালাম। ব্লাডপ্রেসার ইত্যাদি কিছুই খারাপ পেলেন না। তেরো বছর হয়ে গেল। ঐ সংক্রান্ত বই আমি পাগলের মতো খুঁজে বেড়িয়েছি। মন ভরে নি। যথোপযুক্ত উত্তর পাই নি।

ঐ জাতীয় ছোটখাটো ঘটনা আমার জীবনে আরো ঘটেছে। আঠারো বছরের মামাতো বোন হঠাৎ মারা গেল। আমি খবর পাওয়ার আগেই দেখলাম—হাত নেড়ে ও আমাকে বলছে—'দিদি আমি কিন্তু যাচ্ছি।' যেমন বেড়াতে যাওয়ার আগে বলে। একবার শ্রীযুক্ত দেবরায় এবং তাঁর ভাই গাড়ী এক্সিডেন্টে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলেন। কিভাবে যে বেঁচে গেলেন—তা তাঁরা নিজেরাও জানেন না। দুজনের কারো গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত লাগেনি। এদিকে দুশো মাইল দূরে আমার চোখে সে দৃশ্য ফুটে উঠল। কারো কথা খুব মনে হচ্ছে। তিনি এসে হাজির। এমন ঘটনা তো অনেকেরই জীবনে ঘটে থাকে। কারো জন্যে খুব চিন্তা হচ্ছে। তাঁর বিপদের খবর পাওয়া গেল।

সুতরাং মানুষের এই বিচিত্র মনের লীলা এবং সজ্ঞান মনে এর ছায়াপাত স্বীকার না করার জো নেই। এসম্পর্কে 'টেলিপ্যাথির' লেখাপত্র যা পেয়েছি পড়েছি। কিন্তু তেমন করে আলোচনা চোখে পড়েনি। শুনেছি রাশিয়াতে এ নিয়ে বিশেষ গবেষণা হচ্ছে। তাঁরা সার্থক হলে আমরাও কিছুটা ভাগ পেয়ে আনন্দ লাভ করবো বৈকি। যদি কিছু আরো জানতে পারি তাহলে 'অমৃত' পত্রিকায় লিখে জানাবার ইচ্ছে রইল।

নির্ঝরিণী দেবরায়
রাইফেল রোড
কলিকাতা-২৬

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

মন্মথনাথ ঘোষের
প্রকৃতি-চেতন উপন্যাস

বনরাজিনীলা

"উপন্যাসটি নামেও যেমন কবিত্বময়, অন্তঃপ্রকৃতিতেও তেমনি সৌন্দর্যরসাপ্লুত। এর মধ্যে সিংভূম ও সাঁওতাল পরগণার বিভিন্ন জাতীয় আদিবাসীঅধ্যুষিত বনভূমির অতি চমৎকার রূপ ও ভাবসম্পদের শক্তির বর্ণনা কাব্যানুভূতিময় ভাষায় অভিব্যক্ত হয়েছে...একটি ভ্রমণ কাহিনীর পটভূমিকায় এক অন্তর্বেদনাক্লিষ্ট জীবনবিমুখ তরুণ প্রাণের শূন্যতাবোধ পূরণের মনস্তাত্ত্বিক ইতিহাস বিন্যস্ত হয়েছে। এরই মাধ্যমে নায়িকার মনে ঔৎসুক্যবোধ সঞ্চারের উপায়স্বরূপ নানা নূতন নূতন দৃশ্য-বৈচিত্র্যের ছবি ও নানা অপরিচিত জীবননীতির কৌতূহলময় দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করা হয়েছে। ভ্রমণের কৌতূহল ও আদিবাসীদের জীবন-প্রথাবৈচিত্র্য ছিন্নমূল জীবনতরুর শিকড়জালে রস-সিঞ্চন করেছে।...বিষয়নির্দেশের রীতিকৌশলেই মুখ্য ও গৌণ স্থান বিনিময় করেছে বলে মনে হয়। উপন্যাসের একেবারে শেষের দিকে মানব পরিচিত অভিভব থেকে মুক্ত হয়ে নিজ স্বাধীন সত্তার পুনরুদ্ধার করেছে। সমস্ত উপন্যাসে মানব-পরিচয় প্রকৃতি পরিচয়ের তুলনায় গৌণরূপে প্রতিভাত হয়েছে। উপন্যাসটিতে প্রকৃতিরূপ-মুগ্ধতা ও তার চেতন-সৌরভ অপূর্ব সূক্ষ্মদর্শিতার সঙ্গে অনাবৃত হয়ে তার সমস্ত আত্মাটাকে যেন পরিব্যাপ্ত করেছে।...প্রকৃতি পরিবেশের বিভিন্নতা ও তার রূপসজ্জার আবেদন-বৈচিত্র্য লেখকের অন্তর্মুখী অনুভব প্রকাশশক্তির সংযোগে অপূর্বভাবে ও প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্যবৈশিষ্ট্যে ফুটে উঠেছে। এই প্রকৃতিচেতনার সৌকুমার্যই উপন্যাসটির প্রধান গৌরব।"

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ সাত টাকা ॥

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
অসামান্য সাহিত্য কীর্তি

নগর পারে রূপনগর ১৮৲

"একটি মাত্র পরিবারের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে, একটু দাম্পত্য সম্পর্কের ঘটনাবিরল কাহিনীর মধ্যে যে কি অদ্ভুত তীব্র উচ্ছ্বাসশক্তির অভিভব-প্রতিরোধ নাটকীয় দ্বন্দ্বের ক্ষেত্র চিহ্নিত করিতে পারে তাহা লেখক অপূর্ব অনুভব ও প্রকাশ-শক্তি দিয়া পরিস্ফুট করিয়াছেন। সমস্ত উপন্যাসটি এক অতি সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক কারুকার্য খচিত, জীবনের গূঢ়সঞ্চারী অনুভূতি কেন্দ্রসমূহের বর্ণনা ও অন্তর-প্রতিবেশের চিত্ররূপ। লেখকের দৃষ্টি সর্বগ্রাসী ও বর্ণিত বিষয়ের তাৎপর্য-ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের অন্তর্দৃষ্টিও তাঁহার সেই পরিমাণে অমোঘ। তাঁহার পদ্ধতি বিখ্যাত আমেরিকান ঔপন্যাসিক হেনরী জেম্স্-এর মনোজ্ঞ ও সমীক্ষারীতির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।...বাস্তবরস প্রধান আধুনিক উপন্যাসের মধ্যে 'নগর পারে রূপনগর' যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থানের অধিকারী তাহা অকুণ্ঠিতভাবে ঘোষণা করা যায়।"

—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (ডঃ)

[প্রায় ৩০০০ শব্দ সম্বলিত সমালোচনার কয়েকটি পংক্তি মাত্র।]

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
গন্নাবেগম ৮৲ শুকসারী কথা ৮॥

অবধূতের
নীলকণ্ঠ হিমালয় ৮॥

প্রবোধকুমার সান্যালের
উত্তর হিমালয় চরিত ১১৲

নির্মলকুমারী মহলানবিশের
বাইশে শ্রাবণ ৬॥

প্রফুল্ল রায়ের
আগাছায়ময় ৮॥ কিন্নরী ৪॥

প্রমথনাথ বিশীর
লালকেল্লা ১৪৲ রবীন্দ্র সরণী ১০৲

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের
হিমালয়ের পথে পথে ৬॥

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
উপকণ্ঠে ৯৲ বহ্নিবন্যা ৮॥

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
অথৈ জল ৫॥ অনুবর্তন ৬৲

স্বামী দিব্যাত্মানন্দের
পুণ্যতীর্থ ভারত ১০৲

স্বামী জগদীশ্বরানন্দের
তপস্বী ভারত ১০৲

বিমল মিত্রের
কড়ি দিয়ে কিনলাম ১ম—১৬৲ ২য়—১৪৲

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
স্বর্গাদপি গরীয়সী ১ম—৭৲ ২য়—৭॥ ৩য়—৬৲

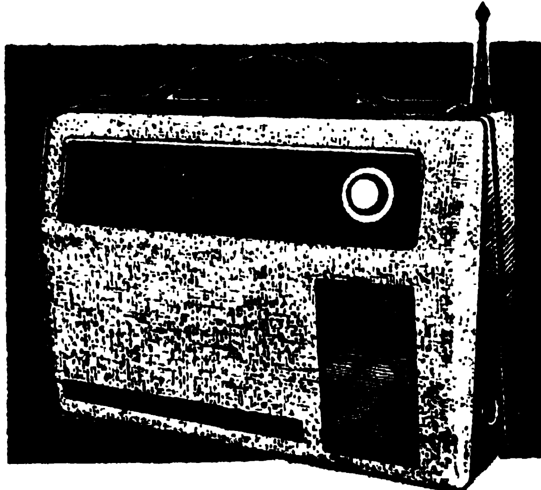
বিমল করের
পরবাস ৪॥ খোয়াই ৩৲

জীবনায়ণ ৫৲ সীমারেখা ৪॥

মিত্র ও ঘোষ : ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২ ফোন : ৩৪-৩৪৯২ ৩৪-৮৭৯১

"অবিচল ধ্বনিপ্রবাহ" সমন্বিত

GEC র [illegible] ট্রানসিস্টর



ঘরে বাইরে যেখানে চান ৩-ব্যাণ্ড অত্যুৎকৃষ্ট এই সেট দুটির বাজনা আপনি যেখানে ইচ্ছা পেতে পারেন।

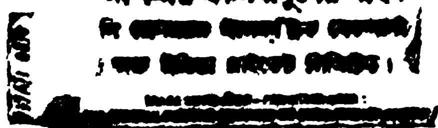
বিসি ৫০৭ : ইলিপ্টিকাল স্পীকার সমেত শক্তিশালী ৮+১ ট্রানসিস্টর ৩ ব্যাণ্ড পোর্টেবল রিসিভার—উন্নত ধরণের সিগন্যাল-টু-নয়েজ রেশিও—হাই-লো স্বর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা—সুদৃশ্য কেবিনেট। ৫২৮৲ টাকা উৎপাদন শুল্ক সমেত—স্থানীয় কর অতিরিক্ত।



বিসি ৮২৩ : ৭+১ ট্রানসিস্টর ৩ ব্যাণ্ড টেবিল মডেল—অবিচল স্বর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা —[illegible]—বড় স্পীকার—[illegible] আওয়াজ—লো-লাইন কাঠের কেবিনেট। ৩৭৫৲ টাকা—উৎপাদন শুল্ক সমেত। স্থানীয় কর অতিরিক্ত।



GEC



৭ম বর্ষ
৩য় খণ্ড

অমৃত

৩৮শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday 26th January, 1968. শুক্রবার, ১২ই মাঘ, ১৩৭৪ 40 Paise

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২ প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেণ্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

		কলিকাতা		মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা	২০-০০	টাকা	২২-০০
ষাণ্মাসিক	টাকা	১০-০০	টাকা	১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা	৫-০০	টাকা	৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

সূচীপত্র

আজই সংগ্রহ করুন মনোরঞ্জন রায়ের
গেরিলা যুদ্ধ কি ও কেন ১·৫০
প্রকাশক :
অন্নপূর্ণা প্রকাশনী
১/২ জ্যাকসন লেন, কলিঃ—১
প্রাপ্তিস্থান :
কথা ও কাহিনী
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিঃ—১২
শিয়ালদহ ও হাওড়া স্টেশনের বুকস্টল

পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস ও সংস্কৃতি প্রসঙ্গে

'অমৃতে'র ৩৪শ সংখ্যায় (৭ম বর্ষ) 'পর্যটক' ইতিহাস ও সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্র পশ্চিমবঙ্গ' শিরোনামায় সুলিখিত প্রবন্ধটিতে বাংলাদেশের বহু প্রাচীন দর্শনীয় বস্তুর সন্ধান দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। এগুলো উৎসাহী ও অনুসন্ধিৎসু পাঠকের প্রেরণা জোগাবে সন্দেহ নেই।

লেখক নদীয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দ মজুমদার ও তৎপ্রসঙ্গে মাটিয়ারীর (বানপুর) নাম সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করেছেন। এই প্রসঙ্গে আমি আরও দু একটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই।

ভবানন্দ মজুমদার যখন মাটিয়ারীতে রাজধানী স্থাপন করে বসবাস করছিলেন তখন তিনি ঐ গ্রামে একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। বহু প্রাচীন বকুলগাছ বেষ্টিত ঐ শিবমন্দিরটি সমুদয় অঞ্চলের ভক্তিও আকর্ষণের বস্তু। চৈত্র-সংক্রান্তির গাজন উপলক্ষে ঐ মন্দির প্রাঙ্গণে বহু সন্ন্যাসীর সমাবেশ হয় এবং একটি মেলা হয়ে থাকে। রাজপরিবার কৃষ্ণনগরে উঠে যাবার পূর্বে মাজদিয়ার সন্নিকটে ইছামতীর তীরে কিছুকাল বসবাস করেন ও কয়েকটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ স্থানটির নামকরণ করেন 'শিবনিবাস'। এইসব থেকে মনে হয় তাঁরা শৈব ছিলেন।

প্রসঙ্গত, ভবানন্দ মজুমদার যশোর জেলার ভূশালীর কায়স্থ বংশজ শ্রীশ্রীবল্লভ দে-কে দেওয়ান নিযুক্ত করে মাটিয়ারীতে আনেন এবং তাঁকে ঐ গ্রামে বসবাসের বস্তুজমি ও অন্যান্য সম্পত্তি দান করেন। সেই দানপত্রটি আজ ইতিহাসের উপাদান হয়ে আছে। পরে শ্রীবল্লভের বিচক্ষণতা ও বিশ্বস্ততার জন্য ভবানন্দ তাঁকে 'বিশ্বাস' উপাধি দান করেন। শ্রীবল্লভ মহারাজার অনুমতি নিয়ে তাঁর বসতবাড়ীতে দুর্গোৎসব শুরু করেন। ৩০০ বৎসরেরও অধিক একাদিক্রমে ঐ উৎসবটি পালিত হয়ে আসছে। এটি বাংলাদেশের মধ্যে অন্যতম প্রাচীন দুর্গোৎসব বলে মনে হয়। পরবর্তীকালে শ্রীবল্লভের কনিষ্ঠপুত্র মধুসূদন কাশী থেকে পদব্রজে শালগ্রাম শিলা মাথায় করে এনে নারায়ণ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। নারায়ণের নিত্যসেবা আজও চলছে। মাটিয়ারীতে শ্রীবল্লভের বংশধরেরা স্কুল, হাসপাতাল প্রভৃতি অনেক জনহিতকর প্রতিষ্ঠান তৈরী করে দিয়েছেন। বর্তমান লেখক ঐ বংশের সন্তান।

মনতোষ বিশ্বাস,
লণ্ডন।

প্রমোদ ও শিল্প

অমৃত ক্রীড়া ও বিনোদন সংখ্যায় প্রখ্যাত অভিনেতা অভিনেত্রীর চিন্তা বিষয়ে মতামত প্রকাশিত হয়েছে। 'অমৃত'-এর তরফ থেকে তাঁদের কাছে কয়েকটি প্রশ্ন রাখা হয়েছিল। তার মধ্যে একটি হচ্ছে 'চলচ্চিত্র প্রমোদমাধ্যম না শিল্পমাধ্যম।' এই প্রশ্নটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আজকাল প্রায়ই তোলা হয়ে থাকে। কিন্তু প্রশ্নটির গোড়াতেই গলদ রয়েছে। প্রমোদ ও শিল্পকে যেন পরস্পর-বিরোধী দুটি জিনিষ মনে করা হচ্ছে। আসলে কিন্তু প্রমোদ ও শিল্পের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। শুধু তাই নয় শিল্প মাত্রই প্রমোদ মাধ্যম। যে শিল্প কারোর প্রমোদের উপকরণ নয় তা শিল্পই নয়। তবে এও ঠিক যে একই বস্তু সকলের প্রমোদের উপকরণ হতে পারে না। পিকাসোর কোন বিখ্যাত ছবি থেকে আমি হয়ত বিন্দুমাত্র আনন্দ পাবো না, কিন্তু কোনও শিল্পরসিক ব্যক্তি সেই ছবির সামনে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা নির্মল আনন্দ উপভোগ করতে পারেন। চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও তাই। যে ছবি শিল্প-গুণসম্পন্ন নয় তা কোনও প্রমোদচিত্রও হতে পারে না। আবার শিল্প সমৃদ্ধ ছবি রসিকজনের প্রমোদের উপকরণ হতে বাধ্য।



যেমন, সত্যজিৎ রায়ের 'মুক্তি' আবালবৃদ্ধবনিতার মনোরঞ্জন করেছিল। ঋত্বিক ঘটকের 'মেঘে ঢাকা তারা' সারা দেশে বোধহয় হাজার হাজার লোকের প্রিয় হয়েছিল কিনা সন্দেহ। কিন্তু দুটিই শিল্পসমৃদ্ধ ছবি এবং সেই হেতু দুটিই প্রমোদচিত্র।

আমরা ভুল করে অনেক সময় চটুল গানভরপুর বোম্বাই মার্কা ছবিকে প্রমোদচিত্র আখ্যা দিয়ে থাকি। কিন্তু তা ঠিক নয়। এসব ছবিতে ভিড় হয় ঠিকই তবে, তা প্রকৃত প্রমোদের জন্যে নয়। দৈনন্দিন অসহায়তার হাত থেকে উদ্‌ভ্রান্ত দর্শককে কিছুক্ষণ ভুলিয়ে রাখার নাম যদি প্রমোদ বিতরণ হয় তাহলে আফিংই হচ্ছে সব থেকে বড় প্রমোদের উপকরণ। চটুল ছবি দেখে দর্শক কিছুক্ষণ ভুলে থাকে ঠিকই তবে তা প্রমোদ উপভোগ নয় তা হল আফিংখোর-এর ভুলে থাকা। কিন্তু পথের পাঁচালীতে অপুর কাহিনী দর্শকের আত্মবিস্মরণ ঘটায় না, বরং ছবির মধ্যে দর্শক নিজেকে আবিষ্কার করে তাই পথের পাঁচালীই প্রকৃত প্রমোদচিত্র। সুতরাং চলচ্চিত্র শিল্পমাধ্যম এবং সেইহেতুই সে প্রমোদ-মাধ্যম।

দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়,
কলিকাতা—১৯।

"হাছন্ রাজা" প্রসঙ্গে

গত সংখ্যায় শ্রীশীতাংশু পাঁজা মহাশয়ের 'হাছন রাজা' (রেজা-রজা-রাজা) প্রবন্ধের জন্য তাঁকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু পাঁজা মহাশয় হাছন রাজার বংশ সম্বন্ধে ভুল পরিচিতি দিয়েছেন। হাছন-রাজার পিতা শ্রীহট্টের সদর মহকুমার কৌড়িয়া পরগণার অন্তর্গত রামপাশার সুপ্রসিদ্ধ দেওয়ান (বড় জমিদার) আলী রজা সাহেব শ্রীহট্টের জগন্নাথপুরের রাজা বিজয় সিংহের বংশধর ছিলেন। বিজয় সিংহ ভরদ্বাজ গোত্রীয় বৈদিক্ ব্রাহ্মণ ছিলেন। শ্রীহট্টের 'সিংহ' উপাধিধারী হিন্দু রাজারা বৈদিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, লাউড়ের রাজা দিব্যসিংহ কাত্যায়ণ গোত্রীয় বৈদিক্ ব্রাহ্মণ ছিলেন, এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বলে খ্যাত শ্রীশ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদ তাঁহার মাতুলস্থানীয় ছিলেন। আলী রজা সাহেব সুনামগঞ্জ শহর সন্নিকটস্থ লক্ষণশ্রীর জমিদার মহঃ আমীর চৌধুরীর বিধবা পত্নীকে বিবাহ করে লক্ষণশ্রীর জমিদারী প্রাপ্ত হন। এই লক্ষণশ্রী গ্রামেই হাছন রাজার জন্ম হয়। হাছন রাজার বৈমাত্রেয় ভগিনী সহিফাবানু একজন স্বভাবকবি ছিলেন। এখানে বলা আবশ্যক যে, হাছন রাজার পরে একলিম রজাও একজন প্রসিদ্ধ মরমী কবি। তাঁহার একটি বিখ্যাত গানের প্রথম পদ হঠাৎ মনে পড়লো—

"অন্তরে বৈরাগীর লাউ বাজে
সজনী গো—
অন্তরে বৈরাগীর লাউ বাজে।।"

সুরেশচন্দ্র দেবনাথ
কাঁচুগঞ্জ, এলাহাবাদ।

সৌন্দর্য প্রসঙ্গে

গত ৬ই পৌষ তারিখে অমৃতে প্রকাশিত অঙ্গনা বিভাগে শ্রীমতী রমা সরকারের 'সৌন্দর্য' লেখাটা পড়ে অত্যন্ত প্রীত হলাম। লেখিকা জীবনের একটা খুব মূল্যবান অবস্থার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য তাঁকে অসংখ্য ধন্যবাদ। যৌবনশ্রী দীর্ঘস্থায়ী করতে হলে ও স্বাস্থ্য অটুট রাখতে হলে আমাদের জীবনে যে কতটা নিয়ম ও সংযমের প্রয়োজন সেকথা তিনি বারবার উল্লেখ করে সতর্ক করে দিয়েছেন। আমার ধারণা এই লেখাটি পড়ে আমরা অনেকেই কিছু না কিছু সাবধান হতে চেষ্টা করবো। কারণ এই পৃথিবীতে আমরা সবাই যৌবনদীপ্তির আলো ছড়িয়ে সুন্দর হয়ে বেঁচে থাকতে চাই।

লেখিকার মতে অকালবার্ধক্য, জরা ও ব্যাধির হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে হলে সংযমের নিয়মগুলি আমাদের স্মরণ রাখতে হবে এবং সেগুলি যথাসম্ভব মেনে চলতে হবে। নাহলে উচ্ছৃঙ্খলতা, অনিয়ম, অসংযম আমাদের যৌবনলাবণ্যকে এমনভাবে নষ্ট করে দিতে পারে যা স্নো, ক্রীম, পাউডারের প্রলেপেও ঢেকে রাখা যাবে না।

মালেকা খাতুন,
নপাড়া, রাজীবপুর,
২৪-পরগনা

সম্পাদকীয়

ছাব্বিশে জানুয়ারী

ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার অনেক আগেই এ-দেশের সংগ্রামী মানুষ ঘোষণা করেছিল স্বাধীনতার সংকল্প-বাক্য। দিনটি ছিল ছাব্বিশে জানুয়ারী। একটা পরশাসনক্লিষ্ট জাতির পক্ষে এই সংকল্প ছিল জীবনের পূর্ণতার আহ্বান। রাজনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া এই পূর্ণতা কিছুতেই সম্ভব ছিল না। স্বাধীনতা লাভের পর সেই সংকল্পের রকমফের হয়েছে মাত্র লক্ষ্য আছে স্থির উদ্দাম রয়েছে অবিচল। প্রতিটি দুঃখী মানুষের চোখের জল যেদিন মুছে দেওয়া সম্ভব হবে সেদিনই হবে স্বাধীনতার সার্থকতা, এ-কথা বলেছিলেন গান্ধীজী। তখনও স্বাধীনতা ছিল অনেক দূরে। শুধু আত্মদানের আহ্বান এসেছিল সেদিন। কিন্তু স্বাধীনতার পর কী ধরনের সমাজ আমরা চাই, তার ইঙ্গিত ছিল স্পষ্ট। আজ তার হিসাব-নিকাশের দিন। ছাব্বিশে জানুয়ারী সে-কথাই আমাদের মনে করিয়ে দেয়।

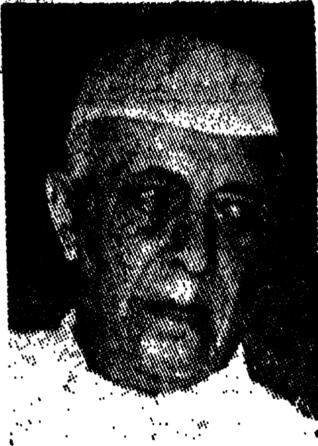
স্বাধীন ভারতবর্ষ এই দিনটিতে গ্রহণ করেছিল সাধারণতন্ত্রের সংবিধান। পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে। আজ থেকে আঠারো বছর আগে ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীন ভারতের নতুন সংবিধান প্রবর্তিত হয়। সেদিন থেকেই ভারতবর্ষ একটি সাধারণতন্ত্র জনগণের সম্মতির ওপর তাদের কল্যাণে জন্য যার প্রতিষ্ঠা। এরপর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হয়েছে। ইতিমধ্যে রাষ্ট্রের লক্ষ্য ঘোষিত হয়েছে গণতান্ত্রিক সমাজবাদ। সামাজিক কল্যাণের জন্য রাষ্ট্রের হাতে যতটা সম্ভব ক্ষমতা তুলে দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রবর্তন করে সামাজিক উন্নয়নের কাজে হাত দেওয়া হয়েছে। জাতীয় আয় যাতে ব্যক্তিগত সঞ্চয়কে স্ফীত করে সমাজের বঞ্চনা না বাড়াতে পারে তার জন্য সতর্ক ব্যবস্থা গ্রহণ করাও সাধারণতন্ত্রী ভারতের অন্যতম লক্ষ্য।

তা সত্ত্বেও সাধারণতন্ত্র দিবসে প্রাণখুলে এ-কথা বলতে পারছি না যে, আমাদের লক্ষ্য পূরণ হয়েছে, আমরা সংকল্প রক্ষা করতে পেরেছি। পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্রের উদার ও ব্যাপক ব্যবস্থা সত্ত্বেও ত্রুটি ঘটছে, সাফল্য হচ্ছে বিলম্বিত। উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজে শিল্প ও কৃষির ওপর সমান ঝোঁক না থাকায় আমাদের অর্থনীতিতে বিড়ম্বনা ঘটছে। তিনটি পরিকল্পনার পর শিল্পক্ষেত্রে মন্দা আমাদের ভবিষ্যৎ উন্নয়নকে সংশয়গ্রস্ত করে তুলেছে। এদিকে কৃষিখাতে উৎপাদন বাড়লে জনসংখ্যার অনুপাতে তার হার কম এবং এখনও আমাদের কৃষি-অর্থনীতি মূলত আকাশ-নির্ভর বলে কখনও খরা, কখনও প্লাবন আমাদের ক্ষেতের ফসলের ভাগ্য করে রেখেছে অনিশ্চিত। অথচ জীবিকার সংস্থান বাড়াতে হলে এবং জীবনযাত্রার মান উঁচু করতে হলে শুধু কৃষির ওপর নির্ভর করলে চলে না। কিন্তু কোথায় ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে তা পরিকল্পনা-প্রণেতার চিন্তা করে দেখুন। নতুবা তিনটি পরিকল্পনার পর এভাবে আমাদের মাথায় হাত দিয়ে বসতে হবে কেন?

অন্যান্য ক্ষেত্রেও ভারতকে এই দিনটিতে আত্মসমালোচনা করে দেখতে হবে যে, কেন আমাদের সমস্ত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আশানুরূপ সাফল্য লাভ করতে পারিনি। গত দুই দশক আমরা বড় বেশি আন্তর্জাতিকতাবাদী ছিলাম। নিশ্চয়ই এ-যুগে কোনো দেশই দ্বৈপায়ন নীতি অনুসরণ করে চলতে পারে না। কিন্তু নিজের ঘর না সামলে আমরা অপরের ঘরের শান্তি প্রতিষ্ঠান জন্য মুরুব্বিগিরি না করলেও পারতাম। বিদেশে খুব বেশি বন্ধু কি আমাদের আছে? কেন নেই তা আমরা যেন নিজেদেরই জিজ্ঞাসা করি। যারা আমাদের অকৃত্রিম সুহৃদ, তাদের বন্ধুত্বের মর্যাদা আমরা রক্ষা করে চলবো। কিন্তু যারা আমাদের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ, আমাদের দেশের অনিষ্ট করাতেই যাদের লাভ, তাদের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে আমাদের। আত্মরক্ষার ক্ষমতা না থাকলে কোনো জাতিই মর্যাদা দাবী করতে পারে না। দুর্বলতাকে যেন আমরা উদারতা বলে নিজের মনকে চোখ না ঠারি। যে-জাতি যত বেশি নিজের দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতন তার পক্ষেই নতুন শক্তি সঞ্চয় সম্ভব। অর্থনীতি, প্রতিরক্ষানীতি, মৈত্রীনীতি সকল দিকেই নতুনতর শক্তি অর্জনের আহ্বান আজ এসেছে। সামনে গিরি দুর্গম, মরু ও দুস্তর কিন্তু তার মধ্যেই পথ চিনে চিনে এগিয়ে যেতে হবে পঞ্চাশ কোটি মানুষকে।

আমরা জানি মানুষের জয় একদিন হবেই। ভুলভ্রান্তি, দোষত্রুটি কাটিয়ে সমগ্র জাতির উন্নয়নের জন্য এক মন এক প্রাণ হয়ে কাজ করতে হবে। দল ও মতের পার্থক্য যাই থাকুক না কেন, কোনো দেশপ্রেমিক মানুষই এ-বিষয়ে দ্বিমত হবেন না যে, শোষণের অবসান এবং বঞ্চিতের মুক্তি সমাজতান্ত্রিক আদর্শের মূল লক্ষ্য। ভারতবর্ষ সেই লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে। তার জয়যাত্রা সফল হোক। ছাব্বিশে জানুয়ারী সেই আদর্শের প্রতীক, সংকল্পের স্মারক। তার সার্থকতা উজ্জীবিত করুক ভারতের সাধারণ মানুষকে।





প্রথম প্রধানমন্ত্রী
জওহরলাল নেহরু

তি ন
জ ন



দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী
লালবাহাদুর শাস্ত্রী



বর্তমান প্রধানমন্ত্রী
ইন্দিরা গান্ধী

সতের বছরের সাধারণতন্ত্র

যোগনাথ মুখোপাধ্যায়

রাজনৈতিক উত্থানপতন, সাংবিধানিক সঙ্কট, নানা ধরনের বিক্ষোভ ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্যে সাধারণতন্ত্রী ভারতের সতের বছর কেটে গেল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে তৃতীয় সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত এদেশের রাষ্ট্রীয় কর্মসূচী যে রীতি অনুসরণ করে চলে তা অপরিবর্তিত ও অব্যাহত রাখার সার্থকতা নিয়ে সবচেয়ে জোরালো প্রশ্ন তোলে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে প্রতিফলিত জনমত—যা বিশ্বের এই বৃহত্তম সাধারণতন্ত্রের বিগত বর্ষের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। গত বছর সাধারণ নির্বাচনের আগে ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ভুবনেশ্বরে একটি দারুণ শঙ্কাজনক ঘটনা ঘটে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সেখানে একটি নির্বাচনী সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে উচ্ছৃঙ্খল জনতার ছোঁড়া ইটের আক্রমণে আহত হন। এতে অনেকেরই আশঙ্কা হয়েছিল, সাধারণ নির্বাচন হয়ত শান্তিপূর্ণভাবে শেষ করা সম্ভব হবে না। সৌভাগ্যের বিষয়, সে আশঙ্কা মিথ্যা প্রমাণিত হয়, কিন্তু সাধারণ নির্বাচনে যে জনমতের অভিব্যক্তি ঘটে তা কেউই প্রায় আশা করতে পারেন নি।

কেন্দ্রে কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বহু পরিমাণে হ্রাস পেলেও একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অক্ষুন্ন থাকে। সেকারণে ১২ই মার্চ তারিখে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে চতুর্থ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। কিন্তু রাজ্য ও কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলগুলির নির্বাচনে কংগ্রেসকে অপ্রত্যাশিত বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়। চতুর্থ নির্বাচনের প্রাক্‌কালে রাজ্যগুলির মধ্যে শুধু কেরল ও নাগাভূমিতে এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মধ্যে শুধু গোয়ায় কংগ্রেস দলের শাসনকর্তৃত্ব কায়েম ছিল না। কেরলে ছিল রাষ্ট্রপতির শাসন, নাগাভূমির শাসনকার্য পরিচালনা করছিলেন কংগ্রেস সমর্থিত জাতীয় ফ্রন্ট দল। আর গোয়ায় শাসনকার্য পরিচালনা করছিলেন মহারাষ্ট্রবাদী গোমন্তক দল। কিন্তু চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস দল পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ, কেরল, রাজস্থান ও পাঞ্জাব—এই সাতটি রাজ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে ব্যর্থ হলেন। তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজ এবং শ্রীপাতিল ও শ্রীঅতুল্য ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্ট কংগ্রেসনেতারা নির্বাচনে পরাজিত হলেন। শ্রীপ্রফুল্ল সেন, শ্রীকৃষ্ণবল্লভ সহায়, শ্রীবিজু পট্টনায়েক, শ্রীশঙ্কর প্রমুখ বহু প্রাক্তন ও তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীও পুনর্নির্বাচিত হতে পারলেন না। ফলে উল্লেখিত রাজ্যগুলির মধ্যে অনতিবিলম্বে পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ, কেরল ও পাঞ্জাবে অকংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। তবে শুধু মাদ্রাজ ছাড়া সর্বত্র গঠিত হয় বিভিন্ন অকংগ্রেসী দলের সংযুক্ত মন্ত্রিসভা। তার কারণ, শুধু মাদ্রাজেই ডি এম কে দল একক শক্তিতে রাজ্য বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছিলেন; উড়িষ্যায় স্বতন্ত্র দল ও জনকংগ্রেস মিলিত শক্তিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেন, তাই ঐ দুই দলের সহযোগিতায় গঠিত হয় ঐ রাজ্যের মন্ত্রিসভা। কিন্তু কেরল, পাঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের জন্য সাত থেকে চোদ্দটি পর্যন্ত ছোট বড় দলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হয়, এবং কংগ্রেস-বিরোধিতাই ঐ ঐক্যের একমাত্র সূত্র হয়। স্বতন্ত্র, জনসঙ্ঘ কম্যুনিস্ট, মুসলিম লীগ, গান্ধীবাদী, জাতীয়তাবাদী প্রভৃতি একসঙ্গে জোট বাঁধেন, অকংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠন করতে। কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত রাখাই তখন অকংগ্রেসী দলগুলির কাছে সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক কর্তব্য বলে মনে হয়।

রাজস্থানে কংগ্রেস দল অল্পের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেন নি। আবার বিরোধী দলগুলির সংখ্যাগরিষ্ঠতাও সুনিশ্চিত ছিল না। তাঁরা হয়ত নির্দলীয়দের সঙ্গে জোট বেঁধে একটা মন্ত্রিসভা গঠন করতে পারতেন, কিন্তু মন্ত্রিসভা স্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা কম ছিল। এসবের জন্য ২৩শে মার্চ তারিখে রাজস্থানে অস্থায়ীভাবে রাষ্ট্রপতির শাসন কায়েম হয়। রাজস্থানের বিরোধী দলগুলি কিন্তু কেন্দ্রের এই হস্তক্ষেপকে ন্যায্য বলে গ্রহণ করতে পারেননি। ফলে রাষ্ট্রপতির শাসন কায়েম হওয়ার পরেই সে রাজ্যে কংগ্রেস-বিরোধী দলগুলি প্রচণ্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি করে। কিন্তু, ঐ বিক্ষোভ শান্ত হওয়ার কয়েকদিন পরেই বিরোধী দলের বিশেষ করে জনসঙ্ঘ ও স্বতন্ত্র দলের কয়েকজন সদস্য দলত্যাগ করে কংগ্রেসে যোগ দেওয়ায় কংগ্রেস রাজস্থান বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে পরিণত হন, ও বিরোধী দলগুলির মন্ত্রিসভা গঠনের দাবীর জোর কমে যায়।

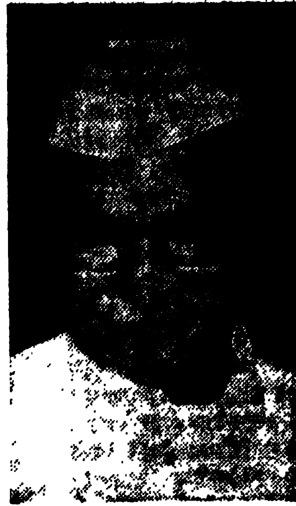
এই রাজস্থানে ২৬শে এপ্রিল তারিখে শ্রীমোহনলাল সুখাড়িয়ার নেতৃত্বে রাজস্থানে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। দলত্যাগী সদস্যদের জোরে রাজস্থানে ক্ষমতা ফিরে পেলেন কংগ্রেস দল।

কিন্তু একই কারণে ক্ষমতা হারাতে হল কংগ্রেসকে সদ্যগঠিত রাজ্য হরিয়ানায় ও উত্তরপ্রদেশে। দুটি রাজ্যেই কংগ্রেস দলের কমবেশী সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল, এবং সে কারণে কংগ্রেসের নেতৃত্বেই ঐ দুই রাজ্যে প্রথম মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। কিন্তু কংগ্রেস সদস্যদের দলত্যাগের জন্য সে মন্ত্রিসভা পক্ষকালের জন্যও স্থায়ী হতে পারেনি। রাও বীরেন্দ্র সিং-এর নেতৃত্বে একদল কংগ্রেস সদস্য কংগ্রেস ত্যাগ করায় ২২শে মার্চ তারিখে হরিয়ানায় শ্রীভগবৎদয়াল শর্মার নেতৃত্বে গঠিত কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার পতন হয়, এবং তার দুইদিন পরে রাও বীরেন্দ্র সিং-এর নেতৃত্বে গঠিত হয় সে রাজ্যের অকংগ্রেসী মন্ত্রিসভা। ঠিক একইভাবে উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার পতন ঘটান শ্রীচরণ সিং। তিনি সদলবলে কংগ্রেস পরিষদীয় দল ত্যাগ করায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়ে শ্রী সি বি গুপ্তর নেতৃত্বে গঠিত কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাকে ১লা এপ্রিল পদত্যাগ করতে হয়, আর তার পরদিন শ্রীচরণ সিং উত্তরপ্রদেশের নতুন মুখ্যমন্ত্রীরূপে শপথ গ্রহণ করেন। জনসংঘ, এস এস পি, পি এস পি, কম্যুনিস্ট পার্টি ও স্বতন্ত্র দল একজোট হলো শ্রীচরণ সিং-এর নবগঠিত জনক্রান্তি দলের সঙ্গে।

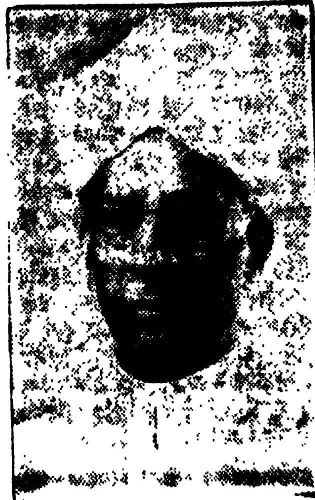
উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার পতন হওয়ার পর একই কারণে পাঁচ মাস পরে, আগস্ট মাসে মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে হঠাৎ বিদ্রোহী হলেন শ্রীগোবিন্দনারায়ণ সিং এবং ৩৬ জন কংগ্রেসী এম-এল-এ সহ ত্যাগ করলেন কংগ্রেসী পরিষদীয় দল। সুতরাং শ্রী ডি পি মিশ্রকেও বিদায় নিতে হল। এইভাবে দলত্যাগের সুযোগে শুধু রাজস্থানে ক্ষমতালাভ করলেন কংগ্রেস দল, আর ক্ষমতা হারাতে হল, তাঁদের কনিষ্ঠতম রাজ্য হরিয়ানায়, সর্বাধিক জনবহুল রাজ্য উত্তরপ্রদেশে, আর আয়তনে বৃহত্তম রাজ্য মধ্যপ্রদেশে। ভারতের সতেরোটি রাজ্যের মধ্যে কংগ্রেসের শাসনাধীন থাকল শুধু আসাম, কাশ্মীর, রাজস্থান, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, মহীশূর ও অন্ধ্র।

কিন্তু দল ভাঙাভাঙির পালা এখানেই সাঙ্গ হল না। কারণ কোন কোন নীতিজ্ঞান-বর্জিত বিধানসভার সদস্যরা এরই মধ্যে দেখতে পেলেন আখের গুছিয়ে নেওয়ার সুবর্ণ সুযোগ। দলত্যাগ করলেই মন্ত্রী হওয়া যায়, আর মন্ত্রী না হলে নগদ পাওনাও কিছু কম হয় না। সুতরাং 'আয়ারাম' ও 'গয়ারাম'দের আর পায় কে! দলত্যাগ সবচেয়ে নগ্ন, নির্লজ্জ ও সংক্রামক রূপ নিল হরিয়ানায়। মাত্র ৭৯ সদস্যবিশিষ্ট হরিয়ানা বিধানসভায় ন্যূনতম সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রাখতে ৩২ জনকে মন্ত্রী করলেন রাও বীরেন্দ্র সিং! কিন্তু তাতেও তিনি শেষ রক্ষা করতে পারলেন না। দারুণ অস্থিরতার জন্যে গত ২০শে নভেম্বর

তিন জন



প্রথম রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ



দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণ



বর্তমান রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন

হরিয়ানায় রাষ্ট্রপতির শাসন কায়েম হল ও ভেঙে দেওয়া হল সে রাজ্যের বিধানসভা। হরিয়ানা বিধানসভার কোন কোন সদস্য আট মাসের মধ্যে দল বদলিয়েছিলেন পাঁচবার।

এর পরেই পাঞ্জাবে খেল দেখালেন শ্রীলছমন সিং গিল। হঠাৎ পনেরোজন সদস্য সঙ্গে নিয়ে তিনি সংযুক্ত মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে চলে গেলেন। ফলে গত ২২শে নভেম্বর অর্থাৎ হরিয়ানায় রাষ্ট্রপতির শাসন কায়েম হওয়ার মাত্র দু দিন পরে পাঞ্জাবেও অকংগ্রেসী মন্ত্রিসভার পতন হল। ২৫শে নভেম্বর কংগ্রেসের সমর্থনে পাঞ্জাবে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করলেন শ্রীলছমন সিং গিল, তাঁর সঙ্গে দলত্যাগী প্রত্যেককে মন্ত্রিসভায় স্থান দিয়ে। সুতরাং মন্ত্রী হওয়ার জন্যই যে ঐ ষোলজন দলত্যাগ করেছিলেন তাতে আর সন্দেহ কি?

নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতেও। এই রাজ্যে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় ভাঙনের প্রথম লক্ষণ প্রকাশ পায় গত ৩রা নভেম্বর। ঐদিন যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার খাদ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ পদত্যাগ করেন এবং পদত্যাগপত্র সরাসরি রাজ্যপালের কাছে পেশ করেন, আর সেই সঙ্গে রাজ্যপালকে জানিয়ে দেন যে, আরও ১৭ জন এম-এল-এ তাঁর সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট ত্যাগ করেছেন। স্বভাবতই এর পর রাজ্য বিধানসভায় যুক্তফ্রন্ট দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় সন্দেহ জাগে এবং রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর রাজ্যের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়কে অনতিবিলম্বে বিধানসভা ডেকে তাঁর দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রমাণ দিতে আহ্বান জানান। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শে রাজ্যপাল ডঃ ঘোষের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেন এবং ডঃ ঘোষ তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে প্রোগ্রেসিভ ডিমক্রাটিক ফ্রন্ট নামে একটি নতুন পরিষদীয় দল গঠন করেন। পাঞ্জাবের মত এখানেও কংগ্রেস দল

ঘোষণা করেন, ডঃ ঘোষের নেতৃত্বে রাজ্যে নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হলে তাঁরা সেই মন্ত্রিসভাকে [illegible] জানাবেন এবং [illegible] নতুন [illegible] যোগ দেবেন।

অপর [illegible] দাবী জানালেন, ডঃ ঘোষের [illegible] কয়েকজন এম-এল-এ দলত্যাগ করলেও যুক্তফ্রন্ট বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারায় নি এবং যথাসময়ে এর প্রমাণ তাঁরা দেবেন। যুক্তফ্রন্ট ১৮ই ডিসেম্বর বিধানসভা আহ্বানের সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু রাজ্যপাল আরও আগে বিধানসভা ডাকতে বললেন। রাজ্যপালের আপত্তিতে যুক্তফ্রন্ট নেতৃবৃন্দ আবার আলোচনায় বসলেন, কিন্তু সবদিক বিচার-বিবেচনা করে স্থির করলেন, ১৮ই ডিসেম্বরের আগে তাঁদের পক্ষে বিধানসভার অধিবেশন ডাকা সম্ভব হবে না। যুক্তফ্রন্ট দলের এই সিদ্ধান্ত ঘোষিত হওয়ার পরেই রাজ্যপাল স্বীয় সাংবিধানিক ক্ষমতাবলে ২১শে নভেম্বর রাত্রে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে অকস্মাৎ বাতিল করলেন ও সেই রাত্রে ডঃ ঘোষ মুখ্যমন্ত্রীরূপে শপথ নিয়ে গঠন করলেন নতুন মন্ত্রিসভা। ডঃ ঘোষের পরামর্শে রাজ্যপাল ২৯শে নভেম্বর বিধানসভার অধিবেশন ডাকলেন।

প্রবল উত্তেজনার মধ্যে ২৯শে নভেম্বর বিধানসভার অধিবেশন বসল। স্পীকার শ্রীবিজয় বন্দ্যোপাধ্যায় সভাকক্ষে প্রবেশ করলেন। তারপরেই তিনি ঘোষণা করলেন, এই অধিবেশন তিনি অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখতে চান। কারণ বিধানসভা সংবিধানসম্মত পথে আহুত হয়েছে বলে তিনি মনে করতে পারছেন না। তাঁর মতে মন্ত্রিসভা গড়ার বা ভাঙার ক্ষমতা শুধু বিধানসভারই আছে, সে অধিকার বিধানসভার হয়ে অন্য কেউ প্রয়োগ করতে পারেন না। সুতরাং বিধানসভার অনাস্থা প্রস্তাবে অজয় মন্ত্রিসভা পরাজিত না হওয়া সত্ত্বেও তাকে খারিজ করে 'বেআইনীভাবে' যে ঘোষ মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে তার পরামর্শে রাজ্যপাল যে বিধানসভার অধিবেশন ডেকেছেন তা আইনসংগতভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে না।

মনের মতন গহনা
বি. সরকার এণ্ড সন্স
সন অব লেট এম. বি. সরকার
১২৪, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২, ফোন: ৩৪-৯২০৩

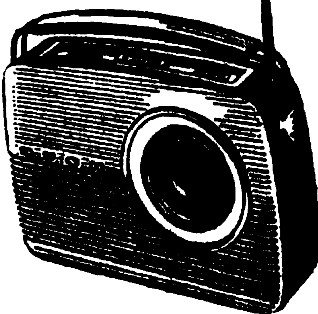
স্পীকারের এই রুলিং-এর পরেই পশ্চিমবঙ্গ বিধানমণ্ডলীর অধিবেশন রাজ্যপালের নির্দেশে বন্ধ হয়ে যায়। সে অধিবেশন আবার কবে ডাকা হবে তা নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা চলছে। কিন্তু অধিকাংশ সংবিধানবিশেষজ্ঞের ধারণা, স্পীকার যদি তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থাকেন তবে এই রাজ্যের সাংবিধানিক সংকটের কোন সমাধান হবে না। এবং ৩১শে মার্চের মধ্যে বিধানমণ্ডলীর অধিবেশন স্বাভাবিকভাবে শুরু না হলে ঘোষ মন্ত্রিসভার অস্তিত্ব বজায় রাখা কঠিন হবে। যুক্তফ্রন্টের অন্তর্গত সবকটি দলই নতুন নির্বাচনের দাবী তুলেছেন এবং বর্তমান মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে তাঁরা ইতিমধ্যে দু দফা আন্দোলন পরিচালিত করেছেন। যুক্তফ্রন্টের তৃতীয় দফা আন্দোলন শুরু হবে ২৬শে জানুয়ারী থেকে। এই সব আন্দোলন যদি চলতে থাকে এবং স্পীকারের রুলিংজনিত সাংবিধানিক সংকটের কোন প্রতিকার যদি না হয় তাহলে এ রাজ্যেও জটিল সংকট বাড়বে বই কমবে না।

উত্তরপ্রদেশ ও বিহারেও যুক্তফ্রন্ট সরকারের অবস্থা ভাল নয়। উত্তরপ্রদেশে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচরণ সিং-এর সঙ্গে যুক্তফ্রন্টের কয়েকটি শরিকের অনেক দফা বিরোধ ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। যার ফলে প্রথমে কম্যুনিস্ট পার্টির মন্ত্রীরা, পরে এস-এস-পি দলের মন্ত্রীরা মন্ত্রিসভা থেকে বেরিয়ে এসেছেন। কিন্তু কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত রাখার জন্য তাঁরা চরণ সিং মন্ত্রিসভাকে সমর্থন জানিয়ে যাচ্ছেন। তবু এই রকম একটা একটা জোড়াতালি দেওয়া অবস্থা খুব বেশী দিন চলবে বলে মনে হয় না।

বিহারেও যুক্তফ্রন্ট থেকে শ্রীবিন্দেশ্বরী প্রসাদ মণ্ডলের নেতৃত্বে এক দল এম-এল-এ বেরিয়ে এসে শোষিত দল নামে একটি দল গঠন করেছেন এবং তাঁরাও কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশন করে বিহারে মন্ত্রিসভা গঠন করতে চান।

সীমান্ত বিরোধ, ভাষা বিরোধ, রাজ্য পুনর্গঠনের দাবী প্রভৃতি নিয়েও ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের সপ্তদশবর্ষ কম বিঘ্নিত হয় নি। রাজ্যগুলি পুনর্গঠনকালেই মহারাষ্ট্র ও মহীশূরের সীমানা ভাষার ভিত্তিতে যথাযথ নির্ধারিত হয় নি। কেরলের কাসারগোড় তালুকের উপরেও মহীশূরের পুরাতন দাবী স্বীকৃত হয় নি। ফলে ঐ কটি রাজ্যে সীমান্ত পুনর্নির্ধারণের দাবী নিয়ে দীর্ঘ দিন আন্দোলন চলছিল। মাঝে মাঝে সে আন্দোলন হিংসাত্মক হয়ে উঠে সব কটি রাজ্যেরই শান্তি বিঘ্নিত করছিল। তাই মহারাষ্ট্র-মহীশূরের সীমান্ত নির্ধারণ ও কাসারগোড়ের ভবিষ্যৎ স্থিরীকরণের জন্য গঠিত হয় মহাজন কমিশন। কমিশনের রায় গত নভেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়। তাতে মহারাষ্ট্রের একাংশ মহীশূরকে দিয়ে এবং মহীশূরের একাংশ মহারাষ্ট্রের সঙ্গে সংযুক্ত করে বিরোধের নিষ্পত্তির সুপারিশ থাকে। কাসারগোড় তালুকটি মহীশূরের সঙ্গে সংযুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু মহাজন কমিশনের সুপারিশ একমাত্র মহীশূর ছাড়া আর কোন রাজ্য গ্রহণ করে নি। কেরল কাসারগোড় ছাড়তে রাজী নয়, আর মহারাষ্ট্র দলমতনির্বিশেষে জানিয়ে দিয়েছে যে, তারা মহীশূরের যে সব অংশ মহারাষ্ট্রের সঙ্গে সংযুক্ত করার দাবী জানিয়েছে তার কোন অংশই তারা ত্যাগ করতে রাজী নয়। আর মহারাষ্ট্রের যে অংশ মহীশূরের সঙ্গে সংযুক্ত করার প্রস্তাব মহাজন কমিশনে থাকে তারও এক ইঞ্চি তারা মহীশূরকে দেবে না। সুতরাং মহাজন কমিশনের রিপোর্ট এখন ছেঁড়া কাগজের মতই মূল্যহীন। সারা মহারাষ্ট্র জুড়ে শুরু হয়েছে শিবসেনাদের তাণ্ডব, আর সম্পূর্ণ মহারাষ্ট্র সমিতির আপসহীন সংগ্রাম, যাতে সামিল হয়েছে কম্যুনিস্ট, সমাজতন্ত্রী, জনসংঘ প্রভৃতি সব দল।

আসাম পুনর্গঠন প্রশ্নেরও কোন মীমাংসা হয় নি। আসামের চারটি পার্বত্য জেলা নিয়ে একটি স্বতন্ত্র রাজ্য গঠনের দাবী পার্বত্য নেতারা ১৯৬০ সাল থেকে করে আসছেন। কেন্দ্রীয় সরকার আসামকে যুক্তরাষ্ট্রীয় ভিত্তিতে পুনর্গঠনের পক্ষপাতী এবং পার্বত্য নেতারাও তা [illegible] মেনে নিতে [illegible]। কিন্তু আসামের [illegible]-

অনেক রকমের
রেডিও, রেডিওগ্রাম, রেকর্ড প্লেয়ার, রেকর্ড চেঞ্জার রেকর্ড রিপ্রডিউসর, গ্রামোফোন রেকর্ড ট্র্যানজিসটর রেডিও, ও রেডিওগ্রাম, টেপ রেকর্ডার, এমপ্লিফায়ার ইত্যাদি নগদ ও কিস্তিতে বিক্রি করা হয়।
মেরামতের সুবন্দোবস্ত আছে
ফোন : ২৪-৪৭৯৩

"বুশ" ট্র্যানজিসটর রেডিও।
রেডিও এণ্ড ফটো ষ্টোরস
১৫নং [illegible] এভিনিউ, কলিকাতা-১৩,

বাসীরা ঐ প্রস্তাব মানতে রাজী নয়। ফলে, অত্যন্ত জরুরী হলেও আসাম পুনর্গঠন সমস্যার মীমাংসা কিছুতেই সম্ভব হচ্ছে না। ওদিকে মিজো পার্বত্য জেলায় বৈরী মিজোদের তৎপরতা আগের মতই সাধারণ মানুষের শান্তি বিঘ্নিত করছে, এবং নাগা-ভূমিতেও বৈরী নাগাদের সঙ্গে কোন আপসে আসা সম্ভব হয় নি। একমাত্র সান্ত্বনার কথা, বৈরী নাগাদের সঙ্গে অস্ত্র সম্বরণের শর্ত এখনো পর্যন্ত লঙ্ঘিত হয় নি।

'৬২ সালের অক্টোবর মাসে চীন ভারত আক্রমণ করার পর সারা ভারতে যে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয় তা এতদিন পরে '৬৮ সালের ১০ই জানুয়ারী প্রত্যাহৃত হল। কিন্তু চীন-ভারত বিরোধের কোন নিষ্পত্তি হয় নি। পরন্তু গত ১লা অক্টোবর নাথুলা সীমান্তে চীনা সৈনদের গুলীবর্ষণের ফলে সীমান্ত সংকট আবার তীব্র হয়ে ওঠে। কয়েক দিন ধরে উভয় পক্ষের গুলীবিনিময় ও কয়েকশত সীমান্ত প্রহরীর প্রাণহানির পর আবার নাথুলা, চোলা সীমান্ত শান্ত হয়। কিন্তু এ শান্তি কতদিনের তা কারও পক্ষে বলা সম্ভব নয়। পাকিস্তানের সংগেও ভারতের সম্পর্কের কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয় নি। গত ১ই অক্টোবর জম্মু ও কাশ্মীরের উরি অঞ্চলে পাকিস্তানের সৈন্য-বাহিনী বিনা প্ররোচনায় ভারতীয় টহলদার সৈন্যদের উপর গুলীবর্ষণ করে। সম্প্রতি কূটনৈতিক পর্যায়েও পাকিস্তানের সংগে ভারতের বিরোধ তীব্র হয়ে উঠেছে। গত ৬ই জানুয়ারী পাক সরকার হঠাৎ এক আদেশ জারী করে ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনের ফার্স্ট সেক্রেটারী শ্রী পি এন ওঝাকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পাকিস্তান ত্যাগের নির্দেশ দেন। শ্রীওঝার বিরুদ্ধে পাক সরকারের অভিযোগ, তিনি নাকি সেখানে লোকদের টাকা দিয়ে পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগে সাহায্য করছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য যে সামরিক ষড়যন্ত্রের কথা পাক সরকার প্রকাশ করেছেন তার সংগেও শ্রীওঝার সম্পর্ক ছিল বলে অভিযোগ করা হয়েছে। ভারত সরকার অবশ্য পাক সরকারের সব অভিযোগই মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বলে বাতিল করে দিয়েছেন এবং নয়াদিল্লীস্থ পাক দূতাবাসের উপদেষ্টা এম এম আহমদকেও অবাঞ্ছিত কার্যকলাপে লিপ্ত থাকার অভিযোগে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ভারত থেকে বহিষ্কৃত করা হয়েছে।

ভারত-পাকিস্তানের সম্পর্ক যখন এই অবস্থায় তখন শেখ আবদুল্লাকে আর এক দফা মুক্তি দিয়ে ভারত-বিরোধী পাক প্রচারের ইন্ধন যোগানো ঠিক হয়েছে কিনা এ নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক মহল প্রশ্ন তুলেছেন। গত ৩রা জানুয়ারী শেখ আবদুল্লাকে সম্পূর্ণ মুক্তি দেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রী অবশ্য বলেছেন, এ মুক্তি পরীক্ষামূলক। কিন্তু শেখ সাহেব বেরিয়ে এসেই বলেছেন, তিনি তাঁর মত পাল্টান নি। তিনি নিজেকে ভারতীয় নাগরিক বলে পরিচয় দিতে রাজী নন, কিন্তু ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়ে তিনি বিনা বাধায় তাঁর ইচ্ছামত কাজ করে যেতে চান। ভারতের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণের ব্যাপারেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে চান। তিনি নিজেকে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর সমগোত্রীয় একজন বলে মনে করেন। একজন রাষ্ট্রদ্রোহীর প্রতি ভারত সরকারের এই ঔদার্য সত্যই বিস্ময়কর। প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানে আমরা দেখতে পাই খান আবদুল গফুর খান, ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, শেখ মুজিবর রহমানের মত দেশবরেণ্য নেতারা বছরের পর বছর বন্দী অথবা নির্বাসিত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন, কোন ডাকবাংলোয় রাজার হালে তাঁদের রাখা হয় নি। নেপালে কৈরালা ভ্রাতারা বিনা বিচারে আট বছরেরও বেশী বন্দী হয়ে আছেন। বর্মায় থাকিন নুর মত শ্রদ্ধেয় জননেতা কয়েক বছর বিনা বিচারে বন্দী থাকার পর এখন মুক্ত হয়েও বন্দীর মত নীরবে দিনাতিপাত করছেন। যুগোশ্লাভিয়ায় জিলাস,

॥ চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হ'ল ॥
নুখোপাধ্যায়ের
বলাকার মন ৬·০০

॥ তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হ'ল ॥
বিমল মিত্রের
চার চোখের খেলা ৬·০০

নীলকণ্ঠের শেষ অপ্রকাশিত রচনা
রাজপথের পাঁচালী ৬·০০

সতীনাথ ভাদুড়ীর শেষ উপন্যাস
দিগভ্রান্ত ৯·০০

জরাসন্ধ-র
ন্যায়দণ্ড ৬ষ্ঠ সং ৬·০০

বিমল মিত্রের নতুন উপন্যাস
কথা চরিত মানস ৬·৫০

অমল মিত্রের
কলকাতায় বিদেশী রঙ্গালয় ৬·০০

নন্দিতা চক্রবর্তীর
শাশ্বতী ৫·০০

অধ্যাপক সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের
আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ৫·০০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
মহাশ্বেতা ৪র্থ সং ৬·০০

ধনঞ্জয় বৈরাগীর
দম্পতি ২য় সং ৫·০০
জয় জয়ন্তী নতুন উপন্যাস ৪·০০

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
জনপদবধূ ৪র্থ সং ৫·০০

সমরেশ বসুর
শ্রীমতী কাফে ৩য় সং ৭·০০
গঙ্গা ৬ষ্ঠ সং ৩·৫০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের
কালের মন্দিরা দাম : ৪·৫০

কালি ও কলম সম্পাদক : বিমল মিত্র
প্রতি সংখ্যা ০·৬০ পঃ
ষান্মাসিক ৩·৫০ বার্ষিক ৭·০০
পৌষ সংখ্যায় লেখকসূচী : সতীনাথ ভাদুড়ী ॥ পুলিনবিহারী সেন ॥ আশিষ ঘোষ ॥ জরাসন্ধ ॥ আশিষ মজুমদার ॥ বিমল মিত্র ॥ শংকরশেখর রায় ॥ পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ॥ বীরেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ দেবনারায়ণ গুপ্ত ॥ শিবদাস চট্টোপাধ্যায় (কবিতা) ॥ চতুর্থ পাণ্ডব ॥ বিজন ঘোষ ॥

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের
মেজদিদি দাম : ৩·০০
নিষ্কৃতি দাম : ২·০০
পণ্ডিত মশাই দাম : ৩·০০
শ্রীকান্ত ১ম ৪·০০, ৪র্থ ৫·০০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের
সন্ধ্যার সুর ৩·০০

নবেন্দু ঘোষের
আগুনের উক্তি ৩·৫০

প্রকাশ ভবন ১৫, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সোভিয়েট ইউনিয়নে মলোটভ, ক্রুশ্চেভ প্রমুখ এককালের প্রথম সারির নেতারা এখন সম্পূর্ণ বিস্মৃত নাগরিকের মত নিঃসঙ্গ নির্বাক জীবন যাপন করছেন। পৃথিবীর সব দেশেই এমন সমস্যা মাঝে মাঝে দেখা যায়, দু-চারজন লোক যখন কিছুতেই সরকারের চলতি নীতির সংগে আপস করে নিতে পারেন না। কিন্তু শেখ আবদুল্লার মত এমন 'ভি আই পি ট্রিটমেন্ট' তাঁদের কেউ পেয়েছেন বলে আমাদের জানা নেই।

রাষ্ট্রের ভা ষা নী তি নির্ধারণের ব্যাপারেও সরকার যথেষ্ট কঠোর ও নিরপেক্ষ মনোভাব অবলম্বন করতে পারেন নি। অন্তত এইবারের ভাষা আন্দোলনে প্রমাণ হয়েছে যে, হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য হিন্দীভাষী রাজ্যগুলি ছাড়া আর কারও মাথাব্যথা নেই। তাও উত্তরপ্রদেশে হিন্দীর জন্য যতটা দাপাদাপি হয়েছে বিহারে ততটা হয় নি। হিন্দীভাষী প্রদেশ বলে পরিচিত মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থান ত প্রায় সম্পূর্ণই নীরব ছিল। অপর দিকে হিন্দীর বিরুদ্ধে প্রচন্ড বিক্ষোভে আলোড়িত হয়েছে সারা দাক্ষিণাত্য। পশ্চিমবঙ্গও প্রতিবাদ জানিয়ে দিয়েছে, হিন্দীকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা বলে এই রাজ্য কখনও মেনে নেবে না। এই অবস্থায় সংশোধিত সরকারী ভাষা বিলে যা প্রস্তাব করা হয়েছে তা প্রকৃতপক্ষে কাউকেই খুশি করতে পারে নি। বিদায়ী কংগ্রেস সভাপতি কামরাজ ত প্রকাশ্যেই ভাষা বিলের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। সত্যিই এটা একটা চরম অবিচার যে, হিন্দীভাষী রাজ্যগুলোর অধিবাসীদের শুধু হিন্দী শিখলেই চলবে, আর অহিন্দীভাষী রাজ্যগুলির অধিবাসীদের শিখতে হবে তিনটি ভাষা—হিন্দী, ইংরেজী আর মাতৃভাষা।

নানা ভাষা, নানা বেশ, নানা পরিধানের এই দেশে অবশিষ্ট সকলের উপর একের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য কোনদিন কায়েম করা যাবে না, একথাটা দেশের কর্মকর্তারা যতশীঘ্র বুঝতে পারবেন ততই দেশের কল্যাণ হবে।

বিগত বর্ষে ভারতকে নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্য উড়িষ্যার সাইক্লোন ও মেদিনীপুরে অতিবৃষ্টিজনিত প্লাবন। এবার ফসলের অবস্থা ভাল হলেও পশ্চিমবঙ্গের শস্যভান্ডার কাঁথির প্রায় সব ফসল প্লাবনে বিনষ্ট হয়েছে। উড়িষ্যার ফসলের ক্ষতিও কম নয়। আর একটি প্রলয়ংকর প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটে মহারাষ্ট্রের সাতারা জেলায় জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের উপনগরী কয়নানগরে। গত ১১ই ডিসেম্বর মধ্যরাত্রে হঠাৎ প্রচন্ড ভূমিকম্পে সেখানে ১১০ জনের নিদ্রিত অবস্থায় মৃত্যু হয়। সমগ্র উপনগরীটি বিধ্বস্ত হওয়ায় প্রায় দশ হাজার লোক নিরাশ্রয় হয়েছেন। আর আহত হয়েছেন তেরশজন। কয়নানগরে এখনও মাঝে মাঝে ভূকম্পন অনুভূত হচ্ছে। কয়েকজন বিশেষজ্ঞের অনুমান, জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে সঞ্চিত জলের চাপই কয়নানগর ভূমিকম্পের কারণ।

গত ১২ই অক্টোবর সমাজতন্ত্রী নেতা ডঃ রামমনোহর লোহিয়া পরলোকগমন করেন। একজন শক্তিশালী সমাজতন্ত্রী নেতার এই অকালমৃত্যুতে দেশের সমাজতন্ত্রী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চীন ও পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের উন্নতি না হলেও বর্মা, নেপাল, মালয়েশিয়া ইন্দোনেশিয়া ও পশ্চিমী দেশগুলির সংগে ভারতের নিবিড় মিত্রতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। সোভিয়েট অনুগত কম্যুনিস্ট দেশগুলির সঙ্গেও ভারতের সম্পর্ক ক্রমোন্নতির পথে। যে সব রাষ্ট্রনায়ক বিগত বর্ষে ভারত সফরে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্য পশ্চিম জার্মানীর চ্যান্সেলর ডঃ কিসিংগার এবং সিংহলের গভর্নর জেনারেল শ্রীগোপালাওয়া। সম্প্রতি ইন্দোনেশিয়ার অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট জেনারেল সুহার্তো ভারত সফরের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন।

অর্থনীতির ক্ষেত্রে কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয় নি। সারা দেশ জুড়ে যে মন্দা চলেছে তার কোন প্রতিকার হয় নি। ঋণাত্মক ব্যয় বন্ধের যে সংকল্প কেন্দ্রীয় সরকার নিয়েছিলেন তা শেষ পর্যন্ত রক্ষা করা সম্ভব হয় নি। অর্থনৈতিক সংকটের জন্য চতুর্থ যোজনার কাজ ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত স্থগিত রাখা হয়েছে। শিল্পোন্নতি বন্ধ হওয়ায় হাজার হাজার শিক্ষিত ইঞ্জিনীয়ার বেকার হয়ে বসে আছেন। সরকারী অর্ডার বন্ধ হওয়ায় ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পগুলির দরজাও একে একে বন্ধ হচ্ছে। এখন সরকারের সংকট ত্রাণের একমাত্র আশা শুধু চলতি মরসুমের ঢালাও ফসল। সে আশা অলীক প্রমাণ হলে দেশের অবস্থা কি দাঁড়াবে বলা কঠিন। চালের এখনও যা আকাশ-ছোঁয়া দাম তাতে মনে হয় না যে সুখের দিন অদূরে অপেক্ষা করছে।

একমাত্র চায়ের বাণিজ্যে কিছুটা সুসংবাদ আছে। সিংহলকে পরাস্ত করে ভারত আবার আন্তর্জাতিক চায়ের বাজারে শীর্ষস্থান অধিকার করেছে।




এটিই আমার রোভার, উৎসবে-ব্যসনে নির্ভরতার প্রতীক। রোদে, বড়-বৃষ্টিতে সদাই আমার সাথী—
'অভিজাতদের এই বস্তুটির এখন বশ্যাবাদের কিছু লোভ হবার নয়।
জনগণের নিজস্ব বাহন, রোভার, আজই কিনুন
ওয়ারেস্ট সাইকেলস লিমিটেড • কলিকাতা • বারাণসী

স্বাধীন ভারতে ডেমোক্রেসী

দিলীপ মালাকার

ডেমোক্রেসী শব্দের চলন দু'একশ বছরের নয়। কম্যুনিজম, সোস্যালিজম, ফাসিজম, ইত্যাদির আবির্ভাবের বহু পূর্বে, হাজার দেড় হাজার বছর আগে গ্রীস ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন রাজ্যে বিক্ষিপ্তভাবে ডেমোক্রেসীর সংক্ষিপ্ত চাল-চলন চলে। এমন কি প্রাচীন ভারতে কোনো কোনো রাজ্যে অল্প সময়ের জন্যে হলেও গণতন্ত্রের প্রচলন ছিল কিছুকালের জন্যে। তবে গোটা ভারতবর্ষে আসমুদ্র-হিমাচল জুড়ে বছরের পর বছর ধরে গণতন্ত্র চলেনি। হিন্দু-বৌদ্ধ সাম্রাজ্যে কখনো-সখনো গণতন্ত্রের আবির্ভাব হত। রাজাহীন রাজ্য ভাবা তখনকার দিনে পুরোপুরি সম্ভব ছিল না। তাই গণতন্ত্র পুরোপুরি চালু হওয়ারও সম্ভাবনা ছিল না। মোগল ইত্যাদি আমলের মুসলিম রাজ্যও পুরোপুরি স্বদেশী ছিল না। বরং তা ছিল বাদশা-নবাবদের রাজস্ব উপনিবেশের নামান্তর মাত্র। সেখানে গণতন্ত্রের বিকাশ হওয়া সম্ভব নয়। নবাব-বাদশা আমলের পরে কায়েম হল ইংরেজ, ফরাসী, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ উপনিবেশবাদ। ইংরেজ সাম্রাজ্য ছিল রাজতন্ত্রের অধীনে। সেটা আর যাইহোক গণতন্ত্র নয়। অবশ্য সেকালে ইংরেজরা বলত ওটাই নাকি স্বাধীন গণতন্ত্র। আসল কথা ইংরেজ আমলেও গণতন্ত্র ছিল না। সত্যিকারের রাজনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল স্বাধীন ভারতে। এবং ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম। এর আগে আসমুদ্র-হিমাচল জুড়ে ভারতে কোনোদিন গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়নি।

আধুনিক যুগ বলতে আমরা যা বুঝি তার শুরু ইউরোপে। এবং তার দুটো পর্ব হল (১) ফরাসী বিপ্লব ও (২) শিল্প বিপ্লব। ফরাসী বিপ্লব আনে সমগ্র জগতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা। শিল্প বিপ্লব ঘটায় ইংরেজরা। শিল্প বিপ্লব শুরু হয় ফরাসী বিপ্লবের আগে অষ্টাদশ শতাব্দীতে। শিল্প বিপ্লব আনে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। তার ফলেই আজ কলকারখানা শিল্পের জয়যাত্রা। ফলে মানুষের খাটুনি কমেছে। মানুষ আরও ভোগবিলাসী হয়েছে। ভোগবিলাস আজ আর নবাব-বাদশা বা রাজা-মহারাজার একার জিনিস নয়। তা সর্বসাধারণের আয়ত্তের মধ্যে এসে গেছে। ফরাসী বিপ্লব ও শিল্প বিপ্লবের পরে রাজনৈতিক জাগরণ আনে সোস্যালিজম, কম্যুনিজম, ফাসিজম এবং আরও কত ইজম। প্রথম দুটো বিপ্লব না ঘটলে রুশ ও চীন বিপ্লব ঘটতে পারত কিনা সে বিষয়ে ঐতিহাসিকদের সন্দেহ আছে। যাইহোক ফরাসী বিপ্লবের মূল "লিবার্তে—এগালিতে—ফ্রাতার্নিতে" সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠাকল্পেই স্বাধীন ভারতের প্রধান লক্ষ্য ছিল। গণতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশ এই তিন লক্ষ্যে।

স্বাধীন ভারতে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা সম্পর্কে কারুর সন্দেহ থাকতে পারে না কিন্তু সাম্য ও মৈত্রী কতদূর সার্থক হয়েছে বলা মুশকিল।

প্রতি পাঁচ বছর অন্তর ভোটযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার অধিকার আজ সকলের। ভোটের ব্যাপারে আমরা গণতান্ত্রিক ও স্বাধীন। আমার অনেক বিদেশী বন্ধু বলেছেন যে, তোমাদের দেশে শতকরা সত্তর জনই লেখা-পড়া জানে না, তারা কি বোঝে ইজম্-এর কচ্-কচানি? তাছাড়া প্রার্থী নির্বাচনে অক্ষর জ্ঞানের কি প্রয়োজন নেই? অক্ষর জ্ঞান ছাড়া গণতান্ত্রিক রাজনীতি কী সফল হতে পারে?, আমি কিন্তু তাদের সঠিক জবাব দিতে পারিনি। ওদের মতে ভারতে ওসবগুলো গোঁজামিলে চলছে।

আমাদের বিভিন্ন রাজ্য সরকার ও কেন্দ্র সরকার গণতান্ত্রিক। রাজকার্যও চলে গণতান্ত্রিকভাবে। সবারই সমান স্বাধীনতা। কিন্তু আরও কিছু ঠোঁটকাটা বিদেশী সমালোচক প্রশ্ন তুলেছে যে, তোমাদের দেশে শতকরা আশীজনই গ্রামে বাস করে। তাদের উপজীবিকা কৃষিকার্য। তাদের মধ্যে জাত-পাতের ভেদাভেদ কী ঘুচেছে? এক জাতের সঙ্গে অন্য জাতের মেলামেশা কতখানি? জাতপাতের বেড়া ভেঙে কতজন সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। সামাজিক স্বাধীনতা কী পুরোপুরি এসেছে? গণতন্ত্র কী সেখানে সফল?

সত্যি কথা বলতে কী নিরক্ষর কৃষক গ্রামবাসী ছাড়াও আমাদের উচ্চশিক্ষিত সমাজেও গণতন্ত্রের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হয়নি। 'যুগান্তর' পত্রিকার রবিবারের কয়েকটি পৃষ্ঠা নেড়েচেড়ে দেখলেই দেখবেন পাত্র-পাত্রী বিজ্ঞাপনে বিবাহের ব্যাপারে অর্থাৎ সামাজিক লেনদেনে এখনও অ-গণতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থা প্রচণ্ডভাবেই চাপান আছে। সেখানে স্বাধীনতা খুবই কম।

মৈত্রীর কথা না বলাই ভাল। কারণ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে লাঠা-লাঠি এখনও কমেনি। একটু ছুতো পেলেই লাঠা-লাঠি বেধে ওঠে। আর সাম্য! সে তো স্বপ্নের জিনিস। সামাজিক সাম্য বহু দূরে। কিন্তু তার চেয়েও আরও বহু দূরে অর্থনৈতিক সাম্য। ভারসাম্য এখনও আসেনি। একটি স্বাধীনতা বেশ ভালভাবেই বোঝা যায়, সে হল দরিদ্রের আরও দরিদ্র হবার এবং ধনীর আরও ধন লাভ। সেক্ষেত্রে গণতন্ত্রের অবাধ বিচরণ। এর মধ্যে কোনো ভারসাম্য নেই। সাম্যের চেয়ে সামঞ্জস্যের অভাব আরও বেশী। তাই স্বাধীন ভারতে দারিদ্র্যের চিত্র এত প্রকট। জন্ম ও মৃত্যু গণতন্ত্রের কথায় ওঠে বসে। জন্মশাসনে যেমন গণতন্ত্রের হাত নেই তেমনি বুভুক্ষায়। না খেতে পেরে মরার ব্যাপারে গণতন্ত্র সফল। এই দুই ব্যাপারে পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকায় গণতন্ত্রের ওপর কড়া শাসনদণ্ড চালান হয়। তাতে কিন্তু গণতন্ত্র জখম হয় না। সেখানে গণ-তন্ত্রকে মাঝে মাঝে মেপে বাজারে ছাড়া হয়।

স্বাধীন ভারতে সমাজ ও অর্থনীতিতে গণতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশ না ঘটলেও কতক-গুলো আচরণে পূর্ণ বিকাশ দেখা যায়। যেমন রাজনৈতিক আন্দোলনে, ভোট যুদ্ধে। শহরের নাগরিকদের শহর নোঙরা করার যেমন পূর্ণ অধিকার আছে তেমনি শহর আবর্জনাপূর্ণ রাখার ব্যাপারে পৌরপিতা ও প্রতিষ্ঠানের। ট্রাম-বাসে ঝোলা এবং ট্রাম-বাস পোড়ানর ব্যাপারে যেমন পূর্ণ গণতন্ত্র তেমনি নতুন ট্রেন-কামরার সাজসরঞ্জাম চুরির ব্যাপারে। সবটাই কিন্তু গণতন্ত্রের হাতিয়ার। এ ব্যাপারে গণতন্ত্রের ওপর কড়া শাসন চালাতে রাজ্য নেতারা। কারণ তারা গণতন্ত্রের পূজারী। স্বাধীন ভারতে গণতন্ত্রের সার্থকতা কী এখানেই?

বেনারসী শাড়ী

ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট

কলিকাতা

ভারত রাষ্ট্র ও গণতন্ত্র-প্রসঙ্গে

বাগ্-বুল-ইসলাম

(সংখ্যাধিক্য ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মিলন সেতু)

পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষেই সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত। এই রাষ্ট্রে পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্র অপেক্ষা সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সবচেয়ে বেশী। ভারতবর্ষে যে সমুদয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় রয়েছে তার মধ্যে মুসলিম সম্প্রদায় সর্বাধিক। এত বেশী সংখ্যায় মুসলিম সংখ্যালঘু বোধহয় কোন ক্ষুদ্র মুসলিম রাষ্ট্রে আছে কিনা সন্দেহ। সেজন্য ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় চরিত্র, তার আচরণবিধি, আইন-কানুন সভ্যতা, সংস্কৃতি সাংবিধানিক ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা করা দরকার। এবং বিচার করতে হবে কোন তন্ত্র ভারত-বর্ষের পক্ষে কল্যাণকর। ভারতের অধি-বাসীরা নানা ধর্মের সংস্কৃতি-আশ্রয়ী। নানান প্রকার সামাজিক আচার ব্যবহারে পরস্পরে পৃথক। তবুও কিন্তু সবাই এক। এ বড় আশ্চর্য দেশ। এরকম দেশ পৃথিবীতে আর একটিও নাই বললে চলে।

ভারতে সংখ্যালঘুর অধিকার

ভারতের জাতীয় নেতারা দেশবিভাগ মেনে নিয়ে গোড়ায় মস্তবড় ভুল করেছেন। আর সেই ভুলের মাশুল দিতে হচ্ছে সমগ্র জাতিকে। এই সর্বনাশা কাজের প্রশংসা করা কোনদিনই যাবে না—দেশ ভাগ করার পক্ষে যাঁরা সেদিন সায় দিয়েছেন আজ দেখা যাচ্ছে তাঁরা প্রায় সকলেই ছিলেন দুর্বল ও অপরিণামদর্শী নেতা। স্বাধীনতা লাভ করতে যত লোকের প্রাণ বলি না হয়েছে স্বাধীনোত্তর যুগে তার শতগুণ মানুষ বলি হয়েছে এবং আজও হচ্ছে। কে জানে আরও হবে কিনা। কিন্তু সেদিন যদি দেশভাগের আগে জনগণের মত জানার জন্যে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হত তাহলে এপথে জনগণ কিছুতেই যেত না। কিন্তু সে যাই হোক দেশভাগের ভুল সংশোধনের জন্য অবশ্য হিসাবে আমাদের নেতৃবর্গ ভারতে গণতন্ত্র সংগত সংবিধান প্রবর্তিত করতে একটুও দ্বিধা করেন নি। গণতন্ত্রের উন্নতি কামনা আজ সকলের লক্ষ্য হওয়া উচিত। এই গণতন্ত্রে সংখ্যালঘুদের 'ধর্ম নিরপেক্ষতা) কথা ভেবেই ধর্মে, রাজনৈতিক কর্মে সংখ্যাধিক্যের মতোই সমান অধিকার দেওয়া হয়েছে। একথা খুবই সত্য যে এই অধিকার অনেক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পক্ষে আশীর্বাদস্বরূপ। প্রথম শ্রেণীর নাগরিক অধিকার ও রাজনৈতিক অধিকার ও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে সংখ্যালঘুদের প্রদত্ত হয়েছে। সন্দেহ নেই এ একটি অত্যাশ্চর্য ঘটনা। জগতে এর একটা মূল্য রয়েছে বড় রকমের। প্রত্যেক সংখ্যালঘু জাতিকে সেকথা ভেবে দেখা উচিত। প্রশ্ন হতে পারে কেন এই অধিকার দেওয়া হোলো? এর উত্তর এখানেই পাওয়া যাবে। প্রথমত এই বহুত্বের দেশের সম্প্রদায়গত নানা জাতিকে একটা পরিবেশে রাখা। দ্বিতীয়, পরস্পরবিরোধী মনোভাবকে ধ্বংস করে এক জাতিত্ববোধে সকলকে উদ্বুদ্ধ করা। তৃতীয়ত, রাজ-নৈতিক পরিশৃঙ্খলতাকে দৃঢ় ও সংহত করা। চতুর্থত সংস্কৃতিগত ও ভাষাগত প্রাদেশিকতাকে আস্তে আস্তে নির্মূল করা। বিশেষ করে এই কয়েকটি দিকে দৃষ্টি দিয়েই ভারতের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। আর সত্যিই এদিক থেকে বলতেই হবে এদেশের পক্ষে গণতন্ত্র হল অপরিহার্য। গণতন্ত্র রয়েছে বলেই এদেশে বিভিন্ন সম্প্রদায় তাঁদের ব্যক্তি-স্বাধীনতার অবাধ অধিকার ভোগ করবার সুযোগ পেয়েছে। ধর্মীয় আচারে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, সাহিত্যে সর্ব-ক্ষেত্রে তাই আজ সংখ্যালঘুরা সংখ্যা-ধিক্যদের সম সম্মানে বিকশিত। বিশেষভাবে ভারতীয় মুসলিমগণ আজ ধন্য যে, তাঁরা ভারতে এই অধিকার অর্জন করতে পেরেছেন। সেজন্য গণতন্ত্রকে অনুক্ষণ স্বাগত জানান উচিত।

জনগণ, রাষ্ট্র ও পরস্পরের কর্তব্য

আজ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনগণ ও রাষ্ট্রকে এক ছন্দে ও সুরে বাজতে হবে। আজ প্রত্যেক ভারতীয়কে প্রত্যেকের কথা ভাবতে হবে। সকলে বাঁচার চিন্তা সংকল্পকে একযোগে কাজ করতে হবে। রাষ্ট্রের শক্তি হল জনগণ। শুধু রাষ্ট্রের উপর নির্ভরতা এনে জনগণের সমূহ কল্যাণ হওয়া আদৌ সম্ভব নয়। সেজন্য প্রত্যেককে তার ব্যক্তি-গত চিন্তা ছেড়ে রাষ্ট্রগত চিন্তা করতে হবে। আর রাষ্ট্রের করণীয় হল জনগণকে তাদের নিজেদের কথা চিন্তা করার পথ সৃষ্টি করে দেওয়া। তবেই রাষ্ট্র ও জন-গণের মঙ্গল হওয়া সম্ভব। এক কথায় পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হতে হবে। তাহলে আমরা পূর্ণতা লাভ করতে সক্ষম হব। তবে বুঝতে হবে রাষ্ট্র রাষ্ট্র-নায়কগণ ও জনসাধারণ এরা পরস্পর-বিরোধী কিনা? রাষ্ট্র এক জিনিস। আর রাষ্ট্রনায়কগণ অপর-এক সত্তা। এবং জনগণ আর-এক ব্যাপার। তিনের সমন্বয়ী দৃষ্টিতে ঐক্য সৃষ্টি হয়। আর এই ধরনের একমুখী চরিত্রই হওয়া উচিত জাতির আদর্শ। না হলে বিশৃঙ্খলতা সৃষ্টি অনিবার্য।

আবার অন্য দিক থেকে বলা যায়, রাষ্ট্রনায়কগণ সচ্চরিত্র না হলে রাষ্ট্র পরিচালনায় গলদ দেখা দেয়। কিন্তু জনগণ উন্নত চরিত্রের অধিকারী না হলে সদ্‌রাষ্ট্রনায়কও সৃষ্টি হয় না। কাজেই চরিত্রবল ছাড়া উন্নতির আশা করা ভুল। তাই জাতীয় চরিত্রকে আগে সৃষ্টি করতে হবে জাতিকে। জাতীয় চরিত্র বলিষ্ঠ হলেই রাষ্ট্রীয় চরিত্র সৎ হবে। কাজেই দেখা যাচ্ছে উভয়কেই অগ্রসর হতে হবে উভয়ের দিকে। তা না হলে উন্নতি অসম্ভব। একটা কথা মনে রাখতে হবে, মানুষ আইন সৃষ্টি করে, আইন মানুষ সৃষ্টি করে না। আইন মানুষকে, জাতিকে, ও রাষ্ট্রকে উন্নত চরিত্র প্রদান করে। আইনকে মেনে চলা, ধর্মকে মেনে চলার সমান। আইন না মেনে চলা অধর্ম। কিন্তু ন্যায়নিষ্ঠা ও সত্য-বাদিতা অর্জন করার ক্ষমতা না থাকলে আইনকে মানার যোগ্যতা থাকে না। আজ ভারতে মজুতদারী চোরাকারবারী, খুন, হত্যা, লুটতরাজ ইত্যাদি বহু দুর্নীতি ছেয়ে গেছে। এই সমস্ত দুর্নীতির মূলোৎপাটিত না হলে ভারতবর্ষের পরিণাম ভয়ঙ্কর অন্ধকারাচ্ছন্ন। দুর্নীতি ভারত-রাষ্ট্রের এক কঠিনতম ব্যাধি। এ ব্যাধি দূরীকরণের ঔষধ হল ন্যায়নিষ্ঠতা ও সত্যবাদিতা অর্জন করা এবং সচ্চরিত্র ব্যক্তি হওয়া। এ ছাড়া অন্য পথ নাই। বন্দুকের গুলীতে অসৎ মানুষ মেরে ফেলা যায়, কিন্তু মানুষকে সৎ মানুষে পরিণত করা যায় না। কেবল সৎ শিক্ষার দ্বারা ও সত্য-বাদিতার দ্বারাই তা সম্ভব হয়। এবং হবেও।

সংখ্যাধিক্য ও সংখ্যালঘুদের কর্তব্য

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও সংখ্যাধিক্য সম্প্রদায় উভয়ে উভয়কে ভ্রাতৃসুলভ মনোভাবে দেখতে হবে। তবেই রাষ্ট্রের মঙ্গল সুনিশ্চিত। সংখ্যাধিক্য সম্প্রদায়গণের দ্বারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে ভীতি সঞ্চারিত হওয়া আদৌ উচিত নয়। কারণ সংখ্যালঘুরা শুধু অসহায় বোধ নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে না। রাষ্ট্র একা পারে না সংখ্যা-লঘুদের নিরাপদ রাখতে। সংখ্যালঘু রক্ষার ব্যাপারে রাষ্ট্রের চেয়ে সংখ্যাধিক্যের দায়িত্ব ও শক্তি বেশী। সংখ্যালঘু জাতিকে মানুষের স্তরে থেকে বাঁচবার মত পরিবেশ সংখ্যাধিক্যদের সৃষ্টি করে দিতে হবে। সংখ্যালঘুদের সুস্থ ও সংহতিপূর্ণ চিন্তাধারা বিকাশ করার সাংবিধানিক অধিকার আছে এখানে, সেকথা আগেই বলেছি এবং সেজন্যে তারা গর্বিত মনে করে। কিন্তু সাংবিধানিক অধিকার ছাড়াও পারিবেশিক অধিকারও দিতে হবে। আর সেই পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে সংখ্যাধিক্য সম্প্রদায়গণ। রাষ্ট্র তা পারে না। ব্যবসায়, বাণিজ্যে, সাহিত্য-শিল্পে, সংখ্যা-লঘুদের সম্প্রসারী দৃষ্টি নিক্ষেপ করবার জন্য তাদের মনে সাহস সৃষ্টি করতে হবে। তবেই আমরা একত্রে পৌঁছাতে পারব।

আর সংখ্যালঘুদেরও সব সময় ভাবতে হবে, ভারতরাষ্ট্রই তাঁদের পরিচয় ও শেষ সম্বল। অন্য কোন রাষ্ট্র তাঁদের শেষ সম্বল বা পরিচয় নয়। এবং আরও বিশ্বাস করতে হবে, রাষ্ট্রের চেয়ে সংখ্যাধিক্যের ক্ষমতা বেশী। সেজন্য সংখ্যাধিক্যের ভাল-বাসা ও সহানুভূতি অর্জন করবার চেষ্টা করতে হবে সতত। আর সেই চেষ্টাই হবে উভয় সম্প্রদায়ের মিলনসেতু।

জয়তু নেতাজী



দেশেবিদেশে

কোয়ালিশনে কংগ্রেস

"আমার চাইতে খুশি আর কেউ নন," এই কথা বলে ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ তাঁর সরকারের অংশীদার হিসেবে কংগ্রেসের [illegible]।

সোমবার ১৫ ডিসেম্বর বিকেলে রাজভবনের সিংহাসন কক্ষে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ছ'জন ঘোষ সরকারের মন্ত্রীরূপে শপথ নেন। এই নিয়ে মন্ত্রীদের সংখ্যা দাঁড়ালো ১৭। বাকী ১১ জন হচ্ছেন ডঃ ঘোষের প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের সাতজন পূর্ণ ও চারজন রাষ্ট্র মন্ত্রী।

কংগ্রেসী মন্ত্রীরা হলেনঃ ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র (অর্থ, বিধানমণ্ডলী ও বিচার); শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (সেচ ও জলপথ), শ্রীবিজয়সিং নাহার (পরিবহন, আবগারী ও বন), শ্রীরবীন্দ্রলাল সিংহ (পূর্ত ও গৃহনির্মাণ), ডঃ বিনোদবিহারী মাঝি (উদ্বাস্তু পুনর্বাসন ও সমাজ কল্যাণ) এবং শ্রীআবদুস সাত্তার (ভূমি ও ভূমি রাজস্ব)।

পি-ডি-এফ সরকারকে কংগ্রেস এতদিন শুধু পেছনে থেকে সমর্থন জানিয়ে আসছিলেন। এখন তাঁরা সামনে এগিয়ে এসে কাঁধে কাঁধ মেলালেন। যদিও বিধানসভার স্পীকার শ্রীবিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন মন্ত্রিসভা সম্পর্কে তাঁর আগের মত পাল্টাবার কোন কারণ ঘটেনি, তবু বাস্তব বিচারে এই কোয়ালিশন বামপন্থীদের অন্তত একটি প্রচারকে ভ্রান্ত প্রমাণিত করবে। বামপন্থীরা এতদিন বলে আসছিলেন ১৭ জনের পি-ডি-এফের শাসন কার্যত

একটি সংখ্যালঘু সরকারের শাসন। এরপর ডঃ ঘোষকে আর এই সমালোচনা শুনতে হবে না যে, তিনি সংখ্যালঘু সরকারের মুখ্যমন্ত্রী। সুতরাং আগামী ২৬ জানুয়ারী থেকে যুক্তফ্রন্ট যে তৃতীয় পর্যায়ের আন্দোলন আরম্ভ করছে, তার একটা বড় যুক্তি আর রইল না।

এই কোয়ালিশন অবশ্য খুব তাড়াতাড়ি আসেনি। ডঃ ঘোষ গোড়া থেকেই চাইছিলেন কংগ্রেস শুধু সমর্থন না জানিয়ে সরকারের মধ্যে আসুক। কংগ্রেসই কোন না কোন যুক্তি দেখিয়ে কেবল সময় নিচ্ছিল। শেষের দিকে ডঃ ঘোষ ক্রমেই বিরক্ত হয়ে উঠছিলেন। এক সময়ে তিনি এ-কথাও বলতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, কংগ্রেস যদি কোয়ালিশনে না আসে তাহলে তিনি মন্ত্রিসভা ভেঙে দিতে পর্যন্ত দ্বিধা করবেন না।

ডঃ ঘোষের এই অধৈর্যের কারণ ছিল। কংগ্রেস একথা কখনই বলেনি যে, সে কোয়ালিশন করবে না। অথচ কোয়ালিশনে আসতে সে কেবলই দেরী করছিল। এর ফলে ডঃ ঘোষের মন্ত্রিসভার পক্ষে বলিষ্ঠতার সঙ্গে কোন প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব ছিল না। তাঁর মন্ত্রিসভা অনেকটা কেয়ারটেকার হিসেবে কাজ করছিল। তাঁর কাছে এই ভূমিকা বাঞ্ছনীয় হতে পারে না। রাজ্যের কল্যাণের দিক থেকেও তা বাঞ্ছনীয় ছিল না।

কিন্তু রাজ্যের প্রশাসনকে দৃঢ়তর ভিত্তির ওপর স্থাপন করা ছাড়াও কংগ্রেস-পি-ডি-এফ কোয়ালিশনের সামনে আরেকটি কর্তব্য রয়েছে: বিধানসভাকে চালু করা। কিভাবে করা হবে তা এখনো ঠিক হয়নি, তবে তাঁরা আশা করছেন ফেব্রুয়ারীর প্রথমদিকে বিধানসভার অধিবেশন সম্ভবত ডাকা হবে। যদি স্পীকার আবার সভাকে অচলাবস্থার দিকে ঠেলে দিতে চান তাহলে অবশ্য শুধু রাজ্য সরকারের চেষ্টায় কাজ হবে না, কেন্দ্রীয় সরকারকেও হস্তক্ষেপ করতে হবে।

ইতিমধ্যে কোয়ালিশন সরকারের জন্মলগ্নে একটি অশুভ সম্ভাবনা একে বিপন্ন করে তুলেছিল। কংগ্রেসী এম-এল-সি শ্রীআশুতোষ ঘোষ জানান যে, পি-ডি-এফ ও কংগ্রেসের ৩১ জন সদস্য কোয়ালিশন সরকারের ওপর থেকে তাঁদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নিতে চান। এ নিয়ে তিনি লোক পাঠিয়ে দিল্লীতেও দরবার করেছিলেন। তাঁর অভিযোগ ছিল, কোয়ালিশনে কংগ্রেসী মন্ত্রী নির্বাচনের ব্যাপারে কংগ্রেস পরিষদীয় দলের সঙ্গে পরামর্শ করা হয়নি। পরে বোঝা গেছে তাঁদের আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল এইভাবে চাপ দিয়ে শ্রীঅতুল্য ঘোষকে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বাইরে রাখা। তাঁদের সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে এবং এর ফলে তাঁদের বিরোধিতার তীব্রতাও অনেকখানি কমে এসেছে।

কংগ্রেস যাতে কোয়ালিশনে যোগ দিতে পারে তার জন্যে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অনুমতি দরকার হয়েছিল। হায়দরাবাদের অধিবেশনে কংগ্রেস হাই-কমাণ্ড কেবল এই অনুমতিই দেননি, তাঁরা বিভিন্ন রাজ্যে অধিষ্ঠিত যুক্তফ্রন্ট সরকারগুলির বিরুদ্ধে কংগ্রেসকে সক্রিয় হবার জন্যেও ছাড়পত্র দিয়েছিলেন।

এই ছাড়পত্র অন্তত একটি রাজ্যে কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দকে দ্বিগুণ উৎসাহিত করেছে। সেই রাজ্য বিহার। বিহারের কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ অবশ্য কোনদিনই তাঁদের ক্ষমতাগুলিকে সহজভাবে নিতে পারেনি। তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে উৎসাহ পেলেন যখন গত সেপ্টেম্বরে যুক্তফ্রন্ট সরকারের তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীবিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ মণ্ডলের নেতৃত্বে কিছুসংখ্যক সদস্য ফ্রন্ট থেকে বেরিয়ে এসে শোষিত দল নামে একটি দল গঠন করলেন এবং কংগ্রেসের সঙ্গে আঁতাত করলেন। শোষিত দল-কংগ্রেসে আঁতাতের পক্ষ থেকে দাবী করা হতে থাকে যে, ৩১৮ সদস্যের বিধানসভায় তাঁরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ, সুতরাং শ্রীমহামায়াপ্রসাদ সিংহের ফ্রন্ট সরকারকে বাতিল করা হোক। তদানীন্তন রাজ্যপাল শ্রীঅনন্তশয়নম আয়েঙ্গার ঐ দাবী অগ্রাহ্য করে বিধানসভায় শক্তি পরীক্ষার পরামর্শ দেন। পরে শ্রীনিত্যানন্দ কানুনগো রাজ্যপাল হয়ে এলে তাঁর কাছেও একই দাবী পেশ করা হয়। কিন্তু তিনিও সে-দাবী অগ্রাহ্য করেন।

গত ১৪ জানুয়ারী এক সাংবাদিক বৈঠকে শ্রীমণ্ডল জানান, কংগ্রেস-শোষিত দল আঁতাত এখন ১৭৪ জন সদস্যের সমর্থনের অধিকারী। কিন্তু বিধানসভার অধিবেশনের জন্যে অপেক্ষা করা ছাড়া তাঁদের উপায় ছিল না।

১৮ জানুয়ারী বিধানসভার বহু-প্রতীক্ষিত ঐ অধিবেশন আরম্ভ হয়। কংগ্রেস-শোষিত দল আঁতাতের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল বিধানসভায় শক্তিপরীক্ষা হলে তাঁরা জিতবেনই। সেই বিশ্বাস দৃঢ়তর হয় যখন বিধানসভা আরম্ভের আগের দিন দুজন রাষ্ট্রমন্ত্রী, শ্রীসাইমন টিগা ও শ্রীবি পি জওহর ফ্রন্ট থেকে পদত্যাগ করে কংগ্রেস-শোষিত দল আঁতাতে চলে আসেন। উল্লেখযোগ্য যে, শ্রীমণ্ডল যখন ফ্রন্ট থেকে বেরিয়ে এসে শোষিত দল গঠন করেন, শ্রীজওহর সেই সময় কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে গিয়ে পাল্টা শোষিত দল গঠন করে ফ্রন্টে যোগ দিয়েছিলেন।

এর দ্বারা উৎসাহিত হয়ে কংগ্রেস-শোষিত দল আঁতাতের পক্ষ থেকে বিধানসভার প্রথম দিনই অনাস্থা প্রস্তাব তোলার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু স্পীকার অনুমতি দেননি। এখন ঠিক হয়েছে ২৪ ও ২৫ জানুয়ারী অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হবে। ঐ প্রস্তাবের ওপর যে ভোট নেওয়া হবে তাতে যে যুক্তফ্রন্ট পরাজিত হবে তাতে এখন আর সন্দেহ করার খুব বেশি কারণ নেই। শোষিত দল গঠিত হবার পর এমনিতেই ফ্রন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠতা কমে গিয়েছিল। এখন কংগ্রেস হাই-কমাণ্ড সরাসরি যুক্তফ্রন্টগুলির পতন ঘটাবার তৎপরতা অনুমোদন করায় কাজটা আরো সহজ হয়ে গেল।

এদিকে উত্তরপ্রদেশেও কংগ্রেস [illegible] সক্রিয় হতে আরম্ভ করেছে। এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ যে, সম্প্রতি সংযুক্ত সোস্যালিস্ট দলের মন্ত্রীরা যখন সংযুক্ত বিধায়ক দলের সরকারকে পদত্যাগের জন্যে রাজভবনে যান তখন সমবেত জনতা 'সি বি গুপ্ত জিন্দাবাদ' বলে শ্লোগান দিয়ে উঠেছিল। শ্রীসি বি (চন্দ্রভান) গুপ্ত ইতিমধ্যে রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে জানিয়ে এসেছেন যে, বিধায়ক দলের অনেক নির্দলীয় সদস্যই তাঁকে জানিয়েছেন কংগ্রেস সরকার গঠন করলে তাঁরা কংগ্রেসকে সমর্থন করবে।

তবে কংগ্রেসী তৎপতার চাইতেও যদি কোন কিছু সংযুক্ত বিধায়ক দলের সরকারকে বিপন্ন করে তবে তা হবে নিজেদেরই অন্তর্দ্বন্দ্ব। শ্রীচরণ সিংয়ের সরকার বিধায়ক দলের গৃহীত মূল কর্মসূচী রূপায়ণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন এই যুক্তিতে কম্যুনিস্ট ও সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী মন্ত্রীরা সরকার থেকে বেরিয়ে এসেছেন। তাঁরা অবশ্য ফ্রন্ট থেকে বেরিয়ে আসেননি তবে তাঁরা, বিশেষ করে এস-এস-পি এই হুমকি দিয়েছে যে, চরণ সিংয়ের আর মুখ্যমন্ত্রী থাকা চলবে না। বিরক্ত হয়ে চরণ সিং নিজেও পদত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। এ নিয়ে আলোচনার জন্যে দলের সমন্বয় কমিটির বৈঠক বসে। ১৮ জানুয়ারী চার ঘণ্টাব্যাপী বিতর্কের পর ঠিক হয় যে, শ্রীচরণ সিং-ই দলের নেতা থাকবেন এবং সেজন্যে দলের কর্মসূচীর কিছু কিছু পরিবর্তন করা হবে।

এর ফলে দলের আশু বিপদ কেটে গেল বটে, কিন্তু একেবারে কেটে গেল একথা বলা যায় না। কারণ এর দ্বারা জোড়াতালি দিয়ে কাজ চালাবারই চেষ্টা করা হয়েছে আমূল সংস্কার করা হয়নি। তাছাড়া এস-এস-পি জানিয়ে দিয়েছে যে, সমন্বয় কমিটি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাতে সে সন্তুষ্ট নয়।

রুশ লেখকদের বিচার

মস্কো সিটি কোর্ট গত ১০ জানুয়ারী চারজন রুশ লেখককে রুশ-বিরোধী কার্যকলাপ ও প্রচারের অভিযোগে বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। এঁরা হচ্ছেন, সাময়িকপত্র সম্পাদক ইউরি গালানস্কভ, ডানিয়েল ও সিনিয়াভস্কির বিচার সংক্রান্ত 'হোয়াইট বুকের' লেখক আলেকজাণ্ডার গিনসবার্গ, আলেক্সি ডব্রোভলস্কি (ইনি অবশ্য পরে রাজসাক্ষী হয়েছিলেন), এবং ভেরা লাশকোভা। মিঃ গালানস্কভকে সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে।

এই বিচার রাশিয়ার বাইরে তো বটেই রাশিয়ার ভিতরেও বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে।

সিসিলিতে ভূমিকম্প

১৫ জানুয়ারী এক ভয়াবহ ভূমিকম্পে ইতালীর সিসিলি দ্বীপে [illegible] শতাধিক ব্যক্তি নিহত হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। কয় [illegible] ১৯৬৩ সালে

রাজনৈতিক সমালোচনা

পাশ বালিশের অভাব

মহেন্দ্র চক্রবর্তী

হায়দ্রাবাদে গ্রীনল্যান্ডের বড় একটা ঘরে ফোমসের গদীর ওপর বসে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যরা দেশের সমস্যা বলে কথিত কতকগুলি বিতর্কের বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। নেতারা ঐ গ্রীনল্যান্ডে যেতে যে পথ অতিক্রম করেছিলেন, সে সকল রাস্তার ওপর পেট্রোলের দোকানে অথবা বড় বড় হোটেলে আলো দিয়ে সাজানো হয়েছিল।

প্রকৃতপক্ষে জব্বলপুরের অধিবেশনে নেতারা আলোর মুখ সে রকম দেখতে পান নি বলতে হবে। সত্যসত্যি সে সময় তাঁরা একটু মুষড়ে পড়েছিলেন। তবে একটা সান্ত্বনা ছিল যে, শত্রুপক্ষের লোকেরা তখন ওখানে রাজত্ব করছেন। অতএব বলার কিছু নেই।

এর পর জব্বলপুরে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যরা একটু অসুবিধায় পড়েছিলেন। কারণ, তাঁদের চেয়ার-টেবিলে বসে বৈঠক করতে হয়েছিল। তাই হায়দ্রাবাদে সেই অসুবিধা দূর করার জন্য অভ্যর্থনা কমিটি বিশেষ নজর রেখেছিলেন। কিন্তু তবু মনের মত হয় নি। ফোমসের গদীতে মিটিং-এর ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু চাদরের সংখ্যা কম পড়ে যায়। তার চেয়ে আরও বিপদ দেখা দেয় পাশ বালিশ নিয়ে। দুর্ভাগ্যবশত অনেক নেতাই পাশ বালিশ পান নি। তবে কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারী বোর্ড পশ্চিমবঙ্গে 'কোয়ালিশন' মন্ত্রিসভা গঠন নিয়ে আলোচনার জন্য যখন মিলিত হয়েছিলেন, তখন তাঁরা সকলেই পাশ বালিশের সাহায্য নিতে পেরেছিলেন। কারণ তাঁরা তখন সংখ্যায় কম। তাই ঐ বোর্ডের বৈঠক পয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে শেষ হয়ে যায়। খেয়ে-দেয়ে উঠে পাশ বালিশের ওপর বসে নেতারা পশ্চিমবঙ্গের স্পীকারের ব্যাপারে চূড়ান্ত গালি-গালাজ করেছেন।

দ্বিতীয় দিনে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকের পর ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে কে ডি মালব্য অতুল্য ঘোষকে বললেন, 'দাদা কোথায় যাচ্ছেন?' অতুল্যবাবু হেসে বললেন 'জাহান্নামে।' মালব্যজী জানালেন, 'আমিও যাবো।' 'তবে চলুন।' উত্তর এলো। দুজনই তারপর খাওয়ার ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন।

জাহান্নাম যে এতো ভাল জায়গা, তা আগে জানা ছিল না।

এতো সিরিয়াস ঘটনার মধ্যেও মাঝে মাঝে নেতাদের মধ্যে যে হাসি-ঠাট্টা হয় নি, তা বলা যায় নি। কামরাজের একজন শুভাকাঙ্ক্ষী অধিবেশন চলার সময় তাঁকে দু বাক্স সন্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি দিল্লীর রিপোর্টারদের কাছে একটা বাক্স এগিয়ে দিয়েছিলেন। আর একটা সরিয়ে রাখলেন। এই সময় কে ডি মালব্য ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য নির্বাচনে ভোট দিয়ে কামরাজের দিকে এগিয়ে গেলেন। কামরাজ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'খবর কি? নির্বাচনে তোমার অবস্থা কি রকম?' মালব্যজী তাড়াতাড়ি হেসে বললেন, 'সেটা পরে উত্তর দেবো। আগে একটা সন্দেশ দিন; আমি আমার একজন এজেন্টকে তা দিই।' এ বলে একটা সন্দেশ তুলে নিয়ে তিনি এক ভদ্রলোকের দিকে এগিয়ে দিলেন। এ ভদ্রলোক মালব্যের হয়ে খুব পরিশ্রম করেছেন। তারপর তিনি কামরাজকে বললেন, 'আমি খুব নীচেই আছি। আমি আর নীচে নামতে পারি না। এবার শুধু উঠবো।'

একথা শুনে উপস্থিত সবাই হেসে উঠলেন।

কেন্দ্রের কংগ্রেসী নেতারা অনেক দিন ধরে বেঁধে রাখার পর যেই ছেড়ে দিলেন, অমনি পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস ছুটে গিয়ে প্রগতিশীল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের সঙ্গে কোয়ালিশনে যোগ দিলেন। কিন্তু তাতে বিপদ কাটলো না। শ্রীআশুতোষ ঘোষ প্যাঁচ মারতে শুরু করে দিলেন। সত্যসত্যি মোক্ষম প্যাঁচ বলতে হবে।

ভোলানাথ ব্রহ্মচারী বললেন, 'আমাদের লীডার অতুল্যবাবু এই নতুন সরকার গড়ে দেবার ব্যাপারে কম কাজ করেন নি। এবার নতুন সরকার গঠন হলো, একবারও তার জন্য অতুল্যবাবুর সঙ্গে আলোচনা হলো না। ব্যাপারটা কি?'

প্রশ্ন — আপনি কি ডিফেক্টারদের খাতায় সই করেছেন?

ব্রহ্মচারী — লিখে নিন আমি নম্বর ওয়ান সই করেছি!

একথা বলে ব্রহ্মচারী তাঁর গায়ের চাদরটা উড়িয়ে দিলেন।

সত্যি, জলটা একটু ঘুলিয়ে গেছে। তবে এই রাজ্যে রাজনীতির গতি-প্রগতি নিয়ে আর বোধহয় ভবিষ্যদ্বাণী কিছু করা যাবে না। কিন্তু একটু নজর রাখতে হবে, কে কোথায় কার সঙ্গে রাতের অন্ধকারে দেখা করছেন?

কুয়েলা লামপুরে স্বাপীরেতে যে ভূমিকম্প হয়েছিল তারপর তার এত বড় ভূমিকম্প হয়নি।

শেখ আবদুল্লার ব্যাখ্যা

১৪ জানুয়ারী দিল্লীতে এক সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে শেখ আবদুল্লা কাশ্মীর সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গী পুনরায় ব্যাখ্যা করেন বলেন। তাঁর মতে কাশ্মীরের ভারতভুক্তি সাময়িক, চূড়ান্ত নয়। তিনি বলেন, কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংগ এই কথা তিনি মানেন না। যদি তাই হত তাহলে তাঁর মতে কোন বিরোধই থাকত না। তিনি বলেন, গত চল্লিশ বছর ধরে কাশ্মীরীরা তাঁর নেতৃত্বে নিজেদের ভাগ্য নিজেরা নির্ধারণের অধিকার লাভের জন্যে লড়াই করে এসেছে; ভারত বা পাকিস্থান কারো সেই অধিকার কেড়ে নেবার সাধ্য নেই।

১৫ জানুয়ারী শেখ আবদুল্লার কাছে এক বার্তা পাঠিয়ে পাকিস্থানের প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ বলেছেন কাশ্মীরীদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভ করতে পাকিস্থান সাহায্য।

বৈষয়িক প্রসঙ্গ

দিল্লীতে দুই বিশ্ব

ধনবান দেশগুলি মুখে দরিদ্র বিশ্বের প্রতি যে দরদই দেখাক না কেন, বাস্তব ঘটনা হচ্ছে এই যে, উন্নত ও উন্নতিকামী দেশগুলির মধ্যে ধনবৈষম্য কমছে না, বরং বাড়ছে। বিশ্ব ব্যাঙ্কের সদ্য বিদায়ী প্রেসিডেন্ট জর্জ ডি উডস সম্প্রতি এক প্রবন্ধে লিখেছেন:—

"উন্নয়ন দশকের লক্ষ্য ছিল, স্বল্পোন্নত দেশগুলির বৈষয়িক বিকাশের হার সমগ্রভাবে ৫ শতাংশ হবে। ১৯৫০ থেকে ১৯৫৪ সালের মধ্যে এই দেশগুলির মোট জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির হার ঐ অঙ্কের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছেছিল। কিন্তু ১৯৫৫ থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে বিকাশের হার কমে মাত্র সাড়ে চার শতাংশ হয়। ১৯৬০-৬৪ সালে এই হার আরও কমে মাত্র চার শতাংশ হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কথা মনে রাখলে দেখা যাবে, যে ৮০টি উন্নতিকামী দেশ বিশ্ব ব্যাঙ্কের সদস্য তাদের প্রায় অর্ধাংশে মাথাপিছু আয় বার্ষিক এক শতাংশ বা তার চেয়েও কম হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সম্প্রতি জনসংখ্যা যে উচ্চ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে তার সঙ্গে তাল রাখতে পারাটাও সামান্য কৃতিত্বের কথা নয়, তবে এটাই যথেষ্ট নয়। এই অনগ্রসর গোষ্ঠীর দেশগুলির অধিবাসীদের গড় মাথাপিছু আয় বাৎসরিক ১২০ ডলারের বেশী নয়। এক শতাংশ হারে বৈষয়িক বিকাশ হতে থাকলে ২০০০ খৃস্টাব্দে বাৎসরিক গড় মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ ১৭০ ডলারে পৌঁছবে কিনা সন্দেহ। কতকগুলি দেশে এই আয়ের স্তর আরও কম হবে।

"এটা হচ্ছে খাঁটি পাটিগণিতের ব্যাপার। কিন্তু এর তাৎপর্য স্পষ্ট এবং ভেবে দেখার মত। এইভাবেই যদি চলতে দেওয়া হয় তাহলে এই শতাব্দীর অবশিষ্ট কয়েক বছরে বিশ্বের বৃহৎ অঞ্চলে জীবনধারণের মানের কোন উন্নতি হবে না। অথচ এই একই সময়ের মধ্যে সমৃদ্ধতর দেশগুলির সম্পদ দেড় কতকটা বৃদ্ধি পাবে। যেমন,

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির বর্তমান হার যদি বজায় থাকে তাহলে সে-দেশে মাথাপিছু বাৎসরিক গড় আয়ের পরিমাণ বেড়ে এই শতাব্দীর শেষে তিন হাজার ডলারের স্থলে সাড়ে চার হাজার ডলারে এসে দাঁড়াবে। অর্থাৎ, অন্য কথায়, এই সময়ের মধ্যে কতকগুলি দেশে জনপ্রতি গড় আয় যেখানে ৫০ ডলার বাড়বে সে-জায়গায় আমেরিকায় জনপ্রতি গড় আয় বাড়বে দেড় হাজার ডলার।"

পৃথিবীর ৮০টি উন্নতিকামী দেশের মধ্যে ৩০টির বেশী দেশকে তাদের বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের অর্ধেকের বেশীর জন্য একটি মাত্র ফসল বা পণ্যের রপ্তানীর উপর নির্ভর করতে হয়। বিশ্বের বাজারে এইসব ফসল বা পণ্যের (সাধারণত কৃষিজাত) দর আদৌ স্থিতিশীল নয়, বরং শিল্পজাত পণ্যের বাজার দর যখন চড়তে থাকে তখন এই সব কৃষিজাত পণ্যের বাজার দর পড়তে থাকে। তার ফলে উন্নতিকামী দেশগুলিকে দুই দিক থেকে অসুবিধায় পড়তে হয়। তাদের বেশী দাম দিয়ে বিদেশ থেকে নিজেদের প্রয়োজনীয় পণ্য কিনতে হয় অথচ তারা নিজেদের পণ্যের জন্য বিদেশে কম দাম পায়। দুনিয়ার বাজারে কোকোর দাম পড়ে যাওয়ায় আবার বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় কয়েক বছরের মধ্যে নিরপেক্ষ হয়ে গিয়েছিল। রাষ্ট্রসংঘের একটি হিসাবে প্রকাশ যে, দশ বছরের মধ্যে উন্নতিকামী দেশগুলির মামুলী রপ্তানী পণ্যের দাম প্রায় দশ শতাংশ হারে কমে গেছে। ১৯৫৩ সালে আন্তর্জাতিক বহির্বাণিজ্যে দরিদ্র বিশ্বের অংশ ছিল শতকরা ২৭ ভাগ, ১৯৬০ সালে সেটা কমে হয়েছে শতকরা ১৯·৩ ভাগ।

অন্যদিকে উন্নত দেশগুলি উন্নতিকামী দেশগুলিকে যেসব ঋণ দিচ্ছে তাদের সর্তগুলি কঠোরতর হচ্ছে। সুদের হার মোটের উপর বাড়ছে এবং ঋণ পরিশোধের মেয়াদ মোটের উপর কমছে।

এবং সবচেয়ে আশঙ্কার কথা, ক্রমবর্ধমান বৈদেশিক ঋণের বোঝা উন্নতিকামী দেশগুলির উপর দেনা শোধের এমন একটা দায় চাপিয়ে দিচ্ছে যাতে উন্নত দেশগুলির বৈদেশিক সাহায্যের কর্মসূচী বলতে গেলে অর্থহীন হয়ে পড়েছে। জর্জ উডস তাঁর ঐ প্রবন্ধেই দেখিয়েছিলেন যে, বর্তমান অবস্থা যদি চলতে থাকে তাহলে ১৫ বছরের মধ্যে এমন একটা পরিস্থিতি দেখা দেবে যখন উন্নতিকামী দেশগুলিতে যে পরিমাণ মূলধন গিয়ে পৌঁছবে সে-পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রাই সুদ ও লভ্যাংশ বাবদ বেরিয়ে যাবে।

এর উপর সম্প্রতি ইউরোপের বারোয়ারী বাজারের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যে ধরনের বাজারের লড়াই শুরু হয়েছে তাতে "উন্নয়ন দশক"-এর বাকী ভবিষ্যৎও অন্ধকারাচ্ছন্ন বলে মনে হচ্ছে। সচ্ছল পৃথিবীর এই দুই তরফই নিজের নিজের সচ্ছলতা বজায় রাখতে উৎসুক। তারা আমদানী যথাসম্ভব বাড়িয়ে এবং রপ্তানী যথাসম্ভব কমিয়ে বহির্বাণিজ্যে নিজেদের শক্তিবৃদ্ধি করতে চাইছে। তার ফলে উন্নত বিশ্বের বাজারগুলিতে অনুন্নত বিশ্বের পণ্যের প্রবেশাধিকার আরও সংকুচিত হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই আগামী ১ ফেব্রুয়ারী থেকে নয়াদিল্লীতে রাষ্ট্রসঙ্ঘের দ্বিতীয় বাণিজ্য ও উন্নয়ন সম্মেলন আরম্ভ হচ্ছে। জেনেভা সম্মেলনের পর এই দ্বিতীয়বার ধনী ও দরিদ্র বিশ্ব পরস্পরের মোকাবলায় নামছে। এই সম্মেলনে আর একবার ধনী বিশ্বের বিবেকের সামনে প্রশ্নটি উঠবে—আন্তর্জাতিক ধনবৈষম্য হ্রাস করার জন্য উন্নত দুনিয়া কোন আন্তরিক প্রয়াস করবে কিনা? দরিদ্র বিশ্বের পক্ষ থেকে নয়াদিল্লীর এই সম্মেলনে অবশ্যই দাবী উঠবে—উন্নতিকামী দেশগুলির পণ্যের জন্য উন্নত দেশগুলির বাজার উন্মুক্ত করা হোক এবং সেই উদ্দেশ্যে সেসব দেশে আমদানী পণ্যের উপর যেসব শুল্ক ধার্য করা আছে সেগুলি তুলে দেওয়া হোক, যেসব ক্ষেত্রে এই ধরনের শুল্ক তুলে দেওয়া যাবে না সেখানে এই শুল্ক থেকে আয়ের একটা অংশ রপ্তানীকারী দেশগুলিকে ফিরিয়ে দেওয়া হোক, উন্নতিকামী দেশগুলি সাধারণত যেসব কৃষিপণ্য রপ্তানী করে থাকে সেগুলির মূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য চেষ্টা করা হোক ইত্যাদি।

ধনী দেশগুলিকে দরিদ্র দুনিয়ার এই সব দাবী অত্যন্ত সতর্কভাবে বিবেচনা করতে হবে। কেননা, এটা নিছক ন্যায়-নীতির প্রশ্ন নয়, বাস্তব রাজনীতিরও প্রশ্ন।





একা একা রাত দুটোয় ঘরে শুয়ে আমি আপনার কথাই ভাবছি অলকবাবু।

জানি, আপনি আইনের কেতাবে অনেকটা সময় ডুবে থাকেন, জানি, একটা মস্ত আলোর চারপাশে লক্ষ লক্ষ দেওয়ালী পোকার মত আইনের সূক্ষ্ম পোকাগুলো আপনার বুদ্ধির আলোর চারপাশে দিনরাত ঘুরে বেড়ায়। আপনার হয়তো অনেক কথাই মনে থাকে না, অনেক কথাই আপনার পক্ষে ভুলে যাওয়া সহজ হয়, কিন্তু সকলের তা হয় না।

পরিচ্ছন্ন মন আর বুদ্ধি নিয়ে যারা বাঁচতে চায়, তারা জীবনের অনেক কথাই ভুলে যেতে পারে না, ভালবাসা আর ঘৃণা দুটোরই দাম তাদের কাছে অনেক বেশী।

আপনি পাপপুণ্যের বিচারে ওকালতি করেন। শহরের ঘানু অ্যাডভোকেট আপনি। হ্যাঁ-কে না করে দিতে পারেন। না-কে হ্যাঁ করে দিতে পারেন। সত্যিকে মিথ্যে করতে পারেন, মিথ্যেকে সত্যি পারেন। কিন্তু সত্যিই পারেন কি? পারেন না। সত্যি যা, তা মিথ্যে হয় না। বাইরে হলেও মনে হয় না।

কথাটা খুবই সাধারণ। তবু কথাটা আমরা ভুলে যাই, বড় বেশী ভুলে যাই।

বাইরে সংসারের মামলায় আপনি জিতেছেন মনে করলেও আপনি হেরেই যান। হেরে গেছেন। অমলার কাছে আপনি হেরে গেছেন। আমার কাছেও আপনি হেরে গেছেন।

আপনার কথা ভাবলে মাঝে মাঝে আমার কষ্টও হয় অলকবাবু। পরকে ফাঁকি দিয়ে জেতা আপনার অভ্যেস হয়ে গেছে। তাই নিজেকে ফাঁকি দিয়েও আপনি জিততে চেয়েছিলেন। কিন্তু নিশ্চয় জানি, আপনি জিততে পারেন নি।

অমলার কাছে আপনি হেরে গেছেন, আমার কাছেও আপনি হেরে গেছেন।

আবার মাঝে মাঝে ভাবি, দোষ আপনার নেই, অমলাকে আপনি ভালবেসেছিলেন।

আপনি পঞ্চাশ বছর বয়েসের ঘানু অ্যাডভোকেট। সাংসারিক কৃতিত্বে আপনার তুলনা নেই। খাটো শক্তসমর্থ ফরসা দেহটি আপনার শক্তিমত্তার পরিচয় দেয়। দামী চশমার নীচে আপনার ছোট ছোট চোখ দুটি বুদ্ধির দীপ্তিতে সব সময় দীপ্যমান। মাথার পেছনের চুল পাতলা হয়েছে, চুলে পাক ধরেছে, তবু আপনি চব্বিশ বছর বয়েসের মধুর যৌবনবতী অমলাকে ভালবেসেছিলেন।

আমি জানি না, আপনি কেন বিয়ে করেন নি। জানি জীবনের প্রারম্ভে কোন গূঢ় গোপন কারণে আপনি বিয়ে করতে চান নি কিনা, অথবা কোন ব্যক্তিগত কারণে আপনি বিয়ের বোঝা কাঁধে তুলে নিতে পারেন কিনা। আমি জানি না।

আমি যতটুকু জানি, বিয়ে করা আপনার উচিত ছিল। আর অমলাকেই আপনি বিয়ে করতে পারতেন। অমলা নিটোল যৌবনবতী। ওর ছায়া-ছায়া গায়ের রঙ মুখের গাঢ় লাবণ্য যে কোন মেয়ের চেয়ে ওর রূপকে আকর্ষণীয় করেছে। আপনি জানেন, ওর বড় বড় কালো চোখদুটোয় কি মায়া! মনটা ওর বুকের মতই নরম, নমনীয়।

তবু আপনি অমলাকে বিয়ে করেন নি।

বিয়ে করতে আপনি চান না। আপনি কি বিয়ে করতে ভয় পান? কিসের ভয় আপনার বুঝি না। অর্থেসামর্থ্যে আপনার প্রতিপত্তি সামান্য নয়। বুদ্ধিবিবেচনায় আপনি কারো চেয়ে কম নন। মেয়েদের আকর্ষণ করবার মত অনেক কিছুই আপনার আছে। তার ভেতর সবচেয়ে বড় দুটো বস্তু আপনার আছে, প্রচুর অর্থ আর দেহের সামর্থ্য। যদিও জানি, আপনার যৌবন অতিক্রান্ত, তবু শক্ত মজবুত দেহটি আপনার

যে কোন যৌবনবান পুরুষের চেয়ে কম নয়। তবু আপনি বিয়ে করতে চান না।

আপনি কি দায়িত্ব নিতে নারাজ, বিশেষ করে কোন মেয়েমানুষের দায়িত্ব?

বুঝি না। তবে এইটুকু বুঝি যে মেয়েমানুষের কেন, যে-কোন মানুষের দায়িত্ব নিতে যেটি প্রধানতম প্রয়োজন, সেই আর্থিক সম্পদ আপনার আছে। এ সম্পদ যার থাকে না, সে কোন দায়দায়িত্ব নিতে ভয় পেতে পারে, কিন্তু আপনি নন।

হয়তো ভুল করেছি, একটি কথা মনে পড়ল। এমনও হতে পারে, কোন মেয়েমানুষকে বাধ্য হয়ে আপনার দীর্ঘদিন ভাল লাগতে হবে। এমন একটা বাধ্যবাধকতা আপনি চান না। হতে পারে কোন মেয়েমানুষ আপনাকে খুব বেশীদিন আকর্ষণ করতে পারে না। কিছুকাল পরেই পুরোন আসবাবের মত সেটা সরিয়ে ফেলে অথবা বিক্রি করে নোতুন আসবাবের খোঁজ করেন।

এমন যে হতে পারে না, তা বলছি না। হতে পারে। কিন্তু তা যদি হয়, তবে আমি বলব, আপনি মেয়েমানুষের দেহ ছাড়া আর কিছু কখনো আকাঙ্ক্ষা করেন না। তাই যত সুগঠিত দেহের অধিকারিণীই হোক না কেন, কোন যৌবনবতীর যৌবনচিহ্ন আপনার কাছে দীর্ঘদিন নোতুন আস্বাদ আনতে পারে না। কিছুকাল পরেই পুরোন হয়ে যায়।

তা যদি হয়, তবে আমাকে বলতে হবে আপনি হৃদয়ের সন্ধান করেন নি। হৃদয় দিয়ে হৃদয়কে জানতে চাননি। মেয়েমানুষের হৃদয়ের খবর পাবার কোন চেষ্টা কোনদিন করেন নি। আপনি ভালবাসতে পারেন না। ভালবাসতে জানেন না।

তা হলে বলব, আপনার চেয়ে হতভাগ্য পুরুষ সংসারে অতি অল্পই আছে। আপনার বন্ধ্যা হৃদয়ের জন্যে যে চাপা আর্তনাদ হৃদয়ের তলায় ধ্বনিত হচ্ছে তা আপনি শুনতে না পেলেও আপনার কথা ভেবে কষ্টই হয়।

আমার এ সব ভাবনা বোধহয় ঠিক নয়। কেননা অমলা আমাকে অন্যরকম বলেছিল।

একটা কথা মনে পড়ল। আপনি হয়তো ভেবেছিলেন, অমলা আমাকে এ সব কথা কখনো বলবে না। আমাকে কেন কাউকেই বলবে না। কোন মেয়েমানুষই তার যৌবন কালের অনেক কথা চিরদিনই মনের তলায় পাথর চাপা দিয়ে রাখে। সে পাথর অনড় অটল। মৃত্যু পর্যন্ত কেউ জানতে পারে না। তার কোন কোন পাপ-পুণ্যের কাহিনী বা সমাজের চোখে অবৈধ।

ঠিকই ভেবেছিলেন আপনি। অবিবাহিত কালের গ্লানি আর ভুল অথবা বেদনার কাহিনী কখনো কোন মেয়েমানুষ নিজে মুখে কারো কাছে বলতে পারে না। বলেও না। জীবনের এই সব পরিচ্ছেদ চিরকাল অজানা থেকে যায়। কিন্তু অমলাকে আপনি চিনতে ভুল করেছিলেন। মানুষকে ভুল করেছিলেন।

অমলা আমাকে বলেছিল।

অকপটে সব কথা আমাকে বলেছিল। বলতে বলতে কেঁদেছিল। অনেক কেঁদেছিল।

ও আমার কাছে ক্ষমা চাইবার চেষ্টা করেনি। কাঁদুনি গেয়ে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণিত করবার চেষ্টা করেনি। শুধু যা ঘটেছিল। তাই বলেছিল।

আমিও শোনামাত্র ওকে দোষী সাব্যস্ত করে কোন শাস্তি দেবার চেষ্টা করিনি। শোনামাত্র নিজের জীবন সম্পর্কে হতাশ হয়ে হাজার হাজার দীর্ঘশ্বাস ফেলবার চেষ্টা করিনি। কেননা আমি জানি, সংসারে এমন ঘটনা ঘটে, এর চেয়ে অনেক বেশী কিছুও ঘটে।

আমার কোন ক্ষোভ নেই অলকবাবু। আমি শুধু ভাবছি, আপনি অমলাকে ঠকাতে গিয়ে হয়তো নিজেই ঠকেছেন। তাই আপনার জন্যই আমি বেদনা বোধ করছি। অমলার জন্যে নয়।

অমলা আমাকে বললে,—দ্যাখ, অলকবাবুর জন্যে আমার বড় কষ্ট হচ্ছে. আমার বিয়ের কিছুদিনের ভেতরেই বিছানায় পড়ল। বাঁচবে কিনা কে জানে।

আমিও শুনেছিলাম, আপনার অসুখটা হৃদয়ের। আর এখন আমার মনে হয়, আপনি কোনদিন আপনার হৃদয়কে উন্মুক্ত করেন নি। নিজের হৃদয়ের আবেগকে নিজে কখনো জানতে চাননি, তাকে হয়তো বা চেপে রাখবার চেষ্টা করেছেন, আর হয়তো বা সেই জন্যেই হৃদয় তার স্বাভাবিক প্রকাশের পথ না পেয়ে অবরুদ্ধ আবেগে দিনের পর দিন জখম হয়ে হয়ে আপনাকে শয্যাশায়ী করে ফেলেছে।

আমি বিছানায় পাশ ফিরে অমলার গায়ে একটা হাত রেখে বললাম,—বেশ তো, যাও। একবার দেখে এস। তোমার একবার দেখা করতে যাওয়া উচিত।

অমলা অন্ধকার নির্জন রাত্রে আমার পাশে শুয়ে তখুনি কোন উত্তর দিল না। আস্তে আস্তে বলল,—ভেবেছিলাম, আর কখনো ওর কাছে যাব না।

—কেন?

অমলা এবার পাশ ফিরে আমার গালে মুখে নিজের হাতটা বুলিয়ে আস্তে বললে,—আমার মাঝে মাঝে কি মনে হয় জান? তুমি এত ভাল হলে কেন? তুমি যদি খারাপ হতে তবে বোধহয় আমি যন্ত্রণা থেকে বেঁচে যেতাম।

আমি হাসলাম। আমি ভাল কি খারাপ সে কথা আমি জানি না। তবে এইটুকু জানি যে সংসারে সব কিছুই ভাল খারাপ মিলেমিশে রয়েছে, এ নিয়ে অযথা ভাবনার কিছু নেই। পাপপুণ্য মিশিয়েই সংসার। শুধু পাপেও সংসার হয় না, শুধু পুণ্যেও সংসার চলে না।

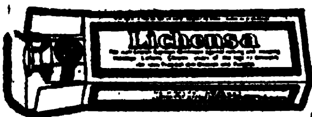
অমলা বললে,—কথাটা তুমি হয়তো বিশ্বাস করবে না, অলকবাবুকে আমি ঘৃণা করি। এত বেশী ঘৃণা করি যে কখনো ওর কাছে গেলে ওর গায়ে থুতু দিতে ইচ্ছে হবে। তাই যেতে ইচ্ছে হয় না। কোনদিন আর যাব না বলেই ভেবেছিলাম। কিন্তু—।

একটু হেসে বললাম,—কিন্তু ওর জন্যে কষ্টও হয়, তাই নয়?

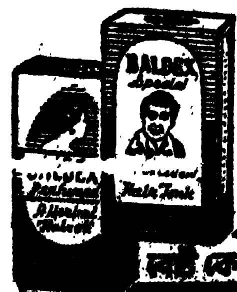
অমলা অন্ধকারে আমার মুখের দিকে মুখ ফেরাল। আমার মুখের রেখাগুলো ভাল করে লক্ষ্য করবার চেষ্টা করল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আস্তে বলল,—কষ্টও হয়।

হ্যাঁ, অমলার কষ্টও হয়। অমলা আপনাকে ঘৃণাও করে অলকবাবু! অমলার ঘৃণা আর বেদনা দুটো মিলিয়ে কথাটা কি দাঁড়ায় আপনি কখনো কি ভাববার চেষ্টা

ব্রণ
দূর করবার জন্যে
লিচেনসা



● ১০৮ টি দেশে ডাক্তাররা প্রেসক্রিপশন করেছেন।
● যে কোন নামকরা ওষুধের দোকানেই পাওয়া যায়।



আয়ুর্বেদীয় উপাদানে প্রস্তুত
বলডেক্স
চুল ওঠা বন্ধ করে
নতুন চুল গজায়
কেমিক্যাল কর্পোরেশন-কলিকাতা-৩৭

করেছেন অলকবাবু? না, কখনো করেন নি। মনকে অগ্রাহ্য করা আপনার স্বভাব। হৃদয়কে বন্ধ করে রাখা আপনার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

তবু আমি জানি, আপনি জড় নন। আপনি পাথর নন। আপনার স্নায়ু আছে, বুদ্ধি আছে, সবই আছে। শুধু সেগুলোকে আপনি বাইরের দিকে উন্মুখ করে রেখেছেন, ভেতরের দিকে কখনো দেখেননি, দেখবার চেষ্টাও করেননি।

আর্থিক আর সাংসারিক দিকে আপনি উদার। আপনি মহানুভব। অমলার বাবা মারা যাবার পরে আপনি যে তাদের আর্থিক বোঝা অনেকটা ঘাড়ে তুলে নিয়েছিলেন, সে কথা জানি। আমি আরও জানি, অমলার সংগে আপনার কোন আত্মীয়তা ছিল না। আপনারই অনেকগুলো বাড়ির একটা ছোট বাড়ির একটা অংশে ওরা ভাড়া থাকত, আর সে অংশটা আপনার নিজের বাসস্থানের সংলগ্ন।

ছোটবেলা থেকে অমলা আপনার কাছে আসত, আপনি তাকে অপত্যস্নেহে আদর করতেন। অমলার মা ভাবত, আপনি বিয়ে করেননি, আপনার নিজের সন্তান নেই, তাই হয়তো আপনি অমলাকে অত ভালবাসেন।

ভাবলে অবাক লাগে। ছোটবেলায় আপনি অমলাকে আদর করে চকোলেট বিস্কুট দিয়েছেন, চুমু খেয়েছেন। অমলার বাইশ বছর বয়েসের সময়েও তাকে টাকা শাড়ি দিয়েছেন, আদর করে চুমু খেয়েছেন। কিন্তু দুই চুম্বনে কত তফাত।

কে জানে, দুই চুম্বনে আপনার কাছে হয়তো কোন তফাত ছিল না। চুম্বনে আপনার মনে কোন আবেগের উদ্ভব হয় কিনা তাই বা কে জানে। মক্কেলের কোন কাজ শেষ করবার আগে তার সংগে হাতে হাত মেলাবার মত আপনি ঠোঁটে ঠোঁট মেলান কিনা, কে বলতে পারে?

চুম্বনের মাধুর্যের স্বাদ আপনার কাছে কতখানি গভীর জানি না। কোন একটি মেয়ের নরম মসৃণ ওষ্ঠের যৌবনোত্তাপ আপনার মনকে কতখানি আচ্ছন্ন করে জানি না। বোধহয় করে না। আপনি হয়তো যৌবন-বতীর কামনাতুর ওষ্ঠের মাধুর্য না দেখে শুধুমাত্র চামড়ায় মোড়া নরম মাংস রক্ত স্নায়ু বলেই মনে করেন। তা যদি হয়, তবে আপনার বাস্তবতাবোধকে প্রশংসা করি আর আপনার মাধুর্য স্বাদ গ্রহণের অক্ষমতাকে ঘৃণা করি।

অমলা বলেছিল,—কিছুই লুকোব না তোমায়। উনি সবই তো পেয়েছিলেন। আমার এই দেহকে সবরকমে পেয়েছেন। তবু কি মনে হয় জান, কি যেন উনি পেলেন না। সব ওকে দিতে পারিনি। কি যে দিতে পারিনি, সেটা আমি নিজেও জানি না।

আপনি কি জানেন অলকবাবু। আপনি কি পাননি?

আমি বলব, আপনি কিছুই পাননি। যা পেলে একটি মেয়ের মনটুকু পাওয়া হয়, তা আপনি পেতে জানেন না, তাই পাননি। পাবার একটা অধিকার থাকা চাই। পেতে হলে দিতে জানা চাই। আপনি তা জানেন না।

অর্থ রোজগারের সব ফন্দিফিকির আপনার জানা আছে। সাংসারিক বুদ্ধিতে যে কোন সত্যকে মিথ্যা করে দেবার কৌশল আপনার জানা আছে। বিষয় আর সম্পদে নিজেকে উঁচুতে তোলবার শক্তি আপনার আছে। তবু আপনার চেয়ে দুর্বল, আপনার চেয়ে অজ্ঞ সংসারে অতি অল্পই আছে।

অমলা বলেছিল,—অলকবাবু তোমায় ঠকাতে চেয়েছিল, কিন্তু আমি তোমাকে ঠকাতে পারব না। আমি নিজেই ঠকিনি, তোমাকেও ঠকাব না।

অমলা কেঁদেছিল। অমলা আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদেছিল।

ঠিকই বলেছিল অমলা।

আমি জানি, আপনি আমায় ঠকাতে চেয়েছিলেন। অমলাকে আর আমাকে দুজনাকে ঠকাতে চেয়েছিলেন। অমলা যখন সরল বোকার মত আপনাকে বিয়ের কথা বলেছিল, আপনি অল্প হেসে বলেছিলেন। বিয়ে তোমার নিশ্চয় দেব, ভাল ছেলের সংগে নিজে দেখে তোমার বিয়ে দেব। তোমার বিয়েতে আমি দশ হাজার টাকা খরচ করব।

আপনি আপনার কথা রেখেছিলেন। কিন্তু অমলার কথা রাখেননি।

অমলা আপনার বিয়ের কথা বলেছিল, আপনি বললেন, অমলার বিয়ের কথা। অমলা আপনার কথা শুনে বোবা জন্তুর মত তাকিয়েছিল আপনার দিকে। ও অবাক হয়েছিল, স্তম্ভিত হয়েছিল। কেননা ও ভাবতে পারেনি যে আপনি ওকে বিয়ে করবেন না। আর ভাবতে পারেনি যে আপনি এমন অক্লেশে হাসতে হাসতে ওকে আমার মত এক দরিদ্র অধ্যাপকের হাতে তুলে দেবেন। আমিই সেই ছেলে, যার নাম সুজয় বসু, যার হাতে আপনি অমলাকে তুলে দিলেন।

আপনি ভাবলেন, এক হতভাগ্যের হাতে এক হতভাগিনীকে তুলে দিলেন। আর মনে মনে হাসলেন।

আপনার উচ্ছিষ্ট খাদ্য এক ভিখারীকে ভিক্ষা দিলেন।

আত্মপ্রসাদে আর বুদ্ধির গৌরবে আপনি ভাবলেন যে আপনি নিশ্চিন্ত হলেন, কিন্তু জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয়, আপনি নিশ্চিন্ত হতে পেরেছেন কি?

না, চিন্তার হাত থেকে আপনি রেহাই পান নি। ওই যে বললাম, আপনার হৃদয়ের আলোর চারপাশে দেওয়ালী পোকার মত অসংখ্য পোকা উড়ছে। আপনি অস্থির হয়ে উঠেছেন, আপনি যন্ত্রণায় আর জ্বালায় অসহায় হয়ে পড়েছেন। আপনি ব্যর্থ হয়েছেন। ধরাশায়ী হয়েছেন।

আপনার জন্যে অমলার কষ্ট হয়। কেন জানেন? জানেন না।

অমলা আপনাকে ঘৃণা করে, অথচ অমলার আপনার জন্যে কষ্ট হয়। তবে কি অমলা আপনাকে ভালবাসে? অমলার ভালবাসাটাই ঘৃণার রূপ নিয়েছে? আমিও প্রথমে একবার তাই ভেবেছিলাম, যে কোন স্বামী হলেই তাই ভাবত আর তারপর চলত দুটো ব্যর্থ হতাশ জীবনের কামড়াকামড়ি—আপনি যা চেয়েছিলেন, যা ভেবেছিলেন।

-তা নয়। পরে আমি ভেবে দেখেছিলাম, তা নয়। আপনি অমলার কাছে ধরা পড়ে গেছেন। আপনি যে অমলাকে ভালবেসে ফেলেছিলেন, আপনি নিজেও তা জানতেন না। অমলা জানত। অমলার হৃদয় আছে, সে ভালবাসা বোঝে, সে হৃদয় দিয়ে হৃদয়কে জানতে পারে। বুদ্ধি দিয়ে বোঝবার চেষ্টা করে না।

আপনার জন্যে অমলার কষ্ট হয়, আপনার নিজের ভালবাসা নিজে বুঝলেন না, অথচ ভয়ঙ্কর এক জ্বালায় আপনি দগ্ধ হতে থাকলেন। এই ভেবেই অমলার কষ্ট হয়। আপনার সমস্ত গৌরব ব্যর্থ হয়ে গেছে। আপনি আমাকে ভিক্ষা দিতে গিয়ে নিজে ভিখিরী হয়েছেন। আমাকে আর অমলাকে ঠকাতে গিয়ে নিজে ঠকেছেন।

আজ রাত্রে অন্ধকার ঘরে শুয়ে শুয়ে আমি আপনার কথাই ভাবছি অলকবাবু।

আপনি কৃতী পুরুষ। বুদ্ধির কৌশলে সত্যকে মিথ্যা করা আর মিথ্যাকে সত্য করাই আপনার পেশা। কিন্তু সত্য যা তা কখনো মিথ্যে হয়ে যায় না। সেই সত্যটা আজ আপনার কাছে ধরা পড়ে গেছে।

সব কিছু জেনে বুঝে অমলার মত আমারও আপনার জন্যে কষ্ট হচ্ছে। বিশ্বাস করুন, আপনার জন্যে আমি বেদনা অনুভব করছি।

শুধু একটা কথাই বুঝতে পারছি না। আপনি চিরকাল কেন অবিবাহিত রইলেন?

†

কিং কো'র
আর্ণিকা
হেয়ার অয়েল
একমাত্র পরিবেশক :
আর. ডি. এম এণ্ড কোং
২১৭, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬
ফোন : ৩৪-৩৮৩৬
প্রস্তুতকারক :
কিং এণ্ড কোং কলিকাতা
(রেজিঃ কেমিষ্টস, স্থাপিত—১৮১৪ সাল)

'ভারতবর্ষের আত্মার আলোয়'

Amrita Bazar Patrika

পত্রিকায় প্রথম রাজনৈতিক শ্লোগান :
জয় জয় ভারত

পুলকেশ দে-সরকার



স্বাধীনতালাভের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করা একটু বড় কথা; পরাধীনতা-বোধও সহসা জাগে না; পরাধীনতার বোধ যদি জাগে, পরাধীনতার জ্বালা যদি দুঃসহ হয়, তবেই পর-অধীনতা থেকে মুক্ত হবার বাসনা জাগে এবং সে বাসনারই আর এক নাম স্বাধীনতা-লাভের আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু যেহেতু আকাঙ্ক্ষাই যথেষ্ট নয়, এজন্যই সর্বস্ব ত্যাগ ও প্রাণ-পাতের কথা ওঠে। কেননা, প্রথম জাগরণ অত্যন্ত মন্দগতি। ১৮৫৭ খৃস্টাব্দেও যা ছিল না, ১৮৬৮ খৃস্টাব্দে তার হয়তো বা সামান্য উন্মেষ দৃষ্টিগোচর হয়। ১৮৫৭ খৃস্টাব্দে এদেশবাসীর অনেকেই সিপাহী বিদ্রোহে অকল্যাণ লক্ষ্য করেছেন ও তার প্রতিরোধে প্রস্তুতও হতে চেয়েছেন—নিছক ঔদাসীন্য নয়। ১৮৬৮ খৃস্টাব্দে সেই একই কাণ্ডকে একটা 'জাতীয়' অভ্যুত্থান ব'লে চিহ্নিত করা পৃথক দৃষ্টিভঙ্গিরই সূচনা করে।

মুসলিম রাজত্বকালে ধর্ম বা সম্প্রদায়-ভেদে হয়তো যথেষ্ট বিরাগের সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু পরাধীনতাবোধ বা স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা কোনটিই এত তীব্র হয়নি যার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটে কোনো অভ্যুত্থানের চেষ্টায়। যদি তাই হত তবে ১৭৫৭ খৃস্টাব্দের ইতিহাস এবং ইতিহাসের গতিও অন্যরকম হত। মুসলিম আমলে বিরাগ সঞ্চার অকারণ ছিল না, বলা যায়, সেই কারণেই ব্রিটিশ আমলের প্রতি অনুরাগের সঞ্চার হয়েছিল। পরাধীনতা বোধের কোনো লক্ষণই এখানে ছিল না। বরং, সেকালের সাহিত্য বা চিন্তাধারায় পরাধীনতা অধীনতা সম্পর্কে বিতর্ক লক্ষ্য করলে বিপরীত ধারণারই সৃষ্টি করবে। একথাও সত্যি যে, পাশ্চাত্য সভ্যতার বাহক ব্রিটিশ শাসনের প্রতি বৃহৎ বঙ্গসমাজের একান্তে যে আনুগত্য প্রকাশ পেয়েছিল তা সর্বতোভাবে নিন্দনীয়ও নয়। কিন্তু পরাধীনতা বোধ এবং স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা —হলেও সোনার খাঁচা ভাল নাহি বাসি অথবা স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে কে বাঁচিতে চায়; দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় রে কে পরিবে পায়—ইত্যাদি ভাবনা একেবারেই ভিন্ন জিনিস। তার অনেক দায় আছে।

অমৃতবাজার পত্রিকার দ্বাদশ সংখ্যায় (২৬ বৈশাখ, ১২৭৫, ৭ই মে, ১৮৬৮) "জাতি-ঐক্যতা" শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধটি এই কারণেই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতে একাধারে পরাধীনতা বোধ, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও জাতি, জাতীয়তা, জাতীয় ঐক্য বা সংহতির স্থান জাগ্রত করার সফল প্রয়াস আছে। সব কিছু থাকতেও কেন ভারতীয়েরা (তখন 'হিন্দু' শব্দেই ভারতীয়দের বোঝাত) এত হেয় ও অপরের করুণার পাত্র হয়ে আছে, পত্রিকা তারই বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন :

"হিন্দু জাতির পরাধীনতার কারণ যাঁহারা সাহস ও বীর্যের অভাব বলেন তাঁহারা ভারতবর্ষীয়গণকে চেনেন না। তাঁহাদের বীর্যের, সাহসের, বুদ্ধির কি রাজ-কৌশলতার অভাব নাই, তাঁহাদের এক মহৎ অভাব—ঐক্যতা এবং ইহাই তাঁহাদের সকল সর্বনাশের মূল। যদি জাতি-ঐক্যতা থাকিত, তবে ভারতভূমি স্বাভাবিক যেমন পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত, ভারত সন্তানগণের যেমন বীর্য, যেমন সাহস, তাহাতে কখনই কোন ভিন্ন জাতি এদেশে প্রবেশ করিতে পারিত না কিন্তু এই অনৈক্যতার জন্য এতদ্দেশীয়গণের কোন দোষ নাই। যে দেশ কস্মিনকালে সম্পূর্ণরূপে একছত্রাধীন হয় নাই, যে দেশে ভিন্ন ২ ভাষা ও ভিন্ন ২ ধর্ম প্রচলিত, সে দেশে সকলের মধ্যে ঐক্যতা থাকা কঠিন বই অসম্ভব নয়।

"ভারতবর্ষীয়গণ হৃদয়শূন্য নন; পূর্বে ঐক্যতা হওয়ার যে সমুদয় প্রতিবন্ধক ছিল, তাহাও এখন অনেক গিয়াছে; এখন সকলেরই এক দশা, আবার পরাধীনতাতে সকলকে ঐক্যতা কত প্রয়োজনীয় বস্তু তাহার শিক্ষা উত্তমরূপ দিয়াছে; অতএব এখন যত্ন করিলে আমাদের এই সর্বনেশে দূরীভূত হওয়া সম্ভব। যদি কোন দেশহিতৈষী, ব্রাহ্মগণের ন্যায়, ভারতের সর্বত্র ভ্রাতৃভাব উদ্দীপনের জন্য ভ্রমণ করেন তবে বোধ হয় তিনি অনায়াসে কৃতকার্য হইতে পারেন। যান না, প্রতিনিধি সভার উদ্যোগী কোন দেশহিতৈষী এদেশের সর্বত্র ভ্রাতৃভাব যাজন করিয়া বেড়ান গিয়া। আমাদের মধ্যে যখন যিনি ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়াছেন তিনিই আসিয়া বলিয়াছেন যে সর্বত্রই তিনি সহৃদয়ে গৃহীত হইয়াছেন প্রীতির অভাব তিনি কোথাও দেখেন নাই।"

লক্ষণীয় যে, ১৮৫৭ খৃস্টাব্দে যে ভাবনার হয়তো বা অস্তিত্ব মাত্র ছিল না অথবা দুর্বল জলাগমক্ষেত্রগত ক্ষীণধারার মত অস্ফুটশব্দ ছিল, দশ বছরের ব্যবধানে তা শুধু বেগমাত্র সঞ্চার করেনি সুস্পষ্ট বাণীবহও হয়েছে। এসব নিছক কথা নয়, প্রেরিত দৈবোক্তিও নয়, একতা ও একতার শক্তি ঘোষ-পরিবারে ছিল এক অমোঘ বাস্তব, খুব কম একান্নবর্তী পরিবারেই এমন ঘনিষ্ঠতা, ভাইয়ে ভাইয়ে আন্তরিক ঐক্য দেখা গেছে; মনমো-ওকিনিলি কেবল ও'দের গ্রামসেবা দেখে মুগ্ধ হন নি, ঘোষ-ভাইয়েদের অবিচ্ছেদ্য সান্নিধ্য, অগ্রজের প্রতি অনুজের আনুগত্য লক্ষ্য করেও মুগ্ধ হয়েছিলেন।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন : "ঘোষ-ভ্রাতাগণের মধ্যে অপূর্ব সম্প্রীতি অনেকের ঈর্ষার বিষয় ছিল।" (শিশিরকুমার ঘোষ, পৃঃ ৯)

অনাথনাথ বসু বলেছেন : "বসন্তকুমারের পরামর্শ অনুসারে শিশিরকুমার 'ভ্রাতৃ-সমাজ' নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠা করেন। বসন্তকুমার প্রেসিডেণ্ট, হেমন্তকুমার সভ্য ও শিশিরকুমার সম্পাদক হইলেন।" (মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ, পৃঃ ২০) এই "ভ্রাতৃসমাজের" উদ্যোগেই গ্রামে নানারকম সদনুষ্ঠান সম্ভব হয়েছে, বিপক্ষের জড়তা, অনীহা, অসূয়া, প্রতি-বন্ধকতা বা প্রতিরোধিতা অতিক্রম করা সম্ভব হয়েছে এই ঐক্যবলেই। সর্বাগ্রজ বসন্তকুমার ছিলেন 'আইডল', হেমন্তকুমার ছিলেন তাঁরই অবিচ্ছিন্ন ছায়াসম, শিশির-কুমার "দাদাকে ঈশ্বরের ন্যায় ভক্তি" করতেন, তাঁর "একটু সন্তুষ্টির নিমিত্ত" তিনি "শতবার প্রাণ দিতে" পারতেন; মতিলাল কিভাবে শিশিরকুমারের ছাঁচে গড়ে উঠে পত্রিকা সম্পাদন করেছিলেন, লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের বর্ণনায় তা প্রশ্নাতীত। এবং এই ঐক্যবলেই ঝিকরগাছার নীলকর সাহেবের উদ্যত আক্রমণ নিরস্ত হয়েছিল। এই ঐক্যবলেই অমৃতবাজার পত্রিকার অতি-শৈশবে সম্ভবধ্বংস রাজপুরুষ-চালিত লাইবেল মকোদ্দমার বিষম বিপর্যস্ত বিরাট সংসার স্বগ্রাম থেকে তুলে নিয়ে অপরিচিত নির্বান্ধব কলকাতায় দৃঢ়মূলে করা সম্ভব হয়েছিল। সুতরাং, ঐক্যই যে শক্তি অমৃতবাজার পত্রিকার পরিচালকবর্গ বা সম্পাদকের কাছে তা বাক্য-মাত্র ছিল না। ছিল বাস্তব পরিবেশে

অন্তরোপলব্ধি: "জাতি-ঐক্যতা" তারই লিপিবদ্ধ পরিচয়।

১৮৬৮ খৃস্টাব্দে গ্রাম থেকেই মুদ্রিত, প্রকাশিত ও প্রচারিত হত; কিন্তু গ্রামের সীমা তাঁদের চোখে পড়ত না; যা কোন এক পরিবারে সম্ভব, গ্রামের একাংশে সম্ভব, সমগ্র ভারতবর্ষে তা সম্ভব নয় কেন?

"যদি কোন দেশহিতৈষী ভারতের সর্বত্র ভ্রাতৃভাব উদ্দীপনের জন্য ভ্রমণ করেন তবে বোধ হয় তিনি অনায়াসে কৃতকার্য হইতে পারেন। ধ্যান না, প্রতিনিধি সভার উদ্যোগী হইয়া এদেশের সর্বত্র ভ্রাতৃভাব যাজন করিয়া বেড়ান গিয়া।" (ঐ)

কিন্তু ভ্রাতৃভাব একটি ভাব মাত্র; বিচ্ছিন্ন অন্তরে অন্তরে তার শান্ত নিষ্ক্রিয় অবস্থিতি; ওটি ক্ষেত্র মাত্র, প্রস্তুত সন্দেহ নেই। কিন্তু ক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্তির ওপর নির্ভর হলে বাঞ্ছিত সুফল পাওয়া যায় না। প্রবন্ধে তাই সে বিষয়ে সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়েছে :

"কিন্তু এইরূপ প্রীতিযাজন দ্বারা সকলের পরস্পরের ভালবাসা জন্মাইতে পারে মাত্র এবং ভালবাসা আর ঐক্যতা ঠিক এক নয়। ভালবাসা ঘটক মাত্র। [পরবর্তী যুগে সার্থক বিপ্লবী নেতা লেনিনও বলতেন, তত্ত্বকথা বলার জন্য ব্যস্ত হ'য়ো না, বন্ধু হও।] জাতি-ঐক্যতার সংস্থাপন করিতে গেলে একটি এমন উদ্দেশ্য আবশ্যক করে যেখানে সকলের স্বার্থ সমানরূপে সম্মিলিত হয়। এবং আমাদিগের মধ্যে এমন কি আছে যেখানে গিয়া সকলে মিশিতে পারে? কেহ ২ বলেন ইংরেজ প্রতি ঘৃণা বিষয়ে সকলে একমত হইতে পারেন—এমন কি ইহাতে হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতি সকল জাতিতে ঐক্য হইবে; কিন্তু এটি কি কর্তব্য?"

যাঁর দৃষ্টি স্বচ্ছ, যিনি দূরদর্শী, একমাত্র তিনিই এমন কথা বলতে পারেন। একমাত্র তিনিই জানেন ঘৃণা নিছক প্রতিক্রিয়া, একেবারেই নঙর্থক এবং মনের এই অভিব্যক্তি কোন স্থায়ী বন্ধনের ও অম্লান কল্যাণের সূত্র হতে পারে না। সুতরাং, তাঁর পক্ষেই একথা বলা সম্ভব :

"কোন জাতিকে ঘৃণা করা নীচত্বের কার্য্য......"

বহু বৎসর পর ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীজী এই কথা বলেছিলেন।

কিন্তু ঘৃণা যদি নয় তবে কি?

"এতদ্দেশীয়গণের সম্মিলিত হইবার এক মহৎ উদ্দেশ্য আছে এবং যেখানে বোধ করি সকলের স্বার্থ থাকিতে পারে। সেটি ভারত-ভূমিকে দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে উন্মোচন করা।"...

১৮৬৮ খৃস্টাব্দের কথা। স্পষ্ট কথা। ১৮৫৭ খৃস্টাব্দের মানসিকতা স্মরণ করলে ১৮৬৮ খৃস্টাব্দে একথা বিস্ময়কর মনে হয় না? দশ বছরে বৃটিশ শাসন দুর্বলতর হয়নি, প্রবলতর হয়েছে; দশ বছর আগে বৃটিশ শাসনের যে মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছিল তার বৃদ্ধি, ঘটেছে বৈ হ্রাস পায়নি। তবু 'সংবাদ প্রভাকর', 'সংবাদ ভাস্করের' তাৎকালিক প্রভাব অগ্রাহ্য করে এমন ঋজু কথা একটি গ্রামের "শিশু" সাপ্তাহিক বলার ভয়শূন্যতা পেল কোথায়?

কবি নবীনচন্দ্র সেন বলেছেন :

যশোহরে লিখিত আমার খন্ড কবিতায় ও 'পলাশির যুদ্ধে' স্বাধীনতার জন্য যে নিঃশ্বাস ও মাতৃভূমির জন্য অশ্রু বিসর্জন আছে, তাহা কথঞ্চিৎ শিশিরকুমারের সংসর্গের ও শিক্ষার ফল। তিনি ও তাঁহার পত্রিকাই প্রথমে এই দেশে স্বদেশভক্তির পথ-প্রদর্শক।" (নবীনচন্দ্র রচনাবলী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১ম খন্ড)

এই। এই-ই তো অমৃতবাজার পত্রিকাকে সেকালের অন্যান্য পত্র-পত্রিকা থেকে বিশিষ্ট করে তুলেছিল এবং শাসকবর্গের সন্দিগ্ধ ক্রুদ্ধ দৃষ্টি এই পত্রিকার ওপরই নিবদ্ধ ছিল। 'ভারতভূমিকে দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে উন্মোচন করা'—এক কথায়, স্বাধীনতা।

"ইহাতে শুদ্ধ হিন্দুরা কেন পৃথিবীর সকল মহৎ জাতিই সম্মিলিত হইতে পারেন। হিন্দুজাতির ন্যায় মহৎ একটি জাতি স্বাধীন হইবে, ইহাতে কাহার না আন্তরিক আনন্দ হইবে? ইংরেজগণ আমাদিগকে এই রত্ন উপভোগের জন্য এত যত্ন পাইতেছেন। এ দেশে থেকে, স্বদেশে অবস্থিতি, করিয়া, ক্রমে আমাদিগকে সভ্যতার সোপানে তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা যদি দেখেন যে আমরা স্বদেশকে স্বাধীন করিবার জন্য যত্নশীল হইতেছি তাহা হইলে তাঁহারাও আনন্দে নৃত্য করিবেন।"

লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক যে সাংবাদিক লিপিকৌশলের কথা উল্লেখ করেছেন তা এই; আশঙ্কিত প্রতিবাদীকেও কিভাবে নিরস্ত ও সপক্ষ করতে হয় এ সেই কৌশল। স্বাধীনতা শুধু আমরা চাই তা নয়, আমাদের শাসক ইংরেজরাও আমাদের স্বাধীনতা দিতে চান এবং তারই যত্ন করে চলেছেন।

এই সাংবাদিকতাকেই অনুসরণ করেছেন তিলক তাঁর পত্র-সম্পাদনায় এবং এই সাংবাদিকতা সম্পর্কে তিনি কি বলেছেন তার একটু পুনরাবৃত্তি করি : "আমার মতে শিশিরবাবু হচ্ছেন এদেশের সাংবাদিকদের অগ্রদূত।......আজকাল সরকারের সমালোচনা করা খুবই কঠিন কাজ—কিন্তু সেকালে তা আরও কঠিন ছিল; শুধুমাত্র মর্মঘাতী শ্লেষ নয়, প্রচুর সঙ্গতি, যথেষ্ট সাহস, গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও অফুরন্ত সহানুভূতি অপরিহার্য ছিল এদেশে সৎ সাংবাদিকতাকে সফল করে তুলতে......আমি একথাও বলতে পারি যে, আমরা যখন আমাদের মাতৃভাষায় আমাদের কাগজখানি বের ক'র তখন অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদককেই অনুসরণের চেষ্টা করেছি।

এ হচ্ছে সেই সময় যে-সময় কিভাবে আমলা-তন্ত্রের সমালোচনা করেও আর্থিক না হোক শারীরিক নিরাপদে থাকা যায় তা শিখতে হত। তখনকার সাংবাদিকতায় শিশিরকুমার এই রীতিটির পূর্ণ বিকাশসাধন করেছিলেন।......ভগবানকে ধন্যবাদ যে, ভারতীয় সাংবাদিকতার শৈশবে এমন এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছিল।"

নিপুণ সাংবাদিক তাই এই বলে উপসংহার করলেন, কি উদ্যোগ করতে হবে দেশকে স্বাধীন করবার জন্য?

"ফল কি উদ্যোগে দেশকে স্বাধীন করা যাইতে পারে?"

"এদেশে প্রতিনিধি সভা সংস্থাপনের কথা হইতেছে।" সংগঠন—organisation, নেতৃত্ব, subjective leadership.

"উদ্যোগটি মন্দ নয়, বোধ করি যদি সমুদয় ভারতবর্ষীয়গণ ইহার মর্ম সুন্দর-রূপে অবগত হন তবে সকলে একতানে "জয় জয় ভারতেরই" বলিয়া উঠিতে পারেন।" (৭ই মে, ১৮৬৮)

আরও আট বছর পর বঙ্কিমচন্দ্র "বন্দেমাতরম্" সঙ্গীত রচনা করেছিলেন (১৮৭৫); তারও পাঁচ সাত বছর পর (১৮৮০-৮২) সঙ্গীতটি বঙ্কিমচন্দ্র "আনন্দ মঠে" সন্তানমুখে উচ্চারিত করেছিলেন। তার দুই দশক তো বটেই, তারও পরে, "বন্দেমাতরম্" রাজনৈতিক ধ্বনি হিসেবে গৃহীত হ'তে থাকে। হিন্দীর প্রাধান্যে "ভারত মাতাকী জয়" তারও অনেক পরে, বিংশ শতাব্দীর দুই দশকের পর, 'জয় ভারত' অথবা 'জয় হিন্দ' চার-পাঁচ দশকের ব্যাপার। সুতরাং, ভাবলে বিস্মিত হ'তে হয়, উনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকেই অমৃতবাজার পত্রিকা সারা ভারতের জন্য প্রথম পলিটিকাল শ্লোগান দিলেন—জয় জয় ভারতেরই জয় এবং তা বর্তমান সংস্কৃতিকেন্দ্র কলকাতা থেকে নয়, কলকাতা থেকে ৭০।৭৭ মাইল দূরের যানবাহনরিক্ত বাংলার অভ্যন্তরে এক গ্রাম থেকে। এই উন্মুক্ত বিরাট বিস্তৃত দৃষ্টি প্রতিফলিত হয়েছিল বলেই না সুদূর মহারাষ্ট্রের শিক্ষিত অধিবাসীরাও কবে অমৃতবাজার পত্রিকা আসবে এ জন্য উন্মুখ হ'য়ে বসে থাকতেন? বাংলাদেশে অমৃত-বাজার পত্রিকার পক্ষে এ দাবী সঙ্গত ও স্বাভাবিক যে, ১৮৬৮ খৃস্টাব্দে কেবল বাংলা প্রান্তের নয় সারা ভারতের রাজ-নৈতিক শ্লোগান দিয়েছেন তাঁরাই। কালক্রমে ঘটনাতরঙ্গের উত্থান পতনে অজ্ঞান বিস্মৃতির গর্ভে তা হারিয়ে গেছে।

উনবিংশ শতাব্দীর একালে বহুবিধ সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল এবং এমন কোন সমস্যাই ছিল না যা পত্রিকায় প্রতিফলিত হয় নি; কিন্তু চারপাশের প্রাসঙ্গিক আনুষঙ্গিক সামাজিক অর্থনৈতিক সমস্যা-বলীর মধ্যে মূল লক্ষ্যকে স্থির করে নিয়েছিলেন অমৃতবাজার পত্রিকা; আত্ম-

বিশ্লেষণেও যতখানি নির্মম ততখানি নির্মমতায় সংগেই রাজনৈতিক মূল্যাধারটি বিচার করেছেন। শুধু সাহিত্যের রসকথায়, কাব্য-কাহিনী চর্চায় অথবা সমাজের পাণ্ডিত্যী শাস্ত্রের অকারণ চক্রজালে কিম্বা বিচ্ছিন্নভাবে দেশের আর্থিক সংগতি ক সম্পত্তির আলোচনায় অযথা ভারাক্রান্ত হয় নি অমৃতবাজার পত্রিকা; চারিদিককার খাঁচি-বিক্ষোভের মধ্যে রাজনৈতিক দিগন্তের দিকে লক্ষ্য ছিল স্থির; যাঁরা হাল ধরে ছিলেন তাঁরা একবারও দিগভ্রান্ত হন নি। স্বভাবতই তৎকালীন রাষ্ট্রনায়ক, রাজপুরুষ, আমলা ও ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের অনুগত্য ঐতিহ্যবাহী দেশী বিদেশী মানুষের এটি মনঃপূত ছিল না; পক্ষান্তরে যাঁদের চিত্ত-পটে কিছুমাত্র মর্যাদাবোধের আঁচড় পড়েছিল, সুস্থ সবল সতত বিকশমান জীবনের আকাঙ্ক্ষায় পরাধীনতাচ্ছিন্ন সুশৃঙ্খল স্বাধীনতার কামনা দুর্নিবার হয়ে উঠেছিল তাঁরা গভীর আশ্লেষে তাঁদেরই অস্ফুট বাণীবহ মুখপত্ররূপে গ্রহণ করেছিল।

ভারতে ইংরেজ শাসন সম্পর্কে এককালে ইংরেজদের মধ্যেও মতদ্বৈধ ছিল এবং ডিসরেলী প্রমুখ নিরেট সাম্রাজ্যবাদীদের এবং কট্টর শ্বেতকায় আই-সি-এস স্টীল ফ্রেমের দৃঢ় বনিয়াদ গড়ে তোলবার আগে উদারচরিত্র ইংরেজের অভাব ছিল না এবং নিঃসন্দেহে জাতিসংস্কারমুক্ত এ'দেরই জন্য হেস্টিংস, ক্লাইভ প্রমুখের ইম্পীচমেন্ট সম্ভব হয়েছিল। অমৃতবাজার পত্রিকা অকুণ্ঠ ভাষায় এই জাতীয় ইংরেজদের কথা উল্লেখ করেছেন এবং তাঁদের বক্তব্য সবিস্তারে উদ্ধৃত করেছেন।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ১৪ই মে "ভারতবর্ষ শাসন সম্বন্ধে মণ্টগমারী সাহেবের মত" নিয়ে আলোচনা করলেন পত্রিকা :

"ব্রিটিশ শাসনের উপর এ দেশস্থ লোক কেন বিরক্ত, মণ্টগমারী সাহেব তাহার এই ২ হেতু দর্শান। (১) ইংরেজেরা বিদেশী (২) বিচার প্রণালীর জটিলতা (৩) আইনের অস্থৈর্যতা (৪) বাকী খাজনার নিমিত্ত জমিদারী বিক্রয় (৫) ব্যভিচারিণী-দিগকে দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি (এটা কোন কাযের কথা নয়) প্রভৃতি (৬) সাক্ষীদিগের কষ্ট (৭) ব্রহ্মোত্তর বাজাপ্ত করা (৮) পদস্থ ব্যক্তিদিগকে অপদস্থ করা, মহৎ বংশীয়দিগকে মর্যাদাজনক পদ না দেওয়া, কি সম্বংশোদ্ভূত যুবা ব্যক্তিদের উত্তম উত্তম পদ হইতে বঞ্চিত রাখা ইত্যাদি ইত্যাদি।

"মণ্টগমারী সাহেব বেশ বলিয়াছেন, কেবল গুটিকয়েক প্রধান২ কারণ ছাড়িয়া দিয়াছেন। অনেকে জাতিবৈরিতার কারণ শুদ্ধ এইগুলিকে বলিয়া থাকেন। বিচারপতিদের পক্ষপাতিত্ব, এদেশবাসী ইংরেজদিগের অর্থাৎ নীলকুঠিয়াল প্রভৃতির অত্যাচার, তন্তুবায় প্রভৃতি ব্যবসায়ীদের অন্ন মারা ও ইংরেজদিগের অহঙ্কার ও এদেশীয়-দের প্রতি ঘৃণা। আর একটি কারণ আছে। এদেশে নূতন ২ ইংরেজের আগমন এবং প্রচুর অর্থের সংগ্রহ হইলে, ইংরেজদিগের এদেশ হইতে প্রস্থান।"

"মণ্টগমারী সাহেব বলেন যে, গবর্ণ-মেণ্ট কর্মচারীদের প্রজার সহিত মিশ্রিত হইয়া তাহাদের দুঃখে দুঃখ, সুখে সুখ দেখান কর্তব্য। প্রজাদিগকে রাজ-কার্যে নিযুক্ত করা, অধিবাসীদের মত লইয়া আইন প্রস্তুত করা, দেশ শাসনের ভার কতক কতক এদেশীয়দের উপর দেওয়া উচিত ইত্যাদি। মণ্টগমারী সাহেব যে উপদেশগুলি দিয়াছেন, ইহাতে তাঁহাকে আমরা শত শত ধন্যবাদ দিই। গবর্ণমেণ্ট যদি সুবোধ হন তবে সত্বর-সত্বর মণ্টগমারী সাহেবের উপদেশানুসারে কার্য করিতে থাকুন। তাঁহারা যদি স্বেচ্ছাপূর্বক এই কর্মে প্রবৃত্ত হয়েন, তবে তাঁহাদের জিত থাকিবে, আর যদি বাধ্য হইয়া করেন তবে সম্পূর্ণ-রূপে ঠকিবেন।" (১৪ই মে, ১৮৬৮, ১৩ সংখ্যা)

একেবারে আধুনিক ভারতের পরি-কল্পনার শতবর্ষ পূর্বের দাবী। শতবর্ষ পূর্বের সামাজিক - অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক চিত্রও বটে এবং নির্ভুল চিত্র।

ইংরেজেরা বিদেশী; কিন্তু তার জাতিগত বোধ ও রাজনৈতিক বোধের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য আছে। এমনি একজন বিদেশী নাগরিক সম্পর্কে যে মনোভাব, শাসক হিসেবে কোন বিদেশী সম্পর্কে সে মনোভাব হতে পারে না। সেখানে ইংরেজ বিদেশী মাত্র নয়, বিদেশী শাসকও বটে। তারা আইন-কানুন সম্পর্কে একটা বিশেষ ধারণা নিয়ে এসেছে, শাসক হিসেবে কিছু নতুন ধারণাও জন্মেছে, তার সংগে প্রচলিত বিধির একটা সংঘর্ষ বাধতে, সুতরাং, জটিলতার সৃষ্টি হ'তেও বাধ্য; এখান থেকেও ওরা একটি নতুনতর সভ্যতার বাহক ও বিদেশী এ কথাই জেগে ওঠে এবং এই কারণেই আইনের "অস্থৈর্যতা"; প্রচলিত সমাজকাঠামো ও সমাজবিধির মধ্যে নব-বিন্যাস। প্রাপ্য অনাদায়ে জমিদারী বিক্রয় ঐ সমাজকে আদৌ স্বস্তিতে থাকতে দেয় নি—

"A tremendous chang. in usage and practice was introduced by the Permanent Settlement legis-lation", বলেছেন Vincent Smith, "through the enforcement of the sale of zemindaris by auction as the sole penalty for default".

১৮০২ খৃষ্টাব্দের মেদিনীপুরের কালেক্টরের যে রিপোর্ট তিনি উদ্ধৃত করেছেন তা আরও স্পষ্ট—

"all say that such a harsh and oppressive system was never be-fore resorted to in this country; that the custom of imprisoning landholders for arrears of revenue was, in comparison, mild and indulgent to them; that though it was no doubt the in-tention of Government to confer an important benefit on them by abolishing the custom, it has been by melancholy experience that the system of sales and attachments, which has been substituted for it has in the course of a very years reduced most of the great zemin-dars of Bengal to distress and beggary, and produced a greater change in the landed property of Bengal than has, perhaps, ever happened in the same space of time, in any age or country, by the mere effect of internal regu-lations". (The Oxford History of India, V A. Smith, pp 566-67)

দিনাজপুর, রাজসাহী, নদীয়া প্রভৃতির 'রাজারা' কিভাবে সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন স্মিথ সে দৃষ্টান্তও উল্লেখ করেছেন। সমাজদেহে এই পরিবর্তন কি তালোড়ন সৃষ্টি করেছিল অমৃতবাজার পত্রিকায় তাই প্রতিফলিত হয়েছে এবং পত্রিকা এর সংগে যোগ করেছেন নীলকুঠিয়ালদের অত্যাচার, শ্বেতকায়দের পক্ষপাতিত্ব আর সর্বোপরি এখানকার শিল্পের সমূহ ধ্বংস সাধন। শিল্প ও কৃষি নিয়ে যে উৎপাদিকা-শক্তি ও সম্বন্ধ তার নতুনতর বিন্যাস দারুণ বেদনাদায়ক।

কিন্তু পরিবর্তিত অবস্থা যাই হোক—নব-পরিকল্পিত রাজনৈতিক কাঠামোয় এদেশীয়দের স্থান দিতে হবে, তাদের মত নিয়ে আইন করতে হবে, মণ্টগমারীর এই সুপারিশের জন্য পত্রিকা আন্তরিক সাধুবাদ জানিয়ে বলেছেন, স্বেচ্ছায় দিলে তাদেরই জিত হবে, বাধ্য হলে ঠকবেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের কথা।



কুইন ষ্টেশনারী ষ্টোর্স
প্রাঃ লিঃ

কলিকাতা-১
ফোন : অফিস—২২-৮৫৮৮ (২ লাইন)
২২-৩৩৩২
(২ লাইন)



তস্য তস্য অথবা সূর্য কাঁদলে সোনা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

'সূর্য কাঁদলে সোনা'র দেশ শুনতে শুনতে ত কান পচে যাবার যোগাড়। কিন্তু দেশটা কি কেউ বোধহয় বোঝেন নি। দেশটা আসলে হল পেরু। হ্যাঁ, দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম প্রান্তের পেরু রাজ্য, প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে একটু সরু বাঁকানো পটির মত যা লাগানো আছে।

দেশটা অবশ্য সত্যিই অদ্ভুত। সাহারার মত মরুভূমি, তার পরেই হিমালয়ের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার মত নগাধিরাজ আর তারই লাগাও কঙ্গোর মত অজগর গহন জঙ্গল একই রাজ্যে এমন পাশাপাশি পৃথিবীর আর কোথাও পাবার নয়। পেরুর প্রশান্ত সমুদ্রের নীল জল থেকে শুরু করে ধূ ধূ মরু হিমেল তুষারঢাকা পাহাড় আর গহন অরণ্য আজকালকার জেট বিমানে অন্ততঃ দুঘন্টার মধ্যেই বোধহয় পার হওয়া যায়।

পশ্চিমে সমুদ্র উপকূলের মরুভূম চওড়ায় কোথাও ষাট মাইলের বেশী নয়, কিন্তু লম্বায় প্রায় চোদ্দ শ' মাইল। এই মরুভূমির পরই আন্ডিজ পাহাড়ের সিয়েরা আর তার পর মনটানা অর্থাৎ গহন জঙ্গল। আন্ডিজ পর্বতমালা ছোটখাট পাহাড় নয়। মর্যাদায় তা হিমালয়ের পরেই। পেরুর মধ্যেই তার হুয়াসকারান চূড়োর উচ্চতা প্রায় বাইশ হাজার ফিট। মরুভূমির সমতল থেকে এ পাহাড়শ্রেণী প্রায় খাড়াভাবেই উঠে গেছে। সমুদ্রের লেভেল ছাড়িয়ে ষোল হাজার ফুট উঠতে পঁচাশী মাইলের বেশী যেতে হয় না। আন্ডিজ পাহাড়ের মাথায় এই পেরুতেই পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু মালভূমির হ্রদ টিটিকাকা। তার উচ্চতা সাড়ে বারো হাজার ফুটেরও বেশী। টিটিকাকা হ্রদের পশ্চিম তীরের পুনোই হল পেরুর দক্ষিণের শেষ বড় শহর। তারপর......

তারপর বক্তা থামলেন।

বক্তা কিন্তু শ্রীঘনশ্যাম দাস নন, মর্মরের মত মস্তক যাঁর মসৃণ সেই ইতিহাসের ভূতপূর্ব অধ্যাপক শিবপদবাবু।

সেদিন অন্য সবাই যথাসময়ের আগেই উপস্থিত হলেও দাসমশাই তখনও এসে পৌঁছোন নি। আসর ফাঁকা পেয়ে শিবপদবাবু তাঁর বিদ্যা একটু জাহির করছিলেন।

'তারপর'-টুকু বলেই তাঁকে থামতে হয়েছে অবশ্য তাঁর শ্রোতাদের মুখেই কিরকম একটা অস্বস্তি লক্ষ্য করে।

শ্রোতাদের দৃষ্টি অনুসরণ করেই এবার পিছন ফিরে শ্রীঘনশ্যাম দাসকে তিনি দেখতে পেয়েছেন। দাসমশাই কখন তাঁর পেছনে এসে নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছেন, শিবপদবাবু টের পান নি।

শিবপদবাবু মুখ ফিরিয়ে একটু অপ্রস্তুতই হলেন। দাসমশাই কিন্তু তাঁকে উৎসাহ দিয়েই বললেন,—থামলেন কেন? বলুন তারপর কি?

অপ্রস্তুত ভাবটা কাটিয়ে উঠতে শিবপদবাবুর দেরী হল না। দাসমশাই-এর কথাগুলো উৎসাহের হলেও মুখের হাসিটা তেমন বাঁকা মনে হওয়ায় তিনি একটু গরম গলাতেই বললেন;—তারপর কি আবার? তারপর চিলি আর বলিভিয়া। এ বৃত্তান্ত বলবারই বা দরকার কি? ভূগোলের ম্যাপ দেখলেই জানা যায়। আপনি 'সূর্য কাঁদলে সোনা'র দেশ বলে অত প্যাঁচালো হেঁয়ালী করছিলেন বলে সেটা একটু ভেঙে দিলাম।

খুব ভালো করেছেন। —দাসমশাই তাঁর নির্দিষ্ট আসনটিতে অধিষ্ঠিত হয়ে বললেন, কিন্তু পেরুর হেঁয়ালী কি শুধু তার ভৌগোলিক বিবরণ একটু দিয়েই ঘুচিয়ে দেওয়া যায়? পেরুর বিবরণ যা দিলেন তাও ত ঠিক নয়।

ঠিক নয় মানে! শিবপদবাবু প্রায় খাপ্পা, —পেরু দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম প্রান্তের সরু একটু লম্বা বাঁকানো ফালির মত রাজ্য নয়? মরুভূমি থেকে তুষার ঢাকা চূড়োর পাহাড় আর অজগর জঙ্গল ও রাজ্যে পাশাপাশি নেই?

ও সবই ঠিক! দাসমশাই-এর মুখে সহিষ্ণুতার মৃদু হাসি,—শুধু আয়তনটা ভুল বলেছেন। আজকের পেরু আর সেই পিজারোর যুগের পেরু এক নয়। সেকালে পেরুর শেষ দক্ষিণের শহর পুনো ছিল না। উত্তরে দক্ষিণে তখনকার পেরু আরো অনেক দূর ছড়ানো। এখনকার ইকোয়েডর বলিভিয়া চিলির বেশ কিছুটা নিয়ে সেকালের সে পেরু রাজ্য আয়তনে ইওরোপের প্রায় তিন-ভাগের এক ভাগ ছিল। এই বিশাল দেশের রাজেশ্বরকে বলা হত ইংকা। জাপানের সম্রাটবংশের মত ইংকারা নিজেদের সূর্যের

কাজেই বলতেন। ইংকাদের সাম্রাজ্যে লেখার পাট ছিল না। লেখার বিদ্যাই ছিল অজানা। ধাতু হিসেবে তখনো লোহা পেরুতে আবিষ্কৃত হয় নি। তবু সভ্য স্বচ্ছল সুখী দুনিয়া গড়ে তোলার এক আশ্চর্য দৃষ্টান্ত তাঁরা রেখে গেছেন বহুদিক দিয়ে। তাঁদের স্থাপত্য ছিল অদ্ভুত। চুন সুরকি সিমেন্ট কিছু ব্যবহার না করে আর লোহার ব্যবহার না জেনে তাঁরা বড় বড় পাথরের চাঁই দিয়ে যে সব দুর্গ দেবস্থান প্রাসাদ তৈরী করে গেছেন শুধু খাপসই ভাবে খাঁজে খাঁজে বসাবার কৌশলে আজও তা অটল। সে যুগে এই দুর্গম মরু পাহাড় অরণ্যের দেশে তাঁরা দিকদিকে যোগাযোগের হাজার হাজার মাইল রাস্তা তৈরী করিয়েছেন। তাক তাক করে পাহাড় কেটে চাষের ব্যবস্থা করেছেন। যেখানে যেমন দরকার খাল কেটে আর সুড়ঙ্গ নালা বসিয়ে মরুভূমিকেও উর্বর করবার ব্যবস্থা করেছেন দুরন্ত পাহাড়ী নদীর সেচের জল দিয়ে। সমস্ত পৃথিবীর আজ যা একটা প্রধান খাদ্য, সেই আলুর চাষ পেরু থেকেই আমাদের পাওয়া। ইংকাদের পেরু রাজ্যে দারিদ্র্য ছিল না বললেই হয়। সমস্ত দেশের যা শস্য তার একভাগ দেবতার নামে উৎসর্গ করা হত। এক ভাগ বরাদ্দ হত রাজসরকারের জন্যে আর তিন ভাগের বাকি এক ভাগ পেত প্রজারা। শস্যের মধ্যে প্রধান হল ভুট্টা যা আলুর মত আমেরিকা থেকেই সমস্ত পৃথিবী পেয়েছে। সেচের সুব্যবস্থায় চাষের নৈপুণ্যে আর অধ্যবসায়ে ফসল প্রচুরই হত। কাউকে উপবাসী থাকতে হত না। তবু দুর্বৎসরের জন্যে রাজভাণ্ডারে ফসল জমা করে রাখার ব্যবস্থাও ছিল। ইংকারা ছিলেন সূর্যোপাসক। দেবতাকে কেন্দ্র করে রাজা শাসন করলেও রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রের নীতির আভাস তাঁদের পরিচালনায় পাওয়া যেত।

পেরু রাজ্যে অধীশ্বর এই ইংকরাই কিন্তু সে দেশের সবচেয়ে বড় হেঁয়ালী। নিজেদের সূর্যের সন্তান বলে সূর্যকেই যাঁরা উপাসনা করতেন কোথা থেকে কেমন করে পেরুতে তাঁদের আবির্ভাব ঘটেছে?

প্রমাণ যতদূর পাওয়া যায় তাতে খৃস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতেই পেরুতে তাঁদের আধিপত্য শুরু হয়েছে মনে হয়।

তাঁরাই কি এসে পেরুকে সভ্যতায় দীক্ষা দিয়েছেন?

না, তা নয়। পেরুর সভ্যতা আরো অনেক প্রাচীন। টিটিকাকা হ্রদের কাছে এমন সব ধ্বংসস্তূপ আছে যা ইংকাদের আবির্ভাবের অনেক আগে নির্মিত হয়েছিল। ইংকাদের আগে পেরুতে যারা রাজত্ব করে গেছে এসব তাদের কীর্তি। তারাই বা কোন জাতি কোথা থেকে এসেছে পেরুর রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিয়ে গেছেই বা কোথায়?

প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহাসিকরা এখনও উত্তর খুঁজছেন। সুদূর স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার এক তরুণ পণ্ডিত গবেষক এই সেদিন ইংকাদের পূর্বগামীদের রহস্য ভেদ করতে মাত্র কাঠের ভেলায় অকূল প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়েই অক্ষয় কীর্তি রেখেছেন। অজানা দেশের উপকূলের সাগরজলে পাল-তোলা যে বিচিত্র ভেলা দেখে পিজারোর নৌ-প্রধান মুগ্ধ বিস্মিত বিমূঢ় হয়েছিলেন এ সেই 'বালসা' ভেলা। নরওয়ের তরুণ দুঃসাহসী পণ্ডিত থর হেয়েরডাল এই 'বালসা' ভেলায় প্রশান্ত মহাসাগরের পারের যে কোনো পলিনেশীয় দ্বীপপুঞ্জে পৌঁছে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে ইংকাদের আগে পেরুতে যাদের প্রতাপ ছিল তারাই ভেলায় ভেসে এসে পলিনেশিয়ার সমস্ত ছড়ানো দ্বীপে ডেরা পেতে তাদের সভ্যতা ছড়িয়েছে।

তাঁর সিদ্ধান্ত প্রমাণ করতে পারুন বা না পারুন মাত্র কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে ইস্ক্রুপ পেরেক ছাড়া শুধু দড়িতে বাঁধা কাঠের ভেলায় হেয়েরডাল সত্যিই প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে পলিনেশিয়ার এক দ্বীপে গিয়ে পৌঁছেছিলেন।

ইংকা বা তাঁদের পূর্বগামীদের রহস্য কিন্তু আজও সম্পূর্ণ ভেদ করা যায় নি।

যাবে কি করে? পেরু পৃথিবীর এক অদ্ভুত দেশ। বহু বিষয়ে অসামান্য হলেও পেরুর মানুষ লেখবার কৌশলটাই আবিষ্কার করে নি। লেখা পুঁথিপত্রের বদলে তাদের যা ছিল তার নাম হল 'কিপু'—গিঁট দেওয়া কিছু রঙীন সুতুলী। এই গিঁট দেওয়া সুতুলী দিয়ে কেমন করে তারা কাজ চালাত তাই বুঝে ওঠা যায় না।

যা কিছু স্মৃতি-পুরাণ সব তাদের মুখে মুখে চলে এসেছে। ইংকাদের সম্বন্ধেও তেমনি পুরাণ কথা আছে। এ পুরাণ-কথা লিখে গেছেন গার্সিলাসসো দে ভেগা। তিনিও এক অদ্ভুত মানুষ। বাপ এসপানিওল আর মা ইংকা রাজপরিবারের মেয়ে। ইংকা সাম্রাজ্যের মুখে মুখে ফেরা সমস্ত স্মৃতি-পুরাণ স্পেনের কর্ডোভা শহরে বসে তিনিই তাঁর মহাগ্রন্থ 'কমেণ্টারিয়োস রিয়ালেস'-এ স্প্যানিশ-এ লিখে গেছেন।

ইংকাদের আবির্ভাব সম্বন্ধে যে পুরাণ-কথা তিনি লিখে গেছেন তা পৃথিবীর অন্য বহু জাতির আদি কথার মতই আজগুবি কল্পনায় বোনা।

পৃথিবীর এক পরম দুর্দিনে সূর্যদেব মানুষের ওপর দয়া করে তাঁর দুটি সন্তান পাঠিয়েছিলেন।

নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি খাওয়াখাওয়ি করে, যেখানে যা দেখে নির্বিচারে তাই পুজো করে মানুষজাতটা তখন ধ্বংস হতে যাচ্ছে।

সূর্যের দুই ছেলে মেয়ে এসে মানুষকে ধ্বংস থেকে বাঁচালেন। এই দুই ভাই বোনের নাম হল মানকো কাপাক আর মামা ওক্লো হুয়াকো। এই দুই স্বর্গের ভাই বোন প্রথমে মানুষকে সমাজ গড়তে শেখানোর সঙ্গে সভ্যতার আর সব দীক্ষাও দিলেন। তারপর তাঁরা এক সোনার খুঁটি নিয়ে চললেন উত্তর দিকে। সেখানে টিটিকাকা হ্রদের ধারে এক জায়গায় তাঁদের সোনার খুঁটি আপনা থেকে মাটিতে পুঁতে গেল। সেইখানেই দুজনে তখন ডেরা বাঁধলেন। এই ডেরা থেকেই গড়ে উঠল কুজকো শহর।

সেখানে মানকো কাপাক পেরুর পুরুষদের চাষবাস শেখালেন আর মামা ওক্লো মেয়েদের শেখালেন সুতোকাটা আর কাপড় বোনা।

ইংকাদের আবির্ভাব সম্বন্ধে আর একটি পুরাণ কাহিনীও আছে। তাতে বলা হয় যে টিটিকাকা হ্রদের তীর থেকে গৌরবর্ণ শ্মশ্রু-মণ্ডিত কিছু মানুষ এসে পেরুর ওপর আধিপত্য বিস্তার করে। পেরুর লোকেদের সভ্যতার দীক্ষা তারাই দিয়েছে।

ইংকাদের সম্বন্ধে বিভিন্ন পুরাণ কাহিনীর মধ্যে অন্য যা তফাৎই থাক একটি বিষয়ে মিল দেখা যায়।

ইংকারা যে দক্ষিণ থেকে এসে প্রথম টিটিকাকা হ্রদের ধারে এবং তারপর কুজকো শহরে তাঁদের ঘাঁটি গাড়েন এ বিষয়ে সব পুরাণই একমত। তার বিপরীত কথা কোনো পুরাণ কাহিনীতে নেই।

কিন্তু পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু হ্রদের ধারে উদয় হবার আগে দক্ষিণে কোথায় ছিলেন ইংকারা? ওদেশের সাধারণ আদি-বাসীদের চেয়ে সভ্যতায় ওপরের ধাপে তাঁরা উঠলেন কোথা থেকে? একেশ্বর সূর্যকে পুজো করবার আশ্চর্য বৈশিষ্ট্যও তাঁদের মধ্যে দেখা দিল কেমন করে, কবে?

এ সব প্রশ্নের সুস্পষ্ট উত্তর আজও মেলে নি। সমস্ত আমেরিকার নৃতত্ত্বের ওপর নতুন আলো পড়েছে ইদানীং। বহু ভ্রান্ত ধোঁয়াটে ধারণা দূর হয়ে গেছে। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মহাদেশে খৃস্টজন্মের হাজারখানেক বছর আগে মানুষ প্রথম এশিয়া ও আমেরিকার উত্তরের বেরিং যোজক দিয়ে পদার্পণ করে এরকম একটা ধারণা বহুকাল বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতরাও আঁকড়ে ধরেছিলেন। সে মতবাদ এখন অচল। তারও বহু পূর্বে, খৃস্টপূর্ব প্রায় বারো হাজার বছর আগে প্রস্তর যুগের মানুষ যে উত্তরের আলাস্কা থেকে দক্ষিণ আমেরিকার টেরা ডেল ফুয়েগো পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিল তার সুস্পষ্ট প্রমাণ এখন পাওয়া গেছে। কিন্তু মেক্সিকো য়ুকাটান আর পেরুর উন্নত সভ্যতার জন্মরহস্যের তাতে মীমাংসা হয়নি।

আশ্চর্যের কথা এই যে য়ুকাটান ও মেক্সিকোর মায়া টোলটেক কি আজটেক সভ্যতার সঙ্গে পেরুর ইংকা সভ্যতা ও সাম্রাজ্যের কোনো যোগাযোগই ছিল না। একই যুক্ত মহাদেশের মধ্যে কয়েক হাজার মাইল ব্যবধানে দুটি বিভিন্ন সভ্যতা পরস্পরের সম্পূর্ণ অচেনা থেকে স্বাধীন-ভাবে গড়ে উঠেছে।

এ দুই সভ্যতার বীজ কি ওই মহাদেশের মাটিতে আপনা থেকে জন্ম নিয়ে সঞ্জাত ও অঙ্কুরিত হয়েছে? না, বাইরের কোথাও থেকে তা বিক্ষিপ্ত হয়ে এসে পড়েছে এই কুমারী মহাদেশের গর্ভে?

অনেক অনুমান অনেক জল্পনা-কল্পনা মতবাদ সিদ্ধান্তের তোলাপাড়া চলেছে আজও এই নিয়ে।

এশিয়ার প্রাচ্য ভূখণ্ড থেকেই এ সব সভ্যতার বীজ সাগর-স্রোতে ভেসে এসেছে এ মতবাদটাও ফেলনা নয়।

(ক্রমশঃ)

রাষ্ট্রগত বর্ষ ফল

দৈবাচার্য

১৯৬৮ সালের বছর শুরুতে গ্রহের সন্নিবেশ এই আভাসই দেয় যে, বিশ্বশান্তির পক্ষে এপ্রিল-মে এবং সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস বিশেষ বিপজ্জনক। তবে বৃহস্পতির অনুকূল অবস্থান বিশ্বযুদ্ধের পরিবেশকে স্তিমিত করে আনবে। এবছরে ৩রা মার্চ মঙ্গল ও শনির সম্মিলন, ২৭শে নভেম্বর মঙ্গল ও রাহুর বিরুদ্ধ অবস্থান, ৬ই নভেম্বর মঙ্গল ও বৃহস্পতির সম্মিলন এবং ২৫শে এপ্রিল শনি ও রাহুর সম্মিলন ও ২৫শে ডিসেম্বর বৃহস্পতি-রাহুর বিরুদ্ধ অবস্থান পৃথিবীকে বিভিন্নভাবে অরাজকতা, অশান্তি ও উদ্বেগের মধ্যে টেনে আনবে।

ভারত

১৯৬৮ সালের নতুন বছরের সূচনায় গ্রহের যে অবস্থান ছিল নয়াদিল্লীর উপর তার দৃষ্টে বলা চলে যে, ভারতে আবার মুদ্রা-মূল্য নিয়ন্ত্রিত হবে, ব্যাঙ্কের জাতীয়করণের সূচনা হতে পারে। তেমনি কর-নীতির বিরাট পরিবর্তন হতে পারে। ১৯৭০ সালের আগে চতুর্থ প্রকল্প শুরু না হওয়াই সম্ভব। প্রাকৃতিক পরিবেশ এ বছর ভারতের অনুকূল নয়। ১৯৬৮ সালের মে মাসে ঝড়-বৃষ্টি, কম্পন, প্লাবন বিশেষ ক্ষতি করতে পারে। খাদ্যাবস্থার বিশেষ কোন হেরফের হবে না। আমেরিকা থেকেও অন্যান্য বছরের মত খাদ্য আনতে হবে। চাষী-বিদ্রোহ বিভিন্নাংশে কৃষি উৎপাদনে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে। এই অঞ্চলগুলো কেরল, তামিলনাদ এবং পশ্চিমবঙ্গ।

মঙ্গলের অবস্থান থেকে বলা চলে যে, এবার বড়রকমের রেলওয়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এই দুর্ঘটনাগুলো ঘটবে রাহু-শনি সম্মিলন এবং রাহু ও মঙ্গল যখন পরস্পর বিরোধী হয়ে দাঁড়াবে তখন। এপ্রিল মাসে পূর্ব ভারতে রেল দুর্ঘটনার সম্ভাবনা আছে।

বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে বিরাট চিন্তা আসতে পারে। ৭ম ঘরে বৃহস্পতির অবস্থানে অনুকূল পরিবেশ মনে হলেও, কার্যত ভারত, আরব এবং যুগোশ্লাভিয়া এবার তাদের বৈদেশিক-নীতি পরিবর্তন করতে বাধ্য হতে পারেন। ভারতের উপর চীন ও পাকিস্থানের যুক্ত হামলার সম্ভাবনা প্রবল রয়েছে। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে বৈদেশিক আক্রমণের সম্ভাবনা ভারতকে পুনরায় চঞ্চল করে তুলতে পারে। পাকিস্থান তার সীমান্ত বিরোধ মীমাংসা প্রস্তাবের নামে ভারতের উপর অগ্রাসী প্রয়াসকে কার্য করতে পারে। চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের কালটি ভারতের পক্ষে বিশেষ ... হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু ভারত-মার্কিন, ভারত-রুশ সম্পর্ক তখনও দৃঢ় থাকবে। তবে, ভিয়েৎনাম ও পশ্চিম এশিয়ার প্রশ্নে আমেরিকার সঙ্গে ভারতের মতভেদ মনান্তর ঘটাতে পারে শনি-রাহু সম্মিলনের সময়।

এই দুই গ্রহের সম্মিলনের সময় অথবা সূর্যগ্রহণের সময় সেপ্টেম্বর মাসে ভারতের প্রশাসনিক জটিলতা, নেতৃত্বের পরিবর্তনের চাপ আসতে পারে। প্রধানমন্ত্রীর কতগুলো কাজ বা সিদ্ধান্ত নিজস্ব দল ও মতের লোকের মধ্যে ভাঙনের সূচনা করতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গের ন্যায় কেরল, বিহার, উত্তরপ্রদেশে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক জটিলতা দেখা দিতে পারে। আসামে ঘোরতর অশান্তি দেখা দিতে পারে। কেরলে যুক্তফ্রন্টে ভাঙনের সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠতে পারে।

গ্রহসন্নিবেশ অনুযায়ী ভারতের অবস্থা বেশ জটিলতর। ১৯৬৮ সালের ৩ মার্চ মিথুনে মঙ্গল ও শনির সম্মিলনের প্রতিক্রিয়ায় ভারতে ঘোরতর অশান্তি সৃষ্টি হতে পারে। শুধু তাই নয়, এই সময়ে ভারত-পাকিস্থান সম্পর্কের অবনতি ঘটতে পারে। শনি-মঙ্গল সম্মিলনের সময় ভারতের কোন কোন অংশে বিদ্রোহ, রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড, বিশৃংখলা ব্যাপক আকার ধারণ করতে পারে। ২২ সেপ্টেম্বর সূর্যগ্রহণের সময়টি ভারতের উপর চীনের হামলার সম্ভাবনা প্রবল।

আমেরিকা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে ১৯৬৮ সালটি আরও শক্তি সঞ্চয় ও সংঘর্ষের বছর হিসাবে চিহ্নিত হবে। রাহু-মঙ্গল সম্মিলনের সময় এই সমরসজ্জা ও সংঘর্ষজনিত ক্ষয়-ক্ষতিটা বাড়বে। সেপ্টেম্বর মাসে সূর্যগ্রহণের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি ও যুদ্ধসম্ভার বৃদ্ধি সংক্রান্ত ব্যবস্থা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সূচিত হতে পারে। বাইরে যুদ্ধের পরিবেশ এবং অভ্যন্তরে বিদ্রোহী ও হিংসাত্মক কার্যকলাপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত রকম কার্যনীতি প্রভাবিত করবে। ভিয়েৎনাম যুদ্ধ সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট জনসন আরও কঠোর ব্যবস্থা ঘোষণা করতে পারেন। আমেরিকার বছরের মধ্যভাগে নিগ্রো বিদ্রোহের সম্ভাবনা প্রবল।

শনি ও রাহুর সম্মিলনের ফলে জনসন শারীরিক কোন রোগে অসুস্থ হয়ে না পড়লে আগামী নির্বাচনে তাঁর সাফল্যের সম্ভাবনা খুব উজ্জ্বল। এপ্রিল মাসে আমেরিকায় শ্রমিক বিক্ষোভ ব্যাপক রূপ নিতে পারে। বিশ্বের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমেরিকার প্রভাব আরও বাড়বে।

রাশিয়া

আগামী চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ মাসে, বিশেষ করে এপ্রিল এবং সেপ্টেম্বর মাসে সোভিয়েট রাশিয়া বিশেষ কতকগুলো আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সমস্যায় বিব্রত বোধ করবেন। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের খুব প্রভাবশালী দুই-একজন নেতা অপসারিত হতে পারেন। এছাড়া, আভ্যন্তরীণ অশান্তি, কোন যুদ্ধে জড়িত হওয়া, ভূমিকম্প, ধ্বস, বিবিধ দুর্ঘটনায় জনজীবনহানির সম্ভাবনা রয়েছে। এবছর রাশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রশ্নে তীব্র বিরোধ সত্ত্বেও বিশ্বশান্তির প্রশ্নে নিকটতর হবেন। রাশিয়ায় জনজীবন ক্রমশ গণতান্ত্রিক আদর্শের স্বাদ পাবেন, তেমনি কম্যুনিস্ট-ধরণের নিয়ন্ত্রণ শিথিল হবে বৃহস্পতির প্রভাবে। রাশিয়া ও চীন নিজেদের সীমান্তের প্রশ্নে ঘোরতর অশান্তির মধ্যে জড়িত হতে পারে। রুশ-ভারত বন্ধু সম্পর্ক বজায় থাকবে।

চীন

পিকিং-এর উপর মঙ্গল, শনি, রাহু এবং রবি ও চন্দ্রের অবস্থান ও প্রভাব এটাই সূচিত করে যে, 'সাংস্কৃতিক বিপ্লবের' নামে আরও ব্যাপকতর সংঘর্ষ, আত্মঘাতী হানাহানি চীনের জনজীবনকে বিপর্যস্ত করবে। চীনের কোষ্ঠি অনুযায়ী এই দেশটি রাহুর দশা ভোগ করছে। আগামী শনি-রাহু সম্মিলনের সময় চীন শুধু আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ নয় প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর উপর কড়া দৃষ্টি দিতে পারে। আবার আভ্যন্তরীণ কারণে ভারত সীমান্তে চীনের হামলা অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠতে পারে। এছাড়া সারা চীনে অশান্তি, খাদ্যাভাব, মহামারী এবং রক্তপাত দেখা দিতে পারে বৃহস্পতির অন্তর্দশায়। ১১ মে, ১৯৬৮ সাল থেকে চীনের রাজনীতি নতুন খাতে প্রবাহিত হতে পারে। চীন ও রাশিয়ার সম্পর্কের উন্নতির পরিবর্তে আরও অবনতি ঘটতে পারে।

পাকিস্থান

গ্রহের সন্নিবেশ অনুযায়ী পাকিস্থানের অগ্রাসী নীতি এখন খুব প্রবল। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বিরাট বিদ্রোহ ও রাজনৈতিক সংঘর্ষ দেখা দিতে পারে। এমন কি, শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত আছে। কাশ্মীরের যে অংশ পাকিস্থান চীনকে দানের প্রস্তাব করেছে সেই অঞ্চলে এবার পাকিস্থান ও চীনের সংঘর্ষের লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও পাকিস্থান ভারতের বিরুদ্ধে চীনকে মিত্র হিসাবে পাবে। ভারতের ন্যায় পাকিস্থানেও এবছর সংঘর্ষ, রোগ-ভীতি, যানবাহন দুর্ঘটনা, খাদ্যাভাব, প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘটনা ঘটতে পারে। পাকিস্থান মধ্য-প্রাচ্যে বন্ধু হারাবে।

ফ্রান্স

গ্রহের সন্নিবেশ অনুযায়ী ফ্রান্সে এবার বিবিধ ধরণের দুর্ঘটনা যথা বিমান, রেল দুর্ঘটনার সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, বিভিন্ন রোগে লোকের মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। এপ্রিলের গ্রহণের কালটি জনজীবনের উপর বিবিধ দুর্ঘটনার ছায়া বাড়াতে পারে। জনির

সপ্তম স্থানে এবং বৃহস্পতির ষষ্ঠ স্থানে অবস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, ফ্রান্সের বৈদেশিক সম্পর্ক জটিল হয়ে উঠতে পারে। এমন কি ইউরোপীয়ান কমন মার্কেট থেকে ফ্রান্স বেরিয়ে আসতে পারে।

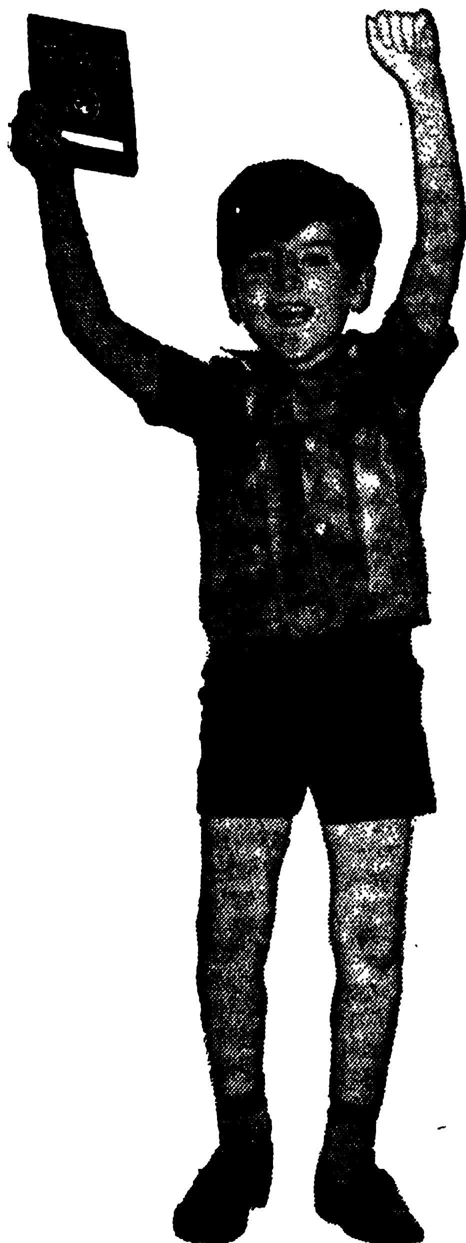
কিন্তু এসব সত্ত্বেও বিভিন্ন অনুকূল গ্রহের প্রভাব ফ্রান্স ও জার্মানীর মধ্যে সম্পর্ক উন্নততর হতে পারে। ফ্রান্স ও আমেরিকার সম্পর্ক খুব ভাল না হলেও আরও অবনতি ঘটবে না।

বৃটেন

১৯৬৮ সালটি বৃটেনের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। চন্দ্র ও কেতু ২য় স্থানে, রাহু অষ্টমে, শনি সপ্তমে এবং বৃহস্পতি দ্বাদশে অবস্থান করছে। ২ মার্চ তারিখে শনি ও মঙ্গলের সম্মিলনের সময় নৌ-বাহিনী সংঘর্ষের মধ্যে জড়িত হতে পারে। বৃটেনে গুরুতর বিমান দুর্ঘটনা, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার লক্ষণ আছে। শনি-মঙ্গলের সম্মিলনের কালে—মার্চ থেকে এপ্রিল মাসের মধ্যে বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী বিদায় নিতে পারেন। রাজপরিবারের কেউ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। হংকং নিয়ে আবার উদ্বেগ দেখা দিতে পারে।

মধ্যপ্রাচ্য

এপ্রিল এবং সেপ্টেম্বর মাসে আবার আরব-ইসরাইল প্রশ্নে সংঘর্ষ, এমন কি সীমাবদ্ধ যুদ্ধ দেখা দিতে পারে। মিঃ নাসের এবারও প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করবেন। তুরস্ক ও গ্রীসের মধ্যে সংঘর্ষ ঘোরতর হতে পারে।



মাত্র ৫ বছরের ছেলে

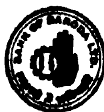
—আর ইতিমধ্যেই রোজকার করছে

বুদ্ধিমান ছেলে? হতে পারে। কিন্তু মা-বাবা আরো বেশী বুদ্ধিমান। কেননা, তার জন্মদিনে তাঁরা ছেলেটিকে একটি চমৎকার উপহার দিয়েছেন। আর এই উপহারটি হচ্ছে ব্যাঙ্ক অব বরোদাতে ছেলেটির নামে একটা মাইনর্স সেভিংস অ্যাকাউন্ট।

বড় হয়ে যখন সে ডাক্তারী, আইন, ইঞ্জিনিয়ারিং এসব পড়তে চাইবে তখন তার জন্য প্রচুর টাকা জমা থাকবে।

আপনার ছেলের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করতে ব্যাঙ্ক অব বরোদা আপনাকে সাহায্য করতে পারে। আজই তার নামে ব্যাঙ্ক অব বরোদাতে একটা মাইনর্স সেভিংস অ্যাকাউন্ট খুলে দিন।

- এমনকি এক টাকা জমা দিয়েও আপনি মাইনর্স সেভিংস অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন। আর এতে ৪% হারে সুদ পাবেন।
- ছেলের ১৪ বৎসর বয়স অবধি অ্যাকাউন্টটি পরিচালনা করতে পারেন। তারপরে সে নিজেই পরিচালনা করতে পারবে—আর এভাবে শুরু হবে তার মিতব্যয়িতার অভ্যাস।



চিরসমৃদ্ধির সোপান

দি বরোদা

স্থাপিত: ১৯০৮, রেজিস্টার্ড অফিস: মাণ্ডবী, বরোদা।
ভারত ও বহির্ভারতে তিন শতের বেশী শাখা আছে।

কাছাকাছি কোনও শাখা থেকে 'আমরা আপনাকে সাহায্য করতে পারি' নামক বিনামূল্যের পুস্তিকাটি চেয়ে নিন বা চেয়ে পাঠান।

shilpi bob 12/67A BEN

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

জি কে সি

একজন শক্তিমান লেখককে আমরা আজ প্রায় ভুলে গেছি। তাঁর নাম জি কে চেস্টারটন। মনে হয় এই যুগে তাঁকে স্মরণ করা কর্তব্য।

১৮৭৪ জি কে সি'র জন্ম বৎসর। ইংরাজী সাহিত্যে জি বি এস-র নাম যেমন সর্বজনমান্য, জি কে সি-ও তেমনই সর্বজনপ্রিয় লেখক। গিলবার্ট কীথ চেস্টারটন-এর পিতৃদেব এডওয়ার্ড চেস্টারটন ছিলেন এস্টেট এজেন্ট। জননী মেরী গ্রসজিনের পূর্বপুরুষেরা সুইডেন এবং এবারডিনের মানুষ। পাঁচ বছর বয়সে যখন ছোট ভাই সিসিল জন্মাল তখন শৈশবকে তাচ্ছিল্য করে গিলবার্ট বললেন, 'এখন থেকে আমার একজন শ্রোতা হল'। আনন্দময় শৈশবের পর কেনসিংটনের সেণ্ট পলস স্কুলে তিনি পড়তে গেলেন। সেখানকার শিক্ষাপদ্ধতি গিলবার্টের মতে মূর্খতা শিক্ষার আড্ডা। নিম্নপদস্থ শিক্ষকরাও এই কথা স্বীকার করতেন। কিন্তু চীনদেশে খৃস্টধর্মের প্রচারক সেণ্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ারের বিষয় এক কবিতা লিখে গিলবার্ট 'মিল্টন পুরস্কার' লাভ করলেন। সন্তানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জননী যখন প্রধান শিক্ষক ডাঃ ওয়াকারের অভিমত জানতে চাইলেন, ডাঃ ওয়াকার তখন পরমোৎসাহে বললেন — আপনার সন্তান প্রতিভাধর ওকে গড়ে তুলুন।

সেণ্ট পলের পর গিলবার্ট স্লেড স্কুল অব আর্টস-এ কিছুকাল ছবি আঁকা শেখেন। সেই সঙ্গে আবার য়ুনিভার্সিটি কলেজে ইংরাজী সাহিত্যের বক্তৃতার ক্লাসেও যোগ দিতেন, জনশ্রুতি, এই স্লেড স্কুলে প্রতিভাধর মানুষটি বসে শুধু লিখতেন আর য়ুনিভার্সিটি কলেজে লেকচার শোনার সময় কেবল ছবি আঁকতেন।

এর পর কয়েক বছর মেসার্স ফিসার আনউইনের প্রকাশ ভবনে গিলবার্ট চাকরি করেন, কিন্তু অফিসের বাঁধ-ধরা জীবন তাঁর ভালো লাগল না, তাই সাংবাদিকতার উন্মুক্ত সমুদ্রে চেস্টারটন ঝাঁপ দিলেন, আর এই তরঙ্গক্ষুব্ধ সমুদ্রে চেস্টারটনের নাবিকীয় কুশলতা সাফল্য লাভ করল। দি স্পীকার, দি ডেইলি নিউজ প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত চেস্টারটনের রচনা প্রশংসা লাভ করল। তাঁর সেই খ্যাতি অধিকতর বর্ধিত হয় সেদিন জি কে চেস্টারটনের কাব্যগ্রন্থ দি ওয়াইল্ড নাইট প্রকাশিত হয়। এর পর 'ইংলিশ মেন অব লেটারস' সিরিজে ব্রাউনিং বিষয়ক আলোচনা, এবং পরে দি নেপোলিয়ন অফ নটিংহিল প্রকাশিত হল। দি নেপোলিয়ন অফ নটিংহিল এক কল্পনামূলক সুখপাঠ্য উদ্ভট রূপক। লন্ডন এবং তার শহরতলীর মধ্যে এক কাল্পনিক যুদ্ধ কাহিনী।

১৯০০ খৃস্টাব্দে জি কে সি'র প্রথম গ্রন্থ 'গ্রে বিয়ার্ডস' প্রকাশিত হয় আর সর্বশেষ গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ খৃস্টাব্দে। এই ছত্রিশ বছরে চেস্টারটনের মোট আশীখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, তার বিষয়বস্তু প্রবন্ধ, জীবনী, সাহিত্য সমালোচনা, উপন্যাস ও নাটক। আয়ারল্যান্ডের বার্নার্ড শ'র মত—ডাঃ সামুয়েল জনসনের পর ইংলণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, লেখক, বক্তা ছিলেন গিলবার্ট কীথ চেস্টারটন। ১৯০১-এ ফ্রান্সেস ব্লগের সঙ্গে গিলবার্টের বিবাহ হয়, এবং সেই বিবাহ সার্থক হয়েছিল। বিবাহের প্রথম কয়েক বছর লণ্ডনে কাটালেও ১৯০৯ খৃস্টাব্দে গিলবার্ট বেকনসফীল্ডে চলে এলেন এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সেইখানেই কাটিয়ে গেছেন।

১৯২২-এ তাঁর আধ্যাত্মিক জীবন শুরু হয়, তার প্রথম প্রকাশ কিন্তু দি অর্থোডক্সি (১৯০৮) নামক গ্রন্থে পাওয়া যায়। এই সময় চেস্টারটন রোমান ক্যাথলিক চার্চভুক্ত হ'ন। ১৯২৫ থেকে ১৯৩০ পর্যন্ত চেস্টারটন তাঁর ভাইয়ের পত্রিকা দি নিউ উইটনেসের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। ভাইয়ের মৃত্যুর পর 'জি কে'স উইকলি' পত্রিকার সম্পাদনা ভার গ্রহণ করেন। অশেষ সুখ ও শান্তিভোগের পর ১৯৩৬ তাঁর জীবনাবসান ঘটে, শুধুমাত্র নিঃসন্তানের দুঃখ ভিন্ন গিলবার্ট আর কোনো কষ্ট ভোগ করেন নি।

আকারে চেস্টারটন ছিলেন 'শালপ্রাংশু মহাভুজ', এই বিশাল আকৃতির জন্য গিলবার্ট নিজেও আনন্দ উপভোগ করতেন। চেস্টারটনের এই আকৃতিগত বিশালত্ব নিয়ে একটা গল্প প্রচলিত আছে, একবার বাসে নাকি তিনি উঠে দাঁড়িয়ে তিনজন মহিলার বসবার জায়গা করে দিয়েছিলেন। সৌজন্যবোধ, ঠান্ডা মেজাজ আর মানসিক স্থৈর্য ছিল চেস্টারটনের চরিত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ, তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল অতি চড়া পর্দায় বাঁধা, ঐ বিশাল আকৃতির ভিতর থেকে যখন স্বর নির্গত হত তখন কাছের মানুষ সবিস্ময়ে তাকিয়ে থাকত। জি কে'র এই আকৃতি তাঁর চরিত্রের রোমান্টিকত্ব হ্রাস করে নি,—বর্ণসমারোহ আর উত্তেজনা ছিল তাঁর জীবনের তীর্থযাত্রার পাথেয়। বয়স্ক জীবনের চল্লিশ বছর কাল স্বীয় পতাকা উঁচু রেখে, বিজয় দামামা বাজিয়ে চলেছেন গিলবার্ট, শুধু সেই পতাকা তিনি নিজেই বিচিত্রিত করেছিলেন, আর দামামা নিজেই বাজাতেন।

গিলবার্টের ব্যক্তিত্ব রূপকথার মত চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু গিলবার্ট নিজে রূপকাহিনীর জগতের মানুষ ছিলেন না, বরং রীতিমত শাঁসালো মানুষ ছিলেন, গিলবার্ট ইঁট-পাথরের সংগ্রামমুখর শহরে বসে কলমের জোরে সাংবাদিকের মর্যাদামণ্ডিত জীবনযাপন করে জীবিকা অর্জন করেছেন। উপকথা, রূপকথা, পৌরাণিক কাহিনী, ইতিহাস প্রভৃতির প্রতি চেস্টারটনের এমন নিবিড় আগ্রহ ছিল যে তার ফলেই তাঁর চরিত্রেও উপকথার গৌরব লাভ করে। সাধারণ মানুষের কাহিনী, লোকগাথা, সাধুসন্তের মহাজীবন কাহিনী প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে পাঠকমহলের যে আগ্রহ বর্তমান, গিলবার্ট তাঁর রচনায় সেই সব বিষয়বস্তুকে উপজীব্য করেছেন। গতানুগতিক জীবনযাত্রার উপরে এই জগৎ মানুষ এই অপরিচিত অলৌকিক জগৎকে ভালোবাসে, জি কে'র রচনার বিচিত্র বৈশিষ্ট্য এবং তার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব এই যে, তাঁর জীবন ও সাহিত্য রক্ষণশীল হলেও তাঁর চিন্তাধারা ছিল উদারনীতিক, সেই উদারতার পরিচয় ইংরাজী সাহিত্যে আর পাওয়া যায় না। গিলবার্টের মত অনেক রস-রচনাকার আছেন, যাঁদের রচনার মধ্যে কোন বাণী নেই। আবার অনেক বাণীবাগীশ আছেন যাঁদের মধ্যে এতটুকু রসজ্ঞানের পরিচয় নাই। বার্নাড শ'র রচনা রক্ষণশীলতার ছোঁয়াচমুক্ত এবং তার মধ্যে অতুলনীয় শ্লেষ ও ব্যঙ্গ বর্তমান; কিন্তু রক্ষণশীলতার প্রচারে এমন উদারনীতিক উদারতা, এমন সরসতা, অসম্ভবকে প্রতিষ্ঠা করার এমন প্রয়াস, রীতিমত কুস্তিগীরের কসরৎ যার ফলে এইসব বাহ্যিক আচরণ ভেদ করে রসোচ্ছলতার বর্মের অভ্যন্তরে যে গূঢ়তত্ত্ব নিহিত আছে তা হৃদয়ঙ্গম করা বিশেষ কঠিন।

বিজ্ঞান সম্পর্কেও গভীর অবিশ্বাস ছিল জি কে'র। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে বন্ধু এইচ জি ওয়েলস বিজ্ঞানের উপর ভবিষ্যতের ভার ন্যস্ত করে ভুল পথে চলছেন।

তেমনি অপর এক বন্ধুর সঙ্গেও মতান্তর ছিল, সে ব্যক্তি জর্জ বার্নাড শ। শ'র বিশ্বাস ছিল ভবিষ্যতের ভার হচ্ছে প্রজ্ঞার হাতে

"One cannot imagine Shaw inspiring any of his followers to write a war-song or a drinking song or a love-song, the three forms of human utterance which come next in nobility to a prayer"

সবকিছু আধুনিক ধারা এবং ফ্যাসন তিনি অশ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু অশ্রদ্ধার চাইতেও তাঁর শ্রদ্ধা ছিল গভীরতর। স্নেহ ও প্রেম তাঁর চরিত্রের প্রধান গুণ। মানুষের কিছু অপকর্ম তিনি অপছন্দ করতেন, বিধাতার সমগ্র কর্ম তিনি ভালোবাসতেন, হৃদয়ের আনন্দের সন্ধানে তাই বেশী দূরে তাঁকে যেতে হ'ত না.

"For Heaven is every-
where at home,
The big blue cap that
always fits......"

শ্রমিক বা কেরানী তাদের পরিবার প্রতিপালন করুন, সেখানে "রক্ষণশীল সংখ্যালঘু যাঁরা ধনী বা উদারনীতিক সংখ্যালঘু যাঁরা উন্মাদ, তাঁরা এসে যেন বাধা না দেন।" তাহলে তিনি, শ্রমিক আর কেরানী সকলেই শান্তি পাবে।

—অভয়ঙ্কর

ভারতীয় সাহিত্য

দিগম্বর কভুল ॥

তেলেগু সাহিত্যে অতি সাম্প্রতিককালে যে-তরুণ কবি সমাজ প্রচলিত কাব্যকলা ও সমাজনীতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন, সেই কবিদের নাম দেওয়া হয়েছে 'দিগম্বর কভুলু'। এই কবিগোষ্ঠীর মধ্যে আছেন ছ'জন তরুণ কবি। এ'দের নাম যথাক্রমে—নাগনামুনি, নিখিলেশ্বর, জ্বালা-মুখী, চেরাবান্দারাজু, ভৈরভায়া ও মহাস্বপ্ন। নামকরণ থেকেই বোঝা যাচ্ছে, এই নাম তাঁদের আসল নাম নয়। কেন তাঁরা এরকম ছদ্মনাম ব্যবহার করছেন—এরকম একটি প্রশ্নের উত্তরে 'নিখিলেশ্বর' জানান—"অন্ধের সামাজিক ব্যবস্থার জন্যই আমাদের এরকম করতে হয়েছে। এখানে ব্রাহ্মণ কায়স্থ বা অন্য সম্প্রদায়ের লোকদের নাম থেকেই চেনা যায়। আর একজন ব্রাহ্মণ কখনই একজন কায়স্থের রচনা যতই ভাল হউক না কেন, তার প্রশংসা করবেন না। এই কারণেই আমরা ছদ্মনাম গ্রহণ করেছি।"

এ'দের আবির্ভাবের ব্যাপারটিও বেশ মজাদার। গত ১৯৬৫ সালের ৬ মে এ'দের সংকলিত প্রথম কবিতাগ্রন্থ রাত বারোটায় 'সাধপল্লী' নামক একজন রিক্সাচালক প্রকাশ করেন। দ্বিতীয় গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় বিজয়বাড়ায় ঠিক একই সময়ে একজন হোটেলের মেথর দিয়ে। এ'দের কর্মপদ্ধতির সংগে 'বীট' কবিদের কিছুটা মিল থাকলেও কিন্তু এ'রা একটি প্রবন্ধে গীনসবার্গ ও তাঁর সহবন্ধুদের তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছেন। গীনসবার্গ যেভাবে সাহিত্যের নগ্নতা দেখাতে গিয়ে মঞ্চে নিজের নগ্নশরীর প্রদর্শন করেছেন, এ'রা তারও বিপক্ষে। এ'রা মনে করেন শারীরিক নগ্নতা নয়, মনের নগ্নতাই আসল নগ্নতা।

মানুষের মধ্যে যে সত্য লুকিয়ে আছে তার কোন আভরণ নেই। মানুষ কতকগুলি আভরণ দিয়ে তাকে আচ্ছাদিত করে রাখে। সেই আড়ালকে সরিয়ে দিয়ে মানুষ যখন তার নিজস্ব মনের আসল রূপকে তুলে ধরতে পারবে, তখনই তা হবে মানবতার যথার্থ প্রকাশ। এই কারণেই এই গোষ্ঠীর কবিরা কোনও নীতি, দর্শন বা ধর্মের অনুগত নয়। সব কিছুর বিরুদ্ধাচারণ করে যথার্থ স্বরূপকে প্রকাশ করাই এ'দের প্রধান উদ্দেশ্য।

লেখকের প্রতিমূর্তি উন্মোচন ॥

সম্প্রতি মাদ্রাজে দ্বিতীয় বিশ্ব তামিল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এই সম্মেলনকে নিয়ে মাদ্রাজে বিপুল উৎসাহ এবং উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছিল। এই সম্মেলনের একটা বিশেষ দিক হল লেখকদের প্রতিমূর্তি উন্মোচন। সমুদ্রতীরে মেরিনায় কিনার ঘে'সে উন্মোচিত হয়েছে তামিল সাহিত্যের প্রখ্যাত লেখকদের প্রতিমূর্তি। এই প্রতিমূর্তিগুলি উন্মোচিত হয় ২রা জানুয়ারী।

প্রথম প্রতিমূর্তিটি হলো শ্রীতীরামামূ-ভিরারের। এই প্রতিমূর্তিটি উন্মোচন করেন মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীআন্নাদুরাই। দ্বিতীয় প্রতিমূর্তিটি হলো থিরুভাল্লুভারের। থিরুভাল্লুভার বোধ করি এখন প্রাচীন তামিল সাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় কবি। তাঁর 'কুরাল' তামিল সাহিত্যের অন্যতম ক্লাসিক। রুশ ভাষাতেও কুরাল অনূদিত হয়েছে। এই প্রতিমূর্তিটি উন্মোচন করেন মাদ্রাজের শিক্ষামন্ত্রী শ্রী ভি আর নেদুন-চিয়ান। তিনি বলেন থিরুভল্লুভারের শত-বার্ষিকী আগামী বৎসর উদযাপিত হবে। এই প্রতিমূর্তি স্থাপন তারই শুভ সূচনা। এই বিশ্ব তামিল সম্মেলনের আহ্বায়ক মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলর শ্রী এম আর পেরুমল মুদালিয়র সকলকে অভিনন্দন জানান। এই প্রতিমূর্তিটি নির্মাণের খরচ বহন করেন প্রখ্যাত অভিনেতা শিবাজী শ্রীগণেশন।

প্রখ্যাত তামিল কবি ভারতীর প্রতি-মূর্তিটি উন্মোচন করেন শ্রী এন আর পিল্লাই। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি বলেন—"ভারতী তাঁর জাতীয়তামূলক সংগীতের মাধ্যমে প্রথম তামিলভাষীদের মধ্যে জাতীয় চেতনার সঞ্চার করেন।" আইনমন্ত্রী শ্রী এস মাধবন

বিদেশী সাহিত্য

গ্রন্থাগারিকদের রাজকুমার ॥

ভাবতেও বেশ মজা লাগে যে বৃটিশ মিউজিয়মের প্রতিষ্ঠাতা একজন ইতালীয় ভদ্রলোক—নাম আন্টনিও প্যানিজ্জি। এ'র জীবনী এবং সে সময়কার বৃত্তান্ত নিয়ে বই লিখেছেন, লেখক এডওয়ার্ড মিলার। বইটির নাম "The life and times of Antonio Paniyyi of the British Museum"

ডাচি অভ্ মডেনার ব্রেসসেলো শহরে সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী পরিবারে ১৭৯৭ সালে এ্যান্টনিও প্যানিজ্জির জন্ম হয়। তাঁর যৌবন কাটে ফরাসীদের শাসনাধীনে—ফলে, রাজ-নীতিক স্বাধীনতার বিষয়ে তাঁর চিন্তাশক্তি প্রথম থেকেই সজাগ হয়ে ওঠে। পরে নানা রাষ্ট্রনীতিক আন্দোলনে জড়িত হয়ে প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে ১৮২৩ সালে পালিয়ে গিয়ে শেষপর্যন্ত তাঁকে ইংলণ্ডে এসে আশ্রয় নিতে হয়। ক্রমে ক্রমে প্যানিজ্জি বৃটিশ মিউজিয়মের সংগঠনের সংগে যুক্ত হয়ে পড়েন। তাঁর অসাধারণ পান্ডিত্য এবং রাষ্ট্রনীতির দক্ষতার সাহায্যে বৃটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরী (এবং মিউজিয়ামের অন্যান্য দিকগুলোও) আঠারো শতকের ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা থেকে কিভাবে পৃথিবীবিখ্যাত সংস্কৃতিভবনে পরিণত হয়েছে, তা অতি সুন্দরভাবে আলোচনা করে দেখিয়েছেন এডওয়ার্ড মিলার তাঁর বইটিতে।

মিঃ মিলারের মতে তাঁর সময়ের সমস্ত ঘটনাবলী ও পরিবেশ প্যানিজ্জির কাজের অনুকূল এবং সহায়ক হওয়াতেই তাঁর পক্ষে এই অসাধারণ সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছিল। লুইগ গোষ্ঠীর সে পৃষ্ঠপোষকতা প্যানিজ্জি লাভ করেছিলেন, তাঁর মতো কপর্দকশূন্য ইতালীয়ান পন্ডিতের পক্ষে ১৭৯০ সালে বা ১৮৯০ থেকে পরবর্তীকালে তা পাওয়া সম্ভব হতো না। গ্ল্যাডস্টোনের কাছ থেকে প্যানিজ্জি যে সাহায্য, সহানুভূতি এবং পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন, কয়েক বছর আগে বা পরে তা লাভ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল।

গ্রন্থটিতে প্যানিজ্জির লুইগ পৃষ্ঠ-পোষকদের, যেমন লর্ড হল্যান্ড এবং ব্রাউ-হ্যামের উদার মনোভাবের কথাও সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। এইসব লোকেদের সাহায্য না পেলে প্যানিজ্জির পক্ষে বৃটিশ মিউ-জিয়মের এই অভূতপূর্ব সংস্কার সাধন করা কিছুতেই সম্ভব হোতো না। প্যানিজ্জির নানাবিধ গুণের কথা— যেমন তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা, অগাধ পান্ডিত্য, আদর্শবাদ—সহযোগী এবং ট্রাস্টিদের সংগে বিবাদ-বিসম্বাদ, টমাস কার্লাইলের মতো বিদগ্ধ পন্ডিতদের সংগে তাঁর মতদ্বৈধ প্রভৃতির কথাও অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে পরি-বেশিত হয়েছে। প্যানিজ্জি যেভাবে তাঁর বিপক্ষদলের সংগে দ্বন্দ্ব চালিয়েছেন, তার বর্ণনা সত্যিই মনোজ্ঞ। এই বিরাট গ্রন্থা-গারকে সৃষ্টি করার পেছনে কত অধ্যবসায়, পরিশ্রম এবং চিন্তাশক্তির দরকার, সেকথা ভাবতে গেলেও প্যানিজ্জির প্রতি শ্রদ্ধায় মন ভরে যাবে।

সমগ্র বইটি পড়ার পর বেশ স্পষ্ট-ভাবেই বোঝা যায় বিদেশী হয়েও প্যানিজ্জি নিজেকে পুরোপুরিভাবে একজন ইংরেজ রূপে পরিণত করেছিলেন। একদিকে তিনি ছিলেন ধূর্ত, কিন্তু মনটা ছিল উচ্চ আদর্শে ভরা। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মিঃ মিলারের বইটি একালের অন্যতম আকর্ষণীয় জীবনালেখ্য।

মূল্যবান রেফারেন্স বই ॥

সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে ফিলিস হার্ট-নোল সম্পাদিত 'দি অক্সফোর্ড কম্প্যানিয়ন টু দি থিয়েটার' বইটি—দশ বছর বাদে এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল সম্পূর্ণ পরিমার্জিত, পরিশোধিত এবং বিস্তারিত-ভাবে। ইউরোপীয় এবং মার্কিনী নাটক, অভিনয়, রঙ্গমঞ্চ ও নটনটীদের শিল্প-জীবন সম্বন্ধে যাবতীয় খবর এই অমূল্য গ্রন্থটিতে পাওয়া যাবে। সত্যিকারের নাট্য-রসিক এবং অভিনয়ে উৎসাহী লোকদের পক্ষে এটি একটি অতি প্রয়োজনীয় বই।

ডেভিড বোল্টনের উপন্যাস ॥

শহীদদের সম্পর্কে আমাদের মনে একটা চিরন্তনী সশ্রদ্ধ কৌতূহল জেগে

অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। তিনিও তামিল সাহিত্যে ভারতীর অবদানের কথা উল্লেখ করেন।

ভারতী দশনের প্রতিমূর্তি উন্মোচন করেন শ্রী এম বরদারাজনর। তিনি ভারতী দশনের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। এই প্রতিমূর্তিটি নির্মাণের খরচ বহন করেন মাদ্রাজ করপোরেশন।

এই উৎসব উপলক্ষে মাদ্রাজের সমস্ত রাজপথ আলোকমালায় সজ্জিত হয়। ভারতের ইতিহাসে ইদানিংকালে লেখকের এরকম সম্মান আর দেখা যায়নি।

কবিতা আউর কবিতা

"হিন্দি কবিতার ঐতিহ্য সুদীর্ঘদিনের। সেই ঐতিহ্যেরই পরিচয় বহন করছে আধুনিক হিন্দি কবিতা।"—বলেছেন ইন্দ্রনাথ মদন তাঁর হিন্দি কবিতার সংকলন গ্রন্থের ভূমিকায়। তিনি মনে করেন, হিন্দি কবিতার আজ যেটুকু প্রতিষ্ঠা, তার প্রেক্ষাপটে আছে সুদীর্ঘ দিনের কবিতাচর্চা। এর থেকে তিনি এই উপসংহারে উপনীত হয়েছেন যে ধর্মবোধ এবং ঐতিহ্যচেতনা ছাড়া যথার্থ কবিতা হয় না। এই কারণে তাঁর সংকলিত কবিতাগ্রন্থে ধর্মবোধ ও ঐতিহ্যমূলক কবিতাই স্থান পেয়েছে। গোপাল শরণ সিং-এর 'চিত্তচোর' কবিতাটি প্রসঙ্গত গ্রহণ করা যেতে পারে। এই কবিতায় তিনি দেখিয়েছেন, পৃথিবীর সবকিছুই ঈশ্বরের প্রতীক। সবকিছু ভাঙছে গড়ছে। তারই ভেতর দিয়ে সৃষ্টি হচ্ছে ক্রমাগত। কবির ব্যক্তিগত অনুভূতি সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত।

এই সংকলনে গ্রন্থের ভূমিকায় সম্পাদকের আর একটি বক্তব্যও উল্লেখ্য। তিনি বলেছেন, সাম্প্রতিক হিন্দি কবিতার যে নির্জনতাবোধ তা কোনও রাজনৈতিক বা সামাজিক সমস্যার পরিণাম নয়। এটা আসলে রচনারীতিরই একটা বিশেষ অংশ। এই পটভূমিকায় প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে হিন্দি কবিতার উপর প্রতীচ্য প্রভাব কতদূর? সম্পাদক এর উত্তরে জানিয়েছেন "প্রতীচ্য প্রভাব আসলে দুই বিপরীতধর্মী অনুভবের সমন্বয় ঘটিয়েছে।" সম্পাদক কবি অজ্ঞেয়কে আধুনিক যুগের লেখক বলে স্বীকার করেন নি। তাঁর মতে অজ্ঞেয় হলেন প্রাচীন ও আধুনিক যুগের মধ্যবর্তী। অতি তরুণ হিন্দি কবিরা এখন শব্দ ও ছন্দের পুনরুদ্ধারে ব্যস্ত। তাঁরা সাধারণ বস্তুকে অসাধারণ করে তুলছেন। কেদারনাথ সিং-এর একটি কবিতায় আছে, তিনি যেন তাঁর ঘরে একটি অদৃশ্য দানবকে ঘুরে বেড়াতে দেখছেন। তাঁর স্বরচিত জগতটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তিনি দেখাতে চেয়েছেন, যে সমস্ত পৃথিবী একটা শিকারভূমি। সাম্প্রতিক হিন্দি কাব্য আন্দোলনের একটা দিক এই সংকলিত গ্রন্থটির মাধ্যমে ফুটে উঠেছে। হিন্দি কবিতা সম্বন্ধে উৎসাহী পাঠকদের কাছে এটি একটি অপরিহার্য গ্রন্থ।

সাম্প্রতিক পাঞ্জাবী উপন্যাস

পাঞ্জাবী উপন্যাসের সাম্প্রতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রটি খুবই প্রসারিত। ইদানীংকালে এমন কটি পাঞ্জাবী উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে, যা ভারতীয় সাহিত্যেও স্বতন্ত্র অভিধায় চিহ্নিত হবার দাবী রাখে।

যশোবন্ত সিং কানওয়ালের 'তারিখ ওখেদী হ্যায়' নামক উপন্যাসটি সাম্প্রতিক পাঞ্জাবী সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট সংযোজন। এই উপন্যাসে তিনি আধুনিক গণতন্ত্রে যুব সমাজের স্পন্দনকে ফুটিয়ে তুলেছেন। বর্তমান পৃথিবীর বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদকে তিনি বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে স্থাপিত করে তিনি অসারতাগুলি ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি উপন্যাসের ঘাত সংঘাতকে ফুটিয়ে তুলবার জন্য পাঞ্জাবের একটি গ্রাম্য পরিবেশকে কেন্দ্র করেছেন।

সাম্প্রতিক পাঞ্জাবী সাহিত্যের অপর একজন শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক হলেন এস নানক সিং। প্রতি বছরেই তাঁর কোন না কোনও উপন্যাস প্রকাশিত হয়। নানক সিং হচ্ছেন পাঞ্জাবের জীবিত লেখকদের মধ্যে বয়স্ক। সম্প্রতি ইন্দো-পাক যুদ্ধকে কেন্দ্র করে তাঁর একটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও আরও কয়েকটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে, যা স্বাতন্ত্র্যের দাবী রাখে।

থাকে। বোল্টন লিখিত এই বইটি সেদিক থেকে সার্থক।

বোল্টনের বইটি একদল ইংরেজ শহীদকে নিয়ে লেখা। এই দলটি প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের সময়ের বিবেকসম্পন্ন যুদ্ধবিরোধী সম্প্রদায়ের মানুষ। খৃস্টিয় শান্তিবাদ থেকে শুরু করে বিপ্লবাত্মক সমাজতন্ত্রবাদ প্রভৃতি নানা মতবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে এঁরা যুদ্ধবিরোধী হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। এঁদের কর্মপদ্ধতিও ছিল বিভিন্ন। কেউ যুদ্ধরত সমাজের কোনো কাজেই অংশ নিতে চাইতেন না— আবার অন্যেরা হয়তো ফ্রন্টে গিয়ে স্ট্রেচার বাহকের দায়িত্ব গ্রহণ করা একটা পরম নৈতিক কর্তব্য বলে মনে করতেন।

যুদ্ধকালীন সময় 'নো-কনস্ক্রিপসন-ফেলোশিপ' দলের নানাবিধ শান্তি অভিযান এবং প্রচারকার্যের ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বইটিতে বর্ণিত হয়েছে।

নো-কনস্ক্রিপসন ফেলোশিপের নেতা বারট্রান্ড রাসেল, ফ্রেনার ব্রকওয়ে, ক্লিফোর্ড অ্যালেন-এর কথা বেশ বিশদভাবে আলোচনা করেছেন বোলটন। নানা শ্রেণীর যুদ্ধবিরোধী সংগ্রামীদের মতপার্থক্যের দিকটাও খোলাখুলিভাবে বলা হয়েছে। এই সব কয়েদীদের প্রতি যে ধরনের ব্যবহার করা হতো, তা যেমন ঘৃণ্য, তেমনই বর্বরোচিত। বিচারকদের বেশীর ভাগই প্রথম থেকেই শান্তিকামীদের প্রতি একটা ঘোর বিদ্বেষভাব পোষণ করতো। অন্ততঃ তিয়াত্তরজন এই শ্রেণীর কয়েদী জেলে পৈশাচিক অত্যাচারের ফলে প্রাণ হারায়, একত্রিশজন উন্মাদ হয়ে যায়। যুদ্ধসংক্রান্ত ব্যাপারে ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ সাল অবধি ইংলণ্ডে কি ঘৃণা এবং বিষময় আবহাওয়া বিরাজ করতো, তা আবার নতুন করে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন ডেভিড বোলটন তাঁর এই বইটিতে। ভয়াবহ অত্যাচারের এই কাহিনীগুলো এর পঁচিশ বছর বাদে জার্মানীর কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে অনুষ্ঠিত বীভৎসতাকেও ম্লান করে দেয়। তবু তারা হিটলারের সাগরেদদের সমপর্যায়ে যেতে পারেন নি সেই সময়কার একদল প্রাণবন্ত সংখ্যালঘু সজাগ রাজনীতিকের জন্য। এঁরা সব সময়ে জনসাধারণের বিবেক-বুদ্ধি এবং ন্যায়-অন্যায়বোধের কাছে আবেদন করতেন। এঁদের দলের দুই-তৃতীয়াংশ ছিলেন সোস্যালিস্ট—যাঁরা ধনতন্ত্রবাদীদের যুদ্ধে অংশ নিতে অস্বীকার করেছিলেন। আর বাকী এক-তৃতীয়াংশ যুদ্ধ ব্যাপারটাকেই একটা বিরাট অন্যায় বলে ধরে নিয়েছিলেন। কিন্তু একথাও সত্য, ব্যক্তিগত শান্তিবাদী বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন লোকেদের প্রচেষ্টায় আজও পর্যন্ত পৃথিবীর কোনো দেশে কোনো সময়ে যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ করা যায় নি। কিন্তু প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের শান্তিবাদীদের প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ বিফল হয় নি। ১৯১৮ সাল থেকেই শান্তিকামীদের প্রতি অন্যায় অত্যাচারের জন্য যারা দায়ী, তাদের বিবেক-দংশন দেখা দিয়েছিল। ফলে সেই সময় থেকে ইংরেজ সমাজে একটা সাধারণ মানবিকতা বোধের জন্ম হয়, যা আজকের দিনে পরিণত রূপ ধারণ করেছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বিবেকসম্পন্ন যুদ্ধবিরোধীদের প্রতি অনেক বেশী সদ্ব্যবহার করা হয়। জার্মান বিরোধিতাও আগের মতো উন্মত্ততার স্তরে গিয়ে ওঠে নি। ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ সালে রাস্তার পেভমেন্টে ডসহুণ্ড দেখলে পথচারীরা তাকে আর লাথি মেরে রাস্তায় ছিটকে ফেলার চেষ্টা করে নি। বেটোফেনের গান শোনা বন্ধ করে নি। জার্মান নামাঙ্কিত দোকানগুলোরও জানলা ভাঙে নি। দুটি যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে ইংলাণ্ডের সাধারণ লোকেদের এই রকম মনোভাব পরিবর্তনের জন্যে শান্তিবাদীরা যথেষ্ট কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন বৈকি।



মেলা ও মানুষ

বাংলার লোকসংস্কৃতি আজ শুধু বিশেষজ্ঞ ও গবেষকদের আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, উপন্যাসেও তার বহু বিচিত্র পটভূমি রূপ পেয়েছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ী প্রমুখ অনেকেই লোকসংস্কৃতির উপকরণে বাংলা উপন্যাসকে সমৃদ্ধ করেছেন। এ কালের অগ্রগণ্য কথাশিল্পী তারাশংকরের উপন্যাসের অন্যতম উপকরণ হলো লোকসংস্কৃতি। তরুণ ঔপন্যাসিকদের মধ্যেও কেউ-কেউ এ-পথে অগ্রসর হয়েছেন। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'নিশিলতা' উপন্যাসের পটভূমি হলো একটি মেলা। গ্রামবাংলার এই মেলাগুলি লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতির এক-একটি উৎসভূমি। রাণীচকের রুদ্রদেবের মেলা কেন্দ্র করে কাহিনীটি গড়ে উঠেছে। জীর্ণ মন্দির ও ভাঙাচোরা দেবমূর্তি, পাশে বিশাল বটগাছ—লোকে বলে কল্পতরু। শিব চতুর্দশীকে ঘিরে এক মাস ধরে মেলা চলে।

বৈচিত্র্যে ও জীবনস্পন্দনে মেলাটি উপন্যাসের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। বাঁশীর শব্দ, মাইকে ফিল্মের গান, পসারীদের চীৎকার, পাঁপড় ভাজার গন্ধ—এই সব মিলে মেলার উত্তেজিত রূপটিকে রচনা করেছে। সার্কাসের বাঘের গর্জন, ক্লাউনের চিৎকার, তাঁবুর দরজায় ব্যাণ্ডের বাজনা, জুয়াড়ী মাতালদের অট্টহাসি, চিত্রবিচিত্র পায়জামা, ছুঁচলো টুপিপরা চানাচুরওয়ালার ঘুঙুর বেঁধে নাচা, শহুরে দেহতত্ত্বজ্ঞানীর পয়সা জোটার বিচিত্র কৌশল সবকিছু মিলে মেলা একটি অখণ্ড চরিত্র—যেমন সজীব, তেমনি প্রগলভ। নাগরিক সভ্যতা ও কলকারখানার বিস্তারের ফলে মেলার রূপটি পরিবর্তিত হয়েছে। নগর ও গ্রামের বিচিত্র মিশ্রণে রাণীচকের মেলার রূপ পাল্টে দিয়েছে। শহুরে কায়দায় মেলার উদ্বোধন হয়, মাইক বাজে, এমন কি ইলেকট্রিক নিয়ে আসারও তোড়জোড় চলে। মালিক পালটায়, রুচি বদলায়, নন্দ সরকারের জায়গায় আসেন ন্বিজু ঘোষাল। বিবর্তনের এই রূপটি লেখক সুকৌশলে বর্ণনা করেছেন।

শুধু পটভূমি নয়, ছোট-ছোট এপিসোড ও মেলার নরনারীদের স্বল্পপরিসর চরিত্রগুলি তীক্ষ্ণ রেখায় আঁকা হয়েছে। দ্বিজু গোমস্তার দ্বিতীয় পক্ষ গ্রহণের ফলে পারিবারিক সংকট, ঘুমুরওয়ালীর নেশায় সর্বস্ব খোয়ানো লতফ ঠিকাদার, ম্যাজিসিয়ান প্রফেসর সামন্তের আচার-আচরণের উৎকেন্দ্রিকতা, জড়বুদ্ধি সাবিত্রীর মিষ্টি খাওয়ার কমপ্লেকস্, ফজলচাচার জীবনে ভারত-পাকিস্তান হওয়ার অভিশাপ, মহাদেবঠাকুরের মনের করুণাকাতরতা, লেবুতলার মোহনের ব্যক্তিত্বহীনতা ও আসক্তি—মেলার পটভূমিকায় ঐকতানের সৃষ্টি করেছে। ব্যষ্টি ও সমষ্টি মিলেই মেলার সম্পূর্ণতা। মেলার সর্বগ্রাসী সর্বব্যাপক সত্তা উপন্যাসের মূল ভূমিকা হলেও ব্যক্তি-ভূমিকাগুলিও উপেক্ষণীয় নয়।

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় আকর্ষণ নিশিলতা-গোবরার সম্পর্ক। মেলাটি যেন একখানি ফ্রেম, সেই ফ্রেমে বাঁধা পড়েছে এই দুটি নরনারীর জীবনেতিহাস। ভুবনপুরের নিস্তরঙ্গ জীবনে নিশিলতার শুধু একটি ঘটনাই মনে পড়ে—যে হলো বীণাদি ও বীণাদির বরের কথা। কিন্তু তার তখন বয়ঃসন্ধির মুহূর্ত, সে জগৎ অস্পষ্টতার। মেলা তার জড়ত্ব ঘুচিয়েছে—জাগিয়ে তুলেছে তার ব্যক্তিত্ব ও যৌবনকে। নিশির চরিত্রে আছে ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তা—সেই দৃঢ়তাই তাকে উদ্যাত আঘাতের মুখ থেকে রক্ষা করেছে। গোবরার মতো ভয়ংকর লোকটির সম্মুখে দাঁড়াতেও কুণ্ঠিত হয় নি। পুঞ্জীভূত ঘৃণা নিয়েই সে এগিয়েছিল, কণ্ঠে ছিল তার চ্যালেঞ্জের সুর। কিন্তু ক্রমশ ঘৃণা রূপান্তরিত হয়েছে সমবেদনায়, সমবেদনা পরিণত হয়েছে দুর্নিবার আকর্ষণে। পিসির সমস্ত শাসন, মেলার লোকের গোপন পরিহাস ও লেবুতলার মোহনের মৃদু ইঙ্গিতকে উপেক্ষা করে সেই দুর্নিবার আকর্ষণে সে ছুটে চলেছে। বৃষ্টির রাত্রিতে গোবরার জন্য ভাত বেড়ে রেখে তাকে গোটা মেলা সে খুঁজে বেড়িয়েছে। দু-একটি আবেগদীপ্ত চকিত মুহূর্ত সৃষ্টি করে লেখক নিশির প্রেমানুভূতির যে ইঙ্গিত দিয়েছেন, তাতে লেখকের কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। গোবরার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে নিশির আশঙ্কা-মিশ্রিত মনের আলোছায়া-রহস্য সূক্ষ্মরেখায় অঙ্কিত হয়েছে। গোবরার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মেলার আকর্ষণও তার ফুরিয়েছে।

নিশিলতা কেন্দ্রীয় চরিত্র হলেও লেখক গোবরা চরিত্র অঙ্কনে ও তার চরিত্ররহস্য উন্মোচনে সবচেয়ে বলিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছেন। গোবরা নীতিজ্ঞানের ধার ধারে না, নীতি তার কাছে বিদ্রূপের বস্তু। নরহত্যা থেকে নারীসম্ভোগ, মদ্যপান প্রভৃতি কোন কিছুই তার বাদ নেই। বুদ্ধিহীনা মেয়ে সাবিত্রী পর্যন্ত তার কামনায় আহুতি দিয়েছে। দারোগা-পুলিশ থেকে আরম্ভ করে মেলার দোকানদারেরা সকলেই তার ভয়ে কম্পমান। কিন্তু এই চরিত্রের পরিবর্তনকে লেখক অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে উদ্ঘাটিত করেছেন। গোবরাকে ভিলেন বললে ভুল হবে। তার পাপাচরণের মধ্যে যে মানবিক দুর্বলতার বীজ ছিল লেখক তাকেই পল্লবিত করেছেন। এইজন্যই তার পরিবর্তনের মধ্যে আকস্মিকতার অপঘাত নেই। নিশির ভালোবাসা তার চরিত্রের সুপ্ত সম্ভাবনা জাগিয়ে তুলেছে। তারিণী মুখুজ্জেকে হত্যা করার পর থেকে তার এই পরিবর্তন সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তার স্বীকৃতি থেকে বোঝা যায় যে, কীভাবে তার উপর থেকে পাপের আবরণ ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছিল। সর্বশেষে নন্দ সরকারের অপঘাত মৃত্যু নয়, সুপরিকল্পিত আত্মহত্যা—অথচ এ না করে তার উপায় ছিল না। মানুষ স্বভাব-পাপী নয়—আদিম পাপের ফলে যদি মানুষ স্বর্গ হারিয়ে থাকে, তবে মানুষের বুকের রক্তে স্বর্গ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এই মহৎ প্রতিশ্রুতি উপন্যাসখানিকে রূপদী মহিমা দিয়েছে।

নিশিলতা (উপন্যাস) সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ। [illegible], ১৪ [illegible] লেন, কলিকাতা —১২। সাতটাকা।

নতুন উপন্যাস

'চাতকের মেঘ' একটি নতুন আঙ্গিকে লেখা উপন্যাস। উপন্যাসে ভাষা বিন্যাস বিশেষভাবে ।। মানভূম অঞ্চলের প্রচলিত কথ্য ভাষা এবং কলকাতা অঞ্চলের ভাষার মিশ্রণে লেখক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সৃষ্টি করেছেন।

চাতকের মেঘ (উপন্যাস) — সুনীল সরকার। এম ভট্টাচার্য অ্যান্ড কোং। ৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলকাতা-১২। দাম—পাঁচ টাকা।

গ্রেহাম ম্যাকইনসের নতুন বই ।।

মাত্র কিছুদিন আগে প্রকাশিত হয়েছে গ্রেহাম ম্যাকইনসের 'ফাইন্ডিং এ ফাদার'। এ টি লেখকের আত্মচরিতের তৃতীয় খণ্ড। আলোচ্য খণ্ডে গ্রন্থকার স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন, কিভাবে সুরাপানবর্জিত একটি জাহাজে তিনি অস্ট্রেলিয়া থেকে ক্যানাডায় গিয়েছিলেন নিজের বাবার খোঁজে। তাঁর বাবা ছিলেন বিখ্যাত বাঁশিবাদক জেমস্ ক্যাম্পবেল ম্যাকইনস্।

প্রায় আঠারো বছর গ্রেহাম বাবার দেখা পাননি। এই দীর্ঘ সময়ের ভেতর তাঁর কাছে তাঁর বাবা কোনো চিঠিও লেখেন নি। আঠারো বছর আগেই তাঁর মা এঞ্জেলা থারকেল্ তাঁর বাবার সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ করেন। স্বামীর নিষ্ঠুর ব্যবহারই ছিল এই বিচ্ছেদের মূল কারণ। টরেন্টোতে গিয়ে একটি অত্যন্ত সহজ উপায়ে অর্থাৎ টেলিফোন গাইড দেখতে দেখতে বাবার ফোন নাম্বার আবিষ্কার করে ডায়াল করলেন গ্রেহাম এবং তারপর বললেন—

তোমার ছেলে কথা বলছি।

আমার ছেলে কে?

গ্রেহাম।

বইটি বর্ণনাকুশলতায় এবং ঘটনা রূপায়ণে নিঃসন্দেহে চিত্তগ্রাহী।

'নতুন মানুষ' গড়ার মনোজ্ঞ কাহিনী

'পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে নয়'—যুগে-যুগে দেশে-দেশে মহৎ মানুষদের মুখে এই বাণীটি বারংবার উচ্চারিত হলেও জনমানসে তা দৃঢ়মূলে প্রোথিত হয় নি। সাধারণ মানুষ আজও পাপকে নয়, পাপীকেই ঘৃণা করে।

অধুনা পৃথিবীর সব সভ্যদেশে এই মহৎ বাণীর রকমফের ঘটিয়ে বলা হচ্ছে—'অপরাধকে ঘৃণা কর, অপরাধীকে নয়'। অপরাধী হয়ে মানুষ জন্মায় না। অপরাধীর ছেলে অপরাধী বা চোরের ছেলে চোর হবেই এই মতবাদ আজ ভ্রান্ত বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। সমাজবিজ্ঞানীরা চুরি-রাহাজানি ইত্যাদি অপরাধকে 'মনের ব্যাধি' বলে অভিহিত করেছেন। সমাজ-জীবন ও সাধারণ সুস্থ জীবন-বিচ্যুত 'মানসিক ব্যাধি' আক্রান্ত মানুষদের ব্যক্তিত্ব, সদিচ্ছা, সহানুভূতি ও সতর্ক-সহৃদয় দৃষ্টি এবং সুষ্ঠু পরিবেশ দ্বারা সুস্থ-জীবনে ফিরিয়ে আনা সম্ভব—তার নজির পাশ্চাত্ত্য দেশগুলি ইতিমধ্যেই সার্থকভাবে রেখেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে আমাদের দেশে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাঁর ব্যক্তি-জীবনে এক দুর্দান্ত দস্যুকে স্নেহ-প্রীতি-সহানুভূতি দিয়ে 'নতুন' মানুষ করে তুলেছিলেন।

বিপথগামী মানুষদের বিশেষ করে, কিশোর-তরুণ বয়স্কদের 'নতুন মানুষ' করে তোলার উদ্যোগ-আয়োজন ইদানিং আমাদের দেশে জোর কদমে চলেছে। জেলের মধ্যে সুস্থ ও স্বাভাবিক পরিবেশ সৃষ্টি করে স্বভাব-অপরাধীদের স্বভাবের আমূল পরিবর্তন ঘটাবার চেষ্টায় কারা-আইনের নানা সংশোধন-সংযোজন হয়েছে। ক্ষণেকের এতটুকু ভুলের জন্যে বিপথগামী কিশোর-তরুণরা যাতে জেলে স্বভাব-অপরাধীর পর্যায়ে না গিয়ে পড়ে সেজন্য অন্য সভ্যদেশের মতো ভারতরাষ্ট্রেও নতুন নতুন আইনের সৃষ্টি হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সতর্কীকরণ ও আবেক্ষণাধীনে মুক্তি আইন ১৯৫৪ তারই একটি কল্যাণময় রূপ। এই আইন অনুযায়ী লঘু অপরাধে অপরাধীকে (যারা অনধিক ছ'মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত) বিচারক ইচ্ছা করলে প্রবেশন অফিসারের রক্ষণাধীনে রাখতে পারেন এবং সুস্থ মানুষ হয়ে গড়ে ওঠবার সুযোগ-সুবিধা দিতে পারেন। প্রবেশন অফিসারকে তখন 'ফ্রেণ্ড ফিলসফার ও গাইড'-এর দুরূহ কঠিন ভূমিকায় নামতে হয়। রোগ-নির্ণয়ে এবং নিরাময়ের পথ আবিষ্কারে প্রবেশন অফিসারকে হতে হয় স্থিতধী সত্যাসন্ধ বিজ্ঞানীর মতো। সহানুভূতি, সদিচ্ছা ও ব্যক্তিত্বের পরশপাথরের স্পর্শে অসীম ধৈর্য ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় তিনি সেই বিপথগামী বিকৃতবুদ্ধি মনের মধ্যে শুভবুদ্ধির উন্মেষ ঘটিয়ে নতুন মানুষ গড়ে তোলার সাধনায় নিমগ্ন হয়ে যান। নতুন মানুষ গড়ে তোলায় নিমগ্ন এক প্রবেশন অফিসারের মুখে শোনা বিচিত্র কাহিনী আশ্চর্য আন্তরিকতায় নতুন করে পরিবেশন করেছেন সুলেখক শ্রীদ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায় এই 'এতটুকু ভুল' বইতে। টুকরো কাহিনীগুলি লেখকের গল্প বলার অনবদ্য প্রসাদ-গুণে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। অভিভাবকবর্গের বইখানি পড়া দরকার। কেননা, কিশোর-তরুণদের বিপথগামী করে তোলার মূলে বয়স্ক মানুষরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত। তাঁদের এতটুকু ভুলের জন্যে কিশোর-তরুণরা 'মানসিক রোগে' আক্রান্ত হয়ে সুস্থ জীবন থেকে চিরদিনের জন্যে নির্বাসনদণ্ড লাভ করে। তাই বইখানি পড়ার পর অনেকক্ষণ মনকে ভাবনায় আপ্লুত করে রাখে।

এতটুকু ভুল (কাহিনী সংকলন)—দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়। জেনারেল প্রিণ্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা—১৩। দাম : তিন টাকা।

বিচারপ্রার্থী নারী

আমাদের সমাজে মেয়েদের স্থানটি ঠিক কোথায়, এ নিয়ে নানা আদর্শবাদী কথা উঠবে। তবে এখনও যে প্রায় মাটির পাত্রের মত তাকে কারণে অকারণে দেখা হয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। নির্যাতনকারী স্বামীর হাত থেকে মুক্তি হয়তো আদালত তাকে দেবে, কিংবা চোর অপবাদদাতা দুশ্চরিত্রের চক্রান্ত থেকে হাকিমের হুকুম হয়তো তাকে মুক্তি দেবে, কিন্তু সমান মর্যাদায় আর কি সমাজে সে ফিরে আসবে? আমাদের দেশের মেয়েদের আর্থনীতিক ও সামাজিক অবস্থাগত দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে যারা তাদের বিপথে ঠেলে দেয়, অসহায়তার সুযোগ নিয়ে পাপপঙ্কে ডুবিয়ে দেয়, তাদের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া তো সহজ নয়। আর সমাজের অনুশাসনের মধ্যেই তো ফাঁক রয়েছে। এই সব নানা প্রশ্ন শ্রীজয়শ্রী চক্রবর্তী তাঁর 'কাঠগড়ায় নারী' বইটিতে তুলেছেন। বিভিন্ন নারী চরিত্র এতে অপরাধী হয়ে বিচারের জন্য কাঠগড়ায় এসেছে, হয়তো আইনের বিচারে মুক্তিও পেয়েছে, কিন্তু মনুষ্যত্বের বিচারশালায় তারা তবুও বিচারপ্রার্থী থেকে গেছে।

কাঠগড়ায় নারী
কথাকলি, ১
কলিকাতা—১। দাম তিন টাকা।

বিদ্যাসাগর জননীর কথা

সন্তানের চরিত্রগঠনে মায়ের প্রভাব কতখানি তা উপলব্ধি করা যায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রে। তাঁর চরিত্রের অপরিমেয় শক্তির উৎস ছিলেন জননী ভগবতী দেবী। তাই বিদ্যাসাগরকে যথার্থরূপে জানবার আগে প্রয়োজন ভগবতী দেবীর জীবনী ও চরিত্র অনুধ্যান। শ্রীসতীকুমার নাগ 'বিদ্যাসাগরের মাতা ভগবতী দেবী' গ্রন্থের মাধ্যমে আমাদের সেই সুযোগ করে দিয়েছেন। মাতৃ-মহিমার অনুপম প্রকাশে ভগবতী দেবীর চরিত্র ভাস্বর। এই পূত চরিত্রের বিস্তৃত পরিচয় শুধু শিশুদের নয়, মায়েদের চরিত্র-গঠনেও যথেষ্ট সাহায্য করবে এবং মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত করবে। লেখকের উদ্যম খুবই প্রশংসনীয়।

বিদ্যাসাগরের মাতা ভগবতী দেবী
—(জীবনী) সতীকুমার নাগ, চয়নিকা পাবলিশিং হাউস, ৪৭, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা—৯। দাম : ১·৭৫ (বাঁধাই) এবং ১·৫০ (সাধারণ)।

নির্ভরযোগ্য কয়েকখানি বই

By S. Banerjee & Revised by Prof. P. B. Sengupta

1.	P.U. & U.E. Logic Made Easy (in Bengali)	2.25
2.	Ethics Made Easy (in Bengali)	2.50
3.	Psychology Made Easy (in Bengali)	4.50
4.	H. S. Logic Made Easy (in Bengali)	4.00

বি-এ (শিক্ষা) এবং বি টি-র জন্য প্রকাশিত হল :
অক্ষেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত
ভারতের শিক্ষা সমস্যা (২য় সংস্করণ) ১২.০০



ব্যানার্জী পাবলিশার্স
৫।১এ কলেজ রো, কলিকাতা-৯　৩৪-৭২০৪

অনার্থক রচনা

মাথার অসম্ভব যন্ত্রণা হলে বা মাথা ভয়ানকভাবে ধরলে একটি বিশেষ ধরনের বড়ি আশ্চর্য কাজ দেয়—এ সংবাদ তো সবার জানা। কিন্তু যাঁদের মাথা ধরে না, যাঁরা মাথার কোন যন্ত্রণার ধার ধারেন না তাঁদের মাথা ধরার ও সুস্থ শরীরে অস্বস্তি-যন্ত্রণা আনার একটি মোক্ষম দাওয়াই বাংলা প্রকাশন থেকে হালফিল মিলছে। এমনি একটি বই 'সূর্যপথিক'। এতে কোন কাহিনী নেই। শুধু পারম্পর্যহীন আবোল-তাবোল উক্তি। মাথার যন্ত্রণা বাড়ার এবং শরীরে অস্বস্তি আনার এমন দাওয়াই লেখক কি করে পাঠক-সাধারণকে বিনাদ্বিধায় উপহার দিলেন—সেটাই আশ্চর্য। গ্রন্থশেষে লেখক-পরিচিতি হাস্যোদ্দীপক।

সূর্যপথিক— নরেশচন্দ্র রায়। ডি লাইট বুক কোং। ১৭৩।৩, বিধান সরণি, কলকাতা-৬। দাম ঃ ২-৭৫।

প্রাপ্তি-স্বীকার

ছদ্মনামে লিখিত এই পুস্তিকা দুখানিতে কতকগুলি গীতি কবিতা সংকলিত হয়েছে। গানগুলি মীরার ভজনের কথা মনে পড়ায়। লেখিকার প্রয়াস অভিনন্দনযোগ্য।

অভিরাম ও আর্ষ (কাব্য) দেবী মল্লিকা। ৩এ, নন্দরাম সেন স্ট্রীট। কলি-৫।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

রায়গঞ্জ কলেজ থেকে প্রকাশিত আলোচ্য পত্রিকাটি নানাদিক থেকেই উল্লেখযোগ্য। এই সংখ্যায় দুটি সুচিন্তিত আলোচনা লিখেছেন সুভাষ রায়চৌধুরী, সন্তোষ চন্দ্র। কবিতা লিখেছেন হরেকৃষ্ণ দাস, সমর সরকার। এছাড়া রয়েছে ভ্রমণ-কাহিনী। ইংরেজি বিভাগে শম্ভুনাথ রায়ের প্রবন্ধটি বিশিষ্টতার দাবি রাখে। পার গালের্কভিস্টের একটি গল্পের সাবলীল অনুবাদ করেছেন শিশির মজুমদার।

ঃ রায়গঞ্জ কলেজ, দিনাজপুর থেকে প্রকাশিত।

সাহিত্যালোকে চিকিৎসাদর্শনের অভিনব পত্রিকা 'হেমভাবনা' ইতিমধ্যেই খ্যাতি লাভ করেছে। সাম্প্রতিক সংকলনে লিখেছেন মণীন্দ্র রায়, সুশীল রায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত, শংকর চট্টোপাধ্যায়, দেবাশিস সান্যাল এবং আরো অনেকে।

হেমভাবনা ঃ সম্পাদক—দেবাশিস সান্যাল, ১, বেলগাছিয়া রোড, কলিঃ-৪।

●

কালপ্রতিমার বর্তমান সংকলনে লিখেছেন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কিরণশংকর সেনগুপ্ত, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, তুলসী মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিম মাহাত, মনোরমা সিংহরায়, বিজয়কুমার দত্ত এবং আরো অনেকে।

কালপ্রতিমা (৪র্থ সংকলন)—সম্পাদক ঃ বাসুদেব দেব চাবেরিয়া, কলিঃ-২৭। দাম ঃ এক টাকা।

●

কৃষ্ণনগর থেকে প্রকাশিত সাহিত্য ত্রিমাসিক 'অনুক্ষণ' পরিচ্ছন্ন কাগজ হিসেবে মোটামুটি পরিচিত। বর্তমান সংকলনে লিখেছেন মণীন্দ্র রায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তরুণ সান্যাল, রত্নেশ্বর হাজরা, গণেশ বসু, আশিস সান্যাল, রথীন ভৌমিক, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে।

অনুক্ষণ—সম্পাদক ঃ রথীন ভৌমিক, বি কে চ্যাটার্জি লেন, কৃষ্ণনগর, দাম ঃ চল্লিশ পয়সা।

পাটনা থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকার বর্তমান সংখ্যাটিতে কয়েকটি মূল্যবান আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীগোপাল হালদারের 'রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ঃ 'প্রবাসী' সম্পাদক' ডঃ গুরুচরণ সামন্তের 'বিহারে বাঙলা ভাষার ভবিষ্যৎ' ডঃ সিয়ারাম তেওয়ারীর 'বজ্জিকা ভাষা ও সাহিত্য', হিমাংশুভূষণ রায়ের 'ভাগলপুরের বাঙ্গালী সমাজ' এবং নকুল চট্টোপাধ্যায়ের 'বাংলা যখন একমাত্র রাষ্ট্র-ভাষা ছিল' আলোচনা পত্রিকাটির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। তাছাড়া আছে আরো কয়েকটি গল্প, কবিতা এবং আলোচনা।

সঞ্চিতা (কার্তিক-পৌষ ১৩৭৪) সম্পাদক—দীপেন্দ্রনাথ সরকার। সুলেখা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পাটনা। দাম ৮০ পয়সা।

●

শুকসারী পত্রিকাটি নিয়মিত চার বছর প্রকাশিত হয়ে সাম্প্রতিক বাংলা ছোটোগল্পের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব সৃষ্টি করেছে। বর্তমান শীত সংখ্যাটি চতুর্থ বর্ষের শেষ সংখ্যা। এই সংখ্যায় দুটি বিতর্কিত আলোচনা করেছেন অলোক রায় এবং সুবিমল মিশ্র। যুদ্ধোত্তর জার্মানীর অন্যতম প্রতিনিধি বরশার্টের একটি কাহিনীর মূলানুবাদ করেছেন হরিদাস সিংহরায়। আর একটি অসমিয়া গল্পের মূলানুবাদ করেছেন অনুপম দাশগুপ্ত। সাম্প্রতিক গল্প লিখেছেন অলোক সিংহ, চণ্ডী মণ্ডল, অমিয় চৌধুরী, মালবিকা ঘোষ, চিত্রা দেব, তুলসী মুখোপাধ্যায়, মতি মুখোপাধ্যায়, সুনীল দাশ এবং দীনেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

শুকসারী ঃ (গল্পপত্র) সম্পাদক ঃ মিহির আচার্য, ১৭২।৩৫, আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলকাতা—১৪। দাম এক টাকা।

●

ডাইরেক্টরেট অফ ড্রাগস কন্ট্রোল এমপ্লয়ীজ রিক্রিয়েশন ক্লাব প্রকাশ করেছেন একটি সংকলন, নাম তার 'প্রয়াস'। গল্প, কবিতা, ভ্রমণকথায় সংকলনটি এক কথায় সুন্দর হয়েছে। কিন্তু এখানেই প্রয়াস-এর কৃতিত্বের শেষ নয়। এরপরেও আছে হিন্দী কবিতা এবং কাহিনী। সেই সঙ্গে এর স্বাদ বাড়িয়েছে ফুলকি (কৌতুক) এবং ছড়া। একসঙ্গে এত বিচিত্র রসের আয়োজন নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। ভেষজ অধিকর্তা শ্রীবিভূতিভূষণ সরকারের শুভেচ্ছা দিয়ে সূচীপত্রের শুরু এবং লেখকসূচীতে আছেন সর্বশ্রী অমল চক্রবর্তী, অসীমকুমার ঘোষ, আনন্দ ভট্টাচার্য, প্রদীপ ঘোষ। দুটি স্কেচই সমান প্রশংসার যোগ্য। স্কেচ করেছেন থাকমোহন কর এবং শ্রীপ্রদীপ ঘোষ। সুন্দর প্রচ্ছদের কৃতিত্ব শ্রীঅনিল সেনগুপ্তের।

প্রয়াস ঃ ডাইরেক্টরেটর অফ ড্রাগস কন্ট্রোল এমপ্লয়ীজ রিক্রিয়েশন ক্লাব, কলেজ স্কোয়ার ওয়েস্ট, কলকাতা—৭ থেকে শ্রীবিভূতিভূষণ রায়চৌধুরী কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

●

বাংলা দেশের বই ও পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি আলোচনার একমাত্র পাক্ষিক। যদিও এটা গত ৫ বছর ধরে প্রকাশিত হয়ে আসছে তবুও এটা আমাদের কাছে প্রথম এলো। ইদানীং আঙ্গিক দিক থেকে এর প্রভূত পরিবর্তন করা হয়েছে এবং এর নবকলবরের সংখ্যাটি সবাইর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হবে। গ্রন্থ পরিক্রমাতে যে বইগুলোর আলোচনা করা হয়েছে তা খুবই মনোজ্ঞ ও নিরপেক্ষ হয়েছে। প্রতিটি সমালোচনাই যথেষ্ট পান্ডিত্যপূর্ণ মনোগ্রাহী হয়েছে। সাধারণ বইয়ের আলোচনা যে পত্র ও পত্রিকাতে বার হয় গ্রন্থ পরিক্রমা তা থেকে ব্যতিক্রম। এর বিশেষ আকর্ষণ দৈনিক ও পাক্ষিক পত্রিকার আলোচনা এবং এ আলোচনা একমাত্র গ্রন্থ পরিক্রমাতেই আলোচিত হয়। আমরা এই পত্রিকটি সকলের পাঠ করা উচিত মনে করি এবং এর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

গ্রন্থ পরিক্রমা ঃ সম্পাদক ঃ শ্রীঅপর্ণাপ্রসাদ সেনগুপ্ত। সহ-সম্পাদক ঃ শ্রীদিলীপ সেন ও শ্রীকেশব সেনগুপ্ত। পাক্ষিক। ৬নং বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা—১২ থেকে প্রকাশিত হয়। প্রতি সংখ্যা মূল্য ২৫ পয়সা। বার্ষিক চাঁদার হার ৭ টাকা।

কাদায় ধনঞ্জয়ের রোমাঞ্চ

কাহিনী (৪)

রাজা ভবানন্দ সেন অদৃশ্য হলেন

অদ্রীশ বর্ধন

অলৌকিক ঘটনা বিংশ শতাব্দীতে বড় একটা ঘটে না। ঘটলেও জলজ্যান্ত মানুষের বেমালুম অদৃশ্য হয়ে যাওয়াটা একেবারেই অসম্ভব।

কিন্তু এই অসম্ভব কাণ্ডই ঘটেছিল গত বছরের পনেরোই জানুয়ারী ডাকাতডাঙার বালুকাবেলায়।

ভোরবেলা। সেন-মহল থেকে ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে বেরোলেন জমিদার ভবানন্দ সেন। গাঙের তীর বরাবর হেঁটে পৌঁছোলেন ছোট্ট গাঁয়ে। এক সারিতে কয়েকটি মাত্র গোলপাতা, খড়, টিন আর টালির ছাউনি। খোশমেজাজে ঢুকলেন গাঁয়ের ভেতর।

সেই যে ঢুকলেন, আর বেরোলেন না। ঊষার কিরণে প্রেতচ্ছায়ার মতই যেন গলে মিলিয়ে গেল তাঁর ছ ফুট লম্বা বংশদণ্ডের মত শক্ত দেহটা। অদৃশ্য হয়ে গেলেন দোর্দণ্ডপ্রতাপ জমিদার ভবানন্দ সেন।

ডাকাতডাঙা জায়গাটা সুন্দরবন অঞ্চলে। সেন-মহলের সাতমহলা প্রাসাদ সে অঞ্চলের দর্শনীয় বস্তু। অনেক কিছুই ভেঙেচুরে গেছে। কিন্তু যা আছে, তা নেহাৎ কম নয়। ধমনীতে রাজরক্ত নিয়েই ধরার আলো দেখেছিলেন ভবানন্দ সেন।

*

রাজা-রাজবাদের মতই মেজাজ ছিল তাঁর, তেমনি ছিল জেদ। মনে ছিল বিপুল সাহস আর দেহে অসুরের শক্তি। তুলি-কলম ছিল তাঁর দুচক্ষের বিষ, পরম প্রিয় ছিল বন্দুক আর বুলেট। তাই সারাজীবন কাটিয়েছেন এ অরণ্যে, সে অরণ্যে। মৃগয়ার নেশা তাঁকে নিয়ে গেছে আফ্রিকায়, আমাজনে, আসামে, নীলগিরিতে। তাঁর স্নায়ু ছিল ইস্পাতকঠিন, নিশানা ছিল অব্যর্থ। বাঘের জ্বলন্ত চোখে চোখ রাখতেন তিনি, চোখের পাতা একটুও কাঁপত না; ঘোড়া টিপতেন নিষ্কম্প আঙুলে—গুলি ব্যর্থ হত না।

শোনা যায়, একবার এক সাহেব ঠাট্টাছলে 'ডার্টি নিগার' বলেছিলেন ভবানন্দ সেনকে। ভবানন্দ সেন তখন হেসে-ছিলেন। সে হাসি অনেকটা হায়েনার হাসির মত শুনিয়েছিল। তারপর দুটো বছর গেছে। কতবার সেই সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়েছে ভবানন্দ সেনের। প্রতিবারেই তেমনি অদ্ভুত হাসি হেসেছেন ভবানন্দ সেন। তারপর একদিন ডাকাতডাঙায় অতিথি হয়ে এলেন সেই সাহেব। ভবানন্দ সেন তাঁকে নিয়ে গেলেন গভীর জঙ্গলে। ফিরে এলেন একলা। বললেন, সাহেবকে নাকি বাঘে নিয়ে গেছে।

কিন্তু সে বাঘ মানুষ-বাঘ কিনা, সে সন্দেহ গাঁয়ের লোকেদের মনে দেখা দিয়ে-ছিল। কেননা, সেইদিন থেকেই একটা রক্ত-হিম করা আর্তকান্না ভেসে আসত সেন-মহলের ধ্বংসস্তূপ থেকে। রাতের পর রাত সে কান্না শোনা গেছে। সুপ্ত দেশ গ্রাম নগর পার হয়ে ক্রমশ ক্ষীণ ক্ষীণতর ক্ষীণতম হয়ে অসীম সুদূরে মিলিয়ে গেছে। প্রতি রাতেই এমনি করে মর্মভেদী কান্না অভ্রভেদী হাহাকার হয়ে গাঙের পূবপার থেকে পশ্চিমপারে বয়ে গেছে। তারপর একদিন আচমকা স্তব্ধ হয়ে গেছে সবকিছু।

প্রজারা ফিসফাস করে বলেছে, লোহার তৈরী পাতালঘরে বন্দী সাহেবকে না খাইয়ে রাতের পর রাত স্রেফ চাবকে খুন করেছেন ভবানন্দ সেন।

অমানুষিক মনোবলের অধিকারী সেই মানুষটাই পনেরোই জানুয়ারীর ভোরে যখন বাতাসে মিলিয়ে গেলেন, তখন প্রজাদের গা ছমছম করেছিল। বলেছিল, এ সেই সাহেব-ভূতের প্রতিহিংসা।

*

শুনে ভুরু কুঁচকে উঠেছিল জয় দত্তর।

জয় দত্ত শিল্পী মানুষ। ক্যানভাস, রঙ আর তুলির মধ্যেই তার মনের জগৎ। বাল্যবন্ধু ভবানন্দর আমন্ত্রণে এসেছিল কুহেলী-আবিল সুন্দরবনের কিছু ছবি ইজেলের বুকে তুলে নিতে।

জয় দত্ত সৌন্দর্যের উপাসক। ভূত-প্রেতের নয়। তাই কুঞ্চিত ললাটে কিছুক্ষণ



থেকে অবশেষে কাশ্মিরী শালটা কাঁধে ফেলে রওনা হল ভূঁইতরাসির গ্রামের দিকে। গ্রামটা মাইলখানেক দূরেই। কদিন আগে ছবি আঁকতে গিয়ে সেখানে দেখা হয়ে গিয়েছিল ফাদার ঘনশ্যাম মণ্ডলের সঙ্গে।

সব শুনল ঘনশ্যাম পাদরী।

তারপর সযত্নে ভাঙা ছাতাটা বগলে নিয়ে বলল, 'চলো, বাকীটুকু যেতে যেতেই বলবে।'

তাই বলল, জয় দত্ত। ভোরবেলা ভবানন্দ সেন যখন হাতীর দাঁত দিয়ে বাঁধানো বেতের ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে গেলেন গাঁয়ের দিকে, জয় দত্ত তখন সেন-মহলের পাশেই গাঙের তীরে বাগানে দাঁড়িয়ে। সঙ্গে ছিল প্রলয় বর্মা।

"প্রলয় বর্মা কে?" ঘাড় হেঁট করে হাঁটতে হাঁটতে সহসা প্রশ্ন করল ঘনশ্যাম মণ্ডল

"ভবানন্দের আর এক অতিথি।"

"বন্ধু?"

"ডিরেক্টলি নয়।"

"তার মানে?"

"তার মানে, প্রলয় বর্মা ভবানন্দর পালিতা-কন্যা শ্রাবণীর বন্ধু। ডাকাত-ভাঙাতেই পাখী শিকার করতে এসেছিল প্রলয় বর্মা। শ্রাবণীর সঙ্গে আলাপ তখনি। সেই সূত্রে বাড়ীতে যাতায়াত। যাই হোক, ভোরবেলা আমি ও প্রলয় দাঁড়িয়েছিলাম গাঙের পাড়ে বাগানে। দেখলাম, ভবানন্দ গেল। কিছুক্ষণ পরে সিগারেট বার করতে গিয়ে দেখি প্যাকেট ফুরিয়েছে। তাই দেখে প্রলয় নিজেই গাঁয়ে গিয়ে দশ মিনিটের মধ্যে কিনে আনল একটা প্যাকেট। প্রলয় দেখেছে, ভবানন্দ দাঁড়িয়েছিল মাংসের দোকানের সামনে। তারপর থেকেই যেন উবে গেল লোকটা।"

নতমস্তকে কিছুক্ষণ হাঁটল ফাদার ঘনশ্যাম।

তারপর মৃদুকণ্ঠে বললে, "শ্রাবণী সম্বন্ধে কিছু বলো।"

"সে এক ইন্টারেস্টিং কাহিনী। ভবানন্দ ন পুরো জোয়ান। মাইশোরের ফরেস্টে গিয়ে শ্রাবণীকে কুড়িয়ে পায় গাছের তলা থেকে। এমনিতে ওর মন পাথরের মত। কিন্তু রাম কসাসের মেয়েটার ওপর ওর কি রকম মায়া পড়ে যায়। ধাই রেখে মানুষ করে। কনভেন্টে রেখে পড়ায়। বাইরে জঙ্গল আর ঘরে শ্রাবণী নিয়ে কেটে আরো আঠারোটা বছর। বিয়ে-থার মাথাতেই আনল না ভবানন্দ।"

থামল জয় দত্ত। ঘনশ্যাম প্রশ্ন করল, "তারপর?"

আজও অকৃতদার। পাথরেও ফুল ফোটে, ভবানন্দ তার প্রমাণ। দেখে কুড়িয়ে পাওয়া একটি মেয়েকে মানুষ করার জন্যে নিজের সব সুখ বিসর্জন দিয়ে চিরকুমার থাকার কাহিনী উপন্যাসে পড়েছিলাম, এবার চোখে দেখলাম।"

"ওঁর বয়স কত এখন?"

"চল্লিশ। কিন্তু এবার বুঝি একটা ধাক্কা খাবে ভবানন্দ।"

" কিসের ধাক্কা?"

"মেয়ের বিয়ে দিয়ে সব বাবাই যে ধাক্কা সহ্য করেন, সেই ধাক্কা। সোজা বাংলায়, শ্রাবণী বিয়ে করছে।"

"কাকে?"

"প্রলয় বর্মাকে।"

•

কিছুক্ষণ সব চুপ।

তারপর আস্তে আস্তে বলল ঘনশ্যাম, "জয়, তুমি কি তাতে খুশী নও?"

"ছোকরার চ্যাটাং চ্যাটাং কথা শুনলে গা জ্বলে যায়। শ্রাবণীর কাছে ও যেন বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা।"

"ভবানন্দ সেন?"

"এক কথাতেই রাজী হয়ে গেছে। এ বিয়েতে ওর উৎসাহই তো সব চাইতে বেশি দেখছি।"

"ডাকাতডাঙা বোধহয় এসে গেল, জয়। কিন্তু ও ভদ্রলোকটি কে?"

•

মাথায় বাঁদুরে টুপী, আপাদমস্তক নীল র‍্যাপার জড়ানো একটা কিম্ভূত-কিমাকার মূর্তি উঠে এল গাঙের পাড় বেয়ে। লোকটার এক হাতে থলে, আর এক হাতে ছিপ।

দেখেই সোল্লাসে বলল জয় দত্ত, "আরে, নিধিরামবাবু নাকি? কটা মাছ পড়ল মশাই?" পরক্ষণেই খাটো গলায় বললে ঘনশ্যাম মণ্ডলকে, "নিধিরাম সামুই। ডাকাতডাঙার পুরোনো বাসিন্দা।"

জয় দত্তর হাঁক শুনেই থমকে দাঁড়িয়েছিল নীল মূর্তি। ভদ্রলোকের চেহারার সঙ্গে চামচিকের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। চোখ দুটিও বাদুড়ের মত সদাই রাঙা। চাহনিও সরল নয়।

সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল নিধিরাম সামুই। তারপর খ্যানখেনে গলায় বলল, "কপাল খারাপ। তা, কি একটা খবর শুনলাম মশায়? রাজাবাবুকে নাকি পাওয়া যাচ্ছে না?"

"সেই রকমই তো শুনছি। আপনি কতক্ষণ আছেন এখানে?"

"অনেকক্ষণ। রাজাবাবু তো আমার পেছন দিয়েই গেলেন গো। আর চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলে ঐ যে ভদ্রলোকটি—"

"প্রলয় বর্মা।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, প্রলয়বাবু। তিনিও গেলেন, ফিরে এলেন। কিন্তু রাজাবাবুকে তো আর ফিরতে দেখিনি। তা এটি কে গো?"

বলে ছিপ হেলিয়ে দেখাল খর্বকায় ফাদার ঘনশ্যাম মণ্ডলকে।

পরিচয় দিল জয় দত্ত। কিন্তু আলাপ করার কোনো আগ্রহই দেখা গেল না নিধিরাম সামুইয়ের আচার-আচরণে। বরং অদ্ভুতভাবে ধূর্ত শিয়ালের মত খিক-খিক করে হাসতে হাসতে অন্তর্হিত হল জঙ্গলের অন্তরালে।

আর, একদৃষ্টে অপসৃয়মান সেই মূর্তির দিকে তাকিয়ে রইল ফাদার ঘনশ্যাম মণ্ডল।...

বলতে বলতে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল শ্রাবণী। মনে হল যেন অঝোরধারে শিশিরকণা গড়িয়ে পড়ছে শ্বেত-পদ্মের পাপড়ির ওপর দিয়ে।

মানুষ কি এত সুন্দর হয়? এ যেন কুমোরটুলির শিল্পীর হাতে গড়া একটি মৃন্ময় মূর্তি। প্রাণস্পন্দনে স্পন্দিত যৌবন-ভারে ছন্দিত। তেমনি ডাগর চোখ, সুডৌল সুন্দর নাক, আর টুকটুকে রাঙা ঠোঁট।

জয় দত্ত আর ফাদার ঘনশ্যামের সামনে এসে যখন প্রথম দাঁড়িয়েছিল শ্রাবণী, তখন মনে হয়েছিল বুঝি বা পৌরাণিকা তিলোত্তমাই এল নূপুরের ছন্দে। কিন্তু তখনও ওর দুই চোখে ছিল বাষ্পের আভাস, থর-থর কম্পিত অধরে আবেগের ইশারা।

একটা-একটা প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করেছিল ফাদার। ধীর কণ্ঠে জবাব দিয়েছিল শ্রাবণী। ক্রমে ক্রমে দুধে-আলতা রঙ আবীরের মত রাঙা হয়ে উঠেছে: তারপর এসেছে সেই চরম মুহূর্ত যখন এক আশ্চর্য কাহিনী শুনিয়েছে শ্রাবণী, এবং গাল বেয়ে নেমে এসেছে শ্রাবণের ধারা।

স্তম্ভিত হয়ে বসে থেকেছে জয় দত্ত আর ফাদার ঘনশ্যাম।

এ যেন সেই রূপকথার গল্প। রাজা মৃগয়া করতে গিয়েছিলেন বনে। বনদেবীর ইচ্ছায় তখন দুঃখিনী কাঠকুড়ুনী মেয়েকে সকলে রূপসী করে তুলতে সাহায্য করল। কোকিল এসে বললে, আমার গলার স্বরটি তোমাকে দিলাম। হরিণী বলল, আমার চোখের চাহনিটি তোমাকে দিলাম। চাঁপা গাছ বলল, আমার ফুলের রঙটি তোমার গায়ে বসুক। প্রজাপতি বলল, আমার ডানা দুটি তোমার দু চোখের দুটি ভুরু হয়ে যাক। পাকা তেলাকুচা ফল বলল, আমার রঙ তোমার দুটি নরম অধরে লেপে দিলাম।

রাজা এলেন। সব রূপের সার নিয়ে অপরূপ রূপোত্তমা দেখে মুগ্ধ হলেন। শ্রাবণীকে ঘরে নিয়ে এলেন।

তারপর?

তারপর কেটে গেল আঠারোটি

যুগ, শুধু নিজেদের

যৌবন-তরঙ্গ। কনভেন্টের শিক্ষা সমাপ্ত করে ফিরে এল ডাকাতডাঙায়।

সেন-মহলের বাগানের একটি কোণ মনের মত করে সাজাল শ্রাবণী। বেল জুঁই গোলাপ গন্ধরাজ করবী রজনীগন্ধার সৌরভে যখন বাতাস মদির হয়ে উঠত, তখন প্রতি সন্ধ্যায় প্রকাণ্ড একটা বকুল গাছের তলায় মার্বেলের বেদীতে বসে গাঙের দিকে উন্মনা হয়ে তাকিয়ে থাকত শ্রাবণী।

তারপর এল সেই রাত। দুটি একটি করে প্রস্ফুট বকুল ঝরছিল মার্বেল বেদীতে। ঘনগন্ধপূর্ণ ছায়ান্ধকারে পাশে এসে দাঁড়ালেন রাজা ভবানন্দ সেন। চারিদিক শান্ত নিস্তব্ধ। শাখান্তরাল হতে ছায়াঙ্কিত জ্যোৎস্না পড়েছিল। শ্রাবণীর মোমের মত শুভ্র সুন্দর মুখে।

দুই হাতে তার একটা হাত তুলে নিয়েছিলেন রাজা ভবানন্দ। বলেছিলেন, গাঢ় কন্ঠে—"শ্রাবণী আমি তোমাকে ভালবাসি। তোমাকে বিয়ে করতে চাই।"

তড়িৎস্পৃষ্টের মত চমকে উঠেছিল শ্রাবণী। শিউরে উঠেছিল দেহ-মন। পরক্ষণেই ফুঁসে উঠেছিল ভয়ংকরী-ভুজঙ্গিনীর মতই। হলেই বা কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে, কিন্তু রাজা ভবানন্দ যে শ্রাবণীর স্নেহময় পালক-পিতা!

*

আশ্চর্য!

হেমন্তের জ্যোৎস্না রাতে যে সাময়িক আবিলতা দেখা দিয়েছিল ভবানন্দের অন্তরে, শ্রাবণীর অশ্রুসিক্ত গঞ্জনায় তা চিরন্তরে মিলিয়ে গেল। শ্রাবণী ভেবেছিল বুঝি বা প্রলয়ংকর ক্রোধে ভিসুভিয়াসের মতই ভবানন্দ জ্বলে উঠবেন, ফেটে পড়বেন, তছনছ করে দেবেন সব কিছু।

কিন্তু না। একেবারেই নিভে গেলেন ভবানন্দ সেন। স্বাভাবিক হয়ে গেলেন আগের মতই। শ্রাবণীও দুদিনে কাটিয়ে উঠল অস্বচ্ছন্দতা।

গেল আরও একটি বছর।

*

সেদিনও ছিল শুক্লপক্ষ। সূর্যাস্তের স্বর্ণচ্ছায়া মিলিয়ে গেছে। চরবিহারী জলচর পাখীর ডাক শোনা যাচ্ছে এদিকে-ওদিকে।

উচ্ছ্বসিত জ্যোৎস্নার রেখা যেন মূর্ছিতভাবে পড়ে রয়েছে তরুশাখায়। বনচ্ছায়াতলে নিশ্চুপ হয়ে বসেছিল শ্রাবণী।

অকস্মাৎ বন্দুকের নির্ঘোষ শোনা গেল। কোথায় যেন ধড়ফড় করে উঠল পাখীর ঝাঁক। আর, তার কিছুক্ষণের মধ্যেই এক দীর্ঘদেহী যুবাপুরুষের আবির্ভাব ঘটল প্রস্তরবেদিকার পাশে।

যুবকের নাম প্রলয় বর্মা। পাখী-শিকারের জন্য আগমন সেখানে। কিন্তু শ্রাবণীর চোখে প্রলয় বর্মার আবির্ভাব ঘটল যেন স্বপ্নপুরুষরূপে—যেন সেই নির্জন চন্দ্রালোকে অসীম স্বপ্নরাজ্যের মধ্যে আচম্বিতে এসে পৌঁছেছে রাজপুত্র—কেশবতী রাজকন্যাকে যে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে দৈত্যপুরীর মায়াপাশ ছিন্ন করে।

পৃথিবীতে অঘটন আজও ঘটে। প্রথম দর্শনে প্রেম হল সেই অঘটন। তা না হলে মাত্র দু ঘন্টার আলাপে কেনই বা অমন অনিবার্য আবেগে অভিভূত হয়ে যাবে শ্রাবণী, কেনই বা তার মাথার ওপর থেকে শালটি হঠাৎ খসে পড়বে; আর, সেই জ্যোৎস্না বিকশিত মুখখানি তুলে ধরে চুম্বন করবে প্রলয় বর্মা!

যথাসময়ে প্রলয় বর্মা বিয়ের আরজি পেশ করল ভবানন্দ সেনের কাছে। এক কথাতেই রাজী হয়ে গেলেন রাজা ভবানন্দ। হাসিমুখে বিয়ের তোড়জোড় শুরু করলেন।

অপরিসীম শ্রদ্ধায় ভরে উঠল শ্রাবণীর অন্তর। ভাবল, এমন দেবতার মত মানুষ। না হয় সামান্য ভুলই করেছিলেন। তাই বলে অমন আঘাত দেওয়া বোধহয় ঠিক হয়নি শ্রাবণীর।

তারপরেই ভারি অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটল।

সামান্য ঘটনা। কিন্তু খটকা লাগল শ্রাবণীর।

প্রলয় বর্মাকে শ্রাবণীই আমন্ত্রণ জানিয়েছিল সেন-মহলে। আলাপ করিয়ে দিয়েছিল ভবানন্দ সেনের সঙ্গে।

তারপর কতবার প্রলয় বর্মা এসেছে সেন-মহলে, থেকেছে বেশ কয়েকটা দিন, হৈ-হুল্লোড়ে মাতিয়ে রেখেছে সবাইকে।

কিন্তু একদিন রাতে খাওয়ার টেবিলে বসে সুরাপান করছেন ভবানন্দ। মাঝে মাঝে মদ খেতেন তিনি। ব্যাপারটা খুবই গা-সওয়া। সেদিনও মদিরা সেবনের ফলে রাজাসাহেবের মন যখন তরলাবস্থায় রয়েছে, তখন কি একটা হাসির কথা বলল প্রলয় বর্মা। সুমিষ্ট সুতীক্ষ্ণ কণ্ঠে হেসে উঠেছিল শ্রাবণী। হাসতে হাসতেই শুনেছিল ভবানন্দ বলছেন প্রলয় বর্মাকে, দশ বছরেও তুমি একটুও পালটাওনি দেখছি।"

স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল শ্রাবণী! তবে কি দশ বছর আগে থেকেই প্রলয় বর্মাকে চেনেন রাজা ভবানন্দ সেন? কিন্তু শ্রাবণীর কাছে তা গোপন করে যাওয়ার অর্থ?

এই কথা বলতে বলতেই ঝরঝর করে কাঁদতে লাগল শ্রাবণী। রাজা ভবানন্দ সেনকে শ্রাবণী শ্রদ্ধা করে, ভয় করে, কিন্তু সন্দেহ কখনো করেনি। অথচ প্রলয় বর্মাকে চিনেও না চেনার ভান করার হেঁয়ালী আজও ধরতে পারেনি। তাও সয়ে যেত শ্রাবণীর। কিন্তু আজ যা ঘটল, তা যে আরও মর্মান্তিক; তোমরা না হতেই অদৃশ্য হয়ে গেলেন ভবানন্দ সেন। সে কি শ্রাবণীর ওপর রাগ করেই? কিন্তু কেন? কেন? কেন?

মোরদামানা শ্রাবণীকে সেন-মহলে রেখে ঘনশ্যাম পাদরীকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল জয় দত্ত। হাঁটিতে হাঁটিতে গেল গাঙের পাড়ে ছোট্ট গাঁ-টার দিকে—যে গাঁ থেকে জলজ্যান্ত ভবানন্দ সেনকে সাহেব-ভূতে উড়িয়ে নিয়ে গেছে বলে প্রজাদের বিশ্বাস।

পথে একটি কথাও বলেনি ফাদার। অস্বাভাবিক গম্ভীর মুখে ঘাড় হেঁট করে থেকেছে। গাঁয়ে গিয়ে বার কয়েক পায়চারী করেছে এ-মোড় থেকে সে-মোড় পর্যন্ত। গাঁ মানে একটি মাত্র সারিতে গোলপাতা, খড়, টালি টিনের কয়েকটা ছাউনি। কোনোটাতে মনিহারী দোকান, কোনোটাতে পান-বিড়ি-সিগারেট, কোনোটাতে মাংস। হপ্তায় একবার হাট বসে। তখন এ জায়গা গমগম করতে থাকে। এখন তা নিঝুম।

কশাইয়ের দোকানের সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়াল ফাদার ঘনশ্যাম। শেষবারের মত এখানেই দেখা গিয়েছিল ভবানন্দ সেনকে। তারপরেই যেন কাপালিকের মারণ-মন্ত্রে পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গেছে তাঁর নশ্বর দেহ।

ফিরে এল ঘনশ্যাম মণ্ডল। ফিরে এল সেন-মহলে। কিন্তু প্রাসাদে না গিয়ে গাঙের পাড় বরাবর হাঁটিতে হাঁটিতে প্রবেশ করল বিশাল বাগিচায়। অর্ধভগ্ন মর্মর-মূর্তি শোভিত বাগানে এখন ফুলের চেয়ে আগাছার ভিড় বেশি। অযত্নে অনাদরে এককালের উদ্যান আজ অরণ্যে পরিণত।

ফাদার ঘনশ্যামের অন্তরে বুঝি তখন চিন্তার তুফান। তাই চাইছিল একটা নিভৃত কুঞ্জ। যেখানে গিয়ে অশান্ত মনকে শান্ত করা যাবে, দুরন্ত ভাবনাকে বাগে আনা যাবে।

কিন্তু কে জানত ঝিল্লিধ্বনিমুখরিত বনচ্ছায়াতলে আর এক বিস্ময়, আর এক বিভীষিকা অপেক্ষা করছিল তাদের জন্যে?

সামনে পেছনে ডাইনে বাঁয়ে ঘনছায়াবৃত ঝাউগাছ বাতাসে সশব্দে কাঁপছিল।

অদূরে একটা সুবিশাল বকুলগাছ। নীচে মার্বেল পাথরে বাঁধানো শাদা বেদী। জায়গাটি বেশ পরিষ্কার। চারপাশে মেহেদির বেড়ার মাঝখানে নিতান্ত দিশি পন্থায় সজ্জিত এক টুকরো বাগান। সেখানে

প্রশান্ত মিত্র সম্পাদিত আসন্ন-প্রকাশ 'সিরিয়াস' মাসিক পত্র জ্ঞাপন-এর জন্য ভালো গদ্যরচনা ডাকযোগে আহ্বান করা হচ্ছে। কবিতা পাঠাবেন না। বিশেষ লেখার জন্য 'অনারেরিয়াম' দেওয়া হবে। 'ডাকের ঠিকানা : প্রশান্ত মিত্র, সম্পাদক 'জ্ঞাপন' ১২১।২।২ডি, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা—১৩।

বর্ণের বাহার না থাকুক, ছিল গন্ধের আধিক্য। বেল জুঁই গোলাপ গন্ধরাজ করবী রজনীগন্ধার সৌরভ। অদূরে মেরুদণ্ড ভাঙা তন্তুবক্রের মতো বাঁকা-চোরা একটি বাঁধানো ঘাট। বিদীর্ণ পাষাণ-পঞ্জরে অশত্থগাছের সুকঠিন শিকড়-জাল।

নির্জন সেই বনতলে এসে ফাদার ঘনশ্যামের ছটফটানি যেন আরও বৃদ্ধি পেল। ঝোপঝাড়ের ফাঁক দিয়ে অদূরে দেখা যাচ্ছে গাঙের জল। সূর্যালোকে তা অজস্র মাণিক্যের দীপ্তিতে উজ্জ্বল।

বুকভরে ফুলের ঘ্রাণ নিচ্ছিল জয় দত্ত। ফাদার নেমে গেছিল গাঙের তীরে।

সেখান থেকেই ভেসে এল তার প্রশান্ত কণ্ঠ—"জয়, এদিকে এস।"

নেমে গেল জয় দত্ত। এবং দেখল সেই ভয়ানক দৃশ্য!

তীরে আমগাছের নিচে যেখানে কচুবন জন্মেছে তার অদূরে জলের মধ্যে জেগে রয়েছে তিনটে পুরোনো ইঁটের পাঁজা। গাঙের জল সেখানে চক্রাবর্ত রচনা করেছে। জলরেখার ঠিক ওপরেই ঘাটের খাঁজের মধ্যে মুখ থুবড়ে আটকে রয়েছে একটা দেহ।

মনুষ্যদেহ। কর্দমাক্ত। তা সত্ত্বেও মূল্যবান তসরের পাঞ্জাবি সিল্কের পায়জামা দেখলে চেনা যায়। চেনা যায় পাঞ্জাবির হীরের বোতাম আর চুনীর লকেট। চেনা যায় বাম মণিবন্ধের সোনার ঘড়ি।

পেশীবহুল, সুগঠিত, সুদীর্ঘ সেই দেহের অধিকারী এ তল্লাটে শুধু একজনই। তিনি রাজা ভবানন্দ সেন।

কিন্তু সেই মুহূর্তে রাজার মুখাবয়ব দেখার উপায় ছিল না। কারণ, গোটা মুণ্ডটাই যেন কেউ দানবিক শক্তিতে মুচড়ে পেছন করে দিয়েছে। তাই রাজা ভবানন্দের ধড়টি চিৎ হয়ে থাকলেও মুণ্ডটি মুখ গুঁজড়ে পড়েছিল কাদামাটিতে।

বীভৎস দৃশ্য! এ কোন অমানুষের কাণ্ড! কোন নরাসুরের কীর্তি!

হাওড়া কুষ্ঠ কুটির

৭২ বৎসরের প্রাচীন এই চিকিৎসাকেন্দ্রে সর্বপ্রকার চর্মরোগ, বাতরক্ত, অসাড়তা, ফুলা, একজিমা, সোরাইসিস, দূষিত ক্ষতাদি আরোগ্যের জন্য সাক্ষাতে অথবা পত্রে ব্যবস্থা লউন। প্রতিষ্ঠাতা : পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা কবিরাজ, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। শাখা : ৩৬, মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা—৯। ফোন : ৬৭-২৩৫৯

শান্ত স্বরে ফাদার ঘনশ্যাম বলল,—"ওখান থেকে সবটুকু দেখতে পাচ্ছ না জয়। নিচে এস।"

নেমে এল জয় দত্ত। শিউরে উঠল আর একবার কারণ, কে যেন শাণিত অস্ত্রে জবাই করেছে রাজা ভবানন্দকে। গলাটা প্রায় দুটুকরো। মুণ্ডটা তাই ঘুরে গেছে পেছন দিকে।

প্রচণ্ড বিবমিষায় গা-পাক দিয়ে ওঠে জয় দত্তর। বিস্ফারিত দৃষ্টির সামনে রাজা ভবানন্দর বিকৃত বীভৎস লাশটি ঝাপসা হয়ে আসে।

কিন্তু এতক্ষণের অশান্তি যেন আচম্বিতে উধাও হয়েছে ফাদার ঘনশ্যামের আচার-আচরণ থেকে। দুই হাত বুকের ওপর ভাঁজ করে রেখে দাঁড়িয়েছিল ধ্যান-গম্ভীর যিশুর মত। অর্ধ-নিমীলিত দুই চোখে গভীর তন্ময়তা।

তারপরেই হেঁট হল ঘনশ্যাম। আঙুল দিয়ে সন্তর্পণে ভবানন্দর দুই গাল থেকে কাদামাটির পলস্তারা চেঁছে ফেলল। গম্ভীর মুখে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। ঘাড় নাড়তে লাগল আপনমনে।

এরপর জামা-কাপড় হাতড়াতে লাগল ফাদার। নিজের নয়, লাশের। এ-পকেট সে-পকেট হাতড়ে একটা রুমাল ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না।

অন্তত জয় দত্তর কাছে তাই মনে হল।

কেন না, পাশ-পকেট থেকে ক্ষুদ্রকায় একটা বস্তু নিয়ে ফাদার অনেকক্ষণ উল্টে-পাল্টে দেখেছিল বটে, কিন্তু জিনিসটা এমনই নগণ্য যে তা নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাবার দরকার মনে করেনি জয় দত্ত।

ফাদার ঘনশ্যামের আগ্রহ তাতে বিন্দুমাত্র কমেনি। বরং হাতের তালুতে রেখে বস্তুটার দিকে এমনভাবে মিনিটের পর মিনিট তাকিয়ে থেকেছে যেন বিশ্বের বিস্ময় তার মধ্যেই বিধৃত।

কৌতূহল চরিতার্থ করতে জয় দত্তও এগিয়ে গিয়েছিল এবং দেখেছিল, জিনিসটা দেখতে অনেকটা আলুর খোসার মত। নতুন আলু থেকে যেমন খোসা বেরোয়, অনেকটা সেই রকম।

সাগর-ছেঁচা রত্নের মতই বস্তুটিকে রুমালে মুড়ে আলখাল্লার পকেটে রাখতে রাখতে হৃষ্টকণ্ঠে বলল ফাদার ঘনশ্যাম, "দেখলে তো?"

"কী দেখব? ঐ-ঐ খোসার মত জিনিসটা?"

"আরে না, না! ওটা তো , সামান্য ব্যাপার। আমি বলছি, তোমার বন্ধুর গাল দুটো?"

হকচকিয়ে গেল জয় দত্ত, "কাদা ছাড়া তো আর কিছুই দেখছি না।"

"যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ তাই পাইলেও পাইতে পার অমূল্য রতন।" হৃষ্টকণ্ঠে বলল ফাদার ঘনশ্যাম। "ডান হাতটা দেখেছো?"

"ব্যাণ্ডেজ বাঁধা রয়েছে। কারণটাও জানি।"

"কী শুনি?"

"গতকাল কালির দোয়াত ভেঙে ফেলে হাত কেটে ফেলে। তাই ঐ ব্যাণ্ডেজ।"

"বেশ, বেশ, কালির দোয়াতটা অবশ্য সামান্য ব্যাপার। তামামা হল ঐ ব্যাণ্ডেজ। জয়, জয়, তুমি চোখ খুলে কিন্তু এখনও দেখছ না। দেখলে আরও একটা অসাধারণ ব্যাপার লক্ষ্য করতে।"

"কী?" বিমূঢ়কণ্ঠে জয় দত্তর।

"ভোরবেলা হাতীর দাঁতে বাঁধানো ছড়ি নিয়ে বেরিয়েছিলেন রাজা ভবানন্দ সেন। কিন্তু সে ছড়ি কি এখানে আছে?"

"না, নেই।"

রাজাসাহেবের গলা প্রায় দুটুকরো হয়ে গেছে। অথচ ধারে কাছে রক্তগঙ্গা দেখা যাচ্ছে কি?"

"না, দেখা যাচ্ছে না।"

"ছড়ি নেই, রক্ত নেই। সুতরাং এ খুন হেথা নয় হোথা নয়, হয়েছে অন্য কোথাও।"

"খুন! খুনের কথা বলছেন কেন? রাজা ভবানন্দ সেনকে খুন করবার মত পশু তো দূরের কথা, মানুষও নেই এ তল্লাটে।"

আবার হেঁট হল ফাদার ঘনশ্যাম। লাশের চুলের মুঠি ধরে মুণ্ডটা ঈষৎ ফিরিয়ে দিল সামনে।

বলল, "দেখেছো?"

মরিয়া হয়ে বলল জয় দত্ত, "দেখেছি। শান্ত মুখ। যেন হাসতে হাসতে মরেছে ভবানন্দ। মানুষে কি হাসতে হাসতে খুন হয়? না, না, ফাদার, ভবানন্দ খুন হয়নি। হতে পারে না।"

"তবে কী?"

"আত্মহত্যা করেছে ভবানন্দ।" ঢোক গিলে জবাব দিল জয় দত্ত।

"তাই কী?" বলে চোখ নাচিয়ে নিগূঢ় হাসি হাসল ফাদার ঘনশ্যাম মণ্ডল।

শিহর জাগল তরু-পল্লবে। বিবশ সোনাল জলকল্লোল। আমগাছের পাতা ঝরঝর করে হঠাৎ করে উঠল বাতাস।

নির্নিমেষ নয়নে গভীর স্থির রেখায় মত ফাটল ধরা পাষাণ-ঘাটের দিকে তাকিয়ে রইল শিল্পী জয় দত্ত। চোখের সামনে ভাসতে লাগল প্রাবণীর ছোট ছোট চরণদুটি এই ঘাটের পাষাণ কতবার পুলকিত হয়েছে তার চরণমাধুরী স্পর্শে বর্ষার আজন্তে গাঙ যেমন প্রতিদিন দেখতে দেখতে ভরে

ওঠে, শ্রাবণীও তেমনি প্রতিদিন সৌন্দর্যে যৌবনে ভরে উঠেছে। তারপর এসেছে সেই রাত। জ্যোৎস্নাস্নাত ঊর্ধ্বমুখ ফুটন্ত ফুলের মত মুখখানি দেখে সবকিছু বিস্মৃত হয়েছে জমিদার ভবানন্দ সেন।

এই সেই ঘাট। সেই ঘাটেই অবশেষে এসে ভিড়েছে ভবানন্দের নিষ্প্রাণ দেহ-পিঞ্জর। সংগে এনেছে কুহেলী-আবিল এক নিগূঢ় প্রহেলিকা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘুরে দাঁড়াল জয় দত্ত।

ফাদার ঘনশ্যাম কিন্তু সেন-মহলে ফিরল না।

বলল, "ইচ্ছে হচ্ছে সিগারেট খাই। আছে?"

জয় দত্তর ধূমপানের নেশা ছিল না। বলল, "আপনি তো জানেন ওসব আমার চলে না।"

"ভুলে গেছিলাম। তাহলে চলো গাঁয়ে গিয়ে সিগারেট কেনা যাক।"

"কিন্তু লাশটা এখানে পড়ে রইল। খবর দেওয়াটা আগে দরকার।"

"হবে, হবে, লাশ তো আর গায়েব হবে না।"

বলে, জয় দত্তকে একরকম টানতে টানতেই নিয়ে এল ছোট্ট গাঁয়ের ভেতরে। দাঁড়াল গোলপাতার ছাউনির সামনে। সিগারেটের দোকান। কিন্তু দোকানী নেই। দোকানঘরের ভেতরের দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে আরও একটা ঘুপসিঘর।

কিন্তু সিগারেট-পিপাসা সত্ত্বেও সেদিকে নজর ছিল না ফাদারের। এদিকে বুকসমান উঁচু পাঁচিলের ওপর দিয়ে উঁকি মেরে দেখছিল ভেতরের উঠোনে। জয় দত্তও দেখল। খুশীমুখে ফাদার বলল, "লক্ষ্য করেছো?"

"কী"

"ঐ তো এককোণে জড়ো করা রয়েছে একগাদা আলুর বস্তা। ওদিকে দেখো, মণ-কয়েক নতুন আলুও ঢালা রয়েছে। কি বুঝলে?"

"কিছু না।"

"অহো, পল্লীগ্রামের কারবার তো এমনি-ভাবেই চলে। পাঠশালার গুরুমশাই মুদীর দোকানীও হয়। একসংগে দুটো তিনটে ব্যবসা না চালালে পেট চলে না। যেমন ধরো সিগারেটের দোকান দিয়েও সুবিধে হয় না বলে হাটবারে আলুর পাইকারী কারবার করে এ দোকানের মালিক।"

"কিন্তু লোকটা গেল কোথায়?"

"নিশ্চয়ই ভেতরে আছে। চলো, ঢোকা যাক," বলে ঠেলা দিল পাশের দরজায়। দরজা বন্ধ। এক লহমাও চিন্তা না করে বিপুল দেহ নিয়ে আশ্চর্য ক্ষিপ্রতার পাঁচিলের ওপর উঠে বসল ফাদার। হুড়মুড় করে পরক্ষণেই প্রবেশ করল ভেতরে। এবং নিমেষমধ্যে পৌঁছোলো পেছনকার ঘুপসি-ঘরে। আঠার মত পেছনে লেগে রইল জয় দত্ত।

ভূত দেখার মতই চমকে উঠল ঘরের লোকটি। বয়স ষাটের কম নয়। একমুখ খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। ভয়ার্ত চোখে নিঃসীম আতঙ্ক নিয়ে এককোণে কেঁচোর মতই কুঁচকে সরে গেল বৃদ্ধ। কাঁপতে লাগল ঠকঠক করে।

ঘরের মধ্যে একটা সস্তা টেবিলে দাড়ি কামানোর সব সরঞ্জামই প্রস্তুত। ক্ষুর, সাবান, কাঁচি, ক্লিপ পাশাপাশি সাজানো। টেবিলের সামনের চেয়ারটি সেই মুহূর্তে শূন্য।

তবে, ঘরের আলনায় ঝুলছে একটি সুদৃশ্য বস্তু।

হাতীর দাঁত দিয়ে বাঁধানো একটা দামী ছড়ি!

"ভবানন্দর ছড়ি!" চীৎকার করে উঠেছিল জয় দত্ত।



এই কথা বলতে বলতেই...

"হ্যাঁ, রাজা ভবানন্দর ছড়ি," জলদগম্ভীর স্বরে বলল ফাদার ঘনশ্যাম। টেবিল থেকে ক্ষুরটা তুলে নিয়ে বলল, "আর এই সেই ক্ষুর যা দিয়ে দু-টুকরো করা হয়েছে তাঁর কণ্ঠনালী।" তারপরে ঘরের মেঝেতে চোখ বুলিয়ে নিয়ে—"রক্তের দাগ-টাগ ধুয়ে ফেলেছো দেখছি। কি নাম তোমার?"

থরথর করে কাঁপতে লাগল বৃদ্ধ। মুখ দিয়ে কোনো শব্দ বেরোলো না।

স্নিগ্ধ গম্ভীরকণ্ঠে বলল ঘনশ্যাম, "থাক, নাম বলতে হবে না। কিন্তু অত ভয় পেও না। আমি সব জানি। সমস্ত। তবে তা তোমার মুখেই শুনতে চাই।"

চেষ্টা সত্ত্বেও ত্রাস-কম্পিত বৃদ্ধের কণ্ঠে কোনো শব্দ ফুটল না।

"থাক, থাক, আমিই বলছি," কোমল স্বরে বলল ঘনশ্যাম। "একসংগে তিনটে ব্যবসা তোমাকে দেখতে হয়। পান-বিড়ি-সিগারেটের দোকান, আলুর পাইকারী ব্যবসা আর পরামানিকের কারবার। তাই আজ ভোর-বেলা রাজাসাহেব এসেছিলেন তোমার ঘরে দাড়ি কামাতে। কারণও ছিল। কাল ভাঙা দোয়াতের কাঁচে হাত কেটেছেন রাজাবাবু। তাই আজ সকালে স্বহস্তে ক্ষৌরকর্ম করা সম্ভব ছিল না।

"এই চেয়ারে বসেছিলেন রাজা-সাহেব। ছড়ি ঝুলিয়ে রেখেছিলেন আলনায়। রাজাবাবুর দাড়ি, অতএব বেশ যত্ন নিয়েই কামাতে হচ্ছিল তোমাকে। একটা গাল সবে কামানো হয়েছে এমন সময় সিগারেট কিনতে রাস্তায় এসে দাঁড়াল এক-জন ভদ্রলোক। তার নাম প্রলয় বর্মা।

"রাস্তা থেকে দেখা যায়। এ ঘরের এই চেয়ার। তাই সিগারেট কিনতে এসে প্রলয় বর্মা দেখেছিল রাজাসাহেবকে চেয়ারের পেছনে মাথা হেলিয়ে বসে থাকতে। নর-সুন্দরের ক্ষুরের মোলায়েম ছোঁয়া তিনি চক্ষু বুঁজে অনুভব করছিলেন, মুখে ছিল আরাম আর আমেজের হাসি। তাই দেখেই প্রলয় বর্মার মাথায় অকস্মাৎ রক্ত চড়ে গেছিল। তুমি যখন হাতের ক্ষুর টেবিলে রেখে সিগরেট দিতে এসেছিলে ঠিক তখনি বিদ্যুৎবেগে পাশের দরজা দিয়ে এ ঘরে ঢুকে পড়েছিল প্রলয় বর্মা। চক্ষের পলকে টেবিল থেকে খোলা ক্ষুর তুলে নিয়ে ঘ্যাচাং করে ভবানন্দ সেনের গলা দু'টুকরো করে দিয়েই আবার ফিরে গেছে দোকানের সামনে। চোখবোঁজা অবস্থায় হাসিমুখেই মারা গেছেন ভবানন্দবাবু। মৃত্যুর পরেও সে হাসি লেগেছিল তার ঠোঁটে। তুমি কিছুই তার টের পাওনি। সিগরেট দিয়ে ফিরে এসে দেখছ, যাঁর জমিদারিতে থেকে তুমি দুমুঠো ডালভাত জোটাচ্ছো সেই রাজা-বাহাদুর খুন হয়ে পড়ে আছেন তোমারই ঘরে।'

"তোমার তখনকার মনের অবস্থা আমি কল্পনা করতে পারছি। ভয়ঙ্কর সেই দৃশ্য দেখে তুমি অজ্ঞান হয়ে গেছিলে কিনা জানি না। তবে কিছুক্ষণ নিশ্চয় ঘোরের মধ্যে ছিলে। তাই সেই মুহূর্তে লাশটাকে সরিয়ে ফেলার কথাই তুমি ভেবেছিলে। উঠোন থেকে আলুর বস্তা এনেছিলে, লাশটাকে ভেতর ঢুকিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে নিয়ে গিয়ে গাঙের জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলে। কিন্তু তাড়াতাড়িতে মুখটা ভাল করে বাঁধোনি। সেইজন্যেই কিছুদূর গিয়ে আলুর বস্তা ভেসে গেছে। লাশটা ইঁটের পাঁজার কাছে জলের পাকে আটকে গিয়ে ঘাটে গিয়ে ঠেকেছে। একটা নতুন আলুর খোসাও রাজা-বাবুর পকেটে থেকে গিয়েছে।

"তারপর তুমি ফিনকি দিয়ে ছিটকে পড়া রক্ত ধুয়ে পরিষ্কার করে ফেলেছিলে। কিন্তু এত করেও আলনায় ঝোলানো ছড়িটার দিকে নজর পড়েনি।"

চুপ করল ঘনশ্যাম। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ছিল বৃদ্ধ। ফাদার মন্ডল থামতেই

সটান আছড়ে পড়ল তার পায়ের ওপর। হাউমাউ ক'রে কেঁদে উঠে বলল—"আপনি মানুষ নন গো, আপনি দ্যাওতা। সত্যিই আমি রাজাবাবুকে খুন করিনি গো। কিন্তু আমি যে অনেক খাজনা বাকী ফেলেছি। তাই তো লোকে ভাববে আমিই ও'কে খুন করেছি।"

শক্ত মুঠিতে বৃদ্ধকে ধরে দাঁড় করিয়ে দিল ফাদার ঘনশ্যাম মন্ডল।

বলল, "আমি জানি তুমি নিরপরাধ। তাই তুমি নির্ভয়ে থাকবে। এই ছাড়ি আমি নিয়ে চললাম। কেমন?"

এতক্ষণ রুদ্ধশ্বাসে গিলছিল জয় দত্ত। রাস্তায় বেরিয়েই উদগ্র কৌতূহলে বলে উঠল "কিন্তু ফাদার আপনি বলছেন কি? প্রলয় বর্মা খুন করতে যাবে কেন? মোটিভ কি? শ্রাবণীকে বিয়ে করা? অনুমতি তো ভবানন্দ আগেই দিয়েছে?"

ম্লান হাসি হাসল ফাদার ঘনশ্যাম। বিষণ্ণ কন্ঠে বলল, "রহস্য তো সেইটাই।"

"তার মানে?"

"জয়, ভবানন্দ সেনের পুরনো বন্ধু হয়েও বন্ধুর চরিত্র তুমি অনুধাবন করতে পারোনি। মৃগয়া যাঁর নেশা, জিঘাংসা তাঁর রক্তে থাকে। বাঘের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে যিনি অভ্যস্ত, প্রতিহিংসাকে দীর্ঘদিন জিইয়ে রাখার অভ্যাসও তাঁর থাকে। সাহেবের গল্প কি তুমি ভুলে গেলে? কোন্-কালে তাঁকে ডার্টি নিগার বলে ঠাট্টা করেছিলেন। ভবানন্দ সেন তা ভোলেন নি। বেশ কয়েকবছর পরে এই ডাকাতডাঙাতে ডেকে এনে স্রেফ অনাহারে রেখে চাবুক মেরে খুন করেছেন তাঁকে। সমঝে দিয়েছেন নিগার বলার প্রতিক্রিয়া কন্দুর যেতে পারে। জেদী, একরোখা, প্রতিহিংসাপরায়ণ যাঁর চরিত্র, তিনি শ্রাবণীর মত একফোঁটা মেয়ের গালমন্দ স্রেফ হজম করে বসে থাকবেন একথা কল্পনা করাও মহাভুল। সেই ভুলই তোমরা সবাই করছো।"

একটু থেকে আবার বলতে লাগল ফাদার, "তুমি প্রলয় বর্মার মোটিভ কি জানতে চাইছ। কিন্তু তার আগে জানা দরকার ভবানন্দ সেনের মোটিভ।"

"ভবানন্দ সেনের মোটিভ?" অস্ফুট-কন্ঠে বলল জয় দত্ত।

"এ রহস্যে মোটিভ একটা নয়—দুটো। ভবানন্দ সেনের এবং প্রলয় বর্মার। আমি যা অনুমান করেছি, তা এখুনি বলতে চাই না। আগে দেখা করতে চাই প্রলয় বর্মার সঙ্গে।"

ঘন্টাদুয়েক পরের কথা।......

ঝাউগাছের ওপর শীতের রোদ্দুর পড়েছে। রঙ তার কাঁচা সোনার মতো, চাঁপা ফুলের মতো।

যে অশ্বত্থগাছটি ভাঙা ঘাটের পঞ্জরে পঞ্জরে সুবঙ্কট সুদীর্ঘ আঙুল প্রসারণ করে বিদীর্ণ পাষাণ-প্রাণকে মুঠোয় ধরে রেখে দিয়েছিল, তারই গুঁড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল ফাদার ঘনশ্যাম মন্ডল। সামনে জয় দত্ত।

"তার পর? জিজ্ঞেস করল জয় দত্ত।

"তারপর আর কি। ভবানন্দ সেন কিছুই ভুলবেন না। অন্তরের গহনতম কন্দরে আয়োজন করলেন এক নিষ্ঠুরতম চক্রান্তের—প্রতিহিংসার যার চাইতে বড় রূপ কোনো নারী ভাবতে পারে না।

"তাঁরই পরিকল্পনামাফিক প্রলয় বর্মা এল পাখী শিকার করতে। জ্যোৎস্না রাতে যেন অচমকা দেখা হয়ে গেল শ্রাবণীর সঙ্গে এবং প্রথম দর্শনেই প্রেমের সূচনা দেখা দিল। এমনকি মহাপাপী প্রলয় বর্মাও শ্রাবণীর দুটি আয়ত সুন্দর কালো কালো ঢলঢল চোখ দেখে মজলো।"

"মহাপাপী কেন?"

"কারণ, তারুণের দুরন্তপনায় অন্ধ হয়ে গিয়ে একটা অত্যন্ত গর্হিত কাজ করেছিল প্রলয় বর্মা। হাত রাঙিয়েছিল নরশোণিতে। পুলিশ তাকে সন্দেহও করতে পারেনি। কিন্তু তার কুকীর্তির একটা মোক্ষম ডকুমেন্ট সংগ্রহ করেছিলেন ভবানন্দ সেন। তাই প্রলয় বর্মা তাঁকে ভয় করত। কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর মানুষটাই যখন তাঁর রূপসী পালিতা-কন্যাকে তার হাতে সঁপে দেওয়ার প্রস্তাব জানালেন, তখন তাঁর মহত্ত্বে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল প্রলয় বর্মা। শুধু একটি শর্ত ছিল, প্রলয় বর্মাকে যে ভবানন্দ সেনই শ্রাবণীর সঙ্গে জুটিয়েছেন, একথা কোনোদিন শ্রাবণীকে বলা চলবে না। তাঁর সঙ্গে পূর্ব-পরিচয়ের কথাও নয়।

"এই গেল চক্রান্তের প্রথম পর্যায়। দ্বিতীয় পর্যায়ের বৃত্তান্ত ভবানন্দ সেন প্রলয় বর্মাকেও জানালেন না। ফাল্গুনের যে শুভদিনে বিয়ের দিন স্থির হত, সেই-দিনই সকালবেলা পুলিশ এসে গ্রেপ্তার করত প্রলয় বর্মাকে মানুষ খুনের অভি-যোগে। ডকুমেন্ট ভবানন্দ সেনই সাপ্লাই করতেন। যাতে প্রলয়ের ফাঁসি হয়, সে ব্যবস্থাও করতেন। ফলে, প্রচন্ডতম শক পেত শ্রাবণী। সম্পূর্ণ হত ভবানন্দ সেনের প্রতিহিংসাপর্ব। এক ভালবাসা প্রত্যাখ্যান করার শাস্তিস্বরূপ আরেক ভালবাসার পাত্রকে ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে হত। আঘাতে আঘাতে যখন একেবারেই ভেঙে পড়ত শ্রাবণী, শরবিদ্ধ হরিণীর মত যন্ত্রণায় ছটফট করত, তখন মনে অট্টহাসি আর মুখে মধু নিয়ে আবার ভবানন্দ সেন আসরে অবতীর্ণ হতেন বিবাহের প্রস্তাব পেশ করতে।"

"পাষন্ড!" দাঁত কিড়মিড় করে উঠল জয় দত্ত। "কিন্তু এতকথা আপনি জানলেন কোত্থেকে?"

"প্রলয় বর্মার কাছ থেকে। ভবানন্দ সেন তাঁর এই পৈশাচিক ষড়যন্ত্রের সবকিছু ডায়েরীতে লিখে রেখেছিলেন, দৈবাৎ সেটি প্রলয় বর্মার চোখে পড়ে যায়। লাইব্রেরীর সেই ড্রয়ারটিতে চাবি দিতে ভুলে গেছিলেন ভবানন্দ সেন। শিউরে উঠেছিল প্রলয়। মানুষ এত নির্মম হয়? শ্রাবণীকে সে-ও ভালবেসেছিল। শ্রাবণীর দুচোখের কালো তারা, ঘনদীর্ঘ পক্ষ্ম, আর সজল উজ্জ্বলতার মধ্যে দেখেছিল আপন ভবিষ্যতের সুখ আর শান্তির ছবি। কিন্তু নহবতের শাহানা বাজবার আগেই যে নর-পিশাচ এই ছবি ছিঁড়তে উদ্যত হয়েছে, তাকে চরমতম শাস্তি দেওয়ার পণ করেছিল প্রলয়। আর, তাই জীবনে আর একবার নর-হত্যা করল প্রলয় বর্মা—এবার করল ফুলের মত নিষ্পাপ মেয়ের মুখ চেয়ে।"

"কিন্তু প্রলয় বর্মাই যে হত্যাকারী, তা আপনি জানলেন কি করে?"

"জয়, তুমি শিল্পী মানুষ, তবুও চোখ চেয়ে দ্যাখো না কেন? তুমি কি দ্যাখোনি ভবানন্দ সেনের একগালের দাড়ি পরিষ্কার কামানো, আর এক গালে ক্ষুরের টান হঠাৎ শেষ হয়ে গেছে? ঐ দেখেই আমি অনুমান করেছিলাম, তোমার বন্ধু যখন দাড়ি কামাচ্ছিলেন, তখনি হঠাৎ কেউ তার গলা কেটে দিয়েছে—তাই ঠোঁটের কোণে হাসি নিয়েই বিদায় নিয়েছেন মানুষ-পিশাচ ভবানন্দ সেন।"

ঠিক এই সময়ে ঝমঝম শব্দ শোনা গেল বনান্তরালে। কে যেন পায়ের মল আর হাতের গয়না বাজিয়ে ছুটে আসছে। পর-মুহূর্তে দেখা গেল তাকে। শ্রাবণী। উত্তে-জনায় রাঙা হয়ে উঠেছে টুকটুকে সুন্দর মুখখানি। ছোটার ছন্দে উঠছে আর নামছে কবুতর-কোমল পীবর বক্ষ।

হাঁপাতে হাঁপাতে বলল শ্রাবণী—"ফাদার! জয়কাকা! প্রলয় বর্মাকেও পাওয়া যাচ্ছে না!"

সস্নেহ হেসে ফাদার জিজ্ঞেস করলো, 'মা, আমার ছাতাটা কোথায়?

'বারে বৈঠকখানায় রেখে এলেন তো?"

"চল, নিয়ে আসি।"

স্তব্ধ বিস্ময়ে অপসৃয়মান দুই মূর্তির দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে রইল শিল্পী জয় দত্ত। শিঞ্জিত চরণধ্বনি ক্ষীণ ক্ষীণতর ক্ষীণতম হয়ে মিলিয়ে গেল ঝিল্লির করুণ কান্না আর হায় হায় মর্মর দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে।*

---

* বিদেশী ছায়ায়

গৌরাঙ্গ পরিজন

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

(৬৩)

রঘুপতি উপাধ্যায়

ত্রিহুতবাসী পণ্ডিত, পরমবৈষ্ণব।

বল্লভ ভট্টের গৃহে আহারান্তে প্রভু বিশ্রাম করছেন, রঘুপতি এসে প্রভুকে প্রণাম করে দাঁড়াল।

কৃষ্ণে মতি স্থির থাক। প্রভু আশীর্বাদ করলেন। বললেন, কৃষ্ণকথা বলো।

কৃষ্ণভক্ত রঘুপতি আনন্দিত হল। নিজের লেখা কৃষ্ণলীলাশ্লোক পড়ে শোনাল প্রভুকে। ভগবতী মানুষ শ্রুতি স্মৃতি মহাভারত যাই ভজনা করুক, আমি শুধু নন্দকে বন্দনা করি, যে নন্দের অলিন্দে পরব্রহ্ম খেলা করছেন।

প্রভু প্রেমাবিষ্ট হলেন। বললেন, আরো বলো।

রঘুপতি আবার শ্লোক পড়ল : কাকেই বা বলব, কেই বা বিশ্বাস করবে যমুনাতটের নিকুঞ্জে পরব্রহ্ম অল্পবয়স্কা গোপবধূদের সঙ্গে খেলা করছে।

প্রভু প্রেমবিহ্বল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, উপাধ্যায়, তুমি কোন রূপকে শ্রেষ্ঠ মানো?

কৃষ্ণের শ্যাম রূপকেই শ্রেষ্ঠ মানি। বললে উপাধ্যায়, 'শ্যামমেব পরং রূপং।'

কৃষ্ণের কোন বাসস্থানকে শ্রেষ্ঠ মানো?

বৃন্দাবনকেই শ্রেষ্ঠ মানি। 'পুরী মধুপুরী বরা।'

বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর—কৃষ্ণের কোন বয়সকে শ্রেষ্ঠ মানো?

কৈশোরকেই শ্রেষ্ঠ মানি। কৈশোরেই কৃষ্ণের নিত্যস্থিতি। বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়ং।'

আর রসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কী?

রসের শ্রেষ্ঠ মধুর। 'আদ্য এব পরো রসঃ।'

'শ্যামমেব পরং রূপং পুরী মধুপুরী বরা।
বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়মাদ্য এব পরো রসঃ।।

প্রেমাবেশে প্রভু রঘুপতিকে আলিঙ্গন করলেন। বললেন, তুমি আজ আমাকে পরমতত্ত্ব শেখালে।

রঘুপতি ভাবল, এত প্রেম কি মানুষে সম্ভব? স্থির করল, এই সন্ন্যাসীই স্বয়ং কৃষ্ণ। 'মনুষ্য নহে, ইঁহো কৃষ্ণ করিল নির্ধার।'

(৬৪)

সনাতন গোস্বামী

(ক)

কর্ণাটের রাজা সর্বজ্ঞ জগদ্গুরু। ভরদ্বাজ গোত্রীয় যজুর্বেদী ব্রাহ্মণ। পুত্র অনিরুদ্ধ। অনিরুদ্ধের দুই মহিষী, দুই পুত্র—রূপেশ্বর আর হরিহর। রূপেশ্বর শাস্ত্রে আর হরিহর শস্ত্রে পারদর্শী। অনিরুদ্ধের মৃত্যুর পর হরিহর বড় ভাই রূপেশ্বরকে রাজ্যচ্যুত করলে। রূপেশ্বর সস্ত্রীক পৌরস্ত্য দেশে পালিয়ে গেল। সেখানকার রাজা শিখরেশ্বরের সঙ্গে মিত্রতা করে নিশ্চিন্তে বসবাস করতে লাগল।

রূপেশ্বরের ছেলে পদ্মনাভ। রূপে-গুণে ধনে-মানে শুধু নয়, বেদে-উপনিষদে কাব্যে-ব্যাকরণে প্রসিদ্ধ। শিখরধাম ছেড়ে গঙ্গা-তীরে, নবহট্টে বা নৈহাটিতে এসে বসতি করল। বিবাহ করল পণ্ডিত যদুজীবন তর্ক-পঞ্চাননের মেয়ে রমা দেবীকে। তাঁদের আঠারো কন্যা ও পাঁচ পুত্র। জগন্নাথ উপাস্য দেবতা, তাঁর নামেই পঞ্চ পুত্রের নাম-করণ হল। পুরুষোত্তম, জগন্নাথ, নারায়ণ, মুরারি আর মুকুন্দ।

মুকুন্দের ছেলের নাম কুমারদেব। কুমার-দেব পরম আচারনিষ্ঠ, অহিন্দুর স্পর্শ ঘটলে প্রায়শ্চিত্ত না করে জলবিন্দু গ্রহণ করে না। নৈহাটিতে ধর্মবিপ্লব হলে বাকলা চন্দ্রদ্বীপে গিয়ে বাসা বাঁধল। বিয়ে করল মহানন্দার পূর্বকূলে মাধাইপুরের হরি-নারায়ণ বিশারদের মেয়ে রেবতী দেবীকে। এঁদের অনেক পুত্রের মধ্যে তিনজন কীর্তিমান—সনাতন, রূপ আর অনুপম।

সনাতনের পিতৃদত্ত নাম অমর, রূপের সন্তোষ আর অনুপমের বল্লভ। অনুপমের পুত্রই শ্রীজীব।

কুমারদেবের পরকাল হলে তিন ভাই মাতুলালয়ে মানুষ হতে লাগল। বহু বিদ্যায় অলঙ্কৃত হয়ে উঠল। গৌড়ের রাজা হুসেন শার কানে উঠল এদের গুণ-গরিমার কথা। কোতোয়াল কেশব ছত্রীকে পাঠিয়ে দিল মাধাইপুরে, দু ভাইকে নিয়ে এস। এত যাদের বিদ্যা ও ভক্তির কথা শুনি তাদের একবার দেখি।

রাজার নিমন্ত্রণ, অগ্রাহ্য করা গেল না। দু ভাই পালকিতে করে রাজসকাশে চলে এল রামকেলিতে। রাজা দেখল রূপে গুণে বিদ্যায় আরাধনায় দু ভাই-ই অত্যুজ্জ্বল। খুশি হয়ে দু ভাইকেই রাজকর্মে নিযুক্ত করতে চাইল। রাজাজ্ঞা না মানলে অসুবিধে হতে পারে ভেবে দু ভাই-ই রাজি হল। সনাতন হল প্রধান সচিব আর রূপ হল খাস মুন্সি। রাজপদবী যথাক্রমে সাকর মল্লিক আর দবির খাস।

রাজকার্যে অধিষ্ঠিত হয়েও শাস্ত্রচর্চা থেকে এদের বিরতি নেই। নবদ্বীপ থেকে তো বটেই সুদূর কর্ণাট থেকেও পণ্ডিতেরা আসে আলোচনা করতে। কিন্তু শুধু শাস্ত্রে শুধু বিদ্যায় শান্তি পেত না। তারা যে লোকমুখে শুনেছে গৌরাঙ্গের কথা। তাঁকে দেখবার জন্যে, তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে যে মন-প্রাণ অস্থির হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই রাজকার্য থেকে মুক্তি পাব কী করে?

নীলাচলে প্রভুর কাছে দু ভাই চিঠি লিখে পাঠাল—আমাদের এ দুরবস্থায় উপায় কী?

উত্তরে প্রভু দু ভাইকে আশ্বাস দিলেন। লিখলেন : পরপুরুষে আসক্তা রমণী যেমন গৃহকর্মে ব্যস্ত থেকেও সর্বদা অন্তরে তার কান্তকে স্মরণ করে নব-নব সঙ্গরস আস্বাদন করে তেমনি ভক্তজন বাইরে বিষয়ীর মত লোকব্যবহার করেও অনুক্ষণ তার ইষ্টবস্তু শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গস্মৃতিতে সংলগ্ন থাকে।

অর্থাৎ রাজকর্ম যা করছ তা করো কিন্তু মনটিকে সর্বক্ষণ ভগবৎচরণে রেখে রাখো।

প্রভু যখন রামকেলিতে এসে পৌঁছুলেন, লোকসংঘট্টে ভীষণ কোলাহল উঠল। হুসেন শার ভয় হল, দেশে বিদ্রোহ-বিপ্লব দেখা দিল নাকি? কেশব ছত্রীকে পাঠাল খোঁজ নিতে। এত লোকজন কেন? কেন এত কোলাহল?

কেশব ছত্রী ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দিতে চাইল। বললে, এক ভিখিরি সন্ন্যাসী তীর্থ পর্যটনে বেরিয়েছে। তাকে দেখতে দু-চারজন অলস কৌতূহলী একত্র হয়েছে মাত্র। তাকে নিয়ে মাথা ঘামাবার কিছু নেই। তাকে হিংসা করারও মানে হয় না।

হুসেন শা তার দবির খাস ও সাকর মল্লিকের কাছে সন্ধান নিতে গেল।

তারা বললে, যিনি আপনাকে রাজ্য দিয়েছেন, যাঁর মঙ্গলেচ্ছায় আপনার সমস্ত কার্যসিদ্ধি হচ্ছে, আপনি সর্বত্র জয়ী হচ্ছেন, সেই ঈশ্বরই এই সন্ন্যাসী। আপনার সৌভাগ্য আপনার রাজ্যে প্রকাশিত হয়েছেন।

সত্যি? নবাব বিস্ময়াবিষ্ট হল।

আমাদের জিজ্ঞেস করছেন কেন? নিজের অন্তরকে জিজ্ঞেস করুন। আপনার যেমন অনুভব তেমনি প্রমাণ।

হুসেন শা ক্রুদ্ধ না হয়ে বিনত হল। বললে, কেন কে জানে আমার প্রাণও তাই বলছে। বলে চিন্তাকুল মনে অন্তঃপুরে চলে গেল।

নবাবের কী মতলব কে জানে। মৌখিক সৌজন্য দেখাচ্ছে, হয়তো অন্তরে ক্রূরতা। চলো দু ভাই গিয়ে সন্ন্যাসীকে সতর্ক করে আসি। দর্শন যেখানে সহজ সেখানে সুযোগ ছাড়ে কে?

সাকর মল্লিক আর দবির খাস পোশাক বদলাল। অর্ধরাতে দুভাই চলল প্রভু দর্শনে।

দন্তে তৃণ ধরে গলবস্ত্র হয়ে দু ভাই প্রভুর চরণে লুটিয়ে পড়ল।

প্রভু মঙ্গলনেত্রে তাকালেন। বললেন, ওঠো, দৈন্য সংবরণ করো।

আমরা নীচ সঙ্গী, নীচ কাজ করছি। আমাদের মত পতিতাধম জগতে আর কেউ নেই। আমাদের দোষ মার্জনা করো এমন প্রার্থনা করতেও আমাদের লজ্জা হচ্ছে। কাতর কণ্ঠে বললে দু ভাইঃ জগাই-মাধাইয়ের উদ্ধার তো সহজ ছিল। তারা জাতিতে ব্রাহ্মণ, থাকে নবদ্বীপে, তারা নীচের দাসত্ব করেনি। তাদের একমাত্র দোষ পাপাচার। শুধু তোমার নিন্দা করতে গিয়ে তোমার নাম করে তারা লাভবান হয়েছে। শুধু নামে কী, নামাভাসেও পাপ চলে যায়। কিন্তু আমরা? আমাদের সঙ্গম-সাহচর্য গো-ব্রাহ্মণদ্রোহীদের সঙ্গে। আমাদের কী উপায় হবে? তুমি ছাড়া আমাদের আর কেউ নেই। আমাদের উদ্ধার করে তুমি তোমার বল দেখাও। তোমার পতিত-পাবন নাম সার্থক করো।

প্রভু বললেন, তোমাদের দৈন্যে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। কিন্তু তোমাদের ভয় কী। তোমরা রাজকার্যে লিপ্ত থেকেও মন সর্বদা ভগবানে ফেলে রেখেছ। ভগবানে নিরবচ্ছিন্ন নিবিষ্টতাই তোমাদের সংসারাসক্তি কাটিয়ে দেবে। আর কিছুর জন্যে নয়, তোমাদের দুজনকে দেখতেই আমি রামকেলিতে এসেছি। ভয় নেই, শিগগিরই তোমাদের সংসারবন্ধন ঘুচে যাবে। কৃষ্ণ কৃপা করবেন। আজ থেকে তোমাদের নাম হল সনাতন আর রূপ।

তবে আমাদের আর পায় কে। দু ভাই আশ্বস্ত হল।

প্রভু, আপনি এ অঞ্চলে বেশি দিন থাকবেন গৌরহরিকে লক্ষ্য করে সনাতন বললে, না। বিধর্মী রাজার কখন কী মতিগতি হয় কিছু ঠিক নেই। তাছাড়া তীর্থযাত্রায় এত লোক কি ভালো?

ঠিক বলেছে সনাতন। এত লোক সঙ্গে থাকলে তীর্থ দর্শনে শান্তি হবে না, রস-ভঙ্গ হবে। কানাইয়ের নাটশালা পর্যন্ত গিয়ে প্রভু ফিরে চললেন নীলাচলে।

দুই ভাই, সনাতন আর রূপ, বিষয়-ত্যাগের উপায় ভাবতে বসল।

প্রথমেই কৃষ্ণমন্ত্রের পুরশ্চরণ করল যাতে নির্বিঘ্নে অচিরে চৈতন্য-চরণ পেতে পারে। মন্ত্রের সিদ্ধিলাভের জন্যে যে প্রাথমিক অনুষ্ঠান যে তাকে পুরশ্চরণ বলে। কৃষ্ণমন্ত্রের পুরশ্চরণ করল যেহেতু গৌরহরি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ।

রূপ ছুটি নিয়ে পালাল। কিন্তু সনাতন কী করবে? সে অসুখের ছল করে বাড়িতে বসে রইল। সে প্রধান মন্ত্রী. সে জানে ছুটি চাইলে নবাব তার দরখাস্ত মঞ্জুর করবে না, বরং ক্রুদ্ধ হবে। সরাসরি কাজে ইস্তফা দিলে কারাদণ্ড সুনিশ্চয়। কিন্তু চাকরিই বা করে কী করে? বিষয়ব্যাপারে আর বিন্দুমাত্র স্পৃহা নেই। তাই ভাবল অসুস্থ হয়ে সরে থাকাই উপায়।

কী এমন অসুখ, নবাব রাজবৈদ্যকে বললে, যাও, দেখে এস। রাজবৈদ্য এসে বললে, অসুখ ভান মাত্র। সনাতন ভালো আছে বাড়িতে বসে শাস্ত্রচর্চা করছে।

নবাব আচম্বিতে সনাতনের বাড়িতে এসে হাজির হল। নিজের চোখে দেখল সনাতন ভট্টাচার্যদের নিয়ে ভাগবত-বিচার করছে।

তার মানে? নবাব রুষ্ট হয়ে বললে, দিব্যি ভালো আছ অথচ রাজকাজ করছ না?

সনাতন শান্তস্বরে বললে, আমার আর কাজ-কর্মে রুচি নেই, আপনি অন্য লোক বহাল করুন।

সজ্ঞানে রাজকার্যে অবহেলা। নবাব আদেশ দিল, একে কারাগারে নিক্ষেপ করো।

কারাগারে বন্দী হল সনাতন।

কদিন পরেই উড়িষ্যার সঙ্গে নবাবের যুদ্ধ বাধল। নবাব নিজে চলল সৈন্য নিয়ে। সনাতনকে বললে, তুমিও আমার সঙ্গে চলো।

সনাতন বললে, মার্জনা করুন। আপনি যদি দেবস্থান কলুষিত করেন তা আমার সহ্য হবে না।

বটে? নবাব বললে, কারাগারে একে হাতকড়া পরিয়ে বেঁধে রাখো।

রূপ সনাতনকে চিঠি লিখে পাঠালঃ আমি আর অনুপম বৃন্দাবনে যাচ্ছি প্রভুর চরণবন্দনা করতে। তুমি যেমন করে পারো চলে এস। রামকেলিতে মুদির কাছে দশ হাজার মুদ্রা রেখে এসেছি, তাই মুক্তিপণ দিয়ে কারাগার থেকে বেরিয়ে এস।

সনাতন কারারক্ষীকে চাটুবাক্যে তুষ্ট করতে চাইল। বললে, তুমি একজন জীবন্ত পীর, সিদ্ধ মহাপুরুষ। কেতাবে-কোরানে তোমার অগাধ জ্ঞান। এত বড় ভাগ্যবান কজন আছে?

রাজমন্ত্রী প্রশংসা করছে, প্রহরীর চিত্ত আলোড়িত হল।

যদি কারাগার থেকে কাতর কোনো বন্দীকে মুক্ত করে দাও তবে ভগবানও তোমাকে সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত করে দেবেন।

বলুন কী করতে হবে।

মনে আছে আগে আগে তোমার অনেক উপকার করেছি, তুমি এবার তার কিঞ্চিৎ শোধ দাও। আমাকে ছেড়ে দাও, খালাস দিয়ে দাও। শোনো, তোমাকে পাঁচ হাজার মুদ্রা দেব—একসঙ্গে তোমার পুণ্য আর অর্থ দুই-ই লাভ হবে।

কিন্তু বাদশাকে বড় ভয়।

বাদশা যুদ্ধে গিয়েছে, কে জানে হয়তো আর ফিরবে না। আর যদি ফেরে, বলবে সাকর মল্লিক প্রাতঃকৃত্য করতে গঙ্গাতীরে গেল আর অতর্কিতে ঝাঁপ দিল নদীতে। অনেক খুঁজলাম, সন্ধান পেলাম না। হাতে বেড়ি ছিল, সাঁতার দিতে পারেনি, জলের অতলেই ডুবে মরেছে। আমি মরে গেছি ভেবে বাদশা আর তোমাকে শাস্তি দেবে না। শোনো, তোমার কোনো ভয় নেই, আমি এ রাজ্য ছেড়ে দরবেশ হয়ে সোজা মক্কায় চলে যাব।

তাতেও প্রহরীর মন উঠল না।

বেশ, সাত হাজার দিচ্ছি। বললে সনাতন, বণিকের দোকানে টাকা গচ্ছিত আছে। তুমি আমাকে তার কাছে নিয়ে চলো। আগে টাকা গুনবে পরে আমাকে ছাড়বে।

রাশীভূত টাকা। প্রহরীর মন টলল।

সনাতনকে ছেড়ে দিল। হাতের বেড়ি কেটে দিল। রাতারাতি গঙ্গা পার হয়ে গেল সনাতন।

এ সংসারে চৈতন্যচরণই সত্য। সে চরণপ্রাপ্তির যা কিছু প্রতিবন্ধ, সব [illegible],

উপায় হোক, ছলে বলে কৌশলে, তাকে অতিক্রম করাই মানুষের একমাত্র সত্যধর্ম।

সঙ্গে চাকর ঈশান, নিরিবিলি পথ নিল সনাতন। পাতড়া-পর্বতে এসে থামল। সেখানকার ভুঁইয়াকে বললে, আমাদের পার করে দিন।

গুনতে জানত ভুঁইয়া। গুনে দেখল এদের সঙ্গে আটটা মোহর আছে। খুশি হয়ে বললে, স্নান করে খাওয়া-দাওয়া করো, রাত্রে লোক দিয়ে পার করে দেব।

স্নানাহার সারল দুজনে। কিন্তু তাদের প্রতি এত যত্ন-আদর কেন, সনাতনের সন্দেহ হল। আমাকে তো ওর চেনবার কথা নয়, নিতান্ত দরিদ্রবেশ পরে আছি, তবে কেন এত আপ্যায়ন? এ আবার কোনো বিপদের ছদ্মবেশ নয় তো?

ঈশানকে জিজ্ঞেস করল, তোমার কাছে কি কোনো লোভনীয় জিনিস আছে?

ঈশান বললে, সাতটা মোহর আছে।

এই কাল-যম সঙ্গে এনেছ কেন? দাও আমাকে দাও।

সেই মোহর নিয়ে সনাতন ভুঁইয়ার কাছে গেল। বললে, এই সাতটা মোহর সঙ্গে ছিল, তাই আপনাকে সম্মানমূল্য দিচ্ছি। আমাদের পার করে দিন। আপনার পুণ্য হবে।

সাত নয়, আটটা মোহর আছে। ভুঁইয়া বললে, তা যাক গে। আজ রাত্রে তোমাদের খুন করে মোহর সংগ্রহ করব—এই রকম সংকল্প ছিল। তার দরকার হল না। তুমি নিজের থেকেই দান করতে এসেছ। আমাকে নরহত্যার পাপ থেকে বাঁচিয়ে দিলে। শোনো, এই মোহর আমি নেব না, পাপের চেয়ে পুণ্যেই আমার এখন লোভ হচ্ছে। আমি লোক দিচ্ছি, তোমাদের নির্বিঘ্নে পার করে দেবে।

মোহর কিছুতেই সনাতন ফিরিয়ে নেবে না। বললে, এ শত্রু সঙ্গে থাকলে দস্যুর হাতে আমি মারা যাব। এ মোহর আপনি গ্রহণ করে আমার প্রাণরক্ষা করুন।

অগত্যা ভুঁইয়া নিল সেই সাত মোহর। সনাতনের জন্যে চারজন দেহরক্ষী নিযুক্ত হল। এরা বনপথে নিয়ে যাবে।

পর্বত পার হয়ে এসে সনাতন ঈশানকে জিজ্ঞেস করলে, তোমার কাছে আর কিছু আছে?

ঈশান বললে, শেষ সম্বল আরেকটি মোহর আছে।

ওটি তুমি নাও। ওটি নিয়ে দেশে ফিরে যাও।

ঈশান কাঁদতে লাগল।

সজল চোখে সনাতন বললে, আমি কাঙাল হয়ে একা-একা যাব। আমি নিঃসঙ্গ, আমি অকিঞ্চন।

হাতে করঙ্গ গায়ে ছিন্ন কাঁথা, নির্ভয়ে চলতে লাগল সনাতন। নির্ভয়, যেহেতু কৃষ্ণেই আমার আত্মসমর্পণ, কৃষ্ণকেই আমি রক্ষাকর্তারূপে বরণ করে নিয়েছি।

হাজিপুরে এসে পৌঁছুল সনাতন। সেখানে থাকে তার ভগ্নীপতি শ্রীকান্ত, বাদশা হুসেন শার ঘোড়া জোগানের কাজ করে। তার সঙ্গে দেখা হল। বললে, গৌরাঙ্গ পাবার আশায় কারাগার থেকে পালিয়ে এসেছি।

কিন্তু এ তোমার কী পোশাক! চলো আমার ঘরে, কদিন বিশ্রাম করো। দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে মুখখানি ভদ্র করো। শ্রীকান্ত পীড়াপীড়ি করতে লাগল।

সনাতন বললে, আমি এখানে এক মুহূর্তও থাকব না, আমি কাশী যাব। দয়া করে আমাকে গঙ্গা পার করে দাও।

শ্রীকান্ত দেখল এ আরেক রকম সনাতন। বেশে-বাসে ভদ্রে-সভ্যে স্পৃহা নেই। ঈশ্বরভাবনাই তার একমাত্র আচ্ছাদন। ঈশ্বরচিন্তনই তার একমাত্র আহার। ঈশ্বরনির্ভরই তার একমাত্র আনন্দ।

শ্রীকান্ত সনাতনকে গঙ্গা পার করিয়ে দিল। শীতত্রাণ ভোটকম্বল দিল একখানা।

হাটিতে-হাটিতে সনাতন কাশী চলে এল। শুনল প্রভু এখানেই আছেন, উঠেছেন চন্দ্রশেখরের বাড়িতে।

সেই বাড়ির দরজায় এসে বসল সনাতন। অন্তর্যামী প্রভু বললেন, দেখ তো একজন বৈষ্ণব দ্বারে এসে বসেছে। তাকে ভিতরে ডেকে নিয়ে এস।

সনাতনের অঙ্গে কোনো বৈষ্ণববেশ বা চিহ্ন নেই, তাকে তাই চন্দ্রশেখর চিনতে পারল না। প্রভুকে বললে, দ্বারে কোনো বৈষ্ণব নেই, একজন দরবেশ বসে আছে।

তাকেই ডেকে আনো।

সনাতন অঙ্গনে এসে দাঁড়াতেই প্রভু দ্রুত এগিয়ে এসে তাকে আলিঙ্গন করলেন।

আমাকে ছুঁয়ো না। সনাতন কেঁদে উঠল: আমি পতিত, আমি অধম, আমি তোমার স্পর্শের অযোগ্য।

প্রভু বললেন, নিজে পবিত্র হবার জন্যে তোমাকে স্পর্শ করছি। ভক্তিবলে তুমি সমস্ত বিশ্ব পবিত্র করতে পারো। ভক্তি যার নেই, সে পরকে দূরের কথা, নিজেকেও পবিত্র করতে পারে না। তাই তোমাকে দেখতে দাও, ছুঁতে দাও, গাইতে দাও তোমার গুণগান। তোমার দর্শনই চক্ষুর ফল, ভক্তগাত্রসঙ্গই দেহের ফল, ভক্তের গুণকীর্তনই জিহ্বার ফল। জগতে ভক্তই সুদুর্লভ। আর ভয় নেই, কৃষ্ণই তোমাকে উদ্ধার করলেন।

আমি কৃষ্ণ জানি না, আমি শুধু তোমাকে জানি। বললে সনাতন, তুমিই আমাকে কারাগার থেকে মুক্ত করে এনেছ।

প্রভু চন্দ্রশেখরকে আদেশ দিলেন ক্ষৌর-কর্ম করিয়ে একে ভদ্র বানিয়ে দাও।

ভদ্র হয়ে সনাতন গঙ্গাস্নান করল। চন্দ্রশেখর নতুন বস্ত্র দিল। তা নিল না সনাতন। বললে, নতুনে আমার রুচি নেই, একখানা পরিহিত পুরোনো বস্ত্র দাও।

তাই দিল তপন মিশ্র। পুরোনো ধুতি ছিঁড়ে বহির্বাস ও ডোর কৌপীন করে পরল সনাতন।

তপন তার বাড়িতে সনাতনকে প্রভুর পাত্রশেষ নিবেদন করল।

মহারাষ্ট্রী বিপ্র বললে, আপনি যতদিন কাশীতে থাকবেন, আমার বাড়িতে প্রত্যহ ভিক্ষে করবেন।

সনাতন বললে, না, আমি মাধুকরী করব, এক ঘরে রোজ-রোজ ভিক্ষে নেব না।

সনাতনের মুক্তবৈরাগ্য দেখে প্রভুর আনন্দ হল। কিন্তু তিনি বারে বারে সনাতনের কম্বলের দিকে তাকাচ্ছেন কেন? বোধহয় তাঁর পছন্দ হচ্ছে না। যে মাধুকরী করে খাবে তার গায়ে দামী কম্বল মানায় না।

গঙ্গায় স্নান করতে গিয়েছে সনাতন, দেখল কে একখানা কাঁথা ধুয়ে শুকোতে দিয়েছে। তাকে বললে, ভাই, তুমি আমার কম্বলখানা নিয়ে তোমার ঐ ছেঁড়া কাঁথা-খানা আমাকে দাও।

কাঁথার বদলে কম্বল! লোকটা তক্ষুনি রাজি হয়ে গেল।

কাঁথা গায়ে দিয়ে সনাতন প্রভুর কাছে এসে দাঁড়াল। প্রভু খুশি হয়ে বললেন, কৃষ্ণ তোমার বিষয়ভোগ খণ্ডে দিয়েছেন। সংবৈদ্য রোগের অবশেষও রাখে না।

সনাতন শিক্ষার্থীর ভঙ্গিতে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল। বললে, এতদিন গ্রাম্য ব্যবহারে বিষয়ব্যাপারে দিন কাটালাম, আমাকে যদি উদ্ধার করলেন, তবে এবার আমার কর্তব্য কী বলে দিন। আমার তিনটি প্রশ্ন—আমি কে, তাপত্রয় আমাকে কেন জীর্ণ করছে আর কিসে আমার মঙ্গল?

এই তিন সনাতন প্রশ্নের উত্তর দিলেন গৌরহরি।

(ক্রমশ)

কথার ভিড়

মনের কোণে হাজারো ভাবনার জমায়েত কোনটাকে ফেলে কোনটার কথা শুনি ঠিক করে উঠতে পারছি না। সকলেই গুরুত্বের দিক থেকে সমান ওজনের, একটু উনিশ-বিশ এই আর কি। সবাই যে যার কথা বলে যাচ্ছে। প্রচণ্ড গোলমালে কোন কিছুই স্পষ্ট শ্রুতিগোচর হচ্ছে না। যত বলি আস্তে ধীরে। গোলমাল ততই বেড়ে চলে। যেন ঘোড়ায় জিন দিয়ে এসেছে। মাঝে মাঝে ওদের নিজেদের মধ্যেই বাদ-বিতণ্ডা শুরু হয়ে যাচ্ছে। ক্রমান্বয়ে ঠেলা ধাক্কায় তা চরমে উঠছে। কানপাতা দায় হয়ে পড়ছে। একবার মনে ওদের যেমন আসতে দিয়েছি তেমনি ঠেলে সরিয়ে দিই—তারপর একেবারে নিস্পৃহ নির্বিকার হয়ে বসি। কিন্তু কাজটা খুবই কঠিন, চেষ্টা করে অন্তত তাই মনে হলো। আমার কথায় ওদের ঘেয়াল নেই। বুঝলাম আস্তানা যখন গেড়েছে তখন আর সহজে হটছে না। আর এক ঝামেলা হৈ-হল্লায় ওদের কথাও কিছু বুঝছি না। শেষ চেষ্টা হিসাবে একবার কান পাতলাম, মনে হলো সব কিছু ছাপিয়ে একটা স্বর বেশ সোচ্চার হয়ে উঠছে এবং সবাই তাতে গলা মেলাচ্ছে। আমি ভাল করে শোনার চেষ্টা করলাম এবং সম্পূর্ণরূপে সফলও হলাম। বিভিন্ন সমস্যার মধ্যেও সবাই এক জায়গায় একমত। এই ঐক্যতান স্বাভাবিকভাবেই আমাকে আকৃষ্ট করবে এবং করলোও তাই।

সমস্যা অনেক আছে এবং তার সমাধানের চেষ্টারও অন্ত নেই। কিন্তু সমস্যার তীব্রতা তাতে হ্রাস না পেয়ে আরো বিপুল বিক্রমে আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। জীবন সংগ্রামে সর্বদা সতর্ক পদক্ষেপের জন্য হয়তো এই তীব্রতা বৃদ্ধি। তাতে সংগ্রামী জীবনের স্বাদটুকু বজায় থাকে সত্যি কথা কিন্তু জীবনের ফাঁদে পড়ে যে নাকানি-চোবানি খেতে হয় তার যে এরকম সার্বজনীন কি প্রয়োজন থাকতে পারে তা বোঝা যায় না। আরো বোঝা যায় না সমস্যা সমাধানে বহুবারম্ভে লঘুক্রিয়ার কারণগুলি। শিক্ষাক্ষেত্রের কথা দিয়ে শুরু করলে সমস্ত জিনিসটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর ব্যাপারে অনেকেই আজ হালে পানি পাচ্ছেন না। গুটিকয় ভাগ্যবান ছাড়া আর সবাই এই অবশ্যম্ভাবী সমস্যার শিকার হচ্ছেন। অনেক ঢাক-ঢোল পিটিয়ে স্ত্রী-শিক্ষার কথা প্রচার করা হচ্ছে—অগ্রগতিও অনেক হয়েছে। অবশ্যই ঢক্কানিনাদের তুলনায় এর ব্যাপকতা বৃহৎকে স্পর্শ করতে পারছে না। স্ত্রীশিক্ষার অনেক প্রসার হয়েছে। স্কুল-কলেজ সবই বেড়েছে। কিন্তু উচ্চশিক্ষার আকাঙ্ক্ষায় এখনও অনেককে জলাঞ্জলি দিতে হচ্ছে। কলেজ প্রয়োজনের তুলনায় কম এবং সীট কম—এতো সর্বজন-বিদিত সত্য। কলেজ অবশ্য অনেক এগিয়ে আসা হলো স্কুল দিয়ে শুরু করা উচিত ছিল। সে যাকগে, অনেকেই শহরে থেকে পড়াশোনা করতে চায়, বিশেষ করে কলকাতায়। সেরকম যথেষ্ট ব্যবস্থা আজো করা সম্ভব হয়নি। বৃত্তিকরী শিক্ষার প্রশ্নটা আগেই আসা উচিত ছিল। এই প্রসঙ্গেও নৈরাশ্যজনক চিত্র ছাড়া উপহার দেবার মত আর কিছু সম্বল নেই। বৃত্তিকরী শিক্ষার আজকাল অনেকেই আগ্রহী কিন্তু সুযোগের অভাবে সাধ চরিতার্থ করতে পারছে না। দীর্ঘদিন ধরেই এ সম্পর্কে বিরাট পরিকল্পনার কথা শুনে আসছি। শহরে থেকে মেয়েদের পড়াশোনার সুব্যবস্থার জন্যও নাকি বিরাট অঙ্কের অর্থ বরাদ্দ করা আছে কিন্তু কাগজ-কলম পেরিয়ে বাস্তবে তা রূপলাভ করছে না। তাই হতাশার একটা চাপা বেদনা অনেকেই মনে মনে পোষণ করে চলেছেন দীর্ঘদিন। সবাই আর সমস্যা না বাড়িয়ে এর সুষ্ঠু সমাধান চাইছে। সমাধানের পথ খুঁজতে গিয়ে ঢক্কানিনাদের কোন জরুরী আবশ্যকতা নেই।

ওদের কথা শেষ হলো। সমস্ত জিনিসটা আরেকবার ভেবে দেখলাম। সব শেষে আবিষ্কার করলাম, আরে এটা তো আমারও সমস্যা।

সব ঠাঁই মোর ঘর আছে

'সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া'—'অল বেঙ্গল উওমেন্স ইউনিয়নের' আশ্রমবাসিনীদের সম্পর্কে আর একথা বলা যাবে না কারণ সেই 'ঘর' তারা খুঁজে পেয়েছে কলকাতার ৮৯, এলিয়ট রোডে।

১৯৩২ সালে, দমদমের কাছে অল্প ক'জন সদস্য নিয়ে অত্যন্ত সীমিত ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে এই সংস্থাটির সূচনা হয়। সেই থেকে, এর সদস্যোরা ও তাদের পরিচালিত দুটি 'গৃহের' বাসিন্দারা দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়েছে তাদের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে। জনসেবা নিরাপত্তা, শিক্ষের উৎকর্ষ—তাদের এইসব আদর্শগুলি তারা সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছে। এজন্য প্রতিষ্ঠান-কর্ণধার শ্রীমতী রমলা সিংহের কৃতিত্ব অনেকখানি।

আজ দেশের জনসাধারণের মনে এঁরা নিজেদের জন্য এক পরম শ্রদ্ধার আসন করে নিয়েছেন, কারণ দেশের আশ্রয়হীন, অবাঞ্ছিত মানুষের এঁরা আজ একান্ত আপনার জন। এঁদের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে নারী এবং অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের সবরকম বিপজ্জনক কার্যকলাপ, লাঞ্ছনা ও অত্যাচার থেকে উদ্ধার করে সহজ ও স্বাভাবিকভাবে উপযুক্ত করে দেওয়া। যে নিঃসম্বল, গৃহহীন, সে যতদিন না নিজের পায়ে দাঁড়াবার যোগ্যতা অর্জন করেছে, ততদিন পর্যন্ত স্বচ্ছন্দে হোমে থাকতে পারে।

অবশ্য, সাধারণভাবে এরা কোন অসহায় মানুষকে ঠিক রাস্তা থেকে কুড়িয়ে আনে না। যিনি থাকবেন তিনি বা তার কোনও অভিভাবক বা বন্ধু যদি বত্রিশ টাকা মাসোহারার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ইউনিয়নের কাছে আবেদন জানান, অথবা সোস্যাল ওয়েলফেয়ার বোর্ড, রিফুজী রিহ্যাবিলিটেশন ডিপার্টমেন্ট প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান যদি কারও জন্য আবেদন করে এবং তার জন্য নির্ধারিত টাকা দিতে রাজী থাকে, তবেই তাকে নেওয়া হয়।

১৯৫৬ সালে, মেয়েদের নিয়ে, সমগ্র দেশব্যাপী, দুর্নীতিমূলক দেহ-ব্যবসার বিরুদ্ধে যে আইনজারী করা হয়েছিল সেটিকে কার্যে পরিণত করা এঁদের কর্মসূচীর আরেকটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই কাজের ব্যাপারে, রাজ্য সরকার এবং অন্যান্য সমপর্যায়ের অনুমোদিত সংস্থাগুলির সঙ্গে এঁরা সংযোগ স্থাপনা করে চলেন। উদ্ধার-প্রাপ্ত মেয়েদের সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠা, আর্থিক নিরাপত্তা এবং নির্ভরে ভবিষ্যৎ জীবনধারণের পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হয়।

যার যেরকম যোগ্যতা তাকে সেইরকম শিক্ষা দেওয়া হয়, যাতে তার জীবিকা

অঙ্গনা

প্রমীলা

নির্বাহের পথ সুগম হয় ও জীবনধারা সুষ্ঠুভাবে অতিবাহিত হতে পারে। জাতি, ধর্ম, বয়সনির্বিশেষে, সমগ্র দেশের মেয়েদের এইভাবে একটা গঠনমূলক ভিত্তিতে সঙ্ঘবদ্ধ করে, ইউনিয়ন তার আদর্শের পথে এগিয়ে চলেছে।

আশ্রয়হীন শিশুদের জন্য রয়েছে আরেকটি আলাদা 'হোম', যেখানে জন্ম থেকে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত এদের প্রতিপালন ও নানাবিধ শিক্ষা দেওয়া হয়। এই 'হোমে'র একটি নার্সারী আছে যেখানে আড়াই থেকে পাঁচ বছর বয়স অবধি শিশুদের রাখা হয়। খুব ছোট শিশু অবশ্য ঐ বয়সের পূর্ব পর্যন্ত মায়ের সঙ্গে মেয়েদের হোমেও থাকতে পারে। ছ বছর বয়সের পর ছেলেমেয়েদের আলাদা হোমে স্থানান্তরিত করা হয়। এছাড়া স্বাস্থ্য-রক্ষারও সুবন্দোবস্ত আছে।

এই 'ইউনিয়ন' চারটি বড় বড় সমাজ উন্নয়নকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নানা যোগসূত্রে আবদ্ধ। একটি হচ্ছে জেনিভার International Abolitionist Federation নামক একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা। অন্য তিনটি হচ্ছে নয়াদিল্লীর নৈতিক ও সামাজিক [illegible] কোলকাতার

মহিলা সভা' এবং 'পশ্চিমবঙ্গ সংযোগ স্থাপনকারী সংসদ'।

ইউনিয়নের নিজস্ব একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে, যেখানে দুটি আশ্রমের সে কেউ প্রাথমিক শিক্ষালাভ করতে পারেন। এইসঙ্গে একটি কিন্ডারগার্টেনও আছে।

বিভিন্ন সমিতিগুলি আবার ভাগ হয়ে গিয়ে কতকগুলি ছোট ছোট সমিতি গঠিত হয়েছে, যথা আইন বিধান সমিতি, প্রচারক সমিতি শিক্ষামূলক সমিতি, পরিবার উপদেষ্টা সমিতি, ক্রয়বর্ধন সমিতি, ক্রীড়া সমিতি, অর্থসংগ্রহকারী সমিতি, শিল্প-নির্দেশক সমিতি ইত্যাদি।

এদের মধ্যে অর্থসংগ্রহকারী সমিতির গুরুত্ব খুব বেশী কারণ হোমগুলির পরিচালনায় কোন আর্থিক সমস্যা দেখা দিলে তখন ইউনিয়নকেই সেটা সমাধানের উপায় উদ্ভাবন করতে হয়।

'আইন সমিতি'র কাজ হচ্ছে দেহ-ব্যবসার বিরুদ্ধে যে আইন আছে সেটি বলবৎ করা। 'প্রচার সমিতি' এই আইনের প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি ও সহানুভূতি আকর্ষণ করে। এই প্রচারকার্যের জন্য বেতার-ভাষণ, বিভিন্ন পত্রিকা ও খবরের কাগজে প্রবন্ধ রচনার দায়িত্বও এদের উপর রয়েছে।

ছাত্রীদের যৌন-বিষয়ক শিক্ষা দেবার জন্য বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষদের ও একজন সরকারী প্রতিনিধিকে নিয়ে একটি 'ছাত্রী উপদেষ্টা' সমিতিও রয়েছে।

"শিক্ষা সমিতি'র কাজ হল 'হোমের' বিভিন্ন শিক্ষকদের জন্য বক্তৃতা প্রভৃতির আয়োজন করা। ছাত্রীদের জন্য বিশিষ্ট লোকদের ভাষণ, সরকারের ও বিভিন্ন দূতাবাসের প্রচার বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত শিক্ষামূলক ডকুমেন্টারী ফিল্ম প্রদর্শন—এসবের ব্যবস্থাও এরাই করে। প্রত্যেক মাসে 'চা চক্র' নামক একটি অনুষ্ঠানে এরা বাইরে থেকে আগত অভ্যাগতদের সঙ্গে 'হোমে'র মেয়েদের মিশবার সুযোগ দেয়।

'ক্রয় সমিতি'র পরিচালিত বিক্রয়কেন্দ্রে 'হোমে'র বিভিন্ন শিল্পবিভাগগুলি তাদের হাতে তৈরী জিনিস বিক্রী করে অর্থ ও বাইরের জগতের স্বীকৃতি—দুই-ই লাভ করে।

মেয়েদের নিজেদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি 'বিধান সভা'ও রয়েছে, যেখানে শাসন সম্বন্ধে মূল কথাগুলি তারা খুব সহজেই রপ্ত করে নিতে পারে। তাদের লব্ধ শিক্ষা দিয়ে তারা 'হোমের' অধ্যক্ষদের শাসনব্যবস্থায় সাহায্য করে। এইভাবে তাদের শিক্ষা ব্যবহারিক জ্ঞানে পরিণত হয়, তাদের দায়িত্বজ্ঞান সুদৃঢ় হয়, এবং আশ্রমের অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থাও অনেক বেশী স্বাচ্ছন্দের সঙ্গে চলতে পারে।

'দীপ শিখা' নামে একটি বাৎসরিক পত্রিকায় মেয়েদের লিখিত প্রবন্ধ এবং অন্যান্য রচনা নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়।

'উপদেষ্টা সমিতি' মানসিক রোগে বা মানসিক বিশৃঙ্খলায় পীড়িত মেয়েদের নিরাময় করে তোলার সব ব্যবস্থা করে। এইরকম মেয়ের সংখ্যা এখানে কম নয়, কারণ যেসব পরিবেশ থেকে এদের উদ্ধার করে আনা হয়, তা প্রায়ই তাদের মানসিক শান্তির পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিজনক। এইসব মেয়েদের জন্য একটি বিশেষ ক্লাসও খোলা হয়েছে। এসব ব্যাপারে সাহায্য করেন দু'জন সমাজসেবক, আশ্রমবাসিনীদের বিবাহ, চাকরী ও হারানো সম্পর্ক পুনঃসংস্থাপনে এঁদের অবদান উল্লেখযোগ্য। 'নকল আত্মীয়' ব্যবস্থাও এদিক থেকে কিছুটা সহায়ক।

যেসব মেয়েরা হোমে রয়েছে, কোন না কোন বৃত্তি বা পেশার জন্য ব্যবহারিক শিক্ষা তাদের নিতেই হবে।

হোমের শিক্ষণীয় বিষয়সূচীর মধ্যে আছে : সেলাই ও দর্জির কাজের জন্য তিন বছরের ডিপ্লোমা কোর্স; এই শিক্ষা ছাত্রীকে লেডি ব্রাবোর্ন ডিপ্লোমা পরীক্ষার উপযোগী করে তোলে, তাঁত বস্ত্র বোনায় দুবছরের কোর্স, যার অন্তে সরকারের তাঁত বিদ্যালয়' থেকে পরীক্ষকেরা এসে এদের ছাড়পত্র দিয়ে যান, রান্না, ক্যান্টিন চালান, ও বাইরের অর্ডার অনুযায়ী খাবার সরবরাহ ইত্যাদিতে এক বছরের কোর্স। সেইসঙ্গে শাড়ি ছাপান এবং অন্যান্য টুকিটাকি কাজও শেখান হয়।

এছাড়া, টাইপ করা, নার্সিং, রেডিও নির্মাণ পদ্ধতি, ধাত্রীবিদ্যা এইসব শিখতে বহু মেয়েকে হোমের বাইরেও পাঠান হয়। 'হোমে'র প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপন করে যেসব ছেলেমেয়ে আরও পড়তে চায় তাদের বাইরের স্কুল কলেজে পড়তে পাঠান হয়।

নানা উপলক্ষে, 'হোমে'র বিভিন্ন শিল্প বিভাগগুলি হোমের প্রাঙ্গণে বা শহরের কতকগুলি বিশিষ্ট জায়গায়, বিক্রয়কেন্দ্রের আয়োজন করে। এইসব প্রদর্শনী ও বিক্রয়-কেন্দ্রে, তারা নিজেদের তৈরী জিনিস বিক্রী করে।

কয়েক বছর হল হোমের মেয়েদের তৈরী বেড কাভার, টি কোজী, পর্দা প্রভৃতি জিনিস সুদূর ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রেও পৌঁছে গেছে। তারা এইগুলির বৈশিষ্ট্য



দেখে মুগ্ধ হয়েছে এবং ব্যবহার করে সন্তোষ লাভ করেছে। আরও কয়েকটি দেশে এইগুলি রপ্তানির প্রচেষ্টা চলছে।

'হোমে'র উৎপাদন কেন্দ্রগুলির দুটি প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে হোমের নিজস্ব আয়ের পথ সুগম করা এবং যেসব 'হোম'বাসিনীরা শিক্ষাকেন্দ্রগুলি থেকে ট্রেনিং বা ছাড়পত্র নিয়ে বেরিয়েছে তাদের জন্য স্থায়ী উপার্জনের ব্যবস্থা করা। তাঁত শিল্পের বিভাগে যে ২৮টি মেয়ে বর্তমানে কাজ করছে, তাদের মাসিক আয় গড় ৮০্। এম্ব্রয়ডারী ও দর্জি বিভাগে যে কুড়িটি মেয়ে এখন কাজ করে, তাদের জনপ্রতি মাসিক আয় মাসে ৬০্। হোমের নিজস্ব ক্যান্টিনে যে মেয়েরা কাজ করছে, তাদের সংখ্যা ১৫। শহরের বিভিন্ন জায়গা থেকে সে খাবারের অর্ডার আসে তা সরবরাহ করে তাদের মাসিক আয় হয় জনপ্রতি ৭০্। গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে এদের নিজস্ব একটি বিক্রয় কেন্দ্র আছে। তাছাড়া হোমের একটি স্থায়ী 'হাতে তৈরী' জিনিসের বিক্রয়কেন্দ্র আছে। ১৯৬৫ সাল থেকে এই উৎপাদন বিভাগগুলি তাদের আয়তন ও কাজের পরিমাণ এতটা বাড়াতে সক্ষম হয়েছে যে 'হোমের' বাইরে থেকেও বেশ কিছু দুঃস্থ মহিলাকে এখানে চাকুরী দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

এছাড়া 'হোমে'র মেয়েরা তাদের অবসর সময়ে আরও নানাবিধ কার্যকলাপে নিজেদের ব্যস্ত রাখে। এর মধ্যে পূর্ব-পাকিস্থান-আগত উদ্বাস্তুদের সেবাকার্য এবং সাম্প্রতিক ভারত-পাকিস্থান সীমান্ত সংঘর্ষের সময়ও এদের উদ্যোগ প্রশংসনীয়।

মাঝে মাঝে হোম পরিদর্শনে আসেন বিশিষ্ট অভ্যাগতেরা—শুধু বাংলা ও ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকেই নয়, যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট রাশিয়া, পশ্চিম জার্মানী, অস্ট্রেলিয়া—এইসব দূর দিগন্ত থেকেও। এঁদের ঔৎসুক্য ও সহৃদয় ব্যবহার হোমবাসিনীদের আত্মপ্রত্যয় ও আত্মমর্যাদা অনেক বাড়িয়ে দেয়। এইসব দেখেশুনে মনে হয় যে শুধু দেশের ভিতরে নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ইউনিয়ন নিজের জন্য একটা বিশিষ্ট স্থান করে নিয়েছে।

ইউনিয়নকে সাহায্যের ব্যাপারেও আমরা দেখতে পাই, সে শুধু রাজ্য সরকার ও রাজ্যের সমাজসেবক সংস্থাগুলিই নয়, বিদেশের অনেক জনপ্রিয়, সমগ্র দেশব্যাপী সংস্থাও এদের আর্থিক এবং অন্যান্যভাবে প্রচুর সাহায্য করেন। সাহায্যকারীদের মধ্যে আছে 'কেন্দ্রীয় সমাজ উন্নয়ন সংসদ', 'আমেরিকান মহিলা ক্লাব', 'অক্সফাম', এবং আরও অনেকে। সাধারণ লোকদের মধ্যেও অনেকেই এই সর্বজনবিদিত 'ইউনিয়ন'কে অনেকভাবে সহায়তা করেন।

—রত্না চক্রবর্তী

কুসুম, তপতী তুমি ।।

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

তোমার আঁচলে ছিল খসে-পড়া রোদের আভাস
আভা ছিল কপালে বা গালে
লাজুক সিঁদুর লাগা লালে
ঘুম থেকে উঠে বসা হঠাৎ আকাশ

ভাড়াটে বাড়ির কলে জল ধরা প্রথম খবরে
স্নান সারা হলেই চঞ্চল
যুবতী চরণচিহ্নে জল
ছাপ রাখে ভোরভাঙা চকিত শহরে

বুকে ডৌল ছিল ঢেউয়ে দেহদোলা কোমল উত্থান
ফুটে ওঠা বয়সের ফুলে
চমকিত যুগল শিমুলে
এসেছিলে এয়োতীর সহজ সম্মান

কুসুম, তপতী তুমি উনুনের ফুঁ দেওয়া ফাগুনে
খোলাচুলে রন্ধনশালায়
কুসুম তোমাকে দেখা যায়
দাবানল পুষে রাখা সিঁথির আগুনে

শেষ দ্বন্দ্ব ।। পিনাকেশ সরকার

কালমৃগয়ায় যাই নি তাদের সঙ্গে
শূন্য ঘরেই কাটুক মহানিশা
দুঃসাহসী অগ্নিস্মৃতি রঙ্গে
দিই নি যোগ, জাগুক মরুতৃষা।

এখন আমার ঘরের প্রদীপ নেভা
চতুর্দেয়াল সমান একাকার
এখন খুঁজি নিজের হাতের সেবা
অশোকবনে সীতার সংসার।

সম্মিলনী কাঁটার কোলাহলে
তোরা অনেক আনলি অভিশাপ
মধ্যরাতে প্রাচীন শতদলে
আমার চোখের শিশিরে ঝরে পাপ।

পাখি ও ফুল নদী সবার কাছে
মেনেছি হার...পাথরে কাঁপে জল
অলুক স্পন্দে আহত আত্মা নাচে
মারণকীটে কাটে কি শেষ ফল?



ব্রজমাধব ভট্টাচার্য

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বহুকাল স্বাধীন হবার পরেও এদেশের কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাস আজও যেমন ন-গণ্য। সামাজিক নগণ্যতা যেমন রোগের মতো ওরা মেনে নিয়েছে,—তেমনি শ্বেত-শোষকের অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যকে স্বীকার করে নিয়েই এরা স্বাধীন। এদেশ থেকে ঔপনিবেশিক দুর্মর জড়তা এবং মজ্জাগত হীনতাবোধ যেতে যেতে কল্প পেরিয়ে সত্য যুগ এসে যাবে।

শাদা-পালিশের আর্থিক-সাম্রাজ্য আজও কালাবা বইছে। এতকাল ওরা গান গেয়েছে white-man's burden: আজ দেখা যাচ্ছে এই বিশাল য়োরোপীয় জড়-সভ্যতার তাঞ্জাম বয়ে নিয়ে চলেছে ভারত, আফ্রিকা, চীন।— ওরাই বলতে পারে বর্তমান পশ্চিমী সভ্যতার বিশাল বোঝাভার black man's burden

জর্জ টাউনের গ্রাহামা স্ট্রীটে খানেরা থাকেন। কোটিপতি ব্যবসায়ী। ত্রিশ বছর আগে এই আমেদ খানই আমার বন্ধু রহমৎ উল্লার বাগানে কাজ করতো। যখন ম্যাকেঞ্জির বক্সাইট খনি লুট করবার সময়ে ইংরেজ আর আমেরিকার টাকায় রেল লাইন হোলো তখন আমেদ খান জংগল কাটার ঠিকাদারী নিলো। সেই ঠিকাদারী থেকে আজ বিরাট ঠিকাদার কোম্পানী খান-ডটার্স লিমিটেড।

তারই সংগে কথা হচ্ছিলো। আমেদ কমই কথা বলছিলেন। বলছিলেন স্ত্রী। বুদ্ধিমতী। খান-প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর তিনি।

বার্বডোজে ওদের অনেক টাকা খাটে। আমি সেবার ওদের সংগেই গেলাম। ওদের দুঃখ বার্বাডোজে ওরা কালোদের 'পাবে' যেতে চায় না; হীন বোধ করে। আর শাদা-দের ক্লাবে ঢুকতে পায় না. মেথর নয় বলে। বড়ো বড়ো দু-চারটে চীনী হোটেল আছে বটে। থাকলে কী হবে। নিষিদ্ধ ফল না খাওয়া পর্যন্ত সারা বাগান খেয়েও তৃপ্তি নেই। মানুষকে পাগল করে তোলে নিশ্চুপ অন্তর টিপুনী। টাকা সত্ত্বেও কেবল চামড়া চটকের অভাবে মানুষের কাছে মানুষকে যখন হেয় হতে হয় সে অপমান হাড় মাস মজ্জায় ছাড়ে।

আমি ডোরা খানকে যখন এসব কথা শোনাই মাঝে মাঝে যখন চোখ তুলে ডোরা বলে, 'তুমি কম্যুনিস্ট!'

আমি হাসি আর বলি, "ডেমোক্র্যাসীর পাল্লায় পড়েই তো সামুয়েল হল্টের সংগে কাল নাচতে পেলে না। তবুও ডেমোক্রাট তোমরা। হক্কের বাত কই বলে আমি হনু কম্যুনিস্ট।"

সত্যিই দু-দিন ধরে স্যাম হল্ট ডোরাকে নিয়ে ফুর্তি করে বেড়িয়েছে। কিন্তু সন্ধ্যার পর ক্লাবে নাচতে যাবার সময়েই ডোরার কোমরের রং যেন প্রথম দেখলো হল্ট। ডোরার রাগ হবার কথাই।

তাও হল্ট নিজে পুরোপুরি শ্বেতাঙ্গ নয়। 'পুয়োর হোয়াইট' নয় অবশ্য হল্ট। কিন্তু আসলে তো সেন্ট মার্টিন দ্বীপের বাসিন্দা! লী-ওয়ার্ড দ্বীপ-পুঞ্জের এই সেন্টস দ্বীপগুলোতেই রাজ্যের পুয়োর হোয়াইটসদের বাস।

সেই হল ডোরাকে নিয়ে যায়নি ক্লাবে কালা বলে! ধনীর গোসা হবারই কথা।

গাড়ী ডোরাই চালাচ্ছিলো। আখ-ক্ষেতের মধ্যদিয়ে মাঝে মাঝে একটু উঁচু মতো জায়গায় নারকোল-আম আর অন্যান্য ফলের গাছের একটা দল। তার মধ্যে দু-চারখানা বাড়ী। শাদাদেরই বাড়ী। এরা 'রেড্-লেগস'—বার্বাডোজের 'রেড-লেগস'।

সেজমুয়েরর প্রান্তরে হার খেয়ে ডিউক অব মনমথের দল চারধারে পালালো। কাকা দ্বিতীয় জেমস ফাঁসি কাঠে চড়ালো ভাইপো মনমাথকে। এবং মনমাথের গুণগ্রাহী ভাবৎ প্রটেস্টান্ট এংলিক্যান সম্প্রদায়ের পশ্চাৎভাগে লেলিয়ে দিলো এক জবরজস্ত দালকুত্তা,—নাম জর্জ জেফ্রীজ। তার পাল্লার বাইরে আসার সময়ে বহু বীর এবং সদ্বংশজাত সম্ভ্রান্ত পরিবার এই বার্বা-ডোজে এসে মান বাঁচিয়ে ছিলো। কিন্তু আপোষে আন্তর্বিবাহের ফলে আজ এরা হীনের হীন, দীনের দীন। কী ভাষায়, কী বেশে, কী রুচিতে, পরিচ্ছদে এরা বার্বাডোজ সমাজের ব্রাত্য, বোধকরি মনুষ্য-সমাজেরও। অনুধাবনীয় এই যে, বার্বাডোজ, যেখানে শ্বেতবর্ণই সর্ব-বিভাগে প্রবেশের টিকিট, সেখানে, শ্বেতবর্ণ সত্ত্বেও বরং যেখানে যেখানে নিগ্রোদের সম্মান আছে, সেখানেও রেডলেগস্‌রা একেবারেই ছি-ছি। সাংকর্য এমন দোষ! জাতি যখন মাতৃভাষা ভোলে, আত্মসমীক্ষা হারায়, আত্মচেতনা খোয়ায়—তখন তার এই দশা হয়।

এমনি হয়েছিলো মিশরের সুপ্রসিদ্ধ টলেমীবংশে। ক্ষয় হয়ে গিয়েছিলো রামেসিসের শক্তি, টলেমীর প্রতিভা।

কিন্তু সেদিন দেখেছিলাম বার্বাডোজের বিখ্যাত গুহা-মালা। এই গুহা থেকে গুহায় বয়ে চলেছে বিশাল এক তরঙ্গিণী নদী। ঘোর অন্ধকার গুহা। স্পেট্স-টাউন শহর থেকে বেশী দূরে নয়। মেহগনীর একটা জংগল পার হলেই পাহাড়ের বলি-রেখা। ফাঁকে ফাঁকে ঠাসা গ্রীষ্মবলয়ের সুপ্রচুর বাষ্প-বনজ-উদ্ভিদ লতা-পাতা লেখাজোখা নেই যার। তেমন নয় মহাপিন-মহীরুহের বন্য দীপ্ত। সোজা মাটি ছেড়ে আকাশঠেলে উঁচিয়ে গেছে পর পর, গাছের পর গাছ। শাদায়-রক্তে চাকা চাকা দাগ কাটা বাকল, আর ছল্‌ছলে বড়ো বড়ো নিবিড়-ছায়া পাতা।

তারপরই সমুদ্রঘেঁষা গুহা-মালা। গুহা থেকে গুহা। পুরাকালে বোম্বেটের দল লুকিয়ে থাকতো। হঠাৎ বার হয়ে গ্রাম-শহরে ডাকাতের মতো হানা দিয়ে লুঠতরাজ করে খাদ্য পানীয় নিয়ে আসতো। তারপর যতদিন পারতো এই গুহার মধ্যে কাটিয়ে দিতো। এই ছিলো তাদের বাড়ী-ঘর-সংসার। পরে চিনি-সামন্তেরা বিলেত থেকে বিশেষ করে ব্লাডহাউণ্ডের দল আমদানী করেছিলো এই গুহার অন্তহীন ইনটেস্টাইন থেকে ঐ সব মানুষ-কুমী-গুলোকে তাড়িয়ে বার করে আনতে। এখন পর্যটককে সরকারী পাণ্ডা পয়সার বিনিময়ে এ-সব দেখায়। বড়ো ইলেকট্রিক লণ্ঠনের আলোয় সেই দেখাটা আলো-ছায়ায় আরও রোমাঞ্চকর হয়ে ওঠে।

তবু কিছুই তেমন ভালো লাগেনি। কাপ্রীর সেই নীল গ্রোত্তোর কাছে কিছু নয়।* স্কটল্যাণ্ডের লক-গুলোর মতোও নয়। তবে ডোরা ছিলো। খুব অ-ভালোও লাগেনি।

একটা কথা মনে আছে। বালুর তীরে খাড়া-খাড়া তিমিমাছের শাদা পাঁজর দেখে এগিয়ে গিয়ে দেখি লস এঞ্জেলেসের নিক-গোয়ান এক ব্লু-প্রিন্ট হাতে করে কতিপয় নিগ্রো কারিগরের সাহায্যে কলম্বাসের সেই প্রসিদ্ধ তিনখানা জাহাজের হুবহু নকল তৈরী করাচ্ছে। সান্তামারিয়া, নীনা; পিন্টা। অর্থাৎ র‍্যাংক কোম্পানী কলম্বাস নিয়ে কী ছবি তুলবে, তারই প্রস্তুতি।

আমাদের দেশে রাম-রাবণের যুদ্ধেও পোস্টবোর্ড আর কাগজের রথে চড়ে লড়াই হয়। অথচ ভারতবর্ষ নাকি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রীতে পৃথিবীর দ্বিতীয়।

"কী ভাবছো!"

ডোরাকে আর কী বলবো কী ভাবছি। ডোরা কী বুঝবে।

"ভাবছি শাদা হয়েও কী দুর্দশা রেড লেগস্‌দের!"

গাড়ী চলেছে ধীর মন্থর গতিতে বাড়ীতে খাবো না। বাইরে খাবো। বার্বাডোজের উড়ুক্কু মাছভাজা ল্যাটুশ-টম্যাটো সহ ফ্রেঞ্চ সস মেখে দিব্যি খাদ্য রমণীয়। বার্বাডোজের পথে পথে একটু মোমতাজ-তোয়াজী জায়গা হলেই একটি "আইল্যাণ্ড হোটেল।" ঢোকা,

* মদীয় 'তিন-সাগর' দ্রষ্টব্য।

বোসো, খাও, গান শোনো। দু-চার পয়সা টিপস্ দাও। জীবনন্দী বয়ে যাবে মন্দাক্রান্তা তালে। বসলাম "কোরাল রীফস্" হোটেলে।

প্রাক্-ডিনার পর্বের গলা ভেজাবার সন্ধ্যকালে রংদারপান না তলব করে একেবারে পহলে কফী শুনেই তো—।

পহলে মাফী চেয়েই কাফী চেয়েছি। ডোরাই সবটা সামলাচ্ছিলা। "ভাজিয়ে ভাজিয়ে গুলতাপ্পী চালিয়ে দিলো পূর্ব-মুলুকের জাঁদরেল গুণীজন। যখন যোগে মগ্ন থাকেন না কাফী চান। না সময়, না বাক্যব্যয় চলে। সুতরাং।

কিন্তু ঢেঁকী যদি ইন্দ্রপুরীর উঠোনেও দাঁড়ায়, লাথ খাবেই। সান্তনা এই যে। উর্বশী, ঘৃতাচীর লাথি।

—আমারও তাই।

জুটেছে এক ম্যান্ডোলীন দল। বাজাচ্ছে পিড়িং পিড়িং আমার পিত্ত-জ্বালানো ইন্ডিয়ান ফিল্মের ল্যাটিন-পপ্-মিউজিক। ভাবছে "দাদুর দ্যাশের বাইদ্যা ; দাদুর কলেজা তর কইর‍্যা দিবাস।"

কী জ্বালা!! প্যার করেঙ্গা, ক্যা ডরেঙ্গা-র সেই লড়ঙ্কু বাদ্য!

ঘৃতাচীর লাথি, উর্বশীর লাথি। কিন্তু ঢেঁকীর দিব্যি গেলে বলছি, সে লাথিও লাথিই। শাদা ম্যান্ডোলিন, নির্ভেজাল শাদা ভিখিরী আরও শাদা এবং নির্ভেজাল ডলার প্রার্থী। কিন্তু সেই গানার ঘ্যান-ঘ্যান "প্যার করেংগা ক্যা ডরেঙ্গা! ফলে খানা যেন কানা কবার জো!

"ও ডোরা! কতো দিলে ওরা যাবে! দিয়ে দাও। কফি যে আমার পপের পাল্লায় প্রাণ হারাচ্ছে।"

ডোরা তৎক্ষণাৎ ওদের বিদায় করলো এক একটি বীয়ার-বোতল দিয়ে।

ওরা পালালো। সে দন্তরুচি কৌমুদী উপভোগ্য।

আমি বললাম, "বিশ্বাস হয় না শাদা-খাক জমানো বার্বাডোজ পথপ্রান্তের পান্থ-শালার মেঝেয় বসে শাদা বৈরাগী ভিক্ষে করছে কালা আদমীর কাছে। বিজাতীয় তৃপ্তি হবার কথা ডোরা। লন্ডনের শু ব্ল্যাক যখন আমার জুতো পালিশ কর-ছিলো তখন মুহূর্তে সহসা খুশীর ঝলকে চমকে উঠেছিলো। আজ কিন্তু মনটা বেদনায় কাতর। এরা ইংলন্ডের অভিজাত-বংশের রক্ত।"

ব্রিজটাউনের সেরা পাড়া সেন্ট জেমস্-এ বার্বডোসের প্রসিদ্ধ বাড়ীওয়ালী মিডেসে ক্লার্কের বাড়ীতে ডোরা ভাড়াটে। সেখান থেকে বাজার বেশী দূর নয়। দূরে কাছে কী ; গাড়ীতে এবং বার্বাডোজের কোরাল রকের বুক চাঁছা এবং কোরাল গুড়ুনো পথে বিশ মাইলও কাছে। বাজার যাই মাঝে মাঝে, অবকাশ পেলেই। ডোরা তার ব্যবসায়িক কাজে ব্যস্ত থাকে। আমার সাথী যথারীতি আমিই জুটিয়ে নিই। সেদিনও জুটেছিলো। দালাল-বুড়ো রীভ্ মর্গান, নিকষ কালো চেহারায় তুলো-পেঁজা শাদা মাথা সর্বদাই রং-রে টং।

"মদই খাও না ছোকরা? খেলে কি তবে? সমুদ্দুরের পানি? এই তোমাদের এক ঝামেলা আছে। প্রায় ভারতীয়দেরই দেখি এই ব্যবহার। যেথা যাও বাস্, এক-বুলি সিম্প্‌ল্ ওয়াটার। গোল্লায় গেলো জাতটা!"

"এদেশের নিগ্রোদের চেয়েও?"

কটমট করে তাকায় মর্গান। "নিগ্রোরা যে বেঁচে আছে আজও তা লক্ষ্মী-ধান্যবতীর কৃপায়। ওই মদিরাক্ষীর রস ছাড়া শাদা-গুলোর বেধড়ক নষ্টামী, অত্যাচার, পটন হোতো কি? ভারী জারক হে, ভরী জারক...বার্বাডোজে ঘুরবে, পাঞ্চ্-কম্বাইন্ খাবে না! না খাও চলো মাছভাজা খাবে।"

বার্বাডোজের খানা-ঘরে সমুদ্র-জাত খাদ্যের সম্ভার। তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ "আওর সিন" অর্থাৎ সী-আর্চিনস্ কাঁটায় ভরা কাঁকারালের মতো দেখতে বার্বা-ডোজের আশেপাশে প্রচুর। একিনোডিয়া জাতের মধ্যে একিনুস্ এস্কিউলেন্ডস বা এগ্-আর্চিনকেই বার্বাডোস বলে "আওরসিন"। কাঁকড়ার মতো খোলাটে ভেঙে ভেতরের গোলাপী জেলীর মতো মাংস দিয়ে এরা সভা-খানা তৈরি করে : স্বাদে বিশেষত্ব আছে। কিন্তু উড়ুক্কু মাছই হোলো বার্বাডোজের সুপ্রসিদ্ধ খাদ্য। তপ্শে বড়ো হলে উড়ুক্কু মাছের স্বাদ দিতো। আমি কফি এবং মাছভাজায় মন দিয়েছি, মর্গান হাঁক পেড়েছে বার্বাডোজের নিজস্ব খাস 'স্যাঙ্গারী'! স্যাঙ্গারী রামের পূর্বপুরুষ আদিবাসী বার্বাডোজের স্বতন্ত্র পানীয়। নির্ভেজাল খাওয়া কেউ সাহস করে না। দু আউন্স 'মদীরা'-আসব, আধচামচ 'কুরা-সাও', ঢেলে দিতে হবে মস্ত গেলাস ভর্তি বরফের মাথায়। তারপর সোডা ঢালো; এক-কুচি লেবুর স্থান করে দেও; একচিমটি জয়ফল গুঁড়ো দাও। এ পানীয় তর্ করে দেবে।

মর্গান তার গেলাসটি ধরে প্রথমেই লম্বা টান দেবার চেষ্টা করে মুখ বিকৃত করে থেমে গেলো। বুঝলাম কী পরিমাণ আগুন জ্বালিয়ে ওই সুধা ওর বক্ষকে খাক করে দিচ্ছে। থেমে বললো, "রাতে যাবো" কোকোনাট্ ক্রীক্ ক্লাবে। দেখবে মলা-রুজ আর ফলি বার্জার সাগে কোথায়। যাকে বলে নাইট-ক্লাব। বার্বাডিয়ান লা-পরো-য়াঙ্গ। বেলেল্লাপনা নয়। সি-সি-সি ভারী নামজাদা ক্লাব। আর যদি বে-এখতিয়ার বেলেল্লাপনাই চাও,—ঐ ডেরার ডোর মুক্ত হও। বিদেশে এসেছো ; ফূর্তি করে যাও। বার্বাডিয়ান তরুণী স্যাঙ্গারীসহ মনে হবে তোমার বয়স দশ বছর পিছিয়ে দিয়েছে, আর বিশ-জনম এগিয়ে দিয়েছে, রসকে জ্বালন দিয়ে দানাদার করেছে ; তন্ত্রীর-গুলোকে পেট্রলের পাইপ করেছে ; মেজাজকে আগুন করেছে; সর্বনাশকে পোষমাস করে দিয়েছে।"

আমি যোগ দিই.........'পকেটকে ফাঁকা করেছে, পরকালকে ঝরঝরে করেছে, ইহ-কালকে পোকায় কাটিয়ে......"

"ওই তো তোমাদের ভারতবর্ষের দোষ! কন্দর্পকে ছাই করবে, শিবকে কোপীন পরাবে।"

ব্রড স্ট্রীট বার্বাডোজের সেরা বাজার, ব্রীজ টাউনের অক্সফোর্ড স্ট্রীট। সারা পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জব্যাপী সুপ্রসিদ্ধ উইবেয়ম ফগার্টি তো আছেই, আরও ভালো ভালো ডিপার্টমেন্টাল স্টোরস্ আছে হ্যারিসন এন্ড কোং, কেভ এন্ড শেফার্ড। কিন্তু গডার্ড-স্-এর প্রসারীই বোধকরি সব সে-সেরা দোকান। কেবল ভীড়। সারা ব্রড স্ট্রীটে ভারতীয় দোকান বলতে কয়েকটা তেজারতী দোকান; সবগুলোই গুজরাতী। দু-একটি সিন্ধী দোকান। কিন্তু ভারতীয়দের দোকান এদেশে এখনও 'কুলি" দোকান। নেহাৎ টাকা-আনা-পাইয়ের বিচারে কেফায়ৎ হয় বলে লোকে আসে: আর ঐ কারণে আসে বলেই চুপ-সাড়ে আসে;—ফলে দোকানগুলো মানহানি হয়ই।

এখানেও ট্রাফালগার স্কোয়ার আছে; ট্রাফালগার স্কোয়ারে নেলসনের স্টাচু-ও আছে। চারধারে সরকারী দপ্তরের ইমারত। ইংরাজ শাসনের অবিচ্ছেদ্য প্রতীক কুৎসিত জড়ভরত থামসর্বস্ব জোব্দা জোব্দা ইমারত। রং সাম্রাজ্যে লাল-সবুজের মিলন একমাত্র ব্রিটিশ-ব্রেন এই পাক খেতে পারে।

তবে বলেছি তো, বার্বাডোজে ইংরেজ প্রীতির ভারি খবরদারী। এদের খানদানী কুলুজীর ধারক বলতে আছে লেজিস্‌-লেটিভ এসেম্বলী এ তল্লাটের অতলান্তি-কের পশ্চিমপাড়ের সব-সে-পুরানো পুরানো এসেম্বলী। প্রথম জেমসের তৈল-চিত্র চেষ্টা করলে দেখা যায়। বেচারী ঝুলে আছে অসহায় চোখে;—খৃস্টীয়-জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মূর্খ-পন্ডিত! সেই সঙ্গে (ভাগ্যে এসেম্বলীর দেয়ালগুলো বড় এবং দরাজ) পর পর ইংলন্ডের সিংহাসনস্থ এবং প্রজা-পালক-পালিকাদের ছবিও ঝুলছে। কেউ হাসে না, কেউ মানুষের মতো দাগ কাটে না মনে: এই সব লম্বশাটপটবৃত। ঐতিহাসিক রামফলগুলো বার্বাডোজ-চ্যুত হয়েও দেওয়ালচ্যুত হয়নি। পুরোনো রাজ্ঞা-রাণীর ছবি একালের পর্যটকের চোখে বিস্ময় আনে। হাঁক-ডাক করে গাইড সব-কিছু "সমঝিয়ে" দেয়।

বার্বাডোজে একটি জায়গা আমার খুব ভালো লেগেছিলো; বার্বাডোজে বললাম,—ব্রিজ টাউনেই। এবং ট্রাফালগার স্কোয়ারেই। ওয়ার মেমোরিয়লের পথে বেসাতীরা নানা জাতের, নানা ছাঁচের মৃৎ-পাত্র নিয়ে বসে আছে। গ্রীসীয় কুঁজো এবং 'ভাস্' থেকে নিয়ে, টার্কিশ 'জাগ্', পানপাত্র, এবং হেনরী মুরে কায়দায় অত্যাধুনিক সরলতা, কতো যে মাটির বাসন। বেশীর ভাগই কড়া পালিশ করা। বার্বাডোজের মাটি কোরালগুঁড়ো, শাদা বালি এবং নদীর অববাহিকার শাদা কাদা। এই বস্তুগুলি একত্রে চাকায় পিষে চমৎকার এঁটেল মাটির তাল করে নেয়; পরে তাই দিয়ে বাসন গড়ে। সারা ওয়েস্ট ইন্ডিজে এ বাসন প্রখ্যাত শিল্প। আমেরিকী চর্বিরসীরা অতি স্নেহ-সন্তোষে কেনেন। বার্বাডোজ

ডলার উপার্জন করে। আমরা কেষ্টনগর, চুনার, পুরুলিয়া, মাদুরাইয়ের মৃৎ-শিল্পীদের আজও বাঁচাতে পারি। ডলারও কবলিত করতে পারি।

রীত মর্গান হাজির করেছে একখানা সেকেলে বাড়ীতে। ওর বক্তব্য এটায় নাকি জর্জ ওয়াশিংটন ছিলেন। বহু যাত্রী, বিশেষ গুরুবিত্ত, লঘুবুদ্ধি আমেরিকী ডলার-গরবিনীরা, ভীড় করে আসেন এই তীর্থে যেখানে জি, ডবল্যু, পুজো পাচ্ছেন ষোড়শ সহস্র উপচারিকা সহযোগে। "দূর দূর! কেন এখানে ভেড়ালে বলোতো!" ক্ষেপে যাই আমি।

"বারে! কাগজে-পত্তরে লেখা জি, ডবল্যু রীজটাউনে নগদা পনের ডলার ভাড়ায় একটা বাড়ীতে ছিলেন। ওর আধা ভাই—"

"যাঃ, গুলেগপ্পী দিচ্ছো। বলো পুরো ভাই, বৈমাত্রেয়। মেরী নন্দন জর্জের পিতার প্রথমার নাম জেন্। তার......"

রীত হাসতে হাসতে বলে, "তাই। ভায়ের যক্ষ্মা। সারাতে এসেছিলো জর্জ। এবং যে ক্যাথিড্রালের এতো রবরবা, সেণ্ট মাইকেল ক্যাথিড্রাল, সেই ১৬৬০ থেকে চলে আসছে—"

"ওরে বাবা, গুলতাপ্পী দিস্ নি। ১৬৬৩তেই ঝড়ে তোর গির্জে উড়ে গিয়েছিলো সমুদ্দেরের পেটে; ১৭৮০তে পুনশ্চ। এ গির্জে তো—"

"হ্যাঁ ১৮০১ থেকে; তা বলে গির্জে তো ছিলো। ১৭৫১তে জি, ডবল্যু এখানে প্রার্থনা করতে আসে ভায়ের জান পেতে।"

"এবং পারনি!"

কটমট করে চেয়ে বলে রীত, "তা পারনি, নিজের জীবন ভিক্ষা পেয়েছিলেন।"

"সে কী বাত? কিস্সা?"

"জর্জ ওয়াশিংটনের বসন্ত হয়। সে দাগ সেরা-সে-সেরা শিল্পীও মুখে ধরে রেখেছে। বার্বাডোজ ওয়াশিংটনের মুখে বসন্তের দাগ করে দিলো বটে, কিন্তু সিভিল-ওয়ারের সময় যখন নাগাড়ে বসন্তের প্রকোপে সৈন্যদলে মড়ক ধরলো, তখন ওয়াশিংটন বেঁচে গেলেন এই বার্বাডোজের—"

"দয়ায়!! তা বেশ। তা বলে এই বিছানা, এই গোশলখানা, এই পর্দা, এই বন্দুক আর টুপী দেখিয়ে আমেরিকান খোপড়ীকে ভাম্পী দিতে পারো, আমার পঞ্চাশ সেণ্ট জলাঞ্জলি গেলো।"

"পঞ্চাশ কেন, গোটা ডলারই বলো না কেন! আমারও তো!"

"আরে, তুমি তো ডগোমগো ইতিহাসের জ্ঞান-সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছো বোলে, আমিই তো লুম্বো কাষ্ঠং! ও সবে মন ভেজে না: বরং চলো এ দেশের গলি খুঁজির খুব নাম শুনেছি। সবই নাকি সেকালের ইংলণ্ড; দেখি সেইটে। বারমুদস মতো নিখুঁত সপ্তদশ শতাব্দীর মাত্রা ধরার কি-না।"

লিটারারি রো, ভিক্টোরিয়া স্ট্রীটের আশেপাশের গলিগুলোর মধ্যে এখনও যেন মনে হয় সেন্ট্রিলনার ছুতোর, ওড়ে কুইরিসিটির কাঞ্চন, স্টোর-কোচের লণ্ঠন ঘুমিয়ে আছে, কেবল সুন্দরীদের রংকরা চুল, এবং মাঝে মাঝে ন্যানেলের খোশবয় মনে করিয়ে দিচ্ছিলো। "হায়রে কবে কেটে গেছে কালিদাসের কাল!"

আমাকে যখন ডোরা জিজ্ঞাসা করলো, "সে-কি ক্রাইস্ট চার্চে যাওনি! নাঃ তোমার মতো বেরসিকের মদ না খেলে বুদ্ধি খুলবে না।"

—আমি বাধ্য হয়ে বলি, "মদ খেয়েছি, বুদ্ধি খুলে বেমালুম বেরিয়ে গেছে। কিন্তু ভূতুড়ে ব্যাপারের সওদাগরি আমি করিনে। ক্রাইস্ট চার্চে যাবো না। এবার প্লেনের রিজার্ভেশনটা করাবো। ব্যস্।"

ডোরা রাগ করে কফিতে দু' চামচ চিনি দিলো। হাসলো। আমিও হাসলাম।

এ শতাব্দীর কথা নয়; এর ঠিক আগেরটায় ক্রাইস্ট চার্চ খুব ভুগিয়েছিলো। চার্চের নীচের তলার ভল্টের ভেতর মৃতদেহ সহ কফিন রেখে যেতো লোকে। কিন্তু সে সব কফিন শোয়ানো অবস্থায় পাওয়া যেতো না। সিধে দাঁড়িয়ে। কখনও কাৎ হয়ে শুয়ে। কতো তালা; কতো সতর্ক। অবশেষে সরকারী পাহারা। কিছুতেই কিছু নয়। স্বয়ং গবর্নরের পরিবারের কফিন,—স্রেফ স্থানচ্যুত হয়ে এক নিগ্রো কফিনের ধারে কাৎ হয়ে শুয়ে আছে। অবশ্য নিগ্রো-কফিনও কাৎ। ভারী বে-ইজ্জতি ব্যাপার। বাইবেল বেদান্ত-বাগীশরা পর্যন্ত উল্টো কপালের গায়ে হাত বোলায়—'তাইতো!' অবশেষে রাজকীয় আদেশে ভল্ট বন্ধ হোলো। বার্বাডোজে কেউ আর ক্রাইস্ট চার্চ গির্জায় সমাধির জন্য শবাধার প্রেরণ করেন না। এই একটি ব্যাপারে গডের ওপরে সেটান্ সটান টেক্কা মেরেছে। বার্বাডোজে ক্রাইস্ট চার্চে ঢোকার আগে অনেকে গোচরে অগোচরে বারবার বুকে ক্রুশ চিহ্ন আঁকে।

শুধু এই একটি নয়। এমনি আছে স্যাম্ লর্ডস কাসল্। চমৎকার হল বাগানের নতোন্নত বিষম ভূভাগের মধ্যে মর্মস্পর্শী সাহসিক একটি সেকালীন কাসল্। শাদা কোরাল পাথরের চাঁচাছোলা বাড়ী। ডাকাত-বোম্বেটে ছিলো এই স্যামুয়েল লর্ড। সহজেই নিজেকে ধনী করেছে জাহাজ লুঠ করে। বিশেষত এই কখনও স্যাম লর্ড জাহাজে চড়েনি; অন্ততঃ সমুদ্রের বুকে সঞ্চরমান জাহাজে তো নয়ই। জাহাজে না চড়ে জাহাজের ডাকাত! এ এক আশ্চর্য! অথচ সত্য।

স্যাম্ নারকোল গাছের মাথায় লণ্ঠন ঝুলিয়ে দিতো দু' চারটে। অন্ধকার রাতে ঝড়ের রাতে, কাছেপিঠে বন্দর বা গাঁ আছে মনে করে জাহাজ আসতো আশ্রয় পেতে। ব্যস্। কোরালের রীফে ফেঁসে জাহাজ গয়া হোতো। সেই রুক্ষ, দুর্ধর্ষ, আছাড়-পিছাড়ি ঢেউ কোরালের গায়ে ঠুকে ঠুকে খুলির পর খুলি ফাটাতো। যে কটা বা বাঁচতো, তীর থেকে তাগ করে সে কটাকেও শেষ করতো। যদি তোফা মেয়ে নজরে দেখতো, মারতো না; পরে তারাই অধম করবে আশায়। কিন্তু জাহাজগুলো রীফের মালায় আটকে থাকতো। স্যাম ধীরে ধীরে সে-গুলোর তাবৎ মালপত্র আনতো, বেচতো; টাকা করে বিরাট ধনী হয়ে গেলো। সেই টাকার দৌলতে ইটালি থেকে ভাস্কর-স্থপতি আনিয়ে যে বাগান, যে অট্টালিকা স্যাম করে গেছে দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে যেতে হয়।

চকী মাউণ্টের সবটাই বারবাডোজের কুমোরটুলি। এ ধারটাতেই বার্বাডোজ রমণীয়। কারণ পাহাড় আছে। হাজার ফুটের হ্যাস্‌ল্‌টন্ ক্লিফ বা চেরী-ট্রি-হিলের ওপর থেকে সমুদ্র এবং পৃথিবীর দৃশ্য মনকে স্নিগ্ধ করে দেয়। আশ্চর্য লাগে ভাবতে এতো নিবিড় কারিগরীর মুন্সিয়ানায় এতোখানি সুন্দরকে যে দু'খানা হাত গড়ে তুলেছে, সেই দু'খানা হাতই মানুষের মতো এমন নিকৃষ্ট জীবকে কেন তৈরী করলো?

ভুলতে পারি না এই পাহাড়ের প্রস্তর স্তর বেরিয়ে গেলেই স্কটিশ হাইল্যাণ্ডস পাবে। সেই স্কটিশ হাইল্যাণ্ডসে ভাঁজে-ভাঁজে আছে ঘুম-ঘুম সব গাঁ। সেই সব গাঁয়ে স্কচ্-সন্তানরা থাকে। তাদের পূর্ব-পুরুষেরাই মন-মাউথের হয়ে লড়তে নেমেছিলো। রাজার ছেলে মন-মাউথ। রাজার আর কোনো সন্তানই নেই। ওই এক। সবাই জানে দ্বিতীয় চার্লসের সন্তান। স্কচ্ রাজার সন্তান, স্কচ্ মেয়ের গর্ভে। লুকিয়ে বিয়েও করেছেন রাজা। কেবল খাতায় লেখা হয়নি। হতভাগিনী রাজাটাকে ভালোও বাসতো। রাজা সেই একমাত্র সন্তানকে ডিউকও করে দেন, রাজদরবারে তাকে ছেলেরই খাতির দেন; কিন্তু মরার আগে রাজা দেবার কথাটি না বলেই মরেন। ফলে ভাই দ্বিতীয় জেমস্ এই ভাইপোকে তাড়ালো। যুদ্ধ হোলো। স্কচেরা হারলো। জাজ্ জেফ্রিস খুঁজে খুঁজে এই সব স্কচদের উৎখাত করলো। সম্ভ্রান্ত সর্দারেরা, অভিজাত পরিবারেরা জেফ্রিসের নির্যাতনের ভয়ে পালিয়ে এলো বার্বাডোজে। তাই তারা বোম্বেটে হতে পারেনি; উড়ো মন নিয়ে সওদাগরী করার উৎসাহও পায়নি। মন চেয়ে থাকতো স্কটল্যাণ্ডে ফিরে যাবার দিনের পানে। দেশে ফিরবার সাধ্য ছিলো না তাদের। অথচ স্কচ রক্তের গরিমা ছিলো। আপোষে বিয়ে করে করে শতাব্দীর রক্ত ফিকে হয়ে গেছে। দারিদ্র্য, অনটন অশিক্ষা, আশাহীনতা, বিষাদ সব মিলিয়ে বার্বা-ডোজের স্কটিশ হাইল্যাণ্ডের এই 'রেড-লেগ্‌স্‌রা' নৃতত্ত্ববিদদের গবেষণার বস্তু, লিখিয়ে পর্যটকদের বইয়ের গরম মশলা, ধনীদের কৃপার পাত্র। কিন্তু সমাজে অপাংক্তেয়; মহাকরণে অবাধ্য; সরকারের খাতায় অপ্রয়োজনীয় উপসর্গ। এখনকার নিগ্রো-শাসিত সরকারের চোখে তো এদের গরীবি এক ধরনের সুকন্ম, প্রতীকধর্মী তৃপ্তি! লোকে ওদের গাঁ দেখতে যায়; ডলার-রাজারা ওদের সুন্দর মেয়েদের লোভ দেখায়। কিন্তু দরিদ্র রেড-লেগ্‌স্‌রা আজও অহঙ্কার করে—'শির দিয়া পর সর্ ন দিয়া' হয়তো নয়, কিন্তু 'জান্ দিয়া, পর জাত ন দিয়া!' ওরা মরছে, করে যাচ্ছে, মানুষে-পৃথিবী থেকে মুছে যাচ্ছে;

অবিগ্রোহে, অচেষ্টায়, অনাপত্তির ঔদাসীন্যভরে।

অথচ এই বার্বাডোজেই গড়ে উঠেছে বিশ্ববিখ্যাত প্লাটিনাম কোস্ট, যেখানে একখণ্ড জমিতে একখানা একতলা বাংলো করা মানে পৃথিবীর ধনীসমাজে কুলীন বলে গণ্য হওয়া। শান্ত, সুন্দর, চিক্কণ, নধর, পিচ্ছিল, যৌবনবতী এই প্লাটিনাম-কোস্টের সুষমা দিনে দিনে দুনিয়ার তাবৎ ধনীদের টাকার চর্বি মেখে গড়ে উঠেছে এক লক্ষ্মীর দেহ সুন্দরী তন্বী। এখানে একটু টেলিফোনের দৌলতে সব কিছু দোর-গোড়ায় হাজির হবে। কলোনী ক্লাব, বা কোরাল রীফ ক্লাবে কালারা তো কখনও ঢোকার কথা ভাবেই না, শাদারাও যায় না। এক-পাক নাচের খরচ মাত্র দুজনার জন্য অন্ততঃ তিন থেকে চারশো টাকা। এক প্যাকেট সিগারেটের দাম সাত ডলার! মানুষ দেয়; কেন দেয়? প্লাটিনাম-কোস্টে থাকে তাই। তবু এটা নরক! কারণ? ফুল আছে, পাখী আছে, আছে আকাশ-বাতাস-সমুদ্র: তবু নরক? কেন? একটি কারণে; মাত্র একটি। প্লাটিনাম-কোস্টে কুকুর নিষিদ্ধ জীব নয়; কিন্তু শিশু নিয়ে, বালক-বালিকা, কিশোর-কিশোরী নিয়ে, কেউ যেতে পারে না। নিষেধ। প্লাটিনাম-কোস্টে হাসি নেই। ওরা কোনো ফাঁক দিয়েই সদ্যস্ফুট সরলতাকে আমল দিতে চায় না।

এই নরকের মধ্যস্থলে ১৬০৫ খৃস্টাব্দে 'অলিভ ব্লসম্' জাহাজে চড়ে ক্যাপ্টেন ক্যাটলিন, প্রথম ইংরেজ, পদার্পণ করেন। ইচ্ছে করে নয়। দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে।

আজও দিগ্‌ভ্রান্ত সভ্যতার (?) বসুপতিরা এখানে এসে বন্দর খোঁজেন,—কোথায় শান্তি, কোথায় তৃপ্তি, কোথায় অমৃত? নরকের আগুনে অমৃত শুকিয়ে যায়।

অন্ততঃ রোমক-সাম্রাজ্য এখানেই শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছে। বিশ্বাস হয় না। কোথায় রোম, কোথায় বার্বাডোজ। তা হোক; কালের চাকার পাল্লায় লেগে রোম এবং বার্বাডোজ ইতিহাসে একবার এবং শেষবার এক হয়েছিলো।

মুসলমানেরা যেদিন বাইজান্টিয়াম ধ্বংস করলো সেদিনটা ছিল ২৯শে মে, ১৪৫৩ সম্রাট একাদশ কনস্টাইন প্যালিও-লোগাস্ এইখানে মারা যান। শত শত মুসলমান মৃতদেহের তলায় তাঁর মৃতদেহ আবিষ্কার করে আল্লা হো রবে তুর্কেরা সেদিন কম্পিত বাইজেণ্টিয়াম শহরের দেহে শত অত্যাচারের চিহ্ন দেগে দিয়েছিলো। সেই সম্রাটের দুই ভাই সুলতানের হারেমে কন্যাদানের পরিবর্তেও আত্মরক্ষা করতে পারেনি। ফলে গভীর অনীহায় একজন সন্ন্যাসী হয়ে যান; অপরে রোমে যান। সেই পলিওলোগাস্ বংশের শেষ প্রতীকের সমাধি, অখ্যাত সমাধি সেণ্ট জনের গির্জায় দেখলাম পড়ন্ত বেলায় অল্প আলোয় পড়লাম

> **Here lyeth ye body of Ferdinando Palaeologus, descended from ye Imperial lyne of ye last Christian Emperor of Greece. Churchwarden of this parish 1655·656. Vestry man twentye years. Died Oct. 3, 1679.**

রোমে এর পূর্বপুরুষ বাইজাণ্টিয়াম চার্চের শ্রেষ্ঠ সম্পদ সেণ্ট এণ্ড্রুজ-এর মাথাটি বিক্রী করে আত্মপ্রতিষ্ঠা উদ্ধারের চেষ্টা করেছে; অন্য পূর্বপুরুষ ধনাঢ্য বারবনিতাকে বিবাহ করে উঠতে চেয়েছে। ...শেষ অবধি......

ডোরা বলে, কী দেখছো অতো ও পাথরখানায়। প্লেন রাত আটটায়। সোজা এয়ারোড্রোম যেতে হবে। মালপত্র অনেকক্ষণ চলে গেছে।

আমি উঠে আসি।

জাগুয়ারখানায় কেবল শোকে বসে।

ডোরা আবার বলে "কী হোলো? ভূত দেখলে?"

আমি হেসে বলি,—"নাঃ ভবিষ্যৎ!"

"কিসের?"

"শিশুর হাসিকে বর্জিত করে যে সভ্যতা ঠাক জমায় তার।"

ডোরা বলে, নাও, চকোলেট খাও। ভালো চকোলেট।

যে ফ্রান্স আতলান্তিকের পারে

ফ্রান্স দুটো। একটা য়োরোপে; জেনারেল দ্য গ-লকে যেখানে আজ আইফেল টাওয়ারের চেয়েও বেশী লম্বা দেখাচ্ছে। লম্বা শুধু কথাতেই নয়, রীতিমতো হাঁক-ডাকেও; কেননা বর্তমান দুনিয়ায় আমেরিকাকে এমন নাজেহাল আর কেউ করছে না। রুশও নয়। যুদ্ধোত্তর দুনিয়ায় আমেরিকা অবতীর্ণ অনেকটা যুগাধার অবতাররূপে, অন্ততঃ আমেরিকা তাই ভাবছে। আমেরিকার ভাবখানা যেন বাড়ীর বড়ো গিন্নী। দেশ-বিদেশে বিতরিছ অন্ন—এবং অন্যান্য। কোরিয়া, জাপান, মিশর, ক্যুবা,—সব জায়গা থেকে আমেরিকাকে খেদিয়ে বিদেয় করেছে; সে এক অপমান। সইতে সইতে গা সওয়া হয়ে এসেছে। কিন্তু 'ন্যাটো' থেকে ফ্রান্স চলে গিয়ে যখন আমেরিকাকে বললে—এবার ফ্রান্সের জমিন থেকেই সরে পড়ো: সেটা অভাবনীয়। বে-ইজ্জৎ যে কেউ হোতো এর পর। কোনো গুপ্ত কারণে আমেরিকা বে-ইজ্জৎ হয় না। এটা আমেরিকার গুণ।

আমেরিকাও দু-তিনটে। হাওয়াই; পোর্টোরিকো; ফিলিপিন; এরা সব আমেরিক্। ধর্মে, কর্মে, অনুশীলনে, মননে, মুদ্রায়, মদ্যে এবং আরও আরও তাত্ত্বিক গুহ্য সিদ্ধাইতে। আমাদের দেশে সেদিনও পর্তুগীজ কর্তা শালা-জার 'গোয়া-দমন-দিউ'-কেও 'পর্তুগাল' বোলে ফতোয়া দিয়েছিলেন আর কী। আমরা সমস্বরে বললাম, ভারতবর্ষ ভারতবর্ষই। ভারতে পর্তুগাল সে তো নবভূগোল পাঠ! জেনারেল চৌধুরীও পর্তুগালকে পর্তুগালেই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

যেমন হয়েছে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ গুয়াদালুপ, মার্তিনীক, সেইণ্টস্ আর ফরাসী গুয়েনার। এগুলো এখন ফ্রান্স। এরা জাতিতে ফ্রান্স, ভাষায় ফ্রান্স, নামে কামে, সর্ববিষয়ে ফ্রান্স। এদের চাঁই-রা ভোটের মহিমায় প্যারিস-র এ্যাসেম্‌লীতে বসেন। কী করেন জানি না! মোদ্দা, ফ্রান্সের বাইরে নয়া-ফ্রান্স। নিও কলোনীয়ালিস্তিক তত্ত্ব।

এই ফ্রান্সের গুণগানই করবো। এই দ্বীপগুলোকে প্রকৃত পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে ফেললে কী হবে, এরা ফ্রান্স। ক্যারিবিয়ান-সীতে ঢোকার তোরণ-দ্বার। এই তোরণদ্বারে এই দ্বীপ কটি দেখে নিতে হবে :

গুয়াদেলুপ; দেজীরেদী, আইল-দ্য-গ্যাঁ (সেণ্টস্ আইল্যাণ্ডজ); মেরী গ্যালাণ্টী; ডোমিনিকা; মার্তিনীক্। উত্তরে পোর্তোরিকো, দক্ষিণে ত্রিনিদাদের মাঝে ধনুকের মতো বেঁকে অতলান্তিক থেকে ক্যারিবিয়ানকে রক্ষা করছে শত শত দ্বীপ-পুঞ্জ; কোরাল-দ্বীপ, শ্যামল সুন্দর, শষ্পিত, স্নিগ্ধ, সবুজের দোলা নীলের বুকে। যে দখিন বাতাস, ১৪৯২ খৃস্টাব্দের ২২শে অক্টোবর তারিখে কলম্বাসের তিনখানা জাহাজকে ক্যানারী দ্বীপ থেকে ভাসিয়ে সান সালভাদোর দ্বীপ পর্যন্ত এনেছিলো; যে দখিন বাতাসের অবিরত স্রোতে গা ভাসিয়ে পাল তুলে সেভিল-ক্যাস্টিল-গ্যালিসিয়ার বণিকরা দাস নিয়ে আসতো, আর পণ্য-স্বর্ণ-রৌপ্য নিয়ে ফিরে যেতো,—সেই বাণিজ্য-বাতাসের মুখে পড়ে এই দ্বীপপুঞ্জের বলয়,—তাই তার নাম লী-ওয়ার্ড আইল্যাণ্ডস্।

লী-ওয়ার্ড আইল্যাণ্ডসের ভাগাভাগী বহুবার হয়েছে। এ সব দ্বীপের বালি ইতিহাসের রক্তে ভেজা। এখন এর মালিকানা ব্রিটিশ, আমেরিকা এবং ফরাসীদের মধ্যে বিধৃত (স্বাধীনতা নামক সোনার শিকল সত্ত্বেও)। এর মধ্যে ফরাসী-অধ্যুষিত তিনটি দ্বীপের কথাই আপাততঃ বলা যাবে। অন্য ফরাসী ছোটো দ্বীপের খবর আমি বইয়ে, ছবিতে ছাড়া জানিনে।

এর মধ্যে মার্তিনিকই বোধকরি সবচেয়ে কমদিন ফরাসীদের হাতে ছিলো। মার্তিনিক, গুয়াদেলুপ আর হেইতি. ১৭৮৯ খৃস্টাব্দে এ তিনটির চেহারা ছিলো অবিকল এক; ১৮১৫তে তিনটি যেন তিন মূর্তি। হেইতি প্রথম স্বাধীন নিগ্রো দ্বীপ, অবশ্য ক্যারিবিয়ানের মধ্যে; প্রথম ক্যারিবিয়ান দাস-দেশ, যেখানে কালো-চামড়া বিদ্রোহ করে: এরাই অবিকল ঠেঙিয়ে শাদাদের কাছ থেকে স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছে। গুয়াদেলুপ-এ ফরাসী তেরঙ্গা ঝাণ্ডা উড়ছে। আর মার্তিনিক? তখন সে ব্রিটিশের বাসর শয়নে। ইঙ্গ-ফরাসী চুক্তি হোলো ১৮১৫তে এমিয়েন্স শহরে। ১৮০১ থেকে ১৮১৪ পর্যন্ত ইংরেজের হাতে ছিলো মার্তিনিক। তারপরে যেই নেপোলিয়নের সঙ্গে বাধলো, পুনশ্চ ব্রিটিশ হয়ে গেলো। তারপরে প্যারিসের চুক্তিতে আবার মার্তিনিক ফরাসী হোলো।

যেন বিশ বছর ইংরেজের বিছানায় ঘুমিয়ে জেগে দেখলো মার্তিনিক, তার শয্যাসঙ্গীটিও ফরাসী হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে গুয়াদেলুপের বয়স বেড়ে গেছে। ফরাসী দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার ফলে মার্তিনিকের জুকাদার, জোতদার, 'প্লাণ্টোক্রাসী', নবাবী

খিঁচড়ে গেছে; ছোঁচড়ে গেছে। জখম হয়েছে অর্থনীতি, সমাজ, ভাষা, বাণিজ্য। ফ্রান্স ভুলে গেছে শাদারা। বুঝেছে 'দুঃখে-সুখে, পতনে-উত্থানে' সাগরপারী মোদের দেশ ইংলণ্ড বা ফ্রান্স তাদের বাঁচিয়ে রাখেনি। রেখেছে মার্তিনিকের মাটি, মার্তিনিকের কালো হাতের সীমাহীন সেবা-যত্ন। তাই মার্তিনিকের ধনাঢ্য শ্বেতাঙ্গ বণিক এবং বরিষ্ঠ, আইনু এবং কলমজীবী সম্প্রদায়েরা ঠিক করলো, না, বারবার, বছর বছর, ফ্রান্স-অমরাবতীর স্বপ্ন দেখে বিত্তক্ষয় এবং চিত্তক্ষোভ না বাধিয়ে, দেশের সঞ্চয় দেশে রেখে মার্তিনিককেই বড়ো করে তুলতে হবে। সেই থেকে মার্তিনিক 'ছোটো পারিস' হবার ভার গুয়াদেলুপকে দিয়ে, নিজে নিজের ঘরকন্না করছে।

মার্তিনিক শান্তির জায়গা। চিনির জায়গা। মদ এবং মদানন্দের জায়গা। একদা মার্তিনিকে কফি ছিলো, কোকো ছিলো। কী পোকা লেগে সব উজাড় হয়ে গেছে। পরে লেবুর বাগান করে লেবু নির্যাসের বৃহৎ কারখানা হোলো। লেবু গাছও কীট-বিপন্ন হোলো। ধ্বংস হোলো। এখন মার্তিনিক মানে চিনি এবং সুরা; কলা এবং নারকোল হয় বটে, তবে ঐ অবধি।

মার্তিনিকে আজকাল হোটেল হবে হবে শোনা যাচ্ছে। রকফেলার-রা নাকি ফলাও হারে হোটেল-অমরাবতী করে ফেলবে। ওরা ময়-দানব। সব পারে। আমার সময়ে মার্তিনিকে কারুর অতিথি হয়ে যাওয়া ছাড়া



কি ধবধবে ফরসা! কি পরিষ্কার! সত্যিই, সার্ফে পরিষ্কার করে কাচার আশ্চর্য্য শক্তি আছে! আর, কী প্রচুর ফেনা! শাড়ী, ধোতি, শার্ট, প্যান্ট, ছেলেমেয়েদের জামাকাপড় ... আপনার পরিবারের প্রত্যেকটি জামাকাপড়ই সার্ফে [illegible] সবচেয়ে পরিষ্কার হবে। বাড়ীতে সার্ফে কেচে দেখুন!

সার্ফে সবচেয়ে ফরসা কাচা হয়

অন্য গতি ছিলো। কোনো ঘর ভাড়া নিয়ে থাকা। তেমন তেমন ঘর ভাড়া পাওয়া যায় না তা নয়।

কিন্তু সত্যি কথা এই যে এ দ্বীপগুলো চোখে না দেখলে, এদের নরম-গরম যৌবনবতী মাটিতে পা না রাখলে বোঝাতে পারা যায় না কেন বার বার এটাকে দেখে ওটাকে দেখতে ইচ্ছে করে। মানুষের যৌবনে যে বহুপত্নীত্বের, বহু নায়কত্বের কামনা, সে-ও বোধহয় এমনি নির্মম অদম্যতা। আমি তো দ্বীপের পরে দ্বীপে গেছি। ক্যারিবিয়ানের নীল বুকের ভাঁজে ভাঁজে ছোটো ছোটো সবুজ পিণ্ড শত শত দ্বীপ আলগোছে হেথা-হোথা পড়ে আছে, জন-মনিষ্যি নেই; যেন কিশোরী পুষ্পবতী। চেয়ে আছে প্রথম সমাগম লজ্জার মধুর বিধুর রস সংগ্রহ করার আরক্ত প্রত্যাশা নিয়ে। মন গান গায়, কতেবার স্টীমার থেকে চেয়ে চেয়ে গেয়েওছি—

নীলের বুকে সবুজ সে দ্বীপ
প্রবাল দিয়ে ঘেরা,
শৈল চূড়ায় নীড় বেঁধেছে
সাগর বিহঙ্গেরা।

আর যেখানে যতো ভাবুক পরিব্রাজক আছে, সকলকে এই কর্কট-মকরক্রান্তি ঘেরা বিষুব-তাপতপ্ত দ্বীপগুলোর অকৃপণে, অবাধ, অপরিমিত, স্বচ্ছন্দ শষ্প-পুষ্প সম্ভারের, ফলের পর ফলের বিপুল অবদানের ফলে সহৃদয় অনুভবনের মাধুরী রসে সিক্ত করে বলতে হয়েছে ক্যারিবিয়ানের পিপাসা বার-বার কারণে অকারণে প্রাণী মাত্রকে টেনে আনে।

আমাকেও এনেছে।

এদেশের আদিম অধিবাসীরা নাকি আরাওয়াক। তারা নাকি ফিনীশীয় সভ্যতার ধারক। ভেসে ভেসে ব্রাজিল থেকে ক্রমশ এই দ্বীপগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে প্রাগৈতিহাসিক শিবোনীস্ এবং ইগ্‌নেবীস জাতিদের সরিয়ে নিজেরা বসত বসায়। শান্ত, নির্বিবাদ জাত; উলঙ্গ-নৈসর্গিকতার মধ্যে পরতো গলায় ফুলের মালা, মাথায় পাখীর পালকের টুপী। 'কাজ' করা কাকে বলে জানতো না। ফল-মূল খেতো, মাছ ধরতো। ভেলায় চড়ে সমুদ্রে ফুর্তি করতো। সাঁতার, গান আর নাচ এই নিয়ে থাকতো। কখনও মদ খেতো না। নেশা জানতো না। এরা খাবার খেতো একসঙ্গে বসে। খাওয়া শেষ হলে মেয়েরা খেতো একসঙ্গে। রান্না-বান্না-ঘর-কন্না এসব কী তার খবর অবধি জানতো না। শান্তিপ্রিয় জাতের শান্ত পরিবেশ শান্ত দিগন্তরে ছবির মতো শোভা পেত।

কিন্তু বলেছি ক্যারিবিয়ান ভাল। তার অন্তঃসত্ত্বে বহু সম্ভাবনার অতল বীজ। এর পরে এলো কারীব। কারিবিয়ানা; স্পেনের ওরা বলতো ক্যারিবাল। সেই থেকে একটা স্প্যানিশ শব্দই হোলো ক্যানিবাল, যার অর্থ দাঁড়ালো নরমাংসভোজী। অবশ্য কারীবরা যে নরমাংস খেতো এমন পরিচয় শত্রুপক্ষের কড়চা ছাড়া অন্যত্র পাওয়া যায় না। এরাও উলঙ্গ। এরাও দুর্ধর্ষ। এরাও এক-সঙ্গীতানুরাগী। কিন্তু এরা কর্মঠ, কুশলী, ধুরন্ধর, দুর্ধর্ষ, ভীষণ জাত। স্প্যানিয়ার্ডদের, ইংরেজদেরও বার বার নাজেহাল করেছে। এরা আরাওয়াকদের সরিয়ে সরিয়ে নিজেরা জায়গা করেছে। আরাওয়াক এবং কারীব, বেজী এবং সাপ।

তাও তো ডাক শেষ হয় না এ ক্যারিবিয়ানে যারা এসেছে তারা যেতে চায় না। চিরযৌবনার আহ্বান জোয়ান রক্তকে চনমনিয়ে তোলে; ক্ষেপিয়ে দেয়।

হিস্পানিওলার বুকে কলম্বাস যখন দেখলো তিনখানা জাহাজের মাত্র একখানা রয়ে গেছে, তখন দুর্গ গড়ে, কামান বসিয়ে তার বহু সহযাত্রীদের সে রেখে গেলো। আবার সে আসবে। মস্ত বড়ো বড়ো জাহাজ, জাহাজের বহর নিয়ে আসবে। এ সব দ্বীপে 'সভ্য' বসতি হবে; এ সব মানুষকে 'সভ্য' এবং খৃস্টান করতে হবে। হিস্পানিওলায় সোনা আছে। কতো খুশী কলম্বাস। বলে গেলো তার প্রতিভূ যুবকদের,—আর যা করো, আরাওয়াক বন্ধুদের ক্ষেপিও না। এদের মেয়েদের ঘাঁটিও না।'

কিন্তু বললাম, — ক্যারিবিয়ান ডাকে। সে ডাক রক্তের মানা শোনে না; মনের ডানা কেটে দেয়; জানাকে অজানায় ভাসিয়ে দেয়। সে সব বন্দী যৌবন শিকল কেটে বার হয়েছিলো। কলম্বাস দু' বছর পরে ফিরে এসে দেখেছিলো হিস্পানিওলার দুর্গ নিশ্চিহ্ন। তার প্রতিভূদের মধ্যে একজনও বেঁচে নেই। আরাওয়াক সর্দার এসে নিবেদন করেছিলো করুণ কাহিনী। সভ্য জগতের ইতিহাসে অনেক ঘন-কালো পাতা আছে, চোখ মেলে পড়া যায় না। কিন্তু সেদিন সেই 'অসভ্য' সর্দার কাস্টিলিয়ান-রাজসভার মদমত্ত সভ্য-ধুরন্ধর খৃস্টসেবী হঠকারী কলম্বাসকে যা বলেছিলো, তার কালো যেন 'সভ্য' দুনিয়ার মুখে আজও অক্ষয় হয়ে লেগে আছে। সেই বুনো সর্দার বলেছিলো—"তোমাদের দেবতা ভেবেছিলুম। ভেবেছিলুম মানুষের ক্ষুধায় তোমরা ভোগো না, তাই সঙ্গে মেয়েমানুষ দেখিনি। তোমরা যাবার পর যখন তোমার সাগরেদদের পরিচয় পেলুম তাদের রক্তেও জীবনের ক্ষুধা আছে, হে অদ্ভুত দেশের অদ্ভুত কৌশলী মানুষ,—তাদের প্রত্যেককে আমি একটি করে স্ত্রীলোক দিলুম। ফলে তারা আপোষে সেই সব মেয়ে নিয়ে লড়াই করলো। একটা মেয়েতে একজনার কুলোয় না, এই অদ্ভুত আচরণ আমাদের মেয়েদের ক্ষেপিয়ে তুললে.। তারপর সেই মেয়েরাই শেষ করে দিলো পুরুষের অসংযত সেই ক্ষুধা, যা একজন নারীকে অতিক্রম করে অন্য নারীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে।"

কলম্বাস মাথা নীচু করে নিয়েছিলো।

কিন্তু সে ক্ষণিক। পরক্ষণেই ক্যাস্টিলিয়ান ক্যাথলিক তলোয়ার কোষমুক্ত হয়েছিলো। ক্যারিবদের ভাতিরে আরাওয়াকদের শেষ করে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিলো। স্প্যানিশ প্রতি-হিংসার বিবাক্ত দাপট।

এ সব দ্বীপ ডাকে। পর্তুগীজদের ডেকেছে; স্প্যানীশদের ডেকেছে; ইংরেজ, ফরাসী, ডাচ, দিনেমার, সারা য়োরোপের সেরা সেরা জাতের সেরা সেরা বংশের ছেলেরা এই ক্যারিবিয়ানে সূর্যের পিপাসা মেটাতে এসেছে। এখানে নারকোল, কফি, কে.কো, চিনি তো আছেই; আছে জায়ফল, লবঙ্গ, দারুচিনি, গোলমরিচ, লঙ্কা,—য়োরোপের মাংসাশী জিহ্বার অনিবার্য পালিশ, খানাঘরের জৌলুষ। মাটির ওপরে শান্ত ছায়া, বসন্ত বাতাস, মাটীর তলায় সোনা, রূপো, তেল, এলুমুনিয়ম, পীচ; জলের তলায় মুক্তো, মাছ—অবাধ ধনকোষ। এসব দ্বীপের ধারে ধারে যৌবনের স্থির যৌবনবতীর মতো বিস্তৃত, দৃঢ়, সুঠাম বালুবেলাতট। দেখলেই মনে হয় গা ঢেলে দিয়ে এলিয়ে পড়ি, শুধু আরাম, শুধু বিশ্রাম। কোরালের লাল-নীল-শাদা-হলদে বর্ণে সে বেলাতটের কান্তিশোভা মদাতুর করে তোলে পর্যটকের বিস্ময়বোধকে। এ দ্বীপ দেখার পর ও দ্বীপ না দেখে সাধ্য কি পদাতিক চরণ বিচরণ ছাড়ে। নাগরিক অতৃপ্তি এ নাগরীর নীলে সবুজে, পান্নায়-পোখরাজে গড়া দেহতটে কেন খুঁজবে না অভিসার?

কখন যে ডোরা বলেছিলো সেণ্টস দ্বীপের কথা। তাই সম্বল। সেই কথা তুলেই আমি মার্টিনিকে পিয়েরে লাজ তার ঠিকানা সংগ্রহ করি। ফরাসীরা ভারতবর্ষ থেকে প্রথমটায় বেশ কিছু কুলী-কামীন গুয়েদালুপে এবং মার্তিনিকে এনে ফেলে। তাদের আজ আর কোনো চিহ্ন নেই। দু-দশ ঘর এখনও ভারতীয় আছে যারা নামে ভারতীয়ত্ব বজায় রেখেছে। ভাষায় ফরাসী, ক্রিওল্; ধর্মে ক্যাথলিক; বেশে ভূষায় মার্তিনীক। De Senrath দেখলে দশরথ-এর বংশ মনে করতে হবে; কোনো আস্ত দশরথ। তেমনি আনামাংথডু, মনিরাপপা, বীরুধারার; এদের বর্তমান নাম যদি Annam-et-Judeum, Muni-e-Peus বা Beur-ut-Deuer হয়ে গিয়ে থাকে, সাবধানে বুঝে নিতে হবে এ নাম ও রঙের পেছনে—ও নামের বক্তব্য কী! এখনও ওদের বাড়ীতে যে 'দাদা' 'দাদী' আছে, তাদের চোখ-মুখ-নাক দেখে, হরিদ্রা-প্রীতি দেখে, তেঁতুল এবং লঙ্কার আকৃতি দেখে আবিষ্কার করে নিতে হবে। বানান যা-ই হোক, নামটা ভারতীয়ই বটে। তবে আজকাল সদ্য সদ্য কিছু কিছু কাথিয়াওয়াড়ী এবং ইস্ট আফ্রিকা এবং ঘানাচ্যুত স্বর্ণ-বণিক তেজারতীর জন্য এইসব দ্বীপে উপস্থিত হয়েছে। 'একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়'—এদেশে তাদের অবশ্য প্রাচীন কোনোই পরিচয়।

(ক্রমশঃ)



॥ ১৩ ॥

তবে স্বাভাবিক অবস্থায় নানুর আসল চেহারাটা কদাচিৎ প্রকাশ পায়। গেলেও কয়েক মুহূর্তের জন্যে। পরক্ষণেই আবার ভাঁড়ামিতে ফিরে যায় সে। এ-ভাঁড়ামিতে তার লজ্জাও নেই, সঙ্কোচও নেই। সকলের সঙ্গেই সমান ভাঁড়ামি করে যায়—কেবল জি-সি ছাড়া। তাঁকেই যা-কিছু সমীহ করে, ভয় করে। দেখা হলে প্রণাম করে। সুরোকে বলে, 'ও'র মধ্যে আগুন আছে, বুঝলি? আগুনে যেমন আরশোলা কি কোন পোকা কি নোংরা জিনিস ফেললে কিছুক্ষণের জন্যে একটা দুর্গন্ধ বেরোয় কিন্তু তাতে আগুনের কোন ক্ষতি হয় না—সে-দুর্গন্ধও ঐ বদ জিনিসটা পুড়ে ছাই হবার সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে যায়—ও-মানুষটাও তেমনি। ও'কে কোন অনাচারই অপবিত্র করতে পারবে না কোনদিন।'

আর সমীহ করে নানু সুরবালাকেই। সেটা অনেকদিন লক্ষ্য করেছে সুরো। মুখে যা-ই বলুক, প্রণয়-নিবেদনটা ওর ভাঁড়ামিরই অঙ্গ কিন্তু সে সবই প্রকাশ্যে, পাঁচজনের সামনে। আড়ালে কখনও কোন ঘনিষ্ঠতা করতে আসেনি কোনদিন, কাছা-কাছি বসে কথা কয় বটে, পাশে বসতে চেষ্টা করে না, স্পর্শ করারও না। অথচ এই থিয়েটারেই এমন কোন মেয়ে নেই বোধহয় —ছোট বা বড়—যার হাত ধরে টানাটানি করে না বা কাঁধে হাত রেখে কথা বলে না। পাঁচজনের সামনে সুরোর সঙ্গেও খিস্তি-খেউড় করে, নোংরা রসিকতা করে। কখনও কখনও গালমন্দও দেয়। ওদের বাড়িতেও এসে গেছে এর মধ্যে ক'দিন। প্রথম প্রথম নিস্তারিণী খুব কঠিন হয়েই ছিলেন, ভ্রূকুটি করে বেশ কড়া সুরেই কথা বলে-ছিলেন কিন্তু নানু 'মা' বলে সম্বোধন করে আর সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে একেবারে গলিয়ে দিয়েছে। নানু এখন তার ঘরের ছেলে।

অন্তরঙ্গতা করতে না আসুক—তার খবর সব রাখে নানু। বোধহয় একটা গভীর সহানুভূতিও বোধ করে দলছাড়া গোত্রছাড়া এই মেয়েটার জন্যে। আর তা করে বলেই সমীহ করে। বলে, 'এখানে কেন মরতে এলে বাবা! সাতজন্মেও এদের মধ্যে খাপ খাওয়াতে পারবে না। একেবারেই গোত্তর ছাড়া যে তুমি। মায়া বাড়িয়ে আর লাভ কি? সরে পড়ো, সরে পড়ো। তোমার তো এখানে কোন আখের নেই—মাঝখান থেকে আর একটা মেয়ের অন্ন মারছ! তোমার জায়গায় যে-ই আসত সে-ই এ্যাদ্দিনে গুছিয়ে নিত।'

খবর যে রাখে তার প্রমাণ প্রথম পেল—যেদিন নিশ্চিত দেবেন বলে কথা দিয়ে রাখা সত্ত্বেও ক্যাশিয়ারবাবু এক পয়সাও দিলেন না। অথচ এর আগে আরও দুদিন তাগাদা হয়ে গেছে—এই ধরনের তাগাদার পর নিশ্চিত দেব বলে কথা দিলে তার খেলাপ করেন না ভদ্রলোক সাধারণত—যা-হয় কিছু দেনই। ও'র কথার ওপর নির্ভর করেই বাড়িওলাকে কথা দিয়ে রেখেছে সুরো—পরের দিন অন্তত কিছু দেবেই। তার নিজের কথা হলেও তত ক্ষতি হত না, বাড়িওলার সঙ্গে কথাটা হয় বাবার মারফৎ, সে-কথার খেলাপ হলে তাঁর অপমান।... চুপ করে একপাশে বসে আছে গুম খেয়ে—হঠাৎ নানুই এসে খবর দিলে, 'তোর গাড়ি তৈরী রে সুরো, যা—বাড়ি যা।' তারপর সঙ্গে সঙ্গে নিজেও বাইরে এসে—গাড়িতে ঢোকার আগেই—হাতে কী একটা গুঁজে দিয়ে বললে, 'যা নিয়ে যা, বাড়িওলাকে দিয়ে দিস।' গাড়িতে অন্য মেয়েও ছিল, তখন আর দেখা হল না, বাড়িতে ফিরে দেখল, কাগজে মোড়ক-করা পাঁচটা টাকা।

তারপর সুরো টাকা পেয়ে যখন ফিরিয়ে দিতে গেছে—স্থিরদৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে বলেছে, 'দিবি? কেন—নইলে আত্মসম্মানে বাধবে? তা দে।...তবে দ্যাখ, ও আমার টাকা নয়। আমার সেই অবস্থা—মেগে পাই বিলিয়ে খাই। তুই দিলেও এখনই বাজে খরচে চলে যাবে, হয়ত শুঁড়িবাড়িতেই চলে যাবে খরচ হয়ে যাবে। রেখেই দে না বাপু, বরং পরে যখন তোর খুব পয়সা হবে, এর সুদসুদ্ধ চেয়ে এনে এমনি অপর কাউকে দেব—কিম্বা ফুর্তি করে মদ খাবো?'

শুধু ঐ একবারই নয়—আরও দু-একবার এ-ঘটনা ঘটেছে। দু টাকা-পাঁচ টাকার ব্যাপার অবশ্য, কিন্তু প্রতিবারই সুরো লক্ষ্য করেছে। তার অতি সংকট মুহূর্তেই কী করে যেন জানতে পেরে—নিজে থেকে, স্বেচ্ছায় গোপনে হাতে গুঁজে দিয়ে গেছে কিন্তু তার জন্যে কোন সুবিধার দাবী করেনি। ঐ টাকা দেবার সময় ছাড়া স্পর্শও করেনি কখনও।

এই নানুই তাকে প্রথম সাবধান করে দেয়, 'ওরে, এই বেলা মানে মানে সরে পড়, ওরা আদাজল খেয়ে লেগেছে এবার।'

কথাটা তখন বোঝেনি, বুঝল কয়েক-দিন পরে।

পরবর্তী নূতন বইয়ের রিহার্স্যাল শুরু হবে শিগ্‌গির—অনেকের মুখেই শুনেছিল। তার আগ্রহও নেই—কৌতূহলও নেই। কী নাটক, কবে শুরু হবে—তা নিয়ে আলো-চনাও করেনি কারও সঙ্গে। তার কি পার্ট থাকবে, তাও জানার কথা মনে হয়নি। যা হোক একটা ছোটখাটো পার্ট দেবেই তাকে, যখন দেবে তখন শুনবে, সেদিন আসতে বলবে সেদিন আসবে—তার আর কি?

হঠাৎ একদিন রিহার্স্যাল-মাস্টার—এখানের হিরো অভিনেতাও—অমর্ত্য মিত্তির ওকে ডেকে পাঠালেন। সুরো গিয়ে দাঁড়াতে বললেন, 'বসো। তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

সুরবালা বিস্মিত হলেও সে-বিস্ময় প্রকাশ করল না। নির্দেশমতো সামনের টুলটার ওপর বসল।

'দ্যাখো, আমি এখানকার শিক্ষক তো, সবাইকেই আমি ওয়াচ করি, মানে লক্ষ্য করি। সেটা দরকার—সেটাই আমার কাজ। নইলে নতুন নতুন লোক তৈরী করব কি করে?'

এতখানি ভূমিকা কিসের, অবাক হয়ে ভাবে সুরো—বিশেষ তার মতো সামান্য প্রাণীর সঙ্গে কথা বলার? তবে চুপ করেই থাকে। এ-কথায় আর উত্তরই বা কি। যাঁর বলবার আছে তিনি বলবেনই—তার সায় দেওয়া অনাবশ্যক।

বললেনও তিনি—ওব উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করেই—'তোমার মধ্যে পার্টস্ আছে আমি লক্ষ্য করেছি। মানে শক্তি আছে, তবে উৎসাহ কম। বোধহয় এইসব ছোটখাটো পার্ট পাও বলেই তেমন আগ্রহ বোধ করো না। কিন্তু এভাবে তো চলবে না। চিরদিনই কি আর তুমি এই মাইনেতে থাকবে? উন্নতি করা দরকার। তাই আমি ঠিক করেছি, তোমাকে একটা বড় পার্ট দিয়ে দেখব। নতুন বই জি-সি লিখছেন, কিন্তু তার দেরি আছে, তাতেও বড় পার্টই থাকবে—তবে আপাতত এই সামনের বড়-দিনে আমরা বঙ্কিমবাবুর বিষবৃক্ষ খুলব। বিক্রি ঝুলে গেছে দেখছই তো—একটা কিছু করা দরকার। তোমাকে ঠিক করেছি হীরার পার্ট দেব। হীরা ঝি—কিন্তু তার চরিত্র খুব জটিল। এর আগেও হয়েছে একবার, খুব বড় অ্যাকট্রেস একজন এই পার্ট করেছেন। গান আছে, ম্যাড্-সিন আছে—বদমাইশী শয়তানী আবার প্রেম—হীরা চরিত্রে একাধারে সব আছে। যদি জমাতে পারো—এই এক পার্টেই নাম করবে।...তুমি বাংলা পড়তে পারো আমি শুনেছি, এই বইটা নিয়ে যাও, ছাপা বই—অসুবিধে হবে না। পড়ে যতটুকু বুঝতে পারো নিজে বোঝবার চেষ্টা করো। তারপর এখানে যেদিন পার্টটা পড়া হবে—সেদিন আমি চরিত্রটা ঠিক কি বুঝিয়ে দেব। সময় কম, খুব চেপে রিহার্স্যালও দিতে হবে কদিন—তেমন দরকার হলে ভোরে চলে আসবে, এখানেই খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করব—একেবারে সন্ধ্যে পর্যন্ত রিহার্স্যাল চলবে। আবার সারারাতও থাকতে হবে দু-একদিন। বই খুলব-খুলব সময়ে দিন-দুই অন্তত প্লের পরও রিহার্স্যাল দিতে হবে। সে বলে দেব, কবে কোনদিন, বাড়িতে বলে আসতে পারবে। আচ্ছা...এখন যাও।'

নিতান্তই কাজের কথা। সেইভাবেই বলা। অনুগ্রহ বটে—তবে সেটা যে অনুগ্রহ তা বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা নেই। সেজন্যে কোন সুবিধা আদায় বা দাবী উত্থাপনের ইঙ্গিত নেই। শিক্ষক ছাত্রীর সম্পর্ক যা হওয়া উচিত—মনিব ও কর্মচারীর—সেই ধরনেরই কথা। নিখুঁত। কোন দুরভিসন্ধি থাকলেও তা বোঝার উপায় নেই। কোন বিশ্বনিন্দুক দুর্মুখও এঁর কথার ভঙ্গীতে কোন দোষ ধরতে পারবে না।

তবু বইখানা হাতে নিয়ে চিন্তিত মুখেই বাড়ি এল সুরবালা। আজ আর নানুকে থিয়েটারের ত্রিসীমানায় দেখা গেল না। তাকে পেলে [illegible] একটা হদিশ মিলত হয়ত। অন্তত [illegible] কথাটা জিজ্ঞাসা করতে পারত—এর [illegible] দিয়েছিল কিনা।...[illegible] কি [illegible] প্রণয়-নিবেদনেরই পূর্বাভাস? [illegible] হাত করার চেষ্টা; [illegible] রিহার্স্যাল দেওয়ার নাম করে ঘনিষ্ঠ হবার ইচ্ছা? ...ওঁর সম্বন্ধে অনেক দুর্নাম আছে। উনি নাকি যখন যে নতুন মেয়েকে দিনরাত পার্ট শেখাতে শুরু করেন—অনেক সময় ঘরের দরজা বন্ধ করেও—সে-মেয়ে বড় অভিনেত্রী হয়ে যায় তাতে সন্দেহ নেই—কিন্তু মেয়েদের জীবনে যা বড় জিনিস, সেটি তাকে ঐ রুদ্ধ দরজার ওপারে রেখে আসতে হয়। তার অদৃষ্টে কি এই পরিণতি নাচছে?...

বাড়িতে এসে পড়ল বইখানা। এর আগেও পড়েছে খানিকটা। গণেশ কোথা থেকে একখানা পাতা ছেঁড়া বই এনেছিল, শেষের কটা পাতা পড়তে পায়নি। এবার সবটাই পড়ল। পার্ট বড় তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু মনটা খুশী হল না। উৎসাহ বোধ তো করলই না। প্রথমত এ-জগতে খ্যাতি তার কাম্য নয়—দ্বিতীয়ত ঐ দুশ্চিন্তাটা। আবছা অস্পষ্ট একটা আতঙ্ক। নামহারা আকারহীন ভয়। খালি বাড়িতে একা থাকার মতো।

পরের দিনও যথেষ্ট সংশয় এবং আশঙ্কা নিয়েই থিয়েটারে গেল।

কথাটা এতক্ষণে 'চাউর' হয়ে গেছে যে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ-সব কথা এখানে চোখের নিমেষে রাষ্ট্র হয়ে যায়। অর্থাৎ তার সম্বন্ধে অন্য মেয়েদের ঈর্ষা ও বিদ্বেষের কারণ বেড়েই গেল। আরও বেশী বাক্যবাণ সইতে হবে।...আশঙ্কাটা সেইজন্যে আরও। সইতে পারবে তো শেষ-পর্যন্ত? অকারণে সইতে হবে বলেই হয়ত আরও দুঃসহ হয়ে পড়বে।

কিন্তু থিয়েটারে পা দিয়ে আরও অবাক হয়ে গেল।

যেন কোন্ যাদুমন্ত্রে রাতারাতি এখানের আবহাওয়া বদল হয়ে গেছে। কঠিন ব্যঙ্গ, কদর্য রসিকতা ও কুৎসিত ইঙ্গিতের জন্যেই সে নিজেকে প্রস্তুত রেখেছিল—এসে তার চিহ্নমাত্রও দেখল না। তার বদলে যেন মনে হল—সকলের ব্যবহারেই একটা সম্ভ্রমের ভাব, অমায়িক আত্মীয়তারও। দু-একজন এসে ওর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করল। শরীর কাহিল হয়ে যাচ্ছে কেন, দুধ খায় কিনা, একটু করে অন্তত দুধ খাওয়া উচিত ওদের স্বাস্থ্যটাই তো মূলধন ইত্যাদি প্রশ্ন এবং উপদেশ বর্ষণ করতে লাগল। এক বড় অভিনেত্রী পানের ডিবে হাতের মধ্যে গুঁজে দিয়ে পান খাবার জন্যে পীড়াপীড়ি শুরু করলেন।

হেঁয়ালিটা বেড়েই যাচ্ছে ক্রমশ। এর সমাধান একমাত্র যার কাছ থেকে পাওয়া যেতে পারত—তারও পাত্তা নেই। সে নাকি কাল থেকে একেবারে গায়েব হয়ে আছে কোথাও। পাঁচটা মিনিটের জন্যে তাকে আড়ালে পেলেও জিজ্ঞাসা করতে পারত এর রহস্যটা কি?

কিন্তু তা হল না। কিছুই জানা গেল না শেষপর্যন্ত। অধিকতর বিস্ময় ও দুশ্চিন্তা নিয়ে বাড়ি ফিরতে হল।

পরের দিন সকালে বই পড়ার কথা। গাড়ি আসতে তাড়াতাড়ি নেমে গিয়ে সুরো দেখল এক বড় অভিনেত্রী আগে থেকেই গাড়িতে বসে আছেন। কাঞ্চন নাম—কাঞ্চনমালা। কাঞ্চী বলেও ডাকে অনেকে। ইনি সাধারণত তাদের মতো সাধারণের দলে যান না, হয় একা যান নয় তো তাঁর সমপর্যায়ের কোন অভিনেত্রীর সঙ্গে। দৈবাৎ কোন কারণে এমন যাবার দরকার হলেও চুপ করে গম্ভীর হয়ে বসে থাকেন। আজ সুরোকে দেখে অতি মধুর অমায়িক-ভাবে হেসে বললেন, 'এইটিই বুঝি তোমাদের বাড়ি ভাই? দেখিনি কখনও। ইদিকে তো আসা হয় না। তা চলো না ভাই, তোমার মাকে একটু পেন্নাম করে আসি। তোমরা তো শুনেছি বেরাহ্মণ—বর্ণগুরু। নাকি তাতে কোন দোষ হবে? না হয় না-ই ছুঁলুম, দূর থেকেই দণ্ডবৎ করে আসব?

এরপর সাদর আহ্বান জানানো ছাড়া উপায় থাকে না। 'না না, দোষ কিসের—আসুন না।' বলতেই হয়।

সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে একে একটা মাদুরও পেতে দিতে হয়।

তাঁর দামী চওড়া-পাড় শান্তিপুরে শাড়ি আর গা-ভর্তি গহনার দীপ্তিতে নিস্তারিণীও অভিভূত হয়ে যায়। বিশেষ এমন মানুষ যদি দূর থেকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে অনুমতি চায়, 'পায়ের ধুলো একটু পাব মা?' সে গলে যায় একেবারে।

কাঞ্চনমালা একবার চারদিকে তাকিয়ে নিয়ে বলেন, 'বাঃ, তা ছোটখাটোর ওপর বাড়িটি তো ভালই।...আপনার ইদিকটা তো অন্তত একালে, কারুর সঙ্গে নেপচ নেই। আমার অবিশ্যি নিজের বাড়ি—তা পোড়ার কী কুক্ষণে যে ভাড়া বসিয়েছি, রাতদিন ক্যাচর-ম্যাচর—অশান্তি লেগেই আছে।'

নিস্তারিণী এতটা আত্মীয়তায় আরও বিচলিত হয়ে পড়ে। কী বলবে, এক্ষেত্রে কি বলা উচিত, কী বললে এই আত্মীয়তার

উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া হয়—ভেবে না পেরে যে-চিন্তাটা মনের মধ্যে অগ্রগণ্য সেইটেই প্রকাশ করে ফেলে। বলে, 'হ্যাঁ! আমাদের আবার বাড়ি! কোনমতে মাথাগুঁজে থাকা। বাড়ির আয়-পয়ও যা। এর আগে যে মেটে-বাড়িতে ছিলুম, সে আমার ঢের ভাল ছিল। সেখানে থাকতে মেয়ের যা কিছু উন্নতি, ও-বয়সে অমন কারুর হয় না। সেই মেয়ে আমার শখ করে পাকা-বাড়িতে এসে কী কষ্টটা না পাচ্ছে।'

'না না মা, এ-বাড়ির পয়ও ভাল। দেখে নেবেন।' কেমন একরকমের অর্থপূর্ণ মুচকি হাসি হেসে বলেন অভ্যাগত, 'আপনার মেয়ের এ-অবস্থা কি থাকবে ভাবছেন! বরাতের চাকা ঘোরে মা, কখনও রাত্তির, কখনও দিন। তা রাত কাটল বলে। এবার খোলকেলাওটা দেখে নেবেন।'

এই বলে হেসে, আর একবার বর্ণ-গুরুর পায়ের ধুলো নিয়ে, চারিদিকে ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের যেন তরঙ্গ তুলে উঠে বেরিয়ে বললেন, 'বসবার কি জো আছে মা, তেমন মস্টাব নয় অমত্য মিত্তির—আবার তার সঙ্গে সোনায় সোহাগা এসে জুটেছেন সায়েব, দু-ই কড়া হাকিম—রিয়েসালে দেরি হলে কাউকে রেয়াৎ করবে না, বাপের নাম ভুলিয়ে ছেড়ে দেবে।......চলো ভাই, চলো—'

এটা সবটাই পূর্বপরিকল্পিত কিনা বুঝতে পারে না সুরবালা। যে কথাগুলো বলে এলেন ইনি—স্তোকবাক্য না বিদ্রূপ, নিছক সৌজন্যের বিনিময় না আর কিছু—ঠিক করতে না পেরে আরও ছট্‌ফট্‌ করে মনে মনে।

সেদিন আগেই পুরো পার্টখানা পড়া হল। নাটকটা লেখা হয় একরকম, তারপর অভিনয়ের সুবিধের জন্যে কাটছাঁট অদল-বদল করা হয়। যেমনটি দাঁড়ায়, মানে যেমনটি অভিনয় হবে—সেইটেকেই 'শাট' বলে। সুরবালা এসব কিছুই জানত না। প্রম্পটার হরিপ্রসন্ন বুঝিয়ে দিল তাকে। ছাপা বই দেখে প্রম্পট্‌ করা চলে না, তাই যেসব নাটক ছাপা বাজারে পাওয়া যায়, তা থেকেও শাট তৈরী করে রাখা হয় নাকি। প্রম্পটার আড়ালে দাঁড়িয়ে সেই শাট দেখে পাত্র-পাত্রীদের কথার খেই ধরিয়ে দেয়।

পড়া শেষ হলে প্রধান প্রধান চরিত্র-গুলি একটু বুঝিয়ে দিয়ে 'পার্ট' বিলি করে দিলেন অমর্ত্যবাবু। জি-সি ছিলেন না, বাকি সবাই ছিল। দু-তিনটে বড় পার্ট বিলি করার পরই হীরার পার্ট লেখা কাগজের তাড়াটা ইঙ্গিতে সুরবালাকে ডেকে তার হাতে দিলেন। যার যতটুকু বক্তব্য—সেইটুকু শুধু নকল করিয়ে—বাকি এই চরিত্রের সঙ্গে যারা যে-দৃশ্যে কাজ করবে, তাদের উত্তর-প্রত্যুত্তরের প্রথম ও শেষ কটা শব্দ মাত্র রেখে—আলাদা আলাদা লিখে দেওয়া হয়, মুখস্থ করার জন্যে। আগে থাকতে মুখস্থ থাকলে রিহার্স্যালের সুবিধা হয় অনেক।

শতবর্ষ পূর্বে
যাত্রা শুরু করেছিল

অমৃত বাজার পত্রিকা

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ সম্পাদিত এই পত্রিকাটি বাঙালীর সামগ্রিক জীবনধারায় তুমুল আলোড়ন তুলেছিল। সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক প্রবাহে এর গৌরবময় অতুলনীয় মহিমা আজও অম্লান।

আগামী ২০ ফেব্রুয়ারী

অমৃত বাজার পত্রিকা

শতবর্ষে পদার্পণ করবে। বাঙালী সম্পাদিত অন্য কোন পত্রিকা আজও এই গৌরব অর্জন করতে পারেনি।

এই উপলক্ষে
বহু মূল্যবান নিবন্ধ সমাবেশে
অমৃতের একটি

বিশেষ সংখ্যা

প্রকাশিত হবে
আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারী।

কথাটা জানাই ছিল, এখানে 'যা রটে' তা প্রায়ই ঘটে। তবু সুরবালাকে ডেকে পার্টটা হাতে দেবার সময় হঠাৎ যেন চারি-দিকে সবাই স্তব্ধ হয়ে গেল। নীরবে নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রইল এদিকে।

এদের মুখভাব দেখতে পেল না সুর-বালা, কিন্তু অনুমান করতে পারল, অবস্থা বা চারিদিকের আবহাওয়াটাও অনুভব করতে পারল। এ-অবস্থা যে স্বাভাবিক নয়, কিছুক্ষণ পূর্বের মৃদু গুঞ্জন যে অকস্মাৎ থেমে গেল কেন—তা অনুমান করা কঠিন নয়। এ-নিস্তব্ধতা ঝড় ওঠারই পূর্বলক্ষণ। এখানের স্তব্ধ বাতাসে বজ্র-বিদ্যুতের পূর্বাভাস।

পার্টটা হাতে দিয়ে অমর্ত্যবাবু বললেন, 'বইটা পড়েছিলে তো—যা বললুম তাও শুনলে। আজ বাড়ি গিয়ে পার্টটা মুখস্থ করে ফ্যালো। কাল তিনটের রিহার্স্যাল বসবে, সেই সময় মুখস্থ ধরব। সেই সময়ই দেখব তুমি কি বুঝেছ, কেমন-ভাবে বলো—তারপর আমি যা শেখাবার শেখাব। খাটতে হবে বাপু। তুমি তো নতুন—এ-পার্ট করতে পাকা অ্যাকট্রেসরাই হিমসিম খেয়ে যায়।'

কে যেন পিছন থেকে খুব আস্তে কি বলে উঠল। সুরবালার মনে হল বলল, 'ওরে বাবা পাকারাই তো হিমসিম খাবে! কাঁচাদের তো সাতখুন মাপ—পাকাদের তো আর তা নয়। কাঁচমুখে আধো বুলি—যা বলবে তাই শোভা পাবে!'

কে তার জবাবে বললে, আরও আস্তে, 'কাঁচির সবই ভাল, চিবিয়ে খেতেও কাঁচিই ভাল লাগে, বুড়ো জিনিস দাঁতে লাগে, জিভেও বিস্বাদ ঠেকে।'

অখণ্ড স্তব্ধতার মধ্যে অতি সামান্য শব্দও কানে যায়। অমর্ত্যবাবুরও কানে গিয়ে থাকবে—তিনি কঠিন দৃষ্টিতে মুখ তুলে চাইলেন একবার। সঙ্গে সঙ্গেই আবার তেমনি বিদ্যুৎগর্ভ নিঃশব্দতা নেমে এল।

এরপর আরও কিছুক্ষণ পার্ট বিলি চলল। দু-একজন খুচরো কথা বললেও আগের সে গুঞ্জন আর উঠল না।...

পার্ট বিলি হচ্ছিল স্টেজে বসে, যাদের পাওয়া হয়ে যাচ্ছিল তারা তা নিয়ে সকলেই স্টেজের বাইরে—অর্থাৎ ভেতরের দিকে চলে যাচ্ছিল। গ্রীনরুমেই বেশী জটলা। একমাত্র সুরবালাই শেষপর্যন্ত বসেছিল। ইচ্ছে করেই ওঠে নি। সব শেষ হতে উঠে ভেতরে এল। এখনই স্টেজে রিহার্স্যাল শুরু হবে, এখন আর বসে থাকার কোন অজুহাত নেই।

গ্রীনরুমের জটলার মধ্যে এসে দাঁড়াতেই দু-তিনজন বড়দরের অভিনেত্রী, যাদের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে আর কোন সংশয় নেই—যাঁরা সূর্যমুখী দেবেন্দ্র দত্ত প্রভৃতি বড় বড় পার্ট পেয়েছেন এইমাত্র—চন্দ্রমণি, কাঞ্চনমালা প্রভৃতি তাঁরা খুব অমায়িকভাবে ওকে ডাকা-ডাকি শুরু করলেন, 'এই যে—এসো ভাই, এসো।' এখানে এসো ভাই—এই যে এদিকে—'

আগের স্তব্ধতাও যেমন স্বাভাবিক নয়, এখনকার সকলরকম অভ্যর্থনাও তেমনি একটু বেশী অমায়িক। সুরবালা বিব্রত বোধ করে সামনেই একটা চৌকীর কোণে যে খালি জায়গাটুকু ছিল—সেইখানে বসে পড়ল। যার পাশে বসল, সে মেয়েটিও প্রায় নবাগতা, সেও এতকাল 'সখীশ্রেণীভুক্ত' ছিল—সম্প্রতি ছোটখাটো পার্ট পেতে শুরু করেছে। সে বললে, 'ভালই হল ভাই, ম্যানেজারবাবু তোমার উপযুক্ত পার্ট পেলে। যদি ক্ষমতা থাকে—এবার আখেরের কাজ করে নিতে পারবে।'

কণ্ঠস্বরে হৃদ্যতার অভাব ছিল না, কিন্তু সুর-বালার মনে হল একটু বেশী রকমেরই হৃদ্যতা। এতটা বেশী চেষ্টা না করলে গলার কাছে উপচে ওঠা বিষ ঢাকা যেত না।

এই অভ্যর্থনার আধিক্যেই সম্ভবত গুরোর নজরে পড়ে নি—নানুও এদের মধ্যে বসেছিল। কোথাও বোধহয় কারুও ব্যাপারে

অথচ কাল রাত্তির অসংখ্য বিসদৃশে রাত জাগতে হয়েছে সারা পথ, দুই চোখ লাল, মুখে কালি—ক্লান্তভাবে একপাশে জড়োকরা একটা বড়-গাড়ির ওপর বসেছিল; সে এবার বলে উঠল, 'কী বাবা, হঠাৎ সরো, রাতারাতি তোর কপাল ফিরে গেল নাকি? কোথাও কোন গুপ্তধন পেয়ে গেছিস—হ্যাঁরে? আজ তোর এত খাতির দেখছি যে!'

সরোর মুখ তখন সিঁদুরের মতো লাল হয়ে উঠেছে, এই ঠান্ডার মধ্যেও তার কপালে ঘামের রেখা—সে কোন উত্তর দিতে পারল না, কোনমতে মাথাটা তুলে বসে রইল শুধু। সে যখন কোন অন্যায় করেনি, মাথা নিচু করবে কেন? কিন্তু একটা অসহ্য ক্রোধ আর অপরিসীম ঘৃণায় তার সমস্ত মন তখন বিষিয়ে উঠেছে, উত্তর দেবার মতো অবস্থা তার নয়।

সে প্রয়োজনও হল না অবশ্য। তার হয়ে জবাব দিলেন এইমাত্র যিনি দেবেন্দ্র দত্তের বড় এবং দুরূহ পার্ট নিয়ে এলেন তিনিই—জর্দা দেওয়া পানের পিক্‌টা বাঁচাবার চেষ্টায় মুখটা একটু তুলে বললেন, 'তা খাতির করতে হবে বৈকি, এখন তো ওরই দিন। এখন থেকে একটু সনজরে থাকা ভাল।'

আর একজন টুক্ করে বলে উঠলেন, 'এবার থেকে আর তোকে সুপারিশ ধরতে হবে না নানু। এখন আমরা ভাল লোক পেয়ে গেছি, আমাদের আপনার লোক!'

এসব ইঙ্গিতের অর্থ পরিষ্কার, তবু এমন স্পষ্ট নয় যে জবাব দেওয়া যায়। দিতে গেলে 'ঠাকুরঘরে কে, না আমি তো কলা খাইনি' সেই প্রমাণে দোষী সাব্যস্ত হয়ে যাবে সম্পূর্ণ নিরপরাধেও। সে হঠাৎ মুখ তুলে বললে, 'আমার তো আর আজ এখন কোন কাজ নেই, আমি বাড়ি যাই না নানুদা?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ,—তাই যা। তোর মুখ শুকিয়ে গেছে। খেয়ে আসিস নি বুঝি? চ, আমি আবদুলকে বলে দিয়ে আসছি, তোকে এক খেপ্ পৌঁছে দিয়ে আসুক—'

কত কী প্রশ্ন করবে ভেবেছিল নানুকে, কত কি জানবার ছিল—এখন সেসব কিছুই করা গেল না। কথা বলারই শক্তি নেই যেন। মনের মধ্যেটা রি রি করছে, অপবিত্র ক্লেদাক্ত কিছু স্পর্শ করার মতো ঘৃণা বোধ হচ্ছে। শুধু গাড়িতে উঠতে উঠতে প্রায় রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'এ—এসব কি অসভ্যতা নানুদা! তোমাদের কি এই রকমই চলে এখানে?'

নানুও খুবই শ্রান্ত, অভ্যস্ত ভাঁড়ামিতে জবাব দিতে পারল না। হেসে বলল, 'তা ভাই বড় গাছে নৌকো বেঁধেছিস—ঝড়-ঝাপটা কিছু সইতে হবে বৈকি। ঝড় এসে উঁচু জায়গাতেই আগে পৌঁছয় জানিস তো—সেখানে যারা থাকে কাছাকাছি—তাদেরও খানিকটা ভাগ পেতে হয়। বরং আঘাত তাদেরই বেশী লাগে, পাড়ে বাঁধা নৌকাই ঝড়ের হাওয়ায় কি বনের তোড়ে অনেক আগে ভাঙে, যে নৌকো ভাসছে সে টিকে থাকে।'

'তোমাদের এখানে বুঝি হিংসে আর বিষ ছাড়া কিছু নেই। যারা অনেক উঁচুতে উঠেছে তাদেরও এত বিষ কিসের?'

'যে উঁচুতে উঠেছে তার যে পড়বার ভয় আছে এটা ভুলে যাচ্ছিস কেন, মাটিতে যে আছে তার আর ভাবনা কি, তার তো লব-ডঙ্কা। যে পেয়েছে তারই সদা হারাই হারাই ভয়।' বলতে বলতে গলাটা কেমন যেন তীক্ষ্ন হয়ে ওঠে, 'আয়নাতে নিজের চেহারাটা নজরে পড়ে না বুঝি ছুঁড়ি? না কি গলাটা কেমন শোনায় গাইবার সময় তা বুঝতে পারিস না? দোষ তোরও নয় ওদেরও নয়—দোষ ভগবানের। ভগবান তোকে এত দিয়েছেন যে যেখানে যাবি সেখানেই অন্য মেয়েদের মনে রাঁধের আগুন জ্বলবে। তুই এখন কতটা উঠেছিস তা তো ওরা দেখছে না—আরও কতটা উঠতে পারিস সেই হিসেব করছে যে। আচ্ছা, যা এখন—বাড়িতে গিয়ে ঘুমিয়ে নে, হঠাৎ কোন পাগলামি করে বসিস নি।'

নানু ঠিকই ধরেছিল, সে সময়ে দিক্-বিদিক জ্ঞান হারানো হঠাৎ পাগলামিতেই পেয়ে বসেছিল তাকে। অত তাড়াতাড়ি গাড়ি ঠিক না হলে—আর কিছুক্ষণ ঐ টিটকিরি আর আপাতমধুর বাক্যবাণ সইতে হলে সে বোধহয় পাগল হয়ে যেত, তখনই হয়ত অমর্ত্যবাবুর মুখের সামনে পার্টটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে চলে আসত। নানুই বাঁচিয়ে দিল তাকে।

নানুর কথামতো বাড়িতে ফিরে মাথার সামনেটায় একটু জল থাবড়ে দিয়ে শুয়ে পড়েছিল। ঘুম আসেনি—তবু মাথাটা ক্রমশ ঠান্ডা হয়ে এসেছিল ঠিকই। ফলে মধ্যাহ্নের সে মনোভাব আর থাকেনি, বরং মজা দেখার মনোভাবই জেগেছে, 'আচ্ছা, দেখাই যাক না ওরা কতদূর এগোতে পারে। আমি নির্বিকার থাকব, আর আমার মনে তো পাপ নেই—ওরাই নিজেদের হিংসের বিষে জ্বলে পুড়ে খাক হবে।'

পরের দিন বিকেলে তাই যখন রিহার্স্যালে গেল তখন আর আগের দিনের উদ্ধতার বিশেষ কিছুই অবশিষ্ট নেই, কৌতুকই তখন প্রবল। ওদের আপাত অমায়িক ব্যবহার খুব সহজভাবেই নিল সে। নিজের ব্যবহারেও কোন ত্রুটি ঘটতে দিল না। এ অমায়িকতাকে সে স্বাভাবিক ভাবেই বাহ্য মূল্যে গ্রহণ করেছে—এইটেই বুঝিয়ে দিল নিজের কথায় বার্তায় আচরণে।......

রিহার্স্যালের প্রথম পাঠ হিসেবে—সুরো নিজে যেমন বুঝেছে তেমনি ভাবেই বলল খানিকটা। মনে হল ভালই বলেছে। অমর্ত্যবাবু তো খুব বাহবা দিলেনই, স্বয়ং সাহেব সুদ্ধ বললেন, 'না হে, তুমি ঠিকই বলেছ, —এর মধ্যে জিনিস আছে, গড়ে-পিটে নিতে পারলে কালে ভালই দাঁড়াবে।'

সাহেবের কড়া মাস্টার এবং পাকা জহুরী বলে খ্যাতি আছে, তাঁর প্রশংসা পাওয়া ভাগ্যের কথা এ সকলের মুখেই শুনেছে সুরবালা। তাছাড়া তিনি নিজেও বড় অভিনেতা একজন। স্বয়ং জি সি ছাড়া তাঁর সমকক্ষ নাকি কেউ নেই।

'তা তুমি একটু দেখিয়ে দাও না!' অমর্ত্যবাবু বললেন, 'তোমার হাতে পড়লে গাধাও ঘোড়া হয়।'

'গাধাগুলোই থাক বরং আমার জন্যে।' সাহেবও হেসে জবাব দিলেন, 'একে তুমিই মানুষ করতে পারবে।'

কান এদিকে থাকলেও সুরবালা লক্ষ্য করছিল অন্য মেয়েদের। তাদের মুখে যে বিপুল বিস্ময় ফুটে উঠেছে তা তারা অতটা বুঝতে পারেনি বোধ হয়—বুঝতে পারলে সামলে নিত। সামলে নিলেও শেষ পর্যন্ত—একটা নৈর্ব্যক্তিক নিস্পৃহতা ফুটিয়ে তুলল—কিন্তু সেই অল্পক্ষণের অসতর্ক অবস্থাটা সুরবালা দেখে নিয়েছে, তাতেই সে খুশী, সেইটেই তার বিজয় গৌরব।

দুদিন সাধারণ রিহার্স্যাল চলল। এক-দিন সকাল থেকে চারটে অবধি চলবার কথা। সেদিন শনিবার, অমর্ত্যবাবু সুরোকে বলে দিলেন, 'তোমার সকালে আসবার দরকার নেই। তুমি তৈরী থেকো, তিনটেয় গাড়ি যাবে। এদের কাজ শেষ হলে তোমাকে নিয়ে পড়ব। তুমি রিহার্স্যাল দিয়ে গেল সেরে একেবারে বাড়ি ফিরবে। বাড়িতে তাই বলে এসো। তোমাকে অবশ্য শেষ অবধি থাকতে হবে না—তোমার তো প্রথম দুটো য়্যাকটেই যা গান আছে কটা—তুমি কাজ শেষ হলে আগে সকাল করে চলে যেয়ো, আমি আবদুলকে বলে রাখব।'

সহজ স্বাভাবিক কথা। কিন্তু উপস্থিত অনেকেরই ঠোঁটের কোণে ঈষৎ হাসির আভাস দেখা গেল। অতি সামান্য অবশ্য, হাসি না বলে হাসির ইশারা বলাই উচিত। এর অর্থ অতি পরিষ্কার। সুরবালারও বুকটা যে একবার কেঁপে না উঠেছিল তা নয়। এইটেই তার অগ্নিপরীক্ষা। আবার প্রায় তখনই মনে জোর আনল। শশীবৌদির কথা মনে পড়ল। তিনি বলেন, 'কেউ নিজে নষ্ট না হলে তাকে নষ্ট করা যায় না। পদ্মিনীর গল্প শুনেছিস তো, তার জন্যে একটা রাজ্য ছারখার হয়ে গেল—যা লোক মরেছে শুনেছি তাদের পৈতের ওজনই সাড়ে চুয়াত্তর মণ—যা থেকে সাড়ে চুয়াত্তর দিব্যি হয়েছে—কিন্তু তবুও পদ্মিনীকে পারল নষ্ট করতে? সে তো হাসতে হাসতে স্বর্গে চলে গেল।...তার জোর করে যদি কেউ কিছু করেও—তাতে আত্মাটা তো নষ্ট হয় না। সে রকম ব্যাপারে মেয়েটার কোন পাপ হয় বলে আমি বিশ্বাস করি না।'

স্বেচ্ছায় নষ্ট হবে না সে, কোন কিছুর লোভেই নয়।

আর জোর? ঐ প্রায় বৃদ্ধ মানুষটা জোর করে তাকে কাবু করতে পারবে বলে মনে হয় না।......

অবশ্য অগ্নিপরীক্ষাটা আর শেষ অবধি দেবার প্রয়োজনই হল না।

সেদিন বাড়ি ফিরে দেখল তার বাবা সেই অসময়েই শুয়ে পড়েছেন। প্রথমটা ভেবেছিল শরীর খারাপ, ব্যস্ত আর উদ্বিগ্ন হয়ে খবর নিতে যাচ্ছিল— কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কেমন যেন একটা খটকা লাগল। ভবতারণ ওদিকে ফিরে দেওয়ালের দিকে মুখ করে শুয়ে আছেন, সুরোর গলা পেয়েও এদিকে ফিরলেন না। এটা একেবারেই অস্বাভাবিক। যত অসুস্থই হোন, আর সে যত রাত্রেই ফিরুক—গাড়ির শব্দ আর পায়ের আওয়াজ পেয়ে এদিকে ফিরে তার কুশল প্রশ্ন করেননি বা তাকে দেখে স্নেহে আনন্দে বাবার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠেনি—এমন একদিনের কথাও মনে পড়ে না।

তবে কি ঘুমিয়েই পড়লেন?

সে ওঁকে আর বিরক্ত করল না। পা টিপে টিপে বেরিয়ে এসে মায়ের সন্ধানে গেল। নিস্তারিণী অন্যদিনের মতোই রান্নাঘরে ছিল, কিন্তু দেখল সেখানেও অবস্থাটা ঠিক স্বাভাবিক নয়। উনুন নিভনো, রান্নাও হচ্ছে না—তবু সেই উনুনের ধারেই মুখ অন্ধকার করে বসে আছে সে।

'হ্যাঁ মা, বাবা এমন অসময়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন যে? শরীর খারাপ নাকি? কী হয়েছে বাবার?'

নিস্তারিণী যেন এই প্রশ্নটার জন্যেই এতক্ষণ কষ্টে অপেক্ষা করছিল, সে ফেটে পড়ল এবার, 'তোমার মতো কুল উজ্জ্বল-করা মেয়ে যার—তার আর শরীর মন খারাপের অপরাধ কি বাছা? একেবারে ঘুমিয়ে না পড়া পজ্জন্ত তো আর শান্তি হবে না। সেইটে হচ্ছে না বলেই তো যত জ্বালা।...পোড়ারমুখো বিধেতা যত ভরন্তরন্ত সংসার ভেঙে ঘরণী গিন্নীদের টেনে নিতে পারে—আমাদের বেলায় একবার মনেও পড়ে না যে যমদূতদের খবরটা দেবে!'

'তার মানে? নতুন এমন কি হল, আবার?'

অসহ্য ক্রোধে মাথার মধ্যে দপ্ করে জ্বলে উঠলেও সে অসহিষ্ণু হয় না, শান্ত কণ্ঠেই প্রশ্ন করে।

'আর কি হতে বাকি আছে? আরও কি চাও?......এতকাল কত বড় বড় কথাই না শুনে এলুম। সেই যদি ধম্মটাই দিলি, একটা তুচ্ছ জিনিসের জন্যে একটা বুড়োর কাছে শুইয়ে বসে রইলি। পরকালও গেল, এহকালেও কিছু হল না। কী না বড় পার্ট দেবে সে। ওতে তোর কী জাতগুষ্ঠি উদ্ধার হল তাই শুনি? ক পয়সা পাবি তুই? কত টাকা মাইনে হবে তোর? তাতে কোঠা বালাখানা উঠবে—না জুড়িগাড়ি চড়তে পারবি?'

সবটাই অন্ধকার ছিল এতক্ষণ, এইবার যেন কোথায় একটা ঝাপসা ঝাপসা অস্পষ্ট আলোর আভাস পায়।

'আমি ধর্ম দিয়েছি—বড় পার্টের জন্যে? বুড়োর কাছে? এসব কে বললে তোমাদের? কার কাছে শুনলে এসব কথা?'

'যার কাছেই শুনি না—হ্যাঁ কি না তাই জবাব দে না!'

'জিজ্ঞেস তো কিছু করো নি মা যে জবাব দোব। একেবারে ধরেই তো নিয়ে বসে আছ। যে মেয়েকে বলতে গেলে জন্মের থেকে মানুষ করলে, এতকাল দেখলে—তাকে তো বিশ্বাস হল না—এক কথায় বিশ্বাস করে বসে রইলে অজানা অচেনা কে পর কে বলে গেছে তার কথায়।...তোমাকে কি জবাব দোব, তোমার সঙ্গে কথা কইতেই আমার ঘেন্না হচ্ছে!'

আর দাঁড়াল না সেখানে সুরবালা। সোজা এসে বাবার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল, 'তুমিও ঐ কথা বিশ্বাস করলে বাবা? একবার বলো বিশ্বাস করেছ—আর কিছু করব না, আমার জন্যে তোমাদের মুখ হেঁট হতে দেব না, এ মুখও আর দেখাব না তোমাদের। গঙ্গার জল তো এখনও শুকোয় নি, সেখানে আমার মতো একটা মানুষের ঢের ঠাঁই হবে। গঙ্গায় গিয়ে গা ঢাকা দোব নিজের কোন লজ্জা ঢাকতে নয়—বাবো এর পরও যদি তোমাদের সঙ্গে ঘর করতে হয়—এই ঘেন্নায়!'

ভবতারণ ধড়মড় করে উঠে বসে মেয়েকে একেবারে কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন, 'আমার অন্যায় হয়ে গেছে মা, সত্যিই অন্যায় হয়ে গেছে। আমি জানি তুই আমার লোভে পড়ে কোনদিন কোন ছোট কাজ করবি না। তুই মাপ কর মা, বড্ড বুড়ো হয়ে গেছি, মাথার ঠিক নেই আর। ভিমরতি মনে করে এইবারটি মাপ কর।... ওরা এমনভাবে এসে বললে—'

আবেগে দুঃখে ভবতারণ বুকটা চেপে ধরে হাঁপাতে লাগলেন।

সুরবালা তাড়াতাড়ি তাঁকে শুইয়ে দিয়ে বুকে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, 'তুমি স্থির হও বাবা, তুমি বিশ্বাস করো নি—এইটেই আমি জানতে চেয়েছিলুম। আর আমার কোন দুঃখ নেই। সংসারে আর কে কি ভাবল কিম্বা কি বলল তার জন্যে আমার কোন মাথাব্যথা নেই। তুমি ঘুমোও আমি পায়ে হাত বুলিয়ে দিই—'

সেদিন আর কোন কথাই হল না। স্বামীর হাড়ভাজাভাজাকরা জ্বালা নবীতে গা জ্বালা করতে থাকলেও নিস্তারিণী আর কোন কথা বলতে সাহস করল না। কিন্তু কৌতূহলে ছটফট করতে লাগল মনে মনে। মেয়ের কঠিন কথাতে যত না হোক—কঠিনতর মুখের দিকে চেয়ে দমেই গিয়েছিল একটু। মেয়েটা যদি আর একবার জিজ্ঞাসা করে—কে এসেছিল, কেন এসেছিল, বেড়িয়ে বাবার নাম করে বাড়িতে ঢুকে বিষ



সূর্যমন্দিরে ফটো : দেবদাস চট্টোপাধ্যায়

উদ্গার করেছিল—তাহলে সে সবিস্তারে সবটা বলে বাঁচে, কে ওর মেয়ের এমন বন্ধু তাও বোঝা যায়।

'এই এসুম একবার বেড়াতে বেড়াতে, আপনি আমাকে চিনবেন না মা, আপনার মেয়ে চেনে—আমি তার খুব বন্ধু। বলি এদিকে এলুম—এ পাড়ায় তো আসা হয় না বড় একটা—তা এলুম তো দেখেই যাই একবার আমাদের সুরোর আস্তানাটা। অবিশ্যি বেশীদিন এখানে থাকতে হবে না এটাও ঠিক, দেখবেন এবার চড়বড় করে উন্নতি হবে। তবে এও বলি মা, এখানে যত উন্নতিই হোক—মাইনে আর কত হবে যে বিরাট কোঠাবালাখানা তুলতে পারবে— কি অঙ্গে গহনা উঠবে দু-এক ভরির? যে লাইনের যা, মাইনেতে আর আমাদের কী হয় মা?...... বোকা বোকা। সেই জাতটাই যদি খোয়াল, ধম্মটাই যদি দিল—একটা উঁচুদরের লোকের কাছে দিলে পারত। ওর যা চেহারা—তবু তো তেমন হেলাফেলাতে থাকে না—ওর সঙ্গে ভাব থাকলে মুনির মন টলে

তা সে মরুক গে, এমনিতেই কি ওর বড়-লোকের অভাব হত? তু করে ডাকলে কত গাড়িজুড়ি দোরে এসে ভীড় করত! ও বুড়োর আর কতটুকু ক্ষ্যামতা—কী বল মা? ......হ্যাঁ, নাম করে দিতে পারবে—সেটুকু ওর হাতে আছে, মানছি! কিন্তু তাতে কি আর পেট ভরবে!......তবে হ্যাঁ, বুড়ো আর কদিন, একবার নাম করে নিতে পারলে ওর হাত এড়াতে বেশী দেরি লাগবে না এটাও ঠিক, তখন অবিশ্যি বেছে বেছে মানুষ ধরতে পারবে।' ইত্যাদি—। তারপর নিস্তারিণীর প্রশ্নর উত্তরে বাকী যা বলবার সবই বলে গেছে, কিছুই বাকী রাখেনি।

নিস্তারিণী তার মুখের তোড়ে যেন অতিয়ে গিয়েছিল। এত কথা যে কেউ মিথ্যা বলতে পারে তা ওর একবারও তখন মনে হয়নি। এখন মনে হচ্ছে সত্যি হোক মিথ্যে হোক—দুচার কথা শুনিয়ে দেওয়াই উচিত ছিল ওর। ও কেন খামকা অপরিচিত পরের কাছে নিচু হতে গেল—ছোট হয়ে অপরাধী বনে রইল! মুখে দড় থাকতে কোন দোষ ছিল না তো! উলটে বোকার মতো লজ্জিত হয়ে মরমে মরে থেকে তার কথাটাই আরও সত্য প্রমাণ করে দিল।

কিন্তু এসব আপসোস এখন আর করে লাভ নেই। তবু নাম বা পরিচয়টা জানতে পারলেও ভবিষ্যতে কোনদিন দেখা করেও সে কিছু চোটপাট করে আসতে পারত। মেয়েকেও সমঝিয়ে দিতে পারত যে এইসব তোমার বন্ধু!......কথাগুলো নিয়ে যত তোলাপাড়া করতে লাগল—ততই যেন উত্তেজিত বোধ করতে লাগল—আপসোসও সেই অনুপাতে বেড়ে চলল। তবু এখনও এটা তার মাথায় গেল না যে, এমন কোন মানুষ কারও বন্ধু হতে পারে না। যে এত মিথ্যা বলতে পারে বন্ধু বলে পরিচয় দেওয়াটা তার পক্ষে এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। আর ঐসব দুষ্ট মেয়েমানুষদের বাড়ি গিয়ে ঝগড়া করে আসাও নিস্তারিণীর পক্ষে সম্ভব নয়!......

তবু সে সবই পরের কথা। কে এসেছিল সেটা জানতে পারলেও কিছুটা স্বস্তি পেত সে। কৌতূহলটাই আপাতত বেশী বেদনা-দায়ক। কিন্তু পোড়ার মেয়ে একবার জিজ্ঞাসাও করল না যে।

পরের দিন ঠিক তিনটেতেই গাড়ি এল। অন্য দিন সুরবালা মাকে বলে রাখে কখন বেরোতে হবে। তব-তারণের একটা ঘড়ি ছিল—পয়সার অভাবেই বহুকাল তাতে তেল দেওয়া হয়নি—বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। তা ঘড়ির খুব দরকারও হয় না, নিস্তারিণী আলোর দিকে চেয়েই আটকাটি সময় বুঝতে পারে, ওকে তাগাদা দেয় তৈরী হয়ে নেবার জন্যে। আজ কিছুই বলে নি, নিস্তারিণী ভরসা করে প্রশ্ন করতে পারেনি। কাল সেই সন্ধ্যে থেকেই মেয়ে কথা বন্ধ করে দিয়েছে। এখন গাড়ি এসে দাঁড়াতে ঘরের সামনে থেকে—যেন বা দেওয়ালটাকেই উদ্দেশ করে বলল, 'গাড়ি তো এসে হাজির হয়ে গেল, তা এদিকে তো কোন উযুগ সজ্জোগই দেখছি না। দাসীবাঁদীকে একবার মুখের কথাটা খসিয়ে জানিয়ে রাখলেই হত—আমার আর কোন্‌-কালে হায়পিত্তি আছে, আমি ঠিকই লজ্জা-ঘেন্নার মাথা খেয়ে ডেকে দিতুম। বাপ-সোহাগী বাপের কোন দোষ দেখতে পান না। যত বজ্জাত এই মা মাগী। হাত্তোর কপাল বটে!......এই পাজী বদমাইশ মেয়েছেলেটা না থাকলে বাপকে কোথায় পোঁতিস তার তো ঠিক নেই!'

সুরবালা শুয়ে শুয়ে একখানা পুরনো বঙ্গবাসী পড়ছিল। এ আক্রমণের কোন জবাব দল না, শুধু দরজার কাছে গিয়ে কোচোয়ানকে ডেকে বললে, 'তুমি চলে যাও আবদুল—আমি যাবো না।'

'এখন যাবে না দিদিবাবু? তবে আবার কখন যাবে? আমি কি একশবার এদিকে আসব?' অপ্রসন্নমুখে প্রশ্ন করে আবদুল।

'আর আসতে হবে না। তুমি বাবুদের বলে দিও—আমি আর কোনদিনই যাবো না। ও'রা যেন আমাকে বাদ দিয়েই ব্যবস্থা করেন।'

'সে সব কথা যা বলবার তুমি বলো। না হয় তো খৎ লিপে ভেজে দিও। আমি কোচোয়ান মানুষ, গাড়ি চালাই—আমার অত কথায় কাম কি?'

গজ গজ করতে করতে ঘোড়া হাঁকিয়ে চলে গেল সে।......

খানিক পরেই যথারীতি ভগ্নদূত এল—নান্দু দত্ত।

ওকেই আশা করেছিল সুরবালা। উঠে নিজে মাদুর থেকে নেমে মেঝের বসে মাদুরটা দেখিয়ে বলল, 'বসো।'

'কী হল রে আবার?' বসতে বসতেই প্রশ্ন করে নান্দু।

'কী হল তুমিই তো জানো। তোমারই তো জানবার কথা। তুমিই তো আমাকে সাবধান করেছিলে।'

গতরাত্রের ঘটনা খুলে বলল সে। গত কদিনের ঘটনাও।—নান্দুর সঙ্গে যে কদিন দেখা হয়নি—সেই কদিনের ঘটনা।

সব শুনে নান্দু চুপ করে রইল। বলল, হ্যাঁ, এটা হবে তা জানতুম। জানতুম মানে—ওদের জ্বালাটা জানা ছিল। তবে মাস্টার-মশাইয়ের দিক থেকে যে কোন সত্যিকারের বিপদ আছে আমি মনে করি না। ওদেরও নতুন নতুন লোক গড়ে তোলা দরকার—নইলে পুরনোদের বড্ড দেমাক হয়ে যায়, কাজ চালানো মুস্কিল হয়ে পড়ে। এদের সব অম্বল চাখা অভ্যেস তো—এ থিয়েটার ও থিয়েটার করে বেড়ায়।'

তারপর বললে, 'সবধান করে দিয়েছিলুম তবু ভেবেছিলুম তুই যা শক্ত—তুই ওদের ঘা ঠিক সইতে পারবি।......কিছু না, চুপ করে থাকলেই ওদের মুখের মতো জবাব দেওয়া হত। নিজেদের আগুনেই নিজেরা জ্বলে পুড়ে মরত।'

'আর কাজ নেই নানুদা। ঢের হয়েছে। অপরকে জ্বালাতে গিয়ে নিজেকেও কিছুটা জ্বলতে হত। ওদের ওপর আমার অত রাগ নেই। ওদের দোষ কি, যেমন শিক্ষা পেয়েছে তেমনিই আচরণ ওদের। শশীবৌদির কথাই ঠিক—কালীয় নাগকে বিষই দিয়েছেন ভগবান —সে বিষ ছাড়া অর কি ছড়াবে?...এমনিতেই আমার ভাল লাগছিল না—তার ওপর এই তুচ্ছ জিনিস নিয়ে অশান্তি—যা আমি ওদের মতো ভাগ্য বলে মনে করি না—তাই নিয়েই এত রেষারেষি এত বিষ—ও আর আমার দরকার নেই। ও যাদের ভাল লাগে তারাই নিক!'

'তা তোর এখন চলবে কিসে?' কিছু-ক্ষণ চুপ করে থেকে নান্দু প্রশ্ন করল।

'জানি না। এ-ই বা আর কি চলছিল। এক বাড়িভাড়াটা। দেখা যাক। এতকাল তো ভগবান চালিয়ে দিলেন। এবারও যা হয় তিনিই করবেন। এ কাজও তো ধরো দৈবাৎই পেয়ে গিয়েছিলুম। কিছুই তো জানতুম না, চিনতুমও না কাউকে। মার যদি ইচ্ছা হয় মা-ই পথ করে দেবেন—না হয়, তার মনে যা আছে তাই হবে। ও আর আমি ভাবব না।'

'দ্যাখ, যা ভাল বুঝিস।' নান্দু চলে গেল।

তারপরও দুচারজন কর্তাব্যক্তি এসে-ছিলেন। এসেছিলেন স্বয়ং অমৃতবাবুও—ধর্মদাসকে সঙ্গে করে, কিন্তু কেউই আর সুরোকে থিয়েটারে যেতে রাজী করাতে পারল না। কারণও বলল না কিছু। হয়ত ও'রাও কিছু আঁচ করে থাকবেন—কারণ জানবার জন্য ও'রাও বেশী পীড়া-পীড়ি করলেন না।

কেবল শশীবৌদিই সব শুনে বললেন, 'বেশ করেছিস।' একটা কুগ্রহ কাটল। সাতটা তুলসী পাতা মাথায় দিয়ে গঙ্গাস্নান করে আয়। ভগবানের ওপর ভরসা করেছিস, তাঁর ওপরই পূর্ণ বিশ্বাস রাখ। তিনিই যা হোক একটা গতি করবেন।'

ভগবান বোধ হয় এই পূর্ণ বিশ্বাস আর নির্ভরতার জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন।

এইবার তিনি মুখ তুলে চাইলেন।

অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁর কাছ থেকেই ডাক এল আবার।

(ক্রমশঃ)

বারাণসীতে বিজ্ঞান কংগ্রেস

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

পুণ্যতীর্থ বারাণসী এবার বিজ্ঞান তীর্থে পরিণত হয়েছিল। কারণ ইংরেজি নববর্ষের প্রথম সপ্তাহে এখানেই ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের পঞ্চান্নতম বার্ষিক অধিবেশনের আসর বসেছিল। প্রতি বছরের মতো এবারও কলকাতা থেকে আমরা এক বিরাট প্রতিনিধিদল এই উপলক্ষে বারাণসীতে সমবেত হয়েছিলুম। এই প্রতিনিধিদলে একদিকে যেমন ছিলেন প্রবীণ বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা, অপরদিকে তেমনি ছিলেন তরুণ বিজ্ঞানী, বিজ্ঞানকর্মী ও গবেষক ছাত্র-ছাত্রীরা। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় দু হাজার প্রতিনিধি এবারের অধিবেশনে যোগদান করেছিলেন। বারাণসীতে ভাষা-আন্দোলনের হাঙ্গামার আশঙ্কায় অন্যান্যবারের তুলনায় এবার প্রতিনিধি-সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম হয়েছিল বিশেষ করে দক্ষিণ ভারত থেকে।

বারাণসীতে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনের অনুষ্ঠান এই প্রথমবার নয়। ইতিপূর্বে আরও দুবার ১৯২৫ ও ১৯৪১ সালে এই পুণ্যতীর্থে বিজ্ঞান কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু সে দুই অধিবেশনে যোগদানের সুযোগ আমাদের অনেকেরই হয় নি।

৩ জানুয়ারী সকাল সাড়ে দশটায় এক মনোরম পরিবেশে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণে সুসজ্জিত মণ্ডপে বিদেশাগত বহু বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর উপস্থিতিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বিজ্ঞান কংগ্রেসের উদ্বোধন করেন। বারাণসীতে প্রধানমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে একদল হিন্দীপ্রেমী ছাত্রের বিক্ষোভের আশঙ্কায় পূর্বাহ্ণেই ব্যাপক সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। প্রতিনিধিদের প্রত্যেকের পরিচয়পত্র পরীক্ষা করে তবে অনুষ্ঠানে যেতে দেওয়া হয়। তা সত্ত্বেও চার-পাঁচজন হিন্দীসমর্থক ছাত্র কোনো উপায়ে বিজ্ঞান কংগ্রেসের সদস্য-পরিচয়পত্র সংগ্রহ করে মণ্ডপে উপস্থিত হয় এবং প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনী ভাষণের সূচনাতেই কৃষ্ণপতাকা প্রদর্শনের ও শ্লোগান দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু তা অতি অল্প সময়ের জন্যে। তারা প্রধানমন্ত্রীর বিরোধী ধ্বনি উচ্চারণের সংগে সঙ্গে শাদা পোশাকের পুলিশ তাদের মণ্ডপের বাইরে নিয়ে গিয়ে গ্রেপ্তার করে। তারপর শেষ অবধি শান্তিতেই সভার কাজ চলেছিল। অবশ্য হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে প্রধান প্রবেশ-পথের কাছে ছাত্র ও পুলিশের মধ্যে কিছু সংঘর্ষ ঘটেছিল।

কিন্তু একদিক থেকে বলতে গেলে হিন্দীপ্রেমীদের আন্দোলন সফল হয়েছিল। কারণ প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে উত্তর-প্রদেশের রাজ্যপাল ডঃ গোপাল রেড্ডি, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ অমরচাঁদ যোশী এবং বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি ডঃ আত্মারাম সকলেই তাঁদের ভাষণ হিন্দী ভাষায় শুরু করেন এবং শেষদিকে কিছু অংশ ইংরেজীতে বলে শেষ করেন। তাছাড়া স্থানীয় অভ্যর্থনা সমিতি প্রদত্ত পরিচয়পত্র থেকে শুরু করে যাবতীয় অনুষ্ঠানপত্র ইংরেজির পাশাপাশি হিন্দীতে ছাপা হয়।

স্তোস্ত্র পাঠের সঙ্গে সঙ্গে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা উদ্বোধন-সংগীত গাইবার পর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি উপাচার্য ডঃ যোশী এবং রাজ্যপাল ডঃ রেড্ডি বিদেশাগত বিজ্ঞানীদের ও ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত প্রতিনিধিদের স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী বিজ্ঞান কংগ্রেসের উদ্বোধনকালে বিজ্ঞানীদের উদ্দেশে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বিস্তারে বিজ্ঞান ও কারিগরী ক্ষেত্রে এক সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলার জন্যে আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য পৃথিবীকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলা, পারমাণবিক যুদ্ধের মাধ্যমে ধ্বংস করা নয়। অতি উন্নত এবং অনগ্রসর দেশগুলির মধ্যে অসাম্যও ধ্বংসের কারণ হতে পারে। যদি পৃথিবীতে ৭০ ভাগ দরিদ্রদের সঙ্গে অবশিষ্টাংশ অবস্থাপন্ন মানুষের জীবনযাত্রার বৈষম্য পৃথিবীর সকল দেশের সহযোগিতায় বিদূরিত না হয়, তা হলে বিশ্বে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে না।

তিনি আরও বলেন, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধির যে বিপ্লব ঘটেছে সেই চিন্তাধারার সঙ্গে বিজ্ঞানীদের চিন্তাধারার সামঞ্জস্য বিধান করে চলতে হবে। গত দু দশক ধরে ভারত অনগ্রসরতা ও দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে আসছে। শুধুমাত্র জীবনযাত্রার উন্নতির জন্যে নয়, সমাজে যে কোটি কোটি মানুষ সবচেয়ে অবহেলিত রয়েছে তাদের দিকেও আমাদের বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। তবেই প্রাচীন ধারণা ও সংস্কারের বশবর্তী মানুষকে আমরা আধুনিক জাতিতে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হব। পরিকল্পনাতে বিজ্ঞানের ব্যবহার যেমন বেশি করতে হবে, তেমনি বৈজ্ঞানিক উন্নতির জন্য পরিকল্পনার উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

উপসংহারে তিনি বলেন, সমাজ-বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রেখেই ভৌত ও কারিগরী বিজ্ঞানকে কাজ করতে হবে এবং এই সমস্ত প্রচেষ্টাই আমাদের জীবনকে নৈতিক মূল্যবোধ ও সমাজচেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে পারে।

মূল সভাপতি ডঃ আত্মারাম তাঁর ভাষণে 'ভারতে বিজ্ঞান' বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে [illegible] বিজ্ঞানের ভূমিকা, মানব সাধনার গুরুত্ব, বিজ্ঞানের আয়োজন ও সংগঠন, বৈজ্ঞানিক প্রতিভা ও জনশক্তি, বিদেশী সহযোগ এবং বিজ্ঞান, সরকার ও রাজনীতি প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য পেশ করেন। তিনি বলেন, প্রত্যেকটি জাতির সমৃদ্ধি ও স্বস্তি নির্ভর করে তার বৈজ্ঞানিক সামর্থ্য ও শিল্পশক্তির উপর। এজন্যে বিজ্ঞান ও শিল্পনীতিকে একসূত্রে গ্রথিত করার উদ্দেশে কারিগরী নীতি নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এর ফলে আমাদের বিজ্ঞান সংক্রান্ত অনেক নীতি কার্যকর করা সম্ভব হবে এবং আমাদের শিল্পনীতি সঠিক পথনির্দেশ পাবে। তিনি যে কারিগরী নীতির কথা বলেছেন সে প্রসঙ্গে এই কথাগুলি বিবেচ্যঃ (১) আধুনিক কারিগরী নীতি মূলধন-অভিমুখী এবং তাতে শ্রম লাগে কম। কিন্তু ভারতে পরিস্থিতি উল্টো অর্থাৎ মূলধন কম আর শ্রমিক অপর্যাপ্ত। (২) কোন কোন ক্ষেত্রে দেশের বাইরে থেকে জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজন আছে এবং এমন কোন ক্ষেত্র আছে যেখানে আমাদের নিজস্ব প্রয়োগশালা ও সংস্থা দ্বারা জ্ঞান সঞ্চয়ের জন্যে আমরা প্রতীক্ষা করতে পারি? (৩) কতিপয় ক্ষেত্র, যেমন ইস্পাত নির্মাণ, মূল রসায়ন, রক্ষা ও স্বাস্থ্য ইত্যাদি, যেখানে সর্বোত্তম কারু-বিদ্যা আমরা নিজেরাই গড়ে তুলতে পারি।

তিনি মনে করেন, ভারতের প্রগতি প্রধানত তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীলঃ (১) ভারতের বৈষয়িক সম্পদের পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষা ও পরিমাপ এবং যতদূর সম্ভব সেগুলিকে কাজে লাগানো, (২) পুঁজি যাতে উৎপন্ন হয়, সেজন্য উৎসাহ দেওয়া এবং (৩) জাতীয় লোকবলকে অর্থনীতির উন্নতিকল্পে কাজে লাগানো। এই তিনটি ব্যাপারেই তিনি বিদেশের মুখাপেক্ষী না হয়ে দেশের নিজস্ব সম্পদ যতদূর সম্ভব ব্যবহার করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

তিনি বলেন, বৈষয়িক সম্পদের উপর অর্থ লগ্নী করে যে লাভ হয়, তার চেয়েও অনেক বেশি লাভ হয় মানবিক সম্পদের (লোকবল) উপর টাকা খাটিয়ে। কারণ, বিজ্ঞানী, কারুবিদ, যন্ত্রবিদ প্রভৃতি বিশেষজ্ঞদের আমরা যত বেশি তালিম দিয়ে তৈরী করতে পারব, জাতির উন্নতি হবে তত বেশি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এপর্যন্ত যাঁরা এসব বিষয়ে তালিম পেয়েছেন, তাঁদের সকলের জন্যে উপযুক্ত বেতনে কর্মসংস্থান করা সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোনো পরিকল্পনা আমাদের নেই। বক্তা বলেন, তাঁর ধারণা যতদিন না আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হবে ততদিন দেশ থেকে যুবকদের বিদেশে যাওয়া বন্ধ করা যাবে না। এঁরা সকলেই দেশভক্ত, কিন্তু কেবলমাত্র দেশভক্তি সম্বল করে কেউ বেঁচে থাকতে পারেন না।

উপসংহারে ডঃ আত্মারাম বলেন, বর্তমানে আমরা যে-যুগে বাস করছি, তা বিজ্ঞান ও কারুবিদ্যার উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। বিজ্ঞানীকে তাঁর উত্তরদায়িত্ব সম্পর্কে ভালোভাবে সচেতন হতে হবে। আধুনিক কালে দেশের সমস্যা সমাধানের ভার কেবলমাত্র রাজনীতিজ্ঞদের উপর ছেড়ে

দেওয়া যায় না এবং দেওয়া উচিতও নয়। বিজ্ঞানীরা কেবল পরামর্শদাতা হয়ে থাকতে পারেন না, দেশের প্রগতির জন্যে তাঁদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে।

মূল সভাপতির ভাষণের পর বিজ্ঞান কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ডঃ অজিতকুমার সাহা বিদেশাগত বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী ও মূল সভাপতির পরিচয় করিয়ে দেন। বিদেশ থেকে এবার সর্বসমেত কুড়িজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এসেছিলেন। তাঁরা হলেন আফগানিস্থানের ডঃ সৈয়দ শাহ গজনফর এবং ডঃ শাহ মহম্মদ আলে-কোজাই, অস্ট্রেলিয়ার অধ্যাপক জে আর এ ম্যাকমিলান, সিংহলের ডঃ বি এ আবেই-কর্মা এবং ডঃ আর এস রামকৃষ্ণ, চেকো-শ্লোভাকিয়ার অধ্যাপিকা হেলেনা রাস্‌-কোভা এবং ডঃ জান জেরি, জার্মান সাধারণতন্ত্রের অধ্যাপক জি প্রুশচেন, হাঙ্গেরীর ডঃ মার্টন পোসি এবং ডঃ ক্যারোলী ভাস্‌, জাপানের ডঃ জিরো ওগাওয়া এবং অধ্যাপক জিরো ওনোকুরা, পোল্যাণ্ডের অধ্যাপক মেরিয়ান কোকর্‌, যুক্তরাজ্যের অধ্যাপক জি ডি সিমস্‌, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধ্যাপক রে কোপেলম্যান, অধ্যাপক পি আর হোয়াইট এবং ডঃ জেম ক্রীস্টেনসন এবং সোভিয়েত রাশিয়ার আকা-ডেমিশিয়ান এ আই ওপারিন, অধ্যাপক আই এম খালাটাইকফ এবং অধ্যাপক বি এম সাম্‌মিন। এঁদের মধ্যে কয়েকজন আবার সস্ত্রীক এসেছিলেন।

মূল অধিবেশন শেষে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচরণ সিং বিজ্ঞান কংগ্রেস উপলক্ষে আয়োজিত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও বিজ্ঞান পুস্তকের প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন। অন্যান্য বারের তুলনায় এবারের প্রদর্শনী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হয়েছিল। তবে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নির্মাণে ভারতীয় প্রতিষ্ঠান-সমূহের ক্রমোন্নতি এবং ভারতীয় ভাষায় অধিকতর সংখ্যায় বিজ্ঞান-পুস্তক প্রকাশের পরিচয় পেয়ে আমরা আনন্দিত ও আশান্বিত হয়েছিলুম।

দ্বিতীয় দিন থেকে বিজ্ঞান কংগ্রেসের অন্তর্গত তেরটি শাখার অধিবেশন পৃথক পৃথকভাবে শুরু হয়। পদার্থবিজ্ঞান শাখার সভাপতি ডঃ এ আর ভার্মা তাঁর ভাষণে আলোচনা করেন 'ক্রিস্টাল গ্রোথ অ্যাণ্ড ওয়াথ — [illegible] পরিজ্ঞান[illegible]' সম্পর্কে, উদ্ভিদবিজ্ঞান শাখার সভাপতি ডঃ পি এন নন্দী বলেন 'মৃত্তিকার জীবাণুর দ্বারা অ্যাণ্টিবায়োটিকস্‌ উৎপাদন' বিষয়ে, শারীরবিজ্ঞান শাখার সভাপতি ডাঃ এম এল চ্যাটার্জি 'ভেষজতত্ত্বের বিজ্ঞান' সম্পর্কে, মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষাবিজ্ঞান শাখার সভাপতি অধ্যাপক ডি কে কোথারকার 'মৌখিক শিক্ষার সুসংবদ্ধ ব্যবস্থাপনা', যন্ত্রবিজ্ঞান ও ধাতুবিদ্যা শাখার সভাপতি ডঃ কে কে মজুমদার 'ভারতে খনিজের উপযোগিতা', সংখ্যায়ন শাখার সভাপতি ডঃ হরিকিংকর নন্দী 'সংখ্যায়নতত্ত্বের প্রয়োগ সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা', রসায়ন শাখার সভাপতি অধ্যাপক এস কে ভট্টাচার্য 'অসমসত্ত্ব অনু-ঘটকের কয়েকটি দিকে সাম্প্রতিক অগ্রগতি', ভূতত্ত্ব ও ভূগোল শাখার সভাপতি শ্রী কে এল ভোলা 'ভারতে তেজস্ক্রিয় খনিজের ভবিষ্যৎ', প্রাণীবিদ্যা ও কীটতত্ত্ব শাখার সভাপতি অধ্যাপক এম ডি এল শ্রীবাস্তব 'ক্রমোসোমের গঠনশৈলী', গণিতশাখার সভাপতি অধ্যাপক জে এন কাপুর 'সাম আস্‌পেক্‌টস্‌ অফ ম্যাথামেটিকস্‌ অফ অপারেশনস্‌ রিসার্চ' বিষয়ে কৃষিবিজ্ঞান শাখার সভাপতি ডঃ এম এস স্বামীনাথন 'দি এজ অফ অ্যালগোনি, জেনেটিক ডেস-ট্রাকশন অফ ইলড্‌ বেরিয়ার অ্যাণ্ড এগ্রি কালচারাল ট্রান্স্‌ফরমেশন' সম্পর্কে, চিকিৎসা ও পশুবিজ্ঞান শাখার সভাপতি অধ্যাপক এস আর রাও 'প্রতিরোধতন্ত্র ও পরাশ্রিত রোগ' বিষয়ে এবং নৃতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্ব শাখার সভাপতি ডঃ এল পি বিদ্যার্থী 'আধুনিক ভারতে আদিবাসীদের মধ্যে কৃষ্টির রূপান্তর' সম্পর্কে আলোচনা করেন।

বিভিন্ন শাখায় যথারীতি বিবিধ বিষয়ে আলোচনাচক্র, বিশেষ বক্তৃতা ও গবেষণাপত্র পাঠ হয়েছিল। এবার উদ্ভিদবিজ্ঞান শাখায় সর্বাধিক গবেষণাপত্র পঠিত হয়, তারপর রসায়ন শাখায়। ভারতের ও বিদেশাগত কয়েকজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী কয়েকটি লোক-রঞ্জন বক্তৃতাও প্রদান করেন। ডঃ আত্মারাম 'অপ্‌টিক্যাল গ্লাস', অধ্যাপক টি আর শেষাদ্রি 'কয়েকটি সুন্দর গাছ, বিষ ও উদ্ভিদ ভেষজ' সম্পর্কে, ডঃ বি ডি নাগ-চৌধুরী 'মৌলিক ও ফলিত গবেষণার যৌগসূত্র' সম্পর্কে [illegible] গুহ স্মারক বক্তৃতা, অধ্যাপক [illegible] 'মানুষের প্রাচীনতম শত্রু ঃ ক্ষুধা' সম্পর্কে, ডঃ কালীপদ বিশ্বাস 'দার্জিলিং ও সিকিম হিমালয় অঞ্চলের ভেষজ উদ্ভিদ ও ফুল' সম্বন্ধে, অধ্যাপক ডুয়ার্স 'সাপ ও সাপের বিষ' সম্পর্কে, অধ্যাপক এস কে ঘোষ 'ইসরাইল ভ্রমণের অভিজ্ঞতা' সম্পর্কে, অধ্যাপক জি বি পান্থ 'চন্দ্রলোকে যাত্রা' সম্পর্কে হিন্দীতে, ডঃ হরনারায়ণ 'ভূমি-কম্প' সম্বন্ধে হিন্দীতে এবং সোভিয়েত রাশিয়ার আকাডেমিশিয়ান ওপারিন 'প্রাণের আবির্ভাব' সম্পর্কে লোকরঞ্জন বক্তৃতা প্রদান করেন।

এবারের অধিবেশনে বিজ্ঞান কংগ্রেসের অনুষ্ঠানসূচীতে একটি নতুন অনুষ্ঠান সংযোজিত হয়—বিশেষ সমাবর্তন উৎসব। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে এই সমাবর্তন উৎসবে অধ্যাপক টি আর শেষাদ্রি এবং ডঃ আত্মারামকে সম্মানসূচক ডি এস সি ডিগ্রীতে ভূষিত করেন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আচার্য বেনারসের মহারাজা ডঃ বিভূতিনারায়ণ সিং।

বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রতিনিধি ও বিদেশা-গত বিজ্ঞানীদের প্রীতি-সম্মেলনে চারদিন আপ্যায়িত করেন রাজ্যপাল, বেনারসের মহারাজা, অভ্যর্থনা সমিতি এবং বারাণসীর নাগরিকবৃন্দ। সারাদিন বিজ্ঞান বিষয়ে গুরুগম্ভীর আলোচনার পর চারদিন আনন্দানুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন স্থানীয় অভ্যর্থনা সমিতি। তার মধ্যে ওস্তাদ বিসমিল্লা খাঁ ও তাঁর সম্প্রদায়ের সানাইবাদন সকলকে মুগ্ধ করেছিল। অধি-বেশনের শেষ দুদিন সারনাথ ও লোকো-মোটিভ কারখানা এবং বারাণসী থেকে প্রায় ১০০ মাইল দূরে রিহন্দ বাঁধ ও হিন্দুস্থান অ্যালুমিনিয়াম করপোরেশনের কারখানা পরিদর্শনের আয়োজন করা হয়েছিল। সেই সঙ্গে অনেক ভারতীয় প্রতিনিধি বিশ্বনাথের মন্দির দর্শন এবং গঙ্গাবক্ষে নৌকাবিহার এবং রামনগর প্রাসাদ ও লালবাহাদুর শাস্ত্রীর পৈতৃক কুটির দেখার সুযোগও গ্রহণ করেছিলেন।



প্রতিধ্বনি

প্রতিধ্বনি

মন্দিরময় উড়িষ্যা

জগন্নাথ কুন্ডু

ঐতিহ্যময় দেশ উড়িষ্যা। স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা, দেবপরিকল্পনায় প্রাচীন উড়িষ্যা স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলেছিল। তাই ভুবনেশ্বর, সাক্ষীগোপাল, পুরী এবং কোনারকের মন্দিরগুলো দেখতে অনেকটা একই ধরনের। এখানকার মন্দিরগুলোকে সাধারণতঃ চারভাগে ভাগ করা যায়। প্রধান মন্দির বা দেউল, জগমোহন, ভোগমন্দির ও নাটমন্দির। মন্দিরগুলোর আকৃতি অনেকটা একই ধরনের হলেও দেব পরিকল্পনা এবং মন্দিরের কারুকার্য কিন্তু ভিন্ন ধরণের। বিভিন্নস্থানে বিভিন্ন দেব পরিকল্পনা করা হয়েছে। ভুবনেশ্বরে কল্পনা করা হয়েছে মহাদেব, পুরীতে বিষ্ণু, সাক্ষীগোপালে গোপাল এবং কোনারকে সূর্য। এইসব দেব পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের কারু-কার্য কিছুটা রদবদল হতে দেখা যায়।

ভুবনেশ্বরের প্রধান দেবতা শিব। এখানে শিবের মন্দির সর্বত্র ছড়ানো রয়েছে। কোথাও কোথাও আবার শিবকে কেন্দ্র করে অন্য দেবতাও দেখতে পাওয়া যায়। লিঙ্গ-রাজ মন্দিরের আঙিনায় বিভিন্ন দেবতার মন্দির রয়েছে। ভুবনেশ্বরের মন্দিরগুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এখানে প্রত্যেক মন্দিরেই দেখতে পাওয়া যায় কার্তিক, পার্বতী এবং গণেশের মূর্তি। শিব-জীবনের অনেক ঘটনাই শিল্পীরা মন্দিরের গায়ে অমর করে রেখেছে। শিবের অনুচরদেরও বাদ দেওয়া হয়নি। প্রত্যেক মন্দিরের উপরে চারটি করে যোগী মূর্তি দেখতে পাওয়া যায়।

সাক্ষীগোপালে কৃষ্ণমূর্তি কল্পনা করা হয়েছে। কালো পাথরে তৈরী এই কৃষ্ণমূর্তি। কে, কবে এবং কেন এই মূর্তি তৈরী করেছিল তার কোন সঠিক তথ্য এখনও পাওয়া যায়নি। সাক্ষীগোপাল সম্বন্ধে অনেক তথ্য এবং কিংবদন্তী আছে। কেউ বলেন, ভগবান এখানে সাক্ষী দিতে এসে-ছিলেন এবং আর ফেরেন নি, সেই থেকেই এই দেবতার নাম সাক্ষীগোপাল হয়েছে। মূর্তিটি দেখতে খুবই সুন্দর।

কোনারকে কল্পনা করা হয়েছে সূর্যকে। নরসিংহদেবকে নির্মিত এই বিরাট মন্দির অতীত ভারতের শিল্পকলার ধারক এবং বাহক। কিংবদন্তী আছে, পিতার শিল্প-কীর্তি প্রতিষ্ঠা দেবার জন্যে পুত্র আত্মত্যাগ করে। কাছেই ছিল চন্দ্রভাগা নদী। প্রতিদিন [illegible] সূর্যকে বন্দনা করত, যাতে সূর্যদেব একটু কৃপা করেন, শরীর নীরোগ রাখেন। আর রয়েছে বিরাট কষ্টি-পাথরের তৈরী নবগ্রহের মূর্তি। মূর্তিগুলো আগে জগমোহনের উপর ছিল; কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে এখন আর জগমোহনের সঙ্গে সংযুক্ত নেই। পৃথক মন্দিরের ব্যবস্থা করে অতীত ভারতের ঐতিহ্যকে রক্ষা করা হয়েছে। অপূর্ব কারুকার্য এই মন্দিরের। চব্বিশ চাকার মন্দির, সাতটা ঘোড়া যেন সূর্যদেবকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেকটি চাকাই প্রতীকধর্মী। সূর্যের বিভিন্ন রূপের কল্পনা করা হয়েছে তার মধ্যে। যে অরুণ-স্তম্ভটি জগন্নাথ মন্দিরের শোভাবর্ধন করেছে তাও একদিন কোনারকেরই ছিল। মন্দিরের গায়ে রয়েছে বিভিন্ন ভঙ্গিমায় লাস্যময়ী নারী মূর্তি; বিভিন্ন ধরণের লতা-পাতা-ফুল ইত্যাদি। প্রত্যেকটি শিল্পই শিল্পীর রুচিবহ।

সূর্যমন্দিরটি সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নরসিংহ দেবের রাজত্বকালে নির্মিত। রাজা বহু অর্থব্যয়ে এই মন্দিরটি তৈরি করেছিলেন আর রাজশিল্পীরা দিয়েছেন অপূর্ব শিল্প দক্ষতার পরিচয়। একদিন এই সূর্যমন্দির জীবন্ত ছিল। শত শত নর-নারী আসত সূর্য বন্দনা করতে। মন্দিরে বিগ্রহ ছিল; কিন্তু আজ শুধু পড়ে রয়েছে ভগ্নাবশেষ আর সর্বত্র বিরাজ করছে এক মহাশূন্যতা।

পুরীর সমুদ্রতীরে রয়েছে জগন্নাথ দেবের মন্দির। মন্দিরে আছে তিনটি বিগ্রহ, জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা। মূর্তি তিনটি দারুনির্মিত। কারুকার্য অপূর্ব। মন্দিরের চারদিকে রয়েছে বিরাট প্রাচীর এবং প্রাচীরের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন দেব-দেবীর মন্দির আর একটি বাজার। এ বাজারে প্রসাদ বিক্রি হয়।

মন্দিরের কারুকার্য বড়ই অদ্ভুত। এখানে বিষ্ণুর দশাবতারের মূর্তি খোদাই করা রয়েছে। আর রয়েছে এক বিরাট নৃসিংহ দেবের মূর্তি।

শোনা যায়, পুরীর মন্দিরে নাকি দেব-দাসীদের থাকার পৃথক ব্যবস্থাও ছিল। তারা জীবন এবং যৌবন দেবতার পায়ে উৎসর্গ করে নিজেদের ধন্য করত। এরা শুধু নিজেকে উৎসর্গ করে ধন্য হল, পেল না কিছু।

উড়িষ্যার মন্দিরের শিল্পকলা রসিক-শিল্পীকে যোগায় প্রেরণা, কবি খুঁজে পায় তার হারানো ছন্দ আর পুণ্যার্থীরা খুঁজে পায় শান্তি।

উড়িষ্যার ঐতিহ্যের আর একটি বিরাট নিদর্শন রয়েছে উদয়গিরি এবং খণ্ড-গিরিতে। এই গুহাগুলোতে জৈন সাধুরা থাকতেন এবং সাধন-ভজন করতেন। গুহা-গুলোর কারুকার্য বড় অদ্ভুত। কয়েকশো বছর আগের শিল্পীরা শিল্পদক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। সাধুদের থাকবার গুহা-গুলো অতি আধুনিক। এখানে দেখতে পাওয়া যায় কয়েকটি র‍্যাকেট যেখানে সাধুরা তাদের ব্যবহার্য বস্ত্রাদি রাখতেন। র‍্যাকেট-গুলোর উপর আঁকা ছিল মনুষ্য মূর্তি। গুহাগুলোর মধ্যে হিন্দুধর্মের অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। কোন কোন গুহার সামনে রয়েছে গজলক্ষ্মীর মূর্তি। আবার কোন কোন গুহার সামনে রয়েছে সূর্যের মূর্তি। খণ্ডগিরির গুহার মধ্যে কয়েকটি দেবী মূর্তির চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়। এখানে একটি অতি আধুনিক ধরনের সভা-গৃহ দেখতে পাওয়া যায়, অনেক গুহার জৈন তীর্থঙ্কর এবং শাসন দেবীর মূর্তি রয়েছে। গণেশ গুম্ফার সামনে রয়েছে দুটো হস্তী মূর্তি।

গুহাগুলোর নামকরণও বেশ তাৎপর্য-পূর্ণ। রাণী গুম্ফা, গণেশ গুম্ফা, জয়-বিজয়া বাঘ গুম্ফা ইত্যাদি। বাঘ গুম্ফাটির নামের সঙ্গে গুম্ফার বেশ সাদৃশ্য রয়েছে। গুম্ফাটি দেখতে অনেকটা বাঘের মুখের মত।

জৈন সাধুদের গুহার মধ্যে কি করে হিন্দু সংস্কৃতি স্থান হল এটাই আশ্চর্যের বিষয়। হয়তো কালক্রমে হিন্দুধর্ম, জৈন-ধর্মকে গ্রাস করেছিল এটা তারই নিদর্শন।

(দীপায়ন ।। দেওয়ালী সংকলন ১৩৭৪)

খ্যানের গান

বৃন্দাবনচন্দ্র বাগচী

পশ্চিম দিনাজপুর (তথা অখণ্ড দিনাজ-পুর) জেলার লোকসঙ্গীতের অন্যতম নিদর্শন হল খ্যানের গান। শুদ্ধ ভাষায় রূপান্তরিত হলে এগুলিকে ক্ষণের গান বলা যেতে পারে। কোনও একটি বিশেষ ঘটনা—যা বিশেষ ক্ষণে এই বৈচিত্র্যহীন গতানুগতিক ধারায় প্রবাহিত গ্রাম্য জীবনের মসৃণতার মধ্যে আলোড়ন জাগিয়েছিল তাকেই গ্রাম্য কবি ভোলা গানের রূপ দিয়ে নিজেদের মধ্যে অভিনয় করে ঐ ঘটনার প্রতি তাদের মনোভাবকে লোকসমক্ষে প্রচার করেছিল। তাই এগুলিকে ক্ষণের গান বলে আখ্যা দেওয়া যায়—বস্তুতঃ এরা দিয়েছেও।

এই খ্যানের গানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে উত্তরবঙ্গের পশ্চাৎপদ সমাজের বিবর্তন এবং সংবাদ সংগ্রহের ব্যাপারে। পুরাতন দিনের সমাজ চিত্র এবং জন মানসিকতার পরিচয় পেতে হলে যেমন ষোড়শ, সপ্তদশ, অষ্টাদশ শতাব্দীর পুরাতন সংবাদপত্র পড়তে হয়, তেমনই পশ্চিম দিনাজপুরের সমাজ চিত্রের বর্ণগুলি—যা আধুনিক ভাবধারার সংঘাতে বিলীয়মান,

তার পরিচয় পেতে হলে বা সম্যক উপলব্ধি করতে হলে খ্যানের গনের বিশ্লেষণ অবশ্যই কর্তব্য।

[illegible] ধরনের ধারা এখনও প্রবহমান। [illegible] পঞ্চাশ বৎসরের পুরাতন [illegible] গ্রামের কোনও ঘটনা নিয়ে রচিত খ্যানের গানের ব্যাখ্যাও পাই। এইসব গানে তথ্য [illegible] ভুল নাই। মুখে মুখে গীত হতে হতে হয়ত প্রতি গায়কের কাছেই কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু মূল রূপটি ঠিক আছে।

এমনই এক পুরাতন গান হল লালু সোহাগীর গান। এই গানের বিষয়বস্তু যাই হোক—গানে উল্লিখিত তাম্বুলী থানা কথাটা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বংশীহারী থানার নাম ছিল তাম্বুলী থানা। এই গান অন্ততঃ সেই সময়ে রচিত যে সময়ে বংশীহারীর তাম্বুলী নামটা লোকের মন থেকে মুছে যায় নাই। আজ কয়জনে জানে সেই তাম্বুলী নাম? লালু আর সোহাগী ঐ খ্যানের দুই মেয়ের নাম। সোহাগী ছিল সুন্দরী। গ্রামের লোকের অনেকের কাম্য নারী ছিল সোহাগী। কিন্তু বিবাহিতা সোহাগী সকলকে অস্বীকার করে চলাতে গ্রাম্য যুবকদের কৌশলপূর্ণ নিপীড়নের সম্মুখীন হতে থাকে। তার স্বামী ছিল দুর্বল প্রকৃতির।

তখন তেজস্বিনী মেয়ে সোহাগী ঐ অঞ্চলের থানার জমাদার সাহেবকে বাপদায় দিয়ে তার ধর্মবেটী হল। 'ধরম দায়' দেওয়া পশ্চিম দিনাজপুরের পোলিয়া বা দেশীয়া (বর্মণ ও দেবশর্মা) সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনও সুপ্রচলিত। কিন্তু সেই পুরাতন দিনে যখন থানাদার ছিল মূর্তিমান বিভীষিকাস্বরূপ তখন সোহাগীর মত একজন মেয়ের পক্ষে জমাদারের শরণ নেওয়া সাহসের কাজ হয়েছিল সন্দেহ নেই।—

নারীর দুঃখ দশা যদি কোনওকালে হয়
জমাদারকে বাপদায় দিলে কিছু নাহি ভয়।

তারপর সোহাগী বিধবা হয়ে বাপের বাড়ীতে ফিরে এল। বাপ বলল—আমি বড় গরীব, তোকে খেতে দেব কি?

বেটী তুই খলে যা
খিয়ার বদলাই খা।
ঘরে নাই মোর হাল গিরস্থি
পরের বাড়ীতে খাটিতে দিন যায়
নাই পারিম তোক পুষিবা
তুই খালে যা
খিয়ার বদলাই খা।

খিয়ার বদল করে খাবার অর্থ, জল। বংশীহারী থানা খানের অঞ্চল। অন্য জায়গা থেকে অন্যান্য জিনিস এনে তার বদলে গ্রামে গ্রামে ঘুরে ধান সংগ্রহ করা, সোহাগী তাও করেছিল। শেষে বাধ্য হয়ে জমাদারের আশ্রয় নেয় এবং তার সঙ্গে পরিণামে প্রণয় জন্মে। তখন ঐ যুবকদের মধ্যেই কেউ এই রকম তৈরী করে সোহাগীর এই তথাকথিত সতীত্বপনা (অবশ্যই তাদের মতে) ও জমাদারের অঙ্কশায়িনী হওয়ার কলঙ্ককে বিদ্রূপ করে।

[illegible] অজস্র [illegible] পশ্চিম দিনাজপুরের গ্রামাঞ্চলে [illegible] গোঁসাইও জীয়ো—। [illegible] নিয়ে বহু অশ্লীলতার সঙ্গে গীত হয় এই খ্যানের গান।

নিশুয় ঘরে দেছে জীয়ো ছাঁদ
আইজনে খিদু গোঁসাই দিবে হরিনাম রে।
তোর সে জীয়ো বেই খেলে মনে
ভাল দেখি দিল গোঁসাই হরিনাম রে।

মোজাম পরশানি—হাড়ীর মেয়ে ও মুসলমান যুবকের প্রণয় কাহিনী—তুফানশ্বরি, ঢাকেশ্বরী এগুলি বেশ প্রাচীন গান এবং পুরাতন সমাজের অনেক চিত্র এই গানের মারফৎ পাই। অপেক্ষাকৃত আধুনিক—বুধেশ্বরি, আদরশ্বরি এবং দইফেলা সেহারী।

দইফেলা সেহারী—মানে হ'ল দই ফেলে দেওয়া স্যানিটারী ইন্সপেক্টর। হাটে হাটে পচা দই বা এতদঞ্চলে খুবই বিক্রয় হয়, তাই ফেলে দেয় যে সেই 'সেহারী'। সে আবার কিভাবে নারী আর অর্থের বশীভূত হয়ে দই ফেলে না তারই গান এটা।

বুধেশ্বরী গানের সম্পূর্ণ অভিনয়ের মধ্য দিয়ে এদের 'ঘরজিয়া' বা ঘরজামাতা রাখা বা বিবাহের শুধুমাত্র বৈষয়িক দিকটা সম্বন্ধে এই সম্প্রদায়ের ধারণার চমৎকার পরিচয় মেলে। ক্ষীরো নামে এক বিধবা তার বোনঝির মেয়ে বুধেশ্বরী। ক্ষীরোর জমিজমা আছে কিন্তু কাজের লোক নাই। তাই ক্ষীরোর কাছে এসেছে 'কারুয়া' (ঘটক)। তাই কথা শুনে ক্ষীরো বোনঝিকে বলছে—

শুনেক বেটী মোর কাথা
হামরা হনু পরম দুখিনী
হাল ধরিয়া যাবার কেহ নাহি—
তোর বহিন বেটীর ঘরজিয়া রাখিবো নাকি।
বোনঝিও সায় দেয়—

যে কাথা কহিলু মাগো কথা মন্দ নয়
ঘরজিয়া আখিলে ভাল হয়
হাল ধরিয়া যাবার লোকও হয়
এইটা কাথা মায়ো মোরও মনটা কয়।

অর্থাৎ হাল ধরে যাবার লোকের জন্যই ঘরজিয়া (ঘরজামাই) রাখা। ঠিক বুধেশ্বরীর বিবাহের জন্য তাদের ব্যস্ততা নাই। বিবাহের এই নিছক বৈষয়িক দিকটা এখনও অনেকেই বোঝে। তারপর বিয়ে দিয়েও তাকে জামাইয়ের সঙ্গে বিবাহোত্তর কোনও সম্পর্ক রাখতে না দিয়ে শুধু চাকরের মত খাটানোর কাহিনীতে এই গান পূর্ণ। এমনকি খেতেও দেয় না তাকে ভাল করে। সেই ঘরজিয়া অর্থাৎ ক্ষীরোদ তাই দুঃখ করে—

হাল বাহিতে বড় খুদা লাগে
প্রাণে শান্তি নাই পাও নাহি চলে
বেলা হইল সাত ঘটি
নাই খাই পন্তা—দুই পাথার মাঝারী
এই দুখিয়াটার খাদা নাহি আসে।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য বুধেশ্বরীর সাহসে এবং ভালবাসার বলে ক্ষীরোদের বিবাহ জীবন সুখের হয়। এই পালাগানের রচয়িতা এ ক্ষীরোদ নিজে।

ভাসুর ভাউসানের খানের একটা পালার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করি। ভাসুর ও ভাদ্রবৌয়ের প্রণয় কথা নিয়ে রচিত। কিন্তু স্থানবিশেষে এবং অবস্থা বিশেষে ভাসুরের সঙ্গে বিধবা ভাদ্রবৌয়ের বিবাহ এ সমাজে প্রচলিত আছে। এই গানের মধ্যে দিয়ে তার পরিচয় পাই।

ছোট ভাইয়ের অকাল মৃত্যুর পর বড়ভাই অনেক দুঃখকষ্ট করেও ছোট ভাই বৌকে লালনপালন করেছে—শেষে সে তার মনের কথা বলল—

মাটী পা কাটিনু বড়া দুঃখে
বহুদিনের একটা কাথা পড়ে হামার
মনে—
কহিবারে চাহসু মনের সে কথা
ভরসায় ত পাচ্ছি না—
পেরেম পীরিতের কথা তোমরা রাখিবেন
কিনা।

ভাই বৌ উত্তর দিল—
কি কথা কহিলেন যে ভাসুরা—
দুঃখের সাগরে
পীরিতির কথা ভাসুরা ভালয়
না লাগে।
কাঁচা চুলে সোয়ামী গেল মারা
পীরিতীর কথা ভাসুরা
হামাক কহেন না।

এই আখ্যান নিয়ে গান রচিত হল কেন বোঝা কঠিন। তবে শেষ পর্যন্ত দুইজনের নিকার মধ্যে দিয়ে আখ্যানের পরিসমাপ্তি।

একটা কথা এই যে এইসব গাথার মধ্যে যদি কেহ ময়মনসিংহ গীতিকার মত ভাবের গভীরতা বা কবিত্বের পরিচয় পেতে চান তবে ভুল হবে। ময়মনসিংহ গীতিকার রচয়িতাগণ সকলেই সমাজের উচ্চতর স্তরের লোকে এবং নিরক্ষর কেউই ছিলেন না। কিন্তু এই খ্যানের গানের সকলেই নিরক্ষর গ্রামবাসী মাত্র তবু যে তথ্য এরা বিভিন্ন কালে পরিবেশন করে গেছে সমাজমতের বিশ্লেষণে তার মূল্য অপরিসীম। অবশ্য এইসব সংগ্রহ করা বেশ দুরূহ সন্দেহ নাই। তবুও বর্তমানের সংঘাতে যে দিনগুলি হারিয়ে যাচ্ছে তার পরিচয় রাখতে হলে এগুলি সংগ্রহ করতেই হবে।

([illegible] তৃতীয় সংখ্যা [illegible])

প্রদর্শনী পরিক্রমা

চিত্ররসিক

"নলিনীপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণনাথ রায় আপনার নিকটস্থ হইবেন ইঁহাদের সহিত রাজা সাহেবের যে মোকদ্দমা চলিতেছে উহার নিষ্পত্তি বিষয়ে যে প্রস্তাব করিবেন তাহা ন্যায়সঙ্গত বোধ হয় আপনি অনুগ্রহপূর্বক তদনুযায়ী কার্য সম্পাদনে যত্নবান ও মনোযোগী হইলে আমি অত্যন্ত উপকৃত ও আহ্লাদিত হইব। আপনি যত্ন ও মনোযোগ করলে ইহার অভিপ্রেতার্থ কোনমতেই অসম্ভাবিত বোধ হয় না—কৃষ্ণনাথবাবু সুশীল ও সচ্চরিত্র ব্যক্তি—যাহাতে ইনি নিষ্কৃতি পান আপনাকে এরূপ দয়াপ্রকাশ করিতে হইবেক আপনি বিজ্ঞ ও সদ্বিবেচক মানুষ বিষয়কর্মে সম্পূর্ণ পারদর্শী এ বিষয়ে আপনাকে অধিক অনুরোধ করা অনাবশ্যক—কিমধিকমিতি ১৬ শ্রাবণ।"

ঠিক একশ বছর আগেকার লেখা একটি চিঠি। সুন্দর পরিচ্ছন্ন হস্তাক্ষর বক্তব্য বিষয় অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বোঝানো, একটিও অবান্তর কথা নেই। আর অপরের মঙ্গলে এভাবে "উপকৃত ও আহ্লাদিত" বোধ করতেন এমন একজন মানুষের কথাই সবচেয়ে আগে আমাদের মনে পড়ে—তিনি হলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়। বিড়লা অ্যাকাডেমিতে গত শতাব্দীর বাংলার মনীষীদের যে অপ্রকাশিত চিঠিপত্রের প্রদর্শনী ৯ থেকে ১৯ জানুয়ারী পর্যন্ত হয়ে গেল এই চিঠিটি তার একটি প্রধান আকর্ষণ। প্রায় আশীখানি চিঠিপত্র ও পাণ্ডুলিপির মধ্যে চিঠিগুলি প্রায় সবই একান্ত ব্যক্তিগত ধরনের সেই জন্যে যাঁদের লেখা তাঁদের নাম অপ্রকাশিত রাখা হয়। তবে পত্রে লিখিত বিষয় থেকে সামাজিক জীবনের অনেক ইতিহাস পাওয়া যায়। একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হল কালীপ্রসন্ন সিংহের চিঠিটি—কারণ এটি 'নীলদর্পণ' অভিনয় সম্পর্কে। তিনি লিখছেন, "মধুসূদনবাবুর বাটিতে কয়েকদিন ধরিয়া 'নীলদর্পণ' নাটকের অভিনয় হইতেছে তাহা আপনি অবগত আছেন। পুলিশ কর্মচারীরা বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোককে ধরিয়া লইয়া আটক রাখিয়াছে। অতএব এ বিষয়ে আলোচনার জন্য আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎ করার বিশেষ প্রয়োজন এবং যত টাকার প্রয়োজন হইবে তাহা সমুদয় বারতার আমি স্বয়ং গ্রহণ করিব। 'নীলদর্পণ' নাটকের অভিনয় বন্ধ থাকিবে না—প্রত্যহ হইবে অন্ততঃ যতদিন আমি বর্তমান আছি। লাট সাহেবের সহিত আপনারা এ সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন। আশা করি অভিনয় দর্শন করিতে আপনি আসিবেন।" বাংলা ১২৮০ সালের চিঠি। এক উত্তেজনাময় পরিস্থিতিতে লেখা। হাতে লেখা মূল চিঠিগুলির একটা প্রধান আকর্ষণ হল চিঠিগুলি দেখলে মনকে ঠিক সেই সময়ে নিয়ে যায়। প্রত্যেক পত্রলেখকের কলমের ব্যক্তিগত টানের মধ্যে যেন তাঁর লেখার সময়কার ব্যক্তিত্বকে খুঁজে পাওয়া যায়। সৈয়দ আমীর আলির ১৮৯০-এ লেখা তাঁর প্রমোশন সংক্রান্ত একটি চিঠিতে তাঁর উত্তেজনা প্রতিটি ছত্রেই ধরা পড়েছে। অত্যন্ত ক্ষিপ্র হাতে লেখা এবং বিশেষ বিশেষ শব্দের নিচে লাইন টেনে সেগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে—"যদি আমি ইউরোপীয়ান হতাম তাহলে এমনিতেই আমার এ পদোন্নতি হত কিন্তু দুঃখের বিষয় আমি নেটিব।" চিঠির লাইনগুলিও অদ্ভুত—অর্ধচন্দ্রাকার বাঁদিক আর ডান দিক সমান কেবল মাঝখানটি ওপরদিকে উঠে গিয়েছে। ১৮৯৩ সালে মতিলাল ঘোষ একজনকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন, "তুমি যদি গৌরাঙ্গ প্রচারিত বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রতি তোমার হৃদয়-মন দিতে পার"—গৌরদাস বসাক তাঁর এক বন্ধুকে লিখছেন (১৮৯৪) তিনি লং-এর অনুদিত নীলদর্পণের একটা কপি চান। আর মাইকেল? তিনি চিরকালই ঋণগ্রস্ত—তাঁর কোন এক বন্ধুকে ঋণ সংক্রান্ত দুঃখের কথাই জানাচ্ছেন। ইস্টার্ণ ইন্ডিয়ান ডেলি নিউজের সম্পাদক জেমস উইলসন শেফিল্ড থেকে তাঁর ভারতীয় বন্ধুকে লিখছেন (১৮৯৭) যে সেখানকার......"সাধারণ লোক ভারতের ব্যাপারে অজ্ঞ বা উদাসীন"...ভারতের অবস্থায় দুঃখ করে লিখছেন..."ভারতবর্ষ নানা দিক দিয়েই দুর্দশাগ্রস্ত মনে হচ্ছে, প্লেগ, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, যুদ্ধ-বিগ্রহ—ভারতের পক্ষে যেটি ব্যয়বহুল এবং যার ফলাফল ব্যয়ের উপযুক্ত নয়......"। যোগেন্দ্রনাথ বসুর একটি পুরনো চিঠিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবাহ সম্বন্ধ তোলা হয়েছে। অরবিন্দ ঘোষ তখন গায়কোয়াড়ের সেক্রেটারী এবং পদোন্নতি হয়ে তাঁর বেতন ৪০০ টাকা হওয়ার সম্ভাবনা। তাঁর বিবাহ সম্পর্কে চিঠি যাচ্ছে, "পাত্রী ১২ হইতে ১৫ বৎসর পর্যন্ত কম বয়সের হইলে ভাল হয়। কিছু ইংরাজী ও বাংলা জানিলেই হইবে কিন্তু স্বাস্থ্য ও রূপে কন্যা উত্তমা হয়েন ইহা তাঁহার মনোগত ইচ্ছা।

"যদি এরূপ কোন পাত্রী উপস্থিত থাকেন এবং তিনি যদি ব্রাহ্ম সমাজের মতে বিবাহ করিতে পারেন তাহা হইলে অরবিন্দ তাঁহাকে এখনই বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছেন।"



শিল্পী : কিথ অ্যাসেমপোল

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর আত্মীয়বিয়োগে দুঃখ করে তাঁর বন্ধুকে চিঠি লিখছেন। নবীনচন্দ্র তাঁর দেশের বন্ধুকে দেশের কথা নিয়ে লিখছেন—শরৎচন্দ্র, স্বর্ণকুমারী দেবী, কুমুদিনী বসু, মানকুমারী বসু প্রভৃতি তাঁদের সাহিত্য এবং প্রকাশন নিয়ে প্রকাশকদের সঙ্গে চিঠিপত্র লিখছেন। এছাড়া রাজেন্দ্রলাল মিত্র, মহেন্দ্রলাল সরকার, লালবিহারী দে, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীমোহন মুখার্জি প্রভৃতি বহু ব্যক্তির চিঠিপত্রে তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের ছোটখাট দিক দেখা গেল। হাতের লেখার দিক দিয়েও চিঠিগুলি গুরুত্বপূর্ণ, অক্ষরের সৌন্দর্যের দিকে অনেকেরই দৃষ্টি থাকত। সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের একটি বৈষয়িক পত্র এবং বিদ্যাসাগরের চিঠির হস্তলিপি সবচেয়ে সুদৃশ্য। স্বর্ণকুমারী দেবী, মানকুমারী বসু প্রভৃতি লেখিকাদের লেখা স্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথের বৈষয়িক পত্রেও কোনরকম বিচলিতভাবের লক্ষণ দেখা গেল না। ইংরিজি হস্তাক্ষর প্রায় প্রত্যেকেরই সুন্দর এক গৌরদাস বসাকের লেখা কিছু অস্পষ্ট। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, মাইকেল, মতিলাল ঘোষ, জেমস উইলসন প্রভৃতি সকলেই তখনকার যুগের কপার-প্লেট রাইটিং বেশ ভালভাবেই রপ্ত করেছিলেন। অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের চিঠির যাঁর হাতে লেখা তিনি সম্ভবত 'অ্যাকিউরেট পেনম্যান' জাতীয় কোন লিখন-রীতির বই থেকে লিখতে শিখেছিলেন। অধিকাংশ ব্যক্তিই সরু নিব ব্যবহার করতেন। কেবল বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং কয়েকজন মহিলার চিঠি মোটা নিবে লেখা। প্রদর্শনীটি বিশেষ আকর্ষণীয় হয়েছিল।

টি এন মজুমদার স্ট্রীটের 'চিত্রম' গ্যালারী কিছুদিন যাবৎ ছোট ছেলেমেয়েদের

শিল্পশিক্ষার একটি ক্লাস খুলেছেন। ১৩ থেকে ২০ জানুয়ারী সেখানে এই শিশু বিভাগের একটি চিত্র প্রদর্শনী হয়ে গেল। ছেলেমেয়েরা অধিকাংশই ৪ থেকে ১৪ বছরের। প্রায় ৩৫ খানি ছবি এখানে রাখা হয়েছিল। ছোট ছেলেমেয়েরা যেমন [illegible]ভাবে ছবি আঁকে এখানেও তার [illegible] হয়নি। নিসর্গ দৃশ্য, পথঘাটের [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] সবই [illegible] [illegible] [illegible] দিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছে এবং [illegible] [illegible] [illegible] তুলে ধরেছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ছবি বিশেষভাবে উল্লেখ করবার মত।

* * *

দীর্ঘকাল পরে কেমুল্ড গ্যালারী আবার প্রদর্শনীর ব্যাপারে সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। এবারে সেখানে ১৫ থেকে ২২ জানুয়ারী শ্রীমতী সুনীতা কুমারের ১৫ খানি ছবির প্রদর্শনী হল। শিল্পী বিখ্যাত ক্রীড়াবিদ নরেশ কুমারের স্ত্রী। গার্হস্থ্য-জীবনের ফাঁকে নিজে নিজেই শিল্পচর্চা করেছেন। অধিকাংশ কাজই অ্যাবস্ট্রাক্ট-ঘেঁষা। অনেক কাজই অ্যামেচারিশ ধরনের হলেও উপস্থাপনার গুণে দর্শনীয়। তাঁর 'রেসট্রাক', 'সিটি বাই নাইট', কম্পোজিশন আদি ছবিগুলির গাঢ় পটভূমিকার মধ্যে লাল, সবুজ, নীল বা বাদামীর ছোপ মন্দ লাগে না। দুয়েকটি ঘোড়া বা ষাঁড়ের অয়েল স্কেচ চলনসই।

* * *

অমল ভট্টাচার্য ১৬ জানুয়ারী থেকে সপ্তাহকালের জন্য মোনালিসা গ্যালারীতে ১২ খানি প্লেট এনগ্রেভিং প্রদর্শন করছেন। প্লেট কেটে ছোট ছোট রিলিফ ডিজাইন সৃষ্টি করা হয়েছে। কতগুলি অ্যাবস্ট্র্যাক্ট-ঘেঁষা কাজ এবং আধা ফিগারেটিভ ডিজাইন এবং জ্যামিতিক নকশার রিলিফ দেখা গেল। তাঁর 'সিটি স্ল্যাম', 'কাপল', 'গসিপ', 'স্পেস ক্রাফট' প্রভৃতি ডিজাইন মন্দ নয়। এগুলির বাঁধাই এবং সজ্জা ভাল হয়েছিল।

* * *

অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে ১৭ থেকে ২২ জানুয়ারী শ্রীমতী কাবেরী মুখার্জির ৪৪ খানি প্যাস্টেল ও জলরং-এর প্রদর্শনী হল। শিল্পী কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর পরীক্ষা দিয়ে বিজ্ঞান কলেজে রিসার্চ করছেন। বোটানিক্যাল সার্ভের কাজ করতে গিয়ে চিত্রবিদ্যার দিকে আকৃষ্ট হন। তাঁর মা'ও নিজে নিজেই শিক্ষালাভ করে চিত্র-বিদ্যার চর্চা করেন। সেই অনুপ্রেরণায় শিল্পী অনেকগুলি নিসর্গ দৃশ্য ও প্রতিকৃতি উপস্থিত করেছেন। অ্যামেচারিশ কাজ, অনেকগুলি মুখমন্ডলে কিছুটা টাইপ আনবার চেষ্টা আছে। নিয়মিত চর্চা করলে আশা করা যায় তিনি ভবিষ্যতে কিছু ভাল ছবি আমাদের উপহার দিতে পারবেন।

* * *

প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় শান্তি-নিকেতনে শিক্ষালাভকালে শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর কাছে শিল্পশিক্ষা লাভ করেন। তারপর দীর্ঘকাল শ্রীনিকেতনে পল্লী উন্নয়নের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। ১৯৩০-এর পর আর কোন ছবি আঁকার মন দেননি। কিছুদিন যাবৎ কর্মত্যাগ করে তিনি আবার প্রবীণ বয়সে শিল্পচর্চায় মন দিয়েছেন। ১৬ থেকে ২২ জানুয়ারী পর্যন্ত প্রাচীন ভারতের সভ্যতার ওপর তাঁর চব্বিশখানি জলরং টেম্পরায় আঁকা ছবির একটি প্রদর্শনী হয়ে গেল। ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের কতকগুলি প্রধান ঘটনাকে তিনি চিত্রে রূপায়িত করেছেন। প্রস্তর-যুগের ভারতের মানুষ, মোহেঞ্জোদড়োর সভ্যতা, বৈদিক যুগ, চন্দ্রগুপ্ত, অশোক, বিক্রমাদিত্য, হূণ আক্রমণ ইত্যাদি অনেক-গুলি ঘটনা তিনি উপস্থিত করেছেন। ছবিগুলি আঁকার সময় তৎকালীন পোষাক-পরিচ্ছদ এবং স্থাপত্যকে যথাসম্ভব কালোপযোগী করবার চেষ্টা করেছেন। অনেকক্ষেত্রে এই সব খুঁটিনাটির দিকে অতিরিক্ত মনঃসংযোগের ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে চিত্রনির্মাণকার্য হয়ত কিছুটা ব্যাহত হয়েছে। কিন্তু লোকশিক্ষার দিক থেকে এ ধরনের তথ্যপূর্ণ ছবির অনেকটা মূল্য আছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য ছবির মধ্যে খারবেল, অশোকের লুম্বিনী উদ্যানে স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা, কণিষ্কের পুরুষপুরে স্তূপ প্রতিষ্ঠা এবং যুদ্রাম্মার সভায় মার্কো পোলো প্রভৃতি ছবিগুলি উল্লেখযোগ্য। ছবিগুলি কোন প্রকাশক ইতিহাসগ্রন্থে ব্যবহার করার কথা চিন্তা করতে পারেন। প্রবীণ বয়সে শিল্পীর এধরনের পরিশ্রম প্রশংসনীয়।

* * *

মার্কটোয়েন একবার পরিহাসচ্ছলে লিখেছিলেন যে শিক্ষাই সব—যুধাকপি কলেজে পড়লে ফুলকপি হয়। ততটা হয় কি না জানি না তবে শিল্পশিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি করলে যে কতটা ফল পাওয়া যায় তার কিছু কিছু নিদর্শন ইউ এস আই এস আয়োজিত শিল্পকলা-চর্চার শিক্ষাদান সংক্রান্ত প্রদর্শনীতে দেখতে পাওয়া গেল। আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিল্পশিক্ষায়তনগুলিতে কিভাবে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে সে সম্বন্ধে ফটোগ্রাফ ছবি এবং ছাত্র-ছাত্রীদের কয়েকটি কাজের নমুনা নিয়ে অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টসে ২০ থেকে ২৮ জানুয়ারী পর্যন্ত এই প্রদর্শনীটি চলবে।

সাধারণত আমেরিকার এই সব শিক্ষায়তনে মোটামুটি চার বছর শিক্ষাদান করা হয়ে থাকে। প্রথম দু বছর ড্রয়িং, অ্যানাটমি, ডিজাইন এবং রঙের ব্যবহার শেখানো হয়। তার পর ছাত্রদের প্রাচীন ও আধুনিক শিল্পরীতির সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ দেওয়া হয় এবং নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তাদের নিজের শিল্পনিয়মক খুঁজে পায় সে সুযোগ দেওয়া হয়। এছাড়া শিক্ষকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শিল্পদর্শন ও শিল্পইতিহাস সম্বন্ধেও তার জ্ঞানলাভের সুযোগ থাকে। শেষ দুবছর ছাত্রকে কোন একটি মাধ্যম সম্পর্কে বিশেষজ্ঞতা অর্জন করতে হয় যেমন পেন্টিং, ভাস্কর্য, গ্রাফিক বা মুরাল ইত্যাদি। সবচেয়ে যেটা উল্লেখ-যোগ্য তা হল শুধু হাতে কাজ করা ছাড়া সাহিত্য, ইতিহাস বা দর্শন ইত্যাদি সম্পর্কেও অনেক প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের কিছুটা পরিচয় থাকার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে চর্চার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। অনেক খ্যাতনামা শিল্পীরা মাঝে মাঝে এসব প্রতিষ্ঠানে এসে ছেলেমেয়েদের কাজ দেখেন এবং সে সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তারা শেখবার সুযোগ পায়। ফলে একদিকে যেমন তাদের প্রথাগত শিক্ষার ভিতও তৈরী হয় অন্যদিকে তার ভিত্তিতে নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথেও তারা এগিয়ে যেতে সুযোগ পায় যে জন্যে আজকের আমেরিকায় প্রায় সব রকমের শিল্পরীতির চর্চাই অবাধে চলছে। বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের কাজের যে নমুনাগুলি দেখা গেল তাতে রিপ্রেজেন্টে-শন ও অ্যাবস্ট্র্যাকশন কোনটাই অনুপস্থিত নেই। গ্রাফিকসের মধ্যে হ্যাল গর্ডনের 'স্ল্যাব' প্যাট্রিশিয়া এম-হেন্ডারসনের 'পিগ' ভার্জি-নিয়া মেয়ারের 'সেল্ফ পোর্ট্রেট' গুলি বৈচিত্র্যে এবং পটুত্বে উল্লেখযোগ্য। এলেন ল্যাণ্ডেলবাউমের 'ডাবল পোর্ট্রেট' ও আই-সেনবার্গ ফ্যামিলি পোর্ট্রেটের সুক্ষ্ম বর্ণ-প্রয়োগ ও পটভূমিকার বিস্তার বেশ মুড সৃষ্টি করেছে। সোফি সারলানের ছবিগুলি তাঁর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য প্রকট করেছে। প্রতিটি ছবিতেই শিল্পীদের কাজের একটা নূন্যতম পটুত্বের অভাব নেই। ভাস্কর্যের মধ্যে জয়েস সুতধরের 'টর্সো'টি ভারি সুন্দর ছন্দোময় রূপ। ফিলিপ বার্কভাল-এর 'থার্ড অব প্যাসেজেস' গতিময়তা এবং স্টেফানী স্কুচিসের অনন্যা স্পাইরাল ভাস্কর্যটি বিশেষ আকর্ষণীয়। প্রদর্শনীটি সবদিকেই ভাল লাগবে।

হার্ণিয়া হাইড্রোসিল, এক-শিরা, [illegible], বাতশিরা, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] নির্ভরযোগ্য চিকিৎসাকেন্দ্র
হিন্দ রিসার্চ হোম
[illegible] [illegible] [illegible], [illegible], [illegible]
[illegible]



চড়ুই

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

শীতের সকাল। বারান্দার থামে ধাক্কা লেগে একফালি সোনালী রোদ্দুর পিঠে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। পাশের টেবিলে ধূমায়মান চা। প্লেটে একটা থিন্ অ্যারারুট বিস্কিট।

পৈত্রিকসূত্রে পাওয়া রামপুরি চাদরটা গায়ে জড়িয়ে বেতের চেয়ারটাতে বসেছি। খবরের কাগজ চোখের সামনে খোলা। নিবিষ্টচিত্তে পড়ছি এক জননেতার দেওয়া একটি ভাষণ।

ফুর্-র্-ৎ। দৃষ্টিটা বিশ্বাসঘাতকতা করলো। খবরের কাগজ থেকে গেল সরে। একটা চড়ুই পাখী এসে বসলো বারান্দার রেলিংএ। এধার-ওধার চেয়ে দেখলো ভয়-চকিত দৃষ্টিতে। দু'পায়ে তিড়িক তিড়িক করে লাফাতে লাফাতে এগিয়ে এল খানিকটা। মুখে একটা শব্দ করে পুচ্ছ তুলে আবার নাচতে নাচতে সরে গেল। বিস্কিটে একটা কামড় দিয়ে ছোট্ট একটা টুকরো ছুঁড়ে দিলুম পাখীটার দিকে। ফুর্-র্-ৎ। উড়ে গেল।

শেষ হ'ল চায়ের পেয়ালা। দৃষ্টি নিবদ্ধ হ'ল খবরের কাগজে। বৈদেশিক প্রীতি, সহাবস্থান, চাঁদে যাবার তোড়জোড়, বাংলা সিনেমা...... ফুর্-র্-ৎ...কিচ্ কিচ্...। চড়ুইটা আবার এসে বসলো বারান্দার রেলিংএ। দু'পা এগোয় আবার পেছোয়। খুব মজা লাগলো। খবরের কাগজটা রেখে ওর দিকে চাইলুম। গায়ের পালক-গুলো ফুলিয়ে ঠোঁট ঘসছে রেলিংএর পাড়ে। আদর করে ডাকলুম......আয় আয়। ফুর্-র্-ৎ......, উড়ে গিয়ে বসলো কার্নিশের ওপর।

কয়েক মুহূর্ত। কি করে, আড়চোখে দেখছি। উড়ে এসে বসলো বারান্দার একটা কোণে। খানিকক্ষণ দেখলো চেয়ে চেয়ে আমার দিকে। পুচ্ছ তুলে দু'পায়ে নাচতে নাচতে এগিয়ে এল বিস্কিটের টুকরোটার কাছে। দু একবার ঠুকরে তিড়িক তিড়িক্ করে নাচতে নাচতে খানিকটা পেছিয়ে গেল। সেই একই ভংগিতে আবার এগিয়ে এল। ঠোঁট দিয়ে ঠোকরাতে লাগলো বিস্কিটের টুকরোটা। আর ভয় নেই আমাকে। সাহস বেড়ে গেছে ওর।

—হ্যাঁ গা, আজ আর কি অফিস যাবার মতলব নেই? —মণিমালার আবির্ভাব।

মণিমালা আমার দ্বিতীয় পক্ষ। ফুর্-র্-ৎ। চড়ুইটা উড়ে গেল।

এই যাঃ।—শব্দটা বেরোলো মুখ দিয়ে। চাইলুম মণিমালার পানে।

মণিমালার কণ্ঠে বিস্ময়—কী হল?

পাখীটা উড়ে গেল।

তাই বল। ...আমি ভাবলাম বুঝি সাংঘাতিক কিছু ঘটলো। মণিমালার কণ্ঠে তাচ্ছিল্য।

মজাটা তো দেখলে না। চড়ুইটা কি সুন্দর তিড়িক তিড়িক করে নাচতে নাচতে এসে বিস্কিটটা ঠোকরাচ্ছিল। —চাইলুম মণিমালার পানে।

তুমি যে দিনের দিন কবি হয়ে উঠছো। —মণিমালার কণ্ঠে শ্লেষ।

না না, কবি-টবি নয়। সুন্দর জিনিস দেখলে সকলেরই আনন্দ হয়। —বোঝাতে চাইলুম মণিমালাকে।

আমার মুখটা দেখে তো আনন্দে আটখানা হয়ে পড় না? আমার মুখের চেয়ে বুঝি ঐ অলপ্পেয়ে পাখীটা তোমার কাছে বেশী সুন্দর লাগলো! —বেশ ঝাঁঝের আভাস পেলুম মণিমালার কণ্ঠে।

পরিস্থিতিটা তরল করার জন্যে বললুম, আহা, তা, কেন! প্রত্যেকেরই তো নিজস্ব একটা সৌন্দর্য আছে। বনের বাঘ-ভাল্লুকের মধ্যেও খুঁজলে কিছু সৌন্দর্য পাওয়া যায়।

তা'হলে তো বাঘ-ভাল্লুক নিয়ে থাকলেই হয়। —সশব্দ পদসঞ্চারে দ্বিতীয় পক্ষের প্রস্থান।

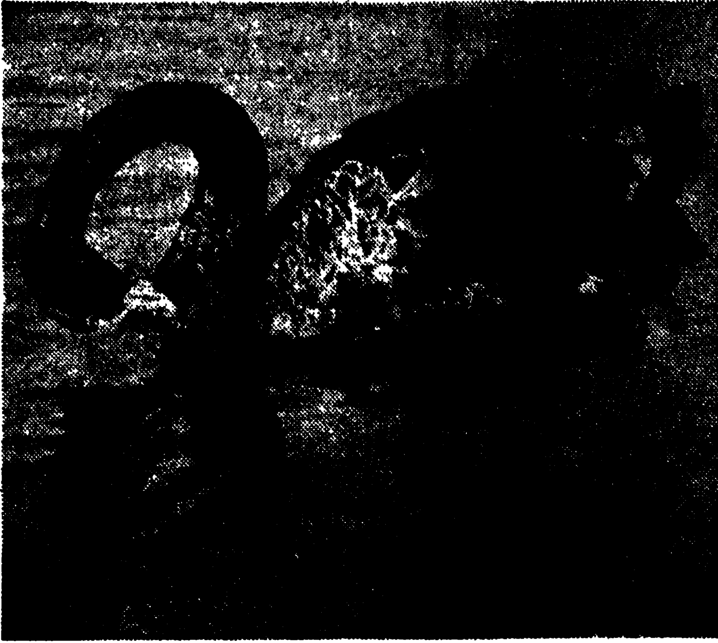
রাগের কারণটা ঠিক অনুধাবন করতে না পেরে ঘাড় ফিরিয়ে চাইলুম সঞ্চারিণী দ্বিতীয় পক্ষের দিকে।

ওরে বাবা, সাড়ে আটটা! অজ নির্ঘাত লাল কালির দাগ। মুখটা হাঁড়ির মত করে বড়বাবু আজও বক্রোক্তি করবেন, কি হ'ল, আজো কেউ মল-টল নাকি? —দূর ছাই, রোজ রোজ কত লোককে আর মারাবো!

চড়ুই রইলো মাথায়। গামছা কাঁধে ফেলে তাড়াতাড়ি ঢুকলুম বাথরুমে।

চড়ুইটা যেন আমায় পেয়ে বসেছে। রোজ সকালে যখন বারান্দায় চা খেতে বসি, ঠিক ফুর্-র্-ৎ করে উড়ে এসে বসবে। আগে তবু একটু ভয়-ডর ছিল। রেলিং কিম্বা কার্নিশে এসে বসতো। তারপর গুটি গুটি এগোতো অবস্থা বুঝে। এখন একেবারে উড়ে এসে বসবে আমার টেবিলে। বিস্কিটের টুকরোটা ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবো টেবিলে, —খুঁটে খুঁটে খাবে। খাওয়া শেষ হ'লে আমার মুখের দিকে চেয়ে দু'একবার কিচ্ কিচ্ করবে। তারপর উড়ে গিয়ে বসবে কার্নিশে। ওর ভাষা আমি বুঝতে পারি না। মনে হয় কি যেন বলে।

আগে আসতো একা। এখন দোসর জুটিয়েছে। আর আসেও ঠিক একই সময়ে। দু'টিতে এসে ঝুপ করে টেবিলের কোণে বসবে। বিস্কিটের গুঁড়ো খাবে খুঁটে খুঁটে। খানিকটা কিচ্ কিচ্ করবে, নয়তো ঝগড়া



ফটো : রেখা সেন

করবে ঠোঁটে ঠোঁট লাগিয়ে। তারপর এক-সঙ্গে উড়ে গিয়ে বসবে কার্নিশে। শুনেছি, আপিংখোরেরা ঠিক সময়টির জন্যে হন্যে হয়ে বসে থাকে। কিন্তু আমার বিস্কিটে তো আপিং থাকে না! তবে ওরা ঠিক একই সময়ে আসে কেন? বলতে পারি না। ওদের ভাষাও বুঝি না, মনের কথাও জানি না। ওরাই জানে কেন ওরা আসে।

দ্বিতীয় পক্ষ গেছেন তাঁর পিত্রালয়ে। উপলক্ষ, আর একটি নতুন মুখকে পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় করানো। বাড়ীতে আমি আর চাকর বিশু। সকালে চা খেতে খেতে চড়ুয়ের সঙ্গে মৌন আলাপ, নাকে মুখে দু'টি আধ সেদ্ধ চাল গ'জে সরকারী ওয়াগনে চেপে আপিস, বড়বাবুর দাঁত খিঁচুনি, তারপর আবার সরকারী ওয়াগনে চেপে বাড়ী—এই-ই এখন নিত্যকর্ম।

মনটা সেদিন খুবই খারাপ। আনকোরা নতুন পাঞ্জাবিটা বাস থেকে নামবার সময় একেবারে ফালা ফালা হয়ে ছিঁড়ে গেল। সেলাই করে নেবো তা'রও উপায় নেই। ছেঁড়া ফালিটা ঝরেই রয়ে গেছে। বিষণ্ণ মনে তালা খুলে ঘরে ঢুকলুম। পট্ করে সুইচ টিপতেই কুড়ি ভাটের ইলেকট্রিকের বালবটা জ্বলে উঠলো। মনে হ'ল কি যেন একটা উড়ে গেল। ওপরের দিকে চেয়ে দেখলুম চড়ুইটা মুখ বাড়াচ্ছে কড়িকাঠের ফাঁক দিয়ে। —আ—হা—আ! বারান্দা থেকে এবার ঘরে? সাহস আরো বেড়েছে! দ্বিতীয় পক্ষ নেই কি না।

ছেঁড়া জামাটা খুলে আলনায় রাখতে গিয়ে দেখি জোড়াটি এসে জুটেছে আমার প্রথম পক্ষের ছবিটার ওপর। ছবিটা হাসছে।

কাবেরী ছবিটা তুলেছিল হাসতে হাসতে। ছবিটা দেখলেই কাবেরীর হাসি হাসি মুখটা মনে পড়ে। বিয়ের পর কাবেরী বেঁচেছিল তের মাস। আমাকে একটা মরা মেয়ে উপহার দিয়ে হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করে কাবেরী।

আমার শোক গেল তলিয়ে, চড়ুই গেল সরে মনের পরদা থেকে। কাবেরীর কথা ভাবতে ভাবতে ময়লা গামছাটা তুলে নিয়ে ঢুকলুম বাথরুমে। তের মাসে কাবেরীর মুখটা ভার হতে দেখিনি কোনদিন। কটু কথাও যেন মিষ্টি করে বলতে পারতো ও।

গামছাটা তারে মেলে দিয়ে লুঙি নেবার জন্যে ঘরে ঢুকলুম।...বাড়টা একবার দেখেছো! দু'টোই এসে বসেছে কাবেরীর ছবিটার ওপর! এখনি নোংরা করবে। রাগ হ'ল ভয়ানক। ইচ্ছে করলো মেরে তাড়াই দু'টোকে। কাবেরীর হাসিমাখা মুখখানা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। হ'ল না মেরে তাড়ানো। নিরুপায় হয়ে আজন্মের মত গিয়ে বসলুম বিছানায়।

কড়িকাঠের ফাঁকে বাসা বেঁধেছে চড়ুই দু'টো। রাজ্যের খড়কুটো এনে জমা করেছে কড়িকাঠের ফাঁকে। আপিস থেকে ফিরে দেখি ধুলোবালি, খড়কুটো পড়েছে বিছানায়। গজ্ গজ্ করতে করতে পরিষ্কার করি। পারি না মেরে তাড়াতে। কোথায় যেন বাধে।

মণিমালার অনুপস্থিতিতে এখনকার নিঃসঙ্গ জীবনে চড়ুই দু'টোই আমার একমাত্র সঙ্গী। সকালে বিস্কুট খায় আমার সঙ্গে। কথা কয় না-জানা ভাষায়। সন্ধ্যের মাঝে মাঝে এসে বসে কাবেরীর ছবিটার ওপর। কিচ্ কিচ্ করে শব্দ করে, ছবির ফ্রেমটা ঠোকরায় ঠোঁট দিয়ে। আমি বিছানায় বসে ওদের রকম দেখে যাই।

মণিমালা পিত্রালয় থেকে ফেরার কথা। বড়বাবুকে অশেষ অনুনয় করে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরেছি। ওপরে উঠে দেখি সে এক কুরুক্ষেত্র ব্যাপার। সদ্যজাত কন্যাটি বারান্দার এক কোণে শোয়ানো। তাকে পাহারা দিচ্ছে আমার ছ'বছরের ছেলে মলয়। ঘরের ভেতর আমার দশ-বারো বছরের শ্যালক জ্যাবল টুলে উঠে কড়িকাঠ পরিষ্কার করছে। আর তা'র দিদি অর্থাৎ মণিমালা নিজের মনেই গজ্ গজ্ করছে।—কি মানুষ রে বাবা ঘরটা যেন আঁস্তাকুড় করে রেখেছে। থাকে কি করে!

আহা—হা, করছো কি! ওদের বাসাটা ভেঙে দিলে!—বিস্মিতকণ্ঠে প্রশ্নটা বেরোলো আমার মুখ দিয়ে।

না, ভাঙবে না? যত রাজ্যের জঞ্জাল জড় করেছে কড়িকাঠে। বিছানাটা যেন ভাগাড় হয়ে ছিল।—মণিমালার দ্বিধাহীন উত্তর।

মেঝেতে দৃষ্টি পড়তেই চমকে উঠলুম। —আহা-হা, বাচ্চা দুটোকে মেরে ফেললে!—দু'টো চড়ুয়ের ছানা মেঝেতে পড়ে। গায়ে তাদের তখনো পালক গজায় নি ভালো করে।

দরদ দেখে আর বাঁচি না। দু'টো চড়ুয়ের বাচ্চা মরেছে, তাতেই তোমার শোক উথলে উঠলো। মরণদশা! ঘরের মধ্যে বাসা করতে আসে কেন?—স্তম্ভিত হয়ে গেলুম মণিমালার উত্তর শুনে। এর পর আর কিই বা বলার থাকতে পারে! ওদের বড় অন্যায়, ওরা ঘরের মধ্যে বাসা বেঁধেছিল, অনধিকার প্রবেশ।

দৃষ্টিটা গিয়ে পড়লো কাবেরীর ছবিটার জায়গায়। কি হ'ল। জায়গাটা খালি। —ও, ঘর পরিষ্কার করার জন্যে ছবিটাকে খুলে মেঝেতে রাখা হয়েছে। ছবিটায় দেওয়ালের ছায়া পড়েছে। কাবেরীর হাসি-হাসি মুখটা দেখতে পেলুম না। বড় আবছা মনে হ'ল ছবিটা। মনে হ'ল ওটা শুধুই একটা ফটো!

কোন কথা না বলে' বারান্দার চেয়ারটায় গিয়ে বসলুম। কার্নিশের একেবারে কোণে চড়ুই দু'টো বসে আছে গা ঘেঁসে। আমাকে দেখে একবার একটু নড়াচড়া করলো, দু'-একবার শব্দ করলো—কিচ্ কিচ্। তারপর যেমন বসেছিল, তেমনিই বসে রইল। ওদের দিকে আর তাকাতে পারছিলুম না। মাথাটা হেঁট করে বসে রইলুম। সামান্যই তো ঘটনা। নিত্যই তো এ রকম কত ঘটনা ঘটছে। তবু যেন নিজেকে বড় অপরাধী মনে হ'ল। ওদের মুখ দেখাতে লজ্জা করতে লাগলো।

পরদিন সকালে নিত্যকার মত বারান্দায় চা খেতে বসেছি। চড়ুই দু'টো ফুড়ুৎ করে উড়ে এসে টেবিলের কোণে বসলো। আমার

চোখ দুটো বুজে ফেলেছিলুম। পিট্‌পিট্ করে চেয়ে দেখলুম ওরা আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে। বিস্কুটের টুকরোটা গুঁড়িয়ে ওদের সামনে দিলুম। ওরা পরস্পরের দিকে মুখ চাওয়াচায়ি করে আরম্ভ করলো ঠোকরাতে।

"ঠাঁই"...একটা শব্দ। একটা চড়ুই কিচ্ কিচ্ করতে করতে মেঝেতে পড়ে ঝট্‌পট্ করতে লাগলো। আর একটা প্রাণভয়ে উড়ে গেল।

কে রে, কে মারলে?—পেছন ফিরে দেখি ভ্যাবল দাঁত বার করে হাসছে। তা'র হাতে একটা গুল্‌তি। পাখীটা মেঝেতে পড়ে তখনো ছট্‌ফট করছে। মুখ দিয়ে সরু সুতোর মত রক্তের ধারা বেরিয়ে আসছে।

আমারো রক্তটা যেন মাথায় উঠে গেল। ছুটে গিয়ে একটা চড় বসালুম ভ্যাবলের গালে।—তুই পাখীটাকে গুলতি দিয়ে মারলি! শয়তান, পাজী, ছুঁচো কোথাকার।

চড় খেয়েই ভ্যাবল প্রাণপণে চীৎকার করে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গেই মণিমালার আবির্ভাব দৃশ্যপটে। ভ্যাবল তখন গাল ধরে বসে পড়েছে। দিদির আবির্ভাবে উঠেই মণিমালাকে জড়িয়ে ধ'রে বলে উঠলো—আমায় মেরেছে! ভ্যাবলের গালটা দেখে মণিমালা প্রথমে শিউরে উঠলো। তারপর বললে, তুমি কি মানুষ! পাঁচ আঙুলের দাগ পড়ে গেছে এমন করে চড় মেরেছো!

মনটা উত্তেজিত হয়েই ছিল। কড়া-সুরেই বললাম, বেশ করেছি মেরেছি। ও কি করেছে দেখ—আঙুল দিয়ে মরা চড়ুইটাকে দেখালুম।

ওঃ, তাই ব'লে তুমি মানুষ খুন করবে? আচ্ছাঃ..., চলে আয় ভ্যাবল।—ভ্যাবলকে নিয়ে মণিমালার প্রস্থান।

ধীরে ধীরে গেলুম চড়ুইটার কাছে। সব শেষ হয়ে গেছে। রক্তটা তখনো তাজা টক্‌টকে।

ভারাক্রান্ত মনে বারান্দার দরজা বন্ধ করে স্নানের ঘরে ঢুকলুম। ওপরে ওঠার সময় দেখলুম মণিমালা তা'র ভায়ের টিনের সুটকেশটা গুছোচ্ছে। সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময়ে মণিমালার বক্রোক্তি কানে এল—এঃ, মারতে এসেছে! ভাত দেবার মুরোদ নেই, কান কাটার গোঁসাই। আমার ভাই যেন খেতে পায় না, তাই ও'র ভাত খেতে এসেছে!

না খেয়েই অপিসে এসেছি। এটা এমন কিছু নতুন নয়, প্রায়ই আসতে হয়। আজ কিন্তু অপিসের কাজে কিছুতেই মন বসছিল না। ঘটনাটা সামান্যই, তবুও থেকে থেকে দৃশ্যটা চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। মেঝেতে পড়ে পাখীটার ছট-ফটানি, কি করুণ আর্তনাদ! তারপরেই লাল সুতোর মত রক্তটা ঠোঁট দুটোর মাঝখান দিয়ে গড়িয়ে এল।

সন্ধ্যের সময় বাড়ী ফিরলুম, যেমন রোজ ফিরি। বিশু বসেছিল চুপ করে ভেতরের চাতালটাতে। নিঃশব্দে উঠে এসে ঘরের চাবিটা হাতে দিয়ে বললে, মা না খেয়েই বাপের বাড়ী চলে গেছেন।—ওঃ, বলে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলুম ওপরে।

ঘরে ঢুকলুম তালা খুলে। জিনিসপত্তর যেমন ছিল তেমনি ছড়ানো পড়ে রয়েছে। বারান্দার দরজাটাও বন্ধ। জামাটা ছেড়ে বারান্দায় গেলুম। আলোটা জ্বালতেই একটা শব্দ কানে এল...ফুরুৎ...। জোড়াটা কোথাও বসেছিল, উড়ে গিয়ে বসলো কার্নিশে। দৃষ্টিটা আপনা থেকেই নেমে এল মেঝেতে। মরা পাখীটা নেই। জায়গাটাতে তখনো কয়েক ফোঁটা রক্ত জমাট বেঁধে কালো হয়ে গেছে। পিঁপড়ে ধরেছে। কয়েকটা ছোট পালক পড়ে আছে মেঝেতে। সেগুলো ঘিরেও পিঁপড়েরা জটলা পাকিয়েছে। আলো নিভিয়ে দিয়ে চেয়ারে বসলুম চুপ করে। জোড়াটা অকারণে কয়েকবার এধার-ওধার ওড়াওড়ি করে গিয়ে বসলো কার্নিশে।

অনাহার, ক্লান্তি আর খানিকটা বেদনা আমাকে এমন করে পেয়ে বসেছিল যে কিছুই ভালো লাগছিল না আমার। যাক্‌গে বাপের বাড়ী মণিমালা। কিছুতেই আনতে যাবো না সাধ্যসাধনা করে। যখন ইচ্ছে হয় নিজে আসবে।

রাতের খাওয়া সাঙ্গ করে শুয়ে পড়েছি। বিছানায় শুয়ে অনেকক্ষণ এপাশ-ওপাশ করে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। মাঝ-রাতে ঘুমের ঘোরে একটা বিশ্রী স্বপ্ন দেখে চীৎকার করে উঠলুম—গেল, গেল, গে...ল। চীৎকার শুনে বিশুর ঘুম ভেঙে গেছে। ছুটে এসে আমাকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে বললে, কি হয়েছে বাবু? অমন করে চেঁচিয়ে উঠলেন কেন?

ঘামে সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে, কাঠ হয়ে গেছে গলাটা। ধীরে ধীরে উঠে বসে কোন-রকমে বিশুকে বললুম—এক গেলাস জল দে তো। জল খেয়ে বিশুকে বললুম, একটা বড় বিশ্রী স্বপ্ন দেখছিলুম রে।—ওঃ, বলে বিশু আবার শুতে চলে গেল।

স্বপ্নে দেখলুম, রাস্তা পার হতে গিয়ে মলয় গাড়ী চাপা পড়েছে। মলয়ের বুকের ওপর আছড়ে পড়ে কাঁদছে মণিমালা। মলয়ের রক্তে ভেসে যাচ্ছে রাস্তা। রক্তটা গড়িয়ে গিয়ে চলে যাচ্ছে রাস্তার নর্দমার দিকে। হঠাৎ দেখলুম, খানিকটা দূর থেকে আর একটা সরু রক্তস্রোত আসছে। চড়ুইটার মুখ দিয়ে যেমন সরু সুতোর মত বেরিয়ে এসেছিল রক্তটা, ঠিক সেইরকম। তারপর মিশে গেল দুটো রক্তস্রোত। এর পরই চীৎকার করে উঠেছিলুম।

উঃ, কি ভয়ঙ্কর স্বপ্ন! বাকি রাতটা আর ঘুমোতে পারলুম না। মনকে যতই বোঝাই, দূর এতো স্বপ্ন,—তবুও মনের ভেতর কোথায় যেন একটা কাঁটা বিঁধতে থাকে খচ্‌খচ্ করে।

ভোর না হ'তেই ছুটলুম শ্বশুরবাড়ীর উদ্দেশ্যে। গিয়ে দেখি মলয় তখনো ঘুমোচ্ছে।

অত ভোরে আমাকে দেখে শ্বশুরমশাই একটু আশ্চর্য হলেন, মুখে বললেন না কিছু। মণিমালা আমাকে দেখেই হেসে ফেললে ফিক্ করে। ভাবটা, কেমন জব্দ। সকাল হ'তে না হ'তেই ছুটে আসতে হ'ল তো।

মলয়কে ডেকে তুলে জামা-প্যান্টালুন পরালে মণিমালা। তারপর আমাকে বললে, একটা গাড়ী ডাক।

কিন্তু আমি তোমাদের নিতে যেতে আসিনি, আমার কন্ঠে বিস্ময়ের সুর।

খুব হয়েছে। শাক দিয়ে আর মাছ ঢাকতে হবে না,—বলে মণিমালা ঘরের দরজা পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে এল। বললে, জান, মলয় কাল গাড়ীচাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছে।

ধড়াস্ করে উঠলো বুকটা। চেয়ে রইলুম মণিমালার মুখের দিকে। মুখ দিয়ে কোন শব্দ বেরোলো না।

বাড়ী ফিরে চায়ের পেয়ালা নিয়ে যখন বারান্দায় বসলুম, দেখি প্রতিদিনের মত চড়াইটা বসে আজো আছে কার্নিশে।

প্রতিদিনের মতোই বটে, তবে এতদিনে বসতো জোড় বেঁধে, আজ ও একা!

প্রশান্ত মিত্র সম্পাদিত **মাসিক কবিতাপত্র** প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা। নগদ দামে বিক্রয় নিষিদ্ধ। ঠিকানা-সহ ৩৫ পয়সার স্ট্যাম্প পাঠালে ডাকে যাবে। চিঠির ঠিকানা : **প্রশান্ত মিত্র**, সম্পাদক 'কবিতাপত্র' ৪।২বি, রাজেন্দ্রলালা স্ট্রীট, কলকাতা—৬

সকল ঋতুতে অপরিবর্তিত ও অপরিহার্য পানীয়

চা

কেনবার সময় 'অলকানন্দার' এই সব বিক্রয় কেন্দ্রে আসবেন

অলকানন্দা টি হাউস

৭, পোলক স্ট্রীট কলিকাতা-১
২, লালবাজার স্ট্রীট কলিকাতা-১
৫৬, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ কলিকাতা-১২

॥ পাইকারী ও খুচরা ক্রেতাদের অন্যতম বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান ॥

শ্রীহট্টে সাহিত্যের উপকরণ

ক্ষীরোদচন্দ্র দেব

কোন এক জাতি বা সম্প্রদায়ের কৃষ্টি গড়িয়া উঠে, তাহাদের অধ্যুষিত দেশের আচার সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান ইত্যাদিকে কেন্দ্র করিয়া। কোন এক বিশেষ স্থানে বংশপরম্পরায় অধিবাসীদের মধ্যে যে সব নিয়মপ্রণালী, সাহিত্য, বিজ্ঞান ইত্যাদি ক্রমাগত রেখাপাত করিতে থাকে তাহা হইতেই উহাদের সভ্যতা গড়িয়া উঠে। মিঃ ই বি হ্যাবেল লিখিয়াছেন—

"The artistic sense is the essence of real culture. Homer, Shakespeare and the Mohabharat products of national life and art, will live when most of our college-made culture is lost in the limbs of time".

Tradition বা ঐতিহ্য ছাড়া কোন জাতিই প্রকৃত কৃষ্টিসম্পন্ন হইতে পারে না। আমরা যখন বলি— He is a highly cultured man...তখন কি এই বুঝি যে লোকটি অনর্গল কালিদাস কিংবা ভবভূতি অথবা মিল্টন কিংবা সেক্সপীয়র আওড়াইয়া যাইতে পারে? Cultured man বলিতে আমরা বুঝি যে লোকটির একটা তীব্র অনুভূতিশক্তি আছে যার বলে সে সদাসৎ, ভালমন্দের পার্থক্য দেখিতে পায়। এই অনুভূতি শক্তি গড়িয়া উঠে বংশানুক্রমে (Heridity) এবং আবেষ্টনীতে (Environment বাহারা শ্রীহট্টবাসী অথবা কার্য উপলক্ষে যাহারা বহুকালবধি শ্রীহট্টে বাস করিতেছেন তাহাদের ভাবিয়া দেখা উচিত বাংলার সভ্যতায় শ্রীহট্টের দান কিছু আছে কি না। কারণ সমগ্র বাংলাদেশের সভ্যতা শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য ভিন্ন ভিন্ন জেলা বা ভূভাগের কৃষ্টির সমষ্টি মাত্র। শ্রীহট্ট যে অতি প্রাচীন দেশ, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। শ্রীহট্টে অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি বলেন যে, (৬00) ছয় শত খৃঃ জালিন্ধরে জালন্ধর রাজধরের শিবমন্দিরে এক প্রশস্তি এবং চৈনিক পরিব্রাজকের ভ্রমণ বৃত্তান্তে শ্রীহট্টের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। Epigraphia Indica-র দ্বাদশ এবং উনবিংশ খণ্ডে পঞ্চখণ্ড পরগণার অন্তর্গত নিধনপুরে প্রাপ্ত ভাস্কর বর্মার তাম্রশাসনগুলি সম্বন্ধে আলোচনা আছে। মুরারিচাঁদ কলেজের অধ্যাপক ডক্টর কিশোরীমোহন গুপ্ত বলেন যে, শ্রীহট্টের সভ্যতা খৃঃ পঞ্চশত শতাব্দীর। কেহ কেহ বলেন যে, ভাটেরায় যে দুইখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে তাহার একখানি ১০২৮ শকাব্দার এবং অন্যখানি সম্ভবত অজ্ঞাতের। এই দুইখানি তাম্রশাসনেই গোবিন্দকেশব দেব শিবের জন্য ভূমি দান করেন; এবং এই গোবিন্দ কেশব দেব হস্তিনাপুরের চন্দ্রবংশজাত রাজা বলিয়া নাকি নিজেকে উল্লেখ করিয়াছেন। লিপিশাস্ত্র (Epigraphical) আলোচনামূলক সিদ্ধান্তের ফলে ডক্টর গুপ্ত বলেন যে, উহা সম্ভবতঃ একাদশ শতাব্দীর। উপরোক্ত তাম্রশাসনগুলি কৌতূহলোদ্দীপক — যেহেতু শিলালিপি, মুদ্রা এগুলি অতীব প্রামাণিক নিদর্শন। তবে তাম্রলিপিগুলির সময়কাল নির্ণয় প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণার বিষয় হইলেও অন্যদিক দিয়া ইহার মূল্য অল্প নহে। নিধনপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসন সম্বন্ধে ডক্টর গুপ্তের পাঠ সত্য হইলে বলিতে হইবে যে, সমগ্র বাংলাদেশের মধ্যে শ্রীহট্টই সর্বপ্রথম অর্থাৎ পঞ্চশত শতাব্দীতে (Five hundred AD.) ব্রাহ্মণের আগমন ঘটিয়াছিল। কিন্তু বঙ্গদেশের অন্য কোনও স্থানে আদিশূরের পূর্বে অর্থাৎ সাত শতাব্দীর পূর্বে (Seven hundred A.D.) কোন ব্রাহ্মণ আসেন নাই। কায়স্থ বা বৈদ্য বলিয়া সেই সময় যে কোনও জাতি ছিল না, ঐ সব পদবী চতুর্বর্ণের লোকেরই কর্মবিভাগ অনুসারে প্রদত্ত হইত, ভাটেরার তাম্রশাসনের দ্বিতীয় খণ্ডের "বৈদ্যবংশপ্রদীপঃ শ্রীবনমালী করঃ" তাহার নিদর্শন। শ্রীহট্টে বৈদ্য-কায়স্থে ভেদাভেদহীনতা, বল্লালী কৌলিন্যপ্রথা এদেশে প্রবর্তিত না হইবার মূলে শ্রীহট্টের প্রাচীনতম সভ্যতা অথবা আচার-ব্যবহার নিহিত কি না তাহাও ভাবিয়া দেখিবার বিষয়।

নৃতত্ত্বের (Anthropolgical) দিক দিয়া দেখিতে পাওয়া যায় যে, এখানে আর্য দ্রাবিড় এবং মনখমেরের (Mon-Khmer) জাতির সংমিশ্রণ রহিয়াছে। ভাটেরার তাম্রশাসনে (Mono-syllabie) ভাষায় কয়েকটি শব্দ এবং বাক্য আছে, আজ পর্যন্ত নাকি কেহ তাহার পাঠোদ্ধার করিতে পারেন নাই। ইহা তৎকালীন প্রচলিত স্থানীয় কোনও ভাষা কি-না তাহাও অনুসন্ধানের বিষয়। এই শ্রীহট্টে আর্য ও অনার্য দেব-দেবীর বাহুল্য দেখিয়া মনে হয় যে, এখানে বিভিন্ন ধর্মেরও অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল। দ্রাবিড়রাই সর্প পূজা করিত। এখন খাসিয়ারা সর্প পূজা করে, মনসা সুবচনি ইত্যাদি দেবতারা আর্যশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত নহেন। যদি কেহ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন এবং জাতিতত্ত্বের অনুশীলন করেন তবে দেখিবেন বৌদ্ধ-প্রভাবের বহু নিদর্শন শ্রীহট্ট জেলার বিভিন্ন স্থানে রহিয়া গিয়াছে। জাতিতত্ত্ব এবং পুরাতন ঠাকুরঘরে কাঠের দরজা এবং বেড়ার খোদাই মূর্তিগুলি এ সম্বন্ধে আপনাদিগকে প্রভূত সাহায্য করিবে। চারুশিল্প এবং প্রাচীন স্থাপত্যের নিদর্শন এ জেলায় বহু স্থানে অনাদৃত পড়িয়া আছে। হাতীর দাঁতের পাটি, পাখা ইত্যাদির কথা ছাড়িয়া দিতেছি—যদিও আমার বন্ধু মৌলবী আবদুল্লার দাদামহাশয়ের প্রদত্ত উপহার হাতীর দাঁতের এক খানা পাখা আজও ব্যাকিংহ্যাম প্যালেসে সযত্নে রক্ষিত হইতেছে। শ্রীহট্ট জেলার বাড়ীতে বাড়ীতে যে সব বিগ্রহের পূজা আজও হইতেছে তাহাদের গঠনশিল্প আলোচনা করিলে দেখিতে পাইবেন কাশীতে প্রস্তুত বিগ্রহ ছাড়া বহু বিগ্রহই শ্রীহট্টের ভাস্কর্যের নিদর্শন। শ্রীহট্টের রথ হইতে কতকগুলি কাঠের খোদাই মূর্তি সংগ্রহ করিয়া জনৈক ভদ্রলোক ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয়কে উপহার দিয়েছেন। সুপ্রসিদ্ধ স্টেলা ক্রামরিশ নাকি তাহা দেখিয়া বলিয়াছেন, এই মূর্তিগুলির গঠনশিল্প অপূর্ব। এই শ্রীহট্টের বন্দরবাজার হইতে সংগৃহীত অপরূপ বুদ্ধমূর্তির খবর আমরা জানি না। ঢাকা মিউজিয়ামে তাহা রক্ষিত আছে, জৈন্তার দোলমঞ্চ কারুকার্যের অপূর্ব নিদর্শন, ঢুবির মঠে অতি সুন্দর একটি বুদ্ধের প্রস্তর মূর্তি ছিল—অযত্নে তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। শিলংযাত্রীরা পথে নিশ্চয় কতকগুলি পান্থশালা দেখিয়াছেন কিন্তু সেগুলির ভাস্কর্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান কেহ করেন নাই। জৈন্তার ভুবন বাসুদেবের মূর্তিটি একবার দেখিয়া আসিলে বুঝিতে পারিবেন, স্থানীয় কারশিল্প কত উচ্চস্তরে পৌঁছিয়াছিল।

মুসলমান রাজত্বের পূর্বে কুশিয়ারা নদী, শ্রীহট্টকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছিল। নদীর দক্ষিণ তীর ত্রিপুরারাজের অধীনস্থ ছিল, উত্তরতীর তিনজন স্বাধীন নৃপতির অধীনস্থ ছিল।—এই তিন বিভাগের নাম—গৌড়, লাউর এবং জৈন্তা। এই তিন বিভাগই হয়ত ত্রিপুরার অংশ কিংবা মিত্ররাজ্যরূপে পরিগণিত ছিল। লাউর-নৃপতি ছিলেন ব্রাহ্মণ, জৈন্তা নৃপতির উদ্ভব সম্ভবতঃ খাসিয়া জাতি হইতে। গৌড়ের "গোবিন্দ" অর্থাৎ নৃপতির জাতি সম্বন্ধে সন্দেহের অনেক কারণ রহিয়াছে। কেহ কেহ বলেন জাতিতে তিনি ছিলেন খাসিয়া, শ্রীহট্টে তৎকালে প্রচলিত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাবে তিনি হিন্দু হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি জাতিতে কি ছিলেন তাহা প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণার বিষয়। কিন্তু শ্রীহট্টে একটা ভুল ধারণা প্রচলিত আছে যে ১৩৪৩ খৃঃ পীর শাহজালাল যে রাজাকে যুদ্ধে পরাভূত করেন তার নামই ছিল গৌড়-গোবিন্দ। গৌড়-গোবিন্দ কাহারও নাম ছিল না—উহা উপাধি মাত্র—অর্থাৎ গৌড়ের গোবিন্দ, কি না নৃপতি। গৌড়ের রাজাদিগের উপাধি ছিল "গোবিন্দ" —ভাটেরার তাম্রশাসনে উল্লিখিত গৌড়ের রাজার নাম ছিল গোবিন্দ কেশব দেব। গৌড়ের শেষ হিন্দু নৃপতির নাম কি তাহা এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। তেমনি জৈন্তার নৃপতিদের উপাধি ছিল 'পুরন্দর'। জৈন্তার প্রাপ্ত বহু মুদ্রার এই উপাধি খোদিত আছে।

গৌড়ের পর লাউড় মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮৩০ খৃঃ পর্যন্ত জৈন্তা নিজ স্বাধীনতা রক্ষা করে। তৎপর উহা বৃটিশ রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত হয়। কুশিয়ারা নদীর দক্ষিণদিকস্থ ভূভাগ কোনো দিন মুসলমান রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল কি না তার বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস নাই। প্রতাপগড় ও পঞ্চখণ্ড পরগণাদ্বয়ের মধ্যবর্তী ভূভাগ ব্যতীত ঐ অঞ্চলের কোনো স্থান সম্রাট আকবরের সাম্রাজ্যভুক্ত থাকার উল্লেখ পাওয়া যায় না। ইটার ব্রাহ্মণ রাজা সুবিদ নারাইণের অধীনে ছিল এবং তিনি ত্রিপুরারই সামন্তরাজ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইটা মুসলমান রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। আমি ইতিহাস আলোচনায় বসি নাই। আমার উদ্দেশ্য, এই ইতিহাসকে আশ্রয় করিয়া শ্রীহট্টের বিভিন্ন স্থানে যে বিশিষ্ট ধর্ম, সাহিত্য রাজনীতি ইত্যাদি গড়িয়া উঠিয়াছে তাহারই প্রতি আপনাদের কৌতূহল উদ্রেক করা। "হাবেলী শ্রীহট্ট" বলিতে যে স্থান বুঝাইত তাহা ছিল পর্বতের অন্তর্গত। বর্তমান সমতল ক্ষেত্র বঙ্গোপসাগরের কুক্ষিগত ছিল। সুরমা ও তাহার শাখানদী কর্তৃক আনিত পলিমাটিতে উহা ক্রমশঃ ভরাট হইয়া উঠিতেছে। শ্রীহট্টের দ্বিতীয় ডেপুটি কমিশনার লিণ্ডুসে যখন ঢাকা হইতে শ্রীহট্ট আসেন তখনও নৌকায় কম্পাস বসাইয়া শুধু জলরাশি ভেদ করিয়া একদম শ্রীহট্টের ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন—তাহার বর্ণনায় আছে, ঠিক যেন সমুদ্রের ভিতর দিয়া চলিয়াছেন। আপনারা অনুসন্ধান নিয়া দেখিবেন, শ্রীহট্টের প্রথম ভূমি বন্দোবস্ত খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে আরম্ভ হইয়াছিল কি না। ভারতবর্ষের অন্য সব অংশে সর্বপ্রথম 'মৌজার' সৃষ্টি হয়, তৎপর 'পরগণার'। কিন্তু শ্রীহট্টে প্রথম 'পরগণা' পরে 'মৌজার" সৃষ্টি হয়। কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইবেন শ্রীহট্টের বাঙ্গালী অধিবাসীরা কোথা হইতে আসিয়া এখানে বসতি করেন। চৌধুরী, কানুনগু, মজুমদার, পুরকায়স্থ, বড়ভুইঞা, লস্কর ইত্যাদি পদবী কেন সৃষ্টি হইয়াছিল প্রাচীন দলিলাদি আলোচনায় তাহারই প্রমাণ পাইবেন।

শ্রীহট্টের সংস্কৃত সাহিত্য ভাণ্ডারও অল্প নহে। পণ্ডিত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয় সেদিন আমাকে লিখিয়াছেন—

"রঘুনাথ রঘুনন্দনের কথা ছাড়িয়া দিলেও যাঁহারা নামে ন্যায়শাস্ত্রকে 'জগদীশী' বলে সেই জগদীশ তর্কালঙ্কারের 'শক্তি প্রকাশিকা', 'তর্কামৃত', 'দীধিতি টিপ্পনী', 'অনুমানময়ূখভাষ্য', 'লীলাবতীর টীকা' প্রভৃতির কথা পণ্ডিতসমাজে কে না জানেন? ইঁহারই ছাত্র পঞ্চখণ্ডের মহেশ্বর ন্যায়ালঙ্কারের 'ভাবার্থ চিন্তামণি', 'স্মৃতি ব্যবস্থা', 'দায়ভাগটীকা', 'সিদ্ধান্ত প্রদীপ' ইত্যাদি অষ্টাবিংশতি প্রদীপ গ্রন্থাবলী, ইটার রামগোবিন্দ সার্বভৌমের 'সমদোদয়' 'বেদ-[illegible] পাণ্ডিত্য প্রকাশক বিংশতি সংখ্যক গ্রন্থের স্থান সংস্কৃত গ্রন্থভাণ্ডারে অতি উচ্চে। ইটার ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন, তরফের বামদেব বিদ্যানিবাস ও গোপীনাথ তর্কসিদ্ধান্ত, জালসুকার বীরেশ্বর ভট্টাচার্য ও রামশরণ বিদ্যালঙ্কার, জয়পুরের শংকর শিকদার প্রভৃতির দান সামান্য নহে। বলভদ্র ভট্টাচার্যের শামলবর্মচরিত, লাউড়ের রাজা দিব্যসিংহের বাল্যলীলাসূত্র, দুলালীর মুরারী গুপ্তের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিত, ঢাকাদক্ষিণের প্রদ্যুম্ন মিশ্রের শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যোদয়াবলী গ্রন্থ প্রাচীনকালের চরিত বিভাগে আদর্শ গ্রন্থরূপে গণ্য।" এই চৈতন্যোদয়াবলী এখন ঢাকাদক্ষিণে পূজিত হইয়া থাকে। গ্রন্থখানি শ্রীচৈতন্যদেবের সমসময়ের লেখা। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ উহার একখানা ফটো তুলাইয়া রাখিয়াছেন। গ্রন্থের একস্থানে উল্লেখ আছে—

তত্রৈকা ব্রাহ্মণী সাধ্বী কাতরা প্রভুমব্রবীৎ
জ্ঞানোহীনো মম সুত বৃত্তিম রক্ষিতমুক্ষমঃ
কৃপয়েমং দীনবন্ধো বিদ্বাংসং কুরু চাধুনা
বয়া যাজনিকী বৃত্তি স্থিবয়া স্যাং প্রযচ্ছতাং
এতৎ শ্রুত্বা তু গৌরাঙ্গ সুস্মিতো বঞ্চিতপ্রদঃ
চণ্ডীমেকাং লিখিত্বা তু প্রাসাদস্মৈ যথেপ্সিতং

শ্রীচৈতন্যদেব একখানা 'চণ্ডী' নিজহাতে লিখিয়া ব্রাহ্মণীর তখনই রাখিয়া যান। গ্রন্থখানি বহুদিন যাবৎই বংশেরায় ছিল। এবং শ্রীচৈতন্যদেবের হাতের লেখা অক্ষরগুলি ভক্তদের নিকট গ্রন্থ হইতে কাটিয়া বিক্রয়ও হইত। বর্তমানে ঐ ব্রাহ্মণীর বংশের শেষ পুরুষ নিরুদ্দেশ। গ্রন্থখানার বাকী অংশটুকু আজ কোথায়? বাংলার আর কোথাও চৈতন্যদেবের হাতের লেখা সংগৃহীত আছে বলিয়া জানি না।

"জ্যোতিশাস্ত্র বিভাগের হরিহরাচার্যের 'জ্যোতিঃপ্রদীপ' রেংগাব রামশরণ বিদ্যাবাগীশের 'জ্যোতিষসার সংগ্রহ' ইটার রামগোবিন্দ তর্কালংকারের 'জাত প্রদীপ' প্রভৃতির নাম উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারিবে। সংস্কৃত তন্ত্রশাস্ত্র প্রণেতাদের মধ্যে 'মন্ত্রকোষ' ও 'তন্ত্র চূড়ামণি' প্রণেতা রায়গড়ের হৃষীকেশ বিদ্যানিবাস, বোয়ালজুরের রামরাম ভট্টাচার্য ইটার 'জাতকপ্রদীপ' প্রণেতা রামগোবিন্দ তর্কালংকার প্রভৃতি বহুতর ব্যক্তির নামোল্লেখ করা যাইতে পারে।—এইরূপই কয়েকজন বিদেশী ভাষা সেবীর নামোল্লেখ করিতেছি। তন্মধ্যে তরপের পারস্যভাষাবিৎ 'গঞ্জে তরাজ' রচয়িতা মহাত্মা পীর বাদশাহ, মুলুকউল উলামোপাধিক তরফের মহাত্মা সৈয়দ সাহ ইস্রাইলের 'মদানুন ফওয়ায়েদ' গ্রন্থ অতি আদরণীয়। আধুনিক কালেও মৌলবী মহম্মদ আসরফের (বাণিয়াচুঙ্গ) পারস্যগ্রন্থ, হিঙ্গাজিয়ার সাদেক 'আলীর হালতুন্নবি' 'রদ্দে কুফুর' প্রভৃতি শ্রীহট্টের নাগরাক্ষরে লিখিত গ্রন্থগুলি কম আদৃত নহে। সিলেটি নাগরাক্ষরের সৃষ্টি শ্রীহট্টিয়া প্রতিভার অন্য এক উদাহরণ বলিয়া মনে হয়। ছয়টি স্বরবর্ণ এবং ৩১টি ব্যঞ্জনবর্ণ এবং সাতটি ফলা সাহায্যে অনেক কেতাব এই অক্ষরে লিখিত আছে। এই অক্ষর অতি সহজে শিক্ষা করা যায়। শ্রীহট্টবাসী মুসলমানগণ এই অক্ষরের একটি মুদ্রাযন্ত্র কলিকাতায়ও স্থাপন করিয়া লইয়াছেন।

সার্দ্ধ চারিশত বৎসর যাবত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মে বাঙ্গালাদেশ প্রভাবান্বিত। সেই সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গ সাহিত্যের এক বিশেষ স্থান জুড়িয়ে শ্রীহট্টের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

অচ্যুতবাবু লিখিতেছেন,—

"সংকীর্ত্তনৈক পিতরৌ" শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দের সৃষ্ট সংকীর্ত্তনের তৎকালে যে সকল কীর্ত্তনগীতি রচিত হয় তাহার সংখ্যা স্বল্প নহে। ঐ সময় কীর্ত্তনরস মাধুর্য্য-মুগ্ধ করিয়া সরল বাঙ্গালা ভাষায় ঐ সব গীতিকা নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছে। শ্রীহট্টের গৌর-আলা ঠাকুর অদ্বৈতাচার্য্যের চৈতন্য গীতিকা, চন্দ্রশেখর-আচার্য্যরত্ন কৃত স্বল্প সংখ্যক পদ, যদুনাথ কবিচন্দ্রের পদাবলী ঐ বিভাগে প্রথমেই উল্লেখিতব্য। ইঁহাদের পরও আরও কতজন ঐ ক্ষেত্রে বিচরণ করিয়াছেন তাহার সংখ্যানির্ণয় সহজ নহে। সেই প্রাচীন কালেই মাজুলিয়ার জগমোহন গোসাঞী, বিথঙ্গলের রামকৃষ্ণ গোসাঞি, বংশীত ঘোষ, কেশব লাল (জন্তরী) বৈষ্ণব রায়, প্রভৃতি সিদ্ধ পুরুষবর্গের সাধন সঙ্গীত অতুলনীয়। শ্রীমহাপ্রভু ও অদ্বৈতাদির বিষয় লইয়া ঐ সময়ে বঙ্গভাষা শিশু হইলেও যে সরল সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিল তাহাতে শ্রীহট্টের দান সর্ব্বাগ্রে।

বঙ্গভাষায় বিরচিত চরিত্র গ্রন্থাবলীর মধ্যে লাউড়ের ঈশান নগরের অদ্বৈত প্রকাশই সর্বাগ্রে অর্থাৎ চৌদ্দশ নব্বই শকাব্দে রচিত হয়। তার পরই বৃন্দাবন দাসের শ্রীচৈতন্য ভাগবত প্রণীত হইয়াছিল। এই চৈতন্য ভাগবতের অনুকরণে লবণী দাসকৃত জগন্মোহন ভাগবত বিরচিত হইয়াছিল। প্রায় ঐ সময়েই ঢাকাদক্ষিণের জগজ্জীবন মিশ্র শ্রীচৈতন্য দেবের শ্রীহট্টাগমন বিষয় অবলম্বনে মনঃসন্তোষিণী রচনা করেন। শ্রীযুত অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি ১৩০ বৎসর পূর্বেকার হস্তলিখিত একখানা চৈতন্য চরিত পাইয়াছেন, প্রণেতা পুরন্দর মিশ্র। উহাতে একটা নূতন কথা আছে। ঐ পুঁথি পাঠ করিলে জানা যায় যে, প্রাচীনকালে ঢাকাদক্ষিণের নাম মিথিলা ছিল। পঞ্চখণ্ড, ঢাকাদক্ষিণ প্রভৃতি স্থানে মৈথিল বিপ্রগণের বসতি স্থাপিত হইয়াছিল। শ্রীহট্টে পূর্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড রাজ্যসমূহ বিভিন্ন নামে উক্ত হইত। স্বদেশ ত্যাগ করিয়া কোন নূতন স্থানে উপনিবেশ স্থাপিত হইলে প্রধানতঃ পূর্বদেশের নামানুকরণেই স্বদেশের মাথায়—নামের স্মৃতিরক্ষার্থ পূর্ব নামে নূতন স্থানের নামকরণ হইত। এইরূপে শ্রীহট্টে মগধ নামে একটি খণ্ডরাজ্য ছিল। শ্রীহট্টের সুপরিজ্ঞাত গৌড় নামটিও তদ্রূপে ছিল বলিয়া মনে হয়।

দেশের স্থান বিশেষের নাম—সম্বন্ধে বহু কৌতূহলপূর্ণ বিবরণী পাওয়া যায়। নীতি ও ধর্মের সহিত সৎ সাহিত্যের সম্বন্ধ গাঢ়তর ছিল। বাংলাদেশের আদি মহাভারত রচয়িতা সঞ্জয়ের বাড়ী এই শ্রীহট্টেই ছিল। শ্রীহট্টের যে কোন গ্রামে অনুসন্ধান করিলে সঞ্জয়কৃত মহাভারতের দুই-একটি পর্ব পাওয়াই যাইবে। সঞ্জয়ের সম্পূর্ণ মহাভারত অন্য কোথাও আছে কি না জানি না। তবে নাকি শিলচর নর্মাল স্কুল লাইব্রেরীতে প্রায় ২০০ দুই শত বৎসরের হস্তলিখিত একখানা সম্পূর্ণ সঞ্জয়—মহাভারত আছে। তৎপর লাউরের জয়চন্দ্র রাজার সভাসদ ভবানীদাসকৃত 'লক্ষণ—দিগ্বিজয়ী' বামদাসের 'স্বর্গারোহণ পর্ব' পরশুরামের 'সুদাম চরিত', দক্ষিণ ভাগের কবি রাজা ধ্রুবরামের 'গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস', লস্করপুরের যুগলকিশোর বণিকের 'কৃষ্ণবিজয়' সাটিয়াজুরীর সীতানাথ করের 'ভামুক পুরাণ' হরিহর দত্তের 'পদ্মপুরাণ' প্রভৃতি গ্রন্থ কবিত্বসম্পদে ভরপুর। এই শ্রীহট্টের সর্বত্র পদ্মাপুরাণ রচয়িতা ছিলেন। হরিদত্ত ছাড়া মুরারী মিশ্র, ভানুদাস শুক্লবৈদ্য, বর্ধমান দত্ত, বিপ্র জানকীনাথ, দীনভবানন্দ, দ্বিজ ত্রিলোচন, দ্বিজ গোপীকান্ত, দ্বিজ কাশীনাথ, জগন্নাথ বৈদ্য, নারায়ণ দেত, ষষ্ঠিবর দত্ত, কালারায়, রামেশ্বর নন্দী, মাসী ধর্মদাস, কাশীনাথ সেন, আনন্দরাম চক্রবর্তী, হৃদয়ানন্দ দত্ত, রাধা নাথ, কৃষ্ণ গোবিন্দ প্রভৃতি গ্রন্থের স্থানে স্থানে শ্রেষ্ঠ কবিত্বের ঝংকার শুনিতে পাওয়া যায়।

শ্রীহট্টের গোবিন্দ ভোগের গান, ঘাটু গান এবং ঠাটকীর্তন অন্য কোথাও নাই। ইহা এ জেলারই বিশেষত্ব। ভাব বৈভব ও শব্দ সম্পত্তিতে গোবিন্দ ভোগের গান অন্যান্য সঙ্গীত সাহিত্যের তুলনায় কোনো অংশে হীন নহে। পূর্বে সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি মাত্রই এই সুখকর সংগীতের আনন্দোপভোগ করিতেন। গোবিন্দ কীর্তন সাত ভাগে বিভক্ত। গৌরচন্দ্রিকা, জলসংবার, রূপ, খেদ, দূতী, সংবাদ, অভিসার এবং মিলন, তৎপর মঙ্গল আরতি হইয়া গীত সমাধা হইত। অচ্যুতবাবু দুলালীর কবি ব্রজকিশোর গুপ্তের একখানা 'পাঁঠি'ও সংগ্রহ করিয়াছেন। গোবিন্দ ভোগের ন্যায় ঘাটু গান ও মান-মাথুরাদি ক্রমে বিভক্ত কৃষ্ণলীলাত্মক গীতি। কাছাড়ের অধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের দেওয়ান কবি সত্যরাম, উচাইলের হরগোবিন্দ দাস প্রভৃতি বহু কবির গুরুত্বপূর্ণ গীতিকা শ্রোতাকে স্বপ্নমোহে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিত।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস তাঁহার প্রসিদ্ধ বাঙ্গালা অভিধানের ভূমিকায় লিখিতেছেন—

সর্বশ্রেণীর নরনারীকে বুঝাইবার জন্য যে ভাষার আশ্রয় লইতে হয় এবং সাধারণতঃ উপভোগ্য যে কাব্য, গাথা, ছড়া, গান প্রভৃতি সাধারণ বোধ্য (popular) ভাষায় বলিবার ও লিখিবার প্রয়োজন হয়, প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে সেই ভাষার এরূপ গ্রাম্য শব্দের সংখ্যা প্রচুর, আধুনিক সাহিত্যেও তাহার অসদ্ভাব নাই। প্রাচীন বাংলা যাহাদের দ্বারা পুষ্ট হইয়াছিল তাহাদের অধিকাংশ যে সংস্কৃত ভাষা জ্ঞানহীন, সমাজের (তথাকথিত) নিম্নশ্রেণীর লোক ও সাধারণতঃ স্বল্পশিক্ষিত ছিলেন ক্রমেই তার নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে।" অথচ বাঙ্গালা ভাষাকে বর্তমানরূপে আনিতে ইহাদের দানই সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ। জীবন্ত ভাষার লক্ষণই এই যে, ভিন্ন ভাষার বহু প্রচলিত শব্দগুলি সে ক্রমশঃই নিজের কুক্ষিগত করিয়া ফেলে। মুন্সেফ, হাকিম, কেরাণী, নাজির, সেরেস্তাদার, উকীলবাবুরা বাঙ্গালা ভাষায় যেমন একটা ফারসী আরবী আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছেন তেমনি জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, রেলটিকিট, বাঙ্গালা ভাষাকে ইংরেজী ঘেঁষা করিয়া তুলিতেছে। বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষা ভাষী আমি যদি জজ সাহেবের এজলাস খুঁজিতে প্রাড় বিবাকের বিচার মণ্ড কোথায়? এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বেড়াই তবে আপনারা হয়ত আমার জন্য ভেজপুরের ব্যবস্থা করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে পারেন, কিন্তু জজসাহেবের আবদালী আমার জন্য লগুড়ের ব্যবস্থা করিবেই। রেলটিকিট কিনিতে গিয়া যদি 'বাষ্পীয়যানের যাত্রা পথ' বলি তবে টিকিটবাবুকে অর্থ বুঝাইতে বুঝাইতে 'ফাসিন্দাররা' আমার পিষিয়া মারিবে—আমার ব্যাথার জন্য বাষ্পীয়যান অপেক্ষা করিবে না। বিশুদ্ধ বাঙ্গালার নাড়িবার চড়িবার জো নাই। ভদ্রলোকের মত বাহির হইতে গেলে 'জামার' প্রয়োজন—খাইতে বসিলে 'তরকারী' আবশ্যক, মিঠাইর দোকান 'জিলিপি'তে ভর্তি ঘরে মা লক্ষ্মীদের কৃপায় যে তিনি একটু মুখ বদলাইবেন তাহারও উপায় নাই—কারণ তাহারাও ঘরে ঘরে পর্তুগীজ 'আচার' বানাইয়া বসিয়া আছেন। আমার এতকথা বলার উদ্দেশ্য এই যে বাঙ্গলা ভাষায় এখনও যেমন আরবী, ফারসী, ইংরেজী শব্দের প্রাচুর্য্য দেখা যায়, বাঙ্গালা ভাষা গড়িয়া উঠিতে প্রাদেশিক বা গ্রাম্য শব্দই ছিল তার একমাত্র সম্বল এবং তাহাই খাঁটি বাংলা ছিল।

ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় প্রাদেশিক (গ্রাম্য) শব্দগুলির অর্থনির্ণয়ের চেষ্টা চলিতেছে। এমন কি প্রাদেশিক শব্দগুলির অভিধান প্রস্তুতের কাজও অনেকদূর অগ্রসর হইতেছে। এই অবস্থা শ্রীহট্টের প্রচলিত প্রাদেশিক শব্দগুলির আলোচনা যে অতি আবশ্যকীয় সে বিষয় কোনও সন্দেহ নাই। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় ১৩২২-২৪ বাংলার রামতনু লাহিড়ী ফেলোসিপ বক্তৃতায় 'মৈমনসিংহ গীতিকা' এবং 'পূর্ববঙ্গগীতিকায়' কয়েকটি পালাগান বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর গোচরীভূত করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। কিন্তু মৈমনসিংহ-গীতিকা যে সব উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত তাহাদের অধিকাংশই শ্রীহট্টে প্রচলিত। সংগ্রহকারক সেগুলির ভাষায় কিছু কিছু পরিবর্তন করিয়াছেন কি না জানি না। না করিলেও প্রত্যেক পালাগানেই এমন অনেক কথা রহিয়া গিয়াছে যাহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় সে গানগুলি শ্রীহট্টবাসী কবির রচিত। পালাগানে মৈমনসিংহের উত্তর পূর্বাংশ ও পূর্বাংশের কতগুলি স্থানের উল্লেখ দেখিয়া তাহাকে 'মৈমনসিংহ-গীতিকা' বলা সঙ্গত কিনা ভাবিবার বিষয়। বর্তমানে মৈমনসিংহ জেলা গঠনের ইতিহাস যাহারা জানেন তাহারা সকলেই অবগত আছেন যে, বর্তমান মৈমনসিংহ জেলার পরিসর প্রায় ১৫০ বৎসর হইল নির্ণীত হইয়াছে। তৎপূর্বে ইহার উত্তর পূর্বাংশ এবং পূর্বাংশ শ্রীহট্টের অন্তর্ভুক্ত ছিল। (শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত দ্রষ্টব্য) দীনেশবাবুর সংগৃহীত গানগুলি প্রত্যেকটিই অন্ততঃ ১৫০ বৎসরের প্রাচীন। সুতরাং তখন যে রচয়িতারা শ্রীহট্টেরই পল্লীকবি ছিলেন তৎসম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। রচয়িতার অঞ্চলের প্রচলিত ভাষা, আচার অনুষ্ঠান, শিল্প ইত্যাদি তাহার জন্মস্থান নির্ণয়ের প্রধান সহায়ক। আপনারা মনে করিবেন না যে কবিদের জন্ম শ্রীহট্টে বলিয়াই একটা খুব গর্ব করিবার কিছু আছে, কারণ বাঙ্গালার প্রতি জেলাতেই এইরূপ প্রাচীন সংগীতাদি রহিয়াছে। কিন্তু ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়া দেখিতে হইলে রচয়িতার প্রকৃত জন্মস্থানের সন্ধান আবশ্যক; কারণ সেই সন্ধান না পাইলে রচয়িতার ব্যবহৃত শব্দের প্রকৃত অর্থ বুঝা যায় না। উদাহরণ স্বরূপ মৈমনসিংহ-গীতিকার মহুয়া ছড়াটি নিতে পারেন:—

"কোথায় আছে জইন্তার পাহাড়
কোথায় গহীন বন।
পাগল হইয়া নদীয়ার চাঁন
ভরমে ত্রিভুবন।।"

দীনেশবাবু বলিতেছেন — "জয়ন্তার পাহাড়ের কথা মহুয়া নদেরচাঁদকে যাইবার পূর্বে বলিয়া গিয়াছিল। ইহা গাড়ো পাহাড়ের অন্তর্গত।" 'জইন্তার পাহাড়' বলিতে কি 'জৈন্তার পাহাড়' বুঝায় না?

"ভিক্ষা মাইগ্যা খাইয়াম আমি
তোমারে লইয়া।
উরের ধন দূরে দিব তবু
না দিব ছাড়িয়া।।"

দীনেশবাবু বলিতেছেন—উরের ধন...। আমার বক্ষের রত্ন দূরে ফেলিয়া দিব, তবু তোমাকে ছাড়িয়া দিব না। 'উর' শব্দের অর্থ যদি 'বক্ষ' হয় তবে 'মহুয়া' ছড়ায়ই পরবর্তী এই কয় লাইনের অর্থ হয় কি?

"রাত্রিকালে শুইব দোয়ে জোড় মন্দির ঘরে।
শীতের রজনীতে কন্যা থাকবা আমার উরে।।
শয্যায় পাইলে ব্যথা থাকবা আমার বুকে।
বানাইয়া পানের খিলি তুইল্যা দিবাম মুখে।।"

'উর' শব্দের অর্থ যদি 'বুক' হয় তবে শয্যায় ব্যথা পাইলে আমার বুকে রাখিবার লোভ দেখান হইত না। 'উর' প্রাদেশিক শব্দ। ইহার প্রকৃত অর্থ 'কোল'।

"নয়াবাড়ী লইয়া যে বাইদ্যা লাগাইল উরি।
তুমি কন্যা না থাকলে আমার জনম বৃথায়।"

'উঁরি' শব্দটি মৈমনসিংহের উত্তর পূর্বাংশে প্রচলিত কি?

দীনেশবাবু বলিতেছেন মহুয়া দুশ্য কাব্যটি দ্বিজ কানাই প্রণীত। কিন্তু ছড়াটির কোথাও দ্বিজকানাইয়ের ভণিতা খুঁজিয়া পাইতেছি না। মৈমনসিংহ গীতিকার দ্বিতীয় ছড়া 'মলুয়া' তাহাতে আছে—

"আইল আইশনারে পানি উভে করল তল।
ক্ষেতকিশা ডুবাইয়া দিল না রইল সম্বল।।"

দীনেশবাবু বলিতেছেন — 'উভে—সম্পূর্ণরূপে।' ইহা 'উভে' না 'উবে' শব্দের প্রকৃত অর্থও 'সম্পূর্ণরূপে' নয়।

"শুকতা খাইল বেগুন খাইল
আর ভাজা ধরা!
পুলি পিঠা খাইল বিনোদ
দুধের শিস্যায় ভরা।।
পাত পিঠা বরা পিঠা চিত্ত চন্দ্রপুলি।
পোয়ো চই খাইল কত রসে ঢল ঢলি।"

'দুধের শিস্যায় ভরা'—ইহার অর্থ দীনেশবাবু লিখিতেছেন শিস্যায়—দুধের শিরে ভরা, ক্ষীর দিয়া ভরা। শব্দটি 'শিস্যা' নহে—ঐ অঞ্চলে প্রচলিত 'খিরসা' অর্থাৎ 'তরল ক্ষীর' শব্দের স্থলে 'শিস্যা' লিখিয়া অর্থের বেলায় এত কষ্ট কল্পনা করিতে হইয়াছে। দীনেশবাবু বলিতেছেন 'পোয়া—মালপো'— কিন্তু 'পোয়া' মালপো নহে—অন্য একপ্রকার পিষ্টক। 'চই' শব্দের অর্থে দীনেশবাবু লিখিতেছেন—চই—একরূপ ঝাল শাক। ছড়ায় আছে "পোয়া চই খাইল কত রসে ঢলঢলি।" 'ঝাল শাক' কখনও 'রসে ঢলঢলি' হয় না। 'চই' একরূপ পিষ্টক—উহা শ্রীহট্টবাসী আপনারা নিশ্চয়ই উপভোগ করিয়াছেন। মৈমনসিংহ-গীতিকার শেষ পালাগান 'দেওয়ানা মদিনা'। উহা বানিয়াচঙ্গের দেওয়ানদের একটি কাহিনী লইয়া রচিত। 'মনসুর বয়াতি' উহার রচয়িতা। এই ছড়া পাঠে সুপ্রসিদ্ধ বিশ্বসাহিত্যিক রোমাঁ রোলাঁ মুগ্ধ হইয়া লিখিয়াছেন—

I was specially delighted with the touching story of Metina which although only two centuries old is an antique beauty and purity of sentiment which art has been rendered faithfully without changing it".

বানিয়াচুঙ্গ নিশ্চয়ই শ্রীহট্টের একটি পরগণা। আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে শ্রীহট্টের ছড়া বলিয়াই যে আপনারা উৎফুল্ল হইয়া উঠিবেন এমন নহে—কিন্তু দুষ্পাচ্য Continental Literature এর মোহে না পড়িয়া যদি শ্রীহট্টের এইসব সহজ প্রাপ্য ছড়াগুলির প্রতিও মনোযোগ দিতেন তবে বাঙলা সাহিত্যের ভাষাতত্ত্বে আপনাদের দান উপেক্ষণীয় হইত না—অনেক নূতন তথ্য সংগ্রহে আপনারা সহায়তা করিতে পারিতেন। তিব্বত রাজার বিচার কাহিনী ও আপনারা পয়সা খরচ করিয়া পড়েন। কিন্তু "আরেক দেওয়ান কটুমিঞা" হত্যার ছড়াটি

কবি ভবানী দাসকৃত গোপী চান্দের পাঁচালী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা ভাষার এম-এ পরীক্ষার পাঠ্য। ইহার ভাষার গাঁথনীতে অনেক স্থলেই শ্রীহট্টের কথ্য ভাষার প্রভাব পড়িয়াছে। যথা—

"বাপসঙ্গে গেছিলা নি
সাক্ষী জানাও চাই।"
"বন্ধক লইবা নি গো নটীর ঝিয়াই।"
"কেমনে আনাম বন্ধক এথা আন চাই।"
"আলা চাউল কলপইত
কলা দিল সেবার লাগিয়া।"
"হাড়িয়ার লগে যতি
হাড়িনীর লগে কথা।"

কবির বাড়ী কোথায় ছিল — তাহা নির্ণয়ের চেষ্টা করিতে গিয়া — "আর আছে আমামাটি তরয়ের দেশ"। কিম্বা "বন্দক মিরাস এড়ি যাইমু গৌড়র সহর।"। ইত্যাদির উল্লেখ নাই করিলাম, কিন্তু

"কিনা কিও শ্যাপাশীর নাথে দেউক ভর
চারি বধর দুগ্ধ খাইয়া চল দেশান্তর।"

—এই লাইন দুইটিতে "চারি বধর দুগ্ধ খাইয়া" দেশান্তর যাইবার ব্যাখ্যা করিতে অধ্যাপকমণ্ডলীকে বেগ পাইতে হইত না। মাতা ময়নামতী পুত্র গোপীচন্দ্রকে যে রহস্য করিয়াছেন সেই রহস্যের ধারা আজও শ্রীহট্ট জেলার পল্লীপ্রান্তে প্রচলিত—"সোনামণি! সোনামণি!" কোথায় গিয়াছে বউর মণি?—টালি দিয়া ঠকাইয়া বেগুন ভাত ফেলাইয়া।।"

যাঁহারা সত্য সত্যই বাংলা ভাষার উন্নতি প্রয়াসী তাঁহাদিগকে শ্রীহট্টের গ্রাম্য ছড়া, হেঁয়ালী ব্রতকথা সংগীত ইত্যাদি খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে।

জৈন্তার জরিপ হইল কম্পাস
চল ঘট সীমানা দেখাইতে।

ইতিহাস খুঁজিলে দেখিতে পাইবেন
After the acquisition of the territory by the British Government the jainta territory was surveyed and measured by Lieut. Thulliod between the years 1835—38 and this survey brought to light the existence of many revenue-free grants under titles derived from native chiefs

তাই জৈন্তার জরিপ হইল বলিয়া এই আতঙ্ক।

হলদি পাখী টিম্ টিম্
মাটীতে ফুরাইল ডিম।

হলদে পাখী সত্য সত্যই মাটিতে ডিম ফুরায় কি না জানি না, কিন্তু পক্ষীতত্ত্বে বিশেষজ্ঞ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা মহাশয়ের কৌতূহল নিশ্চয়ই এই ছড়ায় উদ্রেক হইবার কথা।

কাঠাল পাখী নাইওর যাইতে

ছড়াটায় কোন শিকারী বন্ধু বন্দুক হতে কাঠাল পাখীর ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধের জন্য ছুটিবেন না জানি কিন্তু 'নাইওর' শব্দটির দ্বারা দীনভবানন্দের ইতিহাস ও জন্মস্থান নির্ণয়ের জন্য মাসিক পত্রিকাদিতে প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ ছাপান হইতেছে। কবিত্ব হিসাবেও নিম্নলিখিত এই ছড়াটির মূল্য কম নয়।

সুবল বল বল বল চাই
কেমন আছে কমলিনী রাই?
আমি যার কারণে বৃন্দাবনে রে সুবল!
কান্দিয়া সদাই বেড়াই!
কেমন আছে কমলিনী রাই?

যক্ষের বিরহ ব্যথা অপেক্ষা চাষা কবির কল্পনাপ্রসূত বিরহের গভীরতা কি কম?

ঘুম পাড়ানি মাসি পিসী
আমার বাড়ী আইও।
বাটা ভরি দিমু পান
গাল ভরি খাইও।

'মহুয়ার' চান্দ বিনোদের বাটা ভরা পানের সাদৃশ্য ইহার সহিত না দেখাইলেও 'বাটা ভরা' পান এবং 'গাল ভরি' সেই পান চর্ব্বণ মহিলা মজলিসের তৎকালীন সামাজিকতার একটি উজ্জ্বল চিত্র। সাহিত্যের এই বিভাগে শ্রীহট্টের গীতিকথা, রূপকথা, ব্রতকথা, প্রবাদ ছড়া, খেলার ডাক, হেঁয়ালি ত্রিনাথের সেবার গান মারিফতি, বাউল, গাজির গান, ঝুলন গান, ভরাই পূজা কাপ-পূজা, সারি গান প্রভৃতি সংগৃহীত হইলে ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়া সেগুলি অমূল্য সম্পদ পরিগণিত হইবে। ভাটের কবিতা শ্রীহট্ট জেলার একটি অতি উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত। বানিয়াচঙ্গের মকরন্দ ভাটের কবিতা ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। প্রায় এক লক্ষ টাকা খরচ করিয়া রাজপুতনার চারণ সংগীত সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু এই ভট্ট-গানগুলি একত্রে সংগ্রহ করিবার কোন চেষ্টা নাই। বিপ্রনাথ সেন কৃত সত্যনারায়ণের পাঁচালী, রঘুনাথ দত্ত কৃত বাবাহরের পাঁচালী, দুল্লালীর মনোহর সেন কৃত হাসানপেরর পাঁচালী সংগ্রহ করিলে দেখিবেন এই বিভাগেও শ্রীহট্টের দান অবহেলার বিষয় নহে। আধুনিক যুগেও শ্রীহট্ট জেলা হইতে এবং শ্রীহট্টবাসী সম্পাদিত পঞ্চাশখানার উপরে সাময়িকপত্র প্রকাশিত হইয়াছে। হিবার্ট লেকচারে কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথ যে দেওয়ান হাছন রাজার উল্লেখ করিয়াছেন, সেই হাছন রাজার মনোরম সংগীতগুলি বর্তমানে ভাষার আদল বদল করিয়া বাঙলার আধুনিক কবিমহলের নামে চালাইয়া নেওয়া হইতেছে।

"স্বাধিকার" (১০।১৭ ও ২৪ বৈশাখ ১৩৩৯ সাল) হইতে উদ্ধৃত।



তরুণ মজুমদার পরিচালিত বালিকা বধু চিত্রে শশিকলা।   ফটো : অমৃত

প্রেক্ষাগৃহ

আজকের কথা :

কেন্দ্রীয় সরকার পৃষ্ঠপোষিত চিলড্রেনস ফিল্ম সোসাইটি :

শিশু অর্থে সুকুমারমতি বালক-বালিকাদের জন্যে বিশেষ ধরনের চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রয়োজনীয়তার কথা আজ পৃথিবীর চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করবেন। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ১৯৫১ সালে গঠিত চলচ্চিত্র অনুসন্ধান সমিতিও (ফিল্ম এনকোয়ারি কমিটি) শিশুদের শিক্ষা ও প্রমোদবিধানের জন্যে বিশেষ ধরনের চলচ্চিত্র নির্মাণের সুপারিশ করবার সঙ্গে সঙ্গে এই মন্তব্যটুকুও করতে ভোলেন নি যে, বেসরকারী প্রযোজক-সংস্থার পক্ষে যখন এই বিশেষ ধরনের চলচ্চিত্র নির্মাণের কাজে আর্থিক লাভের পরিবর্তে ক্ষতিরই সম্ভাবনা বেশী, তখন একাজে সরকারেরই অগ্রসর হওয়া উচিত। বালক-বালিকাদের সুস্থ আমোদ-প্রমোদের মাধ্যমে শিক্ষা দান করে তাদের স্বাধীন ভারতের যোগ্য নাগরিকরূপে গড়ে তোলার গুরু দায়িত্ব আজ দেশের সরকারেরই উপরে ন্যস্ত। ফিল্ম এনকোয়ারী কমিটির এই মন্তব্য সমেত সুপারিশটি গ্রহণ করে কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫৫ সালের মে মাসে ১৮৬০-এর সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট অনুযায়ী চিলড্রেনস ফিল্ম সোসাইটি স্থাপন করেন।

সংস্থাটি স্থাপিত হবার পরে পুরো বারো বছর কেটে গেছে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে সোসাইটি কম করে বাহান্নখানি ছবি প্রস্তুত করেছেন—এর মধ্যে পূর্ণ দৈর্ঘ্য, স্বল্প দৈর্ঘ্য, কার্টুন, পাপেট প্রভৃতি সব রকম ছবিই আছে। বলাবাহুল্য, প্রত্যেটি ছবিই মূলত হিন্দী ভাষায় এবং এদের মধ্যে কিছু কিছু ডাবিং পদ্ধতি দ্বারা আঞ্চলিক ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে। এই বাহান্নখানি ছবি তৈরী করতে খরচ পড়েছে মোট ৯৭,৩৪,৬৯১ টাকা এবং এ টাকার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে সাহায্য পাওয়া গেছে ৭৫,৭৫,৩৪৭ টাকা। আর্থিক বছর ১৯৬৩-৬৪ থেকে শুরু করে ১৯৬৬-৬৭ পর্যন্ত চার বছরে ছবিগুলির প্রদর্শনী বাবদ পাওয়া গেছে ৪,৯১,২৮৯ টাকা এবং বিভিন্ন ছবির ৪৪০ খানি প্রিন্ট বেচে আয় হয়েছে ২,৭৬,৪০২ টাকা।

ছবি তৈরী করবার জন্যে চিলড্রেনস ফিল্ম সোসাইটির একটি নিজস্ব ইউনিট আছে বোম্বাই শহরে। এই ইউনিটে সেক্রেটারী, পাব্লিক রিলেশানস অফিসার থেকে শুরু করে ক্যামেরাম্যান, সাউণ্ড ইঞ্জিনীয়ার, এডিটর, প্রোডাকশান ম্যানেজার, আর্ট ডিরেক্টার ও তাঁদের সহকারীরা মাসিক মাহিনায় নিযুক্ত আছেন। কেবল ছবির পরিচালক এবং সংগীত-পরিচালক সংস্থার কর্তৃপক্ষ বাইরে থেকে নিয়োগ করেন। দেখা যায় যে, ১৯৫৬-৫৭ থেকে ১৯৬১-৬২ পর্যন্ত যে ২৬ খানি ছবি তৈরী হয়েছে, তার মধ্যে ১১ খানি ছবিই তৈরী করেছিলেন পরিচালক কেদার শর্মা এবং ৮ খানি করেছিলেন রাজেন্দ্রকুমার শর্মা। এর পরে অবশ্য অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। তবে বোম্বাই শহরে সংস্থার ইউনিট থাকায় সব ছবিরই পরিচালনা ভার পড়েছে ওখানকারই বাসিন্দা চিত্র-পরিচালকদের ওপর। বাহান্নখানি ছবির মধ্যে রঙীন কার্টুন আছে মাত্র তিনখানি—এস নয়মপল্লীকৃত 'মনকি অ্যাণ্ড ক্রোকোডাইল' (১৯৬৩-৬৪), কান্তিলাল রাঠোরকৃত 'অ্যাডভেঞ্চার্স অব এ সুগার ডল' (১৯৬৪-৬৫) এবং মাধব কুন্টেকৃত 'জ্যায়সে কো ত্যায়সা' (১৯৬৫-৬৬)। এদের মধ্যে দ্বিতীয়খানি ১৯৬৬তে প্রধানমন্ত্রী সুবর্ণ পদক দ্বারা সম্মানিত হয়েছে। রঙীন পাপেট আছে মাত্র একখানি : ১৯৬৫-৬৬তে এস এস পিল্লাইকৃত 'অ্যাজ ইউ লাইক ইট।' এছাড়া ১৯৬৫-৬৬-তে জুল ভেলানী পরিচালিত 'ডাকঘর' ছবিখানিও রঙীন। বাকী ৪৭ খানি ছবিই সাদা-কালো ফিল্মে নির্মিত হয়েছে।

গুণের দিক দিয়ে দেখতে গেলে এই বাহান্নখানি ছবির মধ্যে অতিসামান্য সংখ্যকই প্রশংসা পাবার যোগ্য। 'অ্যাডভেঞ্চার্স অব এ সুগার ডল' এবং 'জ্যায়সে কো ত্যায়সা' ছবি দুখানির বেশ সুনাম আছে। 'বাপুনে কাহা থা' ছেলেদের কাছে অর্থাৎ যাদের জন্যে ছবি, তাদের কাছে খুব প্রিয়। কিন্তু বেশীর ভাগ ছবিই দেখবার ও দেখাবার মতো নয়। এবং সেই কারণেই চিলড্রেনস ফিল্ম সোসাইটি সুদীর্ঘ বারো বছরের জীবনে জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারে নি। কাগজপত্র থেকে দেখা যায়, এই সংস্থার সাধারণ পরিষদে জেমিনী স্টুডিওর এস এস [illegible], অর্ধেন্দু [illegible]

থিয়েটার্সের বি এন সরকার, রাজকমল কলামন্দিরের ভি শান্তারাম, রাজশ্রী পিকচার্সের তারাচাঁদ বরজাতিয়া, পরিচালক তপন সিংহ, শিশু রঙমহলের সমর চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি সমেত চৌত্রিশজন সদস্য আছেন এবং পরিচালন পরিষদে ভারত সরকারের তথ্য ও বেতার বিভাগীয় উপমন্ত্রী নন্দিনী সৎপথি চেয়ারম্যান, এস এন লিমায়ে কোষাধ্যক্ষ এবং খাজা আহমেদ আব্বাস, অমিতা মালিক, লীলা নাইডু, পি কে সামন্ত ও বি জি ইদনানী—এই পাঁচজন সদস্য। তবুও চিলড্রেনস ফিল্ম সোসাইটি যে জনসাধারণের আস্থাভাজন হয়ে উঠতে পারে নি, তার প্রমাণ খাজা আহমেদ আব্বাস, মণাল সেন, এইচ ডি দাওরান (সংস্থার জনসংযোগ সচিব) প্রভৃতি নিয়ে গঠিত এঁদের স্টাডি গ্রুপ। এই গ্রুপটি ভারত সফর করে বেড়াচ্ছেন—কেন চিলড্রেনস ফিল্ম সোসাইটি আশানুরূপ জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারে নি, ছবি তৈরীর ব্যাপারে এরা কেন জনসাধারণের কাছ থেকে স্বতঃপ্রণোদিত সহযোগিতা পাচ্ছে না, শিশুচিত্র আন্দোলনটি তেমন জোরদার হচ্ছে না কেন, গলদ কোথায় ইত্যাদি ইত্যাদি সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্যে।

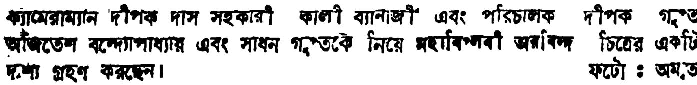
গলদ নিশ্চয়ই আছে : সংস্থাটির গঠনে গলদ, কর্মপদ্ধতিতে গলদ। সংস্থাটি নিশ্চয়ই স্বয়ংশাসিত, কিন্তু এর সাধারণ পরিষদের চেয়ারম্যান এবং অন্ততঃ ছজন সদস্য কেন্দ্রীয় ও কয়েকটি রাজ্য সরকারের পদস্থ ব্যক্তি থাকায় এর স্বয়ংশাসিত রূপটি হারিয়ে গেছে। সাধারণ পরিষদ ও কর্মপরিষদ—দুই-ই জনসাধারণের আস্থাভাজন চলচ্চিত্রবিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত হওয়া উচিত। সরকারী অর্থ যাতে যথেচ্ছভাবে ব্যয়িত না হয়, তার প্রতি লক্ষ্য রাখবার জন্যে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের তরফ থেকে একজন মাত্র প্রতিনিধি এতে থাকতে পারেন। কর্মপদ্ধতিতেও যে-গলদ রয়েছে তা দূরীভূত হতে পারে দু উপায়ে। এক : সংস্থার নিজস্ব কোন চিত্রনির্মাণ ইউনিট থাকবে না, দুই : সংস্থার কর্মকে মাত্র বোম্বাইয়ে কেন্দ্রীভূত না করে বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কলিকাতা—এই তিনটি ভারতের প্রধান চিত্রনির্মাণ কেন্দ্রের মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে। সংস্থাটির সর্বভারতীয় রূপ দেওয়া দরকার এবং এই উপায়েই তা দেওয়া সম্ভব। সংস্থার তরফে বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কলকাতায় যে তিনটি গল্পনির্বাচক বোর্ডের গঠন করা হয়েছে, তারও গঠন প্রতিনিধিমূলক হওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে। কেন্দ্রীয় সংস্থাটি যদি জনসাধারণের আস্থাভাজন সদস্যদের নিয়ে গঠিত হয়, সরকারী আওতার সম্পূর্ণ বাইরে থেকে তা যদি সক্রিয়ভাবে কাজ করতে পায় এবং তার নির্দেশে প্রস্তুত ছবিগুলি যদি যথার্থই শিশু মনোরঞ্জক হয়ে ওঠে, তাহলে এবং মাত্র তাহলেই চিলড্রেনস ফিল্ম সোসাইটি সম্পর্কে কোন রকম দুর্ভাবনা করবার অবকাশ হবে না।

জাপানী চলচ্চিত্রোৎসবে প্রদর্শিত তিনটি জাপানী ছবি :

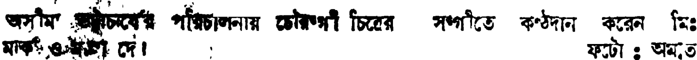
(১) **থ্রী ফেসেস অব লাভ :** ফুজিও, কিকোকু ও মোমোকো—তিন মেয়েকে রেখে 'ইটোয়া শিন্ডো' নামে কিমোনোর কোমরবন্ধ তৈরী প্রতিষ্ঠানের মালিক যখন মারা গেলেন, তখন তিনি মৃত্যুকালীন উইলে মারফৎ ইচ্ছা প্রকাশ করে গেলেন, তাঁর যে-মেয়ে তাঁর ব্যবসাটি চালাবার মতো বুদ্ধিসম্পন্ন কোন যুবককে আগে বিবাহ করবে, সেই দোকানের উত্তরাধিকারিণী হবে। দোকানের হিসাবরক্ষক কেইজি বড়ো মেয়ে ফুজিওকে ভালবাসত। কিন্তু ফুজিওর সং-মা নিজের মেয়ে কিকোকুকে সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী দেখবার আগ্রহে মেয়েকে কেইজির সঙ্গে নিবিড়ভাবে মিশতে বললে এবং ফুজিও যখন কিয়োটো শহরে কেনকিচি নামে একজন কিমোনো-পরিকল্পনাকারীর সঙ্গে ব্যবসায়িক উন্নতির জন্যে এক প্রতিযোগিতায় যোগদান করবার জন্যে পরামর্শে মেতে রয়েছে, সেই সময়ে কয়েকটি বর্ষণমুখর দিনে কেইজি কিকোকুর ছলাকলার শিকার হয়ে পড়ল। ফলে কিকোকু হয়ে পড়ল অন্তঃসত্ত্বা। এদিকে ওদের ছোট বোন দিদি ফুজিওকে কেইজির অনুরাগিণী জেনে কেনকিচির প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ল, কিন্তু যখন জানল, কেনকিচির মন ফুজিওর কাছে বাঁধা পড়েছে, তখন সে ভগ্নোদ্যম হয়ে আত্মহত্যা করতে প্রবৃত্ত হল। ফুজিওর চেষ্টায় মোমোকো শুধু প্রাণেই বাঁচল না কেনকিচিকেও জীবনসঙ্গীরূপে লাভ করল। অপরপক্ষে কেইজি ও কিকোকুর অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার কারণ জেনে ফুজিও কেইজি ও কিকোকুর বিবাহ যাতে সম্ভব হয় এবং কিকোকুই দোকানের উত্তরাধিকারিণী হয়, সে-ব্যবস্থাও করল। এইভাবে প্রেম এবং উত্তরাধিকার—উভয় দিক থেকেই নিজেকে বঞ্চিত করে ফুজিও নির্জন শান্তিময় পরিবেশে থেকে সূক্ষ্ম কারুকার্যবিশিষ্ট কোমরবন্ধ তৈরীর কাজে নিজেকে উৎসর্গ করলে।

ফুজিওর আদর্শ চরিত্রকে কেন্দ্র করে পরিচালক নোবোরু নাকামুরা মনোহর রঙীন চিত্রগ্রহণের সহযোগিতায় যে-শিল্প-





ক্যামেরাম্যান দীপক দাস সহকারী কালী ব্যানার্জী এবং পরিচালক দীপক গুপ্ত অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সাধন গুপ্তকে নিয়ে মহাবিপ্লবী অরবিন্দ চিত্রের একটি দৃশ্য গ্রহণ করছেন। ফটো : অমৃত



অসীম চক্রবর্তীর পরিচালনায় চৌরঙ্গী চিত্রের সংগীতে কণ্ঠদান করেন মিঃ মার্ক ও মঞ্জু দে। ফটো : অমৃত

সমস্তভাবে চিত্রটিকে দর্শকদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন, তা উচ্চপ্রশংসা লাভের যোগ্য।

(২) রিট্রিট ফ্রম কিস্কা : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪৩ সালে জাপান যখন আমেরিকা যুদ্ধবাহিনী দ্বারা নিয়ত আক্রান্ত হচ্ছে, সেই সময়ে আটু্র ১২০ মাইল পূর্বে কিস্কা দ্বীপে ৫২০০ জন জাপানী সৈন্য আটকে পড়ে গিয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রীয় নৌবহর কিস্কা অভিযানে অগ্রসর হচ্ছে জেনে টোকিওস্থ মূল সামরিক ঘাঁটি এই ৫২০০ জন সৈনিককে উদ্ধার করবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিল, কিন্তু কোনোরকম উপায় উদ্ভাবন করতে পারছিল না। শেষ পর্যন্ত ঘন কুয়াশার আশ্রয় গ্রহণ করে জাপানী নৌবাহিনী কি অসম্ভব ঝুঁকি নিয়ে তাদের উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছিল, তারই রোমাঞ্চকর চিত্র হচ্ছে সেইজি মারুয়ামা পরিচালিত রিট্রিট ফ্রম কিস্কা। অসাধারণ সাদা-কালো ফটোগ্রাফী, সূক্ষ্ম সম্পাদনকৌশল এবং বাস্তব অভিনয়ে প্রোজ্জ্বল এই ছবিটি বহুদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

(৩) আওয়ার এরিয়েন্টেশন টু লাইফ : টোফু হচ্ছে সওয়াবীনের তৈরী তাজা চীজ জাতীয় সুস্বাদু ভক্ষ্যদ্রব্য। বাপ, মা, তিনটি ভাই এবং একটি বোনের পরিবার। বাপ-মা টোফুর দোকান চালান, নিজেরাই তৈরী করেন ঐ টোফু এবং তাঁদের তৈরী টোফু অত্যন্ত সুস্বাদু বলে জনপ্রিয়। ছেলে-মেয়েরা কিন্তু চাকরী করে। বড়-ছেলে একটি ইলেকট্রিক দ্রব্যপ্রতিষ্ঠানে, তার মেয়েটি কাজ করে বড়ভাইয়ের মালিকের ছেলের সঙ্গে অন্য একটি সংস্থায়। মালিকের ছেলে কিয়োচী ইচিরোর বোন আটসুকোকে ভালবাসে, তাকে বিবাহ করবার প্রস্তাবও করে। কিন্তু সামাজিক পার্থক্যের জন্যে আটসুকো এই বিবাহ-প্রস্তাবে সম্মত হয় না—বলে, তোমার মার এতে আপত্তি হবে। সত্যিই মা আপত্তি করেন এবং তারই প্রতিবাদে কিয়োচী গৃহ-ত্যাগ করে। এদিকে নিজের পদোন্নতির জন্যে বোনকে মালিকের ছেলের সঙ্গে জড়িয়ে দিয়েছে, এই মিথ্যা অপবাদের প্রতিবাদে ইচিরো কাজে ইস্তফা দিয়ে পিতৃব্যবসায় টোফু তৈরীর কাজে আত্ম-নিয়োগ করে। এবং শিগগিরই পারদর্শিতা লাভ করে। এদিকে ইলেকট্রিক প্রতিষ্ঠানের মালিকের স্ত্রী তাঁর নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হন এবং আটসুকোকে বধূরূপে গ্রহণ করবার জন্যে এগিয়ে আসেন।

ছবিটির উল্লেখযোগ্য হল এর সুন্দর রঙীন ফটোগ্রাফী। এ ছাড়া ছবিটিতে স্মরণযোগ্য কিছু নেই। সেইজি মারুয়ামার পরিচালনাও বিশেষত্ববর্জিত। —নান্দীকর

কলকাতা



চারণকবি মুকুন্দদাস

প্রজাতন্ত্র দিবসের পুণ্যলগ্নে স্মরণ করি সেই মহান্ শহীদদের যাঁরা স্বাধীনতা-সংগ্রামে নিজেদের আত্মাহুতি দিয়ে দেশকে দাসত্বশৃংখল থেকে মুক্ত করে গেছেন। ক্ষুদিরাম, বাঘা যতীন, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের দুঃসাহসিক বিপ্লবীদের সংগে স্মরণ করুন মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, অশ্বিনী দত্ত, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে আর স্মরণ করুন বরিশালের এক মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে মুকুন্দদাসকে। যাঁর উদাত্ত কণ্ঠে ছিল শুধু গান আর গান। সংগীতেই যেন তাঁর জন্ম। গ্রামে গ্রামে গিয়ে বজ্রনির্ঘোষে তিনি গেয়েছেন, 'বন্দে মাতরম বলে নাচরে সকলে কৃপাণ লইয়া হাতে'। পুলিশের তাড়া খেয়ে তিনি গ্রাম থেকে গ্রামে ছুটে বেরিয়েছেন কণ্ঠে নিয়ে স্বদেশী গান। জাতিকে জাগিয়েছেন সুরের আহ্বানে। জেল খেটেছেন।

স্বাধীনতা-সংগ্রামের মহান শহীদদের মধ্যে বাঙলার একমাত্র চারণকবি মুকুন্দদাস নিজের স্থান করে নিয়েছেন।

তাঁর জীবন-কাহিনী নিয়ে ছায়াছবির পর্দায় যে-চিত্রটি ফিল্ম ক্লাসিক নির্মাণ করেছেন, তার নাম-ভূমিকায় অভিনয় করেছেন রাষ্ট্রপতি পুরস্কার বিজয়ী শিল্পী সবিতাব্রত দত্ত। অন্যান্য চরিত্রে আছেন তৃপ্তি মিত্র, ছায়া দেবী, জহর গাঙ্গুলী, রবীন ব্যানার্জি, গুরুদাস, দ্বিজু ভাওয়াল, ভুবন চৌধুরী, ধীরাজ দাস, দিলীপ রায়, শিবেন ব্যানার্জি, সমর চ্যাটার্জি।

'চারণকবি মুকুন্দদাস' পরিচালনা করেছেন নির্মল চৌধুরী। সুরসংযোজনা করেছেন পবিত্র চ্যাটার্জি।

'নির্জনপক্ষ' চিত্রের শুভারম্ভ

সম্প্রতি পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁর নতুন ছবি 'নির্জনপক্ষ'-র শুভ মহরৎ পালন করলেন নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওর এক নম্বরে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত চিরন্তন চিত্র প্রোডাকশন্সের এ কাহিনী চিত্রে রূপদান করছেন উত্তমকুমার, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অজয় গাঙ্গুলী, গঙ্গাপদ বসু, জহর রায়, দীপিকা দাস ও অসীম চক্রবর্তী। সঙ্গীত পরিচালনায় রয়েছেন নচিকেতা ঘোষ।

অগ্রদূত পরিচালিত 'চিরদিনের'

অগ্রদূত পরিচালিত অনিমা চিত্র মন্দিরের নতুন ছবি 'চিরদিনের' চিত্র গ্রহণ শুরু হয়েছে নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওর দু' নম্বরে। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার রচিত এ কাহিনীটি এক সঙ্গীত-শিল্পীর জীবনাবলম্বনে গ্রথিত। প্রধান চরিত্রাবলীতে অভিনয় করছেন উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া দেবী, কমল মিত্র, সুমিত্রা সান্যাল, মিঃ

এবং রূপ বিশ্বাস। নচিকেতা ঘোষ ছবিটির সুরকার। আলোকচিত্র গ্রহণে রয়েছেন বিভূতি লাহা।

'তিন অধ্যায়' সমাপ্ত-প্রায়

মঙ্গল চক্রবর্তী পরিচালিত অপ্সরা ফিল্মসের 'তিন অধ্যায়' ছবিটির চিত্র গ্রহণ সমাপ্ত-প্রায়। সম্প্রতি শেষ অধ্যায়ের চিত্র গ্রহণ শুরু হয়েছে। শৈলেশ দে রচিত এ কাহিনীর প্রধান চরিত্রে রূপদান করেছেন উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া দেবী, অজয় গাঙ্গুলী, অনুপকুমার, বিকাশ রায়, জহর রায়, বঙ্কিম ঘোষ, জীবেন বসু, ছন্দা দেবী, প্রতিমা চক্রবর্তী ও রবীন মজুমদার। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন গোপেন মল্লিক।

'যুগমানব কবির' চিত্রের সঙ্গীত গ্রহণ

টেকনিসিয়ান্স স্টুডিও নিবেদিত 'যুগমানব কবির' চিত্রের সঙ্গীত গ্রহণ সম্প্রতি গ্রহণ করলেন সংগীত পরিচালক বিজন ঘোষ দস্তিদার। দেবনারায়ণ গুপ্ত রচিত চিত্রনাট্য অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করছেন দীপংকর ছদ্ম নামের অন্তরালে অভিজ্ঞ কলাকুশলীগোষ্ঠী। ছবিটির নাম-ভূমিকায় মনোনীত হয়েছেন অসীমকুমার।

বোম্বাই

'সুহাগ রাত' সমাপ্ত-প্রায়

প্রযোজক পরিচালক আর. ভট্টাচার্য তাঁর বর্তমান ছবি 'সুহাগ রাত'-এর চিত্রগ্রহণ প্রায় সম্পূর্ণ করেছেন। সম্প্রতি গুরু দত্ত স্টুডিওয় এ ছবির একটি নৃত্যাদৃশ্য গৃহীত হল। নৃত্যাংশে অংশ গ্রহণ করেছেন মধুমতী ও লক্ষ্মীছায়া। অভিনয়াংশে রয়েছেন জীতেন্দ্র, রাজশ্রী, মেহমুদ, শামা, প্রকাশ ও শবনম।

হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'প্যায়ার কা স্বপ্ন'

হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত মডার্ণ পিকচার্সের 'প্যায়ার কা স্বপ্না' চিত্রের সঙ্গীত গ্রহণ সম্প্রতি শেষ হল সংগীত পরিচালনা করেছেন চিত্রগুপ্ত। কণ্ঠদান করলেন লতা মঙ্গেশকার। ছবির মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করছেন অশোককুমার, বিশ্বজিৎ, মালা সিনহা, জনি ওয়াকার, হেলেন ও নয়েনা।

'রাহগীর' চিত্রের বহির্দৃশ্য গ্রহণ

গীতাঞ্জলি-চিত্রদীপ প্রডাকশন্সের রঙিন ছবি 'রাহগীর'-এর বহির্দৃশ্য গ্রহণ সম্প্রতি বিহারের পাটনা অঞ্চলে গৃহীত হল। এ ছবির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন বিশ্বজিৎ, সন্ধ্যা রায়, কনহৈয়ালাল, পদ্মা, অসিত সেন, জহর রায়, অজিত চ্যাটার্জি, ইফতেকার, নিরূপা রায় ও শশিকলা। ছবিটি পরিচালনা করছেন তরুণ মজুমদার। কলকাতায় ছবিটির অন্তর্দৃশ্য গৃহীত হবে। সুরশিল্পীতে রয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

স্টুডিও থেকে বলছি

কথায় আছে সুখ-দুঃখ নাকি জীবনের চাকায় বাঁধা। একবার সুখ আবার দুঃখ। জীবনের গতিপথে সুখ তাই দুঃখের পেছনে আর সুখের পেছনে দুঃখ। এ সত্যকে জীবনে সকলেই কম-বেশী মেনে নেয়। মন্দিরাও মা মারা যাবার পর পঙ্গু বাবা আর ছোট দু-বোন ইন্দিরা, ছন্দা ও ছোট ভাই নন্দর এই ছোট্ট সংসারে অন্ধকার দেখছিল, তখন সে ভেবেছিল ভোরের আলো নিশ্চয়ই একদিন ফুটবে। রাতের কালিমা ঘুচে একদিন শরতের সোনারোদ দেখা দেবে।

কিন্তু দেখা পায়নি মন্দিরা সে শরতের। সংসারের ভাঙাচোরা উজান ঠেলে বাইতে-বাইতে জীবনের সব রঙীন দিনগুলো কোথায় কখন যেন অলক্ষ্যে সরে গেছে। জীবন-নদীর বালুচরে তার আশা-আকাঙ্ক্ষার সমাধি ঘটেছে।

মা মারা যাবার দিন থেকেই সংসারের সব ভার নিজের কাঁধে নিয়েছিল মন্দিরা। ছোট ভাইবোনগুলোকে মানুষ করে তোলা, রুগ্ন বাবার সেবা-যত্ন ওষুধ-পথ্য সব-কিছুরই যোগাড় তাকে করতে হয়েছে মাস মাইনে সোয়া দুশো টাকার মধ্যে। সে শুধু ভেবেছে ভবিষ্যৎ নন্দ মানুষ হোক বড় হোক তারপর জীবনের হাল তার হাতে তুলে দিয়ে অভিকে আপন করে নেবে। অভি আর কেউ নয়, মন্দিরার প্রণয়ী আর ওদের হাউস-ফিজিসিয়ান। প্রতিবেশী ডাক্তার হিসেবেই ওদের দেখাশোনা করে অভি। ওরা দুজনেই জানে দুজনের প্রয়োজনীয়তা। কিন্তু মন্দিরা সংসার ফেলে আসতে রাজী হয় নি। বহু-বার অভিকে এ কথাই জানিয়েছে, 'দেখো, আমার দায়িত্ব, আমার কর্তব্য আমাকেই শেষ করতে দাও। তোমাকে আর এ অশান্তির মধ্যে জড়াতে চাই না।' অভি কিছু বলে নি। নীরবে সব শুনে গেছে।

অশান্তির আগুন কিন্তু দিন-দিন বেড়েই চলেছে। অত্যুৎসাহী কাকা-কাকিমার সাহায্যে ব্যতিব্যস্ত হয়ে মন্দিরা তার বাড়ীর নীচের তলাটা কার্তিকবাবুকে আর ভাড়া না দিয়ে এক সমাজসেবিকার সাহায্য নিয়ে 'কমলকলি' স্কুল খুলেছে। চাকরী ছেড়ে মন্দিরা এখন স্কুল নিয়েই ব্যস্ত। অভির প্রত্যক্ষ সাহায্য নিতে না চাওয়ায় সে পরোক্ষে ছাত্র-ছাত্রী পাঠিয়ে স্কুলটাকে দাঁড় করানোর জন্য কম চেষ্টা করে নি।

সে কারণে বা অন্য যে কারণেই হোক, স্কুলের উৎসবে অভি ও মা নেমন্তন্ন পান প্রতিবারই। এমনি এক অনুষ্ঠানের দিনে কাকা-কাকিমা এসে পরোক্ষভাবে মন্দিরাকে অপমান করতে ভোলেন না। ছন্দা, ইন্দিরা তখন বড় হয়েছে। ছন্দাকে প্রায় তরুণী মেয়ে দেখাচ্ছে, আর ইন্দিরা? সত্যিই যে তরুণী হয়ে উঠেছে! দিদির এ অপমান মুখ বুজে সহ্য করেও ওরা চলে যেতেই ইন্দিরা গম্ভীর-ভাবে বলে—'কি করে যে তুমি ওদের এত আদর যত্ন কর দিদি!' মন্দিরা ক্লান্ত হাসি হেসে বলে—'কর্ব না বলিস্ কি-রে? ওরাই তো এ ভুবনে আমাদের একমাত্র আপনার লোক।' এই হল মন্দিরা। সর্বংসহা নিরহঙ্কারী এই মন্দিরা কিন্তু জীবনে শান্তি পেল না, শুধুমাত্র ব্যথার বন্যায় হারানোর জ্বালায় কেঁদে গেল।

কালের গতির সঙ্গে পৃথিবীটাই তো বদলে যাচ্ছে। প্রতি মুহূর্তে বদলাচ্ছে। নইলে অমন প্রাণের ভাই সুনন্দ পারতো অতটা বদলাতে! যে সুনন্দ মা-বাবা মরার পর থেকে অনুভব করেছে আমি দাঁড়িয়ে পড়লে তবে দিদির ছুটি, সেই সুনন্দ একদিন বারবেলায় এসে ঝড়ের মত তার চাকরীর সুখবর জানানোর সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানীর মালিক মিঃ দাসের মেয়ে শীলাকে বিয়ে করে তার হাতের পুতুল হবার কথাও জানিয়ে গেল। মন্দিরা শিউরে ওঠে, মন্দিরা তীর-খাওয়া হরিণের চোখে চায়, কথা বলতে পারে না। দাদার এই হঠাৎ মতিভ্রমে অন্য দু-বোনও খুব আঘাত পেয়েছে, বিদ্রূপও করতে ছাড়ে নি দাদাকে। কিন্তু মন্দিরা মনে যতই আঘাত পাক না কেন মুখ ফুটে এক-টুকু প্রকাশ করে নি, যে সুনন্দর ওপর সে আশা করেছিল একদিন সংসারের দায়িত্ব ওর হাতে দিয়ে অভির ঘরে গিয়ে উঠবে। তার এই আশার মুখে ছাই পড়ল জেনেও অন্তর থেকে ভালবাসা তো তার মুছে যায় নি; সে তাই সুনন্দ আর শীলাকে বাড়ীতে

নান্দীকারের নাটক মুক্ত অঙ্গনে

মঞ্জরী আমের মঞ্জরী

৩০শে মঙ্গলবার সাতটায়

মূল নাটক : দ্য চেরী অর্চার্ড

নাট্যকার	আন্তন চেখভ্
মঞ্চ	রাধারমণ তপাদার
আলো	স্বরূপ মুখোপাধ্যায়
রূপসজ্জা	শক্তি সেন
রূপান্তর	নির্দেশনা
অজিতেশ	বন্দ্যোপাধ্যায়
লাবণ্য	[illegible]
গিরীন্দ্র	পশুপতি বসু
অনিমা	বীণা মুখোপাধ্যায়
ফুটু	মঞ্জু ভট্টাচার্য
গোলাবাম	মদন সেন
একর্কড়ি	সুজিতেন্দু আচার্য
দুর্গা	শেলী পাল
ঈশ্বর	রাধারমণ তপাদার
শকুন্তলা	... মুখোপাধ্যায়
লালমোহন	অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীচরণ	রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত
তাপস	অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়
স্টেশনমাস্টার	পরিতোষ পাল
পোস্টমাস্টার	অমলেন্দু চক্রবর্তী

টিকিট পাওয়া যাচ্ছে

এসে তেজ দিয়েই, আপাতভাবে সকলের সঙ্গেই মিষ্টিমুখে অভ্যর্থনা করে গুমরে গুমরে কেঁদেছে মন্দিরা। শীলা স্বামীর এ অবস্থা দেখে অনুযোগ করেছে, নিজেকে ছোট মনে হয়েছে তার ঐ পরিবেশে, সে কোটিপতির ঘরের মেয়ে। এ নিয়ে সুনন্দর সঙ্গে তার বেশ ঝগড়াই হয় কিছু, তারপর টেনিস খেলার অজুহাত দিয়ে সেই উৎসবের রাতেই বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায় শীলা। মন্দিরা এটা আশা করে নি। আঘাতের পর আঘাত তাকে কণ্টকিত করে তোলে।

এদিকে ছন্দা তখন পাখা মেলে উড়ছে, কলেজের তরুণ অধ্যাপক প্রান্তিক চাটার্জিকে সে তখন নাকানি-চোবানি খাওয়াচ্ছে। একদিন সিনেমা দেখার দরুন ফেরার সময়টা ঘড়ির কাঁটার এমন জায়গায় পৌঁছল যে, মন্দিরার ঘুমন্ত মনেও কাঁটা বিঁধল। ফিরতেই বকে উঠেছিল মন্দিরা। কিন্তু আশ্চর্য! দিদির চিরবাধ্য, দিদিতে বিগলিত ছন্দা বিদ্রোহের সুরে বলে উঠেছিল—'গ্যারান্টি দিতে পারব না দিদি; নিজেকে নজরবন্দী আসামী ভাবতে পারা শক্ত।' মন্দিরা চমকে উঠল, চুপ করে গেল।

চুপ করে থাকে নি তপস্যা মন্দিরা। একই সঙ্গে দু বোনের বিয়ে দেবার জন্য যোগাড়-যন্ত্র করেছে। একবার গিয়ে ভেবেছে অভির কাছে গিয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু পারে নি। সুনন্দ একবার উড়ো চিঠি দিয়ে দিদিকে তার বাড়ীতে নিয়ে গিয়েছিল এবং কথায় কথায় দিদিকে সাহায্য করার কথাও সে জানিয়েছে, মন্দিরা নিতে অস্বীকার করলেও সুনন্দর আব্দারে ও জোরে যখন সে রাজী হয়েছে তখন শীলা এসে ভাই-বোনের বিরুদ্ধে টাকা সরানোর মিথ্যা ষড়যন্ত্রের অনুযোগ করেছে। ভাই এর বাড়ীতে গিয়ে ভাই-এর বৌ-এর হাতে অপমানিত হয়ে ফিরে এসেছে মন্দিরা।

তারপর অফিসেই বাবার বন্ধুর কাছ থেকে টাকা জোগাড় করে বিয়ে দেয় ওদের। ইন্দিরা ছন্দার বিয়েতে উৎসবের আলো জ্বালাতে ত্রুটি করে নি মন্দিরা। নিজের সব ব্যথা-বেদনাকে মুখের হাসিতে ঢেকে রেখে সকলের মুখে হাসি ফুটিয়েছে।

ইতিমধ্যে অভির বাড়ী গিয়ে মন্দিরা জেনেছে মাকে নিয়ে সে কাশীবাসী হয়েছে।

নবকল্পা

নিয়মিত পড়ুন।

•

আপনার পণ্য বিক্রয়ের
জন্য বিজ্ঞাপন দিন।

•

দি ক্যালকাটা ম্যাগাজিনস্
১/২সি, বলাই স্ট্রীট, কলিকাতা-৪
ফোন : ৫৫-৯০৮৫

নিজেকে এতদিন পরে কেন যেন তার বড় শূন্য মনে হোল। বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে নিজের শরীরের পরিবর্তনের সঙ্গে মনের কোন গহন অন্ধকার কোণে তার দৃষ্টি আটকে গেল। ইন্দিরা ছন্দার বিয়ের কথা আর তাই অভিকে জানান হয় নি। কিন্তু সুনন্দকে জানিয়েছিল মন্দিরা, শীলা সে চিঠি অবশ্য সুনন্দকে দেয় নি। কাকা-কাকিমা এদিকে এসে শীলাকে বুঝিয়েছে মন্দিরা নাকি বাড়ী-ঘর বিক্রী করে দু বোনের বিয়ে দিয়েছে। কাজেই স্বামীর অংশ হিসাবে ও টাকার ওপর তারও অধিকার আছে। এসব কথা কিছুতেই বিশ্বাস করে উঠতে পারে না সুনন্দ। দিদির চিঠি দেয় নি বলে বকে শীলাকে সে। তারপর সত্য-মিথ্যা যাচাই-এর জন্য শীলাকে নিয়ে ছুটতে ছুটতে আসে সুনন্দ।

এদিকে অভি দূরে সরে গিয়ে নিজেকে স্পষ্ট করে দেখতে পায়, মনের কোণে বার বার মন্দিরার ছায়া ভেসে ওঠে। একথা জানায় অভি। মন্দিরা উত্তরে লেখে 'আমার কর্তব্য শেষ হয়ে গেছে, এবার আমিও অজানার পথে যাত্রা করছি তোমার মত' ইত্যাদি। চিঠি পাওয়া মাত্র ছুটে আসে অভি, অভির মা। দরজা দিয়ে সুটকেশ নিয়ে বেরোনোর পথে সুনন্দর হিসেব দিতে গিয়ে জানায় 'যা ওপরে সব হিসেব করা আছে, তোর পাওনা তুই নিয়ে নে।' অমনি দরজায় এসে দাঁড়ায় অভি। মনের শূন্য কোণে কোথায় যেন ধীরে ধীরে সানাই-এর মিলন রাগিণী বেজে ওঠে মন্দিরার।

রাধারাণী পিকচার্সের পতাকাতলে মুক্তি-প্রতীক্ষিত আশাপূর্ণা দেবীর এই 'বালুচরী' কাহিনী অবলম্বনে ছবির চিত্রনাট্য ও সংলাপ অজিত গাঙ্গুলীর, পরিচালনাও করছেন উনি। সঙ্গীত-পরিচালনা ও চিত্রগ্রহণে আছেন ব্রজেন সরকার ও বিজয় ঘোষ। সঙ্গীতাংশে আছেন হেমন্ত, সন্ধ্যা ও শ্যামল মিত্র। বিভিন্ন চরিত্রে আছেন : মন্দিরা—সাবিত্রী চাটার্জি, অভি—অনিল চাটার্জি, সুনন্দ—অনুপকুমার, ইন্দিরা—লিলি চক্রবর্তী, ছন্দা—জ্যোৎস্না বিশ্বাস, প্রান্তিক—অভয় গাঙ্গুলী, মিঃ দাস—বিকাশ রায়, কার্তিক—জহর রায়, অভির মা—মলিনা দেবী মন্দিরার বাবা—প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শীলা—দীপিকা দাস, কাকিমা—রেণুকা রায়, কাকা—গঙ্গাপদ বসু ও অন্যান্যরা।

মঞ্চ ও নেপথ্য

প্যানোরামিক স্টেজে 'শাহজাহান' ও 'লৌহকপাট'

বিভিন্ন ধরনের নাট্যানুশীলনে মধ্য বাংলাদেশ থেকে অনেক দূরে অন্যান্য প্রদেশে আজ যে সুস্থ নাট্যচর্চার ব্যাপ্তি লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তার মূলে যাঁরা সার্থক পটভূমিকা [illegible]

দলের থাত্রার সঙ্গে ভারতীয় স্বাতন্ত্র্যদীপ্ত নাট্যনিরীক্ষার একটি নিবিড় সেতু রচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে বিহার আর্ট থিয়েটারের নাম উল্লেখযোগ্য। নাট্য-প্রযোজনা নিয়ে এঁরা যে মৌলিক চিন্তার গভীরে ডুবে আছেন, তা ইতিমধ্যেই প্রত্যাশিত সাফল্য এনেছে, তার প্রমাণ 'প্যানোরামিক স্টেজে'র আবিষ্কার যা দেশ ও বিদেশের বিদগ্ধ নাট্য সমালোচকদের অকুণ্ঠ অভিনন্দন ও স্বীকৃতি অর্জন করেছে। এই প্যানোরামিক স্টেজেই সম্প্রতি পাটনা শিল্পী সমিতির প্রযোজনায় মঞ্চস্থ হোল 'সাজাহান' ও 'লৌহকপাট' নাটক দুটি, এই দুটি নাটকের নির্দেশনা ও পরিকল্পনার দায়িত্ব বহন করেন বিহার আর্ট থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীঅনিলকুমার মুখোপাধ্যায়। শ্রীমুখোপাধ্যায়ের নাট্যনিষ্ঠা যে কতো গভীর তার চিহ্ন স্বাক্ষরিত রয়েছে 'কারখানা', 'বহুরূপী', 'পাল্কী' প্রভৃতি নাটকের মঞ্চরূপায়ণে। এ দুটি নাটকেরও প্রায়োগপরিকল্পনায় তাঁর পরিকল্পনার স্বাক্ষর থেকেছে। বিহার আর্ট থিয়েটারের কর্মিবৃন্দ এই নাট্যপ্রযোজনার ব্যাপারে সর্বতোভাবে সাহায্য করে সমস্তরের নাট্যঐতিহ্য সৃষ্টি করার পথে আন্তরিক সমর্পিতার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উপস্থিত করলেন।

তরুণ উৎসাহী কর্মিবৃন্দের অক্লান্ত পরিশ্রমে পাটনার কালীবাড়ীর উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে নির্মিত হয় প্যানোরামিক স্টেজটি, পাটনার বাইরে থেকে বহু নাট্যানুরাগী আসেন এই বিশেষ ধরনের স্টেজটি দেখতে। আনুষ্ঠানিকভাবে নাটকের উদ্বোধন করেন বিহারের তরুণ মন্ত্রী শ্রীবিজয়কুমার মিত্র, প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন 'সার্চ লাইট' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীসুভাষচন্দ্র সরকার।

এই প্যানোরামা স্টেজটি ছিল সাধারণ স্টেজের চেয়ে অনেক বড়—সামনে ৪০ ফিট, পিছনে ৩০ ফিট এবং উঁচুতে ২০ ফিট। মঞ্চের ডানদিকে আগ্রা দুর্গের প্যানোরামার সামনে প্রশস্ত চত্বর যেখানে সম্রাট শাহজাহান বার্ধক্যের শেষদিনগুলো কাটিয়েছিলেন। মঞ্চের বামপাশে দিল্লী দুর্গপ্রাকারের প্যানোরামার সামনে ময়ূর সিংহাসন ও ঔরংজীবের রাজসভা। এই দুই দুর্গ প্রাকার প্যানোরামার মাঝখানে সাজানো হয়েছিল নানা দৃশ্য, যেমন যুদ্ধ শিবির, কুটিরাশ্রিত দারা পরিবারের আবাস ইত্যাদি। জোনাল-সিস্টেমে যখন যে দৃশ্যটি অভিনীত হচ্ছিল তখন সেখানেই আলো থাকার জন্য মঞ্চের অন্য অংশগুলি সম্পূর্ণ অন্ধকার ছিল। পর্দা ওঠার পর নির্বাক ছবির মতো একের পর এক পরিবর্তিত দৃশ্যগুলো দর্শকদের চোখের সামনে মূর্ত হয়ে ওঠে।

শাহজাহান' নাটকের মুখ্য চরিত্র ঔরংজীবকে এখানে অন্যভাবে উপস্থিত করা হয়। এখানে ঔরংজীব আদর্শহীন, চতুর, ভণ্ড, স্বার্থান্বেষী, কুচক্রী নয়, বরং ন্যায়নিষ্ঠ, বুদ্ধিমান, রণকৌশলী, ধার্মিক, চরিত্রবান ও মিতব্যয়ী সম্রাট। এই ভূমিকার রূপদান [illegible]



ক্যালকাটা কেমিক্যাল পরিচালিত প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত ভারতমাতা স্টোর্সের প্রতিনিধি পুরস্কার গ্রহণ করছেন শ্রী এস এন ব্যানার্জীর হাত থেকে।

রেখেছেন। শাহজাহান' চরিত্রে অপূর্ব অভিনয় করেছেন সুভাষ সেন, প্রতিটি মুহূর্তে 'শাহজাহানে'র অন্তর্দ্বন্দ্ব নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। হেনা মুখোপাধ্যায় জাহানারার ভূমিকায় সংযত ও প্রাণবন্ত অভিনয় করেছেন। অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন অজিত গাঙ্গুলী (দারা), সামী খাঁ (সুজা), নীহারিকা ব্যানার্জি (পিয়ারা), সুনীল মুখার্জি (ঔরঙ্গজেব), প্রীতি ব্যানার্জি (সোলেমান), প্রণব গাঙ্গুলী (দিলদার) প্রভৃতি শিল্পিবৃন্দ।

দ্বিতীয় দিনে অভিনীত হয় ... বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক নাট্য রূপায়িত ... নাথের বিখ্যাত উপন্যাস '...'। এই নাটকের মধ্যে কিছু নতুন ঘটনা ও সংলাপ জুড়ে দেওয়ায় আরো আকর্ষক হয়েছিল নাটকটি।

মঞ্চপরিকল্পনার দিক দিয়ে এই নাট্য-প্রযোজনার অনেক নতুনত্ব ছিল। ... পুরোভাগে জেলের অফিস, ডানদিকে ... চৌধুরীর বাড়ীর বসবার ঘর আর পিছনে পিছনে ছায়ায় দেখানো হয়েছে ফাঁসির মঞ্চ। এরই সামনে জেলখানার সেলগুলো। দুপাশে দুটি উঁচু প্লাটফর্মের ওপর এক-দিকে কাশেম ফকিরের কুঁড়েঘর, ... ঘেরা, অন্যদিকে সতীনাথ দত্তের বাড়ী যেখানে মেয়ের বিয়ের দিনে বদর মনসী নোটিশ দিয়ে ডাকাতি করে আসে। প্যানোরামিক মঞ্চে একের পর এক এই দৃশ্যগুলো ছবির মতো ভেসে ওঠে।

সংঘবদ্ধ অভিনয় অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন শিল্পিবৃন্দ। বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ নেন—নেপাল ভট্টাচার্য (বদর মনসী), কাশেম ফকির (সুশীল চক্রবর্তী), রমজান (অজিত গাঙ্গুলী), হেনা মুখার্জি (...), প্রজ্ঞত গাঙ্গুলী, অসিত বিশ্বাস, সমী খাঁ, প্রণব গাঙ্গুলী প্রভৃতি।

সুন্দরম প্রসঙ্গ

৩১শে জানুয়ারী সন্ধ্যায় সুন্দরম নাট্য সংস্থা তাঁদের বহুল আলোচিত 'দর্পণের চোখ' ও 'রাজকীয় মৃত্যুদণ্ড' নাটক দুটি মঞ্চস্থ করতে চলেছেন। নাটক রচনায় ও পরিচালনায় আছেন পার্থপ্রতিম চৌধুরী। অভিনয়ে অংশগ্রহণ করছেন পার্থপ্রতিম, দুলাল ঘোষ, নীরেন ঘোষ, ইন্দ্রনীল, পিন্টু তফাদার, শাপী বন্দ্যোপাধ্যায়, ..., দুলা সেনগুপ্ত ও বেলা সরকার।

বিবিধ সংবাদ

'চিত্রাইনী' চিত্রপ্রযোজনা সংস্থা :

'...' নাম দিয়ে জনকয়েক তরুণ চলচ্চিত্রকর্মী ... ... কন্যা' ... ও ... নামে একটি ছবি ৮ ও ১৬ মিঃ মিঃতে তুলছেন—কলকাতা শহর ও পশ্চিমবঙ্গের নানা স্থানে। ছবিটির মূল পরিকল্পনা, চিত্রনাট্য ও তত্ত্বাবধানে আছেন দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্রগ্রহণ করছেন ... সিংহ এবং পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন যুগ্মভাবে সোমেন ঘোষ ও ... মজুমদার।

ভূগল ও তুহিনা দোকানসজ্জা প্রতিযোগীরা পুরস্কৃত

ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোম্পানী আয়োজিত ভৃঙ্গল ও তুহিনার দোকানসজ্জা প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ গত ১৪ই জানুয়ারী সন্ধ্যায় দক্ষিণ কলিকাতার রবীন্দ্রসরোবর হলে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। ক্লারিয়ন ম্যাককান এ্যাডভার্টাইজিং সার্ভিসেস-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রী এস এন ব্যানার্জি অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন এবং বিজয়ী প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণ করেন। প্রারম্ভে কোম্পানীর কমিটি অব ম্যানেজমেন্টের চেয়ারম্যান শ্রীজগদীশচন্দ্র দাশগুপ্ত সকলকে স্বাগত জানান। কোম্পানীর অন্যতম ডিরেক্টর শ্রী এস সি দাশগুপ্ত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ভৃঙ্গল প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় পুরস্কার লাভ করেন যথাক্রমে ভারতমাতা স্টোর্স, রণজিৎ ভ্যারাইটি স্টোর্স ও দত্ত অ্যান্ড কোম্পানী। তুহিনা প্রতিযোগিতায় দক্ষিণ, মধ্য ও উত্তর কলকাতা (আঞ্চলিক-ভাবে) প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার পান যথাক্রমে রণজিৎ ভ্যারাইটি স্টোর্স, ইন্দ্রাণী স্টোর্স ও সবুজ বিপণি। এগুলি ছাড়া প্রতিযোগিতায় আরও প্রায় দু'শজন বিশেষ মেরিট পুরস্কার, মেরিট পুরস্কার, বিশেষ সান্ত্বনা পুরস্কার ও সান্ত্বনা পুরস্কার পান।

সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটার উদ্যোগে জাপানী চিত্র-প্রদর্শনী :

ফেডারেশন অব্ ফিল্ম সোসাইটিজ অব ইণ্ডিয়া এবং কলিকাতাস্থ জাপানী কনসুলেটের সহযোগিতায় সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা আজ শুক্রবার, ২৬-এ জানুয়ারী ম্যাজেস্টিক সিনেমায় সংস্থার সভ্যবৃন্দকে নোবুসু নাকুমারা পরিচালিত রঙীন জাপানী চিত্র 'দি ফেসেস অব লাভ' প্রদর্শন করবেন।



শিশুদিগের যকৃৎ রোগে উপকারী

দুগ্ধ শিশুকেও মধ্যে মধ্যে কালমেঘ সেবন করাইলে লিভারের দোষ হইবার সম্ভাবনা থাকে না

বেঙ্গল কেমিক্যালের

কালমেঘ

আয়ুর্বেদ শাস্ত্র মতে কালমেঘ তিক্ত, অগ্নিদীপক, বলকারক ও পিত্তনিঃসারক

ইহা আবালবৃদ্ধ সকলের পক্ষেই হিতকর



বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর

জলসা

শৈলেন স্মৃতি সংগীত বিদ্যালয় পরিবেশিত "শ্যামা"

গীতিকাব্যধর্মী সংগীতমুখরিত "নৃত্যনাট্য" "শ্যামা"র আর এক রূপ দেখলাম রবীন্দ্রসদনে শৈলেন্দ্র-স্মৃতিসংগীত বিদ্যালয় রূপায়িত এবং শ্রীরঞ্জিত ঘোষ প্রযোজিত সংগীতনৃত্যোৎসবে। এই অনুষ্ঠানের প্রধান সম্পদ হোল দেবব্রত বিশ্বাস, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়—বর্তমান রবীন্দ্রসংগীতানুরাগীদের পরমাদৃত শিল্পীদ্বয়ের কণ্ঠসংগীত। এ ছাড়াও আরতি মুখোপাধ্যায়, চিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি তরুণ শিল্পীদের উল্লেখযোগ্য অবদানও দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কোটাল চরিত্রের গানগুলির নাটকীয়তা, হাস্যোদ্রেকী বীরত্ব দেবব্রত বিশ্বাসের বলিষ্ঠ কণ্ঠে যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। মিলনানন্দের পূর্বতম মুহূর্তেও অশান্তির সূক্ষ্ম ছায়া জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। "ছায়ানট"-এর অতৃপ্ত ব্যঞ্জনায় হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া "হৃদয় নিকুঞ্জ বনে মাধুরী বিকাশিল" গানটিতে মূর্ত হয়ে উঠেছে। চিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায়ের "জীবনপাত্র উছলিয়া মাধুরী করেছ দান" গানটি সুরেলা কণ্ঠের শ্রুতিসমৃদ্ধিতে মধুর। তবে সংগীতগুলিতে বিভিন্ন শিল্পীদের কণ্ঠের সুর-সঙ্গতির অভাব। উল্লিখিত শিল্পীবৃন্দ সৃষ্ট রসকে ব্যাহত করেছে বারবার। উল্লেখযোগ্য প্রশংসার দাবী রাখে শ্রীনরেশচন্দ্র চন্দ্র রচিত আবহসংগীত। নায়ক-নায়িকার জীবননাট্যের বিভিন্ন অধ্যায়ে ভাববিবর্তনের তালে তালে কোমল-ভৈরো, ভৈরো, কেদার, বসন্তের মূর্ছনা কল্পনার ঐশ্বর্যে ভাববস্তুকে দীপ্ততর ব্যঞ্জনায় অনুরণিত করেছে।

গানের তুলনায় নৃত্যাংশ দুর্বল। জ্যোৎস্না বিশ্বাসের "শ্যামা" নববিকশিত প্রেমের আনন্দে-বেদনায় চিত্তগ্রাহী। আঙ্গিকবিচারে নরেশকুমারের বজ্রসেন যথার্থ মানে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু প্রণয়মদিরার দিকটি যথার্থ বিকাশ ঘটলেও বীরব্যঞ্জনার রূপটি উপেক্ষিত হয়েছে। আলোকসম্পাত ও সজ্জা-পরিকল্পনা প্রশংসার দাবী রাখে।

"সুরঙ্গমা" নিবেদিত নৃত্যনাট্য

"নৃত্যনাট্য"—নৃত্য ও নাট্য এই দুই শিল্পের মিলন। এই মিলনের বড় কথাটা হোল উভয় শিল্পের আপনাপন বৈশিষ্ট্য ও সীমারেখা বজায় রেখেও পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে নাটকের বক্তব্যকে নৃত্যের ভাষায় ব্যক্ত করা। "আমাদের প্রাচীন নৃত্যকলাতে সঙ্গীত অভিনয় দুয়েরই যোগ আছে, তবে নৃত্যের অভিনয় ছন্দের তালটিতে



বজ্র সেন এবং শ্যামার ভূমিকায় গোবিন্দম কুট্টি ও পূর্ণিমা ঘোষ।

প্রকাশিত হত।" দৈনন্দিন জীবনের অতিচেনা সাধারণ ভঙ্গীকে ছন্দলালিত্যের সৌন্দর্য-রঙিন রসের রাজ্যে পৌঁছে দেওয়াটাই ছিল নৃত্যনাট্যের কাজ—কবির ভাষায় বলতে গেলে "সীমার মধ্যে"—"অসীমে"র ব্যঞ্জনা। নির্ভেজাল নাটকে সংসারের বাস্তব ঘটনার দ্বন্দ্ব প্রকাশ পায়—নৃত্যনাট্যে ঘটনার অন্তর্বর্তী বেদনা ও কল্পনার অস্থির অশান্তিকে রূপ দেওয়া—যা ভাষার অতীত চিত্রকলার অধরা বস্তু।

এই একান্তই ব্যক্তিক বস্তুকে নির্ব্যক্তিক রূপকের ভাষায় বলা সহজ নয়। কিন্তু এই কঠিন কাজকে ছন্দে, গানে, রূপে ভাবে অনায়াসদক্ষতায় সম্পন্ন করে রসিকসমাজের সকৃতজ্ঞ অভিনন্দন লাভ করেছেন শ্রীশৈলজারঞ্জন পরিচালিত সুরঙ্গমার শিল্পীবৃন্দ। 'শ্যামা'র ভাববস্তু হোল বাসনাকণ্টকিত আত্মকেন্দ্রী প্রেমের সঙ্গে বিবেকের দ্বন্দ্ব। বজ্রসেনকে পাবার উন্মাদনায় কোনো বাধাকে বাধা বলে মানতে শ্যামা রাজী নয়। নিষ্পাপ কিশোর উত্তীয়ের জীবনের মূল্যে বজ্রসেনের মুক্তি কিনতে দ্বিধান্বিতা নয়। কিন্তু এই মিলনের অন্তরে বিচ্ছেদ লুকোনো সেই নিদারুণ সত্য উদ্ঘাটিত হোল প্রতিদিনের প্রতিটি মুহূর্তে বিবেকের নির্মম কষাঘাতে। এই দ্বন্দ্ব বজ্রসেনের অন্তরে ক্রমশঃ সংক্রামিত। পরিণামে প্রবল আকর্ষণ সত্ত্বেও শ্যামাকে গ্রহণের অক্ষমতা। মিথ্যার মূল্যে আকাঙ্ক্ষিতাকে পাওয়ার গ্লানিতে মার্জনীয় অপরাধকেও অমার্জনীয় মনে হয়।

এই প্রণয়রোমাঞ্চ, আকাঙ্ক্ষার অধীরতা, দ্বন্দ্ব ও পুঞ্জীভূত বেদনার রূপ হোল বজ্রসেন ও শ্যামা। 'শ্যামা'র ভূমিকায় শ্রীমতী পূর্ণিমা ঘোষ মণিপুরী আঙ্গিকের কোমল-মধুর-লীলায়িত ভঙ্গীতে পরিবেশিতব্য চরিত্রের খুঁটিনাটি শিল্পসুলভ দক্ষতায় এঁকে গেছেন দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে। প্রতিটি পদক্ষেপের সুষমা, হস্তসঞ্চালন, দেহভঙ্গীর ব্যঞ্জনাদীপ্ত বিকাশে উপযুক্ত শিক্ষা, নির্দেশনা ও বিষয়বস্তুর প্রতি নিষ্ঠার স্বাক্ষর রেখেছেন শ্রীমতী ঘোষ। তবে মুখভাবের ব্যঞ্জনা অধিকতর অনুশীলনী ও বৈচিত্র্যবিকাশের অপেক্ষা রাখে।

বজ্রসেন একাধারে বীর, প্রেমিক, ধর্মানুরাগী ও পৌরুষদৃপ্ত দীপ্ত ব্যক্তিত্ব। এই বীরধর্মী চরিত্রের প্রতিটি ভাবকে মণিপুরীর সঙ্গে প্রয়োজনমত কথাকলির পরিপ্রেক্ষিতে সুষ্ঠু রূপদান করেছেন কুট্টি। উত্তীয়চরিত্রের শুচিতা ও কোটাল-চরিত্রের কৌতুকরসসিঞ্চিত বীরত্ব শ্রীমতী পাপিয়া বর্ধন ও শিবশঙ্করণের নৃত্যে সু-অভিব্যক্ত। বিশেষ চরিত্রচিত্রণে দক্ষিণ-ভারতীয় শিল্পীনির্বাচনে পরিচালকের সূক্ষ্ম শিল্পদৃষ্টির পরিচয় মুদ্রিত।

নৃত্য ছাড়াও মঞ্চের অন্যান্য দৃশ্য ও শ্রাব্য বস্তুর সুষম সম্মিলনের প্রসাদগুণে পরিবেশিতব্য বিষয়কে এক অনির্বচনীয় কাব্যসৌন্দর্যে প্রকাশ করার কৃতিত্ব একান্তভাবেই পরিচালক শৈলজাবাবুর প্রাপ্য। শ্রীমজুমদারের সারাজীবনের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও ঐকান্তিক সাধনার গভীরতা রয়েছে। সবার ওপর আছে কবির সঙ্গে দীর্ঘ-সাহচর্যজাত রবীন্দ্রঐতিহ্য। গহনসঞ্চারী প্রাণরসের মত এতগুলি উপাদানের অলক্ষ্য আবেগ ও প্রেরণা ১৪ই জানুয়ারী নিউ এম্পায়ারে মঞ্চস্থ 'সুরঙ্গমা'র শ্যামাকে রসোত্তীর্ণ করেছে।

কিছু দোষত্রুটি অবশ্যই আছে। তবে সামগ্রিক সার্থকতার তুলনায় তা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর।

সেনী সংগীত সমাজ

গত ১১ই ও ১২ই জানুয়ারী ১৯৬৮ মহাজাতি সদনে সেনী সংগীত সমাজের তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। কণ্ঠসংগীতে হীরাবাঈ বরোদেকার গারা ও মারু বেহাগ রাগে খেয়াল পরিবেশন করেছিলেন। তাঁর কণ্ঠমাধুর্যে শ্রোতারা পরম তৃপ্তি লাভ করেন। অপর্ণা চক্রবর্তী রসসমৃদ্ধ গায়কীতে দুর্গা ও বাগেশ্রী বাহার গান করে তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। আরতি বাগচির সুরেলা কণ্ঠ ও রাগ বিস্তারের জন্যে শ্রোতাদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছেন। যন্ত্রসংগীতে ওস্তাদ শওকত আলি খাঁ সুরশৃঙ্গারে পূরিয়া কল্যাণ রাগে তাঁর সেনী ঘরানার ও গাম্ভীর্যের পরিচয় দিয়েছেন। বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত সরোদে জয়জয়ন্তী ও মিশ্র কাফি রাগে শ্রোতাদের পরিতৃপ্ত করেন। এছাড়া সবিতা রক্ষিত, ভোলা পাঠক, দুলাল অধিকারী, পম্পা মুখার্জি, গোপাল চৌধুরী, অরুণ চ্যাটার্জি, দুর্গা চ্যাটার্জি সংগীতে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

—[illegible]

অধিনায়ক প্রসঙ্গে

কমল ভট্টাচার্য

ভারতীয় ক্রিকেটে রাজা-মহারাজাদের অবদান অনস্বীকার্য। একসময়ে এঁরাই ছিলেন, ভারতীয় ক্রিকেটের মূল কর্ণধার। ক্রিকেটের শুধু কলকাঠি নাড়া নয়, খেলার সংগেও তাঁদের নিগূঢ় সম্পর্ক ছিল। খেলার মাঠে নিয়মিত খেলে প্রমাণ করেছেন, দলের খাতিরে এবং দলের স্বার্থে তাঁরাও একজন। কখনও কখনও তাঁরা দলের নেতৃত্বের ভারও নিয়েছেন। আর সে গুরুদায়িত্ব যে তাঁরা যোগ্যতার সংগে পালন করেছেন তার কথা ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। দলের অধিনায়কত্ব করা ছিল তাঁদের অংগের ভূষণ। এ সাজ তাঁদের মানাত। শুধু রাজসাজে নয়, উন্নত খেলার জন্য তাঁরা যে কষ্ট স্বীকার করেছিলেন সেকথা বলার নয়। বিদেশ থেকে বড় বড় চৌকস খেলোয়াড় আনিয়ে রাজা-মহারাজারা খেলা শিখতেন। দেশের ও দলের স্বার্থে ক্রিকেট শিক্ষার প্রসার বাড়াবার জন্যে এইসব বহিরাগত খেলোয়াড়দেরও কাজে লাগিয়েছিলেন। এর জন্যে যাবতীয় খরচ-খরচা তাঁরাই বহন করতেন। বিশেষ করে পাতিয়ালার মহারাজারা এবং মহারাজ ভিজিনাগ্রামের একান্ত প্রচেষ্টার ফলেই উইলফ্রেড রোডস, জর্জ হারস্ট, ফ্র্যাংক টারেন্ট, ফ্র্যাংক ওয়ুলি, রয় কিলনার, ব্রনলী, স্নেফি, নারুড, ডলকিন, নিউম্যান, হবস, সার্টক্লিফ এবং লিয়ারী কনস্টানটাইনের মত জগৎবিখ্যাত খেলোয়াড়েরা ভারতে ক্রিকেট শিক্ষণের ব্যাপারে এসেছিলেন।

বাঙলার ক্রিকেটে কুচবিহার মহারাজারও অবদান কিছু কম ছিল না। খেলোয়াড় হিসেবে তিনি যে অনন্যসাধারণ ছিলেন না সে কথা সবাই জানত। তবে ক্রিকেট বিদ্যায় অধিনায়কত্বের মহিমায়নায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। বাঙলাদেশে সাহেবদের ক্রিকেট তখন ডুবু ডুবু। সাহেব খেলোয়াড়ের বাঙলাদেশে তখন খুবই টান। ক্যালকাটা ক্লাবের কৃতী খেলোয়াড় এ্যালেক হোসি এবং টম লংফিল্ড যখন বাঙলা দল থেকে বিদায় নিলেন তখন মহারাজা কুচবিহারের ওপর বাঙলা দেশের নেতৃত্বের ভার পড়ে। বলতে দ্বিধা নেই, বাঙলার অধিনায়কত্ব নিয়ে মহারাজা কুচবিহার যেমন কখনও কোনদিন বিচলিত হননি তেমনি খেলার ব্যাপারে—ব্যাটিং-বোলিং করতেও কুণ্ঠাবোধ করেন নি। মিডিয়াম পেস বোলিং এবং ব্যাটিংয়ে চৌকস মারে মহারাজার খুব হাত ছিল। আর এটাও ঠিক, মাঠের মধ্যে সকলের সুপরামর্শ নিতেও মহারাজা কখনও সংকোচ করেন নি। রাজা ক্যাপ্টেন আর আমি ছিলাম ভাইস-ক্যাপ্টেন। খেলার মাঠে আমাদের খুব মিল। অন্তর-আত্মার মহারাজার কাছে সব খেলোয়াড়ই সমান। কোন ভেদ তিনি রাখেননি। এমনকি নিজের চালচলন বদল নিয়েও সবার সাথে হাত মিলিয়ে ছিলেন। বরং কার্যক্ষেত্রে তিনি আরও নীচে নামবার চেষ্টা করেছিলেন। উদ্দেশ্য, কাজ হাসিল করা। দলের খেলোয়াড়দের মন পাওয়া।

রাজার মন বড়ই উদার। হাতে ভিক্ষা মাগলেই তিনি তা মঞ্জুর করতেন। কিন্তু খেলার ব্যাপারে এই উদার ভাব দেখাতে গিয়ে তিনি বড় মুস্কিলে পড়তেন। রণজি ট্রফির খেলা— উত্তরপ্রদেশের সংগে। বিয়াল্লিশ সালের ইডেনে এই খেলার কথা অনেকেরই জানার কথা। আবার অনেকেরই হয়ত জানেন না উত্তরপ্রদেশের খাজা পানসালকর কত বড় ব্যাটসম্যান ছিলেন। এই খেলায় খাজা অসুস্থ থাকায় প্রথম দিন উত্তরপ্রদেশ দলের হয়ে ফিল্ডিং করতে পারেননি। দ্বিতীয় দিন ব্যাটিংয়ের বেলায় দলটি খাজাকে নিয়ে বড় সমস্যায় পড়লেন। অর্থাৎ খাজাকে ব্যাট না করতে দিলে দলের দুর্দশার অন্ত থাকবে না। কিন্তু আইনের চোখে খাজা ব্যাট করতে গেলে অপরাধী হবেন। উত্তরপ্রদেশের কর্মকর্তারা বিপাকে পড়ে বাঙলার ক্যাপটেন কুচবিহার মহারাজার শরণাপন্ন হলেন। অর্থাৎ তিনি মত দিলে খাজার খেলার আর কোন বাধা থাকে না। মহারাজা খুশ মেজাজেই 'হ্যাঁ' বলে কর্মকর্তাদের পিঠ চাপড়ে দিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই ভুল বুঝতে পারলেন। ছুটে এসে আমাকে বললেন : 'কত অন্যায় করে ফেললাম। আমি খাজাকে ব্যাটিং করবার অনুমতি দিয়ে ফেলেছি।' আমি মহারাজার কথায় ক্ষুব্ধ হলাম। কিন্তু কিছু বললাম না। কথাটা চাপা রইল না। মহারাজার ওপর সব খেলোয়াড়রা অসন্তুষ্ট হলেন। মহারাজার মুখ বন্ধ হল। বলার কিছু নেই। তবে আমাকে চুপিচুপি বললেন : 'আমি বলছি খাজা তোমার বলে কিছুতেই খেলতে পারবে না। এটা আমার দৃঢ় ধারণা।' মহারাজার কথায় হাসি পেল। আর রাগ করে থাকতে পারলাম না।

খাজা যথারীতি মাঠে ব্যাট করতে নামলেন। বাঙলার ক্যাপ্টেন মহারাজা যেন বেশী তৎপর হয়ে উঠলেন। ফিল্ডিং সাজাবার ঘটা পড়ে গেল। তবে আমার বোলিং ব্যাপারেও তিনি সতর্ক করে দিয়ে গেলেন। এত সতর্কতার মধ্যেও খাজা আমার প্রথম বলেই বাউন্ডারী মারলেন। মহারাজা কিন্তু হাল ছাড়লেন না। ওভার শেষ হয়নি, খাজা আমার বলে এল-বি-ডবলিউ আউট হয়ে ফিরে গেলেন। মহারাজা ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে বললেন : 'আমাকে তুমি বাঁচালে। জানো তোমাদের কাছে আমি কত ছোট হয়ে পড়ে ছিলাম।'

ক্রিকেটের জাত নেই। কিন্তু রাজা-মহারাজার জাত আছে। সম্মান আছে। মহারাজা কুচবিহার অবশ্য খেলার মাঠে এসব জিনিস গ্রাহ্যের মধ্যে আনতেন না। কিন্তু মাঠের বাইরে নিজের ঠাট বজায় না রেখে উপায় কি! সাধারণের মাঝে সেটা মহারাজার না মানলেই নয়। বাঙলা দল ফাইনালে খেলবে, ওয়েস্টার্ণ ইন্ডিয়ার সংগে। কিন্তু ট্রেনে থার্ড ক্লাস ছাড়া গতি নেই। উপায় কি। যুদ্ধের দাবানল সর্বত্র। ট্রেনে খেলোয়াড়রা এ সময়ে ফার্স্ট ক্লাসের জায়গা পেল না। ট্রেনের থার্ড ক্লাসই সই। দল রওনা হল। কিন্তু ক্যাপ্টেন মহারাজা কুচবিহারের জায়গা ফার্স্ট ক্লাসে। রাজা বলে কথা। খেলোয়াড়দের অবশ্য থার্ড ক্লাসে কোন আপত্তি ছিল না। আমরা বেশ মিলেমিশে ছিলাম। তবে আমরা মিলেমিশে যে কাজটা রাতদুপুর পর্যন্ত করতে চেয়েছিলাম তাতে ক্যাপ্টেনের ভীষণ অমত। অর্থাৎ রাত এগারটার পর তাস খেলা চলবে না। শুধু নিষেধ করা নয়। তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে মহারাজা আমাদের কামরায় এসে তাস খেলায় মত্ত হয়ে উঠলেন। তবে রাত এগারটার পর নয় একথাটা অবশ্য তিনি আর একবার স্মরণ করিয়ে দিতে ভুল করেননি। তাসখেলা বন্ধ হল। কিন্তু মহারাজা নড়লেন না। আমাকে ডেকে বললেন : 'আমার একটা অনুরোধ, তুমি আমার কামরায় চলে যাও। রাত্তিরে তোমার ভাল করে ঘুমনো দরকার।' কোন আপত্তি তিনি শুনলেন না।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা

INDIAN CLASSICAL DANCES	—শ্রীবালকৃষ্ণ মেনন	২৫·০০
The House of the Tagores	—শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়	২·০০
Studies in Aesthetics	—ড: প্রবাসজীবন চৌধুরী	১০·০০
Tagore On Literature and Aesthetics	—ড: প্রবাসজীবন চৌধুরী	৮·৫০
A Critique of the Theories of Viparyaya	—ড: ননীলাল সেন	১৫·০০
Studies in Artistic Creativity	—ড: মানস রায়চৌধুরী	১৫·০০
রবীন্দ্র-[illegible]	—শ্রীবিমলেন্দ্রনারায়ণ সিংহ	১২·০০
[illegible]	—হরিশ্চন্দ্র সান্যাল	২·৫০
	—হরিশ্চন্দ্র সান্যাল	৩·০০
রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যু	—ড: ধীরেন্দ্র দেবনাথ	৬·০০
পদাবলীর তত্ত্বসৌন্দর্য ও কবি রবীন্দ্রনাথ	—ড: শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য	৬·০০
গান্ধী মানস	—শ্রী[illegible] চট্টোপাধ্যায়, শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন, শ্রীনির্মলকুমার বসু	৩·০০

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ৬/৪, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭
পরিবেশক : জিজ্ঞাসা, ৩৩, কলেজ রো, ১৩৩এ, রাসবিহারী এভেনিউ, কলিকাতা-২৯

সোজা উঠে চড়ে বসলেন বাঙ্কে আমার ময়লা বিছানার ওপর। সে দৃশ্য দেখে তাড়াতাড়ি চোখ সরিয়ে নিলাম। আমার বিছানাটা যেন কেমন কেমন। লজ্জা ঢেকে মহারাজার কাছে বিদায় নিয়ে সঙ্গে আরও দুজন খেলোয়াড়কে নিয়ে যাই। তাতে মহারাজা আপত্তি জানাননি। কিন্তু মহারাজার সেই সুন্দর নরম বিছানায় শুয়ে আমার সে রাত্রি অনিদ্রায় কাটে। আপত্তি জানিয়ে বন্ধুদের বলেছিলাম, 'মহারাজার বিছানাটা যেন কেমন কেমন।' পরের দিন শুনলাম মহারাজ সারারাত অঘোরে ঘুমিয়েছেন। এক কথায় নিজেকে আরও ছোট মনে হল।

সেদিনের সেই সুখ-দুঃখের কাহিনী মনে পড়ে মহারাজাকে নতুন করে জানবার অবকাশ পেলাম। ক্রিকেটের জন্যে তাঁর অন্তর-আত্মা কতখানি সজাগ ছিল তা আজকের প্রবীণ বয়সে সে-কথা উপলব্ধি করতে পারছি। আর এটাও বুঝতে পারছি আজকের দিনে এমন জিনিসটির কত অভাব। ক্যাপ্টেনের দূরদৃষ্টি না থাকলে, দলের প্রতি আন্তরিকতা না থাকলে সে খেলা খেলাই নয়। অধিনায়কে সবার হাতে হাত মেলাতে হবে, খেলোয়াড়দের মন জয় করতে হবে। শুধু মহারাজা কুচবিহার নন। এককালীন বাঙলার অধিনায়ক এ্যালেক হোসিকেও দেখেছি, খেলার দিন খেলোয়াড়দের সঙ্গে বসে খেলার কথা আলোচনা করতে। দলের ভালর জন্যে হোসি সাহেব সবার সঙ্গে আলোচনা ও সুপরামর্শ নিতে কসুর করতেন না।

এই প্রসঙ্গে আরও একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। ভারত-পাকিস্থান ক্রিকেট টেস্ট ম্যাচ। খেলা ঢাকায়। সে সময় অফিসের কাজে ঢাকায় গিয়েছিলাম। খেলা দেখা সেই অবসরেই। দলের ম্যানেজার লালা অমরনাথ টিকিট কাটতে দেননি। বলেছিলেন খেলার আগের দিন রাত্রে তাঁর হোটেল কামরায় এসে টিকিট নিয়ে যেতে। যথারীতি হোটেলের কামরায় দরজা ঠেলে দেখি, অমরনাথ ভীষণ ব্যস্ত। সেখানে রয়েছেন, দলের অধিনায়ক ভীনু মানকড় এবং গোলাম আমেদ। অবস্থা দেখে আমি সরে পড়তে চাইলাম। কিন্তু অমরনাথ আমায় ডেকে ঘরে বসালেন। তাঁদের আলোচনার বিষয়বস্তু বিপক্ষ দলের হানিফ মহম্মদকে নিয়ে। হানিফকে তাড়াতাড়ি কেমন করে আউট করা যায় তা নিয়েই সবাই মশগুল। সবায়ের ভিন্নমত। কিন্তু শীঘ্রই তাঁরা সিদ্ধান্তে এলেন। সবাই একমত হলেন। হানিফ লেগ এন্ড মিডলের ফুলটস ধরণের বল লেগের দিকে সুইপ করেন। তাতে মাঝে মাঝে তিনি উঁচু ক্যাচও তোলেন। সবাই স্বীকার করলেন, এইটাই হানিফের মারণ-অস্ত্র।

খেলার সময়ে হানিফ এই ধরণের বলেই আউট হয়ে ছিলেন। রামচাঁদকে দিয়ে লেগ এন্ড মিডলের ওপর বল করান হয়। পরিকল্পনা মত লেগের দিকে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ফিলডসম্যান পলি উমরিগড়কে রাখা হয়। হানিফ লেগে সুইপ করতে গিয়ে উমরিগড়ের হাতে ধরা পড়েন। সে ক্যাচের তুলনা হয় না।

কুচবিহার মহারাজের কথা শেষ করলাম। ঢাকায় অনুষ্ঠিত সে খেলায় ভারতীয় মাতব্বরের কথাও আর বাকি রইল কি? বাকি রইল শুধু আজকের কথা। ভারতীয় দলের অধিনায়ক—শুনেছিলাম অধিনায়কত্বে খুব পাকা পোক্ত। কিন্তু একটা ব্যাপারে তিনি আজও অক্ষমতার পরিচয় রেখে গেলেন। যেটা রাজা মহারাজারাও পারতেন, এমনকি গোঁড়া সাহেবসুবোরাও দলের খাতিরে যা করেছিলেন তা আজকের ভারতীয় দলের অধিনায়ক নবাব পাতৌদি পারলেন না। ইডেনের মধ্যেও দেখেছি, অধিনায়ক পাতৌদি দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে কখনও আলাপ আলোচনা করেন না। এ সংকোচ না কাটাতে পারলে তিনি দলকে কখনও উন্নত পর্যায়ে আনতে পারবেন না।

খেলাধুলা

দর্শক

জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠান

মাদ্রাজের নেহরু স্টেডিয়ামে আয়োজিত ২৩তম জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানে পাঞ্জাব দল সর্বাধিক স্বর্ণপদক (২৬টি) এবং সর্বাধিক মোট পদক (৪১টি) জয়লাভের সূত্রে পদক লাভের চূড়ান্ত তালিকায় বে-সরকারীভাবে শীর্ষস্থান লাভ করেছে। পাঞ্জাবের পরই রাজস্থানের ১৫টি, মহীশূরের ১১টি, বাংলার ৯টি, অন্ধ্রের ৭টি এবং উত্তরপ্রদেশের ৬টি স্বর্ণপদক জয় উল্লেখযোগ্য। প্রতিযোগিতার তিনটি অনুষ্ঠানে স্বর্ণপদক জয় করেছেন একমাত্র পাঞ্জাবের স্কুল শিক্ষয়িত্রী কুমারী এলিজাবেথ ডেভেনপোর্ট। তিনি ১১·৯৩ মিটারে সটপুট, ৩৮·৯০ মিটারে জ্যাভেলিন এবং ৩৯·৭৬ মিটারে (নতুন জাতীয় রেকর্ড) ডিসকাস নিক্ষেপ করে 'ত্রিমুকুট' সম্মান লাভ করেন। পুরুষদের ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়ে স্বর্ণপদক জয়ের সূত্রে মহীশূরের কেনেথ পাওয়েল স্প্রিন্টে 'ডাবল' সম্মান লাভ করেন। তাঁর ১০০ মিটার দৌড়ে ১০·৭ সেকেন্ড এবং ২০০ মিটার দৌড়ে ২২·০ সেকেন্ড সময় লেগেছিল। পাঞ্জাবের প্রভীন কুমারের হ্যামার এবং ডিসকাস নিক্ষেপে স্বর্ণপদক জয় প্রতিযোগিতার এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তিনি হ্যামার নিক্ষেপে তাঁরই জাতীয় রেকর্ড ভঙ্গ করে নতুন জাতীয় রেকর্ড (দূরত্ব ৬২·১২ মিটার) স্থাপন করেন।

সদ্য সমাপ্ত এই ২৩তম জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানে ১০০ জনের বেশী এ্যাথলীট অংশ গ্রহণ করেছিলেন। আলোচ্য প্রতিযোগিতায় একাধিক বিষয়ে 'মিট রেকর্ড' এবং তিনটিতে জাতীয় রেকর্ড ভঙ্গ হয়।



কুমারী এলিজাবেথ ডেভেনপোর্ট
'ত্রিমুকুট' খেতাব বিজয়িনী

নতুন জাতীয় রেকর্ড

পুরুষ বিভাগ

হ্যামার: ৬২·১২ মিটার—প্রভীনকুমার (পাঞ্জাব)

মহিলা বিভাগ

ডিসকাস: ৩৯·৭৬ মিটার—কুমারী এলিজাবেথ ডেভেনপোর্ট (পাঞ্জাব)

হাইজাম্প: ১·৫৭ মিটার—কুমারী লিন্ডা গোমেজ (মাদ্রাজ)

পশ্চিমবাংলার সাফল্য

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আলোচ্য ক্রীড়ানুষ্ঠানে মোট ১৫টি পদক জয় করে (স্বর্ণ ৯, রৌপ্য ৪ এবং ব্রোঞ্জ ২)। পশ্চিমবাংলার ৯টি স্বর্ণপদক জয়ের হিসাব—বালিকা বিভাগে ৪টি, বালক বিভাগে ৪টি এবং মহিলা বিভাগে ১টি। পুরুষদের মধ্যে মাত্র দুজন পদক পান—একজন রৌপ্য এবং অপরজন ব্রোঞ্জ পদক। দুটি করে স্বর্ণপদক পেয়েছে বালক বিভাগে জি সি কর (রেঞ্জার্স) এবং বালিকা বিভাগে সুবি নন্দী (এরিয়ান)।

বাংলার পক্ষে স্বর্ণপদক

মহিলা বিভাগ

লং জাম্প: সুবি নন্দী (ইস্টার্ণ রেল)

বালিকা বিভাগ

১০০ মিটার: সুবি নন্দী (এরিয়ান)
৮০০ মিটার: কিঙ্করী দাস (এরিয়ান)
লংজাম্প: সুবি নন্দী (এরিয়ান)
জ্যাভেলিন: ইন্দ্রানী মুখার্জি (২৪-পরগণা)

বালক বিভাগ

লংজাম্প: জি সি কর (রেঞ্জার্স)
হাইজাম্প: এম সুর (ইস্টবেঙ্গল)
পোলভল্ট: তপন দাস (২৪-পরগণা)
ট্রিপল জাম্প: জি সি কর (রেঞ্জার্স)



মাদ্রাজের নেহেরু স্টেডিয়ামে আয়োজিত ২৩তম জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানের উদ্বোধনী দিবসে অন্যান্য দলের সঙ্গে বাংলা দলের 'মার্চ-পাস্ট'

বাংলার পক্ষে রৌপ্য পদক

মহিলা বিভাগ

৮০ মিটার: অঞ্জলি মণ্ডল (ইস্টার্ন রেল)



প্রবীর কুমার (পাঞ্জাব)

বালিকা বিভাগ

২০০ মিটার: শ্রীরূপা চ্যাটার্জি (এরিয়ান)

৪×১০০ মিটার রিলে: বাংলা দল

পুরুষ বিভাগ

২০০ মিটার: এ এস ভি প্রসাদ (মোহনবাগান)

বাংলার পক্ষে ব্রোঞ্জ পদক

ডেকাথলন: মহীন্দর সিং (ইস্টবেঙ্গল)

চূড়ান্ত পদক তালিকা

বে-সরকারী চূড়ান্ত তালিকায় প্রথম ৯টি রাজ্যের পদক লাভের খতিয়ান:

	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ
পাঞ্জাব	২৬	১৭	৬
রাজস্থান	১৫	১০	১৮
মহীশূর	১১	৬	৭
বাংলা	৯	৪	২
অন্ধ্র	৭	১০	১০
উত্তরপ্রদেশ	৬	৬	৪
মহারাষ্ট্র	৪	৮	১২
দিল্লী	৫	৯	৭
মাদ্রাজ	৩	১১	৯

রোহিন্টন বারিয়া ট্রফি

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট ফাইনাল

আমেদাবাদের সর্দার প্যাটেল স্টেডিয়ামে আয়োজিত ১৯৬৭-৬৮ সালের [illegible] ক্রিকেট প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্যায়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দল ১৩১ রানে ইন্দোরকে পরাজিত করে রোহিন্টন বারিয়া ট্রফি জয়ী হয়েছে। কলকাতার পক্ষে এই প্রথম ট্রফি জয়। তারা ইতিপূর্বে তিনবার (১৯৭৪, ১৯৪৯ ও ১৯৬৪ সালে) ফাইনালে উঠেছিল। অপরদিকে ইন্দোরের পক্ষে এই প্রথম ফাইনাল খেলা।

প্রথম দিনের খেলায় কলকাতা দল ৪ উইকেটের বিনিময়ে ২৫৪ রান সংগ্রহ করে। ২য় উইকেটের জুটিতে সৌমেন ঘোষ এবং সুজয় গাঙ্গুলী ১৬০ মিনিটের খেলায় দলের ১৩১ রান যোগ করেন। সৌমেন ঘোষ ১৯০ মিনিটে তাঁর ৯২ রান (বাউণ্ডারী ১৪) এবং সুজয় গাঙ্গুলী ৩ ঘন্টায় তাঁর ৬৩ রান (বাউণ্ডারী ৯) করেন। অম্বর রায় তাঁর ৬৫ রান (বাউণ্ডারী ৯) করে অপরাজিত থাকেন।

দ্বিতীয় দিনে ৩৬০ রানের কলকাতা দলের প্রথম ইনিংস শেষ হলে ইন্দোর দল ৩ উইকেট খুইয়ে ১১৫ রান সংগ্রহ করেছিল। অম্বর রায় সেঞ্চুরী (১০৩ রান) করার গৌরব লাভ করেন। ৫ম উইকেটের জুটিতে অম্বর রায় ও বিশ্বরঞ্জন (৪০ রান) দলের মূল্যবান ১৪৫ রান তুলে দেন।



আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় 'রোহিন্টন বারিয়া ট্রফি' বিজয়ী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দল

তৃতীয় দিনে ইন্দোর দলের প্রথম ইনিংস ৩২৩ রানের মাথায় শেষ হলে কলকাতা প্রথম ইনিংসের খেলায় ৩৭ রানে এগিয়ে যায়। ইন্দোর দলের ১৪৮ রানের মাথায় ৫ম, ১৯১ রানের মাথায় ৬ষ্ঠ এবং ১৯৩ রানের মাথায় ৭ম উইকেট পড়ে যায়। শেষে ৮ম উইকেটের জুটিতে গুলরেজ আলী (৮৫ রান) এবং এস ঠাকুর (নট-আউট ৩৫ রান) ১২৩ রান সংগ্রহ করে দলকে শোচনীয় অবস্থা থেকে উদ্ধার করেন। চা-পানের ৪০ মিনিট পর ইন্দোরের প্রথম ইনিংস শেষ হলে খেলার বাকি এক ঘণ্টা সময়ে কলকাতা ১ উইকেট খুইয়ে ২১ রান সংগ্রহ করেছিল।

চতুর্থ দিনে ২০৫ রানের মাথায় কলকাতার দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হলে খেলায় জয়লাভের জন্যে ইন্দোরের ২৪৩ রানের প্রয়োজন হয়। কলকাতার দ্বিতীয় ইনিংসের ১৩১ রানের মাথায় ৫ম উইকেট পড়ে যায়। দলের ১১৯ রানের মাথায় ৪র্থ উইকেট পড়ে গেলে দলের শোচনীয় অবস্থায় অম্বর রায় খেলতে নেমে ব্যক্তিগত ৬১ রান (বাউণ্ডারী ৮) করেন। ইন্দোর দলের দ্বিতীয় ইনিংসের ৫৩ রানের (৩ উইকেটে) মাথায় ৪র্থ দিনের খেলা শেষ হয়। তখনও খেলায় জয়লাভের জন্যে ইন্দোর দলের আরও ১৯০ রানের প্রয়োজন ছিল এবং হাতে জমা ছিল ৭টা উইকেট।

পঞ্চম অর্থাৎ খেলার শেষদিনে লাঞ্চের আধ ঘণ্টা আগে ১১১ রানের মাথায় ইন্দোর দলের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হলে কলকাতা ১৩১ রানে জয়ী হয়।

সেমি-ফাইনালে কলকাতা (পূর্বাঞ্চল বিজয়ী) প্রথম ইনিংসের রান-সংখ্যার উপ[র] উত্তরাঞ্চল বিজয়ী পাঞ্জাবকে পরাজিত ক[রে] ফাইনালে উঠেছিল। অপরদিকের সেমি-ফাইনালে পশ্চিমাঞ্চল বিজয়ী ইন্দোর দল ৮ উইকেটে দক্ষিণাঞ্চল বিজয়ী মাদ্রাজকে পরাজিত করে ফাইনালে কলকাতার সঙ্গে মিলিত হয়েছিল।

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার দীর্ঘ দিনের ইতিহাসে মাত্র এই সাতটি বিশ্ববিদ্যালয় রোহিন্টন বারিয়া ট্রফি জয়ী হয়েছে : বোম্বাই ২১ ব[ার], পাঞ্জাব ৪ বার, মহীশূর ৩ বার, দি[ল্লী] ২ বার এবং একবার করে পুণা, ওসমানি[য়া] এবং কলকাতা।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

কলকাতা : ৩৬০ রান (অম্বর রায় ১০৫, সৌমেন ঘোষ ৯২, সুজয় গাঙ্গুলী ৬৩ এবং এস বিশ্বনাথন ৪০ রান। ভি কে নাইডু ৭৬ রানে ৪, [বি] নারাংগ ২১ রানে ৩ এবং অশোক জগদলে ৯১ রানে ২ উইকেট)

ও ২০৫ রান (অম্বর রায় ৬১ এবং অমরনাথ ব্যানার্জি ৪৬ রান। শ্রীবাস্তব ১৭ রানে ৩, বিজয় নাইডু ৪৯ রানে ২ এবং নারাংগ ৯০ রানে ৪ উইকেট)

ইন্দোর : ৩২৩ রান (অশোক জগদলে ৭২, গুলরেজ আলী ৮৫ এবং এ[স] মেনন ৪০ রান। দিলীপ দোশী ৯[?] রানে ৫ এবং এস দে ৫০ রানে ২ উইকেট)

ও ১১১ রান (অশোক জগদলে ৩৩ এবং সঞ্জয় জগদলে ২৪ রান। সোম ৩৭ রানে ৪, দোশী ২২ রানে ৪ এবং গোপাল বসু ১৮ রানে ২ উইকেট।

বি, আর, বড়ুয়া প্রণীত

যন্ত্র আবিষ্কার পরিচিতি

বিশ্ববরেণ্য বৈজ্ঞানিক জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ বহু উচ্চপ্রতিষ্ঠিত ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসর, সাংবাদিক কর্তৃক প্রশংসিত বাংলা ভাষায় ইঞ্জিনিয়ারিং ও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় সর্বাধুনিক পুস্তক। ইহাতে মিশর, চীন, ভারত, বাইজেন্টিন, আরব, ইউরোপ ও আমেরিকার যন্ত্রপাতি এবং আণবিক ও হাইড্রোজেন বোমা ও রকেট পর্যন্ত আলোচিত হইয়াছে। হায়ার সেকেন্ডারী স্কুলের ইঞ্জিনিয়ারিং পাঠার্থী ছাত্রেরা নিশ্চয়ই পড়িবেন। ইহা সাধারণেরও মনোরঞ্জন করিবে। ভাষা প্রাঞ্জল। মূল্য দশ টাকা। মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ও গ্রন্থকার, ৪৭।বি বেনিয়াপুকুর লেন, কলিকাতা—১৪ ঠিকানায় প্রাপ্তব্য।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

চুল উঠে যাওয়ার জন্য বিব্রত?



আজ থেকে সিলভিক্রিন ব্যবহার করে চুলের পুনর্জীবন ফিরিয়ে আনুন

বিপদের এই সব সঙ্কেত অবহেলা করবেন না

চুল উঠে যাওয়া। মাথার তালুতে চুলকানি। নির্জীব শুকনো চুল। এই সব লক্ষণ থেকেই বুঝা যায় যে আপনার চুল বেড়ে ওঠার জন্ত যে জীবনদায়ী খাদ্যের প্রয়োজন তার অভাব হচ্ছে। এর ফলে অকালে আপনার মাথায় টাক পড়তে পারে। তাই এই সব লক্ষণ দেখা দিলেই বুঝতে হবে আপনার চাই—সিলভিক্রিন—যেটি চুলের জীবনদায়ী স্বাভাবিক খাদ্য।

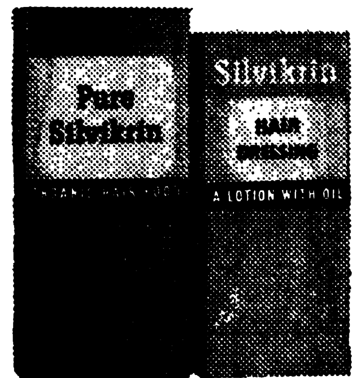
সিলভিক্রিন কি ভাবে কাজ করে ?

চুলের গঠনের জন্ত যে ১৮টি অ্যামিনো অ্যাসিড দরকার হয়, প্রকৃতি তা যোগায়। একমাত্র সিলভিক্রিনেই রয়েছে সেইসব অ্যামিনো অ্যাসিডের মূলতত্ত্বের নির্যাস। এটি চুলের গোড়ায় গিয়ে, তাকে খাদ্য যোগায় ও শক্তিশালী করে তোলে ও সুস্থ চুল বেড়ে ওঠায় সাহায্য করে।

ব্যবহার-বিধি

প্রত্যহ ছমিনিট করে মাথার তালুতে পিওর সিলভিক্রিন মালিশ করুন। চুলের অবস্থায় উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত পিওর সিলভিক্রিন ব্যবহার করে চলুন। একবার চুলের স্বাস্থ্য ফিরে এলে তাকে অটুট রাখবার জন্ত নিয়মিতভাবে সিলভিক্রিন হেয়ারড্রেসিং মাখুন—এটি পিওর সিলভিক্রিন মেশানো একটি অয়েল বেস্।

বিনামূল্যে 'অল অ্যাবাউট হেয়ার' শীর্ষক পুস্তিকার জন্ত এই ঠিকানায় লিখুন—ডিপার্টমেন্ট A-7 পোস্টবক্স ২৩১, বোম্বাই-১.৮



সিলভিক্রিন উৎপাদন পুরুষ ও মহিলা সকলেরই ব্যবহার উপযোগী।

সিলভিক্রিন

চুলের জীবনদায়ী স্বাভাবিক খাদ্য

১৯৬৭

ভারতীয়-বাটার রপ্তানি বাণিজ্যে আর একটি উল্লেখযোগ্য বছর

৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকারও বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন

বিদেশী বহু প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর অপ্রতিহত চাপ সত্ত্বেও ১৯৬৭ সাল ভারতীয়-বাটার রপ্তানি বাণিজ্যে একটি ঐতিহাসিক বছর। এ বছর যতো জুতো তাঁরা বিদেশের বাজারে বিক্রি করেছেন, ততো আর কখনো হয়নি। এবং এই রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করেছেন ৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকারও বেশি।

জাপান, হংকং, ইতালি এবং আরো অনেক বড়ো বড়ো রপ্তানিকারক দেশের ক্রমবর্ধমান তীব্র প্রতিযোগিতার মুখে অর্জিত এই সাফল্য। সুয়েজের প্রতিযোগিতাই নয়, এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতির দরুণ মালবাহী জাহাজের পথ-পরিবর্তন এবং পণ্যের মাসুল-বৃদ্ধি বজায় রাখার জন্য উৎপাদন পরিকল্পনার পুনর্বিন্যাসের সমস্যা।

ভারতীয়-বাটার জুতো পশ্চিম ইওরোপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং অন্যান্য সমুদ্রান্ত বাজারে সমাদৃত।

পৃথিবীর সর্বত্র মানুষের সেবায়—ভারতীয়-বাটা।

Bata

রপ্তানি আয়

১৯৬৬ : ৩,১০,০০,০০০ টাকা

১৯৬৭ : ৩,৫২,৪৪,০০০ টাকা

১৯৬৭ সালে রপ্তানি বাজারের তথ্য

যুক্তরাজ্য এবং পঃ ইওরোপ	১,৪০,১৪,০০০
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	১৬,৮৭,০০০
[illegible]	৬৪,৭০,০০০
কানাডা	
অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড	৩২,০০,০০০
[illegible]	১৭,১৬,০০০
[illegible]	১৬,৬০,০০০
[illegible]	৪,৬৬,০০০
[illegible]	৪,০০,০০০
[illegible]	
মোট	৩,৫২,৪৪,০০০

* নিত্যপাঠ্য তিনখানি গ্রন্থ *

সারদা-রামকৃষ্ণ

—সন্ন্যাসিনী শ্রীদুর্গামাতা রচিত—

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের জনৈক সন্ন্যাসী লিখিয়াছেন :—পড়িতে পড়িতে তন্ময় হইয়া শ্রীশ্রীমায়ের ও শ্রীশ্রীঠাকুরের যেন জীবন্ত স্পর্শ অনুভব করিয়াছি।

যুগান্তর :—সর্বাঙ্গসুন্দর জীবনচরিত...... গ্রন্থখানি সর্বপ্রকারে উৎকৃষ্ট হইয়াছে ॥

সপ্তমবার মুদ্রিত হইল—৮৲

গৌরীমা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যার অপূর্ব জীবনচরিত

আনন্দবাজার পত্রিকা :—ইঁহারা জাতির ভাগ্যে শতাব্দীর ইতিহাসে আবির্ভূতা হন ॥

পঞ্চমবার মুদ্রিত হইয়াছে—৫৲

সাধনা

বসুমতী : এমন মনোরম স্তোত্রগীতি-পুস্তক বাংলায় আর দেখি নাই ॥

পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ—৪৲

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম

২৬ মহারাণী হেমন্তকুমারী ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের

বিচিত্র কাহিনী

(৪র্থ সংস্করণ)

নবীন ও প্রবীণদের সমান আকর্ষণীয়

অজস্র চিত্র সম্বলিত

বিচিত্র গল্পগ্রন্থ। মূল্য : দুই টাকা

লেখকের

আর একখানা বই

আরও বিচিত্র কাহিনী

অসংখ্য ছবিতে পরিপূর্ণ

দাম : তিন টাকা

প্রকাশক :

এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স

প্রাইভেট লিমিটেড

সকল পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

৭ম বর্ষ
৪র্থ খণ্ড

অমৃত

৩৯শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday 2nd February, 1968 শুক্রবার, ১৯শে মাঘ, ১৩৭৪ 40 Paise

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীধ্রুব রায়

গৌরাঙ্গ-পরিজন প্রসঙ্গে লেখকের বক্তব্য

১। নিত্যানন্দ প্রভুর ডালো নাম যে মুকুন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় তা আমি পণ্ডিতপ্রবর দ্বিজপদ গোস্বামী ভাগবতশাস্ত্রীর গ্রন্থ 'শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু (সংক্ষিপ্ত লীলামৃত) থেকে পেয়েছি। সেই গ্রন্থে লিখিত হয়েছেঃ "একচক্রা গ্রামে শ্রীমুকুন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রচলিত নাম হাড়াই পণ্ডিত, হাড়াই ওঝা বাস করিতেন। তিনি মৌড়েশ্বর রাজার কন্যা পদ্মাবতী দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।...মাঘ মাসে শুক্লা ত্রয়োদশী দিনে মধ্যাহ্নকালে শ্রীহাড়াই পণ্ডিতের পতিব্রতা পত্নী শ্রীপদ্মাবতী দেবী অপরূপ এক পুত্ররত্ন প্রসব করিলেন। এই ইঁহাদের প্রথম সন্তান। ইনিই শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীকৃষ্ণাগ্রজ ব্রজের বলরাম।"

২। শ্রীবাসের পিতার নাম যে জলধর পণ্ডিত তা বৈষ্ণব-দিগদর্শনীতে বর্ণিত আছে। উদ্ধৃতি দিচ্ছি : "শ্রীগৌরাঙ্গলীলার পঞ্চতত্ত্বের অন্যতম শ্রীনারদের অবতার শ্রীবাস পণ্ডিত বৈদিক ব্রাহ্মণ জলধর পণ্ডিতের পঞ্চপুত্রের একজন।"

৩। জগদানন্দ পণ্ডিতের নিবাস যে কুমারহট্টে তাও বৈষ্ণব-দিগদর্শনীতে বর্ণিত আছে। উদ্ধৃতি দিচ্ছি : "শ্রীজগদানন্দ দেবী সত্যভামার প্রকাশ। নিবাস কুমারহট্টে, শ্রীশিবানন্দ সেনের বাটীর নিকট।"

৪। শ্রদ্ধেয় ডক্টর রাধাগোবিন্দ নাথ-সম্পাদিত চৈতন্যচরিতামৃতের ২।১০।৪১ পয়ারে এই রূপ দেখতে পাচ্ছি : "প্রদ্যুম্ন মিশ্র ইঁহো বৈষ্ণবপ্রধান। জগন্নাথ-মহাসোয়ার ইঁহো দাস নাম।।" লক্ষ্য করছি 'জগন্নাথ' ও 'মহাসোয়ার' শব্দদুটির মধ্যে ড্যাস নেই, একটি হাইফেন আছে। ডক্টর নাথ তাঁর টীকায় 'জগন্নাথ-মহাসোয়ারের' ব্যাখ্যা করেছেন—"শ্রীজগন্নাথদেবের মহাসোয়ার; সোয়ার অর্থ পাচক (যিনি পাক করেন); মহাসোয়ার —প্রধান পাচক; সর্বশ্রেষ্ঠ পাককর্তা।" অবশ্য 'ইঁহো দাস নাম'-এর অর্থ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—"ইঁহার (মহাসোয়ারের) নাম দাস (সম্ভবতঃ জগন্নাথ দাস)।" এই অর্থে উল্লিখিত হাইফেনের ও তার ব্যাখ্যার মধ্যে বোধহয় কিছু অসঙ্গতি ঘটে। দাস অর্থে সেবক ভেবে নিলে প্রদ্যুম্ন মিশ্রকে 'মহাসোয়ার' বলা সম্ভবতঃ অসমীচীন হয় না। সে যাই হোক, যখন এসম্পর্কে নিশ্চয়তার অভাব আছে, তখন গ্রন্থাকারে প্রকাশ করবার সময় প্রদ্যুম্ন মিশ্রের পাচকত্বের পরিচয়টুকু বাদ দিয়ে দেব।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
কলিকাতা-২৬

বসু বিজ্ঞান-মন্দির

বসুবিজ্ঞান মন্দিরের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে বিজ্ঞানের কথা আলোচনায় (৭ম বর্ষ ২১শ সংখ্যা ৭ অগ্রহায়ণ ১৩৭৪) একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লিখেছেন, শ্রদ্ধেয় শুভঙ্কর। তাঁকে বিশেষ ধন্যবাদ। দুটি প্রশ্ন জিজ্ঞাস্য আছে, অনর্থক তর্কের জন্য নয়—সত্যানুসন্ধানের কারণে।

তিনি লিখেছেন 'মন্দিরের শীর্ষে পতাকাস্বরূপ আছে বজ্রচিহ্ন—যে দৈব অস্ত্র দধীচি মুনির দ্বারা নির্মিত হয়েছিল।' আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যের একটি ধারায় বজ্রের সঙ্গে ইন্দ্রের, দধীচির বৃত্রসংহারের যোগাযোগ বৈদিক যুগ থেকে চলে আসছে একথা ঠিক, কিন্তু অনেকে বলে থাকেন যে ভগিনী নিবেদিতার প্রেরণায় এই প্রতীক বৌদ্ধ বজ্রচিহ্নের রূপকস্বরূপ গৃহীত হয়েছে।

বসুবিজ্ঞান মন্দিরের পরিকল্পনা ১৯১৭ সালের বহু পূর্বে। শুধু রবীন্দ্রনাথ, নিবেদিতা, প্যাট্রিক গেডেস ও অন্যান্য মনীষীরাই যে জগদীশচন্দ্রকে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন তা নয়, জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক সাধনাকে বিশ্বের গোচরীভূত করতে যাঁরা সাহায্য করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্তত আরো কয়েকজনের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা উচিত। একজন শ্রদ্ধেয় রমেশচন্দ্র দত্ত, আর একজন স্বামী বিবেকানন্দ আর ত্রিপুরারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য, যাঁর অর্থানুকূল্যে রবীন্দ্রনাথ একসময়ে জগদীশচন্দ্রকে বিলাতে সাহায্য করতে সমর্থ হয়েছিলেন। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার নিয়ে ভারতবর্ষের প্রথম Scientific deputation জগদীশচন্দ্রের এবং রমেশচন্দ্র দত্ত My dear Rabi বলে ১৬ জুলাই ১৯০১ সালে যে চিঠি লেখেন (চিঠিপত্র ৬ পৃঃ ১৪৩) তাতেই পরিস্থিতিটি বেশ বোঝা যায়। ঐ পুস্তকেই "মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গন...গানটি কবির হস্তাক্ষরে মুদ্রিত আছে এবং এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষের রবীন্দ্রসংগীত (১৩৬৫) পৃঃ ২২৯-৩০৩ দ্রষ্টব্য। ১৩২৩ সালে রবীন্দ্রনাথকে কবি লিখছেন, 'ঐ দেখনা, এত কোণ এত বন্ধনের মধ্যেও জগদীশ বোসকে কেউ ধরে রাখতে পারলে না। তাঁর বিজ্ঞানের মন্ত্র কুণো বিজ্ঞানের মন্ত্র নয়—তিনি জড় ও চেতন, বস্তুবিজ্ঞান ও জড়বিজ্ঞান সমস্তকে একত্র মিলিয়ে বন্ধনমুক্ত জ্ঞানে' মহাসংকীর্তন পূর্ব-পশ্চিমে ধ্বনিত করে তুলেছেন।

সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
কলিকাতা ঃ ২৯

আমার কাল আমার দেশ

অমৃতের পাতায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত ও সদ্যসমাপ্ত শ্রদ্ধেয় সুধীরচন্দ্র সরকার মহাশয়ের উপরিউক্ত আত্মজীবনীমূলক রচনাটি পাঠ করে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করলাম। রচনাটি নানা তথ্যে পূর্ণ। পাঠকের কৌতূহল মেটাতে সার্থক।

সংগ্রামী জীবন সুধীরবাবুর। বিচিত্র মানুষের সংস্পর্শে তিনি এসেছিলেন তাঁর কর্মজীবনে। তাঁদের কেউ সাহিত্যিক, শিল্পী, দার্শনিক বা রাজনীতিবিদ। এঁদের কথা তিনি সার্থকভাবে পরিবেশন করেছেন। এই সমস্ত প্রখ্যাত মানুষদের সম্বন্ধে আমরা নানা কথা জানতে পেরেছি। রচনাটিতে দেশের এক বিশেষ যুগচিত্র আত্মপ্রকাশ করেছে।

সে-যুগে 'সাহেবদের চাকরী আমি করব না'—বলে তিনি যে 'কণ্টকময় অনিশ্চিতের' পথে পা বাড়িয়েছিলেন, তা সফল হয়েছে। এই প্রচেষ্টা, এই উদ্যম, বাংলার যুব-সমাজের কাছে এক আদর্শ হয়ে রইলো।

সহজ সরল ভাষায় সাবলীলভাবে নানা ঘটনার পরিবেশন রচনাটিকে সুখপাঠ্য করে তুলেছে। লেখককে ধন্যবাদ।

পরিশেষে এ-ধরনের রচনা প্রকাশ করার জন্য আপনাদের অভিনন্দন জানাই।

বিদ্যুৎকুমার চট্টোপাধ্যায়।
আমতা, হাওড়া

হায়দরাবাদ সাহিত্য সম্মেলন

দয়া করে চিঠিটা আপনার পত্রিকায় প্রকাশ করে আমার এবং হায়দরাবাদে অনুষ্ঠিত সাহিত্যসম্মেলনে অংশগ্রহণকারী কবিদের অসীম উপকার করবেন। ৩৭শ সংখ্যা 'অমৃত'-য় শ্রীঅনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায় সম্মেলনের একটা সুচিন্তিত বিবরণ দিয়েছেন, এবং সেই সূত্রে জানা গেল, কবিতার সেমিনারে আলোচিত 'আধুনিক কবিতা' ও 'সাম্প্রতিক কবিতা'-র সংজ্ঞা তিনি বুঝতে পারেননি। আমরা অত্যন্ত আগ্রহ ও গভীর উদ্বেগের সঙ্গে তাঁর বক্তব্য লক্ষ্য করেছি। সম্মেলনে কী আলোচনা হয়েছিল, তা' এ-প্রসঙ্গে অবান্তর বিবেচনায় উল্লেখ করছি না, শুধু যে-বক্তব্যে আমরা বিমূঢ়, তারই কথা বলা যায়।

ডঃ হরপ্রসাদ মিত্রের একটা মুদ্রিত নিবন্ধের আলোচনাপ্রসঙ্গে আমি 'আধুনিকতা' ও 'সাম্প্রতিকতা'-র উপর আমার বক্তব্য রাখি। এরপরে শ্রীআশিস সান্যাল আমার বক্তব্য সম্পর্কে একটা সঙ্গত ও প্রাঞ্জল প্রশ্ন করেন, আমি তার উত্তর দেবার চেষ্টা করি,—সম্ভবতঃ শ্রীসান্যাল আমার উত্তরে আংশিক সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তৃতীয় বক্তা শ্রদ্ধেয় কবি শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু আমার বক্তব্যের নিরঙ্কুশ সমর্থন করেন। নিজের বিশ্বাসের কথা মা-বলে ডঃ নীলরতন সেন বললেন, যেহেতু বক্তব্যটি ইতিমধ্যে সভায় সমর্থিত হয়েছে, তিনি আর এ-বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চান না। আমার কথা, ভালো-মন্দ যাই হোক না কেন, এরপরেও কি স্বীকার করতে হবে, বক্তব্যটি অস্পষ্ট ছিল? যদি তাই হয়, তাহলে ধরে নিতে হবে, আলোচক, প্রশ্নকর্তা, সমর্থক কেউ কারোর কথা না বুঝেই শুধু কথা বলে গেছেন।

সামসুল হক
কলকাতা-২০

সম্পাদকীয়

গণতন্ত্রের শক্তির উৎস

রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হুসেন সাধারণতন্ত্র দিবসে জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত বক্তৃতায় একটা কথা বলেছেন যার তাৎপর্য গভীর। তিনি বলেছেন, আমাদের দেশের মানুষ তাঁদের প্রজ্ঞার দৃষ্টিতে বিচার করে গণতান্ত্রিক কাঠামোর শাসন-ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু গণতন্ত্র শুধু আইনমাফিক সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনই নয়। এর পেছনে রয়েছে একটি ব্যাপক ও গভীর নৈতিক সমর্থন। জনগণের অকুণ্ঠ সম্মতিই এই নীতিবোধ জাগ্রত করে। বলা বাহুল্য যে-কোনো উপায়ে একটা সংখ্যাগরিষ্ঠতা আদায় করলেই গণতন্ত্র হয় না। আইনের দিক দিয়ে হলেও, নীতির দিক দিয়ে তার কোনো জোর থাকে না।

আজকের ভারতবর্ষে এই নৈতিক সম্মতির দিকেই আমাদের বিশেষভাবে নজর রাখতে হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠেরা যদি এমনভাবে শাসনকার্য চালায় যে, তাতে জনকল্যাণ বিঘ্নিত হয়, তাহলে নৈতিক দিক দিয়েই তাদের বিরুদ্ধে আপত্তি উঠবে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, রাস্তায় সংঘর্ষ বাধিয়ে গণতন্ত্রের লড়াইকে রক্তাক্ত করে তুলতে হবে। রাষ্ট্রপতি যথার্থই বলেছেন যে, প্রতিটি রাজনৈতিক সমস্যাকে রাস্তায় টেনে আনার যে প্রবণতা দেখা দিচ্ছে তা দুঃখজনক। গণতন্ত্রে রাজপথে রাজনৈতিক আন্দোলনের অধিকার নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু সে-আন্দোলন যদি সংযত ও শৃংখলাপরায়ণ না হয়, তাহলে সংঘর্ষই বাড়বে, সমস্যা সমাধানের কোনো পথ পাওয়া যাবে না।

পশ্চিমবঙ্গের জন্য আমরা চিন্তিত। এখানে একটি কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়েছে। কিন্তু বিধানসভায় শক্তি পরীক্ষার সুযোগ এখনও পাওয়া যায়নি। দল ভাঙাভাঙির খবর এখনও আসছে। সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের একমাত্র ক্ষেত্র বিধানসভা খোলার পথ এখনও বেরোয়নি। তবে এ-মাসের মধ্যেই সাংবিধানিক জট খোলার ব্যবস্থা করতে হবে, নতুবা এই অচলাবস্থা থেকে মুক্তির কোনো পথ থাকবে না রাষ্ট্রপতির হস্তক্ষেপ ছাড়া। সে যাই হক, সাধারণ মানুষ এত জটিল সাংবিধানিক বিতর্ক নিয়ে মাথা ঘামায় না। তারা চায় সুষ্ঠু প্রশাসন, সামাজিক কল্যাণ ও নিরাপত্তা। সরকার অথবা বিরোধী দল কারো পক্ষ থেকেই শক্তি পরীক্ষার বাড়াবাড়ি তারা চায় না। কারণ, দেখা গেছে, রাজায় রাজায় যুদ্ধের ফলে প্রাণ যায় উলুখাগড়ার। যুক্তফ্রন্টের তৃতীয় পর্যায়ের আন্দোলনের সময়ে শান্তি ও শৃংখলা যাতে অব্যাহত থাকে, তার জন্য সরকার ও বিরোধী পক্ষ সকলের কাছেই আমাদের আবেদন রইল।

বাংলাদেশে এই অনিশ্চিত অবস্থার জন্য সাধারণ মানুষের বিস্তর দুঃখ ভোগ করতে হয়েছে। কোয়ালিশন সরকার যদি এই অনিশ্চয়তার ভাব দূর করতে পারেন ভাল। কিন্তু গোলাগুলী, হরতাল, ধর্মঘট দিয়ে জনজীবন অতিষ্ঠ করার অধিকার কারো নেই। রাজপথের রাজনীতির সর্বনাশা ফল সম্পর্কে নেতারা যদি অবহিত হন, তাহলে সাধারণ মানুষের মনে স্বস্তি আসে। পশ্চিমবাংলার অবস্থা সবদিক দিয়েই কাহিল। শিল্পপ্রধান রাজ্য হিসেবেই পশ্চিমবাংলার গুরুত্ব। সেই শিল্পক্ষেত্রের অবস্থা আশাপ্রদ নয়। ঘেরাও-এর চোট সামলে উঠে স্বাভাবিক উৎপাদনের পর্যায়ে না পৌঁছুনো পর্যন্ত আমাদের অর্থনীতির দুর্বলতা কাটবে না। অনিশ্চয়তার ফলে কোয়ালিশন সরকার খাদ্যশস্য সংগ্রহেও খুব বেশি কৃতকার্য হতে পারেননি। যুক্তফ্রন্টের আমলে পাঁচ টাকা কে, জি চাল খেতে হয়েছিল সংগ্রহ-নীতির ব্যর্থতার জন্য। এবারেও কি সেই দুর্বিষহ বিধিলিপিই সাধারণ মানুষের জন্য অপেক্ষা করবে না, যদি নির্দিষ্ট ও প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য এই সময়ে সংগ্রহ করে রাখা না যায়? স্কুল-কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সকরুণ অবস্থা তো আর ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

এই বিষয়গুলোর প্রতি আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই সকল রাজনৈতিক দলের নেতাদের। রাষ্ট্রপতি বলেছেন, সরকার আসবে এবং যাবে। কিন্তু রাষ্ট্র থাকবে তার চিরন্তন অস্তিত্বে। রাষ্ট্রের যারা অধিবাসী—কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত সকল শ্রেণীর মানুষ, তাদের কর্তব্য হল রাষ্ট্রের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করা। কোনো সরকার ব্যর্থ হলে তাকে সরিয়ে অন্য সরকার তাঁরাই বসাবেন। এর জন্য পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া আছে তাঁদের হাতে। কিন্তু রাজনীতির লড়াইয়ে সেই জনগণের কথা কেই বা মনে রাখছে? এতে গণতন্ত্রের মূল শক্তি অর্থাৎ গণ-সম্মতির নৈতিকবোধকেই উপেক্ষা করা হচ্ছে। এর দ্বারা গণতন্ত্র শক্তিশালী হতে পারে না। এবং এ-কথাও সকল রাজনৈতিক নেতাদের মনে রাখা উচিত যে, যে-দেশে মানুষের মৌলিক সমস্যার সমাধান না করে গণতন্ত্রের সূত্র নিয়ে দড়ি টানাটানি হয় এবং রাস্তায় লড়াই হয়, সে-দেশেই গণতন্ত্রের অপমৃত্যু ঘটার আশঙ্কা সবচেয়ে বেশি।





'শতবর্ষের আলোয় আলোয়'

Amrita Bazar Patrika

দুস্তর পারাবার লংঘনের আহ্বান

পুলকেশ দে-সরকার

এদেশে বৃটিশ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পর থেকে একটা কথা বার বার উচ্চারিত হয়েছে যে, ইংরেজেরা (শাসক হিসেবে) দেশ ছেড়ে চলে গেলে এদেশে অরাজকতা বিরাজ করবে। এটিই রাজনীতি ক্ষেত্রে ইংরেজ রাজপুরুষেরা ও রাজনৈতিক নেতারা গুছিয়ে বলতেন, ভারতীয়েরা উপযুক্ত হলেই তাদের স্বায়ত্তশাসনাধিকার দেওয়া হবে, ধীরে ধীরে ক্রমান্বয়ে, Progressively। দীর্ঘকাল এদেশের একশ্রেণীর শিক্ষিত ও মোটামুটি সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরাও তাই বলতেন, যদি-না ব্যক্তিগত কারণে ইংরেজদের উপর বিরাগ জন্মে থাকে। তারপরও যখন একদল পরাধীনতাবোধে সঙ্কুচিত ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপ্ত মানুষের আবির্ভাব ঘটল, এ সংশয়ের ঘোর কাটেনি। বৃটিশশক্তিকে এতই বিশাল এবং আত্মশক্তিকে এতই ক্ষুদ্র মনে হত যে, এই দুই অসম শক্তির কখনও স্থান বদল হতে পারে এটা কল্পনাতেও আসত না। তবু এল একদল দৃঢ়প্রত্যয়ী মানুষ, তারা বলল, তোমরাই যত অনিষ্টের মূল, তোমরা যাও, আমরা আমাদেরটা দেখে নেব। কিন্তু ইংলণ্ডের রাজশক্তি, এদেশের রাজপ্রতিনিধি ও রাজভক্তেরা কিছুতেই ইংরেজের ভারত ছাড়ার মধ্যে কল্যাণ দেখতে পায়নি। তারা ধর্তাই বুলির মত বলে চলেছে, ইংরেজ গেলে সর্বনাশ হবে।

সেকালেও এই যুক্তি ছিল এবং কিছু প্রবলাকারেই ছিল। কেননা, হিন্দু সম্প্রদায় কিছুতেই মুসলিম আমলের কথা ভুলতে পারছিল না, মুসলমানেরাও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সুনিশ্চিত হতে পারছিল না। হিন্দু সম্প্রদায় "জ্ঞানে-বিজ্ঞানে" ইংরাজদের সমপর্যায়ে উঠে যাচ্ছিল, মুসলিম সম্প্রদায় প্রাচীন বৃত্তিগুলো আঁকড়ে থেকে এক্ষেত্রে পিছিয়ে যাচ্ছিল; সুতরাং, এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যেও সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অসাম্য বিরাজ করছিল। এই শাসকমণ্ডলীর ও তাদের প্রবক্তাদের নজর এড়ায়নি। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দেও তাই এক যুক্তি—

"ডেলি নিউজ (ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ) সম্পাদক বলেন যে, ইংরেজেরা আমাদের দেশ পরিত্যাগ করিয়া গেলে আমাদের অবস্থা আরো মন্দ হইবে। সম্পাদক রাজবংশীয়, সুতরাং তাঁহার একথায় আমরা চুপ করিয়া থাকিতে পারিতাম, কিন্তু এদেশস্থ কোন কোন কৃতবিদ্যেরও এইরূপ মত। অতএব এ সম্বন্ধে আমাদের গুটি কয়েক কথা বলিতে বাসনা হইতেছে।"

অমৃতবাজার পত্রিকা ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দেও দেশী ও বিদেশী কৃতবিদ্যদের নাড়ী ঠিক ধরতে পেরেছিলেন এবং তাই বলা দরকার বোধ করেছেন—

"ইংরেজেরা আমাদিগকে হঠাৎ ত্যাগ করিয়া গেলে যে আমরা আন্ধার দেখিব, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু অহিফেনসেবীরা যদি উহার সেবন অভ্যাস ত্যাগ করিতে যায় তবে ঐরূপ প্রথমে আন্ধার ২ দেখিয়া থাকে। সতীত্বভ্রষ্ট স্ত্রীর একমাত্র সম্বল উপপতি, তাই বলে কি তার চিরকাল ব্যভিচার করিতে হইবে? পীড়া হইলেই ঔষধ সেবন কষ্ট সহ্য করিতে হইবে। ঘোড়া হইতে পড়িয়া অস্থি ভগ্ন করিলে হাড় জোড়া লাগাইবার কষ্ট একবার অবশ্যই সহ্য করিতে হইবে। যখন ভারতবর্ষীয়েরা একবার স্বাধীনতা ধন হারাইয়াছেন, যখন তাঁহাদের একবার জাতি গিয়াছে, তখন প্রায়শ্চিত্ত রূপ কষ্ট আজি হউক, কালি হউক, একদিন করিতেই হইবে।

"অদ্যাপি ভারতবর্ষীয়েরা স্বাধীনতা পাইবার উপযুক্ত হয় নাই—ইংরেজমাত্রের মুখে এই কথা শুনে, ও একথার উত্তর দিবার যোও নাই। কেন উপযুক্ত হয় নাই? ইহার প্রমাণের ভার ডেলি নিউজ সম্পাদকের উপর। তিনি কি ইহার উত্তর দিতে পারেন? সিন, কোসিন, টানজেন্ট দ্বারা ইহা প্রমাণ করা যাইতে পারে না। এদেশীয়দের উপর একটি দেশের ভার দিয়া দেখ, তাহারা না পারে তখন আমরা চুপ করিয়া থাকিব। আর যতদিন এরূপ প্রমাণ না দিয়া কোন ব্যক্তি বলিবেন, তিনি হয় বুঝিয়া বলেন না, নয় ধূর্ত।

"ভারতবর্ষীয়েরা ক্রমে স্বাধীনতা পাইবার উপযুক্ত হইবে। —ইহা কি কখনও হইয়া থাকে? স্বাধীনতা শিখিবার পুস্তক ইতিহাসেও নয়, রাজনৈতিক বিজ্ঞানেও নয়। স্বাধীনতা শিখিবার পুস্তক স্বাধীনতা। আমরা না শত শত ইংরেজী পুস্তকে পড়িয়াছি যে, অনেক দিবস পরাধীন থাকায় বাঙ্গালীর মধ্যে দুর্বলের যত দোষ অর্থাৎ মিথ্যা কথা, প্রবঞ্চনা, ভীরুতা, নীচতা প্রবেশ করিয়াছে? আমরা না পড়িয়াছি যে, রোমানেরা যখন ইংলণ্ড প্রথম আক্রমণ করে, তখন অধিবাসীরা অত্যন্ত সাহস ও বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করে ও চারি শত বর্ষ পরে যখন রোমানেরা ঐ দেশ পরিত্যাগ করিয়া আইসে, তখন ব্রিটিশ জাতি এরূপ হীনবল হইয়াছিল যে, তাহাদের চেয়ে অনেকগুণে নিকৃষ্ট পিকট জাতির সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয় নাই? তাহারা ত রোমানদের কর্তৃক সুসভ্য হইয়াছিল? মুসলমানদের ও ইংরেজদের অধিকার অগ্রে আমরা কাহার দ্বারে ২ খোসামোদ করিয়া বেড়াইতাম 'ওগো তোমরা অনুগ্রহ করিয়া আইস, আমাদের দেশগুলি শাসন করিও, আমরা নিষ্কণ্টকে লাঙ্গল চষিব?'

"স্বাধীন থাকিবার ইচ্ছা স্বাভাবিক, এইজন্য দাসেরা মাঝে ২ জুটিয়া যুদ্ধ করিয়াছে, এই নিমিত্ত ১৮৫৭।৫৮ সালের ঘোর সমর হয়, আর এই নিমিত্ত আমরা বিরলে বসিয়া ক্রন্দন করিয়া থাকি। ১৮৫৭।৫৮ সালে যে ২ স্থলে যুদ্ধ হইয়াছিল, সেখানে কি কেহ আর একশত বর্ষের মধ্যে মাথা তুলিতে পারিবে? ইংরেজেরা কি এইরূপে আমাদিগকে স্বাধীনতার উপযুক্ত করিতেছেন? সমস্ত দেশ নিরস্ত্র করিয়াছেন, এ বুঝি আর একটি উপায়? এটি নিশ্চিত যে, পরাধীন অবস্থায় আমাদের যত সময় যাইতেছে, রোগ ততই অসাধ্য হইতেছে।

"ডেলি নিউজ সম্পাদক বলেন যে, ইংরেজেরা গেলে রুশিয়ানেরা কি ফরাসিসরা আসিবে। কিন্তু ইংরেজেরা কিরূপে গেলে? যদি আমরা বাহুবলে কি ধর্মবলে ইংরেজদিগকে এদেশ হইতে বহিষ্কৃত করিতে পারি; তবে স্বীয় দেশ রক্ষা করিতেও পারিব। যদি ইংরেজেরা আপনারা ২ কি অন্য কোন জাতির অনুরোধে, ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেওয়া কর্তব্য মনে করিয়া উহাকে স্বাধীন করেন, তাহা হইলে তাঁহারাই আমাদিগকে রক্ষা করিবেন। গ্রীস কি করিয়া স্বাধীন হইল? অধিক কথার প্রয়োজন নাই, ডেলি নিউজ সম্পাদক

লাইবিরিয়া সাধারণতন্ত্রের ইতিহাস জানেন? দাসগণ কর্তৃক ঐ দেশ স্থাপিত, সুতরাং তাহারা আমাদের অপেক্ষাও নিকৃষ্ট ছিল, কিন্তু কয়েক সহস্র লোক লইয়া ও তাহারা দিব্য স্বাধীনভাবে আছে। তাহারা যদি অন্যের সাহায্য না পায়, তবে তাহাদিগকে ইউরোপের যে কোন জাতি মনে করিলেই অধীন করিতে পারে। কিন্তু যদি এক্ষণে কোন জাতি এরূপ দুষ্প্রবৃত্তি দেখায়, তবে ভূমণ্ডলের তাবৎ জাতি তাহাদের বিরুদ্ধে বন্দুক হস্তে করিবেন। ইংরেজ মাত্রেই ঐরূপ বলিয়া থাকেন। যদি তাঁহারা অকপট হন তবে এক কাজ করুন না কেন? বাংলাদেশ উন্নতি করিয়াছে, শুদ্ধ এই দেশটি আমাদিগকে শাসন করিতে দিউন, তাহা হইলে চারি পার্শ্বে ইংরেজাধিকার, কেহ আমাদের গায়ে সাহস করিয়া হাত দিতে পারিবে না, অথচ আমরা রাজ্য শাসন করিতে শিখিব। নেপালীরা যদি আক্রমণ করে আর আমরা আপনাদিগকে রক্ষা করিতে না পারি, তখন তাঁহারা আমাদিগকে সাহায্য করিবেন, আমরা টাকা দিব। কেমন, হে মহোদয়, স্বাধীনতাপ্রিয়, দাসত্ব-নাশক, সুসভ্য, বিশুদ্ধশষ্য রাজপুরুষেরা! এরূপ প্রস্তাব অনুমোদনে কেহ প্রস্তুত আছ?

"অপর এক প্রকারে আমাদিগের স্বাধীনতা লাভ হইতে পারে, অন্য কোন কারণবশতঃ যদি ইংরেজেরা হঠাৎ আমাদিগের দেশ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। রোমানেরা ঐরূপ কারণবশতঃ ব্রিটন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। এরূপ হওয়া দুর্ঘট, কিন্তু হতে পারে না এরূপ নহে। হইলে আমাদের দেশ বিশৃঙ্খল হইয়া যায় বটে। আমাদের মতে তাহা হইলেও আমাদের মঙ্গল হয়, কিন্তু এ বিষয়ে আমরা পরে বিবেচনা করিব। তবে ডেলি নিউজ সম্পাদক যে বলেন, তাহা হইলে রুশিয়ানেরা আসিবে ও তাহারা আইলে আমাদের ভাল হইবে না, সে সম্বন্ধে দুটি কথা আছে। রুশিয়ানদিগকে নিন্দা করায় তাঁহাদের স্বার্থ আছে, এইজন্য তাঁহারা তাহাদিগকে মন্দ বলিলে স্বভাবতঃ আমাদের তত বিশ্বাস হয় না। আবার যদি তাঁহারা কোন বিষয়ে তাহাদিগকে ব্যাখ্যা করেন, তবে সেই কারণে, তাঁহারা এক গুণ বলিলে আমরা মনে ২ গুণ করিয়া লই। তাঁহারাই বলেন যে, রুশিয়ানেরা স্বেচ্ছাচারী, কিন্তু তাহাদের একটা গুণ আছে যে ভিন্ন দেশ অধিকার করিলে তাহারা অধিবাসীদিগের প্রতি খুব সৎ ব্যবহার করে।" (২৮শে মে, ১৮৬৮, ১৫ সংখ্যা)

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল—সতেরো বছর পর; ১৯৩০-এর আগে কংগ্রেসের মঞ্চে দাঁড়িয়ে আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা সঙ্কল্প গ্রহণের সাহস হয়নি কারও, ইংরেজ দেশ ছাড়ো চীৎকার তারও বারো বছর পর ১৯৪২-এ, ১৯৪৬-৪৭ এও ভারতীয় নেতৃবৃন্দে আপোষে ডমিনিয়ান ষ্ট্যাটাসেও রাজী হয়েছিলেন, শিগগিরই তা স্বাধীনতায় পরিণত হবে এই আশায়। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের আগেও (যাঁরা) মুখে ইংরেজ-তাড়ানো-স্বাধীনতার কথা বলতেন তাঁদের কোন প্রকাশ্য রাজনৈতিক মঞ্চ ছিল না, তাঁরা ছিলেন দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ গুপ্ত সমিতির বিপ্লবী, গোপনে রাজ্যশাসনের সহস্র চক্ষুর আড়ালে যাঁরা আয়োজন করতেন অভ্যুত্থানের অথবা অত্যাচারী রাজ-পুরুষের জাগতিক অপসারণের।

কিন্তু ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দেই অমৃতবাজার পত্রিকা স্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্বাধীনতার পক্ষে বলেছেন এবং যে সব যুক্তি দিয়েছেন তার চাইতে প্রবলতর অকাট্য যুক্তি শতবর্ষ পরেও কিছু দেবার আছে কিনা সন্দেহ করি।

সেকালে রুশ-জুজুর কথা তুলে ভারতবর্ষীয়দের কাতর করে রাখা হত, ওরা এই এল এই এল বলে ত্রাসের সৃষ্টি করা হত, নিঃসহায় ভারতবর্ষীয়েরা স্বভাবতই সম্মোহিত হয়ে পড়ল। অমৃতবাজার পত্রিকা সেই যুক্তি খণ্ডনে ও সেই অকারণ ভীতি দূরীকরণে ওদেরই বক্তব্য উদ্ধার করে দেখিয়েছেন যে, প্রচলিত পর-শাসনের চাইতে বেশী কিছু অসদ্ব্যবহারের আশঙ্কা নেই।

দীর্ঘকাল পরে, গান্ধীজীর অবিসম্বাদী অহিংস নেতৃত্বকালে ইংরেজদের টালবাহানা ও বারংবার হিন্দু-মুসলিম অনৈক্যের যুক্তি প্রদর্শনে গান্ধীজী একবার বিরক্ত ভরে বলেছিলেন, তাই তাই সই, তোমরা যাও, অরাজকতাই বিরাজ করুক। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থ দশকের বহু বহু পূর্বে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে অমৃতবাজার পত্রিকা এক গ্রাম থেকে বললেন, ইংরেজেরা রোমানদের মত হঠাৎ চলে গেলে—

"আমাদের দেশ বিশৃঙ্খল হইয়া যায় বটে। আমাদের মতে তাহা হইলেও আমাদের মঙ্গল হয়।"

এমন কথা সেকালে দুঃসাহসভরে আর কে বলতে পেরেছেন? বরং, অমৃতবাজার পত্রিকা এমন সাহসের পরিচয় দিতেন বলেই এদেশের শিক্ষাভিমানী ও ধনী ব্যক্তিরাও কিছু বিরূপ ছিলেন; তাঁদের শান্তিতে বিঘ্ন ঘটতে পারে এমন আশঙ্কাও করতেন।

ইংরেজরা যখন এদেশে এসেছেন তখন তাঁরা রোমান-শাসনমুক্ত তো বটেই এক নতুন সভ্যতার ঐতিহ্যবাহী; ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকলেও এদেরই মধ্যে এমন ব্যক্তিরাও ছিলেন যাঁরা তৎকালীন দাস ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মতো উদার ও সুসভ্য, কেবল তাই নয়, পেগানরীতি আচার-মুক্ত খৃষ্ট ধর্মেও ছিল এ জাতি অগ্রসর। ভারতে তাদেরই মানদণ্ড রাজদণ্ডে পরিণত হয়েছে। কোম্পানীর আমল গেছে, মহারাণীর আমল এসেছে এবং ভারতের অগণিত জনগণ মহারাণীর নামে জয়-জয় ধ্বনি উচ্চারিত করে চলেছে। সেই "স্বাধীনতাপ্রিয়, দাসত্ব-নাশক, সুসভ্য, যিশুশিষ্য" রাজপুরুষদের সম্বোধন করে অমৃতবাজার পত্রিকা পরীক্ষা-নিরীক্ষার এক প্রস্তাব রাখলেন:

"বাংলাদেশ উন্নতি করিয়াছে, শুদ্ধ এই দেশটি আমাদিগকে শাসন করিতে দিউন, তাহা হইলে চারিপার্শ্বে ইংরেজাধিকার, কেহ আমাদের গায়ে সাহস করিয়া হাত দিতে পারিবে না, অথচ আমরা রাজ্য শাসন করিতে শিখিব।"

বিস্ময়কর চমকপ্রদ প্রস্তাব; সামান্য কিছু প্রশাসনিক সুবিধা মাত্র নয়, ইংরেজদের সমকক্ষ কয়েকটি চাকুরীমাত্র নয়, বাঙালীদের ইংরেজ হওয়ার অবাধ উন্নত পথের দাবীও নয়—স্বায়ত্তশাসন নয়, হোম-রুল নয়, একেবারে পুরোপুরি রাজ্যশাসনের দাবী। যেখানে আত্মশক্তির প্রতি আস্থা নেই, পরাধীনতাবোধ নেই, স্বাধীনতার স্পৃহা হয়নি সর্বজনীন, সেখানে এই প্রস্তাব রাখতে পারেন তাঁরাই যাঁদের প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে আত্মসামর্থ্য আত্মবীর্যে অপরিসীম বিশ্বাস আছে।

দৃষ্টান্ত ও তাদের বিন্যাসও এই নিবন্ধের আর একটি গুণ। রোমান বনাম বৃটনদের ইতিহাস আজ সর্বজনবিদিত; রাজনৈতিক সভাদি প্রতিষ্ঠার পর রাজনৈতিক আন্দোলনে এই কাহিনী বহুবার উচ্চারিত হয়েছে। "লাইবিরিয়া সাধারণতন্ত্রের ইতিহাস" খুব বেশী কথিত হয়নি; গ্রীসের কথাও নয়। অমৃতবাজার পত্রিকা এই সব দৃষ্টান্ত যথাযথ বিন্যাস করে উত্তরপুরুষকেই তথ্য বল দিয়ে গেছেন। এই নিবন্ধের মধ্যেও ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহকে প্রকারান্তরে স্বাধীনতার যুদ্ধই বলা হয়েছে; "স্বাধীন থাকিবার ইচ্ছা মনুষ্যের স্বাভাবিক" এই কথারই সমর্থনে ১৮৫৭।৫৮ সালের "ঘোর সমরের" কথা বলা হয়েছে। তা এমনভাবেই দমন করা হয়েছে যে "আর এক শত বর্ষের মধ্যে"ও কেউ মাথা তুলতে পারবে না। তাই যদি হয় তবে একথা মিথ্যা যে, ইংরেজেরা ভারতীয়দের স্বাধীন হবার উপযুক্ত করে তুলছেন। এবিষয়ে তার্কিকদের সম্পূর্ণ নিরুত্তর করবার জন্যই অমৃতবাজার পত্রিকা Arms Act-এর কথা বলেছেন। ভারতবর্ষীয়দের প্রতি বিশ্বাস নেই, তাদের শাসন করা, দমন

কথাই সাম্রাজ্যবাদীদের যেখানে লক্ষ্য সেখানে সেটা অন্য আইন বলবৎ করা, "সমস্ত দেশ নিরস্ত্র" করাই রীতি। এভাবে কেউ স্বাধীনতার উপযুক্ত হয়ে ওঠে না এবং অমৃতবাজারের আশংকা "পরাধীন অবস্থায় আমাদের যত সময় যাইতেছে, রোগ ততই অসাধ্য হইতেছে।" এই আশংকা থেকেই অমৃতবাজার পত্রিকা স্বীকার করেছেন, "হঠাৎ বন্ধনমুক্ত" হলে অহিফেনসেবীদের মত প্রথমে "আন্ধার ২°" দেখা যেতে পারে; কিন্তু "প্রায়শ্চিত্ত" "একদিন করিতেই হইবে।"

তবু একথা কিছুতেই স্বীকার্য নয় যে, "অদ্যাপি ভারতবর্ষীয়েরা স্বাধীনতা পাইবার উপযুক্ত হয় নাই" এবং "ভারতবর্ষীয়েরা ক্রমে স্বাধীনতা পাইবার উপযুক্ত হইবে।" কারণ? একেবারে মোক্ষম অখণ্ডনীয় তর্কাতীত কথা:

"স্বাধীনতা শিখিবার পুস্তক ইতিহাসও নয়, রাজনৈতিক বিজ্ঞানও নয়। স্বাধীনতা শিখিবার পুস্তক স্বাধীনতা।"

এমন কথা এবং শতবর্ষ আগে এমন স্পষ্ট নির্ভুল কথা! শতবর্ষ আগে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি। স্বাধীনতা শুধুমাত্র মন্ত্র, অভ্যাস, প্র্যাকটিস।

ইতিমধ্যে শিক্ষিত বাঙালী তথা ভারতীয়দের মধ্যে আর একটি যে অভিযোগ সঞ্চারিত ও প্রকাশমান হয়ে পড়েছিল অমৃতবাজার পত্রিকায়, তাও প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। সেটি হচ্ছে "সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা।" প্রচলিত শাসনবিধির বিরুদ্ধে অথবা শাসকশ্রেণী সম্পর্কে ক্রমশ উন্মেষিত অসন্তোষের এও একটি মূল কারণ।

"এতদ্দেশীয়দের সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উপস্থিত হওয়ার পক্ষে বহুকাল যাবৎ নিয়ম আছে কিন্তু কার্যে তাহা ঘটার পক্ষে এত প্রতিবন্ধক রহিয়াছে যে নিয়মটি কেবল শূন্য নিয়ম হইয়া আছে। নামে বটে এতদ্দেশীয়েরা ইংরেজদের তুল্য সামাজিক স্বত্বেও অধিকারী, কিন্তু কার্যে তাহার বিপরীত হইয়া আসিতেছে। নামে শাসনকার্যে ইংরেজেরা যে যে উচ্চপদ গ্রহণ করিতে পারেন, এতদ্দেশীয়েরাও তাহা পারে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এতদ্দেশীয়দের মধ্যে দুই-একজনকে উচ্চ পদাভিষিক্ত করিয়া কর্তৃপক্ষীয়েরা সাধুবাদের স্রোতে গাঁবা প্রসারিত করেন। তখন তাঁহারা মনে করেন এবং অন্য লোককেও বলিতে ইঙ্গিত করেন যে তাঁদের কি অসামান্য বদান্যতা! পার্লিয়ামেন্টের অনুশাসনানুসারে এতদ্দেশীয়েরা ও ইংরেজেরা সমভাবে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার ফল [illegible] করিতে পারে। কার্যেও তাহাই, [illegible] একটি [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] কিছুমাত্র না হইতে—কি জাতি যাহ [illegible] কতকগুলো [illegible] [illegible] [illegible] পার হইয়া [illegible]—এতদ্দেশীয়দের সঙ্কেত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। কর্তৃপক্ষীয়দের [illegible] এইরূপ [illegible] [illegible] [illegible] করিতে [illegible] মানব জাতির উপর অবিশ্বাস জন্মে।"

সর্বত্র নয়, [illegible] কোন ক্ষেত্রে, একটি কি দুটি চাকুরী দিয়ে এই উদার্যের দাবী করা হত যে, "এতদ্দেশীয়" ও ইংরেজদের সম-অধিকার; এবং তারা ইচ্ছে করলেই বা সমর্থ হলেই আই-সি-এস পরীক্ষা দিতে পারে, উত্তীর্ণ হলে ইংরেজের সমকক্ষ চাকুরীও পেতে পারে। অমৃতবাজার পত্রিকা একটি মাত্র সোজা কথায় এই ফাঁকিটি ধরে দিয়েছেন। শ্লেষদিগ্ধ একটি মাত্র কথা, "কেবল একটি সমুদ্রের প্রভেদ।" সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা হবে বিলেতে এবং ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের মধ্যে একটি নয়, একাধিক দুস্তর পারাবার—একাধিক মহাসাগরের ব্যবধান। এই মহাসাগর পার হয়ে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছোবার কেবল দুর্লঙ্ঘ্য সামাজিক বাধাই ছিল তা নয়, আর্থিক এবং অন্যান্য বাধাও ছিল অসীম সমুদ্রতুল্য। বিদেশী ভাষা নিশ্চয়ই বাধা, বিদেশী বিদ্যা পাঠ্য-পুঁথি নিশ্চয়ই বাধা, কিন্তু তা প্রাথমিক হলেও মেধার ব্যাপার এবং মেধা কোন জাতি-নির্ভর নয়। জাতিচ্যুতি এবং প্রত্যাবর্তনের পর সমাজে পুনর্বাসনের দণ্ডস্বরূপ মস্তক মুণ্ডন প্রায়শ্চিত্তাদির বাধা তো বটেই, কিন্তু এমন দুঃসাহসীও জন্মাতে পারে যে এসব বাধা গ্রাহ্য করে না। আরও বাধা অর্থের। কিন্তু তাতেও শাসকশ্রেণী নিঃশঙ্ক হতে পারেন নি। সুতরাং, অভিযোগ, গুঞ্জন কিছু আন্দোলনের বিদ্যুৎ চমক ঘটছে।

"কিছুকাল হইল এই প্রস্তাবের আন্দোলন হইতেছে বটে, কিন্তু যে পর্যন্ত ইহার আন্দোলন হওয়া উচিত তাহা কি হইতেছে? আবার যেটুকু হইতেছে তাহাও কতিপয় বদান্য ও সদাশয় ইংরেজ মহাত্মার চেষ্টায়। কিন্তু এ অত্যুচ্চ বিষয়ে আমাদের নিজেদের মধ্যে আন্তরিক জীবন্ত কায়-মনোবাক্যিক আন্দোলন কেন হয় না? সিভিল সার্ভিসের দ্বারোদ্ঘাটন কর এই ধ্বনি চারিদিক হইতে কেন উত্থিত না হয়? কর্তাবিশেষ মহাশয়েরা কি এই বিষয়টির প্রকৃত ভাব সম্যক প্রকার দেখিতে পারিতেছেন না? তাঁহারা কি বুঝেন না যে এতদ্দেশীয়গণকে সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করিতে না দেওয়ায় পূর্বকালে পৌত্তলিকদিগের সহিত [illegible] যেরূপ সম্বন্ধ লক্ষিত হইত, রাজা ও প্রজার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ইংরেজ পুরুষদিগেরও পরস্পরের ব্যবহার বিষয়ে সম্পূর্ণ না হউক প্রায় সেইরূপ হইতেছে। ......কিন্তু ইংলিশ গবর্ণমেন্টের কি দোষ দিব, আমাদের যেরূপ ভাব তাহাতে কেন তাঁহারা স্বদেশীয়গণের নিমিত্ত উচ্চপদ সমূহ একচেটিয়া না করিবেন? আমাদের তাঁহাদের কর্তৃক এই হেয় রহিয়াছি, ইহার জন্য কখন কি একটা কথা বলিয়া থাকি। কোণে কোণে বউর মত কাঁদিলে কি ইংরেজ বাহাদুরদিগের নিকট অর্থ পাওয়া যায়?"

কৃতজ্ঞতাপ্রকাশে অকৃপণ থেকে "কতিপয় বদান্য ও সদাশয় ইংরেজ মহাত্মার" চেষ্টাকে স্মরণ করেছেন, "এতদ্দেশীয়দিগের" উদ্দেশে তিরস্কার প্রকাশ করেছেন, আবার আপন স্বদেশের মানুষের দুর্বলতা (সেই 'জাতি-ঐক্যতা'র অভাব) জানেন বলেই সেই বদান্য ও সদাশয় ইংরেজ মহাত্মাদের কাছেই আবেদন জানিয়েছেন; "তাঁহারা আমাদের জন্যে অনেক করিতেছেন এবং কৃতজ্ঞ মনে তাহা আমরা চিরকাল মনে করিব। কিন্তু তাঁহাদের ঔদার্যের ভাণ্ডার কি এই নিঃশেষ হইল।"

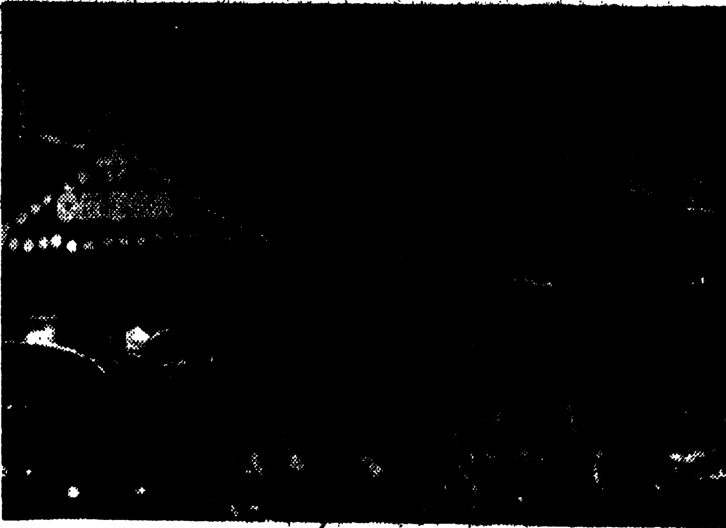
মূক দেশবাসীর পক্ষে ক্ষুব্ধ অভিমানাহত চিত্ত প্রতিফলিত করে বলছেন:

"সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করিতে দেওয়ায় রাজপুরুষগণের যদি মনোগত আপত্তি থাকে, তবে কেন শিক্ষা দ্বারা আমাদের এই উচ্চাভিলাষটির উদ্রেক করিয়াছিলেন, দুটি-একটি উচ্চপদ দিয়া সে আশা কেন বলবতী করিয়াছিলেন? এ নিষ্ঠুরাচরণের উদ্দেশ্য কি? অনিবার্য পিপাসার উদ্রেক করিয়া দিয়া, পিপাসা শান্তির কি সুখ তাহা জানাইয়া, সম্মুখে সুশীতল সুগন্ধময় জল রাখিয়া, জলপান করিতে না দেওয়া কি তোমাদের যোগ্য কর্ম? প্রভু যিশুর উপদেশ কিন্তু অন্যরূপ। প্রকাশ্য শত্রু অপেক্ষা প্রবঞ্চক বন্ধু অনেক গুণে অনিষ্টকর।"

নিজেদের অসহায় অবস্থার কথা উল্লেখ করে বলেন:

"...যেরূপ গতিক দেখি তাহাতে অর্থপ্রিয় রাজপুরুষগণেরা যে সহজে আপনা হইতে আমাদিগকে উচ্চপদের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিবেন এমন ভরসা হয় না। নিজের স্বত্ব আমাদের নিজে সাব্যস্ত করিতে হইবে। কিন্তু এ বিষয় সম্ঘটন হওয়া কঠিন। যাঁহারা নড়িলে চড়িলে কার্য হয় তাঁহারা ইহাতে গরজ মনে করেন না। ......আমাদের বিবেচনায় এখন যদি সম্পাদকেরা আবার চীৎকার করিতে আরম্ভ করেন, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভা হইতে যদি এ বিষয়ে আবেদন প্রেরণ করা হয়, এদেশীয় লোকেরা যদি অত্যাচার অত্যাচার, পক্ষপাতিত্ব বলিয়া নাছোড়বান্দা হন তবে ন্যায়পরতার জন্যেই হউক, চক্ষুলজ্জার জন্যেই হউক, আমাদের কথায় প্রতি রাজপুরুষেরা কর্ণপাত না করিয়া থাকিতে পারিবেন না।"

(১১ই [illegible] ১৮৬৮)



বড়দিনে আলোর সাজে মহানগরী কলকাতা

শীতের কলকাতা

অজিত চক্রবর্তী

কলকাতা এখনও কলকাতাতেই আছে, সম্ভবত থাকবেও। নইলে বোমা-লাঠি-গুলির মধ্যে আন্দর শীতের কলকাতার জৌলুশ কেন?

শীত এলে কলকাতায় যে জৌলুশ আসবেই! কুয়াশা, ক্রিসমাস ট্রি আর শিশির—এ হল কলকাতার আর এক ফ্রন্ট যার কোন দুশমন নেই।

এত হুজ্জুতের মধ্যে শীতের কলকাতার এবারকার আকর্ষণীয় সংযোজন ভি-আই-পি রোডের লম্বা নাইট-ড্রাইভ। সাহেব পাড়ার দিদিরা ময়দানের পরিচিত হাওয়াতেই খুশি থেকেছেন, কিন্তু তাদের তরুণী বোনেদের বয়ফ্রেন্ডদের একবার অন্তত নতুন ভি-আই-পি রোডে গাড়ি ছোটাতে হয়েছে। কোহিমার মত কুয়াশায় মোটরগাড়িকে স্নান করিয়ে নেওয়া যায় এই রাতের ভি-আই-পি রোডেই।

নিঅন আলোর মিছিল আর গন্ডায় গন্ডায় চলন্ত মোটরগাড়ির হেডলাইট টাটকা নতুনত্বের স্বাদ এনে দেয়। কুয়াশার ঘেরা-টোপে উজ্জ্বল আলোগুলোকে সাবেককালের ঘষা-কাচের লণ্ঠনের মত মনে হয়। রূপসী কলকাতার এই হল নতুন রূপ।

নির্জন রাজপথ, মধ্যরাতের কলকাতা ঘুমে অচেতন। ঘুম নেই শুধু আলো আর গাড়ির। এয়ারপোর্ট থেকে রাজাবাজার... ভিড়ের কোন ধার ধারে না কেউ এখানে। যেভাবে গাড়ি চালাও, যা খুশি কর, কেউ কিছু বলবে না।

শেয়ালদা আর এন্টালির চার্চ কিন্তু বড়দিনের সময়টায় কোলাহলমুখর। সুরেন ব্যানার্জি রোড দিয়ে তালতলার দিকে গেলে দেখা পাওয়া যায় বেপরোয়া একদল অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ছোকরার। গার্ল-ফ্রেন্ডদের সঙ্গে নিয়ে বড় গলায় গান গেয়ে চলেছে ওরা। প্রভাতফেরি নয়, বলা যেতে পারে নৈশ ফেরি। আরও কিছু এগোলে বাঙালী খৃস্টানপাড়া থেকে ভেসে আসা বড়দিনের সংকীর্তন শোনা যায়।

নববর্ষের প্রথম দিকে ফ্রী স্কুল স্ট্রীট চৌরঙ্গী কিংবা পার্ক স্ট্রীটের চেহারা পালটে যায়। কেমন যেন লন্ডন লন্ডন ভাব। পেট্রোল পাম্প আর রেস্তোরাঁগুলো উজ্জ্বল আলো আর রঙচঙে কাগজের মুখোস পরেছে দেখা যাবে। হগ-সাহেবের বাজার এখনও সবার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে। ভিতরে-বাইরে তার আস্ত নতুন আলোর পোশাক। সাহেব-পাড়ার বাসিন্দারা এত রাতেও এখানে ভিড় করেছে। মাঝরাতের চলছে কেনা-বেচা।

জোর হইহুল্লোড় চলছে বার, ক্লাব আর অভিজাত রেস্তোরাগুলোতে। 'চিলড্রেনস পার্টি' থেকে রকমারি উপহারে খুশি বাচ্চা-বাচ্চাদের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে মা-বাবার দল সেখানে মনের সাধ মেটাচ্ছে। ছেলে-ছোকরার দল আগে থেকেই বান্ধবীদের নিয়ে হাজির। আলোর ফুলে সাজানো হলে উর্দিপরা বেয়ারারা সংক্ষিপ্ত প্রটিন-সহ লোভনীয় পানীয় পরিবেশন করছে। শাদার-কালোর একাকার। এখানকার পাসপোর্ট পয়সা, পয়সা থাকলে কালো শাদার কাছে আর শাদা কালোর কাছে অবাধে যেতে পারে।

বাঙালী খৃস্টান পাড়ার চেহারা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের, অনেকটা দুর্গাপুজোর মত। ক্রিসমাসের আলো-ঘেরা প্যান্ডেল, কাগজের মালা, চাঁদে লণ্ঠন, যীশুর বাণীর পোস্টার।

এ হল বড়দিনের নির্ভেজাল বাঙালী সংস্করণ যার ব্যাক-গ্রাউন্ডে থাকে সমবেত খৃস্ট-সংকীর্তন।

শীতকালে ছুটির দিনে মুখ পাল্টানোর জন্য সপরিবার সবান্ধবী যাঁরা ডায়মন্ড-হারবারে গিয়ে 'সাগরিকায়' চড় মেরেছেন, তাঁদের অনেকেই হতাশ হয়েছেন ঘর নেই দেখে। বুদ্ধিমানের দল আগে থেকেই রেস্ত নিয়ে গেছেন, গঙ্গা সাক্ষী করে 'সাগরিকা'র স্বপ্নশয্যায় তাঁরা রাত কাটিয়েছেন।

নববর্ষের সূচনায় ফিরিঙ্গিপাড়ায় সারা রাত বাড়িতে বাড়িতে গ্রীটিংস বিনিময় হয়েছে, সেনসর বোর্ডের সদস্যরা উঁকিঝুঁকি মারলে অবাক হয়ে দেখতেন এ পাড়ায় ছেলে-মেয়ে কিংবা পুরুষ-মহিলা কিভাবে পাইকারি হারে পরস্পর পরস্পরকে চুম্বন উপহার দেন। সঙ্গে চলে যথেচ্ছ আহার্য ও পানীয় পরিবেশন।

বাঙালী খৃস্টান পাড়ার কথা আলাদা। সেখানে বিজয়া দশমীর আবহাওয়া। ইট, ড্রিংক অ্যান্ড বি মেরির দুনিয়ার সঙ্গে তার কোন মিল নেই।

শেয়ালদা ট্রাম ডিপোর মুক্ত-প্রাঙ্গণ, মৌলালী অথবা গ্যালিফ স্ট্রীটের পাইপ-কলোনী কিংবা কালিঘাটের মায়ের মন্দিরের সামনের আস্তানাগুলোতে ছুটি উপলক্ষে প্রায় না হোক নিত্যকার নিখরচার নেশা চলে ঠিকই।

কলকাতার ঘুম ভেঙে যায় শেষ রাত্রির সুরু হবার অনেক আগেই। ভিকটোরিয়া অঞ্চলে কে আগে প্রাতঃভ্রমণে এসেছেন অথবা বাবুঘাটে কারা আগে নাইতে নেমেছেন তা কোনদিনই কেউ বলতে পারবেন না। রাস্তায় রাস্তায় পাইপের জল পড়বার আগেই ট্রাম-বাস বেরিয়ে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে খবরের কাগজের আর দুগ্ধ প্রকল্পের ভ্যান। সব্জি-ভর্তি ঠেলা-লরি বার হতে না হতেই খবরের কাগজের হকারদের সাইকেলগুলো ছোটাছুটি সুরু করে দেয়। ফ্ল্যাটবাড়ির ব্যালকনিতে কাগজের প্যাকেট ছুঁড়ে মুন্সিয়ানা দেখানো তাদের নিত্যকার ব্যাপার।

রাতের কলকাতার খবর সামান্যসংখ্যক ভাগ্যবানেরাই শুধু রাখেন। দিনের রূপ সম্পূর্ণ ভিন্নধরনের পুরোপুরি সর্বজনীন। একটা যদি চিৎপুরের বাঈজির নাচ-গানের আসর হয়, অন্যটা হাওড়ার হাট। ট্রেন বাস, ট্যাক্সি, নৌকো, লরি—সব ছুটে চলে কোন পিকনিক স্পট নয়তো চিড়িয়াখানা কিংবা বোটানিকাল গার্ডেনের দিকে। বড়দিনের এই সর্বজনীন রূপ বেশি দিনের নয়, গাল-ফিলের। বয়েসের কোন বাধা নেই এখানে। তারই মধ্যে টুইস্ট চলে, চুটকি কথাবার্তাও। রোমান্টিক উপন্যাসের অনেক উপাদান থাকে এই শীতের কলকাতার আটপৌরে পার্টি-গুলোতে

এবার বোমা শুধু ইডেন উদ্যানে। শুধু ফুকে বসে আছে এতদিনের রাজসাক্ষী রণজি স্টেডিয়াম। খাটে-বলে হয়নি সেখানে, এ বছর হবেও না।



ছুটির কলকাতায়

গণেশ বসু

নানা মুনির নানা মত, তবু বর্ণ-বৈচিত্র্যে কলকাতার জুড়ি মেলা ভার। সত্যই বড়ো আশ্চর্য এই শহরটি। একঘেয়ে জীবনের মধ্যেও এত বৈচিত্র্য ও প্রাণের স্পর্শ আর কোন শহরে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। তাই দেখতে পাবেন, যতো যন্ত্রণাই থাকুক তার প্রতিদিনের জীবনে, কলকাতার মুখে হাসিটি যেন লেগেই আছে। কী গ্রীষ্ম, কী শীত—কোনো ঋতুই এর প্রাণের রস নিংড়ে ফেলতে পারে না। হাজার টানাপোড়েনেও নিজের রীতি বজায় রেখে চলে এই শহর। তবে একথা ঠিক, শীতকালে এর হাতে জৌলুস খোলে এতটা অন্য কোন সময় নয়। শীতে মানুষ সাজে, রঙ-বেরঙের পোশাকের শোভাযাত্রা ভেসে চলে রাজপথে। শহরের মনের আনাচে-কানাচে তখন রঙের ছোপ। বলতে গেলে, একরকম নতুন সাজে সেজে ওঠারই সাড়া পড়ে যায় গোটা শহরে। এ যে আনন্দের জগৎ! চিড়িয়াখানা, জাদুঘর, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল থেকে শুরু করে বিচিত্রানুষ্ঠান, সার্কাসের তাঁবু সবাই যেন একসঙ্গে জানায় সাদর সম্ভাষণ। কোনটা ছেড়ে কোথায় যাবে এই সমস্যাই তখন প্রধান হয়ে ওঠে।

তবু কিছু স্থির না করেই হয়তো একদিন আপনি বেরিয়ে পড়লেন। ছুটির গ্রান্ড কেন্দ্রের ভেতরেই পা বাড়ালেন নাক বরাবর। হাজির হলেন জুলোজিকাল গার্ডেনে।

এবার সব ঘুরে দেখবার পালা। প্রথমেই নজরে পড়বে এবারের চিড়িয়াখানা ভিড়ে ভিড়াক্কার! শীত পড়তে না পড়তে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে শহরের মানুষ। বাইরের লোকও পিছিয়ে নেই। সেই জমজমাট ভিড়ে আপনিও গা ভাসিয়ে দিলেন। (শীতের এই মরশুমেই চিড়িয়াখানার আঁতুড়ঘরে ভূমিষ্ঠ হয়েছে দুষ্প্রাপ্য হরিণের বংশধর ক্যাঙারুর বাচ্চা আর বাঘের শিশু। দেখতে কারই বা না আগ্রহ হয়!) প্রথমেই আপনাকে স্বাগত জানাবে অসংখ্য পাখির স্বর-লহরী—এরা চিড়িয়াখানার শীতের অতিথি। ইতিমধ্যে আপনি হয়তো চিনেবাদামের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে হঠাৎ যেন থমকে দাঁড়ালেন একটা কাণ্ড দেখে। না, না ভয়ের কিছু নেই। হরদমই এমন কাণ্ড ঘটে। প্রায় সব শিশুই কিশোরও বটে, রেলিং-এর মধ্য দিয়ে মুঠো-ভরা ছোলা এগিয়ে ধরে হরিণ-শাবকের মুখে। কাছে গিয়ে ভালো করে দেখতে যাবেন আপনি। আর তখনই অনেক জানা-অজানা তথ্য এসে ভিড় করবে হরিণ-শাবককে ঘিরে। আপনি তখন হয়তো আবিষ্কার করবেন, আপনার সামনে থামিন হরিণ ঘুরে বেড়াচ্ছে। এদের বাস ছিল মণিপুরে। বছর কয়েক আগে চিড়িয়াখানায় মণিপুর থেকে এক জোড়া থামিন শাবক আনানো হয়। বিশেষভাবে ব্যবস্থা করা হয় এদের সংরক্ষণের ও বংশবৃদ্ধির। এরাই এখন ডজনখানেক থামিন মৃগশিশুর জনক-জননী।

চলতে চলতে দেখবেন, কোনো উজ্জ্বল প্রেমিক-যুগল হয়তো কলা ছুঁড়ে দিল বানরের খাঁচার ভেতর। উপভোগ করল নির্ভেজাল আনন্দ। এর পর দেখতে গেলেন হয়তো ক্যাঙারুর বাচ্চা। সামনের ক্যাঙারু ঘরনী এবারেই মা হয়েছে। সন্তানের জন্যে সবসময়েই এক অজানা আশংকা ভর করে আছে তার মনে। তাই সে বুকের মধ্যে আগলে রাখে তার শিশুকে। থলির মধ্যে সন্তানকে ভরেই এই অস্ট্রেলিয়ান জীবটি আপনার কাছে এসে দাঁড়াবে অভ্যর্থনার ভঙ্গিতে এবং দাক্ষিণ্যের প্রত্যাশায়। আপনি তাজ্জব বনে গেলেন কত সহজেই কলকাতার চিড়িয়াখানার আব-হাওয়াকে সে রপ্ত করে নিয়েছে। হাতের মধ্যে ধরে রাখা ছোলার ঠোঙাটা হয়তো এবার ছুঁড়ে দেবেন আপনি ওর দিকে।

তিনটি খেলা



এ ছাড়াও রয়েছে কতো আকর্ষণীয় জীব। কিন্তু সব ভুলে এগিয়ে চললেম শাদা বাঘের খোঁজে। খাঁচার সামনে গিয়ে নাকটা যেন আপনা থেকেই কুঁচকে গেল আপনার। গন্ধ ভেসে আসছে জোর। তার সঙ্গে গর্-গর্ শব্দ। ঘুরে বেড়াচ্ছে বাঘের খাঁচায় বাচ্চাগুলি। বাঘিনী-মা মালিনী তার হিংস্র স্বভাব যেন ভুলে গেছে। মায়ের স্নেহকাতর দৃষ্টি নিয়ে আগলে রাখছে তার শিশুগুলিকে।

আগেই বলেছি, শীতের সময় কলকাতার একটি বড় রকমের আকর্ষণ হল সার্কাস। বেশ কিছুকাল আগেও এই নগরী এবং তার আশপাশে পড়ত ছোট-বড় কতো সার্কাসের তাঁবু। কিন্তু এখন হাওয়া বদল হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে পাল্টে গেছে আমোদ-প্রমোদের উপকরণও। তাই আস্তে আস্তে সার্কাসের আকর্ষণে কিছুটা ভাঁটা পড়তে শুরু করেছে। এখন নানা কারণে তার সংখ্যা এসে ঠেকেছে একের কোঠায়। হয়তো দেখা যাবে কলকাতায় আর সার্কাসের তাঁবু পড়ছে না, ক্লাউনের হাসিও বিদায় নিয়েছে অনেক কিছুর মতোই।

সন্তান গরবিনী মালিনী





জননী ক্যাম্পায়ে

এবার কলকাতার লোককে কিন্তু একটি-মাত্র সার্কাসেই তৃপ্ত থাকতে হচ্ছে। মার্কাস স্কোয়ারে তাঁবু পড়েছে এঁদের। বৈচিত্র্যপূর্ণ নতুন ধরনের খেলায় নিঃসন্দেহেই এই দলটিকে অদ্বিতীয় বলা যায়। তাঁবুর ভেতরে দুই দিকে দুই পোলে বাঁধা লোহার তার, কম করে হলেও মাটি থেকে চল্লিশ পঞ্চাশ ফুট উঁচুতে। সেই তারের উপর দিয়ে কতো অনায়াসেই না হেঁটে চলেছে অবাক মিছিল। কিন্তু পা ফসকালেই পতন ও মূর্ছা। দর্শকদের কারো মুখে রা নেই। থমথমে নিঃশব্দতা চারদিকে। না, ঠিক তা নয়। মাঝে মাঝে ড্রামের শব্দ আসছে—হৃদপিণ্ডের ধক্ ধক্ ধ্বনির সঙ্গে তাল ঠুকে। পুরোভাগে একটি মেয়ে। হাতে নিশান-সহ লম্বা পোল। পেছনে আর একটি ছিপছিপে মেয়ে। এর পর এলো আরও একজন প্রথম জনের পিঠ আর দ্বিতীয় মেয়েটির বুকের সঙ্গে এক রডের উপর এই তৃতীয় কিশোরী। এরও হাতে সেই লম্বা একটি পোল। মিছিল এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে—চড়াইয়ের পথ। এগিয়ে গেল তারা ফুট তিরিশের, আবার কি ভেবে যেন পিছনে সরতে লাগল। উৎরাইয়ের পথ এবার। সকলের মধ্যেই তখন উৎকণ্ঠা। নানা প্রশ্নের ভিড়—ওরা পারবে তো? না, আশঙ্কার ভিতটা সেহাতই নড়বড়ে। ততক্ষণে এই দুঃসাহসিক কসরতে ওরা সফল হয়েছে। দমবন্ধ মানুষগুলো স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। হাততালিতে ফেটে পড়ল তাঁবুটা। কিছুতেই যেন থামতে চায় না।

শুধু এই খেলাটাই নয়, আরো গোটা দশেক অনুষ্ঠান যে আপনাকে শ্বাসরুদ্ধ করবে, তা হলফ করেই বলা চলে। যেমন ধরুন ব্যালান্সের খেলা। চমকপ্রদ এই অনুষ্ঠানটি সত্যিই অকল্পনীয়। তবে ট্রাপিজের খেলাটির কোনো তুলনা নেই। জীপ জাম্প, মোটরসাইকেল জাম্প, দুরন্ত ঘোড়ার উপর শারীরিক কসরত, শূন্যে ঝুলানো তারের উপর সাইকেল চালানো—প্রভৃতি খেলাও কম উত্তেজনা সৃষ্টি করে না। জন্তু-জানোয়ারের অনুষ্ঠানগুলিও বেশ কিছুটা নতুন ধরনের। জন্তু-জানোয়ারের মধ্যে এই সার্কাসে বাঘ, ভালুক, হাতী, সিংহ, কালো বাঘ, কুকুর, জলহাতী রয়েছে। অনেকের মনে হতে পারে গোটা চিড়িয়াখানাই যেন এই সার্কাসের তাঁবুর মধ্যে ঢুকে বসে আছে।

কিন্তু এমন উত্তেজনা যদি আপনার ভালো না লাগে, তবে সোজা চলে যান কোনো বিচিত্রানুষ্ঠানে। নানারকম আকর্ষণীয় অনুষ্ঠানই সব সময় হচ্ছে এই শহরে। এই ধরুন না, এর মধ্যেই কলকাতাতে তিনদিন ধরে হয়ে গেল হিমালয়ান ড্যান্স। কালিম্পংয়ের ডঃ গ্রাহামস্ হোম অনাথ আশ্রমটির সাহায্য সংগ্রহ করতে এই নৃত্য-শিল্পীদল নেমে এসেছিলেন পাহাড় থেকে সমতলে। পার্বত্য অধিবাসীদের ঐতিহ্যগত নাচগানের আসর বসল ফোর্ট উইলিয়মের 'বক্সিং এরিনায়'। পাওয়া গেল নতুনের স্বাদ। মনে হবে যেন সিকিম কিংবা তিব্বতের পাহাড়ী এলাকায় খোলা আকাশের নিচে যে বিবাহ অনুষ্ঠান হয়, তাতে আপনি হাজির রয়েছেন। ইয়াকি নৃত্য, পো নৃত্য কিংবা থালা থাপ সুখী থাপ গানের তালে তালে আপনারও মন নেচে উঠবে, সন্দেহ নেই। ভুলতে পারবেন না সেই সিকিমী বিবাহ উৎসবের গান।

হা-রে-রে-রে-রে-রে
চোঙটে ফিপ লা
ইয়ং মন গো
থালা থাপ সুখী থাপ
থালা থাপ সুখী থাপ
লিকা বাম দাম সো
ওলা ডিউ আম ও
ডিঙ জার মু ভাম পিম
ওলা ডিউ আম ও
থালা থাপ সুখী থাপ......

সিকিমী, ভুটানী, লেপচা ও নেপালীদের নিয়ে তৈরি এই আকর্ষণীয় দলের বেশির ভাগই এর আগে সমতলের মুখ দেখেন নি। আরো আশ্চর্যের বিষয় যে, এঁদের কেউই পেশাদারী শিল্পী নন। অথচ এই কলকাতায় বসেই আপনি পেয়ে গেলেন তাঁদের দেখা। বিনিময় হল পরস্পরের আলাপ-পরিচয়, দৃঢ় হল জাতীয় সংহতি।

শহরের কলকাতা এমন কতো সুযোগ এনে দেয় আমাদের সামনে, ইচ্ছে করলেই আমরা তার সদ্ব্যবহার করতে পারি। আর নানা আনন্দের ভিতর দিয়ে আবিষ্কার করতে পারি নিজেদেরই মনের নতুন পরিচয়।



শীতের রাতে কলকাতা

দিলীপ মালাকার

রাতের কলকাতার রূপ দেখে অনেকেই হয়ত ব্যথিত হবেন। কোনো অঞ্চলে শোনা যাবে শুধু লাঞ্ছনার আর্তনাদ। কোনো অঞ্চলে তার কপটমোহিনী রূপ। শীতের রাতে কম্বল মুড়ি দিয়ে ফুটপাথের এক কোণে শুয়ে আছে বহু নগরবাসী। তারই পাশে দেখেছি ফেলে দেওয়া খুড়ি জড়ো করে আগুন লাগিয়ে তার চারধারে ঘিরে বসে আগুন পোহাচ্ছে একদল। কারুর মুখে হিন্দি ছবির জনপ্রিয় গানের বুলি। কারুর মুখে রামা-হো, রামা-হো সুর। কলকাতা শহরের একটি বড় অংশ ফুটপাথে শুয়ে বসে লোকসংস্কৃতির চর্চা করে। তাদের মূলধন সিনেমার জনপ্রিয় সঙ্গীতের কয়েকটি কলি, নয়তো রামা-হো, রামা-হো। শীতের রাতে এদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও বেশ জমে ওঠে। তবে এসব অনুষ্ঠান সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ।

শীতের রাতে কলকাতার মধ্যবিত্ত সমাজ মেতে ওঠে সঙ্গীত সম্মেলনে ও জলসা নিয়ে। সংগীত সম্মেলন ও জলসার মরশুম শীতের এই কটা মাসে। শীতের রাতে অভিজাত পাড়ায় রাস্তায় বেড়াতে বেরুলে কানে আসবে সুরের ঝংকার। ক্ষমতাবান অভিজাতেরা বাড়ীতে জলসা ডাকেন। সেখানে খ্যাতনামা শিল্পীর সমাবেশ। যুদ্ধের আগে যখন রাজা-মহারাজা ও জমিদারদের ঐশ্বর্য প্রচুর ছিল তখন শীতের রাতে তাঁরাই কলকাতা জমিয়ে রাখতেন। মধ্যকলকাতার কয়েকটি পাড়ার বাইজীদের সংখ্যায় কুলোতো না। বেনারস, এলাহাবাদ, লখনৌ, দিল্লী অথবা সুদূর লাহোর থেকে বাইজীদের আনান হত শীতের রাতকে উপভোগ করার জন্যে। সেদিনের কলকাতায় শীতের রাতে অভিজাত পাড়ায় অনেক বাড়ীতে বাইজী-দের নূপুরের ঝংকারে কলকাতা মুখর হয়ে উঠত। কলকাতায় সামন্ত যুগের অবসান হয়েছে। গণতন্ত্রের যুগে দেখা দিয়েছে পাড়ায়-পাড়ায়, পার্কে-পার্কে "সাংস্কৃতিক" অনুষ্ঠান—জলসা। সেখানে হাজার দর্শকের ভিড়। সিনেমার রুপোলি পর্দায় যাদের দেখে দর্শকরা মুগ্ধ হয়েছে, যাদের গানে গুনগুনিয়ে গেয়ে উঠেছিল শ্রোতার দল, তাদের স্বচক্ষে দেখার কৌতূহল সংবরণ কী সম্ভব। তাই জলসায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এত ভিড়। অনুষ্ঠানের ভিড় জমে শীতের রাতে। অনুষ্ঠানগুলো সাংস্কৃতিক, কিন্তু যাঁরা অনুষ্ঠান সংগঠন করেন এবং যেসব শিল্পীরা যোগ দেন তাঁদের আর্থিক দিক দিয়ে মোটা অংকের লাভ হয়ে থাকে।

এছাড়াও শীতের রাতে কলকাতার আরেকটি পরিচ্ছদ আছে। যার অপর নাম 'ক্যালকাটা বাই নাইট'। প্যারিস বাই নাইটের সুনাম-দুর্নাম অনেক আছে। কিন্তু তাই বলে লন্ডন বাই নাইট বা প্যারিস বাই নাইটের ক্যাবারে-নাইট ক্লাবের নৈশ জীবনের সঙ্গে কলকাতার নৈশ জীবনের কোনো তুলনা করা চলে না। কলকাতার নৈশ জীবন সীমাবদ্ধ কয়েকটা হোটেল-রেস্তোরাঁর মধ্যে। গোটা ছয়েক বেশী নয়। সেক্ষেত্রে লন্ডন প্যারিসে তাদের সংখ্যা কয়েকশ'। এবং সে সব ক্যাবারে নাইট ক্লাবের দৃশ্যাবলিও ভিন্ন। কলকাতার ক্যাবারের সঙ্গে তার তুলনাই চলে না।

বছরখানেক আগে কোনো এক বিখ্যাত মার্কিন সাপ্তাহিক পত্রিকার ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি কলকাতার নৈশ জীবন সম্বন্ধে



এক প্রস্থ সুখ্যাতি করে লিখেছিলেন। তিনি ভারতের প্রতিটি বড় শহর ও রাজ-ধানীতে ঘুরেছিলেন। তিনি বলেছেন যে, অন্যান্য শহরের তুলনায় কলকাতায় নৈশ জীবন উপভোগ করার মতন। নীতিবাদের মুখোস এঁটে মুখ গোমরা করে বসে নেই কলকাতার নিশাচররা। বম্বে-দিল্লীতে দু'চারটে ক্যাবারে-নাইট ক্লাব আছে বটে, তবে সেগুলো পানীয়ের অভাবে তেমন জমে না। সেখানে ভিড়ও কম।

কলকাতার কয়েকটি অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নৈশ জীবন। 'সাহেব'পাড়া নামে খ্যাত পাড়ায় যত বার ও ক্যাবারে আছে বম্বে-মাদ্রাজ-দিল্লীতে তার তুলনায় শূন্য। তাই একটু সুযোগ পেলেই বম্বে-মাদ্রাজ-দিল্লীর শৌখিন সম্প্রদায় ও মহারথীরা কলকাতায় ছুটে করে চলে আসেন নৈশ জীবন উপভোগ করতে। আর নৈশ জীবন জমে এই শীতের রাতেই।

লন্ডন-প্যারিসের ক্যাবারে নাইট ক্লাবে টুরিস্টদের ভিড় জমে কয়েকটি দর্শনীয় জিনিস দেখার জন্যে। তার মধ্যে অন্যতম হল দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ দৃশ্য। সংক্ষেপে বলতে হয়, সুন্দরী রমণীর ইচ্ছাকৃত বস্ত্র ত্যাগ। যার অপর নাম 'স্ট্রিপ-টিজ'। সুন্দরী মহিলারা সেখানে গানের তালে তালে পরিধানের বস্ত্র উন্মোচন করে। এধরনের কোনো দৃশ্য কলকাতার ক্যাবারেতে দেখা যাবে না। তবে দেশি ও বিদেশী নৃত্যের অনুষ্ঠান থাকে। তার সঙ্গে থাকে ম্যাজিক ও শারীরিক কসরৎ। যা দেখে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবাই খুশি হবে। তাছাড়া থাকে ইউরোপীয় "বল্ রুম" নাচ।

শীতের রাতে কলকাতার সাহেবপাড়ায় নৈশ জীবন শৌখিন ও ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাদের সংখ্যা অতি নগণ্য। তবে ভারতের অন্যান্য শহরের মধ্যে কলকাতা এবিষয়ে অনেকখানি এগিয়ে আছে।

পশ্চিমি সভ্যতার নৈশ জীবনের নগ্ন দৃশ্যকে পূর্ব ইউরোপের কম্যুনিস্ট সরকার-গুলো কয়েক বছর আগেও পুঁজিবাদের জঞ্জাল বলে নিন্দা করছে। খানিকটা সত্যও বটে। কিন্তু পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আর্থিক স্বচ্ছলতার মাত্রা বেড়ে যাওয়ার ফলে সেখানকার বড় বড় শহরেও আজকাল ক্যাবারে ও নাইট ক্লাব গজিয়ে উঠেছে। ওই সব নাইট ক্লাবে তেমন নগ্ন দৃশ্য দেখা যায় না বটে তবে সেখানেও আধা 'স্ট্রিপ-টিজ' দেখান হচ্ছে। পশ্চিমি পুঁজিবাদের জঞ্জাল পূবের ব্যূহ ভেদ করে সেখানেও প্রবেশ করেছে। তারই ছোঁয়াচ এসে লেগেছে ভারতের বড় বড় নগরে। সে প্রভাব মুক্ত হতে আমরা অনেক চেষ্টা করেও পুরো সফল হতে পারিনি। কল-কাতার নৈশ জীবন তারই স্বাক্ষর। শিল্প-কারখানা যত বাড়বে ততই বাড়বে আর্থিক উন্নতি। এর সঙ্গে বাড়বে কলকাতার ক্যাবারে নাইট ক্লাবের সংখ্যা। এবং শীত-কালেই তার বহর বাড়বে। শীতের কলকাতার রাতে বৈচিত্র্যময় জীবনে ক্যাবারের ভূমিকা নেহাৎ নগণ্য নয়। নীতি-বাগীশরা সহজেই হয়ত নস্যাৎ করবে। কিন্তু বাস্তব ঘটনাকে কী উড়িয়ে দেওয়া চলে!

এই শীতের

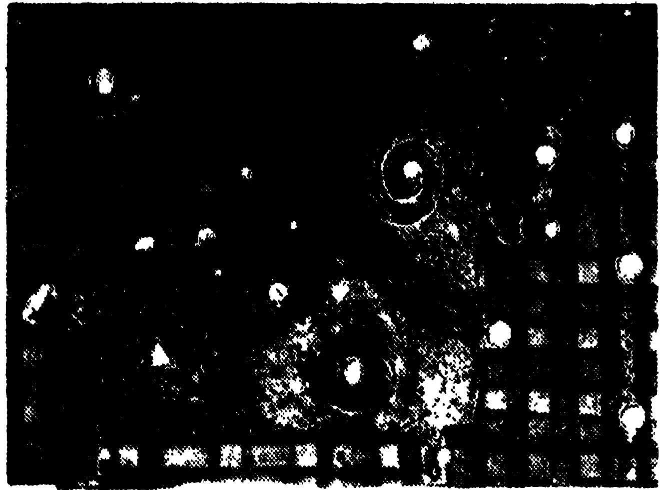
চিত্র-প্রদর্শনী

সমীর দাশগুপ্ত

কলকাতা হয়তো পৃথিবীর সব নগরেরই মতো। অনেক দৈন্য, অনেক নৈঃসঙ্গ্য অনেক আত্মঘাতী পাপ এখানেও। হয়তো অভিশাপের জঞ্জাল জমে জমে পাহাড় এখানে এত বড়ো হয়ে গেছে যে ভেঙে ফেলতে পারব না ভেবে আমরা ক্রমে তাকে নিয়েই বাস করতে শিখছি। অথচ নিজের পূতিগন্ধময় ছায়ার স্পর্শ বাঁচিয়ে যে-সময়ে আমরা অনেকেই অসহায় কাসান্তিপাত করছি ঠিক তখনই এ-শহরেও দেখতে পাই কোন কোন ব্যাখ্যাতিরিক্ত মানুষ অভিশাপের স্তূপের উপরেই শিল্পকলার বহুবর্ণ ফুল ফুটিয়ে চলেন। এঁদের যদি তাই আজকের কলকাতার আমরা হঠাৎ উত্তেজিত সাধুবাদ করেও বাস সে-জন্য সঙ্কোচের কারণ থাকতে পারে না।

আমরা যারা কলকাতাকে বাদ দিয়ে জীবনের অনেক উদ্দেশ্যের কথাই ভাবতে পারি না, তারা স্বভাবতই এই নগরের গৌরবাত্মক ব্যাখ্যা দিতে প্রলুব্ধ হই। এখানে নাকি যার কপালে দু-বেলা অন্ন জোটে সে হয় গান-পাগল: আর যার তা জোটে না সেই ভিখারী পড়ে ডিকেন্স। কথাটা আক্ষরিক অর্থে মিথ্যা, যদিচ প্রতীকী অর্থে হয়তো-বা সত্যিই। নয়তো এই অভিশাপের শহরে ফুল ফোটানের এক বিশিষ্ট আয়োজন, ছবি-আঁকা, প্রদর্শনী এবং ছবি-দেখা লোকের ক্রমবর্ধমান ভিড়—কীভাবে ব্যাখ্যা করি? সম-আয়তনের পশ্চিমা নগরে স্বভাবতই অধিকতর সংখ্যক গ্যালারি থাকে, স্থানবিশেষে প্রদর্শনীর স্বচ্ছলও দুততর। এবং যে কারণে এ-সব পরিমাণগত প্রভেদ, সে-কারণেই ওদেশে ছবির কেনা-বেচাও অনেক বেশি। গরিব শহর কলকাতার চিত্রশিল্পের তথাচ যে সম্ভার ও সম্ভাবনা আছে তা নগণ্য কিম্বা নিষ্প্রভ নয়। এমন কি প্রযুক্তি-নৈপুণ্যের সূক্ষ্মতার ও শিল্পী মানসতার দার্ঢ্যে অনন্য এমন কতিপয় চিত্রকর এই শহরে আছেন যাঁদের জন্ম ঐ সব পশ্চিম দেশে হ'লে সে দেশের লোক নিঃসন্দেহে গর্বিত বোধ করতেন। আমাদের গর্ব, ঐ সব বিত্তশালী দেশের অনায়াস ও সুপ্রচুর জীবনকে বেছে নেবার স্বাভাবিক প্রলোভন সত্ত্বেও আমাদের শহরের একাধিক সমকালীন শিল্পী এখানে ফিরে আসার প্রয়োজন বোধ করেছেন এবং অক্লান্ত বলিষ্ঠতায় আমাদের স্বকৃত পাপের আবর্জনায় নিরবচ্ছিন্ন ফুল ফোটাচ্ছেন।

এই শীতে কলকাতায় এতাবৎ কয়েকটি ভালো ছবির প্রদর্শনী হয়ে গেছে; আরো কয়েকটি ভালোতর প্রদর্শনীর প্রস্তুতিও চলছে। তার মধ্যে একক প্রদর্শনীগুলির জন্যই আমাদের ব্যগ্রতা বেশি। কিন্তু যে-সব প্রদর্শনী হয়ে গেল অথবা ঠিক এই



ষাঁড় (২৩৬)—সুনীলমাধব সেন

মুহূর্তে চলছে, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়ের অভাব ঘটে নি। প্রথমত, বিদেশী ছবির মধ্যে, সমকালীন ৩৪ জন শিল্পীর ৩৪টি ছবির চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা লাভের সৌভাগ্য আমাদের হ'ল। ললিত-কলা অ্যাকাদেমি ও ভারতস্থিত অস্ট্রেলিয়ান হাই-কমিশনারের উদ্যোগে প্রদর্শিত এই ছবিগুলি দেখে ইওরোপের ও আমেরিকার বহুমুখী চিত্ররূপসাধনারই অনুসারী এক ভৌগোলিক বিস্তৃতিমাত্র মনে হয়েছে কারো কারো। অবশ্য আকৃতিগত কয়েকটি চিত্রের শিল্পীরা নিশ্চয়ই স্থানীয় আদিবাসী আর্ট দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। ল্যান্ডস্কেপগুলিতে চড়া-রঙের থমথমে ভারি মেজাজ স্থানীয়তার পরিচয় ও নিসর্গের ঘনত্ব বহন করে। প্রসঙ্গত, এই দলের একটি ল্যান্ডস্কেপ (ড্রাইসডেলের আক দি বর্ণট কান্ট্রি) ক্যানাডার সুবিখ্যাত গ্রুপ অব সেভন শিল্পীদের কয়েকটি ছবির কথা (যথা জ্যাকসনের দি রেড মেপল এবং টম টমসনের রেড লীভস) প্রায় অনিবার্যভাবেই মনে করিয়ে দেয়। ইউ-এস-আই-এসের উদ্যোগে কুড়িটি মার্কিন বিদ্যালয়ের ছাত্রদের আঁকা ছবির যে প্রদর্শনীটি 'এডুকেশন ইন দি আর্টস'), এই মুহূর্তে অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস-এ চলছে সেটিও কিঞ্চিৎ উদ্দীপনার সঞ্চার করবে ব'লে অনুমান করা যায়। ও-দেশে শিক্ষাক্ষেত্রে শিল্পকলার ভূমিকা এবং বস্তু ধারণার তার প্রয়োগপদ্ধতির খানিকটা আভাস পাওয়া যাবে আশা করা যায়।

দ্বিতীয়, আমাদের চিত্রশিল্পীরা ছবির একান্ত নিজস্ব সমস্যা ও উদ্দেশ্য বিষয়ে আশ্চর্য সচেতনতা লাভ করেছেন একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এই সচেতনতার ধারায় শিল্পীবিশেষের ব্যক্তিগত সমস্যার অভিব্যক্তি, তাঁর মানসিক জট, কিম্বা তাঁর রাজনীতিক দর্শন যদিও চিত্রকর্মে অনুপস্থিত থাকতে পারে না, তথাপি ছবির রূপায়ণে উক্ত বিষয়গুলির ভূমিকা প্রাসঙ্গিক মাত্র এবং পরোক্ষ। ছবির প্রাথমিক তথা সর্বশেষ উদ্দেশ্য হল ছবির নিজেরই ভাষায় কথা বলা এবং বস্তু ও বিষয়ের যে-দিকগুলি সেই ভাষার চৌহদ্দিতে পড়ে, শুধুমাত্র সেই দিকগুলিতেই সত্যসন্ধান করা। কলকাতার তরুণ শিল্পীরা তাঁদের সম্প্রতিক কাজে ভাবালুতা কিম্বা নৈরাজ্যবাদশাসিত সবরকম স্বাভাবিক ষড়যন্ত্রকে উপেক্ষা ক'রে যে বিপুল ও সচেতন সত্য-নিষ্ঠার ও রূপ-সাধনার ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছেন তা সাবালকত্বেরই নিশ্চিত পরিচায়ক। এই সচেতন ঐতিহাসৃষ্টির ইতিহাসে কলা-সমালোচকদের ভূমিকাও অনস্বীকার্য। উদাহরণ, কলকাতার সুবিখ্যাত শিল্পী-গোষ্ঠী, সোসাইটি অব কনটেমপোরারি আর্টিস্টস। তাঁদের সঙ্গে আত্মীয়তাপাশে আবদ্ধ জনৈক কলা-সমালোচকের অক্লান্ত ও সযত্ন কষাঘাত ব্যতীত এই সংস্থার দীর্ঘ সাত বছরের সাক্ষ্যর জীবনে শিল্প-অন্বেষার সামগ্রিক রূপ আজকের মতো স্বচ্ছ হয়ে উঠত না।

তৃতীয় উল্লেখযোগ্য বিষয় এ-বছরের অপেশাদার এবং ক্ষেত্রবিশেষে প্রথানুগ চিত্র-শিক্ষাবঞ্চিত কয়েকটি কুশলী শিল্পীর আত্মপ্রকাশ। এঁদের মধ্যে ছিলেন কাবেরী মুখোপাধ্যায় সুনীতা কুমার ও শচী সেন। একদা চলচ্চিত্র পরিচালক শ্রীসেনের ছবিতে অভিব্যক্তি ও রূপ-সজ্জার যুগপৎ প্রয়োগের উদ্দেশ্যে ছন্দোবদ্ধ রেখার প্রতি তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত মনোযোগ চিত্তাকর্ষক। এই ব্যাপারে একদিকে যেমন তিনি নোলডের জাতের অপর দিকে তাঁর সঙ্গে ক্লে-র আত্মীয়তা লক্ষণীয়।

ইদানীং যে-সব শিল্পীর ছবি আমরা দেখতে পেলাম, তাঁদের মধ্যে অনেকেই মহত্ত্বের প্রতিশ্রুতি দেখিয়েছেন। তথাচ কোন সামগ্রিক রূপ পরিগ্রহ না-করা অবধি তাঁদের অধিকাংশকেই নামোল্লেখবর্জিত একমাত্র সাধুবাদ করা ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু অধিকতর শক্তিমানদের নাম করতেই হবে, অন্তত সংক্ষেপে। প্রায় প্রতিদিনই রূপবন্ধ বদলের অস্থির পদচারণে যাঁরা আমাদেরও প্রায় কম্পিত রেখেছেন, সেই সুনীল দাসের চিত্রসাধনায় বিরাট কোন সম্ভাবনার ইঙ্গিত আমরা সর্বদাই পাচ্ছি। গত সেপ্টেম্বরে ক্যালকাটা ইনফরমেশন

সেণ্টারে প্রদর্শিত অনেক ছবির মধ্যে শ্রীদাসের ১৯৫৭-৬৭ পর্যায়ের কয়েকটি কোলাজ্ রীতির কাজ দেখা গেছে, যার মধ্যে তাঁর পূর্বকৃত প্রতীক ও রূপকল্প-কৌশল অনেকাংশেই থেকেছে। ডিসেম্বর মাসে বিরলা অ্যাকাডেমি-তে আয়োজিত দশজন শিল্পীর আরেক প্রদর্শনীতে শ্রীদাসের ছবিতে তাঁর আবেগের তীব্রতা এবং কামনা ও তৃপ্তির অন্তর্দ্বন্দ্ব সত্যোদ্ ডিজাইনধর্মিতার শাসনে ও রঙে উকতায় কম্প্রমান হয়েও সৌভাগ্যত কখনো নৈরাজ্যময় হয়ে পড়ে নি। তাঁর আরো একটি সম্ভাব্য প্রদর্শনীর কথা শোনা যাচ্ছে। আশা করব রঙের খেলায় অতঃপর তাঁর মিতাচার লক্ষ্য হবে।

রঙের মিতাচারের সঙ্গে কম্পোজিশনের কঠিন বাঁধুনি সমকালীন শিল্পীদের মধ্যে সম্ভবত অরুণ বসুতে সবচেয়ে বিস্ময়কর-ভাবে সফল হয়েছে। ডিসেম্বরের যৌথ প্রদর্শনীতে তাঁর ছবি আমরা শেষ দেখেছি। ড্রইং ও কম্পোজিশনের ওস্তাদিতে এবার কিন্তু তাঁর উপর পিকাসোর ছায়াপাতের ইংগিত আমাদের চোখে ঠেকেছে, যদিচ নীল, সিঁদুর ও অন্য দুয়েকটি রঙের ব্যবহারে এবার তিনি ঈষৎ রোমাণ্টিকতা বা মেজাজের আভাস দিয়ে আমাদের দৃষ্টিকে স্নিগ্ধ করেছেন। কেমুল্ড গ্যালারিতে আয়োজন-অপেক্ষা তাঁর আগামী প্রদর্শনী ৭ই ফেব্রুয়ারী থেকে শুরু হবে। এ-শহরে যাঁরা ছবিতে উৎসাহী তাঁরাই জানেন এই আসন্ন প্রদর্শনীটির মূল্য কতখানি, বিশেষত যেহেতু শ্রীবসুর প্রতি আমাদের ঔৎসুক্যের তুলনায় তাঁর প্রদর্শনী এ শহরে এখনো বিরল।

শ্যামল দত্তরায়ের ছবি সম্বন্ধে উৎসাহী তরুণের সংখ্যাও নগণ্য নয়। ডিসেম্বরের প্রদর্শনীতে তাঁর নক্সার-ভরা জলরঙের আহারে ছবিগুলি দেখেছি এবং ক্যানভাসে স্থানপূরণের অভিনব প্রচেষ্টায় তাঁর সাফল্য লক্ষ্য করে বিস্মিত হয়েছি। স্নিগ্ধতায় সুবাসপূরণ তাঁর ছোট ছোট নক্সার বিক্ষেপ যেভাবে ছড়িয়ে থাকে সেই দৃষ্টিচাতুর্যে শ্রীদত্তরায়ের জুড়ি মেলা ভার। তাঁর আগামী প্রদর্শনীটি কলকাতায় না হয়ে বম্বের তাজ আর্ট গ্যালারিতে আয়োজিত হবে, ৩০শে এপ্রিল থেকে ৭ই মে অবধি।

গণেশ পাইনের আঁকা কুড়িয়েক ক্রেয়নে টেম্পেরা কয়েকটি দেখে গত ডিসেম্বরে আমরা চমৎকৃত হয়েছিলাম। এই শিল্পীর আণ ও রূপায়ণ সম্পূর্ণতই ভারতীয়— খানিকটা প্রাচ্য-মিশরেচরণের সগোত্র। এঁর পরবর্তী প্রদর্শনী কবে হবে জানি না, কিন্তু আশা করব এবারের চিত্রকর্মে তাঁর অনন্য রচনাশৈলীকে অম্লান রেখেও রঙের ব্যবহারে তিনি কিঞ্চিৎ মিষ্টত্ব কমাবার প্রচেষ্টা পাবেন। বম্বেতে শিক্ষিত এবং কলকাতার উইভরস্ সরভিস্ সেণ্টারে কর্মনিযুক্ত, মানু পারেখ কোলাজ্-রীতিতে কাজ করে চলেছেন। ডিসেম্বরের প্রদর্শনীতে তাঁর ছবিগুলির মধ্যে নান্দনিক যুক্তির সমস্যা স্পষ্ট। বিমূর্ত এবং বস্তুনিরপেক্ষ আকারসজ্জার মাধ্যমে তাঁর এই অন্বেষণে শিল্পীর ব্যক্তিত্বের ছাপ লক্ষণীয়। তাঁর সাফল্যের মূল্যায়ণের সময় এখনো আসে নি, কিন্তু নিঃসন্দেহে বলা চলে তিনি এক অসহজ পথে ভ্রমণরত। আঁকা-ছবি ছাড়াও, গত কয়েক মাসের মধ্যে কিছু গ্রাফিক কাজ দেখা গেছে। তার মধ্যে বিরলা অ্যাকাডেমিতে ডিসেম্বর মাসে আয়োজিত একটি যৌথ গ্রাফিক প্রদর্শনীতে পশ্চিমের কয়েকজন এন্‌গ্রেভারের সঙ্গে ফ্রান্স-প্রত্যাগত বাঙালী শিল্পী দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এচিং বিশেষ উল্লেখিতব্য। প্রযুক্তি-নৈপুণ্যে এবং কম্পোজিশনের ও টেক্সচারের অনন্যতায় শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের কাজকে নিঃসন্দেহে প্রথম শ্রেণীর বলা চলে। ক্ষেত্র-বিশেষে একই প্লেটের উপর একাধিক টেকনিক আরোপ করে তিনি যে-ধরনের সম্পূর্ণ পূর্বকল্পিত (অর্থাৎ আকস্মিক নয়) রূপসৃষ্টি করেছেন, কলকাতার রসিকজন আন্তরিকভাবে তার তারিফ করতে বাধ্য হয়েছেন।

পরিশেষে, অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসের ৩২তম বাৎসরিক প্রদর্শনীটির উল্লেখ প্রয়োজন। দৃষ্টিশক্তিরহিত শিল্পী, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের কোলাজগুলি স্বগুণেই সকলের প্রশংসা অর্জন করেছেন। প্রবীণদের মধ্যে একমাত্র সুনীলমাধব সেন উল্লেখযোগ্য ছিলেন। আমেদাবাদের শিল্পী-দ্বয়, অমৃতিন মোদি ও রমানিক ভবসারের অবদান অনেকের মতে এই প্রদর্শনীর শ্রেষ্ঠ দৃশ্যবিষয় ছিল। সরকারী কলা ও কারু মহাবিদ্যালয়ের বিরাট প্রদর্শনীটিও ইতিমধ্যে বড়োদিনের অবকাশে ঘটে গেছে, এবং সেখানে উৎসাহী দর্শকের আশ্চর্য ভিড় এবার দেখা গেছে। এই প্রদর্শনী সম্বন্ধে এ-বছর বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার হয়েছে হয়তো এজন্য যে গত মাসে কোন একটি পত্রিকার প্রদর্শনীটির মান ইত্যাদি সম্বন্ধে পর পর দুটি পরস্পরবিরোধী সমালোচনা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমান রিপোর্ট এই প্রসঙ্গে কোন মন্তব্য না করাই বাঞ্ছনীয় মনে করি।

ডো-রে-মি

নীলিমা সেন-গঙ্গোপাধ্যায়

'ডো-রে-মি' আমাকে তাড়া করেছে; কোলকাতায় টিঁকতে পারলাম না। 'ডো-এ ডিয়ার-এ ফিমেল ডিয়ার'—পুরো গানের সুরটা বাঁশীতে বাজছে; কি সর্বনাশ এখানেও? এই অজ পাড়াগাঁয়ে?

বলবার কিছু নেই। পাড়াগাঁ বলে কি মানুষ, নেই সেখানে? আছে বারা আছে তারা এমন কিছু অমানুষও নয়।

কলকাতা শহরে সাউণ্ড অব মিউজিকের তরঙ্গ আজও প্রবাহিত হচ্ছে। ছবিটা সুন্দর, রোমাণ্টিক, একটি চিরন্তন রূপকথা। সব মানুষের অন্তরের গভীরের সেই অনাদি-কালের সুপ্ত রোমান্সের বীজটিকে অকস্মাৎ নাড়া দিয়ে জাগিয়ে দিয়েছে। সত্যি কথা। অস্বীকার করব না। কিন্তু বাল্যকাল থেকে একটা কথা শুনে আসছিলাম—'বেশী চটকাবে না—তেতো হয়ে যাবে!' একটা রসালো টুসটুসে পাতিলেবু নিংড়োতে নিংড়োতে ছিবড়ে হয়ে যায়। সাউণ্ড অব মিউজিকের রসটুকুও আমরা কচলাতে কচলাতে ছিবড়ে করে দিয়েছি। দুঃখের কথা কি সুখের কথা জানি না। কলকাতা শহরের মানুষ বড়ই রসিক—অনেকটা অশ্বত্থ গাছের মতো; নীরস পাথরের বুকে থেকেও রস সংগ্রহ করে। অতএব 'সাউণ্ড অব মিউজিক' বাদ যাবে কেন?

প্রায় বছর দেড়েক আগে থেকেই ছবির নামটা শুনে আসছি। 'জুলি এণ্ড্রুজ' একটা আশ্চর্য নাম! যার নাম জানি না বললে সমাজে হেয় হতে হয়। ইংল্যাণ্ডের স্টেজে নাকি ফাটাফাটি হয়ে গেছে তাকে নিয়ে। সেই বিশ্ববিখ্যাত রমণী সাউণ্ড অব মিউ-জিকের অন্তরের সুরটি আজ আমাদের কাছে পরিবেশন করতে এসেছেন। অতএব সভ্য জগতের মানুষ হিসাবে তার নাম না জানা আমার পক্ষে বড়ই অপরাধ। গত বছরে আমার এক বান্ধবী সুস্মিতা স্টেটস থেকে ফিরলো; এসেই প্রথম কথা সাউণ্ড অব মিউজিকের গুণগান। জুলি এণ্ড্রুজের সাফল্য নাকি ভোলবার নয়—ধরিত্রীর বন-কন্যার মতো অনাবিল তার পবিত্রতা তার গলায় স্বর্গীয় সুর খেলা করে: তার চেহারা 'নাইস'—অনেক কিছু। ভন ট্র্যাপ পরিবারের ইতিহাস মুখস্থ বলে গেল। অবাক হয়ে গেলাম শুনে। সে সময় ছবিটার নাম কলকাতায় খুব শোনা যাচ্ছে: সুস্মিতা নাকি স্টেটসে বার আষ্টেক দেখেছে ছবিটা কলকাতায় এলে আরো বার আষ্টেক দেখতে পারে। শুনে মন ভরে গেল। এতো আর যে সে লোক বলছে না: স্টেটস-ফেরৎ বিদুষীর মুখ থেকে শুনছি। 'নাঃ ছবিখানা এলে বাঁচি'—ভাবলাম। না দেখলে নিজেকে কেমন যেন নগণ্য লাগছে।

ইতিমধ্যে ডো-রে-মির ঢেউ এসে গেছে শহরে—ছবিটা অবশ্য তখনও আসে নি। কোন কোন বাঙ্গালী বা অ-বাঙ্গালী আধুনিক বড়লোক পরিবারে বিদেশ থেকে লংপ্লেয়িং রেকর্ড এসে গেছে এবং তাদের বাড়ীর ছেলেমেয়ে, স্ত্রী মা-কাকা-জ্যাঠার দল সকলেই গানগুলি সমঝদারের মতো হৃদয়ে গ্রহণ করেছেন।

সমস্ত শহরের একটা গদগদ অবস্থা হয়ে এল।

আমি একটা স্কুলে পড়াই। একদিন

অনুষ্ঠে অবসর সময়ে পিয়ানোতে টুংটাং করছি, অলসভাবে—হঠাৎ দেখি আমাকে ঘিরে দল দল কুচো বাচ্চা! 'মিস মিস—প্লিজ প্লে সামথিং ফ্রম সাউন্ড অব মিউজিক!'

বললাম—'আই ডোন্ট নো!'

ফ্রিজ করা চুল, গাল ফুলো একটা মেয়ে গালে হাত দিয়ে চোখ বিস্ফারিত করে আমার দিকে মুহূর্তের জন্য নির্বাক দৃষ্টি ছুঁড়ে মারল—তারপর বলল—'আ মিস! You don'* know! strange? It's very easy—Don't you know Do-Re-mi-Fa?"

ওর মুখে চোখে একটা বিস্ময়—ওর সমগ্র অবয়বে এমনই একটা ভাব যেন ওর মিস কোন জঙ্গল থেকে এসেছেন। আমারই দোষ। পিয়ানো বাজাবো অথচ মিউজিকের এ ব সি ডি জানবো না তা তো হয় না।

সমস্বরে তারা গান সুরু করে দিল আমার অনুমতির অপেক্ষা না রেখে; "Do-Re-mi-fa-So-la-ti-Dol" যাই হোক কোনরকমে কানে শুনে পিয়ানোর চাবি টিপে গেলাম। আমার ভুল হচ্ছে কিনা ওরা গ্রাহ্য করল না। মুখে সেই ডিভাইন ভাব এনে অপার্থিব এঞ্জেলদের মতো গেয়ে গেল।

ভাবলাম ছিঃ! আমার পিয়ানো বাজানোতে ধিক। —ডো-রে মি ই জানি না—জানলাম কি?

বন্ধুবান্ধবের বাড়ীতে ছেলেমেয়েরা সকলেই গাইতে সুরু করেছে— তাদের গায়িকা মায়েরাও তাল দিচ্ছেন; পিতার দল মুগ্ধ হয়ে সেই রস উপভোগ করছেন। একদিন এক দম্পতি এসে গানগুলো শুনিয়েও গেলেন। গানটা গাইবার পরই ভদ্রমহিলার কণ্ঠে বালিকাসুলভ চপলতা প্রকাশ পেলো; তিনি মিষ্টি মিষ্টি ভাষায় এবং সরল চাউনি দিয়ে আমার প্রতি রীতিমত অনুকম্পা প্রকাশ করলেন। আমি এখনও গানটি জানি না শুনে খুবই বিচলিত হলেন। দেখলাম শুধু ছোটরা নয়—বড়রাও জানে। আমিই জানি না? নিজের প্রতি রাগ হল, কেন জানি না?

আমার স্বামীকে বললাম— 'একটা সাউন্ড অব মিউজিকের নোটেশন এনে দেবে? র‍্যাগাজ্জাতে পাওয়া যায়?

'যত্তো সব ছেলেমানুষী! বুড়ো বয়সে ডো-রে-মি নিয়ে পাগলামি। উনি পাত্তাই দিলেন না।

মিঃ চৌধুরী আমার স্বামীর বন্ধু; একদিন এসে বললেন—'একটু ডো-রে-মিটা বাজাও তো শুনি!'

আকুল হয়ে বললাম—'জানি না! নোটেশনটা দাও না!'

মিঃ চৌধুরী মনে মনে বিরক্ত হয়ে আমার সে কথার জবাব দিলেন না। তাই ট্যারচা চোখে চেয়ে দেখলেন। এমন গাইয়া জবাব আশা করেন নি। বললেন—'জানো না? অথচ পিয়ানো বাজাও?'

তারপরেই মুগ্ধকণ্ঠে বললেন 'অস্ট্রিয়ান মেয়ে টিউনগুলো গীটারে যা তুলেছে—ইউনিক!'

উপলব্ধি করলাম আমার আর বেশীদিন পিয়ানো বাজানো চলবে না—লোকের ক্রমশঃ আমার নামে কলঙ্ক পড়ছে। সমাজের চোখে কত আর তুচ্ছ হবো?

অবশেষে সাউণ্ড অব মিউজিক এলো শহরে। কলকাতা তোলপাড় হয়ে গেল। টেস্ট ক্রিকেট দেখার মত এই অসামান্য ছবিটি দেখার ক্রেজ চলল অনেকদিন ধরে। যেখানেই গেলাম সেখানেই জুলি এন্ড্রুজ আর ডো-রে-মি! ভন ট্র্যাপ পরিবারের ইতিহাস।

দিব্যদৃষ্টিতে দেখলাম যে, আমাদের দেশের সব মানুষই এই বিদেশী সঙ্গীতজ্ঞের পুঙ্খানুপুঙ্খ ইতিহাস বাল্যকাল থেকেই জানে! যখন অ্যালফ্রেড দি গ্রেট পড়েছে—আর আওরঙ্গজেবের অত্যাচারের কাহিনী পরীক্ষার খাতায় লিখেছে, সেই সময়ে ভন ট্র্যাপ ফ্যামিলির নাড়ি-নক্ষত্র বাড়তি জ্ঞান হিসেবে সঞ্চয় করে রেখে দিয়েছে। আজ তাই ছবিটা বুঝতে তাদের কিছুমাত্র কষ্ট হয় নি। আমিই শুধু জানতাম না। কি ব্যাকডেটেড—আমি কি প্রচন্ড সেকেলে?

শেষ পর্যন্ত কলকাতা শহরের শতকরা নব্বইজন লোকের যখন ছবিটা কণ্ঠস্থ হয়ে গেছে—তখন আমার দেখার সুযোগ হল।

একটু আগেই গিয়েছি। আগের শো'টা তখনও শেষ হয়নি। বাইরে দাঁড়িয়ে ছবি দেখছি—আর মনে মনে ভাবছি—আজ আমার জীবনটা এক অমূল্য বস্তু সঞ্চয় করবে। সেখানে এক পরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা।

তিনি বললেন—'কবার হল?

জিজ্ঞাসা করলাম—'তার মানে?

—অর্থাৎ আমার এই নিয়ে তিনবার হবে।

—ও! আমরা এই প্রথম। —বললাম।

আমার স্বামী বললেন—'প্রথম ও শেষ! এক ছবি পঞ্চাশবার দেখা যায় নাকি?'

ভদ্রলোক ঘাড় নেড়ে বললেন—'এটা দেখে তা বলতে পারবে না। তাছাড়া একটা গান যা আছে? হাই ক্লাস!'

—কোন গানটা? প্রশ্ন করি।

—ডো-রে-মি! ঠিক কি রকম জানো আমাদের বাংলা সা-রে-গা-মা'র মত! মোহমুগ্ধ কণ্ঠে বলেন তিনি।

বুঝলাম: ইস্ট তার ওয়েস্টের মিলন-মন্ত্র সুরের ভিতর দিয়েও প্রবাহিত হচ্ছে।

ছবিটা দেখলাম। খুব ভাল লাগল। সমাজে, সংসারে, পার্টিতে, পিকনিকে, স্কুলে—তখন আমি নিজেই উচ্চৈস্বরে সাউন্ড অব মিউজিকের আলোচনা চালালাম।

সমালোচনা নয়, সংসারে এমন কয়েকটা বস্তু আছে যার সমালোচনা চলে না। আমিও তাই চেপে গেলাম। কেননা আমার সম্যক জ্ঞান লাভ হয়েছে এতদিনে। এ ছবির জাত আলাদা; এর সমালোচনা করে ইনটেলেকচুয়াল লেভেল থেকে নেমে যেতে আমি কিছুতেই রাজী নই।

তারপর ডো-রে-মি'র প্রবাহে ভাসলাম।

সর্বত্র ডো-রে-মি। অন্নপ্রাশনে, বার্থ-ডে পার্টিতে, রাত্রে ডিনার-ডান্সে, হোটেল-রেস্তোরাঁয় ফরমাস করে সব ডো-রে-মি শুনছে। মুখে কথা ফোটেনি এমন সব শিশু গুলো ডো-রে-মির ধাক্কায় বাবা-মা বলতে ভুলে গেল।

রবীন্দ্রজন্মোৎসবে ডো-রে-মি দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ করল পাড়ার ছেলেরা। চাঁদা তুলে জলসা করে উদ্বোধন হল 'ডো-রে-মি' দিয়ে। বাসরঘরে কনে হারমোনিয়াম বাজিয়ে ডো-রে-মি গাইতে শুরু করল। বিয়েবাড়ীতে বিসমিল্লার সানাইয়ের রেকর্ডের আগে ও পরে লাউডস্পীকারে পুনঃ পুনঃ ডো-রেমি ঝঙ্কার দিতে লাগল।

সেদিন পার্কের কোণে একজন আয়া বাচ্চাদের হাততালি দিয়ে ডো-রে-মি শেখাচ্ছে দেখলাম।

তারপর আমার মাথার মধ্যে কেমন কেমন করতে লাগল।

ট্যাক্সি চড়েছি—ড্রাইভার গুনগুন করে ডো-রে-মি গাইছে। রেডিওতে মিউজিক্যাল ব্যান্ড বক্সে, রেডিও সিলোনে, কলিং অল চিলড্রেন-এ, ভয়েস অব আমেরিকায়, রেডিও পাকিস্তানে এমনকি বি বি সি-তে—কোথাও বাদ নেই; এই সুষমামন্ডিত গানের গোড়ার কথাগুলো ডো-রে-মি—অবিরত বেজে চলেছে।

ছবিটা বড় ভাল লেগেছিল। একবার দেখে মনে হয়েছিল আমার দেখাটা সম্পূর্ণ হয়নি। কিন্তু বিধাতা বাদ সাধলেন। এই চরম সময়ে ভারতীয় সঙ্গীতজ্ঞরা এই সুরগুলি তাঁদের তারের যন্ত্রে তুলে রেকর্ড করে ফেললেন। অথবার ঝঞ্ঝাট বেড়ে গেল। এখন এই ভি বালসারার সেতারের রেকর্ড না থাকলে মান থাকছে না।

ডো-রে-মি'র সাউন্ড যে আমাকে এমন ভাবে তাড়া করবে তা কে জানতো?

বস্তির ছেলেমেয়েগুলো পর্যন্ত ইংরিজি গান শিখে গেল। গত একবছর যাবৎ ওরা 'নিঝুম সন্ধ্যা' গাইছিল; হঠাৎ দেখি প্রাণখুলে ডো-রে-মি গাইছে।

গানটি যথার্থই জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে জনগণমনকেও ছাড়িয়ে গেল। আজকাল কেউ বাজনা শুনতে চাইলে ডো-রে-মি বাজিয়ে ফেলছি; আমার মজ্জায় মজ্জায় সুরটা প্রবলভাবে প্রবাহিত হচ্ছে টের পাই।

কয়েকদিন আগে বীরভূম বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে অবারিত আকাশে সাদা মেঘ—ধুধু মাঠে অবাধ মুক্তি; সেই পরিবেশে বাউলের গান শোনার আশায় মনটা উন্মুখ। হায় হায়! হায়ার সেকেন্ডারীর ছাত্র গাঁয়ের মোড়লের নাতি বাঁশের বাঁশীতে ডো-রে-মি সুরের তরঙ্গ তুলে দিক-দিগন্ত আকুল করে তুলেছে।

এরপর আমার অসম্ভব ভয় করতে লাগল। হয়তো দেখবো মাথায় ঝুঁটি বাঁধা, গেরুয়া আলখাল্লা পরা বৈরাগীর দল তাদের একতারায় ডো-রে-মির সুরে বঙ্-বঙা-বঙ্ করছে।

অস্ট্রিয়ার নীল আকাশ, ধূসর পাহাড়—সবুজ তরুলতা তৃণগুল্মে ভরা মাটি কোনদিন কল্পনাও করেনি যে সেই দেশেরই সঙ্গীতের ইতিহাস এক অতীন্দ্রিয় কল্পলোকের সৃষ্টি করবে; আর তাকে কেন্দ্র করে একখানি গান বাংলার হৃদয় মন্থন করে অমৃতের দেবে।



আনাড়ির মার

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য

সময়ে সময়ে কাঁচা হাতের এমন সাফল্য লাভ হয়, পাকা হাত যার নাগাল পায় না; দেখেছি অনেক খেলায়, অভিনয়ে ও শিকারে। 'আনাড়ির মার দুনিয়ার বার'।

যাঁর কাছে প্রবাদবাক্যটি শুনেছিলাম তিনি আজ আর মর্তজগতে নেই। কিন্তু অপ্রত্যাশিত শিকারের এই কাহিনীতে সার্থক [illegible] হয়েছে তাঁর উক্তির।

আমার সে শিকারী বন্ধুটির নাম সুশান্ত মুখার্জি। তাঁর ছেলে গৌরাঙ্গ সেদিন ফোনে আমায় জানাল ওর বাবার অবস্থা খারাপ হওয়ায় তাঁকে ভর্তি করা হয়েছে হাসপাতালে। জীবনের আশা কম, আমি যেন তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখে আসি।

মুখার্জির ছিল অর্থের স্বাচ্ছল্য, আর এমন বৈশিষ্ট্য ও নৈপুণ্যের সমাবেশ যা সচরাচর চোখে পড়ে না। তিনি ছিলেন সেরা শৌখীন লোক, সেরা শিকারী; জীবন-রসের রসিক, দুর্লভের অনুরাগী, পরিণামে বেপরোয়া। স্নাইপ শিকারের মাঠে নামলে পঞ্চাশটি ছড়ে না তুলে মাঠ থেকে উঠতেন না। হাঁস মারতে গেলে হওয়া চাই পনেরো-বিশটি। নামকরা রাইফেল বন্দুক ছিল পাঁচটি, ছিপ দশটি, হুইল দেশী-বিদেশী অনুরূপ। মাছ ধরতেন রাত্রি জেগে ফাৎনায় আলো ফেলে। পরতেন আদ্দির পাঞ্জাবি। কি গ্রীষ্ম-বর্ষা-শীতে। আঙুলে শোভা পেত বহুমূল্য হীরে ও নীলার আংটি। গাড়ী চড়তেন রোলস-রইস, ডেমলার, জাগুয়ার ও হাম্বার। স্কুলের পড়া শেষ করেন নি, কিন্তু পাঠ্য ছিল সংস্কৃত কাব্য-মহাকাব্য, উপনিষদ, আর বিশ্ববন্ধ ও দেশ-বিদেশের ইতিহাস। আধ বোতল স্কচ উদরস্থ করে টলতেন না। মাথায় ছ-ফুট, কব্জিতে পাকা ন-ইঞ্চি। হাত পৌঁছয় হাঁটুতে, রঙ প্রখর গৌর। বন্ধুত্বে উদার, বিপন্নকে সাহায্য করতে মুক্তহস্ত।

তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয় মোটর গাড়ী মেরামতির এক কারখানায়। সে আজ ত্রিশ বছরের কথা। কারখানাটির মালিক ছিলেন আমেরিকায় শিক্ষাপ্রাপ্ত মোটর-ইঞ্জিনীয়ার জয়ন্ত ঘোষ। সেদিনের আলাপ পরিণত হয় গাঢ় বন্ধুত্বে।

একদিন সেখানে গিয়ে দেখি আমার অপরিচিত দুজনের সঙ্গে ঘোষ ও মুখার্জি কি-এক আলোচনায় নিমগ্ন। আলোচনার বহর থেকে বুঝলাম, প্রসঙ্গটি সুন্দরবনে শিকারে যাওয়ার। ঘোষ আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন অপরিচিত দুজনের, যথাক্রমে শ্রীকৃষ্ণ বাগচী ও মিস্টার লেসি। বাগচীর হল পোর্ট ক্যানিং থেকে গোসবা যাতায়াতের জন্য মোটর-লঞ্চের পাট, লেসি তাঁর সহযোগী।

আমি নিবিষ্ট চিত্তে শুনছিলাম শিকারের প্রস্তাব, এমন সময় মুখার্জি সহসা আমাকে বললেন, আপনার রাইফেল বন্দুক থাকে ত আসুন না আমাদের সঙ্গে। বরাতে থাকে ত বাঘ হবে, নয়ত চিতল হরিণ, কুমীর ত হবেই। সুন্দরবনে শিকারের একটা ছাড়-পত্র করে নিলেই হবে।

আমি বললাম আমার বন্দুক আছে বটে কিন্তু রাইফেল নেই। ও না হলে কি বড় শিকার হয়?

মুখার্জি বললেন, চলুন না, আমার আছে দুটি রাইফেল, একটা দোব আপনাকে। আগের কেনা ·৩১৮ 'বোর' ওয়েস্টলি-রিচার্ডস, আর এবার শিকারে যাবার জন্য সদ্য-কেনা ·৪৫০।৪০০ বোরের দোনলা জেফরি। আপনি নেবেন আগেরটা। সুন্দর-বনের জঙ্গলে রাইফেলটা আপনার হাতসই করে টিপ-করা একটু শিখে নিলেই হবে। আপনার মত আমিও বড় জানোয়ার শিকারে আনাড়ি। বাগচী মেরেছেন ৪।৫টি বাঘ, আট-দশটি চিতাবাঘ, বরা, কুমীর, হরিণ। লেসিও মেরেছেন বাঘ। ঘোষের হয়েছে বরা, সম্বর। তা সবেরই শুরু আছে। চলুন, আপনার-আমার হবে শুরু।

আমি সানন্দে রাজি হলাম। স্থির হল পাঁচজন মিলে আমাদের যাওয়া হবে লঞ্চে।

* * *

শিকারের মোহ মনে রোপিত হয়েছিল রম্য ছেলেবেলায়। তখন থাকতাম বর্ধমান শহরের প্রান্তে দামোদর বাঁধের ধারে, 'সদর ঘাটে'র নিকটে। শিকারের সুযোগ ছিল সেখানে প্রচুর। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এক সময়ে নৌকাযোগে কলকাতা থেকে গঙ্গা বেয়ে দামোদরে পড়ে নৌকাপথে এই সদরঘাটে এসে উপস্থিত হন। মহারাজ মহতাপচাঁদ খবর পেয়ে যানবাহন পাঠিয়ে অতি সমাদরে মহর্ষিকে বর্ধমান রাজ-প্রাসাদে নিয়ে আসেন। আমাদের বাল্যকালে নদীপথে কতবার আমরা ৪০।৪৫ মাইল দূরে স্বগ্রামে যাতায়াত করেছি। এখন রেলপথ বিস্তৃতি ও বাস চলাচলের কল্যাণে

নদীপথে যাতায়াত কাহিনীতে পরিণত হয়েছে।

দামোদরের প্রলয়ঙ্কর বন্যা সুবিদিত। শীত-গ্রীষ্মে শীর্ণকায় দামোদর বর্ষায় স্ফীত উন্মত্ত হয়ে প্লাবনে দুকূল ভাসিয়ে প্রলয় নৃত্যে হয় আত্মহারা। এই প্লাবন থেকে শহর-গ্রাম খেত রেললাইন জি-টি সড়ক বাঁচাবার জন্য রচিত সুদীর্ঘ বাঁধ এসে শেষ হয়েছে উলুবেড়ের কাছে। এই বাঁধ রক্ষণাবেক্ষণ ও দামোদর খালের জলসেচ কাজের ভারপ্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়ার পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন দাদামশাই। বাঁধের ধারেই ছিল তাঁর জন্য নির্দিষ্ট বাংলো। শুনেছিলাম তাঁর কাছে যে এই মনোরম বাংলোয় স্বাস্থ্য-লাভের জন্য মহামতি বিদ্যাসাগর কিছুকাল বাস করেছিলেন গভর্নরের আনুকূল্যে।

বানের জল সরে গেলে বাঁধের অপর পারে পড়ে থাকত বিস্তীর্ণ নদী-সৈকত কিছু কম আধ মাইল চওড়া। সেখানে ঘন হয়ে জন্মাত কুলবন, শরবন, বৈঁচি গাছ, কন্টিকারি, ঝোপ-ঝাড়, কুশবন। কিছু কিছু জায়গা ছিল চাষের উপযোগী, চাষীরা করত ফুটি-তরমুজ ও পটলের চাষ। কোথাও কোথাও থেকে যেত জলা। শীত-কালে এই বালুসৈকত হোত শিকারের অতি অনুকূল। বর্ধমান রাজবাড়ীর রাজপুরুষরা জজ ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ-সুপারকে নিয়ে এখানে আসতেন শিকার খেলতে। বর্ধমানাধি-পতি বিজয়চাঁদ তখন নাবালক। তাঁর পিতা, স্টেটের তত্ত্বাবধায়ক রাজাসাহেব বনবিহারী কাপুর ছিলেন যেমন সুদক্ষ ঘোড়সওয়ার তেমনি সুদক্ষ শিকারী। শিকারী দলের তিনিই ছিলেন দলপতি। শিকার হোত বর্শা দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বরা। অন্য সব শিকার হোত বন্দুকে, —বালিহাঁস, স্নাইপ, খরা ও সজারু। শিকারান্তে সকলে সমবেত হতেন দাদামশায়ের বাংলোয়। প্রশস্ত হাতায় পেতে দেওয়া হোত চেয়ার-টেবল। শিকারলব্ধ পশুপাখী নামিয়ে রাখা হোত সাজিয়ে। দাদামশায়ের খাস আলমারি থেকে আসত শ্রমনিবারক তেজস্কর ফরাসী পানীয় 'এক্স নম্বর ওয়ান', তার সঙ্গে লুচি ভাজি হালুয়া। শ্রমলাঘব ও গল্পগুজব করে চলে যেতেন শিকারীর দল ঘোড়ায় চড়ে টমটমে। সন্ধ্যার আবরণ ঘনীভূত হোত।

সে সময়ে ছিলাম পড়াশুনোর সুবিধের জন্য দাদামশাইয়ের আশ্রয়ে। শিকারের অভিযান, সুসজ্জিত টমটম, তেজী ঘোড়া, শিকারের হাতিয়ার ও চিত্র-বিচিত্র স্নাইপ হাঁস সজারু খরা ইত্যাদি দেখে বালকের মনে একটা অপরিস্ফুট অভিলাষ উঠত জেগে। একদিন পূর্ণ হোল সে অভিলাষ। শীতের মুখে এলেন এক আত্মীয় দাদা, কিছুদিন রইলেন আমাদের সঙ্গে। ওড়া পাখী মারার হাত ছিল তাঁর সরেস। তিনি শিখেছিলেন ওপরওলা সাহেবের কাছে। দাদামশাইয়ের বন্দুক নিয়ে আমাকে সঙ্গে করে একদিন গেলেন বাঁধের ওপারে শিকারে। তিনটি হাঁস, দুটি স্নাইপ ও দুটি পায়রা মারলেন প্রথমে, তারপর বন্দুকটা আমার হাতে দিয়ে বসা ঘুঘু মারা শেখালেন। এই হাতেখড়ি হবার পর, তিনি চলে গেলে লুকিয়ে দাদামশায়ের বন্দুক নিয়ে যেতাম শিকারে।

তার পর বদলী হয়ে দাদামশাই এলেন কলকাতায়, সঙ্গে এলাম আমরা। বাঁধের ধারের উন্মুক্ত আকাশ বাতাস মাঠ আলো ছেড়ে যেদিন উত্তর কলকাতার ধোঁয়াটে স্যাঁতসেঁতে ছিরি-ছাঁদহীন, অবিরাম ঘেঁসা-ঘেঁসি বাড়ীর চাপে নিষ্পেষিত বিবর্ণ অলিগলি রাস্তার কারাগারে প্রবেশ করলাম সেদিন মনে হল—'কোথা সে খোলা মাঠ উদার পথঘাট, পাখীর গান কই, বনের ছায়া!'

স্কুল-কলেজের পড়া শেষ করে কর্ম-জীবনে প্রবেশ করে কিনলুম বন্দুক। সন্ধান করে ধাপার ভেড়িতে গিয়ে করলাম হাঁস শিকার, ওড়া পাখী মারার কৌশল অর্জন করলাম।

তারপর এলো এই সুন্দরবনের ডাক। তখন সুন্দরবনে শিকারের পাশ পেতে কোন অসুবিধা ছিল না। এখন পশ্চিম বাংলা সরকারের কাছে সেখানে শিকারের অনুমতি পাওয়া যায় না। ফলে গুপ্ত-শিকারীরা লুকিয়ে সুন্দরবনে গিয়ে বাঘ, হরিণ মেরে আনছেন!

নির্দিষ্ট দিনে বেলেঘাটা স্টেশনে ট্রেনে চড়ে আমরা আমরা পোর্ট ক্যানিং-এ এসে হাজির হলাম। পথে আসতে চোখে পড়ল রেললাইনের দুদিকে নামাল জমি, আল-দেয়া ক্ষেত, গোড়ের খাল, পিয়ালী নদী। তখন এপ্রিল মাস, গ্রীষ্ম। মাঠ শুকনো। কিন্তু এই দক্ষিণাঞ্চল শস্য-শ্যামলা, ধানে বোঝাই হয়ে ওঠে বর্ষায়-শরতে। "কল্যাণ-ময়ী তুমি ধন্য, দেশ-বিদেশে বিতরিছ অন্ন', হায় কল্যাণময়ী বাংলা মা আজ তুমি ভিক্ষাপাত্র নিয়ে দেশ-বিদেশের শরণাপন্ন হয়েছ।

ক্যানিং স্টেশনটি বেশ খোলা-মেলা। অদূরে মাতলা নদী, এইখান থেকে বাগচীর গোসবাযাত্রী মোটরলঞ্চে যেতে হবে সুন্দরবনে। মুটেরা আমাদের মালপত্র জেটিতে নিয়ে গেল। নিকটে বনবিভাগের আপিস, সেখানে আমাদের লাইসেন্স দাখিল করলাম। জেটিতে পৌঁছাবার অল্প পরেই গোসবা থেকে লঞ্চ এসে হাজির হোল, কিন্তু ভাটা থাকায় লঞ্চ জেটি থেকে দূরে নোঙর করল। যাত্রীরা জলে নেমে হাঁটুভর কাদায় ও পাঁকে হেঁটে কূলে এলেন, মহিলা-যাত্রীরাও পরিত্রাণ পেলেন না, হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে আসতে হোল। জোয়ার এলে লঞ্চ জেটিতে এসে ভিড়ল। গোসবা যাবার যাত্রী সমেত আমরা লঞ্চে উঠলাম। মুটেরা আমাদের মালপত্তর তুলে দিল। সুন্দরবন প্রবাসে যাবার জন্য কলের জল নেওয়া হোল,—সেখানকার জল নোনা। লঞ্চ চালা-বার পেট্রোল কেরোসিন তেলের রসদ নেওয়া হোল। তারপর ছাড়ল লঞ্চ। আমরা যাত্রীদের ভিড় ও ঘেঁসাঘেঁসির মধ্যে আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলাম।

লঞ্চ ছেড়েছিল যখন তখন দুপুর পার হয়ে গিয়েছিল। এগিয়ে যেতে যেতে মাতলা বিস্তৃত বিরাট রূপ নিয়েছে। কলকাতার উত্তর ও পূর্বাঞ্চল দিয়ে যে খাল বাগবাজার মানিকতলা বেলেঘাটা কৃষ্ণপুর হয়ে চলে গেছে তা কুলটিতে পড়েছে বিদ্যাধরী নদীতে। কলকাতায় ময়লা খালও বানতলায় ময়লা-শোধিত হয়ে পড়েছে বিদ্যাধরীতে। এই নদীর ক্যানিং-এ এসে নাম হয়েছে মাতলা। পিয়ালী নদীও মাতলায় বিলীন হয়েছে। মাতলায় বড় বড় ঢেউ। দেখে মনে হল সার্থকনামা মাতলা। মাতলা ছাড়া হাড়িয়াভাঙা, রায়-মঙ্গল, বিদ্যাগুয়াসুবা, বঙ্গাদুনি, গোনা, মায়াদ্বীপ প্রভৃতি বিস্তর নদী ও তাদের সংখ্যাতীত শাখা-প্রশাখা খালের যোগা-যোগে জালবোনা এলাকা সুন্দরবন। এখন তার অর্ধেকের বেশী পাকিস্তানে। আমার যে সময়ের বিবরণ সে সময়ে অবিভক্ত সুন্দরবন ছিল নদী জল ও পলি গড়া জগতের এক বৃহত্তম ব-দ্বীপ।

একটি ছোট স্টেশনে লঞ্চ প্রথমে থামল। কয়েকজন যাত্রীর হল ওঠানামা। এর পর বাঁদিকে মোড় নিয়ে আমরা প্রবেশ করলাম 'করতাল' গাঙে। ডানদিক দিয়ে চলে গিয়ে উন্মত্ত রূপ নিয়ে 'মাতলা' অতি-বিস্তীর্ণ হয়ে পড়েছে বঙ্গোপসাগরে। এর পরে লঞ্চ এসে ভিড়ল 'বাসন্তীতে'। বাসন্তী ধান চাষ-আবাদের জন্য বিখ্যাত। নেমে গেল সেখানকার যাত্রীরা। গোসবা যাবার যাত্রী উঠল দু-একজন। আমাদের জল-যোগের জন্য সংগৃহীত হল এক হাঁড়ি রসগোল্লা। এর পর শেষ স্টেশন গোসবা। সেখানে পৌঁছাতে সময় হল বিকেল ৪টা। চিরস্মরণীয় স্যার ডানিয়াল হামিল্টনের সৃষ্ট বিখ্যাত 'গোসবা'। হামিল্টন সাহেব এখানে কো-অপারেটিভ পদ্ধতিতে চাষের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে বাঙালী চাষী ও যুবকদের নতুন প্রেরণা নতুন পথের সন্ধান দিয়েছিলেন। হামিল্টন সাহেবই বাগচীর লঞ্চ চালানো উদ্যমে অনুপ্রেরণা ও সাহায্য যুগিয়ে ছিলেন। গোসবার একটি সুন্দর জেটি গাঙের জলে এসে নেমেছে। সামনেই

সকল প্রকার অফিস ষ্টেশনারী কাগজ
সার্ভেইং ড্রইং ও ইঞ্জিনিয়ারিং [illegible]
সুলভ প্রতিষ্ঠান।

কুইন ষ্টেশনারী ষ্টোর্স
প্রাঃ লিঃ

৬০-ই, রাধাবাজার স্ট্রীট কলিকাতা-১
ফোন : অফিস—২২-৮৩৮৮ (২ লাইন)
২২-৬০০২
ওয়ার্কসপ—৬৭-৪৬৬৪ (২ লাইন)

হামিল্টন সাহেবের বাংলো। শেষ যাত্রীদল এখানে নামিয়ে দিয়ে লঞ্চ ডাইনে যে খালে প্রবেশ করল তার নাম 'দুর্গাদুনি' খাল। গোসবা হল আমাদের পক্ষে সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার। এর পর থেকে লোকের বসতি চাষবাস ক্রমে কমে এসেছে, সুন্দরবন জঙ্গলের প্রকৃষ্টরূপ বিকশিত হয়েছে। সুন্দরবনে আসবার বহু প্রবেশ পথ। এখানে আসে জেলেরা নৌকোতে। এখানকার খালে মাছ ধরে চালান দেয় কলকাতায় ও অন্যান্য জায়গায়। কাঠুরে আসে সুঁদরি অন্যান্য কাঠ সংগ্রহ করতে, আসে মধু-সংগ্রাহকরা মধু সংগ্রহ করতে। প্রত্যেকটি বেশ আয়কর। আর আসে গুপ্তশিকারী গোপনে, বিনা লাইসেন্সে চিতল হরিণ মেরে হরিণ মাংস বিক্রয় লোভে।

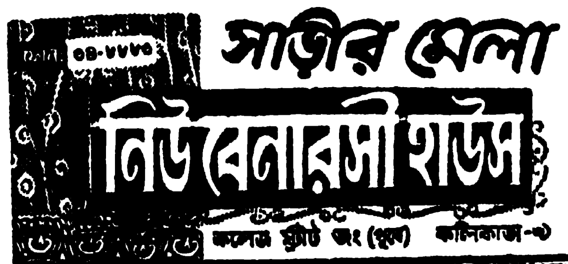
সব যাত্রী নেমে গেলে খালি লঞ্চে আমরা সব জিনিসপত্তর গুছিয়ে রাখার ও হাত-পা মেলে বসার পেলাম অবসর। বন্দুকে রাইফেল গুলী তাদের বাক্স থেকে বার করে ও যথারীতি প্রত্যেকটির নল পরিষ্কার করে লঞ্চের ছাদ থেকে নামান দড়ির শিকেতে ঝুলিয়ে রাখা হল শায়িতভাবে। মুখার্জির রাইফেল—·৪৫০।৪০০ 'জেফরি' দোনলা ঘোষের—·৩৭৫ 'মানলিকার', বাগচীর—·৪৩২ 'মওজর', আমার ৩২ ইঞ্চি লম্বা ৩ ইঞ্চি চেম্বার দোনলা ১২ বোর বন্দুক। লোস কোন হাতিয়ার আনেন নি, শিকার করবেন না, যাতে আমরা প্রথম শিক্ষার্থীরা যথেষ্ট সুযোগ পাই। নয়ত 'অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট'। লঞ্চের ছাদে-ডেকে গিয়ে বসলাম সকলে আমরা। সেখানেই বৈকালিক চা জলপান শেষ করা হল। শহরে সমাজ কোলাহল থেকে বহুদূরে এসে জলবেষ্টিত এই বনানীর অপরূপ শোভা ও নিশ্ছিদ্র নিস্তব্ধতা উপভোগ করতে লাগলাম। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করছে শুধু ইঞ্জিনের দ্রুত তালের একটানা আওয়াজ। সন্ধ্যার আবরণ নেমে এসে গাঢ় করে দিল চারদিক। ঝির ঝির করে হাওয়া বইতে লাগল। আকাশে একটি-দুটি করে তারা উঠল ফুটে। কী অবর্ণনীয় শোভা এখানকার ধূলো ধোঁয়াশূন্য তারাখচিত আকাশের। 'দুর্গাদুনি' খাল বেয়ে 'গুমার' খাল, 'ভরণী' ও 'গজী' খাল হয়ে আমরা 'পঞ্চমুখী' খালে পৌঁছালাম। রাত্রি তখন ৮টা। নিজ নিজ বন্দুক রাইফেল এনে তাতে কার্তুজ ভরে দুজন বাঁয়ে দুজন ডাইনে, ছাদে বসলাম আমরা ভাগ করে। দুদিকে পাড়ে জমাটবাঁধ, অন্ধকার, সামনে তারার আলোয় ঈষদ্দৃপ্ত অস্পষ্ট উন্মত্ততা। লঞ্চের তেজী সন্ধানী বাতির আলো ফেলা হচ্ছে ইতস্তত উভয় দিকের ডাঙায়। উজ্জ্বল উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে যেখানে পড়ছে আলো, ঘাসটুকুও দেখা যায়। একটু পরেই জ্বলে উঠল এক জোড়া পীতাভ-লাল চোখ, জমির খুব কাছেই। লঞ্চের সে দিকটায় ছিলেন মুখার্জি, রাইফেল তুলে তৈরী হলেন তিনি। লঞ্চ খালের পাড়ের দিকে এগিয়ে এনে থামানো হল। সঙ্গে সঙ্গে বোঝা গেল চোখ দুটির মালিক এক বন-বেড়াল। আওয়াজ করলেন মুখার্জি তাঁর ·৪৫০।৪০০ দিয়ে। একটা লাফ দিয়ে উঠে উল্টে পড়ল জানোয়ারটি সেখানেই। দূরত্ব ছিল আন্দাজ ৩০।৪০ গজ। মুখার্জির হাতে এই প্রথম বড় শিকার। সকলের উল্লাস আনন্দধ্বনির ভেতর ডাঙায় লঞ্চ লাগিয়ে শিকারটিকে উদ্ধার করে আনা হল। লম্বায় দেড় হাত, একটা ছোট কুকুরের সামিল। ছাই রঙ, কতকটা হায়নার মত। গায়ে গায়ে এখানে ওখানে অতিঈষৎ ডোরাকাটা ভাব।

লঞ্চ আবার চলতে শুরু করল। সুকান বা হাল ধরেছিলেন বাগচী। তিনিই আমাদের দলপতি ও ওস্তাদ। একটু পরেই আবার জ্বলে উঠল জোড়া জোড়া চোখ, এবার রঙ নীলাভ সবুজ। জমির কিছু ওপরে। বাগচী বললেন, এগুলি হরিণের চোখ, চিতলের। অবিলম্বে দেখা গেল চিতলগুলি, গাঢ় হলুদের রঙ তাতে শাদা শাদা চাকা দাগ। গুনে মনে হল বিশ-পঁচিশটি, তার মধ্যে দুটি দেখা গেল শিঙেল। গাছের আড়ালে আরও কত। বাগচী শিকারে আসবার সময় বলেছিলেন 'পঞ্চমুখী' খালে চিতল হরিণ বৃষ্টি হবে। একেবারে মোক্ষম সত্য। কিন্তু ওস্তাদের মানা ছিল রাত্রে লঞ্চের তেজী বাতি ফেলে হরিণ মারা। তিনি বলেছিলেন দিনে বিস্তর হরিণ পাওয়া যাবে, ডাঙায় জঙ্গলে নেমে গিয়ে মারতে হবে তাদের। আলো ফেলে মারতে পারব শুধু বাঘ। বাঘের সম্বন্ধে নিষেধ নেই কোন। সুন্দরবনের বাঘ সবই মানুষ-খেকো বাঘ। সুন্দরবনে মাছ ধরতে, কাঠ কাটতে, মধু নিতে যারা আসে, প্রতি বছর তাদের কত-জন যে বাঘের উদরস্থ হয়। বন-বিভাগের মতে শ'খানেক, সওয়া-শ', সুন্দরবন এলাকার অধিবাসীদের মতে তার দু-গুণ বা বেশী।

ছাদ থেকে নেমে রাত্রের খাওয়া শেষ করে আবার আমরা ছাদে গিয়ে বসলাম নিজ নিজ স্থানে। লঞ্চের তেজী আলোতে দুদিকে ডাঙায় বনের ভেতর হরিণের চোখ জ্বলে উঠতে লাগলো। রাত্রি ক্রমশ গভীর হয়ে এলো। ইঞ্জিনের আওয়াজ অবিরাম আবৃত্তি করতে করতে অগ্রসর হতে লাগল লঞ্চ। খালের পর খাল, কোনটি মাঝারি, কোনটি বিস্তৃত। দুদিকে বোঝাই করা অন্ধকার। ওপরে মণিময় আকাশে তারার মণিমাণিক্য, সুমুখে ক্ষীণপ্রভ জলপথ।

রাত্রি বারোটা হলে, একটা উপযুক্ত জায়গা বেছে ইঞ্জিন বন্ধ করে লঞ্চের নোঙর করা হোল। একটু নিদ্রার প্রয়োজন। খুব ভোরে উঠতে হবে। আমরা ঝিরঝিরে শীতল হাওয়ায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

ভোর হওয়ার আগেই, ৪টায় লঞ্চ চালু করা হোল। ঘুমভরা চোখ মুছে স্ব স্ব স্থানে আমরা রাইফেল বন্দুক নিয়ে তৈরী হয়ে বসলুম। লঞ্চের আলোতে আবার জ্বলে উঠলো সবুজ নীলাভ চোখ। এত-ক্ষণে আমাদের আন্দাজ হয়ে গিয়েছিল মাটি থেকে কত উঁচুতে থাকে হরিণের চোখ। আমরা 'পঞ্চমুখী' খাল ছেড়ে 'গুয়াসবা' নদীতে এসে পড়েছি। অতি বিস্তৃত নদী, তাই আমরা যেতে লাগলাম এক কোল ঘেঁসে। হঠাৎ এক জায়গায় পৌঁছে জ্বলে উঠলো একজোড়া চোখ,—বেশ একটু বড়, আর নিচে। রঙেও তফাৎ, সবুজ-নীলের বদলে রং ফিকে-সবুজ। দলপতির ঘণ্টা-সংকেতে লঞ্চের গতি কমিয়ে দেওয়া হোল, আস্তে আস্তে নিয়ে যাওয়া হোল ডাঙার কাছে। সকলে সতর্ক উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলাম। অবিলম্বে দেখা গেল চোখের অধিকারীকে—বিরাট এক বাঘ! হলুদ রঙের গায়ে কালো চওড়া ডোরা। আন্দাজ ৩০।৪০ গজ দূরে একটা ফাঁকা জায়গায় পা সামনের খাড়া, পিছনের পা ভাঁজ করে বসে আছে। কী সুন্দর দেখতে। বসে আছে সামনাসামনি নয়, আমাদের দিকে পার্শ্বদেশ রেখে। কী শান্ত, নিরীহ! তাকে চেখে দেখে মারার কথা মনেই হয় না, মারার ইচ্ছাটা শিকারের নেশা থেকে এসেছে। আগে থেকেই ঠিক ছিল যে, রাইফেল চালাবেন প্রথমে মুখার্জি। লঞ্চের তেজী আলোতে বাঘ চিত্রার্পিত হয়ে বসে আছে: মুখার্জি দুটি গুলী ছাড়লেন তাঁর ৪৫০।৪০০ থেকে। বিফল হোল গুলী, রাত্রে কোনকিছুর ওপর আলো ফেলে রাইফেলের গুলী ঠিক লাগানোতে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়। মুখার্জির পর গুলী ছাড়লেন ঘোষ তাঁর ৩৭৫ থেকে কিন্তু সেও হোল বিফল। তখন স্বয়ং বাগচী চালালেন এক গুলী তাঁর ৪২৩ মওজার থেকে। বাঘ তাতেও রইল অক্ষত। সে বসে আছে নির্বিকারচিত্তে, মুখে একটা কৌতূহলের ভাব—কিসের ওরকম বিকট আওয়াজ? চারটি বিকট গুলী ব্যর্থ হবার পর মুখার্জি আবার ছাড়লেন দুটি। এবার বাঘ উঠে পড়ে দিল দুটি লাফ, তারপর বনের দিকে দৌড়। এবার আমার পালা মনে করে আমি



সেই দৌড়ানো বাঘের ওপর আমার ১২ বোর বন্দুকের গুলী ছাড়লাম। অক্ষত শরীরে বাঘ প্রবেশ করল বনে।

লঞ্চ শুরু করল আবার চলতে। দু-দিকের গাঢ় অন্ধকার চিরে চিরে আলো পড়ছে তেজী বাতির। ঘনিয়ে উঠছে মনে একসঙ্গে অবসাদ ও বিস্ময়! ভোর হবার আগে লঞ্চ নোঙর করা হোল। আমরা শুয়ে পড়ে ঘুমের কোলে আশ্রয় নিলাম।

সকালের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো চারিদিক। বিরাট নদী 'গুয়াসুবা' চওড়া প্রায় আধ মাইল। সামনে ঘুরে নদী একটা বিরাট বাঁক নিয়েছে, চক্রাকার সমুদ্র-কূলের মত। মনে পড়ল 'কপালকুণ্ডলার' নবকুমারের কথা। এইরকম জায়গায় এসেই কালিদাসের পংক্তি তাঁর মনে পড়েছিল,—'দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী......কলঙ্করেখা'। সকালের চা-রুটি খাওয়া সমাপন করছি আমরা এমন সময় দেখলাম, আসামযাত্রী এক মালবাহী স্টীমার খানিকটা দূরে দিয়ে চলে গেল। লঞ্চ আবার ছাড়া হোল। এবার প্রবেশ করলাম 'ছোটহলদি' খাল হয়ে 'লক্ষ্মী' খালে। এইখানটায় কুমীর পাওয়া যাবে বলেছিলেন বাগচী। আমরা লঞ্চের দুদিকের বেঞ্চে বসলাম ভাগাভাগি করে, হাতিয়ার নিয়ে তৈরী হয়ে স্থির হোল যার দিকে দেখা যাবে শিকার তারই মওকা, সেই আওয়াজ করবে। অল্পক্ষণ পরেই দেখা গেল কুমীর, দেখাচ্ছিল যেন একটা গাছের গুঁড়ি। ইঞ্জিনের গতি কমিয়ে লঞ্চ নিয়ে যাওয়া হোল ওর দিকে। মুখার্জি তৈরী হলেন, তাঁরই দিকে ছিল কুমীর। বাগচী বলে দিলেন গুলী মারতে হবে ঠিক মাথার পেছনে, গলায়—মাথা ও ধড়ের সঙ্গমে। অন্য কোথাও মারলে প্রাণান্তক না হতে পারে তৎক্ষণাৎ। ইতিমধ্যে কুমীর নড়ে উঠে ঢালু কাদার ওপর দিয়ে চলতে লাগল,—আর অল্প একটু গেলেই জল। গুলী ছুটল মুখার্জির; সঙ্গে সঙ্গে কুমীরের গতি হোল রুদ্ধ। একবার দুবার পাগুলো দিয়ে কাদা আঁচড়াল, তারপর স্থির হয়ে গেল। বাইনোকুলার দিয়ে দেখা গেল মাথার পিছন থেকে গলার ওপর দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়েছে। লঞ্চের মেট কজন নেমে গিয়ে মোটা কাছি দিয়ে বেঁধে কুমীরকে গড়ানে কাদার ওপর দিয়ে টেনে এনে তারপর জলে ভাসিয়ে লঞ্চে তুলে দিল। অনেক পরিশ্রম করে বাগচী তার ছাল ছাড়ালেন। দেখা গেল মুখার্জির ৪৫০।৪০০ রাইফেলের গুলী ঠিক জায়গায় লেগেছে, মাথার পেছনে ঠিক গলায়। ছাল ছাড়াবার আগে কুমীরের মাপ নেওয়া হয়েছিল, লম্বায় তের ফুটের কিছু ওপর। মারটি সকলে খুব তারিফ করলেন, মুখার্জির দ্বিতীয় এই সাফল্যে খুব বাহবা জানালেন। কুমীরটি ছিল চলন্ত —মুখার্জির গুলী হয়েছিল অবিলম্বে। একটু দেরী হলে কুমীর জলে গিয়ে পড়ত।

আবার চলতে শুরু হোল লঞ্চের। ডাঙায় দেখা যেতে লাগল একটি-দুটি করে চিতল হরিণ, মাঝে মাঝে পাঁচ-সাতটি, মাঝে মাঝে শিঙেল। আগে দেখেছিলাম রাত্রে লঞ্চের বাতিতে, এখন দেখলাম দিনের আলোতে। অপরূপ তাদের রূপ দেখে হত্যা করার ইচ্ছা মনে জাগে না—কিন্তু সে-ইচ্ছা মনে সংগুপ্ত করেই সুন্দরবনে আসা হয়েছে। দলপতি এক জায়গায় লঞ্চ ভেড়ালেন। পাটা ফেলে দেওয়া হোল; আমরা নিজ নিজ বন্দুক রাইফেল নিয়ে নেমে গেলাম ডাঙায়। বাগচী বলে দিলেন এক-একজন যাবেন এক-একদিকে। চলতে হবে অতি ধীরে ধীরে এক-পা এক-পা করে। হরিণ দেখলে নিশ্চল স্থাণু হয়ে যেতে হবে। হরিণ অন্যদিকে নজর দিলে আবার দু-পা এগুতে হবে। নিকটে গাছ থাকলে তার গুঁড়ির সঙ্গে মিশে যেতে হবে। এই-ভাবে এগিয়ে এসে হরিণকে পাল্লার মধ্যে পেলে নিশান করে মারতে হবে। পাল্লা যেন ৬০-৭০ গজের বেশী না হয়, তবেই মার নিশ্চিত। নয়ত ফস্কাবে বা বৃথা জখম হয়ে বনে চলে যাবে। নিশান করার জায়গা হোল বুকে কাঁধ-বরাবর অথবা গলায়।

সুন্দরবনের মাটিতে নামবার আগে বোঝা যায়নি কী দুষ্কর সে-মাটিতে চলা। জোয়ারে খাল-নদী ছাপিয়ে জল উঠে ডাঙায় প্লাবিত করে অনেক দূর অবধি। ভাটায় সমস্ত জল নেমে স্পর্শ করে নদী-খালের প্রায় তলদেশ। ডাঙার মাটি তাই কখনো খটখটে শুখনো হয় না; কম-বেশী নরম থেকে যায়। এই নরম জমিতে হাঁটা এক সমস্যা। শুধু তাই নয়। এখানে অনেক স্থানেই গাছগুলি হোল 'কেওড়া' নামে পরিচিত। কেতকী নয়। এ-গাছ বড়, প্রায় বট-পাকুড় গাছের সামিল। কাণ্ডের চতুর্দিকে বহুদূর বিস্তৃত হয়ে এর শিকড় ছড়িয়ে থাকে আর সেগুলি থেকে স্থূলোকার বৃহৎ সূচাগ্র গজালের মত শীর্ষ একফুট দেড়ফুট অন্তর মাটির স্তর ভেদ করে বেরিয়ে থাকে। কেওড়া গাছের এ একরকম শরশয্যা, অথবা প্রকৃতির একটা কৌশল। হরিণ এর ভেতর ক্ষিপ্রপদে চলে বা দৌড়ে যেতে পারে কিন্তু বাঘকে চলতে হয় নিশ্চয় সাবধানে। আমাদের ত খুবই সাবধানে চলতে হয়েছিল।

আমরা এদিক-ওদিকে ছড়িয়ে পড়লাম। মুখার্জি আমাকে দিয়েছিলেন তাঁর ·৩১৮ রাইফেল। শ'খানেক দূরের গাছের গুঁড়িতে নিশান করে গুটি-দুই কার্তুজ ছুড়ে রাইফেল চালানো শেখা হোল। মানুষের আওয়াজে জানোয়ার সতর্ক হয়, সাবধানে সরে গিয়ে আত্মগোপন করে। বন্দুকে রাই-ফেলের আওয়াজে সেরকম সন্ত্রস্ত হয় না; মনে করে আওয়াজ নৈসর্গিক। বাগচীর দেওয়া পরামর্শমত আমি উঠলাম এক কেওড়াগাছের ডালে, মোটা ফোকড়ওলা ডাল। কাণ্ডে ঠেস দিয়ে ডালে বেশ বসা গেল। রাইফেলটি হাতে তুলে দিয়ে বাগচী চলে গেলেন। ওখান থেকে গুলী ছুড়লে যাবে নিচুমুখে পানে, সঙ্গীদের কাউকে লাগবার ভয় নেই। অনেকক্ষণ বসে রইলাম, তারপর দুটি রাইফেলের আওয়াজ শুনলাম পরপর। সামনে কিছুদূরে গাছের গুঁড়ির ভেতর দিয়ে দেখা গেল একটি হরিণকে, পরপর আর তিনটি। একটির শিঙ বেশ বড়, গায়ের রং প্রায় কালো-হলুদ, কিন্তু কেউ স্থির হয়ে দাঁড়ালো না। চলন্ত জানোয়ার মারা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না; আমি রাইফেল চালানো থেকে বিরত হলাম।

সঙ্গীরা ফিরলেন দুটি হরিণ নিয়ে, দুটিই শিঙেল, একটি বেশ বড়। গাছ থেকে নেমে একত্রে লঞ্চে ফিরে এলে বাগচী শিকারদুটির ছাল ছাড়ালেন, ও-বিদ্যা তাঁর জানা ছিল। চামড়াদুটিতে যথারীতি নুন মাখিয়ে মাংস বড় বড় টুকরো করে হলুদ-তেল মাখিয়ে টাঙিয়ে রাখা হোল। আমাদের লঞ্চের নিকটেই ছিল ছই-দেওয়া এক নৌকো নঙ্গর করে। মাছের নৌকো। মাছ ধরেছে প্রায় ৩০।৪০ মণ, ভেটকি। সেগুলি জীয়নো আছে হাপরে। কিছু হরিণ-মাংসের বদলে আমরা নিলাম বড় দুটি ভেটকি। সেদিন আমাদের মৃগমাংস ও ভেটকি মাছের যে ফিস্ট হয়েছিল, তা ইতি-হাসে লিখে রাখা উচিত। তারপর নিদ্রা।

বৈকালিক চা-পান শেষ করে ছাদে এসে দু-এক দল কার্লু উড়ে গেল মাথার ওপর দিয়ে। কার্লু দেখে আমরা নিয়ে এলাম প্রত্যেকের বন্দুক-কার্তুজ ও প্রতিযোগিতা করে ফেললাম ৫-৬টি। ক্রমে হয়ে এলো অন্ধকার। আমরা আবার নিচে নেমে গিয়ে বন্দুক রেখে রাইফেল নিয়ে এসে বসলাম, শুধু রইল আমার বন্দুকটি। রাত্রে মুখার্জি-দের দেওয়া ·৩১৮ রাইফেল চালানোতে হাত তৈরী হয়নি। অন্ধকার গাঢ় হয়ে এলে লঞ্চের সন্ধানী তেজী বাতি ফেলা হোল, ডাইনে থেকে বাঁয়ে, বাঁয়ে থেকে ডাইনে। আমরা চলেছি 'লক্ষ্মী' খাল দিয়ে। এখানে সেখানে মানুষখেকো বাঘের বিস্তর খবর পাওয়া গেছে, জেলেদের ও কাঠুরেদের মুখে। ডেকের ডাইনে ও বাঁয়ে দুজন করে ভাগ করে বসেছি। ডাইনে মুখার্জি তাঁর ·৪৫০।৪০০ নিয়ে। কিছুটা দূরে ঘোষ তাঁর ·৩৭৫ নিয়ে। বাঁয়ে বাগচী তাঁর ·৪২৩ নিয়ে। আর আমি আমার দোনলা ১২ বোর বন্দুক নিয়ে। আমার বন্দুকে আছে ৩ ইঞ্চি 'রোটাকস্' বুলেটের কার্তুজ। লঞ্চ চলেছে সুতীব্র আলো ফেলে। সূচী-ভেদ্য নিস্তব্ধতা ছিন্ন করে ধ্বনিত হচ্ছে ইঞ্জিনের অবিরাম ধ্বনি। ঘণ্টা-দেড় পরে রাত প্রায় আটটার সময় বাঁদিকের কূলে জ্বলে উঠল পীতাভ-লাল চোখ। ঘণ্টা-সংকেতে বন্ধ করা হোল লঞ্চের গতি।

লঞ্চ এসে ভিড়ল কূলে। তীব্র আলোতে দেখা গেল বাঘ, প্রায় ৫০।৬০ গজ দূরে একটা খোলা বালুময় জায়গায়

বসে, আমাদের দিকে তার বাঁ-পাশ রেখে। লঞ্চ স্থির হয়ে দাঁড়ালো। এবার আমার পালা। আমি উঠে দাঁড়িয়ে অতি নিবিষ্ট-ভাবে বাঘের কাঁধে—ঈষৎ তুলে, টিপ করে গুলী ছুড়লাম। মনে হোল বাঘের গায়ে গুলী লাগার একটা কোমল আওয়াজ শুনলাম। আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে বাঘ দিল একটা লাফ,—অতর্কিত লাফ। তারপর ক্ষিপ্রগতিতে দৌড়ে বাঘ প্রবেশ করল জঙ্গলে। মিঃ লেসি ছিলেন আমার পাশে দাঁড়িয়ে, তিনি আমাকে বাহবা দিয়ে বললেন, আমার গুলি লেগেছে বাঘের গায়ে, গুলী লাগার শব্দ তিনি শুনেছেন ও সেই গুলীবিদ্ধ হওয়ার ফলেই বাঘ সঙ্গে সঙ্গে দিয়েছে অতর্কিত লাফ। ও-বাঘ আমারই শিকার; ঠিক পাওয়া যাবে ওকে। আমার গুলী, লেসি বললেন, লেগেছে ঠিক স্থানে, প্রাণান্তক স্থানে। না হলে অমন তড়িৎস্পৃষ্ট লাফ দিত না। বন্দুক রাইফেলের শুধু আওয়াজে বাঘ ঘাবড়ায় না, আর গায়ের অন্যত্র গুলী লাগলে সাড়া অমন তীব্র হয় না। ও-গুলী নিশ্চয় কাঁধের হাড় গুড়ো করে ঢুকেছে কলজেতে।

মুখার্জি ততক্ষণে এসে পড়লেন আমার কাছে। বললেন, তিনিও স্পষ্ট দেখেছেন আমার গুলী লাগা ও সঙ্গে সঙ্গে বাঘের লাফ। মাথা নেড়ে বললেন, হবে না? নয়ত বলেছে কেন, আনাড়ির মার দুনিয়ার বার। আমরা দুজনেই আনাড়ি, তাঁর গুলীতে পড়েছে কুমীর, আমার গুলীতে বাঘ।

স্থির হোল, রাত্রে ডাঙায় নামা হবে না। বাঘ দৌড়ে ছুটে গেছে, অর্থাৎ তখনও সে জীবন্ত। কলজেতে যদি গুলী বিঁধে থাকে মৃত্যু হতে কিছু সময় লাগতে পারে। অন্যথা সাংঘাতিক আহত হলেও অনেক সময় লাগতে পারে। রাত্রে জঙ্গলে নামা মানে যমালয় যাত্রা। সময় দিলে আঘাতের ফলে, জীবন্ত থাকলেও—শরীর হবে আড়ষ্ট, বলহীন। সে অবস্থায় তার সামনে উপস্থিত হলেও অকস্মাৎ সে অনিষ্ট করতে অক্ষম হবে। সুতরাং জায়গাটা বেশ করে চিহ্ন করে রাখা যাক। কাল দিনের আলোয় খুঁজে বার করা যাবে। বাঘ মারার এই প্রাথমিক সাফল্যের সম্ভাবনায় আমি বিস্মিত হতবাক হয়ে গেলাম।

লঞ্চ আবার চলতে শুরু করল দুদিকে তার তীব্র বাতির আলো ফেলে। কিন্তু বাঘ বা কুমীর আর কোন দেখা গেল না। রাত্রি একটায় নোঙর ফেলা হোল, একটা সুবিধা-মত জায়গা বেছে নিয়ে। সকলে শুয়ে পড়লাম। সকালে চা-পর্ব শেষ করে শুরু হোল লঞ্চ চলানো। চলেছি ফিরে, বাঘ মারার জায়গাটার সন্ধানে। ছাদের ওপর উঠে আমরা গভীর মনোযোগের সঙ্গে নিরীক্ষণ করতে লাগলাম রাতের সেই চিহ্নিত জায়গাটি দেখতে পাওয়ার আশায়। কয়েক ঘণ্টা লঞ্চ চালিয়েও জায়গাটি ঠাহর হোল না। রাতের আলোতে নদীর সমস্ত পাড় যে-রকম দেখিয়েছিল, দিনের আলোয় তার সে-রূপের লেশমাত্র সাক্ষাৎ মিললো না। কতবার বিভ্রম হোল কিন্তু কিছুতেই আসল জায়গাটি পাওয়া গেল না। বার-দুই ঘুরে ঘুরে আমরা লঞ্চ চালিয়ে অন্বেষণ করলাম, কিন্তু বৃথাই হোল সব চেষ্টা। শেষে লঞ্চের মুখ ঘুরিয়ে ক্যানিং ফেরার পথ ধরা গেল। দারুণ অবসাদ ও হতাশা মনকে আচ্ছন্ন করল। পরদিন পৌঁছালাম ক্যানিং-এ। মালপত্র নামিয়ে বন-আপিসে আমাদের শিকারের সংবাদ দাখিল করে, যথাসময়ে ফিরলাম কলকাতায়।

ফেরার দিন-সাতেক পরে বন-বিভাগের একজন রক্ষী বাগচীর সঙ্গে দেখা করল—খবর দিল মরা বাঘটির খবর পাওয়া গেছে। তাদের নিয়মমত নৌকায় তত্ত্বাবধান-কালে গুয়াসবা নদী দিয়ে যেতে শকুনির সমাবেশ দেখে ও তীব্র দুর্গন্ধ পেয়ে ডাঙায় নেমে বাঘটির প্রায় গলে-যাওয়া এক-টুকরো চামড়া ও দু-চারটি নখ অবশিষ্ট আছে দেখতে পায়। যত্ন করে তুলে এনেছে সেগুলি বাগচীকে দেবার জন্য। নিদর্শন-কটি বাগচী সংগ্রহ করেন তাদের কাছ থেকে কিছু পুরস্কারের বিনিময়ে।

সুন্দরবন থেকে ফেরার পর শিকারের নেশা মুখার্জির বেড়ে যায় তীব্রবেগে। তাঁর শিকারের হাত হয়ে উঠলো আমাদের জানার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বীহীন; বিশেষত স্নাইপ ও হাঁস শিকারে।

বিধিলিপির বৈচিত্র্যে অকালে আজ তিনি মৃত্যুশয্যায়! যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি গেলাম হাসপাতালে দেখতে। গৌরাঙ্গ বলল, বাবা বিকারের ঘোরে এইমাত্র আপনার নাম করছিলেন—'ওরে ভশ্চাজ-মশায় আসছেন, বোটের পাটা-টা শক্ত করে ধর, ও'র পা-টা কমজোরি।' মুখার্জি আমায় ভশ্চাজ বলতেন।

গৌরাঙ্গ তার বাবার কানের কাছে মুখ রেখে বারদুই-তিন বলল,—'ভটচাজ-জেঠা এসেছেন তোমায় দেখতে।' রক্তবর্ণ চোখ খুলে মুখার্জি একবার আমার দিকে চাইলেন। তারপর বললেন,—'হবে না ভশ্চাজের বাঘ? ও যে আনাড়ির মার দুনিয়ার বার।'

আধঘণ্টা পরে মুখার্জি চিরনিদ্রায় নিমগ্ন হলেন।

স্বাস্থ্যকে

অটুট রাখবার জন্য আপনার প্রতিদিন দরকার অপরিহার্য

ভিটামিন এবং খনিজ পদার্থ সমূহ

অর্থাৎ



ভিমগ্র্যানের

একটি মাত্র ট্যাবলেট।

ভিমগ্র্যানের একটি মাত্র ট্যাবলেটে ১১ প্রকারের অপরিহার্য ভিটামিন ও ৮ প্রকারের খনিজ পদার্থ রয়েছে।

ভিমগ্র্যানের একটি মাত্র ট্যাবলেট আপনাকে সারা দিন কর্মক্ষম রাখবে। আজই ভিমগ্র্যান কিনুন।

SQUIBB SARABHAI CHEMICALS

® রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক

Shilpi SC 53/67 Ben

ধ্বনির উত্তর প্রতিধ্বনি ॥

শংকর চট্টোপাধ্যায়

একবার সুরু হলেই জানি শেষ পর্যন্ত যাবে
তাই আমার এই আত্মশাসন
তাই ধৈর্যই আমার নাম।
না হয় জালের ফাঁক ফোকরেই শুধু চোখ পাঠানো
সিঁড়ির তলার ধাপে দাঁড়িয়ে বলা 'যাই'।

বালিয়াড়ির বুকে পড়ে থাকা নৌকোগুলো আমাকে জানে
আমি যে তাদের ছায়ায় বসে সারাদিন গান সাধি
আমার যে জলে যাওয়া হয় না, নীলিমায় স্নান
আমার চোখের সামনে দিয়েই নারী পুরুষের যাতায়াত
হৃদয় পণ্যের বেচাকেনা।
আমার আত্মার মুখোমুখি পৃথিবীর যাবতীয় খেলার আয়োজন
আমার যে সুরু হলেই শেষ পর্যন্ত যাওয়া।

কেউ জানেনা ॥

সুশান্ত বসু

ওরা কেমন মনে মনে প্রাসাদ গড়ে উঠে গেল
আরেক উঁচু প্রাসাদ-চূড়ায়
মোরগ-চূড়া দিক চেনালো,
তোমার প্রাসাদ গড়লে তুমি চোখের জলে? অন্ধকারে!
রাত নাচানো হ্যারিকেনের চিম্‌নী-ধূসর ভালোবাসায়?
চোখের জলের সেতুবন্ধ দুটি বুকের?
মধ্যে নদী নিরবধি যোজনপ্রমাণ—
কেউ জানেনা, কেউ জানেনা!

তুমি বুকের মধ্যিখানে অভিমানে
বালক-হেন দুঃখ পুষে
ভেবেছ ওই ডুমুর গাছে ফুল ফুটিয়ে
জ্বালবে আলো চতুর্ধারে
কিন্তু হঠাৎ ঘোর কালো রাত চুল মেলেছে
বুকে যতই আগুন জ্বালো
অভিশাপের মন্ত্র আছে কলকাতার এই ধুলোর কাছে,
আলো জ্বলে না, প্রাসাদ কোথায়? চোখের জলের মিথ্যে প্রাসাদ?
কেউ জানেনা, কেউ জানেনা!

মধ্যবেলায় অবহেলায়
ট্রামের লাইন শব্দবিহীন স্তব্ধতাকে
পাঠিয়ে দিল বুকে তোমার, দীর্ঘ মিছিল মন্ত্রণাতে
তোমার বুকে মলম লেপে, তোমার কলম বুকের মধ্যে
শব্দ লেখে, কিন্তু সে সব শব্দ কোথায় হঠাৎ হারায়
কেউ জানেনা, কেউ জানেনা!

ওরা কেমন স্বয়ংবৃত বিবর থেকে
অভিজ্ঞানের পত্র হাতে
সাজিয়েছে ঘর, তোমার সে স্বর
ফাটা রেকর্ড যেন করুণ আর্তনাদে
শূন্যতাকে দীর্ণ করে, তোমার ঘরে
প্রতিধ্বনি কেবল বাজে, ঘর কি তোমার?
ভালোবাসার উথালপাতাল
ঘর যে তোমার চোখের জলের, কেউ জানেনা, কেউ জানেনা!



তস্য তস্য অথবা সূর্য কাঁদলে সোনা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আরও আশ্চর্য অবিশ্বাস্য এমন তথ্যও আছে যা সমস্ত তর্ক একেবারে গুলিয়ে দেয়।

উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা নিয়ে নতুন অজানা মহাদেশ কলম্বসই প্রথম আবিষ্কার করেন আমরা জানি। তার আগে এশিয়া ইওরোপে নতুন মহাদেশ সম্বন্ধে কোনো বিশ্বাসযোগ্য প্রামাণিক উল্লেখ কোথাও নেই। এশিয়া ইওরোপ আফ্রিকা নিয়ে যে সংযুক্ত মহাভূবিস্তার, গৌরাঙ্গ অসামান্য কয়েকটি মানুষের আকস্মিক আবির্ভাব সম্বন্ধে কিছু অস্পষ্ট কিংবদন্তী ছাড়া তার সংগে নতুন মহাদেশের যোগাযোগের কোনো চিহ্ন স্বভাবতঃই কোথাও দেখা যায় নি। প্রথম বীজ প্রাচীন মহাদেশ থেকে পেলেও নতুন মহাদেশ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন আর স্বতন্ত্র হয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী কাটিয়েছে এই সিদ্ধান্তই ছিল সন্দেহাতীত।

হঠাৎ সে সিদ্ধান্তের ভিৎও অপ্রত্যাশিত-ভাবে নাড়া খেয়েছে।

বেশী দিনের কথা নয়। উনিশশো বাহান্ন খৃস্টাব্দ। পেরুর এক অখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক দানিয়েল রুথো এক আজগুবি কিংবদন্তী অনুসরণ করেই আণ্ডিজের মার্কাহাউ'স প্লেটো নামে এক দুর্গম মালভূমিতে যাবার চড়াই ভাঙছেন। যে কিংবদন্তী তাঁকে নাচিয়েছে তা হল এই যে পেরু অভিযাত্রী স্প্যানিশ বাহিনী নাকি কোন এক দুর্গম গোপন অধিত্যকায় নানা মানুষ ও পশুর বিরাট মূর্তি তাদের যাত্রাপথে দেখেছিল।

একটিমাত্র অত্যন্ত দুরারোহ গিরিবর্ত্ম দিয়ে মার্কাহাউসি প্লেটোতে পৌঁছোন যায়। সে গিরিপথ দেখেই দানিয়েল রুথো বুঝলেন যে তা মানুষের হাতে তৈরী। প্লেটোতে যাবার রাস্তা পাহাড়ের ভেতর দিয়ে যারা কেটে তৈরী করেছিল তারা রাস্তার ধারে ধারে পাহাড়ের দেয়ালে সব বড় বড় খোপও রেখেছে শত্রু কেউ আক্রমণ করলে পাথর ছুঁড়ে রোখবার জন্যে।

এই মালভূমিতে যাদের প্রাচীন বসতির চিহ্ন রুথো আবিষ্কার করেন তারা ইংকাদেরও বহু আগেকার মানুষ। গোপন এই প্লেটোতে তারা বারোটি কৃত্রিম হ্রদ বানিয়েছিল জল জমিয়ে রাখার জন্যে, সেচের জন্যে প্রকাণ্ড ও সুড়ঙ্গ নালা কেটেছিল আর যা করেছিল সেইটেই সবচেয়ে অবিশ্বাস্য।

তারা পাহাড়ের গায়ে অদ্ভুত রহস্যময় এমন সব মূর্তি গড়েছিল যা নতুন মহাদেশের পক্ষে সত্যিই কল্পনাতীত।

মূর্তিগুলির একটি হল বিরাট এক কাফ্রীর মুখ।

নতুন মহাদেশে কাফ্রী জাতির প্রথম পদার্পণ ঘটেছে কলম্বসের আবিষ্কারের বেশ কিছু পরে ক্রীতদাস হিসাবে। সে আমদানিও হয়েছে কিউবা হিসপানিওলার মত দ্বীপে। প্রাচীন মহাদেশের প্রায় অগম্য দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম প্রান্তে আণ্ডিজ পাহাড়ের গুপ্ত মালভূমিতে কাফ্রী কোথা থেকে আসবে? তাও কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কারের কমপক্ষে পাঁচ ছ' শতাব্দী আগে!

কাফ্রীর মাথার সঙ্গে মূর্তিটির সাদৃশ্য যদি কিছুটা কাল্পনিক বলেও ধরা হয় তাহলেও অন্য ভাস্কর্যগুলি সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। সেগুলি হাতী ঘোড়া ও গরু ও উটের।

কলম্বসের আবিষ্কারের আগে এসব প্রাণীর সঙ্গে আমেরিকার কোনো পরিচয় ছিল না।

এসব প্রাণীর মূর্তি কারা তাহলে গড়েছে? চাক্ষুষ পরিচয় না থাকলে এ ধরনের মূর্তি গড়া ত সম্ভব নয়। সে পরিচয় যাদের ছিল এমন এক জাতি এই দুর্গম কৃত্রিম গিরিপথ দিয়ে আগলানো গোপন মালভূমিতে কোথা থেকে এসে বসতি করেছিল?

না, পেরুর হেঁয়ালী শুধু একটু ভৌগোলিক [illegible] নয়।

'সূর্য কাঁদলে সোনা'র এই হেঁয়ালীর দেশে পোনেরো শ' একত্রিশ খৃস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে পিজারো তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে পানামা উপসাগর থেকে তৃতীয়বারের অভিযানে পাড়ি দিলেন।

দু দুবারের মত এ অভিযানও কি ব্যর্থ হবে?

তৃতীয় অভিযানেও পিজারো তিনটি জাহাজ নিয়ে রওনা হন। তবে এবারের জাহাজগুলি আগেকার চেয়ে মজবুত ও বড়। মাঝিমাল্লা লোকলস্কর কাউন্সিল অফ ইণ্ডিজ-এর চাহিদামাফিক না হলেও খুব অল্প নয়। সবশুদ্ধ তিনটি জাহাজে একশ আশিজন লোক আর সাতাশটি সওয়ার

সেপাই বাহিনীর ঘোড়া। অস্ত্রশস্ত্র গুলি-বারুদের পরিমাণও এবার একটু বেশী।

কিন্তু বেশী হলেও সবশুদ্ধ জড়িয়ে তিনটে জাহাজে ওই ত মাত্র একশ আশিজন মানুষ আর সাতাশটা ঘোড়া। তাই দিয়ে যে রাজ্য জয় করতে যাচ্ছেন উত্তর-দক্ষিণে তা লম্বাই ত দু'হাজার মাইলের বেশী! তখনকার পেরু সাম্রাজ্য উত্তরে এখনকার ইকোয়েডরের কুইটো থেকে বলিভিয়ার উঁচু পাহাড়ী ডাঙা আর আর্জেন্টিনার উত্তর-পশ্চিম অংশ নিয়ে চিলির মাউলে নদী পর্যন্ত ছড়িয়ে সত্যিই দু'হাজার মাইলের অনেক বেশী লম্বা ছিল।

ওই কটা সেপাই আর ঘোড়া নিয়ে সেই পেরুর মত বিশাল সাম্রাজ্য জয় করার কথা ভাবা মোচার খোলায় সাগর পার হওয়ার কথা ভাবার মতই হাস্যকর আজগুবি দিবাস্বপ্ন।

কিন্তু পিজারোর আত্মবিশ্বাস প্রায় উন্মত্ততারই সামিল। দু-দুবার ব্যর্থতার পর প্রৌঢ় বয়সে অদম্য উৎসাহে তিনি আবার সেই অসাধ্যসাধনের আশায় পাড়ি দিয়েছেন।

পিজারোর ইচ্ছা ছিল প্রথমেই আর কোথাও জাহাজ না ধরে একেবারে টাম্বেথ বন্দরে গিয়ে জাহাজ ভেড়ানো। কিন্তু প্রতিকূল হাওয়ায় আর স্রোতে সম্ভব হয় না। তের দিন সমুদ্রযাত্রার পর পিজারোকে নৌবাহিনী নিয়ে টাম্বেথ-এর অনেক আগেই জাহাজ ভেড়াতে হয়। সেখান থেকে তিনি সৈন্য-সামন্ত নিয়ে হাঁটাপথে যাত্রা সুরু করেন আর জাহাজ তিনটিকে বলা হয় সমুদ্রপথে তাঁদের সংগী হতে।

অজানা দুর্গম দেশ। আণ্ডিজ পাহাড়ের নদীতে শীতের দিনেই ঢল নামে। সেই ঢল নেমে নদীগুলি ফুলে ফেঁপে দুস্তর হয়ে উঠেছে। লোকলস্করের হয়রানি আর দুর্দশার সীমা নেই। সোনার লোভ আর পিজারোর আশ্চর্য দৃষ্টান্ত চোখের সামনে না থাকলে কজন এই অভিযানে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকত বলা কঠিন।

পিজারো সত্যিই যেন দানোয় পাওয়া মানুষ। পিজারোর জন্মতারিখ নিয়ে অনেক গোলমাল আছে সত্যি কিন্তু তৃতীয় অভিযানের সময় তাঁর বয়স যে পঞ্চাশ ছাড়িয়ে প্রায় ষাটের কাছে পৌঁছেছে এবিষয়ে মতভেদ নেই। প্রায় ষাট বছরের এই বুড়ো সেদিন শক্ত-সমর্থ জোয়ানদের লজ্জা দিয়েছেন। তাঁর শ্রান্তি ক্লান্তি হতাশা বলে কিছু নেই। দরকার হলে ক্ষিদে-তেষ্টা সব তিনি জয় করতে পারেন। শত্রুরা যেমন, অসুখ-বিসুখও তেমনি তাঁকে এড়িয়ে চলে।

এই ফ্রান্সিসকো পিজারোর দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে সৈন্যেরাও অসাধ্য সাধন করে। অসাধ্য সাধন অবশ্য নিজেদের চেয়ে সংখ্যায় অনেক গুণ বেশী দেশোয়ালীদের মারকাট আর লুটতরাজ।

নতুন মহাদেশে গৌরাংগ আগন্তুকদের সম্বন্ধে সাধারণ অধিবাসীদের ধারণা তখনই পাল্টাতে সুরু করেছে। এর আগের বার অজানা শ্বেতাঙ্গ এই বিদেশীদের লোকে দেবতার মত অভ্যর্থনা করেছে। এবারে সেই দেবতার আসল পরিচয় ধরা পড়ে গেছে অনেকের কাছেই।

হাঁটাপথে পাড়ি দেবার কিছুদিন বাদেই প্রথম যে আধাশহর তাদের সামনে পড়ে পিজারোর বাহিনী তা লুটেপুটে ছারখার করে। শহরের লোকেদের কাছে ব্যাপারটা তখনও কল্পনাতীত। কারুর কোন ক্ষতি তারা যখন করেনি তখন তাদের ভয় করবার কিছু নেই এই বিশ্বাসে তারা সরল আন্তরিকতার সংগে গৌরাংগ বিদেশীদের তাদের বসতিতে স্বাগত জানায়। কিন্তু বিদেশীরা এ প্রীতির জবাব দেয় খোলা তলোয়ার নিয়ে তাদের তাড়া করে তাদের ঘরবাড়ির যা কিছু সব লুটেপুটে নিয়ে।

এই আধাশহরেই পিজারোর লোক-লস্করেরা প্রথম নুড়ি পাথরের মত এক মণিরত্নের ছড়াছড়ি দেখে। এ মণিরত্ন হল পান্না।

পিজারোর দলে হিডালগো অর্থাৎ বড় ঘরের ছেলে কিছু ছিল না এমন নয়। কিন্তু তারাও বেশীর ভাগ 'ঘটি ডোবে না নামে তালপুকুর' গোছের পড়ে-আসা বংশের দুলাল, তাও বাপে খেদানো মায়ে তাড়ানো। তারা বা বাকি সব নেহাৎ নিচু ঘরের ডান-পিটে মুখ্যুখু গোঁয়ারবা পান্নার মর্ম কি বুঝবে। পায়রার ডিমের মত একটা অমূল্য পান্না তারা এই শহরেই পায়। সে পান্না তারা হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে ভেঙেছিল। ভেঙেছিল আবার এক পাদ্রীর কথায়। পাদ্রীবাবা সকলকে বুঝিয়েছিলেন যে পান্না সাচ্চা কি ঝুটো তা বোঝবার পরীক্ষাই নাকি হাতুড়ি দিয়ে পেটানো। সাচ্চা পান্না নাকি হাতুড়ি দিয়ে পিটেও ভাঙা যায় না। পাদ্রীবাবার এই পরামর্শ শুনেই পৃথিবীর অমূল্য একটি রত্ন নষ্ট হয়ে গেছে।

অমূল্য রত্ন মানে পায়রার ডিমের মত একটা পান্না!—এতক্ষণ বাদে খোঁচা দেবার এ সুযোগটুকু মর্মরের মত মস্তক যাঁর মসৃণ সেই শিবপদবাবু ছাড়লেন না—তা, সে অপরূপ পান্নার ভাঙা টুকরোগুলো কেউ কুড়িয়ে রেখেছিল বোধহয়! নইলে পায়রার না ঘোড়ার ডিম জানা গেল কি করে?

কি করে জানা গেল?—দাসমশাই অবোধকে জ্ঞান দিতে করুণার হাসি হাসলেন,—জানা গেল, রিলেথিওনেস দেল দেশোকিউব্রিমিয়েন্তো ঈ কনকুইস্তা দে লস রেনস দেল পেরু-র দৌলতে।

শিবপদবাবু ভুরু কুঁচকে কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন। তাঁকে সে সুযোগ না দিয়ে দাসমশাই আবার বললেন—না এস-পানিওল-এর বিদ্যে জাহির করছি মনে করবেন না। শুধু সে যুগের চাক্ষুষ দেখা একটি বিবরণের নাম বলছি। যিনি এ বিবরণ লিখে গেছেন তাঁর নাম পেড্রো পিজারো। পিজারো পদবী দেখে যা মনে হয় তা কিন্তু ভুল। তিনি ফ্রান্সিসকো পিজারোর আপন বা সতাতো ভাইটাই কেউ নয়। পিজারোদের জন্মস্থান এসট্রেমাদুরা প্রদেশের টোলে-ডোতেই অবশ্য তিনি জন্মেছেন আর খুঁজলে তাদের সংগে দূরসম্পর্কের একটা জ্ঞাতিত্ব হয়ত পাওয়া যেতে পারে। পেড্রো পিজারো পোনেরো বছর বয়সেই ফ্রান্সিসকো পিজারোর খাস অনুচর হিসেবে তাঁর তৃতীয় অভিযানে যোগ দেন। পেরু-বিজয়ের প্রায় সমস্ত বড় বড় ঘটনাতেই তিনি উপস্থিত ছিলেন। পেরু অভিযানের নেতা ফ্রান্সিসকো তাঁকে বিশ্বাস করে অনেক কঠিন দুঃসাহসিক কাজের ভার দিয়েছেন। পেড্রো সে সমস্ত কাজে তাঁর বিচক্ষণতা ও যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছেন। নেতার বিশ্বাসের অমর্যাদা কখনো করেননি। সম্পদে বিপদে সৌভাগ্যে আর ভাগ্য-বিপর্যয়ে তিনি সমানভাবে ফ্রান্সিসকো পিজারোর অনুগত থেকেছেন। নিজের ধন-প্রাণ রক্ষা করতেও তাঁর বিরুদ্ধে নেমক-হারামী কখনো করেন নি।

পেড্রো পিজারো সম্বন্ধে এত কথা বলার কারণ এই যে, প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে যে বিবরণ তিনি রেখে গেছেন, 'সূর্য কাঁদলে সোনা'-র দেশ আবিষ্কার ও অধিকারের যথার্থ বৃত্তান্ত সংগ্রহের ব্যাপারে তা অমূল্য। পেড্রো পিজারো এ বিবরণে নিজের ঢাক পেটবার চেষ্টা কোথাও করেন নি। নিজের কথা যেখানে বলতে হয়েছে সেখানে তিনি উত্তম পুরুষের 'আমি'র বদলে প্রথম পুরুষের 'সে' ব্যবহার করেছেন। দেখবার চোখ ও বর্ণনার ক্ষমতার সংগে আন্তরিকতা ও সততা মিশে তাঁর বিবরণটিকে অত্যন্ত দামী করে তুলেছে।

এই অমূল্য বিবরণটিও কিন্তু প্রায় হারাতে বসেছিল। এ বিবরণের হাতে লেখা একটিমাত্র পাণ্ডুলিপির কথা সেই ষোড়শ শতাব্দীর পর বহুদিন পর্যন্ত বিশেষ কারুর মনেই ছিল না। শখানেক বছর আগে সেনিয়র দে নাভারেতের হাতে পড়বার পর মাদ্রিদ থেকে এটি ছাপাবার ব্যবস্থা হয়।

এ বিবরণ থেকে শুধু পায়রার ডিমের মত পান্নার কথাই নয় পেরু-অভিযানের আরো অনেক ঘটনার উজ্জ্বল বর্ণনা পাই।

অমূল্য একটি পান্না মূর্খের মত ভেঙে নষ্ট করলেও পিজারোর লোকলস্কর লুটপাট করে যা পেয়েছিল তা প্রচুর। ফ্রান্সিসকো পিজারো তার বাহিনীর লোকেদের লুটপাট করায় বাধা তখন দেন নি। কিন্তু তাঁর একটি অলঙ্ঘ্য আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে সকলকে বাধ্য করেছেন। সে আদেশ হল এই যে যেখান থেকে যা কিছুই লুণ্ঠিত হোক সমস্ত পিজারোর সামনে এক জায়গায় জড় করতে হবে। লুটের মাল পিজারো নিজে তারপর ভাগ করে দেবেন।

লুটের মালের পাঁচ ভাগের এক ভাগ পিজারো বরাদ্দ করেছিলেন স্পেনের সম্রাটের জন্যে, বাকি চার ভাগ নির্দিষ্ট ছিল পদমর্যাদা অনুযায়ী তাঁদের সকলের জন্যে। এ আদেশ অমান্য করার শাস্তি ছিল ছোট-খাট কিছু নয় একেবারে প্রাণদণ্ড।

এই কড়া বিধানে আর যাই হোক লুট নিয়ে নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি পিজারোর বাহিনীতে বন্ধ হয়েছে।

লুটের মাল ভাগ বাঁটোয়ারার পর পিজারো প্রথমেই স্পেন সম্রাটের বরাদ্দ পানামায় পাঠাবার ব্যবস্থা করেছেন। সম্রাটের জন্যে যা পাঠানো হয়েছে তা

সামান্য কিছু নয়। পেড্রো পিজারো লিখে গেছেন যে সে সওগাতের দাম কমপক্ষে বিশ হাজার কাস্তেলানো। কাস্তেলানো হল প্রাচীন স্প্যানিশ স্বর্ণমুদ্রা। ওজনে ত্রিশ রতির কম নয়।

এই সওগাত পাঠাবার পেছনে রাজভক্তি ছাড়া একটু কূটবুদ্ধিও ছিল। সেভিল থেকে জাহাজ নিয়ে পালিয়ে আসতে পারলেও শত্রুদের তাঁর বিরুদ্ধে রাজদরবারে গুঞ্জন তোলবার সুযোগ তিনি দিয়ে এসেছেন। সম্রাটের নামে এই ধনরত্নের ভেট পৌঁছোলে সে গুঞ্জনই শুধু বন্ধ হবে না তাঁর অভিযান সম্বন্ধে যারা বিরূপ কি উদাসীন ছিল এতদিন তারাও নতুন উৎসাহ পেয়ে হয়ত যোগ দিতে পারে।

পিজারোর হিসাবের ভুল হয়নি। নিজে সৈন্যসামন্ত নিয়ে হাঁটাপথে রওনা হয়ে এবার তিনটি জাহাজই তিনি পানামায় ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কিছুদূর অগ্রসর হবার পর একটি জাহাজ পানামা থেকে ফিরে তাঁদের সঙ্গে ধরেছে। সে জাহাজে রাজখাজাঞ্চী ভীডর অর্থাৎ পরিদর্শক ইত্যাদি নিয়ে স্পেন রাজ্যের বেশ কয়েকজন বড় আমলাই ছিলেন। সেভিল থেকে এঁদের সঙ্গে আনবারই কথা। কাউন্সিল অফ ইন্ডিজের চোখে ধুলো দিতে অমন লুকিয়ে পালাবার দরুণই তা সম্ভব হয়নি।

রাজপ্রতিনিধিরা এখন বেশ প্রসন্নমনেই পিজারোর অভিযানে যোগ দিয়েছেন। আরো কিছুটা এগিয়ে পুয়ের্তো ভিয়েখো অর্থাৎ ভিয়েথো বন্দর পর্যন্ত পৌঁছোবার দ্বিতীয় একটি জাহাজও বেলালকাজার বলে একজন সেনাপতির অধীনে নতুন জনত্রিশ সৈন্য নিয়ে তাঁদের সঙ্গে ভিড়েছে।

দলে একটু ভারী হলেও পিজারোকে এবার বেগ পেতে হয়েছে অজানা দেশের লোকের শত্রুতার জন্যে। পিজারোর বাহিনীর লোকেদের কীর্তিকলাপের খবর তাদের আগে হাওয়ায় ছড়িয়ে গেছে। এই শাদা চামড়ার মানুষগুলো যে দেবতা নয় দানব সমুদ্র-উপকূলের শহরে গ্রামে কারুর জানতে বোধহয় তখন বাকি নেই।

পিজারোর দলকে আগের বারের মত অভ্যর্থনা করতে কেউ এগিয়ে আসেনি। যেখানেই তারা গেছে হয় লোকেরা যা কিছু সম্ভব নিয়ে ঘরদোর ছেড়ে বনে গিয়ে লুকিয়েছে কিংবা প্রাণপণে তাদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বাধা দিয়েছে।

পিজারোর প্রথম লক্ষ্য হল টাম্বেজ। সে শহরে পৌঁছোবার আগে কিন্তু অনেক বিপদ তাঁকে কাটাতে হয়েছে।

টাম্বেজ শহরে যেতে ছোট্ট একটি উপসাগর পথে পড়ে। নাম ওয়াকুইল উপসাগর। সেখানে পুনা বলে ছোট্ট একটি দ্বীপের সর্দারের নিমন্ত্রণে বর্ষাকালটা কাটাতে গিয়ে পিজারো সমস্ত বাহিনী সমেত প্রায় ধ্বংস হতে বসেছিলেন।

পুনা দ্বীপের লোকেদের সঙ্গে পেরুর ইংকাদের প্রজাদের ঝগড়া। এই ঝগড়ার সুযোগ নিয়ে পুনাবাসীদের নিজের কাজে লাগাবার ফন্দি কিন্তু সফল হয়নি। পিজারোর বাহিনীর লোকেদের নির্মমতা ও কপটতায় ক্ষেপে উঠে পুনার অধিবাসীরা একদিন তাদের আক্রমণ করেছে।

শরীরের বর্ম লম্বা বল্লম আর বন্দুকের জোরে কোনোরকমে সে আক্রমণ ঠেকালেও পুনা দ্বীপে থাকা পিজারোর পক্ষে সর্বনাশা হয়েছে। সম্মুখ যুদ্ধে গুলি-বারুদের সামনে দাঁড়াতে না পেরে জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নিয়েও পুনার লোকেরা তাদের শত্রুতা ত্যাগ করে নি। রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে হানা দিয়ে তারা পিজারোবাহিনীর রসদ নষ্ট করেছে, দলছাড়াভাবে বাগে পেলে নিকেশ করে দিয়েছে।

এই দুর্দিনে পানামা থেকে আরো শ'খানেক নতুন সেপাই আর কিছু ঘোড়াসমেত দুটি জাহাজ এসে পৌঁছোবার দরুন পিজারো ধড়ে প্রাণ পেয়েছেন।

এই নতুন সেনাদল যাঁর অধীনে এসেছে তাঁর নাম হার্নান্ডো দে সটো—পেরু অভিযানে অবজ্ঞা করবার মত না হলেও এ নাম স্মরণীয় হয়ে আছে আরো একটি বড় কীর্তির জন্যে। সে কীর্তি হল উত্তর আমেরিকার মিসিসিপি নদী আবিষ্কার। সেই মিসিসিপির তীরেই তাঁর সমাধি বহুকাল তাঁর অক্ষয় কীর্তি ঘোষণা করেছে।

হার্নান্ডো দে সটো নতুন সৈন্যসামন্ত সমেত দুটি জাহাজ নিয়ে আসার পর পিজারো তাঁর পক্ষে অভিশপ্ত পুনা-দ্বীপ ছেড়ে আবার পেরুর উপকূলে গিয়ে উঠেছেন। সেই উপকূলের থেকে টাম্বেজ পর্যন্ত পৌঁছোনো অবধি দুর্ভাগ্য তাঁকে একেবারে ত্যাগ করেনি। পুনা দ্বীপ থেকে উপকূলে নামবার সময়েই একটি ছোট দল একলা পড়ে গিয়ে শত্রুদের হাতে মারা পড়েছে। টাম্বেজ শহরে পর্যন্ত এবারে পিজারো প্রথমে সম্পূর্ণ ভিন্ন অভ্যর্থনা পেয়েছেন।

আগের বার যে টাম্বেজ শহরের সুখ-শান্তি ঐশ্বর্য দেখে তাঁরা মুগ্ধ বিস্মিত মনে ফিরে গিয়েছিলেন, সে শহর এখন যেন শ্মশান। লোকজন ত শহরে নেই-ই, তার ওপর দু-চারটি ছাড়া সমস্ত বাড়িঘরও সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে।

বৃথাই এ দুর্দশার যথার্থ কারণ জানবার চেষ্টা করেছেন পিজারো। টাম্বেজের কুরাকা অর্থাৎ শাসকও শহর ছেড়ে পালিয়েছিল। কোনরকমে তাকে ধরে আনবার ব্যবস্থা হয়েছে। কুরাকা যা বলেছে তাকে বিশ্বাস করা পিজারোর পক্ষে সম্ভব হয়নি। পুনা-দ্বীপের অধিবাসীরাই অতর্কিত আক্রমণ করে টাম্বেজের এই দুর্দশা করেছে বলে বোঝাতে চেয়েছে কুরাকা।

টাম্বেজ শহরে যে দুজন প্রতিনিধি পিজারো রেখে গিয়েছিলেন এবারে ফিরে এসে তাদের আর দেখতে পাননি। অদের নিশ্চিহ্ন হওয়ার ব্যাপারেও উল্টোপাল্টা নানা কথা শোনা গেছে।

কেউ বলেছে, তারা মারা গেছে মহামারীতে, কেউ বলেছে, পুনার লোকেদের সঙ্গে লড়াই-এ। দু-একজন ভয়ে ভয়ে জানিয়েছে যে, মেয়েদের ইজ্জৎ নষ্ট করবার চেষ্টায় দরুণই তাদের প্রাণ হারাতে হয়েছে।

শেষের ব্যাখ্যাটাই ঠিক মনে হলেও পিজারো রক্তের বদলে রক্ত চেয়ে এবার কাউকে সাজা দেবার ব্যবস্থা করেন নি। নিঃশব্দে সমস্ত ব্যাপারটা যেন হজম করে নিয়েছেন।

এ দেশের মানুষ সম্বন্ধে পিজারোকে তাঁর নীতিই হঠাৎ বদলে ফেলতে দেখা গেছে এর পর। আর কারণে-অকারণে মার কাট জুলুম জবরদস্তি লুট নয়, একেবারে প্রাণপণ সুনীচ ভদ্র ভদ্রোচিত সহিষ্ণু হতে হবে সকলকে। বাহিনীর প্রত্যেকটি সৈনিকের ওপর এই আদেশ।

হঠাৎ এ পরিবর্তন কেমন করে হল?

এ কি মনেরই পরিবর্তন না শুদ্ধ নীতির?

পরিবর্তন যে রকমই হোক, তার মূলে কিছু একটা ব্যাপার নিশ্চয় আছে। কি সে ব্যাপার? একটি নতুন মানুষের আমদানি?

সেই মানুষ কি হার্নান্ডো দে সটো স্বয়ং? না। হার্নান্ডো দে সটোর অধীনে দুটি জাহাজে শুধু ঘোড়া আর সোনা সন্ধানী সেপাই ছাড়া আরো একটি মানুষ এসেছেন।

পানামা থেকে ১৫৩১-এর জানুয়ারীতে সুদূর কাদলে সোনার দেশের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেবার সময় পিজারোর কোনো জাহাজে তিনি ছিলেন না।

(ক্রমশঃ)



কলকাতায় প্রথম অনাথ আশ্রম

অনাথ পাল

এমন যশ, মান ও প্রতিপত্তি লাভের জন্য কোনদিনই লালায়িত ছিলেন না প্রাণকৃষ্ণ দত্ত। তাঁর প্রাণ ছিল যেমন কোমল তেমনি সরল এবং মনটি ছিল উদার ও মহৎ।

১৮৯২ খৃঃ তিনি অনাথ, গৃহহারা ও সমাজের চোখে হেয় ছেলেমেয়েদের অপরিসীম দুঃখ মোচন ও তাদের আশ্রয় দেবার উদ্দেশ্যে কলকাতায় প্রথম অনাথ আশ্রম স্থাপন করেন। দরিদ্রের দুঃখকষ্ট মোচনের ইচ্ছা ছেলেবেলা থেকেই তাঁর হৃদয়ে প্রবল ছিল। তিনি মনে করতেন দরিদ্রের সেবাই ভগবানের সেবা। তাঁর গুণবতী পত্নী কান্তমণি দত্ত ছিলেন এই কল্যাণমূলক কাজের প্রাণস্বরূপ। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, সাধ্বী পত্নী কান্তমণি দত্তের চেষ্টা ও যত্নে তিনি এই মহৎ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন।

সাধারণ মানুষ তার নিজের দুঃখ ও অবমাননা দেখে যে ব্যথা অনুভব করে, অপরের বেদনা বা গ্লানি দেখে ততটা ব্যথা অনুভব করে না। করলেও তা ক্ষণস্থায়ী। নিজের দুঃকষ্ট দূর করবার জন্য আমাদের যে আন্তরিক প্রচেষ্টা, অপরের দুঃখ দূর করবার জন্য ঠিক ততখানি থাকে না। কিন্তু প্রাণকৃষ্ণ দত্ত ছিলেন এর সম্পূর্ণ বিপরীত। পরের দুঃখ দূর করা ও সেবা করাই ছিল তাঁর জীবনব্রত। ১৮৯২ খৃঃ মাত্র তিনটি অনাথ শিশু নিয়ে এই আশ্রমের কাজ আরম্ভ হয়। ১৯১১ খৃঃ মধ্যে এই আশ্রমের আশ্রিতের সংখ্যা ৩ থেকে ৭৬-এ দাঁড়ায়। এর মধ্যে ছেলের সংখ্যা ৪৫ ও মেয়ের সংখ্যা ছিল ৩১।

ক্ষুধিতকে অন্নদান ও অনাশ্রিতকে আশ্রয় দান—আশ্রমের অন্যতম উদ্দেশ্য হলেও মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান, বাণিজ্য ইত্যাদি নানা বিষয়ে শিক্ষাদান ও ছেলেদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি—এক কথায় 'মানুষ করা' যাতে তারা নিজেদের জীবন উচ্চ আদর্শে গড়ে তুলতে পারে।

আশ্রমের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার জন্য শিক্ষক ও শিক্ষিকা নিয়োগ করা হয়েছিল। প্রতিদিন বেলা ১১টা থেকে ৪টা পর্যন্ত ক্লাস নিতেন। মেয়েদের শিক্ষার ভার প্রথমে একজন পণ্ডিত ও পরে সম্ভ্রান্ত ঘরের একজন সুশিক্ষিতা বিধবা ভদ্রমহিলার ওপর অর্পণ করা হয়। এই ভদ্রমহিলা মেয়েদের শারীরিক উন্নতির দিকে যেমন দৃষ্টি রাখতেন তেমনি তারা যাতে প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে, সেদিকেও প্রখর দৃষ্টি রাখতেন। মেয়েদের সমবেত প্রার্থনা হোত প্রতিদিন সকালে। প্রার্থনা শেষে হোত জলযোগ, আশ্রমের কাজকর্ম ও খাওয়া-দাওয়া শেষ করে প্রতিদিন বেলা ১টা থেকে ৪টা অবধি মেয়েদের নানা বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। বিভিন্ন প্রকার সেলাই শেখাতেন। অপেক্ষাকৃত বয়স্কা মেয়েদের ওপর রান্না করবার ভার থাকতো। তাদেরও লেখাপড়া, সেলাই ও কারুকার্য প্রভৃতির সঙ্গে গৃহকার্যও সুন্দরভাবে শেখান হোত। যে সব মেয়েরা আশ্রয় ও শিক্ষার অভাবে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতে বাধ্য হোত কিংবা অসৎ সংসর্গে পড়ে সমাজের অতি নিম্নস্তরে নেমে গিয়ে অসামাজিক জীবনযাপন করতে বাধ্য হোত, এই আশ্রমে বসবাস করে, তত্ত্বাবধায়িকার স্নেহ ও ভালবাসায় তাদের আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটেছিল। তাদের বিনীত, বাধ্য ও নম্র স্বভাব তদানীন্তন সমাজকে মুগ্ধ করেছিল।

এই মহিলার স্নেহ ও ভালবাসা পেয়ে তারা যেমন দিনে দিনে উন্নতির পথে এগিয়ে গিয়েছিল, তেমনি তাঁর প্রতি মেয়েদের আন্তরিক ভালবাসায় সেকালের বহু ব্যক্তি ছিলেন অভিভূত ও বিস্মিত। নিরাশ্রয়, অন্নাভাবে শীর্ণ অনাথ মেয়েরা তাঁর আদর ও যত্নে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে প্রকৃত 'মা' বলে ভাবতো ও 'মা' বলে ডেকে নিজেরাই আনন্দ লাভ করতো।

বর্তমানে বহু সদাশয় ব্যক্তি, সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় আমাদের দেশে কয়েকটি অনাথ আশ্রম গড়ে উঠেছে। বহু অনাথ ছেলেমেয়ে এই সব আশ্রমে থেকে আশ্রমের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। শিক্ষা লাভ করে সুখের গৃহস্থালী বেছে নিয়েছে অনেক মেয়ে। ছেলেরা নানা শিল্পে জ্ঞান লাভ করে অফিসে, কলকারখানায় কাজ করছে।



সাহিত্য ও সংস্কৃতি

স্বপ্নবিলাসী ইয়েটস্

এই সংসারে যাঁরা পাবলিক মেন এবং প্রচারবিদ হিসাবে খ্যাত তাঁদের বাক্যাবলী উত্তাপময় হাওয়ায় ঠাসা। এই ধরনের ভাষা পরিস্কার চিন্তার পক্ষে বিঘ্নকর। ডবলিউ বি ইয়েটস যে এই জাতীয় বাক্যকে 'বেস ইডিয়ম' বলে ঘৃণা প্রকাশ করবেন তাতে বিস্ময়ের কিছুই নেই। তবে এই ঘৃণার পিছনে আছে তাঁর নিজস্ব যুক্তি। যুক্তিগ্রাহ্য চিন্তাই যে তাঁর কাছে একমাত্র প্রশংসনীয় বস্তু তা নয়, কারণ সাংবাদিকদের প্রতি এবং যুক্তিবাদীদের ওপর তাঁর সমান অনীহা। ইয়েটসের অভিযোগ এই যে, এঁরা জগতটাকে দূরে চোখের বাইরে রাখার চেষ্টা করছেন আর তার পরিবর্তে পড়ে থাকছে যা অসারতায় ভরা তাই।

ইয়েটস যে জগতের জন্য উৎকণ্ঠ সে জগতে মানুষের পক্ষে ধ্যানে আত্মহারা হয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। তিনি রাজনৈতিক মঞ্চ এবং সম্পাদকীয় স্তম্ভ থেকে যে বাণী নিয়ত উৎসারিত হয় তা অপছন্দ করেন।

ইয়েটসের রঙ্গমঞ্চবিষয়ক কিছু প্রবন্ধ যা দীর্ঘকাল পাওয়া যাচ্ছিল না তা সম্প্রতি একত্রিত করে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে Explorations" এই নামে। এই প্রবন্ধাবলী ধ্যানের ধন। ইয়েটস যুক্তিতর্কের ধার ধারেন না, তিনি তাঁর বক্তব্য বিষয় পেশ করেন না। কিন্তু যা তিনি লিখেছেন তার মধ্যে আছে একটি পারম্পর্য। যেহেতু তাঁর কবিজনোচিত বাক্যাবলী মাঝে মাঝে হাওয়ায় ভেসে বেড়ায়, সেই হেতু একথা মনে করা উচিত হবে না যে তাঁর বক্তব্যের মধ্যে শুভবুদ্ধির অভাব আছে। বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁর আস্থাহীনতার জন্য তাঁর কোনো কুণ্ঠা নেই। তাঁর বিশ্বাস যে মৃতের আত্মা জীবিতের মাধ্যমে কথা বলতে পারে। আধুনিক জগতকে তিনি ঘৃণা করেন, কারণ এই যুগ অতিপ্রাকৃত বস্তু বিষয়ে তার অধিকার হারিয়েছে। তাই একটু সুযোগ পেলেই তিনি প্রেত ও পরীর জগতে পলায়নের প্রচেষ্টা করেন। আমাদের এই বিজ্ঞানের যুগের মুখের দিকে তাকাতে তাঁর নিদারুণ শঙ্কা।

কিন্তু প্রেত ও পরীর রাজত্বে পলায়ন করলেও কিংবা যে অতীতে বাক্য ও সঙ্গীতের মধ্যে বিচ্ছেদ কল্পনাতীত ছিল সেই অতীতের প্রতি মোহ থাকা সত্ত্বেও বর্তমানকালের দিকে তাঁকে চকিত দৃষ্টি মেলে ধরতে হয়েছে।

ইয়েটসকে সব থেকে বেশী আশাহত করেছে প্রগতি সম্পর্কে বর্তমানকালের সহজ বিশ্বাসে।

এই কারণেই যে সব লেখকের অভিমত তাঁদের রচনার ওপর প্রভুত্ব করতে চায় তাঁদের তিনি অশ্রদ্ধা করেন—

"An artists' opinion ought, to be a faith in works. "And there is no way for him to succeed but by work."

এ-কথা তিনি বিশেষ জোর দিয়েই বলেছেন।

সাহিত্য কখনও মতবাদ-আচ্ছন্ন সম্প্রদায়ের গন্ডীতে সার্থকতা লাভ করে না। নাটকের ক্ষেত্রে এই বক্তব্য আরো সত্য, কারণ নাটকে কবিতা বা কাহিনীর চেয়ে জীবনের সুস্পষ্ট আকৃতি মূর্ত হয়ে ওঠে।

আমাদের চিন্তাজ্বরকে যে নাটক রূপদান করে মঞ্চে প্রদর্শন করে সেই জীবন্ত নাটক দেখে কি আমরা হতাশ হব? ইয়েটসের মনে ভবিষ্যত বিষয়ে কোনো হতাশা নেই। বর্তমান কাল হয়ত মহৎ নাটকের পক্ষে শুভলগ্ন নয়, কিন্তু যদি কোনো প্রকারে আমাদের স্বকীয় নিউরোসিসের বাঙ্ময় প্রতিমূর্তি নাটকে রূপায়িত করা যায় তাহলে হয়ত আমাদের অনেক ব্যাধির সহজ নিরাময় সম্ভব হবে।

ইয়েটস নিজে ইবসেনের "Ghosts" নাটক দেখতে গেছেন। রঙ্গমঞ্চস্থ সবকটি চরিত্র তাঁর কাছে গুঞ্জনময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুতুল নাচের পুতুল মনে হয়েছে।

কিঞ্চিৎ বিভ্রান্ত হলেন ইয়েটস। কিন্তু তখনই চিত্তকে এই বলে সান্ত্বনা দিলেন এই ভেবে—

"Such art, terrible, satirical, inhuman may turn out to be the medicine of great cities where no one is ever alone with his own strength."

এই ঔষধ কিন্তু কবির তিরোভাবের পর গত কয়েক বছরে বেশ তিক্ত হয়ে উঠেছে। তাই আজ আমাদের মানসিক ব্যাধির বহু ইমেজ নানাবিধ দৃশ্যপটে যত্রতত্র দেখতে পাই। একটা মৃতদেহের দিকে তাকালে মনে হয় যেন সমস্ত বাড়িটাই সে ভরে আছে। এমন মানুষের সঙ্গে দেখা হয়, যে আমাদের চোখের সামনেই গন্ডারে রূপান্তরিত হতে পারে। আবার এমন সব বাউন্ডুলের সন্ধান পাওয়া যায়, যারা গলায় বেঁধে ঝুলে পড়ার জন্য দড়িটুকুও সংগ্রহ করতে পারে না। ওষুধে কাজ হয়েছে কিনা এই সংশয় মনে জাগে।

কবি যখন বলছেন—
"terrible, satirical and inhuman".
তখন তিনি মনের কথা খুলে বলেছেন কিনা বলে মনে হয় না। কারণ তাঁর এই বিধান হয়ত বৃহত্তর শহরগুলির মধ্যে প্রযোজ্য। কারণ, তাঁর নিজস্ব প্রেসক্রিপসান বিভিন্ন রকমের।

তাঁর মনে হয়েছে হয়ত শুধু ট্র্যাজেডিই আমাদের ত্রাণ করতে পারবে। আর তাঁর কাছে কোনো ট্র্যাজেডিই বৈধ নয়—

"Unless it leads some great character to his final joy."

এই আনন্দের চিন্তাতেই তিন এক কাব্যিক পরিক্রমায় ভেসে যান। তাঁর লেখা নাটকাবলীর চরম বিয়োগান্ত মুহূর্তের কথা তাঁর স্মরণে জাগে—

যদি সামর্থ্য থাকত তাহলে তিনি রঙ্গমঞ্চে শুধু ট্র্যাজেডিটুকুই নয় হয়ত প্রাচীন গ্রীক থিয়েটারের রীতি ফিরিয়ে আনতেন, গ্রীক থিয়েটারে সংলাপ অঙ্গভঙ্গীর চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ, আবার অঙ্গভঙ্গীর গুরুত্ব দৃশ্যপটের চেয়ে অনেক বেশী।

কিন্তু ট্র্যাজেডিকে স্টেজে ফিরিয়ে আনা কি সম্ভব? যখন বালক ছিলেন তখন ইয়েটস তাঁর গুরুজনদের প্রশ্ন করেছিলেন—

"Why has the audience deteriorated?"

ইয়েটসের মতে গ্রীক নাটকের কাল থেকে এলিজাবেথীয় যুগের নাটকের অবনতি ঘটেছে এবং সেইকালের মাপকাঠিতে বর্তমানের অবনতি আরো গভীর। কিন্তু ইয়েটস নিজের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন নি। দর্শক যেমনটি চায় ঠিক তেমন ধরের নাটকই কি পায়? নাট্যকার কেন দর্শকের রুচিকে রূপান্তরিত করবেন না? প্রতিটি কবি কি তাঁদের নিজস্ব শ্রোতা সৃষ্টি করে নেন না?

ইয়েটসের সঙ্গে যুক্তিতর্কে নানা বাতুলতা, তিনি স্বপ্নবিলাসী। বাস্তবের মুখে বসন্ত রোগের ক্ষতচিহ্ন দেখা তাঁর সহ্যাতীত। তিনি সেইকালের স্বপ্নে বিভোর যখন সকল মানুষের অবসর ছিল। কোনো উত্তেজনা বা জ্বালা ছিল না। গ্রন্থ থেকে নয়, সংস্কৃতির স্পর্শ মানুষ পেত কাজ এবং খেলার মাধ্যমে।

রাজনীতি এবং অর্থনীতির পরিচ্ছন্ন পদ্ধতির প্রতি তিনি বীতরাগ। ইয়েটসের চিন্তাধারার সঙ্গে বর্তমানের দ্রুতলয়ে চলা পৃথিবীর মতৈক্য হওয়া কঠিন। তিনি স্বপ্নবিলাসী এবং স্বপ্ন দিয়ে স্মৃতি দিয়ে গড়া জগতে বিচরণ করেছেন।

—অভয়ঙ্কর

EXPLORATIONS: By William Butler Yeats, Published by Macmillon & Co. (London). Price 35 shillings.

ভারতীয় সাহিত্য

সাম্প্রতিক মালয়ালম সমালোচনা সাহিত্য ॥

সাম্প্রতিক মালয়ালম সমালোচনা সাহিত্যে অনেক লেখকের আবির্ভাব ঘটেছে। লেখাও হচ্ছে অনেক। কিন্তু সত্যিকারের সাহিত্যিক মর্যাদাপূর্ণ সমালোচনা সাহিত্য খুব একটা দেখা যাচ্ছে না। যাই হোক, তবু এর মধ্যে যে কয়েকজন সমালোচকের নাম করতে হয়, তার মধ্যে প্রথমেই আছেন এম অচ্যুতন। তাঁর দুটি গ্রন্থ এর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম গ্রন্থটি হলো **ভিভেচনম্‌।** দ্বিতীয় গ্রন্থটি কবিতা সম্পর্কিত। এতে কবিতার মৌল চরিত্র সম্বন্ধে এমন কটি প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে, যা নিয়ে সত্যই ভাববার প্রয়োজনীয়তা আছে।

শ্রী পি কে বালকৃষ্ণণের আর একটি গ্রন্থও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থটির নাম **উপন্যাস—ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভা।** এই গ্রন্থে লেখক উপন্যাস রচনার মূল তত্ত্বের গভীরে অবগাহন করতে চেয়েছেন। উপন্যাসের টেকনিক প্রসঙ্গেও তাঁর মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি তাঁর মন্তব্যের অনুকূলে তিনজন ভিন্নধর্মী লেখককে নির্বাচন করেছেন। এই তিনজন লেখক হলেন—তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, জেন অস্টিন ও ডসস্টয়ভস্কি।

সমকালীন মালয়ালম সমালোচনা সাহিত্যের ক্ষেত্রে সি জে স্মারক সমিথাই-এর অবদানও বিশেষ স্মরণীয়। এই সংস্থার প্রচেষ্টায় কয়েকটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পরলোকগত সাহিত্যিক সি জে টমাসের স্মৃতি রক্ষার্থে। এই সংস্থার চেষ্টায় **করিথা** নামে একটি সমালোচনা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটি কোনও একজনের রচনা নয়। এতে বিভিন্ন লেখকের বিভিন্ন ধরনের প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত শ্রী এম এন ভিজয়ন ও শ্রী কে পি শশিধরনের প্রবন্ধটি খুবই প্রশংসনীয়। এছাড়াও আরও অনেক সমালোচনা গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে। মোটামুটিভাবে উল্লেখ্য অবদানের কথাই এখনে আলোচিত হল।

তেলুগু সাহিত্যিকের মৃত্যু ॥

প্রখ্যাত তেলুগু ঔপন্যাসিক শ্রীশববাজু ভেংকট সুব্বা রাও সম্প্রতি পরলোকগমন করেন। তিনি বুচিবাবু—এই ছদ্মনামেই প্রধানতম সাহিত্য রচনা করতেন। ছোটগল্প ও নাটক রচনাতেও তাঁর খ্যাতি ছিল। এ পর্যন্ত তাঁর পনেরটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে **চিভারাকি মিগিলেডি** (উপন্যাস), **দারিনা পোয়ে ভানমা** (একাঙ্কিকা) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রেসিডেন্সি কলেজে কবি সম্মেলন ॥

প্রেসিডেন্সি কলেজ 'রবীন্দ্র পরিষদের' উদ্যোগে গত ২০ জানুয়ারী কলেজ হলে একটি কবি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে কবিতা পাঠ করেন মণীন্দ্র রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, বিজয়া দাশগুপ্ত, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, আনিস সান্যাল ও আরো কয়েকজন। এছাড়া জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে ও সমর সেনের কবিতার রেকর্ড বাজিয়ে শোনান হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন ভূদেব চৌধুরী।

একটি হিন্দি কবিতা গ্রন্থ ॥

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার জৈন সম্প্রতিক হিন্দি সাহিত্যের অন্যতম প্রখ্যাত কবি। তাঁর প্রথম কবিতাগ্রন্থ **অন্ধ কি আঁখে** প্রকাশিত হয়েছিল দীর্ঘদিন আগে। সম্প্রতি তাঁর আর একটি নতুন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটির নাম **বাতনা কা সূর্য পুরুষ**। এতে ৪৫টি কবিতা স্থান পেয়েছে। অধিকাংশ কবিতাই দীর্ঘ কবিতা। তাঁর কবিতা প্রধানতঃ রোমান্টিক জাতের। কিন্তু তাঁর বর্ণনাভঙ্গীই তাঁর সাফল্যের অন্যতম কারণ। তাঁর রচিত জগৎ যেন এক স্বরচিত মায়ার জগৎ। নিজস্ব অভিজ্ঞতার স্পর্শে তিনি গড়ে তুলেছেন তাঁর কাব্যের বাক্‌প্রতিমা। এই কারণেই তিনি তাঁর সমকালীন কবিদের চেয়ে এত স্বতন্ত্র।

মৈথিলি ছোটগল্পের সাম্প্রতিক কাল ॥

মৈথিলি ছোটগল্প সাম্প্রতিক কালে যে রকম সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে, সে রকম বোধ করি কখনই ছিল না। অবশ্য একথা ঠিক, মৈথিলি ছোটগল্পের উপর তেমন কোন আন্দোলন নেই। অধিকাংশ গল্পই

বিদেশী সাহিত্য

মূল্যবান গ্রন্থ ॥

নিঃসন্দেহই বইটি অভিনব। বিশেষ করে আজকাল যখন সাদামাটাভাবেই কবিতার বই বেরোয় তখন অজস্র ছবিতে ভরা কোনো কাব্যগ্রন্থ দেখলে কার না আনন্দ হয়। সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে ফাঙ্ক ওহারার একটি কাব্যগ্রন্থ। সম্পাদনা করেছেন খ্যাতনামা বিল বার্কসন। প্রচ্ছদ এবং অলংকরণে মোট ত্রিশজন শিল্পী সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। বলাবাহুল্য, এঁদের মধ্যে ডে কুনিঙ, রশেনবার্গ, জনস, নিউম্যান, রিভারস, ওল্ডেনবার্গ, মাদারওয়েল, ন্যাকিয়ান, লিশ্‌টেনস্টেইন, অলেকাস কাৎস, সেল ক্লেইন প্রমুখ ওহারার সঙ্গে পূর্ব থেকেই পরিচিত। এঁরা সকলেই জানতেন কবির মানসিকতা, ফলে তাঁদের পক্ষে ওহারার কবিতা অলংকৃত করা যেমন সহজসাধ্য হয়েছে, তেমনি পেয়েছে নতুনতর ব্যঞ্জনা।

ফাঙ্ক ওহারার অকাল মৃত্যু যেমন দুঃখজনক তেমনি মর্মান্তিক। তিনি ১৯৬৬ সালে এক মোটর দুর্ঘটনায় মারা যান। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৪০ বছর। আজীবন তিনি শিল্পীদের সঙ্গেই মেলামেশা করেছেন। আধুনিক শিল্পকলা ছিল তাঁর অন্যতম ধ্যান ধারণা। ১৫ বছর তিনি নিজেকে শিল্পের ছাত্র হিসেবেই নিযুক্ত রেখেছিলেন।

বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার অধিকারী কবি ওহারার জীবন এক কথায় সংগ্রামমুখর। প্রথমদিকে একজন পোস্টকার্ড সেলসম্যান হিসেবে কাজ করেন।

স্মরণ সভা ॥

কয়েকজন মার্কিনী কাব্যানুরাগী সম্প্রতি একটি ঘরোয়া সভায় হাজির হয়েছিলেন। তাঁরা প্রত্যেকে নিজস্ব অনুভূতি প্রকাশ করলেন উপস্থিত গুটিকয়েক শ্রোতার কাছে। অনুষ্ঠানটি নিঃসন্দেহেই আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

কবি র‍্যান্ডাল জ্যারেলের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ছিল এই সভার মূল উদ্দেশ্য। মারা গিয়েছিলেন তিনি ১৯৬৫ সালে। সত্যিই সে এক দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। অনেকটা ঠিক ফাঙ্ক ওহারার মতোই; পথ ভ্রমণের সময় ট্রাকের ধাক্কায় মারা যান কবি।

র‍্যান্ডাল জ্যারেল জন্মেছিলেন ১৯১৪ সালে, সাহিত্যের ঝোঁক ছিল তাঁর ছেলেবেলা থেকে। ধীরে ধীরে আকর্ষণ বাড়তে লাগলো। ক্রমে হয়ে উঠলেন তিনি পুরোপুরি সাহিত্যিক। কবিতা এবং উপন্যাসে আসর জমালেন এবং একই সঙ্গে পেলেন সমালোচকের দুর্লভ খ্যাতি। সোজাসুজি দোষ-ত্রুটির সমালোচনায় শত্রু এবং বন্ধু দুইই পেলেন তিনি। সমকালীন কবিরা তাঁর প্রভাবে পুষ্ট হলেন।

উপন্যাসে তিনি বিচিত্র স্বাদের ভাণ্ডার খুলে ধরলেন। পিকচারস ফ্রম অ্যান ইনস্টিটিউশন এই বিচিত্র স্বাদেই পাঠককে অভিভূত করে। পোয়েট্রি অ্যান্ড দি এজ তার সমালোচনা গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

ছন্দের মারপ্যাচ এবং বক্রোক্তির রসিকতায় কাব্যজগতে তিনি বিশিষ্টতার

ইতস্ততঃ বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় প্রায় ৭টি গল্প সংকলন গত ২।১ বছরের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থগুলি হলো শ্রীরমানাথ মিশ্র মিহিরের স্মৃতি, শ্রীরূপকান্ত ঠাকুরের মোক্ষ কা নখ, শ্রীব্রজমোহন ঝাঁর এক আঁখি এক অন্ত, শ্রীরামদেব ঝার এক কৌর তিন ফাঁক, শ্রীগৌরী মিশ্রের অহিয়েল মন পাঁওল চাহার প্রভৃতি উল্লেখ্য। শ্রীহরিমোহন ঝা মোট ১১টি গল্প সংকলিত করে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। গ্রন্থটির নাম একাদশী। এছাড়াও শ্রীগঙ্গানন্দ সিংহের অগিলাহি গ্রন্থটি এই প্রথমে স্মর্তব্য।

একটি ছোটগল্পের সংগ্রহ গ্রন্থও এর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থটির নাম কথা সংগ্রহ। আঠারজন গল্পকারের নির্বাচিত আঠারটি গল্প নিয়ে গ্রন্থটি সংকলিত।

একটি উর্দু পত্রিকা ॥

হায়দরাবাদ থেকে প্রকাশিত সবা নামক উর্দু পত্রিকাটি উর্দু সাহিত্য প্রেমিকদের কাছে বিশেষ পরিচিত। এই পত্রিকাটির সম্প্রতি একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। পত্রিকাটির সম্পাদক সুলেমান অরীব একজন প্রখ্যাত উর্দু কবি। বর্তমান সংখ্যায় নজর হায়দর, মখদুম মহীউদ্দীন প্রমুখের রচনা প্রকাশিত হয়েছে।

একটি নতুন তামিল কবিতা গ্রন্থ

'কেশিনি' তরুণ তামিল কবিদের মধ্যে [illegible]। দীর্ঘ ছ' বছর ধরে তিনি একটি [illegible] পত্রিকা প্রকাশ করে আসছেন। সম্প্রতি তাঁর একটি নতুন কাব্যগ্রন্থ আসন করে নিয়েছেন। কবির সঙ্গে জনসাধারণের যোগাযোগকে স্বীকার করে নিয়েই তিনি কবিতা রচনা করেছেন। নারী চরিত্র বিশ্লেষণেও তিনি বেশ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। দি ওম্যান অব দি ওয়াশিংটন স্কু কবিতায় নারী চরিত্রের একটি জটিল জিজ্ঞাসার অবতারণা করেছেন তিনি। উল্টো দৃষ্টিভঙ্গিও বিরল নয়। এক কথায় তার জীবনকে বিরোধের সমন্বয় বলাই সঙ্গত। আর এটাই হলো জ্যারেলের জীবনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিক।

পরলোকে পিয়েরে ভ্যান প্যাসে ॥

সম্প্রতি প্রখ্যাত সাহিত্যিক পিয়েরে ভ্যান প্যাসে ম্যানহাটনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। মন্ত্রী হিসেবেও তিনি ছিলেন সফল ব্যক্তিত্ব। তাঁর আত্মজীবনী 'আমাদের সময়কার 'দিনগুলি' একবার বেস্ট সেলারের মর্যাদা লাভ করেছিল।

প্রকাশিত হয়েছে। বইটির নাম "তেইশটি কবিতা"। এই গ্রন্থটি সম্বন্ধে বিভিন্ন সমালোচক যেসব মতামত প্রকাশ করেছেন, তার ইংরেজি অনুবাদ আছে।

বিদেশে ভারতীয় সাহিত্য

ভারতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে বিদেশে ক্রমশ আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিছুদিন আগেও কিন্তু দেখা যেত ভারতীয় সাহিত্য নামে যা কিছু বিদেশে প্রচারিত ছিল, তাতে অধিকাংশই হল ভারতীয় ইংরেজি লেখকদের রচনা অথবা হিন্দি সাহিত্য। এইসব রচনা থেকেই বিদেশীরা ভারতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ কোন ধারণায় উপনীত হতেন। কিন্তু সম্প্রতি সে ধারণার পরিবর্তন হচ্ছে। এর মধ্যেই কেউ কেউ উপলব্ধি করছেন যে, ইংরেজি বা হিন্দি ছাড়াও ভারতীয় ভাষা আছে এবং সেইসব ভাষার মধ্যে বেশ কয়েকটি ভাষার সাহিত্য বিস্ময়কর। এই অনুভব সৃষ্টির পেছনে ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ প্রকাশের দুই একটি পত্রিকার অবদান অসাধারণ।

যাই হোক, সম্প্রতি দুটি ভারতীয় সাহিত্য সংকলন প্রকাশে দু'জন ব্যক্তি অগ্রণী হয়েছেন। প্রথম জন হলেন ইংলন্ডের অদিল যুশাওয়ালা। তিনি সমকালীন ভারতীয় কবিতার একটি সংকলন প্রকাশ করছেন। তাঁকে সহযোগিতা করছেন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উপর একটি ইংরেজি ত্রৈমাসিক। আগামী এপ্রিলের মধ্যেই গ্রন্থটি প্রকাশিত হবে বলে আশা করা যায়।

দ্বিতীয় সংকলনটি সম্পাদনায় উদ্যোগী হয়েছেন আমেরিকার এলান ওয়েন্ড। তিনি করছেন সমকালীন ভারতীয় গল্পের একটি সংকলন। এই ব্যাপারেও তিনি অনেকদূর এগিয়ে গেছেন। ভারতীয় সাহিত্য প্রেমিকরা দু'জন বিদেশীর এই প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানাবেন বলে আশা করি, কেননা আজকে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন ভারতীয় সাহিত্যের যথার্থ স্বরূপ বাইরের পৃথিবীর সামনে উপস্থিত করা।

তিরুকুরালের অনুবাদ ॥

তামিল ক্লাসিক সাহিত্যের মধ্যে 'তিরুকুরাল' সর্বশ্রেষ্ঠ। গ্রন্থটি ইতিমধ্যে পৃথিবীর বহু ভাষায় অনূদিত হয়ে গেছে। সম্প্রতি এর একটি উল্লেখ্য হিন্দি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এটি অনুবাদ করেছেন মূল তামিল থেকে শ্রী এম জি ভেংকটকৃষ্ণ। এই গ্রন্থটি প্রকাশের দিনে একটি অনুষ্ঠানও হয়। কেন্দ্রীয় শিক্ষা রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীশের সিংহ এই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বলেন যে, 'এই ধরনের অনুবাদ খুবই দরকার। ভারতের বিভিন্ন ভাষায় যে সমস্ত ক্লাসিক সাহিত্য আছে, তা অন্যান্য ভাষায় যত অনুবাদ করা সম্ভব হবে, ততই ভারতীয় সংহতির পথ সুগম হবে।"

তেলুগু ও তামিল ভাষায় শাস্ত্রীর জীবনী ॥

তেলুগু এবং তামিল ভাষায় লালবাহাদুর শাস্ত্রীর একটি জীবনী গ্রন্থ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থ দুটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল ডঃ বি গোপাল রেড্ডি। এই গ্রন্থদুটির প্রকাশক 'সাউদার্ণ ল্যাঙ্গুয়েজেস বুক ট্রাস্ট'। এই গ্রন্থগুলি যথাক্রমে অনুবাদ করেছেন সৌরীঞ্জন ও এম নরসিংহচার্য। মূল হিন্দি গ্রন্থটির রচয়িতা শ্রীসুমঙ্গল প্রকাশ।

যুদ্ধ বিষয়ক উপন্যাস ॥

ভালোমন্দের কথা বাদ দিলেও যুদ্ধ বিষয়ক সব উপন্যাসই যে পাঠকের মনকে দারুণভাবে নাড়া দেয়, সেবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এইসব উপন্যাসে ঝরঝরে ভাষা কিংবা চরিত্রচিত্রণের মুন্সিয়ানার চেয়েও বড়ো আকর্ষণ থাকে কাহিনীর উত্থান পতনে। তার উপর লেখক যদি নিজে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে থাকেন, তবে তাঁর রচনা নিঃসন্দেহেই জীবন্ত ও মনোগ্রাহী হয়ে উঠবে।

নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকার একজন নামজাদা সাংবাদিক হলেন মিঃ ডেভিড হালবারস্টাম। এই বিশেষ সংবাদদাতাটি ১৯৬৪ সালে পেয়েছিলেন আমেরিকার সবচেয়ে লোভনীয় পুরস্কার পুলিৎসার প্রাইজ। দিয়েম রাজত্বকালের দক্ষিণ ভিয়েতনামী রাজনীতি আর যুদ্ধের রিপোর্টাজের জন্য মিঃ হালবারস্টাম এই পুরস্কার পান। তিনি যেমন সব ব্যাপারেই কৌতূহলী তেমনি সিরিয়াস। সম্প্রতি প্রকাশিত উপন্যাসটি অবশ্য ভিয়েৎনামের যুদ্ধকে কেন্দ্র করে ঠিক নয়, তবে ভিয়েতনাম সংক্রান্ত পুরনো দিনের বিভিন্ন মার্কিনী নীতি ও নানারকম সাহায্য দান কাহিনীর পটভূমি তৈরি করেছে। ২১৬ পৃষ্ঠার আলোচ্য গ্রন্থটির নাম হল 'ওয়ান ভেরী হট ডে।' বইটি বের করেছেন হাউফটন মিফিন।

পরলোকে গীতিকার।।

প্রখ্যাত গীতিকার বিলি মল সম্প্রতি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬২ বছর। তাঁর বিখ্যাত সঙ্গীতগুলির মধ্যে র‍্যাপ ইওর ট্রাবলস ইন ড্রিমস, আই স্ক্রিম ইউ স্ক্রিম—উই অল স্ক্রিম ফর আইসক্রিম সবিশেষ উল্লেখ্য।

●

ভ্রম সংশোধন

২৬ জানুয়ারি তারিখের সংখ্যায় নতুন বই পর্যায়ে আলোচিত 'সূর্য পথিক' গ্রন্থের লেখকের নাম শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র রায় পড়তে হবে।



বিচিত্র স্বাদের উপন্যাস

সম্প্রতি তরুণ কবি বৈদ্যনাথ চক্রবর্তীর একটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে—'প্রতিনিধি'। উপন্যাসটির বৈশিষ্ট্য যে এর নায়ক-নায়িকা বাংলা সাহিত্যে নবাগত। কয়েকজন 'সেলস রিপ্রেসেনটেটিভ' বা বাণিজ্যিক প্রতিনিধি এই উপন্যাসে ভীড় করে এসেছেন। কেউ বই ধরানোর প্রতিনিধি, কেউ ওষুধ গছানোর। তাদের নিয়ে গল্প। কয়েকটি বিরহ-মিলনের কথা ছড়িয়ে আছে উপন্যাসটির প্রতিটি পৃষ্ঠায়। নির্মল ও সন্ধ্যার ভালোবাসা ও তার পরিণাম। অনুপম আর পাখি। অনুপম পাখিকে পায় নি অর্থাভাবে, যখন সৌভাগ্য এসে হেসেছে তখন সে আত্মহত্যা করল। ডাঃ সেন অনুকে ভয়ে ভয়ে বিয়ে করেন নি কিন্তু পরের জীবনে বিধবা হয়ে অনু তাঁর ঘরে এসেছে। শিবনাথ সমুদ্রের সামনে যে মেয়েটিকে জীবনসঙ্গিনী করেছিল তার মৃত্যুর ফলে সে বই বিক্রীর কাজে নেমেছে, হয়ত তার কবি মানস এইভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছে। এই সব বিচিত্র ঘটনার দিবারাত্রির কাব্য 'প্রতিনিধি' উপন্যাসে দক্ষতার সঙ্গে লিখেছেন লেখক। উপন্যাসটি একটানা নয়, নানা চরিত্র এবং নানা কাহিনী চালচিত্রের মতো সাজানো। তবু তার মধ্যে অনেক পরিচিত মুখ, অনেক পরিচিত সুখ-দুঃখের আকস্মিক উপস্থিতিতে পাঠককে চমকিত হতে হয়। গ্রন্থটির প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ সুন্দর।

●

অনুতোষ বিয়ে করেছে সর্বাণীকে। ভালবাসার জোরে নয়। মন্ত্র পড়ে। বিয়ের কিছুদিন পর অনুতোষ ও সর্বাণী এল মহুলিয়ায়—শংখদের বাড়ি বেড়াতে। শংখ আর অনুতোষ মামাতো-পিসতুতো ভাই। শংখদের বাড়ি ও সারা মহুলিয়ায় ছড়িয়ে আছে শংখর স্মৃতি। কোথাও কোথাও শংখ-সর্বাণীর স্মৃতি। মন্ত্রপড়ে সর্বাণীকে বিয়ে করলেও অনুতোষ ও তার বাড়ির লোকেরা কোনদিনই তাকে একান্ত করে পায় নি। কেননা, বিয়ের অনেক আগে থেকেই সর্বাণী ভালোবেসেছিল শংখকে। সমর্থন ছিল শংখর মা'রও। কিন্তু সর্বাণীর বাড়ি ও অনুতোষেরা তাকে স্বীকার করতে চায় নি। শংখ ছিল প্রাণচঞ্চল, উদ্দাম; সে রাজনীতি করতো। প্রচলিত সমাজ ও অর্থ-নৈতিক কাঠামোকে সে অস্বীকার করতো কিন্তু হৃদয়-বৃত্তিকে কখনো অবহেলা করতো না। সেই শংখ এক দিন পাগল হয়ে গেল। তাকে পাঠানো হল রাঁচির মানসিক হাসপাতালে। এবং সেই সুযোগে, সর্বাণীর মতামতকে অগ্রাহ্য করে প্রায় জোর করেই বিয়ে দেওয়া হলো অনুতোষের সঙ্গে রীতিমতো শাস্ত্রীয়ভাবে।

মহুলিয়ায় এসে সেই সব পুরনো স্মৃতি জীবন্ত হয়ে উঠলো। সর্বাণীর মনে। বিরোধ দেখা দিলো অনুতোষের সঙ্গে। বিদ্রোহ করতে চাইলো সর্বাণী। তাকে সমর্থন করলেন শংখর মা ও শেখরকাকু। এই সময়ে রোগমুক্ত হয়ে শংখও ফিরলো মহুলিয়ায়। সে গ্রহণ করলো সর্বাণীকে।

'চোখের আলোয়'র এই মূল আখ্যানকে বেশ সতর্কতার সংগে কৌশলী লেখন-ভঙ্গিমার মাধ্যমে, লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন।

প্রতিনিধি (উপন্যাস)— বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী। টাইগার ডিস্ট্রিবিউটার্স, ৮, বি, কলেজ রো, কলিকাতা-৯। ইন্ডিয়ান অ্যাসো-সিয়েটেড পাবলিসিং কোং (প্রাঃ) লিঃ—৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭। দাম : তিনটাকা মাত্র।

চোখের আলোয় —(উপন্যাস) শংকর মিত্র। মিত্রাণী, ৩৮ বাগবাজার স্ট্রীট, কলি—৩। দাম : টাঃ ২·৫০ পঃ।

দুটি মূল্যবান গ্রন্থ

জাতীয় সংস্কৃতি পরিষদ সম্পূর্ণ একটি বিজ্ঞান কোষ প্রকাশ করবার পরিকল্পনা নিয়েছেন। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভারতীয় ভাষার বিকাশের জন্যে সরকারী অর্থসাহায্য পাওয়ায় এতগুলি ছবি দিয়ে ২০০ পাতার ওপর এই বইটি অল্পমূল্যে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। বিজ্ঞান কোষের প্রথম খন্ডে কেবল পরিবহন ব্যবস্থার বর্ণনা করা হয়েছে। স্থলপথে, জলপথে এবং আকাশপথে পরিবহনের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বিকাশ নিয়ে সুন্দরভাবে আলোচনা করা হয়েছে। প্রতি পাতায় লাল, নীল, হলদে, সবুজ প্রভৃতি বিভিন্ন রঙের জমির ওপর একাধিক ছবি বা নকশা ছাপানো হয়েছে। প্রতিটি ছবি যে নির্ভুল তা হলফ করে বলা যায় না। যেমন ১৫ পৃষ্ঠার রোমান আমলের একটি গাড়ির ছবির গাড়ি ঘোড়া বা সওয়ার কোনটিকেই বিশেষভাবে রোমান বলে মনে হল না। ভারতীয় রথের ছবিটিও কতকটা কাল্পনিক বলেই মনে হল। তবে এসব ছোটখাটো ত্রুটি বাদ দিলে বইটি মোটামুটি সুখপাঠ্য এবং তথ্যপূর্ণ হয়েছে। চাকার আবিষ্কার এবং রাস্তা তৈরীর ইতিহাস থেকে আধুনিক রকেট পর্যন্ত সবরকমের পরিবহনের সুন্দর বর্ণনা একত্রে বাংলা ভাষায় সচরাচর পাওয়া যায় না। এঁদের অন্যান্য খন্ডগুলি প্রকাশের আশায় রইলাম।

●

বড়ু চন্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' আবিষ্কার করেন পন্ডিত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ। তারপর দীর্ঘদিন বাদে তরুণ গবেষক শ্রীদুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে কবিশেখরের গোপালবিজয়। বড়ু চন্ডীদাস এবং কবি-শেখর যে সমসাময়িক ছিলেন, তা বোঝা যায় গোপালবিজয়ের ভাষা, রচনাশৈলী এবং তথ্যখানভাগ থেকে। অন্ততঃ চৈতন্যদেবের শতাধিক বৎসর পূর্বে যে কবিশেখর গোপাল-বিজয় রচনা করেন, তা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে। শ্রীভাগবত ও শ্রীগীতগোবিন্দ বর্ণিত কৃষ্ণলীলামাধুরীর সঙ্গে লোক-প্রচলিত কিংবদন্তী মিশিয়ে গোপাল-বিজয় কাহিনী রচনা করেছেন কবি-শেখর। বিশ্বভারতীর এই তরুণ গবেষক অক্লান্ত পরিশ্রম এবং গভীর পান্ডিত্যে প্রাচীন সাহিত্যের যে অসামান্য উপাদান তুলে ধরেছেন আজকের পাঠকের সামনে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার্হ। বৈষ্ণব সাহিত্য এবং কৃষ্ণলীলামৃতের যে প্রবাহমান ধারা আরো দৃঢ়ভিত্তিতে স্থাপিত হোল তার জন্য সম্পাদক সুধীজনের কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন। এই সুদীর্ঘ গ্রন্থখানি প্রকাশের জন্য বিশ্বভারতী প্রকাশন বিভাগকে ধন্যবাদ জানাই।

সচিত্র বিজ্ঞান কোষ : প্রথম খন্ড, প্রকাশক : জাতীয় সংস্কৃতি পরিষদ, মূল্য : ১২·০০। সম্পাদক : যুগল শ্রীমল।

কবিশেখরের গোপালবিজয় দুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। বীরভূম, শান্তিনিকেতন। বিশ্বভারতী। দাম কুড়ি টাকা।

পত্র-পত্রিকা

কালি ও কলম-এর পঞ্চম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। পত্রিকার মর্যাদা যথারীতি অক্ষুণ্ণ রয়েছে। এবারের লেখকসূচীতে আছেন সতীনাথ ভাদুড়ী (পড়ুয়ার ডায়েরী থেকে), পুলিনবিহারী সেন (রবীন্দ্র গ্রন্থপঞ্জী) শিবদাস চট্টোপাধ্যায় (একটি টপিক্যাল কবিতা), দেবনারায়ণ গুপ্ত ও জরাসন্ধ। এ ছাড়াও অন্যান্য রচনা আছে। বাংলা সাহিত্যের সাম্প্রতিক গতিবিধির পরিচয় নিয়ে এই পত্রিকাটি নিঃসন্দেহে পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় হবে।

কালি ও কলম : বিমল মিত্র কর্তৃক সম্পাদিত। ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২ থেকে প্রকাশিত। দাম—৬০ পয়সা।

গৌরাঙ্গ পরিজন

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

(৬৪)

সনাতন গাঙ্গুলী

(খ)

সনাতনের তিন সনাতন প্রশ্ন ঃ আমি কে, তাপত্রয় কেন আমাকে জীর্ণ করছে আর কিসে আমার মঙ্গল?

প্রভু তার উত্তর দিলেন।

আমি কে, আমার স্বরূপ কী? জীবের স্বরূপ—জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস। এই নিত্যদাসত্ব ভুলে জীব যখন বহির্মুখ হয়, তখনই তাকে ত্রিতাপজ্বালা জীর্ণ করে। আর মঙ্গল সাধুর কৃপায়, শাস্ত্রের কৃপায়। যদি সাধু ও শাস্ত্রের উপদেশে জীব কৃষ্ণোন্মুখ হয় তা হলেই সে মায়ার কবল থেকে উদ্ধার পেতে পারে। সুতরাং কৃষ্ণভজনই সার কথা।

প্রশ্ন হল ঃ কে কৃষ্ণ?

কৃষ্ণ আমার একমাত্র প্রভু, একমাত্র ত্রাতা—একমাত্র প্রাপ্য। আর সেই প্রাপ্তির সাধনই ভক্তি। সাধনভক্তির ফলেই প্রেম, আর এই প্রেমেই কৃষ্ণমাধুর্যের আস্বাদন। সুতরাং প্রেমই মহা প্রয়োজন, মুখ্য প্রয়োজন।

কাশীতে গঙ্গাতীরে দশাশ্বমেধ ঘাটে সনাতনকে দু মাস ধরে উপদেশ করলেন প্রভু--কী করে কৃষ্ণপ্রেমধন পাওয়া যায়? বোঝালেন সম্বন্ধ, অভিধেয়, সাধন আর প্রয়োজন। সম্বন্ধ কৃষ্ণ, অভিধেয় ভক্তি, প্রয়োজন প্রেম, আর তা পাবার জন্যে যে উপায় তাই সাধন। সাধনবিধি পাঁচটি—সাধুসঙ্গ, নামকীর্তন, ভাগবতশ্রবণ, মথুরাবাস আর বিগ্রহসেবা।

পরীক্ষিৎ কৃষ্ণকে পেয়েছিল শ্রবণে, শুকদেব পেয়েছিল কীর্তনে, প্রহ্লাদ স্মরণে লক্ষ্মী পদসেবনে পৃথু পূজনে, অক্রুর চন্দনে, হনুমান দাস্যে, অর্জুন সখ্যে আর বলি আত্মনিবেদনে।

বোঝালেন কৃষ্ণতত্ত্ব, অবতারতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, বোঝালেন রাগানুগা ভক্তি। কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং। এক কৃষ্ণ থেকে অসংখ্য অবতারের উদ্ভব। গুনে শেষ করা যায় না। গাছের পল্লবিত শাখার মধ্য দিয়ে দেখা টুকরো টুকরো চাঁদের মত।

সনাতন জিজ্ঞেস করল, প্রভু এটা কলিযুগ। এই কলির অবতার কে? কী করে বুঝব?

প্রভু বললেন, শাস্ত্র বিচার করে বুঝতে হবে। যিনি অবতার তিনি তো আর নিজের অবতারত্ব ঘোষণা করবেন না, লক্ষণ দেখেই সিদ্ধান্তে আসতে হবে।

যিনি স্বরূপে অবতীর্ণ আর প্রকটে কীর্তন-প্রবর্তক ও প্রেমদাতা তিনিই তো কলির অবতার। সনাতন আকুল কণ্ঠে বললে, বলুন ঠিক কিনা। নিশ্চয় করে বলুন।

প্রভু বললেন, চাতুরালি ছাড়ো। কৃষ্ণের কথা শোনো।

কৃষ্ণ চিরকিশোর। কৈশোরেই কৃষ্ণের নিয়তস্থিতি। তার ঐশ্বর্যের অমৃত-সিন্ধুর এক বিন্দুও মনোবাক্যের গোচর নয়। কৃষ্ণের সমান কেউ নেই, উচ্চতরও কেউ নেই। তার সমস্ত লীলার মধ্যে নরলীলাই সর্বোত্তম। নিজের রূপ দেখে নিজেই বিস্মিত। নিজেকে আস্বাদ করবার জন্যে নিজেই ইচ্ছুক-উৎসুক।

যারা পতিব্রতা-শিরোমণি, বৈকুণ্ঠের সেই সব লক্ষ্মীরাও কৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট। আর কৃষ্ণ আকৃষ্ট গোপীদের কামগন্ধহীন নির্মল প্রেমে। সেই নির্মল প্রেমিকাদের সঙ্গেই কৃষ্ণের রাসক্রীড়া। সেই ক্রীড়ায় কন্দর্পের মনও মথিত। যে সকলের মোহ উৎপাদন করে সে এখানে নিজেই মোহিত। তাই কৃষ্ণের এখানে মদনমোহন নাম। 'চাঁ গোপীমনোরথে, মন্মথের মন মথে, নাম ধরে মদনমোহন।'

মাধুর্যই ভগবত্তার শেষ কথা। সে কথাই প্রকাশিত হয়েছে ভাগবতে। তাই ভাগবতশ্রবণই সর্বজীবের আশ্রয়। ভাগবতই জীবকে ভগবৎপরায়ণ হতে প্রবুদ্ধ করে।

সনাতন, তোমার প্রতি কৃষ্ণের অগাধ কৃপা। আমাকে মন্ত্র করে আমার চিত্তভ্রম জন্মিয়ে আমার মুখে তাঁর ঐশ্বর্য-মাধুরী তোমাকে শোনালেন। আমি তো পাগল, কী কথা বলতে কী কথা বলি তার ঠিক নেই। শুধু কৃষ্ণ-মাধুরীর স্রোতে ভেসে যাওয়াই আমার কাজ।

শোনো। ভক্তি অর্থ সেবা। এ সেবা নিজের সুখের জন্যে নয়, কৃষ্ণের সুখের জন্যে। একমাত্র কৃষ্ণ প্রীত হলেই বিশ্ব প্রীত।

শুধু একবার বলো, কৃষ্ণ, আমি তোমার হলাম। আমার দেহ মন প্রাণ সমস্ত তোমার হল। আমি তোমাতেই প্রসন্ন, আমি একমাত্র তোমারই। তুমি ছাড়া আমি বলে কিছু নেই, তা হলেই মায়া পলাতকা। যার মায়াতে অভিনিবেশ তারই ভয় আর যার ভয় তারই দুঃখ।

মহৎকৃপা হলেই ভগবৎকৃপা। সাধুর চরণধূলি না পাওয়া পর্যন্ত কৃষ্ণপাদপদ্মে মতি হয় না। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়।'

জানবে সদাচারই বিধি, অসদাচারই নিষেধ।

সাধনভক্তি দু'রকম। এক বৈধী, অন্য রাগানুগা। যার অনুরাগ নেই সে শাস্ত্রশাসনের ভয়ে কৃষ্ণভজন করে, কৃষ্ণকে সুখী করবার জন্যে নয়। আর যে অনুরাগে রঞ্জিত সে বিধিনিষেধের ধার ধারে না, সে প্রাণের থেকে ভজনা করে, তার প্রাণধন কৃষ্ণকে খুশি করতে।

ইষ্টে গাঢ় তৃষ্ণাই রাগ। এ কোনো শাস্ত্রযুক্তি মানে না, শুধু ভাবমাধুর্যেই লোভান্বিত। ভাবমাধুর্যে লোভ জন্মে বলে লোভধর্মেই শাস্ত্রযুক্তি উপেক্ষা করে। বাইরে শ্রবণ-কীর্তন করে, অন্তরে স্মরণ-সেবন করে। যার যেমন ইচ্ছা কৃষ্ণকে সেই-ভাবে প্রিয়তম ভেবে অন্তর্মনা হয়ে নিরন্তর সেবা করো। যার খুশি দাস হও, সখা হও, প্রিয়া হও। এতেই প্রীতির উদয় হবে। প্রীতির অঙ্কুর অবস্থার নাম রতি। রতি গাঢ় বা পরিপক্ক হলেই প্রেম।

কোনো ভাগ্যে জীবের যদি শ্রদ্ধা জাগে শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস জাগে, তবে কে কী করে? সাধুসঙ্গ করে। সাধুসঙ্গ থেকে শ্রবণ-কীর্তন বা সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করে। এই সাধনভক্তিতেই সমস্ত অনর্থের নিবৃত্তি হয়। ভক্তি-মুক্তিস্পৃহা দূরে যায়। অনর্থ-নিবৃত্তি থেকে নিষ্ঠা আসে। নিষ্ঠা রুচি আনে। রুচি থেকে আসক্তি জাগে। আসক্তি থেকে প্রীত্যঙ্কুর। আর এই প্রীতি বা রতি ঘনীভূত হলেই প্রেম।

যে সাধনের মধ্যে প্রেমের অঙ্কুর জেগেছে তার লক্ষণ কী?

ক্ষান্তি, ক্ষোভের কারণ থাকলেও ক্ষোভশূন্যতা। অব্যর্থকালত্ব, নিরবচ্ছিন্ন কৃষ্ণভজন। একমুহূর্তও বৃথা বা কৃষ্ণ ছাড়া না থাকা। বিরক্তি বা বিরাগ। মানশূন্যতা বা দৈন্যবোধ। আশাবন্ধ অর্থাৎ কৃষ্ণ-কৃপা করবেন এই দৃঢ়বিশ্বাস। সমুৎকণ্ঠা অর্থাৎ

কৃষ্ণকে দেখবার লালসা। নামগানে সারা রুচি। কৃষ্ণগুণবর্ণনে আসক্তি। আর তীর্থবাসে অনুরাগ।

সনাতন, বললেন গৌরহরি, তোমাকে চারটি কাজের ভার দিচ্ছি। তুমি মথুরামণ্ডলে লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার করো, বৃন্দাবনে প্রচার করো কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণব আচার আর ভক্তিস্মৃতিশাস্ত্র। শুষ্কবৈরাগ্য ছেড়ে ধরতে বলো যুক্ত-বৈরাগ্য।

সনাতন বললে, এই অমৃতসমুদ্রের এক বিন্দুও ধারণ করি আমার এমন সাধ্য নেই। তবে তুমি যদি পঙ্গুকে নাচাতে চাও, আমার মাথায় তোমার চরণ রাখো।

প্রভু বললেন, তোমাকে যা শেখালাম, তোমাতে তা স্ফুরিত হোক। বলে সনাতনের মাথায় হাত রাখলেন।

পরে বৈষ্ণবস্মৃতি সংকলনের সূত্র ধরিয়ে দিলেন। বললেন, তোমাকে কিছু চিন্তা করতে হবে না। জ্ঞান বুদ্ধি ভাব সমস্ত কৃষ্ণ তোমাকে জুগিয়ে যাবেন। লিখতে আরম্ভ করলেই দেখবে কৃষ্ণ তোমার চিত্তে সমস্ত উজ্জ্বল করে তুলবেন। 'যবে তুমি লিখ কৃষ্ণ করাবেন স্ফুরণ।'

একবার তবে বৃন্দাবন যাও। আমার আরেকটি অনুরোধ। বললেন গৌরহরি, ছেঁড়া কাঁথা গায়ে, হাতে করঙ্গ, আমার কাঙাল ভক্তেরা বৃন্দাবন এলে তাদের প্রতিপালন কোরো।

ব্রজবনের বনে বনে মহাবিরক্ত সনাতন কৃষ্ণান্বেষণে ঘুরে বেড়াতে লাগল। দিনের বেলায় এক-এক দিন এক-এক বৃক্ষতলে ও রাতে এক-এক রাত এক-এক কুঞ্জে বাস করতে লাগল। মথুরা-মাহাত্ম্য শাস্ত্র সংগ্রহ করে তা দেখে মথুরাখণ্ডের লুপ্ত তীর্থের স্থান নির্দেশ করল।

কিন্তু প্রভু ছাড়া মন টেঁকে না। সনাতন পুরীর দিকে যাত্রা করল। গৌড়ের পথে গেল না, ঝারিখণ্ডের পথ নিলে। একেবারে একলা চলেছে সনাতন, একেবারে নিঃসহায়। অর্ধাশনে, অনশনে, চানা চিবিয়ে কখনো বা শুধু জল খেয়ে পথ ভাঙতে লাগল। ঝারিখণ্ডের জলের দোষে গায়ে চুলকুনি দেখা দিল। ভাবল, এ অশুচি শরীর নিয়ে কী করে প্রভুর মুখোমুখি হব? আমি কৃষ্ণভজনের অযোগ্য, তাই আমার দেহে এ কুৎসিত ব্যাধি উপস্থিত হয়েছে। মন্দিরে ঢোকবারও আমার অধিকার নেই। এ দেহ আর রাখব না, আত্মহত্যা করব। রথযাত্রার আর দেরি নেই, রথের দিনে প্রভুর সামনে প্রভুকে দেখতে দেখতে রথের চাকার নিচে দেহ ছাড়ব।

নীলাচলে হরিদাসের বাসায় এসে উঠল সনাতন।

মন্দিরে উপলভোগ দেখে প্রভু সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। সনাতন প্রণাম করতেই প্রভু তাকে আলিঙ্গন করতে বাহু বাড়ালেন।

সনাতন পিছু হটল। না, না, ছুঁয়ো না আমাকে, আমি হীন অস্পৃশ্য, আমার সারা গায়ে ব্যাধি—

প্রভু নিষেধ শুনলেন না। জোর করে সনাতনকে আলিঙ্গন করলেন। সনাতনের কণ্ডুক্লেদ তাঁর গায়ে লাগল। সনাতন অপরাধীর মত ম্লান হয়ে গেল। কিন্তু প্রভুর মুখে বদান্য হাসি।

হরিদাসের ঘরেই থেকে গেল সনাতন। প্রভু বললেন, আর কথা কী। দুজনে একসঙ্গে থাকো আর কৃষ্ণ-নাম আস্বাদ-সমুদ্রে স্নান করো।

সনাতন মন্দিরে যায় না, মন্দিরের চক্র দেখে দূর থেকে প্রণাম করে। গোবিন্দই প্রসাদ নিয়ে আসে। হোক প্রণাম, হোক প্রসাদ, তবু দেহ-ত্যাগের সংকল্প ত্যাগ করেনি সনাতন। যে দেহ কণ্ডুতে কলুষিত সে দেহ রথের চাকায় পিষ্ট হয়ে গেলেই সদ্গতি।

সহসা সেদিন প্রভু চলে এলেন হরিদাসের বাসায়। সনাতনকে বললেন, শোনো, দেহত্যাগে কৃষ্ণ পাওয়া যায় না। কৃষ্ণ পাওয়া যায় ভজনে। দেহত্যাগেই যদি কৃষ্ণ পাওয়া যেত, তবে আর ভাবনা ছিল না, কোটি কোটি লোক এক মুহূর্তে আত্মহত্যা করত। কৃষ্ণপ্রাপ্তির একমাত্র উপায় ভক্তি।

আশ্চর্য, অন্তর্যামী প্রভু মনের গূঢ় বাসনাটি পর্যন্ত জেনে ফেলেছেন!

তুমি নীচ জাতি কে বললে? শুধু যবনের সংস্রবে দীর্ঘকাল ছিলে বলে দৈন্যবশত নিজেকে নীচ বলছ, কিন্তু ভক্তের আবার জাতি কী? কৃষ্ণ ভজন করে সেই উচ্চ সেই বৃহৎ। ভক্তিতে সবাই সমজাতি। আর যদি সত্যি দৈন্য ধরো, অভিমান থেকে মুক্ত হও, দেখবে তোমার প্রতিই ভগবানের বেশি দয়া।

ভগবানের অশেষ দয়া কি সনাতনের চোখের সামনে প্রতিমূর্ত নয়?

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধ ভক্তি, আর সেই নয় অঙ্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নামকীর্তন। বললেন প্রভু, নিরপরাধে নাম নিলেই প্রেমধন মিলে যাবে।

তা হলে বোঝা যাচ্ছে সনাতনের দেহত্যাগ প্রভুর মনঃপূত নয়। সনাতন বললে, আমি ক্ষুদ্র জীব, আমার স্বাতন্ত্র্য কিছু নেই। যৈছে নাচাও তৈছে নাচি। কিন্তু জিজ্ঞেস করি, আমাকে বাঁচিয়ে রেখে তোমার কী লাভ হবে?

যখন তুমি আমাতে আত্মসমর্পণ করেছ তখন তোমার দেহে আর তোমার স্বত্বাধিকার নেই। বললেন প্রভু, যা এখন পরের দ্রব্য তা তুমি নষ্ট করবে কোন অধিকারে? তোমার শরীরে আমার ভীষণ দরকার, অনেক প্রয়োজন সাধন করব একে দিয়ে।

প্রভু যমেশ্বরটোটায় আছেন, পুরীতে খবর পাঠালেন, সনাতন যেন মধ্যাহ্ন-ভিক্ষার সময় আসে।

সনাতন আছে হরিদাসের সঙ্গে, সিদ্ধবকুলের স্থানে। সিদ্ধবকুল থেকে যমেশ্বরে যাবার দুটো রাস্তা। একটা মন্দিরের সিংহদ্বার পেরিয়ে শহরের রাজপথ দিয়ে, অন্যটা সমুদ্রতীর ধরে। প্রথম পথটাই অপেক্ষাকৃত সহজ, অকষ্টসাধ্য। দ্বিতীয় পথটা নির্জন, বালুকাপূর্ণ গাছগাছালি নেই, ছায়া নেই এক ফোঁটা। জ্যৈষ্ঠের বেলা, তবু দ্বিতীয় পথই নির্বাচন করল সনাতন।

তপ্ত বালিতে পা পুড়ে যাচ্ছে সনাতনের খেয়াল নেই। ফোস্কা পড়েছে তো পড়ুক। প্রভু তাকে ডেকেছেন সেই আনন্দ-তন্ময়তায় তপ্ত বালিও তার কাছে সুখস্পর্শ।

ভিক্ষাশেষে প্রভু বিশ্রাম করছেন, সনাতন এসে পৌঁছুল। গোবিন্দ তার জন্যে ভিক্ষাবশেষ নিয়ে এল। প্রসাদ পেল সনাতন।

সনাতন, কোন পথে এলে? প্রভু জিজ্ঞেস করলেন।

সমুদ্রতীরের পথ দিয়ে এসেছি।

সে কি, সিংহদ্বারের পথ দিয়ে এলে না কেন? সিংহদ্বারের পথ ঠাণ্ডা, সমুদ্রতীরের পথ তপ্ত বালিতে দুঃসহ। তোমার পায়ে ফোস্কা পড়ে গিয়েছে, তুমি হাঁটলে কী করে?

পায়ের ফোস্কা টের পাইনি। বললে সনাতন, সিংহদ্বারের পথে আমার যাবার অধিকার নেই। সে পথে জগন্নাথের সেবকেরা যাতায়াত করছে, যদি দৈবাৎ কারু সঙ্গে আমার গাত্রস্পর্শ হয়ে যায়, তাহলে আমার অপরাধের শেষ থাকবে না। আমার স্পর্শে দেবসেবার কাজ অপবিত্র হলে এ অসহ্য।

সনাতনের দৈন্য ও মর্যাদাবোধ দেখে প্রভু তুষ্ট হলেন। বললেন, তুমি অপবিত্র এ তোমাকে কে বলল? তুমি জগৎপাবন, তোমার স্পর্শে মুনি-ঋষিরা পবিত্র হয়। বলে সনাতনকে প্রভু আবার আলিঙ্গন করলেন। তার কণ্ডুরস প্রভুর গায়ে লাগল।

কত নিষেধ করছে তবু প্রভু শোনেন না। ক্ষোভে লজ্জায় মলিন হল সনাতন। জগদানন্দকে জানাল তার দুঃখের কথা, অপরাধের কথা। জগদানন্দ তাকে নীলাচল ছেড়ে বৃন্দাবনে চলে যাবার পরামর্শ দিল।

সে কথা শুনে প্রভু রুষ্ট হয়ে জগদানন্দকে তিরস্কার করলেন। কালকের ছোঁড়া জগা, তার কিনা এত অহংকার, তোমাকে উপদেশ করে! তুমি মাননীয় জন, তোমার মূল্য ও কী বুঝবে?

জগদানন্দের কী ভাগ্য! বললে সনাতন, তাকে আপনি আত্মীয়বোধে তিরস্কার করছেন। আর আমি আপনার অনাত্মীয়। তাই আমাকে আপনার গৌরবস্তুতি। আমার মত হতভাগ্য আর কে আছে? আমি আপনার আত্মীয়তা পেলাম না।

তোমাকে যে আমি প্রশংসা করি, তা বহিরঙ্গ বুদ্ধিতে নয়, তোমাকে বাইরের লোক মনে করে নয়, তোমার এত গুণ,

তোমাকে স্তুতি না করে থাকা যায় না। তোমার দেহ তোমার কাছে বীভৎস, আমার কাছে অমৃততুল্য। তোমার দেহ, ভক্তের দেহ, অপ্রাকৃত, চিন্ময়, শুধু বুদ্ধিদোষে তুমি তা প্রাকৃত মনে করছ। শোনো, আমি সন্ন্যাসী, আমার ধর্ম সমদর্শন। চন্দনে ও পঙ্কে আমার সমবুদ্ধি। তাই তোমাকে আমি ত্যাগ করতে পারি না। তোমাকে ত্যাগ করলে আমার নিজধর্ম সন্ন্যাসধর্ম ক্ষয় হয়।

হরিদাস বললে, প্রভু এ তোমার পরিহাস। জ্ঞানযোগের কথা বাজে কথা। আমি আসল কথাটি জানি।

সে আবার কোন কথা?

আসল কথা হচ্ছে, আমরা অধম, আমরা পতিত, আর তুমি দীনের প্রতি, পতিতের প্রতি স্বভাবদয়ালু। বললে হরিদাস, তুমি তোমার দীনদয়ালগুণে আমাদের অঙ্গীকার করে নিয়েছ। ঘৃণ্য জেনেও স্থান দিয়েছ পাদপদ্মে।

না, তা নয়। বললেন প্রভু, তোমাদের আমি লাল্য মনে করি আর নিজেকে মনে করি লালনকর্তা। মা যেমন সন্তানের ক্লেদ-মালিন্য ধুয়ে-মুছে দেন তেমনি। মার মধ্যে কি ঘৃণা থাকে না দোষজ্ঞান থাকে? মার মধ্যে যে ভাব তাকে তুমি শুধু দয়াও বলতে পারো না। মার মধ্যে শুধু স্নেহসুখ, শুধু প্রীতিময়ী পরিচর্যা। সনাতনের প্রতিও আমার সেই মাতৃস্নেহ। শিশু-সন্তানের গায়ে যদি কন্ডুরস থাকে মা কি তাকে কোলে নেয় না, না কি কোলে নিতে তার ঘৃণা হয়? আমার তো মনে হয় ক্লিন্ন বলেই মার সন্তানকে কোলে নিতে বেশি আনন্দ।

পরে আবার বললেন, বৈষ্ণব দেহ প্রাকৃত নয়, চিদানন্দময়। দীক্ষাকালে যেই ভক্ত কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করল, অমনি সে কৃষ্ণের আত্মসম হয়ে উঠল। ভগবানে সমর্পিত ভক্তদেহ চিন্ময়ত্ব অর্জন করল। তাই সনাতন, তোমার দেহ নিত্যপবিত্র, তোমাকে আলিঙ্গন করে আমি নিত্যতৃপ্ত নিত্যসুখী।

বলে প্রভু আরেকবার সনাতনকে আলিঙ্গন করলেন। আর তখুনি সকলে দেখল, সনাতনের শরীরে আর কন্ডু নেই, সর্বঅঙ্গ মসৃণ সোনার মত ঝলমল করে উঠেছে।

এই তোমার ভঙ্গি! হরিদাস উল্লসিত হয়ে উঠল : ঝাড়িখন্ডের জল খাইয়ে সনাতনের দেহে কন্ডু করালে, তারপর তাকে পরীক্ষা করলে যন্ত্রণায় পড়ে ভগবানে দোষ দেয় কিনা, কর্তব্যে বিমুখ হয় কিনা, পরে নিজেই আবার ব্যাধির নিরাকরণ করলে। তোমার এ লীলারহস্য কে দেখে কে বোঝে।

দোলযাত্রার পরে সনাতন বৃন্দাবন যাত্রা করল। লুপ্ততীর্থ প্রকট করবে, বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা করবে, কৃষ্ণসেবা, কৃষ্ণপ্রচার করবে। প্রভু আবার মনে করিয়ে দিলেন।

প্রভু যে পথে গেছেন সেই পথ ধরল। বলভদ্র আচার্যের কাছ থেকে জেনে নিল কোন গ্রামে কোন নদীতে কোন পাহাড়ে প্রভুর কী কী লীলা হয়েছে। সেই সব দেখতে দেখতে সনাতন পৌঁছুল বৃন্দাবন।

তারপর জগদানন্দ যখন বৃন্দাবনে যায় তখন প্রভু তাকে বলে দিলেন, সনাতনকে বোলো, আমি শিগগির যাচ্ছি, আমার জন্যে যেন স্থান করে রাখে।

দ্বাদশাদিত্য টিলায় প্রভুর জন্যে এক মঠ সংস্কার করে রেখে তার সামনে এক ছাউনি করে তাতে সনাতন বাস করতে লাগল। কিন্তু প্রভু এলেন না।

জগদানন্দের নিমন্ত্রণে সনাতন একদিন মাথায় রক্তবস্ত্র বেঁধে হাজির হল। জগদানন্দ ভাবল এ বুঝি প্রভুরই দেওয়া, ভেবে প্রেমানন্দে বিভোর হয়ে গেল। পরে প্রশ্ন করে জানল এ কোন এক মুকুন্দ সরস্বতী নামে সন্ন্যাসীর দেওয়া। শুনে জগদানন্দ খেপে গেল, রান্নার হাঁড়ি নিয়ে সনাতনকে তেড়ে গেল—প্রভুর প্রধান পার্ষদ হয়ে তোমার এমন আচরণ! সনাতন হেসে বললে, প্রভুতে তোমার যে নিষ্কপট প্রেম তা দেখবার জন্যেই আমার এই ছল। ভয় নেই, এ বস্ত্র আমি আর মাথায় রাখব না, কোনো প্রবাসীকে দিয়ে দেব।

তখন জগদানন্দ শান্ত হল।

বৃন্দাবনে সনাতনের কাছে এল জীবন-ঠাকুর। কন্যাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণ, কাশীতে বিশ্বনাথের কাছে ধনের জন্যে প্রার্থনা করলে বিশ্বনাথ আদেশ করলেন, বৃন্দাবনে সনাতনের কাছে যাও, সেখানে তাঁর হাতে ধনের উপায় আছে। শুনে সনাতন বললে, আমার তো প্রভু ছাড়া কিছু নেই, কী দিয়ে আপনার সেবা করব? বিপ্র হতাশ হয়ে চলে যাচ্ছে, সনাতন হঠাৎ উচ্চকণ্ঠে তাকে ডেকে উঠল, শুনুন, মনে পড়েছে, ঐখানে বালি খুঁড়ে দেখুন তো কী আছে, যা পান নিয়ে যান। আপনার দুঃখ দূর হবে।

আঙুল দিয়ে সনাতন যে জায়গা দেখাল তার বালি খুঁড়ে জীবন পেল এক আশ্চর্য নীলকান্তমণি। অভিভূতের মত বসে পড়ল। ভাবল কী সে বৈরাগ্য কী সে বিপুল ঐশ্বর্য যার জন্যে এই অমূল্য মণিকেও তুচ্ছ করা যায়।

জীবন সনাতনের চরণ আশ্রয় করে বললে, আমাকে দীক্ষামন্ত্র দিন।

সনাতন তাকে দীক্ষামন্ত্র দিল। বললে, শ্রীমন্মহাপ্রভু শরণাগতের পালক, কোনো চিন্তা নেই।

এই সাধুকৃপাই স্পর্শমণি। 'মহৎ-কৃপা বিনা কোনো কার্যে সিদ্ধি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়।।'

দৈন্যার্ণবে শ্রীচৈতন্য আমার মহাবৈদ্য। আমি ভক্তিহীন দীন দরিদ্র, আমি কোথায় যাব, আমার কে আছে? আমি শুধু দীনবন্ধু শ্রীচৈতন্যে শরণ নিলাম।



ফিরে আসা

প্রভাস সান্যাল

বিখ্যাত লেখকদের লেখা কেদার-বদ্রিনাথ যাত্রা সম্বন্ধে নানা রকম বই পড়ে সে পথে পা বাড়াবার জন্য উতলা হয়ে উঠেছিলাম এবং দৈবক্রমে সেদিকে যাবার সুযোগও আমার জীবনে এসেছিল। সে আজ অনেক দিনের কথা। বয়স ছিল আমার নিতান্ত কাঁচা। ইংরাজরা তখন ছিলেন আমাদের দেশের হর্তাকর্তা বিধাতা। থাকতাম শিখদের তীর্থস্থান অমৃতসরে।

স্থানীয় মেডিকেল কলেজের এক পাঞ্জাবী ছাত্র ছিল আমার বিশেষ বন্ধু। নাম তার প্রকাশচাঁদ। গরম কালের এক দুপুরে এসে সে ধরে বসল, তার বাবার সঙ্গে কেদার-বদরিনাথে আমাকে যেতেই হবে। তিনি যাচ্ছেন তীর্থ-ভ্রমণে। তাঁকে একলা ছেড়ে দিতে সে রাজী নয়। প্রকাশ-চাঁদের বাবা লালাজী আগেই ছেলের কাছে জেনেছিলেন ছবি আঁকা আমার পেশা। এজন্য তিনি টোপ ফেলেছিলেন যে, আমি যদি তাঁকে হরিদ্বার থেকে আরম্ভ করে কেদার-বদরিনাথ অবধি যত প্রসিদ্ধ তীর্থ-স্থান আছে সেগুলির ছবি এঁকে দিই তবে আমাকে মোটা টাকা দক্ষিণা দেবেন। আমি তাঁর ছেলের বন্ধু। আমাকে মিথ্যা আশা দিতে লালাজীর বিবেকে নিশ্চয়ই বাধবে, এই রকম ধারণা নিয়ে তাঁর প্রস্তাবে সম্মতি দিলাম। সাব্যস্ত হল পরের দিন বিকেলের ট্রেনেই আমরা অমৃতসর থেকে রওনা দেব।

পরের দিন সকালে মেডিকেল কলেজের ক্যানটিন থেকে জলযোগপর্ব শেষ করেই নিজের আস্তানায় ফিরে এলাম। সফরের জন্য জিনিষপত্র গোছাতে হবে তো? স্থানীয় বৈশাখী মেলা থেকে একটি মিলিটারি ব্যাগ কিনেছিলাম, সেটা এবার কাজে এসে গেল। তার এক খোপে ড্রইং-বোর্ড, রঙ, তুলি ও ছবি আঁকার জিনিসপত্র, আর অন্যটায় দুটি মোটা কম্বল একটা ছোট্ট বালিশ কিছু পরিধেয় কাপড়-চোপড় ভরে নিলাম। দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর বিশ্রামান্তে দেখি প্রকাশচাঁদ তার বাবাকে সঙ্গে নিয়ে এসে হাজির। মেডিকেল কলেজের দুজন ছাত্রও তার সঙ্গে এসেছিল। দেখলাম তাদের হাতে কতকগুলি ফুলের মালা। হেসে জিজ্ঞেস করলাম, এসব মালা দিয়ে কি হবে? প্রকাশ-চাঁদ বলল, 'বাবা তীর্থস্থানে শুভ কাজে যাচ্ছেন, ওঁর গলায় পরিয়ে দেব।' নিজের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'ভাই সান্যাল, ঝটপট তৈরি হয়ে নাও, তোমাদের ট্রেনের সময় হয়ে গেছে।' আমি একখানি হাত কাটা সার্ট ও একটা হাফ প্যান্ট পরে নিলাম। তারপর পায়ে কেডস জুতো পরে নিয়ে মালপত্র বোঝাই মিলিটারী ব্যাগটা পিঠের উপর ঝুলিয়ে দিয়েই প্রকাশচাঁদকে মিলিটারী কায়দায় হাত তুলে একটি স্যালুট দিলাম, এবং সঙ্গে সঙ্গে বললাম, যো হুকুম জনাব, আমি প্রস্তুত। এতে সবাই জোরে হা-হা করে হেসে উঠল।

এর পর দুটো টাঙ্গায় করে আমরা সকলে স্টেশনে যেয়ে দেখি ট্রেন আসতে খুব অল্প দেরি। বুকিং অফিসের দিকে টিকিট কিনতে যাচ্ছি দেখে প্রকাশচাঁদ আমার সামনে এসে বললো, 'ভাই সান্যাল, আমি সকালেই তোমার ও বাবার জন্য হরিদ্বারের টিকিট কিনে নিয়েছি। তুমি ত আমাদের জন্যই ওদিকে যাচ্ছ, তোমার সমস্ত খরচ আমরাই দেব।'

ইতিমধ্যে দেখা গেল উপস্থিত সমস্ত যাত্রীই সজাগ হয়ে উঠল। ট্রেন প্ল্যাটফর্মে এসে গেছে। প্রকাশচাঁদ ওর বাবা লালাজী আমাকে ফার্স্ট ক্লাসে বসিয়ে দিল। মনে মনে ভাবলাম, লালাজী গত দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধে ইংরাজ সরকারের কাছ থেকে ঠিকার কাজ নিয়ে যে প্রভূত টাকা উপার্জন করে-ছেন। তার কিছুটা অংশ ধর্মীয় কাজে খরচ করতে চান। প্রকাশচাঁদ আর তার সাথী মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা সঙ্গে আনা ফুলের মালাগুলি লালাজীর গলায় পরিয়ে দিল। যথা সময়ে গাড়ী ছাড়লো। প্রকাশচাঁদ ও তার সাথীরা হাত উঁচু করে নাড়াতে লাগল। আস্তে আস্তে স্টেশন ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম হয়ে দিকবলয়ের সঙ্গে মিশে গেল।

লুকশার জংশনে ট্রেন পৌঁছতে রাত সাড়ে দশটা বেজে গেল। আমরা সেইখানেই স্টেশনের হোটেলে রাত্রের খাবার খেয়ে নিয়ে হরিদ্বারগামী ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাসে গিয়ে নিজেদের আস্তানা গাড়লাম। দশ, পনেরো মিনিট বাদে আমাদের গাড়ী ছাড়ল। দেখতে দেখতে লুকশার স্টেশনের আলোগুলো জোনাকি পোকার মত ঝকমাকিয়ে চোখের সামনে মিলিয়ে গেল। তখন ঘন অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে আমাদের গাড়ী সর্পিল গতিতে এগিয়ে চললো। চেয়ে দেখি লালাজী ততক্ষণে নাক ডাকিয়ে অকাতরে ঘুমুচ্ছেন। আমাদের কামরার অন্যান্য যাত্রীদের অবস্থায়ও তথৈবচ। আমি শুধু নিশাচরের মত জানলার পাশে একা জেগে রইলাম। ঐ দূরে ঘন অন্ধকারময় আকাশের বুকে ছোট ছোট তারাগুলি ঝিকমিক করে জ্বলছে। ওরা ত আমার অপরিচিত নয়। শৈশবে যখন বাংলা-মায়ের স্নেহক্রোড়ে থাকতাম, কখনো কখনো গভীর রাতে জেলেদের ইলিশ মাছ-ধরার ছোট্ট ডিঙি নিয়ে ভরা পদ্মার মাঝখানে চলে যেতাম, তখন মাথার ওপরে থাকত ঐ তারাগুলি। ওরা আমার পিছনে ফেলে আসা শৈশব-জীবনের অনেক কথাই মনে করিয়ে দিতে লাগল, যার কোন শেষ নাই। অতীত জীবনের ঘটনাসমূহের কথা চিন্তা করতে করতে অবশেষে ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

ভোরে লালাজীর ডাকে ঘুম ভাঙলো। হরিদ্বার এসে গেছে। ঝটপট মালপত্র সঙ্গে নিয়ে আমরা স্টেশনের বাইরে এসে দেখি টাঙ্গা পাওয়া দুষ্কর ব্যাপার।। যাত্রীর অনেক ভীড়। শেষে লালাজী একটি এক্কা ভাড়া করলেন। প্রায় এক মাইল এক্কা চালিয়ে গঙ্গার ঘাটের উপর একটা দোতালা ধর্ম-শালার সামনে আমাদের নামিয়ে দিয়ে, লালাবাজীর কাছ থেকে পয়সা নিয়েই এক্কা ওয়ালা বিদায় নিল। ধর্মশালার ম্যানেজারের কাছ থেকে নীচের তলার একটি ঘর পেতে আমাদের বেশী বেগ পেতে হল না। জানলা খুলতেই মনটা খুশীতে ভরে গেল। দেখলাম সামনেই গঙ্গা বইছে। জিনিষপত্র ভিতরে রেখে, হাতমুখ ধুয়ে নিয়ে, কাঁধের উপর গামছা ফেলে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে উপস্থিত হলাম। গঙ্গার ঘাটটা দেখলাম অনেকখানি জায়গা নিয়ে বাঁধান। যথেষ্ট লোকের ভীড় সেখানে। ভারতের সমস্ত প্রদেশের লোকের সমাবেশ হয়েছে। আমাদের বেশভূষা, আচার ব্যবহার এবং ভাষার পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সংস্কৃতির দিক দিয়ে আমরা সকলে এক গরিষ্ঠ মহান হিন্দুজাতি। হরিদ্বারকে এক পবিত্র তীর্থস্থান বলেই মনে করি। এখানকার গঙ্গায় স্নান করে নেওয়াটা আমাদের কাছে এক মহান পুণ্য কর্ম। পুণ্য লোভাতুর লালাজী কোমরে গামছা বেঁধেই গঙ্গায় নেমে পড়লেন। আমিও তাঁর অনুসরণ করলাম। কিনারায়ও দেখলাম জলের বেগ বেশ তীব্র। একটু অসাবধান স্নান করলেই জলের বেগ যে কোথায় টেনে নিয়ে যাবে তার কোন ঠিক নেই। স্নান সমাপ্ত ধর্মশালায় ফিরে, জামা কাপড় পরে নিয়ে বাজারের এক ময়রার দোকানে জলযোগ করে নিলাম। তারপর লালাজী অন্য দোকান থেকে খুঁটিনাটি জিনিষ কেনবার জন্য আমাকে সঙ্গে নিয়ে বাজারের ভেতরে চললেন। সেখান থেকে যা কিছু জিনিষ কিনলেন, ধৈর্যের সঙ্গে দরাদরি করে প্রত্যেকটি জিনিষের দাম বেশ কমিয়ে কমিয়ে কিনলেন। আমি বললাম, লালাজী আপনি যে ওদের কাছ থেকে প্রত্যেকটি জিনিষের দর অত কমিয়ে কিনলেন, তাতে ওদের লাভের অংশ খুব কমই থাকবে।' আমার কাছ থেকে এই রকম শুনে লালাজী জোরে হাহা করে হেসে উঠলেন, আর বললেন, 'সান্যালবাবু, শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি। আমি বাচ্চা কাল থেকে ব্যাবসা করে খাচ্ছি, ব্যাবসাদারের চরিত্র আমার বেশ জানা আছে। এটা তীর্থস্থান। যাত্রীরা একবারেই ওদের দোকান থেকে জিনিষ কিনবে, রোজ রোজ কিনতে যাবে না। এই

সুযোগে ওরা যাত্রীদের একবারেই লুটে নিতে চায়। তুমি শিল্পী মানুষ, ব্যবসাদারের চাল বুঝবে না।' এই বলেই আমার দিকে তাকিয়ে একটু মুচকে হাসলেন।

এরপর বাজারের হোটেল থেকে দুপুরের খাবার খেয়ে আমরা ধর্মশালায় ফিরে এসে বিছানা পেতে বিশ্রামের আশায় শুয়ে পড়লাম। অল্প সময়ের মধ্যে ঘুমও এসে গেল।

বিকাল সাড়ে চারটা নাগাদ লালাজীর ডাকে ঘুম ভাঙলো। তিনি বললেন, 'আমি গঙ্গার ধারে চললাম স্যান্যালবাবু। তুমি ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দাও।' বেলা পড়ে গেছে দেখে লালাজীকে বললাম, 'আমিও বেরুব। আমাকে এখন ছবি আঁকতে হবে।' লালাজী বললেন, 'হ্যাঁ এখানকার বিখ্যাত হরকিপিয়ারী মন্দিরটিই আমাকে এঁকে দিতে হবে।' হরকিপিয়ারী মন্দিরটি আঁকতে ঘণ্টা দুয়েক সময় আমার লেগেছিল। রাত্রে শোবার সময় লালাজী বললেন 'বাঙ্গালী বাবু, তুমি যখন ছবি আঁকো, তখন আমি স্থানীয় বাস কম্পানির অফিসে গিয়েছিলাম। সেখানে জানতে পেলাম তাদের একটি বাস কাল সকালেই হৃষিকেশের দিকে রওনা দেবে। আমরা কাল সকালেই ঐ বাসে যদি হৃষিকেশ যাই তবে কেমন হয়?' বললাম, 'এখানকার কাজ ত সেরেই নিয়েছি, এখন হরিদ্বার ছাড়তে আমার কোন আপত্তি নেই।'

পরের দিন সকালেই আমরা সেই বাসেই অল্প সময়ের মধ্যে হৃষিকেশ পৌঁছলাম। হৃষিকেশ দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারলাম না। এখান থেকেই হিমালয় সুরু হয়েছে। গঙ্গা হিমালয় থেকে নেবে এইখানেই সমতল ভূমিতে মিশেছে। লালাজী স্থানীয় পাঞ্জাব-সিন্ধ ধর্মশালা থেকে আমাদের থাকবার জন্য একটি ঘর নিলেন। লালাজীর নির্দেশে সকালের দিকে রোদের তাঁত না বাড়তেই আমি হৃষিকেশের বিখ্যাত ভরত মন্দিরটি এঁকে নিলাম। দুপুরের আহারান্তে বিশ্রামের পর বিকালের দিকটা লালাজী ও আমি গঙ্গার ধারে গিয়ে একটি পাথরের উপর বসলাম। আমাদের পায়ের নিচ দিয়ে পাথর ঘেসে গঙ্গা বয়ে চলেছে। কি স্বচ্ছ পরিস্কার নীল জল। তার মধ্যেই কিনারা দিয়ে বিরাট বিরাট রুই কাতলা মাছ হেলেদুলে মন্থর গতিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারা মানুষকে ভয়ত দূরে কথা, ভ্রুক্ষেপও করে না। গঙ্গাধারে বসে উত্তর ভারতীয় যাত্রীরা মাছগুলিকে কি যেন খেতে দিচ্ছিল। লোকমুখে শুনলাম এখানে মাছ ধরা আইনত নিষেধ। অল্প সময়ের মধ্যে দেখলাম গঙ্গাতীর গেরুয়াধারী সন্ন্যাসীতে ভরে গেল। স্থানীয় লোক মারফত জানা গেল, এই সন্ন্যাসীরা হৃষিকেশে বারমাসই থাকেন। সন্ধ্যা বেলায় গঙ্গা তীরের এক ছত্র থেকে ওঁদের ডালরুটি বিলি করা হয়। তাই সব সন্ন্যাসী এখন গঙ্গার ধারে এসে উপস্থিত হয়েছেন। অনতিদূরে একটি শ্বেতপাথরের উপর বসে যুবক সন্ন্যাসী মিষ্টি সুরে সংস্কৃত স্তোত্র পাঠ করছিলেন। কিছু সংখ্যক গৃহস্থ লোক বালুর উপর তাঁর সামনে বসে শ্রদ্ধাভরে তা শুনছিলেন। সংস্কৃত স্তোত্র শুনবার জন্য লালাজীও সন্ন্যাসীর সামনে গিয়ে বালুর উপর বসে পড়লেন। যুবক সন্ন্যাসী কখন কখন সংস্কৃত শ্লোকগুলির অর্থ শ্রোতাদের সরল হিন্দিতে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। এদিকে তখন অপর পারে দিকবলয়ের দিকে সূর্য ঝুঁকে পড়েছিল। ডুবন্ত সূর্যের গোলাপী আভা গেরুয়াধারী যুবক সন্ন্যাসীর উপর পড়াতে মনে হচ্ছিল যেন এক দিব্য জ্যোতির্ময় পুরুষ শ্বেত পাথরের উপর বসে আছেন। তাঁর মুখনিঃসৃত সংস্কৃত শ্লোক শ্রোতাদের মনকে অভিভূত করে ফেলেছিল। শেষে আমিও শ্লোক শোনবার জন্য লালাজীর পাশে গিয়ে বসলাম। খানিকক্ষণ বাদেই গঙ্গার ধারে কোথায় যেন জোরে ঘণ্টা বেজে উঠল। তখন যুবক সন্যাসী শ্লোক বলা বন্ধ করে আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। তাঁর হাসি দেখেই আমি চমকে উঠলাম, এযে আমার অতি পরিচিত হাসি! নিজেকে সামলে নিয়ে সন্ন্যাসীকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে যাব, ততক্ষণে সন্ন্যাসী সেখান থেকে উধাও হয়েছেন। দেখলাম গঙ্গাধারের উপস্থিত সকল সন্ন্যাসীই অনতিদূরে একটি চালাঘরের দিকে এগিয়ে চলেছেন। স্থানীয় এক লোকের কাছে জানা গেল যে, ঐ চালা ঘর থেকে হৃষিকেশের একছত্রের তরফ থেকে সন্ন্যাসীদের ডাল-রুটি দেওয়া হয়।

রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর শোবার জন্য যখন বিছানা পাতছিলাম লালাজী জিজ্ঞাসা করলেন, 'স্যান্যালবাবু তুমি তখন সন্ন্যাসী মহারাজের হাসি দেখে চমকে উঠলে কেন?' বললাম, 'হাসিমুখ দেখেই বুঝতে পারলাম সন্ন্যাসী ছাত্রজীবনে আমার সহপাঠি ছিল।'

'আচ্ছা! তবে প্রথমেই ওঁর কাছে এলে না কেন?'

ওর সুন্দর লম্বা কোঁকড়ান চুল কেটে ফেলবার জন দূর থেকে ওকে আমি চিনতে পারি নি। তাছাড়া ধবধবে ফরসা রংটা পুড়ে তামাটে হ'য়ে গেছে।'

আমার কাছে এইরকম শুনে লালাজী জিজ্ঞাসা করলেন, 'ছোটবেলাতে নিশ্চয়ই তোমার সহপাঠির ধর্মের দিকে ঝোঁক ছিল?'

বললাম, 'মোটেই না, ছোটবেলায় ও ছিল ঘোর নাস্তিক।'

'তবে মনে এরকম পরিবর্তন এল কি কি করে?'

'হয়ত বা পুলিশের ভয়ে।' আমার কাছ থেকে এই রকম শুনে লালাজী আশ্চর্য হয়ে গেলেন। খানিকক্ষণ চুপ থেকে লালাজী নীচু স্বরে প্রশ্ন করলেন, 'স্যান্যালবাবু ছোটবেলায় তোমার সহপাঠীর স্বভাব খারাপ ছিল কি?'

বললাম, 'না, ছোটবেলায় ও ছিল দারুণ দেশভক্ত, সব সময় মোটা খদ্দর পরে থাকত, সি, আই, ডি অফিসের লোক মাঝে মাঝে আমাদের স্কুল হোস্টেলে এসে ওর খবর নিয়ে যেত। শেষে একদিন দার্জিলিং-এর ঘোড়দৌড় মাঠে তৎকালীন ইংরাজ গভর্ণরকে বিপ্লবী দলের লোকের দ্বারা গুলি করে মারবার চেষ্টার খবর দৈনিক সংবাদপত্রে বেরুতেই দেখা গেল স্কুল হোস্টেল থেকে ও উধাও হয়েছে। ওর কথা ত আমি একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম। আজ বহু বৎসর পরে উত্তর ভারতের তীর্থস্থান এই হৃষিকেশ, তাও আবার এক সন্ন্যাসীর বেশে ওকে যে দেখতে পাব তা আমি কল্পনা করতে পারিনি।'

আমার এই কথাগুলি লালাজী অবাক হয়ে শুনে গেলেন। তারপর একটু চুপ করে থেকে আমাকে বললেন, 'কাল সন্ধ্যায় তোমার সহপাঠীর সঙ্গে একবার দেখা কর, তিনি যখন এইখানে থাকেন তবে কেদার-বদ্রিনাথের যাত্রা করতে হলে সঙ্গে কি কি জিনিষ নেওয়ার প্রয়োজন তা বলে দিতে পারবেন।'

পরের দিন গঙ্গার ধারে অনেকক্ষণ বসে থেকেও আমার সহপাঠীর দেখা পেলাম না। সন্ধ্যায় আবার আগের দিনের মত স্থানীয় ছত্রের কুটির থেকে সন্ন্যাসীদের ডাল-রুটি দেওয়ার জন্য ঘণ্টা বেজে উঠল। দেখতে দেখতে পূর্বদিনের মত গঙ্গার ধারটা আবার সন্ন্যাসীতে ভরে গেল। তখন আমি আর লালাজী অনেকক্ষণ ধরে গরু খোঁজার মত খুঁজেও আমার সহপাঠীর টিকটির দর্শন পেলাম না। লালাজী ক্লান্ত হয়ে গেছেন দেখে, তাঁকে গঙ্গার ধারে একটি জায়গায় বসিয়ে রেখে, যে ছত্র থেকে সন্ন্যাসীদের ডালরুটি দেওয়া হচ্ছে তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, এই আশায় যদি সেখানে তার দেখা পাই। চার পাঁচজন সন্যাসী লাইনে পর পর এসে তাদের কমণ্ডুল-বালতিতে ডাল ও হাতে রুটি নিয়ে যাওয়ার পর আমাদের আকাঙ্ক্ষিত মুখটির দর্শন পেলাম। সেও নিজের কমণ্ডুলবালতীতে ডাল ও এক হাতে রুটি নিয়ে পাঁচ ছয় পা এগিয়ে যেতেই আমি পিছন থেকে নিঃশব্দে গিয়ে সন্ন্যাসীর কাঁধের উপর হাত রাখলাম। সে চমকে আমার দিকে তাকাল। এতে আমি হাসি চেপে রাখতে না পেরে উচ্চস্বরে হা হা করে হেসে উঠলাম। তখন রমেশ আমাকে চিনতে পারল দেখলাম, সে তৎক্ষণাৎ বলে উঠল, 'বাংলা দেশ ছেড়ে উত্তর ভারতের এই দূর হৃষিকেশেও বাঁদরটা এসে জুটেছে দেখছি।'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কাঁধে হাত রাখতে ভয় পেয়ে গেলি কেন?'

রমেশ বললো, 'এই হৃষিকেশে কোন গৃহস্থই সন্ন্যাসীর কাঁধের উপর এইভাবে হাত রাখতে সাহস পাবে না। আমি মনে করেছিলাম কোনো সি-আই ডির কাছে ধরা পড়ে গেছি। ওদের দয়াদৃষ্টি কারোর উপর পড়লে, ওরা কি সহজে ছাড়তে চায় রে ভাই! তোরা ত জানিতস তোদের সঙ্গে যখন পাবনার

স্কুলে পড়তাম, মাঝে মাঝে সি-আই-ডির লোক এসে আমার খবর নিয়ে যেত।'

বললাম, 'হাঁ আমার খুব মনে আছে; শেষে ওদের তাড়নাতেই তুই বিরক্ত হয়ে দেশ ত্যাগ করলি তাও আমরা বেশ বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু তুই খদ্দর ছেড়ে গেরুয়া ধারণ করবি সেকথা কোনদিন ভাবতে পারিনি। বহুদিন পরে হিমালয়ের পাদদেশে আমার বাল্যকালের সহপাঠীকে যে এক সন্ন্যাসীরূপে দেখব তা আশা করিনি। তোকে কাছে পেয়ে আমার কি যে ভাল লাগছে রমেশ তা আমি কি করে তোকে বোঝাই।'

'আমারও কি তোর সাথে দেখা হয়ে কম আনন্দ হচ্ছে রে প্রভাস, ছোটবেলার সমস্ত স্মৃতি সিনেমার মত চোখের সামনে ভেসে আসছে। চল চল আমার কুটিয়াতে চল দুজনে প্রাণখুলে গল্প করা যাবে'খন।' বলেই রমেশ আমার ডান হাতটি ধরে গঙ্গার ধারের একটি পাহাড়ের উপর চড়তে উদ্যত হল, আর বললো, পাহাড়ের উপরেই তার কুটিয়া আছে।

আমি হেসে বললাম, 'তোর কুটিয়াতে নিশ্চয়ই যাব, তবে তার আগে আমার সঙ্গী এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের সঙ্গে তোকে দেখা করতে হবে। আমরা কেদার-বদরীনাথের যাত্রী। পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটি যাত্রার পথে কি কি জিনিষ সঙ্গে নেওয়ার প্রয়োজন তা তোর কাছ থেকে জেনে নিতে চান।' এতে রমেশ আমার সঙ্গে ঘাটের দিকে এসে লালাজীর সঙ্গে দেখা করল। লালাজী এক এক করে রমেশের কাছ থেকে যাত্রার পথের প্রয়োজনীয় জিনিষের নাম নিজের নোটবুকে টুকে নিলেন। এরপর আমাকে সঙ্গে নিয়ে পাহাড়ের দিকে না গিয়ে রমেশ ভরত মন্দিরের দিকে চলালো দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কিরে পাহাড়ের উপর তোর কুটিয়াতে যাবি না?'

'আগে মার সঙ্গে দেখা করে নিই।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'কার মার সঙ্গে দেখা করবি?'

'আমার মার সঙ্গে রে। মা যে আমার সঙ্গে এইখানেই থাকেন। রোজ সন্ধ্যায় ভরত মন্দিরে আরতি দেখতে যান। মাকে বলে যাই কুটিয়াতে ফেরার পথে বাজার থেকে যেন কিছু ভাজা মুগের ডাল আর বেগুন নিয়ে যান। মা ত হবিষ্যান্ন করেন, কুটিয়াতে কিছু ঘিও আছে।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'এসব দিয়ে কি হবে?'

'কেন তোর জন্য মা খিঁচুড়ি আর বেগুন ভাজা করে দেবেন।'

বললাম, 'এখন আবার এসব হাঙ্গামা করতে যাচ্ছিস কেন?'

ও বললো, 'আমরা খাব, আর তুই চুপ করে বসে থাকবি তা কেমন করে হয়?'

বললাম, 'খেয়ে ধর্মশালায় ফিরতে দেরী হয়ে যাবে। আমার সঙ্গী পাঞ্জাবী ভদ্রলোককে খামকা কষ্ট দেওয়া হবে। আমরা একসঙ্গে খাই, অথবা তিনি খাবার নিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করবেন। বরঞ্চ আজকে তোর সঙ্গে গিয়ে তোর কুটিয়াটা দেখে আসি, কাল বিকেলেই তোদের কাছে চলে আসব। আর রাত্রে তোর মায়ের হাতে রাঁধা খিঁচুড়ি খাওয়া যাবে'খন।'

রমেশ আমার প্রস্তাবে রাজী হ'ল এবং আমায় সঙ্গে নিয়ে গিয়ে পাহাড়ের উপর তার কুটিয়া দেখাল। আহা কি সুন্দর জায়গা! সেখানকার দৃশ্য দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। একটি বকুল গাছের তলায় রমেশের কুটিয়া বিদ্যমান। কুটিয়ার বেড়া পাহাড়ী লালমাটি দিয়ে পরিষ্কার তকতকে করে লেপা। সামনের খানিকটা জায়গা নিয়ে উঠান, উঠানের চারিধারে নানা রং-এর ফুল ফুটে আছে। কুটিয়ার দরজার দুই পাশে সূর্যমুখী গাছে বড় বড় দুটি ফুল ফুটে রয়েছে, যেন আগন্তুককে হাসিমুখে কুটিয়ার ভিতর যাবার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে। উপর থেকে বকুল ফুলের মিষ্টি মোহক গন্ধ এসে আমাকে মোহিত করে ফেলল। বলে উঠলাম, 'রমেশ হিমালয়ের কোলে এমন সুন্দর শান্তির নীড় বেঁধে নিয়েছিস, তোর এরকম শান্তিময় জীবন দেখে আমার বেশ হিংসা হচ্ছে রে।'

এই কথা শুনে রমেশ জোরে হাহা করে হেসে উঠে বললো, 'আমার মার সঙ্গে দেখা হ'লে যেন একথা তাঁকে বলিস।' এই বলে রমেশ আমাকে নিয়ে তার কুটিয়ার মধ্যে ঢুকল। দেখলাম ভিতরে বাঁদিকে এক কোনে একটা তক্তার উপর কতকগুলি ইংরাজী ও সংস্কৃত বই সাজান রয়েছে। বেড়ার উপর একটা হরিণের চামড়া ঝুলানো দেখে রমেশকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ঋষি-মহাশয়ের মৃগচর্মের উপর বসে সাধনা করা হয় বুঝি?'

এতে সে হেসে বললো 'ব্রাহ্ম মুহূর্তে ওটার উপর বসে একটু যোগ প্র্যাকটিস করি আর কি।' কুটিয়ার আর এক কোনে ছোট্ট একটা কাঠের সিংহাসনের উপর গৌর-নিতাই-এর মূর্তি রয়েছে দেখলাম। দুজনের গলাতেই বকুল ফুলের মালা পরান, কপাল চন্দনচর্চিত। মূর্তি দুটো দেখতে খুবই সুন্দর।

আমি সেইদিকে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে আছি দেখে রমেশ বলে উঠল 'মা গৌর-নিতাই-এর পুজো করেন।' বাংলাদেশ ছেড়ে এই সুদূর হৃষিকেশে এসেও রমেশের মা দেখছি বাংলারই দুই মহাপুরুষকে বরেণ্য মনে করেন এবং মনে-প্রাণে খাঁটি বাঙ্গালী রয়েছেন। দেখে তাঁর প্রতি মনে একটা বেশ শ্রদ্ধার ভাব এসে গেল।

কুটিয়ার বাইরে নজর পড়াতে দেখলাম বেশ অন্ধকার হয়ে আসছে, সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়েছে। তখন রমেশের কাছ থেকে ধর্মশালায় ফিরে যাবার জন্য বিদায় চাইলাম। রমেশ বললো, 'কাল বিকালে এখানে আসবি, আর মার হাতে রাঁধা খিঁচুড়ি খাবি। কাল আমরা কোথাও যাব না, তোর জন্য অপেক্ষা করব।'

পরদিন বিকেলে ওদের ওখানে যাবার কথা দিয়ে ধর্মশালাতে গিয়ে দেখি, লালাজী সামনে রাত্রের খাবার নিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। আমাকে দেখেই লালাজী বলে উঠলেন, 'বহুদিন বাদে ছোটবেলার বন্ধুর সঙ্গে মিলন! আমি ভাবলাম বাঙ্গালীবাবু আমাকে বোধহয় ভুলেই গেলেন।' বললাম, 'তা কি করে হয়? আপনার কথা বলাতেই সে আজ আমাকে ছেড়ে দিল, তবে আমাকে কথা দিতে হল কাল বিকালে ওদের ওখানে আবার আমাকে যেতে হবে এবং রাত্রের খাবার ওদের ওখানেই আমাকে খেতে হবে।' লালাজী বললেন, 'তাই করো। আমি কাল সন্ধ্যায়, তোমার বন্ধুর কাছ থেকে যাত্রাপথের প্রয়োজনীয় যে জিনিষ-গুলির নাম লিখে নিয়েছি, এখানকার বাজার থেকে কিনে নেব ঠিক করেছি।'

পরের দিন বিকালে রমেশের কুটিয়ার সামনে গিয়ে তার নাম ধরে ডাকতেই কুটিয়ার ভিতর থেকে একজন মধ্য বয়সীয়া মহিলা বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন 'বাবা, তুমিই আমার ছেলে রমেশের বাল্যবন্ধু? ওর সঙ্গে পাবনায় স্কুলে একসঙ্গে পড়তে?'

'আজ্ঞে হাঁ।'

'রমেশ বাজার থেকে কিছু জিনিষ কিনতে গেছে। তুমি ভিতরে এসে বস।' বলেই রমেশের মা মেঝের উপর আসন পেতে দিলেন। আমি আসনে বসলেই, দেখলাম, রমেশের মা পাথরের একটা রেকাবিতে দুটো পেঁড়া ও একটি গ্লাসে জল সামনে রাখলেন এবং আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'বাবা, আমার গৌর-নিতাই-এর প্রসাদটুকু খাও।' প্রসাদের অসম্মান করা উচিত নয় ভেবে আমি চুপচাপ পেঁড়া দুটি কপালে ঠেকানর পর মুখে পুরে দিয়ে গ্লাসের জলটুকু খেয়ে নিলাম। প্রসাদটুকু খেয়ে নেওয়ার পর সামনে পলক পড়তেই দেখি, রমেশের মা সস্নেহে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। এতে আমি লজ্জায় মাথা নিচু করে নেওয়াতে, তিনি বললেন, 'লজ্জা কিসের বাবা তুমি ত আমার ছেলের মত। বলি হ্যাঁ তুমি নাকি কেদার-বদরি-নাথের তীর্থে যাচ্ছ?'

'আজ্ঞে হাঁ।'

'খুব সাবধানে যাবে, রাস্তাঘাট বেজায় খারাপ, মা বাপের—অনুমতি নিয়েছ ত?'

'মার কাছে একটি চিঠি লিখে দিয়েছি যে আমি কেদারবদরিনাথের তীর্থে যাচ্ছি।'

আমার কাছ থেকে এই রকম শুনে, রমেশের মা ব'লে উঠলেন, 'মায়ের কাছ থেকে তো অনুমতি নিয়ে এপথে পা বাড়াও'নি, দয়া করে মার নামে একটি চিঠি ছেড়ে দিয়েছ। এই ত আজকালকার ছেলেদের একধারা, রমেশও কি আমাকে কম ভুগিয়েছে।'

বললাম, 'ছেলে ত এখন আপনার কাছেই আছে।'

'এখন না হয় আছে। সেই যে তোমাদের পাবনার স্কুলের বোর্ডিং থেকে ইংরাজের পুলিশের ভয়ে পালাল তারপর বছরের পর বছর ধরে ওর বাবা ও আমি কম দুঃশ্চিন্তায় দিন কাটিয়েছি? ছেলে তো আমাদের ঐ একটি। ওর বাবাও একদিন

হঠাৎ হার্টফেল করে আমাকে একা ফেলে ইহলোক ত্যাগ করলেন। একা জীবনযাপন করা হ'য়ে গেল আমার দায়! ছেলের আশা ত একদম ছেড়েই দিয়েছিলাম।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'রমেশের সঙ্গে আবার দেখা হল কি করে?'

'আমাদের পারিবারিক পুরোহিত ভট্টাচার্য মশাই-এর সঙ্গে এদিকে তীর্থ করতে এসে এই হৃষিকেশে ছেলেকে সন্ন্যাসীরূপে দেখতে পেলাম। সেই থেকে রমেশের সঙ্গে এইখানেই রয়ে গেলাম বাছা।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'রমেশ না হয় সন্ন্যাসী হয়ে গেছে, ছত্র থেকে ডাল-রুটি খেয়ে জীবন নির্বাহ করে! আপনার খরচ কি করে চলে?'

ভট্টাচার্য দেশে ফিরে গিয়ে আমাদের বাড়ীতে এক ভাড়াটে বসিয়েছেন। সেই ভাড়াটে প্রতি মাসে বাড়ী ভাড়ার টাকা মণি-অর্ডার করে আমাকে পাঠিয়ে দেয়। ঐ টাকাতেই আমার খরচ চলে যায় বাছা।'

'এখানে থাকতে আপনার কেমন লাগছে?'

'তা বাবা শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর ইচ্ছায় আমাদের মা-বেটার দিন একরকম বেশ কেটে যাচ্ছে। রমেশ ওর বই পড়াশুনায়, আর যোগ সাধনায় ব্যস্ত থাকে আর আমি শ্রীগৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ প্রভুর বিগ্রহ পূজায় আর মন্দিরে মন্দিরে কীর্তন শুনে, আরতি দেখে জীবনের শেষদিনগুলি কাটিয়ে দিচ্ছি।'

ইতিমধ্যে রমেশ একহাতে গুটি কতক টম্যাটো আর অন্য হাতে একটা থলে নিয়ে কুটিয়াতে ঢুকেই আমাকে দেখে বলে উঠল, 'প্রভাস এসে গেছিস?'

বললাম, 'না এসে উপায় কি! সন্ন্যাসীর আদেশ যদি অবহেলা করি তাহলে পাপ ভোগের ভয় নেই?'

'পাপভোগের ভয় না কচু। খিচুড়ির লোভে এসেছিস! তুই যে মহাপেটুক তাকি আমি জানি না।'

একথা শুনে রমেশের মা বলে উঠলেন, 'হ্যাঁরে রমু তুই মুখে লাগাম দেওয়া কবে শিখবি? বাল্যবন্ধুকে খাওয়ার নেমতন্ন করে তাকে আবার খোঁটা দিচ্ছিস?'

তখন আমি রমেশের মাকে বললাম, 'আপনি উতলা হবেন না, আমরা স্কুল-জীবনে পরস্পরকে এইভাবে খেপিয়ে আনন্দ পেতাম। আজ বহুদিন বাদে তারই পুনরাবৃত্তি হচ্ছে মাত্র।' আমার কাছে এই রকম শুনে রমেশের মা নিবৃত্ত হয়ে রাঁধার কাজে মন দিলেন।

এরপর রমেশ আর আমি নিচে গঙ্গা-ধারে গিয়ে বসলাম। জ্যোৎস্না রাত হওয়াতে বাইরের প্রত্যেকটি জিনিষ স্পষ্ট নজরে পড়ছিল। চারিদিকে গাছ লতা, পাতা, পাহাড়। খরস্রোতা গঙ্গার উপর জ্যোৎস্নার আলো পড়াতে জলধারা রূপোর মত চকচক করছিল। আমরা একটা পাথরের উপর বসে অতীতের স্কুলজীবনের অনেক ঘটনার কথা পরস্পরে উল্লেখ করে উপভোগ করতে লাগলাম। কতক্ষণ যে এইভাবে গল্প-গুজব করে কাটিয়েছি তা বলতে পারি না, রমেশের মায়ের ডাকে আমাদের হুঁস এল। তিনি আমাদের উপরে খেতে যেতে বললেন। উপরে ফিরে কুটিয়ার ভিতরে গিয়েই দেখি মেজের উপর পাশাপাশি দুটো আসন পাতা রয়েছে, আসনের পাশে দুটো জলভরা গ্লাসও রয়েছে দেখলাম। রমেশের মা গৌর-নিতাই বিগ্রহের সামনে গলায় আঁচল দিয়ে চোখ বুজে মনে হচ্ছিল যেন কিছু জপ করছেন। রমেশ একটা আসনে আমাকে বসিয়ে নিজে চুপচাপ অন্যটায় বসে গেল। দু-তিন মিনিট বাদে রমেশের মা বিগ্রহের সামনে গড় হয়ে প্রণাম করে, দুটো থালাতে আমাদের খাবার এনে দিলেন। ও বাবা এ যে এলাহি কারবার। ভাজামুগের ডালের খিচুড়ি আর বেগুন ভাজার সঙ্গে কিসমিস দিয়ে টম্যাটোর চাটনী ও পায়েস। অনেক বৎসর ধরে উত্তর ভারতে ঘুরে আর শুকনো ডালরুটি খেয়ে খেয়ে প্রাণটা আমার শুকিয়ে গিয়েছিল। আজ বহুদিন বাদে রমেশের মায়ের হাতে রাঁধা, নেহাত বাঙ্গালীর নিজস্ব ধরনের খাবার খেয়ে মনটা তৃপ্তিতে ভরে গেল।

আমাদের আহার পর্ব শেষ হলে রমেশ আবার আমাকে সঙ্গে নিয়ে নীচে গঙ্গার ধারে গিয়ে বসল। তারপর পাবনার স্কুল থেকে কি করে পালিয়ে এসে হরিদ্বারের কাছে কনখলের সংস্কৃত-টোলে সংস্কৃত শিখে নিয়ে শেষে এই হৃষিকেশে এসে আস্তানা গাড়লো, তার সমস্ত ইতিহাস শোনাল।

কিছুক্ষণ পর রমেশের মা উপর থেকে চেঁচিয়ে বললেন, 'রমু, অনেক রাত হয়ে গেছে বাবা, আর কতক্ষণ গল্প করে ওকে ঠেকিয়ে রাখবি? এদিকে আমাদের তৃতীয় বিছানার ব্যবস্থা নেই যে ওকে শুতে দেব।'

তখন রমেশ ও আমি উপরে কুটিয়ার সামনে গেলাম। দেখলাম রমেশের মা কুটিয়ার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। জ্যোৎস্নার আলো তাঁর মুখের উপর পড়াতে তাঁকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল যেন, মা জগদ্ধাত্রী আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আমি তাঁর দুটি পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বিদায় চাইতেই চোখ দুটি তাঁর ছল-ছল করে উঠল। আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে বললেন, শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন। ফিরে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করবে বাবা! আমি তাঁর প্রস্তাবে স্বীকৃতি দিয়ে ধর্মশালায় ফিরলাম।

আমাকে দেখেই লালাজী জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা সান্যালবাবু, আমরা যদি প্রথম থেকে লছমন ঝোলা পার না হয়ে একদিনের রাস্তা মটরবাসে করে এগিয়ে যাই তাহলে কেমন হয়?'

বললাম, 'আপনি যা ভাল বোঝেন তাই করুন।'

'তবে কাল সকালেই বাসে করে দেব-প্রয়াগ যাব। রাত্রে সেখানে থেকে, পরশু সকালে হাঁটা পথ ধরব।'

বললাম, 'তাই করুন।'

পরদিন সকালে মালপত্র সঙ্গে নিয়ে বাস কোম্পানীর অফিসে গিয়ে দেখি, সেখানে গোটা ভারতবর্ষ যেন একত্রিত হয়েছে। বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী, গুজরাট, মারাঠী, বিহারী, উড়িয়া যাত্রীদের বেজায় ভিড়! সবাই চায় বাসে করে একদিনের পথ এগিয়ে যেতে। অনেক কষ্টে ঠেলাঠেলি করে টিকিট কিনে আমরা বাসের ভেতর গিয়ে, আগের দিকে এক কোণায় দুজনে পাশাপাশি বসে পড়লাম। আমাদের সামনের খোপে চার-পাঁচজন বাঙ্গালী মহিলা বসেছিলেন। তাঁদের হাব-ভাব দেখে মনে হল, কোন বনেদী ঘরের লোক হবেন। দুজন হিন্দুস্থানী দ্বারোয়ানকেও সঙ্গে রেখেছেন দেখলাম। তারাও সামনের খোপে এক কোণায় বসেছিল। দেখতে দেখতে আমাদের পিছনের বড় কামরাটা যাত্রীতে ভরে গেল। তখন ড্রাইভার গাড়ী স্টার্ট করে দিল।

মোটর চলার রাস্তার পাশে মাঝে মাঝে লেংগুটি-ধারী সন্ন্যাসীরা দেখলাম নিজেদের আস্তানা করে নিয়েছেন। তারা কেউ মৃগচর্মের উপর বসে ধ্যানমগ্ন হয়ে চোখ বুজে বসে আছেন, কেউ সমস্ত গায়ে ভস্ম মেখে সামনে আগুন জ্বালিয়ে রেখেছেন, আবার কেউ বস্ত্রবিহীন তৈলঙ্গ মহাপ্রভু হয়ে বসে আছে। যাত্রীদের অনুরোধে এই সন্ন্যাসীদের সামনে কখনো কখনো ড্রাইভারকে বাধ্য হয়ে গাড়ী থামাতে হচ্ছে দেখে আমার মন বিরক্তিতে ভরে গেল। সময় বাঁচানোর জন্যই পায়ে হাঁটা ছেড়ে গাড়ীতে চড়া। যাত্রীরা যদি এই সন্ন্যাসীদের দর্শনের জন্য এত সময় নেয় তবে আমাদের দেবপ্রয়াগে পৌঁছাতে দেরী হয়ে যাবে, এইটাই আমি তাদের একবার যুক্তির দ্বারা বোঝাতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু তা ব্যর্থতায় পরিণত হল। একজন যাত্রী কর্কশ গলায় আমাকে লক্ষ্য করে বললেন 'সবাই আমরা এদিকে তীর্থস্থান ও সাধুসন্ত দর্শন করতে এসেছি। এসব সাধুসন্তদের আশীর্বাদেই অনেক পুণ্য লাভ হয়। আপনি ছোকরা মানুষ, তা কি করে বুঝবেন?' উক্ত যাত্রী আমার প্রতি এই রকম মন্তব্য করাতে সকলের দৃষ্টি আমার প্রতি পড়ল দেখে আমি একেবারে চুপ করে থাকা যুক্তিসঙ্গত মনে করলাম। কথা দিয়ে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। দেখলাম আগের খোপের বাঙালী মহিলারাও আমার দিকে তাকালেন। তাঁদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে বয়জ্যেষ্ঠা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাছা, তুমি বাঙালী?'

আমি সলজ্জভাবে বললাম, 'আজ্ঞে হাঁ।'

'এই কাঁচা বয়সে তোমার আবার তীর্থ-যাত্রা করবার কি প্রয়োজন হল?'

'তীর্থযাত্রা করে পুণ্য লাভের আশায় আমি এদিকে আসি নি। আমার এদিকে আসাটা ঠিক রথ-দেখা কলা-বেচার মত বলতে পারেন।' আমার এরকম মন্তব্য শুনে ও'রা সবাই খিল খিল করে হেসে উঠলেন।

ওঁদের অন্য একজন বললেন, 'তোমার ঐ রথ-দেখা কলা-বেচার অর্থ কিন্তু ঠিক বুঝতে পারলাম না ?'

'রথ-দেখা কলাবেচার অর্থ হচ্ছে—হিমলয়ের সুন্দর সুন্দর দৃশ্য দেখব, আবার পয়সাও উপার্জন করব।'

'পয়সা আবার এধারে কি করে উপার্জন করবে ?'

তখন লালাজীকে দেখিয়ে বললাম, 'এঁর জন্য এদিকের সমস্ত মন্দিরের ছবি আমাকে এঁকে দিতে হবে। তাতে কিছু ভালরকম দক্ষিণাও পাওয়া যাবে।'

'তুমি ছবি আঁক ?'

'আজ্ঞে পেটের দায়ে এটাই আমার পেশা।'

'তুমি যদি কলকাতায় যাও তবে আমাদের সঙ্গে দেখা করো বাছা। আমরাও তোমাকে কিছু কাজ দেব। দেবপ্রয়াগে পৌঁছে তোমাকে আমাদের ঠিকানা লিখে দেব।'

বললাম, 'তাই দেবেন। যদি কলকাতায় যাই তবে আপনাদের সঙ্গে দেখা করব।' আমার কাছে এই রকম উত্তর পেয়ে মহিলাটি সস্নেহে আমার দিকে তাকালেন।

এর পর গাড়ীর সকল যাত্রীই মৌনভাব ধারণ করল। কারও মুখে কোন শব্দ নেই। বাঁদিকে মোটরের বাইরে নজর পড়াতে দেখলাম, বড় বড় মুখ কালো হনুমানের দল গাছের এক ডাল থেকে অন্য ডালে সোল্লাসে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। একটি স্ত্রী হনুমানের বুকে তার বাচ্চাটা চিপটে থেকে সভয়ে এদিক-ওদিক কুত কুত করে তাকাচ্ছে। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য! অপর দিকে নজর পড়াতে দেখলাম, গঙ্গা কখনো উঁচু চট্টান থেকে বহু নীচে পড়ে শৈল-প্রান্তর মুখরিত করে, কখনো-বা বড় বড় পাথরের ডান দিকে, বাঁ দিকে এঁকেবেঁকে লীলায়িত ভঙ্গীতে নীচে হৃষিকেশের দিকে বয়ে চলেছে। এবার আমাদের গাড়ী একটা বেশ উঁচু পাহাড়ের শিখরে উঠে আবার তীব্র-গতিতে নীচের দিকে নামতে লাগল। ক্লিনারের কাছে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল, গাড়ী আর বিশ-পঁচিশ মিনিট বাদেই দেব-প্রয়াগে পৌঁছবে। তাই শুনে যাত্রীদের মন খুশীতে ভরে গেল। তারা পরস্পরের মধ্যে দেবপ্রয়াগ থেকে কি করে পায়ে হেঁটে কিম্বা ডাণ্ডি করে কেদার-বদরীনাথে যাত্রা করবে সে বিষয়ে আলোচনা করতে লাগল। লালাজী বললেন, 'সান্যালবাবু, দেবপ্রয়াগে পৌঁছেই প্রকাশচাঁদকে আমার দেবপ্রয়াগে নির্বিঘ্নে পৌঁছানোর খবর দিয়ে তার পাঠাব। তাহলে ছেলে আমার খুব খুশী হবে।' লালাজীর এই রকম অভিমত প্রকাশ করবার পরমুহূর্তেই গাড়ীটা ডান দিকে হেলে যেতেই সকলেই দৃষ্টি বাইরের দিকে পড়ল। ওহো, রাস্তার বাঁকের মোড়ে গাড়ী বাঁদিকে মোড় না নিতে পারাতে ডান দিকের দুটো চাকা খাদের মধ্যে পড়ে গেছে। সবাই মরণ-ত্রাসে চেঁচিয়ে উঠল, 'গাড়ী থামাও, গাড়ী থামাও!' ড্রাইভারকে দেখা গেল প্রাণ-পণে সে পা দিয়ে, হাত দিয়ে, শেষে ব্রেকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েও গাড়ী থামাতে পারল না। একবার অপর পাশের যাত্রীরা আমাদের সঙ্গে আর একবার আমরা অপর পাশের যাত্রীদের সঙ্গে ঠোকর খেতে খেতে যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম।

যখন জ্ঞান ফিরল, দেখলাম আছি একটা চালাঘরের মধ্যে এক চার পাই-এর উপর পড়ে আছি, আমার মাথা ও হাত-পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। সমস্ত শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা। সামনে কোট প্যান্ট-পরা একজন ভদ্রলোক স্টেথিসকোপ হাতে নিয়ে গম্ভীর-ভাবে আমাকে লক্ষ্য করছেন। বুঝলাম ইনি ডাক্তার। তাঁর পাশেই দু-তিনজন ভদ্রলোক মুখে উৎকণ্ঠার ভাব নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। কথা বলতে চাইলাম কিন্তু পারলাম না, সে শক্তি আমার নেই। দুই চোখ দিয়ে দর-দর করে জল পড়তে লাগল। তাই দেখে ডাক্তারবাবুর পাশের একটি লোক রুমাল দিয়ে আমার চোখের জল মুছে দিলেন। এর দুদিন পরে ডাক্তার-বাবু যখন কাছে বসে আমার নাড়ীর গতি পরীক্ষা করছিলেন, অতি ক্ষীণ স্বরে জিজ্ঞাসা করলাম, গাড়ীর আর সব যাত্রীরা কোথায়? লালাজী, আগের খোপের বাঙালী মহিলারা?' ডাক্তারবাবু নিজের ঠোঁটের উপর আঙুল রেখে সংকেতে আমাকে কথা বলতে বারণ করলেন, এবং হেসে বললেন, 'সব ঠিক আছে, আপনি ভাববেন না। একটু ঘুমুতে চেষ্টা করুন দেখি?'

ডাক্তারবাবু গভীর সহানুভূতির সঙ্গে প্রত্যেক দিন আমার মাথার ও হাত-পায়ের ব্যাণ্ডেজ খুলে ক্ষত স্থানগুলির দূষিত রক্ত স্পিরিট দিয়ে সাফ করে ওষুধ লাগাবার পর ব্যাণ্ডেজ করতে লাগলেন। এটা বেশ মনে পড়ল, আমাদের যাত্রীবাহী বাসটি রাস্তার এক মোড়ের মাথায় স্লিপ করে ডান দিকে গহন খাদের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। সেই জন্যেই যে আমার মাথায় এবং হাত-পায়ে চোট লেগেছে, সেকথা বুঝতে আমার বাকী রইল না। কিন্তু আর সব যাত্রীদের খবর কি? তাদের খবর জানবার জন্য মন অস্থির হয়ে উঠল। লালাজী কোথায়? সামনের খোপের বাঙালী মহিলারা কোথায়? কে আমার এ প্রশ্নের উত্তর দেবে? আমি যখনই ডাক্তারবাবুর কাছে গাড়ীর অন্যান্য প্যাসেঞ্জারের খবর জানতে চেয়েছি, লক্ষ্য করলাম তিনি তার কোন জবাব দেন না। একদিন যে গাড়োয়ালী চাকরটা আমার খাবার নিয়ে আসত তাকে বকসিসের লোভ দেখিয়ে গাড়ীর অন্যান্য প্যাসেঞ্জারের খবর জানতে চাইলে, সে যা বলল তা শুনে বিশ্বাস করতে পারলাম না। বললাম, 'আমাকে মিথ্যা কথা বলে তোর লাভ কি?'

তখন ভূপ সিং বলল, 'বাঙালীবাবু, আমি শ্রীবদরীনাথের কসম খেয়ে বলছি আপনি ছাড়া বাসের আর কোন যাত্রী বেঁচে নাই।'

ভূপ সিং-এর কাছে এই রকম ভয়ঙ্কর খবর শুনে আমার মাথাটা ঘুরতে লাগল। চোখ বুজে দু হাতে বালিশ আঁকড়ে পড়ে থাকলাম, মনে হল যেন দম আটকিয়ে আসছে। সেদিনও রাত কিভাবে যে কেটে গেল তা টেরও পেলাম না।

পরদিন সকালে ডাক্তারবাবু যখন ক্ষত স্থানগুলি ব্যাণ্ডেজ করতে এলেন আমার মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ব্যাপার কি? মুখটা এত ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে কেন?'

আমি আস্তে আস্তে ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তাহলে বাসের অন্যান্য যাত্রীরা সকলেই অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে ডাক্তারবাবু?'

আমার এ প্রশ্ন শুনে ডাক্তারবাবু গম্ভীর হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ মৌন থেকে আমার দিকে তাকিয়ে সান্ত্বনার স্বরে বললেন, 'উপরওয়ালার যা মরজী তাই হয়েছে, আপনি আর এ বিষয়ে বেশী চিন্তা করবেন না।' এই বলে আমার শরীরের ক্ষত স্থানগুলির ব্যাণ্ডেজ করে ফেললেন। ভূপ সিং প্রত্যেক দিন ব্যাণ্ডেজ বাঁধার সময় ডাক্তারবাবুর ফাইফরমাজ খাটবার জন্য কাছেই থাকে, সেদিনও ছিল, ডাক্তারবাবু তাকে চালাঘরের বাইরে নিয়ে গিয়ে ভর্ৎসনা করতে লাগলেন। বলতে লাগলেন, 'আমি বাদে—একমাত্র তুই রোগীর কাছে আসিস। বলি, তোর এমন কি মাথায় ব্যথা হল যে দুর্বল রোগীকে এরকম দুঃসংবাদ দিতে গেলি? গণ্ডমূর্খ হতভাগা কোথা-কার! তোকে নিয়ে আর বেশী দিন দেখছি ডিসপেনসারীর কাজ চলবে না।'

পরের দিন সকালে একজন বাঙালী ভদ্রলোক এক সন্ন্যাসীকে সঙ্গে নিয়ে আমাকে দেখতে এলেন। বললেন কলকাতায় এক কলেজে প্রফেসারী করেন। তাঁর পুরো নাম এখন আর মনে নেই তবে পদবী ছিল মুখার্জি। বাস দুর্ঘটনার সংবাদ তিনি নীচে হৃষিকেশেই জানতে পেরেছিলেন। এখানে এসে লোক মারফতে কেবল মাত্র একজন বাঙালী বেঁচে আছে শুনে, আমাকে দেখতে এসেছেন। আমাকে দেখেই বলে উঠলেন, 'ভাই তুমি ত দেখছি একেবারে ছেলেমানুষ! ঝটপট করে বাড়ীর ঠিকানাটা দাও দেখি, একটা তার করে দেই।'

বললাম, 'তার যদি করতেই হয় তবে আমার এক বন্ধু মেডিকেল কলেজের ছাত্র প্রকাশচাঁদকেই করুন। তার বাবার মোটর দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সংবাদ দিয়ে। করুন। আমি ত প্রাণে বেঁচে গেছি। এই আমার আপনার কাছে একান্ত প্রার্থনা।'

আমার এই রকম অনুরোধ শুনে প্রফেসার মুখার্জি বললেন, 'তবে তোমার বন্ধুর ঠিকানাই দাও, তাকেই তার করে দিচ্ছি।' তখন আমি তাঁকে প্রকাশচাঁদের অমৃতসরের ঠিকানা বলে দিলাম। এর পরে দিল্লী-প্রবাসী শ্রীবিকাশ রায় আমার কাছে এসেছিলেন, জানতে পারলাম ঐ বাসে তাঁর স্ত্রীও ছিলেন। মিঃ রায় স্ত্রীর শোকে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। আমার সঙ্গে বেশী কথা বলতে পারেন নি।

তিন দিন পরে প্রকাশচাঁদ তার এক কাকাকে সঙ্গে নিয়ে এসে হাজির। আমাকে জড়িয়ে ধরে সে শিশুর মত হাউ-মাউ করে কাঁদতে লাগল। প্রায় দশ মিনিট বাদে সে ভাঙা ভাঙা গলায় বলল, 'ভাগ্যিতে তোমাকে খাবার সঙ্গে পাঠিয়ে দিলাম তাই খবরটি সময়মত পেলাম। না হলে আমার পক্ষে খাবার সম্বন্ধে কোন খবরই পাওয়া সম্ভব ছিল না। এর পর সে ডিসপেনসারীর দিকে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেল। খানিকক্ষণ বাদে ফিরে এসে আমাকে বলল, 'তুমি সুস্থ হয়েই অমৃতসরে আমাকে চিঠি লিখে দেবে, আমি নিজে এসে তোমাকে অমৃতসরে নিয়ে যাব। বলেই প্রকাশচাঁদ আমার কাছ থেকে বিদায় নিল। এর পর আর একজন ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন, তিনি স্থানীয় পুলিশ স্টেশনের দারগা-বাবু। ভদ্রলোক দেখলাম বেশ রসিক লোক। হেসে আমাকে বলতে লাগলেন, 'এবার যমকে বেশ বুড়ো আঙুল দেখিয়েছেন মশাই! বাস দুর্ঘটনার সংবাদ পেয়েই আমরা ডাক্তারবাবুকে সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখি—ও বাবা মানুষের, কাঠের আর মেশিনের টুকরোর জগা-খিচুড়ি! ডাক্তার-বাবু প্রত্যেকটি দেহের ক্ষত পরীক্ষা করেন আর নিরাশ হন। আপনি ক্ষতবিক্ষত জড়-পিণ্ডবৎ হয়ে মৃত লাশগুলির মধ্যে কুকুর-কুণ্ডলি হয়ে, অজ্ঞান অবস্থায় পড়েছিলেন। আপনাকে পরীক্ষা করার পর দেখলাম, ডাক্তারবাবুর মুখে খুশীর ঝলক দেখা ছিল। এবং আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, হাতের নাড়ী একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে কিন্তু হৃৎপিণ্ডের কাজ ঠিক চলছে। এর পর ডাক্তারবাবুর ইচ্ছাতেই আপনাকে চ্যাংদোলা করে আমরা এই রাজপ্রাসাদে নিয়ে আসি। এখন দয়া করে আপনার নাম-ধাম বলুন ত মশাই! আমাদের থানার রেকর্ডে লিখে রাখতে হবে।'

হ্যাঁ, আপনার পেশা কি?'

বললাম, 'এই পট এঁকে পেট ভরি।'

'ও হো একটি মিলিটারী ব্যাগে হরি-দ্বারের ও হৃষিকেশের হাতে আঁকা ছবি পাওয়া গেছে। সেই ব্যাগে একটি কার্ড'ও পাওয়া গেছে, আপনিই কি প্রভাস সান্যাল?'

'বললাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

বাস বাস নিশ্চিন্ত থাকুন! আপনার ব্যাগটি আমাদের কাছে সুরক্ষিত আছে। আপনার জিনিষপত্র, টাকাকড়ি যা কিছু ব্যাগটির মধ্যে ছিল তেমনটিই রয়েছে। আপনি এখান থেকে যাবার সময় আমাদের থানার খাতায় আপনার শ্রীহস্তের একটি সই দিলেই আপনার ব্যাগটি ফিরিয়ে দেব।' এই বলেই দারগাবাবু চোখ বুজে দু হাত করজোড়ে মাথায় ঠেকিয়ে 'জয় বাবা বদরি-নাথের জয়' বলেই চালাঘর ত্যাগ করলেন।

এক দিন ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমার ব্যাণ্ডেজ, ওষুধ ও খাওয়ার খরচ কে দিচ্ছে?'

'আপনি এখন গাড়োয়াল স্টেটের ডিসপেনসারীর অধীনে রয়েছেন। স্টেট আপনার সমস্ত খরচ দিচ্ছে। আমি গাড়োয়াল সরকারের ডাক্তার। আপনি খরচপত্রের সম্বন্ধে চিন্তা করে খামাখা উদ্বিগ্ন হবেন না,' এই বলে ডাক্তারবাবু চলে গেলেন।

এরপর সারাদিন এক চারপাই-এর উপর পড়ে রইলাম। সবচেয়ে দুঃসহ হয়ে উঠল আমার একান্তে নিঃসঙ্গ অবস্থায় চারপাই-এর উপর পড়ে থাকা—সময় যে আমার আর কাটতে চায় না। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব ছেড়ে সুদূর পার্বত্যদেশের এক পর্ণকুঠিরে, মুমূর্ষ অবস্থায় আর কত আমাকে পড়ে থাকতে হবে তা কে জানে? একদিন অতি কষ্টে চারপাই থেকে উঠে পূর্বদিকের জানালাটা খুলে দেখি—অনতিদূরে নিচ দিয়ে একটি পাহাড়ী নদী বয়ে চলেছে। ভূপসিং যখন দুপুরের খাবার নিয়ে এল তাকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম, নদীটির নাম অলকানন্দা। সে আরও বলল যে, অলকানন্দা গঙ্গোত্রী থেকে নেমে আসা গঙ্গার সঙ্গে এই দেবপ্রয়াগেই মিশেছে। সঙ্গম স্থলটি এখান থেকে খুব বেশী দূরে নয়, বলেই ভূপসিং চলে গেল। দুপুরের দিকে পূর্বদিকের জানালাটা খুলে অলকা-নন্দার দিকে তাকাতেই মনটা বিতৃষ্ণাতে ভরে গেল। ওঃ কি কর্দমাক্ত ঘোলাটে জল। অলকানন্দার গা ঘেসে ধূসর বর্ণের বিরাট একটি রুক্ষ পাহাড় ঠিক আমার জানালার বিপরীত দিকে মাথাটা খুব উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এক ফালি নীল আকাশ দেখেও মনে শান্তি পাবার উপায় নাই। কাছেই একটি শুকনো গাছের ডালের উপর বসে রুক্ষ স্বরে তিন-চারটা কাক ডাকছিল। প্রাণটা আমার শুকিয়ে গেল। এ দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে জানলাটা বন্ধ করে দিলাম।

একদিন ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার ক্ষত স্থানগুলো আস্তে আস্তে ভরছে, আজকাল শরীরে একটু শক্তি পাচ্ছেন কি?'

বললাম, শরীরে কোন রকম শক্তি পাচ্ছি না, ডাক্তারবাবু।'

এই শুনে ডাক্তার গম্ভীরভাবে একটু চিন্তা করে বললেন, 'আচ্ছা, চেষ্টা করে দেখি স্থানীয় কোন গৃহস্থ বাড়ী থেকে আপনার জন্য গরুর দুধের ব্যবস্থা করতে পারি কিনা। এই রকম দুর্বল অবস্থায় একমাত্র গরুর দুধই আপনার জন্য ফলদায়ক হবে।'

সেইদিনই সন্ধ্যাবেলায় ১৫।১৬ বৎসরের একটি পাহাড়ী মেয়ে এসে, একটি বড় বাটিতে করে আধসের খানেক গরম দুধ আমাকে খেতে দিল। বুঝলাম, ডাক্তারবাবুর নির্দেশেই মেয়েটি আমার জন্য দুধ নিয়ে এসেছে। আমি দুধটা ঢক-ঢক করে গভীর তৃপ্তিতে খেয়ে নিলাম। দুধ দেখলাম বেশ গাঢ় এবং খেতেও খুব সুস্বাদু।

পরের দিন সকালে ডাক্তারবাবু আমার ক্ষত স্থানগুলি ব্যাণ্ডেজ করতে এলে, জিজ্ঞাসা করলেন, একটি মেয়ে গত সন্ধ্যায় আমাকে দুধ দিয়ে গেছে কিনা? বললাম, 'হ্যাঁ, আর খেয়েও বেশ তৃপ্তি পেয়েছি।'

তিনি বললেন, 'এখন থেকে ঐ মেয়েটি রোজ সন্ধ্যায় আপনাকে দুধ দিয়ে যাবে।' সেই থেকে রোজ সন্ধ্যায় মেয়েটি চালাঘরে এসে আমাকে এক বাটি গরম দুধ দিতে লাগল। আমি দুধ খেয়ে নিলে সে বাটিটা নিয়ে চলে যেত।

একদিন সন্ধ্যায় তন্দ্রাভিভূত হয়ে চার পায়ের উপর পড়েছিলাম, কখন যে মেয়েটি দুধ নিয়ে এসেছে বুঝতেও পারিনি। হয়ত বা খানিকক্ষণ অপেক্ষাও করেছে। আমাকে অবাক করে স্পষ্ট বাংলাভাষায় সে বলে উঠলো—'এই ভর সন্ধ্যায় ঘুমোন ভাল না। নিন আপনি দুধ খেয়ে নিন। আজ বাড়ীতে কিছু কাজও আমার আছে, তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে হবে।'

আমি অবাক হয়ে আকাশ থেকে পড়লাম। এই পাহাড়ী মেয়েটি এত সুন্দর বাংলা কোথা হতে শিখল। কিন্তু তার গম্ভীর মুখ দেখে কোন প্রশ্ন করতে সাহস পেলাম না। দুধ খাবার পর সে চুপচাপ বাটিটা নিয়ে চলে গেল।

পরের দিন ভূপসিং যখন আমার দুপুরের খাবার নিয়ে এল, তাকে জিজ্ঞাসা করলাম সন্ধ্যায় যে মেয়েটি আমার জন্য দুধ নিয়ে আসে, তাকে সে জানে কিনা?

'পার্বতীকে ত খুব জানি। ও ত আমার আত্মীয় রামসিং-এর মেয়ে। আহা বেচারা রামসিং গত বৎসর কোলকাতায় ট্রেন

চটপট্ কাজ?
ম্যার্কেন্টাইল ব্যাঙ্কে
পাবেন

প্রতিটি শাখায়
প্রত্যেকের সুযোগ সুবিধা
লক্ষ্য রাখার জন্য
সুদক্ষ কর্ম্মচারী আছেন



ম্যার্কেন্টাইল ব্যাঙ্ক লিঃ

কলিকাতার প্রধান কার্য্যালয়ঃ
গিলাণ্ডার হাউস,
৮, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১
স্থানীয় শাখাঃ
১৫, গড়িয়াহাট রোড, কলিকাতা-১৯
পি-৩৭৫, ব্লক 'জি', নিউ আলিপুর,
কলিকাতা-৫৩
৫, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯
২১, গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, হাওড়া

চাপা পড়ে হঠাৎ মারা গেছে। সেই জন্যই ত রামসিং-এর বিধবা বৌ এক ছেলে আর ঐ মেয়েটাকে নিয়ে দেবপ্রয়াগে রাম সিং-এর বাস্তুভিটায় চলে এসেছে।'

'রামসিং কি কোলকাতায় থাকত?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। জোয়ান বয়েসে সে কলকাতায় গিয়েই একটি চাকরী পায় এবং আমাদের না জানিয়ে কোলকাতারই বাসিন্দা এক গাড়োয়ালীর মেয়েকে বিয়ে করে সেইখানেই থাকত।'

'তুমি বললে রামসিং-এর একটি ছেলে আছে। সে দুধ না নিয়ে এসে, বোনটিকে পাঠায় কেন?'

'ছেলেটিই বড়। আজ মাসখানেক হোল সে দেরাদুনের মিলিটারী স্কুলে একটি চাকরী পেয়েছে। তাকে সেইখানেই থাকতে হয়।'

'রামসিং-এর বাড়ী এখান থেকে কত দূরে?'

'এই তো এখান থেকে চার-পাঁচ মিনিটের রাস্তা। আমাদের ডিসপেনসারীর একটু পিছনে।' বলেই ভূপসিং চলে গেল।

সেদিন সন্ধ্যায় পার্বতী দুধ নিয়ে আসলে তাকে বললাম, 'পার্বতী, তুমি কোলকাতায় থাকার সময় বাঙ্গালী ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে মিশে, বেশ সুন্দর বাংলা শিখে নিয়েছ দেখছি। সে বলল, 'শুধু তাই নয়, বাবা আমাকে সেখানকার বাঙ্গালী মেয়ে স্কুলে ভর্তিও করে দিয়েছিলেন। বাবা বেঁচে থাকলে আমি এই বৎসরেই ম্যাট্রিক দিতাম। কিন্তু কপালে তা হোল কই? বাবা মরে যাওয়াতে সব ওলট-পালট হয়ে গেল।'

জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার দাদা তোমার পড়ানর পক্ষপাতী নন?'

'দাদা ত রাজী আছেন, কিন্তু মা আর পড়াতে চান না। মা বড় বেশী গোঁড়া। বলেন, লেখাপড়া শিখলে মেয়েরা বেহায়া হয়ে যায়।'

এরপর পার্বতীর সঙ্গে এ বিষয়ে কোন কথা বলা যুক্তিসঙ্গত নয় মনে করেই চুপ করে গেলাম।

আমার দুধ খাওয়া হলেই, সে দুধের বাটিটা নিয়ে চলে গেল।

আমার ঘরে একটি তেলের প্রদীপ ছিল। ভূপসিং রোজ সন্ধ্যায় সেটা জেলে দিত। দুদিন ধরে দেখছি ভূপসিং সে কাজটা পার্বতীর ঘাড়ে চাপিয়েছে। পার্বতীই যখন দুধ নিয়ে আসে, প্রদীপটা জ্বালিয়ে দিচ্ছে।

বাংলা দেশে জন্ম ও বাংলাদেশেই মানুষ হয়েছে বলেই পার্বতীর মুখের ধাঁচটা প্রায় বাঙ্গালী মেয়েদের মত হয়েছে। কিন্তু তার মুখের ভাবটা দেখতে পাহাড়ী মেয়েদের মতই সরল। প্রদীপ জ্বালিয়ে দেওয়ার পর, যখন তার স্নিগ্ধ আভা পার্বতীর সরল মুখের উপর পড়ে, তখন এক অপূর্ব সৌন্দর্য আমার সামনে দেখতে পাই, যার কোন তুলনা হয় না।

একদিন পার্বতী আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা! সারাদিন একা এই চালাঘরে পড়ে থেকে সময় কাটাতে আপনার কষ্ট হয় না?'

বললাম, 'কষ্ট হলেই বা কি করি বল? সারাদিন চারপাই-এর উপর চিৎ হয়ে পড়ে থেকে চালাঘরের টিনের ছাউনির দিকে চেয়ে থাকা ছাড়া আর কোন উপায় নাই।'

আমার কাছে এই রকম শুনে, পার্বতীর চোখ দুটো ছল-ছল করে উঠল। এরপর সে আমাকে চুপচাপ দুধ খাইয়েই চলে গেল।

পরেরদিন আমাকে অবাক করে সকালেই পার্বতী এসে হাজির। তার হাতে দেখলাম একটা মলাট দেওয়া বই। সেটি আমাকে দিয়ে বলল, 'আশাকরি এইটি পড়ে আপনার সময় ভালভাবে কাটবে।' বলেই আমার উত্তরের কোন-প্রতীক্ষা না করে সে চালাঘর ত্যাগ করল। বই-এর মলাটের উপর কিছু লেখা ছিল না। বইটা খুলে তার নাম পড়তেই খুশীতে মন ভরে গেল। এত আমার অতি প্রিয় বই—বিভূতি বন্দ্যো-পাধ্যায়ের আরণ্যক। এটি পড়ে সময় আমার বেশ কেটে যাবে।

শৈশবে বাংলামায়ের পল্লী অঞ্চলে মানুষ হয়েছি। গ্রামের পাশ দিয়ে বিশাল পদ্মা বইত। বর্ষার ভরা পদ্মার বুকের উপর বিরাট, বিরাট ঢেউ-এর তালে তালে শৈশবের বন্ধুদের সঙ্গে নৌকো চালিয়ে আনন্দ পেতাম। আবার যখন গরমের সময় পদ্মা ক্ষীণকায়া হয়ে এখানে সেখানে নতুন চরের সৃষ্টি করত, তখন তাদের বুকের উপর ঝাউ গাছের জঙ্গলে বন্ধুদের সঙ্গে খেলা করে কতই না আনন্দ পেতাম! শৈশবেই প্রকৃতিদেবীর সঙ্গে অতি নিকট সম্বন্ধ থাকাতে, তাঁকে প্রাণদিয়ে ভালবেসেছি। শ্রদ্ধেয় লেখক বিভূতিভূষণ তাঁর লিখিত আরণ্যক বইটিতে অতি সুন্দরভাবে প্রকৃতির বর্ণনা করেছেন। বইটি পড়ে সময় আমার বেশ কাটতে লাগল।

একদিন ডাক্তারবাবু বললেন, 'আপনার শরীর ত বেশ ফিরে গেছে দেখছি।

বললাম, 'হ্যাঁ, আপনার সুব্যবস্থার জন্যই এখন একটু শরীরে শক্তি পাচ্ছি। গরুর দুধ বেশ উপকার দিচ্ছে।'

এই শুনে ডাক্তারবাবু বললেন, 'বাঙ্গালীবাবু, যদি ঐ পার্বতী মেয়েটি সাহস করে এগিয়ে না আসত, তাহলে ত্বমার পক্ষে, আপনার জন্য এত তাড়াতাড়ি দুধের ব্যবস্থা করা সম্ভব হোত না।। ওর মা তো একেবারেই গোঁড়াপন্থী। অন্য পুরুষের সঙ্গে কথাই বলতে চায় না, আপনাকে দুধ দিতে আসবে কি করে? শেষে এই মেয়েটাই আমার প্রস্তাবে রাজী হোল। সেই থেকে নিজেই দুধ গরম করে আপনাকে রোজ খাইয়ে যাচ্ছে। আপনি যে দিন-দিন আপনার স্বাস্থ্য ফিরে পাচ্ছেন, তা ঐ মেয়েটির জন্যে।' এই বলে ডাক্তারবাবু ডিস্পেনসারীর দিকে চলে গেলেন।

সেদিন রাত্রে তাড়াতাড়ি আমার ঘুম এল না। কেবলই পার্বতীর কথা মনে হতে লাগল। আমার অতি দুঃখের দিনে এই দরদী মেয়েটি যে বুকভরা মমতা নিয়ে আমার পাশে এসে দাঁড়াল একে কি জীবনে ভুলি কখন ভুলতে পারব? সৃষ্টির আদিম যুগ হতে আজ অবধি মানুষের জীবনপ্রবাহ এই যে বয়ে চলেছে তাতে প্রায়ই দেখা যায়, যখনই পুরুষের জীবন বাস্তবের কঠোর আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে উঠেছে, তখন কোন-না-কোন নারী, মাতা ভগ্নি জায়া অথবা বান্ধবীরূপে পুরুষকে সেবা শুশ্রূষা স্নেহ, ভালবাসা দিয়ে তার জীবনকে বিকশিত করে তুলেছে। পার্বতী সেই নারীধর্ম অবলম্বন করেই যে, আমার জীবনের বড় দুঃসময়ে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে—এ বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ রইল না।

পরের দিন সকালদিকটায় পার্বতীকে, আমার ঘরের সম্মুখ দিয়ে নীচে দক্ষিণ দিকে যেতে দেখলাম। ইচ্ছা হোল তাকে ডাকি, কিন্তু একটু সমীহ এসে গেল, পারলাম না। তখন সময় কাটানর জন্য আরণ্যকটি নিয়ে পড়তে লাগলাম। অল্প সময়ের মধ্যেই লেখকের প্রকৃতির বর্ণনায় মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেললাম। কতক্ষণ বই পড়েছি জানি না হঠাৎ পার্বতীর গলার আওয়াজে সজাগ হয়ে উঠলাম। দেখলাম, একটি সব্জী বোঝাই টুকরী হাতে নিয়ে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে।

সে বলছে, 'ভাগ্যিস বাজার থেকে ফেরার পথে আপনার ঘরে ঢুকে পড়েছি, তা নাহলে এসব এলোমেলো অবস্থা দেখবার সুযোগ কখন কি আমার কপালে সন্ধ্যাবেলায় হয়েছে?'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি এলোমেলো অবস্থা দেখলে পার্বতী?'

'এই কোথায় অসুস্থ লোকের ঘরে সকালে টাটকা হাওয়া এসে ঢুকবে তার কোন উপায় নাই। সন্ধ্যায় না হয় জানালা-গুলি বন্ধ রইল কিন্তু কোন বুদ্ধিমান দিনের বেলায় বন্ধ রেখেছে শুনি?' এই বলেই পার্বতী পুবের জানলাটা খুলতে গেল।

আমি বলে উঠলাম, 'দোহাই পার্বতী ও-জানলাটা খুল না। অলকানন্দার ঘোলাটে জল আর অপর পারের ধূসর বর্ণের রুক্ষ পাহাড়টা দেখলে মনটা আমার বিষাক্ত হয়ে ওঠে।' আমার কাছ থেকে এ-কথা শুনে দেখলাম সে পুর্বদিকের জানলা খুলতে নিরস্ত হল, কিন্তু দক্ষিণের জানলাটা খুলতে সে দ্বিধাবোধ করল না। এতে দক্ষিণের জানলা দিয়ে ঘরের ভিতর মিষ্টি হাওয়া ঢুকতে লাগল। এরপর ঘরের মেঝের দিকে তাকিয়ে পার্বতী আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'মেঝের উপর কিছু ঝাড়ুটাড়ু পড়ে কি?'

বললাম, 'ভূপসিং রোজ একবার ঝাড়ু দিয়ে যায়।'

আমার কাছে এরকম শুনে ঘরের মেঝের উপর ভাল করে তাকিয়ে দেখে সে বলল, 'ঘরে ত প্রচুর ধুলো দেখতে পাচ্ছি।' এই বলেই সে জায়গাটা ত্যাগ করল।

কয়েক মিনিট বাদেই দেখলাম একটি বালতি করে জল আর এক হাতে ঝাড়ু নিয়ে পার্বতী ঘরে ঢুকলো। আমাকে চারপাই থেকে পা নামাতে বারণ করেই সে মেঝের উপর জল ছেটানোর পর ঝাড়ু দিয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই ঘরের মেঝেটা সাফ করে ফেলল। দেখলাম, পার্বতী প্রচুর ধুলো জমা করেছে। আমি মৌনভাবে সেইদিকে অবাক হয়ে তাকাতে পার্বতী সগর্বে আমার দিকে চেয়ে বলে উঠল 'ব্যাটাছেলে আবার রাখবে ঘরদোর পরিস্কার। তাহলেই হয়েছে আর কি!' এই বলেই জমা ধুলো বালতির মধ্যে উঠিয়ে নিয়ে সে চালাঘর ত্যাগ করল।

সেই থেকে পার্বতী প্রত্যেক দিন সকালে এসে দক্ষিণের জানলা খুলে দেওয়ার পর, ঘরটি ভালভাবে ঝাড়ু দিয়ে যেতে লাগল।

একদিন সন্ধ্যায় দুধ খেয়ে নেবার পর যখন সে দুধের বাটিটা আমার কাছ থেকে ফিরিয়ে নিচ্ছিল, জিজ্ঞাসা করলাম, 'পার্বতী, রোজ তুমি নিয়মমত এসে ঘরদোর পরিষ্কার কর, সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বাল এবং তারপর আমাকে দুধ খাইয়েই তখনি সরে পড়। কই তোমাকে তো একদিনের জন্যও আমার কাছে বসতে দেখলাম না?

আমার এ-প্রশ্নে সে একটু চুপ করে রইল। তারপর বলল, 'আপনি—আপনি যে যুবক। আপনার যে কাঁচা বয়স, তাই আমার মা একটু সাবধান করে দিয়েছেন।'

বললাম, 'তোমার মার যদি যুবককে দেখে এতই ভয় হয়, তবে তোমার মাকে বোল, তোমার বিয়ে যেন কোন যুবকের সাথে না দিয়ে, বেশ পাকা চুলওয়ালা, খুব থুড়-থুড়ো বুড়োর সঙ্গে দেন।'

আমার কাছ থেকে এইরকম শুনে পার্বতী জোরে খিল খিল হেসে উঠলো। লক্ষ্য করলাম, তখন তার গালের উপর দুদিকে দুটো টোল পড়েছে। তাতে তার সরল মুখটি আরও সুন্দর দেখাচ্ছিল। আমি মুগ্ধ হয়ে তার দিকে চেয়ে আছি দেখে, সে লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এইরকমভাবে আরও সপ্তাহখানেক কেটে যাবার পর ডাক্তারবাবু আমাকে বললেন, 'আপনার হাত-পায়ের জখম তো দেখছি শুকিয়ে গেছে। তবে মাথার কাটাটি শুকোতে আরও এক সপ্তাহ নেবে বলে মনে হচ্ছে।' সেদিন আর তিনি হাত ও পায়ের ব্যাণ্ডেজ করলেন না। শুধু মাথায় ব্যাণ্ডেজ করে গেলেন। সন্ধ্যায় আমার হাত-পায়ের জখম সম্পূর্ণ ভাল হয়ে গেছে দেখে পার্বতী খুব খুশি হল।

বললাম, 'ডাক্তারবাবু বলেছেন মাথার কাটা শুকোতে মাত্র আর এক সপ্তাহ নেবে। তারপরেই এখান থেকে চলে যাব ভাবছি।

এ-কথা শুনেই পার্বতী গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর আমার কাছে এসে চারপাই-এর পাশে বসে আমার দিকে বেশ কিছুক্ষণ খেয়াল করে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলো,—'সত্যি, আপনি এক সপ্তাহ বাদে এখান থেকে চলে যাচ্ছেন?'

বললাম, 'তা কি করব। সারাদিন একলা চারপাই-এর উপর পড়ে থাকতে ভাল লাগে? কেউ কাছে বসে দুটো কথাও বলে না।'

আমার কাছ থেকে এরকম শুনে, পার্বতী আমার দিকে দুষ্টুমির দৃষ্টিতে চেয়ে খিল খিল করে হেসে উঠল। তারপর বলল, 'বুঝেছি, আমাকে ভয় দেখান হচ্ছে।' এরপর দুটো চোখ বড় বড় করে আমার দিকে চেয়ে বললো, 'আমি অত কচি খুকি নই যে, আপনার এইরকম কথায় ভয় পেয়ে যাব, বুঝলেন?'—বলে সে গম্ভীরমুখে ঘরের প্রদীপ জ্বালানর পর আমাকে দুধ খাইয়ে চলে গেল।

সপ্তাহখানেক বাদে দেখলাম ডাক্তারবাবু আমার মাথার ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ছেড়ে দিলেন এবং বললেন, 'এখন শুধু মাথায় বোরিক পাউডার লাগিয়ে দিলে চলবে।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমাকে ছেড়ে দেবেন কবে ডাক্তারবাবু?'

উনি বললেন, 'দেবপ্রয়াগ থেকে হৃষিকেশের রাস্তাটা ত দেখেছেন—কিরকম চড়াই-উৎরাই। তাছাড়া গাড়ীতে বেশ ঝাঁকুনিও লাগে। সপ্তাহখানেক এখানে থেকে একটু শক্তি অর্জন করে নিন, তারপর আপনাকে ছেড়ে দেবখন।'

পরের সপ্তাহও কেটে গেল প্রায়। সময় শেষ হয়ে আসছে দেখে পার্বতীকে বললাম, 'একদিন আমাকে সঙ্গমটা দেখিয়ে আনবে লক্ষ্মী?'

'না, বাবু, মা সেখানে আমি আপনার সঙ্গে যেতে পারব না।' আমাদের জানাশুনা অনেক পাণ্ডা সেখানে থাকে, আপনার সঙ্গে আমাকে দেখলেই তাদের চোখে ছুঁচ ফুটবে।

'তার চেয়ে বরং একদিন বিকেলে ডিসপেন্সারীর উপর দিয়ে যে নির্জন রাস্তাটি গঙ্গার দিকে গেছে, আপনাকে সঙ্গে করে সেদিকে গিয়ে গঙ্গা দেখিয়ে নিয়ে আসব। দেখবেন, এখানকার গঙ্গার দৃশ্য কি সুন্দর।'

এরপর একদিন বিকেলে কোমরে শাড়ী শক্ত করে বেঁধে নিয়ে পার্বতী সত্যিই নির্জন রাস্তা দিয়ে আমাকে নিয়ে গঙ্গা দেখাতে চলল। পায়ে-হাঁটা পথের মাঝে মাঝে দুবার দুটি পাথরের চাঁই পড়ে থাকতে দেখলাম। পার্বতী বিনা দ্বিধায় তার উপর লাফিয়ে উঠে দু' হাত বাড়িয়ে আমাকে উপরে তুলে নিল। দেখলাম মেয়েটি গায়ে বেশ জোরও রাখে।

প্রায় দুই ফার্লং যাওয়ার পর একটু দ্রুতগতিতে এগিয়ে গিয়ে, সে একটি উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে সামনের দিকে ইঙ্গিত করে আমাকে বলল, 'ঐ দেখুন গঙ্গা কেমন গঙ্গোত্রী থেকে নেমে আসছে!' আমি পার্বতীর পাশে দাঁড়িয়ে গঙ্গোত্রী থেকে নেমে-আসা গঙ্গার রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

হিমালয়ের এক অতি উচ্চ পাহাড়ের শিখর থেকে নীলসলিলা খরস্রোতা গঙ্গা ক্ষিপ্রগতিতে ঋং-বেরং-এর পাথরের স্পর্শে কল কল গুঞ্জনে দেবপ্রয়াগের দিকে নেমে আসছে। চলন্ত রবির গোলাপী আভা এসে গঙ্গার উচ্ছলিত নীল জলরাশির উপর পড়াতে সেখানে এক অপরূপ শোভা দেখা দিয়াছে, যার কোন তুলনা হয় না। মনে হল যেন এক নীলবসনা অপূর্ব সুন্দরী নারী হিমালয়ের বুকে এক স্বপ্নের জাল বিছিয়ে নৃত্যের তালে তালে নূপুরগুঞ্জনে স্বর্গ থেকে এই পৃথিবীতে নেমে আসছে।

আমি মুগ্ধ হয়ে সেইদিকে চেয়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম জানি না। পার্বতীর কোমল স্পর্শে হুঁস এল। সে আমার একটা হাত ধরে বলল, 'বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে, চলুন ফিরে যাই।'

এখানে সে-ই আমার গাইড, সুতরাং অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার সঙ্গে স্বস্থানে ফিরে এলাম।

ক্রমে সপ্তাহ শেষ হয়ে এল। একদিন দুপুরের খাওয়ার ঘণ্টাখানেক বাদে ডাক্তারবাবু আমার কাছে এসে বললেন, 'আর আপনার এখানে পড়ে থাকবার প্রয়োজন দেখছি না। আপনি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। দারোগাবাবু পরশু আপনাকে পুলিশের ভ্যানে করে হৃষিকেশে পৌঁছে দেবার ভার নিয়েছেন।' বিকেলে দারোগাবাবু



এসে আমার হস্তরেখা নিয়ে মিলিটারী ব্যাগটা দিয়ে গেলেন।

সন্ধ্যায় পার্বতী যখন ঘরের প্রদীপটি জেনলে, আমাকে দুধ খাইয়ে চলে যেতে উদ্যত হল, আমি বললাম, 'পার্বতী, আমার কাছে একটু বস।' সে আমার কাছে চার পাই-এর উপর বসলে, তার হাতদুটো আমার হাতের মধ্যে নিয়ে বললাম, 'পার্বতী আমি পরশু এখান থেকে চলে যাচ্ছি। ডাক্তারবাবু আমাকে ছুটি দিয়েছেন।'

আমার কাছ থেকে এরকম শুনে পার্বতী শুধু শূন্যদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। দেখলাম তার ঠোঁটদুটো কাঁপছে, শেষে চোখ দিয়ে দু'বিন্দু জলও ঝরে পড়ল।

তা দেখে আমার বুকের ভেতরটা টন টন করে উঠল।

এই মেয়েটি বড় দুঃখের দিনে দরদী-ভরা মন নিয়ে, যে-সেবাটা আমাকে দিল, তা কি আমি জীবনে কখনও ভুলতে পারব? ওর আন্তরিক স্নেহ-ভালবাসাই ত আমার শুষ্ক প্রাণে জোয়ার এনেছে এবং জীবনের সঙ্গে যুদ্ধ করবার শক্তি আবার আমি ফিরে পেয়েছি।

এ-কথা কেমন করে এই সরল বালিকাকে বোঝাই?

শেষে আর কোন গত্যন্তর না দেখে আমার ডান হাতটা তার পিঠের উপর রেখে আস্তে আস্তে বুলোতে বুলোতে বললাম, পার্বতী! তোমার আন্তরিক সেবাতেই আমি সুস্থ হয়ে উঠেছি। তোমার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবার কোন ভাষাই আমি খুঁজে পাচ্ছি না। তোমার কাছে আমার একান্ত অনুরোধ, অন্তত যাবার সময় আমাকে হাসিমুখে বিদায় দেবে। নাহলে সারাজীবন ধরে তোমার জন্য আমার মনে একটা খেদ রয়ে যাবে। তাতে আমি ভীষণ ব্যথা পাব। তুমি কি তাই চাও?'

সে ঠোঁটদুটো সংযত করে বলল, 'কখনই না।'

এতে আমি বললাম, 'তবে যাবার সময় আমাকে হাসিমুখে বিদায় দেবে কথা দাও।'

সে মাথা ঝুঁকিয়ে স্বীকৃতি জানাল।

তারপর আমার হাত দিয়ে তার চোখের জল মুছে দিয়ে বললাম, 'আচ্ছা এখন রাত হয়ে যাচ্ছে, তুমি বাড়ী ফিরে যাও, দেরি হয়ে গেলে তোমার মা ব্যস্ত হয়ে উঠবেন।' তখন পার্বতী আমার ঘর ত্যাগ করল।

পরেরদিন সকালেই মানি-ব্যাগটা পকেটের মধ্যে ফেলেই, স্থানীয় বাজারে গিয়ে হাজির হলাম। আন্তরিক ইচ্ছা, যাবার সময় পার্বতীকে কোন জিনিষ উপহার দিয়ে যাই। একটি দোকানাদার দেখলাম মেয়েদের জন্য রুপোর গয়না বেচছে। এক জোড়া রুপোর চুড়ির উপর কারুকার্য দেখে আমার খুব পছন্দ হল। পার্বতীর উজ্জ্বল শ্যাম-বর্ণের সঙ্গে রুপোর চুড়ি দুটো মানাবে ভাল।

সেদিন সন্ধ্যায় আমাকে দুধ খাওয়ানর পর পার্বতীকে তার হাত দুটো আমার সামনে বাড়িয়ে দিতে বলাতে, সে হেসে জিজ্ঞাসা করল, 'কেন?'

বললাম, 'হাত দুটো সামনে এগিয়ে দিলেই দেখতে পাবে।'

পার্বতী দুষ্টুমির হাসি, হেসে মাথাটা একটু হেলিয়ে বলল, 'উঁহু সেটি হচ্ছে না।' বলেই হাত দুটি পিছনে করে রাখল।

তখন আমি চারপাই থেকে চট্ করে লাফিয়ে উঠে পার্বতীর পিছনে রাখা হাত দুটোকে শক্ত করে চেপে ধরতেই, সে বলে উঠল 'উঁহু, ছাড়ুন ছাড়ুন, ব্যথা লাগছে। বাবা! হাত দুটো আপনার সামনে দিচ্ছি,' বলেই সে তার হাত দুটো আমার সামনে এগিয়ে দিল। বললাম 'এখন চোখ দুটো বোজো।' পার্বতী বিনা আপত্তিতে চোখ দুটো বুজলে, পকেট থেকে চুড়িগাছা বের করে, তার হাতে পরিয়ে দিয়ে বললাম, 'এখন চোখ দুটো খুলতে পার।' চোখ খুলেই হাতের চুড়ি সে অবাক হয়ে দেখতে লাগল। জিজ্ঞাসা করলাম, 'পছন্দ হয়েছে?'

সে হাসিমুখে মাথা হেলিয়ে বলল, 'খুব।'

তখন আমি বললাম, 'কাল যাবার আগে একবার দেখা করতে ভুলো না লক্ষ্মীটি।' সে কাল আসবার কথা দিয়ে চলে গেল।

পরের দিন ভূপসিং দুপুরের খাবারটা বেশ তাড়াতাড়ি দিয়ে গেল। তারপর ডাক্তার বাবু এসে বললেন, 'থানার একটি লোক এসে আপনাকে বাস স্ট্যান্ডে নিয়ে যাবে। থানার স্টেশনওয়াগন সেখানেই থাকবে। দারগাবাবুও উপস্থিত থাকবেন।'

আমি চারপাই থেকে উঠে করজোড়ে ডাক্তারবাবুকে নমস্কার করলাম এবং বললাম, 'আপনি আমার যে উপকার করলেন, তা আজীবন ভুলতে পারব না।'

ডাক্তারবাবু হেসে বললেন, 'দুনিয়ার মালিকের মর্জি তাই হয়েছে।' বলে, আমার কাছ থেকে বিদায় নিলেন।

দু-চার মিনিট বাদেই পার্বতী আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। তার হাতে দেখলাম এক গ্লাস গরম দুধ। জিজ্ঞাসা করলাম, এখন আবার দুধ এনেছ, কেন পার্বতী? আমার খাবার আমি খেয়ে নিয়েছি।'

'দুধ ত ভারি জিনিষ নয়। নিন গরম থাকতে খেয়ে নিন।'

কথা কয়টি সে বেশ গম্ভীরভাবেই বলল, আমি আর কোন আপত্তি না করে গরম দুধটুকু খেয়ে ফেললাম।

তখন পার্বতী হেসে বলল, 'আপনি বড়জোর আমার চেয়ে ছ-সাত বৎসর বড় হবেন। কিন্তু বড় হ'লে কি হবে? স্বভাবটা আপনার শিশুর মত। তাই বলি এখন কিছুদিনের জন্য যাযাবরের মত বিদেশে বিদেশে না ঘুরে মায়ের ছেলে মায়ের কাছে গিয়ে থাকুন।

বললাম, 'ভাবছি তাই করব।'

তখন আমাকে বাস স্ট্যান্ডে নিয়ে যাবার জন্য একটি লোক ঘরে ঢুকল দেখে, আমি হেসে—পার্বতীকে বললাম, তবে বিদায় দাও পার্বতী।

দেখলাম পার্বতীর আমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে যাচ্ছে; তখন দু'হাত দিয়ে তাকে তুলে নিয়ে বললাম,—'তোমার কাছ থেকে প্রণাম নেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই পার্বতী, শুধু তোমার কাছে আমার এই অনুরোধ যে, আমাকে হাসিমুখে বিদায় দাও, তাতেই আমার কল্যাণ হবে।'

পার্বতী তখন হেসে আমার ডান হাতটি তার দুটো হাতের মধ্যে নিয়ে বলল, 'জীবনে চিরদিন সুখে থাকুন এই প্রার্থনাই করি।'

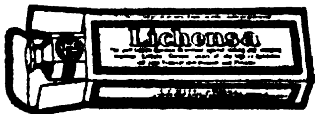
এর পর আমি আগন্তুক লোকটির সঙ্গে আমার ব্যাগটি নিয়ে বাস স্ট্যান্ডের দিকে রওনা দিলাম। রাস্তার মোড়ে এসে পিছনে তাকিয়ে দেখি পার্বতী দরজার কাছে দাঁড়িয়ে, মাথাটা একটু হেলিয়ে আমার দিকে চেয়ে আছে। মোড় ফিরতেই তাকে আর দেখতে পেলাম না।

এর পর বাস স্ট্যান্ডে পৌঁছে দেখি, দারগাবাবু সেখানে উপস্থিত রয়েছেন। আমাকে দেখেই হেসে তিনি বলে উঠলেন, 'এই যে মিস্টার সান্যাল এসে গেছেন।' তার পর পাশে একটী স্টেশনওয়াগনের দিকে নির্দেশ করে বললেন, 'আমাদের এই রথ আপনাকে নিরাপদে হৃষিকেশ পৌঁছে দেবে।' থানার ড্রাইভার খুব এক্সপার্ট লোক। কোন ভয়ের কারণ নেই। আপনি রথে আরোহণ করুন।' আমি দারগাবাবুকে নমস্কার করে গাড়ীতে বসতেই ড্রাইভার হৃষিকেশের দিকে গাড়ী ছেড়ে দিল।

তখন আমার রমেশ ও তার মায়ের কথা মনে পড়তে লাগল। মনে হতে লাগল, রমেশের মায়ের শ্রীগৌরাঙ্গের নাম নিয়ে, আমাকে দীর্ঘজীবী হওয়ার আশীর্বাদের জোরেই এ যাত্রা রক্ষা পেলাম।

বাঁদিকে চেয়ে দেখি খরস্রোতা সমানভাবে মোটরের সঙ্গে তাল দিয়ে কুলু কুলু রবে হৃষিকেশের দিকে এগিয়ে চলেছে।

ব্রণ
দূর করবার জন্য
লিচেনসা



● ১০৮টি দেশে ডাক্তাররা প্রেসক্রিপশন করেছেন।
● যে কোন নামকরা ওষুধের দোকানেই পাওয়া যায়।

DZ-1676 R-BEN

দেশে বিদেশে

মহামায়াপ্রসাদের বিদায়

ডঃ রামমনোহর লোহিয়া আজ জীবিত থাকলে নিশ্চয়ই দুঃখ পেতেন এই দেখে যে, বিহারে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার পতনের পরোক্ষ দায় তাঁরই উপর এল। একজন হরিজনকে মন্ত্রিসভায় নিতেই হবে, সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টির এই দাবী ডঃ লোহিয়ারই জেদের ফল। এই জেদের জোরেই শ্রীবিন্ধ্যেশ্বরী-প্রসাদ মণ্ডল বিহারের কোয়ালিশন মন্ত্রি-সভায় স্থান পেলেন। ছুঁচ হয়ে যিনি ঢুকলেন তিনিই ফাল হয়ে বেরোলেন। লোকসভার সদস্য শ্রীমণ্ডলকে যখন মন্ত্রি-সভা থেকে বেরিয়ে আসতে বলা হল তখন তিনি পাল্টা চাল দিলেন। তিনি মন্ত্রিসভা ও যুক্তফ্রন্ট থেকে বেরিয়ে এসে "শোষিত দল" নামে একটি পৃথক দল গঠন করলেন। গত ২৫ আগস্ট তারিখে ঘোষণা করা হল যে এস এস পি-র ১৪ জন এবং পি এস পি, জনক্রান্তি ও জনসঙ্ঘ মিলিয়ে আর নয়জন বিধানসভার সদস্য শ্রীমণ্ডলের নেতৃত্বে গঠিত শোষিত দলে যোগ দিয়েছেন। ২৭ আগস্ট তারিখে তিনি বিহারের তৎকালীন রাজ্যপাল শ্রীঅনন্তশয়নম আয়েঙ্গারের সঙ্গে দেখা করে জানান যে, কংগ্রেস তাঁর নবগঠিত শোষিত দলের সঙ্গে ও তাঁর নেতৃত্বে কোয়া-লিশন গঠন করেছে এবং কংগ্রেসের ১৩২ জন সদস্যসহ বিহার বিধানসভায় এই কোয়া-লিশনের সদস্যসংখ্যা ১৭২ অর্থাৎ ৩১৮ জন সদস্যবিশিষ্ট রাজ্য বিধানসভায় সংখ্যা-গরিষ্ঠ।

সেদিন থেকেই বোঝা যাচ্ছিল যে, বিহারে মহামায়াপ্রসাদ সিংহের মন্ত্রিসভার আয়ু আর বেশী দিন নেই। কিন্তু তারপর আরও পাঁচ মাস এই মন্ত্রিসভা টিকে ছিল। এই পাঁচ মাসে মন্ত্রিসভার ভিতরকার অনৈক্যের ফলে মহামায়াপ্রসাদের সরকার একটার পর একটা সংকটের মধ্য দিয়ে চলে-ছেন। উর্দুকে দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা করার প্রশ্নে মন্ত্রিসভায় ফাটল দেখা দেয় এবং জনসঙ্ঘ এই প্রশ্নে যুক্তফ্রন্ট থেকে ইস্তফা দেওয়ার হুমকি দেয়। উর্দু নিয়ে রাঁচীতে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হল সে সম্পর্কে কম্যুনিস্ট পার্টি জনসঙ্ঘকে দোষারোপ করল। ডাল্টনগঞ্জের চিনিকলটি মহীশূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়াতে বাধা দেওয়ার ব্যাপারে সর-কারের ব্যর্থতার প্রতিবাদে ডিসেম্বর মাসে পি-এস-পি মন্ত্রিসভা ত্যাগ করল। পি-এস-পি'র পর এস-এস-পি মন্ত্রীরাও যুক্ত-ফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ত্যাগ করার কথা ঘোষণা করলেন। দুদিন পরে দক্ষিণপন্থী কম্যু-নিস্টরাও মন্ত্রিসভা ত্যাগ করলেন। কোন দলই অবশ্য যুক্তফ্রন্ট থেকে তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করল না। কিন্তু সর্বশেষে ঝাড়-খণ্ড দল যুক্তফ্রন্ট থেকে বেরিয়ে এল।

এই পাঁচ মাস ধরে কংগ্রেস ও শোষিত দল ক্রমাগত দাবী করে যাচ্ছিল যে, বিধান-সভায় যুক্তফ্রন্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়েছে। কিন্তু পর পর দুজন রাজ্যপাল (প্রথমে শ্রীআয়েঙ্গার, পরে শ্রীনিত্যানন্দ কানুনগো) বিধানসভায় শক্তি পরীক্ষা ছাড়া এই দাবী মেনে নিতে অস্বীকার করেছেন এবং বিধান-সভায় শক্তি পরীক্ষার জন্য পাঁচ মাস ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী মহামায়া-প্রসাদ সিংহ যে তারিখে বিধানসভা আহ্বান করার জন্য রাজ্যপালকে পরামর্শ দিয়েছিলেন সেই তারিখেই বিধানসভা আহ্বান করা হল।

এই পাঁচ মাস ধরে বিহারের রাজনীতির অস্থির রঙ্গমঞ্চে অনেক কিছুই ঘটনা ঘটে গেল। উভয় পক্ষ কর্তৃক বিধানসভার সদস্যদের গুম করে রাখার অভিযোগ শোনা গেল। মন্ত্রিসভা ভাঙার জন্য টাকার খেলা চলছে, এই মর্মে যুক্তফ্রন্টের পক্ষ থেকে চেক নম্বরসহ অভিযোগ আনা হলে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও কংগ্রেস নেতা শ্রীকৃষ্ণবল্লভ সহায় স্বীকার করলেন যে, যুক্তফ্রন্ট থেকে লোক ভাঙিয়ে আনার ব্যাপারে তিনি রাহাখরচ ইত্যাদি বাবদ প্রায় লাখ খানেক টাকা ব্যয় করেছেন। বিধানসভা বসবার অব্যবহিত পূর্বে বিহার মন্ত্রিসভা ঘোষণা করলেন যে, রাজ্যের ভূতপূর্ব কংগ্রেস মন্ত্রিসভার সদস্যদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ বিবেচনা করার জন্য সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি শ্রী টি এল বেঙ্কটরাম আয়ারকে নিয়ে গঠিত তদন্ত কমিশনের সামনে কংগ্রেসের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণবল্লভ সহায়, প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রী সত্যেন্দ্রনারায়ণ সিংহ প্রভৃতির বিরুদ্ধে ১৯২টি দুর্নীতির অভিযোগ দায়ের করা হবে। বিহার বিধান-সভার সদস্যদের আবাস থেকে একদিন গুলীর শব্দ পাওয়া গেল, যদিও কে কাকে লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়েছিলেন সেটা বোঝা গেল না। বিধানসভার লবী থেকে ঝাড়খণ্ড দলের একজন অসুস্থ সদস্যকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে পুলিশ মন্ত্রী শ্রীরামানন্দ তেওয়ারির সঙ্গে সঙ্গে প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীরাম-লক্ষ্মণ সিং যাদবের সঙ্ঘর্ষ হয়ে গেল। বিহার বিধানসভার একজন উপজাতীয় সদস্যের অভিযোগে বিহারের 'প্রতিমন্ত্রী শ্রীফিলমন টোপোর বিরুদ্ধে লোক গুম করে রাখার মামলা হল। ২২ জানুয়ারী তারিখে এক সাংবাদিক সম্মেলনে পুলিশ মন্ত্রী শ্রীতেওয়ারি বললেন যে, বিরোধী পক্ষের কোন কোন নেতা গুণ্ডামি ও সন্ত্রাসের দ্বারা ক্ষমতা দখল করার চেষ্টা করছেন। ১৫ জন এম-এল্-একে চুরি করা হয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করলেন। ঐদিনই বিহার প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীরাজেন্দ্র মিশ্র বললেন যে, যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য বিশৃঙ্খলা ও হিংসার প্ররোচনা দিচ্ছেন। শ্রীরামলক্ষ্মণ সিং যাদব বললেন, "ফ্রন্ট সরকার বিহারে আর একটি কলকাতা সৃষ্টি করতে চাইছেন।" এস এস পি ও কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে দাবী উঠল যে, কংগ্রেস ও শোষিত দলের নেতাদের নিবারণমূলক আটক আইনে গ্রেপ্তার করা হোক; কিন্তু রাজ্যপালের পরামর্শে মুখ্যমন্ত্রী এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলেন।

এই নাটকীয় সংঘাতের চরম মুহূর্ত এল ২৫ জানুয়ারী সন্ধ্যাবেলায়। বিধান সভায় বিরোধীপক্ষ থেকে শ্রীমহামায়াপ্রসাদ সিংহের মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে যে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়েছিল সেই অনাস্থা

'রূপা'র বই

॥ নতুন উপন্যাস ॥

মৃত্যুঞ্জয় মাইতি

নতুন জনপদ

আসন্ন রাত্রির জনশূন্য নদীতীরে নৌকার জন্য স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন নীলাপুরের নবাগতা প্রধানা শিক্ষয়িত্রী নমিতা দেবী। কর্মস্থলে নিয়ে যাবার জন্য নির্দিষ্ট নৌকা না আসায় অবশেষে স্থানীয় তরুণ ডাক্তার অসিতের নৌকায় সহযাত্রী হতে হল তাকে। ...এরপর শুরু হল নীলাপুরের ইতিহাসে নতুন এক অধ্যায়। [৬·০০]

আমাদের প্রকাশনায় লেখকের আর একখানি উপন্যাস :

নিঃসঙ্গ নায়ক ৩·০০

আমাদের পূর্ণ গ্রন্থতালিকার জন্য লিখুন

রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট * কলকাতা-১২
Phone : 34-4821 * 34-6305

প্রস্তাবের উপর গোপন ব্যালটে ভোট গ্রহণ করা হল। রাত্রি ৮-১০ মিনিটে যখন ভোট গ্রহণ করা হল তখন দেখা গেল অনাস্থা প্রস্তাবের পক্ষে ১৬৩ ও তার বিপক্ষে ১৫০ ভোট পড়েছে। স্পীকার শ্রীধনিক মণ্ডল ভোটের ফলাফল ঘোষণা করার অল্প পরেই মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপালের কাছে তাঁর মন্ত্রিসভার পদত্যাগপত্র পেশ করলেন। রাজ্যপাল তাঁকে বিকল্প ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যেতে বললেন।

এইভাবে ভারতবর্ষে প্রথম একটি অকংগ্রেসী মন্ত্রিসভা বিধানসভায় সরাসরি শক্তিপরীক্ষায় পরাজিত হয়ে ক্ষমতা থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হলেন। এই ঘটনা থেকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিজের নিজের দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী শিক্ষা গ্রহণ করেছে ও করবে। পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ও অর্থমন্ত্রী ডাঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র বলেছেন যে, বিহারে আর একবার প্রমাণ হল পাঁচমিশালি দলের জোড়া-তালি দেওয়া সরকার কোন স্থায়ী প্রশাসন দিতে পারে না। সংযুক্ত সোস্যালিস্ট নেতা শ্রীমধু লিমায়ে বলেছেন যে, বামপন্থী দলগুলি নির্বাচনে প্রার্থী মনোনীত করার সময় যদি আর একটু দেখেশুনে মনোনয়ন দিত তাহলে পরবর্তীকালে হয়ত এমন ব্যাপক দলত্যাগ ঘটত না। উপজাতীয় সদস্যদের মধ্যে যে রকম দলত্যাগের হিড়িক দেখা গেছে সেই অভিজ্ঞতার পর সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টি অনুন্নত সম্প্রদায়গুলির জন্য বিশেষ রাজনৈতিক সুবিধা দেওয়ার নীতি পুনর্বিবেচনা করবে কিনা তা বলা যায় না, তবে দলের মধ্যে যদি এরকম চিন্তা শুরু হয় তাহলে আশ্চর্যের বিষয় হবে না।

এখন বিহারের মানুষের সামনে বড় প্রশ্ন হচ্ছে, অকংগ্রেসী কোয়ালিশন সরকার যে প্রশাসনিক স্থায়িত্ব দিতে পারেন নি, কংগ্রেস ও শোষিত দলের কোয়ালিশন কি সেই স্থায়িত্ব দিতে পারবে? প্রথমেই যে বাধাটি বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে সেটি হচ্ছে এই যে, কংগ্রেস শ্রীবিন্দেশ্বরীপ্রসাদ মণ্ডলকে মুখ্যমন্ত্রী করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কিন্তু শ্রীমণ্ডল আইনসভার সদস্য নন। আইন-সভার সদস্য না হয়েও তিনি প্রায় পাঁচ মাসকাল যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভায় মন্ত্রিত্ব করেছেন। আইনজ্ঞরা সংবিধানের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাতে বলা হয়েছে যে, ইতিমধ্যে আইনসভার সদস্য না হলে তিনি আর একবার মন্ত্রিসভায় যেতে পারেন না। এই অবস্থায় রাজ্যপাল কি করে শ্রীমণ্ডলকে মন্ত্রিসভা গঠন করতে আহ্বান জানাবেন সে প্রশ্ন উঠেছে।

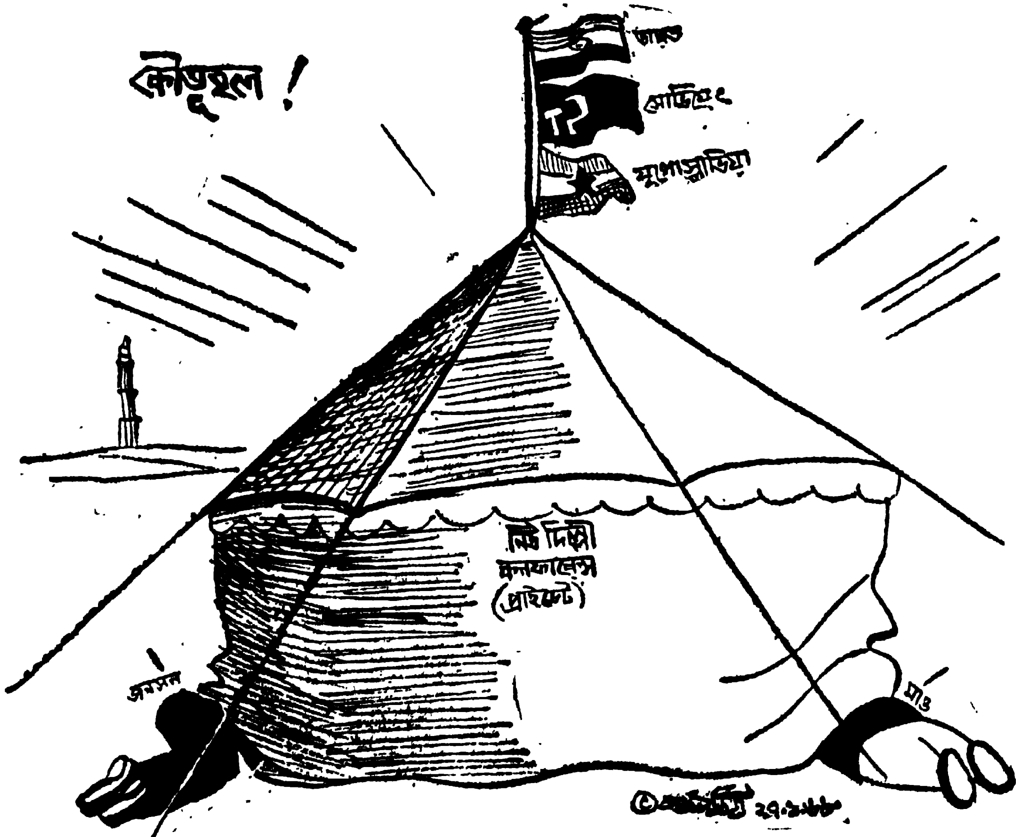
দ্বিতীয় আর একটি অসুবিধা আছে। সেটি কংগ্রেস দলের ভিতরকার। বিহারের কংগ্রেসের ভিতরকার দলাদলির কাহিনী সুবিদিত। এই দলাদলির মধ্য থেকে কংগ্রেস কোয়ালিশন মন্ত্রিসভায় কাকে নেবে আর কাকে বাদ রাখবে এবং এই বাছাবাছির ফলে কংগ্রেস দলে প্রকাশ্য ভাঙন ধরবে কিনা সেটা আগামী কয়েক দিনে লক্ষ্য করার বিষয় হবে।

যদি কংগ্রেস-শোষিত দলের এই কোয়ালিশনও অকেজো হয়ে যায় তাহলে বিহারে অন্তর্বর্তী নির্বাচনই অনিবার্য হয়ে উঠবে—যার জন্য শ্রীমহামায়াপ্রসাদ সিংহ ইতিমধ্যেই কথা তুলেছেন।

দ্বিতীয় টংকিন উপসাগর?

টংকিন উপসাগরে একটি মার্কিন জাহাজের উপর হামলার অভিযোগকে কেন্দ্র করেই আজকের ভিয়েতনাম যুদ্ধ। এই ধরনের আর একটি ঘটনা ঘটে গেছে উত্তর কোরিয়ার উপকূলের সমীপবর্তী সমুদ্রে এবং টংকিন উপসাগরের ঘটনার মতই এই ঘটনাও একটা বৃহত্তর সংঘর্ষের আকার ধারণ করতে পারে বলে আশংকা করা হচ্ছে।

এই নতুন আন্তর্জাতিক সংকটাবস্থা দেখা দিয়েছে "পুয়েব্লো" নামক একখানি



মার্কিন জাহাজকে অবলম্বন করে। মার্কিন সরকার জাহাজটিকে "তথ্যানুসন্ধানী জাহাজ" বলে বর্ণনা করেছেন। উত্তর কোরিয়ার নৌবাহিনী এই জাহাজটিকে তার ক্রুসহ আটক করে উত্তর কোরিয়ার ওনসান বন্দরে নিয়ে গেছে। উত্তর কোরিয়ার অভিযোগ এই যে, জাহাজখানি তার দরিয়ার সীমানার মধ্যে অবস্থান করে গোয়েন্দাগিরি চালাচ্ছিল। গোয়েন্দাগিরির অভিযোগ অস্বীকার না করে মার্কিন সরকার বলেছেন, জাহাজটি আন্তর্জাতিক দরিয়ায় ছিল এবং সেখানে উত্তর কোরিয়ার কোন এক্তিয়ার নেই।

ব্যাপারটা যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে তার মান-মর্যাদার প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। উত্তর কোরিয়ার আচরণ যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে আরও অসহনীয় হয়েছে এই কারণে যে, আটক মার্কিন জাহাজের ক্যাপ্টেন বলে কথিত এক ব্যক্তি পাইয়ংইয়ং বেতার কেন্দ্র থেকে বিবৃতি দিয়ে উত্তর কোরিয়ার অভিযোগ পুরোপুরি স্বীকার করে নিয়েছেন এবং এই কাজ করার জন্য উত্তর কোরিয়ার সরকারের মার্জনা ভিক্ষা করেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কঠোর ভাষায় জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আটক ক্রুসহ "পুয়েবলো"কে ছেড়ে না দেওয়া পর্যন্ত তাঁরা কিছুতেই সন্তুষ্ট হবেন না। উত্তর কোরিয়াকে শাসানর জন্য ইতিমধ্যে তার সীমানা থেকে কিছু দূরে সমুদ্রবক্ষে বিরাট মার্কিন নৌসমাবেশ করা হয়েছে এবং মার্কিন বিমান বাহিনীর রিজার্ভ সৈনিকগণকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়ার সীমান্তে সীমান্ত সংঘর্ষের এবং দক্ষিণ কোরিয়ার অভ্যন্তরে নূতন কম্যুনিস্ট গেরিলা তৎপরতার সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক উত্তেজনার আর একটি নূতন হেতু পাকিয়ে উঠছে বলে মনে হচ্ছে।

বৈষয়িক প্রসঙ্গ

পাট-শিল্পের সমস্যা

পৃথিবীর দেশগুলির মধ্যে ভারত যদিও এখনো এককভাবে পাটজাত দ্রব্যের বৃহত্তম উৎপাদক, তবু তার একচেটিয়া কারবারের অবস্থা আজ আর নেই। সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে এক আলোচনাচক্রে ভারতীয় পাট-শিল্পের সমস্যার এই দিকটি বিশেষ-ভাবে তুলে ধরা হয়েছিল।

ভারতীয় পাটকল সমিতির চেয়ারম্যান শ্রীএইচ, এস, সিংহানিয়া জানান, পাটজাত দ্রব্যের বিশ্ব উৎপাদনে ভারতের অংশ ৪১ শতাংশ থেকে ৭০ শতাংশে নেমে এসেছে। আন্তর্জাতিক রপ্তানী বাণিজ্যে ভারতের অংশ আগে যেখানে ছিল ৮৩ শতাংশ এখন সেই পরিমাণ হ্রাস পেয়ে হয়েছে ৬১ শতাংশ।

শ্রীসিংহানিয়া আরো জানান, ১৯৫৩ সালে ভারত ৬ লক্ষ ৮৯ হাজার টন পাট-জাত দ্রব্য রপ্তানী করেছিল। ১৯৬৫ সালে তা বেড়ে হয় ৯ লক্ষ ২৯ হাজার টন। কিন্তু ১৯৬৬ সালে তা কমে গিয়ে ৭ লক্ষ ৪৬ হাজার টনে দাঁড়ায় এবং ১৯৬৭ সালে রপ্তানীর পরিমাণ ছিল মাত্র ৭ লক্ষ ৭৩ হাজার টন।

এই অবস্থার প্রধান কারণ অন্যান্য পাট উৎপাদক দেশের, বিশেষ করে পাকি-স্থানের, প্রতিযোগিতা। আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্থানের উৎপাদন ও রপ্তানীর পরিমাণ ৭ শতাংশ থেকে বেড়ে যথাক্রমে ১৩ ও ২৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

এ-ছাড়া রয়েছে কৃত্রিম দ্রব্যের ক্রম-বর্ধমান ব্যবহার। বিদেশে পাটজাত প্যাকিং দ্রব্যের চাহিদাই সবচেয়ে বেশি। সেই প্যাকিংয়ের কাজ এখন কাগজের থলে ইত্যাদি অন্যভাবে মেটানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। স্বভাবতই পাট-শিল্পের ওপর একটা বড় আঘাত এর ফলে এসে পড়েছে।

এই আঘাত থেকে পাট-শিল্পকে রক্ষা করতে হলে কৃত্রিম দ্রব্যের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতেই হবে। অর্থাৎ একদিকে যেমন উৎপাদনকে বহুমুখী করতে হবে অন্যদিকে তেমনি গবেষণার এবং উৎপন্ন দ্রব্যের উন্নয়নের দিকে ক্রমাগত নজর দিতে হবে। কিন্তু সেই সঙ্গে পাট-শিল্পের এখনো যেটা মৌলিক সমস্যা—কাঁচা পাটের সমস্যা —তার প্রতি উপেক্ষা দেখালেও চলবে না। কারণ একথা অনস্বীকার্য যে, ভালো পাট ও পর্যাপ্ত পাট না পাবার দরুনই পাট কলগুলির উৎপাদন ক্ষমতাকে পুরোপুরি কাজে লাগানো যাচ্ছে না, আর সেই পরিমাণে ভারত অন্যান্য দেশের কাছে হেরে যাচ্ছে।

কাঁচা পাটের এই সঙ্কট সৃষ্টির পেছনে কল মালিকদের হাত খুব একটা কম নেই। কারণ তাঁরা চাষীদের ন্যায্য মূল্য কোন-দিনই দেননি। আর তার ফলে চাষীরা পাট চাষ করতে উৎসাহ বোধ করছে না। অনেক-ক্ষেত্রে চাষীরা ইতিমধ্যেই পাট চাষ বন্ধ করে দিয়ে অন্য কিছু চাষ করছে।

সুতরাং মিল-মালিকরা যদি চাষীকে পাটের জন্যে ন্যায্য মূল্য দিতে প্রস্তুত না থাকেন তাহলে পাট-শিল্পকে রক্ষা করা অসম্ভব। কারণ সেক্ষেত্রে তাঁরা কাঁচা পাটের পর্যাপ্ত সরবরাহ সম্পর্কে নিশ্চিতই হ'তে পারবেন না, আর পর্যাপ্ত সরবরাহ পাওয়া না গেলে রপ্তানী বাড়ানোর আশা তাঁদের ত্যাগ করতে হবে।

উপ-প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই আলোচনাচক্রে এই মৌলিক সমস্যার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেবার জন্যে শিল্প মালিকদের কাছে আবেদন জানান। তিনি এই কথাও বলেন যে, পাট উৎপাদকদের স্বার্থ পাট-শিল্পের স্বার্থের চাইতেও বেশি গুরুত্ব-পূর্ণ। কারণ "যদি কাঁচা পাট না থাকে তাহলে শিল্পও থাকবে না।"

শ্রীদেশাই শিল্প মালিকদের প্রতি একটি পরামর্শ দেন : তাঁরা একে অপরের গলা কাটা থেকে বিরত হয়ে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করে চলুন, এবং চাষীরা যাতে ভালো জাতের পাট উৎপাদন করতে পারে তার জন্যে তাদের সাহায্য করুন।

আলোচনার দ্বিতীয় দিনে কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীজগজীবন রামও উৎপাদকদের সমস্যার ওপর জোর দেন। তিনি বলেন, সরকার যে সংগ্রহ-মূল্য ঠিক করে দিয়েছেন, কল-মালিকদের সেই মূল্যেই তাঁদের প্রয়ো-জনীয় কাঁচা পাট কিনতে হবে। কাঁচা পাটের জন্যে যে ন্যূনতম সমর্থন মূল্য বেঁধে দেওয়া আছে, কোনমতেই দাম সেই পর্যায়ে নেমে আসতে দেওয়া হবে না।

এই প্রসঙ্গে শ্রীরাম আরেকটি সমস্যার উল্লেখ করেন যাকে পাট-শিল্পের অন্যতম প্রধান সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করা চলে। তিনি বলেন, পাট কলগুলিকে উৎপাদনের খরচা কমাতে হবে ঠিক কথা, কিন্তু সেটা কাঁচা মালের দাম কমিয়ে নয়, কারখানা-গুলির কর্মদক্ষতা বাড়িয়ে ও পরিচালনার ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করতে হবে। মালিক-দের বিরুদ্ধে অদক্ষ পরিচালনার অভিযোগ দীর্ঘদিনের। কারখানাগুলি বহুদিনের পুরনো, যন্ত্রপাতি জীর্ণ ও মান্ধাতার আমলের। এগুলি বদলিয়ে যদি পাটকল-গুলির আধুনিকীকরণ করা না হয় তাহলে ভারতীয় পাট-শিল্প কোনদিনই আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারবে না। মালিকরা অনেক রকম সমস্যার কথাই উল্লেখ করেন, কিন্তু এই সমস্যার কথা দীর্ঘদিন ধরে সযত্নে এড়িয়ে আসছেন। যদি তাঁরা প্রশ্নটি এইভাবে এড়িয়েই যেতে থাকেন তাহলে সরকারকে হস্তক্ষেপ করতেই হবে।

কল মালিকদের পক্ষ থেকে অবশ্য পাটের ন্যূনতম মূল্য বেঁধে দেবার সিদ্ধান্তের নিন্দা করা হয়। বলা হয় যে, উৎপাদনের ব্যয় অসম্ভব রকম বেড়ে গেছে। শ্রমিকদের বেতনের হার, বিদ্যুতের হার ও কর ও অন্যান্য শুল্কের দরুন পাটশিল্পকে নিদারুণ অসু-বিধার মধ্যে পড়তে হয়েছে, কারণ দাম বাড়িয়ে এই বর্ধিত দায় মেটানো সম্ভব নয়। সুতরাং কাঁচা পাটের ব্যাপারে সরকারের এত কড়াকড়ি করা উচিত নয়।

এই কথার মধ্যে যে যুক্তিই থাকুক কল-গুলির পরিচালনার ত্রুটি দূর করে এবং পুরনো যন্ত্রপাতি বদলে নতুন যন্ত্রপাতি বসিয়ে উৎপাদনের ব্যয় যে অনেকখানি কমানো যায় একথা অনস্বীকার্য। অথচ মালিকরা এ সম্পর্কে কোন উচ্চ-বাচ্যই করছেন না।



শিল্প প্রদর্শনী

সমাজসেবায় গৌরব সরোজনলিনী নারী মঙ্গল সমিতিকে বনস্পতির মর্যাদা দিয়েছে। দীর্ঘদিনের পথ বয়ে অক্লান্ত পদক্ষেপে আজও এই প্রতিষ্ঠান সেই গৌরবে অক্ষুণ্ণ রয়েছে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হলো এর বার্ষিক শিল্প প্রদর্শনী। কেন্দ্র সমিতি ছাড়াও এর অনুমোদনপ্রাপ্ত কয়েকটি সমিতি এই প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করে। আলো ঝলমল সেই প্রদর্শনী ঘুরে ঘুরে দেখলাম, প্রতিটি জিনিস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। শুধু আমি একা নয় আরো অনেকে। কেউ কেউ কেনা-কাটাও করলেন। পছন্দসই সব জিনিষপত্র এনে সাজানো হয়েছে সুবিস্তৃত প্রদর্শনী-কক্ষ। ভিন্ন ভিন্ন রুচির লোককে তৃপ্ত করার পক্ষে এই আয়োজন যথেষ্ট। প্রিন্টিং সেকসনে দেখলাম ছাপানো শাড়ীর ভিড়। ক্রেতার ভিড়ও মন্দ নয়। এই আক্রার বাজারেও দাম খুব বেশি মনে হচ্ছিল না। কথাপ্রসঙ্গে জানা গেল যে, শাড়ী সরবরাহ করা হয় প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে, আর ছাপানো হয় এখানেই। সেটা প্রতিষ্ঠানের মেয়েরাই করে। এজন্য অবশ্য তারা মজুরী পায়। বাটিকের বহুল প্রচলনের মধ্যেও এবারের প্রদর্শিত কাপড় ও অন্যান্য জিনিস-গুলি বেশ আকর্ষণ করে। ঘুরে ঘুরে এবার এসে দাঁড়ালাম ড্রইং-এর কাছে। বেশ লাগলো। সুন্দরভাবে চিত্রিত কলসীগুলি বলিষ্ঠ শিল্পের স্বাক্ষর রাখে। ব্রাশ মেটালের কাজগুলিও মন্দ নয়। এবার

অঙ্গনা

প্রমীলা

ফুলের বাহার নেইক যাহার

ফসল ফলাবার ঝোঁকেই আজকের মধ্যবিত্ত গৃহের গৃহিণীরা চঞ্চল। যেখানে যেটুকু জমি পাওয়া যায় তাতে বেগুন টমাটো কাঁচা লঙ্কা ঢেঁড়স পুঁইডাঁটার সমাহার, সমারোহ। ঝুলবারান্দায় ঝুলন্ত গামলায় ফুলন্ত অর্কিডের বদলে ধনেপাতা, মেথি শাক লেটুস। দেখেশুনে মনে হয় রামপ্রসাদ বেঁচে থাকলে পতিত জমিতে আবাদ করে সোনা ফলাবার জন্যে আর খেদ করতেন না। জমি বেশী থাকলে এখনকার নাগরিকরা হয়ত ধানক্ষেতও তৈরী করতে বাকী রাখতেন না। জীবনের পরিধিটা গুটোতে গুটোতে ক্রমশ রান্নাঘরেই সীমাবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। পাঁচতলা থেকে নিয়ে গাছতলার বাসিন্দা পর্যন্ত সকলের মুখেই অহরহ অভাবের ফিরিস্তি অভিযোগের ফর্দ। প্রাণ মাঝে মাঝে হাঁপিয়ে ওঠে বৈকি। মানুষের উদরের চেয়ে যে অন্য উদারতর ক্ষেত্র বা উপরতলা বলে স্থান আছে এ সত্য কেন ভুলতে বসেছি আমরা। হা-অন্ন যো-অন্ন করে অন্যান্য সমস্তই বাতিল করে দিয়েছি। বাগান মানে এখন হয়ত বা শুধুই কীচেন-গার্ডেন। সুতরাং ফুলের কথা বলতে বসলে ফুলিশ শোনাবে কিনা সেটাই ভাবছি।

মধ্যবিত্ত বাঙালীর ঘরে পুষ্পপ্রীতি একটা বিলাস, হয়ত বা অপরাধ। ফুল বলতে অবশ্য সজনে ফুল কিংবা কুমড়ো ফুল বাদ দিয়েই বলা। 'বাঙালির জীবনে ফুলের প্রয়োজন মাত্র দু'বার—ফুলশয্যায় এবং মৃত্যুশয্যায়।' কথাটাকে একেবারে অগ্রাহ্য করা যায় না। রবীন্দ্রনাথের ল্যাবরেটরী গল্পের নায়িকা বিদগ্ধ এবং বিদুষী সোহিনী তির্যকতর ভঙ্গীতে বলেছে 'বাঙালি মেয়ের জীবনে পুজোর সাজির বাইরের ফুল পরপুরুষের মতন, ওদের চিনতে নেই।' কথাটা কিন্তু নিতান্ত ফেলে দেবার মত নয়। একমাত্র বটানির ছাত্রী ব্যতীত কজন মেয়ে আর ফুলের জাতি প্রকৃতি নাম গোত্র শিখে রেখেছেন বলুন? মেয়েদের প্রশ্ন করলে বড় জোর কোন ফুলে কোন দেবতা তুষ্ট হন সেইটুকুই বলতে পারবেন; আবার অতিআধুনিকা কেউ কেউ মন্ত্রশক্তির অম্বরের মতন শ্যামার ফুলে শ্যামের পুজোর ব্যবস্থাও দিয়ে ফেলতে পারেন। কারণ ফুল সম্পর্কে বেশীর ভাগ মেয়েই বিশেষজ্ঞ নন, বিশেষ অজ্ঞ।

অথচ ফুল সম্বন্ধে এমন জন্মান্ধতা বোধহয় বাঙালি মেয়েদেরই রক্তের সংস্কার। ঘরে কিংবা বিছানায় ফুলের শোভা, কেশ-পাশে অথবা বেশবাসে ফুলের বাহার কেমন যেন ছেলেমানুষি বা ছ্যাবলামির পর্যায়ভুক্ত মনে করেন এঁরা। অন্যান্য প্রদেশবাসিনীরা কিন্তু ফুল সম্পর্কে এমন নিস্পৃহ বা নিরুৎসুক নন। "ওমা, দু'ছেলের মা মাথায় ফুল দিয়েছে দ্যাখো"—কিংবা "বয়সের গাছ-পাথর নেই, ওদিকে খোঁপায় মালার বাহার" এমনতর নির্মম উক্তির প্রয়োগস্থল হবার ভয় তাঁদের নেই। রক্তকরবী ভূষিত কালো কবরী বা শ্বেত চম্পা বিজড়িত শাদা মাথা দেখতে তাঁদের চোখ অনভ্যস্ত নয়। ফুলের মালা তাঁদের চোখে সব বয়সেই সমান প্রিয়-দর্শন। শুধুমাত্র পুজোর ঘর বা বড় জোর বৈঠকখানাতেই পুষ্পসজ্জা সীমিত নয় ওঁদের, প্রায় প্রত্যেক ঘরেই প্রত্যহ ফুল রাখা দৈনন্দিন কর্মসূচীর অঙ্গ। বুক-র‍্যাক, ব্রিকব্র্যাক, ড্রেসিং টেবিল, ওয়াল-ভাস সর্বত্রই ফুলের স্তবকে তাঁদের জীবনের স্তব উচ্চারিত। সংসারযাত্রায় ফুলের ব্যবহার যেন শুধু সম্ভাব্য নয়, অবশ্যম্ভাবী।

ঢেঁড়স-টোমাটো লেটুস বেগুন মুলোর ফাঁকে ফাঁকে তাঁরা বেল জুঁই রজনীগন্ধারও চাষ করতে কুণ্ঠিত নন। শাক দিয়ে মাছ হয়ত ঢাকা যায় না, কিন্তু ফুলের স্বভাব

আসা যাক এম্ব্রয়ডারীর কথায়। মেশিন এম্ব্রয়ডারী এবং হাতের এম্ব্রয়ডারী দুয়েরই দক্ষতার প্রশংসা করা যায়। মেশিন এম্ব্রয়ডারীর সূক্ষ্মতা হাতে আসেনি এবং তা সম্ভবও নয়। তবু হাতের এম্ব্রয়ডারীর কাজগুলি সুন্দর হয়েছে। বাচ্চাদের জামা আর উলের সোয়েটার বেশ ভালই হয়েছে। তাঁতের কাজগুলি ক্রেতাদের টানবে মনে হলো। তবে ভিড়টা বেশি দেখলাম প্রিন্টিং সেকসনে এবং বাটিকের শাড়ীর দিকে। ও দুটো জিনিসই এবার প্রদর্শনীর মুখ্য আকর্ষণ।

এবার আসা যাক সমিতির অন্তর্ভুক্ত সমিতিগুলির শিল্প সামগ্রীর কথায়। মোট ছাপান্নটি সমিতি এর অন্তর্ভুক্ত। সবাই অবশ্য আসেনি। কিন্তু যে কয়টি এসেছে তাদের শিল্পসৌরভ খুব একটা কম যায় না। ওদের কাপড়, বাচ্চাদের জামা এবং টিকোজির প্রশংসা না করে পারা যায় না। কিন্তু কারণটা ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না যে, ক্রেতাদের ওদিকে তেমন ভিড় নেই কেন। আবার এমনও হতে পারে যে, ক্রেতাদের মনোযোগ ওদিকেও সমান। আমি ত মাত্র কিছুক্ষণ ছিলাম। এরই মধ্যে একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছি যে, ক্রেতা সমাগম বেশ ভালই হয়েছিল। ওঁরা সেইরকম আভাসই দিলেন। দক্ষিণ কলকাতায় এরকম একটি প্রদর্শনীতে ক্রেতা সমাগম খুবই স্বাভাবিক। তাই সবাই বেশ আনন্দিত।

সরোজনলিনী নারী মঙ্গল সমিতি এবার উদযাপন করলো ৪৩শ বার্ষিক উৎসব। সেই উপলক্ষেই এই প্রদর্শনীর আয়োজন। শিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন, স্বামী রঙ্গনাথানন্দ এবং ব্রিটিশ ডেপুটি হাই-কমিশনারের স্ত্রী শ্রীমতী জে মেকেন্জী। সভাপতির ভাষণে স্বামী রঙ্গনাথানন্দ সমাজসেবার ক্ষেত্রে এই সংস্থার উল্লেখযোগ্য অবদানের কথা উল্লেখ করেন এবং এর আরো বিস্তৃতি কামনা করেন। নানা বক্তার বক্তৃতায় আর্থিক সমস্যা প্রাধান্য পায়। সরকারী এবং বে-সরকারীভাবে যে সাহায্য এই সংস্থা পায় তা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্ত অকুলান। তাই এঁরা আরো সাহায্য কামনা করেন সমাজসেবার সুযোগকে বিস্তৃত করার জন্য এবং সংস্থার কর্মী ও শিক্ষার্থীদের জন্য।

বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে পাঁচদিনব্যাপী নানা মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রীরা এতে সমান অংশ নেয়। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে মহিলা প্রতিনিধি সম্মেলনে ও সমাজ শিক্ষায় নারীর স্থান উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত বিষয়ে আলোচনা করেন পশ্চিমবঙ্গের স্ত্রীশিক্ষা বিভাগের প্রধান পরিদর্শক শ্রীমতী শান্তি দত্ত। এছাড়া অন্যান্য দিনে নাটক ও পুতুল-নাচ অনুষ্ঠানসূচীতে প্রাধান্য লাভ করে।

বার্ষিক উৎসব এবং শিল্প প্রদর্শনী উপলক্ষে সমিতির নিজস্ব পরিচালিত ক্যান্টিন চালু ছিল। এই ক্যান্টিনের বৈশিষ্ট যে এখানে ছাত্রীরা সব কিছু তৈরি করে এবং তাঁদেরই ব্যবস্থাপনায় ক্যান্টিনটি পরিচালিত হয়। এমন কি বাইরের অর্ডার সরবরাহ করার ব্যবস্থাও আছে।

সৌন্দর্য দিয়ে অভাববোধকে ঢাকা যায় অনেক অংশে।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশে মেয়েদের চোখে ফুলের আদর এবং কদর কিন্তু ক্রমবর্ধমান।

শুধু পুষ্পরোপণ এবং পুষ্পসজ্জা প্রকরণই নয় ফুল সম্পর্কে পড়াশুনো আলাপ-আলোচনা এবং গবেষণার মাধ্যমে ফুলের উৎকর্ষ সাধনেও এঁরা ব্রতী। গোলাপের গ্রাফটিং করে সাদা ফুলে লাল ছিটে দেওয়া অথবা গোলাপীতে লালের স্ট্রাইপ টানা সুন্দর সুন্দর ফুলের উদ্ভাবন ও উৎপন্ন করায় এঁরা উৎসাহী। ফুলের প্রদর্শনী ত সৌন্দর্যবোধের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এঁদের চোখে। পুষ্পসজ্জার অভিনব রীতি ও পদ্ধতির নিত্য নতুন ধরন আবিষ্কারে এঁদের অসীম অনুসন্ধিৎসা। জাপানের ইকেবানা শিল্পরীতি ত বিশ্বের বিস্ময়। প্রসঙ্গতঃ শ্রীমতী দুর্গা মুখোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টা উল্লেখ্য। ইনিই [illegible] চর্চা করে প্রখ্যাত হয়েছেন। দিল্লীতে অনুষ্ঠিত একাধিক প্রতিযোগিতায় পুষ্প-সজ্জা ও ইকেবানা অলংকরণে ইনি পুরস্কৃত হয়ে বাঙালী মেয়েদের মুখোজ্জ্বল করেছেন। এঁর পুষ্পসজ্জা বিষয়ক পুস্তক রচনাও অভিনন্দনযোগ্য।

বাঙালী গৃহিণীরা কবে যে পুষ্প-ভীতি জয় করে পুষ্পপ্রীতিতে আকৃষ্ট হবেন জানি না তবে আশা করব সেদিন যেন আসন্ন হয়।

পুষ্পপ্রীতি সুকুমার মনের সৌন্দর্য-বোধের স্বাক্ষর। স্নেহ-ভালোবাসা-সৌহার্দ-শ্রদ্ধা এবং পূজার অকপট নিদর্শন। আমাদের ক্রমপ্রসারমান অন্ধকার জীবনের পটভূমিতে কিঞ্চিৎ পরিমাণে রং এবং গন্ধের আমদানি করতে পারলে হয়ত এই নীরন্ধ্র হতাশাকে সহ্য করা সহজ হবে। চোখে শুধু সর্ষে ফুল নয় বহু কিছু মৌসুমী ফুল দেখারও অভ্যাসও একান্ত দরকার।

—রেবা হাজরা

শীতে অল্প খরচে

ভাল খাবার

শীত পড়েছে। এই পৌষ মাসেই তো পিঠে-পুলির মরশুম। কিন্তু চিনির যা দুরবস্থা পিঠে-পুলির কথা পুরোপুরি লিখতেও হাত সরে না। এ ছাড়াও অবশ্য নোনতার মধ্যে কড়াইশুঁটির কচুরি ফুল-কপির সিঙ্গাড়া, বাঁধাকপির চপ এ সবও পড়ে। কিন্তু এইসব ছাড়াও কম খরচে অথচ মুখরোচক আর পুষ্টিকর জলখাবার আপনি করতে পারেন। অবশ্য এর জন্য অন্য দেশের খাবারের দিকে একটু নজর দিতে হবে। আশা করি কারুরই এতে আপত্তি হবে না। আর এ কথাও ঠিক, খাবারগুলি অনায়াসে পেটেও সইবে। বিশ্বাস না হয় পরখ করেই দেখুন।

যেমন ধরুন দালিয়া। এই দালিয়া তৈরী করার রীতিই হয়ত অনেকে ভাল জানেন না। এটি ঠিক মত তৈরী করে নিতে পারলে দেখবেন কত সহজে কত সুস্বাদু আর পুষ্টিকর খাবার তৈরী করতে পারবেন। দুপুর ও রাত্রের প্রধান খাদ্য হিসেবেও ব্যবহার করতে পারবেন।

বেশ পুরুষ্টু লাল গম চার কিলো মত নিন দালিয়া তৈরী করার জন্য। সারারাত এই গমগুলি জলে ভিজিয়ে দিন। তারপরের দিন রোদে দিয়ে বেশ খটখটে করে শুকিয়ে নিন। এবার মুড়ি ছোলা ভাজার দোকানে নিয়ে গিয়ে ঐ গমকে খোলায় ভাজিয়ে নিন। তারপর ঐ হালকা মুচমুচে গমগুলিকে ইচ্ছে হলে শিলে আধভাঙ্গা করে নিন কিম্বা সুবিধে থাকলে হালকা জাঁতায় দয়ে আলগা হাতে ভেঙ্গে নিন। এবার মুখ বন্ধ টিনের ভরে রাখুন। বেশ কিছুদিনের নিশ্চিন্তি। ইচ্ছে হলে চেলে নিয়ে এর থেকে সুজিও বার করতে পারেন।

এবার এটি তৈরী করার প্রণালী বলি। চায়ের সঙ্গে নোনতা দালিয়াই ভাল লাগবে। তাহলে দালিয়ার খিচুড় করুন। এর জন্য ডালের কোন প্রয়োজন হয় না। এই দালিয়া আপনি রোগী থেকে শুরু সকলকেই অনায়াসে পরিবেশন করতে পারবেন। এটি যেমন পুষ্টিকর তেমনি সহজে হজমও হয়। ডায়াবিটিস বা ডায়েটিং-এর জন্যও উপযুক্ত খাদ্য।

এক বা দেড় কাপ দালিয়াতে লাগবে গোটা চারেক লবঙ্গ, চায়ের চামচের দু-চামচ ঘি বা তেল। আদা, পেঁয়াজ, রসুন কুঁচি সবশুদ্ধ বড় চামচের এক চামচ। ধনেপাতা কুঁচি, কাঁচা লঙ্কা চিরে দিন ইচ্ছে মত। সিকি চামচ হলুদ আর আন্দাজ মত নুন।

ডেকচিতে ঘি দিন গরম হলে লবঙ্গ ফোড়ন দিন। ফুলে উঠলে দালিয়া ছেড়ে দিন, সঙ্গে দিন হলুদ গুঁড়ো। একটু নেড়ে চেড়ে জল ঢেলে দিন। অন্ততঃ চার কাপ জল দেবেন। এবার ধনেপাতা বাদে বাকি সব কুচোনো জিনিস দিয়ে দিন। পেঁয়াজ-রসুন ইচ্ছে না হলে দেবেন না। নামাবার



অল বেঙ্গল উওমেন্স ইউনিয়নের কর্মক্ষেত্র বহুবিস্তৃত। সেলাই, দর্জির কাজ, লেডি ব্রাবোর্ণ ডিপ্লোমা, তাঁত বস্ত্র বোনা, টাইপ করা, নার্সিং, রেডিও নির্মাণ পদ্ধতি প্রভৃতি নানা জিনিষ এখানে শেখানো হয়। কয়েক বছর ধরে এখানকার মেয়েদের তৈরি বেড কভার, টি কোজী, পর্দা প্রভৃতির কদর দেখা যাচ্ছে সাগরপারের নানা দেশে। ব্রিটেন এবং যুক্তরাষ্ট্র ইতিমধ্যেই এসব জিনিষ প্রচুরভাবে আমদানী করছে। অন্যান্য দেশেও বেশ আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। সেসব দেশের চাহিদা পূরণেরও চেষ্টা চলছে। এছাড়া দেশেও চাহিদা কিছু কম নয়। নানা উপলক্ষে এ'রা হোমের প্রাঙ্গণে এবং শহরের বিশিষ্ট জায়গায় বিক্রয়কেন্দ্রের আয়োজন করেন। এসব প্রদর্শনী ও বিক্রয়কেন্দ্রে তাঁরা নিজেদের তৈরী শিল্পসম্ভার বিক্রি করেন। ক্রেতাদের কাছ থেকে সাড়া পাওয়া যায় উল্লেখযোগ্যভাবে। এ'দের কর্মের পরিধি রোজই বেড়ে চলেছে। হোমের মেয়েদের আয়ও বাড়ছে। চিত্রে দেখা যাচ্ছে কয়েকজন মেয়েকে ব্লক প্রিন্টিং বিভাগে কাজ করতে।

আগে ধনেপাতা দিয়ে নামান। কড়াইসুঁটিও দিতে পারেন। দিলে প্রথমেই দেবেন। না হলে সেদ্ধ হবে না। এই দালিয়ার খিচুড়ি করতে আপনার মিনিট সাতেক লাগবে বড় জোর। দেখুন তো কেমন সহজে কত সুস্বাদু আর পুষ্টিকর জলখাবার হল। আরও পুষ্টিকর করতে চাইলে এর মধ্যে একটা ডিম ভেঙে ঘেঁটে দিন। বেশ একটু পাতলা পাতলা নামাবেন, ঠান্ডা হলেই জমে যাবে। এই এক কাপ দালিয়াকে অন্ততঃ জনাতিনেক ভালো মত জলখাবার খেতে পারেন।

আবার মিষ্টি দালিয়াও করতে পারেন। এমনি জলে সেদ্ধ করে পরিজের মত দুধ-চিনি দিয়েও পরিবেশন করতে পারেন। এই ঘরে তৈরী পরিজ টিনের পরিজের থেকে স্বাদে বা পুষ্টিতে কোন অংশে কম যাবে না। আবার সামান্য জল মেশান দুধে আধ কাপ দালিয়া ফুটিয়ে নিন। সঙ্গে একটু কিসমিস দিন। এতে স্যাকারিণ-এর গোঁজামিলও অনায়াসে দিতে পারেন। পাঁচ-ছয়টি স্যাকারিণ-এর ট্যাবলেটের সঙ্গে চামচ দুয়েক চিনি দিলেই সুন্দর দালিয়ার পায়েস বলে চলে যাবে। বাচ্চারাও খুশী হয়ে যাবে। পেটও ভরবে পুষ্টিও হবে। এই দালিয়া তৈরীর প্রকরণটি কিন্তু মুসলমানী।

কড়াইসুঁটিরও তো দারুণ দাম। তার চেয়ে মাঝে মধ্যে মেথি শাক-এর পরোটা ভাজুন। অনেকটা কড়াইসুঁটির পরোটার মতই খেতে লাগে আর এতে প্রোটিনও আছে যথেষ্ট। এটি হিন্দুস্থানী খাদ্য।

শাক সামান্য ভাপিয়ে নিয়ে জল ফেলে দিন। এবার একটু জিরে আর লংকা কাঠ-খোলায় ভেজে নিয়ে সামান্য হিং এর সঙ্গে শিলে পিষে নিন। এবার আটাতে একটু নুন আর ময়ান দিয়ে এ মশলা মেশান তারপর ঐ শাক দিয়ে মেখে নিন। জল দেবেন না একটুও। ঐ শাকে যতটা আটা যায় ততটা আটা দেবেন। এবার লেচি কেটে পরোটা ভাজুন লাল করে। গরম গরম পরিবেশন করুন।

লোকে ঠাট্টা করে বলে কচু পোড়া খাও। কিন্তু ঐ কচুরই আবার চমৎকার পরোটা আর তরকারি হয়। এটিও খাদ্য।

ছোট ছোট কচু সেদ্ধ করুন। উত্তর-প্রদেশে এর নাম ঘুঁইয়া। যতটা কচু ততটা আটা নিন। কচু বেশী গলবে না। এবার কালো জিরে, জিরে, লংকা কাঠখোলায় ভেজে সামান্য একটু হিং দিয়ে পিষে নিন। এই মশলা আটায় মেশান। আটাতে ময়ান দেবেন না। এবার ঐ আটা কচুর সঙ্গে মাখুন। কচু অবশ্য আগেই ছাড়িয়ে চটকে নেবেন। বেশ ভালো মত মাখা হলে পুরে করে পরোটা বেলে ভাজুন, দেখবেন কেমন খাস্তা পরোটা হয়।

কচুর খাট্টা তরকারি—

কচু সিদ্ধ করে ছাড়িয়ে চাকা চাকা করে কাটুন। কড়ায় তেল আর ঘি মিশিয়ে (একটু বেশী করে) চড়ান তাতে হিং আর জোয়ান ফোড়ন দিন। কচু কাটা দিন, নুন লংকার গুঁড়ো আর আমচুর দিয়ে নেড়ে-চেড়ে নামিয়ে নিন। ইচ্ছে হলে ঐ আটায় মেশাবার মশলাও একটু দিতে পারেন। এই তরকারিটা লুচি-পরোটার সঙ্গে খুবই ভাল লাগে। আর কচুর প্রোটিনের কথা তো সর্বজনবিদিত।

এবার একটু পিঠের কথা বলি। নাই বা চিনি রইল। গুড়ের পিঠে করুন। পাঞ্জাবী আন্দেকায় বা শান্তিপুরী পক্কান্ন ছেলেবুড়ো সকলেরই তো সমান প্রিয়।

পাঞ্জাবী আন্দেশা—

আখের গুড় জ্বাল দিয়ে ছেঁকে নিন। এবার এর সঙ্গে আধ মালা নারকোল কোরা, দু-কাপ আটা, সিকি কাপ চালের গুঁড়ি, বড় চামচের দু চামচ সাদা তিল বেশ করে মেখে নিয়ে হাতায় করে তুলে তুলে তেলে ভাজুন লাল করে। চমৎকার মচমচে পিঠে হবে দেখবেন।

শান্তিপুরী পক্কান্ন—

আড়াইশো গ্রাম বেসন গুলে নিন খুব করে। তেল চড়ান। মোটা ছ্যাঁদার ঝাঁঝরার গায়ে ডলে ডলে ঐ বেসনের কাঠি ভাজুন গরম তেলে। এবার গুড়ের ঘন রসে এ কাঠি নেড়েচেড়ে ঘি মাখান থালায় একটু একটু তুলে তুলে জমতে দিন। ঠান্ডা হলে খুলে নিয়ে খেতে দিন। ঠিক মত করতে পারলে এসব পিঠেও মোটেই নিন্দের হয় না। আর শীতকালে গুড় খাওয়াও উপকারী। সর্দি-কাশি হয় না।

আজ এই পর্যন্ত বলেই রান্নাঘরে শেকল দিলাম। জলখাবারগুলি পছন্দ হলে সত্যি খুশি হব। —আভা পাকড়াশী





ফাদার ঘনশ্যামের রোমাঞ্চ কাহিনী (৫)

বিশ্বের জঘন্যতম অপরাধ

অদ্রীশ বর্ধন

ঘটনাস্থল মহীশূর প্রদেশ।

ব্যাঙ্গালোরের একটা আর্ট গ্যালারীতে অকস্মাৎ একদিন দেখা গেল বিপুল-উদর হ্রস্ব-আকৃতি বেঢপ চেহারার এক পাদরীকে। পাদরীর পরণে কালো আলখাল্লা। দীর্ঘকাল রজক-গৃহ গমন না করায় ধূলি-ধূসর। চোখ নিশ্চয় বেজায় খারাপ। তাই ডাঁটি-ভাঙা চশমার মধ্যে দিয়ে পিটপিট করে ইতি-উতি তাকানোর অভ্যেস। সব মিলিয়ে কুমড়ো-পটাশ টাইপের সেই বিচিত্র মূর্তি দেখে কেউ মনে মনে হাসল, মেয়েরা গা টেপাটেপি করল। কিন্তু যারা চিনতে পারল তাদের চোখে ফুটে উঠল নিবিড় বিস্ময়। কারণ, ফাদার ঘনশ্যাম মধ্যে মাঝে মাঝে পাপীতাপীর অন্তরশুদ্ধির জন্যে অপরাধচর্চা করে বটে, কিন্তু আর্ট-চর্চা তো কদাপি করে নি।

ফাদার ঘনশ্যামের অবশ্য এদের কারোর দিকেই নজর ছিল না। এমন কি দেওয়ালে প্রলম্বিত আর্টের নিদর্শনগুলির দিকেও নয়।

ফাদার ঘনশ্যাম ভাবছিল রাণী ঘোষের কথা।

রাণী ঘোষ। ঘনশ্যাম পাদরীর হিন্দু বন্ধুর কন্যা রাণী ঘোষ। বন্ধু ছিলেন ব্যারিস্টার। ব্যাঙ্গালোরে পসার জমিয়ে বিষয়সম্পত্তি করেছিলেন। বিয়ে করেছিলেন ম্যাঙ্গালোরের এক কোঙ্কানী রূপসীকে।

সমুদ্রউপকূলস্থ ম্যাঙ্গালোর জেলার রমণীদের রূপের সুনাম আছে। হাতীর দাঁতের মত শাদা তাদের গাত্রবর্ণ, মুখ



চাঁপাফুলের পাপড়ির মত পেলব মসৃণ; গড়ন গ্রীকভাস্কর্যকেও হার মানায়; চাহনি কোমল ও স্নিগ্ধ।

তাই ম্যাঙ্গালোর কামিনীরা নাকি মোহিনীর মতই পরদেশীকে আকর্ষণ করে।

সুন্দরীদের মধ্যেও যে ছিল সুন্দরী-তমা, ফাদার ঘনশ্যামের ব্যারিস্টার বন্ধু তারই পাণিপীড়ন করেন।

রাণী ঘোষ তাঁদেরই মেয়ে। তাই তার ধরতনুর মধ্যে যুগপৎ দেখা যায় বঙ্গললনার নমনীয়তা আর ম্যাঙ্গালোর মোহিনীর কমনীয়তা।

এক কথায়, রাণী ঘোষ সুন্দরী। তার সৌন্দর্য চোখে জ্বালা ধরায় না, চোখ জুড়িয়ে দেয়। বুকে আগুন জ্বালায় না, জ্বলা আগুন নিভিয়ে দেয়।

মূর্তিমতী অগ্নিশিখার মতই পীন-পয়োধরা একটি যুবতীর দিকে তাকিয়ে এইসব কথাই ভাবছিল ফাদার ঘনশ্যাম। ভাবছিল, এ মেয়ের পাশে রাণী ঘোষ এসে দাঁড়ালে দৃশ্যটা কতখানি বিসদৃশ হবে।

যুবতীর তনুলতা ঘিরে আগুনে রঙের শাড়ী। ঘাড় পর্যন্ত ছাটা কুন্তলদাম। মেঘবরণ নয়, আগুনবরণ। স্যাম্পুর দৌলতে তা সিংহের কেশরের মতই ফুলোনো ফাঁপানো।

মর্কটাকৃতি একটি মনুষ্যমূর্তি ল্যাঙ-বোটের মত লেগে রয়েছে পেছনে। যুবতী যেখানে যাচ্ছে, মর্কট-মানুষটিও যাচ্ছে সেখানে। যুবতী কারণে-অকারণে অট্টহাস্য করছে, মর্কট-মানুষ গোমড়া হয়ে রয়েছে। যুবতীর মাসকারার আলপনা আঁকা আঁখি-যুগলের তীব্র চাহনি যেদিকে ঘুরছে, মর্কট-চাহনিও সেদিকে ছুটছে।

ভুরু কুঁচকে এদের দিকেই তাকিয়ে-ছিল ফাদার ঘনশ্যাম মন্ডল। ভাবছিল রাণী ঘোষ যদি মোমবাতির স্নিগ্ধ শিখা হয়, এ কন্যা তাহলে দাবানলের সর্বনাশা স্ফুলিঙ্গ।

কে জানত, ফাদার ঘনশ্যামের এই আশংকাই শেষে সত্য হবে।

•

ঠিক এই সময়ে হাঁক এল পেছন থেকে—"আরে ফাদার মন্ডল নাকি?" পেছন ফিরল ফাদার। তাও চশমার ফাঁক দিয়ে মিটমিট করে তাকিয়ে বললে, "উকিলসাহেব যে! এদিকে কি মনে করে? মোকদ্দমাকে কি আর্ট গ্যালারীতেও এনে ফেললেন?"

"তাহলে আমিও জিজ্ঞেস করি, মহাশয় কি ক্রাইমকেও আর্টের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলেছেন?"

"মিশে তো রয়েছেই, শুধু যা আর্টিস্টের অভাব। যাক, আমি এসেছি ভাইঝির সঙ্গে দেখা করতে।"

"আর আমি এসেছি মেজর ভবানী-শঙ্কর দীক্ষিতের সঙ্গে দেখা করতে।"

"নামটা চেনা-চেনা মনে হচ্ছে।"

"হবেই তো। খানদানী বংশ যে। ভবানীশঙ্করের ধমনীতেও বইছে রাজ-রক্ত।"

"সুতরাং সাক্ষাৎকারটা রাজপ্রাসাদে হলেই ভাল হত না?"

"উপায় নেই। আমার কোম্পানী মেজরের ওপর একটা মোটা টাকা ইনভেস্ট করতে যাচ্ছে। তাই ভবানীশঙ্করের স্টেটের অবস্থা কিরকম, উত্তরাধিকার হিসেবেই বা তিনি থাকছেন কিনা, এ সবগুলো আমাদের এক্ষুনি জানা দরকার। ঐ, ঐ এসে গেছেন মেজর, চললাম আমি।"

বলেই নেউলের মত ক্ষিপ্রবেগে ধাবিত হলেন উকিল রাধাকান্ত নন্দী।

ফাদার ঘনশ্যামও দেখল মেজর ভবানী-শঙ্কর দীক্ষিতকে। বছর পঁয়ত্রিশ বয়স। মজবুত গঠন। চোখে ধোঁয়াটে চশমা। গালে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। ইতিহাসের পাতায় পঞ্চম জর্জের গালে যে রকম শ্মশ্রু দেখা যায়, অনেকটা সেই রকমের।

কিন্তু সেই মুহূর্তে ভবানীশঙ্কর অত্যন্ত কেতাদুরস্ত স্টাইলে এমন এক-জনের সঙ্গে আলোচনারত ছিল যাকে দেখেই আবার কপাল কুঁচকে উঠল ফাদারের।

সিংহের মত কেশরযুক্তা আগুনবরণ যুবতীর সঙ্গে তন্ময় হয়ে কথা বলছিল মেজর ভবানীশঙ্কর দীক্ষিত।

•

মেজরকে নিয়ে অন্য ঘরে অন্তর্হিত হলেন উকিল রাধাকান্ত নন্দী। কিন্তু তখনও চিন্তা-আকুল দৃষ্টি মেলে সেদিকে তাকিয়ে রইল ফাদার ঘনশ্যাম।

চমক ভাঙল কাঁধের ওপর হস্তস্পর্শে।

রাণী ঘোষ। পেছনেই এসে দাঁড়িয়েছে রাণী। হাস্যমুখে মুক্তোর ঝিকিমিকি। চঞ্চল চোখে নক্ষত্র দীপ্তি। তাম্বর আননে চাঁদের রোশনাই।

"কি দেখছেন কাকাবাবু?" জিজ্ঞেস করল রাণী ঘোষ।

"এসেছিস? ওদের চিনিস?"

"কাদের?"

"ঐ যে ঐ হাফ-উলঙ্গ বেহায়া মেয়েটা, আর সঙের মর্কটের মত দেখতে লোকটাকে?"

হাসল রাণী। বলল, "সমাজের ওপর মহলে ওদের গতিবিধি, কিন্তু বিচরণ হল নীচের মহলে।"

"তার মানে দুর্জন?"

"এক্সেন্ট্রিক। অভিজাত মহলের সবাই মেয়েটিকে এমিলি নামেই চেনে। কিন্তু আমি জানি এমিলি ওর অর্কেস্ট্রা জগতের একটি নাম। ওর কানাঘুসোর অন্ত নেই কাকাবাবু। তবুও সমাজের বহু বুদ্ধিমান ওর খপ্পরে পড়ে—আর বেরোতে পারে না।"

"সঙের ফুদে নর-বানরটি?"

"ওর চব্বিশ ঘন্টার সাগরেদ, কু-চক্রের সঙ্গী। ওর পক্ষে কোনো কুকাজই নাকি অসাধ্য নয়।"

"সর্বনাশ। এদের সঙ্গে ভবানী-শঙ্করের মেলামেশা তো তাহলে ভালো নয়।"

নিমেষে চোখ জ্বলে উঠল রাণী ঘোষের। আশ্চর্য শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, "কোন্ ভবানীশঙ্করের কথা বলছেন কাকাবাবু?"

"মেজর ভবানীশঙ্কর দীক্ষিত।"

নিমেষে যেন দশ হাজার ভোল্টের মারাত্মক শক খেল রাণী ঘোষ। মার্বেল পাথরের মত সাদা হয়ে গেল গ্রীক-আনন।

•

চট করে অবাক হওয়াটা ফাদারের ধাতে নেই। তাই ভাইঝির বিবর্ণ মুখচ্ছবি দেখে ধীর কণ্ঠে বললে, "মা, ভবানী-শঙ্করের সঙ্গে তোর আলাপ আছে বুঝি?"

চোখ নামিয়ে নিল রাণী। বলল, "আছে।"

"খুব আলাপ? মানে—"

সহসা চোখ তুলল রাণী। অবরুদ্ধ কণ্ঠে বললে, "কাকাবাবু, আজ আপনাকে এখানে কেন ডেকেছি জানেন?"

"কেন মা?"

"ভবানীশঙ্কর আমাকে বিয়ে করতে চায়। মার'ও সেই ইচ্ছে। তাই এসেছিলাম আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে।"

"বটে। বটে। ভবানীশঙ্কর তো হীরের টুকরো ছেলে। তবে তোর দ্বিধা কিসের?"

"দ্বিধা আগে ছিল না। কিন্তু একটু আগেই এমন একটা কান্ড ঘটল, ভাবছি এ বিয়েতে আমি সুখী হব কিনা।"

কৌতুকতরলিত চোখে ফাদার বলল, "বুঝেছি। এমিলির সঙ্গে ভবানীশঙ্করের মেলামেশা তোর ভাল লাগে নি?"

মুখ লাল হয়ে গেল রাণীর। সজোরে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "মোটেই না। অবশ্য এ ঘটনা ঘটল এখুনি। আমি বলছি তারও আগের কথা।"

"তারও আগের ঘটনা! নিশ্চয় গুরুতর অন্যায় করেছে ভবানীশঙ্কর। কি অন্যায় শুনি?"

অদ্ভুত চোখে তাকাল রাণী ঘোষ। সেকেন্ড কয়েক চুপ করে থেকে ফিসফিস করে বললে, "কাকাবাবু, ভবানীশঙ্কর হেসেছে!"

•

অবিচলিত চোখে তাকিয়ে রইল ফাদার ঘনশ্যাম মন্ডল।

ধীর কণ্ঠে বললে, "বেশ তো, হাসি জিনিসটা তো অন্যায় নয়।"

"না, না কাকাবাবু আপনি বুঝছেন না, এ-হাসি সে-হাসি নয়।"



বি. সরকার এন্ড সন্স
সন অব লেট এম. বি. সরকার
১২৪, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলিকাতা-১২, ফোনঃ ৩৪-২২০৩

শতবর্ষ পূর্বে
যাত্রা শুরু করেছিল

অমৃত বাজার
পত্রিকা

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ সম্পাদিত এই পত্রিকাটি বাঙালীর সার্মগ্রিক জীবনধারায় তুমুল আলোড়ন তুলেছিল। সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক প্রবাহে এর গৌরবময় অতুলনীয় মহিমা আজও অম্লান।

আগামী ২০ ফেব্রুয়ারী

অমৃত বাজার
পত্রিকা

শতবর্ষে পদার্পণ করবে। বাঙালী সম্পাদিত অন্য কোন পত্রিকা আজও এই গৌরব অর্জন করতে পারেনি।

এই উপলক্ষে
বহু মূল্যবান নিবন্ধ সমাবেশে
অমৃতের একটি

বিশেষ সংখ্যা

প্রকাশিত হবে
আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারী।

"তবে কি হাসি মা?"

গভীর চোখে তাকাল রাণী ঘোষ। ফাদার ঘনশ্যাম কবি নয়, কিন্তু সেই মুহূর্তে তার মনে হল মেঘমল্লারের সব মীড়গুলো যেন আর্ত হয়ে উঠল রাণী ঘোষের কালো চোখের চাহনিতে।

কাহিনীটি বলল রাণী, আর যেন ছলছলে কালো চোখের জলের আয়নায় সিনেমার দৃশ্যের মতই ঘটনাটি দেখতে পেল ঘনশ্যাম পাদরী।

•

নির্জন দিঘির ধার। নারিকেল বনের মর্মরমুখরিত সন্ধ্যা। ঝিল্লীর ঝংকারে থরথর করে কাঁপছে বেণুবনের কাক-জ্যোৎস্না। শোনা যাচ্ছে কেতকী বনের চিরবিরহের দীর্ঘশ্বাস আর শালমঞ্জরীর উতলা আত্মনিবেদন। সব মিলিয়ে যেন আকাশ-পৃথিবীর বিবাহমন্ত্রগুঞ্জন।

ভিজে ঘাসের গন্ধভরা বনপথে বাজছে ভীরু পায়ের নূপুরধ্বনি ঝুম্-ঝুম্, ঝুমুর-ঝুম্! নীলাঞ্চল দুলিয়ে অভিসারে চলেছে রাণী ঘোষ।

পরণে গাঢ়-নীল শাড়ি, পাতলা ওড়নায় ঢাকা স্থল-পদ্মের মত সুন্দর আনন। কিন্তু তবুও বোঝা যায় সুন্দরীর চোখ মুখ নাক যেন তুলি দিয়ে আঁকা। বড় বড় দীঘপল্লব চোখ দুটিতে সন্ত্রস্ত চাহনি। টিকলো নাকে স্বাতী নক্ষত্রর মত এক কণা কমলহীরে। আঙুলের রত্নাঙ্গুরী আর মণিবন্ধের মণিময় কঙ্কণ ঝিলিক দিয়ে উঠছে চাঁদের আলোয়।

কিন্তু সেই ঘন-নীল শাড়ি, সেই কালো ওড়না আর মেখলা-পরা গুরু-নিতম্বের মন্থর ছন্দের দিকে দৃষ্টি ছিল না দিঘির ধারে বসা আত্মভোলা মানুষটির।

নির্নিমেষ চোখে দিঘির দিকে তাকিয়ে বসেছিল মেজর ভবানীশংকর দীক্ষিত। সুঠাম দীর্ঘাঙ্গ পুরুষ। যেন শংকর-মাছের নিষ্ঠুর চাবুক।

কিন্তু সেই মুহূর্তে আপনাতে আপনি ছিল না ভবানীশংকর। দিঘির কালো জলে অনিমেষ নয়নে অন্বেষণ করছিল এমন কিছুর যা বেণুবনের আলো-ছায়ামায়ায় দাঁড়িয়ে দেখতে পেল না রাণী ঘোষ। সে কি সমরখন্দ বোখারা বিলিয়ে দেওয়ার স্বপ্ন?

রত্নাংশুকের সলাজ অবগুন্ঠনতলে নিলাজ নূপুর এবার প্রগলভতার মত হেসে উঠল ঝুম-ঝুম-ঝুম-ঝুম!

আর তানে তানে সহসা অট্টহাস্য করে উঠল ভবানীশংকর। শিউরে উঠল নিথর সন্ধ্যা। কোথায় যেন ককিয়ে উঠল একটা কালপ্যাঁচা। শাখায় শাখায় হাহাকার তুলে অস্থির হয়ে উঠল নির্জন বনানী। ক্ষীণ ক্ষীণতর ক্ষীণতম হয়ে মিলিয়ে গেল হাসির রেশ।

তবুও চোখ তুলল না ভবানীশংকর। ঘারেকও ফিরে তাকালো না রোমাঞ্চিত নিতম্বিনীর দিকে।

•

বলতে বলতে টপটপ করে কয়েক বিন্দু অশ্রু গড়িয়ে পড়ল রাণীর পেলব গাল বেয়ে। বলল বাষ্পাকুল কণ্ঠে, "কাকাবাবু, ওরকমভাবে ভবানীশঙ্করকে কখনো আমি হাসতে শুনিনি। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল আমার। তারপর থেকেই ভাবছি ভবানীশঙ্করকে বিয়ে করা কি ঠিক হবে?"

•

এই রকমই একটা আবেগ থর-থর মুহূর্তে নেহাৎ বেরসিকের মত ছুটে এলেন উকিল রাধাকান্ত নন্দী। হন্তদন্ত হয়ে ফাদার ঘনশ্যামের কাছে এসে বললেন, "এই যে, আপনি এখনও আছেন দেখছি।"

"তাতো আছি। কিন্তু বক্তব্যটা কি?"

ঠিক এই সময়ে দোরগোড়ায় পুনরাবির্ভাব ঘটল মেজর ভবানীশঙ্করের। সেদিকে এক ঝলক তাকিয়ে নিয়ে রাধা-কান্ত বললেন, "শঙ্করগড়ে যাচ্ছি। আপনিও চলুন।"

"কেন?"

"মেজরের বাবার সঙ্গে কিছু বৈষয়িক কথাবার্তা বলব।"

ইতিমধ্যে কাছে এসে দাঁড়িয়ে-ছিল মেজর ভবানীশঙ্কর। অমায়িক হেসে বললে, "আপনাদের কোনো অসুবিধে হবে না। আমার গাড়ীতেই যাবেন।"

"তাহলে আজই।"

"না। আগামীকাল। আজ গাড়ীতে একটু কাজ আছে। আমি কিন্তু কালও যেতে পারব না। আপনারাই যান।"

"বেশ তো, আমি রাজী", বলে ভাইঝির সঙ্গে দৃষ্টিবিনিময় করল ফাদার ঘনশ্যাম মন্ডল।

•

দূর থেকেই দেখা গেল শঙ্করগড়ের কালো রেখা। যেন আকাশের পটভূমিকায় আঁকা একটা কাল-জীর্ণ তৈলচিত্র।

পথে আসতে আসতেই শঙ্করগড়ের ইতিহাস শুনেছিল ফাদার ঘনশ্যাম। এ দুর্গের পত্তন টিপু সুলতানের আমলে। মহীশূর-ব্যাঘ্র বৃটিশ-সিংহের সঙ্গে সমানে টক্কর দিয়ে চলেছিল সে যুগে। দেশের বিভিন্ন স্থানে গড়েছিল পর্বত-কেল্লা। শঙ্করগড় তাদেরই অন্যতম।

গড়ের চতুর্দিকে সুগভীর পরিখা। এক সময়ে অদূরস্থ নদীর জলে পরিপূর্ণ থাকত। এখন তা প্রায়-শুষ্ক, কালো কাদা আর সবুজ পাঁকের রাজত্ব।

পরিখার ওপর সেতু। এ পাড়ে দাঁড়িয়ে সংকেত করলে তবে ওপারের দ্বাররক্ষী ব্রীজ নামিয়ে দেয়। যেমনটি হত সেকালে; লোহার শিকলে ঝোলানো সেতুর মুখ এ পাড় স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে টগবগিয়ে ছুটত কালো ঘোড়া, শাদা ঘোড়া, খয়েরী ঘোড়া। পরিখার স্থির জলতল অপ্সরীর কেশদামের মত কুঞ্চিত হয়ে উঠত অশ্ব-খুর নির্ঘোষে।

কিন্তু সেদিন সেই সেতুর সামনে দাঁড়াল নিরীহ দুটি মনুষ্যমূর্তি। বেজির মত ক্ষিপ্রচরণে এল উকিল রাধাকান্ত নন্দী; আর স্থূল বপু নিয়ে থপথপ করে ফাদার ঘনশ্যাম।

প্রচন্ড শব্দে চাকা ঘুরতে লাগল ওপাশে। আস্তে আস্তে নামতে লাগল ব্রীজ। কিন্তু হায় রে! এ পাড় স্পর্শ করার আগেই অ.চম্বিতে রুদ্ধ হল তার গতি। শূন্যে ঝুলতে লাগল সেতুর মুখ। মাঝে মাঝে ব্যবধান রইল হাত দুয়েকের।

বিস্তর চেঁচামেচি এবং দ্বাররক্ষীর আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও জংধরা ব্রীজের চাকা আর ঘুরল না। ব্রীজও এ-পাড় স্পর্শ করল না।

অগত্যা রাধাকান্ত বললেন—"ফাদার, খামোকা দাঁড়িয়ে থেকে লাভটা কি? চলুন, লাফিয়ে পেরিয়ে যাই।" বলেই, নেউল-দেহ নিয়ে শশকের মতই লাফ দিলেন রাধাকান্ত এবং মুহূর্তের মধ্যে পৌঁছোলেন ব্রীজের ওপর।

বিপদে পড়ল বেচারী ঘনশ্যাম পাদরী। বিপুল দেহ নিয়ে বারকয়েক বৃথাই লম্ফ-ঝম্প করতে গিয়ে একবার তো পা হড়কে

পড়েই গেল খানার মধ্যে। গোড়ালী পর্যন্ত ডুবে গেল পাঁকে। লাফিয়ে এসে রাধাকান্তই সে-যাত্রা উম্ধার করলেন তাকে, এবং অতিকষ্টে টেনে-হিঁচড়ে তুললেন পরিখার ওপর।

তারপরেই মরিয়া হয়ে আচম্বিতে এক প্রচন্ড লাফ দিল ফাদার ঘনশ্যাম। বাতাসে যেমন পাতা উড়িয়ে নিয়ে যায়, মনে হল ঠিক সেইভাবেই একটা প্রকান্ড জালা উড়ে গেল শূন্যপথে।

সশরীরে ব্রীজের ওপর অবতীর্ণ হল ফাদার ঘনশ্যাম মন্ডল।

•

সামনেই দোতলা সমান উঁচু বিশাল সিংদরজা। এতো শুধু কেল্লা নয়, প্রাসাদও বটে। তাই সিংদরজার ওপরেই নহবৎখানা। এক দিন হয়তো ঐ ভগ্নচূড়া নহবৎখানা থেকে প্রহরে প্রহরে বাজত রাগ-রাগিণীর আলাপ। টোড়ী, মুলতান, পুরবী আর দরবারী।

কিন্তু আজ সব নীরব। বড় বড় লোহার গুলি মারা বিশাল কাঠের পাল্লা দুটো তৈলহীন জীর্ণ কব্জায় ভর দিয়ে আর্তনাদ করে ঘুরে গেল। লম্বা লম্বা জংলী ঘাস ঠেলে উঠোনে এসে দাঁড়াল দুই মূর্তি।

সামনেই বিরাট শৈলপ্রসাদ। কেল্লার ধরনে নির্মিত। তালগাছ-সমান থাম আর কারুকার্যখচিত খিলানের ওপর বিস্তীর্ণ ছাদ। কিন্তু বিপুল শূন্যোতাভারে সব কিছুই যেন অহর্নিশ গম্‌গম্ করছে।

প্রকান্ড একটা ঘরে এসে পৌঁছোলো দুজনে। মেঝেতে পুরু কার্পেট—এত পুরু যে হাঁটতে গেলে ভারসাম্য থাকে না। শ্বেতপাথরের অজস্র টেবিল, টেবিলের ওপর লাল-কালো-শাদা পাথরের দেশ-বিদেশের মর্মরমূর্তি। প্রতিটির ওপর দামী বেলজারের আচ্ছাদন। দেওয়ালজোড়া বড় বড় আয়নাগুলো সদ্য বিধবার হৃদয়ের মত ধূসর।

ছমছমে নৈঃশব্দের মধ্যে দুটি প্রেত-মূর্তির মত বসে রইলেন ফাদার ঘনশ্যাম আর রাধাকান্ত নন্দী।

অনেক...অনেকক্ষণ পরে মার্জারের মত নিঃশব্দচরণে ঘরে প্রবেশ করলেন রাজা সূর্যশংকর। শংকরগড়ের বর্তমান অধিপতি রাজা সূর্যশংকর।

রাজা সূর্যশংকর। তিনি যে রাজা তা ঘোষণা করার জন্যে নকীবের প্রয়োজন হল না। রাজার মতই আবির্ভূত হলেন এবং রাজার মতই অভিবাদন গ্রহণ করলেন রাধাকান্ত আর ঘনশ্যামের।

রাজা সূর্যশংকর নিঃসন্দেহে প্রিয়-দর্শন। এই বয়সেও মেরুদন্ড সিধে। চলনে বলনে যুবকোচিত দৃপ্ততা। অন্ত-র্ভেদী তীক্ষ্ম চক্ষু। দাড়িগোঁফ পরিস্কার কামানো। চওড়া ললাটের অনেকখানি ঢাকা পড়ে গেছে সমুদ্রের ফেনার মত রেশমী উষ্ণীষে। কানে বীরবৌলা। পরনে জরিদার রেশমী পোশাক।

দেরী হওয়ার জন্যে বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ হলেন না রাজা সূর্যশংকর। বরং দেরী করে আসাটাই যে আভিজাত্যের লক্ষণ, অত্যন্ত স্বাভাবিক অভ্যর্থনার মধ্য দিয়েই তা স্পষ্ট করে তুললেন। শতাধিক বছর আগে তাঁর পূর্বপুরুষেরা পাত্র-অমাত্য প্রজা-পূর্ণ সভাকক্ষে যেমন রাজকীয় গাম্ভীর্য সহকারে প্রবেশ করতেন, তাঁর হাবভাবে দেখা গেল তারই স্পষ্ট প্রতিফলন। বিজন এই কেল্লাতে বছর ঘুরে গেলেও যে কোনো অতিথির আগমন ঘটে না, তা আঁচ করাও গেল না তাঁর স্মিতমুখ দেখে।

রাধাকান্ত নন্দী কারবারী মানুষ। গৌরচন্দ্রিকার পরেই সোজা চলে এলেন বৈষয়িক কথাবার্তায়। পরিস্কার জানতে চাইলেন, রাজা সূর্যশংকরের স্টেটের উত্তরাধিকারী কে? মেজর ভবানীশংকর না, আর কেউ?

গম্ভীর মুখে সব শুনলেন রাজা সূর্যশংকর। তারপর দাঁড়িয়ে উঠে সংক্ষেপে বললেন, "আসুন।"

•

ঘরটা এতবড় যে অনায়াসেই ফুটবল খেলা চলে। ঘরের চার দেওয়ালে ঝুলছে বিস্তর তৈলচিত্র। ধূলিধূসর। অস্পষ্ট। তিন কোণে তিনটি লৌহবর্ম। আকারে মানুষপ্রমাণ। নিকষকালো। হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন গ্রহান্তরের কিমুতকিম্মাকার তিন দানো।

এ ঘরেই প্রবেশ করলেন রাজা সূর্য-শংকর। সঙ্গে দুই অতিথি।

বললেন, "ছবিতে যাঁদের দেখছেন, এঁরা আমার পূর্বপুরুষ। প্রত্যেকেই কীর্তিমান। সে কীর্তি কখনও গৌরবের, কখনও অগৌরবের। যেমন, ধরুন, এঁকে। চোখ দুটো দেখেছেন তো? যেন দু' টুকরো আগুন। এঁর বুকেও ছিল আগুন। সে আগুনের আঁচে বৃটিশ-সিংহও থমকে গিয়েছিল। দেশের লোক এঁকে দেবতার মত পুজো করত। পাশেই দেখুন ও'র ছেলেকে। ইনি যখন রাজা হলেন, শংকরগড়ের রক্তস্রোত বয়েছিল—নিরীহ প্রজার রক্ত। বহু অসহায়া সুন্দরীর যৌবন নিয়ে তিনি ছিনিমিনি খেলেছেন এই গড়ের নাচঘরে—তাদের হাহাকার আজও বুঝি রাতের অন্ধকারে শোনা যায় শংকরগড়ে।"

চুপ করলেন রাজা সূর্যশংকর। নির্জন দুর্গের কোথায় যেন বিকট স্বরে ডেকে উঠল একটা তক্ষক, মর্মভেদী দীর্ঘশ্বাসের মত হু-হু করে খানিকটা ঝড়ো হাওয়া ঢুকে পড়ল ঘরের মধ্যে।

গাঢ়স্বরে বলে চললেন রাজা সূর্যশংকর, "নির্মম, চরিত্রহীন, ঘোর পাপী এই রাজার ছেলেই যখন সিংহাসনে বসলেন, তখন দেখা গেল তিনি পিতার কোনো কুগুণই পাননি—যা কিছু সুগুণ পেয়েছেন পিতামহের। পিতার কুকীর্তির সমস্ত চিহ্ন তিনি আপন মহিমা দিয়ে মুছে দিলেন রাজত্ব থেকে। আপনারা ভাবছেন, বংশের এই ইতিহাস সম্পূর্ণ অবান্তর। কিন্তু, না।"

বলে বুকভরে শ্বাস নিলেন রাজা। ফসফরাসের মত জ্বলতে লাগল আশ্চর্য তাঁর দুটি চক্ষু। বললেন মেঘমন্দ্র কণ্ঠে,—"রক্তের বিষ ঘুমিয়ে থাকে। কখন জাগে, তা কেউ জানে না। কিন্তু আমি জেনেছি। বিষ আবার জেগেছে, বিষধর ফণা তুলেছে, ছোবলও মেরেছে।"

কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়েছিলেন রাধাকান্ত নন্দী। আর ফাদার ঘনশ্যাম? যেন ঘুমিয়ে পড়েছিল।

ইস্পাত-কণ্ঠে বললেন রাজা সূর্যশংকর, "যে বিষ আমার রক্তে ঘুমিয়েছিল, সে বিষ আমার ছেলের রক্তে মাথাচাড়া দিয়েছে। তবুও বংশের রীতি অনুযায়ী মেজর ভবানীশংকরই হবে আমার উত্তরাধিকারী। আর কেউ নয়। বিশাল এই শংকরগড় আর স্টেটের একমাত্র মালিক হবে সে—হবে আমার মৃত্যুর পর। কিন্তু......।"

বলে অকস্মাৎ স্তব্ধ হলেন রাজা। যেন যাদুমন্ত্রবলে মিলিয়ে গেল কণ্ঠের ইস্পাত, ঝনঝনানি।

বললেন আশ্চর্য শান্ত কণ্ঠে, "কিন্তু ইহজীবনে আমি তার মুখদর্শন করব না।"

সেই মুহূর্তে যেন ঝিল্লীর কান্নাও থেমে গেল, শিউরে উঠল মায়াময়ী নিশীথ রাত্রি।

"কেন?" ঢোক গিলে প্রশ্ন করলেন রাধাকান্ত নন্দী।

"কারণ," ফিসফিস করে বললেন রাজা সূর্যশংকর, "বিশ্বের জঘন্যতম অপরাধে সে অপরাধী!"

তখন একে একে তারারা জোনাকির মত জ্বলতে শুরু করেছে আকাশের চন্দ্রাতপে।

আচ্ছন্নের মত সিংহদরজা পেরিয়ে এলেন রাধাকান্ত এবং ঘনশ্যাম। ঝুলন্ত ব্রীজ তখনও শূন্যে ঝুলছিল। এবার লাফিয়ে ওপাড়ে পৌঁছোতে কোনো অসুবিধে হল না।

কিন্তু গাঁয়ে ফিরেই বেঁকে বসল ঘনশ্যাম পাদরী।

বলল, "উকিলসাহেব, আপনি ফিরে যান। আমি ক'টা দিন থেকে যাই।"

"কারণ?"

"কারণ, আপনি যা জানতে চেয়েছিলেন, তা জেনেছেন। কিন্তু আমি যা জানতে চেয়েছি, তা জানিনি।"

"আপনি কি জানতে চেয়েছেন?"

"রাণী ঘোষের উপযুক্ত বর হতে পারবে কিনা মেজর ভবানীশংকর দীক্ষিত!"

•

তাই সে রাত সরাইখানায় কাটাল ফাদার ঘনশ্যাম মন্ডল। রাধাকান্ত নন্দীও থেকে গেলেন ফাদারকে সঙ্গ দিতে।

পরের দিন বিকেলের দিকে জানা গেল সেই আশ্চর্য খবর।

মেজর ভবানীশংকর দীক্ষিত নিখোঁজ হয়েছে!

খবরটা জানা গেল ভবানী-জনক রাজা সূর্যশংকরের মুখ থেকেই।

অপরাহ্নে বেড়াতে বেরিয়েছিল ঘনশ্যাম পাদরী। সঙ্গে রাধাকান্ত নন্দী। নদীর ধারে হাঁটছিল দুজনে। ফাদার ঘনশ্যামের মুখ বজ্রগর্ভ মেঘের মতই থমথমে। এমন সময়ে নেউলের মত তিড়বিড়িয়ে উঠলেন রাধাকান্ত নন্দী।

কার্নিশের মত একটা পাথর ঝুলছে খরস্রোতা নদীর ওপর। পাথরের একপ্রান্তে পাথরের মতই দাঁড়িয়ে রাজা সূর্যশংকরের দীর্ঘ মূর্তি।

পদশব্দে ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়েছিলেন রাজা। রাঙা সূর্যের পড়ন্ত আলোয় ধূর্ত চোখ দুটো যেন মশালের মতই বারেক জ্বলে উঠল।

দুই হাত পেছনে রেখে এবার পুরোপুরি ঘুরে দাঁড়ালেন রাজা। হাওয়ায় উড়তে লাগল তাঁর উষ্ণীষের দীর্ঘ প্রান্ত। দিনের আলোয় দেখা গেল তাঁর মুখের রেখায় রেখায় উদ্ধত দাম্ভিকতার ছাপ। চোখের কোণে মমতাহীন নিষ্ঠুর চাপা রোষের আগুন।

তীব্রকণ্ঠে বিষাণ বাজিয়ে বললেন রাজা, "খবরটা এইমাত্র পেলাম পোস্টঅফিস থেকে। ভবানীশংকর উধাও হয়েছে ব্যাঙ্গালোর থেকে। খুব সম্ভব দেশ ছেড়েই পালিয়েছে।"

"দেশ ছেড়ে পালিয়েছে!" মূঢ়ের মত পুনরাবৃত্তি করল ফাদার ঘনশ্যাম।

"এমিলি নামে একটা মেয়ে ক্রমাগত টেলিগ্রাম পাঠাচ্ছিল ওর ঠিকানার জন্যে। মেজরকে ব্যাঙ্গালোরে পাওয়া যাচ্ছে না। জবাব দেব বলে গতকাল বিকেলে নিজেই গিয়েছিলাম পোস্টাফিসে। কিন্তু দেরি করে ফেলেছিলাম। তাই আজ এখুনি গিয়ে টেলিগ্রাম পাঠালাম—ছেলের কোনো খবর আমি রাখি না। খুব সম্ভব সে দেশ ছেড়েই পালিয়েছে।"

"কিন্তু কেন?" ফাদার ঘনশ্যাম নিজেই যেন একটা প্রকান্ড বিস্ময় হয়ে উঠল এবার।

"কেন?" হিসহিসিয়ে হেসে উঠলেন রাজা সূর্যশংকর। "পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে। কিন্তু সে পাপ যে কী, তা কল্পনাতেও আনতে পারবেন না আপনি। পারলে আহাম্মকের মত এ প্রশ্ন করতেন না।"

শুনে কাচুমাচু মুখে বোকা-বোকা হাসি হাসল ফাদার।

কিন্তু সজাগ হয়ে উঠলেন রাধাকান্ত নন্দী। কারণ তিনি জানেন, যে মুহূর্তে বুদ্ধির সব আলো নিভে যায় ফাদারের মুখ থেকে, ঠিক সেই মুহূর্তে লক্ষ ঝাড়বাতি জ্বলে ওঠে তার মগজের অন্দরে!

•

আর, তাই পরের দিনই রহস্যের একটি একটি গিঁট খুলতে শুরু করল ফাদার ঘনশ্যাম মন্ডল।

শুনে নিঃসীম বিস্ময়ে ক্ষণে ক্ষণে শিউরে উঠতে লাগলেন রাধাকান্ত নন্দী।

সকালে একলাই বেরিয়েছিল ঘনশ্যাম পাদরী। ফিরল দুপুরের দিকে।

ভাঙা ছাতার কালো বান্ডিলটা রাখল খাটের ওপর। মুখে ক্লান্তির ছাপ। কিন্তু সে ক্লান্তি ব্যর্থতার নয়—সফলতার। টেবিলের ওপর কনুই রেখে গালে হাত দিয়ে বলল, "তারপর?"

গতকালের ঘটনার পর থেকেই কৌতূহলে বেলুনের মত ফুলছিলেন রাধাকান্ত। এবার দড়াম করে ফেটে পড়লেন। বললেন, "তারপর তো মশাই আপনি



ফটো : রেখা সেন

বলবেন? ভবানীশংকর উধাও হলেন কেন? এমিলি মেয়েটাই বা কে?"

চশমার ফাঁক দিয়ে তেরচা চোখে তাকাল ফাদার।

বলল, "আপনার প্রথম প্রশ্নের জবাব তো জেনেনেই। বিশ্বের জঘন্যতম অপরাধে অপরাধী সে—তাই গা-ঢাকা দিয়েছে। আর এমিলি? সমাজে যে কটা জোঁক এখনও কিলবিল করছে, এমিলি তাদের অন্যতম। ভবানীশংকরের কোনো গর্হিত কীর্তি তার জানা আছে। সম্ভবত সেই কারণেই ব্ল্যাক-মেল করছে মাসের পর মাস।"

"বুঝলাম। কিন্তু জঘন্যতম সেই অপরাধটি কী?"

"আমি নেহাতই মাথামোটা। তা নাহলে শংকরগড়ের হলঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে বোঝা উচিত ছিল আমার।"

"হলঘরের সঙ্গে ভবানীর অপরাধের কি সম্পর্ক?"

"অনেক। জিনিসটা তো হলঘরেই দাঁড় করানো ছিল।"

"ফাদার, ফাদার, খুলে বলুন। কি দাঁড় করানো ছিল হলঘরে?"

"মানুষসমান লৌহ-বর্ম।"

•

নৈঃশব্দ্য।

শুধু শোনা যাচ্ছে ওয়াল ক্লকের টিক টিক টিক শব্দ।

বিস্ফারিত চোখে ঘনশ্যাম পাদরীর দিকে তাকিয়ে রইলেন রাধাকান্ত নন্দী।

একইভাবে মোলায়েম কণ্ঠে বলে চলল ফাদার ঘনশ্যাম, "দীক্ষিতবংশের অনেকের সম্বন্ধেই খবরাখবর নিলাম। এঁরা প্রত্যেকেই দীর্ঘজীবী হন। সুতরাং সূর্যশংকরের সম্পত্তি ভবানীশংকর খুব তাড়াতাড়ি পাচ্ছেন না।"

"আমি তা জানি। এই হোটেলেই খেতে বসে কয়েকজন বলাবলি করছিল, আশি বছরেও বুড়ো সূর্যশংকর এখনও জোয়ান। এখনও তিনি দিব্যি হেঁটে চলে বেড়ান। গাঁয়ের লোকেরা গা-টেপাটেপি করে। বলে, বুড়োর মৃত্যু নেই।"

তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল ঘনশ্যাম পাদরী। দুই হাত টেবিলে রেখেই ঝুঁকে পড়ে রাধাকান্তর চোখে চোখ রেখে বলল অদ্ভুত কণ্ঠে, "উকিলসাহেব, আসল ধাঁধা তো সেইটাই।"

"কোনটা?"

"বুড়োর মৃত্যু নেই। কারণ, মড়ার তো মৃত্যু নেই!"

"কি বলতে চান আপনি?"

"বলতে চাই—মেজর ভবানীশংকর দীক্ষিত যে অপরাধে অপরাধী—আমি তা জানি।"

ঘনশ্যামের বরফ-ঠান্ডা সেই বিচিত্র স্বর শুনে হিমশীতল স্রোত নেমে গেল রাধাকান্তর শিরদাঁড়া বেয়ে।

ঢোক গিলে বললেন কোনমতে, "জানেন তো বলে ফেলুন।"

"বাস্তবিকই এ অপরাধ বিশ্বের জঘন্যতম অপরাধ। সভ্যতার শুরু থেকেই এ অপরাধের ক্ষমা নেই। ভবানীশংকর কি করেছে আমি জানি—কেন করেছে তাও জানি।"

"কি করেছে?"

"বাবাকে খুন করেছে।"

ধীরে ধীরে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন রাধাকান্ত নন্দী। ফাদারের চোখে চোখ রেখে বললেন অস্বাভাবিক শান্ত কণ্ঠে—"কিন্তু ভবানীশংকরের বাবা তো এই মুহূর্তে শংকরগড়েই রয়েছেন!"

•

এ যেন প্রলয়ের পূর্ব লক্ষণ! দেওয়াল ঘড়ির টিক-টিক শব্দটা তারই ডম্বরু-সংকেত!

ম্লান মুখে বলল ফাদার ঘনশ্যাম—"মিথ্যে, মিথ্যে, সব মিথ্যে। রাজা সূর্যশংকর এখন শংকরগড়ে আছেন ঠিকই। কিন্তু

কেল্লার ভেতরে নয়—বাইরে। পরিখার মধ্যে —পাঁক আর কাদার তলায়।"

কাগজের মত শাদা হয়ে গেল রাধাকান্তর জীর্ণ মুখ—মৃত্যুর হাওয়ায় যেন দম আটকে এল—বারেক কেঁপে উঠল বিস্ফারিত নাসারন্ধ্র।

বিষণ্ণকণ্ঠে বলতে লাগল ঘনশ্যাম পাদরী, "হলঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে আমার বোঝা উচিত ছিল। আমি যা দেখেছি, আপনিও তা দেখেছেন। দেখেছেন সুসমঞ্জস সাজানো ঘর। দেওয়ালে সাজানো সারি সারি ছবি। চার দেওয়ালে চার জোড়া রণকুঠার আড়াআড়িভাবে ঝোলানো। চার দেওয়ালে চারটি ঢালের ওপর চার জোড়া তরবারিও রয়েছে সেইভাবে। কিন্তু চার কোণের তিনটি কোণে রয়েছে মানুষ-সমান তিনটে লৌহবর্ম —নেই শুধু একটি কোণে।"

"আপনি বলতে চান, চার কোণেই লৌহ-বর্ম থাকা উচিত ছিল?"

"শুধু উচিত ছিল নয়—একদা ছিল। হলঘর যিনি সাজিয়েছেন, তাঁর টনটনে সামঞ্জস্য জ্ঞান যে ছিল, তার প্রমাণ অন্যান্য সাজসজ্জার মধ্যেই রয়েছে। তা সত্ত্বেও একটা কোণ শূন্য।"

একটু থেমে আবার বলতে লাগল ঘনশ্যাম, "লৌহবর্মগুলোর বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছেন তো? আপাদমস্তক লোহা—এমন কি মুখাচ্ছাদনও রয়েছে শিরস্ত্রাণে। ডেডবডি লুকিয়ে রাখার উপযুক্ত জায়গা—তাই নয় কি? নিহত সূর্যশংকরকে দাঁড় করিয়ে রাখা হল লৌহবর্মের অন্দরে। চাকরবাকররা আশপাশ দিয়ে গিয়েও কেউ কিছুই টের পেল না। তারপর রাতের অন্ধকারে লৌহবর্ম সমেত লাশটাকে টেনে-হিঁচড়ে পরিখার কাদায় ফেলে দিতেই ল্যাঠা চুকে গেল। ব্রীজ নামানোরও কোনো দরকার হল না। কাদা আর পাঁকের মধ্যে লাশ খুঁজতেও কেউই যাবে না। দীর্ঘকাল পরে দৈবাৎ লোহার বর্ম কারও চোখে পড়লে সমস্ত জিনিসটাই স্বাভাবিক মনে হবে। মনে হবে, কেল্লারই কোনো যোদ্ধার কংকাল—যুদ্ধের সময়ে যিনি মারা গেছেন অনেক-অনেক বছর আগে।"

"কিন্তু আপনি নিশ্চয় জ্যোতিষী নন?" ঢোক গিয়ে বললেন রাধাকান্ত মল্লী।

"নিশ্চয় নই। তবে ব্রীজ পেরোতে গিয়ে যখন পিছলে পড়ি খানায়, তখনি আমি দেখেছিলাম ওপাড়ে শক্ত জমিতে দুটো গভীর পদচিহ্ন—এত গভীর যে পায়ের মালিক নিশ্চয় বেজায় ভারী অথবা গুরুভার কিছু তাকে বহন করতে হয়েছে। ভাল কথা, আমার সেদিনের বেড়াল-লাফ দেখেও আপনার চোখ ফুটল না কেন, বুঝলাম না।"

"বেড়াল-লাফ দেখে চোখ ফুটল না মানে?"

"মানে অতি সরল। আশি বছরের বৃদ্ধ হাঁটতে পারে, নদীর ধারে বেড়াতে পারে, কিন্তু লাফাতে পারে না। ঝুলন্ত ব্রীজের দুহাত ব্যবধান টপকে যাওয়া আশি বছরের বুড়োর কর্ম নয়। কিন্তু বুড়ো সূর্যশঙ্কর



যুবকের মতই একবার নয়, দু দুবার লাফিয়েছেন ঐ ফাঁকটুকু।"

"আপনি দেখেছেন?"

"কল্পনায় দেখেছি। আমরা যখন শঙ্করগড়ে পৌঁছোই, ঠিক সেই সময়ে সূর্য-শঙ্কর পোস্টাফিসে গিয়েছিলেন গতকাল ও'র কথাই তার প্রমাণ। আমরা যখন হল-ঘরে অপেক্ষা করছিলাম, তখনি উনি ফিরে আসেন। দেরি হয়েছে সেই কারণেই। ব্রীজের চাকা উনিই সম্ভবত বিগড়ে রেখে গেছিলেন, যাতে আমরাও শঙ্করগড়ে দেরিতে ঢুকি। আজ সকালে দেখেছি, চাকা সারানো হয়েছে, ঝুলন্ত ব্রীজ এ পাড় স্পর্শ করেছে। কিন্তু কল্পনার চোখে যখনি দেখলাম, আশি বছরের বৃদ্ধ বেড়ালের মত লম্বা লাফ মেরে ব্রীজ পেরোচ্ছেন, তখনি বুঝলাম বুড়োর ছদ্মবেশে রয়েছে একজন যুবাপুরুষ। ব্যস, এবার সব বুঝলেন তো?"

"আপনি বলতে চান, ভবানীশংকর বাপকে মেরে বর্মসমেত খানায় ফেলে দিয়ে নিজেই বাপের ছদ্মবেশে আমাদের সঙ্গে কথা বলে গেছে?"

"হ্যাঁ, তাই বলতে চাই। হলঘরের ছবি-গুলো দেখলেন না, বংশের প্রত্যেকের চেহারায় সাদৃশ্য আছে। সূর্যশংকর আর ভবানীশংকরের মুখের গড়নও হুবহু এক। ভবানীশংকরের গালে ছিল দাড়ি আর চোখে চশমা। দুটোই বর্জন করল ভবানীশংকর। বাকী রইল মাথার চুল। উষ্ণীষ ধারণ করতেই তাও ঢাকা পড়ে গেল। তারপর সামান্য মেক-আপ—ব্যস। অদৃশ্য হয়ে গেল মেজর ভবানীশংকর—আবির্ভূত হলেন রাজা সূর্যশংকর। আমাদের একদিন পরে গাড়ী দেওয়ার কারণটা এবার বুঝলেন তো? ভবানীশংকর সেই রাতেই ট্রেনে শংকরগড়ে এসে বাপকে পরলোকে পাঠিয়ে দেয়।"

"পাছে রাজা বেফাঁস কিছু বলে ফেলেন সেই ভয়ে?"

"তা তো বটেই। রাজা সূর্যশংকর আপনাকে স্পষ্টই বলে দিতেন ছেলেকে কানাকড়িও তিনি দেবেন না। তাই তাঁকে সরানোর দরকার হয়ে পড়ল। তারই ছদ্ম-বেশে বিরাট মস্করা করল ভবানীশংকর। পিতৃহত্যার মহাপাপ নিজমুখেই স্বীকার করল—কিন্তু এমন কৌশলে যে তখনকার মত আমরা কেউ বিন্দুমাত্র সন্দেহ করতে পারলাম না। এখন বুঝেছি, ভবানীশংকর কেন সে রাতে আপন মনে অমন অদ্ভুত অট্টহাসি হেসেছিল।"

"কবে?"

"দীঘির ধারে রাণী দেখা করতে গিয়ে-ছিল ভবানীশংকরের সঙ্গে। ভবানীর তখন আপন মনে পিতৃহত্যার প্ল্যান আঁটছিল। বাবাকে খুন করে বাবার ছদ্মবেশে মহা-পাপের স্বীকারোক্তির নারকীয় দৃশ্যটা কল্পনা করেই নিষ্ঠুর আনন্দে হেসে উঠে-ছিল সে। পৈশাচিক ঠাট্টা, কিন্তু খুবই মৌলিক, তাই নয় কি?"

"তা তো বটেই। এখন বুঝছি, কেন সূর্যশংকর তখন বলেছিল ইহজীবনে ছেলের মুখদর্শন করব না।"

"করতে গেলেই তো ছেলেকে বাপের সামনে আসতে হয়। কিন্তু মুখোমুখি দ্বৈত ভূমিকায় অভিনয় তা সম্ভব নয়।"

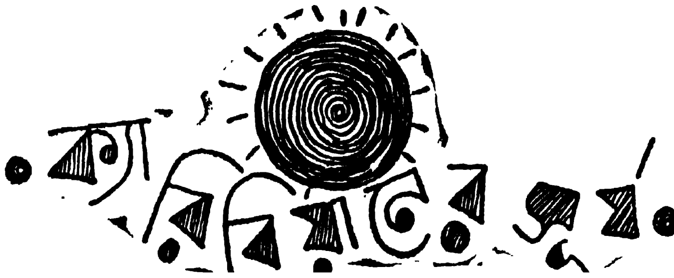
"তাছাড়া মড়ার আবার মৃত্যু হবে কি করে? বাবার সম্পত্তিই বা ভবানীশংকর পাবে কি ভাবে?"

"সে প্ল্যান এঁটেই এ কাজে নেমেছে যুবরাজ মেজর ভবানীশংকর দীক্ষিত", বলে মুখ অন্ধকার করে বসে রইল ফাদার ঘনশ্যাম মণ্ডল।*

* বিদেশী ছায়ায়

হাওড়া কুষ্ঠ কুটির

৭২ বৎসরের প্রাচীন এই চিকিৎসাকেন্দ্রে সর্ব-প্রকার চর্মরোগ, বাতরক্ত, অসাড়তা, ফুলা, একজিমা, সোরাইসিস, দূষিত ক্ষতাদি আরোগ্যের জন্য সাক্ষাতে অথবা পত্রে ব্যবস্থা লউন। প্রতিষ্ঠাতা : পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা কবিরাজ, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। শাখা : ৩৬, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯। ফোন : ৬৭-২৩৫৯



ব্রজমাধব ভট্টাচার্য

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পিয়েরে শাঁসালো ব্যক্তি। জমিজমা আছে। কিছু চিনির শেয়ার আছে। সমুদ্দুরে খানকয়েক পালতোলা জাহাজ আছে এবং খানকয়েক বাড়ী আছে। মজাদার লোক। আচার্য কৃপালনী, যতীন দাসের মতো অনশনের পর যা হতেন তেমনি চেহারা। বিশ্বাস হয় না লোকটার এতো তেজ। তবে দেশলায়ের কাঠিও তো সামান্য দ্রব্য নয়! চেহারার সঙ্গে তেজের কী। বিদ্যুতের চেহারা তো ভীমের গদার মতো নয় কিছু। কিন্তু পিয়েরের ভেনেজুয়েলান পত্নী ক্যাথি-পিয়েরের চেহারা দেখে মনে হয়েছিলো যে আমাকেও যদি একাদিক্রমে একত্রিশ বছর ঐ চেহারা দেখতে হোতো, আমিও একশো ষাট পাউন্ড থেকে সতেরো পাউন্ডে শুটকে যেতাম; মরতাম না; কারণ ক্যাথী-পিয়েরে না মরা পর্যন্ত যমের সাধ্য কী তার দুর্ভেদ্য মেদের বহু-স্তর প্রাচীর ভেদ করে সুরক্ষিত পিয়েরেকে কুক্ষিগত করে। যমের রুচি না থাক, ভয় তো আছে। ক্যাথী পিয়েরেকে আমি কখনও ভুলবো না। ক্যাথী কখনও ফোটো তুলতে দিতো না। অথচ ক্যাথীকে দেখলেই ছবি নিতে ইচ্ছে হয়। পিয়েরে বলে, "কেন গরীবকে গচ্চা দেওয়াবে? ছবি নিয়েছো জানার পর তোমার ক্যামেরা ও আস্ত রাখবে না। ...জীবনে সাত-আটটা ক্যামেরার দাম দিতে হয়েছে!"

ভি-ভি হাসে। ভি-ভি ক্যাথীর সঙ্গিনী। নামে মেড্।

ভি-ভি বোধহয় সব সময়েই মদ খায়। অন্ততঃ তাই বোধ হয়। মদিরাক্ষী বলতে না। অথচ ক্যাথী আর ভি-ভি অবিচ্ছেদ্য।

পিয়েরে ওজর দেখায়, "কী করি। ভি-ভি নৈলে ক্যাথিকে সামলানো জিহোবার অসাধ্য। ...তবে কি জানো ভাই, ঐ যে ক্যারেলটি দেখছো, পাৎলা ছিমছিমে, ওটি সত্যিই অতলান্তিক। ...মদ খেতে পারে বটে!"

সকাল সকাল ব্রেড-ফ্রুট ভাজা, ক্রশড্ এগস অন ক্রিম্পস্, কিছু কাজু-বাদাম ভাজাসহ কফি খেয়ে আমি বার হবো। একা ভালো লাগছে না। পিয়েরের কাজ আছে। ও শহরে যাচ্ছে।

হঠাৎ ক্যাথী বললো, "যাবে। পরে বোঝা গেলো, ভি-ভি যখন আমার দিকে নয়ন কোণে চেয়ে বললো, আমি যাবো তোমার সঙ্গে। তাই, ভিমীকে পটালাম। ধন্যবাদ আমার দিও।"

"বাদ দাও ধন্যবাদ। আমার সঙ্গ পাওয়াটা কি ফালতু?"

গাড়ীখানা লাল ডি-সোটো। চালাতে বেগ নেই। অটোমেটিক। বোতাম টিপলেই চললো। না গিয়ার না কিস্সু। স্টিয়ারিংটা ঠিক রাখলেই হোলো।

ভিভি বললো,—"জানো মাদাম, হিন্দু অতিথির দেমাক বড়ো উঁচু। আমাদের সঙ্গে এনেছে বলে নাকি আমরাই ওঁর কাছে ধরা পড়েছি।"

"তাই নাকি, তাই নাকি? মার্তিনীক-মেয়েদের খবর এখনও বাছারাম জানে না। তামাম য়ুরোপ মার্তিনিক-মেয়ের জন্যে দন্যে।"

পিয়েরেকে ক্যাথী ভালোবাসতো, যেমন ভালোবাসা দরকার নির্ঝঞ্ঝাট সংসারের সুব বজায় রাখতে। কিন্তু ক্যাথীর মধ্যে গভীর প্রেম যতটুকু সবই ঐ ভি-ভি। ভি-ভি ক্যাথীকে করুণা করতো, উপেক্ষা করতো না। ভি-ভি জানতো, ক্যাথী নামক পাহাড়টার সেবা-যত্ন করলে ফসল পাওয়া যায় অফুরন্ত অবকাশ, অনায়াস খাদ্য, নিরন্তর মদ এবং এই বিশাল জমিদারীর কর্তৃত্ব।

ভিভির চেহারা ছিলো দেখবার মতো। সত্যিকার মার্তিনিকান মেয়ে।

চমৎকার লকলকে চেহারার মধ্যেও শ্যামল-ঢল তোলা, যেন বোর্নিওর পাম্। টিকোলো নাক; ছড়ানো চুলের রাশি। মেরিন-বের মতো গভীর নীলঘন দুটি চোখ। জলপাই-রঙ চামড়ার উর্বর ব্যঞ্জনা রোদ-ভেজা পলিমাটির মতো চেয়ে আছে আগামী শরতের ফসলের প্রত্যাশায়।

মার্তিনিকের রক্তে ডাচ্, ডেন, জর্মান, ইংরেজ, আরাওয়াক, নিগ্রো,—সব মিশেছে। মার্তিনিকে কোনোদিন রক্ত-সমস্যা আসেনি। ফরাসীরা সমাজকে সংস্কৃতি দিয়ে পোষণ করেছে; বর্ণালু শুচিবাই দিয়ে তোষণ করেনি।

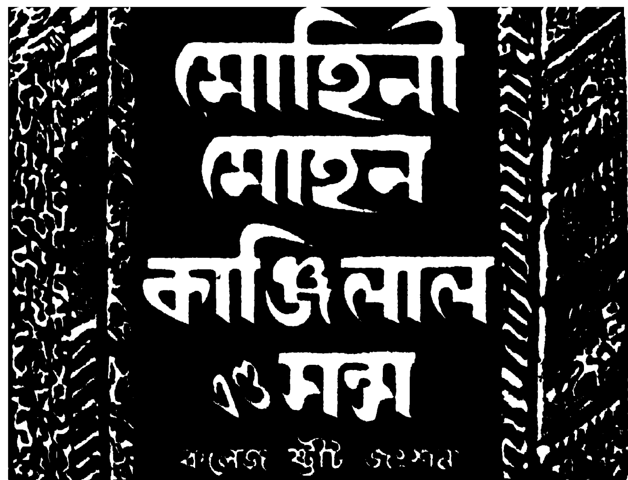
কাজেই মার্তিনিক গুয়াদেলুপ, মেরী গ্যালাণ্টী আইনতঃ এবং কৃষ্টিতঃ ফরাসীই।

গাড়ী চলেছে। স্যাভানায় ভিক্টর শোয়েলশরের মূর্তি। ভিক্টর শোয়েলশর ইংরেজ-উইলবারফোর্সের ফরাসী তর্জমা। ফরাসী ওয়েস্ট ইণ্ডিজে দাসপ্রথা রহিত হোলো ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে। কমাশ্চর্য-মতঃপরম্। ফরাসী দেশের দাসরা স্বাধীন অস্বাধীন বুঝলো না। তাদের জীবন-জীবিকা-ছন্দ যেওি-কে-ত্যেও রয়ে গেলো। ফরাসী প্রভুরা মালিক হিসেবে দরাজ লোক ছিলেন। শোয়েলশার স্ট্রীট ফোর্ট-দ্য-ফ্রান্সের বিখ্যাত বিপণি-পাড়া। শোয়েলশারের নামে শহরও আছে।

শহরের বনেদী পাড়া। দেখলে মনে হয় যেন গন-উইথ-দি-উইণ্ডে নিউ অরলেন্স দিয়ে চলেছি। সেই সব লোহার থাম, লোহার ঢালাই রেলিং, লোহার ঢালাই সিঁড়ি, বারান্দা। বাকী সব শাদা। রহিসী বাড়ী। কফি, কেকো, গোলমরিচের গন্ধওলা বণিক-সামন্তদের সভ্যযুগের বসতি।

বে-দিয়ে চলেছি। ফোর্ট-দ্য-ফ্রান্স-বে, বাঁকা উপসাগরে সূর্যাস্ত দেখার মিছিল বসে। বন্দরের ওপরেই পথ। পথের ওপরেই সারি সারি দোতলা কাঠের বাড়ীর সার। ও পথ আমার অনধিগম্য। কিন্তু ঐ পথের জন্যই সারা লস্কর জগতে অবিসম্বাদিত নাম মার্তিনিকের। মার্তিনিকের মতো শহর নেই!

লাল-ভালের পাড়ায় চুনী, মতি, পান্না, হীরে পাওয়া যায়। বাতাসা, খই, মুড়কি, ছোলাভাজার দরে। সম্প্রতি সরকার একটা দ্যাল গেঁথে দিয়ে এই লস্কর-খ্যাত জগতে অ-লস্করদের যাতায়াত সুগম করে দিয়েছেন। পাশাপাশি কয়েকটি ভাত্তারখানা।



বিজ্ঞাপন দেখলে বুঝতে কষ্ট হয় না এগুলো অত্যয়খানা হলেও রোগীর রোগের উপশমের খবর রাখে না। প্রিভেনসন ইজ বেটার দেন কুওর, এই নীতিবাক্যের বর্ম-জীবি। এ বর্ম পরে গেলে স্বয়ং স্পাইরোচিটা-প্যালিডা কিংবা গোনোকোক্কাই এলেও যৌবন নিরাপদ।

আমি গাড়ী থামাই দেখে ভি-ভি প্রায় মূর্ছা যায় আর কি! এখানে এ ভাগাড়ে কি করবে? আমি ফিকি ফিকি হাসি; শুধু চেখে।

সামনে দু-সার টিন ছাওয়া জায়গা। তার তলায় হাট বসেছে। মাজোর খচ্চর-ঘোড়া-বলদটানা গাড়ী কাং হয়ে আছে। সব্জীপাতি থেকে হাঁস, মুরগী, ফুলের বাহার সব। সাদা সাদা চালকুমড়োর ফালি, সোনাবরণ মিষ্টি-কুমড়ো, টুকটুকে টম্যাটো, হুদো হুদো রাম, আর সবুজ তো থৈ থৈ। ও সব আর কী দেখছি ছাই!

দেখছি আমি গগাঁকে। এই ছবি এঁকে গেছে গগাঁ। ফরাসী চিত্রকর গগাঁ। ব্যাঙ্কার গগাঁ, লক্ষপতি গগাঁ, মধ্যবয়সে ক্যানভাস এবং রঙের মত্ত হয়ে প্রণয়, প্রাণ, প্রেম, প্রজ্ঞা সব ভাসিয়ে দিয়েছিলো। বিকিয়ে গিয়েছিলো গগাঁ; নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিলো। তাহিতীতে সামান্য কটা টাকার জন্য জেলে যেতে হয়েছিলো; নিরীহের ওপর অত্যাচারের বিপক্ষে দাঁড়াবার অপরাধে গবর্নরের অপ্রিয়-ভাজন হয়ে নিদারুণ প্রাণান্তকর দুর্দশায় পড়তে হয়েছিলো। অনাহার, অচিকিৎসা, অক্লান্ত দারিদ্র্যতা,—কোনো কিছুতে গগাঁ ভাঙেনি। আজই কাগজে পড়লুম গগাঁর একখানা ছবি নিলাম হচ্ছে ৭৭৩,০০০ ডলারে!!

—সেই গগাঁ প্রথম এসেছিলো মার্তিনিকে। এই যে বাজারের ছবি, এ যেন সেই ছবি, তারই ছবি। সেই নীল, হলদে, প্রাইমারি কলার, মৌলিক-বর্ণের দুর্জ্ঞেয় আঢ্যতা; অনমনীয়, স্পর্ধিত মর্যাদা। মনে পড়ে যায় জীবনের শেষের দিকে প্যারিসে বন্ধুকে রং পাঠাবার জন্য চিঠি লিখেছিলো গগাঁ, তাতে নীল, লাল, হলদে লিখতে গিয়ে তিনবার লিখেছিলো হলদে, হলদে, হলদে। এতো অল্প রং খরচ করতো গগাঁ যে সময়ে-সময়ে ক্যানভাসের সুতোর দাগও ঢাকা পড়তো না!

সেই হলদে, সেই লাল, সেই প্রাইমারি-কলারের সম্ভার। আমি থেমে না গিয়ে করি কী। এক গোছা চেনেট্ কিনে ফেলে দিলাম ক্যাথীর জামার স্ফীতি সমুদ্রে; আর দৌড়ে কিনে আনলাম বরবাকিট্ট এক প্লেট। দিলাম ভি-ভিকে। ওরাও ওদের নেশায় মগ্ন হয়ে গেলো। আমি ঘুরে ঘুরে শুধু গগাঁকেই দেখি, যে গগাঁ মার্তিনিকে এসে-ছিলো; যে গগাঁর ছবিতে প্যাসিফ প্রথম সূর্যের তাপলাগা আদিম জীবনের প্রথম রেখাপাত দেখতে পেলো।

কিন্তু মার্তিনিক গগাঁকে ধরতে পারে নি। তাহিতি পেরেছিলো। মার্তিনিক তাহিতি নয়। মার্তিনিক মাছ ধরে খাবার জন্য; তাহিতিতে মাছ ধরে খাবার জন্য। মার্তিনিকে কাজ, ধান্দা, রোজগার, তাহিতি কাজ জানে না। যা চায় পায়; যা পায় তাতেই বেশ আছে। মার্তিনিকে নেমেই কোকা-কোলা'; 'এন্ড্রুজ'; 'কলিনস্'। মার্তিনিকে যত দিন থেকেছি 'কোকা-কোলা' থেকে চোখ ফেরাতে পারি নি। তাহিতি অপূর্ব-ভাবে নিরক্ষর। মার্তিনিকে?—হ্যাঁ ধনী আছে, বহু আছে। কিন্তু তাহিতিতে,—গগাঁ বলতো তাহিতির প্রত্যেকেই লক্ষপতি, কোটীপতি! মার্তিনিকান সুন্দরী যে কাজ করে বাড়ীভাড়া মেটাবার জন্যে, ডাক্তারের ফি জোটাবার জন্য,—সেই কাজটিই তাহিতির সুন্দরী করছে অবসর বিনোদনে লীলায়।

মনে পড়ছে মার্তিনিকে একটা করুণ দৃশ্য দেখেছিলাম। জাহাজ থামার সঙ্গে সঙ্গে বহুতর সজ্জায় সজ্জিতা, মার্তিনিকের 'গ্রীটিং-মাদ্রজ' —মানে মদ্রাস-এৎ-ফুলার্দে বাঁধা স্পর্ধিত মাথা নেড়ে কাতারে কাতারে মেয়েরা দাঁড়ালে, সুস্বাগতম্,—কুইন অব দি এন্টিলিসে সুস্বাগতম্। কিন্তু পথিক ক্ষণেক তিষ্ঠ। একটু দূরে চেয়ে দেখো। হ্যাঁ, বন্দরের অনতিদূরে কয়লার পাহাড়। দলে-দলে মেয়ে মাথায় ঝুড়ি করে কয়লা বহন করে নিয়ে চলেছে পিঁপড়ের মতো। সর্বাঙ্গ কালো, পৃথিবী কালো, ভবিষ্যৎ কালো। এতো কালো জড়ো করেছে পাঁচ নয়া পয়সার বিনিময়ে, ঝুড়ি প্রতি পাঁচ নয়া পয়সা। তাই আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান তারি লাগি তাড়াতাড়ি।

এখানেই শেষ নয়। আরো আমেরিকান আরামপ্রয়াসী টুরিস্ট নই। আরও জানতে হয়েছে। কার কাছে? পরে তার কথা বলা যাবে। যদি চিনতে হয়, চিনে নিতে হবে। ঐ যারা কয়লা ভরছে তারাও এককালে দেলিসেস-দু-লিদোর দোতলা বাড়ীতে থাকতো। তারাও মাথায় মদ্রাস-এৎ-ফুলার্দে বেঁধে, হাতে প্যানসীগুচ্ছ, লিলি-গুচ্ছ নিয়ে দাঁড়াতো। কিন্তু দেলিসেস-দু-লিদোর-এর মেয়েদের পালিশ ফুরুলেই তারা ফুলের গোছা ফেলে কয়লার ঝুড়ি ধরে। ...যারা আজ এধারে কয়লা ভরছে তাদেরই কন্যারা এধারে ফুল নিয়ে সুস্বাগতম্ জানাচ্ছে।

মার্তিনিকে আমেরিকী বাতাস বইতো। বইছেই। তবে কিনা এই সেদিনি জেনারেল দ্য গল মার্তিনিক ঘুরে গেলেন। আমেরিকা দাঁত বসাতে গিয়েও জুৎ করতে পারছে না। আমিরকী বাতাসে এই কয়লাওয়ালা 'মেকা-নাইজড্' হতে গিয়েছিলো। দেলিসেস-দা-লুদোর কান্নাকাটি পড়ে গিয়েছিলো। একটা মেশিন এসেছিলো। কাজও চলেছিলো। কিন্তু কী করে জানি কে ডাইনামাইট ফাটিয়েছিলো। ব্যস। সেই হয়ে গেলো মার্তিনিকের কয়লাখাটার ব্যাস্টোইল্। অবাধ পরম সুখে ওরা কয়লা ভরছে জাহাজে,—প্রতি ঝুড়ি পাঁচ নয়া পয়সা!

,আজ আমি যখন মার্তিনিকের কথা ভাবি তখন মনে পড়ে কয়েকটা বিচিত্র খবর। মানুষের স্বাদ। দেশে-দেশে মোর দেশ আছে, —বলতে গিয়ে আমার কণ্ঠ রোধ হয়। আমি ভারতবর্ষকে ভালোবাসি। 'মোর দেশ' —সেই ভারতবর্ষ। সে দেশ দেশে দেশে নেই। তবে আমি বলতে বাধ্য যে, 'মনে-মনে মোর মন আছে, আমি সেই মন লব চিনিয়া।' এই আমি, অনেক আমিতে; এই আত্মা সর্ব-ভূতাত্মাত্মা; এই যে আমি মানুষ ব্যক্তি, এই ব্যক্তিই তো ব্যক্ত সহস্র মনের সহস্র রূপে।

মেয়ে তাহিতিতে গগাঁ রস পেয়েছিলো; মার্তিনিক ব্যবসায়ী পুরুষ। বাণিজ্যকেন্দ্র, প্যারিস হৃৎপিণ্ডের ধমণী, তাহিতি লীলা-কেন্দ্র, দক্ষিণ-সমুদ্রের মেখলায় ধৃত নাভি-কেন্দ্রের সংকেত। কিছু বা রাজনীতিতে, কিছু বা অর্থনীতিতে,—শহরের আকাশ ধুলোয় ভরপুর, সবাইকে চিনি; সবাই চাইছে এ ওকে ডিঙিয়ে যায়; লক্ষপতি হবার গাজর-গুচ্ছ নাকের ডগায় বেঁধে সবাই দৌড়ুচ্ছে আর দৌড়ুচ্ছে। বলে ক্ষুদ্র সীমিত সমাজের লক্ষণই এই। তা বলি কি করে? তাহিতি-ও তো ক্ষুদ্র. সীমার মাঝে অসীম, কারণ মন অসীম. কোন সংস্কার নেই যেমন আকাশের আলো গাছের ফল, বনের সবুজে বনান্তরে প্রবেশাধিকার, সমুদ্র তরঙ্গের অবিরত দাপাদাপি, তেমনি মানুষের মনের পরাণ, দেহের যৌবন প্রীতির তৃপ্তি, জীবনের লীলা। হিংসাও নেই, দ্বন্দ্বও নেই। অবাধ স্বাধীনতায় ডগমগ জীবন। নারী নরকে স্বীকার করেছে অনিবার্য লীলা-সঙ্গিনী হিসেবে। কোথায় হিংসা?

আর মার্তিনিকে কলম্বাস এসে প্রতিষ্ঠিত আরাওয়াক কারাইবকে নাশ করে উপনিবেশ গেড়েছে। স্পানিশ-গুণ্ডাদের সে গর্জনে তো ওলন্দাজ ভয় পায় নি, ফরাসী সতর্ক হয় নি. ইংরেজও পিছু হটে নি। ওরা পরস্পর পশ্চিম ভারত দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে শত-শত বৎসর লড়েছে। মার্তিনিক হয়েছে ফ্রান্সের। তিনশো বছর ধরে মার্তিনিক ফরাসী ধনাঢ্য-তাকে স্ফীততর করেছে। এখানে তাহিতির হাসি পাবে কেন গগাঁ। রং আছে! কিন্তু প্রাণ? সে তাহিতিতে।

সেই প্রাণান্তকর দোমড়ানো মোচড়ানো নেংড়ানো জীবনের প্যাঁচে মার্তিনিক হাসি হারিয়েছে। মাইলের পর মাইল অটোমেটিক ভি-সোটা যাচ্ছে; কেবল নিগ্রো আর নিগ্রো। কাজ ছেড়ে এসে চেয়ে আছে আমাদের দিকে; কী শুকনো, বিদ্বেষ-বিষে জীবনহীন দৃষ্টি। রাগ করে যেন, যেন বলতে চায়,—আবার কেন? ঢের হয়েছে তো। এবার যাও। দরকার মতো আদর-খাতির করবে। কিন্তু বাক্য-ব্যবহারে অনিচ্ছুকতা, জড়তা। জড়িয়ে জড়িয়ে কথা বলল, যেন না বলতে হলেই ভালো হোতো। ছোটো ছোটো বাচ্চা ছেলে-মেয়েগুলো অবধি যেন সন্দেহ করে আমাকে। আমাকে চায় না। মাঝে মাঝে মনে হয়,—রীতিমত অপমানজনক ব্যবহার। ঠিক না, বলতে জানে না, এরা কাল।

(ক্রমশ)

আমি কান পেতে রই

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

[উপন্যাস]



॥ ১৪ ॥

অবশ্য সেইদিনই কি তখনই নয়। ডাক এল যখন সত্যিই সুরবালাদের অবস্থা চরমে উঠেছে। দিন আর কাটছে না। এর পর একদিন বাড়িওলা নালিশ করে পেয়াদা এনে ঘটিবাটিসুদ্ধ মালপত্র ক্রোক করবে—তারই দিন গুনছে সবাই।

নানু কাবেছে তের। তবু মাঝেমাঝে। ওখানের পরিচিতদের মধ্যে নানুই নির্দিষ্ট তার খবর নেয়। কোন কোন দিন হয়ত ঘি ময়দা একবারে নিয়ে এসে নামিয়ে বলে 'জননী পরোটা ভাজো দিকি খানকতক।..তোমার হাতের পরোটা খাওয়ার ঐ তো জ্বালা। একবার খেলে আর অন্য কারও পরোটা মুখে লাগে না। গরম পরোটা আর কাঁপির ডালনা। সেই সঙ্গে যাঁড়াবাড়ির মতো ফাজোফানা বেগুনভাজা। কী বল বে?'

সুরোর দিকে চেয়ে চোখ মটকে বলে, 'মাগীর ঐ বড় দোষ, মাগী রাঁধে ভাল।' বলা বাহুল্য, সে সব বাজার একদিনে কেউ খেতে পারে না, সেইভাবেই বাজার করে নানু, যাতে আরও পাঁচ ছ'দিন এদের চলে যায়।

এর মধ্যে টাকাও দিয়ে গেছে বার দুই তিন। কোনদিন পাঁচ কোনদিন বা চার। খুচরো টাকা। এ টাকা যে সহজে সংগ্রহ হয়নি তা সুরবালা জানে। হয়ত মার কাছ থেকেই চেয়ে এনেছে শরীর খারাপ বলে। নানুই কথাটা বলেছিল একদিন, 'যখন দেখি মা এমনিতে দিচ্ছে না। মুখটা শুকিয়ে একদিন গিয়ে বলি, অসুকটা হয়েছে—হয়ত বলি মাথাতে ন্যাবা হয়েছে—তা ডাক্তার যা ফিরিস্তি দিয়েছে ওষুধের—সে আর আমার সাধ্য নয় কেনা।...দেখি সামনের মাসেটাসে যদি মাইনের টাকা কিছু আদায় হয়।... অমনি মা সুড়সুড় করে বার করে দেয় টাকা। এমনি একবার বলেছি, সেদিন অবিশ্যি সত্যিই শরীরটা একটু খারাপ ছিল, জ্বর জ্বর মতো—দেখি তোর সতীলক্ষ্মী খাবরের পুঁটুলির মধ্যে আরও পাঁচটা টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে। বুঝলুম বাবা কি ভাইদের কারুর ঘাড় ভেঙেছে। সবাই তো ওর বশ, মুখের কথা খসালেই হল!'

এ একরকম ভিক্ষাই নেওয়া।

বিশেষ কীভাবে এ টাকটা সংগৃহীত হচ্ছে জানবার পর আর কিছুতেই নেওয়া উচিত নয়— তবু সুরো হাত পেতে নেয়। কে জানে কেন, নানুকে ওর সংকোচ হয় না। কিছুতেই ওর সম্বন্ধে কোন সংকোচ হয় না। এক একদিন নানু রাত্রেও থেকে যায়। সুরো আর নিস্তারিণী এক বিছানায় শোয় তার পাশে যে হাত দুই সংকীর্ণ জায়গা, সেখানেই একটা কাঁথা কি দুপাটকরা এদের কারও ছেঁড়া কাপড় পেতে শুয়ে পড়ে, শীতবোধ করল নিজের একটি অদ্বিতীয় আলেস্টার কোট আছে সেইটেই পা থেকে কোমর পর্যন্ত চাপা দেয়; কোনদিন বা—আগে থাকতে বললে সুরোই ওদের বিছানার নিচে থেকে একটা কাঁথা বার করে দেয়। নিস্তারিণী থাকে অবশ্য—না থাকলেও সুরোর বোধকরি সংকোচ হত না। নানুর দ্বারা তার কোন অনিষ্ট হতে পারে—একথা তার মনেই হয় না।

তবে এসব সামান্য সাহায্যে দিন চলে না। ভবতারণ জরার প্রকোপে যত না হোক ভাবনা চিন্তায় আরও যেন ভেঙে পড়ছেন দিন দিন, কিছুই প্রায় আনতে পারেন না আজকাল। আর যত চারিদিক থেকে অভাব চেপে ধরে, ততই নিজের অকর্মণ্যতা, অসহায় অবস্থাটা বেশী করে অনুভব করেন—ভাবনা চিন্তাও সেই অনুপাতে বেড়ে যায়। প্রতিকারের সম্ভাবনাহীন দুশ্চিন্তা। সে চিন্তার আদিও নেই অন্তও নেই—ইদানীং বোধহয় চিন্তার স্বচ্ছতাও হারিয়ে ফেলছেন, কী ভাবছেন তাও ঠিক বুঝতে পারেন না, শুধু মধ্যে মধ্যে খানিকটা কেঁদে শ্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েন যখন তখনই কিছুটা শান্তি পান।......

নিস্তারিণী দেখেশুনে আরও প্রমাদ গণে। নানুকে ধরে পড়ে, 'তুমি বাব একটা ঘটকীর সন্ধান দাও। যেমন করেই পারি মেয়ের বিয়ে দোব এবার, কারুর কথা শুনব না। আমাদের ঘরে বড় মেয়ে—ঢের পণ পাবার কথা—তা মরুক গে সে যা দেয় দিক —খরচটা উঠলেই হল। ওকে পার করতে পারলে ওর চিন্তে গেলে বুড়োটা অন্তত বাঁচে কিছুদিন। আমাদের জন্যে কোন ভাবনা নেই—ছেলেতো তো গেছেই—আমরা বুড়ো-বুড়ী বৃন্দাবন চলে যাবো। সেখানে শুনেছি মাধুকরী করলে দিন চলে যায়। আর তাতে নাকি তেমন লজ্জাও নেই। অনেকেই তার শুনেছি—বড় বড় লোক শখ করে স্বেচ্ছা-সুখে মাধুকরী করে খায়।'

ভবতারণ বলেন, 'তুমি ক্ষেপেছ? ঐ মেয়ের বিয়ে হবে?'

'খুব হবে। অমন সুন্দরী মেয়ে আমার—পেলে লুফে নেবে।'

লুফে যে নেবে না তা নানুও বোঝে, সেটা মুখের ওপর নিস্তারিণীকে বলতে পারে না। কোথা থেকে দুটো ঘটকীকে ধরেও আনে। তার মধ্যে ক্ষীরি নাপ্তিনী স্পষ্ট-বক্তা লোক, সে মুখের ওপরই বলে গেল, 'তোমার মেয়ে কীর্তন গাইত মা—আমি শুনেছি। তার ওপর আবার দিনকতক নাক থ্যাটারও করেছে। ওকে কেউ ঘরের বৌ করে নে যাবে না। আমাকে তুমি মাপ করে ঘাট করো মা—ওর সম্বন্ধ করা আমার সাধ্য নয়।'

'মর মাগী, ঘাট করো কি বলছিস? ঘাট মানছি বল!' ওর মধ্যে আড়ালে মুখ ফিরিয়ে বলে নানু, আর চোখ মটকে হাসে।

অপর ঘটকীটি দিনকতক ঘোরাঘুরি করল তবু। এই দুঃখের সংসার থেকেও দু' আনা এক আনা পয়সা নিয়ে যেতে লাগল মধ্যে মধ্যে খরচা বলে—কিন্তু শেষ

পর্যন্ত কোন সম্বন্ধই আনতে পারল না। যত সুন্দরীই হোক, কীর্তনউলী থিয়েটার করা মেয়েকে ঘরের বৌ করার এমন কারুও বুকের পাটা নেই। শেষে সুরবালাই আর থাকতে না পেরে নিস্তারিণীকে বারণ করল, 'কেন মা এই সাত-দুঃখের পয়সা বাজে খরচ করছ। ঐ দু' আনা পয়সা থাকলে দুদিন বাজার খরচ হবে। কেউ নেবে না এখন তোমার মেয়েকে। আগে দিত সে এক কথা ছিল!'

নিস্তারিণী দাঁত কিড়মিড় করে, ঐ যে তোমার গুষ্টি! দোব কি—ঐ বিটলে বামনা দিতে দিলে! ধম্মজ্ঞান টনটনে হয়ে উঠল একেবারে. আমি কারুর জাত মারতে পারব না! এখন ধর্ম্মজ্ঞান বেরিয়ে যাচ্ছে একেবারে!'

ঘটকীকে মিনতি করে. 'আর একটু দ্যাখো মেয়ে-ঘেয়ে দ্যাখো মেয়ে, আমি তোমাকে খুশী করে দোব। বামুনের কন্যেদায় উদ্ধার করে দিলে পুণ্যিও হবে।'

ইতিমধ্যে হাতের সেই অম্বিতীয় রুলি দুগাছিও গেছে। নানুকে দিয়েই বেচিয়েছে সুরবালা। নানুই কোথা থেকে দুগাছা গিলটির বালা এনে দিয়েছে তার বদলে। বলেছে, 'খুব ভাল দোকানের জিনিস, থিয়েটারে আমরা কিনি এখান থেকে, অন্ততঃ দুমাস এমনি থাকবে। তেলজল না লাগে তো আরও বেশীদিন যাবে।'

'তারপর?' হেসে বলেছে সুরবালা, 'এগুলো যখন কালো হবে, তখন তো কাঁচের চুড়ি কেনবারও পয়সা জুটবে না!'

'সে তখন দেখা যাবে। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।' .....

এই আশটারই কোন চিহ্ন খুঁজে পায় না সুরবালা। শুধু শ্বাসটাই যেন বন্ধ হয়ে থাকে ক্রমশ। সত্যিই আজকাল এই ছোট্ট বাড়টার চারপাশের দেওয়াল যেন তাকে চেপে ধরে মধ্যে মধ্যে। একঘেয়ে একাদিক্রমে এই সংকীর্ণ জায়গায় অবরুদ্ধ থাকতে থাকতে মনে হয় সে বুঝি পাগল হয়ে যাবে একদিন। কোথাও যায় না, যেতে ইচ্ছেই করে না—বেশভূষার যা হাল হয়েছে, ঘরের বাইরে যেতেই লজ্জা করে। খুব যখন অসহ্য বোধ হয় মাঝে মাঝে সেই এতটুকু উঠানে এসে দাঁড়িয়ে ওপরদিকে একফালি আকাশের দিকে চেয়ে যেন বাইরের মুক্ত প্রকৃতির বাতাস নেবার চেষ্টা করে, পরিচিত বৃহত্তর জগৎটাকে মনে করার চেষ্টা করে।

শশীবৌদিদের ওখানেও যেতে ইচ্ছে করে না আর। তারও দুঃখের কান্না, কাঁদেন না তিনি ঠিকই—কিন্তু কাহিনীটা শুনতে হয়। তাছাড়া ওকে দেখলেই তিনি এটাওটা খাওয়াতে চেষ্টা করেন কিছু কিছু খাদ্য-বস্তু—আনাজকে নাজ গাছিয়ে দেন। এইটেই বিশ্রী লাগে সুরবালার। তাছাড়া তাঁদেরও অভাব যে কত তাতো সুরবালা জানে—তাদের জীবনযাত্রার ঐ সামান্য উপচারে ভাগ বসাতে লজ্জা করে ওর।

সুতরাং চারখানা দেওয়ালবদ্ধ ঘরে বসে বসে আকাশপাতাল ভাবা ছাড়া কোন উপায় দেখতে পায় না। কোন হাতের কাজ শেখা যায় কিনা, কিছু তৈরী করে বিক্রী করা যায় কিনা—ভাবতে চেষ্টা করে। কে কী শেখাবে—কার কাছে গেলে শেখা যায় তা জানে না, কাজেই ভেবেও কোন লাভ হয় না শেষ-পর্যন্ত। দুপুরে ঘুমনো অভ্যেস নেই। আগে গণেশ এর-ওর কাছ থেকে একআধখানা ছেঁড়াখোঁড়া বই চেয়ে আনত, সেইগুলোই দুবার তিনবার করে পড়া চলত। এখন তাও থাকে না। শুধুই বসে বসে ভাবে আর কান পেতে থাকে—বাইরের গলিতে কত হরেক-রকম পণ্য নিয়ে ফিরিওয়ালারা ঘুরে বেড়াচ্ছে; দুপুরের জনহীন পথের শূন্যতায় তাদের ডাকগুলো জাগিয়ে চারিদিকের বাড়ির দেওয়ালে প্রতিহত হয়ে বিচিত্ররকমের প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করছে। কান পেতে শোনে আর ভাববার চেষ্টা করে এদের এইসব পণ্যের কোন একটা তার পক্ষে সরবরাহ করা সম্ভব কিনা। মধ্যে মধ্যে এক আধজনকে ডাকেও কে কোন মাল কোথা থেকে কী দরে কেনে—তাই খোঁজ নেয়। তারা যখন বোঝে সে খদ্দের নয়—শুধুই সময় নষ্ট করার গোঁসাই—বিরক্ত হয়ে চলে যায়।...

এমনি করেই দিন কাটে। শীতের পর বসন্ত নামে বসন্তের পরে গ্রীষ্ম—তারপরে একসময় ওপরের একফালি আকাশ কালো করে বর্ষাও ঘনিয়ে আসে—শুধু সুর-বালাই তার জীবনে কোন বৈচিত্র্য বোধ করে না—বুঝতে পারে না কোন পরিবর্তন। তার দুঃখের বোঝা এতই বাস্তব, এত দুঃসহ যে প্রকৃতিদত্ত দুঃখে আর এসে যায় না বেশী-কিছু—সমস্ত অনুভূতিগুলোই যেন একাকার হয়ে গেছে ওর জীবনে।......

একএকবার ভাবে এখানের পাট তুলে সকলে মিলেই বৃন্দাবন বা ঐরকম কোন দূরতীর্থে চলে যাবে কি না। যেখানে গিয়ে বুড়ো বাবার হাত ধরে মন্দিরে মন্দিরে গান গেয়ে বেড়ালে অনেক ভিক্ষা মিলবে—এমন করে প্রতিনিয়ত কাল খেয়ে কালচুরি করতে হবে না—না খেয়েও বাইরের সম্ভ্রম বজায় রাখতে প্রাণান্ত হবে না সেখানে। আবার ভাবে—যে শান্তির জন্যে তাঁদের নিয়ে যাবে সে শান্তি দিতে পারবে না—অন্যদিক দিয়ে বাপমায়ের বিড়ম্বনা বেড়েই যাবে হয়ত।

কিছুই ঠিক করতে পারে না, একটানা চাপা অন্ধকার ছাড়া আর কিছু চোখেও পড়ে না।

এরই মধ্যে একদিন খবরটা এল।

খবরটা আনল নিস্তারিণীই। কী একটা যোগে গঙ্গায় চান করতে গিয়েছিল সে, পুরনো পাড়ার সোনার মায়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে। তার মুখ থেকেই শুনেছে।

'শুনেছিস? তোর মতি কেত্তনউলী যে শয্যাগত!'

চমকে উঠল সুরবালা, 'সে কি? কে বললে? কী হয়েছে?'

'বাত। বাতে নাকি সব্ব অঙ্গ পড়ে গেছে একেবারে। যাকে বলে চৌরঙ্গী বাত। পাশ ফিরতে পারে না, উঠে বসতে পারে না—জলটুকুও খাইয়ে দিতে হয় তবে খায়। খুব কষ্ট পাচ্ছে।'

তারপরই, ভিজে কাপড় ছাড়তে ছাড়তে বলে, 'হবে না! বেশ হয়েছে। আমাদের সঙ্গে মিছিমিছি আক্রোশ করা—তার ফল ভুগতে হবে না? এখন কি হয়েছে আরও অশেষ দুর্গতি আছে ওর অদেষ্টে, এই বলে দিলুম!'

'ছি মা!' মৃদু ধমক দিয়ে ওঠে সুর-বালা, 'মানুষের অসুখ নিয়ে অমন কথা বলতে নেই। কার কখন কী হয়—বলা যায় কি? তাছাড়া তার দ্বারা যে আমার উপকার হয়নি তাও তো নয়!'

নিস্তারিণী তবু আপনমনেই গজগজ করে যায় অনেকক্ষণ ধরে। তার বিপদের কোন আসান না হোক, মতির বিপদে সে খুশী হয়েছে, অনেকদিন পরে একটা প্রতি-হিংসার আনন্দ লাভ করতে পেরে যেন বৈচিত্র্য এসেছে তাদের একঘেয়ে দুঃখ আর অভাবে ভরা জীবনে।

এর ঠিক দুদিন পরেই মতির ঝি এল।

'ওমা কী ব্যাপার! এতকাল পরে?...... এসো এসো। কী ভাগ্যি!'

সুরবালা সমাদর করেই বসায়। বলে, 'তারপর? কী খবর বলো।'

'রসো দম নিই বাপু। কম ঘুরেছি। ঠিকানা লিখে ছেড়ে দিলে—নিজে জানি না পড়তে—খুঁজে খুঁজে হয়রান।'

'কেন, দারোয়ান তো চেনে।'

'সে দারোয়ান কি আছে নাকি? সে কবে চলে গেছে। এখন নতুন লোক এসেছে সে একেবারে আবর।.... এসিছি তো আমিও গো, কবে কোনকালে একদিন এসিছি অত বাপু মনেটনে নেই।'

সুরবালার বুকের মধ্যেটা ধুক্‌ধুক্‌ করছে। আশা হচ্ছে: তবু—এতবার এতদিন নিরাশ হয়ে হয়ে আর যেন আশা করতে সাহসও হচ্ছে না ঠিক।

সে একটু অসহিষ্ণু হয়েই বলে, 'তার পর? মাসী কেমন?'

'বলছি। সেইজন্যেই তো আসা। তুমি শোননি কিছু?'

'কী শুনব?'

'মায়ের অসুখের কথা?'

মিথ্যে কথাটা মুখে আটকাল শেষ-মুহূর্তেও। বললে, 'কী যেন শুনেছিলুম বটে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাত না কি হয়েছে। তা খবর আর কে দেবে বলো, তোমরা কি খবর দাও—না নাও, মলুম কি বাঁচলুম!'

শেষের দিকটায় গলায় জোর দিতে পেরে যেন বেঁচে যায় সুরো।

ঝি এবার একটু অপ্রতিভ বোধ করে। বলে, 'আমরা আর কি করব বলো দিদি, আমরা হলুম গো হুকুমের চাকর। আমাদের ওপর কড়া হুকুম ছেল যে এতকাল। খবর-দার আমার বাড়ির টিকটিকি মাকড়শা পজ্জন্ত যেন ওমুখো না হয়।...তা সেখেনে আমরা আর কি করতে পারি? আজ আবার উল্টো হুকুম হয়েছে—এয়িছি।'

'তা উলটো হুকুমটা হল কেন?'

ভ্রূ কুঁচকে প্রশ্ন করে সুরবালা।

'তাও জানি নি। বলে পাঠিয়েছে যে আমার খুব অসুখ, সুরোকে বলো সে যাও—যেন শেষদেখা দেখে যায় একবার। যা হবে গেছে হয়ে গেছে—মনে যেন কিছু রাখে না, শয্যাগত রুগীর ওপর রাগটাগ না রাখে, ক্ষ্যামাঘেন্না করে যেন অতি অবিশ্যি আসে।

আরও বলে দেছে একটা গাড়ি ভাড়া করে যেতে—যাওয়াআসা গাড়িভাড়া যা লাগে সব সে দেবে। বললে লোকও পাঠাতে পারে।'

চুপ করে থাকে সুরবালা। শুধুই কি মরণাপন্ন রোগীর শেষ দেখার আকিঞ্চন—না, এখনও ওর আশার কোন কারণ আছে?

'খুব কি বাড়াবাড়ি নাকি দাশুর মা?'

বাড়াবাড়ি—মানে শয্যাগত ঠিকই। বাতে সব্ব অঙ্গ পড়ে গেছে, হাতটাপাটা পজ্জন্ত নাড়বার উপায় নেই, কেউ দয়া করে এক ঝিনুক জল দিলে তবে গলা ভিজবে—নইলে টাকরা শুকিয়ে মরবে। তা বলে আর উঠবে না কি বাঁচবে না—কৈ, তেমন তো মনে হয় না।'

'কি চিকিচ্ছে হচ্ছে?'

'কবরেজী। কে এক বড় কবরেজ আছে রমণী কবরেজ বলে—সে-ই দেখছে। তেল দিয়েছে, পুলটিশ দিয়েছে—কী দুগ্‌গন্ধ মা কি বলব। কাছে যায় কার সাধ্যি। আর দুগ্‌গন্ধের অপরাধটাই বাকি বলো, তাতে নেই কি, হিং আছে রসুন আছে মুসম্বর আছে—'

'তা কে দেখছে? মানে করছে কম্মাচ্ছে কে?'

'আমরাই করছি। এই দুদিন কে এক বোনঝি এসেছে কোথা থেকে। আর আছে রঘুবাবু—ছুটোছুটির কাজ সব তার, বাজার-হাট ওষুধ কবরেজ তাকেই করতে হচ্ছে। মানে যেমনে দিয়ে যা হোক—রঘুবাবুর দু পয়সা কামাই নেই।'

এই বলে ওর মুখের দিকে চেয়ে অর্থপূর্ণ হাসি হাসে দাশুর মা।

সুরবালা একটুখানি চুপ করে থেকে বলে, 'আচ্ছা তুমি বলো গে যাও, কাল দুপুরের দিকে যখন হোক আমি যাবো। কিন্তু কেউ এসো বাপু।'

'দারোয়ান পাঠাতে হবে? না কি আমিই আসব?

'দারোয়ান তো শুনেছি নতুন লোক। তুমিই এসো না হয়। বারোটা-একটা নাগাদ এসো। আমি তৈরী থাকব।'

আর কখনও সুরবালার মুখ দেখবে না প্রতিজ্ঞা করেছিল মতি। বলেছিল, 'পথের ময়লার পানে তাকাব তবু ওর মুখের দিকে তাকাব না—দেখে নিস তোরা।'

কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা রাখতে পারল না।

এত অল্পে যে সে প্রতিজ্ঞা ভাঙতে হবে তা সে স্বপ্নেও ভাবে নি।

ভাঙতে হ'ল তার কারণ—টাকার ওপর অদ্ভুত মায়া তার।

টাকার তার অভাব নেই। কলকাতা শহরে তিনখানা বাড়ি, কোম্পানির কাগজ, ব্যাঙ্কে জমানো টাকা—এ ছাড়াও তার বাড়িতে যে পরিমাণ নগদ টাকা আর গহনা লুকনো আছে তাতে একটা ছোটখাট পরিবারের বিশ বছর কেটে যেতে পারে হেসে-খেলে। কোন দায় ধাক্কাও নেই। যে সব গরীব আত্মীয় কোনকালে সাহায্যপ্রার্থী হতে পারত তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচিয়ে দিয়েছে অনেক দিন। আর যে সব বোন-বোনঝিদের সঙ্গে এখনও আত্মীয়তা বজায় আছে—তাদের কারুরই পয়সার অভাব নেই। বোনও নামকরা গাইয়ে। বোনঝিরা কেউ এ লাইনে আসে নি কিন্তু তাদের ভাল ভাল বাঁধা বাবু আছে, তাদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব বাড়ি-ঘর হয়ে গেছে কবে। সুতরাং কেউই তার অর্থের প্রত্যাশী নয়। বরং প্রয়োজন হলে অসময়ে দেখতে পারে তারা।

তবু এবার শয্যাগত হয়ে পড়তেই চোখে অন্ধকার দেখল।

দৈহিক কষ্ট তো আছেই—কিন্তু সেটা মতির কাছে বড় কথা নয়। বড় কথা—আসরটা বন্ধ হয়ে গেল। 'টাকা আছে ঠিকই—কিন্তু কুবেরের ভাণ্ডার তো আর নয়। বলে 'কুবেরের ভাণ্ডারও বসে খেলে শেষ হয়ে যায়।' একটার পর একটা বায়না ফেরৎ যায়, মুজরো দিতে এসে লোক ফিরে যায়—মতির মনে হয় তার বুকের এক-খানা পাঁজর ভেঙে যাচ্ছে। হায় হায় করে শুয়ে শুয়ে—চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে।

দাসী চাকররা সকলেই প্রায় পুরনো লোক। তারা সান্ত্বনা দেয়, 'ও অমন দু চারটে ফিরুক না মা। অসুখবিসুখ করে না মানুষের? ভগবানের দয়ায় সেরে ওঠো—তোমার কি বায়নার অভাব হবে?'

'তোরা যা বুঝিস না তা নিয়ে কথা কইতে আসিস নি বাপু'—অসহিষ্ণু বিরক্ত মতি ঝেঁঝে ওঠে, 'এসব হল গে কারবারের কথা। এ তোরা কি বুঝবি? ক্রমাগত লোক ফিরতে ফিরতে চারদিকে চাউর হয়ে যাবে—মতি বুড়ো হযে গেছে, ও আর গাইতে পারে না—গাওনা ছেড়ে দিয়েছে। তখন কি আর কেউ আসবে এ দরজায়?'

'তা গোটা-কতক না হয় তোমার বোনকে দাও না, যদ্দিন না সেরে ওঠো?'

'তারই কি আর মুজরোর অভাব আছে! তাছাড়া তাকে দিতে দিতে তো তার ঘরেই চলে যাবে খদ্দেরগুলো। তাকে দিয়েই যদি কাজ চলে, সে বেশ ডাঁটো আছে এখনও, খারাপও গায় না—তাহলে আমার কাছে আর পরেই বা আসবে কেন? ঐটেই রাষ্ট্র হবে—মতি আর গাইতে পারে না, পারবেও না। আর দরকারই বা কি, ওর বোনকেই খবর দাও। আমার দরজায় যে লক্ষ্মী আসছে তাকে আমি সাধ করে ওর দরজা দেখিয়ে দেব?'

এর পর আর কে কী বলবে? সবাই চুপ করে থাকে। এ বৃথা বিলাপের অর্থ বোঝে না তারা। উঠতে যখন পারবেই না কোনমতে—তখন এ ক্ষতি সহ্য করতে হবে, উপায় কি?

চুপ করে থাকে মতিও। আকাশ-পাতাল ভাবে। কবে উঠবে, কবে আবার কর্মক্ষম হবে, গাইতে যাবার মতো হবে—তার কোন হিসেবই পায় না, এই হয়েছে মুশকিল। প্রথম প্রথম ভেবেছিল বাত তো—এ আর কদিন সেরে উঠবেই। কিন্তু দিন গুনতে গুনতে সপ্তাহ, মাস, দু মাস হয়ে গেল, সেরে ওঠার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। গোড়ায় ডাক্তার ডেকেছিল, সবাই বললে বাতে ডাক্তার কিছু করতে পারবে না, কবিরাজ দেখাও। কবিরাজ প্রথম যাঁকে ডাকা হয়েছিল তিনি মাঝারি দরের, এক মাস দেখে তাঁকে বিদায় দিয়ে সবচেয়ে নাম-করা কবিরাজ যিনি তাঁকেই ডাকা হয়েছে। ইনি নিজস্ব পালকী করে আসেন, ওষুধ দেন—আসা আর ওষুধ নিয়ে হপ্তায় পঞ্চাশ টাকা চুক্তি। গা করকর করে মতির তবু তাই দেয় সে। কিন্তু কৈ, তবু তো সেরে ওঠার কোন গতিক দেখা যায় না।

যদি আর উঠতে না পারে? আর কোন দিনই না সেরে ওঠে?

ইদানীং এই ভয়টাই বেশী হয়েছে তার। শুনেছে রোগ 'গোড় পাড়লে' আর সারে না। সারবার হলে এতদিনে সেরেই যেত। যদি ছ মাস কি বছরখানেক এমনি শুয়ে থাকতে হয়?

যে টাকা আসছে না, সে তো লোকসান বটেই, যা খরচ হচ্ছে তাও তো কম নয়। আয় আদৌ নেই—ব্যয় বেশী ভাবতেই যেন মাথার মধ্যে কেমন করে। রোগ যন্ত্রণার চেয়ে এ যন্ত্রণা অনেক দুঃসহ। তার ওপর যে খবরটা 'সদরে' অর্থাৎ প্রকাশ্যে হচ্ছে সেটা একরকম—যেটা আড়ালে চুরি হচ্ছে সেটার পরিমাণ বোঝা যাচ্ছে না বলেই আরও যন্ত্রণা তার। লোক যতই পুরনো হোক—চুরির এমন সুযোগ ছেড়ে দেবে না কেউ। বিশেষ করে ঐ রঘোটা! রঘু তো নয়, রাঘব নাম হওয়াই উচিত ছিল ওর। রাঘব বোয়াল একেবারে, ওর খাঁই আর মেটে না।

না, এভাবে আর চলবে না। কিছু একটা উপায় বার করতেই হবে। আর শীগগির।

গত দু সপ্তাহ ধরে এই কথাটাই ভাবছে মতি, ক্রমাগত ভাবছে। সুরবালার কথাটা যে মনে পড়ে নি তা নয়—প্রথমেই মনে হয়েছিল। কিন্তু ওর কথাটা মনের কোণে সরিয়ে রেখে অন্য উপায় কি হতে পারে সেইটে ভেবে দেখছিল। অনেক ভাবল এই কদিন—অনেকের কথা ভাবল—কোনটাই মনে ধরল না। কেউই পারবে না তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে কাজ চালাতে এক সুরবালা ছাড়া।

সেইজন্যেই লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে আবার সেই সুরোকেই ডেকে পাঠাতে হল। আপৎকালে তুচ্ছ মান-অভিমান ধরে বসে থাকলে চলে না। মালক্ষ্মী জেদ পছন্দ করেন না। জেদের বশে যারা মালক্ষ্মীকে অবহেলা করে, মা তাদের একেবারে ছেড়ে যান। আর—এখন নিজের মনকে বোঝাল মতি—এমন কিছু ঝগড়াঝাঁটি হয়ও নি তাদের মধ্যে। সুরবালাও, সত্যি কথা বলতে কি—মাথা ঠাণ্ডা করে ভেবে দেখলে কথাটা মানতেই হবে—এমন কিছু অন্যায় করে নি। সে বেইমান নয়—একটু 'বাবু বাছা' করলেই হয়ত তাকে গলানো যাবে আশায়। তারও দুরবস্থা যাচ্ছে—আয় নেই এক পয়সাও, অত বড় সংসারটা তার ঘাড়ে। এই বিছানায় পড়বার আগে পর্যন্ত সব খবর রেখেছে মতি, থিয়েটারে যায় বটে, তবে সেখানে ক-পয়সা আর হয় তাতে মতি জানে। থিয়েটারে গিয়ে বাবু ধরতে না পারলে কোন সুবিধে নেই।

মতি সুরবালাকে বিলক্ষণ চিনত। আজ এতকাল পরে শুধু মজুরোর লোভ দেখিয়ে আনা যাবে না হয়ত। বড় শক্ত মেয়ে, ভাঙবে তবু মচকাবে না। তার চেয়ে অন্য কথা বলাই ভাল। মৃত্যুপথযাত্রিনী শেষ দেখা দেখতে চেয়েছে জানলে আর থাকতে পারবে না—ঠিক আসবে। তাছাড়া কারবারের কথা লোক মারফৎ হয়ও না। তাই সে কথা আর তোলে নি—এদের কাউকেই বলে নি ডেকে পাঠানোর উদ্দেশ্যটা। আসল মতলবটা নিজের মাথাতেই ছিল।...

বহুকাল পরে সুরবালা এ বাড়িতে ঢুকল।

এর মধ্যে কত কীই ঘটে গেছে তার জীবনে। দুর্দশা। এরাও কি আর খোঁজ রাখে না কিছু? চাকর দারোয়ানরা আগের মতোই হেসে সম্বর্ধনা জানাল বটে, সেই সঙ্গে তার আপাদ-মস্তক চোখ বুলিয়ে বর্তমান অবস্থাটাও নিশ্চয় আঁচ করে নিল। গিলটির বালা আর সেই অদ্বিতীয় ফঙ্গ-বেনে হার—গয়না বলতে তো এই, শাড়িও সেই মতির আমলেরই—ভাল কাপড় বলতে এই একখানাতেই ঠেকেছে এখন।

তারা কেউ সত্যিই অত লক্ষ্য করছিল কিনা কে জানে—সুরবালার মনে হল সবাই সেই দিকে তাকিয়ে আছে। কোনমতে—প্রাণপণে লজ্জা দমন করে যতটা সম্ভব সহজভাবে ওপরে উঠে গেল বটে, তবে কানের কাছে জ্বালা-করা ভাবটা থেকেই বুঝতে পারল—লজ্জা ও অপমানের রক্তাভা ঢাকা পড়ে নি, যদি কারও চোখ থাকে সে বুঝতে পারছে।

মতির ঘরের সামনে গিয়ে কিন্তু আর এসব কথা মনে রইল না। সত্যিই চমকে উঠল সে। কিছুক্ষণের জন্যে অন্তত নিজের ব্যথা—নিজের প্রতি অবিচারের কথাটা ভুলে গেল। এ কী হাল হয়েছে মাসীর! দাশুর মা মিছে কথা বলে নি—কী দিয়েছে কবিরাজ পুলটিশে—মনে হচ্ছে হিং রশুন ছাড়াও ঐ জাতীয় কিছু আছে। তাদের মিলিত দুর্গন্ধে ঘরে ঢোকা যায় না। তার সঙ্গে মালিশের একটা উৎকট কটু গন্ধ। এই দুর্গন্ধের মধ্যে মেঝের বিছানাতে অসহায়ভাবে পড়ে আছে মতি—হাত-পা হাঁটু সব ন্যাকড়া জড়ানো-জড়ানো কুটে রুগীর মতো, রোগে ভুগে ভুগে মুখের চামড়া কুঁচকে বিশ্রী হয়ে গেছে, চুলগুলো অর্ধেকের ওপর উঠে গেছে—যেকটা অবশিষ্ট আছে তারও বেশির ভাগ পাকা—সবটা জড়িয়ে সত্যিই মনে হচ্ছে—মৃত্যুর আর বেশী দেরি নেই।

সেদিকে চেয়ে দেখে অকস্মাৎ সুরোর দুই চোখে জল এসে গেল। সে ছুটে গিয়ে মতির গায়ে হাত রেখে বলল, 'এ কী হাল হয়েছে তোমার মাসী, আমাকে দু-দিন আগে ডাকতে পারো নি? এ কী অবস্থায় পড়ে আছ! এই দেখতে ডেকে পাঠালে আমায়!'

সুরোর এই চোখের জলটা মতি আশা করে নি। আন্তরিকতার চেহারা সে দেখেছে—চেনে। আনন্দে আবেগে অনুশোচনায় তারও চোখে জল এসে গেল। সে প্রায় ডুকরে কেঁদে উঠে বললে, 'ওরে কী মুখ নিয়ে তোকে ডাকব সুরো, আমার কি পাপের শেষ আছে! তোর ওপর যে অন্যায় করেছি ভগবান তারই সাজা যে দিচ্ছেন আমাকে। আর আমার বেশি দিন নেই রে—তুই আমাকে মাপ করে যা মা, নইলে এ যন্তন্না থেকে আমি রেহাই পাব না।'

সুরবালা তাড়াতাড়ি ওর মুখে হাত চাপা দিল, 'ছিঃ! ওসব কথা কী বলছ মাসী। অমন করে বলো না। আমার কাছে তোমার এমন কোন অন্যায় হয় নি যে—সেইজন্যে তোমার এই ব্যামো হবে। ওকথা বলতে নেই। যা-ই হোক, রাগ করে অভিমান করে যা করেছ—মিথ্যে হলেও তার বেশি কিছু নয়। তেমনি তোমার কাছে আমার দেনাও কম নয়, সে কথা যদি আমি গরমান্যি যাই তো আমি মহাপাতুকী বুঝতে হবে।...তুমি চুপ করো মাসী, বাত এমন একটা সাংঘাতিক ব্যামো কিছু নয়—আবার সেরে উঠবে। বড় কবিরাজ দেখছে—ভয় কি!...কিন্তু তুমি এ কী হালে পড়ে রয়েছ, একটু সাফ-সুতরোও করে দিতে পারে নি কেউ?'

সত্যিই বিছানাটার দিকে তাকানো যায় না। মালিশের তেল লেগে চাদরটায় ছাবকা ছাবকা দাগ হয়েছে তাতে ধুলো আটকে চিট-চিট করছে ময়লা। এমনিতেও—কতকাল সে চাদর বদলানো হয় নি তার ঠিক নেই। হয়ত অসুখের শুরু থেকেই এর ওপর পড়ে আছে। ভিখিরিরাও এমন বিছানায় শোয় না। সেই শৌখীন মতির এই হাল!

ঝিয়ের দল এসে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল, তাদের দিকে চেয়ে সুরবালা তিরস্কারের সুরে বলল, 'তোমরা এতগুলো মানুষ করো কি? চাদরটাও বদলে দিতে পারো নি?'

'বদলাবো কেমন করে বলো। মাকে নাড়া যায় নি যে। মা উঠতে পারলে তবে তো বদলাবো।' মালতী ঝি বলে উঠল। সে নতুন লোক, কোথাকার কে হঠাৎ এসে তাদের ওপর তম্বী শুরু করল—ব্যাপারটা তার ভাল লাগছিল না একটুও।

'ওমা, তাই বলে রুগীটা এই এক চাদরে এতকাল পড়ে থাকবে! বলিহারী তোমাদের আক্কেল তো।'

সেই বোনঝিটিও ইতিমধ্যে ওর সাড়া পেয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল দামী শান্তিপুরে শাড়ি আর চন্দ্রহারের ঝিলিক খেলিয়ে সে বললে, 'আমিও তো তাই বলছিলুম—তা মাসী যে নাড়াতে গেলেই চিল চেঁচায় একেবারে!'

'আচ্ছা, আমি দেখছি। দিন তো দেরাজ থেকে একটা কাচা চাদর বার করে, আর গোটাকতক অড়।'

বোনঝি অসহায়ভাবে ঝিদের দিকে তাকায়।

'ঐ যে—ঐ দেরাজটায় থাকে সব। চাদর অড় সব কাচা থরে থরে সাজানো আছে।'

সুরবালাই আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। এ বাড়ির কিছুই তার অজানা নেই।

মতি নাকে-কেঁদে উঠে, 'ও তুই পারবি না সুরো, সত্যিই হাত-পা ধরে কেউ নাড়লে যেন মরণ-যন্তন্না হয়। তারচেয়ে এ বেশ আছি।'

'তা তুমি পাশ ফিরছ না?

'সে অতিকষ্টে, প্রাণটা বেরিয়ে যায় যেন সে সময়টায়।'

'সেই অতিকষ্টেই হবে। ওরা একটু পাশ ফেরাতে পারবে তো? আমিও ধরব এখন—'

এইটে সে শশীবৌদির কাছ থেকে শিখেছে। একবার ছেলের খুব অসুখের সময় — বদ্যিরা বলেছিল সান্নিপাতিক বিকার—বিছানা ছেড়ে ওঠা বারণ হয়ে গিয়েছিল। অথচ বৌদি কেমন সুকৌশলে তাকে না তুলে চাদর পাল্টে দিতেন।

সেই বিদ্যেটাই কাজে লাগল আজ। ধরাধরি করে অতিকষ্টে ফিরিয়ে দিয়ে এদিক থেকে ময়লা চাদর গুটিয়ে সাদা চাদর পাততে পাততে গিয়ে আবার এ পাশ ফিরিয়ে ওদিকটা বদলে দিল। একটু-আধটু 'উ'-আঁ' 'বাপরে মারে' অবশ্য করল মতি, সুরো তা গায়ে মাখল না। চাদর বদলে দেবার পর বালিশের ওয়াড় পরানো দু মিনিটের কাজ।

বিছানার পালা শেষ হতে ছলছল চোখে মতি বললে, 'দেখলি দেখলি তোরা, কেন আমি সুরো সুরো করি—দেখলি নিজেদের চোখে? ভগবান যাকে রূপ দেন, গুণ দেন, তাকে বুদ্ধিও দেন। শুধু গানই গাইতে শেখে নি— সব দিকে নজর ওর, সব দিকে মাথা। ওর কড়ে আঙুলের যোগ্যতা তোদের কারও নেই।'

হরিমতী বহুকালের রাঁধুনী, সে আর থাকতে পারল না, বলে ফেলল, 'আমরাও তো সুরো সুরো করি দিদি, তুমিই তো এতকাল শাসিয়ে আমাদের মুখে গো দিয়ে রেখেছ—ও নাম করবে নি আমার কাছে।'

'তবেই দ্যাখ কত ভালবাসি। ভালবাসি বলেই তো এত অভিমান। যার কোন দাম নেই, যাকে আমার কোন দরকার নেই—তার কথায় রাগই বা করব কেন, রীষই বা করব কেন?...শোন সুরো, যা হয়ে গেছে হয়ে গেছে—আমি তো এই মরা পড়ে আছি—মড়ার চ্যাকড়াতেই পড়ে ছিলুম, তুই এলি তবু তোর দৌলতে একটু ভদ্দর লোকের মতো হল বিছানাটা—হ্যাঁ, যা বলছিলুম, আমি কবে উঠব, উঠলেও কবে আবার বাইরে যেতে পারব গান গাইতে পারব তার তো ঠিকই নেই—তাই বলছি, বাঁধা ঘরগুলো সব নষ্ট হচ্ছে—মজুরোগুলো তুই ধর। কী বলিস?' বলা শেষ করে একটু যেন উদ্বিগ্নভাবেই চায় সুরোর মুখের দিকে।

কী বলিস।

বুকের মধ্যেটা আশায় আনন্দে মুক্তির আস্বাদে যেন লাফিয়ে উঠে কিছুকালের জন্যে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল—মনে হল বুকের ভেতরের যন্ত্রণা থেমেই গেল বুঝি একটা তীব্র আনন্দের আঘাতে। তবু প্রাণপণে নিজেকে সামলেই নিল, স্থির হয়ে

রইল কিছুক্ষণ। এত দীনতা দেখাতে নেই চট করে। তাছাড়া মতিকে সে চেনে, হঠাৎ এত উদারতা স্বাভাবিক নয়, এর আড়ালে আরও কোন কথা আছে, আরও কোন শর্ত। সেইটে কি শুনে নেওয়া দরকার--রাজী হওয়ার আগে।

মতি কিন্তু অতক্ষণ ধৈর্য ধরতে পারে না, মিনতি করে। বলে, লক্ষ্মী মা আমার, হাজার হোক আমি তোর গুরু—ম্যাস্টার, গুরুর শতেক অপরাধও মেনে মানিয়ে নিতে হয়। ওস্তাদের কাছে গান-বাজনা শিখতে গেলে তার সমস্ত কম্মা করতে হয় তবে শেখায় সে। আমার ওপর আর রাগ অভিমান রাখিস নি। আমার ধারাটা বজায় থাক—ঘরগুলো, এইটুকু দেখেই আমার শান্তি।'

এবার উত্তর দিতে হল। কিন্তু গুছিয়ে সাজিয়ে কিছু বলতে পারল না, কেন 'কথা-শোনানো'ও গেল না। কেমন যেন দুর্বলই শোনাল জবাবটা, 'কিন্তু মাসী এতক্কালের অনবোস—এখন কি আর গাইতে পারব? তুমি ভাল থাকলেও না হয় একটু শিখিয়ে-পড়িয়ে দিতে।'

মতিও আশায় উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে, 'নে! তোর কি সেই শিক্ষা—না সেই গলা! ঈশ্বরদত্ত ক্ষ্যামতা তোর। জাত-গাইয়ে তুই। তুই কি আর অগাতো-গাইয়ে!.. যাদের কিছু হয় না, গঙ্গার ধারে গিয়ে বসে থাকে—মড়ার সঙ্গে যাবার জন্যে ভাঙা খোল-কত্তাল কিনে কীত্তনের দল করে। বেসুরো বেতালা যা হোক হলেই হল--ভাঙা গলা, চেরা গলা--তারাই হল গে অগাতো-গাইয়ে।..তুই একদিন দোয়ারদের নিয়ে, বাজনদারদের নিয়ে বোস—তাহলেই দেখবি গলা আবার ঠিক সুরে বলছে। না হয় আমার ঘরে এইখানেই বসবি, আমি দেখে দোব দরকার হয় তো ধরিয়েও দোব। দরকার হবে না অবিশ্যি—'

আরও একটু চুপ করে থেকে—মতি একটা যেন কি ইতস্তত করছে দেখে নিজেই কাজের কথাটা পাড়ল, 'তা আমি কি পাব মাসী?'

'ওমা, তুই আবার পাবি কি! সবই পাবি। এ কি মাইনের বন্দোবস্ত, তুই হলি এখন মুল গায়েন একজন, তোকে কি মাইনে করে রাখব! শুধু মুজরোর যে টাকাটা ধরে বায়না হবে তার অদ্ধেক আমার। আর পেলা যা পাবি—যদি বাড়তি কিছু দেয়—অনেক সময় দেয় অমন--একশো এক টাকা হয়ত বায়না হল—দোবার সময় খুশী হয়ে একশো পঁচিশ কি একশো একান্ন টাকা ধরে দিলে—সে সব তোর। তুই শুধু ধম্মত আমাকে মুজরোয় অদ্ধেক টাকা ধরে দিস—আমি আর কিছু চাইনে। যেখানে দোয়ারদের আলাদা খরচা দেবে না—সেখানে সেটা আমরা ভাগাভাগি করে দোব—তাকে সবটা দিতে হবে না...দ্যাখ্, অন্যেহ্য কিছু বলেছি? আমার নামে মুজরো আসবে, ঠাটবাট সব আমার—বস্তর-পাতি দোয়ার বাজনদার সব আমার—মজুরীর অদ্ধেক চাইছি। বলি, আপিস ভাড়াও তো একটা লাগত, কোথাও প্রেথক্ আড্ডা খুলে বসতে!'

না, অন্যায় কিছু চায়নি মতি সত্যিই। এতটাও আশা করেনি সুরবালা। সে ভেবেছিল মতি বারো আনা নিজের রেখে চার আনা ওকে দেবে কিম্বা সবই নিয়ে ওর সঙ্গে একটা মাইনের বন্দোবস্ত করবে। তাতেও বেঁচে যেত সুরো—এমন কি শুধু পেলার অর্ধেক পাবে বললেও রাজী হত।

'তা তুমি স্বচ্ছন্দে নিও। পেলার অদ্ধেকও নিও, আমি তোমাকে ঠকাব না। সব এখানে এনে তোমার সামনে গুনে গেঁথে চুলচেরা ভাগ করে বুঝিয়ে দোব।'

'না না, পেলা তোর। ও আমি চাই না। মুজরোর আদ্ধেক দিবি তো? পসার জমিয়ে মুখে নাতি মেরে চলে যাবি না?'

'ছি, মাসী। আমাকে কি তাই মনে হয়? এতকাল কি দেখলে তবে?'

'তা বটে। তবু, আমার গা ছুঁয়ে দিব্যি গাল। কালটা যে কলি। তাছাড়া পয়সা হলে নানা মন্তরণাদাতা এসে জোটে। বয়সটাও কাঁচা তোর হাজার হোক।'

'এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি, যা পাব অদ্ধেক দোব, কোনদিন এর নড়চড় হবে না—তুমি বেঁচে থাকতে নয়।'

'আ, বাঁচলুম। এতেই অদ্ধেক পেরান ফিরে পেলুম যেন। তবে একটা কথা, তোকে রোজ সকালে একবার করে এসে বসতে হবে। বায়না এলে দরদস্তুর করা, কথাবাত্তাবা বলা --তোকেই সব করতে হবে তো। আপিস করার মতো সকালে দুঘণ্টা হাজির থাকতে হবে। মানে—আমার সে টাইম দেওয়া ছেল—ঐটেই জেনে গেছে তো সবাই, সকাল নটা থেকে এগারোটা--এর মধ্যেই আসে বেশির ভাগ। অবিশ্যি যেদিন সকালেই গাওনা পড়ে সেদিন বাদ--যে এসে ফিরে যাবে, কী আর হবে, সে আমারও ফিরত। আমাদের তো আর কোন বাঁধা টাইম নেই থ্যাটারের মতো। এসব কথা কি দরদাম করা, নিজে ছাড়া হয় না। রঘোটা রাঘব বোয়াল একেবারে, মহা ধড়িবাজ আর মহা জোচ্চোর। রঘো কেন—যে কটা দালাল আছে, সব কটাই সমান। তবে রঘোটা একেবারে পুকুর চুরি করতে চায়। তোর কাছে গেছল আলাদা কারবার খুলতে আর পীরিত করতে—তুই সোংখানার খ্যাংরা দেখিয়েছিস—সব শুনেছি। ভাবিস নি আমার কানে কিছু এড়িয়েছে। বেশ করেছিস। সাপের পাঁচ পা দেখেছিল দিন কতক।'

এতেও রাজী হল সুরো। এ একরকম শাপে বরই হল বরং। এইটেই আসল কারবার। কারা বায়না আনে, কোন কোন বাঁধা বাড়ি আছে—এ সবগুলো জানা হয়ে যাবে। এর পর মতির সঙ্গে বেইমানী করতে চায় না সুরো কিন্তু মতি মারা গেলে যদি নিজেকে স্বাধীনভাবে এই কাজ করে খেতে হয় তখন এ জ্ঞান বা যোগাযোগ কাজে লাগবে। সব কাজেরই একটা বাইরের দিক আছে, সব কারবারেরই বাইরের ঠাট্—সেগুলো জানা দরকার বৈকি!......

স্থির হল সকালেই চলে আসবে সুরো প্রত্যহ। যাওয়া আসার গাড়ির ব্যবস্থা করবে মতি। লোকজন তো আর রোজ কি অষ্ট-প্রহর আসছে না, এইখানে এসে তার গলা-সাধা গান গটানো সব কাজই চলবে—আবার কেউ বাবু-ভাই এলে কথাবার্তাও কইতে পারবে। কি বলবে, কি বলতে হয়—প্রথম প্রথম মতিই শিখিয়ে দেবে, ভেতরে এসে জেনে যাবে জবাব—তারপর পোক্ত হয়ে গেলে সুরোই বলতে পারবে। যেদিন দুপুর থেকে গাওনা পড়বে সেদিন এখানেই খাবে, নইলে বাড়ি চলে যাবে। বিকেলে আসবার দরকার নেই। যদি কোনদিন তেমন প্রয়োজন হয় তো মতি খবর দেবে কি গাড়ি পাঠাবে।......

সুরো বাড়ি ফিরে দেখল নানু রান্নাঘরে বসে নিস্তারিণীর সঙ্গে গল্প জমিয়েছে। মতি ডেকে পাঠিয়েছে শুনেই আরও অপেক্ষা করছিল সে, খবরটা শুনে যাবে বলে। এখন সুরোর মুখ দেখেই অনেকটা অনুমান করতে পারল। বলল, 'কীরে, মনে হচ্ছে মতি কেত্তনউলীর ঘড়টা মটকে সাফ্ করে দিয়ে এসেছিস? বেশ করে ঘা কতক দিয়ে এলি নাকি—মনের ঝাল মিটিয়ে?'

সব শুনে মন্তব্য করল, 'মাগী তাহলে তোকেই যখ্ দিয়ে গেল বল—ও-ই হ'ল, এও একরকম যখ্ দেওয়া। তোকেই তো বসাল কারবার পাহারা দিতে। যাক—যা হল হল—বুঝতে তো পারছি আর তাকে উঠা ধানে পাত্ত করতে হবে না। ওকের উঠতে উঠতে খদ্দের সব তোর হাতে চলে আসবে। হাজার হোক তোর উঠতি বয়েস, চাঁচাছোলা গলা। তোর গান শোনার পর কি আর ওর ঐ শেলেষ্মধরা গলা শুনতে চাইবে কেউ? ওর দফা নিকেশ করেই ছাড়বি তুই।......নে, এখনই যা, দাঁড়া হরির নোটের ব্যবস্থা করগে যা। রোস্—তুই-ই বা কি করবি, দাঁড়া, আমিই বাতাসা কিনে আনছি। আর অমনি বাজারও করে আনছি—পরোটা-ধোঁকা হয়ে উঠবে না এত তাড়াতাড়ি—অন্তুর দম আর আসুবোখরার চাটনির যোগাড় করুক মা মাগী।'

'দাঁড়াও দাঁড়াও। এখনও এক পয়সাও ঘরে আসেনি।' সুরো বাধা দেবার চেষ্টা করে।

'তেমনি ঘর থেকে যাচ্ছেও না এক পয়সা। আমি খরচ করছি, তোর জামাইয়ের কি?'

নানু প্রায় ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে চলে গেল।

সুরো গেল শশীবৌদিকে খবরটা দিতে।

বৌদির সঙ্গে পরিচয় হবার পর এই প্রথম দেবার মতো একটা সুসংবাদ পাওয়া গেছে। তাঁকেই আগে দেবে যে।

(ক্রমশঃ)

বিবেকানন্দ শৈলমন্দির

মনকুমার সেন

মহা-ভারতের দক্ষিণ সীমান্তে তিন-সমুদ্রের সঙ্গমে, উচ্ছ্বসিত ফেনিল তরঙ্গ-রাশিকে উপেক্ষা করে, কিম্বা বলা যায় দুঃসাহসিক অভিযানে আলোকস্তম্ভের মতো,—দাঁড়িয়ে আছে দুটি শিলাস্তম্ভ। এদেরই একটিকে নামাঙ্কিত করা হয়েছে অপরাজেয় পৌরুষের প্রতীক, সর্ব-সেবার অগ্রদূত ও সর্বোদয়ের পূর্বাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের নামে। সমুদ্রের কিনারায় শক্তিময়ী কন্যা-কুমারীর মন্দির দর্শনের পর বীর সন্ন্যাসী স্বামীজীর এই স্মৃতি-শিলা যত দর্শন করেছি,—এবং ক্ষণকাল পরেই নৌকাযোগে পার হয়ে গিয়ে এই পুণ্যস্তম্ভ ও নির্মীয়মাণ মন্দির স্পর্শ করেছি, ভারত-দর্শন তত স্পষ্ট হয়েছে! মনে হয়েছে এই তো সেই মহান, বিচিত্র দেশ, যেখানে অধ্যাত্মবাদ ও আধ্যাত্মিক উপলব্ধি কেউ কাউকে ফেলে পলায়ন করেনি। সেই কোন বাংলাদেশের এক দুরন্ত যুবক কিনা তার কোন অভিযান খুঁজে পেল না—না পাহাড়ে, না জঙ্গলে, না অন্য-কোথাও—সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে, সাঁতার কেটে উত্তীর্ণ হল মূর্তিমান বিপদ ঐ জোড়া-শৈলে, আর ত্রিনয়নে ভারত তথা জগতের অভিন্নরূপ, একাত্মতা দর্শন করতে করতে তন্ময় হয়ে পড়ল! অবিশ্বাসীর কাছে এ অর্থহীন, বিশ্বাসীর কাছে এ হচ্ছে আধ্যাত্মিক-দিগবলয়ে এক নবীন সূর্যের আত্মপ্রকাশের সংকেত।

সেই 'প্রকাশ' পরবর্তীকালে ঘটেছিল: আমেরিকার শিকাগো শহরে বিশ্বধর্ম সম্মেলনকে এই দীপ্যমান নবারুণ করেছিল চমকিত ও বিমুগ্ধ, তার স্বদেশের ভূমিকে তারুণ্যের তেজে, আত্মিক মাহাত্ম্যে ও অবনত-মানবতার একান্ত সেবায় উজ্জ্বল।

স্বামীজী স্বপ্ন দেখেছিলেন এক মহাত্মার, দীন-দুঃখীর বেদনা যাকে অস্থির করে তুলবে: তাঁর স্বপ্নদর্শনকে সত্য করে আবির্ভূত হলেন মহাত্মা গান্ধী: আত্মিক শক্তিতে অন্যায়ের প্রতিরোধ ও সর্বতোমুখী সেবার যিনি এক অনন্য দৃষ্টান্ত।



কন্যাকুমারিকার মন্দিরে দেবীমূর্তি

বিবেকানন্দ-শৈলের সন্নিকটেই বেলা-ভূমির ওপর নির্মিত হয়েছে গান্ধী-মন্দির। কন্যাকুমারী-মন্দির, বিবেকানন্দ শৈলমন্দির আর গান্ধী-মন্দির—তিনটি সূত্রে গাঁথা ভারতের সুপ্রাচীন সংস্কৃতি ও অধ্যাত্ম-শক্তিরই একটি পরমরমণীয় ছবি। কন্যাকুমারী ছোট শহরটি এই ছবি ধারণ করে ধন্য, ধন্য সেই তীর্থংকর ও পর্যটক দল যাঁরা দেশ-বিদেশের কোন কোণ থেকে সুযোগ পেলেই ছুটে যায় এই সঙ্গম তীর্থে।

আগে ছিল স্থানীয় রাজ্য ত্রিবাঙ্কুরের অন্তর্গত: সুদাক্ষিণী রাজ্য মাদ্রাজের সর্বাধিক আকর্ষণীয় মফস্বল শহর এই কন্যাকুমারী।

যাবার পথ

মাদ্রাজ রাজ্যের মাদুরা হয়ে কন্যাকুমারী যাবার পথ: একটি পশ্চিমঘাট পর্বতমালার মধ্য দিয়ে কেরলের রাজধানী ত্রিবান্দ্রম, ত্রিবান্দ্রম থেকে বাসে চড়ে ৫৭ মাইল; অপরটি হল—তিনেভেলী পর্যন্ত রেলে, তিনেভেলী থেকে বাসে ৫৫ মাইল।

মাদ্রাজ ও কেরলের বাস-ব্যবস্থা সময়ানুবর্তিতা ও সুখকরতার দরুন যাত্রীদের কাছে স্মরণীয়। প্রকৃতিদেবী এই অঞ্চলটিতে যেমন অপরূপা তেমনি লাবণ্যময়ী। ঘন সবুজের অনাবিল বিস্তার কোনদিক থেকেই চোখ আর ফেরাতে দেয় না—নদী-নালা, ছোট-বড় জলধারা, দিগন্ত-বিস্তারী ক্ষেতের মধ্য দিয়ে কাছে ও দূরে কখনও নিটোল-বলিষ্ঠ নারিকেল, কখনও বা কলা বা আম বন ডিঙিয়ে চড়াই-উতরাই সড়ক ধরে বাস যখন এগুতে থাকে, মনেই হয় না বাংলার বাইরে আছি।

মসৃণ, সরীসৃপ গতিতে চলতে চলতে এক সময় আমাদের বাসটি যেন একেবারে সমুদ্রের কিনারায় গিয়ে হুস করে থেমে গেল। রীতিমত চমকে উঠলাম!...না, আসলে কিনারায় নয়—শেষ বাসস্টপ থেকে রাস্তা

খুব ঢালু হয়ে সমুদ্রের দিকে নেমে গেছে, তাই বাসের পেছনের সীটে বসে সামনের দিকে তাকালে তখন মনে হয় যেন স্থলভূমি ছাড়িয়ে অকস্মাৎ বাসটি কোথায় নীচে ঝাঁপিয়ে পড়েছে!

সুদর্শনা কুমারীকন্যা

বাস থেকে নামলাম যেখানে, সেখান থেকে প্রায় দেড়শ গজ সমুদ্রগামী পথের এক ধারে বিশাল বিবেকানন্দ স্মৃতি-শৈল মণ্ডপ, শিল্পী ও সংগঠকদের তৎপরতায় মুখর। মণ্ডপ পেরিয়ে সমুদ্রের বাঁধানো উঁচু পাড় ধরে বাঁয়ে আবার দশ গজ পথ অতিক্রম করলেই কন্যাকুমারী মন্দির, মন্দিরের পথে ও প্রতিবেশে বিচিত্র বিপণী ও বসতি, যাত্রীদের সুলভ বাসস্থান যাত্রীদের ক্লান্তি সহজেই নিঃসঙ্গতা ভুলিয়ে দেয়। আর, দেবীদর্শনের পর পাড় থেকে বা বিস্তৃত বেলাভূমি থেকে যেদিকে তাকানো যায় জল আর জল : পূর্বে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে আরব সাগর, আর দক্ষিণে ভারত মহাসাগরের সঙ্গম ঘটেছে এই সুদর্শনা কন্যাকুমারিকায়। ক্ষুদ্র চিন্তা ও ক্ষুদ্র স্বার্থের গণ্ডী থেকে অন্ততঃ মুহূর্তের জন্যও নিজেকে তুলে ধরবার এ এক মহৈশ্বর্য-আত্মদর্শন!

পুরাকালে হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত বিশাল ভারতে রাজা ভরত রাজত্ব করতেন বলে জানা যায়। রাজার আটটি পুত্র ও একটি কন্যা,—কন্যার নামকরণ হয়েছিল 'কুমারী'। ভরত তাঁর গোটা রাজত্বকে নয় ভাগে চিহ্নিত করে এক এক ভাগ প্রশাসনের দায়িত্ব এক একটি সন্তানের ওপর দিয়েছিলেন : দক্ষিণ অংশের রাজত্ব পেয়েছিলেন 'কুমারী' কন্যা। বলাই বাহুল্য, কন্যাকুমারী দর্শনের জন্য যে-কোন দিনই পবিত্র দিন; তথাপি, চৈত্রের প্রথম দিন, চৈত্র পূর্ণিমা, বৈশাখী পূর্ণিমা, আষাঢ়-অমাবস্যা 'মহালয়া' নবরাত্রি প্রভৃতি উপলক্ষে কুমারী-দর্শন পুণ্যার্থীদের কাছে অধিক পবিত্র বলে গণ্য হয়ে আসছে।

কন্যাকুমারী প্রসঙ্গে বৈদিক উপাখ্যানটিও সুন্দর : কশ্যপ প্রজাপতির পুত্র বাণাসুর কঠিন তপস্যার দ্বারা 'অমরত্ব' লাভ করেছিলেন,—কিন্তু কোন 'কন্যার' হাতে তাঁর মৃত্যু হবে না এরূপ বর তিনি পাননি। অমরত্বের অহংকারে দিগ্বিদিগজ্ঞান হারিয়ে বাণাসুর তাঁর আসুরিক অত্যাচারে মাতা পৃথিবীকে অস্থির করে তুললেন। ব্রহ্মা কোন সাহায্য করতে পারলেন না,—তখন পৃথিবী বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন। বিষ্ণু বললেন, একমাত্র পরাশক্তি মহামায়াই বাণাসুরকে স্তব্ধ করতে সক্ষম। কিন্তু তার জন্য এক বৃহৎ যজ্ঞের আয়োজন করতে হবে। এই যজ্ঞাগ্নিতে দেবতাগণ তাঁদের সকল শক্তি আহুতি দেবেন, তখন সেই হোমাগ্নি থেকে যে জ্যোতির্ময়ী মূর্তি আবির্ভূতা হবেন, তিনিই হবেন সর্বমঙ্গল-মঙ্গলা।

যজ্ঞ হল, জ্যোতির্ময়ী কন্যাও উদ্ভূতা হলেন। ক্রমে তিনি হলেন বয়ঃপ্রাপ্তা,—তাঁর বিবাহের ব্যবস্থা হতে লাগল। ত্রিভুবন-বিহারী ও অঘটন-ঘটনে পারঙ্গম দেবর্ষি নারদ প্রমাদ গণলেন।—বিবাহ হয়ে গেলে 'কন্যা' তো আর কুমারীকন্যা থাকবেন না,—তখন যে বাণাসুরকে বধ করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। নারদের কৌশলে নানারকম সর্তাধীনে দেবাদিদেব শঙ্কর কন্যা-কুমারীর পাণিগ্রহণের জন্য যাত্রা করলেন! নিশাকালে কুমারীও এই অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুত। শঙ্কর যখন কন্যাকুমারীর অদূরে সুচীন্দ্রমে পৌঁছুলেন, কূটবুদ্ধি নারদ তখন স্থানান্তর থেকে মোরগের ডাক ডেকে ওঠে শঙ্করকে হতবুদ্ধি করে দিলেন! শঙ্কর ভাবলেন রাত ভোর হয়ে গেছে,—আজ তো আর বিয়ে হবে না, বিয়ে নিশ্চয় স্থগিত থাকবে।—শঙ্কর স্থাণুবৎ সুচীন্দ্রমে দাঁড়িয়ে রইলেন,—আর ওদিকে কন্যাকুমারীতে দাঁড়িয়ে রইলেন তপস্বিনী ও প্রতীক্ষিতা পার্বতী। কন্যাকুমারী এ ঘটনার পর চিরকুমারী থাকার সংকল্প করলেন।

বিবেকানন্দ শিলা

কুমারী মন্দিরের দক্ষিণ-পূর্বে তীর থেকে প্রায় আড়াই ফার্লং দূরে, তরঙ্গ-ভঙ্গের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে জোড়া শিলা। ঠিক জোড়া নয়,—একটি থেকে অপরটির দূরত্ব প্রায় ২০০ ফুট। অপেক্ষাকৃত ছোট শিলাটি তটভূমির কিছু কাছাকাছি, কিন্তু এটির উপরিভাগ প্রায় লম্বালম্বি বলে তাতে বসবার সুযোগ নেই। অপেক্ষাকৃত দূরের শিলাটি আকারেও বড়, প্রায় ৫৫০×৫৯০ ফুট। তার উপরিভাগও অনেকখানি প্রশস্ত। আমরা নৌকোয় করে গিয়ে, দীর্ঘ বড় দলে উপরে উঠে হাত-পা ছড়িয়ে বসে গান ও গল্প করেছি প্রাণভরে। স্বামীজীও এই সামুদ্রিক ঊর্মিমুখর উপরেই ধ্যানস্থ হয়েছিলেন—আর সেজন্যই এটি বিবেকানন্দ শিলা নামে পরিচিত। পৌরাণিক আখ্যান এবং বিশেষজ্ঞগণের গবেষণামতেও এই শিলাস্তম্ভটি অতি পবিত্র, কেননা, তাঁদের মতে এটি হচ্ছে 'শ্রীপদ পরাই'। তামিলে 'পরাই' মানে পাহাড়। অর্থাৎ দেবীর শ্রীপদ তথা তপস্বিনী দেবীমূর্তি এখানেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। কন্যাকুমারীর সামুদ্রিক পৃষ্ঠভূমি, তার পৌরাণিক পবিত্রতা এবং জলপথে তার বিশ্বসংযোগই যে পরবর্তীকালের বিশ্ব-বিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দকে এই দূরান্তের তৎকালীন দুর্গম স্থানটিতে আকৃষ্ট করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের শেষাশেষি স্বামীজীর এই কুমারী দর্শন ও সাগর-ধ্যান মানবাত্মার এই বাণী মূর্তির মধ্য দিয়ে ভারতের শাশ্বতদৃষ্টি, সার্বিক কল্যাণ-চিন্তা বা বিশ্ববোধকেই নতুন মন্ত্রে জাগরিত করেছিল।

স্বামীজীর জীবনকথায় জানা যায় :

স্বামীজীর ধ্যান-ধারণা

...'রামেশ্বর থেকে স্বামীজী গেলেন কন্যাকুমারী (কেপ কমোরিণ)। এইখানে তিনি ভারতের পবিত্রতা ও গভীর আধ্যাত্মিক জীবনের কথা চিন্তা করলেন, যে-জীবনের দুটি শিখর-স্বাক্ষর হচ্ছে বদরিকাশ্রম ও কন্যাকুমারী। মাকে দেখবার জন্য তখন তিনি শিশুর মত ব্যাকুল। দেবীমূর্তির সম্মুখে স্বামীজী লুটিয়ে পড়লেন। পূজাশেষে, উদ্দাম ও উত্তাল তরঙ্গমালা সাঁতার কেটে তিনি গেলেন সেই শিলায়,—তাঁর মনে তখন



প্রস্তর কেটে মন্দিরের রূপসজ্জায় প্রখ্যাত স্থপতি শ্রীএস কে আচারী

চলেছে আরো উদ্দাম ঝড়। ভারতের সেই শেষ উপলখণ্ডের ওপর ধ্যানস্থ হয়ে তিনি ভারতের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মানচিত্রের ওপর দৃষ্টিপাত করলেন। ভারতের অধঃপতনের মূলে তিনি প্রবেশ করলেন এবং দ্রষ্টারূপে উপলব্ধি করলেন কেন গৌরবোজ্জ্বল ভারতবর্ষ অবনতির গভীর খাদে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। সামান্য সন্ন্যাসী এক মহান সংস্কারক, মহান সংগঠক এবং জাতির এক মহান রূপশিল্পীতে রূপান্তরিত হলেন। ভারত-পৃথিবীর উদ্দেশ্য ও ফলপ্রসূতার কথা তিনি মনন করলেন... ভারতের দারিদ্র্যের চিন্তা তাঁর হৃদয়কে অন্তহীন মমতা ও অন্তহীন বেদনায় দ্রবীভূত করল। তিনি ভাবলেন, জনগণই যদি না রইল, তবে ধর্ম কিসের জন্য? সর্বত্র সর্বকালে দরিদ্র ও অবনত মানুষই অত্যাচারিত হয়েছে। পুরোহিতকুলের স্বেচ্ছাচার, জাতি দম্ভের পীড়ন, এই সমস্তই ভারতীয় জাতির 'অগ্রগতির পথে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা'। পরবর্তী কালে তিনি নিজেই লিখেছেন, "এই সমস্ত দেখে, বিশেষ করে জনগণের দারিদ্র্য ও অজ্ঞতার চিন্তায় আমার এতটুকু ঘুম ছিল না। কন্যাকুমারীতে কুমারী-মাতার মন্দিরের সামনে বসে, সামুদ্রিক শিলার ওপর উপবেশন করে আমি এক প্ল্যান করলাম: এই যে আমরা সব সন্ন্যাসীরা ঘুরে ঘুরে লোকদের মনোবিজ্ঞানের বাণী দিচ্ছি এ তো নিছক পাগলামী। আমাদের গুরুদেব কি বলতেন না, "খালি পেটে ধর্ম হয় না।" ঐ যে দরিদ্র জনগণ বর্বরের জীবন যাপন করছে তার একমাত্র কারণ তাদের অজ্ঞতা। যুগ যুগ ধরে আমরা তাদের রক্ত শোষণ করেছি ও পায়ের তলায় তাদের মাড়িয়েছি।"

কিন্তু প্রতিকার কি? স্বপ্নদৃষ্টি স্বামীজী দেখলেন—ত্যাগ ও সেবাই হওয়া চাই ভারতের যুগ্ম-আদর্শ। জাতীয় জীবনকে যদি এই ধারায় বেগবতী করা যায়, তাহলে আর কিছুর জনাই ভাবতে হবে না।

..."পর্বত যদি মহম্মদের কাছে না আসে মহম্মদই পর্বতের কাছে যাবে। গরীবরা এত গরীব যে ইস্কুল ও পাঠশালায় আসতে পারে না; কাব্যপাঠ প্রভৃতিতে তাদের কোন লাভ হবে না। জাতি হিসেবে আমরা আমাদের চরিত্র হারিয়েছি, আর ভারতের যাবতীয় অনিষ্ঠের মূলে রয়েছে তাই। জাতিকে এই হৃত-চরিত্র ফিরিয়ে দিতে হবে, জনগণকে উপরে তুলতে হবে।"

ব্যথাহত আশাহত সন্ন্যাসী অনন্ত সমুদ্রের দিকে তাকালেন,—একটি আলোর রেখা তাঁর দৃষ্টিপথ ভেদ করে চলে গেল! ..হ্যাঁ তাঁকে সমুদ্র পার হতে হবে এবং ভারতের লক্ষ লক্ষ মানুষের নামে আমেরিকায় যেতে হবে।

এই কন্যাকুমারীতেই তাঁর ভারত-চিন্তার পরিণতি ঘটেছিল, ...এই মুহূর্ত থেকেই ভারতসেবায় বিশেষ করে জাতিচ্যুত উপবাসী কোটি কোটি দরিদ্র-নারায়ণের সেবায় তিনি তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

[The Life of Swami Vivekananda. By His Eastern & Western Disciples. পৃঃ ২৫১-২৫৪। বর্তমান নিবন্ধকারকৃত সারানুবাদ]।

স্মৃতি-মন্দিরের পরিকল্পনা

কোচিনে তৈরী এক বিশেষ ধরনের হাল্কা অথচ মজবুত নৌকায় করে যাত্রীদের বিবেকানন্দ-শিলায় পারাপার করানো হয়। স্বামী বিবেকানন্দ-শৈল স্মৃতি কমিটি জেটি তৈরী হওয়া সাপেক্ষে এই ব্যবস্থাটি করেছেন, এর অন্য কোন মাশুল নেই।—তবে প্রায় প্রত্যেক যাত্রীই খুশী হয়ে স্মৃতিভাণ্ডারে কিছু না কিছু দান করে আসেন। কমিটির কন্যা-কুমারী জেলা শাখার সম্পাদক শ্রীক পরমেশ্বরণের সঙ্গে কয়েকবার কথাবার্তা হল এই স্মৃতি-মন্দিরের পরিকল্পনা ও তার অগ্রগতি সম্পর্কে। বর্ষীয়ান, আদর্শবাদী ও উদ্যমী সমাজসেবী এই পরমেশ্বরণ। তদুপরি পণ্ডিতও। সেই সুদূর কন্যাকুমারীতে সিমলার নরেন্দ্রনাথের জন্য কি বিপুল শ্রদ্ধার্পিত ভাবনা ও প্রয়াস প্রতিনিয়ত চলছে, তা দেখে অভিভূত হয়েছি: লজ্জাও হয়েছে—বাংলা দেশে আজ পর্যন্ত আমরা এ-কাজে কতদূর এগিয়েছি?

মাথা-উঁচু ঢেউ ভেঙে ভেঙে যাত্রী-বোঝাই বোটটি বিবেকানন্দ শিলার কাছাকাছি যেতেই নাবিকদের একজন লাফিয়ে তার ওপরে উঠে যান এবং মোটা রশি দিয়ে টেনে ধরে ধীরে ধীরে তরঙ্গের টানা পোড়েনের পরীক্ষা কাটিয়ে বোটটিকে শিলায় আড়াআড়ি করে ফেলেন। তখন শুরু হয় যাত্রীদের পরীক্ষা। রীতিমত লাফ মেরে বোট থেকে শিলায় উঠতে হয় নাবিক ও সহযাত্রী বন্ধুদের সাহায্য নিয়ে। নীল আকাশের নীচে ঊর্মিমুখর সমুদ্রের মাঝখানে, বিশ্ববরেণ্য সন্ন্যাসীর পুণ্যস্মৃতির আলোকসন্ধানে এ এক অনবদ্য অ্যাডভেঞ্চার! .. ..সেই মুহূর্তে বার বার স্বামীজীর রচিত 'সাগরবক্ষে' কবিতাটি মনে পড়ছিল।

নীলাকাশে ভাসে মেঘকুল,
শ্বেতকৃষ্ণ বিবিধ বরণ
তাহে তারতম্য তারলার
পীতভানু মাগিছে বিদায়,
রাগচ্ছটা জলদ দেখায়।
বহে বায়ু আপনার মনে,
প্রভঞ্জন করিছে গঠন—
ক্ষণে গড়ে, ভাঙে আর ক্ষণে—
কত মত সত্য অসম্ভব—
জড়, জীব, বর্ণ, রূপ, ভাব।
ঐ আসে তুলারাশি সম,
পরক্ষণে হের মহানাগ
দেখ সিংহ বিকাশে বিক্রম,
আর দেখ প্রণয়ীযুগল;
শেষে সব আকাশে মিলায়।
নাচে সিন্ধু গায় নানা তান;
মহীয়ান সে নহে, ভারত!
অম্বুরাশি বিখ্যাত তোমার;
রূপরাগ হয়ে জলময়
গায় হেথা, না করে গর্জন।

[স্বামীজীর বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, ২৭৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

মন্দিরের পরিকল্পনা অনুযায়ী শিলার ওপরেও পুরোদস্তুর কাজ চলছে: মাপজোক, কাটাকুটি, ওঠানো-নামানো। যাত্রী-দলের এক তরুণ সেবক, স্মৃতি কমিটির কর্মী আমাদের দেখালেন শিলার ওপর সেই 'শ্রীপদ' চিহ্ন; আরও জানালেন এই পদচিহ্নকে কেন্দ্র করেই মন্দিরের নতুন পরিকল্পনাকেও শাস্ত্র-বিধিসম্মত করা হয়েছে।

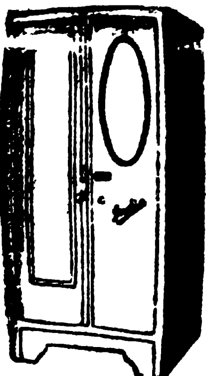
স্মৃতিমন্দিরের রূপরেখা (ডিজাইন) তৈরী করেছেন মাদ্রাজের বিখ্যাত স্থপতি ও বাস্তুশিল্পী, তিরুভাদুরের শ্রীএস কে

সকল ঋতুতে অপরিবর্তিত ও অপরিহার্য পানীয়

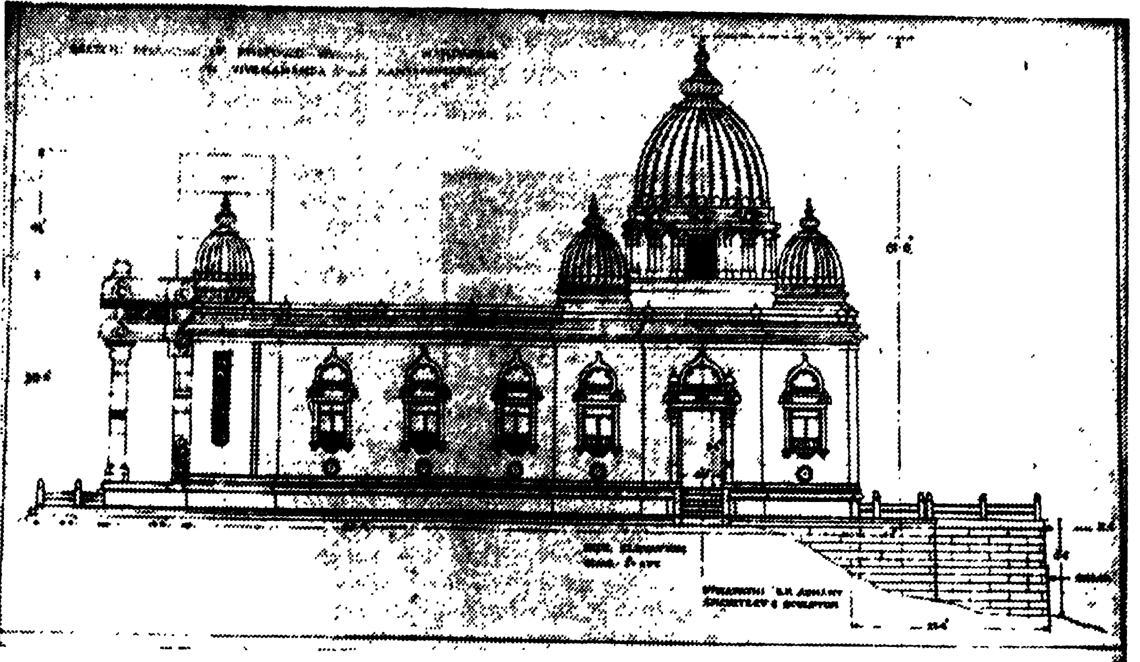
চা

কেনবার সময় 'অলকানন্দার' এই সব বিক্রয় কেন্দ্রে আসবেন

অলকানন্দা টি হাউস
৭, পোলক স্ট্রীট কলিকাতা-১
২, লালবাজার স্ট্রীট কলিকাতা-১
৫৬, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ কলিকাতা-১২
॥ পাইকারী ও খুচরা ক্রেতাদের অন্যতম বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান ॥



নিরাপত্তা ও সৌন্দর্যের জন্য কিনুন
ইণ্ডিয়া ষ্টীল আলমারি
• মজবুত ফিটিংস • ভাল ফিনিশ
• নকল চাবি লাগবে না সেজন্য গ্যারান্টি দিচ্ছি।
ইণ্ডিয়া ষ্টীল ফার্ণিচার
ম্যানুঃ কোং
১৫, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭
'গ্রেস' সিনেমার পশ্চিমে — ফোন ৩৪৭৫৯২



স্বামী বিবেকানন্দ স্মৃতিমন্ডপের রূপরেখা

আচারী। সহশিল্পীদের নিয়ে তিনি তাঁর কর্মে যেন ধ্যানমগ্ন,—কখনও মণ্ডপে, কখনও শিলায়। এ-কাজ শুধু জ্ঞানে হয় না, ধ্যানও চাই; শুধু কুশলতায় হয় না, হৃদয় চাই।

বিবেকানন্দ শিলায় একটি যথোপযুক্ত স্মৃতিমন্দিরের কল্পনা অনেকেই করেছেন বহুদিন থেকে: স্বামীজী শতবার্ষিকী উৎসবই এই কল্পনাকে প্রাণবন্ত করে তোলে এবং এর একটি বাস্তব রূপ দেবার আগ্রহ পরিস্ফুট হয়। জনগণের এই আগ্রহদৃষ্টেই গঠিত হল সারা ভারত বিবেকানন্দ শতাব্দী উৎসব ও বিবেকানন্দ-শিলাস্মৃতি কমিটি। ১৯৬৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মাদ্রাজ রাজ্যসরকার শৈলমন্দিরের পরিকল্পনা অনুমোদন করেন।

লম্বায় ৯৫ ফুট ও চওড়ায় ৩৮ ফুট এই শৈলমন্দির বা মণ্ডপের প্রায় গোটাটাই তৈরী হবে গ্র্যানাইট পাথরে। মণ্ডপের চারধারে অনেকটা খোলা প্ল্যাটফর্ম রেলিং দিয়ে ঘেরা থাকবে। মণ্ডপের পশ্চাদ্ভাগে প্ল্যাটফর্মের তলায় ৫০×২৫ ফুটের একটি হলেরও ব্যবস্থা থাকবে। এই হলে স্থাপিত হবে স্বামীজীর একটি পূর্ণাবয়ব মূর্তি। মণ্ডপের অন্তর্দেশীয় গাত্রে উৎকীর্ণ থাকবে শাস্ত্রীয় বাণী ও স্বামীজীর জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনাপঞ্জী। মণ্ডপের প্রবেশভাগ অজন্তা গুহার শিল্প-শৈলী অনুসরণে তৈরী হবে। মণ্ডপটি হবে মোটামুটি উত্তর-পশ্চিমমুখী, দেবীপদের দিকে।

সমগ্র পরিকল্পনার মধ্যে তীর ও তরঙ্গ বরাবর শৈলমণ্ডপে সেতুবন্ধই বোধ হয় সবচেয়ে দুরূহ কাজ। এই সেতু, এবং সাময়িক জেটিও বস্তুবিজ্ঞান ও কারিগরী কলার এক দর্শনীয় বস্তু হয়ে থাকবে সন্দেহ নেই। স্থায়ী সেতুর ব্যাপারে স্থানীয় মৎস্যজীবীদের আপত্তি আছে শুনেছি।

কন্যাকুমারীর প্রায় একশ মাইলের মধ্যে বিভিন্ন স্থান থেকে উপযুক্ত পাথর আহরণ করা হয়েছে ও হচ্ছে। বেশীর ভাগই এসেছে ষাট মাইল দূরবর্তী অম্বাসমুদ্র থেকে।

বাস থেকে নেমেই যে মণ্ডপের কথা আমরা বলেছি, তারি নীচে এই সব বিচিত্র, বিরাট বিরাট প্রস্তরখণ্ড জড়ো করা হয়েছে, তাদের কাটা-ফাটা ও নক্‌সা-করা হচ্ছে, শিল্পীর যাদুকরী হস্তে চিত্রিত হয়ে উঠছে পাথরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। ১৯৬৪ সালের ৬ই নভেম্বর পরিকল্পনার উদ্বোধন হয়েছিল মাত্র ৬ জন কারিগর ও শিল্পী নিয়ে, আর আজ কর্মী সংখ্যা দু'শ-রও বেশী। এঁরা বংশ-পরম্পরায় মন্দির-স্থাপত্যে কৃতবিদ্য,—বেশীর ভাগই মাদ্রাজী।

পাথর সাজানো প্রাঙ্গণের ('স্টোন-ড্রেসিং ইয়ার্ড') পাশেই তৈরী হয়েছে একটি সাময়িক কামারশালা,—কর্মীদের যন্ত্রপাতি সারাই করা ও মজবুত রাখার জন্য।

আনুমানিক ব্যয় ও বাংলার দায়িত্ব

পরিকল্পনার মূলে ব্যয়-বরাদ্দ ছিল ৪০ লক্ষ টাকা; কিন্তু জিনিসপত্রের দর চড়ে যাওয়ায় বর্তমানে ব্যয়ের অনুমান হচ্ছে ৫০ লক্ষ টাকা। এ পর্যন্ত সংগৃহীত হয়েছে ২০ লক্ষ টাকা, আর তা সম্ভবতঃই অতিদ্রুত নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে।

১৯৬৮ সালের মধ্যেই যে-পরিকল্পনার পূর্ণরূপারোপ করার সংকল্প নেওয়া হয়েছে তার জন্য অর্থসংগ্রহের এই গতি দুশ্চিন্তরই কারণ এবং সম্প্রতি দিল্লীতে স্মৃতি কমিটির মুখপাত্ররা এই দুশ্চিন্তাই প্রকাশ করেছেন।

এ-পর্যন্ত সাতটি রাজ্যসরকার তাঁদের প্রতিশ্রুত অর্থসাহায্যের আংশিক দান করেছেন। উল্লিখিত ২০ লক্ষ টাকার মধ্যে রয়েছে একমাত্র মহীশূর রাজ্যে জনগণের কাছ থেকে সংগৃহীত ৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা এবং মাদ্রাজ সরকারের ১ লক্ষ টাকা।

তীর থেকে শিলান্তর পর্যন্ত পাকা জেটি নির্মাণের দায়িত্বও মাদ্রাজ সরকার নিয়েছেন।

নতুন বৎসরে সব রাজ্যগুলোরই আরো বেশী উদ্যোগী হবেন এটাই প্রত্যাশিত। রাজস্থান দশ লক্ষ টাকা সংগ্রহের বিরাট দায়িত্ব নিয়েছে। প্রয়োজনীয় অর্থের বেশীও সংগৃহীত হয়ে যাবে তাতে সন্দেহ নেই,—কিন্তু অর্থসংস্থান ত্বরান্বিত হলে তবেই কাজ সুষ্ঠু হয়, কর্মীদল নিশ্চিন্ত মনে ও দূরদৃষ্টি নিয়ে কাজ করতে পারেন।

পশ্চিম বাংলার দায়িত্ব ও কর্তব্য যে এ-কাজে কত বেশী তা বলার প্রয়োজন নেই: কিন্তু এক দিকের রাজ্যের অস্বস্তিকর পরিস্থিতির দরুণ এবং অন্য দিকে, সম্ভবতঃ, উপযুক্ত কর্মী সংগ্রহ—পরিকল্পনার অভাবে, এখন পর্যন্ত বিশেষ কোন উদ্যোগ বা সাড়া নেই। রাজ্য কমিটির পরিকল্পনা অনুযায়ী মার্চ মাস থেকে ব্যাপক ও বাস্তবরূপে অর্থ-সংগ্রহ অভিযান শুরু হলে তার সাফল্য অবশ্যম্ভাবী। এই মহান ব্রতে রাজ্যের একটি স্কুল, একটি কলেজ একটি ক্লাব, তথা একটি কৃষ্টিমূলক ও সমাজসেবী সংগঠনও পিছিয়ে থাকলে সেটি হবে তার পক্ষে চরম লজ্জার এবং গোটা বাংলা দেশের পক্ষে অতীব অগৌরবের।

পশ্চিমবাংলার শাখা কমিটির শীর্ষে রয়েছেন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার। সুতরাং এই রাজ্যের অভিযানে এক সুনিশ্চিত নেতৃত্বও রয়েছে।

তিন সাগরের সঙ্গমে ৬১ ফুট উঁচু বিবেকানন্দ মণ্ডপ বিশ্বের যে বিস্ময় সৃষ্টি করবে তাতে আমাদের যথোপযুক্ত অবদান থাকাই চাই।

২৭ নম্বরে একজনও সর্বশুদ্ধ বিজয়ী হন নাই। দুইজন একটি ভুল করিয়া প্রত্যেকে ৮০০০, টাকা হিসাবে লাভ করিয়াছেন। ২৬ নম্বরে. শ্রীও. বি. আর. মেনন, ওভাথ হাউস, থিরুভামবাডি, ত্রিচুর-১ (কেরালা) ১৫,০০০, টাকা লাভ করিয়াছেন।

LitQuiz No. 28

Rs. 32,500

First Prize	RUNNERS-UP (UPTO ② ERRORS)	MINIQUIZ (UPTO ② ERRORS)	PRIZES IN BOOKS (A.C. ③ ERROR, MINIQUIZ A.C.)
Rs. 16,000	Rs. 10,000	Rs. 5,000	Rs. 500
	RELIEF FUND Rs. 1000		

এই এনট্রি ফরম ৪-২-৬৮ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায় পুনরায় প্রকাশিত হবে।

বন্ধের শেষ তারিখ

ডাকে প্রেরিত সকল প্রবেশপত্র : ৮-২-৬৮

আনন্দবাজারে সমাধান : ১৩-২-৬৮

আপনি আপনার প্রবেশপত্র পাঠাতে পারেন বুধবার ৭-২-৬৮ তারিখে কিন্তু উহা এক্সপ্রেস ডেলিভারীতে পাঠান।

সমাধান ফেরৎ পাইবার জন্য আপনার প্রবেশপত্রসহ নিজ ঠিকানা লিখিত ৬ পয়সার পোষ্টকার্ড পাঠান।

১. টাকা পাঠান এবং লিট্‌কুইজ টিকেটের ৫টি সংখ্যা লাভ করুন।

স্থানীয় এজেন্ট

নিম্নবর্ণিত এজেন্টের নিকট থেকে এনট্রি ফরম ও ক্যাশ রসিদ পাবেন :

পি, সি, অ্যান্ড কোং, ফ্ল্যাট নং ৬, ব্লক 'ই', ১৫, বেচুলাল রোড, কলিকাতা—১৪

২৮, লিট্‌কুইজের সরকারী ভর্তি ফর্ম

ADDRESS:—LITQUIZ No. 28. ALANKAR, BALARAM ST., BOMBAY-7 (WB).

দ্রষ্টব্য:—(১) প্রত্যেক কলমে. আপনার বাতিল করা শব্দটি কালি দিয়ে কেটে দিন; (২) আপনি যদি সবকয়টি কুপন না পাঠান, তাহলে বাকী কুপনগুলি বাতিল করে দিন; (৩) আপনি যদি মানি অর্ডারযোগে প্রবেশমূল্য পাঠান, তাহলে এই এনট্রি ফর্মের সংগে, ডাকঘর থেকে পাওয়া মানি অর্ডার রসিদটি অবশ্যই পাঠাবেন। মানি অর্ডার রসিদ ছাড়া এনট্রি বাতিল করা হবে; (৪) আই-পি-ও ক্রস করবেন না। লিট্‌কুইজ নং—২৮ বোম্বাই-৭-এর অনুকূলে টাকা পাঠান।

	Re. 1	1		Re. 1	2		Re. 1	3		Re. 1	4
1	BEAUTY	REALITY	1	BEAUTY	REALITY	1	BEAUTY	REALITY	1	BEAUTY	REALITY
2	BECOME	BEHOLD	2	BECOME	BEHOLD	2	BECOME	BEHOLD	2	BECOME	BEHOLD
3	BIRTH	FAITH	3	BIRTH	FAITH	3	BIRTH	FAITH	3	BIRTH	FAITH
4	CIVILIZATION	EDUCATION	4	CIVILIZATION	EDUCATION	4	CIVILIZATION	EDUCATION	4	CIVILIZATION	EDUCATION
5	CULTURAL	IDEOLOGICAL	5	CULTURAL	IDEOLOGICAL	5	CULTURAL	IDEOLOGICAL	5	CULTURAL	IDEOLOGICAL
6	ECONOMIC	SCIENTIFIC	6	ECONOMIC	SCIENTIFIC	6	ECONOMIC	SCIENTIFIC	6	ECONOMIC	SCIENTIFIC
7	FALLACIOUS	MONOTONOUS	7	FALLACIOUS	MONOTONOUS	7	FALLACIOUS	MONOTONOUS	7	FALLACIOUS	MONOTONOUS
8	HISTORY	PROSPERITY	8	HISTORY	PROSPERITY	8	HISTORY	PROSPERITY	8	HISTORY	PROSPERITY
9	HUMANITY	MORALITY	9	HUMANITY	MORALITY	9	HUMANITY	MORALITY	9	HUMANITY	MORALITY
10	HUMBLE	RESPONSIBLE	10	HUMBLE	RESPONSIBLE	10	HUMBLE	RESPONSIBLE	10	HUMBLE	RESPONSIBLE
11	JOYFUL	PURPOSEFUL	11	JOYFUL	PURPOSEFUL	11	JOYFUL	PURPOSEFUL	11	JOYFUL	PURPOSEFUL
12	JUSTICE	SERVICE	12	JUSTICE	SERVICE	12	JUSTICE	SERVICE	12	JUSTICE	SERVICE
13	MATERIAL	SOCIAL	13	MATERIAL	SOCIAL	13	MATERIAL	SOCIAL	13	MATERIAL	SOCIAL
14	MORAL	RATIONAL	14	MORAL	RATIONAL	14	MORAL	RATIONAL	14	MORAL	RATIONAL
15	NATION	RELIGION	15	NATION	RELIGION	15	NATION	RELIGION	15	NATION	RELIGION
16	PERSONAL	SOCIAL	16	PERSONAL	SOCIAL	16	PERSONAL	SOCIAL	16	PERSONAL	SOCIAL
17	SACRIFICE	SANITY	17	SACRIFICE	SANITY	17	SACRIFICE	SANITY	17	SACRIFICE	SANITY
18	WILL	ZEAL	18	WILL	ZEAL	18	WILL	ZEAL	18	WILL	ZEAL

SEND THESE 2 COUPONS & ENTER MINIQUIZ FREE | 28 | SEND THESE 2 COUPONS & ENTER MINIQUIZ FREE

12 CLUES FREE COUPON — 1 — MiniQuiz

BEAUTY	REALITY	JUSTICE	SERVICE
BECOME	BEHOLD	MATERIAL	SOCIAL
BIRTH	FAITH	MORAL	RATIONAL
CIVILIZATION	EDUCATION	NATION	RELIGION
CULTURAL	IDEOLOGICAL	PERSONAL	SOCIAL
ECONOMIC	SCIENTIFIC	SACRIFICE	SANITY

12 CLUES FREE COUPON — 2 — MiniQuiz

BEAUTY	REALITY	JUSTICE	SERVICE
BECOME	BEHOLD	MATERIAL	SOCIAL
BIRTH	FAITH	MORAL	RATIONAL
CIVILIZATION	EDUCATION	NATION	RELIGION
CULTURAL	IDEOLOGICAL	PERSONAL	SOCIAL
ECONOMIC	SCIENTIFIC	SACRIFICE	SANITY

২৮ (অমৃত)

এই কুইজে যোগদান করবার জন্য আমি নিয়ম ও সর্তাবলী পালন করতে রাজী এবং প্রতিযোগিতা সম্পাদকের বিচার চূড়ান্তভাবে ও আইনতঃ বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ করলাম। প্রত্যেক কুপনের জন্য প্রবেশ মূল্য : ১, টাকা, সম্পূর্ণ ফরমটির (৪টি কুপন) প্রবেশ মূল্য ৪, টাকা। আমি এম-ও রসিদ/আই-পি-ও/লিট্‌কুইজ ক্যাশ রসিদ/প্রাইজ কার্ড ও তার নম্বর.................পাঠাইলাম।

CAPITAL LETTERS

NAME ______________________________

ADDRESS ______________________________

____

এখানে কাটুন ও এই পুরো ফর্মটি পাঠান

18 CLUES

LITQUIZ NO: 28

(1) The pursuit of Beauty/Reality, according to our sages and men of enlightment. leads to Goodness.

(2) By means of religious discipline a man has to Become/Behold what he really and eternally is.

(3) Human Birth/Faith is a rare gift indeed

(4) It is the ultimate role of Civilization/Education to aid man to realize his highest potentialities

(5) The Cultural/Ideological differences have not only to be tolerated but accepted in humility of spirit and fostered

(6) If the Economic/Scientific pursuit drains most of human energies and resources neither knowledge nor goodness can thrive

(7) It is perhaps not in God's plan to make the world Fallacious/Monotonous.

(8) A nation's art is a visible representation of its History/Prosperity

(9) Moral ease and corrosion of idealism are the deadly enemies of Humanity/Morality

(10) The rich and the powerful should be Humble/Responsible

(11) Joy without Joyful/Purposeful activity is unthinkable to us.

(12) In our behaviour there is an increased insensibility and a frightening decrease of civility decency and sense of Justice/Service

(13) With too much of Material/Social contact men lose their higher self

(14) Man as a Moral/Rational being is essentially a votary of Good

(15) No Nation/Religion can survive if it neglects the discipline of the spirit

(16) Personal / Social consciousness remains so long as the I and the Thou last

(17) Humanity cannot survive without Sacrifice/Sanity

(18) Indians can work hard but they often lack the Will/Zeal

দ্রষ্টব্য ঃ—ওপরের ধাঁধাগুলি বিভিন্ন ভারতীয় লেখকদের লেখা থেকে নেওয়া কয়েকটি প্রশ্ন। এগুলি সব সম্পূর্ণ বাক্য ও নিজস্ব সম্পূর্ণ অর্থ বহন করে। লেখক/প্রবন্ধকারের নাম ও তাঁহাদের রচনার নাম সরকারীভাবে সমাধানের সঙ্গে লিট-কুইজ টিকিটে প্রকাশ করা হবে।

১। আমাদের ঋষিদের ও জ্ঞানীদের মতে **সৌন্দর্য/বাস্তবতা**-র সাধনা কল্যাণের পথে নিয়ে যায়।

২। ধর্মীয় অনুশাসনের মাধ্যমেই মানুষকে সে নিজে বাস্তবিক এবং শাশ্বত যা, তা হ'তে দেখতে হবে।

৩। মনুষ্য **জন্ম/প্রত্যয়** বাস্তবিকই একটি দুর্লভ দান।

৪। **সভ্যতা/শিক্ষা**-র অন্তিম ভূমিকা হ'ল মানুষকে তার চরম সম্ভাবনার উপলব্ধির পথে সাহায্য করা।

৫। **সাংস্কৃতিক/আদর্শগত** মতভেদ কেবলমাত্র যে সহ্য করতে হবে তাই নয়, আন্তরিক বিনয়ের সঙ্গে তাকে স্বীকার ও উৎসাহিত করতে হবে।

৬। যদি **অর্থনৈতিক/বৈজ্ঞানিক** অনুশীলনের জন্য মানুষকে শক্তি ও সংস্থানের অধিকাংশই হারাতে হয়, তাহ'লে জ্ঞান বা সততা কোনটিই বাড়তে পারে না।

৭। পৃথিবীকে **প্রতারণাপূর্ণ/একঘেয়ে** করা বোধ হয় ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয়।

৮। যে কোন জাতির শিল্প তার **ইতিহাস/সমৃদ্ধি**-র চাক্ষুষ প্রতিমূর্তি।

৯। আদর্শবাদের নৈতিক সহজভাব ও অবক্ষয় **মানবতা/নৈতিকতা**-র প্রধান শত্রু।

১০। ধনী ও শক্তিশালীদের **বিনম্র/দায়িত্বশীল** হওয়া উচিত।

১১। **আনন্দদায়ক/উদ্দেশ্যপূর্ণ** কাজ ছাড়া আনন্দের কথা আমরা ভাবতেই পারি না।

১২। আমাদের আচরণে অধিক মাত্রায় বোধশক্তিহীনতা ও ভদ্রতা, শালীনতা এবং **ন্যায়/সেবা**-র বোধের অভাব আছে।

১৩। অধিক মাত্রায় **বস্তুতান্ত্রিক/সামাজিক** সংস্পর্শে মানুষ তার উন্নত সত্ত্বাকে হারিয়ে ফেলে।

১৪। **নৈতিক/বিবেকী** জীব হিসেবে মানুষ প্রধানত কল্যাণ প্রেমী।

১৫। সচেতন নিয়মানুবর্তিতাকে অবহেলা করা হলে কোন **রাষ্ট্র/ধর্ম** টিকে থাকতে পারে না।

১৬। **ব্যক্তিগত/সামাজিক** সচেতনতা ততক্ষণই থাকে যতক্ষণ আমি ও তুমি বজায় থাকে।

১৭। মনুষ্যজাতি **ত্যাগ/জ্ঞানের** ছাড়া বাঁচতে পারে না।

১৮। ভারতীয়েরা কঠিন শ্রম করতে পারে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তাদের **সংকল্প/উৎসাহ**-র অভাব দেখা যায়।

৫,৪৬,০০০

টাকারও বেশী বিতরিত হয়েছে

প্রেক্ষাগৃহ

আজকের কথা ঃ

পূর্বভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নতিকল্পে একটি প্রস্তাব ঃ

ইস্টার্ন ইণ্ডিয়া মোশান পিকচার্স অ্যাসোসিয়েশন হচ্ছে পূর্বভারতের—পশ্চিমবঙ্গ, আসাম বিহার এবং উড়িষ্যা রাজ্যের—চলচ্চিত্র ব্যবসায়ের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা। চলচ্চিত্রের প্রযোজনা, পরিবেশনা ও প্রদর্শনী—এই তিনটি বিভাগেরই প্রতিনিধিত্ব করে থাকে এই সংস্থাটি প্রযোজক বিভাগ, পরিবেশক বিভাগ এবং প্রদর্শক বিভাগের মাধ্যমে। লক্ষ্য করবার বিষয়, সংস্থাটির পরিবেশক ও প্রদর্শক বিভাগ দুটি যে-রকম শক্তিশালী ও সক্রিয় প্রযোজক বিভাগটি তেমন নয়। পরিবেশক ও প্রদর্শকদের মধ্যে বিরোধও যেমন নিত্যই সংঘটিত হচ্ছে, ইস্টার্ন ইণ্ডিয়া মোশান পিকচার্স অ্যাসোসিয়েশনও তেমনই নিত্যই সেই বিরোধের চূড়ান্ত মীমাংসা করতে ব্যস্ত। প্রতি সপ্তাহেই এই বিরোধ মীমাংসার জন্যে একটি নির্দিষ্ট দিনে সংস্থা নিয়োজিত মীমাংসক সমিতির অধিবেশন বসে। এছাড়া কোনও চিত্রের জন্যে পরিবেশক ও প্রদর্শকের মধ্যে যে-চুক্তিনামা সম্পাদিত হয় তার বয়ানও ই-আই-এম-পি-এ দ্বারা কৃত ও মুদ্রিত বয়ানের অনুরূপ হয়ে থাকে কিন্তু এই চলচ্চিত্র-শিল্পের মূলে যাঁরা আছেন, যাঁরা না থাকলে এই শিল্পের অস্তিত্বই থাকত না, সেই প্রযোজকদের প্রতিনিধিত্ব করে এই সংস্থাটির যে-বিভাগ, সেই প্রযোজক বিভাগটি আদৌ সক্রিয় নয়। অথচ এই বিভাগে অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের অজিত বসু, চারুচিত্র প্রতিষ্ঠানের অসিত চৌধুরী পরিচালক সুধীর মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির মতো গুণী ও জ্ঞানীজন রয়েছেন এবং এঁরা যথাযথভাবে সক্রিয় হলে যে আমাদের বাংলা চলচ্চিত্র-শিল্প কি শিল্প কি অর্থনীতি উভয় দিক দিয়েই যথেষ্ট উন্নতি লাভ করাতে পারে একথা আমরাও যেমন জানি তাঁরা নিজেরাও যে তেমন জানেন না তা নয়।

তাঁরা কিভাবে সক্রিয় হতে পারেন সেই কথাটিই এখন বলি। এটা তো জানা কথা যে, ইস্টার্ন ইণ্ডিয়া মোশান পিকচার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভ্য না হলে কোনো পরিবেশক সংস্থা পূর্বভারতে চলচ্চিত্রের পরিবেশনা ব্যবসায় করতে পারেন না এবং কোনো প্রদর্শকও তাঁর চিত্রগৃহ (সিনেমা হাউস) চালু রাখতে পারেন না। কাজেই এ ব্যবস্থা করা নিশ্চয়ই সম্ভব যে কোনো প্রযোজক বা প্রযোজক সংস্থা যতক্ষণ না ই-আই-এম-পি-এর সভ্য শ্রেণীভুক্ত হচ্ছেন ততক্ষণ তিনি তাঁর ছবির পরিবেশনা বা প্রদর্শনীর কোনো রকম বন্দোবস্ত করতে পারবেন না। চলচ্চিত্র ব্যবসায় সম্পর্কিত সামগ্রিক স্বার্থ

নিয়ে সেখানে কথা, সেখানে এই ব্যবস্থা-গ্রহণে কোনো আইনগত বাধা আসতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা এবং আসাম রাজ্যে যিনিই বা যে-সংস্থাই চলচ্চিত্র-প্রযোজনা ব্যবসায়ে ব্রতী হতে বা থাকতে চাইবেন, তাঁকেই বা সেই সংস্থাকেই নিজ স্বার্থে এবং সমগ্র ব্যবসায়ের স্বার্থে ঐ ই-আই-এম-পি-এর সভ্য হবার জন্যে আবেদন করতে হবে। সমষ্টিগত স্বার্থের দিকে তাকিয়ে যদি লোহ, বস্ত্র বা মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীরা সংঘ বা অ্যাসোসিয়েশন গড়তে ও সভ্য হতে পারেন, তাহলে চলচ্চিত্র-প্রযোজকরাই বা সঙ্ঘবদ্ধ হতে অস্বীকার করবেন কেন?

ই-আই-এম-পি-এর প্রযোজক বিভাগের সভ্য হবার জন্যে একটা ন্যূনতম যোগ্যতার কথাও এখানে তোলা যেতে পারে। প্রথম যোগ্যতা নিশ্চয়ই অর্থবিষয়ক। যিনি বা যে-সংস্থাই চিত্রপ্রযোজনায় ব্রতী হতে চান, তাঁকে বা তাঁদের প্রথমেই দেখাতে হবে, চিত্রপ্রযোজনার কাজে ব্যয় করবার জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা কিভাবে করা হয়েছে। এ-ব্যাপারে একটা সর্ব-সম্মত নিয়মাবলী আগে থাকতেই প্রণয়ন করা যেতে পারে। যে-ছবি তিনি বা তাঁরা করতে যাচ্ছেন তাতে আনুমানিক কত ব্যয় হতে পারে, সে-বিষয়ে তিনি বা তাঁদের কোনো ধারণা আছে কিনা তাও জানতে চাওয়া হয়ত অসংগত হবে না; এমন কি অভিজ্ঞ প্রযোজক ও পরিচালকদের সমন্বয়ে গঠিত একটি উপদেষ্টা সমিতির মাধ্যমে কোনো নবাগত প্রযোজককে প্রযোজনার বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে পরামর্শও দেওয়া যেতে পারে। একটি কাহিনীর চলচ্চিত্রোপ-যোগিতা আছে কিনা সেই কাহিনী অবলম্বনে ছবি নির্মাণ করতে কত ব্যয় হওয়া উচিত, কত সময় লাগা উচিত, কি রকম শিল্পীসমাবেশ করা উচিত, কি ধরনের কলাকুশলী নিয়োগ করা প্রয়োজন, নির্মিত ছবিটি থেকে প্রদর্শনী বাবদ কত অর্থ সংগৃহীত হবার আশা করা যেতে পারে, ডাবিং বা সাব-টাইটেলের মাধ্যমে ভারতের অন্যান্য রাজ্য ও বহির্ভারত থেকে কোনো রকম আয়ের সম্ভাবনা আছে কিনা প্রভৃতি নানা বিষয়ে উপদেষ্টা সমিতি এবং পরিবেশক সমিতির কাছ থেকে ছবিটির প্রযোজক বা প্রযোজক সংস্থা মূল্যবান পরামর্শ ও মতামত পেতে পারেন।



পাথর কি সনম চিত্রে মনোজকুমার এবং ওয়াহিদা রহমান।

প্রযোজক সমিতি কোনো আর্থিক বছর আরম্ভ হবার আগেই সেই বছরের জন্যে প্রযোজনা বিষয়ে একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারেন। পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট আলাপ-আলোচনার পর প্রযোজকরা আগে থাকতেই স্থির করতে পারেন, কে কি ধরনের কাহিনীর চিত্ররূপ দেবেন এবং কে কোন্ স্টুডিওতে কতদিন কাজ করবেন। একতাই শক্তি, একথা মনে রেখে ঐক্যবদ্ধ-ভাবে তাঁরা স্টুডিওগুলিকে আধুনিকতম যন্ত্রপাতি সমন্বিত ও যথার্থই শব্দনিরোধক-ভাবে প্রস্তুত চিত্রগ্রহণ-মঞ্চ (সাউন্ডপ্রুফ স্টেজ) বিশিষ্ট করে তুলতে বাধ্য করতে পারেন। একযোগে পুরো একটি বছরের পরিকল্পনা গ্রহণ করলে শিল্পী, কলাকুশলী এবং অন্যান্য কর্মীদের মধ্যে কর্ম সম্বন্ধে অনিশ্চয়তার ভার যথেষ্ট কমে যাবে। ফলে তাঁদের কার্য ঢের বেশী উৎসাহপূর্ণ হবে।

ই-আই-এম-পি-এর সভ্য হবার দরুণ আরও যে-সব সুবিধা কোনো প্রযোজক বা প্রযোজক সংস্থা আশা করতে পারেন তার মধ্যে আছে তাঁর বা তাঁদের ছবির মুক্তি সম্পর্কে স্থির নিশ্চয়তা এবং শিল্পী ও কলাকুশলীর নিয়োগ ব্যাপারে অযথা অর্থ-ব্যয়ের হাত থেকে সুনিশ্চিত অব্যাহতি। মোট কথা, ই-আই-এম-পি-এর প্রযোজক বিভাগীয় সর্বশ্রী অজিত বসু, আসিত চৌধুরী, সুধীর মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অভিজ্ঞ সদস্য যদি চলচ্চিত্রপ্রযোজনা শিল্পটির সামগ্রিক উন্নতি বিধানে একটু সচেষ্ট হন, তাহলে আমরা বাংলা তথা পূর্বভারতের চলচ্চিত্রশিল্পের সর্বাংগীন শ্রীবৃদ্ধি সম্বন্ধে আশান্বিত হতে পারি। এ-ব্যাপারে তাঁরা ইচ্ছা করলে যে রাজ্যসরকারের কাছে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা নিশ্চয়ই লাভ করবেন, এ-বিষয়ে কোনো রকম সন্দেহ নেই।

—নান্দীকর

আপনার প্রিয় মাসিক পত্রিকা

নবকল্প

পরবর্তী (মাঘ) সংখ্যায়

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের আলোড়ন সৃষ্টিকারী

ছোট্ট জিজ্ঞাসা

চিত্র নাট্যাকারে সম্পূর্ণ উপন্যাসটি পড়ে নিন

●

এজেন্ট ও বিজ্ঞাপনদাতাগণ
যোগাযোগ করুন:

দি ক্যালকাটা ম্যাগাজিনস্

১।২সি, বসন্ত স্ট্রীট কলিঃ-৪, ৫৫-১৩৮৫

কলকাতা

'গুপী গায়েন ও বাঘা বায়েন' ছবিতে বাঘ:

নেপাল দত্ত ও অসীম দত্ত প্রযোজিত পূর্ণিমা পিকচার্সের 'গুপী গায়েন ও বাঘা বায়েন' ছবির বহির্দৃশ্য গ্রহণের জন্য সত্যজিৎ রায় তাঁর দলবলসহ বীরভূম যাত্রা করেছিলেন এবং গেল ১৮ই থেকে ৩১-এ জানুয়ারী পর্যন্ত সিউড়ী, রামপুরহাট, হেতমপুর প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলে পূর্ণোদ্যমে

উত্তমকুমারের শত চিত্র পূর্ণ

বাংলাদেশের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়ক উত্তমকুমারের শত চিত্র পূর্ণ হয়েছে গত ১৯৬৪ সালের 'নতুন তীর্থ' ছবিতে। বর্তমানে শুধু নায়ক চরিত্রে অভিনয় করে তাঁর অভিনীত ছবি-সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১১৫টি। এই নতুন বছরে তাঁর নায়ক জীবনের বিশ বছর পূর্ণ হল।

বাংলা চলচ্চিত্র ইতিহাসে ইতি-পূর্বে কোন নায়কই শত ছবি পূর্ণের গৌরবে ভূষিত হননি। একমাত্র উত্তম-কুমার এই প্রথম শত ছবি পূর্ণ করলেন। নায়ক জীবনের এই অসাধারণ সাফল্যের জন্য আমরা চির-দিনের নায়ক উত্তমকুমারকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

উত্তমকুমার অভিনীত শত ছবির একটি তালিকা প্রকাশ করা হল: কামনা, মর্যাদা, ওরে যাত্রী সহযাত্রী, নষ্টনীড়, সঞ্জীবনী, বসু পরিবার, সাড়ে চুয়াত্তর লাখ টাকা, নবীন যাত্রা বৌঠাকুরাণীর হাট, মনের ময়ূর, ওরা থাকে ওধারে, চাপাডাঙ্গার বউ, কল্যাণী, মরণের পরে, সদানন্দের মেলা অন্নপূর্ণার মন্দির, অগ্নি-পরীক্ষা বকুল, গৃহপ্রবেশ, মন্ত্রশক্তি, সাঁঝের প্রদীপ অনুপমা, রাইকমল, দেবত্র শাপমোচন বিধিলিপি, হ্রদ, উপহার কংকাবতীর ঘাট, রাত ভোরে, ব্রতচারিণী, সবার উপরে সাগরিকা, সাহেব বিবি গোলাম, লক্ষহীরা, চির-কুমার সভা একটি রাত, শংকরনারায়ণ ব্যাংক শ্যামলী ত্রিযামা পুত্রবধূ, শিল্পী নবজন্ম হারাজিৎ, বড়দিদি, যাত্রা হল শুরু পৃথিবী আমারে চায়, তাসের ঘর, সুরের পরশে পুনর্মিলন হারানো সুর অভয়ের বিয়ে, চন্দ্রনাথ পথে হল দেরী জীবন তৃষ্ণা, রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত বন্ধু, মানময়ী গার্লস স্কুল, ডাক্তারবাবু, শিকার, ইন্দ্রাণী যৌতুক, সূর্যতোরণ, মরুতীর্থ হিংলাজ, চাওয়া পাওয়া, বিচারক, পুষ্পধনু, গলি থেকে রাজপথ, খেলাঘর, সোনার হরিণ, অবাক পৃথিবী, মায়ামৃগ, রাজা সাজা, কুহক উত্তর মেঘ, হাত বাড়ালেই বন্ধু, খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, সখের চোর শহরের ইতিকথা, শুনো বরনারী, সাথীহারা, অগ্নি সংস্কার, ঝিন্দের বন্দী, মেকআপ, সপ্তপদী, দুই ভাই বিপাশা, দ্বিতীয় বাড়ি, কান্না, শেষ অঙ্ক, নিশীথে, উত্তরায়ণ, ভ্রান্তিবিলাস, সূর্যশিখা, দেয়া নেয়া, বিভাস, জতুগৃহ ও নতুন তীর্থ।

চিত্রায়িত করেছেন। এই পর্যায়ে গুপী ও কেন্দ্র করে ভাবপ্রবণতাদীপক নিম্নিতম পরিবেশের ঘটনাবলী তিনি চিত্রায়িত করেছেন। যে সব শিল্পী উক্ত বহির্দৃশ্যে অংশ গ্রহণ করেছেন, তাঁরা হলেন নবাগত তপেন চট্টোপাধ্যায় (গুপী), রবি ঘোষ (বাঘা), হরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, জহর চট্টোপাধ্যায়, চিন্ময় দত্ত, গোবিন্দ চক্রবর্তী, শান্তি চট্টোপাধ্যায়, রতন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজকুমার লাহিড়ী এবং দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, এই চিত্রগ্রহণে শিল্পীদের সঙ্গে একটি জীবন্ত বাঘও অংশ গ্রহণ করেছিল। উক্ত হিংস্র জন্তুটিকে কলকাতা থেকে বীরভূমে প্রেরণ করা হয়েছিল। এ ছবির আলোকচিত্র শিল্পী হলেন সৌমেন্দু রায়।

১৯০৮ সালের মে মাসে ৪৮নং গ্রে স্ট্রীট থেকে অরবিন্দকে গ্রেপ্তার করা হোল। অপরাধ: ক্ষুদিরামের বোমা নিক্ষেপের সঙ্গে তিনি জড়িত। প্রেসিডেন্সী জেলের অপরিসর 'অর্ধ-সেল'-এ তিনি আবদ্ধ রইলেন। এ বছরের জুন-জুলাই মাসে গীতা-পাঠরত অরবিন্দ কারাকক্ষেই লাভ করেন আত্মদর্শন। দিব্য অনুভূতি তাঁর দেহমন পরমপুলকে ভরিয়ে দিল—চিত্ত-বাণী তাঁকে রোমাঞ্চিত করে তুলল। আগস্ট মাসে কানাইলাল দেশদ্রোহী নরেন গোস্বামীকে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য প্রেসি-ডেন্সী জেল কম্পাউন্ডেই হত্যা করলেন। স্বাধীনতাসংগ্রামের এইসব রক্তক্ষরা ইতি-হাস 'মহাবিপ্লবী অরবিন্দ' ছবিতে বর্তমানে চিত্রায়িত করা হচ্ছে নিউ থিয়েটার্স এক নম্বর স্টুডিওতে। এ, কে, বি ফিল্মসের এ ছবিখানি পরিচালনা করছেন দীপক গুপ্ত।

গেল ১৬ই থেকে ৩১-এ জানুয়ারী পর্যন্ত এ ছবির শেষ পর্যায়ের চিত্রগ্রহণ চলেছে। আরও যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার চিত্রগ্রহণ করা হচ্ছে তা' হল প্রেসি-ডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বার্লি এবং 'মিঃ বিচক্রফট-এর আদালতে অরবিন্দের ঐতিহাসিক বিচার। এই বিচারকালেই দেশ-বন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস অরবিন্দের পক্ষ গ্রহণ করেন। ছবিটির নামভূমিকায় অভিনয়

শুভমুক্তি ঃ ২রা ফেব্রুয়ারী ঃ শুক্রবার

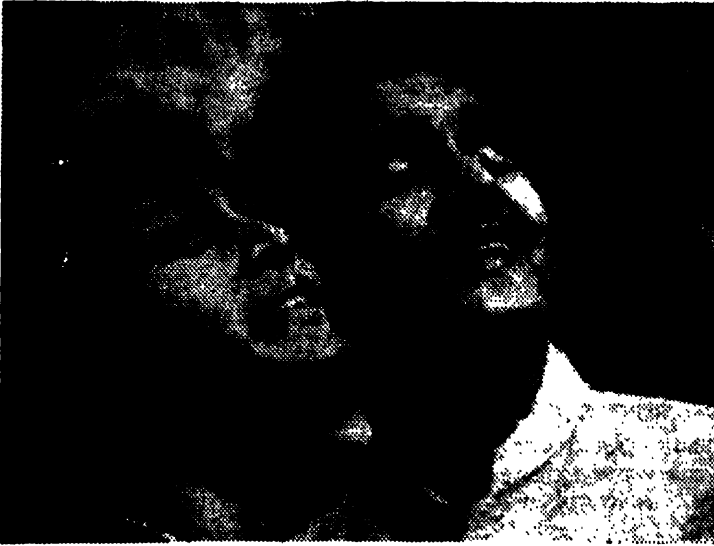
গানে গানে ভরা অফুরন্ত হাসির ঝর্ণা......



উত্তরা ঃ পূরবী ঃ উজ্জ্বলা

শ্রীচিত্রা — মায়াপুরী — নবরূপম — পারিজাত — লীলা

নিউ তরুণ — উদয়ন ও অন্যত্র



পঞ্চশর চিত্রে রুমা গুহঠাকুরতা ও শুভেন্দু চ্যাটার্জি

করছেন দিলীপ রায়, অন্যান্য চরিত্রে রয়েছেন প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মল ঘোষ, তমাল লাহিড়ী, শেখর চট্টোপাধ্যায়, জহর রায়, এন বিশ্বনাথন, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, পদ্মা দেবী, শর্মিতা বিশ্বাস, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, মিহির ভট্টাচার্য প্রভৃতি। সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

"পঞ্চশর" চিত্রের শুভমুক্তি

অরূপ গুহঠাকুরতা পরিচালিত ফিল্ম ক্র্যাফটের "পঞ্চশর" ছবিটি এ সপ্তাহের ২রা ফেব্রুয়ারী বসুশ্রী বীণা, পদ্মশ্রী চিত্রগৃহে শুভমুক্তিলাভ করছে। সুবোধ ঘোষের কাহিনী অবলম্বনে এ ছবির প্রধান চরিত্রাবলীতে রূপদান করেছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়, রুমা গুহঠাকুরতা, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, সুস্মিতা সান্যাল, রবি ঘোষ, অনুভা গুপ্তা, কণিকা মজুমদার, জহর রায় ও সীতা মুখোপাধ্যায়। সঙ্গীত-পরিচালনায় রয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। ছায়ালোক ছবিটির পরিবেশক।

"পথে হল দেখা" চিত্রের শুভারম্ভ

জে, এন, সিনহা প্রযোজিত ও শচীন অধিকারী পরিচালিত "পথে হল দেখা" চিত্রটি ২রা ফেব্রুয়ারী উত্তরা, পূরবী ও উজ্জ্বলা প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করছে। এছবির মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, তরুণকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, সবিতা চট্টোপাধ্যায়, বিপিন গুপ্ত, জহর রায়, ভারতী দেবী, রেণুকা রায় ও শ্যাম লাহা। ছবিটির সুরসৃষ্টি করেছেন ভি, বালসারা।

আগামী সপ্তাহে "ছোট্ট জিজ্ঞাসা" চিত্রের শুভমুক্তি

ট্রায়ো ফিল্মসের পরীক্ষামূলক ছবি "ছোট্ট জিজ্ঞাসা" আগামী সপ্তাহের ৯ই ফেব্রুয়ারী শ্রী, প্রাচী, ইন্দিরা ও শহরতলির অন্যান্য চিত্রগৃহে শুভমুক্তি লাভ করবে। বিশ্বজিৎ প্রযোজিত ও অভিনীত এ ছবির শিশু-নায়ক চরিত্রে অভিনয় করেছেন বিশ্বজিৎ-পুত্র প্রসেনজিৎ। অন্যান্য চরিত্রে মাধবী মুখোপাধ্যায়, অনুপকুমার, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, প্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং গীতা দে। ছবিটির পরিচালক উপদেষ্টা হলেন হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়। নচিকেতা ঘোষ ছবিটির সুরকার।

'চৌরঙ্গী' চিত্রের চিত্রগ্রহণ

বহুজন পঠিত শঙ্কর-এর জনপ্রিয় উপন্যাস **'চৌরঙ্গী'**র অন্তর্দৃশ্যগ্রহণ বর্তমানে শুরু হয়েছে টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওয়। ছবিটি পরিচালনা করছেন পিনাকী মুখোপাধ্যায়। এ ছবির বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করছেন উত্তমকুমার (স্যাটা বসু), অঞ্জনা ভৌমিক (সুজাতা), সুপ্রিয়া দেবী (করবী), বিশ্বজিৎ (অনিন্দ্য), শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় (শঙ্কর), দীপ্তি রায় (মিসেস পাকড়াশী), প্রসাদ মুখোপাধ্যায় (মিঃ পাকড়াশী), উৎপল দত্ত (মিঃ মার্কোপোলো), ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় (নিত্যহরি), হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় (জিমি), তরুণকুমার (ফোকলা চট্টোপাধ্যায়), দীপক মুখোপাধ্যায় (মিঃ বায়রণ), মিস্ এন্টোনা (রোজী), বঙ্কিম ঘোষ (মিঃ আগরওয়ালা) ও জহর রায় (হেড কুক)। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন এ ছবির প্রযোজিকা অসীমা ভট্টাচার্য।

বোম্বাই

'পাথর কে সনম' চিত্রের শুভমুক্তি

রাজ নওয়াথে পরিচালিত রঙিন ছবি **'পাথর কে সনম'** এ সপ্তাহের ২রা ফেব্রুয়ারী রক্সি, কৃষ্ণা, প্রিয়া, মিত্রা প্রভৃতি চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করছে। ছবিটির মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন ওয়াহিদা রেহমান, মনোজকুমার, মুমতাজ, প্রাণ, ললিতা পাওয়ার এবং মেহমুদ। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল। দোসানি ফিল্মস ছবিটির পরিবেশক।

অসিত সেন পরিচালিত 'আনখী রাত'

পরিচালক অসিত সেন এল বি ফিল্মসের **'আনখী রাত'** ছবিটির অন্তর্দৃশ্য শুরু করেছেন মোহন স্টুডিওয়। ছবিটির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন সঞ্জীবকুমার, জাহিদা, অরুণা ইরাণী, পরীক্ষিৎ সাহনি, মুকরি, তরুণ বোস, আনোয়ার হুসেন ও বদরীপ্রসাদ। ছবিটির সুরকার হলেন পরলোকগত রোশন।

কোলাপুর বহির্দৃশ্যে 'প্রেম পূজারী' চিত্রের দৃশ্যগ্রহণ শুরু

বোম্বাইয়ের কোলাপুর অঞ্চলে অভিনেতা-প্রযোজক-পরিচালক দেব আনন্দ তাঁর নতুন রঙিন ছবি **'প্রেম পূজারী'**র বহির্দৃশ্যগ্রহণ শুরু করেছেন। দেব আনন্দের বিপরীত নায়িকাদ্বয়ের চরিত্রে অভিনয় কর-



ছোট্ট জিজ্ঞাসা চিত্রে প্রসেনজিৎ এবং মাধবী মুখোপাধ্যায়।

ছেন ওয়াহিদা রেহমান এবং জাহিদা। পরিচালক হিসেবে দেব আনন্দের এটি প্রথম ছবি। সঙ্গীত পরিচালনায় রয়েছেন শচীনদেব বর্মন। ছবির কয়েকটি প্রেম-মধুর সঙ্গীত এই বহিদৃশ্য অংশে গৃহীত হবে।

'জোকার' চিত্রে সোভিয়েত অভিনেত্রী মনোনীত

রাজকাপুর অভিনীত, পরিচালিত ও প্রযোজিত 'মেরা নাম জোকার' চিত্রের সার্কাস অংশের নায়িকা হিসেবে সোভিয়েত চিত্র ওয়ার এন্ড পীস-এর নায়িকা নিউদমিলা সাভেলিয়াভা সম্প্রতি মনোনীত হয়েছেন। এ ছাড়া ছবির একটি সার্কাস দৃশ্যে সোভিয়েত সার্কাস পার্টির দল অংশ গ্রহণ করছেন। বর্তমানে ছবিটির বহিদৃশ্য ওটি অঞ্চলে গৃহীত হচ্ছে। নামভূমিকায় অভিনয় করছেন রাজকাপুর। এ ছবির সঙ্গীত পরিচালক হলেন শঙ্কর-জয়কিষণ।

টি প্রকাশ রাও পরিচালিত 'ইজ্জৎ'

পুষ্প পিকচার্সের 'ইজ্জৎ' ছবিটির চিত্রগ্রহণ বর্তমানে ফিল্মীস্তান স্টুডিওয় অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ছবিটির পরিচালক হলেন টি প্রকাশরাও। মুখ্য চরিত্রে অংশ গ্রহণ করেছেন ধর্মেন্দ্র, জয়ললিতা, তনুজা, বলরাজ সাহনি, ডেভিড, মনমোহন কৃষ্ণ, ললিতা পাওয়ার, মুকরি ও মেহমুদ। সঙ্গীত পরিচালনায় রয়েছেন লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল।

'আদমী' মুক্তি-প্রতীক্ষিত

ভীম সিং পরিচালিত 'আদমী' ছবিটি বর্তমানে মুক্তিপ্রতীক্ষিত। ভিরুপ্পা প্রযোজিত পি এস ভি পিকচার্সের এ চিত্রে রূপদান করেছেন দিলীপকুমার, ওয়াহিদা রেহমান, মনোজকুমার, প্রাণ, সিমি, পদ্মা চোহান ও আগা। নৌসাদ ছবিটির সুরকার।

স্মৃতি থেকে বলছি

ক্যামেরা রাত্রির কোলকাতার ওপর দিয়ে ট্রলি করে এধার থেকে ওধার। বস্তি, আধুনিক ফ্ল্যাট, মাঠ, রেসকোর্স, সবগুলোই তখন ঘুমন্ত। অফ ভয়েস—রজনীর অন্ধকারে মহানগরীর বুক থেকে মুছে গেছে জীবনের সকল চিহ্ন। কিন্তু জীবনের নাটক রচনার বুঝি কখনও বিরাম নেই। হাঁ, সত্যিই তাই। নার্সিং হোমে তখন সত্যিই নতুন নাটক তৈরী হচ্ছে। অনিমাণ সন্তান হয়েছে। আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠেছেন মিসেস মজুমদার।

বলছেন—ওগো, ছেলে...ছেলে হয়েছে।

ক্যামেরা চার্জ করে মিসেস্ মজুমদারকে।

মিড্ শট মিসেস মজুমদারের।

মিসেস্ মজুমদার—ছেলে হয়েছে...... রাজপুত্তুরের মত ছেলে।

মিঃ মজুমদার (অফ ভয়েস)—কোন রাজপুত্তুর?

দৃশ্যের ওখানেই সমাপ্তি।

ক্যামেরা মিড্ শটে নার্সকে ধরে ট্রলি করে।

নার্স শিগ্গির আসুন, শিগ্গির। ডাক্তারবাবু ডাকছেন কল করছেন!!

ক্যামেরা মন্থরগতিতে অনিমাকে চার্জ করে। ডাক্তার দাঁড়িয়ে আছে। মিঃ মজুমদার (অফ্ ভয়েস)—অনু অনু!

ফ্রেমের মধ্যে ঢুকে পড়েন মিসেস মজুমদার। বসেন রোগীর পাশে। ঝুঁকে পড়েন। ক্লোজ শট্।

মিসেস্ মজুমদার —অনুমা ...অনুমা আমার...অনুমা আমার! ক্রন্দনরতা মিসেস মজুমদার। ক্লোজ শট্। নিশ্চল অনিমা।

মিসেস মজুমদার—অনুমা! কথা ক' মা! কথাক্! কথাক্...। অনিমার মাথা এলিয়ে পড়ে। নিশ্চল অনিমা। ক্লোজ শট্। মিসেস মজুমদার।

মিঃ মজুমদার (অফ ভয়েস)—ভগবান এ তোমার কেমন বিচার; যাকে রাখতে পারব না তাকে রেখে যাকে রাখতে চাই তাকে নিয়ে গেলে। দৃশ্য ডিসলভ্ হয়ে গেল।

তৃতীয় দৃশ্য

মিড্ ক্লোজ। নার্স। সামনের টেবিলে অনেক টাকা। ক্লোজ শট্। টাকা। নার্স—একি! এত টাকা! কাট্

মিড ক্লোজ শট্। মিঃ মজুমদার।

মিঃ মজুমদার—আমার স্ত্রীর জ্ঞান ফিরে আসবার আগে ওটাকে নিয়ে যাও (উনি সদ্যজাত শিশুটিকে দেখালেন)।

নার্স—নিয়ে, যাব কোথায়? কাট্।

মিঃ মজুমদার—জানি না—অসুবিধা হয়, পথে কোথাও ফেলে দিও। যাও! কাট্।

পূর্বোক্ত তিনটি দৃশ্যই সুধীর মুখার্জি প্রোডাকসন্সের নির্মীয়মাণ ছবি 'আঁধার সুখ' ছবির। পরিচালনা করছেন সুধীর মুখার্জি। ঐ তিনটি চরিত্রে অভিনয় করছেন (নার্স) দীপ্তি রায়, (মিঃ মজুমদার) কমল মিত্র, (মিসেস মজুমদার) ছায়া দেবী, (অনিমা) সংহিতা কর। মিঃ মজুমদার যে শিশুটিতে রাস্তায় কোথাও ফেলে দেবার জন্য বললেন সেই শিশুর বড় চরিত্রে আছে মৃণাল মুখোপাধ্যায়।

কয়েকদিন আগে টেকনিসিয়ান স্টুডিওতে আর একটি যে দৃশ্য আমার সামনে গৃহীত তার কথা বলি।

মিঃ মজুমদারের আধুনিক ফ্ল্যাটের সামনে এসে দাঁড়াল একটা ভ্যান্। সত্যেন

শুভমুক্তি ২রা ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার!

হৃদয়ের আনন্দ-বেদনা ও অনুতাপের জ্বালায় যে প্রেম স্বর্গ-নরক দেবদূত ও শয়তানের মাঝে দাঁতিয়ালী করে স্বর্ণ-সুষমায় এক অশান্ত হৃদয়ে তারই অনুপম কাহিনী...



রক্সি-প্রিয়া-ম্যাজেষ্টিক-কৃষ্ণা-মিত্রা-কালিকা

ছায়া - ভবানী - মৃণালিনী (দমদম) - ন্যাশনাল (খিদিরপুর) - [illegible] (মেটিয়াবুরুজ)

অজন্তা (বেহালা) - নবভারত (হাওড়া) - অশোক (শালকিয়া) - শান্তি (কদমতলা)

নারায়ণী (আলমবাজার) - সন্ধ্যা (খড়দহ) - শ্রীকৃষ্ণ (জগদ্দল)

চলচ্ছবি (কোন্নগর) - চিত্রালয় (দুর্গাপুর) - নিউ সিনেমা (আসানসোল)

o দোসানি ফিল্মস পরিবেশিত o



দিবারাত্রির কাব্য চিত্রের সেটে পরিচালক বিমল ভৌমিক, প্রশান্ত সরকার, মাধবী মুখোপাধ্যায় ও বসন্ত চৌধুরী।
ফটো : অমৃত

গাড়ী থেকে নেমেই ঢুকল ঘরে। একটু অবাক হল।

মিড লং শট্। সত্যেন ধীরে ধীরে সোফায় বসে থাকা মিঃ মজুমদারের পা স্পর্শ করে। চমকে কাগজটা সরিয়ে উঠে দাঁড়ান মিঃ মজুমদার।

মিঃ মজুমদার—কে! সত্যেন!

সত্যেন—হ্যাঁ, মেসোমশাই। শত্রুশিবির থেকে ছাড়া পেয়েই ছুটতে ছুটতে এসেছি।

মিঃ মজুমদার—শত্রুশিবির!

আজ্ঞে হ্যাঁ। ধরা পড়ে এতদিন শত্রু-শিবিরেই ছিলাম। আমার খবর না পেয়ে নিশ্চয়ই আপনারা দুশ্চিন্তায় ছিলেন। আপনারা ভাল আছেন? আপনি মাসিমা... অনিমা?

অনিমা...অনিমা কোথায়?

মিসেস মজুমদার (অফ ভয়েস)—কে?

এর পরের টুকু আর পরিচালকের দয়ায় দেখার সৌভাগ্য হয় নি। এই সত্যেন-এর চরিত্র করছেন অজিতেশ ব্যানার্জি। গৌরাঙ্গ-প্রসাদ বসুর চিত্রনাট্যরূপে দেওয়া এ ছবিতে সুর দিয়েছেন রবীন চট্টোপাধ্যায় ও গান গেয়েছেন প্রতিমা, নির্মলা, শ্যামল ও ধনঞ্জয়।

স্টুডিও থেকে বলছি পর্যায়ে এতদিন তো শুধু ছবির গল্পই বলে এলাম। এখন থেকে মাঝে মাঝে ছবি হবার গল্প বলবো।

সেদিন সেই উদ্দেশ্যেই ঘুরতে ঘুরতে নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওর দু'নম্বর ফ্লোরে ঢুকে দেখি 'মহাবিপ্লবী অরবিন্দ' ছবির কাজ হচ্ছে। ক্যামেরাম্যান দীপক বসু লাইটিং-এর কাজে ব্যস্ত। এটায় পাঁচশো গজ, ওটায় ফিল্টার, সেটায় কিছুটা কেটে সব ঠিক হবার পর যে দৃশ্যটি গৃহীত হলো সেটা তুলে দিচ্ছি।

প্রেসিডেন্সী জেলের হাসপাতাল। তারই একটা ঘরে অসুস্থ সত্যেন শুয়ে আছে। ক্যামেরা ওকে পাশ থেকে মিড ক্লোজে ধরে আছে। কাশতে শুরু করে সত্যেন। ডানদিকে মাথা প্যান্টা তুলে নিয়ে রক্তভরা থুথু ফেলে। মাথা উঁচু করতেই নরেনকে দেখে বলে—'নরেন, আয় ভাই।'

(প্রসঙ্গতঃ বলি বিপ্লবী দলের সদস্য নরেন দলত্যাগ করে আপনস্বার্থে ইংরাজদের হাতে ধরা দিয়েছে। সত্যেন একথা জানতে পেরে নরেনকে বিশ্বাসঘাতকতার প্রকৃত শাস্তি দিতে বদ্ধপরিকর। সত্যেন অসুস্থ, নরেন অনেকটা লুকিয়েই তাকে দেখতে আসে।)

ক্যামেরা তখন ট্রলি করে ধরে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা নরেনকে।

নরেন ঘরে ঢুকে ওর সামনে বসতে বসতে বলে—'আমায় ডেকেছিলে!'

ক্যামেরা ট্রলি করে এগিয়ে আসে, দু'জনকেই ফ্রেমে ধরে।

সত্যেন—হ্যাঁ, জেলের কষ্ট আর সহ্য হচ্ছে না ভাই। আমিও তোমার মত রাজ-সাক্ষী হয়ে যাব।

নরেন—বেশ তো, তাছাড়া কি হবে এসব করে? (বলতে বলতে বিছানার ওপর এগিয়ে আসে) রাজসাক্ষী হয়ে গেলে সরকারই বিলেত পাঠিয়ে দেবে আমাদের।

সত্যেন—পুলিশের কাছে কি বলতে হবে ভাই। সেটা যদি......

(কাশতে থাকে আবার)। পৃথক শট্।

ক্যামেরা এবার সম্পূর্ণ অন্য অ্যাঙ্গেলে ধরে থাকে দু'জনকে।

নরেন—বলো বলো সত্যেন।

সত্যেন—রাজসাক্ষী হয়ে গেলে আর কোন হ্যারাসমেন্ট হয় না।

নরেন—নিশ্চয়ই, রাজসাক্ষী হয়ে গেলে কত ব্রাইট ফিউচার আমাদের।

সঙ্গে সঙ্গে কম্বলের তলা থেকে সত্যেনের রিভলবার বেরিয়ে এসে রক্তাক্ত করে দেয় নরেনের দেহ। বিকট আর্ত চিৎকারে নরেন বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। সত্যেন হাঁপাতে থাকে। বিশ্বাসঘাতককে শাস্তি দেওয়ার আনন্দে তার মুখ উজ্জ্বল। রিভল-ভারের নলটা দাড়িতে ঠেকিয়ে সত্যেন দাঁত কামড়ে বলে ওঠে—'দেশদ্রোহিতার পুরস্কার!'

ক্যামেরা চার্জ করে হাঁফানো সত্যেনকে ধরে।

নরেন ও সত্যেন দুটি চরিত্রে অভিনয় করলেন অজিতেশ ব্যানার্জি ও অশোক মুখার্জি। এ ছবির অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে আছেন দিলীপ রায়, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, সাধন সেনগুপ্ত। এ কে বি ফিল্মসের পতাকাতলে নির্মীয়মাণ এ ছবির পরিচালক দীপক গুপ্ত।

মঞ্চাভিনয়

বৌদির বিয়ে

গত ৬ই জানুয়ারী সন্ধ্যায় এ ভি পি স্পোর্টস অ্যাণ্ড রিক্রিয়েশন ক্লাবের (দুর্গা-পুর) সৌজন্যে বিশিষ্ট নাট্য সংস্থা কল্লোল থিয়েটার গ্রুপ শৈলেশ গুহ-নিয়োগীর 'বৌদির বিয়ে' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে ক্লাব হলে মঞ্চস্থ করেন। নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়, সমীর সেনগুপ্ত, সুদীপ্ত ভট্টাচার্য, দ্বিজেন বোস, প্রবীর বোস, গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়, পুষ্পেন রায়, বিকাশ রায়, অসিত বাগচি অমল মুখোপাধ্যায় হোসী দোরাবজী এবং শ্রীমতী উমা প্রামাণিক।

দু-একটি দোষত্রুটি থাকা সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে নাটকটি দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দিয়েছে। অভিনয়ের দিক থেকে বিচার করলে প্রথমেই বলতে হয় যুধিষ্ঠির চরিত্রে অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম। তার-পরেই আসে কান্তর চরিত্রে দ্বিজেন বোসের নাম। তিনি দর্শকদের প্রচুর হাসিয়েছেন আরও বোধহয় সুযোগ ছিল কান্তর চরিত্রে।

নাট্য প্রতিযোগিতা

বেঙ্গলী ক্লাব ও যুবক সমিতি লক্ষ্ণৌর প্রকাশচন্দ্র ঘোষ স্মৃতি নাট্য প্রতিযোগিতা ৯ই থেকে ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৬৭ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ নাট্য প্রতিযোগিতায় মোট ২০টি সংস্থা যোগদান করে। ফলাফল:—

অযান্ত্রিক চিত্তরঞ্জনের 'লাল মাটি'—শ্রেষ্ঠ নাট্য প্রযোজনায় ১ম পুরস্কার। আমরা দিল্লীর এবং ইন্দ্রজিৎ'—শ্রেষ্ঠ নাট্য প্রযোজনায় ২য় পুরস্কার। শ্রীসুনীল ভট্টাচার্য (লাল মাটি)—শ্রেষ্ঠ পরি-চালক। শ্রীঅলোক মুখার্জী (জতুগৃহ রজনীর অভিনয় মিলনী লখনউ, তাপসের ভূমিকায়)—শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। শ্রীমতী পুতুল দত্ত (লাল মাটি'র তুফানীর ভূমিকায়) শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী, শ্রীউৎপল মুখার্জী (যাযাবর গোষ্ঠী দিল্লীর —টাকার রং কালো' নিতাই-য়ের ভূমিকায়)—শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেতা, শ্রীমতী কল্যাণী সরকার (নন্দন সংঘ কানপুর কর্তৃক 'কলকাতার ইলেকট্রা' নাটকে ভূমি-

কার)—শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেত্রী ; এবং কুমারী সুনীতি মুখার্জী (গীতি ছন্দম, বালীর 'কাবুলীওয়ালা'র মিনি—(ছোট) ভূমিকার বিশেষ পুরস্কার লাভ করেন।

ডাঃ সুরেশ অবস্থী, সেক্রেটারী সংগীত নাটক একাডেমী, দিল্লী, প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। পদ্মভূষণ ডাঃ রাধাকমল মুখার্জীর পৌরোহিত্যে পুরস্কার বিতরণী সভায় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব উপকুলপতি ডাঃ কে এ এস আয়ার। এই উপলক্ষে গুণীজন সম্বর্ধনা সভায় স্থানীয় হিন্দী কথাশিল্পী ও নাট্যসেবী শ্রীঅমৃতলাল নাগরকে শাল ও মানপত্র দানে সম্মানিত করা হয়।

বিচারক মণ্ডলীতে অংশ গ্রহণ করেন সর্বশ্রী কিরণ মৈত্র, বিমল রায় (কলিকাতা) কমলাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (লক্ষ্ণৌ)।

সমগ্র প্রতিযোগিতাটিতে আলোক সম্পাত করেন কলিকাতার শ্রীতাপস সেন বড়ুয়া।

দীপান্বিতা

দক্ষিণ কলকাতার প্রগতিশীল নাট্যসংস্থা রাজা সাজা'র শিল্পিবৃন্দ আগামী ৫ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা ৭-৩০ মিঃ মুক্ত-অঙ্গনে তাঁদের নতুন নাটক 'দীপান্বিতা' মঞ্চস্থ করবেন। নাট্যকার প্রবীর মুখোপাধ্যায় স্বয়ং নির্দেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন, আলোকসম্পাতে রয়েছেন সুশীল দাস। বিভিন্ন ভূমিকায় রূপ দেবেন—কল্পনা ভট্টাচার্য, প্রভাত ভট্টাচার্য, রূপ ভট্টাচার্য, দুর্গাদাস মুখার্জি, বিপিন দাস, শিশির দাস, শিবব্রত মজুমদার শ্রীকান্ত মণ্ডল, পূর্ণিমা চ্যাটার্জি, দীপাবলী ঘোষ।

প্রেক্ষাপটের মেঘ

আগামী ২রা ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা সাতটায় মুক্ত-অঙ্গন মঞ্চে প্রেক্ষাপটের মঞ্চ-সফল নাটক 'মেঘ' মঞ্চস্থ হবে। ভূমিকালিপিতে আছেন সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল দত্ত, নন্দিতা দে, সমীর লাহিড়ী, অজয় শ্রীমানী, সলিল ঘোষ, রাধাচরণ ঘোষাল ও সীমন্তিনী রায়।

রঙ্গম সম্প্রদায়-এর 'নতুন গোঁসাই' :

শরৎচন্দ্র রচিত উপন্যাসাবলীর নাট্যরূপের সার্থক প্রযোজনা করে রঙ্গম সম্প্রদায় ইতিমধ্যেই নাট্যামোদী দর্শকবৃন্দের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছেন। সম্প্রতি এঁরা শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্বের শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রদত্ত নাট্যরূপ 'নতুন গোঁসাই' অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করছেন। সামু চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনাধীনে চারটি অঙ্কে এবং সতেরোটি দৃশ্যে সমাপ্ত এই নাট্যরূপটির সুষ্ঠু সামগ্রিক অভিনয়ের মধ্যেও যে-সব শিল্পীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তাঁরা হচ্ছেন ছন্দা দেবী (কমললতা), শচীন মুখোপাধ্যায় (গহর), সামু চট্টোপাধ্যায় (দ্বারিক দাস), নির্মল চট্টোপাধ্যায় (শ্রীকান্ত), কেষ্টধন মুখোপাধ্যায় (নয়নচাঁদ) ও বাসন্ত চট্টোপাধ্যায় (রাজলক্ষ্মী)।

জব চার্ণকের বিবি

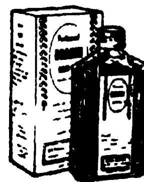
এবার লাইমলাইট থিয়েটার অ্যামেচারদের [illegible]

অভিনয় করলেন প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রের 'জব চার্ণকের বিবি' উপন্যাসের নাট্যরূপে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম যুগের কাহিনী অবলম্বনে রচিত এই উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছেন মণি দত্ত। অতীত দিনের নায়ক জব চার্ণক ও নায়িকা লীলাবতীকে ঘিরে ঘটনার যে আবর্ত সৃষ্টি হয়েছিল শ্রীদত্তের নাট্যরূপে তা এক আশ্চর্য সজীবতা লাভ করেছে। কয়েকটি সংঘাত-সমৃদ্ধ মুহূর্ত সৃষ্টি করে নাটকটিকে সব দিক থেকে গতিশীল করে তোলা হয়েছে এবং এই গতিবেগ স্বচ্ছন্দভাবে পরিণতির পথে এগিয়ে গিয়েছে শ্রীদত্তের প্রয়োগ-চিন্তার অভিনবত্ব ও আঙ্গিকগত নতুনত্বের সূত্র ধরে। প্রতিটি শিল্পীও তাঁর চরিত্র সম্পর্কে সচেতন থাকায় সংঘবদ্ধ অভিনয়ে শৈথিল্য আসে নি। দিলীপ রায়চৌধুরীর 'জব চার্ণক' ও শিখা ভট্টাচার্যের 'লীলাবতী' দুটি আশ্চর্য চরিত্রচিত্রণ। চরিত্রের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিখুঁতভাবে অভিনয় করেছেন হরিদাস গঙ্গোপাধ্যায় (চেম্বারলেন), নিতাই বসু (ক্যাচাহল), সুব্রত রায় (ইলিয়ট), নব দত্ত (পিটম্যান), লতিকা বন্দ্যোপাধ্যায় (এঞ্জেলা)। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন ধ্রুব চক্রবর্তী, বিজয় কুণ্ডু, অজেন মিত্র, সূর্য চট্টোপাধ্যায়, শান্তি মুখোপাধ্যায়, উৎপল লাহিড়ী, গণেশ পাল, মানিক গোস্বামী, পুতুল চক্রবর্তী, সুপর্ণা চট্টোপাধ্যায়। আলো ও আবহ-সঙ্গীতে সুরুচি পরিমিতিবোধ সমগ্র নাট্যপ্রযোজনাটিকে একটি বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে।

অভিনয় ও মৌচোর

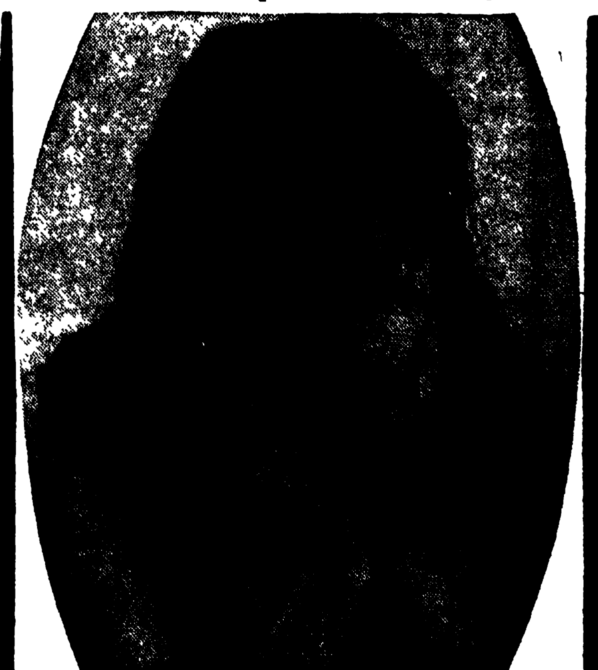
হিটলে প্লেসাম অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস কোম্পানী রিক্রিয়েশন ক্লাবের শিল্পীবৃন্দ সম্প্রতি বিশ্বরূপার মঞ্চে অভিনয় করেছেন বিমল রায়ের একাঙ্ক নাটক 'অভিনয়' ও সলিল সেনের পূর্ণাঙ্গ নাটক 'মৌচোর'। অভিনয় একটি রহস্যধর্মী নাটক, একটি মৃত্যুরহস্যের পটভূমিকায় রচিত হয়েছে এ নাটকের কাহিনী। নাটকটির মধ্যে যে সাসপেন্স আছে শিল্পীদের অভিনয়ে তা মূর্ত হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দিয়েছেন—দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, জনার্দন দাস, অজিত রায়চৌধুরী, নিখিল মুখো

বেঙ্গল কেমিক্যালের



সুবাসিত ব্রাহ্মী হেয়ার অয়েল

আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে
আয়ুর্বেদ-নির্দেশিত উপকরণে প্রস্তুত



বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর • দিল্লী

পাধ্যায়, অর্ধেন্দু সরকার, সুনীলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

মৌচোর নাটকটির মধ্যে যে সুগভীর জীবনবোধ লুকিয়ে আছে তাও শিল্পীরা তাঁদের অভিনয়ে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। এই নাটকে অংশ নেন—সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন মিত্র, দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, লক্ষ্মী দে, প্রতিমা পাল রাণু রায়, সৌমেন মজুমদার, শম্ভুদাস চৌধুরী, প্রেমজিৎ সিনহা, অর্ধেন্দু সরকার, কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় জগদীশ দাস, নিখিল মুখোপাধ্যায়, সুনীল মুখোপাধ্যায়, শান্তিরঞ্জন দাস, গণেশচন্দ্র দাস, নমিতা দত্ত।

'উত্তরণ গোষ্ঠী' কিছুদিন আগে 'প্রতাপ মেমোরিয়াল হলে' 'মমতাময়ী হাসপাতাল' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেছেন। নাট্যনির্দেশক বহু জায়গায় উন্নত নাট্যচিন্তার স্বাক্ষর রেখেছেন। সামগ্রিক অভিনয়ও শিল্পীদের নিষ্ঠায় প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। এই নাটকে বৈশিষ্ট্য-চিহ্নিত অভিনয় দেখান রথীন সরকার, রবীন চট্টোপাধ্যায়, শ্যামাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পরেশ ঘোষ অরবিন্দ দাস, খোকন সরকার, চৈতালী রায়, সুনন্দা দাস। অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন—দীপঙ্কর মৈত্র, সনৎ ধর, দেবাশীষ ঘোষ দীপ্তেন সরকার, অসীম মিত্র, চণ্ডী ঘোষ।

বিবিধ সংবাদ

গোর্কী জন্মশতবার্ষিকী

সংস্কৃতি পরিষদ-এর কার্যকরী সভাপতি শ্রীনারায়ণ চৌধুরী ও যুগ্ম-সম্পাদক অধ্যাপক প্রিয়তোষ মৈত্র ও ডঃ মানস চৌধুরী জানিয়েছেন, আগামী মার্চ মাসে বিশ্ববরেণ্য রুশ কথা-সাহিত্যিক ম্যাক্সিম গোর্কীর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপিত হতে চলেছে। এই উপলক্ষে সংস্কৃতি পরিষদ-এর পক্ষ থেকে এক ব্যাপক কর্মক্রম আয়োজন করা হচ্ছে। সাধারণ সভা প্রবন্ধ পাঠ, আলোচনা ইত্যাদি এই কর্মসূচীর অন্তর্গত। উৎসাহী প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গ বিশেষত যাঁরা এই অনুষ্ঠানে প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে চান, তাঁরা নিম্নঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন। ১সি, মধু গুপ্ত লেন, কলকাতা—১২।

পিয়াল নাট্য-সংসদের "রাজা দেবিদাস"

মহাজাতি সদন নেতাজী জন্মোৎসব কমিটির আহ্বানে পিয়াল নাট্য-সংসদ কর্তৃক গত ২৫শে জানুয়ারী মহাজাতি সদনে ব্রজেন্দ্রকুমার দে রচিত "রাজা দেবিদাস" নাটকটি সাফল্যের সহিত অভিনীত হয়। অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন শ্রীবিমলেন্দু ঘোষ, পুরেন পাল, নিখিল দাস, শ্যামল চক্রবর্তী, কেণ্ট সিংহ, কেষ্ট গুপ্ত, শশাঙ্ক চাটার্জী, সমীর ব্যানার্জী, বাদল ঘোষ, বাদল পাল, নবরঞ্জন দাস, শৈলেন ব্যানার্জী, অনিল ঘোষ, সমর বিশ্বাস, সুব্রত রায়, সলিল নিয়োগী, সন্ধ্যা সরকার, গৌরচন্দ্র পাল, প্রাণশঙ্কর গোস্বামী, নিমাই দে ও ধীরেন চক্রবর্তী। সঙ্গীত পরিচালনায় ছিলেন শ্রীনলিনী করণ, নাট্য-পরিচালনায় ছিলেন শ্রীসমীর ব্যানার্জী।

সঙ্গমের বিচিত্রানুষ্ঠান

খ্যাতনামা শিল্প-সংস্কৃতি সংস্থা সঙ্গম এক বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল গত তেরোই জানুয়ারী শ্রী শিক্ষায়তন অডিটোরিয়ামে। অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসনে ছিলেন সীতারাম শেকসারিয়া ও রামকুমার ভুয়ালকা। কবি গজানন্দ ভার্মার উদ্বোধনী সঙ্গীতের পর রাজস্থানী নৃত্য ও শর্মিষ্ঠা, মিঃ সাকুর এবং গ্রাম-সঙ্গীত পরিবেশন করেন। আট বছর মেয়ে কুমারী আলকা বাঙ্কার একটি কবিতা সকলের দ্বারা উচ্চপ্রশংসিত হয়। এই অনুষ্ঠান পরিষদের চেয়ারম্যান শ্রী কে পি চামারিয়ার দ্বারা আয়োজিত হয়েছিল।

কুশীলবের বার্ষিক অনুষ্ঠান

গত ১ জানুয়ারী মুক্ত অঙ্গন মঞ্চে দক্ষিণ কলকাতার 'কুশীলব' নাট্যগোষ্ঠীর দ্বিতীয় বার্ষিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে প্রখ্যাত নট শ্রীহারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল সংস্থার কর্মাধ্যক্ষ শ্রীআশিসকুমার সান্যাল রচিত 'অবচেতন' নাটকের অভিনয়। রহস্য নাটকে মনস্তত্ত্বের প্রাধান্য যে এত নিখুঁত নাটকীয় দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করতে পারে তা এর পূর্বে খুব একটা দেখা যায়নি। বস্তুতঃ নাটকটি একটু ভিন্নস্বাদের—তাই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি দর্শকই অপলক দৃষ্টিতে নাটকের গতি লক্ষ্য করেছেন।

নাটকটি পরিচালনায় শ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। কয়েকটি ছোটখাটো ত্রুটি সত্ত্বেও নাটকটির প্রয়োজনা খুবই প্রচ্ছন্ন। চতুর্থ দৃশ্যের নাটকীয় মুহূর্ত রচনায় শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের অবদান প্রশংসনীয়। শুধু সেতারের ঝংকারে নাটকের আবহসঙ্গীত রচনা করেন শ্রীচিত্ত মুখোপাধ্যায় যা প্রতিটি নাটকীয় মুহূর্তকে মূর্ত করে তোলে। শ্রীনীরেন ঘোষকৃত নাটকের মঞ্চপরিকল্পনা প্রশংসনীয়।

এই নাটকে শিল্পীদের দলগত অভিনয় দেখার মত। প্রতিটি অভিনেতা নিজের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে নাটকের গতিকে সচ্ছল করে তোলে। ব্যক্তিগত অভিনয়ের দিক থেকে প্রথমেই নাম করতে হয় শ্রীনীরেন ঘোষের যিনি নাটকের প্রধান চরিত্র (সোমনাথ) এর দ্বন্দ্ব অতি নিখুঁতভাবে ফোটাতে সক্ষম হন। জাঁদরেল দারোগা গোবিন্দ রায় (লোকে বলে 'জুজু রায়') এর চরিত্রটি নাট্যকার শ্রীআশিস সান্যালের অভিনয়ে প্রাণবন্ত হয়ে উঠে। মনস্তত্ত্ববিদ অধ্যাপক সর্বাধিকারী চরিত্রে শ্রীকমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় অতি উচ্চ মানের। এছাড়া ডেপুটি কমিশনার মিঃ লাহিড়ীর চরিত্রে শ্রীসুজন বন্দ্যোপাধ্যায়, মদের দোকানের মালিক কালীচরণের ভূমিকায় অমলেশ ঘোষ, ডাক্তার সামন্তর ভূমিকায় সমরেন্দ্র চক্রবর্তী ও ফটোগ্রাফারের ভূমিকায় তুলসী চৌধুরীর অভিনয় প্রশংসনীয়। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেন সৌমেন মিত্র (রিপোর্টার), শংকর বিশ্বাস (সাব-ইনস্পেক্টর), বুলা সেনগুপ্তা (মিসেস সামন্ত), অলোক ভট্টাচার্য (মাতাল), পান্না দত্ত (রেলওয়ে কুলী), অরূপ দাস (কনস্টবেল), অমিয় দাস (কনস্টেবল)।

বিদ্যাভারতী বিদ্যায়তনের "মায়ার খেলা"

"মায়ার খেলা" বহুবার অভিনীত হয়ে যে ঐতিহ্য রচনা করেছে তা অতিক্রম করাও খুব সহজ নয়। গত ২৮ জানুয়ারী অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসে বিদ্যাভারতী বিদ্যায়তন আয়োজিত "মায়ার খেলা" নৃত্যনাট্য কিছুটা উল্লেখের দাবী এই জন্যই রাখে যে গানের ভূমিকাকে অম্লান রেখে এ নৃত্যনাট্যে নৃত্যপরিকল্পনা করা হয়েছে। "মায়ার খেলায়" রবীন্দ্রনাথ যে ফ্যান্টাসী পদ্ধতির ব্যবহার রেখেছিলেন আলোক-সম্পাত, অঙ্গসজ্জা, সঙ্গীত ও নৃত্য যেন তারি সঙ্গে সাযুজ্য রেখে ব্যবহৃত হয়েছে। এইখানেই শ্রীরামগোপালের নৃত্যপরিচালনার সার্থকতা। অবশ্য ত্রুটিপূর্ণ মাইক্রোফোনের জন্য কোনো কোনো সময়ে গান সুবোধ্য হয়নি। শান্তার গানে সুমিত্রা মুখোপাধ্যায় এবং অন্য গানে শ্যামলী সেন ও অরূপ রায় ও সৌরীন রায়ের কৃতিত্ব দেখা গেছে। নৃত্যে প্রমদার ভূমিকায় মাধবী রায়ের নৃত্য সুন্দর। শান্তার ভূমিকায় শ্রাবণী রায় বিশিষ্ট। অমরের ভূমিকায় মন্দিরা গুপ্তরায় উল্লেখনীয়। প্রমদার সখীর ভূমিকায় স্বপ্না রায়, স্বপ্না ঘোষ, সুচিত্রা ঘোষ ও সুপ্রিয়া ঘোষ বিশেষভাবে উল্লেখনীয়। নৃত্যের নাট্য-মুহূর্ত ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করেছেন এঁরা। পোশাক ও মঞ্চসজ্জায় শ্রীমতী পূর্ণিমা মুখোপাধ্যায় যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

মার্চেন্ট-আইভরি প্রোডাকসন-এর 'দি গুরু' ছবির নায়িকা রীটা টুশিংহামের ভারতে আগমন :

বৃটিশ অভিনেত্রী রীটা টুশিংহাম বর্তমানে হলিউড চিত্র-জগতের একজন জনপ্রিয় তারকা। 'হাউস হোল্ডার' ও 'শেকসপীয়রওয়ালা'র প্রযোজকসংস্থা মার্চেন্ট-আইভরি প্রোডাকসন আর্কেডিয়া ফিল্মস—এই নতুন পতাকাতলে তাদের তৃতীয় ছবি 'দি গুরু'র নায়িকার ভূমিকায় অভিনয়ের জন্যে এই রীটা টুশিংহামকে চুক্তিবদ্ধ করেছেন। কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে সর্বশ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীরূপে পুরস্কারপ্রাপ্তা 'এ টেস্ট অব হনি'র নায়িকা রীটা তাঁর স্বামী টেরি বিকনেল ও তাঁদের ছোট দুটি ছেলেকে নিয়ে ইতিমধ্যেই ভারতে এসে পৌঁছেচেন এবং সোৎসাহে শুটিংয়ে যোগদান করেছেন। তাঁর বিপরীতে অভিনয় করছেন মাইকেল ইয়র্ক, উৎপল দত্ত (গুরু), মধুর জাফ্রে, সঈদ জাফ্রে, অপর্ণা দাশগুপ্ত, লীলা নাইডু, ব্যারী ফস্টার প্রভৃতি শিল্পী। ছবিটির প্রযোজক, পরিচালক, চিত্রনাট্যকার এবং আলোকচিত্র-শিল্পী হচ্ছেন যথাক্রমে ইসমাইল মার্চেন্ট, জেমস আইভরি, রুথ প্রাওয়ার ঝাবওয়ালা ও জেমস আইভরি এবং সুব্রত মিত্র। টোরেন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ফক্স ছবিটির পরিবেশনা দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

জলসা

রীতাম্বরা

সঙ্গীতশ্যামলা এবং লায়নস ক্লাব নিবেদিত : রবীন্দ্র সদনে মঞ্চস্থ নৃত্যনাট্য 'রীতাম্বরা' গত সপ্তাহের এক উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান। সৃষ্টির প্রেরণায় মানুষের সংগ্রাম, অন্তর্দ্বন্দ্ব ও ব্যর্থতা, আকৃতি ও পরাজয়ের এক মর্মস্পর্শী আলেখ্য রীতাম্বরার সঙ্গীত ও নৃত্যসমন্বয়ে রসিকজনের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছে। মঞ্জুলিকা রায়চৌধুরীর কল্পনাসমৃদ্ধ নৃত্যপরিচালনা অনুষ্ঠানের বিশেষ সম্পদ। এই কাব্যধর্মী আখ্যানকে গীতকবিতায় বিশ্লেষণ করেছে প্রোঃ লোভা এবং সুরে সুরে রূপময় করে তুলেছেন শ্রীমতী সোম তেওয়ারী। মল্লার, বসন্ত, যোগকোষ ভৈরবী, ললিত রাগাশ্রয়ী ঋতু-চিত্রণ জীবন্ত হয়ে উঠেছে রবি কিরণ ও সোম তেওয়ারীর কণ্ঠসঙ্গীতের অবদানে। আবহসঙ্গীত রচনা করেছেন রবি রায়-চৌধুরী। কিছু কিছু নৃত্যে উচ্চাঙ্গের স্বাক্ষর ছিল কিন্তু প্রযোজনার বিরাটত্বের জন্য বা যে কারণেই হোক অসঙ্গতি ও অন্যান্য ত্রুটিবিচ্যুতিও ছিল। তবে সে ফাঁকটুকু ভরিয়ে দিয়েছে মানব-মানবীর অপূর্ব নৃত্যপরিকল্পনা। সমাপ্তি দৃশ্যের স্বপ্নকল্পনা পৃথিবীর ধূলিমাটির ঊর্ধ্বের এক সুন্দর প্রার্থনা যেন। এই রসোত্তীর্ণ অনুষ্ঠানটির জন্য উদ্যোক্তারা ধন্যবাদার্হ।

বিদেশ সফরান্তে আশীষ খাঁ

সম্প্রতি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন উপলক্ষ্যে শ্রীআশীষ খাঁকে সম্বর্ধনা জানানোর জন্য পাম অ্যাভিনিউতে এক সঙ্গীতাসরের আয়োজন করেছিলেন ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ।

অধিকাংশই সাংবাদিক ও শিল্পীশ্রোতার এই সঙ্গীতসভায় আশীষ খাঁ "শ্রী" রাগে আলাপ বাজিয়ে পূরিয়া কল্যাণে গৎ বাজিয়ে শোনালেন। আশীষ খাঁর বাজনা এর আগেও বহুবার শুনেছি। আলাউদ্দিন ঘরাণার ঐতিহ্যমণ্ডিত সকল ঐশ্বর্য অধিগত হলেও সম্ভবতঃ বাজে কিছু দাপটের অভাবে সব সময়ই একটা অপূর্ণতাবোধ শ্রোতাদের মনে ছিল। কিন্তু এবারের বাজনায় রেওয়াজ, ধ্যানধারণা ও প্রয়োগকৌশলের অপূর্ব সমন্বয়ে তাঁর বাজের যথাযথ অনুশীলনের পরিণতি, গাম্ভীর্য ও গভীরতায় সম্পন্নে দীপ্ত তাঁর বাজনা রসিক পণ্ডিতজনের আনন্দের কারণ হয়েছে। ধ্রুপদাঙ্গের আলাপে ভক্তিরসাশ্রয়ী এই রাগ সবিস্তারে পল্লবিত। মধ্যজোড় ও গমকজোড়ের মর্যাদাগাম্ভীর্য স্বরসমন্বয়ের মধ্যে রেখাব পঞ্চমের অনুরণনে আশীষ খাঁর অনুভব ও অনুশীলনজাত অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় মুদ্রিত।

'পূরিয়া-কল্যাণ' গতের বিলম্বিত অংশের শান্ত বিস্তারের পর তানবৈচিত্র্যে ছন্দসৌন্দর্য এবং লয়ের মুন্সিয়ানায় পিতার উপযুক্ত পুত্রের কৃতিত্ব সুপরিস্ফুট। তাঁর প্রতিভার মোড় ফেরা পূর্ণতায় পৌঁছবে এই আশাই আমরা রাখি। উপযুক্ত সঙ্গতে বাজনার শ্রীবৃদ্ধি করেছেন শঙ্কর ঘোষ।

যুক্তরাষ্ট্রে তবলা বাদ্যের সমাদর

"সঙ্গত মূল্য ছাড়াও মৌলিক ভারতীয় যন্ত্র হিসাবে তবলা এবং তবলাবাদকের নিজস্ব একটা বিশেষ মূল্য আছে এ সত্য সম্বন্ধে সচেতন হলাম এবার আমেরিকা গিয়ে। এ কথা মানতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই।" কথাপ্রসঙ্গে বললেন সাফল্যদীপ্ত বিদেশ সফর-প্রত্যাগত কানাই দত্ত।

"বিদেশে গিয়ে স্বদেশী যন্ত্রের মূল্য হৃদয়ঙ্গম?" ঈষৎ কৌতুকচ্ছলেই জিজ্ঞেস করি।

"মাফ চেয়েই বলছি ওদেশে বাজনার শেষে আমার চারপাশে কৌতূহলী শ্রোতার ভীড়ে এবং তবলা সম্বন্ধে তাদের অজস্র প্রশ্নবাণে আমি যেন নিঃশ্বাস নেবার সময় পেতাম না।

এদেশে যন্ত্রসঙ্গীত, কণ্ঠসঙ্গীত ও নৃত্যের সঙ্গতিরা ছাড়া আমাদের যেন পৃথক কোন অস্তিত্ব নেই। অন্য শিল্পীকে উদ্দীপ্ত করাই শুধু আমাদের কাজ। তারপর বাহবার বেলোতো আনই পান অন্যান্য শিল্পী। কারো যদি নেহাৎ দয়া হোল বললেন, 'কানাইবাবু আপনি ত বেশ বাজিয়েছেন।' কিন্তু আমেরিকায় ১৯৫৪-৫৫তে য়ুহুদি মেনুইনের সঙ্গে গিয়েছিলেন স্বর্গত চতুর-লালজী। সঙ্গত ছাড়াও শুধুমাত্র তবলা বাজনার একক শিল্পীরূপে তিনি ওদেশে রীতিমত "সেনসেসন ক্রিয়েট" করেছেন। তারপরই পণ্ডিত রবিশঙ্করের সঙ্গে আমি গেলাম। চতুরলালজীর বাজনার রেশ তখনও যেন ওদেশের আকাশে বাতাসে ছড়ানো। "চাটুরলাল"-এর খ্যাতি সবার মুখে মুখে ফিরছে।"

"বিদেশী শ্রোতারা তবলার বোল ঠেকার মজাটা বুঝতে পারতে না শুধু সেতারের সঙ্গে জবাব দেওয়া-দেওয়ি শুনেই হাততালি দিতেন?"

জিজ্ঞেস করায় কানাইবাবু বললেন, "ওঁদের একটা সহজাত বোধশক্তি ও অন্তর্দৃষ্টি আছে—যা দিয়ে যে কোনো সঙ্গীত ও শিল্পীর সৌন্দর্যের উৎসটা খুঁজতে চেষ্টা করেন। এদেশের শিল্পীদের পাণ্ডিত্যকে ওঁরা খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখেন। মিঞা বিসমিল্লার ওখানে রাজার মত সম্মান, অথচ এখানে? সানাইওলা থেকে বড়জোর সানাইবাদকের পদে উন্নীত। এর বেশী কিছু নয়। তাঁর সমাদর নেই তা নয়। তবে স্বল্প-সংখ্যক সঙ্গীতবোদ্ধার মধ্যে তা সীমাবদ্ধ।

"ওস্তাদ আল্লারাখার প্রায় ৩০০ জন তবলার ছাত্রছাত্রী। ওদেশের বহু প্রতিষ্ঠান আমাকেও অনুরোধ করছেন তবলায় ক্লাশ খোলার জন্য। জুন মাসে আরো কয়েকটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাচ্ছি।"

"ক্লাশও খুলবেন?"

"মনস্থির করতে পারি নি। তবে প্রস্তাবটি নিঃসন্দেহে লোভনীয়। আমি যা কোনোদিন আশা করিনি—স্বপ্নেও ভাবিনি সেই আশাতীত বস্তু পেয়েছি ওদেশে।"

"কি সেটা?"

"একক শিল্পী হিসাবে নিজস্ব সম্মান। এইটুকু বজায় থাকলেই আমি খুশী।"

গীতালির মাসিক অনুষ্ঠান

কলিকাতার প্রখ্যাত সঙ্গীতশিক্ষা ভবন গীতালির দশম মাসিক আসর অনুষ্ঠিত হয়েছে। কণ্ঠসঙ্গীতে শ্রীঅরুণ সরকার, তবলা লহরায় প্রণব মুখার্জী, বেহালায় শ্রীরঞ্জিৎ রায়।

সুর-বাহারের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

নৃত্য, কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীত শিক্ষায়তন সুর-বাহার আয়োজিত সাংস্কৃতিক উৎসবে ভারতীয় লোকসঙ্গীত সম্বন্ধে উদাহরণ সহযোগে হৃদয়গ্রাহী আলোচনা করেন যশস্বী শিল্পী শ্রীহেমাঙ্গ বিশ্বাস। এঁর সাথে কণ্ঠ ও যন্ত্রে সহযোগিতা করেন শ্রীমতী রত্না সরকার ও সহশিল্পীবৃন্দ। এ-ছাড়া সর্বশ্রী কৃষ্ণগোপাল ঘোষ, কৃষ্ণ সমাদ্দার, বিমলকুমার মিত্র, অপর্ণা দত্ত ও সমরেশ মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে পরি-বেশিত রবীন্দ্র-নৃত্য, কাজী নজরুলের দেশা-ত্মবোধক গান, যন্ত্রসঙ্গীত, রাগপ্রধান বাংলা গান ও ভজন গান শিক্ষার্থীরা পরিবেশন করেন। সবশেষের অনুষ্ঠানে গীটারে রাগসঙ্গীত বাজিয়ে শোনান শ্রীত্রিদিব বন্দ্যোপাধ্যায় ও তবলায় সহযোগিতা করেন শ্রীচন্দ্রকুমার চট্টো-পাধ্যায়। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শ্রীসুনীল সাহা।

বিচিত্রিতার 'শেষরক্ষা'

গত ডিসেম্বর মাসে মহাজাতি সদনে 'বিচিত্রিতা'র সভ্য-সভ্যাবৃন্দ সাফল্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'শেষরক্ষা' অভিনয় করেন। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে শ্রীসলিল মিত্র বৈদ্যুতিক বেহালায় রবীন্দ্রসংগীতের সুর বাজিয়ে সকলকে মুগ্ধ করেন। সামগ্রিকভাবে নাটকাভিনয় রসোত্তীর্ণ হয়। চন্দ্রকান্ত, বিনোদ ও ইন্দুমতীর ভূমিকায় যথাক্রমে সর্বশ্রী প্রফুল্ল ভোস, প্রবীর মুখোপাধ্যায় ও রীণা চৌধুরী নৈপুণ্যের পরিচয় দেন। সংগীতপরিচালনায় ছিলেন শ্রীদীপ্তিকুমার মিত্র, আলোকসম্পাতে শ্রীরাজকুমার, নেপথ্য কণ্ঠসংগীতে সর্বশ্রী মলয়া চক্রবর্তী, আরতি বসু, মণিমালা দাশগুপ্ত ও শ্রীলেখা মিত্র এবং যন্ত্রসংগীতে সর্বশ্রী সলিল মিত্র ও নৃপেন ঘোষ। নাটক পরিচালনা করেন শ্রীপ্রফুল্ল ভোস।

—চিত্রাঙ্গদা

ওলিম্পিকের প্রস্তুতি: এদেশে ও ভিনদেশে

শঙ্করবিজয় মিত্র

প্রতিভা সম্পর্কে জর্জ এলিয়টের এই উক্তিটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য—

"Genius is often the capacity for receiving and improving by discipline.

অবধারণ আর সনিষ্ঠ অনুশীলনতার উন্নয়নই হল প্রতিভা। জীবনের সকল ক্ষেত্রে এর উপযোগিতা সর্বাধিক। ক্রীড়াজগতের প্রতিটি প্রতিভা এই পথেই পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করে। বিশ্বের সমুন্নত দেশগুলি আবার আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পন্থা প্রয়োগে এই বিকাশের পথকে সহজতর করে তুলছে। ক্রীড়া-প্রতিভা স্ফুরণের অবাধ সুযোগ-সুবিধা এগিয়ে দিয়ে ক্রীড়ামানকেও আজ তারা অনেক ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছে। বিশ্বের এই সমস্ত দেশের সঙ্গে ক্রীড়াক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করতে হলে সেই সমুন্নত মানে পৌঁছতে হবে, পিছিয়ে থাকলে নৈরাশ্য ও নিষ্ফলতাই সার হবে। এই সহজ সত্যটি উপলব্ধি করে দেশের মানসম্মান বিশ্বের দরবারে তুলে ধরার ভার যাঁরা নিয়েছেন তাঁরা কতদূর কাজ এগিয়েছেন সে-কথা আলোচনা করার সময় হয়েছে। টোকিও ওলিম্পিকের পর চার-চারটে বছর কেটে গেছে। মেক্সিকো ওলিম্পিকের আর মাত্র সাত-আট মাস বাকি। কিন্তু আমরা চার বছরে চার-পাও এগোতে পেরেছি কি? ক্রীড়াক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সাফল্যের দু-একটা খাপছাড়া সাফল্যের নজির ছাড়া কোথাও কোন হিরণ-হরিতের সম্ভাবনা দেখা দেয়নি। এমনকি ছলনাময়ী আশার হাতছানিও কোন উৎকট আশাবাদীর নজরে পড়েনি। হকির সোনার হরিণ লণ্ডনের ক্রীড়ারণ্যে পাকিস্থানী ব্যাধের সায়কে আহত হয়েছে। রেঙ্গুনের মাঠে ভারতীয় ফুটবলের অপঘাত ঘটেছে। ইংলন্ডের পর অস্ট্রেলিয়ার দুরন্ত প্রান্তরে ভারতীয় ক্রিকেটের অপযশ পরিব্যাপ্তি লাভ করেছে। এমনকি টেনিস, টেবল টেনিস, ব্যাডমিণ্টন প্রভৃতি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় এতটুকু সফল্যের নজীর ভারত রেখে আসতে পারেনি। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার মধ্যে '৬৭ সালের শেষার্ধে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব কুস্তি প্রতিযোগিতায় ভারতীয় প্রতিযোগীরা গভীর অন্ধকারে ক্ষীণ আশার আলো দেখিয়েছেন।

তার এত নৈরাশ্যের মধ্যেও বুকে বল পাবার মত ক্রীড়াকৃতি দেখিয়ে এসেছে ভারতের স্কুলের ছেলেরা ইংলণ্ডের ক্রিকেটের মাঠে মাঠে। এই তাজা প্রাণগুলিকে অবলম্বন করেই ভারতের ভবিষ্যৎ রচনা করতে হবে। আর তাদের দিয়েই আন্তর্জাতিক কীর্তিসৌধে আরোহণের সোপান গড়ে তুলতে হবে। বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় দেশগুলিও এই পথেই এগিয়ে সাফল্য অর্জন করেছে।

আধুনিক ওলিম্পিকের প্রবর্তক পিয়েরে কুবের্টিন যে-আদর্শের কথা প্রচার করেছিলেন, আক্ষরিক অর্থে কোন দেশই তা আজ মেনে চলতে পারে না। তিনি বলেছিলেন, ওলিম্পিকে যোগ দিতে পারাটাই বড় কথা, বিজয়ী হওয়াটা বড় কথা নয়! মুখে এ-কথা বললেও, কোন্ দেশ ক'টা সোনার মেডেল ঘরে তুলতে পারে তার প্রতিই লক্ষ্যটা সর্বাধিক এবং সমগ্র প্রস্তুতিটাও চলে সেই লক্ষ্যে। একটা ওলিম্পিক অনুষ্ঠান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে চলে পরেরটার জন্যে প্রস্তুতি। তাই ১৯৬৪ সালে টোকিও ওলিম্পিক অনুষ্ঠানের শেষে প্রতিটি দেশ ফলাফলের তালিকায় তার স্থান দেখে নিয়ে ১৯৬৮ সালে যাতে সেটাকে আরও উঁচুতে তোলা যায় তার পরিকল্পনা নিয়েছে ১৯৬৫ সালের গোড়াতেই এবং মেক্সিকো সিটির ক্রীড়াক্ষেত্রে অ-পেশাদার ক্রীড়ার স্বর্ণ-স্বীকৃতি জিনে আনবার সাধনায় ব্রতী হয়েছে।

মেক্সিকো সিটিকে ঘিরে সারা বিশ্বে আজ জল্পনা-কল্পনার অন্ত নেই। এখানকার উচ্চতা আর তার জলহাওয়া গবেষণার খোরাক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এর উচ্চতা প্রায় সাত হাজার ফুট। এই উচ্চতা একটা সমস্যা, এর খেয়ালী আবহাওয়াও তেমনি আর একটা সমস্যা। উঁচু জায়গার আবহাওয়া কোন কোন ক্রীড়ানুষ্ঠানের সহায়ক নয়। তাদের বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে এখানে, যেমন দূরপাল্লার দৌড়ানীরা, মল্লবীর, মুষ্টিযোদ্ধা প্রভৃতি। আবার উঁচু জায়গার হাওয়ার প্রতিরোধক্রিয়া কম বলে সাইক্লিস্টদের পক্ষে তাড়াতাড়ি প্যাডেল করা, হ্যামার, জেভেলিন, ডিসকাস প্রভৃতি ছোড়া সুবিধাজনক। স্বল্পপাল্লার দৌড়ানিরারা দ্রুততর লয়ে ছুটতে পারবেন। লম্ফনকারীরাও তাঁদের লম্ফনে সহায়তা পাবেন। গুণাগুণের বিচারে দু-দিকের পাল্লাতেই কিছু-না-কিছু যুক্তি রাখতে পারা যায়। উচ্চস্থানে অবস্থিতির ফলে মেক্সিকো সিটিতে ম্যারাথন দৌড়ে সবচেয়ে অসুবিধা হবার কথা। কিন্তু সম্প্রতি এখানে তৃতীয় ওলিম্পিক সপ্তাহের ক্রীড়ানুষ্ঠানে বেলজিয়ামের ম্যারাথন দৌড়বীর গ্যাস্টন রোল্যান্টস দু ঘন্টা ১৯ মিনিটে এই পথ দৌড়েছেন। ম্যারাথন দৌড়ের দূরত্ব এই সময়ের মধ্যে দৌড়ানো সাধারণ অবস্থাতেই সহজসাধ্য নয়। কাজেই বেলজিয়ান দৌড়বীরের এই সাফল্য সাধারণ স্তরের নয়। তবে শোনা গেছে রোল্যান্টস এখানে আসার আগে পার্বত্য এলাকায় দৌড়ে দৌড়ে প্রচুর প্রস্তুতি নিয়েছেন এবং তাঁর সাফল্যের রহস্যই এইখানে।

খেয়ালী আবহাওয়ার জন্যেও মেক্সিকো সিটির সুনাম আছে। ঝড়, বৃষ্টি, ঠাণ্ডা, গরমের আকস্মিক আবির্ভাব এর বৈশিষ্ট্য। এরজন্যে ওলিম্পিক প্রতিযোগীদের তৈরী থাকতে হবে। ইংলণ্ডে ঠাণ্ডা ও বৃষ্টির জন্য আমাদের ক্রিকেট দলকে যেভাবে নাস্তানাবুদ হতে হয়েছে, সে-কথা ভেবে ভারতীয় প্রতিযোগীদের তৈরী করা এবং সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। এর জন্য উপযোগী সাজ-পোষাক ও আবহাওয়ার আকস্মিক পরিবর্তনশীল অবস্থার জন্য শরীরকে সইয়ে নিয়ে তৈরী করা দরকার।

মেক্সিকো সিটির এই সকল বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে আজ রাশিয়া, আমেরিকা, জার্মানী, জাপান প্রভৃতি দেশগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। তৃতীয় ওলিম্পিক সপ্তাহের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এই সকল দেশের বিভিন্ন প্রতিযোগী যোগ দিয়ে মূল প্রতিযোগিতার জন্য রিহার্সাল দিয়েছে। আর এঁদের সঙ্গে সঙ্গে এসেছেন ডাক্তার, বিজ্ঞানী ও ক্রীড়াবিদদের দল। তাঁরা সমস্ত অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে কিভাবে তাঁদের প্রতিযোগীদের সফল করা যায় তার পরিকল্পনা নেবেন। প্রাক্-ওলিম্পিক পর্বে এইভাবে প্রস্তুতি চলেছে দেশে দেশে।

সোবিয়েৎ রাশিয়া কিভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছে তা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সোবিয়েৎ এ্যাথলিটরা প্রাক-ওলিম্পিক প্রতিযোগিতায় তিন-তিনবার যোগ দিয়েছে। তাদের সঙ্গে বিজ্ঞানী ও চিকিৎসাবিজ্ঞানীর দল সবকিছু দেখেশুনে এসে ব্যবস্থাপত্র দিয়েছেন।

আর্মেনিয়ার উচ্চ পার্বত্য এলাকার এক গ্রামে সোবিয়েৎ ওলিম্পিক দলকে ট্রেনিং দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। ট্র্যাক ও ফিল্ড এ্যাথলিটদের চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতা এবার উচ্চ পার্বত্য এলাকার শহর লেনিনাকেনে অনুষ্ঠিত হবে বলে স্থির করা হয়েছে। এইভাবে ওলিম্পিক প্রতিযোগীদের মেক্সিকো সিটির আবহাওয়ার উপযোগী করে তোলা হচ্ছে।

তবে এ তো সম্পূর্ণ বাইরের দিক। আসল দিকটা হল উপযুক্ত এ্যাথলিট নির্বাচন, এমন এ্যাথলিট যারা ওলিম্পিক যাতে তৈরি। আর এই নির্বাচন পর্বটা যেমন বিশাল তেমনি জটিল। একমাত্র ট্র্যাক ও ফিল্ড প্রতিযোগিতার জন্যই ৬০ লক্ষ ছেলে-

মেয়ে এবং মুষ্টিযুদ্ধের জন্যে তিন লক্ষ ছেলে এগিয়ে এসেছে।

নির্বাচন-পর্বের শেষ প্রান্তে এসে ট্র্যাক এন্ড ফিল্ড এ্যাথলিট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় দুশো। এর মধ্যে নব্বুই থেকে পঁচানব্বুই জনকে পাঠান হবে মেক্সিকো ওলিম্পিকে। সম্ভাব্য দলটিকে এখন সেরা কোচের প্রশিক্ষণে দুরন্ত করে তোলা হবে। প্রতি বিভাগেই এমনি ঝাড়াই-বাছাই করে সু-নির্দিষ্ট পন্থায় তাদের সুশিক্ষিত করে তোলা হয়।

প্রাক-ওলিম্পিক বছরে এই নির্বাচন-পর্বটা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সাধারণ ক্রীড়ানুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রাথমিক পর্ব এগিয়ে চলে। স্কুলে, কারখানায়, যৌথ খামারে, রাষ্ট্রীয় খামারে ছোট ছোট প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই সকল প্রতিযোগিতায় সেরা প্রতিযোগীর এরপর শহর ও জেলা-ভিত্তিক প্রতিযোগিতায় যোগ দেয়। পরবর্তী প্রতিযোগিতা হলো রাজ্য-ভিত্তিক। এর ফলাফলের উপর বাছাই করে মস্কো, লেনিনগ্রাদ প্রভৃতি শহরের শ্রেষ্ঠ এ্যাথলিট-দের নিয়ে শেষ নির্বাচন হয়। এই প্রথায় নির্বাচনে প্রতিযোগীর সংখ্যা বিপুল আকার ধারণ করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়—টোকিও ওলিম্পিকের প্রাক্কালে প্রাথমিক নির্বাচনে প্রার্থী-সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ছ' কোটি। সাধারণের ক্রীড়ানুষ্ঠান থেকে শেষ নির্বাচন পর্যন্ত বিপুল ব্যবস্থায় সকল স্তর থেকে প্রতিভার অনুসন্ধান চালান হয়, নানাভাবে তাকে পরীক্ষা করে বাছাই করা হয়। ফলে বহু রত্নের সন্ধান মেলে এবং এইভাবেই দেশ সাফল্যের শিখরে উঠতে সমর্থ হয়। এইভাবে কত অজ্ঞাত ক্রীড়া-প্রতিভা সামনের সারিতে এসে বিশ্বে চমক লাগিয়েছে। মেলবোর্ণ ওলিম্পিকের প্রাক্কালে ১৯৫৫ সালে এইভাবেই অষ্টাদশ বর্ষীয় ইগোর-টার-ওভানেশিয়ান আত্মপ্রকাশ করেন এবং ওলিম্পিকে দীর্ঘ লম্ফনে বিশ্বের রেকর্ড সৃষ্টির অধিকারী হন।

সমগ্র দেশের স্কুল, কারখানা, খামার, শহর ও পল্লীগ্রাম থেকে ব্যাপকভাবে অনুসন্ধান চালিয়ে প্রতিভার অন্বেষণ এবং তাকে সকল রকম সুযোগ-সুবিধা দিয়ে বিকশিত করে তোলার যে বিপুল আয়োজন করা হয়েছে, তার তুলনা নেই। এর ফলও সুদূর-প্রসারী হয়েছে। সোবিয়েৎ রাশিয়া ১৯৫২ সালে হেলসিঙ্কি ওলিম্পিকে প্রথম যোগ দেয় এবং ধাপে ধাপে সাফল্যের চরম শিখরের দিকে এগিয়ে চলেছে। মেক্সিকোর উনবিংশ ওলিম্পিক রাশিয়ার কাছে পঞ্চম ওলিম্পিক। পাঁচবারের মধ্যেই রাশিয়া ওলিম্পিকে মার্কিন প্রাধান্যের অবসান ঘটিয়েছে।

মেক্সিকো ওলিম্পিকেও রাশিয়া সকল বিভাগে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালাবে। মুষ্টিযুদ্ধে রুশ মুষ্টিযোদ্ধারা টোকিওতে বিশেষ সাফল্য লাভ করে। বার্লিনে অনুষ্ঠিত ইউরোপীয় প্রতিযোগিতাতেও এবার রুশ মুষ্টিযোদ্ধারা আটটি স্বর্ণপদক নিয়েছে। রুশ মুষ্টিযোদ্ধাদের মধ্যে স্ট্যানি-স্লাভ স্টেপাসকিন, রিচার্ডস ট্যামিলান, ভিক্টর আগিয়েভ নিশ্চিত সাফল্যের আশা রাখে। তাছাড়া তরুণ মুষ্টিযোদ্ধাদের মধ্যে ভ্যালেরি ট্রেগুবভ, নিকোলাই নভিকভ, ভিক্টর বারানিকভ প্রভৃতিও দলের শক্তি বৃদ্ধি করবে।

জিমনাস্টিকে রাশিয়ার নারী প্রতি-যোগীরা বিশেষ শক্তিসম্পন্ন। এবার এ-বিভাগেও নতুন প্রতিভার সন্ধান মিলেছে নাটাশা কুচিনস্কায়া, লারিসা পেট্রিক, মিনাইদা দ্রুজিনিনার মধ্যে। মেক্সিকোতে চেকোস্লোভেকিয়ার ভেরা কামলাওয়াস্কার সঙ্গে রাশিয়ার কুচিনস্কায়ার মধ্যে তীব্রতম প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে বলে মনে হয়। জিমনাস্ট ভ্যালারি ডরোলিন টোকিও ওলিম্পিকে রুশ দলে রিজার্ভ তালিকায় ছিলেন। এখন তিনি সর্ববিষয়ে পারদর্শী বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন এবং মেক্সিকো ওলিম্পিকেতে স্বর্ণপদকের প্রত্যাশী।

ট্র্যাক এ্যান্ড ফিল্ড বিভাগে এখন প্রবীণ রুশ এ্যাথলিটদের প্রাধান্য। টার-ওভানেশিয়ান আমেরিকার রালফ বোস্টনের রেকর্ড ভাঙার স্বপ্ন দেখেন। বাইলো-রাশিয়ার ৩৪ বছর বয়স্ক রমুয়াল্ডক্লিন হাতুড়ি ছোড়ায় টোকিওর মত মেক্সিকোতেও স্বর্ণপদক জিনে আনবে বলে দৃঢ়সংকল্প করে বসে আছেন। ল্যাটভিয়ার ট্যাসিটার্ন জ্যানিস লুসিস এখনই ৮০ মিটার দূরে জেভলিন ছোড়েন। প্রবীণদের পাশাপাশি তরুণরাও মেক্সিকোর জন্যে জোর প্রস্তুতি চালাচ্ছেন। উচ্চ লম্ফনে ভ্যালেরি ব্রুমেলের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন একেবারে এক অজ্ঞাত তরুণ, নাম ভ্যালেরি স্কভর্টসভ, উচ্চ-লম্ফনে তিনি ২·২১ মিটার পার হয়েছেন। রাশিয়ার ব্রুমেল ও আমেরিকার জন টমাস ছাড়া আর কেউ ঐ সীমা ছাড়াতে পারেননি। স্টীপলচেজে সোভিয়েট এ্যাথলিট ভিক্টর কুডিনস্কির নাম কেউ জানতো না। মাত্র দু' বছর পরে কিয়েভের এই প্রতিযোগীটি বেলজিয়ামের স্বর্ণপদক বিজয়ী গাস্টন রোলেন্টসকে পরাজিত করতে সমর্থ হন।

এইভাবে ওলিম্পিক প্রতিযোগিতার সকল বিভাগে নতুন নতুন প্রতিভা আত্ম-প্রকাশ করেছে এবং স্বর্ণসম্মানের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। একমাত্র হকি ছাড়া সর্বক্ষেত্রেই তারা সাফল্যের আশা রাখে। হকিতে রাশিয়া কোন দল পাঠায় না। ভারোত্তোলনে ভিক্টর কুরেন্টসভ, লিওনিড যাবোটনোস্কি, ইউরি্ভলসব বিশ্বের সর্ব-দেশের প্রতিদ্বন্দ্বীদের সমকক্ষ। কুস্তিতে আলেকজান্ডার ইভানিটাস্কি, আলেকজান্ডার মেডভেব, আঙ্গোর-কিকনাদাজি, সেরাজ্ঞ আগমভ আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছেন। সোভিয়েট ফুটবল দল খেলো-য়াড়েরা ওলিম্পিক চ্যাম্পিয়ানশিপ অর্জনেও সমর্থ হয়েছে। এ ছাড়া আরও অনেক বিভাগেই রাশিয়া আজ সাফল্যের আশা রাখে।

ওলিম্পিকে প্রথম আবির্ভাবেই রাশিয়া দীর্ঘকালের মার্কিন প্রাধান্যে হানা দেয় এবং হেলসিঙ্কি ওলিম্পিকে বেসরকারী হিসেবে দলগত পয়েন্ট অর্জনে আমেরিকার সমান সমান হয় ৫৯৪ পয়েন্ট পেয়ে। ১৯৫৬ সালের মেলবোর্ণ ওলিম্পিকে রাশিয়া ৬২৪'৫ পয়েন্ট নিয়ে আমে-রিকাকে পেছনে ফেলে। আমেরিকা পায় ৪৯৮ পয়েন্ট। ১৯৬০ সালের রোম ওলি-ম্পিকে এই ব্যবধান আরও বৃদ্ধি পায়। রাশিয়া পায় ৬৮৩ এবং আমেরিকা ৪৬৩ পয়েন্ট। টোকিওতে আমেরিকা কিছুটা সামলে উঠলেও মোট পয়েন্টের হিসেবে রাশিয়াই শীর্ষস্থান দখল করে।

রাশিয়ার এই সাফল্য একদিনে বা অনায়াসে করায়ত্ত হয় নি। এর জন্যে কি বিপুল প্রয়াস, কি সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও নিখুঁত ব্যবস্থাপনা নিতে হয়েছে তারই কিছুটা বর্ণনা দেবার প্রয়াস পাওয়া গিয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের চিত্রটা যে হতাশাব্যঞ্জক হবে তা একরকম চোখ বুজেই বলা যায়। কিন্তু আমরা কি চির-কালই চোখ বুজেই থাকবো? ক্ষুদ্র স্বার্থ আর দলাদলির দোষানলে তিলে তিলে পুড়ে মরেছি আমরা, সারা অঙ্গে জ্বালা ধরেছে, তবুও কি চৈতন্য হবে না?

যে নিষ্ঠা, সততা ও আন্তরিকতা নিয়ে দেশের ক্রীড়া সম্পদকে উন্নীত মানে তোলা যায় আজও আমাদের মধ্যে তার প্রতিফলন নেই। ওলিম্পিকে ভারতের মত বিরাট দেশের প্রতিনিধি কজনই বা যায় এবং যে দল পাঠান হয় তার তুলনায় কত-টুকু সাফল্য করায়ত্ত হয়। চার বছর ব্যব-ধান সময়ের মধ্যেও আমরা তথ্যসমীক্ষা, প্রতিভা-অন্বেষণের চেষ্টা করি না বিনা চেষ্টায় যাঁদের পাওয়া যায় তাঁদের বিজ্ঞান-ভিত্তিক অনুশীলনের ব্যবস্থা করে দিই না। ফলে খেলাধুলার ক্ষেত্রে ভারত এক বিরাট অবক্ষয়ের সম্মুখীন হয়েছে। এই অবক্ষয় প্রতিরোধ করা একান্ত প্রয়োজন এবং এই প্রতিরোধের জন্যে নির্ভীক নেতৃত্ব অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। আমরা সরকারের কাছে সেই নেতৃত্ব দাবী করি।

খেলাধুলা

দর্শক

অস্ট্রেলিয়া বনাম ভারতবর্ষ

তৃতীয় টেস্ট ক্রিকেট

অস্ট্রেলিয়া : ৩৭৯ রান (ডগলাস ওয়াল্টার্স ৯৩, বিল লরী ৬৪, পল সিহান ৫৮ এবং বব কাউপার ৫১ রান। কুলকার্ণী ৩৭ রাণে ২, সুর্তি ১০২ রাণে ৩, প্রসন্ন ১১৪ রাণে ২ এবং নাদকার্ণী ৩৪ রাণে ২ উইকেট)

ও ২৯৪ রান (ওয়াল্টার্স ৬২ এবং আয়ান রেডপাথ ৭৯ রান। সুর্তি ৫৯ রানে ৩ এবং প্রসন্ন ১০৪ রাণে ৬ উইকেট)

ভারতবর্ষ : ২৭৯ রান (এম এল জয়সীমা ৭৪, পাতৌদির নবাব ৭৪ এবং রুসী সুর্তি ৫২ রান। ফ্রিম্যান ৫৬ রানে ৩, কনোলী ৪৩ রানে ২ এবং কাউপার ৩১ রানে ৩ উইকেট)

ও ৩৫৫ রান (জয়সীমা ১০১, সুর্তি ৬৪, বোরদে ৬৩, পাতৌদির নবাব ৪৮ এবং আবিদ আলী ৪৭ রান। কাউপার ১০৪ রানে ৪ এবং গ্লিসন ৫০ রানে ৩ উইকেট)

প্রথম দিন (জানুয়ারী ১৯) :
অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসের ৭টা উইকেট খুইয়ে ৩১২ রান সংগ্রহ করে। ওয়াল্টার্স ৫১ রান এবং গ্লিসন ৭ রান করে অপরাজিত থাকেন।

দ্বিতীয় দিন (জানুয়ারী ২০) :
অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস ৩৭৯ রানের মাথায় শেষ হলে ভারতবর্ষ তাদের প্রথম ইনিংসের ৬ উইকেটের বিনিময়ে খেলার বাকি সময়ে ১৬৯ রান সংগ্রহ করেছিল।

তৃতীয় দিন (জানুয়ারী ২২) :
অস্ট্রেলিয়ার ৩৭৯ রানের উত্তর ২৭৯ রানের মাথায় ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস শেষ হলে অস্ট্রেলিয়া ১০০ রানে অগ্রগামী হয়ে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে এবং ৩ উইকেটে ১৬২ রান সংগ্রহ করে ২৬২ রানে অগ্রগামী হয়।

চতুর্থ দিন (জানুয়ারী ২৩) :
অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস ২৯৪ রানের মাথায় শেষ হয়। ভারতবর্ষ দ্বিতীয় ইনিংসের ৪ উইকেট খুইয়ে ১৭৭ রান সংগ্রহ করে। ফলে খেলায় জয়লাভের জন্যে ভারতবর্ষের আরও ২১৮ রানের প্রয়োজন হয়। এদিকে হাতে জমা থাকে ৬টা উইকেট। সুর্তি ৫৫ রান এবং জয়সীমা ৫ রান করে অপরাজিত থাকেন।

পঞ্চম দিন (জানুয়ারী ২৪) :
ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংস ৩৫৫ রানের মাথায় শেষ হলে অস্ট্রেলিয়া ৩৯ রানে জয়ী হয়।



ব্রিসবেনে ভারতবর্ষ বনাম অস্ট্রেলিয়া তৃতীয় টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ভারতবর্ষের ফারুক ইঞ্জিনীয়ারের ... ভারতবর্ষের তাজিত ওয়াদেকার মাথা নীচু করে রেনেবার্গের বাম্পার বল থেকে আত্মরক্ষা করেছেন।

ব্রিসবেনের উলুনগাব্বা মাঠে অনুষ্ঠিত অস্ট্রেলিয়া বনাম ভারতবর্ষের তৃতীয় টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়া ৩৯ রানে ভারতবর্ষকে পরাজিত করার সূত্রে ১৯৬৭—৬৮ সালের টেস্ট সিরিজে ৩—০ খেলায় 'রাবার' জয়ের গৌরব লাভ করেছে। সুতরাং সিরিজের শেষ চতুর্থ টেস্ট খেলার গুরুত্ব সেই দিক থেকে অনেক কমে গেছে। অস্ট্রেলিয়া যদি শেষ চতুর্থ টেস্ট খেলাতেও ভারতবর্ষকে পরাজিত করে তাহলে সিরিজের সমস্ত টেস্ট খেলায় জয়লাভের সূত্রে এক বিশেষ গৌরব লাভ করবে।

আলোচ্য তৃতীয় টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার ডগলাস ওয়াল্টার্স ৯৩ ও ৬২ রান এবং ভারতবর্ষের এম এল জয়সীমা ৭৪ ও ১০১ রান করে ব্যাটিংয়ে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। এই মাঠেই ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১৯৬৫ সালের ১ম টেস্টে ওয়াল্টার্স তাঁর খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম টেস্ট খেলতে নেমে সেঞ্চুরী (১৫৫ রান) করেছিলেন। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১৯৬৫ সালের টেস্ট সিরিজে পাঁচটি টেস্টের ৭টা ইনিংসে খেলার সূত্রে ওয়াল্টার্স ৪১০ রান করেছিলেন। তারপর পুরো দু' বছর (১৯৬৬—৬৭) তাঁকে আর অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট দলে পাওয়া যায়নি। অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট দলের শক্তি বৃদ্ধির জন্যে সামরিক বিভাগের চাকুরী থেকে ছুটি নিয়ে দু' বছর বাদে ওয়াল্টার্স টেস্ট খেলতে নেমে বিশেষ কৃতিত্বেরই পরিচয় দিয়েছেন। অপরদিকে ওয়াল্টার্সের মতই স্বদেশ থেকে জয়সীমার ডাক পড়েছিল। বর্তমান অস্ট্রেলিয়া সফরে জয়সীমা বাদ পড়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত সেই বাতিল খেলোয়াড় জয়সীমাই তৃতীয় টেস্টে সেঞ্চুরী করে ভারতবর্ষের মুখ রেখেছেন—অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৯৬৭-৬৮ সালের টেস্ট সিরিজে ভারতবর্ষের পক্ষে প্রথম সেঞ্চুরী। আলোচ্য তৃতীয় টেস্টে ব্যাট ও বলে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার বব কাউপার এবং ভারতবর্ষের রুসী সুর্তি। কাউপার প্রথম ইনিংসে ৫১ রান করেন এবং ৩১ রানে ৩টে ও ১০৪ রানে ৪টে উইকেট পান। রুসী সুর্তি করেন ৫২ ও ৬৪ রান এবং ৩ উইকেট পান

১০২ রানে এবং ৩ উইকেট ৫৯ রানে। উভয় দলের পক্ষে বোলিংয়ে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন প্রসন্ন—১১৪ রানে ২ এবং ১০৪ রানে ৬টা উইকেট।

আলোচ্য তৃতীয় টেস্টে অস্ট্রেলিয়া দলে দুজন শক্তিশালী খেলোয়াড়—বব সিম্পসন এবং গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জী ছিলেন না। অস্ট্রেলিয়া দলের নেতৃত্ব করেন বিল লরী। অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস ২৯৪ রানের মাথায় শেষ হলে খেলায় জয়লাভের জন্যে যেখানে ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৯৫ রান করার প্রয়োজন ছিল সেখানে তারা ৫ উইকেটের বিনিময়ে ৩১০ রান সংগ্রহ করেও শেষ পর্যন্ত ৩৯ রানে পরাজয় বরণ করে। শেষ ৫ উইকেটে ভারতীয় খেলোয়াড়রা মাত্র ৪৫ রান তুলেছিলেন—ব্যাটিংয়ে কি শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয়! শেষ পর্যন্ত ৩৫৫ রানের মাথায় দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হওয়ার ফলে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে জয়লাভের সুবর্ণ সুযোগ ভারতবর্ষ হাতছাড়া করে। অস্ট্রেলিয়ার অতিবড় সমর্থকও এই তৃতীয় টেস্ট খেলায় তাদের দলের জয়লাভ আশা করেননি।

ভারতবর্ষের অধিনায়ক পতৌদি টসে জয়ী হয়ে যথারীতি অস্ট্রেলিয়াকে প্রথম ব্যাট করার দান ছেড়ে দেন। মধ্যাহ্ন ভোজের সময় অস্ট্রেলিয়ার এক উইকেট পড়ে ৯৮ রান উঠেছিল। চা-পানের ঠিক আগের ওভারে সুর্তির বলে চ্যাপেল বোল্ড আউট হন। চা-পানের পরের খেলায় অস্ট্রেলিয়াকে বিপর্যয়ে পড়তে হয়। যেখানে খেলার এক সময়ে ৫ উইকেট পড়ে ২৫০ রান ছিল সেখানে দেখা গেল ২৭৭ রানের মাথায় ৭ম উইকেট পড়েছে। প্রথম দিনের খেলায় অস্ট্রেলিয়া ৭ উইকেট খুইয়ে ৩১২ রান সংগ্রহ করেছিল। দীর্ঘ দুবছর পর পুনরায় টেস্ট খেলতে নেমে ওয়াল্টার্স ৫১ রান করে অপরাজিত থাকেন। প্রথম দিনের খেলায় ভারতবর্ষের স্পিন বোলাররা—সুর্তি (৮৬ রানে ৩), প্রসন্ন (৯৫ রানে ২) এবং নাদকার্নী (৩৪ রানে ২) বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

দ্বিতীয় দিনে ৩৭৯ রানের মাথায় অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস শেষ হয়। ডগলাস ওয়াল্টার্স মাত্র ৭ রানের জন্যে শতরান করার গৌরব থেকে বঞ্চিত হন। তাঁর ৯৩ রান (৭টা বাউন্ডারীসহ) তুলতে ২১৮ মিনিট সময় লেগেছিল। দ্বিতীয় দিনের খেলার বাকি সময়ে ভারতবর্ষ ৬টা উইকেট খুইয়ে মাত্র ১৬৯ রান সংগ্রহ করেছিল। ভারতবর্ষের খেলার সূচনা খুবই হতাশব্যঞ্জক হয়েছিল; মাত্র ৯ রানের মাথায় ৩য় উইকেট পড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত ৪র্থ উইকেটের জুটিতে পতৌদি এবং সুর্তি ১২৮ রান তুলে রানের চেহারা অনেকটা ভদ্রলোকের মত করেছিলেন।

তৃতীয় দিনে ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস ২৭৯ রানের মাথায় শেষ হয়। মধ্যাহ্ন ভোজের সময় ভারতবর্ষের ২৩৪ রান (৭ উইকেটে) ছিল। তৃতীয় দিনে খেলায় সমস্ত গৌরব একমাত্র জয়সীমারই প্রাপ্য। তিনি তাঁর অনবদ্য খেলায় ৭৪ রান করেন এবং নাদকার্নীর সঙ্গে ৭ম উইকেটের জুটিতে ৪৯ রান এবং প্রসন্নর সঙ্গে ৮ম উইকেটের জুটিতে দলের মূল্যবান ৫৯ রান সংগ্রহ করে দেন; তৃতীয় দিনের খেলার বাকি সময়ে অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংসের ৩টে উইকেট খুইয়ে ১৬২ রান তুলে খেলায় ২৬২ রানে অগ্রগামী হয়।

চতুর্থ দিনে ২৯৪ রানের মাথায় অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়। লাঞ্চের সময় তাদের রান ছিল ২৫৭ (৫ উইকেটে)। কিন্তু লাঞ্চের পর প্রসন্নর বোলিংয়ে নাটকীয়ভাবে মাত্র ৪০ মিনিট সময়ে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়। অস্ট্রেলিয়ার শেষ ৪টে উইকেট মাত্র ১০ রানের বিনিময়ে পড়ে যায়। খেলার একসময়ে প্রসন্নর বোলিং পরিসংখ্যান ছিল—ওভার ৪.৪—মেডেন ১—রান ১৭ এবং উইকেট ৪। দ্বিতীয় ইনিংসে প্রসন্ন ১০৪ রান দিয়ে ৬টা উইকেট পান।

হাতে খেলার সময় ৫৪৭ মিনিট এবং জয়লাভের জন্যে ৩৯৫ রানের প্রয়োজন—এই হিসাব মাথায় নিয়ে ভারতবর্ষ দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নেমে ৪র্থ দিনে ৪ উইকেট খুইয়ে ১৭৭ রান সংগ্রহ করে। ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংসের সূচনা ভাল হয়নি—মাত্র ৬১ রানের মাথায় ৩য় উইকেট পড়ে যায়। ৪র্থ উইকেটের জুটিতে পতৌদি (৪৮ রান) এবং সুর্তি (নট আউট ৫৫ রান) দলের ৯৩ রান যোগ করেন। এই নিয়ে ন্যাটা-খেলোয়াড় সুর্তি বর্তমান টেস্ট সিরিজে পাঁচবার অর্ধ-শত রান করার গৌরব লাভ করেন।

পঞ্চম অর্থাৎ খেলার শেষদিনে ৩৫৫ রানের মাথায় ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হলে অস্ট্রেলিয়া ৩৯ রানে জয়ী হয়। খেলার একসময়ে যেখানে ভারতবর্ষের ৫টা উইকেট পড়ে স্কোর বোর্ডে ৩১০ রান ছিল সেখানে দেখা গেল ৩৫৫ রানের মাথায় তাদের ইনিংস শেষ। ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংসে জয়সীমার ২০৯ মিনিটের খেলায় সেঞ্চুরী রান এবং বোরদে ও জয়সীমার ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে ১১৯ রান—বহুকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। চা-পানের কিছু পর কাউপারের বল 'স্কোয়ার-কাট' করতে গিয়ে জয়সীমা তাঁর ১০১ রানের মাথায় গ্লীসনের হাতে ধরা পড়ে আউট হন। তাঁর বিদায়ের সঙ্গেই ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলাও শেষ হয়।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম ইংল্যান্ড

প্রথম টেস্ট ম্যাচ

ইংল্যান্ড : ৫৬৮ রান (কেন ব্যারিংটন ১৪৩, টম গ্রেভনী ১১৮, কলিন কাউড্রে ৭২ এবং জিওফ বয়কট ৬৮ রান। চার্লি গ্রিফিথ ৬৯ রানে ৫ এবং গিবস ১৪৭ রানে ৩ উইকেট)

ওয়েস্ট ইন্ডিজ : ৩৬৩ রান (লয়েড ১১৮ এবং কানহাই ৮৫ রান। জোন্স ৬৩ রানে ৩ উইকেট)

ও ২৪৩ রান (৮ উইকেটে। বুচার ৫২, ক্যামাকো ৪৩, নার্স ৪২, কানহাই ৩৭, সোবার্স নট আউট ৩৩ এবং হল নট আউট ২৬ রান)

পোর্ট অব স্পেনে আয়োজিত ইংল্যান্ড বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম টেস্ট খেলায় জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়নি। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের দ্বিতীয় ইনিংসের ২৪৩ রানের (৮ উইকেটে) মাথায় খেলাটি শেষ হলে খেলার ফলাফল অমীমাংসিত থেকে যায়। ওয়েস্ট ইন্ডিজের অধিনায়ক সোবার্সের দৃঢ়তাপূর্ণ খেলার দরুণই শেষ পর্যন্ত ইংল্যান্ডের জয়লাভ সম্ভব হয়নি।

প্রথম দিনে ইংল্যান্ড প্রথম ইনিংসের ২ উইকেট খুইয়ে ২৪৪ রান সংগ্রহ করেছিল। দলের অধিনায়ক কলিন কাউড্রে ৭২ এবং কেন ব্যারিংটন ৭১ রান করে অপরাজিত ছিলেন।

দ্বিতীয় দিনে ইংল্যান্ড আরও ৫টা উইকেট খুইয়ে ৩০২ রান সংগ্রহ করেছিল—৫৪৬ রানের (৭ উইকেটে) মাথায় দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ হয়। ৩য় উইকেটের জুটিতে কাউড্রে এবং ব্যারিংটন ১০৪ রান এবং ৪র্থ উইকেটের জুটিতে ব্যারিংটন এবং গ্রেভনী দলের ১৮৮ রান তুলে দেন। ব্যারিংটন সাড়ে ছ ঘণ্টার খেলায় তাঁর ১৪৩ রানে দুটো ওভার-বাউন্ডারী এবং ১৪টা বাউন্ডারী করেন—টেস্ট ক্রিকেট খেলায় তাঁর এই বিংশতি সেঞ্চুরী। অপরদিকে টম গ্রেভনী করেন ১১৮ রান।

তৃতীয় দিনে ৫৬৮ রানের মাথায় ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হয় (১৯৫৭ সালের পরবর্তী টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ইংল্যান্ডের এক ইনিংসের খেলায় সর্বাধিক রানের রেকর্ড)। ইংল্যান্ডের শেষ ৩টি উইকেটে মাত্র ২২ রান সংগৃহীত হয়েছিল। খেলায় বাকি সময়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল প্রথম ইনিংসের ৩টে উইকেট খুইয়ে ১৯৫ রান তুলেছিল।

খেলার চতুর্থ দিনে ৩৬৩ রানের মাথায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের প্রথম ইনিংস শেষ হলে তারা 'ফলো-অন' করতে বাধ্য হয়। 'ফলো-অন' থেকে অব্যাহতি পেতে তাদের ৩৬৯ রানের প্রয়োজন ছিল।

পঞ্চম অর্থাৎ খেলার শেষ দিনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল যখন দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে তখন ইনিংস পরাজয় থেকে ছাড় পেতে ২০৫ রানের প্রয়োজন ছিল। জমা ছিল ১০টা উইকেট। লাঞ্চের সময় তাদের দুটো উইকেট পড়ে ১০৪ রান উঠেছিল। কিন্তু চা-পানের ৪৫ মিনিট আগে খেলার মোড় ইংল্যান্ডের অনুকূলে ঘুরে যায়। লাঞ্চের পর মাত্র ১৬ রানের বিনিময়ে তাদের ৪টে উইকেট পড়ে যায়। কিন্তু ৭নং খেলোয়াড় হিসবে খেলতে নেমে অধিনায়ক সোবার্স দলের পরিত্রাতার ভূমিকা গ্রহণ করেন। ৯ম উইকেটের জুটিতে সোবার্স (নট আউট ৩৩ রান) এবং হল (নট আউট ২৬ রান) ৯০ মিনিটের খেলায় ৬৩ রান তুলে অপরাজিত থেকে যান। এই ৬৩ রান ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট খেলায় তাদের ৯ম উইকেট জুটির নতুন রেকর্ড।

'৭২ অলিম্পিক কেন্দ্র সাপ্পোরো

তারাপদ পাল

লেটস সাপোর্ট দি অলিম্পিক উইন্টার গেমস্, সাপ্পোরো। সাপ্পোরো '৭২'—এই কথা ঘোষিত হচ্ছে হাজার হাজার পোস্টারে। জাপানী ও ইংরেজী ভাষায়। সেখানে অবস্থিত অলিম্পিক অরগানাইজিং কমিটির বাড়ির মাথায় পত্‌পত্‌ করে



সাপ্পোরোর অলিম্পিক অর্গানাইজিং কমিটির অফিসের মাথায় অলিম্পিক পতাকা

উড়ছে অলিম্পিক পতাকা। সারা শহরে পড়ে গেছে এক অপূর্ব আনন্দের আলোড়ন। এই আলোড়ন বলছে : ১৯৭২ সালের শীতকালীন অলিম্পিক ক্রীড়া এখানেই অনুষ্ঠিত হবে। সেই আনন্দ-সঙ্গীতের সুরে যেন সোচ্চার হয়ে উঠছে সমগ্র সাপ্পোরো শহরে, শহরবাসীদের মনের মণিকোঠায়, আর তাই, সেই আসন্ন অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার প্রয়াসে চলেছে অনেক উদ্যোগ আয়োজন। চলেছে সাপ্পোরোকে আরও মনোরমা করে তোলার কাজ। চলেছে '৭২ সালের শীতকালীন অলিম্পিক ক্রীড়ার প্রস্তুতি পর্ব। স্থান : জাপানের হোক্কাইডো দ্বীপের রাজধানী শহর সাপ্পোরো।

*

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের আগেই কিন্তু সাপ্পোরোতে অলিম্পিক ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হবার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়েছিল। সেই ক্রীড়া হবার কথা ছিল ১৯৪০ সালের শীতে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের সম্ভাবনায় সে সময় ওখানে কোন অনুষ্ঠান সম্ভব হয়নি। তারপর এল ১৯৪২-এর অভিশপ্ত আগস্ট। শুরু হয়ে গেল বিশ্বযুদ্ধ। যুদ্ধও একসময় শেষ হলো। শান্তি এলো। সাপ্পোরোতে আবার গড়ে উঠলো জনপদ। সঙ্গে সঙ্গে সাপ্পোরোবাসীদের মনে আবার সেই আশার গুঞ্জনও ধ্বনিত হতে থাকলো। এখানে অলিম্পিক ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হবে। সেই থেকে কর্মকর্তাদের চেষ্টা ও তদ্বির চলছিল বেশ জোরের সঙ্গে। মাঝে মাঝে আশার আলো দেখা দিয়েই নিভে গেছে। ১৯৬৪ সালের চেষ্টাও ব্যর্থ হলো। কিন্তু একেবারে হতাশ করা হয়নি তাদেরকে। জাপানকে সে সম্মান দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু অনুষ্ঠান ক্ষেত্র হিসেবে সাপ্পোরোর বদলে মনোনীত হয়েছিল টোকিও। ১৯৬৮-র চেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু তারপরই তাঁদের ঈপ্সিত সম্মান তাঁরা পেয়েছেন। তাই এত উল্লাস, এত আনন্দ।

হনসু, শিকোকু, কিউসু এবং হোক্কাইডো—এই চারটি জাপানের প্রধান দ্বীপ। এর মধ্যে হোক্কাইডো জাপানের একেবারে সর্বোত্তরে। হোক্কাইডো এক বিস্মৃতিপ্রায় এলাকা। হোক্কাইডোর রাজধানী সাপ্পোরো। হোক্কাইডোকে ঘিরে রেখেছে, জাপান, সমুদ্র, প্রশান্ত মহাসাগর ওকহটস্ক সমুদ্র এবং সোয়া প্রণালী। হনসু দ্বীপ থেকে একে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে৺সুগারু প্রণালী।

হোক্কাইডোর রাজধানী সাপ্পোরো শহরটি সুপরিকল্পিত এবং সুগ্রথিত। প্রয়োজনের তাগিদে এর দ্রুত উন্নয়ন ঘটেছে। এবং উন্নতির ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেছে। শহরের ভেতরের রাস্তাগুলি এমন ভাবে বিন্যস্ত এবং এমনভাবে পরস্পরকে অতিক্রম করেছে, তাতে সারা শহরটাকে মনে হয় যেন একটা দাবার ছক। বৃক্ষশোভিত বিস্তৃত রাজপথ চলে গেছে এর হৃদয়কেন্দ্র দিয়ে। সেই রাজপথের দুপাশে সুসজ্জিত সুউচ্চ অট্টালিকাশ্রেণী। মাঝে মাঝে বীথিকা, সবুজ আস্তরণে মোহময়ী করে তুলেছে ব্যবসা কেন্দ্রগুলিকে। তার সঙ্গে সাজানো আছে অসংখ্য এলম আর অ্যাকাসিয়া বৃক্ষ। সাপ্পোরো শহরের বর্তমান জনসংখ্যা ৭ লক্ষ ৮০ হাজার এবং এই সংখ্যাও ক্রমবর্ধমান। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে শহরটি হোক্কাইডোর সার্থক রাজধানী।

*

হোক্কাইডো দ্বীপটি যেমন জাপানের অন্যতম আকর্ষণীয় স্থান, তেমনি সাপ্পোরো শহরটি হোক্কাইডোর অন্যতম আকর্ষণীয় শহর। তুষারাবৃত পর্বতশ্রেণী, বনবীথিকা প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদ ও সৌন্দর্য প্রয়োজনবোধে কৃত্রিম বিন্যাসের দ্বারা হয়ে উঠেছে পরম রমণীয়। এ-ছাড়াও রয়েছে উষ্ণঝরণা, ন্যাশনাল পার্ক। আসন্ন অনুষ্ঠানকে লক্ষ্য করে এর সেই সৌন্দর্য বৃদ্ধির প্রয়াসও চলেছে। তৈরী হচ্ছে অলিম্পিকনগর, স্টেডিয়াম। আর যে সময়ে এখানে অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হবে তখন সাপ্পোরোর বার্ষিক বরফ উৎসবের সময়। এই উৎসব এখানকার একটা বড় অনুষ্ঠান। তখন শহরের কেন্দ্রীয় উদ্যান ও শহরের আশেপাশে প্রদর্শিত হয় বরফের তৈরী বিভিন্ন ভাস্কর্য, যা জাপানী শিল্পীদের পরিশ্রমসাপেক্ষ ও সাধনালব্ধ শিল্প কৌশল ও অপূর্ব সৌন্দর্যবোধরূপে স্বীকৃত। এই শহরের কয়েকটি অঞ্চল এমনিতেই স্কী খেলার যথাযথ স্থান। তার ওপর অলিম্পিক ক্রীড়ার জন্যে স্কী খেলার ব্যবস্থা ও বন্দোবস্তকে আরও উপযুক্ত করে তোলা হচ্ছে। পাহাড়ের ঢালুতে এই স্কী খেলা হবে। মাকোমনাই পাহাড়ের পাদদেশের বনভূমির মধ্যে দিয়েই অনুষ্ঠিত হবে 'ক্রস কান্ট্রি রেস'। শিকোৎসু হ্রদের তীরে অবস্থিত এনিওয়া পর্বতে অনুষ্ঠিত হবে 'পর্বতাবতরণ' অনুষ্ঠান এবং তেইন পর্বত-পৃষ্ঠের বর্তমান স্কী-খেলার অন্যতম ক্ষেত্রটিতে অনুষ্ঠিত হবে 'স্লালোম' খেলা।

টোকিও শহর থেকে সাপ্পোরোর দূরত্ব কয়েক শ' মাইল এবং জেট বিমানযোগে টোকিও থেকে সাপ্পোরোতে পৌঁছতে সময় লাগে এক ঘণ্টা। তা' ছাড়া ট্রেন এবং পরে হনসু থেকে খেয়াযোগেও সাপ্পোরোতে যাওয়া যায়। এক কথায় বলা যায় যে, সাপ্পোরো প্রাকৃতিক পরিবেশ, আবহাওয়া ও পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে শীতকালীন ক্রীড়ানুষ্ঠানের একটি যথার্থ স্থান। এখানকার অক্ষাংশ ৪৩°৩'২৭" উত্তর। সোভিয়েত-সাইবেরীয়ার ভ্লাডিভোস্টোক-এর সমান। ফেব্রুয়ারী মাসে এখানকার তাপ মাত্রা থাকবে ৪'৪ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড এবং দিনের গড় তাপমাত্রা থাকবে ২ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। আর্দ্রতা ৭৪ শতাংশ। এবং স্কী খেলার ক্ষেত্রগুলি ১২ শত মীটার ঢালু (যা মধ্য ইউরোপের স্কী খেলার ক্ষেত্রগুলির সমান) এবং ঐ সময়ে এখানকার বরফের গভীরতা হবে ৮৮ সেন্টিমীটার, শুকনো এবং হাল্কা।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

নগরপারে রূপনগর

॥ অঠারো টাকা ॥

'নগরপারে রূপনগর' উপন্যাসের সবচেয়ে বড় গৌরব হল লেখকের জীবনসমীক্ষার দৃষ্টিভঙ্গী। এ যুগের কোনো কোনো শক্তিশালী ঔপন্যাসিকও জীবনের পুঞ্জীভূত গ্লানি ও অসুস্থ মনোবিকারকেই একমাত্র সত্য বলে স্বীকার করে তার কাছে দাসখৎ লিখে দিয়েছেন। পরাজিত মানুষের মানসিক দৈন্য ও বিকৃতিকে সর্বস্ব করে তোলার প্রচেষ্টা চলেছে। 'নগরপারে রূপনগর' উপন্যাসের লেখক আধুনিক যুগের জটিল জীবনযন্ত্রণার স্বরূপ বোঝার চেষ্টা করেছেন, বৈজ্ঞানিকের মতো নিস্পৃহতা নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন, গভীর সহানুভূতির সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করেছেন। মানুষের এই পরাজিত সত্তার পটভূমিকে তিনি চরম সত্য বলে মানতে পারেননি। বলিষ্ঠ প্রত্যয়, সুস্থ জীবনবোধ ও নবীন প্রত্যাশার প্রতিশ্রুতি এই মহাকাব্যোচিত মনস্তাত্ত্বিক কথাচিত্রের প্রাণকেন্দ্র।

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের

নূতন ধরণের ভ্রমণ কাহিনী

হিমালয়ের পথে পথে

॥ সাত টাকা ॥

হিমালয় প্রেমিক উমাপ্রসাদের ভ্রমণ-কাহিনীর বিশেষত্ব যে, তিনি কোন [illegible] মধ্যে দিয়ে হিমালয়কে দেখবার চেষ্টা করেন না—পাঠকের নিজের চোখকে স্বাধীনতা দেন।

প্রবোধকুমার সান্যালের

উত্তর হিমালয় চরিত

॥ এগারো টাকা ॥

'মহাপ্রস্থানের পথে'র লেখক প্রবোধকুমার সান্যালকে বর্তমান কালের পর্যটক-সাহিত্যিক—সর্বশ্রেষ্ঠ ভ্রমণকাহিনী লেখক বললে কিছুমাত্র অতিশয়োক্তি হবে না। প্রবোধকুমার এই বইতে উত্তর হিমালয়ের সর্বাঙ্গীণ দিগ্‌দর্শন করেছেন।

বিমল করের উপন্যাস

জীবনায়ন

॥ পাঁচ টাকা ॥

আধুনিক কালের ঔপন্যাসিকদের মধ্যে বিমল করের স্থান অগ্রগণ্য। তিনি সাহিত্যের মূল সত্য যা সে সম্বন্ধে অবহিত থেকেও নূতন পথ ও নূতন গতি তৈরি করে নিতে পারেন। জীবনায়ন তাঁর সার্থক সৃষ্টির অন্যতম।

বিমল করের অন্যান্য বই

পরবাস ৪॥ খোয়াই ৩৲ যাদুকর ৫॥ সীমারেখা ৪॥

মন্মথনাথ ঘোষের প্রকৃতিসচেতন উপন্যাস

বনরাজি নীলা

॥ সাত টাকা ॥

"[illegible] পটভূমিকায় এক অন্তর্বেদনাক্লিষ্ট জীবন-[illegible] শূন্যতাবোধ [illegible] মনস্তাত্ত্বিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে। এরই মাধ্যমে নায়িকার মনে ঔৎসুক্যরস সঞ্চারের উপকরণরূপে নানা নূতন নূতন দৃশ্যবৈচিত্র্যের ছবি ও নানা [illegible] কৌতূহলময় দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করা হয়েছে। ভ্রমণের কৌতূহল ও আদিবাসীদের জীবনপ্রথাবৈচিত্র্য ছিন্নমূল জীবনতত্ত্বের শিকড়জালে রসসঞ্চিত করেছে।"

—(ডঃ) শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাস

আঁধারমাণিক

॥ সাড়ে বারো টাকা ॥

বর্তমান কালের বাংলাসাহিত্যে মহাশ্বেতা দেবী একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। তাঁর দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা, তাঁর কল্পনাশক্তির উদারতা, তাঁর রচনার নৈপুণ্য এবং দৃষ্টির প্রসারতা—তাঁর সব সৃজনশক্তিশালিনী প্রতিভাকে অপরূপ মহিমামণ্ডিত করেছে। তাঁর আঁধারমাণিকে সেই শক্তি ও প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে।

নির্মলকুমারী মহলানবিশের **বাইশে শ্রাবণ ৬৲**

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের **ভক্ত বিবেকানন্দ ৪॥**

স্বামী তত্ত্বানন্দের **তপস্বী ভারত ১০৲**

মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ ফোন : ৩৪-৩৪৯২ ৩৪-৮৭৯১

নির্মল বার সাবান দিয়ে কাচলে
আপনার কাপড়-চোপড় হবে
ধবধবে ফরসা
হালকা সুগন্ধে ভরপুর





নির্মল বার সাবান দিয়ে কাচাও খুব সহজ—নির্মল বার সাবানে চটপট দেদার ফেনা হয় আর সেই ফেনায় শক্ত ক'রে এঁটে বসা তেল-কালি ও ধুলো-ময়লা উধাও হয়ে যায়। কাপড়-জামা ধবধবে তকতকে দেখায়, আর নতুন ধোয়ার গন্ধে ভরে থাকে। নির্মল দিয়ে কাচলে খরচও কম। ঢের বেশীদিন চলে, কারণ নির্মল বার সাবান বেশ শক্ত থাকে, অনেকদিন টেঁকে।

নির্মল
পূর্ব ভারতে এই বার সাবানই
কাটতিতে সবার ওপরে।
কুসুম প্রোডাক্টস্ লিমিটেড, কলিকাতা-১

KPM 4064

৭ম বর্ষ
৪র্থ খণ্ড

অমৃত

৪০শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday 9th February, 1968. শুক্রবার ২৬শে মাঘ, ১৩৭৪ 40 Paise

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

		কলিকাতা		মফস্বল
বার্ষিক	টাকা	২০-০০	টাকা	২২-০০
ষান্মাষিক	টাকা	১০-০০	টাকা	১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা	৫-০০	টাকা	৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২০১ (১৪ লাইন)

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীশ্যামদুলাল কুণ্ডু

পঞ্চম সংস্করণ বাহির হইল!!!

শিক্ষা জগতের প্রশংসাধন্য
ছোটদের জন্য

Common Words

A Simple English Bengali Dictionary
for Boys and Girls

সচিত্র ইংরেজী-বাংলা অভিধান
মূল্য দুই টাকা

জেনারেল বুকস
এ-৬৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা—বারো

এক লিপি বহু ভাষা

অমৃতের ২৯শ সংখ্যায় 'জানাতে পারেন' পৃষ্ঠায় আমি দুটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলাম। তাদের প্রথমটি ভারতের সর্বত্র এক ভাষা প্রবর্তন প্রচেষ্টার আগে এক লিপি প্রবর্তনের প্রচেষ্টা না করার কারণ কী এবং দ্বিতীয়টি ভারতের আদি ভাষা সংস্কৃত লিপি গ্রহণে কী আপত্তি থাকতে পারে, সেই বিষয়ে। সুখের বিষয় ৩৩শ সংখ্যা অমৃতের ৫৮৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত উপ-প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাইয়ের উদ্বোধনীতে যোগদানকারী বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার ভাষাতত্ত্ববিদগণ এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ অগ্রণী হয়েছেন। এখন এ সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। স্ব স্ব মাতৃভাষা এবং লিপি সকলেরই যে একান্ত প্রিয় এবং অভ্যাসবশত সহজবোধ্য ও সহজলেখ্য, তা কেও অস্বীকার করতে পারেন না। সংস্কৃত ভাষা যে সর্বভারতীয় ভাষা সে সম্বন্ধেও কারো দ্বিমত থাকতে পারে না। সম্ভবপর হলে এই একটি মাত্র ভাষাই নিরপেক্ষ ভাষা হিসাবে ভারতের সর্বত্র প্রচলিত কথ্য ও লেখ্য এবং পরিণামে রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এই ভাষা এত দুরূহ যে তা সম্ভব নয়। সংস্কৃত লিপির অন্য নামই দেবনাগরী, তা সত্ত্বেও এই নিরপেক্ষ লিপি গ্রহণে যদি কোনো কোনো পক্ষে আপত্তি থেকে যায় তবে ভারতে বর্তমান প্রচলিত সব এবং প্রত্যেকটি লিপিই পাশাপাশি পরীক্ষা করে যে লিপি সহজবোধ্য এবং সহজ লেখ্য সেই লিপি গ্রহণ করলে এক লিপি প্রবর্তন সমস্যার সমাধান হওয়া আদৌ অসম্ভব নয়।

এরপর কিছু কল্পনার আশ্রয় নেওয়া যাক। মনে করা যাক, যে সর্ববাদীসম্মত একটি মাত্র লিপি গ্রহণ করে ভারতের সর্বত্র প্রচলিত করা হলো। তারপর এলো এক ভাষা প্রবর্তনের সমস্যা। এ বিষয়ে অমৃতের ৩২শ সংখ্যায় "ভাষা নিয়ে আবার তাণ্ডব" সম্পাদকীয় প্রবন্ধের উপসংহারে লিখিত "যতদিন বিভিন্ন ভারতীয় রাজ্য পরস্পরের ভাষা শিখে একটি সাধারণ যোগাযোগের ভাষা গড়ে তুলতে না পারছে" কথাগুলি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ভারতে বর্তমানে প্রচলিত প্রায় তের-চোদ্দটি ভাষা শিক্ষা করা কী করে সম্ভব হতে পারে তার সমাধানে আমাদের প্রাথমিক শিক্ষাপ্রণালীর আমূল পরিবর্তনের বিশেষ প্রয়োজন। সামান্য অনুধাবন করলেই দেখতে পাওয়া যাবে যে ছোট ছোট বালক-বালিকাদের আমরা একই সঙ্গে বহু বিষয় শেখাতে আরম্ভ করি, যার ফলে তারা কোনো বিষয়ই ভাল করে শিখতে পারে না। তা সত্ত্বেও যেমনভাবেই হোক বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি যাতে তারা বিশ-বাইশ বৎসর বয়সেই পার হয়ে আসতে পারে সেই দিকেই নজর দিয়ে থাকি। এতে নিরক্ষরতা শব্দটির কিছু কম প্রাপ্তি হয়ত হয়, শিক্ষাটা আসলে বহুল পরিমাণে মেকী থেকে যায়। ভাষায় অজ্ঞতাও যে এর একটা প্রধান কারণ তা বললে বোধহয় অত্যুক্তি হবে না। তারস্বরে অন্য কোনো ভাষার বিরুদ্ধে চীৎকার করলেও আমরা অনেকেই স্ব স্ব মাতৃভাষাই ভালরূপে জানিও না। এমতাবস্থায় আমরা ভারতের অন্য ভাষাগুলি শিখব কী করে? এর একমাত্র উপায় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে অন্যান্য সব বিষয় বাদ দিয়ে কেবলমাত্র ভাষা শিখবার জন্য বেশ কয়েক বৎসর সংরক্ষিত রাখা। যখন সব ভাষাই একই লিপিতে পাশাপাশি লেখা থাকবে তখন মাতৃভাষার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ভাষাগুলি শেখাও সহজতর হয়ে পড়বে, অবশ্য বানান বা ব্যাকরণের অযথা জটিলতা যতদূর সম্ভব এড়িয়ে যেতে হবে। সব ভাষাগুলির প্রাথমিক জ্ঞানলাভের পর অনিবার্য সর্বাঞ্চলীয় ভাষা সাহিত্যের সঙ্গে অন্যান্য বিষয় শেখান আরম্ভ করা যেতে পারে এবং তখন বালক-বালিকাদের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে বোধশক্তি বাড়বার ফলে পরবর্তী বিষয়গুলি তাদের অধিকতর সহজগম্য হয়ে পড়বে। ভারতের সব ভাষাগুলির প্রাথমিক ব্যুৎপত্তি লাভবশত কালক্রমে সব ভাষাগুলির সংমিশ্রণে এমন একটি ভাষা উদ্ভবের সম্ভাবনা দেখা দেবে যে সেইটিই হবে সর্বভারতীয় ভাষা। ভাষা শিক্ষা তা যে কোনো ভাষাই হোক দোষনীয় নয়। ইংরেজি কথা ছেড়ে দিয়েও আমাদের দেশের অনেকেই রুশ, জার্মানী, ফরাসী ইত্যাদি বিদেশী ভাষা শিক্ষার দিকে আগ্রহশীল, অথচ স্বদেশের ভাষাগুলি কেন অবহেলিত হবে তার কোনো সদুত্তর নাই। একথাও অস্বীকার করা যায় না যে আমরা অনেক বিদেশী শব্দ নিজেদের করে নিয়েছি এবং বর্তমানে যতই ইংরেজির বিরুদ্ধে যাই না কেন আমরা কেউ যদি সামান্য দু-একটি ইংরেজি শব্দও জেনে থাকি তবে তার ব্যবহার করতে পশ্চাৎপদ হই না। আমার মনে হয় আমাদের দেশের প্রতিটি রাজ্যের তথা কেন্দ্রের সুধী কর্তৃপক্ষ, শিক্ষাবিদ ও ভাষাতত্ত্ববিদগণ একত্রিত হয়ে যত শীঘ্র সম্ভব সর্ববাদীসম্মত এক লিপি গ্রহণ ও ভারতের সব ভাষা শিক্ষণের প্রবর্তন করতে সক্ষম হবেন, ততই দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক হবে।

নিরাপদ চট্টোপাধ্যায়
কোডরু, হিনু, রাঁচী।

একাঙ্ক নাটক বিষয়ে

অমৃত ৭ম বর্ষ, ৩ খণ্ড ৩৪শ সংখ্যায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের দিকে চোখ পড়ল, দিলীপ মৌলিক রচিত 'বাংলা একাঙ্ক নাটকের গতি-প্রকৃতি' ঐ লেখার বিষয়। এতে সাম্প্রতিক একাধিক কবি ও নাট্যকারের উল্লেখযোগ্য রচনা প্রচেষ্টার কথা বর্ণিত হয়েছে। ও সাধারণ পাঠকদের হাতের কাছে সেই সব বই যাতে এমন পরীক্ষামূলক একাঙ্ক নাটক রচিত হয়েছে, তা নাও থাকতে পারে। তাই তাঁরা শুধু 'ইনফরমেশন পাবেন, মানে খবর রাখবেন সম্প্রতিকালে যে সব নাটক লেখা হচ্ছে তার বিষয়ে।

কৌতূহলী হলাম বিশেষ করে যখন কাব্যনাট্য সম্পর্কে কিছু মন্তব্য নিক্ষিপ্ত করেছেন এই লেখক। কাব্যনাট্য রচয়িতাদের মধ্যে নিজের নামটা খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে পেয়ে গেলাম ইত্যাদিদের মধ্যে। (তাও সুমুদ্রিত নয়) অন্তত কাব্যনাট্য লেখার ব্যাপারে ঠিক প্রভৃতিদের মধ্যে নিজেকে পাব, এটা আশা করিনি। তার কারণ আমার লেখা প্রথম কাব্যনাট্য 'মার্কিন' রচিত হয়েছিল ১৯৪৯ সালে ও "দুই আর দুই" [illegible] তার কিছুকাল পরেই [illegible] অবশ্য একাঙ্ক নয়। কিন্তু "একটি নাটক" একাঙ্ক মঞ্চস্থ হয়েছিল প্রথম [illegible] একটি কবিতা মেলায় যেখানে [illegible] লেখা একটি নাটকও অভিনীত হয়েছিল। কিছুকাল আগে নান্দীকার গোষ্ঠী মুক্তাঙ্গনে আমার লেখা অন্য একটি কাব্যনাট্য 'প্রস্তাব' অভিনয় করেন এক রাত্রের জন্য, ঐ নাটকটি 'গন্ধর্ব' নামক নাট্য পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল। ইতস্তত ছড়িয়ে আছে আমার কিছু বিক্ষিপ্ত রচনা, "চার চোখ" [illegible] শ্রীমৌলিক দেখে থাকবেন। এতে আছে "সংলাপ" নামক একটি ক্ষুদ্র কাব্যনাট্য।

এ বিষয় বিনীতভাবে নীরব না থেকে এই কথগুলি লিখছি, তার কারণ হয়তো বা কখনো কোনো সাহিত্যের উৎসাহী ছাত্র সঠিক খবর রাখতে চাইবেন কাব্য নাটক বিষয়ে। আমি খুশি হব সম্পাদক মশাই যদি পাঠক সমীপে "অমৃত" মারফৎ এই পত্রটি প্রকাশ করেন।

দিলীপ রায়
কলকাতা-১৯।

ওয়েলস সম্পর্কে

আপনাদের "অমৃতে" প্রকাশিত (২৯শ সংখ্যা ৭ম বর্ষ, ৩য় খণ্ড) শ্রীঅভয়ঙ্করের 'প্রথম যুগের ওয়েলস' রচনাটি সত্যই অনবদ্য হয়েছে। ওয়েলসের শতবার্ষিকী উপলক্ষে এই বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিকের সাহিত্যের নানান লেখার মাধ্যমে নবমূল্যায়ন হয়েছে। ওয়েলসের সাহিত্য ও সৃষ্টি সারা বিশ্বে এক নতুন আলোড়ন ও সাড়া জাগিয়েছে। ওয়েলস স্থান ও কালের বহু ঊর্ধ্বে। বার্নাড বারগনজী তার "The Eanly H. G. Wells" পুস্তকে এই মহৎ উপন্যাসিকারের প্রথম প্রভাতের সাহিত্য সৃষ্টি সম্বন্ধে যে তথ্য নিবেদন করেছেন এবং তার উপর ভিত্তি করে শ্রীঅভয়ঙ্কর যে রূপ দিয়েছেন তার জন্য অভয়ঙ্করকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের জগতে ওয়েলস একটি অবিস্মরণীয় ও বরণীয় নাম।

কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
কলকাতা-৩৯।

সম্পাদকীয়

কবির স্বপ্ন শান্তিনিকেতন

শিক্ষা নিয়ে ও ভাষা নিয়ে যখন সারা দেশে তুমুল কাণ্ড চলছে তখন স্বভাবতই আমাদের মনে হয় রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন আশ্রম ও বিশ্বভারতীর কথা। ভারতবর্ষে চিরকালের ভাষার বিভিন্নতা ছিল। শিক্ষার প্রসার অবশ্য সর্বত্র ছিল না। কিন্তু তার জন্য অনর্থ বাধবার মতো দুরবস্থা আমাদের কোনোকালে হয়নি। অথচ ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর এই দুইটি বিষয় নিয়ে আমরা হিমসিম খাচ্ছি।

শান্তিনিকেতন আশ্রমের মূল বাণী হল "যত্র বিশ্বভবত্যেক নীড়ম্" যেখানে সমস্ত পৃথিবী একত্রে বাস করে। এর চেয়ে বড় কথা আর কী হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের পিতৃদেব এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কবি তাকে তাঁর স্বপ্নের বাস্তব প্রতীকরূপে গড়ে তোলেন। মানুষের মিলনের স্থান হল শান্তিনিকেতন। বৃটিশের আমলে এক ধরনের শিক্ষা প্রচলিত ছিল আমাদের দেশে। ইংরেজি ছিল সে শিক্ষার বাহন। দেশের অধিকাংশ মানুষ ছিল সে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। রবীন্দ্রনাথ এ জন্য আক্ষেপ করে গেছেন। মাতৃভাষাকে উচ্চতম শিক্ষার বাহন করার জন্য তিনি বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে আকুল আবেদন জানিয়ে গেছেন। তিনি আবেদন করেছিলেন, শিক্ষার ধারা গ্রামে গ্রামান্তরে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে। বর্ষার মেঘ যেমন তার বারিধারায় সমস্ত দেশকে স্নান করিয়ে দেয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাও তেমনি শুধুমাত্র শহুরে সমাজের মুষ্টিমেয় ব্যক্তির মধ্যে আবদ্ধ না থেকে সর্বত্রগামী হবে এই ছিল শিক্ষাবিদ রবীন্দ্রনাথের অন্তরের প্রার্থনা।

কবি তাঁর নিজের সীমায়িত সামর্থ্যে গড়ে তুলেছিলেন বিশ্বভারতী—একটি আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয়। গতানুগতিক শিক্ষার বেড়া ডিঙিয়ে প্রকৃত মানবিক শিক্ষাদান ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। পৃথিবীর সকল দেশের মানুষকে তিনি আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন বিশ্বভারতীর স্নিগ্ধ ছায়াতলে সমবেত হবার জন্য। সরকারের দাক্ষিণ্য ছিল না তাঁর প্রতি। এই মহৎ ভিখারী দেশবাসীর কাছ থেকে পাওয়া স্বেচ্ছাদানে পরিচালনা করতেন এই বিশ্ববিদ্যালয়। বিদেশের এবং এদেশের মনীষী দার্শনিক, সাহিত্যবেত্তা, বিজ্ঞানীরা এসেছিলেন শিক্ষকরূপে কবির স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে। তখন অনেক অসুবিধা ছিল, অনটন ছিল কিন্তু অভাব ছিল না আন্তরিকতার, হৃদয়ের উষ্ণতার।

শান্তিনিকেতন আশ্রম শুধুমাত্র একটা গতানুগতিক বিদ্যালয়রূপে কবি দেখেন নি। তার মধ্য দিয়ে তিনি ভারতবর্ষের মানুষ গড়ার সাধনাকে রূপ দিতে চেয়েছিলেন। তিনি একবার আশ্রমবাসীদের একথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, "শান্তিনিকেতন আশ্রমেও সেই তপস্যা রয়েছে—ধর্ম যে কত বড়ো, বিশ্ব যে কত সত্য, মানুষ যে কত বড়ো এই আশ্রম সে কথা নিয়তই স্মরণ করিয়ে দেবে। এইখানে আমরা মানুষের সমস্ত ভেদ, জাতিভেদ, ভুলব। আমাদের দেশে চারিদিকে ধর্মের নামে যে অধর্ম চলছে, মানুষকে কত ক্ষুদ্র করে—সঙ্কীর্ণ করে তার মানবধর্মকে নষ্ট করবার আয়োজন চলছে. আমরা এই আশ্রমেই সেই বন্ধন থেকে মুক্ত হব।"

তারপরেই দেখি তিনি দুঃখ করছেন এই বলে, "কিন্তু আমরা একে কেউ বা স্কুলের মতো করে দেখছি। কেউ বা আপনার আপনার ছোটোখাটো চিন্তার মধ্যে বদ্ধ হয়ে রয়েছি।" বিশ্বভারতীর জীবনে তারপর বহু বৎসর কেটে গেছে। স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদের সময়ে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর প্রেরণায় এই বিশ্বভারতীকে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা দেওয়া হয়। তার আর্থিক দায়িত্বভারও গ্রহণ করেন স্বাধীন ভারতের সরকার। কবি তাঁর জীবনসায়াহ্নে বিশ্বভারতী ও শান্তিনিকেতন আশ্রমের ভবিষ্যৎ বিষয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। ভারতের ভবিষ্যৎ কর্ণধাররূপে তিনি তাঁর পরম স্নেহাস্পদ জওহরলাল নেহরুকে এর দায়িত্ব গ্রহণের অভিলাষ প্রকাশ করে গিয়েছিলেন। নেহরু সেই প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন।

জওহরলাল একথা বহুবার বিশ্বভারতীর সমাবর্তন ভাষণে বলে গেছেন যে, বিশ্বভারতী আর পাঁচটা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো স্নাতক তৈরীর কেন্দ্রে পরিণত হক, এ তিনি চান না। কবি যে শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তন করে গেছেন তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আশ্রমের পবিত্রতা রক্ষা করে বিশ্বভারতী স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। এ দায়িত্ব খুবই দুরূহ। শান্তিনিকেতনকে আমরা শুধু একটি দর্শনীয় স্থান হিসেবে রক্ষা করতে চাই না। 'আমাদের শান্তিনিকেতন, আমাদের সব হতে আপন' এ গান যখন আশ্রমিকদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় তখন একে শুধু কবির স্বপ্ন-দৃষ্টিতে দেখা একটি তপোবন বলেই আমরা গণ্য করি না, এর সুরে সুরে বাজতে থাকে কবির সমগ্র জীবনের আকুলতা—একটি আদর্শ, একটি স্বপ্নের রূপায়ণের জন্য আকুলতা। তিনি যেন বলতে থাকেন, "এই শান্তিনিকেতনে, যেখানে আমরা সকলে আশ্রয় লাভ করেছি, এবং সম্মিলিত হয়েছি, এখানে এই সম্মিলনের ব্যাপারকে কোনো-একটা আকস্মিক ঘটনা বলে মনে করতে পারিনে। বিশ্বের মধ্যে আমাদের জীবনের অন্যান্য যে-সকল সম্ভাবনা ছিল তাদের এড়িয়ে এই এখানে যে আমরা আশ্রয় পেয়েছি, এর মধ্যে একটা গভীর অভিপ্রায় রয়েছে।" এই মানবজীবনের ঐক্য। আমাদের কবির সেই স্বপ্ন যেন সার্থক হয়। আজকের শান্তিনিকেতনের কাছে, বিশ্বভারতীর কাছে এই আমাদের চাওয়া। দেশের নানাদিক থেকে অনৈক্যের সংঘাতে জর্জরিত হয়ে বড় আশায় আমরা শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতীর দিকে তাকিয়ে আছি।

শান্তিনিকেতনের উৎসব

বিশ্বজিৎ রায়



শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন জীবনকে গভীরভাবে উপলব্ধি করার সাধ এবং সাধ্য ছাত্র-ছাত্রীদের মনে সৃষ্টি করে দিতে। তার জন্যে তিনি বিচিত্র মানব-জীবনের সঙ্গে এবং বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে একটি প্রগাঢ় যোগসূত্র রচনার ছাত্রোপযোগী শিক্ষা-ব্যবস্থার আয়োজন করেছিলেন। আর বলা বাহুল্য তাঁর এই শিক্ষাব্যবস্থাকে তিনি কামনা করেছিলেন আনন্দকেন্দ্রিক করে তুলতে। শান্তিনিকেতনে যে বিভিন্ন ধরনের উৎসব প্রচলিত আছে তা রবীন্দ্রনাথের উপরোক্ত প্রধান এবং অন্য একাধিক শিক্ষাগত উদ্দেশ্যসাধনের জন্য পরিকল্পিত। এদের মাধ্যমে আনন্দ করতে করতে যেমন মানব-জীবনের তেমনি বিশ্ব-প্রকৃতির বহু রূপের কাছাকাছি হওয়া যায় আর সঙ্গে সঙ্গে পারা যায় সংগঠনের, মিলেমিশে কাজের, রসাস্বাদে সুরুচিগঠনের এবং সাধারণভাবে ক্লাসে শেখা বিদ্যাপ্রয়োগের এবং তা পরিপূরণের ক্ষমতা বিকাশ করতে। শান্তিনিকেতনের উৎসব নানারকমের। এক-রকম হচ্ছে ঋতু উৎসব; কিছু হচ্ছে সামাজিক যদিও তাদের মধ্যে ঋতুগত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। এছাড়া হয় বিভিন্ন তিথি এবং স্মরণীয় মহাপুরুষের জন্ম-দিবস বা মৃত্যুদিন উদ্‌যাপন।

বছরের সুরু হয় নববর্ষ উৎসব দিয়ে। শান্তিনিকেতনের প্রকৃতি-পারিপার্শ্বিকের বিশিষ্টতা প্রথম তপন-তাপে পুরাতন বছরের জীর্ণতাকে দাহ করে, এবং বৈশাখী ঝড়ের হাওয়ায় বিগত দিনের আবর্জনাকে দূর করে নতুন বছরে নবীনভাবে প্রবেশের প্রতিজ্ঞাগ্রহণের রূপকল্পটি জীবন্ত করে তোলে। এইদিন গুরুদেবের জন্মোৎসবও পালিত হয় কেননা ২৫ বৈশাখের আগেই শান্তিনিকেতনের গ্রীষ্মাবকাশ সুরু হয় প্রাকৃতিক কারণে।

গরমের দীর্ঘ দগ্ধ দিনের পরে যখন বাদল ছোঁয়া লেগে মাঠে মাঠে ঢাকে মাটি সবুজ মেঘে মেঘে তখন বিদ্যায়তনে ফিরে আসেন ছাত্র-ছাত্রীরা। ইস্কুল ছাড়া অন্যান্য বিভাগে নতুন শিক্ষাবর্ষ সুরু হয়। তাই অধিকাংশ নতুন ছাত্রছাত্রীরাও শান্তি-নিকেতনে প্রবেশ করে এই সময়ে। নব ছাত্র-ছাত্রীদের এই শান্তিনিকেতন-জীবনের সূচনার সঙ্গে এই কালের বৃক্ষরোপণ উৎসবের একটি প্রতীকি যোগ আছে। বৃক্ষরোপণ উৎসব অবশ্য প্রধানত করা হয়, দেশের বৃক্ষসম্পদকে সমৃদ্ধ করে তোলা, তার সাহায্যে বীরভূমের মরুপ্রতিম এলাকাকে শ্যামল করে তোলা, বর্ষার আবাহন করা এবং ঋতু, বৃক্ষ এবং মানবের সখ্যকে বাস্তব করার জন্য। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে উৎসবে যখন অনুষ্ঠান-গীতি ধ্বনিত হয়—

"তরু আমাদের অঙ্গনে
অতিথি বালক তরুদল
মানবের স্নেহ সঙ্গ নে
চল আমাদের ঘরে চল"—

তখন সদ্য-উপ্ত তরুরাজির সঙ্গে নবাগত ছাত্র-ছাত্রীদের শান্তিনিকেতনের সাম্প্রতিক জীবনে অঙ্গীভূত করে দেওয়া হয়। এই উৎসবটি আশ্চর্য বর্ণাঢ্য। বিচিত্র-ভাবে শোভিত একটি আধারে কয়েকটি কচি চারাগাছ বহন করে নিয়ে আসেন সুসজ্জিত ছেলের দল আর সে-শোভাযাত্রার পুরো-ভাগে থাকেন সুবেশা ছোট-বড় মেয়েদের

এক বিরাট নৃত্যরতা সারি, পিছনে আসেন বিরাট গানের দল গাইতে গাইতে—"মরু-বিজয়ের কেতন উড়াও"। শোভাযাত্রা এসে থামে আলপনা-অলংকৃত বৃক্ষরোপণের স্থানে। যথোচিত মন্ত্র-সহকারে মহাসমারোহে বৃক্ষ রোপিত হয়। তার উদ্দেশ্যে তখন রবীন্দ্রনাথের বিশেষভাবে রচিত গান গীত হয় এবং পঞ্চভূতের আশীর্বাদ এবং মাঙ্গলিকী উচ্চারিত হয়।

বৃক্ষরোপণ উৎসব ১৩৪৯ সাল থেকে হয়ে আসছে গুরুদেবের মৃত্যুদিনে। মৃত্যুর দিনে নব-জীবনের আহ্বান রবীন্দ্র-জীবন-দর্শনোচিত। তাই সেদিন সকালে হয় গুরুদেব-স্মরণ এবং তার বিস্তৃতি ঘটে অপরাহ্নের বৃক্ষরোপণ উৎসবে।

বৃক্ষরোপণের পরের দিন হয় হলকর্ষণ উৎসব। এটি অনুষ্ঠিত হয় শ্রীনিকেতনে। সমাজের অত্যাবশ্যক যে কাজটির সূচনা চাষী করেন বর্ষাস্নাত ক্ষেতে তাকে একটি সুন্দর আনন্দানুষ্ঠানে পরিণত করা হয়েছে হলকর্ষণ উৎসবে। এইদিন "ফিরে চল মাটির টানে" গান গেয়ে অনুষ্ঠানের সুরু এবং চাষী তার [illegible] দ্বারা রচিত আলপনা-সুসজ্জিত একটি ক্ষেত্রের ওপর সুশোভিত হল [illegible] হয় আনুষ্ঠানিক ভাবে, গান শোনা যায়—"আমরা চাষ করি আনন্দে"।

এই সময়েই কোন একদিন হয় বর্ষামঙ্গল। তারপর আস্তে আস্তে আসে শরৎ। তখন বিশ্বকর্মা পূজার দিন হয় [illegible] কারিগর আর শিল্প-কর্মীদের [illegible]। তারপর রবীন্দ্রনাথ [illegible] ছুটির এবং ঋণ-শোধের [illegible] বর্ণনা করেছেন তাকে উপলক্ষ করে [illegible] অনুষ্ঠান হয় শারদোৎসব এবং আনন্দবাজারের। এই মেলাটি [illegible] আগে শান্তিনিকেতনে প্রবর্তিত হয়েছিল। এইদিন ছাত্র-ছাত্রীরা [illegible] যাকে Fete বলেন তার আয়োজন করেন এবং লব্ধ অর্থ সমাজসেবায় দান করে সামাজিক ঋণশোধের একটি প্রতীক চেষ্টা করেন।

শারদীয় অবকাশের পরে আবার যখন শান্তিনিকেতনের ছেলেমেয়ে — শিক্ষক-শিক্ষিকারা ফিরে আসেন তখন শীত মরশুম। অল্পকাল পর থেকে সুরু হয় শান্তিনিকেতনের বার্ষিক উৎসবের প্রস্তুতি। ৭ই পৌষ থেকে সুরু হয় এই তিনদিনের পৌষোৎসব। বাতাসে থাকে ঠাণ্ডার আমেজ; হাওয়ায় থাকে খেজুরের ঘ্রাণ; তালপাতার ঘর ওঠে শান্তিনিকেতনের মাঠে। গরুর গাড়ির চলার ছন্দ আর বাঁশের ঠক-ঠক আওয়াজের মধ্যে ছাত্র-শিক্ষকরা পৌষমেলার অজস্র কাজ নিয়ে ব্যস্ত তখন দূরে থেকে শোনা যায় মহড়া চলছে—"বিশ্ববিদ্যাতীর্থ-প্রাঙ্গণ করো মহোজ্জ্বল আজ হে"।

পৌষমেলা সরকারীভাবে হয় তিনদিন। ৭ই পৌষ দিনটি শান্তিনিকেতনের অধ্যাত্ম-ইতিহাসের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সেইদিন সকালে ছাতিমতলায় হয় উপাসনা।



রবীন্দ্র-উৎসবের অন্যতম অনুষ্ঠান শ্যামা নৃত্যনাট্যের একটি রূপায়ন দৃশ্য

পরের দিন ৮ই পৌষ আম্রকুঞ্জে হয় সমাবর্তন এবং ৯ই পৌষ প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের সম্মিলন। কিন্তু পৌষমেলা আসলে সুরু হয়ে যায় ৫ই পৌষ থেকেই এবং তা চলে প্রায় ১১ই পৌষ অবধি। মেলার দোকানপাট ইত্যাদি তারপর গা-তুলতে সুরু করে।

প্রকৃতপক্ষে পৌষমেলার সুরু হয় ৬ই পৌষ রাতের শান্ত-মধুর সুরের বৈতালিক দিয়ে। শীতের স্তব্ধতার মধ্যে দিয়ে শোনা যায়—"প্রভু তোমা লাগি আঁখি জাগে।" পরের দিন সকালবেলা ঘুম ভাঙে সূর্যোদয়ের আগে গাওয়া প্রভাতী বৈতালিকে। তারপর বেজে ওঠে সানাই। স্নান করে মার্জিত চিত্তে সকলে যায় ছাতিমতলায় উপাসনায়। সেখানে গান, মন্ত্র, পাঠ এবং প্রার্থনায় শান্তিনিকেতন জীবনের মূল সত্যটিকে নানাদিক দিয়ে চিহ্নিত করে দেওয়া হয়। উপাসনার পরের দিনে শালবীথির ধারে আম্রকুঞ্জে সুগম্ভীর সমাবর্তন। যে-কুঞ্জের ছায়ায় এবং যাঁদের স্নেহের মধ্যে দিয়ে স্নাতকরা শিক্ষাগ্রহণ করেছেন, তাঁদের কাছ থেকে তাঁরা আশীর্বাদ নেন কর্মপথ শুরু করার আগে। বিশ্বভারতীর আনুষ্ঠানিক উত্তরীয় ধারণ করে তাঁরা প্রণত চিত্তে এগিয়ে আসেন সুসজ্জিত মণ্ডপের দিকে। আচার্য তাঁদের হাতে দেন শান্তিনিকেতন-জীবনের প্রতীক ছাতিমপাতার একটি গুচ্ছ, উপাচার্য পরিয়ে দেন চন্দন-তিলক, অধ্যক্ষ অর্পণ করেন অভিজ্ঞানপত্র। সঙ্গে সঙ্গে গাছের পাতারা মাথা দোলায়, সূর্যের প্রসন্ন হাসি চিক চিক করতে থাকে।

তারপর আচার্য এবং প্রধান অতিথি স্নাতকদের সমাবৃত হওয়া উপলক্ষে উপদেশ-ভাষণ দেন। অনুষ্ঠান শেষ হয় সকলের মিলিত 'আমাদের শান্তিনিকেতন' গানে। পরের দিন প্রথমে হয় পরলোকগত আশ্রমবন্ধুদের স্মৃতিবাসর। তারপর প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীরা আশ্রমের প্রতি তাঁদের অম্লান অনুরাগ এবং আনুগত্যের পরিচয় দিতে সম্মিলিত হন। সারি বেঁধে তাঁরা এগিয়ে আসেন সুধীরঞ্জন দাশ, তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়, সৈয়দ মুজতবা আলী, গোপাল রেড্ডি, নবকৃষ্ণ চৌধুরী থেকে আরো সকলে। আনুষ্ঠানিক গান হয় 'যদেমি প্রস্ফুরন্নিব' এবং 'মোরা সত্যের পরে মন আজি করিব সমর্পণ।' তারপর তাঁরা মিলিত হন বর্তমান ছাত্রদের সঙ্গে। সকলে মিলে মধ্যাহ্নে বিশ্ববিদ্যালয়ের খাবারঘরে হবিষ্যান্ন গ্রহণ সেদিনকার অনুষ্ঠানের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

এই মেলায় বাঙলার এবং বোধগম্য কারণে কমমাত্রায় সারা ভারতের লোক-সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। মেলায় বিনোদনের মধ্যে প্রধান থাকে বাউল সমাবেশ, কবিগান, যাত্রা, বাজি এবং সানাই-বাদন। এছাড়া বিভিন্ন বছরে অন্যবিধ আকর্ষণও থাকে। অজস্র মিষ্টির দোকান, গ্রামীণ চায়ের দোকান থেকে একেবারে শহুরে রেস্তোরাঁর ভিড় লেগে যায়। সেই-সব চায়ের দোকানে বসে কিম্বা নাগরদোলায় চেপে পোড়া বাঁশের সরু ছড়ি ঘুরিয়ে প্রচণ্ড উল্লাসে গান লাগান শান্তিনিকেতনীয়



ছাতিমতলায় অনুষ্ঠান

—সে প্রাক্তন বর্তমান, কিশোর-প্রৌঢ় সকলে মিলে। সাঁওতাল নাচ এবং খেলাধুলোও খুব জনপ্রিয় হয়। মেলার উদ্দাম কলরোল থামতে না থামতে সবাই দল বেঁধে চলে যায় একমনোদর্শনে। জানুয়ারী থেকে আবার বিদ্যায়তন খোলে।

মাঘ মাসের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো শ্রীনিকেতনের মেলা। সে-মেলা পৌষমেলার মতো প্রসিদ্ধি লাভ করেনি। কারণ, এটি প্রধানত প্রদর্শনী এবং গ্রামকেন্দ্রিক। তবুও বিশ্বভারতীর ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে এ-মেলা পরম আকর্ষণের, বিশেষত বিরাটাকার কুমড়ো, বেগুন, কুমড়ো, টম্যাটোর প্রতিযোগিতাটি এবং বিভিন্ন ধরনের হাতের কাজের প্রদর্শনী।

গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে এসে শান্তিনিকেতনেই তাঁর ফিনিক্স স্কুলের ছাত্রদের তুলেছিলেন এবং একদা তিনি এই আশ্রমের সর্বাধ্যক্ষ ছিলেন। গান্ধীজী স্ব-ধারায় শিক্ষাকে পরিচালনা করতে চেয়েছিলেন, তার সঙ্গে শান্তিনিকেতনের মতে মেলেনি। কিন্তু তবুও তাঁর প্রণালীর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে শান্তিনিকেতনে ১০ই মার্চ গান্ধী-পুণ্যাহ পালিত হয়। সেদিন রান্নাবান্না এবং সর্বপ্রকার কাজ ছাত্র-শিক্ষকরা স্বহস্তে করেন এবং এ-কথা স্বীকার করতেই হবে যে, তার ফলে ক্লাসের পড়া কিম্বা রান্নার স্বাদ কোনটিরই ক্ষতি হয় না। সকলে সোৎসাহে লেগে যান আবর্জনা দূর করতে, বাসন মাজতে, নর্দমা-শৌচাগার পরিষ্কার করতে। শোনা যায় আবর্জনা-নিষ্কাশকরা নাকি মাঝে মাঝে কিছু কিছু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোমাঞ্চকর ডিগ্রিধারী বাবুদের দিকেও নজর দিয়ে থাকেন, তবে সেটা বোধহয় নেহাৎই গল্প।

এরপরই এসে যায় বসন্তকাল। দখিন হাওয়া গাছে গাছে, মানুষের মনে মনে মারে ধাক্কা। সাড়া পড়ে যায় বসন্তোৎসবের প্রস্তুতির। ফাল্গুনী-পূর্ণিমা বা দোলের দিন হয় এই উৎসব।

প্রত্যুষে বৈতালিক হয়—'আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে।' বাসন্তী রঙের শাড়ি পরিহিতা এবং উত্তরীয়ধারী ছাত্র-ছাত্রীরা সমবেত হন উৎসব করতে। কপালে আবীর মেখে গানের দল গান ধরে—'ওরে গৃহবাসী খোল দ্বার খোল, লাগল যে দোল' আর তার তালে তালে নাচতে থাকে নাচের দল। বিচিত্রবর্ণের চাদর দিয়ে সাজিয়ে দেওয়া হয় আম্রকুঞ্জকে। সেখানে বসন্তের উদ্দেশ্যে নানা উপচারে পূর্ণ ডালা এনে রাখে মেয়েরা। বসন্তের কাব্য, গান এবং তদনুযায়ী নাচ চলতে থাকে। অনুষ্ঠান শেষের গান—'যা ছিল কালোধলো রঙে রঙে রাঙা হলো' ধরা হতেই যে-যার লেগে যায় আবীর খেলতে। একমাত্র আবীরই শান্তিনিকেতনের বসন্তোৎসবে ব্যবহৃত হয়। ছোটরা বড়দের পায়ে আবীর দিয়ে প্রণাম করেন, বড়রা দেন আবীরের তিলক এঁকে। আর সমবয়স্করা অবশ্য নিজেদের মধ্যে ঠিক ততটা গাম্ভীর্য অনুসরণ করেন না। রঙে রঙে রঙিন হয়ে এক-এক দল বসে যায় ঘণ্টাতলার ধারে বা প্রাক-কুটিরের সামনে। তারপর গান, আবার নাচ—'আজ সবার রঙে রঙ মেশাতে হবে।' দখিনের হাওয়া বয়ে আনে শালের-কচি আমের মুকুলের গন্ধ। মানুষ আর প্রকৃতি রঙের ঝড়ে, রসের প্লাবনে মেতে ওঠে।

সন্ধেয় হয় নাটকাভিনয়। তবে তাও বসন্তোৎসবকে ঘিরে। অবশেষে যখন পূর্ণিমার চাঁদের স্নিগ্ধ কিরণ পড়ে ক্লান্ত ঘাস, কাঁকর আর আবীরের গুঁড়ো ওপরে, যখন 'ও আমার চাঁদের আলো' গান গেয়ে উৎসব শেষ হয়, তখন কেবল মত্ত কোকিল শান্তিনিকেতনে গভীর নীরবতাকে ভঙ্গ করতে থাকে।

বসন্তোৎসবের পরে বছর ঘুরে আসার আর দেরী থাকে না। ফাল্গুনের তাপে পুলকিত আম্রবীথি আস্তে আস্তে হেসে-খেলার পালা সাঙ্গ করে ফল ফলাবার সাধন ধরে। তখন একদিন চৈত্র-সন্ধ্যায় ম্লান আলোয় সকলে মিলিত হয়ে পুরোন বছরকে বিদায় জানায়—'মধুর তোমার শেষ যে না পাই।'

শান্তি-নিকেতনের সঙ্গীত ও কলাভবনে কয়েকদিন

দিলীপ মালাকার



ছাত্র-ছাত্রী পরিবেষ্টিত প্রখ্যাত ভাস্কর ও শিক্ষক শ্রীরামকিঙ্কর বেইজ।
ফটো : দিলীপ মালাকার

উৎসবমুখর শান্তিনিকেতনের অন্তরালে সঙ্গীত ও কলা ভবনের বিশিষ্ট ভূমিকা সবাই মেনে নেন। উৎসবের একটি প্রধান অঙ্গই হল সঙ্গীত, নৃত্য, আলপনা, মণ্ডপ-মেলার প্রসাধন। এসব আয়োজনের অন্তরালে সঙ্গীত ও কলা ভবনের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের নিষ্ঠাবান প্রচেষ্টাকে কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। অবশ্য অন্যান্য ভবনের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকরা এগিয়ে আসেন, উৎসবকে সার্থক করে তুলতে।

উৎসবে মেলায় যখন শান্তিনিকেতন কলমুখর হয়ে ওঠে, দেশ-বিদেশ থেকে কত লোকজন আসে শান্তিনিকেতনের আনন্দ উপভোগ করতে। উৎসব মেলা সাঙ্গ হলে দর্শকরা চলে যান যে যাঁর ডেরায়। অনেক দর্শকের মুখে শুনেছি, 'বাঃ বেশ আছে শান্তিনিকেতনের ছেলে-মেয়েরা! বেশ আনন্দে আছে। নাচ-গানের মধ্যে এদের দিন কাটে।' অনেকেরই কিন্তু এমনি মনোভাব। আমি কিন্তু দেখেছি তার ঠিক উল্টোটা। সঙ্গীতে-নৃত্যে, ছবিতে-অঙ্কনে এরা দর্শকদের মন ভোলায় বটে কিন্তু তার জন্যে যে ছাত্র-ছাত্রীরা কত কঠোর পরিশ্রম ও সাধনার মধ্যে দিন কাটায় সে খবর অনেক দর্শকই রাখে না।

উৎসবের আগে ও পরে এদের শিল্প-চর্চা চলে সমানভাবে। উৎসবকে সার্থক করে তোলার জন্যে সঙ্গীত ও কলা ভবনের সবাই প্রাণ-মন ঢেলে দিয়ে কাজে লাগে। তারই কয়েকটা দৃষ্টান্ত উপলব্ধি করেছি মাত্র কয়েকদিনের অভিজ্ঞতায়। প্রথমে সঙ্গীতভবনের কথাই ধরা যাক। শান্তি-নিকেতনের সঙ্গীতভবন সম্পর্কে আমার কৌতূহলও কম ছিল না। সঙ্গীতভবনের প্রতি কৌতূহলের প্রধান কারণ হল রবীন্দ্র-সঙ্গীত। রবীন্দ্র-সঙ্গীতে এখন যাঁরা দিক্‌পাল তাঁদের অনেকেই সঙ্গীত ভবনে চর্চা করেছিলেন। রবীন্দ্র-সঙ্গীতপ্রেমিকরা এঁদের গানে তৃপ্ত। সেবিষয়ে কারুর দ্বিমত নেই।

ভারতীয় সঙ্গীতের সীমানা সত্যি ব্যাপক। একালে রবীন্দ্র-সঙ্গীত তারই একটা বড় অংশ গ্রহণ করেছে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের শ্রোতা ও প্রেমিকের সংখ্যা অনেক, তেমনি আরেকটি বিরাট অংশ রবীন্দ্র-সঙ্গীতের দিকে। অনেক সাধারণ বাঙালী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অ, আ, ক, খ-র সঙ্গে খুব ভাল-ভাবে পরিচিত নন। কিন্তু তাঁদের অনেকে অতি সহজে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন রবীন্দ্র-সঙ্গীত। আমরা তাঁদেরই একটি অংশ মাত্র। এই কারণেই রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রতি আমাদের প্রীতি গড়ে উঠেছে। রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্য সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে। ভাল লাগে বলেই বোধহয় তার এত জন-প্রিয়তা। কিছু উন্নাসিক অবশ্য আছেন। যাঁরা উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েন আবার আরেকটি গানে ভোরে জাগেন। তাঁদের কথা স্বতন্ত্র।

শান্তিনিকেতনে উৎসব-মেলার সার্থক ভূমিকার পেছনে সঙ্গীতভবনের কথা আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রশ্ন ওঠে। এখানে আলোচনাটা অ-প্রাসঙ্গিক হবে বলে মনে করি না। রবীন্দ্র-সঙ্গীত সম্বন্ধে বিদেশে বিদেশীদের আগ্রহও দেখেছি। বছর কয়েক আগে প্যারিসের 'ইউনেস্কো' ভবনে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সঙ্গীত সম্মেলন বসেছিল। সম্মেলনের প্রথম রাতে দাগর ভ্রাতৃদ্বয়ের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। ভারতীয় সঙ্গীত শোনাব বলে আমার কিছু ফরাসী বন্ধুদের নিয়ে গিয়েছিলাম। দাগর ভ্রাতৃদ্বয় প্রাণ দিয়ে সঙ্গীত পরিবেশন করলেন দেড় ঘণ্টা ধরে। বেশ কিছু শ্রোতা নির্লিপ্ত মনে শুনলেন। সম্মেলন শেষে বন্ধুদের মতামত জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কেমন লাগল? তারা ওই সঙ্গীতের একবিন্দুও উপলব্ধি করতে পারেনি বলে জানায়। অবশ্য আমাদের কজনই বা উচ্চাঙ্গের পাশ্চাত্য সঙ্গীত বোঝেন। কিন্তু সেই শ্রোতাদের কয়েক-জনকে আমি রবীন্দ্র-সঙ্গীতের কিছু রেকর্ড বাজিয়ে শুনিয়েছিলাম। তারা গানের মানে না বুঝতে পারলেও সুরগুলো গুনগুনিয়ে গেয়ে শুনিয়েছে।

তারও কিছুকাল আগে যখন রবীন্দ্র-



কলাভবনের ছাত্র-ছাত্রীদের আঁকা বাটিকের কাজ
ফটো : দিলীপ মালাকার

শতবর্ষ উপলক্ষে কিছুসংখ্যক ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রী প্যারিসে রবীন্দ্রশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করছিল তখন কিন্তু বেশ কিছু-সংখ্যক সাধারণ ফরাসী ছাত্র-ছাত্রীর প্রচুর আগ্রহ দেখেছিলাম। তারা বাংলা জানে না কিন্তু গানগুলো শুনে শুনে আর সুরের গুণে কয়েকটা গানের কলি গুন-গুনিয়ে গাইত। ওই সময়ে রবীন্দ্র-নৃত্য-নাট্যে অংশ গ্রহণ করে কয়েকটি বিদেশী ছাত্র-ছাত্রী।

প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় পাড়ায় 'ল্যাটিন কোয়ার্টারে' রু গেলুশাক ও রু লুইয়ের কলার রাস্তার মোড়ে বেসরকারী এবং ছোট্ট আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাস হলটি বিদেশী ছাত্রদের কাছে অপরিচিত নয়। ছাত্রাবাসের পরিচালক এক ক্যাথলিক পুরোহিত।

সকল ঋতুতে অপরিবর্তিত ও অপরিহার্য পানীয়

চা

কেনবার সময় 'অলকানন্দার' এই সব বিক্রয় কেন্দ্রে আসবেন

অলকানন্দা টি হাউস

২, পোলক স্ট্রীট কলিকাতা-১
২, লালবাজার স্ট্রীট কলিকাতা-১
৫৬, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ কলিকাতা-১২

। পাইকারী ও খুচরা ক্রেতাদের একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান ॥

ভারতীয় ছাত্রের দল ওখানে কিছুকাল আড্ডা জমিয়েছিল। রবীন্দ্রশতবার্ষিকী শেষ হওয়ার পরেও কয়েক বছর সেখানে অনুষ্ঠান জমে। ক্যাথলিক পাদ্রির একমাত্র অনুরোধ ছিল যে, তোমরা যখন খুশি ওখানে এসে হলে বসে আড্ডা জমাও, সঙ্গীতানুষ্ঠান কর আপত্তি নেই। কিন্তু সঙ্গীতানুষ্ঠান শুরু করলে আমায় "ঝর ঝর বায়ু বহে বেগে" গানটা শোনাতে হবে। তিনি কোনোদিন ভারতেও আসেননি এবং ফরাসী ছাড়া কোনো বিদেশী ভাষাও জানতেন না। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের অনেক গানের সুর তাঁর ভাল লাগত। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রতি তাঁর টান ওই কারণেই বেড়েছিল।

রাজনৈতিক তাণ্ডবলীলায় কলকাতার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রায়ই বন্ধ থাকে। লেখা-পড়া এখন উঠে গেছে প্রায়। সেদিক দিয়ে শান্তিনিকেতন রাহুমুক্ত। সঙ্গীত ও কলা ভবনে শিল্প-চর্চা তাই পুরোদমে চলেছে। উৎসব-মেলাকে সার্থক করে তুলতে যেমন ছাত্র-ছাত্রীরা এগিয়ে আসে তেমনি তারা শিল্পসাধনায় নিষ্ঠা দেখিয়ে চলেছে। কয়েকদিন ওদের সঙ্গে থেকে এটাই বুঝেছি যে, সঙ্গীতভবন বা কলা-ভবনের ছাত্ররা সত্যি পরিশ্রমী। ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে এসেছে কত ছাত্র-ছাত্রী। বিদেশীও একেবারে নগণ্য নয়।

শিক্ষিত বাঙালী মাত্রেরই শান্তি-নিকেতনের প্রতি শ্রদ্ধামিশ্রিত আকর্ষণ রয়েছে। তার ওপর উৎসব-মেলা হলে তো কথাই নেই। পৌষ মেলাই তার প্রমাণ। বাইরের দর্শকদের বন্যায় তখন শান্তি-নিকেতন প্লাবিত।

শান্তিনিকেতনে উৎসব-মেলার কৃত-কার্যতা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে অনেক সাধারণ দর্শক বলেছেন, ওখানকার ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সৌহার্দমূলক "কমরেড-শিপ"ই হল এর মুখ্য কারণ। বিভিন্ন ভবনের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কমরেডশিপ বজায় আছে বলেই কর্মীর অভাব নেই।

সঙ্গীতভবনের বাইরে অন্যান্য ভবনের অনেক ছাত্র-ছাত্রী যেমন ওখানে সঙ্গীত চর্চা করে তেমনি দেখেছি ছেলে-মেয়েরা কখনো হানা দেয় হোস্টেলে ছাত্রদের ঘরে। ছাত্ররা হয়ত গলা সাধছে, তারা সেখানে শ্রোতা। তাদের অনেককে আমি গলা মেলাতেও দেখেছি। কিন্তু কখনো সঙ্গীতভবনের ছাত্র-ছাত্রীদের বিরক্তি প্রকাশ করতে দেখিনি। সঙ্গীতভবনের হোস্টেলে বিভিন্ন রাজ্যের ছাত্ররা একই ঘরে বাস করে। তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে সত্যিকারের 'কমরেডশিপ'। এ দৃশ্য কলকাতার হোস্টেলে খুব কমই দেখা যাবে।

ছোট ছেলে-মেয়েদের ছবি আঁকা একটা শখ। এবং এটি আন্তর্জাতিক। আমি অনেক ছোট ছেলে-মেয়েকে দেখেছি যা হয় একটা কিছু এঁকে 'চিত্রপটটি' দেখাতে নিয়ে গেছে কলাভবনে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে। তার ওপর বায়না একটা ভাল ছবি এঁকে দাও।

এখানেও কিন্তু আমি কলাভবনের ছাত্র-ছাত্রীদের বিরক্তভাব প্রকাশ করতে দেখিনি। কলাভবনের ছাত্র-ছাত্রীদের 'কমরেডশিপ'টা যেন আরও ঘন। ওরা চিত্রকলা চর্চা তো সারাদিন করেই তারও ওপর আবার গান-বাজনা। সেদিন দেখলাম একদল ছাত্র-ছাত্রী ছুটির দিনে কাজ করে চলেছে। পরীক্ষা সামনে, তারই প্রস্তুতি।

উৎসব-মেলায় কলাভবনের ছাত্রদের অনেক হাঁক-ডাক। আলপনার কাজ থেকে আরম্ভ করে ডেকোরেশান ইত্যাদিতে তাদের চাইই। সেখানেই বোধ হয় কমরেড-শিপটা আরও ভাল করে গড়ে ওঠে।

কলকাতার কোনো ছাত্র ভাবতে পারবে কী, সে প্রাকৃতিক পরিবেশে নিজের ঘরের



কলাভবনে কর্মরত একজন ছাত্র।
ফটো : দিলীপ মালাকর

দাওয়ায় বসে একমনে শিল্পসাধনায় মগ্ন। কলকাতার ঘিঞ্জি গলির কোনো আলোহীন ঘরে দম আটকানো ধূম্রজালে বসে কোনো শিল্পী হয়ত প্রাকৃতিক দৃশ্যের কথা কল্পনা করে কালির আঁচড় দিতে পারে। কিন্তু শান্ত মনে নয়। কলাভবনের পাশেই আট-চালার আকারে ঘরের দাওয়ায় বসে ছাত্রদের আঁকতে দেখে প্রথমে বিস্মিত হয়েছিলাম। ওই পরিবেশে বোধহয় শিল্পের সূক্ষানুভূতি আরও ফুটে ওঠে।

ভাস্কর্য বিভাগে মাটির দলা নিয়ে মূর্তি গড়তে ব্যস্ত তরুণ শিল্পী। একমনে কাজ করে চলেছে। দর্শকরা উঁকি মারে কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। এক জাপানী ভাস্কর বিরাট পাথরের টুকরোর ওপর ঠুং ঠাং শব্দে খোদাই করে চলেছে। বাইরের দর্শকদের কৌতূহল বড্ড বেশী সংগীত ও কলা ভবনের দিকে। সেখানে ভীড় লেগেই আছে। আবার কিছু দর্শক তাদের বিরক্তও করে। দর্শকদের কৌতূহল প্রশ্ন ও অবাঞ্ছিত কথা কখনো কখনো জাপানী ভাস্কর বিরক্ত হয়ে তার যন্ত্রপাতি থলেতে ভরে ঘরমুখো রওনা দেয়। কী করবে সে, উপায় নেই।

কলাভবনের শিক্ষকরা ছাত্রদের নিয়েই ব্যস্ত। ডাক পড়লেই ছাত্রদের পাশে এসে হাজির। ভুল-ত্রুটি শুধরে দেন শিক্ষক।

ভাস্কর্য বিভাগে দেখলাম এক নবীন পাঞ্জাবী শিক্ষককে তালিম দিচ্ছেন শিল্পী রামকিংকর। 'শিল্পী রামকিংকরের ভাস্কর্য পদ্ধতিতে ভারতীয় শিল্পে একটি "স্কুল" গড়ে উঠেছে।

শান্তিনিকেতনে উৎসব-মেলার আমেজ পেলাম একদিন সন্ধ্যায় কলাভবনের হোস্টেল-গুলোর সামনে। সারাদিন খাটাখাটুনির পর কলাভবনের ছাত্ররা নৈশভোজনের পর কিছু কাঠ জোগাড় করে আগুন পোহাতে বসল। কাঠের আগুনের চারধারে ঘিরে বসল ছাত্রের দল। এলো সংগীতভবন থেকে কিছু ছাত্র। একজনের পর একজন করে শুরু করল খোলা গলায় গান। কোনো বাদ্যযন্ত্র নেই। কেউ আসামী গান, কেউ বা কানাড়া। পূর্ব ও পশ্চিমবাংলার পল্লীগীতি হল প্রধান আকর্ষণ। কলাভবনের বেশ কিছু ছাত্র রবীন্দ্রসংগীতেও ওস্তাদ। পাঞ্জাবী-গুজরাতী গান তো বাদ গেলই না, উপরন্তু এক জাপানী ছাত্র গাইল করুণ সুরে জাপানী গান। আগুন পোহাতে পোহাতে শুধু গানই জমল না, মাঝে মাঝে চুটকি হাসির গল্প আসরটা আরও জমিয়ে তুলল। প্রাদেশিকতা বর্জন করে এবং কাউকে আক্রমণ না করে চুটকি হাসির গল্পে যে মিশ্র সম্মেলন সার্থক হতে পারে সেটা আমি ওখানেই প্রথম দেখলাম। আমার মনে হয় ওদের মধ্যে কমরেডশিপটা ভাল-ভাবে গড়ে ওঠে বলেই বোধহয় ওটা সম্ভব সেখানে।

সেদিন সন্ধের আড্ডায় একটি গুজরাতী ছাত্র ডেকে উঠল, 'এই মোটী, মোটী, এদিকে আয়।' আমি ভাবলাম, কোনো লোকজন হবে বোধহয়। আমাদের পাশেই একটি সারমেয় শায়িত অবস্থায় আগুন পোহাচ্ছিল। সে আড়ামোড়া ভেঙে ছেলেটার পাশে গিয়ে বসল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম মোটীটা আবার কে? উত্তরে ছেলেটা বলে, কলা-ভবনের কুকুর। বছর দেড়-দুই আগে তিনটে কুকুরছানা পাওয়া যায় দাওয়ার পাশে। তিনটের মধ্যে এটাই বাঁচে। এবং এটা ছিল বেশ নাদুশ-নুদুশ। তাই ছেলেরা আদর করে নাম দেয় মোটী। ছেলেদের দেওয়া খাবার ছাড়াও সে বিনানুমতিতে ছাত্রদের ঘরে একটু সুযোগ পেলেই অবাধ বিচরণ করে যা পায় তাই খায়। মোটী নিজেকে পরিবারের একজন বলেই মনে করে। তার বিচরণ-ক্ষেত্র কলাভবনের আশে-পাশে। গুজরাতী ছেলেটি পরিষ্কার বাংলায় বলে-ছিল, 'জানেন, সেদিন অমুক দাদাকে বলে-ছিলাম যে, দেড়-দু বছরের মধ্যে অনেকেই তো কলাভবন থেকে ডিপ্লোমা নিয়ে বেরিয়ে গেল। এখন তো অনেকে আর্ট-শিক্ষক। মোটী আমাদের আঁকা দেখে অনেক শিখেছে। ওকে একটা কিছু দিয়ে দিলে ও চলে যাবে এখান থেকে। ওর হাত থেকে বাঁচব আমরা। চাই কী মোটীও আঁকা শেখাতে পারে।'

দেখলাম মোটী আড়চোখে তাকিয়ে সব শুনছে। ওর সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছে ভেবে সে বেশ প্রফুল্লচিত্তে দুবার হাই তুলে ঠ্যাংটা ওপরে ছুঁড়ে আবার আমাদের পাশে শুয়ে পড়ল। আমরাও তারপর যে-যার ঘরের মুখে রওনা দিলাম। রাত বাড়ছিল। শীতের রাত।



আয়ুর্বেদীয় উপাদানে প্রস্তুত
বলডেক্স
চুল ওঠা বন্ধ করে
নতুন চুল গজায়
বেষ্ট কেমিক্যাল কর্পোরেশন• কলিকাতা-৩৭

উত্তরাধিকার ॥ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

নবীন কিশোর, তোমাকে দিলাম ভুবনডাঙার মেঘলা আকাশ,
তোমাকে দিলাম বোতামবিহীন ছেঁড়া সার্ট আর
ফুসফুস ভরা হাসি
দুপুর রৌদ্রে পায়-পায় ঘোরা, রাত্রির মাঠে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা
এসব এখন তোমারই, তোমার হাত ভরে নাও আমার অবেলা
আমার দুঃখবিহীন দুঃখ, শিহরন—
নবীন কিশোর, তোমাকে দিলাম আমার যা কিছু ছিল আভরণ
জ্বলন্ত পেটে কফির চুমুক, সিগারেট চুরি, জানলার পাশে
বালিকার প্রতি বারবার ভুল
পরুষ বাক্য, কবিতার কাছে হাঁটু মুড়ে বসা, ছুরির ঝলক,
গূঢ় অভিমানে মানুষ কিংবা মানুষের মত আর যা কিছুর
বুক চিরে দেখা,
আত্মহনন, শহরের পিঠ তোলপাড় করা অহংকারের দ্রুত পদপাত—
একখানা নদী, দু' তিনটে দেশ, কয়েকটি নারী—
এসব আমার পুরোনো পোষাক, বড় প্রিয় ছিল, এখন শরীরে
আঁট হয়ে বসে, মানায় না আর,
তোমাকে দিলাম, নবীন কিশোর, ইচ্ছে হয়তো অঙ্গে জড়াও
অথবা ঘৃণায় দূরে ফেলে দাও, যা খুশী তোমার—
তোমাকে আমার তোমার বয়সী সব কিছু দিতে বড় সাধ হয়।

কর্ণ ॥ দাস

আমায় তুমি পতিত করলে হে মহাজন, কাকেই বলি
মাথা ঠুকলে রথের চাকায় ধ্বনি থেকে প্রতিধ্বনি
নিজের কাছেই ফিরে আসে ঃ

চেয়ে দ্যাখো পাঁজরাগুলো লক্ষভেদে যন্ত্রণাময়
অন্ধকারে আলজিহ্বা নড়ে উঠলে শব্দ হয় না
দু' হাত দিয়ে চাকা ঠেলালে ধ্বজা কাঁপে শব্দ হয় না
রক্তে মেশে ভালবাসা অনুরণন হৃদয় জুড়ে।

কেন আমি পথ মাপলাম সমস্ত দিন তোমার সাথে
কেন আমি হৃদয় দিলাম হৃদয় দিয়ে তাপ পোহাতে
অন্ধকারে মাথা খুঁড়লে স্মৃতি নূপুর হয়ে বাজে
চামড়া ফেঁড়ে হৃদপিণ্ডে
লক্ষভেদে সহস্র তূণ।

আমায় তুমি পতিত করলে হায় মহাজন
কাকেই বলি
মাথা ঠুকলে রথের চাকায় ধ্বনি থেকে প্রতিধ্বনি
নিজের কাছেই ফিরে আসে।

প্রতিচ্ছবির হাঙর



সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

লোকটার মুখ দেখে চেনা মনে হচ্ছিল।

ট্রেন আসতে পুরো একটি ঘণ্টা সময় হাতে আছে। তার মানে এতখানি বাড়তি সময় বাজে খরচ হয়ে যাচ্ছে। তাই ভাবছিলুম কীভাবে এর সদ্ব্যবহার করা যায় এবং জনশূন্য দেহাতী স্টেশনের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত হেঁটে যেতেই দেখতে পেয়েছিলুম লোকটাকে। গোড়াবাঁধানো পিপুল গাছের নীচে সে চুপচাপ বসে ছিল। শীর্ণ তামাটে শরীর ডুবো চোখ ফ্যাকাশে চাউনি খাড়া নাক বর্শার ডগার মত চিবুক—এই লোকটাকে দেখে হঠাৎ আমার রোমগুলো শিরশির করে উঠেছিল। রুগ্ন গাঙফড়িং যেমন আজকাল শীতের বিকেলে বেড়ার গায়ে বসে রোদ পোহায়, তেমনি নিস্তেজ আর বিষণ্ণ তার অবস্থান। ধূসর আ কাচা পাঞ্জাবি গায়ে, গলায় পাটকিলে রঙের পশমী মাফলার, ধুতির নীচে তাতোধিক ময়লা কেডস্ জুতো; তা সত্ত্বেও তার চেহারায় বেশ বনেদীবংশের ছাপ। তাছাড়া তার চাউনিতে ছিল এমন একটা উদ্দেশ্যহীনতা, আমার ধারণা—সামনে বোমা ফাটালেও সে থোড়াই কেয়ার করে।

অনেক সময় খুব কাছের জিনিস দৃষ্টি এড়িয়ে যায়, সামনের চেনা মুখ হয়ে ওঠে অচেনা—সম্ভবত তার তখন সেই সময়টাই এসে গেছে। ঘুম রুগ্নতা যন্ত্রণা ব্যস্ততা কিংবা জরুরী খবর—মানুষের জীবনে কত কিছু ঘটে। এবং সেই অবসরে কত কিছু গোচরে এলেও অগোচর থেকে যায়। সে কি আমাকে, চিনতে পারল না? নাকি চিনেও না চেনার ভান করে এড়িয়ে থাকল?

হ্যাঁ, তারপরই তাকে আমি চিনতে পেরেছিলুম। তার কড়ে আঙুলের মোটা আংটিটার দাগ আমার গলার খাঁজে এখনও মোছেনি। তেমনি মোছেনি তার চিবুকের বাঁপাশে আধখানা চাঁদের মত কালচে ক্ষত-চিহ্নটা। অবশ্য আমার সেই পেন্সিল কাটা ছুরি বহুদিন আগে সঙ্গ ছেড়েছে। তপতীর কাছে বাহাদুরী নেবার জন্যে অর্জুন গাছের গুঁড়িতে তাকে ছুঁড়ে বিঁধিয়েছিলুম। বের করবার সময় অর্ধেকটা প্রাচীন বীরদের মত শক্তিমান গাছের হৃদয় কেড়ে নিল। খুব অবাক হবার মত ঘটনা না হলেও আমার কাছে এটার তাৎপর্য ছিল। তপতীকে আমি পাইনি। সেই ভীষণ মারাত্মক অর্জুন গাছের ছায়া মাড়াতে যেরূপ কষ্টের কারণ ছিল, হঠাৎ এতদিন পরে এই লোকটির মুখোমুখি হয়েও সেরূপ কষ্ট আমার হৃৎপিণ্ডকে নাড়া দিচ্ছিল। ও কি চিনতে পেরেছে আমাকে? যদি চিনতে পারে, মড়ার চোখের স্থির পাণ্ডুর দৃষ্টি মেলে উঠে আসবে মুখোমুখি? প্ল্যাটফরমে সোনালী বিকেলের রঙ আস্তে আস্তে গোলাপী হয়ে আসছে। রোদের পাপড়িগুলো নেতিয়ে পড়ছে। শীতের কুয়াশা রোমশ শুঁয়োপোকার মত হাঁটছে আস্তে আস্তে তাদের বুকের উপর। নির্জন স্টেশনে বিবাদমান দুটি মানুষকে বাধা দেবার মত কেউ এখন উপস্থিত নেই।

স্টেশনবাবু দূরে কোয়ার্টারের বারান্দায় বসে সপরিবারে চা-পান করছেন। সাত-তাড়াতাড়ি একজন খালাসী লণ্ঠনগুলো ঝেড়েমুছে ও তেল পুরে রেখে ওদিকে কোথায় চলে গেল। সিগন্যালম্যানকে দেখলুম দূরের চটানে তার গাভী আনতে যাচ্ছে। মাঠের মধ্যিখানে এই ছোট্ট স্টেশনটা এখন সোহাতই ঈশ্বরের জিম্মায় সমর্পিত।

পা [illegible] টিপে পিছন ফিরে হাঁটছিলুম। [illegible]ন্ধকার তৎপর জানোয়ারের মত কান [illegible] করে স্টেশনের দিকে সরে যাচ্ছিলুম। পরক্ষণে হাঁৎ করে একটা অপূর্ব সুযোগের কথা মাথায় এসে গেল। স্টেশন-বাবুর কোয়ার্টারে গেলে মন্দ হয় না। সন্ধ্যা ছটায় ডাউন ট্রেন। আমার ফিরে যাবার কথা এই গাড়িতে। পরেরটা রাত নটার কাছাকাছি। মাঝামাঝি সময়ে একটা আপ আছে। কিন্তু ও কোন্ ট্রেনে যাবে আমি জানিনে। সেই হচ্ছে ভাবনার কথা। সুতরাং কোন একটা ছলছুতো করে রাতের মত একটুখানি মাথা গোঁজবার আশ্রয় চেয়ে নিতে হবে।

কিন্তু কী ছুতো করব? যে গ্রাম থেকে ফিরছি, সেটা পাক্কা চার মাইল দূরে। সেখানে আবার ফিরে যাবার মানে হয় না। তাছাড়া সেখানে থাকব কোথায়? হাসপাতালের কোয়ার্টারে তপতী একা থাকলেও যা, অন্য নার্সদের সঙ্গে থাকলেও তাই। পুরুষ-মানুষের ঠাঁই নেই সে সোনার তরীতে—তার বাবা নয়, দাদা নয়; অন্যরকম পুরুষ-মানুষ। হাল-না-ছাড়া বেহায়া পুরুষমানুষ। নিজেকে আর ছোট করার প্রবৃত্তি হল না। তপতী শুধু বিব্রতই হবে না; আমার বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দিহান হবে। নাঃ, তা অসম্ভব আমার পক্ষে। বিশেষ করে, ওই লোকটিকে এখানে দেখার পর তপতীর প্রতি আমার একটা ঘৃণাভাব বেড়ে উঠছে ক্রমান্বয়ে।

মরীয়া হয়ে পা বাড়ালুম স্টেশন-কোয়ার্টারের দিকেই। রেললাইনের এপাশে নয়ানজুলি। ঘাস আর ছোট ছোট আগাছায় ঢাকা তার কিনারা ছুঁয়ে একফালি পথ। খোয়াঢাকা সেই সরু পথ দিয়ে হেঁটে গেলুম। সামনে বেড়াঘেরা ফুলবাগিচা। স্টেশনবাবু বেশ যত্ন নিয়ে অনেকরকম মরশুমী ফুল ফুটিয়েছেন দেখতে পেলুম। নিরাবরণ শস্যশূন্য বিরাট মাঠের প্রান্তে লাল কোয়ার্টারটা খুবই নীরস দেখাত, যদি না এই ফুলগুলো থাকত। স্টেশনবাবু একটা বেতের চেয়ারে বসে চা-পান করছিলেন। সামনাসামনি সম্ভবত তাঁর স্ত্রী ও কন্যা আরো দুটি চেয়ারে বসে রয়েছেন। স্ত্রী উল বুনছেন নিবিষ্টমনে, কন্যা বোধহয় নভেল পাঠ করছেন। শুকনো ঘাসের উপর একটি বাচ্চা ছেলে নিজের মনে একা ব্যাডমিণ্টন খেলছে।

আমাকে দেখেই ও'রা বিস্মিতভাবে মুখ তুলেছিলেন। কী বলা যায় ভাবছি, হঠাৎ ছেলেটি ছুটে এসে খুবই পরিচিতের মত হাত ধরে টানল। ব্যাডমিণ্টন খেলবে? এস না!

এতে স্টেশনবাবু হো হো করে হেসে ফেললেন।—দেখছ, দেখছ লুলুর কাণ্ড?

আমি ওর কাঁধে হাত রেখে আদর করে বললুম—তোমার কোন খেলার সঙ্গী নেই দেখছি? র‍্যাকেট আছে আর একটা?

ছেলেটি অর্থাৎ লুলু সোৎসাহে বলল—আছে। নেটও আছে যে! নেট লাগবে না?

—লাগবে বৈকি। আমি ওর হাত থেকে র‍্যাকেট আর ককটা নিলুম। ও দৌড়ে ঘরের দিকে গেল।

স্টেশনবাবুর একটি দাঁত সোনায় বাঁধানো। ফের একগাল হেসে বললেন—ওই হয়েছে এক জ্বালা, মশাই। পাণ্ডববর্জিত জায়গায় হঠাৎ ঠেলে দিলে আমাকে। দিন-রাত্তির কীভাবে যে কাটছে, সেকথা বলে বোঝানো কঠিন। এই আজব জায়গায় স্টেশন করে কী লাভ হল বুঝতে পারিনে! সারাদিনে দু'চারজন যাত্রী...ধুস্!

ও'র স্ত্রী ও কন্যা মুখ তুলে আমাকে দেখছিলেন। ও'দের চোখেও বেশ তৃষ্ণার রঙ লক্ষ্য করছিলুম। সত্যি তো, এই ভীষণ নির্জন পোড়ো জায়গায় টিকে আছেন কেমন করে? আমি অস্পষ্ট চাউনিতে অল্প-বয়স্কাকে ফের দেখে নিলুম। একটু রোগাটে, কিন্তু মুখশ্রী আছে। আলোর দোষে কিনা জানিনে, একটু ময়লা দেখাচ্ছিল গায়ের রঙ। তা সত্ত্বেও সরু নাক, টানা চোখ, চাপা চিবুক, ছোট্ট কপালে ওর একটা ব্যক্তিত্বের প্রকাশ আছে—আছে হয়ত ঈষৎ প্রচ্ছন্ন অহঙ্কারও। ডিমালো খোঁপা বাঁ কাঁধের দিকে ঝুলেছে। ফিকে লাল রঙের ছাপা শাড়ি আর হাতকাটা রঙমেলান জামায় ওকে খুবই পরিচ্ছন্ন দেখাচ্ছে। পায়ের কাছে শাদা ফিতের স্যাণ্ডেলজোড়া হঠাৎ দেখায় বিশ্রাম-রত পাখির মত।

খুব আগ্রহে মেয়েদের এইরকম করে দেখা আমার অভ্যাস। পরক্ষণে স্টেশনবাবু ও বয়স্কা মহিলার দিকে তাকাতেই দেখি, ও'রা দু'জনেই আমার এই দেখাটা দেখে ফেলেছেন। অপ্রস্তুতভাবে বললুম—ট্রেনের অনেক দেরী। সময় কাটানো কঠিন। তাই...

—যা বলেছেন! স্টেশনবাবু লাফিয়ে উঠলেন। শুনলে কিন্তু হাসবেন, আবু-হোসেনের গল্প পড়েছেন? সেই যে রাস্তা থেকে লোক ডেকে নিয়ে এসে আসর জমাত...

অল্পবয়স্কা কথা কেড়ে নিল। খাওয়াত বলো!

সবাই মিলে হেসে উঠলুম। স্টেশনবাবু বললেন—আমারও হয়েছে সেই দশা। বাগে পেলে স্টেশন থেকে লোক কুড়িয়ে আনি। তারপর কণ্ঠস্বর চাপা করে ফের বললেন—দিনটা তো যাহোক, কেটে যায় কোনমতে। রাত্রে সে এক ভীষণ অবস্থা। এলাকায় সব চোরডাকাতের রাজত্ব। ভয়ে সারাটি রাত আমরা জেগে থাকি। বুঝলেন? তিনটিতে মিলে তাস খেলি। এই তেপান্তর মাঠে আমরা অল্প ক'জন মাত্র মানুষ...বাপস্!

এতক্ষণে নেট খুঁজে পেয়েছে ছেলেটি। এসেই চোখ পাকিয়ে বলে উঠল—কে লুকিয়েছিল শুনি? হুঁ, দিদির দিকে আঙুল রাখল সে। —তোমার কাণ্ড। দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা। আমিও তোমার বই লুকিয়ে রাখব।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কোনপ্রকারে নেট টাঙিয়ে ফেললুম আমরা। তারপর খেলা শুরু হল। ততক্ষণে সূর্য ডুবেছে। একটা ঠাণ্ডা হাওয়া মাঠ থেকে শিরশির করে বয়ে এসেছে আমাদের গায়ের উপর। কুয়াশার নীলাভ চাদরে চারপাশের সব দৃশ্য ঢেকেছে। নক্ষত্র ফুটে ওঠার সময় নিয়ে আকাশ হয়েছে প্রস্তুত। খেলা জমবার কথা নয়। জমছিল না। তবু জমানোর চেষ্টা করছিলেন স্টেশনবাবু চড়া গলায় উৎসাহ দিয়ে। মাঝে মাঝে গল্প বলছিলেন অন্যান্য স্টেশনের। সেই ফাঁকে এক কাপ চাও এসে গেল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চা খেলুম। বহুকাল পরে এই ছেলেমানুষ প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বয়স্ক বুকের খাঁজে আটকেথাকা বহু কষ্ট আমার সরে যাচ্ছিল একের পর এক। চপলতা সারল্য আর ভয়হীনতা আমাকে বিহ্বল করে তুলছিল। পারিবারিক জীবনের এমন আনন্দ আমি অনেকদিন আগে হারিয়েছি!

স্টেশনবাবু বললেন—বসুন। গাড়িটা ছেড়ে দিয়েই আসছি। না, না। যাবেন কোথায় এ রাতবিরেতে। ...হুঁ, আপনাদের মত ইয়ংম্যানদের আবার কাজ! .. ও সব কাজ টাজ রাখুনদিকি, মশাই। মনে করুন না, এক দাদার বাড়ি রাত কাটিয়ে গেলেন। সকালে গাড়িতে তুলে দেব। যথাস্থানে চলে যাবেন।

গড়গড় করে একনিঃশ্বাসে এসব কথা বলে গেলেন স্টেশনবাবু। চেয়ার থেকে মার্কামারা কোটটা তুলে নিয়ে গায়ে চড়াতে চড়াতে প্রায় দৌড়ে অদৃশ্য হলেন।

লুলু আমার হাতটা ধরে ছিল। সে মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল—আজ আমার ছুটি কিন্তু। কাকুর কাছে গল্প শুনব।

ভদ্রমহিলা অনায়াসে কটমট করে ছেলের দিকে কটাক্ষ করে বললেন—ওঁকে কাকু বলছ কেন? ও তোমার দাদার মত। দাদার নাম জিগ্যেস করছ না কিন্তু, লুলু!

মতলব কী? আমি একটু হেসে বললুম—আমার নাম স্বপন......

মায়ের স্নেহে প্রশ্ন এল—স্বপন কী?

—স্বপন চ্যাটার্জি।

মেয়ে ওদিকে হেরিকেন জ্বালতে ব্যস্ত হয়েছে। কাচ তোলা ও দেশলাই জ্বালবার শব্দ পাচ্ছি। যতটুকু দেখা যাচ্ছিল, ওর ঠোঁটের পাশে একটা অদ্ভুত হাসি ঝুলছে এবং মায়ের সারা মুখটা কেমন উজ্জ্বল হতে দেখছিলুম। সেই উজ্জ্বলতাসহ তিনি বলে উঠলেন—আমরা ব্যানার্জি। কিছু মনে কোরো না বাবা, তুমি বলছি। তুমি আমার ছেলের বয়সী। তা তোমার দেশ কোথায়?

—বহরমপুর।

—বরাবর বহরমপুর, না আগে অন্য কোথাও ছিল?

—ঢাকায়। অবশ্যি আমি এখানেই জন্মেছি।

—আশ্চর্য! আমরাও ঢাকার লোক। ভাগ্যকুলের নাম শুনেছ?

—শুনেছি।

এবার রীতিমত পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণে ভদ্রমহিলা প্রশ্ন শুরু করলেন। পারিবারিক অবস্থা, চাকরী-বাকরী, বাবা-মায়ের খবর এবং অবশেষে গোত্র। আরও কতদূর এগোত কে জানে, স্টেশনবাবু ঊর্ধ্বশ্বাসে এসে গেলেন। তাঁকে মধ্যপথে তিষ্ঠমন্ত্রে স্থির করে উনি উঠলেন—আরে শুনছ নাকি, স্বপনরাও ঢাকার লোক! অদ্ভুত যোগাযোগ কিন্তু!

ট্রেনটা ইতিমধ্যে বাঁকের দিকে অদৃশ্য হয়েছে। স্টেশনবাবু বললেন—ঢাকার কথা তোমার মনে আছে নাকি! পূর্বজন্মে ঢাকা ছেড়েছ। এ জন্মটা তো কোথায় কে থায় ভেসে কেটে গেল। ওসব রাখো। তাড়াতাড়ি রান্নাটা সেরে নাও। আজ ভালভাবেই বসা যাবে। কী বলেন মশাই।

আমি জিজ্ঞাসু চোখে তাকালুম।

ভদ্রমহিলা কতকটা ভেংচি কেটে উঠে দাঁড়ালেন। —মশাই-মশাই করছ কেন ওকে? অদ্ভুত লোক। ও আমাদের ছেলের মত। বলে ভিতরে চলে গেলেন তিনি।

স্টেশনবাবু বললেন—চেয়ারগুলো ঘরে ঢোকাই, কী বলেন? ঠাণ্ডা পড়ছে বেশ।

দুজনে চেয়ারগুলো ঘরে রাখলুম। টেবিলে হেরিকেন জ্বলছিল। স্টেশনবাবু ফের বললেন—যাই বলুন, মেয়েরা তাস খেলার জানে না কিসসু। সেই একঘেয়ে ব্রে, নয়ত স্ক্রু! আজ মশাই, ব্রীজ খেলব। কী বলেন?

বললুম—তাস খেলা আমি বিশেষ জানিনে।

—সে শিখিয়ে নেব'খন। তেমন কিছু কঠিন নয়। ভাববেন না। সবিতাও জানে না, ওর মা তো ব্রীজের নামই শোনেনি। তা সত্ত্বেও দেখবেন, সব ট্রেনের মত ঠিকই চলছে।

হাহা করে হেসে উঠলেন স্টেশনবাবু। পকেট থেকে সিগ্রেট বের করে এগিয়ে দিলেন। আমি ও'র স্ত্রীর কথা ভেবে ইতস্তত করছিলুম। শেষে হাতে নিতে বাধ্য হলুম; কিন্তু না জ্বেলে মুঠোয় রেখে দিলুম শুধু।

স্টেশনবাবুর মুখটা ভীষণ আনন্দিত ও ব্যস্ত দেখাচ্ছিল। ক্ষুধার্ত বাঘ যেমন শিকার কামড়ে ছটফটিয়ে হাঁটে, সেই ব্যস্ততা।

আমার মনে এতক্ষণে সেই লোকটি এসে গেল। কৌতূহলে অস্থির হয়ে উঠছিলুম। অথচ সরাসরি প্রসঙ্গ তুললে কী ভেবে ফেলেন ভদ্রলোক, সেই ভয়।

তাই পাশ কাটিয়ে তুলতে হল কথাটা। —আজকাল শীতের সময় রাতের দিকে বুঝি তেমন যাত্রী হয় না স্টেশনে!

—নাঃ। থারটিন ডাউন লোকাল তো একেবারে ফাঁকা গেল।

—শুক্রবার যাত্রীও ছিল না বুঝি?

—কই ছিল? কে একজন ভূতের মত ওদিকে বসে রয়েছে দেখলাম। কে জানে কোথায় যাবে। আমার এমন দায় পড়েনি যে যেচে জিগ্যেস করব।

বুকে হাতুড়ি পড়তে থাকল আমার। উদ্দেশ্য কী ওর? তাহলে কি যাত্রার প্রথম থেকেই আমাকে চিনতে পেরেছে? চুপি চুপি অনুসরণ করেছিল সারাটি পথ, শহর থেকে এই স্টেশন অব্দি? তারপর হাসপাতাল অব্দি গিয়ে ফের এসেছে পিছনে পিছনে?... সম্ভব-অসম্ভবের মাঝখানে আমার সব সিদ্ধান্ত দুলছিল। নাকি সবই ভগবানের কারচুপি?

স্টেশনবাবু বললেন—তবে যাত্রী হবে এ মাসের শেষদিকে। বিনোদিয়ায় মেলা বসবে শ্যামচাঁদ পুজো উপলক্ষে। খুব বড় মেলা নাকি। ...তারপর হাসতে থাকলেন। —সেই সুদিনের পথ চেয়ে স্টেশনটা পড়ে থাকে সারা বছর।

চাণক্য সেনের
তারা-রা শোনেনা
এ্যান্টি গল্প ৩·০০

সমরেশ বসুর নতুন উপন্যাস
তিনতরঙ্গ ২য় সং ৬·০০
জগদ্দল দাম : ১৫·০০

বিমল মিত্রের
এর নাম সংসার ৪র্থ সং ৮·৫০
গল্প সম্ভার ১৬·০০
স্ত্রী ৫ম সং ৪·৫০

শংকর-এর
পাত্রপাত্রী ৯ম সং ২·৫০
মানচিত্র ১৩শ সং ৬·০০
চৌরঙ্গী ১৯শ সং ১২·০০
রূপতাপস ৪র্থ সং ৪·০০

-র
পাড়ি ১০ম সং ৩·৫০
মহাশ্বেতার ডায়েরী ২য় সং ৪·০০
মসিরেখা ৫ম সং ৯·০০

বনফুলের
দুরবীন ৩য় সং ৪·৫০
এক ঝাঁক খঞ্জন ৬·৫০

মধু বসুর
আমার জীবন দাম : ১৫·০০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
নিশিপদ্ম ৮ম সং ৪·০০

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
দ্বিতীয় অন্তর ২য় সং ১০·০০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের
দুর্গরহস্য দাম ৫·০০
হসন্তী ৩য় সং ৪·৫০

সৈয়দ মুজতবা আলীর
শ্রেষ্ঠগল্প ৫ম সং ৫·০০

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
পৌষ ফাগুনের পালা ৪র্থ সং ১৫·০০

মনোজ বৈরাগীর
কালো হরিণ চোখ ২য় সং ১০·০০
বিদেহী ৪র্থ সং ২·৫০

দীপক চৌধুরীর
আবৃত আকাশ ২য় সং ১০·০০

দিলীপকুমার রায়ের
অভাবনীয় দাম : ১০·০০
বনাবিবি দাম : ৬·০০

নিমাই ভট্টাচার্যের
আকাশভরা সূর্যতারা দাম : ৪·০০

মালতী গুহরায়ের
ভারতী নিবেদিতা দাম : ৬·৫০

স্টুয়ার্ট চেজের The Proper Study of Mankind-এর অনুবাদ
মানব ও সমাজ বিজ্ঞান : একটি নূতন দিগন্ত
অনুবাদ : রেবা চট্টোপাধ্যায় দাম : ৩·০০

ব্রায়ান ক্রোজিয়ারের South East Asia in Turmoil--এর অনুবাদ
এশিয়ার ধূমায়িত অগ্নিকোণ ৩·০০
অনুবাদ : রবি গঙ্গোপাধ্যায়

বাক সাহিত্য ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা—৯

আমি বারবার দরজার দিকে তাকাচ্ছিলুম। স্টেশনের প্লাটফরমে বাতি জ্বলছে দু'টিকয়। আর সব অন্ধকারে আর ঠাণ্ডায় ডুবে আছে। হঠাৎ কি দেখতে পাবো একজোড়া জ্বলন্ত নীলচোখ হায়েনার মত ফুলের বেড়ার ওপাশে? ছুটে আসবে কোন মারাত্মক প্রাণঘাতী ছুরি?

—ঠাণ্ডা আসছে? দরজাটা বন্ধ করে দিই। আপনি বসে গল্প করুন। নটার ডাউন পাস করিয়ে আমি ফিরবো'খন। তারপর সারাটি রাত্তির ছুটি। লুপলাইনের এই বেশ মজা কিন্তু।

চা এসে গেল ফের। প্লেটে অল্পকিছু তেলেভাজা। গোগ্রাসে গিলে স্টেশনবাবু বেরিয়ে গেলেন। সবিতা শূন্য কাপপ্লেটগুলো নিয়ে যাচ্ছিল। বললুম—নন্দু কোথায়? দেখছিনে যে!

সবিতা মুখ ফিরিয়ে হাসি চাপল। —এখন ঘণ্টাখানেক ও মায়ের কাছে বন্দী। যা দুষ্ট, ছেলে, পড়াশোনা করতে চায় না। আমাকে তো আমলই দেয় না। তাই মা ওকে পড়ান।

বললুম—ওর দোষ কী। স্কুল নেই এখানে।

সবিতা বলল—জানুয়ারীতে মামার বাড়ি ওকে রেখে আসবেন বাবা। ওখানে থেকেই পড়বে।

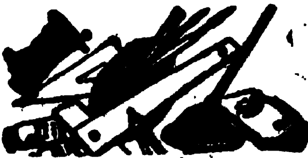
—কোথায়?

—জল্পাইপুরে। আমিও মামাবাড়ি থেকে লেখাপড়া শিখেছি। জল্পাইপুর কলেজের ছাত্রী ছিলাম।

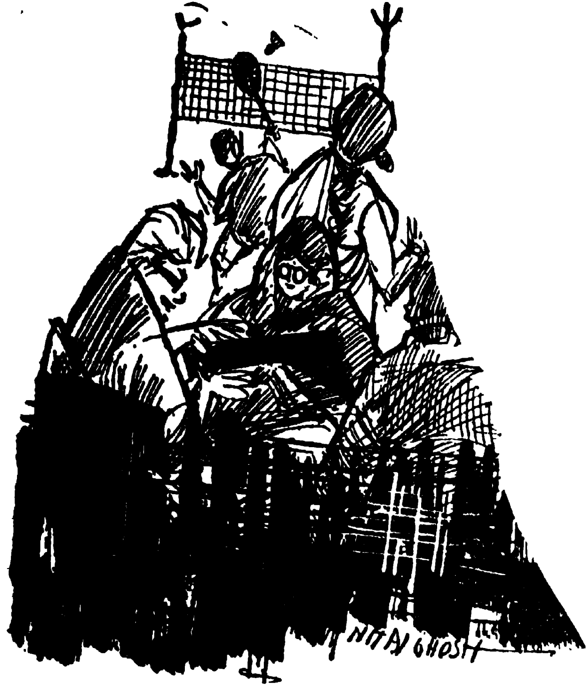
একটু ইতস্তত করে প্রশ্ন করলুম—কিছু মনে করবেন না। একটা কথা জিগ্যেস করছি।

সবিতা নীরবে আমার দিকে তাকাল।

—ওখানের কলেজে একটি মেয়ে পড়ত। খুব নামকরা মেয়ে ছিল, অবশ্যি স্পোর্টসে। সাঁতারে মেয়েদের মধ্যে ডি স্ট্রিক্ট



কুইন ষ্টেশনারী ষ্টোর্স
প্রাঃ লিঃ



সবাই হেসে উঠলুম...

চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। হঠাৎ পড়া ছেড়ে চাকরীতে ঢোকে। নামকরা মেয়ে বলেই জানতে চাচ্ছি—চিনতেন না কি?

সবিতা ভ্রূ কুঁচকে বলল—নাম কী বলুন তো? চিনি মনে হচ্ছে। তপতী সোম নয় তো?

—হ্যাঁ। চেনেন তাহলে।

—খুব চিনি। ও আমার ক্লাসফ্রেন্ড ছিল তো? সেকেন্ড ইয়ারে কলেজ ছেড়েছিল।

—কী আশ্চর্য! তপতী আপনার কাছেই থাকে এখন।

সবিতা অবাক হল।—এ মা, সে কি। কাছে মানে?

—বিনোদিয়া হসপিটালের নার্স।

—তাই নাকি! আপনি ওকে চেনেন?

—চিনি, মানে কিছুটা পরিচয় ছিল বা আছে। স্পোর্টসে আমারও অল্পসল্প নেশা ছিল একসময়। সবিতা হেসে উঠল।—সাঁতার নয় তো!

ঠিকই বলেছেন। যদিও তপতীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামবার প্রশ্ন ওঠে না।

সবিতার মা সম্ভবত রান্নাঘর থেকে আমাদের কথাবার্তা কান খাড়া করে শুনছিলেন। সেখানে চড়া গলায় বললেন—ঝুনু, মামার সঙ্গে গল্পসল্প কর। বেচারা একা বসে আছে।

বললুম—ঝুনু! বেশ নাম তো আপনার।

সবিতা চোখ নামাল।—ছেলেবেলায় নাকি ভীষণ নাচতাম। তাই......

আমি হেসে উঠলুম।—অর্থাৎ ঝুনুঝুনু নূপুরের শিঞ্জন .....

সত্যি বলতে কী, দুর্ভেদ্য উদ্বেগ অনিশ্চিত পরিস্থিতি সব কেটে যাচ্ছিল এক অভূতপূর্ব চপলতার মধ্যে। স্টেশনবাবু না আসা অব্দি আমরা অজস্র কথা বললুম তপতীর সম্পর্কে। আমি ওকে জানিয়ে দিতে চাচ্ছিলুম—কোন সংশয় মনে রেখো না লক্ষ্মী মেয়ে। তপতী আমার হৃদয় কেড়ে বসে আছে। সেই যে জল্পাইপুর থেকে বহরমপুর ভরাগঙ্গার সাঁতার প্রতিযোগিতায় তাকে প্রথম দেখেছিলুম, তখনই জলের নীচে দিয়ে আমার হৃদয় লুকিয়েছিল সে। তারপর ছেলেদের পালা। সাঙ্গ হলে প্রথম যে মেয়েটি যেচেপড়ে আলাপ করতে এসেছিল বহরমপুরে তাকে মুখোমুখি বলেছিলুম—তোমার জয় আমার শক্তি যুগিয়েছে। এ জয় তোমারই। সে বলেছিল—জল আমাদের পরস্পর দূরে থেকে কাছে এনেছে।

অথচ তপতীকে আমি পাইনি। অক্ষম ছুরির প্রাচীন গাছের বুকে ভেঙে গেল। যে জল স্রোতের টানে দূর থেকে পরস্পরকে একত্র করেছিল কিছুক্ষণ, সেই জল একত্রকে পরস্পর দূরে নিয়ে গেল। তবু অক্ষম দুঃখ আজও ব্যর্থ সাঁতার কেটে কাছে

পৌঁছতে চাই। মাঝে মাঝে দেখা দিচ্ছিল এক বুড়ো হাঙর—ধারাল দাঁত বের করে রুখে দাঁড়াচ্ছিল, তপতী রুপোলী মাছের মত তার আড়ালে সরে যাচ্ছিল। লুকোচুরি খেলছিল।

রাত নটার ডাউন চলে গেলে স্টেশনবাবু এসে গেলেন হন্তদন্ত হয়ে। দরজা খুলতেই বললেন—আরে ওদিকে এক কান্ড হয়ে গেল। শোনেন নি আপনারা?

বললুম—কী হয়েছে?

—দরজাজানালা বন্ধ ছিল, শুনবেন কী। মরুক গে। যা হবার হল। এখন সব প্ল্যান শিকেয় উঠল আমার। খেয়েদেয়ে এখন গিয়ে মড়া আগলাতে হবে, যতক্ষণ না জংশন থেকে কেউ আসে। শিউশরণের জ্বর, কালীপদ ভীতুর রাজা—হাউমাউ করে কাঁদছে। যত দায় আমারই।

সবিতা একপা এগিয়ে বলল—অ্যাকসিডেন্ট নাকি?

হ্যাঁ, সুইসাইড। কালীপদ দেখেছে। মরবার আর জায়গা পেল না ব্যাটা। কিন্তু কী আশ্চর্য দেখুন, গার্ড কীরকম ইররেসপনসিবল্! আমি মশাই খোলাখুলি রিপোর্ট লিখব। জলজ্যান্ত লোকটা প্লাটফরম থেকে গড়িয়ে পড়ল চাকার ফাঁকে, লক্ষ্য করলে না? সবে চাকা গড়াচ্ছিল— অনায়াসেই বাঁচানো যেত ওকে। কালীপদ অবশ্য প্রথমে বুঝতে পারে নি। গাড়ি চলে গেলে দেখে যা ঘটবার ঘটে গেছে। উঃ, কী নিষ্ঠুর লোক বলুন তো, ধীরেসুস্থে ঢুকে গেল চলন্ত চাকার ফাঁকে!

আমি গুম হয়ে বসেছিলুম। এবার বললুম—আচ্ছা, ওর পরণে পাঞ্জাবি আর গলায় মাফলার জড়ানো আছে, তাই না?

—আছে, আছে। চেনেন নাকি? কে বলুন তো? চেনেন না? মরুক গে। নিন, খাওয়াদাওয়া সেরে দুজনে স্টেশনে যাই। এখনো কালীপদকেই পাঠিয়ে দিচ্ছি। কই গো, তোমার হল? স্টেশনবাবু ভিতরে চলে গেলেন।

ম-রে গে ল! আমার শরীর নিস্তেজ হয়ে আসছিল। সাঁতার কাটবার সময় যেমন কখনও নীচের নরম বালি আমাকে টেনে ধরত, শুয়ে ঘুমোতে ইচ্ছে করত চিরকালের মত স্রোতময় জলের নীচে বালিতে গাল রেখে, স্বপ্নের আরাম গায়ে নিয়ে দেখতুম যেন ঝাঁকে ঝাঁকে নীলচক্ষু রক্তাভ পাখনা রুপোলী মাছ আমাকে স্পর্শে সোহাগ জানাতে ভেসে আসছে—সেইরকম একটা অপরূপ ক্লান্তিজড়ানো ঘুমঘুম স্বপ্নভরা মোহের দিকে আমি তলিয়ে যাচ্ছিলুম।

তপতীতে খবরটা আমিই দিয়ে আসব। জানতে চাইব--কেন ওর যাওয়ার কথা তপতী আমাকে গোপন রেখেছিল? মুখ তুলে সবিতাকে বললুম—যাই বলুন, আপনার বন্ধু তপতী খুব নিষ্ঠুর মেয়ে।

সবিতা চমকে উঠল একথায়।—কেন? কেন?

—ও এক ধনী ব্যবসায়ীকে বিয়ে করেছিল জানেন? লোকটা ছিল দারুণ মাতাল।

—শুনেছিলাম। কী যেন স্ক্যান্ডালও ছিল ওর নামে।

—পরে স্বামীর বয়স ও মাতলামির অজুহাতে ও ডিভোর্স করেছিল তাকে।

সবিতা মুখ টিপে হাসল মাত্র। অথচ তার চোখে একটা তীব্র অনুসন্ধান খেলেছিল। সে যেন আমার মুখে তপতীর কোন প্রতিশ্রুতি খুঁজছিল। প্রতিশ্রুতি—তা তো ছিলই। খুবই সতেজ টাটকা প্রতিশ্রুতি।

আর অবিনাশ আমার সঙ্গে মারামারি করবে না এটা নিশ্চিত হয়ে গেল। আমার শ্বাসনলী টিপে ধরবে না মধ্যরাতে তার ঘরে। আমাকেও বেঁধাতে হবে না তার চিবুকে পেন্সিলকাটা ছুরি। পুরো তিনটি বছর পরে বয়স্ক হাঙরটা ফের একবার সামনে এসেই দূরে সরে গেল ভিন্ন সমুদ্রের দিকে।

এখন সামনে আমার প্রিয় সাঁতারু রুপোলী মাছ। আমরা নিরুদ্বেগ।

তারপর সকালে অবিনাশের ছেঁড়া ত্রিপলঢাকা মড়াটা যখন জংশনের লোকেদের সঙ্গে আমিও দেখছিলুম, কাঁধের কাছে কার উষ্ণ নিশ্বাস লাগতেই মুখ ফিরিয়ে আঁতকে উঠি। দুপা পিছিয়ে যাই। আরে, আরে, অবিনাশ আমার মতই সোল্লাসে ঝুঁকে নিজের থ্যাতলানো মড়া দেখছে! চোখ কচলে তাকাই। সেই ছুরিবেঁধানো চিবুক আর ধূসর নিস্তেজ গাংফড়িংয়ের মত অবস্থিতি, সেই নির্বিকার নিষ্পলক দৃষ্টিপাত দেখতে পাই। অবিনাশ একমনে অবিনাশকে দেখতে থাকে। আমি ভয় পেয়ে দ্রুত সরে যাই। ট্রেনের দরজায় হাতল হাতড়ায় আমার অস্থির আঙুল। বুঝতে পারি, সাঁতারু রুপোলী মাছ আড়াল করে সেই বয়স্ক হাঙর আমার সামনে অবিনশ্বর। আমার সকল আশা ওই প্রতিচ্ছবির বর্ণময় প্রগাঢ় মৃত্যুতে সমর্পিত।

সুলেখা প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

(সারা ভারত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য)

বিষয় :

ভারতের জাতীয় সংহতি

এই একই বিষয়ে বাংলা, হিন্দী ও ইংরাজী ভাষায় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইবে।

বিচারকমণ্ডলীর সভাপতি

ইংরাজী : অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য, এম. এস, সি

বাংলা : অধ্যাপক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

হিন্দী : অধ্যাপক কে. এম. লোড়া, কলঃ বিশ্ববিদ্যালয়

প্রতিযোগিতার জন্য প্রবন্ধ দাখিল করিবার শেষ তারিখ ১৪ই এপ্রিল, ১৯৬৮। কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

প্রথম পুরস্কার : উপরোক্ত প্রতিটি ভাষায় : একটি স্বর্ণ পদক, প্রতি মাসে ১৬ টাকা করিয়া এক বৎসর স্টাইপেন্ড ও ৫০ টাকার বই।

দ্বিতীয় পুরস্কার উপরোক্ত প্রতিটি ভাষায় : একটি স্বর্ণখচিত রৌপ্য পদক প্রতি মাসে ১২ টাকা করিয়া এক বৎসর স্টাইপেন্ড ও ৩০ টাকা মূল্যের বই।

তৃতীয় পুরস্কার : উপরোক্ত প্রতিটি ভাষায় : একটি রৌপ্য পদক প্রতি মাসে ৮ টাকা করিয়া এক বৎসরের জন্য স্টাইপেন্ড ও ২০ টাকা মূল্যের বই।

এতদ্ব্যতীত প্রতিটি ভাষায় আতিরিক্ত দশটি করিয়া যোগ্যতানুযায়ী সার্টিফিকেট অব মেরিট (প্রশংসাপত্র) ও ২৫ টাকা নগদ পুরস্কার দেওয়া হইবে।

বিশদ বিবরণ ও এনরোলমেন্ট ফরমের জন্য লিখুন :

সম্পাদক

সুলেখা প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা কমিটি

সুলেখা পার্ক, কলিকাতা—৩২



শতবর্ষের আলোয়-আলোয়

অমৃতবাজার পত্রিকা

সূর্য গ্রহণের ছায়ামণ্ডল

পুলকেশ দে-সরকার

অমৃতবাজার পত্রিকা প্রথমাবধি জনসাধারণের মুখপত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, আজকাল যাকে দলীয় মুখপত্র বলা হয় তেমন তো নয়ই, কোন একটা বিশেষ স্বার্থেরও নয়। ভারতের মূক জনসাধারণের বৃহত্তম স্বার্থ সাধারণভাবে মানবিক স্বার্থেরই অবিচ্ছেদ অংশ, এখানে নিপীড়ক ও শোষকেরাই ছিল নিন্দনীয়, নতুবা সত্যি কোন জাতিদ্বেষ ছিল না। পরাধীন ভারতকে বিদেশী শাসন-শোষণমুক্ত করতে হবে—এই লক্ষ্য, এজন্য কেবল বিদেশী শোষকের নিন্দা নয়, নির্বীর্য উদাসীন এদেশী শোষিতদের তিরস্কারেও কোন কার্পণ্য বা কুণ্ঠা ছিল না।

কিন্তু প্রথমাবধিই অমৃতবাজার পত্রিকা চাইছিলেন একটি গণসংগঠনও গড়ে উঠুক—কোন একটি রাজনৈতিক সভা, যেখান থেকে ইংরাজদের পাল্টা জবাব হিসেবে এদেশীয়দেরও মর্মকথা উচ্চারিত হতে পারে।

১৮৬৮ খৃস্টাব্দে যখন "জাতি-ঐক্যতা" বা "সিবিল সার্বিস পরীক্ষা" সংক্রান্ত প্রবন্ধ লেখেন তখন অমৃতবাজার পত্রিকার লেখকচিত্তে এই আকুতিই বার বার উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। তখন উল্লেখ করবার মত একটি মাত্রই সংগঠন ছিল, তার নাম "ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান সভা" বা British Indian Association। কিন্তু এর কর্মতৎপরতা অমৃতবাজার পত্রিকা যথেষ্ট কার্যকর মনে করতে পারছিলেন না, সম্প্রদায়নির্বিশেষে এটি সমষ্টিগত স্বার্থের প্রতিনিধিস্থানীয় নয় বলেই নয়, এটি তেমন কর্মপটু ছিল বলেও পত্রিকা মনে করতেন না। এই কারণেই লিখেছেন :

"ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান সভা আমাদের সকল বল, সকল ভরসা কিন্তু দুরদৃষ্টক্রমে আমরা যেমন আমাদের তেমনি সভা। কোন কর্তব্যকর্মে ইহাদের প্রায়ই উৎসাহ নাই, বিশেষতঃ যেখানে স্বার্থের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ না থাকে।"

শুধু তাই নয়। এই প্রসঙ্গেই পত্রিকা বলেছেন, "কেহ কেহ দুটি একটি ভাঁড়ামির দ্বারা রায়বাহাদুর পাইয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন কিন্তু বাহাদুরির কার্য যাহা তাহাতে অগ্রসর হওয়া রায়বাহাদুরদিগের উচিত।"

এখানেই স্বার্থপরতাটুকু পরিস্ফুট, এতে কোন এক ব্যক্তি-মাহাত্ম্য অবশ্যই বিকশিত বা প্রকাশিত হয় কিন্তু সর্বসাধারণের অবস্থা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকে। সমষ্টিকে নিয়ে না চলতে পারলে ব্যক্তি-মাহাত্ম্যও ব্যর্থ হয়ে যায়। এ মাহাত্ম্য চিরভাস্বর রাখতে গেলে তার সবাইকেও মহত্ত্বে উন্নত করতে হবে, তার একমাত্র অবলম্বন কোন সভা, রাজনৈতিক সাহিত্যিক অথবা ধর্মীয়—যাই হোক। তবে একালের মহিমায় যখন রাজনীতিকে এড়িয়ে কোন সংগঠনই সম্ভব নয়, এমন কি উন্নতিও সম্ভব নয়, এই কারণেই পত্রিকা রাজনৈতিক সংগঠনের ওপর জোর দিয়েছেন। রাজশাসনের সমালোচনায় রাজনীতির কথা বলতে হবে এবং সেটি একা নয় অনেকে বলতে হবে। এজন্য একমাত্র পত্র-পত্রিকাই যেমন যথেষ্ট নয়, একমাত্র সংগঠনও তেমন নয়, দুইয়ে মিলিয়ে এক অখন্ড শক্তির সৃষ্টি করতে পারে। তাই বলেছেন,

"সম্পাদকেরা বটে সিবিল সার্বিস, সিবিল সার্বিস বলিয়া চীৎকার করেন, কিন্তু তাঁহাদের গলার শব্দে কি স্বার্থে

বিনিদ্রিত রাজপুরুষগণকে জাগরিত করিতে পারে? যে গাঢ় নিদ্রায় তাঁহারা নিদ্রিত তাহাতে দেশ সমেত জুটিয়া কানের কাছে ঢাক না বাজাইলে তাঁহারা কি শুনিতে পাইবেন?"

বিচ্ছিন্ন একক ক্ষীণ কণ্ঠ নয়, আর যদি একেও বলে তবে যেন তার পেছনে সমবেত কণ্ঠের শক্তি সংযোজিত থাকে। কিন্তু সময়জ্ঞানও অপরিহার্য, যখন তখন চেঁচামেচি করলে তা ব্যর্থ লক্ষ্য হতে বাধ্য, অকারণ বিরক্তিরও উদ্রেক করতে পারে। সময়-নির্বাচনও তাই আন্দোলনের একটি অবিচ্ছেদ্য পর্ব। পত্রিকা তাই সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন :

"এখন পার্লিয়ামেন্টে সিবিল সার্বিস লইয়া গোল হইতেছে। সময় মত যদি তাঁহারা দুটি কথা বলেন তবে কত কাজ হয়। কিন্তু তাঁহারা কৈ কিছুই তো বলেন না!"

তাই পত্রিকা সম্পাদকদের "ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ন সভাকে" এবং "এদেশীয়" লোকেদের একযোগে জোরালো দাবী তুলতে বলেছেন। সাহেবি অত্যাচারের কথা, পক্ষপাতিত্বের কথা তুলতে হবে এবং লক্ষ্য সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত লেগে থাকতে হবে, তখন তা কারও পক্ষেই আর উপেক্ষা করা সম্ভব হবে না। সুতরাং দুইই চাই, সম্পাদক বা পত্রপত্রিকা জাতীয় চৈতন্য ও বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত জনসাধারণের সমষ্টিগত সংস্থা।

কি রকম প্রতিনিধিস্থানীয় সভা হলে জনসাধারণের স্বার্থরক্ষা করা সম্ভব হবে? পত্রিকা প্রথম বৎসর তিন মাসের মধ্যেই তা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন।

"আমরা কয়েকবার প্রতিনিধি সমাজের কথা লিখিয়াছি তাহাই উল্লেখ করিয়া মিরার (ইণ্ডিয়ান মিরার) একটা ভুল করিয়াছেন। মিরার বলেন যে মধ্যবিত্ত ও নিম্নশ্রেণীস্থ লোকের আনুকূল্যার্থে এই সভা সংস্থাপিত হইবে। যাঁহারা সভা প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত কৃতসংকল্প হইয়াছেন তাঁহারা উহাকে সার্বভৌমিক প্রতিনিধি সভা করিবার মনস্থ করিয়াছেন। সুদ্ধ মধ্যম ও নিম্ন শ্রেণীস্থ লোক যে ইহাতে থাকিবেন এরূপ নয়, উত্তম, মধ্যম, অধম সকল প্রকার লোক লইয়া এই সভার সৃষ্টি হইবে। তাঁহারা আরো বলেন যে সুদ্ধ বাংগালার নয়, ভারতবর্ষের প্রায় তাবৎস্থান হইতে যাহাতে প্রতিনিধি আইসে তাহার যোগাড় কতক করিয়াছেন ও করিবেন, এটি প্রকাণ্ড ব্যাপার, ইহা সুসিদ্ধ হইলে ভূমণ্ডলে আমরা একটা জাতি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিব। সুসিদ্ধ হইবার আর কোন বাধা নাই, দশজনে মনে করিলেই হয়।" (১৪ই মে, ১৮৬৮)

আজও দশজন কেন, আটজনেই একটি নিখিল ভারত দল গড়ার কথা ভাবেন, গড়েন, আজ যানবাহনের সুযোগ-সুবিধার জন্যও বটে, পত্র-পত্রিকায় প্রচারের অবকাশের জন্যও বটে এরকম কল্পনা সহজ। কিন্তু ১৮৬৮ খৃস্টাব্দে যখন সমগ্র ভারত বৃটিশ অধীনে আসেনি, এমন একটি ভারতীয় চেতনারও উদ্ভব হয়নি, এমন কি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পরিকল্পনাও হয়নি—তখন এমন একটি বৃহৎ কর্মকাণ্ডের জন্য সক্রিয় হয়ে ওঠা বিস্ময়কর নয়? কেমন সভা? "সার্বভৌমিক প্রতিনিধি সভা" কাদের নিয়ে? "সুদ্ধ মধ্যম ও নিম্নশ্রেণীস্থ লোক" মাত্র নয়, "সকল প্রকার লোক", "ভারতবর্ষের প্রায় তাবৎ স্থান হইতে", "প্রকাণ্ড ব্যাপার"। ১৮৮৫ খৃস্টাব্দে কংগ্রেস সূচনার সতের বছর আগে এমন এক সর্বভারতীয় পরিকল্পনা, সামান্য কথা নয়।

কৃষ্ণদাস পাল সম্পাদিত "হিন্দু পেট্রিয়ট" ছিল সেকালে এক অতি-প্রতিপত্তিশালী সংবাদপত্র এবং বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের মুখপত্র। নতুনতর ও ব্যাপকতর একটি সংস্থা গঠনের সংবাদে এসোসিয়েশন স্বভাবতই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল এবং পেট্রিয়টে তাই-ই প্রতিফলিত হয়েছিল।

"পেট্রিয়ট এই সভার কথা শুনিয়া ব্যস্তসমস্ত হইয়া সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশন সকল শ্রেণীর লোকের নিমিত্ত, সুদ্ধ জমিদারদিগের নিমিত্ত নহে। ইহা দেশ সমেত লোক, এমন কি গবর্ণমেন্ট পর্যন্ত কেহই বিশ্বাস করেন না। ফল ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশনে যে মাসিক চাঁদা নির্ধারিত আছে তাহা দিতে জমিদারগণ ব্যতীত সকলের সাধ্য নাই। যাহা হউক এ সম্বন্ধে আমাদের যাহা কিছু বলিবার আছে পরে লিখিব ভারতবর্ষীয় সভার সভ্যেরা অনেকে যাহাতে এ সভার সৃষ্টি না হয় তাহার চেষ্টা পাইতেছেন। তাঁহারা বলেন (মনে মনে কি ভাবেন তাঁহারা জানেন) যে এদেশের যাহা কিছু মুখপাত্র তাহা তাঁহারা, এমতস্থলে এরূপ সভা করিলে তাঁহাদের বলের হানি হইয়া প্রকারান্তরে দেশের অমংগল ঘটিবে। এটা বোধ হয় ভুল। যদি উভয় সভা একমত হইয়া চলেন তবে যে বলের বৃদ্ধি হইবে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। আর একমত না হইয়া যদি পরস্পরে ঘোরতর বিবাদ হয় তবু আমাদের রাজনৈতিক শক্তি প্রবল বেগে বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। রাজনৈতিক দুই দলে পরস্পর সংঘাত হইলে যে অগ্নির উৎপত্তি হয় তাহাতে দূষিত বায়ু পরিষ্কৃত হইয়া নূতন জীবন প্রদান করে।" (১৪ মে, ১৮৬৮)

গণতন্ত্রের ধারণা সেকালে যথেষ্ট সঞ্চারিত হয়নি, আজই যে হয়েছে একথাও সম্পূর্ণ বাস্তব-ভিত্তিক নয়; কিন্তু সেকালে অমৃতবাজার পত্রিকা কেবল এই "প্রতিনিধি সভার" প্রস্তাবে নয়, পরবর্তী বহু প্রবন্ধে গণতন্ত্রের আইডিয়া নির্ভুল প্রকাশ করেছেন। বিরোধ সর্বদা বা সর্বথা অবাঞ্ছনীয় নয়, বিজ্ঞানও তাই বলে এবং ন্যায়শাস্ত্রের মূলকথাও তাই। ইংরাজ শাসনের বিরোধিতা করতে গিয়েও পত্রিকা পরবর্তীকালে বার বার বলেছেন যে, এদেশের সংবাদপত্র বৃটিশ গণতন্ত্রের অপরিহার্য বিরোধী পক্ষের ভূমিকা নিয়ে চলেছে, বিরোধ বিতর্কে যে উত্তাপ তাতে বহু প্রশ্নের কাঠিন্য দ্রবীভূত হয়, এবং এইভাবেই কোন একটি সমন্বয়ে পৌঁছোনো সম্ভব। গণতন্ত্রে একাধিক দল একে অপরের পরিপূরক, সুতরাং বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের পাশাপাশি আর একটি সভা বা সমিতির উদ্ভব যদি হয়েই তবে তাতে অকল্যাণ নেই। কোন একটি সংস্থার মধ্যে সর্বজনীন স্বার্থ প্রতিফলিত নাও হতে পারে একাধিক সংস্থার বিরোধ-সহযোগিতায় একটা সামগ্রিক স্বার্থের চেহারা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। অমৃতবাজার পত্রিকা সেকালেও এই বাস্তব ও বৈজ্ঞানিক কথাটিই যথাযথ বলতে পেরেছেন এই তার বৈশিষ্ট্য।

এইভাবে ক্রমশঃ একটির পর একটি প্রবন্ধ ও নিবন্ধের মধ্য দিয়ে অমৃতবাজার পত্রিকার রাজনৈতিক ধ্যানধারণা এক বিশেষ রূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে থাকে। শুধু রূপ মাত্র নয় একে জীবন্ত ও গতিশীল করবার জন্য সংগঠন ও সংস্থার কথাও যখন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে তখন প্রতিষ্ঠাবান এদেশীয় ব্যক্তি ও মর্যাদাভিমানী রাজপুরুষেরা উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠতে লাগলেন। অমৃতবাজার পত্রিকার সামাজিক প্রশ্নগুলোও ছিল এমন যে অচলায়তন সমাজের কপালেও কুঞ্চিত রেখার সৃষ্টি করে চলেছিল। এমনি এক প্রতিকূল পরিবেশের কৃষ্ণমেঘ যখন সঞ্চারিত তখন পত্রিকা তার নির্ভয় গতিমুখে একটি মন্তব্য সংবাদ প্রকাশ করল তার সপ্তদশ সংখ্যায়। তাই থেকে নিদারুণ গোলযোগের সৃষ্টি হয়েছিল। পত্রিকার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের করেছিল সাহেবেরা। সাত মাস এই মামলায় জড়িয়ে থাকতে হয়েছিল, অনেক অর্থব্যয় ছাড়াও প্রেস কর্মচারীসহ পত্রিকা পরিচালকদের নিয়ে টানাহেঁচড়া চলেছে এবং লাঞ্ছনারও সীমা ছিল না। কাগজ প্রায় মাসাবধি বন্ধ রাখতে হয়। মামলা ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত থেকে সেসনে যায়, সেখানে দশদিন শুনানী চলে। অবশেষে রায় বেরোয় প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ বেকসুর অব্যাহতি পান; কেন না, তাঁকে সম্পাদকরূপে প্রতিপন্ন করে আদৌ জড়ানো যায় নি; পত্রিকায় সম্পাদক বলে কারও নাম ছাপাও হ'ত না। যদিও সবাই জানতেন শিশিরকুমার ঘোষই প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক তথাপি আদালতে তা কোনরকমেও প্রমাণিত করা যায়নি, এমন কি, শিশিরকুমারের অনুজ তরুণবয়স্ক মতিলাল ঘোষকে নিদারুণ জেরা করেও এই কথাটি বের করা যায় নি।) মফস্বলে প্রকাশিত একটি গ্রামের পত্রিকা নিয়ে এই যে ক্রিয়াকাণ্ড তা একাধারে উদ্বেগ, উত্তেজনা ও রোমাঞ্চের সৃষ্টি করেছিল।

ঐ মন্তব্য সংবাদটি বেরিয়েছিল ১৮৬৮ খৃস্টাব্দের ১২ই জুন, পত্রিকার সপ্তদশ সংখ্যায়। জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকেই এ নিয়ে যে হুলুস্থুল পড়ে যায় পত্রিকায়ই তার আভাস দেওয়া হয়; কিন্তু বিস্তারিত সংবাদ দেওয়া সম্ভব হয় না। ৩১ ডিসেম্বর থেকে সবিস্তারিত খবর বেরোতে থাকে।

সপ্তদশ সংখ্যায় "ঘোর অত্যাচার" শিরোনামায় যে মন্তব্য বেরোয় তা হচ্ছে :

> "দুই বৎসর গত হইল কোন একজন নিম্নশ্রেণীস্থ ম্যাজিস্ট্রেট বলপূর্বক একটি স্ত্রীলোককে আক্রমণ করিতে যাইতেছিলেন কিন্তু গ্রামস্থ লোকেরা একজুট হইয়া তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ

করিতে দেয় নাই। এ কথাটি দেশময় রাষ্ট্র বলিয়া আমরা প্রকাশ করিলাম যদি গবর্ণমেণ্ট অনুসন্ধান করেন তবে আমরা কিছু কিছু সাহায্য করিতে পারি।"

তখন যশোহরের ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন মিঃ জেমস মনরো। তাঁর সঙ্গে শিশিরকুমারের খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল, পত্রিকা প্রকাশকাল পর্যন্তও. কিন্তু পত্রিকার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সেই ঘনিষ্ঠতা কেটে গিয়ে বৈরীভাবে পরিণত হচ্ছিল. সে কত দ্রুত প্রথম জানা যায় নি; জানা গেল এই ঘটনা উপলক্ষে। মনরো সাহেব এক পত্র লিখলেন- প্রকাশক, সম্পাদক ও অধ্যক্ষের নামে জানতে চাইলেন, কে এই 'প্রস্তাবের' লেখক। সেকালেও সাংবাদিকতার সুস্থ রীতি অনুসারে পত্রিকা থেকে তাঁকে কোন নাম-ধাম দেওয়া হল না. কিন্তু জানানো হল কোথায় কোথায় তিনি এই সংবাদের যাথার্থ্য যাচাই করতে পারবেন। তাতে অবশ্য পত্রিকার বিরুদ্ধে মামলা আটকায় নি।

এই মূল মামলার সঙ্গে আর একটি আনুষঙ্গিক মামলাও ছিল। কেননা ঐ প্রথম প্রস্তাবের পর ঊনবিংশ সংখ্যায় "পাঠকগণের প্রতি" নামে আর একটি "প্রস্তাবও" প্রকাশিত হয়। তা নিয়ে পত্রলেখকের নামে মামলা হয়।

এই মামলা সম্পর্কে অনেকেই অনেক কথা লিখেছেন, সে সব কথার মধ্যে সর্বত্র সংগতিও খুঁজে পাওয়া যায় না এবং সকল তথ্যও সঠিক তারিখ মতো উদ্ধার করা যায় না। কিন্তু পত্রিকার শত বৎসরের জীবনে একেবারে শৈশবকালের এই ঘটনাটি এতই তাৎপর্যপূর্ণ যে সে সব কাহিনীও একত্রে গ্রথিত করা কর্তব্য ও আবশ্যক মনে করি।

মনরোর সঙ্গে শিশিরকুমারের কি রকম ঘনিষ্ঠতা ছিল তার কৌতুককর দৃষ্টান্ত দিয়ে কবি নবীনচন্দ্র তাঁর আত্মজীবনীতে এই সম্পর্কে লিখেছেন :

কিন্তু শাস্ত্র বলেন,—'বিশ্বাসো নৈব কর্তব্য : স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ।' 'অতি' সবই মন্দ। অতি-বন্ধুতায় ইদানীং বিষোৎপন্ন হইয়াছে। অমৃতবাজারের এক সংখ্যায় 'ঘোরতর অত্যাচার' নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাতে লেখা থাকে যে, কোনও সবডিভিসনাল অফিসার একটি সাক্ষীর সতীত্ব নষ্ট করিয়াছেন, এবং অন্য প্রবন্ধে প্রকাশিত হয় যে তিনি উপদংশ রোগগ্রস্ত হইয়াছেন। ফৌজদারী হেডক্লার্ক রাজকৃষ্ণ মিত্র মেজিষ্ট্রেটকে লিখিয়া পাঠান যে এই দুই প্রবন্ধের লক্ষ্য তাঁহার অধীনস্থ কোন কর্মচারী। সাহেব জিজ্ঞাসা করেন সে কে। রাজকৃষ্ণ বলেন তিনি বলিতে পারেন না। সাহেব সম্পাদককে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। কি—আমার হুকুম অমান্য! শিমুলস্তূপে অগ্নিকণা পড়িল, আর হুহুঙ্কার শব্দে সাহেবের ক্রোধানল জ্বলিয়া উঠিল। তিনি লিখিলেন. দশ মিনিটের মধ্যে রাজকৃষ্ণের উত্তর দিতে হইবে। তাহার পর পাঁচ মিনিট। তাহার পর দুই মিনিট। কিন্তু রাজকৃষ্ণ উত্তর দিলেন না। তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ কর্ম হইতে সাসপেন্ড করিয়া তিনি শিশিরকুমারকে পত্র লিখিলেন। শিশিরকুমার লিখিলেন যে প্রবন্ধে যাহা আছে তাহার অতিরিক্ত তিনি আর কিছু বলিতে বাধ্য নন। এবার সাহেবের ক্রোধ দাবানলে পরিণত হইল। তিনি তখন অমৃতবাজারের সম্পাদক বা সম্পাদকগণ, মুদ্রাকর বা মুদ্রাকরগণ, প্রকাশক বা প্রকাশকগণের নামে যথাশাস্ত্র এক 'অফিফিয়াল' পত্র কাড়িলেন। শিশিরকুমার এ পত্রেরও ঐরূপ উত্তর দিলেন। তখন সাহেব চুপ করিয়া থাকিলে কেহ তাঁহার দোষ দিত না। কিন্তু তিনি সেরূপ পাত্র নহেন। বিধাতার নীতি টলিতে পারে, কিন্তু তাঁহার হুকুম টলিবে না। তাঁহার হুকুম যতই অসংগত ও নীতিবিরুদ্ধ হউক না. তাহার একটি অক্ষর যে পালন না করিবে. সে যতই তাঁহার বন্ধু হউক না, যতই নির্দোষী হউক না. তিনি তাহার সর্বনাশ না করিয়া ছাড়িবেন না। তিনি তখন তদন্ত করিয়া জানিলেন যে উক্ত প্রবন্ধদ্বয়ের লক্ষ্য ঝিনাইদহের সব ডিভিসনাল অফিসার রাইট (Wright) সাহেব। তখন উহার দ্বারা শিশিরকুমার ঘোষ রাজকৃষ্ণ মিত্র এবং একজন প্রিন্টারের নামে অপবাদ বা 'লাইবেল' অভিযোগ উপস্থিত হইল। যশোহরে একটা হুলুস্থুল পড়িয়া গেল, যেন একটা খন্ড প্রলয় হইয়াছে। এ সময়ে আমি সশরীরে যশোহরে ধর্মাবতারের সিংহাসন আরোহণ করি।" (নবীনচন্দ্র রচনাবলী, 'আমার জীবন', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১ম খন্ড)

অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রথম এই সংবাদটুকু বেরোয় :

"১৭শ সংখ্যক পত্রিকায় যে ঘোর অত্যাচারের কথা উল্লেখ করা হয় তাহা লইয়া যশোহরে মহা গন্ডগোল উপস্থিত হইয়াছে। এ বিষয় আমরা এক্ষণে কিছু লিখিব না. পাঠকবর্গ অধৈর্য হইবেন না, সময় হইলেই আমরা তাহাদিগকে সমুদয় জ্ঞাপন করিব। যাহা হউক এ ডিভিসনের কমিশনারের প্রজা বাৎসল্যে ও ন্যায়পরতায় এ দেশস্থ তাবল্লোকে তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিতেছেন।' (২৭শে আষাঢ়, ১২৭৫। ৯ই জুলাই ১৮৬৮; বিংশ সংখ্যা)

এর পর ২৩নং সংখ্যায় জানা যায় :

"শ্রীযুক্ত রাইট সাহেবের অপবাদ করা মকদ্দমা বিচার পর্যন্ত ফৌজদারীর হেড ক্লার্ক সাসপেন্ড হওয়াতে পেশকার শ্রীযুক্ত বাবু বরদাপ্রসাদ ভাদুড়ি তাঁহার স্থলে এক্টিন হইয়াছেন।" (১৬ই শ্রাবণ, ১২৭৫; ৩০শে জুলাই. ১৮৬৮; ২৩ সংখ্যা)

অনাথনাথ বসু তাঁর "মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ" পুস্তকে লিখেছেন :

"পত্রিকার ধ্বংস সাধনের জন্য উচ্চপদস্থ রাজ কর্মচারিগণ সুযোগের সন্ধান করিতে লাগিলেন। পত্রিকার সপ্তদশ সংখ্যায় যশোহর জেলার কোন মহকুমার জনৈক য়ুরোপীয় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক একটি স্ত্রীলোকের শ্লীলতাহানি সম্বন্ধে একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট ওকিনিলীর হেড ক্লার্ক বাবু রাজকৃষ্ণ মিত্র ডেপুটির উক্ত কাহিনীটি বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া অমৃতবাজার পত্রিকার অষ্টাদশ সংখ্যায় প্রকাশ করেন। মনরো প্রবন্ধের লেখক কে জানবার জন্য অনুসন্ধান করেন। পত্রিকায় য়ুরোপীয় ম্যাজিস্ট্রেটের নাম অপ্রকাশ থাকিলেও ঝিনাইদহের সব ডিভিসনাল অফিসার রাইট সাহেবের দ্বারা মনরো অমৃতবাজার পত্রিকার পরিচালকগণের বিরুদ্ধে আদালতে এক মোকদ্দমা রুজু করাইলেন। প্রকৃত লেখক কে তাহা স্থির করিতে না পারায় শিশিরকুমারের সহিত পরিবারস্থ সকলকেই আসামী করা হইয়াছিল। মতিলাল ও একজন খুল্লতাতকে মুক্ত দিয়া সাক্ষী শ্রেণীভুক্ত করা হয়। এই মোকদ্দমার ব্যাপার লইয়া দেশের মধ্যে একটা মহা আন্দোলন হইয়াছিল।" (পৃঃ ৫৩)

এই পুস্তকের বিস্তারিত বিবরণে আরও জানা যায়, শিশিরকুমারের অগ্রজ হেমন্তকুমারের কলিকাতা হাইকোর্টে তদ্বিরতদারকের ফলে পত্রিকার প্রতি বৈরীভাবাপন্ন ওকিনিলির হাত থেকে এই মামলার বিচারভার দায়রা জজের ওপর অর্পণ করা হয়। সেখানেও কিছু জটিলতা ছিল। তৎকালীন "দায়রা জজ লফোর্ডও শিশিরকুমারের প্রতি সদয় ছিলেন না।" (পৃঃ ৫৫) তিনি ছুটিতে গেলে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন Mr. Lewis "বাদীপক্ষ প্রস্তুত নহে" এই অজুহাতে কয়েক মাস মকোদ্দমা স্থগিত থাকে। "মিঃ লফোর্ড বিদায় হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া মোকদ্দমা আরম্ভ করিলেন।" (পৃঃ ৫৫) গভর্নমেণ্ট-উকিল দক্ষিণাপ্রসাদ বসু ছিলেন বিপক্ষে এবং ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ ছিলেন পক্ষে। "মনোমোহনের এই সর্বপ্রথম মোকদ্দমা। শিশিরকুমার ঘোষ এক হাজার টাকা জামিনে খালাস ছিলেন।" (পৃঃ ৫৬)

জানা যায়, শিশিরকুমারই যে পত্রিকা-সম্পাদক তা প্রমাণের জন্য মনরোর কাছে শিশিরকুমার কোন কালে যে পত্র লিখেছিলেন তা মনরো আদালতে পেশ করেন। কিন্তু তাতেও কিছু প্রমাণিত হয়নি। (পৃঃ ৫৭) ফলে, " অনেক চেষ্টা করিয়াও শিশির ও তাঁহার সহোদরগণের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া গেল না, বিচারপতি বাধ্য হইয়া তাঁহাদিগকে মুক্তি প্রদান করিলেন।" (৬০) মতিলালের সাক্ষ্যে ব্যারিস্টার মনমোহন ঘোষ এমনই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, তিনি মন্তব্য করেছিলেন, এ মতির জুড়ি পাওয়া ভার। (পৃঃ ঐ)

"শিশিরকুমারের মোকদ্দমায় জয়লাভের সংবাদ ক্রমে ভারতবর্ষে প্রচারিত হইল। শিশিরকুমার এই মোকদ্দমায় একরূপ সর্বস্বান্ত হইয়াছিলেন; মোকদ্দমার পর হইতেই পত্রিকার গ্রাহক-সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পায়।" (ঐ, পৃঃ ৬১)

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

অনুবাদ প্রসঙ্গ

সংবাদপত্রের রিপোর্টে দেখা গেল যে একটি লেখক সমবায় গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তাঁরা বাংলা গ্রন্থের ইংরাজী বা অন্য ভাষায় অনুবাদ এবং ইংরাজী বা অন্য কোন বিদেশী ভাষার রচনাকে ভাষান্তর-করণের ব্যবস্থা করবেন। উত্তম প্রস্তাব সন্দেহ নেই। আমরা নিজেদের সাহিত্য-সম্পদ নিয়ে গর্ব অনুভব করি কিন্তু বিদেশীদের কাছে নিজেদের সাহিত্যকীর্তি প্রচারে তেমন উৎসাহী নই। বিক্ষিপ্ত ধারায় কিছু কিছু প্রচেষ্টা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে সুরু করে অতি সাম্প্রতিক-কালের লেখকদেরও রচনা অনূদিত হয়েছে। ইংরাজী এবং হিন্দি ভাষার মাধ্যমে কিছু কিছু বাংলা রচনা বোম্বাই অঞ্চলের সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়েছে, এ ছাড়া যিনি যখন সুযোগ পেয়েছেন তিনি তখনই তাঁর এবং তাঁর পছন্দসই গোষ্ঠীর রচনার অনুবাদ প্রচার করার চেষ্টা করেছেন।

এলোপাথাড়ি ভঙ্গীতে বাংলা রচনার অনুবাদ হয়েছে। বাংলা গল্পের অনেকগুলি ইংরাজী সংকলন হয়েছে এবং সেই কাজ সুরু হয়েছে চল্লিশের দশক থেকে। লীলা রায়, নীলিমা দেবী, লীলা মজুমদার, অধ্যাপক হীরেন মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক বাংলা গল্প ও উপন্যাসের উত্তম অনুবাদ করেছেন। সুধীন্দ্র দত্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, সমর সেন প্রভৃতি কবিরা স্বরচিত কবিতার অনুবাদ করেছেন, ডাঃ শিশির চট্টোপাধ্যায় 'সংকালের কবিতা' এবং চিদানন্দ দাশগুপ্ত 'জীবনানন্দের কবিতা'র সার্থক অনুবাদ করেছেন।

সম্প্রতি আশিস সান্যাল সম্পাদিত 'বেঙ্গলী লিটারেচার' পত্রিকায় একটি সুপরিকল্পিত অনুবাদ নীতি গৃহীত হয়েছে এবং 'বেঙ্গলী লিটারেচার' ইতিমধ্যেই এযুগের অনেক কবির কবিতার অনুবাদ প্রকাশ করেছেন।

বিদেশী কবিতা বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে প্রচুর। এলিঅট, শার্ল বদলেয়র লরেন্স, পল এলুয়ার, সাঁ জ পার্স, মায়কোভস্কী, ইভসেতুংকো, রবার্ট ফ্রস্ট ল্যাংসটন হিউজেস প্রভৃতি কবিদের প্রচুর কবিতা সাম্প্রতিককালে বাংলায় অনূদিত হয়েছে। হুইটম্যান হাইনে সেকসপীয়র প্রভৃতির কবিতাও স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে প্রচুর পরিমাণে অনূদিত হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত একদিন প্রচুর বিদেশী কবিতা অনুবাদ করে সমকালীনদের অনুবাদে অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বিদেশী সাহিত্য থেকে বঙ্গানুবাদ করার কাজে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। উপযুক্ত গ্রন্থ বা রচনা ছাড়াও সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় ছড়ানো অনেক মূল্যবান রচনা তিনি শান্তি নিকেতনের ছাত্রদের দিয়ে অনুবাদ করাতেন এবং স্বয়ং তা সংশোধন করে দিতেন।

ঠাকুরবাড়ির নেতৃত্বে যে অনুবাদকর্ম বিশেষ উৎসাহ লাভ করেছিল তার প্রমাণ ছড়ানো আছে পুরাতন 'ভারতী'র পৃষ্ঠায়। টলস্টয় বাংলায় অনূদিত হয়েছেন ষাট বছর আগে, তুর্গেনভ, মপাসা, বালজাক, ডুমা, চেখভ, প্রসপার মেরিমে, আনাতোল ফ্রাঁস প্রভৃতি বাঙালীর ঘরে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন অনেক বছর আগে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ফরাসী থেকে যেমন অসংখ্য সাহিত্য-সম্পদ অনুবাদ করেছেন, তেমনই আবার সংস্কৃত কবিদের নাটক ও কাব্য এবং লোকমান্য তিলকের মারাঠী ভাষায় রচিত গীতাও অনুবাদ করেছেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা অনুবাদের একটি অবিস্মরণীয় নাম। অনুবাদকের কাজ মিশনারীর কাজ। কোনো দিকে না তাকিয়ে কোনো প্রত্যাশা না রেখে তাঁকে অনুবাদ করতে হয় পরের ধনে পোদ্দারী করার ফলে সাহিত্যজগতে তাঁর আসন কুলীন সমাজে নয়, তিনি ব্রাত্য। মৌলিক রচনার কৃতিত্বের অধিকারী নন বলে তাঁকে কিঞ্চিৎ হীনদৃষ্টিতেই দেখা হয়। কিন্তু এজরা পাউন্ডের মত অনুবাদকদের ভুললে চলে না। এজরা পাউন্ড অনুবাদ করতে বসে অনেক ক্ষেত্রে মূল রচনার খোল-নলচে পালটে যা দাঁড় করিয়েছেন তা সাহিত্যিক সমাজে সম্মানের আসন লাভ করেছে।

বাঙালী অনুবাদকদের মধ্যে 'কল্লোল যুগে'র নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় শুধু অনুবাদ করে গেছেন, আর প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার বুদ্ধদেব, প্রবোধ সান্যাল প্রভৃতি সকলেই বিখ্যাত গ্রন্থাবলী অনুবাদ করেছেন।

অনুবাদকে জনপ্রিয় করেছিলেন কল্লোলের কালের সাহিত্যিকরা।

তবে একটি ইতালীয় প্রবন্ধ এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়—

"traddutore traditore—"

অর্থাৎ অনুবাদকরা বিশ্বাসঘাতক। কথাটি কটু এবং কঠোর তবে কিছুটা সত্যও বটে।

অনুবাদকরা যদি বিশ্বাসঘাতক হন তাহলেও তাঁরা একেবারে বর্জনীয় নন তাঁদের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। খুব কম সংখ্যক দুই বা ততোধিক ভাষার অধিকারী। বিদেশী সাহিত্য বিদেশী ভাষায় পাঠ করে তার যথার্থ মর্মগ্রহণের বিদ্যা অল্প লোকেরই আছে, তাই সেই বিদেশী সাহিত্য সম্পদ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত না থেকে অন্য কোনো উপায়ে আমাদের মর্মলোকে তার অনুপ্রবেশ প্রয়োজনীয়।

বৈজ্ঞানিক বা কারিগরি বিষয়ক গ্রন্থের অনুবাদ না হলে তেমন ক্ষতি নেই, কারণ, নিজস্ব প্রয়োজনে পাঠককে সেই সব গ্রন্থ পাঠ করতেই হবে, পড়াটা সেখানে আবশ্যিক, ঐচ্ছিক নয়। এ ছাড়া বিজ্ঞানের একটা নিজস্ব আন্তর্জাতিক ভাষা আছে। এই সব গ্রন্থের অনুবাদক সহজেই তথ্যানুবাদ করে দিতে পারেন। কিন্তু সাহিত্য তা হয় না। মূল গ্রন্থের অতি-সূক্ষ্ম রস অনুবাদককে ভাষান্তরকালে তাঁর পাঠকদের সামনে ধরতে হবে।

যে কথা পূর্বে বলেছি সেই কথাই আবার বলতে বাধ্য হচ্ছি যে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অনুবাদকর্মকে হ্যাক-ওয়ার্ক বলে ধরা হয়েছে অনুবাদ যাঁরা করেন তাঁরাও 'হ্যাক'। কিন্তু অনুবাদকর্ম সহজ নয় অতিশয় উচ্চস্তরের সততা এবং কল্পনা-কুশলতা থাকলে তবেই সার্থক অনুবাদক হওয়া যায়। আর সেই কর্ম সম্পাদনে একটি মোটা রকমের ডিকসনারী হাতের কাছে থাকলে সেটুকুই যথেষ্ট হাতিয়ার নয়।

এ কথা স্বীকার করতে হয় যে বর্তমানের পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনেক ভালো এবং অনেক শক্তিমান লেখক অনুবাদকর্মকে হীনকর্ম বলে মনে করেন না কিন্তু এই বিভাগে অনেক অযোগ্য ভাগ্যান্বেষীর ভীড় হওয়ায় কিঞ্চিৎ আতংকের সৃষ্টি হয়েছে। এ ছাড়া কয়েকটি বিদেশী দূতাবাসের অর্থানুকূল্যে অনেক অযোগ্য অনুবাদক দিয়ে বিশিষ্ট গ্রন্থকারের গ্রন্থাবলী অনুবাদ করানোর ফলে, সাধারণ পাঠকের অনুবাদে অশ্রদ্ধা জন্মেছে। আলেকজান্দার ডুমার উপন্যাসের নাকি উপযুক্ত অনুবাদ পাওয়া যায় না।

'থ্রি মাসকেটিয়ার্স' যৌবনে পাঠ করেন নি এমন মানুষ কম আছেন। কিন্তু সেই উপন্যাসের বীরপুঙ্গবরা পরস্পরকে 'মাই ডীয়ার' বা 'মাই ওলড' বলে সম্বোধন করছেন কেন। অনুবাদক ডিকসনারীতে "mon" এবং "cher" কথাটির অর্থ দেখে সোজাসুজি তাই বসিয়ে গেছেন।

আদর্শ অনুবাদককে অসম্ভবকে সম্ভব করতে হয়, মূল গ্রন্থের আবহাওয়াকে নিজস্ব মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করতে হয়, দুটি ভাষা বিভিন্ন, ভাব বিভিন্ন। সামাজিক পরিবেশ বিভিন্ন। সেই সমাজকে তুলে এনে স্বদেশী পাঠকের চোখের ওপর ধরতে হয়।

—অভয়-কর

ভারতীয় সাহিত্য

মধুসূদনের জন্মদিবস অনুষ্ঠান ॥

গত ২৪ জানুয়ারী আচার্য জগদীশ বসু রোডে মাইকেল মধুসূদনের সমাধি-ক্ষেত্রের সামনে তাঁর জন্মদিবস উদ্‌যাপিত হয়। এই জন্মদিবস অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান। কলকাতার মেয়র, নাগরিকরা এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে কবির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন কলকাতার মেয়র শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দে। তিনি বলেন, "কবি মাইকেল মধুসূদন কাব্যজগতে এক বিপ্লব এনেছেন। কবি ছিলেন প্রকৃত বাঙালী।" মেয়র কবির মৃত্যু শতবার্ষিকী পালনের প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি প্রার্থনা করেন, "বাংলা দেশের মনকে মধুহীন করো না মা। বাংলাদেশের গৌরবকে সুপ্রতিষ্ঠিত কর।"

কাউন্সিলর শ্রীমুকুর সর্বাধিকারী বলেন, "কবির স্মরণে তাঁর কাব্য, নাটক ও সাহিত্যকে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতে হবে।" শ্রীপঙ্কুগোপাল দত্ত বলেন, "কবি ছিলেন ইউরোপীয় সংস্কৃতির ভারতীয় কলম্বস।"

সভায় কাউন্সিলর শ্রীবিমান মিত্র মাইকেল স্মৃতিরক্ষা কমিটি ও নাগরিকদের পক্ষ থেকে স্বর্গত মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের পরিকল্পনা অনুযায়ী সমাধিক্ষেত্রটি পুনর্বিন্যাস করবার এক প্রস্তাব দেন। তিনি সমাধিক্ষেত্রের পাশে পৌরসভার জমিতে একটি লাইব্রেরী গঠনেরও দাবী করেন। পৌর কমিশনার শ্রীদুলালচন্দ্র মুখার্জি প্রস্তাব দেন, কবি আলিপুরের যে হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন, সেখানে তাঁর নামে একটি ওয়ার্ড করা হোক।

সভায় ডেপুটি মেয়র শ্রী শিবকুমার খান্না, শ্রীহেমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ কে পি ঘোষ, শ্রীসোমনাথ মুখার্জি, শ্রীপান্নালাল দাস প্রমুখও ভাষণ দেন। কলকাতা পৌরসভার এই প্রচেষ্টার জন্য তাঁরা সকলের অভিনন্দন লাভ করবে বলে আশা করি।

হিন্দী কবির পরলোকগমন ॥

প্রখ্যাত হিন্দি কবি শ্রীমাখনলাল চতুর্বেদী গত জানুয়ারী ভূপালে পরলোকগমন করেছেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরেই রোগে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী ছিলেন। হিন্দি সাহিত্যে তাঁর অবদানের জন্য তিনি পদ্মভূষণ উপাধিতে ভূষিত হন। কিন্তু গতবছর সরকারী ভাষাবিলের প্রতিবাদে তিনি তা পরিত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুতে হিন্দি সাহিত্য একজন সুযোগ্য সেবককে হারাল।

জাতীয় পুস্তক মেলা ॥

গত ১৭ই ডিসেম্বর দিল্লিতে 'জাতীয় পুস্তক মেলা' অনুষ্ঠিত হয়। এই মেলার উদ্বোধন করেন ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন। এই মেলায় কয়েকটি আলোচনা সভারও আয়োজন করা হয়েছিল। এর মধ্যে বিশেষ প্রাধান্য পায় 'কপি রাইট', 'পুস্তক সমালোচনা' ইত্যাদি ভারতীয় পুস্তক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত সমস্যাবলী। এইসব আলোচনায় বিভিন্ন পুস্তক ব্যবসায়ী সমালোচক, সাহিত্যপ্রেমী যোগদান করেন। উদ্যোক্তাদের এই প্রচেষ্টা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ডে লুইসের নতুন সম্মান ॥

পোয়েট লরিয়েট হওয়া নিঃসন্দেহেই ব্রিটেনের কবিদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে সেরা সম্মান। দীর্ঘ ৩৭ বছর পোয়েট লরিয়েট থাকবার পর জন মেসফিল্ড যখন গত মে মাসে পরলোক গমন করেন, তখন অনেকেই ভেবেছিলেন ঐ দুর্লভ সম্মানের পদটির বোধহয় বিলোপ হবে। কিন্তু সম্প্রতি তা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। গত ১ জানুয়ারি সিসিল ডে লুইস ব্রিটেনের পোয়েট লরিয়েট হন।



সিসিল ডে লুইস

কবি হিসেবে ডে লুইস আজ বিশ্ববিখ্যাত। আধুনিক কবিতার ইতিহাসে তিনি স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী। শুধু কবিই নন, সাহিত্য সমালোচক ও কবিতার অধ্যাপক হিসেবেও তিনি বিশিষ্ট। বর্তমানে ডে লুইসের বয়স হল ৬৩ বছর।

গোর্কি জন্মশতবার্ষিকী ॥

গোটা পৃথিবী জুড়েই এ বছর উদ্‌যাপিত হচ্ছে ম্যাকসিম গোর্কির জন্মশতবর্ষ উৎসব। আগামী ২৮ মার্চ হল এই মহত্তম লেখকের জন্মশতবার্ষিকী দিবস। এই উপলক্ষে মস্কো থেকে গোর্কির রচনাবলী বিশ্বের নানান ভাষায় অনূদিত হচ্ছে।

মস্কোর প্রগ্রেস পাবলিশিং হাউস ২ খণ্ডে বাংলা, হিন্দী, উর্দু, স্প্যানিশ, আরবি প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত গোর্কি রচনাবলী প্রকাশ করছেন। গোর্কির নির্বাচিত গ্রন্থাবলী ৫ খণ্ডে ইংরেজিতে বেরুচ্ছে। শুধু তাই নয়, সোভিয়েত বিশ্ব-সাহিত্য সংস্থা ৫০ খণ্ডে মূল রুশ ভাষায় গোর্কির এক সুবৃহৎ সমগ্র রচনাবলী প্রকাশ করছে। বলা বাহুল্য এ জাতীয় গ্রন্থাবলী প্রকাশ সোভিয়েতে এই প্রথম হতে যাচ্ছে। সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের অন্যান্য প্রকাশ ভবনগুলিও নিজ নিজ জাতীয় ভাষায় গোর্কির রচনাবলীর অনুবাদ প্রকাশ করছে।

গোর্কি-সাহিত্য সম্পর্কে আন্তর্জাতিক আলোচনা-চক্র বসাবারও ব্যবস্থা আছে। মস্কোর ক্রেমলিন প্যালেস অব কংগ্রেসে অনুষ্ঠিত হবে 'গোর্কি-ঐতিহ্য ও আধুনিক সাহিত্য', আর্মেনিয়ায় হবে 'গোর্কি ও জাতিসমূহের সাহিত্য' এবং জর্জিয়ায় হবে 'সোভিয়েত ও বিশ্ব ভাষায় গোর্কি সাহিত্যের অনুবাদ' সম্পর্কে আলোচনা। এ ছাড়া ও বিভিন্ন সোভিয়েত রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হবে গোর্কির নাটক। 'মেলোদিয়া' সংস্থা এই মহান লেখকের নাটকের রেকর্ড করা পুরো সেট বের করবে। কিয়েফের দভ্‌চেঙ্কো স্টুডিও এবং মস্কোর মর্সাফিল্ম স্টুডিও গোর্কির গল্প ও উপন্যাসের চলচ্চিত্ররূপ দিতে নিযুক্ত রয়েছে। সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়নসমূহের কেন্দ্রীয় পরিষদ ও সোভিয়েত লেখক ইউনিয়ন যুগ্মভাবে সাহিত্যে ৬টি 'গোর্কি পুরস্কার' ঘোষণা করেছেন। প্রতিটির মূল্য হবে আড়াই হাজার রুবল।

কাফকার চিঠিপত্র ॥

একালের সাহিত্যানুরাগীর কাছে ফ্রান্স কাফকার পরিচয় নতুন করে দেবার কোন দরকার আছে বলে মনে হয় না। সম্প্রতি বেরিয়েছে তাঁর নির্বাচিত পত্রগুচ্ছ। বলাবাহুল্য, এটাই হল কাফকার চিঠিপত্রের প্রথম প্রকাশ, বেরিয়েছে পশ্চিম জার্মানীতে।

বই কেনা সম্পর্কে আলোচনা-সভা ॥

গত ২৬শে নভেম্বর থেকে ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত এনাকুলমে 'সাউদার্ন ল্যাঙ্গুয়েজ বুক ট্রাস্টে'র উদ্যোগে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই আলোচনা সভার উদ্বোধন করেন শ্রীমহম্মদ কোয়া। এছাড়াও অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন শ্রীই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ, শ্রীথাজকি শিভশঙ্কর পিল্লাই ও শ্রীশঙ্কর কুরুপ।

শিশুসাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা সভা ॥

আঞ্চলিক কলেজ শিক্ষা পর্ষদের উদ্যোগে গত নভেম্বরে মহীশূরে শিশু-সাহিত্যের উপর একটি দুদিনব্যাপী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন ভাষী প্রায় এগারজন সাহিত্যিক এই অধিবেশনে যোগদান করেন। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শ্রীশিভরাম কারনাথ।

একটি অসমীয়া কবিতা ॥

অসমীয়া সাহিত্য সভার মুখপত্র "অসমীয়া সাহিত্য সভা পত্রিকার" ২৫তম বর্ষের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। এই সংখ্যাটি বিভিন্ন কারণেই অসমীয়া সাহিত্য ও শিল্প সম্বন্ধে উৎসাহীদের প্রয়োজনীয় বলে মনে হবে। এই সংখ্যাটি প্রখ্যাত অসমীয়া কবি শ্রীঅম্বিকা গিরি চৌধুরীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়েছে। শ্রীমতী নির্মলপ্রভা বরদলুই রচিত "শ্রীঅম্বিকা গিরি চৌধুরীর" উপর প্রবন্ধটি একটি প্রশংসনীয় উদ্যম।

কবিরের রচনার তেলুগু অনুবাদ ॥

সাহিত্য অকাদমীর উদ্যোগে প্রকাশিত 'কবীর রচনাবলীর' একটি তেলুগু অনুবাদ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। হিন্দিতে মূল গ্রন্থটির সম্পাদনা ও ভূমিকা লিখেছিলেন কবি হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী। তেলুগু ভাষায় অনুবাদ করেছেন শ্রী পি নারায়ণ চারালু।

ওড়িশার লেখক নীলকান্ত দাশের পরলোকগমন ॥

ওড়িশার সাহিত্যে নীলকান্ত দাশ একটি উল্লেখযোগ্য নাম। তিনি দীর্ঘদিন সাহিত্য আকাদমীর সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তাঁর রচিত ওড়িশার সাহিত্যের উপর গ্রন্থগুলি বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেছিল। সম্প্রতি তিনি পরলোকগমন করেছেন।



সুশীলকুমার দে

দেশ-বরেণ্য মনীষী ডক্টর সুশীলকুমার দে সম্প্রতি পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল আটাত্তর। অধ্যাপক দে-র জীবনাবসানে বাংলার সাহিত্যাকাশের একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের পতন হল, অস্তমিত হল বৈদগ্ধ্য এবং মনস্বিতার একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়।

কাফকার বয়স তখন ২৯ বছর। বন্ধু ম্যাকস ব্রডের মাধ্যমে একেবারে হঠাৎই পরিচয় হয়ে গেল তাঁর ফেলিসি বয়ারের সঙ্গে। সেটা ১৯১২ সাল। ভালোবেসে ফেললেন তিনি স্বর্ণকেশী এই মহিলাকে। চাইলেন জীবনসঙ্গিনী করতে। কিন্তু চাইলেই সব পাওয়া যায় না। বাধা এলো নিজের কাছ থেকেই। আত্ম বিশ্লেষণে মন দিলেন কাফকা। সাময়িকভাবে পিছু হটলেন। পরে আবার ইচ্ছা জাগল তাঁকে বিয়ে করবেন, কিন্তু এবারেও বাধা এলো। আবিষ্কার করলেন তিনি ক্ষয়রোগে আক্রান্ত। স্যানাটোরিয়ামই হল তাঁর ভবিষ্যৎ আবাস-স্থল। ফেলিসি বয়ার এদিকে বিয়ে করলেন বার্লিনের এক ব্যবসায়ীকে। সেটা ১৯১৯ সাল। পাঁচ বছর আগে তিনি মারা যান নিউইয়র্কে। এখানে ফেলিসি বয়ার অনেকটা হাল্কা হয়েছেন বটে, কিন্তু কাফকার স্মৃতি ভুলতে পারেন নি। তাই বের করলেন তাঁর কাছে লেখা কাফকার প্রায় ৫০০ খানা চিঠি এবং পোস্টকার্ড। সব চিঠিই লেখা হয়েছিল ১৯১২ থেকে ১৯১৭ সালের মধ্যে। বইটির নাম ব্রিফে অন ফেলিসি। ৭৬৮ পৃষ্ঠার এই বিরাট গ্রন্থটি বের করেছেন এস ফিসার ভেরলেগ। সম্পাদনা করেছেন এরিস হেলার এবং জুরগেন বর্ণ।

বিদেশী সাহিত্য

বেস্ট সেলারের আলোকে ॥

সত্যিই কি এরা বেস্ট সেলার? কথাটায় কিছুটা ভ্রান্তি থাকতে পারে, কিন্তু তাই বলে যে এই সব বইয়ের কোনো চাহিদা নেই, সে কথা ঠিক নয়। সেজন্যে বেস্ট সেলার না বলে আলোচ্য গ্রন্থগুলিকে বলা উচিত 'সবচেয়ে বেশি বিক্রিত' রচনা।

সম্প্রতি বেস্ট সেলার গ্রন্থের একটি তালিকা বেরিয়েছে। ১৮৯৫ সাল থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত বেস্ট সেলার গ্রন্থ সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য এখানে সন্নিবেশিত। সম্পাদনা করেছেন পাবলিশার্স উইকলির সম্পাদিকা মিস আলিস প্যায়েনে হ্যাকেট। মিস হ্যাকেটের এই গ্রন্থটি দেখিয়েছে পেপার ব্যাক বইগুলির চাহিদা কতো বেশি এবং এর পাঠক সংখ্যাও অগণ্য। বেস্ট সেলার গ্রন্থের মধ্যে ১৯০৪ সালের 'রেবেকা অফ সানিব্রুক ফার্ম' বইটি এক সময় সত্যি সত্যিই একটি নজির স্থাপন করে। এই গ্রন্থের ১৪ লাখেরও বেশি কপি বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। বর্তমানে এটির নতুন সংস্করণ যন্ত্রস্থ। ফরএভার অ্যাম্বার প্রথম বেরিয়েছিল ১৯৪৪ সালে। এ পর্যন্ত ১,৬৫২,৮৩৭টি কপি বিক্রি হয়েছে। বর্তমানেও এর চাহিদা কম নয়।

পরলোকে ডেভিট স্ট্যাকটন ॥

ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক হিসেবে ডেভিড স্ট্যাকটন মার্কিন দেশে বেশ সুপরিচিত। সম্প্রতি তিনি পরলোকগমন করেন। মৃত্যু-কালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪২ বছর মাত্র। এ পর্যন্ত তিনি ১৩ খানি ইতিহাস-আশ্রিত উপন্যাস লেখেন।

পরলোকে কবি আইভর উইনটার্স ॥

সম্প্রতি ৬৭ বছর বয়স্ক প্রতিষ্ঠিত কবি আইভর উইন্টার্স ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন। কবি হিসেবেই শুধু নয়, সাহিত্য সমালোচক এবং স্ট্যান-ফোর্ড লিটারেচর প্রফেসর হিসেবেও তিনি যথেষ্ট খ্যাতির অধিকারী। সমালোচক হিসেবে তিনি রবার্ট ব্রিজেস এবং টি এস এলিয়টের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। এজরা পাউন্ডের প্রতিও তাঁর দুর্বলতা কম ছিল না।

নতুন বই

জপজী ঃ গুরুনানক বিরচিত। অনুবাদ ঃ সুধীর গুপ্ত। পূর্বাশার প্রাইভেট লিমিটেড। ২২, বিধান সরণি। কলকাতা-৬।

প্রতীচ্যের পন্ডিতরা, মধ্যযুগকে তামিস্র বা তমসাচ্ছন্ন যুগ বলে বর্ণনা করেছেন কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসে মধ্যযুগ হচ্ছে ভক্তিধর্মের প্লাবনের যুগ। এই যুগে ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলে ভক্তিধর্মের যে বন্যা প্রবাহিত হয়েছিল, তাতে মানুষে-মানুষে সকল কৃত্রিম ভেদ বিলুপ্ত হয়েছিল। বাংলাদেশে প্রেমাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁর পরিবারবর্গের আবির্ভাব মধ্য যুগের বাঙ্গালী সংস্কৃতির ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ঘটনা।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের কয়েক বৎসর পূর্বেই শিখ জাতির আদি গুরু ও শিখ-ধর্মের প্রবর্তক নানক পশ্চিম পঞ্জাব প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। এই মধ্যযুগেই ভারত-বর্ষের নানা অঞ্চলে শংকরদেব মাধবদেব জ্ঞানদেব, সুরদাস মীরাবাঈ দাদু, রুইদাস প্রভৃতি সাধক ও সাধিকার আবির্ভাব ঘটেছিল, যাঁরা কুসংস্কার ও লোকাচারের বেড়া ভেঙে সর্ব মানবকে মিলনের মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন।

ভারত-পথিকদের সাধনা ছিল বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যোপলব্ধির সাধনা। রবীন্দ্রনাথ বলেন—'এই ভারত-পথিকেরা যে মিলনের কথা বলেছিলেন, সে মিলন মনুষ্যত্বের সাধনায়, ভেদবুদ্ধির অহংকার থেকে মুক্তি-লাভের সাধনায়।' কিন্তু এই সকল ভারত-পথিকদের মধ্যেও গুরু নানকের পুণ্য চরিত্র-কথা ও বাণী যে রবীন্দ্রনাথের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল, কবির রচনায় তার প্রমাণ আছে। গুরু নানকের মধ্যে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির ত্রিধারা প্রবাহিত হয়েছিল, এই ত্রিবেণী-সঙ্গমে অবগাহন করে তিনি ধন্য হয়েছিলেন। তিনি যে নবধর্মের প্রবর্তন করেছিলেন বাস্তবিক পক্ষে ভারতের সনাতন ধর্মেরই যুগোপযোগী সংস্কৃত রূপ। ভারতবর্ষের যে সকল ধর্মের উদ্ভব হয়েছে একজন প্রতীচ্য মনীষী তাদের ভারত-ধর্ম আখ্যা দিয়েছে। বৌদ্ধ ধর্ম জৈন ধর্ম শিখ ধর্ম প্রভৃতিও সনাতন ধর্মের নানা শাখার ন্যায় ভারত ধর্মেরই অন্তর্গত বলে তাদের মধ্যে একটি মূলগত ঐক্য বিদ্যমান। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সকল ধর্ম-সম্প্রদায় পরস্পরের সম্পর্কে অনেকাংশে অজ্ঞ এবং এই অজ্ঞতা যে আমাদের জাতীয় সংহতির অন্যতম অন্তরায় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অবশ্য, শিখ-ধর্ম ও শিখজাতি সম্পর্কে যে কয়েকজন স্মরণীয় বাঙ্গালী গ্রন্থ বা প্রবন্ধাদি রচনা করেছেন, তাঁরা শুধু বাংলা সাহিত্যকেই পুষ্ট করেন নি, আমাদের মহৎ আদর্শেও অনুপ্রাণিত করেছেন। রজনীকান্ত গুপ্ত, কুমুদিনী মিত্র, শরৎকুমার রায়, যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। আচার্য কেশবচন্দ্রের প্রেরণায় তাঁর জনৈক অনুগামী শিখধর্ম সম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। 'নববিধান ব্রাহ্ম সমাজ' থেকে যে 'শ্লোক-সংগ্রহ' প্রকাশিত হয়েছে, তাতেও শিখ গুরুগণের কয়েকটি প্রসিদ্ধ বাণী ও তাদের অনুবাদ (বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দী) প্রদত্ত হয়েছে। কিন্তু গুরু নানক বিরচিত জপজীর মূলানুগ পদ্যানুবাদ (মূল সহ) এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি।

সম্প্রতি অধ্যাপক শ্রীসুধীর গুপ্ত মহাশয় গুরু নানক-বিরচিত শ্রীজপজী গ্রন্থের মূল ও পদ্যানুবাদ প্রকাশ করে শিখজাতির আদিগুরুর বাণীর সঙ্গে বাঙ্গালী পাঠকের পরিচয় সাধন করেছেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। 'ভূমিকায়' তিনি লিখেছেন—

'ভগবানে ভক্তি, নাম-সংকীর্তন, জীবে-দয়া, মৈত্রী ও করুণার ভাব, সর্ব মানবে সমদৃষ্টি এবং নিরাকার, নিরঞ্জন পরম ব্রহ্মে সর্ব-সমর্পণ গুরু নানকের প্রচারিত শিখধর্মের মূল মন্ত্র।'

গুরু নানক বিরচিত শ্রীজপজী গ্রন্থের মূল মন্ত্রটি এই—

'ওঁকার পুরুষ কর্তা, নির্বৈর, নির্ভয় সৎ,
স্বয়ম্ভূ, শাশ্বত তিনি, তাঁহারে জানার পথ
শ্রীগুরুপ্রসাদের জপ,—নানক তা ধ্যানে জানে
আদি অন্তে তিনি সত্য—
সত্য তিনি বর্তমানে'।

গুরু নানক বলেছেন,—শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি কখনও শ্রীভগবানের কৃপা লাভ করতে পারে না।

'শ্রদ্ধাভক্তি-হীন নর তাঁর কৃপা নাহি পায়,
শ্রেষ্ঠ জন্ম লভিলেও
লোকে তারে ভুলে যায়'।

আবার যাঁরা শ্রদ্ধান্বিত হয়ে তাঁর নাম-গান করেন, তাঁরা অবলীলাক্রমে ভব-সমুদ্র থেকে উত্তীর্ণ হন।

'লভে তাঁর নাম-গানে সত্য পথ অন্ধ জন,
ভব-পারে যায়, যারা করে নাম-সংকীর্তন'।

যাঁরা ধ্যান-যোগী, তাঁরাই আত্ম-দর্শন করেন, বিশুদ্ধ জ্ঞানের দ্বারাই মানুষ মুক্তি লাভে অধিকারী হন, এ কথাও গুরু নানক উদাত্ত ঘোষণা করেছেন।'

গুরু নানক মানুষের ধর্মান্ধতার নিন্দা করেছেন। তাঁর মতে 'নাম বিনা বস্তু নাই এই বিশ্ব-চরাচরে'। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে বলা হয়েছে, তাঁর মহামায়া-প্রভাবে সর্ব জীব বিমোহিত, আর এই মহামায়ার তত্ত্ব মুক্তি-মানের নিকটও দুর্জ্ঞেয় ও দুরধিগম্য। গুরু নানকও বলেন—

'তাঁর মহামায়া-শক্তি পরিমাপ করিবে কে?
কে পাবে উদ্দেশ্য হেথা তাঁর মহামায়া থেকে।
নিরঞ্জন-নিরাকার-নির্দিষ্ট যা তা-ই করো,
বিশ্বস্রষ্টা-প্রভু-কার্যে শুভ
শুদ্ধ পন্থা ধরো'।

নানক বলেন, যাঁরা শ্রেষ্ঠ মানব, তাঁরাও সেই অসীম, অনন্তের সীমা বা অন্ত পান না। জীব অণুচৈতন্য, তাই সে কেমন করে বিভু-চৈতন্যের সম্যক ধারণা করবে? গুরু নানক বলেন—

'নদ-নদী প্রবাহেরা সাগরে মিশায় ধায়,
কি ভাবে জানিবে তারা
কী বিশাল পারাবার'।

শ্রীভগবন আমাদেরই কল্যাণের জন্য আমাদের দুঃখ দান করেন, বৈষ্ণবেরা একেই বলেন দণ্ডানুগ্রহ। গুরু নানকও বলেন—

'কত জনে দুঃখে-দাহে মৃত্যুকল্প হয় হায়,
এ দুঃখ যে তাঁরই দান
এ কথা কি বুঝা যায়'!

অধিকার-বাদ ভারতীয় সাধনার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। গুরু নানকের রচিত 'জপজী'তে এই অধিকার-বাদ স্বীকৃতি লাভ করেছে। গুরু নানক বলেছেন—

'কর্ম-জ্ঞান-ভক্তি—এই তিন পথে তাঁরে-পায়,
অধিকারী-ভেদে দান দেন তিনি এ ধরায়'।

এখানে গুরু নানকের উপর গীতার প্রভাব আমরা লক্ষ্য করি। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি কত উদার ছিল উপরি-উদ্ধৃত পংক্তিদ্বয়ে তাহারও পরিচয় পাওয়া যায়।

অধ্যাপক সুধীর গুপ্ত 'জপজীর' ভূমিকায় গুরু নানক ও গ্রন্থ-সাহেব সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন, তা সংক্ষিপ্ত হলেও সারগর্ভ। শিখজাতির আদিগুরু-রচিত পদাবলীর মূলানুগ প্রকাশ করে অধ্যাপক মহাশয় বাঙ্গালী সংস্কৃতি ও শিখ সংস্কৃতির মধ্যে সেতু-বন্ধন করেছেন। আমরা 'জপজীর' এই সমূল পদ্যানুবাদের বহুল প্রচার কামনা করি।*

—ত্রিপুরাশঙ্কর সেন

অমৃতস্য পুত্রাঃ— (নাটক) রতন ঘোষ, **প্রকাশক ঃ রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, রবীন্দ্র লাইব্রেরী, কলেজ স্ট্রীট, কলি—১২, মূল্য ২-৫০।**

মায়া, মমতা আর প্রেমের উচ্ছলতায় ভরা জীবনের দিন আর রাত্রির আবেগমন্থর মুহূর্তগুলো ছিন্ন করে শিল্পী সনাতন এসে বাসা বেঁধেছে অবহেলিত একটি পার্কের কোণে। হাতে একটি তুলি, ক্যান-



'বিশ্ববিধানের সন্ধানে' (অনুবাদ) গ্রন্থের বিখ্যাত লেখক ডঃ রিচার্ড এন গার্ডনার কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে তাঁর ক্রেতাদের গ্রন্থে স্বাক্ষর দেন এবং তাঁদের সঙ্গে বর্তমান বিশ্বসমস্যা নিয়ে আলোচনা

ভাসের ওপর সে ছবি আঁকে, অদ্ভুত, রহস্যময় সেই ছবির সুগভীর কল্পনায় সে আনতে চায় সংগ্রামক্লান্ত মানুষের অমৃতময় এক রূপ। কিন্তু লোভ, হিংসা, জিঘাংসাবৃত্তি, স্বার্থন্ধতার ঝড় এখানেও উদ্ধত অহংকারে দাপামান। তাই একটি রেখা, একটু রং পেলে যে ছবিটা মহিমময় হয়ে উঠতো, তা অসমাপ্ত হয়ে থাকার বেদনায় যেন গুমরে কেঁদে উঠলো, শিল্পীর জীবনদীপও গেল নিভে। এই ঘটনার প্রেক্ষাপটেই গড়ে উঠেছে শ্রীরতন ঘোষের 'অমৃতস্য পুত্রাঃ'র নাটকীয় সংঘাত। শ্রীঘোষ শিল্পীর এই সাধনার সীমানায় এনেছেন আরো অনেক চরিত্র যারা জীবনযাত্রার এক-একটা বিশেষ দিক উদ্ভাসিত করে তুলেছে, তাদেরই চোখ মেলে দেখে শিল্পী ছবি আঁকার রং খুঁজেছেন। এ'র মধ্যে আছেন জ্ঞানতপস্বী 'অধ্যাপক', যিনি মানুষের অঙ্ক কষার সাধনায় ব্রতী, আদর্শবাদী যুবক 'বিদ্যুৎ', সুন্দরের পূজায় যে জীবন উৎসর্গ করেছে, কুট ক্রুর রমণীমোহন স্বার্থসিদ্ধির জন্য যিনি নৈতিক দিকটা বিসর্জন দিতে একেবারেই দ্বিধা প্রকাশ করেন না, সমাজের চোখে গুণ্ডা সজ্জন, যার স্নিগ্ধ স্বাভাবিক জীবন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে এই সমাজের ক্রুর শাসনে এবং আরো অনেকে। এ'রা সবাই এসেছেন কোন সুপরিকল্পিত কাহিনীর সূত্র ধরে নয়, এসেছেন নাটকের বক্তব্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নিজেদের ভূমিকা প্রতিষ্ঠা করতে। অধ্যাপকেরাই কণ্ঠে নাটকের শেষ মুহূর্তে যে প্রশ্ন ধ্বনিত হয়েছে 'ভগবান, আর কতোকাল', এই প্রশ্নই মনে হয় নাটকের মূল কথা। মানুষ তার সাধনার সিদ্ধির জন্য আর কতোকাল সংগ্রাম করে যাবে, এই প্রশ্নটিই বোধ হয় নাট্যকার তুলে ধরতে চেয়েছেন।

শ্রীরতন ঘোষের 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' কাব্যধর্মী নাটক, কিন্তু সূক্ষ্ম বিচারে এটা রূপক নাটকের পর্যায়ে পড়ে না। না পড়লেও এ নাটক তার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হোতে পেরেছে। সাধারণতঃ দেখা যায় বক্তব্য যেখানে প্রাধান্য পায়, নাটকীয় গতি, চরিত্র ও ঘটনাগত সংঘাত সেখানে প্রায়ই প্রতিহত হয়। কিন্তু আশ্চর্য নৈপুণ্যের সঙ্গে নাট্যকার বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন সংঘাত আর সংঘর্ষের আবর্তের মধ্যে। তাই নাটকটি কখনো নীরস, বক্তব্য ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠেনি। বরং নাটক যতো এগিয়েছে ততোই মুখর হয়ে উঠেছে এর সংঘাত। সংলাপ রচনায় মুন্সিয়ানার পরিচয় রেখেছেন শ্রীঘোষ, এমন কিছু সংলাপ আছে যা সত্যি মুখস্থ করে রাখার মতো। একটি পার্কের সেটেও একদিনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এগিয়েছে এ নাটক, তাই মঞ্চ রূপায়ণের অনেক সুবিধা আছে এতে। ইতিমধ্যে 'শৌভনিক' ও 'রজনীগন্ধা'র শিল্পীগোষ্ঠী এই নাটকের সার্থক অভিনয় করে এর ব্যাপ্তিতে সাহায্য করেছেন।

—সম্পা.

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

কবিতা (১২ সংকলন) সম্পাদক : সুপ্রিয় বাগচী, ডালগিস হাউস, কলকাতা-৪৭ দাম : ত্রিশ পয়সা।

মননশীল কবিতা পত্রিকা 'কবিতা' ইতিমধ্যেই সুনাম অর্জন করেছে। প্রত্যেক সংখ্যাতেই বেশ কয়েকজন প্রতিষ্ঠিত কবির সঙ্গে থাকে নবাগতদের রচনা। বর্তমান সংখ্যাটি এ দিক দিয়ে বিশিষ্টতার দাবি রাখে। এই সংকলনের বেশির ভাগ কবিই একরকম সাহিত্যের ক্ষেত্রে নবাগত। সব লেখাও যে রসোত্তীর্ণ হয়েছে তা বলা যায় না। এ সংখ্যায় লিখেছেন বঙ্কিম মাহাতো, বিজয়কুমার দত্ত, রথীন্দ্র মজুমদার, রাণা চট্টোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে।



তস্যতস্য অথবা সূর্য কাঁদলে সোনা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

হ্যাঁ ঘনরামই সেই আশ্চর্য মানুষ যিনি পিজারোর অভিযানের নীতি বদলাবার মূলে ছিলেন।

কিন্তু পিজারোর সঙ্গে এক জাহাজেই ত তিনি কাপিতান সানসেদোকে নিয়ে কুয়াসাচ্ছন্ন মধ্যরাতে সেভিলের বন্দর ছেড়েছিলেন বেদের সাজে। গোপনে নোঙর তুলে জাহাজ ছাড়ার ফন্দিও তাঁর।

তারপর তিনি গেলেন কোথায়? ১৫৩১-এর জানুয়ারী মাসে পিজারো যখন পানামা থেকে তাঁর তৃতীয় অভিযানে বার হন তখন ঘনরাম আর সানসেদো পিজারোর দল থেকে বাদ পড়েছিলেন কেন?

না বাদ তাঁরা পড়েননি। ঘনরাম কাপিতান সানসেদোকে নিয়ে নিজে থেকেই পিজারোর খাস জাহাজ ছেড়ে পানামায় পৌঁছোবার আগেই সান্তা মার্তায় নেমে গিয়েছিলেন।

সান্তা মার্তায় জাহাজ ভেড়ানো পিজারোর পক্ষে শুভ হয়নি। ১৫৩০-এর জানুয়ারী মাসে সেভিল ছেড়ে সান লুকার-এর চড়া এড়িয়ে ক্যানারী দ্বীপপুঞ্জের গোমেরাতে জাহাজ ধরে তিনি ভাই হার্নান্ডোর জন্যে অপেক্ষা করেন।

কাপিতান সানসেদো সেভিলে জাহাজ নিয়ে লুকিয়ে পালাবার সময় যে-আশ্বাস দিয়েছিলেন তা মিথ্যে হয়নি। পিজারোর ভাই হার্নান্ডো সেভিল কাউন্সিল অফ ইণ্ডিজএর মাতব্বরদের ধোঁকা দিয়ে ঠিকই সেখানে এসে তাঁর সঙ্গে মিলিত হন।

তারপর মহাসাগর নিরাপদে পেরিয়ে তাদের জাহাজ ভেড়ে সান্তা মার্তা বন্দরে। এইখানেই পিজারোর লোকলস্করের মধ্যে অনেকে বিগড়ে যায়। সান্তা মার্তার বাসিন্দারা তাদের বেশ দমিয়ে দেয়। এসব বাসিন্দারাও একদলে এসপানিয়া থেকে সোনাদানা আর ঐশ্বর্যের লোভে পাড়ি দিয়েছিল। তারপর তাদের সব আশায় ছাই পড়েছে। জোয়ার বয়ে যাবার পর ডোবার জঞ্জালের মত তারা আটকে পড়ে আছে এই জলাজঙ্গলের রাজ্যে।

এসব পোড়-খাওয়া নাকাল মানুষের কোনো কিছুতেই আর বিশ্বাস নেই। পিজারোর লোকলস্কর বন্দরে নেমে যখন তাদের অভিযান সম্বন্ধে একটু বড়াই করেছিল।

সান্তা মার্তার লোকেরা তাদের উপহাসে একেবারে নাজেহাল করে দিয়েছে।

তারা হেসে যা বলেছে তার মোদ্দা বক্তব্য হল এই যে, আর কাছে মরণের ফাঁদ আর কোরো না। খোলামকুচির মত সোনা ছড়ানো এমন দেশ সত্যি কোথাও আছে নাকি! ওইসব ভুজুং দিয়ে শুধু তাদের স্পেন থেকে ভুলিয়ে আনা।

সান্তা মার্তার লোকেরা নিজেদের দৃষ্টান্তই দিয়েছে। তারাও দেশ ছেড়ে অমনি সব মিথ্যে আশ্বাসে ভুলেই এসেছিল। এসে এখন তাদের এই হাল। তাদের এ-অঞ্চল ত তবু পদে আছে। 'সূর্য কাঁদলে সোনা'-র দেশ ত একেবারে অধম। সে-দেশের কথা জানতে ত আর তাদের বাকি নেই। সে যদি সত্যি অমন সোনার দেশ হত তাহলে তারা নিজেরা পচে মরত এই নরকে। পিজারোকে যে স্পেন পর্যন্ত ধাওয়া করতে হয়েছে লোকলস্কর আনতে, তাতেই ত তার ফাঁকিটা বোঝা উচিত। হাতের কাছে এখানে লোক পেলে সাগরপারে তাকে পাড়ি দিতে হয়?

মুখে একটু-আধটু তর্ক করবার চেষ্টা অবশ্য পিজারোর লোকেরা করেনি এমন নয়, কিন্তু তাদের মনে একটু করে খোঁচা উঠতে শুরু করেছে সেই থেকেই।

কিন্তু সে-দেশ কেমন কেউ ত তোমরা জানো না। দু-একজন মুখে প্রতিবাদ জানিয়েছে—জানোও ত হতে পারে।

হ্যাঁ তা পারে বৈকি। তারা টিটকারির দিয়ে বলেছেন,—সেখানকার আবহাওয়া গরম আরো ভাপসা, মশা-মাছি জংলা পোকা-মাকড়ের ঝাঁক আরো পাগল-করা ডাঙ্গায় কিলবিলে সাপ আরো বড় আর বিষাক্ত, আর জলে কেম্যান অর্থাৎ কুমীর আরো ভয়ংকর। সবদিক দিয়েই সে-দেশ ভালো ত বটেই।

সান্তা মার্তায় বসে কথাগুলো শোনার দরুণই তা মনে দাগ কেটেছে আরো বেশী। স্পেন ছেড়ে যারা বড়জোর ক্যানারিজ দ্বীপ-পুঞ্জ, কি হিসপানিওলা ফার্ণানডিনা পর্যন্ত এক-আধবার এসেছে তাদের কাছে সান্তা মার্তা সত্যিই প্রত্যক্ষ নরক।

এরকম জায়গার সঙ্গে তাদের পরিচয়ই নেই। তারা আর যাই হোক খোলামেলা জায়গার মানুষ। এ-ধরনের বুকচাপা লতায়-পাতায় ডালপালায় দিনদুপুরেই অন্ধকার দুর্ভেদ্য জঙ্গল তারা কল্পনাই করেনি। শুধু জঙ্গল নয় যেন বিষাক্ত নিঃশ্বাসে আকাশ ভারী করে রাখা বিরাট সব জলা। আর শয়তানের দূতের মত বিদঘুটে সব কীট-পতঙ্গের জ্বালায় এক দণ্ড স্বস্তি নেই। এ-জলাজংগলের জন্তুজানোয়ারগুলোও যেন সত্যি হয়ে ওঠা দুঃস্বপন।

প্রথম অভিজ্ঞতা যাদের এইরকম নতুন মহাদেশটা আগাগোড়াই ভয়াবহ বলে তাদের বোঝানো খুব কঠিন হয়নি। প্রথম পরিচয়-টুকুই সারাদেশের নমুনা বলে তারা মেনে নিয়েছে।

এরকম ধারণা ঠেকাবার চেষ্টা কেউ করেনি এমন নয়। কিন্তু তাতে বিশেষ কিছু ফল হয়নি।

তখন সান্তা মার্তার বন্দরে জাহাজ তিনটিতে সামান্য কিছু রসদ আর জল তোলার সঙ্গে সেগুলির ছোটখাট একটু-আধটু মেরামতি চলছে। মাঝি মাল্লা সেপাইরা বেশীর ভাগই বন্দরের লোকজনের সঙ্গে সেই সুযোগে অবসরমত একটু আড্ডা দেয়। আড্ডা মানে অবশ্য শুঁড়িখানায় বসে 'পুলকে' টানা। আমেরিকার-ই একটি অদ্ভুত গাছ 'আগেভি'র ডাঁটার রস থেকে গাঁজানো, দুধে রং-এর এই 'পুলকে' তখন নেশা হিসেবে এসপানিওলদের দারুণ পেয়ারের হয়ে উঠেছে।

এই 'পুলকে'-র আসরেই সান্তা মার্তার সেকেরা পিজারোর লোকেদের কান ভাঙিয়েছে।

বাধা দেবার চেষ্টা যে করেছে সে একটা বেদে মাত্র। পিজারোর দলের লোকেরা তাকে গানাদো বলে জানে। সেভিলের বন্দর ছাড়বার পর জাহাজে নতুন মুখ হিসেবে তাকে দেখা গিয়েছিল। তা নতুন মুখ ত ওই একটাই নয়। এ-ধরনের অভিযানে হামেশাই তা দেখা যায়। গানাদো নামটা একটু অদ্ভুত কিন্তু বেদেদের নাম হিসাবে তাও কানে সয়ে গিয়েছে।

কিছু যারা পুরানো তারা বেছে বলে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য কি ঘেন্না যেমন করেনি, তেমনি সমীহও নয়। আসলে গানাদোকে নিয়ে তাদের বিশেষ মাথা ঘামাতেই হয়নি। লোকটা নিজে থেকেই একটু যেন সরে সরে থেকেছে সবকিছু থেকে।

এই গানাদোকে কিন্তু 'পুলকে'-র মৌতাতের আসরে একটু ঘন ঘন দেখা গেছে আর সব দলের সঙ্গে।

সেটাও কিছু এমন অদ্ভুত নয়। 'পুলকে'-র মত নেশার টানে কে না বেরিয়ে আসে।

কিন্তু সান্তামার্তার লোকেদের সঙ্গে তাকে কথা-কাটাকাটি করতে দেখে সবাই একটু অবাক।

'সূর্য কাঁদলে সোনা'-র দেশের নিন্দে শুনে গানাদো অবশ্য ক্ষেপেটেপে যায়নি। সে যা বলেছে, তা বিদ্রুপের সুরে।

বলেছে, হ্যাঁ, কথাটা মন্দ নয়। নিজের পচা জলের গর্ত যার ছাড়বার ক্ষমতা নেই, সে কুয়োর ব্যাঙের পক্ষে বাইরের সব এঁদো পুকুর মনে করাই ভালো।

'পুলকে'র নেশা ভেদ করে খোঁচাটা মর্মে গিয়ে পৌঁছোতে একটু দেরী আছে। সান্তা মার্তার মাতালরাই ক্ষেপেছে তারপর।

আমরা কুয়োর ব্যাঙ! নিজেদের মান বাঁচাতে আমরা বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যে দুর্নাম রটাচ্ছি! তাহলে শুনবে একটা ছড়া?

কি ছড়া?—জিজ্ঞাসা করছে পিজারোর মাকিমাল্লাদের অনেকে।

গানাদো অর্থাৎ ঘনরাম প্রমাদ গণেছেন তখনই। ছড়ার উল্লেখ শুনেই তিনি বুঝেছেন সমস্যাটা সঙ্গীন।

সন্তামার্তার মাতাল নিন্দুক তখন ছড়া আওড়াতে সুরু করেছে—

পুয়েস সেনিয়র গোবেরনদর
মিরেলো বিয়েন পোর এন্তেরো
কুয়ে আল্লা ভা এল রেকোখেদর
ঈ আক কুয়েদো এল কার্ণিথেরো

এ-ছড়া আওড়ানো শেষ হবার পর গানাদোকে আর সেখানে দেখা যায়নি। অবস্থা বেগতিক দেখে গানাদোরূপী ঘনরাম সরে পড়েছেন আগেই।

কেন? ঘনরাম ওই ছড়া শুনেই পালালেন কেন? ও-ছড়া ভূতের মন্তরতন্তর নাকি!—শিরোদেশ যাঁর মর্মরের মত মসৃণ শিবপদবাবু জো পেয়ে চিমটিটুকু কাটলেন।

না, ভূতের মন্তর নয়। ক্ষমার অবতার হয়ে দাসমশাই কিন্তু অনায়াসে এ-বেয়াদপি মাপ করে বললেন, তবে এ বড় সাংঘাতিক ছড়া। এ-ছড়ার নাম শুনেই ঘনরাম বুঝেছিলেন যে সান্তা মার্তা তাঁদের পক্ষে বেশ একটু গরম জায়গা। এ-ছড়া যারা আওড়ায়, তাদের ঠান্ডা করবার মত জবাব কখনও তৈরী হয়নি।

কিন্তু ছড়াটা অত সাংঘাতিক কেন? ওর মানেটানে কিছু আছে? মেদভারে হস্তীর মত যিনি বিপুল সেই সদাপ্রসন্ন ভবতারণ সরল কৌতুহলে জিজ্ঞাসা করলেন,—

হ্যাঁ, মানে আছে বইকি!—দাসমশাই আশ্বস্ত করে জানালেন, আর সেই মানেটার জন্যেই ছড়াটা সাংঘাতিক। ও-ছড়ার বাংলা মানে মোটামুটি এইরকম করা যায়—

ফৌজদারসাব থাকুন হুঁশিয়ার,
আড়কাটিটার ওপর রাখুন নজর!
ভেড়ার পাল সে যায় তাড়িয়ে আনতে
কসাই হেথায় ছুরি শানায় জবর।
এই ছড়াকে...

শিবপদবাবুর টিপ্পনিটুকু নিজেই পূরণ করে দিয়ে দাসমশাই বললেন,—এই ছড়াকে এত ভয়! সবাই আপনারা তাই ভাবছেন নিশ্চয়। ছড়াটার ইতিহাস জানলে তা আর ভাবতেন না। ছড়াটা রচনা হিসেবেও উঁচু দরের নয়, মানেটার ভেতরেও এমন ভয়ংকর কিছু শুধু কানে শুনে পাওয়া যায় না। তা পাওয়া যায় কেন, কারা কবে, ও ছড়া বেঁধেছিল তা জানলে। ও ছড়া বেঁধে ছিল পিজারোর দ্বিতীয় অভিযানের কয়েক-জন খাপ্পা নাবিক সেপাই। সোনার প্রলোভনে পিজারোর অভিযানে যোগ দেবার পর তাদের তখন সব দিক দিয়ে দুর্দশার একশেষ হয়েছে। কোনো রকমে দেশে 'ফবত' পেলে তারা বাঁচে। কিন্তু পিজারো আর আলমাগ্রো তাদের জোর করে গাল্লো বলে এক অখদ্যে দ্বীপে ধরে রাখবার ব্যবস্থা করেন। ক্ষেপে আগুন হয়ে নাবিক-সেপাইদের বেশীর ভাগই তখন পানামায় তাদের বন্ধুদের কাছে তাদের অবস্থার কথা জানাবার চেষ্টা করে। গাল্লো দ্বীপে এক দলকে রেখে নেহাৎ রুগ্ন আর অনিচ্ছুক কয়েকজনকে নিয়ে আলমাগ্রো তখন নতুন লোকজন আর রসদ সংগ্রহ করে আনতে একটি জাহাজে পানামায় ফিরছেন। এই জাহাজে ফিরে-যাওয়া সেপাইদের মারফৎই গাল্লো দ্বীপে যাদের থাকতে বাধ্য করা হয় তারা তাদের চিঠি পাঠাবার ব্যবস্থা করে। কিন্তু আলমাগ্রো সে সব চিঠি কেড়ে নিয়ে তাদের বিক্ষোভ পানামায় পৌঁছোবার রাস্তা বন্ধ করেন। তা সত্ত্বেও একটি চিঠি পানামায় গিয়ে পৌঁছোয়। পৌঁছোয় আবার যার তার কাছে নয়, একেবারে খোদ গভর্নর পেড্রো দে লস রিয়সের বিবিসাহেবের কাছে।

কেমন করে এ চিঠি তাঁর হাতে পৌঁছোল। সাবধানের মার নেই বলে আলমাগ্রো ত' তন্ন তন্ন করে খুঁজিয়ে লেখা কাগজের একটা টুকরোও কোথাও জাহাজে থাকতে দেন নি। এ চিঠি তাঁর নজর এড়াল কি করে?

(ক্রমশঃ)



নয়াদিল্লীতে রাষ্ট্রসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়ন সম্মেলন উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

দেশে বিদেশে

দ্বিতীয় দিয়েনবিয়েনফ্যুর সূচনা

"ভিয়েৎনামের বিরুদ্ধে আমেরিকা যে নোংরা লড়াই আরম্ভ করেছে তার জন্যে ইতিহাস তাকে কখনো ক্ষমা করবে না।' লাইফ ম্যাগাজিনের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে রুশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ কোসিগিন এই মন্তব্য করেছেন। সাক্ষাৎকারের বিবরণ ২৯ জনুয়ারী প্রকাশিত হয়েছে।

ইতিহাস কি সেই প্রতিশোধ নিতে আরম্ভ করেছে? ৩০শে জানুয়ারী ভিয়েৎনামে চান্দ্র নববর্ষের সুরু থেকে ভিয়েৎকং গেরিলাদের যে তৎপরতা সুরু হয়েছে তা থেকে এ-কথাই মনে হওয়া স্বাভাবিক। এই তৎপরতা ধাপে ধাপে বেড়ে পরের দিন ৩১ জানুয়ারী একেবারে দ্বিতীয় দিয়েনবিয়েনফু প্রচণ্ডতা অর্জন করতে চলেছিল। তার জের এখনো থামেনি এবং সহজে থামবে না।

চান্দ্র নববর্ষ উপলক্ষে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব ভিয়েৎকং তরফ থেকে করা হয়েছিল, কিন্তু দক্ষিণ ভিয়েৎনামের সরকারী পক্ষ তা সরাসরি অগ্রাহ্য করেছিলেন। গেরিলা তৎপরতা তার পরেই তীব্রতা লাভ করে।

২৯ নভেম্বর গেরিলারা আকস্মিক আক্রমণ চালিয়ে অন্তত দুটি শহর দখল করে নেয় এবং আরো সাতটি শহরে মার্কিন-দক্ষিণ ভিয়েৎনামী বাহিনীকে বিপন্ন করে তোলে।

পরের দিন প্রচণ্ড লড়াইয়ের পর গেরিলারা অবশ্য পিছু হটতে বাধ্য হয় কিন্তু জনৈক মার্কিন মুখপাত্রের মতেই মার্কিন যুদ্ধ সরঞ্জামের যে ক্ষতি হয়েছে তা 'ব্যাপক'। এক দানাং ঘাঁটিতেই ছটি মার্কিন বিমান বিধ্বস্ত ও ২৩টি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

কিন্তু তারা পিছু হটেছিল আবার পুনোদ্যমে এগোবার জন্যে। ৩১ ডিসেম্বর গেরিলারা একযোগে রাজধানী সায়গন ও দেশের সর্বত্র আরো গোটা তিনেক শহরের ওপর আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণ যেমন ছিল নাটকীয়, তেমনি ছিল দুঃসাহসী ও প্রচণ্ড। এই আক্রমণের কোন তুলনা নেই। রাজধানী সায়গনে রাতের অন্ধকারে অনুপ্রবেশ করে মার্কিন রক্ষীদের পর্যুদস্ত করে মার্কিন দূতাবাসটি দখল করে নেয় ও ছ' ঘন্ট তাদের দখলে রাখে। একই সঙ্গে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের প্রেসিডেন্ট থিউ'র প্রাসাদ, রেডিও স্টেশন, মার্কিন সৈনাদের থাকবার গোটা ছয়েক বাড়ী, দুর্ভেদ্য তান সন নুট বিমানবন্দর এবং সায়গনের উত্তরে বিয়েন হোয়ার দক্ষিণ ভিয়েৎনামের বৃহত্তম মার্কিন ঘাঁটির ওপর আক্রমণ চলায়। মার্কিন রাষ্ট্রদূত এলসওয়ার্থ বাংকার এবং প্রেসিডেন্ট থিউ অজ্ঞাত স্থানে চলে গেছেন। সায়গন থেকে লোকাপসারণ করা হচ্ছে। সারা দেশে সামরিক আইন জারী করা হয়েছে।

ভিয়েৎনামের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বার পর আমেরিকা এতবড় মার আগে আর খায়নি। ১৯৫৪ সালে দিয়েনবিয়েনফুর পতনের পর গেরিলারা এত বড় শৌর্য আর কখনো প্রকাশ করতে পারেনি। মার্কিন সৈন্যরা পরে অবশ্য দূতাবাস ভবনটি উদ্ধার করে, কিন্তু গেরিলাদের প্রতিহত করা এখনোন সম্ভব হয়নি। সায়গনে প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলতে থাকে।

১ ফেব্রুয়ারী গেরিলাদের উচ্ছেদ করার জন্যে সায়গনের ওপর বোমা বর্ষিত হয়। কালো ধোঁয়ায় শহর ও শহরতলীর আকাশ আচ্ছন্ন হয়ে যায়। তান সন নুট বিমানবন্দরের চারপাশে লড়াই কেন্দ্রীভূত হয়। গেরিলারা একটি হোটেলের ওপরতলা দখল

করে নেয়। প্রেসিডেন্ট থিউ যখন হেলিকপ্টারে করে তাঁর প্রসাদের ছাদের ওপর নামবার চেষ্টা করে তখন ঐ হোটেল থেকে গেরিলারা হেলিকপ্টারের দিকে গুলী করে। শহরের অন্তত ন'টি জায়গায় রাস্তায় রাস্তায় লড়াই চলতে থাকে। অন্তত দু'টি এলাকায় দেখা যায় গেরিলারা দরজায় দরজায় ধাক্কা দিয়ে লোকজনকে বলছে: "আমরা জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টের লোক, আমরা সায়গনকে মুক্ত করতে এসেছি।"

এদিকে দেশের অন্যান্য অংশে অন্তত পাঁচটি শহর গেরিলারা দখল করে নিয়েছে বলে জানা গেছে। শহরগুলি হ'ল দানাং, দালাত, হুয়ে, টুয়া টিয়েন ও কোয়াং ঙ্গি। হ্যানয় বেতারের খবরে দাবী করা হয়েছে যে, সায়গন ও হুয়ে শহরে বিপ্লবী পরিষদ কায়েম হয়েছে।

ভিয়েৎনামের এই নতুন ঘটনাচক্রে মার্কিন কর্তৃপক্ষ স্পষ্টই বিহ্বল হয়ে পড়েছেন। প্রেসিডেন্ট জনসন তাঁর সামরিক উপদেষ্টাদের সঙ্গে পরামর্শ সুরু করে দিয়েছেন এবং রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাট উভয় দলের কাছে অকুণ্ঠ সমর্থন দাবী করেছেন। ইতিমধ্যে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে মার্কিন বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওয়েস্টমোরল্যান্ড মন্তব্য করেছেন, ভিয়েৎকংদের আসল আক্রমণ আসা এখনো বাকী আছে।

আক্রমণের ধরণ দেখে একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, ভিয়েৎকংরা এবার চূড়ান্ত মোকাবিলার জন্যে প্রস্তুত। দ্বিতীয় দিয়েন বিয়েনফু সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য নিয়েই যদি তারা এই আক্রমণ চালিয়ে থাকে তাহলে অবশ্য এই উদ্দেশ্য আপাতত ব্যর্থ হয়েছে। এর পর, ধরে নেওয়া যায়, আমেরিকা আরো সতর্ক হবে, প্রেসিডেন্ট জনসন শান্তি আলোচনার যে-কোন প্রস্তাব এরপর সরাসরি অগ্রাহ্য করবেন, মার্কিন কংগ্রেস ভিয়েৎনামে কঠোরতর নীতি সমর্থন করবেন।

কিন্তু তাতেও কি তাঁরা শেষ রক্ষা করতে পারবেন? শুধু নাটকীয় ও দুঃসাহসিকতার জন্যেই নয়, ভিয়েৎকংদের সর্বশেষ তৎপরতা ভিয়েৎনাম পরিস্থিতি সম্পর্কে কতগুলি সত্যকে তুলে ধরছে যেগুলি সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রথমত, রাজধানী সায়গনের ওপর, বিশেষ করে মার্কিন দূতাবাসের ওপর যেভাবে আক্রমণ চালানো হয়েছে তাতে এটা প্রমাণিত হয়েছে আমেরিকা যত কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থাই করুক গেরিলাদের গতি রোধ করা সহজ নয়।

দ্বিতীয়ত, পাঁচলক্ষাধিক মার্কিন সৈন্য দিয়ে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম ছেয়ে ফেলার পরেও গেরিলারা যেভাবে সর্বত্র একযোগে এবং অনেকাংশে সফল আক্রমণ চালাতে পেরেছে তাতে এটা বোঝা যাচ্ছে যে, এই বৃদ্ধ গেরিলা সংগঠনকে এতটুকু কাবু করতে সক্ষম হয়নি এবং গেরিলারা সহজেই যে-কোন সময় মার্কিন-দক্ষিণ ভিয়েৎনামী বাহিনীকে গুরুতর রকমে বিপন্ন করে ফেলতে পারে।

তৃতীয়ত, এটা অনস্বীকার্য যে, এই তৎপরতা, বিশেষ করে খোদ রাজধানীর



বুকে একখানি দুঃসাহস কখনই সম্ভব হত না যদি সাধারণ মানুষ ও দক্ষিণ ভিয়েৎনামী বাহিনীরই কোন কোন অংশের সমর্থন গেরিলারা না পেত।

এই যেখানে অবস্থা সেখানে আমেরিকার পক্ষে যুদ্ধ জেতা এবং সেই জয়লাভকে স্থায়িত্ব দেওয়া কতখানি সম্ভব? এই কথাটা মার্কিন কর্তৃপক্ষের এখন ভেবে দেখার সময় এসেছে।



সশস্ত্র বাহিনীর এই চারজন সিনিয়র অফিসারকে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করা হয়। (বামদিক থেকে দক্ষিণে)—লেঃ জেনারেল এস এইচ এফ জে মানেকশ (পদ্মভূষণ); লেঃ জেনারেল এ কে দেব, রিয়ার এ্যাডমিরাল এস এন কোহলি এবং মেজর জেনারেল এস পি ভোরা (পরম বিশিষ্ট সেবা পদক)।

শোষিত এখন শাসক

ঘুরিয়ে ভাত খাওয়ার মত শ্রীবিন্ধ্যেশ্বরী মণ্ডল শেষ পর্যন্ত ঘুরিয়ে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হলেন।

মুখ্যমন্ত্রিত্ব শ্রীমণ্ডলের কপালে লেখা ছিল। নইলে সাধারণ নির্বাচনের সংসদে নির্বাচিত হয়েও রাজনীতি করার জন্যে রাজ্যে থেকে যাবেন কেন? আর বিধানসভার সদস্য না হয়েও ছ'মাস যুক্তফ্রন্ট সরকারে মন্ত্রিত্ব করার পর যখন তাঁর মন্ত্রিত্বের পথে সাংবিধানিক বাধা এসে দাঁড়ালো, তখনই বা তিনি সংসদে ফিরে যেতে চাইলেন না কেন?



শোষিত দলের নেতা শ্রীবিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ মণ্ডল

তার বদলে, গত আগস্ট মাসে, তিনি যুক্তফ্রন্ট থেকে সতেরোজন সদস্য নিয়ে বেরিয়ে এলেন এবং শোষিত দল নামে একটি দল গঠন করে কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলালেন।

গত ১৮ জানুয়ারী বিহার বিধানসভার ভোটাভুটিতে কংগ্রেস-শোষিত দল আঁতাতের কাছে মহামায়াপ্রসাদ সিংহের যুক্তফ্রন্ট হেরে গেল। সরকার গঠনের ভার স্বভাবতই এসে পড়ল আঁতাতের ওপর। কিন্তু আবারও একটি সাংবিধানিক বাধা উপস্থিত হয়ে মণ্ডল মশাইয়ের বাড়া ভাতে ছাই দেবার উপক্রম করল। তিনি ইতিমধ্যে বিধানমণ্ডলীর সদস্য না হয়ে ছ'মাস মন্ত্রিত্ব করে নিয়েছেন। সুতরাং তিনি সদস্য না হয়ে আর কি করে মন্ত্রিত্ব করেন? আইন অনুযায়ী সদস্য না হয়ে সর্বোচ্চ ছ'মাস পর্যন্ত মন্ত্রিত্ব করা যেতে পারে।

কিন্তু মণ্ডল মশাইর তাতে দমলে চলবে কেন। মুখ্যমন্ত্রী হবার জন্যেই যে তিনি বিহারে যুক্তফ্রন্টের পতন ঘটিয়েছেন। সুতরাং মুখ্যমন্ত্রী না হলে তাঁর চলবে কেন?

অতএব তিনি কি করলেন? তিনি সতীশপ্রসাদ সিংহ নামে তাঁর এক অনুগত ভক্তকে সাময়িকভাবে মুখ্যমন্ত্রী করে সরকার গঠন করিয়ে নিলেন। আর সেই সঙ্গে পরমানন্দ নামে বিধান পরিষদের একজন মনোনীত কংগ্রেস সদস্যকে ভজালেন যাতে তিনি পরমানন্দে মণ্ডল মশাইর জন্যে তাঁর আসনটি ছেড়ে দেন। ছেড়ে তিনি দিলেন। আর সেই জায়গায় ভক্ত সতীশপ্রসাদের পরামর্শক্রমে রাজ্যপাল নিত্যানন্দ কানুনগো মণ্ডল মশাইকে পরিষদের শূন্য আসনে মনোনীত করে নিলেন।

তারপর? তারপরের কাহিনী অতি সোজা। এবার ভক্ত সতীশপ্রসাদের পদত্যাগের পালা। তিনি পদত্যাগ করলে রাজ্যপাল কানুনগো মণ্ডল মশাইকে সরকার গঠনের জন্যে ডেকে পাঠালেন। আর কোন বাধা রইলো না। শ্রীবিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ মণ্ডল বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হলেন। শোষিত নেতা এখন শাসনের গদীতে বসলেন।

বৈষয়িক প্রসঙ্গ

ভারত-সোভিয়েট যৌথ উদ্যোগ

ভারতবর্ষের সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়ার বৈষয়িক সহযোগিতা একটা নূতন পথ ধরে অগ্রসর হতে চলেছে। সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী আলেকসি কোসিগিনের সাম্প্রতিক ভারত সফরের পর এই আশা দেখা দিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী কোসিগিনের সফরের শেষে তাঁর ও প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর দ্বারা যৌথভাবে স্বাক্ষরিত যে বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছে তাতে ভারত-সোভিয়েত বৈষয়িক সহযোগিতার প্রসঙ্গটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, উভয় দেশ আশা করে যে, তাদের মধ্যে বাণিজ্যের প্রসার হবে। তারা উভয়ে এ বিষয়েও একমত হয়েছে যে, তাদের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক দৃঢ়তর করার উপায় হিসাবে তাদের অবশ্যই অর্থনৈতিক ও শিল্পের ক্ষেত্রে সহযোগিতার নূতন পথ খুঁজে বের করতে হবে। উভয় পক্ষ একমত হয়ে স্থির করেছে যে, উভয় তরফের বিশেষজ্ঞরা বিষয়টির বিশদ পর্যালোচনা করে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করবেন।

এই বিবৃতির মধ্যে অর্থনৈতিক ও শিল্পের ক্ষেত্রে ভারত-সোভিয়েট সহযোগিতার "নূতন পথ অনুসন্ধান" করার উল্লেখটি তাৎপর্যপূর্ণ। এই নূতন পথ কি হতে পারে তার কোন আভাস কোসিগিন ইন্দিরা যুক্ত বিবৃতির মধ্যে দেওয়া হয় নি। কিন্তু কোসিগিনের ভারত সফরকালে যেসব সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তা থেকেই যথেষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া গেছে যার থেকে অনুমান করে নেওয়া যায়, ভারত-সোভিয়েট বৈষয়িক সহযোগিতা কোন্ নূতন পথ ধরে অগ্রসর হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

প্রস্তাবিত এই নূতন পথটি হচ্ছে, ভারতবর্ষে দুই দেশের যৌথ উদ্যোগে শিল্প প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ ভারতবর্ষে সরাসরি সোভিয়েট মূলধন বিনিয়োগ। গত প্রজাতন্ত্র দিবসে সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার সময় ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীদীনেশ সিং প্রস্তাবটি তোলেন। সংবাদে প্রকাশ যে, প্রস্তাবটি সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রীর সহানুভূতি লাভ করেছে।

যদি শেষ পর্যন্ত প্রস্তাবটি গৃহীত হয় তাহলে ভারতবর্ষের বৈষয়িক উন্নয়নে বৈদেশিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে একটি নূতন দিক উন্মোচিত হবে। এতদিন পর্যন্ত সোভিয়েট রাশিয়া ভারতবর্ষের শিল্পপ্রসারে যে সাহায্য দিয়ে এসেছে সেটা সীমাবদ্ধ ছিল কারিগরী জ্ঞান ও ঋণ দানের মধ্যে। সোভিয়েট সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলির কোনটিতেই সোভিয়েট মূলধন লগ্নী করা হয় নি এবং কোনটির পরিচালনাতেই সোভিয়েট রাশিয়ার অংশ নেই। এই ব্যবস্থার একটা বড় অসুবিধা এই যে, একটা শিল্প প্রতিষ্ঠা ও চালু করে দিয়েই সাহায্যদাতা দেশের দায়িত্ব ফুরিয়ে যায়, প্রতিষ্ঠিত শিল্পটি লাভজনক হচ্ছে কিনা, পরিবর্তিত অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য করে নেওয়ার ক্ষমতা সেই শিল্পের থাকছে কিনা সেদিকে দৃষ্টি রাখার দায়িত্ব শুধুমাত্র সাহায্যগ্রহীতা দেশের উপর বর্তায়।

সোভিয়েট সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত কতকগুলি ভারতীয় শিল্পে ইতিমধ্যে এই ধরনের সমস্যা দেখা দিয়েছে। ভিলাই ইস্পাত কারখানা, রাঁচীর ভারী ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানা, দুর্গাপুরের খনি যন্ত্রপাতি কারখানা ইত্যাদির উৎপন্ন দ্রব্যের বাজার দেশে অর্থনৈতিক মন্দার ফলে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে গেছে। এই কারখানাগুলিতে যে অর্থ লগ্নী করা হয়েছে তাতে যদি সোভিয়েট রাশিয়ার অংশ থাকত তাহলে সেই লগ্নীর নিরাপত্তায় তার আগ্রহ আজকের তুলনায় বেশী হত এবং যেসব কারখানায় আজ ঐ ধরনের সমস্যা দেখা দিয়েছে সেগুলির প্রয়োজনীয় রদবদলে রাশিয়ার সাহায্য পাওয়া সহজ হত।

সম্ভবত এই বিবেচনাতেই ভারতবর্ষের তরফ থেকে ভারত-সোভিয়েট যৌথ উদ্যোগের প্রস্তাব করা হয়েছে। সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী যে এই প্রস্তাব এক কথাতেই প্রত্যাখ্যান করে দেন নি তাতে বোঝা যাচ্ছে যে, প্রস্তাবটি গৃহীত হওয়ার যথেষ্টই সম্ভাবনা আছে। যদি তা হয় তাহলে বুঝতে হবে যে, সোভিয়েট রাশিয়া বিদেশে পুঁজি নিয়োগ সম্পর্কে সমাজতন্ত্রের ঐতিহ্যগত ধারণা থেকে অনেকখানিক অগ্রসর হয়ে এসেছে। একবার যদি সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে এই ধরনের সহযোগিতার ব্যবস্থায় আসা ভারতের পক্ষে সম্ভব হয় তাহলে পূর্ব ইয়োরোপের অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিও রাশিয়ার এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবে, এটা অবধারিত।

এই নূতন যৌথ উদ্যোগের প্রস্তাব ছাড়া অন্যান্য যেসব দিকে ভারত-সোভিয়েট বৈষয়িক সহযোগিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে সেগুলির কিছু কিছু উল্লেখ ইন্দিরা-কোসিগিন যুক্ত ইস্তাহারে আছে। দুই দেশই নূতন পাঁচসালা পরিকল্পনা গ্রহণ করতে চলেছে। দুই দেশের পরিকল্পনার মধ্যে সমন্বয়ের কথা বলা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে যে, এই সমন্বয় এমনভাবে করা হবে যাতে ভারতীয় শিল্পজাত পণ্য যথাসম্ভব অধিক পরিমাণে রাশিয়ায় রপ্তানী করার সুযোগ থাকবে। বিশেষ করে রাশিয়ার সাহায্যে যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠিত সেগুলির উৎপন্ন পণ্যের জন্য সেদেশে যথাসম্ভব বৃহৎ বাজার উন্মুক্ত করা হবে, এটা আশা করা যাচ্ছে। সংবাদে প্রকাশ যে, রাশিয়া ইতিমধ্যে যথাসম্ভব অধিক পরিমাণে ভারতীয় রেলওয়ে ওয়াগন ও রেললাইন আমদানী করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। বিদেশে ভারতীয় পণ্য রপ্তানী বাড়াবার জন্য আর একটি পন্থা গ্রহণের প্রস্তাব নিয়েও প্রাথমিক আলোচনা হয়ে গেছে। সেটা হচ্ছে এই যে, ভারতের বাইরে যেসব দেশে রাশিয়া কারিগরী সহায়তা দিচ্ছে সে সব দেশে উপযুক্ত ক্ষেত্রে ভারতীয় সাজসরঞ্জাম আমদানী করতে হবে, সোভিয়েট রাশিয়ার পক্ষ থেকে এমন শর্ত নির্দিষ্ট করে দেওয়া হবে। সোভিয়েট রাশিয়ার বৈষয়িক সহযোগিতার আর একটি নূতন সম্ভাব্য ক্ষেত্র হল—দুর্গাপুরের খনি যন্ত্রপাতি কারখানার ন্যায় যে সকল শিল্পের উৎপন্ন পণ্যের চাহিদা প্রত্যাশার তুলনায় অনেক কম সেগুলির কিঞ্চিৎ রদবদল করে ঐ কারখানাগুলিকে অন্য কোন ধরনের পণ্য উৎপাদনের উপযুক্ত করে তোলা।

সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরকালে তাঁর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী, উপপ্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই, শিল্পমন্ত্রী ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ, পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান ডঃ ডি আর গ্যাডগিল প্রভৃতির আলোচনায় এইসব বিষয়ে কতকগুলি নীতিগত সিদ্ধান্ত স্থির হয়ে গেছে। এইসব সিদ্ধান্তকে বাস্তবে রূপায়িত করার ভার বিশেষজ্ঞদের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আগামী কয়েক মাসে দুই দেশের বিশেষজ্ঞরা একত্রে বসে ভারত-সোভিয়েট বাণিজ্যের প্রসারের জন্য এবং ভারতীয় শিল্পের প্রসার ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে ঘনিষ্ঠতর সোভিয়েট সহযোগিতার জন্য বাস্তব ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।

ইতিমধ্যে সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রীর সফরের মধ্য দিয়ে এবং এই সফরকালে দুই দেশের ভিতর বৈষয়িক সম্পর্কের দিকটির উপর যে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তার মধ্য দিয়ে একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে গেছে। সেটি হচ্ছে এই যে, ভারতবর্ষের বৈষয়িক উন্নয়নে সোভিয়েট রাশিয়া আগ্রহবান। ভারতবর্ষে ভারী শিল্প, তৈল শিল্প, ভেষজ শিল্প ও বিদ্যুৎ উৎপাদনে সোভিয়েট রাশিয়া বিরাট সাহায্য দিয়েছে। এইসব শিল্পোদ্যোগ নষ্ট হতে যাচ্ছে, চাহিদার অভাবে সে সব শিল্পোদ্যোগের উৎপন্ন পণ্যের কাটতি নেই এবং বহু মূল্যবান যন্ত্রপাতি অকেজো হয়ে পড়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে—এমন সম্ভাবনায় রুশ সরকার উদ্বিগ্ন। কোসিগিন-ইন্দিরা যুক্ত ইস্তাহারে সেই উদ্বেগের প্রতিফলন হয়েছে।

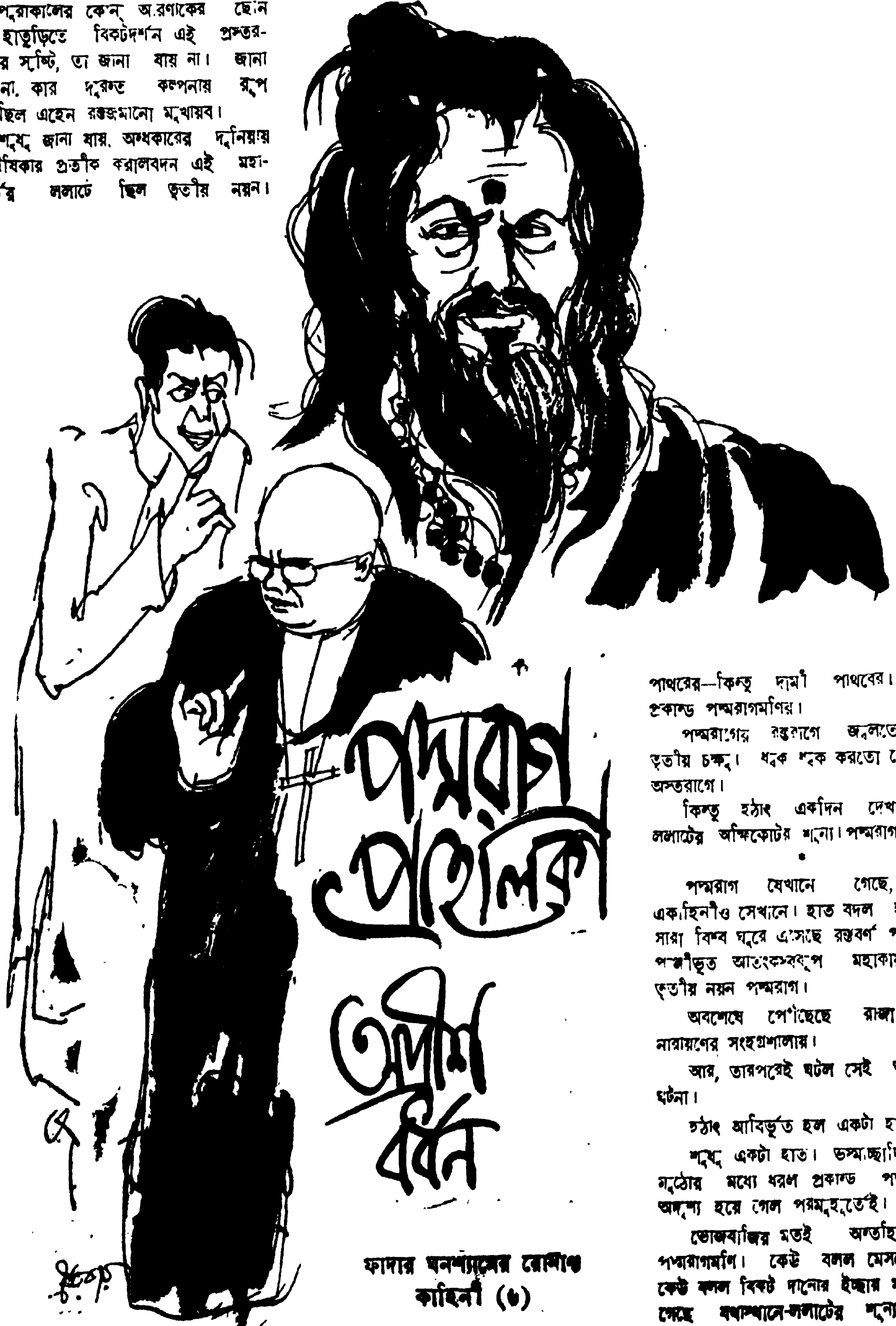
মনে হয় যেন অলৌকিক কাহিনী।

আসামের দুর্গম অঞ্চলে এক পাহাড়। দুর্ভেদ্য অরণ্যসংকুল সেই পাহাড়ের ওপর একটিমাত্র মূর্তি।

পাথরের মূর্তি। নিকষকালো। যেন কষ্টিপাথর। আকারে মূর্তিটা দানবিক। গঠনসৌকর্যেও তাই। হঠাৎ দেখলে রক্ত ছলাৎ করে ওঠে—এমন ভয়াবহ।

পুরাকালের কোন্ অরণ্যকের ছেনি আর হাতুড়িতে বিকটদর্শন এই প্রস্তর-দানোর সৃষ্টি, তা জানা যায় না। জানা যায় না কার দুরন্ত কল্পনায় রূপ নিয়েছিল এহেন রক্তজমানো মুখাবয়ব।

শুধু জানা যায়, অন্ধকারের দুনিয়ায় বিভীষিকার প্রতীক করালবদন এই মহা-মূর্তির ললাটে ছিল তৃতীয় নয়ন।



ফাদার ঘনশ্যামের রোমাঞ্চ কাহিনী (৬)

পাথরের—কিন্তু দামী পাথরের। একটি প্রকান্ড পদ্মরাগমণির।

পদ্মরাগের রক্তরাগে জ্বলতো সেই তৃতীয় চক্ষু। ধ্বক ধ্বক করতো গোধূলির অস্তরাগে।

কিন্তু হঠাৎ একদিন দেখা গেল ললাটের অক্ষিকোটর শূন্য। পদ্মরাগ উধাও।

•

পদ্মরাগ যেখানে গেছে, গেছে একাহিনীও সেখানে। হাত বদল হতে-হতে সারা বিশ্ব ঘুরে এসেছে রক্তবর্ণ পদ্মরাগ—পুঞ্জীভূত আতংকস্বরূপ মহাকায় দানোর তৃতীয় নয়ন পদ্মরাগ।

অবশেষে পৌঁছেছে রাজা রাঘব-নারায়ণের সংগ্রহশালায়।

আর, তারপরেই ঘটল সেই অলৌকিক ঘটনা।

হঠাৎ আবির্ভূত হল একটা হাত।

শুধু একটা হাত। ভস্মাচ্ছাদিত হাত। মুঠোর মধ্যে ধরল প্রকান্ড পদ্মরাগকে। অদৃশ্য হয়ে গেল পরমুহূর্তেই।

ভোজবাজির মতই অন্তর্হিত হল পদ্মরাগমণি। কেউ বলল মেসমেরিজম্; কেউ বলল বিকট দানোর ইচ্ছায় মণি ফিরে গেছে যথাস্থানে-ললাটের শূন্য অক্ষিকোটরে।



কিন্তু ফাদার ঘনশ্যাম বলল...!

গোড়া থেকেই বলা যাক সেই বিচিত্র কাহিনী।

•

যেমন কুয়াশা, তেমনি ঠান্ডা। হাড়ে সুদ্ধ কাঁপনি ধরিয়ে দেয়।

কনকনে এই শীতের দিনে দৌহিত্রের জন্মদিন উপলক্ষ্যে বিরাট মেলার আয়োজন করেছেন রাজা রাঘবনারায়ণ। কি নেই মেলায়। পাঁপর ভাজা থেকে আরম্ভ করে তালপাতার ভেঁপু, নাগরদোলা থেকে শুরু করে মাস্টার ভানুর সার্কাস পর্যন্ত কিছুই বাদ যায়নি।

রঙ্গীন ফানুস আর লাল-নীল কাগজের নিশানে ঝলমল করছে মেলা। ভেঁপুর শব্দে, ছোটদের সোরগোলে আর নাগরদোলার ক্যাঁচকোঁচ শব্দে গমগম করছে গোটা প্রাঙ্গণটা।

মেলার কলরব ক্ষীণ হয়ে পৌঁছোচ্ছে এক কোণের দুটি তাঁবুতে। মেলা উপলক্ষ্যে এ তাঁবুর পত্তন। তবুও মেলার হট্টগোল থেকে গা বাঁচানোর জন্যেই যেন নিরিবিলি জায়গায় পড়েছে তাঁবু দুটি।

তাঁবুর অধিকারীদের পেশাও বড় বিচিত্র। একজন ফ্রেনলজিস্ট: অর্থাৎ মানুষের মাথার খুলির গড়ন দেখে চরিত্র-বলে দেওয়ার বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ।

অপরজন ত্রিকালদর্শী। ভীমদর্শন এক কাপালিক!

•

সংক্ষেপে এই হল মেলার বিবরণ।

পুরো মেলাটাই বসেছে রাজার প্রাসাদ-অভ্যন্তরে—প্রাচীর বেষ্টিত প্রকান্ড চত্বরে।

অদূরে চকমিলানো মর্মরসৌধের সামনে দাঁড়িয়ে গল্প করছিলেন রাণী সাগরিকা, ফাদার ঘনশ্যাম পিয়ারিলাল, কৃপাসিং এবং প্রসেনজিৎ।

রাণী সাগরিকা আর ফাদার ঘনশ্যামের পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। পিয়ারিলাল আর প্রসেনজিৎ যথাক্রমে রাজা এবং রাণীর ভাগিনেয়। পিয়ারিলাল প্রৌঢ়। প্রসেনজিৎ যুবক। কৃপাসিং পাকাশিকারী এবং রাজার বন্ধু।

নিরালা তাঁবু দুটি নিয়ে আলোচনা চলছিল। প্রসেনজিতের মতে দুটো তাঁবুই দুটো প্রকান্ড ভন্ডের। মাথার খুলি দেখে চরিত্র বলে দেওয়া স্রেফ বাকতাল্লা ছাড়া আর কিছুই নয়। আর কাপালিকের ভন্ডামি তো চোখেই দেখা যাচ্ছে। চিরকালই শোনা গেছে। সাধু-সন্ন্যাসীরা ধুনি জেবলে ছাই মেখে গাছতলায় বসে থাকে। কিন্তু এই মহাপ্রভু তাঁবুতে অধিষ্ঠান করছেন কেন? গাছতলায় শীত করবে বলে?

রাণী সাগরিকা বললেন, "ওহে প্রসেনজিৎ, পহেলে দর্শনধারী পিছে গুণ-বিচারী—একথা সবসময়ে খাটে না। সাধু-বাবার তাঁবুর সংগে তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার কোনো সম্পর্ক নেই।"

পিয়ারিলাল বললেন, "কিন্তু অলৌকিক ক্ষমতা বলতে মরা মানুষকে জ্যান্ত করা থেকে ভবিষ্যৎ বলে দেওয়া সবই তো এসে পড়ে।"

"সাধুবাবার দিব্যদৃষ্টি আছে।"

"অর্থাৎ?"

"অর্থাৎ তিনি ভূত-ভবিষ্যৎ বর্তমান প্রত্যক্ষ করেন।"

"হাত দেখে না মুখ দেখে?"

"হাত দেখে। প্রসেনজিৎ তো পরখ করতেই এসেছে। হাত-নাতে প্রমাণ পাবে।"

"আর প্রমাণে দরকার নেই: দেখেই বোঝা যাচ্ছে।" বলে উঠল প্রসেনজিৎ।

ফিক করে হেসে বললেন রাণী সাগরিকা, "তার মানে সাহসে কুলোচ্ছে না। কাঁপুনিটা শীতের না ভয়ের? দুহাতেও তো দেখছি দস্ত না।"

হেসে উঠল সবাই। কিন্তু মোটেই অপ্রস্তুত না হয়ে প্রসেনজিৎ বললে, "আমি চললাম খুলি এক্সপার্টের কাছে।"

•

দূর থেকেই দেখা গেল, ফ্রেনলজিস্টের তাঁবুর সামনে প্রসেনজিৎ পৌঁছতে না পৌঁছোতেই করোটি-বিশেষজ্ঞ নিজেই বেরিয়ে এল বাইরে।

লোকটার চেহারাটা অনেকটা সারস পাখীর মত। লম্বা লম্বা ঠ্যাং। লম্বা গলা। মাথায় প্রায় সাত ফুটের কাছাকাছি।

তিন লাফে প্রসেনজিতের সামনে পৌঁছেই হাত চেপে ধরল লোকটা।

বলল তারস্বরে, "আসুন স্যার, আসুন। আপনার কপালের দুপাশে ঐ যে দুটো ঢিবি দেখছেন, ও দুটোর মানে জানেন? জানেন শুধু ঐ দুটি ঢিবির জন্যে আপনার মগজ কি কি ক্ষমতার অধিকারী?"

আচমকা আক্রমণে থতমত খেয়ে গেছিল প্রসেনজিৎ।

তারপরেই এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললে, "তাতে আপনার কি?"

"কিছুই না স্যার। এ বিজ্ঞান আমার জন্যে তো শিখিনি, শিখেছি আপনাদের জন্যেই।"

শুরু হল কথা কাটাকাটি। করোটি-বিশেষজ্ঞ প্রসেনজিতকে তাঁবুতে নিয়ে যাবেই, প্রসেনজিৎও যাবে না। বাগবিতন্ডার মাঝে সুলনবলে পাশে এসে দাঁড়ালেন রাণী সাগরিকা।

বললেন, "হলো কী?"

ঝটিতি জবাব দিল করোটি-বিশেষজ্ঞ, "রাণীমা, ও'র ঐ ঢিবি কপালের মানে আমি এখুনি বলে দিতে পারি।"

রেগে তিনটে হুংকার ছাড়ল প্রসেনজিৎ, "ফের যদি ঢিবি কপাল বলবেন তো—"

সকৌতুকে বললেন রাণী সাগরিকা, "পরে হবে'খন। আগে সাধুবাবার সংগে দেখা করে আসি. পিয়ারিলাল যাও। সাধুবাবাকে বলো, আমি এসেছি।"

তৎক্ষণাং দ্বিতীয় তাঁবুর ভেতরে অদৃশ্য হল পিয়ারিলাল। বেরিয়ে এল কয়েক সেকেন্ড পরেই।

বলল, "সাধুবাবা নেই।"

•

সাধুবাবা নেই।

তাঁবুর মধ্যে নেই, মেলার প্রাঙ্গণেও নেই। তবে গেল কোথায়?

কে যেন বলল, "রাজাসাহেবের কাছে যাননি তো?"

কিন্তু রাজাসাহেব তো এখন প্রাসাদের ভেতরে। সংগ্রহশালায়।

রাণী সাগরিকা বললেন, "বেশ তো, মিউজিয়ামেই যাওয়া যাক। পদ্মরাগটাও সেই সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে।"

"কোন্ পদ্মরাগ?" প্রশ্ন করল কৃপাসিং।

রাণী সাগরিকা তখন সাড়ম্বরে শুরু করলেন সেই কাহিনী যা এ উপাখ্যানের প্রারম্ভেই বর্ণিত হয়েছে অতি সংক্ষেপে।

কাহিনীও শেষ হল, মিউজিয়ামও এসে গেল।

প্রাসাদের মধ্যেই একটা মস্ত হলঘর। চৌকোণা হলঘরের ঠিক মাঝে বুক-সমান উঁচু প্রাচীর দিয়ে চতুষ্কোণ খানিকটা জায়গা ঘেরা। প্রাচীরের সংগে ছাদের কড়ি-কাঠের সংযোগ রয়েছে সুদীর্ঘ থামের মাধ্যমে। সারি সারি থাম। মধ্যে পাঁচ ফুটের

বেনারসী শাড়ী
ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা

ব্যবধান। মার্বেল পাথরের জাফরিকাটা ঝিলেন ঝুলছে এক থাম থেকে অন্যেক থামের মধ্যে। ওপরে ঝিলেন, নীচে প্রাচীর, দুপাশে থাম—মাঝখানের ফাঁকটা যেন একটি মোগলাই গবাক্ষ। এমনি গবাক্ষ সারি সারি।

গবাক্ষপথে দেখা যায়, কেন্দ্রস্থিত বৃত্তাকার পথটি। বৃত্তের ঠিক কেন্দ্রবিন্দুতে একটি ফোয়ারা। ফোয়ারার শীর্ষে একটি পাথরের মূর্তি।

হলঘরের দরজা থেকে দেখা যাচ্ছিল প্রস্তরমূর্তির পেছন দিকটা। মূর্তি আর ফোয়ারার ওপাশে, বৃত্তাকার পথের ওপর দাঁড়িয়েছিল আর একটি মূর্তি। নিথর দেহে দাঁড়িয়ে থাকলেও সে মূর্তি জীবন্ত মানুষের। ভীমদর্শন এক কাপালিক। মাথায় জটাভার।

আরক্ত চোখে অনিমেষে তাকিয়েছিল ফোয়ারার শীর্ষস্থিত প্রস্তরমূর্তির দিকে। পেছনদিক থেকে দেখলেও বোঝা যায়, সে মূর্তি সাধারণ কোনো মূর্তি নয়। অসুরাকৃতি সেই শিলাদেহ ঈষৎ ঝুঁকে ছিল কাপালিকের দিকে।

কাপালিকের ভস্মাচ্ছাদিত দেহেও যেন কোনো প্রাণ ছিল না।

•

মিউজিয়ামের প্রবেশ পথেই অভ্যর্থনা জানালেন স্বয়ং রাজা রাঘবনারায়ণ। রাজার মতই বেশভূষা তাঁর। মাথায় জহরৎ বসানো উষ্ণীষ, কানে কমল হীরের মীরবোলি; জরিদার রেশমের মহার্ঘ পোশাকে সর্বাঙ্গ আবৃত।

একথা সেকথার পর রাণী সাগরিকা বললেন,—"সাধুবাবা দেখছি ধ্যানস্থ। তোমার পদ্মরাগটাই আগে দেখাও এঁদের।"

যেন এই প্রস্তাবের অপেক্ষায় ছিলেন রাজা রাঘবনারায়ণ। তৎক্ষণাৎ তিনি হাতীর দাঁতের পেটিকায় সোনার চাবী লাগালেন এবং ডালা তুলে দিয়ে বললেন, "এই সেই মণি!"

*

অকস্মাৎ যেন এক রক্তজ্যোতি ঠিকরে বেরিয়ে এল পেটিকার মধ্যে থেকে। চোখ সয়ে গেল অচিরেই। তখন দেখা গেল লাল মখমলের ওপর বসানো ছোটখাট নারকেলের মত একটা প্রকাণ্ড পদ্মরাগমণি।

অবহেলায় হাতের তালুতে মণিটা তুলে নিলেন রাজা রাঘবনারায়ণ। মণির কাঞ্চন মূল্যের চাইতে ঐতিহাসিক মূল্যটাই যে তাঁর কাছে অনেক বেশি, তা স্পষ্ট বোঝা গেল তাঁর ভাবভঙ্গী দেখে। সবার বিস্ফারিত দৃষ্টি যখন পদ্মরাগের দিকে নিবদ্ধ, রাজার স্বপ্নালু দৃষ্টি তখন কড়িকাঠের দিকে প্রসারিত—সম্ভবত তারও ঊর্ধে লোকাতীত কোনো কিছুর দিকে।

মৃদুকণ্ঠে পদ্মরাগের ইতিহাস আরও একবার শোনাতে শুরু করলেন রাজা। কথা বলতে বলতে মণিটাকে রাখলেন গবাক্ষের ওপর।



এই সেই মণি—

ঠিক তখনি বৃত্তাকার পথের খানিকটা ঘুরে গবাক্ষের অদূরে এসে দাঁড়াল কাপালিক। পলকহীন চোখে তাকিয়ে রইল ফোয়ারার মূর্তির দিকে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হন্তদন্ত হয়ে হলঘরে প্রবেশ করল প্রসেনজিৎ। পেছনে নাছোড়বান্দা কয়েৌটি-বিশেষজ্ঞ।

•

প্রসেনজিৎ যে সঙ্গে নেই, এতক্ষণ সে খেয়াল ছিল না রাণী সাগরিকার। তাই বিস্মিতকণ্ঠে বললেন, "কোথায় গেছিলে?"

"যাবো আর কোথায়?" ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলল প্রসেনজিৎ। "যেখানেই যাই, সেখানেই তো দেখি এই আঁচিল—"

"আপনার কপালের ঠিক মাঝখানে—"

"শুরু করল কয়েৌটি-বিশেষজ্ঞ।

"অ্যাও!" হুংকার ছাড়ল প্রসেনজিৎ।

চেঁচামেচি শুনে স্বপ্নজগৎ থেকে বস্তুজগতে ফিরে এসেছিলেন রাজা রাঘবনারায়ণ। এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন স্বপ্নের মত। এবার এগিয়ে এসে বিরক্ত কণ্ঠে বললেন, "ব্যাপার কী?"

"প্রসেনজিতের কপালের ঐ যে দুটো ছবি দেখছেন, শুধু ঐ দুটির স্টাডি করে প্রসেনজিতের ব্রেনের কয়েকটা বৈশিষ্ট্য বলে দিতে চান এই ভদ্রলোক" জবাব দিল কৃপাসিং।

"উত্তম প্রস্তাব", বললেন রাজাসাহেব। 'এতে প্রসেনজিতের আপত্তির—"

কথাটা শেষ হল না। তার আগেই বিকট চীৎকারে গম্ গম্ করে উঠল গোটা হলঘরটা!

*

গ্লাসেসের মত প্রচণ্ড জোরে লাফ মেরে গবাক্ষের সামনে পৌঁছলো প্রসেনজিৎ। পর মুহূর্তেই থামের পাশ দিয়ে ঝুঁকে পড়ে চীৎকার করে উঠল, "গেছে! গেছে!"

*

হাতটা দেখা গেল ঠিক তখনি!

বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে প্রত্যেকেই দেখল এবং শিহরিত হল।

বিশেষজ্ঞেরা সবাই একটা আশ্চর্য সাদা হাত চকের পাশে ফেলে এল গবাক্ষের ওপর দ্রুত প্রসারিত। ছিল,

মুঠোর মধ্যে ধরল মণি এবং অদৃশ্য হল নিমেষে!

হাতটা আবির্ভূত হল থামের আড়ালে গবাক্ষের ওদিক থেকে এবং অন্তর্ধানও ঘটল সেইদিকে!

৪

সবাই যখন পাথরের মত নিস্পন্দ, তখন উচ্চকণ্ঠে প্রথম কথা বলল ফাদার ঘনশ্যাম, "সাধুবাবা কোথায়?"

রক্তকম্বল পথ শূন্য। সাধুবাবু নেই।

চেঁচিয়ে উঠল প্রসেনজিৎ, "এদিকে এলেই দেখতে পাবেন।"

গবাক্ষের কাছে গিয়ে সত্যিই দেখা গেল সাধুবাবাকে।

কিন্তু বড়ই শোচনীয় এবং অসম্মানজনক পরিস্থিতিতে কেননা, বাঁ হাতে জটা খামচে ধরে নির্দয়ভাবে ঝাঁকুনি দিচ্ছিল প্রসেনজিৎ এবং জ্ঞানপাপীর মতই নীরবে সেই অপমান হজম করে যাচ্ছিল ভীমাকার সাধুবাবু।

দৃশ্যটি দর্শনীয় সন্দেহ নেই। বিশেষ করে প্রসেনজিতের বাহাদুরি। ডানহাত পাৎলুনের পকেটে রেখে শুধু বাঁ হাতের মুঠোয় দৈত্যাকার কাপালিককে বেড়ালছানার মতই ঝাঁকাচ্ছিল প্রসেনজিৎ।

তৎক্ষণাৎ দেহ তল্লাশ করা হল সাধুবাবার। কিন্তু পাওয়া গেল না পদ্মরাগ মণি।

তোলপাড় করে ফেলা হল গোটা মিউজিয়মটা। তন্ন তন্ন করে দেখা হল ফোয়ারার জল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা হল ঘরের মেঝে।

কিন্তু পদ্মরাগ মণির রক্তচ্ছটাও দেখা গেল না কোথাও।

প্রত্যেকেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল পদ্মরাগ অন্বেষণে। এমনকি বিষয়-উদাসীন ফাদার ঘনশ্যামও প্রসেনজিতের সঙ্গে সমানে বকবক করতে করতে ঘুরছিল ঘরময়।

আর নিষ্কম্পশিখার মতই ফোয়ারার পাশে বসেছিল ঋজুদেহ কাপালিক। কৌতুক উচ্ছ্বসিত দুই চক্ষু নিবদ্ধ ছিল সন্ধানীদলের দিকে—ঠোঁটের কোণে নৃত্য করছিল বিচিত্র হাসি!

*

আশ্চর্য!

বিংশ শতাব্দীতেও এমন কান্ড ঘটে? অতগুলো চোখের সামনে থেকেই দিনদুপুরে বাতাসে মিলিয়ে গেল অতবড় একটা মণি? এ কান্ড দেখেও যদি অলৌকিক ব্যাপারে বিশ্বাস না আসে তো কিসে আসবে? তবে রহস্য এইখানেই শেষ হল না, বরং বলা যায় শুরু হল। কেন না—

রাজা বললেন, 'পিয়ারি, সব জায়গায় দেখা হয়েছে তো?

"শুধু লালমাছগুলোর পেট চিরে দেখা বাকী আছে।" মুখ গোঁজ করে বলল পিয়ারিলাল।

চুপ করে রইলেন রাজা রাঘবনারায়ণ। তারপর জলদগম্ভীর কণ্ঠে বললেন, "বিশ্বরহস্যের এককণা রহস্য আজ আমরা দেখলাম। ঈশ্বরই দেখালেন। সাধুবাবা নিমিত্ত মাত্র। আমি জানি পদ্মরাগ কোথায়।"

"কোথায়?" ব্যগ্রকণ্ঠ রাণী সাগরিকার।

"যেখান থেকে এসেছিল, সেইখানে। আসামের পাহাড়ের চূড়ায় সেই দেবতার ললাটে। পদ্মরাগ ফিরে গেছে সেইখানেই। ফিরে গেছে আমাদেরই চোখের সামনে দিয়ে—শূন্যপথে, অদৃশ্যভাবে।"

"অসম্ভব!" করোটি-বিশেষজ্ঞ লোকটি সারস পাখীর মত লম্বা গলা তুলে যেন খেঁকিয়ে উঠল।

নিমেষে শক্ত হয়ে উঠল রাজা সাহেবের চোয়ালের রেখা।

"অসম্ভব আমাদের সীমিত জ্ঞানের হিসেবে। কিন্তু তত্ত্বরহস্যের আমরা কতটুকু জানি? সাধুবাবা তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার সামান্য কিছু আজ আমাদের দেখালেন কেবল শিক্ষা দেওয়ার জন্য। এরপরও যদি—"

কথাটা শেষ হল না। আচম্বিতে আবার একটা চীৎকারে গম্ গম্ করে উঠল হলঘর, "একী! একী! একী!"

চোখ তুলতেই সবাই দেখতে পেল। ছানাবড়ার মত বড় বড় চোখে গবাক্ষের দিকে তাকিয়ে আছে প্রসেনজিৎ। নিঃসীম বিস্ময়ে যেন চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

আর, মূর্তিমান প্রহেলিকার মতই গবাক্ষের ওপর রক্তজ্যোতি বিকিরণ করছে একটা আশ্চর্য উজ্জ্বল বস্তু।

হারিয়ে যাওয়া সেই পদ্মরাগমণি।

*

নিথরদেহে ফোয়ারার পাশে তখনও বসে রইল ভীমদর্শন কাপালিক। পরম কৌতুকে চিকমিক করতে লাগল দুদুটো পদ্মরাগমণির মত দুটো রক্তচক্ষু। ঠোঁটের কোণে ভেসে রইল নিবিড় রহস্যঘেরা মিটিমিটি হাসি।

দুইহাত পেছনে রেখে কিছুক্ষণ পাদচারণা করল পিয়ারিলাল। তারপর অতিকষ্টে কণ্ঠের উত্তেজনা গোপন করে বললেন, "একেই বলে মেসমেরিজম! পদ্মরাগ আগাগোড়াই ছিল আমাদের সামনে। কিন্তু সাধুবাবার মেসমেরিজম-এর প্রভাবে আমরা এতক্ষণ তা দেখিনি। প্রভাবমুক্ত হতেই দেখেছি। পদ্মরাগ কিন্তু কোথাও নড়েনি—এমনকি ছাইমাখা যে হাতটা দেখেছি। তাও মেসমেরিজম-এর খেলা!"

রাণী সাগরিকা বললেন, "প্রসেনজিতের অবিশ্বাস এবার নিশ্চয় ঘুচেছে?"

হেঁটমাথায় দাঁড়িয়ে রইল প্রসেনজিৎ।

*

একে একে হলঘর থেকে বেরিয়ে এল সকলে। সারস পাখীর মত লম্বা লম্বা ঠ্যাং ফেলে নিজের তাঁবুর দিকে এগুলো করোটি-বিশেষজ্ঞ। এমন সময়ে গলাখাঁকারি

যুগজয়ী বই

রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য
শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত

ঠাকুরবাড়ীর কথা

দ্বারকানাথের পূর্বপুরুষ থেকে রবীন্দ্রনাথের উত্তরপুরুষদের তথ্যপূর্ণ জীবন কথা। [১২·০০]

উপনিষদের দর্শন

উক্ত বিষয়ের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা। [৭·৫০]

রবীন্দ্র দর্শন

কবিগুরুর জীবন-দর্শন। [২·৫০]

শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত

বাঁকুড়ার মন্দির

বাঁকুড়ার তথা বাংলার মন্দিরগুলির সচিত্র মূল্যায়ন। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা: ৬৭ আর্ট প্লেট। [২৫·০০]

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত রচিত

ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য

সাহিত্য আকাদমী পুরস্কারপ্রাপ্ত বই। [১৬·০০]

সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ও সংকলিত

বৈষ্ণব পদাবলী

প্রায় চার হাজার পদের আকর গ্রন্থ। [২৫·০০]

অমলেন্দু দাশগুপ্ত রচিত

ডেটিনিউ

জাতীয় জীবনের একটি অধ্যায়।
শ্রীভূপেন দত্তের ভূমিকা। [৩·৫০]

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত

বঙ্কিম রচনাবলী

১ম খণ্ডে সমগ্র উপন্যাস। [১২·৫০]
২য় খণ্ডে সমগ্র সাহিত্য অংশ। [১৭·০০]

ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত

দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী

দুই খণ্ডে সমগ্র রচনা।
১ম খণ্ড [১২·৫০] ২য় খণ্ড [১৫·০০]

ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত

মধুসূদন রচনাবলী

ইংরেজিসহ সমগ্র রচনা এক খণ্ডে। [১৫·০০]

দীনবন্ধু রচনাবলী

সমগ্র রচনা এক খণ্ডে। [১০·০০]

প্রতি রচনাবলীতে জীবন-কথা ও সাহিত্য কীর্তি আলোচিত।

সাহিত্য সংসদ

৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলি-৯

শুয়ে পেছন ফিরে দেখল বর্তুলবপু নিয়ে পেছন পেছন আসছে কাদার ঘনশ্যাম।

কাছে এসে বোকা বোকা হাসি হেসে বলল ঘনশ্যাম "বিরক্ত করলাম নাতো?"

"মোটেই না। আপনার থলিটা দেখাবেন বুঝি?"

"না, না। আমি বলছিলাম কি, আপনি মেসমেরিজম এর আগে দেখেছেন?"

"দেখবো না কেন? তবে আজ যা দেখলাম তা স্রেফ বুজরুকি।"

"তবে পদ্মরাগের পুনরাবির্ভাব ঘটল কি ভাবে?

"হাতসাফাইয়ের কায়দায়।"

"এই দেখুন। আমি যা জানি আপনিও তা জানেন। আমি কিন্তু আর একটা জিনিস খোঁজ জানি" নিরীহকণ্ঠে বলল কাদার ঘনশ্যাম।

'কী?' দুই চোখ ছুঁচ হয়ে এল করোটি বিশেষজ্ঞের।

"আপনার প্রকৃত পেশা।"

"সেটা কী?"

"ক্রেনিয়লজি আপনার হবি হতে পারে, কিন্তু নেশা নয়, পেশাও নয়। আপনার প্রকৃত নেশা এবং পেশা হল গোয়েন্দাগিরি। আপনি একজন প্রাইভেট গোয়েন্দা!"

•

অপলকে তাকিয়ে রইল সারসপাখী-সদৃশ করোটি-বিশেষজ্ঞ।

তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, "তাতে কি প্রমাণিত হল?"

"কসুর না। শুধু সত্যের প্রকাশ ঘটল। সম্ভবত রাণী সাগরিকই আপনাকে এখানে অ্যাপয়েন্ট করেছেন। কিন্তু সেকথা থাক। মণিটা কেন ফিরে এল বলুন তো?"

"আমার ভয়ে। কাপালিক বুঝেছিল আমি কে, তাই।"

কাষ্ঠহাসি হাসল কাদার ঘনশ্যাম। বলল, "কয়েকটা অতি সামান্য, কিন্তু অদ্ভুত ঘটনা হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে।"

"যথা?"

"এক নম্বর—প্রসেনজিৎ কাপালিকের জারিজুরি ফাঁস করার জন্যেই রাণীর সঙ্গে বেরিয়েছিল। কিন্তু কাপালিক হাত দেখে ভূতভবিষ্যৎ বর্তমান বলে শুনে আর রাজী হল না কেন?"

"বেশ। তারপর?"

"দু নম্বর—প্রসেনজিৎ শুধু বাঁ হাতে কাপালিককে ধরে রইল কেন?"

"তারপর?"

"তিন নম্বর—প্রসেনজিৎ ডানহাতটা পকেটের মধ্যে রেখে দিয়েছিল কেন?

"তারপর?"

"চার নম্বর—প্রসেনজিৎ হাতে গ্লাভস্ পরেছিল কেন?"

"তারপর?"

"পাঁচ নম্বর—প্রসেনজিতের চাইতে কাপালিক অনেক শক্তিমান পুরুষ। অথচ প্রসেনজিৎ তাকে একহাতে ধরে রইল—কাপালিক নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার কোনো চেষ্টা করল না কেন?"

"আর কিছু আছে?"

"নেই। কিন্তু এই পাঁচটা 'কেন'র উত্তর কি বলুন দিকি?'

"আপনিই বলুন।"

"প্রসেনজিৎ মণি-চোর, কাপালিক নির্দোষ।"

"কথাটা আর কাউকে বলবেন না। সন্দেহ করবে। ভাববে ইদানীং গাঁজা ধরেছেন।"

"সবটা শুনলে তা ভাববে না।"

"তবে শুনি সবটা।"

"প্রসেনজিৎ কাপালিককে হাত দেখায়নি কেন? কারণ আগে থেকই ডানহাতে ছাই রাখা ছিল। দস্তানাও পরেছিল সেই কারণে প্রসেনজিৎ কাপালিককে বাঁহাতে ধরেছিল কেন? কারণ থামের এপাশ দিয়ে সে বাঁহাতে ধরেছিল কাপালিককে, আর ওপাশ দিয়ে দস্তানাখোলা ছাইমাখা ডানহাত বাড়িয়ে ধরেছিল মণিটাকে। পেছন থেকে আমরা তাই দেখেছি শুধু একটা হাত। ছাইমাখা সে হাত কাপালিকেরই ভেবে নিয়েছি। হাত সাফাইয়ের কায়দায় মণিটাকে পকেটস্থ করে এই কারণেই প্রসেনজিৎ ডানহাত আর বার করেনি।"

শুনতে শুনতে প্রাইভেট ডিটেকটিভের মুখের ভাব পালটে যাচ্ছিল। তাচ্ছিল্যের জায়গায় ফুটে উঠেছিল নিবিড় বিস্ময়। এবার চোখাপিলে বলল, "কিন্তু কাপালিক কেন ধস্তাধস্তি করেনি?"

"কাপালিকের চরম ঈপ্সা কি? অলৌকিক ক্ষমতালাভ। কিন্তু অযাচিতভাবে এই ক্ষমতার কৃতিত্ব যদি তাকে কেউ দেয়, তবে সেটা না নেওয়াটা বোকামি। কাপালিক বুদ্ধিমান পুরুষ। তাই সব বুঝেও সে মৌনী হয়ে গেছে। কারণ একটা বিরাট অলৌকিক মায়ার পুরো কৃতিত্বটাই সে পেয়ে যাচ্ছে বিনা পরিশ্রমে। যার নাম পাবলিসিটি অ্যামবিশন।"

"কিন্তু প্রসেনজিৎ—"

"অভাবী ছেলে। রাণীর কাছ থেকে হামেশাই টাকা ধার করত। তাই প্ল্যান করেছিল পদ্মরাগকে উধাও করে দেওয়ার।"

"কিন্তু ফেরৎ দিল কেন?"

"আমার কাজই তো তাই। পাপীর মনকে অনুতাপের আগুনে পুড়িয়ে শোধন করে দেওয়া।"

সশ্রদ্ধকণ্ঠে বলল ডিটেকটিভ, "কিন্তু কাপালিকের ভণ্ডামি আপনার ফাঁস করে দেওয়া উচিত ছিল।"

"বটগাছ বিরাট হয়। তার তলায় পাপী আসে, পুণ্যবান আসে—সবাই স্থান পায়। সব প্রাচীন ধর্মেই এমনি পাপপুণ্যের খেলা চলে সেখানে কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করাটা বিবেক আটকায়না। কি?"

* বিদেশী ছায়ায়।



সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র ও সমাজচিন্তা

কমল চৌধুরী

৭১নং [?] সিমলা স্ট্রীটে ছিল প্রভাকর প্রেস। সেখান থেকেই নিয়মিত সংবাদ প্রভাকর প্রকাশিত হোত। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ছিলেন সম্পাদক। পাথুরিয়াঘাটার যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের অর্থ সাহায্যেই পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল। প্রভাকর প্রথমে ছিল সাপ্তাহিক। ১৮৩১ খৃঃ ২৮ জানুআরি প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। প্রতি শুক্রবার প্রকাশিত হোত। মাঘ মাসে প্রভাকর (১৬ মাঘ ১২৩৭ সাল) প্রকাশের ছয় মাস বাদেই ঠাকুর বাড়ীতে একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয় পত্রিকা প্রকাশের জন্য।

ঈশ্বর গুপ্তের সম্পাদনায় পত্রিকাটির জনপ্রিয়তা দিনের পর দিন বাড়তে থাকে। প্রভাকরের পদ্য এবং প্রবন্ধই ছিল অন্যতম আকর্ষণ। ঈশ্বর গুপ্তের রুচিবৈচিত্র্য ছিল। তা না হলে এত বিচিত্র বিষয়ের রচনা তিনি পত্রিকায় স্থান দিতে পারতেন না। ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য, শিক্ষা ছাড়াও দেশ-বিদেশের সংবাদে ভরে থাকত প্রভাকরের পাতা। সেকালের বহু বিখ্যাত পণ্ডিত ও লেখকদের পত্রিকার নিয়মিত লেখক হিসাবে যুক্ত থাকতে দেখা যায়। এদের মধ্যে প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ, রাধানাথ শিরোমণি, গৌরীশংকর তর্কবাগীশ, নীলরতন হালদার, গঙ্গাধর তর্কবাগীশ, ব্রজমোহন সিংহ, গোপালকৃষ্ণ মিত্র, বিশ্বম্ভর পাইন, রাধাকান্ত দেব, জয়গোপাল তর্কালংকার, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামকমল সেন, গোবিন্দচন্দ্র সেন, ধর্মদাস পালিত, কানাইলাল ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, উমেশচন্দ্র দত্ত, শম্ভুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসন্নচন্দ্র ঘোষ, রামলোচন ঘোষ, হরিমোহন সেন, জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক, সীতানাথ ঘোষ, গণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, যাদবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, হরনাথ মিত্র, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, গোপালচন্দ্র দত্ত, শ্যামাচরণ বসু, উমানাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনাথ শীল, শম্ভুনাথ পণ্ডিত এবং আরো অনেকে। পত্রিকার অন্যতম হিতাকাঙ্ক্ষীদের মধ্যে ছিলেন গিরিশচন্দ্র দেব, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রমাপ্রসাদ রায়, কালীপ্রসাদ ঘোষ, মাধবচন্দ্র সেন, রাজেন্দ্রলাল দত্ত, হরচন্দ্র লাহিড়ী, অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরী, হরিনারায়ণ ঘোষ প্রভৃতি। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং দীনবন্ধু মিত্রের লেখকজীবনের শুরু [illegible] প্রভাকরে।

প্রভাকরের শিরোভাবে দুটি শ্লোক ছাপা হোত। এই দুটি রচনা করেছিলেন সংস্কৃত কলেজের অলংকার শাস্ত্রের অধ্যাপক প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ। শ্লোক দুটি হোলঃ

।।সতাং মনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব
সর্বেষু সমপ্রভাকরঃ।।
।।উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকর
সদর্থসম্বাদ নবপ্রভাকরঃ।।
।।নন্তং চন্দ্রকরাণে ভিন্ন মুকুলাম্বিন্দীবরেষু
ক্বচিচ্চন্দ্রামং ভ্রামমতন্দ্র
মীষাদমৃত: পীত্বা ক্ষুধাকাতরঃ।।
।।অদ্যোদাম্বিমল প্রভাকরকর প্রোশ্ভিন্ন-
পদ্মোদরেস্বচ্ছন্দ:
দিবসে পিবন্তু চতুবাঃ স্বান্তম্বরেফারসং।।

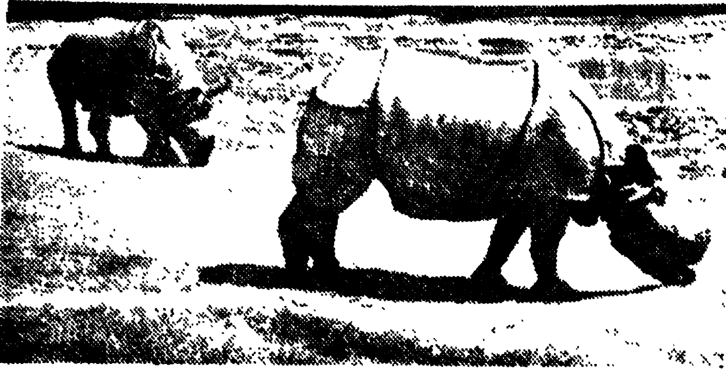
সংবাদপ্রভাকর প্রকাশের উদ্দেশ্যও জনসাধারণকে জানান হয়েছিল। ১৮৩১ খৃঃ ১৯ ফেব্রুআরি 'সমাচার দর্পণে' একটি দীর্ঘ বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। ঐ বিজ্ঞাপনে জানান হয়েছিল যে, প্রভাকরে কলকাতার গভরণরের কাউন্সিল সুপ্রিম কোর্ট, পুলিশ, সদর দেওয়ানি ও নিজামত আদালতের বোর্ডের সংবাদ, ইংলাণ্ড ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের সংবাদ থাকবে। তাছাড়া আরও থাকবে ভারতবর্ষে কোম্পানীর অধীন অঞ্চলের সংবাদ, রাজকর্মে নিয়োগ বদলির খবর, যুদ্ধ, শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ের খবর। দৈব দুর্ঘটনা এবং রহস্য বিষয়ক সংবাদও বাদ যাবে না। পরিশেষে জানান হয়... 'পাঠকবর্গেরা অবকাশে পরিশ্রম স্বীকার করিয়াও যদ্যপি এই পত্র অবলোকন করেন তবে অনায়াসে একস্থানে অবস্থান করিয়াও নানা দেশীয় বৃত্তান্তাবগত ও বহুদর্শী হইতে পারেন......।' সেকালের পাঠক সম্ভবত এই কারণেই পত্রিকাটির প্রতি যথাযোগ্য সমাদর জানিয়েছিল।

কিন্তু প্রভাকর দীর্ঘকাল প্রকাশিত হয়নি। ১২৩৯ সালে যোগেন্দ্রমোহন মারা যান। এই বৎসরের ১৩ জ্যৈষ্ঠ (১৮৩২ খৃঃ ২৫ মে) প্রভাকরের ৬৯ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়। এর মাস তিনেক আগেই ঈশ্বরচন্দ্র পত্রিকার সংস্রব ত্যাগ করেছিলেন। তারপর থেকেই প্রভাকরের লেখার জোর অনেক কমে যায়। ক্রমশঃ জনপ্রিয়তা হ্রাস পাওয়ায় একদিন প্রকাশও বন্ধ হয়ে গেল। চার বৎসর প্রভাকর বন্ধ ছিল।

প্রভাকর আবার প্রকাশিত হয় ১৮৩৬ খৃঃ ১০ আগষ্ট। এবার সাপ্তাহিক নয়; সপ্তাহে তিন দিন প্রকাশিত হোত। দ্বিতীয়-পর্যায় প্রভাকরের ব্যয়ভার বহন করেন পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর বাড়ীরই কানাইলাল ঠাকুর এবং গোপালচন্দ্র ঠাকুর। এবারও প্রভাকরের গদ্যপদ্যময় সাধুভাষা জনসমাদর লাভ করে। জনপ্রিয়তা বাড়বার ফলে পত্রিকাটি দৈনিকে রূপান্তরের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। প্রভাকর দৈনিক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে ১৮৩৯ খৃঃ ১৪ জুন (১ আষাঢ় ১২৪৬)। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম দৈনিক যেমন প্রভাকর, তেমনি প্রথম বাংলা দৈনিক সম্পাদনার সম্মান ঈশ্বর গুপ্তেরই প্রাপ্য। মাসিক মূল্য ছিল এক টাকা। প্রভাকরের প্রচার ও উন্নতিতে ঠাকুর পরিবারের অপরিশোধ্য ঋণের কথা গুপ্ত-কবি বার বার স্বীকার করে গেছেন। প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর। পরবর্তীকালে কানাইলাল ঠাকুর, চন্দ্রকুমার ঠাকুর, নন্দলাল ঠাকুর, হরকুমার ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রমানাথ ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এরা প্রত্যেকেই আন্তরিক যত্ন এবং পরিশ্রম দিয়ে প্রভাকরকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছিলেন।

উনিশ শতকে বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চিন্তাধারা কোন পথে কিভাবে প্রবাহিত হয়েছিল, তার বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাত সংবাদ প্রভাকরে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য শিক্ষা, ডিরোজিও ও ডফের প্রভাবে বাঙালী ছাত্রদের যুক্তিবাদী ও অবাধ চিন্তাধারাকে সমাজ সংস্কারের পথ দেখায়। প্রবীণ ও নবীনদের লড়াইয়ে সেকালে বাংলা দেশের আবহাওয়া বেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। গুপ্তকবি এই সংঘর্ষ থেকে দূরে থাকতে পারেননি। তার মত সমাজ-সচেতন ব্যক্তির পক্ষে দূরত্ব বজায় রেখে চলাও ছিল সম্পূর্ণ অসম্ভব।

সংবাদ প্রভাকরের একটি মাসিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল বৈশাখ ১২৬০ (১৮৫৩ খৃঃ)। এই বিশেষ সংস্করণে 'সর্বাগ্রে জগদীশ্বরের মহিমাবর্ণনা, নীতি-কাব্য ও বিখ্যাত মহাত্মাদিগের জীবন বৃত্তান্ত প্রভৃতি গদ্য-পদ্য পরিপূরিত উত্তম উত্তম প্রবন্ধ এবং সর্বশেষে—মাসের সমুদয় ঘটনা অর্থাৎ মাসিক সংবাদের সারমর্ম প্রকটিত' করাই ছিল সম্পাদকের অন্যতম লক্ষ্য। এই সুসম্পাদিত পত্রিকায় ঈশ্বরচন্দ্র প্রাচীন কবিয়ালদের রচনা ও জীবনী সংগ্রহ করে প্রকাশ করেন। এদের মধ্যে ছিলেন রামপ্রসাদ সেন, নিধুবাবু, রাম বসু, নিত্যানন্দদাস বৈরাগী, কেষ্টা মুচী, লালু-নন্দলাল, গোঁজলা গুই, হরু ঠাকুর, রাসু, নৃসিংহ, লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস। গুপ্তকবি যদি এই কাজে ব্রতী না হতেন সম্ভবত, এদের সমগ্র রূপটিই বিনষ্ট হয়ে যেত। ১২৫৭ সালের ১ বৈশাখ প্রভাকর কার্যালয়ে সাহিত্য সম্মেলন আয়োজিত হয়। পণ্ডিত ও লেখকরা আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। কবিতা ও প্রবন্ধ পাঠ হোত। আলাপ-আলোচনার অবশেষে জলযোগ—তারপর সভা শেষ।



চিড়িয়াখানার বাসিন্দা ফটো : রেখা সেন

এইটি গুপ্তকবি বাৎসরিক প্রীতিমিলন উৎসব হিসাবে রাখতে চেয়েছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মারা যান ১৮৫৯ খৃঃ ২৩ জানুআরি (১০ মাঘ ১২৬৫)। প্রভাকর সম্পাদনার দায়িত্ব নেন তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র গুপ্ত।

প্রভাকর ছাড়াও গুপ্তকবি আরো কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা করেছিলেন। কখনও তার নাম পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত থাকত কখনও তিনি গোপনেই থেকে যেতেন। প্রভাকর প্রেস থেকে একটি উত্তেজনামূলক পত্রিকা 'পাষন্ড পীড়ন' প্রকাশিত হয়েছিল। এই পত্রিকার সঙ্গে গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের 'সংবাদ রসরাজের' তীব্র মসীযুদ্ধ সেকালে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করে। গুপ্তকবি পাষন্ড পীড়নে পদ্যে তার মত প্রকাশ করলে গৌরীশঙ্কর রসরাজে পদ্যে উত্তর দিতেন। সেই আক্রমণের ভাষা ছিল যেমন অশ্লীল তেমনি কুৎসাপূর্ণ। শেষ পর্যন্ত জয় হয়েছিল ঈশ্বর গুপ্তের। পাষন্ড পীড়ন ১৮৪৬ খৃঃ ২০ জুন (১২৫৩ সালের ৭ আষাঢ়) প্রকাশিত হয়ে ১৮৪৭ খৃঃ আগস্ট-সেপ্টেম্বরে বন্ধ হয়ে যায়। পত্রিকাটি ছিল সাপ্তাহিক। পত্রিকাটি অদ্ভুত কারণে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। প্রকাশক ছিলেন সীতানাথ ঘোষ। তিনি পত্রিকার হেড লাইন চুরি করে পালিয়ে যান এবং বিপক্ষ 'সম্বাদভাস্করে' যোগ দেন।

প্রভাকর প্রেস থেকে প্রকাশিত আর একটি সাপ্তাহিক হোল "সংবাদ সাধুরঞ্জন"। প্রতি সোমবার প্রকাশিত হোত। ১৮৪৭ খৃঃ আগস্ট মাসে (১২৫৪ সালের ভাদ্র) প্রকাশিত হয়। বার বৎসর পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। ১২৬৬ সালের বৈশাখে বন্ধ হয়ে যায়।

নানান বিষয়ের মূল্যবান প্রবন্ধ এবং কবিতা প্রচারই ছিল সংবাদ সাধুরঞ্জন প্রকাশের উদ্দেশ্য। ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য বা ছাত্রসমাজই ছিলেন এই পত্রিকার লেখক-গোষ্ঠী। সেকালের জনসাধারণের মধ্যে এর প্রবল সমাদর ঘটেছিল। শিক্ষিত, স্বল্প-শিক্ষিত, ছাত্র এবং নারী প্রত্যেকেই প্রায় এর পাঠক ছিলেন।

পত্রিকাটির জনসমাদর এত বেশী ঘটে যে, পত্রিকায় প্রকাশের জন্য বিজ্ঞাপন আসতে থাকে। ঈশ্বরচন্দ্র সংবাদ সাধুরঞ্জন থেকে নিজের নাম প্রত্যাহার করে নেন। সম্পাদক হিসাবে নবকৃষ্ণ রায়ের নাম ছাপা হতে থাকে। তিনি ছিলেন মেডিকেল কলেজের ছাত্র। লেখার ব্যাপারে তার মাথা খেলত না। নাম ছাড়া কাগজের সঙ্গে তার সম্পর্কও বিশেষ ছিল না। সব কাজই করতেন ঈশ্বরচন্দ্র এবং তার অনুরাগী সহকর্মীরা।

ঈশ্বরচন্দ্র মারা যাওয়ার পর সংবাদ সাধুরঞ্জন নিয়ে একটি মজার ব্যাপার ঘটে। নবকৃষ্ণ রায় সাধুরঞ্জন স্বয়ং গ্রহণ করতে চান। কিন্তু পত্রিকার পরিচালকরা তাতে অসম্মত হলেন। তারা পত্রিকা থেকে লভ্যাংশ তাকে দিতে রাজি ছিলেন; কিন্তু স্বত্ব দিতে চাননি। ঈশ্বরচন্দ্র উইলেও এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন। নবকৃষ্ণ একদিন শেরিফ অফিসে গিয়ে বিজ্ঞাপনের জন্য প্রাপ্য ছয় মাসের টাকা নিয়ে এলেন। পত্রিকার পরিচালকরা এ ব্যাপারে কিছুই জানতে পারলেন না। এ ব্যাপারে কিছু জানতে চাইলে তিনি কোন উত্তর দিতে অসম্মত হন। কিন্তু একদিন রাত্রে হঠাৎ তিনি পত্রিকার হেড লাইন এবং অন্যান্য জিনিসপত্র নিয়ে চলে যান। আর সাধুরঞ্জন প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু প্রভাকর কর্তৃপক্ষ নানাভাবে চেষ্টা করেও যখন কৃতকার্য হলেন না, তখন তারা 'সংবাদ দ্বিজরাজ' নামে আর একটি সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন।

সংবাদপ্রভাকর প্রকাশের এক বছর বাদে মেছুয়াবাজার থেকে 'সংবাদ রত্নাবলী' সাপ্তাহিক প্রকাশিত হয়েছিল। মহেশচন্দ্র পাল ছিলেন সম্পাদক। কিন্তু সমস্ত দায়িত্বভার ছিল ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ওপর। কারণ মহেশচন্দ্রের কোনরকম রচনাশক্তি ছিল না। পরে সম্পাদক হন রাজনারায়ণ ভট্টাচার্য। ১৮৩২ খৃঃ ২৪ জুলাই প্রথম প্রকাশিত হয়। এক বৎসর আট মাস চলবার পর রত্নাবলী বন্ধ হয়ে যায়। অর্থ সরবরাহ করতেন মেছুয়াবাজারের জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক।

ঈশ্বর গুপ্তের সম্পাদকীয় দৃষ্টিভঙ্গী বিচারের অন্যতম প্রতিবন্ধক হোল তার মত-বৈপরীত্য। উদার মত, প্রগতি চিন্তা এবং সনাতন রক্ষনশীল চিন্তা ধারার টানাপোড়েনে গুপ্তকবি যেন দিগভ্রান্ত। নবজাগ্রত চিন্তা এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় গলদের ফলে যে বিকৃত সংস্কৃতির উদ্ভব হচ্ছে তা প্রভাকর সম্পাদকের চোখে ধরা পড়েছিল। তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে হিন্দুয়ানী বজায় রাখতে চেয়েছিলেন নিজের ধর্মকে বাঁচাবার জন্য। খৃষ্টধর্ম প্রচাররোধ এবং হিন্দুবিদ্বেষ প্রতিরোধও তার মধ্যে সক্রিয় ছিল।

শ্লেষ ও ব্যংগাত্মকভাবে এই কবি-সাংবাদিকের অধিকাংশ রচনাই বিশিষ্ট। তিনি ছিলেন স্বদেশপ্রেমিক দরদী প্রাণের মানুষ। বাংলাদেশে অন্নাভাব কোম্পানীর অত্যাচার, নীলকরদের অমানুষিক উৎপীড়ন, বাংলার দুর্গতি তাকে বিক্ষুব্ধ করেছিল বলে তার কলম ক্ষুরধার অগ্নিবর্ষণে সকলকে বিব্রত করে তুলেছিল। বাংলা দেশের মানুষকে পরাধীনতার গ্লানি সম্পর্কে সচেতন এবং আত্মমর্যাদাবোধে উদ্দীপ্ত করতে গুপ্তকবির ভূমিকা ছিল অনন্য। তিনি বলেছিলেন:

"মিছা মণিমুক্তা হেম
স্বদেশের প্রিয় প্রেম
তার চেয়ে রত্ন নাহি আর।"

উনিশ শতকের বহু মনীষীর মতই ঈশ্বর গুপ্তের সমগ্র জীবনটাই জটিলতায় আচ্ছন্ন। উচ্চতর শিক্ষালাভের সুযোগ তার ঘটেনি। জীবনে প্রতিষ্ঠা অর্জনের জন্য কঠোর সংগ্রাম করতে হয়েছিল। নানান প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে এই মানুষটি বহু শিক্ষালাভ করেছিলেন। নানান বিপরীতধর্মী বক্তব্যের মধ্যে স্বীয় চরিত্রকে জটিল থেকে জটিলতর করে তুলেছিলেন।

আদর্শ বৈপরীত্য ।।

প্রভাকর সম্পাদক রক্ষনশীল বা প্রগতি-বিমুখ ছিলেন কি না—তা নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। হিন্দু কলেজের তরুণ ছাত্র-সমাজ, হিন্দুধর্ম সংস্কারকামী ব্রাহ্মদের বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন ঈশ্বর গুপ্ত। তরুণ সমাজের মুখপত্র ছিল 'এনকয়ারার' এবং 'জ্ঞানান্বেষণ'। রামমোহনপন্থী উদার-মতাবলম্বীদের ছিল 'সম্বাদকৌমুদী'। তাদের সমর্থক ছিল ইণ্ডিয়া গেজেট, বেঙ্গল হরকরা প্রভৃতি পত্রিকা। এই উভয় দলের প্রতি রক্ষনশীলদের তীব্র আক্রোশ নানাভাবে ফেটে পড়েছিল তাছাড়া ইতিমধ্যেই ব্রাহ্মদের চেষ্টায় সতীদাহপ্রথা বন্ধ হয়েছে। তারপর তারা ছিল প্রতিমা পূজা বিরোধী। এই

শক্তিশালী দলের সংগে কলম নিয়ে লড়তে হয়েছিল গুপ্তকবিকে।

প্রশ্ন উঠতে পারে ঈশ্বর গুপ্ত কেন রক্ষণশীল হলেন। তার কারণ উদারপন্থী বা ইংয়বেঙ্গলের দলে যাওয়ার মত শিক্ষা, আর্থিক অবস্থা বা মানসিক প্রস্তুতি ছিল অনুপস্থিত। হিন্দু কলেজের ছাত্রদের বিরুদ্ধে লিখেছেন। ডিরোজিওর বিতাড়নে উল্লসিত। অন্য সম্প্রদায়ের ছেলেদের হিন্দু কলেজে প্রবেশের বিরোধিতা করে প্রভাকরের পাতায় তীব্র ভাষায় কর্তৃপক্ষকে আক্রমণ। ঈশ্বর গুপ্তের এ মনোভাব তিরিশ দশক পর্যন্ত শক্তভাবে দানা বেঁধে ছিল।

কিন্তু প্রভাকরের গোঁড়ামী চিরদিন বজায় থাকেনি। গুপ্তকবি ক্রমশ স্বাধীন মতাদর্শ গড়ে তুলেছিলেন। তরুণ লেখকদের নিয়ে একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠী গড়ে ওঠবার সংগে সংগে উদারপন্থী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের মুখপত্ররূপে এর স্বরূপ ফুটে উঠতে থাকে। নবজাগ্রত চিন্তা এবং সদাচঞ্চল সামাজিক প্রবাহের মধ্যে 'সংবাদ প্রভাকর' স্থির আদর্শ অনুসরণ করতে পারেনি। তত্ত্ববোধিনী সভার সংস্পর্শে এসে গুপ্তকবির মতাদর্শের বিবর্তন ঘটেছিল। তিনি উদারপন্থী হিন্দু হয়েছিলেন, ব্রাহ্ম হননি। আধুনিক চিন্তা এবং প্রগতিমূলক ধ্যান-ধারণাকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজন

বিশেষ করে শিক্ষা এবং অর্থনীতি বিষয়ে মনোভাব সেকালের চোখে ছিল অনেকখানি আধুনিক। এদেশে কারিগরী-বিদ্যা এবং যন্ত্রশিল্পের উন্নতির জন্য মেকানিকস ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। বিজ্ঞান অনুশীলনে এদেশবাসীর অনুৎসাহ এবং সরকারের ঔদাসীন্যে সেটি বন্ধ হয়ে যায়। এই বিদ্যালয়ের দুরবস্থা দেখে ঈশ্বরচন্দ্র ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। প্রভাকরের পাতায় সে সম্পর্কে সুদীর্ঘ আলোচনা করে এদেশবাসীর বিজ্ঞানশিক্ষার প্রয়োজনীয়তায় গুরুত্ব দিয়েছিলেন। চরকা প্রভৃতি দেশীয় যন্ত্রে সামান্য সুতো প্রস্তুত করে তার থেকে যে সামান্য বস্ত্র তৈরি হোত সেগুলি ছিল দুর্লভ এবং দুর্মূল্য। কিন্তু মানুষের বুদ্ধিতে যন্ত্রে উৎকৃষ্ট সুতো প্রস্তুত হচ্ছে। ফলে অল্প সময়ে অনেক বস্ত্র তৈরি হওয়ায় দামও কম পড়ছে। ফলে বাজারে অল্পমূল্যে বস্ত্র পাওয়া যাচ্ছে। ইংরেজরা আসবার আগে এদেশে অতি সামান্য বস্ত্রাদি ছিল। তা চলত আবার মানুষের হাতে। কিন্তু এদেশে অধিকার বিস্তারের সংগে সংগে ইংরেজরা নানাপ্রকার বস্ত্রাদি নিয়ে আসে। তার ফলে সাধারণ মানুষের অত্যন্তই উপকার হয়েছে। ইংরেজদের বিজ্ঞানে অসাধারণ জ্ঞানের ফলেই ভারতবাসী উপকৃত হচ্ছে। গঙ্গার জল শোধন করে সরবরাহ করা হচ্ছে। জাহাজ নির্মিত হচ্ছে। বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা হয়েছে। কলকাতা থেকে দিল্লী পর্যন্ত রেল লাইন বসছে। এসবকে নিজেদের করায়ত্ত করতে হবে। তাই প্রয়োজন হয়েছে বিজ্ঞান শিক্ষার। তার জন্য দরকার স্বতন্ত্র বিদ্যালয়ের। ঈশ্বরচন্দ্র স্বার্থহীন ভাষায় একথা বার বার ঘোষণা করেছেন। এ থেকে বোঝা যায় বিজ্ঞান ছাড়া উন্নতি অসম্ভব তা গুপ্তকবি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন।

অর্থনীতি চিন্তা।।

ধনী বাঙালীরা ব্যবসায়ে পরাঙ্মুখ হওয়াতে বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ নষ্ট হোচ্ছে গুপ্তকবির চোখে তা ধরা পড়েছিল। ১৮৫৪ খৃঃ ২ আগস্ট প্রভাকরের সম্পাদকীয় নিবন্ধে তিনি লেখেন "বাঙ্গালিদিগের মধ্যে যাঁহারা পরমেশ্বরের প্রসাদে বিলক্ষণ ঐশ্বর্যশালী হইয়াছেন তাহারা সুদ অর্থাৎ বৃদ্ধির দ্বারা উপার্জন করণেই অধিক যত্নশীল, সুতরাং স্বাধীনরূপে বাণিজ্য-করণের নিয়ম এদেশে একেবারে রহিত হইয়াছে যে পর্যন্ত বাণিজ্যপ্রতিযোগী বণিক নিয়মাদির উচ্ছেদ না হইবেক সেই পর্যন্ত এই বঙ্গদেশবাসী প্রজাবৃন্দের সৌভাগ্যের উদ্দীপন হইবেক না।"

দেশের অর্থনীতি যে কী ভয়ংকর জটিল অবস্থার সম্মুখীন, প্রভাকর সম্পাদক তা উপলব্ধি করেছিলেন বলেই বাঙ্গালীকে ব্যবসায়ে, শিল্পে নামতে বার বার আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু এর প্রতিবন্ধকতার দিকে তাকিয়ে তিনি তীব্র আক্রোশে বার বার কলম চালিয়েছেন! ১৮৫৪ খৃঃ ২ আগস্ট তিনি সম্পাদকীয় নিবন্ধে লিখেছেন, যে, বাঙ্গালীদের মধ্যে অনেকেই উপার্জন করে ধনী হয়েছেন। তারা কোন প্রকার ব্যবসায়ে যান না। টাকা সুদ খাটিয়েই তারা অর্থ উপার্জন করেন। কোনরকম পরিশ্রম বা ঝুঁকির কাজের মধ্যে তারা যান না। এই মনোভাব দূর না হওয়া পর্যন্ত বাঙ্গালীর উন্নতি অসম্ভব।

গুপ্তকবি বাংলাদেশের দুরবস্থার দিকে, বাংলার কৃষকসমাজের অসহায়তা অবলোকন করে আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেনঃ "হা পরমেশ্বর। যাঁহারদিগের অধীনস্থ প্রজামন্ডলীর ঈদৃশ দুরবস্থা তাঁহারদিগের সুসভ্য ও রাজনীতিজ্ঞ বলিয়া অভিমান করিতে কি লজ্জাবোধ হয় না? যে পর্যন্ত কৃষকদিগের অবস্থার পরিবর্তন না হইবেক সে পর্যন্ত ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট বিজ্ঞ-সমাজে কদাচ প্রতিষ্ঠাভাজন হইতে পারিবেন না।" —তিনি বুঝেছিলেন দেশের ভূমিব্যবস্থাই এই সংকট এই দৈন্যকে ঘনীভূত করেছে। একশ্রেণীর মানুষের স্বদেশবাসীদের প্রতি হৃদয়হীন চরম ঔদাসীন্যে রক্ষণশীল কবিকেও বিভ্রান্ত করেছিল। জমিদারী মানুষটি তাই বার বার বিরুদ্ধ চিত্রে পত্রিকার পাতায় নির্মমভাবে কলম চালিয়েছিলেন।

দেশের করবৃদ্ধি করে রাজস্ব বৃদ্ধিরও ঈশ্বরচন্দ্র প্রতিবাদ করেছেন। তিনি বলেছেনঃ "এইক্ষণে বাড়ীর কর, গাড়ীর কর, পথের কর, গুদামের কর, লবণের কর, স্ট্যাম্পের কর প্রভৃতি বিবিধ প্রকার কর স্থাপন করিয়া রাজ্যেশ্বরের সহসাধক প্রভাকরের ন্যায় ক্লেশকর প্রচন্ডকর বিস্তারপূর্বক প্রজানিকরের শোণিত শোষণ করিয়া দুঃখাকর হইতেছেন, তাহার উপর আবার এই নতুন প্রকার কর গ্রহণের নিয়ম হইলে

॥ প্রকাশিত হ'ল ॥

বাংলা ভাষায় সাংবাদিকতা বিষয়ে প্রথম পু

সাংবাদিকতার গোড়ার কথা

ফ্রেজার বন্ড ॥ অনুবাদক সন্তোষকুমার দে

আধুনিক সাংবাদিকতার সকল দিক সম্পর্কে ২৪টি সুদীর্ঘ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা। বাংলা ভাষায় প্রচার বিজ্ঞানের প্রথম গ্রন্থের রচয়িতা, 'দি ডায়াস' এবং 'রেকর্ড-সংগীত' পত্রিকাদ্বয়ের সম্পাদক, খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও সাংবাদিক সন্তোষকুমার দে সযত্ন নিষ্ঠায় ফ্রেজার বন্ডের বিখ্যাত গ্রন্থ "অ্যান ইনট্রোডাকশান টু জার্নালিজম" হতে পরিচ্ছন্ন ভাষায় অনুবাদ করেছেন। বহু চিত্র, তথ্য ও চার্ট সংবলিত ডিমাই ৪৬৩ পৃষ্ঠা। দাম ঃ ৪·৫০ মাত্র।

প্রতিটি পাঠাগার, সাংবাদিকতার ছাত্র, সংবাদপত্রসেবী, বিজ্ঞাপনদাতা ও বিজ্ঞাপন সংবলিত। ডিমাই ৪৬৩ পৃষ্ঠা। দাম ঃ ৪·৫০ মাত্র।

এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রজাদিগের ক্লেশের আর সীমা থাকিবে না।"

শুধু শিল্পবাণিজ্যের কথা বলেই ঈশ্বরচন্দ্র নীরব থাকেন নি। চাকুরী ক্ষেত্রেও বাঙ্গালীর সুযোগদানের জন্য আবেদন জানিয়েছেন সরকারের কাছে। তাছাড়া ক্রমবর্ধন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ যে বাঙ্গালী জাতির ভবিষ্যতের পক্ষে যে কতদূর সংকটজনক হয়ে উঠবে তার দিকে তাকিয়ে গুপ্তকবি সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন।

নারী শিক্ষা।।

প্রথম জীবনে ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন নারীশিক্ষার বিরোধী। তার প্রথম জীবনের অনেক রচনায় তার নিদর্শন রয়েছে। সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র কিন্তু পরবর্তীকালে নারীশিক্ষা বিস্তারের পক্ষেই মত দিয়েছিলেন। এমন কি এ নিয়ে যে তুমুল ঝড় উঠেছিল সেকালের সমাজ হিতৈষী ও সমাজপতিদের মধ্যে তিনি তার থেকে দূরে সরে থাকেন নি। বরং তার সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন। বেথুন সাহেব রাণী ভিক্টোরিয়ার নামে স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ বিদ্যালয়ে ঠাকুরবাড়ীর মেয়েরা পড়তে যেত। ১৮৫১ খৃঃ ৭ জুলাই (২৪ আষাঢ় ১২৫৮) সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত হয়ঃ "আমরা কোন বিশেষ বিশ্বাসিবন্ধুর প্রমুখাৎ শ্রুত হইলাম যে দেশহিতৈষি সুবিখ্যাত মান্যবর বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় অনরবিঙ্গ মেং বেথুন সাহেবের স্থাপিত 'ভিক্টোরিয়া বালিকা বিদ্যালয়ে' আপনার কন্যা ও ভ্রাতৃকন্যাকে বিদ্যানুশীলনার্থ প্রেরণ করিবেন এমত কল্পনা স্থির করিয়াছেন এবং বেথুন সাহেবের নিকট স্পষ্টরূপে স্বীকার করা হইয়াছে। বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অতি সজ্জন, সত্যবাদী, প্রতিজ্ঞাপরায়ণ এবং সর্বগুণজ্ঞ মহন্মনুষ্য। বরং পশ্চিমদিগে সূর্যোদয়ের সম্ভবনা আছে..... তথাচ উল্লেখিত ঠাকুরবাবুর মুখ নির্গত বাক্যের অন্যথাহওনের সম্ভাবনা নাই. তিনি যখন যে কার্য করেন তখন পূর্বেই দৃঢ়রূপে তাহার সংকল্প করিয়া থাকেন অগ্রে স্থির না করিয়া কোন কর্মের সূচনা করেন না, অতএব তিনি যৎকালে বালিকা বিদ্যালয়ে কন্যা প্রদানের প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন তৎকালে কদাচ কোন ব্যক্তি বিশেষের অনুরোধে বাধ্য হইয়া তাহাতে বিরত হইবেন না। অস্মদ্দেশের সর্বাগ্রগণ্য প্রধান মহাশয়েরা যদি এ বিষয়ে যথাযোগ্য অনুরাগ ও উৎসাহ প্রকাশ করেন তবে অবিদ্যাবধূদের বিদ্যালাভের কোন প্রতিবন্ধকতাই থাকে না। আর ব্যবস্থাপক সাহেবের রোপিত কীর্তিলতা কিছুতেই বিনাশ হইবে না, ক্রমেই বলবতী ও ফলবতী হইতে থাকিবেক। তিনি এখানে থাকুন না থাকুন তাহাতে হানি কি? স্ত্রীবিদ্যার বৃদ্ধি হিন্দুগণ দ্বারা সুনিয়মে তৎকার্য নিষ্পাদিত হইবেক।

নীলকর অত্যাচার

নীলকরদের অত্যাচারে বাঙলা দেশের কৃষক বা সাধারণ চাষী সম্প্রদায়ই শুধু নয় সর্বপ্রকারের কৃষিনির্ভরশীল মানুষমাত্রেই সর্বস্বান্ত হয়েছিল। প্রভাকর সম্পাদক নিরলসভাবে এর বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় কলম ধরেছিলেন।

নীলকর সাহেবদের দস্যুসুলভ অত্যাচারে নিরীহ প্রজারা চরম লাঞ্ছনা ভোগ করছে। তাদের সুখ স্বাচ্ছন্দময় জীবন অন্তর্হিত। তৎকালীন শাসকবর্গের আমলে এর কোন প্রতিবিধান হওয়ার সম্ভাবনা গুপ্তকবি দেখতে পাননি। তিনি লিখেছিলেন ঃ "মহকুমা সংস্থাপিত হইল তখন আমারদের এই দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছিল যে ইহাতেই প্রজাদের কল্যাণ সঞ্চার হইবেক; কিন্তু বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয় "যে রক্ষক সেই ভক্ষক"......তাঁহারা নীলকর সাহেবদের পোষ্যপুত্রস্বরূপ হইয়াছেন, তাঁহারা কানে কানে যে মন্ত্র প্রদান করেন তাহাই বিচারকদের ইষ্টমন্ত্রস্বরূপ হইয়া ওঠে. বাঙ্গালিলোকের কথা গ্রাহ্যই করেন না, বাঙ্গালিদের রাজনিয়মানুসারে অর্পিত আবেদনে যাহা না হয় নীলকর সাহেবদের এক গুপ্ত পত্রে তাহা অপেক্ষা সহস্রগুণ ফল দর্শায়, সেই পত্রের প্রতি পংক্তি তাঁহারদের নিকট গোস্পালান্তর্গত বচনের ন্যায় জ্ঞান হয়। ফল তদনুসারেই......।" রাজার ধর্মের লোকেরা কিভাবে এদেশের নিরীহ প্রজাদের জীবনকে বিষাক্ত করে তুলেছিল তার পরিচয় তুলে ধরতে ঈশ্বরচন্দ্র কুণ্ঠাবোধ করেন নি।

ধর্মচিন্তা

শেষকালে প্রভাকর হয়ে উঠেছিল উদার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুখপাত্র। এরা একমাত্র স্বার্থগত চিন্তায় তৎপর। ইংরেজ তোষণ, বাঙালীর সুখচিন্তা, আধুনিক শিক্ষার আমদানী সবই এই একই কারণে গুপ্তকবির কাম্য ছিল। তিনি মনেপ্রাণে হিন্দু ছিলেন। হিন্দুর যাবতীয় দোষগুণ তার ছিল। ব্রাহ্মদের সঙ্গে মিশেছেন, কিন্তু ব্রাহ্ম হননি। ধর্মসভার সঙ্গে যোগ রেখেও সনাতনপন্থী হিন্দুদের মত কঠোর হননি। ১৮৪৮ খৃঃ ১৬ এপ্রিলের প্রভাকরের পাতায় তার মনোভাব স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হয়েছিল। তিনি লিখেছিলেন যে ধর্মসভা শব্দটা শুনতে বেশ ভাল, কারণ ধর্ম শব্দ অত্যন্ত জাঁকজমকে পরিপূর্ণ। কিন্তু এর ভিতরের ধর্ম অন্বেষণ করলে কোন পদার্থই দেখা যায় না। কেননা এক সভাতেই সকল শোভা নষ্ট করেছে। সতীরীতি সংরক্ষণের জন্য এই সভা সৃষ্টি হয়। সেই সময়ে এই দেশের অবস্থা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল। বিশেষ করে ধর্মবিষয়ক গোলযোগ চরমে ওঠে। নানাপ্রকার আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। হিন্দুরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পরস্পর কলহে লিপ্ত হয়। মঙ্গলামঙ্গলের কথা ভুলে গিয়ে তারা আত্মকলহে লিপ্ত হয়। সে সময়ে ধনী ব্যক্তিরা এবং সমাজনেতারা মিলে ধর্মসভা স্থাপন করেন। উদ্দেশ্য বিরোধীদের বিনাশ। "কিন্তু জগদীশ্বরের কি আশ্চর্য ইচ্ছা, সত্যের কি নির্ম্মল প্রতিভা, দলাধ্যক্ষ মহাশয়েরা যে অভিপ্রায়ে সভা করিয়া দ্বেষানলে দগ্ধ হইলেন, সে ব্যাপারে কৃতকার্য হইতে পারিলেন না, 'ধর্ম' আপনি আপনার রক্ষক হইয়া তাঁহার দর্পের মর্ম্মভেদ ও মর্ম্মচ্ছেদ করিলেন......।"

এখানেই গুপ্তকবির মানসপ্রবণতা অনেকখানি স্পষ্ট। পুরোন কালকে পেরিয়ে নতুন যুগের দ্বারে এসে পৌঁছেছেন। সবকিছুই নতুন করে ভাবছেন। প্রায় অশিক্ষিত একজন মানুষ কি করে যুগধর্মের সঙ্গে এতখানি তাল মিলিয়ে চলতে পেরেছিলেন সেটাই বিস্ময়ের।

কিন্তু সেকালে সংঘটিত প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামকে ঈশ্বরচন্দ্র মুক্তচিত্তে স্বীকার করে নিতে পারেন নি। এইখানে তার চিন্তাধারার প্রকৃত মূল্যায়ন অসম্ভব হয়ে পড়ে। একদিকে দেশের অগ্রগতি, স্বার্থসংরক্ষণ, শিল্পের ক্রমবিকাশ, নারীশিক্ষা বিস্তারের স্বপক্ষে লিখছেন, অপরদিকে ইংরেজ রাজশক্তির প্রতি প্রবল আনুগত্যবশত শত্রুহাতে কলম ধরেছিলেন। কেন এমনটি ঘটেছিল? কেন রাজপক্ষকে সমর্থন করতে গিয়ে কঠোর ভাষায় স্বদেশবাসীদের ওপর দোষারোপ করেছেন? সম্ভবত বিদেশী শাসকের প্রকোপ থেকে পত্রিকাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য তার এই পথ অবলম্বন করা ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না। সেই যুগের ছিল মধ্যবিত্তসুলভ ধ্যানধারণা।



কিং কো'র
আর্ণিকা
হেয়ার অয়েল
একমাত্র পরিবেশক ঃ
আর. ভি. এম এণ্ড কোং
২১৭, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬
ফোন ঃ ৩৪-৩৮৩৬



পেয়িং গেস্ট

শৈল চক্রবর্তী

আপনিই সম্পাদক?

হ্যাঁ, বসুন।

আর বসব কি? কি সর্বনাশ করলেন আপনি আমার! রাখহরি 'সমাজসেবা' কাগজের সম্পাদকের ঘরে আর্তনাদ করে ফেটে পড়ল।

কেন, কেন—কি করলুম আমি? সম্পাদক পতিতপাবন হুমড়ি খেয়ে পড়েন টেবিলের ওপর।

এই দেখুন, কি ছেপেছেন? বলেই রাখহরি একখানা কাগজ মেলে ধরল। একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছিলুম, 'পেয়িং গেস্ট চাই' আপনি কি ছেপেছেন দেখুন।

কাগজটা চশমার কাছে তুলে, সম্পাদক পড়তে থাকে, কেন? ঠিকই আছে ত—

কি মুস্কিল। গেষ্টকে কি করেছেন ভাল করে দেখুন।

ওহো, একটা অনাবশ্যক আকার পড়ে গেছে—এই ত। তা পাঠকরা ঠিক বুঝে নেবে—

আজ্ঞে না, এ বিজ্ঞাপনের টাকা যা দিয়েছি, তা ফেরত দিন আমায়। হায় হায়, বরাতে কি দুর্ভোগ আছে জানি না।

কিছু ভয় নেই আপনার, সম্পাদক আশ্বাস দিয়ে চাঙ্গা করতে চায় রাখহরিকে। দেখুন দু'একদিনের মধ্যেই কত চিঠিপত্র পেয়ে যাবেন।

আজ্ঞে না, অশরীরীদের হামলা যে হবেই তা বেশ বুঝতে পারছি। ঘোস্ট অব গোষ্ট ত বাউন্ডুলে, তারা যদি একটা আস্তানা পায় তা কি ছেড়ে দেবে? শ্মশানে মশানে অশথ গাছের ডালে ভাঙ্গা বাড়িতে কার আর ভাল লাগে? এই বিজ্ঞাপন নজরে পড়লে সবাই এসে চড়াও হবে আমার বাড়িতে। তার ওপর, আমার গৃহিণীর আবার এইসব অশরীরী জীবদের ওপর যৎপরোনাস্তি আতঙ্ক। এখন বুঝে দেখুন কি বিপদে ফেলেছেন আমায়।

পতিতপাবন বিচলিত বোধ করেন। সত্যিই ত, তাঁর কাগজের নাম 'সমাজ সেবা' আদর্শও তাই। সমাজের সেবার জন্যেই ত তাঁর আপ্রাণ চেষ্টা সম্পাদকীয় স্তম্ভে স্তম্ভে তিনি সেই কথাই ত লিখে আসছেন আজ সাত বছর ধরে। পতিতপাবন পতিত-পাবনী গঙ্গার মত বিগলিত বোধ করেন। এমনসময় হঠাৎ কি যেন তাঁর মনে পড়ে যায়।

আচ্ছা, রাখহরিবাবু, পতিতপাবন বাস্ত করেন আপনাকে, আমি একটা উপায় বাৎলাচ্ছি, আপনি মোটেই ঘাবড়াবেন না। আপনি একজন পেয়িং গেস্ট চান, এইত কথা?

আজ্ঞে হাঁ, একজন সুস্থ ভদ্রসন্তান। তার জন্যেই ত বিজ্ঞাপন।

পুরুষ না মহিলা?

মহিলা হলেই ভাল হয়।

বেশ, আমার এইমাত্র মনে পড়ল, আমার এক শালী, মিস মজুমদার পেয়িং গেস্ট থাকবার একটা বাড়ি খুঁজছেন। তিনিও বিজ্ঞাপনের কপি পাঠিয়েছেন। তাঁকে আপনি স্বচ্ছন্দে রাখতে পারেন। বিয়ে-থা করেননি ভাল চাকরি করেন, টাকাপয়সার ব্যাপারে টু-দি-পাই মিটিয়ে দেবেন আপনাকে।

কি নাম? কোথায় কাজ করেন, একটু জেনে নেওয়া ভাল।

নিশ্চয়ই, এসব জেনে নেবেন বইকি। মিস মজুমদার, মানে, হেলেন মজুমদার, ইস্ট-ওয়েস্ট ক্লাবটস্-এর সেক্রেটারী। ঠিকানাটা আপনাকে দিয়ে দি, আপনি যোগাযোগ করতে পারেন। এই নিন ওর টেলিফোন নম্বর, ফোনেই আলাপ করে নেবেন। আর কোনো পার্টি যদি আসে এখন আপনি নিশ্চিন্ত মনে তা গয়ে দেবেন।

টেলিফোনের চিরকুটটুকু বুকপকেটে রেখে সম্পাদকের আশ্বাস নিয়ে রাখহরি বেড়িয়ে পড়ে 'সমাজ সেবা' অপিস থেকে। বাড়িতে একটি অপরিচিতা মহিলা থাকবেন, অবিবাহিতা তায় হেলেন......রাখহরি একটা ট্রামে চড়ে বসে এবং পরে দেখে সেটা ভুল ট্রাম।

বিজ্ঞপ্তি প্রচারের আগের একটু ইতিহাস আছে।

রাখহরি ও তস্য পত্নী বিজনবালা নিজ বাড়িতেই বাস করে। এই শহরে বাড়িটুকু করতে রাখহরির জমানো টাকা সবই ঢুকতে হয়েছে কনট্রাকটরের পকেটে। তবু দুখানি ঘরের বেশি আর উঠল না। কায়ক্লেশে ছাদে একখানা চিলকোঠা।

একফালি বারান্দায় মাঝে মাঝে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই এসে বসে। গল্প করতে চেষ্টা করে কিন্তু কথা যে কেন ফুরিয়ে যায় তা ওরা বুঝতে পারে না।

ঐ দেখ, বিজুদের বারান্দা আজ সরগরম, রাখহরির কথা বাড়াতে চায়।

হ্যাঁ, কেন হবে না? বাড়িতে লোক কত, সবাই মিলে গল্প করলে জমজমাট ত হবেই।

বেশ আড্ডা দিচ্ছে ওরা তাই না?

দেবেই ত, কেন দেবে না!

আমরাও দিই না কেন—কি বল?

ওসব কথা ছাড় দিকি, আমি যা বলছিলুম তার কি হল?

কিসের?

দিঘায় যাওয়া। চল না একবার বেড়িয়ে আসা যাক। কত লোক যাচ্ছে। সঙ্গীসাথী জুটতেও অভাব হবে না—তুমি প্রাণখুলে বেড়াবে আর গল্প করবে, আমিও সঙ্গী পাব।

তাত হয়, কিন্তু আটকায় যে এক জায়গায়। বাইরে পা বাড়ালেই পকেটের টাকা কর্পূর হয়ে উড়ে যায়। থাকতো সেরকম ওড়াবার মত, তাহলে দিঘা কেন কাশ্মীর রাণীক্ষেত কিছু বাদ দিতুম কি?

বাড়তি আয়ের চেষ্টা ত নেই তোমার। আর অত হাত লম্বা করে খরচ করলে আর থাকবে কি?

ঝিনি বলছেন তার হাতটা খুব ছোট!

আমি অমন বেহিসেবী খরচ করি না। যেটুকু দরকার তাই করি। আছি দুটো মানুষ, একটু ভাল না খেলেই বা চলবে কি করে? তোমারই ত মুখে রুচবে না। থাকতো যদি একটা গুঁড়ো তাহলে ভাব দেখি কত খরচ বাড়ত—

ওসব কথা থাক, শোন, একখানা ঘর ভাড়া দিলে কেমন হয়?

ওমা! এর মধ্যে ভাড়াটে? তার রান্নাঘর কোথা দেবে? তার চাই বাথরুম, চাই খাবার ঘর...... হ্যানো তেনো......

হয়েছে! একটা আইডিয়া মাথায় এসেছে, রাখহরি উচ্ছ্বসিত হয়ে স্ত্রীকে অবাক করে দেয়।

কি হল?

পেয়িং গেস্ট। আজকাল আমাদের মত সেরেস্থর একমাত্র সমাধান হচ্ছে পেয়িং গেস্ট। একটি ভাল গেস্ট পেলে, সঙ্গীকে সঙ্গী আবার মাসে মাসে টাকাও পাওয়া যাবে।

তাত, কিন্তু বাড়ির মধ্যে কে এসে ঢুকবে, কেমন লোক হবে—জানা নেই শোনা সে ত আমাদের হাতে। দেখেশুনে নিতে হবে লোক, রীতিমত বাজিয়ে না নিলে কি চলে? লোক ভাল চাই, সদ্বংশ সচ্চরিত্র—থাকতে পাবে খাওয়া পাবে, বাড়ির লোকের মত বেশ আড্ডা, গল্পও চলবে—কি বল? সঙ্গীকে সঙ্গী আবার পয়সা দেবে।

তা হ'লে ত ভালই হয়, সংসার খরচটা ওই থেকেই চালিয়ে নেব—

কর্তা-গিন্নী দুজনেই চেষ্টায় থাকে ভাল একটি পেয়িং গেস্টের। কাগজে বিজ্ঞাপন দেবে নাকি? রাখহরি হিসেব করে, কতরকম লোক এসে হামলা দেবে, তা হোক। তার মধ্যেই বাছাই করতে হবে।

রাখহরি ভাবল, বাড়ির মধ্যে পুরুষ-মানুষ ঢোকানো উচিত হবে না। বিজুর এমন কিছু বয়েস হয়নি। মহিলা গেস্টও এখন পাওয়া যাচ্ছে। মহিলাই ভাল—দেওয়া যাক 'সমাজ সেবা'য় একটা বিজ্ঞাপন।

এর পরের কাহিনী আমরা জানি।

রাখহরি ডায়াল করল, থ্রি এয়েট টু নাইন ডবল ফোর......হ্যালো, আমি একবার মিস মজুমদারকে চাই...ও আপনিই, নমস্কার, আমি রাখহরি......পতিতপাবনবাবুর কাছে আপনার কথা—

ওপার থেকে ভাষণ এল, ও বুঝতে পেরেছি, জামাইবাবুর কাছে সব শুনেছি, আপনি পেয়িং গেস্ট চান ত?

হ্যাঁ—ঠিক ধরেছেন।

খুব ভাল কথা, আমি একটা বিজ্ঞাপন দিতে যাচ্ছিলাম। শুনুন আমার কিন্তু পুরো একটা রুম চাই। আপনার ঘরটা কত বড়?

দশ বাই বারো, দক্ষিণে একটু বারান্দাও আছে।

ফাইন! আমার চলে যাবে। বাড়িতে মেম্বার?

আমরা স্বামী-স্ত্রী মাত্র।

ছেলেপুলে?

নাথিং!

বাঃ, আমি আবার বাচ্চাকাচ্চা পছন্দ করি না। আচ্ছা কত দিতে হবে আমায়......

আজকাল বোঝেন ত বাজারের অবস্থা। খাওয়া থাকার জন্যে মোট শ' দুই টাকার কম পারব না।

তা আপনি যা বলছেন বেশী নয়, অবশ্য যদি খাওয়ার স্ট্যান্ডার্ডটা ভাল হয়। আপনার স্ত্রীই রাঁধেন নাকি?

হ্যাঁ, অদ্ভুত রাঁধে সে, রান্না তার বাতিক। রোজ নতুন একটা কিছু আছেই। আর বলবেন না, খেয়েই প্রায় ফতুর আমরা।

বাস্ বাস্ আর বলতে হবে না। তাহলে নেকস্ট মাস থেকে আমি আপনার গেস্ট হচ্ছি। মানে পয়লা শুক্রবার যাচ্ছি আমি। তখনই দিয়ে অ্যাডভান্স দেব, কি বলেন?

আপনার প্রিয় মাসিক পত্রিকা

নবকল্প

প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হ'ল

অজস্র ছবি • সুন্দর গেট আপ • পরিচ্ছন্ন ছাপা। ২৫০ পাতার বই • দাম ১·৫০

এতে লিখেছেন—

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

সলিল চৌধুরী • শ্যামলী সিংহ

চিরঞ্জীব • ভৈরব হালদার • সমর বন্দ্যোঃ

ও গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

ছোট্ট জিজ্ঞাসা (চিত্রনাট্যাকারে)

নিয়মিত বিভাগ। চেম্বার থেকে। ভিস্তর্স প্রশ্ন উত্তর চিত্রখান। আরও অনেক কিছু

আপনার স্টল বা হকারের কাছে পাবেন

ঠিক আছে, তার জন্যে ব্যস্ত হতে হবে না আপনাকে। ঠিকানাটা লিখে রাখুন, রাখহরি ঠিকানাটা বলে দিল।

আচ্ছা, তাহলে কথা পাকা রইল, আমি আমার বাসায় নোটিশ দিয়ে দিচ্ছি, কেমন? নমস্কার।

নমস্কার।

বাব্বা! কি বাজারটাই করেছেন দিদি!

কে পুষ্প নাকি! বিজনবালা মার্কেটিং সেরে ফিরছিল এমনসময় পুষ্পর সঙ্গে প্রায় ধাক্কা আর কি।

চলুন গল্প করতে করতে যাওয়া যাক, দুটি ত প্রাণী এই এত্তো বাজার! পুষ্পর বিস্ফারিত চোখ।

কি আর এমন বল। মাখন জেলি কটা নিয়েই, আচার না হলে আমাদের চলে না, তারপর, এটাসেটা, হ্যাঁ, পায়েসের চাল আছে কিসমিস আছে, ভিনিগারও নিলুম একট—

দাদা বুঝি খুব খেতে ভালবাসেন?

বলিস না। খেয়েই ত ফতুর আমরা। তাইত একতলার ওপর উঠতে হ'ল না আর। তা ভাই, খাওয়া ছাড়া আর কি আছে বল খাওয়ার জন্যেই ত সব, এই বাজারে তোর দাদার দুদিনরকম মচ্ছ না হলে চলে না। জলখাবার সময় চপটি কাটলেটটি চাই, না হলেই তুলকালাম...

ঠিক আমার ভাসুরপো আর কি। কি খেতেই যে ভালবাসে! বড় চাকরি করছে। হোটেল রেস্তোরাঁয় খেয়েই সব টাকা উড়িয়ে দেয়। বিয়েথাও করল না বলে কাকিমা, হোটেল বেঁচে থাক, তোমাদের ওই সংসার গারদের মধ্যে আর ঢুকছি না। এদিকে অবার বলে, বাড়ির রান্নার স্বাদ ভুলে গেলুম। সে খুঁজছে যদি কোথাও পেয়িং গেস্ট হয়ে থাকা যায়

তাই নাকি?

হ্যাঁ, বলে, টাকার জন্য এসে যাচ্ছে না, যত লাগে দেবে। তবে বেশ ফ্যামলি ভাল হবে। খাওয়াদাওয়া ভাল হবে ঘরটা ভাল হবে। এরকম পেলে বেঁচে যাই......

বিজনবালার হঠাৎ খেয়াল হল, তারাও ত পেয়িং গেস্ট খুঁজছে। মন্দ কি জানা-শোনার ভেতর। সে পুষ্পকে থামিয়ে বললে শোন শোন, একটা কথা বলছি, আমরা ভাবছিলুম একজন পেয়িং গেস্টের কথা—

তাই নাকি? পুষ্প যেন লাফিয়ে ওঠে। ভাল কথাই ত। আজকাল বিলেতে শুনি সব বাড়িতে পেয়িং গেস্ট ... খারাপ কি? যার বাড়তি জায়গা আছে সেই রাখতে পারে। সংসারের কত সুসার হয়।

তুই আসিস না একদিন, এ বিষয়ে কথা হবে।

তারপর পুষ্প ভাসুর-পোর গরজেই হোক, বিজুদির বাড়ি হাজির একদিন।

শোনো, বোকেনকে খবর পাঠিয়েছিলুম।

কাকে?

ঐত যার কথা বলেছিলুম, আমার ভাসুর-পোকে। সেত প্রস্তাবটা শুনেই লুফে নিল। বলেছে সামনের মাস থেকেই সে গেস্ট হবে। বড় সৌখীন লোক, বুঝলে।

তাত, কিন্তু আচারব্যাভার কেমন হবে জানি না, বাড়ির মধ্যে একজন অচেনা অপরিচিত লোক নিয়ে বাস করা—আমি ভাবছিলুম একটি মেয়ে গেস্ট হলে ভাল হত, আমারও সঙ্গী হত, বেশ গল্পগুজব করা যেত—

বিজুদি, তার চেয়ে ঐ দা দিয়ে নিজের পায়ে চোপ দাও না!

কেন?

ওকাজ করতে আছে? একজন কোথাকার কে মেয়েছেলে ঢোকাবে বাড়িতে। তারপর দেখবে—দুদিন পরে কর্তাটি কেমন যেন আনমনা ভাব। মাসখানেক পরে দেখবে বেশ জমে গেছে ওরা। গল্পগুজব হাসিখুশি-- তারপর আর বলব? সিনেমা না দেখলে চলছে না তোমাকে কি আর সবটা জানিয়ে করবে? তখন তুমি কেঁদে কুলুতে পারবে না।

ঠিক বলেছিস, আমিও তাই ভাব-ছিলুম।

রামোঃ, পুরুষদের আবার বিশ্বাস করতে আছে নাকি? সামনে নতুন পেলে--

থাম্, তাহলে তুই তোর ভাশুরপোকেই বলে দিস সামনের মাস থেকে যেন ঠিক করে ফেলে। হ্যাঁ, কত দেবেন তিনি? সে সব কথা ত হল না, উনি বলছিলেন দুশ টাকার কম কাউকে দেবেন না—দুবেলা খাওয়া জলখাবার, তার কমে কি করে হয় বল?

দুশ কেন, আড়াইশ বললেও সে রাজি হয়ে যাবে।

যাক্, তাহলে ঠিক রইল ঐ কথা, আমি আর কাউকে দিচ্ছি না।

হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার। এই আমি বলে গেলুম।

বিজনবালা ভাবল কর্তাকে একটা সার-প্রাইজ দিতে হবে। কিছু বলা হবে না। নতুন গেস্টের কথা চেপে যাওয়া যাক। মাস-কাবার হলে একেবারেই তার আবির্ভাবে রহস্য উদ্ঘাটিত হবে। বুঝবে, মেয়েরা চেষ্টা করলে একজন ভাল গেস্টও জোগাড় করতে পারে।

রাখহরিও প্রাণপণে কথাটা চেপে রেখেছে। বিজুকে সে একেবারে তাজ্জব করে দেবে। বরং খুশিই হবে সে মহিলা সঙ্গী পাবে ত। ভাগ্যিস জানাশোনার মধ্যে পাওয়া গেল বিজ্ঞাপনের কোনো সাড়াই ত পেলুম না। গোস্ট দেখেই বোধ হয় ঘাবড়ে গেছে সবাই ঃ ভূতের ভয় আর নেই কার?

পয়লা মার্চ।

সকালবেলাই একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল রাখহরির রক ঘেঁষে। তেত্রিশের দুই, এই বাড়িই ত? মেয়েলি কন্ঠের আওয়াজ।

রাখহরি বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। টেলি-ফোনে পাকা কথা দিয়ে পর্যন্ত তার স্বস্তি ছিল না। কেমন গেস্ট আসবে। হেলেন মজুমদার কেমনতর হবে......যদি সুন্দরী না হয় রাখহরির পাঁজরায় একটা কাঁটা ফুটল যেন আর যদি ইভস উইকলির পাতা-খসা একটি সুবেশা আধুনিকা হয়—তাহলে বিজু কি তাকে টিকতে দেবে?

আপনি কি রাখহরিবাবু?

আজ্ঞে হ্যাঁ আপনি কি—?

মিস মজুমদার।

রাখহরি দেখে এক বিপুলায়তন বপু, মাজা রং চল্লিশ পার প্রসাধন আধুনিকা,

॥ নব নব রূপে ॥

● স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ●

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ লীলাসহচর স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে। বিভিন্ন সময়ে ও পরিবেশে গৃহীত তাঁহার নানা ভাবের ফটোসমূহের একটি মনোরম অ্যালবাম মূল্যবান বিলাতী আর্ট পেপারে ছাপা হইতেছে।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর রেঙ্গুণ, সিংহল, মাদ্রাজ, জামশেদপুর পাটনা, মেদিনীপুর তমলুক বাঁকুড়া, বরিশাল দিনাজপুর ও ঢাকা অবস্থান সময়ে এবং সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বের কোন দুষ্প্রাপ্য ফটো কেহ অনুগ্রহপূর্বক আমাদিগকে পাঠাইলে তাহা সাদরে গৃহীত কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকৃত এবং প্রতিলিপি গ্রহণান্তর অনতিবিলম্বে প্রত্যর্পিত হইবে। পরে একখানি অ্যালবামও তাঁহাকে উপহার দেওয়া হইবে।

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

মাথায় চুড়ো করা খোঁপা...রাখহরির স্বপ্ন-জাল যেন ছিঁড়ে খুঁড়ে জট পাকিয়ে গেল।

আসুন আসুন, মালপত্রগুলো ভেতরে নিয়ে আসুন......

সুটকেশ হোল্ডঅল ইত্যাদি গাদাপ্রমাণ মালপত্র ভেতরে এল।

বাড়ির বাইরে গাড়ির শব্দ ও কলরব শুনে বিজনবালা আলু বেগুনের ভাগ ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে নতুন আগন্তুকের সামনে।

ইনি আমার স্ত্রী।

নমস্কার, হেলেন হাত তোলার চেষ্টা করে।

আর ইনি, মানে মিস মজুমদার আমাদের বাড়িতে গেস্ট থাকবেন বলে এসেছেন। তোমায় বলতে একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম।

বিজনের মুখখানায় কে যেন কালি ঢেলে দিল। বাবা! পেটে পেটে এত—গেস্ট ঠিক ঠাক হয়ে গেছে! তাও আবার বেছে বেছে এক মেমসায়েব!

আপনাদের বাড়িতে এলুম। অতিথি হয়ে থাকতে চাই...হেলেন কথা পাড়ে।

বেশত, এর বেশি বিজনবালার ঠোঁট দিয়ে বেরুল না, আমি চা করে আনি, বসুন—বলেই সে অন্তর্ধান করল।

আচ্ছা, আমার ঘর কোনটা বলুন ত? হেলেন এবার কাজের কথায় নামে।

এই যে, এর পাশের ঘরটাই আপনার... বলে রাখহরি সেই ঘরে নিয়ে গেল হেলেনকে।

এদিক ওদিক তাকিয়ে হেলেন বললে, সব ভাল কিন্তু যাই বলুন ঘরে আলোটা একটু কম।

আচ্ছা, বলতে পারেন, মিস্টার রাখহরি রায়ের বাড়িটা? চোয়াড়ে গাল তক্তার মত চিমড়ে সুট পরিহিত একটি জীব দাঁড়াল রাখহরির সামনে। মাথায় তার পাৎলা চুলে বাদামী আভা, মুখে পাইপ।

আজ্ঞে, এইটেই, আপনি—?

আমি বোকেন বোস, বুঝতে পেরেছেন বোধহয় কেন এসেছি?

ঠিক বুঝতে পারছি না ত—কি ব্যাপার?

হা হা হা ... ...

I am your guest from this day on, I have settled it with your wife.

মিসেসকে একবার জিগ্যেস করুন, পাইপ মুখে দেহখানা কাত করে বলল বোকেন।

তাই নাকি? আমি ত শুনিনি...

Strange. আপনি শোনেন নি, আশ্চর্য! এক মিনিট, আমি সুটকেস আর হোল্ডঅলটা নিয়ে আসছি...

দেখুন, আমাদের একজন গেস্টের দরকার ছিল, তিনি ত আগেই এসে গেছেন... এখন—

Good Lord! ভদ্রলোকের কথাই কথা আমি একবার আপনার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে পারি?

রান্নাঘরে চলে গেছে রাখহরি।

ব্যাপারটা কি? তুমি এক চিমড়ে সাহেবকে গেস্ট ঠিক করেছ—? কই একবারও ত বলনি।

তুমি বলেছিলে আমায়?

আহা, তোমায় সব কথা বলতে যাব কেন, এটা ত পুরুষেরই কাজ।

কেন? মেয়েদের কাজ না কেন? আমরাও যে পারি তাই দেখিয়ে দিলুম।

বে-শ! এখন, কথা দিয়েছ যখন, কোথায় থাকবে ঠিক করে দাও। চল, সে তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে।

শাড়িটা গুছিয়ে নিয়ে বিজনবালা বাইরে এসেছে।

নমস্কার! আমি বোকেন বোস, কাকিমার সঙ্গে আপনার কথা পাকা ছিল, তাই না? কাকিমা মানে, আপনার বন্ধু পুষ্প বোস—

হ্যাঁ, কিন্তু—

ব্যস, আর কিন্তুর কিছু নেই। রিয়্যালি, সত্যি বলতে কি, আমি আপনার রান্না খাবার লোভেই এসেছি......এত প্রশংসা শুনেছি যে—তাহলে মালগুলো গাড়ি থেকে নামিয়ে আনি—বোকেন তরতর করে নেমে গেল রাস্তায়।

কি হবে এখন? সমস্যার জটিল আবর্তে নিমজ্জমান রাখহরি শুধু এই প্রশ্নটুকুই রাখল।

একটু চা ত খাওয়াই আগে এদের, বাড়িতে যখন এসেছে তারপর যা হয় হবে—বলে বিজনবালা ডুবন্ত রাখহরিকে তদবস্থায় রেখেই প্রস্থান করল।

রাখহরি একবার মনে মনে হরিকে স্মরণ করেছে। হরিই ত রাখেন তাকে চিরদিন—এবং তারপরই ঘরে উঁকি মেরে দেখেছে। দেখেছে, হেলেন তার জিনিসপত্র ঘরের তাকে তাকে গুছিয়ে ফেলেছে। জানলাতে নতুন পর্দা ঝুলছে।

আসুন একটু চা খাওয়া যাক, রাখহরি গলায় দরদ মিশিয়ে ডাক ছাড়ল হেলেনের উদ্দেশে। বোকেনও এসে বসল। মালপত্র সবই উঠিয়ে এনেছে ঘরের মধ্যে। রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বললে, যাই বলুন আপনাদের পাড়াটা খুব quiet লাগছে, আমি যেখানে ছিলুম একেবারে কান-কর্ণ ঝালাপালা, horrible ট্রাফিকের আওয়াজ। হেলেনকে দেখে সে হাত তুলে বললে, নমস্কার, আপনাকে যেন কোথায় দেখেছি! দাঁড়ান দাঁড়ান, আচ্ছা আপনি কি একটা exhibition করতে আমাদের club-এর হলটা নিয়েছিলেন?

হবে। হেলেনের নিস্পৃহ জবাব। আমরা ত ক্রাফট্‌সের exhibition করি মাঝে মাঝে—

রাখহরি অধীরভাবে বলে উঠল, আচ্ছা দেখুন, আপনাদের দুজনের কাছে আমার একটা অনুরোধ—আমাদের মাত্র একখানি ঘর, আমরা একজন গেস্ট রাখতে পারি। ভুলক্রমে আপনারা দুজন এসে গেছেন, এখন, যদি কিছু মনে না করেন, আপনাদের মধ্যে একজন থাকুন আর একজন—কথা আটকে গেল রাখহরির।

Oh never! পাইপ নামিয়ে বোকেন বলে ওঠে, আমি কিছুতেই যাচ্ছি না। কোথায় যাবো এখন বলুন, বাড়িওয়ালাকে দস্তুরমত নোটিশ দিয়ে এসেছি—এখন খালি বাসা পাবো কোথায়—?

হেলেনও সমস্বরে বলে উঠল, আমি কিছু বুঝতে পাচ্ছি না, আমায় কি চলে যেতে বলছেন মিঃ রায়? আমিও ত বাড়ি ছেড়ে এসেছি। সেখানে এতক্ষণে নতুন ভাড়াটে এসে গেছে......তাছাড়া আমি ত আমার ঘরে জিনিসপত্র গুছিয়ে ফেলেছি, দেখে আসুন না......

উনি বুঝি ঐ ঘরটা occupy করেছেন, বোকেন বলে ওঠে, ঠিক আছে, আমি এই ঘরটা নিচ্ছি—তবে ফার্ণিচারগুলো সরাতে হবে—

ওটায় আ-আ-আমরা থাকি যে—রাখহরির ধরা গলা।

আপনার ত বাড়ি মশায়......হে হে-হে—বোকেন যেন হাসিতে ফেটে পড়ে। আপনারা যেখানে খুশি থাকতে পারেন। কি বলেন মিস—

মজুমদার, কথা জুগিয়ে দিল হেলেন। আপনাদের আবার থাকবার ভাবনা কি? নিজের বাড়ি, যেখানে খুশি থাকতে পারেন ...হিক হিক হিক—হেলেনও হাসির ফুলঝুরি ছাড়ে।

রাত্রে ছাদে দুখানা মশারি পড়েছে। একটা বিজনবালার একটা রাখহরির।

যাই বল, বিজনবালা কথা পাড়ে। বোকেনবাবু এক কথার লোক, এসেই টাকাটা অ্যাডভান্স করে দিয়েছে।

মিস মজুমদারও সেদিকে খেলাপ করেনি, রাখহরি পাল্টা তুরুপ মারে। সন্ধেবেলা ব্যাগ খুলে টাকাটা মিটিয়ে দিয়েছে......যাই হোক, মন্দ হল না—কি বল?

এবার তাহলে দিঘায় যাবার আর বাধা কি?

সেকি? এদের খাওয়াবে কে? আমরা গেলে চলবে কি করে? দেখতে পাচ্ছ বিজু ওপরে নীল আকাশ, নক্ষত্র দেখা যাচ্ছে—মনে কর এটা যেন সমুদ্রতীর। বাইরের যে ঝিরঝিরে বাতাস লাগছে আমাদের মশারির গায়ে সেটা বঙ্গোপসাগরের হাওয়া। কল্পনা কর আমরা দিঘায় বেড়াচ্ছি—নীচে কিসের শব্দ না? কে যেন হাসছে—

কে আবার? ঝাঁঝিয়ে ওঠে বিজনবালা, দুজনে খুব গল্প চলছে আর মাঝে মাঝে খুব হাসির হল্লাও উঠছে! সন্ধ্যে থেকেই ত চলছে।

মন্দ হল না। ওরাও সঙ্গী পেয়েছে গল্প করার—তাই না?

ওই শোনো, এখন আবার দুম দুম শব্দ।

ওটা কিসের?

দেয়ালে পেরেক ঠুকছে বোধ হয়—সর্বনাশ করলে গো, ঘরগুলো গেল আজকে! ঘরগুলো গেল! কোথা থেকে দুই ভূত এসে আমাদের ঘরছাড়া করল গো!

ছিঃ, অতিথিদের ও কথা বলতে আছে! ওরা যে পেয়িং গেস্ট।



AGARTALA

।। ১৫ ।।

সুরবালার মনে হল সে টানা একটা দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠল যেন। কিম্বা যেন কোন ডাইন বা জাদুগরের মায়ায় মরে ছিল এতদিন—নতুন করে সোনারকাঠির ছোঁয়া লেগে বেঁচে উঠল আবার। খোলের আওয়াজে আর খঞ্জনীর বোলে যে এত আনন্দ তা জানত না, এমনভাবে কোনদিন অনুভব করেনি সে। আজ বুঝল এই তার জগৎ, এই তার জীবন।

মুজরো আসতেও আরম্ভ হল প্রায় প্রথম দিন থেকেই। সুরো খাটতেও লাগল প্রাণপণে। ক্লান্তি জানে না সে, বিশ্রাম নিতে চায় না। বাজনদাররা দোহাররাই বরং ক্লান্ত হয়ে পড়ল। হরেকৃষ্ণ তো একদিন স্পষ্টই বলে ফেলল, 'সুরোদি, দুটো-একটা দিন রেহাই দাও, এত খাটলে আমরা পারি কি করে! আমাদের তো বয়েস হচ্ছে।'

সুরো বলে, 'কেন কেষ্টদা, এই তো দু'-তিন মাস টানা ছুটি খেলে—এখনও অরুচি হল না ছুটিতে। কাজ ছাড়া তোমরা থাকো কি করে?'

'ওগো, হ্যাঁ হ্যাঁ—কাকে নতুন ময়লা খেতে শিখলে অমনি হয়। আমাদের তো আর নতুন নয়—খেটে খেটে অরুচি ধরে গেছে।'

সুরো কিন্তু শোনে না। সে যা পায় তাই নেয়। কোন বায়নাই ফেরায় না প্রায়। আগের সে 'কিন্তু কিন্তু' পরমুখাপেক্ষী ভাব আর নেই—এই গত বছরে দেড়েক তার যেন অনেক বয়স বেড়ে গেছে। কর্তৃত্ব করার শক্তি আপনা থেকেই আরম্ভ হয়ে গেছে কতকটা—সবাই সেটা মেনেও নিয়েছে। মতির সংসার ও কারবারের সে-ই এখন সর্বেসর্বা। দরদস্তুরও করে সে পাকা পুরনো লোকের মতো। একশো, এমনকি তেমন শাঁসালো মানুষ পেলে সওয়াশো দেড়শো টাকা পর্যন্ত আদায় করে নেয় সে। আবার পঞ্চাশ-ষাট টাকার মুজরোও ছাড়ে না, সেক্ষেত্রে নানা অজুহাতে বাজনদার দোহার দেখিয়ে উপরি কয়েকটা টাকা আদায় করে। তার দিনে দু' জায়গা গাইতেও আপত্তি নেই। গাইলেও দু-একদিন। অল্প টাকার বায়না হলে তাদের স্পষ্ট বলে নেয়, 'টাকা কম নিচ্ছি আমরা—কিন্তু বেশীক্ষণ গাইতে পারব না। সবসুদ্ধ তিনঘণ্টা থাকব আমরা। সওয়া দুঘণ্টা আড়াই ঘণ্টা গাইব। আসর তৈরি রাখবেন, দেরি হলে আপনাদেরই ক্ষতি। তখন ধরপাকড় করলেও থাকতে পারব না। বৈকালে আগে থাকতে কথা দেওয়া আছে, বড়লোকের বাড়ি, বেশী টাকার বায়না সেটা—ঠিক সময়ে যেতেই হবে। আমাদেরও তো নাওয়া-খাওয়া আছে, মানুষের জান বৈ তো আর নয়।...এ-ই আমায় লোকজন মারমার করছে। আপনাদের উপরোধে পড়ে বলতে গেলে হাতে-পায়ে ধরে রাজী করিয়েছি।'

কথাটা খুব মিথ্যেও নয়, একদিনে দু' জায়গায় গাইতে রীতিমতো বিদ্রোহই করে এরা—অনেক করে বলে-কয়ে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নেওয়ায় খরচ বাড়তি দেবে বলে রাজী করায় সুরো।

আসলে সুরবালার যেন একটা ভয় হয়ে গেছে। মনে মনে সর্বদাই 'হারাই হারাই' ভাব। অথবা—তার এই নবজন্মের একটি ঘণ্টাও সে বাজে খরচ করতে চায় না। প্রতিটি মুহূর্ত এই জীবনে বাঁচতে চায়, এই জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত অনুভব করতে চায়।

মতি খুব খুশী। এতটা আশা করেনি সে। তার সামনেই কথা হয় খদ্দেরদের সঙ্গে, দালালদের সঙ্গে। পাশের ঘর অবশ্য—কিন্তু শোনার কোন অসুবিধা নেই। মাঝের দরজাটা একটু আড়-ভেজনো থাকে মাত্র। মতির মনে হয় এমনভাবে দর সেও করতে পারত না। এত খাটতে তো পারতই না। দালাল আর দোহার বাজনদারদের এঁটুকু মেরে যা দাপটে রেখেছে, ভাবতেও অবাক লাগে। সেদিনের সে অনুগ্রহপ্রার্থিনী যেন রাতারাতি সম্রাজ্ঞী হয়ে বসেছে।

একটু ঈর্ষা বোধ করারই কথা। যাকে অসহায় অবলম্বনপ্রার্থী বলে জানি সে যদি কোনদিন মাথা তুলে আমার সমপর্যায়ে উঠে আসে—আমার কোন ক্ষতি না হলেও সেক্ষেত্রে আমি ঈর্ষা বোধ করব—এইটেই স্বাভাবিক। স্বাভাবিক সকল মানুষের ক্ষেত্রেই। কিন্তু সে-ঈর্ষাও মতিকে বিক্ষিপ্ত করে তোলে না এইজন্যে যে, শিল্পীসত্তার থেকেও বিষয়ীসত্তা বোধ করি তার মধ্যে প্রবল। সুরোর কাজ-কারবার খুব পরিষ্কার। একটা মোটা খাতা করেছে, তাতে কত টাকায় কার সঙ্গে রফা হচ্ছে, কে কত আগাম দিচ্ছে—পরে কত আদায় হচ্ছে তা পরিষ্কার

লেখা। খরচপত্র বাদে যা আদায় তার অর্ধেক—পাই পয়সা পর্যন্ত হিসেব করে চুকিয়ে দেয় সুরবালা—রোজকার রোজ। সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ কি অস্পষ্টতার অবকাশ রাখে না।

প্রথম প্রথম দু-একদিন 'আজ থাক না, হবেই এখন। এই এত খেটেখুটে এলি হাক্লান্ত হয়ে—আবার হিসেব নিয়ে বসলি কেন' বলতে গিয়েছিল মতি। সুরবালা বলেছে, 'না মাসী, সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভাল। ঐ করে গাফিলি করে ফেলে রাখলে পড়েই থাকবে হয়ত—তারপর আমার একটা ভুল হল কি খরচ করে ফেললুম—কিম্বা তোমারই মনে রইল না, মনে মনে একটা সন্দ জেগে রইল আমি বুঝি গোঁজামিল দিচ্ছি—অথচ মুখফুটে বলতেও পারবে না—মনের মধ্যে একটা পাঁচিল পড়বে অকারণ। ওতে আমার কাজ নেই। এতক্ষণ এত চেঁচিয়ে আসতে পারলুম—এটা পারব না? ও যখনকার যা তখন তখনই তা মিটিয়ে ফেলা ভাল।'

টাকা-পয়সা গুনে গুনে থাক দিয়ে মতিকে দেখিয়ে ছোট হাতবাক্সে পুরে লোহার সিন্দুকে তুলে চাবি মতির বিছানার তলায় গুঁজে রেখে সুরো বাড়ি যায় তবে। আজকাল সেইজন্যে ওর ওপর অগাধ বিশ্বাস হয়েছে মতির—তার সংসারের খরচপত্র সব ওকে দিয়েই করায়। মানে সুরোর একটা খাটনি বেড়েছে। রোজ সকালে এসে সে-সব জমা-খরচ ঠিক দিয়ে খাতায় লিখে রাখতে হয়, নিত্যকার যা খরচ, তা ঠাকুর-চাকর-সরকারকে বুঝিয়ে দিতে হয়।...

কবিরাজী ওষুধে যত না হোক—এতেই যেন মতি সেরেও উঠছে দ্রুত। ইদানীং হাটু-কনুইয়ের ফুলো অনেকটা কমেছে। হাত-পা নাড়তে পারছে, ধরে বসিয়ে দিলে কিছুক্ষণ বসে থাকতেও পারে। কারবার বন্ধ হয়ে গেল বলে হতাশ হয়ে পড়াতেই শরীরটাও যেন ভেঙে পড়েছিল। এখন দেখছে যে, পুরো টাকা তার থাকলেও যা আয় হত—অর্ধেকও তার চেয়ে কিছু কম হচ্ছে না। আরও সেই আনন্দে নতুন আশায় সেও যেন নতুন করে সঞ্জীবিত হয়ে উঠছে, তারও নবজন্ম লাভ ঘটছে।

হাওড়া কুষ্ঠ কুটির

৭২ বৎসরের প্রাচীন এই চিকিৎসাকেন্দ্রে সর্ব-প্রকার চর্মরোগ, বাতরক্ত, অসাড়তা, ফুলা, একজিমা, সোরাইসিস, দূষিত ক্ষতাদি আরোগ্যের জন্য সাক্ষাতে অথবা পত্রে ব্যবস্থা লউন। প্রতিষ্ঠাতা : পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা কবিরাজ, ১নং মাধব ঘোষ লেন খুরুট, হাওড়া। শাখা : ৩৬, মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা—৯। ফোন : ৬৭-২৩৫৯

দেড়মাস দুমাসেই মুখের চেহারা বদলে গেছে আবার।

তবে টাকার ওপর লোভ যতই বেশী হোক—একটা ব্যাপারে মতি সেটা খুব সম্বরণ করেছে। নিজের কথার ঠিক রেখেছে। প্রথম প্রথম সুরবালা পেলারও ভাগ দিতে এসেছে, ঠিক ঠিক হিসেব করে অর্ধেক, মতি নেয়নি। জিভ কেটে বলেছে, 'নারে, ও তোর। বলেই তো দিয়েছি। ওটা তো বকশিস। ব্যবসার মধ্যে তো নয়। ও হল খুশির সওদা। তোর কাজ দেখে খুশি হয়ে যে-যা দেয়—ও আমি ছোঁব না এক পয়সাও।'

'কিন্তু মাসী ভেবে দ্যাখো—পেলার টাকা মজুরোর টাকার চেয়েও বেশী হয়ে যেতে পারে—তেমন তেমন বাড়ি হলে। এখন ছেড়ে দিচ্ছ, এরপর আপসে মরবে না তো? মনটা ছোট হবে না তো?' সুরবালা জেদ করে।

'সে তো বেশী হয়ই। বিশেষ করে ছেরাদ্দ বাড়িতে পেলা তো বেশীই ওঠে—দুনো তিনগুণও হয়ে যায়—বড়লোকের বাড়ি হলে। সে জানি। তবুও ও লোভ করব না। সেটা অধম্ম হবে। আর তাতে আবার তোর মন ছোট হয়ে যাবে। হতে বাধ্য। মনে হবে আমি ভূতের ব্যাগার খাটছি। তাছাড়া একটা কথা কি জানিস, ওটা হল বেহিসেবী পয়সা। লোভে লোভে বেড়েই যায়—বিশেষ টাকা বড় পাজী জিনিস, ওদিকে লোভ দিলে এরপর মনে হবে—হিসেবের মধ্যে তো ধরা যাবে না—মনে হবে তুই সব দিচ্ছিস না কিছু হাতে রাখছিস। তারপর ভাবব বেশীটাই হয়ত তুই রাখছিস। ও-পাপ আর দরকার নেই। ও তোরই থাক। পেলুম না সে এক জ্বালা—পাবার শতেক।'

পেলা পায়ও এক-একদিন খুব। কোন কোনদিন সত্যিই মজুরী ছাড়িয়ে যায়। মাঝে মাঝে সোনাও পায়। বড়লোকরা রুমালে বেঁধে দেন অনেকে। গিন্নীরা হার খুলে দেন গলা থেকে। এক বিয়ে-বাড়িতে বেনারসী শাড়িও পেল। এমনি শাড়ি তো আছেই। সকালে গোষ্ঠ গাইলে হাঁড়ি-ভর্তি ঘি-মাখন পাওয়া যায়। টাকা না হোক—এসব জিনিসের ভাগ নেবার জন্যে খুব পীড়াপীড়ি করেছিল সুরো। বিশেষত গিনিগুলো নেবার জন্যে। গিনি ভালবাসে মতি—তবু সে রাজী হয়নি কিছুতেই! একখানা শাড়ি পর্যন্ত নেয়নি। তার ঐ এক যুক্তি, একটা সুতোর খেই নিতে শুরু করলেই এরপর যথাসর্বস্ব নিতে ইচ্ছে করবে। বলে, 'তুই যা আমার করলি মা পেটের মেয়েও তা করে না। আমি অভাগী মানুষ চিনতে না পেরে নিজেও কষ্ট পেলুম, তোকেও দিলুম। আমার আর দরকার নেই রে। নেহাৎ এতকাল এই ব্যবসা করে এসেছি—এটা চালু না থাকলে যেন মনে হত জ্যান্তেই মরে গেছি—তাই ঐ বন্দোবস্ত। নইলে আমার যা আছে যদি আর বিশ-পঁচিশ বছরও বাঁচি—একরকম করে কেটে যাবে।'

মতির এ-কৃতজ্ঞতা যে আন্তরিক—তা আরও বেশী করে বোঝা গেল মাস-দুই পরে। সে আরও একটু সুস্থ হয়ে উঠে যখন বাড়ির মধ্যে অল্প অল্প চলাফেরা করতে লাগল, এক-আধবার ওপর-নিচেও করতে শুরু করল সিঁড়ি ভেঙে—সুরো প্রস্তাব করল, 'এইবার তুমি নিজে এক-আধটা মুজরো নাও মাসী, দেখবে সেই সুখে আরও চটপট সেরে উঠবে। না-ই বা দাঁড়িয়ে গাইলে, বসে বসেই গেও। তুমি গেলেই লোকে কৃতার্থ হয়ে যাবে।'

'যাবো যাবো—দাঁড়া, গলাতে তো জঙ ধরে গেছে একেবারে, একটু মেজেঘষে সেটা পোষ্কার করে নিই।...এখন গাইতে গেলেই লোকে তোর সঙ্গে তুলনা করবে। বলবে, ওমা—মতি কেত্তনউলী এই—! এরই এত নাম! এর চেয়ে সুরো তো ঢের ভাল। না, বুড়ো বয়সে তোর কাছে ব্যাভ্রম হতে পারব না। গাইব যেদিন আবার—লোককে তাক্ লাগিয়ে দিতে হবে না!' বলে হাসতে লাগল।

কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল নিজের গলার জঙ্ ছাড়ানোর চেয়েও সুরোর গলায় শান দেওয়ায় তার উৎসাহ বেশী। সে ভাল হয়ে উঠেই ওকে নিয়ে পড়ল। সকালে রোজই একটু-আধটু 'রেওয়াজ' চলত, এবার মতি তাতে নিয়মিত গিয়ে বসতে শুরু করল। সে বলত, 'রিয়েস্যাল' শব্দটা সুরোর কাছ থেকেই শিখেছিল। থিয়েটারের বুলি এটা।

এই আসরে দু-একদিন বসবার পরই সুরবালা বুঝল মতি কত বেশী জানে—আর সে কত কম। কীর্তনের যে এত অঙ্গ আছে, এতও শেখবার মতো জিনিস আছে সে সম্বন্ধে সুরোর, এতকাল মতির গান শোনা সত্ত্বেও কোন ধারণা হয়নি। দেখল, এক এক নতুন জগৎ শুধু নয়—বিপুলও। মতি শুধু তাকে চালু করেই ছেড়ে দিয়েছিল আসল জিনিস কিছু এতকাল দেয়নি। ভরসা করে বিশ্বাস করে দিতে পারেনি। শিল্পীরা দেয়ও না সাধারণত, নিজের সন্তান বা প্রিয়তম ছাত্রর জন্য রেখে দেয়। বিশেষ সংগীতশিল্পীরা। এতকাল পরে সুরো সেই আস্থা আর স্নেহ অর্জন করেছে, তাকে উপযুক্ত আধার বলেও বুঝেছে মতি। সে যত্ন আর শ্রম ঢেলে দিল যেন। সুরোকেও যেমন খাটাতে লাগল তার সঙ্গে নিজেও তেমনি খাটতে লাগল।

'ভাবছিস এ আবার কি এক ঝামেলা হল। এর চেয়ে বুড়িটা পড়েছিল সেই তো ভাল ছিল—সেরে উঠে কাল হল— খাটিয়ে খাটিয়েই বুঝি দফা নিকেশ করে দেবে আমার। না? ওলো, এই বেলা এই হাড় ক'খানা থাকতে থাকতে আদায় করে নে—যতটা পারিস। এরপর কেউ আর এত দিতেও পারবে না। একেক জন এক এক ধারা ধরে সাধনা করেছে, শিক্ষা করেছে, তারা কেউই অপরের কোন খবর বলতে পারবে না। জানেও না কিছু। অনেক খেটে, অনেক গুরোর বাড়ি দিয়ে, অনেকের পায়ে তেল দিয়ে, কেষ্টর নাথিঝাঁটা খেয়ে তবে

আমাকে শিখতে হয়েছে, জানতে হয়েছে এসব। সে-সব তো তোকে কিছুই করতে হল না—দিব্যি দোতলার ঘরে জাজিম গালচেতে বসে আরাম করে শিখছিস। এত সহজে পাইনি আমরা, এত সহজে কেউই পায় না। আরাম করে শেখবার জিনিস নয় এসব।'

শেখার আর শিক্ষার ফাঁকে ফাঁকে ইতিহাসও বিবৃত করে। যোহার বাজনদাররা তামাক খেতে নিচে নেমে গেলে পা-দুটো ছড়িয়ে দিয়ে হাঁটুতে হাত বুলোতে বুলোতে মালাসুদ্ধ হাতটা কপালে ঠেকিয়ে বলে, 'আমি যে গান গাই—সাধারণ কোন কেত্তনউলী এ-লাইনে গায় না। শুনেছি এর আদি জন্ম হল খেতুরে। এতে খাটুনি বড় বেশী, একালে লোক হাল্কা গানের দিকেই বেশী ঝুঁকেছে, কিন্তু আগে এতটা ছিল না। আর আমারও কেমন একটা ঝোঁক ছেলেবেলা থেকেই—যা সহজ, যা অল্পে হয়, তাতে আমি যাবো না; যা অপরে পারে না আমি যদি তা না পারি, তবে আর বাহাদুরি কি?'

আর একবার হাতটা কপালে পৌঁছয়, কেত্তন শুরু করেন প্রথম মহাপ্রভুই। তবে তিনি লীলাকেত্তন গাইতেন কি পালা তা বলতে পারব না। খোলকত্তাল জগঝম্প—পাঁচটি জিনিস নিয়ে অনেক দল লোক নিয়ে গাওয়া হত বলে সংকীত্তন বলা হত। শুনেছি—ঠিক জানি না, ভগবানের কীর্তি গাওয়া হয় বলে কীত্তন, তা থেকে আমরা বলি কেত্তন। তবে শ্রীল রূপ গোসাই আর তাঁর ভাইপো জীব গোসাই প্রভু—এ'রা লীলাই গাইতেন বলে শুনেছি। এ'দের তিরোধানের পর এ'দেরই শিষ্য-পরম্পরায় একজন ঠাকুর নরোত্তম—ধনী নরোত্তম যাকে বলে কেউ কেউ, তিনি খেতুরে এক মোচ্ছব দেন, মহামোচ্ছব চারিদিক থেকে বহু বোষ্টম-সাধু গাইয়ের দল আসে, রাঢ় থেকেই বেশী—সেইখানেই এই ঠাটের গান চালু করেন নরোত্তম ঠাকুর। আগে যা গাওয়া হত, তাতে ভক্তির কথাটাই প্রবল—গানের চেয়ে চোখের জলের দাম ছিল বেশী। ইনিই একটা আইনে ফেললেন সবটাকে। নতুন রূপেতাপ রূপ দিলেন কেত্তনের।'

এই বলে আর একটু থেমে নিঃশব্দে কয়েকবার জপ করে বলে, 'আর এই নরোত্তম ঠাকুরই গৌরচন্দ্রিকার রেওয়াজ করেন! মানে—কথাটা বুঝিয়ে বলি একটু। বোষ্টমরা বলেন, ও'রা বিশ্বেস করেন শ্রীকৃষ্ণকে হারিয়ে রাধিকা যে একশ' বছর কেঁদেছিলেন—যে দশাটার কথা আমরা মাথুরে গাই—সেও ভগবানের এক লীলা। তা রাধিকার শাপেই হোক আর ভগবানের সেই লীলা আস্বাদনের শখ হওয়ার জন্যেই হোক—গৌরাঙ্গ অবতারে তিনি রাধিকার দেহ নিয়ে তাঁর মন নিয়ে জন্মেছিলেন; সেইজন্যেই হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ করে কেঁদে কেঁদে বেড়াতেন তাঁর, সেইজন্যেই কান্তা-ভাবে সাধনা। তাই ও'রা যেন সবাই জানেন, শ্রীকৃষ্ণ ও'দের প্রভু, ও'দের গোসাঁই—এইভাবে দেখেন ও'রা ভগবানকে। তা গৌরাঙ্গ যদি শ্রীকৃষ্ণই হন, আর সে-জন্মের লীলা আস্বাদ করতেই ধরায় অবতীর্ণ হয়ে থাকেন—তাহলে এ-জন্মেও সেইসব লীলা করবেন তো। তাই গৌরকে দিয়েই শুধু যে গান আরম্ভ করা হয় তা নয়—এ-লীলায় সে-লীলায় মিলিয়েও দেওয়া হয়। ধর, যেমন নৌকাবিলাস। গৌর নৌকায় বিহার করছেন এই দিয়ে আমরা শুরু করি—তারপরই চলে যাই শ্রীকৃষ্ণলীলায়। কেউ কেউ অবশ্য শুধুই গৌরাঙ্গের স্তব গেয়ে শুরু করেন। যাই হোক—গোরাচাঁদই আমার এই কেত্তনের মূল তো—সেইজন্যে তাঁকে পেন্নাম না করে কেউ লীলা শুরু করি না। গৌরচন্দ্রের কথা দিয়ে শুরু বলে ঐ শুরুটাকে বলে গৌরচন্দ্রিকা। দ্যাখ্ না এই থেকে কথাটা এমন ছড়িয়ে গেছে, কেউ যদি কোন কথা বলতে এসে, বাত্তারাটা সারিয়ে রেখে আগড়ুম বাগড়ুম বকে, আমরা বলি, নে তোর গৌরচন্দ্রিকা রাখ দিকি, যা বলবার বলে ফেল্।'

এই বলে হাসে মতি।, 'শুধু ভগবানের নাম গাওয়া 'ক হরেকেষ্ট হরেকেষ্ট গাওয়া যা—এও একরকমের কেত্তন। কিন্তু আমরা যা গাই তা হল কৃষ্ণরাধিকার লীলা—তাই একে বলে লীলাকেত্তন, কেউ কেউ আবার পালাকেত্তনও বলে। ভগবান যেসব লীলা করেছিলেন, তারই এক-একটা অংশ এক-এক পালা করে গাওয়া হয়। এমন পালা এক-আধটা নয় চৌষট্টিটা আছে। প্রাচীন পদকর্তারা যেসব গান লিখে গেছেন, ভেন্ন ভেন্ন রাগ-রাগিণীতে ভেন্ন ভেন্ন তালে—দরকার মতো বেছে বেছে মিলিয়ে মিশিয়ে গাই আমরা, একটা পালার মতো খাড়া করি। তাই পালা-কেত্তন বলে। তা চৌষট্টি রসের মধ্যে সব চালু নেই, সব গান গাওয়াও যায় না, আমরা মোটামুটি যা গাই, তার মধ্যে গোষ্ঠ, পূর্বরাগ, দান, মান, রাস, ঝুলন, মাথুর—এই কটারই চল বেশী। এর আবার গাইবার সময় বিশেষ আছে। গোষ্ঠপালা কেউ সন্ধ্যেয় গাইবে না—সকালে ছাড়া গোষ্ঠ হবে না। তেমনি রাস বা ঝুলন সকালে গাওয়া যায় না।'

বলতে বলতে হয়ত চুপ করে মতি, হয়ত অনামনস্ক হয়ে পড়ে, কিম্বা মনের মধ্যে গুছিয়ে নেয় বক্তব্যগুলোকে, মনে করার চেষ্টা করে কথাগুলো। দু-এক কলি গানও হয়ত গুনগুন করে ভেঁজে নেয়—তারপর আবারও মালাটা কপালে ঠেকিয়ে বলে, 'আ মলো যা, হরেকেষ্টর আক্কেলটা দেখেছ! সেই গেল আর ফেরবার নাম নেই। তামুক খেতে গেল—না গাঁজা? কোথায় দ্যাখো গে যাও দাঁত ছরকুটে ভিরমি লেগে পড়ে আছে।...হ্যাঁ, যা বলছিলুম, খেতুর হল গে রাজশাহী জেলার গরানহাটি পরগণার মধ্যে, তাই নরোত্তম ঠাকুর যে ঠাট প্রবর্তন করলেন, তাকে বলা হয় গরানহাটি। গরানহাটি ঠাটের কেত্তন। কিন্তু এ-ধারার গান গাওয়া অত সহজ নয়, সহজ হলও না। উঁচুদরের গান, রীতিমতো শিক্ষা মেহনৎ দরকার। আমিও তেমন আসর দেখলে এ-ঠাটে গাই না, হালকা চালের রেনেটি ঠাটে গাই। গরানহাটি ঠাট যে-সে যেমন গাইতেও পারে না—তেমনি বুঝতেও না।'

তারপর একটু থেমে, দম নিয়ে বলে, 'নরোত্তম ঠাকুর যেমন-তেমন গাইয়ে ছিলেনও না, শুনেছি তিনি গান শিখেছিলেন খোদ হরিদাস ঠাকুরের কাছে। হরিদাস ঠাকুর ছিলেন সেকালের সবচেয়ে বড় গাইয়ে তানসেনেরও ওস্তাদ—মানে গুরু। লোকের মুখে তাঁর গানের কথা শুনে আকবর বাদশা নাকি ডেকে পাঠিয়েছিলেন—তা হরিদাস ঠাকুর যান নি। কেনই বা যাবেন—তিনি তো আর খেতাব কি টাকার কাঙাল ছিলেন না। বলে পাঠিয়েছিলেন আমি ভিখিরি-ফকিরী মানুষ, ওসব রাজা বাদশার দরবারে আমার কি কাজ? অপর কোন নবাব বাদশা হলে হয়ত তখনই শূলে চড়াবার হুকুম হত—কিন্তু আকবর ছিলেন অন্য ধাঁচের মানুষ, গুণীর মর্যাদা বুঝতেন। বললেন, তানসেন তুমি তৈরী হও আমিই যাবো। তানসেন বললেন, উঁহু, তা হবে না, বাদশা দেখলে গাইবেনই না আমার গুরু—আর লোকজন দেখলে গান চমকেও যাবে। তখন ঠিক হল দুজনেই বৈরিগী সেজে গিয়ে আড়াল থেকে গান শুনবেন। ...লোকে বলে হরিদাস ঠাকুরের গান শুনে বাদশা নাকি তানসেনকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, এ'র কাছেই তো তোমার শিক্ষা, তা কৈ, তুমি তো এমন গাইতে পারো না! তাতে তানসেন জবাব দিয়েছিলেন, হুজুর, আমি গান শোনাই দুনিয়ার বাদশাকে, আমার গুরুজী শোনান বাদশার বাদশাকে—তফাৎ একটু থাকবে না?'

এই প্রসঙ্গের জের টের আর এক সময় আবার ধরে, 'গরানহাটি ঠাটে গাওয়া চার পাটি দাঁতের কম্ম, বুকের জোর থাকা চাই। এতে কীত্তন গাইলে সবাই শুনবেও না, বুঝবেও না—তাই ভাবগতিক দেখে শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দন ঠাকুর এক নতুন ধারা আনলেন। খেতুরিতে মহামোচ্ছব হবার বেশ কিছুদিন পরে রঘুনন্দন ঠাকুর এই ধারায় গাইতে শুরু করলেন। রঘুনন্দন ঠাকুর হলেন কাঁদড়ার মঙ্গল ঠাকুরের বংশধর। কাঁদড়া হলগে রাঢ় দেশে—বীরভূম নাকি বলে সেই দেশে। আমরা যে পদকর্তা জ্ঞানদাস ঠাকুরের গান গাই—ইনিও এই ধারায় গাইয়ে। জ্ঞানদাস গান বাঁধতেন, গাইতেনও খুব ভাল। রঘুনন্দন ঠাকুর অনেকটা হাল্কা করে



বি. সরকার এণ্ড সন্স
সন অফ লেট এস. বি. সরকার
১২৪, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলিকাতা-১২, ফোন: ৩৪-৯২০৩

আনলেন তাই বলে একেবারে—এখন যে সব ঢবআলারা হয়েছে ঢব্ গেয়ে বলে কেমন গাইলুম তেমন নয়—এতেও মেহনৎ ছিল বেস্তর। বৈঠকী আমেজটা এল, কিন্তু সুরের কারিগরীও রইল, অনেকটা খেয়াল গানের মতো। তার মধ্যে খেয়াল গান তো তুই বোধহয় শুনিস নি। সে যাক্‌গে মরুক গে—এতেও অনেকটা সহজ হয়ে এল। লোকে বুঝতেও পারল, আনন্দও পেল। মনোহরশাহী কেন? এ নিয়ে বাপু নানান মুনির নানান মত— কেউ বলে কাঁদড়া মনোহরশাহী পরগণায় বলে ঐ নাম হল, কেউ বলে এই দশঘরার কাছে মনোহর শাহ্ বলে একজন প্রথম ঐ ঢং প্রবর্তন করেন বলে ওর ঐ নাম। কেউ বলে কাঁদড়াতেই আউলে মনোহর দাস বলে এক বৈরাগি ছিলেন, তিনিই এই ঢং আমদানী করেন। কিন্তু আমার মনে হয় মনোহরশাহী পরগণার কথাটাই ঠিক, সব জায়গাতেই তো দেখি জায়গার নাম থেকেই ঠাটের নাম।'

এসব ইতিহাস ভাল লাগার কথা নয়—কিন্তু সুরবালার লাগে। মন্ত্রমুগ্ধের মতোই শোনে সে। তার কাছে এ এক সম্পূর্ণ নতুন জগৎ। গাইছে সে, বাহবাও পাচ্ছে এতকাল—কিন্তু এ গান সম্বন্ধে যে এত কথা জানবার আছে তা কখনও কল্পনা করেনি। মতি শুধু মুখেই বলে না—একই পদ নিজে বিভিন্ন ঠাটে গেয়ে শুনিয়ে দেয়—তফাৎটা বুঝিয়ে দেয়। তারও যেন নেশা লেগেছে একটা। এতকালের অধীত বিদ্যা আর জ্ঞান কাউকে দেবার জন্যেই বুঝি এতকাল ছটফট করছিল সে, আধার পায় নি। আদৌ শুনতেই চায় না কেউ—এমন মুগ্ধদৃষ্টিতে মুখের পানে চেয়ে একাগ্রমনে শোনা তো দূরের কথা। মনে করেও রাখে না। এ রাখবে—এ মেয়েটি, তা ওর মুখের দিকে চেয়েই বোঝে। (রেখেও ছিল। পরবর্তী জীবনে সুরোদিদি বলেছিলেন আমাকে, 'সেদিনের প্রত্যেকটি কথা আমার মনে আছে। আজও তেমন চেলা বা সাগরেদ পেলে শিখিয়ে যেতে পারি, আর কিছু না হোক, গুরুঋণ শোধ হয় খানিকটা। কিন্তু শোনাব কাকে? কেউ কি আর আজকাল শিখতে চায়? না শুনতেই চায় এসব ?')

'ঠাট বা ধারা কি একটা?' কোন কোন দিন, মুজরোটুজরো না থাকলে পূর্ব অভ্যাসমতো বিকেলে গা ধুয়ে কুঁচনো শাড়ি পরে সিঁদুর মেখে পা-ছড়িয়ে বসে মালা জপতে জপতেও এসব প্রসঙ্গ ওঠে 'গরানহাটি থেকে একটু হালকা করার জন্যে মনোহরশাহীর চল করা হল কিন্তু তাতেও লোক তেমন নিলে না। তাই লোকের মেজাজ বা মন বুঝে আর একটু হালকা করে 'ফললেন পদকর্তা ঠাকুর বিপ্রদাস ঘোষমশাই। ঠাকুরমশাই ছিলেন হুগলী জেলার রাণীহাট পরগণার লোক, সেই জন্যেই ঐ ধারাটাকে বলে রাণীহাটী, তা থেকে রেনেটি। এটা কিরকম দাঁড়াল জানিস? গরানহাটিকে যদি ধ্রুপদ বলো, তাহলে মনোহরশাহী হল গে খেয়াল—রেনেটি ঠুংরি। এই রকম তফাৎ পেয়ার। এই যে এখন আখরের চল হয়েছে—গাইতে গাইতে আসল গান ছেড়ে আখর দেওয়া—এও শুনেছি ঐ বিপ্রদাস ঠাকুরের আসন থেকেই শুরু হয়েছে।

'এ ছাড়া ধরোগে ময়নাডালের দল। মহাপ্রভুর পার্ষদ ছিলেন গদাধর ঠাকুর তাঁর বংশের সন্তান ছেলেন মঙ্গল ঠাকুর, তাঁর বংশ এখনও কাঁদড়ায় বাস করেন—আদি বাস অবিশ্যি ওখানে নয়—সে ঐ মুকশুদোবাদের ওদিকে কোথায় ছেল শুনিছি—কাঁদড়া তো আমাদের দেশের কাছে—মানে কাটোয়ার কাছাকাছি বর্ধমান জেলায়। তা সে যাকগে মরুক গে নিসিংহি মিত্তির হলেন ঐ মঙ্গল ঠাকুরের শিষ্যিসাগরেদ, ওঁদের কাছেই গান শেখেন। এঁদেরই বংশে সেই ধারাটা বজায় রেখেছেন, ময়নাডালের ধারা বলে।... এমন কত বলব। মন্দারিণী ঠাট বলে একটা, গড়মান্দারণ বলে কী একটা নাকি জায়গা আছে—সেখান থেকেই ঐ ঠাটের নাম। সে জায়গা নাকি বাংলার মধ্যে। তবে এসব নতুন নয় কি হাল আমলের নয়। যখন খেতুরে মোচ্ছব হয় তখনও এসব ধারায় লোকে গেয়েছে। ঝাড়খন্ডী বলো, মন্দারিণী ধারা বলো—এ সবই বহুকাল থেকে লোকে গেয়ে আসছে। ঝাড়খন্ডী তো খুবই পুরনো আমাদের কড়ুইয়ের গোকুল ঠাকুর পঞ্চকোটের শেরগড়ে গিয়ে বাস শুরু করেন—তিনি যে ধারায় গাইতেন সেইটেই ঝাড়খণ্ডী বলে বলছে। পঞ্চকোট ঐ ঝাড়খণ্ডের মধ্যে পড়ে তো। মহাপ্রভু যখন নীলাচলে যেতেন ঝাড়খণ্ডের পথেই যেতেন নাকি—পুঁথি-পুরাণে লেখা আছে। তবে এসব গানের খুব চল হয়নি—যেখানকার জিনিস সেখানেই—ঐ জেলায় কি ঐ পরগণার ভেতরে লোকে গায়। এসব শুনেছি আমি পয়সা খরচ করে লোক আনিয়ে আনিয়ে। তবে ওসব আর শিখিনি, অত পেরে উঠব না, মজুরীও পোষাবে না—তা জানতুম। মোটামুটি বড় যে তিনটে ঠাট্—মনোহরশাহী গরানহাটি রেনেটি—এ কটা ভাল করে শিখেছি, গাইতেও পারি। গাইও মধ্যে মাঝে মিলিয়ে মিশিয়ে। ওস্তাদরা শুনলে গাল দেবে—কিন্তু আমার ভাল লাগে—যারা শোনে, তাদেরও মুখ বদল হয়! যে যা বলুক, আমাদের তো এই রোজগার, লোকের ভাল লাগাটা আমাদের আগে দেখা দরকার।'

টাকা হাতে আসতে প্রথমেই শশী-বৌদির ধার শোধ করে এসেছে সুরো। আরও কিছু নেবার জন্যে অনেক করে ধরেছিল, বৌদি রাজী হন নি। সুরো বলেছিল, 'চড়া সুদে যেগুলো নেওয়া আছে সেগুলো অন্তত শোধ করে দাও না বৌদি সুদটা তো বাঁচবে! আমি তো দান করছি না, সে আস্পদ্দা আমার নেই—ধারই দিতে চাইছি। না হয় আমাকেও কিছু সুদ দিও।'

চারুবাবু ধমক দিয়েছেন শুনে, 'এত দুঃখেও তোর চৈতন্য হয়নি সুরো। টাকা জমা, দু'চারখানা গয়না গড়িয়ে নে এইবেলা। দিনকতক খুব ডাক আসছে—ভাবছিস এমনিই চলবে এখন থেকে—না? এর পর যদি কিছুদিন তেমন বায়না না আসে—তখন? টাকা হাতছাড়া করিস নি!'

শশীবৌদি প্রস্তাব করেছিলেন, সেই হারটা ভেঙে আর কিছু সোনা দিয়ে ভারী দেখে একটা হার কিম্বা—কী এখন নেকলেস হয়েছে এখন—তাই গড়াতে। সুরো প্রবল-ভাবে ঘাড় নেড়েছে, 'ও হার আমি গালাতে দেব না বৌদি ও তোমার দেওয়া—ও আমার লক্ষ্মী। ও আমার তোলা থাকবে। যদি কোন দিন নিজের ঘরবাড়ি হয়—লক্ষ্মী পাততে পারি—ঐ হার পেতে লক্ষ্মী বসাবো।'

অবশ্য সে সোনার দরকারও হয় না। মাস তিন চারের মধ্যেই চুড়ি বালা হার গড়িয়ে নেয় একে একে। মাকেও গড়িয়ে দেয় কিছু কিছু। কাপড়-চোপড় তো কিনতেই হয়—এগুলো ঠাট বজায় দেবার অঙ্গ। নিত্য বাইরে যাওয়া ভাল ভাল শাড়ি না হলে চলে না। প্রথম প্রথম মতিই শাড়ি বার করে দিয়েছিল, গয়না পরিয়ে দিয়েছিল, এখন আর তার কাছে নিতে হয় না। মতি বলেছে, এবার দু'তিন সেট সবরকম গয়না গড়িয়ে দেবে তার স্যাকরাকে দিয়ে, এক গয়না রোজ পরে গেলে ইজ্জত থাকে না।

'হাতে একটু বেশী জমুক তোর, ভাল দেখে সাঁতে হার আর মুক্তোর কণ্ঠী করিয়ে দেব। এ সঙ্গে কানের জড়োয়া কেরাপাৎ আর আশা ঝুমকো। এদিকে গা-সাজানো হলে টায়রা গড়িয়ে নিস একটা ভালো দেখে—' ইত্যাদি।

আরও বলে, 'কী সব এখন নতুন বিলিতি জিনিস বেরিয়েছে মুখে মাখে, তাই একটা-আধটা কিনিস। আমিও মেখেছি, ফরাসীদের তৈরী, দাম কি—একো একো শিশি পাঁচ-সাত-দশ বারো টাকা পজ্জন্ত। এদান্তে ছেড়ে দিয়েছিলুম, চেনা বামুনের পৈতের দরকার নেই বলে। নতুন নতুন, এখন কাঁচা বয়স তোদের—একটু ছেলাবতে থাকা দরকার। এসব খরচ কেপ্পনতা করতে নেই, যে কাজের যা। বলে, আগে দর্শন ডালি পরে গুণ বিচারি। মানুষটাকে দেখে যদি ভাল লাগে তখন তার সবই ভাল লাগবে।'

দুঃখদিনের স্মৃতি, দুর্দিনের স্মৃতি প্রথম বয়সের উজ্জ্বল বটে ক্রমশঃ ম্লান হয়ে আসে একটু একটু করে—কিন্তু দুঃখ অত সহজে অব্যাহতি দেয় না। অভাবের চিন্তা ছিল একটা—এখন অসংখ্য দুশ্চিন্তা মাথা তোলে। প্রাচুর্য অন্য বেদনা জুটিয়ে আনে। ভাইটা এখনও নিরুদ্দেশ। নিস্তারিণী আগের মতো আর কান্নাকাটি করে না, সে ধরেই নিয়েছে ছেলে আর তার নেই—তবু নানা সুখাদ্য রাঁধতে গিয়ে তার চোখে জল আসে, এক এক দিন—গণেশ যা বেশী ভাল-বাসত সে সব খাবার রেঁধে—নিজে মুখে তুলতে পারে না।

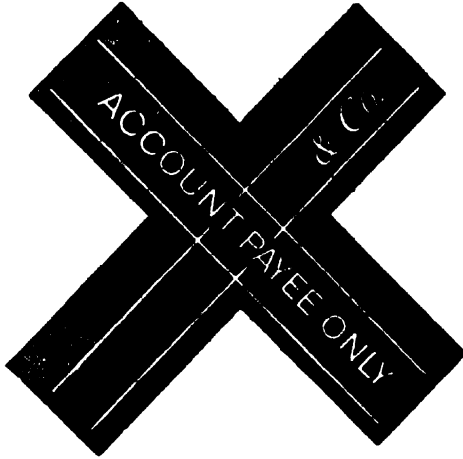
তার চেয়েও দুর্ভাবনা সুরোর বাবার জন্যে। ভবতারণ যেন একেবারেই ভেঙে পড়েছেন। কোন যে স্পষ্ট রকমের ব্যাধি আছে তা নেই, মনে হয় যেন আস্তে আস্তে শুকিয়ে আসছেন। অসুস্থ দুর্বল শরীর নিয়ে জোর করে ঘুরেছেন, মড়া ঘোড়াকে চাবুক মেরে চালানোর মতো—সম্ভবত এবার তারই প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। ভবতারণ নিজেই ঘোড়ার সঙ্গে উপমা দেন, জ্বালা

হেসে বলেন, 'আমরা কি জানিস মা, ছ্যাকড়া গাড়ির ঘোড়া। ঐ যে দেখিস হাড়জিরজিরে রোগা ঘোড়াগুলো—কোনমতে ঠেলেঠুলে তুলে দাঁড় করিয়ে জোত পরিয়ে দাও, থাকতক চাবুক মারো—ঠিক চলতে শুরু করবে, তার করল তো সারাদিনই খুরছে. জোরেও না আস্তেও না, একভাবে চলে যাবে—যে মুহূর্তে জোত-লাগাম খুলবে একেবারে শুয়ে পড়বে, তখন মড়া একেবারে। তা আমারও হয়েছে সেই এক দশা।'

সুরবালা কবিরাজ ডেকেছিল এর মধ্যে। ভাল নামকরা কবিরাজ একজন। তিনি এসেও সেই কথাই বলেছেন, 'শরীর কিছুই নেই মা, বুকটাও খুব দুর্বল, রক্তহীন হয়ে পড়েছেন অনেকদিন ধরে। নিজের দিকে নজর দেন নি কখনও—অনেক আগে থেকেই ভাঙন শুরু হয়েছে। এখন একটু ভাল করে খাওয়াও দাওয়াও—আর কী করবে! মকরধ্বজ দিয়ে যাচ্ছি দুধের সর আর মিছরির গুঁড়োর সঙ্গে দুবার করে খাইও, সেই সঙ্গে একবলকা দুধ খানিকটা করে। একটা হজমের ওষুধও দিয়ে যাচ্ছি—দুধ ফল যা খেতে চান নির্ভয়ে খেতে দিও। এ ছাড়া আর তো কোন উপায় দেখছি না।'

কিন্তু ভবতারণ কিছুই খেতে চান না। আজকাল বেশির ভাগ সময়ই চুপ করে চোখ বুজে পড়ে থাকেন শুধু। কিম্বা দুপুরের পর খেয়ে দেয়ে উঠোনের যে কোণে একফালি রোদ এসে পড়ে—সেইখানে গিয়ে বসেন। সুরবালা চাকর রেখেছে একটা, আরও এই

Shilpi bob 10A/67 Ben.

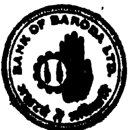


সময় পাচ্ছেন না? আপনার ঝঞ্ঝাট ব্যাঙ্ক অব বরোদার ওপর ছেড়ে দিন।

আজই আমাদের ব্যাঙ্কে একটা কারেন্ট অ্যাকাউন্ট খুলুন।

আপনি ব্যস্ত মানুষ। অফিসের কাজ, বাড়ীর ঝামেলা, ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে ছুটাছুটি, সামাজিক কর্তব্য—এসব হাজার কাজে আপনি জড়িত। ইনসিওরেন্সের প্রিমিয়াম, বাড়ীভাড়া, ক্লাবের বিল, বাচ্চাদের স্কুলের বেতন দেওয়া অথবা ডিভিডেণ্ড ও অন্যান্য প্রাপ্য আদায়ের মতো রুটিন-বাঁধা কাজের জন্য সময় আপনার অতি অল্পই রয়েছে।

এসব ছোটখাট ঝামেলার কাজ উত্তম যত্ন নিয়ে ব্যাঙ্ক অব বরোদা করে দেয়। আজই আপনি আমাদের এখানে একটা কারেণ্ট অ্যাকাউণ্ট খুলুন। আপনি অবশ্যই চেক বই পাবেন। এবং চেকই হচ্ছে দেনা-পাওনার সর্বোত্তম পদ্ধতি। কারণ, এ হচ্ছে বিল পরিশোধের প্রমাণ তথা দৈনন্দিন ব্যয়ের এক নিদর্শন।



চিরসমৃদ্ধির সোপান

দি ব্যাঙ্ক অব বরোদা লিমিটেড

(স্থাপিত: ১৯০৮) রেজিষ্টার্ড অফিস: মাণ্ডবী, বরোদা।
ভারত ও বহির্ভারতে তিন শতের অধিক শাখা আছে।

কাছাকাছি কোনও শাখা থেকে "আমরা আপনাকে সাহায্য করতে পারি" নামক বিনামূল্যের পুস্তিকাটি চেয়ে নিন বা চেয়ে পাঠান।

বাজারের জন্যেই, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানান জিনিস আনায়, নিস্তারিণী রাঁধেও—কিন্তু ভবতারণ কিছুই খেতে পারেন না। পীড়াপীড় করলে হাসেন। বলেন, 'মশাই এ পৃথিবীর খাওয়া শেষ করে এনেছেন, আর কেন?... হলও তো অনেক দিন, এবার ছেড়ে দে বো।' কোন কোন দিন মেয়েকে বলেন, 'কেন মিছিমিছি টানাটানি করছিস মা, শুধুশুদ্ধ খরচ অন্তর কতকগুলো তার চেয়ে এবার ভরসা করে ছেড়ে দে।... তোর জন্যেই ভাবনা ছিল—এখন সেটাও কমেছে, আর কিছু না হোক, তোর ভাত-কাপড় তুই চালিয়ে নিতে পারবি মনে হচ্ছে. তোর মাকেও কিছু ফেলবি না।... আর তোর ভাই—? না, তার কথা আর ভাবি না। ভেবেই বা কি করব বল! সে তো একরকম নিজের পথ নিজেই দেখে নিয়েছে—।'

মুখে বললেও—তার কথা যে বেশী রকম ভাবেন, আর সেই ভাবনাই যে দিন দিন তাঁকে এমন ক্লিষ্ট এমন কৃশ এমন জীবন-বিমুখ করে তুলছে তা সুরো জানে। তবে এও জানে যে শুধু ভাইয়ের কথা নয়, সেই সঙ্গে ওর কথাও ভাবেন—এখনও পর্যন্ত।

এক একদিন নিস্তারিণীকে বলেন ভবতারণ. 'তখন তুই বিয়ে দিতে চেয়েছিলি সুরোর—কিন্তু তোর কথা শুনিনি। এখন মনে হচ্ছে দিয়ে দিলেই হত। সত্যিই ও ব্রাহ্মণের মেয়ে ছাড়া হতে পারে না। এত তেজ ওর, এত সত্যি কথা ভালবাসে—। তাছাড়া, মায়ের দেওয়া—আজ পর্যন্ত অন্য জাতের ভাতও খায়নি।... তখন বে দিলে আজ একঘর নাতিনাতনি দেখে যেতে পারতুম। ছেলেটা তো বাদে ছরাদেই গেল। বংশটা আর রইল না। এমন কি আর মহাশয় লোকের বংশ তা—কিছু না, তবু পিতকুলের কাছে ঋণটা থেকেই গেল।... যাক গে, কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম। ঠাকুর যা ভাল বুঝেছেন তাই করেছেন। আমরা মিছেই ভেবে মরি বৈ তো নয়।'

ঠাকুর যে শেষ করে আনছেন, প্রদীপের তেল যে কমে আসছে—তা সুরোও বোঝে। তবু সে তার চেষ্টার কোন ত্রুটি করে না। শেষ পর্যন্ত বড় সাহেব ডাক্তারও ডাকে একদিন। কিন্তু তিনিও শুনে ঘাড় নাড়েন—অর্থাৎ ভেতরে কিছু নেই, আর বেশীদিন নয়। ভবতারণ তিরস্কার করেন সুরোকে, 'পয়সাগুলো কি তোর কুটকুট করে রে? গরীবের এসব ঘোড়া রোগ কেন? দেখে বুঝতে পাচ্ছিস না? কলকব্জা অনেকদিন বিনা তেলে ঘুরলে যা হয়—সব ক্ষয়ে গেছে একধার থেকে। এবার এ ফেলে দেবার সময় হয়েছে। মিছিমিছি এর পেছনে এত পয়সা খরচ করছিস কেন? ...তোর এত দুঃখের পয়সা।... তোর রোজগার কিছু ব্যাপারীর গদির রোজগার নয়, যে মালিক পড়ে থাকলেও অপরে চালাতে পারবে। ঈশ্বর না করুন—ঠাণ্ডা লেগে দুদিন গলা ভাঙলে এ কারবার বন্ধ। একটা লোকের গতরের ওপর সব নির্ভর করছে। ...মতিকে দেখেও শিক্ষে হল না তোর? অত বড় ডাকসাইটে ওস্তাদ একটু বাত ছাড়লো তো রোজগার বন্ধ হয়ে গেল। এইবেলা—মা লক্ষ্মী যদ্দিন আছেন—দুদিনের জন্যে জমিয়ে রাখ. পোস্টাপিসে কি সব জমানোর আইন হয়েছে, সেখানে রাখ। কোম্পানীর ঘরে টাকা থাকলে কোন ভয় নেই। সোনাদানা করাও গুচ্ছের ঠিক নয়, কোনদিন চোর ডাকাতের পেটে যাবে—এক রাত্তিরে আবার যে-কে সেই, পথের ভিখিরী। লক্ষ্মী দুচার দিন মানুষকে দিয়ে যাচাই করেন, যে যত্ন করে ধরে রাখে তাকেই ঢেলে দেন। টাকা নিয়ে এমন অযথা ছিনিমিনি খেলিস নি।'

শেষ হয়ে আসছে তো বটেই। বেশীদিন আর নয়—তা সুরোও জানে। কেবল ভগবানকে ডাকে। মানুষটা তো কখনও অধর্মের পথে চলে নি, শেষ ইচ্ছাটা ওঁর পূরণ করো ঠাকুর। ছেলেটাকে এনে দাও। একবার শেষ দেখাটাও দেখতে পাবে না!...

ছেলের জন্যে যে কী পরিমাণ আকুলি-বিকুলি করছেন ভবতারণ তা মুখের ভাষায় প্রকাশ করেন না সহজে—বোধহয় এদের মুখ চেয়েই আরও, অকারণে কষ্ট পাবে ভেবেই প্রাণপণে চেপে থাকেন—কিন্তু এক এক সময় মনের সে আকুলতাটা হঠাৎ বেরিয়ে পড়ে, চাপতে পারেন না কিছুতেই।

কীর্তনের মুজরো সাধারণত ক্রিয়াকর্ম উপলক্ষেই হয়—মতির ভাষায় 'যজ্ঞিবাড়ি' ছাড়া শখ করে কেত্তন আবার কে কমনে দেয়? দোহার বাজনদাররা বসে খায়, তেমন 'এটেন্ডেন্ট' দেখলে চেয়েচিন্তে ছাঁদাও বাঁধে—যে গাইতে যায় সে বিশেষ খায় না। মতি খেত না, সেই দেখাদেখি সুরোও খায় না কোথাও। মতি বলে, 'ওতে ইজ্জত থাকে না। কেত্তনওলীকে তো কেউ আর ভদ্দর লোক বামুন কায়েতের মেয়েদের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসাবে না, আলাদা বসিয়ে খাওয়াবে—হয়ত আমারই দোয়ার বাজনদারদের সঙ্গে বসাবে, তাতে আশ্চর্য্যিও নয়। সে অপমান জেনে নিতে যাই কেন? গাল বাড়িয়ে চড় খেতে যাওয়া। ...কেন, আমরা কি খেতে পাই না যে, দুখানা লুচি খেয়ে পিণ্ডি গিলতে যাবো একেবারে?'

বসে না খেলেও—বেশির ভাগ বাড়িতেই—বাড়ী ভরে খাবার তুলে দেয় গাড়িতে। সুরো প্রথম প্রথম নিজের বাড়ি আনত না, মতির বাড়িতেই রেখে আসত—ঝি চাকর ঠাকুর দরোয়ানের জন্যে। ইদানীং মতি রাগ করে, বলে, 'অত খাবার রেখে যাস কেন? যখন নিয়েই এলি তখন খেতে দোষ কি? এখন তো আমিও গাইছি, খাবার তো আসছেই। তোর পাওনা তুই নিবিনে কেন? কিছু রেখে কিছু নিয়ে যা অন্তত—এ তো আর কেউ পাতকুড়নো এঁটোকাটা মাগে দেয় না।'

তবু সুরোর কেমন ঠেকত, একটা বাধত। শেষে মতিই জোর করে বামুন ঠাকুর বা ঠিক করুন—যখন যে থাকে রাঁধুনী তাকে দিয়ে ভাগ করিয়ে কিছু রেখে কিছুটা আবার গাড়িতে তুলে দিতে শুরু করল। শ্রাদ্ধ-বাড়ির খাবার বড় একটা দিত না—খুব নাম-করা বড়লোকের বাড়ির ছাড়া—তবে বিয়ে পৈতে অন্নপ্রাশনের খাবার নিঃসংকোচে দিত, নির্বিচারে। খাবার অনেক বেশীই থাকত, এদের প্রয়োজনের ঢের বেশী। তিনটে তো প্রাণী, একটা ঠিকে-ঝি অবশ্য হয়েছে এখন তেমনি ভবতারণ খাওয়া ছেড়েই দিয়েছেন বলতে গেলে। শশীবৌদি-দের এসব খাবার দিতে লজ্জা করত সুরোর, শেষে একদিন খুব ভয়ে ভয়ে প্রস্তাব করতে তিনি হেসে বললেন, 'যজ্ঞিবাড়ির খাবার উনি এমনিই খেতে চান না, আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে গিয়েও পংক্তিতে বসেন না—নিয়ে গিয়ে তো আমি আর ছেলেটা, ওসব মছটাছে দরকার নেই, যদি ভাল মিষ্টি আসে কোনদিন—আলাদা করে কেউ দেয়—দু একটা দিয়ে যাস। এই তো সোজা কথা—তুইও যেমন জিজ্ঞেস করলি আমিও তেমনি উত্তর দিলুম, এতে আর তোর এত লজ্জা কি?'

তাই দেয় সুরো। অধিকাংশ জায়গাতেই মিষ্টির অংশ আলাদা করে দেয়—হাঁড়ি ভরে। সুরোও আলাদা করে আগভাগ দই মিষ্টি রাবড়ি ক্ষীর ওদের দিয়ে আসে। নিস্তারিণীর একটু বাড়াবাড়ি পছন্দ হয় না। আড়ালে চাপা গলায় গজগজ করে, 'তোকে দিয়েছে ভাল জিনিসগুলো তুই বেছে রাখ নিজে খা—তা নয়, আলতাল সেরা জিনিস-গুলো নিয়ে চললেন দাতব্য করতে। যেমন কপাল, চিরটাকাল আমার সমান গেল, যেমন বাপ তেমনি বেটি। এত ঠেকে এত শিখেও চৈতন্য হল না।'

সুরবালা এসবে কান দেয় না। সে জানে এত দিয়েও যা থাকবে তা ওরা খেয়ে শেষ করতে পারবে না, ফেলা যাবে। যেতও তাই। মিষ্টি তবু দু' একদিন রেখে খাওয়া যায়, মাছ তরিতরকারি পচে ওঠে, ফেলে দেওয়া ছাড়া গতি থাকে না। তার আজকাল তো

বিনা অস্ত্রোপচারে
অর্শ থেকে
আরাম পাবার
জন্য
হ্যাডেনসা
ব্যবহার করুন!

প্রায় নিত্যই আসছে, সঞ্চয়ের প্রয়োজনও হয় না।

এক একদিন খাবারের ঝুড়ি এনে ঘরে নামাবার পর নিস্তারিণী যখন একে একে নানা সুখাদ্যের—তাদের ঘরে স্বপ্নসম্ভব মাত্র এমন সব মহার্ঘ ভোজ্যের রাশি—নানা আকারের ভাঁড় খুরি মালসা হাঁড়ি চ্যাঙাড়ি নামিয়ে মেঝেতে সাজাত। ভবতারণ মনের ভাব বা চোখের জল চেপে রাখতে পারতেন না, বলেই ফেলতেন, 'কোথায় কোথায় যে ঘুরে বেড়াচ্ছে হতভাগাটা—কী অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে, দুবেলা খাওয়াই জুটছে না হয়ত—এখানে এমন সব দেবভোগ্য খাবার নিত্যি আস্তাকুঁড়ে যাচ্ছে, নয়ত কুকুর-বেড়ালের পেট ভরছে। কপাল। আমারও কপাল তারও কপাল। বেটা জীবনে এসবের নামও জানতে পারল না কোনদিন।'

চোখে সুরবালারও জল এসে যেত। বলত, 'তাই বুঝি এসব তুমি দাঁতে কাটতে চাও না বাবা?'

'ওরে না না', নিমেষে ব্যাকুল ও বিব্রত হয়ে পড়তেন ভবতারণ, 'তা নয়। তুই খাওয়াচ্ছিস, তোরা খাচ্ছিস তাতেই কি আমার কম তৃপ্তি। খাইও তো। একেবারে দাঁতে কাটি না তা তো নয়।...তবে এখানের খাওয়া আমার ফুরিয়ে আসছে তা বুঝছিস না? ক্রমশ কমতে কমতে একদিন একেবারেই শেষ হয়ে যাবে। ভগবান মানুষকে পাঠান খাবার মেপে দিয়ে, সেটুকু শেষ হলে আর কিছুই মুখে ওঠে না তার—এ যে নিয়ম-করা একেবারে।'

নিস্তারিণীর পুত্রশোক এতদিনে কিছু মন্দীভূত হয়ে এসেছে, ঠিক এতটা প্রাচুর্যের জন্যেও হয়ত নয়—আসলে হাল ছেড়েই দিয়েছে সে, সে বলে, 'তুমি মিছেই মন খারাপ করছ। সে কি আর আছে যে কোথায় কি খেয়ে বেড়াচ্ছে তাই ভেবে হাঁপিয়ে মরছ! বেঁচে থাকলে এমনভাবে নিড়ুবি খেয়ে থাকতে পারত না।'

'না না, তা হয় না বৌ'—সরবে সজোরে প্রতিবাদ করে উঠতেন ভবতারণ, 'ও-কথা বলিসনি আমার কাছে। জপতপ মন্তর-তন্তর কিছুই জানি না—গুরুকেও প্রাণ-ভরে ডাকব সর্বদিন হয়ত তাও হয়ে ওঠে না—তবে এটুকু কর্তামশাইয়ের দরবারে পৌঁছে বুকে হাত দিয়ে নিভ্‌ভরসায় বলতে পারব, অকারণে কোনদিন একটাও মিথ্যে বলিনি আর জ্ঞানত কারুর কোন অনিষ্ট করিনি—এত বড় আঘাত ঠাকুর আমাকে কখনও দেবেন না। বুড়ো বয়েসে পুত্তুর-শোক দেবেন না কিছুতেই। আমি হয়ত দেখতে পাব না—তবে সে বেঁচে আছে, একদিন ফিরবেও নিশ্চিত—এই বলে গেলুম। দেখে নিস্‌ তোমরা।'

ফিরলও গণেশ, আশ্চর্যভাবেই ফিরল। বিনা খোঁজে, বিনা খবরে—যেন আকাশ থেকেই পড়ল সে, বাপকে শেষ দেখা দেখবে বা দেখা দেবে বলেই।

কবিরাজ, সাহেব ডাক্তার শেষপর্যন্ত নতুন কী এক চিকিৎসা উঠেছে হোমিও-প্যাথি বলে জলে একফোঁটা ওষুধ ফেলে খাওয়ানো—তা পর্যন্ত হয়ে গেল কিন্তু ভবতারণ আর সেরে বাইরে বেরোতে পারলেন না। প্রদীপের তেল ফুরিয়ে গেলে সলতেটা যেমন একটু একটু করে নিভে যায়, ঠিক তেমনিই একটু একটু করে শেষ হয়ে গেলেন তিনি। মৃত্যুর দু-তিনদিন আগে থেকে একেবারেই খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল, জলও আর খেতে পারছেন না—এই যখন অবস্থা, হাত-পা আস্তে আস্তে পাথরের মতো ঠাণ্ডা হয়ে আসছে, সেঁকে, তেল মালিশ করে গরম জলের বোতল দিয়েও গরম করা যাচ্ছে না; ওদিকে কপালে দিন-রাত আঠার মতো চটচটে ঘাম, অবিরাম ইশারা করে বলছেন বাতাস করতে মাথায়, কবিরাজ নিদান হেঁকে গেছেন—আর বড়-জোর দুটো দিন, আটচল্লিশ ঘণ্টা পরমায়ু—ঠিক সেই সময় কোথা থেকে গণেশ তার এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে এসে হাজির হল।

না, ভিখিরীর মতো নয়, দীনহীন বেশেও নয়। অস্নাত অভুক্ত রোদেপোড়া না-খেতে-পাওয়া চেহারাও নয়, বরং বলা যায় এল রাজপুত্রের মতোই, হেঁটেও এল না, একটা ভাড়াটে গাড়ি থেকেই নামল ওরা—গণেশ আর তার বন্ধু। দুজনেই সম্ভবত একবয়সী, যদিও বন্ধুকে আরও ছেলে-মানুষই দেখায়। তার বেশভূষার পারিপাট্যও একটু বেশী। কুঁচনো ফরাসডাঙার ধুতি, কুঁচনো চাদর, রেশমের পিরান, পায়ে বিলিতি চামড়ার পাম্পশু। গণেশের অতটা না হলেও তারও আড়ং-ধোলাই করা দিশী ধুতি, আররোয়ার জামা, তারও বিলিতি জুতো। কিন্তু বেশভূষাটাও বড় কথা নয়, চেহারারও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। গণেশ চিরদিনই রূপবান—তবে মধ্যে টো-টো করে অস্থানে-কুস্থানে ঘোরার জন্যেই হোক বা অনিয়মিত অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাত্রার জন্যেই হোক চেহারাটা খুবই খারাপ হয়ে গিয়ে-ছিল; অমন সোনার মতো রঙে যেন কালি মেড়ে দিয়েছিল কে—বিশেষ যেদিন থিয়েটারে আড়াল থেকে সুরবালা দেখতে পায় ওকে—সেদিন তো তার চোখে জলই এসে গিয়ে-ছিল—চেহারা, বেশভূষা ও সঙ্গিনীদের দেখে। আজ সে কালিমার চিহ্নমাত্রও নেই। যেন এই ক' মাসে—দেড় বছরে দু' বছরে কে ভেঙে গড়েছে তার ভাইকে। প্রথম যৌবনের দীপ্তিতে, স্বাস্থ্যে ঝলমল করছে। চিরদিনই বয়সের তুলনায় ঢের বেশী বড় দেখায়—আজ তো মনে হচ্ছে চব্বিশ-পঁচিশ বছরের ছোকরাবাবু একজন এসে দাঁড়াল। নিস্তারিণী তো চিনতেই পারেনি—'বলি কে গা তোমরা, সরাসরি না বলা-কওয়া ভদ্দরলোকদের বাড়ির মধ্যে ঢুকছ?' বলে তেড়ে এসেছিল—প্রায় মিনিট-দুই লেগেছিল তার ছেলেকে চিনে চিৎকার করে কেঁদে উঠতে। সুরবালা চিনতে পারলেও প্রথমটা থতমত খেয়ে গিয়েছিল রীতিমতো, আগের মতো এসে একেবারে হাত ধরে কাছে টেনে আনবে বা কান মলে দেবে কিনা—ভেবে স্থির করতে পারেনি অনেকক্ষণ।

সঙ্গে যে বন্ধুটি এসেছিল—কিরণ তার নাম, গণেশের মতো অত রূপবান বা স্বাস্থ্যবান না হলেও, তারও চেহারা ভাল, সুশ্রী। তাছাড়া বেশ একটি সুকুমার লাজুক লাজুক ভাব আছে। খুব ঠাণ্ডা মেজাজের হাসি-মুখ ছেলে। দোষের মধ্যে দোষ নয়, খুঁৎ বলাই উচিত—সেটা অনেক পরে আবিষ্কার করেছিল সুরবালা, কিরণের ডান হাতের থেকে বাঁ হাতখানা ছোট, নইলে তাকেও দস্তুরমতো সুপুরুষই বলা চলত হয়ত। বেশ একটু ছোট এবং একটু রোগা রোগা—অপুষ্ট। কামিজ কি পিরানের মধ্যে থাকলে বোঝা যায় না অতটা, কিন্তু জামা খুলে ফেললে, মের্জাই-পরা অবস্থায় বড় দৃষ্টিকটু লাগে।

তখন অবশ্য আর অত আলাপ-পরিচয়ের সময় ছিল না। অভ্যস্ত হাল্‌কা ভঙ্গীতে চেঁচিয়ে কী একটা বলতে যাচ্ছিল গণেশ, হয়ত সবিস্তারে কিরণের পরিচয়ই দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু সুরবালার দিকে চেয়ে তার কেমন খট্‌কা লাগল, বুঝল তার সাধারণ অপরাধ নয়—এদের সেই চির-পরিচিত অপরিসীম দৈন্যও নয়—অন্য একটা কি বড়রকমের গোলমাল বেধেছে কোথায়। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দিদির দৃষ্টি অনুসরণ করে ভেতরের মেঝেতে শোয়ানো মৃত্যুপথযাত্রী ভবতারণের কঙ্কাল-সার দেহটার দিকে চেয়ে তার মুখের হাসি মুখেই মিলিয়ে গেল। মুহূর্তকয়েক স্তব্ধ আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে 'বাবা' বলে অস্ফুটস্বরে ডেকে উঠে ছুটে গিয়ে পাশে বসল, তাঁর একটা হাত দুহাতে ধরে যেন ডাকবারই চেষ্টা করতে যাচ্ছিল। কিন্তু পরক্ষণেই ভয় পেয়ে ছেড়ে দিল আবার। এমন হিমশীতল যে মানুষের স্পর্শ হয় তা বোধহয় জানত না সে, শুনলে বা কেতাবে পড়া থাকলেও এর আগে কখনও নিজে হাতে ছুঁয়ে দেখেনি। কিন্তু সেই একবার ডাক সেই একটু স্পর্শই ভবতারণের অনু-ভূতিগোচর হয়েছিল, অবসন্ন হয়ে থাকলেও জ্ঞান হারাননি, তিনি প্রাণপণ চেষ্টায় চোখ চাইলেন একবার। তবে প্রথমটা দেখেও ঠিক বিশ্বাস হল না, সম্ভবত কিম্বা তিনিও চিনতে পারলেন না। শ্রান্ত হয়ে চোখ বুজলেন আবার। কিন্তু সে বেশীক্ষণ নয়, তাঁরও কানের মধ্যে সে-ডাক হয়ত এক অভূতপূর্ব শব্দ-তরঙ্গের সৃষ্টি যে তাঁকে স্থির থাকতে দিল না। আর কিছুক্ষণ পরে তেমনিই চেষ্টা করে যখন চোখ খুললেন আবার, তখন যে অসীম আনন্দ আর অপরিসীম তৃপ্তি সেই স্তিমিতপ্রায় চোখে ফুটে উঠল, তাতেই বোঝা গেল যে, এবার চিনতে পেরেছেন তিনি, বুঝতেও পেরে-ছেন। অবশ্য কথা আর বলতে পারেননি, আর চোখও চাননি। তারপর, সেই অবস্থা-তেই আরও একটা দিন কাটিয়ে চিরদিনের মতোই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। তবু সে-তৃপ্তির হাসিটি, অথবা হাসির ভঙ্গীটি মৃত্যুর পর পর্যন্ত মুখে লেগেছিল, মৃত্যুর কালিমাও তাকে ম্লান করতে পারেনি। অন্তত সুরবালার মনে হয়েছিল তাই।

(ক্রমশঃ)

ঘণ্টাউ·ভূত শ্রুতিপারের শব্দের সাহায্যে জনৈক রোগীর মস্তিষ্কে টিউমার পরীক্ষা করা হচ্ছে।

মূত্রলালা পরীক্ষা করে বহুমূত্র, বৃক্ক, যকৃৎ ও হৃদ্‌রোগের পূর্বসংকেত পাওয়া যেতে পারে।



বিজ্ঞানের কথা

মানুষের স্বাস্থ্য সম্পর্কে পূর্বাভাষ

এতদিন আমরা আবহাওয়ার পূর্বাভাসের কথাই শুনে এসেছি। এই পূর্বাভাস থেকে দৈনন্দিন আবহাওয়া সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায় এবং অনেক সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগ-দুর্বিপাকের হাত থেকে আমরা রক্ষা পেয়ে থাকি। আমাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে এমনি ধরনের পূর্বাভাস যদি জানা যায়, তা হলে অনেক রোগ অসুখের হাত থেকে আমরা পূর্বাহ্ণেই পরিত্রাণ পেতে পারি। এখন পর্যন্ত স্বাস্থ্যের অবস্থা জানার যে ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তা হচ্ছে নির্দিষ্ট সময়-ব্যবধানে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো। এর ফলে স্বাস্থ্যের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে জানা যায়। কিন্তু বর্তমানে চিকিৎসাবিজ্ঞানী মহলে এমন পন্থা উদ্ভাবনের চেষ্টা চলছে, যার সাহায্যে প্রকৃত রোগাক্রমণের পূর্বাহ্ণেই তার সম্ভাব্য আক্রমণ সম্পর্কে পূর্বাভাস জানানো যাবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এ বিষয়ে ব্যাপক পরীক্ষানিরীক্ষা চালানো হচ্ছে, যাতে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান সঞ্চয় করে এতদিনের প্রচলিত ব্যবস্থার পরিবর্তে আধুনিক নিবর্তনমূলক চিকিৎসা-ব্যবস্থা গড়ে তোলা যাবে। এই আধুনিক চিকিৎসা-ব্যবস্থাকে অভিহিত করা হয়েছে 'প্রিডিকটিভ মেডিসিন' অর্থাৎ পূর্বাভাসমূলক চিকিৎসা।

এই নতুন চিকিৎসা-ব্যবস্থায় চিকিৎসক কেবলমাত্র রোগাক্রান্ত মানুষের রোগ নির্ণয় করেন না, অধিকন্তু রোগের সম্ভাব্য আক্রমণ সম্পর্কেও মানুষকে পূর্বাভাস দিতে পারবেন। শুধু রোগের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণের ফলেই এটা সম্ভব হয় নি, নতুন নতুন যন্ত্র ও পরীক্ষার ফলেও আপাতসুস্থ মানুষের দেহে পরবর্তীকালে কোন মারাত্মক রোগাক্রমণের সম্ভাবনা সম্বন্ধে জানতে পারায় তা সম্ভব হয়েছে।

কিন্তু নতুন পন্থায় মূল শরীর পরীক্ষায় কোন পরিবর্তন ঘটে নি। যদিও পরীক্ষার পদ্ধতি ভিন্নরকমের, তবে চিকিৎসক সাধারণভাবে দেহের তাপ, রক্তচাপ, নাড়ীর গতি এবং স্টেথোসকোপের সাহায্যে হৃদ্‌স্পন্দন ও শ্বাসপ্রশ্বাসের স্পন্দন পরিমাপ করেন। চোখ, নাক, কান, মুখ, গলা ও অন্য ইত্যাদি শরীরের উন্মুক্ত অঙ্গগুলি তিনি পরীক্ষা করে দেখেন এবং শরীরের বহির্ভাগের কাছাকাছি যেসব আভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলি আছে সেগুলি টোকা দিয়ে ও আঙুল চালিয়ে পরীক্ষা করেন। তিনি শরীরের বহির্ভাগও পরীক্ষা, স্নায়ুর সাড়া পরিমাপ, মলমূত্রের রাসায়নিক পরীক্ষা এবং এক্স-রে ফটোও পরীক্ষা করে দেখেন।

নিজস্ব জ্ঞান ও বিচারবুদ্ধির দ্বারা চিকিৎসক তারপর এইসব তথ্য যাচাই করেন। এ সমস্ত অনুসন্ধান পূর্বাভাসমূলক চিকিৎসার অন্তর্ভুক্ত এবং এসব তথ্যের সঙ্গে যোগ করা হয় উন্নত ধরনের স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতিপ্রদত্ত তথ্য। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির সঙ্গে যে কম্পিউটার যুক্ত থাকে তা পরীক্ষালব্ধ তথ্যাদি গ্রহণ ও সঞ্চয় করে চিকিৎসককে সাহায্য করে এবং তাঁর নির্দেশমতো সেগুলি বিচারবিশ্লেষণ করে ফলাফল জানিয়ে দেয়।

স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের একটি উদাহরণ হচ্ছে 'রোবট কেমিস্ট' অর্থাৎ যান্ত্রিক রাসায়নিক। এই যন্ত্র ঘণ্টায় ১২০ জন রোগীর রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পাদন করতে পারে। যন্ত্রের সম্পাদিত পরীক্ষার সঙ্গে অন্যান্য তথ্য মিলিয়ে রক্তবাহ সংক্রান্ত ব্যাধি, বাত, ন্যাবা ও আরো অনেক ব্যাধির পূর্বাভাস দেওয়া যায়।

মূত্রলালার রাসায়নিক বিশ্লেষণের সঙ্গে নতুন পন্থায় সম্পাদিত অন্যান্য পরীক্ষার ফল যোগ করে হৃদ্‌রোগ, বহুমূত্র রোগ, বৃক্ক ও যকৃতের রোগের পূর্বাভাস কোনরকম রোগ-সংকেত প্রকাশ পাবার বহু পূর্বেই জানা সম্ভব হয়েছে।

সানফ্রানসিসকোর ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাকেন্দ্রের জনৈক শারীরতত্ত্ববিদ এমন একটি পরীক্ষাপদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন, যাতে সামান্য পরিমাণ রক্তের নমুনায় একটি তেজস্ক্রিয় উপাদান মিশিয়ে কয়েক শ্রেণী ক্যানসারের পূর্বাভাস জানা যায়।

ফিলাডেলফিয়া জেনারেল হাসপাতালের জনৈক হৃদ্‌তত্ত্ববিদ সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন, শ্রমসাধ্য কর্মরত মানুষের হৃদ্‌যন্ত্রের বৈদ্যুতিক সংকেত পরিমাপ করে তিনি সংশ্লিষ্ট মানুষটির হৃদ্‌রোগের কোন সম্ভাবনা আছে কিনা তা বলে দিতে পারেন।

'মালটি ফেজ স্ক্রীনিং' বলে অভিহিত এই ধরনের বিবিধ পরীক্ষালব্ধ তথ্যাদি থেকে চিকিৎসক কম্পিউটারের সাহায্যে

সংশ্লিষ্ট মানুষের 'রোগপ্রবণতা'র একটি পঞ্জী প্রস্তুত করতে পারেন। এই পঞ্জী থেকে মানুষটির কোন বিশেষ রোগে আক্রান্ত হবার প্রবণতা নির্ণয় করা যায়।

চিকিৎসক তারপর স্বাস্থ্যের স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখার জন্যে পরীক্ষিত মানুষটির কি করণীয় তার ব্যবস্থাপত্র লিখে দেন। ব্যবস্থাপত্রের মধ্যে বিশ্রাম, খাদ্যের পরিবর্তন, ধূমপান ইত্যাদি অভ্যাসের পরিবর্তন, খেলাধুলায় অংশগ্রহণ ইত্যাদি নির্দেশ থাকতে পারে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে জীবিকাবৃত্তিক বা জলহাওয়া পরিবর্তনের নির্দেশও দেওয়া হতে পারে।

নির্দিষ্ট সময়ব্যবধানে স্বাস্থ্যপরীক্ষার প্রচলিত ব্যবস্থা মতো মালটি ফেজ স্ক্রীনিংও নিয়মিত সময়ব্যবধানে করলে তা থেকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিটির চিকিৎসাগত একটি ইতিবৃত্ত রচিত হয়। এর ফলে পরীক্ষালব্ধ তথ্যাদির তুলনামূলক বিচার করা যায় এবং ওজন, রক্তচাপ বা রক্তের রাসায়নিক উপাদানের আকস্মিক বা ক্রমিক পরিবর্তনে, যা অন্য উপায় ধরা যায় না সে সম্বন্ধে একটা ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে। এই ধরনের পরিবর্তন ক্ষতিকারক নাও হতে পারে অথবা সম্ভাব্য রোগাক্রমণের পূর্ব-সংকেতও হতে পারে।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা রোগমুক্ত পৃথিবী গড়ে তোলার স্বপ্ন বহুদিন থেকে দেখে আসছেন। অবশ্য তাঁদের সে স্বপ্নসাধ পূরণের কোন চিহ্নই এখনও পর্যন্ত দেখা যায় নি। কিন্তু যদি কোনদিন তাঁদের সে স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হয়, তা সম্ভবত বিস্ময়কর ভেষজের মাধ্যমে হবে না, বরং পূর্বাভাসমূলক চিকিৎসা-ব্যবস্থার মাধ্যমেই তা বাস্তবে রূপায়িত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

আদেশ মতো ফল পাকানো

স্বাভাবিক সময়ের আগেই গাছের ফল পাকানো সম্ভব কিনা তা নিয়ে মানুষ অনেকদিন থেকে মাথা ঘামাচ্ছে। উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীরা মনে করেন, তা সম্ভবপর। তাঁরা এক্ষেত্রে ইথিলিন গ্যাসের (যা নাকি ফল পাকবার সময় স্বাভাবিকভাবেই বের হয়ে আসে) ব্যবহারে সুফলের সম্ভাবনা সম্পর্কে আশা পোষণ করে থাকেন।

তাঁরা ঐ গ্যাসের সাহায্যে কাঁচা ডুমুরকে মাত্র ৬ দিনে পাকিয়েছেন—সেগুলি সুমিষ্ট রসাল ফলে পরিণত হয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলতত্ত্ববিদ ডঃ ই নি ম্যাক্সি এবং ডঃ জে সি ক্রেন ঐ পরীক্ষা চালান। তাঁরা বলেন: এই আবিষ্ক্রিয়ার ফলে দীর্ঘদিন ধরে বাজারে ফল পাওয়া যাবে। তা ছাড়া, ফলের বিপণন ব্যবস্থাও আগের তুলনায় উন্নততর হতে পারে। আবার ফল পাকবার সময়ের পরিবর্তন ঘটিয়েও শ্রম ও আবহাওয়া সমস্যারও সুরাহা করা যেতে পারে।

বিজ্ঞানীরা আশা পোষণ করেন, কলা তাড়াতাড়ি পাকাবার ব্যাপারে ইথিলিন গ্যাস বিশেষ সহায়ক হতে পারে।

ক্যানসার গবেষণায় ভারতীয় গাছপালা

ক্যানসার ব্যাধির প্রতিষেধক হিসাবে ভারতীয় গাছপালার গুণাগুণ পরীক্ষার জন্যে সম্প্রতি ভারত সরকারের লখনৌস্থিত কেন্দ্রীয় ভেষজ গবেষণা মন্দির যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ক্যানসার ইনস্টিটিউটের সঙ্গে একটি চুক্তি করেছেন।

কর্মসূচী অনুসারে লখনৌ-এর গবেষণা-কেন্দ্রটি ডঃ এইচ এল ধরের নির্দেশানুযায়ী দেশীয় গাছপালা, লতাগুল্ম প্রভৃতি সংগ্রহ করে তা থেকে প্রস্তুত নির্যাস যুক্তরাষ্ট্রে ন্যাশনাল ক্যানসার ইনস্টিটিউটে পরীক্ষার জন্যে পাঠায়।

যুক্তরাষ্ট্রে পশুর দেহে ক্যানসার রোগে এর কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষার সুফল দেখা গেলে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা ঐ নির্যাস থেকে পুনরায় নির্যাস তৈরী ও বিশ্লেষণ করেন। বিশ্লেষণের পর ঐ উপাদান পশুর দেহের ক্যানসার রোগে প্রয়োগ করা হয়, রোগদমনের সক্রিয় উপাদান নির্ধারণ করার জন্যে।

গত ৪ বছরে লখনৌ-এর গবেষণা-কেন্দ্রেও শতাধিক রকমের গাছপালা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়েছে। এর মধ্যে



বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য কোয়েলাকান্থ মাছ। সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকার উপকূলে এটি ধরা পড়ে। মাছটি লম্বায় তিন ফুট এবং ওজন ত্রিশ পাউন্ড। মাছটির পাশে সিকাগোর প্রাকৃতিক ইতিহাসের ফিল্ড মিউজিয়ামের কিউরেটার লোরেন পি উডল্যান্ডকে মাপবার ফেকল হাতে দেখা যাচ্ছে।

১৪ রকমের গাছপালা পশুদেহের ক্যানসার দমনে কার্যকর বলে জানা গেছে। ১০ রকমের গাছপালা নিয়ে এখনও পরীক্ষা করা হচ্ছে। আশা করা যায়, পশুদেহের ক্যানসার দমনে ভারতীয় গাছপালার কার্যকারিতা যথাযথভাবে প্রমাণিত হলে মানুষের ক্যানসার রোগে ব্যবহারোপযোগী নতুন ও বিভিন্ন রকমের উপাদানেরও সন্ধান পাওয়া যাবে এদেশে।

আকাদেমিশিয়ান ওপারিন

বিশ্ববিখ্যাত সোভিয়েত জীববিজ্ঞানী আকাদেমিশিয়ান এ আই ওপারিন, বারাণসীতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৫৫তম অধিবেশনে যোগদানের পর কলকাতায় আসেন। আকাদেমিশিয়ান ওপারিন হলেন সোভিয়েত বিজ্ঞান আকাদেমির বাখ্ জৈব-রসায়ন গবেষণা ইনস্টিট্যুটের ডিরেক্টর।

আকাদেমিশিয়ান ওপারিন ১৫ ও ১৬ জানুয়ারী আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু প্রতিষ্ঠিত বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের স্বর্ণজয়ন্তী অধিবেশনে যোগ দেন এবং আচার্য জগদীশচন্দ্র স্মৃতি স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সম্মেলন ও ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদানের মধ্য দিয়ে এই বিখ্যাত সোভিয়েত জীববিজ্ঞানী মনে করেন যে, বিজ্ঞানের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ শাখা জৈব-রসায়নবিজ্ঞানেও ভারতীয় বিজ্ঞানীদের অবদান ক্রমেই অত্যন্ত মূল্যবান হয়ে উঠবে।

আকাদেমিশিয়ান ওপারিন আজ প্রায় বিশ বছর ধরে সোভিয়েত বিজ্ঞান আকাদেমির বাখ্ জৈব-রসায়ন গবেষণা ইনস্টিট্যুটের অধিকর্তা এবং ১৯৪৬ সাল থেকেই সোভিয়েত বিজ্ঞান আকাদেমির সদস্য। তাঁর বয়স এখন ৭৪ বছর।

আলেকজান্ডার ইভানোভিচ ওপারিন ১৮৯৪ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃতিবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক হন ১৯১৭ খৃঃ ও পরে ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন। আকাদেমিশিয়ান এ এন বাখের অধীনে তিনি গবেষণা করেন ও পরে তাঁরই সঙ্গে একযোগে সোভিয়েত বিজ্ঞান আকাদেমির জৈব-রসায়ন গবেষণা ইনস্টিট্যুটের প্রতিষ্ঠা করেন। এই ইনস্টিট্যুটের নাম হয় পরে বাখ্ ইনস্টিট্যুট। ১৯৪৬ সাল থেকেই আকাদেমিশিয়ান ওপারিন ইনস্টিট্যুটের অধিকর্তা রয়েছেন।

১৯২৯ খৃঃ থেকে তিনি প্রথমে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার ও পরে অধ্যাপক হন। ১৯৩৯ খৃঃ থেকে তিনি সোভিয়েত বিজ্ঞান আকাদেমির করেসপনডিং সদস্য ও ১৯৪৬ খৃঃ থেকে পূর্ণ সদস্য হন। ওপারিন বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। ১৯৫২ খৃঃ তিনি বিশ্ব-বিজ্ঞানকর্মী ফেডারেশনের সহ-সভাপতি। তিনি বুলগেরীয় বিজ্ঞান আকাদেমি, লিওপোলডিনা বিজ্ঞান গবেষণা আকাদেমি, ফিনল্যান্ডের রসায়ন-পরিষদ, জাপানের জৈব-রসায়ন সমিতি প্রভৃতির সম্মানিত সদস্য ও জেনার ফ্রেডারিক শিলার বিশ্ববিদ্যালয়, পয়াতিয়ের বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতির সম্মানিত ডক্টরেট।

স্বদেশে বাখ্ পুরস্কার, মেচনিকভ পুরস্কার, সোভিয়েত বিজ্ঞান আকাদেমির মেসনিকফ স্বর্ণপদক প্রভৃতি তিনি লাভ করেছেন। সর্বোচ্চ সোভিয়েত সম্মান অর্ডার অব লেনিন, অর্ডার অব গ্রেট প্যাট্রিয়টিক ওয়র, অর্ডার অব রেড ব্যানার অব সোস্যালিস্ট লেবর প্রভৃতি সম্মানে তিনি ভূষিত। সোভিয়েত মহাকাশ গবেষণা সংস্থার তিনি সদস্য। "বৃহৎ সোভিয়েত চিকিৎসা-বিজ্ঞান এনসাইক্লোপিডিয়া"র তিনি যুগ্ম সম্পাদক।

আকাদেমিশিয়ান ওপারিনের বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক অবদানের মধ্যে পড়ে উদ্ভিদ জগতে এনজাইমের ক্রিয়া সম্পর্কে গবেষণা শ্রমশিল্পে জৈব-রসায়ন বিজ্ঞানের ব্যবহার সংক্রান্ত গবেষণা ইত্যাদি। পৃথিবীতে জীবনের উদ্ভব সম্পর্কে তাঁর তত্ত্ব বিজ্ঞান-জগতে তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান বলে স্বীকৃত।

আকাদেমিশিয়ান ওপারিন ১০০টিরও বেশি বিজ্ঞানগ্রন্থের প্রণেতা। এর মধ্যে তাঁর শ্রেষ্ঠ গবেষণা গ্রন্থগুলি হল : "জীবনের উদ্ভব", "পৃথিবীতে জীবনের উদ্ভব", "জীবন : তার প্রকৃতি উদ্ভব ও বিকাশ", "জীবকোষের এনজাইমের ক্রিয়া" প্রভৃতি গ্রন্থ।

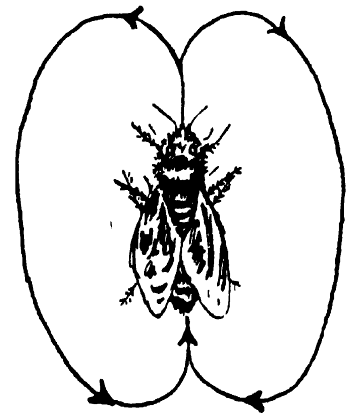
শুভংকর

মৌমাছির নাচ

কুঞ্জবিহারী পাল

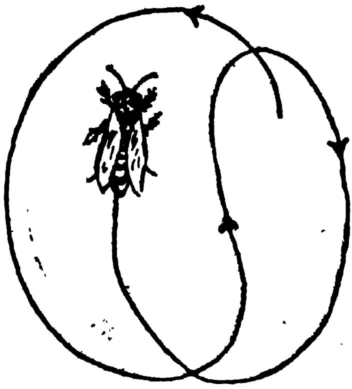
একটি মৌমাছিরাজ্যে রাণী থাকে একটি এবং তাকে ঘিরেই মৌমাছির সামাজিক এবং অন্যান্য ব্যবস্থাদি। একটি মৌমাছির চাকে চল্লিশ থেকে ষাট হাজারের মত মৌমাছি থাকে। এদের মধ্যে অধিকাংশই হল শ্রমিক-মৌমাছি। এরা সব সময়েই ব্যস্ত রয়েছে মধু সংগ্রহের কাজে। একটি রাণীমৌমাছি কয়েক ঋতু বেঁচে থাকে, কিন্তু শ্রমিক এবং পুরুষমৌমাছিরা দীর্ঘজীবী নয়। রাণী-মৌমাছির গা থেকে একটা বিশেষ ধরনের লালার গন্ধে পুরুষমৌমাছিরা তার দিকে আকৃষ্ট হয়। এ লালা জিনিসটার বৈজ্ঞানিক নাম অক্সোডেক্সেন সেনোইক অ্যাসিড। এরই গন্ধে রাণীমৌমাছির চারদিককার দশ কিলোমিটার জায়গার সব পুরুষমৌমাছি রাণীর কাছে এসে হাজির হয়। উঁচু আকাশের পানে ওড়ার প্রতিযোগিতায় যে সব পুরুষমৌমাছি রাণীর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে রাণী তাদের কাছেই দেহদান করে থাকে।

রাণীমৌমাছিকে এরপর অনেক কাজ করতে হয়। কলোনী গড়ার উপযুক্ত জায়গা খুঁজে বের করে ঘরগৃহস্থালীর কাজে মন দিতে হয় তাকে। ডিমপাড়ার জন্যে ঘর বানিয়ে সেগুলো পরিষ্কার করা, মৌচাকের কোষ দেখাশুনা করা এবং শূককীটদের সেবা-শুশ্রূষা করা প্রভৃতি কাজে ব্যস্ত থাকে রাণীমৌমাছি এসময়। এরপর কয়েকদিন ধরে তার কাজ হল মধু এবং পরাগ জমিয়ে রাখা। বিভিন্ন ফুল থেকে মধু এবং পরাগ সংগ্রহের কাজ করে শ্রমিকমৌমাছি। বিশদিন এমনিভাবে কেটে যায়। এবারে সে মৌচাকের দরজায় প্রহরীর মত অবস্থান করতে থাকে। বাকী জীবনটা তার মধু এবং পরাগের সুবন্দোবস্তাদি করতেই কেটে যায়। তার শরীরের গঠনও একাজের সম্পূর্ণভাবেই উপযুক্ত। শূককীটদের সেবাশুশ্রূষা করবার সময় তার মাথার নার্সিং গ্ল্যান্ড থেকে রয়াল জেলি বেরোয় যা দিয়ে সে শূককীটদের খাওয়াতে পারে। আবার যখন মধুচক্র তৈরীর কাজ করে সে, তার নার্সিং গ্ল্যান্ড শুকিয়ে গিয়ে পেটের উপরকার ওয়াক্স গ্ল্যান্ড কার্যকরী হয়। প্রহরীমৌমাছি এবং শ্রমিকমৌমাছিদের এই দুধরনের গ্ল্যান্ড শুকিয়ে যায় প্রায় পুরোপুরি।



ইংরেজি ৮-এর মত

ফুলে মধু তৈরী হতে সুরু করলেই হাজার হাজার মৌমাছিকে গুনগুন করতে দেখা যায় এক ফুল থেকে অন্য ফুলে। কিন্তু কেন অজানা জায়গায় কোন ফুলে



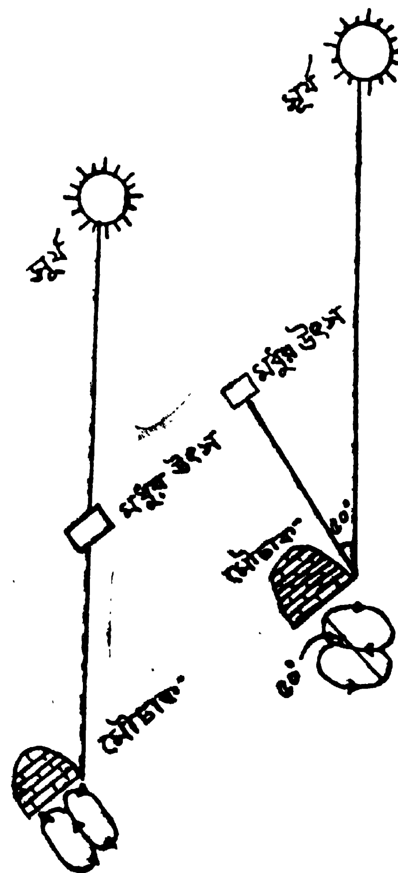
গোল নৃত্য

কখন মধু তৈরী হল তা মৌমাছিরা টের পায় কী করে? বিজ্ঞানীরা অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বলেন যে, একদল মৌমাছির কাজই হল ফুলে ফুলে ঘুরে কোথায় মধু তৈরী হল তার সংবাদ সংগ্রহ করা। এদের বলা যেতে পারে স্কাউটমৌমাছি। কোন মধুর সংবাদ পেলে এরা পেটভরে মধু খেয়ে চাকে ফিরে আসে। এসময় তাকে খুবই উত্তেজিত মনে হয়। চাকের দরজা দিয়ে সে একদম ছুটে চলে যায় চাকের উপরকার অংশে। সেখানে অন্য মৌমাছির দলের মধ্যে বসে সে পেটের মধু মুখ দিয়ে বের করে দেয়। চাকের মৌমাছিরা তার মুখ থেকে মধু চুষে নিয়ে কোষে জমা করে রাখে। এবারে স্কাউটমৌমাছি চাকের উপর নাচতে সুরু করে দেয়। নৃত্য চলে কয়েক সেকেণ্ড কখনো বা মিনিটখানেকের মত। ফলে যেসব শ্রমিকমৌমাছি চাকের উপর নিষ্কর্মা বসেছিল এতক্ষণ তারা নর্তকীর নাচের অর্থ বুঝে নিয়ে তার নাচের অনুসরণ করতে থাকে। নর্তকী এবার চাকের অন্য অংশে গিয়ে হাজির হয়। সেখানেও সে আগের মতই একটু সময় নেচে নেয়; ফলে এখান থেকেও কিছু সঙ্গী জোটাতে তার বেগ পেতে হয় না। দুদল মৌমাছি নিয়ে সে এবারে ছুটে যায় নতুন আবিষ্কার করা ফুলের কাছে। দলের সকলেই এখান থেকে পেট ভরে মধু খেয়ে ফিরে আসে চাকে। আগের নর্তকীর মত এরা সকলেই মধু জমা করে দিয়ে আগের মতই নাচ সুরু করে দেয়। ফলে একে একে অনেক মৌমাছিই এবারে এদের দলভুক্ত হয়ে পড়ে। মধুসংগ্রহের কাজে এরপর তার কোন অসুবিধেই হয় না।

মধুসংগ্রহের জায়গাটি যদি হয় খুব কাছে তবে মৌমাছিরা যে ধরনের নাচ নাচে তাকে বলা যেতে পারে 'গোলনৃত্য'। এ নাচের ব্যাসার্ধ একটি কোষের আয়তনের চেয়ে বড় নয়। এ জায়গায় মধুর পরিমাণ যদি হয় বেশী তবে নাচের উত্তেজনাও থাকে বেশী এবং নাচও চলে বেশী সময় ধরে। আবার মধুসংগ্রহের জায়গাটি যদি হয় বেশ খানিকটা দূরে তবে যে নাচ নাচে মৌমাছিরা তাকে আমরা 'ইংরেজী আটের নাচ' বা 'বাংলা চারের নাচ' বলতে পারি। কারণ আগের মতই এ নাচের পথ গোল হলেও ইংরেজী আট বা বাংলা চারের আকার ধারণ করে এবারকার এ নাচের পদ্ধতি। এ নাচের ব্যাসার্ধ দুটি বা তিনটি কোষের আয়তনের সমান হয়। নাচের উত্তেজনা ও স্থায়িত্ব আগের মতই মধুর পরিমাণের স্বল্পতা বা প্রাচুর্যের ওপর নির্ভর করে থাকে। অর্ধ-বৃত্তাকার পথের সরল রেখার অংশ দিয়ে নাচবার সময় নর্তকী তার লেজের দিকটা প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ১৩ বার করে এদিক-ওদিক নাড়াতে থাকে।

নাচের ছন্দ, এদিক-ওদিক কতবার ঘুর-পাক খাচ্ছে এবং নাচের দ্রুততার উপর মধু-সংগ্রহের জায়গার দূরত্ব নির্ভর করে। মধু-সংগ্রহে জায়গা যদি ১০০ মিটার দূরে হয় তবে দেখা যায় যে, নর্তকীমৌমাছি যে 'আটের নাচ' করে তাতে প্রতি ১৫ সেকেণ্ডে ১১বার অর্ধবৃত্তাকার পথ অতিক্রম করে চলেছে সে। আবার এ দূরত্ব ১৫০ মিটার হলে প্রতি ১৫ সেকেণ্ডে ৯বার এবং ২০০ মিটার হলে ১৫ সেকেণ্ডে ৮ বার অর্ধ-বৃত্তাকার পথ অতিক্রম করতে দেখা যায়। যখন দূরত্ব বেড়ে হয় ১ কিলোমিটার তখন এ পথ দাঁড়ায় চারবার মাত্র। এককথায় বলা চলে যে, মধুসংগ্রহের স্থানের দূরত্ব যত বাড়বে অর্ধবৃত্তাকার গতির গতিবেগ হবে কম।

মধুর উৎস যত দূরে হবে লেজের কম্পন হবে বেশী সংখ্যকবার। নর্তকী যখন ১০০ মিটার দূরের পথের জন্যে সঙ্গী সংগ্রহ করে তখন আটের নাচের সরল অংশে দুই কি তিনবার সে তার লেজ নাড়ে। দু'শ মিটার দূরের জন্যে লেজের কম্পন হয় চারবার। আবার সাতশ' মিটার দূরত্বের জন্যে কম্পন দাঁড়ায় দশ বা এগার বার। কাজেই নাচের সময় লেজ নাড়া এবং নাচের দ্রুততা দেখে অনুমান করা সম্ভব কত দূরে রয়েছে মধুর উৎস।



নর্তকী তার নাচের সাহায্যে মধুর উৎসের দূরত্ব বুঝিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হয় না; মধুর উৎস কোনদিকে তারও নির্দেশ দেয় সে তার নাচের সাহায্যে। নাচের সময় সূর্যের অবস্থান, মৌচাক এবং মধুর উৎস—এ তিনটি স্থানে যদি একটি ত্রিভুজের তিনটি কৌণিক-বিন্দু বলে ধরে নেওয়া যায় তবে দেখা যায় যে, চাক থেকে মধুর উৎসবিন্দুর ভিতরকার সরলরেখা এবং চাক থেকে সূর্যের অবস্থান-বিন্দু যোগ করে যে সরলরেখা পাওয়া যায় তাদের ভিতরকার কোণই উৎসের দিক্-নির্ণয়ে সাহায্য করে। সূর্য, মৌচাক এবং মধুর উৎস যদি একই সরলরেখায় অবস্থিত হয় তবে আটের নাচের সরলরেখার অংশটি চাকের ঠিক উপরেই পড়বে। আবার চাক থেকে মধুর উৎস এবং চাক থেকে সূর্য যোগ করে যে দুটি রেখা পাওয়া যাবে তাদের ভিতরকার কোণটি হয় যদি ৫০ ডিগ্রী তবে নাচের সরলপথটিও চাকের উপর ৫০ ডিগ্রী কোণ উৎপন্ন করবে।

নর্তকী যখন দক্ষিণ দিকের কোন মধুর উৎসের সন্ধান পায় তখন সে চাকের উত্তর দিকেই নৃত্য করতে থাকে, তবে এসময় সে তার মাথাটি উঁচু করে রাখে। আবার উত্তর দিকে মধুর উৎস থাকলে নাচবার সময় সে তার মাথা রাখে নীচু করে। পূর্বদিকের উৎসের বেলা মৌমাছি তার মাথা রাখে বাঁদিকে হেলিয়ে তবে পশ্চিমদিকের উৎসের বেলা মাথাটি থাকে ডানদিকে হেলানো। কাজেই নাচের ধরনধারণ দেখে শ্রমিক-মৌমাছিদের উৎস চিনে বার করতে বেগ পেতে হয় না।

আমাদের মত মৌমাছির কোন ভাষা নেই সত্যি, কিন্তু তাদের সামাজিক ব্যাপার-স্যাপার এবং উঁচুস্তরের নাচের ভাষা দেখলে সত্যিই তাই অবাক হতে হয়।

গৌরাঙ্গ পরিজন

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

(৬৫)

লোকনাথ গোস্বামী

যশোহর জেলার তালখড়ি গ্রামে আবির্ভাব। পিতা পদ্মনাভ, মাতা সীতাদেবী—বংশের উপাধি চক্রবর্তী। বয়সে মহাপ্রভুর চেয়ে দু বছরের বড়।

অদ্বৈত আচার্যের বিদ্যালয়ের নাম অদ্বৈতসভা। পিতার কাছে শাস্ত্র-ব্যাকরণ পড়ে লোকনাথ অদ্বৈতসভায় এল ভাগবত পড়তে। অদ্বৈত তাকে দীক্ষামন্ত্র দিয়ে তাঁর সভায় ভর্তি করে নিলেন। সেখানে সে সতীর্থ পেল গদাধরকে। আর গৌরাঙ্গসুন্দরকে।

গৌরাঙ্গসঙ্গের গুণে লোকনাথের মধ্যে ভক্তিশাস্ত্র প্রস্ফুটিত হল। 'শ্রীগৌরাঙ্গসঙ্গের গুণে অতি চমৎকার। লোকনাথের হৈল ভাগবতে অধিকার।।' গৌরাঙ্গের প্রতি লোকনাথের অদ্ভুত প্রেম দেখে অদ্বৈত লোকনাথকে গৌরাঙ্গের হাতে সমর্পণ করে দিলেন।

তালখড়ি গ্রামের পার্শ্ববর্তী 'বারাঙ্গনা' নদীর ধার দিয়ে পূর্ববঙ্গে যাবার সময় গৌরহরি লোকনাথের খোঁজ করলেন। পদ্মনাভ হাতে চাঁদ পেয়ে গৌরাঙ্গকে ঘরে ডেকে নিল। দিন কয়েক সযত্নে অতিথিসংকার করল। তারপর লোকনাথকে গৌরাঙ্গের সঙ্গী করে দিল।

প্রভুর পূর্ববঙ্গ বিজয়ের সহচর লোকনাথ। তারপর পর্যটন শেষে যখন নবদ্বীপে ফিরলেন লোকনাথকে বললেন, ঘরে গিয়ে অপেক্ষা করো।

লোকনাথ ঘরে ফিরল বটে কিন্তু সব সময়ে উদাস ভাব, অনুরাগময়ী উৎকণ্ঠাদশা। ইতিমধ্যে পিতা-মাতার লোকান্তর হল। ঘরে আর মন টিকল না, নবদ্বীপে চলে এল লোকনাথ।

এসে বুঝল প্রভু অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই সন্ন্যাস নেবেন। প্রভুর পায়ে পড়ে কাঁদতে লাগল লোকনাথ—তোমার চাঁচর চিকুরের কী হবে?

গৌরহরি বললেন, তুমি শ্রীধাম বৃন্দাবনে চলে যাও। আমিও যাচ্ছি।

লোকনাথের দ্বিরুক্তি নেই, সে বৃন্দাবনে চলল। গদাধরের শিষ্য ভূগর্ভ গোস্বামী বললে, আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

দুই ভক্ত, লোকনাথ আর ভূগর্ভ, পদব্রজে শ্রীব্রজে উপনীত হল। এসে দেখল গৌরভক্তদের মধ্যে শুধু সুবুদ্ধি রায়ই বৃন্দাবনে প্রথম সমাগত। কিন্তু বৃন্দাবনে প্রভু আসছেন কই, তিনি কবে আসবেন? তাঁর সঙ্গে মিলবে বলেই তো তাদের বৃন্দাবনে আসা।

শুনল প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করে নীলাচলে চলে গিয়েছেন, সেখান থেকে গিয়েছেন দক্ষিণ-বিজয়ে। সাক্ষাৎদর্শনের আশায় লোকনাথ দক্ষিণে যাত্রা করল। দাক্ষিণাত্যে গিয়ে শুনল প্রভু নীলাচল হয়ে বৃন্দাবনের দিকে গিয়েছেন। লোকনাথ বৃন্দাবনে ফিরে গেল। ফিরে এসে শুনল প্রভু বৃন্দাবনবিজয় শেষ করে প্রয়াগে প্রয়াণ করেছেন।

লোকনাথ স্থির করল প্রয়াগে যাবে। সাক্ষাৎদর্শন ছাড়া এ বিরহযন্ত্রণা শান্ত হবে না।

রাত্রে প্রভুকে স্বপ্ন দেখল লোকনাথ। প্রভু বললেন, তুমি বৃন্দাবনেই থাকো, এখেনেই ভজন করো।

স্বপ্নাদেশকে সাক্ষাৎ-আদেশ বলে মানল লোকনাথ। বৃন্দাবন ছেড়ে এক পা-ও আর বাইরে গেল না। দুর্গম প্রদেশে শুধুই ঘুরে বেড়াতে লাগল—কোথায় কৃষ্ণ—গেল না তার বিরহের কাতরতা। এমন দুর্বার বৈরাগ্য কেউ আর কখনো দেখেনি, এমন নিষ্কিঞ্চনতা। আকৌমার ব্রহ্মচারী, ফলমূলের বেশি কিছু খায় না, থাকে বৃক্ষতলে। সুবুদ্ধি রায় আছে মথুরায়, কেশবদেবের মন্দিরের কাছে আর লোকনাথ আছে ছত্রবনের কাছে উমরাও গ্রামের কিশোরীকুণ্ডের ধারে। প্রবল বর্ষাই হোক বা দুর্দান্ত শীতই হোক, বৃক্ষতল ছাড়া কোথাও আশ্রয়প্রতীক্ষা করে না, গায়ে জীর্ণ একখানি কাঁথা, জীর্ণতর বহির্বাস। গ্রামবাসীরা ছোট একটি কুটির নির্মাণ করে দিতে চাইল, কিন্তু লোকনাথ রাজি হল না। আমি সর্বক্ষণ কৃষ্ণানুসন্ধান করছি, কুটিরে স্থায়ী হয়ে বসবাস করি এমন সাধ্য কী।

কিন্তু যদি একটি অন্তত বিগ্রহ পেতাম তার সেবা করে আমার কৃষ্ণ না-পাওয়ার যন্ত্রণার কিঞ্চিৎ লাঘব হত। লোকনাথ উৎকণ্ঠিত হয়ে দিন কাটাতে লাগল।

একদিন কে একজন নির্জনে তার সামনে এসে দাঁড়াল। লোকনাথের হাতে একটি যুগল বিগ্রহ দিয়ে বললে, এই নাও, এই বিগ্রহের সেবা করো।

এ বিগ্রহের নাম কী?

রাধাবিনোদ। বলে সেই লোক অন্তর্হিত হয়ে গেল।

এ বিগ্রহ কে দিয়ে গেল? কোথাকার বিগ্রহ? কোনখান থেকে নিয়ে এল একে?

তখন বিগ্রহই কথা কয়ে উঠল। বললে, আমি এই কিশোরীকুণ্ডেই বাস করি। তোমার উৎকণ্ঠা ও আকুলতা দেখে নিজেই নিজেকে প্রকট করেছি। আমাকে আবার কে আনবে? কেন আমি নিজে তোমার কাছে চলে আসতে পারি না?

আনন্দে লোকনাথ কাঁদতে লাগল। ভাবল এ শুধু প্রভুর কৃপা।

কিন্তু তোমার কান্না দেখবার আমার সময় নেই। আমি ক্ষুধার্ত। বললে বিগ্রহ, আমাকে শিগগির কিছু খেতে দাও।

গাছতলায়ই রান্না করল লোকনাথ। খেতে দিল বিগ্রহকে। ভোগ-রাগের পর পুষ্পশয্যায় শুইয়ে দিল। বনাপল্লবে বাতাস করল খানিকক্ষণ, পদসেবা করল। কিন্তু উত্থানের পর একে রাখি কোথায়?

বৃক্ষতলে বাস, বৃক্ষের কোটরে রাখল। কিন্তু যখন ভিক্ষায় বেরুব তখন একে কে দেখে? লোকনাথ একটি ঝোলা তৈরি করল, সেই ঝোলার মধ্যেই রাখল বিগ্রহকে। সেই ঝোলাই রাধাবিনোদের মন্দির। সেই ঝোলাই কণ্ঠমালার মত বুকে ঝুলিয়ে রাখল সর্বক্ষণ।

ক্রমে-ক্রমে গোস্বামীরা আসতে লাগল বৃন্দাবনে। রূপ সনাতন গোপাল ভট্ট রঘুনাথ ভট্ট। বৃন্দাবন কৃষ্ণখ্যাতিতে মুখর হয়ে উঠল।

এল নরোত্তম দত্ত। নরোত্তমই লোকনাথের একমাত্র শিষ্য। প্রিয়তম শিষ্য।

বৃন্দাবন যাবার উদ্দেশে গৌরহরি যখন কানাইর নাটশালায় পৌঁছোন তখন একদিন কীর্তনে নৃত্য করতে করতে আচম্বিতে

'নরোত্তম' নাম ধরে ডাকতে সুরু করেন। কে নরোত্তম? এখনো জন্মগ্রহণ করেনি, পরে করবে।

পদ্মাতীরে গড়েরহাটে নিত্যানন্দকে নিয়ে এলেন গৌরহরি। সেখান থেকে কুতুবপুরে। পদ্মায় স্নান করে তীরে কীর্তন আরম্ভ করলেন। পদ্মাবতীকে বললেন, আমি আর নিত্যানন্দ তোমাকে প্রেম দিয়ে যাচ্ছি, যত্ন করে এ প্রেম তুমি গোপন করে রাখো। নরোত্তমই এই প্রেমের পাত্র। সে এলে তাকে এই প্রেম দিও।

পদ্মাবতী জিজ্ঞেস করলে, নরোত্তমকে চিনব কী করে?

যার স্পর্শে তুমি বেশি উচ্ছল হবে বুঝবে সেই নরোত্তম। 'যাহার পরশে তুমি অধিক উছলিবা। সেই নরোত্তম, প্রেম তাঁরে তুমি দিবা।'

কিশোরবয়স্ক নরোত্তম স্বপ্ন দেখল নিত্যানন্দ তাকে বলছেন, যাও, পদ্মাবতীর স্থানে তোমার জন্যে যে প্রেম গচ্ছিত আছে তাই নিয়ে এস।

প্রভাতে একাকী পদ্মাতীরে চলে এল নরোত্তম। স্নান করতে নদীতে নেমেছে, নদী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। তখন গৌরাঙ্গের কথা মনে করে পদ্মাবতী নরোত্তমকে প্রেম দিলে। প্রেম পেয়ে নরোত্তমের গায়ের রঙ বদলে গেল, শ্যামবর্ণ গৌরবর্ণ হল। নরোত্তমের মনে হল এক গৌরবর্ণ শিশু তার মধ্যে প্রবেশ করেছে। দিনে দিনে তার প্রেমব্যাধি বাড়তে লাগল, পরিশেষে একদিন গৃহশৃংখল ছিন্ন করে চলে এল বৃন্দাবন।

বৃন্দাবনে এসে নরোত্তম লোকনাথের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হল। বললে, আমাকে আপনার শিষ্য করে নিন।

লোকনাথ প্রথমে রাজি হয়নি। কিন্তু শুধু সেবাভক্তির মূল্যে নরোত্তম গুরুকৃপা ক্রয় করে নিল।

রঘুনাথ দাসের মত নরোত্তমও ধনীর দুলাল। ইচ্ছে করলে সে তো অনায়াসে ভোগ-বিলাসে ডুবে থাকতে পারত। কিন্তু সমস্ত রাজৈশ্বর্য ঠেলে ফেলে দূর-দুর্গম বৃন্দাবনে সে কী কঠোর কৃচ্ছ্রে কালাতিপাত করছে! যদি গুরুকৃপার সৌভাগ্য তার অদৃষ্টে থাকে।

লোকনাথের দুয়ারেই নরোত্তম পড়ে থাকে। শিক্ষা নেয়, প্রসাদ নেয়, কিন্তু কিছুতেই দীক্ষামন্ত্র পায় না।

লোকনাথ দেখল প্রত্যূষে তারও শয্যা-ত্যাগ করবার আগে নরোত্তম উঠেছে, উঠে লোকনাথের জন্যে শৌচ-মৃত্তিকা প্রস্তুত করছে। অন্ধকার তখনো ভালো করে কাটেনি আরেকদিন লোকনাথ দেখল অন্দরে অঙ্গনে ঝাঁট দিচ্ছে নরোত্তম। লোকনাথের হৃদয় দ্রবীভূত হয়ে গেল। বললে, তোমার হৃদয়ে জগৎগুরু প্রবেশ করেছেন, যে প্রেমের জন্যে মানুষ ভজনা করে সেই প্রেমে তুমি ভরপুর, তোমার কি আর গুরুর প্রয়োজন আছে?

তবু নরোত্তমকে দীক্ষামন্ত্র দিল লোক-নাথ। শিখিয়ে দিল যাবতীয় উপাসনা-রীতি। তারপর একদিন শ্রীনিবাসের হাতে সঁপে দিল গৌড়ে-উৎকলে মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম প্রচার করবার জন্যে। নিজে আর বৃন্দাবন ছাড়ল না।

কৃষ্ণদাস কবিরাজকে বললে, তোমার চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে আমার বিষয়ে যেন কিছু লেখা না হয়।

নামাকাঙ্ক্ষাহীন লোকনাথ ভজন-আনন্দে শতাধিক বছর বেঁচে ছিল। ব্রজমণ্ডলের খদির বনে ভজন করতে করতে শ্রাবণী কৃষ্ণাষ্টমীতে নিত্যলীলায় প্রবেশ করল।

(৬৬)

সুবুদ্ধি রায়

প্রকৃত নাম সুবুদ্ধি ভাদুড়ি, পিতা শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ি।

সুবুদ্ধি এককালে গৌড়ের অধিকারী ছিল, তার অধীনে চাকরি করত হুসেন শা। হুসেন শাকে সুবুদ্ধি দীঘি খনন করবার ভার দিল। কাজে ছিদ্র পেয়ে হুসেন শাকে চাবুক মারল সুবুদ্ধি। পিঠের আঘাত এত গভীর হল যে ঘা শুকোলেও দাগ মিলিয়ে গেল না।

কালক্রমে হুসেন শা গৌড়ের নবাব হয়ে বসল। প্রথম-প্রথম সুবুদ্ধিকে সে অনেক সম্মান দেখাল, করল অনেক পরিতোষ। কিন্তু একদিন হুসেন শার স্ত্রী দেখতে পেল সেই খোলা পিঠের কালো দাগ। স্বামীকে জিজ্ঞেস করল, এ দাগ কিসের?

সুবুদ্ধি রায় একবার মেরেছিল। হুসেন শা আর ঢেকে রাখতে পারল না।

কী মেরেছিল?

চাবুক।

সব শুনে স্ত্রী মরীয়া হয়ে উঠল। তুমিও সুবুদ্ধি রায়কে মারো।

প্রহার করব?

না, বধ করবে। একেবারে মেরে ফেলবে।

হুসেন শা বললে, তা পারব না। সুবুদ্ধি রায় আমার পূর্ব মণিব, আমার পালনকর্তা, পিতৃতুল্য। তাকে প্রাণে মারা অধর্ম হবে।

তা হলে জাতে মারো।

জাতে মারলেও সে প্রাণে বাঁচবে না।

কিন্তু স্ত্রী কিছুতেই নিবৃত্ত হল না স্বামীকে দিবারাত্রি উত্তেজিত, উত্যক্ত করতে লাগল।

সুবুদ্ধি রায়কে ডেকে এনে তার মুখে করোয়ার জল ঢেলে দিল হুসেন শা।

সুবুদ্ধি রায়ের জাত গেল। কাশীতে এসে পণ্ডিতদের কাছে প্রায়শ্চিত্তের বিধান চাইল। কেউ বললে তপ্ত ঘি খেয়ে প্রাণত্যাগ করাই একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত। কেউ বললে, নিজের ইচ্ছায় তো আর জল খায়নি, এ অবস্থায় অতবড় শাস্তি অবিধেয়। কী করে, কোথায় যায়, সুবুদ্ধি অস্থিরচিত্তে দিন কাটাতে এলেন।

এমন সময় বৃন্দাবনের পথে কাশীতে মহাপ্রভু এলেন।

সুবুদ্ধি তাঁর কাছে গিয়ে সুবুদ্ধি চাইল।

নিয়মিত ব্যবহার করলে ফরহান্স টুথপেষ্ট মাড়ির গোলযোগ ও দাঁতের ক্ষয় রোধ করে

ছোট বড় সকলেই ফরহান্স টুথপেষ্টের অযাচিত প্রশংসায় পঞ্চমুখ

ফরহান্স টুথপেষ্ট মাড়ির এবং দাঁতের গোলযোগ রোধ করার জন্যেই বিশেষ প্রক্রিয়ায় তৈরী করা হয়েছে। প্রতিদিন রাত্রে ও পরদিন সকালে ফরহান্স টুথপেষ্ট দিয়ে দাঁত মাজলে মাড়ি সুস্থ হবে এবং দাঁত শক্ত ও উজ্জ্বল ধবধবে সাদা হবে।

ফরহান্স টুথপেষ্ট-এক দন্তচিকিৎসকের সৃষ্টি

বিনামূল্যে ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় রঙীন পুস্তিকা—"দাঁত ও মাড়ির যত্ন"
এই কুপনের সঙ্গে ১০ পয়সার ষ্ট্যাম্প (ডাকমাশুল বাবদ) "ম্যানার্স ডেণ্টাল এডভাইসরী ব্যুরো, পোষ্ট ব্যাগ নং ১০০৩১, বোম্বাই-১ এই ঠিকানায় পাঠালে আপনি এই বই পাবেন।
নাম..............................
ঠিকানা..............................
ভাষা..............................
A. 7

জেফ্রি ম্যানার্স এণ্ড কোং লিঃ   -7F r BG

প্রভু বললেন, নিরন্তর হরিস্মরণই শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত। তুমি বৃন্দাবনে যাও। অনুক্ষণ কৃষ্ণনাম কীর্তন করো। এক নামাভাসেই তোমার পাপদোষ যাবে আর নাম হতেই পাবে কৃষ্ণচরণ।

হরিনাম পরমপাবন। অশুচিকে শুচি করে, অতীর্থকে তীর্থ করে। হেলায়-অশ্রদ্ধায় এমন কি বাক্য-পূরণেও নমোচ্চারণ করলে ফল হয়। 'খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়। দেশ কাল নিয়ম নাহি সর্বসিদ্ধি হয়।।'

শুধু নামে নয়, নামাভাসেও হবে। রত্ন যেখানেই রাখো, সিন্দুকেই হোক বা ছাইয়ের গাদায়ই হোক, তার সমান মূল্য। পুরো নাম তো বটেই, নামে-বদ্ধ নামের অক্ষরগুলোও অপ্রাকৃত চিন্ময়। তাই নামের মত নামাভাসেও প্রচণ্ড শক্তি। শূকরের দাঁতে আহত হয়ে যবন 'হারাম' 'হারাম' বলে ডেকে মুক্তি পেয়েছিল। বলছে শূকর, ডাকা হচ্ছে রামকে। একেই বলে নামাভাসে মুক্তি। নামাভাসেরই যদি এত শক্তি তাহলে স্পষ্ট নামোচ্চারণ যে প্রত্যক্ষ ফল দেবে তাতে আর কার সন্দেহ? নামের উচ্চারণ যদি অশুদ্ধ হয়, এমন কি অসম্পূর্ণও হয়, কিছু এসে যাবে না, ঐ ভ্রমে ও ন্যূনতায়ও নাম-প্রভাব অম্লান থাকবে। সমস্ত প্রারব্ধ পাপের নাশও এই নামেই। আর নাম ও নামী অভিন্ন বলে নামীর যেমন মহিমা, নামেরও তেমনি।

সুবুদ্ধি রায় বৃন্দাবনের দিকে যাত্রা করল। প্রয়াগ অযোধ্যা হয়ে পৌঁছুল নৈমিষারণ্যে। সেখান থেকে মথুরায়। মথুরায় এসে শুনল প্রভু ব্রজভূমি দর্শন করে ফিরে গিয়েছেন। আরেকবার দেখা হবে ভেবেছিল, হল না।

কী করে জীবিকানির্বাহ করবে সুবুদ্ধি? জঙ্গল থেকে শুকনো কাঠ এনে বাজারে বিক্রী করতে লাগল। কাঠ আনে কী করে? দড়ি দিয়ে বেঁধে, কাঁধে বয়ে। বেচে পায় কত? এক বোঝা মাত্র পাঁচ পয়সা, খদ্দের সদয় হলে, ছয়। তার থেকে এক পয়সা দিয়ে চানা-চাবানা কিনে নিজে খায় আর বাকি পয়সা বেনের দোকানে জমিয়ে রাখে। সে পয়সায় গরিব দুঃখী সাধুসন্ন্যাসীর সেবা করে। আর যদি সে বাঙালি বৈষ্ণব হয় তাহলে তারজন্যে গায়ে মাখবার তেল কেনে, শুধু রুটির বদলে দুই ভাতের জোগাড় দেখে। নিজের জন্যে কিন্তু শুকনো চানার বেশি নয়, না, কখনো নয়।

যে সুবুদ্ধি একদিন অধিকারী ছিল, কত তার দাসদাসী, কত তার ভোগের উপকরণ, সে আজ কিনা এক পয়সার চানা খেয়ে দিন কাটায়। প্রভুর কৃপায় সে বৈরাগ্য-ভূষণ হয়েছে। পরাপেক্ষা নেই, নিজেতেই নিজের নির্ভর, নেই বিন্দুমাত্র অপ্রসাদ। যেটুকু সঞ্চয় সেটুকুও নিজের ভোগের জন্যে নয়, কাঙাল বৈষ্ণবের সেবার জন্যে।

রূপ ও অনুপম মথুরায় এলে সুবুদ্ধি রায় দেখা করতে গেল। দুই ভাইকে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখাল দ্বাদশবন। কিন্তু মাসখানেকের বেশি তারা থাকতে পারল না, সনাতন কাশীতে আছে খবর পেয়ে চলল কাশী। গঙ্গাতীরের রাস্তা দিয়ে প্রভু গিয়েছেন শুনে তারা সেই পথ ধরল। আর সনাতনের বৃন্দাবনযাত্রা সটান রাজপথ দিয়ে। তাই কারুর সঙ্গে কারুর দেখা হল না। প্রয়াগে পৌঁছে রূপ ও অনুপম খবর পেল সনাতন মথুরায় গিয়েছে আর সনাতন মথুরায় পৌঁছে জানল যদিও রূপ-অনুপম মথুরায়ই ফিরেছিল, তারা এখন প্রয়াগে।

সনাতনকে পেয়ে সুবুদ্ধির আনন্দ আর ধরে না। কিন্তু কঠোর তপস্বী মহাবিরক্ত সনাতনের দেহসুখে স্পৃহা নেই, তাই সুবুদ্ধির স্নেহ ব্যবহার তার কাছে লোভনীয় নয়। সে তীব্র বৈরাগ্যে প্রতিষ্ঠিত, কী হবে তার দেহস্বাচ্ছন্দ্যে?

বৃন্দাবনে পরে যে আনন্দ নিকেতন গড়ে উঠেছিল তার ভিত্তির প্রথম প্রস্তর সুবুদ্ধি রায়।

(৬৭)

রামজপী বিপ্র

দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে মহাপ্রভু সিদ্ধবটে এসেছেন। সেখানে শ্রীরামচন্দ্রের মন্দিরে দেখলেন রঘুনাথকে।

মুখে নিরন্তর রামনাম, এক ব্রাহ্মণ এসে দাঁড়াল যুক্ত করে। কৃপা করে আমার ঘরে যদি ভিক্ষা পান—ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করল সবিনয়ে।

রাম নাম ছাড়া অন্য কথা বলে না, ব্রাহ্মণে আকৃষ্ট হলেন প্রভু। তার ঘরে অতিথি হয়ে রাত কাটালেন।

পরদিন চললেন আরো দক্ষিণে। স্কন্দ-ক্ষেত্রে এসে স্কন্দ দর্শন করলেন। ত্রিমঠে এসে দেখলেন ত্রিবিক্রমকে।

ফিরে এলেন সিদ্ধবটে। সেই রামভক্তের বাড়িতে গিয়ে উঠলেন। এ কী, ব্রাহ্মণ দেখি এখন নিরন্তর কৃষ্ণনাম বলছে!

এ তোমার কী রকম হল? প্রভু জিজ্ঞেস করলেন, আগে তুমি সর্বদা রামনাম করতে, এখন হঠাৎ কৃষ্ণনাম বলতে সুরু করেছ কেন?

ব্রাহ্মণ বললে, প্রভু তোমার দর্শন প্রভাবে আমার আজন্মের স্বভাব দূর হল। আমি বাল্যকাল থেকে রামনাম করছি, তোমাকে দেখে কেন কে জানে একবার কৃষ্ণনাম মনে এল। মনে আসতেই জিভে এল, আর বিনা চেষ্টায়ই বারে-বারে স্ফুরিত হতে লাগল। শাস্ত্রমতে রামও পরব্রহ্ম, কৃষ্ণও পরব্রহ্ম, কিন্তু শাস্ত্রই বলছে রামনামের চেয়ে কৃষ্ণনামের মাহাত্ম্য বেশি। তবু আমি যে রাম-নাম করতাম তার কারণ রাম আমার ইষ্টদেব, কিন্তু তোমাকে দেখে যখন স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে কৃষ্ণনাম মুখে এসে গেল, তখনই বুঝলাম সে নামের কী মহিমা!

প্রভু হাসতে লাগলেন।

তুমিই সেই সাক্ষাৎ কৃষ্ণ। ব্রাহ্মণ প্রভুর পায়ে লুটিয়ে পড়ল।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ। সকলকে, এমন কি নিজেকে যিনি আকর্ষণ করেন তিনিই কৃষ্ণ। যিনি জীব-হৃদয় কর্ষণ করে ভক্তির বীজ বোনেন তিনিই কৃষ্ণ। কৃষ্ণই নিত্য আনন্দের উৎস। কৃষ্ণই সুধস্বামী।



আর্নিকল

আর্নিকল হেয়ার অয়েল

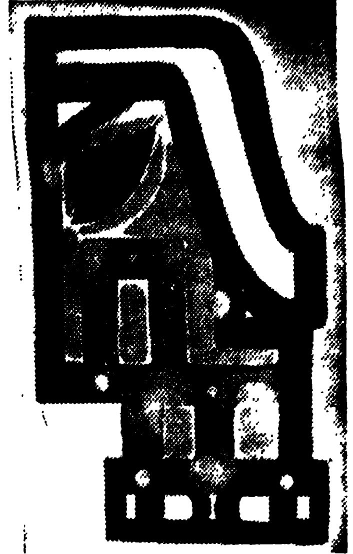
কেশের অকালপক্কতা ও পতন নিবারণে সহায়তা করে এবং কেশ সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।

মহেশ লেবোরেটরিজ প্রাইভেট লিমিটেড কলিকাতা-১১



এম. ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড
৭৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১
ফোন : ২২

প্রদর্শনী



শিল্পী : সীতেশ রায়।

জানুয়ারীর শেষের দিকে দক্ষিণ কলকাতায় দুটি শিশুশিল্প প্রদর্শনী উপভোগ্য হয়েছিল। একটি বিড়লা অ্যাকাডেমিতে করা বালিগঞ্জ শিক্ষা সদনের ছাত্র-ছাত্রীদের কাজ অন্যটি নবপ্রতিষ্ঠিত বিপিন পাল রোডে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনী। বালিগঞ্জ শিক্ষা সদনের ছাত্রছাত্রীরা দেড়শ'র ওপর ছবি এবং শিক্ষাপ্রদ চার্ট ইত্যাদি প্রদর্শন করেছিল। ছবিগুলি এদের ইতিপূর্বে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীর মতই সুন্দর হয়েছিল। মোটামুটি ছয় থেকে সতেরো বছরের ছেলেমেয়েদের কাজ দেখা গেল। এর মধ্যে ছয় থেকে নয় বছরের ছেলেমেয়েদের কতকগুলি কাজ বিশেষভাবে চোখে পড়ল। ছোট ছেলেমেয়েদের কাজে এমনিতেই একটা সারল্য এবং দ্রষ্টব্য বিষয়কে সোজাসুজি উপস্থিত করার প্রবণতা থাকে যেটা প্রায় যে-কোন অবস্থায়ই আকর্ষণীয় হবার ক্ষমতা রাখে। তাছাড়া তাদের পরিচিত জগৎ বা যে বিষয়ে তাদের কৌতূহল কিম্বা যেসব ঘটনা তাদের মনকে নাড়া দেয় তাকেই তারা ছবিতে রূপ দেবার চেষ্টা করে। এখানে তাই ফুচকাওয়ালা, বেলুন নিয়ে খেলা, পোষা-পাখীদের খাওয়ান, পারিস্বলেটের ঠেলে নিয়ে যাওয়া, ছাতামাথায় মানুষ ইত্যাদি বিভিন্ন সাধারণ বিষয় ছোট ছেলেদের চোখে অসাধারণ হয়ে দেখা দিয়েছে এবং তাকেই তারা তুলে ধরতে চেষ্টা করেছে। আরেকটু বড় বয়সের ছেলেমেয়েদের কাজে বড়দের আলাপ-আলোচনা বা কোন সাময়িক সংবাদ-পত্রের উত্তেজনাকর ঘটনা রেখাপাত করেছে। তাই ট্রাম-বাস পোড়ানোর ছবি বা পথে-পথে জনতার মিছিলের দৃশ্য তাদের কল্পনার খোরাক জুগিয়েছে। এই বয়সের ছাত্রছাত্রীরা অবশ্য দুর্গাপুজো কি সার্কাস বা স্কুলের পুরস্কার বিতরণী সভাকেও উপেক্ষা করে নি। এর উর্ধে যাদের বয়স তাদের মধ্যে আবার একটু বড়দের কাজের ছাপ বেশী করে এসে পড়েছে। তাছাড়া তাদের কেউ-কেউ কবিতা বা রূপকথা বা পুরাণের কাহিনী নিয়ে ছবি আঁকার চেষ্টা করেছে। এগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোন না কোন বড়দের ছবির অনুসরণে আঁকা বলে ক্ষেত্র-বিশেষে সুঅঙ্কিত হলেও আকর্ষণ করে না। কতকগুলি মৃৎপাত্রের অলঙ্করণ কাজও দর্শনীয় হয়েছিল।

বিড়লা অ্যাকাডেমিতে বালিগঞ্জ শিক্ষা-সদনের প্রদর্শনী শেষ হয়ে যাবার পর এক সঙ্গে তিনজন শিল্পীর দুটি চিত্র প্রদর্শনী শুরু হয়। একদিকে সীতেশ রায় এবং অন্যদিকে রণজিৎ রায় ও টুকু নন্দীর ছবি। সীতেশ রায় ইতিপূর্বে দক্ষিণ কলকাতায় আরেকটি শিল্প সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত এক প্রদর্শনীতে সুনাম অর্জন করেছেন। বাংলার পট এবং লোকশিল্পের নমুনা তাঁকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে বলে মনে হল। এর ভেতর থেকেই তিনি নতুন কিছু ডেকরেটিভ ফর্ম খোঁজবার চেষ্টা করছেন। মোটামুটি ফ্ল্যাট টেম্পেরায় আঁকা তাঁর কাজ। তার মধ্যে মোটা কালো রেখাই প্রধান। মাঝে মাঝে সবুজ, নীল, গৈরিক বা লালের ছোঁয়ায় কালোকে আরো সুস্পষ্ট করা হয়েছে। সীতেশ রায়ের বেশীর ভাগ ছবিই ইলাস্ট্রেশনধর্মী এবং প্রধানতঃ কাব্যই তাঁর প্রেরণার উৎস। রবীন্দ্রনাথ ও পরবর্তী কবিদের কাব্যের থেকে তিনি ছবির উপাদান সংগ্রহ করেছেন। স্বপ্নপ্রয়াণ, বিম্ববতী, কালি মধু যামিনীতে প্রভৃতি ছবিগুলির মধ্যে কয়েকটি সুন্দর নিদর্শন পাওয়া গেল। পথের পাঁচালীর কয়েকটি ইলাস্ট্রেশনে পটশিল্পের প্রভাবটাই বেশী। তবে গোকুল ব্রত এবং কয়েকটি পটশিল্পভিত্তিক অ্যাবস্ট্রাক্ট-ঘেঁষা স্টাডি সবচেয়ে আকর্ষণীয় লাগল। শাদা জমির ব্যবহার তিনি এসব ছবিতে সুন্দর-ভাবে করেছেন। তবে শ্রীরায়ের ছবিগুলি মাপে অত্যন্ত ছোট এবং এই মিনিয়েচার-ধর্মীতা অনেক সময় প্রায় টেল-পিসঘেঁষা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে অনেক ছবিতেই বড় মাপের ছবি করার উপাদান রয়েছে। আশা করা যায় আগামীবার তাঁর ছবির আরো পূর্ণতর রূপ দেখা যাবে।

রণজিৎ রায় এগারোখানি জলরঙ এবং তিনখানি তেলরঙের বড় ছবি উপস্থিত করেছেন। জলরঙের কাজগুলি বেশীর ভাগই রেখা এবং ওয়াশে সম্পূর্ণ—কতকটা আলগাভাবে আঁকা। বেশীর ভাগই গ্রুপ কম্পোজিশন। ছবিগুলির মধ্যে কোথাও মানুষের নিষ্ঠুরতা কোথাও বা বেদনার রূপ ফোটানো হয়েছে। কতকটা নিখিল বিশ্বাসের কাজের ধরনে করা—তবে মাপে আরো ছোট এবং তুলনায় একটু কমজোরি। তেলরঙের কাজগুলিও এই ধরনেরই তবে রঙ একটু অন্ধকারাচ্ছন্ন।

টুকু নন্দী পনেরোখানি বড় ও মাঝারি মাপের তৈলচিত্র উপস্থিত করেছেন। দুটি প্রতিকৃতি এবং অন্যান্য ছবিতেও একটিমাত্র রমণী মূর্তি। একটি ফিগারের ভেতরেই তিনি বিভিন্ন মুড সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন; যদিও সবকটিই মনে হয় একজনেরই ছবি। ছবির কম্পোজিশনের দিকে তিনি অনেক-খানি নজর দিয়েছেন; রঙের প্রয়োগ তাঁর অনেকটা পোস্ট-ইম্প্রেশানিস্টধর্মী এবং ডেকরেটিভ; তবে একটুখানি শুষ্ক। তাঁর আত্মপ্রতিকৃতি, "এগেনস্ট দি উইন্ড", "আউট-সাইড দি চার্চ" "এ কাপ্টি বেল", "অ্যাট দি পার্টি" প্রভৃতি কাজগুলি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া "আই অ্যাপীল" ছবির শাদা এবং নীলের হার্মনি এবং "ইন দি চার্চের" কম্পোজিশন ও প্রতীকধর্মীতা ভালই লাগল। ছোটখাট দোষত্রুটি থাকলেও তাঁর ছবিগুলিতে একটা রূপ সৃষ্টির প্রচেষ্টা আছে।

গত ৩১শে জানুয়ারী থেকে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে পশ্চিমবঙ্গ ও ফ্রান্সে ভ্রমণসম্পর্কিত একটি সুদৃশ্য প্রদর্শনী হয়ে গেল। প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর। রাজ্যের ভ্রমণ বিভাগ এবং ফরাসী সাংস্কৃতিক সংস্থার প্রচেষ্টায় এই প্রদর্শনীটি ফরাসী পার্লামেন্টারী মিশনের রাজ্যসফর উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন ফটোগ্রাফ, চার্ট এবং পোস্টারের সাহায্যে প্রদর্শনীতে উভয় দেশের ভ্রমণের সুযোগসুবিধা এবং দ্রষ্টব্য স্থানগুলি সম্পর্কে সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ বিভাগের শুরুতে বাউলের চিত্র-সহযোগে রবীন্দ্রনাথের "কত অজানারে জানাইলে তুমি" কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে প্রদর্শনীতে আহবান করা হয়েছে। সঙ্গে আঁদ্রে জিদ-এর অনুবাদ। উভয় দেশকে পরস্পরের কাছে সুপরিচিত করতে এ ধরনের প্রদর্শনীর একটা বিশেষ উপযোগিতা রয়েছে। —চিন্ময় গুহ

গ্রামসেবিকা

গ্রামকেন্দ্রিক ভারতবর্ষ। এ-দেশের নব্বুই শতাংশ লোক বাস করে গ্রামে। তাই গ্রামের উন্নতি আমাদের মুখ্য লক্ষ্য। এ-জন্য নানা পরিকল্পনার প্রবর্তন করা হয়েছে। পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত কর্মীর এবং সর্বোপরি গ্রামবাসীর আন্তরিক সহযোগিতা। দেশে নতুন চিন্তাপ্রবাহ বয়ে চলেছে—কত নতুন কর্মকান্ডের পূর্ণ রূপায়ণ ও সূচনা হচ্ছে। এই সবকিছুর সঙ্গে গ্রামবাসীদের সংযোগ রক্ষা করা এবং তাদের অগ্রহশীল মনের চরিতার্থতার জন্য গড়ে উঠেছে কম্যুনিটি ডেভেলপমেন্ট-এর বিরাট কার্যক্রম। আর এরই অন্তর্ভুক্ত অন্যতম হলেন গ্রামসেবিকা। গ্রামবাসীদেব সার্বিক উন্নতির বিরাট কর্মসূচীর ভিৎ রচনা করার দায়িত্ব এই গ্রামসেবিকার।

গ্রামের মহিলামহলকে নিয়েই গ্রামসেবিকার কার্যসূচী। আমাদের দেশের অধিকাংশ গ্রামই কম-বেশি ঐতিহ্যের আলোকে দীপ্ত। কারণ আমাদের সভ্যতাকে গ্রাণকেন্দ্রিক বললে অন্যায় হবে না। যুগের



তাঁত নিয়ে বসেছেন এক শিক্ষার্থী

পরিবর্তনে শহরের চাপে পড়ে গ্রাম অনেকটা পিছিয়ে পড়েছে। আর সেই অভিশাপ গ্রামগুলি নিঃশব্দে বহন করে চলেছে যুগের পর যুগ। সম্প্রতি সরকারী উদ্যোগে আবার সুরু হয়েছে গ্রামগুলির ঘুম ভাঙানোর কাজ। দীর্ঘদিনের সুপ্তি থেকে গ্রামগুলি মনে হয় আবার জেগে উঠবে এবং পুরোপুরি শহরের মুখ চেয়ে না থাকে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে সক্ষম হবে।

এক-একটি গ্রামকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে গ্রামসেবিকার কর্মক্ষেত্র। গ্রামসেবিকার অনেক কাজ। প্রতি পরিবারে তিনি নিজের দক্ষতায় হয়ে ওঠেন অত্যন্ত আপনার জন। তিনি প্রতিটি পরিবাবকে গ্রামের এবং নিজের স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করেন। উন্নত জীবন ধারণের জন্য তাদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন ও সাহায্য করেন। শিশুদের দিকেও তাঁর সুতীক্ষ্ণ নজর। ওরাই দে

জীবন সংগ্রামে নারী

অকথিত জীবনের একটি নেপথ্য দর্শনের পাতা মেলে ধরলেন ললিতা দেবী।

জীবনের ভাঙা সুরের পরিয়ায় অনেকবারই বোধ হয় খেয়া পারাপার করছিলেন। তথাপি—গলার সুরে সহসা যেন উচ্ছ্বাস ফোটালেন। আবেশমথিত চোখ চেয়ে রইলেন—দূরান্তের আকাশে এখনো যে রং-ছড়ানো মন-ভোলানো খেলা চলছে ও দিকে।

জীবনটা যেন সুরুতেই অমনি করে রং ছড়াতো। মন ভোলানো একটি স্বপ্ন দিনের গল্প শুনতাম। পৃথিবী সুন্দর, তদীয় আস্বজন প্রকৃতির লীলা আরও অশ্চর্য অভিভূত দৃশ্যপট। গাছে-গাছে ফুল ফোটে, প্রকৃতির পত্রপুঞ্জে কোরকের অনাবিল বিকাশ। হয়তো সময় বিশেষে সে-ফুল বাগানে ছড়ায় তাদের ভূলুণ্ঠিত দেহ। ধরণীর আসঙ্গ প্রেমের সে দৃশ্য আমি দেখেছি।

দেখেছি যত, তত ভেবেছি—এই যে সব সুন্দরের আয়োজন। ঈশ্বরের সংসারে যাবতীয় এই রস সৃষ্টির ভান্ডার সত্যই পূর্ণ, পরিপূর্ণ।

কোথাও যেন তিনি রাখেন নি অপূর্ণতা, অসম্পূর্ণতা, সারা বুক ভরে উঠলো এক গভীর আত্মপ্রত্যয়ের আনন্দ নিয়ে সেই রসিক সৃষ্টির মনটি—কোথায় যে কোন্ রহস্যে সেদিন হারালো আমি আজও জানি না।

শুধু আজ জানি, সেটা আমার ছেলেবেলার প্রকৃতি প্রেমের এক মুগ্ধ খেলা। যে খেলা খেলতে খেলতে আজও আমার সঠিক চৈতন্য হলো না—এই শিল্প জীবনের এই রোমাণ্টিক 'মোহ'টাই আসলে মিথ্যে।

অঙ্গনা

প্রমীলা

জীবনটা মস্ত বড় একটা ফাঁকির আড়ালে পড়ে গেছে। আজ একটা নৈরাশ্যবাদীর নিহত শরীরের অবহেলিত অস্তিত্বের দিকে আমি অসহায়ভাবে চেয়ে আছি। ভাবছি, এই যদি হবে—এই শেষের ইতিহাসে শুধু ঝরা-ফুলের শব দেখবো, তাহলে সেই সুরুতে কে আমায় মাতালো অমন আনন্দে? কে আমার মন ভোলালে—এক মায়ামুগ্ধ জীবনের ইশারায়?

ললিতা দেবীর চোখে আশ্চর্য বিস্ময়! তবু জীবনের সব প্রশ্নের সমাধানই যেন হাতের নাগালে পেয়েছেন। ঠিক তেমনি করে বললেন—ঠিক একেবারে মরিনি সত্য! শিল্পীদের মৃত্যু যেমন অসংখ্যবার, তেমনি জন্মটাও তদধিক। এই জন্ম-মৃত্যুর একটা বিচ্ছিন্ন যন্ত্রণা নিয়ে আমার দিন কাটে।

জানি একদিন আমার জীবনের মঞ্চ শূন্য হয়ে যাবে। সহসা সেই অত্যুজ্জ্বল ফ্লাশ লাইট নিভে যাবে। শুধু শেষ একটি সংলাপ শোনা যাবে—বাঁচিতে চাহি না আমি আর এই সুন্দর ভবনে।

এবার কিন্তু সশব্দে হেসে উঠলেন ললিতা দেবী। এই মহিলা শিল্পীর কণ্ঠটি যেন আদিম মানবীয়-ক্ষুধা-তৃষ্ণা-কাতরতার অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো।

আর একটু গল্প শোনার ইচ্ছে জাগলেও আমি থামলাম। কেননা, এতক্ষণে

ভাবী নাগরিক। তাই ওদের সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে পারলে সকলেরই লাভ। গ্রাম-সেবিকা শিশু সম্পর্কিত নানা তথ্য ও তত্ত্ব পরিবেশন করেন মায়ের কাছে।

এবার তিনি নজর ফেরান ক্ষয়িষ্ণু অর্থনৈতিক জীবনের উন্নতির দিকে। বাড়ির পুরুষদের সঙ্গে মেয়েরাও যাতে কিছু রোজগার করে পরিবারের উন্নতি করতে পারে সেদিকেও তাঁর ভাবনা আছে। পরনিন্দা পরচর্চায় সময় না কাটিয়ে গৃহস্থবধূ এবার এদিকে মনোযোগী হয়েছে। গ্রামসেবিকা একাজে নিজের সেন্টারেই বিভিন্ন কাজের আসর বসান। আবার কোথাও বা কয়েকটি সেন্টারের মাধ্যমে এটি পরিচালনা করা হয়। নানা হাতের কাজের মধ্যে তাঁত বেশ কিছুটা জায়গা জুড়ে থাকে—আর তাঁতের কাপড় বাংলাদেশের পুরনো ও ঐতিহ্যমণ্ডিত ঘরানা। তাই অনেক মেয়ের ঝোঁকটা এদিকে বেশি। প্রায়ই দেখা যায়, ভিড় লেগেই আছে। এ থেকে শেখার আগ্রহটাই প্রমাণিত হয়। এখানে শিক্ষা-নবিশী শেষ করে অনেকেই উৎপাদন বিভাগে কাজ করেন এবং নিজের ও বাড়ির আর সকলের জন্য কাপড় বোনেন। সময়ে যে কিছু অর্থ উপার্জন না হয় এমনও নয়। কিন্তু সেই পুরোন অভিযোগটা এখানেও প্রায়ই শোনা যায়—প্রয়োজনের তুলনায় তাঁত খুব কম। এ সম্বন্ধে এখনও খুব একটা ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়ে ওঠে নি। তবে আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে আর এই সমস্যা থাকবে না।

এরপর মেয়েদের শেখানো হয় নানা প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরি করার পদ্ধতি—যার প্রয়োজন খুব বেশি অথচ উপাদানগুলি গ্রামজীবনে সহজলভ্য। মোড়া, আসন, ঝুড়ি প্রভৃতি নানা ধরনের জিনিস মেয়েদের শেখানোর নিয়মিত আসর বসানো হয়। শুধু উৎপন্ন হলেই তো চলবে না, সেগুলির বিক্রির ব্যবস্থাও করতে হবে। এখানে মুখ্য দায়িত্ব হচ্ছে গ্রামসেবিকার। তিনি সরকারী সাহায্য ও সহযোগিতায় এগুলি বিক্রি করার ব্যবস্থা করেন। অনেক সময় গ্রামবাসীরা নানা জিনিস কিনে নেয়। এখান থেকে বিক্রি করে যা কিছু পাওয়া যায় সেই অর্থের মোটা অংশটা পান যাঁরা এগুলি তৈরি করেন। এইভাবে অর্থনৈতিক সমস্যার কিছুটা সুরাহা করার চেষ্টা করেন গ্রাম-সেবিকা।

বাচ্চাদের নিয়ে গ্রামসেবিকার বিরাট কর্মকাণ্ড প্রসারিত। বাচ্চাদের প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব তিনি বহন করেন। অর্থাৎ তাদের লেখাপড়ার প্রথম পাঠটা তাঁর কাছেই হয়। কোন স্কুল বা গুরুগম্ভীর পরিবেশে নয়, এমনি নিছক ঘরোয়া পরিবেশে এবং অধিকাংশ সময়েই খেলার ছলে। এর উদ্দেশ্য হলো লেখাপড়ার প্রতি তাদের আগ্রহ ও স্বাভাবিক ভালবাসা সৃষ্টি করা। গোড়া থেকে নরম জমি উপযুক্ত পরিচর্যার ফলে সুফল পাওয়া যাবে আশা করা অন্যায় হবে না। আর এ-ক্ষেত্রে গ্রামসেবিকাই 'আর্কিটেক্ট'-এর ভূমিকা পালন করে চলেছেন।

এতক্ষণ শুধু বলা হলো গ্রামসেবিকার কাজের ফিরিস্তি। কিন্তু আরো কিছু বাকী রয়ে গেছে। গ্রামে-গ্রামে আজো কত না সংস্কার দানা বেঁধে আছে। তার মধ্যে একটি হলো পর্দানশীনতা। কিন্তু কাজ তাঁর অন্দরমহলে। তাই হাজারো অসুবিধার বিধিনিষেধ পার হয়ে তাঁকে সেখানে পৌঁছুতে হয়। গৃহস্থবধূর সঙ্গে এইভাবে আস্তে জমে ওঠে তাঁর অন্তরঙ্গতা। কাজও এগিয়ে চলে সহজ গতিতে। অশিক্ষা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে গ্রামসেবিকা সংগ্রাম চালিয়ে যান এভাবে অনেক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করে।

সময় সন্ধ্যা! পুরোন পাড়ার এই অন্ধকার অস্তিত্বে যেন ধীরে ধীরে আবার ডুবে যাচ্ছে —ললিতা নামে একজন শিল্পীর জীবন।

ভাঙা টেবিলের ওপর ছড়নো কিছু পত্র-পত্রিকা। যেগুলোর পাতায়-পাতায় ললিতা দেবীরই ছাপানো লেখা।

অনেক দিনই তিনি লিখছেন। সেই সুরু থেকে আজ অবধি। সত্যিকারের এক শিল্পীর খাঁটি প্রাণের জোয়ার আজও বইছে এই পুরোন পাড়ার এই অখ্যাত ভাঙা বাড়ীটাতে।

শুধু আজ নেশায় লেখা নয়। কতকটা পেশার তাগিদও এসেছে। স্বামী ব্যবসায়ী। কিন্তু এই মন্দা বাজারে নিঃসম্বল হয়ে তিনি আজও এক শিল্পীর হৃদয়ে পেয়েছেন স্থান। .

শুধু দগ্ধে-দগ্ধে পুড়ছে ওই একটা প্রাণ! ঠিক একেবারে যেন পোড়ে না—অথচ জ্বলে-জ্বলে খাক হয়।

তবু ছটি ক্ষুধার্ত সন্তানেরমুখের দিকে চেয়ে আজও সেই জ্বলন্ত প্রাণ স্থির। নিষ্কম্প।

তবু যেন দুঃখের শেষ নেই। শুধু আছে সেই দুঃখ প্রকাশেই সুখ।

সারাদিনই প্রায় লেখা তাগিদ। কিন্তু যত লেখা—তত টাকা কই? শিল্পীর মূল্য তো কেউ দেয় না—সে কথা সবারই জানা। কিন্তু এই পরিশ্রমের মূল্য? কাগজের দরবারে দরবারে ঘোরা। শুধু সেখানে করুণা, বঞ্চনা—বড় জোর এক-আধটা সুযোগ পাওয়া। তাও টাকা সব জায়গায় মেলে না। লেখা ছাপানই নাকি সব পরিশ্রমের মূল্য। এবং শিল্পীরও মূল্য।

বড় অভিমান! তবু তা দেখাবার ঠাঁই নেই। এ যেন নিভৃতে কাঁদার সুর। হয়তো সেই ভাবেই কাঁদেন লেখিকা ললিতা দেবী।

কিন্তু আমি সে চোখের জল কোন দিনও দেখতে পাই নি। হয়তো কোন দিনও দেখতে পাব না। ও যে চিরদিনের শিল্পীর গোপন সত্তা! ও দেখতে গেলে অনেক গভীর মন চাই। অনেক দূরের দৃষ্টি চাই।

কিন্তু হায় বিধাতা, এ ব্যাপারে আমাদের চোখ তুমি বন্ধ করে দাও। বার-বার ওদের অভিমানের কান্নাটুকু দেখতে দাও না।

কিন্তু ওদের লেখা পড়ে আমরা কাঁদি। মিথ্যে নায়ক-নায়িকার গল্প শুনে। ওদের বেদনামথিত প্রাণের তৈরী কত কল্পনার চরিত্র—আমাদের মনের পটে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

কিন্তু নেপথ্যের অন্ধকার চিরদিনই তাদের ঢেকে রাখবে। শুনতে পাব না তাদের গল্প—যাদের জীবনে সত্যিই এক দিনও প্রকৃতির ফুল ফোটে না, আকাশে রং ছড়ায় না, শুধু ভোলায়, মন ভোলায়। মরীচিকা আলেয়ার মত শুধু মুগ্ধ ইশারায় পাগল করে।

আর সেই পাগলামিতে শিল্পী ললিতা দেবী আজও রোমান্টিক মনের সৃষ্টির নেশা নিয়ে মেতে আছেন। যদিও দারিদ্র্যের নিষ্করুণ নিয়তি জীবনের ঠিক পাশে পাশে চলেছে।



শ্রীমতী রত্না সাহা আন্তঃ কলেজ সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় সেতারে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। শ্রীমতী রত্না মহারাণী কাশীশ্বরী কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী।

তবু আজ জীবন সংগ্রামে অপরাজিতা নায়িকা ললিতা দেবী। যার জন্যে তিনি একটা তৃপ্তি অনুভব করেন। ভারি আশ্চর্য লাগে শুধু আমার।

—জয়শ্রী চক্রবর্তী



পুরোন ফ্যাশান নতুন হয়ে ফিরে আসে—কিছুটা রূপ বদল করে মাত্র। এককালের প্রায় বিস্মৃত অঙ্গরাগ উল্কি এখন জনপ্রিয়তা লাভ করেছে পশ্চিম জার্মানীর মেয়েমহলে। চিত্রে একদল মেয়েকে দেখা যাচ্ছে মুখে ও হাতে উল্কির চিত্রে বিভূষিত।

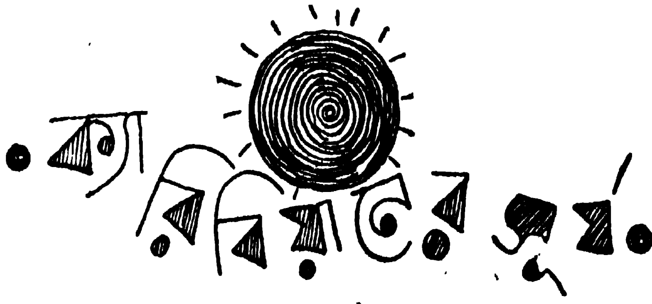
কৃত্রিমতার গভীরে

মাঝে মাঝে গুহাজীবনের কথা ভাবি। অবারিত প্রাকৃতিক দাক্ষিণ্য, অকৃপণ সূর্যালোক আর সহজস্বচ্ছ জীবনপ্রবাহ চকমকি পাথরের সামান্য সংঘর্ষে ক্লাসিক সৃষ্টি করেছে সেদিন। উপকরণের প্রাচুর্য ছিল কিন্তু ব্যবহারের প্রয়োজনীয় তীব্রতা ছিল না। প্রয়োজনের বাসনা সেদিন ডানা মেলে হারিয়ে যেতে পারে নি। এখন মনে হয়, আমরা সবাই যেন রাতের অন্ধকারে চোখ বন্ধ করেছিলাম আর দিনের আলোয় চোখ খুলতেই দেখি বিষম কাণ্ড এ-কি! রাতারাতি যেন সব বদলে গেছে। মনে পড়ে রূপকথার সেই কাহিনী। গরীব স্বামী-স্ত্রী নিজেদের গরিবীয়ানা নিয়েই সন্তুষ্ট ছিল। দেবতার কৃপা হলো তাদের উপর। রাত পোয়াতেই দু'জনে ভীষণ অবাক। কুঁড়েঘরের জায়গায় অট্টালিকা, দাসদাসী এবং সর্বোপরি ধন-রত্নের প্রাচুর্য তাদের কাছে স্বপ্নের ঘোর মনে হচ্ছিল। বাস্তব ক্রমে স্পষ্ট হলো এবং তারাও দৈবী মহিমা উপলব্ধি করলো। অবাক হওয়ার পালা আমাদের ততটা না হলে কিছু কম নয়। সহজ ছেড়ে জটিল এবং গহীন অরণ্যে সুরু হয়েছে আমাদের পথপরিক্রমা। এই পরিক্রমার মূল কথাই হচ্ছে সূক্ষ্মতা বজায় রাখা। স্বাভাবিক জীবন নাকি খুব স্থূল। তাই তাকে সাজিয়ে-গুজিয়ে রংদার করে, প্রকাশ্য দরবারে উপস্থিত না করলে কি রকম খাপছাড়া মনে হয়—সবাই নাক কোঁচকাবে, ঘৃণার শিরা-উপশিরাগুলি দিয়ে গলিত লাভাস্রোত বয়ে যাবে।

এমনি একটা প্রাণান্তকর পরিচ্ছদের মধ্যে দিয়ে আমরা নিশ্চিন্ত বিলাসে দিন কাটিয়ে চলেছি। এদিক-সেদিক তাকাচ্ছি, যুগ-উপযোগী চাল-চলনের মহিমকে দুর্লভ মনে করে নিজেদের সাজাচ্ছি আর এরই মধ্যে মাঝে মাঝে একটু সময় করে সে-দিনের সূর্যকরোজ্জ্বল একান্ত সহজ জীবনের জন্য আপসোস করছি। এসবই আমাদের নেহাত অভ্যাস। এর মধ্যে অকৃত্রিমতা কোথাও নেই—সেটাই কৃত্রিম।

যুগের সঙ্গে সমানে চলা তো জীবনের লক্ষণ এবং এ-থেকে দূরে সরে আসা বা নিস্পৃহ থাকার নাম মৃত্যু। যাঁরা শেষোক্ত পর্যায়ে নিজেদের অন্তর্ভুক্তি চান তাঁদের এক নিশ্বাসে অচল বলা খুব একটা অন্যায় হবে না। এ মতে নিশ্চয়ই অনেকেই সায় দেবেন। মানুষের ধর্মই তো তালে-তালে ছন্দে-ছন্দে চলা। না হলে তাল যায় কেটে, ছন্দ যায় বেতাল হয়ে। তাই জীবনের সুদীর্ঘ কন্দর পথ পেরিয়ে যা আমরা পেয়েছি তা কিছুতেই অন্যদিনের জন্যই চিরাগের প্রভাব। এর সবটাই হচ্ছে আমাদের উন্নতির দিকনির্দেশক।

এসব কথা সবাই শুনবেন এবং মানবেনও। আপত্তি কেউ তুললে তা নিরর্থক হয়ে যেতে বাধ্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা কি অস্বীকার করা যায় যে, আমরা মোটামুটি দল বেঁধে দিনকে-দিন কৃত্রিমতার শিকার হয়ে পড়ছি। মনে-প্রাণে এই কৃত্রিমতার যূপকাষ্ঠে নিজেদের বলি দিচ্ছি। আর মজাটাও এই যে, ঘাতকের ভূমিকা নিচ্ছেন আমাদেরই একজন। একদিন এ-জন্য দায়ী ছিল বিদেশী সভ্যতা এবং পরাধীনতা। আজকের সুন্দর প্রভাতে সে সমস্যা বিগত। সূর্যের উজ্জ্বলতা এবং আলোকবিতরণেও কোন কার্পণ্য নেই। আজ সবই সুন্দর। তবুও সেই পুরনো ব্যাধিটা এখান-সেখান থেকে খোঁচা মারছে। বলতে দ্বিধা নেই এবং আশা করবো এব্যাপারে আমার সঙ্গে অনেকেই একমত হবেন যে, এই কৃত্রিমতা ক্রমবর্ধমান। আর এই হুজুগটিতে আমাদের লাভের মধ্যে কিছুই নেই। শুধু আমরা বেশ সুন্দর 'পুতুল' হয়ে যাচ্ছি। মানুষের এ-রকম মারাত্মক অবস্থাটা আর নেই। ক্রমেই এই অবস্থাটা প্রকট হচ্ছে। অথচ নিরাময়ের ব্যবস্থায় কেউ হানা দিচ্ছে না।



ব্রজমাধব ভট্টাচার্য

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

হাসে না বলেছি। কিন্তু হাসে। হাসির ধারে, হাসির ধমকে, হাসির অভ্রভেদী, ছাদ তুলে ধরা তীক্ষ্ণতার চমকে উঠেছি। বোঝা যায় তৃপ্তির হাসি নয়, অতৃপ্তির অপচয়। ভাবের আলাপ নয়, অভাবের বিলাপ। প্রণয়ের প্রবাহ নয়, প্রলয়ের প্রদাহ। ওদের রক্তে ঘুমিয়ে আছে প্রতিকারের ভৎর্সনা; ওরা আশী বছরের স্বাধীনতায় ভুলতে পারে নি দাস-জীবনের সেই হ্যাংলা দিনগুলো। ওদের মন অবচেতনের গলি বেয়ে ফিরে যেতে চায় মোম্বাসায়, অলজেরিয়ায়, ঘানায়, সিয়েরা-লিওনীতে। অরণ্য আফ্রিকা ওদের ডাকে।

সেই অরণ্য, সেই চিৎকার দেখেছি মোরগের লড়াইতে, সাপ-বেজীর লড়াইতে, আর দেখেছি ওদের উৎসবে। প্রত্যেক গ্রামে বেড়া দেওয়া জায়গা আছে। মোরগের লড়াই হয়। রক্তী ধরে, রক্ত ঝরে, পিশাচের মতো মানুষগুলোই খন-খন করে হাসে। মার্তিনিকের পবিত্র গ্রাম নির্জলা শেষ হয় সেখানে। ঘামে ভেজে রোদের রং, গন্ধে মনে পড়ে আস্তাবলের পাশে জমা করা আবর্জনার পাহাড়।

মদের ভাটির পেছনে টিনের ছাদ দেওয়া হল। সেই হলের চতুর্দিকে রেলিং দেওয়া বারান্দা। তার মধ্যে চৌকো জায়গায় বালি বেছানো। বারান্দার তলা থেকে কে ছেড়ে দিলো একটা বেজী। অন্য ধার থেকে দুরন্ত, দুর্মদ, বিষধর ফুর-দ্য-লিস্ লক্-লক্ করতে করতে আসে। ইংরেজরা বলে বুশ-মাস্টার। এ-পৃথিবীর সবচেয়ে সংঘাতিক নাগ। রাগ ভীষণ। বেজী ছিলো না মার্তিনিকে। ছিলো ঐ সাপ। গুয়াদেলুপে ও সাপের আড্ডা। তখন তো ফরাসীরা হিন্দুস্তানের সোয়াদ পেয়েছে। মহম্মদ আলি, চাঁদা সাহেব, সালের জন্য ওদের লড়াইয়ে নাক ঢুকিয়ে দক্ষিণ ভারতে জাঁকালো মসনদ গেড়েছে। সেখানে শিখেছে বেজীর কৃতিত্ব। ভারতের বেজী এলো মার্তিনিক, গুয়েদালুপে সর্পযজ্ঞ করতে। এখন সাপ নিঃশেষ প্রায়; কিন্তু বেজী তো ছাড়বে না। মুগী হাঁসও প্রায় নিঃশেষ করে আর কি। এ হয়েছে নতুন যন্ত্রণা। সেই বেজী এবং সাপে লাগে লড়াই। বেজী পাক খায় আর পাক খায়। মুহূর্তে কালচে বালু রংয়ের দড়িটা সাংঘাতিক পাক খেয়ে সাপটে পড়ার অবসরে যেই শাদা পেটটা দেখায়, সংগে সংগে বেজী চেপে ধরে গলার দিক থেকে মাথার তলা। সাপ জড়াতে চায় বেজীকে। বেজী এগিয়ে দেয় তার লেজ। লেজে পাক দিয়ে ভুল বুঝতে পারে নাগরাজ। ততক্ষণে বালির ওপর গড়াগড়ি খাচ্ছে আর খাচ্ছে, ওলোট-পালোট। কিন্তু বেজী তার কামড় ছাড়ে নি। বালিতে রক্ত, বেজীর চোয়াল থেকে রক্ত। সাপের বেড় শিথিল হয়ে পড়ে। বেজী নিজেকে মুক্ত করে চলে যায়। সাপের দেহ পড়ে থাকে।

সেই চরম উন্মাদক সংঘাতের পরতে-পরতে হাসির এক-একটা দমক চমকে দেয়। মনে হয় অবচেতনের রুদ্ধ জিঘাংসা হাসির ভয়ঙ্কর রূপ নিচ্ছে। এ হাসি কী হাসি।

আর দেখেছি বিকট বীভৎস হাসি এদের নাচে। মার্তিনিকের সে নাচ নাচার পর ইংরেজ সন্তান বলেছিলো "Never had so much fun with clothes on" মার্তিনিকানরা বলে, মার্তিনিক হট্ (গরম)? সত্যিকার মার্তিনিকান দাহ ছুঁতে চাও বাম্বু-ক্লাবে বিগোয়াইন্ নাচ নাচতে যাও, তাকৎ না থাকে দেখতে যাও। তাতেই ফল পাবে। —নানা রকম ঢাকের বাদ্য হল; গাছের ফাঁপা গুঁড়ির ওপর ঘা মেরে মেরে একটা মৃদু-তালে নাচ আরম্ভ হবে। মৃদুতর আলোয় স্ত্রীর সারি পুরুষের সারির সঙ্গে মিশবে, হাতে হাত, কটিতে কটি,—অতঃপর ছন্দে-ছন্দে পায়ে পা জড়িয়ে সামনে-পিছনে দোলা দিতে থাকবে। সেই দোলায় দাপট বাড়তে বাড়তে ক্রমশ একটা আত্মহারা জৈবিক উন্মাদনায় অধীর হয়ে ওঠে নর্তক-নর্তকীর দল। অদ্ভুত আবেশে কোনো কোনো দম্পতি স্থির হয়ে যাবে। আর দর্শক দল ঘন-ঘন চিৎকার করবে। হাসবে; হাসতে হাসতে অজ্ঞান হয়ে যাবে। লোকে তার মুখে বোতল থেকে রাম ঢেলে দেবে।

এমনি নাচ রাম্বা, সাম্বা, তাঙ্গো, কালেম্বা। হেইতির ভুডু নাচও এখানে পাওয়া যায়। কিন্তু মার্তিনিকের বিশ্বরূপ দর্শন বিগোয়াইন্ এবং কালেন্দা।

মনকে সম্পূর্ণ বিবিক্ত করে দিয়ে শুধু নগ্ন দেহকে নিয়েই মানুষ থাকতে পারে না। এমনটা তার পক্ষে অসাধ্য বলেই সে মানুষ। মানুষ ছাড়া আর কোনো জীব ছবি আঁকে না, চিন্তা করে না, কবিতা লিখে প্রেম প্রকাশ করে না। মানুষ যে কেবল দেহ-যন্ত্রণাটাকে দুলিয়ে দুলিয়ে মাত্র একটা পেশীল তাড়নাকে ঠেলে-ঠেলে তুলে ধরবে দেহ-রিরংসার তুঙ্গে,—এতো কখনও স্বভাব নয়, স্বাভাবিক নয়। চৈতন্যকে এমন করে নিরন্ধ্র অন্ধকারে ঠেলে নিয়ে যাওয়া তো সহজে সম্ভব নয়। গতোকালের কতো স্তরের কতো গভীর অবচেতনের ফেনায়িত স্বীকৃতি এই দেহ-বিনোদন রমণাতুর উদ্দাম নাচ, যা বাম্বু-হোটেল নিত্য হয়। অথচ মার্তিনিকে টুরিস্ট বেশী যায় না বলে ভালো হোটেল নেই।

বাজার ছেড়ে এসেছি অনেকক্ষণ। জেলেদের মাছের জাল শুকুচ্ছে। বহু মাইল-ব্যাপী এই জাল। বহু মাইলব্যাপী এই আঁশটে গন্ধ। পার হয়ে যাচ্ছি। নদীর পর নদী। মার্তিনীকে অনেক নদী। লিজার্ড নদী পেরিয়ে চলেছি। সারা মার্তিনিকে যে দুশো মাইল ভালো পীচের পথ আছে সেই পথেই চলেছি। মাঝে মাঝে বাস আসছে উল্টো পথ দিয়ে। বাসগুলো সর্বদাই ভ্রান্ত।

ত্রয় ইলে শহরটার নাম। ছোট্টো শহর। ছবির মতো শহর। দূর থেকে দেখা যায় একসার পাহাড়। সমুদ্রের ধারে দুটি পাহাড় মর্ন লা প্লা এবং মর্ন কনস্তা। একটির পার ত্রয় ইলে, অন্যটির পারে লা-পাজেরী। ধীরে ধীরে পথ উঠছে; পথে বহু নদী, নদীর পর নদী। ছোটো দ্বীপ; ছোটো পাহাড়; ছোটো নদী। সবই যেন ছোটো; ছবির মাপে। সাঁকের মতো সেতু। পথ চলেছে সর্পিল ভঙ্গের পাহাড়ের গা বেয়ে; বাঁশের ঝাড় ঝুঁকে পড়ছে এপার ওপার। পাহাড়ের গায়ে শুকনো বাঁশ-পাতা; নানা ফার্ন। মেহগনির গাছের গায়ে ছাতা; ছাতার মধ্যে ফার্ন। তীব্র আলো আকাশে; এখানে তাই তীব্র আলোছায়ার কিংখাব।

থামিনি, কারণ আমার সময় নেই। পাহাড়ের ধারে ধারে কফির বাগান; যতদূর দেখা যায় কফি। ফুলে ফুলে শাদা হয়ে আছে গাছগুলো। আর মিষ্টি গন্ধে ভরে আছে বাতাস। এক জায়গায় গাড়ী থামাতেই হোলো। এ গন্ধ কফি-ফুলের নয়। মন-মাতানো গন্ধ। এ অজানার গন্ধ।

হেসে বাঁচে না ক্যাথি। কারণ থাকলে তো হাসেই; অকারণেও হাসে। যদি হর্ন শুনে মুর্গী দৌড়োয়, ক্যাথি হেসে হেসে চোখের জলে ভেসে যায়। আমার গাড়ী থামানো দেখে বলে, "কাণ্ড দেখো। বুনো গাছের জন্য গাড়ী থামায়।"

কিন্তু ভিড় নামলো আমার সঙ্গে। আমি এগিয়ে যেতে থাকি। পাহাড়ী নদী

একটু সমতল পেয়ে নিঃশব্দে পথ চিনে চিনে নেমে যাচ্ছে। মুখে একটি কথা নেই। কেবল পলক পড়ছে বলেই চেনা যাচ্ছে নদী। তারই ধারে আদা গাছের মতো, আর একটু লম্বা, তবে ক্যানা গাছের মতো অতো লম্বা নয়; পাতাও ক্যানার চেয়ে ঢের সরু গাছের ঝাড়। আর গুচ্ছ গুচ্ছ শাদা ফুল হয়ে আছে, হনি সাকলের আকার, পাপড়িগুলোর ডগা ঝুঁকে পড়ছে ফুলের নাভিকেন্দ্রের দিকে। প্লাডিওলাসের ডাঁটির মতো ডাঁটির গায়ে সারি সারি ফুল। অদ্ভুত গন্ধ। ফুল নিলাম। গাছ নেবার জন্য গাছ ধরে টানাটানি করতেই ভিভি এগিয়ে এলো। ওর হাতে কাটলাস।

"কাটলাস? পেলে কোথা থেকে?"

"পুরুষের সঙ্গে আমি যখন বার হই তখন একা থাকলে কাটলাস আনি না। দোকা হলেই কাটলাস আনি। ইটারনাল ট্রায়াঙ্গেল কাটার সাহায্য করে।"

"এখন তো একা! তবে কাটলাস কেন?"

"কে একা!" হাত ছুঁড়ে বলে ভিভি! "তা হলে কি আর কথা ছিলো! তোমার সোহাগ তো ঐ বুনো ফুল। কাজেই এ ট্রায়াঙ্গল কাটতে হবে। মূল শুদ্ধ।"

কাটলাস চালাতে লাগলো ভিভি। গভীর শিকড়। আদার মতো জড়াজড়ি করে আছে।

গাড়ী থেকে এবার দেখা যাচ্ছে কোকোর বাগান। রাঙা রাঙা লম্বা কোকো ফলের ছটায় শাখাগুলো দীপ্ত। কফি আর কোকো আর্জাতে হলে বাতাসে প্রচুর আর্দ্রতা দরকার, প্রায় গুমু সেদ্ধ হবার মতো। এবং সঙ্গে সঙ্গে জোর বাতাসও দরকার। তাই কোকো এবং কফি বাগানের বুকে দাঁড়িয়ে থাকে বিশাল বিশাল আকাশছোঁয়া গাছ। মেহগনি, ইম্মোরটেল, হর্তুকীর মতো বুনো গাছ। আজকাল সেগুনের চারা লাগানো হচ্ছে। এদের গায়ে অসংখ্য অর্কিড, অসংখ্য প্যারা-সাইট গাছ। এদের ছায়াতলে পুষ্টিলাভ করছে শ্রীমান কোকো। শ্রীমতী কফী। কোকো বাগানের শেষ হতেই ধীরে ধীরে মনুষ্য বসতি চোখে পড়ে। চোখে পড়ে পর পর ঝুঁকে পড়া ব্রেড ফ্রুটের গাছ। Moraceal পরিবারের Artocarpus incisa; আমাদের কাঁঠাল গোত্রের. ঘন সবুজ পাতা-গুলো সাইজেও বড়ো। যেন দৈত্যের পাঞ্জা। কম্পাউন্ডারদের প্যাচুলা! রবারের গাছের মতো গাছটার দিকে তাকাতেই মনে হয় ক্ষীরে ভরতি এর কোষ। ফুল হয় যখন তখন দেখে মনে হয় কুটলে এটা হবে অতিকায় ধুতরো ফুল। কিন্তু কিছুই ফোটে না। যখন ফোটে, তখন দেখা যায় লিচুর মতো, আমড়ার মতো এক গুটি ফল। তাই বড়ো হয়ে বড়ো বেলের মতো বাতাবী লেবুর মতো বড়ো হয়। নিরেট ফল। কাটলে শাদা। টুকরো টুকরো, ফালা ফলা, চাকতি চাকতি, যেভাবে ইচ্ছে কেটে সেদ্ধ করে মেখে চটকে খাও, বড়া করে খাও, ডালনা করো, ভাজো, পেট ভরে খাও। অপর্যাপ্ত, অবিরল,—সারা ওয়েস্ট ইন্ডিজ ভরতি ব্রেড ফ্রুটের গাছ। নিগ্রোদের প্রাণ, যেমন বাঙালীর ভাত। ব্রেড ফ্রুট পুড়িয়ে (কেক করে) ভেতরটা কুরে নিয়ে নুন-মশলা মেখে খাওয়া, নারকোল-চিংড়ির মতো প্রেমাস্পদ ভোজন,—এদেশীয়দের।

তবু তফাৎ আছে। এবং সেই তফাতের মধ্যেই লেখা আছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেট খেলার মূলমন্ত্র। নিগ্রো মেয়ের মেদের, নিগ্রো ছেলের স্ফূর্তির উচ্ছল মাংসল জীবনযাত্রার, নিগ্রো শ্রমবিমুখতা এবং নিগ্রো কৃষ্টির গোপন মিষ্টিক ইতিহাস। সেই গুপ্তিভেদের কথা বলতে গেলেই মনে পড়ে যায় এসিকুউবোর কাফগ্রেভে দেওরূপ মহারাজের বাগানের কথা।

সেদিন সঙ্গে ছিলো দেওরূপের ম্যানেজার মিঃ গ্রিফিথ। গুয়ানার লোক। পর্তুগীজ বা ইংরেজ বা আরও কোনো জগা-খিচুড়ি হবে। নাক আর চুল দেখলে কেউ শাদা বলবে না। কিন্তু ওর চামড়া শাদা। ও নিজেকে শাদাই ভাবতো।

আমি ব্রেড ফ্রুট গাছ দেখে মাত্র বলেছি, "কী মনোহর গাছ। প্রকৃতির দেওয়া একটা আস্ত ভাঁড়ার ঘর!"

সেদিন গ্রিফিথ দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো, কাশীর মুন্সীঘাটে সহদেও মহারাজকে 'জয় রাধেশ্যাম' বললে যেমন সে কটমট করে চাইতো। ('সীতারাম' বলার ভক্ত ছিলো সহদেও মহারাজ)। গ্রিফিথ মুখ থেকে ভাঙা পাইপটা নামিয়ে বললো, "মনোহর বললেন, আস্ত ভাঁড়ার ঘর? আস্ত ক্রীতদাস করার যন্ত্র। যতদিন ও আছে ততোদিন নিগ্রোর দাসত্ব ঘুচবে না, ঘুচবে না।" অবাক হয়েছিলাম। মাত্র গাছ একটা, বলে কিনা ক্রীতদাসের সেরা মালিক? কিন্তু গ্রিফিথ বলে চলেছিলো, "ঐ যে আপনাদের 'বাউন্টী' জাহাজের বিদ্রোহের কথা নিয়ে তালেবর তালেবর সিনেমা হয়ে গেলো, সেই 'বাউন্টি' জাহাজে চড়েই তো তাহিতি থেকে এই গাছের চারা যাচ্ছিলো ইংলন্ডে। তারপর ক্যাপটেন ব্লাই সেগুলো এনে এই ওয়েস্ট ইন্ডিজে চালান করেন! আজ সে কতোকাল হোলো? সেই হোলো কাল। এই গাছ লাগাতে তো আর কষ্ট নেই। লাগালেই হোলো। দু' তিনটে গাছ হলেই একটা পরিবারের খাওয়া-পরা সব চলবে। নির্ঝঞ্ঝাট! ব্যস্, কোনো নিগ্রো কাজ করবে না; কেবল ঐ গাছে হ্যামক টাঙিয়ে দোল খাবে। করবে কেন? জলে মাছ, ডাঙায় ব্রেডফ্রুট! আলস্য আর কুঁড়েমিতে দেশটা উচ্ছন্নে গেলো। এক এক সময়ে মনে হয় কীটে ছাগল নিপাত করার জন্য যেমন আইন হয়েছিলো, তেমনি ব্রেডফ্রুট নিপাত করার আইন হোক দেশে। নিপাত যাক গাছগুলো। অভাবে স্বভাব যেমন বিগড়েয়, অভাব নৈলে স্বভাব আবার ফোটেও না। অতি সুখে রোম মোলো, অতি সহজ জীবনে নিগ্রো মোলো; দেশের শিল্প-বাণিজ্য বোদা হয়ে রইলো।"

সত্যি কথাই তাই। মনে পড়ে ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে মাত্র ১৮ জন খালাসী শুদ্ধু ক্যাপটেন ব্লাইকে H M S. Bounty থেকে খোলা বোটে নামিয়ে দেওয়া হয়। ক্যাপটেন ব্লাইয়ের নিদারুণ অত্যাচারেই খালাসীরা বিদ্রোহ করে। বিদ্রোহীরা ভেবেছিল ৪০০০ মাইল পাড়ি দিয়ে ক্যাপটেন ব্লাই বাটাভিয়ায় জীবন্ত পৌঁছুবে। পৌঁছেছিলো। সেখান থেকে সে ওয়েস্ট ইন্ডিজ হয়ে ইংলন্ডে ফিরেছিলো। ইতিমধ্যে ব্রেডফ্রুটের চারাগুলো মরে যাচ্ছে দেখে সেগুলোকে ক্যাপটেন ব্লাই ওয়েস্ট ইন্ডিজের জমিতে ছেড়ে দিয়ে যায়। এখন এই একশো সাতাত্তর বছর পরে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের খানা টেবিলের চেয়ারম্যান শ্রীমান ব্রেডফ্রুট।

চাষ নেই। পরিশ্রম নেই। সামান্য আম কাঁঠালের যত্নও চায় না। শুধু গাছ থেকেই সব। ছাল থেকে আঁশ হয়, কাপড় বোনে, হ্যামক করে। রস বেরোয় গাছ থেকে। সংগ্রহ করে নৌকোর ছেদায় কর্ক লাগায়। গুঁড়ি কুরে খাসা নৌকো করে। ব্রেডফ্রুট, নারকেল আর কলা,—এ তিন থাকতে শ্রম আবার করা কেন? পড়ে আছে বিস্তর মাঠ। সারাদিন খেলো, নাচো, দৌড়োও, ঘুমোও। তাই ক্রিকেটে ওয়েস্ট ইন্ডিজ; নাচে নিগ্রো, গানে নিগ্রো, এ্যাথলেটিকসে নিগ্রো, ঘোড়-বাজীতে নিগ্রো। এতো অবসর, এতো বিলাস আর ব্রেডফ্রুটের গাছ। কোথায় সম্ভব? তাই বলছিলাম ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান ক্রিকেটের এতো যে সুনাম, তার সুলুকসন্ধান ঐ ব্রেডফ্রুটের গাছ! যেখানে শহর, সেখানে ফ্যাক্টরি, সেখানেই পরিশ্রম, দারিদ্র্য, রোগ, জ্বালাতন। সত্যিকার ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান জীবন মেদুর-মন্থর-মৃদু জীবন। তার চলা মন্দাক্রান্তা তালে।

ঝকঝকে গাঁ খানা। ভ' মলা। এয়ার ফ্রান্স হোটেল পার হয়ে এলাম। ভ' মলা গ্রামখানা একটা ওলন্দাজ উইন্ড-মিল ঘিরে গড়ে উঠেছে। এর গড়নটা তাই গোল। একটা বড়ো পথ নেমে গেছে সুঠাম, বিরাট জাভানীজ পামের সারিতে ছাওয়া। ও পথে গেলে আর ট্রাম ইয়েতে যাওয়া হবে না।

(ক্রমশঃ)

হার্ণিয়া
কাইলোরিয়া এক-শিরা, রসবাত বাতশির, কম্পজ্বর ও আনুষঙ্গিক যাবতীয় উপসর্গাদি স্থায়ী প্রতিকারের জন্য আধুনিক বিজ্ঞানানুমোদিত চিকিৎসার নিশ্চিত ফল প্রত্যক্ষ করুন। পত্রে অথবা সাক্ষাতে ব্যবস্থা লউন। নিরাশ রোগীর একমাত্র নির্ভরযোগ্য চিকিৎসাকেন্দ্র
হিন্দ রিসার্চ হোম
১৩, শিবতলা লেন, শিবপুর, হাওড়া
ফোন ঃ ৬৭ ২৭৭৭

দুই জাতের পাখি

অজয় হোম



রামগাংরা

বনগুলী-বংশ

রামগাংরা

কলকাতায় থাকতে মধ্যে মধ্যে আলি-পুরের চিড়িয়াখানায় যেমন যাই তেমনি কিনি বা না কিনি তবু পাখির হাটে ঘোরাঘুরির কথা আমার একটা বাতিক। সেখানে দেশি বিদেশি মেলা বসেছে কত হরেকরকমের পাখি। বেশির ভাগই অতি সাধারণ পাখি; তবু ভালো লাগে দেখতে। দৈবাৎ ভাগ্যে জুটে যায় সহজে যা চোখে পড়ে না তেমন কিছু। অবশ্য আজকাল পাখির হাটে তেমন জৌলুস নেই।

বহু বছর আগে একদিন চোখে পড়ে এক খাঁচার মধ্যে গোটা তিনেক পাখি। ছবিতে দেখেছি, কিন্তু এর আগে চাক্ষুষ পরিচয় ঘটে নি। মনে হল ডালানি পাখি। জিজ্ঞেস করে জানলাম তা নয়; বারাসাতের কাছে ধরেছে। বাগানের ঘন গাছপালার আড়ালে থাকে। শীতের শেষে বেশিমাত্রায় নজরে পড়ে বলে এ সময় ধরা পড়েছে।

প্রথম দেখেই মনে হয় বুঝি চড়াই-বাবুই-মুনিয়া অর্থাৎ চঞ্চুসূচী-বংশের পাখি। কিন্তু নাকের গর্ত দেখা যায় না, কাকের মতো খোঁচা খোঁচা পালকে ঢাকা। তলার চঞ্চুর শেষে চিবুকেও তাই। পক্ষি-তত্ত্ববিদরা এই জাতীয় পাখিকে সম্পূর্ণ ভিন্ন বংশের মধ্যে ধরে নামকরণ করেছেন—বনগুলী-বংশ (পারিদি)। এই বংশকে ইংরেজিতে বলে 'টিটমাউস'। ভারতীয় পক্ষি-তত্ত্বে বায়স-বংশের পরেই এর স্থান। সুতরাং এরাও যষ্টিসাদি বর্গের অন্তর্গত। মুক্ত বা স্বাধীন অবস্থায় দেখেছি মাত্র বার দুই. কিন্তু এদের রীতিনীতি বুঝতে খাঁচায় পুষেছি, বেশ কয়েকটা।

বনগুলী গণের (পারুস) অন্তর্গত এই পাখির নাম— রামগাংরা (পারুস মেজর)। হিন্দি—ঐ ইংরেজি—গ্রে টিট।

লম্বায় ৫ ইঞ্চি। চেহারায় স্ত্রী-পুরুষ দুজনেই সমান। মাথায়, ঘাড়, চিবুক গলা বুক এবং বুক থেকে কুচকুচে কালো চওড়া একটা লাইন তলপেটের মাঝখান পর্যন্ত নেমে এসেছে। গালের দুপাশে সাদা ছোপ। বাকি তলার পালক সাদাটে। উপরের বাকি পালক নীলচে ছাই-ধূসর। লেজের বাইরের পালকের উপর সাদাে ছোপ। কনীনিকা গাঢ় বাদামী; ত্রিকোণাকার চঞ্চু; পা সীসে রঙা।

বাসস্থান— ভারতে প্রায় সর্বত্র ৬ হাজার ফিটের মধ্যে; দুই পাকিস্তান, সিংহল ও ব্রহ্মদেশ। ইওরোপীয় যে রামগাংরা যাকে বলে 'গ্রেট টিট' তা পাওয়া যায় সমগ্র ইওরোপ, উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা, এশিয়ার উত্তরাংশে, জাপান ও দক্ষিণ চীন। এই গ্রেট টিটকে দুই দলে ভাগ করা হয়েছে— ইও-রোপীয় এবং এশীয়। ইওরোপীয় টিটের উপর দিক সবুজ এবং তলা হলদে। এশীয়-

দের উপর ধূসর এবং নিচটা সাদাটে। খেয়োজ দলেই পড়ে ভারতীয় টিট বা রামগাংরা। সবুজ-পিঠ টিটের এক প্রজাতি (পারুস মন্টিকোলাস) ভারতে হিমালয় অঞ্চলে ৫ থেকে ৮ হাজার ফিটের মধ্যে সাধারণতঃ দেখা যায়। বাচ্চা অবস্থায় কিন্তু সব শ্রেণীর টিটেরই উপরিভাগ সবুজাভ। এর থেকে প্রমাণিত হয় এরা ইওরোপীয় থেকেই

ভারতীয় রামগাংরা দেশভেদে পাঁচটি উপজাতিতে বিভক্ত। প্রথমটিকে (পারুস মেজর কাশ্মিরেনসিস) দেখা যায় পশ্চিম হিমালয়ে কাশ্মীর থেকে গাড়োয়াল। শীতকালে পাঞ্জাবের সমতলভূমিতে নামে। দ্বিতীয়টি (পা মে নিপালেনসিস) নিম্ন নেপাল থেকে বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স থেকে আসাম, পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম ব্রহ্মদেশ। তৃতীয় (পা মে স্টুপি) আবু পাহাড়, মধ্যভারত, উড়িষ্যা থেকে দক্ষিণে কন্যা কুমারিকা। চতুর্থ (পা মে জেরারডিনসিস) আফগানিস্থান, বেলুচিস্তান, পশ্চিম পাকিস্তান ও পাঞ্জাবের সমতল। পঞ্চম (পা মে মাহ্রাত্তারাম) সিংহলবাসী। কেবল রাজপুতানায় দেখা যায় একটি প্রজাতি (পারুস ন্যুকালিস)—সাদা-ডানা কালো রামগাংরা।

খাদ্য— কীট-পতঙ্গ, তাদের ডিম ও শূক, ফুলের কুঁড়ি, ছোটখাটো ফল, ছোট বাদাম ও ফলের বীজের শাঁস।

রামগাংরাকে ভারতের সমতল অপেক্ষা পার্বত্য অঞ্চলে দেখা যায় একটু বেশি। সাড়ে ৩ হাজার থেকে ৬ হাজার ফিটের মধ্যে বেশি। তার উপরে দেখা গেলেও তা অল্পস্বল্প। অবস্থা বিশেষে কদাচিৎ ৯-১০ হাজার ফিটেও দেখা গেছে।

গভীর জঙ্গল না হলেও মোটামুটি ঘন গাছপালার মধ্যেই এদের আস্তানা। ঝোপেঝাড়েও ঘোরাফেরা আছে। অবশ্য খাদ্যান্বেষণে মাটিতে নামতে মোটেই দ্বিধা করে না। স্বভাবে পরিযায়ী না হলেও প্রজননকালের পর বেশ কিছুটা ভ্রমণ করে। সমতলে নেমে আসতে তখন দ্বিধা করে না।

অন্যান্য কীট-পতঙ্গভুক ছোটো পাখির সঙ্গে ছোটো দলে শিকার করে বেড়ালেও সাধারণতঃ জোড়ে কিংবা একা বিচরণ করতে দেখা যায়।

খাদ্যসংগ্রহের কায়দাটা দেখতে বেশ লাগে। ছোটো পোকা বা তার শূক কিংবা তার ডিম খুঁজতে প্রতিটি ক্ষুদ্রতম শাখা-প্রশাখা পাতা ও গাছের ছালের ফাঁকে তন্ন তন্ন করে দেখে। সে সময় মাথা ও ঘাড়ের দোলানি দেখলে হাসি আসে। উপর থেকে যখন কিছু দেখা গেল না তখন সরু ডাল বা ফুল ফলের বোঁটা আঁকড়ে ঝুঁকে তলার দিকে সম্ভব অসম্ভব জায়গায় খুঁজতে থাকে। তখন কসরত যা দেখায় তা একমাত্র সার্কাসেই সম্ভব। চেহারায় বাঁধুনি ও পায়ে মাংসপেশীর শক্ত সাহায্য করে এই কসরত প্রদর্শনে। এক-এক সময় খাদ্য কোনো শক্ত বস্তু গাছের ডালে পায়ে চেপে ধরে মোটা ত্রিকোণাকার চঞ্চু দিয়ে কুড়ুলের মতো সেটাকে ঠুকতে থাকে ভাঙার জন্যে। সেই আওয়াজটা প্রায়ই ভুল করায় কোনো কাঠঠোকরার বলে। বাগানের ফল-ফুল কিছু নষ্ট করলেও অনেক অনিষ্টকারী কীট-পতঙ্গ এদের হাতে মারা পড়ে।

হাবেভাবে অর্থাৎ স্বভাবে খুবেই স্ফূর্তিবাজ। খাদ্যান্বেষণের সময় পরস্পরের মধ্যে নানা ডাকের আদান প্রদান চালায়। বেশ জোরে শিসের মতো পরিষ্কার ডাক দেয়—হুঁসি-ই হুঁসি-ই হুঁস-ই...জুইং জুইং... হুই-চিচি হুই-চিচি হুই-চিচি......।

একবার, শিকারে গিয়ে রামগাংরার একটি অদ্ভুত চরিত্রের পরিচয় পেয়েছিলাম। ঘন গাছপালার মধ্যে এক গাছের ডালে হঠাৎ একজোড়া হরিয়াল দেখতে পাই। তারা আমায় দেখতে পায় নি বা আমার আগমন বুঝতে পারে নি। না হলে অত সহজে জোড়ায় মারা সম্ভব ছিল না। উপরের ডাল থেকে পড়ে নিচের ডালে আটকে গেল। সে দুটিকে সংগ্রহ করতে গিয়ে যেই একটা ডালে উঠেছি অমনি হিস্ হিস্ শব্দে চমকে উঠলাম। আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত হই। স্থির হয়ে দেখছি কোথায় কালরূপী শমন। নাঃ, কোথাও নড়াচড়া নেই। চোখেও কিছু পড়ছে না। আবার ডালের উপর উঠতে গিয়ে হিস্ হিস্ শব্দ। সেইসঙ্গে মনে হল যেন থুতু ছিটোচ্ছে। লক্ষ্য করলাম গাছটার কাণ্ডে একটা গর্ত। ক্রুদ্ধ আওয়াজ সেখান থেকেই আসছে। ভালো করে ফোকরটাকে দেখলাম। ভয়টা অমূলক। সামান্য একটা পাখি। গাছের ফোকরে তার বাসায় বসে আছে। খুব সম্ভব ডিমে তা দিচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্য হলাম, যার থেকে উদ্ভূত সমস্ত পক্ষিকুল সেই সরীসৃপের একটি ঐতিহ্য এত কোটি বছর পরেও বিবর্তনের মাধ্যমে এই পাখি তা কাটাতে পারে নি। নিশ্চিন্তে খুব কাছে গিয়ে দেখলাম—রামগাংরা। তার চোখ পাকানো, সাপের মতো হিস্ হিস্ আর থুথু ছিটকানোতে বেশ মজা লাগল।

৫ থেকে ১৫ ফিটের মধ্যে গাছের গায়ে বসন্তবৈরী বা কাঠঠোকরার পরিত্যক্ত গর্ত করা বাসায় অথবা দেওয়ালের গায়ে গর্তে রামগাংরা বাসা বানায়।

প্রজননকাল ফেব্রুয়ারি থেকে নভেম্বর। তবে এক-এক স্থানে এক-এক রকম সময়। যেমন, হিমালয় অঞ্চলে মার্চ থেকে জুলাই, কোথাও ফেব্রুয়ারি থেকে জুলাই, কোথাওবা জুলাই থেকে নভেম্বর। বছরে দুবার ৪ থেকে ৬টি ডিম পাড়ে। ডিমের রঙ সাদা, তার উপর লালচে-পাটকিলে এবং ফিকে বেগুনীর ছিট ও ছোপ। ডিমের মাপ—লম্বায় ০.৭০, চওড়ায় ০.৫৪ ইঞ্চি।

আরও কয়েকটি গণের রামগাংরা বা টিট বসবাস করে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে। যথা—

১। চূড়াবলগুলী (লোফোফানিস)। কালো-ঝুঁটি টিট দেখা যায় আফগানিস্তান থেকে গাড়োয়াল, নেপাল, সিকিম এবং তিব্বত।

২। শঙ্কুশিখ (ম্যাকলোলোফাস)। হলদে-গাল টিট। বাসস্থান—নেপাল থেকে উত্তর আসাম, আবু পাহাড় থেকে ছোটোনাগপুরের পরেশনাথ এবং দুই পাকিস্তান।

৩। কেশিকী (ইজিথালোস বা ইজিথালিসকাস)। লাল-মাথা টিট। বাসস্থান—হিমালয়ের চিত্রল থেকে উত্তর আসাম।

৪। স্বর্ণচূড় (মেলানোক্লোরা)। সুলতান টিট (মে সুলতানিয়া সুলতানিয়া)। ইংরেজি— ঐ। কাছাড়ি—দাও-রাজা-গাটাং-লিলি। লেপচা—বন-তিলিয়া-ফো।

বাসস্থান—হিমালয়ের নিম্নাংশ ২ থেকে ৪ হাজার ফিটের মধ্যে উত্তরবঙ্গ, নেপাল ও আসাম।

বলগুলী-বংশের সবচেয়ে সুন্দর পাখি সুলতান টিট। কপাল, মাথার চাঁদি এবং ঝুঁটি ঝকঝকে হলুদ। মাথার বাকি অংশ, ঘাড়, পিঠ, ডানা এবং বুক কুচকুচে কালো। ডানা ও বুকের কালোর ধাতব ঔজ্জ্বল্য। লেজও তাই, কেবল বাইরের পালকের ডগা সাদা। বাকি নিচের পালক গাঢ় উজ্জ্বল হলুদ। উরুতে হলুদ পালকের মধ্যে কয়েকটি সাদা। চক্ষু কালো, চোখের পাতা সীসে, কনীনিকা গাঢ় বাদামী, গাঢ় ধূসর।

ছোটো ঝাঁকে অর্থাৎ গোটা ছয়েক একসঙ্গে চরে। বাকি আচারব্যবহার রামগাংরার ন্যায়। ডাকটাও প্রায় তাই তবে আরও তীব্র।

ভারতকোষ
চারি খণ্ডে প্রামাণিক বিশ্বকোষ
তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে—২০·০০
প্রথম ও দ্বিতীয় : প্রতি খণ্ড ২০·০০
॥ কলিকাতাস্থ বিক্রয়কেন্দ্র :
সান্যাল অ্যান্ড কোং—১২; দাশগুপ্ত অ্যান্ড কোং—১২; জিজ্ঞাসা—১২/২৯;
ইণ্ডিয়ান বুক ডিস্ট্রিবিউটিং কোং—৯ ॥
এবং
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্
২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬

শিলীন্ধ্রী-বংশ

চোরপাখি

আমবাগানের কয়েকটি আমগাছ বেশ বড়ো এবং খুবই বড়ো। প্রায় পাঁচতলার সমান উঁচু। সেগুলোতে ফলন এখন আর ধরে না। মোটামোটা শাখাপ্রশাখায় বেশ কিছু পরগাছা রাসনা (লোবানথাস লংগিফ্লোরাস) জন্মেছে। জানলার পাশেই এমন একটা বড়ো আমগাছ। জানলা দিয়ে তাকালে ছায়ায় ঢাকা এই মোটা শাখা-প্রশাখাগুলো পরিষ্কার দেখা যায়।

সেদিন দুপুরে হঠাৎ তাকিয়েছি গাছটার দিকে, মনে হল কি যেন সরসর করে ডালের পিছনে চলে গেল। প্রথমে ভাবলাম কাঠবিড়াল। কিন্তু কাঠবিড়াল হলে তো লম্বা লেজ থাকতো। সেরকম লেজ তো দেখলাম না। তবে কি গেছো ইঁদুর? অপেক্ষা করে থাকি ইঁদুর কি কাঠবিড়াল দেখবার জন্যে। সরসর করে আবার পিছন থেকে উপরে এল। ও হরি! একটা পাখি! তারপরে দেখি আরও গোটা চারেক ওই রকম ক্ষিপ্রগতিতে চলাফেরা করছে যেন মানুষ মতো। গুরুপাবেন সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে বলে মনে হল।

বেঁটে লেজ লম্বা চঞ্চু পাখিগুলো ঝড়ের মতো ধড়ফড় করে সামনে গেল, সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে মাথা নিচু করে আবার ফিরে এল। এপাশ ওপাশ ডাইনে বাঁয়ে ঘোরাফেরা সবই দ্রুতগতিতে, মাঝে মাঝে গাছের ছালের ফুটো [illegible] চঞ্চু কাঠঠোকরার মতো ঠুকে দেখা হচ্ছে। সবাই চঞ্চল ও কর্মব্যস্ত। গাছের গায়ে চলাফেরার রকম দেখে মনে হয় এরা যেন সব ডালে বসতে জানে না। কিন্তু মৌটুসি বা দণ্ডচারী পাখির [illegible] ডাল আঁকড়েও বসতে দেখলাম।

পক্ষিতত্ত্বে এই গোষ্ঠীর পাখির নাম [illegible] (সিটিডি)। বন-গুলী বংশের [illegible] এদের স্থান। ইংরেজি —নাটহ্যাচ। ইউরোপের পাখির যেমন বাদামের প্রতি অদম্য আসক্তি, ভারতীয়দের ততটা নেই। [illegible] থাকে বলে বিলেতের পাখি [illegible] বাদাম সঞ্চয় করে রাখে। ভারতীয়রা বাদাম খেলেও জমায় না।

ভারতবর্ষে এই বংশে মাত্র একটি গণই দেখা যায়। বংশ ও গণের এক নাম। এই শিলীন্ধ্রী গণে ৯টি প্রজাতি। তার মধ্যে গোটা পাঁচেক প্রজাতি ভারতের বিভিন্ন অংশে দেখা যায়। একটি হিমালয়ে (সিট্টা হিমালয়েনসিস), একটি কাশ্মীরে (সি কাশমিরেনসিস), একটি কেবল পশ্চিম হিমালয়ে (সি লিউকোপসিস), একটি দক্ষিণ ভারতে ও অন্যান্য স্থানে (সি ফ্রন্টালিস) এবং পঞ্চমটিকে দেখছি আমবাগানে। বাকি চারটি প্রজাতি ভারতের সংলগ্ন ভিন্ন ভিন্ন দেশে। সিকিম, ব্রহ্ম থেকে যবদ্বীপ, আফগানিস্তান থেকে তুর্কিস্তান।



চোরপাখি বা বনমালী

আমবাগানে যে পাখিদের দেখলাম তাদের নাম— চোরপাখি (সিট্টা কাস্টানিয়া)। কেউ কেউ বলেন —বনমালী। হিন্দি— সিরি, কাঠফোরিয়া। ইংরেজি— চেস্টনাট-বেলিড নাটহ্যাচ।

লম্বায় ৫ ইঞ্চি। পুরুষের উপরের পালক সীসে-নীল, নিচের পালক বাদামী। নাকের ছাঁদা থেকে চোখের উপর দিয়ে ঘাড় পর্যন্ত একটা কালো টানা লাইন। চিবুক ও চোখের তলা থেকে কানের গর্তের উপরের পালক সাদা। লেজের মাঝের কটা পালক ছাই-নীল, তার পাশের দুটো কালো কেবল ধারে ও ডগায় অল্প ছাই-নীলের ছোঁয়াচ, বাকি কালোর উপর সাদা দাগ। লেজের তলা বাদামী ও ছাই মেশানো। ডানার তলায় কালোর উপর সাদার ছোপ। স্ত্রী-পাখির শুধু নিচের পালকের রঙটা ফিকে। কনীনিকা গাঢ় পাটকিলে। চঞ্চু কালো, ডগটা ধূসর। পা গাঢ় সবজে-সীসে। চঞ্চু লম্বা ও সূচল। পিছনের পায়ের আঙুল বড়ো, সামনের তিনটে আঙুলের মাঝেরটা বেশ খাটো।

বাসস্থান— ভারতের সর্বত্র, পূর্ব পাকিস্তান, ব্রহ্মদেশ থেকে মালয়েশিয়া। গোটা চারেক উপজাতিতে বিভক্ত। পশ্চিম হিমালয়ের একটি উপজাতির (সি কা আলমোরি) চঞ্চুটা মোটা এবং রঙের কিছুটা তফাৎ।

খাদ্য— মাকড়সা, নানাবিধ কীট ও পতঙ্গ, ছোটো ফলের বীজের শাঁস বা বাদাম।

হাবেভাবে অর্থাৎ স্বভাবে খানিকটা কাঠঠোক্‌রা রামগাংরা ও ইঁদুর মেশানো। কাঠঠোকরার মতো গাছের ছাল আঁকড়ে লেজের উপর ভর দিয়ে কিন্তু বসে না। চলাফেরায়, খাবারখোঁজায় এবং পোকামাকড় খাওয়ায় সে-রকমো পাখিকে হার মানায়। সহজে ওপরেই থেকে মাটিতে নামে না। সেকারণে সহজে চোখে পড়ে না। পাহাড়ের ধারে বেশ বড়ো বড়ো গাছে বা আমবাগানে চোরপাখিদের বসবাস। বেশিভাগ জোড়ায় বা একা বিচরণ করে। মাঝে মাঝে দলবদ্ধ হয়ে অন্যান্য কীটভুক পাখিদের সঙ্গে গাছের মগডালে খাদ্যান্বেষণে ঘোরাফেরা করে। তাই দেখার চেয়ে ডাকটাই শোনা যায়। ডাকটা ইঁদুরের মতো চিপ্‌প চিপ্‌প...চিক্‌-চিপ্‌। বাদাম বা অন্যান্য ছোটো ফলের বীজ গাছের কোনো ফাঁকে রেখে শক্ত সুচালো চঞ্চু দিয়ে হাতুড়ি ঠোকার ন্যায় ভাঙে। সেই ভাঙার শব্দ শুনে বোঝা যায় কোথায় ওদের অস্তিত্ব।

প্রজননকাল ফেব্রুয়ারি থেকে মে। সময়ে সময়ে বছরে দুবারও ডিম দেয়। ডিম থেকে বাচ্চা ফোটাতে পুরুষ-স্ত্রী, দুজনেই পরস্পরকে সাহায্য করে। ৮ থেকে ৩০ ফিটের মধ্যে গাছের গায়ে গর্তে বা ফোকরে বাসা বানায়। বাসার ভিতরে বিছায় গাছের পাতা, সরু শিকড়, গাছের নরম ছালের টুকরো ও পশুর লোম। পাহাড়ী চোরপাখি বাড়ির গায়ে গর্তে বাসা তৈরি করে। চোরপাখি বা বনমালীর একটা স্বভাব বেশ মজার। ওদের বাসায় ঢোকার যে-গর্ত সেটা কিংবা ফোকরের ভিতর অন্য গর্ত থাকলে কাদা এনে সেটা সম্পূর্ণ বোজায় এবং প্লাস্টার করে ঢোকার গর্তের মুখ অনেক ছোটো করে। সেটি করে বেশ পরিপাটি-সহকারে। মানুষের হাতের নাগালের মধ্যে থাকলে কেউ যদি সেই কাদার প্রলেপ ভেঙে দেয়, তবে সঙ্গে সঙ্গে তা সারাতে থাকে। সমস্ত বাসা ভেঙে দিলেও তাই। গর্তের মুখে কাদার প্রলেপ দেখে এদের বাসা চিনতে কোনো অসুবিধা হয় না।

২ থেকে ৬টি খুব ভঙ্গুর অল্প চকচকে ডিম পাড়ে। আকারে অনেকটা রামগাংরার মতো। ডিমের রঙ সাদা, তার উপর ইঁট-লাল বা লালচে ছিট ও ছোপ থাকে। ডিমের মাপ—লম্বায় ০·৫৬, চওড়া ০·৪৫ ইঞ্চি।

চোরপাখির একটি উপজাতিকে (সি কা সিন্নামোভেন্ট্রিস) দেখেছি তার বুক-পেটের রঙটা বাদামী নয় একেবারে দারুচিনি রঙের। স্ত্রী-পাখির রঙটা খুব ফিকে। আকারে একটু বড়ো, সাড়ে ৫ ইঞ্চি। দেখা যায় ৩ থেকে ৭ হাজার ফিটের মধ্যে নেপালের থেকে পূর্ব আসাম, উত্তরবঙ্গে দার্জিলিঙ জেলায়, মণিপুর লুসাই অঞ্চলে। হিন্দি—কাঠফোরিয়া। শিলাশ্রী-বংশের সব পাখিকেই হিন্দিতে তাই বলে। কাছাড়ি—দাও-বোজো-গাজাও। ইংরেজি—সিন্নামন-বেলিড নাটহ্যাচ।

'দারুচিনি-পেট' বা 'পাটকিলে চোরপাখি' বেশ বড়ো দলে বাস করে এবং মাটিতে নেমে অন্যান্য পাখিদের সঙ্গে উই ও পিঁপড়ে খায়। ডাকটা—টুক্‌-টুক্‌-টুক্‌। গাছের উপরে যখন থাকে, তখন পরস্পরের সঙ্গে সংযোগ রাখে টুক্‌-টুক্‌ ডাক ডেকে কেউ যেন কোনোক্রমে দলছাড়া না হয়। বাকি আচার-ব্যবহার চোরপাখির ন্যায়।

একটি প্রজাতি (সিট্টা ফ্রন্টালিস) যার ইংরেজি নাম—ভেলভেট-ফ্রন্টেড নাটহ্যাচ, কাছাড়ি—দাও-মোজো-বুকু-গাজাও এবং বাংলা—বনমালী বললেই ঠিক সেও চোরপাখির মতো লম্বায় ৫ ইঞ্চি। কপাল ও চোখের উপর দিয়ে ঘাড় পর্যন্ত যে-টান, তা কুচকুচে ভেলভেট কালো। উপরে ও ডানার উপরাংশ নীল, বাকি ডানাটা কালো, কয়েকটি পালকের ধার নীল। লেজের মাঝের পালক নীল, বাকি কালচে, ডগায় নীল ছোপ। কান-ঢাকা পালক ফিকে বেগুনী-লাল। চিবুক ও গলা সাদাটে বাকি তলার পালক ফিকে ধূসর-বেগুনীলালের আভা। স্ত্রী-পাখির চোখের উপর কালো দাগটা সরু ও ছোটো। কনীনিকা হলদে, চঞ্চু প্রবাল-লাল, পা পাটকিলের উপর কমলার আভা।

বাসস্থান—উপদ্বীপাত্মক ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম পর্বতমালায় ও তার নিকটবর্তী স্থানে, সুন্দরবনমণ্ডল, হিমালয়ের পাদদেশে ১ থেকে ৪ হাজার ফিটের মধ্যে, উত্তরবঙ্গ, আসাম, ব্রহ্মদেশ থেকে মালয়েশিয়া এবং সিংহল। একটি উপজাতি (সি ফ্র কোরাল্লিনা)। উপজাতিটি আকারে একটু ছোটো।

খাদ্য—কেবল পোকামাকড়।

কালো-কপাল বনমালী দলবদ্ধ হয়ে বাস করে এবং শিলাশ্রী-বংশের ভিতর সবচেয়ে চঞ্চল ও কর্মঠ পাখি। ডাকটাও ইঁদুরে 'চিক্‌ চিক্‌ চিক্‌' এবং বেশ জোরে প্রায় মৌচুষি বা দুর্গা টুনটুনির গলার জোরের মতো। একটু চিরসবুজ স্যাঁতসেঁতে অঞ্চলে বাস করাটা পছন্দ। অন্যান্য ছোটো পাখিদের সঙ্গে বিচরণ করতে প্রায়ই দেখা যায়। মরা গাছ এদের সবচেয়ে প্রিয় শিকারভূমি। এক গাছে বেশিক্ষণ থাকে না। বনের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায় পড়ে-থাকা কাটা গাছের উপর দিয়ে দৌড়ে যেতে। বাকি সব আচার-ব্যবহার চোরপাখির মতো।

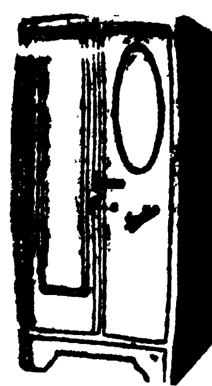
স্থানবিশেষে ফেব্রুয়ারি থেকে জুনের মধ্যে ৩ থেকে ৬টা ডিম পাড়ে। ডিমের উপর গাঢ় লাল বা বেগুনী ছিট ও ছোপ। পুরুষ-স্ত্রী দুজনেই ডিমে তা থেকে বাচ্চা ফুটানো পর্যন্ত পরস্পরকে সাহায্য করে। ডিমের মাপ—লম্বায় ০·৬৫, চওড়ায় ০·৫০ ইঞ্চি।

চোরপাখিদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর দেখতে যে প্রজাতি (সিট্টা ফরমোসা) পুরোপুরি ভারতের নয়, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত ছোঁয় শুধু, তার নাম দেওয়া যেতে পারে—অপরূপ বা সুন্দর বনমালী। কাছাড়ি—দাও-মোজা-গাদেবা। ইংরেজি—বিউটিফুল নাটহ্যাচ।

বাসস্থান—সিকিম থেকে পূর্ব আসামের মিরি আবর খাসি ও উত্তর কাছাড়ের পাহাড় থেকে ব্রহ্মদেশ।

কি রঙের বাহার! দেখলে মনে হবে বুঝি ছোটো মাছরাঙা। নীল, কালো, সাদা আর পিঙ্গল। একই অঙ্গে কত বিভিন্ন রকমের যে নীল তা বলে বোঝানো কঠিন। লম্বায় ৬ ইঞ্চি।

দেখতে পাওয়া যায় খুব অল্প, কারণ থাকে ঘন জঙ্গলে। এদের ডাকটা ইঁদুরে নয় বরং কিছু মিষ্টত্ব আছে। রোদে যখন ওড়ে এদের রূপ তখন অবর্ণনীয়।



আপনার মেয়ের বিয়েতে উপহার দিন—

ইণ্ডিয়া ষ্টীল আলমারি

● মজবুত ফিটিংস ● তালা
● নকল চাবি লাগবে না, সেজন্য গ্যারান্টি দিচ্ছি।

ইণ্ডিয়া ষ্টীল ফার্নিচার
ম্যানুঃ কোং
৯৫, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭
'প্রেস' সিনেমার পশ্চিমে — ফোন ৩৪-৭৫৯২



ঝুক গয়া আসমান চিত্রে সায়রাবানু ও রাজেন্দ্রকুমার

প্রেক্ষাগৃহ

চিত্র-সমালোচনা

পঞ্চশর (বাঙলা) : ফিল্ম ক্রাফট-এর দ্বিতীয় নিবেদন : ১৩ রীলে সম্পূর্ণ ; পরিচালনা অরূপ গুহঠাকুরতা ; কাহিনী : সুবোধ ঘোষ ; সংগীত-পরিচালনা : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, চিত্রগ্রহণ : শৈলজা চট্টোপাধ্যায়, শিল্পনির্দেশনা : বংশীচন্দ্র গুপ্ত, সম্পাদনা : তরুবিন্দ ভট্টাচার্য নেপথ্য কণ্ঠসংগীত : দেবব্রত বিশ্বাস, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও রুমা গুহঠাকুরতা, অভিনয় : শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, রুমা গুহঠাকুরতা, অনিল চট্টোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, জহর রায়, পিসু মজুমদার, রতীন ঠাকুর, সুস্মিতা সান্যাল, অনুভা দেবী, কণিকা মজুমদার আশা দেবী, সীতা মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। ছায়ালোক প্রাঃ লিঃ-র পরিবেশনায় গত শুক্রবার ২ ফেব্রুয়ারী বসুশ্রী, বীণা, পূর্ণশ্রী এবং অন্যান্য চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করেছে।

মাঝে মধ্যে এমন দু-একটি বাংলা ছবি আসে যাদের ঠিক গতানুগতিক বললে কিছুটা অবিচার করা হবে। পরিচালক অরূপ গুহঠাকুরতার পঞ্চশর ছবিটি নিঃসন্দেহেই এ জাতের। বাংলা সিনেমার ক্ষেত্রে এটি কিছুটা ব্যতিক্রম বৈকি। এর স্বাদও যে আলাদা তা হলফ করেই বলা চলে।

অথচ কাহিনীতে যে অভিনবত্ব রয়েছে তা নয়। অতসী বিশ্বাসকে ঘিরে প্রায় গোটা এলাকার যুবকের মনেই ছিল এক কৌতূহল। রাজপুরের বিখ্যাত ছেলে-ধরা মেয়ে বলেই ছিল তার যত দুর্নাম। সেই মেয়েটিই একটি ভাঙা গ্রামোফোন সারাতে এল পরেশ দত্তের দোকানে। পরেশের এক সময় নেশা ছিল কবিতার। কলকাতা থেকে বি-এস-সি পাশ করার বেশ কিছু পরে (ইতিমধ্যে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং পড়েছিল দু বছর), তিনকড়ি দত্তের ছেলে পরেশ ফিরে আসে বাবার কাছে। মাঝেমধ্যে চাকরির চেষ্টা করলেও সাহিত্য নিয়েই সে রইল মশগুল। এই নিয়ে একদিন পিতা পুত্রের মধ্যে দারুণ বচসা হল। পরিণতিতে কলহ। যাই হোক,

পরেশ এর আগে অতসী সম্পর্কে ছেলে ধরার যে অপবাদ শুনেছিল তা বিশ্বাস করল না। আসলে পরেশের চোখে তখন অন্য নেশা। ইতিমধ্যে বেশ কিছুদিন গড়িয়ে গেল। অতসী হয়ে উঠল পরেশের কাঙ্ক্ষিত, যদিও অতসীর দিক থেকে ভাল-লাগাটা প্রেমে পরিণত হয় নি। ইতিমধ্যে অঘটন ঘটে গেল। অতসীর বন্ধু প্রতিমার ছোড়দা অভিলাষ পাটনা থেকে কয়েক দিনের ছুটিতে রাজপুরে হাজির হল। প্রথম দর্শনেই আকৃষ্ট হল অতসী। অভিলাষ যে কদিন ছিল রাজপুরে, ততদিন বেশ মৌতাতে বুঁদে চলেছিল অতসী। কিন্তু ছেদ পড়ল। অভিলাষকে ফিরে যেতে হল পাটনায়—চাকরিস্থলে। সেখান থেকে অতসীকে লিখল চিঠি। অতসী তার জবাবে মনের সব লুকানো কথা উজাড় করে দিল। অভিলাষ তো তাজ্জব। সে ভাবতেও পারে নি এসব। সুতরাং পত্রপাঠ কড়া জবাব। মন দেয়া-নেয়ার এই পালা ধরা পড়ল পলুর চোখে। পলু পরেশের বন্ধু, ডাকঘরের কেরানী। সে চিঠি চুরি করে দেখাত

পরেশকে। এ চিঠিও পৌঁছল না অতসীর হাতে, তার বদলে অভিলাষের বেনামে মনের কথা ঢেলে দিল পরেশ, আর সেই চিঠি নিয়েই অতসী রচনা করে চলল তার স্বপ্নের নীড়। কিন্তু সে ভুল ভাঙল এক-দিন। অভিলাষ বুঝিয়ে দিল তৃতীয় কোন ব্যক্তিই এই ভুল-বোঝাবুঝির নাটের গুরু। কিন্তু কে সে? অবশেষে অতসীই খুঁজে বের করল। পরেশই হল সেই তৃতীয় ব্যক্তি। অভিলাষ-প্রত্যাখ্যাত অতসী এক নাটকীয় মুহূর্তে কী করে শেষ পর্যন্ত আশ্রয় পেল পরেশের কাছে এই নিয়েই ছবির শেষাংশ রচিত। সুবোধ ঘোষের 'আবিষ্কার' গল্প অবলম্বনে এই কাহিনীটির ট্রিটমেন্ট সত্যিই প্রশংসনীয়। অবশ্য ত্রুটি যে কিছু নেই তা নয়। পরেশের কবিতাচর্চার দৃশ্যটি কিছুটা অনভিজ্ঞতার পরিচয়ই বহন করে। এ ছাড়া কাহিনীর গতিও মাঝে মাঝে শ্লথ। অভিনয়ে প্রত্যেকেই কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তবে অতসী বিশ্বাসরূপী রুমা গুহঠাকুরতার অভিনয় কিছুতেই ভোলা যায় না। এমন প্রাণবন্ত, সাবলীল অভিনয় সত্যিই প্রশংসার্হ। অভিলাষরূপী অনিল চট্টো-পাধ্যায়ের অভিনয়েও এক আশ্চর্য প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়। শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় (পরেশ) তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। পল্টুর ভূমিকায় রবি ঘোষ এক কথায় অপূর্ব! অন্যান্য ভূমিকায় সুমিতা সান্যাল, অনুভা দেবী, কণিকা মজুমদার, জহর রায়, ব্রতীন ঠাকুর, পিসু মজুমদার নিজ নিজ ভূমিকায় সুঅভিনয় করেন।



অগ্রদূত পরিচালিত চিরদিনের সংগীতগ্রহণের সময় সংগীত-পরিচালক নচিকেতা ঘোষ ইলা বসু ও অরুণ দত্তকে নির্দেশ দিচ্ছেন।

এ ছবির একটি বড় আকর্ষণ রবীন্দ্র-সঙ্গীত। গান তিনটি গেয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, দেবব্রত বিশ্বাস ও রুমা গুহ-ঠাকুরতা। তবে রুমা গুহঠাকুরতার কণ্ঠে 'মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে' গানটি অবিস্মরণীয়। ছবির কলাকৌশলের প্রত্যেকটি বিভাগই মোটামুটি কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখে।

এক কথায় বলা যায়, অরূপ গুহ-ঠাকুরতা পরিচালিত 'পঞ্চশর' অভিনয়ে, গানে, বহির্দৃশ্যগ্রহণে নিটোল ছবি ও শিল্পনির্দেশনার হিসেবে রীতিমত আকর্ষ-ণীয় হবে তাতে সন্দেহ নেই।

●

পথে হল দেখা (বাঙলা) : শ্রীলেখা মুভিটোনের নিবেদন; ৩,০৫০·১৩ মিটার দীর্ঘ এবং ১৩ রীলে সম্পূর্ণ, প্রযোজনা : জে এন সিনহা; পরিচালনা : শচীন অধিকারী; কাহিনী : জ্যোতির্ময় রায়; চিত্রনাট্য : বিধায়ক ভট্টাচার্য; সংগীত-পরিচালনা : ভি বালসারা; গীত-রচনা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও মণ্টু সরকার; চিত্রগ্রহণ : নিমাই রায়; শব্দানুলেখন : জে ডি ইরাণী ও বাণী দত্ত; সংগীতানুলেখন ও শব্দপুনর্যোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ; শিল্পনির্দেশনা : গৌর পোদ্দার; সম্পাদনা : মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়; নেপথ্য কণ্ঠ-সংগীত : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় এবং ইলা বসু; রূপায়ণ : সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সবিতা চট্টোপাধ্যায়, ভারতী দেবী, রেণুকা রায়, ভানু বন্দ্যো-পাধ্যায়, তরুণকুমার, বিপিন গুপ্ত, শ্যাম লাহা, জহর রায়, অমর মল্লিক, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। এস সি ফিল্মস-এর পরিবেশনায় গেল ২রা ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার থেকে উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলা এবং অন্যান্য চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করেছে।

ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় যে ছবির নায়ক এবং জহর রায় যে ছবিতে ভানু বন্দ্যো-পাধ্যায়ের বন্ধু চাকর, সে ছবি যে হাসির ছবি, তাতে নিশ্চয়ই কারুর সন্দেহ নেই। তবুও বলব, 'পথে হল দেখা' ছবিটি কত

১৩ই মঙ্গলবার ৭টায় মুক্ত অঙ্গনে



নান্দীকার

(বিশেষ অভিনয়)

যখন একা

নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

টিকিট পাওয়া যাচ্ছে

১০·০০ । ৫·০০ । ৩·০০ ২·০০

কোমল গাত্রত্বক...

বেঙ্গল কেমিক্যালের স্যান্ডালউড সোপ

চন্দন-গন্ধ এই সাবান ব্যবহারে গ্রীষ্মের দিনেও আপনার গাত্র-ত্বকের কমনীয়তা ও উজ্জ্বলতা অম্লান রাখবে—এর মধুর গন্ধ আপনাকে সারাদিন প্রফুল্ল রাখবে।





বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর • দিল্লী

না হাসির, তার চেয়ে বেশী রোমান্টিক এবং রোমান্টিক কমেডি রূপেই ছবিখানির সার্থকতা। মা-হারা তরুণী অনসূয়ার আসল অসুখটা যে কি, সেটা তার বন্ধ-ফেরৎ বাবা কৃষ্ণবিহারী চৌধুরী তাঁর মিলিটারী মেজাজ নিয়ে কিছুতেই বুঝতে পারেন নি। তাই তিনি রিটায়ার্ড মিলিটারী ডাক্তার বিরূপাক্ষকে দিয়ে তার রোগের চিকিৎসা করাতে চেয়েছিলেন। বিরূপাক্ষের ওষুধ, ইঞ্জেকশান, পথ্য ও বিধিনিষেধে ওষ্ঠাগতপ্রাণ অনসূয়া তাই তার বাপের অলক্ষ্যে রাস্তায় বেরিয়ে আইসক্রীম খেতে যায় এবং নিতান্ত আকস্মিকভাবে বিরূপাক্ষের সামনে পড়ে যাওয়ার দরুণ দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে পালাতে গিয়ে ধাক্কা খায় অবিবাহিত ধনী যুবক রণদীপ সেনের সঙ্গে। নায়কের সঙ্গে নায়িকার মনের মিল হতে বেশী দেরী লাগে না। কিন্তু একদিকে ডাঃ বিরূপাক্ষ এবং অন্যদিকে মিলিটারী মেজাজের মেজর চৌধুরী ও তাঁর প্রিয় অ্যালসেশান কুকুরটি এদের প্রেমে বিরাট বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। এর ওপর আবার তৃতীয় বাধাস্বরূপ [illegible] হন [illegible] (জিমূদা), যাঁর সঙ্গে নাকি অনসূয়ার বিবাহের কথাবার্তা ছেলেবেলা থেকেই একেবারে পাকা হয়ে আছে। ডাক্তারের পরামর্শে বায়ু-পরিবর্তনের জন্য অনসূয়াকে জসিডি নিয়ে যাওয়া হল। নায়ক রণদীপ সেন বন্ধু চাকরকে নিয়ে গোপনে তাদের অনুসরণ করলেন। [illegible] নানা ঘটনার পরে নায়ক-নায়িকার মিলন কিভাবে সম্পন্ন হল, তাই নিয়েই [illegible] হাসির হুল্লোড়ওলা দৃশ্যাবলী রচিত।

অভিনয়াংশে প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেন নায়িকা অনসূয়ার ভূমিকায় সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। যে অনায়াস ভঙ্গীতে তিনি ক্ষণে ক্ষণে মূর্ছা যাবার ভান করেন, তা দর্শককে সম্মোহিত না করে পারে না। '[illegible] মাছটি উল্টে খেতে জানি না'—এই [illegible] ভঙ্গী প্রকাশে তিনি অদ্বিতীয়া বললেও অত্যুক্তি করা হবে না। নায়ক রণদীপরূপে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় দর্শকদের হাসাবার সুযোগ পেয়েছেন বেশী ছবির শেষভাগে, বিশেষ করে নায়িকার জন্মতিথি উৎসব অনুষ্ঠানে নকল দাড়ি-গোঁফপরা এবং জুতোর কালিমাখা অবস্থায়। ছবির প্রথমাংশে তিনি অনেকখানি জায়গায় প্রায় উত্তমকুমারের মত রোমান্টিক হিরো, বিশেষ করে নায়িকা অনসূয়ার সঙ্গে সাক্ষাতের কয়েকটি দৃশ্যে। ডাঃ বিরূপাক্ষবেশে শ্যাম লাহা চমৎকার নাট্যনৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। নায়িকার পিতা, বন্দুকধারী মেজর চৌধুরীর ভূমিকায় বিপিন গুপ্ত একের দিকে লক্ষ্য করা বন্দুক অপরের দিকে হঠাৎ ঘুরিয়ে চরিত্রটির খামখেয়ালী মিলিটারী মেজাজের বাস্তব রূপ দেখিয়েছেন। বোম্বের সবিতা চট্টোপাধ্যায় অনসূয়ার বান্ধবী মণিকার ভূমিকায় তাঁর নৈপুণ্য দেখাবার বিশেষ কোন সুযোগ পান নি। অপরাপর ভূমিকায় তরুণকুমার (বস্তুবাদী জীমূতবহন), ভারতী দেবী (অনসূয়ার পিসিমা), রেণুকা রায় (ভাড়াটিয়ার স্ত্রী), অমর মল্লিক (ভাড়াটিয়া) নৃপতি চট্টোপাধ্যায় (অপর ভাড়াটিয়া), জহর রায় (বন্ধু চাকর), শীতল বন্দ্যোপাধ্যায় (অন্যতম ভাড়াটিয়া) এবং অনসূয়ার বাড়ীর দুদাম চাকরবেশী শিল্পীটি উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ মোটামুটি প্রশংসনীয়। প্রধানত হাসির ছবির ফোটোগ্রাফিক ঔজ্জ্বল্য বজায় রাখবার চেষ্টা করেছেন ক্যামেরাম্যান নিমাই রায়। ছবিটির চারখানি গানের মধ্যে 'চলো চলো মোরা চলে যাই সেই দেশে' এবং 'যে-কথা কলির কানে বলে অলি' গান দুটি সুর ও গাওয়ার গুণে জনপ্রিয়তা লাভ করবে। আবহ-সঙ্গীত রচনায় ভি বালসারা বহু স্থানেই তাঁর দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

রোমান্টিক হাসির ছবি হিসেবে 'পথে হল দেখা' দর্শকসাধারণকে যথেষ্ট খুশী করবে।

পাত্থরকে সনম (হিন্দী) : এ জি ফিল্মের নিবেদন; ৪,০২৬·৮৯ মিটার দীর্ঘ এবং ১৫ রীলে সম্পূর্ণ; প্রযোজনা : এ এ নাদিয়াদওয়ালা; পরিচালনা : রাজা নাওয়াথে; কাহিনী : গুলশান নন্দ; চিত্রনাট্য ও সংলাপ : আখতার-উল-ইমান; সঙ্গীত-পরিচালনা : লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল; গীতরচনা : মজরু সুলতানপুরী; চিত্রগ্রহণ : সুধীন মজুমদার; শব্দানুলেখন : মার্কন্ড মেহতা; সঙ্গীতানুলেখন : মীনু কাত্রক; শিল্প-নির্দেশনা : এ এ মজিদ; সম্পাদনা : বাবুভাই ঠক্কর; নৃত্য-পরিচালনা : পি এল রাজ ও কিরণকুমার; নেপথ্যকণ্ঠসঙ্গীত : লতা মঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলে, মুকেশ ও মোহাম্মেদ রফী; রূপায়ণে : ওয়াহিদা রেহমান, মমতাজ, ললিতা পাওয়ার, মমতাজ বেগম, উমা দত্ত, অরুণা ইরাণী, মনোজকুমার, প্রাণ, মেহমুদ, তিওয়ারী, রাজমেহরা, জানকী দাস, মকবুল, বিক্রমভূষণ প্রভৃতি। দোসানী ফিল্মসের পরিবেশনায় গেল ২রা ফেব্রুয়ারী শুক্রবার থেকে রক্সী প্রিয়া, কৃষ্ণ,

শুভারম্ভ শুক্রবার ৯ই ফেব্রুয়ারী!

একটি চিরন্তন "জিজ্ঞাসা' যার উত্তর আজও সৃষ্টি হয়নি.....



॥ কাহিনী ও রচনা—গৌরীপ্রসন্ন : গানে—হেমন্ত - মন্নাদে - গীতা সেন ॥

শ্রী - প্রাচী - ইন্দিরা - পদ্মশ্রী - অশোকা

জয়শ্রী - নেত্র - অলকা - পার্বতী - মায়া - শ্রীলা - উদয়ন - কল্যাণী - গৌরী

॥ পরিবেশনা : ন্যাশনাল্ ফিল্মস্ প্রাঃ লিঃ ॥



স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে চিত্রের মহরত অনুষ্ঠান বসন্ত চৌধুরী, মাধবী মুখোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, স্বরূপ দত্ত ও পরিচালক পীযূষ বোস। ফটো : অমৃত

ম্যাজেস্টিক, মিত্রা, ছায়া, কালিকা, ভবানী এবং অন্যান্য চিত্রগৃহে দেখান হচ্ছে।

'এস, লোকটাকে নিয়ে একটু মজা করা যাক—দুজনেই এমন ভাব করি, যেন ওর প্রেমে আমরা হাবুডুবু খাচ্ছি।'

'কিন্তু সখী, যদি প্রেমের অভিনয় করতে করতে সত্যিই আমরা ওর প্রেমে পড়ে যাই, তখন?'

'আমাদের হৃদয় আমাদের কাছে; জেনে-শুনে প্রেমে পড়লেই হোল? খেলা খেলাই।'

কিন্তু এই খেলা কিছুদিন ধরে খেলবার পরে সখীর আশঙ্কাই সত্যে পরিণত হোল—ওরা দুজনেই লোকটার প্রেমে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হল। তখন প্রথম সখী দ্বিতীয় সখীকে তার প্রেমের পথ থেকে সরে দাঁড়াতে বলল, তাকে মনে করিয়ে দিল, তার বিবাহ তো আর একজনের সঙ্গে আগে হতেই স্থির হয়ে রয়েছে, তার তো নতুন করে প্রেম করা সাজে না। কিন্তু প্রথমার অনুরোধ দ্বিতীয়া রাখে কি করে? সে যে হৃদয় হারিয়ে বসে আছে। এবং যার কাছে ওরা দুজনেই হৃদয় হারিয়েছে, সেও যে ওকে গোপনে জানিয়েছে, সে ওকেই করেছে তার হৃদয়ে বরণ। সমস্যা আরও বেড়ে গেল, যখন প্রেমাস্পদের জননী এসে উপস্থিত হলেন দ্বিতীয়ার কাছে এই অনুরোধ নিয়ে যে, প্রথমার সঙ্গেই তাঁর একমাত্র সন্তানের বিবাহ সম্ভব করতে হবে গুরুতর কারণে। তখন রক্তাক্ত হৃদয় নিয়ে দ্বিতীয়া তার প্রেমাস্পদের কাছ থেকে দূরে যেতে চাইল।

গুরুতর কারণটি কি এবং শেষ পর্যন্ত জননীর অনুরোধ রক্ষিত হল কিনা, এই সব তথ্য উদ্ঘাটিত হয়েছে ছবির উত্তেজনা-পূর্ণ শেষাংশে। বলা বাহুল্য, এই উত্তেজনার উপাদানটিই 'পাত্থর কে সনমকে' তার নির্মাণস্থান বোম্বাইয়ের অতি-পরিচিত মূর্তি পরিগ্রহ করতে বাধ্য করেছে।

দ্বিতীয়া সখী তরুণার ভূমিকায় স্বভাবসিদ্ধ নাটনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন ওয়াহিদা রেহমান। প্রথমা সখী মীনা বেশে মমতাজ আধুনিক ঢঙে টুইস্ট ও শেক নেচেছেন এবং অভিনয়ও করেছেন অত্যন্ত সাবলীলভাবে। নায়ক রাজেশরূপে মনোজ-কুমারের অভিনয় হয়েছে মনোজ্ঞ। কাহিনীর চাহিদা অনুযায়ী ছবির শেষাংশে তিনি শত্রু আক্রমণ প্রতিহত করতে 'বাহাদুর'-এর ভূমিকা গ্রহণ করলেও প্রেমের দৃশ্যগুলি ও ঠাকুরসাহেবের সঙ্গে পিতা-পুত্ররূপে সঙ্ঘর্ষের দৃশ্যে অত্যন্ত সংযম ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। শঠ লালা ভকতরামরূপে প্রাণ তাঁর সুপ্রসিদ্ধ ভীলেন রূপটি চমৎকারভাবে খুলে ধরেছেন। মেহমুদ হাসির অভিনেতারূপে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন বহুদিন যাবৎ। আলোচ্য ছবিতে কিছুটা বোকা-ভাবসম্পন্ন হরিয়ারূপে তিনি দর্শকদের হাসির খোরাক জুগিয়েছেন প্রচুর। তাঁর জুড়ী হিসেবে উমা দত্ত দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়েছেন। রাজেশের পালক-মা বেশে ললিতা পাওয়ার তাঁর ছোট্ট ভূমিকাটিতে অভিব্যক্তিপূর্ণ সুঅভিনয় করেছেন। ঠাকুরসাহেবরূপে তিওয়ারী চলনসৈয়ের ওপরে উঠতে পারেন নি।

ছবিটির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে প্রথমেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে হয় এর চিত্রগ্রহণের অসামান্য নৈপুণ্যের। ইস্টম্যান কলারে তোলা ভারতীয় ছবিগুলির মধ্যে এমন বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং অভিনব ফোটোগ্রাফির নিদর্শন অল্পই পাওয়া গেছে। মজরুহ সুলতান পুরীর রচনা লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল দ্বারা সুর সমৃদ্ধ হওয়ার ফলে ছবিটির সাতখানি গানের মধ্যে 'বতা দু ক্যা লানা, তুম লোটকে আ জানা' গানখানি অতুলনীয়; এমন প্রাণমাতান গান বহুদিন শোনা যায় নি। এ ছাড়া 'মেহবুব মেরে' ও 'পত্থরকে সনম' গান দুখানিও মর্মস্পর্শী। আবহ-সঙ্গীত রচনায় বিশেষ কোন অভিনবত্ব শ্রুতিগোচর হল না। ছবিটি সুদীর্ঘ, কিন্তু সম্পাদনার গুণে কোথাও ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়ে দাঁড়িয়ে যায় নি—চমৎকার গতিশীলতা রেখে কাহিনীটি বেশ অগ্রসর হয়ে গেছে।

এ জি ফিল্ম-এর 'পত্থরকে সনম' সঙ্গীত, ফোটোগ্রাফী, সম্পাদনা এবং অভিনয়সমৃদ্ধ হয়ে দর্শকসাধারণের প্রশংসা অর্জন করবে।

—নান্দীকর

শুক্রবার দুপুর অজনে
সন্ধ্যা সাতটায়
হলে টিকিট
নাটক : ভোলা দত্ত
প্রয়োগ : রবি ঘোষ
অভিনয়ে : রবি ঘোষ
ভোলা দত্ত - সুনীল
রায় - নিতাই ঘোষ - উমানাথ ভট্টাঃ - প্রণব
চক্রঃ - গোরা চট্টোঃ - রবি চক্রঃ - তপেন
চট্টোঃ - অতীন - রণজিৎ - তপন
স্বর্ণেন্দু - মৃন্ময়ী - চৈতালি সেন
অপর্ণা মুখোঃ - অনুভা ঘোষ

দেশী ছবির খবর

বিশ্বজিৎ প্রযোজিত ট্রায়ো ফিল্মসের **'ছোট্ট জিজ্ঞাসা'** এ সপ্তাহের ৯ ফেব্রুয়ারী শ্রী, প্রাচী, ইন্দিরা ও শহরতলীর বিভিন্ন চিত্রগৃহে শুভ মুক্তিলাভ করছে। একটি শিশুর ছোট্ট জিজ্ঞাসাকে কেন্দ্র করে এ কাহিনীর পট গড়ে উঠেছে। কাহিনীটি রচনা করেছেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। শিশুনায়ক চরিত্রে রূপদান করেছে শ্রীমান প্রসেনজিৎ। ছবির প্রধান শিল্পীদের মধ্যে রয়েছেন বিশ্বজিৎ, মাধবী মুখোপাধ্যায়, অনুপকুমার, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, শমিতা বিশ্বাস ও গীতা দে। স্কাপস ফিল্মস পরিবেশিত ছবিটির সুরকার হলেন নচিকেতা ঘোষ।

পরমহংসদেব, বিবেকানন্দ, চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র, মাইকেল, রাজা রামমোহন, বিদ্যাসাগর এঁদের মত বিরাট পুরুষ হয়তো তিনি নন, তিনি শুধু বাংলা দেশের মধ্যবিত্ত গৃহস্থের একটি সন্তান,—লেখাপড়ায় বিশেষ এগোতে পারেননি। গুণের মধ্যে ছিল ভরাট গলায় গানের সুর।

এমনি একটি সাধারণ মানুষ তাঁর অসাধারণ দেশপ্রেমের নিষ্ঠার পরিচয় রেখে গেছেন। তিনি বাংলাদেশের একমাত্র চারণকবি—চারণকবি মুকুন্দদাস। গান গেয়ে যিনি জাতির দেশাত্মচেতনাকে জাগিয়ে তুলেছেন। ফিল্ম ক্লাসিকের প্রযোজনায় 'চারণকবি মুকুন্দদাস' চিত্রটি আগামী ১৬ই ফেব্রুয়ারী মুক্তিলাভ করবে।

...কায় অভিনয় করেছেন সবিতা-দত্ত। অন্যান্য চরিত্রে আছেন তৃপ্তি মিত্র, জহর গাঙ্গুলী, বিজু ভাওয়াল, ছায়া দেবী, দিলীপ রায় প্রভৃতি শিল্পীবৃন্দ।

'চারণকবি মুকুন্দদাস' পরিচালনা করেছেন নির্মল চৌধুরী, সুররচনা করেছেন পবিত্র চ্যাটার্জি।

সারদা চিত্রমন্দির প্রযোজিত নতুন ছবি **'স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণের'** শুভমহরৎ অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে গেল ৩০-এ জানুয়ারী ক্যালকাটা মুভীটোন স্টুডিওতে। কালকূট রচিত কাহিনী অবলম্বনে এর চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পীযূষ বসু স্বয়ং। নবাগত স্বরূপ দত্ত হবেন এর নায়ক এবং নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণা হচ্ছেন মাধবী মুখোপাধ্যায়। সঙ্গে থাকছেন সুমিতা সান্যাল, গীতা দে, দিলীপ রায়, অরুণ মুখোপাধ্যায়, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, রবি ঘোষ প্রভৃতি শিল্পী। কৃষ্ণা প্রধান নামে একটি নেপালী তরুণী একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন। শৈলেশ রায়ের সঙ্গীত-পরিচালনায় ছবিটির গান গৃহীত হয়েছে বোম্বাইয়ে এবং এগুলিতে কণ্ঠ দিয়েছেন লতা মঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলে, মান্না দে ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

প্রযোজক-পরিচালক ও পি রালহান তাঁর রঙিন ছবি 'তলাশ'-এর বহির্দৃশ্যগ্রহণ সম্প্রতি শুরু করেছেন সিমলা অঞ্চলে। এই বহির্দৃশ্য অংশে শিল্পীদের মধ্যে রয়েছেন রাজেন্দ্রকুমার, শর্মিলা ঠাকুর ও হেলেন। এ ছাড়া এ ছবির একটি বিশিষ্ট চরিত্রে রূপদান করছেন বলরাজ সাহানী। সঙ্গীত-পরিচালনায় রয়েছেন শচীনদেব বর্মন।

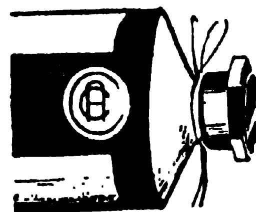
পরিচালক লেখ ট্যান্ডন **'প্রিন্স'** ছবির বহির্দৃশ্যগ্রহণের জন্য সম্প্রতি জয়পুর অঞ্চলে উপস্থিত হয়েছেন। ছবিটির প্রধান চরিত্রে রূপদান করছেন শাম্মি কাপুর, বৈজয়ন্তীমালা, অজিত, প্রভীন চৌধুরী, সাপ্রু, লীলা চিটনীস, ডেভিড ও রাজেন্দ্রনাথ। শঙ্কর-জয়কিষণ ছবিটির সুরকার।

সম্প্রতি কুলু অঞ্চলে ভাম্পি সোনি পরিচালিত **'এক শ্রীমান এক শ্রীমতী'** ছবির বহির্দৃশ্যগ্রহণ শুরু হয়েছে। ছবির মুখ্য অংশে অভিনয় করছেন শশি কাপুর, ববিতা, প্রেম চোপরা, হেলেন, রাজেন্দ্রনাথ, লক্ষ্মী ছায়া, সুলচনা, মমতাজ বেগম, কামিনী কৌশল এবং ওমপ্রকাশ। এ ছবির সঙ্গীত-পরিচালনায় রয়েছেন কল্যাণজী-আনন্দজী।

বিদেশী ছবির খবর

পরিচালক রবার্ট ব্রেস ডস্টয়েভস্কির উপন্যাস 'লা ফেমে দ্যুস'কে চিত্রায়িত করার মনস্থ করেছেন। প্যারিসেই সকল ঘটনাবলীর বিস্তৃতীকরণ হবে এবং দুটি প্রধান চরিত্র থাকবে স্বামী-স্ত্রীর। ছবির মূল বক্তব্য হচ্ছে একাকীত্ব ও বোঝাবুঝির সমস্যা। ... আলেকজান্ডার আস্ত্রুক-এর নতুন ছবি 'টানিয়ের সুর ল আড্রিয়াটিক' এর চিত্রনাট্য লিখেছেন যুগোশ্লাভ লেখক সেলিমোভিক। জার্মানীর আক্রমণে গত মহাযুদ্ধে যখন মিত্রপক্ষের একখানি ডেস্ট্রয়ার বিপর্যস্ত তখন দুই অফিসারের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়। একজন চায় আত্মসমর্পণ করতে আর একজন যুদ্ধ চালাতে। অবশ্য শেষে দুজনের কেউই আর বাঁচে না। ছবির কাজ শিগগির শুরু হবে।

...আত্মহত্যা করতে গিয়েও ফিরে এসেছে একটি লোক। তারপর নির্জনে একাকী বসে অতীতের রোমন্থন করতে করতে সে তার আত্মহত্যার বিশ্লেষণ করতে





...হয়েছে। জীবনের এই শুভ লগন তার যেন এল যখন সে বুঝতে পারল তখন সে তার আত্মহত্যার কথা ভাবে নি। জ্যাক শিউডবার্গের চিত্রনাট্যে উপরোক্ত উপরোক্ত কাহিনীর চিত্রায়ন করেছেন অ্যালা রেনে। প্রধান চরিত্রে আছেন রুদ স্মিথ ও ওলগা জর্জ পিকট, অ্যানকে ফারজাক তার সহযোগী।...জাঁ লুকে গাদার 'লা চায়নীজ' ছবি শেষ করে এখন করছেন প্রতি সপ্তাহান্তে প্যারিসের খোলা রাস্তায় যে গাড়ীর মেলা বসে তার ওপরই এক হাস্য-রসাত্মক ট্রাজিক ছবি। ইতিমধ্যে রাস্তায় রাস্তায় কিছু দৃশ্য তোলা হয়েও গেছে। এ ছবিতেই নাকি গদার দীর্ঘতম ট্র্যাকিং শটটি তুলবেন। ছবির নায়ক-নায়িকা চরিত্রে আছেন মেরিল ডার্ক ও জিন ইয়েন।... খ্যাতনামা লেখক রোম্যান গ্রে (যাঁর ক্রেডিটে 'রুটস অফ হেভেন', 'লেডি এল', 'দি স্কি বাম্'-এর মত কয়েকটি বেস্ট সেলার রেকর্ড আছে) এবার নতুনরূপে দেখা দিচ্ছেন। নিজের গল্প ও নিজের চিত্রনাট্য অবলম্বনে 'বার্ডস ইন পেরু' নামে একটি ছবি করার মনস্থ করেছেন গ্রে। ছবিতে লেখকের স্ত্রী জাঁ সিবার্গ এক সুন্দরী, যৌন-কাতরতা উন্মাদনীর চরিত্রে অভিনয় করলেন। এই স্ত্রীলোকটি নিজের ঐ অস্বাভাবিক মানসিক অবস্থার দরুণ শান্তি পায় নি আর তার কাছাকাছি যারা ছিল তারাও পেল না। অন্যান্য চরিত্রে থাকলেন মনারুস রোনেৎ, পিয়ের ব্রাসুর, ড্যানিয়েল ড্যারি।

মঞ্চাভিনয়

শ্রীমধুসূদন নাট্যাভিনয়

গত ২৫ জানুয়ারী মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্মদিন উপলক্ষে বাণীপুরের নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের (২নং) ছাত্রবৃন্দ অধ্যাপক শ্রীউৎপল চক্রবর্তীর পরিচালনায় বনফুল রচিত 'শ্রীমধুসূদন' নাটকটি পরিবেশন করেন।

বিভিন্ন ভূমিকায় সর্বশ্রী দেবব্রত দে, তুলসী মুখোপাধ্যায়, অনিল মুখোপাধ্যায়, মৃণাল চট্টোপাধ্যায়, সুধারঞ্জন চক্রবর্তী, পান্নালাল পাত্র, ফণীভূষণ হীরা, পরেশ পড়িয়া, মুকুল দাস, শম্ভুলাল ব্রহ্মচারী, মণিমোহন, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতিরা। উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেন। এছাড়াও শ্রীমধুসূদন রচিত সঙ্গীত 'রেখো মা দাসেরে মনে' এবং কবিতাও পরিবেশন করেন ছাত্র-ছাত্রীরা।

বলাকা নাট্যগোষ্ঠীর অভিনয়

'বলাকা' নাট্যগোষ্ঠী ফেব্রুয়ারী মাসে দক্ষিণ কলিকাতার একটি নির্দিষ্ট মঞ্চে কাব-গুরু রবীন্দ্রনাথের 'মাল্যদান' ও মধু-সংলাপী বিশ্বস্ত ভট্টাচার্যের হদ্ অভিনীত নাটক 'অমৃতের ক' নিয়মিত পরিবেশন করবেন।

মাল্যদানের নাট্যরূপ ও পরিচালনার দায়িত্বে আছেন অরুণকান্তি সাহা ও মাটির



হিন্দী হাই স্কুলে অভিনীত অনামিকা-র 'সপ্তর' নাটকে রবি দন্ডে এবং পল্লবী মেটা

ঘরে' দিলীপ চৌধুরী। দুইটি নাটকেই সংগীত পরিচালনা করবেন সংগীত শিল্পী শচীন গুপ্তের ভাই গৌরেন গুপ্ত।

রাজা বদল

গত জানুয়ারী বিশ্বরূপা মঞ্চে চেনা-মহল গোষ্ঠী জোতু বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'রাজা বদল' নাটকটি বিশ্বস্ততার সঙ্গে মঞ্চস্থ করলেও নাটক নির্বাচনেই গোষ্ঠীর চিন্তার অপরিপক্কতাকে প্রকাশ করেছে। গভীরতাহীন এই নাটকের পরিচালক শ্রীরণজিৎ দত্ত। আলোকসম্পাত ও আবহ-সঙ্গীতের কাজ পরিচ্ছন্ন হলেও প্রধান নারী চরিত্রে অঞ্জলি চট্টোপাধ্যায় যথেষ্ট সাবলীল নন, তার চাইতে বরং ছেলেহারা বিধবা মার চরিত্র অপেক্ষাকৃত সুন্দর। প্রধান পুরুষ চরিত্রে রণজিৎ দত্ত স্বচ্ছন্দ ও সরল। অন্যান্য চরিত্রে যাঁরা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তাঁরা হলেন উপেন তরফদার, ও অন্যান্যরা।

বিবিধ সংবাদ

শিশু স্বর্গ

শিশু স্বর্গের নিয়মিত অনুষ্ঠান বসবে মহাজাতি সদনে সকাল ৯টায়, রবিবার ১১ ফেব্রুয়ারী।

এদিনে অংশগ্রহণ করছেন শ্রী ভি বালসারা ও সম্প্রদায় আর শ্রীদেবেশ মুখোপাধ্যায়। নতুন প্রতিভা ছাড়া সপ্তকের 'ঋতুরঙ্গ' আর রবিরূপের 'কিপ্টে ঠাকুর্দা'ও সেদিন পরিবেশিত হবে।

নিউ এম্পায়ারে মহিলা যাদুকর

প্রায় এক বছর অনুপস্থিতির পর মহিলা যাদুকর উমা দাশগুপ্ত আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারী রবিবার সকাল সাড়ে দশটায় নিউ এম্পায়ারে দর্শকদের অভিবাদন জানাচ্ছেন। এর আগে দেখানো খেলাগুলোর সঙ্গে তাঁর সম্প্রতি উদ্ভাবিত উত্তেজক দুটি খেলা—'ভানুমতির খেল' ও 'ভুতুড়ে বাড়ি' নিঃসন্দেহে রবিবারের আসরটিকে মাৎ করে দেবে।

প্রীতি অনুষ্ঠান

গত শনিবার সন্ধ্যায় পানিহাটি ব্যানার্জিপাড়ার নিলামবাটিতে স্থানীয় যুব-সংস্থা তরুণ সঙ্ঘের এক প্রীতি অনুষ্ঠান সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয় ২৪-পরগণা (উত্তর) অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীভুবনমোহন পোদ্দারের সভাপতিত্বে। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন শ্রীবিমল বসু। সঙ্ঘের সভাপতি শ্রীসিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় তরুণ সঙ্ঘের আদর্শ ও করণীয় কর্মের এক বিস্তৃত বিবরণ দান করেন। সভাপতি এবং প্রধান অতিথির সময়োপযোগী ভাষণের পর একটি সঙ্গীতানুষ্ঠানে সর্বশ্রী দিলীপ ঘোষ, বাবুল কুশারী, রেবতীভূষণ, মঞ্জু দেবী, বুনু চৌধুরী, পার্থ বাগচী প্রমুখ সুখ্যাত শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেন। সর্বশ্রী মদন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাসুদেব মুখোপাধ্যায়, শিবশঙ্কর মুখোপাধ্যায় প্রমুখের আন্তরিক চেষ্টায় প্রীতি-অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়।

একটি সুপরিকল্পিত শিশু-উৎসব

দেশ স্বাধীন হবার পর জাতির ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়ে ভাই-বোনেদের আসর শতাধিক বিদ্যালয়ের সহযোগিতায় একটা সুপরিকল্পিত শিশু-উৎসবের আয়োজন করে আসছেন জাতির স্মরণীয় দিন ২৩ জানুয়ারী থেকে ২৬ জানুয়ারী পর্যন্ত চার দিন ধরে। এবারেও সে অনুষ্ঠান খ্যাতনামা শিশু সাহিত্যিক শ্রীমণীন্দ্র দত্ত ও শ্রীপ্রভাতচন্দ্র মণ্ডলের যথাক্রমে সভাপতিত্বে ও প্রধান আতিথ্যে সোনারপুরে অনুষ্ঠিত হয়।

এবারের অনুষ্ঠানেও শতাধিক শিশু-শিল্পীরা দৈনিক সহস্রাধিক ছেলে-মেয়েদের ও তাদের অভিভাবকদের পর্যন্ত আবৃত্তি, গানে, নাচে, যন্ত্রসঙ্গীতে, অভিনয় ও ব্রতচারী নৃত্য দেখিয়ে মুগ্ধ করে প্রত্যেকেই 'উৎসাহ-পুরস্কার' লাভ করে। এ ছাড়া ছোটদের 'চলচ্চিত্রের মাধ্যমে শিক্ষা' দেবার জন্যে শিক্ষামূলক রঙীন ছবি দেখানো হয়।

সমবেত কণ্ঠে 'দেশাত্মবোধক সঙ্গীত' প্রতিযোগিতায় এবারে খগেন্দ্রচন্দ্র দাশ স্মৃতি ফলক লাভ করে নীহারকণা বালিকা বিদ্যালয়, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে নোওয়াপাড়া বালক-বালিকা বিদ্যালয় দেবেন্দ্র-স্মৃতি ফলক লাভ করে। 'শিক্ষাগুরুর প্রতি ভক্তি রাখো' ছোটদের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা জানিয়ে এবারে গরম আলোয়ান উপহার দেওয়া হয় তেঁতুলবেড়িয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীঅনন্তলাল চক্রবর্তীকে (৬০ বছর)। 'ছোটদের আনন্দের মাধ্যমে শিক্ষা' দেবার এই অভিনব পরিকল্পনা ও পরিচালনাটা হল শিশু-সাহিত্যিক শ্রীবিজনকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের। এই অভিনব শিশু-উৎসবটির আয়োজনের জন্য পরিচালকে অভিনন্দন জানাই।

জলসা

নৃত্যছন্দিত কলকাতা

গত কয়েক সপ্তাহে সারা কলকাতা যেন নৃত্যে উৎসবে মেতে উঠেছিল। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য শিল্পী ডাঃ মিনতি মিশ্রের ওড়িষী ও ভারতনাট্যম নৃত্য।

ওড়িষী নৃত্য স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে শ্লোক, মঙ্গলাচরণ, বটুনৃত্য, পল্লবী, অভিনয় অষ্টপদী ও মোক্ষনৃত্যে পরিবেশিত। ললিত-মধুর অভিব্যক্তি ও পূর্ণ-প্রস্ফুটিত ফুলের মত ভাবের মঞ্জরিত প্রকাশই ওড়িষী নৃত্যের প্রাণ। ত্রিভঙ্গ, অষ্টপদী ভঙ্গীতে উড়িষ্যার মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ ভাস্কর্যসৌন্দর্যের ছন্দের সঙ্গে লীলায়িত দেহভঙ্গিকে শিল্পী মিলিয়ে দিতে পেরেছেন। কাম্বোজী রাগাশ্রয়ী শ্লোকে নটরাজ চরণে আত্মনিবেদনের আকুতি মূর্ত হয়ে উঠেছে। বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে "মঙ্গলাচরণ"। কারণ উড়িষ্যার বিশেষ একটি তাল "একতালী"র তীব্র মধুর তালের অসম অথচ মজাদার ছন্দের মাত্রাশেষে শ্রীমতী মিশ্রের ছন্দসুষমাসিঞ্চিত পদক্ষেপ রসিক দর্শকবৃন্দের মনকে এক বিশেষ আনন্দের সরিক করেছিল। এ ছাড়াও "ইমন" রাগাশ্রিত এই নৃত্যে উত্তর-ভারতীয় "ইমন" রাগের সঙ্গে ওড়িষী শিল্পীর গাওয়া ইমনের পার্থক্যও (নরগকপধনসার জায়গায় সরগকপধনসা) সুপরিস্ফুট হয়েছে।

ভারতনাট্যমে অলারিপ্পু, তিল্লানা—নৃত্যাঙ্গের অংশে শিল্পীর দেহভঙ্গির চিত্র-সৌন্দর্য প্রার্থনার স্থির আকৃতিতে ব্যক্ত হয়েই ছন্দের মুখর আনন্দে উত্তাল হয়ে উঠল। আনন্দ ছিল সংযমের সীমায় বাঁধা, প্রকাশের আবেগে আত্মপ্রকাশের ব্যাকুলতা ছিল কিন্তু ছিল না চাঞ্চল্যের উন্মাদনা। প্রকৃত শিল্পবোধচিহ্নিত এই সীমিত সংযমই তাঁর নৃত্যকে রসের দ্বারে পৌঁছে দিয়েছে। পাদমে মুদ্রা ও নাটকীয়তার সমাবেশে উপযুক্ত শিক্ষার নিদর্শন মুদ্রিত। মুখভাব-বিবর্তনে হাস্যোজ্জ্বল অভিব্যক্তিতে মধুর রসের ব্যঞ্জনায় কার্পণ্য ঘটেনি। তবু বলব মহ কাব্যধর্মী এই নৃত্যে অন্যান্য রসব্যঞ্জনার অধিকতর বৈচিত্র্যসম্ভার আমরা আশা করেছিলাম।

'নটনাম-আদিনারে' শিল্পীর লয়দক্ষতা মুদ্রা ও দেহসঞ্চালনের সৌন্দর্যের অভাব ছিল না, কিন্তু নৃত্যের তুলনায় নৃত্যাংশ কিছু কমজোরী। সামগ্রিক বিচারে শিল্পীর নিষ্ঠা ও অনুভব গভীরতা তাঁর মত উচ্চাঙ্গের শিল্পীরই উপযুক্ত।

এই অনুষ্ঠানের জন্য ম্যাক্সমুলার ভবনের কর্তৃপক্ষ ধন্যবাদার্হ।

আমেরিকান নৃত্যগীতোৎসব

নৃত্য ও গীতের আন্তর্জাতিক ভাষার দাক্ষিণ্যে মার্কিনী শিল্পসংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হবার এক দুর্লভ সুযোগ সম্প্রতি ঘটেছিল। ইন্দো-আমেরিকার সৌজন্যের কাছে আমরা এজন্য ঋণী।

২৫ জানুয়ারী মুরে লুইসের নৃত্য দিয়ে উৎসব শুরু হয় রবীন্দ্রসদনে।

আপনার নৃত্যদর্শন বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে মিঃ মুরে লুইস বলছেন, "মাই স্পিরিট, মোটিভেশন অ্যান্ড ক্রিয়েটিভ পাওয়ার আই ড্র ফ্রম দি গ্রেট এনার্জি অ্যান্ড রেটলেসনেস অফ মাই কনট্রি টু-ডে।" কিন্তু এই অস্থিরতাপ্রসূত নৃত্যে অন্তর্মুখী ধ্যানদর্শন ও ঊর্ধ্বমুখী অভীপ্সার ছবিটিও ফুটে উঠেছে জীবনের উল্লাস ও উচ্ছলতার সঙ্গে সমান্তরাল ছন্দে। এই গভীরতায় দিকটি ভারতীয় মনকে বোধহয় বেশী নাড়া দিয়েছে।

"ট্রানসেনডেন্সিস" "রিফ্লেক্সন" নৃত্যে বহিরাবরণের খোলস ভেঙে দিয়ে আকাশে ওড়ার দুর্বার ব্যাকুলতার ছবিখানি তোলার নয়। ভারতীয় নৃত্যের 'মুদ্রা'র ব্যঞ্জনা অথবা মুখভাবের প্রকাশবৈচিত্র্য এ নৃত্যে নেই। তার এই স্থলে মাটির দেহও যে শিল্পচেতনার বিদ্যুৎস্পর্শে ভাবের আধার হয়ে উঠতে পারে সে অনুভব সঞ্চার মিঃ লুইসের বিস্ময়কর অবদান নিশ্চয়।

সারা দেহ যেন মাটি ছেড়ে আকাশে উঠে দিবাস্বপ্নে বিভোর। এই ভাবউদ্দীপনে দেহের 'অ্যাক্রোবেটিক' দিক ছিল নিশ্চয়। তবে শিল্পীর পরিবেশনার গুণে তা কোনো কষ্টসৃষ্ট প্রয়াস বলে একবারও মনে হয়নি।

'জ্যাজ-ড্যান্সিং' 'পপ'-নৃত্যভিত্তিক হলেও মিঃ লুইসের বিভিন্ন ঘরানার নৃত্যের জ্ঞান এক উপভোগ্য বৈচিত্র্যরসের সৃষ্টি করেছে। এই নৃত্যের পটভূমিকার মঞ্চসম্পদ বর্ণসমারোহে, গঠনবিভবে শিল্পীদের অভিনব সজ্জায় এমন এক চিত্রধর্মী সৌন্দর্য ব্যাপ্ত করেছিল যা দেখামাত্র চোখ ভরে যায়। বর্তমান যন্ত্রযুগের তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়—এই নৃত্যপরিকল্পনার উপাদানসম্ভার যুগিয়েছে। তথাকথিত কর্মজীবনের অসঙ্গতি, কৌতুকরসসিঞ্চিত হয়ে অন্তর্নিহিত বেদনার ফল্গুকে শিল্পীর নিজস্ব ভাষায় যেন ব্যক্ত করেছে। মৃদু সবুজ, গৈরিক ও রক্তবর্ণের আলোকসম্পাতে হৃদয়ের অনুভবকে প্রত্যক্ষ করে তোলার চিত্রসৌন্দর্য সপ্রশ্ন উল্লেখের দাবী রাখে।

*

কণ্ঠসঙ্গীতের শিল্পী বীয়ারস ফ্যামিলীর লোকসঙ্গীত শোনা গেল হিন্দী হাইস্কুলের রঙ্গমঞ্চে। 'আমেরিকা' বিভিন্ন দেশের অধিবাসী আবাসিত দেশ। তারই ফলশ্রুতি হোলো স্কটিশ, আইরিশ, ইংলিশ, জার্মান ইত্যাদি বিভিন্ন জাতির সম্মিলিত অবদানপুষ্ট এর লোকসঙ্গীতের ঐতিহ্য। এই নবজাত দেশের বিভিন্ন ধারাবাহী সংস্কৃতির নামই "আমেরিকান সংস্কৃতি।"

১৯ শতকের পর থেকে এই লোক-সঙ্গীতের ঐতিহ্যের প্রায়াবলুপ্তি ঘটে। ১৯৫০-এর পর থেকে এই আদিম সংস্কৃতির প্রতি নবজাগ্রত এক তৃষ্ণা জাগল। তখনই এই লোকঐতিহ্য সযত্নরক্ষিত উৎস বীয়ারস ফ্যামিলির আবিষ্কার ও সমাদর ঘটে। ২৫শে জানুয়ারী বব ইভলিন ও মার্থা পরিবেশিত সঙ্গীতানুষ্ঠানে লোকসংস্কৃতির



ম্যাক্সমুলার ভবনে নৃত্যরতা মিনতি মিশ্র

যন্ত্র ও সঙ্গীতের দিকটি আমাদের কাছে উন্মোচিত হোলো। লোকসঙ্গীতের প্রেরণা উৎস মোটের ওপর সকল দেশেই এক—সাধারণ জনজীবনের আনন্দবেদনা, স্বপ্ন, প্রবাদ ও রূপক যার ঘনীভূত রূপ। গ্রাম্য-জীবনের 'কান্না-হাসির দোল-দোলানো' 'পৌষ ফাগুনের মেলা' স্যালুট্রি, ব্যাঞ্জো, ফিড্‌ল ইত্যাদি লোকযন্ত্রের সঙ্গতে মূর্ত হয়ে উঠল। এ আনন্দ চরমে পৌছল যখন প্রেক্ষাগৃহে উপবিষ্ট মার্কিনী শ্রোতারা শিল্পীদের সঙ্গে কণ্ঠ মেলালেন অতি পরিচিত সুদূর দেশের মাটির গন্ধবাহী সঙ্গীতগুলির সঙ্গে। এই স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের উৎসধারায় অবগাহন করে আনন্দটুকুই ছিল আমাদের উপরি পাওনা। যন্ত্রসঙ্গীতে—ফিলাডেলফিয়া স্ট্রিং কোয়া-র্টেটের পরিবেশনায় ছিলেন ও'দেরই ভাষায় "দি ম্যাগ্‌নিফিশিয়াণ্ট ফোর" ভেজা রেনলস, আরউইন আইসেনবার্গ, চার্লস বার্নাড এবং অ্যালান ইগ্‌লিটিজিন। আপন দেশে এ'রা "ওয়ান অফ দি মোস্ট্ এ্যাড্‌ভেনচারাস্ অফ অল মিউজিক্যাল অরগেনাইজেশন" রূপে খ্যাত।

ইগ্‌লিন-উক্ত সঙ্গীতদর্শন অনুসারে সুপ্রতিষ্ঠিত প্রাজ্ঞ শিল্পীদের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক যুগের প্রগতিশীল শিল্পীদের সঙ্গীতচিন্তা পরিবেশন করাই এই শিল্পী-চতুষ্টয়ের লক্ষ্য। বীটোফেন থেকে বারটক, স্কুবার্গ থেকে সোয়েনবার্গ অবধি তাঁদের অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত। ক্লাসিক ও রোম্যাণ্টি-সিমের যুগ্ম পরিবেশনায় উজ্জ্বল নিদর্শন তাঁদের হিন্দী হাইস্কুলের সঙ্গীতানুষ্ঠান।

মোজার্টের কোয়ার্টেট ইন বি ফ্ল্যাটকে ৪৫৮ দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হোলো। শিল্পী-চতুষ্টয় এ্যাডাগিও এবং এ্যালেগ্রো অংশে অনুষ্ঠানকে স্মরণীয় করে তোলেন। একক অংশে সাঙ্গীতিক ভাষায় কথোপকথন, একাধারে নাটকীয় রস ও অর্কেস্ট্রার শক্তিশালী সুরনিক্ষেপে মর্মবাণী প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

লিও কিরচারের উত্তেজনাসঞ্চারী সঙ্গীতরচনার বেগবান গতি জীবনের প্রবহমান ভাবধারাকে সুস্পষ্ট করে তোলে।

নৃত্য-সঙ্গীত ও যন্ত্র-সঙ্গীতের এই দ্বিধারা উপহার দেবার জন্য ইন্দো-আমেরিকান কর্তৃপক্ষ ধন্যবাদার্হ।

একডালিয়া সঙ্গীত সম্মেলন

ছোট্ট পরিসরের মধ্যেও খুব জমে উঠেছিল দক্ষিণ কলকাতার একডালিয়া সঙ্গীত সম্মেলন। ২৫-২৬ এবং ২৭ জানুয়ারী যথাক্রমে রবীন্দ্রসঙ্গীত, আধুনিক ও উচ্চাঙ্গসঙ্গীত অধুনা সঙ্গীতজগতের এই ত্রিধারা সমন্বয় সকল শ্রেণীর শ্রোতাদের আনন্দের আয়োজনে উদ্যোক্তাদের ত্রুটি ছিল না। আর এই সঙ্কট যুগের হাজারো সমস্যাবিক্ষুব্ধ শ্রোতৃবৃন্দ আকণ্ঠ করেছে "পান সুধা নিরবধি"।

রবীন্দ্রসঙ্গীতে সর্বশ্রী দেবব্রত বিশ্বাস, সুচিত্রা মিত্র, চিন্ময় চ্যাটার্জি, সুমিত্রা সেন, দ্বিজেন মুখার্জি, সাগর সেন, চিন্তাপ্রিয় মুখার্জি ছাড়াও ছিলেন অলোকা দে এবং দেবীপ্রসাদ মল্লিক।

আধুনিক গানে মান্না দে, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, নির্মলেন্দু চৌধুরী, প্রতিমা ব্যানার্জি, উৎপলা ঘোষ, হাস্যকৌতুকে অজয় রায় এবং যন্ত্রে বাঙালায়া শ্রোতাদের আনন্দ দিয়েছেন।

উচ্চাঙ্গসঙ্গীতে শ্রীভীষ্মদেব উপস্থিত হতে পারেন নি। প্রতিশ্রুত অন্যান্য সকল শিল্পীই অনুষ্ঠানে যোগদান করেছেন।

তরুণ শিল্পীদের মধ্যে শ্রীমতী প্রগতি বর্মন বাগেশ্রী রাগে বিলম্বিত একতাল, দ্রুত ঝাপতাল, ত্রিতালে হিন্দোলবাহার এবং পরিশেষে ঠুংরী গেয়ে শোনালেন। সুর ও লয় উভয় বিচারেই তাঁর গান যথোচিত মানে প্রতিষ্ঠিত।

ওস্তাদ নাসির আমেদের "বেহাগ" রাগ-পরিবেশনায় তাঁর স্বভাবানুগ তানশিল্পীর বৈচিত্র্য ও দ্রুতগতিবেগ সঞ্চারিত হলেও কণ্ঠস্বর ঈষৎ ভগ্ন থাকায়, ওপরের দিকের পর্দায় সুরসঞ্চালন বিঘ্নিত। তাই আশানুরূপ জমে উঠতে পারেনি।

পণ্ডিত ভীমসেন যোশীর আশাবরী-টোড়ি অনেকরকম বাধা যথা শীতাধিক্য অথবা যে কারণেই হোক বসে-যাওয়া কণ্ঠস্বরে স্বাভাবিক মাধুর্যের অভাব, সহযোগী শিল্পীদের উপযুক্ত কণ্ঠস্বর সহায়তায় কার্পণ্য ইত্যাদি অতিক্রম করেও রসোত্তীর্ণ হয়ে শ্রোতাদের মনস্কামনা পূর্ণ করেছে।

আমজেদ আলির সরোদ বাজের দাপটে, তানের গতিচমকে এবং শিল্পীর আবেদন-সঞ্চারী আনন্দতন্ময় মেজাজে অত্যন্ত উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল। তবে বিস্তার অংশ আরো একটু সুসংবদ্ধ এবং সুচিন্তিত হলে এ'র বাদনশৈলী উপযুক্ত মর্যাদায় সুপ্রতি-ষ্ঠিত হয়ে জনপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে গুণী-জনেরও আনন্দের কারণ হবে।

নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় বাজালেন 'বিলাসখানি'। জয়দৃপ্ত বিদেশ সফরের পর এই একই রাতে উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতায় শ্রীব্যানার্জির যুগ্ম অনুষ্ঠান তাঁরই উপযুক্ত সু-উচ্চ শিল্পীমন, ধ্যান ও ধারণার আলোয় উজ্জ্বল। বিলাসখানি টোড়ির বিষন্ন গাম্ভীর্য ভাবতন্ময়ের পর ভৈরবী-ঠুংরীর রূপবাহারের আকাশে শ্রোতাদের চিত্তকে স্বচ্ছ মুক্তিদানের উজ্জ্বল আনন্দ তোলায় নয়। এই অনুষ্ঠান নিঃসন্দেহে এই আসরের শ্রেষ্ঠতম অনুষ্ঠান।

ভারত নাট্যম ও কথকে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য শিল্পী

সম্প্রতি বিড়লা আকাদামিতে আয়োজিত ভারতনাট্যম ও কথকনৃত্যের এক যুগ্ম অনুষ্ঠানে বৈচিত্র্যের চমক ছিল।

প্রথমে আমে-রিকান নৃত্যশিল্পী শ্রীমতী জুলি সেপড্। ইনি 'আমেরিকান মডার্ন ডান্সে'র ছাত্রী হলেও বালাসরস্বতীর নৃত্য দর্শনে মুগ্ধ হয়ে প্রহ্লাদ দাসের কাছে 'ভারতনাট্যম' শিক্ষা করছেন। সেদিন ইনি দেখালেন আলারিপু, নবরস-নটনাম-আদিনার।

বিষয়বস্তুগুলির গুরুত্ব যে কোনো নৃত্যদর্শকের নিকট সহজবোধ্য। মাত্র দশ মাসের শিক্ষা ও অনুশীলনীতে কোনো বিদেশিনী শিল্পীর পক্ষে এই নৃত্যবিষয়ের বিশ্লেষণ কত কঠিন তাও সহজেই অনুমেয়। কিন্তু এই কঠিন কাজে অপেক্ষাকৃত অনু-শীলনীর অপেক্ষা থাকলেও উপভোগের ভোজে বঞ্চিত হতে হয়নি। প্রথমেই যে বস্তু আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তা হচ্ছে শ্রীমতী জুলির নৃত্যের স্বতঃস্ফূর্ততা। ভারতনাট্যমের মত ব্যাপক ও সুকঠিন নৃত্যকে তিনি শিক্ষার বিষয়রূপে নির্বাচন করেছেন এবং নেচে আনন্দ পাচ্ছেন। এইটেই হোলো বড় কথা। রসের অভিব্যক্তিতে তিনি কতটা উত্তীর্ণ হয়েছেন সে প্রশ্ন না তোলাই ভাল। তবে এ অভাবের ক্ষতিপূরণস্বরূপ অন্যদিকও ছিল। বিভিন্ন দেহভঙ্গির নির্ভুল স্থাপনদক্ষতা প্রশংসনীয় লয়জ্ঞান। বিশেষ খণ্ডজাতি আটোয়া তালের মত ১৪ মাত্রার জটিল মাত্রা বিভাগে নির্ভুল পদক্ষেপ অকুণ্ঠ অভিনন্দনের দাবী রাখে। শ্রীপ্রহ্লাদ দাসের সুযোগ্য পুত্র চিত্রেশ দাসের কথকনৃত্য এই সন্ধ্যার বিশেষ অনুষ্ঠান। পরণ, চক্রধার, তকোর গৎ, রেলার সমন্বয়ের লক্ষ্ণৌ-ঘরানার কথকের এক প্রামাণ্য উদাহরণ তিনি দর্শক-দের কাছে পেশ করলেন। তবলা ও পাখোয়াজের বিভিন্ন বোলসমৃদ্ধ পরণের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তালের মাত্রাবিভাগে চিত্রেশের দৃপ্ত পদক্ষেপ সাহসিকতা ও আত্মবিশ্বাসে উজ্জ্বল। রেলার ছন্দবৈচিত্র্যে উপযুক্ত শিক্ষা ও রেওয়াজের সুস্পষ্ট ছাপ। শিল্পীর মৌলিকতা ব্যক্ত হয়েছে তৎকার অঙ্গভিত্তিক "ট্রেনচলা" বিভিন্ন গতির লয়-বিন্যাসে। গত বছর রবীন্দ্রভারতীতে এই নৃত্য প্রদর্শন করে সুবিখ্যাতা মার্কিনী শিল্পী পলিন-কোনারের লিখিত উক্তি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য "এ্যানাদার ডান্সার হু শোড মি সাম কোরিওগ্র্যাফি ওয়াজ এ বয় ট্রেন্‌ড্ ইন এনারজিটিক কথক স্টাইল অ্যাণ্ড হু ইউজড্ কথক ফুট অ্যাণ্ড বেল রিদম্‌স ইন এ্যাডভান্স হুইচ ট্রায়েড টু গিভ অ্যান ইম্‌প্রেশন অফ দি সাউণ্ডস এ্যাণ্ড ফিলিং অফ এ ট্রেনরাইড। ইট ওয়াজ এ রিমার্কেবল এভোকেশন এ্যাণ্ড দি ট্রেডিশনালিস্ট কনসিডার্ড ভেরী ডেয়ারিং।"

নৃত্যশেষে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান শিল্পী-দ্বয়কে অভিনন্দন-মাল্যে ভূষিত করেছেন। সকলের চেয়ে বড় শ্রীমতী কানন দেবী ও অমলাশঙ্করের উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন। এ যেন নবীন শিল্পীদ্বয়ের যাত্রাপথে শিল্পজগতের স্তম্ভস্বরূপ বিশিষ্ট শিল্পীব্যক্তিত্বদ্বয়ের আশীর্বাদ।

—চিত্রাঙ্গদা



খ্যাত পেশাদার টেনিস খেলোয়াড় পানচো গনজালেস : বিশ্ব পেশাদার টেনিস প্রতিযোগিতায় তিনি আটবারের বেশী খেতাব জয়ী হন।

টেনিসে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত

ক্ষেত্রনাথ রায়

ইংরেজদের জাতীয় চরিত্রের এক লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য তাদের প্রবাদবাক্যের সমতুল্য রক্ষণশীল নীতি। দেশের বৃহত্তর স্বার্থের কারণে এই নীতি তারা জীবনের ধ্যান-ধারণা হিসাবে গ্রহণ করেছে। তাদের রাষ্ট্র ও সমাজজীবনে এবং শিল্প-বাণিজ্য, শিক্ষা ও খেলাধুলার ক্ষেত্রে--সর্বত্রই রক্ষণশীল নীতির প্রভাব বিদ্যমান। এই নীতির যে পরিবর্তন কখনও হয় না, এমন নয়। তবে তা শম্বুক-গতিতে—দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর। যেমন ১৯৬৭ সালের ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে বৃটিশ লন টেনিস এসোসিয়েশন অনেক আলাপ-আলোচনার পর পেশাদার এবং অপেশাদার টেনিস খেলোয়াড়দের সম্পর্কে তাদের রক্ষণশীল নীতি বর্জন করেছেন। তাদের পূর্বনীতির পরিবর্তনের ফলে বৃটিশ লন টেনিস এসোসিয়েশনের এক্তিয়ারভুক্ত সমস্ত টেনিস প্রতিযোগিতায় পেশাদার খেলোয়াড়রাও অংশগ্রহণ করতে পারবেন। পূর্বে এইসব প্রতিযোগিতাগুলি একমাত্র অপেশাদার খেলোয়াড়দের জন্যে সংরক্ষিত ছিল—পেশাদার খেলোয়াড়রা অংশ-গ্রহণ করতে পারতেন না। গত ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে বৃটিশ লন টেনিস এসোসিয়েশনের ঐতিহাসিক সভায় যে ৩০০জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন তাদের মধ্যে মাত্র পাঁচজন সদস্য পূর্বনীতি পরিবর্তনের বিপক্ষে ভোট দেন। অর্থাৎ এই পাঁচজন সদস্য অপেশাদার এবং পেশাদার খেলোয়াড় সম্পর্কে এসোসিয়েশনের পূর্বনীতির পক্ষই সমর্থন করেন। এসোসিয়েশনের এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে আগামী ২৪শে এপ্রিল বৃটিশ হার্ডকোর্ট চ্যাম্পিয়ানশীপের যে আসর বসছে সেখানেই অপেশাদার এবং পেশাদার খেলোয়াড়রা একত্র যোগদানের প্রথম সুযোগ পাবেন। আন্তর্জাতিক টেনিস খেলার আসরে বেসরকারী বিশ্ব টেনিস প্রতিযোগিতা নামে সুপরিচিত ইংল্যান্ডের উইম্বলেডন লন টেনিস প্রতিযোগিতার আসর ১৯৬৮ সালের অনুষ্ঠানেই পেশাদার খেলোয়াড়রা অংশ গ্রহণ করতে পারবেন।

বৃটিশ লন টেনিস এসোসিয়েশনের এই সিদ্ধান্তটি কিন্তু ইন্টারন্যাশন্যাল লন টেনিস ফেডারেশনের সভাপতি মিঃ জর্জিয়ো দা স্টিফানির মনঃপুত হয়নি। তিনি প্রকাশ্যে বৃটিশ লন টেনিস এসোসিয়েশনকে বরখাস্ত করার ভয় দেখিয়েছেন। বৃটেনের সংবাদপত্রগুলি বৃটিশ লন টেনিস এসোসিয়েশনের সিদ্ধান্ত সমর্থন করে যে জনমত সৃষ্টি করেছেন তার যথেষ্ট মূল্য আছে। প্রখ্যাত 'দি টাইমস' পত্রিকা সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলেছেন, বৃটিশ যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তা নির্ভুল এবং সে সম্পর্কে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। টাইমস' পত্রিকা ইন্টারন্যাশানাল লন টেনিস ফেডারেশনের নীতির কঠোর সমালোচনা করে বলেছেন, ফেডারেশনের নীতি অসাংগতিরই পরিচয় এবং সংস্থার পক্ষে তা খুবই লজ্জার কারণ। 'টাইমস আরও বলেছেন এত এগিয়ে ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশনের কাছে নতি-স্বীকার করা বৃটেনের পক্ষে ভুল হবে। তাদের অর্থাৎ ইন্টারন্যাশানাল ফেডারেশনের এই ভণ্ডামির দরুণই দীর্ঘদিন ধরে টেনিস খেলার প্রভূত ক্ষতি হয়েছে। প্রখ্যাত 'ডেইলী এক্সপ্রেস' পত্রিকার মতে, 'বৃটেন সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছে, কারণ এক্ষেত্রে বাস্তবকেই স্বীকার করা হয়েছে।'

আন্তর্জাতিক টেনিস খেলার আসরে খেতাব জয়ের দিক থেকে যে দুটি দেশের নামডাক খুব বেশী সেই অস্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকা অপেশাদার এবং পেশাদার টেনিস খেলোয়াড়দের মধ্যে যে দীর্ঘকালের গন্ডী ছিল তা তুলে দেওয়ার পক্ষে ভোট দিয়েছে। ফলে বৃটেনের সিদ্ধান্ত আরও জোরদার হয়েছে। গত ৩০শে জানুয়ারী তারিখে অস্ট্রেলিয়ান লন টেনিস এসোসিয়েশন 'ওপন' টেনিসের পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। অস্ট্রেলিয়ার ৬টি স্টেটের মধ্যে ৫টি স্টেট সিদ্ধান্তের পক্ষে এবং মাত্র একটি স্টেট (ভিক্টোরিয়া) সিদ্ধান্তের বিপক্ষে ভোট দেয়। এই সিদ্ধান্তের ফলে অপেশাদার এবং পেশাদার টেনিস খেলোয়াড় সম্পর্কে পূর্বের ভেদনীতির অবসান হল। অপরদিকে ইউনাইটেড স্টেটস লন টেনিস এসোসিয়েশন ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখের সভায় বিপুল ভোটাধিক্যে 'ওপন' টেনিস সমর্থন করেছে। ওয়েস্ট জার্মান টেনিস ফেডারেশন বৃটেনকে সমর্থন করেছে তবে এ বছরের প্রথম 'ওপন' উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতায় তাদের খেলোয়াড়রা অংশ গ্রহণ করবে কিনা সে সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি। বৃটেন, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, পশ্চিম জার্মান প্রভৃতি দেশের সঙ্গে আরও অনেক দেশ 'ওপন' টেনিসের সমর্থক। তবে এ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার 'সুপ্রীম কোর্ট' হল ইন্টার-ন্যাশানাল লন টেনিস ফেডারেশন। আগামী ২৩শে মার্চ প্যারিসে ইন্টারন্যাশানাল লন টেনিস ফেডারেশনের অধিবেশনেই এ

সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানা যাবে। এদিকে বিভিন্ন দেশের টেনিস খেলার কর্মকর্তারা আজ মহা সঙ্কটে পড়েছেন। তাঁদের সামনে দুটি পথ খোলা আছে—পেশাদার খেলোয়াড়দের জন্যে প্রতিযোগিতার দ্বার উন্মুক্ত করার দাবী স্বীকার করে নেওয়া অথবা প্রতিভাশালী অপেশাদার টেনিস খেলোয়াড়দের নিয়েই প্রতিযোগিতার আসর করা। শেষের পথটি কিন্তু খুব সহজ নয়, নানা অভিযোগ, বাধা-বিপত্তি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। পেশাদার টেনিস খেলার পথপ্রদর্শক জ্যাক ক্র্যামার হুংকার দিয়ে বলেছেন, অনুমতি পাওয়া না গেলেও পেশাদার এবং অপেশাদার খেলোয়াড়রা আগামী উইম্বলেডন লন টেনিস প্রতিযোগিতার আসরে খেলতে নামবেই। সেক্ষেত্রে অপেশাদার খেলোয়াড়দের বরখাস্ত করার জন্যে কর্মকর্তাদের একটা বিরাট তালিকা তৈরী করতে হবে। বৃটিশ লন টেনিস এসোসিয়েশনের জনৈক মুখপাত্র বলেছেন, আমরা যে শিখা জ্বালিয়েছি তা বর্তমানে আন্তর্জাতিক টেনিস মহলে ছড়িয়ে গেছে।

এদিকে বিশ্ববিশ্রুত অপেশাদার টেনিস খেলোয়াড়রা পেশাদার খেলোয়াড়দের দলে যোগ দিতে শুরু করেছেন। ১৯৬৭ সালের ডেভিস কাপ বিজয়ী অস্ট্রেলিয়া দলের দুই সদস্য জন নিউকম্ব এবং টনি রোচ পেশাদার খেলোয়াড় হিসেবে আমেরিকার 'ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ানশীপ টেনিস' সংস্থার সঙ্গে তিন বছরের এক চুক্তি করেছেন। এই চুক্তি অনুযায়ী খেলার জন্যে গত বছরের উইম্বলেডন চ্যাম্পিয়ান জন নিউকম্ব ন্যূনপক্ষে ১০৫,০০০ আমেরিকান ডলার পারিশ্রমিক পাবেন। অপরদিকে রোচের পারিশ্রমিকের পরিমাণ ন্যূনপক্ষে ১২০,০০০ আমেরিকান ডলার।



আমেরিকার পেশাদার টেনিস খেলোয়াড় ডেনিস রলস্টোন

টেনিস খেলায় অপেশাদার এবং পেশাদার খেলোয়াড়দের যেভাবে দেখা হয় তা খেলার বৃহত্তর স্বার্থের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। অপেশাদার খেলোয়াড়দের সামাজিক পদমর্যাদা অনেক বেশী। সেখানে পেশাদার খেলোয়াড়রা 'একঘরে' হয়ে আছেন। এই ভেদনীতির ফলেই আর এক শ্রেণীর খেলোয়াড়দের আবির্ভাব হয়েছে—যাঁদের বলা হয় আধা-পেশাদার। এঁরা গাছেরও ফল পাড়েন এবং তলারও ফল কুড়িয়ে নেন। এই আধা-পেশাদার খেলোয়াড়রা সামাজিক মর্যাদা নষ্টের ভয়ে সরাসরি পেশাদার খেলোয়াড় দলে যোগ দেন না, কিন্তু ক্রীড়ানুষ্ঠানের দৌলতে পকেট এবং যাতায়াত খরচা বাবদ পেশাদার খেলোয়াড়দের সমান অর্থ উপার্জন করেন। খেলাধুলার বৃহত্তর স্বার্থের প্রশ্নে এই আধা-পেশাদার খেলোয়াড়দের উৎখাতের উদ্দেশ্যে পেশাদার খেলোয়াড় সম্পর্কে পূর্বের ভেদনীতির পরিবর্তনের চেষ্টা অনেকদিন ধরে আলাপ-আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বৃটেন সর্বপ্রথম এই ভেদনীতির বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যথেষ্ট সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে।



বিশ্ববিশ্রুত পেশাদার টেনিস খেলোয়াড় লুই হোড এবং রড লেভার

খেলাধুলা

দর্শক

ভারতবর্ষ বনাম অস্ট্রেলিয়া
চতুর্থ টেস্ট

অস্ট্রেলিয়া : ৩১৭ রান (ওয়াল্টার্স নট আউট ৯৪, সিহান ৭২ এবং লরী ৬৬ রান। প্রসন্ন ৬২ রানে ৩, বেদী ৪২ রানে ২ এবং কুলকার্ণী ৭৩ রানে ২ উইকেট)।

ও ২৯২ রান (কাউপার ১৬৫ এবং লরী ৫২ রান। প্রসন্ন ৯৬ রানে ৪ উইকেট)।

ভারতবর্ষ : ২৬৮ রান (আবিদ আলী ৭৮, পতৌদি ৫১ এবং ওয়াদেকার ৪৯ রান। ফ্রিম্যান ৮৬ রানে ৪ এবং সিম্পসন ৩৮ রানে ৩ উইকেট)।

ও ১৯৭ রান (আবিদ আলী ৮১ এবং ইঞ্জিনীয়ার ৩৭ রান। সিম্পসন ৫৯ রানে ৫ এবং কাউপার ৪৯ রানে ৪ উইকেট)।

প্রথম দিন (জানুয়ারী ২৬) :

অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসের ৬টা উইকেট খুইয়ে ২৪৫ রান করে। খেলায় অপরাজিত থাকেন ওয়াল্টার্স (৫০ রান) এবং জার্মান (২ রান)।

দ্বিতীয় দিন (জানুয়ারী ২৭) :

অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস ৩১৭ রানের মাথায় শেষ হলে খেলার বাকী সময়ে ভারতবর্ষ প্রথম ইনিংসের ৬টা উইকেট খুইয়ে ১৯৬ রান সংগ্রহ করেছিল। পতৌদি ১৪ রান এবং প্রসন্ন ৪ রান করে অপরাজিত ছিলেন।

তৃতীয় দিন (জানুয়ারী ২৯) :

ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস ২৬৮ রানের মাথায় শেষ হলে অস্ট্রেলিয়া ৪৯ রানে অগ্রগামী হয়ে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে এবং ৩ উইকেটের বিনিময়ে ২২২ রান তুলে দেয়। কাউপার ১২৬ রান করে অপরাজিত থাকেন।

চতুর্থ দিন (জানুয়ারী ৩০) :

অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস ২৯২ রানের মাথায় শেষ হলে খেলায় জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৩৪২ রান সংগ্রহ করতে ভারতবর্ষ দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে এবং ৬টা উইকেট খুইয়ে মাত্র ১৯৩ রান তুলতে সক্ষম হয়।

পঞ্চম দিন (জানুয়ারী ৩১) :

ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংসের বাকী ৪টে উইকেট খেলার পঞ্চম অর্থাৎ শেষ দিনে মাত্র ২৮ মিনিটে পড়ে গেলে তাদের দ্বিতীয় ইনিংস ১৯৭ রানের মাথায় শেষ হয়। ফলে অস্ট্রেলিয়া ১৪৪ রানে জয়ী হয়।



সিডনীর ভারতবর্ষ বনাম অস্ট্রেলিয়ার শেষ চতুর্থ টেস্টে আবিদ আলির আউটের দৃশ্য।

সিডনীর শেষ চতুর্থ টেস্টে অস্ট্রেলিয়া ১৪৪ রানে ভারতবর্ষকে পরাজিত করে টেস্ট সিরিজে ৪-০ খেলায় জয়লাভের গৌরব লাভ করে।

ভারতবর্ষের অধিনায়ক পতৌদি টসে জয়ী হলেও অস্ট্রেলিয়াকে সর্বপ্রথম ব্যাট করার দান ছেড়ে দেন। অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের ২৪৫ রানের (৬ উইকেটে) মাথায় প্রথম দিনের খেলা শেষ হয়। ২য় উইকেটের জুটি লরী এবং সিহান দলের ৭৫ রান তুলে দেন। আলোর অভাবে খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ের ৫৩ মিনিট আগে প্রথম দিনের খেলা শেষ হয়।

দ্বিতীয় দিনে ৩১৭ রানের মাথায় অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস শেষ হয়। ডগলাস ওয়াল্টার্স ৯৪ রান করে অপরাজিত থেকে যান। তাঁর দুর্ভাগ্য যে, তাঁর আর শত রান পূর্ণ হল না। এই দিনের খেলায় ভারতবর্ষ প্রথম ইনিংসের ৬টা উইকেট খুইয়ে মাত্র ১৯৬ রান সংগ্রহ করেছিল—অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের ৩১৭ রানের থেকে ১২১ রান কম, হাতে জমা মাত্র ৪টে উইকেট। ভারতবর্ষের গোড়াপত্তন খুব খারাপ হয় নি। দলের ১১১ রানের মাথায় ২য় উইকেট পড়েছিল। কিন্তু দলের ১৭৮ রানের মাথায় ৩য় ও ৪র্থ এবং ১৮৪ রানে ৫ম ও ৬ষ্ঠ উইকেট পড়ে যায়। অস্ট্রেলিয়া দলের প্রাক্তন অধিনায়ক বব সিম্পসন কোন রান না দিয়েই তাঁর ২০টি বলে ৩টে উইকেট পান। তাঁর বলে সুর্তি, জয়সীমা এবং নাদকার্ণী আউট হন।

তৃতীয় দিনে লাঞ্চের কিছু আগে ২৬৮ রানের মাথায় ভারতবর্ষের ইনিংস শেষ হয়। ভারতবর্ষ অন্যের বাকী ৪ উইকেটে ৭২ রান যোগ করেছিল। অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসের খেলায় ৪৯ রানে অগ্রগামী হয়ে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নেমে ৩ উইকেট খুইয়ে ২২২ রান করে। তাদের দ্বিতীয় ইনিংসের সূচনা ভালই হয়েছিল—প্রথম উইকেটের জুটিতে লরী (৫২ রান) এবং কাউপার (নট আউট ১২৬ রান) দলের ১১১ রান তুলে খেলার ভিত বেশ শক্ত করেছিলেন। কাউপার ২০২ মিনিটে তাঁর ১২৬ রান তুলে অপরাজিত থাকেন। টেস্ট খেলায় এই নিয়ে কাউপারের ৫টা সেঞ্চুরী হল। অস্ট্রেলিয়া দলের যখন ৭০ রান এবং কাউপারের মাত্র ৪১, সে সময় জয়সীমা এবং সুর্তির মধ্যে ভুল বোঝার দরুণ জয়সীমার হাত থেকে কাউপার আউট হওয়ার থেকে খুব জোর বেঁচে যান। এর জন্যে ভারতবর্ষকে শেষ পর্যন্ত খুব বেশী মূল্য দিতে হয়েছিল।

চতুর্থ দিনে ২৯২ রানের মাথায় অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হলে খেলায় জয়লাভের জন্যে ৩৪২ রান তুলতে ভারতবর্ষ দ্বিতীয় ইনিংসে খেলতে নামে। স্কোর বোর্ডে ভারতবর্ষের ২ উইকেট পড়ে ১৪৫ রান দেখে অনেকের মনে হয়েছিল ভারতবর্ষ জয়লাভের প্রয়োজনীয় রান তুলতে সক্ষম হবে। কিন্তু ভারতবর্ষ যথারীতি শোচনীয় বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে যায়। যেখানে খেলার এক সময়ে এক উইকেট পড়ে ১২০ রান ছিল, সেখানে দেখা গেল, ১৮০ রানের মাথায় ৬ষ্ঠ উইকেট পড়ে গেছে অর্থাৎ ৫ উইকেটের বিনিময়ে মাত্র ৬০ রান যোগ হয়েছে। চতুর্থ দিনের খেলায় মোট ১৩টা উইকেট পড়েছিল—অস্ট্রেলিয়ার ৭টা উইকেট ৭০ রানে এবং ভারতবর্ষের ৬টা উইকেট ১৯৩ রানে। অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসে তিনজন খেলোয়াড় রান-আউট হয়েছিলেন। ভারতবর্ষের এই দিনের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় একমাত্র আবিদ আলী আক্রমণাত্মক খেলায় ৮১ রান করে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

পঞ্চম অর্থাৎ শেষ দিনে ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংস মাত্র ২৮ মিনিট স্থায়ী ছিল। অস্ট্রেলিয়া মাত্র ৬·৬ ওভার বল দিয়ে ভারতবর্ষের বাকী ৪টে উইকেট ফেলে দেয়। ১৯৭ রানের মাথায় ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়। অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক ববি সিম্পসন ১৬টা বলে মাত্র দুই রান দিয়ে নাদকার্ণী, প্রসন্ন এবং বেদীকে আউট করেন। ভারতবর্ষের শেষ জয়সীমার উইকেট পান কাউপার। ভারতবর্ষ পূর্ব দিনের ১৯৩ রানের (৬ উইকেটে) পুঁজি নিয়ে শেষ দিনে খেলতে নামে। পূর্ব দিনের রানের সঙ্গে কোন রান যোগ হওয়ার আগেই দুটো উইকেট (নাদকার্ণী এবং প্রসন্ন) পড়ে যায়। শেষ দিনের চার রান তুলেছিলেন বেদী (২ রান), কুলকার্ণী (এক রান) এবং জয়সীমা (এক রান)। বিদায়ী টেস্ট খেলোয়াড় সিম্পসন দ্বিতীয় ইনিংসে ৫৯ রানে ৫টা এবং কাউপার ৪৯ রানে ৪টে উইকেট পান। তাছাড়া সিম্পসন তিনটে ক্যাচ ধরে ইঞ্জিনীয়ার (৩৭ রান), আবিদ আলী (৮১ রান) এবং বোরদেকে (৪ রান) আউট করেন।

ব্যাটিং ও বোলিংয়ের গড়

ব্যাটিংয়ের গড়পড়তা তালিকায় উভয় দলের মধ্যে শীর্ষস্থান পেয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার ডগলাস ওয়াল্টার্স—খেলা ২, ইনিংস ৪, নট-আউট ২ বার, মোট রান ২৫৪, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ৯৪* এবং গড় ১২৭·০০। ভারতবর্ষের পক্ষে শীর্ষস্থান পেয়েছেন পতৌদি—খেলা ৩, ইনিংস ৬, মোট রান ৩৩৯, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ৮৫ এবং গড় ৫৬·৫০। উভয় দলের পক্ষে সর্বাধিক মোট রান করেছেন অস্ট্রেলিয়ার কাউপার—খেলা ৪, ইনিংস ৭, নট-আউট ০, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১৬৫, মোট রান ৪৮৫ এবং গড় ৬৯·২৮। ভারতবর্ষের পক্ষে সর্বাধিক মোট রান করেছেন রুসী সুর্তি—খেলা ৪, ইনিংস ৮, নট-আউট ০, মোট রান ৩৪৯, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ৭০ এবং গড় ৪৩·৩৭।

বোলিংয়ের গড়পড়তা তালিকায় শীর্ষস্থান পেয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার ববি সিম্পসন—ওভার ৭৯, মেডেন ২০, রান ১৮৮, উইকেট ১৩ এবং গড় ১৫·২৩। ভারতবর্ষের পক্ষে শীর্ষস্থান পান প্রসন্ন—ওভার ১৯৪·৫, মেডেন ৩৪, রান ৬৮৬, উইকেট ২৫ এবং গড় ২৭·৪৪। তাছাড়া প্রসন্ন উভয় দলের পক্ষে সর্বাধিক উইকেট (২৫টি) পাওয়ার গৌরব লাভ করেছেন। তাঁর পরই সুর্তির স্থান—উইকেট সংখ্যা ১৫ (গড় ৩৫·২০)। অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে সর্বাধিক উইকেট (১৩টি) পেয়েছেন তিনজন—সিম্পসন (গড় ১৫·২৩) কাউপার (গড় ১৮·৩৮) এবং ম্যাকেঞ্জী (গড় ২৪·০০)।

সেঞ্চুরী করার গৌরব লাভ করেছেন অস্ট্রেলিয়ার চারজন—নামী খেলোয়াড় বব কাউপার ২টি (১০৮ ও ১৬৫), ববি সিম্পসন (১০৯), আয়ান চ্যাপেল (১৫১) এবং বিল লরী (১০০)। অপর দিকে ভারতবর্ষের পক্ষে মাত্র এম এল জয়সীমা সেঞ্চুরী (১০১ রান) করেন।

টেবল টেনিস টেস্ট

ভারত সফরকারী জাপানী টেবল টেনিস দল বোম্বাইয়ের প্রথম টেস্টে ৫-০ এবং বাঙ্গালোরের দ্বিতীয় টেস্টে ৫-০ খেলায় ভারতবর্ষকে পরাজিত করেছে।

প্রথম টেস্টের ফলাফল

টোকিও তাসাকা ১৮-২১, ২১-১৬ ও ২১-৯ পয়েন্টে ভি এম মার্চেন্টকে পরাজিত করেন।

সিগেও ইটো ২১-৫ ও ২১-১২ পয়েন্টে মীর কাসিম আলীকে পরাজিত করেন।

তোকুয়াসু নিসি ২১-১৩ ও ২১-১৬ পয়েন্টে ফারুক খোদাজিকে পরাজিত করেন।

সিগেও ইটো ২১-৫ ও ২১-১৫ পয়েন্টে ভি এম মার্চেন্টকে পরাজিত করেন।

টোকিও তাসাকা ২১-১৪ ও ২১-৯ পয়েন্টে ফারুক খোদাইজিকে পরাজিত করেন।

বিশ্বজয়ী জাপান

১৯৫২ সালে বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় প্রথম যোগদান করে ৪টি খেতাব জয়ের সূত্রে (মহিলা বিভাগের কোর্বিলোন কাপ, ব্যক্তিগত বিভাগে পুরুষদের সিঙ্গলস ও ডাবলস এবং মহিলাদের ডাবলস) জাপান আন্তর্জাতিক টেনিস মহলে একেবারে রাতারাতি খ্যাতি-লাভ করে। ১৯৫৩ সালে জাপান রাজনৈতিক কারণে বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় যোগদান করেনি। ১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় জাপানের সাফল্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য—১৯৫৪ সালে ৩টি খেতাব, ১৯৫৫ সালে ২টি খেতাব, ১৯৫৬ সালে ৪টি খেতাব, ১৯৫৭ সালে ৫টি খেতাব, ১৯৫৯ সালে ৬টি খেতাব, ১৯৬১ সালে ৩টি খেতাব, ১৯৬৩ সালে ৪টি খেতাব, ১৯৬৫ সালে ২টি খেতাব এবং ১৯৬৭ সালে ৬টি খেতাব। এখানে উল্লেখ, ১৯৫৭ সালের পর এক বছর অন্তর বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার আসর বসছে এবং প্রতিযোগিতায় খেতাবের সংখ্যা মোট ৭টি—দলগত বিভাগে ২টি এবং ব্যক্তিগত বিভাগে ৫টি। মোট এই ৭টি খেতাবের মধ্যে জাপান দু'বার (১৯৫৯ ও ১৯৬৭ সালে) একই বছরে ৬টি করে খেতাব জয়ের গৌরব লাভ করেছে। [illegible] জাপান ১০টি প্রতিযোগিতায় [illegible] মোট ৭০টি খেতাবের [illegible] জয় হয়েছে [illegible] ১৯৫২ সালে ১৯৩ম বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় জাপানের ৪টি [illegible] ১৯৬৫ সালের [illegible] হয়। [illegible] বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় [illegible] প্রজাতন্ত্রী চীন এবং [illegible] সাতটি [illegible] ছিলেন। [illegible] এই [illegible] টেনিস প্রতিযোগিতার [illegible] মধ্যে [illegible] হয়েছে। [illegible] ১২টি [illegible] ১৯৫৩ সালে [illegible] প্রজাতন্ত্রী চীন [illegible] করেনি।

[illegible] টেবল টেনিস [illegible] (১৯৬৭) [illegible] জাপানের [illegible] এবং [illegible] নিসি। এই দুজন খ্যাতনামা খেলোয়াড় ছাড়া [illegible] উদীয়মান খেলোয়াড় দলভুক্ত হয়েছেন।

আগামী ১২ই ফেব্রুয়ারী কলকাতার রঞ্জি স্টেডিয়ামে জাপান বনাম ভারতবর্ষের ৩য় টেবল টেনিস টেস্ট খেলার আসর বসবে।

জাতীয় বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা

জব্বলপুরে আয়োজিত অষ্টাদশ জাতীয় বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় গত বছরের চ্যাম্পিয়ান সার্ভিসেস দল পুরুষ বিভাগের খেতাব জয়ী হয়েছে। অপর দিকে মহারাষ্ট্র খেতাব পেয়েছে মহিলা এবং বালক বিভাগে।

ফাইনাল খেলা

পুরুষ বিভাগ : সার্ভিসেস দল ৭৮-৬৪ পয়েন্টে রেলওয়ে দলকে পরাজিত করে।

মহিলা বিভাগ : মহারাষ্ট্র ৪০-৩৩ পয়েন্টে বাংলাকে পরাজিত করে।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

চুল উঠে যাওয়ার জন্য বিব্রত?



আজ থেকে সিলভিক্রিন ব্যবহার করে চুলের পুনর্জীবন ফিরিয়ে আনুন

বিপদের এই সব সঙ্কেত অবহেলা করবেন না

চুল উঠে যাওয়া। মাথার তালুতে চুলকানি। নির্জীব শুকনো চুল। এই সব লক্ষণ থেকেই বুঝা যায় যে আপনার চুল বেড়ে ওঠার জন্য যে জীবনদায়ী খাদ্যের প্রয়োজন তার অভাব হচ্ছে। এর ফলে অকালে আপনার মাথায় টাক পড়তে পারে। তাই এই সব লক্ষণ দেখা দিলেই বুঝতে হবে আপনার চাই—সিলভিক্রিন—যেটি চুলের জীবনদায়ী স্বাভাবিক খাদ্য।

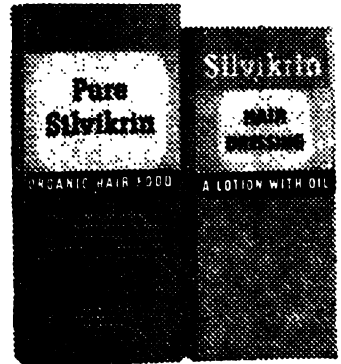
সিলভিক্রিন কি ভাবে কাজ করে ?

চুলের গঠনের জন্য যে ১৮টি অ্যামিনো অ্যাসিড দরকার হয়, প্রকৃতি তা জোগায়। একমাত্র সিলভিক্রিনেই রয়েছে সেইসব অ্যামিনো অ্যাসিডের মূলতত্ত্বের নির্যাস। এটি চুলের গোড়ায় গিয়ে তাকে খাদ্য জোগায় ও শক্তিশালী করে তোলে ও সুস্থ চুল বেড়ে ওঠায় সাহায্য করে।

ব্যবহার-বিধি

প্রত্যহ দুমিনিট করে মাথার তালুতে পিওর সিলভিক্রিন মালিশ করুন। চুলের অবস্থার উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত পিওর সিলভিক্রিন ব্যবহার করে চলুন। একবার চুলের স্বাস্থ্য ফিরে এলে তাকে অটুট রাখবার জন্য নিয়মিতভাবে সিলভিক্রিন হেয়ারড্রেসিং মাখুন—এটি পিওর সিলভিক্রিন মেশানো একটি অয়েল বেস্।

বিনামূল্যে 'অল অ্যাবাউট হেয়ার' শীর্ষক পুস্তিকার জন্য এই ঠিকানায় লিখুন—ডিপার্টমেন্ট A-7 পোস্টবক্স ১২১, বোম্বাই-১।



সিলভিক্রিন উৎপাদন পুরুষ ও মহিলা সকলেরই ব্যবহার উপযোগী।

সিলভিক্রিন

চুলের জীবনদায়ী স্বাভাবিক খাদ্য

LPE-Alpars S. I BEN

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের

বিচিত্র কাহিনী

(৪র্থ সংস্করণ)

নবীন ও প্রবীণদের সমান

আকর্ষণীয়

অজস্র চিত্র সম্বলিত

বিচিত্র গল্পগ্রন্থ। মূল্য: দুই টাকা

লেখকের

আর একখানা বই

আরও বিচিত্র কাহিনী

অসংখ্য ছবিতে পরিপূর্ণ

দাম: তিন টাকা

প্রকাশক:

এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স

প্রাইভেট লিমিটেড

সকল পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

ন্যাশনালের প্রকাশিত কয়েকটি বই

নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাস

মিখাইল শলোখফ

ধীর প্রবাহিনী ডন ৯·০০

সাগরে মিলায় ডন (১ম খন্ড) ৬·০০ ... ২য় খন্ড ৭·০০

●

ইলিয়া এরেনবুর্গ

পারীর পতন ৮·০০

নবম তরঙ্গ (২য় খন্ড) ৬·০০ ... ৩য় খন্ড ৭·৫০

আলেকজান্ডার কুপরিন — রক্তবলয় ৫·৫০

সদরুদ্দিন আইনী — সেকালের বুখারায় ৪·০০

গল্প ও উপন্যাস

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় — উত্তরকালের গল্প সংগ্রহ ১০·০০

সৌরি ঘটক — কমরেড ৪·৫০

প্রবন্ধ ও ইতিহাস

মুজফ্‌ফর আহমদ — কাজী নজরুল ইসলাম-স্মৃতিকথা ১৩·০০

আবদুল হালীম — নবজীবনের পথে ৫·০০

চিত্তরঞ্জন দেব

বাংলার পল্লীগীতি ৮·০০

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিঃ

১২ বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

শাখা: নাচন রোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর-৪





পোড়া··· কাটা··· পোকার কামড়

এই সব আকস্মিক দুর্ঘটনায়

এ্যাক্রিমেণ্ট

চর্বিবর্জিত এ্যান্টিসেপটিক মলম

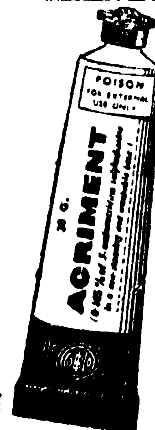
নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য

সংক্রমণ প্রতিরোধক □ সত্বর আরামদায়ক

শিশুদের কোমল ত্বকের পক্ষেও নিরাপদ □ দাগ লাগে না



বেঙ্গল ইমিউনিটির তৈরী



হাতের কাছে রাখুন

৭ম বর্ষ
৪র্থ খণ্ড

অমৃত

৪১শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday 16th February, 1963 শুক্রবার ৩রা ফাল্গুন, ১৩৭৪ 40 Paise

সূচীপত্র

'রূপা'র বই

॥ কিশোর গ্রন্থ ॥

পরিচয় গুপ্ত

আষাঢ়ে ভূতের গল্প

(৪·০০)

তোমার 'আষাঢ়ে ভূতের গল্প' শীতের মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যা বেশ গরম করে জমিয়ে পড়ে শেষ করেছি। বড় ভাল লেগেছে। তোমার কাছ থেকে বাংলাদেশের ছেলেরা ভূতদের পরিচয় পেয়ে ভূতভয় বিজয়ী হোক। এবং বাংলার শিশুসাহিত্য তোমার রচনায় সমৃদ্ধ হোক।

—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের
আরও কয়েকখানি কিশোরগ্রন্থ:—

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়
বোর্ডিং ইস্কুল
(উপন্যাস) ৩·০০

খগেন্দ্রনাথ মিত্র
গড় জঙ্গলের কাহিনী
(উপন্যাস) ৩·৫০

কল্যাণকুমার মুখোপাধ্যায়
হেঁয়ালিকা
(সচিত্র কথামালা) ২·০০

অলোকেন্দ্রনাথ ঠাকুর
ছবির রাজা
ওবিন ঠাকুর ৩·০০

অনু বন্দ্যোপাধ্যায়
বহুরূপী গান্ধী
(চরিত্র চিত্রণ) ৬·০০

আমাদের পূর্ণ গ্রন্থতালিকার জন্য লিখুন



রূপা অ্যান্ড কোম্পানী
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট কলকাতা-১২
Phone 34-4821 * 34-6305

জয়তু মহাত্মা শিশিরকুমার



অমৃত

সম্পাদকীয়

শতাব্দীর অভিনন্দন

একশত বৎসর একটি জাতির ইতিহাসে খুব বেশি সময় নয়। কিন্তু আমাদের জাতির ইতিহাসে বিগত একশত বৎসর নানাদিক দিয়ে চিহ্নিত হয়ে আছে অগ্রযাত্রার পদক্ষেপে, সাফল্যের কীর্তির আলোকে। ভারতবর্ষের নবযুগের অধ্যায়রূপে এই শতাব্দী আমাদের কাছে এবং উত্তরকালের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই স্মরণীয় শতাব্দীর সমানবয়সী হল ভারতের সংবাদপত্র-জগতের পুরোধা অমৃতবাজার পত্রিকা। এই বৎসর ২০শে ফেব্রুয়ারী অমৃতবাজারের শতবর্ষপূর্তি। তার উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন চলছে নানাভাবে। দেশ-বিদেশ থেকে খ্যাতনামা মনীষী, রাষ্ট্রনীতিবিদ, শিল্পী, সাহিত্যিক ও লেখক, সাংবাদিক ও দার্শনিক পত্রিকার শতবর্ষ জয়ন্তী উপলক্ষে পাঠিয়েছেন অভিনন্দন। আমরা পত্রিকার কনিষ্ঠতম সহযোগী হিসেবে শতাব্দীর বনস্পতিকে জানাই অন্তরের অভিবাদন। পত্রিকা শতবর্ষ অতিক্রম করেছে, আরও বহু শতাব্দী তাকে অতিক্রম করে যেতে হবে জাতির অগ্রগতির সঙ্গে পা মিলিয়ে, তার দুঃখ-সুখ, আশা এবং নিরাশার সঙ্গী হয়ে।

বাঙালীর গৌরব এই যে, তাদের একটি প্রতিষ্ঠান বিপুল প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে শতবর্ষের বৈজয়ন্তী উড্ডীন করেছে স্বাধীন চিন্তা ও লেখনীর মুক্ত আকাশে। অমৃতবাজার বাংলাদেশের প্রকৃত প্রতিভূরূপেই আত্মপ্রকাশ করেছিল। শহরের চাকচিক্য তখন তার ছিল না যশোহর জেলার পলুয়া-মাগুরো গ্রামে (বর্তমান নাম অমৃতবাজার) মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ ও তাঁর ভ্রাতাদের প্রচেষ্টায় পত্রিকার প্রথম আবির্ভাব। সে-যুগে সহায়-সম্বলহীন আদর্শবাদী বাঙালী যুবকের পক্ষে এত বড় একটা দায়িত্ব গ্রহণ সহজ কথা ছিল না। বিশেষত পত্রিকা তার জন্মলগ্ন থেকেই ছিল ভারতে বৃটিশ স্বৈরাচারের কঠোর সমালোচক। নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দুর্জয় ঘোষণা নিয়ে শিশিরকুমারের স্বাধীন সাংবাদিকতার সূত্রপাত। তারপর সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন চিন্তা, সংস্কারের বিরোধিতা এবং সুস্থ পরিচ্ছন্ন সমাজ প্রবর্তনের জন্য অবিশ্রান্তভাবে তিনি তাঁর লেখনী প্রয়োগ করেছেন।

পত্রিকার কণ্ঠ স্তব্ধ করার জন্য তদানীন্তন বৃটিশ শাসকদের প্রেস আইন প্রবর্তন ঐতিহাসিক কলঙ্কের স্মারক হয়ে আছে। অমৃতবাজার পত্রিকার আদর্শবাদী ও অকুতোভয় সম্পাদক বাংলা পত্রিকাকে ইংরেজিতে রূপান্তরিত করে স্বৈরাচারী বৃটিশ শাসকদের সেদিন বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করেছিলেন। অমৃতবাজার পত্রিকা তখন থেকেই ইংরেজি পত্রিকা। কিন্তু বিদেশী ভাষায় প্রকাশিত হলেও নামে ও কাজে অমৃতবাজার রয়ে গিয়েছিল সম্পূর্ণ ভারতীয়। ভারতের কল্যাণ, ভারতের মুক্তি, ভারতের উন্নয়নই হল তার ধ্যান, তার স্বপ্ন, তার সমগ্র কর্মপ্রয়াসের একমাত্র উদ্দেশ্য। বহু বৎসর পর জাতির চরমতম দুর্দিনে অমৃতবাজারের সাংবাদিকতার উৎকর্ষ ও অবিচল আদর্শনিষ্ঠার উল্লেখ করে গান্ধীজী বলেছিলেন, অমৃতবাজার পত্রিকা সত্যিই অমৃত।

জনগণের আশীর্বাদ ও অকুণ্ঠ সমর্থন না থাকলে কোনো সংবাদপত্র এত দীর্ঘকাল অবিচলিতভাবে তার কর্তব্য সম্পাদন করতে পারে না। অমৃতবাজার পত্রিকার নাম আজ প্রতি ঘরে-ঘরে। বৃটিশ আমলে পত্রিকার চেয়ে বিত্তশালী অনেক সংবাদপত্র ছিল, যারা বিদেশী সরকারের প্রসাদপুষ্ট হয়ে ভারতের জনগণের আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে ব্যর্থ করে দিতে চেয়েছিল। তাদের সেই চেষ্টা সফল হতে পারেনি, তার কারণ জনগণ সেদিন সমর্থন জানিয়েছিল অমৃতবাজার পত্রিকার মতো দেশকল্যাণব্রতী সংবাদপত্রের প্রতি।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর সংবাদপত্রের স্বাধীনতাও স্বীকৃত। কিন্তু পত্রিকার কর্তব্য তাতে শেষ হয় না। সংবাদপত্রকে বলা হয় জনমতের দর্পণ এবং জনমতের সংগঠক। দেশ স্বাধীন হবার পর আমাদের সমস্যা আরও স্পষ্টভাবে দেশবাসীর সামনে উপস্থিত হয়েছে। এই সময়ে পত্রিকার দায়িত্ব বেড়েছে বহুগুণ। দেশের স্বাধীনতা রক্ষা, তার অখণ্ডতা অটুট রাখা এবং তার সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য জনমতকে সতর্ক ও সজাগ রাখার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে পত্রিকা। সামাজিক ন্যায় বিচারের জন্য পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সম্পাদক মহাত্মা শিশিরকুমারের প্রজ্জ্বলন্ত আদর্শের শিখাই তাঁর উত্তরসূরীদের পথ প্রদর্শন করে নিয়ে যাচ্ছে। জন্মভূমির দুঃখমোচনের জন্য যশোহরের এক ক্ষুদ্র গ্রামে আদর্শে উদ্দীপ্ত ভ্রাতৃবৃন্দ যে মহান্ ব্রত উদযাপন করেছিলেন, আমরা আজ সশ্রদ্ধচিত্তে সেই কল্যাণব্রতের শতাব্দীপূর্তি উৎসবে যোগদান করি।

অমৃতবাজারের সহযোগীরূপে অমৃত তার ক্ষুদ্র পরিসরে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছে। অমৃত এক্ষেত্রে নবাগত। কিন্তু তার সামনে রয়েছে শতাব্দীর সাক্ষীস্বরূপ এই বনস্পতি। কত ঝড়, কত বিদ্যুৎ-চমক কত প্রসন্ন সূর্যোদয়ের স্মৃতি বক্ষে ধারণ করে এই মহীরূহ নিশ্চিত সত্যের মতো দণ্ডায়মান। তার জয়যাত্রা অব্যাহত থাকুক, এই আজ কনিষ্ঠের অভিনন্দন অগ্রজের প্রতি।

জয়তু অমৃতবাজার পত্রিকা।

মহাত্মাজীর বাণী



১৯৪৭ সালে অমৃতবাজার পত্রিকা যখন সাম্প্রদায়িক মত্ততার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছিল, মহাত্মা গান্ধী তখন বলেছিলেন — "অমৃতবাজার পত্রিকা সত্যিই অমৃত।"

জাতির জনকের কাছ থেকে অমৃতবাজার পত্রিকার এ এক বিরাট পুরস্কার।



রবীন্দ্রনাথের প্রথম কবিতা

(পত্রিকায় প্রকাশিত)

হিমাদ্রি শিখরে শিলাসন পরি,
গান ব্যাস-ঋষি বীণা হাতে করি—
কাঁপায়ে পর্বত শিখর কানন,
কাঁপায়ে নীহার শীতল বায়।

২

স্তব্ধ শিখর স্তব্ধ তরুলতা,
স্তব্ধ মহীরুহ নড়েনাক পাতা।
বিহগ নিচয় নিস্তব্ধ অচল;
নীরবে নির্ঝর বহিয়া যায়।

৩

পূর্ণিমা রাত চাঁদের কিরণ -
রজত ধারায় শিখর কানন,
সাগর-উরমি, হরিত-প্রান্তর,
প্লাবিত করিয়া গড়ায়ে যায়।

৪

ঝংকারিয়া বীণা কবিবর গায়,
"কেনরে ভারত কেন তুই হায়,
আবার হাসিস্! হাসিবার দিন
আছে কি এখনো এ ঘোর দুঃখে!

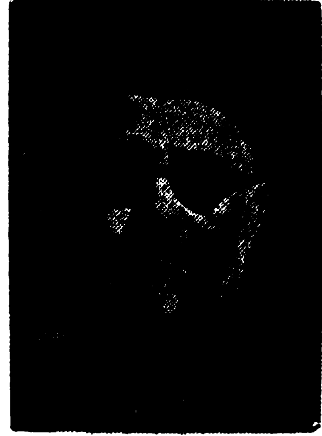
[সম্পূর্ণ কবিতাটি অন্যত্র]

মহামতি লেনিন বলেছেন :

জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিস্তারিত বিবরণ অমৃতবাজার পত্রিকা যখন নির্ভীকভাবে সারা বিশ্বের সামনে তুলে ধরেছিল, পত্রিকার অন্যতম বিশিষ্ট পাঠক মহামতি লেনিন তখন অমৃতবাজারের সেই সংবাদ পাঠ করে ভারতবর্ষের প্রতি তাঁর গভীর সহানুভূতি জানাবার জন্যে নির্দেশ দিলে উত্তর ভারতের বলশেভিক ব্যুরোর চীফ এজেন্ট অ্যালেক্সিয়েভ যে পত্র দিয়েছিলেন নীচে তা উদ্ধৃত হোল :

"মঁসিয়ে লেনিন আপনার বিখ্যাত কাগজে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের মর্মস্পর্শী বিবরণ পড়েছেন এবং তিনি আমাকে ভারতবর্ষের জনগণকে জানাতে বলেছেন যে, সোভিয়েত সরকার তাঁদের ভারতীয় ভ্রা তৃ বৃ ন্দে র ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতিশীল। যেহেতু আপনি ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় পত্রিকাটি সম্পাদনা করছেন, তাই আমি আপনাকে এই চিঠি পাঠাতে প্রয়াসী হয়েছি।"





অমৃতবাজার পত্রিকার শতবার্ষিকী উৎসব শুরু হচ্ছে ২০ ফেব্রুয়ারী রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন এবং প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী।

শতবার্ষিকী উপলক্ষে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

একটি ভাল সংবাদপত্র ইতিহাস সংকলন করা যায়। আর একটি মহৎ সংবাদপত্র সেই ইতিহাসকে রূপায়িত করে। অমৃতবাজার পত্রিকা নিষ্ঠা ও গৌরবের সঙ্গে বাংলাদেশ এবং ভারতের সেবা করেছে। স্বাধীনতা সংগ্রামে এর বিরাট অবদান আছে। পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা এবং দীর্ঘকালের সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ স্বাধীনতার জন্যে তাঁর লেখনী পরিচালনা করে গেছেন।

তাঁর ভাই মতিলাল ঘোষ তদানীন্তন সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের বিরুদ্ধে যে কঠোর সংগ্রাম চালিয়েছিলেন সাংবাদিকতার ইতিহাসে তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এ'দের আদর্শ পরবর্তী দিনে পত্রিকার সম্পাদকদের এবং মালিকদের অনুপ্রেরণা দিয়েছে। আদর্শবাদ, বুদ্ধিজীবীর সততা এবং জনসেবার সংকল্পই এখন সংবাদপত্রকে বাঁচাতে পারে এবং একে ব্যবসাদারী একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করার পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে।

বিবেকসম্মত সেবার শতবর্ষ পূরণের জন্যে আমার অভিনন্দন জানাচ্ছি।



সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন

"...দীর্ঘকাল ধরে স্বাধীনতাযুদ্ধে এবং যে অসমাপ্ত বিপ্লব সমাধা করতে আমরা ব্যস্ত আছি তাতে এই পত্রিকা সহায়তা করে এসেছে। দলগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে স্বাধীনভাবে নিজস্ব মতামত প্রকাশের জন্যে এই পত্রিকার জনসেবা অমূল্য। মূলত এটি জাতীয় সংবাদপত্র। জাতীয় এই হিসেবে যে, এ কোন বিশেষ স্বার্থকে রক্ষা করবার প্রতিশ্রুতি নেয় নি। ভবিষ্যতে এর আরো সাফল্য কামনা করি এবং আশা করি যে কোন গোষ্ঠীর চাপ থেকে অটল হয়েই এর নিজের নীতির অনুসরণ করে চলবে। আজকের দিনে সংবাদপত্রগুলি যখন বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীর সহায়তায় তাদের বিশেষ স্বার্থগুলি রক্ষা করে চলে তখন অমৃতবাজার পত্রিকার মত একটি স্বাধীন সংবাদপত্র থাকা মঙ্গলজনক।"

পত্রিকার অবদান



আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

"বাল্যকাল থেকেই আমি অমৃতবাজার পত্রিকার পাঠক। বছরের পর বছর ধরে আমি এই কাগজের নিয়মিত পাঠক। এমন কথাও বলতে পারি যে, এটি আমার তরুণ বয়সের প্রথম প্রেম এবং এই ভালবাসা আজ পর্যন্ত টি'কে আছে। জনসাধারণের সেবায় পত্রিকার দৃঢ়তা সম্পর্কে আমার সপ্রশংস মনোভাব কখনো কমে নি। আমাদের জাতীয় জীবনের প্রগতির প্রতিটি স্তরে একে জনমতের সামনে দেখা গিয়েছে। আমার দেশের মতই আমি একে ভালবাসি।"

তেজবাহাদুর সপ্রু

"অমৃতবাজার পত্রিকা একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। অতীতে এ অনেক কাজ করেছে এবং আজকের দিনে আরো অনেক বেশী সেবা করতে পারে।"

লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক

"শিশিরবাবুর সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয়ের সম্মান ও সৌভাগ্য আমার ঘটেছিল। তাঁর পদপ্রান্তে বসে অনেক শিক্ষা আমি পেয়েছিলাম। তাঁকে আমার পিতার মতই আমি সম্মান করতাম এবং একথাও বলতে পারি যে, পরিবর্তে তিনিও আমায় পুত্রবৎ স্নেহ করতেন।"

"আমার কাছে মনে হয় শিশিরবাবু ছিলেন এদেশের সাংবাদিকদের পথিকৃৎ... পত্রিকায় তাঁরই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ দেখা যায়...তখনকার দিনে স্বাধীন ও মুক্ত সাংবাদিকতা সহজ ছিল না। কি উৎসাহ এবং আগ্রহের সঙ্গে আমার প্রদেশে পত্রিকার জন্যে অপেক্ষা করা হত তা আমি জানি। আমরা স্বদেশী ভাষায় যখন সংবাদপত্র প্রকাশ করি তখন অমৃতবাজার পত্রিকারই অনুসরণ করেছিলাম।"



রাজেন্দ্রপ্রসাদ

"স্বাধীনতার দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে ভারতের জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রের অংশ অনেকখানি। বিদেশী প্রভুদের লৌহকঠিন নিষ্পেষণ একে সহ্য করতে হয়েছে। এদের স্বত্বাধিকারীদের প্রভূত ক্ষতি হয়েছে এবং সম্পাদকদের দীর্ঘকাল কারাবাস করতে হয়েছে।

"অমৃতবাজার পত্রিকার স্থান জাতীয় সংবাদপত্রগুলির মধ্যে অতি উচ্চে এবং এর আত্মত্যাগের জন্যে ভারতীয় জনসাধারণের কাছে এটি সুপরিচিত।

"আমি আশা করি অতীতে স্বাধীনতার জন্যে পত্রিকা যেভাবে কাজ করে এসেছে ভবিষ্যতেও ভারতমাতার মঙ্গল ও উন্নতির জন্যে তেমনি শক্তি নিয়েই কাজ করে যাবে।"

শেখ আবদুল্লা

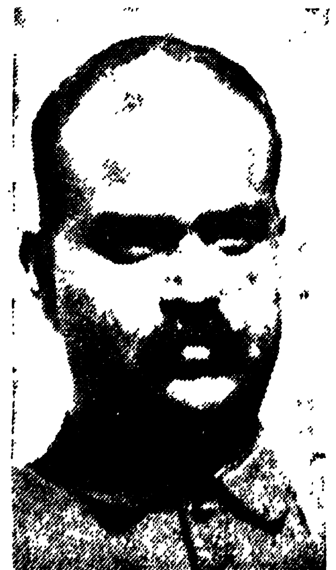
"সাধারণের স্বার্থরক্ষার জন্যে অগ্রসর হওয়ার নিজস্ব ঐতিহ্য অমৃতবাজার পত্রিকার রয়েছে এবং বিশেষভাবে ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলির জনসাধারণের সংগ্রামে নিরবচ্ছিন্নভাবে এর সমর্থন লক্ষ্য করার মত। জম্মু ও কাশ্মীরের জনসাধারণের মঙ্গলের জন্যে যাঁরা প্রথম তীব্র আগ্রহ নিয়েছিলেন এই পত্রিকাটি তাঁদের অন্যতম।"

চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী

"...অমৃতবাজার পত্রিকা ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। আঠারোশো আশী নাগাদ এতে কি বেরোত এবং কলকাতার এই কাগজের ভাগ্যে কি ঘটত এবং সালেমে আমার সেই অতি অল্প বয়সে তাতে আমি কতখানি উত্তেজিত বোধ করতাম সে সব আমার মনে পড়ে। আমি ভারতের ঐক্য এবং স্বাধীনতার আগমন অনুভব করতাম।"

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

"পত্রিকার দুঃখভোগ এবং সেবার ইতিহাস মহান এবং এটি চিরকালই এর মহান প্রতিষ্ঠাতাদের আদর্শ রক্ষা করে এসেছে। 'পত্রিকা' একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠেছে। রাজনৈতিক উত্থান-পতনে সর্বস্তরেই একে ক্ষমতায় আসীন ব্যক্তিদের রোষ উপেক্ষা করে দুর্দম সাহসে জনসাধারণের অধিকারের পতাকা উত্তোলিত করে এগিয়ে আসতে দেখা গিয়েছে।"



অমৃতবাজার পত্রিকা শতবার্ষিকী লগ্নে

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়



একশত বৎসর পূর্বে ১৮৬৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে যশোর জেলার পল্লীগ্রাম মাগুরা থেকে বাংলাভাষায় একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা জন্মলাভ করেছিল। মাগুরা গ্রামের ঘোষ পরিবারের হরিনারায়ণ ঘোষ গৃহকর্তা। সেকালের পল্লী অঞ্চলের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, ওই অঞ্চলের গ্রামবাসী-জনদের সমাজপতি। অমৃতবাজার পত্রিকা বের হয়েছিল তাঁর পুত্রদের উদ্যোগে। তাঁদের মধ্যে শিশিরকুমার মধ্যমণি, তিনিই প্রধান।

বিরাট এক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কল্পনা করে অমৃতবাজার বের করেন নি তাঁরা। তখন ভারতবর্ষে বা বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলের উদ্ভব হয় নি। ইংরেজ শাসন তখন ঘায়েল করা হরিণকে তার প্রতিটি দেহের আক্ষেপে মৃদু গর্জন ক'রে হিংস্র বাঘের মত থাবা মারছে। বলছে নড়ো না। ইংরেজ বাঘের মত, সিংহের মত, যার মতই হোক, বাংলাদেশে সামনের দুটো পা বা থাবা উদ্যত ক'রে রেখেছে, একটা থাবা কুঠীয়াল সম্প্রদায় তার মধ্যে নীলকরেরা প্রধান, এরাই সংখ্যায় বেশী; (এরা ছাড়া অন্য কুঠীও ছিল — যেমন রেশমকুঠী, তারা নীলকরদের মত প্রবল ছিল না।) আর একটা থাবা হল ইংরেজ সিভিলিয়ান সম্প্রদায়। নীলকররূপী যে থাবাটা তার অত্যাচারে পল্লীবাংলা তখন ক্ষতবিক্ষত, জর্জরিত। বাংলাদেশে ডাকাতের ভয়ও ছিল, প্রবল ভয় সেকালে। কিন্তু ডাকাতের ভয় সাধারণ মানুষে করত না, এবং দিনেও কেউ ডাকাতের ভয় করত না। নীলকরদের ভয় ছিল সকল মানুষের পক্ষে সমান ভয়, দারিদ্রের পক্ষে বেশী এবং এর আর দিন-রাত্রি ছিল না। দিনে-রাত্রে সমান ভয়, কার ভাগ্য যে কখন মন্দ হবে, কেউ বলতে পারে না, নীলকরদের পাইকেরা এসে বেঁধে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে যাবে। সেকালের নীলকরদের অত্যাচারের কথা সর্বজনবিদিত। তখন নীলদর্পণ লেখা হয়েছে, হরিশ মুখুজ্জে এবং লঙ সাহেব দণ্ডিত হয়েছেন প্রতিবাদ করতে গিয়ে। সম্ভ্রান্ত সম্পত্তিশালী যাঁরা, তাঁদের অনেকে নীলকরদের সঙ্গে সহযোগিতা করে লাভবান এবং রাজদরবারেও প্রতিষ্ঠাবান হচ্ছেন। এদেশে তখন কয়েকখানি ইংরিজী সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তারা ইংরেজ রাজত্ব কায়েম করবার জন্য কলম ধরেছে, ছাপাখানা খুলেছে।

সারা বাংলাদেশে একটি মাত্র প্রতিষ্ঠান, যে প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সেকালের বাংলাদেশের মুখ্য বাঙালীজনেরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছেন। তাঁরা রাজার এবং রাজার জাতের অত্যাচারের প্রতিবাদ করেন কিন্তু যেন যথেষ্ট নয়। তাতে না জাগেন ঈশ্বর, না জাগে মানুষ, বাকী থাকে রাজশক্তি, তারাও এতে এতটুকু কান দেয় না। সে প্রতিষ্ঠানটির নাম বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন।

অমৃতবাজার পত্রিকায় এ সম্পর্কে যে মন্তব্য করা হয়েছিল, সে মন্তব্য হতাশাজনক। গত সপ্তাহে অমৃতে সে মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। তাই তুলে দিচ্ছি—

"বৃটিশ ইণ্ডিয়ান সভা আমাদের সকল বল, সকল ভরসা কিন্তু দুরদৃষ্টক্রমে আমরা যেমন আমাদের তেমনি সভা। কোন কর্ত্তব্যকর্ম্মে ইহাদের প্রায়ই উৎসাহ নাই, বিশেষতঃ যেখানে স্বার্থের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ না-থাকে।"

বৃটিশ ইণ্ডিয়ান সভার সভ্যেরা দেশের জন্য কর্ম করে উপাধি পেতেন ইংরেজের সরকারের কাছে। কালটাই ছিল মডারেটদের কাল। যাঁরা ইংরেজের কাছে খেতাব পেতেন, তাঁরাই ছিলেন দেশের নেতা, সমাজের সমাজপতি।

অমৃতবাজারে এ সম্পর্কে লেখা হয়েছিল—"কেহ কেহ দুটি-একটি ভাবি কাযের দ্বারা রায়বাহাদুর পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছে"। কিন্তু দেশের দরিদ্র, আর্ত সাধারণ মানুষের উপর রাজশক্তি বা রাজকর্মচারীদের যে উদ্ধত অত্যাচার তার প্রতিকারে কেউ এক পা বাড়াতেন না, বা একটি কণ্ঠেও প্রতিবাদ-বাণী ধ্বনিত হত না।

অমৃতবাজার প্রকাশিত করেছিলেন ঘোষ ভ্রাতৃবৃন্দ এই বোবা বেদনা ও ক্ষোভকে ভাষা দেবার জন্য।

এই সত্যকে আমি মর্মে মর্মে একদা উপলব্ধি করেছিলাম, আমার নিতান্ত বাল্যকালে। অমৃতবাজার পত্রিকার শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে সেই উপলব্ধি নূতন ক'রে যেন মনের মধ্যে অনুভব করছি।

দেশসেবার যে উৎস, মানবপ্রেমের যে উৎস, অন্যায়ের প্রতিবাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের যে-উৎস অকস্মাৎ সক্রিয় হয়ে ওঠে, সেই উৎস থেকেই হয়েছে সংবাদপত্রের জন্ম। অবশ্য একথাগুলি সেদিন এমন স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি, তখন আমার বাল্যাবস্থা,—বয়স মাত্র তখন সাত বৎসর কয়েক মাস। সালটা ইংরিজী ১৯০৫ সাল। বঙ্গভঙ্গ হচ্ছে। দেশ তখন উত্তপ্ত। রাজশক্তি তখন হিংস্র এবং ক্রুদ্ধ। দেশের ধনী এবং সম্পন্ন অবস্থার অধিকাংশজনেরাই রাজশক্তির নিকটসান্নিধ্যে এসে তাঁদের সাম্রাজ্যের স্তম্ভে পরিণত হচ্ছেন। বিদেশী সরকার দেশ ভাগ ক'রে সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষের যে-জাগরণশক্তি, সেই শক্তিকে দুর্বল করবার জন্য একদিকে তারা দেশকে দ্বিখণ্ডিত করেছে। অন্যদিকে ধনীদের ও ইংরাজী শিক্ষিতদের একাংশকে কাছে টেনে সাধারণ সমাজ থেকে পৃথক করার ভেদনীতিকে গ্রহণ করেছে। এই সব সম্পন্ন ব্যক্তিদের দিয়ে কিছু কিছু গঠনমূলক কাজ করিয়ে তাঁদের খেতাবে এবং অন্যান্য সম্মানে সম্মানিত করে প্রচারও করতে চাচ্ছেন যে, এ'রাই দেশের নেতা এ'রাই দেশের হিতৈষী। এ'দের কথাই দেশের মানুষের শোনা উচিত এবং বিদেশী সরকার বিদেশী হলেও গুণগ্রাহী ও দেশের কল্যাণকামী।

আমাদের গ্রামের সমাজটি মধ্যবিত্ত-প্রধান সমাজ। ব্রাহ্মণের সংখ্যা বেশী। অধিকাংশেরাই ছোটখাট জমিদারীর মালিক। আয় দুশো-আড়াইশো থেকে দু হাজার-তিন হাজার চার হাজার পর্যন্ত। একজনের ছিল হাজার ছয়েক টাকা তিনি আমার জ্যাঠামশাই এবং আর একজনের আয় ছিল লক্ষাধিক। লোকে তাঁকে লক্ষপতি বলত। তাঁর আয় ব্যবসায় থেকেই বেশী, জমিদারীর ক্ষেত্রে তিনি নবাগত, আধুনিক, জমিদারীর পরিমাণ দশ হাজারের কাছে বাই-বাই করছে। ব্যক্তিটি ভাগ্যবানই শুধু ছিলেন না, সত্যিকারের সদ্গুণসম্পন্ন, সহৃদয়, শুদ্ধ মানুষও ছিলেন। ইংরেজ সরকার আমাদের থানার মধ্যে তাঁকে কাছে টানলে। এর আগে তিনি গ্রামে দেবপ্রতিষ্ঠা করেছেন, পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করেছেন, বৃক্ষ-প্রতিষ্ঠা, দেবকীর্তি সংস্কার প্রভৃতি অনেক কর্ম করেছেন, ইংরেজ সরকারের ম্যাজিস্ট্রেট, একজন আমেদ সাহেব আই-সি-এস এসে তাঁকে ইস্কুল প্রতিষ্ঠা করালে, চ্যারিটেবল ডিসপেন্সারী প্রতিষ্ঠাও করালে এবং খেতাবের ভরসা দিয়ে তাঁকে বলে দিয়ে গেল, তুমিই এখানকার নেতা ও প্রধান,

তুমিই শ্রেষ্ঠ। নেতৃত্ব প্রাপ্য সত্যিই ছিল তাঁর। তিনি নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ ছিলেন। সেই হিসেবে মানুষ তাঁকে নিশ্চয় একদিন মনে নিত। এই মানানো এবং মেনে নেওয়ার একটি পথ ও পদ্ধতি আছে, সেই পথ ও পদ্ধতি সম্পূর্ণ করতে একটু সময়ও লাগে। এই হৃদয়বান ধনীজনটি এতকাল পর্যন্ত সেই পথেই চলেছিলেন, কীর্তির পর কীর্তি করে সকল বংশের কীর্তিকে অতিক্রম করে অগ্রগামী হবেন, হলেই তাঁকে সকলে মানবে, এই নীতিই অনুসরণ করে-ছিলেন। হঠাৎ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রশ্রয় তাঁকে স্ফীত করে তুললে। পুণ্য-সঞ্চয়ের জন্য প্রতীক্ষার তর সইল না, তিনি রাজকীয় প্রশ্রয়ে অহংকৃত হয়ে চাপ দিয়ে প্রধান বলে মানাতে চাইলেন। ফলে আমাদের গ্রামে স্বাধীনতা আন্দোলনের কোন প্রভাব না-থাকলেও সাধারণ মানুষ ও বিশেষ ব্যক্তি ধনীজনের সঙ্গে একটা ঠাণ্ডা যুদ্ধের সৃষ্টি হল। দুই-একটা ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মত ছোটখাট সংঘর্ষও ঘটল।

গ্রামের সমাজের মাথার দিকে যাঁরা ছিলেন, স্বাভাবিকভাবে সংগ্রাম তাঁদের সঙ্গে। আমার বাবা, আমার জ্যাঠামশায় এঁরা ছিলেন এঁদের মধ্যে। প্রত্যক্ষ সংগ্রাম এঁদের সঙ্গে ছিল না। যাঁর সঙ্গে ওই ধনীটির প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ছিল, তাঁর সঙ্গে প্রীতি ছিল আমার বাবার ও জ্যাঠামশায়ের। যদি কেউ বলে এঁরা একটা দলের অন্তর্গত ছিলেন, তাহলে তাতে আপত্তি করব না। হঠাৎ একটা বিচিত্র পথে এঁদের তিনজনের সঙ্গেই এই প্রধান ব্যক্তিটির সংঘর্ষ বাধল। বাধল ইস্কুলের ব্যাপার নিয়ে। ধনীর প্রতিষ্ঠিত স্কুলটির ম্যানেজিং কমিটিতে এঁরা সকলেই মেম্বর ছিলেন, সেখানে এক-জন শিক্ষককে ম্যানেজিং কমিটির বিনা সম্মতিতে জবাব দেওয়া নিয়ে মতভেদ এবং পরিশেষে মত-বিরোধে পরিণত হল। তারও পরে বিরোধ আর শুধু মতামতের গণ্ডীর পরিধির মধ্যেই আবদ্ধ রইল না, ছড়িয়ে পড়ল জীবনের সর্বত্র। জেদের অত্যাচারে জীবন হয়ে উঠল জর্জরিত। দেশপ্রেম নয়, নিতান্তভাবে গ্রাম-জীবনে প্রতিষ্ঠা নিয়ে দ্বন্দ্ব। তবে একটি শিক্ষকের প্রতি অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মধ্যে যে ন্যায় আছে—সে ন্যায় নিঃসংশয়ে ছিল।

তখন বালক ছিলাম, জানি না, বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে সে-জেদবশে মামলা-মকর্দমা কতটা বেড়েছিল, তবে বেড়েছিল কিছুটা। অন্যদিকে সে-উত্তাপ যে কতখানি অসহনীয় হয়ে উঠেছিল, তা সেই-বালক বয়সেও আমি অনুভব করেছিলাম। একটা বিরোধের কণ্টকিত জ্বালাকর স্পর্শ যেন আমি অনুভব করতাম। আমি তখন গ্রামের ইস্কুলেই পড়ি। তখন হাইস্কুলে ইনফ্যাণ্ট ক্লাস ছিল। সেই ক্লাসে ভর্তি হয়ে এইটথ বি ক্লাসে উঠেছি। সেকেণ্ড হয়েছি। স্কুলের হেডমাস্টার থেকে অপর সব মাস্টারেরাই প্রায় এই বিরোধে জড়িয়েছেন, তাঁদের ভ্রূ যেন কুঞ্চিত হয় আমাকে দেখে। অন্ততঃ ললাটের যে মসৃণ প্রসন্নতা শিশুকে প্রীত করে অভয় দেয়, তার সন্ধান পাইনে। যাঁরা এ বিরোধে অন্তরে অন্তরে সায় দেন না, বা মনে মনে যাঁরা আমার বাবা-জ্যাঠার দিকে তাঁরাও সে প্রসন্নতাকে গোপন করে রাখেন। এরই মধ্যে একদা ঘটে গেল এক অবিশ্বাস্য ঘটনা। আমার বাবা-জ্যাঠার উপর নেমে এল ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের আঘাত।

ব্যাপারটা ঘটল এই। স্কুলে হল প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন সমারোহ। জেলার সদর থেকে এলেন সস্ত্রীক জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। বাঙালী আই-সি-এস। তাঁর চেহারাটা আজও মনে পড়ছে আমার। সুপুরুষ ব্যক্তি, সুন্দর ঘিয়ের রঙের স্যুট পরা। টাইটা ছিল সুন্দর ঘোর লাল রঙের। এবং উপর পাটীতে সামনের একটা বা দুটো দাঁত ছিল সোনার।

আমি দুটি প্রাইজ পেয়েছিলাম। একটি ক্লাসে সেকেণ্ড হওয়ার প্রাইজ অন্যটি সভায় কবিতা আবৃত্তির জন্য প্রাইজ। আমার বাবা অনেক প্রত্যাশা করতেন আমার উপর। প্রথম পক্ষের সংসার ধুয়ে-মুছে যাওয়ার পর বাবা সাতাশ বৎসর বয়সে দ্বিতীয় সংসার করেন। সেই সংসারেও প্রথম সন্তানের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় সন্তান আমি। আমার সমাদর যত, আমার উপর প্রত্যাশাও তত। বাবার বাসনা ছিল আমি হাইকোর্টের উকীল হব। (আমার পিতামহ উকীল ছিলেন)। ওই পুরস্কার বিতরণী সভায় আমার জীবনের প্রথম গৌরব অর্জন করেছি আমি। কিন্তু বাবা এ সভায় গেলেন না। গেলেন না, স্কুলের কর্তৃপক্ষের অর্থাৎ প্রতিষ্ঠাতাপক্ষ ম্যানেজিং কমিটির সভ্যদের অগ্রাহ্য ক'রে যে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছেন এবং ওই শিক্ষকটিকে বরখাস্ত করে যে অন্যায় করেছেন সেই কারণে, তারই প্রতি-বাদে। কিন্তু বুঝতে পারেন নি এর জন্য কি ঘটতে পারে।

যা ঘটল তাকে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত বলা চলে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কানে এই ঘটনাটি তুলে দিয়ে ব্যাখ্যা করা হল যে, এই সভায় উপস্থিত না-হয়ে এই ব্যক্তি সাহেবেরই অপমান করেছে।

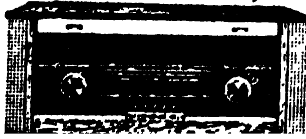
১৯০৫ সালের আই-সি-এস। সঙ্গে সঙ্গে এক পত্র জারী হল (দিন পনেরো পর) "তুমি এই সভায় অনুপস্থিত হয়েছ, তাতে আমি অবজ্ঞাত হয়েছি বলে মনে করি। আমার সঙ্গে স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা প্রত্যক্ষভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন। এর জন্য আমি চাই যে, তুমি স্থানীয় সেটেলমেণ্ট অফিসারের সামনে (তখন ওখানে সেটেল-মেণ্ট চলছিল) স্কুলের প্রতিষ্ঠাতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে।"

আমার বাবার অন্তরে একটা নিদারুণ ইংরেজ-ভীতি ছিল। তাঁর বাল্যকালে তাঁর মামার বাড়ীতে (সাঁওতাল বিদ্রোহের কেন্দ্র-স্থল) সাঁওতালদের উপর ইংরেজের নির্মম ও নিষ্ঠুর দমনমূলক অত্যাচারের গল্প শোনার ফলে এই ভয় তাঁকে আশ্রয় করে-ছিল। তিনি ভয়ে প্রায় ভেঙে পড়লেন। কোনমতেই সাহস সঞ্চয় করে 'না' বলতে পারলেন না। একটি নির্দিষ্ট দিনে সেটেল-মেণ্ট অফিসারের আপিসে হাজির হয়ে, এক-ভাই,









পোস্টমাস্টার এবং সাব-রেজিস্ট্রারের সামনে স্কুলের প্রতিষ্ঠাতার কাছে ক্ষমা চাইলেন।

চাইলেন, এবং মাথা হেঁট করে বাড়ী ফিরে এসে বললেন, আমার মৃত্যু হল না কেন। এর চেয়ে যে মৃত্যু ভাল ছিল। মাথা হেঁট করে বসে থাকা আমার বাবার সে বিষণ্ণ মূর্তি আজও আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে মধ্যে মধ্যে। তাঁর সে-বিষণ্ণতা ও সে-বেদনার কথা তাঁর ডায়রীতে তিনি লেখে গেছেন। তার মধ্যে আমাকে উদ্দেশ করে কয়েকটি ছত্রও আছে। আছে, "তারাশঙ্কর তুমি যেন লেখাপড়া শিখিয়া বড় হইয়ো। কাহারও নিকট মাথা হেঁট করিয়ো না এবং বড় হইয়া কাহারও মাথা হেঁট করিয়া দিয়ো না।" সমস্ত বাড়ীতে একটা বিষণ্ণতার ছায়া পড়েছিল। আমার মনে আছে।

বিচিত্রভাবে সে বিষণ্ণতা কাটল।

মাস কয়েকের মধ্যে আবার একটা সমারোহ হল, ওই স্কুল প্রতিষ্ঠাতার ঘরে। এখানেও মধ্যমণি সেই জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। তখন বালক ছিলাম। সব কথা জানতেও পারতাম না, ভাল করে বুঝতামও না। খুঁটিনাটি কিভাবে কি ঘটল। আমার পিসীমাও ছিলেন গ্রামের মেয়ে এবং বড় [illegible]। তিনিও বুঝতে না পেরে ব্যাকুল হলেন। বললেন এবারও সাহেব এসেছে, আবারও এবার তুমি যাবে না দাদা।

বাবা বলেছিলেন, ভয় নেই দিদি। এবারও যাব না আমি। কি করবে সাহেব করুক। পিসীমা এতে অভয় পান নি। আমার মনে পড়ছে আমিও পাই নি। কিন্তু বাবা সেবারও আবার গেলেন না। কিন্তু সভার শেষে সাহেব যখন থানায় এলেন ইন্সপেকশনে তখন তাঁকে সেলাম দিতে গেলেন। ছোটখাট জমিদার ছিলাম আমরা, সাহেব এলে সাহেবকে সেলাম দিতে যাওয়াটা নাকি জমিদারীর অন্যতম সর্ত ছিল। সেই সর্তানুযায়ী থানায় গিয়ে সেলাম জানিয়ে হাসিমুখেই বাড়ী ফিরলেন তিনি। সেই সঙ্গে শুনলাম এবারও সভায় অনুপস্থিতির জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠাতার তরফ থেকে সাহেবের কাছে কথাটা তুলে বলা হয়েছিল 'ব্যাটা এবারও আসে নি হুজুরবাহাদুর আবারও সে আপনার প্রতি অসম্মান দেখাতে চেয়েছে।'

সাহেব বলেছিলেন না বাবু। এতে আপনার বাড়ীর সমারোহে উনি না এলে আমার অসম্মান বলে আমি ধরব না। কারণ নিমন্ত্রণ আমি করি নি, আপনি করেছেন। আমি যখন থানায় বা ডাকবাংলোয় থাকব তখনও সে যদি না আসে তাহলেই আমার অসম্মান হয়েছে বলে মনে করব।

বিচিত্র এই বোধটা ওই আই-সি-এস ভদ্রলোকটির মনে জাগিয়ে দিয়েছিল 'অমৃতবাজার পত্রিকা'। এবং এর পর আমার বাবার সঙ্গেও শাসক সম্প্রদায়ের সম্পর্ক ভাল অনেকখানি হয়েছিল। আমার মামা তখন কানপুরে ছিলেন। তিনি এই ঘটনাটির বিবরণ একটি চিঠির আকারে লিখে এই প্রশ্নই করেছিলেন, "যে, কোন বিশেষ ব্যক্তির সঙ্গে কোন ব্যক্তির প্রীতি না-থাকতে পারে, মুখ দেখাদেখিও না থাকতে পারে। তাঁর বাড়ীতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর নিমন্ত্রণে আসবেন বলে সকলকে কেন যেতে বাধ্য হতে হবে এ কথা কে বলবে? এতে ম্যাজিস্ট্রেটের অপমান কি করে হয়, কেমন করে হয়, তাই বা কে বলবে?" এই পত্র অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ফল ফলেছিল। অমৃতবাজার পত্রিকায় ক্ষুদ্রের বেদনাও উপেক্ষিত হয় নি, এই তার বড় মহত্ত্ব।

অমৃতবাজার পত্রিকায় অনেক বৃহৎ এবং অনেক জটিল প্রশ্ন প্রকাশিত হয়েছে। কাশ্মীর সম্পর্কে গুপ্ততথ্য প্রকাশ করে বিদেশী সরকারের উদ্যত গ্রাসে বাধা দেওয়ার ঘটনাটি ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি ঘটনা। কিন্তু এই ক্ষুদ্র পত্রটি, বাংলাদেশের একটি মধ্যবিত্ত ভদ্রসন্তানের অসহনীয় অপমান ও বেদনার উপশম ক'রে তার উত্তর-পুরুষের মনের মধ্যে কেমন এবং কোন শ্রদ্ধার আসন পেতে নিয়েছিল তাই আজ এই অমৃতবাজার পত্রিকা শতবার্ষিকার লগ্নক্ষণে আমি প্রকাশ করে উচ্চকণ্ঠেই বলছি, ১৯৬৮ সালে শতায়ু হয়েছে অমৃতবাজার পত্রিকা, ভাবীকালে অমৃত অক্ষর পরমায়ু লাভ করুক।

ডঃ দিলীপ মালাকারের
নানান দেশের নানান সমাজ ৪·০০

বিমল মিত্রের
চারচোখের খেলা — ৩য় সং ৫·৫০
কথা চরিতমানস — নতুন উপন্যাস ৬·০০

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বলাকার মন — ৪র্থ সং ৬·০০
সতীনাথ ভাদুড়ীর দিগভ্রান্ত — দাম : ৯·০০
জরাসন্ধ-র ন্যায়দণ্ড — ৬ষ্ঠ সং ৭·০০

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনপদ বধূ — ৭ম সং ৫·০০
ধনঞ্জয় বৈরাগীর জয় জয়ন্তী — দাম : ৪·০০
দম্পতি — ২য় সং ৫·০০

কালি ও কলম ॥ সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্রিকা ॥ ·৬০ পঃ
সম্পাদক : বিমল মিত্র — ষাণ্মাসিক ৩·৫০, বার্ষিক ৭·০০
মাঘ সংখ্যার লেখক সূচী : অশোক ভট্টাচার্য ॥ পুলিনবিহারী সেন ॥ জরাসন্ধ ॥ রণেন গুপ্ত ॥ সুভাষ সমাজদার ॥ শক্তি চট্টোপাধ্যায় (কবিতা) ॥ যজ্ঞেশ্বর রায় ॥ দেবনারায়ণ গুপ্ত ॥ প্রণয় সেন ॥ মৃত্যুঞ্জয় মাইতি ॥ বিমল মিত্র ॥ সুকোমল বসু (কবিতা) ॥ নির্মলেন্দু গৌতম ॥ চতুর্থ পাণ্ডব ॥

নীলকণ্ঠের রাজপথের পাঁচালী — দাম : ৬·০০
স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোপী সংবাদ — দাম : ৩·৫০
নমিতা চক্রবর্তীর শাশ্বতী — দাম : ৫·০০

সমরেশ বসুর শ্রীমতী কাফে — ৩য় সং ৭·০০
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের প্রথম কদম ফুল — ২য় সং ১৫·০০
প্রবোধকুমার সান্যালের — দাম : ৫·৫০

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের
পণ্ডিত মশাই — দাম : ৩·০০
শ্রীকান্ত — ৩য় ৪·০০, ৪র্থ ৫·০০
মেজদিদি — দাম : ৩·০০
নিষ্কৃতি — দাম : ২·০০

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের
রবীন্দ্র সংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশ ২০·০০
Languages and Literatures of Modern India 18.00

প্রকাশ ভবন ১৫, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

পুরাণ মহিমা

প্রেমেন্দ্র মিত্র



খ্যাতি-অখ্যাতি এক জিনিষ, আর পুরাণ হয়ে ওঠা আরেক।

ঢাক বাজানো নাম নিয়েও পুরাণের উপাদান হবার সৌভাগ্য কজন মানুষ বা কটা বস্তুর হয়?

পুরানো হলেই তা পুরাণ হয় না।

মানুষজন বা অন্য কিছু পুরাণ-কথা হয়ে ওঠে সময়ের এমন এক রসায়নে যার নকল চলে না। চেষ্টা-চরিত্র করে কি পয়সা ঢেলে এ রসায়ন সার্থক করা সম্ভব নয়।

শুধু সাময়িক সাফল্যও এ পুরাণ মাহাত্ম্য দেয় না। নিজের যুগের প্রচুর সম্মান সমাদর নিয়েও একজন ইতিহাসের উল্লেখ মাত্র হয়ে থাকেন, আরেকজন পুরাণের মহিমা পান।

মাইকেল মধুসূদন পুরাণ-কথা হয়ে আছেন কিন্তু হেমচন্দ্র তা হন নি, এমন কি ভারতচন্দ্রও পুরাণের প্রান্তটুকুর বেশী ছুঁয়েছেন কিনা সন্দেহ।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বর্তমান জীবিত-কালের স্মৃতিতেই যে পুরাণ-গরিমায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন তাঁর সমসাময়িক আর কোন দেশনায়ক তার নাগাল পেয়েছেন কি?

পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আসতে পারে জেনেও সত্যের খাতিরে বলতে হয় যে, বোম্বাই তার সমস্ত সমৃদ্ধি আর প্রাকৃতিক শোভা নিয়ে যা থেকে বঞ্চিত জনাকীর্ণ কলকাতা তার সমস্ত সমস্যা সত্ত্বেও পুরাণের উপাদান হিসাবে সেই রহস্য মহিমায় মণ্ডিত।

পুরাণ হয়ে ওঠার বিরল গৌরব, কিন্তু আকস্মিক দৈবাধীন ব্যাপার নয়। তার মূলে এমন কিছু থাকে যার মূল্য সময়ই যাচাই করে দেয়। সময় যেন তার গূঢ় রসায়ন প্রক্রিয়ায় জারিত করে অনেক বাতিল মেকী ও আংশিক খাঁটি স্বর্ণের মধ্যে একটি কি দুটিকে বেছে নিয়ে পুরাণ কিংবদন্তীর দুর্লভ অমরত্ব দেয়।

আমার সামনে আজ সকালে এই পুরাণ কিংবদন্তীর রহস্যমহিমামণ্ডিত একটি জিনিষ মেলা রয়েছে। জিনিষটি আর কিছু নয়, একটা খবরের কাগজ।

এ খবরের কাগজে যে সব সংবাদ ছাপা আছে অন্য অনেক কাগজেই তা পাওয়া যাবে নিশ্চয়। ছাপা ও সংবাদ পরিবেশনের ব্যাপারে এ কাগজের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবার যোগ্য কেউ নেই এমনও বোধহয় নয়।

তবু এ কাগজটিকে ভিন্ন একটি মুগ্ধ সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে না দেখে পারি না।

তার কারণ বোধহয় এই যে, এ কাগজটি হাতে নিলে নিজের অজান্তেই পুরো একশত বৎসরের এক অবিচ্ছিন্ন প্রাণোচ্ছল ইতিহাসের স্রোত আমাদের স্পন্দিত আন্দোলিত করে যায়।

এক-আধ বছর নয়, একশ' বছর ধরে এই কাগজটি আমাদের দেশের জাগরণ-যজ্ঞের সাক্ষী ও শরিক।

নীলকরের অত্যাচারের বিরুদ্ধে এ কাগজ আগুন হয়ে জ্বলেছে। ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্টের অপমান ও নির্লজ্জ অবিচারের জবাব দিয়েছে রাতকে দিন করার মত অবিশ্বাস্য অসাধ্য সাধনে। ইলবার্ট বিলের সমর্থনে সমস্ত দেশের আত্মমর্যাদাবোধ তীব্র করে তুলেছে, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের বিবরণ শোনাবার গৌরব লাভ করেছে, বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনে জয়-পতাকার উদ্দীপনা সঞ্চারিত করেছে সমস্ত দেশবাসীর চিত্তে।

সামান্য কটি দৃষ্টান্ত দিলাম মাত্র। সম্পূর্ণ বিবরণ দীর্ঘ বিচিত্র বিস্ময়কর। তা বিস্তারিতভাবে জানার অপেক্ষা রাখে। সে বিবরণ এখানে দু কথায় শেষ করবার নয়। তবে বাংলা ও ভারতবর্ষের বর্তমান কালের ইতিহাসের সঙ্গে কিছু পরিচয় যাঁদের আছে তাঁরা জানেন একাধারে দিশারী ও দর্পণ হিসাবে দেশের সমস্ত মহৎ ও দুঃসাহসী মুক্তি-অভিযানে এবং আত্মশুদ্ধির সাধনায় এই একটি পত্রিকা নির্ভীক সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে আসছে একশত বৎসর ধরে।

একশত বৎসর! মানুষের পক্ষে যেমন একটি সংবাদপত্রের পক্ষেও তেমনি বড় সামান্য ব্যাপার নয়। মানুষের বেলা প্রাকৃতিক নিয়মেই শতবর্ষে জরা আসে। মনে করা যেতে পারে যে, যান্ত্রিক-ভাবে মুদ্রিত কোন পত্রিকার বেলায় হয়ত সেরকম অমোঘ প্রাকৃতিক বিধান নেই। কিন্তু একশ' বছর ধরে সমানের বদলে বর্ধমান প্রাণবেগ নিয়ে দেশে-বিদেশে কটা দৈনিকের এমন বলিষ্ঠ আত্ম-বিস্তারের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়!

বিলেতের টাইমস পত্রিকা স্বনামে প্রকাশিত হয় অবশ্য ১৭৮৮-র পয়লা জানুয়ারী। কিন্তু আমেরিকার নিউইয়র্ক টাইমস অমৃতবাজার পত্রিকার চেয়ে বয়সে মাত্র সতেরো বছরের বড়। তার প্রথম প্রকাশের তারিখ হল ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৮৫১।

বিলেতের 'টাইমস' পত্রিকাকে বাদ দিলে সেখানকার অন্য অনেক সুবিখ্যাত দৈনিক পত্রিকাই অমৃতবাজারের তুলনায় বয়সের বড়াই করতে পারে না। 'ডেলী নিউজ' ১৮৪৬-এ প্রতিষ্ঠিত হলেও মালিক বদলাই করেছে কয়েকবার। আর যথার্থ হিসাব ধরলে এক পেনি দামে যেদিন থেকে তার প্রকাশ শুরু হয় সেই ত' তার সত্যকার প্রতিষ্ঠা দিবস। এ ব্যাপারটি ঘটে ১৮৬৮তে। ডেলী ক্রনিকল, ডেলী মেল বা ডেলী এক্সপ্রেস, সব কটি পত্রিকাই অমৃতবাজারের চেয়ে কনিষ্ঠ। ডেলী ক্রনিকল ১৮৭৭-এ, ডেলী মেল ১৮৯৬-এ আর ডেলী এক্সপ্রেস প্রথম ১৯০০ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

বয়সের এ সব হিসাব শুধু কিছুটা কৌতূহলই অবশ্য মেটায়। কোনো পত্রিকার সার্থকতা শুধু তার পরমায়ু দিয়ে বিচার করবার নয়। অমৃতবাজার পত্রিকার সুদীর্ঘ পরমায়ু আমাদের সশ্রদ্ধ বিস্ময় জাগায় কিন্তু দৈনিক পত্রিকার ক্ষেত্রে তার অসামান্য ভূমিকার বিচারে এ দীর্ঘ পরমায়ুর বৈশিষ্ট্যও গৌণ।

আজকের যুগে খবরের কাগজের প্রভাব যেমন গভীর ও সুদূরপ্রসারী তার দায়িত্বও তেমনি কঠিন। রোমক সাম্রাজ্যে দেওয়ালে লটকানো হাতে লেখা বিজ্ঞপ্তি Acta Diurna রূপে যা ভূমিষ্ঠ হয়েছিল আজ আধুনিক যন্ত্রবাহনে তা জনজীবনের এক বিরাট মহাশক্তিধর নিয়ন্তা হয়ে উঠেছে। এ নিয়ন্তা দেব না দানব, কার পক্ষে যুদ্ধমান, সেইটেই সবচেয়ে বড় কথা।

শুধু সংবাদ ও বিবরণের প্রাচুর্য, তার ভাষার চাতুরী, শিরোনামার বাহাদুরী, এমন কি নিরপেক্ষতার ভঙ্গী দিয়েই খবরের কাগজ শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে না, সমস্ত ব্যবসায়িক সাফল্যের ঊর্ধ্বে সত্য ও ন্যায়ের জন্যে অক্লান্ত নির্ভীক সংগ্রাম করে যাবার এক অনির্বাণ প্রেরণা যদি না তার মধ্যে প্রকাশ পায়।

এক শতাব্দী ধরে এ প্রেরণা অম্লান রাখবার চেষ্টা কখনো শিথিল হতে দেয় নি বলেই অমৃতবাজার সংবাদপত্রের জগতে আজ পুরাণ-মাহাত্ম্যে প্রতিষ্ঠিত।

শাখায়-প্রশাখায় যে পত্রিকা আজ বিরাট এক মহীরুহ, শতবর্ষ আগে বাংলার অখ্যাত একটি গ্রামে তার বীজ বপন করেছিলেন সেকালের আশ্চর্য এক মানুষ মহাত্মা শিশিরকুমার। তপোদীপ্ত সেই অদ্ভুত-কর্মা পুরুষের পবিত্র প্রাণ-প্রেরণাই এ পত্রিকাকে অক্ষয় পরমায়ু দিয়ে চিরঞ্জীব রেখেছে বলে বিশ্বাস করি।

সাক্ষাৎকার

পত্রিকা শতবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশের কয়েকজন বিশিষ্ট সাহিত্যসেবী তাঁদের অভিমত প্রকাশ করেন আমাদের বিশেষ প্রতিনিধির কাছে। এখানে তাঁদের বিচিত্রতর চিন্তা-জগতের সংক্ষিপ্ত অথচ সুন্দর একটি প্রতিচিত্র ফুটে উঠেছে।



অন্নদাশঙ্কর রায়

'অমৃতবাজার পত্রিকার' ইতিহাস সকলেই জানেন। গ্রামের কাগজ শহরে এসে সারা-দেশের যেখানে যে অন্যায় দেখে তা নির্ভীক-ভাবে অনাবৃত করে ও অকপটে তার প্রতিবাদ করে। বক্তব্য বিষয় বাংলার থেকে ইংরেজীতে ভাষান্তরিত হওয়ায় লেখনী আপনা হতেই সংযত হয়। তা ছাড়া সব্যসাচী সম্পাদক এমন কৌশলী ছিলেন যে অতি কঠোর উক্তিও হাস্যরসে জারিত হয়ে কবিরাজী মোদকের মতো সুস্বাদু লাগত। কর্তাবা সেই অদ্বিতীয় অম্লমধুর পত্রিকার উঠে যাওয়া পছন্দ করতেন না। অথচ বাগবাজারের তেজস্বী বৈষ্ণবকে বাগ মানাবার ব্রিটিশ রীতিও ব্যর্থ হয়। পরে লক্ষ করা গেল আপিসের টেবিলে একখানা 'অমৃতবাজার পত্রিকা' না থাকলে শাসকদের চলত না। জনসাধারণের প্রতি এই শ্রদ্ধা না থাকলে রাজত্বও চলত না।

শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে 'অমৃতবাজার'কে আমি আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এই ক্রিকেট খেলোয়াড়ের পক্ষে এক সেঞ্চুরি যথেষ্ট নয়। আমরা দর্শকরা আর এক সেঞ্চুরি কামনা করি।

বুদ্ধদেব বসু

বাঙালির একটা বদনাম আছে যে সে ব্যবসা বোঝে না। কিন্তু বাঙালি-পরিচালিত দৈনিক পত্রিকাগুলির দিকে তাকালে এই কথাটা পুরোপুরি মেনে নেয়া অসম্ভব হ'য়ে ওঠে। এমনকি এও বলা যায় যে যে-সব রাস্তা বেয়ে বাঙালির ঘরে লক্ষ্মীঠাকরুন বাঁধা পড়েছেন, তার মধ্যে এইটেই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু দৈনিকপত্র শুধু একটি অর্থকরী বাণিজ্য নয়; তা জনগণের উদ্বোধক, শিক্ষক ও পরিচালক—অন্তত আদর্শ হিসেবে তা-ই। অতএব, বাঙালি যদি এই বিষয়ে কৃতী হয়ে থাকে, আমাদের সকলের পক্ষেই তা আনন্দের কথা। এবং এই কৃতিত্বের একটি মস্ত প্রমাণ আজ আমাদের সামনে উপস্থিত : 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র শতবর্ষ পূরণ হ'লো। এই পত্রিকার উজ্জ্বল অতীতের কথা সকলেরই জানা আছে ; পরবর্তী কালে, বহু প্রতিযোগী সত্ত্বেও, এর প্রাণশক্তিতে অবসাদ দেখা যায়নি। আশা করা যায় ভবিষ্যতেও বাংলা দেশের এই প্রবীণতম দৈনিক নবীন ও নবীনতরদের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলতে পারবে, এবং আমাদের পৌত্রেরা এর দ্বিশতবার্ষিকী উপলক্ষে অভিনন্দন জানাবেন, যেমন আমি শতবার্ষিকীতে জানাচ্ছি।



অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত



'ভেঙে মোর ঘরের চাবি, নিয়ে যাবি কে আমারে?'

ঘরের চাবি ভেঙে দিলেও যে-রহস্যপুরে নিয়ে যাবে তার চাবি কে ভাঙবে? সে-রংপুর বা রহস্যপুরও চিরন্তন ঢাকা—সে-ঢাকা খুলো না খুলো কেও না কেনন! খুললেও পাবে না অভীষ্টকে।

আমাদের এক সহকর্মী রংপুর থেকে ঢাকা বদলি হলেন। ঢাকা থেকে খুলনা। খুলনা থেকে পাবনা। পাবনাতেই রিটায়ার করলেন।

আমরা বললাম, রংপুর ঢাকা। খুলনা পাবনা।

আমি নেত্রকোনা থেকে খুলনা বদলি হলাম। নতুন লাইনে যাচ্ছি ট্রেনে করে। সমস্ত চলা আর থামা দেখছি খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে।

কী একটা সাদাসিধে নিরীহ স্টেশনে গাড়ি থামল। আর থামল তো ছাড়তে চায় না।

কী নাম স্টেশনটার?

অবাক হয়ে গেলাম নাম দেখে। নাম অমৃতবাজার।

অমৃতবাজার তো পত্রিকা—যে পত্রিকা শীতে-গ্রীষ্মে বাতে-বর্ষায় চিরদিন বিশ্বস্ত সহচর হয়ে ফিরেছে, জাগিয়েছে অবিচ্যুত দেশপ্রেমের উত্তেজনা. তার নাম চুরি করল কে? শেষে জানলাম যিনি এ পত্রিকার মহানায়ক তাঁরই জন্মস্থান এই গ্রাম—অমৃতবাজার।

যারা শুধু অফিস-টাইমে মোজা পরে বাকি সময় পরে না, অর্থাৎ যারা প্রাদেশিক সার্ভিসের লোক তারা, ১৯৪৭ এর আগে রাজকার্যে নিযুক্ত থাকলেও মন রেখেছিল স্বাধীনতার স্বপ্নে। সে-স্বপ্নের জাদুকর অমৃতবাজার পত্রিকা। আর যারা দিনে-রাতে মোজা পরে, তাদের কাছে অমৃতবাজার 'সিডিশন'—স্টেটসম্যানই তাদের একমাত্র আচ্ছাদন। দেশের স্বাধীনতার পতাকা অকুতোভয় অমৃতবাজারই উন্মোচিত। আজ স্বাধীনতার পরেও বিশ্বস্ততার গুণে অমৃতবাজার প্রত্যহের বন্ধু।

যে-পত্রিকা অমৃতের বার্তা এনেছে তার শতবর্ষপূর্তি তো সামান্য কথা। তার তো অমর হবারই প্রতিশ্রুতি। আর আমরা খুঁজে না পেলেও যিনি এ পত্রিকার সার্থক রূপকার সেই মহাত্মা সাধক জানেন কোন চাবিতে সেই বন্ধ রহস্যপুরী খোলা যায় কী মন্ত্রে পাওয়া যায় অভীষ্টকে।

সুধীরচন্দ্র সরকার

বহু দিন আগেকার কথা। সেকালে স্কটল্যান্ডের অধিবাসীরা বড়দিনের সময়ে প্রতি বছর একটা ডিনার দিতেন। সেই ভোজসভায় একবার তখনকার বড়লাট বলে ছিলেন সকালে পত্রিকা (অর্থাৎ অমৃত বাজার পত্রিকা) না দেখলে গোটা দিনটাই তাঁর ফাঁকা লাগে। ইংরেজ বড়লাটের কাছ থেকে এই প্রশস্তি পাওয়া কতটা বড়াই ছিল না তখন। কারণ তখন অমৃতবাজার পত্রিকা ছিল বৃটিশ সরকারের সব থেকে কঠোর সমালোচক রাজপুরুষদের খুশি হবার মতো কোন খবরই থাকত না এই কাগজে বরং রুষ্ট হবার মতো কারণ থাকত প্রতিদিনই। কিন্তু পত্রিকা তখন থেকেই জাতির জীবনে এমন একটা স্থান দখল করেছে যে তাকে এড়িয়ে যাওয়া কঠিন ছিল। আবার সেই সঙ্গে পত্রিকার সংবাদ ও মন্তব্যে ছিল এমন একটা বৈশিষ্ট্য যে আক্রান্ত রাজপুরুষেও তাকে অভিনন্দন না জানিয়ে পারেন নি।

আজ সেই অমৃতবাজারের একশ' বছর পূর্ণ হতে যাচ্ছে। পত্রিকা আজ ভুবনবিদিত খ্যাত আমাদের দেশবাসীর অন্তরে তার নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত। আজ ষাট বছর ধরে আমিও পত্রিকার একনিষ্ঠ পাঠক। তার সম্পাদক তুষারবাবু আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। দ্বিতীয় শতবর্ষের পথিক অমৃতবাজার পত্রিকাকে আমি আমার অভিনন্দন জানাই।



প্রবোধকুমার সান্যাল



'অমৃতবাজার পত্রিকার একশ' বছরের ইতিহাস নূতন বাঙালী জাতিসৃষ্টির ইতিহাস। সিপাহী বিদ্রোহের পর যেকালে আপন মূঢ়তায় সমগ্র ভারত রাজনীতিক অচৈতন্যে আচ্ছন্ন ছিল সেই দূরাতীত কালে অমৃতবাজার পত্রিকা বৃহত্তর দেশের কানে কানে উজ্জীবনী মন্ত্র পাঠ করতে বসেছিল। অমৃতবাজারের গৌরব জাতিসৃষ্টির গৌরব। একথা কেউ ভোলে নি, সেই একটা কাল—যে কালে অশিক্ষা বা কুশিক্ষার অনড় অন্ধতা জাতির মুখে কোনও ভাষা এনে দেয় নি। বাংলার প্রাক্তন মনীষীদের তখন যৌবন-কাল। রবীন্দ্রনাথ নাবালক। সেইকালে না ছিল বিদ্যুৎ, না মোটর, না বেতার, না বা টেলিফোন। বড়জোর ঘোড়ার গাড়ি আর পাল্কি ছিল যানবাহন। এক রাজ্যের খবর অন্য রাজ্যে পৌঁছতে হয়ত ছ' মাস লাগত। তখন না ছিল কংগ্রেস, না বা গণতন্ত্রের আস্বাদ। সমাজ-উন্নয়ন বিদ্যা কি প্রকার—কারও ধ্যান-ধারণা বিশেষ ছিল না। পৃথিবী কত বড় বা ব্যাপক, তা কেবল একটু-আধটু শোনা যেত ঔপনিবেশিক ইংরেজ আর ফরাসডাঙার ফরাসীদের মুখে—যারা তখনও বাঙালী মহলে ঢুকে তামাক আর গড়গড়ায় টান দিয়ে যেতো। সেইকালে ইংরেজের বেদখলী মনোবৃত্তির প্রথম প্রতিবাদ ওঠে অমৃতবাজার পত্রিকায়। দশ বা বিশ না, তৎকালীন কালে অমৃতবাজার সেই প্রথম একটি অভিনব চিন্তাধারা ও সাংবাদিক ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছিলেন। সেদিনকার সেই রেড়ির তেলের বা চর্বির বা দুষ্প্রাপ্য কেরোসিনের লম্প হাতে নিয়ে অমৃতবাজারই প্রথম সাংবাদিকদের পথ চেনাতে বেরিয়েছিলেন এবং সাংবাদিক এক গোষ্ঠী রচনা করে তাঁরা এই প্রথম চেতনাটি এনেছিলেন যে, সংবাদপরিবেশকরা এককালে বেতন-ভোগীও হতে পারেন। তখনকার দিনে শিক্ষিত সমাজের দৈনন্দিন কর্মজীবনের ফাঁকে উদ্বৃত্ত অবসরটুকু ছিল এই ধরনের কাজে আত্মনিয়োগ করা,—এর জন্য পারিশ্রমিকের প্রশ্ন ছিল স্বপ্নের অগোচর। সাহিত্য, শিল্পকলা, সাংবাদিকতা, রাজনীতি বা দেশকর্ম—তখনও অর্থকরী হয়ে ওঠে নি। কাব্য, সাহিত্য, চারুশিল্প, দেশকর্ম বা সাংবাদিকতা,—এসব বিষয় নিয়ে যারা মেতে থাকত তাদেরকে বেকার বলা হত, এবং তাদের বিবাহ ব্যাপারে কন্যার পিতারা তাদের হাতে কন্যাসমর্পণ করতে চাইত না। অমৃতবাজার পত্রিকার সুদীর্ঘকালের ইতিহাস বাঙালী জাতির মানসলোকে নানাবিধ পরিবর্তন সাধন করেছে। চিন্তায়, ধ্যানে, বিবেচনায় এবং আদর্শে—সাংবাদিক দিক থেকে জাতীয়তাবাদের প্রথম চেতনা আনে এই পত্রিকা। 'বিগত একশ' বছরে এই পত্রিকার পথ সর্বথা কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। অনেকবার পায়ে কাঁটা ফুটেছে, মাঝে মাঝে রক্ত ঝরেছে অনেক। ঈর্ষায়, অনুযোগে, স্খলনে বা ত্রুটিবিচ্যুতিতে মাঝে মাঝে তাকে হোঁচট খেতেও হয়েছে,—কিন্তু তার জীবনের কাল ধারাবাহিক প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতিতে সমৃদ্ধ।

অমৃতবাজার এখন আন্তর্জাতিক পত্রিকা। শুধু এটি যে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দৈনিক পত্রিকাগুলির অন্যতম তাই নয়, প্রাচ্য এবং দক্ষিণ প্রাচ্যে তার প্রভাব ও প্রতিপত্তি বোধ করি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তার সংবাদ-সরবরাহব্যবস্থা উচ্চবিজ্ঞানসম্মত, এবং তার গতি দ্রুত ধাবমান। বহিঃ-পৃথিবীতে বসে যদি কেউ ভারতকে জানতে চায় এবং ভারতের সুদূর অংশে বসে যদি কেউ বাঙালীর সুস্পষ্ট পরিচয় বুঝতে চায়, তবে তাকে এই পত্রিকাই পাঠ করতে হবে। এই পত্রিকার সঙ্গে বাঙালীর সংস্কৃতি সাধনা বাঙালীর শিল্প সাহিত্য কাব্য ও ললিতকলার সমস্ত প্রকার আন্দোলন — প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। এই পত্রিকার নৈতিক আদর্শের সঙ্গে যাঁদের পুণ্যনাম অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত রয়েছে তাঁদের মধ্যে স্বর্গত শিশিরকুমার ঘোষ, মতিলাল ঘোষ বা মৃণালকান্তি ঘোষ,—এঁদেরকে কেউ ভোলে নি। কিন্তু এই পত্রিকার আধুনিক কালের সর্বাঙ্গীণ সমৃদ্ধি ও প্রভাব-প্রতিষ্ঠা যাঁর হাতে ঘটেছে সেই অক্লান্ত অধ্যবসায়ী ও নিত্যভ্রমী সম্পাদক শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ মহাশয় সকলের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন।

অমৃতবাজারের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে আমি আরেকবার অভিনন্দন জানাই।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
পৃথিবীর ইতিহাস ১৬৲
ভারতের জাতীয় আন্দোলন ১১·০০
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ
১ম—৮৷৷৹ ২য়—৮৲ ৩য়—৭৷৷৹
ধনঞ্জয় বৈরাগী
মঞ্চ কন্যা ৭·০০
এক পেয়ালা কফি ২৷৷
আর হবে না দেরী ২৷৷
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
বাক্স বদল ২৷৷
প্রতিভা বসু
বনে যদি ফুটলো কুসুম ৪৷৷
ডেল কার্ণেগীর
প্রতিপত্তি ও বন্ধুলাভ ৪৷৷
দুশ্চিন্তাহীন নূতন জীবন ৫৷৷
নীহাররঞ্জন গুপ্ত
সীমন্তিনী ৬৲
দীপক চৌধুরী
খড়ি মাটির স্বর্গ ৭৲
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
অরণ্যবহ্নি
বেদুইন
মাণিক্য রাজ্যের প্রেমকথা ৫৲
অচিরে প্রকাশিত হবে
উৎপল দত্তের
বহু বিতর্কিত নাটক
কল্লোল
গ্রন্থম, ২২/১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬



ইংরেজি কাগজের বাংলা নাম

মনোজ বসু

অমৃতবাজার পত্রিকার একশ বছর পূর্তি আর কয়েকটা দিন পরে।

অমৃতবাজার জায়গাটা আমার জন্মগ্রাম থেকে অধিক দূরে নয়। ছোট-বয়স গ্রামেই কেটেছে, সেই গ্রামাঞ্চল ছাড়া আর কিছু জানতাম না। জ্ঞান হওয়া ইস্তক অমৃতবাজারের কথা শুনেছি। খানিকটা রূপকথার মতো। আসল নাম পোলো-মাগুরা। যশোহর-খুলনায় অনেকগুলো মাগুরা—কেন জানি না, পোলো নামে বিশেষ চিহ্নিত ছিল ঐ গ্রাম।

ঘোষেরা জমিদার—গ্রাম্য জমিদার যেমনধারা হয়। কিছু প্রজাপাটক খাসজমি বাগবাগিচা ও বাড়ি। আর ঐ অঞ্চলের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নেতৃত্ব। ঘোষ-ভ্রাতাদের অতুলন মাতৃভক্তি। মা অমৃতময়ী—তাঁরই নামে সাহিত্যপত্রিকা হল 'অমৃত-প্রবাহিনী'। (সে কাগজ উঠে গিয়েছিল। শতবর্ষের কাছাকাছি এসে নাম কিছু হ্রস্ব হয়ে আবার 'ক নবরূপে দেখা দিল—এই 'অমৃত'? পাক্ষিক এবারে সাপ্তাহিক হয়ে এসেছে।) গ্রামের উপর তাঁরা বাজার বসালেন, তা-ও মায়ের নামে। অমৃতবাজার। পোলো-মাগুরা লোপ পেয়ে গ্রামের নামও শেষটা লোকের মুখে মুখে 'অমৃতবাজার' হয়ে দাঁড়াল।

সাহিত্য-পত্রিকা ছেড়ে তারপর খবরের কাগজ। গ্রামের পত্রিকা, গ্রামের নামেই তার নাম—অমৃতবাজার পত্রিকা। পুরোপুরি বাংলা কাগজ, নাম থেকেই মালুম হচ্ছে—গাঁয়ের সর্বসাধারণ অবাধে যা যা পড়তে পারে। 'প্রবাহিনী'র জন্য কাঠের প্রেস এসেছিল—সেই প্রেসে ছাপা হয়ে হপ্তায় হপ্তায় বেরোয়। কাগজের আয়তন ছোট, কিন্তু লেখার মধ্যে আগুন। দেশপ্রেমের আগুন—অবিচার অত্যাচারের বিরুদ্ধে অগ্নিজ্বালা। ইংরেজ রাজপুরুষদের বাংলা লেখা সঠিক বোধগম্য হবার কথা নয়—গায়ে নিশ্চয় যথোচিত ছ্যাকা লাগছে না, খানিকটা লেখা অতএব ইংরেজিতেও থাকা উচিত। পত্রিকা তখন দ্বিভাষিক হল—বাংলা তো আছেই, সংগে কিছু ইংরেজি লেখা।

যশোহর ও প্রতিবেশী জেলা নদীয়ায় অজস্র নীলকুঠি তখন। যার ধ্বংস-চিহ্ন আজও সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। নীলের ব্যবসা জোর চলছে, এবং যা হয়ে থাকে, বেশি মুনাফার লোভে রায়তের উপর নানা অত্যাচার। রাজপুরুষেরা সাহেব, নীলকরও তাই। সাদায় সাদায় মুখ শোঁকাশুঁকি—একই ক্লাবে স্ফূর্তিফার্তি খানাপিনা। রায়তে বিচার পায় না। বিচারের জন্য লড়বে, সে তাকতই বা কজনার? এমনি সময় ঘোষ-ভ্রাতৃগণ বিশেষ করে শিশিরকুমারের মধ্যে তারা আপন মানুষ পেয়ে গেল। শৈশবে গ্রাম-বৃদ্ধদের মুখে আমি তাঁর গল্প শুনতাম। শিক্ষিত অর্থবান জমিদার গ্রামে গ্রামে নিরক্ষর চাষাভুষোর মধ্যে ঘোরেন। তাদের নেতৃত্ব দেন, কাগজে তাদের কথা তুলে ধরেন, সাহসে ও আত্মবিশ্বাসে দুর্বার করে তোলেন তাদের। লাল-মুখের সামনাসামনি দাঁড়াতে আর তারা পরোয়া করে না। বাংলার প্রথম গণজাগৃতি যাঁদের আয়োজনে গড়ে উঠল, শিশিরকুমার তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রধান।

হু-হু করে প্রচার বাড়ছে—সবাই পড়তে চায়, কাগজ সবাই হাতে পেতে চায়। লাট-বেলাট থেকে সামান্য-সাধারণ। ছোট্ট গ্রামের মধ্যে থেকে আর চলে না। গ্রামের পত্রিকা নগরে এলো তখন, এই গঙ্গার কূলে। ইংরেজ-ঘাঁটির একেবারে বুকের উপর—বুকে চেপে বসে দাড়ি উপড়ানো আর কি!

দাঁড়াও, দেখাচ্ছি! নতুন আইন হল—ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট। ইংরেজি কাগজে যদি-ই বা কিছু গরম-গরম লেখে, দেশি কাগজে কখনো তা চলতে পারবে না। ঘোষেরাও দমেন নাকি! আইন আজকে পাশ হল এক রাত্রির মধ্যে ভানুমতীর খেল, পরের দিনের পত্রিকা বেরুল বিলকুল ইংরেজি। সারা রাত্রি জেগে ভাইয়েরা চেহারা পাল্টে দিয়েছেন। প্রেস অ্যাক্টকে কলা দেখালেন। ইংরেজি কাগজের বাংলা নাম—নাম-রহস্য এইখানে।

ছোট বয়সে আমরা রূপকথার মতন অমৃতবাজারের কাহিনী শুনতাম। মা-জননীর নাম জগতের সামনে তুলে ধরা—কী অপরূপ মাতৃপ্রেম! নিষ্ঠা অধ্যবসায় ও স্বদেশপ্রেমের সম্বল নিয়ে নগণ্য গ্রামে থেকেও কত বড় জিনিষ গড়ে তোলা যায়।

আরও আছে। কলকাতা-যশোহর রোড একটা জায়গায় হঠাৎ বাঁক নিয়ে রেললাইন ভেদ করেছে। ঘনপত্র আমকাঁঠালের গাছ কয়েকটা এবং কসাড় বৈঁচিবন—ট্রেনের পথে বরাবর তাই দেখতাম। হঠাৎ সেখানে ঘর উঠে গেল, আলো জ্বলল, স্টেশন হল। অমৃতবাজার রোড স্টেশন। গ্রাম অমৃতবাজার অনেকখানি দূর সেই স্টেশন থেকে—নামটা তবু হাজার হাজার যাত্রীর চোখে নিত্যদিন ঝিলিক দিয়ে যেত। মাতৃনাম-বিজড়িত অমৃতবাজার। এই আমলে, এখন যাঁরা পত্রিকার কর্ণধার তাঁরাই করেছিলেন। বাংলাদেশ দুই খণ্ড করল—তার পরেও যাতায়াতের পথে সে স্টেশন দেখেছি। এখন আর যেতে দেয় না—স্টেশন আছে কিনা জানিনে। না থাকলেই বা কী করতে পারি দীর্ঘশ্বাস মোচন এবং নিষ্ফল হাত কামড়ানো ছাড়া?

অমৃতবাজার পত্রিকা শতবর্ষের উৎসব করছেন। পত্রিকার প্রথম প্রতিষ্ঠাভূমি অমৃতময়ীর স্মৃতিবাসিত গ্রাম অমৃতবাজারে অনুষ্ঠানের খানিকটা অন্তত হলে কেমন হত বলুন দিকি। পাখি-ডাকা ছায়া-ছায়া গ্রাম-পথে তীর্থযাত্রীর প্রসন্নতা নিয়ে দেশ-বিদেশের অতিথিরা বিচরণ করছেন, বাঁওড়ে নৌকা বাইছেন, কপোতাক্ষীর স্নিগ্ধ জলে অবগাহন করে পরিতৃপ্ত হচ্ছেন—কী অপরূপ উৎসবই না হতে পারত।

আজ নয়, আজ নয়। নীলকর সাহেবদেরও অন্যায়-অত্যাচার একদিন অপ্রতিরোধ্য মনে হয়েছিল—দোর্দণ্ডপ্রতাপ তারা কোথায় চলে গেল পাত্তাড়ি গুটিয়ে! তেমনি স্বভূমি থেকে বিনা দোষে নির্বাসিত আমরা বুকে অশ্রু আর চোখে আগুন নিয়ে ফুঁসছি—আজ না হোক অদূর-কালে এ অন্যায়ের অবসান হবে। হবেই। অমৃতবাজার শতবার্ষিকী উৎসবের ঐ অংশটা ততদিন পর্যন্ত মুলতুবি রইল।

শত বর্ষের পথিক

হেমচন্দ্র ঘোষ

বিভেদ আর বিবাদ এই দুটি মারাত্মক মহা অস্ত্রে ইংরেজ এদেশে সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হলো। রাজনৈতিক শাণিত অস্ত্রে একে একে ধ্বংস হলো মোগল সাম্রাজ্য, দুর্ধর্ষ মারাঠা বিলীন হয়ে গেল! বীর শিখ জাতিও চূর্ণবিচূর্ণ হলো। মোগল দরবারে ইংরেজ যেখানে কুর্নিশ করে ভিক্ষের ঝুলি হাতে সুযোগ সন্ধিধের আশায় বিবর্ণ মুখে দাঁড়িয়ে থাকতো একদিন সেই দিল্লীর সম্রাট হাতজোড় করে বললো—"As you are my friend, as you are my protector, as you are my master, I ask you to sit down" মোগল সাম্রাজ্যের সূর্য অস্তাচলে চলে গেছে। ইংরেজ ধীরে ধীরে বেশ শক্ত হয়ে উঠেছে। ভারত শাসন করতে কত শত ইংরেজ এই দেশে এলো। এদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন সহানুভূতিশীল আবার কেউ ছিলেন অনমনীয় জবরদস্ত, যাদের শাসনদণ্ড এদেশের লোকদের মেরুদণ্ড যেন গুঁড়িয়ে দিয়ে যেতো। কিন্তু তাঁদের সকলেরই ছিল একই উদ্দেশ্য ভারত লুণ্ঠন। ইংরেজ মেয়েরা, লাটপত্নীরা এই লুণ্ঠনের ছিলেন অংশীদার। পাথুরেঘাটার বংশলোচন হেস্টিংস পত্নীর পুর্ণ স্নামীর সরকার। নদীয়ার মহারাজ শিবচন্দ্র জমিদারী হারিয়েছেন। উদ্ধারের চেষ্টায় তিনি রামলোচনকে দিয়ে এক মহামূল্য মুক্তোর হার হেস্টিংসের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

—এত দামী হার আমি কিনবো না!

সরকারের কাছে শুনে শিবচন্দ্র জানিয়ে দিলেন—এর কোন দামই নেবো না।

কবি রসসাগর রহস্য করে লিখলেন—
"নাহি লব মূল্য—দিব উপহার।
ধন্য আমি ভূমণ্ডলে কিবা শোভে মুক্তাহার,
শ্বেতাঙ্গীর গলে।"

সরকারী কর্মচারীদের দুর্নীতি, তাদের কুশাসন, তাদের প্রকাশ্যে উৎকোচ গ্রহণ যেন একটা রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এর বিরুদ্ধে অভিযান শুরু হলো মিঃ হিকির ইংরেজি সংবাদপত্রে। তাঁর বেঙ্গল গেজেট বার হলো ১৭৮০ সালে। সরকারী কর্মচারীদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনার ফলে মিঃ হিকিকে বহু লাঞ্ছনা সইতে হয়েছিল, বহুবার নিগৃহীতও হতে হয়েছিল। মানহানির মামলা তাঁর যেন গাসহা হয়ে গিয়েছিল। ১৭৮৪ সালের মার্চ মাসে বার হলো কলকাতা গেজেট। সেটা ছিল সরকারী মুখপত্র এবং এখনও তাই আছে। মুসলমান আমলের শাসননীতি ছিল সুষ্ঠু পরিবেশ ও শৃংখলার বহির্ভূত। ইংরেজরাও সেই পথ ধরল। সংস্কৃত ও আরবী পার্সী শিক্ষার মাধ্যমে দেশ গোঁড়ামিতে ভরে উঠলো। এটাই ছিল ইংরেজের রাজনীতি। "With the hope of creating a thirst for knowledge in the Native community. শ্রীরামপুরের মিশনারীরা "সমাচার দর্পণ" প্রকাশ করলেন। এই সময়ে প্রায় বাষট্টিখানা সংবাদপত্র কলকাতায় গজিয়ে উঠলো। এইসব কাগজের পারস্পরিক কুৎসা রটিয়ে মহানন্দে নৃত্য করা ছাড়া আর কোন কাজ ছিল না। সেই মধ্যযুগের আমলের সামাজিক কুসংস্কার আঁকড়ে রাখা এই কাগজগুলোর ছিল একমাত্র বেসাতি। অগ্রগতির নামগন্ধ নেই—সমাজ পঙ্কিল আবর্তে ডুবে গেছে। আশা আর আকাঙ্ক্ষা অমানিশার অন্ধকারে আচ্ছন্ন। এই বাষট্টিখানা সংবাদপত্র তখনকার যুগে ছিল দেশের দুর্ভাগ্যের সহচর। দেশে আইন নেই, শৃংখলা নেই, সারা দেশ অরাজকতায় ভরা। দস্যু তস্করের লীলাভূমি এই সবুজ বাংলার তরঙ্গিনী নদীর বুকে আর চোখ-জুড়ানো হরিৎ ক্ষেতে শুধু চলতো লুণ্ঠনের অভিযান। ইংরেজ হয়ে উঠলো আরো ধূর্ত আর চতুর। তাদের লুণ্ঠনের মাত্রা আরও গেল বেড়ে। এবার গ্রামাঞ্চলে ঝাঁকে ঝাঁকে নীলকর সাহেবরা ছড়িয়ে পড়ল। এদেশের লোকেরাই তাদের কর্মচারী, এদেশের লাঠিয়ালরাই ছিল তাদের শক্তির উৎস। আর জেলার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবরা ছিল প্লান্টার্স-দেরই বন্ধু এবং বিলাসবিভবের নৈশ সহচর।

মোলনী আর স্কীনার যশোহর প্লান্টার্স ঘেঁষা ম্যাজিস্ট্রেট। তাদের খামখেয়ালী আর খুশীমত বিচার এবং তাদের অত্যাচারে সারা জেলা তখন জর্জরিত। কারও প্রতিবাদ করার উপায় নেই—সাহস নেই, শক্তিও নেই। প্লান্টার্সদের 'শ্যামচাঁদ'-এর কতশত নিরীহ প্রজার মাথা গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে গেল। কত কুলবধূ জীবন বিসর্জন দিয়ে নিজেদের সম্মান রক্ষা করলেন। গ্রাম্য কবির করুণ বিলাপ বাংলার আকাশে বাতাসে কেঁদে ফিরে গেল—"নীল বাঁদরে সোনার বাংলা করলো ছারখার"।

প্লান্টার্সদের অত্যাচারের পাদপীঠ ছিল যশোর। যশোর ছিল জেলার সদর। কলকাতার বহির্ভাগে রাজনৈতিক চেতনার সূত্রপাত হলো এই যশোরে, আর সেই চেতনার প্রধান যাজ্ঞিক ছিলেন শিশিরকুমার, পিতা হরি-নারাণ যশোরের একজন নামকরা উকিল। দেশ পোলো-মাগুরো—একটা ছোট্ট গ্রাম। শান্ত আবহাওয়ায় গ্রামখানি স্নিগ্ধ শ্যামল শ্রীমণ্ডিত। নিকটে নদী কপোতাক্ষী—শ্রীমধুসূদনের চির আরাধ্য মাতৃসমা দুগ্ধ স্রোতস্বিনী, তাঁর বিদেশের সুখদা চিন্তা। ছোট্ট গ্রামটিতে নিদাঘের অশ্বত্থ ছায়ে রাখাল বালকের বাঁশির মূর্ছনা মন্দ হিল্লোলের বুকে ভেসে ভেসে দিগন্তের কোলে মিলিয়ে যেতো। গ্রামের মোহময় আকর্ষণে হরিনারাণবাবু সপ্তাহ অন্তে দেশে আসতেন। তাঁর বাড়ীতে বৈঠক বোসতো। তাতে আলোচিত হত গ্রাম-বাসীদের সুখসমৃদ্ধি আর তাদের অভাব-অভিযোগের কথা। সামাজিক শৃংখলার অনুশাসনও চলতো। গ্রামে পাঠশালা ছিল, কিন্তু সেখানে ইংরেজি শেখার কোন ব্যবস্থা ছিল না। ইংরেজী পড়তে হলে যেতে হতো যশোরে। হরিনারাণবাবু বয়োঃজ্যেষ্ঠ তিনটি ছেলে—বসন্ত, হেমন্ত আর শিশির এদের যশোরের বাসায় আনলেন। তাঁরা ইংরেজি স্কুলে ভর্তিও হলেন। এই তিন ভাই নিজেদের দলের মধ্যে খেলাধুলো আর পড়া-শুনায় ছিলেন অদ্বিতীয়।

যশোরের উত্তর গায়ে ভৈরব নদ। স্কুলটা তারই কাছে। একদিন শিশিরকুমার খেলতে যাননি। বিকেল বেলা। হরিনারাণবাবু কাছারী থেকে ফিরেছেন। পরদিন শনিবার—ছেলেদের নিয়ে দেশে যাবেন। যশোর থেকে পোলো-মাগরো অনেকটা দূর। একটা গাড়ীর ব্যবস্থা তো করতে হবে!

শিশিরকুমার পিতার কাছে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখটা বিষাদে ভরা। হরি-নারাণবাবু একটু হেসে বললেন, 'কালই তো শনিবার, আমার সঙ্গে দেশে যাবে। মন খারাপ করছ কেন?'

কিশোরচিত্তে তখন যেন ঝড় বইছে।

—'স্কুলের পাশ দিয়ে কতকগুলো লোককে গোরুর মতো বেঁধে নিয়ে গেল। তার মধ্যে কত লোক বুড়ো আর অথর্ব—তাদেরও টানতে টানতে নিয়ে গেল!'

হরিনারাণবাবু পুত্রের দিকে তাকালেন। শিশিরকুমারের চোখ দিয়ে তখন জল ঝরছে!

পিতার মনটা ভিজে গেল। গম্ভীর হয়ে বললেন 'ওরা নীল চাষ করবে না—সাহেবরা তাই ওদের কয়েদ করেছে।'

'নীল চাষ করবে না, সেটা তো ওদের ইচ্ছাধীন।'

'তা তো ঠিক। কিন্তু ওদের কথা শোনে কে?'

ধীরভাবে শিশিরকুমার বললেন,

'যশোরে এত উকিল—কত নামকরা লোক। এঁরা কি তাদের এতটুকু সাহায্য করতে পারেন না?'

পিতা নিরুত্তর।

'তারা কি চিরদিনই সাহেবদের জুলুম সহ্য করে যাবে?'

'ওদের কথা লাটসাহেব পর্যন্ত পৌঁছয় না। তিনি জানলে হয়ত কিছুটা ভাল হতে পারে!'

শিশিরকুমারের মুখে একটু হাসি ফুটলো, উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন, 'মাস্টার-মশাই আজ বলেছেন, Pen is mightier than sword?

পুত্রের মুখের ওপর পিতার স্নিগ্ধ দৃষ্টি নিবদ্ধ। বললেন, 'কথাটা ঠিক। Pen is mighter than sword!

যশোরের উত্তর বিভাগ—মহম্মদপুর। মুর্শিদকুলির আমলে সীতারাম রায় এখানকার রাজা ছিলেন। তাঁর অভ্যুত্থান ও পতন যেন একটা চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী। মহম্মদপুর ধ্বংস হয়ে গেল। এই ধ্বংস-স্তূপের ওপর জন্ম নিল মারাত্মক ব্যাধি—ম্যালেরিয়া। এর বিস্তৃতি সারা দেশটাকে ধ্বংস করে দিল। যশোর নিল এক নামকরা ভূমিকা। গ্রামের পর গ্রাম বিধ্বংস হয়ে গেল, প্রতিকারের কোন ব্যবস্থাই সরকার থেকে হলো না। এই সংকটময়কালে পোলো-মাগরোর ঘোষ পরিবারে এলো এক কল্পনাতীত দুর্দিন। হরিনারায়ণবাবু এই রোগের কবলে দেহ রাখলেন। ঘোষেদের সংসারে অসচ্ছলতা ছিল না। দুঃস্থ মানুষদের সাধ্যমত সাহায্য করতেন শিশির-জননী অমৃতময়ী। হরিনারায়ণের মৃত্যুর পর অবস্থান্তর ঘটল। তখন দুঃখকষ্টের অবধি নেই, তবুও কিন্তু ঘোষদের মনোবল এতটুকু ভেঙে পড়েনি। সে সময়ে একটু ইংরেজী বলতে লিখতে পারলে বেশ ভাল চাকরি মিলতো। শিশিরকুমার ইংরেজিতে সুপণ্ডিত হয়ে উঠলেন।

"The articles of Sisir Kumar display his remarkable sagacity, strong common sense, power of expression and clear scathing style and mastery over the English language even in those days when he was a mere strippling".

যশোরের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সহৃদয়তা তাঁকে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী করে দিল। তাঁর সুমিষ্ট আলাপ, ভদ্রব্যবহার, কর্মশক্তি ও দরদী মন যেন তাঁকে প্রত্যেককেই আপনজন বলে মনে করতে লাগলো। যশোরে তিনি হয়ে পড়লেন সকলের মানুষ।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু। তিনি বললেন একদিন,

'একটা চাকরি নেও না। সংসারের কষ্টটাতো যাবে। সাহেবরা এক্ষুনি রাজি হবে!'

শিশিরকুমার একটু হাসলেন। বললেন, 'কি চাকরি ভাই? দারোগাগিরি!' অল্পক্ষণের মধ্যে তাঁর মুখখানা গম্ভীর হয়ে উঠলো। শান্ত ধীর অকম্পিত কণ্ঠে বললেন, 'দাসত্বের চেয়ে দারিদ্র্য শতগুণে শ্রেয়।'

তাঁর মনের ভেতর একটা কথাই যেন বারে বারে জেগে উঠতো—Pen is mightier than sword; ভাইদের সঙ্গে পরামর্শ চললো। দুঃখ আর দৈন্যে হতাশ হওয়া অপৌরুষেয়। স্থির হলো, যশোর থেকে একটা কাগজ বের করতে হবে। সাহেবদের অত্যাচার ও তার প্রতিরোধ—গ্রামের দুঃখদুর্দশা নিরসনের সুচিন্তিত পন্থা, ধনীদের শাসন ও শোষণের প্রতিবাদ ও প্রতিকারের এটি হ'বে নির্ভীক মুখপত্র। সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে শিশিরকুমার গ্রামে ফিরলেন। মাকে গিয়ে বললেন, 'আজ তোমার আশীর্বাদ নিতে এসেছি মা!'

মাতা অমৃতময়ী শিশিরকুমারের মস্তক স্পর্শ করে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন, 'আশীর্বাদ! জগজ্জননী জানেন আমার অন্তরের কথা!'

শিশিরকুমারের চোখটা ভিজে উঠলো। বললেন 'স্বর্গাদপি গরীয়সী সে যে তুমি, আমার মা!'

পুত্রকে স্নেহালিঙ্গনে বুকে চেপে ধরলেন মাতা অমৃতময়ী।

তাঁর চোখে তখন অশ্রুধারা।

'আশীর্বাদ করো মা! দেশের শতসহস্র জননীর চোখের জল যেন মুছিয়ে দিতে পারি। আশীর্বাদ করো মা তোমার নাম নিয়ে অমৃতবাজার পত্রিকা যেন জগতের কল্যাণ-সাধনে ব্রতী হয়।' বললেন শিশিরকুমার।

যশোরে প্রতিষ্ঠিত হলো অমৃতবাজার পত্রিকা। এটা আজ থেকে একশ বছর আগে।

ম্যাজিস্ট্রেটরা সাহেব। তাঁরা গোড়ার দিকে পত্রিকার সমর্থক ছিলেন। তাঁরা এই ভেবেছিলেন—পত্রিকা তাঁদের সব কাজের সমর্থক হবে। কিন্তু শিশিরকুমার ভিন্ন-ধাতের লোক। তাঁদের অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদ পত্রিকায় প্রকাশ হতে লাগলো। সাহেবরা জ্বলে উঠলেন। শিশিরকুমার লাট-সাহেবের কাজের সমালোচনা করতে দ্বিধা করলেন না। সাহেবরা একেবারে ক্ষেপে গেলেন। গোয়েন্দা পুলিশ ছুটলো তাঁর পিছনে। প্রসন্নবাবু, গিরীশ বোস দুজন নামকরা প্রথম শ্রেণীর দারোগা। তাঁরা শিশিরকুমারকে আইনের আওতায় ফেলার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাঁদের সব চেষ্টাই বিফল হল।

তখন দেশে আর্থিক দুর্দিন। পত্রিকার প্রচার স্তিমিত হয়ে গেল। এর ওপর বারবার ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে শিশিরকুমারের কর্মশক্তি অবলুপ্ত হবার উপক্রম হয়ে উঠেছে। তিনি কলকাতায় চলে এলেন।

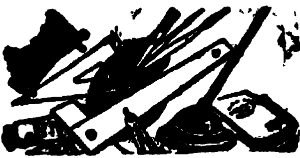
এখন নূতন কর্মস্থল হলো—বাগবাজার। একটা প্রেস কিনলেন শিশির-কুমার। এই প্রেসটি "পত্রিকা আপিসে" সযত্নে রাখা আছে। তখনকার দিনের জাতীয়তাবাদী হিন্দু প্রেটিয়টের অবলুপ্তি ঘটেছে। ইণ্ডিয়ান মিরর তত জোরদার নয়। ধীরে ধীরে 'পত্রিকা' তার মূল আদর্শ রূপায়িত করে জনগণের চিত্ত জয় করে নিল। লোকে বলতো—পত্রিকা, দেশের পত্রিকা—সকলের পত্রিকা। স্যার রিচার্ড টেম্পল তখন ছোটলাট। স্যার রিচার্ড এর মত সহৃদয় লাট বাংলায় খুব কমই এসেছেন। পত্রিকার প্রবন্ধে তিনি আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন। তিনি নিজেই শিশিরকুমারের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করলেন। তখনকার দিনের বাংলার লাট দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে সৌহার্দ্যের নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ হলেন তিনি। ঈর্ষায় জ্বলে উঠলো কলকাতার সাংবাদিকের দল।

কোনো এক সম্পাদক প্রকাশ্যে বলে ফেললেন,—"বাঙালটা লাটসাহেবকে একেবারে মুঠোর মধ্যে পুরে ফেলেছে।" শিশির-কুমারের পরামর্শ নিয়ে স্যার রিচার্ড শাসন-পদ্ধতির অনেক পরিবর্তন করলেন। তাঁরই পরামর্শ মতো কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটিতে নির্বাচন প্রথার ব্যবস্থা হলো। সেইটেই ভারতে সর্বপ্রথম 'ইলেকশনের' প্রচলন। পত্রিকার এই অবদান আজ গণতন্ত্রের পূর্ণ লক্ষ্যে এসে পৌঁচেছে।

কলকাতায় তখন ইংরেজি শিক্ষা চালু হয়েছে। ইয়ং বেঙ্গল তখন সাহেবদের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে আত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ। মেধাবী ছেলেরা চলেছে বিলেতে। ব্রাহ্মণদের জাতিচ্যুত করার ফতোয়া আর কেউ মানছে না। বিলিতী দার্শনিক পন্ডিতদের দর্শন-সূত্রে তাদের ধ্যানজ্ঞান হয়ে উঠেছে। উমেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরেছেন। শিক্ষায় দেশ অগ্রগামী, কিন্তু দেশ যে পরাধীন। মিঃ হিউমের সাহায্যে জাতীয় কংগ্রেস স্থাপিত হলো—উদ্দেশ্য দেশকে পরাধীনতার শৃংখল হতে মুক্ত করতে হবে।

১৮৮৫ সালে বোম্বাইতে জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন—সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তখনকার দিনে ইংরেজদের কাছে আবেদন আর নিবেদন, এই ছিল কংগ্রেসের কাজ। এই গোলপাকানো রাজনৈতিক আবহাওয়ার মধ্যে পত্রিকা দেখিয়ে দিল পথের সন্ধান। কংগ্রেসের মনোভাব ক্রমশ কঠোরতর হয়ে উঠলো। রাজনীতির মূল উৎস ছিল কলকাতায়। বিডন স্কোয়ারে শিশিরকুমার এক জনসভা ডাকলেন। অগণিত লোকসমাগম। সরকারী কর্মচারীদের বেয়াদপি, সরকারী কার্য-পদ্ধতির অসঙ্গতি, হগ সাহেবের স্বেচ্ছা-চারিতার বিরুদ্ধে পত্রিকা প্রভাতসূর্যের মতো সাফল্যের চঞ্চলতা সৃষ্টি করলো। শিশির-কুমারের সংগঠনশক্তির প্রশংসা ভারত-বিদ্বেষী ইংলিশম্যানেও প্রকাশিত হলো।

তখন ভারতে ইংরেজ রাজত্বের মধ্যাহ্ন। ভিক্টোরিয়া যুগ। উদার মানবদরদী



সকল প্রকার আফিস ষ্টেশনারী কাগজ ড্রইং ও ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্যাদির সুলভ প্রতিষ্ঠান।

কুইন ষ্টেশনারী ষ্টোর্স প্রাঃ লিঃ

৬৩-ই, রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১
ফোন : আফিস—২২-৮৫৮৮ (২ লাইন)
২২-৬০০২
ওয়ার্কশপ—৬৭-৪৬৬৯ (২ লাইন)

গ্লাডস্টোন ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী। আয়ার-ল্যান্ড রক্ষণশীল লর্ডদের কুক্ষিগত। আয়ার-ল্যান্ডকে শোষণমুক্ত করার জন্যে গ্লাডস্টোন বদ্ধপরিকর। রাণীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও হোমরুল বিল পার্লামেন্টে পাশ হলো। যেটুকু স্বাধীনতা আইরিশরা পেলো তাতে তাদের মন উঠলো না। 'সিন ফিনার্স' সন্ত্রাসবাদীর দল আয়ারলণ্ডে জোরালো হয়ে উঠলো। ডি ভ্যালেরা এই দলের সভাপতি। সিন ফিনার্সদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলায় গড়ে উঠলো সন্ত্রাসবাদীর দল। বাংলার শিক্ষিত যুব সম্প্রদায় এই দলে যোগ দিল। বাংলায় সন্ত্রাসের সৃষ্টি হল। জাতীয়তাবাদী পত্রিকার পরোক্ষে সমর্থন ইংরেজ ভাল চোখে দেখেনি। শিশিরকুমারকে ধরবার পন্থা খুঁজে বার করবার চেষ্টা চললো। তখন বাংলা বিহার উড়িষ্যার বিভাগ হয়নি। শিশিরকুমার সপরিবারে মাঝে মাঝে দেওঘরে যেতেন—সেখানে একটা বাড়ি ছিল। বসন্তবাবু দেওঘরের একজন পুলিশ অফিসার। তাঁর স্ত্রী শিশিরবাবুদের বাড়িতে প্রায়ই বেড়াতে আসতেন। কথাপ্রসঙ্গে একদিন শিশিরবাবুর স্ত্রীকে বললেন, 'পত্রিকার কর্তাদের ধরার চেষ্টা চলছে। তখন কাগজ চলবে কেমন করে?' শিশিরবাবুর স্ত্রী পাড়াগেঁয়ে মেয়ে, তবু ঘাবড়ে গেলেন না। উত্তর দিলেন, 'কর্তাদের যদি পুলিশে ধরে নিয়ে যায় তবুও কাগজ চলবে। আমরা বাড়ির মেয়েরা কাগজ চালাবো।' বসন্তবাবুর স্ত্রী আর কখন এই প্রসঙ্গ তোলেন নি।

বাংলায় ঘটনাচক্রের অতি দ্রুত পরিবর্তনে ইংরেজ চিন্তিত হয়ে উঠলো। তাদের দমন-নীতি যতই কঠোর হতে লাগলো সন্ত্রাস-বাদীদের কার্যকলাপ ততই জোরালো হয়ে উঠলো। কলকাতা, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলাগুলোতে সন্ত্রাসবাদীদের গুপ্ত আড্ডা গড়ে উঠলো। ইংরেজ এটা অনুধাবন করে নিল। তাদের নূতন পদ্ধতিতে বিচারের ব্যবস্থা করার জন্যে ১৯৩০ সালে বেঙ্গল ক্রিমিনাল সংশোধিত আইন পাশ করে নিল। তখন পত্রিকার সম্পাদক তুষারবাবু। ১৯৩২ সালের ৩০শে এপ্রিল মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ডগলাস আততায়ীর গুলিতে নিহত হলেন। প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য হত্যাকারী বলে ধৃত হল। নতুন আইনে তার বিচারের জন্যে বেঙ্গল গবর্নমেন্ট কয়েকজন কমিশনার নিযুক্ত করলেন। বিচার শুরু হলো ৮ই থেকে। প্রদ্যোতের ফাঁসির হুকুম হলো। ২৮শে ও ২৯শে জুন কমিশনারদের বিচার ভ্রমাত্মক ও আইনসঙ্গত নয় বলে পত্রিকার কড়া সমালোচনা বের হলো। বেঙ্গল গবর্ন-মেন্ট পত্রিকার সম্পাদক তুষারবাবুর নামে আদালত অপমাননার দায়ে মামলা রুজু করলেন। হাইকোর্টও রুল দিলেন। কমিশনারদের কোর্টে প্রদ্যোতের মামলা পত্রিকার নিয়মিতভাবে বড় বড় হরপে ছাপা হতো। সরকারী বক্তব্য ছিল—হেডলাইনগুলো "disguised criticism of the prosecution case and garbled and misleading as summaries of the evidence". ১৪ই জুন তারিখে বড় বড় হরপে ছাপা হল—"Identity doubtful — Prodyot attracted from play ground by report of firing". সাক্ষীদের মনে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করা হয়েছে হাইকোর্টের জজদের এই হল সিদ্ধান্ত। তুষারবাবু কোর্টকে জানিয়ে দিলেন তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন

"Editors believe that they are entitled to comment and have done what the law permits to do".

জজেরা আশা করেছিলেন তুষারবাবু ক্ষমা চেয়ে ব্যাপারটা নিষ্পত্তি করে নেবেন। সংবাদপত্রের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে, সংবাদপত্রের নির্ভীক সম্পাদনা ব্যাহত হবে, তাই ক্ষমা চাইবার প্রশ্নই তাঁর মনে ঠাঁই পায় নি। ১৯৩২ সালের ১লা ডিসেম্বর হাইকোর্টের রায় হলো—

"We do not consider it necessary to commit the opp party (editor and others) to prison and we consider it sufficient to order that each of them do pay a fine of Rs. 500".

পত্রিকা চিরদিনই সোজা পথ ধরে চলেছে। রাজরোষের ভয়ে কোনদিনই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে সঙ্কুচিত হয়নি। ১৯৩৫ সালের ২১শে মার্চ Bengal Legislative Council-এ হাই-কোর্টের কার্যাবলীর সমালোচনা হলো। ২৩শে মার্চ পত্রিকায় প্রকাশিত হল—

"It is so unfortunate and regrettable that at the present day the Chief Justice and the Judges find a peculiar delight in hobnobbing with the Executive with the reseet the judiciary is robbed of its dependence".

২৮শে মার্চ অপমাননার দায়ে সম্পাদক তুষারকান্তি ঘোষ ও প্রিন্টার তড়িৎকান্তি বিশ্বাসের বিরুদ্ধে রুল জারি হল। স্যার তেজবাহাদুর তুষারবাবুর পক্ষে সওয়াল করলেন। ক্ষমা চাইলেই তুষারবাবু ছাড়া পেতেন। লর্ড ডার্বিশায়ার স্যার তেজ-বাহাদুরকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সম্পাদকের পক্ষে কিছু বলার আছে কি?'

তেজবাহাদুর উত্তর দিলেন, 'এইটুকু বলতে পারি, এই অল্পবয়সী ভদ্রলোকটি অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক। এ ছাড়া আর কিছু বলার নেই।'

আইনের বহু বিতর্ক চললো। ইংলণ্ডের আইনবিশেষজ্ঞদের বিভিন্ন নজির ও অভিমতের বিচার চললো—

যুগজয়ী বই
রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের
বন্দ্যোপাধ্যায়
ঠাকুরবাড়ীর কথা
দ্বারকানাথের পূর্বপুরুষ থেকে রবীন্দ্র-নাথের উত্তরপুরুষদের তথ্যপূর্ণ জীবন-কথা। [১২·০০]
উপনিষদের দর্শন
উক্ত বিষয়ের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা। [৭·০০]
রবীন্দ্র দর্শন
কবিগুরুর জীবন-দর্শন। [২·৫০]
বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত
বাঁকুড়ার
বাঁকুড়ার তথা বাংলার মন্দিরগুলির সচিত্র মূল্যায়ন। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা; ৬৭ আর্ট প্লেট। [১৫·০০]
ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত রচিত
ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য
সাহিত্য আকাদমী পুরস্কারপ্রাপ্ত বই। [১৫·০০]
সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ও সংকলিত
বৈষ্ণব পদাবলী
প্রায় চার হাজার পদের আকর গ্রন্থ। [২৫·০০]
রচিত
ডেটিনিউ
জাতীয় জীবনের একটি অধ্যায়। শ্রীভূপেন দত্তের ভূমিকা। [৩·০০]
শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত
বঙ্কিম রচনাবলী
১ম খণ্ডে সমগ্র উপন্যাস। [১২·৫০]
২য় খণ্ডে সমগ্র সাহিত্য অংশ। [১৫·০০]
ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত
দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী
দুই খণ্ডে সমগ্র রচনা।
১ম খণ্ড [১২·৫০] ২য় খণ্ড [১৫·০০]
ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত
মধুসূদন রচনাবলী
ইংরেজিসহ সমগ্র রচনা এক খণ্ডে। [১৫·০০]
দীনবন্ধু রচনাবলী
সমগ্র রচনা এক খণ্ডে। [১০·০০]
প্রতি রচনাবলীতে জীবন-কথা ও সাহিত্য কীর্তি আলোচিত।
সাহিত্য সংসদ
৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলি-৯

তবুও হাইকোর্ট ছাড়লেন না। ৮ই এপ্রেল রায় হলো। লর্ড জার্বিশায়ার তুষারবাবুকে বললেন,

"Tushar Kanti Ghosh—you have been adjudged by this court to be guilty of contempt of court by reason of the article. No apology or regret has come from you. You be detained in simple imprisonment for a period of three months".

প্রিণ্টার তড়িৎকান্তি বিশ্বাসকে জানানো হল,

"You were before this court in 1917 reflecting the impartiality of the then Chief Justice. You were subjected to a fine. That ought to have put you on your guard. You adopt the same attitude as the Editor. Therefore you be detained in simple imprisonment for a period of one calender month".

আইনের কূটতর্কের মীমাংসার জন্যে প্রিভি কাউন্সিলে আপিলের অনুমতি চাওয়া হলো, কিন্তু জার্বিশায়ার তা বাতিল করে দিলেন।

বিদেশী বিচারের ভ্রূকুটিতে নতি-স্বীকার না করে জনগণের স্বার্থ দেশের কল্যাণ ও স্বাধিকার রক্ষা করতে পত্রিকার সম্পাদক বারবার রাজরোষে নিপীড়িত হলেন। জনসাধারণের দরদী অমৃতবাজার পত্রিকা শিশিরকুমারের আশা ও আকাঙ্ক্ষা, অত্যাচারের প্রতিবাদ-পত্র আজ ভাস্বর দীপালোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে—সুদূর ভবিষ্যতেও পত্রিকা দেশ ও জনগণের স্বার্থের অতন্দ্র প্রহরী হয়ে থাকবে।



মাথাধরা?

অ্যানাসিন

ব্যথা-বেদনার উপশমে
ঢের ভালো কারণ
এটি ৪-ভাবে
কাজ করে



অ্যানাসিন ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্রের মত একাধিক ভেষজের অপূর্ব্ব সমবায়ে তৈরী বলেই খুব তাড়াতাড়ি ৪-ভাবে আপনাকে আরাম এনে দেবে :

১) অ্যানাসিন মাথাধরার যন্ত্রণা সারাবে তাড়াতাড়ি।
২) অ্যানাসিন স্নায়ুর উত্তেজনা দূর করবে—যা মাথাধরার সাধারণ কারণ।
৩) অ্যানাসিন অবসাদ ঘোচাবে—যা সাধারণতঃ মাথাধরার সঙ্গী হ'য়ে আসে।
৪) অ্যানাসিন ক্লান্তি দূর ক'রে আবার আপনার স্বাভাবিক উৎসাহ ও আনন্দ ফিরিয়ে আনবে।

এছাড়া অ্যানাসিনে সর্দি আর ইনফ্লুয়েঞ্জা, দাঁতশূল আর গায়ের ব্যথাও সারবে।

১টি অ্যানাসিন খেলেই
খুব তাড়াতাড়ি আরাম

পত্রিকার নিগ্রহ ও আত্মরক্ষার কাহিনী

১। অমৃতবাজার পত্রিকার জন্মস্থানে এর বিরুদ্ধে একটি মানহানির মামলা দায়ের হয়। কারণ এক ইউরোপীয় কর্মচারীর 'বীভৎস অত্যাচার'-এর কাহিনী ১২ই জুন ১৮৬৮তে (পত্রিকার সপ্তদশ সংখ্যায়) পত্রিকার স্তম্ভে প্রকাশিত হয়েছিল। দু সপ্তাহের জন্য এই সাপ্তাহিক কাগজের প্রকাশনা বন্ধ থাকে।

২। তখন এটি দ্বিভাষিক সাপ্তাহিক। সেই সময় নবপ্রচলিত ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট অব ১৮৭৮ অনুযায়ী কাগজের বিরুদ্ধে আইনের ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা হয়। এই বিপদ থেকে উদ্ধারের একমাত্র উপায় ছিল সম্পাদক কর্তৃক একে পরিপূর্ণভাবে ইংরাজী সাপ্তাহিকে পরিবর্তিত করে। এবং রাতারাতি বাংলা কাগজকে ইংরাজী কাগজেই রূপান্তরিত করা হয়। (২১শে মার্চ ১৮৭৮)।

৩। কটকের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বাংলা প্রেসিডেন্সীর উড়িষ্যা বিভাগের অ্যাক্টিং কমিশনার যিনি অবস্থাপন্ন ভারতীয়দের কাছ থেকে মোটা টাকা 'ধার' করতেন তাঁর দুর্নীতিমূলক কর্ম প্রকাশ করার জন্য ১৮৮৭-তে এই সাপ্তাহিকের বিরুদ্ধে আরেকটি আইনের সাহায্য নেবার ভীতি প্রদর্শন করা হয়। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান কাগজগুলি এই কর্মচারীকে পত্রিকার বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা আনবার জন্যে যথেষ্ট উস্কানী দেয়। কিন্তু পত্রিকায় তাঁর কীর্তি প্রকাশিত হবার পর তিনি দীর্ঘ ছুটি নিয়ে এদেশ ত্যাগ করেন এবং আর ফেরেন নি।

৪। ১৮৮৮ সালে মধ্যভারতীয় দেশীয় রাজ্যগুলিতে ভাইসরয়ের এজেন্ট পত্রিকার বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগের জন্যে পীড়াপীড়ি করেন। অপরাধ এই যে ভূপালের বেগম ও সেওয়ার মহারাণীর অধিকার ও সুযোগ-সুবিধাগুলির জন্য এতে বিভিন্ন সময়ে অনেকগুলি প্রবন্ধে এই কর্মচারীর সমালোচনা প্রকাশিত হয়। তবে ভাইসরয় তাঁকে মামলা করতে দেন নি। পরে তিনি এদেশ ত্যাগ করেন।

৫। ১৯০১ সালে কানপুরের কুলি এমিগ্রেশন এজেন্ট পত্রিকা সম্পাদকের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা আনেন। এই মামলার শুনানীর একজন জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট সম্পাদককে দোষী সাব্যস্ত করে সর্বোচ্চ জরিমানা (১০০০৲ টাকা) করেন। আপীলে সেসন জজ সম্পাদককে মুক্তি দেন।

৬। ১৯১৩ সালে পত্রিকাকে ১৯১০-এর প্রেস অ্যাক্ট অনুযায়ী সর্বোচ্চ মূল্য ৫০০০৲ টাকা সিকিউরিটি ডিপোজিট হিসেবে চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জমা রাখতে নোটিশ দেওয়া হয়। পত্রিকাকে জানানো হয় যে আসামের জগৎসী পুলিশ কেসের সমালোচনায় 'অরুণাচল আশ্রম বন্ধ' নামে প্রবন্ধ লেখবার জন্য এই জামানত চাওয়া হয়েছে।

৭। সেই বছরেই পত্রিকার মুদ্রক ও সম্পাদককে কলকাতা হাইকোর্টের স্পেশাল বেঞ্চে উপস্থিত করিয়ে বলা হয় যে 'বরিশাল ষড়যন্ত্রের মামলা'র ওপর কতকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশের দরুণ আদালত অবমাননার দায়ে তাঁদের কারাবাস না করার কারণ দর্শানোর প্রয়োজন। মামলাটি ব্যয়সমেত ডিসমিস করা হয়েছিল। এই মামলার ফলে আদালত অবমাননার বিল প্রচলিত হয়। এতে বলা হয় যে, প্রত্যেক কাগজে তার সম্পাদকের নাম প্রকাশ করতে হবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দরুণ তখনই বিলটি সুপ্রীম লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় নি। ১৯২৬ সালে এটি বিধিবদ্ধ হয়।

৮। কলকাতা হাইকোর্টের আপীলের শুনানীর জন্যে একটি বেঞ্চের সংগঠন সম্পর্কে একটি প্যারা লেখার জন্যে পত্রিকার সম্পাদক ও মুদ্রকের বিরুদ্ধে ১৯১৭ সালে আরেকটি আদালত অবমাননার মামলা দায়ের করা হয়। একটি ফুল বেঞ্চে মামলার শুনানী হয় এবং এবারেও সম্পাদক মুক্তি পান। মুদ্রককে ৫০০ টাকা জরিমানা দিতে হয়।

৯। ১৯১৯-এর ১৭ই এপ্রিল (অর্থাৎ ১৩ই এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের ঠিক পরেই) বাংলা সরকার পত্রিকার ৫০০০৲ টাকা জামানত জব্দ করে নতুন করে ১০,০০০৲ টাকা জামানত দেবার নির্দেশ দেন কারণ দুটি প্রবন্ধ কাগজে বেরিয়েছিল: "ভারতবর্ষ কাহাদের" এবং "মিঃ গান্ধীর গ্রেফতার : আরো অত্যাচার"।

এই উপলক্ষে প্রথম পত্রিকার সম্পাদকীয় হয় ফাঁকা রাখা হয় নয়ত আংশিকভাবে এই ধরনের বিদ্রূপাত্মক লেখা দিয়ে বেরোতে থাকে যেমন : "প্রেস অ্যাক্ট অনুযায়ী আদর্শ ভারতীয় সংবাদপত্র এবং 'আলু ও কলা সম্পর্কে আলোচনা'। দেশের দ্রুত পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে উদাসীন থাকা এর পক্ষে বেশীদিন সম্ভব হয়নি। ২১শে এপ্রিল থেকে এতে স্বাভাবিকভাবে সম্পাদকীয় বেরোতে থাকে।

১০। ১৯১৯-এর ৩রা মে অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রেস কমিউনিকেতে জানানো হয় যে, পাঞ্জাব সরকার সেই প্রদেশে পত্রিকার প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছেন।

১১। ১৯৩০-এর ৩রা থেকে ১৪ই মে প্রায় পক্ষকালের মত পত্রিকা প্রেস অর্ডিনান্সের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে এর প্রকাশনা বন্ধ রাখে। বোম্বাইয়ে সর্বভারতীয় সাংবাদিক সভা সংবাদপত্র প্রকাশের স্বপক্ষে মত প্রকাশ করলে পত্রিকা আবার প্রকাশনা শুরু করে।

১২। ১৯৩২এর জুনে পত্রিকার জামানত আবার জব্দ হয় এবং একে নতুন করে ৬০০০৲ টাকা জমা দিতে বলা হয়। অপরাধ, এতে বিশপ্স কলেজের জনৈক ইংরাজ অধ্যাপকের (এস কে জর্জ) "ভারতের কঠোর শ্রমযন্ত্রণা" (প্রসবযন্ত্রণা) নামে একটি প্রবন্ধের প্রকাশ।

১৩। সেই মাসেই স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে 'ডগলাস হত্যাকাণ্ডের মামলা'র রায়ের ওপর দুটি প্রবন্ধের জন্যে পত্রিকা ও তার সম্পাদক ও মুদ্রকের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা আনা হয়। কলকাতা হাইকোর্টের ফুলবেঞ্চের বিচারে সম্পাদক ও মুদ্রকের প্রত্যেককে ৫০০৲ টাকা করে জরিমানা হয়।

১৪। ২৩শে মার্চ ১৯৩৫-এ বিচারকার্য পরিচালনার ওপর সম্পাদকীয় প্রকাশের জন্য আবার পত্রিকা এবং তার সম্পাদক ও মুদ্রকের নামে আদালত অবমাননার মামলা আনা হয়। সম্পাদকের তিন মাস ও মুদ্রকের এক মাস কারাবাসের আদেশ হয়।

১৫। ১৪ই অক্টোবর থেকে ২রা ডিসেম্বর ১৯৪৩ পর্যন্ত পঞ্চাশ দিন পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে কিছু প্রকাশিত হয়নি, ফাঁকা রাখা হয়। ১৪ই অক্টোবর এর কোন কারণ দর্শানো হয়নি কারণ যে আদেশে পত্রিকাকে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হতে হয় সেটিও প্রকাশিতব্য ছিল না। ৩রা ডিসেম্বর এর দীর্ঘ মৌনতা ভংগ করে ছাপা হয় 'আরো পঞ্চাশ দিন' এতে ব্যাপারটি সম্পর্কে বেশ পরিষ্কার ইঙ্গিত দেওয়া হয়।

১৬। ১৯৪৬ সেপ্টেম্বর বাঙলা সরকার ভারতরক্ষা আইনের আওতায় একটি নির্দেশ জারী করেন যাতে বংগদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সম্পর্কে কোন সংবাদ প্রকাশন মুদ্রণ ও বিতরণ নিষিদ্ধ করা হয়। পরদিন পত্রিকার ফাঁকা সম্পাদকীয় স্তম্ভ প্রকাশিত হয়।

১৭। ১৯৪৭-এর মে মাসে অমৃতবাজার পত্রিকার জামানত বাজেয়াপ্ত হয়। সংবাদটি এইভাবে প্রকাশিত হয়েছিল :

'যুগান্তরের সাম্প্রতিক একটি সংখ্যায় 'কলিকাতা ছাড়ো' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য বাংলা সরকার ভারতীয় প্রেস (জরুরী ক্ষমতা) আইন অনুযায়ী অমৃতবাজার পত্রিকার রক্ষিত ২০০০৲ টাকা জামানতের ১০০০৲ টাকা বাজেয়াপ্ত করেছেন। কাগজটি উক্ত পত্রিকা প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়।

'প্রেসের কীপারের কাছ থেকে নতুন ৫০০০৲ জামানত চাওয়া হয়েছে যাতে তিনি ডিক্লারেশন পুনরায় পেতে পারেন।

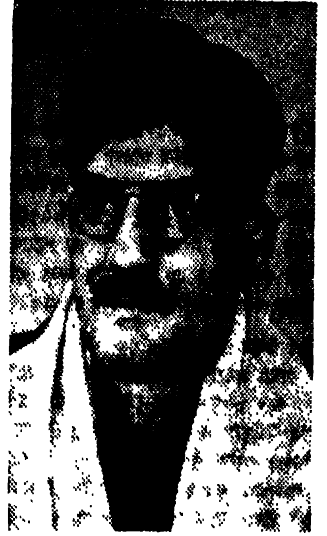
১৮। ঐ মাসেই আবার পত্রিকার সিকিউরিটি ডিপোজিট বাজেয়াপ্ত হয়। সংবাদটি এইভাবে ছাপা হয় :

'১২ই এপ্রিল ভদ্রতাটুকুও নয়' শিরোনামে যে সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হয় তার জন্যে বাংলা সরকার ৫০০০৲ টাকা জমা থেকে ৪০০০৲ টাকা বাজেয়াপ্ত করেছেন।

"কাগজের মুদ্রক ও প্রকাশকের কাছে নতুন করে ৭০০০৲ টাকা জমা চাওয়া হয়েছে"।

(সংকলন)

কারাবাসের দিনগুলি



তুষারকান্তি ঘোষ

আমি ১৯৩৫ সালে তিন মাসের জন্যে জেলে গিয়েছিলাম। কারণ, হাই-কোর্টের জজেদের ব্যবহার সম্বন্ধে আমাদের কাগজে একটা রচনায় আমরা বলেছিলাম যে, হাইকোর্টের জজেরা যদি বড় বড় সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে দহরম-মহরম করেন তবে তাঁদের স্বাধীনভাবে রায় দেবার ক্ষমতা থাকবে না। প্রায় সমস্ত ফৌজদারী মোকর্দমায় সরকার নিজেই একটি পক্ষ। তাই সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে জজ যদি বেশী মেশেন তবে তিনি ন্যায়সঙ্গত কাউকে শাস্তি দিলেও আসামীর মনে হতে পারে যে, 'আমার জজকে সেই দিন দেখলাম চীফ সেক্রেটারীর সঙ্গে চা খেতে খেতে হাসাহাসি করছেন।' আমাদের বলবার কথা এই ছিল যে, শুধু ন্যায়-পরায়ণ রায় দেওয়াই যথেষ্ট নয়, মামলার বিবদমান পক্ষের মনে এমন একটা বিশ্বাস থাকতে হবে যে রায় তাদের বিরুদ্ধে গেলেও তাতে অন্য কারো প্রভাব কাজ করে নি। এই ঘটনার বিষয়ে অনেকেই জানেন। সেইজন্যে স্বল্প কথায় জানাচ্ছি যে, হাইকোর্ট আমাকে আদালত অবমাননার জন্যে বিচার করেন, এবং চীফ জাস্টিসকে নিয়ে পাঁচজন জজ ছিলেন আমার বিচারক। চীফ স্যর হ্যারল্ড ডার্বিশায়ার এবং আর তিনজন ইংরেজ জজ একমত হয়ে আমাকে দোষী সাব্যস্ত করেন। কেবল একজন বাঙালী জজ মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় বলেন, আমি নির্দোষী। দোষী সাব্যস্ত করে জজেরা আমাকে ক্ষমা চাইতে বলেন। কিন্তু আমি তা পারি নি। আমি অবশ্য জানতাম যে রচনাটি যেভাবে লেখা হয়েছে সেটা ঠিকভাবে লেখা হয় নি—এই কথাই অন্য-ভাবে বলা যেত, কাউকে কটাক্ষ না করে। এটা জানবার একটা কারণও আগেই ঘটে-ছিল। পত্রিকায় ঐ রচনাটি যখন বেরোয় তখন আমি ছিলাম এলাহাবাদে। সেদিন আমি স্যর তেজবাহাদুরের সঙ্গে গল্প করছি। এমন সময় পত্রিকা এল। স্যর তেজবাহাদুর পত্রিকা হাতে নিয়ে রচনাটিতে চোখ বুলিয়ে তখনই বলেছিলেন, আপনার উদ্দেশ্য ভাল হলেও এ লেখার জন্যে শাস্তি পেতে হবে। কিন্তু এসব জানলেও আমার ক্ষমাপ্রার্থনার প্রধান বাধা ছিল এই যে, তাতে আমার আদর্শবোধে আঘাত লাগত। অসংযত ভাষায় লেখা হলেও যেটা বলতে চেয়েছিলাম সেটা ন্যায়সঙ্গত। সেইজন্যে ক্ষমাপ্রার্থনার কোন প্রশ্নই আমার মনে ওঠে নি। এবং আমার অ্যাডভোকেট স্যর তেজবাহাদুর সপ্রু এবং শৈলেন বন্দ্যো-পাধ্যায় জজেদের জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, ক্ষমা চাইতে আমি সক্ষম নই এবং অসম্মত।

এইখানে একটা কথা বলে রাখি। আদালতকে, বিশেষ করে হাইকোর্টকে আমি আন্তরিক সম্মান করি। বিশেষত, তখনকার কালে যখন বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন বিদেশী শক্তি এখানে রাজত্ব করছিল তখন একমাত্র হাই-কোর্টই আমাদের খানিকটা নিরাপত্তা দিতে পারত।

যাই হোক, একটা বিষয়ে আমি মনে ব্যথা পেয়েছিলাম যে, পত্রিকার গরীব প্রিন্টার বেচারিও আমার সঙ্গে জেলে গিয়েছিলেন। কারণ তাঁর কোন দোষই ছিল না। তিনি ছিলেন অধীনস্থ কর্মচারী এবং কোন রচনাতে পরিবর্তন করার কিছুমাত্র ক্ষমতাও তাঁর ছিল না। তাছাড়া আমার মতোই ঐ বিশেষ রচনাটির বিষয়ে তিনিও কিছুই জানতেন না। আমি ছিলাম এলাহাবাদে এবং তিনি সেই সময় ছিলেন কলকাতার বাইরে। তবে বিচারে শাস্তি হলেও ভালোর মধ্যে এই যে, আমার যে ক্ষেত্রে হয়েছিল তিন মাস, তাঁর হয়েছিল মাত্র এক মাস জেল। এবং তিনিও হয়ে-ছিলেন প্রথম শ্রেণীর বন্দী।

এইবার জেলের কয়েকটি ঘটনার কথা বলব।

জজেরা রায় দেবার পর তখনকার শেরিফ আবদুল হালিম গজনভি আমাদের প্রেসিডেন্সী জেলে নিয়ে গেলেন। তার আগে তিনি দয়া করে আমাকে একটা সুবিধে দিয়েছিলেন, তার জন্যে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব। আমার বিচার হয়ে যাবার পর জেলে যাবার আগে তিনি আমাকে আমার স্ত্রীর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলার সুযোগ দিয়েছিলেন। এটা নাকি রীতি-বিরুদ্ধ কাজ। কিন্তু তিনি আমাদের পরিবারকে ভালমত জানতেন, এবং সেই-জন্যেই আমি স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবার এই সুযোগটুকু পেয়েছিলাম। বলাবাহুল্য, টেলিফোনে আমি শুধু আমার স্ত্রীকে ভরসা ও আশ্বাস দিয়ে মন খারাপ করতেই বারণ করেছিলাম।

জেলের প্রথম ঘটনা হল, সেখানে পৌঁছেই আমার টাকাকড়ি যা-কিছু সঙ্গে ছিল সব জেল গেটে নিয়ে নিল। এবং দোতলার দুখানি পাশাপাশি ঘরে আমাদের রাখা হল। কিছুক্ষণ পরে দেখি, আমাদের প্রিন্টার, তিনি সম্পর্কে আমার মামা, তাঁর মুখ শুকনো। আমি বললাম, 'মামা, এত মন খারাপ করছ কেন? একসঙ্গে থাকব। তাছাড়া তুমি তো আগেই চলে যাবে।' মামা বললেন, 'তা নয়, মুশকিল হয়েছে একটা। বাবাজী, তুমি তো জানো আমি আফিংখোর। সময়ে আফিং না পেলে তো আমার চলবে না।' এই কথা শুনে যখন ভাবছি কী করা যায়, তখন বঙ্কিমবাবু বলে একজন ভদ্র-লোক—যিনি আমাদের পাশের সেলে থাকতেন — তিনি আমাদের কথাবার্তার কিছুটা শুনে এগিয়ে এসে বললেন, 'এর জন্যে ভাবনা কী? টাকা আছে?' আমি বললাম, 'না।' কিন্তু মামা বললেন, 'আছে।' কারণ আমাদের কাছ থেকে যখন টাকাকড়ি জেল গেটে নিয়েছিল তখন মামা হয়তো ভুলবশত তাঁর সঙ্গের টাকা জমা দেন নি। যাই হোক, বঙ্কিমবাবু মামার কাছ থেকে একটি টাকা নিয়ে চলে গেলেন। এবং তখন যদিও প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল তবু ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আট আনা দামের মত আফিং এনে দিলেন। আমি বঙ্কিমবাবুকে জিজ্ঞাসা করলুম, তিনি কয়েদী হয়ে এ কাজ কী করে করলেন। তাতে তিনি জানালেন, "এসব জিনিস অল্পস্বল্প আনা যায়। তবে টাকায় আট আনা কমিশান। আমি প্রায় চার বছর জেলে আছি। আমি এসব জানি।" আফিং দেখে মামার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এবং তখনই বুঝলাম, হাই-কোর্টে জেল হবার খবর পাবার পর মামা কেন এতো মুষড়ে পড়েছিলেন। এর পর থেকে মামা যতোদিন আমার সঙ্গে জেলে ছিলেন, বেশ হাসিখুশিভাবেই ছিলেন। অবশ্য ইতিমধ্যে দরখাস্ত করায় ফলে জজেরা তাঁর আফিং পাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন।

প্রেসিডেন্সী জেলে সাত দিন কাটানোর পর আমাদের আলিপুর জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই আমি বাকী সময়টা ছিলাম।

জেলে আমাদের ইউরোপীয়ান ইয়ার্ডে রাখা হয়েছিল। সেটা একটা ছোটো বাংলো মত। যতোদূর মনে পড়ছে, সেখানে তিনটি ঘর এবং কমোডসহ একটি বাথরুম ছিল। আর ছিল পাঁচিলে ঘেরা ছোট একটি উঠোন।

আলিপুর জেলে নবজীবন আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে আমি অনেকগুলো বন্ধু পেয়েছিলাম—তাঁরা সেখানকার ডেপুটি জেলার এবং ডাক্তার ছিলেন। রোজ সন্ধ্যার সময় আমার লক-আপ হয়ে গেলে তাঁরা এসে দরজার লোহার গরাদের বাইরে বসে আমার সঙ্গে গল্প করতেন।

এঁদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হওয়াতে আমি কত উপকৃত হয়েছিলুম তা বলতে পারি না। সপ্তাহে একদিন করে আমি বাড়ির লোকের সঙ্গে দেখা করতে পারতাম। এই সব দেখা করার সময় বলাবাহুল্য আমার স্ত্রী নিয়মিত আসতেন। একদিন তিনি এলেন না। শুধু আমার ভাইপো শচীবিলাস এল, এবং জানাল, একটা বিয়ের নিমন্ত্রণে যাবার কথা ছিল তাই আমার স্ত্রী সেদিন আসেন নি। শচীর সঙ্গে আমার স্ত্রীকে না দেখে আমার মন অত্যন্ত চিন্তান্বিত হয়েছিল। তাই শচীর প্রবোধবাক্যে আমি বিন্দুমাত্র আশ্বস্ত হতে পারি নি। আমি আমার স্ত্রীকে ভালোরকমই চিনতাম। তাই আমি একেবারে বিশ্বাস করতে পারি নি যে, তিনি জেলে আমার সঙ্গে দেখা করতে না এসে নিমন্ত্রণ খেতে যাবেন। তা সে নিমন্ত্রণ যতোই অপরিহার্য এবং নিকট-আত্মীয়দের দ্বারা হোক না কেন। আমার মনে হয়েছিল, তিনি আর নেই! আমি তাই শচীর সঙ্গে কোন কথা না বলে আমার ঘরে ফিরে গেলুম।

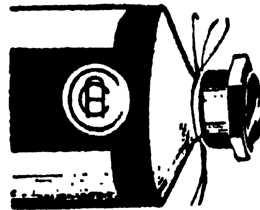
সেই দিন সন্ধ্যায় ডেপুটি জেলার অনাদিবাবু অতি গোপনে আমাকে একখানি পত্র এনে দিলেন। সে পত্র আমার স্ত্রী লিখেছিলেন। তার পূর্বরাত্রি থেকে প্রায় কলেরার মত শক্ত পেটের অসুখ হয়েছিল তাঁর—সেইজন্যে তিনি তখন সম্পূর্ণ শয্যাগত ছিলেন। এই পত্র পেয়ে আমি যেন নতুন জীবন পেয়েছিলাম। কারণ তার আগে দুঃখে ও চিন্তায় আমি জীবন্মৃত হয়েছিলাম।

এইখানে একটা কথা বলে রাখি যে জেলে আটক থাকাকালীন মনের এমন অবস্থা হয় যে, একটা স্বাভাবিক ঘটনাও অস্বাভাবিক মনে হয়, এবং একটা তুচ্ছ ঘটনাও ভয়ংকর বলে মনে হয়। অনাদিবাবু আমাকে অনুগ্রহ না করলে এ চিঠি আমি সেদিন কখনোই পেতাম না। কারণ বন্দীদের প্রত্যেক চিঠি সেন্সর না করে দেওয়া হত না।

এ প্রসঙ্গে চিঠি সম্বন্ধে আরেকটা কথা মনে হচ্ছে। প্রথম প্রথম আমার স্ত্রী আমাকে যেসব চিঠি লিখতেন এবং আমি তার যেসব জবাব দিতাম সেগুলো সেন্সর করা হত। এ থেকে বেশ বোঝা যাবে যে, সে চিঠিগুলো কোন জাতের চিঠি ছিল। তুমি কেমন আছ, আমি ভালো আছি, এর বেশী নয়। এ চিঠিতে আমাদের কারো তৃপ্তি হত না। সেইজন্যে আমরা একটা নিয়ম-বিরুদ্ধ কিন্তু সম্পূর্ণ নির্দোষ উপায়ে পত্রের আদান-প্রদান করতুম। আমাদের যখন সাক্ষাৎকার ঘটত তখন একজন ডেপুটি জেলার সেই ঘরে উপস্থিত থাকতেন। আমরা তাঁকে বলতাম যে, আপনি একটু দূরে বসে অন্য দিকে চেয়ে থাকুন। তিনি তাই করতেন এবং সেই সময়ে আমার গোপনে লেখা চিঠি আমার স্ত্রীকে দিতাম, এবং তিনিও তাঁর লেখা চিঠি আমার হাতে দিতেন। আমি এ জিনিসটা আমার বন্ধু ডেপুটি জেলারদের কাছে সম্পূর্ণ গোপন করি নি। তবে আমরা এমন কোন কথা লিখতাম না যা কোন রকমেই জেলের আইন-বিরুদ্ধ হতে পারে। এইসব চিঠিতে কেবল আমাদের ব্যক্তিগত কথাই থাকত। জেল সম্বন্ধে কোন খবর থাকত না। আমার তখনকার পরিচিত ডেপুটি জেলারদের মধ্যে একজন ছিলেন চারুচন্দ্র চক্রবর্তী, যিনি পরে 'জরাসন্ধ' নামে সাহিত্যখ্যাতি অর্জন করেছেন। তবে আমাদের এই ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে কেবল একজন অহিন্দু ডেপুটি জেলার কোন সাহায্য করতেন না। আমরা যখন আস্তে আস্তে কথা বলতাম তখন তিনি কটমট করে চেয়ে থাকতেন। তা সত্ত্বেও অবশ্য তিনি আমাদের চিঠি আদান-প্রদান ধরতে পারতেন না। কারণ চেয়ারে বসার সময় কিম্বা উঠে যাবার সময়ই আমরা এ কাজটা করতাম। এই সব চিঠিতে আমার নিকট আত্মীয়স্বজনদের সংবাদ থাকত বলে আমার জেল-জীবনে অনেকটা শান্তি পেয়েছিলাম। আজ এই পর্যন্ত।



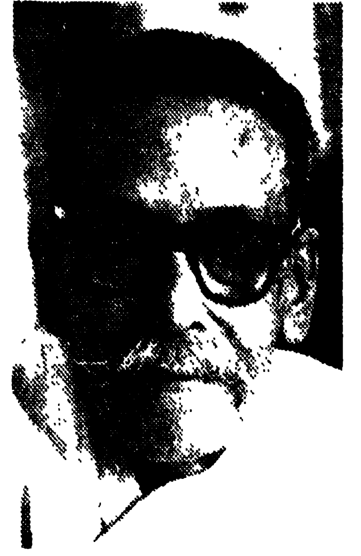
বি. সরকার
সন অব লেট এম. বি. সরকার
১২৪, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলিকাতা-১২, ফোন: ৩৪-৯২০৩

সুরভিত ক্রীম

ভীষন সতর্কতার
সাথে আপনার
ত্বকের যত্ন নেয়

প্রস্তুতকারক:
এ. সি. কেমিক্যালস
৮২/২/ই বিধান সরণী
কলিকাতা-৪
রিপোনেক্স
GRACE/25/ACC/67

অমৃতবাজার শতবার্ষিকীতে

নরেন্দ্র দেব



শিক্ষায় অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রের সঙ্গেও আমার পরিচয় শুরু। আমাদের ছাত্রাবস্থায়, অর্থাৎ, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাবে যখন ছাত্রসমাজ উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছে সেই সময় থেকে সংবাদপত্র নিয়ে আমরা রীতিমত তর্কযুদ্ধে মেতে উঠতুম। কতরকম ন্যায়-অন্যায় বিচার করতুম। তখন আমাদের এই ধারণাই বদ্ধমূল ছিল যে খবরের কাগজে ছাপার হরফে যা বেরিয়েছে তা সবই সত্য। তার একবর্ণও মিথ্যা হতে পারে না।

খবরের কাগজ নিয়ে অল্প বয়সে আমরা কাড়াকাড়ি করতুম বিশেষতঃ "ক্রিকেট" খেলার বিবরণটা পড়বার জন্যই। সে সময় মহারাজা নাটোরের 'নাটোর ইলেভেন' কুচবিহার মহারাজের 'কুচবিহার ইলেভেন' পাতিয়ালার মহারাজের 'পাতিয়ালা ইলেভেন' এদের সঙ্গে 'ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাবের' দলটির খেলা দেখবার খুবই উৎসাহ ছিল। ইউরোপীয়দের সঙ্গে ভারতীয়দের খেলায় একটা প্রচণ্ড আকর্ষণ অনুভব করতুম আমরা। লালমুখদের হারাতে পারলে খুশীতে আমাদের কালো মুখও লাল হয়ে উঠতো! খেলার বিবরণ এবং খেলুড়েদের পরিচয় জানবার একমাত্র উপায় ছিল আমাদের খবরের কাগজের 'স্পোর্টিং নিউজ'।

কাজেই সকাল হতে না হতেই 'খবরের কাগজ' নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যেতো বাড়ির ছেলেদের মহলে। পাড়ার ছেলেরাও অনেকে আমাদের বাড়ি এসে জড়ো হত সকালে, শুধু ওই খেলার খবরটা পড়ে যেতে বা জেনে যেতে। এটি জানবার একমাত্র উপায় ছিল সেদিন দৈনিক ইংরিজী সংবাদপত্রগুলি। পাঁচখানি 'ইংরিজী দৈনিক' নিয়ে সেদিন আমাদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যেতো। যথাঃ 'স্টেটসম্যান', 'ইংলিশম্যান', 'ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ', 'অমৃতবাজার পত্রিকা' আর 'বেঙ্গলী'।

এদের মধ্যে তিনখানির অস্তিত্ব আজ আর নেই, যথা 'ইংলিশম্যান', 'ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ' আর 'বেঙ্গলী'। 'স্টেটসম্যান' আর 'অমৃতবাজার পত্রিকা' এখনও অমর হয়ে আছে। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' পড়ে আমরা যে তৃপ্তি পেতুম 'স্টেটসম্যান' পড়ে আমরা সে তৃপ্তি পেতুম না। কারণ "স্টেটসম্যান' পত্রিকায় থাকতো—চৌরঙ্গীর ইউরোপীয় সমাজের খবরই বেশি। ভারতবাসীদের অভাব-অভিযোগ প্রায় না থাকার মধ্যে বলা চলে। ভারতের সকল প্রদেশের এবং সামন্ত রাজ্যগুলিরও খবর 'অমৃতবাজার পত্রিকা' যেমন নির্ভীকভাবে পরিবেশন করতেন একমাত্র রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের 'বেঙ্গলী' কাগজ ছাড়া অন্য কোনও কাগজেই তা পেতুম না আমরা।

"বুয়োর ওয়া'রর" খবর 'রুশো-জাপানীজ ওয়ারে"র খবর সঠিক জানবার জন্য বিশ্বাসযোগ্য কাগজ ছিল আমাদের কাছে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'। তারপর স্বদেশী আন্দোলনের যুগে 'বিলাতী' কাগজ আমরা 'বয়কট' করেছিলুম। সেদিন আমাদের একমাত্র নির্ভরযোগ্য পত্রিকা ছিল 'অমৃতবাজার' আর 'বেঙ্গলী'। স্বদেশী আন্দোলনের সময় কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের সম্পাদিত বাঙলা 'হিতবাদী' পত্রিকাও আমাদের দেশাত্মবোধ উদ্বুদ্ধ করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল।

তারপর, এই কলকাতার কোল ছুঁয়ে ভাগীরথীর বহু তরংগ বয়ে গেছে। পৃথিবী জুড়ে দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধ হয়ে গেল। কত রাজা ও রাজসিংহাসন শূন্যে মিলিয়ে গেল। কত আন্দোলন, কত আলোড়ন এই ভারতের বুকে 'নরমপন্থী' 'গরমপন্থী' কংগ্রেস নিয়ে চললো। মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আন্দোলন ও বিপ্লবীদের সহিংস আন্দোলনে দেশ উত্তাল হয়ে উঠলো—'অমৃতবাজার সেই ঢেউয়ের উপর আজও ভেসে চলেছে।

"অমৃতবাজার পত্রিকার" কাছে সারা ভারতবাসী নানাভাবে প্রভূত ঋণী। আমার এই সুদীর্ঘ জীবনে বরাবরই আমি দেখে এসেছি 'অমৃতবাজার পত্রিকা' চিরদিনই এই বিদেশীর পদদলিত দুঃখ-দারিদ্র্যে বিপর্যস্ত, নানা অত্যাচারে নিপীড়িত ভারতবাসীদের সতত কল্যাণকামী সজাগ বন্ধু ছিলেন। 'স্টেটসম্যান' পত্রিকার শিরোনামের তলায় বড় বড় হরফে লেখা থাকতো বটে 'ফ্রেন্ডস অফ ইণ্ডিয়া' কিন্তু আমার মনে হয় একথা একমাত্র বলতে পারতো—'অমৃতবাজার পত্রিকা'ই। বিদেশী সরকারের নানা উৎপীড়ন অত্যাচার তুচ্ছ করে নির্ভীক দুঃসাহসী কর্তব্যনিষ্ঠ সংবাদসেবী রূপে অমৃতবাজার পত্রিকা এই শতবৎসরকাল তার গৌরবধ্বজা উঁচে ধরে আছে। শিশিরকুমার ও মতিলালকে ভারতবাসী যদি কোনও দিন ভুলেও যায় তথাপি তাঁদের সৃষ্ট 'অমৃতবাজার পত্রিকা'কে এদেশ কোনও দিনই ভুলতে পারবে না।

অমৃতবাজার পত্রিকার এই শতবার্ষিকী তো একখানি সংবাদপত্রের শতায়ু লাভের গৌরব নয়, এ যে—এদেশের শিক্ষা, সভ্যতা সমাজ ও সংস্কৃতি, দেশাত্মবোধ এবং রাষ্ট্রচেতনার অবিস্মরণীয় ইতিহাস। জয় হোক শতায়ুষ্মান 'অমৃতবাজার পত্রিকার'।

চটপট কাজ ?

মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্কে পাবেন

প্রতিটি শাখায়
প্রত্যেকের সুযোগ
সুবিধা লক্ষ্য
রাখার জন্য সুদক্ষ
কর্ম্মচারী আছেন।



মার্কেন্টাইল
(ইংলণ্ডে সমিতিবদ্ধ)
হংকং ব্যাঙ্ক গোষ্ঠীর একটি সদস্য

কলিকাতায় প্রধান কার্য্যালয়ঃ
[illegible] হাউস,
৮, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১
শাখা ঃ
১৫, গড়িয়াহাট রোড, কলিকাতা-১৯
পি-৩৭৫, ব্লক 'সি', নিউ আলিপুর,
কলিকাতা-৫৩
২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯
২১, গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, হাওড়া

সাহিত্যে আর সংবাদপত্রে কালান্তর

রাধারাণী দেবী



স্মরণের সুস্পষ্ট চৈতন্যে পৌঁছেছি অর্ধশতাব্দীরও বেশ অনেকটা আগে। জাগ্রত চৈতন্যের সঙ্গে সঙ্গে অক্ষরজ্ঞানের আগেই বাড়ীতে অমৃতবাজার পত্রিকার সঙ্গে আমাদের চাক্ষুষ পরিচয়।

বাবার জীবনে প্রধান ঝোঁক বা hobby ছিল, নানারকমের পত্র-পত্রিকার গ্রাহক হওয়া। ইংরেজি বাংলা অনেকগুলি খবরের কাগজ আসত বাড়ীতে। অমৃতবাজার, ইংলিশম্যান, বেঙ্গলী, স্টেটসম্যান, হিতবাদী, সঞ্জীবনী ইত্যাদি। বাংলা মাসিক পত্রিকাও রকমারি। লোকে কিন্তু তখন "পত্রিকা" বলতে অমৃতবাজারকেই বুঝত।

প্রথম স্বদেশী আন্দোলনের যুগে আমার বাল্যকাল কেটেছে স্মরণের স্পষ্টতা-অস্পষ্টতার মধ্যে। সেই সময় থেকেই বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা ছোটো থেকে বড়ো হয়ে উঠতে উঠতে ক্রমশ সাহসী থেকে দুঃসাহসী হয়ে উঠছিল। এলো এনার্কিজম। বোমার আন্দোলন। সেই সময়ে ঘরে ঘরে লোকের মুখে মুখে ফিরত উত্তেজনার রোমাঞ্চভরা নানা দুঃসাহসের গল্প।

বাবার বৈঠকখানায় প্রাত্যহিক সান্ধ্য-আসরে ভারতীয় বিপ্লবীদের কার্যকলাপ আর ইংরেজের শাসননীতির নানা আলোচনা হত। এই সভায় বেশি সময়ে মুখ্য আলোচ্য বিষয় থাকত বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত স্বদেশী খবর। এঁদের তথ্য নির্ভরতা ছিল অমৃতবাজারের খবরের উপরে। দেশবাসী সেদিন এই নির্ভীক সত্যনিষ্ঠ দৈনিক কাগজখানির সংবাদের উপর সব চাইতে বেশি নির্ভরশীল ছিল।

কাল এগিয়ে চলেছে। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রেরও অদ্ভুত উন্নতি ঘটেছে। খবরের কাগজের অফিসে মুদ্রণ-বিভাগ বার্তাবিভাগ সাংবাদিকতার রচনা-বিভাগগুলির ব্যবস্থা দেখলে চমৎকৃত না হয়ে উপায় নেই।

পৃথিবীর দূর-দূরান্তরের খবর এখন আমরা রাত পোহালেই ঘরে বসে পেয়ে যাই। অনেক খবরের আশ্চর্য দ্রুত প্রকাশ আমাদের বিস্মিত করে তোলে। এর জন্য আমরা কৃতজ্ঞতা জানাব প্রধানত বিজ্ঞানকেই। কিন্তু, মানুষের কাছে আমাদের প্রধান আশা, মনুষ্যত্বের পাওনার। সেই পাওনায় ভেজাল ঢুকলে তার পরম ক্ষতি পূরণ হবে কী দিয়ে? যন্ত্রবিজ্ঞানের অজস্র দাক্ষিণ্যের দানে সে-ক্ষতি পূরণ তো সম্ভব নয়। এই সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বিনীত নম্রতায় বলবো।

আগের কালের চেয়ে এখন সাংবাদিকতার ভাষা অনেক বেশি উন্নতি লাভ করেছে। বাংলাদেশে তো এখন সাংবাদিকের ভাষা সাহিত্যের পাশাপাশি হাঁটে। বাংলা সাংবাদিক-ভাষার পরিচ্ছন্ন স্বচ্ছতায়, সাবলীলতায়, ঔজ্জ্বল্যে মন পরিতৃপ্ত হয়। কিন্তু, আগের যুগে আমরা সংবাদপত্রে যে নির্মল সততা দেখেছি, সুদীর্ঘ জীবনের পরবর্তী যুগে তার যেন অনেকটাই ঝাপসা হয়ে যেতে দেখে মনে গভীর দুঃখ হয়।

পুরানোকালে সাংবাদিকতায় সম্পদ তো ছিলই না, সঙ্গতিও যৎসামান্য ছিল। সাংসারিক দুঃস্থ অবস্থার মধ্যেও তাঁরা এমন ধারা লিখতেন, হয়তো তার ফলে গ্রাসাচ্ছাদনের উপায়টুকুও হারিয়ে বসতে হতো। বিদেশী সরকারের অন্যায় বা অনাচারের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনার অপরাধে এমন পরিমাণ অর্থদণ্ড বহাল হতো যার ফলে কাগজগুলি হয়তো জীবিত রাখাই সম্ভবপর হতো না। বহু সংবাদপত্রই সেদিন আদর্শবাদ আর দেশবাসীর স্বার্থে সত্য-ভাষণের দায়ে আত্মোৎসর্গ করে গেছে, স্বল্পায়ু জীবন নিয়ে। তবুও সেকালে বাংলাদেশের সংবাদপত্রগুলি আত্মস্বার্থ-নিরপেক্ষ হয়ে নির্ভীক সত্য উচ্চারণ করতে ভীত হয়নি। অমৃতবাজার পত্রিকা সেকালে সর্বস্বপণ করে সে-ভূমিকা পালন করে গেছেন। যে সকল কাগজ জীবন উৎসর্গ করে নিশ্চিহ্ন হয়েছে, তাদের কথা আমরা ভুলে গেছি।

সাংবাদিকদের তখন পারিশ্রমিক যৎসামান্য ছিল। সঙ্গতিই যে তখন অল্প ছিল। কিন্তু সেই সামান্য পারিশ্রমিকে তাঁরা কঠোর পরিশ্রমে দিনে আর রাত্রে কাজ করেছেন বিপুল উৎসাহ উন্মাদনায়। মহৎ-সাংবাদিকতার উজ্জ্বল আদর্শবাদ তাঁদের অদম্য পরিশ্রমের মূলে ছিল। তাঁদের প্রধান লক্ষ্য আর আনন্দ ছিল দেশের মাটিতে সাংবাদিকতাকে সবরকমে উন্নত ও উজ্জ্বল করে গড়ে তোলা। জাতির উন্নয়ন প্রচেষ্টা আর সমাজসংস্কারের অপ্রিয় কঠিন কাজও নবীন সংবাদপত্রগুলিই গ্রহণ করেছিলেন। দেশের মানুষেরাও সেদিন সংবাদপত্রের কণ্ঠকে সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করেছেন, শ্রদ্ধা করেছেন, ভালোবেসেছেন।

আমাদের সেই অকুণ্ঠ বিশ্বাস এখন আর আগের মত উজ্জ্বল নেই কেন যখন চিন্তা করি, মন ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে।

এখন যে-কোনও সংবাদপত্রের সংবাদের মধ্যে খুঁজে বার করতে চেষ্টা করতে হয়, সামগ্রিক সত্যের কতোটুকু খণ্ডিত অংশ কী আকৃতিতে আমরা পাচ্ছি।

সাহিত্যসাধনা আর সাংবাদিকতা এই দুটি পথ সেকালে শুধু আদর্শবাদী আনুষ্ঠানিকদের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। নানা বিভিন্ন বৃত্তিজীবী শিক্ষিত-সাধারণের মধ্যে সাহিত্যিক আর সাংবাদিকদের অশন-বসন গৃহস্থালীর অবস্থা সেদিনে আর সবাইকার চেয়ে নিরুজ্জ্বল ছিল। আর্থিক সঙ্গতিতে উজ্জ্বলতা না থাকলেও এঁদের কলম ছিল খাদহীন নির্ভেজাল উজ্জ্বল। এঁদের জীবনের প্রধান গৌরব আর পরিতৃপ্তি ছিল নিজেদের লেখনীর সাফল্যের মধ্যে। আজ সেই আদর্শবাদদীপ্ত সাংবাদিকতা আর সাহিত্যসাধনা অনেকটা লক্ষ্যবদল করে নিয়েছে। যে সত্যকার অনুভব আর শিল্প-প্রেরণা সাহিত্যসৃষ্টির মূল, তা আজ নানা পুরস্কারে প্রশংসাপত্রে আর লোভনীয় অর্থ-মূল্যে আত্মবিক্রীত, বন্দী।

বাংলাদেশে অমৃতবাজার পত্রিকার ভূমিকা শতাব্দীর ইতিহাস বিস্তৃত শুধু নয়, জাতীয়তার ঐতিহ্যমণ্ডিত। সংবাদপত্রের প্রথম যুগ থেকে প্রবাহিত হয়ে চলতি নতুন কাল পর্যন্ত সে নানারূপে নানাবেশে ইংরেজি ভাষায় বাংলাভাষায় প্রাত্যহিক রূপে সাপ্তাহিক রূপে আমাদের চিন্তার পথ্য জুগিয়ে চলেছে। অনেক দুঃখ লাঞ্ছনা, ক্ষয়-ক্ষতি দুর্যোগ উদ্বেগের কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে অমৃতবাজারকে একশো বছর কেটে আসতে হয়েছে। আজ সমস্ত দেশবাসীরই উচিত তাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা, অভিনন্দনে অভিনন্দিত করে জয়ধ্বনি উচ্চারণ করা। কারণ, এই কাগজটির সঙ্গে কেবলমাত্র বাঙালী জাতিরই নয়, সারা ভারতবাসীরই পুরুষানুক্রমিক যোগ।

সাক্ষাৎকার

অমৃতবাজার পত্রিকা শতবার্ষিকী উপলক্ষে বাঙলাদেশের কয়েকজন অগ্রণী চিন্তানায়ক তাঁদের অভিমত প্রকাশ করেন আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি শ্রীশ্যামাপ্রসাদ সরকারের কাছে। এখানে তাঁদের বিচিত্রতর চিন্তাজগতের সংক্ষিপ্ত অথচ সুন্দর একটি প্রতিচিত্র ফুটে উঠেছে।


নির্মলকুমার বসু


যামিনী রায়


নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত

যামিনী রায় :

সেকালে কত কাগজ বেরুত। হিতবাদী, বঙ্গবাসী, সঞ্জীবনী। আমার বাবা সঞ্জীবনী ছাড়া পড়তেন না। সঞ্জীবনীর সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্রের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল।

পুরনো সব দিনের কথা মনে আসে। যুগান্তরের ঐ বাড়িটে, ভাঙাচুরো। পাশের গলিতে থাকতুম। সব দেখেছি। তুষারবাবু ওপরে বসতেন, মৃণালকান্তিবাবু নিচে। তুষারবাবুই একমাত্র লোক যিনি এই প্রতিষ্ঠানকে এত বড় করেছিলেন।

সকালবেলায় যারা কাগজটি দিয়ে যায় প্রতিদিন দেখে আমি স্তম্ভিত। মনে হয়, একটি কথাই বুঝি সত্য, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই। কত রকমের খবর, হরেক রকম, নিত্যদিন। তুষারবাবুরা এতে যেন সিদ্ধিলাভ করেন, এই কামনা করি।

আমি আর কি বলব? ছবির মধ্যেই আমার ধর্ম ও জীবন আছে। আমার যে কোন ছবি দেখলেই তার মধ্যে আমার মনের ভাব, প্রাণের তাগিদকে খুঁজে পাবে তোমরা।

নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত :

অমৃতবাজার পত্রিকার শতবার্ষিকী উপলক্ষে কিছু লিখিতে হইলে প্রথমেই মনে হয় যে এতদিন ধরিয়া একইভাবে একটি সংবাদপত্র চালানো একটা অসামান্য কৃতিত্বের লক্ষণ। যে মহাত্মা ইহা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, আর কিছু না হইলেও এইজন্যই তাঁহার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

অমৃতবাজার পত্রিকার যে কত প্রভাব ছিল ও আছে তাহা সকলেই দেখিতেছেন। আমি নিজের একটি ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত দিতেছি।

সে আজ ৬০ বৎসরের কথা। তখন আমি মেডিকাল কলেজে দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। আমি তখন অনুশীলন সমিতির সভ্য ছিলাম। উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষে ত্রাণকার্যের জন্য অর্থসংগ্রহের ভার আমাদের কয়েকজনের উপর ন্যস্ত হইল। ময়মনসিংহ জেলার কিষণগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট কনফারেন্স হইবে। এই কনফারেন্সে কিছু অর্থসংগ্রহ ও পরে ময়মনসিংহ জেলায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া আরও অর্থসংগ্রহ করিবার জন্য সমিতির নির্দেশ হইল। সংগৃহীত অর্থে ত্রাণকার্যের উদ্দেশ্য প্রধান হইলেও কিছু অর্থে রিভলভার পিস্তল ইত্যাদি ক্রয় করিবার গোপন উদ্দেশ্যও ছিল।

তিনজনে আমরা ময়মনসিংহ অভিমুখে যাত্রা করিলাম। গোয়ালন্দে স্টীমারে গিয়া দেখি কলিকাতা হইতে ডেলিগেট হইয়া যাইতেছেন শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীমোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী এবং শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ মহাশয়। যতক্ষণ স্টীমারে ছিলাম ঘোষমহাশয়কে একবারও দেখি নাই।

আমরা কিশোরগঞ্জ না গিয়া ঢাকায় নামিলাম। সেখানে অনুশীলন সমিতির শ্রীপুলিন দাস মহাশয়ের নিকট হইতে একটি ছাড়পত্র লইতে হইবে। দাস মহাশয়ের এমনই প্রভাব যে তাঁহার ছাড়পত্র দেখাইলে পূর্ববঙ্গে যে কোনও জায়গায় কোনও অনুশীলন সমিতির সভ্যের নিকট আশ্রয় পাওয়া যাইত। পুলিন দাস মহাশয়ের নিকট হইতে ছাড়পত্র লইয়া কিশোরগঞ্জ পৌঁছলাম। সেখানে যে কয়দিন কনফারেন্স হইল, ঘুরিয়া ঘুরিয়া টাকা আদায়ের চেষ্টা করিলাম। বিশেষ কিছুই আদায় হইল না। সেখানে থাকার কয়দিন বার লাইব্রেরীতে একটি ঘরে অরবিন্দবাবু থাকিতেন। আমাদের স্থানও পাশের হলে হইয়াছিল। সমস্তদিন সেই ঘরেই থাকিতেন। কখন আহার করিতেন, কখন শৌচাদি করিতেন কিছুই দেখিতে পাই নাই। কেবল প্রত্যহ সভায় গিয়া বক্তৃতা করিতে দেখিতাম। বাংলাতে বলিতেন বটে কিন্তু সাহেবী উচ্চারণ। আমরা সামান্য লোক,

তাঁহার কাছে গিয়া কথা কহিবার সাহসও ছিল না। পরিধানের মধ্যে টুইল শার্ট, ধুতি ও চটিজুতা ছাড়া আর কিছু দেখি নাই। তিনদিন থাকার পর সভা ভঙ্গ হইল। আমরা কলিকাতা হইতে আসিয়াছি, আমরা অরবিন্দবাবুর সহিত আসিয়াছি, আমরাও ডেলিগেট লোকে জানিত। টাকা প্রায় কিছুই আদায় হইল না। কিন্তু অভ্যাগত সেবা এত পাইলাম যে অতিশয় গুরুভোজনে শরীর অসুস্থ হইয়া গেল। ফিরিবার পথে উদরপীড়া, তাহার উপর ৮।১০ মাইল হাঁটিয়া যখন গফরগাঁও স্টেশনে পৌঁছিলাম তখন একেবারে শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। স্টেশনে গিয়া চালের বস্তাগুলির উপর শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। ট্রেনের তখনও দেরী ছিল। আমি বেশ নিদ্রিত, এমন সময়ে কে যেন গায়ে হাত দিল। জাগিয়া উঠিয়া দেখি শ্রীঅরবিন্দ—সেই ধুতি, টুইল শার্ট ও চটি জুতা পায়। আমায় বলিলেন, 'অসুখ করিয়াছে? কলিকাতা যাইবেন? আমি কলিকাতা যাইতেছি।' আমি জানিতাম তিনি ময়মনসিংহ যাইবেন, আমরাও সঙ্গে সঙ্গে যাইব। কেন যে সহসা কলিকাতা যাইতেছেন তখন বুঝিলাম না, পরে বুঝিলাম। কেন না কয়েকদিন পরেই শুনিলাম মজঃফরপুরে ক্ষুদিরাম বসু, প্রফুল্ল চাকী বোমা ফেলিয়াছেন ও সেইজন্য অরবিন্দবাবুকে যাইতে হইয়াছিল। যাহা হউক তাঁহাকে আমি বলিলাম, 'না স্যার, আমাদের কিছুই আদায় হয় নাই। আমাদের ময়মনসিংহ যাইতেই হইবে।' তিনি আর কিছু বলিলেন না। তখনই কলিকাতার দিকে ট্রেন চলিয়া গেলেন। তারপর তাঁহাকে গোলদীঘিতে ভাষণ দিতে শুনিয়াছি। সে ভাষণে তিনি জেলের প্রাচীরে চতুর্দিকে গোপাল কৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছেন বলেন। আর তাঁহাকে দেখি নাই—কথার পূর্বেও না, পরেও না। সেইজন্য আমার আজও ৬০ বৎসর পরে অতিশয় আশ্চর্য মনে হয় যে তিনি কেমন করিয়া জানিলেন আমি অসুস্থ। কেহ তাঁহাকে বলে নাই। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ কথা একবারও হয় নাই। আমাকে তাঁহার চিনিবার কথা নয়। কিন্তু কি করিয়া জানিলেন যে আমি অসুস্থ ও কাতর হইয়া পড়িয়াছি। আর তখনই দয়া করিয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় ফিরাইয়া লইয়া যাইতেছিলেন। এই অদ্ভুতকর্মা লোকটির চরিত্র যে কত অসাধারণ তাহা এইসকল দৃষ্টান্ত হইতে জানা যায়। তাঁহার সে স্পর্শের কথা আজও আমাকে বিস্মিত করে।

যাহা হউক ময়মনসিংহ গিয়া চারিদিকে খোঁজাখুঁজি করিতে লাগিলাম। এক আত্মীয়ের বাসায় উঠিলাম। টাকার চেষ্টা করিতেছি। আত্মীয় ভদ্রলোক খুব বিজ্ঞ। তিনি বলিলেন, 'তোমাদের অত্যন্ত বিপদের অবস্থা। অনুশীলন সমিতির সভা, পুলিন দাসের পাণ্ডা লইয়া আসিয়াছ, অরবিন্দবাবুর সঙ্গে আসিয়াছ। তাছাড়া কয়েকদিন আগে মজঃফরপুরে বোমার ঘটনা হইল। আর এখন পূর্ব-বাংলায় ফুলারী শাসন। এখনই গিয়া ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে দেখা কর। নতুবা এখনই তোমাদের ধরপাকড় আরম্ভ হইবে।' আমরা তাঁহার পরামর্শ অনুযায়ী ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে গেলাম। তাঁহাকে বলিলাম টাকা দাও। ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ব্ল্যাকউড খুব সদাশয় ছিলেন। তিনি বলিলেন, "তোমরা বালক, তোমাদের এখনও অসৎ মতলব হয় নাই। কিন্তু

> if I subscribe to your fund Motilal Ghosh will write an article in the A. B. Patrika contrasting my attitude with that of my predecessor Mr. Clarke and Simla (বড়লাটের রাজধানী) and Dacca (পূর্ব-বঙ্গের রাজধানী will come down on me."

আরও অনেক কথা বলিলেন, তাহা অদাকার বিষয়ীভূত নয়। পাঁচদিন পরে পুনরায় দেখা করিতে গেলাম। তাঁহার উপদেশে তৎক্ষণাৎ ময়মনসিংহ ত্যাগ করিয়া পলাইয়া আসিলাম। দেখিলাম তখনও অমৃতবাজার পত্রিকা কি বলে সেই ভয়ে সাহেব ত্রস্ত। তখন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের Bengalee ছিল, Indian Mirror ছিল, কিন্তু অমৃতবাজার পত্রিকার নামে বিদেশী শাসকমন্ডলী কত যে ত্রস্ত ছিল বলা যায় না।

পত্রিকার আজ শতবর্ষপূর্ণ। দেখিয়া মনে হয় এ পত্রিকা চিরস্থায়ী হইয়া থাকিবে।

নির্মলকুমার বসু:

বাংলা সংবাদপত্র হিসাবে সেকালে বাংলায় সহজ ভাষায় জাতীয়তাবোধ প্রচার করা এবং সংবাদ সেবা করার দিকে ঝুঁকেছিলেন অমৃতবাজারের পরিচালকগোষ্ঠী। পত্রিকার স্বাধীন মতাবলম্বী ভাব দেখে তাকে যখন নিষ্পেষিত করা হয় তখন আশ্চর্য সাহসের সঙ্গে ইংরেজি পত্রিকা হিসাবে নিজেকে রূপান্তরিত করে পত্রিকা শাসকদের পরাস্ত করেন। এই সময় দেশের মধ্যে যথেষ্ট সাহসের সঞ্চার হয় বলে আমার বিশ্বাস।

প্রজা এবং দেশীয় রাজন্যবর্গের যে অধিকার বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকা উচিত তার জন্য জনমত বহুবার প্রতিষ্ঠিত করে পত্রিকা এই সব দাবী সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করেন।

স্বাস্থ্যকে
অটুট রাখবার জন্য আপনার
প্রতিদিন দরকার অপরিহার্য
ভিটামিন এবং
খনিজ পদার্থ সমূহ
অর্থাৎ



ডিমগ্র্যানের
একটি মাত্র ট্যাবলেট।
ডিমগ্র্যানের একটি মাত্র ট্যাবলেটে ১১ প্রকারের অপরিহার্য ভিটামিন ও ৮ প্রকারের খনিজ পদার্থ রয়েছে।
ডিমগ্র্যানের একটি মাত্র ট্যাবলেট আপনাকে সারা দিন কর্মক্ষম রাখবে। আজই ডিমগ্র্যান কিনুন।



SARABHAI CHEMICALS
® রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক

জাতীয়তার ভাবকে সমস্ত দেশে প্রসারিত করার চেষ্টায় তাঁরা কখনো সাম্প্রদায়িকতা অথবা প্রদেশ বিশেষের স্বার্থের ভাবকে পোষণ করেননি। অখণ্ড ভারত মিলে যে জাতীয়তা দেশের মনে ধীরে ধীরে রচিত হচ্ছিল তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য এই পত্রিকা নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস করেন।

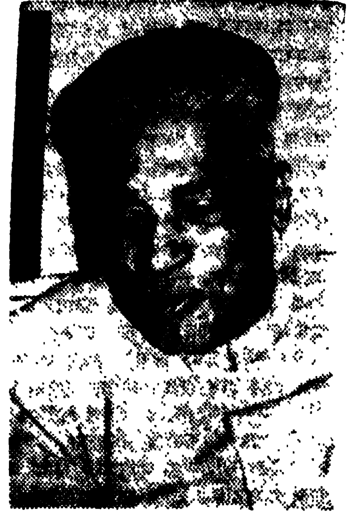
জাতীয়ভাবোধ শুধু রাজনৈতিক অধিকারকে ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। তার একটি সংস্কৃতিগত ভিত্তি থাকার দরকার। ভারতবর্ষে সংস্কৃতি তখন প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের দোটানায় মধ্যে পড়ে দোলায়মান অবস্থায় রয়েছে। একদল পশ্চিমের দিকে ঢলে পড়েছে, কেউ বা উগ্র ব্রাহ্মণ্য ধর্মের গোঁড়ামির পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছেন। সে সময় কেউ বা মধ্যপথ অবলম্বন করেছেন। এই সময় বিশেষ করে বাংলাদেশে সংস্কৃতিগত ইতিহাসের মধ্যে দেখা যায় ব্রাহ্মণ্য গোঁড়ামীর ভাব অথবা পশ্চিমের সাহেবীয়ানার আকর্ষণ থেকে মুক্ত করে ভারতীয় সংস্কৃতিকে আত্মপ্রতিষ্ঠ করার চেষ্টায় বৈষ্ণবধর্ম অথবা বেদান্তের এক নতুন ব্যাখ্যা পুনঃপ্রচলিত করার চেষ্টা হয়।

এই দুই ভাবই দেশের জাতীয়তাবোধকে সুদৃঢ় করায় সহায়তা করে। বৈষ্ণবধর্মে ব্রাহ্মণ থেকে শূদ্র পর্যন্ত সকলের সমান অধিকার। যুগের প্রয়োজন অনুসারে এই ধর্মের প্রসার তখন অত্যন্ত উপযোগী হয়েছিল। অমৃতবাজার পত্রিকাকে কেন্দ্র করে এই ভাব বিশেষভাবে বাংলাদেশে পরিপুষ্ট হয়। জাতীয়তার ইতিহাসে অমৃতবাজারের উপরোক্ত প্রচেষ্টা এক বৃহৎ দান বলে গ্রহণ করা উচিত।

আপনার প্রিয় মাসিক পত্রিকা
নবকল্পা
চলচ্চিত্রে রূপায়িত
গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের
ছোট্ট জিজ্ঞাসা
(সম্পূর্ণ উপন্যাস)
বর্তমান (মাঘ) সংখ্যায় পড়ুন
আপনার হকার্স এর কাছে বা স্টলে পাবেন

বিনা অস্ত্রোপচারে
অর্শ থেকে
আরাম পাবার
জন্য
হ্যাডেনসা
ব্যবহার করুন।
DOL-327 BEN

ত্রিপুরারি চক্রবর্তী :



ত্রিপুরারি চক্রবর্তী

অমৃতবাজারের গত একশো বছরের ইতিহাস জাতীয় চেতনার উন্মেষ ও মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাস। এই পত্রিকার জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদেশের তথা সর্বভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং জনহিতকর সমস্ত প্রচেষ্টার সংগে যুক্ত হয়। অমৃতবাজার পত্রিকার সেই অবদান দেশের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে।

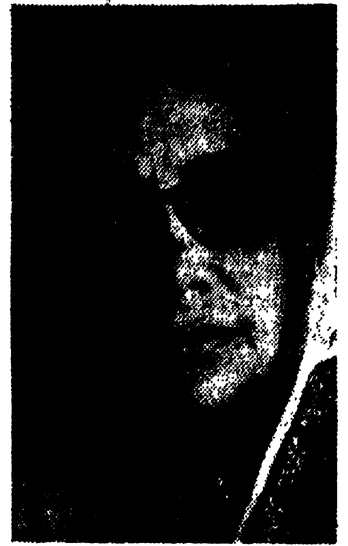
পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ এই পত্রিকা প্রতিষ্ঠার অনেক পূর্বে দেশের রাষ্ট্রিক চেতনার উন্মেষের সংগে যুক্ত হয়েছিলেন। বাংলায় বিদেশী নীলকর ইংরেজের অত্যাচার এবং এই নীলকরদের হস্তে বাংলার কৃষকগণের অমানুষিক লাঞ্ছনা ১৮৬০ সাল বা তার কিছু পূর্ব হতেই সর্বজনবিদিত মহাত্মা শিশিরকুমার করুণাদ্র হৃদয় নিয়ে নির্ভীক চিত্তে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেন। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের হিন্দু পেট্রিয়ট কাগজে তিনি এই অত্যাচারের ধারাবাহিক কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এটি অবশ্য তিনি করেছিলেন মন্মথলাল ঘোষ নামে। শিশিরকুমারের অন্য নাম মন্মথলাল ঘোষ। হিন্দু পেট্রিয়টের করেসপণ্ডেন্ট হিসাবে নাম সই করতেন এম, এল, জি। মুদ্রাকর প্রমাদবশত এটি হয়ে গিয়েছিল এম, এল, এস। এখনও ভেবে বিস্মিত হই যে শিশিরকুমারের তখন মাত্র বিশ বছর বয়স। পরে অমৃতবাজার পত্রিকা মহাত্মা শিশিরকুমারের এই ঐতিহ্যের ধারক এবং বাহক হতে পেরেছিল।

প্রথম থেকেই পত্রিকা দেশের বৃটিশ শাসক সম্প্রদায়ের অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করতে পেরেছিল। একথা আজ সর্বজনবিদিত যে, ভারতের বড়লাট লর্ড লিটনের ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট এই পত্রিকারই বিরুদ্ধে রচিত হয়েছিল। এই আক্রমণের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল অমৃতবাজার পত্রিকা। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই পত্রিকার রূপান্তর হলো এবং অমৃতবাজার পত্রিকা নব কলেবর নিয়ে ইংরেজি ভাষায় ভারতের রাষ্ট্রীয় রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হলো। একথা স্মরণ করতে মনে উদ্দীপনার সঞ্চার হয় যে, ১৮৬৮ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী—অর্থাৎ অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠা দিবসে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের (ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেস) সৃষ্টি হয় নি, এমন কি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনও দেখা দেয় নি। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের জন্ম হয়েছিল ১৮৭৬ সালে এবং জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়েছিল বোম্বাই নগরীতে ১৮৮৫ সালের ডিসেম্বর মাসে। এই দিক থেকে বলা যায় যে, রাষ্ট্রীয় চেতনার উন্মেষে অমৃতবাজার পত্রিকার দান অবিস্মরণীয় এবং এর মূল্য অপরিসীম।

বাংলার স্বদেশী আন্দোলন যুগের কথা আমার অনেক মনে আছে। তখন বাংলাদেশের এ আন্দোলন ১৯০৬, ১৯০৭ ১৯০৮, ১৯০৯ এমন কি ১৯১১-র ১২ই ডিসেম্বর পর্যন্ত যখন ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জ দিল্লীর দরবারে বঙ্গভঙ্গ রহিত করে এক ঘোষণাবাণী প্রচার করলেন সেইদিন পর্যন্ত বাংলার এই তীব্র এবং সর্বতোমুখী আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিল সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বেঙ্গলী" কাগজ এবং "অমৃতবাজার পত্রিকা"। ভারতসচিব লর্ড মর্লের 'সেটেল্ড ফ্যাক্ট' আনসেটেলড হলো। অর্থাৎ বাংলা আবার এক হলো, এ এক বিস্ময়কর ঘটনা। সেদিনের কথা আমার মনে আছে। আমরা বেঙ্গলী পড়ে অমৃতবাজার পত্রিকা কি বলে বা কি লেখে তা জানবার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকতাম। মনে হয়, এসেছিল সে একদিন বাংলায়, 'লক্ষ পরাণে শঙ্কা না মানে না রাখে কাহারো ঋণ।' আজ আবার বাংলায় দুর্দিন ঘনিয়ে এসেছে। বাংলা দ্বিধা বিভক্ত। এক নতুন পার্টিশানের অভিশাপ দেশকে জর্জরিত করছে। স্মৃতিভারে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমি আবার ভাবি মহাত্মা শিশিরকুমারের আদর্শে অনুপ্রাণিত অমৃতবাজার পত্রিকা কি সেই বলিষ্ঠ, সুদৃঢ় এবং উদ্দীপনাময় নেতৃত্ব দেশকে দিতে পারে না! আশা করবো যে, পত্রিকার দ্বিতীয় শতাব্দীর জীবন যার সূচনাকে আমরা পরমানন্দের সংগে অভিনন্দিত করছি—সেই জীবন দেশের উৎসর্গীকৃত হোক এবং এই নূতন জীবন গৌরবমণ্ডিত হোক, ধন্য হোক।

দ্বিতীয় শতবর্ষের পথিক

আশাপূর্ণা দেবী



'অমৃতবাজার পত্রিকা' সম্পর্কে আমার মতামত জানতে চাইছেন? পণ্ডিতলোক নই, মতামত মূল্যবান নয়, তবে প্রশ্ন যখন করছেন, বলি—

শুভ কামনার প্রথম কথা দীর্ঘজীবন।

আশীর্বাদের প্রধান মন্ত্র 'শতায়ুঃভব।'

অতএব নিশ্চয়ই বলা যায় উৎসবের সেরা উৎসব শতবর্ষপূর্তি উৎসব। কারণ উৎসব তো সেই জীবনেরই, যে জীবন স্বাস্থ্যে শান্তিতে সমুজ্জ্বল, খ্যাতিতে দীপ্তিতে গৌরবময়। তা সে যেমন মানুষের ক্ষেত্রে, তেমনি যে কোনো প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র শতবর্ষপূর্তি উৎসবের আয়োজন সংবাদে সেই কথাটিই মনে এলো।

একটি সংবাদপত্রের জীবনে শতবর্ষপূর্তি বড় সহজ কথা নয়। যে হেতু যুগ বদলায়, কাল বদলায়, বদলায় জনমানসের দৃষ্টিভঙ্গী। বদল হয় জনজীবনের রুচির, সংস্কার, এমন কি আদর্শেরও। এই বিরাট পরিবর্তনের ঢেউয়ের মধ্যে অবিচল মহিমায় শতবর্ষের পথ অতিক্রম করে আসা নিশ্চয়ই বিস্ময়কর।

মানুষের দীর্ঘজীবন যদি তার স্বাস্থ্যে নিহিত, তো একটি সংবাদপত্রের দীর্ঘজীবন তার সত্যনিষ্ঠায়। সেই সত্যনিষ্ঠা রূপায়িত হয় নির্ভীকতায়, তেজস্বিতায়, স্পষ্টবাদিতায়, দেশের যথার্থ কল্যাণচিন্তায়, আর আপন শক্তির প্রতি বিশ্বাসে ও আস্থায়। অবশ্যই যে কোনো সংবাদপত্রেরই নিজের শক্তিতে আস্থা থাকা দরকার। আর দরকার সে শক্তি সম্পর্কে দায়িত্ববোধ। এ হচ্ছে যেন আগুন নিয়ে খেলা, যে খেলায় এতটুকু অসতর্কতায় সর্বনাশ।

বাস্তবিক একটি সংবাদপত্রের দেশের প্রতি দায়িত্ব যে কতখানি, তা গভীরভাবে অনুধাবনযোগ্য। সে দায়িত্ব একজন দেশনেতার থেকে অনেক বেশী, একজন ধর্মগুরুর থেকে অনেক গভীর। কাজেই সকলের আগে দরকার সতর্কতা সংযম। একটি প্রতিষ্ঠিত পত্রিকা জনমানসের উপর যতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারে, তেমন আর কে পারে? সংবাদপত্র পরিবেশিত মতবাদ অলক্ষ্যে তিল তিল করে জনমানসে প্রবিষ্ট হতে হতে তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে পারে, তার পরিবর্তন সাধন করতে পারে। কাজেই বিষ পরিবেশিত হলে দেশ বিষে জারিত হয়ে পড়বে, আর অমৃত পরিবেশিত হলে দেশ সুস্থ জীবনের মন্ত্র খুঁজে পাবে।

সত্যই সংবাদপত্রের আছে সে ক্ষমতা। সমগ্র দেশের মনের মোড় ঘুরিয়ে দেবার ক্ষমতা থাকে তার। প্রয়োগ বিধির তারতম্যে বিষ আর অমৃত। অতএব হাতে যাদের হাল বৈঠা তাঁদেরই হুঁশিয়ার হয়ে থাকতে হয়, ভাবতে হয় কোন দিকে মোড় নিলে কল্যাণ।

সংবাদপত্রের প্রধান হাতিয়ার অবশ্যই রাজনীতি, (যা নাকি আপাত আস্বাদে বিষ ও অমৃতে পার্থক্য বুঝতে দেয় না।) অতএব সেই হাতিয়ারধারী যদি প্রকৃত শুভবুদ্ধি সম্পন্ন ও চিন্তাশীল হন তবেই মঙ্গল। কিন্তু তা না হলে, সেই রাজনীতি কেবলমাত্র দলনীতি হলে, অথবা অর্থ আহরণ নীতি হলে, শুধু যে দেশেরই ক্ষতি হয় তা নয়—হাতিয়ারধারীর নিজেরও সমূহ ক্ষতি। সেই পথেই আসে বিনষ্টি। কোনো উদ্দেশ্যসিদ্ধির বাহন হলে বেশীদিন টিঁকে থাকা যায় না, সেই 'উদ্দেশ্য'টা নিরুদ্দেশ হলে বাহনেরও অস্তিত্ব শেষ। অনেক অধুনা বিলুপ্ত সংবাদপত্রের বিলুপ্তির ইতিহাস ইতিহাসকে এই শিক্ষাই দেয়।

যারা সে শিক্ষার সঞ্চয় নিয়ে এগিয়ে চলে, তারাই পারে শতবর্ষের ইতিহাস রচনা করতে।

ভারতবর্ষের বিগত শতবর্ষের ইতিহাসে এসেছে কত দিনবদলের পালা, কত মনবদলের খেলা, কত ভাঙা-গড়ার লীলা। এসেছে নানা সংঘর্ষ, এসেছে বহু সংগ্রাম, এই অসংখ্য তরঙ্গ তরঙ্গায়িত কালের পথ বেয়ে যদি কোনো সংবাদপত্র আপন লক্ষ্যে অবিচল, আপন সত্যে স্থির, আর আপন ধর্মে অটল থেকে সগৌরবে বর্তমানের ঘাটে এসে পৌঁছতে পারে, বিস্ময়ে সম্ভ্রমে তাকে সহস্র সাধুবাদ দিতে হয় বৈকি। সেই সাধুবাদ আজ প্রাপ্য হয়েছে অমৃতবাজার পত্রিকা'র।

'অমৃতবাজার পত্রিকা' চিরদিন তার নিরপেক্ষ নীতির আদর্শে অবিচল। সে তার শতবর্ষব্যাপী কর্মসাধনায় দেশের কাছে কখনো ধিকৃত হয়নি। এটা কম শক্তির পরিচয় নয়।

'অমৃতবাজার পত্রিকা' লাঞ্ছিত হয়েছে বৃটিশ শাসনের শাসনযন্ত্রের যাঁতায়। সেকালে সে বারে বারে পড়েছে রাজরোষে, বারে বারে দিয়েছে অর্থের খেসারৎ, কিন্তু কখনো নতি স্বীকার করেনি, "খেসারৎ" দিয়ে বসেনি পরমার্থকে।

বাংলা অমৃতবাজার পত্রিকার রাতারাতি ইংরেজি হয়ে যাওয়ার কাহিনী অনেকেই জানেন, সে ও তো রাজরোষেরই সুকৌশল 'জবাব'! বাংলা সংবাদপত্রের উপর বহুবিধ বিধি-নিষেধ আরোপ করে আইন জারি হলো, 'অমৃতবাজার পত্রিকা' সে আইনকে ব্যঙ্গ করে তার আওতা থেকে বেরিয়ে এলো এই আকস্মিক পরিবর্তনের কৌশলে। কোনো একটি সংবাদপত্রের জীবনেতিহাসে এমন নজীর দুর্লভ।

'অমৃতবাজার পত্রিকা' সম্পর্কে এ দেশের ইতিহাস সম্পর্কে অনেক তথ্য যাদের জানা, তাঁরা অবশ্যই অনেক বেশী আর অনেক ভাল করে বলতে পারবেন, আমি এইখানেই থামছি।

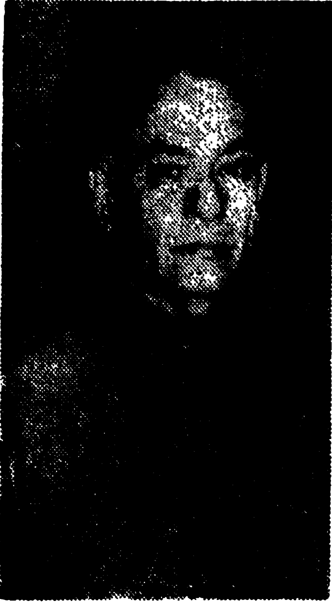
এখন 'অমৃতবাজার পত্রিকা' সম্পর্কে অনেক তথ্য পরিবেশন করা হচ্ছে 'অতীতের পৃষ্ঠা' থেকে, যার মধ্যে থেকে আমরা জানার দিক দিয়ে লাভবান তো হচ্ছিই, তাছাড়া বিস্ময় ও আনন্দ কম পাচ্ছি না। বিস্ময় অনুভব করছি তদানীন্তন কালের পারিপার্শ্বিকতা অনুমান করে, আর আনন্দ অনুভব করছি— সে যুগের সেই পরাধীন দেশে একখানি সংবাদপত্রের নির্ভীকতা তেজ ও স্পষ্টবাদিতা দেখে। এইগুলি প্রচার করে অনেক তথ্য জানবার সুযোগ দিচ্ছেন কর্তৃপক্ষ।

তবে—আমার কাছে, অর্থাৎ আমার মনের কাছে 'তথ্য'টাই বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে 'তত্ত্ব'টা। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র এই উজ্জ্বল শতবর্ষ-জীবনের "তত্ত্ব"টি আজ আমাদের সকলেরই ভেবে দেখা উচিত।

সেই "তত্ত্ব"টি হচ্ছে কোনো প্রলোভন বা অন্য লাভের কাছে 'ধর্ম' বিকিয়ে না দেওয়া। আজ তার এই উৎসবের দিনের প্রধান কামনা পরম বৈষ্ণব মহাত্মা শিশির-কুমারের পুণ্যস্মৃতিপূত আর তাঁর জন্মভূমির পুণ্য নাম পূত এই পত্রিকাটি যেন তার 'ধর্ম' থেকে দ্বিতীয় শতবর্ষের পথে চলা সুরু করে আগামী শতবর্ষের লক্ষ্যে।

পত্রিকাজগতের শীর্ষদেশে

হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়



আঠারোশ আটষট্টি থেকে উনিশশো আটষট্টি। একশো বছর। জাতীয় চেতনা এবং সামাজিক বিবর্তনের এ এক ইতিহাস।

আঠারোশ' আটষট্টির বাংলা। সবে জাতীয় চেতনা ধীরে ধীরে পরিস্ফুট হতে আরম্ভ করেছে। অমৃতবাজার পত্রিকা বেরল বাংলাদেশের এক গ্রাম থেকে। ইংরেজি রোষ পড়ল তার উপর। ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট, রাতারাতি সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা ইংরেজি হয়ে গেল।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে সুরেন্দ্রনাথের 'বেঙ্গলী' ও শিশিরকুমারের 'পত্রিকা' ভারতবাসীকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সত্যিকারের জাতীয়তাবোধের শিক্ষা দিয়েছে। ওদিকে সিভিলিয়ান হিউম ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস স্থাপন করলেন। ভারতবাসীকে আত্মনির্ভর করার জন্য তাঁর আগ্রহের সীমা ছিল না। জাতীয় কংগ্রেস স্থাপনের পর একটি সর্বজন শিক্ষিত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ভারতের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের চেষ্টা উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে চলেছিল। ঠিক এই সময় ধর্ম-আন্দোলনেরও মীমাংসা হয়।

উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরাজি শিক্ষা লাভের পর বাঙালী পৌরাণিক ধর্মের উপর আস্থা হারিয়েছে। বিগ্রহ-পূজা পৌত্তলিকতা কিনা, একে কেন্দ্র করে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধে একটি ধর্ম আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই সূত্রে ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠা। সাধারণ হিন্দুর ধর্মের প্রতিষ্ঠা অভাবনীয়ভাবে ঠাকুর রামকৃষ্ণের ব্যাখ্যায় মীমাংসা হয়ে যায়। ফলে হিন্দুর বিগ্রহ-পূজা সম্পর্কে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ছিল তার মীমাংসা হয়ে যায়। বিগ্রহ-পূজক হিসাবে তার কোন লজ্জাবোধ ছিল না।

তারপরের বড় ঘটনা বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে। রাজনৈতিক চেতনার পরিস্ফুটন যে বাঙালীর মধ্যে বিশেষভাবে ঘটেছিল এটি তারই প্রতিষেধক ব্যবস্থা।

সে ব্যবস্থা বাঙালী গ্রহণ করেনি। জাতীয় নেতারা এগিয়ে এলেন. এমনকি রবীন্দ্রনাথও আন্দোলনে যোগ দিলেন। ওদিকে শ্রীঅরবিন্দ এসে জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়বার ভূমিকা গ্রহণ করলেন। সেটা ছিল বাঙালীর গৌরবোজ্জ্বল যুগ। এই স্বদেশী আন্দোলন বাংলা তথা সমগ্র ভারতে জাতীয়তাবোধকে পরিস্ফুট করতে সহায্য করেছে। এই সময় রাজনৈতিক চেতনা লক্ষ্য করে বিদেশী সরকার আরও প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ভারতবাসীর মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টির আশায় আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলো।

দুর্ভাগ্যক্রমে মুসলমান সমাজ ইংরাজি শিক্ষার সুযোগ সময়মত গ্রহণ না করায় হিন্দু সম্প্রদায় থেকে পিছিয়ে পড়ে। এই পরিবেশে সরকারের চেষ্টা খানিকটা সাফল্য-মণ্ডিত হয়। সাম্প্রদায়িকতার মনোভাবকে স্থায়ী করার উদ্দেশ্যে লর্ড মিণ্টোর সময় দুই সম্প্রদায়ের পৃথক নির্বাচনরীতি গ্রহণ করা হয়। ওদিকে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের চাপে সরকার বাধ্য হয়ে পূর্ববঙ্গের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গকে যুক্ত করে। কিন্তু তাও এমনভাবে করা হয় যাতে বাংলাভাষী হিন্দু অঞ্চলকে বাংলার বহির্ভূত রেখে নূতন বাংলার প্রদেশে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা স্থাপিত হয়।

এর পর বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলন হিংসাত্মক নীতি গ্রহণ করে। ঠিক এই সময় মহাত্মা গান্ধী রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁর উদ্ভাবিত নূতন অস্ত্র অহিংস অসহযোগ রীতিতে সিদ্ধিলাভ করে ভারতে তা প্রয়োগ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে ফিরে আসেন। মাঝে ১৯১৪ সাল থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধ ভারতের ইতিহাসকেও একরকম আচ্ছন্ন করে।

রাজনৈতিক আন্দোলন আবার দানা বাঁধে। চেমসফোর্ডের সময় যখন ভারতে আংশিক স্বায়ত্তশাসন প্রচলিত করা হয় তখন মহাত্মা গান্ধী এই দ্বৈতশাসন গ্রহণ করেন নি। ১৯২১ সালে তিনি অসহযোগ আন্দোলন করেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং নৈতিক গুণ সকল রাজনৈতিক নেতাদের আকৃষ্ট করে। সন্ত্রাসবাদীরাও তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। এমন কি মহম্মদ আলি জিন্নাও কংগ্রেসে যোগ দেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র আই-সি-এস ত্যাগ করে আন্দোলনে নামেন। এবারকার আন্দোলন সমগ্র ভারতকে পরিব্যাপ্ত করে। মহাত্মার নেতৃত্বে পরিচালিত হয়ে সমগ্র ভারতবাসীর মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা আরও ভালভাবে পরিস্ফুট। মহিলারা এই আন্দোলনে যোগদানের ফলে সমাজে স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

চৌরিচৌরার দুর্ঘটনার পর মহাত্মা অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করেন, কিন্তু মতিলাল নেহরু ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে স্বরাজ পার্টি বিধানসভার মধ্যেও আন্দোলন অনুপ্রবিষ্ট করান। সাইমন কমিশনের ভারত পরিদর্শনের পর ১৯৩০ সালে গান্ধীজীর নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়।

লবণ আইনকে কেন্দ্র করেই এই আইন অমান্য আন্দোলন। এবারকার জনজাগরণ যেন আরও ব্যাপক ছিল। ইংরেজ সরকার একরকম নতিস্বীকার করতে বাধ্য হলো। ফলে নূতন শাসনতন্ত্র রচনার কাজ আরম্ভ হয়।

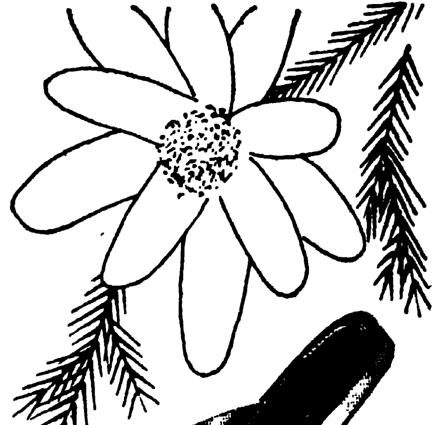
তারই ফলে ১৯৩৯ সালে নূতন শাসনতন্ত্র প্রচলিত হয়। মহাত্মা গান্ধীর পরামর্শে কংগ্রেস এবার শাসনযন্ত্রে যোগ দেন। এর পরেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং মহাত্মা গান্ধীর ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সূত্রপাত। রাজনৈতিক নেতাদের কারারুদ্ধ করে ইংরেজ সরকার তা দমন করে। কিন্তু মহাযুদ্ধের শেষে রাজনৈতিক পরিস্থিতি এমন পরিবর্তিত হয় যে, ইংরেজ সরকার ভারত ত্যাগ করতে সিদ্ধান্ত নেয়। ইতিমধ্যে মুসলমান সম্প্রদায় জিন্নার নেতৃত্বে মূল আন্দোলন থেকে সরে যায় এবং পাকিস্তান গঠনে আগ্রহী হয়। ফলে ভারতে দুটি রাষ্ট্র গঠিত হয়—ভারত ও পাকিস্থান। প্রথম অবস্থায় তার আনুষঙ্গিক ফল হিসাবে উভয় রাষ্ট্রে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা লাগে। ভারত সরকারের বিশেষ নজর দিতে হয় উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে।

তারপর এক নূতন যুগের সূত্রপাত। জওহরলালের নেতৃত্বে নূতন ভারত গঠনের জন্য নূতন সংবিধান রচনা। দেশের মানুষের বড় হয়ে দাঁড়ায় সংগঠন।

এই একশো বছরের দীর্ঘ ইতিহাসে অমৃতবাজারের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। প্রথম দিকে রাজনৈতিক চেতন পরিস্ফুটনে তার ভূমিকা স্মরণীয়। পরবর্তীকালে যখনই যে কোন আন্দোলনই এসেছে পত্রিকা স্থির লক্ষ্য হতে কখনো ভ্রষ্ট হয়নি। মোটকথা পত্রিকা অনন্যসাধারণ এবং ভারতের পত্রিকার ইতিহাসে তার স্থান শীর্ষদেশে।

মৌসুমী নকশা

পথ চলতে পায়ের আরাম—
চমৎকার খোলামেলা গড়ন, ছিমছাম
মনোরম স্টাইল...বাটার এইসব স্যান্ডাল বা চপ্পলে
নিজেকে আপনি অনেক বেশি পরিচ্ছন্ন
এবং স্বচ্ছন্দ বোধ করবেন। সুঠাম,
কোমল ওপর-চামড়া, তেমনি মোলায়েম আর
মজবুত সোল—প্রত্যেক পদক্ষেপে আশ্চর্য
আরাম। স্টাইলের বহুমুখী বৈচিত্র্য
এদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য। আজই এসে
দেখে যান বাটার দোকানে স্যান্ডাল ও চপ্পলের
সুদর্শন মৌসুমী নকশা।


অরুণা ১০.৫০

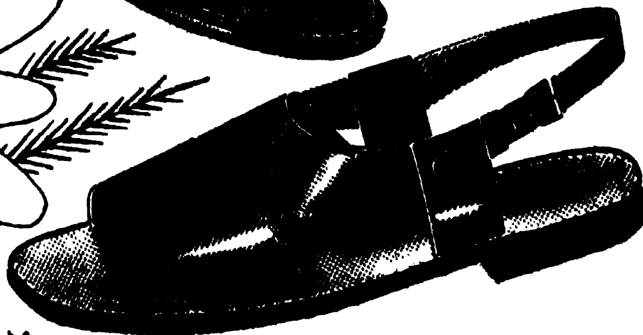

পদ্মিনী ১২.৫০


শান্তি ১৬.৯৫

Bata


প্রতীশ ৭.৯৫




এমারকুল ১৭.৯৫

পত্রিকার পাতায় কংগ্রেসের সূচনা

পুলকেশ দেসরকার

একই বছরে—১৮৮৬ খৃস্টাব্দে—অমৃত-বাজার পত্রিকায় "ন্যাশনাল কংগ্রেস"-এর প্রথম ও দ্বিতীয় অধিবেশনের কথা বেরোয়। প্রথম অধিবেশন হয়েছিল বোম্বাইয়ে ডবলিউ সি বোনার্জির (উমেশচন্দ্র ব্যানার্জির) সভাপতিত্বে, দ্বিতীয়টি কলকাতায় দাদাভাই নৌরজীর সভাপতিত্বে। সম্ভবত এই কারণেই কলকাতার অধিবেশনের তুলনায় বোম্বাইয়ের অধিবেশনের বিবরণীতে কিছু অপ্রাচুর্য ঘটেছে।

কিন্তু সংবাদ আছে।

১৮৮৬ খৃস্টাব্দে ৭ই জানুয়ারীর সংখ্যায় অমৃতবাজার পত্রিকা জানালেন :

"সেদিন বোম্বাইয়ে একটি ন্যাশনাল কংগ্রেস হয়ে গেল। ছোট জিনিসের বড় নাম দেওয়ার পক্ষপাতী আমরা কোনকালেই নই। কিন্তু আমাদের বড় আকাঙ্ক্ষা যে, আমাদের একটি জাতীয় কংগ্রেস (ন্যাশনাল কংগ্রেস) হয়। এটি সত্যি দেখবার মতো জিনিস যে, বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সমাজের নেতারা তাঁদের অধঃপতিত অবস্থার প্রতি খেদ প্রকাশের জন্য আসছেন। যাঁরা দেশের দুর্দশার কথা অনুভব করেন, তাঁদের চিত্তজুড়ে এই একটিমাত্র কথা। বক্তৃতা দেওয়া? তাতে শুধু বক্তারই আগ্রহ থাকতে পারে— কোন কাজ তাতে হবে না। আমরা একটি ন্যাশনাল কংগ্রেস আহ্বান করে একটি প্রস্তাবক্রমে বৃটিশ সরকারকে উচ্ছেদও করে দিতে পারি। (We might as well convene a national congress and abolish the British Government by a resolution). সে যাই হোক, এমন সভা সম্ভব করে তোলার জন্য আমরা বোম্বাইবাসীদের প্রতি বিশেষ বাধিত রইলাম। উদ্যোক্তারা এজন্যও ধন্যবাদার্হ যে, তাঁরা আমাদের প্রখ্যাত স্বদেশবাসী মিঃ ডবলিউ সি বোনার্জিকে চেয়ারম্যান পদে অভিষিক্ত করে বাংলাদেশকে সম্মানিত করেছেন।

কংগ্রেস বিবরণী আমাদের হাতে এখনও পৌঁছোয়নি। তবে আমরা শুনেছি যে, মাদ্রাজবাসীরা অধিকতর উৎসাহ দেখিয়েছেন। তাই তো হওয়া উচিত। বাংলা তার শক্তিকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করে ফেলেছে; বোম্বাই-য়ের মতিগতিও তদনুরূপ; কিন্তু মাদ্রাজ-বাসীরা শক্তিকে সংরক্ষিত রাখতে পেরেছেন। কলকাতায়ও একটি সম্মেলন হয়েছে। আমাদের মতে কলকাতার সম্মেলনটি স্থগিত অথবা একেবারেই বন্ধ করে দেওয়া উচিত ছিল। আমরা ভগবানের কাছে এই কাতর প্রার্থনা জানাই যে, বোম্বাইয়ে যে বীজ বপন করা হল তা যেন অঙ্কুরিত হয়। বাংলা থেকে বিশিষ্ট তিনজন উপস্থিত ছিলেন : মিঃ ডবলিউ সি বোনার্জি, বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন ও বাবু গিরিজাভূষণ মুখার্জি।

ঐ বছরেরই ১১ই ফেব্রুয়ারীর সংখ্যায় পত্রিকা লিখলেন : বোম্বাইয়ের ন্যাশনাল কংগ্রেস প্রতিদিনই শক্তি সঞ্চয় করে চলেছে। বোম্বাই ও মাদ্রাজবাসীরা ব্যাপারটিকে খুবই আগ্রহের সঙ্গে নিয়েছেন এবং জানা গেল, জনসাধারণের সমর্থন লাভের জন্য কর্মীরা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বাংলাদেশ নানা কারণে পিছিয়ে আছে; কারণগুলো এখানে বলার দরকার নেই। তবে আমরা শুনে খুশি হলাম যে, বাংলাদেশে কংগ্রেসের কার্যভার বাবু গিরিজাভূষণ মুখার্জির ওপর ন্যস্ত হয়েছে। সারা বাংলায় এ কাজের জন্য ওঁর চাইতে অধিকতর উপযুক্ত লোক পাওয়া কঠিন। আমরা তাই সাহস করে বলতে পারি যে, যখন তিনটি প্রেসিডেন্সির কাজের হিসেব বেরোবে, গিরিজাভূষণের মতো নিঃস্বার্থ ও যোগ্য কর্মী যেখানে রয়েছে, সেই বাংলাদেশের কাজও অন্য দুই প্রদেশের তুলনায় কিছু সামান্য হবে না। আমরা আশা করি, রাজ-নৈতিক এসোসিয়েশনগুলো কংগ্রেসের কাজে এগিয়ে আসবে।

কলকাতায় যে দ্বিতীয় অধিবেশন হল তার বিশদ বিবরণের সঙ্গে সঙ্গে দুটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখলেন অমৃত-বাজার পত্রিকা। একটির শিরোনামা : The National Congress (দি ন্যাশানাল কংগ্রেস), আর একটি The Beginning of the End (শেষ হবার পালা শুরু)। এ ছাড়া থাকল কংগ্রেস কমিটির বিবরণী, টাউন হল মিটিংয়ের খবর। এসবই ৩০শে ডিসেম্বর সংখ্যায় বেরোয়; তার আগে ১৬ই ডিসেম্বর কংগ্রেস অধিবেশনের প্রস্তুতি ও প্রাসঙ্গিক সংবাদ ও মন্তব্য।

টাউন হল মিটিংয়ের খবরে বলা হয় :

"সোমবার বেলা তিন ঘটিকায় ডেলিগেট-দের (প্রতিনিধিদের) উদ্বোধনী সভা হল। স্থির হয়েছিল, সভায় আরও যেসব ভদ্র-মহোদয় আসবেন তাঁদের থেকে কিছু স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য প্রতিনিধিরা টাউন হলে প্রবেশ করবার আগে এক ধরণের ব্যাজ ধারণ করবেন। তদনুসারে তাঁরা সবাই ১৩নং পার্ক স্ট্রীটের বাড়ীতে এসে জমায়েৎ হলেন। সেখানে প্রত্যেক প্রতিনিধির বহিরাবরণে একটি গোলাপ ফুল পিনে এঁটে দেওয়া হল। সেখানে তাঁরা কিছুক্ষণ পরস্পরের সঙ্গে আলাপ করলেন; তারপর আধ মাইল-ব্যাপী এক গাড়ীর মিছিল করে তাঁরা টাউন হলের দিকে রওনা হলেন।

একেবারে ঠিক তিনটের সময় সভা আরম্ভ হল। এই সমাবেশ এক অত্যাশ্চর্য দৃশ্যের অবতারণা করেছিল। তিন সহস্রাধিক ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতি এই সমাবেশকে মর্যাদা-ভিষিক্ত করে তুলেছিল। তাঁদের মধ্যে ছিলেন মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, বাবু জয়কৃষ্ণ মুখার্জি, ভারতের ফসেট মিঃ নাইট, মাননীয় দাদাভাই নৌরজী, মিঃ জে এইচ এস কটন ও মিঃ এ ও হিউম। শেষোক্ত তিনজন যখন হলে প্রবেশ করেন তখন পুনঃ পুনঃ হর্ষধ্বনিতে অভিনন্দিত হন।

কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সাপেক্ষে মাদ্রাজের মাননীয় এস সুব্রাহ্মনিয়া আয়ারের প্রস্তাব এবং বোম্বাইয়ের মিঃ চন্দ্রাবারকরের সমর্থনক্রমে ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র চেয়ার-ম্যানের আসন গ্রহণ করেন; এ থেকেই সভার কাজ শুরু হয়ে যায়। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতি-ক্রমে গৃহীত হয়েছিল।

ডাঃ রাজেন্দ্রলাল সভার কাজ সূচনা করে বলেন যে, তাঁর প্রথম কর্তব্য হচ্ছে, কলকাতার নাগরিকদের পক্ষ থেকে যেসব প্রতিনিধি বিভিন্ন প্রদেশ থেকে কংগ্রেসে যোগ দিতে এসেছেন তাঁদের আন্তরিক অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা। তাঁর স্বপ্ন ছিল তিনি দেখবেন জাতির ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত খণ্ডগুলো একত্রিত হবে, একসঙ্গে কাজ করবে এবং তাঁদের পূর্বপুরুষদের মতই এক অখণ্ড জাতি হিসেবে আবার অবস্থান করতে থাকবে। এই সভায় তিনি সেই সম্ভাবনাই প্রত্যক্ষ করছেন—দেখছেন ভারতের নতুনতর সুন্দরতর দিনের উদয়। আরও কিছু বলার আগে তাঁর বিশেষ কর্তব্য হবে যেসব মুসলিম ভদ্রমহোদয় এই সভায় উপস্থিত হয়ে সভার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেছেন তাঁদের সাদর অভ্যর্থনা জানানো। তাঁরা না এলে এটা দাঁড়াত যেন মেয়ে নেই তো বিয়ের আসর! তাঁদের আচার-আচরণ, ধর্ম ও সমাজরীতির পার্থক্য সত্ত্বেও একই জাতির দাবীদার হিসেবে তাঁরা কিছুমাত্র কম নন। তাঁরা একই দেশের অধিবাসী, একই রাজ-শাসনের প্রজা; যা হিন্দুদের পক্ষে কল্যাণকর বা ক্ষতিকর তা মুসলমানদের পক্ষেও কল্যাণকর বা ক্ষতিকর।

তিনি বলেন, এ কংগ্রেসাধিবেশনের যৌক্তিকতা নিয়ে সম্প্রতি অনেক কিছু লেখালেখি হয়েছে। এই ধরনের কলঙ্ককর অসম্ভব গালগল্পও ছড়িয়েছে যে, এ হচ্ছে একদল অভিসন্ধিপরায়ণ ও পেশাদার হুজোড়বাজের ওপর নির্ভরশীল বিরূপচিত্ত কিছু মানুষের কাজ। এইভাবে যারা তাঁদের অনানুগত্যের বদনাম দিতে চায় তাদের জবাবও তিনি দিতে রাজী নন। কিন্তু এ ছাড়াও কেউ কেউ বলে যে, তাঁরা "গবর্ন-মেণ্টকে জবরদস্তি বাধ্য করতে প্রয়াস

পাচ্ছেন"। এমন কথা যারা বলে তারা গবর্নমেণ্টেরই মানহানি ঘটায়। তিনি বলেন, তাঁরা কখনও গবর্নমেণ্টকে বিরোধী বলে গণ্য করেন না। এমন কিছুই তো নেই যা তাঁদের পরিহার করে গবর্নমেণ্ট করছেন। তবে তাঁরা জবরদস্তি গবর্নমেণ্টকে বাধ্য করতে যাবেন কেন?

এমনও পরামর্শ দেওয়া হয় যে, তাঁদের গবর্নমেণ্টের প্রতি "আস্থার নীতি" অবলম্বন করা উচিত। আস্থার নীতি কি? গবর্নমেণ্টের ওপর যদি তাঁদের পূর্ণ আস্থা থাকে তবে তাঁদের "আস্থার নীতি" অবলম্বন বা তার অনুকরণ প্রয়োজন করে না। গবর্নমেণ্ট ইতিমধ্যেই সরকারী চাকুরী সম্পর্কে তদন্তের জন্য এক প্রস্তাব নিয়েছেন। সেই তদন্তের সহায়তার তথ্য-প্রমাণাদি সংগ্রহের জন্যই তাঁরা সমবেত হয়েছেন।

কংগ্রেস নানাবিধ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন। প্রথম হচ্ছে কাউন্সিলের সংগঠন। তিনি মনে করেন, সমগ্র রাজনৈতিক সংবিধানের এই হচ্ছে মূল বুনিয়াদ। বিদেশী শাসক, তাঁদের চালচলন, ভাষা এবং সব কিছু অন্যান্য মানুষ থেকে স্বতন্ত্র, তাঁদের পক্ষে "আমাদের অন্তঃস্তলে গিয়ে আমাদের হৃদয়বৃত্তি ও আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিচয় লাভ সম্ভব নয়।

তার পরের কথা হচ্ছে সরকারী চাকুরী। পৃথিবীর সর্বত্র দেশবাসীরাই দেশের চাকুরী করে থাকে। রুশিয়ায় আরও দেশবাসীর এ অধিকার স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের যুবকদের স্বদেশ থেকে ৯০০০ মাইল দূরে, মাত্র ১৬ বছর বয়সে, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়, কিন্তু প্রায়শঃই তারা সর্বস্বান্ত হয়ে যায়। কানাডাবাসীরাই কানাডা শাসন করে থাকেন, এজন্য তাঁদের ইংলণ্ডে গিয়ে শিক্ষালাভ করতে হয় না।

কংগ্রেসে আরও অন্য বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে। পরিশেষে আমার নিবেদন এই যে, তাঁরা যাই করুন না কেন, যাই বলুন না কেন, অথবা তাঁরা যে বিষয়েই অভিযোগ করুন, তাঁদের স্মরণ রাখতে হবে সংযমের প্রয়োজন সব চাইতে বেশী। সব বক্তৃতা ও প্রস্তাবই যেন সংযত সুরের হয়।

এর পর বাবু জয়কৃষ্ণ মুখার্জি স্বল্প কয়েকটি সুন্দর কথায় মাননীয় দাদাভাই নৌরজীকে প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনের জন্য প্রস্তাব করেন। অযোধ্যার নবাব রেজা আলী খাঁ এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। সমর্থন করতে গিয়ে তিনি উর্দুতে যে বক্তৃতা দেন ব্যারিস্টার মিঃ আহমেদ আলি তার ইংরাজী তর্জমা করে দেন। নবাব বললেন, তিনি এই কংগ্রেসে যোগদানের জন্য ৬০০ মাইল দূরে থেকে এসেছেন। তিনি যে জেলা থেকে আসছেন সেখানে হিন্দু ও মুসলমানেরা সম্পূর্ণ মনের মিলে বাস করে। তিনি তাঁর লক্ষ্ণৌর সমধর্মীদের পক্ষ থেকে বলতে পারেন যে, তাঁরা হিন্দুদের সঙ্গে ঐক্য-সাধনের ও একই স্বার্থে অগ্রসর হবার জন্য যা কিছু করণীয় তা করবেন।

কর্ণভেদী হর্ষধ্বনির মধ্যে মাননীয় দাদাভাই নৌরজী তাঁর ভাষণ দিতে উঠলেন। তাঁকে প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত করে তাঁকে যে সম্মান দেওয়া হল তার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বললেন যে, তাঁরা যে উপলক্ষ্যে সমবেত হয়েছেন তা তাঁদের ইতিহাসে একটি ঘটনা হয়ে থাকবে—বিশেষ একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বৃটিশ শাসনের প্রসাদে একটি সাধারণ ভাষা পাওয়া গেছে, যোগাযোগ ও ভ্রমণের সুবিধে হয়েছে, জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা পাওয়া গেছে, সর্বোপরি; একটি সাধারণ রাজনৈতিক জীবনের আবির্ভাব ঘটেছে; এই সব মিলিয়েই বিভিন্ন জাতির এই সমাবেশ সম্ভব হয়েছে। অন্তত, এই কারণে তাঁরা বৃটিশ শাসনের প্রতি তাঁদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছেন। বৃটিশ-রাজের প্রতি তাঁদের আন্তরিক আনুগত্যে সংশয় প্রকাশ করার কোন হেতু নেই। ইংরেজদের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ ও যোগ্য ব্যক্তি তাঁরা এই আন্তরিকতায় যে বিশ্বাসী তার বহু প্রমাণপত্র জোগাড়ের সৌভাগ্য আমার হয়েছে। (এখানে মাননীয় মিঃ নৌরজী Sir Bartle Frere, the Marquis of Ripon ও আর্ল অব ডাফরিনের বক্তৃতা বা পত্র থেকে অংশবিশেষ পড়ে শোনান—সব চিঠিরই মর্ম হচ্ছে যে, বৃটিশ ক্রাউনের প্রতি এদেশবাসীর আনুগত্য নিঃসংশয়)। কংগ্রেস

পাঠকের সুরুচি ও জ্ঞানানুশীলনের আগ্রহের প্রতি লক্ষ্য রেখে গ্রন্থপ্রকাশে 'জিজ্ঞাসা' যত্নবান।
প্রকাশিত কয়েকখানি গ্রন্থের তালিকা দেওয়া হ'ল।

ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত লীলাশুক বিল্বমঙ্গল বিরচিত শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্ ১২·০০, ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য ১৫·০০ পাঁচশত বৎসরের পদাবলী ৭·০০। অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য সম্পাদিত ও প্রবোধচন্দ্র সেন কৃত ছন্দপরিচিতি সম্বলিত বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ১০·০০ ॥ সুধা দেবী মহাপ্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর ৮·০০ দীনেশচন্দ্র সেন পৌরাণিকী ৬·০০, মুক্তাচুরি ২·৫০, সুবল-সখার কাণ্ড ২·৫০, কানু পরিবাদ ও শ্যামলী-খোঁজা ২·৫০, রাখালের রাজগী ২·৫০, রাগরঙ্গ ২·৫০, রামায়ণী কথা ৪·০০ ॥ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বপ্নপ্রয়াণ ৬·০০।

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর পিতৃস্মৃতি ১৬·০০। সুশীল রায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ১০·০০। সীতা দেবী পুণ্যস্মৃতি ১০·০০। মণি বাগচী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ৪·৫০, মাইকেল ৬·০০, রমেশচন্দ্র ৫·০০, রামমোহন ৬·০০, শিক্ষাগুরু আশুতোষ ৫·০০, সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ ৫·০০, কেশবচন্দ্র ৪·৫০, বঙ্কিমচন্দ্র ৬·০০, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ৫·০০। নমিতা চক্রবর্তী বিদ্যাসাগর ৬·০০। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় নেতাজী ২·৫০।

সদ্য প্রকাশিত

রা গা ঙ্কু র

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস

রাগসংগীতের প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী পাঠক্রম। সংগীত বিদ্যালয় ও সংগীত মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থিগণের অবশ্য পাঠ্য পুস্তকরূপে পরিকল্পিত ৪০০ পৃষ্ঠার বই—১০·০০

ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য

গান্ধীজির জীবনপ্রভাত

মূল্য : ২·০০

জিজ্ঞাসা ১ কলেজ রো (প্রকাশন বিভাগ) ও ৩৩ কলেজ রো। কলিকাতা ৯
১৩৩এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ। কলিকাতা ২৯

সামাজিক সংস্কার সম্পর্কে উদাসীন এই অভিযোগের উত্তর দিতে গিয়ে মিঃ নৌরজী বলেন যে, কংগ্রেস হচ্ছে রাজনৈতিক সংস্থা এবং বিভিন্ন আচরণ ও ধর্মবিশ্বাসের প্রতিনিধি তার অন্তর্ভুক্ত; সুতরাং তাঁরা এমন বিষয়ে আলোচনা করতে পারেন না যা ঐক্যবিধায়ক না হয়ে বিভেদ বৃদ্ধির কারণ হবে।

মিঃ নৌরজী অতঃপর গত বছরের কার্যক্রমের কথা উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, তাঁদের অধিকাংশ প্রস্তাবই কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ পার্লামেন্টারী কমিটি অব এনকোয়েরী ও পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের কথা উল্লেখ করা যায়। ১৮৫৮ খৃস্টাব্দে মহারাণীর ঘোষণায় (যা কুইন্স প্রোক্লামেশনে) যে সুবিচারের নীতি উল্লেখ করা হয়েছিল ১৮৮৩ খৃস্টাব্দেও সেই নীতি অনুসৃত হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত সেই তাদের নীতি হবে। সংযত ভাষায় বৈধ পন্থায় তাঁরা যদি তাঁদের অভাব-অভিযোগের কথা জানান তবে তাতে কর্তৃপক্ষ কর্ণপাত করবেন, বিশেষ করে আর্ল অব ডাফরিনের মত মহৎ হৃদয় তো করবেনই।

প্রেসিডেন্ট তারপর হায়দরাবাদ থেকে যে টেলিগ্রাম পাওয়া গেছে তা পড়ে শোনান :

"উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের মুসলমানেরা কংগ্রেসের উদ্দেশ্যের প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতিশীল এবং এর দ্রুত অগ্রগতি কামনা করেন। তাঁরা শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছেন তাঁদের কলকাতার ভাইয়েরা এর সংস্রব পরিহার করে চলেছেন, তবু, এখনও তাঁরা আশা করেন যে, তাঁরা যোগ দেবেন।"

প্রেসিডেন্ট আরও ঘোষণা করেন যে, দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এই সভার উদ্দেশ্যের প্রতি গভীর সমর্থন জ্ঞাপন করে হিন্দু-মুসলিম ভারতীয়গণের কাছ থেকে যেসব টেলিগ্রাম পাওয়া গেছে তা পড়তে গেলে অনেক সময় লেগে যাবে। মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রেসিডেন্টের উদ্দেশে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলে শ্রোতৃবৃন্দ তুমুল হর্ষধ্বনি দিয়ে তা সমর্থন করেন এবং এই সঙ্গে সভার সমাপ্তি হয়। মহারাণী সম্রাজ্ঞী ও বড়লাটের উদ্দেশেও হর্ষধ্বনি করা হয়। পরদিন সকাল ১১-৩০ পর্যন্ত সভা মুলতুবী রাখা হয়।

দুটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ ছাড়াও, ওপরের এই সংবাদ পরিবেশন করে পত্রিকা তার নীচে যে মন্তব্য করেন তার প্রথমাংশে আছে :

এই সভা গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধে কোন অভিব্যক্তি নয়, কর্তৃপক্ষস্থানীয়দেরও বিরুদ্ধাচরণ নয়। আশু প্রতিকারের জন্য যেসব অভিযোগ তোলা হয়েছে তাও গৌণ। আন্দোলনের মূল লক্ষ্য শিক্ষা ও সংগঠন। এই যখন অবস্থা তখন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সংবাদপত্রগুলোর বিরূপ মনোভাব এই আন্দোলনের ওপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। এই যথেষ্ট যে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ সন্তুষ্ট হয়ে ফিরেছেন। সভার সামগ্রিক আবহাওয়াটা ছিল রাজনৈতিক উদ্দীপনায় পরিপূর্ণ। নিতান্ত হতাশ-প্রাণেও উৎসাহের সঞ্চার হয়েছে। কয়েক শতাব্দীর মধ্যে পতিত দীর্ঘ নিপীড়িত ভারতীয়ের জীবনে এমন উপলক্ষ্য আর আসেনি। এ তাকে নতুনতর জীবনের চেতনা দিয়েছে। "It was cheering, invigorating, soul-thrilling." (৩০শে ডিসেম্বর, ১৮৮৬)

টাউন হল অথবা বৃটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন কক্ষে তিনদিন ধরে সাব-কমিটির প্রস্তাবগুলো চূড়ান্ত করা হয়। টাউন হলের এক সভায় জুরী প্রথা নিয়ে উত্তপ্ত বিতর্ক চলে। মূল প্রস্তাবের যেটুকু জুড়ে দেওয়ার জন্য বলা হয় তা প্রস্তাব করেন মনমোহন ঘোষ (বাংলা), সমর্থন করেন সি বারকার (বোম্বাই)। তাতে বলা হয় যে,

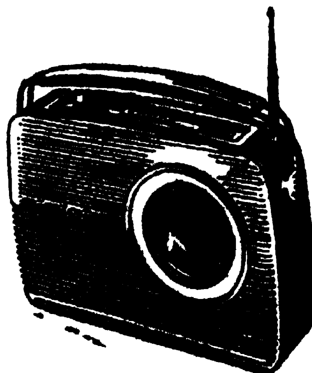
"That in the opinion of this Congress the accused person in all warrant cases should have the right of electing to be tried by the Sessions Court or by the Magistrate of the district."

একদিন বড়লাট কয়েকজন ডেলিগেটের সঙ্গে দেখা করলেন; একদিন অপরাহ্ণে একটা স্টীমার পার্টিও হল। এর পরও সভা হয়েছিল।

অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সংবাদপত্রগুলো কি বিরূপ মনোভাব অবলম্বন করেছিল তার একটি নমুনাও পত্রিকা ইংলিশম্যান থেকে উদ্ধৃত করেন :

"This then is the harmless and colourless concession for which the natives are striving by means of National Congress and other manoevres. We are to abdicate authority in favour of Mr. Naoroji, Babu Surendranath Banerji and their following, and are to be allowed to remain in the country on tolerance, conditionally upon our doing the disagreeable police work, and protecting the Government of the future from molestation. We are to mount guard on the Treasury, and our masters are to handle the rupees; we are to keep the Mahomedans in order, and to guard the frontiers against foreign attack, while the Hindus are to relieve us of the cares of legislations and are to settle among themselves to what extent the services of Europeans in the civil administration are to be retained.

উল্লেখযোগ্য ১৮৭৮ খৃস্টাব্দের ২১শে মার্চ থেকেই অমৃতবাজার পত্রিকা পুরোপুরি ইংরিজী এবং তার পর থেকে বাংলা বিভাগের কোন অস্তিত্ব রাখা সম্ভব ছিল না। এ প্রবন্ধে যা-কিছু উদ্ধৃত তার সবটাই অনুবাদ। আলোচ্য সংখ্যার পূর্ববর্তী একাধিক সংখ্যায় এই কংগ্রেসের প্রস্তুতি সংবাদ আছে এবং আগাম যেসব প্রস্তাব পাওয়া গেছল তার আলোচনাও আছে। সেখানে অনেক বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপনের কথা আছে। পত্রিকা সেখানে মন্তব্য করেছেন, লেখাই হোক, বক্তৃতাই হোক, কথার অংশটা যেন গৌণ হয়। মাত্র কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব বাছাই করে নিয়ে তার ওপর জোর দেওয়া দরকার। লক্ষ্য থাক অনেক কিছু, ক্রমশঃ একটি করে অনেক মাছ ভেজে তোলা হোক (aim after frying a good lot of fishes in course of time) আলোচনার সুবিধের জন্য বিষয় ভাগ করে সেগুলো কয়েকটি কমিটির ওপর ন্যস্ত করা হোক। মাদ্রাজ, বোম্বাই ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশের অপ্রতিহত খাজনাবৃদ্ধির প্রশ্নটা যেন রাখা হয়ই. এটা সেসব প্রদেশের জীবন-মরণ প্রশ্ন। বোম্বাই, মাদ্রাজ ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশের অধিবাসীরাও যেন এ বিষয়ে বিশেষ অবহিত হন। (পত্রিকা এ নিয়ে অনেকটা লিখেছেন; এতেই বোঝা যায়, বাংলাদেশের একটি সাপ্তাহিক কি করে এমন সর্বভারতীয় স্বীকৃতি পেল। শুধু তাই নয়, শিক্ষিত শ্রেণীর চাকুরীর চীৎকারও গৌণ গণ্য করেছেন পত্রিকা মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের



'স্বপ্ন' ট্রানজিস্টর রেডিও।

অনেক রকমের

রেডিও, রেডিওগ্রাম, রেকর্ড প্লেয়ার, রেকর্ড চেঞ্জার রেকর্ড রিপ্রডিউসর, গ্রামোফোন রেকর্ড, ট্র্যানজিসটর রেডিও, ও রেডিও-গ্রাম, টেপ রেকর্ডার, এমপ্লি-ফায়ার ইত্যাদি নগদ ও কিস্তিতে বিক্রি করা হয়।

মেরামতের সুবন্দোবস্ত আছে

ফোন : ২৪-৪৭১০

রেডিও এণ্ড ফটো ষ্টোরস

৬৫নং গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

কৃষকদের প্রশ্নের কাছে) জুরীবিচার, সিভিল সার্ভিস কাউন্সিলের সদস্যপদ লাভ, সবই আছে, ভাল, কিন্তু পত্রিকার মতে এসব প্রশ্ন ধরং মুলতুবী রাখা চলে

"till the question of the agrarian grievances of Madras and Bombay were duly dealt with and the mass of the people brought together with the educated classes.'

(মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের কৃষকসমাজের অভিযোগ পর্যালোচনার সমাপ্তি ও ঐ জনসাধারণকে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সামিল না করা পর্যন্ত)। আরও এরকম বহু মূল্যবান কথা আছে যা কোন সীমাবদ্ধ প্রবন্ধে দেওয়া সম্ভব নয়।

মুসলমানদের একাংশ কেন যোগ দেয়নি তারও একটা কারণ পাওয়া যায়; সেণ্ট্রাল মহামেডান এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী মিঃ আমির আলি এক চিঠিতে জানান: আপনারা এমন কোন প্রশ্ন বা প্রস্তাবই রাখেননি যা নিয়ে ভারত সরকার ও বৃটিশ সরকার সর্বাংশে না হয়েছেন।

যাইহোক, সেকালের উৎসাহ উদ্দীপনা প্রতিফলিত করে পত্রিকা যে দুটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখেন সে দুটি ঐতিহাসিক বিচারে খুবই উল্লেখযোগ্য। দুটিই ৩০শে ডিসেম্বরের সংখ্যায় প্রকাশিত।

'One feels disposed to give flight to his imagination on an occasion like this." বলে আরম্ভ করেন: 'The National Congress

এ একটি এমন উপলক্ষ্য যখন কল্পনার পাখায় ভর করে উড়ে যেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু বেশী মাত্রা চেতনা জাগে এ তো বহুদিন এর ক্ষমতায় তখনই হায়, চোখে পড়ে... পারা যাচ্ছে না। যে ডেলিগেটেরা এ কংগ্রেস গঠন করেছেন তারা ঠিক বেশ ... এ নয় তো ... প্রতিনিধিরূপে প্রেরিত হতে পারতেন। তারা এক জায়গায় বসে দেশের বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং কোন কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। কিন্তু তাতে কি? তাদের প্রস্তাবে কর্ণপাত করবার কেউ নেই, তাদের ইচ্ছা পূরণের জন্য কেউ নেই; তাদের আদেশ পালন করার জন্য একটি কনস্টেবলও নেই!

"আমরা এক সভা ও বিদেশ গবর্নমেণ্টের অধীন বাস করছি; সেই গবর্নমেণ্ট আমাদের সরকারী বিষয়ে অবাধ আলোচনার অবকাশ দিয়েছেন। সংগঠনে বাধা দিতে কোন আইন অথবা কোনো লোক নেই; কোন ব্যক্তি বা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নিন্দাজ্ঞাপনেও কোন বাধা নেই। রাজপুরুষদের মন্ত্রীবর্গের ও বড়লাটদের ধিক্কার দেওয়া যায়, পার্লামেণ্টকেও দায়ী করা যায়। এ সবই আমরা বিদেশী শাসনাধীনে পেয়েছি। কিন্তু গবর্নমেণ্ট কেবল একটি সুবিধে নিজেদের জন্য সংরক্ষিত রেখেছেন। তা হচ্ছে এই—তারা আমাদের বিতর্ক-আলোচনা, প্রস্তাব, অভিযোগ ও সমালোচনা শুনতে বাধ্য নন।"

দীর্ঘ এই বিশ্লেষণাত্মক প্রবন্ধে মুসলিম শাসনের সঙ্গে বৃটিশ শাসনের তুলনা করে বলা হয়েছে, মুসলিম শাসকেরা যেমন প্রজাদের আবেদন না পড়েই ছিঁড়ে ফেলতেন এঁরা তা করেন না বটে কিন্তু আবেদনপত্রের মর্মকথা গ্রাহ্যও করেন না। পক্ষান্তরে, একটি উদার মনোভাবের ভান করার ফলে লোকে প্রতারিত হয় মাত্র। এই ভানের জন্য কোন কোন বৃটিশ রাজনীতিক লোকমতের ফাঁদে পা দিয়ে ফেলেছেন বলে ও'রা পরে আৎকে উঠেছেন। তারপর সতর্ক পদক্ষেপে এগোতে লাগলেন। একাধিক দৃষ্টান্ত দিয়ে পত্রিকা একথা প্রতিপন্ন করেছেন। এও দেখালেন যে, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানরা তাঁদের নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এদেশীয় লোকদের দিয়ে চীৎকার তুলেছে:

They were taught to clamour to serve the particular ends of the teachers. But the people gradually learnt to turn this knowledge to their own account, and thus grew political agitation in India

প্রথমে এইসব সভাসমিতি সীমাবদ্ধ ছিল কলকাতায় তারপর তা ছড়ালো মফস্বলে; মফস্বলের লোকেরা যখন শহরের লোকের সঙ্গে যোগ দিল তখন রাজনৈতিক আন্দোলনের শক্তি লক্ষ্য করবার মতো হল।.......

'The Beginning of the End' এ বললেন:

"And the National Congress is the beginning of the end. It is the first step of the Indian nation, under British rule, towards the political regeneration of their country ...."

আমরা কথায় কথায় বলি, স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার উপযোগী; অতি ব্যবহারে কথাটার মূল্য গেছে কমে; কিন্তু যদি সত্যি স্বর্ণাক্ষরে বেঁধে রাখবার মতো কিছু থাকে তো এই। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখে একথা দূরপ্রসারী দূরদর্শী ছাড়া আর কে বলতে পারেন?

আজ সেই সমাপ্তির সূচনা সত্য ও বাস্তব; কিন্তু ১৯৪৭ থেকে আজ অবধি পত্রিকায় একথাটি কে একবারও স্মরণ করেছেন? কথাগুলো স্বর্ণাক্ষরে বেঁধে রাখা তো দূরের কথা। অথচ এইসব প্রাজ্ঞ ব্যক্তিই দেশপ্রেমকে, দেশের জন্য আত্মবিসর্জনের আকাঙ্ক্ষাকে, সংগঠন প্রচেষ্টাকে অনুপ্রাণিত করেছেন; একমাত্র এঁদের পক্ষেই ৮২ বছর আগে বলা সম্ভব:

"It is an achievement calculated to raise the drooping spirits of the desponding millions ... in this achievement what was believed to be impossible has been accomplished .... The National Congress is a proof that India is growing in life and spirit, and that she has yet children who feel for her abject condition..
Let them come together, educate themselves, fit themselves for leadership, and they will get a following of the masses in no time. ...It is asserted that the natives of India are yet but children......The National Congress will give the lie to all these assertions ...... The Congress will secure respect for us, and that will lessen the number of our evils ...... It will create respect for us not only in India, but in England and other parts of the World .... The Government will feel, in spite of itself, uneasy, if four hundred delegates from all parts of India sit together to pass their judgment upon its actions."(৩০শে ডিসেম্বর, ১৮৮৬)

এসব ভবিষ্যদ্বাণীর কোনটি না সত্য ও বাস্তব প্রতিপন্ন হয়েছে? কোনটি স্বর্ণাক্ষরে বেঁধে রাখবার মতো নয়? এই—এই গুণেই পত্রিকা শতবর্ষ উত্তীর্ণ হতে পেরেছে।

'রূপা'র বই

॥ চরিত্র-চিত্রণ ॥

বহুরূপী গান্ধী

অনু বন্দ্যোপাধ্যায়

অনেক উঁচু থেকে অনেক নীচু—অতি সাধারণ মানুষের ভীড়ে যিনি নেমে আসতে পারতেন, সেই গান্ধী-জীবনের পরিচয়। - [৬·০০]

GANDHI'S EMISSARY
By SUDHIR GHOSH
Rs. 30.00

THE MAHATMA AND HIS MEN — G. D. BIRLA
By ATULANANDA CHAKRABARTY
Rs. ?.00

আমাদের পূর্ণ গ্রন্থতালিকার জন্য লিখুন



রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা—১২
Phone: 34-4821 • 34-6305.

নবজাগরণের দিন ও অমৃতবাজার পত্রিকা

কৃষ্ণ ধর

অমৃতবাজার পত্রিকার একশো বছর বয়স হওয়াটা খুবেই আশ্চর্যের। শিশু-বয়সেই তার প্রাণান্ত হবার আশংকা ছিল। ইংরেজরা এই পত্রিকাটিকে সুনজরে দেখেনি। তার কন্ঠরোধ করার জন্য প্রেস আইনই পাল্টে দিলে। কিন্তু অমৃতবাজার পত্রিকার কলম তাতে বন্ধ হয়নি। ছিল বাংলা ও ইংরেজি মিশানো দ্বিভাষিক সাপ্তাহিক। ইংরেজের কুখ্যাত আইনের বেড়া ডিঙাবার জন্য সম্পাদক শিশিরকুমার পরবর্তী সপ্তাহেই তাকে সম্পূর্ণ ইংরেজিতে রূপান্তরিত করেন।

ঘটনাটা অবাক করার মতোই। সেকাল আজ আমরা অবাক হয়ে ভাবি কী করে সহস্র বাধা অতিক্রম করে বাংলাদেশের গন্ডগ্রামে প্রকাশিত একটি পত্রিকা সারা ভারতবর্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল। তা সম্ভব হয়েছিল পত্রিকার সম্পাদনা-বৈশিষ্ট্যে, তার কলমের জোরে। ভারতবর্ষের ঘুম ভাঙাবার জন্য যাঁদের কাজ স্মরণীয় হয়ে আছে, অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় নির্ভীকতা ও একনিষ্ঠতা তাদের মধ্যেই গণনীয়। এই একশো বছর বাংলাদেশ এবং ভারতবর্ষের নবজাগরণের কাল। অমৃতবাজার পত্রিকা তার সাক্ষী। তার শতবর্ষের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় অনুসন্ধানীরা একটি জাতির জাগরণের স্বাক্ষর পাবেন। আজকের যুগে বাস করে কোনো তরুণ পাঠকের পক্ষে বোঝা দুঃসাধ্য যে সংবাদপত্র প্রকাশ ও পরিচালনা করা সে যুগে ছিল কত কঠিন। তখন মুদ্রাযন্ত্রের এত উন্নতি হয়নি, তা সুলভও ছিল না। তা ছাড়া ইংরেজ শাসনের পাথরটা বেশ জাঁকিয়ে বসেছিল দেশের বুকে। সম্পাদককে কলম চালাবার আগে পাঁচবার ভাবতে হত— এই লেখা বেরোলে কাগজের আয়ু আর কতদিন টিঁকবে?

শিশিরকুমার তা জানতেন। কিন্তু তাতে তিনি হতাশ হননি। বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের সঙ্গে ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠতা। পরবর্তীকালে ভারতবরেণ্য ব্যক্তিরা এসে জড়ো হয়েছিলেন এই পত্রিকার চারপাশে। তা সম্ভব হয়েছিল অমৃতবাজার পত্রিকার আন্তরিক দেশসেবার গুণে।

১৮৬৮ সাল। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ। সিপাহী বিদ্রোহের দশ-এগারো বছর পরের সময়। ইংরেজরা একটা মস্ত ঘা খেয়ে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের বিষয়ে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন মাত্র সাত বৎসরের বালক। বঙ্কিমচন্দ্রের বয়স তখন ত্রিশ। আলীপুরে তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেকটর। ঔপন্যাসিক হিসেবে তিনি তখন প্রতিষ্ঠিত। মাইকেল মধুসূদন তখন যুগস্রষ্টা কবিরূপে বন্দিত। বাংলাদেশে সাহিত্যে, দর্শনে এবং ভাবধারায় নবীন প্রাণের জোয়ার প্রবাহিত। এই পরিবেশে অমৃতবাজার পত্রিকার জন্ম। অমৃতবাজারের প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক তাঁর এই প্রয়াসের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে স্বভাবসিদ্ধ শ্লেষমিশ্রিত ভাষায় লিখেছিলেন, "স্বার্থশূন্য মহাত্মা ইংরাজ বাহাদুরেরা...... যাহারা কেবলমাত্র আমাদের হিত ও স্বচ্ছন্দতার নিমিত্ত, রাজ্যশাসনের ন্যায় অতি ক্লেশকর ও কঠিন কার্যে আমাদিগকে হস্তক্ষেপ করিতে দেন না, তাহাদিগের রীতিনীতি উদ্দেশ্য, স্বার্থশূন্যতা ও কৌশল যথাসাধ্য বর্ণনা করিয়া তাহাদিগের নিকট যে ঋণপাশে আবদ্ধ আছি, তাহা পরিশোধের যত্ন করি।" অতি স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ ভাষায় সম্পাদক লিপিবদ্ধ করেছিলেন তাঁর উদ্দেশ্য। ভাষায় কোনো জড়তা নেই, বাক্য-বন্ধনও বেশ আধুনিক। পত্রিকার শিরোভূষণরূপে প্রকাশিত হত এই দুটি ছত্র :

"অধীনতা কালকূটে মরি হায় হায়।
কয়েছে কি আর্যসুতে চেনা নাহি যায়।।"

এর পর পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্পর্কে পাঠকদের এবং শাসকবর্গেরও কোনো সন্দেহ থাকার কথা নয়। বাংলাদেশে পত্রিকার পূর্বসূরী হিন্দু পেট্রিয়ট— তার দিকপাল সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নাম তখনও লোকের মুখে মুখে। অমৃতবাজার পত্রিকা প্রকাশিত হবার কয়েক বৎসর আগেই হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যু হয়। কিন্তু হরিশ্চন্দ্র তখন এক লেজেন্ডে পরিণত। দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণে ধীরাজের মুখে শোনা গেল এই গান :

নীল বানরে সোনার বাংলা
    করলে এবার ছারেখার
অসময়ে হরিশ মল,
    লংয়ের হ'ল কারাগার,
প্রজার আর প্রাণ বাঁচানো ভার।"

শিশিরকুমারের মনে এই বেদনার্ত কণ্ঠের গান নিশ্চয়ই প্রতিধ্বনিত হত। কারণ, আমরা পরবর্তীকালে দেখেছি নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে অমৃতবাজার পত্রিকার অক্লান্ত ক্রুসেড। উত্তরাধিকারের মর্যাদা তিনি রক্ষা করেছিলেন। বাংলাদেশে সে কারণেই অমৃতবাজার পত্রিকা তখন শিক্ষিত মানুষের কাছে হয়ে উঠেছিল অপরিহার্য।

শিশিরকুমারের সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ প্রথম ভারতীয় সিভিলিয়ান সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পিতৃদেব ডঃ গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে অমৃতবাজার পত্রিকার ঘনিষ্ঠতা যে ছিল তা বোঝা যায় বালক রবীন্দ্রনাথের প্রথম কবিতা প্রকাশের সুযোগ দিয়েছিলেন শিশিরকুমারই তাঁর কাগজে।

শিশিরকুমারের লেখনীর ক্ষমতা প্রকাশ পেয়েছিল পত্রিকার জন্মের আগে হরিশ্চন্দ্রের হিন্দু পেট্রিয়টে। ওই কাগজে তিনি ছদ্মনামে নীলকরদের অত্যাচারের বর্ণনা করে কঠোর ভাষায় তার সমালোচনা করতেন। পরশাসনের বিরুদ্ধ সংগ্রামের আন্দোলন তখন এভাবেই দানা বেঁধে ওঠে। তার সংগে সংগে দাবী ওঠে শিক্ষা প্রসারের, সমাজ সংস্কারের। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে এই আন্দোলন তখন সার্থকতায় উজ্জ্বল। বাংলাদেশে এই সময়টাকে আমরা চিহ্নিত করেছি নবজাগরণের কাল হিসেবে। চিন্তার মুক্তি ও সমস্ত রকম সংস্কারের বিনাশ— এই আদর্শ নিয়েই শুরু হয়েছিল বাংলার নবজাগরণ। তার জন্য চাই নতুন ভাষা, নয়তো নতুন চিন্তার বাহন হবে কোন জরাজীর্ণ অপ্রচলিত ভাষা। বিদ্যাসাগরের হাতের মশালে আগুন জ্বালিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা গদ্যকে নতুন যুগের উপযোগী করে তুললেন। বাংলা পদ্যের পয়ারের বেড়ি ভেঙে তার পায়ে অমিত্রাক্ষরের নূপুর পরালেন মধুসূদন। শুধু তাই নয়, কাব্যচিন্তাতেও তিনি বিপ্লব আনলেন রামায়ণ কাহিনীর নববিন্যাসে। তার অনুগামী হলেন নবীনচন্দ্র সেন।

অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক সমাজ উন্নয়ন ও রাজনৈতিক কর্মে ঝোঁক আকণ্ঠ হলেও তিনি ছিলেন বিদ্যোৎসাহী। অমৃত-

বাজার পত্রিকার পৃষ্ঠা সাহিত্যের নতুন পরীক্ষার জন্য সর্বদাই উন্মুক্ত থাকত। সাহিত্যিকদের তিনি ছিলেন সুহৃদ এবং গুণগ্রাহী। তাঁর লেখনী ও কর্মধারা অনেক সাহিত্যিককে নতুন সৃষ্টিতে প্রেরণা দিয়েছে। নবীনচন্দ্র সেন তখন যশোহরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেকটর। স্বভাবতই শিশিরকুমারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটতে দেরী হল না। কবি তাঁর স্মৃতিকথা 'আমার জীবন'এ লিখেছেন : "শিশির তখন মাতৃভূমির দুঃখের কথা বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিতেন, উচ্ছ্বাসে উন্মত্ত হইতেন। .....যশোহরে লিখিত আমার খণ্ডকবিতায় ও 'পলাশীর যুদ্ধে' স্বাধীনতার জন্য যে নিঃশ্বাস ও মাতৃভূমির জন্য অশ্রু বিসর্জন আছে, তাহা কথঞ্চিৎ শিশিরকুমারের সংসর্গের ও শিক্ষার ফল। তিনি এবং তাঁহার পত্রিকাই প্রথম এই দেশে স্বদেশভক্তির পথ-প্রদর্শক।"

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ কয়-দশক আমাদের দেশাত্মবোধের উন্মেষকাল। বিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই তা বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতায় প্রবল জলতরঙ্গে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে তার রূপ এত স্পষ্ট ছিল না। তখনও কবিকণ্ঠে শুধু আক্ষেপ "স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়"। বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরমে তার ভাবমূর্তির প্রথম বন্দনা। কিন্তু সেই লক্ষ্যে পৌঁছুবার পথ কি, সাহিত্য ও সাংবাদিকতাই বা তাকে কীভাবে ভাষা দিতে পারে তার জন্য আমাদের আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল — রবীন্দ্রনাথের অমৃতকণ্ঠ ও অলোকিত দৃষ্টির। কিন্তু তার আগেই শিশিরকুমার তাঁর সাংবাদিক লেখনীতে দেশাত্মবোধের কথা লিপিবন্ধ করেছেন।

পত্রিকার জন্মের এক বছর আগে নবগোপাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল হিন্দুমেলা। বাংলাদেশের তরুণমনে দেশপ্রেম জাগানোর জন্য এই মেলার দান অবিস্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথ নিজে হিন্দুমেলার কথা লিখে গেছেন সপ্রশংস ভাষায়। শিশিরকুমার এবং তাঁর কাগজ অমৃতবাজার পত্রিকা ছিল হিন্দুমেলার অনুরাগী, সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষক। অর্থাৎ জাতির উন্নয়ন ও প্রগতির জন্য যেদিকেই কোনো উল্লেখযোগ্য কাজ হয়েছে বা করার চেষ্টা হয়েছে শিশিরকুমার তাঁর নিজের শক্তি ও পত্রিকার সমর্থন নিয়ে এগিয়ে যেতেন তাদের কাছে।

আজকের যুগে সংবাদপত্র এক বৃহৎ শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। তার সংবাদ সংগ্রহের জন্য প্রভূত লোকবল ও অর্থবল আজ একত্রিত। সে যুগে অর্থবল ছিল শূন্যের কোঠায়, লোকবলও ছিল সীমাবদ্ধ। অমৃতবাজার পত্রিকার আদিযুগে এর কোনোটার জন্যই কাজ আটকে থাকেনি। আনন্দমোহন বসু, বালগঙ্গাধর তিলক ভগিনী নিবেদিতার মতো স্মরণীয়রা ছিলেন পত্রিকার অন্তরঙ্গ সুহৃদ ও শুভানুধ্যায়ী। তাঁরা [illegible] এসেছিলেন শিশিরকুমারের পত্রিকা পরিচালনায় আকৃষ্ট হয়ে, তাঁর জ্বলন্ত দেশপ্রেমে ও আদর্শনিষ্ঠার প্রতি শ্রদ্ধাবশত।

শিক্ষিতদের মধ্যে যাঁরা সরকারী আনুকূল্য পেতেন তাঁরা সব সময় পত্রিকার নির্ভীক সমালোচনার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন না। সংবাদপত্রটি ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠছে এবং তার প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়ছে দেখে ইংরেজ শাসকরা শঙ্কিত হয়ে উঠলেন।

১৮৭৮ সালে 'ভার্ণাকুলার প্রেস অ্যাক্ট' পাশ হলে অমৃতবাজার পুরোপুরি ইংরেজিতে রূপান্তরিত হয়। তারিখটা ছিল ২১ মার্চ। অবিচল সংকল্প এবং প্রবল আত্মপ্রত্যয়ই সহায়সম্বলহীন এক সম্পাদককে এত বড় একটি দায়িত্ব গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। একশো বছর পরে অন্য এক শতাব্দীর শেষার্ধে দাঁড়িয়ে আজ আমরা বুঝতে পারি যে, অমৃতবাজারের ইংরেজিতে রূপান্তর সেদিন শাপে বর হয়েছিল। অমৃতবাজারের লেখনী বাংলার সীমানা ছাড়িয়ে ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল নতুন যুগের বাণী বহন করে। আজকের মতো ভাষাবৈরিতা তখন ছিল না। ইংরেজির হাতিয়ার দিয়েই ইংরেজ শাসনের ভিত্তিমূলে সেদিন আঘাত করা হয়েছিল।

অবশ্য বাংলা ভাষার বিজয়যাত্রাও তখন চলেছে অব্যাহত গতিতে। রবীন্দ্রনাথের তখন তরুণ বয়স। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন'-এর প্রভাবে বাংলা গদ্য অপূর্ব লাবণ্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলা কবিতা হয়ে ওঠে আশ্চর্য রোমান্টিক। নবজাগরণের সার্থকতার বিচার হয় দেশের সাধারণ মানুষের চিত্তবৃত্তির বিকাশে, তাদের সামাজিক কল্যাণে। অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক নিজে ছিলেন বহুকলাবিদ। লেখায়, বেখায়, নাট্যকলায় ছিল তাঁর সমান পারদর্শিতা।

'এ ন্যাশন ইজ নোন বাই ইটস্ স্টেজ'—থিয়েটার দেখে একটা জাতিকে চেনা যায়। কলকাতায় তখন নাটক রচিত হচ্ছে, কিন্তু অভিনয়ের সুযোগ সীমাবদ্ধ। 'জাতীয় নাট্যশালা'র প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নে অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক এগিয়ে গেলেন। সহযোগীরূপে পেলেন তিনি মহানট কবি গিরিশচন্দ্র ঘোষকে। আমরা জানি, জাতীয়তাবোধ সঞ্চারে বাংলা নাটকের স্থান কতখানি। 'নয়শো রূপেয়া', 'বাজারের লড়াই' লিখে শিশিরকুমার সেযুগের নবনাট্য আন্দোলনের সহযাত্রী হলেন। যতদিক দিয়ে সম্ভব আধমরা জাতিকে ঘা দিয়ে জাগিয়ে তোলাই ছিল সেযুগের সবচেয়ে বড় কাজ। অমৃতবাজার পত্রিকা সেই দায়িত্ব পালন করেছিল।

আমাদের সৌভাগ্য দেশের মাটি তখন প্রস্তুত ছিল নতুন চিন্তা, নতুন ভাবধারা গ্রহণের জন্য। বিংশ শতাব্দীর বিদ্যুৎ-গতি অগ্রযাত্রার সঙ্গে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের গতিবেগের কোনো তুলনাই চলে না। কিন্তু শতাব্দীর বেড়া পার হবার জন্য যে ব্যাপক প্রস্তুতি সেদিন হয়েছিল তার জন্যই শিল্পে, সাহিত্যে, রাজনীতিতে ও সাংবাদিকতায় এমন অভূতপূর্ব বিকাশ সম্ভব হয়েছিল। অমৃতবাজার পত্রিকার প্রথম সম্পাদক সম্পর্কে গোপালকৃষ্ণ গোখলে বলেছিলেন, তাঁর মধ্যে ছিল দুটি আপাতবিরোধী গুণ—গভীর প্রশান্তি এবং প্রবল অস্থিরতা। অমৃতবাজারের জন্মলগ্নে বাংলার চিন্তাজগতে ও তার সমাজমানসেও এই দুই আপাতবিরোধী ভাবই লক্ষ্য করা গিয়েছিল। একদিকে ছিল তার অপরিসীম প্রশান্তি অন্যদিকে তার অপ্রতিরোধ্য অস্থিরতা। এই দুইয়ের সংযোজনেই পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল বাংলার নবজাগরণ। সেই নবারুণের আলোক উদ্ভাসিত দিগন্তে ভোরের পাখির গান শুনিয়েছিল অমৃতবাজার পত্রিকা।



'পত্রিকা' একটি প্রতীক

দক্ষিণারঞ্জন বসু

'A Subservient Press is a greater evil than no Press at all.'

যে দৃঢ় মনোভাবের প্রকাশ পেয়েছে এই মন্তব্যের মধ্যে, একশ' বছর আগে তেমনি দৃঢ়তা নিয়েই আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল অমৃতবাজার পত্রিকার। সেবা এবং স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার ব্রত উদ্‌যাপনে যার জন্ম তার পক্ষেই এমন বজ্র-নির্ঘোষ ঘোষণা সম্ভব। অমৃতবাজার পত্রিকা যথার্থই স্বাধীন মনোভাবের এবং স্বাধীন সত্তার প্রতীক। সত্যনিষ্ঠাই তার প্রধান অবলম্বন, পরশাসন থেকে জাতীয় মুক্তি বিধান ছিল তার মূল লক্ষ্য। সঙ্গে সঙ্গে সংগঠন।

আত্মাহুতির পবিত্র হোমানলে প্রাণবহ্নির সমুজ্জ্বল শিখা প্রায় দু'শো বছরের ঘন তমিস্রায় কেবলই জ্বলেছে। কবে আঁধার কাটবে, কবে অন্তরের সযত্ন-লালিত আশা দিগন্তের নতুন আলোতে রূপায়িত হবে, তারই দীর্ঘ নিপীড়িত দুঃসহ প্রতীক্ষা চলেছে বর্ষে বর্ষে নব নব আত্মদানের মহিমার মধ্য দিয়ে। বাংলার প্রবর্তিত জাতীয়তা-ধর্মে দীক্ষিত ভারতের প্রাণের মধ্যে থেকে ক্ষণে ক্ষণে একটা দুরন্ত মুক্তিকামী শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। সে শক্তি পর্বতকে লঙ্ঘন করতে চেয়েছে মধ্য-রাত্রির অন্ধকারে চেয়েছে মধ্যাহ্নের দুর্জয় আলোক-প্রভাকে প্রতিষ্ঠিত করতে। আঘাত এসেছে, নির্যাতন এসেছে, কিন্তু তার উত্তরে গণচিত্তে সাড়াও প্রতিধ্বনিত হয়েছে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ-বেগের মতো। সে-ধ্বনি আর প্রতিধ্বনি প্রতিবারই রূপায়িত হয়েছে এদেশের সংবাদপত্রের পাতায় পাতায়। সংবাদপত্রের উদাত্ত আহ্বানে ভারতের গণমানস চঞ্চল হয়ে উঠেছে বার বার, ক্ষণিকের জন্যে হলেও কতবার আত্মসুখ-বিস্মৃতির উদার প্রাঙ্গনে এসে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়েছে আপামর সাধারণ মানুষ।

সে কাজে অমৃতবাজার পত্রিকার অবদান অসামান্য, অবিস্মরণীয়। ভারতীয় সাংবাদিকতার ইতিহাস খুব প্রাচীন নয়। পরশাসিত ভারতে সংবাদপত্রের দায়িত্ব ছিল কঠিন, কিন্তু মত প্রকাশের সুযোগ ছিল অত্যন্ত সীমিত। তবুও সেই পরিবেশেই জাতীয় সংবাদপত্র বিদ্রোহী ভারত-আত্মার বাণীরূপে দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামকে জয়যুক্ত করবার প্রেরণা জুগিয়ে এসেছে। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের ভারতীয় সাংবাদিকতায় সেটাই আসল পরিচয়।

এখানে একটা কথা প্রথমেই বলে নেওয়া দরকার। ভারতীয় সাংবাদিকতায় বাংলা দেশের একটা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সে তার সংগ্রামী রূপ। ১৭৮০ খৃস্টাব্দে কলকাতায় প্রথম ভারতীয় সংবাদপত্র (হিকিজ বেঙ্গল গেজেট) প্রকাশিত হবার পর থেকেই শাসন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সংবাদপত্রের সংগ্রাম চলে এলেও এবং কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের কয়েকজন ইংরেজ সম্পাদককে ভারত-ত্যাগ করে যেতে হলেও অষ্টাদশ শতকে বৃটিশ ভারতে কোনো প্রেস আইন প্রবর্তিত হয়নি। গভর্ণর-জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলির আমলেই বাংলা দেশে প্রথম সংবাদ ও সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা চালু করা হয় এবং ওয়েলেসলি নিজেই অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে শেষ বছরে সংবাদপত্র সম্বন্ধে কতকগুলি বিধিনিষেধ ঘোষণা করেন। সংবাদ সেন্সরের ব্যবস্থা মাদ্রাজে অবশ্য প্রবর্তিত হয়েছিল আরো চার বছর আগে। ভারতীয় সাংবাদিকতার সেই প্রথম যুগে বম্বে এবং মাদ্রাজের সম্পাদকবর্গ শেষপর্যন্ত সরকারী শাসনে অনেকখানি সংযত হলেও বাংলা দেশের সংবাদপত্রকে শায়েস্তা করা বৃটিশ কর্তৃপক্ষের পক্ষে কোনোদিনই সম্ভব হয়নি। বাংলার সংবাদপত্র গোড়া থেকেই সংগ্রামের পথকে বেছে নিয়েছে এবং বৃটিশ শাসনের শেষদিন পর্যন্ত সেই সংগ্রামী ঐতিহ্যকে সে অবিচল নিষ্ঠায় অনুসরণ করে এসেছে। বাংলা দেশের সংবাদপত্রের সেই বৃটিশ-বিরোধী সংগ্রাম সারা ভারতের সংবাদপত্রের সংগ্রামে রূপান্তরিত হয়েছিল। অমৃতবাজার পত্রিকা আগাগোড়াই সেই সংগ্রামী ঐতিহ্যের প্রতীক।

ঊনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে ভারতীয় ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশ শুরু হলে এবং দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশের জনসাধারণের ওপর সে সব কাগজের প্রভাবও ক্রমশই বেড়ে চলে। তাতে স্বাভাবিকভাবেই শংকিত হয়ে ওঠেন শাসক সম্প্রদায়। চারদিকের ঘটনায় ও উত্তেজনাকর পরিবেশে আতংকিত হয়ে জাতীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করতে উঠেপড়ে লাগলেন বিদেশী সরকার। কিন্তু তাঁদের বাঁধন যতই শক্ত হতে লাগলো দেশীয় নেতৃবর্গও সেই স্বাধীনতা রক্ষায় ততই বদ্ধপরিকর হয়ে উঠলেন। ১৮২৭ খৃস্টাব্দ অবধি সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্যে এদেশে যে সংগ্রাম চলে, সে সংগ্রাম সীমাবদ্ধ ছিল ইংরেজ শাসক ও ইংরেজ সাংবাদিকদের মধ্যে। ওয়ারেন হেস্টিংস প্রমুখ বৃটিশ সাম্রাজ্য-স্তম্ভদের কৃত অন্যায়ের ইংরেজ সমালোচকের সংখ্যাও তখন কম ছিল না। তখনকার স্থানীয় বৃটিশ কর্তৃপক্ষ সে সব সমালোচকদেরই নানাভাবে দমন করতেন এবং অনেক ক্ষেত্রেই এদেশ থেকে তাঁদের অপসারণ করতেন। এমনিভাবে ইংরেজ সমালোচকদের হাত থেকে অব্যাহতি লাভের উপায় বার করা গেলেও বাংলা তথা অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় সংবাদপত্রগুলির মুখ বন্ধ করা খুব সহজ ছিল না। সংবাদপত্রের ওপর দমননীতি প্রয়োগের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিল সমগ্র জাতি। অবশ্য শাসকদের মধ্যে সবাই যে সংবাদপত্র দলনের পক্ষপাতী ছিলেন তা' নয়। স্যার চার্লস মেটকাফের আগ্রহেই ১৮৩৫ খৃস্টাব্দে পূর্বেকার সমস্ত সংবাদপত্র-দমন আইন প্রত্যাহৃত হয়েছিল। লণ্ডনের কর্তাদের বিরাগভাজন হয়েও সেকালে যে উদার মনের পরিচয় দিয়েছিলেন মেটকাফ, ভারতীয় সাংবাদিক মহলে তাঁর নাম সেজন্যে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সিপাহী বিদ্রোহের সময় আবার বিশেষভাবে বিচলিত হয়ে পড়লেন শাসক সম্প্রদায়। আরেকবার তাঁরা এদেশের সংবাদপত্রের স্বাধীনতা পুরোপুরি কেড়ে নিতে উদ্যোগী হলেন। লর্ড ক্যানিং থেকে শুরু করে লিটনের শাসন সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের বিধিনিষেধের ইতিহাসে মসীলিপ্ত। লিটনের শাসনকালে বাংলা দেশে অনেকগুলি সংবাদপত্র প্রকাশিত হচ্ছিল বাংলা পত্র-পত্রিকার প্রভাবও তখন ক্রমশই বেড়ে চলছিল।

নীলকর সাহেবদের অত্যাচার চলছিল তখন দেশব্যাপী। আর তারই প্রতিবাদে তত্ত্ববোধিনী সোমপ্রকাশ প্রভৃতি পত্রপত্রিকায় বৃটিশ-বিরোধী বিক্ষোভ চারদিকে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছিল। ১৮৬০ খৃস্টাব্দে ইণ্ডিগো কমিশনের সামনে রেভারেণ্ড লং তখনকার পরিস্থিতি ও দেশীয় সংবাদপত্র বিশেষভাবে বাংলা পত্র-পত্রিকার ব্যাপক প্রভাব সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন ইংরেজ শাসকবর্গকে তা' বিশেষভাবে ভাবিত করে তুলেছিল।

বাংলা দেশে শিক্ষিতসমাজের একটা বড়ো অংশে তখন বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে দৃঢ় মনোভাব দানা বেঁধে উঠেছে। দেশসেবার অংশগ্রহণে তাঁরা আগ্রহী। তার নানা পথ। একটা পথ সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রচারকার্যে নেমে যাওয়া। যশোহর জেলার 'পালুয়া মাগুরা' (অমৃতবাজার) গ্রামে ঘোষভ্রাতৃবর্গের মনে তেমনি একটা ইচ্ছা দেখা দিলে জ্যেষ্ঠ বসন্তকুমার 'অমৃত প্রবাহিনী' নামে একটি বাংলা পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। কিন্তু বসন্তকুমারের আকস্মিক মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই পত্রিকাখানি বন্ধ হয়ে যায়। এই 'অমৃত প্রবাহিনী'ই বিখ্যাত অমৃতবাজার পত্রিকার অগ্রদূত।

জ্যেষ্ঠের আকস্মিক অন্তর্ধানে তাঁর প্রকাশিত পত্রিকা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেলে

কনিষ্ঠ হেমন্তকুমার, শিশিরকুমার ও মতি-লাল চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে ১৮৬৮ খৃস্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে নতুন একটি বাংলা সাপ্তাহিকের প্রকাশ আরম্ভ করলেন এবং তার নাম দিলেন 'অমৃত-বাজার পত্রিকা'—তাঁদের গ্রামের নামে নাম, যে গ্রামের নাম তাঁরাই দিয়েছিলেন তাঁদের মা অমৃতময়ীর নামে। হেমন্তকুমার ও শিশিরকুমার ছিলেন আয়কর বিভাগের ডেপুটি কালেক্টর এবং মতিলাল ছিলেন খুলনা জেলার পিলজঙ্গ গ্রামের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক। খুব বড়ো-লোকের জীবন যাপন করতে না পারলেও এই চাকরীতেই মোটামুটি আর্থিক সংগতি রক্ষা করে তাঁরা চলছিলেন। কিন্তু বড়োলোক হবার উদ্দেশ্যে নয়, নিছক দেশ-প্রেমের তাগিদেই তিন ভাই চাকরি-বাকরি ছেড়ে দিয়ে সরকার-বিরোধী পত্রিকা-প্রকাশে যে উদ্যোগী হয়েছিলেন তা' নিশ্চয়ই একটা সাধারণ ঝুঁকির ব্যাপার ছিল না। প্রথম থেকেই এই ঘোষ ভ্রাতৃত্রয় জ্বলন্ত দেশ-প্রেমের পরিচয় দিয়ে আসছিলেন এবং সেই দেশপ্রেমেরই প্রতীক 'অমৃতবাজার পত্রিকা'। নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমের প্রেরণায় ঘোষ-ভ্রাতৃ-বর্গ বার বার নিজেদের বিপন্ন করেছেন। তার প্রত্যেকটি দৃষ্টান্তের বিবরণ দেবার অবকাশ নেই এখানে। মাত্র অল্প কয়েকটি ঘটনারই এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

আগেই বলা হয়েছে, বেশ কিছুকাল ধরে বাংলা দেশে নীলকর সাহেবদের নিদারুণ অত্যাচার চলছিল। যে সমস্ত পত্র-পত্রিকা এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে রায়ত ও চাষীদের হয়ে অকুতোভয়ে লড়ছিল তার মধ্যে অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক 'তত্ত্ববোধিনী' এবং 'ভার-তীয় সাংবাদিকতার জনক' রূপে খ্যাত হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ইংরেজী সাপ্তাহিক 'দি হিন্দু পেট্রিয়ট'-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকাতেই সাংবাদিকতায় প্রথম পাঠ গ্রহণ করেছিলেন শিশিরকুমার ঘোষ। তাঁদের 'অমৃতবাজার পত্রিকা' প্রকাশিত হবার আগে থেকেই শিশিরকুমার যশোহর জেলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে নীলকুঠীর সাহেবদের অমানুষিক অত্যাচারের নানা কাহিনী সংগ্রহ করে সংবাদ আকারে সে সব 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এ পাঠিয়ে দিতেন। একদিকে সেইসব করুণ সংবাদচিত্র অন্যদিকে ঐ সকল কাহিনীর ওপর সম্পাদক হরিশচন্দ্রের অগ্নিবর্ষী সম্পাদকীয় জনসাধারণের মধ্যে যে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল তাতে শাসকবর্গ স্বাভাবিকভাবেই শংকিত ও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিলেন। ১৮৬১ খৃস্টাব্দে হরিশচন্দ্রের মাত্র ৩৭ বৎসর বয়সে হঠাৎ মৃত্যুতে ইংরেজদের আতঙ্ক সাময়িকভাবে কিছুটা হ্রাস পেলেও ইতিমধ্যে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র আবির্ভাব শাসনযন্ত্রকে এমনভাবে নাড়া দিল যাতে তার কণ্ঠরোধের জন্যে শাসককুলের মধ্যে সংগে সংগেই তাড়াহুড়ো পড়ে গেল। কিন্তু 'পত্রিকা'কে স্তব্ধ করার কোনো পথই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না।

অমৃতবাজার পত্রিকার বয়স তখন মাত্র চার মাস। কলকাতা থেকে শিশিরকুমারের কেনা মাত্র ৩২ টাকায় কাঠের মুদ্রাযন্ত্রে ছাপা এই সাপ্তাহিক পত্রিকাখানির চাহিদা পাঁচশ থেকে ক্রমশই বেড়ে চলেছে। কিন্তু সে চাহিদা মেটানো সহজও নয়, সম্ভবও নয়। তবু ঘোষ-ভ্রাতৃবর্গ ও তাঁদের সহ-যোগী সহকর্মীরা আপ্রাণ চেষ্টা করে চলে-ছেন দেশের মানুষের দাবি মেটাবার জন্যে। সত্যপ্রকাশের সাহসিকতার জন্যে এবং জন-সাধারণের দুঃখ-দুর্দশার কথা অকপটে নির্ভয়ে প্রকাশের জন্যে জনমানসে 'পত্রিকা' তখন এমন এক স্থান অধিকার করে নিয়েছে যে, অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত সাপ্তা-হিক খবর না পড়ে কেউই তৃপ্ত হতে পারতেন না। কিন্তু প্রচারসংখ্যা অতি অল্প সময়ের মধ্যে দ্বিগুণিত হলেও এই কাগজের একটি কপি তখন সংগ্রহ করা ছিল এক দুরূহ ব্যাপার। তাই আট বছর পূর্বে রেভারেন্ড লং ইন্ডিগো কমিশনের কাছে সাক্ষ্য প্রসংগে যে কথা বলেছিলেন তা' আরো বিশেষভাবে প্রমাণিত হলো অমৃত-বাজার পত্রিকার বেলায়—দেশের দূর-দূরান্তে এই সাপ্তাহিক পত্রিকাখানির এক একটি সংখ্যা শত শত লোক মিলে পড়তে আরম্ভ করলো। প্রবাসের শিক্ষিত বাঙালীরা অবাঙালীদের মধ্যেও এর বিভিন্ন গুরুত্ব-পূর্ণ সংবাদ প্রচার করতে লাগলেন।

সেই চার মাস বয়েসেই অসীম সাহ-সিকতার সংগে এক গুরুতর সংকটের সম্মুখীন হতে হলো অমৃতবাজার পত্রিকাকে। মিঃ রাইট নামক একজন মহকুমা হাকিমের পক্ষ থেকে মানহানির এক ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হলো 'পত্রিকা'র বিরুদ্ধে, সাপ্তাহিকখানির সম্পা-দক মুদ্রাকর ও সপ্তদশ সংখ্যায় প্রকাশিত 'ঘোরতর অত্যাচার' শীর্ষক একটি রচনার অনামী লেখককে আসামী করে।

তখনকার দিনে কাগজে সম্পাদকের নাম প্রকাশের রেওয়াজ ছিল না, শুধুমাত্র মুদ্রাকরের নামই পত্র-পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় প্রকাশিত হতো। কাজেই তিনজন আসামীর মধ্যে দু'জনের অর্থাৎ সম্পাদকের এবং সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধকারের নাম বার করে এই মামলার কূল-কিনারা করতে হাকিমকে হিম-সিম খেতে হয়েছিল। যশোরের তদানীন্তন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মনরো ছিলেন পত্রিকা-সম্পাদক শিশিরকুমারের অন্তরংগ বন্ধু। 'ঘোরতর অত্যাচার' প্রবন্ধে যে লেখক একজন ইংরেজ মহকুমা শাসকের বিরুদ্ধে ভারতীয় নারীর শ্লীলতাহানির অভিযোগ তুলেছে জেলা শাসক বন্ধু-সম্পাদকের কাছে যে সেই লেখকের নাম জানতে চাইবেন এবং এমন কি চোখ রাঙিয়েও সে নাম জানার চেষ্টা করবেন তাতে আর আশ্চর্য কি কিন্তু মনরোর মিঠে-কড়া কোনো কথাতেই শিশিরকুমারকে সেদিন টলানো সম্ভব হয়নি—তিনি অনায়াসেই ইংরেজ শাসকের বন্ধুত্ব সেদিন হেলায় বিসর্জন দিয়েছিলেন সাংবাদিক সততা রক্ষার জন্যে। যে মনরোর ব্যক্তিগত বাসগৃহে যাতায়াতে তাঁর ছিল অবাধ অধিকার, ঐ ঘটনার পর থেকে

॥ গান্ধী স্মারক নিধির বই ॥

১৯৬৯ সনে গান্ধী-জন্মশতবার্ষিকী উৎসব

এই উপলক্ষ্যে গান্ধী স্মারক নিধি (বাংলা), প্রকাশন বিভাগ হইতে একাধিক গান্ধী-বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশের আয়োজন চলিতেছে। উৎসবের প্রকাশন-কার্যক্রমের সূচনারূপে নীচের দুইখানি বহি কিছুকাল হইল প্রকাশিত হইয়াছে—

গান্ধীজীর আত্মজীবনীর সচিত্র নূতন বাংলা সংস্করণ

আত্মকথা

মূল গুজরাটী হইতে অনূদিত
অনুবাদক : শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ
মূল্য : ১২·০০

গান্ধী-রচনা সংকলন

অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু সংকলিত
মূল্য : ৫·০০

আমাদের প্রকাশিত অন্যান্য পুস্তক

মহাত্মা গান্ধী (জীবনী) :	৬·৫০
	৫·৫০
সর্বোদয়	২·৫০
সর্বোদয়ের পথ	৩·০০
গান্ধীজীর অর্থনৈতিক দর্শন	৫·৫০
মহাত্মাজীর গঠনকর্ম-পদ্ধতি	৩·০০
পল্লী পুনর্গঠন (২য় সংস্করণ)	৩·০০
সভাই ভগবান (২য় সং)	৩·০০
নারী ও সামাজিক অবিচার (৩য় সং)	৪·৫০
গীতাবোধ (২য় সং)	১·৫০
পঞ্চায়েত রাজ	০·৭৫
উৎপাদক শ্রম	০·৬০
অভিবাদ	০·৬২
সর্বোদয় ও শাসনমুক্ত সমাজ	২·৫০
আমার সমাজবাদ	১·০০
অহিংসার পথে বিশ্বশান্তি	১·০০
কর্মের সন্ধান	০·৭৫
মোহনমালা	৩·৫০

প্রকাশন বিভাগ
গান্ধী স্মারক নিধি, বাংলা
১২ডি, শংকর ঘোষ লেন কলিকাতা—৬

শিশিরকুমার আর তাঁর ত্রিসীমানাও মাড়ান নি কোনোদিন। শেষপর্যন্ত অবশ্য অনেক কষ্টে এবং অন্য কৌশলে সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধলেখক রাজকৃষ্ণ মিত্রের নাম সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছিলেন শাসন কর্তৃপক্ষ এবং তাঁকে এক বছর ও 'পত্রিকা'র মুদ্রাকরকে ছয় মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিতও করা হয়েছিল। কিন্তু অমৃতবাজার পত্রিকার প্রকৃত সম্পাদক তখন কে ছিলেন আইনের দিক থেকে কোর্টের পক্ষে তা নির্ধারণ করা সম্ভবই হয়নি সেদিন। কোর্টের সে চেষ্টা মাত্র বাইশ বছরের যুবক মতিলাল ঘোষ সেদিন কিভাবে বানচাল করে দিয়েছিলেন তাও সত্যি জানবার মতো বিষয়।

পূর্বোক্ত মামলায় সরকার পক্ষ থেকে সাক্ষী মানা হয়েছিল মতিলাল ঘোষকে তাঁর সেজদা শিশিরকুমার যে অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক এবং সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধটির লেখক যে অন্য আর কেউ, তাঁকে দিয়ে তা' প্রমাণ করার জন্যে এবং তাঁর কাছ থেকে প্রবন্ধকারের নামটি বার করে নেবার জন্যে। কিন্তু তাঁকে জেরা করে কোনো উদ্দেশ্যই সফল হয়নি। এখানে সেই জেরারই কিছুটা উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে।

ম্যাজিস্ট্রেট মতিলালকে জিজ্ঞেস করলেন—অমৃতবাজার পত্রিকার মালিক কে?

মতিলাল—এ পত্রিকা জনসাধারণের।

ম্যাজিস্ট্রেট—তা' কেমন করে হতে পারে? এর আগের এক মামলায় আপনিই বলেছিলেন এর মালিক আপনার এক কাকা, আর এখন বলছেন, এর মালিক জনসাধারণ!

মতিলাল—আমি ঠিকই বলেছি। আমার কাকা প্রেসের মালিক, এ কথাই আমি আগে বলেছিলাম, তিনি পত্রিকার মালিক নন। প্রেস এবং পত্রিকা এক জিনিস নয়।

ম্যাজিস্ট্রেট রেগে গিয়ে তখন প্রশ্ন করলেন—'পত্রিকা'র সম্পাদক কে?

মতিলাল—তা' হলে সে কথা শুনুন, অতি সম্প্রতি এই কাগজখানার প্রকাশ শুরু হয়েছে। এখন পর্যন্ত স্থির হয়নি কে সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন।

ম্যাজিস্ট্রেট—কিন্তু জনসাধারণ কি শিশিরকুমারকেই তার সম্পাদক বলে মনে করে না?

মতিলাল—হ্যাঁ, সে কথা ঠিক, কারণ শিশিরকুমার খুব ভালো লিখতে পারেন বলে তারা জানে।

ম্যাজিস্ট্রেট—আপনি কি বলতে চান শিশির ও বেশ ভালো ইংরেজী লিখতে পারে?

মতিলাল—নিশ্চয়ই, খুব ভালো ইংরেজীই তিনি লেখেন এবং অনেক মোটা মাইনের রাজকর্মচারীদের চেয়েও ভালো ইংরেজী।

এরপর বিচারক আর কোনো প্রশ্ন করতে ভরসা পাননি। "ঘোরতর অত্যাচার" প্রবন্ধের লেখক বা অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদকের নাম বার করার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে শাসন কর্তৃপক্ষকে সে সময়ে যে অবস্থায় পড়তে হয়েছিল তা' সহজেই অনুমেয়। শেষপর্যন্ত প্রবন্ধকার ও মুদ্রাকরকে অন্যায়ভাবে ইংরেজের আদালতে দণ্ডিত করা হলেও শিশিরকুমারকে ধরা-ছোঁয়া সম্ভব হয়নি।

তা' হলেও সেই থেকেই অমৃতবাজার পত্রিকাকে জব্দ করার জন্যে, তাকে ঘুষ দিয়ে হাত করার জন্যে এবং শেষপর্যন্ত তাকে ধ্বংস করার জন্যে ক্রমাগত চেষ্টা চলে এসেছে, কিন্তু বৃটিশ শাসকের সেই সমস্ত চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে অমৃতবাজার পত্রিকা যে আজ তার শতবর্ষ অতিক্রম করে আসতে পারছে তার মূলে রয়েছে সেকালের জন-প্রতিনিধিদের শক্তি। সেই বলে বলীয়ান হয়েই শাসকবর্গের ভ্রূকুটি, ভীতিপ্রদর্শন ও প্রলোভনকে অগ্রাহ্য করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা-বোধ করেননি শিশিরকুমার-মতিলাল।

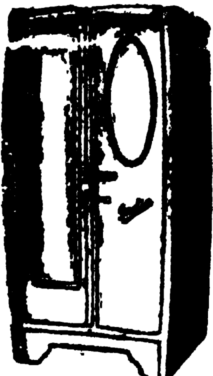
প্রথম থেকেই সৎ সাংবাদিকতা ও অসীম সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে এসেছে অমৃতবাজার পত্রিকা। কিন্তু শিশিরকুমারের জীবনের একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা ভারতীয় সাংবাদিকতার ইতিহাসে যে উজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা করেছিল তার কোনো তুলনা নেই। বৃটিশ-বিরোধী সংবাদ ও তীব্র সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশে অমৃতবাজার পত্রিকাকে কিছুতেই নিরস্ত করতে না পেরে বাংলার তদানীন্তন লেঃ গভর্ণর স্যার অ্যাসলি ইডেন এক অভিনব কৌশল-জাল বিস্তার করেছিলেন শিশিরকুমারকে বাগে আনার জন্যে। শিশিরকুমারের কাছে ছোট লাটসাহেব এক নির্লজ্জ প্রস্তাব উত্থাপন করে বলেছিলেন, "আসুন আমরা তিনজন—আমি, আপনি ও কৃষ্ণদাস—এই প্রদেশ শাসন করি। আমার নির্দেশ মতো কৃষ্ণদাস তাঁর কাগজ (হরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর কৃষ্ণদাস পাল "হিন্দু পেট্রিয়ট" পত্রিকার সম্পাদক পদে বৃত হয়েছিলেন) চালাতে রাজী হয়েছেন। আপনাকেও তাই করতে হবে। "হিন্দু পেট্রিয়ট"কে যেমন করা হয়ে থাকে আপনার কাগজেও আমি তেমনি অর্থসাহায্য দিয়ে যাবো।" এই ঘৃণ্য প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে সেদিন যেভাবে রাজপ্রতিনিধির মুখের ওপর যোগ্য জবাব দিয়েছিলেন শিশিরকুমার, তা' কোনোদিন বিস্মৃত হবার নয়। স্যার অ্যাসলি ইডেনের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বলে দিলেন,

> 'Your honour, there ought to be at least one honest Journalist in the land.'

একেই বলে মুখের মতো জবাব। এবং সেই জবাব শোনবার পর স্যার অ্যাসলি তখনকার মতো স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন বটে কিন্তু সেই থেকেই কী করে অমৃতবাজার পত্রিকা এবং দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত বৃটিশ-বিরোধী অন্যান্য পত্র-পত্রিকাকে একেবারে ধ্বংস করে ফেলা যায় তার চক্রান্ত চলতে থাকে। তারই পরিণতিতে বড়লাট লর্ড লিটনের প্রেরণায় ১৮৭৮ খৃস্টাব্দের ১৪ই মার্চ ভারতীয় ভাষার সংবাদপত্র দমন আইন ঘোষিত হলে সাপ্তাহিক দ্বিভাষিক (ইংরাজী-বাংলা) অমৃতবাজার পত্রিকা ২১শে মার্চের সংখ্যা থেকেই পুরোপুরি ইংরাজী সংবাদপত্রে রূপান্তরিত হয়ে যায় এবং এই দমন-নীতির প্রতিবাদে তীব্র সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশ করে বলা হয়—

> 'A subservient Press means no Press in the long run But what is the good of a Press at all that is subservient? It will not represent the feelings and wishes of the nation. It will not lead but mislead the nation The institution will not be wanted in the country, but it will stand a huge lie deceiving both the Government and the nation. It is far better to grope in the dark than to have a light which misleads. It is better to have no advocate and depend upon the good sense of the Judge than to trust one who is false and treacherous.

এই কথা কয়টির মধ্যেই অমৃতবাজার পত্রিকার নীতি ও আদর্শ যথার্থভাবে ফুটে উঠেছে। সত্য ও সেবা এবং স্বাধীনতা ও সাহসিকতার প্রতীক অমৃতবাজার পত্রিকাকে সেই আদর্শই অমরত্বের অধিকারী করেছে এবং যতদিন দেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত প্রতিষ্ঠাতাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সে চলতে পারবে ততদিনই এই জাতীয় সংবাদপত্রখানি জাতির পরম সম্পদ ও অশেষ গৌরবের বস্তু বলে গণ্য হবে।



আপনার মেয়ের বিয়েতে উপহার দিন—

ইণ্ডিয়া ষ্টীল আলমারি

● মজবুত ফিটিংস ● ভাল ফিনিশ
● নকল চাবি লাগবে না, সেজন্য গ্যারাণ্টি দিচ্ছি।

ইণ্ডিয়া ষ্টীল ফার্ণিচার
ম্যানুঃ কোং
১৫, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭
'প্রেস' সিনেমার পশ্চিমে — ফোন ৩৪-৭৫৯২

পত্রিকার সম্পাদকীয়

(সংকলিত অংশ)

আর এক প্রকারে আমাদের স্বাধীনতা লাভ হইতে পারে, অন্য কোন কারণবশতঃ যদি ইংরাজেরা হঠাৎ আমাদিগের দেশ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। রোমানেরা ঐরূপ কারণবশতঃ ব্রিটেন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। এরূপ হওয়া দুর্ঘট, কিন্তু হতে পারে না এরূপ নহে। হইলে আমাদের দেশ বিশৃংখলা হইয়া যায় বটে। আমাদের মতে তাহা হইলেও আমাদের মঙ্গল হয়, কিন্তু এ বিষয়ে আমরা পরে বিবেচনা করিব। তবে ডেলি নিউজ সম্পাদক যে বলেন, তাহা হইলে রুশিয়ানরা আসিবে ও তাহারা আইলে আমাদের ভাল হইবে না, সে সম্বন্ধে গুটিকত কথা আছে। রুশিয়ানদিগকে নিন্দা করায় তাঁহাদের স্বার্থ আছে, এই জন্য তাঁহারা তাহাদিগকে মন্দ বলিলে স্বভাবতঃ আমাদের তত বিশ্বাস হয় না। আবার যদি তাঁহারা কোন বিষয়ে তাহাদিগকে ব্যাখ্যা করেন, তবে সেই কারণে, তাঁহারা একগুণ বলিলে আমরা মনে ২ শতগুণ করিয়া লই। তাঁহারাই বলেন যে "রুশিয়ানেরা স্বেচ্ছাচারী, কিন্তু তাহাদের একটা গুণ আছে যে ভিন্ন দেশ অধিকার করিলে তাহারা অধিবাসীদের প্রতি খুব সংব্যবহার করে।" (১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৭৫। ২৮ মে, ১৮৬৮)

হিন্দুসমাজ ধরিয়া এক্ষণে টান দাও উহা উপড়াইতে পারিবে না, আর যদি একেবারে উপড়াইয়া ফেলিয়া দাও, তবে তাহার স্থানে কি সন্নিবেশিত করিবে তাহার সাবাস্ত আগে করা উচিত। (২২শে জ্যৈষ্ঠ, ১২৭৬। ৩ জুন, ১৮৬৯)

......যে রাজ্যে রাজায়-প্রজায় সম্প্রীতি নাই সে রাজ্যে কখন ভদ্র নাই। .....যদি গবর্নমেণ্টের কুশাসনে আমরা অসভ্য হইয়া যাই, তবে ১৮ কোটী অসভ্য লোকের উপর কর্তৃত্ব করিয়া লাভই বা কি গৌরবই বা কি? যদি গবর্নমেণ্টের অত্যাচারে আমাদের জাতি লোপ প্রাপ্ত হয়, তবে এই বিস্তীর্ণ মাঠ লইয়া ইংলণ্ডের লাভ কি?...

গুণে ইংরেজেরা ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছেন, আর দোষে উহা হারাইবেন।...... (২৮ ফাল্গুন ১২৭৬। ১০ মার্চ, ১৮৭০)

আমরা দেশের অবস্থা যতদূর ভাল জানি ইংরাজদিগের তাহা জানিবার অতি অল্প সম্ভব আছে। দেশের আচার-ব্যবহার রীতি-প্রকৃতিও আমরা তাঁহাদিগের অপেক্ষা অনেক ভাল জানি। ইংরেজী পত্রিকার সম্পাদকেরা সম্ভবত রাজনীতি আমাদিগের অপেক্ষা ভালরূপ জানিতে পারেন, তাঁহারা আমাদিগের অপেক্ষা অধিক লেখাপড়া জানিতে পারেন, কিন্তু গবর্নমেণ্ট প্রবর্তিত কোন রাজকৌশলে দেশের আভ্যন্তরিক কিরূপ পরিবর্তন করিতেছে, প্রজারা তাহায় কিরূপ ফল ভোগ করিতেছে, তৎসমুদয় আমরা তাঁহাদিগের অপেক্ষা সহস্রগুণে ভাল করিয়া জানিতে পারি।... এদেশীয় পত্রিকার উপর তেমন আস্থা থাকিলে উড়িষ্যা দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন অসংখ্য লোক বিনষ্ট হইত না।..... (১৭ আষাঢ়, ১২৭৭। ৩০ জুন, ১৮৭০)

......আমাদের দেশের জেল জরাসিন্ধুর কারাগার হইতেও ভয়ানক হইয়া উঠিয়াছে। জেলের এরূপ দুর্দশা আর কোন সভ্য দেশে দেখা যাইবে না।......

......জেলের কর্তা বদমায়েশ লোকেরা। জেলারের নিজে সকল বিষয়ে দেখিবার সম্ভাবনা নাই, দেখিলেও নিবারণ করিবার ক্ষমতা নাই। জেলে আহারের কষ্ট, শয়নের কষ্ট, থাকিবার কষ্ট। জেলে পদে পদে অপমান, পদে পদে গ্লানি, পদে পদে উপবাস, ও পদে ২ বেত্রাঘাত। পাঠকগণ ভুলুন, কয়েদীগণ অপরাধী। তিনি এইটুকু মনে করুন যে, কয়েদিগণ তাঁহাদেরই ন্যায় মানুষ, ও যে অবস্থায় তাহারা অপরাধ করে, তিনিও সেই অবস্থায় ঠিক সেইরূপ অপরাধ করিতেন।......

১। জেলে যাইবামাত্র ছালার ন্যায় মোটা কাপড়ের জাঙ্গিয়া ও কুর্তি করিয়া দেওয়া হয়। ইহাতে শীতকালে শীত নিবারণ হয় না।

২। আহারের সর্বদিক কষ্ট।

৩। যে পায়খানা আছে, সেখানে ১৪।১৫ জন একত্র হইয়া গায় গায় বসিতে হয়। কয়েদি হইলে মনুষ্যমাত্রের যে লজ্জা আছে, উহা পরিত্যাগ করিতে হয়। পায়খানা দৈবাৎ অপরিষ্কার হইলে, নিজেরা উহা পরিষ্কার করিতে হয়।

৬। পাকা বদমায়েশরা, অর্থাৎ যাহারা অনেকদিনের নিমিত্ত কয়েদ হইয়াছে, তাহারাই সর্দার হয়, ও তাহাদিগকে বাধ্য না করিতে পারিলে কোন ক্রমেই নিস্তার নাই।......

৮। বেত্রাঘাত করা। এ আংগ্লস্যাক্সন শোণিত নয় যে, বেত্রাঘাত করা প্রয়োজন হয়। বেত্রাঘাত করা কোন দেশে কখনও প্রয়োজন হয় না, বাঙ্গালীর ত কথাই নাই। স্বাধীনতা লইয়া আবার বেত্রাঘাত করা (এ বেত্রাঘাতে প্রত্যেক বেতে শোণিত নির্গত হয়) মনে করিলে আমাদের হৃৎকম্প হয়। (২ মাঘ ১২৭৫। ১৬ জানুয়ারি ১৮৬৯)

......সমস্ত বাঙ্গালায় কতজনে কিরূপ দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার তালিকা এই।

	১৮৬৫	১৮৬৬	১৮৬৭
ফাঁসি	৫০	৭৪	৭৫
দায়মল	১২০	১২৬	২৭৪
১৪ হইতে ১১ বৎসরের মিয়াদ	৩২	৪৪	২১
১০ বৎসর	১৬৮	৩৩	২১৪
১ হইতে ৭ বৎসর	৩০০	৫৪১	১০৪৩
৭ বৎসরের কম মিয়াদ	১২৬৯	১৫৬১	২২৮৮
জরিমানা	৪৮	১০	১১
	১৯১৬	২৬১৭	৪০৮৪

..... এক্ষণে যেরূপ পরিমাণে অপরাধীর সংখ্যাবৃদ্ধি দেখিতেছি, ইহতে ভয় হয়। বিবেচনা কর এইরূপে বাড়িতে চলিল, এক্ষণে আমরা গণিতের অধ্যাপকদের নিকট এই প্রশ্নটি করি যে, কত বৎসর এইরূপ চলিলে ভারতবর্ষের তাবৎ লোককে কারারুদ্ধ হইতে হইবে। (১৫ ফাল্গুন ১২৭৫। ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৯)

কি সর্বনাশ, শতকরা ৩/০ করিয়া ইনকম ট্যাক্স। লোকে কোথা হইতে দিবে! এইবারই প্রকৃত শিশু সন্তানের মুখের দুধ, স্ত্রীর কাণের সোণা, রোগীর পথ্য কাড়িয়া

নির্ভরযোগ্য কয়েকখানি বই

By S. Banerjee & Revised by Prof. P. B. Sengupta

1. P.U. & U.E. Logic Made Easy (in Bengali) 2.25
2. Ethics Made Easy (in Bengali) 2.50
3. Psychology Made Easy (in Bengali) 4.50
4. H. S. Logic Made Easy (in Bengali) 4.00

বি-এ (শিক্ষা) এবং বি টি-র জন্য প্রকাশিত হল :

জতেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

ভারতের শিক্ষা সমস্যা (২য় সংস্করণ) ১২.০০



ব্যানার্জী পাবলিশার্স

৫।১এ কলেজ রো, কলিকাতা-৯ ৩৪-৭২৫৪

[illegible] দিতে হইবে।......গবর্ণমেণ্ট যে [illegible] হার ধরিয়াছেন তাহা নিম্নে দিলেন।

৫০০	হইতে	৭৫০	পর্যন্ত	১৯
৭৫০	"	১০০০	"	২৭
১০০০	"	১৫০০	"	৩৯
১৫০০	"	২০০০	"	৫৪

......একজন ইংরেজ শনিবারে ২৩১৪ মধ্যে এতদ্দেশীয় ১৫ কোটী লোকের ভাগ্য পাঠ করিলেন. তাহার তিন দিনের দিন আর একজন ইংরেজ উহা লইয়া খানিক তর্ক করিলেন, করিয়া ইনকম ট্যাক্‌স বিধিবদ্ধ করা হইল আর গবর্ণর জেনারেল উহা অমনি পাশ করিলেন।..............

আমরা ইনকম ট্যাক্‌সের মূলগত প্রণালীর বড় সপক্ষে। রাজ্যের ভার যেরূপ ব্যক্তি তাহার সেইরূপ বহন করা উচিত তাহা হইলে কাহারো কষ্ট হয় না, কিন্তু তাহা প্রায় ঘটিয়া উঠে না।................
ন্যায্য বিচার করিতে গেলে আয় বৃদ্ধি করার সঙ্গে সঙ্গে নিরিখ বৃদ্ধি করা উচিত।...... আমরা নিম্নে যেরূপ সিডিউল দিতেছি এইরূপে হার ধরিলে অত্যাচারের অনেক লাঘব হইতে পারে।

১০০	হইতে	৫০০	শতকরা	။॰
৫০০	"	১০০০	"	১
১০০০	"	১৫০০	"	১।॰
১৫০০	"	২০০০	"	১৸॰
২০০০	"	৩০০০	"	২
৩০০০	"	৫০০০	"	২।॰

এইরূপে যাহাদের আয় ৫ হাজার টাকার উপরে তাহাদের নিকট ৩৸॰ লওয়া যাইতে পারে। ......(২ বৈশাখ ১২৭৭। ১৪ এপ্রিল ১৮৭০)

চৈত্র মেলার বিজ্ঞাপন

আগামী চৈত্রমেলা উপলক্ষ্যে কর্মাধ্যক্ষগণ নিম্নলিখিত বিষয় সকলের নিম্নলিখিত পুরস্কার দেওয়া স্থির করিয়াছেন।

বিষয় ঃ

(১) নীতি বিষয়ক অন্যূন ২৫টি উৎকৃষ্ট সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোক সংগ্রহ।

(২) বিদ্যা, ভাষা, রাজনিয়ম, কৃষিকার্য্য ও বাণিজ্য এই পাঁচটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া এদেশের উন্নতিকল্পে উৎকৃষ্ট সংস্কৃত রচনা।

(৩) এতদ্দেশে কার্পাস ও রাঙ্করাদি দ্বারা যেরূপ বস্ত্রাদি বয়ন করে, তদ্বিষয়ক বর্ণনা ৮ পেজি ফারমার অন্যূন ২ ফারমা উৎকৃষ্ট সাধু ভাষায় রচনা।

(৪) এদেশীয় চিকিৎসা শাস্ত্রানুযায়ী মনুষ্যশরীরের অস্থি-সংস্থান, সংখ্যা ও অবস্থা বিষয়ে বর্ণনা, ও ৮ পেজি ফারমার অন্যূন ৫ ফারমা উৎকৃষ্ট সাধু ভাষায় রচনা।

(৫) রামায়ণ গ্রন্থের মর্ম্ম ও তদন্তঃস্থ নীতি-বিষয়ক উৎকৃষ্ট সাধু ভাষায় রচনা।

(৬) মহাভারত গ্রন্থের মর্ম্ম ও তদন্তঃস্থ নীতি-বিষয়ক উৎকৃষ্ট সাধু ভাষায় রচনা।

(৭) ক্ষত্রিয় জাতির সাহস ও স্বদেশপ্রিয়তা বিষয়ক উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা কবিতা রচনা।

(৮) বিজ্ঞান, অর্থাৎ মেকানিকস, হাইড্রস্ট্যাটিক্‌স, অপটিক্‌স, ইলেক্‌ট্রিসিটি, এই সকল বিষয়ে ৮ পেজি ফারমার অন্যূন ৬ ফারমা উৎকৃষ্ট সাধু ভাষায় রচনা ১০০

(৯) বর্ত্তমান রাজনিয়ম বিষয়ে ঐ অন্যূন ৫ ফারমা উৎকৃষ্ট সাধু ভাষায় রচনা। ৫০

(১০) এদেশীয় গুরুমহাশয়েরা এক্ষণে যেরূপে শিক্ষা দিয়া থাকেন, কিরূপে তাহার উৎকর্ষ সাধন হইতে পারে তদ্বিষয়ক বর্ণন ২৫

(১১) এতদ্দেশীয় সঙ্গীতশাস্ত্রের আলোচনা বিষয়ে পূর্ব্বের সহিত এখনকার তুলনা করিয়া তদীয় অবস্থার উৎকর্ষাপকর্ষ বর্ণন, ৮ পেজি ফারমার অন্যূন ৩ ফারমা ঐ

(১২) কৃষিকর্ম্মোপযোগী ও কৃষ্যুৎপন্ন দ্রব্যজাত প্রদর্শনের জন্য ৩০০

(১৩) এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের কৃত শিল্পকর্ম্ম প্রদর্শনের জন্য ২০০

(১৪) এদেশীয় চিত্রকর ও কারিকরদিগের চিত্রিত ও নির্মিত দ্রব্যের প্রদর্শনের জন্য ২০০

(১৫) নানাপ্রকার যন্ত্র প্রস্তুত করিবার প্রদর্শনের জন্য ২০০

(১৬) এদেশীয় লোকের ব্যায়াম শিক্ষায় নৈপুণ্য প্রদর্শনের জন্য ১০০

উপরোক্ত লেখনী বিষয়-সকলের মধ্যে যিনি যে বিষয় লিখিবেন তিনি তাহা আগামী ২০ চৈত্রের মধ্যে ১০ নম্বর কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে ন্যাশনাল প্রেসে আমাদিগের নিকট পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

যাঁহারা চাঁদা দিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ঐ স্থানে তাহা অনুগ্রহ করিয়া পাঠাইবেন, আগামী চৈত্রমেলা উপলক্ষ্যে যিনি যে সকল দ্রব্যাদি প্রদর্শন করিবেন, তিনি তাহার তালিকা বা দ্রব্যাদিসকল শোভাবাজারে রাজবাটীতে শ্রীযুক্ত কুমার সুরেন্দ্রকুমার দেবের নিকট পাঠাইলে, তিনি কিম্বা শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজনাথ দেব তাহার রসিদ দিবেন। শ্রীগণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সম্পাদক। শ্রীনবগোপাল মিত্র সহকারী সম্পাদক। (৩০ ফাল্গুন, ১২৭৫। ১১ মার্চ, ১৮৬৯)

চৈত্র মেলা

গত চৈত্র সংক্রান্তিতে কলিকাতার বাবু আশুতোষ দেবের বেলগাছিয়ার বাগানে চৈত্র মেলার তৃতীয় অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। গত বৎসর অপেক্ষা এবার অধিকতর সমারোহের সহিত কার্য সুসম্পন্ন হইয়াছে। লোকের জনতা বিস্তর হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় স্থান সংকীর্ণ ও উত্তম বন্দোবস্ত না হওয়ায় ভারি গোল হইয়াছিল। এমনকি আমরা শুনিলাম অনেকগুলি ভদ্রলোককে ধাক্কা খাইতে হইয়াছিল। এদেশজাত অনেক জিনিষপত্রের আমদানী হইয়াছিল। এ দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের শিল্পজদ্রব্যও বিস্তর প্রদর্শিত হইয়াছিল। এইগুলি দেখিয়া অনেকে সন্তোষলাভ করেন। গত বৎসরের ন্যায় উৎকৃষ্ট ২ সংস্কৃত ও বাঙ্গালা প্রস্তাবসকল পঠিত হইয়াছিল। বিশেষ আহ্লাদের বিষয়, সংস্কৃত কলেজের কতকগুলি ছাত্র বেণীসংহার নাটকের অভিনয় প্রদর্শন করাইবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু নাট্যশালাটি অতিশয় অপ্রশস্ত হইয়াছিল এবং এই অভিনয়-বিষয় দেখিতে লোকের এত সমাগম হয় যে, তাহারা অভিনয় ভঙ্গ করিতে বাধ্য হন। যাহা হউক ইহাদিগের উদ্যোগ অতিশয় মহৎ। ব্যায়াম চর্চার এবার উন্নতি হইয়াছে বলিতে হইবে। অনেকগুলি ভদ্রসন্তান ব্যায়াম চর্চার পরীক্ষা দেন। তাঁহাদের নৈপুণ্যতা দেখিয়া সকলেই বিশেষ প্রীতি লাভ করেন।......

(২১ বৈশাখ ১২৭৬। ২২ এপ্রিল ১৮৬৯)

......বাবু সীতানাথ ঘোষের বাড়ী যশোহর, রামগ্রাম। ......শৈশবকাল অবধি তাঁহার মনের গতি একদিকে—নূতন যন্ত্র প্রস্তুত করা।...

আমাদের যতদূর স্মরণ হয়, সীতানাথবাবুর প্রথম যন্ত্রের ফল নূতন একরূপ ঘানিগাছ। ...পরে...তিনি মনে মনে নানাবিধ

ডাঃ পি ব্যানার্জী (মিহিজাম)
লিখিত গৃহচিকিৎসার বই

আধুনিক চিকিৎসা

মূল্য ছ'টাকা, ডাক খরচা আলাদা

ডাঃ পি. ব্যানার্জি
৫৩, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬
এবং
১১৪এ, আশুতোষ মুখার্জি রোড,
কলিকাতা—২৫

দ্রষ্টব্য ঃ—বর্তমানে মিহিজামে আমাদের অফিস নাই। লেক্সিন, নার্ভল টনিসিলিন, ঔষধাদি এখন কলিকাতা হইতে পাওয়া যায়।



কেশুত

কেশুতে পাতার রস সংযোগে

সুগন্ধি কেশরঞ্জন কেশ তৈল

কলিকাতা-১

যন্ত্রের সৃজন করিয়াছেন, কিন্তু অর্থাভাবে তাহার একটাও পরীক্ষা হইতেছে না। আমরা তাঁহার দুইটি যন্ত্রের চিত্র দেখিয়াছি, একটি এয়ার পাম্প, আর একটি এয়ার ইঞ্জিন। এয়ার পাম্পে তিনি কৃতকার্য হইয়াছেন ও এক্ষণে তিনি তাঁহার পেটেণ্ট লইতে পারেন, কিন্তু তাহাতে বিশেষ লাভ কি। তাঁহার এয়ার এঞ্জিন অদ্যাপি সম্পূর্ণ হয় নাই, কিন্তু যতদূর হইয়াছে তাহাতে তাঁহার বিস্তর বুদ্ধির পরিচয় আছে।...

সম্প্রতি বাঙ্গালায় যে চারিটি বক্তৃতা হইতেছে, তাহার প্রথম বক্তৃতা সীতানাথবাবু দিয়াছেন। প্রথম বক্তৃতা যন্ত্র-বিষয়ক, সীতানাথবাবু কর্তৃক, দ্বিতীয় বক্তৃতা বাণিজ্য-বিষয়ক, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কর্তৃক, তৃতীয় বক্তৃতা বাবু যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রাযন্ত্র-বিষয়ক, চতুর্থ বক্তৃতা বাবু সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর কর্তৃক ভারতবর্ষীয় সঙ্গীত-বিষয়ক। সীতানাথবাবুর বক্তৃতা হইয়া গিয়াছে। তিনি বক্তৃতাস্থলে তাঁহার এয়ার পাম্প যন্ত্র আর তাহার সঙ্গে নূতন একটি তাঁত দেখান।...

(১২ চৈত্র ১২৭৬। ২৪ মার্চ ১৮৭০)

সম্প্রতি এই পত্রিকার (ন্যাশনাল পেপার) সম্পাদক সভায় বাবু সীতানাথ ঘোষ বাঙ্গালার একটি বক্তৃতা পাঠ করেন। প্রস্তাব বিদ্যুৎ। প্রস্তাব পাঠক পরীক্ষা দ্বারা উপস্থিত সভাগণকে কতকগুলি কৌতূহল-জনক বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়া প্রদর্শন করান। বাঙ্গালায় বিজ্ঞান লেখা কঠিন ও শুনিলাম সীতানাথবাবু শব্দ যোজনায় পারদর্শিতাও দেখাইয়াছেন। প্রস্তাব পাঠক কলেজে না পড়িয়া নিজ যত্নে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছেন ও তাঁহার মন বিজ্ঞানে নিতান্ত রত।......বাবু সীতানাথ শিলারিদিগের কথা প্রস্তাবে উত্থাপন করেন। আমাদের দেশে এক জাতি আছে, তাহারা শস্য শিলা হইতে রক্ষা করে ও তাহাদিগকে শিলারি বলে। ইহারা কি অদ্ভুত বলে ভূমিতে শিলা পড়িতে দেয় না, স্থানান্তরে দূর করিয়া দেয়। নিতান্ত তাহা না পারে তাহাদের অদ্ভুত ক্ষমতায় শিলা সমুদয় ভূমির আলিতে পড়ে মধ্যে পড়ে না। এ বিষয়ে কিছুকাল হইল আমরা একটি প্রস্তাব লিখি, কিন্তু কেহ তাহাতে দৃক্‌পাত করেন না, ও বোধ হয় কেহ বিশ্বাস করেন নাই। বিশ্বাস না করিবার কথা কিন্তু আশ্চর্য এই শত শত বুদ্ধিমান লোক স্বচক্ষে দেখিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন।

(৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৮। ১৮ মে ১৮৭১)

আমাদের কৃষকের ন্যায় ঘোর পরিশ্রমী জাতি পৃথিবীর মধ্যে দৃষ্ট হইবে না, আবার ইহাদের তুল্য দৈন্যও বুঝি জগতে নাই।...

এই হতভাগাদের দুর্দশার প্রথম কয়েকটি কারণ আমরা নিম্নে লিখিতেছি।

প্রথম দৈব দুর্বিপাক। ...দ্বিতীয় জমিদারের অত্যাচার। যদি প্রজারা খাজানা দিতে বিলম্ব হইল, তবে পেয়াদা নিযুক্ত করা হয়। পেয়াদা হতভাগা প্রজাকে কাছারি বাটীতে ধরিয়া আনিয়া যারপর নাই অপমান করে। তাহাকে রৌদ্রে দাঁড় করাইয়া রাখে, প্রহার করিতে করিতে কখন ২ জুতা পর্যন্ত করিয়া থাকে। ...পেয়াদারা উহাদের নিকট হইতে চারি আনা কেহ বা আট আনা করিয়া লইয়া থাকে। ...জমিদার মাঝে ২ জমিদারীতে গমন করেন এবং নজর স্বরূপ আচ্ছা দশ টাকা হাত মারিয়া আসেন। ...এতদ্ভিন্ন তাহার কর্মচারীদের অত্যাচার আছে। ...তৃতীয় মহাজন। ফলে কৃষকেরা জমিদার ও মহাজনের ক্রীতদাস বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ...(১৮ আষাঢ় ১২৭৬। ১ জুলাই ১৮৬৯)

ধান্য মৎস্য এবং গব্য বাঙ্গালীর জীবন আধার। আর এ দেশে কি কুগ্রহ প্রবেশ করিয়াছে যে দিন দিন এই তিন নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য হইতেছে। আমরা পিতামহ মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি যে তাঁহারা দেখিয়াছেন এক টাকার ধান্য সারা দিনরাত্রি বহন করিয়া কেহ শেষ করিতে পারিত না। মৎস্য ও দুগ্ধ আমরা ২০ বৎসর পূর্বে অযত্নেও দেখিয়াছি। কিন্তু সেই সোনার বাঙ্গালার এখন অবস্থা কি? লোকে হা অন্ন ২ করিয়া বেড়াইতেছে। দুগ্ধ ঘৃত দেবদুর্লভ দ্রব্যের মধ্যে হইয়াছে এবং যাঁহারা ধনী তাঁহারাই কেবল মধ্যে মধ্যে মৎস্য আহার করিতে পারেন।

চৈত্র হইতে শ্রাবণ মাস পর্যন্ত পল্লীগ্রামের লোকের অবস্থা প্রকৃত শোচনীয়। এমন একটি গ্রাম নাই যেখানে অন্ততঃ ২৫টি পরিবারের সচ্ছলপূর্বক আহার চলে, ৫০ ঘরের প্রায়ই দুবেলা আহার চলে না এবং ২৫ ঘর লোক বোধ করি এ কয়েক মাস প্রকৃত কোন দিন উদর পূর্তি করিয়া চারিটি অন্ন পায় না।...

ভদ্রলোকের বৎসরে যাহা কিছু আয় হয়, এই সময় নিঃশেষ হইয়া যায়, শুধু সঞ্চিত ধন নিঃশেষ হয় না। পেটের দায়ে দুখানি একখানি করিয়া পরিবারস্থ স্ত্রীগণের অলংকার বাসন দোকানদারদের করে নীত হয়। ...সেকালে ভদ্রলোকের অবস্থা সচ্ছল ছিল এবং তাহাদের দানশীলতায় অনেকে জীবন ধারণ করিত অনেকের পড়াই সমাপ্ত ছিল কিন্তু ইউরোপীয় বিদ্যাজ্যোতিতে এখন সে সমুদয় অন্তর্হিত হইয়াছে।......আমাদের রাজপুরুষগণের সকল বিষয়ে মনোযোগ আছে, কেবল প্রজার দুরবস্থা ব্যতীত। ...লোকে যে প্রকারে ২ অন্ন ২ করিয়া বেড়াইতেছে সে বিষয় কেহ তল্লাসও করে না।

(১৫ শ্রাবণ ১২৭৬। ২৯ জুলাই ১৮৬৯)

মধ্যবিত্ত লোকে যেরূপ অবস্থায় অবস্থিত তাহাতে ইহাদের ধনাঢ্যগণের অবস্থার দোষের ভাগ থাকে না,

রাধাদামোদর মিত্রের
অনবদ্য উপন্যাস
কদমখণ্ডীর কল্পনা
৩·০০
জয়দেব কেন্দুলীর কদমখণ্ডীর ঘাট, আর সেখানকার বিচিত্র পরিবেশের বিচিত্রতর মানুষদের নিয়ে এই উপন্যাস সজীব।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ !
হ্যাঁ, নেতাজী সুভাষের বিরুদ্ধে যখন ভারতীয় বৃটিশ বাহিনী যুদ্ধ করছিল তখনকার বিশদ বিবরণ
মন্মথ রায়ের
পূর্ব সীমান্ত
৪·০০

গৌরীশঙ্কর সম্পাদিত	প্রেমাঙ্কুর প্রবন্ধ সংকলন
রূপ-কল্প	প্রেম মঞ্জরী
৪·০০	২·০০

সাহিত্য রত্নী ॥ ১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট ॥ কলিকাতা ১২

...থাকে। ইহারা দরিদ্রগণের ন্যায় অন্ন-চিন্তায় দিবানিশি জর্জরিত হন না, অথচ দুষ্ট হন...। এদেশের সৌভাগ্য অনেক অংশে এই শ্রেণীর লোকের উপর নির্ভর করে। যদি কোন কালে এদেশে কোনরূপ সামাজিক কি অন্য কোন বিপ্লব হয়, ইহাদের দ্বারাই তাহা সম্পাদিত হইবে।... ...দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের রাজপুরুষগণের দৃষ্টি জমিদার ও দরিদ্র প্রজাদিগের প্রতিই ধাবমান। ...মধ্যবিত্ত লোক যে একটি সম্প্রদায়ী আছে, তাহা তাহারা বোধ হয় জানেন না...।

(২৫ অগ্রহায়ণ ১২৭৬।
৯ ডিসেম্বর ১৮৬৯)

বিধবা বিবাহ হিন্দুশাস্ত্রাসিদ্ধ, ব্যবহার বিরুদ্ধ। ব্যবহার চিরকাল একরূপ থাকে না। সমুদয়ই ক্রমে পরিবর্তিত হইতেছে।...বিধবা বিবাহ করিলে জাতি কেন যায় বুঝিতে পারি না।......বেশ্যাগমনে উপপত্নী রাখিলে, ব্যভিচারে—আমাদের দেশে জাতি যায় না, ইহাতে জাতি গেলে কয়টি লোকের জাতি আছে? যে বিধবা বিবাহে অনিচ্ছা প্রকাশ করে তাহারা ব্রহ্মচর্য্য করুক। কিন্তু যাহারা দায় পড়িয়া ব্রহ্মচর্য্য করে, কি কুকর্মে রত হইবার উদ্যোগী, তাহাদিগকে ধরিয়া বাঁধিয়া ব্রহ্মচর্য্য করার কি ফল?......ব্রহ্মচর্য্য করা অপেক্ষা সহমরণ যাওয়া অনেক গুণে ভাল।......

আমাদের দেশে যতগুলি প্রকাশ্য বেশ্যা আছে, অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে তাহাদের মধ্যে শতকরা নব্বইজন বিধবা...। ......লাম্পট্যদোষ এত প্রচলিত হইবার প্রধান কারণ বিধবাদের বিবাহ না দেওয়া।

(৩০ ফাল্গুন ১২৭৫।
১১ মার্চ ১৮৬৯)

সংপ্রতি কলিকাতায় একটি বিধবা বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্র অতি সম্ভ্রান্তবংশীয়। হাইকোর্টের অন্যতম উকীল বাবু শ্রীনাথ দাসের পুত্র বাবু উপেন্দ্রনাথ দাস পাত্র। উপেন্দ্রবাবু যে মহৎ কাজ করিয়াছেন তাহার সমুচিত পুরস্কার তিনি ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কাহারও নিকট প্রত্যাশা করিতে পারেন না। যশোরবাসীদের নিকট একটি বিশেষ আনন্দের বিষয় আছে। শ্রীনাথ বাবুর বাড়ী যশোরে (এক্ষণে কলিকাতায় বাড়ী করিয়াছেন) সুতরাং উপেনবাবুকে আমরা যশোরে বলিলেও পারি।

গত ২রা নবেম্বর তারিখে একটি সভার প্রস্তাব হয় ও ২৮ তারিখে উহার বাবু মুরারিধর সেনের বাটিতে অধিবেশন হয়। সভাটি কেশববাবুর (কেশব সেন) যত্নে সংস্থাপিত ও উহাতে জাস্টিস ফিয়ার প্রভৃতি অনেক সম্ভ্রান্ত লোক উপস্থিত থাকেন। শুনিতে পাই যখন কেশববাবু বিলাতে যান তখন সেখানকার অনেক ভদ্রলোক তাঁহাকে এইরূপ একটি সভার সংস্থাপন নিমিত্ত অনুরোধ করেন এবং ইহার নিমিত্ত অর্থ সাহায্য করিতে তাঁহারা প্রতিশ্রুত হন। কেশববাবু সেই আশায় আশ্বাসিত হইয়া সভার অনুষ্ঠান করিয়াছেন। সভার উদ্দেশ্য ৫টি—(১) স্ত্রীজাতির উন্নতি সাধন, (২) ব্যবসায়ী লোকদিগকে জ্ঞান শিক্ষা, (৩) সুলভ সাহিত্য প্রচার, (৪) সুরাপান ও মাদক নিবারণ (৫) দুঃখীদিগকে সাহায্য প্রদান। ...কেশববাবুর ইণ্ডিয়ান রিফরম সভা

প্রসঙ্গে—২৪ অগ্রহায়ণ ১২৭৭।
৮ ডিসেম্বর ১৮৭০)

... হা ঈশ্বর! আমরা এই কয়েক সহস্র বৎসর পর্যন্ত পুরুষ পুরুষানুক্রমে রিপু সেবন করিয়া আসিতেছি, এখন আমাদের তাহার ফল ভোগ করিতে হইতেছে। তুমি কৃপা করিয়া আমাদের সে অপরাধ মার্জনা কর, করিয়া আমাদের রিপুগুলি আমাদের প্রত্যর্পণ কর। আমাদের কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য প্রবল করিয়া দেও যে আমরা একটু সজীব হই। আমরা মৃতপ্রায় আমাদের কিছুতেই সুখ নাই, আমাদের সাধগুলি একটু উত্তেজিত করিয়া দেও। একটু বেশী কাম, একটু বেশী ক্রোধ, একটু বেশী লোভ ইত্যাদি হইলেই আমাদের ভদ্র, নতুবা আমাদের ভদ্র নাই। (আমাদের হৃদয় নাই—২১ অগ্রহায়ণ ১২৭৯। ৫ ডিসেম্বর ১৮৭২)।

গত জুন সংখ্যার দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে যে বাঙ্গলায় মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা হিন্দু অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক। এই মুসলমানেরা ভিন্ন-দেশবাসী নন, ইঁহারা ইংরেজ বণিক কি কর্মচারীদিগের ন্যায় কিছুদিন এখানে অবস্থিতি করিয়া অন্যত্র গমন করেন না। ইঁহাদের গৃহ, সম্পত্তি, সহায়, আত্মীয়, বন্ধু বান্ধব সমুদয় এদেশে। ইঁহারা এখানে জন্মগ্রহণ করিয়া এখানেই মানবলীলা সংবরণ করেন। শুধু ইহা নহে। ইঁহারা হিন্দু সমাজের প্রজাগত হইয়াছেন।

(৮ কার্তিক ১২৮০।
২৩ অক্টোবর ১৮৭৩)

আমাদের দেশীয় লোকেদের অনেকের বিশ্বাস আছে যে ইংরেজেরা ন্যায়পরায়ণ, নিরপেক্ষ, সুবিচারক এবং তাঁহাদের উপর লোকের এই বিশ্বাস ও ভক্তি আছে বলিয়া তাঁহারা আমাদের উপর এত আধিপত্য করেন, কিন্তু যেদিন আমরা দেখিব যে তাঁহারা পক্ষপাতী, তাঁহাদের কোনরূপ ধর্মজ্ঞান নাই, তাঁহারা ন্যায় অন্যায় গ্রাহ্য করেন না, সেই দিন অবধি ইংরেজের প্রতি আমাদের ভক্তি কমিয়া যাইবে এবং ঘৃণার উদ্রেক হইবে এবং যেদিন অবধি তাহাই হইবে সেদিন অবধি এদেশে ইংরেজের পতন আরম্ভ হইবে।......

(১৯ জ্যৈষ্ঠ ১২৮১। ৪ জুন ১৮৭৪)

সিবিল সার্বিস পরীক্ষায় যদিও বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় সিবিল সার্বিস কমিশনারগণ কর্তৃক উপেক্ষিত হইয়াছেন তবু আমরা তাঁহাকে এখন পর্যন্ত হারাই নাই। তিনি তাঁহার পক্ষ সমর্থনার্থে যে সমুদয় যুক্তি ও প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা অকাট্য। সদ্বিবেচক ব্যক্তি মাত্রই তাঁহাকে নির্দোষী বিবেচনা করিবেন। কমিশনারগণ তাঁহাকে এই ঘোর কলঙ্ক হইতে মুক্ত করুন বা না করুন, সমস্ত জগৎ তাঁহাকে মুক্ত করিবে। ওদিকে ইংরেজ জাতি, যাঁহারা আপনাদের মহত্ত্ব দেশ-বিদেশে রটনা করিয়া বেড়াইতেছেন, সুসভ্য জাতির নিকট চির-কলঙ্ক পাশে আবদ্ধ হইবেন।

(২ শ্রাবণ ১২৭৬। ২৫ জুলাই ১৮৬৯)

....শুধু বলপ্রয়োগ দ্বারা দুষ্কর্ম সম্যক প্রকারে জনসমাজ হইতে অন্তর্হিত হওয়া অসম্ভব। দুষ্কর্ম করা মানসিক পীড়া। ... আমাদের দেশের রাজপুরুষগণ যদি শুদ্ধ দণ্ডবিধান দ্বারা ক্ষান্ত না দিয়া দুষ্কর্মের কারণ অনুসন্ধান করেন এবং জেলে আবদ্ধ রাখিয়া দৈহিক দণ্ডের সঙ্গে দুষ্কর্মের কারণ দূর করিবার উপায় অবলম্বন করেন, তাহা হইলে জনসমাজের প্রকৃত মঙ্গল হয়।

মাউট সাহেব......দেখিয়াছেন যে সামান্য অপরাধে অপরাধীর মধ্যে কৃষক ও ভূমধ্যাধিকারীগণই সর্বাপেক্ষা অধিক এবং ডাকাইতি চুরি প্রভৃতি গুরুতর অপরাধে প্রায় কারবারী বণিক, কারিগর, পারিবারিক ভৃত্য অথবা গোয়ালা ডোম দোসাদ প্রভৃতি নীচ জাতিকে লিপ্ত থাকিতে দেখা যায়, কয়েদীর সংখ্যার প্রায় অর্দ্ধেক কৃষক। ডাক্তার (মাউট) ইহার কারণ এই বলেন, কৃষকদিগের অজ্ঞতা ও দ্বন্দ্ব লইয়া বিবাদ। তিনি আর একটু অগ্রসর হইলে দেখিতেন, ইংরেজী আইনের কুটিলতা ও জটিলতা ইহার একটি কারণ।..

অপরাধের হিসাবে দৈনিক শ্রমোপজীবি ও পারিবারিক ভৃত্য প্রায় তুল্য। ১৮৬৪ সালে ৬৩৩৬০জন বন্দীর মধ্যে ইহারা ৫২৪৩৪ জন। ......ইহাদের নিম্নে মুদি! ১৮৬৪ সালে ৬৩৩৬০ জনের মধ্যে ১৮৩৫ জন মুদি। ওজনের কম আহারীয় দ্রব্যের কৃত্রিমতা প্রভৃতিই কর্তৃক ইহারা রাজদ্বারে নীত হয়........।

(৭ ফাল্গুন ১২৭৬
১৭ ফেব্রুয়ারী ১৮৭০)

সকল ঋতুতে অপরিবর্তিত ও অপরিহার্য পানীয়
চা
কেনবার সময় 'অলকানন্দার' এই সব বিক্রয় কেন্দ্রে আসবেন
অলকানন্দা টি হাউস
৭, পোলক স্ট্রীট কলিকাতা-১
২, লালবাজার স্ট্রীট কলিকাতা-১
৫৬, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ কলিকাতা-১২
॥ পাইকারী ও খুচরা ক্রেতাদের আস্থাভাজন বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান ॥

মহাত্মা শিশিরকুমার ও পরলোকতত্ত্ব

ভবানী মুখোপাধ্যায়

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের জননী অমৃতময়ী মাত্র ন' বছর বয়সে শ্বশুর-ঘর করতে এসেছিলেন। পরিপূর্ণ সংসার, স্বামী হরিনারায়ণ ঘোষ ১২৬৯ সালের পৌষ মাসে যখন লোকান্তর গমন করেন তখন তাঁর আটটি পুত্র, তিনটি কন্যা, তিনটি পুত্রবধূ ও কয়েকটি পৌত্র ও দৌহিত্র। অমৃতময়ী বালিকাবয়সে সংসারে প্রবেশ করে এই প্রথম শোক পেলেন। এর প্রায় আড়াই বছর পরে অমৃতময়ীর পঞ্চম পুত্র হীরালালের মাত্র আঠারো বছর বয়সে মৃত্যু হয়। তিনি জীবের দুঃখ সহ্য করতে পারতেন না, বলতেন, "যদি জীবের দুঃখ দূর করিতে নাই পারিলাম তবে বাঁচিয়া ফল কি?"

মাতৃগতপ্রাণ হীরালালের মৃত্যুতে অমৃতময়ী বিশেষ কাতর হলেন, তিনি পুত্রদের বললেন : "বাবা, আমার হীরালাল যখন তার অমূল্য জীবন বিসর্জন দিয়েছে তখন আমি আর এই ছার প্রাণ রাখব না।"

পুত্র বসন্তকুমার জননীকে প্রবোধ দিলেন—"মৃত্যুর পর আবার আমাদের মিলন হবে, বৃথা শোক কেন? যদি প্রমাণ না পাই তবে আমরা সবাই হীরালালের পথ অনুসরণ করব।"

এই সময় আমেরিকায় প্রেত-তত্ত্বচর্চা বিশেষ সাফল্যলাভ করে এবং তাঁদের উদ্ভাবিত পন্থায় পরলোকগত আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়। এই বিষয়ে বিস্তারিত জ্ঞানের জন্য শিশিরকুমার দেশ থেকে কলকাতায় এলেন এবং কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর প্যারীচাঁদ মিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। প্যারীচাঁদ মিত্রের ৩০শ বার্ষিক শোকসভায় (১৯১৬) মতিলাল ঘোষ মহাশয় সভাপতির ভাষণে বলেন—

> "For some domestic affection my late lamented brother, Sisir Babu, thought of starting for America to learn the modern art of occultism direct from the spiritualists there. He met Peary Chand Babu in the Calcutta Public Library to consult with him. Peary Babu gave him some verval instructions as how to form Circles etc. and some books to read and advised him that it is not necessary for any person to go anywhere but we can succeed if we practice here".

এইভাবে শিশিরকুমার সর্বপ্রথম প্রেততত্ত্বে আগ্রহী হলেন। প্রেততত্ত্ব সম্পর্কে মহাত্মা শিশিরকুমার যে উৎসাহ প্রদর্শন করেছেন তা তুলনাবিহীন। তিনি "The Hindu Spiritual Magazine" নামে যে মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন তা বিশেষ মূল্যবান। তাঁর তিরোভাবের পর শিশিরকুমারের ভ্রাতৃবৃন্দ কিছুকাল এই পত্রিকা পরিচালনা করেন, পরে অবশ্য পত্রিকাটি লুপ্ত হয়।

পরলোকে সুধীরচন্দ্র সরকার

প্রখ্যাত সাহিত্য-সেবী এবং প্রকাশক শ্রী সুধীরচন্দ্র সরকার গত ১০ ফেব্রুয়ারি ৭৬ বৎসর বয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন। অমৃতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ। আগামী সংখ্যায় তাঁর কর্মবহুল জীবন সম্পর্কে একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হবে।

মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয়ের গ্রন্থটি পরলোকতত্ত্ব সম্পর্কে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ, তা ছাড়া এই গ্রন্থে ঘোষ পরিবারের পারিবারিক চক্রের ৬৮ বর্ষের বিবরণ ও কলকাতায় অধ্যাত্মচর্চার ৭৩ বৎসরের ইতিবৃত্ত পাওয়া যায়। মৃণালকান্তি শিশিরকুমারের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং সুলেখক ছিলেন। 'দি হিন্দু স্পিরিচুয়্যাল ম্যাগাজিন' ইদানীং দুর্লভ। তবে সেই মাসিক পত্রিকা এমনই মূল্যবান প্রবন্ধ ও তথ্যসমৃদ্ধ যে যদি কোনো উৎসাহী প্রকাশক তার সংকলন প্রকাশ করেন তাহলে লাভবান হবেন।

এই পত্রিকায় স্বয়ং মহাত্মা শিশিরকুমার অধ্যাত্ম বিষয়ে কিভাবে তাঁদের আগ্রহ সঞ্চারিত হয় তা বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন :

> "We were eight brothers and devotedly loved one another. One of our brothers suddenly died and this had a tremendous effect upon the entire family. Was it for this that God implanted love in the human breast? Was it for this that He gave life? The fact was, we were trained under religious principles, and had a strong faith in the existence and goodness of our Creator. Our faith in God received a rude shock when the incident happened.

ঈশ্বরের মহিমায় বিশ্বাসী মহাত্মা শিশিরকুমার ও তাঁর পরিবারবর্গের মনে একটা সংশয় সৃষ্টি হল। শৈশব থেকে তিনি ধর্মশিক্ষার মধ্যে লালিত, সর্বনিয়ন্তার করুণা বিষয়ে তিনি বিশ্বাসী, এখন মনে হল তিনি কি নিষ্ঠুর ও নির্মম?

> "If God gave life and love to man and then destined man for anihilation, if He implanted love in the human breast and destined man to suffer the severe pangs of bereavement. He must be the most cruel being in existence. Surely a man, unless he were a monster, would never snatch a child from the bosom of its mother. This God was doing constantly; was God more cruel than His creation, man? If there was survival and reunion after death it was all right, otherwise what was the use of living it all? Let the entire family put an end to their lives once for all, and put an end to their misery. Thus the entire family felt in the anguish of their soul".

মহাত্মা শিশিরকুমারের উপরিউক্ত মন্তব্য থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, হীরালালের মৃত্যুতে ঘোষ পরিবার কি গভীর শোকে মগ্ন হয়েছিলেন। তাই প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের নিকট তথ্যাদি সংগ্রহ করে শিশিরকুমার গ্রামে ফিরে ভ্রাতা বসন্তকুমার, হেমন্তকুমার, মতিলাল এবং জননী ও ভগিনীদের একত্রে নিয়ে চক্রে বসলেন। কাতরকণ্ঠে তাঁরা প্রার্থনাসঙ্গীত গান করতে লাগলেন—প্রথম প্রথম তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু না হলেও চতুর্থ দিনে দুই-তিনটি প্রার্থনা সঙ্গীতের পর হীরালালের আত্মার আবির্ভাব ঘটে। হীরালাল মিডিয়ম মতিলাল মারফৎ পরলোক সম্পর্কে জানালেন যে, "পৃথিবী হইতে এই স্থান সহস্রগুণে উত্তম। এখানে এখনও শ্রীভগবানের কিম্বা যাহারা তাঁহাকে দেখিয়াছেন এরূপ কোন ভাগ্যবান পবিত্র পারলৌকিক মূর্তির দর্শন পাই নাই। এখানে এরূপ প্রেতাত্মাও আছে যাহারা এই চিন্ময়-জগতে আসিয়াও পূর্বের ন্যায় পশুবৎ আচরণ করিতেছে এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব পর্যন্ত বিশ্বাস করে না।"

চক্রের এই সাফল্যে ঘোষ পরিবারের নূতন প্রাণ সঞ্চারিত হল এবং প্রত্যহই সেখানে এইভাবে চক্রে বসার অনুষ্ঠান পালিত হল। শিশিরকুমারের ভ্রাতা হেমন্তকুমার, ভগ্নী স্থির সৌদামিনী, নীল কাদম্বিনী প্রভৃতি মাঝে মাঝে মিডিয়ম হতেন।

হেমন্তকুমার সম্পর্কে মহাত্মা শিশিরকুমার শ্রীঅমিয়-নিমাই চরিতের প্রথম খণ্ডের উৎসর্গপত্রে লিখেছেন—

"মেজদাদা মহাশয় (হেমন্তকুমার) যখন কখন আবিষ্ট হইতেন ও সেই অবস্থায় আমাকে পত্র লিখিতেন। সে সময়ে পত্রগুলি যেন তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া লেখাইতেন।" একদিন এই রকম একটি পত্রে হেমন্তকুমার লিখেছিলেন :— "শিশির! কোন দেবতা—তাঁহাকে আমি চিনি না—আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া বলিলেন — তোমার কনিষ্ঠ শিশির, তাঁর গৌরাঙ্গের চিহ্নিত দাস। তাঁহার দ্বারা মহাপ্রভু অনেক কর্ম সাধন করিবেন...।" শিশিরকুমারের জীবনে এই কথা কিভাবে ফলেছে তা যাঁরা মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের জীবন ও কর্মের সঙ্গে পরিচিত তাঁদের অবিদিত নয়।

এই পারিবারিক চক্রের অনুষ্ঠানে অনেক পবিত্র আত্মার আবির্ভাব ঘটেছে। গোলকান্তি ঘোষ মহাশয় লিখেছেন—

"আমাদের পারিবারিক চক্রে কত কবিতা, কত গান, কত ধর্মকথা, পরলোক সম্বন্ধে কত নূতন তথ্য উচ্চস্তরের মৃতাত্মাদিগের নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছিল এবং লিপিবদ্ধ করে রাখাও হইয়াছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে নানা কারণে ক্রমে সেগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে।"

স্থির সৌদামিনী রচিত "আমাদের পারিবারিক প্রসঙ্গ" নামক গ্রন্থে সেই সময়ের অনেক তথ্য পাওয়া যায়। স্থির সৌদামিনী উত্তম শ্রেণীর মিডিয়াম ছিলেন।

স্থির সৌদামিনীর আত্মা সপ্তম-স্বর্গ পর্যন্ত পরিভ্রমণ করে সেই সব অঞ্চলের অতুলনীয় দৃশ্য বর্ণনা করতেন। শিশিরকুমার মেসমেরাইজ করার শক্তিও অর্জন করেছিলেন। একবার স্থির সৌদামিনীর আত্মা এই অবস্থায় পরলোক সপ্তম স্তরে পৌঁছায় এবং তিনি সেখান থেকে কিছুতেই ফিরে আসতে রাজী হন না।

মহাত্মা শিশিরকুমার এই বিষয়ে "দি হিন্দু স্পিরিচুয়্যাল ম্যাগাজিনে" একটি মনোজ্ঞ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি বলেছেন—

"We personally know the case of a lady who was so deeply mesmerised that she almost died under the process. We saw that her body had become cold, her heart and pulse ceased to beat. With gigantic efforts she was brough to consciousness. And no sooner was this done than she declared: 'Why did you bring me back? There is struggle in death; I conquered it without any struggle; I had been to the border of a beautiful world. Let me go, let me tell you that death is nothing but a present change So don't mourn for me'.

She at last consented to come. But wonder of wonders, when she regained her consciousness fully, she refused to be mesmerised again, lest she died again and could not come back"

মহাত্মা শিশিরকুমার মন্তব্য করেছেন মানুষ এই জগতে অবস্থানকালে মরতে চায় না কিন্তু যখন তাঁরা প্রেতলোকে পৌঁছান তখন আর সেখান থেকে কিছুতেই মর্তলোকে ফিরে আসতে রাজী হন না।

মহাত্মা শিশিরকুমারের পরলোক-বিষয়ক অনেক নিবন্ধ আনন্দবাজার ও বিষ্ণুপ্রিয়া নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই সব রচনা প্রেততত্ত্ব-বিষয়ক ইতিহাস রচনার জন্য সংকলিত হওয়া প্রয়োজন।

শিশিরকুমার পরলোকতত্ত্ব চর্চায় সেইকালের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনা করেছেন এবং অনেক বিদেশীরও শ্রদ্ধা অর্জন করেন।

শিশিরকুমারের তৃতীয় পুত্র পয়সকান্তি মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন, শিশিরকুমারের বয়স তখন সত্তর। এই পুত্রটির মৃত্যুতে শিশিরকুমার অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েন। শ্রীশ্রীঅমিয়-নিমাই চরিতের ষষ্ঠ খণ্ডটি পুত্র পয়সকান্তির স্মৃতিতে নিবেদিত। এই উৎসর্গপত্রে শিশিরকুমার লিখেছেন—

"তুমি আমাকে ছাড়িয়া গেলে, তোমার একখানি ছবি প্রস্তুত করাইবার ইচ্ছা ছিল। মার্কিন দেশের এক বিখ্যাত মিডিয়াম আমার সে মনস্কামনা পূর্ণ করিয়াছেন। চিত্রখানি ২০ মিনিটে দিবাভাগে লোকের সাক্ষাতে অদৃশ্য হস্তে বিচিত্র হয়।"

ছবিখানি এমনই সূক্ষ্ম কারুকার্যে পূর্ণ যে অন্ততঃ এক মাসের কম এমন ছবি আঁকা সম্ভব নয়। শিকাগো শহরের Bangs Sisters নামক দুই ভগিনী মৃতের ছবি আঁকার ব্যাপারে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। শিশিরকুমার এই সংবাদ পেয়ে শিকাগো শহরে তাঁর এক বন্ধুকে পত্র দেন। তিনি শিশিরবাবুর অনুরোধে শেষ পর্যন্ত ব্যাঙ্গস ভগিনীদের দিয়ে এই ছবি আঁকান। ছবি আঁকার সময় বেলা এগারোটা—সেই উজ্জ্বল দিবালোকে এই আশ্চর্য ছবিখানি যেন আপনা-আপনি ক্যাম্বিসের গায়ে ফুটে উঠল।

শিশিরকুমার প্রেততত্ত্ব বিষয়ে বিশেষ শক্তি লাভ করেছিলেন তার অসংখ্য প্রমাণ তাঁর জীবন থেকে পাওয়া যায়। 'অমিয়-নিমাই চরিত' ষষ্ঠ খণ্ডটির মুদ্রণ ব্যাপারে বিলম্ব ঘটায় তিনি বিশেষ ব্যস্ত হয়ে পড়েন এবং যাতে তিনি গ্রন্থটি শেষ করতে পারেন সেই ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

যে দিনটিতে তিনি মহাপ্রয়াণ করেন সেই দিন প্রাতে সকল প্রকার কাজ শেষ করে, ভজন-কীর্তনাদি ও পরে স্নানাহার শেষ করেন। অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক তুষারকান্তি ঘোষ মহাশয় তখন শিশু। সেই সময় তিনি সামান্য জ্বরে অসুস্থ। শিশিরকুমার পুত্রকে সস্নেহে প্রশ্ন করেন—কি খাওয়ার বাসনা? পুত্র যখন কাঁচা পেয়ারা খাওয়ার বাসনা প্রকাশ করলেন তখন শিশিরকুমার স্বয়ং বাজার থেকে সেই ফল সংগ্রহ করে আনলেন। স্নানাহার শেষ করে 'অমিয়-নিমাই চরিতে'র ষষ্ঠ খণ্ডের শেষ ফর্মাটির প্রুফ সংশোধন করে বললেন—আমার এখানকার কাজ শেষ—আর আমার বন্ধন রইল না, এখন স্বচ্ছন্দ চিত্তে ইহলোক ত্যাগ করতে পারব।

এই সময় একজন ডাক্তার তাঁকে পরীক্ষা করে বললেন— আজ ত বেশ ভালোই আছেন।

শিশিরকুমার বললেন — হ্যাঁ, ভালোই আছি, তবে এই তোমার সঙ্গে শেষ দেখা।

শিশিরকুমার একটি তাকিয়া ঠেস দিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করলেন, প্রতিদিন এইভাবে কিছুক্ষণ ঘুমান তাঁর অভ্যাস। অল্পক্ষণ পরে জেগে উঠে কন্যা সুহাসনয়নাকে প্রশ্ন করলেন : সকলের আহারাদি পর্ব শেষ হয়েছে কিনা। তারপর 'নিতাই-গৌর' এই কথাটি উচ্চারণ করে তর্জনী উঠালেন। তাঁর কন্যা ভীত হয়ে সকলকে ডাকলেন। বেলা একটার সময় দেশপূজ্য মহাত্মা শিশিরকুমার স্বধামে প্রয়াণ করলেন। এই ঘটনাটি থেকে শিশিরকুমার অধ্যাত্মলোকে যে কি বিশেষ বিশেষ শক্তির অধিকারী হয়েছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ঘোষ পরিবার আজও স্বধর্মে অনুরাগী এবং শিশিরকুমার প্রভৃতি পূর্বপুরুষগণের চিন্তাধারায় বিশ্বাসী।

প্রেততত্ত্ব ও পরলোক সম্পর্কে আজো গবেষণার যথেষ্ট অবকাশ আছে। দুঃখের বিষয় এই বিষয়ে যতখানি আলোচনা হওয়া প্রয়োজন ইদানীং তেমন আর হয় না।

প্রাচীন গ্রীক ও মিশরীদের ধর্ম ও দর্শন গ্রন্থে পুনর্জন্মের আভাস পাওয়া যায়। "The Day after Death" নামক গ্রন্থে আছে—

"The re-incarnation of Souls is not a new idea; it is on the contrary, an idea as old as humanity itself. It is the metempsychosis, which from Indians passed to the Egyptians, from the Egyptians to the Greeks and which was afterwards professed by the Druids"

কালক্রমে যে তত্ত্বজ্ঞান প্রায় লুপ্ত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল মহাত্মা শিশিরকুমারের ঐকান্তিক চেষ্টায় তার পুনরুজ্জীবন ঘটেছিল।

হাওড়া কুষ্ঠ কুটির

৭২ বৎসরের প্রাচীন এই চিকিৎসাকেন্দ্রে সর্বপ্রকার চর্মরোগ, বাতরক্ত অসাড়তা, ফুলা, একজিমা, সোরায়াসিস, দূষিত ক্ষতাদি আরোগ্যের জন্য সাক্ষাতে অথবা পত্রে ব্যবস্থা লউন। প্রতিষ্ঠাতা : পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা কবিরাজ ১নং মাধব ঘোষ লেন খুরুট, হাওড়া। শাখা : ৩৬ মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা—৯। ফোন : ৬৭-২৩৫৯

শিশিরকুমার ও বঙ্গরঙ্গমঞ্চ

দেবনারায়ণ গুপ্ত

যে যুগে অভিনেতাকে 'মোটো' বলে লোকে ঘৃণায় মুখ ফেরাতো। নাট্যাভিনয়কে ভাল চোখে দেখতো না। উপরন্তু, তারা মনে করত, কতকগুলো খরচের খাতায় নাম লেখানো বখাটে ছেলেদের বদ আড্ডা হচ্ছে—ঐ থিয়েটারের রিহার্শালের ঘরগুলো। সেই যুগে কিন্তু 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় এদের পৃষ্ঠপোষকতা করে এসেছেন, আজকের দিনে একথা ভাবতেও বিস্ময় লাগে। সব বাধা এবং বিপক্ষ সমালোচনাকে তুচ্ছ করে এই সব ছোট ছোট নাট্যকে দলগুলোকে শিশিরকুমার কি উৎসাহ কি প্রেরণাই না দিয়েছিলেন। যে কজন শিক্ষিত ব্যক্তি সে যুগে নাট্যাভিনয়ের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে এ কাজে এগিয়ে এসেছিলেন, শিশিরকুমার তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

১৮৭২ সালে 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নামে সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় থেকেই কখনো প্রত্যক্ষ কখনো বা পরোক্ষভাবে শিশিরকুমার নাট্যশালার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এমন কি সে যুগে নাট্যশালার প্রয়োজনে শিশিরকুমার নাটক রচনাতেও মনোনিবেশ করেছিলেন। ১৮৭৩ সালের ৮ ফেব্রুয়ারী শিশিরকুমারের "নয়শো রুপেয়া" ন্যাশনাল থিয়েটারে এবং ১৮৭৪ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী "বাজারে লড়াই" গ্রেট ন্যাশনালে মঞ্চস্থ হয়।

শিশিরকুমারের থিয়েটারের প্রতি এই ঐকান্তিক অনুরাগ কিন্তু সে যুগের একশ্রেণীর শিক্ষিত ব্যক্তিদের কাছে অত্যন্ত সমালোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৮৭৯ সালের ১৯ এপ্রিল 'সুলভ সমাচার' লিখলেন—"ন্যাশন্যাল থিয়েটারের অনেক অভিযোগ আসিতেছে।...থিয়েটারের লোকেরা মন্দ স্ত্রীলোক লইয়া অভিনয় করে, মদ খায়, অভিনয় স্থলে মারামারি হুড়োহুড়ি করিয়া দক্ষযজ্ঞের ব্যাপার করিতেছে দেখিয়াও শিক্ষিত ভদ্রলোক উঁহাতে উৎসাহ দিয়া থাকেন, আমোদ করেন, তখন আর এ দুরাচার কে নিবারণ করিবে? এখন আবার বাবু না নিজের পরিবার লইয়া এ থিয়েটার করিয়া বসেন—আমাদের আশঙ্কা হইতেছে।"

এই রকম বিরুদ্ধ সমালোচনার সম্মুখীন হয়েও কিন্তু শিশিরকুমার আজীবন সক্রিয় সহযোগিতা করে এসেছেন এবং উৎসাহ দিয়ে এসেছেন থিয়েটারগুলোকে।

বিনোদিনী "আমার কথা" নামক আত্মজীবনীর এক জায়গায় লিখেছেন—'চৈতন্যলীলায় রিহার্শালের সময় অমৃতবাজার পত্রিকার এডিটার বৈষ্ণবচূড়ামণি পূজনীয় শ্রীযুক্ত শিশিরবাবু মহাশয় মাঝে মাঝে যাইতেন এবং আমার ন্যায় হীনার দ্বারা সেই দেবচরিত্র যতদূর সম্ভব সুরুচি সংযুক্ত হইয়া অভিনয় হইতে পারে, তাহার উপদেশ দিতেন এবং বার বার বলিতেন যে—"আমি যেন সতত গৌরপাদপদ্ম হৃদয়ে চিন্তা করি। তিনি অধমতারণ, পতিতপাবন, পতিতের উপর তাঁর অসীম দয়া।" তাঁর কথামত আমিও সতত ভয়ে ভয়ে মহাপ্রভুর পাদপদ্ম চিন্তা করিতাম।" বিনোদিনীর এই উক্তি থেকে শিশিরকুমারের নাট্যাভিনয়ের প্রতি সক্রিয় সহযোগিতার কথা বিশেষভাবে প্রকাশ পায়।

নটগুরু গিরিশচন্দ্র ছিলেন শিশিরকুমারের প্রতিবেশী। গিরিশচন্দ্র প্রতিবেশীদের কাছে ছিলেন বখাটেদের পর্যায়ে। কিন্তু তিনি ছিলেন শিশিরকুমারের অত্যন্ত প্রিয় পাত্র। ইংরাজীতে একটা কথা আছে—'Take their virtue not their fault' শিশিরকুমার গিরিশচন্দ্রের দোষগুলি ক্ষমাসুন্দর চক্ষে দেখতেন—আর তাঁর সৃজনী প্রতিভায় তিনি ছিলেন একান্ত গুণগ্রাহী। শিশিরকুমারের উৎসাহ ও স্নেহের প্রভাব গিরিশচন্দ্রকে যে কিভাবে প্রেরণা জুগিয়েছে তা একটি ঘটনা থেকেই বোঝা যায়।

গিরিশচন্দ্রের প্রথমা পত্নী প্রমোদিনীর যখন মৃত্যু হয়, গিরিশচন্দ্রের বয়স তখন ত্রিশ বৎসর। পত্নী বিয়োগের পর গিরিশচন্দ্র অত্যন্ত মানসিক আঘাত পান। যে সওদাগরী অফিসে চাকরী করতেন, তা ছেড়ে দেন। দিন-রাত দরজা বন্ধ করে পড়াশোনা করেন। মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনায় যোগদান করেন। এমন কি অভিনয় করাও ছেড়ে দেন। শিশিরকুমারের কানে কথাটা যায়। শিশিরকুমার গিরিশচন্দ্রকে ডেকে এনে নানাভাবে বুঝিয়ে শান্ত করেন। কিন্তু সে যুগে অভিনয় করে সংসার প্রতিপালন করা সম্ভব ছিল না। পাছে গিরিশচন্দ্র অভিনয় করা ছেড়ে দেন, তাই শিশিরকুমার ইণ্ডিয়ান লীগের (আজকের ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন) হেড ক্লার্ক ও ক্যাশিয়ারের চাকরীটি তাঁকে জুটিয়ে দেন।

সেদিন যদি শিশিরকুমার এমনি স্নেহ ও যত্নে গিরিশকে পাদপ্রদীপের আলোর সম্মুখে পুনরায় ফিরিয়ে না আনতেন, তাহলে হয়তো গিরিশ-প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ কোনদিনই হোত না, আর বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের পক্ষেও তার নব-নটগুরুকে পাওয়া সম্ভব হোত না।

সপ্তমবার মুদ্রিত হইল

সারদা-রামকৃষ্ণ

সন্ন্যাসিনী শ্রীদুর্গামাতা রচিত

যুগান্তর,—সর্বাশংসনীয় জীবনচরিত।... গ্রন্থখানি সর্বপ্রকারে উৎকৃষ্ট হইয়াছে।

আনন্দবাজার পত্রিকা,—ভক্তিমতী লেখিকার সরস ও সরল বর্ণনাভঙ্গী প্রথমেই বিশেষভাবে পাঠকের চিত্তে এক অপার্থিব ভাবলোক সৃষ্টি করে।...অনেক কথা আছে যাহা ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয় নাই।

অল ইণ্ডিয়া রেডিও,—বইটি পাঠক-মনে গভীর রেখাপাত করবে। যুগাবতার রামকৃষ্ণ-সারদা দেবীর জীবন আলেখ্যের একখানি প্রামাণিক দলিল হিসাবে বইটির বিশেষ একটি মূল্য আছে।

দৈনিক বসুমতী,—এইরকম যত্নভাবে রচিত জীবনকথা এই প্রথম প্রকাশিত হল। লেখিকা দেখিয়েছেন যে,...তাঁরা অভিন্ন ও একাত্মা। দেশ,—তিনি জাতির মহোপকার সাধন করিয়াছেন।...তিনি আমাদের জীবনকে অমৃতে অভিষিক্ত করিয়াছেন।

ডিমাই সাইজে ৪৫২ পৃষ্ঠা, বহিশখানি ছবি, একখানি ম্যাপ; বোর্ড-বাঁধানো সুদৃশ্য মলাট।

॥ মূল্য আট টাকা ॥

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম

২৬, মহারাণী হেমন্তকুমারী স্ট্রীট, কলিকাতা

ডেন্টল
(টুথ-এক্ ড্রপস)
দাঁত ও মাড়ীর ব্যথায় দ্রুত আরাম দেয় এবং দাঁতের গোড়া ও মাড়ীর ফোলা দূর করে।
বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা . বোম্বাই . কানপুর . দিল্লী

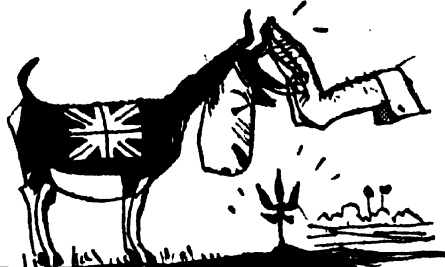
একটী শতবার্ষিকী

ভেবে দেখ মনে —

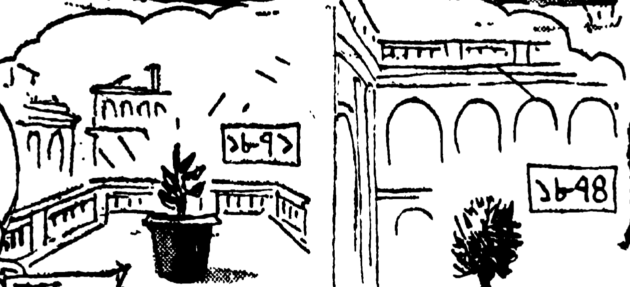
এক দিন শতবর্ষ আগে

অমৃত বাজার পত্রিকা

২০ ফেব্রুয়ারী ১৮৬৮ যশোহর

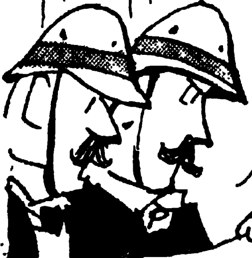


মানহানির প্রথম আক্রমণ - জুন. ১৮৬৮



স্থান - পরিবর্তন - কলকাতা হিদারাম বানার্জী লেন

বাগবাজার



এত বড় আস্পর্দ্ধা ? কোথাকার একটা নেটিভ সাপ্তাহিক, লিখেছে কিনা - পাবনা প্রজাবিদ্রোহ, আর বিহারে দুর্ভিক্ষ - এ সবই আমাদের অপশাসনের ফল !

সাপ্তাহিক অমৃত বাজার পত্রিকা

১৮৭৩ ১৮৭৪

অমৃত বাজার পত্রিকা সাপ্তাহিক (নেটিভদের কাগজ)

Amrita Bazar Patrika
ENGLISH WEEKLY
THE RULERS NEED NO LAW

আইনের আগের দিন

ভার্নাকুলার প্রেস আইন ১৮৭৮

আইনের পরের দিন

কী দুঃসাহস, এবার আমাদের কাপুরুষ বলে সম্বোধন করেছে !



ইলবার্ট বিল ১৮৮৩

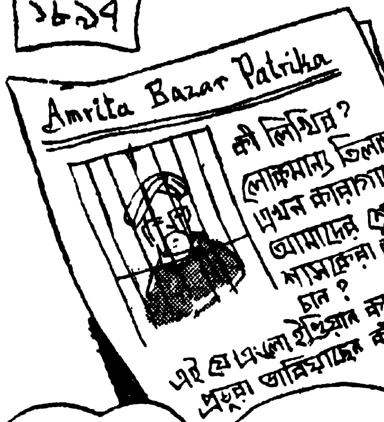
যেতে দাও ভাই ! নেটিভরা ৮০ বছরে সাবালক হয় !

AMRITA BAZAR PATRIKA (WEEKLY)
AGE OF CONSENT BILL
'ARE WE NOT HUMAN BEINGS?'

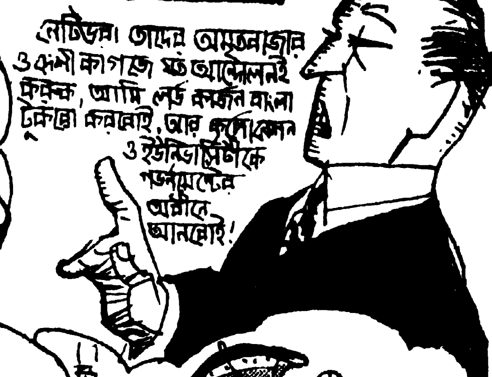
১৮৯১

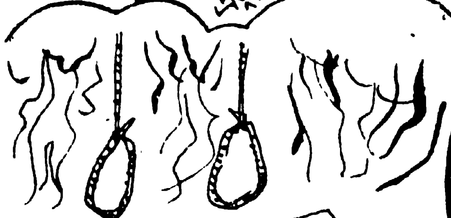


দৈনিক পত্রিকা ১৮৯১ ১৯ ফেব্রুয়ারী



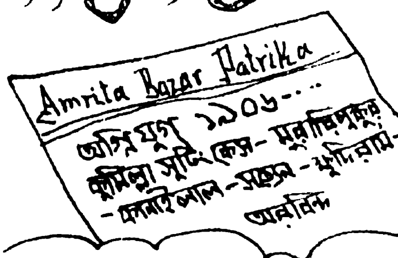


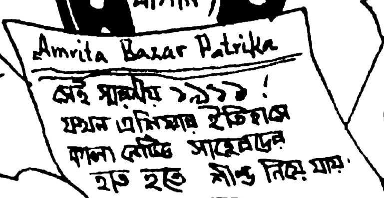


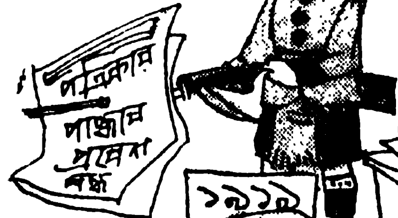








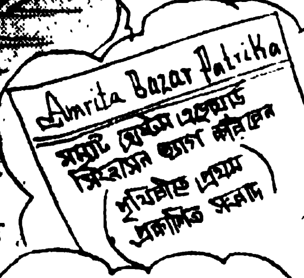






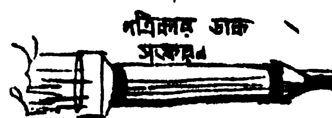








আজি হতে শত বর্ষ পরে·



COPYRIGHT RESERVED
TO PICIEL 1968

পত্রিকা শতবার্ষিকী ডাকটিকিট



আগামী ২০ ফেব্রুয়ারী অমৃতবাজার পত্রিকার শতবার্ষিকী উপলক্ষে ডাক ও তার বিভাগ ১৫ পয়সা মূল্যের এই বিশেষ ডাকটিকিট প্রচারের ব্যবস্থা করেছেন।

অমৃতবাজার পত্রিকা সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্য

পত্রিকার জন্ম : প্রথম সংখ্যা ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৮৬৮, বাংলো সাপ্তাহিক যশোরের (বর্তমানে পূর্ব-পাকিস্থানে) 'অমৃতবাজার' গ্রাম থেকে মুদ্রিত।

কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় ২১শে ডিসেম্বর ১৮৭১।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম স্বাক্ষরিত কবিতা ২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৮৭৫-এর পত্রিকায় প্রকাশিত হয় (তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৪ বছর)।

১৫ই মার্চ ১৮৭৪ ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট প্রচলন (লক্ষ্য পত্রিকা বন্ধ করা)। এই আইন এড়াবার জন্যে পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যা পুরোপুরি ইংরাজীতে প্রকাশিত হয়।

১৯শে ফেব্রুয়ারী ১৮৯১-এ এটি ইংরাজী দৈনিকে পরিবর্তিত হয়।

এর শুরু থেকেই পত্রিকার ওপর বহুবার অত্যাচার হয়। প্রথম জন্মের হয় প্রকাশনের চার মাসের মধ্যে। প্রধান মামলাগুলি অন্যত্র বর্ণিত হল।

পত্রিকার সহযোগী প্রকাশন হল নদার্ন ইন্ডিয়া পত্রিকা। এটি উত্তর প্রদেশ ও মধ্য-প্রদেশের সর্বাধিক প্রচারিত কাগজ (ভারতের দুটি বৃহত্তম ও জনবহুল প্রদেশ)। নর্দার্ন ইন্ডিয়া পত্রিকার সঙ্গে সংবাদ বিনিময় ও বিজ্ঞাপন বিনিময়ের ব্যবস্থা পত্রিকার আছে। উড়িষ্যা ও অন্ধ্রের জনসাধারণের অধিকতর সুবিধার জন্যে ১৯৬৬-র নভেম্বর থেকে কটক থেকেও পত্রিকা প্রকাশন হচ্ছে। উড়িষ্যা থেকে বর্তমানে এই একটিই ইংরাজী দৈনিক প্রকাশিত হয়।

বাংলার একটি জেলা থেকে শুরু করে আজ পত্রিকায় সারা ভারতের সংবাদ পরিবেশিত হয়। পূর্ব ও উত্তর মধ্য অঞ্চলের সংবাদ বিস্তৃতভাবে থাকে।

বিদেশে : বৈদেশিক পাঠকদের জন্যে বিভিন্ন দেশে পত্রিকা পাঠানো হয়।

পাঠকদের জন্যে : ভারত ও বিদেশের বিভিন্ন প্রধান সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের সভ্য হওয়া ছাড়াও (পি টি আই, রয়টার এ এফ পি, ইউ পি আই, ইউ এন আই এ পি এ, ডি পি এ ও নাফেন) বিশেষ সংবাদ সরবরাহের জন্যে সারা ভারতবর্ষে পত্রিকার শতাধিক সংবাদদাতা আছেন। বিদেশে লন্ডন, প্যারিস, মস্কো, ভিয়েনা (ইউরোপ), ওয়াশিংটন, নিউ ইয়র্ক (ইউ এস এ), হংকং, সিঙ্গাপুর সিডনি (অস্ট্রেলিয়া), নাইরোবি (আফ্রিকা), কায়রো (ইউ এ আর), বেইরুট (লেবানন)-এ পত্রিকার নিজস্ব সংবাদদাতা রয়েছেন যাতে পাঠকদের বিশ্বের সংবাদ ভালভাবে পরিবেশন করা যায়। এছাড়া পূর্ব ভারতের জন্যে একান্ত-ভাবে নিউইয়র্ক টাইমস নিউজ সার্ভিস-এর সঙ্গে বন্দোবস্ত আছে।

দ্রুত পরিবেশনের জন্যে পত্রিকার নিজস্ব টেলিপ্রিন্টার সার্ভিস রয়েছে : দিল্লী-কলকাতা, লক্ষ্ণৌ-এলাহাবাদ-কলকাতা, ভুবনেশ্বর-কটক-কলকাতা, পাটনা - কলকাতা, গৌহাটি - কলকাতা। টেলেক্স সার্ভিস : বোম্বাই - কলকাতা, দিল্লী-কলকাতা।

(সংকলন)

অবিস্মরণীয় সাক্ষাৎকার

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

ঐতিহাসিক নয়। তবে অবিস্মরণীয় নিশ্চয়ই বলা চলে। একটি তরুণ কিশোর জেলখানায় এসেছে। এক সাহেব-কয়েদীর সঙ্গে সে দেখা করতে চায়। জেলরক্ষকও সাহেব। ঐ কিশোর বালকটির প্রস্তাব শুনে তিনি [illegible] সোজা হাঁকিয়ে দিলেন। [illegible] ছেলেমানুষী চলবে না, [illegible]।

সারা বাংলাদেশ জুড়ে সেদিন এক টাল-মাটাল অবস্থা। শহর কলকাতার উত্তেজনা সব থেকে বেশি। জুলাই মাসের ভ্যাপসা গরমে হাঁসফাঁস করছে নগরবাসী। মাঝে মাঝে এক পশলা বৃষ্টি। তাতে গরম আরো বাড়ছে। দলে দলে সেদিন লোক চলেছে হাইকোর্টের দিকে। সেখানে নাকি দারুণ এক নাটক হচ্ছে। যাকে বলে রীতিমত নাটক, তাই। কেউ চলেছে হেঁটে। কেউ ঘোড়ার গাড়িতে। কেউ কেউ আবার পালকি করে এসে নামলেন হাইকোর্টের সিংহ-দরজায়। তারপর সবাই চললেন মরডান্ট সাহেবের এজলাসের দিকে। কেননা তিনিই হলেন নাটকের মূল গায়েন। তাঁর বিচারেই লঙ সাহেবের কয়েদ হতে চলেছে।

শুধু কয়েদ নয়, তা। সঙ্গে জরিমানাও হল।—লঙ সাহেবের অপরাধ? অপরাধ কি গুরুতর। মানহানি। সাহেব 'নীলদর্পণ' নামক একটি বাঙলা নাটকের অনুদিত ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশ করেছেন। সেদিন নীলকরদের অত্যাচারের গ্রাম বাঙলার ঘরে ঘরে কান্নার কলরোল। 'ইংলিশম্যান' ও 'হরকরা' প্রশ্রয়ে নীলকরদের বেজায় দর্প। খুন-জখম এবং লুঠতরাজ ও অগ্নিসংযোগ কিছুতেই তাদের ঘৃণা নেই। না, কিছুতেই তাদের হাত ময়লা হয় না। নীলকরদের এহেন অত্যাচারে নেটিভদের সঙ্গে একদল সাহেবও যথেষ্ট মর্মপীড়া অনুভব করেছিলেন। লঙ সাহেব হলেন তাঁদের একজন। তাই নীল-যন্ত্রণার কাহিনী নিয়ে যেদিন নীলদর্পণ রচিত হয়, সাহেব সেদিন খুবই খুশি হয়েছিলেন। আর মাইকেল মধুসূদন দত্ত যেদিন রাতারাতি নাটকটিকে অনুবাদ করে দিলেন, সাহেব নিজেই সেদিন তার প্রকাশের ব্যবস্থা করলেন তাড়াতাড়ি।

আর ঐ বই প্রকাশ করেই তিনি কাল করলেন। সাহেব অবশ্য এমন ঘটনা যে ঘটবে তা জেনে-শুনেই এ কাজে হাত দিয়েছিলেন। তাই হাসিমুখেই তিনি জেলখানার দিকে পা বাড়ালেন। সাহেবী পত্রিকার সম্পাদকেরা এবং নীলকরেরা ভারি খুশি। তাঁরা ফলাও করে মরডান্ট ওয়েলসের মহিমা কীর্তন করতে লাগলেন। এবং প্রাণভরে গালাগাল দিলেন লঙকে।

কিন্তু এদিকে? নেটিভ পাড়ায় সেদিন হাঁড়ি চড়ল না। আলো জ্বলল না ঘরে। গভীর বিষাদে কালো কলকাতা থমথম করতে লাগল।

সেদিন লঙ সাহেবের কথা না জানে কে? — সাহেবের পুরো নাম, রেভারেণ্ড জেমস লঙ। আঠারোশ বিয়াল্লিশ থেকে ছেচল্লিশের ভেতর কোন এক সময় তিনি এদেশে এসেছিলেন। চব্বিশ পরগণার ছোট্ট একটি গ্রাম, ঠাকুরপুকুর। সেখানে এসে উঠলেন। আম-কাঁঠালের ছায়ায়-ঘেরা ছোট্ট লোকালয়। বাঁশ বাগানের মাথায় চাঁদ ওঠে। আর বর্ষাকালের অন্ধকার রাতে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি ঝরে। চারদিকের খালবিল জলে ভরে যায়। উঁচু টিলার ওপর ছোট ছোট গ্রামগুলি কেবল জেগে থাকে। হ্যাঁ, বছরে আট মাস চারদিক জলে ভরে থাকে। শালতি অথবা ডোঙা দিয়ে যাতায়াত করতে হয়।

যাই হোক, খৃস্টধর্ম প্রচারের জন্য এখানে ছোট্ট একটি আখড়া ছিল। লঙ সাহেব সে আখড়ার বোষ্টম হয়ে এলেন। নাতিদীর্ঘ মানুষটি হাসিখুশিতে ভরা। যদিও সাহেব, কিন্তু নেটিভদের প্রতি মমতায় তাঁর হৃদয় গলে যায়। আর দুঃখ দেখলে ত কথাই নেই। তাঁর আইরিশ রক্তে সেদিন করুণার বান ডেকে যায়। তাই নেটিভ মহলে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়তে দেরী হল না। সাহেব রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেলেন।

বৃটিশদেশে কেটেছিল তাঁর কৈশোর। সেখানে তৈরী হয় তাঁর এশিয়া-প্রীতি। তাই খুব অল্প বয়সেই আদর্শ মিশনারির ব্রত তিনি গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে 'চার্চ অব ইংলণ্ডের' কাছ থেকে 'ডেকন' উপাধি পান। পরের বছরে হন 'প্রিস্ট'। তারপর আসেন এদেশে। এই বাঙলাদেশে।

এদেশের মাটিতে সাহেব যেদিন এসে পা দিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তখন নিতান্তই শিশু। সম্ভবত বাবার কর্মস্থল মেদিনীপুরে তাঁর দিন কাটছে। মধুসূদন সম্ভবত তখন মাইকেল হয়ে গেছেন। শুধু তাই নয়, বোধহয় তখন তিনি মাদ্রাজের অজ্ঞাতবাসে। আর নাট্যকার দীনবন্ধু? — তিনি তখন তরুণ কিশোর। শহর কলকাতার অদূরে গন্ধর্বনারায়ণ হয়ে বোধহয় পিতা কালাচাঁদ মিত্তিরের দপ্তর আলোকিত করছেন। আর অমৃতবাজার পত্রিকার জন্ম হতে তখনো দু যুগ দেরী।

ক্রমে ক্রমে দিন বদলাল। উনিশ শতকের নবজাগরণের ফলে চারিদিকে নানা পরিবর্তন দেখা দিল। দেখা গেল সৃষ্টির উল্লাস। রেভারেণ্ড জেমস লঙ এই সৃষ্টির নেশায় মেতে গেলেন। যেখানেই আমাদের অপূর্ণতা সেখানেই তিনি ছাতা ধরতে লাগলেন।

'চার্চ অব ইংলণ্ড' সাহেবকে এদেশে পাঠিয়েছিল মিশনের কাজে। প্রথম দিকে সাহেব সেদিকে সম্ভবত সচেতন ছিলেন। সেই খৃস্টীয় অনুরাগে তাঁর প্রথম গ্রন্থ লিখিত হয়। আঠারোশ' আটচল্লিশে তাঁর যে বইটি বেরোয়, সেটি হল, 'হ্যাণ্ড বুক অব বেঙ্গল মিশনস'। হ্যাঁ মিশনারিদের কাজে লাগার মত বই।

এর পর রেভারেণ্ড জেমস লঙ আমাদের কাজে নেমে পড়লেন। তাড়াতাড়ি তিনি এদেশের ভাষাটি রপ্ত করে ফেললেন। শুধু

অধ্যক্ষ জয়কৃষ্ণ মাইতি প্রণীত

১। সঙ্গীত শাস্ত্র প্রভাকর—৩,
২। তবলা প্রভাকর ২॥০
৩। তবলা শাস্ত্র প্রভাকর—৯,

বাংলা ও হিন্দীতে এইরূপ বই নাই

প্রাপ্তিস্থান—সংগীত কনফেক্স,
দেবীপুর, মেদিনীপুর এবং কলকাতার বিভিন্ন দোকান।

ভারতকোষ

চারি খণ্ডে প্রামাণিক বিশ্বকোষ

তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে—২০.০০

প্রথম ও দ্বিতীয় : প্রতি খণ্ড ২০.০০

॥ কলিকাতাস্থ বিক্রয়কেন্দ্র :

সান্যাল অ্যাণ্ড কোং—১২; দাশগুপ্ত অ্যাণ্ড কোং—১২; জিজ্ঞাসা—১২/২৯;
ইণ্ডিয়ান বুক ডিস্ট্রিবিউটিং কোং—৯ ॥

এবং

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ

২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬

রুস্ত নয়, ভাষা ও সাহিত্যের জন্য পরিশ্রমও আরম্ভ করে দিলেন। মিশন সম্পর্কীয় গ্রন্থখানি প্রকাশের তিন বছর পরেই আমরা পেলুম বাংলা প্রবাদসংগ্রহের একখানি বই। সেকালের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থখানি যে অপরিসীম মূল্যের অধিকারী তা বলা নিষ্প্রয়োজন।

সেদিন শুধু ভাষা নয়, চারিদিকেই আমাদের কৌতূহল। সেই কৌতূহল মেটানোর কাজেও সাহেব হাত দিলেন। তখনো রেললাইন সারা দেশ জুড়ে পাতা হয় নি। দূরকে নিকট করার কোন পথ ছিল না। তাই সাহেব যখন কলকাতা থেকে দিল্লী চললেন, তাঁর অভিজ্ঞতা কলম দিয়ে ধরে রাখলেন আমাদের জ্ঞাতার্থে। সাহেব ইস্কুল খুললেন। কিন্তু কি পড়াবেন? সেদিন আমাদের দেশে কোন স্পষ্ট শিক্ষাদর্শ ছিল না। সুতরাং শিক্ষাব্রতীর পক্ষে কি করণীয়? — ইস্কুল চালাতে গিয়ে সাহেব নিজে যা অনুভব করলেন তা নিয়ে একটি বইও লিখে ফেললেন। বইটির নাম, 'হোয়াট মে বি ডান : এ ট্রাক্ট ফর পারসন্স এনগেজ্‌ড ইন এডুকেশন'। সেদিন ছাপাখানার আবির্ভাবের ফলে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যে জোয়ার এসেছে। কত বই বেরোচ্ছে, কত পত্রিকা সম্পাদিত হচ্ছে। — কে তাদের হিসাব রাখে? আর হিসাব না রাখলে পরবর্তীকাল তাদের কি কোন কালে জানতে পারবে? — যাই হোক, সাহেব এ দায়িত্ব নিজের কাঁধেই তুলে নিলেন। সেকালে প্রকাশিত চোদ্দশ বাঙলা বইয়ের বর্ণনামূলক একটি তালিকা তিনি পরবর্তীকালের জন্য প্রণয়ন করে গেলেন।

না, বেশি গভীরে না গেলেও চলে। লঙ সাহেব সেদিন নেটিভদের স্বার্থে যা করে গেছেন তা অভাবনীয়। বাঙলাদেশের ঘরে ঘরে সেদিন তাঁর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হত। আর তিনি যে শেষপর্যন্ত নীল-দুশমনদের সঙ্গেও পাঞ্জা লড়বেন তাতে আর বিস্ময়ের কি?



আপনার ইচ্ছেমত সস্তা বা দামী যে' কোন কলম আপনি পছন্দ করতে পারেন ; কারণ,
কেমিঙ্ক —তাড়াতাড়ি শুকোয়, অবাধে লেখা হয় এবং জমাট বাঁধেনা। সেই জন্য কেমিঙ্ক সব রকম কলমের পক্ষে উপযোগী।
সলভেন্ট 'এ'—যুক্ত কেমিঙ্ক দিয়ে লিখে আপনার কলমের উপযুক্ত ব্যবহার করুন।
—লিখে আনন্দ কেমিঙ্কে
বেঙ্গল কেমিক্যাল কলিকাতা, কানপুর, দিল্লী, বোম্বাই।

কিন্তু তাই বলে লঙ সাহেবের যে জরিমানা ও কয়েদ হবে তাও কেউ ভাবে নি। একজন নেটিভ জমিদার জরিমানার টাকা বনাৎ করে কোর্টে ফেলে দিলেন। কিন্তু তাঁর হয়েত আর জেল খাটা যায় না। আইনে আটকায়। নইলে তাতেও নেটিভরা পিছপা ছিল না। কিন্তু এখন কি হবে?

আগেই বলেছি সেদিন এ দুশ্চিন্তায় থমথম করতে লাগল কলকাতা। নেটিভ পাড়ায় কারো বাড়িতে আর হাঁড়ি চড়ল না। আবালবৃদ্ধবনিতা অঝোরে কাঁদল। পল্লীগ্রামের কৃষককুল মাথার চুল ছিঁড়ল আর বুক চাপড়ে হাহুতাশ করতে থাকল। এতদসত্ত্বেও সাহেবকে কিন্তু জেলেই নিয়ে যাওয়া হল।

পরের দিন সকালবেলায় জেলরক্ষকেব যখন ঘুম ভাঙল, তিনি সবিস্ময়ে দেখলেন জেলখানার দরজায় সাংঘাতিক ভিড়। চাপরাসীকে ডেকে সাহেব জিগ্যেস করলেন, 'কি ব্যাপার, এত ভিড় কিসের?'

চাপরাসী এসে সেলাম দিয়ে বলল : 'হুজুর, ওনারা সব লঙ সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চান।'

সাহেব ভাল করে একবার ভিড়ের দিকে চোখ তুলে দেখলেন। শুধু নেটিভ নয়, অনেক সাহেবও সেখানে দাঁড়িয়ে। ওপরে তিন তলার একটি কক্ষে লঙ সাহেবকে রাখা হয়েছিল। মিসেস লঙকেও থাকার জন্য দেওয়া হয়েছিল বিশেষ অনুমতি। এবার দর্শনার্থীদের এক এক করে বিশেষ অনুমতি দিলেন জেলার সাহেব।

এইভাবে অনুমতি দিতে দিতে একটি কিশোর ছেলের দিকে নজর পড়ল সাহেবের। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এলো, 'তুমি কি চাও খোকা, তুমিও কি লঙ সাহেবের দর্শনার্থী?'

ছেলেটি ঘাড় নেড়ে জানাল, হ্যাঁ।

কেন কে জানে জেলার সাহেব ছেলেটিকে হটিয়ে দিলেন। বললেন, না বাপু, ওসব ছেলেমানুষী চলবে, না। ভাগো হটো।

কিন্তু ছেলেটি সহজে হটবার পাত্র নয়। সে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। ঘাড় নীচু করে। মনে হল মুখ তুললেই টস টস করে গড়িয়ে পড়বে চোখের জল।

ছেলেটির আগ্রহ ও বয়সের কথা বিবেচনা করে শেষপর্যন্ত জেলার সাহেবের দয়া হল। তিনি অনুমতি দিলেন। এইবার ছেলেটির চোখ দিয়ে লঙ সাহেবকে দেখবার চেষ্টা করা যাক।

সেই কিশোর বালকটিকে তিনতলায় ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। সে যখন সেখানে

গিয়ে পৌঁছল, ঘরে তখনো অনেক লোক। দরজার কাছেই লঙ সাহেব দাঁড়িয়ে ছিলেন। দাড়িগোঁফের আড়ালে তাঁর চিন্তাকুল মুখাবয়ব ঠিক স্পষ্ট নয়। মেম সাহেব কি যেন একটা গৃহস্থালী কাজ করছিলেন। সম্ভবত সাহেবকে প্রাতরাশ দেওয়ার পর পেয়ালা-পিরিচগুলি সাজিয়ে রাখছিলেন। কিশোর বালকটি নিতান্তই সরল। অনুভূতি চেপে রাখার মতন তার বয়স হয় নি। আর তা সে শেখেও নি। কেন কে জানে, সাহেবকে দেখামাত্রই তার দুচোখ জলে ভরে এলো। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। মনে হল, সে যেন তার আপন প্রিয়জনকে হারিয়ে ফেলেছে।

•

এহেন দৃশ্য দেখে সাহেবও রীতিমত নার্ভাস। তাঁর চোখেও জল টলটল করে উঠল। কোনরকমে তিনি তা সংবরণ করলেন। তা সত্ত্বেও দুএক ফোঁটা জল যে [illegible] বেয়ে নেমে না-এলো, তা নয়।

'ছিঃ, ছেলেমানুষী করতে নেই', এই বলে সাহেব ছেলেটির পিঠ চাপড়ে দিলেন। না, তবু ছেলেটির চোখের জল বাধা মানে না। সাহেব তখন তাকে আরো কাছে টেনে নিলেন। খবরের কাগজটি মেঝের ওপর পড়েছিল সেটি তুলে নিলেন। তারপর আদর করে বললেন, 'এই দেখ খবরের কাগজে আমার সম্বন্ধে কি লিখেছে, দেখছ?' তারপর খবরের কাগজ থেকে লেখাটি নিজেই পড়ে শোনালেন, 'দি প্ল্যান্টার্স মাস্ট নট থিংক দ্যাট অ্যাটেন্ড এ ডিকটেটিং [illegible] দি রেভারেন্ড জে লঙ টু প্রিজন— রেভারেন্ড জেমস লঙকে জেলে পাঠিয়ে নীলকরেরা যদি ভেবে থাকে যে তারা জিতেছে, নাঃ তবে তারা ভুল ভেবেছে।' সাহেব কথাটি পুনরাবৃত্তি করলেন। একবার নয়। দুবার।

সেই কিশোর ছেলেটির এ কথাগুলি শুনতে ভালই লাগছিল। তাই অবাক হয়েই সে শুনেছিল। লঙ সাহেব তাকে বুঝিয়ে বলছিলেন, ছিঃ এতে কি কাঁদতে আছে? মানবজাতির কল্যাণের জন্য এ জাতীয় আত্মোৎসর্গ সর্বদাই দরকার।

একটি ছোট ছেলেকে বোঝাবার জন্য সাহেব হয়ত ক্রাইসটের গল্পই ফেঁদে বসেছিলেন।

এইভাবে আলোচনা যখন জমে উঠেছে, একজন চাপরাসী এসে সেলাম জানাল। তারপর একটি কাগজ মোড়া প্যাকেট এগিয়ে ধরল সাহেবের দিকে। কাগজের আবরণটি সাহেব খুলে ফেললেন। এবং ঐ আবরণটি খোলার পর বেরিয়ে এলো একটি সম্বর্ধনা-লিপি। একটি অ্যাড্রেস। বৃটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন সেকালের একটি বিখ্যাত সভা। অনেক তাবড় তাবড় লোক সে সভার সদস্য। তাঁরা ঐ অ্যাড্রেসটি পাঠিয়েছেন সাহেবকে। তলায় সদস্যদের স্বাক্ষর। দেখা গেল, সেকালের কলকাতার কোন সাহেব-শ্যা বাদ পড়েন নি।

ঘর ভরা লোক। অথচ বসবার জন্য সাহেবকে মাত্র দুটি চেয়ার দেওয়া হয়েছিল। তাই কারোর পক্ষেই বসা সম্ভব হচ্ছিল না। শেষপর্যন্ত সাহেব মাদুরে বিছানো মেঝের ওপরই বসে পড়লেন। সম্বর্ধনালিপিতে কটা সই আছে, কাগজের ওপর ঝুঁকে পড়ে তাই গুনতে আরম্ভ করলেন। দেখা গেল মোট সাতশ' লোকের সই রয়েছে। সাতশ'। মেমসাহেব একটু দূরে দাঁড়িয়েছিলেন। নামগুলি শোনার জন্য তিনি কৌতূহল প্রকাশ করলেন। — সাহেব হাসতে হাসতে সে নামগুলি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়তে আরম্ভ করে দিলেন।

জুলাই মাসের সকাল ধীরে ধীরে দুপুরের দিকে গড়াতে লাগল। রোদ্দুরের তাপ প্রখর হল। এরই ফাঁকে ঝির ঝির করে একটু বৃষ্টিও হয়ে গেল। ভ্যাপসানি গরমে সকলেই একটু হাঁসফাঁস করতে থাকলেন। ঘামে সাহেবের পিঠটা ভিজে উঠল। হাতপাখাটি খুঁজে নিয়ে সাহেব একটু হাওয়াও খেলেন। এমন সময় কেল্লার তোপ পড়ল।

না, সাহেবকে আর বিরক্ত করা ঠিক নয়। এই বলে সকলেই উঠে পড়লেন। সাহেব ধীরে ধীরে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এলেন, তারপর বললেন : 'ইউ মাস্ট নো দি প্ল্যান্টার্স আর ডুমড অব দে উড নট গ্রাউন্ড অ্যাডপটেড সাচ মিন্স টু স্ট্রাইফল ইনকোয়ারি' — নীলকরদের দিন যে ঘনিয়ে এসেছে তা ওদের ঝগড়ার বহর দেখেই বোঝা যাচ্ছে—সুতরাং মা ভৈষীঃ — স্পষ্ট অথচ দৃঢ় কণ্ঠে সাহেব কথাকটি উচ্চারণ করলেন।

* * *

এই সাক্ষাৎকারটি যখন ঘটে তখনো অমৃতবাজার পত্রিকার জন্ম হয় নি। এর থেকে ছ বছর পরে তার আবির্ভাব। কিন্তু এই সাক্ষাৎকারের বিবরণটি অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। প্রকাশের তারিখ হল — আঠারোশ' সাতাশি সাল, উনিশে মে। সম্পাদকীয় মন্তব্যের ঘরে এটি দেখতে পাওয়া যায়। কোন এক সাংবাদিকের ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণার দ্বারা এটি রচিত।

একবারে অকারণে নয়। কারণ ছিল। সপ্তাহ তিনেক আগে মার্চ মাসের তেইশ তারিখে সেই ভয়ংকর ঘটনাটি ঘটে। শহর লন্ডনের অ্যাডেলফি পল্লীতে শীতের আমেজ কেটে আসছিল। গাছগুলিতে হয়ত লাগছিল নববসন্তের ছোঁয়া। হ্যাঁ, ঠিক সেই সময় অ্যাডাম স্ট্রীটের তিন নম্বর বাড়িতে ভারতবন্ধু রেভারেন্ড লঙের জীবনাবসান হয়। সপ্তাহ তিনেক পরে ঐ দুঃসংবাদ যখন ভারতে এসে পৌঁছয়, তখন এ বঙ্গের নেটিভদের এতই বুকে বাজে যে, তারা গুছিয়ে একটি লাইনও লিখতে পারে নি। সেই শোকের ছায়ার এই স্মৃতিচারণটি প্রকাশিত হয়।

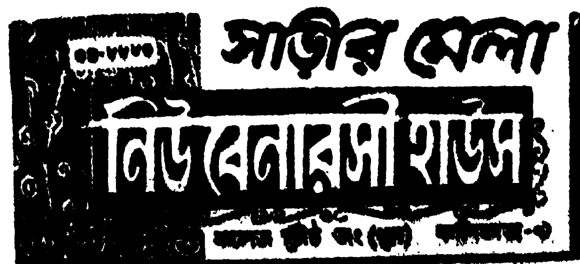
এখন একটি জিজ্ঞাসা থেকে যায় ঐ লিপিটি কে, যিনি পরবর্তীকালে পত্রিকার পাতায় তাঁর চোখে দেখা লঙ সাহেবের ছবি এঁকেছেন? — এ কথার স্পষ্ট জবাব দেওয়া কঠিন। তবে আমরা যদি মহাত্মা শিশিরকুমারকে এর রচয়িতা মনে করি, তাহলে হবে অসঙ্গত হবে কি? নীল আন্দোলনে তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকা সর্বজনস্বীকৃত। সুতরাং লঙ সাহেবের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা মোটেই আশ্চর্যের নয়।

আঠারোশ' বাহাত্তর সালে ঐ রকম এক বসন্তকালে যখন তিনি চিরদিনের মত এই ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যান, তখন শিশিরকুমার লিখেছিলেন—

'When we shall have occasion to see our ricefields overflowing with crops, our cultivators with their family members enjoying hearty meals, happy and contended, we will gratefully remember this English — Rev James Long'.

সোনার ফসলে যখন আমাদের খেত-খামার ভরে উঠবে, আমাদের কৃষকেরা যেদিন সপরিবারে দুমুঠো অন্ন পেট ভরে খেতে পাবে, সুখী ও সন্তুষ্টচিত্তে বসবাস করতে সক্ষম হবে, হ্যাঁ সেদিন আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে ঐ ইংরাজ সন্তানকে—রেভারেন্ড জেমস লঙকে স্মরণ করব।

না, ঐতিহাসিক নয়। তবে তাঁরই এক অবিস্মরণীয় চিত্র লুকিয়ে আছে পত্রিকার পাতায়। এবং এর রচয়িতা আর কেউ নন, স্বয়ং শিশিরকুমার।



হিন্দুমেলার উপহার

রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'হিন্দুমেলার উপহার'। ১৮৭৫ খৃঃ ২৫ ফেব্রুয়ারী (১৪ ফাল্গুন ১২৮১ সাল) অমৃতবাজার পত্রিকায় কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল। সম্পূর্ণ কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত হোল :

হিমাদ্রি শিখরে শিলাসন পরি,
গান ব্যাস-ঋষি বীণা হাতে করি-
কাঁপায়ে পর্বত শিখর কানন,
কাঁপায়ে নীহার শীতল বায়।

স্তব্ধ শিখর স্তব্ধ তরুলতা,
স্তব্ধ মহীরুহ নড়েনাক পাতা।
বিহগ নিচয় নিস্তব্ধ অচল;
নিরবে নির্ঝর বহিয়া যায়।

পূরণিমা রাত চাঁদের কিরণ—
রজত ধারায় শিখর কানন,
সাগর-ঊরমি, হরিত-প্রান্তর,
প্লাবিত করিয়া গড়ায়ে যায়।

৪

ঝঙ্কারিয়া বীণা কবিবর গায়,
"কেনরে ভারত কেন তুই হায়,
আবার হাসিস্! হাসিবার দিন
আছে কি এখনো এ ঘোর দুঃখে!

৫

দেখিতাম যবে যমুনার তীরে,
পূর্ণিমা নিশীথে নিদাঘ সমীরে,
বিশ্রামের তরে রাজা যুধিষ্ঠির;
কাটাতেন সুখে নিদাঘ নিশি।

৬

তখন ও হাসি লেগেছিল ভাল,
তখন ও বেশ লেগেছিল ভাল,
শ্মশান লাগিত স্বরগ সমান,
মরু উরবরা ক্ষেত্রের মত।

তখন পূর্ণিমা বিতরিত সুখ,
মধুর উষার হাস্য দিত সুখ,
প্রকৃতির শোভা সুখ বিতরিত
পাখীর কূজন লাগিত ভাল।

এখন তা নয়, এখন তা নয়,
এখন গেছে সে সুখের সময়।
বিষাদ আঁধার ঘেরেছে এখন,
হাসিখুসি আর লাগে না ভাল।

আমার আঁধার আসুক এখন,
মরু হয়ে যাক্ ভারত কানন,
চন্দ্র সূর্য হোক মেঘে নিমগন
প্রকৃতি শৃংখলা ছিঁড়িয়া যাক্।

১০

যাক ভাগিরথী অগ্নিকুণ্ড হয়ে
প্রলয়ে উপাড়ি পাড়ি হিমালয়ে,
ডুবাক্ ভারতে সাগরের জলে,
ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ভাসিয়া যাক্।

১১

চাই না দেখিতে ভারতেরে আর,
চাই না দেখিতে ভারতেরে আর,
সুখ-জন্ম-ভূমি চির বাসস্থান,
ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ভাসিয়া যাক্।

১২

দেখেছি সে দিন যবে পৃথিবরাজ,
সমরে সাধিয়া ক্ষত্রিয়ের কাজ,
সমরে সাধিয়া পুরুষের কাজ,
আশ্রয় নিলেন কৃতান্ত কোলে।

১৩

দেখেছি সে দিন দুর্গাবতী যবে,
বীরপত্নীসম মরিল আহবে
বীর বালাদের চিতার আগুন,
দেখেছি বিস্ময়ে পুলকে শোকে।

১৪

তাদের স্মরিলে বিদরে হৃদয়,
স্তব্ধ করি দেয় অন্তরে বিস্ময়;
যদিও তাদের চিতা ভস্মরাশি
মাটির সহিত মিশায়ে গেছে!

১৫

আবার সেদিন (ও) দেখিয়াছি আমি,
স্বাধীন যখন এ ভারত ভূমি,
কি সুখের দিন! কি সুখের দিন!
আর কি সে দিন আসিবে ফিরে?

১৬

রাজা যুধিষ্ঠির (দেখেছি নয়নে,)
স্বাধীন নৃপতি আর্য সিংহাসনে,
কবিতার শ্লোকে বীণার তারেতে,
সে সব কেবল রয়েছে গাঁথা!

১৭

শুনেছি আবার শুনেছি আবার,
রাম রঘুপতি লয়ে রাজ্যভার,
শাসিতেন হায় এ ভারত ভূমি,
আর কি সেদিন আসিবে ফিরে!

১৮

ভারত কঙ্কাল আর কি এখন,
পাইবে হায়রে নূতন জীবন;
ভারতের ভস্মে আগুন জ্বালিয়া,
আর কি কখন দিবেরে জ্যোতি।

১৯

তা যদি না হয় তবে আর কেন,
হাসিবি ভারত! হাসিবিরে পুনঃ
সে দিনের কথা জাগি স্মৃতি প[illegible]
ভাসে না নয়ন বিষাদ জলে?

২০

আমার আঁধার আসুক এখন,
মরু হয়ে যাক্ ভারত কানন,
চন্দ্র সূর্য হোক মেঘে নিমগন,
প্রকৃতি-শৃংখলা ছিঁড়িয়া যাক্।

২১

যাক্ ভাগিরথী অগ্নিকুণ্ড হয়ে,
প্রলয় উপাড়ি পাড়ি হিমালয়ে,
ডুবাক ভারতে সাগরের জলে,
ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ভাসিয়া যাক্।

২২

মুছে যাক্ মোর স্মৃতির অক্ষর
শূন্যে হোক্ লয় এ শূন্য অন্তর,
ডুবুক আমার অমর জীবন,
অনন্ত গভীর কালের জলে।"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দাদার ঘনশ্যামের রোমাঞ্চ কাহিনী—(৭)

বিদ্যুৎ চমকালো।

যেন লক্ষকোটি ঝাড়লন্ঠন নিমেষের জন্যে জ্বলে উঠেই নিভে গেল ঘনকৃষ্ণ আকাশের অবগুন্ঠন তলে।

চোখঝলসানো সেই ক্ষণিক আলোকেই স্পষ্ট হয়ে উঠল এ কাহিনীর প্রথম দৃশ্যপট। ঝকঝকে রূপোলী আলোয় দেখা গেল এক বিশাল অরণ্য। অরণ্যের বিশেষ এক ঝাঁকড়া গাছের নিচে সতরঞ্চি বিছিয়ে বসে একদল মেয়েপুরুষ। আসন্ন ঝড়ের সংকেতে তারা বাসনপত্র গুছোতে ব্যস্ত।

বুনো ঘোড়ার কালো কেশরের মত পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ যেখানে ছুটছে, তার নিচে দেখা গেল কুতুবমিনারের কাছাকাছি যায় এমনি উঁচু চারটে মিনার। মাঝখানে বিশাল গম্বুজ। চারদিকে প্রাকার এবং পরিখা।

মসীকৃষ্ণ এই রেখাচিত্র বিশালগড়ের। অরণ্যের মধ্যে প্রোথিত ঐতিহাসিক বিশাল-গড়। বহু কাহিনী, বহু হাহাকার, বহু দীর্ঘশ্বাসবিজড়িত বিশালগড়। বহু কিংবদন্তী, বহু উপকথা, বহু নাটকের রঙ্গমঞ্চ বিশালগড়।

চোখঝলসানো সেই বিদ্যুতের আলো গলিত রৌপ্যধারার মতই ঝরে পড়ল আর একটি অঙ্গ বেয়ে। ঝাঁকড়া গাছের নিচেই দাঁড়িয়েছিল একটি মনুষ্যমূর্তি। দাঁড়িয়েছিল পাথরকুঁদে তৈরী গ্র্যানাইট মূর্তির মত। পিকনিক পার্টির আর সবাই যখন সতরঞ্চিতে বসে জিনিসপত্র গুছোতে ব্যস্ত, দীর্ঘদেহ এই ব্যক্তি তখন একাই দাঁড়িয়েছিল ঝাঁকড়া গাছের ঘুপসি অন্ধকারে—দূরের বিশাল-গড়ের আকাশছোঁয়া মিনারের মতই নিষ্বাত-নিষ্কম্প দেহে।

লোকটির অনড় দেহভঙ্গিমার মধ্যে এমন একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, যা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ব্যাকব্রাশকরা এক মাথা কুচকুচে কালোচুল, শংকর মাছের চাবুকের মত ছিপ-ছিপে তেজালো চেহারা, গ্রীক ভাস্করের হাতে কোঁদা মূর্তির মত বীরত্বব্যঞ্জক চোখ মুখ নাক চিবুক। সব মিলিয়ে মানুষটির চেহারা সিনেমার হিরোর মত।

আর, বাস্তবিকই ইনি একজন স্বনামধন্য চিত্রতারকা। যার প্রতিভার দ্যুতিতে মুহুর্মুহু ঝলসে উঠেছে চিত্রজগৎ, যার আবির্ভাব উল্কার মত, শ্রেষ্ঠ অভিনেতার বহু পুরস্কার যিনি বারংবার জয় করে এনেছেন দেশবিদেশের বহু ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল থেকে—ইনিই সেই আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন ভারতগৌরব ফিল্মস্টার কাঞ্চনকুমার।



স্ট্যাচুর মতই অচঞ্চল দেহে দাঁড়িয়ে রইল কাঞ্চনকুমার এবং বজ্রপাতের আওয়াজটা শোনা গেল তখনি।

যেন হাজার হাজার দামামা বেজে উঠল আকাশের এ প্রান্ত থেকে সে প্রান্ত পর্যন্ত... গুরু গুরু শব্দ ক্ষীণ হয়ে আসতেই নড়ে উঠল কাঞ্চনকুমারের গ্র্যানাইট মূর্তি।

বলল প্রশান্ত কণ্ঠে, "প্রায় এক মিনিট।"

"তার মানে?" প্রশ্ন করল দিবস নামধারী হাওয়াই শার্ট পরা যুবক।

"বিদ্যুত চমকানোর প্রায় এক মিনিট পরেই শোনা গেল শব্দটা। ঝড়ের খুব দেরি নেই। বৃষ্টি এলে এ গাছটাই ছাতার কাজ করবে।"

দলের একমাত্র মহিলা সত্যবতী কাতরকণ্ঠে বললেন,—"তার আগেই কোথাও মাথা গুঁজতে পারলে ভাল হত না?"

দিবস বললে, "দূরের ঐ কেল্লাটায় গেলেই তো হয়।"

সত্যবতীর জাঁদরেল স্বামী কর্নেল মণিলাল এতক্ষণ চুপচাপ বসে পাইপ টানছিলেন। ভদ্রলোক রিটায়ার্ড কর্নেল। কিন্তু মস্ত পাকানো গোঁফের মধ্যে বিগত সামরিক আভিজাত্য এখনও খানিকটা ধরে রেখে দিয়েছেন।

দিবসের প্রস্তাব শুনে পাইপ সরিয়ে বললেন তিনি, "যেতে পারো, কিন্তু পরে পস্তাবে।"

"কেন?"

"কারণ, ও কেল্লার নাম বিশালগড়। কিন্তু আমরা বলি বিষাদগড়।

"বিষাদগড়! তার মানে, বিষাদের রাজত্ব!"

"এগজ্যাকটলি। ও বিষাদপুরীর কাহিনী যদি শোনো তো তুমিও বিষণ্ণ হয়ে যাবে।"

গল্প শুনতে দিবস ভালবাসে। তাই চেপে ধরল কর্নেল মণিলালকে। শুরু হল বিশালগড়ের বিষাদ কাহিনী। দিনান্তের শীতবায়ুতে বনস্পতির অগ্রশাখার পল্লবমর্মরের সঙ্গে একাকার হয়ে গেল কর্নেলের কণ্ঠস্বর। হু-হু করে পেছিয়ে গেল পঁচিশটা বছর।

পঁচিশ বছর আগের কাহিনী।

*

মেয়েটির নাম রাত্রি।

রাত্রির মতই নিবিড় শ্যামল তার রূপ। সে রূপে উগ্রতা ছিল না, ছিল স্নিগ্ধতা।

ঘনপল্লবিত অতিসতেজ লতার মতই রাত্রিকে গড়েছিলেন বিধাতা। মেঘের মত একরাশ চুল এলিয়ে যখন সে বসে থাকত পারস্য-গালিচা-পাতা ঘরের এককোণে, বেলোয়ারী ঝাড়ের রামধনু রোশনাই পরম সোহাগে জড়িয়ে ধরত তার জাফরান রংয়ের অতিপিনদ্ধ কাঁচুলি, জরির-চটি-পরা ক্ষুদ্র সুন্দর দুখানি চরণ গোলাপি মখমল আসনে স্থাপিত থাকত অলসভাবে, তখন মনে হত আরব্য উপন্যাসের সহস্র রজনীর একটি রজনী যেন উপন্যাসলোক থেকে উড়ে এসেছে। মনে হত সুস্মিতস্বপ্না বোগদাদের নির্বাপিতদীপ একটি রাত্রি। কল্পনার চোখে দেখা যেত [illegible] স্ফটিকপাত্রে আপেল নাশপাতি নারাঙ্গি আঙুর; ঝিকমিকে কাচপাত্রে স্বর্ণাভ মদিরা; মনে হত, এই মুহূর্তে রাত্রি যদি গ্রীবা বেঁকিয়ে, ঘনকৃষ্ণ বিপুল চক্ষুতারকায় হাসি আর কটাক্ষর স্ফুলিঙ্গ বৃষ্টি করে লঘু-ললিত নৃত্যে আপন যৌবনপুষ্পিত দেহটিকে দ্রুতবেগে ঘুরিয়ে বাসনা আর বিভ্রাট সৃষ্টি করে, যদি সারেঙ্গীর কান্না, নূপুরের আর্তনাদ আর সিরাজের সুবর্ণমদিরার মধ্যে ছুরির ঝলক, বিষের জ্বালা আর কটাক্ষের আঘাত হানে—তখন বুঝি আরাবল্লী গিরিকাননের তরুণী-ইরানীর মতই সে মোহিনী হয়ে উঠতে পারে। পারে সর্পিনীর মত মাদকবেষ্টনে সর্বাঙ্গ বেঁধে ফেলতে, সুগন্ধ নিঃশ্বাস আর সুকোমল ওড়নার স্পর্শে তনুমন অসাড় করতে।

রাত্রির স্নিগ্ধশ্যামল রূপের এই ছিল বৈশিষ্ট্য। অতিবড় পুরুষসিংহও পতঙ্গের মত ছুটে আসত তার কাছে—যেন আগুনের আকর্ষণে। অথচ কাছে এলেই পেত শান্তি, নিবিড় শান্তি। যেমনটি পেয়েছিল বিশালগড়ের নবাবজাদা ইস্পাহানী।

ইস্পাহানী দীর্ঘাঙ্গ পুরুষ। খানদানী চেহারা। তরবারির মত ধারালো মজবুত স্বাস্থ্য। উদার মন। দিলদরিয়া মেজাজ।

বন্ধুবান্ধবরা বলত, ইস্পাহানী পূর্বপুরুষদের সব কটি নবাবী গুণই পেয়েছে, পায়নি কেবল একটি।

পর্বতপ্রমাণ রৌপ্যচক্রের বিনিময়ে বিশ্ব-সুন্দরীদের সংগ্রহ করে হারেম সাজানোর আর্ট ইস্পাহানী জানত না।

তার কারণও ছিল।

বাল্যকাল থেকেই যে বালিকার অন্তরের সঙ্গে সখিত্ববন্ধনে নিজেকে বেঁধেছিল ইস্পাহানী, নাম তার রাত্রি।

ফুটফুটে দুটি ছেলেমেয়ের ছেলেমানুষি আড়ি ও ভাব, খেলা ও মন্ত্রণা অনেকের কাছে সুমিষ্ট কৌতুকাবহ ছিল। ক্রমে ক্রমে মধুর এই সম্বন্ধটুকু মধুরতর মধুরতম হয়ে উঠেছে। যৌবনসমীরণের ধর্মই তাই। দুজনে দুজনকে মেনে নিয়েছে জীবন-মরণের সঙ্গী হিসেবে।

সন্ধ্যার সময়ে আঁধারের সূত্রপাত দেখলেই পাখি যেমন নীড়ে ফিরে আসে, পুরুষসিংহ ইস্পাহানীও তেমনি বহু প্রলয়সংকটে ছুটে আসত রাত্রির কাছে। ওষুধ পড়ত ক্ষতযন্ত্রণায়। কারণ, রাত্রি যেন অমাবস্যার রাত্রি। তার অতলস্পর্শ অন্ধকারের মধ্যে ষোলকলা চাঁদের সমস্ত আলোকই স্তরে স্তরে সঞ্চিত থাকত—সামান্য রশ্মিবর্ষণে স্নিগ্ধ হয়ে উঠত ইস্পাহানীর কাতর হৃদয়।

এমনি মেয়ে ছিল রাত্রি। আর এমনি পুরুষ ছিল ইস্পাহানী।

কিন্তু ভালবাসা যাদের সুগভীর, তাদের বেদনাও অত্যন্ত বেশি। তা না হলে ধূমকেতুর মত কেনই বা মেহের আলির আবির্ভাবে ইস্পাহানী-রাত্রির হাসি আর গান মিলিয়ে যাবে, কেনই বা সুখের চিত্র শতচ্ছিন্ন হবে, কেনই বা দুরন্ত শোকোচ্ছ্বাসে চিরকালের মত ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে প্রেম-মুগ্ধ দুটি অন্তরে?

মেহের আলি নবাবজাদা ইস্পাহানীর দূরসম্পর্কের ভাই। চপল, চঞ্চল, দুরন্ত। ইস্পাহানী তাকে ভালবাসত আপন ভাইয়ের মত। একই প্রাসাদে কেটেছে দুজনের শৈশব, কৈশোর। যৌবনের সিংহতোরণও পেরিয়েছে দুজনে একসঙ্গে।

কিন্তু দুই ভাইয়ে এক জায়গায় মিল ছিল না। ইস্পাহানীর মন ছিল আকাশের মত উদার, দিবালোকের মত অকপট। আর, মেহের আলি ছিল ঠিক তার বিপরীত। কপটতা ছিল তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। মনের ভাব মুখে প্রকাশ করত না। বুঝি সেই কারণেই ইস্পাহানী যখন পিস্তল-বন্দুক চালনায় লক্ষ্যভেদী হয়ে উঠল, মেহের আলি তখন মন দিল অভিনয় শিক্ষার দিকে।

রাত্রি ছিল দুজনেরই খেলার সঙ্গী।

মানুষের জীবনে দুর্যোগ যখন আসে, তখন অকস্মাৎই আসে। আচম্বিতে অকালে পৃথিবীর মায়া কাটাল মেহের আলি।

রাজস্থানে বেড়াতে গিয়েছিল দুই ভাই। সেইখানেই একটি গণ্ডগ্রামে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করল মেহের আলি। প্রচণ্ড আঘাতে দিশেহারা হয়ে গেল ইস্পাহানী। বংশের ঐতিহ্য অনুসারে মেহের আলিকে গোর দেওয়ার কথাও তার মাথায় এল না। কোনরকমে ভাইকে কবরস্থ করে উধাও হয়ে গেল পৃথিবীর অন্য প্রান্তে। পাগলের মত ঘুরতে লাগল দেশদেশান্তরে।

রাত্রির সঙ্গে তার বিয়ের দিন ঠিক হয়েছিল মেহের আলির মৃত্যুর আগে। কিন্তু এখন বিয়ে ভেঙে গেল। প্রেয়সীর চেয়ে ভাই যে অনেক বড়, পঁচিশ বছরের বৃহৎ বিষাদের মধ্যে দিয়ে এই কথাই অক্ষরে বলে চলেছে ইস্পাহানী।

অনেক বিশ্রম্ভসুখবিজড়িত লতাবিতান ছেড়ে, রাত্রিকে ছেড়ে, ইস্পাহানী দীর্ঘ পঁচিশ বছর এমনি করে পালিয়ে বেড়িয়েছে। পাছে স্মৃতির আক্রমণ ঘটে, সহ্য করতে না পারে, তাই মেহের আলির সঙ্গে যাদের ঘনিষ্ঠতা, তাদের সকলের সংস্রব ত্যাগ করেছে, মেহের আলির যাবতীয় চিহ্ন বিশালগড় থেকে মুছে ফেলেছে, নিজে নিমগ্ন থেকেছে ঈশ্বরের উপাসনায়। দিবারাত্র কালো আচ্ছাদনে মুখ ঢেকে থাকে ইস্পাহানী; বিশালগড়ের বাইরে এক পা-ও বেরোয় না। গত পঁচিশ বছর কেউ তার মুখ দেখেনি—সে-ও কারও মুখের দিকে তাকায়নি। পঁচিশ বছরের বিষাদ পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে বিশালগড়ের প্রতিটি ঘরে। তাই ও কেল্লার আর এক নাম বিষাদগড়।

*

শেষ হল কাহিনী।

কিছুক্ষণ সব স্তব্ধ। শুধু বনস্পতির অগ্রশাখায় পত্রমর্মরের হাহাকার। যেন অরণ্যের দীর্ঘশ্বাস।

তারপর দিবস বললে,—"তাহলে মোদ্দা কথা এই দাঁড়াচ্ছে যে, মেহের আলির বিচ্ছেদস্মৃতি যে বিশালগড়কে বেষ্টন করে জ্বলছিল, দাবানল দেখে আর্ত হরিণের মত ইস্পাহানী সেই বিশালগড় ত্যাগ করে পালাতে চেয়েছিল।"

কর্নেল মণিলাল বললেন,—"ঠিক তাই। কিন্তু মেহের আলির স্মৃতিতে তার অন্তর আর বাইরে এমনই পরিব্যাপ্ত যে, কোথাও সে পালাবার স্থান পায়নি। তাই আবার ফিরে এসেছে বিশালগড়ে। তারপর অন্তরের অন্তঃস্তরের একদম তলায় সুড়ঙ্গ খুঁড়েছে, সেই নিরালোক নিস্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে অশ্রুমালা দিয়ে সাজিয়েছে গোপন শোকের মঞ্জিল গোপনতম, গভীরতম, প্রিয়তম সেই মঞ্জিলে তার প্রেয়সীর স্থানও হয়নি।"

"চমৎকার," বললে দিবস, "বাঁশেও ফুল ধরে, কিন্তু কখন যে ধরে তার ঠিক নেই। যেমন আপনি হঠাৎ এখন কবি হয়ে গেলেন।"

"ঠাট্টা হচ্ছে?"

"মোটেই না। কিন্তু খটকা লাগছে কোথায় জানেন? শান্ত বিষাদের চন্দ্রাতপ-চ্ছায়ায় যে আশ্রয় নিয়েছে, কালো কাপড়ের ঘোমটায় মুখ ঢাকবার তার কি প্রয়োজন?"

"আরে মশাই, ভাই মারা গেছে তো হয়েছে কি? তাই বলে কি তাকে প্রেয়সীর কাছ থেকে কেড়ে নিতে হবে?" বললেন মিস্টার তলাপাত্র—নামকরা কাগজের সম্পাদক।

দিবস বললে, "আমার তো মনে হয়, আমরা সবাই গিয়ে একদিন হানা দেই বিশালগড়ে—আমাদের একটা সামাজিক কর্তব্য আছে তো।"

"ঢের হয়েছে, আমি আর ওদিক মাড়াচ্ছি না।" অকস্মাৎ মুখঝামটা দিয়ে বলে উঠল সত্যবতী, কর্ণেল মণিলালের গৃহিণী।

"'আর' ওদিক মাড়াচ্ছি না মানে? আর একবার মাড়িয়েছিলেন নাকি?" তৎক্ষণাৎ প্রশ্নটা ছুড়ে দিল দিবস।

"কেন যাবো না কেন? রাত্রি যে আমার বান্ধবী। মেয়েটা আজও বিয়ে করল না শুধু ঐ ইস্পাহানীর জন্য। তাই গেছিলাম তাকে সুবুদ্ধি দিতে। পুরুষগুলো এমনি পাষাণই হয়। কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

"ও রকম অপমানিত আমি জীবনে হইনি। ইস্পাহানীকে নিয়ে রাত্রি বেশ কয়েকবার এসেছিল আমার বাড়ীতে। মেহের আলিকে কোনোদিন দেখিনি। তবে ইস্পাহানী মেহের আলিকে নিয়ে আমার সঙ্গে প্রায় ঠাট্টা করত। বলত মেহেরের বিয়ের খুব শখ হয়েছে। অবিকল রাত্রির মত একটা বউ তাকে জোগাড় করে দিতে পারবে? তাহলে দুভায়ে দিব্যি থাকা যায়। আমি রাগ করে বলতাম, কেন রাত্রি ছাড়া বুঝি আর মেয়ে হয় না। ইস্পাহানী শুনে খালি হাসত। সেই ইস্পাহানীই আমাকে সেদিন চিনতে পারল না।"

"কবে?"

"যেদিন আমি গেছিলাম বিশালগড়ে। দূর থেকেই দেখেছিলাম কালো কাপড়ে মুখ ঢেকে ইস্পাহানী বাগানে পায়চারী করছে। ওমা সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম অথচ আমাকে যেন চিনতেই পারল না। পাশ দিয়ে ভূতের মত নিঃশব্দে চলে গেল গড়ের মধ্যে।"

"চিনতে পারল না?"

"মুখ তুলেই নামিয়ে নিল। কালো কাপড়ে মুখ ঢেকে সে এক ঢং। মোট কথা আমি আর ওর সামনে যাচ্ছি না।"

"বেশ, তাহলে আমিই যাবো," বললেন তলাপাত্র, 'আপনারা কেউ না যান তো আমি নাচার।'

•

দিবসের মনে কিন্তু শান্তি এল না পরের দিন সকালেও।

মন খুঁত-খুঁত করার কারণও ছিল। তার মন চলে অংকের হিসেবে ভর করে, আবেগের হাওয়ায় নয়। তাই পঁচিশ বছর একটা লোক স্রেফ খেয়ালের খপ্পরে পড়ে কষ্ট পাচ্ছে, এ রহস্যের কিনারা করতে না পেরে দৌড়ালো তার প্রৌঢ় বন্ধু ফাদার ঘনশ্যামের কাছে।

ফাদার ঘনশ্যাম মন্ডল তখন ছিল অন্য একটি বাড়িতে। সেখানে মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসে একমনে পুতুল খেলছিল দুটি বাচ্চার সঙ্গে।

সেই অবস্থাতেই সমস্ত কাহিনীটা আগাগোড়া শোনাল দিবস। কলের রেস-গাড়ী চালানোর ফাঁকে ফাঁকে সব শুনল ঘনশ্যাম পাদরী। তারপর দাঁড়িয়ে উঠে বলল—"কর্ণেল মণিলাল থাকেন কোথায়?"

•

ভাঙা ছাতাটা মুড়তে মুড়তে একাই কর্ণেল মণিলালের বৈঠকখানায় প্রবেশ করল ফাদার ঘনশ্যাম মন্ডল।

কর্ণেল তখন একটা ম্যাপে বিস্তর পিন গেঁথে যুদ্ধ-খেলা খেলছিলেন। ঘনশ্যাম পাদরীর কিম্ভূতকিমাকার মূর্তি দেখে ভ্রূকুটি করে বললেন, "কে আপনি?"

"ফাদার ঘনশ্যাম মন্ডল।"

"কি চাই?"

"বিশালগড়ের বিষাদ রহস্যের মীমাংসা।"

স্থির চোখে তাকিয়ে রইলেন কর্ণেল। তারপর পাইপ কামড়ে বললেন, "খুলে বলুন।"

"ইস্পাহানী পঁচিশ বছর একটানা শোকাচ্ছন্ন কেন?"

"কার কাছে শুনেছেন?"

"দিবসের কাছে।"

"পরের ব্যাপারে মাথা গলাচ্ছেন কেন?"



দ্বিবিধ গুণসম্পন্ন
আয়ুর্বেদীয় সুরভিত
মহাভৃঙ্গরাজ
কেশ তৈল



ভৃঙ্গল

● মাথা ঠাণ্ডা রাখে
● স্বাস্থ্যোজ্জ্বল কেশ বর্দ্ধনে সাহায্য করে।
ছোট শিশির জন্যই আপাততঃ এই নতুন বাক্স।
ছোট ও বড় দুই রকম শিশিতেই এখনও পুরানো লেবেল চলবে। পরে আসবে নতুন লেবেল।

চিঠি লিখলে ভৃঙ্গল-এর বিস্তৃত বিবরণ সম্বলিত পুস্তিকা পাঠান হয়।

ক্যালকাটা কেমিকেল কর্তৃক প্রস্তুত

"আপনারা আমাদের ব্যাপারে মাথা গলাতে আসছেন বলে।"

"বেশ গুছিয়ে কথা বলেন দেখছি। কিন্তু কিছুই আপনি প্রমাণ করতে পারবেন না।"

"অর্থাৎ আপনি আসল ঘটনাটা বলবেন না?"

"আসল ঘটনা মানে?"

"ভাইয়ের মৃত্যুতে ইস্পাহানীর বুক ভেঙে গেছে বলেই যে পঁচিশ বছর ধরে সে বিষণ্ণ রয়েছে—আপনার এই গল্পের মূলে যে ঘটনা আছে সেইটা।"

"আর কোনো ঘটনা নেই।"

ভাঙা চশমার ফাঁক দিয়ে মিটমিট করে তাকিয়ে বলল ফাদার ঘনশ্যাম, "তাহলে আপনি আমাকেই বলতে বাধ্য করলেন। নবাবজাদা ইস্পাহানী যে কেবল ভাইয়ের মৃত্যুতেই শোকাচ্ছন্ন, এ ধাপ্পা আমি বিশ্বাস করি না। তাই পাঁচটা প্রশ্ন করছি।

"প্রথম প্রশ্ন রাত্রির সঙ্গে ইস্পাহানীর বিয়ের দিন ঠিক হয়েছিল। অথচ ভাইয়ের মৃত্যুর পর সে বিয়ে ভেঙে গেল কেন? নিকটআত্মীয়ের মৃত্যুতে বিয়ে ভেঙে দিতে কখনো শুনেছেন? বরং বিচ্ছেদব্যথা ভোলবার জনোই মানুষ এ ক্ষেত্রে বিয়ে করে বসে। নবাবজাদা ইস্পাহানীর মত সম্ভ্রান্ত পুরুষ কিন্তু ঠিক তার বিপরীত কাণ্ড করলেন। বিনা দোষে বাগদত্তাকে ত্যাগ করলেন। কেন?"

পাইপ নামিয়ে গোঁফের প্রান্ত কামড়ে ধরলেন কর্ণেল মণিলাল।

"দ্বিতীয় প্রশ্ন" টেবিল থেকে কয়েকটা পিন তুলে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বলল ঘনশ্যাম: "ইস্পাহানী হামেশাই ঠাট্টা করত, অবিকল রাত্রির মত একটা বউ মেহের আলির জন্যে এনে দিতে। কেন?"

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন কর্ণেল মণিলাল।

তৃতীয় প্রশ্ন, ইস্পাহানীর শোকের ধরনটা বড়ই অদ্ভুত। মেহের আলির সব চিহ্ন সব ছবি বিশালগড় থেকে মুছে ফেলার কোনো দরকার ছিল কি? অবশ্য শোকের প্রচণ্ড ধাক্কায় কখনো-সখনো এ রকম দেখা যায় বটে কিন্তু একটানা পঁচিশ বছর যদি এই বিষাদ-নাটক চলে, তখন বুঝতে হবে এর অন্য মানে আছে।"

তীব্র কণ্ঠে বলে উঠলেন কর্ণেল, "থামুন।"

"চতুর্থ প্রশ্ন", অবিচলিত কণ্ঠে বলল ফাদার ঘনশ্যাম। "মস্ত ফ্যামিলির ছেলে হওয়া সত্ত্বেও মেহের আলিকে বংশের নিয়মমত গোর দেওয়া হয়নি কেন? খুব সম্ভব তাড়াহুড়ো করে গোপনে কবরস্থ করা হয়েছিল তাকে। পঞ্চম আর শেষ প্রশ্ন—ভাইয়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বিদেশে উধাও হয়ে গেলে কেন ইস্পাহানী? আসলে, পালিয়ে গেল, তাই নয় কী?"

"থামুন!" গর্জে উঠল কর্ণেল মণিলাল: "আমি বলছি সব বলছি। তবে সবার আগে শুনে রাখুন, এ লড়াইয়ে অন্যায় কিছু ঘটে নি।"

"বটে!" বলে পাঁজর-খালি-করা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন ঘনশ্যাম পাদরী।

"ডুয়েল লড়েছিল দুভাই। উপলক্ষ্য, রাত্রি। ইস্পাহানী বিয়ের দিন ঠিক করে ফেলতেই খেপে গেল মেহের আলি। রাত্রিকে সে দীর্ঘদিন ধরে মনে মনে ভালবেসেছিল। দ্বন্দ্বের অবসান ঘটল দ্বন্দ্বযুদ্ধের মধ্যে। সে দৃশ্য আমার চোখের সামনে এখনও ভাসছে। বালিয়াড়ির এদিকে দাঁড়িয়ে ইস্পাহানী—সঙ্গী হিসেবে আমিও। ওদিকে মেহের আলি—আর তার সঙ্গী কাঞ্চনকুমার। কাঞ্চনের তখন সবে নাম হচ্ছে। মেহের তার কাছেই অভিনয় শিখত। কিন্তু যা ভয় করেছিলাম তাই হল। ইস্পাহানীর নিশানা কখনো ব্যর্থ হত না। সেদিক দিয়ে মেহের ছিল নেহাতই আনাড়ি। গুলি চলল। ধড়াশ করে আছড়ে পড়ল মেহের। সঙ্গে সঙ্গে শুভবুদ্ধি ফিরে এল ইস্পাহানীর।

চেঁচিয়ে উঠল এ কি করলাম। বলেই রিভলবার ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দৌড়োলো ভাইয়ের দিকে। ছুটতে ছুটতে আমাকে বলল গাঁ থেকে ডাক্তার নিয়ে আসতে। আমিও দৌড়োলাম গাঁয়ের দিকে। বালিয়াড়ির আড়ালে যাওয়ার আগে শেষবারের মত দেখলাম তীরবেগে দৌড়োচ্ছে ইস্পাহানী। বালির ওপর লুটিয়ে পড়ে আছে মেহের আলি। পাশেই গোধূলির রাঙা দিগন্তের পটভূমিকায় স্থিরদেহে দাঁড়িয়ে কাঞ্চনকুমার। হাঁপাতে হাঁপাতে গিয়ে গাঁয়ের ডাক্তারকে খবর দিতেই ভদ্রলোক টপ করে নিজের ঘোড়ায় উঠেই ধাঁ করে বেরিয়ে গেলেন। আমি আবার দৌড়ে এসে যখন পৌঁছোলাম তখন সব শেষ হয়ে গেছে। মেহের আলিকে কবর দিয়ে ফিরে আসছেন ডাক্তার আর কাঞ্চনকুমার ইস্পাহানী নেই। নিজের হাতে ভাইকে খুন করে সেই যে উধাও হয়ে গেল ইস্পাহানী, ফিরল অনেক বছর পরে। কিন্তু ও মুখ আর কাউকে দেখালো না।"

শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক হয়ে গেছিল ফাদার ঘনশ্যাম। মনের চোখে ভাসছিল একটি রক্তসন্ধ্যার দৃশ্য। বালিয়াড়ির ওপর দিয়ে বেগে দৌড়োচ্ছে ইস্পাহানী আর লুণ্ঠিত মেহের আলির পাশে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে কাঞ্চনকুমার।

"আশ্চর্য!" নিজের মনেই বলল ঘনশ্যাম।

"কি আশ্চর্য?"

"সঙ্গী যখন গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়ল, তখনও কাঞ্চনকুমার দাঁড়িয়ে রইল কেন?

"অথচ কাঞ্চনেরই তখন উচিত ছিল মেহেরের কাছে দৌড়ে যাওয়া।"

"কিন্তু গেল না। কেন গেল না? চটপট কিছু করা বোধহয় কাঞ্চনকুমারের ধাতে নেই?"

"বিলক্ষণ আছে। তবে মাঝে মাঝে থিয়েটারী ঢঙে এমন পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকে আরে মশাই, কাল রাতেই তো ঐভাবে দাঁড়িয়েছিল কাঞ্চন। বিদ্যুৎ চমকালো, আমরা চমকালাম, কিন্তু চোখের পাতাও ফেলল না কাঞ্চনকুমার। ঠায় দাঁড়িয়ে রইল বাজপড়ার আওয়াজ শোনার জন্যে। ডুয়েলের দিনও ওকে এমনিভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম। কাল সন্ধ্যাতেও বাজের আওয়াজ শোনার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বলল সঠিক সময়টা—কী হলো?"

লজ্জিতমুখে উঠে দাঁড়াল ফাদার ঘনশ্যাম,—পিনটা আঙুলে ফুটে গেল। আচ্ছা চলি। নমস্কার।"

"আজ বিকেলেই কিন্তু তলাপাত্র নিয়ে যাচ্ছেন বিশালগড়ে।"

"তাই নাকি?" বলে ভাঙা ছাতা নিয়ে এগোলো ঘনশ্যাম। দরজার কাছে গিয়ে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল।

ফিস্‌ফিস্ করে বললে, "কর্ণেল, রাত্রিকে নিয়ে যাবেন না, সর্বনাশ হয়ে যাবে!"

*

বিশালগড়।..

দেউড়ীর সামনে সবাই হাজির। দিবস, তলাপাত্র, কর্ণেল সত্যবতী এবং রাত্রি।

চিরকুমারী রাত্রি। শ্যামলা স্নিগ্ধা রাত্রি। বিষাদ-প্রতিমা রাত্রি।

দলে নেই একটি অতি-পরিচিত মূর্তি। নেই অভিনেতা কাঞ্চনকুমার অকস্মাৎ জরুরী কাজে তাকে দূরে যেতে হয়েছে—অনেক দূরে।

প্রশস্ত চত্বর পেরিয়ে চওড়া মর্মর সোপানের নিচে এসে দাঁড়াল ছোট্ট দলটি। সবার আগে সমুদ্রের ফেণার মত কোমল শুভ্র বেশপরিহিতা রাত্রি।

সিঁড়ির নিচ থেকে হাঁক দিলেন কর্ণেল, "ইস্পাহানী আমরা এসেছি।"

চারটি মিনারে প্রতিহত হয়ে ডাক মিলিয়ে গেল দূর অরণ্যে। উত্তর এল না। তার বদলে ওপরের চাতালে এসে দাঁড়াল এক বেঢপ মূর্তি। পরণে ঝলঝলে কালো আলখাল্লা।

"ফাদার ঘনশ্যাম!" অস্ফুটকণ্ঠে বলল দিবস।

"আপনি কেন এসেছেন?" ঈষৎ রুক্ষকণ্ঠে কর্ণেলের।

"আমার কর্তব্য করতে," গম্ভীর মুখে জবাব দিল ফাদার ঘনশ্যাম।

"যথেষ্ট হয়েছে! আর বেশি কর্তব্য না করাই ভাল।" বিদ্রূপতীক্ষ্ণ কণ্ঠ তলাপাত্রর।

"আজ্ঞে না। একটু এখনও বাকী আছে। আমি এসেছি ওঁকে ওঁর যন্ত্রণার খাঁচা থেকে মুক্তি দিতে রাত্রি দেবীকে তাঁর জীবনভোর প্রতীক্ষা থেকে রেহাই দিতে।"

ঠিক এই সময়ে ফাদার ঘনশ্যামের পেছনে এসে দাঁড়াল আর একটি দীর্ঘাঙ্গ পুরুষ। মাথায় তার কৃষ্ণবস্ত্রের আচ্ছাদন।

সঙ্গে সঙ্গে গুঞ্জন উঠল সিঁড়ির নিচে।

"ইস্পাহানী। ইস্পাহানী!"

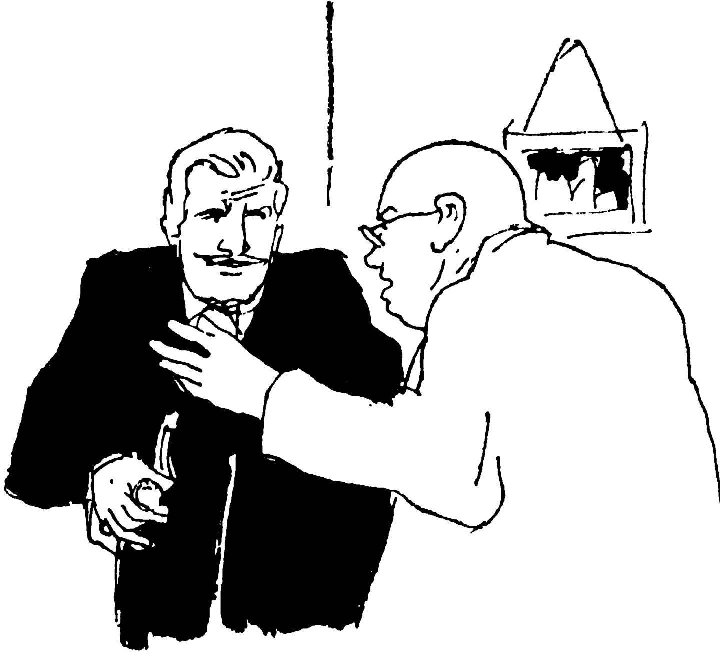
রাত্রিকে ঠেলে দিল সত্যবতী। এক-এক পা করে সিঁড়ির ওপর উঠতে লাগল রাত্রি। হাওয়ায় উড়ন্ত লাগল তার শাদা শাড়ির আঁচল রুক্ষ কুন্তল। আবেগ-বিহ্বল দুই চোখে ফুটে উঠল নিঃসীম আকুতি।

ঈষৎ প্রসারিত দুই হাতের আঙুল কাঁপতে লাগল থরথরিয়ে, কাঁপতে লাগল ঈষৎ স্ফুরিত অধরোষ্ঠ।

পিস্তল নির্ঘোষের মত তীব্রকন্ঠে বলল ফাদার, "থামুন! আর উঠবেন না। সইতে পারবেন না!"

মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে আবার থর-থর দেহে ওপরে উঠতে লাগল রাত্রি।

আচমকা শোনা গেল এক বজ্রকণ্ঠ। কৃষ্ণ আচ্ছাদনের আড়াল থেকে কথা কইছে নবাবজাদা ইস্পাহানী, "আসুক। ফাদার, ওকে আসতে দিন। আজই শেষ হয়ে যাক এই প্রহসনের। যবনিকা পড়ুক পঁচিশ বছরের তিক্ত নাটকে।"



বলে নিজেই কয়েক ধাপ নেমে এসে রাত্রির মুখোমুখি দাঁড়ান ইস্পাহানী।

তারপর ধীরে অতি ধীরে, তুলে দিল মুখের কৃষ্ণ আচ্ছাদন!

•

আতীক্ষ্ন চীৎকার আছড়ে পড়ল বিশালগড়ের চার মিনারে, বিশাল গম্বুজে। গমগম করে উঠল সমস্ত চত্বর। বুকফাটা একটা হাহাকার বিশালগড়ের প্রাকার পেরিয়ে, পরিখা পেরিয়ে, অরণ্য পেরিয়ে ক্ষীণ ক্ষীণতর ক্ষীণতম হয়ে মিলিয়ে গেল সুদূরে।

"মেহের আলি! মেহের আলি!"

রক্ত-হিমকরা সেই আর্তকান্নায় শিউরে উঠল সিঁড়ির নিচে ছোট্ট দলটি। রোমাঞ্চিত দেহে সকলেই দেখল সেই একই অবিশ্বাস্য অসম্ভব দৃশ্য!

ত্রাসকম্পিত রাত্রির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মেহের আলি। পঁচিশ বছর আগে মৃত, কবরস্থ মেহের আলি! শান্ত, বিষণ্ন, ক্যাঙালে!

ছিন্নমূল লতার মতই সিঁড়ির ওপর লুটিয়ে পড়ছিল রাত্রি। ধাপের ওপর গড়িয়ে পড়ার আগেই লম্বা কয়েকটা লাফ মেরে উঠে গিয়ে মূর্ছিত দেহটা ধরে ফেলল দিবস।

আর, একটি কথাও না বলে পেছন ফিরল মেহের আলি। ধীরপদে একটি একটি করে ধাপ উঠে মিলিয়ে চাতালের ওদিকে।

•

নেমে এল ফাদার ঘনশ্যাম।

বলল, "কর্ণেল, কেউ ঘোমটা দেয় লজ্জায়, কেউ দেয় আত্মগোপন করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু ভ্রাতৃহত্যার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্যে ঘোমটা দিয়ে রাখার বিধান কোনো ধর্মেই নেই। তাই আমি দিবসের কাছে কাহিনীটা শুনেই বুঝেছিলাম নবাবজাদা পঁচিশ বছর ধরে মুখ ঢেকে রেখে দিয়েছে কেবল নিজেকে লুকিয়ে রাখার জন্যেই—আর কিছুর জন্যে নয়। মেহের আলির সব প্রতিকৃতি, সব চিহ্ন বিশালগড় থেকে সরিয়ে দিয়েছে, যাতে তাকে কেউ মনে করতে না পারে। কিন্তু কিন্তু কেন?

"ভাবুন দিকি সেই দ্বন্দ্বযুদ্ধের দৃশ্য। গুলি চলার সঙ্গে সঙ্গে লুটিয়ে পড়ল মেহের আলি। সেই মুহূর্তে তার সংগী কাঞ্চনকুমার দাঁড়িয়ে রইল পাথরের মূর্তির মত। গুলির আওয়াজ মিলিয়ে গেল, বালিয়াড়ির আড়ালে আপনিও অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছেন—তখনও কাঞ্চনকুমার নড়ল না। কেন?

"সেই কেন'র উত্তর আপনিই দিলেন। গতকাল বিদ্যুৎ চমকানোর পর বাজের আওয়াজ শোনার প্রতীক্ষাতেও কাঞ্চনকুমার এমনি করে দাঁড়িয়েছিল। অর্থাৎ কিছুর প্রতীক্ষায় থাকলেই কাঞ্চনকুমার এমনিভাবে নিবাতনিষ্কম্পদেহে দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু সেদিন বালিয়াড়ির ওপর দ্বন্দ্বযুদ্ধের শেষে কিসের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়েছিল কাঞ্চনকুমার? সব তো শেষ হয়ে গেছিল, তবুও কিসের প্রতীক্ষা?

"ক্লাইম্যাকসের প্রতীক্ষা। সব শেষ হয়নি, তাই প্রতীক্ষা! রিভলবার চালানোর ব্যাপারে আনাড়ি ছিল মেহের আলি। কিন্তু তা জেনেও যখন দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে মেহের আলির মত খল চরিত্রের পুরুষ, তখন বুঝতে হবে মাথার মধ্যে একটা ষড়যন্ত্র নিয়েই সে এসেছিল রণভূমিতে। কি সেই ষড়যন্ত্র?

"কর্ণেল, আপনিই বলেছেন, মেহের আলি অভিনয় শিখছিল কাঞ্চনকুমারের কাছে। কেনা জানে, অভিনয়শিক্ষার প্রথম পাঠই হল মড়ার অভিনয়, চুপ করে পড়ে থাকার অভিনয়। মেহের আলি সেই অভিনয়ই করেছিল সেদিন। ইস্পাহানী গুলি ছোড়ার আগেই ধড়াশ করে আছড়ে পড়ে মড়ার মত পড়েছিল। তাই দেখেই রিভলবার ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ইস্পাহানী দৌড়ে এসেছে ভাইয়ের কাছে, ঝুঁকে পড়েছে তার লুটিয়ে পড়া দেহের ওপর। আর ঠিক তখনি একহাতের কনুইয়ে ভর দিয়ে আর এক হাতে গুলি চালিয়েছে মেহের আলি। অত কাছ থেকে গুলি ব্যর্থ হয় না। হৃৎপিন্ড এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেছে ইস্পাহানীর।

"কর্ণেল, আপনি ফিরে আসার আগেই টাকার জোরে ডাক্তারের মুখবন্ধ করে কাঞ্চনকুমার বালির মধ্যে গোর দিয়েছে ইস্পাহানীকে—মেহের আলি পালিয়েছে দূর বিদেশে।

"কিন্তু নিকুঞ্জবন থেকে হঠাৎ বেরিয়ে মরুভূমির মধ্যে গিয়ে পড়েছে মেহের আলি। যতই দিন গেছে মরুপ্রান্তর ক্রমাগতই বেড়েছে। সমস্ত সংসার তার কাছে বুড়িয়ে গেছে, শুকনো হয়ে গেছে, জীর্ণ হয়ে গেছে। যে বঞ্চনার জন্য তার এই অশ্রান্ত চেষ্টা, সেই বঞ্চনা সেই ছলনার জন্য ক্ষত-হৃদয়ের যন্ত্রণা চতুর্গুণ বাড়িয়ে অভাগাকে প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে হৃৎপিন্ড থেকে রক্ত নিংড়ে বার করে দিতে হয়েছে। এমন লোক পায়নি, যাকে সবকথা বলা যায়, এমন জায়গা পায়নি যেখানে হৃদয় খুলে হাহাকার করে উঠতে পারে।

"নিঃসম্পর্ক মেহের আলি দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে এই একান্ত অপ্রকাশ্য যন্ত্রণাভার একাই বহন করেছে।

"এইটাই কি খুনী মেহের আলির বিরাট প্রায়শ্চিত্ত নয়?

"তাই আজ অতি বৃহৎ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেল একটি নয়— দুটি হৃদয়। দুজনের দুরকম যন্ত্রণা, একজনের আত্ম-গোপনের—আরেকজনের প্রতীক্ষায়।"

রাত্রির তখন জ্ঞান ফিরেছে। অশ্রুহীন অনিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বিশাল-গড়ের বিরাট গম্বুজের দিকে।•

• বিদেশী ছায়ায়



ক্যারিবিয়ানের সূর্য

ব্রজমাধব ভট্টাচার্য

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ঐ দূরের দুটি পাহাড়,—মর্ন-লা-প্লা মর্ন-কনস্তা। ঐ পাহাড় দুটির গা বেয়ে বয়ে যায় ক্যারিবিয়ানের প্রসিদ্ধ বাতাস। ঝিরি ঝিরি বাতাসের বুকে গাল পেতে ঘুমিয়ে আছে মৌ-কোষ দুটি গাঁ। ত্রয় ইলে, লা পাজেরী। তারও দূরে আছে আরও পাহাড়; আরও শ্যামল বন। গাড়ী রেখে উঠছি। পাহাড়ের ঢের তলায় নীল সমুদ্র ফেনা তুলে ধাক্কা দিচ্ছে পাথর ছড়ানো তীরে। দূরের গিরিচূড়ায় শ্যামল বনানীর ভেলভেটের ওপর রাখা পুণ্যাত্মা যীশুর নামে গড়া ধবধবে শাদা এক গির্জা,—মার্তিনিকের মঁমার্ত। বাতাস দিচ্ছে। এ বাতাসের নাম বণিক ইংরেজ দিয়েছে ট্রেড উইন্ড, বাণিজ্য বাতাস; রসিক ফরাসী দিয়েছে আরাম-বিধুর বাতাস!

পা ছড়িয়ে বসেছি একটা বুনো গাছের তলায়। চেস্টনাটের মতো বিশাল ঝুঁকে পড়া পাতা-ঘন গাছ। ক্যাথি কোনো রকমে গড়িয়ে পড়লো ঘাসের বুকে। ভিভি তাড়াতাড়ি একটা হ্যামক টাঙিয়ে দিলো। খাবারের সরঞ্জামে ব্যস্ত হোলো।

আমি তখন মনে মনে দেখছি জসেফিনকে। নেপোলিয়নের ভাগ্যআকাশের শুকতারা জোসেফিন। ত্রিয়ে-ইলের মেয়ে নয়, পাশের গাঁ লা-পাজেরীর মেয়ে। তারই নামে এই স্যাভানা। পার্কের মাঝে রোদ্দুর-ঘেরা জোসেফিনের মর্মর মূর্তি। ও মূর্তি আমি দেখতে পাবো; ও মূর্তির খবর নেবো; ও মূর্তি সব মূর্তির মতো ফুরিয়ে যাবে। কিন্তু আমার মনের উপত্যকা বেয়ে দৌড়ে নেমে আসছে চপল মেয়ে জোসেফিন; খালি পায়ে ফ্রকপরা টাল খাওয়া জোসেফিন। এই মাটিতেই সে খেলা করতো তার বোন এমীর সঙ্গে। এমীর কথাও বলবো।

ফরাসীরা সাজিয়েছে বটে জোসেফিনের গাঁ। কিন্তু ইতিহাস তো লজ্জায় ঢাকা পড়ে না। আমার মনে পড়ে একা জোসেফিন নয়; মাদাম মন্তেস্পান; মাদাম মন্তেনান; এমী-দ্যু-বুক-দা-রিভেরী। এক মার্তিনিক য়োরোপের ইতিহাসের পাতায় চার-চারজন বরণীয়া নারীকে পাঠিয়েছে। এবং তার মধ্যে দুজন এই গাঁয়ের মেয়ে। একজন সম্রাট নেপোলিয়নের ঘরণী; অপরটি তুর্কের সম্রাট তৃতীয় সেলিমের হারেমের বাঁদী এবং তুর্ক সম্রাট দ্বিতীয় মেহমুদের জননী।

"কী হোলো!" হাঁক পাড়ে ক্যাথি!

"জসেফিন ভর করেছে! মার্তিনিকে আসবে, মদ ছোঁবে না, ভিভি-কে আদর করবে না,—পেত্নি ভর করবে না তো কী হবে। যে দেশের যে দেবতা; পেন্নামী না দিলে চলে কখনও?"

ওরা নানা দ্রব্য গুছিয়ে নিয়ে বসেছে। শঙ্খের মাংস ভাজা। স্যাটাইনের বিচি পুড়িয়ে মশলা দিয়ে। বড়ো বড়ো চিংড়ি, ফ্রাই করা এক গাদা; সসে ডুবোও, আর খাও। ভিভির গ্লাস ভরতি। আমি বলি, "কী ওটা? শ্যাম্পেন, না মার্তিনিকান 'শেরবে'?"

ভিভি ঢোকটা গিলে বলে,—"এও যা, ও-ও তাই। ও নিয়ে তোমার মাথা ঘামানো কেন? এখানকার নদীর জলও তো তোমার চলবে না।

ভিভির চোখ যেন জ্বলজ্বল করে। ওর স্বাভাবিক অবস্থাটাই সদাতুর। মদ খেলে শুধু কথাগুলো খুলে যেতো; বেশী, একটু বেশী হাসতো, আর অকারণ রোমান্টিক হয়ে পড়তো।

আমি বলি "নদী জলের অপরাধ?"

"ওমা! তা জানো না। ঝিরঝিরে ঐ যে দুটি নদী দেখলে, একটির নাম মাদাম, অন্যটির নাম মঁসিয়ে।"

হেসে বলি, "মঁসিয়ে থেকে জল আনা যাবে?"

ক্যাথী হাসে।

ভিভি বলে, "তোমারও রোগ। আমি ক্যাথী ছাড়া জানিনে; তুমিও মঁশিয়ে পেলে মাদাম চাও না!"

ভিভি মার্তিনিকান মেয়ে। ফরাসী পারম্পর্যতার ফলে বিবিক্ত নিরাসক্তিতে পরিপূর্ণ। —ফরাসীরা ইংরেজদের মতো কথার বোরখায় জীবনের দীপ্তি ঢেকে রাখে না।

"আমারই মতো ভালোবাসতো জোসেফিন তার পিসতুতো বোন এমীকে। আমি যেমন ক্যাথীকে ভালোবাসি। আমারই মতো ওরাও একসঙ্গে বেড়েছে। বড়োঘরের মেয়ে। কতো সাধ, কতো আহ্লাদ। তখনকার দিনে, ধিঙ্গিকেও পাবে কিছু কিছু, তবে হেইতিতেই বেশী,—এখানে কম,—এই সব পাহাড়ের আনাচে-কানাচে থাকতো সাধু, সন্ন্যাসী..."

"মার্তিনিকে সাধু সন্ন্যাসী?" আমি হেসে উঠি।

"হ্যাঁগো! মন্ত্র সিদ্ধাই! ত্রিকালজ্ঞ। ম্যাকবেথও তো সেই সব সাধু-সাধ্বীর কাছে গিয়েছিলো।"

"ডাইনী?"

"মূর্খেরা তাই বলে; গল্প পেলে। জ্ঞানীরা বলে সিদ্ধ-যোগিনী। তেমনি সব বুড়ী থুড়থুড়ি যোগিনীরা থাকতো ঐ সব পাহাড়ে।......সবার সেরা ছিলো য়োরাই মা। আরাওয়াকে জাতের শত-শত বছরের ভারে নুয়ে পড়া বুড়ী। থাকতো মাকড়সার জালে ঢাকা, বাদুড়ের পাখার বাতাসে শীতল একটা গুহায়। তিন কাল বলে দিতে পারতো।

"কিশোরী সেই দুটি মেয়ে ফ্রান্সে যাচ্ছে' পড়াশুনো করবে।...কার ভাগ্যে কী আছে' ওরা পরামর্শ করলো যাবে বুড়ী য়োরাইমার গুহায় যতো ভয়ই করুক যাবে।"

আমি বলি, "মেয়েদের মাথায় সন্দেহ আর ঔৎসুক্য একবার ঢুকলে, জানতেই হবে!"

ভিভি হেসে বলে, "তাই জানতে চায়। খালি পায়ে চুপি চুপি ওরা গিয়েছিলো য়োরাইমার কাছে। প্রথম প্রশ্ন করলো জোসেফিন। আমার ভবিষ্যৎ বলে দাও। আগুন জেলে তার মধ্যে নানা জড়ি-বুটি ফেলে ধোঁয়ার কুণ্ডলী রচনা করে বুড়ী তাকে বলেছিলো তোর বিয়ে যেতে যেতেই সারা হবে। সে বিয়ে কিছু নয়। তোর বাচ্চারা সব রাজা-রাণী হবে। তাও কিছু নয়। তোর মাথায় চড়বে সম্রাজ্ঞীর তাজ। পরাবে আরেকজন; তাকে তুই ভালোবেসে মরবি। ভালো যে বাসে সেই মরে, তুইও মরবি। ঘোর ঘোর রং, বেঁটে খাটো মর্নাষ্যি! কিছু নয় সে। কিন্তু তোর চোখে চোখ পড়লে সে আর থাকতে পারবে না। তারপর তোর ভাগ্যেই সে চড়-চড় করে উঠবে। রাজ-চক্রবর্তী হবে। বিশ্ব ভুবন তার ভয়ে থরো থরো কাঁপবে। তোকে সে সমাজের মাথায় বসাবে......আর সেইদিন থেকেই তুই নামবি আর নামবি। সে তোর কাছে যা চাইবে তাকে তুই তা দিতে পারবি না। তোর বুক থেকে নেমে সে অন্য বুকে যাবে। নেমে যাবে, নেমে যাবে। অনেক দূরে, অনেক নীচে। তখন তুই থাকবি একা। আর সারা জাতি তোর নামে প্রণাম জানাবে। তুই আর তুই থাকবি না' তুই তখন তার মধ্যে থাকবি। সে থাকবে তোর অনেক বাইরে, অনেক অনেক বাইরে।"

"কিন্তু সত্যি এ কথা?"আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করি। ভিভি বলে, "তুমি সত্যি, না আমি সত্যি? ইতিহাস যা বলে তাই বলছি। তাওতো এমীর কথা শোনোনি। ওরা এক জাহাজেই ফ্রান্সে গিয়েছিলো। এমী ছিলো বড়ো ঘরের, বড়ো ব্যবসাদারের মেয়ে।"

আমি বলি "আমি শুনতে চাই।"

"ভ্রমণ কাহিনী লিখবে বলে তো? এমীর ইতিহাস তো জানো।"

"তা জানি। জানি না এই য়োরাইমার কাহিনী। ওটা বলো, শুনবো। এমীকে কী বলেছিলো ডাইনী?"

"কফির গ্‌রুঁড়োর পরাতে কফি নাড়তে নাড়তে বলোছলো এমীর সম্বন্ধে সব কথা বড়ী। —হাসছো তুমি? বিশ্বাস হচ্ছে না। এখানে শেরেলশার লাইব্রেরী আছে, বই পড়ে দেখো।"

যদে টং না হওয়া পর্যন্ত টং-টং করে বাজতে থাকে ভিভি।

ক্যাথী হাসতে হাসতে গড়াতে যেতেই ওর মুখে একটা গোটা চিংড়ি ঠেসে দিলে ভিভি।

আমি মাপ চাওয়ার সুরে বলি, "হাসছিলাম এই ভেবে যে একটুখানি ছোট্টো দ্বীপ তিন তিনটে রাণী রপ্তানী করেছে। যদি রাজাদের সময় তাক্তও থাকতো ক্যাথী পাহাড়ের আড়ালে না দাঁড়িয়ে রাজসভার চূড়ায় দাঁড়াতে পাবে।"

"ভাবছো কেন? সময় যায় নি। রাজার রাণী হবার চেয়েও ঢের বড়ো কথা সুলেখকের বইয়ে নায়িকা হয়ে থাকা।"

"আমাদের ভাষায় নায়িকা কথাটা নিয়ে ভারি রসমন্থন চলে।"

ভিভি দমবার পাত্র নয়। বলে, "যা নিয়েই চলুক, রসমন্থনের মতো সুস্বাদু আর কিছুই নেই।"

আমিই হেরে যাই, বলি,—"কফির গুঁড়োয় নাম চালো। এর পরে আবার মাদাম মণ্ডেনান, মণ্ডাম্পান আছে।"

"হাঁ, বুড়ী বলে চললো—পড়া শেষ হলে জাহাজ চড়বে, দেশে ফেরার পাড়ও দেবে, মাঝপথে হারিয়ে যাবে, পাওয়া যাবে শেখানে, লোকে দাম দিয়ে কিনবে, রাজার বাঁদী হবে, সোহাগ পাবে না, রাজার মা হবে, সমান পাবে না। রক্তে পা ধোবে, বড় গরবে, যে জালে সূর্য ধরবে, সেই জালেই অন্ধকার এসে জড়াবে।"

আমি বলি 'এমী কে জানো?'

ভিভি বলে, "হাঁ। সুলতান মামুদের মা। রাণী না হয়েই রাজার মা হয়েছিলো।"

ক্যাথী আপত্তি করলো। ইতিহাস ওর ভালো লাগছে না। ফিরতে চায়। পথও দীর্ঘ।

জোসেফিনের মর্মর মূর্তি পার হয়ে নীচে নেমে গেছে ছায়া ঢাকা পাথর নুড়ি ছড়ানো পথ। তার তলায় ঝিরিঝিরি জলধারা। নেমে গেছি। ওপরে উঠে গেছে বনে ঢাকা পাহাড়। ওরই মধ্যে কোন গৃহস্থ বুড়ী থাকতো। এমনি পাথরে পা রেখে দুটি কিশোরী ভয়-শংকায়-দুরুদুরু বুক নিয়ে কুণ্ঠনে গ্রস্ত হয়ে নেমে এসেছিল ঐ বন, পার হয়েছিলো এই জলধারা।

এমী পড়তে গিয়েছিলো। কনভেন্টে পড়া সেরে মার্তিনিকে ফেরার জন্য জাহাজে চড়েছিলো। মুর জলদস্যুরা জাহাজ থেকে ওকে ধরে নিয়ে আলজিয়ার্সে বেচেছিলো। আলজিয়ার্সের নরপতি ধরাতলে খোদায় প্রতিষ্ঠিত তুর্ক সুলতানের সন্তোষের জন্য এই অপূর্ব সুন্দরীকে উপঢৌকন পাঠিয়েছিলো। সুলতানের কাছে এমী বাঁদী ছাড়া কী। কিন্তু ওমীর ছেলে? তাকে সে সযত্নে লেখাপড়া শেখালো। রাজনীতি শেখালো। সুলতানের অন্যান্য পুত্রদের ডিঙিয়ে মামুদ হোলো সুলতান।

কিন্তু যখন নেপোলিয়ন বোনাপার্ট নীলনদের যুদ্ধে হেরে গিয়ে তুর্কীর সুলতান মামুদের কাছে সাহায্য চেয়েছিলো, যখন মস্কো থেকে ফিরে সকাতর নিবেদন করেছিলো—তখন এমীই সে সাহায্য মামুদকে পাঠাতে দেয়নি। এমী নিজের ছেলেকে জোসেফিনের স্বামী নেপোলিয়ানের অনুরক্ত করে তুলেছিলো বটে; কিন্তু যখন নেপোলিয়ন জোসেফিনকে ত্যাগ করেছিলো তখন এমী মার্জনা করে তার চিরপরাধিনী বোনের সুখ-শান্তির হন্তারককে। তুর্কীর সাহায্য নেপোলিয়ন পায়নি।

জোসেফিন কি জানতো তুর্কী সুলতানের মা তার বোন এমী? সে পরিচয় কি এমী দিয়েছিলো জোসেফিনকে? একই জাহাজে মেয়ে দুটি ফ্রান্সে আসে। জোসেফিন বিয়ে করেই বিধবা হয়। একটি মেয়ে, একটি ছেলে। তখন তার চোখ পড়ে ইতালী-বিজেতা নতুন যুগের নেপোলিয়নকে। সেই থেকে জোসেফিন নেপোলিয়নের। সম্রাজ্ঞী হয়ে গেলো জোসেফিন। কিন্তু নেপোলিয়ন চাইলো ভবিষ্যৎ বংশধর, সমৃদ্ধি, রাজবংশের চক্রমণ। নেপোলিয়নকে সন্তান দিতে পারেনি জোসেফিন। জোসেফিনের চেয়ে ঢের বড়ো বংশের মেয়ে মেরিয়া লুইসা। অস্ট্রিয়ার রাজবংশের মেয়ে। জোসেফিনের বিয়েতেই নাকচ করে নেপোলিয়ন মেরিয়া লুইসাকে বিয়ে করলো, ছেলে পেলো, শুধু রাজ্য হারালো। স্ত্রী পেলো, প্রেম হারালো। খ্যাতি পেলো, মনুষ্যত্ব হারালো।

কিন্তু প্যারিসের বাইরে মার্তিনিকের পাজেরী গাঁয়ের জোসেফিন লা-মাই-মেসঁতে তার অট্টালিকায় তার শেষ জীবন কাটিয়েছে। সারা প্যারিস রাষ্ট্রবিপ্লবের ভীষণ দিনগুলোর মধ্যেও এই বিদুষী, বিষণ্ণ মহিলাকে শ্রদ্ধা সম্ভ্রমে ঢেকে রেখেছিলো।

কিন্তু ফিরতে হোলো।

পরদিন যাবো সেন্ট পিয়েরে।

ডিনার শেষ করে বারান্দায় জড়ো হয়েছি। বেতের চেয়ারে গা এলিয়ে আছি। বাগানময় বড়ো বড়ো জোনাকি জ্বলছে। আমি বুঝেছি ক্যাথী ঘুমিয়ে পড়েছে। ভিভি মদাতুর হয়ে ক্যাথীকে জড়িয়ে আদর করছে। —পিয়েরে মার্টিনীর পর মার্টিনী চালিয়ে চলেছে। সিগারের ধোঁয়ায় অন্ধকার করে রেখেছে নিজেকে। রেডিওতে ঠাণ্ডা একটা স্পানিশ টিউন বাজছে, বেজায় সেন্টিমেন্টাল।

আমি তো জাত-যাযাবর নই। দেশ-ভ্রমণ করা নেশাও নয়, পেশাও নয়। অপরূপকে দেখে গেলাম দুটি নয়ন মেলে। দেখতে চেয়েছি তাই; জানতে চেয়েছি মানুষকে। কিন্তু মাঝে মাঝে এমনি অবসরে মনের পরোক্ষ দিয়ে দৃষ্টি চলে যায় অনেক দূরে।

ভিভি আর ক্যাথী ঘরেতে ডিভানে পড়ে আছে। ডিভান জোড়া ক্যাথী, পাশটিতে একটা বড়ো বেতের-চেয়ারে ভিভি। ভিভির লম্বা হাতখানা ধরে রেখেছে ক্যাথী তার বুকের ওপরে। ঘরে আলোটা তীব্র। ওদিকে চাইলে আলো। বাইরে ঘন বনের প্রচ্ছদে জোনাকির ঝিলমিল। বাতাস ভারী, বৃষ্টি হতে পারে।

॥ প্রকাশিত হ'ল ॥

বাংলা ভাষায় সাংবাদিকতা বিষয়ে প্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ

সাংবাদিকতার গোড়ার কথা

ফ্রেজার বণ্ড ॥ অনুবাদক **সন্তোষকুমার দে**

আধুনিক সাংবাদিকতার সকল দিক সম্পর্কে ২৪টি সুদীর্ঘ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা। বাংলা ভাষায় প্রচার বিজ্ঞানের প্রথম গ্রন্থের রচয়িতা, 'দি ভয়েস' এবং 'রেকর্ড-সংগীত' পত্রিকাদ্বয়ের সম্পাদক, খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও সাংবাদিক সন্তোষকুমার দে সযত্ন নিষ্ঠায় ফ্রেজার বণ্ডের বিখ্যাত গ্রন্থ "অ্যান ইনট্রোডাকশান টু জার্নালিজম" হতে পরিচ্ছন্ন ভাষায় অনুবাদ করেছেন। বহু চিত্র তথ্য ও চার্ট সম্বলিত। ডিমাই ৭৬৩ পৃষ্ঠা। দাম : ৪·৫০ মাত্র।

প্রতিটি পাঠাগার সাংবাদিকতার ছাত্র সংবাদপত্রসেবী বিজ্ঞাপনদাতা ও বিজ্ঞাপন এজেন্সী এবং জনসংযোগ কর্মীর অবশ্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থ।

এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড

১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

দেয়ালে টাঙানো আলমারির মধ্যে বিচিত্র বিচিত্র প্রজাপতি। মেহগনীর সাইড-বোর্ডের মাথায় কাঁচের জারে রাখা পর পর দু-তিনটি সাপ। এক থাক বই। লম্বা ঘড়িটায় বাজনা বাজে মনোরম, শান্ত। ঘরের আলোটা জুড়ে একটা পিয়ানো। আমগাছের ফাঁক থেকে একটা পাখী ডাকছে। দূরে গাঁয়ের বুকে ঝুম্-ঝুম্ শাক্-শাক্ বাজছে; বাজছে ঢোল। নিগ্রো মেয়েরা গান গাইছে। এই সব ক্ষণিকের ফুলঝুরির ইশারা বেয়ে চলে গেলেই মহা-কালের সিংহাসনে জ্যোতি সমুদ্রের তীরে দাঁড়ানো যায়; অগাধ শান্তির মধ্যে ডুবে যাওয়া যায়। ছোটো হোক, তুচ্ছ হোক, ব্যর্থ নয় ভিভির হাতখানা ক্যাথীর বুকে, প্রজাপতির ডানা, প্রবালের ঝামা, শঙ্খের রক্তবর্ণ, সাপের কুণ্ডলী, চামড়া বাঁধানো বইগুলোর মেরুদণ্ড। এই যে অপরূপের আঙুল ঘোরানো আলপোনা আঁকা ছন্দ এরই মধ্যে খুঁজে পাই আমার বিগত জীবনের বহু বহু জীবনের, জন্ম-জন্মান্তরের কতো আলো-ছায়া-ঘেরা চিরন্তনের পদচিহ্ন। জানতে পারি এই বিশাল বিশ্বের একটুখানি নগণ্য হয়েও আমার আমি ততো তুচ্ছ, ততো ছোটো নয়। জীবনদেবতার কাছে কতো ঋণে ঋণী যে এমনি নগণ্য তুচ্ছ সময়ের বুদ্বুদ তাঁর পানপাত্র থেকে হঠাৎ ভেসে আসে। তাতেই তো পরিচয় পাই এই পৃথিবীর সঙ্গে আমার সঙ্গে এবং অদৃষ্ট কালান্তরের সঙ্গে নিবিড় একটা বন্ধনের।...ভাবি, যদি এমনি টুকরো সময়ের জোনাক-জ্বলা বোধ না থাকতো, জীবন হয়ে যেতো নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। সেই অন্ধকারের কাদা ঠেলে মোষের মতো জীবনধারণ হয়তো করতে পারা যেতো। কিন্তু আমি যে মানুষ সে পরিচয়ের লিপি তো এই অকারণ অবারণ ভেসে আসা সুরেলা ক্ষণগুলোর বুকেই পড়া যায়।

যেন বসতে পারি না। উঠে পড়ি। পিয়েরে বলে, এখন আবার কোথায় চললে? চেপে বৃষ্টি আসছে।

বললাম, "তা আসুক। একটু ঘুরে আসি নৈলে নিজেকে ধরে রাখতে পারা যাব না। বৃথাই স্যর ওয়ালটার রালে সোনা খুঁজেছে এই দেশের এলডোরাডোর বক্ষশোণিত, ক্যারিবিয়ানের সোনা তার আকাশে, নেশা আর সূর্যে আর ক্যারা-বিয়ানের চাঁদঝরা সমুদ্রের বুকে ক্যারিব এবং আরাওয়াকরা রেখে গেছে তাদের ঘরভাঙা কান্না। আসে বৃষ্টি আসুক। সে বসতে চায় বসতে দিও; যেতে চায় যেতে দিও। সে আসবে, চলে যাবে। কিন্তু জীবনে এমন এমন সময় আসে তাকে ব্যর্থ হতে দিতে নেই।"

আমি গাড়ী নিয়ে চলে গেলাম। পীয়েরে বুদ্ধিমান। সঙ্গ নেয় নি।

অতি রোখো। থার্ড ক্লাস কাফেটা; পোর্ট অব স্প্যানের ধারে কয়লা ঘাটার গা ঘেঁষে অনেকগুলো নারকোল গাছের পাশে কেন ঝুঁকছে। সাজগোজগুলো আবরণ সত্ত্বেও নিরাবরণ। যেন সবটাই বেমানান। বেঁচে থাকা অভ্যেস হয়ে গেছে বলেই মরতে ভুলে গেছে। জবর পাওয়ারের আলো ছোট্টো কফেটার ভেতরে সবাই শান্ত। রেডিওতে ট্রানজিস্টারটা ঢিলে হয়ে গেছে। যে ফরাসী গানটি বাজছে থেকে থেকে সেটা কেটে কেটে যাচ্ছে।

তবু বদলেয়ার বদলেয়ারই।

সূর্য কাঞ্চীবন্ধ ঘেরা সে দেশের কোলে
আমার কামনা ভাঙা এক গ্রাস
শ্যাম-কুঞ্জ সুখ,
ঝিরি ঝিরি অশ্রু ঝরা পাম পত্র দোলে;
ক্রিওল-কন্যার রূপে বিপ্রলব্ধ
রতির যৌতুক।

ফ্রান্সে রেডিওতে বদলেয়ার শুনিনি; মার্তিনিকে শুনলাম। আসল সাহেব আর সাজা-সাহেবে অনেক তফাৎ। যতো মেকী ততো গোঁড়ামি : যতো অনুকরণ, ততো তদ্গততা।

একটি ধার ঘিরে বসেছি। হাল্কা একটা পানীয়ের বোতল রেখে গেলো মেয়েটি। দূর থেকে লক্ষ্য করছি তিন-চারটে মেয়ে কয়েকটা লস্করকে নিয়ে উদ্দাম রঙ্গে মত্ত। ওরা দেলিসিস-দ্য-ক্রুডো থেকে বেরিয়ে এসেছে। লস্কর তিনটিই সদ্য যুবা। অনেকক্ষণ ধরে লড়ায়ে নেমেছে। ক্লান্ত চেহারা। মদ্যপানে আরও ক্লান্ত দেখাচ্ছে। ঠোঁটে রাখা সিগারেট দুমড়ে গেছে।

আমারই মতো আরও একটি অন্য কোণে বসে। হাতের কাছে কয়েকটি ডার্ট। দূরে রাখা নিশানার গায়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারছে। মারছে? —না নিজেকে নিয়ে খেলা করছে। ও-ও মেয়ে। দেলিসিস-পাড়ারই মেয়ে। চোখে পড়া শত শত আচমকা মেয়ের মধ্যে এই লম্বা পিয়াল তমাল বরণ মেয়েটির জলপাই মসৃণ নিবিড় রূপ যেন পান করতে লাগলুম। এমন মেয়ে একা একা রাতে ডার্ট খেলছে! যদি প্রফেসর হিগিন্সের হাতে পড়তো, এ মেয়েই হয়ে যেতো জোসেফিন কিংবা এমী-দ্য-বুক। কোন পুরুরবার সাধ্য এই উর্বশীকে গৃহাঙ্গনা করে? ওর অসামান্য ব্যক্তিত্ব ওকে একক করেছে: ওর রূপের মসৃণ বিহ্বলতা ওকে সামান্য গোচরের বাইরে রেখে দিয়েছে; ওর অহংকৃত দর্প-চটুল ভঙ্গী ওকে সীমাহীনতার রেখায় বহু দূরের করে রেখেছে। এ যেন নেপথ্যের নওরোজে রূপের অবগুণ্ঠনে নিজেকে দুর্লভ করে রেখেছে।

......ওর কাছে ঘুরে ঘুরে অন্য মেয়ে-গুলো মাঝে মাঝে থামছে। মৃদু কী বলছে। শান্ত কথার তীক্ষ্ম ধারে তাদেরও সরিয়ে দিচ্ছে তলোয়ারের মুখে আলোর রেখার মতো ভাবার ছটায়। ক্ষুরধার রসনায় বাক-চাতুরীর ঝলক যেন বেলোয়ারী কাঁচের ভাঙা ধারে পড়া এক ফালি রোদ।

মেয়েটি বুঝেছে আমার ওকে ভালো লেগেছে। যে মেয়েটি ওকে বার বার দলে টানার জন্য ঘন ঘন ওর কাছে আসছিলো, সেও বুঝেছে।

শিস দিয়ে একটা পাক খেয়ে চলে যায় মেয়েটা।

যাবার আগে কী বলে গেলো মলিকে।

আমার দিকে মলি চাইলো। হাসলো না; কিন্তু চোখভরা হাসি।

পেছন থেকে ভীষণ একটা হুল্লোড়ের শব্দ। বুঝছি এক নয় সাপ-বেজীর লড়াই চলছে; নয়তো মুর্গীর লড়াই। জুয়ার ভাঁটি।

হঠাৎ মলি হেসে এগিয়ে এলো। আমি আমার গেলাসটা সরিয়ে ওকেও গেলাস-ভর্তি করে মার্টিনি এনে দিতে বললাম।

মলি বললো, হিন্দ্? কুলি-হিন্দ্?

এদেশে ভারতীয়কে অবজ্ঞায় কুলি বলে, চীনীকে চিংক্, শাদাকে চেকে আর নিগ্রোকে নিগার বলে। এটা প্রায় গা-সওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু মন-মেজাজ খারাপ থাকলে এ নিয়ে রক্তারক্তিও হয়ে যায়।

আমি বলি, হ্যাঁ।

হাত দেখতে জানো?

জানি?

দেখো তো আমি কী হবো?

হাত তুলে বলি রাণী হবে।

পৃথিবী থেকে রাজারা তো বিদেয় হয়েছে। রাণী হবার সুবিধে কৈ তেমন।

রাজ্য যাবৎ থাকবে রাণী থাকবেই, রাজা থাক আর না থাক।

যাঃ, তোমাকে দিয়ে হবে না। ভাব-ছিলাম তোমাকে দিয়ে ভবিষ্যৎ গণনা করাবো।

কী চাও জানতে?

কোনো গর্গ কোনো লাব্রেক, কোনো বুশো, কোনো আদ্রে জীদের নামের সঙ্গে মিশে যেতে পারবো কি না; নাকি কপালে আছে কয়লাঘাটার ঝুপড়ি। নিদেন একটা মার্লিন মনরো কি রীটা হেওয়ার্থও হতে পারি? —আচ্ছা তুমিই বা কি করে জানলে আমি ফালতু?

তোমার ফুলার্দ!

সবাই সতী?

কিন্তু তোমাদের এই কোণ তুলে বাঁধার রীতি বার বার আমার গুলিয়ে যায়।

হেসে মলি বলে,—সর্বনাশ! গুলিয়ে গেলে তো সদ্য সদ্য মৃত্যু। এই বাঁধনের মধ্যেই তো আমাদের নানা পর্যায়ের শ্রেণী-ভেদ। এ সংকেতের নাম 'পয়েন্টেস'। এক কোণ দেখা গেলে তিনি কুমারী, দুই কোণ যদি বেরিয়ে রইলো, কোসোন, খালো, ও কন্যার পতি নির্বাচন সারা। লক্ষ্য করে দেখো, ওর আঙুলে এনগেজমেন্ট রিং। তারপর ধরো তিন পয়েন্ট। যেমন আমার ফুলার্দে। আমি লক্ষ্মী বুদ্ধিমতী গৃহিণী। আমার কর্তা মশায় আছেন। তবে কি জানো তিনিও তিন কোণা নিয়ে আছেন। আমার অবস্থা—

হঠাৎ মলি গান গেয়ে ওঠে—

He saw her wave her
handkerchief
As much as if to say.
I'm wide awake young
fisherman,
And all the folys away.

অবশ্য তার অর্থ এ নয় যে আমি দিন-রাত হ্যাংলামি করছি ; বা আমার কোনো বদনাম আছে। আমার কর্তা হয়তো বা আছেনঃ তা থাকুন। উপস্থিত সবার বড়ো কথা আমি আছি। ফূর্তির নাম আনন্দ,—কে না বোঝে? যদিও পতি-দেবতাদের বুঝতে ঈষৎ দেরী হওয়াটাই সবার কাম্য। ফরাসীরা সমঝদার জাত। বলে 'স্বামীকে জানতে হয় সব শেষে।' (Husband knows the last).... তারপরে এলো চার কোণা। লিডো-মিনার্ভা-ভীনাসের জাত। আফ্রোদিতের মন্দিরের পরিচারিকা। সমাজ-দেবতার দাসী। প্যানের বনবাংগণী বলো, নানার খগোত্রা বলো, ইশতারের পূজারিণী বলো, জুপিটারের ঘরনী বলো,- যা ইচ্ছে।

অনেকক্ষণ ধরেই ক্ষুরধার মেয়েটির তারিফ করছিলাম। এমনি অদ্ভুত রথন-কারিগরীর দোলাতেই তো ক্ষুদ্র মার্তিনিক ইয়োরোপের রাজশয্যায় দরজন-দরে 'ক্রিওল' রূপসী পাঠিয়েছে। চারশো বছর ধরে ফরাসী সাহিত্যের ওপর এই ক্ষমতা আঁচ ফেলছে। মাদাম মন্তেস্পান, মাদাম মন্তেনান -এঁরা রূপবতী কতো ছিলেন তার নেই, কিন্তু এদের অদ্ভুত আকর্ষণের স্বরূপ নির্ণয় সেকালীন সমাজ-ইতিহাসের ছত্রে ছত্রে উদ্গীত।

আমি বলি, নিশ্চয়। আমাদের পুরাণে, দেবালয়ে, আচারে, অনুষ্ঠানে, শিল্পে, কলায় এঁদের মর্যাদা সময়ে সময়ে বন্দনীয়, এমন কি আধিদৈবও বলা যায়। এঁদের নমস্কার করি; তোমাকেও নমস্কার করি। কিন্তু এমন সমুচ্চ চার পয়েন্টী কৌলীন্য ছেড়ে তুমি শাদা-মাটা তিন-পয়েন্টী ফ্লুলার্দে বেঁধে জাতিচ্যুত হতে গেলে কেন?

এবার মলি হাসে—চার কোণা ফুলার্দে বড়ো সেকেলে প্রেম,—সওদাগরী ব্যাপার। আর তিন কোণায় ঘর-সেবস্থালীর গৌরব আছে; কেলেংকারীর কালো ততো ঘোর রং নয়; আর সবার বড়ো নিজেকে প্রেমিক-প্রেমিক বোধ করা যায়। হাম্বড়াই আছে!

সত্যিই এ একটা স্বতন্ত্র জগৎ। এর আবর্তন, বিবর্তন, সংবর্তন আদি জীব-শক্তি-শিবশক্তির বাদী-বিবাদী-সম্বাদীর ধ্রুপদী তান গুরুগৃহ বিদ্যা: নিরন্তর সাধনা সাপেক্ষ। আমি কিন্তু মলির কথার ঝাঁঝ, ধার, জৌলুষ লক্ষ্য করে বিস্মিত। সবটাই যদি ওর এতো পরিপক্ক বুদ্ধি প্রসূত তবে ও মদ খায় কেন, কেন কাফের অন্ধকারে একা বসে থাকে। ওর জলপাই মসৃণ দারুচিনি বর্ণের দেহ-সৌষ্ঠবে ক্যারিবিয়ানের দৃঢ়তটের পাবে শ্যামল বনানীর স্নিগ্ধতা; ওর চোখের ঘন গভীরে উন্মদ বিহ্বল আত্মবিস্মৃতি; ওর কণ্ঠস্বরে, লাবণ্যে ভাষায় এক বৈদ্যুতিক স্পর্শ লাগা কমনীয়তা। তবু কেন, কেন ও একাকিনী।

আমি বলি, তাই যদি সত্য মলি, তিন কোণা ফুলার্দের বাস তো কাফে-পাড়ায় নয়। আলেকজেন্দ্রিয়ার বন্দরে না হোক, ফোর্ট দ্য ফ্রাঁর বন্দরের বাতাসে তোমাকে দেখতাম।

শান্ত হয়ে গেলো মলি। মার্টিনীর ঘোর লেগেছে। বলে, "কী জানো, ভালো লাগে না, কিছুই ভালো লাগে না। ভালো-লাগাও যেন আর ভালো লাগে না, আমি চাই ভেতরের মানুষটাকে জানতে। আমি কোনো কিছুতেই এদের মতো নই, এ কাফের নই, এই লাল-বাতিপাড়ার পর্দা-ঝোলানো সৌখীন জানলা নই। আমি যেনি আমি অনেকদিন আগে জন্মেছিলাম। সেদিন মাউন্ট পে-লীর বুকে আগুন জ্বলেছিলো, ফেটে গিয়েছিলো মাউন্ট পেলী। লাভা ছিলো বলে লোকে। লোক পাগল। যা-তা বলে। সে ছিলো বিষ-বালু-ধোঁয়া। আমি সেই বিষম আগুনের স্রোতে হারিয়ে গিয়েছিলাম। আবার এসেছি। যেন রাইডার হ্যাগার্ডের 'শী'। যেন সাহারার প্রোজ্জ্বনী সুন্দরী সী-মামুদ? নাম শুনেছো? ইসাবেল এবেরহার্ড্‌ৎ? উত্তর মেরুর বস্ত, জেনেভার দীপ্তি, ফরাসীর উচ্ছলতা সব এনে সে ঢেলে দিয়েছিলো সাহারার বুকে।

হঠাৎ নেমে যায় মলি।

সেই বাদল-বাদল গোমরানো ভাব হঠাৎ ছিঁড়ে গেলে প্রথর বিদ্যুতের জ্বালায়। কড়কড় করে সংগে সংগে বাজ পড়লো পাহাড়, সাগর, আকাশ ফাটিয়ে। আকাশ ভেঙে তুমুল ধারায় বৃষ্টি নেমে এলো একস্মাৎ।

ছুটে বেরিয়ে গেলো মলি। বাইরের দোর ধরে সামনের সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রইলো।

বিপুল সৈন্যের আক্রমণের মতো, পাহাড় বেয়ে হাতীর পাল নেমে আসার মতো ঘনঘোর মেঘের তুফান আকাশ থেকে আকাশে ছড়িয়ে পড়ছে। ঘন ঘন বাজ পড়ছে। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। ভীষণ বেগে বাতাস উড়িয়ে, ভেঙে, চুরে, কুড়িয়ে, ডুবিয়ে নিয়ে যাচ্ছে শহরের সব আবর্জনা। আলোকস্তম্ভের আলোটার গতিবেগ বেড়ে গেছে। জেলেদের নৌকোর লন্ঠনগুলো দুলছে। স্টীমারগুলোর আলো যেন বাঁ ক্রম।

আমাকে জড়িয়ে ধরে মলি বললো, চলো না, তোমার তো গাড়ী আছে, চলো না। ভীষণ ঝড়, জলে, বৃষ্টিতে গাড়ী চালাতে আমার ভারী ভালো লাগে।

গাড়ী চালাচ্ছি উত্তর দিকে। সেন্ট-পিয়েরে অবধি পথটা চওড়া, ভালো, আলো দেওয়া—এবং আগাগোড়া সমুদ্রের ধারে ধারে। বাঁ-ধারে পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে বন। বৃষ্টির তুমুল ধারা সবেগে, নামছে পাহাড় ধুয়ে। উইন্ড শীলডের ওপর ওয়াইপারটা অর্ধচন্দ্র নাচ নেচে নেচে ক্লান্ত যেন। পথের আলোয় মলির মুখ ক্ষণে উদ্ভাসিত হচ্ছে, ক্ষণে অন্ধকার।

আমি বলি, সেন্ট পিয়েরের দিকে চালাতে বললে, বিশেষ কোনো জায়গায় যাবে?

যেতাম। রাত হবে। —ইয়াট ক্লাবের পাশে একটা মস্ত খোলা জেটি আছে। গাড়ী চালিয়ে নিয়ে দাঁড় করাও সেখানে। সেন্ট পিয়েরে—অনেক দূর, অনেক।

হঠাৎ জোরে ব্রেকটার ওপরে পা চেপে ধরে মলি।

বহু কষ্টে গাড়ীর টাল সামলাই।

গম্ভীর হয়ে বললো, ফিরে চলো। তারপর-এর ব্রেক এখানেই কষো।

আমি গাড়ী ঘোরালাম। সেট-জোসেদের একটা পার্কের কাছে গির্জার তলায় গাড়ী দাঁড় করালাম।

পথ বিজন, তিমির সঘন

কানন কণ্টক তরু গহন—আঁধার রজনী।

মলি বলছে, যদি ঐ সেন্ট পিয়েরে আমার সর্বনাশ না করতো—আমি আজ মলি হতাম না। সেন্ট পিয়েরে। পেলী একটা আগ্নেয়গিরি নয়, পেলী একটা সর্বনাশ। মার্তিনিকের রাণী হতাম আমি, রাণী। আর আজ আমি একটা কুলীকে অনুরোধ করছি গাড়ীতে চড়াবে? আমাকে নিয়ে ঘুরবে? ......চলো কাফেটায় চলি। একটু মার্টিনী খাবো।

কাফেটার ভেতরে লোক ঠাসা। দুর্যোগে সবাই এসে জড়ো হয়েছে। আমি বলি, কী দরকার, চলো ব্রিস্টলে যাই, তোমার ফোলার্দে বেমানান হবে না।

ব্রিস্টল শোয়েলশার-রোডের ওপরে প্রসিদ্ধ হোটেল। সুমুখে ফোর্ট-দ্য-ফ্রাঁ-বে। ঝড়-জল নেমেছে। বৃষ্টিটা তখনও পড়ছে। মনে হয় সারারাত চলবে।

আমরা প্রথমেই বলে দিলাম একটু নির্জনে বসতে চাই। মার্তিনিকের বিশিষ্ট খাদ্য কালালু এক-এক ডিশ দিলো। আমি এক পট কফির অর্ডার দিলুম।

মলি হেসে বললো, কফি খাচ্ছো দেখলেও আমার নেশা ফিকে হবে। আমি বরং একটা মার্টিনীই নিই।

আমার চোখে-মুখে নিশ্চয় কিছু লক্ষ্য করেছিলো মলি।

বললো, আজ আমার বাবার জন্মদিন। সকাল থেকে তাঁকে মনে হচ্ছে। সন্ধ্যায় আজ সঙ্গীহীন বসেছিলাম। তুমি এলে। মনে হোলো অনেকদিন আগেকার দিনে এমনি সন্ধ্যায় বাবা বলতেন, চল্ মলি আজ ডিনার ব্রিস্টলে খাই। এই ছোটো বারান্দা-তেই বসলাম—আমি আর বাবা। ঐখানে ঐ যারা নাচছে, তখনও নাচতো। আমি ছোটো ছিলাম। তবু বাবা নাচতেন আমায় নিয়ে। বাবার তো আর কেউ ছিলো না। আমারও কেউ ছিলো না। আজও নেই। তোমরা ভারতের লোক। ভালো লোক। তোমাদের বড়ো ঘৃণা আমাদের ওপর...

না মলি, আমি ঘৃণা করি না।

হ্যাঁ। তা দেখলাম। হঠাৎ বিদ্যুতের চমক পেয়ে তোমাকে ধরেছিলাম,—

হ্যাঁ, হাত সরিয়েছিলাম। সরিয়েই মনে হয়েছিলো তুমি ভুল বুঝবে। আমি মানুষকে জড়ালে প্রকৃতিকে পাই না। শুধু তুমি বলেই নয়।

কারণ যাই হোক। অবচেতনে কোথায় কার কী সে কে জানে। অথচ মানুষ

এক সংগে ৩টি পুরস্কার জেতা যায় এবং তার সংগে ফিলিপস্‌-এর ট্রানজিস্টর !

LITQUIZ NO. 29

Rs. 32500

FIRST PRIZE RUPEES 16,000

RUNNERS-UP (UPTO 4 ERRORS) Rs. 8,500

MINIQUIZ (A) All-Correct only Rs. 2,000

MINIQUIZ (B) (UPTO 2 ERRORS) Rs. 5,000 For Every All Correct

PHILIPS TRANSISTOR

RELIEF FUND: Rs. 1,000

এই এনট্রি ফরম ২৭-২-৬৮ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হবে।

বন্ধের শেষ তারিখ

ডাকে প্রেরিত সকল প্রবেশপত্র : ২২-২-৬৮

আনন্দবাজারে সমাধান : ২৭-২-৬৮

আপনি আপনার প্রবেশপত্র পাঠাতে পারেন বুধবার ২১-২-৬৮ তারিখে কিন্তু উহা এক্সপ্রেস ডেলিভারীতে পাঠান।

সমাধান ফেরৎ পাইবার জন্য আপনার প্রবেশপত্রসহ নিজ ঠিকানা লিখিত ৬ পয়সার পোস্টকার্ড পাঠান।

১ টাকা পাঠান এবং **লিট্‌কুইজ টাইকলির** ৫টি সংখ্যা লাভ করুন।

স্থানীয় এজেন্ট

নিম্নবর্ণিত এজেন্টের নিকট থেকে এনট্রি ফরম ও ক্যাশ রসিদ পাবেন :

পি, সি, অ্যান্ড কোং, ফ্ল্যাট নং ৬, ব্লক 'ই', ১৫, বেচুলাল রোড, কলিকাতা—১৪

২৯, লিট্‌কুইজের সরকারী ভর্তি ফর্ম

ADDRESS :—LITQUIZ No. 29, ALANKAR, BALARAM ST., BOMBAY-7

দ্রষ্টব্য :—(১) প্রত্যেক কলমে, আপনার বাতিল করা শব্দটি কালি দিয়ে কেটে দিন; (২) আপনি যদি সবকয়টি কুপন না পাঠান, তাহলে বাকী কুপনগুলি বাতিল করে দিন; (৩) আপনি যদি মানি অর্ডারযোগে প্রবেশমূল্য পাঠান, তাহলে এই এনট্রি ফর্মের সংগে, ডাকঘর থেকে পাওয়া মানি অর্ডার রসিদটি অবশ্যই পাঠাবেন। মানি অর্ডার রসিদ ছাড়া এনট্রি বাতিল করা হবে; (৪) আই-পি-ও ক্রস করবেন না। **লিট্‌কুইজ** নং—২৯ বোম্বাই-৭-এর অনুকূলে টাকা পাঠান।

Re. 1		1	Re. 1		2	Re. 1		3	Re. 1		4
1	ACQUIRE	DESIRE	1	ACQUIRE	DESIRE	1	ACQUIRE	DESIRE	1	ACQUIRE	DESIRE
2	CHARITY	HUMILITY	2	CHARITY	HUMILITY	2	CHARITY	HUMILITY	2	CHARITY	HUMILITY
3	CONSCIENTIOUS	VIRTUOUS	3	CONSCIENTIOUS	VIRTUOUS	3	CONSCIENTIOUS	VIRTUOUS	3	CONSCIENTIOUS	VIRTUOUS
4	COURSE	FORCE	4	COURSE	FORCE	4	COURSE	FORCE	4	COURSE	FORCE
5	CRUELTY	ENMITY	5	CRUELTY	ENMITY	5	CRUELTY	ENMITY	5	CRUELTY	ENMITY
6	DEEDS	IDEAS	6	DEEDS	IDEAS	6	DEEDS	IDEAS	6	DEEDS	IDEAS
7	DESPAIR	PAIN	7	DESPAIR	PAIN	7	DESPAIR	PAIN	7	DESPAIR	PAIN
8	EDUCATION	RELIGION	8	EDUCATION	RELIGION	8	EDUCATION	RELIGION	8	EDUCATION	RELIGION
9	INDEFINITELY	INVINCIBLY	9	INDEFINITELY	INVINCIBLY	9	INDEFINITELY	INVINCIBLY	9	INDEFINITELY	INVINCIBLY
10	LAWS	LIMITS	10	LAWS	LIMITS	10	LAWS	LIMITS	10	LAWS	LIMITS
11	LIBERALLY	LITERALLY	11	LIBERALLY	LITERALLY	11	LIBERALLY	LITERALLY	11	LIBERALLY	LITERALLY
12	LONELINESS	WORLDLINESS	12	LONELINESS	WORLDLINESS	12	LONELINESS	WORLDLINESS	12	LONELINESS	WORLDLINESS
13	MENTALITY	PERSONALITY	13	MENTALITY	PERSONALITY	13	MENTALITY	PERSONALITY	13	MENTALITY	PERSONALITY
14	MORAL	SOCIAL	14	MORAL	SOCIAL	14	MORAL	SOCIAL	14	MORAL	SOCIAL
15	POLITICAL	PRACTICAL	15	POLITICAL	PRACTICAL	15	POLITICAL	PRACTICAL	15	POLITICAL	PRACTICAL
16	PURITY	PURSUIT	16	PURITY	PURSUIT	16	PURITY	PURSUIT	16	PURITY	PURSUIT
17	READING	THINKING	17	READING	THINKING	17	READING	THINKING	17	READING	THINKING
18	UNAWARE	UNWORTHY	18	UNAWARE	UNWORTHY	18	UNAWARE	UNWORTHY	18	UNAWARE	UNWORTHY

SEND FIRST TWO COUPONS & ENTER MINIQUIZ (A) FREE — No. 29 — SEND FOUR COUPONS & ENTER BOTH MINIQUIZ (A&B) FREE

MiniQuiz (A) — 6 CLUES FREE COUPON

ACQUIRE	DESIRE
CHARITY	HUMILITY
CONSCIENTIOUS	VIRTUOUS
COURSE	FORCE
CRUELTY	ENMITY
DEEDS	IDEAS

MiniQuiz (B) — 12 CLUES FREE COUPON

DESPAIR	PAIN	MENTALITY	PERSONALITY
EDUCATION	RELIGION	MORAL	SOCIAL
INDEFINITELY	INVINCIBLY	POLITICAL	PRACTICAL
LAWS	LIMITS	PURITY	PURSUIT
LIBERALLY	LITERALLY	READING	THINKING
LONELINESS	WORLDLINESS	UNAWARE	UNWORTHY

২৯ (অমৃত)

এই কুইজে যোগদান করবার জন্য আমি নিয়ম ও সর্তাবলী পালন করতে রাজী এবং প্রতিযোগিতা সম্পাদকের বিচার চূড়ান্তভাবে ও আইনতঃ বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ করলাম। প্রত্যেক কুপনের জন্য প্রবেশ মূল্য : ১, টাকা, সম্পূর্ণ ফরমটির (৪টি কুপন) প্রবেশ মূল্য ৪, টাকা। আমি এম-ও রসিদ/ আই-পি-ও/লিট্‌কুইজ ক্যাশ রসিদ/প্রাইজ কার্ড ও তার নম্বর..................পাঠাইলাম।

CAPITAL LETTERS

NAME—

ADDRESS—

এখানে কাটুন ও এই পুরো ফর্মটি পাঠান

LITQUIZ PVT. LTD.

No. 29 : 18 CLUES

(1) As man could not have desire for food if there were no food, so men could not Acquire/Desire immortality if men were not immortal

(2) There are unsurpassed joys in self-denial, self-restraint and Charity/Humility.

(3) A sense of duty presupposes a Conscientious/Virtuous disposition.

(4) None on earth can withstand the Course/Force of destiny.

(5) Cruelty/Enmity and greed give full licence to the barbarity of human instincts and put man on a crooked road.

(6) Man as an individual perishes but his Deeds/Ideas, separate from their progenitor, live on

(7) No one can live with a continual sense of Despair/Pain and void

(8) The main function of Education/Religion consists in strengthening social solidarity

(9) One can inflate the Ego tremendously, inflate it frightfully, but not Indefinitely/Invincibly

(10) Nature has set Laws/Limits everywhere

(11) We have to sacrifice, Liberally/Literally, men and material in the fire of ambition in order to create the phantom of an empire

(12) Loneliness/Worldliness will fall away from you automatically when you allow God to come into your souls and rule all your activities

(13) It is wrong to hold that human Mentality/Personality is basically irrational

(14) A conflict of desires, motives or habits sets a Moral/Social problem

(15) No one will deny that we need Political/Practical wisdom today

(16) Renunciation of wordly pleasures is the highest kind of Purity/Pursuit

(17) It is common experience that a flood of anger or fear will make calm Reading/Thinking impossible

(18) Man remains Unaware/Unworthy of himself, as long as he does not realise God

---

দ্রষ্টব্য :—ওপরের ধাঁধাগুলি বিভিন্ন ভারতীয় লেখকদের লেখা থেকে নেওয়া কয়েকটি প্রশ্ন। এগুলি সব সম্পূর্ণ বাক্য ও নিজস্ব সম্পূর্ণ অর্থ বহন করে। লেখক/প্রবন্ধকারের নাম ও তাঁহাদের রচনার নাম সরকারীভাবে সমাধানের সংগে **লিট-কুইজ উইকলিতে** প্রকাশ করা হবে।

১। যেমন খাদ্য না থাকলে মানুষের খাদ্যের প্রতি আকাঙ্ক্ষা থাকতো না, তেমনি মানুষ যদি অমর না হ'ত, তাহ'লে তারা অমরত্ব **অর্জন/আকাঙ্ক্ষা** করত না।

২। স্বীয় সুখত্যাগ, আত্মসংযম এবং **দয়া/বিনম্রতা**-য় অদ্বিতীয় আনন্দ আছে।

৩। কর্তব্যবোধের মধ্যেই অন্তর্নিহিত রয়েছে **বিবেকী/সদাচারী** মনোবৃত্তি।

৪। নিয়তির **গতি/বল** পৃথিবীতে কেউই প্রতিরোধ করতে পারে না।

৫। **নিদয়তা/শত্রুতা** আর লোভ মানুষের বর্বরতার প্রবৃত্তিকে পুরো প্রশ্রয় দেয় এবং মানুষকে ছলনাময় রাস্তায় চালিত করে।

৬। স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসেবে মানুষ বিনাশ-প্রাপ্ত হয় কিন্তু তার **কার্য/ভাবনা**, যেগুলি তার পূর্বপুরুষ থেকে আলাদা, বেঁচে থাকে।

৭। **নিরাশা/দুঃখ** এবং রিক্ততার একটানা ক্রমাগত বোধ থাকলে কেউই বেঁচে থাকতে পারে না।

৮। **শিক্ষা/ধর্ম**-র প্রধান কাজই হ'ল সামাজিক ঐক্যকে সুদৃঢ় করা।

৯। যে কেউ অহংকে খুব বাড়িয়ে তুলতে পারে, তাকে ভয়াবহভাবে বাড়াতে পারে, কিন্তু **অনিশ্চিত কাল/অজেয় হওয়া** পর্যন্ত বাড়াতে পারে না।

১০। প্রকৃতি সব জায়গায় **নিয়ম/সীমা** নির্ধারণ করছে।

১১। সাম্রাজ্যের সফল করতে স্বপ্নকে হলে উচ্চাকাঙ্ক্ষার আগুনে মানুষ ও সামগ্রীক **উদারতার সংগে/আক্ষরিক-ভাবে বলিদান** করতে হবে।

১২। আপনি যদি ঈশ্বরকে আপনার হৃদয়ে বাস করতে দেন, এবং আপনার সব কাজ তার নির্দেশ হতে দেন, তাহ'লে **নিঃসঙ্গতা/সাংসারিকতা** আপনার কাছ থেকে নিজে থেকেই চলে যাবে।

১৩। মানব **স্বভাব / ব্যক্তিত্ব** মূলত অবিবেকী, এরূপ মেনে নেওয়া ভুল।

১৪। ইচ্ছা, উদ্দেশ্য অথবা অভ্যাস-এর সংঘর্ষ থেকেই **নৈতিক/সামাজিক** সমস্যার উদ্ভব হয়।

১৫। কেউই অস্বীকার করবেন না যে আমাদের বর্তমানে প্রয়োজন **রাজনৈতিক/ব্যবহারিক** বিজ্ঞতা।

১৬। সাংসারিক সুখত্যাগ হ'ল **শুদ্ধতা/আচরণ**-এর সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ।

১৭। সাধারণ অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে রাগ অথবা ভয়ের বেগ শান্তভাবে **অধ্যয়ন/মনন** অসম্ভব করে তোলে।

১৮। যতক্ষণ না মানুষ ভগবানকে পায়, ততক্ষণ সে নিজে **অজ্ঞান/অযোগ্য** থাকে।

মিনিকুইজ (বি)

যাঁরা ৪টি কুপন পাঠাবেন কেবল তাঁরাই মিনিকুইজ (বি) পাঠাতে পারবেন। মিনি-কুইজে প্রত্যেক অলকাবেক্ট বিজেতা পুরস্কারের অংশ ছাড়াও একটি ফিলিপস্ ট্রানজিস্টর (বিজেতাদের সংখ্যার উপর মডেল নির্ভরশীল) পাবেন। ৫,০০০ টাকার পুরস্কারে ট্রানজিস্টরের মূল্য অন্তর্ভুক্ত।

মণ্ডেনান এই মার্তিনিকেরই মেয়ে; ঠিক মার্তিনিকান বলতে যে 'ক্রিওল' বলা যায় তা না হলেও মাদাম মন্তেনানের মনটা ছিলো মার্তিনিকান মেয়েদের মতো। বিবিক্ত, নিঃসঙ্গ, মুক্ত। বুঝবে না তার স্বাদ। বিবিক্ত মনের উদাসীন মুক্তি; সে বড়ো দুর্লভ;—সেই ভার্সাইতে, মারিয়া থেরেসা এবং মাদাম মন্তেপানের গড়া ফাঁকা ধাপ্পা-বাজ কথা-সর্বস্ব রাজকীয়তার ফাঁপরের মধ্যে এই ক্যারিবিয়ানের বাতাস! সে যে তাদের কতো স্নিগ্ধ লাগতো, বুঝবে না। অনেকে দোষ দেবে চতুর্দশ লুই-র 'মাদাম' প্রীতি নিয়ে। কিন্তু যারা মারিয়া থেরেসার মতো স্ত্রী নিয়ে ঘর করেনি, তারা কী করে জানবে যে, লুইয়ের পরিতাপ; কিংবা হয়তো যারা মারিয়া থেরেসার মতো স্ত্রী নিয়ে ঘর করেছে তারাই বুঝবে।

কিন্তু মারিয়া থেরেসা নিজেও তো মাদাম মেন্তেনন-কে খুব ভালোবাসতেন।

মার্টিনী সিপ্ করে মলি বলে, ঐ তো বললাম, ক্যারিবিয়ানের উত্তাপ, ক্যারিবিয়ানের বাতাস,—ক্যারিবিয়ানের সূর্য,—মারিয়া থেরেসাও তো ভার্সাই-ভিয়েনা-খাঁচার পাখী। জোসেফিন যখন মাইমেসঁতে তাঁর প্রাসাদে বিরাট চুল্লী ফিট করে সারা প্রাসাদ গরম করার ব্যবস্থা করেছিলেন, লোকে বলেছিলো 'পাগল', 'খেয়ালীপনা', 'বড়মানুষী'। জোসেফিনের বড়মানুষী নিয়ে অখ্যাতিই ছিলো। কিন্তু ক্যারিবিয়ানের মেয়ে ঐ হিমশীতল ইয়োরোপে গেলে যে কিসের বিরহে কাঁদে তা বোঝে এখানকার সূর্যতাপে স্নান করা বড়ো বড়ো বাসুতীরগুলো।

মাদাম মেন্তেনন্ নিজে সম্বংশজাতা। ফ্রান্সে যেবার হিউগিনট্ আন্দোলন হয়, তখন ওর বাবা জেলে যান। সমস্ত পরিবারই তখন জেলে। ওরা প্রোটেস্টাণ্ট হিউগিনট্। জেলেই মেন্তেননের জন্ম। তখনকার নাম ফ্রাঁসোয়া। মুক্তি পেয়ে সপরিবারে কনস্তাঁ দা বিগনেরা মার্তিনিকে আসে। সমৃদ্ধ পরিবার। ব্যবসা-বাণিজ্যে বেশ উন্নতি। হঠাৎ কনস্তাঁ দা-বিগনে মারা গেলেন; মা তখন মেয়েকে নিয়ে ফ্রান্সে গেলেন: শোক মুছতে গেলেন। মারা গেলেন। ফ্রান্সে যাবার আগে মা মেয়েকে ক্যাথলিক করে নিয়ে যান। কিন্তু মা মারা যাবার পর যখন দা-বিগনে পরিবারেরা ফ্রাঁসোয়াকে স্থান দিলো, সর্ত হোলো প্রোটেস্টাণ্ট হতে হবে। সেই চরম দুর্দিনে মাতৃ-পিতৃহারা ফ্রাঁসোয়ার চিত্তে এই বজ্ররূক্ষ কঠিন দাগ রেখে গেলো। মার্তিনিকে যে-মেয়ের জন্য পাঁচ-ছটা নিগ্রো আয়া ছিলো, মার্তিনিকে যার বাপ সমৃদ্ধির শিখরে ছিলেন, তাকে প্যারীর সমৃদ্ধ পরিবারে, সেই হিমে-শীতে, সূর্য-হীন, সমুদ্রহীন নরকে চরম লাঞ্ছনায় অপমানে দিন গুনতে হচ্ছে। ফ্রাঁসোয়া সুন্দরী, বিদুষী, বুদ্ধিমতী। কিন্তু ধনী আত্মীয়ের বাড়ী নগণ্য পরিচারিকা।

(ক্রমশঃ)



বাংলার বিক্ষুব্ধ কংগ্রেস প্রতিনিধি দল : শ্রীশঙ্কর সেন. ই শোর, মিঃ এ বি গণি চৌধুরী ও মিঃ কাজেম আলী মীর্জার সংগে শ্রীআশুতোষ ঘোষকে (সর্ব ডানদিকে) দেখা যাচ্ছে।

দেশে বিদেশে

শ্রীআশু ঘোষের পশ্চিমবাংলা

শ্রীআশুতোষ ঘোষ যখন দিল্লীতে যাচ্ছিলেন, তখন দমদম বিমানবন্দরে সাংবাদিকরা লক্ষ্য করেছিলেন যে, তাঁর কোটের বাটনহোলে ছিল একটি রক্তগোলাপ। অন্যান্য কথার মধ্যে তিনি বললেন, "রাজনীতির চুক্তি হচ্ছে যুবতী নারী আর গোলাপ ফুলের মত—যতক্ষণ থাকে ততক্ষণই ভাল।" আশুবাবুর বুকে-আঁটা রক্তগোলাপ দিল্লীতে পৌঁছবার আগেই ঝরে গিয়েছিল কিনা জানি না; কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতির চুক্তিগুলি যে ভেঙে যাচ্ছিল গত সপ্তাহে সেটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল। এবং তার ফলে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ একটা অনিশ্চিত অবস্থার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল।

অথচ, এমনি করে এত তাড়াতাড়ি যে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস-পি ডি এফ কোয়ালিশন সরকারের সামনে সংকট এসে যাবে সেটা আগে থেকে অনুমান করা যায়নি। ১৪ ফেব্রুয়ারী তারিখে বিধানমণ্ডলীর বাজেট অধিবেশন আহ্বান করা হয়েছে। গত অধিবেশনের মত এই অধিবেশনও যাতে স্পীকারের বাধা দানের ফলে বানচাল হয়ে না যায় এবং এই অধিবেশনে ভোট নিয়ে যাতে দেখান যায় যে, ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের সরকারের পক্ষে অধিকাংশ সদস্যের সমর্থন আছে তার জন্য কি ব্যবস্থা করা যায়, সেদিকেই কংগ্রেস ও পি ডি এফ মহলের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। তার জন্য বিভিন্ন প্রস্তাব নিয়েও আলোচনা হচ্ছিল।

এরই মধ্যে আশু ঘোষ সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠার সংবাদ হয়ে গেলেন।

২ ফেব্রুয়ারী তারিখে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কমিটির ও পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী কার্যনির্বাহক সমিতিদ্বয়ের এক যুক্ত বৈঠক হল। সেখানে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হল, "কংগ্রেসের ভিতরে অনৈক্যের সব সংবাদ ভিত্তিহীন। কংগ্রেসের সাংগঠনিক ও পরিষদীয়, এই উভয় শাখাই সকল অবস্থায় দৃঢ় ও ঐক্যবদ্ধ।" এই অধিবেশনের পর শ্রীঅতুল্য ঘোষ এক সাংবাদিক সম্মেলনে বললেন, আশু ঘোষ যেসব চাল দিচ্ছেন বলে সংবাদ আছে, সেগুলিতে কোয়ালিশন সরকারের পক্ষে ভয়ের কোন কারণ নেই এবং সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠতা "সপ্তাহে সপ্তাহে না হলেও মাসে মাসে" বাড়তে থাকবে।

অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এক বিবৃতিতে বললেন যুক্তফ্রণ্টের ন'মাসব্যাপী অশুচি শাসন জনসাধারণের উপর যেসব অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সংকট চাপিয়ে দিয়েছে, সেই সংকটগুলির মোকাবেলা করার জন্য পশ্চিমবঙ্গের কোয়ালিশন সরকার দৃঢ়সংকল্প নিয়ে ও ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করছেন।"

পশ্চিমবঙ্গের কোয়ালিশন সরকারের দুই শরিকের দুই নেতার এই ধরনের আশ্বাসসূচক বিবৃতি প্রকাশিত হবার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই কিন্তু দেখা গেল,

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ডাঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। ডাঃ চন্দ্র নিজে সংবাদপত্রকে জানালেন, রাজ্যপালকে তিনি বলে এসেছেন যে, সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন হারিয়েছেন, এটা দেখতে পাওয়া মাত্র কংগ্রেস দল এই সরকার থেকে তার সমর্থন প্রত্যাহার করে নেবে এবং রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তন ও অন্তর্বর্তী নির্বাচনের জন্য দাবী জানাবে।

যদি কোয়ালিশন সরকারের কোন সংকটই না থাকে এবং যদি কংগ্রেস ও পি-ডি-এফ এই সরকারের পিছনে ঐক্যবদ্ধ থাকে, তাহলে এই সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থন হারাবার কথা ওঠে কি করে?

এই প্রশ্নের উত্তর পেতে দেরী হল না। ৫ ফেব্রুয়ারী প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীআশু ঘোষকে এক চিঠি দিয়ে জানালেন যে, দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ করার অপরাধে তাঁকে আপাতদৃষ্টিতে অপরাধী বলে মনে হওয়ায় অনুসন্ধানসাপেক্ষে তাঁকে সাময়িক ভাবে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করা হল। এদিনই প্রাক্তন কংগ্রেসী মন্ত্রী ও বর্তমানে বিধানসভার একজন কংগ্রেসী সদস্য শ্রীশঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায় একটি বিবৃতিতে এই ইঙ্গিত দিলেন যে, শ্রীআশু ঘোষের সঙ্গে প্রায় ২০ জন কংগ্রেস এম এল-এ আছেন এবং তিনি নিজেও তাঁদের অন্যতম।

ডঃ ঘোষের সরকার খাদ্য সমস্যা এবং আইন ও শৃঙ্খলার সমস্যা সমাধান করতে ব্যর্থ হয়েছেন এই অভিযোগ করে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে, তাঁকে যদি মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করতে বলা হয়, তাহলে তিনি সেই দায়িত্ব গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছেন, যদিও তিনি সেজন্য লালায়িত নন।

পরবর্তী কয়েক দিনের ঘটনা দ্রুত দুর্গতিতে ঘটে গেল যেগুলির মধ্য দিয়ে দেখা গেল, কংগ্রেস দলের ভিতরে গভীর অনৈক্য রয়েছে এবং অনৈক্য শেষপর্যন্ত কোয়ালিশন সরকারের অস্তিত্বকে বিপন্ন করতে পারে। এটা বোঝা যেতে লাগল যে, প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেসের ভিতরে বিদ্রোহ একটি নয় একাধিক। এইসব বিদ্রোহের আক্রমণের লক্ষ্য ভিন্ন ভিন্ন হলেও কখনও এই পৃথক পৃথক বিদ্রোহগুলি একই খাতে প্রবাহিত হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসের অনৈক্যের এই লক্ষণগুলি হচ্ছেঃ—

এক, শ্রীআশু ঘোষের নেতৃত্বে যে তেরোজন এম-এল-এ ও অন্যান্য কয়েকজন কংগ্রেস সদস্য দিল্লীতে গিয়েছিলেন তাঁরা প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী উপ-প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা ও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক শ্রীচন্দ্রজিত যাদবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দাবী জানালেন যে, শ্রীঅতুল্য ঘোষকে ওয়ার্কিং কমিটি থেকে এবং পশ্চিমবঙ্গের সকল পর্যায়ের কংগ্রেস কমিটি থেকে সরিয়ে দিতে হবে। তাঁদের আরও দাবী যে, প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি থেকে আরম্ভ করে ব্লক কংগ্রেস কমিটি পর্যন্ত সকল কমিটি ভেঙে দিয়ে অ্যাড হক কমিটি তৈরী করতে হবে। তাঁদের এই দাবী মেনে না নিলে তাঁরা কোয়ালিশন সরকার থেকে তাঁদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নেবেন বলে জানিয়ে এলেন।

দুই, শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দে-র নেতৃত্বে আর একদল কংগ্রেস এম-এল-এ পশ্চিমবঙ্গ বিধানমণ্ডলীর কংগ্রেস দলের নেতা শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন।

তিন, শ্রীকৃষ্ণকুমার শুক্ল প্রমুখ ২৪ পরগণার কয়েকজন কংগ্রেসকর্মী কংগ্রেসের

॥ অমর সাহিত্য প্রকাশনের বই ॥

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
অরণ্য মর্মর ৭৲ অশনি সংকেত ৫৲

শঙ্কু মহারাজের
ভ্রমণকাহিনী
গিরি-কান্তার ৯৲

প্রশান্ত চৌধুরীর
উপন্যাস
সেই মেয়ে সুজাতা ৭৲

প্রফুল্ল রায়ের
আলোছায়াময় ৮·৫০

সুমথনাথ ঘোষের
জলধি তরঙ্গে ৫৲

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
তিন সঙ্গিনী ৩·৫০ এক প্রহরের খেলা ৫৲

আশাপূর্ণা দেবীর
নীলপর্দা ৫৲

বিমল মিত্রের
তিন ছয় নয় ৬·৫০

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
অমলতাস ৫·০০

প্রবোধকুমার সান্যালের
তিন কন্যার ঘর ৭৲

নীহাররঞ্জন গুপ্তের উপন্যাস
শ্রাবণী ৬৲ মায়ামৃগ ৬৲ বাদশা ৫৲

মহাশ্বেতা দেবীর
অজানা ৪·৫০

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের
নায়িকার মন ৪·৫০

জরাসন্ধের
পরশমণি ৫৲ পসারিণী ৪৲

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী ও ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
বাংলার সকল কবির কবিতার সংকলন
কাব্যবিতান ১২·৫০
(সম্পূর্ণ কাপড়ে বাঁধাই)

অমর-সাহিত্য প্রকাশন ঃ ৭ টেমার লেন, কলিকাতা—৯



রাষ্ট্রপতি জাকির হোসেন ও প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে ভুটানের মহারাজা জিগমে দোরজি ওয়াং চুক।

বর্তমান সাংগঠনিক অবস্থায় প্রকাশেই অসন্তোষ জানিয়েছেন। তাঁরা বর্তমান কংগ্রেস কমিটি ভেঙে দিয়ে অ্যাড হক কমিটি করতে চান। শ্রীশুক্র ১৪ ফেব্রুয়ারীর আগে বিধানসভার সদস্যপদ ত্যাগ করার ইচ্ছা প্রকাশ করে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতির কাছে পত্র দিয়েছেন।

এই সব বিবৃতি ও বক্তব্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে, কোয়ালিশন মন্ত্রিসভায় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কারা মন্ত্রী হবেন সেই নামগুলি যেভাবে কংগ্রেস পরিষদীয় দলের সঙ্গে পরামর্শ না করেই স্থির করা হয়েছে এবং বিশেষভাবে শ্রীআশু ঘোষ যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভাঙার ব্যাপারে যে সাহায্য করেছেন সেই সাহায্যের স্বীকৃতি না দিয়ে তাঁর প্রতি যে উপেক্ষা দেখান হয়েছে তাতে কংগ্রেসের একাংশ খুবই অখুশী। আবার আর এক দল কংগ্রেস সদস্যের মন্ত্রিসভার ব্যাপারে বিশেষ কোন বক্তব্য না থাকলেও কংগ্রেস সংগঠনের মধ্যে শ্রীঅতুল্য ঘোষ ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের একাধিপত্যের তাঁরা বিরোধী। এই দুই অংশের বিক্ষুব্ধ কংগ্রেস-সদস্যরাই অতুল্য-বিরোধিতায় এক এবং ভাগ্যচক্রে, যে আশু ঘোষ উদ্যোগী হয়ে একদা পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতার আসন থেকে যুক্তফ্রন্টকে সরিয়েছিলেন সেই আশু

॥ কয়েকটি উপভোগ্য বই ॥

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের **জোনাকির দীপ** ৫·০০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের **মনচোরা** ৩·৫০

পলাশের রঙ	নরেন্দ্র ঘোষ	৪·০০
রাতের গাড়ি	নরেন্দ্র ঘোষ	৪·০০
আলোকে তিমিরে	হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	৫·০০
মাটির দেবতা	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	৩·৫০
তুজিকালিপ পর্বং	অবধূত	৫·৫০
শুভদৃষ্টি	রমাপদ চৌধুরী	২·৫০
অনেকদিনের চেনা	শক্তিপদ রাজগুরু	৬·০০
নানারঙের দিন	নীহাররঞ্জন গুপ্ত	৩·৫০
ভেনডেটা	নীহাররঞ্জন গুপ্ত	৫·৫০
পঙ্কতিলক	নীহাররঞ্জন গুপ্ত	৬·০০
মালতীপ্রিয়া (যৌনগ্রন্থ)	নীহাররঞ্জন গুপ্ত	৫·৫০

গ্রন্থপীঠ, ২০৯বি, বিধান সরণি, কলিকাতা—৬

দলের প্রাথমিক কথাবার্তা শুরু হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

(৩) রাষ্ট্রপতির শাসন — কংগ্রেসের মত রাজ্যপালও এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন যে, ডঃ ঘোষের সরকারের পতনের পর বর্তমান অবস্থায় অন্য কোন স্থায়ী বিকল্প সরকার গঠন করার সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ এবং সেই কারণে হরিয়ানার রাজ্যপালের ন্যায় পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালও রাষ্ট্রপতির কাছে পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তনের সুপারিশ করতে পারেন। এই সম্ভাবনা সামনে রেখে পশ্চিমবঙ্গের আমলা মহল ইতিমধ্যেই রাষ্ট্রপতির শাসনের প্রস্তুতি করে রেখেছেন বলে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

সপ্তাহের শেষে আশু ঘোষের পশ্চিমবঙ্গে এই রুদ্ধশ্বাস অনিশ্চয়তার দোলায় দোদুল্যমান ছিল।

বৈষয়িক প্রসঙ্গ

ধনী ও দরিদ্র দুনিয়ার মোকাবিলা



রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল উ থান্ট নয়াদিল্লীতে আগমনের পর প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

ধনী ও দরিদ্র—এই দুই বিশ্ব নয়াদিল্লীতে মিলিত হয়েছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে ১৩২টি দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে যে বাণিজ্য ও উন্নয়ন সম্মেলন গত ১ ফেব্রুয়ারী আরম্ভ হয়েছে তার প্রধান উদ্দেশ্য হল কিভাবে এই দুই বিশ্বের মধ্যে ব্যবধান ঘোচানো যায়। বর্তমান দশককে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের এক প্রস্তাবে উন্নয়নের দশক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ঐ প্রস্তাবের লক্ষ্য ছিল যে, উন্নতিশীল ও দরিদ্র দেশগুলির বৈষয়িক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার জন্যে উন্নত দেশগুলি তাদের জাতীয় আয়ের অন্তত এক শতাংশ ব্যয় করবে। কিন্তু সে আশা ব্যর্থ হয়েছে। উন্নত দেশগুলি তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেনি। উপরন্তু তারা উন্নতিশীল দেশগুলির রপ্তানী বাণিজ্যের পথে এমন সব বাধা সৃষ্টি করে রেখেছে যেগুলি রপ্তানী বাণিজ্যের প্রসারের সহায়ক নয়। তার ওপর সেটুকু সাহায্য দেওয়া হচ্ছে সেগুলির সুদ ও পরিশোধের শর্তাবলী এত কঠোর যে দরিদ্র দেশগুলি ক্রমেই আরো বেশী ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। এই অবস্থা বৈষয়িক উন্নতির মোটেই সহায়ক নয়। কিভাবে এই অবস্থা দূর করা যায়, সেই সঙ্গে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের একটা নির্ভরযোগ্য ভিত্তি রচনা করা যায় তা আলোচনার জন্যই এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের বাণিজ্য ও উন্নয়ন সম্মেলনের এটি দ্বিতীয় অধিবেশন। প্রথম অধিবেশন বসেছিল জেনিভায় ১৯৬৪ সালে। আলোচনা চলবে আগামী ২৫ মার্চ পর্যন্ত।

১ ফেব্রুয়ারী সম্মেলনের উদ্বোধন করে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী উন্নত দেশগুলিকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, তারা যদি উন্নতিশীল দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সময়মত সাহায্য না করে তাহলে "ফলাফল যা হবে তা কল্পনা করতেও ভয় হয়।"

শ্রীমতী গান্ধী সমবেত প্রতিনিধিদের মনে করিয়ে দেন যে, মানবজাতির গরিষ্ঠাংশের ভাগ্যে দারিদ্র্য লেখা থাকবে তা হতে পারে না। "ধনী ও দরিদ্র দেশের মধ্যে যে তারতম্য ক্রমেই কঠোর থেকে কঠোরতর হচ্ছে তা যদি আমরা দূর করতে না পারি তাহলে পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন করা যাবে না।"

এমনকি তিনি এই কথাও বলেন যে, "অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে আমরা যদি অর্থনৈতিক অসাম্যের কারণগুলি দূর করার জন্যে আমাদের শক্তি নিয়োজিত না করি তাহলে মানুষ বিদ্রোহ করতে, এমনকি হিংসার পথে পরিবর্তন আনতে বাধ্য হবে।"

২ ফেব্রুয়ারী পূর্ণাঙ্গ বৈঠকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের বাণিজ্য ও উন্নয়ন সম্মেলনের সেক্রেটারী-জেনারেল ডঃ রাউল প্রেবিশ যে ভাষণ দেন তাতেও উন্নতিশীল দুনিয়ার আশা-আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ভাষা পেয়েছে।

ডঃ প্রেবিশ মনে করেন উন্নয়নের দশকে অর্থনৈতিক বিকাশের যে ৫ শতাংশ হার ধার্য করা হয়েছিল তা পর্যাপ্ত নয়। তাঁর মতে বিকাশের হার আরও বেশী হওয়া উচিত এবং সেজন্যে দরিদ্র দেশগুলির উন্নয়ন পরিকল্পনায় অব্যাহত অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি উন্নত দেশগুলিকে দিতে হবে। কারণ এই প্রতিশ্রুতি ছাড়া কোন উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা করাই সম্ভব নয়। সুতরাং



এবছর শীতকালেও গুলমার্গে (কাশ্মীর) যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে দিল্লীতে অধিবেশনরত রাষ্ট্রসংঘ বাণিজ্য ও উন্নয়ন সম্মেলনের প্রতিনিধিদের জন্যও গুলমার্গ পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ছবিতে বরফের ওপর স্কী-ক্রীড়ারত পর্যটকদের দেখা যাচ্ছে।

শিল্পোন্নত দেশগুলিকে একদিকে যেমন উন্নতিশীল দেশের রপ্তানী আয়ের আকস্মিক ঘাটতি মেটাবার জন্যে অতিরিক্ত অর্থ সাহায্য দিতে হবে, তেমনি মৌলিক সাহায্যও দিতে হবে। মৌলিক সাহায্য ছাড়া অতিরিক্ত সাহায্যে কোন ফল হবে না।

জাতীয় আয়ের এক শতাংশ উন্নতিশীল দেশে হস্তান্তর সম্পর্কে ডঃ প্রেবিশ বলেন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই লক্ষ্যে পৌঁছুতে হবে। এই প্রসঙ্গে তিনি প্রস্তাব করেন এক শতাংশের ৭৫ ভাগ আসুক সরকারী সূত্রে এবং ২৫ ভাগ আসুক বেসরকারী বিনিয়োগের মাধ্যমে।

অর্থ সাহায্যের শর্তাবলীও যাতে শিথিল করা হয়, ডঃ প্রেবিশ সেজন্যেও আহ্বান জানান। তাঁর ধারণায় বর্তমান সম্মেলনের সামনে দুটি কর্তব্য রয়েছে: (১) উন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার একটি বিশ্ব স্ট্র্যাটিজির কাঠামো তৈরী করা, এবং (২) ঐ লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্যে কি কি করা দরকার সে সম্পর্কে মতৈক্যে আসা।

তাঁর প্রস্তাবিত বিশ্ব স্ট্র্যাটিজির মূল বিষয়গুলি হল:

- উন্নয়নের মুখ্য দায়িত্ব যদিও উন্নতিশীল দেশগুলির নিজেদের কিন্তু আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ছাড়া সম্ভব নয়।
- এই সহযোগিতাকে উচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে।
- সাহায্য করার মনোভাব নিয়েই এই সহযোগিতা দিতে হবে, সাহায্যকারী দেশের বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক স্বার্থের দিকে তাকালে চলবে না।
- ডঃ প্রেবিশ এই প্রসঙ্গে উন্নতিশীল দেশগুলির প্রতিও একটি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন। তিনি বলেন: ঐ দেশগুলি যাতে বৈদেশিক সাহায্যের সুযোগ ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারে সেজন্যে তাদের সামাজিক কাঠামোর উপযুক্ত সংস্কার সাধন করা উচিত।

তিনি আশা করেন, উন্নতিশীল দেশগুলির রপ্তানী বাড়ির জন্যে বাণিজ্যিক সুবিধা দেবার সাধারণ নীতিগুলি নির্ধারণ করতে সম্মেলন সক্ষম হবে। তিনি বলেন, বর্তমানে কোন কোন দেশ সমৃদ্ধ দেশগুলিকে যে পাল্টা বাণিজ্যিক সুবিধা দিয়ে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে তারও অবসান করতে হবে। তা না হলে উন্নতিশীল দেশগুলি পুরোপুরি লাভবান হতে পারবে না।

তারা স্বাস্থ্য হাতে সাহায্যের আবেদন জানান রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল উ থান্ট ১ ফেব্রুয়ারী তাঁর ভাষণে উন্নত দেশগুলির প্রতি বলেন যে, উন্নতিশীল দেশগুলি সাহায্য ও বাণিজ্যিক সুবিধা দিলে পরিণামে তাদেরই লাভ হবে। সাহায্যের ধারায় অতিরিক্ত ক্রয়-ক্ষমতা সৃষ্টি হয় তা দাতা দেশগুলির রপ্তানী বাণিজ্যকেই সাহায্য করবে।

"আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন, অস্ত্রশস্ত্র কিংবা সশস্ত্র বাহিনী নয়।"

সুবিধা দেবার বদলে পাল্টা সুবিধা আদায় করার যে নীতি উন্নত দেশগুলি প্রয়োগ করে থাকে, উ থান্ট তার তীব্র নিন্দা করেন। নিজেদের কৃষি ও শ্রমিক-প্রধান শিল্পকে বাঁচাবার যে অতিরিক্ত আগ্রহ উন্নত দেশগুলির মধ্যে দেখা যায় তিনি তারও কঠোর সমালোচনা করেছেন।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে বাণিজ্য উদারতর করার জন্যে সেক্রেটারী-জেনারেল আবেদন জানান, এবং বলেন উন্নয়নের পরিকল্পনায় সমাজতন্ত্রী দেশগুলির আরো বেশী অংশ গ্রহণ করা উচিত।

বিশ্ব ব্যাংকের চেয়ারম্যান মিঃ জর্জ উডস্‌ও ঐদিন সম্মেলনে ভাষণ দেন। তিনি বলেন উন্নত দেশগুলির বর্তমান জাতীয় আয় দেড় হাজার বিলিয়ন ডলার। এই শতাব্দীর শেষ নাগাদ এই আয় চারগুণ বেড়ে যাবে। এর ফলে পৃথিবীতে এক অসহনীয় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিভাজন দেখা দিতে পারে। এই বিভাজন যদি এড়াতে হয় তাহলে দরিদ্র দেশগুলির উন্নতির জন্যে উন্নত দেশগুলিকে আরো সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

এই চারটি ভাষণের মধ্যে যে সমস্ত নীতি ও লক্ষ্যগুলির উল্লেখ করা হয়েছে তারই আলোকে সম্মেলনে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব গ্রহণ করা হবে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত

(শ্রীম-কথিত)

সাধারণ—২৫, কাপড়ে—৩০

কথামৃত ভবন

১৩।২, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলিকাতা-৬

অমৃতবাজার পত্রিকা ও শিশিরকুমার

পশুপতি চট্টোপাধ্যায়

শতবর্ষের গৌরবময় জীবনের অধিকারী অমৃতবাজার পত্রিকা আজ ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতীয়তাবাদী ইংরেজী দৈনিক সংবাদপত্ররূপে সম্মানিত। কিন্তু ১৮৬৮ সালের ২০এ ফেব্রুয়ারী (বাঙলা ৯ই ফাল্গুন, ১২৭৪ সাল) যখন এই পত্রিকাখানি প্রথম আত্মপ্রকাশ করে যশোহর জেলার পলুয়া গ্রামের অমৃত-প্রবাহিনী মুদ্রণযন্ত্র থেকে, তখন এটি ছিল বাঙলা এবং সাপ্তাহিক। পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যাতেই এটি প্রকাশের যে-উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়েছিল, তা থেকে 'ভারত ভারতীয়দের জন্য', এই নীতিই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। ভারত-শাসক ইংরাজদের প্রতি প্রকাশকদের যে-মনোভাব ছিল, তা পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠাতেই মুদ্রিত এই কয়েকটি পংক্তি থেকে সহজেই বুঝতে পারা যায়: "আমাদের বিশেষ যত্ন থাকিবে যে, যে স্বার্থশূন্য মহাত্মা ইংরাজ বাহাদুরেরা আমাদের দেশ, পরম অত্যাচারী যবন অধিকার হইতে স্বীয় হস্তে লইয়া আমাদের এত উন্নতি করিয়াছেন—যাহারা কেবলমাত্র আমাদের হিত ও স্বচ্ছন্দতার নিমিত্ত, রাজ্য-শাসনের ন্যায় অতি ক্লেশকর ও কঠিন কার্যে আমাদিগকে হস্ত ক্ষেপণ করিতে দেন না, তাহাদিগের রীতি, নীতি, উদ্দেশ্য, স্বার্থশূন্যতা ও কৌশল যথাসাধ্য বর্ণনা করিয়া তাহাদিগের নিকট যে ঋণপাশে আবদ্ধ আছি, তাহা পরিশোধের যত্ন করি।" পত্রিকার প্রথম সংখ্যার এই অসামান্য শ্লেষাত্মক ভাষা পত্রিকা-পরিচালকেরা বরাবর বজায় রেখে এসেছেন।

"যতদিন আসিসিনিয়ার যুদ্ধ, ফিনিয়ানদিগের দৌরাত্ম্য শেষ না হয়, ততদিন সংবাদাবলী দ্বারা আমাদের পত্রিকা সুসজ্জিত করিবার কোন চিন্তা থাকিবে না", এই প্রত্যাশা পাঠকদের জানাবার পরেও পত্রিকা প্রকাশকরা বলেছেন, "কিন্তু সম্পাদকদের দুর্ভাগ্যক্রমে যদি এ সমুদয় ক্ষান্ত হইয়া যায়, আর নূতন কোন রাজবিপ্লব, ঝটিকা, জলপ্লাবন প্রভৃতি উপস্থিত না হয়, তখন আমারদিগকে কিছু বিপদে পড়িতে হইবে, সন্দেহ নাই।" এই বিপদ থেকে তাঁরা উদ্ধার পাবার উপায় স্বরূপ বলেছেন, "এরূপ দায়ে যদি পড়ি তখন আমরা সংবাদ প্রস্তুত করিতে ত্রুটি করিব না।"

এই সংবাদ প্রস্তুত ব্যাপারটা যে-কোনোও সংবাদপত্র সম্পাদকের কাছেই অভিনব বলে বোধ হবে।

অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদকের দৃষ্টি ছিল সদাজাগ্রত। দেশ-বিদেশের কোথায় কি ঘটছে, কোন্ রাজকর্মচারী কখন্ কি বলছেন বা করছেন, এ সম্পর্কে তিনি সর্বদাই ওয়াকিবহাল থাকতেন। অপর দিকে কৌতুকমিশ্রিত ব্যঙ্গাত্মক ভাষায় তিনি ছিলেন সুপটু। যখনই তিনি দেখতেন, ভারতের পক্ষে ক্ষতিকর বা অমঙ্গলজনক কোনো বিধান প্রবর্তিত হচ্ছে, কিংবা কোনো ভারতীয়ের প্রতি অবিচার বা অসম্মানপ্রদর্শন করা হয়েছে, তখনই তাঁর লেখনী সোচ্চার হয়ে উঠত। যদি স্পষ্টাস্পষ্টি কোনো কথা লিখলে রাজদ্রোহ বা মানহানির দায়ে পড়তে হয়, তখন শিশিরকুমার হিতোপদেশ-কথামালার মতো কাহিনীর অবতারণা করতেন। এই ধরনের কাহিনীর মাধ্যমে তিনি সমসাময়িক অন্যায় অবিচারকে তীক্ষ্ম মন্তব্যসমেত পাঠকদের সামনে তুলে ধরতেন। তাঁর সরস ব্যঙ্গাত্মক ভাষার চাবুক পাঠকরা প্রচণ্ডভাবে উপভোগ করতেন, আর যাঁর বা যাঁদের উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হত, তিনি বা তাঁরা শত বৃশ্চিক-দংশনের জ্বালা অনুভব করলেও শিশিরকুমারের ওপর কোন পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারতেন না, এমনই ছিল এর মজা।

এক বছর বাঙলায় প্রকাশিত হবার পরে দ্বিতীয় বছর থেকে অমৃতবাজার পত্রিকা দ্বিভাষিকে পরিণত হয়েছিল অর্থাৎ এর কিছুটা অংশ থাকত বাঙলায় এবং কিছুটা ইংরেজীতে। দেখেছি, টাইটেল পেজ অর্থাৎ পত্রিকার নাম-তারিখ প্রভৃতি সমেত প্রথমাংশটাই থাকত বাঙলায়। এই ১৮৬৯ থেকে শুরু করে ১৮৯০ সাল নাগাদ ছোট ভাই মতিলালের হাতে সম্পাদকীয় দায়িত্ব অর্পণ করবার দিন পর্যন্ত বাইশ বছরের মধ্যে শিশিরকুমার ইংরেজী ভাষাতে কত যে কাহিনী পত্রিকার পৃষ্ঠে লিপিবদ্ধ করেছেন, তার ইয়ত্তা নেই। শিশিরকুমারের ইংরেজী সম্বন্ধে এইটুকু লিখলেই যথেষ্ট হবে যে, যখন তাঁর এই ইংরেজী রচনাগুলির কয়েকটিকে পুস্তকাকারে প্রকাশের পূর্বে বৃটিশ পার্লামেন্টের বিশিষ্ট সদস্য ডাব্লু এস কেন-এর কাছে ভাষাসম্পর্কীয় সম্ভাব্য সংশোধনের জন্যে পাঠান হয়, তখন তিনি সেগুলিকে অক্ষত অবস্থায় ফেরৎ পাঠিয়ে দেন এবং লেখেন, 'শিশিরকুমারের জীবন্ত ও ঝরঝরে রচনারীতিকে আমি ব্যাহত করতে চাই না। তাঁর ইংরেজীর বিশুদ্ধতা আমাকে সত্যিই অবাক করে দিয়েছে' (I don't care to interfere with Shishir Kumar's fresh, crisp, style. I am simply astonished at the purity of his English).

শিশিরকুমার ভারতে ইয়োরোপীয়দের আগমন সম্বন্ধে লিখেছিলেন 'মঙ্গলগ্রহ জয়' (The Conquest of Mars) প্রবন্ধে। তাতে মঙ্গলগ্রহবাসীদের শান্তিপ্রিয়তার পরিবর্তে রুশবাসীদের (তথা ইংরাজদের) যোদ্ধৃ-মনোবৃত্তির ব্যঙ্গাত্মক পরিচয় পাঠকের মনে বিদেশীয়দের প্রতি বিরূপভাবই সৃষ্টি করে। বেহারী সর্দারের কাহিনীতে তিনি লিখেছেন, বেহারী ছিল ডাকাত, কিন্তু সে সাধারণ ডাকাত ছিল না। যে-অর্থে পশ্চিমী জাতিগুলি ডাকাত, ঠিক সেই অর্থে বেহারীও ডাকাত। কারণ, একটি অঞ্চলের ওপর সে গায়ের জোরে কর্তৃত্ব করত, সেই অঞ্চলের গ্রামবাসীদের কাছ থেকে শুল্ক বা কর আদায় করত। বেহারীকে দোষ দেওয়া যায় কি? — শাসক সম্প্রদায়ের ন্যায়বিচার, স্বার্থসিদ্ধির জন্যে ভেদবুদ্ধি (divide and rule policy) প্রভৃতি সম্পর্কে শিশিরকুমার লিখেছিলেন, 'সিংহাসনোপবিষ্ট মহারাজ' (The great king on his throne)। এই ধরনে দেবতাদের যুদ্ধ, ভূতের পাথরবৃষ্টি, একটি বৈদেশিক বিভাগের কাহিনী, মিঃ কিপলিং এবং তাঁর পার্লামেন্টের সদস্য, ষাঁড়ের সঙ্গে লড়াই, পিলে-ফাটা, রাজকীয় যুদ্ধ, ঈশ্বরের নির্বাচিত স্থান এশিয়া, বুনো কুকুরদের কাছ থেকে শিক্ষণীয় বিষয় প্রভৃতি বহু শ্লেষাত্মক রসরচনা তিনি লিখেছেন অমৃতবাজার পত্রিকার পৃষ্ঠায়।

এই রচনাগুলির বিষয়বস্তু ও রীতি সম্পর্কে ডাব্লু এস কেন বলেছেন: 'কোনো যথার্থ ইংরাজ এই রচনাগুলি পাঠ করে স্বীকার না করে পারবেন না যে, এগুলি শাসক জাতির প্রতি অভদ্রভাবে ঘৃণাকারীর রচনা নয়, উল্টে এগুলি এমন একজনের উক্তি, যিনি উদার মতাবলম্বী ও সহৃদয়, নিপীড়ন এবং অন্যায় সম্পর্কে যিনি অতিমাত্রায় সংবেদনশীল, স্বদেশবাসীর প্রতি যাঁর আছে অগাধ প্রীতি এবং যিনি তাদের মহত্তর এবং উন্নততর জাতীয় ও সামাজিক জীবনযাপনে সাহায্যপ্রয়াসী' (no candid Englishman can read the articles without realising that they are not written by a mere vulgar hater of a dominant race, but they are the utterances of a man of broad views and generous sympathies, intensely sensitive to oppression and wrong, filled with a passionate love of his countrymen and a desire to help them to nobler and higher national and social life).

প্রশান্ত মিত্র সম্পাদিত
আসন্ন-প্রকাশ মাসিক পত্র
সংখ্যা—০·৭৫ বার্ষিক—৮·০০

ভাষণ

সব রকম গল্প, প্রবন্ধ, রম্যরচনা, নক্সা, একাঙ্ক নাটিকা, অনুবাদ, পরীক্ষামূলক ছোট লেখা ডাকযোগে আহ্বান করা হচ্ছে। উপন্যাস ও কবিতা আপাতত পাঠাবেন না। সম্পাদকের সঙ্গে সাক্ষাৎ অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট-এ।

১২১।২।২ডি, সুরেন্দ্র ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-১৩, ফোন : ২৪-২০৮৬

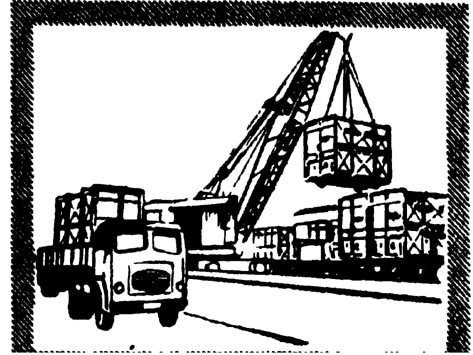
রেলওয়ের কনটেনার সার্ভিস

স্বল্পব্যয়, নিরাপদ, দ্রুত

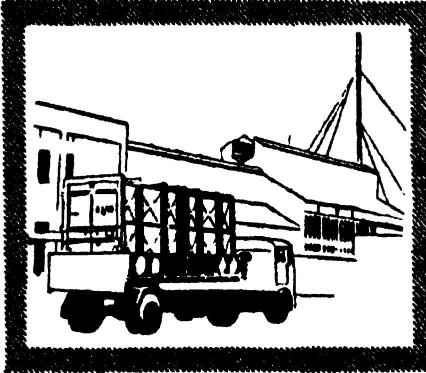
এবং আপনার দোরগোড়ায়



আপনার উপস্থিতিতেই আপনারই গুদামে কনটেনার-এ মাল বোঝাই হয় —এবং হাতে হাতেই রেলের রসিদ দেওয়া হয়। আপনি নিজে কনটেনার-এ তালা এবং সীল লাগাতে পারবেন।

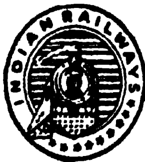


বিশেষভাবে তৈরী ট্রাক-এ এই কনটেনারগুলি নিয়ে গিয়ে 'রেল ফ্ল্যাট'-এ তোলা হয় এবং দ্রুতগামী ট্রেন-এ গন্তব্য স্থলে পৌঁছে দেওয়া হয়।



গন্তব্য স্থলে এই কনটেনারগুলিকে আবার ট্রাক-এ তুলে প্রাপকের গুদামে বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

পূর্ব-রেলওয়ে নীচে উল্লিখিত স্টেশনগুলির মধ্যে কনটেনার-সার্ভিস প্রবর্তনের কর্মসূচী গ্রহণ করেছে :



হাওড়া এবং বারৌনি

হাওড়া এবং নিউ দিল্লী

হাওড়া এবং গৌহাটি

হাওড়া গুডস্-জেটি সাইডিং-এ কনটেনার সহ রেল-ফ্ল্যাট দেখতে পাওয়া যাবে।

সংযোগ করুন : ডিভিসনাল কমার্শিয়াল সুপারিন্টেণ্ডেন্ট, হাওড়া এরিয়া, ফোন ঃ ৬৬-৩৮৬৭



অমৃতবাজার পত্রিকা শতবার্ষিকী উপলক্ষে নির্মিত তথ্যচিত্র **শতবর্ষের সেবা-র** ভাষ্যদান করছেন বসন্ত চৌধুরী। ছবির পরিচালক মধু বসু এবং পশুপতি চট্টোপাধ্যায়কে দেখা যাচ্ছে। ফটো: অমৃত

প্রেক্ষাগৃহ

আজকের কথা :

আমাদের তারকাপ্রীতি :

বেশ কিছুদিন আগেকার কথা। ভারতীয় সবাকচিত্রের জগতে তখন নিউ থিয়েটার্সের যুগ। মাত্র হিন্দী এবং উর্দু ছবি তোলবার জন্যে নিউ থিয়েটার্সের কর্তৃপক্ষ পাঞ্জাবের লাহোরে (বর্তমানে পশ্চিম পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত) নিউ ইণ্ডিয়া থিয়েটার্স নামে একটি স্টুডিও খোলবার জন্যে মনস্থ করলেন। যখন সকল ব্যবস্থা সম্পূর্ণ, তখন কলকাতা থেকে দলবলে নিউ থিয়েটার্সের ম্যানেজিং ডিরেকটার বীরেন্দ্রনাথ সরকার রওনা হলেন আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন উৎসবে যোগদান করবার জন্যে। লাহোর স্টুডিওর প্রবেশপথে লোকে লোকারণ্য। তোরণ নহবৎ, ফুল, মালা, নিশেনের ছড়াছড়ি। 'ঐ এসেছে', 'ঐ এসেছে' রব উঠতেই রাস্তার দুধারে সারি বেঁধে দাঁড়ানো লোক ভেঙে পড়ল প্রথম মোটারটির ওপর এবং আরোহীদের ওপর এক ঝলক চোখ বুলিয়ে নিয়েই হতাশভাবে পেছু হেঁটে গেল। শুনতে পাওয়া গেল, তারা বলছে : সব ফালতু আদমি হ্যায়! এই ফালতু আদমির দলে ছিলেন—বীরেন্দ্রনাথ সরকার, রাইচাঁদ বড়াল (সংগীত-পরিচালক), প্রফুল্ল রায় (চিত্রপরিচালক) প্রভৃতি। কিন্তু যে-গাড়ীখানায় ছিলেন কে এল সাইগল (কুন্দনলাল সাইগল), পৃথ্বিরাজ কাপুর, রতনবাঈ প্রভৃতি শিল্পী, উল্লাসে ফেটে-পড়া জনতার হাত থেকে সে-গাড়ীটির মুক্তি পেতে অন্তত আধঘণ্টা সময় লেগেছিল।

হলিউডের চলচ্চিত্র-শিল্পপতিদের দৌলতে যে-দিন থেকে চিত্রতারকার সৃষ্টি হয়েছে, সেদিন থেকেই আমরা তারকাদের ভক্ত হয়ে পড়েছি। আমরা অর্থে পৃথিবী-জোড়া সিনেমার দর্শকবৃন্দ। নির্বাক যুগে কলকাতার দর্শকবৃন্দ ডগলাস ফেয়ার-ব্যাঙ্কসের যে-কিরকম গোঁড়া ভক্ত হয়ে পড়েছিল, তা আজ প্রাচীনদের মধ্যে কারুর কারুর স্মরণ থাকতে পারে। তাঁর অভিনীত ছবি মুক্তি পেলেই চিত্রগৃহের সামনে শোনা যেত : বাহাদুর আ গায়া। ক্রাউন সিনেমায় (বর্তমানে উত্তরা) ডগলাস অভিনীত থীফ অব বাগদাদ (চলতি ভাষায়—থীফু বাগদাদ) যে কত সপ্তাহ ধরে চলেছিল, তার ইয়ত্তা নেই। যতদূর মনে পড়ে, ১৯৩০-৩১ সালের গ্রীষ্মের সময়ে এই স্বনামধন্য অভিনেতাটি দিন-দুয়েকের জন্যে কলকাতায় পদার্পণ করেছিলেন। তিনি এসেছিলেন জাহাজে চেপে। তাঁকে মাত্র একবার চোখের দেখা দেখবার জন্যে প্রচণ্ড সূর্যতাপকে উপেক্ষা করে লক্ষ লক্ষ মানুষ ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে জাহাজঘাটায় অপেক্ষা করেছিল কখন তাঁর জাহাজটি এসে ঘাটে ভিড়বে, তারই জন্যে আকুল প্রত্যাশাকে বুকে নিয়ে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসানে যখন সত্যিই তাঁর জাহাজখানি দৃষ্টিগোচর হল এবং জাহাজখানি ঘাটে লাগবার পরে তিনি কেবিন থেকে বেরিয়ে এসে ওপরের ডেক থেকে অপেক্ষমান জনতার দিকে হাত নেড়ে তাদের আপ্যায়িত করলেন, তখন সমস্ত আকাশ-বাতাস জুড়ে সে কী আনন্দের কলরোল! অথচ ঠিক তারই পাশে যে হলিউডের বিখ্যাত চিত্র-পরিচালক এরিক ফন্ স্ট্রহিম দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁর দিকে ঐ লক্ষ লক্ষ দর্শনার্থীর মধ্যে একজনও ফিরে তাকায়নি।

তারকাপ্রীতি শুধু আমাদেরই একচেটিয়া নয়, এটা সব দেশেরই ব্যাপার। শোনা যায়, 'সিটি লাইটস্'-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্যে চার্লি চ্যাপলিন লণ্ডনে গেলে জনতার চাপ এড়াবার জন্যে নকল চার্লির আমদানী করতে হয়েছিল এবং কয়েক গ্রোস রুমালকে ছোট ছোট টুকরো করে সমবেত জনতার ওপর 'হরির লুট'-এর মতো ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। নির্বাক যুগের সর্বাপেক্ষা প্রিয়দর্শন ও জনপ্রিয় নায়ক রুডলফ ভ্যালেন্টিনোর মরণান্তক রোগের সময়ে যখন তাঁর দেহে রক্ত সঞ্চারের প্রয়োজন হয়েছিল, তখন সংবাদ পেয়ে হাজার হাজার মার্কিনী এগিয়ে গিয়েছিলেন রক্তদানের অভিপ্রায়ে। এবং তাঁর মৃত্যু-সংবাদ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বহু লোকের কাছে এমনই মর্মান্তিক হয় যে, অন্তত আট-নজন এই সংবাদে হৃদ্‌রোগাক্রান্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

বোম্বাই থেকে হিন্দী ছবির রাজ কাপুর, দিলীপকুমার, রাজেন্দ্রকুমার, সায়রা বানু, ওয়াহিদা রেহমান প্রভৃতি শিল্পীরা যখন হঠাৎ আমাদের কলকাতা শহরের গ্র্যাণ্ড হোটেলে এসে ওঠেন, তখন তাঁদের আগমনসংবাদ কি-জানি-কি-এক বিচিত্র উপায়ে একটি বিশেষ দর্শকমহলে বিদ্যুৎ-গতিতে ছড়িয়ে পড়ে এবং তাঁরা যে-কদিন এখানে অবস্থান করেন, সে-কদিন গ্র্যাণ্ডের বিপরীত ফুটপাথে জনতার ভিড় থাকে উদয়াস্ত কিংবা চব্বিশ ঘণ্টাই। 'গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না' এই প্রবচনটি তারকাদের ক্ষেত্রে খাটে না। তাই দেখি, আমাদের উত্তম, বিশ্বজিৎ, সৌমিত্র, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, সুচিত্রা, সুপ্রিয়া, মাধবী, সন্ধ্যা রায়, সাবিত্রী প্রভৃতি শিল্পী কোথাও

আসছেন, আসবেন বা এসেছেন শুনলে ফটকের সামনে পথে কম দর্শনার্থীর সমাগম হয় না। এমনকি, কোনো চিত্রগৃহে যদি কোনো জনপ্রিয় চিত্রশিল্পী উপস্থিত হন, সমবেত দর্শকমণ্ডলীকে তিনি যতক্ষণ না অভিবাদন জানাচ্ছেন, ততক্ষণ দর্শকবৃন্দের ভিতর থেকে তাগিদের পরে তাগিদ আসতে থাকে। 'নায়ক' ছবির প্রথম দিনের সান্ধ্য-প্রদর্শনীতে দেখেছিলুম, বিশ্ববিশ্রুত পরিচালক সত্যজিৎ রায়কে দেখবার জন্যে দর্শকমহলে কোনোরকম ব্যস্ততা নেই, কিন্তু 'নায়ক'-এর নায়ক উত্তমকুমারের বারেক দর্শনলাভের জন্যে তাঁদের ব্যাকুলতার অন্ত নেই। যতক্ষণ না তাঁদের জনপ্রিয় 'গুরু' তাঁদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন, ততক্ষণ তাঁদের অধীরতা নানাভাবে প্রকট হয়ে উঠছিল।



পরলোকে চিত্রাভিনেত্রী রেণুকা রায় :

কিছু দিন রোগভোগের পরে গেল বুধবার ৭ই ফেব্রুয়ারী বাঙলার সর্বজন-স্নেহধন্যা, প্রথিতযশা চিত্রাভিনেত্রী রেণুকা রায় মাত্র ৪৯ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। ১৯৩৫ সালে প্রথম চিত্রাবতরণ করে জীবনের প্রায় শেষ দিন পর্যন্ত একজন সার্থক অভিনেত্রীরূপে তিনি অন্তত তিনশোটি ছবিতে দর্শকদের অভিবাদন জানিয়েছেন। চল্লিশ দশকে তিনি বহু ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এর মধ্যে স্মরণীয় হচ্ছে শৈলজানন্দ পরিচালিত 'বন্দী' এবং 'শহর থেকে দূরে'। পরবর্তীকালে তিনি কুটিল চরিত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করেন. এদের মধ্যে 'নিষ্কৃতি', 'বিন্দুর ছেলে' ও 'মেজদিদি'তে তাঁর গৃহীত ভূমিকাগুলি স্মরণীয়। তাঁর শেষ ছবি 'বিবাহ বিভ্রাট' এখনও মুক্তি-প্রতীক্ষায়। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন সদা হাস্যময়ী. অত্যন্ত সরলা এবং অজাতশত্রু। আমরা তাঁর পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি।

চিত্র-সমালোচনা :

ছোট্ট জিজ্ঞাসা (বাঙলা) : ট্রায়ো ফিল্মস-এর নিবেদন; ২,৮২৫·৭০ মিটার দীর্ঘ এবং ১১ রীলে সম্পূর্ণ; প্রযোজনা : বিশ্বজিৎ; সংগঠন : রত্না চট্টোপাধ্যায়; পরিচালনা : ? প্রযোজনা সম্পর্কে বিশেষ উপদেশদান : হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়; সংগীত-পরিচালনা : নচিকেতা ঘোষ; কাহিনী ও গীতরচনা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার; চিত্রগ্রহণ : দিলীপরঞ্জন মুখোপাধ্যায়; শব্দানুলেখন : বাণী দত্ত এবং অতুল চট্টোপাধ্যায় (অন্তর্দৃশ্য); অনিল তালুকদার, সুজিত সরকার ও দশরথজী (বহির্দৃশ্য); সংগীতানুলেখন ও শব্দপুনর্যোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ; শিল্প-নির্দেশনা : সুধীর খান; সম্পাদনা : ? নেপথ্য কণ্ঠসংগীত : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য ও নীতা সেন; রূপায়ণে : প্রসেনজিৎ, বিশ্বজিৎ, অনুপকুমার, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ডঃ অজিত অধিকারী, মাধবী মুখোপাধ্যায়, গীতা দে, সুরুচিবালা সেনগুপ্তা, সীমা জানা, মায়া দেবী, প্রিয়া চট্টোপাধ্যায়, শর্মিষ্ঠা বিশ্বাস, মাঃ চীনা, মাঃ বাপী, মাঃ অধীর, মাঃ স্বপন, মাঃ অর্পণ, মাঃ মলয় প্রভৃতি। ক্যাপস্ ফিল্মস্ লিমিটেড-এর পরিবেশনায় গেল ৯ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার থেকে শ্রী, প্রাচী, ইন্দিরা এবং অন্যান্য চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করেছে।

মা-হারা ছোট্ট ছেলের মুখে ছোট্ট জিজ্ঞাসা : বাপী, মা কোথায়? বাপ এ-প্রশ্নের কি জবাব দেবে? বিশেষ করে সে যখন মুমূর্ষু স্ত্রীর কাছে কথা দিয়েছে, ছেলেকে মায়ের অভাব কোনোদিনই বুঝতে দেবে না। বাপের কাছ থেকে জবাব পেল না ছেলে; কিন্তু পেল ড্রাইভার রতনকাকার কাছে; তার মা স্বর্গে। অমনি প্রশ্ন হল : স্বর্গ কোথায়? স্বর্গ আকাশ ছাড়িয়ে অনেক দূরে, জবাব পেল সে। অতএব ছোট্ট ছেলে মাকে চিঠি লিখে রবারের উড়ন্ত বেলুনের সঙ্গে বেঁধে দিল। অধীর প্রতীক্ষার পরেও কোনো উত্তর না আসায় সে স্বর্গে যাবার জন্যে এরোপ্লেনের টিকিট কিনতে চাইল। মাকে কাছে পাবার বাসনা তার ক্রমেই বেড়ে উঠতে লাগল। এমন সময় একদিন তার নজরে পড়ল, সকলের থেকে তফাতে দাঁড়ানো একজন আনমনা মেয়েকে; দেখেই তার ধারণা হল—এই তার মা। ছুটে গেল তার কাছে, জোর করে আদায় করল তার কাছ থেকে মাতৃস্নেহ। বাপ যখন নিরুদ্দেশ ছেলের খবর পেয়ে তাকে বাড়ীতে ফেরত আনতে গেল, তখন সে আকর্ষণ করল তার নতুন পাওয়া মাকে তার সঙ্গে যাবার জন্যে। কিন্তু বেচারা নতুন-পাওয়া মা যায়ই বা কেমন করে, আবার ওই ছোট্ট কচি হৃদয়ের ভুলটাই বা ভেঙে দেয় কোন্ কাঠিন্যের দ্বারা নিজেকে আবৃত করে? বেচারা মাতৃহারা অবোধ সন্তান, বেচারা ঐ সন্তানের পিতা এবং বেচারা অনাত্মীয়া তরুণী! কেমন করে সকল দিক রক্ষা হয়, কেমন করে ঐ অবোধ বালকের বুভুক্ষিত হৃদয় প্রশমিত হয়, এরই সমাধানে 'ছোট্ট জিজ্ঞাসা'র শেষ কটি আবেগভরা দৃশ্য রচিত হয়েছে।

বিখ্যাত রুশ ছবি 'আই বট এ ড্যাডি'র ছায়া গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার রচিত 'ছোট্ট জিজ্ঞাসা'র ওপর কোথাও কোথাও পড়েছে কি? তা পড়ুক বা নাই পড়ুক, 'ছোট্ট জিজ্ঞাসা'তে চলচ্চিত্রোপযোগী ছোট ছোট পরিস্থিতির আদৌ অভাব নেই, যার ফলে কাহিনীটির চিত্রোপযোগিতা সুপরিস্ফুট। বিশেষ করে, অবোধ বালক বোম্বা যখন গীতাকে তার নিজের মা ভেবে অনুসরণ করে এবং নিজের সরল শিশুত্ব দ্বারা গীতাকে প্রভাবিত করে, তখন থেকে শুরু করে প্রায় শেষপর্যন্ত কাহিনীটির নাটকীয় পরিস্থিতি সদাই কৌতূহলী এবং উৎকণ্ঠিত রাখতে সমর্থ হয়েছে। অবশ্য সুবিমলের প্রশ্নের উত্তরে গীতার সংলাপগুলি আরও যুক্তিপূর্ণ ও স্পষ্ট হবার অবকাশ ছিল। কাহিনীর প্রথম দিকে বোম্বার বিদ্যালয়ের বার্ষিক অনুষ্ঠানটি নানা কারণে মনে কোনো রেখাপাত করে না। এসত্ত্বেও সমগ্রভাবে 'ছোট্ট জিজ্ঞাসা' হচ্ছে অভিনব সৃষ্টিধর্মী চিত্র।

'ছোট্ট জিজ্ঞাসা'র কেন্দ্র-চরিত্র হচ্ছে অবোধ বালক বোম্বা। এই চরিত্রটিতে জনপ্রিয় অভিনেতা বিশ্বজিতের বালকপুত্র প্রসেনজিৎ প্রথম চিত্রাবতরণ করেছে এবং নিজ অভিনয়দক্ষতায় দর্শকচিত্ত জয় করেছে। ব্যথিত ও বিপন্ন পিতা সুবিমলের চরিত্রে সংবেদনশীল ও সংযত অভিনয় করেছেন বিশ্বজিৎ। গীতার চরিত্রটিকে মাধুর্যমণ্ডিত করেছেন মাধবী মুখোপাধ্যায়। অতীতে একদিন যে গীতার স্বামী-পুত্র ছিল এবং সে যে বঞ্চিত জীবন যাপন করছে এবং তারই জন্যে তার আবার নতুন করে পাতানো মা হতে ভয় করে, এই ইঙ্গিতটি শ্রীমতী মাধবী গোড়া থেকেই তাঁর অভিনয়ের মাধ্যমে দিতে পেরেছেন। অন্যান্য ভূমিকায় অনুপকুমার (কল্যাণ), সুরুচি সেনগুপ্তা (মাসীমা), হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় (গীতার বাবা), জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় (ড্রাইভার রতন) প্রভৃতি উল্লেখ্য অভিনয় করেছেন।

ছবিটির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে চিত্রগ্রহণে, বিশেষ করে কয়েকটি বহির্দৃশ্যে একটি শিল্পময় রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন দিলীপরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। শিল্পনির্দেশনাও প্রশংসনীয়। কাহিনীটির

কতকগুলি স্থানকে আরও গতিবেগসম্পন্ন করবার সুযোগ ছিল চিত্র-সম্পাদকের। ছবিতে মোট তিনখানি মাত্র গান আছে, কিন্তু কোনো গানই কাহিনীর প্রয়োজন মিটিয়ে ছবিটির অগ্রগতিকে সাহায্য করেনি।

বালক-অভিনেতা প্রসেনজিৎ অভিনয়-দীপ্ত 'ছোট্ট জিজ্ঞাসা' একটি অভিনব রসোৎসারী ও নতুন আঙ্গিকের ছবি, যা দর্শকমাত্রকেই খুশী করবে।

—নান্দীকর

ফারেনহাইট ৪৫১ :—ইউনিভার্সালের নিবেদন; পরিচালনা : ফ্রাঁসোয়া ত্রুফো। চরিত্রচিত্রণ : জুলি ক্রিস্টি, অস্কার ওয়ার্ণর, সিরিল কুসাক্।

বিশ্ববিখ্যাত 'নিউ ওয়েভ-পন্থী' ফরাসী-চিত্র-পরিচালক ফাঁসর ত্রুফো পরিচালিত বহু-বিতর্কিত ফিল্ম ফারেনহাইট 451'এর একটি বিশেষ এবং কলকাতায় প্রথম প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। সায়ান্স-ফিকশ্যান সিনে ক্লাব ১১ই ফেব্রুয়ারী মেট্রো সিনেমায়।

প্রকাশ, বিশেষ কারণে, এই ফিল্মের সাধারণে মুক্তিলাভ এখনও অনিশ্চিত।

রে ব্র্যাডবেরী রচিত সায়ান্স ফিকশান বইখানি প্রথম বেরোয় ১৯৫৩ সালে। বইটির নামের অর্থ হচ্ছে এই যে, ঐ তাপমাত্রায় কাগজ পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

ফাঁসর ত্রুফো 'নিউ ওয়েভ' ফিল্ম্ আন্দোলনপন্থী অন্যতম অগ্রণী চিত্র-পরিচালক; তিনি শুধু 'ফারেনহাইট 451' পরিচালনাই করেননি—এর নাট্য-রচনাতেও সহযোগিতা করেছেন। ছবি তৈরী শুরু হবার চার বছর আগে তিনি ঠিক করেন একখানি সায়ান্স-ফিকশান থ্রিলার ছবি করবেন এবং ব্র্যাডবেরীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ব্র্যাডবেরী তাঁর গল্পটিকে চিত্র-উপযোগী করে নেবার জন্যে তাঁকে ঢালাও অনুমতি দিয়েছেন। প্রকাশ, ব্র্যাডবেরী সত্যজিৎ রায়কেও তাঁর যে কোন একটি কাহিনী অবলম্বনে ছবি তোলার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

ফারেনহাইট 451' ত্রুফোর রচিত রক্ত ঠান্ডা-করা গ্রন্থহীন ভবিষ্যতের ভাষায় ভয়াবহ চিত্র। তিনি উপন্যাসটিকে যেভাবে রূপ দিতে চেয়েছেন, তাকে তাঁর ভাষায় বলা চলে 'ভবিষ্যতের সমাজ-ব্যবস্থা এবং ইলেকট্রনিক যুগের পটভূমিকায় একটি উপকথা' যেন।

ভবিষ্যতের এক নাম-না বলা রাজ্যে ঘটেছে ছবির কাহিনী, মানুষকে যেখানে নিজস্ব চিন্তা থেকে নিরস্ত করা হয়ে থাকে। শুধু তাই নয়, আগে থেকে ছকে বাঁধা চিন্তাধারাকে প্রকান্ড টেলিভিশন পর্দায় প্রতিফলিত নিষ্প্রাণ—এক মূর্তির কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে মানুষের মনের মধ্যে যেন ঢাক পিটিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। সে-কণ্ঠস্বর হুকুম করে।

বিজ্ঞানসম্মত অগ্নিনিরোধক সে জগতে ফায়ার ব্রিগেডের কাজ আগুন নেভানো নয়, আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া। লাল রঙের দমকলগুলো কোলাহল তুলে দিগদিগন্ত সচকিত করে ছুটে যায়। কোথায় বই লুকোনো আছে খুঁজে বার করার ট্রেনিং দেওয়া হয়, ছাদের ঝুলোনো বাতিদানের মধ্যে থেকে ভারী ভারী বই বেরোয়, ইলেকট্রিক টোস্টারের ভেতর থেকে বেরোয় পেপারব্যাক বই। ছাপা হরফের ওপর এই নির্যাতনের কথা ত্রুফো চিত্রায়িত করেছেন সিনেমার করুণ কাব্যরসের স্পর্শে। একটি দৃশ্যে আছে, ওপরের ব্যালকনি থেকে একগোছা বই ফেলা হচ্ছে। বইগুলো ক্যামেরার ধীরগতির ফলে আস্তে আস্তে আসছে নেমে, অসহায়ভাবে পাতাগুলি বাতাসে ওলটপালোট হচ্ছে, তারপর মেঝেয় পড়ে ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে, অপেক্ষা করে থাকছে অগ্নি-সংযোগের জন্যে।

ফিল্মটিতে দোষত্রুটি যে নেই, তা নয়। তবে সেগুলো সামান্য। ত্রুফো ফরাসী ইংলন্ডে ছবি তুলেছেন। তবু নিজের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখেছেন ছবিতে। কলা-কৌশল পদ্ধতি ছাড়া ত্রুফোর রঙের ব্যবহারও অননুকরণীয়। ছবিটি দেখে যতো না তৃপ্তি, এ থেকে পাওয়া মনের খোরাক তার চেয়ে অনেক বেশি দামী। চিন্তার খোরাক ছাড়াও দেখবার খোরাকের বেশ কতকগুলি বিষয় উল্লেখ করবার মতো। সবচেয়ে স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে সেই ভবিষ্যৎ যুগের প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলি তিনি ফিল্মে দেখিয়েছেন ঠিক আমাদের এ যুগের মতো। ভবিষ্যতের প্রাকৃতিক দৃশ্য বলে, সায়ান্স-ফিকশানের কল্পনার ঘোড়া ছোটান নি, বরং বর্তমানকেই যেন বেশি যত্নের সঙ্গে ফোটাতে চেয়েছেন সে-দৃশ্যে।



শ্যামাশ্রী — নারায়ণী — মায়াপুরী — মীনা — রূপালী
জ্যোতি — মানসী — বাটা

ত্রুফো পরিচালকরূপে ফিল্মটিতে বেশ সংযম রক্ষা করেছেন, নামকরা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের দিয়ে অভিনয় করালেও তাঁদের বেশি করে কখনো দেখান নি। ছবিখানি দেখার পর তারিফ করতে হয়, কী বিরাট দুঃসাহস নিয়ে তিনি মানুষের সংস্কৃতি বিপর্যয়ের সম্ভাবনাকে বাস্তব চিন্তার ছোঁয়ায় সবার সামনে তুলে ধরে ভাবতে শিখিয়েছেন।

ফিল্মটির : প্রযোজক লিউইস এম অ্যালেন। ফোটোগ্রাফি : নিকোলাস রোয়েগ। সঙ্গীত : বার্নার্ড হ্যারমান।

ফিল্মটিতে একাই দুটি ভূমিকায় অভিনয় করেছেন যিনি, তিনি হলেন জুলি ক্রিসটি—'ডার্লিং' ফিল্মে অভিনয় করে যিনি বহু-আকাঙ্ক্ষিত অসকার পুরস্কার অর্জন করেছেন। 'ডক্টর জিভাগো' ফিল্মে ইনিই লারার ভূমিকায় নেমেছিলেন।

র‍্যাপচার : টুয়েন্টিথ সেঞ্চুরী ফক্স নিবেদিত ; পরিচালনা : জন্ গুলারমিন ; চরিত্রচিত্রণ : গুনেল লিন্ডবম্, প্যাট্রিসিয়া গোজ্জি, ডিন্ স্টকওয়েল্স, মেলভিন ডগ্লাস।

অ্যাগনেস কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পা দিয়েছে, প্রকৃতির উন্মুক্ত কোলে পাখীদের কলকাকলির সঙ্গে তার নিবিড়, (পাখীদের চক্রাকারে ঘোরার সঙ্গে অ্যাগনেসের দৃষ্টির পরিবর্তন সুপরিকল্পিত) সে তাই নিজেকে নিঃসঙ্গতায় ডুবিয়ে রেখে খড়ের পুতুলের মধ্যেই সঙ্গীকে খুঁজেছে। তারপর যখন সে সত্যিকারের জীবন্ত পুরুষ যোশেফকে পেল, তাকেও সে ছাড়তে রাজী নয়। কিন্তু এরই মধ্যে সৎমার সঙ্গে যোশেফের অবৈধ সম্পর্ক অ্যাগনেসের মধ্যে গভীর বেদনার সৃষ্টি করে। মা এরপর চলে যায় বাড়ী থেকে। যোশেফ অ্যাগনেসের মাঝে ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটে। বাবার এই দড়ীকাটা জীবন থেকে তাকে শহরে নিয়ে আসে যোশেফ। কিন্তু শহরের কোলাহল আর কৃত্রিমতার সে হাঁফিয়ে ওঠে, তাই সে আবার ফিরে আসে বাবার কাছে। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই ঝড়ের রাতে খেলার পুতুল হারিয়ে যাওয়ার মত যোশেফকেও সে হারায়। চিত্র-ব্যাকরণের ছোটখাট সব নিয়ম মেনে চলায় দরুনই ছবিটার গতি এসেছে, দর্শক তাই ক্লান্ত বোধ করে না কোন সময়। অবশ্য প্যাট্রিসিয়ার অভিনয় ছবির অন্যতম সম্পদ। পরিচালক গুলারমিন কিছু দৃশ্যের ওপর আরও একটু বেশী সংযত হতে পারতেন (যদিও সেন্সর করা হয়েছে)। কয়েকটি দৃশ্যের পরিকল্পনা অত্যন্ত সুন্দর—বিশেষ করে সৎমার সঙ্গে বয়ফ্রেন্ডের মিলনের পরের দৃশ্যেই পাখীর চিৎকার আর অ্যাগ্নেসের হাত পা ছড়িয়ে সবুজ ঘাসের ওপর 'স্কেয়ার ক্রো' হয়ে শুয়ে থাকা, শেষ দৃশ্যে রক্তমাখা স্কার্ট গায়ে মেয়েটির সেই মাথা ঘোরানো আর ওপরে দু একটা ক্লান্ত পাখীর ওড়া ইত্যাদি, চিত্রনাট্যের প্রয়োজন অনুযায়ী ছবিটাকে পরিচালক এমন জায়গায় এনে



ত্রুফোর 'ফারেনহিট ৪৫১' ছবির একটি দৃশ্য

ফেলেছেন সেখানে অ্যাগেনেস্কে একা থাকতেই হবে, তাছাড়া উপায়ই বা কি ছিল। পাখীদের শূন্য হাহাকার আর সমুদ্রের কলোচ্ছাসের মাঝে অ্যাগনেস তাই নির্বাসিত হোল।

ফিফটিটু মাইলস্ অফ্ টেরর : বর্তমান আমেরিকায় যুবসমাজের মধ্যে যে অস্থিরতা, তার প্রকাশ আমরা হিপ্পি বা মস্তক জাতীয় দলের আচার-ব্যবহার থেকে আন্দাজ করতে পারি। এ ছবিতেও ঠিক তেমনি দুটি যুবক আর একটি যুবতী কি ভাবে একটি কিশোরীর পিছনে ধাওয়া করে তার বাবা মা সকলকে স্নায়বিক টানাপোড়েন এর মধ্যে ফেলেছিল তারই কাহিনী। জনৈক ব্যবসায়ী স্ত্রী, কিশোরী কন্যা ও ছোট ছেলেকে নিয়ে দূরে এক শহরের পথে রওনা হয়েছিল সেখানে একটা মোটেল এর মালিক সে। পথে এই দুর্যোগ। চারটে রেসিংকার সারাটি পথ জুড়ে তাদের পিছু নিয়েছে। ঐ বেপরোয়া যুবক আর কিশোরীকে নিয়ে যখন সমস্যা এসেছে তখন অভিভাবকের সংকট ও এরূপ ক্ষেত্রে তাদের কর্তব্যাকর্তব্যের মধ্যে দিয়েই চিত্রনাট্য এগিয়েছে। যখন সে মাঝপথে এক শহরে এসেছে সেখানে ছেলেমেয়েদের মাধ্য এক ধরনের অভব্যতা তাকে ব্যাথিত করেছে আবার তারই কিশোরী মেয়ে যখন একটি ছেলের সঙ্গে মিশেছে সে তখন আর সেখানে থাকতে চাইল না। ফিরবে ঠিক করল, পথে শেষবারের মত এক দুর্ঘটনা ঘটিয়ে সেই যুবকটিকে উপযুক্ত শাস্তি দিলেন ভদ্রলোক। আর সাধারণ পাঁচটা ছবির মত নাচগান যৌনতায় ভরা এ ছবিতে যেটুকু বাড়তি আছে তা হল বর্তমান যুবসমাজের এক সাধারণ সমস্যার চিত্রায়ন, প্রধান চরিত্রদুটিতে আছে ডায়না এন্ডুস্ ও জিন্ ক্রেন।

দেশী ছবির খবর

ফিল্ম ক্লাসিকের জীবনচিত্র 'চারণকবি মুকুন্দদাস' চলতি সপ্তাহের ১৬ই ফেব্রুয়ারী রাধা, পূর্ণ, আলোছায়া ও অন্যান্য চিত্রগৃহে শুভমুক্তি লাভ করছে। ছবিটির নামভূমিকায় রূপদান করেছেন সবিতাব্রত দত্ত। নির্মল চৌধুরী পরিচালিত এ ছবির অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন জহর গাঙ্গুলী, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ছায়া দেবী, তৃপ্তি মিত্র, দিলীপ রায়, দ্বিজু ভাওয়াল, নিরঞ্জন রায়, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিমা চক্রবর্তী ও শ্রীমান দেবাশীষ। পবিত্র চট্টোপাধ্যায় সুরকৃত এ ছবিটির পরিবেশক চন্ডীমাতা ফিল্মস।

গীত ছন্দমের 'হংসমিথুন' চিত্রটি এ সপ্তাহের ১৬ই ফেব্রুয়ারী রূপবাণী, ভারতী, অরুণা প্রভৃতি চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করছে। পার্থপ্রতিম চৌধুরী পরিচালিত ও রচিত এ কাহিনীর প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন অপর্ণা সেন, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, রুমা গুহঠাকুরতা, জহর গাঙ্গুলী, সবিতা বসু, জহর রায় ও রবি ঘোষ। মিতালী ফিল্মস পরিবেশিত এ ছবির সুরকার হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত সমরেশ বসুর 'দুরন্ত চড়াই' বর্তমানে মুক্তি-প্রতীক্ষিত। সুর আর ছন্দের এ ভিন্ন সুরের কাহিনী-চিত্রে রূপদান করেছেন মাধবী মুখোপাধ্যায়, অনুপকুমার, বিকাশ রায়, দিলীপ রায়, জহর রায়, সোমেন চক্রবর্তী, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, পদ্মা দেবী, শিশির বটব্যাল ও সবিতা চট্টোপাধ্যায়। শ্যামল মিত্র সুরারোপিত এ চিত্রের পরিবেশক প্রতিমা চিত্র মন্দির।

জ্ঞানপীঠ পুরস্কারপ্রাপ্ত কথাসাহিত্যিক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসের চিত্ররূপ সম্পাদনের পর ছবিটি বর্তমানে মুক্তিপ্রতীক্ষিত। বিজয় বসু পরিচালিত এ ছবির প্রধান চরিত্রাবলীতে অংশ গ্রহণ করেছেন বিকাশ রায়, ছায়া দেবী, রুমা গুহঠাকুরতা, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, দিলীপ রায় জহর গাঙ্গুলী, বঙ্কিম ঘোষ, ছন্দা দেবী, কালী সরকার ও রবি ঘোষ। অরোরা ফিল্মস কর্পোরেশন প্রযোজিত ও পরিবেশিত এ ছবির সুরকার রবীন চট্টোপাধ্যায়।

সম্প্রতি ফিল্মীস্থান স্টুডিওর গোয়েল সিনে কর্পোরেশনের রঙিন ছবি 'এক ফুল দো মালি'র শুভ মহরৎ পালিত হয়। ডি. পি সিপ্পি পরিচালিত এ ছবির প্রধান চরিত্রে মনোনীত হয়েছেন সাধনা, সঞ্জয়, বলরাজ সাহনি, ডেভিড, দুর্গা খোটে এবং শিশু-শিল্পী মাস্যামা। সঙ্গীত পরিচালক রবি এ ছবির সুরকার।

ভীম সিং পরিচালিত ও ভীম সিং মেহমুদ প্রোডাকশনের রঙিন ছবির নতুন

নামাকরণ হয়েছে 'বাবুজী'। এ ছবির মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করছেন মেহমুদ, ওম প্রকাশ, প্রাণ এবং দক্ষিণ ভারতের অভিনেত্রী ভারতী. লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল ছবিটির সুরকার।

পরিচালক রমেশ তাঁর নির্মীয়মাণ 'ঈসক পর জোর নেহি'র চিত্রগ্রহণ ফিল্মিস্থান স্টুডিওয় সুসম্পন্ন করছেন। ছবিটির প্রধান অংশে রূপদান করছেন ধর্মেন্দ্র, সাধনা, বিশ্বজিৎ, অভি ভট্টাচার্য ও মেহমুদ। শচীন দেববর্মন ছবিটির সুরকার।

অমরকুমার পরিচালিত রঙিন ছবি 'মেরে হামদাম মেরে দোস্ত' সমাপ্তপ্রায়। ছবির মুখ্য চরিত্রে রূপদান করেছেন ধর্মেন্দ্র, শর্মিলা ঠাকুর, মমতাজ, ওমপ্রকাশ, অচলা সচদেব ও স্নেহলতা। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল।

শ্রীমতী রূপালী চৌধুরী প্রযোজিত চিত্ররঙ্গের 'চেনা-অচেনা' ছবির কাজ সমাপ্তপ্রায়। পরিচালনা করছেন হীরেন নাগ। আশাপূর্ণা দেবী রচিত হাসি-কান্না বিজড়িত এই অপরূপ কাহিনীর চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালক স্বয়ং। বিভিন্ন চরিত্রে অংশ গ্রহণ করছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, বিকাশ রায় সুমিতা সান্যাল, ছায়া দেবী, বিনা রাও আশা দেবী, অজয় গাঙ্গুলী, জহর রায়, অমর মল্লিক, বঙ্কিম ঘোষ, খগেন পাঠক প্রভৃতি।

'চেনা-অচেনা ছবির সুর সংযোজনার দায়িত্বে রয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এবং ইতিমধ্যেই এ ছবির কয়েকটি গান গ্রহণ করা হয়েছে। সঙ্গীতে কণ্ঠদান করেছেন আরতি মুখোপাধ্যায় ও সুরকার হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। গীত রচনা করেছেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার।

বিদেশী ছবির খবর

ইউরিপিডিসের নাটক অবলম্বনে মাইকেল কাকোয়ালিস্-এর 'ইলেকট্রা' গত এডিনবরা ও সালোনিকা উৎসবে পুরস্কৃত ও প্রশংসিত। এ ছবির প্রধান দুটি চরিত্রে আছেন আইরিন পাপাসা ও ইয়ানিস্...... ফরাসী ইতালীর যুগ্ম প্রযোজনায় ফরাসী চিত্র পরিচালক লুই মালের 'ভিভা মারিয়া'। পরিচালক ছাড়াও এ-ছবির অন্য আকর্ষণ ব্রিজিত বার্দং, জাঁ মোরা ও জর্জ হ্যামিল্টনের মত খ্যাতনামা শিল্পীরা...জন ফ্রাংকহাইমার পরিচালিত জাঁ মোরো, বার্ট ল্যাঙ্কাস্টার, পল্ স্কফোল্ড অভিনীত 'দি ট্রেন'...৭০ মি মি-এ তোলা ক্যারল রীড প্রযোজিত 'দি অ্যাগনি এণ্ড এক্সটাসি' ছবিটিও মুক্তি-প্রতীক্ষিতর তালিকায়। চরিত্র চিত্রণে আছেন চার্লটন হেস্টন ও রেক্স হ্যারিসন।...ইতালীয় প্রযোজক সংস্থা দিনো দ্য লরেন্তিস্-এর 'দি বাইবেল' এর অন্যতম আকর্ষণ মাইকেল পার্কস্, উলা বিগেড এর আদম ও ইভ্ চরিত্রে রূপদান নগ্ন অবস্থায় অভিনয়। জন হাস্টন্ পরিচালিত এ ছবির অন্যান্য চরিত্রে আছে রিচার্ড হ্যারিস্, জন হাস্টন্, স্টিফেন বয়েড, আভা গার্ডনার, পিটার ওটুল ও অন্যান্যরা...প্রখ্যাত আমেরিকান পরিচালক রবার্ট ওয়াইজ্-কৃত ও স্টিভ্ ম্যাকুইন, রিচার্ড অ্যাটেনবরো, রিচার্ড ক্রেনা, ক্যান্ডিস বার্গেন অভিনীত 'দি স্যাণ্ড পিবলস্'... 'ইভিনিং স্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকায় প্রকাশিত সত্যকার জীবনকাহিনী অবলম্বনে জোশেফ লজী পরিচালিত 'দি মডেস্টি ব্লেজ'। এ-ছবির অন্যান্য চরিত্রে আছেন মনিকা ভিত্তি, টেরেন্স স্ট্যাম্প, ডার্ক বোগার্ড, আলেকজাণ্ডার নক্স, হ্যারি এণ্ড্রুস।

*

প্রখ্যাত রুমানিয়ান পরিচালক গিও সাইজেস্কু তাঁর আগেকার সবকটি ছবিতেই এমন সব বিষয়বস্তুর অবতারণা করেছেন যা সাধারণ লোকের মধ্যে সমাজের ওপরেই রয়েছে। অবশ্য তিনি ক্যামেরা দিয়ে সেই সমস্যাগুলোর ভেতরে যাবার চেষ্টা করেছেন। ওঁর নতুন ছবি 'দি বল অন সাটারডে নাইট'ও তার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম নয়। একটি লাজুক যুবক সন্ধ্যাবেলা বলে নাচবার জন্য একজন সঙ্গিনী খুঁজে বেড়ায়, একে ছেলেটি লাজুক তার আবার মেয়েদের ওপর তার খুব একটা বিশ্বাস নেই আর ভয়ও আছে। অবশ্য শেষে সে মেয়ে পেয়েছিল সন্ধ্যার সঙ্গী হিসাবে তার একাকীত্ব দূরীকরণের জন্য।

অতীত যুগের বীরদের নিয়ে তোলা 'আউটলস' ছবির অসামান্য সাফল্যের পর পরিচালক দিনু কোকিন্না আরও দুটি নতুন ছবি তৈরীর পরিকল্পনা করেছেন। ইন্ডাজন বার্বুর চিত্রনাট্যে ছবি দুটি অর্থাৎ 'দি রেপ অফ দি মেইডনস' ও 'রিভেঞ্জ অফ দি আউটলস'-কাজ আগামী মাসেই শুরু করছেন।

পোলিশ চিত্র-পরিচালক জাঁ রিকুবস্কির নতুন ছবি 'হোয়েন লভ ওয়াজ এ ক্রাইম' দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে থার্ড রাইখের সকল বিদেশী শ্রমিকদের দুর্ভাগ্যের কাহিনী বর্ণনা করেছে। চিত্রনাট্যের বিস্তৃতি ঘটেছে যুদ্ধকালীন অস্বাভাবিক অনিশ্চিত পরিবেশের মধ্যে। যেসকল বিদেশীদের জার্মানরা বন্দী করে এনে শ্রমিকের 'মর্যাদা' দিয়েছিল তাদেরকে মানবিক অধিকার, এতটুকু স্বাচ্ছন্দ তো দূরে থাক এমনকি আইনগত অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিল যা দেখলে বিংশ শতাব্দীর মানুষের সভ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ জাগে। পরিচালক নিজে



॥ কাহিনী ও গীত রচনা—গৌরীপ্রসন্ন : গানে—হেমন্ত - ধনঞ্জয় - গীতা সেন ॥

শ্রী - প্রাচী - ইন্দিরা - পদ্মশ্রী - অশোকা

অলকা – পার্বতী – মায়া – জয়শ্রী – নেত্র – শ্রীমা – কল্যাণী – উদয়ন

॥ পরিবেশনা : স্কাপস্ ফিল্মস্ প্রাঃ লিঃ ॥

বি-এফ-জে-এর ১৯৬৭ সালের পুরস্কার

বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্টস্ অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের প্রদত্ত ভোটে কলকাতায় মুক্তিপ্রাপ্ত ভারতীয় (হিন্দী, বাঙলা এবং ইংরেজী) এবং ব্যবসায়িক ভিত্তিতে প্রদর্শিত বিদেশী ছবিগুলি সম্পর্কে নিম্নলিখিত ফলাফল ঘোষিত হয়েছে :

শ্রেষ্ঠ দশটি ভারতীয় ছবি : (১) ছুটি, (২) বালিকা বধূ, (৩) অনুপমা, (৪) কেদার রাজা, (৫) শেক্সপীয়রওয়ালা (৬) উসকী কহানী, (৭) আখরী খত, (৮) হাটেবাজারে, (৯) উপকার এবং (১০) মিলন।

শ্রেষ্ঠ তিনটি বিদেশী ছবি : (১) ডকটর জিভাগো, (২) হুজ অ্যাফ্রেড অব ভার্জিনিয়া উল্ফ এবং (৩) জোর্বা দি গ্রীক।

শ্রেষ্ঠ পরিচালক : অরুন্ধতী দেবী (বাঙলা : ছুটি), হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় (হিন্দী : অনুপমা) এবং ডেভিড লীন (ইংরাজী : ডকটর জিভাগো)।

শ্রেষ্ঠ অভিনেতা : উত্তমকুমার (বাঙলা : গৃহদাহ), সুনীল দত্ত (হিন্দী : মিলন) এবং অ্যান্টনী কুইন (ইংরাজী : জোর্বা দি গ্রীক)।

শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী : মৌসুমী চট্টোপাধ্যায় (বাঙলা : বালিকা বধূ), নয়না সাহু (হিন্দী : হরে কাঁচকী চুড়িয়াঁ) এবং জুলি ক্রিস্টি (ইংরাজী : ডকটর জিভাগো)।

শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেতা : বিকাশ রায় (বাঙলা : প্রস্তর স্বাক্ষর) এবং বলরাজ সাহনী (হিন্দী : আসরা)।

শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেত্রী : সুব্রতা চট্টোপাধ্যায় (বাঙলা : চিড়িয়াখানা) এবং দীনা গান্ধী (হিন্দী : উস্‌কী কহানী)।

শ্রেষ্ঠ সংগীত-পরিচালক : হেমন্ত মুখোপাধ্যায় (বাঙলা : বালিকা বধূ) এবং লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল (হিন্দী : মিলন)

শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকার : অরুন্ধতী দেবী (ছুটি) এবং বিমল দত্ত ও ডি এন মুখোপাধ্যায় (অনুপমা)।

শ্রেষ্ঠ সংলাপলেখক : বিমল কর (ছুটি) এবং মনোজকুমার (উপকার)।

শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী : সৌমেন্দু রায় (বালিকা বধূ), সুব্রত মিত্র (শেক্সপীয়রওয়ালা) এবং রাধু কর্মকার (রঙীন : আমন)।

শ্রেষ্ঠ শব্দযন্ত্রী : নৃপেন পাল এবং অনিল তালুকদার (বালিকা বধূ), রামস্বামী ও শ্রীনিবাসন্ (মিলন)।

শ্রেষ্ঠ সম্পাদক : সুবোধ রায় (ছুটি) এবং দাস ধায়মাড়ে (অনুপমা)।

শ্রেষ্ঠ শিল্পনির্দেশক : বংশী চন্দ্রগুপ্ত (চিড়িয়াখানা) এবং 'আসরা' চিত্রের শিল্পনির্দেশক।

শ্রেষ্ঠ নেপথ্য সংগীতশিল্পী : (১) পুরুষ : মান্না দে (অ্যান্টনী ফিরিঙ্গী) এবং মুকেশ (মিলন)। (২) স্ত্রী : প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় (ছুটি) এবং লতা মঙ্গেশকর (মিলন)।

বিশেষ পুরস্কার : ভারতীয় চিত্র : নন্দিনী (ছুটি) এবং বাণ্টি (আখরী খত)।

এ ছবি সম্পর্কে বলছেন—'আমি ছবিতে যুদ্ধকে সিন্থেটিক ফর্মে দেখাতে চেষ্টা করেছি, যারা সাধারণ মানুষ, যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে না কিন্তু যুদ্ধের শিকার হয় তাদের দৃষ্টিতে যুদ্ধকে দেখেছি আমি। আমি আমার ছবিতে দুজন জার্মান মহিলা, একজন পোলিশ ও কয়েকজন আমেরিকান চরিত্রের মধ্য দিয়েই এ কাজটা করেছি, ওরা হঠাৎ দুর্ঘটনাক্রমেই একসঙ্গে জড়ো হয়েছিল। সাধারণ ছোটখাট দুঃখ বেদনা মানুষকে কিভাবে একত্র করে এবং তাদের মধ্যে সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো কিভাবে তাদের চরিত্রে জটিলতা সৃষ্টি করে তাই বলতে চেষ্টা করেছি ছবিটায়।'

পোলিশ চিত্রজগতের অন্যতম প্রাণ জনপ্রিয় অভিনেতা জেবগ্‌নিউ সিবুলাস্কির কোন সপ্রাণ হাসি আর লজ্ ফিল্ম স্টুডিওয় দেখা যাবে না। রেল দুর্ঘটনায় তাঁর মর্মান্তিক মৃত্যু সেদিন প্রভাতী কাগজগুলোয় যে বিষাদের সুর বয়ে এনেছিল, ওঁর শেষ ছবি আলেকজান্ডার স্কিবর-রিলস্কির 'দি মার্ডারার লিভস্ হিজ ক্লুজ' ছবিতে সেই চিরাচরিত সেই হালকা রঙীন চশমা চোখে দেখতে দেখতে তাকে হারাবার কথা মনেই আসে না। স্কিবর-রিলস্কির স্বভাবতঃ প্রথম ছবি 'দেয়ার এন্ডারিডে লাইক'-এ সিবুলস্কি নায়ক চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন ও পরবর্তী ছবি 'লেট আফটারনুন' ও 'মেক্সিকো মুন' ছবিতে অভিনয় করেছেন' সিবুলস্কির অনুপস্থিতিতে ছবির অনেকাংশে তাদেসুজ লেমোনিস্কির গলায় ডাব করে নেওয়া হয়েছে।

ক্লুজো নতুন ছবি 'দি ব্রাইড ওর ব্ল্যাক'-এ এক সদ্য বিধবার স্বামীর রহস্যজনক মৃত্যুর কাহিনী সন্ধানের কথা বিবৃত করেছে।

রহস্য সন্ধানের পথে তাকে অনেক চরিত্রের সংস্পর্শে আসতে হয়েছে। শেষে যখন সে রুঝল ফার্গুস্ নামে এক চরিত্র তাকে ভালবাসে তখন সে পালাল ভয়ে। সবশেষে দেখা গেল বিধবাটি দাঁড়িয়ে আছে গীর্জা প্রাঙ্গণে। ব্যাকগ্রাউন্ডে তখন বিবাহের বাজনা বাজছে, ছবির শুরুও ছিল ঠিক এইভাবেই।

ছবির রিস্ চরিত্রের প্রণয়ী ভূমিকায় নিস্ সুন্দরী মাইকেলাকে নিয়েছেন। আর একটি এনগেজমেন্ট পার্টির ছোট পাঁচটি চরিত্রের জন্য নিয়েছেন ফরাসী সুন্দরী, কোৎদাজুর সুন্দরী, কার্নাভ্যাল সুন্দরী ও অন্যান্যদের। ক্লুজো প্রথম থেকেই স্থির করেছিলেন তিনি এ ছবির সব কাজই স্টুডিওর চার দেয়ালের বাইরে করবেন আর করেছেনও তাই। এ জন্য তাঁকে বন্দীশালা থেকে শুরু করে পাহাড়-ঘেরা গ্রাম, কোৎদাজুরে সেন্ট মাইকেল্-এর ঘর থেকে শুরু করে স্কুল কম্পাউন্ড, ভার্সাইয়ের থিয়েটার হল পর্যন্ত ক্যামেরা নিয়ে ছুটতে হয়েছে।

নতুন রচনা

নিমাই ভট্টাচার্যের

মেমসাহেব

আগামী সংখ্যা থেকে
ধারাবাহিকভাবে
প্রকাশিত হবে

মঞ্চাভিনয়

প্রতিযোগিতার ফলাফল

'প্রতিরূপে'র পরিচালনায় অনুষ্ঠিত পূর্ণাঙ্গ ও একক নাট্য প্রতিযোগিতার ফলাফল সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে—**পূর্ণাঙ্গ নাটক : প্রযোজনা :** প্রথম 'রজনীগন্ধা' (অমৃতস্য পুত্রাঃ), দ্বিতীয় 'শিল্পায়ন' (চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড), তৃতীয় 'বর্তিকা' (রাম শ্যাম যদু)। **শ্রেষ্ঠ অভিনেতা :** দিলীপ মৌলিক (রজনীগন্ধা), শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী: মঞ্জুলা ভট্টাচার্য (শিল্পায়ন), শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেতা : **অসীম গুহ** (চেনা-অচেনা), **শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেত্রী :** সান্ত্বনা ঘোষ (কল্লোল), শ্রেষ্ঠ শিশুশিল্পী মিনতি গোস্বামী (সখের দল), শ্রেষ্ঠ চরিত্রাভিনেতা : সুবোধ রায়চৌধুরী (রজনীগন্ধা), শ্রেষ্ঠ পরিচালক : বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য (বর্তিকা), শ্রেষ্ঠ নাট্যকার : অভিজিৎ ('বিষাক্ত বীজ' নাটক প্রযোজনা— চেনা-অচেনা)।

একাঙ্ক নাটক : শ্রেষ্ঠ নাট্য দল পর্যায়ে প্রথম হয়েছেন 'বাণীরূপা' (কেন এই অবক্ষয়), দ্বিতীয় 'নাট্যক' (রক্তে রোয়া ধান), তৃতীয় 'রূপক' (মরা গাঙে বান)। শ্রেষ্ঠ নাট্যকার নির্বাচিত হয়েছেন 'নাটতীর্থম' প্রযোজিত 'আমি থামবো না' নাটকের রচয়িতা সাধনবন্ধু চট্টোপাধ্যায়। শ্রেষ্ঠ পরিচালক : নিখিল ভট্টাচার্য (নাট্যক), শ্রেষ্ঠ অভিনেতা : সাধনবন্ধু চট্টোপাধ্যায়

(নাট্যতীর্থম্), শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেতা : পিলু মজুমদার (নাটাম) শ্রেষ্ঠ চরিত্রাভিনেতা : মানিক পাত্র ('নটরাজ'), শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী : সাধনা পাল (চেনা-অচেনা), শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেত্রী : যোগমায়া বেদজ্ঞ ('নাটমহল')।

'মুকুট নাট্য সংস্থা' আয়োজিত ৪র্থ বার্ষিক পূর্ণাঙ্গ নাট্য প্রতিযোগিতার ফলাফল সম্প্রতি ঘোষণা করা হয়েছে : প্রযোজনায় প্রথম 'অন্ধকারের রঙ সাদা' (নটতীর্থম্), দ্বিতীয় 'দশচক্র' (পাঞ্চজন্য), তৃতীয় (১): 'ক্রীতদাস' (নাট্যকে দল), (২): 'রজনীগন্ধা' (নান্দনিক), (৩): 'একটি ঘোষণা' (পথিকৃৎ), চতুর্থ 'মানদণ্ড' (নাট্যরূপা), পঞ্চম 'বিচার' (প্রতিবিম্ব)। শ্রেষ্ঠ পাণ্ডুলিপি 'ক্রীতদাস' (দীপক রায়চৌধুরী)—নাট্যকে দল)। শ্রেষ্ঠ পরিচালক : সাধন চট্টোপাধ্যায় ('অন্ধকারের রঙ সাদা'), শ্রেষ্ঠ অভিনেতা : রুদ্রগোপাল চক্রবর্তী (পাঞ্চজন্য), শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী : কেয়া ব্যানার্জি (পথিকৃৎ) ও গায়ত্রী দেবী (নান্দনিক), শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেতা : প্রকাশ নন্দী (প্রতিবিম্ব), শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেত্রী : রেণু সরকার (কুশীলব)।

বিবিধ সংবাদ

যন্ত্রসংগীতের মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান

গত ৪ ফেব্রুয়ারি রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম হলে আয়োজিত ওভারচার স্কুল অব মিউজিকের ছাত্র-ছাত্রীদের অনুষ্ঠানটি নানা কারণেই বেশ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। প্রধানত বেহালা, গিটার আর পিয়ানো-সহ এরকম যন্ত্রসংগীতের অনুষ্ঠানে যোগদান হওয়া যে সচরাচর ঘটে না, তা বলাই বাহুল্য। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সংস্থার অধ্যক্ষ শিশিরকুমার চট্টোপাধ্যায়।

এক কথায় বলতে গেলে অনুষ্ঠানের অর্কেস্ট্রা সংগীতই সেদিন সবচেয়ে জমে উঠেছিল। তবে শিশিরকুমার চট্টোপাধ্যায় সুরারোপিত আওয়ার ড্রিমল্যান্ড এবং ফলিজম নিঃসন্দেহে এই আসরের শ্রেষ্ঠতম অনুষ্ঠান। একক যন্ত্রে বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখেন বেহালায় মিলন চক্রবর্তী। দীনেশ বসুর ফিনেস এবং তাপস ঘোষের পোলকা ক্রম দি ব্যাটার্ড ব্রাইড শ্রোতাদের যথেষ্ট আনন্দ দেয়। সোমশঙ্কর দাসের অন অ্যান আইল্যান্ড উইথ ইউ এবং কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাজারে বাঁশরী উপভোগ্য হয়। অনুষ্ঠানে সত্যি সত্যিই বৈচিত্র্যের চমক ছিল।

'গীতালি'র সারস্বত সম্মেলন

বিগত শ্রীপঞ্চমী উত্তর কলিকাতার প্রখ্যাত সংগীত শিক্ষায়তন 'গীতালি'র সারস্বত সম্মেলনটি শিক্ষায়তনের অধ্যক্ষ পঙ্কজ [illegible] পরিচালনায় ও সংগীতাচার্য জয়কৃষ্ণ সান্যাল মহাশয়ের সভাপতিত্বে শ্যামবাজারস্থ ৩বি, ললিত মিত্র লেন (কলিকাতা-৪) গীতালি ভবনে সমারোহের সহিত উদ্‌যাপিত হয়। সেখানে বিগত পরীক্ষায় (প্রয়াগ সংগীত সমিতি, এলাহাবাদ) কৃতী ছাত্রছাত্রীদের 'অভিজ্ঞানপত্র'ও বিতরণ করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের মধ্যে বিশেষ করে যাঁরা শ্রোতাদের মনে রেখাপাত করেন তাঁরা হলেন বেহালায় রণজিৎ রায়, গীটারে শিবনাথ সাহা ও কণ্ঠসংগীতে শান্তা সাহা। এ ছাড়া কণ্ঠসংগীতে অংশগ্রহণ করেন শীলা রায়চৌধুরী, চায়না গঙ্গোপাধ্যায় ও উত্তরা চট্টোপাধ্যায়।

টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সমাবর্তন উৎসব

ক্যালকাটা ইনফরমেশন সেন্টার-এ সম্প্রতি টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের প্রথম সমাবর্তন উৎসব ও রবীন্দ্র-সংস্কৃতিবিদ সম্বর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে শিক্ষাবিদ মৃণালিনী দাশগুপ্তার প্রস্তাবানুসারে প্রমথনাথ বিশী ও বর্ষীয়ান সংগীত-সাধক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'রবীন্দ্র-তত্ত্বাচার্য' সম্মানে ভূষিত করেন অনুষ্ঠানের সভাপতি সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট অনুসৃত ডিপ্লোমা 'রবীন্দ্র-জ্ঞানতীর্থ' লাভ করেন শীলা ভট্টাচার্য, প্রণতি মুখোপাধ্যায়, নির্ঝরিণী দেবরায়, ছন্দা সেনগুপ্ত, সুলেখা ভট্টাচার্য ও মীরা ঘোষ।

সাধারণ সম্পাদক শান্তিকুমার দাশগুপ্ত প্রতিষ্ঠানের কার্যবিবরণ উপস্থিত শ্রোতাদের কাছে তুলে ধরেন। এ প্রসঙ্গে 'বৈতানিক' প্রকাশনী ও 'রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ'র ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করা হয়। প্রধান অতিথি ডঃ কালিদাস ভট্টাচার্য বলেন যে, বিশ্বভারতী বা রবীন্দ্রভারতী যে উদ্দেশ্য ও আদর্শে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে, সেই পথ অনেকটা ত্বরান্বিত করেছে টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে ও শেষে 'বৈতানিক' শিল্পীগোষ্ঠীর সময়োচিত সংগীত পরিবেশনও উল্লেখযোগ্য।

শুক্রবার ১৬ই ফেব্রুয়ারী থেকে



সহ-ভূমিকায় : রবি ঘোষ - জহর গাঙ্গুলী - জহর রায় - সবিতা - রত্না

প্রত্যহ ৩, ৬ ও ৯টায়

রূপবাণী :: ভারতী :: অরুণা

সুচিত্রা : যোগমায়া : পারিজাত : স্বপ্না (চন্দননগর) : বৈজয়ন্তী
শ্রীরামপুর টকীজ : নৈহাটি সিনেমা : কুইন (বজবজ) এবং অন্যত্র

খেলাধুলা

দর্শক

রঞ্জি ট্রফি সেমি-ফাইনাল

বাংলা : ১৮৬ রাণ (অম্বর রায় ৪৭, শ্যামসুন্দর মিত্র ৩৩ এবং চুনী গোস্বামী ৩২ রাণ। শিভালকর ৩৯ রাণে ৪, ভার্দে ২৮ রাণে ৩ এবং বন্দ্রে ১১ রাণে ২ উইকেট)

ও ২৮৭ রাণ (শ্যামসুন্দর মিত্র ১০৪, অম্বর রায় ৭১ এবং পি সি পোদ্দার ৫৪ রাণ। ভোঁসলে ২১ রাণে ৪, বন্দ্রে ৩৬ রাণে ২ এবং শিভালকর ৪২ রাণে ২ উইকেট)

বোম্বাই : ৪৩৬ রাণ (সুধীর নায়েক ১৩৬, মনোহর হরদিকার ১৩৫ এবং ভি আর কারকানি ৫০ রাণ। দুলাল সরকার ১০৩ রাণে ৪, রমেশ ভাটিয়া ৯৩ রাণে ৩ এবং সুব্রত গুহ ৭১ রাণে ২ উইকেট)—৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড।

ও ৪ রাণ (১ উইকেটে)

কলকাতার রঞ্জি স্টেডিয়ামে আয়োজিত ১৯৬৭-৬৮ সালের জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার একদিকের সেমি-ফাইনালে বোম্বাই দল প্রথম ইনিংসের রাণ সংখ্যার ভিত্তিতে বাংলাকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছে। খেলায় সরাসরি জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়নি।

এখানে উল্লেখ্য, জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় মোট সর্বাধিক ১৮ বার রঞ্জি ট্রফি জয়ের রেকর্ড বোম্বাইয়ের। তা ছাড়া তারা গত ৯ বার জাতীয় ক্রিকেট চ্যাম্পিয়ানশীপ লাভের সূত্রে উপর্যুপরি সর্বাধিকবার রঞ্জি ট্রফি জয়ের রেকর্ডও করেছে। বোম্বাই যদি ১৯৬৭-৬৮ সালের ফাইনালেও রঞ্জি ট্রফি জয়ী হয় তাহলে তারা উপর্যুপরি সর্বাধিকবার জাতীয় ক্রিকেট চ্যাম্পিয়ান হওয়ার দুর্লভ বিশ্ব রেকর্ড করবে। ভারতবর্ষ, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং পাকিস্থান—ক্রিকেট-ক্রীড়ারত এই সাতটি দেশের জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ইতিহাসে উপর্যুপরি সর্বাধিকবার জাতীয় চ্যাম্পিয়ান হওয়ার বিশ্ব রেকর্ড আছে মাত্র দুটি দলের—উপর্যুপরি ৯ বার করে বোম্বাইয়ের রঞ্জি ট্রফি জয় এবং অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস দলের শেফিল্ড শীল্ড জয়।

প্রথম দিনের খেলায় ১৮৬ রাণের মাথায় বাংলার প্রথম ইনিংস শেষ হলে বাকি সামান্য সময় বোম্বাই দল কোন উইকেট না খুইয়ে ২ রাণ সংগ্রহ করে। বাংলার খেলার সূচনা খুবই খারাপ হয়েছিল—৮ রাণের মাথায় ১ম এবং ১১ রাণের মাথায় ২য় ও ৩য় উইকেট পড়ে যায়। লাঞ্চের সময় বাংলার রাণ ছিল ১৮ (৩ উইকেট)। ৪র্থ উইকেটের জুটিতে শ্যামসুন্দর মিত্র এবং অম্বর রায় দলের ৬৭ রাণ তুলে দিয়ে দলকে শোচনীয় অবস্থা থেকে কিছুটা উদ্ধার করেন। বোম্বাই দলের "গ্রাউন্ড ফিল্ডিং" খুবই উন্নত পর্যায়ের হয়েছিল। তবুও দু-একটা 'ক্যাচ' ফস্কেছিল। তা নাহলে বাংলার রাণের চেহারা আরও কাহিল হত।

দ্বিতীয় দিনের খেলার গোড়ার দিকে বোম্বাই দলকে যে বিপর্যয়ের মধ্যে পড়তে হয়েছিল তা থেকে তারা সামলে নেয়। বোম্বাইয়ের ৩ রাণের মাথায় ১ম এবং ১৮ রাণের মাথায় ২য় উইকেট পড়ে যায়। এই প্রাথমিক বিপর্যয়ের পর ওপনিং-ব্যাটসম্যান সুধীর নায়েক (১৩৬ রাণ), অশোক মানকাদ (৩৯ রাণ) এবং মনোহর হরদিকার (নট-আউট ৬৩ রাণ) শেষ পর্যন্ত খেলার মোড় ঘুরিয়ে দেন। নায়েক বার তিন—রবীন মুখার্জি, চুনী গোস্বামী এবং দীপংকর সরকারের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে শেষ পর্যন্ত ৩৩০ মিনিট খেলে ব্যক্তিগত ১৩৬ রাণ (১৮টি বাউন্ডারীসহ) করেন। বোম্বাই দলের প্রথম ইনিংসের ২৫৯ রাণের (৪ উইকেটে) মাথায় দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ হলে তারা বাংলার প্রথম ইনিংসের থেকে ৭৩ রাণে এগিয়ে যায়; তাদের হাতে জমা থাকে প্রথম ইনিংসের আরও ৬টা উইকেট।

তৃতীয় দিনে চা-পানের নির্দিষ্ট সময়ের ৪০ মিনিট আগে ৪৩৬ রাণের (৯ উইকেটে) মাথায় বোম্বাই তাদের প্রথম ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। বোম্বাই দলের অধিনায়ক মনোহর হরদিকার ব্যক্তিগত ১৩৫ রাণ করে তৃতীয় দিনের খেলায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ৩৬৫ মিনিট খেলে তাঁর ১৩৫ রাণে ১৩টা বাউন্ডারী এবং দুটো ওভার-বাউন্ডারী করেছিলেন। তা ছাড়া তিনি এবং কারকানি ৭ম উইকেটের জুটিতে মূল্যবান ১১৯ রাণ সংগ্রহ করে দলের জয়লাভের পথ প্রশস্ত করেছিলেন।

বাংলা ২৫০ রানের পিছনে পড়ে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে এবং খেলার বাকি সময়ে দ্বিতীয় ইনিংসের ৩ উইকেট খুইয়ে মাত্র ৭৬ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। ফলে ইনিংস পরাজয় থেকে অব্যাহতি পেতে বাংলা দলের আরও ১৭৫ রানের প্রয়োজন হয়; এদিকে হাতে জমা থাকে দ্বিতীয় ইনিংসের ৭টা উইকেট। বাংলার দ্বিতীয় ইনিংসের ১২ রানের মাথায় ১ম ও ২য় এবং ১৫ রানের মাথায় ৩য় উইকেট পড়ে যায়।

চতুর্থ অর্থাৎ খেলার শেষ দিনে ২৮৭ রানের মাথায় বাংলার দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়। শ্যামসুন্দর মিত্র (১০৪ রান), অম্বর রায় (৭১ রান) এবং পি সি পোদ্দার (৫৪ রান) দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে বোম্বাইয়ের সরাসরি জয়লাভের পথ রুদ্ধ করে দেন। বাংলা দলের অধিনায়ক শ্যামসুন্দর মিত্রের ১০৪ রান (১৫টা বাউন্ডারীসহ) তুলতে ৩২০ মিনিট সময় লাগে। তাছাড়া তিনি অম্বর রায়ের সঙ্গে ৪র্থ উইকেটের জুটিতে ১১৩ রান এবং পি সি পোদ্দারের সঙ্গে ৫ম উইকেটের জুটিতে ১২৬ রান সংগ্রহ করে অধিনায়কের বিরাট দায়িত্ব যোগ্যতা-সহকারে পালন করেছিলেন।

খেলার শেষ দিনে যখন ২৮৭ রানের মাথায় বাংলার দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়, তখন খেলা ভাঙতে মাত্র ১৫ মিনিট সময় বাকি ছিল এবং খেলায় সরাসরি জয়লাভের জন্যে বোম্বাই দলের ৩৮ রানের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু বোম্বাই দলের দ্বিতীয় ইনিংসের মাত্র ৪ রানের (১ উইকেটে) মাথায় খেলাটি শেষ হয়।

অপরদিকের সেমি-ফাইনালে মাদ্রাজ ৭ উইকেটে সার্ভিসেস দলকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছে। প্রথম দিনেই খেলা ভাঙার ২৪ মিনিট আগে ২১৩ রানের মাথায় সার্ভিসেস দলের প্রথম ইনিংস শেষ হয়। মাদ্রাজ এইদিন ১ উইকেট খুইয়ে ৮ রান করে। মাদ্রাজ দলের প্রথম ইনিংসের ২৪৫ রানের (৬ উইকেটে) মাথায় দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ হয়। তৃতীয় দিনে ২৮৬ রানের মাথায় মাদ্রাজ দলের প্রথম ইনিংস শেষ হলে তারা ৭৩ রানে অগ্রগামী হয়। অপরদিকে মাত্র ১৪৫ রানের মাথায় সার্ভিসেস দলের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হলে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৭৩ রান তুলতে মাদ্রাজ দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নেমে খেলার ১৩ মিনিটে কোন উইকেট না-খুইয়ে ১০ রান সংগ্রহ করে। চতুর্থ অর্থাৎ শেষ দিনের লাঞ্চের আগেই খেলায় জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়ে যায়। মাদ্রাজের দ্বিতীয় ইনিংসের ৭৬ রানের (৩ উইকেটে) মাথায় খেলা শেষ হয়—মাদ্রাজ ৭ উইকেটে জয়ী হয়।

এই নিয়ে মাদ্রাজ চারবার রঞ্জি ট্রফির ফাইনালে উঠলো। তারা ইতিপূর্বে মাত্র একবার রঞ্জি ট্রফি জয়ী হয়েছে—১৯৫৪-৫৫ সালের ফাইনালে হোলকারের বিপক্ষে ৪৬ রানে। বাকি দুবারের ফাইনালে তারা পরাজিত হয়—১৯৩৫-৩৬ সালে বোম্বাইয়ের কাছে ১৯০ রানে এবং ১৯৪০-৪১ সালের ফাইনালে মহারাষ্ট্রের কাছে ৬ উইকেটে।

প্রদর্শনী ফুটবল

এশিয়ান এবং মারদেকা ফুটবল চ্যাম্পিয়ান ব্রহ্মদেশ সম্প্রতি ভারত সফরে এসে তাদের সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখে গেল। ভারত সফরে তাদের পাঁচটি প্রদর্শনী খেলার ফলাফল : জয় ৩, ড্র ১ এবং পরাজয় ১। নিখিল ভারত ফুটবল একাদশ দলকে তারা গৌহাটিতে ৩—১, কালিকটে ১—১, নয়া-দিল্লীতে ৪—২ এবং পাটনায় ১—০ গোলে পরাজিত করে। ভারত সফরে তাদের একমাত্র পরাজয় কলকাতার রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে আই এফ এ দলের কাছে ০—১ গোলে।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

॥ নূতন বই ॥

নীরদচন্দ্র চৌধুরীর প্রথম বাংলা বই

বাঙালী জীবনে রমণী ৮·৫০

লীলা মজুমদারের সুধাক্ষরা লেখনীর
সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান

কোনোখানে ৫৲

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
নূতন উপন্যাস

আঁধি ৭৲

প্রবোধকুমার সান্যালের
চাঞ্চল্যকর নূতন উপন্যাস

নগরে অনেক রাত ৪-৫০

জরাসন্ধের উপন্যাস

বন্যা ৪৲

তারাশঙ্করের চিরনূতন উপন্যাস

৮৲ (নূতন মুদ্রণ)

রমাপদ চৌধুরীর নূতন উপন্যাস

জরির আঁচল ৪৲

॥ নূতন মুদ্রণ ॥

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

অপরাজিত ১০৲

প্রবোধকুমার সান্যালের

বিবাগী ভ্রমর ৮৲

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের
বহু প্রশংসিত উপন্যাস

ঈষ্ট বাকল্যাণ্ড রোড (সংশোধিত নূতন সং) ৮৲

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের জীবন-মহাকাব্য

।পুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ (১ম খণ্ড) ৬৲

দ্বিতীয় ৬৲ ঃ তৃতীয় ৬৲ ঃ চতুর্থ ৬৲

প্রমথনাথ বিশীর
সিন্ধুনদের প্রহরী ৩॥
রবীন্দ্র সরণী ১০৲

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
একদা কী করিয়া ১৩৲

আশাপূর্ণা দেবীর
সুবর্ণলতা (নূতন মুদ্রণ যন্ত্রস্থ) ১৩৲

ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের
ধর্মে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ৫৲

নীহাররঞ্জন গুপ্তের
স্মৃতির প্রদীপ জ্বালি ৯৲

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
নগরপারে রূপনগর (দ্বিতীয় মুদ্রণ) ১৮৲

জরাসন্ধের
লোহকপাট (সম্পূর্ণ) ২০৲
লোহকপাট — ৪র্থ পর্ব — ৭৲

বিমল মিত্রের
সখী সমাচার ৬৲

তারাশঙ্করের
গন্নাবেগম ৮৲
শুকসারী কথা ৮॥

মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ ফোন ঃ ৩৪-৩৪৯২ ৩৪-৮৭৯১

সর্দি আর ইনফ্লুয়েঞ্জা?

অ্যানাসিন

এরকম ভোগান্তির নিশ্চিত উপশমে ঢের ভালো কারণ এটি ৪ ভাবে কাজ করে



অ্যানাসিন ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্রের মত একাধিক ভেষজের অপূর্ব্ব সমবায়ে তৈরী বলেই খুব তাড়াতাড়ি ৪-ভাবে আপনাকে আরাম এনে দেবে :

১) অ্যানাসিন সর্দ্দি এবং তার আনুষঙ্গিক অস্বস্তি দূর করবে— তাড়াতাড়ি।

২) অ্যানাসিন ইনফ্লুয়েঞ্জার সময় স্নায়ুর উত্তেজনা আর শরীরের ব্যথা সারাবে।

৩) অ্যানাসিন অবসাদ ঘোচাবে—যা সাধারণতঃ সর্দ্দি আর ইনফ্লুয়েঞ্জার সঙ্গী হ'য়ে আসে।

৪) অ্যানাসিন ক্লান্তি দূর ক'রে আবার আপনার স্বাভাবিক উৎসাহ ও আনন্দ ফিরিয়ে আনবে।

এছাড়া, অ্যানাসিনে মাথাধরা, দন্তশূল আর শরীরের ব্যথাও সারবে।

২টি অ্যানাসিন খেলেই খুব তাড়াতাড়ি আরাম

Regd. User: Geoffrey Manners & Co.

৭ম বর্ষ
৪র্থ খণ্ড

অমৃত

৪২শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday 23rd February, 1968. শুক্রবার, ১০ই ফাল্গুন, ১৩৭৪ 40 Paise

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেণ্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য অমৃতের কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে অমৃতের কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক। ভি-পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মনিঅর্ডারযোগে অমৃতের কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০-০০	টাকা ২২-০০
ষাণ্মাসিক	টাকা ১০-০০	টাকা ১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫-০০	টাকা ৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১/১ আনন্দ চাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

সূচীপত্র

শিক্ষাক্ষেত্রে তাণ্ডবলীলা

এখন শিক্ষার্থীরা বিভ্রান্ত, শিক্ষকগণ কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এই চরম দুর্দিনে দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণের চিন্তাধারার সংগে পরিচিত হইলে শিক্ষাসমস্যার সমাধান সম্ভব হইতে পারে।

- বিশ্বভারতীর অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন
  রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা .. ৫·০০
- প্রবীণ শিক্ষাবিদ তামসরঞ্জন রায়
  বিবেকানন্দের শিক্ষাচিন্তা . ৯·০০
- আশৈশব শিক্ষানুরাগী অনিল বিশ্বাস
  আশুতোষের শিক্ষাচিন্তা ... ৫·০০
- অধ্যক্ষ ডক্টর জ্যোতির্ময় ঘোষ
  শিক্ষার কথা ... ২·০০

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ প্রকাশিত

গ্রন্থচতুষ্টয় একত্রে লইলে ডাক খরচ লাগে না

জেনারেল বুকস এ-৬৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা-১২

গৌরাঙ্গ পরিজন প্রসঙ্গে

১৩ই পৌষ অমৃতের চিঠিপত্র পৃষ্ঠায় শ্রীসুরেশচন্দ্র দেবনাথ মহাশয় জানিয়েছেন যে শিবানন্দ সেনের বংশধরগণের এক শাখা এখনো শ্রীহট্টের আদপাশা গ্রামে বাস করছেন এবং তাঁদের বর্তমান পদবী অধিকারী, ব্যবসা গুরুতা। অধিকারী পদবী সাধারণত ব্রাহ্মণদের মধ্যেই প্রচলিত এবং ব্রাহ্মণরাই গুরুগিরি করে থাকেন। শিবানন্দ সেন জাতিতে বৈদ্য। তবে কী ঐ বংশধরগণ সেখানে ব্রাহ্মণ বলেই পরিচিত কিম্বা বৈদ্যদের মধ্যেও অধিকারী পদবী এবং গুরুগিরি ব্যবসা প্রচলিত আছে? দেবনাথ মহাশয়ের কাছ থেকে এ বিষয়ে জানতে আগ্রহ হয়।

ঐ পৃষ্ঠাতেই শ্রীনিরঞ্জন গোস্বামী মহাশয়ের বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। হাড়াই ওঝার মূল পদবী যদি বন্দ্যোপাধ্যায় হয়ে থাকে তবে তিনি ওঝা হলেন কী করে? এঁর বংশধর শ্রীপাদ নিত্যানন্দের বর্তমান খড়দহবাসী বংশধরগণ মূল পদবী পরিত্যাগ করে কখন গোস্বামী পদবীতে অভিহিত হলেন? এঁদের কোনো জ্ঞাতিগোষ্ঠী বীরভূমের একচক্রা গ্রামে থাকলে তাঁদের বর্তমান পদবী কী? শ্রীগৌরাঙ্গের পিতৃকুলের পদবী ভরদ্বাজ গোত্রীয় মিশ্র। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পিতৃকুলের পদবী কোন গোত্রীয় মিশ্র? এই প্রশ্নগুলির উত্তর জানতে আগ্রহ হয়।

শ্রীগোস্বামী মহাশয় আগে জানিয়েছেন যে বুঢ়ন গ্রাম নয়, পরগণা এবং হরিদাসের জন্ম ঐ পরগণার ভাটকলাগাছি গ্রামে। ২০শে পৌষের অমৃতে গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে লেখক তাঁর বক্তব্যে জানিয়েছেন হরিদাসের জন্ম বুঢ়ন গ্রামে। তবে কী এই বুঝতে হবে বিভিন্ন বৈষ্ণব গ্রন্থে একই বিষয়ে বিভিন্ন বর্ণনা আছে? যদি তাই হয় তবে কোন বৈষ্ণব গ্রন্থটি গ্রহণীয়? এ বিষয়েও লেখক ও শ্রীগোস্বামী মহাশয়দের কাছ থেকে জানতে পারলে আগ্রহী জনসাধারণ উপকৃত হবেন।

কোন সঙ্কীর্ণতিসংকীর্ণ অনুভূতিতে একজন মুসলমান স্কুলের টোলে পড়বার আগ্রহ জন্মেছিল এবং সেই ছেলে পরবর্তী জীবনে কৌপিনসার হয়ে তিন লক্ষ হরিনাম জপ না করে জল গ্রহণ করতেন না এই বিস্ময় ত আবহমানকাল থেকে যাবে, তা কী কেউ অস্বীকার করতে পারেন? এই হরিদাসই ত সব অবিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করে গেছেন একথাও কী অনস্বীকার্য।

শ্রীগোস্বামী মহাশয়ের বক্তব্যের উপসংহারে যা বলা হয়েছে সে সম্বন্ধে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে শুধু বৈষ্ণবদের সম্বন্ধেই নয় অতীতের যে কোনো সম্বন্ধে লিখতে গেলে পূর্বলিখিত, প্রচলিত বা শ্রুত যে কোনো সত্য ও তথ্যের সাহায্য নিতেই হয়। তার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ আগ্রহী পাঠক সাধারণের কাছে নিষ্প্রয়োজন এবং গুরুভার।

শ্রীনিরাপদ চট্টোপাধ্যায়
কোডরমু, হিনু, রাঁচী।

'গানের জলসা' প্রসঙ্গে

২৭শে পৌষ, ১৩৭৪ তারিখে প্রকাশিত অমৃতের "গানের জলসা" বিভাগে চিত্রাঙ্গদার কানন দেবীর কণ্ঠে জয়মালা পরিবেশন হওয়ার খবর পড়লাম।

বোম্বের চিত্রশিল্পী, সঙ্গীত-পরিচালক এবং অন্যান্য কুশলী দ্বারা নিয়মিতই এই অনুষ্ঠানটি পরিবেশিত হয়ে থাকে। চিত্রাঙ্গদার সংবাদ পরিবেশনে কিছু ভুল আছে। বাংলা চিত্রজগতের মহিলা শিল্পী পরিচালিত অনুষ্ঠান এই প্রথম নয়, কারণ বেশ কিছুদিন আগে বাংলারই প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীমতী রুমা গুহঠাকুরতা সাফল্যের সঙ্গে এই অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেছিলেন এবং সেটা শোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।

বাণী বোস
কলকাতা-৫

হিন্দী ছবি

আপনাদের সুপ্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক মাধ্যমে হিন্দী ছবি সম্পর্কে দু-একটি কথা বলতে চাই।

'ইভিনিং ইন প্যারিস' বলে একটা ছবি সম্প্রতি কলকাতার কয়েকটি হলে প্রদর্শিত হয়ে আবক্ষ তরুণ-তরুণীর হৃদয়হরণ করছে। ব্যাপারটি মোটেই শুভঙ্কর নয়। এ ছবির বাইরের প্রচারকার্য দেখলেই বোঝা যায় এর ভেতরে শালীনতা-নীতিবোধ-সুন্দরতার কোনো স্পর্শ আছে কিনা! আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, 'সেন্সার বোর্ড' এমনই কর্তব্য সচেতন যে এমন শালীনতাহীন ছবিকে পর্যন্ত বাজারে প্রদর্শনের ছাড়পত্র দান করেন! এই বোর্ডের সভ্যদের মধ্যে বিন্দুমাত্র দেশহিতৈষণা বা সমাজহিতচিন্তা স্থান পায় কিনা সেটা বোঝা মুস্কিল, নেতবৃন্দ বা পার্টি সমবায় যদি সব কিছুর ঊর্ধে মানবতাবোধ এবং স্বদেশকল্যাণকে রাখতেন তবে আমাদের দেশ তো "জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন" লাভ করতো।

বিশেষ করে দৃষ্টিকটু, শুধু দৃ নয়, জঘন্য ঘৃণ্য অথচ হাস্যকর হচ্ছে এ ছবির নায়িকার পোষাক-পরিচ্ছদ এবং অঙ্গভঙ্গী! সাবাস অভিনেত্রী, সাবাস প্রযোজককুল, সাবাস সুধী পরিচালক—একদিকে সনাতন নীতিবোধ বিসর্জন দিতে, অন্যদিকে অহিন্দী-ভাষাভাষী অঞ্চলে হিন্দীর আধিপত্য বিস্তৃত করতে তথা জাতীয় অখণ্ডতা (!) অক্ষুন্ন রাখতে হিন্দী ছবির বরণীয় এবং অমূল্য (!) অবদান যাঁদের আনুকূল্যে সম্ভব হচ্ছে তাঁদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা নেই।

অরুণকান্তি লাহিড়ী
বেহালা।

পর্যটন প্রসঙ্গে

৫ মাঘ ও ১২ মাঘের 'অমৃতে' প্রকাশিত শ্রীদুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমনতোষ বিশ্বাসের পত্রের জন্য তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

নতুন গেজেটিয়ার রচনা আরম্ভ হয়েছে অনেকদিন, কাজটা যথোপযুক্ত ভাবে করা হচ্ছে কিনা সেটাই পর্যালোচনার বিষয়। ১৯৫১ সালের সেন্সাসকে ভিত্তি করে শ্রীঅশোক মিত্র যে জেলা হ্যান্ডবুকগুলি রচনা করেন, তার অধিকাংশের উপক্রমণিকা মূলতঃ ওম্যালি সিরিজের গেজেটিয়ারগুলি ও চতুর্থ দশকের সেটেলমেন্ট রিপোর্টগুলি থেকে উদ্ধৃতি মাত্র, পরিবর্তন অতি সামান্যই। ১৯৬১ সালের সেন্সাসকে ভিত্তি করে শ্রীবিশ্বেশ্বর রায়ের সম্পাদনায় কয়েকটি নতুন জেলা হ্যান্ডবুক প্রকাশিত হয়েছে; এইগুলির উপক্রমণিকার কোন কোন অংশ নতুন রচনা ও অনেক নতুন তথ্যে সমৃদ্ধ। এখানে উল্লেখযোগ্য যে শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র সেনগুপ্তের সম্পাদনায় পশ্চিম দিনাজপুরের নতুন জেলা গেজেটিয়ার কিন্তু প্রকাশিত হয়েছে বেশ কিছুদিন আগে। সহ-সম্পাদক রূপে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম, সুতরাং আমার পক্ষে এই খণ্ডটি সম্পর্কে মতপ্রকাশ করার প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু বিশাল ভারতীয় গেজেটিয়ার সাহিত্য ও আঞ্চলিক ইতিহাস সাহিত্যের ভূমিকা, ইতিহাস ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনার অবকাশও বিশেষ প্রয়োজন আছে। 'অমৃতে' এ সম্পর্কে আলোচনা চলতে পারে।

শ্রীবিশ্বাস তাঁর পত্রে যে তথ্য দিয়েছেন, সে সম্পর্কে ভবিষ্যতে আরও আলোচনা করার ইচ্ছা রইল।

অমলেন্দু মুখোপাধ্যায়,
কলিকাতা—১

সম্পাদকীয়

চল ও অচল অবস্থা

কেউ জানেন না আমরা এখন কোন্ অবস্থায় বাস করছি। সবাই বলছেন, অবস্থাটা সুবিধার নয় অর্থাৎ অচল। অন্যরা বলছেন, বেশ তো চলছে। চরম নিরাশা থেকেই এ-ধরনের উক্তি বেরোতে পারে। পশ্চিমবাংলার অবস্থাও হয়েছে তাই। প্রায় তিন মাস ধরে এই রাজ্যে প্রশাসনিক জট লেগে আছে, তা খোলবার চেষ্টা করেও খোলা যাচ্ছে না। এ যেন রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতার মতো 'যতবার আলো জ্বালাইতে চাই নিভে যায় বারে বারে।'

গত সপ্তাহে বিধানমণ্ডলীর যুক্ত অধিবেশন শুরুতেই পণ্ড হয়ে যায়। রাজ্যপাল ভাষণ দিতে পেরেছেন কি পারেননি, তাই নিয়ে চুল-চেরা তর্ক চলছে। কিছুসংখ্যক সদস্য এমন হট্টগোল করছিলেন যে, রাজ্যপালের পক্ষে স্বাভাবিকভাবে সভাকক্ষে প্রবেশ করতে অনেক বেগ পেতে হয়েছিল। যদিও বা তিনি অন্য দরজা দিয়ে সভাকক্ষে ঢুকেছিলেন, তবুও তাঁর পক্ষে দু'-তিন মিনিটের বেশি ভাষণ দেওয়া সম্ভব হয়নি। তার কারণ বিরোধী পক্ষ চাইছেন বিধানসভা অচল করে দিতে। কার্যত বিধানসভা অচলই। স্পীকার বলেছেন যে, তাঁর পূর্বতন রুলিং পরিবর্তন করার কোনো কারণ ঘটেনি। সুতরাং যথাপূর্বং তথাপরং। অর্থাৎ বিধানসভার অচল অবস্থা চলছে এবং চলতে থাকবে যদি না এর মধ্যে সাংবিধানিক জটিলতা দূর করার অন্য কোনো চেষ্টা হয়।

বিগত সাধারণ নির্বাচনের পর অনেক রাজ্যেই সরকার বদল হয়েছে। কিন্তু এমন সসেমিরা অবস্থা বোধহয় অন্য কোনো সরকারের হয়নি। বিধানসভার অভ্যন্তরে ভোটাভুটিতে সরকারের স্থায়িত্ব বা অস্থায়িত্ব প্রমাণ করার মস্ত সুযোগ ছিল। এছাড়া পরিষদীয় গণতন্ত্রে অন্য কীভাবে সরকার বদল করা যায় তা আমরা জানি না। লক্ষণ খুবই খারাপ। এভাবে পরিষদীয় গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখা মুস্কিল। সরকার ও বিরোধী পক্ষের মধ্যে গণতন্ত্রের রীতিনীতি বিষয়ে ন্যূনতম বোঝাপড়া না থাকলে অচল অবস্থা দেখা দিতে বাধ্য। পশ্চিমবঙ্গে সেই দুর্ভাগ্যই আজ দেখা দিয়েছে।

দলভাঙাভাঙির ফলে রাজনৈতিক পরিবেশও কলুষিত হয়ে উঠছে। কে আসছে, কে যাচ্ছে, এই যদি রাজনৈতিক দলগুলির মুখ্য চিন্তা হয় তাহলে সরকারের কোনো স্থায়িত্ব থাকতে পারে না। এবং সরকার যদি নিজের সংখ্যাগরিষ্ঠতা সামলাতে ব্যস্ত থাকেন, তাহলে প্রশাসনিক কাজকর্ম শিকেয় ওঠে। পশ্চিমবঙ্গে গত ক'মাস ধরে তাই চলছে। বিরোধী পক্ষ পর্যায়ক্রমে করছেন আইন অমান্য। দফায় দফায় লোক গ্রেপ্তার বরণ করে জেলে যাচ্ছেন। ছাত্ররা বিক্ষোভ করছে। শিল্পকারখানাগুলির মধ্যে যেগুলির দরজা বন্ধ ছিল তার কিছু খুলেছে, কিন্তু সব খোলেনি। বেকারীত্বের বোঝা ভারী হচ্ছে, ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ সুযোগ পেলেই ঘটছে। বাইরের লোক তো কলকাতা সম্পর্কে শিহরিত।

এতে ক্ষতি হচ্ছে আমাদেরই। রাজনীতিকদের লড়াইয়ে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ আজ ক্ষতিগ্রস্ত, সন্ত্রস্ত এবং উদ্বিগ্ন। গণতন্ত্রে বলে, বিধানসভাতেই বিতর্কের মীমাংসা করতে হবে। সমস্যা যত জটিলই হক, বিধানসভায় তার সমাধানের পথ পাওয়া দুষ্কর নয়। দুঃখের বিষয়, সেই বিধানসভা এখন অকেজো হয়ে আছে। তার ফলে নানারকম নোংরামি রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে প্রবেশ করেছে। সকালে-বিকালে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে চলছে বিভিন্ন পক্ষের দড়ি টানাটানি—এটা খুবই লজ্জাকর ব্যাপার। এতে গণতন্ত্রের খোলসটুকুই বজায় থাকে, তার স্বধর্ম নষ্ট হয়।

এর প্রতিকারের কথা আমাদের ভাবতে হবে। নয়াদিল্লী এ-বিষয়ে চিন্তা করছেন। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাবলেই হক, কিংবা অন্য কোনো উপায়েই হক এই অচল অবস্থা দূর করা প্রয়োজন। এখন পর্যন্ত যে-সংবাদ পাওয়া গেছে তাতে মনে হয়, একটা হেস্তনেস্ত শীঘ্রই হবে। এখন বাজেট পাশ করাবার সময়। অধিবেশন পণ্ড হওয়ায় তার আশাও সুদূরপরাহত হয়ে গেল। আমরা জানি পরিষদীয় গণতন্ত্র নিয়ে এ-ধরনের খেলা করতে করতে অনেক দেশে গণতন্ত্রের সমাধি রচিত হয়েছে এবং তার ওপর মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে একনায়কতন্ত্র। পৃথিবীর বহু দেশই একনায়কতন্ত্রের দ্বারা কবলিত হয়েছে। ভারতবর্ষের যেন সেই দুর্ভাগ্য না ঘটে। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলি যদি বাস্তববোধ বিবর্জিত হয় এবং যে-কোনোভাবে ক্ষমতা দখলের জন্যই ব্যগ্র হয়ে ওঠে তাহলে পরিষদীয় গণতন্ত্রের স্বধর্ম আর থাকবে না, তার জায়গায় অন্যান্য উৎপাত দেখা দেবে।

পশ্চিমবঙ্গের অচল অবস্থা দেখে সে-কারণেই সকলে উদ্বিগ্ন। তার সুষ্ঠু সমাধান আমাদের দেশের বৃহত্তর স্বার্থেই প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, কোনো জোড়াতালির সমাধান আমরা চাই না। যাতে নির্বাচিত সরকার এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিরা নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে পারেন তার নিরঙ্কুশ ব্যবস্থা হওয়া দরকার। সেটাই গণতন্ত্রের পথ।



বিদেশে রবিশংকর

ভূদেবশংকর

পণ্ডিত রবিশংকর সাধারণের কাছে ভী সঙ্গীতশিল্পীরূপেই পরিচিত, ন্তু তাঁর বৈচিত্র্যময় কর্মজীবনের তিরূপ ভারতীয় সংগীতের সেবায় য়োজিত। ভারতীয় মার্গসঙ্গীতের দেশে প্রচারের ক্ষেত্রে তাঁর অক্লান্ত চেষ্টা জ সার্থক হয়ে উঠেছে। কিছুকাল আগেও রতীয় সঙ্গীত পাশ্চাত্যের শ্রোতাদের ছে অবোধ্য ছিল। দশ বছর আগেও লণ্ড ও আমেরিকায় ভারতীয় সঙ্গীত নিবার জন্য শ্রোতা পাওয়া দুষ্কর ছিল, র আজ সেই সব দেশে হাজার হাজার কি ভারতীয় সঙ্গীতকে অভিনন্দন নাচ্ছেন। একথা স্বীকার করতেই হবে ভারতীয় সঙ্গীতের বিদেশে যথার্থ চারের জন্য রবিশংকরের দান অসামান্য।

ভারতীয় মার্গসঙ্গীত বহুকাল ধরে গোষ্ঠীগতভাবে শিষ্য প্রশিষ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। আমাদের দেশের সাধারণ লোকের পক্ষেও এর নিগূঢ় রস আস্বাদন করার সুযোগ খুবই কম ছিল। রাজা মহারাজাদের আনুকূল্যে তাঁদের পারিষদ বর্গের মধ্যে এই সংগীতের আসর জমে উঠত। আজকাল অবোয়া জলসা ও সঙ্গীত সম্মেলনের মাধ্যমে এই সংগীত জনসাধারণের মধ্যে প্রসার লাভ করেছে। অনেকেই এই ভারতীয় সঙ্গীতধারাকে জানবার ও বুঝবার সুযোগ পেয়েছেন। একদিকে যেমন এই প্রচেষ্টা সার্থক হয়ে উঠেছে, অন্যদিকে তেমনি বিদেশী শ্রোতাদের কাছে এই সংগীতের যথাযথ প্রচার একান্ত প্রয়োজন ছিল। আমাদের দেশের সরকার বার বার সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদল বিদেশে পাঠিয়েছেন। এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে বিদেশী শ্রোতাদের মধ্যে কৌতূহল জেগে উঠলেও তাঁদের মন পরিতৃপ্ত হয়নি। তাই যখন রবিশংকর প্রমুখ শিল্পীরা বিদেশের দরবারে ভারতীয় সঙ্গীতসম্ভার নিয়ে উপস্থিত হলেন তখন তাঁদের মনে যথেষ্ট আগ্রহের সঞ্চার হল। বৎসরের পর বৎসর অক্লান্ত চেষ্টায় আজ রবিশংকর ভারতীয় সঙ্গীতের অন্তর্নিহিত ভাবধারাকে তাঁদের মনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন।

রবিশংকরের শিল্পীজীবনের প্রধান অনুপ্রেরণা তাঁর স্বনামধন্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীউদয়শংকর। শৈশব থেকেই তিনি এক সাংস্কৃতিক পরিবেশের মধ্যে লালিত হন। উদয়শংকরের নৃত্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে তিনি বহু দেশ ভ্রমণ করার সুযোগ পান এবং ভারতবর্ষের ও বিদেশের বহু গুণী

শিল্পীর সংস্পর্শ লাভ করেন। বাল্যকালেই তিনি Chaliapri, Paderwsky, Toscanini, Pablo Casal, Segovia, Vreisler, Hiefitz, Menuhin প্রভৃতি খ্যাতনামা শিল্পীদের সংগীতানুষ্ঠান শোনবার ও বহু প্রসিদ্ধ ব্যালে, সিম্ফনি, অর্কেস্ট্রা ও অপেরা দেখার সুযোগ পান। তাঁর পিতা পণ্ডিত শ্যামশংকর মহাশয়ও পাশ্চাত্য দেশে বহু ভারতীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এই সবের মধ্য দিয়েই রবিশংকরের শিল্পীজীবনের সূত্রপাত হয়।

আলমোড়ায় উদয়শংকর ভারতীয় কলাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে বহু শিল্পীর সমাবেশ হয়। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ প্রমুখ বহু শিল্পী—শ্রীতিমিরবরণ, শ্রীবিষ্ণুদাস শিরালী প্রভৃতির সঙ্গে তিনি সম্মিলিত যন্ত্রসংগীতের অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। বস্তুত পক্ষে আলমোড়া কলাকেন্দ্র সম্মিলিত যন্ত্রসংগীতের (Orchestra) এক নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করেন। মাত্র পনেরো বৎসর বয়সে তিনি উদয়শংকরের নৃত্য ও সংগীতানুষ্ঠানে যোগদান করেছেন। প্রসিদ্ধ সংগীতাচার্য ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব শ্রীউদয়শংকরের সম্প্রদায়ে তখন সংগীত পরিবেশন করতেন। পণ্ডিত রবিশংকর খাঁ সাহেবের পাণ্ডিত্যে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন এবং সব কিছু ত্যাগ করে খাঁ সাহেবের বাসস্থান মাইহারে এসে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বৎসরের পর বৎসর গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে ও কঠোর অনুশীলনের মধ্য দিয়ে তিনি খাঁ সাহেবের সুযোগ্য শিষ্য হয়ে ওঠেন। আর তারপর খুব অল্পকালের মধ্যেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন সংগীতআসরে বেশ প্রতিষ্ঠালাভ করেন। তিনি সেতারের একটি নবযুগের সূচনা করেন। ১৯৪৯ সালে রবিশংকর আকাশবাণীতে দিল্লী কেন্দ্রের সংগীত পরিচালক হিসাবে যোগদান করেন। তাঁরই একান্ত চেষ্টায় ‘বাদ্যবৃন্দ’ (National Orchestra) তৈরী হয় এবং National Programme এর প্রবর্তন হয়।

খুব অল্পকালের মধ্যেই তিনি সুযোগ্য সংগীত পরিচালক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। কয়েকটি চলচ্চিত্রের তিনি সংগীত রচনা করেন। ‘নীচানগর’, ‘ধরতী কে লাল’, ‘পথের পাঁচালী’, ‘কাবুলীওয়ালা’, ‘অপরাজিত’, ‘অনুরাধা’র সংগীত সৃষ্টি এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে কয়েকখানি ছবি বিদেশেও প্রশংসালাভ করে। তিনিই প্রথম ভারতীয় যাঁকে বিদেশী চলচ্চিত্রের সংগীত পরিচালনার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং সেই বিদেশী ছবিগুলির মধ্যে "The Chairy Tales" ভেনিস ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে বিশেষ পুরস্কার লাভ করে।

১৯৪৭ সালে তিনি পণ্ডিত নেহরুর ‘Discovery of India’ ... পুস্তকটিকে

রবিশংকর এবং শিক্ষানবীশ বিটল জর্জ হ্যারিসন



নৃত্য-নাট্যরূপে প্রযোজনা করেন। রবিশংকর বহু নৃত্যনাট্যের সার্থক সংগীত রচনার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। Discovery of India ও ‘সামান্য-ক্ষতির’ সংগীত বহু শিল্পরসিকের প্রশংসালাভ করে।

১৯৫৮ সালে তিনি প্যারিসে অনুষ্ঠিত UNESCO Music Festival -এ আমন্ত্রিত হন এবং প্রখ্যাত শিল্পী Yehudi Menuhin এবং David Oistrach -এর সঙ্গে এক অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন। এরপর ভারতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব নিয়ে তিনি জাপান ও মধ্যপ্রাচ্য পরিভ্রমণ করেন এবং ওইসব দেশে ভারতীয় সংগীতের প্রতি গভীর আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করেন। ১৯৬০ সালে তিনি Czechoslovakia -তে আমন্ত্রিত হন। ১৯৬১ সালে তিনি ষষ্ঠবার আমেরিকা ভ্রমণে যান এবং ন'মাস কাল সেখানে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে সংগীত পরিবেশন করেন। ১৯৬১ সালে Edinburgh Music Festival -এ ওস্তাদ আলি আকবর খানের সঙ্গে ‘যুগলবন্দী’ বাজিয়ে যথেষ্ট সুখ্যাতি লাভ করেন। ১৯৬৪ সালে তিনি দশমবার ইয়োরোপ মহাদেশের বিভিন্ন স্থানে সংগীতকলা প্রচার করেন। বিভিন্ন ভারতীয় সাংস্কৃতিক দলের প্রতিনিধিরূপে তিনি রাশিয়া, জাপান, ইরান, আফগানিস্থান, নেপাল, সিংহল ও ইউ-এ-আর পরিভ্রমণ করেন। পৃথিবীর বহু দেশে তিনি সংগীত পরিবেশন ছাড়াও বহু আলোচনাচক্রে যোগদান করেন এবং ভারতীয় সংগীতের প্রচারকল্পে তিনি নানাস্থানে বক্তৃতাদানও করেন। হিন্দুস্থানী সংগীতের ক্ষেত্রে তাঁর অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ১৯৬২ সালে তাঁকে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার দেওয়া হয় এবং ১৯৬৭ সালে তাঁকে ‘পদ্মভূষণ’ উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

বর্তমানে তিনি এগার মাসকাল যাবৎ আমেরিকা সফর করছেন। সেখানে তিনি দুটি সংগীতবিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। বহু বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীরা এখানে সেতারশিক্ষার অনুশীলন নিচ্ছেন। এবার আমেরিকাবাসীর মনে তিনি এক গভীর আলোড়ন জাগিয়ে তুলেছেন।

দুই শিল্পী রবিশঙ্কর এবং ওস্তাদ আলাউদ্দীন



মার্কিন দেশে রবিশংকর

চিত্রাঙ্গদা সেন

সংস্কৃতির আদানপ্রদানেই সভ্যতা সুদৃঢ় হয়। আর সেই উদ্দেশ্যেই সংস্কৃতির দূত আজ পাড়ি জমাচ্ছে দেশ-বিদেশে। ভারতীয় সংস্কৃতির এমনি একজন দূত হচ্ছেন পণ্ডিত রবিশংকর। সেতার বাদনে তাঁর কৃতিত্ব দেশের সীমা ছাড়িয়ে বিদেশেও ঔৎসুক্য সঞ্চার করেছে। পরদেশী সেই সব উৎসাহীদের অনুরোধে তাঁকে বার বার যেতে হচ্ছে সেখানে, শোনাতে হচ্ছে তাঁর বাজনা। শুধু তাই নয়, সেসব দেশে শিক্ষার্থীও জুটেছে অনেক। শিক্ষার্থীদের মধ্যে অধিকাংশই হচ্ছে বিটল এবং হিপি। তাঁর সুবিখ্যাত শিষ্য হচ্ছেন জর্জ হ্যারিসন—বিটল চতুষ্টয়ের অন্যতম। পণ্ডিতজী তাঁকে এখনও প্রথম শিক্ষার্থী বলে মনে করেন। জর্জকে তিনি সংগীত-শিক্ষা দিয়েছেন ইংল্যাণ্ডে এবং লস এঞ্জেলসে। জর্জ কিছুদিন বম্বেতে এসেও ছিলেন। উদ্দেশ্য অবশ্যই সংগীতশিক্ষা। এই সময় একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। প্রায় হাজার হাজার তরুণ-তরুণী তাঁর হোটেলের চারদিকে ভিড় করে। জর্জ তাদের বলেন, টোকিও অথবা অন্যান্য জায়গায় যে দৃশ্য দেখা যায় এখানে তা দেখব বলে আশা করিনি। আমি এখানে বীটলরূপে আসিনি, এসেছি জর্জ হ্যারিসন হিসাবে যোগসাধনা এবং ভারতীয় সংগীত শিক্ষা করতে। আপনাদের উচিত সবাগ্রে নিজেদের ঐতিহ্যের সংগে পরিচিত হওয়া। জর্জ সম্বন্ধে পণ্ডিতজীর অভিমত হলো, জর্জকে যখন প্রথম দেখি তখন তার বিনম্র আন্তরিকতায় অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছি। সে আমার কাছে ছ সপ্তাহ থাকতে গিয়েছিল। আমি জর্জকে একেবারে প্রাথমিক স্কেল, ফিগারিং ও পাল্টা থেকে শেখাতে শুরু করি। এটা অবশ্যই সময়সাপেক্ষ।

গুরু রবিশংকর ও বিটল শিষ্য সম্পর্কে হেরাল্ড এগজামিনার এক্সপ্রেস-এর সমালোচক বলেছেন, হলিউড Bowl এ আজকের সন্ধ্যায় উচ্চাংগ সংগীত পরিবেশন-রত পণ্ডিত রবিশংকরের সবচেয়ে মনোযোগী শ্রোতা ছিলেন তাঁরই বিনয়াবনত বিটল শিষ্য গীটার বাদক জর্জ হ্যারিসন। জর্জ এ প্রসংগে বললেন, তার লস এঞ্জেলস আসার উদ্দেশ্যই হচ্ছে আজকের রাতের সংগীতানুষ্ঠান শ্রবণ এবং পণ্ডিতজীর নতুন স্কুলে আরও কিছু সংগীতের পাঠ-গ্রহণ। তিনি ইতিপূর্বে ছয় সপ্তাহ জর্জকে শিক্ষা দিয়েছেন। খালি পায়ে ভারতীয় পোষাক পরিহিত জর্জ পায়ের উপর পা তুলে ভারতীয় পদ্ধতিতে মাটির উপর বসেই সাংবাদিকদের সংগে কথা বলছিলেন। তিনি আরো জানালেন, সিটা (সেতারের বীটল উচ্চারণ) নিয়ে আমি যাই বাজাইনা কেন তা পপ মিউজিক ছাড়া অন্য কিছুই দাঁড়াবে না। যদি আমি যথাযথ নিয়ম-মাফিক চর্চা চালিয়ে যেতে পারি এবং অক্ষুণ্ণ রাখতে পারি তবেই হয়তো কিছু বাজাতে পারব।

এ প্রসংগে জানিয়ে রাখা ভাল যে, পণ্ডিতজী লস এঞ্জেলসে কিন্নর স্কুল অফ ইণ্ডিয়ান মিউজিক শুরু করেছেন উৎসাহী শিক্ষার্থীদের অনুরোধে।

হলিউড bowl -এর এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে ন্যাট হ্যিন্ট্যাণ্ড পত্রিকার প্রতিনিধি মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, পণ্ডিত রবিশংকরের বক্তব্য শুনে মনে হলো আমেরিকনরা হুজুগপ্রিয় জাত। তিনি বলেছেন ভারতবর্ষে আমরা বাজাতে বাজাতে রাত-ভোর করে দিই, বাট ইন আমেরিকা ইউ হ্যাভ ইউনিয়নস।' পণ্ডিতজীর পরিচালনাধীন এই সংগীতের আসর চলে পুরোপুরি সাড়ে চার ঘণ্টা ধরে। আমেরিকাবাসী বিশেষত হিপিরা এতক্ষণ ধ'রে রাগসংগীত শুনতে পারে কিনা সেটা তর্কের বিষয়।

শ্রোতার ভিড় ছিল কল্পনাতীত। অনুষ্ঠান আরম্ভের অনেক আগে থেকেই দেখা গেল যে, তরংগস্রোতের মত শ্রোতৃবৃন্দ গাড়ি পার্ক করায় ব্যস্ত। এমন সময় তারকাসদৃশ শিল্পী শংকরের আবির্ভাব। বাইরে থেকে মনে হয় ভারতীয় সংগীত বেশিক্ষণ তাদের কান বরদাস্ত করবে না। যাহোক, লোকজনের আগমন দেখে কিন্তু একটা কথাকে কিছুতেই মনে আমল না দিয়ে পারলাম না যে, এ পর্যন্ত পণ্ডিতজী পশ্চিমে যত স্ট্যাণ্ডিং ওভেশন পেয়েছেন এবারের তীব্রতা তার চেয়ে যেন কিছু মন্দীভূত মনে হলো।

ব্যালকনি থেকে বক্সের দিকে শিশুরা এগুনোর দরুন অনেক আসনই ফাঁকা হচ্ছিল। আবার বেশি উৎসাহী শ্রোতাদের স্টেজের চতুর্দিকে ভারতীয় পদ্ধতিতে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে খুব মন দিয়ে বাজনা শুনতে দেখা গেল।

আত্ম-নিবেদিত শিল্পী রবিশংকরের অনেক কৃতিত্বের মধ্যে একটা মস্তবড় কৃতিত্ব হলো যে, তিনি কখনো পপ রাগাশ্রিত হাল্কা এবং চটুল রাগের পসারী

হয়ে সস্তা জনপ্রিয়তার লোভে ভারতীয় সংগীতের অবমাননা করেননি।

উৎসব শুরু হলো মিঞা বিসমিল্লার সানাই দিয়ে। আর শেষ অনুষ্ঠানটি হলো পণ্ডিতজীর অতি প্রিয় জমাটি সিন্ধু ভৈরবীতে। ত্রিশ মিনিট ধরে অনুষ্ঠানটি চলে এবং এই সময়টুকু যে কোথা দিয়ে কেটে গেল তা বোঝাও গেল না।

এই ভারতীয় সংগীতোৎসব এবং শিল্পীর আন্তরিক উদ্দেশ্য হলো আমেরিকান শ্রোতাদের রাগসংগীতে দীক্ষিত করা। তাঁদের সে প্রয়াস অনেকটা সার্থক হয়েছে। রাগসংগীতে দীক্ষার কাজ অনেকটা এগিয়ে গেছে এ সত্য মানতেই হবে।

প্রায় চল্লিশটি অনুষ্ঠানে রবিশঙ্কর রাগসংগীত পরিবেশন করেন এবং শিশুর ভিড়ে সংগীতসভাগুলি যেন শিশু উৎসবের রূপ নেয়। বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের এই উদ্বেল উচ্ছ্বাস দেখে মনে হচ্ছিল এ যেন শ্রোতা বা শিল্পীর কঠিন চেষ্টাপ্রসূত বস্তু নয়, নদীপ্রবাহের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দধারা।

তবে রবিশঙ্কর নিজের অনুষ্ঠানের মত অন্যান্য শিল্পীদের অনুষ্ঠানের আগেও যদি একটু বিশ্লেষণী পরিচয় জ্ঞাপন করতেন শ্রোতাদের রসগ্রহণের পথ প্রশস্ততর হতো। বিশেষ করে উল্লেখ করতে হয় আর এক সংগীতনায়ক আলি আকবর খাঁর অনুষ্ঠান। এ যেন হেমন্তরজনীর নিবিড় বেদনাভরা আকৃতি। চন্দ্রনন্দনের দুশ্লোকের পর মুহূর্তে দাঁড়িয়ে উঠে হাততালি দেওয়ার বুঝি সীমা ছিল না। করতালি সমাপনান্তে এসে পড়তে যেন শ্রোতারা বিরক্তবোধ করছিল। একই ব্যাপারের তিন-চারবার পুনরাবৃত্তি ঘটলো। এর চেয়ে সূক্ষ্ম কোন সৌন্দর্যব্যঞ্জনা কল্পনা করা যায় না।

আর একটি সংগীত আলোচনাসভা সম্পর্কে এডওয়ার্ড মিলার বলেছেন যে তরুণ সম্প্রদায়কে এই কমাস মধুপানরত মৌমাছির মত ভারতীয় রাগসংগীতের উন্মাদনায় মুগ্ধ হয়ে কনসার্ট হলে ঘুরতে দেখা গেছে। সহস্রাধিক সম্মোহনকারী সুর সমন্বয় ব্যক্তিগত সম্পদের মত প্রতিটি ভারতীয় শিল্পীর দখলে। বিভিন্ন রাগের পশ্চাদপটে, বিভিন্ন ঋতু, ভিন্ন মেজাজ—আধ্যাত্মিক ও অন্যান্য উৎসবের ভাব-ছন্দের তালে তালে ছন্দিত, মঞ্জুরিত হবার যে কি বিরাট সম্ভাবনা, তা আমাদের পাশ্চাত্য শ্রোতার পক্ষে কল্পনাতীত। সাধারণত সেতার এবং সেতারসদৃশ সরোদে এই রাগ বাজানো হয়ে থাকে। সেতারী রবিশঙ্কর বলেন, 'সেসব দিন আর নেই যখন ভারতীয় সংগীতকে পাশ্চাত্যবাসী কিছুটা আজগুবি সংগীতের উদাহরণরূপে গণ্য করতেন। যেমন দিল্লীর পণ্ডিতকুল পপ সংগীতকে 'প্রাথমিক' নামে অভিহিত করে থাকেন। যদিও বম্বে-কলকাতার তরুণ সম্প্রদায় এবং ছাত্ররা বিটল্‌স অথবা মুভি মিউজিককে যতটা দক্ষ আমাদের হাজার বছরের ঐতিহ্যসমৃদ্ধ সংগীতের সঙ্গে ঠিক ততখানি পরিচিত নন।'

পণ্ডিত রবিশঙ্কর এবং ওস্তাদ আলিআকবর



তিনি আরো বলেন, 'এদেশে সংগীতানুরাগী নয় এরকম শ্রোতাদের অভিভূত করতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি। এটা ঈশ্বরের করুণা ছাড়া আর কিছু নয়। সংগীতপরিবেশনের ব্যাপারে আমার হয়তো একটা ঈশ্বরদত্ত সামঞ্জস্যবোধ আছে। সম্প্রতি আমি Chappaquc ফিল্মের সংগীত রচনা করছি একজন অ্যাডিক্টের সম্বন্ধে। এমন অনেক তরুণ শ্রোতা আছেন যাঁরা মনে করেন আমি 'ড্রাগের' প্রভাবেই এত সুন্দর বাজাই। তাঁদের এই ধারণা ভুল। আমি মাদকদ্রব্য ব্যবহার করি না, অথবা করার প্রয়োজন আছে বলে মনেও করি না। খুব সম্ভব ভারতীয় রাগসংগীতের অন্তর্গত আধ্যাত্মিক প্রেরণাই আমায় শক্তি জোগায়। হয়ত তা থেকেই এঁরা এই ধারণা করেছেন। ভারতীয় 'যোগ'-এর সুশৃঙ্খল পদ্ধতির অনুসরণ চিত্তনিবেশের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় বস্তু।'

এ প্রসঙ্গে 'দি ওয়াশিংটন পোস্ট'-এর জুডিথ মার্টিন বলেছেন, রবিশঙ্কর বলেন বাজাবার সময় তাঁর দেহমন স্বচ্ছ, পবিত্র এবং সংযত ও গম্ভীর থাকে। তিনি তাঁর শ্রোতাদের কাছ থেকেও এই জিনিস আশা করেন। তাঁর এই উক্তি শুধুমাত্র হিপিদের প্রতিই নয়, যারা তাঁকে লোকসংগীতের নায়করূপে পূজো করে তাদের কাছেও। ভারতীয় দূতাবাসে আয়োজিত মোরারজী দেশাই-এর সাক্ষাৎসভার ক্যাবিনেট পদস্থ ব্যক্তিদের প্রতিও তাঁর এই আবেদন ছিল।

শঙ্কর বলেন, গত দশ বছরে পপ, ফোক এবং অনেক পাশ্চাত্য শিল্পী আমাদের সংগীতের দ্বারা অনুপ্রেরিত হয়েছেন। আমি জ্যাজ সংগীতের সবসময় প্রশংসাই করেছি। তাঁদের কেউ বা আমার কাছেও সংগীতের পাঠগ্রহণ করেছেন। কিন্তু ভারতীয় সংগীতের পক্ষে কখনো পাশ্চাত্য সঙ্গীত থেকে কোন কিছু ধার করার প্রয়োজন হয়নি। অথবা পাশ্চাত্য সংগীতের সংস্পর্শে এসে আমার বাজনার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয়নি। ভারতীয় সংগীত সম্বন্ধে যাঁদের কোন ধারণা নেই তাঁরা ভাবেন ভারতীয় সংগীত ঘন্টার পর ঘন্টা চলবে, একটানা বেড়ালডাকের মত আদিঅন্তহীন। ভারতবর্ষে আমি দু-ঘন্টা আড়াই ঘন্টা ধরে বাজিয়েও আনন্দ পাই, কিন্তু এখানে আমি অনুষ্ঠানকাল সংক্ষেপ করে দিয়েছি। তবু এই পাঁচ মিনিটের অনুষ্ঠানেও যে শ্রোতারা মুগ্ধ না হয়ে পারেন না তার কারণ এর অপরূপ সুর ও স্বরের মিলন। রাগ রক, রাগ মাফিন—এধারা হয়তো থামানো যাবে না। কিন্তু জনপ্রিয়তা সেতার অথবা সংগীতের কোন ক্ষতি করবে আমি তা বিশ্বাস করি না। যেমন বিশ্বাস করি না যে Segoavia অথবা Valiah Beram এর সিরিয়স গিটার উচ্চাঙ্গ সংগীতের কোন ক্ষতি করতে পারে। আমার বাজনার অনুষ্ঠানে উঠতি তরুণদের দেখে আমি খুশিই হই। এরা মূল্যায়ন করে। এটা ভালই। কিন্তু আমি সত্যিই চমকে উঠি যখন কোনো কনসার্টের শেষে শ্রোতারা এসে তানপুরাবাদককে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, তুমি এক আনন্দদীপ্ত সন্ধ্যা আমাদের উপহার দিয়েছ। অথচ তানপুরাবাদকের কাজ হল, এদেশে যাঁরা পিয়ানো বাদকের সমান—পুস্তকের পাতা ওল্টান তাঁদের মতো।

শঙ্কর সব শেষে বলেন, 'ধর্ম অথবা সংগীতের কোন সোজা রাস্তা নেই। এ হলো সাধনার সম্পদ—ধ্যানলব্ধ বস্তু। শব্দের দ্বারাই ঈশ্বরের কাছে সহজে পৌঁছনো যায়। ইট ক্যান বি ডেভিলিশ অর ইট ক্যান বি গডলি। হিপিদের মত আশু-সিদ্ধির সিদ্ধাই আমাদের দেশেও প্রচুর। কিন্তু ভাল জিনিস সময়সাপেক্ষ। হাউ লং ডাজ ইট টেক টু বিকাম এ কনসার্ট আর্টিস্ট অ্যান্ড হাউ লং ডাজ ইট টেক টু বিকাম এ পপুলার প্লেয়ার!'



রক্তের টান

সুভষ সেন

লম্বা টানা বারান্দা। উপরে টালির ছাদ। সামনের দিকে ঝুঁকে আছে। মফস্বল শহরের পুরনো আমলের ডাক-বাংলোয় যেমনটা থাকে। পরপর গোটাকয়েক ঘর। বিরাট দরজা ঘরগুলোর এবং সবগুলোই বারান্দামুখো। দরজার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জানলাগুলিও বড় বড়। খড়খড়ি লাগানো। তবে এখন আর আস্ত প্রায় কোনটাই নেই। একটা ঘর বাদে বাকি সবগুলোই বন্ধ। এই ঘরটা অর্থাৎ আমি যেটায় উঠেছি, মোটামুটি চলনসই হলেও নেহাতই হতশ্রী—দীর্ঘকাল দরজা জানলায় হাত পড়েনি, কলি ফেরানো হয়নি, মেঝেতে অসংখ্য ফাটল ধরেছে। ঘরের আনাচে-কানাচে ঝুল জমে আছে। প্রথম দর্শনে যে প্রেমে পড়িনি সেটা বলাই বাহুল্য। কিন্তু অন্য ঘরগুলি দেখবার পর মন স্থির করতে এক মুহূর্তও দেরি হয়নি। বিশেষত যখন চৌকিদার দরজাগুলো সব খুলে দিল, আলোয় সারা ঘর ভরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মনের অন্ধকারও যেন দূর হল। চৌকিদার আশ্বাস দিলে যে আরো একটু ঝাড়পোঁছ ও করে দেবে। ঘরের রং-চটা খাট, নড়বড়ে টেবিল আর হাতলভাঙা চেয়ার আমাকে বিশেষ দমাতে পারলে না। কোণে একটা ড্রেসিং-টেবিলও ছিল, কিন্তু তার আয়নাটার এমন জরাজীর্ণ অবস্থা যে তাতে আর ছায়া পড়ে না বললেই চলে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও জায়গাটা আমার খুব ভালো লেগে গেল। শহরটা সুন্দর। বাংলা-বিহার সীমানায় হওয়ার দরুন দুই প্রদেশের ভালো-মন্দ মিশিয়ে থাকবার পক্ষে দস্তুরমতো ভালো, বিশেষত আমার মতো দুদিনের মুসাফিরের কাছে তো বটেই। জায়গাটার আরেক গুণ, লোকের ভিড় বলতে যা বোঝায় তা নেই, আর চেঞ্জারদের উৎপাতও কম। সরকারের নেক-নজর এখানে পড়ে না, তাই ডাক-বাংলোতে ন'মাসে ছ'মাসেও লোক আসে না। সুতরাং এখানে নিশ্চিন্ত মনে কয়েকটা দিন কাটিয়ে দেওয়া যাবে।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হব হব। ঘরের সামনেই বারান্দার একধারে সে আমলের ঢাউস গোছের একটা আরাম কেদারায় বসে আছি গা এলিয়ে। পূর্ণিমার চাঁদ ধীরে ধীরে উঠছে। একটু দূরেই শালবন। ফাঁক দিয়ে চাঁদটি দেখা যাচ্ছে। প্রথমে মনে হচ্ছিল যেন একটা প্রকাণ্ড তামার থালা। যত উপরে উঠছে, থালাটা ততই ছোট হয়ে আসছে, আর সেই সঙ্গে রঙটা তামাটে থেকে ক্রমেই রুপোলী হতে হতে ধপ্ করে একসময়ে হয়ে গেল আলোয় আলোময়। সন্ধ্যার অন্ধকারও ফিকে হতে হতে জোছনার জোয়ারে বিলীন হয়ে গেল। যে শালগাছগুলো লম্বা লম্বা ছায়ার হাত বাড়িয়ে ডাক-বাংলোটাকে ছুঁতে চেষ্টা করছিল, জোছনার উজ্জ্বল আলোয় সচকিত হয়ে তারা যেন হাত গুটিয়ে যে-যার জায়গায় নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। শুধু মিহি বরফের গুঁড়োর মতো জোছনার হাল্কা একটা ওড়না গাছগুলোর মাথায় আলতোভাবে লেগে রইল।

মাথার নিচে হাতদুটো জড়ো করে আরাম কেদারায় আধ-শোয়া হয়ে প্রকৃতির রঙবদলের খেলা দেখছিলাম। দেখতে দেখতে এমন তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম যে, জলজ্যান্ত একটা মানুষ কখন এসে বারান্দার সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়েছে লক্ষ্যই করিনি। পায়ের শব্দে হুঁশ হল। তাকিয়ে দেখি আগন্তুক আমার দিকেই এগিয়ে আসছে। কাছাকাছি আসতে ঠাহর হল ভদ্রলোক ধুতি-পাঞ্জাবি পরা বাঙালী। গায়ে একটা চাদর গলা অবধি জড়ানো। চৌকিদারটা গেছে বাজারে, ফলে বাতি জ্বালানো হয়নি তখনো। চাঁদের আলোয় যতটুকু দেখা যায় তাতে মনে হ'ল ভদ্র-লোকের বয়স বেশি নয়। পঞ্চাশের নিচেই হবে। দাড়ি-গোঁফ কামানো। নাতিদীর্ঘ চেহারা। হাতে একটা মাঝারি সাইজের ব্যাগ।

"আজ রাত্রের মতো একটা ঘর পাওয়া যাবে এখানে?" আগন্তুক প্রশ্ন করলেন। ভারী গলা, স্পষ্ট উচ্চারণ। বেশ ব্যক্তিত্ব-ব্যঞ্জক। আমি নিজের অজান্তেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। জবাব দিলাম,

"ডাক-বাংলোর চৌকিদার একটু বেরিয়েছে, এখনি ফিরে আসবে। আপনি বরং অপেক্ষা করুন এখানে।" এই বলে ওঁকে চেয়ারটা দেখিয়ে দিলাম। উনি হাতের ব্যাগটা একধারে রেখে সিঁড়ির ধাপের উপরেই বসে পড়ে বললেন, "না, না আপনি অনর্থক ব্যস্ত হবেন না। দয়া করে বসুন। আমার কোনো তাড়া নেই, চৌকিদার এলেই সব ব্যবস্থা হবে।" অগত্যা আমাকেই আবার চেয়ারে বসতে হ'ল। ওঁকে বেশি পেড়াপীড়ি করতে সাহস হ'ল না। তবু গায়ে পড়েই আবার বললাম, "আমিও সবে এসেছি। এই ঘরটায় আছি। দেখি বাতিটাতি একটা পাওয়া যায় কিনা। চৌকিদারকে আমিই পাঠিয়েছি বাজারে খাবার কিনতে। আপনারও তো লাগবে? ইস্, একটু আগে যদি আসতেন তবে ওকেই বলে দেওয়া যেত।" এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে থামলাম। ভদ্রলোক শুধু বললেন, "আপনি ব্যস্ত হবেন না প্লীজ, আমি খেয়েই এসেছি।"

ডাক-বাংলোটা শহরের এক প্রান্তে হওয়ায় কাছাকাছি জন-বসতি অপেক্ষাকৃত বিরল। কয়েক ঘর বাড়ি আছে, শাল গাছগুলো আড়াল করে রাখায় জায়গাটা প্রায় নির্জন বলেই মনে হয়। শালবনের ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে দু-একটা আলোর চকিত নিশানা সন্ধ্যার দিকে দেখা যাচ্ছিল কিন্তু এখন জোছনার উজ্জ্বল আলোয় তাও আর নজরে পড়ছিল না। থেকে থেকে একটা দমকা উত্তুরে হাওয়া এসে চোখে-মুখে লাগতে শরীরটা শিন-শিন ক'রে উঠল। আড়চোখে ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে দেখলাম উনি তন্ময় হয়ে পূর্ণিমার শোভা দেখছেন। হঠাৎ কোনো নৈশপাখির ডাকে ওঁর চমক ভাঙলো। আমার দিকে ফিরে জিগ্যেস করলেন, "আপনার কী মনে হয়, ঘর পাওয়া যাবে?" আমি বললুম, "না যাওয়ার তো কারণ নেই। আমি ছাড়া আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই এখন ডাক-বাংলোয়। ঘর তো অনেকগুলো। তবে তাদের ভগ্নদশা দেখলে আপনার এখানে রাত্রিযাপনের আগ্রহ কতখানি থাকবে জানি না।" কোনো জবাব দিলেন না ভদ্রলোক। তারপর খানিকক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। এমন সময়ে চৌকিদার ফিরে এল।

আমার পাশের ঘরেই ভদ্রলোক আশ্রয় নিলেন। আমি নিজের ঘরে ঢুকতে ঢুকতে ওঁকে উদ্দেশ করে বললুম, "হাতমুখ ধোয়া হলে আমার ঘরে চলে আসুন, খেতে খেতে আলাপ-পরিচয় হবে।"

একটু বাদে চৌকিদার একটা কেরোসিনের টেবিল ল্যাম্প জেলে ঘরের সেই নড়বড়ে টেবিলটার উপরে রেখে গেল, তারপর খাবারের চাঙারীটা দিয়ে গেল। কুঁজো থেকে দু-গ্লাস জল ভরে নিয়ে ভদ্রলোকের অপেক্ষায় বসে রইলাম। কয়েক মিনিট বাদেই উনি এলেন। টেবিলের ওধারে আমার মুখোমুখি একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন। ল্যাম্পের আলো সরাসরি ওর মুখের উপর পড়েছে। সুন্দর না হলেও সুপুরুষ। গোঁফ-দাড়ি কামানো তক্‌তকে মুখ, একটু ফ্যাকাশে কিন্তু চওড়া চোয়ালে কেমন যেন কঠিন, প্রায় নির্মম। মাথায় ঘন কালো চুল, উস্কোখুস্কো। গায়ের চাদরটা গলায় জড়ানো। গায়ে খদ্দরের পাঞ্জাবি। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভদ্রলোকের চোখ। আশ্চর্য অনাসক্ত দৃষ্টি সে চোখের, যেন অন্য কোনো জগতে বিচরণ করছে। ওঁর দৃষ্টি আমার উপরে অথচ আমার উপস্থিতি সম্পর্কে উনি সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। কী যেন ভাবছেন আপন মনে।

শালপাতায় কিছু খাবার তুলে ওঁর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম, "নিন খান। কখন খেয়েছেন, নিশ্চয় এতক্ষণে আবার খিদে পেয়ে গেছে। তারপর, মহাশয়ের নাম, ধাম, পেশা এবং এই ভগবান পরিত্যক্ত শহরে আগমনের হেতু?" আমার কথাগুলো ভদ্রলোকের কানে গেল কিনা বোঝা গেল না, তবে ওর দৃষ্টিটা ঈষৎ স্বচ্ছ হয়ে এল, তারপর হঠাৎ যেন সার্চলাইটের মতো আমার মুখের উপর এসে পড়ল। এই আকস্মিক পরিবর্তনে আমি একটু বিব্রত হয়ে নড়েচড়ে বসলাম। আমাকে আরো চমকে দিয়ে ভদ্রলোক তার ভরাট গলায় জিগ্যেস করলেন, "অজিত মিত্তিরকে চিনতেন, আইভি লজের অজিত মিত্তির?"

মানুষের মনের গতি বিদ্যুৎকেও হার মানায়, তা নইলে চোখের পলকে তিরিশ বছর পেছিয়ে গিয়ে কী করে ইওরোপের সেই ছবির মতো ছোট্ট শহরটিতে হাজির হলাম। অয়েল টেকনোলজি শিখতে এসেছি দুজনেই। বিদেশী ভাষা বলতে ইংরেজী ছাড়া আর বিশেষ কিছু জানি না। ভাঙা-ভাঙা জার্মানে কাজ চালানো মুশকিল। তার উপরে আমি আবার সাংঘাতিক মুখচোরা। অপরিচিত কারুর সঙ্গে মুখ তুলে কথা কইতে গেলে হাত-পা কাঁপে। সেদিন অজিত মিত্তির না থাকলে যে আমার কী দশা হত ভাবতেও ভয় করে। আমারই বয়সী অথচ কী সপ্রতিভ। দুদিনেই বিশালকায় ফোরম্যান আর কারিগরগুলোর সঙ্গে ভাব জমিয়ে নিলে। ভাষার সমস্যাকে ও মোটে আমলেই আনলে না। কাজেও ও সকলকে তাক লাগিয়ে দিলে। গান গেয়ে, রসিকতা করে, পাল্লা দিয়ে মদ খেয়ে অল্পদিনেই ও সকলের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিল। আমার অসহায় ভাবটা অজিত খুব উপভোগ করত। কিন্তু আবার সব সময়ে আমাকে আগলেও রাখতো।

তিন বছর শিক্ষানবিশীর পর আমি দেশে ফিরে এলাম। অজিত ওখানে চাকরি নিয়ে থেকে গেল। আসলে ঐ দেশের একটি মেয়ের প্রেমে পড়েছিল। আর বোধহয় দেশটাকেও ও ভালোবেসে ফেলেছিল। দেশে ফেরবার পর কিছুদিন ওর সঙ্গে পত্রালাপ চলেছিল। তারপর যেমন হয়ে থাকে, ধীরে ধীরে দু-পক্ষই নিজের নিজের আবর্তে জড়িয়ে পড়লাম। চিঠিপত্রও বন্ধ। অতঃপর দীর্ঘ তিরিশ বছর পরে এই প্রথম অজিত মিত্তিরের নাম শুনলাম।

জিগ্যেস করলাম, "অয়েল টেকনোলজিস্ট অজিত মিত্তিরের কথা বলছেন? সে তো ইওরোপে আছে জানতাম। আপনি তাকে কোথায় পেলেন? কোন আইভি লজে?" ভদ্রলোক আমার বিস্মিত ভাব লক্ষ্য করেও যেন মোটেই বিচলিত হলেন না, বললেন, "মিশন রোয়ের আইভি লজ চেনেন না? বোর্ডিং হাউস? অজিতের সঙ্গে ওখানেই আমার আলাপ। ওর ফোটো অ্যালবামে আপনার ছবি দেখেছি।" আমার বিস্ময় আরো শতগুণ বেড়ে গেল। এই দেশেই কলকাতা শহরে আইভি লজে অজিত। আর আমি জানি না। এ যে অবিশ্বাস্য। না কি ভদ্রলোক ভুল করছেন। আমার মনের ভিতরে যে তোলপাড় হচ্ছিল সেটা বুঝতে পেরেই যেন উনি আবার বললেন, "আমার নাম রঞ্জন সামন্ত। আইভি লজে একই ঘরে আমরা ছিলাম প্রায় বছর খানেকের ওপর। ইওরোপ থেকে ফিরে সোজা ওখানেই উঠেছিল অজিত।"

"আশ্চর্য তো! এক বছর অজিত কলকাতায় ছিল অথচ আমাকে জানাল না। এ-তো অজিতের পক্ষে অতি অস্বাভাবিক ব্যাপার। যাই হোক আছে কোথায় এখন বাসকেলটা?" আমার কণ্ঠে উষ্মা প্রকাশ পেল বোধহয়। ভদ্রলোক প্রায় কৈফিয়ৎ দেবার মতো ব্যস্ত গলায় বললেন, "অজিত বেঁচে নেই। ঠিক দু-মাস আগে অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে।"

একসঙ্গে এতগুলো শক-এর জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন যেন নাটকীয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অজানা জায়গায় প্রায় পোড়ো বাড়ির মতো এই ডাক-বাংলোয় হঠাৎ রঞ্জন সামন্তের উদয় থেকে শুরু করে অজিতের মৃত্যুসংবাদ সবই কেমন সৃষ্টিছাড়া। আগেই বলেছি অজিতের সঙ্গে প্রায় তিরিশ বছর আমার সাক্ষাৎ নেই, সুতরাং ওর মৃত্যুসংবাদে আমার ঠিক মুহ্যমান হবার কথা নয়। কিন্তু তাসত্ত্বেও ওর মতো সদা হাস্যময়, সদাপ্রফুল্ল একজনের মৃত্যুর খবর ক্ষণিকের জন্য হলেও মনকে স্পর্শ না করে পারে না। তাছাড়া, আরো বড় প্রশ্ন — এক বছর কলকাতায় থেকেও ও কেন আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে নি?

একটু সামলে নিয়ে খাবারের প্রতি মনোনিবেশ করলাম। রঞ্জনবাবু হাত গুটিয়েই বসে রইলেন। তারপর খানিক বাদে ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় চলে গেলেন। অন্যমনস্কভাবে কোন মতে খাওয়া শেষ করলাম। রাত তখন আরো গড়িয়েছে। বহু দূর থেকে একটা কুকুরের একটানা ডাক ছাড়া কোথাও সাড়া-শব্দ নেই। শুধু হাতে বাঁধা রিস্টওয়াচের টিকটিক শব্দটা যেন হঠাৎ বহু গুণ বেড়ে গেছে।

খাওয়া শেষ করে যখন বারান্দায় এলাম, রঞ্জনবাবু নিজের ঘরে ঢুকে পড়েছেন। আমার সাড়া পেয়েই বোধহয় বেরিয়ে এলেন। বললেন "একটু বসবেন, না এখনি ঘুমুতে যাবেন?"

ওঁর প্রশ্নে মনে হল আমি খানিকক্ষণ থাকি এটাই উনি চান। হয়তো অজিতের

সম্বন্ধেই কিছু আরো বলবেন। স্বভাবতই আমার মনে নানা প্রশ্ন ভিড় করে এসেছিল। সুতরাং কৌতূহল মেটাবার আশাতেই একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলাম বারান্দার এক কোণে। জোছনার জোয়ারে চারদিক ভেসে যাচ্ছে আর বোকা কাকগুলো থেকে থেকে ডেকে উঠছে। গা শিরশির করা উত্তুরে হাওয়া থেকে বাঁচবার জন্য গায়ের চাদরটা গলা অবধি টেনে নিলাম।

"সমরেশবাবু, আপনি একটু আগেই প্রশ্ন করেছিলেন যে, আমি এখানে কেন এসেছি। বিশ্বাস করুন, এখানে আসার আগের মুহূর্ত অবধি আমি নিজেই তা জানতাম। কী যেন আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু আপনাকে পেয়ে অবধি মনে হচ্ছে আমাকে আসতেই হত। আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্যই। আপনার নাম শুনেছি অজিতের কাছে। আপনাকে সত্যি ও ভালোবাসত। কিন্তু আপনার সঙ্গে দেখা করবার ওর উপায় ছিল না। ও নিজেও এ জন্য জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কষ্ট পেয়েছে।" সিগারেটের প্যাকেটটা আমার দিকে এগিয়ে ধরলেন রঞ্জনবাবু। আমি সিগারেট খাই না শুনে নিজেই একটা ধরালেন। তারপর নিজের মনেই যেন বলে চললেন, 'দোতলার সিঁড়ি থেকে হঠাৎ পড়ে গিয়ে মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিল অজিত। হাসপাতালে কয়েক ঘণ্টা মাত্র বেঁচে ছিল। ডাক্তারেরা অনেক চেষ্টা করেছিল, কিন্তু শেষরক্ষা হল না। মৃত্যুর সময়ে কাছে ওর আত্মীয়স্বজন বন্ধু বলতে আমি ছাড়া আর কেউ ছিল না। আপনার ঠিকানা ও জানত কিনা বলতে পারি না। আমাকে কখনো বলে নি।" খানিকক্ষণ নির্বাক থেকে জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরোটা বাইরে ছুঁড়ে ফেলে আবার শুরু করলেন "শ্মশান থেকে যখন ফিরে এলাম, শরীর-মন অবসন্ন। যে ঘরে গত এক বছর ধরে দুজনে একসঙ্গে কাটিয়েছি সেই খালি ঘরে ঢুকতে যেন মন বিদ্রোহ করে উঠল। সারা রাত না ঘুমিয়ে কাটল। কী যে আমার হল, সেই থেকে রাতের পর রাত অনিদ্রায় কাটতে লাগল। চোখ বুজলেই দেখতে পাই মুমূর্ষু অজিতের কাতর কাকুতি-ভরা দৃষ্টি আমার দিকে মেলে ধরা। ডাক্তার উপদেশ দিলেন স্থান পরিবর্তন করতে। আইভি লজ ছাড়লাম। কিন্তু তাতেও কিছু ফল হল না। রাত্রি হলেই শরীরের সমস্ত স্নায়ু যেন বেঁকে বসে। কত যে ঘুমের ওষুধ খেয়েছি তার ইয়ত্তা নেই, কিন্তু সবই নিষ্ফল হয়েছে। অজিতের সেই কাতর দৃষ্টি আমাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। আমি এখন মুসাফির। আজ এখানে কাল ওখানে ছন্নছাড়ার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছি। যেমন বেড়িয়েছিল মরা অ্যালবাট্রস পাখি গলায় ঝুলিয়ে কোলরিজের সেই হতভাগ্য নাবিক।"

"আপনার কথায় মনে হচ্ছে, যে-কোন কারণেই হোক অজিতের মৃত্যুর জন্য আপনি নিজেকে দায়ী করছেন। কিন্তু অজিত তো আকস্মিক দুর্ঘটনায় মারা গেছে। তাহলে আপনি কেন অকারণে নিজেকে এভাবে কষ্ট দিচ্ছেন? অজিত আপনার বিশেষ ঘনিষ্ঠ ছিল, সুতরাং ওর অপঘাত মৃত্যুতে যে আপনি প্রচণ্ড আঘাত পাবেন সেটা স্বাভাবিক। আমি অজিতকে জানতাম বলেই বুঝতে পারছি ও আপনাকে কতখানি আপন করে নিয়েছিল। কিন্তু আত্মীয়-বন্ধু বিয়োগের শোকও একদিন-না-একদিন ভুলতেই হয়, সেটাই স্বাভাবিক নিয়ম, নইলে সংসার অচল হয়ে যেত। আপনার সঙ্গে আমার মাত্র ক'মিনিটের পরিচয়। বেশি উপদেশ দেওয়াটা ধৃষ্টতা হবে। অজিত দুজনেরই বন্ধু ছিল বলেই এতগুলো কথা বলতে সাহস পেলাম। অজিতের প্রসঙ্গ না হয় আজ মুলতুবী থাক, মিছিমিছি আপনি কষ্ট পাচ্ছেন। কাল না হয় বাকিটা শোনা যাবে।" ভদ্রলোককে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলাম। আমার কথায় উনি কয়েক মিনিট চুপ করে থেকে যা বললেন, তারপর আর আমার মুখ দিয়ে কথা সরল না।

রঞ্জনবাবু বললেন, "কথাটা আপনাকে না বলা অবধি আমি শান্তি পাব না। অন্তত অজিতের আর একটি বন্ধু জানুক তাতে যদি আমার কিছুটাও প্রায়শ্চিত্ত হয়। দোতলার সিঁড়ি থেকে আমিই ওকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিলাম। মৃত্যুকালীন জবানবন্দীতেও বলেছিল সিঁড়িতে পা হড়কে পড়ে যায়। সবাই তাই বিশ্বাস করে। কাপুরুষ আমি, তাই মুখ বুজে এই নিদারুণ অসত্যকে প্রশ্রয় দিয়েছি। কিন্তু মৃত্যুপথযাত্রী অজিতকে আমার আচরণের কোন কৈফিয়ৎ দিতে পারি নি। তার সেই কাতর দৃষ্টি যেন আমাকে প্রশ্ন করেছে "কেন কেন কেন? আমি তো তোমার কোন ক্ষতি করি নি। তোমাকে পরম বন্ধুর মতো ভালোবেসেছি। তোমার সঙ্গে কোন লুকোচুরি করি নি, তোমাকে প্রতারণা করি নি। কী হল যে তুমি আমাকে এত নির্মম ভাবে তোমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিলে?"

আমি আর ধৈর্য সংবরণ করতে পারলুম না, প্রায় চেঁচিয়ে উঠে বললুম, "দোহাই আপনার, হয় হেঁয়ালি থামান, নয়তো অজিতের কাহিনীর এখানেই ইতি হোক। আপনিই যদি অজিতের মৃত্যুর জন্য দায়ী হয়ে থাকেন তবে সে কথা পুলিশকে গিয়ে বলুন, আমাকে এভাবে কেন কষ্ট দিচ্ছেন?"

জবাবে রঞ্জনবাবু অত্যন্ত শান্ত অনুত্তেজিতভাবে বললেন: "পুলিশকে তখুনি বলেছিলাম, কিন্তু তারা বিশ্বাস করে নি। আইভি লজের অন্য বোর্ডারেরা পুলিশকে আড়ালে ডেকে বুঝিয়েছিল যে বন্ধুর শোকে আমার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে। এক বছরের মধ্যে একদিনের জন্যও কখনো আমাদের দুজনকে কেউ সামান্য কথা কাটাকাটি পর্যন্ত করতে দেখে নি। বরং আড়ালে অনেকে আমাদের বন্ধুত্বের কদর্থ করতেও দ্বিধা করে নি। আমরা অবশ্য ওতে কখনো কর্ণপাত করি নি। কিন্তু এ সত্ত্বেও দুর্ঘটনাটা ঘটল। কেন ঘটল সে কথা এত বিচিত্র এবং অবিশ্বাস্য যে এতদিন কাউকে বলতে সাহস হয় নি। বললে যে আমাকে পাগলা গারদে আশ্রয় নিতে হত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আপনি অজিতের এককালীন বন্ধু ছিলেন এবং বিশেষ ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন একথাও ওর কাছে শুনেছি। সেজন্যই আপনাকে সেই অবিশ্বাস্য কাহিনী শোনাতে আমার দ্বিধা নেই। আপনিও হয়ত শেষপর্যন্ত আমার কথা পাগলের প্রলাপ বলেই উড়িয়ে দেবেন। তবু আমাকে বলতেই হবে।"

একথার পর আমার কৌতূহল যে বাধা মানবে না তা সহজেই অনুমেয়। যদিও হাতের রেডিয়ম-দেওয়া ঘড়ির কাঁটা তখন রাত একটায়। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডার তীব্রতাও বাড়ছে। দূরে কুকুরটা তখনো অবিশ্রান্ত ডেকে চলেছে। নড়েচড়ে নিজেকে আরো একটু গুটিয়ে নিয়ে বসলাম। রঞ্জনবাবু সিগারেট ধরালেন। নিঃশব্দে কয়েকবার টান দিলেন তারপর বলতে শুরু করলেন। আমি নির্বাক বিস্ময়ে ও'র সেই অবিশ্বাস্য কাহিনী শুনতে লাগলাম।

"দিন-কয়েক হল আমার টু-সীটার ঘরের আগেকার অংশীদার চলে গেছেন। একাই আছি আমি। বেশ ভালোই লাগছিল একলা থাকতে। ভাবছিলাম কে না কে এসে খালি জায়গা দখল করবে। সে লোক কেমন হবে, আমার সঙ্গে তার বনবে কিনা কিছুই জানি না। শেষটায় অশান্তি না ভোগ করতে হয়। যিনি চলে গেলেন তাঁর সঙ্গে যে খুব একটা হৃদ্যতা হয়েছিল তা বলা চলে না, তবে ভদ্রলোক নিজের মনে থাকতেন। গায়ে পড়ে কখনো অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করেন নি, আবার অনাত্মীয়ের মত ব্যবহারও করেন নি। ও'র সম্পর্কে আমার মনোভাব মোটামুটি নিস্পৃহই ছিল। তাই উনি যখন চলে গেলেন তখন হাঁফ ছেড়ে বাঁচার মত মনের ভাব যেমন হয় নি, তেমনি আবার বিচ্ছেদের বেদনাও মনকে পীড়িত করে নি।

এই অবস্থায় একদিন আইভি লজের ম্যানেজার অজিতকে নিয়ে আমার ঘরে ঢুকলেন। উস্কোখুস্কো ভাবুক-ভাবুক চেহারা। রোগাই বলা চলে, তবে দুর্বল নয়। যাকে আমরা বলি পেটানো গড়ন। গাঢ় নীল রংএর পাৎলুনের উপর সাদা হাফ শার্ট পরনে। জামা-কাপড়ে পারিপাট্য নেই, তবে পরিচ্ছন্ন। লম্বা দোহারা চেহারায় ঝাকড়া-চুল মাথাটা একটু বড়, বেমানান দেখায়। মুখের গড়ন লম্বাটে। গাল দুটো সামান্য বসা বলে কিছুটা চোয়াড়ে ভাব। কিন্তু আশ্চর্য সুন্দর ওর চোখ দুটো। কিসের আলোয় যেন জ্বলজ্বল করছে। যেমন নীলাভ তেমনি গভীর। মনে হয় আপনার অন্তস্থল অবধি ওর দৃষ্টি পৌঁছুচ্ছে। কিন্তু তাতে আপনার অস্বস্তি হবে না, কারণ সে দৃষ্টিতে সন্দেহের কুটিলতা নেই। আমাকে উদ্দেশ করে হাত তুলে যখন ও নমস্কার করলেন, একটা মিষ্টি হাসিতে ওর চোখমুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল আর দুই চোখের কোণে তারই প্রতিক্রিয়ার কয়েকটা

...রেখা জেগে উঠল। আমি সেই মুহূর্তেই ওর প্রেমে পড়ে গেলাম।

ম্যানেজার গৌরবাবু বললেন, "অজিতবাবু এই সবে বিদেশ থেকে দেশে ফিরেছেন। আপনি তো সাহেব মানুষ, বিদেশেও ছিলেন এককালে — সেজন্যই ওঁকে আপনার ঘরে দিলাম। আশা করি দুজনে মিলে-মিশে থাকতে কোন অসুবিধে হবে না।" তারপর অজিতের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ইনি রঞ্জন সামন্ত, আমাদের অনেক দিনকার পুরনো বোর্ডার। অতি সজ্জন ব্যক্তি, যাকে আমরা বলি পারফেক্ট জেন্টলম্যান। কারুর সাতে-পাঁচে থাকেন না, অফিসে দশটা-পাঁচটা করে যতটুকু সময় হাতে থাকে বইয়ের গাদায় ডুবে থাকেন। আপনার সঙ্গে দেখবেন জমবে ভাল।"

আমি কিছু বলবার আগেই অজিত বললে, "আমার ভাগ্যটা ভাল বলতে হবে। অনেক পুণ্য করলে তবেই জানতাম সজ্জন সঙ্গ লাভ হয়। আমার সেটা ফাঁকি দিয়েই লাভ হল। জানি না রঞ্জনবাবুর আমাকে সহ্য হবে কিনা, কারণ আমি বইটই একদম ভালোবাসি না। তাছাড়া বিদেশে দীর্ঘকাল কাটিয়ে একটি বদভ্যাস করে এসেছি, সেটি হল পানাভ্যাস। শক্ত জিনিস আমার তেমন রোচে না। তরল জিনিসেই আমার আসক্তি বেশি। তবে তাই বলে আমাকে তরলমতি ঠাওরাবেন না। পানদোষ থাকলেও সেটা এখনো আয়ত্তের বাইরে যায় নি। অপরের শান্তি নষ্ট করবার মতো বেসামাল কখনো হই না। রঞ্জনবাবু, বলুন এসব শুনেও কি আপনি আমাকে ঘরে ঠাঁই দিতে রাজী আছেন?" আবার সেই মারাত্মক হাসিতে ওর চোখদুটো জ্বলে উঠল। ওর জিজ্ঞাসু দৃষ্টি অনুসরণ করে আমার মুখ থেকে অজান্তেই বেরিয়ে এল, 'বইয়ের পোকা বলে বেরসিক ভাববেন না। ওটা নেহাতই সময় কাটাবার খোরাক, আপনার তরল পদার্থের সঙ্গে ওর কোন বিরোধ নেই। আপনি বিনা দ্বিধায় চলে আসুন। আপনাকে আমার ভাল লেগেছে।" অজিতের দৃষ্টিতে কৃতজ্ঞতা ফুটে উঠল। গৌরবাবুও যেন অনিশ্চয়তার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

তারপর কটা দিন দেখতে দেখতে কীভাবে যে কেটে গেল বোঝবার অবকাশ পেলাম না। দুজনে এক লাফে আপনি থেকে তুইয়ে নেমে এলাম। আর সবচেয়ে আশ্চর্য, অজিত এমনভাবে আমার পরিচর্যা শুরু করলে যেন আমিই নতুন এসেছি। আমার স্বভাব, আচার-ব্যবহার ও দুদিনে বুঝে নিলে। কোথাও কোনভাবে যাতে আমার অসুবিধে না হয় সেদিকে ওর সদা সজাগ দৃষ্টি। বয়সে আমার চাইতে দু-এক বছর কম বই বেশি নয়, অথচ ওই যেন আমার অভিভাবকের স্থান দখল করে নিলে। ব্যাপারটা এত সহজে ও স্বাভাবিকভাবে ঘটে গেল যে, আমার দিক থেকে সামান্য আপত্তি করারও সুযোগ হল না। দুজনেই সকালে বেরিয়ে যেতাম যে যার চাকরির ধান্দায়। সন্ধ্যার পর দুজনে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে সারা কলকাতা টহল দিয়ে বেড়াতাম। দীর্ঘকাল বিদেশে কাটিয়ে অজিত যেন নতুন করে নিজের দেশ আবিষ্কারের নেশায় মেতে উঠেছিল। ওর সঙ্গে এভাবে ঘুরে বেড়াতে আমারও খুব ভাল লাগত তা বলাই বাহুল্য। বিশেষ করে ভাল লাগত ওর কথা শুনতে। এত সুন্দর কথা বলতে আমি খুব কম লোককেই শুনেছি। বেশির ভাগ কথাই ছিল অবশ্য ওর প্রবাস-জীবনকে কেন্দ্র করে।

ইওরোপের ঐ দেশে ওর প্রেম তারপর বিবাহের কাহিনীও আমাকে শুনিয়েছিল। কিন্তু আপনি বোধহয় জানতেন না যে, বিয়ের এক বছরের মধ্যেই ওদের ছাড়াছাড়ি হয়। তারপর ও আর বিয়ে করে নি। কিছু দিন অশান্ত মন নিয়ে নানা দেশ ঘুরে বেড়িয়ে আবার ঐ দেশেই ফিরে গিয়েছিল। প্রথমে যেখানে চাকরি নিয়েছিল তারাই আবার ওকে সাগ্রহে ডেকে নেয়। প্রবাসে দীর্ঘ ২৮।২৯ বছর একটা দেশেই কাটিয়ে ও প্রায় ওখানকার নেটিভদের মতনই হয়ে গিয়েছিল। দেশে ফিরে এসে তাই ঐ বিশেষ দেশের কনসুলেটেই ও একটা চাকরি নিলে: সাধারণ কেরানির চাকরি। পাকা অয়েল টেকনোলজিস্ট হিসেবে যে কোন তেল কোম্পানিতে অনায়াসে ও মোটা মাইনের চাকরি পেতে পারত, কিন্তু তা না করে কেন যে ও ওই চাকরি নিলে সে অজিতই জানে। জিগ্যেস করেও কোন দিন সদুত্তর পাই নি ওর কাছ থেকে। ও শুধু বলত, "সারাজীবন যে একই কাজ করতে হবে তার মানে কি এখানে বেশ আছি, দশটা চারেকের কাজ, মোটামুটি ভাল মাইনে আর শস্তায় কনসুলেটের মদ—ব্যস, আর কী চাই বল?"

কীভাবে যে সময় কেটে যাচ্ছিল বোঝবার অবকাশ পাই নি। হুঁশ হল যখন বাড়ি থেকে চিঠি এল, মা লিখেছেন। অজিত আসার পর প্রায় ছ মাস কেটে গেছে, এর ভেতরে আর বাড়ি যাবার সময় পাই নি। কলকাতার কাছেই আমাদের বাড়ি, ট্রেনে ঘণ্টা চারেকের পথ। মাসে অন্তত একবার করে বাড়ি যাই। সুতরাং পর পর ছ মাস হয়ে গেল বাড়ি যাওয়া হয় নি, বেশি চিঠিপত্র লেখারও ফুরসৎ পাই নি। এ অবস্থায় বাড়ির লোকের চিন্তা হওয়াই স্বাভাবিক। সত্যি বড় অন্যায় হয়ে গেছে। পরের শনিবারই একবার ঘুরে আসার ঠিক করে ফেললাম। অজিতকে বললাম। আমার কথা শুনে দপ করে যেন ওর মুখের আলো নিভে গেল। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "এই কদিন তাহলে আমাকে একাই কাটাতে হবে?" আমি বললুম, "তা, তুইও চল না। তোকে দেখলে বাড়ির সবাই খুব খুশি হবে। আর দেখিস তোরও ভাল লাগবে জায়গাটা। দেশে ফিরে অবধি তো কলকাতাতেই কাটালি।" খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ও বললে, "নাঃ, তুই-ই যা। আমার কাজ আছে এখানে। পরে একবার যাওয়া যাবেখন। তাড়াতাড়ি ফিরিস, দেরি করিস না যেন।" বুঝলাম ওর সংকোচ হচ্ছে। আমি আর পেড়াপীড়ি করলাম না।

মা বললেন, "এ কী, চেহারার এ কেমন ছিরি হয়েছে? এই ছ মাস কি খাওয়া-দাওয়া করিস নি নাকি? গাল বসে গেছে, মুখ শুকনো। অসুখ-বিসুখ করে নি তো? লুকোস নি আমার কাছে। চিঠিপত্র দেওয়াও তো প্রায় বন্ধ করেছিস।"

হেসে বললাম, "মাগো, ঐ তো তোমাদের রোগ। ছেলে কাছে না থাকলেই মনে কর অযত্ন হচ্ছে। মাছের মাথা, দুধের বাটি এগিয়ে দেবার লোক নেই, সুতরাং ছেলে অনাহারে কাটাচ্ছে। চার ঘণ্টা ট্রেনে লোকের ভিড়ের চাপে যে শরীরটা আস্ত নিয়ে আসতে পেরেছি এটাই ভগবানের দয়া। মুখ কি আর সাধে শুকিয়েছে। যাক কী খেতে দেবে বল, দারুণ খিদে পেয়েছে।"

রাত্রে সবাই একসঙ্গে খেতে বসেছি। ছমাসে বাদে বাড়ি এসেছি, সুতরাং আহারের প্রচুর আয়োজন। খেতে খেতে বাবা বললেন, "তোর শরীর তো ভাল দেখছি না। খাওয়া-দাওয়া ওখানে ঠিক মত হচ্ছে না বোধহয়, না কি অফিসে বেশি খাটুনি যাচ্ছে?"

বেনারসী শাড়ী
ইণ্ডিয়ান
সিল্ক হাউস
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট

আমি বললাম, "না না, খাওয়া-দাওয়ার কোন ত্রুটি হচ্ছে না। আইডিভ লজে আর যে অসুবিধেই থাক, খাওয়ার ব্যাপারে ম্যানেজার খুব যত্ন নেয়। সেজন্য আইডিভ লজের ওয়েটিং লিস্টে সারা বছরই লম্বা কিউ। না, খাওয়া-দাওয়া ভালই হচ্ছে। তবে অফিসে একটু খাটুনি যাচ্ছে। বড় কতগুলো কন্ট্রাক্ট পেয়েছি আমরা। কেন মিছিমিছি চিন্তা করছ তোমরা, আমি বেশ ভালই আছি।"

মা হাল ছাড়বেন না। আবার সেই পুরনো কথার ধুয়ো তুললেন, "বলছি তোকে এভাবে সারা জীবন কাটবে না। বিয়ে করে ভাল একটা ফ্ল্যাটট্যাট নিয়ে একটু গুছিয়ে আরাম করে থাক। বয়স তো তোর নেহাৎ কম হল না, এর পর কেউ তোকে মেয়ে দিতে চাইবে না। তোর যাকে পছন্দ হয় বিয়ে কর, আমরা বাদ সাধতে আসছি না কিন্তু দোহাই তোর, আর খামখেয়ালি করিস না।"

বিয়েতে যে আমার রুচি একদম নেই এটা মাকে কিছুতেই বোঝাতে পারি না বয়সের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। যৌবনের এক প্রায় বিস্মৃতপ্রায় ব্যর্থ-প্রণয়ের প্রসঙ্গ তুলে মার আমাকে 'ববাহে উৎসাহ দেবার এই হাস্যকর প্রচেষ্টা প্রতি বারই বাড়ি এসে আমাকে সহ্য করতে হয় এর কোন জবাব নেই। সুতরাং নিঃশব্দে খেতে লাগলাম।

খাওয়া-দাওয়ার পর সবাই মিলে এক-সঙ্গে বসে গল্প হচ্ছিল। অজিতের প্রসঙ্গ উঠল। মাকে বললাম অজিত কীভাবে আমার আদর-যত্ন করে। এমন কি বেশির ভাগ দিনই ওর খাবারের অধিকাংশটুকুই জোর করে আমাকে খেতে বাধ্য করে। স্বভাবতই মা প্রশ্ন করলেন, "তা হলে ও বেচারী খায় কী?" এর জবাবে কী করে আর বলি যে, অজিত শক্ত জিনিসের চাইতে তরল পদার্থই বেশি পছন্দ করে?

মা বললেন, "থাকবি তো কয়েক দিন? ছমাস বাদে তো তোর আসার সময় হল। ভাবিস মাসে এক-আধখানা চিঠি লিখলেই কর্তব্য করা হয়ে গেল। উনি মাঝখানে জেদ ধরেছিলেন কলকাতায় যাবেন তোর খবর নিতে। নেহাৎ শরীরটা খারাপ, বলে কোন মতে আটকেছি। কয়েকটা দিন থেকে ভাল করে খাওয়া-দাওয়া করে শরীরটা সারিয়ে যা।" বাবাও মার কথায় সায় দিলেন। ছুটি আমার পাওনা হয়েছে অনেক দিনের সুতরাং কয়েকটা দিন অনায়াসে ডুব মারা যায়। মার আবদারও অন্যায় বলা চলে না। বললাম, "হঠাৎ আগে থেকে বলা-কওয়া নেই, ছুটি নেওয়া মুশকিল। দেখি, কাল বিকেল অবধি তো আছি, একটু ভেবে নিই।"

পরের দিন সকাল থেকেই আবার খাওয়া-দাওয়া গল্পগুজব শুরু হল। এক ফাঁকে পাড়ার পুরনো বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা করে এলাম। যতই বেলা বাড়তে লাগল, আমার মন-প্রাণ যেন এক অদৃশ্য আকর্ষণে আইডিভ লজের ঘরটার ফিরে যাবার জন্য ছটফট করতে লাগল। গতকাল রাতেও ভাল ঘুম হয় নি, কেমন একটা অস্বস্তিতে বারবার ঘুম ভেঙে গেছে। আবার রাত আসছে। মাকে বললাম পরের সপ্তাহে এসে কদিন থাকব, আজ কলকাতায় ফিরতেই হবে। খুব মনঃক্ষুণ্ণ হলেন মা, কিন্তু উপায় ছিল না। রাত্রে আইডিভ লজে ফিরে দেখি অজিত জানলার ধারে চুপচাপ বসে আছে। আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখে ওর চোখমুখ খুশিতে ভরে গেল। মুখে শুধু বললে, "এসেছিস? আমি ভাবছিলাম হয়ত আজ আর এলি না।"

ওর ঐ অসহায় ভাব দেখে আমার বুকের ভেতরটা কেমন যেন করে উঠল। বড় মায়া হল ওর উপরে। মনে মনে ভাবলাম, ওকে ফেলে না গেলেই হত। বেচারা বোধহয় কাল থেকে ওভাবে বসে আছে।

ট্রেনের ক্লান্তি নিয়ে যখন ঘুমোবার উপক্রম করছি, অজিত প্রশ্ন করলে, "তোকে দেখে বাড়ির সবাই খুব খুশি, না? মা কী বললেন, এত দিন বাদে বাড়ি গেলি বলে?"

আমি বললাম, "মা-বাবা দুজনেই বললেন আমাকে নাকি খুব শুকনো দেখাচ্ছিল। এখানে ঠিকমত খাওয়া-দাওয়া হচ্ছে না, এই সব।"

আমার কথা শুনে অজিতের চোখ যেন হঠাৎ জ্বলে উঠল। ও বললে, "তার খাওয়া ঠিকমত হচ্ছে না, তা এতদিন বলিস নি কেন?"

আমি বললাম, "খাওয়া-দাওয়া ঠিক হচ্ছে না এ তো ওদের ধারণা। আমি তো আর বলি নি। আর হলেই বা তুই কী করবি? করবার হলে করতে পারেন ম্যানেজার, গৌরবাবু। যাই হোক, বাজে কথা নিয়ে মাথা ঘামাস না। আমার তোর দুজনের খাবারই তো আমি একা খাই আবার কত খাবো বল? আমি কি রাক্ষস নাকি?"

পরের দিন সন্ধ্যাবেলা অফিস থেকে ফিরে দেখি টেবিলের উপর একগাদা ফল, মিষ্টি, মাখন, ডিম, আরো কত কী! দেখে তো পাগলের কান্ড। একটু বাদে অজিত ঘরে ঢুকলো। হাতে ওর দু বোতল দুধ। আমি প্রায় খেঁকিয়ে উঠলাম "তোর কি মাথা খারাপ হল? মা একটা কী কথা বলেছেন যার মাথামুণ্ডু নেই, আর আমার কাছ থেকে সেই কথা শুনে তুই পুরো একটা বাজার তুলে নিয়ে এসেছিস? তুই নিজে তো কুটোটাও দাঁতে কাটিস না। তা খাবে কে এত সব? এই মহাত্মা?" অজিত কৈফিয়তের সুরে বললে, "তোকে তো কতদিন বলেছি যে খাওয়াতে আমার ভাল লাগে। তুই খেলেই আমার খাওয়া হয়ে যায়। তাছাড়া জানিসই তো তরল পদার্থ ছাড়া আর কিছুতে আমার রুচি নেই। কিন্তু তাই বলে তোর চাইতে আমার স্বাস্থ্য ভাল বই খারাপ নয়।" পাগলের সঙ্গে তর্ক করে না পারেন। কথা বাড়ালাম না। সত্যি বলতে কি শরীর আমার বেশ ভালোই থাকছে। খাওয়া তো আগের চাইতে বেশি হচ্ছেই। অজিত আসার পর থেকে ঘুমও যেন বেড়ে গিয়েছিল। অত গাঢ় ঘুম আগে কখনো আমার হত না। এখন সকালে চোখের পাতা খুলতেও যেন কষ্ট হয়। মনে হয় আর একটু ঘুমুই।

কিন্তু অজিত নাছোড়বান্দা। নানাবিধ পুষ্টিকর খাবার খাইয়ে সে আমার স্বাস্থ্যোদ্ধার করবেই। আমি বললাম, "এত ঝামেলার দরকার কী? ডাক্তার দেখালেই হয়। ডাক্তার যদি বলেন যে আমার কিছু হয়নি তবে তো তোর বিশ্বাস হবে?" ডাক্তারের নামে ও যেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল। তারপর বললে, "ডাক্তার কী করবে? তোর তো কোনো ব্যারাম হয়নি যে চিকিৎসা করবে। তোর দরকার ভালো করে খাওয়া-দাওয়া করা আর টেনে ঘুম দেওয়া। ঘুমে তোর রেকর্ড খারাপ নয়, তোর নাকডাকার ফলে বরঞ্চ আমার ঘুমের ব্যাঘাত হয়। এখন শুধু খাওয়ার দিকে নজর দিলেই দেখবি শরীর দুদিনে চাঙ্গা হয়ে যাবে। বাজে তর্ক না করে আমার উপর সব ছেড়ে দে।"

অজিতের কাছে এত সহজে হার মানতে মন চাইল না। অফিস ফেরৎ অজিতকে না জানিয়েই একদিন ডাক্তারের কাছে গেলাম। ডাক্তার আমার পুরনো বন্ধু। আমাকে দেখে বললেন, "কী ব্যাপার মশাই, মাস ছয়েক প্রায় হতে চলল, আপনার পাত্তাই নেই যে? ভাবলুম হয়তো কলকাতার বাইরেটাইরে গেছেন। তারপর কী মনে করে?" সংক্ষেপে আমার সমস্যাটা ওঁকে বললাম। এও বললাম যে আমার নিজের ধারণা আমার শরীর একদম বহাল তবিয়তে আছে। তবে মা-বাবার সন্দেহভঞ্জনের জন্যই ওঁর একটা অভিমত পেলে ভালো হয়। ডাক্তার যথারীতি আমাকে পরীক্ষা করলেন। তারপর বললেন, "গত মাস ছয়েকের ভেতর কোনো অসুখ-বিসুখ, ধরুন একটানা পেটের গোলমাল বা ঐ জাতীয় কিছু হয়েছিল কি আপনার?" আমি বললাম, "আপনাকে তো বলছি, আপনার সঙ্গে ছমাস আগে দেখা হবার পর থেকে আজ অবধি সামান্য সর্দি পর্যন্ত হয়নি।"

ডাক্তার ডাইনে-বাঁয়ে বার কয়েক মাথা নেড়ে বললেন, "ভারী আশ্চর্য তো! আপনার কথায় অবিশ্বাস করছি না, কিন্তু আপনি এত রক্তশূন্য হলেন কী করে তা হলে? এতো একদিন দুদিনে হয়নি, তিলে তিলে হয়েছে। আপনি দুর্বল বোধ করেন না বলছেন, অথচ এমন এনিমিক কন্ডিশনে দুর্বলতা প্রকাশ পাবেই। যাই হোক, দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। ভালো করে খাওয়া-দাওয়া করুন, আর একটা ওষুধ লিখে দিচ্ছি, আজ থেকেই খেতে শুরু করুন। সাতদিন বাদে এসে আবার দেখিয়ে যাবেন।"

রাস্তায় বেরিয়ে মনে হল মাথা যেন ঝিমঝিম করছে। বুঝতে পারলাম ডাক্তারের কথার সাইকোলজিক্যাল এফেক্ট। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে যখন নিজের ঘরে ফিরে এলাম তখন আর কোনো অস্বস্তি

নেই। ডাক্তারের দেওয়া ওষুধটা কিনবো কিনা ভাবছি। এমন সময়ে অজিত ফিরে এল। আমাকে দেখে জিগ্যেস করলে, "এত দেরি হল যে তোর ফিরতে? আর কোথাও গিয়েছিলি নাকি? আমি তোর দেরি দেখে নিচে গিয়েছিলাম তোর অফিসে টেলিফোন করতে। তুই অফিস থেকে অনেকক্ষণ বেরিয়েছিস জেনে ভাবনাই হচ্ছিল।"

ডাক্তারের কথা অজিতকে বলব কিনা ভাবছি, এমন সময়ে আমাকে সম্পূর্ণ অবাক করে দিয়ে একশিশি ওষুধ আমার দিকে এগিয়ে ধরে ও বললে, "রোজ খাবার পর দুটো করে ক্যাপসুল খাবি নে ধর।" শিশির উপরে লেখা ওষুধের নামটা পড়তে আমার এক সেকেণ্ডও লাগল না। ঐ নামেরই ওষুধের প্রেসক্রিপশান তখনো আমার হাতে ধরা। বিস্ময়টা কাটিয়ে উঠে বললাম, "এ ওষুধ তুই কোথায় পেলি, কে খেতে বললে?" জবাবে ও বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে বললে, "তা দিয়ে তোর দরকার কী? যা বলছি শোন। তোকে বার বার বলছি আমার ওপর সব ছেড়ে দে, দুদিনে তোর শরীর ঠিক করে দেব।" অগত্যা ওকে ডাক্তারের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কথা বলতে হল। শুনে ও যেন একটু বিরক্ত হল। হবারই কথা, ওর স্টান্টটা মাঠে মারা গেল। একবার বললে, "আমাকে লুকিয়ে যাবার দরকার ছিল না। আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারতিস।" আমাকে কৈফিয়ৎ দিতে হল, "ভেবেছিলাম যে ডাক্তার বলবে আমার কিছু হয়নি। ডাক্তারকে দিয়ে সেকথা লিখিয়ে এনে তোকে আর বাবা-মাকে দেখাব। এ জন্যই তোকে না জানিয়ে একা গিয়েছিলাম। ডাক্তার যে আবার এমন ফ্যাসাদ বাধাবে কে জানতো।"

রোজকার মতো ঘরে দুজনের খাবার দিয়ে গেল ঠাকুর। অজিতও অন্যদিনের মতো নিজের থালায় প্রায় কিছু না রেখে খাবার সব তুলে দিতে লাগল আমার থালায়। কিন্তু আজ আমি সজোরে প্রতিবাদ করলাম। ওকে বললাম, "দ্যাখ, রোজ রোজ তোকে এভাবে উপোস করতে আমি দেবো না। ভারী নিখাকি বাবা এসেছেন রে আমার! তাছাড়া আমাকে কাঁড়ি কাঁড়ি খাইয়ে তোর লাভটা হচ্ছে কী? এত খেয়েও যদি শুনতে হয় আমার শরীর অসুস্থ, রক্তশূন্য, তবে তো রাক্ষসদের দলে নাম লেখাতে হয়। নারে, আর আমি এ সব পাগলামিকে প্রশ্রয় দেবো না। তুই খাবার তুলে নে থালা থেকে। আমার আজ খিদে মোটে নেই, অত খেতে পারব না।" আমার বলার ধরনে হয়তো বেশি রকম বিরক্তি প্রকাশ পেয়ে থাকবে, এই অপ্রত্যাশিত আঘাতে অজিতের মুখ যেন কালো হয়ে গেল। কয়েক সেকেণ্ড নির্বাক হয়ে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর জোর করে টেনে আনা হাসিতে স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করে ও বললে "হঠাৎ এত চটে গেলি কেন? তোকে তো আর জবরদস্তি করে খাওয়াচ্ছি না। আমার চাইতে তোর খিদে বেশি, প্রয়োজনও বেশি, তাই আমার যতটুকু বেশি হয় সেই খাবারটুকুই তোকে দিই। এতে তোর সংকোচের বিন্দুমাত্র কারণ নেই। তবে তোর যদি ভালো না লাগে, আমাকে খুশি করবার জন্যে জোর করে খেতে হবে না তোকে।"

মনে মনে একটু অনুশোচনা হল। হঠাৎ এভাবে উত্তেজিত হওয়াটা মোটেই উচিত হয়নি। ও বেচারার কী দোষ, ও তো আমার ভালোর জন্যই নিজে আধপেটা খেয়ে খাবারের বেশির ভাগটাই আমাকে খাওয়ায়। হয়তো ওর কথাই ঠিক, ও যতটুকু খায় তাতেই ওর হয়ে যায়। শুনেছি একেকজনের শরীরের ধাতই এমন থাকে। ওর হাত ধরে ক্ষমা চাইলাম। ও কিছু বললে না। দুজনে নিঃশব্দে খেতে লাগলাম। প্রসঙ্গটা আর না উঠলেও শুতে যাবার আগে অজিতের আনা ওষুধের একটা ক্যাপসুল খেয়ে নিলাম।

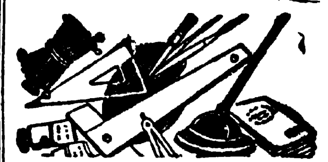
সারাদিনের খাটুনি, তার উপরে ডাক্তারের ওখান থেকে ফেরার পর একটানা উত্তেজনা—সব মিলিয়ে শরীরে একটা চাপা অস্বস্তি নিশ্চয়ই ছিল, নয়তো মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যাবে কেন। কী যেন একটা দুঃস্বপ্ন দেখে আচমকা জেগে উঠেছিলাম। ঘাড়ের কাছে একটা চাপা ব্যথা। চোখ খুলেই দেখি অজিত আমার মুখের উপর ঝুঁকে কী দেখছে। আমায় চোখ মেলতে দেখে ও বলে, "কী হয়েছিল তোর, স্বপ্ন দেখছিলি নাকি? অমন করে গোঙাচ্ছিলি কেন?" আমি লজ্জিত হয়ে উঠে বসতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু ও আমাকে বাধা দিয়ে শুইয়ে দিলে। বললে, "উঠছিস কেন, এখন তো মাঝরাত্তির, শুয়ে পড়। যা তুই গোঁ-গোঁ শব্দ করছিলি, আমার তো পিলে চমকে গিয়েছিল।" এই বলে ও নিজের খাটে গিয়ে শুয়ে পড়ল। একটু বাদেই ওর নাকডাকা শুরু হল। আমিও শুয়েই ছিলাম, কিন্তু ঘুম আসছিল না। ঘাড়ের কাছে একটা জায়গায় কেমন যেন চড়চড় করছিল। নিজের অজান্তেই কখন ওখানে হাত দিয়েছি, চুলকোবার জন্যই বোধহয়। চটচটে মতন কী একটা লাগল হাতে। অন্ধকারে ঠাহর না হওয়াতে বালিশের নিচে থেকে টর্চটা বার করে জ্বেলে দেখতে চেষ্টা করলাম। এ যে রক্ত! নিশ্চই কিছু কামড়েছে। ভালো করে দেখবার জন্য উঠে লাইট জ্বালালাম। বিজলীর আলোয় আয়নাতে স্পষ্ট দেখতে পেলাম ঘাড় আর গলার মাঝামাঝি জায়গায় চাপ-চাপ রক্ত। কী কামড়াল? এত রক্ত বেরোলো অথচ টের পেলাম না। ব্যথা-বেদনা অবশ্য কিছু ছিল না। বাথরুমে ঢুকে ভেজা তোয়ালে দিয়ে ঘাড়-গলা ভালো করে মুছে বেরিয়ে এসেছি, এমন সময়ে আমার চোখ পড়ল অজিতের মুখের উপর। গভীর ঘুমে মগ্ন, মুখ ঈষৎ হাঁ হয়ে আছে, ফাঁক দিয়ে ঝকঝক দাঁতের পাটি দেখা যাচ্ছে। চোখের উপর হঠাৎ আলো পড়াতেই বোধহয় ও জেগে গেল। ঘুমজড়ানো চোখে উঠে বসে বললে, "কী হল তোর, এখনো ঘুমুসনি? শরীর খারাপ লাগছে না তো?" আমি বললুম, "ভয় নেই তোর, আমার কিছুই হয়নি। গলার কাছে কী যেন কামড়ে একদম রক্ত বার করে দিয়েছে। মশা নয় নিশ্চয়ই, অন্য কিছু হবে। বাথরুমে গিয়ে ধুয়ে এলাম।"

আমার কথা শুনে ও যেন বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মতো লাফিয়ে উঠে আমার কাছে এগিয়ে এল। বললে, "দেখি দেখি কী কামড়াল?" গলার যেখানটা রক্ত লেগে ছিল জায়গাটা ভালো করে দেখে ও বললে, "মশা নয়, অন্য কোনো পোকাটোকা হবে হয়তো।" আমি বললুম, "নে নে শুয়ে পড়, অত ভাবতে হবে না। পোকা কামড়েছে, তা নিয়ে মাঝরাত্তিরে এত হৈচৈ করলে লোকে পাগল বলবে।"

পরের দিন সন্ধ্যেবেলা অজিত আবার একরাশ খাবার এনে হাজির করলে। আমি একটু বিরক্ত হয়েই বললুম, "এত সব ফল, মিষ্টি আবার কেন আনতে গেলি? তোকে এত করে বারণ করলুম, তবু তুই শুনলি না। তুই যদি নিজে এর সিকি-ভাগও খেতিস তবে না হয় বুঝতাম। কিন্তু স্রেফ আমার জন্যে এভাবে যদি তুই পয়সা নষ্ট করিস, তবে তোর সঙ্গে আমার একদম ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে।"

জবাবে অত্যন্ত কুন্ঠিত হয়েই অজিত বললে, "তোর শরীর ভালো নেই, সেকথা তো ডাক্তারই তোকে বলেছে। আমি তো আর জানতে যাইনি। ভালো করে খাওয়া-দাওয়া করলে তোর শরীর ভালো থাকবে, এ জন্যেই এগুলো এনেছি। তুই অনর্থক চটে যাচ্ছিস আমার ওপর।"

অজিতের কথায় এমন একটা আকুতি ছিল যে আমার বুকের ভেতরটা হঠাৎ যেন মোচড় দিয়ে উঠল। সত্যিই তো, আমিই তো ওকে ডাক্তারের কথা বলেছিলাম। অবশ্য এও ওকে বলেছিলাম যে



সকল প্রকার অফিস স্টেশনারী কাগজ
সার্ভেইং ড্রইং ও ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্যাদির
সুলভ প্রতিষ্ঠান।

কুইন ষ্টেশনারী ষ্টোর্স
প্রাঃ লিঃ

৬৩-ই, রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১
ফোন : অফিস—২২-৮৫৪৮ (২ লাইন)
২২-৬০০২
ওয়ার্কসপ—৬৭-৪৬৬৪ (২ লাইন)

আমার নিজের কোনোরকম শারীরিক কষ্ট নেই। আমি বেশ ভালোই আছি। ডাক্তারের কাছে গেলেই তারা একটা না একটা রোগ আবিষ্কার করবেই, নইলে তাদের পশার জমে না। এসব কথা সত্ত্বেও বন্ধু হিসেবে ও যদি আমার জন্য উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে, তাতে ওকে দোষ দেওয়া যায় না। আমি ওকে বললুম, "তোর সংগে আমার এজন্মে না হলেও আর জন্মে নিশ্চয়ই রক্তের সম্বন্ধ ছিল। আমাকে নিয়ে তুই যে রকম পাগলামি করিস, নিজের ভাই হলেও বোধ-হয় এত করত না।" আমার কথায় ও যেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল। কোনো জবাব দিলে না।

কয়েকদিন বাদে মাঝরাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। ঘাড়ের কাছে কেমন যেন একটা বোবা ব্যথা। ধড়মড় করে উঠে বসতে গিয়ে কার গায়ে ধাক্কা লাগল। "কে? কে এখানে বসে?" বলে চেঁচিয়ে উঠে বালিশের নিচে রাখা টর্চটা জ্বালিয়ে দেখি অজিত বসে আছে আমার খাটের ধারে। অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকাতেই আমার বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। অন্যায় করে হাতে হাতে ধরা পড়ে গেলে যেমন অপ্রস্তুত অপরাধী মুখ হয় লোকের, তেমনি চকিত সন্ত্রস্ত ওর দৃষ্টি। কাঁচা ঘুমে তখনো আমার চোখ জোড়া, তবু উঠে সুইচ টিপে বাতি জ্বাললাম। অত আলোয় অজিত যেন আরো সংকুচিত হয়ে গেল। ব্যাপার কী? আমি কি আবার সেদিনের মতো ঘুমের ভিতর আবোল-তাবোল বকছিলাম? মাঝরাত্রে অজিতই বা আমার বিছানার ধারে বসে কেন? সব কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। ঘাড়ের কাছে আবার সেই অস্বস্তিকর অনুভূতিটা ফিরে এসেছে। নিজের অজ্ঞাতসারেই ওখানটায় হাত দিয়েছি। এ কী, আবার রক্ত নাকি? হাতটা নামিয়ে আলোর কাছে ধরতেই আর সন্দেহের অবকাশ রইল না। হাতের পাঁচটা আঙুলে স্পষ্ট রক্তের ছাপ।

রাত্রে কখন যে আবার ঘুমিয়ে পড়েছিলাম ঠিক মনে নেই। তবে দুজনেই কেউ কারুর সংগে যে আর কোনো কথা বলিনি, এটা মনে আছে। একটা অশুভ সম্ভাবনায় আমার অন্তরাত্মা কেমন যেন বিমূঢ় বিকল হয়ে গিয়েছিল।

সকালে উঠে চা খেতে খেতে আড় চোখে অজিতের দিকে তাকিয়ে দেখি ও অন্যমনস্কভাবে চায়ে চুমুক দিচ্ছে। ওর দৃষ্টি মেঝের উপর কিন্তু মন উধাও কোনো অজানা রাজ্যে। একটু কেশে ওর মনোযোগ আকর্ষণ করে বললাম, "মনটা কি ইউরোপে পাটিয়ে দিলি নাকি? তোর মতো একটা চ্যাটারবক্স এভাবে ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকলে বড় অস্বস্তি হয়। ঢের অনেক হয়েছে, এবার ধ্যানভঙ্গ কর।" আমার চটুলতায় বিন্দুমাত্র বিরক্ত না হয়ে অজিত বললে, "তোকে একটা কথা বলা দরকার। কিন্তু কীভাবে কথাটা পাড়ব বুঝতে পারছি না। ভয় হয়, পাছে তুই ভুল বুঝিস।"

আমি হেসে বললাম, "অত ভণিতা না করে বলে ফেল। তোর কোনো ভয় নেই, ভুল তোকে আমি বুঝব না।"

অজিত একটু নড়েচড়ে বসল। কয়েক সেকেন্ড নিঃশব্দে কাটল। আমি চায়ের পেয়ালাটা সবে মুখে তুলেছি এমন সময়ে অজিত বলতে শুরু করলে। ওর গলার স্বর হঠাৎ যেন কঠিন হয়ে উঠেছে। এ যেন অন্য কারুর গলা। অজিতকে এত গম্ভীর আগে কখনো দেখিনি। চুমুক না দিয়েই পেয়ালাটা নামিয়ে রাখলাম।

অজিত বললে, "তোকে যা বলতে যাচ্ছি তার সূত্রপাত ইউরোপের প্রবাস-জীবনে। কয়েকদিনের ছুটিতে বেড়াতে গেছি সমুদ্রের তীরে ছোট্ট একটি শহরে। আমাদের দেশের মফস্বল শহরের মতোই কতকটা। আধুনিকতার ছোঁয়াচ তখনো তেমন লাগেনি। আমার মতো অনেকেই ছুটি কাটাতে যায় সেখানে। শহরের মোটা-মুটি সবরকম সুখ-সুবিধে পাওয়া যায়, অথচ নিরিবিলি। কোনো তাড়াহুড়ো নেই, মোটরগাড়ির ভিড় নেই। সব মিলিয়ে বেশ উপভোগ্য জায়গা। এখানেই সোনিয়ার সংগে আমার প্রথম আলাপ। চমৎকার হাসি-খুশি চটপটে মেয়ে। উজ্জ্বল স্বাস্থ্য। যে হোটেলে আমি উঠেছিলাম তার কাছেই একটা বড় স্টেশনারি দোকানে সেলস্‌গার্ল। বিদেশী বলেই বোধহয় প্রথম থেকেই আমার সংগে সোনিয়া ভারী সদয় ব্যবহার করে-ছিল। তখনো ওদেশের ভাষাটা ততটা রপ্ত হয়নি। দুদিনেই সোনিয়া আমার অভি-ভাবকের স্থান দখল করলে। ছুটি হলেই ও আমাকে নিয়ে বেড়াতে বেরোতো। আজ এখানে কাল ওখানে, এইভাবে কয়েকদিনের ভেতরেই সমস্ত শহরটা দেখা হয়ে গেল। যখন আমার ফেরার সময় হয়ে এল, দেখলাম সোনিয়াকে ছাড়া আমার চলবে না। রেজিস্ট্রি অফিসে আমাদের বিয়ে হয়ে গেল।

কর্মস্থলে যখন ফিরে এলাম, বন্ধু-বান্ধবেরা সকলেই অবাক। বিশেষ করে সমরেশ। সোনিয়ার প্রশংসায় সবাই পঞ্চ-মুখ। সুন্দরী, সুগৃহিণী তদুপরি সুরসিকা। খাইয়ে-দাইয়ে রঙ্গ-রসিকতা করে দুদিনেই সকলকে সোনিয়া বশ করে ফেললে। আমাকে তো ও ব্যবহার করত পুতুলের মতো। এটা পরো, ওটা খাও, ঠান্ডা লাগিয়ো না, এবার ঘুমুতে চলো—অষ্টপ্রহর এই লেগেই ছিল। ওর উপর একান্তভাবে নির্ভর করে আমারও খুব ভালো, খুব আরাম লাগছিল। সোনিয়ার এক বাতিক ছিল জোর করে আমাকে খাওয়ানো। নিজে সে খেতো কি খেত না, কিন্তু আমাকে খাইয়েই যেন ওর খিদে মিটত। খেতে খেতে শেষটায় আমার বিরক্তি ধরে যেত। কিন্তু ও তাতে কর্ণপাত করত না।

আমার যে এনিমিয়া হয়েছে ডাক্তারের রিপোর্ট না দেখলে টের পেতাম কিনা সন্দেহ। শরীরে কোনো গ্লানি নেই, দুর্বলতা নেই। তবুও কোম্পানীর নিয়ম-মাফিক বছরে প্রত্যেক কর্মীকে একবার ডাক্তারী পরীক্ষা করিয়ে রিপোর্ট দাখিল করতে হয়। আমার রিপোর্টে ডাক্তার লিখলেন, "বেশ এনিমিক কণ্ডিশন। পুষ্টির অভাব হচ্ছে।" প্রথমটা রিপোর্ট পড়ে আমি একটু অবাকই হলাম। ডাক্তারকে জিগ্যেস করলাম তাঁর কোনো ভুল হয়নি তো। ডাক্তার নির্ঘাৎ মর্মান্তিক চটেছিলেন, শুধু বললেন, ইউরোপের ডাক্তারেরা ভুল রিপোর্ট দেয় না।

সোনিয়া কিন্তু শুনে বিশেষ বিচলিত হল না। ও বললে, "ভুল সকলেরই হতে পারে। ইউরোপের ডাক্তার বলেই যে তার সিদ্ধান্ত ধ্রুব সত্য, একথা আমি মানি না। কিন্তু তুমি তো কিছু খেতে দিলেই আজ-কাল চটে ওঠো। ভালো করে খাওয়া-দাওয়া না করলে যে এনিমিয়া হবে তাতে আর আশ্চর্য কী।"

মনের ভেতরে একটা খটকা থেকে গেল। সোনিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে আমাকে ভালোমন্দ খাওয়াতে শুরু করলে। সংগে সংগে চলল ডাক্তারের নির্দেশ অনুযায়ী ওষুধপত্র। হঠাৎ একদিন মাঝরাত্রে ঘুম ভেঙে গেল। গলার কাছে কেমন একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি। চোখ মেলতেই দেখি সোনিয়া আমার গলার উপর মুখ রেখে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। আমি জেগেছি টের পেতেই ও চট করে উঠে বসল। কী যেন এক অজানা আশঙ্কায় আমিও উঠে বসে বাতিটা জ্বাললাম। সোনিয়া হাত দিয়ে তার মুখ আড়াল করতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই যা দেখবার আমি দেখে নিয়েছি। ওর দুকষ বেয়ে সবু রক্তের ধারা।

সোনিয়া আমাকে বোঝাচ্ছিল। ইউ-রোপের অনেক জায়গায়, বিশেষত ওদের দেশে এখনো অনেক পরিবারে প্রাচীন-কালের সেই রক্তশোষণ বা 'ভ্যাম্পায়ারিজম'-এর ধারা বংশ পরম্পরায় চলে এসেছে। প্রকাশ্যে নয়, একান্ত গোপনেই। অনেক প্রাচীন তান্ত্রিক আচারের মতো এর অস্তিত্ব এখনো সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়নি। এই কদাচারে একবার যে অভ্যস্ত হয়েছে তার আর মুক্তি নেই। আমরণ তাকে অপরের রক্তশোষণ করেই জীবনধারণ করে যেতে হবে। সভ্যজগতে একে কদাচার হিসেবেই গণ্য করা হবে সন্দেহ নেই, কিন্তু যারা এই তন্ত্রে বিশ্বাসী তাদের কাছে এটা অতি স্বাভাবিক লেনদেনের সম্পর্ক ছাড়া আর কিছু নয়। আমি তোমাকে খাইয়ে-দাইয়ে, সেবা-যত্ন করে, এমন কি নিজের বরাদ্দ খাবারটুকু পর্যন্ত দিয়ে সুস্থ সবল রাখছি। প্রতিদানে আমি তোমার কাছ থেকে সামান্য রক্ত নিজের জীবনধারণের জন্য নিচ্ছি। এতে অন্যায়টা কোথায়? তাছাড়া মানুষ অন্য জীবের রক্ত-মাংস যখন বিনা দ্বিধায় খেতে পারে, তখন মানুষের রক্তপানেই বা বাধা কী? দেখা গেছে যে এতে দুপক্ষের কারুরই তেমন কোনো ক্ষতি হয় না। যে রক্তপান করে তার আর অন্য কোনো খাদ্যের বিশেষ প্রয়োজন হয় না। আর অপরজনের কিঞ্চিৎ

বাহ্যিক রক্তশূন্যতা প্রকাশ পেলেও, মারাত্মক কোনো রোগ বা প্রাণহানির আশঙ্কা থাকে না।

সোনিয়াকে বাস্তবিকই আমি মন-প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছিলাম। তা না হলে এই ঘটনার পরও আরো এক বছর দূরে থাক একটা দিনও আমরা একসঙ্গে থাকতে পারতাম না। এই একটা বছর কেমন একটা ঘোরের মধ্য দিয়ে কেটে গেল। দিনের বেলা সোনিয়া আমার প্রাণধারণের রসদ জোগায়, রাত্রে আমি জোগাই ওর প্রাণরসধারা। প্রথম প্রথম অন্তরাত্মা ঘৃণায় আতঙ্কে সঙ্কুচিত হয়ে উঠত এই অমানবীয় ব্যবস্থায়। কিন্তু ধীরে ধীরে আমিও যেন সব কিছু মেনে নিয়েছিলাম। সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে তখন বেশ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল।

বছরখানেক বাদে একটু খোলা আলো-হাওয়ার জন্য মনটা হাঁফিয়ে উঠল। সোনিয়াকে নিয়ে সমুদ্রের ধারে সেই ছোট্ট শহরটিতে বেড়াতে গেলাম। পুরনো জায়গায় গিয়ে সোনিয়াও খুব খুশি। বিশেষ করে এই জায়গা আমাদের দুজনের অনেক সুখস্মৃতি বহন করছে।

খাওয়া-দাওয়ার পর বেশি রাত্রে এক-দিন দুজনে বেড়াতে বেরোলাম। হাঁটতে হাঁটতে আমাদের প্রিয় একটি ছোট নদীর ধারে এসে দাঁড়িয়েছি। চাঁদের আলোয় নদীর ওপরে ছোট সাঁকোটা সুন্দর দেখাচ্ছিল। দুজনে তার ওপরে এসে দাঁড়ালাম। অতো



তফাৎটা দেখুন! কি ধবধবে ফরসা! কি পরিষ্কার! সত্যিই সার্ফে পরিষ্কার করার আশ্চর্য্য শক্তি আছে। আর কী প্রচুর ফেনা হয় সার্ফে। সহজেই সার্ফে অনেক কাপড় কাচা যায়। বাড়ীর সব কাপড়ই সার্ফে কাচুন···ছেলেমেয়েদের জামাকাপড়, সার্ট, পাঞ্জাবী, ধুতি, শাড়ী, সবকিছুই। বাড়ীতে সব কাপড় সার্ফে কেচে তফাৎটা দেখুন।

সার্ফে কাচা সবচেয়ে ফরসা

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

রাত্রে কোথাও জনমানব নেই। ভারী শান্ত নিঃশব্দ চারদিক। সোনিয়া আমার কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। ওর কোমর জড়িয়ে আমার হাত। শাদা ধপধপে পোশাকে ওকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল। সোনিয়া আমার গায়ের সঙ্গে আরো ঘন হয়ে লেগে আমার মুখের কাছে ওর মুখটা তুলে ধরলে। আমিই ভুল করেছিলাম, কারণ পরক্ষণেই গলার সেই বিশেষ জায়গাটিতে ওর ঠোঁট দুটো চেপে বসল। আমার খাওয়া হয়ে গেলেও সোনিয়ার নৈশ আহার তখনো বাকি ছিল। আমার মাথার ভিতরে হঠাৎ যেন হাজার ভোল্টের বিদ্যুতের শক দিল। বহুদিনের জমানো বিদ্রোহ অবচেতন ভেদ করে ফেটে পড়ল নিস্তব্ধ নির্জন রাত্রির অন্ধকারকে খান-খান করে। সবলে দুহাতে ওকে ঠেলে দিলাম। সামান্য বাধা দেবারও সুযোগ ও পেল না। শুধু ঝপ করে একটা শব্দ হল। নিচে জলের বুকে একটা আলোড়ন। তারপর সব স্থির।

লোকজন ডেকে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও সোনিয়াকে উদ্ধার করা গেল না। আমার জীবনে ও যেমন হঠাৎ এসেছিল, তেমনি হঠাৎ চলেও গেল।

একা ফিরে এলাম। কিন্তু নিঃসঙ্গতার বেদনা যে শুধু মনেই নয় সেটা বুঝলাম রাত হতেই। রাতের পর রাত যে কী নরক যন্ত্রণা ভোগ করেছি কাউকে বোঝাতে পারব না। হাই ব্লাডপ্রেসারে অনেকের যেমন হয়, অনেকটা সে রকমের অবস্থা। রক্ত-মোক্ষণের জন্য ছটফট করতাম। সোনিয়া যে কী বিষ রেখে গেল আমার দেহে! একথা কাউকে বলবার নয়। বললে কেউ বিশ্বাস করত কিনা সন্দেহ।

সোনিয়া আমার দেহে যে কী বিষ রেখে গিয়েছিল তার স্বরূপ প্রকাশ পেল আরো কিছুদিন পরে। যখন ধীরে ধীরে আমারও তরলপদার্থ ছাড়া আর সব কিছুতে অরুচি ধরে গেল।"

অজিতের কথা শেষ হল। মিনিটের পর মিনিট নিঃশব্দে কাটতে লাগল। মুখ দিয়ে কথা বার করবার শক্তিও তখন আমার ছিল না। একদিকে ভয়, বিতৃষ্ণা, ঘৃণা। আবার অন্যদিকে অজিতের প্রতি গভীর সহানুভূতি ও ভালোবাসা। এই দুয়ের টানাপোড়েনে আমার তখন এক অবর্ণনীয় অবস্থা।

সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ রিকশা থেকে আমাকে নামতে দেখে মা-বাবা দুজনেই অবাক। ও'দের প্রশ্ন অনুমান করেই বললাম, "তোমরা বলেছিলে কয়েকদিন ছুটি নিয়ে বিশ্রাম করে যেতে। তাই এলাম। তবে ভাবনা কোরো না, শরীর আমার ভালোই আছে।" বলা বাহুল্য মা-বাবা খুব খুশি হলেন।

সেই রাত্রিটা প্রায় না ঘুমিয়ে কাটল। অজিতের অবিশ্বাস্য কাহিনী মনের ভিতর তোলপাড় করতে লাগল সারারাত। ভোরের দিকে বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। মা ডেকে তুললেন। বেশ বেলা তখন। চা খেয়ে পাড়া বেড়াতে বেরিয়ে পড়লাম। দুপুরে সবাই একসঙ্গে বসে খেতে খেতে গল্প করছিলাম। মা বললেন, "কই, তোর সেই বন্ধু অজিতের কথা তো কিছু বললিনে? তাকে নিয়ে এলেই পারতি। তোরও গল্প করার সঙ্গী হত, তারও বেড়ানো হত। তোর খুব যত্ন করে বলেছিলি, আমার দেখতে ইচ্ছে করে ওকে।" মার প্রশ্নের জবাবে কোনো মতে হু' হাঁ করে সেরে আহারে মনোনিবেশ করলাম। যতোই বেলা বাড়তে লাগল আমার ভেতরে ভেতরে একটা অস্থিরতা যেন দানা বাঁধতে লাগল। যখন প্রায় বিকেল হয়ে এসেছে, আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। উঠে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে মাকে ডেকে বললাম, "মা, অফিসের একটা জরুরী কাজের কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলাম। কাল সকালেই কাজ, সুতরাং এ যাত্রাও থাকা গেল না। দেখি, শীগগিরই আসার চেষ্টা করব।"

মা অবাক বিস্ময়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। শুধু বললেন, "যা ভালো বুঝিস, বাবা, কর। ভালো থাকিস, তাহলেই আমরা খুশি।"

অজিত যেন জানত আমি সেদিন না ফিরে পারব না। আমাকে দেখে শুধু একটু হাসল, কিছু বলল না।

তারপর কয়েক মাস কেটে গেল। দুজনে আমরা এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা পড়ে গেছি। প্রাণধারণের তাগিদেই পরস্পর পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে আছি। আমাদের অন্তরঙ্গতা নিয়ে আইভি লজের অন্যান্য বোর্ডারেরা প্রায় প্রকাশ্যেই ঠাট্টা-তামাশা করে। অনেক সময়ে তাদের ঠাট্টা মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। কিন্তু আমরা তখন নিজেদের জগতে এমন বিভোর হয়ে ছিলাম যে ওদের কথায় ভ্রুক্ষেপও করতাম না। একই ছকে বাঁধা দিন আর রাত্রিগুলো যেন একটা স্বপ্নের ভেতর দিয়ে কেটে যাচ্ছিল। দিনের-বেলা অজিত আমাকে আহার জোগায়, আর রাত্রিতে আমারই দেহ থেকে সংগ্রহ করে রুধিররূপী সঞ্জীবনী ধারা, ওর প্রাণধারণের রসদ

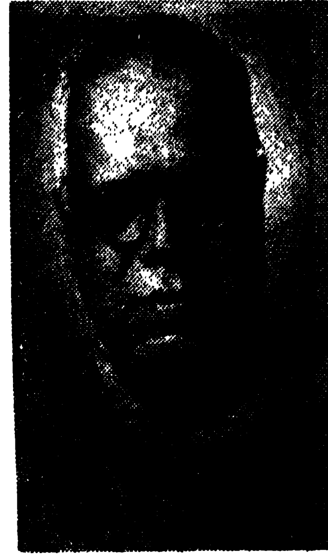
সেদিন ছিল পূর্ণিমা। রাত্রে খাওয়ার পর লজের ছাতে দুজনে পায়চারি করছি। জোছনায় চতুর্দিক থৈ-থৈ করছে। রাত মন্দ হয়নি, গাড়ি-ঘোড়ার শব্দ প্রায় মিলিয়ে এসেছে। ভারী ভালো লাগছিল। রেলিং-এর উপর ঝুঁকে প্রায় নির্জন রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। কচিৎ একটা গাড়ি বা রিকশা যাচ্ছে। কখনো বা দু-একটি পথচারী। অজিত এসে আমার গা ঘেঁষে দাঁড়াল। দুজনেই নির্বাক হয়ে জোছনার শোভা দেখছিলাম। হঠাৎ অজিত মুখটা আমার গলার উপর নামিয়ে এনে—বিষম চমকে আমি ওকে দুহাতে ঠেলে দিলাম। তারপর সবে একলাফে সিঁড়ির কাছে চলে এসেছি, অজিতও আমাকে অনুসরণ করে সিঁড়ির প্রথম ধাপে এসে দাঁড়িয়ে আবার আমার গলাটা জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করলে। আমার যেন হঠাৎ মাথায় খুন চেপে গেল। বহুদিনের চাপা একটা বিদ্রোহ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। শরীরে যতখানি শক্তি ছিল তাই দিয়ে ওকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলাম। এই আচমকা আঘাতের জন্য ও একেবারেই প্রস্তুত ছিল না, বিস্ময়ে দুচোখ বিস্ফারিত করে অসহায়ের মতো একবার শূন্যে দুহাত তুলে সশব্দে গড়িয়ে পড়ল সিঁড়ি দিয়ে। আমি তখন পাথরের মূর্তির মতন অনড় অচল। চোখের সামনে ব্যাপারটা ঘটে গেল, অথচ সামান্য এতটুকু বাধা দিতে পারলাম না। গড়াতে গড়াতে নিচে গিয়ে যখন ও পড়ল, তখনো সামান্য জ্ঞান ছিল। ডাক্তার ডেকে আনা থেকে শুরু করে ওর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করা অবধি যতটুকু সময় ও বেঁচে ছিল ওর চোখ-দুটো আমার মুখের উপরই আটকে ছিল। সে চোখে শুধু আকুতি আর জিজ্ঞাসা। যেন বলতে চাইছিল, 'আমি তো তোমার কোনো ক্ষতি করিনি, তোমাকে প্রতারণা করিনি, মনপ্রাণ দিয়ে শুধু ভালোইবেসেছি। তবু কেন আমাকে তোমার কাছ থেকে সরিয়ে দিলে।' ডাক্তারকে বলেছিল ছাদ থেকে নামতে গিয়ে ওর পা হড়কে গিয়ে-ছিল। ঘণ্টা কয়েক মাত্র বেঁচে ছিল। মাথায় বেশি রকম চোট পেয়েছিল, তাই থেকেই ইন্টারনাল হেমারেজ হয়।"

রঞ্জনবাবুর কাহিনী শেষ হল। দুজনে খানিকক্ষণ নির্বাক হয়ে বসে রইলাম। তারপর নিঃশব্দেই যে যার ঘরে ঢুকে পড়লাম।

ঘুম ভাঙলো একটু বেলাতে। উঠে বারান্দায় আসতেই দেখি পাশের ঘরে তালা ঝুলছে। দরোয়ানকে ডেকে জিগ্যেস করলুম, "কাল রাত্রে যে বাবু এসেছিলেন, তিনি কোথায় গেলেন এত সকালে?" দরোয়ান বললে, "উনি তো ভোরে উঠেই চলে গেছেন। আপনাকে নমস্কার জানাতে বলে গেছেন। ও কী বাবু, আপনার গলায় অতো রক্ত এলো কোত্থেকে? কিছু কামড়েছে নাকি?"

দরোয়ানের কথায় চমকে গিয়ে গলায় হাত দিতেই চটচটে কী যেন লাগল। হাতটা নামিয়ে দিনের আলোয় দেখতে পেলাম পাঁচটা আঙুলেই স্পষ্ট রক্তের ছাপ।





সুধীরচন্দ্র সরকার

১৮৯২—১৯৬৮

ভবানী মুখোপাধ্যায়

প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল ধরে সুধীরচন্দ্র সরকার বাংলা সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে বহু পত্র-পত্রিকা ও সাহিত্যিকের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছেন। সুধীরচন্দ্রের সতীর্থ ও দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হেমেন্দ্রকুমার রায় মহাশয় 'এখন যাঁদের দেখছি' নামক গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

"সুধীরচন্দ্র সরকার একাধারে সাহিত্যিক, সম্পাদক ও পুস্তক-প্রকাশক। সুধীরের আগে বাংলা দেশের আর কোন বিখ্যাত সাহিত্যিক বিখ্যাত প্রকাশকরূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন বলে মনে পড়ছে না, এখন এই পথে দেখি একাধিক ব্যক্তিকে। অনেকেরই মতে লেখকদের সঙ্গে প্রকাশকদের হচ্ছে খাদ্য ও খাদকের সম্পর্ক। সুধীরের বেলায় ওকথা খাটে না।"

যাঁরা সুধীরচন্দ্রের ব্যক্তিচরিত্রের পরিচয় পেয়েছেন এই উক্তি তাঁরাই সমর্থন করবেন। সুধীরচন্দ্র যখন কলেজে পড়তেন তখন তাঁর সহপাঠী ছিলেন শ্রীযুক্ত অমল হোম। কলেজ জীবনেই সুধীর-চন্দ্রের সাহিত্যানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। এর পর তিনি বি-এ পাশ করে আইন পড়া শুরু করেন, আর কিছুদিন আইন পড়ার পর তিনি তাঁর পিতৃদেব রায় বাহাদুর মহিমচন্দ্র সরকার প্রতিষ্ঠিত 'এম সি সরকার অ্যান্ড সন্সে'র দোকানে শিক্ষানবিশী শুরু করলেন। এই প্রতিষ্ঠান সেকালে কেবল আইন গ্রন্থ প্রকাশ করতেন। সুধীরচন্দ্রের সাহিত্যিক মন শুধু আইন গ্রন্থের প্রকাশ করে তৃপ্ত হওয়ার নয়, তিনি বাংলা কথাসাহিত্যের গ্রন্থপ্রকাশে উদ্যোগী হয়ে প্রথমেই প্রকাশ করলেন চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও হেমেন্দ্রকুমার রায় রচিত দুখানি গল্পগ্রন্থ।

সুধীরচন্দ্রের কলেজ জীবনে নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত 'জাহ্নবী' নামে একটি মাসিক পত্রিকার সম্পাদনা শুরু করেন। পত্রিকাটি কিছুকালের মধ্যে উঠে যায়। তারপর সুধাকৃষ্ণ বাগচী আবার সেই 'জাহ্নবী'র পুনর্জীবনের ব্যবস্থা করলেন। হেমেন্দ্রকুমার লিখেছেন—

"নামে সুধাকৃষ্ণ সম্পাদক হলেন বটে, কিন্তু তাঁর মধ্যে ছিল না সম্পাদকের উপযোগী মনীষা। সেই সময় পত্রিকা সম্পাদনার ভার গ্রহণ করলেন প্রভাত (গঙ্গোপাধ্যায়) অমল (হোম), সুধীর (সরকার) ও প্রেমাঙ্কুর (আতর্থী) প্রভৃতি। প্রত্যেকেই তরুণ, আমার চেয়ে বয়সে কিছু ছোট এবং প্রভাত অমল ও সুধীর তখনও বিদ্যালয়ের ছাত্র-জীবন যাপন করেন। কিন্তু সেই বয়সেই তাঁরা পড়ে গিয়েছিলেন সাহিত্যের আবর্তে। বিদ্যালয়ের লেখা-পড়ার চেয়ে সাহিত্যজগতের লেখা এবং পড়ার দিকেই তাঁদের ঝোঁক ছিল বেশী।"

এইভাবে প্রায় কিশোর বয়সেই সুধীর-চন্দ্র সাহিত্যের আঙিনায় প্রবেশ করেন। সেই কালটিও ছিল বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণযুগ। তখনও পর্যন্ত সাহিত্য পেশাদারী বৃত্তিতে পরিণত হয় নি। শৌখীন সাহিত্য-চর্চা করাতেই বাঙালী যুবসমাজের আগ্রহ ছিল অনেক বেশী। আর সেই কালেই তাঁরা দেশী ও বিদেশী সাহিত্য সম্পর্কে সমান আগ্রহশীল ছিলেন বলেই বাংলা সাহিত্যের যে উন্নতি পরবর্তীকালে দেখা যায় তা সম্ভব হয়েছিল।

তখন সাহিত্যিক সমাজের নায়কত্ব করতেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর আশে-পাশে ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল, দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। আর নবীন কবি ও কথা-শিল্পীদের মধ্যে করুণানিধান, যতীন্দ্রমোহন, সত্যেন্দ্রনাথ, চারু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির শক্তির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। এমন সময় 'যমুনা'র পৃষ্ঠায় আবির্ভূত হলেন শরৎ-চন্দ্র। 'যমুনা'তে প্রকাশিত হল শরৎচন্দ্রের 'রামের সুমতি', 'চন্দ্রনাথ', 'পথনির্দেশ' ও 'বিন্দুর ছেলে'। এর কয়েক বছর আগে ১৩১৪ সালে 'ভারতী'তে শরৎচন্দ্রের অজ্ঞাতসারে 'বড়দিদি' প্রকাশিত হয়েছিল। এটি তাঁর পুরাতন রচনাবলীর অন্যতম এবং তাঁকে না জানিয়েই তাঁর এক আত্মীয় এটি প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। বলাবাহুল্য 'যমুনা'র প্রচারসংখ্যা তেমন বেশী ছিল না এবং তার সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পালেরও তেমন প্রতিষ্ঠা ছিল না। কিন্তু শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবে 'যমুনা'র গৌরব বৃদ্ধি পেল। সাহিত্যিক সমাজ সেই দিকে আকৃষ্ট হলেন। 'যমুনা'র সম্পাদকীয় দপ্তরে 'জাহ্নবী'র লেখকরা গিয়ে জমায়েৎ হলেন।

হেমেন্দ্রকুমার লিখেছেন—

"তারপর 'জাহ্নবী', 'যমুনা', 'সঙ্কল্প' ও 'মর্মবাণী' পত্রিকা পরে উঠে গেল। এসব কাগজের সঙ্গেই সুধীরের ও আমার সম্পর্ক ছিল। একদিন আমরা দুজনে সুকিয়া স্ট্রীট দিয়ে যাচ্ছি। এমন সময় কান্তিক প্রেস থেকে স্বর্গত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় আমাদের আহ্বান করলেন।"

সেই সময় স্বর্ণকুমারী দেবী 'ভারতী'র সম্পাদনার ভার মণিলালের ওপর দিতে চান। মণিলাল হেমেন্দ্রকুমার ও সুধীরচন্দ্র সরকারকে বললেন—

"আপনারা দুজনে যদি আমাকে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দেন তাহলে আমি সে ভার গ্রহণ করতে পারি।" ('এখন যাঁদের দেখছি')।

এইভাবে 'জাহ্নবী', 'যমুনা'র দল ভারতীয় দলে রূপান্তরিত হয়েছে এবং 'ভারতী'র লেখকরা বাংলা সাহিত্যে কি ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন বাংলা সাহিত্য পাঠকের তা অবিদিত নেই।

তরুণ সুধীরচন্দ্র এইভাবে পরিপূর্ণ উৎসাহ নিয়ে সাহিত্যসেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। 'এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স' পুস্তক প্রতিষ্ঠানটিও সুধীরচন্দ্রের একক প্রচেষ্টায় ধীরে ধীরে একটি বিখ্যাত প্রকাশন সংস্থায় পরিণত হল। সুধীরচন্দ্র স্বয়ং সাহিত্যরসিক ও সাহিত্যসেবী হওয়ায় পুস্তকনির্বাচনে তাঁর বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া গেল। হেমেন্দ্রকুমার লিখছেন—

"এই বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের মূলে আছে একমাত্র সুধীরেরই মনীষা, সততা ও অমায়িকতা। আজ পর্যন্ত একাধিক ব্যক্তি তাঁকে ঠকিয়েছে, কিন্তু কোনো লেখককেই তাঁর কাছে ঠকতে হয় নি।"

যে কোনো প্রকাশক সম্পর্কে একজন লেখকের এই প্রশংসাবাণী নিঃসন্দেহে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আমরা দেখেছি, অনেক সময় সুধীরচন্দ্র অগ্রিম টাকা লেখককে দিয়ে সেই টাকা বা তার বাবদ গ্রন্থের জন্য লেখককে তাগিদ দেন নি।

মৌচাকের আড্ডায় (বামদিক থেকে সামনে) চারু রায়, সুধীরচন্দ্র সরকার, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, তুষারকান্তি ঘোষ এবং (পিছনের সারিতে বামদিক থেকে) ভবানী মুখোপাধ্যায়, বিশু মুখোপাধ্যায় এবং নির্মল সরকার



শরৎচন্দ্রের প্রথম পুস্তক 'বড়দিদি' কেউ ছাপতে উৎসাহবোধ করেন নি, সেটি ছাপিয়েছিলেন 'যমুনা' সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পাল শখ করেই। তারপর শরৎচন্দ্রের প্রথম প্রকাশক, সুধীরচন্দ্র সরকার। এমন কি যে 'চরিত্রহীন' নিয়ে সেকালে আন্দোলন হয়েছিল, সেই গ্রন্থটিও সুধীরচন্দ্রই প্রকাশ করেছিলেন। হেমেন্দ্রকুমার লিখেছেন—

"প্রকাশকদের মধ্যে সর্বপ্রথম সুধীরই বইয়ের বাজারে শরৎচন্দ্রকে নিয়ে দেখা দেন। শরৎচন্দ্রের সর্বশেষ পুস্তক 'ছেলেবেলার গল্প'ও তাঁরই দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে। মৃত্যুশয্যায় শায়িত শরৎচন্দ্রের যখন অনটন হয়েছিল, সুধীরই তাঁকে অর্থসাহায্য করতে অগ্রসর হয়েছিলেন।" সুধীরচন্দ্র প্রকাশক হিসাবে তাই অনন্য। তাঁর কাছে সাহিত্যরসিক মানুষ মাত্রেরই ঋণের আর সীমা নেই।

'কল্লোলে'র সাহিত্যিকদের গোড়ার দিকের রচনাবলীও এমনই আগ্রহভরে সুধীরচন্দ্র প্রকাশ করেছেন। অচিন্ত্যকুমার, প্রেমেন্দ্র, বুদ্ধদেব, প্রবোধকুমার প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা হওয়ার অনেক আগেই তাঁদের গল্প ও উপন্যাস প্রকাশ করেছেন সুধীরচন্দ্র সরকার। আবার অন্নদাশঙ্কর রায়ের প্রথমতম গ্রন্থ 'পথে ও প্রবাসে'র প্রকাশক সুধীরচন্দ্র সরকার।

ইদানীং জনপ্রিয় পুস্তকের প্রকাশের জন্যই বেশীর ভাগ পুস্তকব্যবসায়ী লালায়িত। কিন্তু সুধীরচন্দ্র জনপ্রিয়তার মোহে আকৃষ্ট হতেন না। ১৩২০ সালে শরৎচন্দ্রের 'নারীর মূল্য' শীর্ষক প্রবন্ধাবলী 'যমুনা' মাসিকপত্রে প্রথম ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়, তখন সুধীরচন্দ্র আগ্রহ প্রকাশ করে তা প্রকাশের অনুমতি লাভ করেন। এই বিষয়ে 'নারীর মূল্যে'র প্রথম সংস্করণে সুধীরচন্দ্র যে 'নিবেদন' লিখেছিলেন তা উদ্ধৃত করা প্রয়োজন। প্রসঙ্গক্রমে একথা উল্লেখ্য যে, পরবর্তী সংস্করণগুলিতেই এই 'নিবেদন' অংশ বর্জিত, কিন্তু 'নিবেদন'টির ঐতিহাসিক মূল্য উপেক্ষণীয় নয়। সুধীরচন্দ্র লিখেছিলেন :

১৩২০ সালের 'যমুনা' মাসিকপত্রে নারীর মূল্য প্রবন্ধগুলি ধারাবাহিকরূপে প্রথম প্রকাশিত হয়। তখন আমরা এগুলি গ্রন্থাকারে ছাপিবার অনুমতি লাভ করি।

কি মনে করিয়া যে শরৎবাবু তখন আত্মগোপন করিয়া শ্রীমতী অনিলা দেবীর ছদ্মনাম গ্রহণ করিয়াছিলেন সে তিনিই জানেন, তবে, তাঁহার ইচ্ছা ছিল, এমনি আরও কয়েকটি 'মূল্য' লিখিয়া 'দ্বাদশ মূল্য' নাম দিয়া পরে যখন গ্রন্থ ছাপা হইবে, তখন তাহা নিজের নামেই বাহির করিবেন। তারপরে, এই দীর্ঘ দশ বৎসর কাটিয়া গেল, না লিখিলেন তিনি আর কোন মূল্য, না হইতে পাইল 'দ্বাদশ মূল্য' ছাপা। আমরা গিয়া বলি মশায়, আপনার দ্বাদশ মূল্য আপনারই থাক, পারেন ত আগামী জন্মে লিখিবেন, কিন্তু যে 'মূল্য' আপাতত হাতে পাইয়াছি, তাহার সদ্ব্যবহার করি,—তিনি বলেন, না হে, থাক, এ আর বই করিয়া কাজ নাই। কিন্তু কারণ কিছুই বলেন না। এমনি করিয়াই দিন কাটিতেছিল। অথচ, তাঁহার মতের পরিবর্তন হইয়াছে তাহাও নয়,—আমাদের শুধু মনে হয় তখনকার কালে নারীরা নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে কথা কহিতে শিখে নাই বলিয়াই এ কাজ তিনি করিয়াছিলেন, কিন্তু এখন কাগজে কাগজে এঁদের দাবী-দাওয়ার প্রাবল্য ও পরাক্রান্ত নিবন্ধাদি দর্শন করিয়া এই বৃদ্ধ গ্রন্থকার ভয় পাইয়া গেছেন। তবে, এ কেবল আমাদের অনুমান, সত্য নাও হইতে পারে। কিন্তু একথা ঠিক যে, বই ছাপাইবার তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল না। তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইহা প্রকাশ করিয়া ভাল করিয়াছি কি মন্দ করিয়াছি তাহা পাঠক বলিতে পারেন, আমাদের ত মনে হয় মন্দ করি নাই। কিন্তু ইহার যত কিছু দায়িত্ব সে আমাদেরই। ইতি—

বিনীত

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার।

গ্রন্থটি অতিশয় সুরুচিসম্পন্নভাবে মুদ্রিত এবং সুধীরচন্দ্রের বন্ধু চিত্রশিল্পী চারুচন্দ্র রায়ের আঁকা ত্রিবর্ণ প্রচ্ছদ শোভিত হয়ে প্রকাশিত হয়।

সুধীরচন্দ্র নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রণীত দুঃসাহসিক উপন্যাসগুলিরও প্রকাশক। 'শুভা', 'পাপের ছাপ', 'বিপর্যয়' প্রভৃতি উপন্যাস সেই যুগে বিশেষ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে।

আবার, যদুনাথ সরকার প্রণীত ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বের মূল্যবান ইংরাজী ও বাংলা গ্রন্থাবলী, রাজশেখর বসুর প্রবন্ধ, গল্প গ্রন্থাবলী, রামায়ণ, মহাভারত ও

চলন্তিকা প্রভৃতি গ্রন্থেরও সুধীরচন্দ্র ছিলেন উৎসাহী প্রকাশক।

যে যুগে সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করা দুঃসাহসের কাজ ছিল, বিশেষত কবিতার বই যখন মোটেই বিক্রয় হত না সেই কালে তিনি প্রকাশ করেছেন নরেন্দ্র দেব ও রাধারাণী দেবী সম্পাদিত 'কাব্য-দীপালী' এবং পরে নিজে সম্পাদনা করেছেন বাংলা ছোটগল্প সংগ্রহ 'কথাগুচ্ছ'। এই শেষোক্ত গ্রন্থটির ভূমিকা লিখেছিলেন প্রমথ চৌধুরী মহাশয়।

কিন্তু সুধীরচন্দ্রের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি বোধকরি ছোটদের জন্য মাসিক পত্র 'মৌচাক'। ১৩২৭ সালে 'মৌচাক' প্রথম প্রকাশিত হয়। তারপর প্রায় সুদীর্ঘ ৪৮ বছর কাল তিনি এই পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। এই পত্রিকায় প্রথম বর্ষের যাঁরা গ্রাহক ছিলেন তাঁরা আজ সবাই প্রায় ষাটের কোঠায় পৌঁছেছেন। উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত 'সন্দেশে'র পর বাংলা শিশু-সাহিত্যে 'মৌচাকে'র মত সর্বজনপ্রিয় ছোটদের মাসিক বোধকরি আর নেই। 'মৌচাকে'র নামকরণ করেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। এই মৌচাকে 'ভারতী'র দলের প্রায় সবাই অর্থাৎ হেমেন্দ্রকুমার, সৌরীন্দ্রমোহন, মণিলাল, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী নরেন্দ্র দেব প্রভৃতি, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র অবনীন্দ্রনাথ প্রভৃতি সাহিত্য-নায়ক এবং পরবর্তীকালে প্রেমেন্দ্র, অচিন্ত্যকুমার, অন্নদাশঙ্কর, বুদ্ধদেব, প্রবোধকুমার, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় এবং তার পরবর্তী যুগেরও প্রায় সব নামকরা লেখক এই 'পত্রিকা'য় লিখেছেন। কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় 'জগন্নাথ পণ্ডিত' ছদ্মনামে এবং তুষারকান্তি ঘোষও মৌচাকে কয়েকটি চমৎকার গল্প লিখেছেন।

হেমেন্দ্রকুমার বলেছেন, "এই সব লেখকবৃন্দ ছোটদের জন্য কলম ধরতেন কিনা সন্দেহ।...তার আসরে এসে আসীন হয়েছেন আজ পর্যন্ত কত বিখ্যাত লেখক, ছোটদের আর কোন পত্রিকা তেমন গর্ব করতে পারবে না।"

সমস্ত আকর্ষণের মধ্যমণি ছিলেন মিতবাক সদাহাস্যময় সুধীরচন্দ্র সরকার। তিনি কথা বলতেন কম, অনেক সময় শুধু হেসেই তিনি প্রসঙ্গ বিশেষের প্রতি তাঁর অনুমোদন জানাতেন, অপছন্দ হলে নীরব থাকতেন, আর এই ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য।

সুধীরচন্দ্র অতি সম্প্রতি তাঁর 'আত্মজীবনী' 'আমার কাল, আমার দেশ' 'অমৃতে'র পৃষ্ঠায় লিখে শেষ করেছেন। অনেক স্মৃতির টুকরো তার মধ্যে ছড়ান আছে, আর আছে সমকালীন ইতিহাসের খুঁটিনাটি।

সুধীরচন্দ্রের অধ্যবসায় ছিল অপরিসীম। তিনি তাঁর সম্পাদিত 'হিন্দুস্থান ইয়ার বুকে'র জন্য প্রতিদিন নিয়মিতভাবে কয়েকটি ঘণ্টা কাজ করতেন। এছাড়া তিনি তিনখানি 'অভিধানে'র সংকলক হিসাবে স্মরণীয়। 'বিবিধার্থ অভিধান' 'পৌরাণিক অভিধান' এবং 'জীবনী অভিধান' প্রভৃতি অভিধানের পিছনে ছিল তাঁর দীর্ঘদিনের নিরলস পরিশ্রম। ছোটদের জন্য একটি কোষগ্রন্থ প্রণয়নের কাজে তিনি ইদানীং ব্যস্ত ছিলেন। যতদূর জানি, সেই গ্রন্থটিরও অনেকখানি কাজ তিনি করে গেছেন।

সুধীরচন্দ্রের জীবনের একটি পদ্ধতি ছিল, সেই বাঁধাধরা পদ্ধতির মধ্যেই তিনি জীবনের সাফল্যের সন্ধান পেয়েছেন, এবং পেয়েছেন অজস্র মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা।

'মৌচাকে'র আড্ডাটি দীর্ঘদিনের। সুধীরচন্দ্রকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল এই আড্ডা। অল্প-পরিসর সেই আড্ডায় নিয়মিতভাবে আসতেন কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় , চারুচন্দ্র রায়, নরেন্দ্র দেব মাখনলাল সেন, অবনীন্দ্রনাথ মিত্র হেমেন্দ্রকুমার, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, সৌরীন্দ্রমোহন, অমল হোম, তুষারকান্তি ঘোষ, অচিন্ত্যকুমার, প্রবোধকুমার, প্রেমেন্দ্র, বুদ্ধদেব, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, মণীন্দ্রলাল বসু, হিতেন্দ্রমোহন বসু, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমল মিত্র, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রিয় গুহ, রঘুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ নির্মল সরকার, মনোজ বসু, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, প্রমথনাথ বিশী, শিবরাম চক্রবর্তী মণীন্দ্র রায়, গোপাল ভৌমিক, নির্মল ভট্টাচার্য প্রভৃতি অনেক বিশিষ্ট সাহিত্যিক, সমাজসেবী ও শিক্ষাব্রতী। সব নাম দেওয়া সম্ভব নয়, যেকটি স্মরণে এল তার উল্লেখ করা গেল—আর মৌচাকের বিশু মুখোপাধ্যায় ছিলেন প্রতিদিনের সঙ্গী।

এই 'মৌচাকে'র আড্ডাতেই 'অমৃত' পত্রিকার পরিকল্পনা হয়। তুষারকান্তি ঘোষ মহাশয় সুধীরচন্দ্রের বিশেষ অনুরাগী বন্ধু, তিনি বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করলেন। তাঁর 'শিশিরকুঞ্জে' দু-দুবার মৌচাকের আড্ডার অনেককে নিয়ে বৈঠক বসল এবং প্রায় পাঁচ বছর জল্পনা-কল্পনার পর সাপ্তাহিক 'অমৃত' প্রকাশিত হল।

তুষারকান্তি ঘোষ মহাশয়ের আগ্রহে সুধীরচন্দ্র হলেন 'অমৃত' পত্রিকার ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। সুধীরচন্দ্র অপরিসীম উৎসাহে 'অমৃত' পত্রিকার সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য প্রাণ-মন ঢেলে দিলেন। প্রতিটি 'ফিচার' এবং বিশেষ সংখ্যা সম্পর্কে তাঁর ছিল অসীম উৎসাহ। অনেক সময় তিনি বিচিত্র ধরনের রচনার কথা বলতেন।

'অমৃত' অল্পকাল মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করায় সুধীরচন্দ্র বিশেষ আনন্দবোধ করতেন এবং সকল সময় 'অমৃত' প্রসঙ্গে আলোচনা করতে ভালবাসতেন। 'অমৃতে'র প্রতিটি প্রকাশিত রচনা তিনি সুগভীর আগ্রহে পাঠ করতেন।

তাঁর সংগঠনী শক্তির আর এক পরিচয় ১৯৫৭ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত 'অল ইণ্ডিয়া রাইটার্স কনফারেন্সে'র কলিকাতা অধিবেশন। এই কনফারেন্সের সম্পাদক ছিলেন তারাশঙ্কর, মনোজ বসু ও বর্তমান লেখক এবং কোষাধ্যক্ষ ছিলেন সুধীরচন্দ্র সরকার। সম্মেলনের সাফল্যের জন্য প্রচণ্ড পরিশ্রমের ফলে আমরা উভয়েই গুরুতরভাবে পীড়িত হয়ে পড়ি, সেকথা তিনি প্রায়ই পরিহাস করে বলতেন। এই সম্মেলনের উদ্বৃত্ত অর্থ নিয়ে যে 'রাইটার্স ক্লাব' গড়ে ওঠে তারও তিনিই কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ পি-ই-এন-এর সম্পাদক ছিলেন সুধীরচন্দ্র, এবং সেই সূত্রে যে সব অধিবেশনের তিনি আয়োজন করেন তা ছিল নিখুঁত এবং পরিচ্ছন্ন।

আমরা তাঁর সঙ্গে একাধিক স্থানে একত্রে ভ্রমণ করেছি, এবং সেই সূত্রে তাঁর কাছে পূর্বাতনদিনের অনেক প্রসঙ্গ শুনেছি, আর পেয়েছি কাছের মানুষ সুধীরচন্দ্রের অন্তরের পরিচয়।

বাঙালী চরিত্রের দুটি দ্রুত বিলীয়মান সদ্গুণ সৌজন্য ও শিষ্টাচারের তিনি ছিলেন বিরলতম প্রতিনিধি। মুখের হাসি দিয়ে চিত্ত জয়ের যাদু তাঁর জানা ছিল। সাহিত্যজগতের ছোট-বড়-মাঝারী সকলকেই তিনি সমদৃষ্টিতে দেখতেন, তাই তাঁর মৃত্যু সাহিত্যসমাজকে পরমাত্মীয় বিয়োগের বেদনায় আকুল করেছে।

সকল ঋতুতে অপরিবর্তিত ও অপরিহার্য পানীয়

চা

কেনবার সময় 'অলকানন্দার' এই সব বিক্রয় কেন্দ্রে আসবেন

অলকানন্দা টি হাউস

৭, পোলক স্ট্রীট কলিকাতা-১
২, লালবাজার স্ট্রীট কলিকাতা-১
৫৬, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ কলিকাতা-১২

॥ পাইকারী ও খুচরা ক্রেতাদের অন্যতম বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান ॥

ভারতীয় সাহিত্য

কৃত্তিবাস স্মরণোৎসব ॥

গত এগারোই ফেব্রুয়ারী, রবিবার নদীয়া জেলার ফুলিয়া গ্রামে মহাকবি কৃত্তিবাসের স্মরণোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্যে নির্মিত 'কৃত্তিবাস স্মৃতিভবন ও সংগ্রহশালা'র উদ্বোধন হয়। এই সভায় পৌরোহিত্য করেন ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র ও প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ডঃ ভূদেব চৌধুরী।

ট্রানস্লেটরস ক্লাব ॥

একটি নতুন 'ট্রানস্লেটরস ক্লাব' স্থাপিত হয়েছে কলকাতায়। এর আগে 'অল ইণ্ডিয়া ট্রানস্লেটরস এ্যাসোসিয়েশন' বলে অনুরূপ একটি সংস্থা স্থাপিত হয়েছিল দিল্লিতে। এঁদের কাজকর্ম ও মোটামুটিভাবে সন্তোষজনক। যাই হোক সম্প্রতি কলকাতায় একটি সভায় শহরের বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতিতে এই ক্লাব গঠিত হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন শ্রীমতী লীলা রায়।

এই ট্রানস্লেটরস ক্লাব-এর মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে, অনুবাদের কাজ সুষ্ঠুভাবে করা, অনুবাদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে অনুবাদকদের মধ্যে আলোচনা করা, যাঁরা এ কাজে আগ্রহী তাঁদের সাহায্য করা, এবং একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে বিশেষজ্ঞদের অধীনে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা। এই ক্লাবের পরামর্শ সমিতির দুটি শাখা থাকবে। একটি ভাষাভিত্তিক, অপরটি বিষয়-ভিত্তিক। যাঁরা যে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, তাঁদের সেই বিষয়ের জন্য পরামর্শ সমিতিতে গ্রহণ করা হবে জানা গেছে।

সভানেত্রী শ্রীমতী রায় অনুবাদের বিভিন্ন দিক নিয়ে একটি সুন্দর আলোচন করেন। অন্যান্য যাঁরা অনুবাদের সমস্যা ও অনুবাদ প্রসঙ্গ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে শ্রীকালীচরণ কর্মকার, ডঃ শিশির চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী এনাক্ষী চট্টোপাধ্যায়, শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, শ্রীমতী লীলা মৈত্র, নিখিলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমিহির সিংহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সভা আরম্ভের আগে রাইটার্স গিল্ডের যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীশেখর সেন সভার উদ্দেশ্য সকলের কাছে তুলে ধরেন। এই ক্লাবের যাঁরা সদস্য হতে চান তাঁদেরকে রাইটার্স গিল্ডের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

পরলোকে বিভাস রায়চৌধুরী ॥

গত ১১ ফেব্রুয়ারী যোগমায়া দেবী কলেজের উপাধ্যক্ষ বিশিষ্ট সাহিত্যসেবী বিভাস রায়চৌধুরী পরলোকগমন করেন। ঐ দিনই তিনি যাদবপুরে বিজয়গড়স্থ লোকশিক্ষা সংসদ সাহিত্যায়ম্ কেন্দ্রের বিংশ বার্ষিক সমাবর্তন উৎসবে ভাষণ-দানের সময় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬২ বৎসর।

সাম্প্রতিক কানাড়ি উপন্যাস ॥

কানাড়ি উপন্যাসের ক্ষেত্রে চল্লিশের দশক খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই সময় থেকেই উপন্যাসের জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করা যায়। উপন্যাস লিখে জীবিকা অর্জনের প্রয়াসও এই সময়েই লক্ষণীয়। কিন্তু উপন্যাসের এই জনপ্রিয়তা উপন্যাসকে পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে বললে অন্যায় হবে না। কেননা, অনেকেই উপন্যাস নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষার পরিবর্তে সস্তা উপন্যাস লেখায় মন দেন। তাতে উপন্যাসের শিল্পরীতি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

পঞ্চাশের দশকে এর বিরুদ্ধে যেন একটা সচেতন বিদ্রোহ ঘটে। এই বিদ্রোহের মূলে ছিলেন দুজন তরুণ ঔপন্যাসিক। এঁদের নাম

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

টমাস উলফ-এর জীবনীগ্রন্থ ॥

পাশ্চাত্য সাহিত্য-জগতে টমাস উলফ একটি সুপরিচিত নাম। ঘটনাবহুল জীবন উপন্যাসের মতোই বিচিত্র, ঘাত-প্রতিঘাতময় এবং দুঃসাহসিক কার্যকলাপে রোমাঞ্চকর। সম্প্রতি তাঁর একটি জীবনীগ্রন্থ বেরিয়েছে। লেখক এনড্রু টার্নবুল। বলা বাহুল্য অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গেই তিনি উলফের জীবন-কাহিনী বিশ্লেষণ করেছেন।

পুরো সাড়ে ছফুট দীর্ঘদেহের অধিকারী উলফ বিশ শতকের গোড়ার দিকে উত্তর করোলিনায় জন্মগ্রহণ করেন। একদা তিনি মিঃ বেকারকে লিখেছিলেন, "নিজেকে ঠকিয়ো না। তুমি আমাকে সংযম শেখাতে পারবে না। আমার চারদিকে বেড়া দিয়ে লাভ নেই। আমি শেষদিন পর্যন্ত অধিকতর অসংযতভাবে আত্মপ্রকাশ করতে থাকব।"

খুব অল্পসময়ের মধ্যেই তাঁর খ্যাতি স্বদেশের গণ্ডি অতিক্রম করে চ্যাপেল হিলের স্টেট ইউনিভার্সিটিতে ছড়িয়ে পড়ে। তারপর অধ্যাপক জর্জ পিয়ার্স পার্কারের অধীনে তাঁর বিখ্যাত ড্রামা ওয়ার্কশপে তিনি যোগদান করেন এবং সেখানেও খ্যাতি পান।

অন্য সবকিছুর মতো তাঁর নাটকগুলিও ছিলো বেখাপ্পা রকমের বড়। নিউ-ইয়র্কে এসেও উলফ নিজেকে সংযত রাখতে পারেননি। যদিও ন্যু-ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের বস্তা বস্তা কাগজের মধ্যে তিনি নিজেকে আবদ্ধ করতে শিখেছিলেন, তবু তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রায়ই ঘুরে বেড়াতেন রাত্রির পথে পথে। এই সময়ে তিনি মায়ের কাছে যে-চিঠি লিখেছিলেন, তাতে তাঁর ক্রমবর্ধমান মানসিক অস্থিরতা ও অসংযমের স্বীকৃতি পাওয়া যায়। অবশ্য বরাবরই তিনি নিজের প্রতিভা সম্পর্কে ছিলেন নিঃসংশয়।

তাঁর ২৫তম জন্মদিনে উলফ একজন মহিলাকে বিয়ে করেন। তাঁর নাম অ্যালাইন বার্নস্টেইন। অ্যালাইন ছিলেন একজন প্রখ্যাত থিয়েট্রিক্যাল ডিজাইনার এবং উলফের চেয়ে বয়সে আঠারো বছরের বড়ো।

উনত্রিশ বছর বয়সেই উলফ একটি বৃহদায়তন গ্রন্থের লেখক। টার্নবুল এই সময়কার ঘটনা বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে—কি ক'রে এই উপন্যাসটির এগারশ' পৃষ্ঠার টাইপ-করা পাণ্ডুলিপি বহু গুরুতর পরিবর্তনসহ আটশ' পৃষ্ঠায় পরিণত হয়—তার সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। উলফ একটি জেনারেশনের ভাবপ্রবাহকে এই উপন্যাসে সংহত করেছেন। অবশ্য তখন তাঁর অন্তরে ছিলো ঝড়ের সংকেত। মাঝে মাঝে তা আত্মপ্রকাশ করতো কারণে-অকারণে। দাম্পত্যজীবনেও বিরোধের সূত্রপাত হলো এই সময়েই। অ্যালাইনকে তিনি গোপনে তিরস্কার করলেন, আর তাঁর দেওয়া প্রেমপত্রগুলি নিয়ে হাসিঠাট্টায় যোগ দিতে লাগলেন মায়ের সঙ্গে। যদিও তাঁর সামাজিক সত্তা নিজের এই নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে অচেতন ছিল না, তবু ভালোবাসার হত্যায় তিনি নিজেকে কখনো বিরত রাখতে পারেননি। উলফ নিজেকে 'অর্ধ-দানব' বলেই জানতেন।

টার্নবুল দক্ষতার সঙ্গে উলফের সংঘাতময় জীবনকাহিনী বর্ণনা করেছেন। এদিক থেকে গ্রন্থটির প্রামাণিকতা সম্পর্কে সংশয়ের কোনো কারণ নেই। তবে উলফের সংগীতপ্রিয় স্বপ্নচারী মানসিকতার রহস্যটি অনুদ্ঘাটিত রয়ে গেছে এই গ্রন্থে।

পিটার হান্ডকের সাম্প্রতিক উপন্যাস ॥

পঁচিশ বছর বয়স্ক অস্ট্রিয়ান লেখক পিটার হান্ডকের দুটি নাটক প্রকাশিত হয়েছিল কিছুকাল আগে। শুধু জার্মানীতেই নয়, গোটা ইউরোপের বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে তাঁর নাটক সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। সম্প্রতি তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'দের

হলো—বাসাংয়ে বাঙ্গাল ও নিরঞ্জনা। বাঙ্গালের উপন্যাসের পটভূমি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বোম্বাইয়ের নগরজীবন। নিরঞ্জনার সমাজ-সচেতনতাই তাঁর সাফল্যের প্রধান কারণ। যাই হোক, এঁদের দুজনের প্রচেষ্টাতেই উপন্যাসের মান উন্নত হয়।

পঞ্চাশের দশকে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল শ্রীশিবরাম কারনাথের আবির্ভাব। তাঁর উপন্যাসে তিনি যেভাবে মনস্তাত্ত্বিক বিষয়কে ব্যাখ্যা করেছেন, তা যে কোনও ঔপন্যাসিকেরই ঈর্ষার বস্তু। এছাড়া, তাঁর উপন্যাসের সবচেয়ে বড় গুণ হল কর্মের প্রতি নিষ্ঠা। শ্রীরঙ্গের উপন্যাসগুলিও কানাড়া উপন্যাসের সাম্প্রতিককালের অন্যতম সংযোজন। তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল নাট্যকাররূপে। কিন্তু উপন্যাস রচনাতেও তিনি যে সফলতা দেখিয়েছেন, তা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। তাঁর উপন্যাসের বিষয়-বস্তু প্রধানতঃ মনস্তত্ত্বমূলক।

এছাড়াও পঞ্চাশের দশকে যাঁরা উপন্যাস রচনায় সফলতা অর্জন করেছেন তাঁদের মধ্যে শ্রীশংকর মোকাশির 'গংগায়া মত্তু গংগামায়ী' এবং বাগুবাহাদুরের 'গ্রামায়ন' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মোকাশির উপন্যাসের চরিত্রাবলী খুবই জটিল। আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার ঘাতপ্রতিঘাতে জর্জরিত নগরজীবনের ব্যর্থতাগুলি তিনি সুনিপুণ শিল্পীর তুলিকায় ফুটিয়ে তুলেছেন। 'গ্রামায়ন'-এর মধ্যে একটা মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনা আছে।

ষাটের দশকে উপন্যাসের ক্ষেত্র যেন আরও সমৃদ্ধ হয়েছে। এই সময়ে কানাড়ি সাহিত্যে উপন্যাস রচনায় যে নতুন আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে, তাকে নাম দেওয়া হয়েছে 'মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসপ্রবাহ'। শ্রীশান্তিনাথ দেশাইয়ের 'মুক্তি' উপন্যাসে জীবনের অর্থ খুঁজে নতুন মূল্যবোধের সন্ধানে লেখক যাত্রা করেছেন। শ্রীযশোবন্ত চৈতালের 'মরু দারুগলু' উপন্যাসে ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। অন্যান্য ঔপন্যাসিকদের মধ্যে যাঁরা এ সময়ে খ্যাতি অর্জন করেছেন তাঁদের মধ্যে শ্রী ইউ আর অনন্তমূর্তি, শ্রীসৌরী রামানুজম, শ্রীপূর্ণ-চন্দ্র তেজস্বী উল্লেখযোগ্য।

পরলোকে তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় ॥



গত ৭ই ফেব্রুয়ারী বিশিষ্ট সাহিত্যিক শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায় ৭২ বৎসর বয়সে কলকাতায় পরলোকগমন করেন। তাঁর মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্যের যে বিশেষ ক্ষতি হল, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম হয় ১৮৯৬ সালে। তাঁর পিতা ছিলেন বিখ্যাত দার্শনিক মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন তাঁর মাতামহ এবং রাজা রামমোহন রায় ছিলেন তাঁর প্রপিতামহ। শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ে ও কলকাতায় তাঁর শিক্ষাজীবনের প্রথম অংশ অতিবাহিত হয়। পরে কেম্ব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে তিনি এম-এ পাশ করেন। ১৯৪০ সালে ব্যারিস্টারী পাশ করে তিনি কলকাতা হাইকোর্টে যোগদান করেন। পরে তিনি 'সলিসিটার্স ফার্মে'র কাজে যোগ দেন। ১৯৪১ সালের কাছাকাছি তিনি আইন ব্যবসা ছেড়ে সাহিত্যসেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। স্বাধীনতার পর তাঁকে বাংলার 'অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ জেনারেল' ও অফিসিয়াল ট্রাস্টির' দায়িত্ব দেওয়া হয়।

বাংলা সাহিত্যেও তাঁর অবদান উল্লেখ্য। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে 'পলাশীর যুদ্ধ', 'পলাশীর পর বক্সার', 'স্মৃতিরক্ষা', 'বাংলা লিরিকের গোড়ার কথা' বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে। এছাড়াও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাংলার ব্রত' তিনি ফরাসী ভাষায় অনূদিত করেন। তাঁর নিজস্ব গল্পেরও কিছু কিছু অনুবাদ ফরাসী ও ইংরেজি ভাষায় হয়েছে।

তিনি ছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রিয়পাত্র। রবীন্দ্রনাথের নাটকের কয়েকটি বিশিষ্ট ভূমিকাতেও তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি শান্তি-নিকেতন আশ্রমিক সংঘের সভাপতি ছিলেন।

বিদেশী সাহিত্য

হৌসিয়েরার' প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম উপন্যাস 'হর্ণসেন' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৬ সালে।

ভ্লাদিমির কর্ণিলভ-এর কাব্যগ্রন্থ ॥

সোভিয়েত কবি-মহলে ভ্লাদিমির কর্ণিলভ কোনো অপরিচিত নাম নয়। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কোয়েসাইড' প্রকাশিত হয় ১৯৬৪ সালে। কর্ণিলভ প্রথম লেখা শুরু করেন ১৯৪৮-এর গোড়ার দিকে। সম্প্রতি তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'এজ' প্রকাশিত হয়েছে। এদিক থেকে তাঁকে ষষ্ঠ দশকের কবি বলতে হয়। কেননা, বর্তমান দশকের মধ্যভাগ থেকেই তিনি সোভিয়েত কবি-সমাজে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছেন। 'এপ্রিল ১৯৪৫'-এর মতো দু'-একটি কবিতায় তিনি তাঁর সময় ও যৌবনের গান গাইলেও, মূলত তিনি আত্মমগ্ন কবি। গত দুই দশকের সমাজবাদী অনুচিন্তনের স্রোতে অবগাহন করলেও পূর্ববর্তী দশকের ভানশেনকিন, সামুইলভ স্লাংস্কি প্রমুখ কবিদের মতো প্রত্যক্ষ যুদ্ধের অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল না, এবং পরবর্তী দশকের ইয়েভতুশেংকো কিংবা সোকোলভের মতো তিনি তারুণ্যে উজ্জ্বল নন। তবু, স্লাংস্কি ও ভিনোকুরভের সঙ্গে তাঁর কবিতার সাদৃশ্য আছে। তাঁর কাব্যিক প্রেরণার মূল-উৎসের পিঠোপিঠি রয়েছেন ইসেনিন। কর্ণিলভ নিজেও স্বীকার করেন, তাঁর গ্রামের প্রকৃতি ও বসন্তের আকাশ, ধূসর রঙের গাছপালা এবং সার্জেই ইসেনিনের কবর তাঁকে উদ্বুদ্ধ করে।

বয়সের দিক দিয়ে কর্ণিলভ এখন জীবনের মধ্যলগনে। সোভিয়েত সমালোচকদের মতে, তিনি হয়তো যৌবনের সংকট ও সংশয়ের কাল অতিক্রম করে দীর্ঘ-বিলম্বিত অভিজ্ঞতার সঞ্চয়-সিদ্ধান্তে পৌঁছবেন। 'এজ' কাব্যগ্রন্থের দুটি কবিতা 'ঘোষক' ও 'অভিনেত্রী' তাঁর জীবন-অভিজ্ঞতার দুটি উজ্জ্বল ফসল।

যৌনাশ্রয়ী উপন্যাসের জনপ্রিয়তা ॥

স্পষ্টতা কিংবা বিপথগামী যৌনতা আজ আর কোনো ইঙ্গ-মার্কিন উপন্যাসের ক্ষেত্রে নতুন বিষয় নয়, তবু যৌনাশ্রয়ী উপন্যাসের চাহিদা পাশ্চাত্যে ঊর্ধ্বমুখী। জন আপডাইকের 'কাপলস্' এরূপ একটি যৌনোপন্যাস। সমালোচকদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েও তাঁর জনপ্রিয়তায় ভাটা পড়েনি। এই উপন্যাসটিতে আপ্‌ডাইক নিউ ইংলণ্ড টাউনের প্রায় দশজোড়া বিবাহিত কিংবা অবৈধভাবে মিলিত নরনারীর উচ্ছৃংখল জীবনযাপনের কাহিনী বর্ণনা করেছেন।

গোরে ভিদালের নতুন বইটিতে বর্ণিত হয়েছে হলিউডের জীবনযাত্রার ঘটনাবলী। লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয়েছে মোরডেসাই রিচ্‌লারের 'কক্‌সিওর' নামে একটি উপন্যাস। বিদ্রূপাত্মক ভংগীতে লেখা হলেও এই উপন্যাসটির ঘটনাক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে স্বয়ং-উত্তেজিত কার্যকলাপে পূর্ণ। টেরি সাউদার্ণের 'ব্লু মুভি' প্রকৃতপক্ষে নিষিদ্ধ গ্রন্থ হিসেবেই আত্মপ্রকাশের অপেক্ষায়, আর লরেন্তন ডুরেলের প্রথম উপন্যাসটি আট বছর আগে প্রকাশিত হলেও জন-প্রিয়তায় এখন সবার ওপরে। কিছুসংখ্যক মহিলা মিলে প্রকাশ করছেন ও'ব্রিয়েন এর একটি উপন্যাস ('দি লোন্‌লি গার্ল')—ক্যাটে ও বাবার অসুখী বিবাহের কাহিনী। সাইমন দ্য বিভয়ের উপন্যাস 'লে বেল্স ইমেজেস' একজন মহিলা একজিকিউটিভকে নিয়ে লেখা, যার ইতিমধ্যে আরাম, আধিপত্য ও প্রথাগত জীবনের প্রতি মোহভংগ হয়েছে। ব্রিজিড ব্রফি ও পামেলা হেন্‌স-ফোর্ড জনসন উভয়েই লণ্ডনের আধুনিক জীবন নিয়ে উপন্যাস লিখছেন। ব্রিজিড-এর লেখা কৌতুকাশ্রয়ী, কিন্তু পামেলা সিরিয়াস।

নতুন বই

সাজাহান নাটক — দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। রথীন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত। সাহিত্য প্রকাশ। ৪৭।২, রমেশ দত্ত প্রসাদ মজুমদার লেন, হাওড়া। দাম পাঁচ টাকা।

নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের আত্মপ্রকাশের পূর্বেই গিরিশচন্দ্র-জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অমৃতলাল বসু - ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। রবীন্দ্রনাথও নাটক লিখতে শুরু করে দিয়েছেন। ঐতিহাসিক এবং যুগোপযোগী নাটক রচনা ক্ষেত্রে এ'দের থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন স্বতন্ত্রলোকের অধিবাসী। সেই সঙ্গে ছিল তাঁর অতুলনীয় কাব্যধর্মী ভাষা আর অসামান্য হাসির গান। সামাজিক নাটক অপেক্ষা ঐতিহাসিক নাটকের রোমান্টিক জগৎ দ্বিজেন্দ্রলালকে এনে দিয়েছে অধিকতর সার্থকতা। দ্বিজেন্দ্রলাল ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক নাটকের মধ্যে আধুনিক জীবন-সমস্যা রূপায়িত করেছেন। সেই সঙ্গে আছে আঙ্গিক, দৃষ্টিভঙ্গি, ভাষায় অভিনবত্ব। বহু প্রহসন খণ্ডকাব্য ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাটক রচনা করেছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল। এর মধ্যে ঐতিহাসিক নাটক রচনায়ই দ্বিজেন্দ্রলালের জনপ্রিয়তা ঘটেছিল সব থেকে বেশী। তাঁর শ্রেষ্ঠ পাঁচটি ঐতিহাসিক নাটক হোল রাণা প্রতাপসিংহ, দুর্গাদাস, নূরজাহান, মেবারপতন, সাজাহান। এর মধ্যে সাজাহান সব থেকে বেশী মঞ্চসফল এবং জনপ্রিয় নাটক। ইতিহাসকে অক্ষুন্ন রেখে নাটক রচনায় তৎপর ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল। বন্দী সাজাহান এবং তার চারপুত্রের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে সংগ্রামের কাহিনীই নাটকে বর্ণনা করা হয়েছে। সাজাহান, দারা, সুজা, ঔরংজীব, মোরাদ, জাহানারা চরিত্রের ঐতিহাসিক ভিত্তি অনস্বীকার্য। সেই সঙ্গে এসেছে নাট্যকারের সৃষ্টি দিলদার চরিত্রটি। এই জীবন্ত চরিত্রগুলির সঙ্গে আরো বহু পার্শ্বচরিত্র। সর্বামিলিয়ে এই নাটকখানি মুঘলযুগের এক আশ্চর্য জীবনচিত্র তুলে ধরে এযুগের মানুষের সামনে।

দ্বিজেন্দ্রলালের এই ঐতিহাসিক নাটকটি সম্পাদনা করেছেন ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায়। একশ চৌত্রিশ পাতার সুদীর্ঘ ভূমিকায় বহু মূল্যবান তথ্যের আলোকে নাটকটির চুলচেরা বিচার করেছেন তিনি। ঐতিহাসিক নাটক হিসাবে 'সাজাহানের' সার্থকতা বিচার করে সম্পাদক দেখিয়েছেন 'সাজাহান' শুধু সার্থক ঐতিহাসিক নাটকই নয়, বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে এর 'ঐতিহাসিক' মূল্যও অনস্বীকার্য। সাজাহান চরিত্রের ট্রাজেডি বিশ্লেষণ করে পূর্ববর্তী সমালোচকদের মন্তব্যকে তিনি নতুন আলোকে বিচার করেছেন। সাজাহান নাটকে পাশ্চাত্য প্রভাব আলোচনা করতে গিয়ে ডঃ রায় দেখিয়েছেন, 'শেক্সপীয়রের চরিত্রসৃষ্টি', অন্তর্দ্বন্দ্ব, ট্রাজেডি-পরিকল্পনা ও জীবনরহস্যের গভীরে অবতরণ করার নাটকীয় কৌশল তিনি এই নাটকে অনেকখানি আয়ত্ত করেছেন। 'সাজাহান' নাটকে তিনি শেক্সপীয়রীয় ট্রাজেডি পরিকল্পনার সার্থকতা দেখিয়েছেন। শেক্সপীয়র বাঙালী নাট্যকারদের প্রিয়তম শিল্পী হলেও দ্বিজেন্দ্রলালের আগে আর কোনো নাট্যকার শেক্সপীয়রীয় রীতি এমন সার্থকভাবে প্রয়োগ করতে পারেন নি।' 'সাজাহান' নাটকে সংগীত প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনায় নাট্যকারের অনন্য সাধারণ কৃতিত্ব সম্পাদক নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তাছাড়া দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যপ্রতিভা, সাজাহানের নায়কচরিত্র, সংলাপ, গঠন-রীতি, অসংগতি, অনৌচিত্য, অতিনাটকীয়তা প্রভৃতি সম্পর্কেও সম্পাদকের আলোচনা মূল্যবান। ডঃ রায় যে নিষ্ঠা ও পরিশ্রমে দ্বিজেন্দ্রলালের এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটকটি সম্পাদনা করেছেন তা নিঃসন্দেহে সুধীজনের স্বীকৃতি পাবে।

দালাল (কৌতুক নাটিকা) হরিপদ বসু। পাণ্ডুলিপি প্রকাশনী ৫৭ নং সূর্য সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৯ থেকে প্রকাশিত। দাম: দেড় টাকা।

একটা কথা আছে "এত ভঙ্গ বঙ্গ দেশ তবু রঙ্গে ভরা।" ইদানীংকালে বাংলার নাট্য সাহিত্য বিশেষ পরিপুষ্টি লাভ করেছে তার নাট্য সাধনার মাধ্যমে। আলোচ্য নাটিকাখানি তার যে সেই প্রয়াসেরই সগোত্র তাতে কোন সন্দেহই নেই। বিশেষ করে হাসির নাটক আমাদের দেশে খুবই কম—সেদিক দিয়ে নাটিকাখানি তার কৌলিন্য বজায় রেখেছে।

হরিপদ বসু একজন প্রবীণ নাট্যকার। তাঁর শৌখীন নাট্যান্দোলন একদিন সমাদর লাভ করেছিল। এ নাটিকাখানিতেও সে পরিচয় আছে বলেই আমাদের মনে হয়। একটি মাত্র নারী চরিত্র আসমান ও ছয়টি বিভিন্ন ধরনের বলিষ্ঠ পুরুষ চরিত্র এবং সুন্দর একটি গল্পকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এই 'দালাল' নাটিকাখানি। এর প্রতিটি চরিত্রই যেন জীবন্ত। পড়তে পড়তে মনে হয়, এসব চরিত্র যেন সকলেরই খুব সুপরিচিত। কাজেই নাটিকাখানি সুধী পাঠক ও নাট্যানুরাগী মহলে ব্যাপক প্রতিষ্ঠা লাভ করবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। ছাপা ও প্রচ্ছদপট সুরুচির পরিচায়ক।

কেমন ডেকেছে বুক: জগদীশচন্দ্র দাশ। প্রকাশক: আলফা-বিটা পাবলিকেশনস্, ১৭/১, সারপেনটাইন লেন, কলকাতা-১৪, দাম—৩·২৫।

বেপথুমতী: সন্তোষ দাশ। প্রকাশক: আলফা-বিটা পাবলিকেশনস্, ১৭/১, সারপেনটাইন লেন, কলকাতা-১৪। দাম —৩·২৫।

দুটি নতুন কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থদ্বয়ের নাম 'কেমন ডেকেছে বুক' এবং 'বেপথুমতী'। গ্রন্থকার যথাক্রমে জগদীশচন্দ্র দাশ এবং সন্তোষ দাশ।

'কেমন ডেকেছে বুক' কাব্যগ্রন্থ মোটামুটি চিত্রধর্মী। কবির সংবেদনশীল হৃদয়ানুভূতির স্পষ্ট ছাপও অবশ্য কোন কোন কবিতায় দুর্নিরীক্ষ্য নয়। কিছু নতুন আমেজ তিনি আমদানি করতে চেয়েছেন। কিন্তু যে-কোন কারণেই হোক তা সফল হয়নি। এজন্য কবির আরো চর্চার প্রয়োজন এবং নিজের শক্তির উপলব্ধিতেই অবশ্য এই চর্চা সার্থকতা লাভ করবে।

সন্তোষ দাশের 'বেপথুমতী' কাব্যগ্রন্থে একটা সহজ সাবলীলতা আছে যা সহজে পাঠককে ধরে রাখে। অযথা চটক সৃষ্টির প্রয়াস তাঁর নেই। কয়েকটি কবিতায় তিনি বেশ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। ছিমছাম, মিঠে ভাবটি তাঁর কবিতায় বেশ ফুটেছে।

উভয় গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদ মনোহর।

●

বিচিত্র বাঘ শিকার: (আলোচনা)—ঊষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়। এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি। কলেজ স্ট্রীট মার্কেট। কলকাতা-বার। দাম তিন টাকা।

শিকার নিয়ে বাঙলাভাষায় রচিত গ্রন্থের সংখ্যা কম নয়। আর শিকার সম্পর্কে বাঙালীর অনীহা কোনকালেই প্রকাশ পায়নি। বহু বিখ্যাত বাঙালী শিকারী দেশ-বিদেশে খ্যাতি লাভ করেছেন। তাঁদের জীবনের বিভিন্ন কাহিনী দুর্ধর্ষ শিকারের মনোরম চিত্র তুলে ধরেছে। কিন্তু শিকারের বিভিন্ন কলাকৌশল বা শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কে বিশেষ কোন উপযোগী গ্রন্থ পাওয়া যায় না। এদিকে লক্ষ্য রেখে শ্রীঊষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় 'বিচিত্র বাঘ শিকার' গ্রন্থখানি রচনা করেছেন।

'বিচিত্র বাঘ শিকার' গ্রন্থে শিকার সম্পর্কে নানান কাহিনী যেমন আছে তেমনি শিকারের ধাঁধা বাঘ শিকার সম্পর্কে জ্ঞাতব্য তথ্যও আছে। বাঙলা দেশের কোন অঞ্চলে কি ধরনের বাঘ পাওয়া যায় এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য তথ্য ও অনেকগুলি শিকার সম্পর্কিত গ্রন্থের নাম আছে। যাঁরা শিকার উৎসাহী এবং যাঁরা শিকার কাহিনী পড়তে ভালবাসেন, তাঁদের কাছে বইখানি সমাদর পাবে।

হপ্তা পাঁচেক বেলুনে চেপে : অদ্রীশ বর্ধন। প্রকাশক : অ্যালফা-বিটা পাবলিকেশনস, ৯৭।১, ন্যুরপেনটাইন লেন, কলকাতা-১৪। দাম—২·০০।

জুল্‌ ভার্নের কল্পনারঙীন উপন্যাস **ফাইভ উইকস ইন এ বেলুন**-এর বাংলা রকেট বই হলো **হপ্তা পাঁচেক বেলুনে চেপে**'। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অ্যাডভেঞ্চারের দুঃসাহসিকতা মুগ্ধ বিস্ময়ে পাঠককে ঘিরে রাখে। পর্যটক ডক্টর ফার্গুসন চলেছেন আফ্রিকা অভিযানে। সঙ্গী হলেন ডিক কেনেডি এবং জো। ভিকটোরিয়া বেলুনে চেপে তাঁরা যাত্রা করলেন জানজিবার থেকে। বাণিজ্যবায়ুর স্রোতে ভেসে চলল বেলুন এবং অভিযাত্রীরা। অবিরাম চলার পথে বিচিত্র অভিজ্ঞতা, রোমহর্ষক নিষ্ঠুরতা, মরুভূমির মরুদ্যোক তৃষ্ণা ও মরীচিকা। মায়াজাল বর্ণনায় লেখক সুনিপুণ দক্ষতা প্রকাশ করেছেন। সেই সঙ্গে সবকিছুকে ভিয়েনে চড়িয়ে সরসও করে তুলেছেন।

এই আশ্চর্য কৌতূহলজনক বইটির বাংলা অনুবাদ করেছেন অদ্রীশ বর্ধন। সায়ান্স-ফিকশান অনুবাদের ক্ষেত্রে ওঁর কৃতিত্ব এই বইটিতে অক্ষুণ্ণ আছে। প্রকাশরীতির বৈশিষ্ট্য এবং বর্ণনানৈপুণ্যে মূলে গ্রন্থের স্বাদ সর্বত্র অব্যাহত আছে। বাংলা সাহিত্যের দিগন্ত বিস্তৃতিতে এরকম একটি গ্রন্থের সংযোজন নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় এবং অনুবাদকের উদ্যমও ধন্যবাদার্হ।

রহস্যময় মোহেনজোদাড়ো (আলোচনা)—বিমলেন্দু চক্রবর্তী। গ্রন্থলোক। কলেজ স্ট্রীট মার্কেট। কলকাতা-বার। দাম দুই টাকা।

সুপ্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা মহেঞ্জোদাড়োর কৃষ্টি সংস্কৃতি নিয়ে বিদগ্ধজন গবেষণা করছেন দীর্ঘকাল যাবৎ। পুরাতত্ত্ববিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহেঞ্জোদাড়ো আবিষ্কারের গৌরব লাভ করে-ছেন। পুরাতত্ত্ববিদ ননীগোপাল নাম এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে গভীরভাবে। বিভিন্ন বাঙালী মনীষী নানান সময়ে এই সভ্যতার সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। বাঙালীর সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে মহেঞ্জোদাড়োর অবদান কম নয়। কিন্তু বাঙলাভাষায় এ সম্পর্কে বিশেষ কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় না।

সম্প্রতি বিমলেন্দু চক্রবর্তীর 'রহস্যময় মোহেনজোদড়ো' গ্রন্থখানি বহুচিত্রশোভিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। মুখ্যত ছোটদের উপযোগী করে রচিত হলেও সকল শ্রেণীর পাঠকই এই গ্রন্থ পাঠ করে উপকৃত হবেন। বর্ণনাভঙ্গী যেমন আকর্ষণীয়, ভাষাও তেমনি সহজ। নীরস বিষয়বস্তুকে মনোরম ভঙ্গীতে বর্ণনা করার দুর্লভ ক্ষমতা লেখকের আছে। রহস্যময় মহেনজোদাড়োর যে চিত্র শ্রীচক্রবর্তী তুলে ধরেছেন, তা নিশ্চয়ই সমাদৃত হবে।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

প্রগতি (বিশেষ সংখ্যা)—সম্পাদক মৃণাল চট্টোপাধ্যায় ৩৩।১ সেন্ট মিশন রোড, কলকাতা-২৩। দাম এক টাকা।

সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে মাসিক সাহিত্য পত্রিকা প্রগতির বিশেষ সারস্বত সংখ্যা। গল্প কবিতা, প্রবন্ধ গ্রন্থসমীক্ষা, চিত্রমণ্ড উপন্যাস নাটক, গানের জলসা, শিল্প ও বিজ্ঞানবিদের প্রভৃতি নানা বিষয়ই এতে রয়েছে। বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। কিন্তু সম্পাদনায় কেমন যেন লক্ষ্যহীন বলে মনে হয়। লেখক সূচীতে আছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, রমাপদ চৌধুরী গোপাল ভৌমিক, রামেন্দ্র দেশমুখ্য, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়, অজিত গাঙ্গুলী এবং আরো অনেকে।

যোজনা (১২শ বর্ষ : ১ম সংখ্যা)। সম্পাদক : শরদিন্দু সান্যাল। পার্লামেন্ট স্ট্রীট, নিউদিল্লী-১। দাম : পঁচিশ পয়সা।

প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে 'যোজনা'র বিশেষ সংখ্যাটি নানা দিক থেকেই মূল্যবান। ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত এই পাক্ষিক পত্রিকাটি প্ল্যানিং কমিশনের তরফ থেকে নিয়মিত দিল্লীতে বেরোয়। এই সংখ্যায় লিখছেন এইচ ডি আর আয়েঙ্গার, এল এন বিড়লা, বি এন ভট্টশালী, সি বি পারেখ, আর সি কুপার, পি এস লোকনাথন, আর কে আসিন, প্রকাশবীর শাস্ত্রী, বলরাজ মাধোক, পি এন মাথুর, অশোক মিত্র রঙ্গচারী, জে পি চতুর্বেদী, জে এন সিনহা, বলজিৎ সিং, ভি আর পিল্লাই, পানিক্কর, ভি ভি বোরকার, জি টি হুচাপ্পা, এম শ্রীনিবাসন, এম আর হাজারে, ডি ব্রাইট সিং, বি আর কে রাউ, এস সি জেসেফ, সি এইচ হনুমন্ত রাও, পি সি গোস্বামী, এ বাসুদেবন, ভি মহাজন প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

বাকপত্র (১ম সংখ্যা)—সম্পাদক বিনয় সেন যশোহর রোড, বনগ্রাম। দাম ৫০ পয়সা।

সাহিত্যের কাগজ হিসেবে বাকপত্রের এই প্রথম আবির্ভাব। যতদূর মনে হয় কবিতা ও কবিতা সম্পর্কিত আলোচনা প্রকাশেই উদ্যোক্তারা আগ্রহী। তবে বেশির ভাগ কবিতায় কেমন যেন অপটু হাতের ছাপ রয়েছে। যাঁদের কবিতা ভালো লেগেছে তাঁরা হলেন হরপ্রসাদ মিত্র এবং মোহিত চট্টোপাধ্যায়। এ সংখ্যার সবচেয়ে আকর্ষণীয় জিনিস হল বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপ্রকাশিত দিনলিপির দুটি পৃষ্ঠা এবং নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পূর্ব বাংলার কবিতায় বাংলা।'

●

গ্রন্থ-পরিক্রমা (পঞ্চম বর্ষ চতুর্দশ সংখ্যা)—সম্পাদক: অপর্ণাপ্রসাদ সেনগুপ্ত। ৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট। কলকাতা-১২। দাম পঁচিশ পয়সা।

'গ্রন্থপরিক্রমা'র বর্তমান সংখ্যায় অমৃতবাজার পত্রিকার শতবর্ষ সম্পর্কে সুদীর্ঘ আলোচনাটি মূল্যবান। মুজফফর আহমদ লিখিত 'কাজী নজরুল ইসলাম', পার্ল এস বাকের 'পলাতকা', গোবিন্দলাল ব্যানার্জীর 'স্পীকার্স রুলিং' প্রভৃতি গ্রন্থের সুদীর্ঘ সমালোচনা আছে। এই ধরনের পত্রিকার শিক্ষিত সমাজে সমাদৃত হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

কৃত্তন (৯ সংকলন) কৃত্তন গোষ্ঠীর পক্ষে জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক বালুরঘাট থেকে প্রকাশিত, দাম ৫০ পয়সা।

এ সংখ্যায় লিখেছেন গৌরাঙ্গ ভৌমিক, মলয় রায়, সামসুল হক, যোগব্রত চক্রবর্তী, বর্ণজিৎ দেব, বিমান চৌধুরী, প্রদীপ দাস, মঞ্জু মিত্র এবং আরো অনেকে। উদ্দেশ্যহীন এই কাগজটির সম্পাদনা আশাব্যঞ্জক নয়।

বিজ্ঞানী—সম্পাদক : সুখরঞ্জন মৃধা। ১১৩ হিন্দুস্থান রোড। কলকাতা-২৯। দাম প্রতি সংখ্যা দশ পয়সা।

বাঙলা ভাষায় প্রকাশিত স্বল্পমূল্যের ক্লাসিক বিজ্ঞান পত্রিকা 'বিজ্ঞানী'র আত্মপ্রকাশ নিঃসন্দেহে প্রশংসার্হ। এদের তিনটি সংখ্যা আমাদের হাতে এসেছে। বেতার, জ্যোতির্বিজ্ঞান, জন্তুজানোয়ারের মর্মরহস্য, রঙের কথা পেপ্‌টিক আলসার, শুক্রগ্রহে জীবনের অস্তিত্ব, অতীত ভারতে রসায়ন চর্চা এবং বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনাগুলি বেশ আকর্ষণীয় এবং সহজবোধ্য। এই পত্রিকাটি ছাত্র-সমাজ এবং বিজ্ঞান-উৎসাহী পাঠকের প্রয়োজন মেটাবে।

যুক্তিবাদী (স্মারক সংখ্যা ৭ বর্ষ) **সম্পাদক: কল্যাণ দাশগুপ্ত, ৯ পঞ্চাননতলা লেন** থেকে প্রকাশিত।

যুক্তিবাদীর মাসিক সাহিত্য সভায় পঠিত ও আলোচিত লেখার এই সংকলনটি মোটামুটি আকর্ষণীয়। এ সংখ্যায় রয়েছে কৃষ্ণ ধর, পুলকেশ দে সরকার, গিরিশংকর ও মিন্টু দাশগুপ্তের লেখা।

জঁ জনে

নন্দদুলাল দে



একালের একজন বহু বিতর্কিত ফরাসী লেখকের জীবন ও সাহিত্য-কৃতির বিবরণ। তাঁর সাহিত্যপ্রতিভা ও কালাপাহাড়ী মতের জন্যে জঁ জনে আজ বিশ্ববিশ্রুত।

সনাতন জীবনধারায় যাঁরা অভ্য তাঁদের কাছে জঁ জনে সমাজের আবর্জনা। তাঁর নাম যেন সমকামী, প্রতারক ও তস্করের প্রতিশব্দ। ফাঁসোয়া ভীয়ঁ, বোদ্‌ল্যের, মারকি দ্য সাদ্ তাঁর ক্লিন্ন জীবনবেদের পাশে ম্লান হয়ে যান। তাঁর সংগে কারাবাসে অন্যান্য কয়েদীদের ঘোর আপত্তি। অথচ জঁ পল্ সার্ত্র, জঁ ককতো প্রভৃতি প্রখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিকবৃন্দ তাঁকে বন্ধুপদে বরণ করে নিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি।

বলা বাহুল্য জঁ জনের মত ও পথ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তিনি কোন বিশেষ সাহিত্যিকগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নন, কোন বিশেষ মতবাদেরও তিনি ধার ধারেন না—অস্তিত্ববাদ, তার নিয়মাবলী বা নির্দেশের উপরও তিনি আদৌ নির্ভরশীল নন। তথাপি সার্ত্র-এর সাহিত্যিক মতবাদের পরিপ্রেক্ষিতে, অর্থাৎ সাহিত্যিক যা হতে পারেন এবং তাঁর যা হওয়া উচিত তিনি সার্ত্র-এর কাছে একটি চাক্ষুস উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সার্ত্র-এর সকল প্রত্যাশা জনের মধ্যে দিয়ে এমনভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে যে তাঁকে অস্তিত্ববাদ-পরিবারের এক দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয় বলে ধরে নিতে পারা যায়।

সমাজের চোখে জনে বে-পরোয়া, বে-আইনী : কি লেখক হিসাবে, কি মানুষ হিসাবে—সবই তাঁর সমাজছাড়া সৃষ্টিছাড়া। শৈশবেই তিনি নিক্ষিপ্ত হয়েছেন সমাজের অতি নীচু স্তরে। এই অচেনা অজানা পৃথিবীতে শিশু প্রথম চোখ মেলে দেখে তার বাবা-মাকে। তাদের স্নেহের ছায়াতেই ধীরে ধীরে সে বড় হয়। জনে সে জগতের আস্বাদ কোনদিনই পাননি। তাঁর জন্ম-তারিখ সঠিক করে কেউ বলতে পারেন না; কেউ বলেন ১৯০৭ সনে, আবার কেউ বা বলেন ১৯১০ সনে পারীতে জন্ম। পিতৃমাতৃ-পরিচয়ও আজ পর্যন্ত অজ্ঞাত। মা তাঁকে সরকারী অনাথ আশ্রমে ছেড়ে চলে যান। পরে মধ্যফ্রান্সের মরভাঁ পাহাড়তলি অঞ্চলে এক কৃষক পরিবারে তিনি মানুষ হন। দশ বৎসর বয়সে হঠাৎ তাঁর মধ্যে চৌর্যবৃত্তি দেখা দেওয়ায় তাঁকে এক শোধন-প্রতিষ্ঠানে পাঠানো হয়। একের পর এক এই ধরনের বহু প্রতিষ্ঠানে অবস্থানের পর, প্রধানত বিদেশীদের নিয়ে গঠিত সেনাদলে তিনি নাম লেখান। সেখান থেকে পালাতেও তাঁর বেশী দেরী হল না। তারপর ইওরোপে ইতস্তত ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। কখন ভিক্ষা করেন, কখন চুরি। বহুবার জেল খাটলেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'নত্র্-দাম্ দে ফ্লর' পারীর দক্ষিণ উপকণ্ঠে ফ্র্যানের কারাগারে বসেই লেখা। ১৯৪৮ সালে চুরি অপরাধে তিনি সাজা পেলেন। চুরির জন্য এই নিয়ে তাঁর দশবার সাজা হল। স্থির হল ফরাসী উপনিবেশগুলির মধ্যে কোন একটিতে তাঁকে স্থানান্তরিত করা হবে। কিন্তু কয়েকজন প্রথিতযশা সাহিত্যিকের মধ্যস্থতায় তিনি সে যাত্রা রক্ষা পান। এই ঘটনার পর তিনি সাহিত্যকর্ম থেকে অবসর নেবেন বলে ঠিক করেন। বেশ কিছুকাল চুপচাপ থাকবার পর ১৯৫৮-র আবার 'লে নেগ্র্' লিখে নাট্যকার হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। বর্তমানে ইনি সাতখানি নাটক সমন্বয়ে একটি নাটক-চক্র রচনায় রত। এদের প্রত্যেকটি স্বয়ংসম্পূর্ণ। আবার সবগুলি জড়িয়ে নাটক-চক্রটি অখণ্ড।

জনে সম্পর্কে এই স্বল্প-পরিচয়ই আমাদের মনে যুগপৎ কৌতূহল ও বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। যিনি কোনদিন বাঁধাধরা পথে চললেন না, বাপমায়ের স্নেহের আস্বাদ পেলেন না, দারিদ্র্য যাঁর নিত্যসহচর, শিক্ষাদীক্ষা বলতে যাঁর কিছুই নেই, কারাগারে যাঁর জীবন কাটে, তিনি সাহিত্যসৃষ্টির এই বিস্ময়কর ক্ষমতা পেলেন কোথা থেকে? বিরল হলেও অস্বীকার করবার উপায় নেই যে এমন প্রতিভা কালেভদ্রে জন্মায়। কিন্তু তাদের জন্ম থাকে এবং জীবনও কাটে থাকে। তাই তাদের চেনা যায় না। হয়তো জনের পরিচয়ও অজ্ঞাত থেকে যেতো, যদি না সার্ত্র তাঁর স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসার আলোকবর্তিকা নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন—সমাজের একেবারে নীচের তলায় যাদের বাস তাদের জীবন কেমন, কি সম্ভাবনা আছে তাদের মধ্যে এই প্রশ্ন নিয়ে। 'সাঁতে' নামক কারাগারে জনে যখন বন্দী তখনই তিনি লিখবেন স্থির করেন। এই জেলেই হঠাৎ সার্ত্র একদিন তাঁর লেখা পড়তে পড়তে বিস্মিত হন। এরই সূত্র ধরে সার্ত্র ও জনের প্রথম পরিচয় ঘটে। জনে সার্ত্র-এরই আবিষ্কার।

জনে সম্পর্কে মনে পড়ে পঞ্চদশ শতাব্দীর (১৪৩১) ফরাসী গীতিকবি ফ্রাঁসোয়া ভীয়ঁকে। জনে এবং ভীয়ঁ দুজনেরই পিতৃমাতৃ-পরিচয় রহস্যাবৃত। ভীয়ঁকে যিনি পালন করেছিলেন সেই পুরোহিতের পদবীতেই তিনি পরিচিত। উজ্জ্বল

জীবনযাত্রার দণ্ড এড়াবার জন্য প্রায়ই তাঁকে জেনের মতই যাযাবর জীবন অবলম্বন করতে হয়। যাঁদের সঙ্গে তাঁর দিন কাটতো তাঁদের না ছিল সমাজে কোন স্বীকৃতি না শিক্ষা-দীক্ষার বালাই; সমাজের চোখে তারা অপরাধীই ছিল। আশ্চর্যের বিষয় এই হেন পরিবেশ অতিক্রম করে তাঁরা কি করে (তৎকালীন) কঠিন এম-এ ডিগ্রী লাভ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই শিক্ষাদীক্ষা কিন্তু জেনের ছিল না। তা সত্ত্বেও তিনি কি করে তাঁর সাহিত্যকর্মে কৃতী হলেন, বাক্যসিদ্ধি বিখ্যাত হলেন, তা আরও আশ্চর্যের কথা। তিনি হলেন সত্যকারের "autodidacte" —নিজেই নিজের শিক্ষা-গুরু ও দীক্ষাগুরু।

ইয়েগারের নিজস্ব কাহিনীর মধ্যে কৃতকর্মের জন্য আক্ষেপ নির্বেদ সুস্পষ্ট। জেনের জীবনদর্শন কিন্তু একেবারে বিপরীত ধারায় বয়ে চলেছে। সাহিত্যকর্মে যাই হন জীবনদর্শনে তিনি অস্তিত্ববাদীদের একজন। তাঁর লেখায় আক্ষেপ আর নির্বেদ একেবারেই অনুপস্থিত। তিনি কোনো সমাজ নয় নিজে নিজে। তিনি সমাজ-নির্ধারিত দুষ্কর্ম করেছেন অনেক দিন। কিন্তু তাঁর মনে তার জন্য অনুতাপ জাগেনি। তাঁর মনে নীতি এবং বেদনা পাপ এবং পুণ্যের সম্বন্ধ জেনের মনে সে সম্বন্ধ নেই কারণ তাঁর কাছে পাপ পুণ্য বলে কিছু নেই। তাঁর সমাজের নিয়ন্ত্রণ মানা প্রাণিবিশারদ তিনি মনে করেন না দুষ্কর্মের বিচারক সমাজ। জেনের জীবনদর্শনের প্রেরণা (অস্বীকরণ বা স্বীকরণ মতবাদ assimilation) যাকে সনাতনপন্থীরা সমাজের বিরুদ্ধে জেহাদ বলে মনে করতে পারেন তা দৃষ্টিভঙ্গীতে নয় অন্যায়ের প্রতি তাৎপর্যিক। প্রসঙ্গত বোদলেয়ার নিজের পাপের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন এবং সমাজই তাঁর বিচারক বলে মনে করতেন।

এখানে জেনের 'লা জুর্নাল দ্য ভলর' (চোরের ডায়েরী) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাতেই তিনি নিঃসংকোচে [illegible] করেছেন তাঁর জীবনকাহিনী, তাঁর নীতি ও মুক্তির উপায়; তিনি স্পষ্টাক্ষরে সেখানে জানাচ্ছেন, তিনি মানুষের মনগড়া অভিযোগ বা দোষারোপকে স্বীকার করেন না—তিনি উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করছেন, "আমি চোর হব।" সার্ত্র তারই প্রতিধ্বনি তুলে বলছেন, "এই অতলান্ত অধঃপতনের মধ্যেই তিনি মুক্তিকে দেখেছেন।......চোর হবার জন্যই তিনি চুরি করবেন।" জেনে ভাল করেই জানেন তিনি সকলের কাছে ঘৃণার পাত্র এবং তাতেই তাঁর আনন্দ—তাঁর লেখার মধ্যে সবকিছু এমন বিশদভাবে বর্ণনা করেন যাতে পাঠকবর্গের কাছে তিনি বিভীষিকা বস্তু বলে প্রতীয়মান হন। তাঁর এই জীবন দর্শন আজও অটুট অক্ষয় হয়ে রয়েছে।

সম্প্রতি 'চোর থেকে সাহিত্যিক'-এর একটি গল্প পড়লাম: কার্ল হাইন্স ইয়েগার ও তার গুণ্ডার দল পোস্টঅফিস থেকে যখন আশি হাজার মার্ক চুরি করে, তখন তার বয়স প্রায় সাতাশ। ইয়েগার ধরা পড়ে ও আদালতের বিচারে তার বারো বছর জেল হয়।

জেলে বসে বসে সে টয়লেট পেপারে "দি ফোর্ট্রেস" নামে একখানা উপন্যাস লিখে ফেলে এবং জেলের একজন রক্ষক সেই পাণ্ডুলিপিটি বাইরে নিয়ে এসে ছাপিয়ে ফেলেন। ১৯৬৩ সালে ইয়েগার জেল থেকে মুক্তি পাবার আগেই লেখক হিসাবে তাঁর খুব নামডাক হয়।

মুক্তি পেয়ে বাইরে এসে ইয়েগার ফ্রাঙ্কফুর্টের একটি সংবাদপত্রের সম্পাদনার কাজ নেয় ও জজসাহেবের মেয়েকে বিয়ে করে ফেলে। এর পর ইয়েগার আরও অনেক বই লিখেছে ও প্রচুর পয়সা রোজগার করেছে।

ইতিমধ্যে ইয়েগার বই লেখার পয়সা দিয়ে পোস্টঅফিসের আশি হাজার মার্ক দেনার বেশির ভাগ শোধ করেছে, কিন্তু ডাকবিভাগ বলছে যে তাকে সুদে-আসলে এক লক্ষ দশ হাজার মার্ক দিতে হবে। ইয়েগার অবশ্য সুদটা মকুব করার জন্যে সরকারের কাছে আবেদন করেছে। সরকার তাকে রেহাই দেবেন কিনা সন্দেহ। যাই হোক চুরির বদনামের জন্যে লেখক হিসেবে ইয়েগারের খ্যাতি এতোটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি।

ইয়েগারের এই বৃত্তান্তের মধ্যে সাধারণ একটি মানুষের ছবিই ফুটে উঠেছে: হয়তো অভাবের তাড়নায় তাঁকে চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন করতে হয়েছিল। তিনিও হয়তো একটি স্বচ্ছল সুখী জীবনের স্বপ্ন দেখতেন। মুক্তি পেয়ে জেলের বাইরে এসে তিনি চাকরী পেলেন, বিবাহ করলেন, বই লিখেও প্রচুর অর্থের অধিকারী হলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চৌর্যবৃত্তি দূরীভূত হল। সমাজের অনুশাসনকে তিনি মাথা পেতে গ্রহণ করেছিলেন আর তারই কৃপালাভের জন্য ইয়েগার সুদ মকুবের জন্য আবেদন জানান। এইখানেই জেনের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য। জেনে কোনপ্রকারেই সমাজের অনুশাসনকে স্বীকার করেন না। তিনিও আজ সাহিত্যিক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। অর্থও প্রচুর সঞ্চয় করেছেন। কিন্তু তবু তিনি চৌর্যবৃত্তি ত্যাগ করেননি; সমকাম ও প্রতারণা অন্য দুটি প্রবণতাও অটুট তাঁর আছে।

এই ক্ষুদ্র নিবন্ধটি শেষ করার আগে তাঁর কয়েকখানি বইয়ের উল্লেখ করছি—

উপন্যাস: নত্র-দাম দে ফ্লর; মিরাকল দ্য লা রোজ; পম্প ফ্যুনেব্র; ল্য প্যাপ্এর দ্য সকে; ক্যারেল দ্য ব্রেস্ত; ওত্ সারেভাইআস; জুর্নাল দ্য ভলর।

কাব্য: ল্য কঁদানে আ মর্; আঁ শাঁ দামুর।

নাটক: লে বন্; লে বালকঁ; লে ন্যাগ্র।

জেনে সম্পর্কে জাঁ-পল সার্ত্র যে গুরুত্বপূর্ণ বইখানি লেখেন তার নাম: সাঁ জনে, কমেদিয়াঁ এ মারতীর, আঁ গীজ দ প্রেফাস।

ফেরিওলা ॥

মৃগাঙ্ক রায়

কী নিয়ে চলেছো তুমি, ফেরিওলা! রোজ ভোর হলে পুবের
মাঠ ভেঙে এসে পশ্চিমের অন্তে চলে যাও। পায়ে শিশিরের হিম
আর ছেঁড়া ঘাসের পাতা জড়িয়ে থাকে, ভোরের হাওয়া লেগে
সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা পাথর। ফেরিওলা, কি নিয়ে চলেছো তুমি?
পুতুল? ছড়ি হাতে বাঙালীবাবু, ঘোমটা-টানা বৌ,
বরযাত্রী, মাচার পুরুত-লাউ, আতাফল,
লবঙ্গ-বেঁধানো খিলিপান?

ফেরিওলা, রোজ আমরা তোমার ডাক শুনি—গর্ভিণী মাছেরা
যেমন জোয়ারের ডাক শোনে। অথচ তুমি আমাদের ডাক
শুনতে পাও না। প্রাচীন গাছের শিশির চোঁয়ানো গুঁড়ির মতো
তোমার শরীর পুবের মাঠ ভেঙে পশ্চিমের অন্তে যায় আর আমরা
তোমার পেছনে পেছনে ছুটতে থাকি আকাশে দু হাত
তুলে একদল উলঙ্গ শিশু।।

অমরতা শিক্ষা নেব বলে ॥

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

আরও এক বৃক্ষ আছে, ওইখানে চন্দনের
কোমল সুবাসে। আলোর পাখিরা আসে, বাসা বাঁধে
তার স্নিগ্ধ গূঢ়তর ডালে।
একাকী নির্জন হলে
আমি সেই পাখিদের চোখে চোখ রাখি।
কেননা, পাতার শব্দে তারা নাকি শুনে গেছে
ভাগীরথী নদীর সঙ্গীত।
শিকড়ে পৌঁছার আগে আমি আজ সে সংবাদ জেনে নিতে চাই।

ইচ্ছে হয়, মাঝে মাঝে শহরের কোলাহল ছুঁড়ে ফেলে দিই
ইচ্ছে হয়, আমি সেই বৃক্ষের সমীপে চলে যাই
চন্দনের গন্ধ দিয়ে সারা অঙ্গ ঢাকি।
কিংবা সেই বৃক্ষটাকে
রোদ্দুরের দিকে তুলে ধরি।
বস্তুতঃ আমার ইচ্ছে আমারই রক্তের পুণ্যে কেনা।

কেননা, আমি যে সেই বৃক্ষটাকে করেছি নির্মাণ।
আজও মরণের ঘ্রাণ
তার দেহে মন্ত্রের মতন।
রাজকীয় অভিষেকে আমি রোজ শুনি তার গান।

এ শহর মরে গেলে আজ রাতে যাবতীয় দুর্ঘটনাগুলি
শ্মশানের ছাই মেখে
পুনরায় ঘটে যেতে পারে।
আমি সেই সর্বনাশ চোখ মেলে দেখতে চাই—
চন্দনবৃক্ষের কাছে [illegible]।



(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

নজর এড়িয়েছিল খুব চতুর একটি ফন্দির জোরে। আলমাগ্রো জানতেই পারেন নি যে তাঁরই হাত দিয়ে চিঠিটা যথাস্থানে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। আলমাগ্রো তাঁদের ভেট হিসেবে পানামার গভর্নর আর তাঁর স্ত্রীর কাছে যা সব নিয়ে গিয়েছিলেন, তার মধ্যেই চিঠিটা সুকৌশলে রাখা ছিল।

না সোনাদানার কোনো জিনিসে নয় শুধু একটা তুলোর গদির ভেতর। নতুন দেশের আজব তুলো হিসাবে সেটা উপহার দেওয়া হয়েছিল গভর্নরের স্ত্রীকে।

গভর্নরের স্ত্রী সেই তুলোর গদি একটু ছাড়িয়ে দেখতে যেতেই সে চিঠি বেরিয়ে পড়েছে। একআধজন নয় বেশ কয়েকজনের সইকরা চিঠি। সে চিঠিতে তারা পিজারো আর আলমাগ্রোর নির্মম জুলুমবাজির বিরুদ্ধে তীব্র নালিশ জানিয়েছে, আর সেই সঙ্গে বর্ণনা দিয়েছে নিজেদের অকথ্য দুর্দশার। এই চিঠির শেষেই এই ছড়াটি ছিল।

পুরোপুরি সত্য হোক বা না হোক এ চিঠির কথা জানবার পর তা বিশ্বাস করে গভর্নর পেড্রো দে লস রিয়স আগুন হয়ে উঠেছিলেন রাগে। টাফুর নামে একজন সেনাপতিকে দুটি জাহাজ দিয়ে তখনই তিনি হুকুম করেন পিজারো আর তার অভিযুক্ত সাঙ্গপাঙ্গকে ফিরিয়ে আনতে।

টাফুর গভর্নরের সে হুকুম পুরোপুরি তামিল করতে পারেনি। পিজারো সব [illegible] পানামায় না ফিরে অভিযান চালিয়ে যাবার সংকল্পই জানিয়েছেন।

টাফুর ব্যর্থ হয়ে ফিরে পিজারোর অবাধ্যতার কথা গভর্নরকে জানিয়েছে। গভর্নর তাতে ক্ষিপ্ত হয়েছেন নিশ্চয়ই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাদ্রি লুকে আর আলমাগ্রোর ধরাধরিতে খানিকটা পড়েছে। জানা যায় নি [illegible] টাফুরের। টাফুর সেই থেকে পিজারোর শত্রু। গভর্নরের স্ত্রীকে লেখা চিঠির ছড়া সাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার ব্যাপারে তার বেশ কিছুটা হাত থাকা অবিশ্বাস্য কিছু

গভর্নরের বিরূপতার চেয়ে এই ছড়া পিজারোর ক্ষতি করেছে বেশী। মুখে মুখে ছড়িয়ে ও অঞ্চলের মানুষের মনে পিজারোর অভিযান সম্বন্ধে অবিশ্বাস তীব্র করে তুলেছে।

এ ছড়া যেখানে পৌঁছেছে সেখানে পিজারোর স্বপক্ষে কোনো কথায় কেউ কান দেবে না বুঝেই অত্যন্ত ভাবিত হয়ে সেদিন ঘনরাম 'পুলকে'র আড্ডা ছেড়ে সরে পড়েন।

আড্ডা ছেড়ে তিনি সোজা বন্দরে গিয়ে কাপিতান সানসেদোকে খুঁজে বার করে সব কথা আলোচনা করেন।

তাহলে কি করা এখন উচিত? জিজ্ঞাসা করেন সানসেদো।

উচিত এখুনি এ বন্দর ছেড়ে যাওয়া! জোর দিয়ে বলেন ঘনরাম, —তা না হলে এই সান্তা মার্তা থেকে জাহাজ নিয়ে [illegible] হবার লোক পাওয়া যাবে না। খবর নিয়ে জেনেছি টাফুর এখানকার ফৌজদার হয়ে কিছুকাল কাটিয়ে গেছে। পিজারোর বিরুদ্ধে এখানকার মন বিষিয়ে দেবার কিছু সে বাকি রাখে নি। এখানে বেশীদিন থাকলে আমাদের লোক লস্কর সব ছেড়ে যাবে।

কাপিতান সানসেদো পিজারোকে সেই পরামর্শই দিতে গেছেন।

কিন্তু পিজারো যদি বা তাঁর কথায় কান দিতেন তাঁর ভাই দাম্ভিক ভাই হার্নান্দো প্রায় অপমান করেই হটিয়ে দিয়েছে সানসেদোকে। অবজ্ঞাভরে বিদ্রূপ করে বলেছে,—এখানকার শুঁড়িখানায় একটু বেশী 'পুলকে' টানা হয়ে গেছে, না? যাও সেই আসরে গিয়ে এ সব গল্প ঝাড়ো।

সানসেদো অপমানিত হয়ে ফিরে গিয়ে ঘনরামকে সব জানিয়েছেন।

তার পরদিনই জানা গেছে একটি দল জাহাজ ছেড়ে পালিয়েছে। দলটা খুব বড় নয় এই যা রক্ষে। সে দলে যারা পালিয়েছে তাদের মধ্যে কাপিতান সানসেদোর নামটাই পিজারো খেয়াল করেছেন। গানাদো নামে একটা ছেলের কথা তাঁকে জানানো কেউ প্রয়োজনও মনে করে নি।

দল ছোট হলেও তাতেই পিজারোর টনক নড়েছে। সান্তা মার্তায় আর একটা বেলাও তিনি কাটাতে সাহস করেন নি। সেইদিনই বাকি লোক লস্কর নিয়ে রওনা হয়েছেন নোম্‌ব্রে দে দিওস-এ। সেইখানেই লুকে আর আলমাগ্রো পানামা যোজকের শিরদাঁড়ার পাহাড় ডিঙিয়ে তাঁর সঙ্গে

মিলেছেন। তারপর ছোটখাট বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও পিজারোর তৃতীয় অভিযান বন্ধ হয়নি।

পোনেরোশ ত্রিশের জানুয়ারীতে তিনি সেভিল ছেড়েছিলেন কাউন্সিল অফ ইণ্ডিজের ভয়ে। পুরো এক বছর বাদে ঠিক ওই জানুয়ারী মাসে তিনি পানামা থেকে রওনা হতে পেরেছেন।

সান্তা মার্তা ছাড়বার পর এতদিনের মধ্যে কাপিতান সানসেদো বা তার সংগী বেদে সেই গানাদোর কোনো খবর তিনি পান নি। তাদের কথা পিজারোর মনেই ছিল কি না সন্দেহ।

টাম্বেজ শহরে হঠাৎ একদিন একটি লোককে দেখে তিনি বিস্মিত হন। বিস্মিত হন তার অদ্ভুত পাগলামিতে। তখনও তাকে দেখে তাঁর স্মৃতিতে কোনো সাড়া জাগে নি।

লোকটির চেহারা পোশাক দেখে তাঁর নিজের বাহিনীর কেউ বলেই বুঝতে পারেন। হার্নাণ্ডো দে সটোর সংগে তারই জাহাজে এসেছে নিশ্চয়। নতুন দলের দু' একজন ছাড়া কেউই তাঁর চেনা নয়।

লোকটি যা করছে তাই অদ্ভুত লাগবার জন্যেই তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। টাম্বেজ শহরে এবারে এসে তখনও বেশী দিন তাঁদের কাটে নি। শ্মশানের মত শহরের চেহারা দেখেই সবাই তাঁরা তখন বিমূঢ়। তাঁদের নিজেদের লোকজন ছাড়া শহরের বাসিন্দা কেউ নেই বললেই হয়।

সেই নির্জন শহরে একটা ছোট পুকুরের ধারে লোকটা করছে কি?

কাছে গিয়ে সেই কথাই জিজ্ঞেস করতে গিয়ে সম্পূর্ণ অন্য প্রশ্ন করেন পিজারো। তার কারণ লোকটার মুখের দিকে চাইতেই চাপাপড়া স্মৃতিটা একটু ঝিলিক দিয়ে উঠেছে।

তুমি! তুমি সেই বেদে না? —ভ্রূকুটি করে জিজ্ঞাসা করেন পিজারো।

হ্যাঁ। গোবেরনাদর, আমি সেই বেদে গানাদো......

গানাদোর আর তার কথাটা শেষ করবার সুযোগ মেলে না। পিজারো জ্বলন্ত স্বরে বলেন, তুমি না সান্তা মার্তার জাহাজ ছেড়ে পালিয়েছিলে সেই বদমাসদের সংগে। আবার তুমি ফিরে এসেছ?

তাতেই ত বুঝবেন আদেলানটাডো, যে ইচ্ছে সুখে পালাই নি। পালাতে যখন চাইনি বলেই আবার ফিরে এসেছি। ঘনরামের গলায় সম্ভ্রম থাকলেও ভয়ের লেশ নেই।

পিজারো তাতে আরো গরম হয়ে ওঠেন, পালাতে তখন চাওনি তবু পালিয়েছিলে? কার পরামর্শে? সেই কাপিতান সানসেদো? পালের গোদা তাহলে সে?

আজ্ঞে হ্যাঁ আদেলানটাডো। ঘনরাম শ্রদ্ধাভরে বলেন, তিনি ছাড়া দলপতি আর কে হবেন? তিনি আপনার অভিযানের ভালোর জন্যেই অত বড় ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন!

প্রথমটা হতভম্ব হয়েই যেন খানিক পিজারোর মুখ দিয়ে কোনো কথা বার হয় না। তারপর একেবারে জ্বলে উঠে তিনি বলেন,—আমার অভিযানের ভালোর জন্যে তিনি ত্যাগ স্বীকার করেছেন! জাহাজ থেকে লোক ভাঙিয়ে পালানোর নাম আমার অভিযানের ভালো করা? আর তা-ই বল ত্যাগ স্বীকার?

আজ্ঞে হ্যাঁ, গোবেরনাদর! ঘনরাম অবিচলিত হয়ে জানান,—তিনি আমাদের কজনকে নিয়ে দল বেঁধে না পালালে আপনার টনক নড়ত না। আপনি তাঁর হুঁশিয়ারী গ্রাহ্য না করে আর কিছুদিন সান্তা মার্তায় থাকলে আপনার সব লোক-লস্করই বিগড়ে যেত। আপনার বিপদ ঠেকাতেই ছোট একটা দল ভাঙিয়ে নিয়ে গিয়ে তিনি আপনাকে সজাগ করে দিয়েছেন। বেছে বেছে যাদের তিনি সংগে নিয়ে গেছেন তারা আপনার বাহিনীর সবচেয়ে বড় বদমাস। তাদের সরিয়ে নিয়ে গিয়ে আর সকলকে ছোঁয়াচ থেকে বাঁচানো একটা বড় কাজ। এ ছাড়া নিজে তিনি ত্যাগ স্বীকার করেছেন অনেক। প্রথমতঃ যেচে মিথ্যা দুর্নাম মাথায় নিয়ে আপনার অভিশাপ কুড়িয়েছেন তার ওপর বুড়ো খোঁড়া মানুষ হয়ে জলাজঙ্গল আর পাহাড় ডিঙিয়ে পালাতে গিয়ে দুর্ভোগ যা ভুগেছেন তার সীমা নেই। একেও ত্যাগ স্বীকার বলবেন না?

পিজারো খানিক চুপ করে থাকেন। কথাগুলো গুছিয়ে বুঝতেই তাঁর বেশ একটু সময় লাগে বোধহয়। তারপর রাগটা কাটিয়ে উঠলেও একটু উত্তাপের সংগে তিনি জিজ্ঞাসা করেন গম্ভীর হয়ে,—তা অভিযানের খাতিরেই অত কষ্ট যিনি করলেন তিনি তোমার সঙ্গে ফিরলেন না কেন? তুমি ত একাই এসেছ দেখছি?

পিজারোর গলায় রাগটা না থাকলেও একটু উত্তাপ তখনও আছে।

হ্যাঁ আমি একাই এসেছি। ঘনরামের মুখে তাইতেই এবার একটু হাসির আভাস বোধহয় দেখা যায়। আসতে চাইলেও তাঁর মত বুড়ো খোঁড়া মানুষকে এ অভিযানে কেউ পাত্তা দিত কি! না, উপায় নেই বলেই পানামাতেই তাঁকে ফেলে আসতে হয়েছে।

ও,—একটু বোধহয় অপ্রস্তুত হয়ে সেটা ঢাকবার জন্যেই পিজারো এবার তীক্ষ্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করেন,—কিন্তু তুমি করছ কি এ পুকুরের ধারে?

গানাদো বলে যে নিজের পরিচয় দিয়েছে সে যা করছিল তা সত্যিই অবাক করবার মত।

তার অদ্ভুত কাণ্ড-কারখানা দেখেই পিজারো প্রথম নির্জন জলাশয়টার ধারে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন কৌতূহলী হয়ে। কাউকে লম্বা একটা আঁকশি গোছের লাঠি নিয়ে কোনো পুকুরের ধারে খামোখা জল ঠেঙাতে দেখলে বিস্ময় কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক।

সেখানে দাঁড়িয়ে পড়বার পর অপ্রত্যাশিতভাবে মানুষটাকে চিনতে পেরে [illegible] উত্তেজনায় অন্য প্রসংগ [illegible] শেষ পর্যন্ত অদ্ভুত ব্যাপারটার মানে না জেনে চলে যাওয়া পিজারোর পক্ষে সম্ভব হয় নি।

পিজারোর প্রশ্নে গানাদো একটু কি অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছে?

পিজারোর তাই অন্ততঃ মনে হচ্ছে।

কয়েক মুহূর্ত একটু ইতস্ততঃ করে গানাদো যা বলছে তাতে [illegible] আহাম্মক বলে ধমক দেবেন পিজারো ঠিক [illegible] পারেন নি।

শেষ পর্যন্ত নিজের গাম্ভীর্য বাঁচিয়ে [illegible] তিনি [illegible]ছেন।

আহাম্মক কোথাকার! [illegible] পড়েছে, তাই [illegible] আঁকশি দিয়ে জল ঠেঙাচ্ছ। লাঠি [illegible] সরে গিয়ে তোমার আংটি [illegible] আঁকশিটা নাড়াও উজবুক [illegible] থাকলে [illegible]।

আজ্ঞে হ্যাঁ আদেলানটাডো। গানাদোকে অত্যন্ত লজ্জিত মনে হচ্ছে।

এ আহাম্মকটার কাছে আর সময় নষ্ট না করে পিজারো তাঁর নিজের [illegible] দিকে এগিয়ে গিয়েছেন।

কিন্তু খানিকদূর যেতেই হঠাৎ তাঁর মনে একটা খটকা লেগেছে। গানাদো একটা বেদে মাত্র বটে, কিন্তু আংটি তুলতে জল ঠেঙাবার মত আহাম্মক বলে ত তাকে মনে হয় না। দেবতা-টেবতার ভর হয়ে দৈববাণী গোছের যা সে শোনাচ্ছে বলেছে, তার মধ্যে তার নিজস্ব বুদ্ধি-শুদ্ধির কোনো প্রমাণ নেই বলে ধরলেও, সাধারণ কাজ-কর্ম কথায়বার্তায় ওরকম নির্বুদ্ধিতার পরিচয় ত সে দেয় নি এ পর্যন্ত।

কেমন একটু সন্দিগ্ধ হয়ে পিজারো আবার সেই জলাশয়টার ধারে ফিরে গিয়েছেন। ফিরে গিয়ে কিন্তু গানাদোকে আর দেখতে পান নি।

সে কি এর মধ্যেই তার আংটিটা তুলে নিয়ে চলে গেছে! পুকুরের ধারে যখন সে নেই তখন তা-ই বুঝে নেওয়া উচিত। কিন্তু পিজারোর মনের খটকাটা যায় নি। আর সেই খটকা থেকেই হঠাৎ তিনি যেন নতুন এক হদিস পেয়েছেন তাঁর অভিযান সম্পর্কে।

(ক্রমশঃ)

হার্ণিয়া
কাইলোরিয়া একশিরা, রসবাত গর্ভশিরা, কুপজনন ও আনুষাংগিক যাবতীয় কষ্টকর ব্যাধি প্রতিকারের জন্য আধুনিক বিজ্ঞানানুমোদিত চিকিৎসার নিশ্চিত ফল প্রত্যক্ষ করুন। পত্র অথবা সাক্ষাতে ব্যবস্থা লউন। নিরাশ রোগীর একমাত্র নির্ভরযোগ্য চিকিৎসাকেন্দ্র
হিন্দ রিসার্চ হোম
১৪, শিবকৃষ্ণ লেন শিবপুর হাওড়া
ফোন: ৬৭-২৭৫৩

বাংলা সাহিত্যের আদি চরিতগ্রন্থঃ ভূমিকা ও ব্যাখ্যান

ত্রিপুরাশঙ্কর সেন

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে, তাঁরা সকলেই জানেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর দিব্য জীবনকে কেন্দ্র করেই বাংলা ভাষায় সর্ব প্রথম চরিত-সাহিত্যের প্রবর্তন হয়। মুরারি গুপ্তের কড়চা প্রভৃতি গ্রন্থ অবলম্বনে পরম ভাগবত শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরই সর্ব-প্রথম বাংলা ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের অলৌকিক লীলা বর্ণনা করেন এবং এই সময় থেকেই দেব-মাহাত্ম্য প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে নররূপধারী শ্রীভগবানের অথবা দেবোপম মানবের মাহাত্ম্যও কীর্তিত হতে থাকে। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের রচিত 'শ্রীচৈতন্য ভাগবত' বা 'শ্রীচৈতন্য মঙ্গল' গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে অপরিসীম মর্যাদা লাভ করে এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীমন্নিত্যা-নন্দের লীলামৃত আস্বাদন করে ভক্তরা ধন্য হন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের রচয়িতা কবিরাজ গোস্বামী তাঁর গ্রন্থে পূর্ববর্তী চরিতকার বৃন্দাবন দাসের প্রতি যে বহুমান প্রদর্শন করেছেন বাংলা সাহিত্যে তার তুলনা নেই। তিনি লিখেছেন—

'চৈতন্যলীলার ব্যাস দাস বৃন্দাবন।
তাঁর আজ্ঞায় করি তাঁর উচ্ছিষ্ট-চর্বণ'।।
'মনুষ্যে রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য।
বৃন্দাবন দাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য'।।

তবে, কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত-রচনায় প্রবৃত্ত হলেন কেন? তার কারণ, শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর নিত্যানন্দ-লীলা বর্ণনে এমনই আবিষ্ট হয়েছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অন্ত্যলীলা বর্ণনা করতে তিনি বিস্মৃত হয়েছিলেন।

নিত্যানন্দ-লীলা-বর্ণনে হইল আবেশ।
'চৈতন্যের শেষ লীলা রহিল অবশেষ'।।

তাই, ভক্তদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করবার জন্য নানা শাস্ত্রে নিষ্ণাত, রঘুনাথ দাস গোস্বামীর চরণাশ্রিত ও ভাগবত ধর্মে দীক্ষিত শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' নামক অতুলনীয় চরিতকথা রচনা করেছেন। মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ-লীলা-বর্ণনই ছিল তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য এবং এই দুরূহতম কার্যে তিনি অনন্যদুর্লভ সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তিনি বলেছেন,—ব্যাসাবতার বৃন্দাবন দাস যা বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন আমি তা সূত্রাকারে নিবন্ধ করেছি এবং নিত্যানন্দ-লীলা-বর্ণনে আবিষ্ট হয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে অন্ত্যলীলা বর্ণনা করতে তিনি বিস্মৃত হয়েছেন, আমি তাই বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করেছি। যা হোক, বাংলার চরিত-সাহিত্যে 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে; শ্রদ্ধা ও অভিনিবেশ-সহকারে এই গ্রন্থখানি পুনঃ পুনঃ পাঠ করলে যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের অভিনব দার্শনিক সিদ্ধান্ত ও রসশাস্ত্রের সঙ্গেও পরিচয় লাভ করা যায়, সে সম্পর্কেও কোন মতদ্বৈধ নেই। কিন্তু স্বয়ং কবিরাজ গোস্বামী বৃন্দাবন দাস-বিরচিত 'শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল' বা 'শ্রীচৈতন্যভাগবতের' অকুণ্ঠ ও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেও এবং এই চরিত-গ্রন্থখানি অপরিসীম মর্যাদা লাভ করলেও বাংলার যুক্তিবাদী সুধীসমাজ তাকে যথাযথ গৌরব দান করেননি। এই শ্রেণীর পাঠক-গণের মধ্যে যাঁরা পল্লবগ্রাহী (Superficial) তাঁদের সিদ্ধান্ত এই যে, বৃন্দাবন দাস জন-সাধারণের জন্য গ্রন্থ রচনা করেছেন বলেই এতে কোন গভীর দার্শনিক তত্ত্বের সন্নিবেশ করেননি। অধিকন্তু, তাঁরা মনে করেন, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আবির্ভাবের প্রয়োজন সম্পর্কেও শ্রীমন্নিত্যানন্দের শিষ্য বৃন্দাবন দাস ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শিষ্য কবিরাজ গোস্বামীর মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য আছে। বৃন্দাবন দাসের মতে প্রধানত কলিযুগের যুগধর্ম নাম-সংকীর্তন প্রচারের জন্যই শ্রীভগবান শ্রীগৌরাঙ্গরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, আর কবিরাজ গোস্বামীর মতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রধানতঃ নিজ রসা-স্বাদন বা ত্রিবিধ বাঞ্ছার পূরণের জন্যই শ্রীরাধার ভাবকান্তি নিয়ে অবতীর্ণ হয়ে-ছিলেন, নাম-সংকীর্তন-প্রচার ছিল তাঁর অবতরণের আনুষঙ্গিক ফল।

সকলেই জানেন, 'শ্রীচৈতন্যভাগবতের' প্রারম্ভে শ্রীল বৃন্দাবন দাস একটি মাত্র শ্লোকে শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীমন্নিত্যানন্দের বন্দনা করেছেন। শ্লোকটি এই—

'আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ
সংকীর্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্মপালৌ
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ'।।

যাঁদের বাহু আজানুলম্বিত, যাঁরা স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বলবর্ণ, যাঁরা সংকীর্তনের একমাত্র প্রবর্তক (পিতামাতা), যাঁদের নয়ন পদ্মের ন্যায় আয়ত, যাঁরা যুগধর্মের রক্ষক, —জগতের প্রিয়কারী, করুণার অবতার, বিশ্বের ভরণকর্তা ও দ্বিজশ্রেষ্ঠ, সেই শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীমন্নিত্যানন্দের বন্দনা করি।

মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত স্বরূপ দামো-দরের কড়চা অনুসরণ করেই কবিরাজ গোস্বামী শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবের কারণ বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। স্বরূপ দামোদর লিখেছেন—শ্রীরাধার প্রণয়-মহিমা কেমন, আমার যে মধুরিমা শ্রীমতী রাধা আস্বাদন করেন, সেই অদ্ভুত মধুরিমা কিরূপ এবং আমার মাধুর্য আস্বাদন করে তিনি যে সুখ উপলব্ধি করেন, সেই সুখই বা কিরূপ, এই তিনটি বিষয়ের প্রতি লোভ-বশতঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রাধার ভাব-কান্তি অব-লম্বন করে শচীর গর্ভে আবির্ভূত হলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ যে রাধাকৃষ্ণের মিলিত স্বরূপ, স্বরূপ দামোদর তাঁর কড়চায় এই রহস্যই প্রকাশ করেছেন। বাংলার একজন পদকর্তাও গেয়েছেন—

'যদি গৌর না হইত কি মনে হইত
কেমনে ধরিতাম দে।
রাধার মহিমা প্রেম-রস-সীমা
জগতে জানাত কে'।।

কিন্তু এ-কালের অনেক সমালোচকের সিদ্ধান্ত এই যে, বৃন্দাবন দাস ঠাকুর কখনও এরূপ উক্তি করেননি, তিনি কখনও বলেননি যে, শ্রীগৌরাঙ্গ রাধাকৃষ্ণের মিলিত স্বরূপ। কিন্তু রসিক ও বিদগ্ধজন জানেন যে, বৃন্দাবন দাস কয়েক স্থানে ইঙ্গিতে শ্রীগৌরাঙ্গের এই স্বরূপটি ব্যক্ত করেছেন।

শ্রীচৈতন্যভাগবত বৈষ্ণবদের পরম আদরণীয় গ্রন্থ হলেও, এ সম্পর্কে বিশদ ও তুলনামূলক আলোচনায় বা গ্রন্থখানির বিস্তৃত ও সর্বজনবোধ্য টীকা রচনায় ইতঃ-পূর্বে কেহ প্রবৃত্ত হননি। প্রভুপাদ শ্রীঅতুল-কৃষ্ণ গোস্বামী এই চরিতগ্রন্থখানির যে-টীকা রচনা করেছেন, তা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হওয়াতে ভক্তদের পরিপূর্ণ তৃপ্তি হতে পারেনি। তাই সুপণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয় বহু ভক্তজনের অনুরোধে শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের একখানি সর্বাঙ্গসম্পন্ন ও সুবিস্তৃত টীকা রচনা করেছেন এবং 'শ্রীচৈতন্যভাগবতের ভূমিকা' নামক একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থে এ সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক সকল বিষয়েরই আলোচনা করেছেন। গ্রন্থখানির সম্পাদনায় লেখক যে বিপুল শ্রম স্বীকার করেছেন এবং যে তত্ত্বদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন, তা চিন্তা করলে বিস্মিত হতে হয়। আমরা নিঃসংশয়ে বলতে পারি যে, তাঁর মধ্যে বহুশ্রুতত্ব নানা দর্শনশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য, শুদ্ধবুদ্ধি এবং ভক্তজনোচিত দৈন্য ও আর্তির সমন্বয় ঘটেছে।

'লেখকের নিবেদনে' তিনি লিখেছেন—

'মহাপ্রভুর অচিন্ত্য শক্তি। পুতুলের দ্বারাও তিনি তাঁহার অভীষ্ট কাজ করাইতে পারেন। ভক্তবৎসল এবং ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু মহাপ্রভু তাঁহার ভক্তদের অভিলাষপূরণের নিমিত্ত এই অযোগ্য অধমের দ্বারাও কিছু কাজ করাইতে পারেন—এই ভরসাতেই শ্রীচৈতন্যভাগবতের "নিতাই-করুণা-কল্লো-লিনী টীকা" লেখার অনধিকারচর্চায় প্রবৃত্ত হইয়াছি'। 'শ্রীমন্নিত্যানন্দের কৃপার উপর নির্ভর করিয়াই এই টীকা-লিখনে প্রবৃত্ত হইয়াছি এবং টীকার নামও দেওয়া হইয়াছে "নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা"। যখন যা চিত্তে জাগিয়াছে তাকেই তাঁহার কৃপায় স্ফুরিত বলিয়া মনে করিয়াছি এবং তদনুসারেই টীকা লিপিবদ্ধ করিয়াছি।'

সুপণ্ডিত লেখক যে অনেক ক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্যভাগবতের উপর নতুন আলোকপাত করেছেন, সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। অবশ্য, তাঁর সকল সিদ্ধান্তই যে পাঠকদের

নির্বিচারে গ্রহণ করবেন, এরূপ আশা করা যায় না।

লেখক 'শ্রীচৈতন্যভাগবতের ভূমিকায়' বৃন্দাবন দাসের মাতা ও শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণী দেবী সম্পর্কে প্রচারিত ভ্রান্ত ধারণা খন্ডন করেছেন। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের চরিত্র-মাহাত্ম্য তিনি উদ্‌ঘাটন করেছেন, তিনি দেখিয়েছেন, পরম ভাগবত বৃন্দাবন দাসের 'দৈন্য ছিল অকপট এবং ভক্তি হইতে উত্থিত'। শ্রীচৈতন্যভাগবতের উপাদান সম্পর্কেও তিনি বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। গৌর-চরিতকার মুরারি গুপ্তের কড়চা, কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, কবি কর্ণপূরের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-মহাকাব্যম্‌ ও শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকম্‌ প্রভৃতি গ্রন্থের সঙ্গে বৃন্দাবন দাসের শ্রীচৈতন্যভাগবতের যে তুলনামূলক আলোচনা তিনি করেছেন, তা অতিশয় সারগর্ভ ও তথ্যপূর্ণ। শ্রীচৈতন্যভাগবতের অসম্পূর্ণতা ও ঐতিহাসিক ক্রমহীনতা সত্ত্বেও যে এই চরিতগ্রন্থখানির অসাধারণ মহিমা আছে, লেখক তারও উল্লেখ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, বৃন্দাবন দাসের চরিতগ্রন্থখানির মধ্যে অসম্পূর্ণতা ও ভাষাগত দুর্বোধ্যতা থাকা সত্ত্বেও প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রতিপাদনে তিনি অসাধারণ সিদ্ধিলাভ করেছেন। লেখক নানা প্রমাণ উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন, বৃন্দাবন দাস নানাভাবে নানা প্রসঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গের মধ্যে যে যুগপৎ ভক্তভাব ও রাধাভাব প্রকট হয়েছিল, বৃন্দাবন দাসের চরিতগ্রন্থে তারও পরিচয় আছে। 'শ্রীচৈতন্যভাগবতের ভূমিকায়' সুপন্ডিত লেখক দেখিয়েছেন,—শ্রীগৌরাঙ্গে যে সাত্ত্বিক ভাবসমূহ সন্দীপ্ত হয়েছিল, শ্রীচৈতন্যভাগবতে তার ভূরি প্রমাণ রয়েছে এবং 'শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিরহ-কালে একমাত্র শ্রীরাধার মধ্যেই সাত্ত্বিক ভাবসমূহ সন্দীপ্ত হয়, অন্য কোনও গোপীতে নহে, শ্রীকৃষ্ণে তো কখনই নহে'। সুতরাং শ্রীগৌরাঙ্গ যে রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপ, বৃন্দাবন দাস ঠাকুর তা ইঙ্গিতে বলেছেন। এখানেই কবিরাজ গোস্বামীর সঙ্গে বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের ভাবদৃষ্টিতে ঐক্য দেখা যায়। আবার শ্রীল বৃন্দাবন দাস অনেক স্থলে শ্রীগৌরাঙ্গ সম্পর্কে বৈকুণ্ঠনাথ, নারায়ণ, বৈকুণ্ঠনায়ক, ত্রিদশের রায় প্রভৃতি উক্তি করেছেন।

গৌরতত্ত্ব-সম্পর্কে যে বৃন্দাবন দাসের সঙ্গে পূর্ববর্তী চরিতকার মুরারি গুপ্ত ও পরবর্তী চরিতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর উক্তির সম্পূর্ণ ঐক্য আছে, সুপন্ডিত লেখক তা প্রতিপন্ন করেছেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতে শুধু গৌরতত্ত্ব নয়, নিত্যানন্দ-তত্ত্ব, অদ্বৈত-তত্ত্ব, গদাধর-তত্ত্ব প্রভৃতিও যে নানাভাবে বিবৃত হয়েছে, সুপন্ডিত লেখক তাও নিপুণভাবে আলোচনা করেছেন। শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীনিত্যানন্দের প্রণয়-কলহের কৌতুককর বিবরণও লেখক লিপিবদ্ধ করেছেন। বৃন্দাবন দাস বলেছেন—শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত,

'এক মূর্তি, দুই ভাগ, কৃষ্ণের লীলায়'।

অন্যত্র—

'প্রভু-বিগ্রহের দুই বাহু দুই জন।
প্রীত বই অপ্রীত নাহি কোন ক্ষণ।।
তবে যে কলহ দেখ, সে কৃষ্ণের লীলা।
বালকের প্রায় বিষ্ণু-বৈষ্ণবের খেলা'।।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে যে সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব প্রয়োজন-তত্ত্ব, সম্বন্ধ-তত্ত্ব ও অভিধেয়-তত্ত্বেরও প্রসঙ্গ আছে এবং এ সমস্ত বিষয়ে যে বৃন্দাবন দাসের সঙ্গে কবিরাজ গোস্বামীর মতের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে, লেখক তাও প্রতিপন্ন করেছেন। শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয় লিখেছেন—

'গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যদের মধ্যে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরই—মহাপ্রভুর উক্তিতে, ভক্তগণের উক্তিতে এবং নিজের উক্তিতে—সর্বপ্রথমে জানাইয়াছেন যে, ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এবং শচীনন্দন শ্রীগৌরাঙ্গ উভয়েই সম্বন্ধ-তত্ত্ব, উভয়ের ধাম এবং উভয়ের সেবাপ্রাপ্তিই জীবের কাম্য, ভগবৎ-সুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবাই স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য, সেই সেবাপ্রাপ্তির নিমিত্ত প্রেমই হইতেছে একান্তভাবে প্রয়োজনীয় বস্তু এবং সেই প্রেমলাভের নিমিত্ত গৌরকৃষ্ণ-সুখৈক-তাৎপর্যময়ী সাধনভক্তিরই, অর্থাৎ রাগানুগা মার্গের সাধনভক্তিরই অনুষ্ঠান কর্তব্য'। বাস্তবিক, বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের সিদ্ধান্ত এই—

(ক) শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীগৌরাঙ্গ উভয়ই সবন্ধ-তত্ত্ব, উভয়ই উপাস্য, এবং উভয়ের ধাম ও সেবাপ্রাপ্তিই সাধকের কাম্য।

(খ) শ্রীগৌরাঙ্গের উপাসনার যোগেই শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা কর্তব্য।

(গ) প্রয়োজন-তত্ত্ব প্রেমলাভের জন্যই সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান জীবের কর্তব্য।

(ঘ) কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবাই জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য।

(ঙ) সেবার বাসনাই প্রেমভক্তি বা শুদ্ধাভক্তি।

শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয় পরম শ্রদ্ধাপ্লুত চিত্তে গৌরলক্ষ্মী শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী সম্পর্কে তথ্যপূর্ণ আলোচনা করে এ সম্পর্কে পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্তি করেছেন। সংস্কৃত ও বাংলাভাষায় নিবদ্ধ বৈষ্ণব শাস্ত্র-সিন্ধু মন্থন করে তিনি আমাদের নানা তথ্য পরিবেশন করেছেন। শ্রীচৈতন্যলীলা-সম্পর্কে লোচন দাসের গ্রন্থ যে প্রামাণিক নয়, এও তিনি প্রদর্শন করেছেন। সকলেই জানেন, শ্রীখন্ডবাসী নরহরি সরকার ও তদীয় শিষ্য লোচন দাস ঠাকুরের সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের ভাবদৃষ্টি-গত পার্থক্য আছে। তথাপি লোচন দাসের শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের কাব্য-মূল্য অস্বীকার করা যায় না। সুপন্ডিত লেখক লোচন দাসের কবিত্ব-শক্তির পরিচয় দিলে তাঁর আলোচনা সর্বাঙ্গসুন্দর হত।

এরপর লেখক 'গৌরমন্ত্র' ও 'জগতের প্রতি শ্রীচৈতন্যভাগবতের শিক্ষা' সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। লোকশিক্ষক বৃন্দাবন দাস যে তাঁর চরিত-গ্রন্থে জগদ্বাসীকে হিংসা বর্জনের উপদেশ দিয়েছেন, ভক্তিহীন কর্মের নিষ্ফলতা প্রদর্শন করেছেন, সাধু-নিন্দা ও বৈষ্ণবনিন্দার কুফল ও বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধির অপকারিতার কথা কীর্তন করেছেন, লেখক নানা উদ্ধৃতির যোগে তা প্রতিপন্ন করেছেন। বৃন্দাবন দাসের কয়েকটি উক্তি আমাদের সকলেরই স্মরণীয়, যেমন—

(১) বিষ্ণুভক্তি নিত্যসিদ্ধ অক্ষয় অব্যয়।
অনন্ত ব্রহ্মান্ডে সব সত্য বিষ্ণুভক্তি।
মহাপ্রলয়েও যার থাকে পূর্ণশক্তি।।

(২) সাধুনিন্দা শুনিলে সুকৃতি হয় ক্ষয়।
জন্ম জন্ম অধঃপাত—চারি বেদে কয়।।

(৩) অহংকার না সহেন ঈশ্বর সর্বথা।

(৪) কৃষ্ণসেবা হৈতেও বৈষ্ণব-সেবা বড়।
ভাগবত-আদি সর্বশাস্ত্রে কৈল দৃঢ়।।

(৫) যে-তে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম
কেনে নহে।
তথাপিহ নরোত্তম—সর্বশাস্ত্রে কহে।।

(৬) পড়ে কেন লোক?
কৃষ্ণভক্তি জানিবারে।
সে যদি নহিল, তবে বিদ্যায়
কি করে?
ইত্যাদি।

ঐতিহাসিক মূল্য

শ্রীল বৃন্দাবন দাসের চরিত-গ্রন্থে তৎকালীন নবদ্বীপের এবং সমগ্র বঙ্গ-



প্রস্তুতকারক ঃ
কিং এণ্ড কোং কলিকাতা
(স্মোষিও কেমিক্যাস, স্বর্ণপদক—১৮৯৪ সাল)

কিং কো'র
আর্ণিকা
হেয়ার অয়েল
একমাত্র পরিবেশক ঃ
আর. ডি. এম এণ্ড কোং
২১৭, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬
ফোন ঃ ৩৪-৩৮৩৬

দেশের যে-চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, তা মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাসের অত্যন্ত মূল্যবান উপাদান। শ্রীচৈতন্যভাগবতের ভূমিকায় পণ্ডিত রাধাগোবিন্দ নাথ এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। বাংলাদেশের শাসন-ব্যবস্থা, ব্যবহার্য দ্রব্য, রীতি-নীতি ও আর্থিক অবস্থা, তৎকালীন নবদ্বীপে নব্য ন্যায় প্রভৃতি নানা বিদ্যার চর্চা, জ্ঞানানুশীলনে পূর্ববঙ্গবাসীদের আগ্রহ প্রভৃতি নানা বিষয়ে লেখক আলোকপাত করেছেন। তৎকালীন ধর্মকর্মের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করে লেখক দেখিয়েছেন যে, সে সময়ে বাংলাদেশে বাস্তবিকই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান ঘটেছিল। সে সময়ে যে ধর্মধ্বজী বা কপট ধর্মাচারীর সংখ্যা বাংলাদেশে নিতান্ত অল্প ছিল না, বৃন্দাবন দাসের চরিত-গ্রন্থ থেকে তা জানা যায়। 'শ্রীচৈতন্যভাগবতের ভূমিকায়' বিদগ্ধ লেখক দেখিয়েছেন যে, কবি কর্ণপূরও তাঁর শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে সেকালের কয়েকজন ভণ্ড তপস্বীর চিত্র অঙ্কিত করেছেন, এঁরা ভগবদ্‌বিমুখ হয়ে কৃচ্ছ্রসাধনার দ্বারা অলৌকিক শক্তি অর্জন করেছিলেন অথবা নানা তীর্থ পর্যটন করেছিলেন অথবা লোক-বিগর্হিত আচরণের দ্বারা দর্শকদের ভীতি উৎপাদন করেছিলেন। সুপণ্ডিত লেখক কবি কর্ণপূরের নাটক থেকে যে-সকল উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তাতে আমরা জানতে পারি যে, বৃন্দাবন দাসের বর্ণনার সঙ্গে কবি কর্ণপূরের বর্ণনার ঐক্য আছে। সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, সেকালের গৃহস্থরাই শুধু পারমার্থিক ধর্ম থেকে ভ্রষ্ট হন নি, যোগমতের অনুসরণকারী বা তান্ত্রিক নামে খ্যাত বহু কৃচ্ছ্রসাধকও সাধনার চরম লক্ষ্য বিস্মৃত হয়েছিলেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে লেখক শৈবাগম, শাক্ততন্ত্র ও আনুষঙ্গিক নানা বিষয়ের যে দীর্ঘ আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন, এতে তাঁর অনুদার দৃষ্টিভঙ্গি ও বৈষ্ণব ভিন্ন অপরাপর ধর্ম-সম্প্রদায় সম্পর্কে বিরূপ মনোভাবেরই পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য সেকালের বাঙালীর ধর্ম গতানুগতিক আচার-অনুষ্ঠানমাত্রে পর্যবসিত হয়েছিল, তখন—

'যোগিপাল ভোগিপাল মহীপালের গীত।
ইহাই শুনিতে সর্বলোক আনন্দিত।।
(শ্রীচৈতন্যভাগবত, ৩।৪।৪১২)

এই প্রসঙ্গে পণ্ডিত রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয় লিখেছেন—'এ স্থলে যে যোগীদের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহারা ছিলেন বেদবিরুদ্ধাচারী। এক শ্রেণীর যোগী আছেন, যাঁহারা দেহস্থ ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করিতে প্রয়াসী। ষট্‌চক্রসাধন এবং কুণ্ডলিনী শক্তির কথা কোনও বেদানুগত শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না। তাঁহাদের এতাদৃশ সাধনের ফলে তাঁহারা কতকগুলি অলৌকিকী শক্তি লাভ করেন এবং সেজন্য বহির্মুখ লোকগণও তাঁহাদের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। কিন্তু তাঁহাদের এই অলৌকিকী শক্তি পারমার্থিক শক্তি নহে, বস্তুতঃ বিশেষ বিকাশপ্রাপ্ত স্নায়বিকী শক্তি।'

কিন্তু আমরা 'বেদ' কথাটিকে কোন সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করবার পক্ষপাতী নই, আমরা 'বেদ' বলতে বুঝি অনাদি, অনন্ত জ্ঞানের সমষ্টি'। আমরা যাকে ভারতীয় সংস্কৃতি বলি তা একটি বিশাল সমুদ্রের ন্যায়, তাতে 'বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা' অবিরোধ মিলিত হয়েছে। আমাদের দেশে 'ত্রয়ী' অর্থাৎ ঋক্, যজুঃ ও সাম বেদের মর্যাদা লাভ করলেও পরবর্তী কালে অথর্ববেদও বেদরূপে স্বীকৃত হয়েছে। তা ছাড়া ছয়টি বেদাঙ্গ, প্রামাণ্য উপনিষদসমূহ, বেদান্ত, এবং আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ প্রভৃতি উপবেদে ভারতীয় সংস্কৃতির যে পরিচয় পাই, তাও মূলতঃ বৈদিক সংস্কৃতি বা আর্য সংস্কৃতি। ষট্‌চক্র ও কুণ্ডলিনী-জাগরণের রহস্য সাধকের অনুভূতিগম্য, এর দ্বারা সাধক যে শক্তি লাভ করেন, তা পারমার্থিকী শক্তি নয়, স্নায়বিকী শক্তিমাত্র, এরূপ মন্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। সিদ্ধপুরুষ শ্রীরামপ্রসাদ গেয়েছেন—

ডুব দে রে মন কালী বলে,
হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে,
রত্নাকর নয় শূন্য কখন দুচার ডুবে ধন না পেলে,
তুমি দম-সামর্থ্যে এক ডুবে যাও কুল-কুণ্ডলিনীর কূলে'।

পণ্ডিত রাধাগোবিন্দ নাথ বৈষ্ণব শাস্ত্রে নিষ্ণাত কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলছি যে, তন্ত্রশাস্ত্রের প্রতি তিনি সুবিচার করেন নি। তিনি বিপুল তন্ত্রশাস্ত্রকে বেদানুগত ও বেদবহির্ভূত বা বেদবিরুদ্ধ এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। শৈবতন্ত্র ও শাক্ততন্ত্রকে তিনি বেদ-বিরুদ্ধ তন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাঁর সিদ্ধান্তের সমর্থনে তিনি যে সকল গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন, তা কোন তান্ত্রিক সিদ্ধাচার্যের রচিত প্রামাণ্য গ্রন্থ নয়। সম্ভবতঃ শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের রচিত তন্ত্রতত্ত্ব (প্রথম ও দ্বিতীয়), স্যার জন উড্রফের রচিত 'Sakti and Sakta' স্বামী নিগমানন্দ রচিত 'তান্ত্রিক গুরু', রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায় রচিত ও এগার খণ্ডে প্রকাশিত তান্ত্রিক সন্দর্ভ, স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দের রচিত ও খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত 'জপসূত্রম্' প্রভৃতি প্রামাণ্য গ্রন্থের সঙ্গে লেখকের পরিচয় ঘটেনি। ফলে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমতী রাধা সম্পর্কে তথা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম সম্পর্কে শ্রীরামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, গোবিন্দ চৌধুরী, শিবচন্দ্র প্রভৃতি সিদ্ধপুরুষ যে উদারতার পরিচয় দিয়েছেন, শাক্ত সাধনা ও শৈব সাধনা সম্পর্কে সুপণ্ডিত লেখক সে উদারতার পরিচয় দিতে পারেন নি।

লেখকের মতে 'শিব হইতেছেন গুণাবতার, তমোগুণের সহায়তা, সৃষ্টি-সংহারকারী। শিব শ্রীকৃষ্ণের অংশাংশ মাত্র'। শাস্ত্রে এই প্রকার উক্তি দৃষ্ট হইলেও শাস্ত্রকর্তাদের যথার্থ অভিপ্রায়—বৈষ্ণব সাধকের ইষ্টনিষ্ঠাকে জাগ্রত করা। শৈব ও শাক্ত সাধকদের সাধনপদ্ধতি অবৈদিক এবং সেই পদ্ধতি অবলম্বনে পরম বস্তু লাভ করা যায় না, যাঁরা এরূপ মনে করেন, তাঁরা একদেশদর্শী। আমাদের দেশের একটি প্রাচীন শ্লোক বলা হয়েছে—

'যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি ব্রহ্মেতি বেদান্তিনো
বৌদ্ধা বুদ্ধ ইতি প্রমাণপটবঃ কর্তেতি নৈয়ায়িকাঃ।
অর্হন্নিত্যথ জৈনশাসনরতাঃ কর্মেতি মীমাংসকাঃ
সোঽয়ং বো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলং ত্রৈলোক্যনাথো হরিঃ'।।

শৈবগণ 'শিব' এই নামে যাঁর উপাসনা করেন, যিনি বৈদান্তিকদের নিকট ব্রহ্ম, বৌদ্ধদের নিকট বুদ্ধ, প্রমাণপটু নৈয়ায়িকদের নিকট কর্তা, জৈনদের নিকট যিনি অর্হৎ, মীমাংসকদের নিকট যিনি কর্ম, সেই ত্রৈলোক্যনাথ হরি আমাদের বাঞ্ছিত ফল বিধান করুন।

এই সমন্বয়ী দৃষ্টি ভারত-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য। শিবমহিম্নঃ স্তবেও এই উদার ও বিশ্বতোমুখী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। শৈব সাধক বলিতেছেন—

'ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিল নানাপথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব'।

তাৎপর্য—ত্রয়ী (ঋক্, যজুঃ ও সাম, এই তিন বেদ) সাংখ্য, যোগ, পাশুপত ধর্ম ও বৈষ্ণব ধর্ম, রুচির বৈচিত্র্যবশত যিনি যে মতই অবলম্বন করুন না কেন, সকল মানুষেরই গম্যস্থল একমাত্র তুমি, যেমন কোন নদী ঋজুগামিনী আর কোন নদী বক্রগামিনী কিন্তু সকল নদীরই গম্যস্থল একমাত্র সমুদ্র—তবে, যিনি যে মত অবলম্বন করেন, তাঁর নিকট সেই মতই উৎকৃষ্ট।

এ স্থলে উল্লেখযোগ্য যে শিবসম্পর্কে যে উক্তি বেদানুগত (?) পদ্মপুরাণে দৃষ্ট হয়, তা সাম্প্রদায়িকতা-দোষে দুষ্ট। লেখকের মতে মহানির্বাণ তন্ত্রও বেদবিরুদ্ধ অথচ মহানির্বাণ তন্ত্র ব্রহ্মজ্ঞানীদের পরম আদরনীয়, এই 'ব্রহ্মজ্ঞানীদের পরম আদরনীয়, এই তন্ত্রের নির্দেশ হচ্ছে—

'ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ।
যৎ যৎ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ।।

এ কি ভগবদ্‌গীতার নিষ্কাম কর্মযোগের আদর্শ নয়?

লেখকের মতে 'তান্ত্রিক কালী' বৈদিকী দেবতা নন। দেবী ভাগবত বলেন—দেবীর পদকমলের ধ্যানই কলির যুগধর্ম। এও লেখকের মতে বেদানুগতশাস্ত্রবিরোধী। আমরা এই সকল উক্তির সার্থকতা বুঝতে পারি না। আমরা জানি, ভারতীয় মনীষার বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে তার স্বাঙ্গীকরণ ক্ষমতা।

তান্ত্রিক সাধনার চরম লক্ষ্য যে ক্রিয়াযোগের সাহায্যে ব্রহ্মসাযুজ্য-লাভ, এ কথা তো তন্ত্রশাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ উক্ত হয়েছে। অবশ্য, বৈষ্ণব সাধকরা 'নরক বাঞ্ছয়ে, তবু সাযুজ্য না লয়।' শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

'মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব-প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান'।।

কিন্তু মোক্ষবাঞ্ছা যে বেদবিরুদ্ধ, এমন কথা কবিরাজ গোস্বামী কোথাও বলেন নি। আচার্য শংকর আমাদের দেশের একজন শ্রেষ্ঠ ধর্ম-সংস্থাপক, ভারতবর্ষে যখন ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান ঘটেছিল, তখন তিনি আবির্ভূত হয়ে সমগ্র দেশকে ধর্মের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করেন, সুতরাং তাঁর প্রবর্তিত মায়াবাদ বেদবিরুদ্ধ নয়।

বাংলার তান্ত্রিক সাধকদের বৈশিষ্ট্য তাঁদের মাতৃভাবাসক্তি। যিনি 'করালবদনী ঘোরা মুক্তকেশী চতুর্ভুজা' তিনি রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি সাধকদের চোখে আমাদেরই ঘরের স্নেহময়ী, মমতাময়ী জননী। বাংলার শক্তিসাধকরা ভক্তিধর্মের বিরোধী নন। শ্রীরামপ্রসাদের গানেও দেখা যায়, তিনি 'চিনি হইতে চাহেন নাই', অর্থাৎ, সাযুজ্য মুক্তি চান নি, তিনি চিনির মাধুর্য আস্বাদন করতে চেয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণও মাতৃচরণে আত্মসমর্পণ করে বলেছেন—মা, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও'।

বৈষ্ণব সাধকবা বলেন—রাগানুগা ভক্তির দ্বারা মানুষ ভাগবতী তনু লাভ করতে পারে। শাক্ত সাধকরাও বলেন—'দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ', স্বয়ং দেবতা হয়ে দেবতার আরাধনা করবে, বহিঃপূজার পূর্বে মানসপূজা করবে। তন্ত্রশাস্ত্র বলেন—ভূতশুদ্ধি, আসনশুদ্ধি প্রাণায়াম প্রভৃতির দ্বারা সাধককে দেবশরীরতা লাভ করতে হবে। সাধনার দ্বারা পক্ব দেহ বা সিদ্ধ দেহ লাভ করাই তান্ত্রিক সাধকদের চরম লক্ষ্য।

তান্ত্রিক সাধকরাও বৈষ্ণব সাধকদের ন্যায় জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে সর্ব মানবকে আশার বাণী শুনিয়েছেন। তন্ত্রশাস্ত্র তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোকের জন্য যথাক্রমে পশ্বাচার বীরাচার ও দিব্যভাবের সাধনার বিধান দিয়েছেন। শ্রীরামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, গোবিন্দ চৌধুরী, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি সাধকরা যে দিব্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ তন্ত্র সম্বন্ধে 'কয়েক জন বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতের' উক্তি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। কিন্তু তার প্রতি শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণ রেখেও আমরা এ কথা বলতে বাধ্য যে, তিনি এই সব "বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণের' এমন সব উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যা তাঁর মতের অনুকূল। তন্ত্র সম্পর্কে স্বামী জগদীশ্বরানন্দের সিদ্ধান্ত মেনে না নিলেও তাঁর 'শ্রীশ্রীচণ্ডীর' ভূমিকা থেকে কোন কোন উক্তি তিনি উদ্ধৃত করেছেন। তিনি এই সব উক্তি থেকে সিদ্ধান্ত করেছেন—'দশ মহাবিদ্যা বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণের কল্পিত, সুতরাং মহাবিদ্যার উপাসনা বেদবিরুদ্ধ। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, যাঁহারা কালী, তারা প্রভৃতি মহাবিদ্যার উপাসনা করেন, তাঁহারা মুক্তিলাভ করিতে বা পরম গতি প্রাপ্ত হইতে পারেন না। সিদ্ধান্ত দাঁড়াইল, শ্রীরামপ্রসাদ বা শ্রীরামকৃষ্ণ মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই।'

লেখকের কয়েকটি বিভ্রান্তিকর উক্তি উদ্ধৃত হল—শ্রীরামকৃষ্ণদেব ছিলেন * বেদবিরুদ্ধ লৌকিক তন্ত্রমতের তান্ত্রিক সাধক। শ্রীরামপ্রসাদও তদ্রূপই ছিলেন। কালী ও ব্রহ্ম-সম্বন্ধে তাঁদের উক্তিগুলিও বেদবিরুদ্ধ তন্ত্রশাস্ত্রেরই কথা। অন্যত্র লেখক বলছেন—

'বেদানুসারে তন্ত্রমতের সাধনে মোক্ষলাভ হইতে পারে না'।

অন্যত্র—

'তান্ত্রিকদের কথিত পরতত্ত্ব বেদকথিত পরতত্ত্ব নহেন'।

অন্যত্র—

'তান্ত্রিকদের কথিত জীবতত্ত্বও বেদবিরুদ্ধ'।

অন্যত্র—

'তান্ত্রিকদের সাধনে * ভক্তির কোনও স্থান নাই'।

* 'তন্ত্রমতের সাধনে মোক্ষপ্রাপ্তি অসম্ভব'।

অন্যত্র—

বেদবিরুদ্ধ তন্ত্রমতাবলম্বীরা পাষণ্ড।

অন্যত্র—

'যাহা বেদবিহিত, তাহাই ধর্ম, যাহা বেদবহির্ভূত বা বেদবিরুদ্ধ, তাহা অধর্ম, ধর্মের সহিত অধর্মের সমন্বয় অসম্ভব।

এ কথা অবশ্য সত্য যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন বাংলা দেশে তান্ত্রিক ধর্মের গ্লানি ঘটেছিল। এখনও হয়তো অনেক যোগী ও তান্ত্রিক সাধক সাধন-পথে অগ্রসর হয়ে কিছু বিভূতি বা অলৌকিক শক্তি লাভ করেন এবং অর্থ বা যশের লোভে চরম লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হন। কিন্তু কালক্রমে সকল ধর্মেরই তো গ্লানি ঘটে থাকে। এখনও অনেক তথাকথিত বৈষ্ণব আছেন যাঁরা 'সহজিয়া' প্রভৃতি উপধর্মের প্রভাবে মহাপ্রভু-প্রবর্তিত বিশুদ্ধ আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছেন। সুতরাং শাক্ত-তন্ত্র যে বেদ-বিরোধী, এ কথা প্রমাণিত হয় না।

এক হিসাবে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মও তান্ত্রিক ধর্মেরই এক বিশিষ্ট রূপ, বৈষ্ণবের নিকট শ্রীরাধাতন্ত্র পরম আদরণীয় গ্রন্থ। বাংলার বৈষ্ণব ধর্মে যুগলের উপাসনা আছে, এতে রাধাভাবেরই প্রাধান্য। যে 'ব্রহ্মসংহিতা' শ্রীমন্মহাপ্রভু দক্ষিণ দেশ থেকে এ দেশে আনয়ন করেছেন, তার প্রথম কয়েকটি শ্লোকেও যন্ত্রযোগে উপাসনার কথা আছে। শ্রীজীব গোস্বামী গ্রন্থখানির যে টীকা রচনা করেছেন, তাতে শক্তিসাধনা-সম্পর্কে তাঁর উদার মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

মনুসংহিতার টীকাকার কুল্লুক ভট্ট বলেছেন—শ্রুতি দ্বিবিধা, বৈদিকী ও তান্ত্রিকী। 'শ্রুতিশ্চ দ্বিবিধা, বৈদিকী তান্ত্রিক চেতি'।

এ কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে যে, প্রামাণ্য তন্ত্রসমূহ বেদসম্মত এবং ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-রহিত, কারণ, তান্ত্রিক সাধনা ও বৈদান্তিক সাধনার লক্ষ্য অভিন্ন, আর সে লক্ষ্য—জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যানুভূতি।

এ কথা বিশ্বাস করবার কারণ আছে যে, যাঁরা পর্বতশীর্ষে আরোহণ করেছেন, তাঁদের নিকট যেমন নিম্নস্থ ভূমিখণ্ডের উচ্চতা ও নীচতার পার্থক্য বিলুপ্ত হয়ে যায়, তেমনই, যাঁরা সত্যকে উপলব্ধি করেছেন, তাঁদের নিকট ধর্মমতের পার্থক্য তুচ্ছ হয়ে যায়। এইজন্যই শ্রীরামপ্রসাদ, রামদুলাল, গোবিন্দ চৌধুরী প্রভৃতি শক্তিসাধকরা কখনও শ্যাম শ্যামাব আবার কখনও আপন উপাস্যা দেবীর সঙ্গে মহাভাবময়ী শ্রীমতী রাধার অভিন্নতা উপলব্ধি করেছেন, আর তান্ত্রিক সাধক শিবচন্দ্র রাসলীলার তাৎপর্য ব্যাখ্যা ও হরিসংকীর্তনের মহিমা প্রচার করেছেন। আবার, শক্তি সাধনা-সম্পর্কে শ্রীঅদ্বৈত-বংশাবতংস প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর দৃষ্টিভঙ্গি যে কত উদার ছিল, সে কথাও সকলেই জানেন।

তথাপি, এ কথা সকলেই স্বীকার করবেন যে পরম পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দনাথ মহাশয় শ্রীচৈতন্যভাগবতের সুবিস্তৃত ভূমিকা ও সুবিশাল টীকা রচনা করে সমগ্র বাঙ্গালী জাতির ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার ভাজন হয়েছেন।

পরিশেষে আমরা 'শ্রীচৈতন্যভাগবতের' 'নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী' টীকা সম্পর্কে দুই একটি কথা বলব। পরমভাগবত রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয় খণ্ডে খণ্ডে শ্রীচৈতন্যভাগবতের যে বিশদ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ টীকা রচনা করেছেন (আদি খণ্ড মধ্যখণ্ড (১ম); মধ্যখণ্ড (২য়) ও অন্ত্যখণ্ড), তা এই চরিতগ্রন্থের উপর নতুন আলোকপাত করেছে—আমাদের মনে হয়েছে, 'শ্রীচৈতন্য-ভাগবত' একটি মণিমঞ্জুষা, কিন্তু এত দুর্লভ রত্ন যে এর ভিতর লুক্কায়িত ছিল, আমরা তা জানতাম না। যে সকল ভক্ত বৈষ্ণব এই চরিতগ্রন্থখানি 'স্বাধ্যায় ব্রত' হিসাবে নিত্য পাঠ করবেন, তাঁরা 'শীতল মসৃণ মৌক্তিক হারের' ন্যায় এই টীকাখানিকে চিরদিন কণ্ঠে ধারণ করবেন।*

* শ্রীচৈতন্যভাগবত—রাধাগোবিন্দ নাথ আদিখণ্ড, মধ্যখণ্ড, ১ম ও ২য়, অন্ত্যখণ্ড। সাধনা-প্রকাশনী ৬৯ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা—৯।

মেমসাহেব

নিমাই ভট্টাচার্য

"যারা কাছে আছে তারা কাছে থাক,
তারা তো পারে না জানিতে
তাহাদের চেয়ে তুমি কাছে আছ
আমার হৃদয়খানিতে।"

•

ওয়েস্টার্ণ কোর্ট
জনপথ
নিউদিল্লী

দোলাবৌদি,

তোমার চিঠি পেলাম। অশেষ ধন্যবাদ। তুমি আমাকে ভালবাস, স্নেহ কর। তাইতো স্বপ্ন দেখ আমি ঘর বাঁধি, সুখী হই। একটা রাঙা টুকটুকে বৌ আসুক আমার ঘরে। আমাকে দেখাশুনা করুক, একটু ভালবাসুক, আমার জীবনের একটা অবলম্বন হোক। তাই না? ভাবতে বেশ লাগে। আমার এই ছন্নছাড়া জীবনে একটা জুনিয়র দোলা এসে দোলা দিলে মন্দ হতো না! হয়ত তার আবির্ভাব হলে নিজের জীবনটাকে নিয়ে এমন জুয়া খেলতাম না, ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি করতাম না। হয়ত তার ছোঁয়া পেলে বুকের ব্যথাটা সেরে যেত, হয়ত নিকট ভবিষ্যতে মুসৌরী বা নৈনীতালের কোন নার্সিংহোমে যাবারও প্রয়োজন হতো না। হয়ত আরো অনেক কিছু হতো। নিজের কাছ থেকে নিজেকে এমনভাবে লুকিয়ে রেখে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতাম না। তাই না দোলাবৌদি?

সত্যি কথা বলতে কি, বিয়ে করতে আমার সম্মতি না থাকলেও যদি কোন মেয়ে আমাকে বিয়ে করে তাতে আমার বিশেষ অসম্মতি নেই। বরং বেশ আগ্রহই আছে। আর তাছাড়া আগ্রহ না থাকার কি কারণ থাকতে পারে?

তুমি তো নিজেই আঠারো কি উনিশ বছর বয়স থেকে খোকনদাকে দোলা দিতে শুরু করেছিলে। ইউনিভার্সিটির দুই গেট দিয়ে দুজনে বেরুতে। তুমি ইউনিভার্সিটির গোরগোড়া থেকে ২-বি বাসে চাপতে আর খোকনদা মেডিক্যাল কলেজের পিছন থেকে ন-নম্বর বাসে চাপত। দুজনে দুটো বাসে চাপলে কি হয়। দুজনেই তো নেমে পড়তে লিণ্ডসে স্ট্রীট'এর মোড়ে। ডিসেম্বরের হাড়-কাঁপানো শীতে ফাঁকা দার্জিলিং উপভোগ করেছ তোমরা দুজনে। এসব আমি জানি। আরো জানি তুমি নিজের হাতের কঙ্কণ আর গলার মোটা হারটা বিক্রী করেছিলে বলেই খোকনদা অত দিন ধরে রিসার্চ করে পি-এইচ-ডি হতে পারল। এমনি করে দোলা দিতে দিতে একদিন অকস্মাৎ নিজের দোলনায় তুলে নিলে খোকনদাকে।

এসবই তো নিজের চোখে দেখা। আরো অনেককেই তো দেখলাম। মঞ্জরী, দীপি, কণিকারাই কি কম খেল দেখাল। আমার প্রথম যৌবনের সেই সবুজ কাঁচা দিনগুলিতে তোমরা সবাই আমাকে যথেষ্ট ইনফ্লুয়েন্স করেছিলে। হয়ত আজো সে ইনফ্লুয়েন্স শেষ হয় নি। আর ঐ অনুরাধা? কত বড় বড় কথা, কত লেকচার, কত তর্ক-বিতর্ক! বিয়ে? সরি! শেষ পর্যন্ত একটা পুরুষের তৃষ্ণা মেটাবার জন্য আমাকে শিকার করবে? নেভার, নেভার, নেভার!

মনে পড়ে দোলাবৌদি? অনুরাধা সেসময়কালে চীৎকার করে হেনরি ফিল্ডিংকে কোট করে বলত,

'His designs were strictly honourable, as the saying is, that to rob a lady of her fortune by way of marriage.'

আমাদের সেই অনুরাধাও একদিন বর্ধমানের নীতিশের গলায় মালা পরাল। আমি দিল্লীতে ছিলাম না। তাই অনুরাধার আমন্ত্রণ পেতে একটু দেরী হওয়ায় সেদৃশ্য দেখার সুযোগ আমার হয় নি। কিন্তু তার বৌভাত-ফুলশয্যার দিন আমি বর্ধমান না গিয়ে পারি নি। প্রাচীন কাব্যে আছে অনন্তযৌবনা উর্বশীর ক্যাবারে ডান্সের খেলায় স্বর্গরাজ্যের ম্যানেজিং ডাইরেক্টরদের সব কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেয়েছিল। কিন্তু মুনি-ঋষিদের নাচে উর্বশীর ধ্যানভঙ্গ ? না পাড়নি। তবে দেখলাম অনুরাধার বেলায়। একটা ভাঙা জীপগাড়ী, দুটো কনস্টেবল আর একটা পেটমোটা সাব-ইন্সপেক্টরের ঘাড়ে চড়ে আই-পি-এস নীতিশ এমন নাচই নাচল যে, অনুরাধাও ক্লিন বোল্ড হয়ে গেল।

ঐ উৎসবের বাড়ীতেই লোকজনের ভীড় একটু পাতলা হলে আমি কানেকানে জিজ্ঞাসা করেছিলাম অনু, এ কি হলো? ছিঃ ছিঃ। শেষ পর্যন্ত পুরুষের তৃষ্ণা মেটাবার শিকার হলে?

তুমি তো অনুরাধাকে ভালভাবেই জান। ও ভাঙবে কিন্তু মচকাবে না। তাই শেকসপিয়ারের 'অ্যান্টনি অ্যান্ড ক্লিওপেট্রা' থেকে কোট করে বলল,

'My salad days when I was green in judgement.'

চমৎকার! তোমাদের এইসব কাণ্ডকারখানা দেখে আমার বিয়ে করার ইচ্ছা কি স্বাভাবিক নয়? মাঝে মাঝেই ভাবি আমিও যদি খোকনদা বা নীতিশের মত......।

থাকগে ওসব। আচ্ছা দোলাবৌদি, তাছাড়া পাত্র হিসেবে কি আমি খুব খারাপ? বোধ হয় না, তাই না? লেখাপড়া না শিখলেও কলেজে—ইউনিভার্সিটিতে গেছি ক'বছর। খবরের কাগজের স্পেশ্যাল করসপনডেন্টের চাকরিটাও নেহাৎ মন্দ নয়। বেশ চটক আছে। মাইনেও নেহাত কম পাই না। বাড়ী না থাকলেও গাড়ী আছে, টেলিফোন আছে, নায়েব না থাকলেও স্টেনো তো আছে। তাছাড়া শুনেছি আজকালকার মেয়েরা বিলেত-ফেরত দুষ্টু ছেলেদের বেশ পছন্দ করে। মেয়েদের বাপ-মা স্মার্ট-সফিস্টিকেটেড বলে ঐসব দুষ্টু ছেলেদের জামাই করতে আপত্তি করেন না। সেদিক থেকে আমি ওভার-কোয়ালিফায়েড! একবার নয়, বহুবার গেছি বিলেত। লোকে বলে দুষ্টুমিও নাকি করেছি।

আরো একটা ব্যাপার আছে। পটলডাঙার গোবিন্দ বিলেত-ফেরত বলে বিয়েতে মিনিস্টারদের মত ইনক্যাস ট্যাক্স ফ্রি ত্রিশ হাজার টাকা ব্যাকমানি পেয়েছিল। সুতরাং আমার ভবিষ্যতও বেশ উজ্জ্বল মনে হয়। আর তাছাড়া তোমার মত হাই ফার্স্টক্লাশ পাওয়া এজেন্ট যখন আছে! পয়সাওয়ালা বোকা বোকা লোকের একটা উড়ু-উড়ু মেয়ে শিকার করা অধ্যাপিকা দোলা সরকারের পক্ষে নিশ্চয়ই খুব কষ্টকর নয়।

তবে তার আগে মেমসাহেব উপাখ্যানটা তোমাদের সবার জেনে নেওয়া দরকার। আমার ঐ কালো মেমসাহেবকে নিয়ে তোমরা অনেকদিন হাসি-ঠাট্টা করেছ। হয়ত কিছু ধারণাও করেছ মনে মনে। শুধু তুমি কেন, অনেকের মনেই আমার মেমসাহেবকে নিয়ে অনেক প্রশ্ন। কেউ-কেউ ভাবে মেমসাহেব বলে কেউ নেই। পুরোটাই গুল, ফোরটোয়েন্টি। আবার কেউ-কেউ ভাবেন মেমসাহেবকে আমি শুধু ভালবাসিনি, বিয়েও করেছি। নানা ধরনের নানা লোকজনের কাছ থেকে মেমসাহেব সম্পর্কে চিঠিপত্রও কম পাই না।

যার সঙ্গেই নতুন আলাপ হয়, তিনিই প্রশ্ন করেন, মেমসাহেব কে? ছেলে-মেয়ে বুড়ো-বুড়ী সবারই ঐ এক প্রশ্ন। এইত কদিন আগে দিল্লী ইউনিভার্সিটির এক তন্বী-শ্যামার সঙ্গে আলাপ হলো। বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। দুটো হিন-এরারুট বিস্কুট, একটা প্যাড়া সন্দেশ আর এক কাপ চা দিয়েই মুচকি হেসে জিজ্ঞাসা করলেন মা জানতে চাইছিলেন মেমসাহেবের আসল নাম কি?

বছরখানেক আগে সিউড়ি থেকে এক বৃদ্ধা পার্শেল করে একটা লাল টুকটুকে সিল্কের শাড়ী পাঠিয়েছিলেন। সঙ্গে একটা ছোট্ট চিঠি ছিল। লিখেছিলেন, তোমার মেমবৌকে এই শাড়ীটা আশীর্বাদী পাঠাচ্ছি। বিদেশী মেমকে এই শাড়ীটা পরালে ভালই লাগবে। [illegible]

বৃন্দাকে আমি লিখেছিলাম, মা, শাড়ীটা আপনি সাবধানে রেখে দিন। সময় মত আপনার মেমবৌকে নিয়ে ওখানে গিয়েই শাড়ীটা গ্রহণ করব।

মেমসাহেবকে নিয়ে আরো কত কি কাণ্ডই হয়! তাইতো এবার ভেবেছি তোমাদের সঙ্গে এমন করে আর লুকোচুরি না খেলে পুরো ব্যাপারটাই খুলে বলব। তাছাড়া আমার জীবনের এইসব ইতিহাস না জানলে তোমার পক্ষে ঘটকালি করারও অসুবিধা হতে পারে। তোমাকে সব কিছু লেখার আগে নৈতিক দিক থেকে মেমসাহেবের একটা অনুমতি নেওয়া দরকার। কিন্তু আজ সে এতদূরে চলে গেছে যে, তাঁর অনুমতি জোগাড় করা প্রায় অসম্ভব। আর হ্যাঁ, তাছাড়া ঠিকানাটাও ঠিক আমার জানা নেই।

তুমি আর খোকনদা আমার ভালবাসা ও শুভেচ্ছা নিও।

—তোমাদের বাচ্চু

(২)

ওয়েস্টার্ণ কোর্ট
জনপথ
নিউদিল্লী

দোলাবৌদি,

মনে হলো তুমি আমার চিঠি পড়ে ঘাবড়ে গেছ। গত চিঠিতে তো বিশেষ কিছুই লিখি নি, এমন কি গৌরচন্দ্রিকাও পূর্ণ হয় নি। সুতরাং এখনই নার্ভাস হবার কি আছে? তাছাড়া তুমি না মেয়ে? অন্যের প্রেমের ব্যাপারে তোমাদের তো আগ্রহের শেষ নেই। শিক্ষিতাই হোক, আর অশিক্ষিতাই হোক, প্রেমপত্র সেন্সর করতে মেয়েরা তো শিরোমণি! ইউনিভার্সিটির জীবনে তো দেখেছ লেকচার শোনা, কফি-হাউসে আড্ডা দেবার মত অন্যদের প্রেমপত্র হাত করাও প্রায় সব মেয়েদের নিত্যকার কাজ ছিল। গণ্ডগ্রামে যাও, সেখানেও দেখবে পারুল-বৌদির চিঠি অন্নপূর্ণা-ঠাকুরঝি না পড়ে কিছুতেই ছাড়বে না। শুনেছি স্কুল-কলেজে মেয়েদের চিঠি এলে দিদিমণিরা একবার চোখ না বুলিয়ে ছাড়েন না। ছাত্রীদের অভিভাবকত্ব করবার অছিলায় চুরি করে প্রেমপত্র পড়াকে কিছুটা আইন-সম্মত করা যেতে পারে মাত্র; কিন্তু তার বেশী কিছু নয়।

তাছাড়া প্রেমের কাহিনী জানতে মেয়েদের অরুচি? কলিকালে না জানি আরো কত কি দেখব, শুনব। মেয়ের বিয়ে হলে মা পর্যন্ত জানতে চান, হ্যাঁরে খুকী, জামাই আদর-টাদর করেছিল তো? হাজার হোক মা তো! ঠিক খোলাখুলিভাবে সব কথা জিজ্ঞাসা করতে পারেন না। তাই ঘুরিয়ে আদর-টাদর করার খবর নেন। বাসরঘর তো মাসি-খুড়ি থেকে দিদিদের ভীড়ে গিজ-গিজ করে।

আর সেই সতী-সাবিত্রী সীতা-দময়ন্তী থেকে সুরু করে আমাদের মা-মাসিরা যে সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধ্বজা বহন করে এনেছেন, শত বাধা-বিপত্তি অগ্রাহ্য করে যে ঐতিহ্যের ধারা অম্লান রেখেছেন, আজ তুমি সেই মহান আদর্শ থেকে বিচ্যুত হলে, আমি ভাবতে পারিনি।

সর্বোপরি আমি যখন নিজে স্বেচ্ছায় তোমাকে সব কথা বলছি, তখন তোমার লজ্জা বা সংকোচের কি কারণ থাকতে পারে? আর তোমাকে ছাড়া আমার এই ইতিহাস কাকে জানাব বলতে পারো? তুমি আমার থেকে মাত্র এক বছরের সিনিয়র হলেও তোমাকে আমি সেই প্রথম পরিচয়ের দিন থেকেই ভালবেসেছি, শ্রদ্ধা করেছি। খোকনদার প্রতি আমার শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসা যেদিন থেকে আবিষ্কার করেছি, সেই দিন থেকেই তুমি আমার দোলাবৌদি হয়েছ। ছাত্রজীবনের সেই শেষ দিনগুলিতে আর আমার কর্মজীবনের প্রথম অধ্যায়ে তুমি আর খোকনদা যেভাবে আমাকে সাহায্য করেছ, সহানুভূতি জানিয়েছ, তার তুলনা হয় না। তাইতো জীবনের সমস্ত সুখে-দুঃখে প্রথমেই মনে পড়ে তোমাদের।

মেমসাহেবের ব্যাপারটা ইচ্ছা করেই জানাই নি। তোমরা অবশ্য কিছু কিছু আঁচ করেছিলে কিন্তু খুব বেশী জানতে পার নি। ভগবানের দয়ায় আমি দিল্লী চলে আসায় নাটকটা আরো বেশী জমে উঠেছিল। আমি ভেবেছিলাম, তোমাকে আর খোকনদাকে একটা সারপ্রাইজ দেব। তাই কিছু জানাই নি। কিন্তু আর দেরী করা ঠিক হবে না। তুমি যখন আমার বিয়ে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছ তখন সব কিছু না জানান অন্যায় হবে।

আর শুধু মেমসাহেবের কথাই নয়, আমার জীবনে যেসব মেয়েরা এসেছে, তাদের সবার কথাই তোমাকে লিখব। সব কিছু তোমাকে জানাব। কিছু লুকাব না। আর কিছু না হোক, তোমাকে হলপ করে এইটুকু গ্যারান্টি দিতে পারি যে, আমার এই কাহিনী তোমার খুব খারাপ লাগবে না। যদি ভাষাটাকে একটু এডিট করো, তাহলে হয়ত ছাপা হয়ে বই বেরুতে পারে।

সুতরাং হে আমার দোলাবৌদি! ধৈর্য ধর! হে আমার খোকনদার প্রাণের প্রিয় 'দোলে দোদুল দোলে দোলনা' দোলা! তোমার ভ্রাতৃসম লক্ষ্মণ-দেবরের প্রতি কৃপা কর, তার ইচ্ছা পূর্ণ কর!

—তোমাদের বাচ্চু

(ক্রমশঃ)



জনগণের নিজস্ব বাহন, রোভার,
আজই কিনুন


ওয়ারেস্ট সাইকেলস

গৌহাটি • কলিকাতা • বারাণসী
সারা ভারতেই স্টকিস্ট

পশ্চিমবঙ্গের সাসপেন্স ড্রামা

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজনৈতিক দিকে তাকালে হিচককের ছবির মত সাসপেন্স ড্রামার সেই চূড়ান্ত আনন্দ উপভোগ করা যাবে। সে চৌরঙ্গীর কংগ্রেস ভবনেই হোক বা সুন্দরী অ্যাভেন্যু-এর আশু ঘোষের বাড়ীতেই যাওয়া যাক না কেন, সব জায়গাতেই কেবল 'হাপ্ হাপ্' ভাব। একটার পর একটা দরজা খুলে যাচ্ছে, কথা কানে ভেসে আসছে, হ্যাঁ. বেলা বারোটা। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের মোড়।

এ রাজ্যের রাজনীতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলা সাধারণ মানুষের পক্ষে দুষ্কর হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। মহামান্য জনপ্রতিনিধিরা এক রোববার রাতে গাড়ী চেপে রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপালকে জানিয়ে আসছেন, আবার তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আটচল্লিশ ঘন্টা যেতে না যেতেই বিধানসভা ভবন থেকে রাজ্যপালকে চিঠি দিয়ে জানাচ্ছেন, আমরা কেউ দল ত্যাগ করিনি। রাতেই আবার তাঁদের দেখা যাচ্ছে আশু ঘোষের বাড়ীতে ব'সে গল্পচ্ছলে বলছেন, আমি কংগ্রেস পার্টিতে ফিরে গেলে কি হয়? আসলে ভোট দেবার সময় আমি আশুবাবুর সঙ্গেই আছি। সাধারণ মানুষ কেন, মহামান্য রাজ্যপাল বাহাদুরের মাথাই ঘুরে গেছে। মাথার সেই 'ভ্যাকুয়াম' ভাব কাটানোর জন্য বোধ হয় আজকাল প্রায়ই তাঁকে দেখা যাচ্ছে, হয় সকালে গড়ের মাঠে গল্ফ খেলতে যাচ্ছেন নয় রাতে কোন প্রাইভেট ডিনারে যোগ দিচ্ছেন।

এতে পুলিশের সিকিউরিটির লোকজনের পরিশ্রম বেশ বেড়েই চলেছে। কিন্তু কিছু করার নেই। কারণ এ পোড়া দেশে জন্মগ্রহণ করেই তাঁরা প্রথমেই অন্যায় করে ফেলেছেন। ভাবলে রাতে ঘুমের ব্যাঘাত হবে; এত বড় একটা গল্ফের মাঠ সাদা পোশাকের পুলিশ দিয়ে 'স্যাডো' করানো সোজা কথা নয়।

শীতকালের শেষাশেষি বৃহস্পতিবার রাতে যখন ঝম্ঝম্ করে বৃষ্টি পড়ছে, তখন বালীগঞ্জের দিকে এক বাড়ীর নিভৃত কক্ষে কংগ্রেস নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষ আর নতুন গজিয়ে ওঠা আই-এন-ডি-এফ-এর সর্বাধিনায়ক শ্রীশংকরদাস ব্যানার্জি বার-এ্যাট্-ল, (ইনি ভূতপূর্ব এ্যাডভোকেট জেনারেল ও প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী ছিলেন) এক শলা-পরামর্শের জন্য মিলেছিলেন। এতদিনে বোধ হয় কংগ্রেসী মাতব্বররা বুঝতে পেরেছেন যে, শংকরবাবুকে পদ দিয়ে কংগ্রেসে ফিরিয়ে না আনতে পারলে তাঁদের সরকারী গদী টলমল হবে। আবার সেই সঙ্গেই দেখা যাচ্ছে আশু ঘোষের এমিসারি মেজর গোবিন্দ সেন সঙ্গে শলা-পরামর্শ করার জন্য 'অ্যাপয়েন্টমেন্ট' চাইছে। তাই বোঝা যাচ্ছে না যে, আই-এন-ডি-এফ এরা নেতা পাল্টাতে চান কিনা?

মুখ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ বারবার বলে এসেছেন সংখ্যালঘিষ্ঠ হয়েছেন মনে করলেই পদত্যাগ করবেন। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ও জোরের সঙ্গে ওই কথা বলেছিলেন। কিন্তু কার্যত দেখা গেছে রাজ্যপাল তাঁকে বেমালুম বরখাস্ত করে দিয়েছেন।

১৪ই ফেব্রুয়ারী বিধানসভা ভবনে শোভাযাত্রা করে যেতে যেতে প্রখ্যাত ব্যারিস্টার শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায়ের অনুরোধে রাজ্যপাল অন্য পথ ধরে বিধানসভা কক্ষে প্রবেশ করতে পারায় কংগ্রেস মহলে কি উল্লাস। তাঁরা দাবী করছেন বুদ্ধির খেলায় ফ্রণ্টকে তাঁরা কয়েক ডজন গোলে হারিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এটা বুদ্ধির খেলা হয়েছে কিনা তা না বুঝলেও সাধারণ মানুষ পরের দৃশ্য দেখতে পেয়েছেন যে কংগ্রেসী দলের শ্রীমিহির উপাধ্যায় ও বিরোধী দলের গোপালবাবুকে বিধানসভা ভবনের মধ্যেই 'ফার্স্ট এড্'-এর নামে 'টিনচার আইডিন' লাগানো হচ্ছে। একজনের নাক দিয়ে অঝোরে রক্ত ঝরছে; আর অন্যজনের আঘাত গুরুতর।

গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে গিয়ে এবার জন-প্রতিনিধিদের অনেক নতুন কাজ 'একসপেরিমেণ্ট' করতে হয়েছে। এমন কি মেয়েদের লাথি মারতে হয়েছে আর টেবিলের ওপর দাঁড়িয়ে চিৎকার করছিল এমন একজন মেয়েকে থাম্‌চে দিতে হয়েছে। এ ছাড়া যাঁরা গণতন্ত্রের ধারক-বাহক এমন এম-এল-এরা রাজ্যপালের উদ্দেশ্যে কুশান ছুঁড়ে দিয়েছেন। স্পীকার মহোদয় অবশ্য পরে বলেছেন, রাজ্যপাল ওইভাবে চুপিসাড়ে বিধানসভায় গিয়ে তাঁর বক্তৃতা দেওয়ার চেষ্টা না করলেই তাঁর মর্যাদা থাকতো।

আজ দেশসেবকদের কাছে মর্যাদা বড় কথা নয়। আসল কথা হচ্ছে, (১) মন্ত্রী আমাকে করতেই হবে। (২) আমি যে ক্ষমতায় বসে আছি, তা লোকের মনঃপূত হোক বা না হোক আমাকে গদী থেকে কেউ নামাতে পারবে না। এতে পার্টি থাক আর না থাক তাতে কিছু যায় আসে না। আমি রক্ত দিয়ে পার্টি গড়ে তুলেছি, অতএব আমিই থাকবো, অন্য যার চলে যাবার হয় সে চলে যাক। যাবার জন্য বেশ বড় দরজাই খোলা আছে।

এই ডামাডোলের বাজারে যুক্তফ্রণ্ট যদিও মাথা গলিয়েছে তবু বলতে হয় যে, তাঁরা এই জটিলতার বিষয়টা কিছুটা শান্ত পরিবেশের মধ্যে বিবেচনা করেছেন। সাংবিধানিক জটিলতা অবসান করে অনাস্থা প্রস্তাবের দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা না করার এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে, আগের সিদ্ধান্তের সঙ্গে তাঁদের বর্তমানের কাজের একটা সূত্রের মিল আছে। তবে মানুষের সাধারণ প্রবৃত্তি অনুযায়ী কংগ্রেসের বাড়ীতে ভাঙন ধরলে তাঁদের আর আনন্দের শেষ নেই। তাই ফ্রণ্টের নেতারা এই ফাটলটাকে আরো বড় করে তোলার উদ্দেশ্য বিনাসর্তে আশু ঘোষকে সমর্থন জানিয়ে দিয়েছেন।

অকস্মাৎ এক সুন্দর সকালে কংগ্রেস নেতা সর্বশ্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন আর অতুল্য ঘোষ অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাচনের ডাক দিলেন। ঐ দলেরই পরিষদ পার্টির নেতা শ্রীখগেন দাসগুপ্ত অবশ্য একমত হতে পারলেন না। সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, কংগ্রেসের দোতলার নেতারাই ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারছেন না। এই নিয়ে দারুণ গবেষণা চলেছে। বিদ্রোহী কাজেম আলি মীর্জা নিজের নির্বাচন কেন্দ্রটা এক সময় প্রফুল্লবাবুর জন্য ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন। কারণ তাঁরা তখন মনে করেছিলেন যে, পরিষদীয় দলের নেতৃত্বে প্রফুল্লবাবুর আসা দরকার। নবাব সাহেব নিজে বলেছেন এই চাওয়ার অপরাধে তাঁকে কংগ্রেস ছেড়ে দিতে হয়েছে। মুর্শিদাবাদে তাঁকে 'কাউণ্টার' করার জন্য নেতা খুঁজে বার করা হয়েছে। শংকরবাবুর ওপর তো অত্যাচারের শেষ নেই। কামরাজ পরিকল্পনার সময় থেকেই ওঁর ওপর কোপের পর কোপ মারা হচ্ছে। কিন্তু আজ একটু বেঁকে দাঁড়াবার ফলে দেখা যাচ্ছে, রাষ্ট্রপ্রধান গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার জন্য ছুটে গেছেন।

লোকসেবক সঙ্ঘ শংকরদাসবাবুকে মুখ্যমন্ত্রীত্বে সমর্থন জানাবেন না বলে ঘোষণা করায় কংগ্রেস-পি ডি এফ মহলে ক্ষণিকের জন্য উল্লাস দেখা গিয়েছিল। কিন্তু যেই তাঁরা বলেছেন, ঘোষ মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে তাঁরা ভোট দেবেন, অমনি মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। সোস্যালিস্ট ইউনিটিরও একই কথা। তবে এস এস পি বাংলা কংগ্রেস ও জাতীয় পার্টির মধ্য থেকে লোক নিয়ে আসার চেষ্টা কম চলছে না। আর কংগ্রেসের ভেতরে আবার একটা দ্বিতীয় বাহিনী গড়ে উঠেছে। তাঁদের কথা যে, এই অস্থিরতার মধ্যে নেতৃত্ব পরিবর্তনের জন্য চাপ দিতে হবে। তাঁরাও গোপনে কাজ চালিয়েও যাচ্ছেন।

সব দিক বিবেচনা করে আজ বোঝা যাচ্ছে যে, ডঃ ঘোষের মন্ত্রিসভাকে বাঁচাতে হলে শংকরবাবু এবং ইত্যাদির দলে আনতে হবে। নচেৎ রাষ্ট্রপতির শাসন। কিন্তু কি যে হবে, তা এখন পর্যন্ত সাসপেন্স ড্রামার মতই অন্ধকারে থেকে যাচ্ছে। কিন্তু এ সকল ঘটনা যে সাধারণ মানুষ একেবারে উপভোগ করছে না, তা বলা যায় না। হরিজনায় পথে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে দেখে কেউ যদি কোন সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছে যান, তবে তাও কিছুটা ভুল হবে বলে মনে হয়।

—[illegible] চক্রবর্তী

১৬।২।৬৮



ইরাণের রাজকীয় সশস্ত্র বাহিনীর চীফ অব দি সুপ্রীম কমান্ডার্স স্টাফ জেঃ বি আরিয়ানা পালাম বিমান-ঘাটিতে এসে পৌঁছালে ভারতীয় বাহিনীর সেনানীমন্ডলীর অধ্যক্ষ জেঃ কুমারমঙ্গলম তাঁকে সম্বর্ধনা জানান।

দেশেবিদেশে

"আকাশ মেঘমুক্ত হতে চলেছে"

গত ১২ ফেব্রুয়ারী সংসদের বাজেট অধিবেশনের উদ্বোধন করে রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকীর হোসেন যে ভাষণ দেন তার মূল সুর ছিল এই কথাটিই।

দেশের অর্থনৈতিক, বিশেষ করে খাদ্যের অবস্থার উল্লেখ করেই রাষ্ট্রপতি এই মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, এক বছর আগেও অবস্থা ছিল খুবই সঙ্গীন, ভবিষ্যৎ ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন। "কিন্তু এখন আকাশ মেঘমুক্ত হতে চলেছে। অতীতের যে-কোন সময়ের চাইতে এই বছর খাদ্যের উৎপাদন ভালো হবে বলে আশা করা যায়। প্রাথমিক হিসেবে দেখা যাচ্ছে প্রায় সাড়ে ৯ কোটি টনের মত খাদ্য এবছর উৎপন্ন হবে। ফলে খাদ্য পরিস্থিতির অনেকটা উন্নতি ঘটবে বলে আশা করা যায়।"

তবে, রাষ্ট্রপতি বলেন, খাদ্য পরিস্থিতিতে স্থিতিশীলতা আনতে হলে বড় রকমের একটা মজুত ভান্ডার গড়ে তোলা দরকার। সেই সঙ্গে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্যশস্য নিয়ন্ত্রিত দরে যাতে জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় তারও ব্যবস্থা করা দরকার। এই উদ্দেশ্যে সরকার এক-দিকে যেমন তিন লক্ষ টনের একটি মজুত ভান্ডার গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন তেমনি আভ্যন্তরীণ সংগ্রহ বৃদ্ধিরও চেষ্টা করছেন।

খাদ্যের প্রসঙ্গে ডঃ হোসেন আরো দুটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেন। এক, উন্নত পদ্ধতির প্রয়োগ। ১৯৬৬-৬৭ সালে যেখানে ৫০ লক্ষ একর জমিতে অধিক ফলনক্ষম বীজ ব্যবহার করা হয়েছিল, সেখানে গত খরিফ মরশুমে ৬০ লক্ষ একর জমিতে এই ধরনের বীজ বোনা হয়েছিল। বর্তমান রবি মরশুমে আরো ৯০ লক্ষ একর জমিতে অধিক ফলনক্ষম বীজ বোনা হবে বলে আশা করা যায়। দুই, সারের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার। ১৯৬৫-৬৬ সালে যে পরিমাণ নাইট্রোজেন সার ব্যবহার করা হয়েছিল এবছর তার দ্বিগুণ পরিমাণ ব্যবহৃত হবে।

ডঃ হোসেনের এই আশাবাদ অন্যান্য বিষয় সম্পর্কেও উচ্চারিত হয়। যেমন তিনি মনে করেন :

- ১৯৬৬-৬৭ সালের তুলনায় এবছর জাতীয় আয় ১০·৮ শতাংশ বেশী হবে;
- দামের ওপর চাপ কমবে : ১৯৬৬ সালে পাইকারী দাম যেখানে ১৬ শতাংশ বেড়েছিল এবছর সেখানে বেড়েছে মাত্র ৫·৭ শতাংশ ;
- খাদ্যের উৎপাদন ও জাতীয় আয় বাড়ায় আগামী বছর শিল্পদ্রব্যের চাহিদাও বাড়বে ;
- রপ্তানী বাণিজ্যের সম্ভাবনা উৎসাহব্যঞ্জক ; ১৯৬৬-৬৭ সালের প্রথম সাত মাসের তুলনায় এবছর প্রথম সাত মাসে ৫·৭ শতাংশ বেশি রপ্তানি হয়।

অবশ্য ডঃ হোসেন কিছু কিছু নিরাশাব্যঞ্জক বিষয়েরও উল্লেখ করেন। যেমন আঞ্চলিক, ভাষাগত ও সাম্প্রদায়িক আনুগত্য নিয়ে বিভেদাত্মক ও ধ্বংসাত্মক আন্দোলন। তিনি বলেন, ভারতের মত বিরাট দেশে জনসাধারণের কোন না কোন ভাবে উত্তেজিত করার মত সমস্যা সব সময়েই থাকবে। "কিন্তু আমাদের যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা আছে তাতে এই সমস্ত সমস্যা শান্তিপূর্ণভাবে আলোচনার জন্যে সব সময়েই উত্থাপন করা যেতে পারে। যুক্তিসম্মত তর্ক ও বোঝাপড়ার ভেতর দিয়েই গণতন্ত্র কাজ করে থাকে। তার বদলে যদি রাস্তায় হিংসাত্মক আন্দোলন চালানো হয় তাহলে দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও জাতীয় ঐক্যই দুর্বল হয়ে পড়বে।"

তিনি বলেন, "স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন উভয় পরিপ্রেক্ষিতেই আমাদের অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার ও ভবিষ্যৎ অগ্রগতি নির্ভর করছে আমাদের গণতান্ত্রিক সংস্থাগুলির সুশৃঙ্খল কাজকর্ম, জনগণের কঠিন পরিশ্রম, তাদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের বোধ, শ্রমিকদের উৎপাদনের ক্ষমতা ও শিল্পক্ষেত্রে শান্তি বজায় রাখার ওপর।"

এই প্রসঙ্গে তিনি ভাষার প্রশ্নের উল্লেখ করে বলেন, "ভাষা নিয়ে দেশের কোন কোন অংশে যে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা গিয়েছে তা অত্যন্ত দুঃখের। সরকারের ভাষা নীতির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশের ঐক্য ও জনগণের সংহতি বিধান করা এবং সেই সঙ্গে প্রত্যেক জনগোষ্ঠীকেই আত্মপ্রকাশের ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির

সুযোগ দেওয়া। সরকার আশা করেন এরপর ভাষা সংক্রান্ত সমস্ত বিতর্কের অবসান ঘটবে।"

রাষ্ট্রপতি তাঁর ভাষণে বৈদেশিক মুদ্রার সংকট থেকে উদ্ধারের জন্যে সরকারী ব্যবস্থাদির কিছু কিছু আভাস দেন, আগামী বছরের মধ্যে আরো ৬০ লক্ষ দম্পতীকে পরিবার পরিকল্পনার আওতায় আনবার সংকল্প ঘোষণা করেন, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যে বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যার ওপর নির্ভর করার গুরুত্ব উল্লেখ করেন, প্রশাসনিক সংস্কার সম্পর্কে আভাস দেন, বেকার সমস্যার উল্লেখ করে যুবক-যুবতীদের শ্রমের গুরুত্ব উপলব্ধি করে যে কাজই পাওয়া যায় তা-ই নেবার জন্যে আহ্বান জানান। তিনি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক প্রশ্নে ভারতের মনোভাবেরও উল্লেখ করেন।

এক কথায় বলা যায়, রাষ্ট্রপতি তাঁর এই ভাষণে সরকারী কাজকর্ম, সদিচ্ছা ও সংকল্পের পরিচয়মাত্র দিয়েছেন, যেমন প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর হ্যাণ্ড-আউটে মাঝে মাঝে দেওয়া হয়ে থাকে। এর বাইরে উদ্বুদ্ধ হবার মত কিছু এই ভাষণে নেই। তিনি নিজেই বলেছেন, "সরকারের পক্ষে আগামী দিনগুলিতে সবচেয়ে প্রধান কর্তব্য হল অর্থনীতিতে একটি গতিশীলতা সঞ্চার করা।" কিন্তু তাঁর ভাষণের মধ্যে কোন নতুন গতিশীলতার পরিচয় পাওয়া কষ্টকর। তিনি যেসব আশা প্রকাশ করেছেন সেগুলি বহু বছর ধরেই প্রকাশ করে আসা হচ্ছে। তিনি যেসব সংকল্পের কথা ব্যক্ত করেছেন সেই সংকল্প গত কুড়ি বছর ধরে সরকার করে আসছেন। তিনি জনগণের উদ্দেশ্যে যেসব উপদেশ বিলি করেছেন গত কুড়ি বছর ধরে সেগুলি শুনতে শুনতে জনসাধারণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আগামী বর্তমান হয়ে ব্যর্থ অতীতে পরিণত হচ্ছে, কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। আগামী বছরটুকু ভালোই যাবে কেবল এই কথা শুনিয়ে গেলেই হল।

চলন্ত ট্রেনে মৃত্যু

গত ১১ ফেব্রুয়ারী ভোরে রহস্যজনক পরিস্থিতিতে ভারতীয় জনসঙ্ঘের সভাপতি শ্রীদীনদয়াল উপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়েছে। মোগলসরাই স্টেশনের কাছে রেল-লাইনের পাশে তাঁর মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া যায়। মাথায়, ঘাড়ে, পায়ে আঘাতের চিহ্ন ছিল।

৫১ বছর বয়স্ক শ্রীউপাধ্যায় লক্ষ্ণৌ থেকে পাটনা যাচ্ছিলেন। তিনি একটি প্রথম শ্রেণীর বগিতে ভ্রমণ করছিলেন। প্রকাশ, তাঁর কামরায় আর কোন যাত্রী ছিল না। তাঁর দেহে টাকাকড়ি সহ যেসব জিনিসপত্র ছিল তার কিছুই খোয়া যায়নি। তবে তাঁর বিছানা ও কোর্টটি খোয়া যায়।

জনসঙ্ঘের নেতৃবৃন্দ সংগে সংগে এই মৃত্যুকে হত্যাকাণ্ড বলে বর্ণনা করেন। যে পরিস্থিতিতে উপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়েছে সেই পরিস্থিতি বিবেচনা করলেও মনে মনে হবে এই মৃত্যু নিছক দুর্ঘটনার জন্যে হয়নি। ভারত সরকার এই মৃত্যুর কারণ উদ্ঘাটনের জন্যে উচ্চ-পর্যায়ের তদন্তের আদেশ দিয়েছেন।

সোমবার রাত্রে দিল্লীতে যমুনার তীরে করা হয়। এঁর আগে তাঁর দেহ নিয়ে যে শোকযাত্রা বার করা হয়, সাম্প্রতিক কালে এত বড় শোকযাত্রা খুব কমই দেখা গেছে।

মঙ্গলবার জনসঙ্ঘের কার্যনির্বাহক কমিটির সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী লোকসভায় জনসংঘ দলের নেতা শ্রীঅটল-বিহারী বাজপেয়ী দলের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন।



ভিয়েৎনাম

গত ৩১ জানুয়ারী থেকে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে গেরিলারা যে ব্যাপক লড়াই আরম্ভ করেছে তার জের এখনো শেষ হয়নি। ১২ ফেব্রুয়ারী ভিয়েৎকংরা দাবী করে যে, উত্তরাঞ্চলের উয়ে শহরটি এখন সম্পূর্ণরূপে তাদের দখলে।

উয়ের যুদ্ধে উত্তর ভিয়েৎনামের নিয়মিত সৈন্যরাও অংশ নিচ্ছে। ১৫ ফেব্রুয়ারী মার্কিন সপ্তম নৌবহরের যুদ্ধজাহাজ থেকে উয়ে শহরের ওপর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করা হয়, কিন্তু ভিয়েৎকং ও হ্যানয়ের সৈন্যদের সরানো যায়নি। শহরে এখনো ভিয়েৎকং পতাকা উড়ছে।

প্রকাশ, এই প্রচণ্ড সংঘর্ষে শহরের প্রায় ৮০ শতাংশই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। দেয়াল-ঘেরা, প্রাচীন, ঐতিহ্যমণ্ডিত এই শহরের রাস্তায় রাস্তায় শত-শত মৃতদেহ ছড়িয়ে রয়েছে।

এদিকে উত্তর-পশ্চিম কোনায় খে-সানে মার্কিন ঘাঁটির ওপর ভিয়েৎকংদের সামরিক চাপ দিনের পর দিন বাড়ছে। গেরিলারা ক্রমেই ঘাঁটি ঘিরে এগিয়ে আসছে। খে-সানের ভৌগোলিক অবস্থা অনেকটা দিয়েন বিয়েনফুর মত। চারদিকে পাহাড়, মাঝখানে উপত্যকা। ঐ উপত্যকাতেই মার্কিন সামরিক ঘাঁটির অবস্থান। এই গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি থেকে কেবল উত্তর ভিয়েৎনামী সৈন্যদের প্রবেশের পথের ওপরেই নজর রাখা হত না, দক্ষিণ ভিয়েৎনামের উত্তরাঞ্চলের প্রতিরক্ষারও আয়োজন চালানো হত। তার ওপর এই ঘাঁটি দক্ষিণ ভিয়েৎনামের গুরুত্বপূর্ণ ৯নং সড়কের ধারে অবস্থিত হওয়ায় (যে সড়ক উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্বে চলে গিয়েছে) এর গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। যদি খে-সানের ঘাঁটি ভিয়েৎকংদের দখলে চলে যায় তাহলে তারা কেবল উত্তরের একটা ব্যাপক অংশের ওপরেই আধিপত্য বিস্তার করতে পারবে না, গুরুত্বপূর্ণ একটি সড়ক দখল করে আমেরিকাকে গভীরভাবে বিপন্ন করে তুলবে।

মার্কিন কর্তৃপক্ষ খে-সানের জন্য চিন্তিত। প্রকাশ, প্রেসিডেণ্ট জনসন তাঁর জয়েণ্ট চীফস অব স্টাফদের দিয়ে এই মর্মে অঙ্গীকার পত্র লিখিয়ে নিয়েছেন যে, খে-সান রক্ষা করা সম্ভব।

ইতিমধ্যে সায়গনের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এখনও গেরিলাদের প্রাধান্য রয়েছে। রাস্তায় রাস্তায় লড়াই চলছে।

ভিয়েৎকংদের এই তৎপরতার মোকাবিলা আমেরিকা শেষ পর্যন্ত কিভাবে করবে তা এখনও বোঝা যাচ্ছে না। তবে আপাতত মার্কিন কর্তৃপক্ষ আরো সাড়ে ১০ হাজার সৈন্য ভিয়েৎনামে পাঠিয়েছেন।

বৈষয়িক প্রসঙ্গ

দিল্লী সম্মেলনে মতভেদ

নয়াদিল্লীতে রাষ্ট্রসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়ন সম্মেলনে প্রাথমিক বক্তৃতা দিতে উঠে দেশগুলির প্রতিনিধিরা দরিদ্র দেশগুলির জন্য অনেক অশ্রু বিসর্জন করেছেন। পৃথিবীর উন্নত ও উন্নতিশীল দেশগুলির মধ্যে ধর্মবৈষম্য কমা দূরে থাকুক ক্রমশঃ বাড়ছে, এজন্য একজনের পর একজন প্রতিনিধি উঠে মামুলী উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

কিন্তু এখন প্রায় এক পক্ষকালব্যাপী পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের পর যখন সম্মেলনের বিভিন্ন কমিটিতে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হচ্ছে তখন দেখা যাচ্ছে, ধনী দেশগুলি দরিদ্র দেশগুলির প্রতি যে মৌখিক সহানুভূতি দেখাচ্ছে সেই সহানুভূতিকে কোন নির্দিষ্ট সুযোগ সুবিধার আকারে রূপ দেওয়ার ইচ্ছা উন্নত দেশগুলির নেই।

প্রকৃতপক্ষে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আগে থেকেই এই সন্দেহ প্রকাশ করে রেখেছে যে, এই সম্মেলনে সাধারণ আলোচনা হতে পারে; কিন্তু সেখানে কোন সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। দ্বিতীয় উংকটাড সম্মেলনের আলোচনা কতকগুলি মামুলী আপ্তবাক্য উচ্চারণের মধ্য দিয়েই শেষ হতে পারে, একথা অনুমান করেই সম্মেলনের সম্পাদক ডাঃ রাউল প্রেবিসকে বলেছিলেন, এই সম্মেলনে আন্তর্জাতিক ধর্ম-বৈষম্য দূর করার বাস্তব ব্যবস্থা না হলে দারুণ বিপদ দেখা দিতে পারে।

আমেরিকার পক্ষ থেকে আর একটা যুক্তি তুলে বলা হয়েছে যে, পৃথিবীর সবচেয়ে ধনশালী দুটি দেশ বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, দুটিই এখন গভীর আর্থিক সংকটে রয়েছে, সুতরাং ঠিক এই সময়ে পৃথিবীর সম্পন্ন দেশগুলি তাদের অসচ্ছল প্রতিবেশীদের জন্য খুব বেশী কিছু করতে পারবে এমন আশা করা যায় না।

কিন্তু, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সম্মেলনের উদ্বোধন করে ঠিকই বলেছেন, "অগ্রসর দেশগুলির সামনে প্রশ্নটা এই নয় যে, তারা উন্নতিশীল দেশগুলিকে সাহায্য করতে পারবে কিনা, আসল প্রশ্নটা হচ্ছে, উন্নতিশীল দেশগুলিকে তারা সাহায্য না দিয়ে পারবে কিনা।"

"৭৭ রাষ্ট্রের" আলজিয়ার্স সম্মেলনে পৃথিবীর দরিদ্র দেশগুলির দাবী-দাওয়ার যে সনদ গৃহীত হয়েছিল তার মধ্যে একটি দফায় বলা হয়েছিল যে, উন্নতিশীল দেশগুলি থেকে পণ্য আমদানী করার ব্যাপারে উন্নত দেশগুলিকে শুল্ক ছাড় দিতে হবে এবং এই ব্যাপারে কোন বৈষম্য করা চলবে না। নীতিগতভাবে এই প্রস্তাব সব উন্নত দেশই মেনে নিলেও কমিটি পর্যায়ে যখন এই প্রস্তাবের তাৎপর্য আলোচনা করা হচ্ছে তখন দেখা যাচ্ছে, উন্নত দেশগুলি নানা ফ্যাকড়া তুলে প্রস্তাবটি বানচাল করার চেষ্টা করছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, এই ধরনের কোন ব্যবস্থা মেনে নেওয়ার আগে কোন কোন উন্নত দেশ বিশেষ বিশেষ কয়েকটি উন্নতিশীল দেশে নিজেদের উৎপন্ন রপ্তানী করার ব্যাপারে যে বিশেষ সুবিধা ভোগ করে সেই প্রথা রদ হওয়া দরকার। কমনওয়েলথের দেশগুলির সঙ্গে বৃটেনের এবং আফ্রিকার কতকগুলি প্রাক্তন উপনিবেশের সঙ্গে ফ্রান্সের এই ধরনের 'বিপরীত বিশেষাধিকার"-এর ব্যবস্থা আছে। এই ব্যবস্থায় বৃটেন ও ফ্রান্স তাঁদের নিজের নিজের বাজারের মধ্যে পণ্য আমদানী-রপ্তানীর ব্যাপারে পারস্পরিক সুবিধা ভোগ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বক্তব্য হচ্ছে, সে যদি তার দেশে উন্নতিশীল দেশগুলির পণ্যের অবাধ প্রবেশের অধিকার দেয় তাহলে উন্নতিশীল দেশগুলিতে তার নিজের উৎপন্ন পণ্য বিক্রীর সম্পর্কে অন্যান্য উন্নত দেশগুলির সঙ্গে তাদের সমান অধিকার দিতে হবে। কিন্তু কমিটির আলোচনায় ফ্রান্সের প্রতিনিধি জানিয়েছেন, তাঁরা এই বিশেষ অধিকার ছাড়তে প্রস্তুত নন।

আরও একটি বিতর্ক উঠেছে, উন্নতিশীল দেশগুলি থেকে কোন কোন ধরনের পণ্য আমদানীর ব্যাপারে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হবে তা নিয়ে। পশ্চিমের শিল্পের দেশগুলি সাধারণভাবে কৃষিপণ্য আমদানীর ব্যাপারে শুল্ক ছাড় দিতে প্রস্তুত আছে; কিন্তু কৃষিজাত দ্রব্য থেকে প্রস্তুত বা আধা-প্রস্তুত পণ্য রপ্তানীর ব্যাপারে ছাড় দিতে রাজী নয়।

ক্রমাগত এইসব জটিল প্রশ্ন উঠতে থাকায় হতাশ হয়েই চিলির প্রতিনিধি ভ্যালেনজুয়েলা সম্মেলনে বলেছেন, 'আমরা শুধু কতকগুলি অনিশ্চয়তাই দেখতে পাচ্ছি। উন্নত দেশগুলি তাদের নিজেদের গোষ্ঠীর সদস্যদের স্বার্থরক্ষার জন্য কি রকম আগ্রহী তা দেখে চমৎকৃত হতে হয়।'



আলিম্পন-শিল্প

আশীষ বসু

আজকের বাঙলাদেশকে দেখলে সেদিনের বাঙলাদেশের চেহারা অনুমান করা শক্ত। সেদিন সত্যিই বাঙলাদেশ ছিল ধনধান্যে-পুষ্পে ভরা সে-বাংলা ছিল সোনার বাংলা। দিগন্তবিস্তৃত ধানক্ষেত, বর্ষায় ফেঁপে-ওঠা নদী, আকাশজোড়া কালো মেঘ, চারদিকে সবুজের মেলা আর বাঙলাদেশের পল্লীর কুঁড়েঘর-আটচালা, চৌচালা-চৌরি ডিজাইনের. উঠোনে ধানের মরাই, পুকুরে মাছ, গোয়ালে গরু, ক্ষেতে সবুজী। বাইরে আছে ঢেঁকিঘর, সেখানে সব সময়েই ধুপ-ধুপ আওয়াজে ধানকোটা হচ্ছে, বাইরে বাড়ীতে হুঁকোয় সুখের আমেজ শব্দ উঠছে গুড়ুর-গুড়ুর—বাঙলাদেশের সে-চেহারা যিনি দেখেননি, তিনি অনেক কিছু হারালেন। আমাদের দুঃখ উত্তরকালের শিশু জানবে না তার এই দেশকে, তার সংস্কৃতির রূপ তার চোখে আর কোনওদিনই ফুটে উঠবে না।

আলিম্পন বা আলপনা-শিল্পকে বুঝতে গেলে আমাদের ফিরে যেতে হবে সেই পুরনো দিনে। সেই পল্লী-সমাজের সুখ-দুঃখের, আশা-হতাশার, বিরহ-বেদনার চিত্রটি মনের মধ্যে তুলতে হবে ফুটিয়ে। আলপনার কাজ ছিল একান্তভাবেই মেয়েদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আজও তাই আছে। সেই সুখের দিনে পল্লীবালা সকালে উঠে স্বহস্তে গৃহমার্জনা করতেন। স্বামী-পুত্র-সংসারের কল্যাণে উদযাপন করতেন বারো মাসে তেরো পার্বন। দেব-দ্বিজে তাঁর ছিল অসামান্য বিশ্বাস ও ভক্তি। গ্রাম্য-দেবতাগুলির উপর ছিল প্রচণ্ড আস্থা।

ব্রতই ছিল কতো রকমের। নীলের ব্রত ষষ্ঠীর ব্রত, সাঁজসেঁজুতি ব্রত, কুমারী ব্রত, মাঘমণ্ডল ব্রত, অশথপাতা ব্রত, ভাদুলী ব্রত, বারের ব্রত ইত্যাদি কত বিভিন্ন ধরনের ব্রতেরই না প্রচলন ছিল বাঙলাদেশে। এই-সব ব্রত পালনের নিয়মও ছিল খুবই সাধারণ। মেয়েরা সকালে উঠে স্নান করতেন, পরিষ্কার কাপড় পরে পূজাদি করতেন. উপবাস করতেন, ব্রাহ্মণভোজন করাতেন ব্রত সমাপনান্তে। এইসব ব্রতের একটিই মাত্র উদ্দেশ্য ছিল প্রকট আর তা হোল স্বামী-পুত্র-সংসারের জন্য সুখ, শান্তি, ঐশ্বর্য কামনা। ধনে-পুত্রে লক্ষ্মী-লাভ, সংসারের বাড়বাড়ন্ত হওয়ার অভিলাষই রূপ পেতো এই ব্রতগুলি পালন করার মধ্যে।

ব্রত এবং পূজার উপকরণ হিসাবে আলপনার ব্যবহার ঠিক কখন থেকে শুরু হয়েছিল, তার হদিশ দেওয়া শক্ত। পুরাণের নির্দেশিত নানা দেব-দেবীর পূজাতেই আলপনা দেওয়ার কথা আছে, আর তাই থেকেই অনুমান হয়, আলপনা দেওয়ার রীতি বেশ পুরনো। বাঙলাদেশ ছাড়াও দক্ষিণ ভারতে আলপনা দেওয়ার রীতি বেশ উল্লেখজনকভাবেই প্রচলিত রয়েছে। বিবাহাদি সামাজিক অনুষ্ঠানেও মঙ্গলচিহ্ন হিসাবে পিঁড়িতে, সরায় এবং বিবাহ-দেওয়ার স্থানে আলপনা দেওয়ার নিয়ম আছে। এইসব থেকেও মনে হয় এই শিল্প-কাজটি বেশ পুরনো এবং আমাদের সংস্কৃতির সঙ্গে এর বিশেষ যোগ আছে।

গভীর বিশ্বাস এবং ত্রুটিহীন নিপুণতাই ছিল ব্রত উদ্‌যাপনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়। ব্রত উদ্‌যাপনে কোনও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ত্রুটি থাকলে মেয়েরা কিছুতেই খুশি হতে পারতেন না। উপবাস, স্নান, পট্টবস্ত্র পরিধান, ভোগ ও নৈবেদ্য রচনা, দানের জন্য ডালা সাজানো, মাটিতে ঘরভর্তি আলপনা দেওয়া এবং শেষে ব্রতের 'কথা'র আবৃত্তি—এই ছিল মোটামুটি অনুষ্ঠানের চেহারা।

আলপনা প্রায়ই অশিক্ষিত এবং কখনো কখনো হয়তো অপটু হাতেও আঁকা হোত আর এই কারণেই আলপনা-শিল্প লোক-শিল্পের অঙ্গ হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। প্রখর জ্যামিতিক জ্ঞান, পরিমিত ডিজাইন-চেতনা এবং শিল্প-চাতুর্য আলপনার মধ্যে বড় একটা প্রকাশিত হয়নি, তবু কাঁচা-হাতের এই ড্রয়িংগুলির দামও শিল্প হিসাবে মোটেই নগণ্য নয়।

আলপনার মধ্যে সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণীয় দিক হোল তার সাদাসিধে কম্পোজিশন। বেশীর ভাগ আলপনার মধ্যেই দেখা যায় পদ্ম, পদ্মলতা বা নাল, শংখ, শঙ্খলতা, লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ, ধানের গুচ্ছ ও শীষ, হাতী-ঘোড়া, কাকুই, আর্শী, নৌকো-পাল্কী, চাঁদ-সূর্য, পূর্ণকুম্ভ, অলংকারের প্রতিকৃতি, বাক্স-প্যাটরা ইত্যাদি। এসবই মেয়েদের মনের কল্পনা ও আবেগের এক সম্মিলিত প্রকাশ। সেযুগে মেয়েদের কামনা ছিল গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু, নীরোগ স্বামী-পুত্র, ভরাট সংসার। সিঁথির সিঁদুর, হাতের নোয়া অক্ষয় হোক এই ছিল ছোটদের প্রতি বড়দের শুভ-কামনা।





হিন্দুধর্মে পদ্মের একটি বিশেষ স্থান আছে। বিষ্ণু আর সূর্যমূর্তির হাতে আয়ুধরূপে পদ্মকেই কল্পনা করা হয়েছে। তাছাড়া সৌরমণ্ডলের চারিদিকে বিরাজমান পশুপাখী, নদী, পাহাড়, মানুষের জগতের কল্পনাও নানা লোকশিল্পের মাধ্যমে রূপায়িত করা যেতে পারে। প্রাচীনকাল থেকেই শঙ্খকে পুজো করার রেওয়াজ আছে। দক্ষিণ ভারতে কোনও কোনও সম্প্রদায় শঙ্খকে এখনও দেবতা-জ্ঞানে পুজো করে থাকেন। বিশ্ব-সংসারের প্রতীক হিসাবে পদ্ম এবং কেন্দ্রীভূত সূর্য কল্পনা ও তাকে ঘিরে শঙ্খলতা ও জীবজগত এই ভাবেই নকসায় ধরা হয়ে থাকে। শঙ্খলতা শাদা, অতএব শুভ্রতা বা শুচিতার প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

ব্রত-উদ্‌যাপন এবং সেই ব্রত-উদ্‌যাপনের মাধ্যম হিসাবে আলপনার ব্যবহার সেই পুরনো বিশ্বাস বা ম্যাজিকের থিয়োরীর উপরেই প্রতিষ্ঠিত। যা চাই তাকে যেন পাই আর সেই পাওয়ার জন্য যে-চেষ্টা তাই এই বিশ্বাস বা ম্যাজিক থিয়োরীর মূল কথা। আলপনার পূর্ণকুম্ভ সংসারের পূর্ণকুম্ভ হয়ে উঠুক তারই জন্য ব্রত-কথা। তারই জন্য আলপনা। ঘটে, পটে, সরায়, বাড়ীর মেঝের, উঠোনে, রোয়াকে সেই ইচ্ছারই অভিব্যক্তি আলপনার মাধ্যমে। উত্তর ভারতে ঘরের দেওয়ালে আলপনা দেওয়ার মধ্যেও এই ইচ্ছারই প্রকাশ। আধি-ভৌতিক শক্তির সাধনা ও তার সাহায্যে সিদ্ধিলাভ এইটিই আসল কথা। লোক-শিল্পের উৎপত্তি, প্রচার ও প্রসারও এই বিশ্বাসকে কেন্দ্র করেই পরিচালিত হয়েছে।

ব্রতের বিকল্প বা তার কাছাকাছি অনুষ্ঠানের উদ্‌যাপনের রেওয়াজ সারা ভারতবর্ষে থাকলেও, বাঙলার মেয়েদের ব্রত-পালনের একটা নিজস্ব রীতি-প্রকৃতি আছে যা আর কোথাও বড়ো একটা চোখে পড়ে না। লক্ষ্মীর পুজো, সরস্বতীর পুজোতে আলপনা দেওয়া আজও অনেক বাড়ীতেই চোখে পড়ে। লক্ষ্মী ধন ও ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, এছাড়াও বাঙলাদেশে খুবই জনপ্রিয় ছিল তোষলা ব্রত। তোষলা ব্রত ছিল জমিকে আরও বেশী শস্য দেওয়ার জন্য উপাসনা করার মতো। বসুধারা ব্রত পালন করে মেঘরাজাকে ডাকা হোত, তাকে বলা হোত এবার যেন ভালো বৃষ্টি হয়। ক্ষেতে ক্ষেতে যেন ডাক দিয়ে যায় নবীন ধানের আমন্ত্রণ। সূর্যের উদ্দেশে উদ্‌যাপন করা হোত মাঘমণ্ডল ব্রত। এই-সব ব্রতে কোনও ব্রাহ্মণ-পুরোহিত পূজারীর প্রয়োজন ছিল না। চালের গুঁড়োকে ভেজানো পিটুলী গোলা দিয়েই আলপনা আঁকা হয়ে থাকে শুধু হাতে আঙুলের সাহায্যে। একটুকরো ন্যাকড়ার মধ্যে কখনো কিছু অপেক্ষাকৃত শক্ত পিটুলী জড়িয়ে নেওয়া হয়ে থাকে তাড়াতাড়ি কাজের জন্য। বাঙলাদেশে এককালে যে চালের প্রাচুর্য ছিল, আলপনা-শিল্পে পিটুলী-গোলার ব্যবহার থেকেই তা বোঝা যায়। দুধে-ভাতে বাঙালীর সন্তান যে একদিন বড়ো হয়ে উঠেছে তা বোঝা যায় বাঙালী পুরনারীর ভাদুলী-ব্রতের কল্পনায়। ভাদুলী-ব্রত পালন করা হোত গোয়াল-ভরা গরুর কামনায়।

সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙলাদেশের চেহারা গেছে পালটিয়ে। যুদ্ধ, দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ সর্বোপরি দেশভাগের ধাক্কাঘাতে বাঙালীর অর্থনৈতিক বুনিয়াদ গেছে ভেঙে আর সেই সঙ্গে মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনেও এসেছে একটা বিরাট পরিবর্তন। ব্রতগুলি উদ্‌যাপন শহরের মানুষের কাছে আজ আর কোনও আবেদন বয়ে আনে না। অনেক স্থলে তা প্রহসনের পাত্র মাত্র।

ব্রতগুলির সংরক্ষণে এবং আলপনা-শিল্পকে নতুন সামাজিক স্বীকৃতি [illegible] দেওয়ার প্রকাশ্য চেষ্টা হয় [illegible] তার প্রাতঃস্মরণীয় অবনীন্দ্রনাথের ছাত্রের [illegible]। অবনীন্দ্রনাথের চেষ্টায় আলপনা ডিজাইন-গুলির একটি সংগ্রহ প্রকাশের চেষ্টা হয়। ১৯১৭ সালে কলকাতার জোড়াসাঁকোর বিচিত্রা স্কুল অব আর্টসে আলিম্পন-শিল্পকে অবশ্যকরণীয় পাঠ্যসূচীর তালিকা-ভুক্ত করা থাকে। এপ্রসঙ্গে নন্দলাল বসুর দানও কম নয়। ১৯১৯ সালে শান্তি-নিকেতনে প্রধানত নন্দলালের চেষ্টাতেই কলাভবনে নিয়মিতভাবে আলপনা শেখানোর কাজ শুরু হয়। এ-কাজে সুকুমারী দেবীর নামও অবশ্য-স্মরণীয়। নন্দলালের চিন্তাকে তিনিই কার্যে রূপায়িত করেছেন বলা চলে। আলপনা-শিল্পের পুনরুদ্ধারে শান্তি-নিকেতন বিদ্যালয়ের বাৎসরিক অনুষ্ঠানের মণ্ডসজ্জায় আলপনা আঁকা হতে থাকে। আলপনার ঢংয়ে মোজাইকে করা নন্দলাল বসুর হলকর্ষণের চিত্রটি শান্তিনিকেতনের গৌরব বৃদ্ধি করেছে। বৃক্ষরোপণ, হল-কর্ষণ, শিল্পোৎসব, জন্মোৎসব, এমনকি সমাবর্তন উৎসবেও আলপনাকে নানাভাবে কাজে লাগাবার চেষ্টা শান্তিনিকেতনে হয়েছে। তাই আলপনা সম্পর্কে কোনও আলোচনায় এই প্রসঙ্গটুকুর উত্থাপনা না করলে আলোচনা অসম্পূর্ণ রয়েছে বলে মনে হতে পারে।

আলপনার প্রচলিত ডিজাইনগুলিকে আজকাল অবশ্য নানাভাবে ভেঙেচুরে বাটিকের কাজে, কাপড়-ছাপাইয়ের নকসার কাজে, এম্ব্রয়ডারীর কাজে, নকসী-চামড়ার কাজে ইত্যাদিতে লাগাতে দেখা যাচ্ছে। (সঙ্গে প্রকাশিত আলপনার ডিজাইনগুলি চিত্রাংশু ইনস্টিটিউট অব আর্ট অ্যাণ্ড হ্যাণ্ডিক্রাফট্‌সের সৌজন্যে প্রাপ্ত)।



গৌরাঙ্গ পরিজন

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

(৬৮)

প্রকাশানন্দ সরস্বতী

(ক)

কাশীবাসী মায়াবাদী সন্ন্যাসী। প্রভূত প্রতাপ ও প্রতিপত্তিশালী। কয়েক হাজার শিষ্যের গুরু।

বৃন্দাবনের পথে কাশীতে এসেছেন গৌরাঙ্গ। উঠেছেন তপন মিশ্রের বাড়িতে।

এক মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ এসে উপস্থিত হল। প্রভুর রূপ আর প্রেম দেখে চমৎকার মানল।

সোজা চলে গেল প্রকাশানন্দের কাছে। তাকে এ খবর না দিলেই নয়।

প্রকাশানন্দ শিষ্যদের বেদান্ত পড়াচ্ছে, ব্রাহ্মণ এসে বললে, শুদ্ধ কাঞ্চনবর্ণ এক সন্ন্যাসী দেখে এলাম। প্রকাণ্ড শরীর আজানুলম্বিত বাহু, কমলনেত্র, সর্ব অঙ্গে ঈশ্বরের সংলক্ষণ। নরদেহে নারায়ণ বলে মনে হয়। আর এমন অদ্ভুত, যে তাকে দেখে সেই কৃষ্ণ-কীর্তন সুরু করে।

প্রকাশানন্দ অবজ্ঞার হাসি হাসল।

ব্রাহ্মণ আরো বললে মহাভাগবতের সমস্ত লক্ষণ তার অঙ্গে পরিস্ফুট। তার মুখে নিরন্তর কৃষ্ণনাম, দুই চোখে নিরন্তর অশ্রু। কখনো হাসেন, নৃত্য করেন, কখনো বা রোদন করেন আর্তস্বরে। আবার কখনো বা সিংহের মত হুঙ্কার করে ওঠেন। নাম শুনেছো? নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

শুনেছি। প্রকাশানন্দ উপহাস করে উঠল: গৌড়দেশে নতুন এক ভাবুক সন্ন্যাসী উঠেছে। কিন্তু আসলে সে প্রতারক। চৈতন্য নাম ধরে দেশে-দেশে লোক নাচিয়ে বেড়াচ্ছে। কেশব ভারতীর শিষ্য বলে শুনেছি। কিন্তু তার আসল বিদ্যা সম্মোহন-বিদ্যা, তারই প্রভাবে যে তাকে দেখে সেই মুগ্ধ হয়, তাকে ঈশ্বর বলে বিবেচনা করে।

বলো কী! অদ্বৈত বেদান্তে মহাপণ্ডিত সার্বভৌম ভট্টাচার্য পর্যন্ত বশীভূত হয়েছেন। মায়াবাদ ছেড়ে ভক্তিপথ ধরেছেন।

সার্বভৌম পাগল হয়েছে বলে তোমার চৈতন্য মহৎ হয় না। প্রকাশানন্দ শাসন করলে উচ্চঃ কাশীপুরে তার ভাবকালি বিকোবে না। ঐ প্রতারকের কাছে যেও না, এখানে বসে বেদান্ত শোনো।

ব্রাহ্মণ সেখানে আর বসতে পারল না। কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলে উঠে পড়ল।

শেষ পর্যন্ত প্রকাশানন্দ প্রভুকে উচ্ছৃঙ্খল বললে।

উচ্ছৃঙ্খল নিন্দার্থে স্বেচ্ছাচারী। কিন্তু প্রশংসার্থে অ-পরতন্ত্র, স্বেচ্ছাধীন। ভগবানই তো স্বতন্ত্র সর্বস্বাধীন। সেই অর্থে প্রভু উচ্ছৃঙ্খল নয় তো কী।

ব্রাহ্মণ প্রভুর কাছে গিয়ে প্রকাশানন্দের কথা বললে। বললে, আপনার নিন্দা করবার উদ্দেশে আপনার নাম বলতে গিয়ে 'চৈতন্য' বললে, কৃষ্ণচৈতন্য বললে না। তিনতিনবার চৈতন্য উচ্চারণ করল কিন্তু একবারও কৃষ্ণনাম তার মুখে এল না। কিন্তু তোমাকে দেখামাত্র আমার মুখে কেবলই কৃষ্ণ-কৃষ্ণ আসছে। এর কারণ কী?

ও যে মায়াবাদী, কৃষ্ণে অপরাধী। বললেন প্রভু, ওর মুখে কৃষ্ণনাম আসবে না। ও কেবল ব্রহ্ম আত্মা চৈতন্য বলে। কৃষ্ণ আর কৃষ্ণনাম এক বস্তু। যার মুখে ... তার ... নামস্ফুরণ হবে না ... নাম নামী আর বিগ্রহ তিনই এক, তিনই চিন্ময়। প্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারা তা গ্রাহ্য নয়। তাই ব্রহ্মজ্ঞানীর লীলাবিলাসের আনন্দে অধিকার নেই। ব্রহ্মানন্দের চেয়ে কৃষ্ণলীলার আস্বাদনে আনন্দ বেশি। কিন্তু তোমায় বলি ভাগবতের শক্তি এত প্রবল যে ব্রহ্মজ্ঞানীকেও আকর্ষণ করে আনন্দ দেয় ... তোলে।

বুঝেছি বারাণসীতে এসেও প্রকাশানন্দের মুখে কৃষ্ণনাম এল না।

আমি এসে তবে কী করব! বললেন প্রভু, আমার ভাবকালির গ্রাহক নেই। এখানে আমার ভাব বেচবার স্থান নেই। ভারী বোঝা নিয়ে এসেছিলাম, সেই ভারী বোঝা বয়ে নিয়েই আমাকে ফিরে যেতে হবে। কিন্তু যদি অল্পসল্প দাম পেতাম এখানেই বেচে যেতাম।

ব্রাহ্মণ শুধু ভাবছে কোনো উপায়ে যদি প্রভুকে একবার মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের সামনে নিয়ে যেতে পারতাম! ভগবান কি কৃপা করে সেই সুযোগ এনে দেবেন না? যদি ওদের প্রভুসাক্ষাৎ না হয়, ওরা তবে চিরদিনই প্রভুর নিন্দে করে বেড়াবে। তা হলে আমার কাশীবাস তো অনন্ত যন্ত্রণা!

মথুরা থেকে প্রভু যখন কাশীতে ফিরলেন তখন চন্দ্রশেখর আর তপন তাঁকে বললে, প্রভু, মায়াবাদীদের মুখে তোমার নিন্দা আর শুনতে পারি না। বলে, বেদান্ত পড়ে না, শুধু ভাবের বন্যায় ভাসে। সন্ন্যাসী কখনো নৃত্য-গীতে মত্ত হয় এমন কথা তো শুনিনি।

প্রভু হাসলেন। নিন্দা-অপবাদ গ্রাহ্য করলেন না। প্রতিবাদ নেই, মনক্ষোভ নেই। উদাসীন হয়ে বসে রইলেন।

কিন্তু ভক্তদুঃখের খণ্ডন করবেন তো? তাঁর নিন্দা শুনে ভক্তদের যে দুঃখ হচ্ছে, হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে তার প্রতিকার কোথায়?

মহারাষ্ট্রী বিপ্র প্রভুর চরণে এসে নিবেদন করলো: আপনার কাছে এক বস্তু ভিক্ষা করতে এসেছি।

জানি তো, আপনি সন্ন্যাসী সঙ্গ করেন না, তবু আমি প্রার্থনা করছি আমার বাড়িতে একবার চলুন।

তোমার বাড়িতে কী?

নিমন্ত্রণ। আপনাকে নিমন্ত্রণ করতে এসেছি।

প্রভু হেসে জিজ্ঞেস করলেন, সেখানে কাশীবাসীরাও আসবে বুঝি?

হ্যাঁ, তাদেরও নিমন্ত্রণ করেছি। ব্রাহ্মণ কাতরকণ্ঠে বললে, শুধু তোমার কৃপার উপর নির্ভর করে তাদের ডেকেছি। কৃপা করে তুমিও রাজি হও। একবার ওরা তোমাকে দেখুক। তোমার করুণায় ওরাও উদ্ধার হোক।

প্রভু রাজি হলেন। বললেন, চলো।

নিতান্ত রুক্ষ সন্ন্যাসীদের কৃপা করবেন তাই তাঁর এই ভঙ্গি।

নির্ধারিত দিনে প্রভু ব্রাহ্মণের ঘরে উপস্থিত হলেন। দেখলেন সন্ন্যাসীরা আগে থেকেই সমবেত হয়েছে। প্রকাশানন্দকে মাঝে নিয়ে বসেছে গোল হয়ে। সবাই এক-একজন গর্বের পর্বত।

প্রভু দূর থেকে সন্ন্যাসীদের নমস্কার করলেন এবং পা ধুয়ে সেই পা-ধোয়ার জায়গাতেই বসে পড়লেন।



সিদ্ধেশ্বরী মন্দির (বরাকর)　　　ফটো : শ্যামাপদ চট্টোপাধ্যায়

সন্ন্যাসীরা তাঁকে দেখেও দেখল না। অভ্যর্থনা করল না।

প্রভু ভাবলেন, একটু ঐশ্বর্য প্রকাশ করা যাক। নইলে ওদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে না।

প্রভুর অংগ তেজোময় হয়ে উঠল. আলো হয়ে গেল চারদিক।

সন্ন্যাসীরা আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। দলপতি প্রকাশানন্দ এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলে, শ্রীপাদ, আপনি ঐ অপবিত্র স্থানে, ঐ পা-ধোবার জায়গায় বসে আছেন কেন? আপনার কিসের দুঃখ?

প্রভু বললেন, আমি হীন সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস নিয়েছি. আপনাদের সভায় বসতে আমার যোগ্যতা নেই।

প্রকাশানন্দ প্রভুর হাত ধরে সসম্মানে সভায় এনে বসাল। জিজ্ঞেস করল, আপনিই কি কেশব ভারতীর শিষ্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য?

প্রভুকে দেখামাত্রই প্রকাশানন্দের মধ্যে কিছু ভাবান্তর ঘটল বোধহয়। প্রকাশানন্দ বললে, শত হলেও তুমি তো সন্ন্যাসীই, আছও এই কাশীতে, তবে আমাদের সঙ্গ কর না কেন? আর সন্ন্যাসী হয়ে নাচ-গান করা কি শোভা পায়? সন্ন্যাসীর ধর্ম হচ্ছে ধ্যান আর বেদান্ত পাঠ. তা না করে ভাবুকের আচরণ করো কেন? তোমার ঐশ্বর্য দেখে মনে হয় তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণ, কিন্তু এই হীনাচার করার অর্থ কী?

প্রভু নম্রস্বরে বললেন, আমি মূর্খ, আমার গুরুদেব আমাকে শাসন করে বললেন, তোমার বেদান্তে অধিকার নেই, তুমি শুধু কৃষ্ণমন্ত্র জপ করো। এই কৃষ্ণমন্ত্রই সমস্ত বেদান্তের সার।

কৃষ্ণমন্ত্র?

হ্যাঁ, কৃষ্ণমন্ত্রেই সংসারমোচন, কৃষ্ণমন্ত্রেই কৃষ্ণচরণপ্রাপ্তি। কলিকালে এই কৃষ্ণনাম ছাড়া আর ধর্ম নেই। কৃষ্ণনামই সমস্ত মন্ত্রের সার। বলে গুরু আমাকে একটি শ্লোক শিখিয়ে দিয়েছেন। সেই শ্লোকটি শুনবে?

কী শ্লোক?

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা। কলিকালে অন্য গতি নেই. হরিনামই একমাত্র গতি। প্রভু বললেন গাঢ় স্বরে, গুরুর আদেশে তাই অনুক্ষণ নাম নিচ্ছি। নাম নিতে নিতে অন্য বিষয়ে আমার ভ্রান্তি জন্মেছে। পাগলের মত হয়ে গিয়েছি। শুধু হাসি কাঁদি নাচি গাই, আমার সমস্ত জ্ঞান কৃষ্ণনামে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে। গুরুদেবকে অবস্থার কথা বললে তিনি বললেন, না, তুমি পাগল হওনি, কৃষ্ণনামের ফল যে প্রেম তুমি সেই প্রেম লাভ করেছ। এই প্রেমই পরম পুরুষার্থ। আমার উপদেশ সফল হয়েছে, আমি কৃতার্থ হয়েছি। তুমি আরো নাচো গাও, ভক্তসঙ্গে কীর্তন করো, উদ্ধার করো সকলকে। গুরুবাক্যে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তাই আমি অহর্নিশ কীর্তন করে বেড়াই। কৃষ্ণনামের আনন্দসিন্ধুর কাছে ব্রহ্মানন্দ গোষ্পদতুল্য।

প্রভুর মধুর কথা শুনে সন্ন্যাসীদের মন ফিরে গেল। কিন্তু প্রকাশানন্দ টলল না। বললে, তোমার প্রেমলাভ হয়েছে সে তো ভালো কথা, কিন্তু বেদান্তকে বাদ দাও কেন? নিজে পড়ে কিছু না বোঝো তো আমাদের কাছে এসেও শুনতে পারো। বেদান্ত শুনতে দোষ কী!

প্রভু মৃদু হাসলেন, বললেন, যদি অপরাধ না নাও, তবে কিছু বলি নিবেদন।

বলো। সন্ন্যাসীরা আকুল হয়ে উঠল: তোমার কথা শুনে মন-প্রাণ স্নিগ্ধ হয়, তোমার মাধুরীতে নয়ন সন্তোষ মানে। তোমার কথা অসঙ্গত হবে না।

প্রভু বললেন, বেদান্তসূত্র তো ঈশ্বরেরই বাক্য। নারায়ণই তো বেদব্যাস-রূপে এ ব্যক্ত করেছেন। তাই এর পঠনে-শ্রবণে দোষ নেই। আর ঈশ্বরের বাক্যে কোনো ভ্রম প্রমাদ নেই, নেই বিপ্রলিপ্সা বা বঞ্চনা করবার ইচ্ছা। না বা করণাপাটব বা ইন্দ্রিয়ের অপটুতা। নেই শাস্ত্রকে চলতে দেখবার দোষ-দৃষ্টি। মুখ্য অর্থ করুন বেদান্ত ঠিক আছে, গৌণার্থেই বড় অসংগতি।

কেন, ব্যাখ্যা করুন।

সেব্য-সেবকের ভাবই ভক্তিমার্গের মূল। জীব আর ব্রহ্মে যদি অভেদ হয় তবে কে সেবক কে বা সেব্য, ভক্তি আর সেখানে দাঁড়াতে পারে না। শঙ্করাচার্য তো জীব আর ব্রহ্মের অভেদই প্রতিষ্ঠা করেছেন, তা হলে ভক্তি আর রইল কোথায়? তবে শঙ্করের দোষ নেই, তিনি ঈশ্বরের আদেশেই মুখ্য অর্থকে গৌণার্থ দিয়ে আচ্ছন্ন করেছেন।

ঈশ্বরের আদেশে।

ভগবান মহাদেবকে আদেশ করলেন, স্বকল্পিত আগমশাস্ত্র দিয়ে মানুষকে তুমি আমার থেকে বিমুখ করো। আমাকে গোপন করো। সবাই যদি ভগবৎ-উন্মুখ হয় সৃষ্টি লোপ পাবে। শঙ্কর নিজেই তো মহাদেব। মহাদেব তাই মায়াবাদ রচনা করে ঈশ্বরের প্রকৃত তত্ত্ব গোপন করলেন। নইলে ধরুন ব্রহ্ম শব্দের মুখ্য অর্থ কী?

আপনিই বলুন।

ব্রহ্ম অর্থ যিনি নিজে বড় হন ও যিনি অন্যকেও বড় করেন। বললেন প্রভু, তাই তিনি সর্বশক্তিমান। শক্তি না থাকলে অন্যকে বড় করবেন কী করে? সর্ববৃহত্তর যে তত্ত্ব তাই ব্রহ্ম। তাঁর অসীমত্ব সব দিকে, স্বরূপে, শক্তিতে, প্রকাশবৈচিত্র্যে। বৃহত্তমতাকে কী বলবেন? নিশ্চয়ই এটা গুণ। তাহলে ব্রহ্ম সগুণ, সবিশেষ। সচ্চিদানন্দময়। এ হেন ব্রহ্মকে শঙ্কর নিরাকার বলেন কী করে? ভগবান অর্থই বিগ্রহময় বস্তু। শুধু উপাসনার সুবিধের জন্যেই রূপকল্পনা করা হয়নি—ব্রহ্মই নিত্যরূপ, সত্যরূপ, আনন্দরূপ।

কিন্তু তার্কিকেরা প্রশ্ন করল, শ্রুতি তো নিরাকার ব্রহ্মের কথা বলেছে, তা কি মিথ্যে?

না, সাকার ব্রহ্ম যেমন সত্য, নিরাকার ব্রহ্মও তেমনি সত্য। শক্তির অল্পতম বিকাশেই সাকার, ন্যূনতম বিকাশেই নিরাকার।

তা হলে দাঁড়াল কী?

দাঁড়াল, শঙ্করের গৌণার্থে ব্রহ্ম নিরাকার, নির্বিশেষ, শক্তিশূন্য। তাঁর ধাম নেই, লীলা নেই, পরিকর নেই, এক তিল ঐশ্বর্য নেই।

আর আপনার মতে?

মুখ্যার্থে ব্রহ্ম সাকার, সবিশেষ সর্বশক্তিমান। তাঁর ধাম আছে, লীলা আছে, পরিকর আছে। ঐশ্বর্যের অনন্ততা আছে।

আর?

আর শঙ্কর বলছেন, সাকার ভগবান প্রাকৃত সত্ত্বের বিকার। তাঁর মতে ভগবান মায়িক উপাধিবিশিষ্ট। যিনি নিজে মায়াময় তিনি অন্যকে কী করে মায়ামুক্ত করবেন? নিজে শৃঙ্খলিত হয়ে কি অন্যকে শৃঙ্খলমুক্ত করা যায়? যে প্রাকৃত সত্ত্বের বিকার সে তো সৃষ্ট বস্তু আর সৃষ্ট বস্তুমাত্রই ধ্বংসশীল। তা হলে ঈশ্বরও অনিত্য হয়ে দাঁড়ান। এই সিদ্ধান্ত শ্রুতি-বিরোধী। কেন না শ্রুতি বলছে ঈশ্বর নিত্য, অনিত্যের মধ্যে নিত্য, নিত্যোনিত্যানাম। ভগবানের দেহকে প্রাকৃত সত্ত্বের বিকার বলে মানা চরমতম বিষ্ণুনিন্দা।

কিন্তু জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে কী বলবেন?

ঈশ্বর যদি প্রজ্বলিত অগ্নি, জীব তার স্ফুলিঙ্গের কণা। বললেন প্রভু, চৈতন্যে বা স্বরূপে দুই অভেদ, কিন্তু পরিমাণে ভিন্ন—ঈশ্বর বিভু-বস্তু, জীব অণু-বস্তু। বিভু অণু হতে পারে কিন্তু অণু বিভু হতে পারে না। দুই-ই চিদ্বস্তু বলে এরা আবার বিভুতে-অণুতে ভিন্ন। ভেদ আর অভেদ একসঙ্গে। তেমনি জীবে-ব্রহ্মেও অভেদ থেকেও ভেদ আছে। যদি ভেদের কথা ভুলে যাই, তাহলে জীবের মনে হবে শক্তি-সামর্থ্যে আমি ঈশ্বরেরই সমতুল। ঈশ্বর যা করতে পারেন আমিও তা করতে পারি। এই ভাব ঈশ্বরমহত্ত্বকে খর্ব করে। সিন্ধু কি বিন্দুরূপে পরিচিত হবার যোগ্য? সে পরিচয়ে সিন্ধুর গৌরবের হানি হয়। তাই জীব ব্রহ্ম নয়, ব্রহ্ম হতে পারে না।

আর জগৎ? তার্কিকেরা প্রশ্ন করল।

শঙ্কর বলছেন, জগৎ ব্রহ্মের পরিণতি নয়। জগৎ ব্রহ্মে ভ্রমমাত্র যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম। এটা গৌণার্থ। কিন্তু মুখ্যার্থে, যেটা আমি বলতে চাচ্ছি—জগৎ ব্রহ্মেরই পরিণাম। ঘট যেমন মৃত্তিকার পরিণাম।

তার্কিকেরা বললে, পরিণামবাদ যদি স্বীকার করেন, তাহলে ব্রহ্মকে বিকার্য বা বিকারশীল বলে মানতে হয়। কিন্তু আসলে ব্রহ্ম অবিকৃত। সুতরাং এ জগৎ ব্রহ্মে ভ্রমমাত্র—যেমন শুক্তিতে রৌপ্যভ্রম মরুভূমিতে মরীচিকাভ্রম। তার মানে ব্রহ্মকেই আমরা জগৎ বলে ভ্রম করছি। এই ভ্রমবাদই আমাদের বিবর্তবাদ।

তার অর্থ বিবর্তবাদে এ জগৎ মিথ্যা, বাস্তবসত্তাহীন। বললেন প্রভু, কিন্তু ভেবে দেখুন, দেহে আত্মবুদ্ধির জন্যেই এই বিবর্ত। অনাত্মদেহে আত্মভ্রমই বিবর্ত। আসলে ভগবান স্বেচ্ছায় জগৎরূপে পরিণত হয়েও আবার অবিকারী। কারু আদেশে-অনুরোধে বা কোনো কর্মবশে ঈশ্বরের কার্য নয়, তাঁর ইচ্ছাই জগৎরূপে পরিস্ফুর্ত, এবং জগৎ হয়েও তিনি যে তিনি সেই তিনিই থেকে যাচ্ছেন। এতে আশ্চর্য হবার কী আছে?

তত্ত্বমসি সম্বন্ধে কী বলবেন?

প্রভু বললেন, শঙ্করের মতে তত্ত্বমসিই মহাবাক্য। তত্ত্বমসি তো বেদের এক পরিচ্ছেদে একটি বাক্যমাত্র, তা প্রণবের মত বিশ্বব্যাপী নয়। একমাত্র প্রণবই মহাবাক্য।

প্রণব?

হ্যাঁ, প্রণবই ওঙ্কার আর ওঙ্কারই ব্রহ্ম। দৃশ্যমান জগৎও ওঙ্কার, অদৃশ্যমান জগৎও ওঙ্কার। ওঙ্কারই সর্বাশ্রয়, সর্বব্যাপক। বেদেরও উৎপত্তি এই প্রণব থেকে। আর তারই একটি উক্তি তত্ত্বমসি। তত্ত্বমসির অর্থ তো তুমি ব্রহ্ম নও—অর্থ, তুমি ব্রহ্মের। দেহাত্মবিশিষ্ট জীব নিজেকেই ঈশ্বর মনে করে আর উপাসনা করতে চায় না—কিন্তু তুমি যদি ব্রহ্মের হও তবে উপাসনা তোমার অবশ্য কর্তব্য। সহজ অর্থ ছেড়ে গৌণার্থ ব্যাখ্যা করেই যত অনর্থের সূত্রপাত। প্রভু তাকালেন সকলের দিকে।

সন্ন্যাসীরা বিস্ময় মানল। বললে, তুমি যে গৌণার্থ খণ্ডন করলে তাতে প্রতিবাদ করবার কিছু নেই। শুধু সাম্প্রদায়িকতার খাতিরেই আমরা শংকরের ব্যাখ্যাকে মর্যাদা দিই।

কিন্তু প্রকাশানন্দ সহজে হটবার পাত্র নয়। তার মতে নির্বিশেষ ব্রহ্মই শ্রুতিসম্মত। তার উপলব্ধির জন্যে একমাত্র জ্ঞানযোগই প্রশস্ত। প্রভু দেখালেন সবিশেষ ব্রহ্মবাদ ও ভগবানের উপাসনাও শ্রুতি-স্মৃতিসম্মত। আর কলিকালে সংসারজয় সন্ন্যাসে নয়, একমাত্র হরিনামে, ভক্তিতে। 'কলিকালে সন্ন্যাসে সংসার নাহি জিনি।'

এই বাঙালি ভাবুক সন্ন্যাসী বলে

ভ্রম-সংশোধন

৩৯শ সংখ্যার ২ পৃষ্ঠায় "গৌরাঙ্গ-পরিজন-প্রসঙ্গে লেখকের বক্তব্য" শীর্ষক চিঠির প্রথম ছত্রে 'নিত্যানন্দ প্রভুর ভালো নাম"-এর স্থলে "নিত্যানন্দ প্রভুর পিতার ভালো নাম" পড়তে হবে।

ঐ সংখ্যার ৩১ পৃষ্ঠায় গৌরাঙ্গ-পরিজনের নাম 'সনাতন গাঙ্গুলী'র স্থলে "সনাতন গোস্বামী" পড়তে হবে।

রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা

ষষ্ঠ বর্ষ প্রথম সংখ্যা । মাঘ-চৈত্র ১৩৭৪

সম্পাদক ঃ রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

লেখকসূচী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (চিঠিপত্র), হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় (রবীন্দ্র-শিল্পতত্ত্ব), সমীরণচন্দ্র চক্রবর্তী (ঋগ্বেদে বৈদিক যজ্ঞের নিদর্শন), যতীন্দ্রমোহন দত্ত (কালকেতুর উপাখ্যান কবিকল্পনা না জনশ্রুতির অনুসরণ?) প্রফুল্লকুমার গুহ (নাটক ও নাটকের মূল্যায়ন), রণজিৎ সেন (ওয়াল্ট হুইটম্যান), সাধনকুমার ভট্টাচার্য (অধিকারতত্ত্ব), কালিদাস দত্ত (বৈদিক ভারতের লোকায়তিক মতবাদ), সুখরঞ্জন রায় (কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের কাব্যবিচার), কালিদাস রায় (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'মন্দ্র'). অমলেন্দু মিত্র (রাঢ়ে ধর্মপূজা), হেরম্ব চক্রবর্তী, কালীকুমার দত্ত ও অজিতকুমার ঘোষ (গ্রন্থসমালোচনা)।

চিত্রসূচী । অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (হারুন-অল্-রসিদ ও উপটোকন)

ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্র। প্রতি সংখ্যা এক টাকা। পুরাতন সংখ্যাও পাওয়া যায়। বার্ষিক চাঁদা। চার টাকা (হাতে ও সাধারণ ডাকে), সাত টাকা (রে[illegible]ডাকে)

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। ৬/৪, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, [illegible] ৭

নামের সার্থকতা

"আমাদের কাজ তো শুধু কলকাতায় নয় যে, আপনাকে সব দেখাতে পারব—" বললেন শ্রীমতী সুশীলা সিংহী। "আমাদের কাজ চলছে অনেকখানি জায়গা জুড়ে। এই ঘরে," বলে ৮ নং গভর্ণমেন্ট প্লেসের অফিসঘরখানির চারিদিকটা দেখিয়ে বললেন, "এইসব দেয়ালজোড়া পুরোন আলমারীতে সেই কাজের নিদর্শন কিছু-কিছু আছে।" বলছিলেন মহিলা সেবা-সমিতির সম্পাদিকা শ্রীমতী সুশীলা সিংহী।

তাঁর নির্দেশ মত একটি মেয়ে এসে আলমারীর মধ্যে রাখা খদ্দরের নানা রকম ডিজাইন করা বেডকভার ও চাদর, ব্লাউসপীস, ঝাড়ন, টেবিলম্যাট, খেশ প্রভৃতি আমাকে দেখাতে লাগল।

"এছাড়া খদ্দরের শাড়ি ও ধুতিও আমরা অল্প-স্বল্প করে থাকি" তিনি বলে চললেন, "আর এ সবই বিক্রীর জন্যে। আমাদের মেয়েরাই এ সমস্ত বানিয়েছে। দশটা থেকে পাঁচটা হল আমাদের প্রতিটি কেন্দ্রের বিক্রীর জন্য নির্ধারিত সময়।"

ইতিমধ্যে সমিতির সভানেত্রী শ্রীমতী অশোকা গুপ্তা এসে পড়লেন। তিনি আমার দিকে চেয়ে বললেন—"পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন রাজ্যপাল ডাঃ কাটজু আমাদের এই সমিতি স্থাপন করেন রাজভবনের মধ্যেই। সেটা ছিল ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাস, দেশবিভাগের অনতিকাল পরেই। তিনি এটার নাম দিলেন, 'ইমারজেন্সী রিলিফ কমিটি'। সব রকম দুর্ঘটনায় সাহায্য করাই হচ্ছে আমাদের মৌলিক উদ্দেশ্য। তবে সেই সময় দেশ-বিভাগের ফলে যেসব উদ্বাস্তু দলে-দলে এসে পশ্চিমবঙ্গে জড়ো হচ্ছিল, প্রধানতঃ তাদের মুখ চেয়েই তিনি এই সমিতি আরম্ভ করেন।"

উদ্বাস্তুদের জন্য এরা যা করেছে তা প্রায় অসাধ্য সাধন। শুধু যে কলিকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে এরা রিফিউজী মেয়েদের রাজভবনে নিয়ে আসত তা নয়, সুদূর মফস্বলে ও গ্রামেও এরা চরকা নিয়ে গিয়েছে। উদ্বাস্তুদের ক্যাম্প ও কলোনীতে গিয়ে সেখানকার মেয়েদের দিয়ে সুতো কাটিয়ে হাজার হাজার পরিবারকে এরা অনশন ও ভিক্ষার হাত থেকে বাঁচিয়েছে।

এখনও এরা সেই কাজই করছে, যদিও 'উদ্বাস্তু' বলে এখন আলাদা কোন সংজ্ঞা নেই। এখন এদের লক্ষ্য—সমগ্র দুঃস্থ নারী-সমাজ। গ্রামে গ্রামে চরকা নিয়ে যাওয়াও বহু দিন হল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। 'চৌহাটি' বলে একটি গ্রামে, 'উদ্বাস্তু পুনর্বাসন বিভাগের পরিকল্পনা অনুযায়ী পঁচিশটি তাঁত নিয়ে একটি শিক্ষা ও উৎপাদন কেন্দ্রের স্থাপনা হয়। বিভিন্ন গ্রাম ও ক্যাম্প থেকে চরকায় কাটা সুতো নিয়ে মেয়েরা এখানে জমায়েৎ হতে লাগল, সেই সুতোর কাপড় বুনবার জন্য। এই কেন্দ্রের অনতিদূরেই ছিল রিফিউজী ক্যাম্প। মেয়েদের আসা-যাওয়ার সমস্ত খরচ ও দুপুরের খাওয়ার সব ভার ছিল 'সমিতির' উপর।

'রাজভবন' থেকে একটু দূরে যখন 'সমিতির' পুনর্স্থাপন হল, তখন সেখানেও তাঁত বসান হল। ১৯৬৩ সাল থেকে এদের জন্য একটি 'ডে হোম'এর সূত্রপাত হল। এখানে এবং চৌহাটিতে যেসব মেয়ে শিক্ষা নিতে বা কাজ করতে আসে, তাদের এখনও আসা-যাওয়ার সব খরচ যোগান হয়। দুপুরের পুরো খাওয়ার পরিবর্তে এখন অবশ্য জলযোগের ব্যবস্থা হয়েছে।

বছরের পর বছর বহু মেয়েই এই দুটি তাঁত ও চরকার কেন্দ্র থেকে সুতো কাটা ও বস্ত্র বোনার ডিপ্লোমা লাভ



একজন বিশিষ্ট মহিলা

বৃটিশ ভেটেরিনারি অ্যাসোসিয়েশনের ইতিহাসে ১৯৬৭ সাল একটি বিশেষ কারণে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই প্রতিষ্ঠানটির প্রায় ১০০ বছরের জীবনে এইবারই প্রথম একজন মহিলা পুরুষকে হটিয়ে তার প্রেসিডেন্ট হলেন।

এই বিশিষ্ট মহিলা হলেন মিস মেরি ব্র্যাঙ্কার, ইনি ১৯৩৭ সালে লণ্ডনের রয়েল ভেটেরিনারি কলেজ থেকে পাশ করে বের হন এবং এখন ইনি বার্মিংহামের কাছে সাটন কোল্ডফিল্ডে বাস করছেন। এখানে তিনি প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন। পশু-চিকিৎসাই তাঁর জীবনের প্রধান ব্রত।

বয়স এখন তাঁর পঞ্চাশের কোঠায় কিন্তু উৎসাহে এখনও ভাটা পড়ে নি। একজন অল্প বয়সী মেয়ের মতই তিনি চটপট কাজ করতে পারেন। অ্যাসোসিয়েশনের এই নির্বাচনে তিনি আদৌ বিস্মিত হন নি। তিনি বলেন : 'অ্যাসোসিয়েশনের কাজ চালাবার মত অত সময় দিতে পারে এমন মেয়ে কোথায়? থাকলেও খুবই কম। এই জন্যই প্রেসিডেন্ট হবার মত মেয়ে খুঁজে বের করা আগে সম্ভব হয় নি। কোন সংস্কার এর মূলে নেই।' বৃটেনে পশু-চিকিৎসকের সংখ্যা প্রায় ৭০০০। এর মধ্যে মহিলা চিকিৎসকের সংখ্যা হল ৫৮৫। সংখ্যাটা মন্দ নয়, মিস ব্র্যাঙ্কার বলেন, কিন্তু তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই অল্প বয়স্কা এবং সকলেই প্রায় পারিবারিক জীবন নিয়ে ব্যস্ত, সেজন্য প্র্যাকটিসে পুরো সময় দেওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় না। পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় মাত্র ১৯৫ জন পুরো সময়ের প্র্যাকটিসের সুযোগ পেয়েছেন।

মিস ব্র্যাঙ্কার প্রথম দিকে পাঁচ বছর একজন প্রবীণ চিকিৎসকের সহকারী হিসাবে কাজ করেন, ১৯৫২ সালের পরে পশু-চিকিৎসক হিসাবে তাঁর সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। বৃটেনে মহিলা পশু-চিকিৎসকদের জন্য আলাদা যে সংস্থা গড়ে ওঠে তিনি তাঁর প্রেসিডেন্ট ছিলেন, তাছাড়া বহু ছোটখাট সমিতির সঙ্গে তিনি যুক্ত।

পশু-চিকিৎসাবিদ্যার পাঁচ বছরের কোর্সটি শেষ করে মেয়েরা নানা দিকের কাজ-কর্মের মধ্যে নিজেদের ব্যাপৃত রাখেন। সাধারণভাবে প্র্যাকটিস করা ছাড়াও তাঁরা গবেষণা অথবা সরকারী কাজকর্ম করতে পারেন। শিক্ষকতাও তাঁদের একটা কাজ হতে পারে। মিস ব্র্যাঙ্কার মনে করেন যে বৃটিশ সরকারের ব্যাপকভাবে মৎস্য চাষের যে প্রস্তাব রয়েছে তা যদি কাজে পরিণত হবার সুযোগ পায় তাহলে বহু পশু-চিকিৎসক, বিশেষ করে মহিলা চিকিৎসক গবেষণার সুযোগ পাবেন। তিনি বলেন : 'সমুদ্রে মাছ চাষের পরিকল্পনাকে সফল করতে হলে আমাদের মাছের রোগ সম্বন্ধে অনেক কিছু ভালভাবে জেনে নিতে হবে এবং সেই সঙ্গে আমাদের জানতে হবে কি ধরনের অবস্থা মাছের ব্যাপক প্রজননের পক্ষে অনুকূল।'

করেছে এবং অনেকে এখানেই শিক্ষিকা বা কর্মী হিসাবে যোগদান করেছে।

এছাড়া রয়েছে সমিতির সেলাই বিভাগ। সেলাই এদের কাজ হলেও ১৯৪৭-৪৮ সালে আশী হাজার পশমের জামা এরা পাঞ্জাব থেকে আগত উদ্বাস্তুদের জন্য বুনে দিয়েছে। এই বিভাগও কলকাতা এবং চোহাটি দুই জায়গাতেই রয়েছে, যদিও কলকাতায় সেলাইয়ে অংশগ্রহণকারী মেয়েদের সংখ্যা অনেক বেশী। এখানে বর্তমানে চল্লিশটি মেয়ে সেলাইয়ে রয়েছে, কিন্তু চোহাটিতে মাত্র ১৭।১৮ জন। তাতে কিন্তু দুজায়গাতে সংখ্যা প্রায় একই রকম দাঁড়াচ্ছে। সেলাইয়ের শিক্ষাক্রম পশ্চিমবঙ্গের শিল্পাধিকারিক কর্তৃক নির্ধারিত।

তাঁত, দর্জির কাজ ও হাতে তৈরী জিনিসের মাধ্যমে এ পর্যন্ত দেড় থেকে দুই হাজার মেয়েকে জীবনে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সমিতি সক্ষম হয়েছে।

যে সব মায়েরা এখানে এবং চোহাটিতে কাজ অথবা ট্রেণিং-এর জন্য আসেন তাঁদের ছেলেমেয়েদের জন্য দুই জায়গাতেই ক্রেশে খোলা হয় ১৯৫৭-৫৮ সালে। এখানে ৫ বছরের নীচে যেসব শিশুর বয়স তাদের আশ্রয় দেওয়া হয়। ১৯৬৫।৬৬ সালে এই শিশুদের সংখ্যা ছিল ২৭। এদের বিনামূল্যে খাদ্য ও বস্ত্র সরবরাহ করা হয়। এদের দুপুরবেলায় টিফিন, ইউনিফর্ম, বই ও খাতা-পেন্সিল নিয়মিতভাবে 'সমিতি'র তহবিল থেকে যোগান দেওয়া হয়। এই ক্রেশের সংলগ্ন স্কুলে বাইরে থেকে আরও অনেক ছাত্রছাত্রীর আগমন হয়। তারা সবাই ঐ একই সুবিধাগুলি ভোগ করে। সম্প্রতি এদের জন্য একটি পার্ক তৈরি করা হয়েছে।

সাধারণের আগ্রহের ফলেই কিছুদিন হল একটি প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষার অন্তবর্তী শিক্ষাদানের জন্য দুটি বিদ্যালয় খোলা হয়েছে। প্রি-প্রাইমারী স্কুলটি বৈকুণ্ঠপুরে খোলা হয়েছে আজ প্রায় সাত-আট বছর হল। এখানে পঞ্চাশজন ছেলে-মেয়ে প্রাইমারী শিক্ষার আগ পর্যন্ত পড়াশুনা করতে পারে, তবে তাদের বয়স হতে হবে পাঁচ থেকে সাত বছরের মধ্যে। সম্প্রতি একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ও খোলা হয়েছে এই অঞ্চলেই।

আবার বৈকুণ্ঠপুরেই 'ক্রেশে' ও প্রি-প্রাইমারী স্কুলের সঙ্গে সঙ্গে নিরক্ষর মহিলাদের জন্য একটি 'মহিলা-মন্ডলও' আছে। 'শিশু-বিকাশ কেন্দ্র' ও 'মহিলা-মন্ডল' প্রায় একসঙ্গেই উন্নতির ধাপে-ধাপে গড়ে উঠেছে।

অঙ্গনা

প্রমীলা

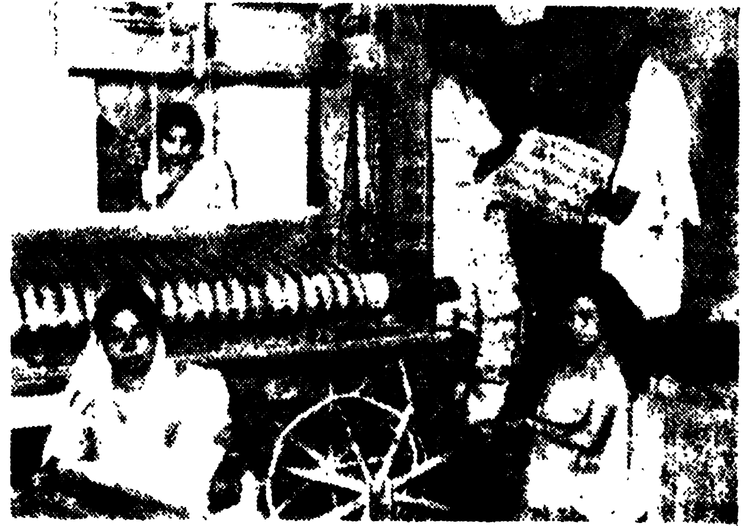
সব রকম দুর্ঘটনার প্রতিষেধক হিসেবে এদের জন্ম হলেও, শুধু বিপদের উপশম করে, সাময়িক সমস্যার নিবৃত্তি করেই এরা ক্ষান্ত হয় নি। হাজার হাজার মানুষের রিক্ত, নিঃস্ব জীবনের মূলে সমস্যাটিও এরা সমাধান করেছে। তাদের শুষ্ক জীবনের মরুভূমিতে এনেছে প্রাণের প্লাবন, তাদের ভাসমান জীবনে এনে দিয়েছে স্থায়িত্ব। এইভাবে চিরকালীন মানবধর্মের সবচেয়ে মহান নীতি এরা পালন করে চলেছে দেশবাসীর চিরন্তন দুঃখ মোচনে।

—রত্না চক্রবর্তী

মিস ব্র্যাঙ্কার অ্যাসোসিয়েশনের উপদেষ্টা বিভাগের কাজকর্মের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখবেন বলে জানিয়েছেন। উদ্দেশ্য, কৃষকদের সমস্যাবলীর সঙ্গে অ্যাসোসিয়েশনের যোগ নিবিড় করা। আগুনে লাগলে দমকল বাহিনীর খোঁজ পড়ে, অনেকটা সেইভাবেই একমাত্র মড়ক লাগলে পশু-চিকিৎসকের ডাক পড়ে। 'সেটা কোন কাজের কথা নয়, মিস ব্র্যাঙ্কার বলেন, কৃষকদের সব সময় করণীয় বিষয় সম্পর্কে উপদেশ নিতে হবে এবং তার জন্য ব্যবস্থা করতে হবে।'

মেয়েদের অনেক সময় জবরদস্ত প্রকৃতির পশু নিয়ে কাজ করতে হয়, এতে বিপদের একটা ঝুঁকি থেকেই যায়। সেই জন্য মিস ব্র্যাঙ্কারের মতে মেয়েদের বেশ শক্ত-সমর্থ হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভয় এক সময় না এক সময় সবাই পেয়ে থাকেন। 'আমি কোন দিনই ভয় পাই নি'—এমন কথা কজন পশু-চিকিৎসক বলতে পারেন?

মিস ব্র্যাঙ্কার নিজে একবার এক শূকরের লাথি খেয়েছিলেন মুখের ওপর, যার দাগ এখনও মুখ থেকে মিলিয়ে যায় নি। আর একবার তাঁকে কামড়িয়ে ছিল একটি অ্যালসেশিয়ান কুকুর। অসুখের বাড়াবাড়ি হলে কথায় কথায় পশুটিকে মেরে ফেলার নির্দেশ দেওয়ার পক্ষপাতী তিনি নন, যথারীতি চিকিৎসা করে তাকে সুস্থ করে তোলার মধ্যে তিনি অপার আনন্দ পান।



আশীর্বাদ ও অভিশাপ

দিন কয়েকের জন্য শহরের বাইরে যাচ্ছি। মৌজ করে ট্রেনে চেপে বসেছি, ভাবছি ইংরেজ কবির কল্পনাদীপ্ত 'এ ম্যান হু হ্যাজ বিন লং ইন সিটি পেন্ট' এর কথা। ভাবতে ভাবতে চোখ বুজে আসছে আর খোলা হাওয়া তাতে ইন্ধন যোগাচ্ছে। একটু পরেই স্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম। আমি যেন আমার কল্পনার দেশের খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। দূর আর খুব বেশি নয়। এখান থেকে সবকিছুই স্পষ্ট দেখা যায়। তাই একটু দাঁড়িয়ে দেখে নিতে ইচ্ছে হলো—এই ফাঁকে জিরিয়ে নেওয়াও হবে। দাঁড়িয়ে পড়লাম আর তাকিয়ে রইলাম। এ যেন নিরবধি বিস্ময়। দৃষ্টি সরিয়ে আনতে পারলাম না—অপলক তাকিয়ে রইলাম। সেদেশের গাছে গাছে কামনার সোনার ফুল থোকা থোকা ফুটে আছে। অভীপ্সা পূরণ কোন সমস্যাই নয়। মনের কথা আকাশে তারা হয়ে ফোটে। গাছে গাছে পাখির গান যেন আমারই কথা হয়ে বাজছে। দেখেশুনে ঘাবড়ে যাচ্ছি। মনে হলো আমি যেন বেহুঁশ হয়ে যাবো, তবু লোভ সামলাতে পারি না। পায়ের বুড়ো আঙুলে সমস্ত দেহটাকে দাঁড় করিয়ে দেখতে থাকি। দোকানে দোকানে সৌখ পণ্যের সমাবেশ। ঠমকে গমকে দোকানগুলি ঝকঝক করছে। মনের ভিতরে তখন বিস্ময়ে বিস্ময়ে ঠোকাঠুকি, তাল কষাকষি চলছে। দোকানে দোকানে থরে থরে সাজানো রয়েছে আমার

মনের মাধুরী মেশানো বিচিত্র সব দ্রব্য-সম্ভার। এতদিন এসব বস্তুকে নিয়েই আমি স্বপ্নের জগৎ গড়ে তুলেছি—ধ্যাননেত্রে এদেরই আমি প্রত্যক্ষ করে পৃথিবীর মানুষকে উপহার দিতে চেয়েছি। রাস্তা দিয়ে সারি সারি লোক হেঁটে চলেছে। তারা যেন সবাই আমার মনের মানুষ। এবার আমি কিরকম একটু দিশাহারা হয়ে পড়লাম। বিস্ময়ে মুখ হারিয়ে ফেলছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। জিভটা শুকিয়ে আসছে। পায়ের বুড়ো আঙুলটা টনটন করছে। সিধে হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করলাম। পারলাম না। এটাই যেন আমার স্বাভাবিক গতিভঙ্গি। পায়ে পায়ে এগুবার চেষ্টা করলাম, কয়েক পা এগিয়েছি এমন সময় হঠাৎ কি হলো। আজব নগরীর (আমার মনে সেটাই সব-চেয়ে সত্যি এবং স্বতঃসিদ্ধ) সবাই ছুটতে শুরু করলো। ওরা আমার দিকেই ক্রমে এগিয়ে আসছে। এতক্ষণ ভাবছিলাম বোধ-হয় দৌড় প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। এবার বিস্ময়ের বাঁধ ভেঙে গেল। দেখলাম সমস্ত নগরীটা একটা বিকটাকার শ্বাপদের চেহারা নিয়ে ছুটে আসছে। তার ধন-সম্পদ, ঐশ্বর্য সব অদৃশ্য হয়ে গেছে। চোখ দুটি যেন জ্বলন্ত দুটি বিরাট মশাল। নাক দিয়ে হল্কা বেরিয়ে আসছে। সামনে যা পড়ছে সব পুড়ছে। লোকগুলো সবাই মরছে। সে দৃশ্য কি বীভৎস। আমার সারা শরীর হিম হয়ে গেছে। নড়বার শক্তিও যেন হারিয়ে ফেলেছি। প্রচণ্ড বেগে পালাতে শুরু করবো তাও পারছি না, এক মুহূর্ত ভাবলাম, তারপরই চোখ মেলে দেখলাম সামনে কেউ কোথাও নেই। আমি একা দাঁড়িয়ে। আর সেই শ্বাপদটা এবার আমাকে শেষ করার জন্যই প্রচণ্ড হুংকারে লেজ ঝাপটাতে ঝাপটাতে এগিয়ে আসছে। হঠাৎ যেন আমি সম্বিত ফিরে পেলাম—ভীষণভাবে আত্মরক্ষার তাগিদ অনুভব করলাম। সেইরকম বুড়ো আঙুলের উপর ভর করেই ছুটতে শুরু করলাম। আমি যত ছুটছি, জন্তুটাও ততই এগিয়ে আসছে। বাঁচবার শেষ চেষ্টায় প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠলাম। সহযাত্রীর ধাক্কায় ঘুম ভেঙে গেল। কপালে হাত দিয়ে দেখি ঘেমে নেয়ে যাচ্ছি। এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া দেহপ্রাণ জুড়িয়ে দিলো। ট্রেন তখন দ্রুত ছুটে চলেছে। সব কথা-গুলো একবার ভাবতে চেষ্টা করলাম কিন্তু খেই কেটে যাচ্ছে; কিছুতেই সব কথাগুলি একসঙ্গে জড়ো করতে পারছি না। ভাবতে ভাবতে আবার চোখ বুজে আসার উপক্রম। ততক্ষণে কিছু কিছু সহযাত্রীর কথাবার্তায় বোঝা গেল কোন একটা স্টেশন নিকটবর্তী। ওরা নেমে যাবার তোড়জোড় করছে। আমিও ভাবলাম স্টেশনে নেমে কিঞ্চিৎ পায়চারি করে ঘুমের ভাবটা কাটিয়ে নেব। ভাবতে ভাবতেই স্টেশনে গাড়ি দাঁড়ালো। সহযাত্রীদের অনেকেই নেমে গেল। কম্পার্টমেন্টটা বেশ ফাঁকা ফাঁকা।

আমিও প্লাটফর্মে নেমে পড়লাম। এদিক-ওদিক তাকালাম। লোকজনের ছোটাছুটি একমাত্র দ্রষ্টব্য। কিছুদূর দৃষ্টি চালালে অবশ্য পাড়াগাঁয়ের চিহ্ন নজরে পড়ে। অদূরে গরুর গাড়িটা কিরকম এঁকে-বেঁকে মোড় ঘুরছে দেখার চেষ্টা করছিলাম। ঘণ্টা পড়লো। ট্রেনে উঠে বসবো এমন সময় একটি পরিচিত কণ্ঠের আওয়াজ ভেসে এলো। ফিরে তাকাতেই দেখি কে একজন আমাদের কামরার দিকেই দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসছে। কাছাকাছি হতেই ওকে খুব পরিচিত মনে হলো কিন্তু ঠিক মনে করতে পারলাম না। তাই নীরব অভ্যর্থনা ছাড়া আগন্তুকের ভাগ্যে আর কিছুই জুটলো না। ট্রেন চলতে

শুরু করলো। একান্ত পরিচিত অথচ সাময়িক বিস্মৃতির ঘোর কিছুতেই কাটছে না। ও এদিকে আমার সম্বন্ধে নানা খোঁজ-খবর নিতে শুরু করেছে। আমি কিছুই বলতে পারছি না। এবার বুঝি ও আমার মনের ভাব ধরতে পারে। দেখলাম সত্যি সত্যি ধরা পড়ে গেছি। ও যেন আকাশ থেকে পড়লো। চোখ দুটো গোল গোল করে জিজ্ঞাসা করলো—

'অবাক করলি ভাই। আমাকেও শেষে ভুলে বসলি? আমি মীরা রে মীরা।

'তা কি করে চিনবো বল? চেহারা যা হাল করেছিস।' আমি দোষ কাটানো চেষ্টা করি।

'তুইও তো অনেক বদলে গেছিস।

পুতুল নাচ



পুতুল নাচ পৃথিবীর সব দেশেই একটি প্রাচীন লোকরঞ্জন শিল্প। বাংলা-দেশের গ্রামে গ্রামেও এককালে এর ব্যাপকতা কম ছিল না। কিন্তু বর্তমান আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংকটের যুগে এই শিল্পটির মৃত্যুর বোধহয় আর বেশী দেরী নেই। অনেক সাবেকী পুতুল-নাচ ব্যবসায়ীকে আর্থিক অনটনের চাপে পড়ে এই ব্যবসাটি ছাড়তে হয়েছে। শহরে আধুনিক শিক্ষিত শিল্পীমহলে এ নিয়ে কিছু কিছু প্রচেষ্টা হয়েছে এবং কয়েকজন সাময়িক সাফল্য লাভও করেছেন। কিন্তু পশ্চিমী দেশের মত একে নতুন করে জন-প্রিয় করে তোলা এখনো সম্ভব হয়নি। তবু বর্তমান নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতির মধ্যেও যাঁরা একাজে হাত দিয়েছেন শিল্পী শৈল চক্রবর্তী তাঁদের অন্যতম। নিজের পরিবারের লোকজন নিয়েই মাঝে মাঝে ইনি পুতুল নাচ দেখিয়ে থাকেন। গত ১৩ ফেব্রুয়ারী রামকৃষ্ণ ইনস্টিটিউট অব কাল-চারের বিবেকানন্দ হলে এঁদের "পুতুল-রঙ্গম্"-এর একটি অনুষ্ঠান হয়ে গেল। নকুড়-বাঘা, লম্বকর্ণ এবং পুতলীবাঈ নামে তিনটি ছোট্ট নাটিকা পরিবেশন করা হল। প্রথমটি কথামালার সেই বাঘের গলায় হাড় ফোটার গল্প থেকে তৈরী. দ্বিতীয় কাহিনী এক লোভী প্রতিবেশীকে নিয়ে এবং তৃতীয় রূপকথাটি পুতুল রাজ্যের নৃত্য-বিমুখ রাজকন্যাকে কেমন করে নাচানো হল সেই কাহিনী নিয়ে। পুতুলগুলি খুবই সুন্দর হয়েছিলো। সঙ্গীত পরিবেশনের দিকেও যথেষ্ট মনো-যোগ দেওয়া হয়। তবে মনে হয় কাহিনীর গতি কোন কোন জায়গায় আরেকটু দ্রুত করবার প্রয়োজন আছে। অনুষ্ঠানে জন-সমাগম দেখা গেল বিশেষ আশাপ্রদ। হয়ত সুযোগ সুবিধে পেলে পুতুলনাচ আবার ছোটদের মনোরঞ্জনের ক্ষেত্রে নিজের আসন করে নিতে পারবে।

তবু কিরকম ঠিক চিনতে পারলাম আর অতদূরে থেকে।'

কথাটা ফসকে গেল বুঝতে পারলাম। চটপট জবাব দিলাম, 'সেই টুকটুকে মেয়েটা যে এমন হয়ে গেছে ভাবতে মন চাইছিলো না।'

এবার মীরা অনেকটা অপ্রস্তুত মনে হলো। এ [illegible] বাড়াবাড়ির সুযোগ না দিয়ে একগাদা প্রশ্ন একসংগে ছুড়ে দিলাম,—

'এদিকে কোথায় চলেছিস? কি করছিস? কেমন আছিস?'

'চলেছি এদিকেই। থাকি এখানেই। আছি ভাল।' সংক্ষেপে উত্তর দিয়ে মীরা আমার দিকে তাকালো।

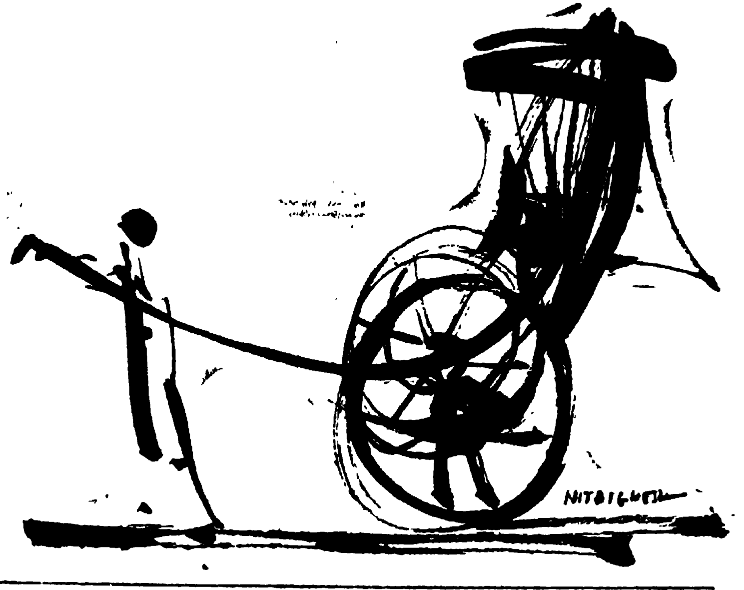
ওর উত্তর শুনে আমার যেন ঘুম ভাঙলো—আড়মোড়া ভেঙে সোজা হয়ে বসলাম। একসংগে মনে পড়ে গেল অনেক কথা। এক মুহূর্তের জন্য আমি স্মৃতির দরজা মেলে ধরবার চেষ্টা করলাম। সবটাই অবশ্য মীরার প্রসংগ।

'রেডি উইট'-এ কলেজে মীরার জুড়ি ছিল না। রূপেও তেমনি। ধারালো রূপ আর শানানো বুদ্ধিতে ও প্রায় অসাধ্য-সাধন করতো। বন্ধু-বান্ধবদের কথা ছেড়ে দিলেও এমনি অনেককে ওর এই দুই মহাস্ত্রের কাছে মাথা নত করতে দেখেছি। নাকানি-চোবানি খাওয়ার কথা নাই বা বললাম। মনে পড়ছে একবার এক ডিবেট কম্পিটিশনে ওর বক্তৃতার কথা। বিপক্ষ দলে ছিল সব বাঘা বাঘা বিতার্কিক। কিন্তু সবাইকে মাৎ করে দিয়ে ফার্স্ট প্রাইজ ও জিতে নিয়ে এলো। সভাপতি মীরার প্রশংসা করে বলেছিলেন 'তোমার সূচনা যত সুন্দর ক্রমবিকাশ তথা প্রকাশ সুন্দরতর হোক।' সেদিন আমাদের সে কি আনন্দ। ওর সম্মানে গোটা থার্ড ইয়ার ক্লাশ ছুটি পেয়েছিল একদিন। শুধু বিতর্কসভা নয়, আবৃত্তি, নাটক সব ব্যাপারেই ছিল ওর প্রচণ্ড উৎসাহ। যে কোন উৎসব আয়োজনে মীরা ছিল অপরিহার্য অংগ। ওকে বাদ দিয়ে কোন কিছু আমরা কল্পনাই করতে পারতাম না। কথাবার্তায়ও মীরা ছিল অতুলনীয়। পড়াশোনায় তো বটেই। আজ আমি সেই মীরার একান্ত কাছে বসে আছি। কলেজে হাজার চেষ্টা করেও যা পারিনি। ভাবতে সত্যি কিরকম লাগে। তাও আবার এরকম পরিবেশে।

অনেক ছেলে ওর সংগে পরিচয়ের জন্য আগ্রহে অধীর ছিল। পরিচয় ছিলও অনেক ছেলের সংগে—এরই মধ্যে একজনের সংগে ওর পরিচয়টা ছিল একটু অন্য-ধরনের। ছেলেটি দেখতে শুনতে মীরার জুড়ি নিঃসন্দেহে। বুদ্ধিদীপ্ত স্মার্ট চেহারায় অনন্য—সত্যি অনন্য। আমরা সবাই ধরে নিয়েছিল্যাম, মীরা এবং অনন্য অচ্ছেদ্য। মেয়েদের মধ্যে দু-একজন মীরাকে ঠাট্টা করে বলতো, অনন্যা। কথাটা মনে আসতেই ধাঁ করে মীরাকে জিজ্ঞাসা করে বসলাম—

'অনন্য এখন কোথায় আছে?'

'আমার জীবন থেকে হারিয়ে গেছে।'



আবার সেই শাণিত জবাব। মনে খটকা লাগলো। ভাবতেও পারি না মীরা এবং অনন্যকে আলাদা আলাদা ভাবতে। কলেজ ছাড়াছাড়ির পর মীরার সংগে আমার দেখাসাক্ষাৎ একরকম হোত না বলাই চলে। তাই ওদের সম্পর্ক এবং পরিণতিটা যে কি দাঁড়িয়েছিল ঠিক জানি না। কৌতূহল সেইজন্য। কথাটা শুনে খুব দমে গেলাম। একটু থেমে জিজ্ঞাসা করলাম—

'হারিয়ে গেল কেন?'

'প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল তাই।'

এবার যে কিছুটা বিরক্ত না হলাম তা নয়। তাই বলেই ফেললাম—

'সব ব্যাপারটা খুলে বলবি? এরকম ধরাবাঁধা উত্তর আমার ভাল লাগে না।'

মীরা একটু হাসলো। হাসিটা খুব স্বাভাবিক মনে হলো না। তারপর বললো—

'যে লোকটাকে জীবন থেকে মুছে ফেলেছি তার প্রসংগ নিয়ে আর কোন আলোচনা করবো না ভেবেছিলাম। তা তুই যখন নাছোড়বান্দা তবে শোন।'

ওরা বিয়ে করেছিল। এবং বেশ সুখেই ছিল। অনন্য একটা ফার্মে বড় গোছের অফিসার আর মীরা ছিল স্কুল-মিস্ট্রেস। একটি ছেলেও হলো। কিন্তু ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের প্রশ্ন ততদিনে দুজনের মধ্যে বেশ বড়রকমের চিড় ধরিয়েছে। মীরার চাল-চলন ইদানীং আর অনন্যর পছন্দ হচ্ছিল না, কয়েকবার বলেও কোন সুফল পায়নি। এবারেও মীরার সাফ জবাব—

'আমরা তো জেনেশুনেই বিয়ে করেছি। তবে আর এ আপত্তি কেন?'

অনন্য হয়তো কিছু বলতে চাইতো। কিন্তু মীরার কাঠিন্যে তা চাপা পড়ে যেতো। একদিন এ নিয়ে বাদ-প্রতিবাদ চরমে উঠলো। মীরা সেদিন পাড়ার কয়েকজনের সংগে একটা ফাংশন নিয়ে কথা বলছিল। এমন সময় ক্লান্তদেহে বাড়ি ফিরলো অনন্য। ওর মাথায় যেন আগুন চড়লো। সব সহ্য করে তখন চুপ করে গেল। ঘন্টা দুয়েক পর লোকজন বিদেয় হলে মীরা এসে দেখলো অনন্য তখনো অফিসের পোষাকে বসে। উৎকণ্ঠাভরে বললো—

'তোমার কি শরীর খারাপ?'

'না', বলে চুপ করলো অনন্য। আবার বললো, 'মীরা, সবকিছু ছেড়ে দিয়ে এবার ছেলে নিয়ে তুমি পুরোপুরি সংসারী হও।'

মীরা তেমনি প্রতিবাদ করে বললো, 'এতে সংসারের কোন ক্ষতি হয়নি।'

'কিন্তু অশান্তি বাড়ছে।'

'সে তোমার নিজে তৈরি।'

'তাহলে আমাদের আলাদা থাকাই বাঞ্ছনীয়।'

'তাই হবে।'

ছেলেকে নিয়ে মীরা সরে এলো অনন্যর জীবন থেকে। ক্রমে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। মীরার ছেলে কোন একটি বোর্ডিংয়ে থেকে পড়াশোনা করে। আর দূর মফঃস্বলে ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়ের কাজ নিয়ে মীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। অনন্যর কোন খবরই তাকে আর ও জানে না।

কয়েকটা স্টেশন পরেই মীরা নেমে গেল। আমার কোন কথা ওকে জানানো হলো না। আর জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেলাম, তুই এখন সুখী কিনা? বিরাট কম্পার্টমেন্টে তখন আমি একমাত্র যাত্রী। মীরার কথা ভাবছিলাম। আজ ওর সুন্দর জীবনের একি হাল! ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়ের কাজ নিয়েছে মীরা কিন্তু নিজের ফ্যামিলিটাই গড়ে তুলতে পারলো না। হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল সেই স্বপ্নের কথা—সেই স্বর্ণসভ্যতায় আমরা যেন পৌঁছে গেছি। কিন্তু তারপরই প্রচণ্ড পিছুতাড়া তারম্ভ হয়েছে। যে সভ্যতা স্বামী-পুত্র-স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় সে আমাদের থাবা উঁচিয়ে গ্রাস করতে আসছে ছাড়া আর কিছু ভাবাও যায় না।

ফাদার ঘনশ্যামের রোমাঞ্চ

কাহিনী (৮)

শুধু একটি আলপিন

অদ্রীশ বর্ধন

কেলেংকারিটা ঘটল সোমাবতীর জন্মদিনেই।

অথচ ঐ একটা দিনেই হাসিখুশীর বন্যা বইয়ে দেন স্যার ত্রিলোকেশ্বর সামন্ত।

সোমাবতী তাঁর একমাত্র মেয়ে। কাজেই সারা বছর তিনি হাত গুটিয়ে বসে থাকলেও জন্মদিনটি এলেই তাক লাগিয়ে দিতেন সোসাইটিকে। ঐশ্বর্যের জৌলুশে চোখে ধাঁধা লাগত অনেক রথীমহারথীর।

বিশেষ কিছু না। প্রতি বছর শুধু একটি মুক্তো তিনি উপহার দিতেন সোমাবতীকে।

প্রাসাদের আলোকসজ্জাও ম্লান হয়ে যেত সেই মুক্তোর কাছে।

দুনিয়ার যেখানে যত হীরে জহরতের মার্কেট আছে, সবাই জানত স্যার ত্রিলোকেশ্বরের মুক্তো কেনার বৃত্তান্ত। বেশি না, শুধু একটি মুক্তো। বছরে একবারই তিনি ঐ একটি মুক্তো কিনতেন। কিন্তু তা হত দুনিয়ার সেরা মুক্তো।

ছোট খাট মার্বেল গুলির মত সেই মুক্তোর চাপা দ্যুতির দিকে তাকিয়ে যে কোনো আনাড়ি জহুরীও বলে দিতে পারত —সাত সাগরের সেরা শুক্তির বুক চিড়ে বার করা এ মুক্তো তোষাখানায় তোলার ক্ষমতা রাজা-বাদশা ছাড়া আর কারও নেই।

কিন্তু মেয়ের জন্মদিনে এই বিপুল অর্থই অকাতরে ব্যয় করতেন স্যার ত্রিলোকেশ্বর সামন্ত।

মুক্তোর সংখ্যা বছরে বছরে বেড়েছে। কুড়িটি জন্মদিন এসেছে তরুণী সোমাবতীর জীবনে—জমেছে কুড়িটি মুক্তো।

সোমাবতীর মুক্তোর মালার নাম শোনেনি সোসাইটিতে হেন লোক নেই। কোত্থেকে যে এমন সাচ্চা মুক্তো জোগাড় করতেন স্যার ত্রিলোকেশ্বর তা গবেষণার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল মেয়ে মহলে। অনেক কাগজে মুক্তোর মালার ছবিও ছাপা হয়েছিল।

মুক্তোর মালা অনেকেরই থাকে। কিন্তু এমনটি আর কেউ দেখেনি। যেমন রঙ, তেমনি ওজন। টলটলে অশ্রুর মত নির্মল, রেশমী অলকগুচ্ছের মত হাল্কা। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ অনেক মুক্তোকেও নাকি হার মানিয়ে দিয়েছিল সোমাবতীর মুক্তোর মালা।



সোমাবতীর মুক্তোর মালা। কিংবদন্তীর মত মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল কণ্ঠহারের খ্যাতি। মুক্তো—প্রশস্তি নিয়ে সম্প্রতি অন্যান্য মহিলা মহল সবগরম হয়ে উঠেছিল।

কারণ, সোমাবতীর জন্মদিনের আর দেরি নেই।

আর, সেইদিনেই আসছে আর একটি মুক্তো। ভোরের শুকতারার মত আর একটি মুক্তো দুলবে সোমাবতীর কণ্ঠহারে।

তারপর এল সেই দিন। সোমাবতীর জন্মদিন।

বিশেষ উৎসবের আয়োজন হল [illegible] প্রাসাদে। নৃত্যগীতের পর ছোট খাট [illegible] বক্তৃতাও দিল অভ্যাগতরা।

[illegible] উৎসবে উপস্থিত ছিলেন মাত্র [illegible]জন। প্রত্যেকেই [illegible] পরিবারের [illegible] আত্মীয় [illegible] বন্ধু। [illegible] [illegible] চেহারা। [illegible] এর [illegible]।

[illegible]

[illegible] প্রস্তাব করলেন 'জলসাঘরে' [illegible]।

অতিশয় [illegible] প্রস্তাব। [illegible] স্যারের [illegible] কেউ প্রতিবাদ করল না।

অগত্যা সবাইকে আসতে হল জলসা[illegible]। [illegible]-প্রাসাদের জলসাঘর দেখবার [illegible]। [illegible] মুর্শিদাবাদ [illegible]। [illegible] বিভিন্ন [illegible] রাগিনীর চিত্র শোভা পায় দেওয়ালে দেওয়ালে। [illegible] সাজানো থাকে কাঁচের [illegible] [illegible]। সে ঘরের মেঝে আগাগোড়া [illegible] কালো কাঁচে, আর [illegible] থেকে ঝোলে একাধিক ঝাড় বাতি।

অর্গ্যানের সামনে গিয়ে বসল [illegible] চাটার্জি। গাইল একটি উচ্চাঙ্গ আধুনিক গান। [illegible] হাই তাপাতে [illegible] কাষ্ঠহাসি হেসে তাই [illegible] অভ্যাগতরা।

অবশেষে গান শেষ হল। সবাই ভাবল, এবার নিশ্চয় সুখনিদ্রার প্রস্তাব। কিন্তু হরি, হরি! স্যার ত্রিলোকেশ্বরের এ কী বদ খেয়াল। মাঝরাতে বলেন কিনা এক হাত তাস খেলা হোক।

সোমাবতী নাকিসুরে বললে, 'না না, বাবা। তাস তো সারা বছরই খেলছো। তার চাইতে বরং এসো, অন্য কিছু খেলা যাক।'

স্যার ত্রিলোকেশ্বর প্রচণ্ড 'তাসুড়ে' মানুষ। একহাত একহাত করতে করতে রাত ভোর করে দেওয়াই মতলব ছিল. তাঁর। তাই মেয়ের প্রতিবাদে ক্ষুন্ন মনে বললেন,

'তা বেশ, কিন্তু এত রাতে আর কোনো খেলা তো না জমে না।'

'কেন, লুকোচুরি।'

'লুকোচুরি!'

'মজার খেলা না? তোমরা সবাই লুকিয়ে পড়ো, আমি খুঁজে বার করি।'

তরুণ রাজনীতিবিদ সম্মান গুপ্ত [illegible] মনেই বলল—বাপকা বেটি রে। রাত [illegible] টায় লুকোচুরি। তোবা, তোবা!

কিন্তু প্রতিবাদ করে লাভ নেই। আদুরে মেয়ে সোমাবতী তাহলে এমনি মুখ ভার করবে যে উৎসবের আনন্দটাই মাটি হয়ে যাবে। কাজেই বিনাবাক্যব্যয়ে পেছনকার ঘরে দৌড়োলো সম্মান গুপ্ত। ঘুম-ঘুম চোখে অন্যান্য অতিথিরাও লুকোবার নানারকম জায়গা খুঁজে নিল। যথাসময়ে [illegible] হল্লোর হট্টগোলের পর একে একে [illegible] খুঁজে বার করল সোমাবতী। সাঙ্গ হল লুকোচুরি খেলা।

হলঘরে জড়ো হল সকলে। আর তার-পরেই প্রশ্নটা করলেন স্যার ত্রিলোকেশ্বর।

বললেন, '[illegible], তোর মুক্তোর মালা [illegible]?'

'খুলে রেখেছি। ছুটোছুটি করবার সময় যদি ছিঁড়ে যায়—তাই।'

'রেখেছিস কোথায়?'

'ঐ যে ঐ টেবিলটায়।'

'কোথায়?'

'আরে! গেল কোথায়! [illegible] তুলে রেখেছে।'

সোমাবতী-জননী সঙ্গে সঙ্গে [illegible] উঠলেন,—'আমি [illegible] রাখিনি। দেখিনি তো [illegible]।'

'তাহলে বাবাই সরিয়ে রেখেছে। তাই না, বাবা? ঠিক ধরেছি।'

বেগে মস্তক চালনা করে অভিযোগ অস্বীকার করলেন স্যার ত্রিলোকেশ্বর। সুতরাং খোঁজ খোঁজ রব পড়ে গেল অভ্যাগতদের মধ্যে। তন্ন তন্ন করে খোঁজা হল সর্বত্র, কিন্তু বিখ্যাত মুক্তোর মালার সুতো-টুকুও দেখতে পাওয়া গেল না কোথাও।

কাজেই মুখ শুকিয়ে আমসি হবার উপক্রম হল বিশ্ববসু ভৌমিকের। কারণ মুক্তোর মালাটা ঠিক তার পাশের টেবিলেই রেখে গেছিল সোমাবতী। তাছাড়া কে না জানে বিশ্ববসু এবং তদীয় পত্নী চিত্রলেখা সোমাবতীর দূরসম্পর্কের মামা-মামী হলে কি হবে, রোজগার তো তাদের কাণাকড়িও নেই। অথচ কি করে ভৌমিক দম্পতির এত উজিরীচালে থাকা হয়, তা নিয়ে বিস্তর গবেষণাও হয়ে গেছে।

সুতরাং মুখ শুকিয়ে গেল বিশ্ব-বসুর। হাতের কাছে সচল বিন্ধ্যাচলের মত ফাদার ঘনশ্যামকে পেয়ে ফিস ফিস করে বলেও ফেলল, "অ মশায়, ব্যাপার তো সুবিধের মনে হচ্ছে না। একি গেরো বলুন তো!"

কূটনীতি-পক্ক সম্মানগুপ্ত বললেন, "মিস সামন্ত, আমরা যে-যে ঘরে লুকিয়ে-ছিলাম, আসুন সে সব জায়গা খুঁজে আসা যাক।"

কিন্তু বৃথা চেষ্টা। ড্রেসিং রুম, স্মোকিং রুম, জলসাঘর, [illegible] [illegible] সবকিছু তোলপাড় করেও পাওয়া গেল না মুক্তোর মালা।

বিপদে না পড়লে মধুসূদনের নাম [illegible] ফাদার ঘনশ্যামের অস্তিত্বও কারো যেমন কারো মনে পড়ে না, অপকর্ম না [illegible] থাকে না।

খেয়াল যখন হল, তখন ঘনশ্যাম পাদরী জলহস্তীর মত মুখব্যাদান করে হাই তুলছিল। হিপো-হাই বন্ধ হলে বলল বোকা হেসে, "মোট পাঁচটা ঘর। কিন্তু বাইরে বেরোবার রাস্তা সামনের ঘর—সেখান দিয়ে কেউ বাইরে যায়নি আমি দেখেছি। বাকী চারটে ঘরে বাইরে যাবার দরজা নেই। এক হতে পারে, জানলা দিয়ে কেউ—"

তাও না। কারণ এ বাড়ীর প্রতিটি জানলাই সুরক্ষিত। বাড়ীতে মোহরের ঘড়া না থাক, হীরে জহরতের তো অন্ত নেই। তাই প্রতিটি জানলায় ভারী শাটার লাগিয়েছিলেন স্যার ত্রিলোকেশ্বর। সে শাটার এমন ভারী যে দুজন চাকরেই তা টেনে তুলতে হিমশিম খেয়ে যায় প্রতিদিন সকালে।

জানলাপথে উধাও হয়নি মুক্তোর নেকলেস। বাড়ী ছেড়েও কেউ বাইরে যায়নি। সুতরাং.. সুতরাং!

প্রস্তাবটা এল সদাশিব পালের কাছ থেকে।

সদাশিব স্যার ত্রিলোকেশ্বরের অন্ত-পুরের সেক্রেটারী। মনিবের জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ, সবই তাকে করতে হয়। কাজেই হুজুরের চিত্তরঞ্জনের এমন খাসা একটা সুযোগ পেয়ে ফস করে বলেই ফেলল, "স্যার, বাকী রইল একটা পথ।"

ভ্রুকুটি করে স্যার বললেন, "কী পথ?"

"পকেট সার্চ।"

আঁৎকে উঠলেন স্যারের গিন্নী।

বললেন, "তোমার মাথা খারাপ হয়েছে, সদাশিব!"

"কিন্তু এছাড়া আর পথ নেই। আমরা প্রত্যেকেই যদি নিজেদের সার্চ করতে দিই, তাহলে অযথা সন্দেহ থেকে রেহাই পাওয়া যায়।"

যুক্তি অকাট্য। কাজেই অভ্যাগতরা লুফে নিল প্রস্তাবটা।

শুরু হল তল্লাসি পর্ব।

দরজা বন্ধ হয়ে গেল প্রধান হলঘরের। পুরুষরা গেল সামনের ঘরে, আর মহিলারা পেছনের জলসাঘরে। আরম্ভ হল বডি সার্চ।

তার ফলে, যে সব জিনিষপত্র পাওয়া গেল, উল্লেখযোগ্য না হলেও অদ্ভুত সন্দেহ নেই। মানুষ যে কতরকম চিত্তা-কর্ষক বস্তু নিয়ে ঘোরাফেরা করে, তার একটা নমুনা পাওয়া গেল।

যেমন, পাদরী ঘনশ্যামের ঝলঝলে আলখাল্লার পকেট থেকে একটা আতস

কাঁচ আর ভাঁজকরা মাপকাঠি বেরিয়ে পড়ায় অনেকেরই চোখ কপালে উঠল।

কূটনীতিবিদ সম্মানগুপ্তর পকেট থেকে দুটো পুরিয়া পাওয়া গেল। পুরিয়ার ভেতরে খানিকটা সাদাগুঁড়ো। নিরীহ গুঁড়ো। কিন্তু সম্মানগুপ্তর মুখটা অকস্মাৎ ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়ায় অনেকেরই সন্দেহ হল পাউডারটা সম্ভবত কোকেন।

সুকান্ত মিত্র স্যার ত্রিলোকেশ্বরের ভাইপো। তার পকেটে পাওয়া গেল একটা ভূতের গল্পের সংকলন। তার বাবার পকেট থেকে বেরুলো শীলমোহর করার খানিকটা লাল গালা, বৃটিশ আমলের একটা সেকেলে রূপোর টাকা, আর একটা ভাঁজ করা টিসু পেপার।

ত্রিলোকেশ্বর-গৃহিণীর খুড়তুতো ভাই শিশুপাল দত্তের পকেট থেকে আবির্ভাব ঘটল ছোট্ট একটা কাঁচির। সেই সঙ্গে গুটিতিনেক লুডোর ছক্কার মত চিনির ডেলা—যেমনটি বড় বড় রেস্তোরাঁয় চা-কফির সঙ্গে দেয়। অতএব শিশুপাল দত্ত নিঃসন্দেহে ক্লেপটোম্যানিয়াক্ অর্থাৎ হাত-টানের অভ্যাস আছে।

কিন্তু সদাশিব পালের পকেট-গহ্বর থেকে সাদা তুলো, তিনটে গুলিসুতো, আর কার্ডের ওপর লাগানো বারোটা সেফটিপিন দেখে যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হলেন সকলে, তারপরেই মনে পড়ল সামন্তপ্রাসাদ সাজানোর ভার পড়েছিল সদাশিব পালের ওপরেই। নিউ মার্কেট থেকে আনা ফুলের মালা, স্তবক এবং প্ল্যাস্টিকের আঙুরগুচ্ছ, লতাপাতা এনে কদিন কি খাটুনিটাই না খেটেছে বেচারী সদাশিব।

বিশ্ববসু ভৌমিক মেয়েদের চুলের ফিতে, কমপ্যাক্ট পাউডার আর আধখানা কাঁচা আলু নিয়ে বেড়ায় দেখে অনেকেই অট্টহাস্য করে উঠল। কাঁচুমাচু মুখে বিশ্ব-বসু জানাল, আলুটা নাকি তার বাতের টোটকা। চুলের ফিতে আর কমপ্যাক্ট পাউডার স্ত্রী চিত্রলেখার।

এই গেল পুরুষদের ব্যাপার। মেয়ে-দের কাছ থেকে পাওয়া গেল আরও মজাদার বস্তু।

যেমন, মিস অহল্যা চ্যাটার্জীর ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে আবির্ভূত হল একটি খনার বচন, তিনটি চুলের কাঁটা এবং একটি ঠাকুর ফোটোগ্রাফ।

গুপ্ত খুপরিসহ চৌকিনক সিগারেট কেস —চিত্রলেখা ভৌমিকের।

তিনটে অ্যাসপিরিন বড়ি—সুকান্তর বোন আভার।

একটি অত্যন্ত গোপনীয় চিঠি—সুকান্তর বান্ধবী দীপা সেনের।

সবশেষে ভ্যানিটিব্যাগ উপুড় করল শিশুপালের বান্ধবী রিনকু সান্যাল। সঙ্গে সঙ্গে দারুণ চমকে উঠল অন্যান্য মেয়েরা। কেননা, ব্যাগের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল একটা মুক্তার নেকলেস!

চমকে দেওয়ার জন্যেই ব্যাগ উপুড় করেছিল রিনকু। কেননা, অচিরেই জানা গেল মুক্তোগুলো বিলকুল ঝুটো!

ফলে, পর্বতের মূষিক প্রসবই সার হল। আসল কণ্ঠহারের কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না।

সোমাবতী তখন করুণ নয়নে তাকাল ফাদার ঘনশ্যামের দিকে।

চড়াই পাখির মত চিঁ-চিঁ করে উঠল ফাদার ঘনশ্যাম। যেন অনেকদিন খেতে পায়নি, এমনি মিনমিনে গলায় বললে, "ঘরগুলো এত বেশি সার্চ করা হয়েছে যে—"

"পায়ের ছাপের বারোটা বেজে গেছে, তাই তো?" বলল সোমাবতী।

"ঠিক ধরেছো। তাহলেও চেষ্টা করে দেখা যাক আর কোনো সূত্র পাওয়া যায় কিনা। আপনারা সবাই এ-ঘরেই বসুন। অন্য ঘরগুলোয় আমি এক চক্কর ঘুরে আসি। কিন্তু আরেকজনকে আমার সঙ্গে থাকতে হবে। কে আসবেন?"

স্যার ত্রিলোকেশ্বর এগিয়ে এলেন। বললেন, "আমি।"

শুরু হল বাকী চারটে ঘরে তল্লাসী-পর্ব।

সব ঘরেই সবকিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল ফাদার ঘনশ্যাম। চকচকে মেঝের ওপর মাঝে মাঝে বাচ্চা হাতীর মতই হামা-গুড়ি দিল, ড্রইংরুমের মেঝেতে সটান উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল এবং একটা স্টীল-আলমারীর তলায় চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ।

আশায় আনন্দে বুকের ধুকপুকোনি বেড়ে গেল স্যার ত্রিলোকেশ্বরের।

অবশেষে আলমারীর তলায় হাত ঢুকিয়ে দিল ঘনশ্যাম। নাগাল পেল না। তাই পকেটের মাপকাঠির ভাঁজ খুলে তাই দিয়ে খানিক কসরৎ করে বার করে আনল জিনিসটা।

দেখে ফুটো বেলুনের মত নিভে চুপসে গেলেন স্যার ত্রিলোকেশ্বর।

অথচ কেন যে পুঁচকে ঐ জিনিসটার দিকে অমন সন্দেহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ফাদার ঘনশ্যাম, তা বুঝলেন না।

ঘনশ্যাম মণ্ডল বোধকরি তখন স্যার ত্রিলোকেশ্বরের কথা ভুলেই গেছিল। ভুলে গেছিল আশপাশের জগৎ। পলকহীন দৃষ্টির মধ্যে দিয়ে গোটা মনটা হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল হাতের তালুতে রাখা ছোট্ট বস্তুটির ওপর।

জিনিসটা আর কিছুই নয়—একটা ক্ষুদে আলপিন!

কিন্তু সাধারণ আলপিন নয়।

খুব ছোট পোকামাকড়কে সেটিং বোর্ডে গেঁথে রাখতে পতঙ্গ বৈজ্ঞানিকরা যে-ধরনের আলপিন ব্যবহার করেন, সেই জিনিস। লম্বায় পৌনে এক ইঞ্চি। ছুঁচের মত সরু। আতীক্ষ্ন ডগা। মাথাটি দিব্যি ছোট।

"হলো কী? ধ্যানে বসলেন নাকি?" বেজায় দমে গিয়ে খেঁকিয়ে উঠলেন স্যার ত্রিলোকেশ্বর।

ফাদার ঘনশ্যাম থেবড়ে বসল মেঝের ওপর। ফলে, মনে হল যেন একটা অতিকায় কোলা ব্যাঙ বসেছে কালো মেঝের ওপর।

বলল, "আপনার গেস্টদের মধ্যে এক-জনের পোকামাকড় সংগ্রহ করার বাতিক আছে।"

"আমার জানা নেই। তাহলেও জিজ্ঞেস করে দেখা যাক।"

"না-না-না। সর্বনাশ, ও-কাজটি করতে যাবেন না" বলে মাথা হেঁট করে রইল ঘনশ্যাম পাদরী। কাচবাঁধানো কালো মেঝের দিকে পলকহীন চোখে তাকিয়ে তন্ময় হয়ে রইল কিসের চিন্তায়। ঝকঝকে মেঝের ওপর দেখা গেল তার নির্বোধ মুখের প্রতি-ফলন—কাচের মধ্যে যেন আর একজন ঘনশ্যাম পাদরী পলকহীন চোখে তাকিয়ে রয়েছে ওপর দিকে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে আপনমনেই বলল —"সাবাস!"

"সাবাস মানে?" তেরিয়া হয়ে [illegible] স্যার ত্রিলোকেশ্বর।

"বাহাদুর বটে মুক্তো চোর [illegible] তারিফ করলাম।"

স্থির চোখে তাকালেন স্যার ত্রিলোকেশ্বর।

বললেন, "মুক্তো-চোরকে আপনি চেনেন?"

"বিলক্ষণ চিনি।"

"কে সে?"

"এখন বলব না।"

মুখ লাল হয়ে গেল স্যারের।

আরক্ত মুখে বললেন, "মুক্তোগুলো কোথায় আছে, তা কি জানা গেছে?"

"অবশ্যই জানা গেছে।"

"কোথায় আছে?"

"এখন বলব না।"

"তাহলে কি বলবেন, দয়া করে সেটা বলবেন?" বোমার মতই দড়াম করে ফেটে পড়লেন স্যার ত্রিলোকেশ্বর।

"শুধু বলব, আজ রাতে এ-ঘর তালা-বন্ধ থাকুক, চাবি রাখুন আপনার কাছে। গেস্টদের আজ রাতে এ-বাড়ীর আলাদা ঘরে শোবার ব্যবস্থা করে দিন—কিন্তু কারো কাছে শুধু একটা কথা বলবেন না।"

"কি কথা?"

"এই আলপিনের কথা।"

"নিকুচি করেছে আপনার আলপিনের। আমি চাই সোমার মুক্তোর মালা।"

"পাবেন—কাল সকালে ব্রেকফাস্টের টেবিলে। মুক্তো চোরকেও দেখবেন—কাল সকালে ব্রেকফাস্টের টেবিলে। কিন্তু মনে রাখবেন, ঘুণাক্ষরেও যেন প্রকাশ না পায় —এ জিনিস পাওয়া গেছে এ-ঘরের মেঝেতে।"

বলে, মেঝের ওপর রাখা আলপিনটা সযত্নে আলখাল্লায় গেঁথে রাখল ঘনশ্যাম মণ্ডল।

গোটা সামন্ত-প্রাসাদ যখন ঘুমিয়ে কাদা, এক [illegible] ঘনশ্যামের চোখে তখন

ঘুম নেই। সজাগ চোখ রইল স্লিইং রুমের দরজার ওপর। কিন্তু সারারাত দরজার ধারে কাছে কাউকেই আসতে দেখা গেল না। কে জানে, চোর হয়তো বেশি সেয়ানা, তাই...!

রাত ভোর হোল। প্রাতরাশের টেবিলে সবার আগে হাজির হল ঘনশ্যাম মণ্ডল। যথাসময়ে সপরিবারে নিচে নামলেন স্যার ত্রিলোকেশ্বর। দেখলেন, জানলার সামনে দাঁড়িয়ে সম্মান গুপ্ত দিল্লী পলিটিক্স নিয়ে স্ফুলিংগ ছড়ানো লেকচার দিচ্ছে, আর নিশ্চিন্ত মনে তাই শুনছে ফাদার ঘনশ্যাম।

একে একে সবারই আগমন ঘটল ব্রেক-ফাস্ট টেবিলে। কিন্তু খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত গত রাতের ঘটনা নিয়ে কেউ কোনো কথাই বলল না।

সম্মান গুপ্তই শুরু করল। কফির পেয়ালাটা ঠন করে পিরিচে রেখে বললে,— "ডিটেকটিভের রিপোর্ট কী?"

জবাব দিতে গিয়ে বিষম লেগে গেল ফাদারের। কেশে-টেশে সে এক কান্ড।

সারারাত ভাল ঘুম হয়নি স্যার ত্রিলোকেশ্বরের। স্বপ্ন দেখেছেন মুক্তোর মালার মুক্তোগুলো এক-একটা কিম্ভূত-কিমাকার জীব হয়ে মুখ ভেঙচাচ্ছে তাঁকে। আবার এখন বামন ঘনশ্যামের বিষম খাওয়া দেখে হঠাৎ মেজাজ খিঁচড়ে গেল তাঁর।

খেঁকিয়ে উঠে বললেন,—"রিপোর্ট আবার কী? যত্তো সব বোগাস...যে

শক্তিসমন্বিত এই টেবিল ট্রানসিস্টরটির কাছ থেকে অনেক কম খরচে পাবেন "অবিচল ধ্বনি প্রবাহ"।



বিসি ৮২২ :

চমৎকার ব্যাকেলাইটে ঢালাই করা কেবিনেটে ২-পোজিশন স্বর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সমন্বিত ৩ ব্যাণ্ড টেবিল মডেল এই ৭+১ ট্রানসিস্টর সেটটি রক্ষিত। হাই আউটপুট পিকআপ ও এক্সটেনশন স্পীকারেরও অতিরিক্ত ব্যবস্থা

G.E.C.

[আপনার ধ্বনিমাধুর্যের বাহক]

উৎসবে এমন কেলেংকারি ঘটে, সে উৎসব ভেঙে দেওয়াই ভাল।"

শান্ত কণ্ঠে ঘনশ্যাম পাদরী সায় দিল, —"ঠিক বলেছেন। সে উৎসব ভেঙে দেওয়াই ভাল।"

অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে সোমাবতী বললে, "তা তো বলবেনই। মুক্তোর মালাও গেল, সমাজেও ছি-ছি পড়ল।"

"পড়ুক। কিন্তু এ উৎসব আর এক-দণ্ডও চলতে দেওয়া উচিত নয়। আপনি কি বলেন?" বলে, মিটমিট করে স্যার ত্রিলোকেশ্বরের দিকে তাকাল ফাদার ঘনশ্যাম।

আচম্বিতে ক্ষেপে উঠলেন গৃহস্বামী। দড়াম করে টেবিলের ওপর প্রবল মুষ্ট্যাঘাত করে বললেন, "ছিঁড়ে ফেলো ফুলের মালা, রঙীন কাগজ, প্ল্যাস্টিকের আংগুর—সব টান মেরে ফেলে দাও এখুনি। সোমার মুক্তো যখন গেছে, তখন এগুলোও গোল্লায় যাক!"

নির্বোধমুখে প্রতিধ্বনি করল ঘনশ্যাম মণ্ডল, "গোল্লায় যাক!"

রিনকু সান্যাল বললে—"কি আবোল তাবোল বকছেন?"

সুকান্ত মিত্র বললে "আপনি কি পাগলামো করছেন?"

সদাশিব পাল "পোঁ ধরে ধাঙড় হরিকে ডাকি?"

শিশুপাল দত্ত বলল, "কি দরকার, আমরাই পারব। তাছাড়া একটা কিছু না করলে মুক্তো চুরির বিচ্ছিরি ব্যাপারটা ভোলাও যাচ্ছে না।"

'কারেক্ট' হুংকার ছাড়লেন স্যার ত্রিলোকেশ্বর। "ডেকরেশন দেখলেই আমার মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে। মারো টান।" বলে নিজেই একটা রঙীন কাগজের শেকল ধরে হ্যাঁচকা টান মারলেন।

"মজা মন্দ নয়", বলে এক লাফে টেবিলের ওপর দাঁড়িয়ে উঠল বিশ্ববসু ভৌমিক এবং এক টানে ঝাড় লন্ঠন থেকে নামিয়ে আনল কৃত্রিম আঙুরের স্তবক।

অহল্যা চ্যাটার্জি বলল, "এ কী অকল্যাণ? জন্মদিনের উৎসবে এমন ছেঁড়া খোঁড়া কি ভাল?"

"অকল্যাণের আর বাকী কি?" জবাব দিল ফাদার ঘনশ্যাম। "সব ধাপেই গেল। নিন, ছিঁড়ে ফেলুন সমস্ত।"

শিশুপাল দত্ত বললে, "আসবার সময়ে তো দেখে এলাম ড্রইং রুমে তালা ঝুলছে।"

"খুলে দিয়েছি", বললেন স্যার ত্রিলোকেশ্বর। "ভোর বেলাই ফাদার বলেছেন আমাকে, ওঘরে মুক্তো নেই। তাই তালা খুলে দিয়েছি।"

সায় দিল ফাদার, "ভালোই করেছেন। সত্যিই ও-ঘরে মুক্তো নেই।"

"তাহলে আর দেরি কেন?" সোল্লাসে বলল শিশুপাল দত্ত। "চলে আসুন মিস চ্যাটার্জি। মিসেস ভৌমিককে নিয়ে আপনি চলে যান জলসাঘরে। আমি চললাম ড্রইং-রুমে। দেখি কে আগে যায়।" বলেই দৌড়ালো শিশুপাল।

বিশ্ববসু বলল, "সব তছনছ করে ফেললে পুলিশ কিন্তু কোনো সূত্র পাবে না।"

"ডেকোরেশনের সঙ্গে পুলিশের কি সম্পর্ক?" বলে এমন বাঘের মত তাকালেন স্যার ত্রিলোকেশ্বর যেন বিশ্ববসুই মালা চোর। [illegible] মানে মানে সরে পড়ল ভৌমিক মশাই।

হই-হই করে লেগে গেল [illegible] সম্মান [illegible] আর সোমাবতী। [illegible] ধীরে [illegible] ঘরে [illegible] পড়ল [illegible]।

[illegible] ফাদার ঘনশ্যাম মণ্ডল। ড্রইংরুমের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে দেখতে পেল কিভাবে প্রচণ্ড উল্লাসে সাজসজ্জা ছিঁড়ছে সুকান্ত মিত্র, দীপা সেন আর শিশুপাল দত্ত। শিশুপাল [illegible]। সুকান্তর [illegible] শেষ করলে সে।

[illegible] হেসে দীপা সেন বলল, "ফাদার আপনি কিন্তু ওকে সাহায্য করলেন না। [illegible]।"

[illegible] চুপ করে রইল ফাদার। দেওয়াল পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত চুপ চাপ দাঁড়িয়ে রইল [illegible]। তারপর তিনজনের পিছু পিছু নেমে এল জলসাঘরে। স্যার ত্রিলোকেশ্বরকে কানে কানে কি বললেন তিনি। এগিয়ে শিশুপাল দত্তের কাঁধে হাত রাখলেন।

বললেন অমায়িক হেসে, "[illegible] আপনাকে ডাকছেন।"

যেন স্প্রিংয়ের বোতামে হাত পড়ল। নিমেষে ঘুরে দাঁড়াল শিশুপাল দত্ত।

মুঠো খুলে ফাদার বললে, "এইগুলোই খুঁজছিলেন তো?"

সমস্ত রক্ত নেমে গেল শিশুপালের মুখ থেকে।

কেননা ঘনশ্যাম মণ্ডলের প্রসারিত হাতের তালুতে দেখা গেল না, মুক্তো নয়।

শুধু সরু, অনেকগুলো ঝিকমিকে আলপিন!

"নিঃসন্দেহে মৌলিক", বলল ঘনশ্যাম মণ্ডল, "কিন্তু এই মৌলিকতা অন্য কাজে লাগালে শিশুপাল দত্তের আখেরে ভালো হত।

"ভদ্রলোকের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের প্রশংসা করতে হয়। টেবিলের ওপর খোলা নেকলেসটা দেখেই গোটা প্ল্যানটা মাথায় আসে। পিনগুলো পকেটেই ছিল। কাজেই ড্রইংরুমে একলা লুকোতে যাওয়ার আগে মুক্তোর মালাটা নিয়ে গেল সঙ্গে। সুতোটা ছিঁড়ে লুকিয়ে রাখল একটা ফুলের স্তবকের ফাঁকে। এই সেই সুতো। তারপর একুশটা মুক্তো নিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল টেবিলের ওপর। ঝাড়বাতি থেকে ঝুলছিল প্ল্যাস্টিকের আঙুরগুচ্ছ আর লতাপাতা। এই রকমই কয়েকটা আঙুর গুচ্ছের ফাঁকে ফাঁকে আলপিন দিয়ে একুশটা মুক্তো গেঁথে দিল শিশুপাল দত্ত। টেবিল থেকে নেমে পায়ের ছাপ মুছে দিল রুমাল দিয়ে।

"আঙুরের সঙ্গে মুক্তোর আশ্চর্য মিলের ব্যাপারটা আগে মোটেই মাথায় আসেনি আমার। স্টীল আলমারীর নিচে আলপিনটা দেখেই খটকা লাগল। সন্দেহ হল নিশ্চয় নেকলেস থেকে আলাদা করে নেওয়া হয়েছে মুক্তোগুলো।

"আজ ভোরবেলাই স্যার [illegible] সামনে সবকটা [illegible] তল্লাস করেছিলাম। ডেকরেশন ছেঁড়ার ব্যাপারটা আসলে একটা ফাঁদ। সেই ফাঁদে পা দিল শিশুপাল দত্ত। চাকর বাকরদের দিয়ে ছিঁড়লে মুক্তোগুলো হাতছাড়া হয়ে যাবে। তাই সদাশিব পালের প্রস্তাব নাকচ করল শিশুপাল। তারপরেই সবার আগে দৌড়োলো ড্রইং-রুমে। বুঝতে আর বাকী রইল না কুকর্মটি কার। তা সত্ত্বেও গেলাম ড্রইংরুমে। মুক্তো উধাও হয়েছে দেখে ভদ্রলোকের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। আর কোনো সন্দেহই রইল না আমার।"

স্যার ত্রিলোকেশ্বর বললেন, "কিন্তু একটা খটকা এখনো গেল না।"

"কী?"

"আলপিনটা হাতে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনি বুঝেছিলেন মুক্তোগুলো কোথায় আছে?"

"শুধু বুঝেছিলাম নয়, দেখেছিলাম। স্পষ্টই দেখেছিলাম মুক্তোগুলো [illegible] পাচ্ছে আঙুরের ফাঁকে ফাঁকে।"

"অসম্ভব।"

"কেন অসম্ভব?"

"আপনি হেঁট হয়ে ছিলেন। একবারও ওপরে তাকাননি।"

"ওঃ, এই কথা। ওপরে তাকানোর দরকার হয়নি বলে তাকাইনি। ওপরে না তাকিয়েও তো ওপর দেখা যায়।"

"যায়, যদি মাথার পেছনে চোখ থাকে।"

"অথবা, ঘরের মেঝে যদি কাচ দিয়ে বাঁধানো থাকে। যেমনটি আছে জলসাঘরে আর ড্রইংরুমে। তাই মেঝের দিকে তাকিয়েই আমি দেখেছি ওপরের আঙুর-গুচ্ছের প্রতিবিম্ব, দেখেছি সাদা মুক্তো নিয়ে ঝুলছে নকল আঙুরের থোকা।"*

* বিদেশী ছায়ায়

বিজ্ঞানের কথা

পৃথিবীতে মেয়ের চেয়ে ছেলের সংখ্যা বেশি কেন?

সারা পৃথিবীতে মোট জনসংখ্যার মধ্যে ছেলে না মেয়ে, কার সংখ্যা বেশি?—এ-প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সাধারণ মানুষের পক্ষে সহজ নয়। কিন্তু বিজ্ঞানীরা পৃথিবী জুড়ে সমীক্ষা করে দেখেছেন, প্রতি বছর পৃথিবীতে শতকরা একশোজন নবজাতকদের মধ্যে ছেলের জন্মহার হচ্ছে ৫১·৪৬। অর্থাৎ প্রতি বছর পৃথিবীতে মেয়ের চেয়ে ছেলেই জন্মায় বেশি। এইভাবে ছেলেদের সংখ্যা যদি ক্রমশই বেড়ে চলে, তাহলে মানুষের সমাজে একটি গুরুতর সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইতিমধ্যেই একজন বিশেষজ্ঞ মন্তব্য করেছেন, 'আমরা এমন এক পৃথিবীর দিকে এগিয়ে চলেছি যেখানে বিবাহযোগ্য মেয়ের অভাব সত্য সত্যই প্রকট হবে।'

পৃথিবীতে মানবজাতির উদ্বর্তনের দিক থেকে বিচার করলে পুরুষের জন্মহার বেশি কেন তার উত্তর খুঁজে পাওয়া কঠিন হয় না। আমরা সাধারণত মেয়েদের 'অবলা জাতি' বলে থাকি। উদ্বর্তনের দিক থেকে দেখলে কিন্তু দেখা যাবে, প্রকৃতপক্ষে পুরুষেরাই হচ্ছে 'দুর্বল জাতি'। কারণ মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের আয়ু অপেক্ষাকৃত কম। প্রাপ্তবয়স্ক ও শিশু উভয় অবস্থাতেই ছেলেরা সংক্রামক রোগে বেশি আক্রান্ত হয় এবং মেয়েদের চেয়ে ছেলেরা আঘাত বেদনা ও ভয়ে কাবু হয় বেশি। এইসব স্বাভাবিক কারণে ছেলেদের জন্মহার অপেক্ষাকৃত বেশি না হলে জীবনের প্রতিযোগিতায় তাদের যে হটে যেতে হবে তা সহজে উপলব্ধি করা যায়।

কিন্তু মানুষের জীবনচক্রে নারী ও পুরুষের এই আনুপাতিক হার কিভাবে নির্ধারিত হয়, তার ব্যাখ্যা করা সহজ নয়। বিজ্ঞানীরা এই বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ব্যাখ্যা করার জন্যে নানা তত্ত্ব পেশ করেছেন। আমরা জানি, স্পার্ম বা শুক্রাণু যখন ডিম্বাণু বা ওভমের সঙ্গে নিষিক্ত হয়, তখনই হয় ভ্রূণের সৃষ্টি। শুক্রাণু বহন করে পুরুষের বৈশিষ্ট্য এবং ডিম্বাণু বহন করে নারীর বৈশিষ্ট্য। পরীক্ষায় জানা গেছে, ডিম্বাণুর তুলনায় শুক্রাণু অপেক্ষাকৃত হালকা এবং দ্রুত ধাবিত হতে পারে। একটি তত্ত্ব অনুযায়ী পুং-ক্রোমোসোম বা ওয়াই-ক্রোমোসোমের এই বৈশিষ্ট্যের দরুণ স্ত্রী-ক্রোমোসোম বা এক্স-ক্রোমোসোমের তুলনায় তারা সহজে নিষিক্ত হতে পারে। আর এই কারণেই পুরুষের জন্মহার অপেক্ষাকৃত বেশি হয়ে থাকে।

সম্প্রতি পরীক্ষামূলক সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে আর একটি তত্ত্ব গড়ে উঠছে। এই তত্ত্বটি উত্থাপন করেছেন অক্সফোর্ডের বিশিষ্ট প্রজননতত্ত্ববিদ অধ্যাপক সি ডি ডার্লিংটন ও তাঁর সহকর্মীরা। এই তত্ত্বটি বেশ জটিল। সরলভাবে বলতে গেলে এই তত্ত্বের মূল কথা হলো—ছেলেরা সংখ্যায় বেশি জন্মায় তার কারণ হচ্ছে, যে-ডিম্ব-কোষ থেকে তার সৃষ্টি, সেটি মায়ের সম্পর্কে পরক বা বহিরাগত। এখানে একটা আপাত-বিরোধী ব্যাপার দেখা যায়, মানুষের দেহ তার অভ্যন্তরস্থ যে-কোনো পরক কোষের উপস্থিতি প্রতিরোধ করতে চায়। কিন্তু এখন পরীক্ষামূলক সাক্ষ্য-প্রমাণ প্রচুর পাওয়া গেছে যা থেকে জানা যায়, দেহমধ্যে পরক প্রোটিন বা অ্যান্টিজেনের উপস্থিতির দরুণ যে প্রতিরোধক অ্যান্টিবডি গড়ে ওঠে, তা নিষিক্তীকরণের পর মায়ের গর্ভাশয়ে ডিম্ব-কোষ রোপণে প্রকৃতপক্ষে সাহায্য করে। অ্যান্টিবডি-অ্যান্টিজেন বিক্রিয়া কিভাবে ডিম্বকোষ রোপণে সাহায্য করে, তা সম্যকভাবে এখনও উপলব্ধি করা যায়নি। তবে একাধিক গবেষক এ-বিষয়ে সাক্ষ্যপ্রমাণ দাখিল করে দেখিয়েছেন, এটাই হয়ে থাকে। ডার্লিংটন-এর মতে পুং-কোষে বেশি অ্যান্টিজেন থাকায় গর্ভাশয়ে রোপণের সময় তারাই সুযোগ পায় বেশি। আর সে কারণেই ছেলের আনুপাতিক জন্ম-সংখ্যা হয় বেশি।

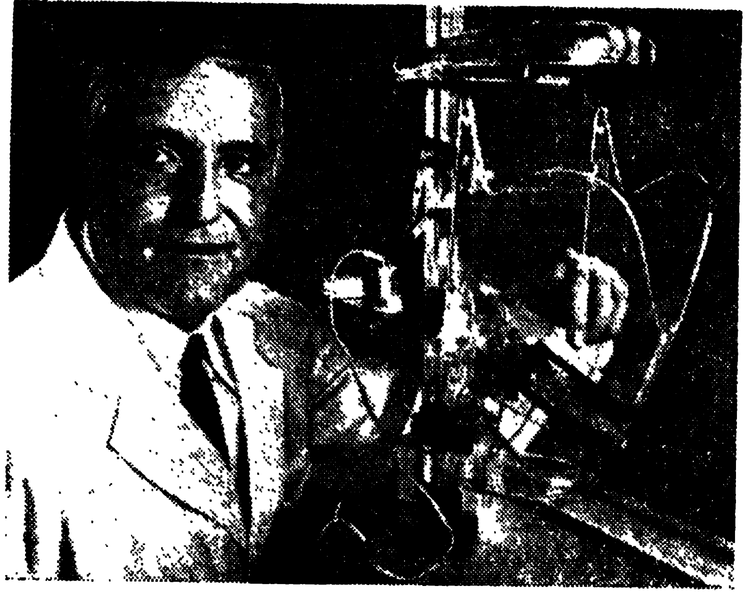
পুং বা ওয়াই-ক্রোমোসোম থাকায় দরুণই মায়ের গর্ভাশয়ে এগুলি পরক হয়। পুং-ক্রোমোসোম বংশগতির যে উপকরণ বহন করে তার দরুনই কোষে পুং-বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। মা মেয়ে হওয়ায় এই উপকরণগুলি মা-র সম্পর্কে পরক এবং সেজন্যে তারা অতিরিক্ত মাত্রায় প্রতিরোধক বিক্রিয়া গড়ে তুলতে চায়। স্ত্রী-কোষে কোনো ওয়াই-ক্রোমোসোম না থাকায় এই ধরনের বিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে না। এই অতিরিক্ত বিক্রিয়ার ফল সামান্য হতে বাধ্য, কারণ ওয়াই-ক্রোমোসোম হচ্ছে ক্ষুদ্রাকারের। কিন্তু তা পুং-কোষের অনুকূলে পাল্লা ভারী করার পক্ষে যথেষ্ট এবং তাই পুরুষের সংখ্যাধিক্য প্রকাশ পায়।

এই তত্ত্বের সমর্থনে যে সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া গেছে, তা হচ্ছে : পুং এবং স্ত্রী-কোষের মধ্যে যত বেশি সাদৃশ্য দেখা যাবে, ওয়াই-ক্রোমোসোমের কার্যকারিতার ফল হবে তত বেশি। জেঠতুতো খুড়তুতো ভাই-বোনের মধ্যে বিবাহে দেখা যায়, জনক-জননীর বংশগতির অবদান অস্বাভাবিক-একই রকম। তাহলে ডার্লিংটনের তত্ত্ব অনুসারে ওয়াই-ক্রোমোসোমের প্রতিক্রিয়া হবে প্রবল এবং জাত স্ত্রী-পুরুষের আনুপাতিক হার হবে অস্বাভাবিকভাবে বেশি। জেঠতুতো খুড়তুতো ভাইবোনের মধ্যে বিয়ের ফলে যে-সব ছেলেমেয়ে জন্মেছে, তার অনুসন্ধান করে ডার্লিংটন এই আনুপাতিক হারের সমর্থন পেয়েছেন। শুধু তাই নয়, তিন পুরুষ ধরে যাদের মধ্যে এই ধরনের বিয়ে হয়েছে, তাদের ছেলেমেয়েদের আনুপাতিক হার আরও বেশি হতে দেখা গেছে। স্ত্রী-পুরুষের হার এক্ষেত্রে ০·৬১ পর্যন্ত হয়েছে। জর্ডন ও ইজরাইলের স্যামারিটন সম্প্রদায়ের মধ্যে (যারা বংশপরম্পরায় এই ধরনের বিবাহ করে থাকে) স্ত্রী-পুরুষের আনুপাতিক হার ০·৬২-তে উঠতে দেখা গেছে, অর্থাৎ একশো জন নবজাতকের মধ্যে ৬২ জন হয় ছেলে এবং ৩৮ জন হয় মেয়ে।

নিদ্রা ও নিদ্রাহীনতা

মানুষ ঘুমায় কেন? সহজ মনে হলেও প্রশ্নটির জবাব দেওয়া সোজা নয়। নিউরোফিজিওলজিস্টদের সাম্প্রতিক আবিষ্কার নিদ্রা প্রহেলিকার কিছু রহস্য উদ্ঘাটন করেছে। দেখা গেছে মস্তিষ্কের একটি বিশেষ কেন্দ্র নিদ্রাকে নিয়ন্ত্রিত করে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময় জন্তুদের মস্তিষ্কের এই অংশ অপসারিত করায় তারা তৎক্ষণাৎ ঘুমিয়ে পড়েছে। কৃত্রিমভাবে বাঁচিয়ে রাখা গেলে দীর্ঘকাল পর্যন্ত এই জন্তুরা নিদ্রিত অবস্থায় থাকতে পারে। কখন ও কেন নিদ্রা আসে তার ব্যাখ্যা অবশ্য এতে পাওয়া যায় না। আপাতদৃষ্টিতে হাজার হাজার বছর ধরে বিকশিত এক চক্র এই নিদ্রাকে নিয়ন্ত্রিত করে ও প্রকৃতি চক্রের সঙ্গে তা যুক্ত। সূর্যগ্রহণ, ঋতু বদল, চান্দ্রচক্র, দিন-রাত, জোয়ার-ভাটা — এ সবই জীবরাজ্যে প্রক্রিয়াসমূহকে প্রভাবিত করেছে।

সম্প্রতি সোভিয়েত শারীরতত্ত্ববিদরা ২৪ ঘণ্টার চক্রকে বদলানোর উদ্দেশ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন। এসব পরীক্ষায়



ফ্রাঙ্কফুর্টের খবর যে একজন চিকিৎসক পাঁজরা থেকে কোমলাস্থি নিয়ে স্বরনালীতে প্রতিরোপণ করে গলার আওয়াজ জোর করে দিচ্ছেন। কিভাবে তা হয় ছবিতে ব্যাখ্যা করছেন ডাক্তার এবেরহার্ট কোইনিক

৪৮ ঘন্টা সময়ের মধ্যে নিদ্রার সময়কে কমিয়ে বারো ঘন্টা করা হয়েছে। সকল মানুষের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন স্বাস্থ্যের ক্ষতি না করে সামাজিক প্রয়োজনীয় কাজ ও অবসরযাপনের অতিরিক্ত সময় জোগাতে পারে।

কোন ব্যক্তি একেবারে না ঘুমিয়ে পারে না — বাতাস বা খাদ্যের মতই ঘুম সমান প্রয়োজনীয়। তবে সব মানুষই যে স্বাভাবিক নিদ্রা যায় তা নয়। চিকিৎসকেরা এমন বহু ঘটনার কথা জানেন যেখানে কোন কোন ব্যক্তি বাসে, সিনেমায় এবং এমন কি হাটতে হাটতে বা সাইকেল চড়ে যেতে যেতে ঘুমিয়ে পড়ে। জনৈক চিকিৎসক রোগী পরীক্ষা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়তেন। কখনো কখনো মাংসপেশী শিথিল হলে নিদ্রা আসে। জনৈক শিকারী বন্দুকের ঘোড়া টিপতে উদ্যত হলেই দুর্বলতা তাকে গ্রাস করত। এই ব্যাধির কোন কোন বহিঃপ্রকাশকে বলা হয় নার্কোলেপিস।

কেস হিস্ট্রি থেকে বহু দিন, মাসের পর মাস ঘুমিয়ে কাটিয়েছে এরূপ রোগীর দীর্ঘ রেকর্ড পাওয়া যায়। এদের অধিকাংশই তরুণ-তরুণী—সাধারণত মহিলা। এরা হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ে এবং দু-তিন দিন কিম্বা দুই থেকে পাঁচ সপ্তাহ পর্যন্ত নিদ্রিত থাকে। সাধারণত কোন কিছুই তাদের জাগাতে পারে না — সূঁচের খোঁচা, ঘুষি কিছুতেই তাদের ঘুম ভাঙে না।

এক বিশেষ ধরনের শীতস্বাপে (হাইবারনেসন) তন্দ্রাচ্ছন্নতার সঙ্গে যুক্ত হয় ক্ষুধা। এ ধরনের 'সাময়িক শীতস্বাপ' প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়। তবে এর স্থায়িত্ব এক মাসের বেশি হয় না। ২০ বছরের অধিককাল ধরে নিদ্রিত ব্যক্তিদের দুটি কেস রেকর্ড করা হয়েছে। রাশিয়ায় এক বড় জমিদারীর ম্যানেজার জনৈক কোচালকিন উনবিংশ শতকের শেষ দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিল এবং তার ঘুম ভাঙে অক্টোবর বিপ্লবের পর। বিখ্যাত সোভিয়েত শারীরবিজ্ঞানী ইভান পাভলফ এই ব্যক্তিকে পরীক্ষা করেছিলেন।

মাঝে মাঝে পত্র-পত্রিকায় এরূপ লোকের সংবাদ বেরোয় যারা নাকি একেবারেই নিদ্রা যায় না। এসব সংবাদ সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা সংশয় প্রকাশ করেছেন। একটা তত্ত্ব আছে যে, এসব ব্যক্তিদের চোখে অকস্মাৎ ঘুম নেমে আসে তা সামান্যক্ষণ স্থায়ী হয় এবং অন্যেরা ও সে নাকি নিজেও এই ঘুমের ব্যাপার লক্ষ্য করতে পারে না।

অবসাদের সম্পূর্ণ বিপরীত হল অনিদ্রা — এটি বর্তমান শতকের এক ব্যাপক ব্যাধি। এর কারণ স্নায়ুব্যবস্থার একটা নির্দিষ্ট বিশৃঙ্খলা—নিউরাস্থানিয়া। ঘুম পাড়িয়ে এখন এ রোগের চিকিৎসা করা হয়।

কয়েক বছর আগে কোন কোন বিদেশী পত্রিকা চাঞ্চল্যকর সংবাদ পরিবেশন করেছিল। এতে বলা হয়েছিল যে, সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা নাকি স্বাভাবিক নিদ্রার জায়গায় বৈদ্যুতিক নিদ্রাবেশ ঘটানোর প্রক্রিয়া প্রবর্তনের চেষ্টা করছেন। বলা হয়েছিল, হাজার হাজার লোকের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান হয়েছে।

এসব সংবাদের উৎস কি ছিল?

বিশিষ্ট সোভিয়েত মানসিক ব্যাধি চিকিৎসক ভাসিলি গিলিয়ারোভস্কির নির্দেশে এল লিভেন্তসেফ, ওয়াই সেগাল ও জেড কিরিলোভা ব্লকিং জেনারেটর নামে একটি নতুন যন্ত্র আবিষ্কার করেন। এর একটি এমপ্লিফায়ার ছিল। এতে রয়েছে নরম সীসার একটি তড়িৎপ্রবাহক ও প্লাস্টিক কাপ। এই কাপে আছে প্রায় দেড়শো ক্ষুদে ইলেকট্রোড। এই ইলেকট্রোডগুলি রোগীর নাকের চারপাশে চামড়ার উপর ও কানের পেছনে ফুটিয়ে দেওয়া হয়। কয়েক মিনিটের মধ্যেই রোগী ঘুমিয়ে পড়ে। একেই বলা হয় 'বৈদ্যুতিক নিদ্রা' ও কখনো কখনো 'বৈদ্যুতিক ঘুম পাড়ানো গান'। রুশ শরীরতত্ত্ববিদ আই পাভলোফ ও এন ভেদেনস্কি যে তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন তার ভিত্তিতেই এই নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন করা হয়েছে।

প্রতি বারে বৈদ্যুতিক ঘুম পাড়ানো ৩০।৪০ মিনিট থেকে দেড়-দু ঘণ্টা স্থায়ী হয়। বস্তুত, বিদ্যুৎতরঙ্গ বন্ধ করে দেবার পরও কিছুক্ষণ রোগী ঘুমোতে থাকে। ১৫ থেকে ২০ দিন চিকিৎসার পর নিউরাস্থানিয়া রোগের পুরো আরোগ্য সম্ভবপর হয়।

ঔষধের বদলে

এই নতুন পদ্ধতির বহু সমর্থক, প্রধানত মানসিকব্যাধি-চিকিৎসকদের মধ্যে মিলে গেল। তাঁরা কোন কোন ধরনের খণ্ড ব্যক্তিত্ব, ছিন্নসজাত মস্তিষ্কপ্রদাহ, মানসিক অবসাদের ভাবের চিকিৎসার জন্য বৈদ্যুতিক ঘুমপাড়ানো পদ্ধতি ব্যবহার করলেন। অন্যান্য ব্যাধিতেও এই

পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে। স্ত্রীরোগ-চিকিৎসকরা এর প্রয়োগ করেন গর্ভাবস্থায় রক্তদুষ্টির চিকিৎসায়, চিকিৎসকরা অলসার ব্যাধির চিকিৎসায়, শল্য চিকিৎসকরা আর্টারিওস্ক্লিরোসিস ও অস্ত্রোপচারের পরবর্তী চিকিৎসায়। কেন্দ্রীয় স্নায়ু ব্যবস্থার ক্ষতঘটিত ব্যাধি, নিউরোসিস, নিউরস্থ্যানিয়া ও হিস্টিরিয়ার চিকিৎসায়ও এ পদ্ধতির প্রয়োগ হচ্ছে।

বৈদ্যুতিক নিদ্রা স্বাভাবিক নিদ্রার বিকল্প হতে পারে না। কোন কোন ব্যাধির ফলে স্বাভাবিক নিদ্রা ব্যাহত হলেই মাত্র এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়।

এই যন্ত্রে প্রথম মডেলটি বহনযোগ্য ছিল না। বর্তমানে মস্কোর একটি কারখানায় বহনযোগ্য এরূপ যন্ত্র তৈরি হচ্ছে এবং এর দামও খুব বেশি নয়। বহু দেশে এই যন্ত্র পাঠান হচ্ছে।

সোভিয়েত জনস্বাস্থ্য দপ্তরের এক্স-পেরিমেন্টাল সার্জিক্যাল ইকুইপমেন্ট সম্পর্কিত নিখিল ইউনিয়ন ইনস্টিট্যুট বৈদ্যুতিক নিদ্রার একটি নতুন প্রক্রিয়া বের করেছে। এর দুটি ডিজাইন করা হয়েছে—একটি বহনযোগ্য ও অন্যটি স্থাণু। মস্কোর কয়েকটি হাসপাতালে পরীক্ষার ফল খুব আশাপ্রদ।

সমুদ্র রহস্য

পৃথিবীপৃষ্ঠের শতকরা সত্তরভাগেরও বেশী সমুদ্রে ঢাকা। এই বিশাল জলরাশি চিরকাল মানুষের কৌতূহল জাগিয়েছে—মানুষ চায় এর সমস্ত খুঁটিনাটি জানতে। সমুদ্রগহ্বরে রয়েছে অফুরন্ত ধাতব সম্পদ। আর সমুদ্রে যে অপর্যাপ্ত খাদ্য-সম্পদ রয়েছে তাকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারলে বুভুক্ষাকে চিরদিনের তরেই দূর করা যেতে পারে। তাছাড়া সমুদ্রস্রোত থেকে আবহবিদরা আরও নিখুঁতভাবে দিতে পারবেন আবহাওয়ার পূর্বাভাস। ঢেউ-এর প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে আরও উন্নত বন্দর জাহাজ তৈয়ারী করাও সুবিধা-জনক হবে।

পৃথিবী পৃষ্ঠের এই সমুদ্রজলে যে ধাতবলবণ দ্রবীভূত অবস্থায় আছে তার পরিমাণ হবে আনুমাণিক ৫৪ মিলিয়ন বিলিয়ন টন। অর্থাৎ প্রতি ঘন মাইলে ১৬৬ মিলিয়ন টন। যদি এই সমস্ত দ্রবীভূত লবণ নিষ্কাষণ করা যায় তবে তার সাহায্যে পৃথিবীপৃষ্ঠের পুরোটার ওপরে ১৬০ ফুট পুরো একটা আস্তরণ তৈয়ারী করা যাবে। বিভিন্ন জায়গায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন যে, সমুদ্রে প্রায় ১০ মিলিয়ন টন সোনা আছে অবশ্য সমুদ্র থেকে সোনা আহরণের কোন লাভজনক পদ্ধতি আজও আবিষ্কার হয় নি। তাছাড়া সমুদ্রে আছে :

তামা	—	১৫	বিলিয়ন	টন
বোরন	—	৭	ট্রিলিয়ন	টন
ম্যাঙ্গানিজ	—	১৫	বিলিয়ন	টন
ইউরেনিয়াম	—	২০	বিলিয়ন	টন
রূপা	—	৫০০	মিলিয়ন	টন

এই সমস্ত ধাতুগুলো যদি পুরোটা নিষ্কাষণ করা সম্ভব হত মানুষের দশ লক্ষ বছরের চাহিদা মেটাতে পারত। এসব ছাড়াও যৌগ অবস্থায় রয়েছে কিছু পরিমাণ এলুমিনিয়াম লোহা, সীসা ফসফরাস এমন কি রেডিয়ামও। সমুদ্রের নীচে পেট্রো-লিয়াম আছে আনুমানিক ৪০০ বিলিয়ন ব্যারেল। আর একটি মূল্যবান খনিজ পদার্থ ব্রোমিন। প্রতি ঘন-মাইল সমুদ্রজলে আছে প্রায় ৪ মিলিয়ন টন ব্রোমিন।

পৃথিবীতে লোকসংখ্যা যেমন দ্রুত-গতিতে বেড়ে চলেছে তেমনি নতুন নতুন শহরও গড়ে উঠছে। যার ফলে কর্ষণযোগ্য জমির পরিমাণ ক্রমশই কমে যাচ্ছে। সমস্ত পৃথিবীতে আজ সকালে যে সংখ্যক লোকের খাদ্যের দরকার হয়েছে আজ রাত্রে তার থেকে পঁচাশি হাজার বেশী লোকের খাদ্যের জোগান দিতে হবে। খাদ্যসমস্যা পৃথিবীতে এক বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। উপযুক্ত ব্যবস্থা না করলে এই সমস্যা ভবিষ্যতে এক ভয়ংকর রূপ নেবে। আধুনিক কৃষিব্যবস্থাও, পুরোপুরিভাবে এর সমাধান আনতে পারবে না। তাই বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আজ সমুদ্রের ওপর—কিভাবে সমুদ্র থেকে খাবার পাওয়া যেতে পারে। সমুদ্রের প্রধান সহজলভ্য খাদ্য মাছ। জাপানীরা প্রতিবছর ৬০ লক্ষ টন মাছ ধরে সমুদ্র থেকে। খাদ্যসমস্যাজর্জরিত ভারতে লোকসংখ্যা যেখানে জাপানের পাঁচগুণ সেখানে মাছধরা হয় বছরে মাত্র ১০ লক্ষ টন। এর কারণ হচ্ছে মাছধরার অনুন্নত পদ্ধতি আর উপযুক্ত জ্ঞানের অভাব। ভারতের উপকূলবর্তী সমুদ্রে প্রচুর মাছ পাওয়া যেতে পারে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। ক্রমবর্ধমান জনসমষ্টির খাদ্যসমস্যা সমাধানে তাই আজ উন্নত মৎস্য চাষ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা হচ্ছে। তাঁরা চিন্তা করছেন সমুদ্রে কোথাও একটা আণবিক চুল্লী বসালে তা থেকে যে তাপ বেরোবে সেই তাপে সমুদ্রের জল গরম হয়ে নীচে থেকে উপরে উঠে আসবে সঙ্গে নিচেকার নানারকম মাছের জীবনধারণোপযোগী খাদ্য। এইভাবে সমুদ্রের কোন একটা নির্দিষ্ট জায়গা কৃত্রিম উপায়ে মাছের বসবাসের অনুকূল করে তৈরী করা যেতে পারে। উন্নত মৎস্যচাষ পদ্ধতিতে উপকূলের মৎস্যব্যবসায়ীরা বছরে অন্তত একরে ৬০০০ পাউন্ড মাছ ধরতে পারে।

সমুদ্রের তলদেশ প্রায় ১০০০ ফুট পুরু একটা পাথরের স্তর দিয়ে গড়া। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে ধুলোবালি, কাদা, পাথরের নুড়ি নদীর স্রোতে কিম্বা বাতাসের সাহায্যে সমুদ্রের নীচে জমা হয়েছে স্তরে স্তরে। তাছাড়া আছে উল্কাপাত। যখন উল্কা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মধ্যে আসে, ঘর্ষণজনিত তাপে ছোট ছোট কণায় ভেঙে যায়। যেহেতু পৃথিবীপৃষ্ঠের বেশীর ভাগই জলে ঢাকা এগুলোর বেশীর ভাগই আশ্রয় নেয় সমুদ্রের নীচে। প্রতি বছর কয়েক লক্ষ টন উল্কাভস্ম সমুদ্রের নীচে জমা হয়। এই স্তরগুলো পরীক্ষা করে বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর অবস্থা কেমন ছিল বিজ্ঞানীরা তার একটা অনুমান করতে পারেন। যে স্তরে উল্কাভস্ম বা আগ্নেয়গিরির ভস্ম [illegible] পাওয়া যাবে, অনুমান করা যায় সেকালে পৃথিবীতে চলছিল ভয়ংকর অগ্নুৎপাত।

জনৈক বৃটিশ পদার্থবিদের মতে পৃথিবীর যতই বয়স বাড়ছে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ততই কমে যাচ্ছে। আর তার ফলে পৃথিবীটা নাকি ক্রমশই ফুলে যাচ্ছে তাঁর মতে পৃথিবীর এই বিরাট স্থলভাগ যখন তৈরী হয়েছিল তখন সবটাই ছিল একটা অখণ্ড ভূমিখণ্ড। পরে ভেঙে ভেঙে আলাদা হয়ে গিয়েছে। পৃথিবীর ম্যাপের দিকে তাকালেই দেখতে পাব আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল যেমন ভেতরের দিকে ঢুকে গেছে ওদিকে দক্ষিণ আমেরিকার পূর্ব উপকূল বাইরের দিকে বেরিয়ে এসেছে। আর দুটোকে পাশাপাশি রাখলে একটার সীমারেখা অন্যটার সঙ্গে পুরোপুরি মিলে যাবে। আরও ভালভাবে লক্ষ্য করলে দেখতে পাব—উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপ কিম্বা ভারতবর্ষ আর আফ্রিকার পূর্বে মাদাগাস্কার—এদের মধ্যেও এই সাদৃশ্য।

সমুদ্রের গভীরতা সব জায়গায় সমান নয় — গড়ে প্রায় সাড়ে সতেরো হাজার ফুট অর্থাৎ তিন মাইলের একটু বেশী। সব-থেকে গভীর প্রশান্ত মহাসাগর। এর গভীরতা ৩৫,৬৪০ ফুট অর্থাৎ সাড়ে ছয় মাইলেরও বেশী। একটা এভারেস্ট পর্বতকে এর মধ্যে সহজেই ডুবিয়ে রাখা যায়। এই-রকম বহু পর্বতশৃঙ্গ রয়েছে সমুদ্রের তলদেশে — হাজার হাজার মাইল লম্বা। এর মধ্যে সবথেকে উঁচু মাউন্ট পিকো—২৪০০০ ফুট।

গভীর রহস্যে ভরা এই সমুদ্র। এর গভীরে হয়ত রয়েছে আরও কত রহস্য যার সন্ধানে মানুষ আজ উঠে-পড়ে লেগেছে—তাকে চিনবে, তাকে জানবে।

বিদ্যুৎকুমার নিয়োগী



।। ১৬ ।।

সেই প্রথম দেখা, প্রথম পরিচয় কিরণের সঙ্গে। অত্যন্ত দুর্দিন, অত্যন্ত দুঃখ-দিনে। শোকের কালোছায়ার মধ্যে, মৃত্যুর অন্ধকারে বলতে গেলে প্রথম দেখল ওরা দুজনে দুজনকে। একেবারে অতর্কিতে, অপ্রত্যাশিতভাবে। কোন প্রস্তুতি কি কোন পূর্বাভাসও ছিল না কোথাও।

সেদিন প্রথমটা একটু বিব্রতই বোধ করেছিল সুরবালা, ভাইয়ের অবিবেচনায় বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। অর্থাভাব আর নেই এটা ঠিক, একটা লোককে খাওয়ানো এখন কিছুই নয়—কিন্তু এসব ক্ষেত্রে অর্থটাই বড় কথা নয়। আত্মীয় বিয়োগ—বিশেষ মা-বাবার মতো একান্ত আপনজন বিয়োগে—শোকের মধ্যে একটু অন্তরঙ্গতা খোঁজে মানুষ, একটু আড়াল, একটু নির্জনতা চায়। বাইরের লোক সেখানে অপ্রয়োজন শুধু নয়, অবাঞ্ছিত। যেখানে শোক কাউকে দেখানোর প্রশ্ন নেই--সেখানে মানুষ তার সমস্ত মুখোশ খুলে কাঁদতে চায়—বাইরের কোন কৌতূহলী—হোক তা সমবেদনাপূর্ণ--চোখের সামনে ততটা স্বচ্ছন্দ হওয়া কঠিন। সুরবালাও সম্ভবত বিরক্ত ও বিব্রত বোধ করেছিল এইজন্যেই এবং বিস্মিত বোধ করেছিল নবাগন্তুক এই অবস্থা দেখেও চলে না যাওয়ায়।

কিন্তু পরে বুঝেছিল, এ যোগাযোগের মধ্যে সেদিন ঈশ্বরেরই নির্দেশ ছিল। কে জানে তার বাবার সতীমাই তার প্রয়োজনে এই ছেলেটিকে টেনে এনে ছিলেন কিনা।

এর যা লৌকিক পরিচয় তা পরে একটু একটু করে পেয়েছিল সুরবালা—কতক ভাইয়ের মুখে, কতক ওর নিজের মুখেই—আর সেই সঙ্গে ভাইয়ের আপাত-স্বচ্ছল অবস্থার কারণটাও পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু সে পরিচয় তখন না পেলেও চলত।

কিরণের অন্য পরিচয়ও একটা ছিল, মানুষ হিসেবে পরিচয়। সেইটেই তার বড় পরিচয়, সত্য পরিচয়। আর সেটা, বোধ-হয় এই একান্ত অসময়ে এসে না পড়লে এমনভাবে পেত না সুরবালা।

পরোপকারী বা মহাপ্রাণ—এসব শব্দ মামুলী, বহু ব্যবহৃত। আর তা বললেও যথেষ্ট বলা হয় না। তেমন লোক হয়ত আরও আছে। সুরবালাই দেখেছে তেমন লোক। এই ছেলেটি তার চেয়েও বেশী। অথবা কম। কারণ সে সর্বত্রই এই ধরনের পরোপকার করে বেড়ায় তাও তো নয়।

এই রকম সম্পূর্ণ অপরিচিত পরি-বেশে, অনভ্যস্ত জীবনযাত্রার পৃষ্ঠপটে একটি আসন্ন মৃত্যুর মধ্যে এসে পড়েও—এক মুহূর্ত বিপন্ন বোধ করল না ছেলেটি। দ্বিধা বা ইতস্তত করল না, চলে যাবার চেষ্টা তো করলেই না। অথচ অনায়াসেই তা করতে পারত, করাই হয়ত উচিত ছিল, লোকের চোখেও সেইটেই শোভন দেখাত। আস্তে আস্তে দু-এক কথায় গণেশের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে চলে গেলে কেউ দোষ দিত না বরং যা করা স্বাভাবিক তাই করছে মনে করত। না যাওয়াতেই সকলে বিস্মিত হয়েছে সে সময়ে। আর সে ব্যবস্থা বা উপায়ও তার ছিল। আশ্রয় মানে থাকার একটা আস্তানা এবং অর্থ—কোনটারই অভাব ছিল না।

কিন্তু সে দিক দিয়েই গেল না কিরণ। বরং চোখের নিমেষে অবস্থাটা বুঝে নিয়ে, রোগীর কষ্ট বুঝে—এই অপ্রত্যাশিত ঘটনার আকস্মিকতায়, এতকাল ভাইকে দেখে পাখা ফেলেই সুরো বাইরে চলে এসেছিল—ছুটে গিয়ে ভবতারণের শিয়রে বসে পাখটা তুলে নিয়ে বাতাস করতে শুরু করল। অপ্রতিভ সুরো অন্যায়টা বুঝতে পেরে এসে পাখাটার দিকে হাত বাড়াতে খুব সহজ অথচ মৃদু কণ্ঠে বলল, 'আপনি ওদিকটাই বরং একটু দেখুন। ও'র খুব কষ্ট হচ্ছে, এ সময়টা একটু জোরে বাতাস করা দরকার। আপনার হাত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, ঠিক এখনই আপনি পারবেন না অত জোরে হাওয়া করতে।' আদেশ নয়, অথচ ঠিক যে কী তা সুরবালাও তখন বুঝল না, বোঝবার চেষ্টাও করল না, বরং যেন কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে আবার ভাইয়ের কাছে এসে দাঁড়াল।

তারপরও যাওয়ার কথাটা যেন চিন্তাই করল না, সম্ভাবনাটাই মাথায় এল না তার। তার বদলে অতি অল্পক্ষণ, বোধহয় আধ ঘণ্টার মধ্যেই সুরোকে দিদি এবং নিস্তা-রিণীকে মাসিমা সম্বোধন করে—কখন সুরোর কোন সম্বোধনের ফাঁকে সম্পর্কটা জেনে নিয়ে শশীবৌদির সঙ্গে বৌদি পাতিয়ে একেবারেই এদের আত্মীয় হয়ে উঠল। এমন অল্পবয়সী তরুণ—তরুণ কেন প্রায় কিশোর ছেলে এত সহজে আপনজনের মতো মিশতে পারে তা এর আগে আর কখনও দেখেনি সুরবালা। এই বয়সটা বড়-

রাজ্যের অকারণ কুণ্ঠা ও লজ্জা টেনে আনে।—পদে পদে আত্মীয়তা যা অন্তরঙ্গতা স্থাপনে বাধা সৃষ্টি করে। এই বয়সের ছেলেরা সাধারণত কোন লোকের সঙ্গেই সহজে মিশতে পারে না—এমন কি অপরিচিত অন্য সমবয়সী ছেলের সঙ্গেও না। স্বল্পপরিচিত আত্মীয়দের পর্যন্ত এড়িয়ে চলে। কিরণ কিন্তু অনায়াসে এক মুহূর্তে এদের পাশে এসে দাঁড়াল, আর তার আচরণে একবারও মনে হল না যে, এই প্রথম এদের দেখল সে, মনে হল না যে, কিছুক্ষণ আগেও এই সমস্ত পরিবারটাই ছিল একেবারে অপরিচিত—তার জীবনযাত্রা আর এদের জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ পৃথক, ভিন্নস্তরের; বলতে গেলে দুই ভিন্নজগতের মানুষ তারা। মনে হল না বোধহয় আরও এই জন্যে যে, এই ধরনের যে-সব মানুষ এমনি অপরিচিত ঘরে এসে আপন হতে চায় বা হয়—তাদের মতো উচ্ছ্বাসের আতিশয্য নেই ওর। কথাই কম বলে, নিজেকে জাহির করে না, ঠিক প্রয়োজনের সময়টির জন্যে শান্তভাবে অপেক্ষা করতে পারে। অথচ কথা যে কম বলে তাও ঠিক বোঝা যায় না, দরকারের সময় কম বলেও না। অর্থাৎ সে একেবারেই সহজ হয়ে যায়, সত্যকারের আত্মীয়রা যেমন সহজ আচরণ করে তেমনি করেই।...

সেদিন তো সে কোথাও গেলই না, পরের দিনও নড়ল না।

তার পরের দিন, তার পরের দিনও না।

ভবতারণের মৃত্যুর পর অশৌচের কটা দিন ঐখানেই কাটাল। ওরই মধ্যে, ঐ সামান্য জায়গাতেই স্থান করে নিয়ে কোনমতে যেন মাথা গুঁজে পড়ে রইল। কায়স্থ জেনে শশীবৌদি ওর খাওয়ার ভারটা নিয়েছিলেন কিন্তু কিরণ এদের সকলের ভার নিজের হাতে তুলে নিল। শ্মশানযাত্রার ব্যবস্থাই তো একটা গুরুদায়িত্ব; তখন ব্রাহ্মণ শববাহক পাওয়া এখনকার মতো এত সহজ ছিল না। বিশেষ ঐ পাড়ায়। শ্মশানযাত্রার নাম করলেই আত্মীয়রা নানা অছিলায় এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করত। কিরণ যে কোথা থেকে কোন মন্ত্রে এতগুলো লোক ডেকে আনল তা সে-ই জানে। সংকারের ব্যবস্থা থেকে শুরু করে হবিষ্যির যোগাড়, পুরোহিত ডেকে শ্রাদ্ধের ফর্দ নেওয়া, টোলে গিয়ে প্রায়শ্চিত্তের বিধান সংগ্রহ, বাজার-হাট, একজন ব্রাহ্মণ সংগ্রহ করে গণেশকে টেনে বার করে দায় জানাতে পাঠানো—সব কাজই যেন আপনা থেকে তার ওপর গিয়ে পড়ল, অথবা তাকে বর্তাল। সেদিন সেই দুঃসময়ে নানুও এসে দাঁড়িয়েছিল কোথা থেকে খবর পেয়ে, এসেছিলেন গোলোকবাবু দুর্গামারাও; শশীবৌদিরা তো করবেনই, করেওছেন ঢের, এঁরা সকলেই করেছেন, যার যতটুকু সাধ্য বরং হয়ত সাধ্যের অতীতই করেছেন—তবে কিরণ যা করল তার যেন তুলনাই হয় না। ছোট নয়—বড় ভাইয়েরই কাজ করল সে। সুরবালার বারবারই মনে হতে লাগল কিরণ না এসে পড়লে কী করত সে! তার জীবন বেশী দিনের নয়—বুদ্ধি-অভিজ্ঞতা দুইই কম। মৃত্যু এই প্রথম দেখল সে। আত্মীয়স্বজন থেকে চিরদিন পৃথক থেকে এসেছে তারা। যেদিন থেকে তার বাবা ঘোষ-পাড়ায় যাতায়াত শুরু করেছেন, সেইদিন থেকেই প্রায় সকলে সম্পর্ক ছেদ করেছে, অন্তত খুব একটা আসা-যাওয়া নেই আর, তাছাড়া ওদের দারিদ্র্যও একটা বড় অন্তরায় আত্মীয়তা অন্তরঙ্গতার। এখন দারিদ্র্য নেই, কিন্তু 'কেত্তনউলী', 'বাইউলী', 'ঢবউলী' ইত্যাদি বিশেষণ আছে। সকলে চায় গোপনে এসে অর্থসাহায্য নিয়ে যেতে। সুরবালার তাতে বিষম আপত্তি। তা সে যাই হোক, ওরা যাদের এতকাল পরিহার করে এসেছে, তারা এখন এসে স্বেচ্ছায় বুক দিয়ে পড়ে সাহায্য করবে। এতটা আশা করা অন্যায়, করেও না সে। সেইজন্যেই আরও কিরণের এই আন্তরিকতার এত মূল্য। সে না এলে এই অসহায় দুঃখের দিনগুলো কেমন করে পার হত সে—কেমন করে এই দায় পার হত—এখন যেন কল্পনাই করতে পারে না।

সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য মনে হত তার, সে এর দ্বারা শশীবৌদিদের নানুদাকে কি গোলোকবাবুদের ছোট করে দেখছে না তো, অবিচার করছে না তো তাঁদের ওপর? সুরবালা এই বয়সেই নিজের মনকে দেখতে শিখেছে। এটাও সে জানে যে, মানুষ যখন যাকে প্রীতির চোখে দেখতে শুরু করে, যখন যার সাহচর্যে আনন্দ পায়, তখন তার ক্ষুদ্রতম আনুকূল্য বা চরিত্রগুণও অনেক বড় করে দেখে। আসলে হয়ত এই প্রিয়দর্শন, বিনত, মিতভাষী ও স্মিতমুখ তরুণটি এই কদিনে আপন ছোট ভাইয়ের মতোই অনেকখানি স্নেহ অধিকার করে নিয়েছে, ভাইয়ের বন্ধু হিসেবে যতটা পাওয়া উচিত—ওর স্বভাবে ও ব্যবহারে তার চেয়ে অনেক বেশীই আদায় করেছে—সেইজন্যেই ওর উপকারকে এতটা বাড়িয়ে দেখছে, কিন্তু এ বিচারবুদ্ধিটা বেশীক্ষণ থাকত না, আবারও কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত।

তখনও সে জানে না, সেদিন কল্পনা করাও সম্ভব ছিল না—কিরণের এই পরিচয়টাই তার জীবনে বার বার পেতে হবে, তার জীবনে বার বারই এসে দাঁড়াবে ও এমনি নিঃশব্দে, এমনি বিনা আমন্ত্রণে ও আড়ম্বরে—ঠিক প্রয়োজনের ক্ষণটিতে, চরম সংকটের দিনে, মর্মান্তিক দুঃখের দিনে!

কিন্তু কিরণের কাছ থেকে তার বা তাদের উপকার নেওয়ার এটাও শুরু নয়। পরে, ক্রমে ক্রমে যা শুনল, গণেশকে এইভাবে ফিরে পাবার মূলেও ভদ্র, সভ্য বেশে এই বাড়িতে এসে ঢোকা নয়, ফিরে পাওয়া কথাটার পরিপূর্ণ অর্থেই—এই কিরণ।

কিরণ হল এই দিককারই, গোবরডাঙ্গা না দত্তপুকুর কোথাকার কোন্ জমিদারের একমাত্র ছেলে (জায়গাটার প্রায় সারা জীবনেও মুখস্থ হল না সুরবালার)—খুব ভাল অবস্থা না হলেও খুব ছোটখাটোও নয়, মাঝারি দরের জমিদার ওরা। মূর্খও নয় একেবারে, লেখাপড়াও কিছু কিছু করেছে। ইস্কুল কলেজে কোথাও পড়েনি, বাবা মাস্টার রেখে বাড়িতেই মোটামুটি বিষয়-কর্ম চালাবার জন্যে যেটুকু দরকার শেখা—শিখিয়েছিলেন। কিন্তু ছেলের ঘোরতর থিয়েটার করার শখ, সে মা ও দিদিমাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে বেশ মোটামুটি কিছু টাকা হাতিয়ে নিয়ে ঐ বয়সেই কলকাতায় এসেছিল, হয় টাকা খরচ করে নিজেই নতুন থিয়েটার খুলে তাতে নতুন বই নামিয়ে নিজে নায়ক সাজবে, নয়তো কোন চলতি থিয়েটারকে অর্থসাহায্য দিয়ে তার আধা-মালিক হয়ে বসবে। এটুকু সে বুঝে নিয়েছিল যে, টাকার জোর ছাড়া তার কোনও নাটকে নায়ক সাজবার কোন সম্ভাবনাই নেই।

সেই সময়টা নাকি গণেশও কোন্ এক সূত্রে থিয়েটার মহলে বা তার ধারেকাছে ঘোরাফেরা করত। সেইখানেই পরিচয় হয় কিরণের সঙ্গে। সমবয়সী সুশ্রী চেহারার ছেলে দেখে কিরণই যেচে আলাপ করে। গণেশের মধ্যে কী একটা চুম্বকের মতো আকর্ষণী শক্তি আছে, যা সহস্র লোকের মধ্যেও চোখকে টানে—একথা পরেও অনেকবার বলেছে কিরণ। গণেশেরও, সুশ্রী-সুকুমার ছেলে-মানুষের মতো সরল চেহারার এই ছেলেটিকে দেখে, ওর সঙ্গে মিশে ওর ভদ্র কথাবার্তায় ও আন্তরিক ব্যবহারে কেমন একটা মায়া পড়ে যায় কিরণের ওপর। সে-ই কিরণকে বোঝায় যে এ ব্যবসায় আজ পর্যন্ত কেউ বড়লোক হতে পারেনি বরং অনেক বড়লোকই পথে বসেছে। টাকার লোভে আজ যারা ওর তোষামোদ করছে, টাকা ফুরোলেই ওকে ছেঁড়া জুতোর মতো আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিয়ে চলে যাবে। আর, টাকা দিয়ে এক-আধটা বইতে নায়ক সাজার মধ্যে কোন কৃতিত্ব নেই, তৃপ্তিও নেই। গুণের সমাদর না হলে, নিজের দক্ষতার জোরে প্রতিষ্ঠিত বা যশস্বী হতে না পারলে কিসের সার্থকতা? যদি বা সত্যিই ওর কোন শক্তি কি অভিনয়-ক্ষমতা থাকেও, সেটার জন্যে কোন বাহবাও পায়, সেটুকুও উপভোগ করতে পারবে না। মনে মনে এই গ্লানিটাই বরং বেশী করে থেকে যাবে যে, শক্তি নয়, অর্থ দিয়েই এই সম্মানটা কিনেছে সে।

তাছাড়া আরও বুঝিয়েছিল গণেশ, যতদূর সম্ভব মোলায়েম করেই বুঝিয়েছিল, ঈশ্বরই তাকে বঞ্চিত করে পাঠিয়েছেন, চেহারায় মেরে রেখেছেন। জীবনে কোনদিনই কোন দর্শক তাকে 'হিরো' বলে মানতে পারবে না। যেটা কিরণ পারবে সেটা কোন 'কমিক পার্ট', আর সে ধরনের অভিনয় সে সত্যিই ভাল করে নাকি। সে অভিনয়ে এমনিই প্রতিষ্ঠা পাবে সে, নিজের শক্তিতে। তার জন্যে টাকা খরচ করতে হবে কেন? গণেশই পারবে তাকে সে ধরনের পার্ট যোগাড় করে দিতে।

এমনি হয়ত এসব কথা, সং বুদ্ধির কথা ভাল লাগত না, অন্য কেউ বললে রেগেই যেত তার ওপর। মোহ তখনও সম্পূর্ণ কাটে নি, কিন্তু গণেশের কথা শুনল। কারণ তার আন্তরিকতার পরিচয় পেয়েই হোক, আর ব্যক্তিত্ব কি রূপে অভিভূত

হয়েই হোক — তার সম্বন্ধে একটা দুর্বলতা জন্মে গিয়েছিল কিরণের মনে। এ ক্ষমতা গণেশের আশৈশব — কোনদিনই তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ যেতে পারে না, তার কোন অনুরোধ বা আবদার প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। সুরবালা তা নিজের অভিজ্ঞতা থেকে ভাল করেই জানে।

কিরণও ক্রমশ একটু একটু করে পোষ মানল। আর সেই সুযোগে পরে কোন ধাড়িবাজ জোচ্চোরের ধাপ্পায় মতিগতি আবার বদলে যাবার সময় না দিয়েই গণেশ ওর সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে দেশ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এল, ওর বাবা-মায়ের কাছে। তাঁরা এত শিগ্‌গির ছেলে বা ঐ টাকার—কোনটাই ফিরে পাবার আশা করেন নি। ছেলে ফিরে আসবে তা তাঁরা জানতেন, কলকাতাতেই যে ঘোরা-ফেরা করছে সে, এ খবরটা পেয়েছেন আগেই, কিন্তু সেই জন্যেই টাকাটা ফিরবে না, সে বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন। টাকাটা ফুরোলে ছেলে ফিরবে রিক্তহস্তে, ভগ্নমনে, ওদিকের নেশাটাও ছুটে যাবে ততদিনে ঘরে ও বিষয়-কর্মে মন বসবে; তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে সেরেস্তার কাজে জুতে দেবেন সেই জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। সেই ছেলে এমন অপ্রত্যাশিতভাবে ফিরে আসতে—আর সেই সঙ্গে প্রায় তিন-চতুর্থাংশ হারানিধি টাকাটাও স্বভাবতই খুশী হয়ে উঠলেন, এবং সমস্ত বিবরণ শুনে গণেশের কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ বোধ করতে লাগলেন। কিরণের মা তো একেবারেই বড় ছেলে সম্পর্ক পাতিয়ে—'তুই আমার যথার্থ বড় ছেলের কাজ করলি বাবা' বলে কোলে বসিয়ে চুমু খেয়ে আদরে আদরে অস্থির করে তুললেন। কিরণের বাবাও কিছুতে তাড়াতাড়ি ছাড়তে রাজী হলেন না, একরকম জোর করেই ধরে রাখলেন। কৃতজ্ঞতা ছাড়াও গণেশের চেহারায় আর কথাবার্তায় ইতিমধ্যেই তাঁরা যথেষ্ট মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন।

সেই সময়েই কথাপ্রসঙ্গে কিরণ একদিন বলেছিল—গণেশের শখ বা নেশার কথাটা।

বিনা অস্ত্রোপচারে
অর্শ থেকে
আরাম পাবার
জন্য
অ্যাডেনসা
ব্যবহার করুন!
DOL-327 BEN

গণেশ এর মধ্যে কয়েকদিনই তার ম্যাজিকের খেলা কিছু কিছু ও'দের দেখিয়ে-ছিল। প্রায় অবিশ্বাস্য সেসব এ'দের কাছে। পরে যখন শুনলেন যে, ব্রাহ্মণের ছেলে হয়েও এই জাদুবিদ্যা বা ইন্দ্রজাল শেখার জন্যে সে পথে পথে ঘোরে, বেদেদের দলে মিশে অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে তাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায় — তখন রামকমলবাবুই ওকে বলেন—এসব বিদ্যা ভাল করে শিখতে হলে কামরূপে যাওয়া দরকার। সেখানে নাকি ঘরে ঘরে — মেয়েরা পর্যন্ত এসব বিদ্যা জানে। শুধু বলাই নয়, ওর উৎসাহ দেখে খরচপত্র সব দিয়ে তিনিই পাঠিয়ে দিয়ে-ছিলেন সেখানে।

কামরূপের কথা তিনি কার কাছ থেকে শুনেছিলেন কে জানে—বোধ হয় 'কামরূপ কামিখ্যের মেয়েরা পুরুষদের ভেড়া করে করে রাখে' এমনি একটা জনশ্রুতি থেকেই ধরে নিয়েছিলেন যে তারা ইন্দ্রজাল জানে। সেখানে খুব কিছু সুবিধে হয়নি গণেশের। সুবিধে হয়েছিল—তবে সে অন্যত্র। রামকমল বাবুর দৌলতে—খরচ দেবার সময় কিছুমাত্র কৃপণতা করেন নি তিনি—আর গণেশেরও আতিথেয়তা আদায়ের শক্তি প্রায় অলৌকিক, গোটা আসামটাই সে দেখে নিয়েছে প্রায় আর সেই সুযোগে পাহাড়ীদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেও নিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে আসাম ঘুরে মাত্র এই কদিন আগে ফিরেছে কিরণের টানে বা তার বাবা-মার টানে, তাদের দেশেই। ইতিমধ্যে কিরণও তাদের সেরেস্তার জাবদা ও রোকড়ের চাপে হাঁপিয়ে উঠেছিল, কলকাতায় আসবার জন্যে ছটফট করছিল। গণেশ যে তাকে থিয়েটারে ঢোকবার সুবিধে করে দেবে—সে প্রতিশ্রুতি কিরণ ভোলে নি। কিরণের সে ইচ্ছাতে পরোক্ষে ইন্ধন যোগালেন রামকমলবাবুরাই। গণেশের মতো ছেলে হারিয়ে, এতকাল না দেখে না জানি ওর বাবা-মা কত কষ্ট পাচ্ছেন অনুমান করে তাঁরাই উপকারের প্রত্যুপকারস্বরূপ কিরণকে সঙ্গে দিয়ে গণেশকে ওর বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। ছেলেটাও একটু ঘুরে আসুক, গণেশ সঙ্গে থাকলে বিগড়োবার ভয় নেই, হয়ত এ কথাও ও'দের মনের মধ্যে ছিল।

ভবতারণের শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকে যেতে কিরণ তাদের বাড়িতে গিয়ে উঠল। চোর-বাগানের দিকে কোথায় তাদের নাকি একটা বাড়ি ভাড়া করাই আছে দীর্ঘকাল থেকে। সেখানে একটা ভাগের চাকরও আছে। ভাগের চাকর মানে সে অন্য বাড়িতে ঠিকে কাজ করে, কাছেই মেয়েছেলের পাড়া, সেখানে ঘর ঘর বাজার করে দিয়ে আসাই তার প্রধান জীবিকা—থাকে এদের এই বাড়িতে কতকটা চৌকীদার হিসেবে। ছোট বাড়ি, ওপরে দুখানি, নিচে একখানি ঘর। চিকিৎসা কি মামলা-মোকদ্দমা উপলক্ষে কলকাতায় এলে রামকমলবাবুরা এখানে ওঠেন, ও'দের আত্মীয়মহলেও মধ্যে মধ্যে প্রয়োজনের সময় ব্যবহার করেন কেউ কেউ। তখন এত হোটেল হয়নি, হোটেলের ভাত খাওয়ারও এত চল

ছিল না। বড়, মাঝারি এমন কি খুব ছোট জমিদারদেরও একটা বাসা ভাড়া করা থাকত কলকাতায়। অনেক ছোট জমিদার পুরো বাড়ি ভাড়া করতে পারতেন না, নতুন বাজারের ওপর একখানা করে ঘর ভাড়া করে রাখতেন। সেখানে থান-দুই মাদুর, দু' সেট হুঁকো-কলকে তামাকের সরঞ্জাম ও দড়ির আনলায় বারোয়ারী গামছা একখানা থাকত। বাকী যার যা দরকার সঙ্গে আনতে হত।

এ'দের বাসাতে যাবুরা কেউ এলে ঐ চাকরটিই এ'দের কাজকর্ম করে দিত, ঠিকে বামুন ডেকে আনত রান্নার জন্যে। রামকমল-বাবু নিজে এলে অবশ্য রান্নার লোক সঙ্গেই আনতেন—বাকী সকলের ঠিকে রাঁধুনী ভরসা। কাউকে না পাওয়া গেলে—লগনসার বাজারে ঠিক রসুয়ে বামুন দুর্লভ হয়ে পড়ত মধ্যে মধ্যে—ঐ ভৃত্যটিই যোগাড়যন্ত্র করে দিত, কিরণ বা অপর যে আসত নিজেরা ভাতটা নামিয়ে নিত। এটুকু তখন জানত প্রায় সকলেই। তখন ব্রাহ্মণ ছাড়া অপর কোন আত্মীয়দের হাতে ভাত খাওয়ার কথা চিন্তাই করতে পারত না কেউ। ..

বাসায় উঠে গেলেও এ বাড়িতে আসা-যাওয়া অব্যাহত রইল কিরণের। আপাত-দৃষ্টিতে দেখলে গণেশের টানেই আসত সে, কিন্তু দেখা যেত যে গণেশ না থাকলেও ওঠবার জন্যে বা গণেশের খোঁজে বেরোবার জন্যে ব্যস্ত হয় না। বরং রান্নাঘরের সামনের সংকীর্ণ রকে বসে নিস্তারিণীর সঙ্গে গল্প করার দিকেই তার যেন ঝোঁক বেশী। অনেক সময় গল্পও করত না, নিস্তারিণী একাই বকে যেত, সে শুধু চুপ করে বসে শুনত। ইতিমধ্যে সুরবালার গান শুনেছে সে; গান শুনে যে মুগ্ধ হয়েছে, সে কথাও বলেছে সে সরলভাবেই। আজকাল কোথায় কবে ওর মুজরো থাকে কৌশলে জেনে নিয়ে অনিমন্ত্রিতই সেখানে যায় গান শুনতে। আলাদাই যায়—আর প্রাণপণে চেষ্টা করে সুরোর চোখের বাইরে আত্মগোপন করে বসে থাকতে। তবে এক আধ দিন ধরা পড়েও যায়—তখন যা হোক একটা অছিলার গোঁজামিল দিয়ে তথ্যটা চাপা দেবার চেষ্টা করে। সুরবালা ওর এই লজ্জা কি সংকোচের কোন কারণ খুঁজে পায় না। একটু অবাক হয়েই বলে, 'তা গান ভালবাস গান শুনতে যাবে, এর মধ্যে দুষ্য তো কিছু নেই, তবে এত লজ্জা পাও কেন? আর লুকোবারই বা চেষ্টা করো কেন? তোমরা বড়ঘরের ছেলে, বিনা নেমন্তন্নে তোমার যাওয়া উচিৎ নয় কিন্তু সে চেনা বাড়িতে। অচেনা জায়গায় আর দোষ কি? সেখানে তো আর সম্মানের প্রশ্ন নেই।'

কিরণ এ প্রশ্নেরও ভালরকম কোন জবাব দিতে পারে না, ঈষৎ লজ্জিত স্মিত মুখে চুপ করে থাকে।...

ঐ গান শোনা আর এদের বাড়িতে বসে বা আড্ডা দিয়ে সময় কাটানো—এবং বেশির ভাগ দিনই রাত্রের খাওয়াটা এখানে সারা ভিন্ন কিরণের কোন কাজই হয় না। প্রথম প্রথম নিস্তারিণী খাওয়াতে চায়নি—একটু কিন্তু বোধ করেছে। লুচি ভাজা, পায়েস

এ সবের কথা আলাদা, ভাত রুটি কি ডাল—এ খাওয়াগুলোতে ঝুঁকি আছে। ব্রাহ্মণ হলেও তেমন উঁচু ঘরের ব্রাহ্মণ নয় তারা, তাদের ঘরে খেলে যদি ওর বাবা-মা কিছু মনে করেন? কিন্তু সে আপত্তি কিরণই উড়িয়ে দিয়েছে, 'আপনি থামুন দিদি মাসিমা, ঐ যে ঠাকুরটাকে জুটিয়ে এনেছে দুর্যোধন—সে-ই একেবারে সৎ ব্রাহ্মণ আপনাকে কে বললে? খোঁজ নিয়ে দেখুন গে যান—কোন ছোট জাতের কেউ একগাছা পৈতে ঝুলিয়ে রাঁধুনী বামুন হয়ে এসে বসেছে হয়তো। এমন তো আকছারই ধরা পড়ছে। আর এ ব্যাটা রাঁধে যা তাতে তো সেইরকমই মনে হয়, সব তরকারীই এক-রকম, ভাত তো পিণ্ডি করে রাখে একদম। যতক্ষণ বাড়িতে মার হেঁসেলে খাই ততক্ষণই যা কিছু খাওয়ার বিচার, বাইরে এলে কি আর অত চলে? এমন তোফা রান্না ছেড়ে সেই পিণ্ডি গিলতে যাব আমি কোন্ জাত বাঁচাতে?'

গণেশের দেখা প্রায়ই পায় না সে। কেউই পায় না অবশ্য। আবার সে নিজ মূর্তি ধরেছে। কোথায় যে ঘোরে টো টো করে তা কে জানে। তার উন্নতিও হয়েছে খুব। গাঁজা-ভাঙ আগেই খেতে শিখেছিল সে—এবার, সুরবালা পরিষ্কারই দেখল, অনুমান নয়, মদও ধরেছে। মধ্যে মধ্যে বেশী হয়ে গেলে মুঠোভর্তি ছোট এলাচেও ঢাকা পড়ে না। বকাবকি রাগারাগি করে সে, যতটা সম্ভব—কিন্তু তার বেশী পারে না, তাড়িয়ে দিতে পারে না। একটা মাত্র ভাই। সদ্য বাপ-মরা। না থাকলে বাবা-মায়ের কি কষ্ট তা তো চোখেই দেখেছে। তার নিজের কষ্টও কম নয়। আর গণেশও এমন, ওকে শাসন করাও যায় না। মিথ্যে কথাও বড় একটা বলে না সে, ধরা পড়ে গেলে অযথা ঢাকবার চেষ্টা করে না। হি-হি করে হেসে বলে, 'দিদি, তুই এখনও তেমনি পাড়াগেঁয়ে ভূত আছিস।... আরে, মদ তো মানুষেই খায়। গোরু কি কুকুরে মদ খায় কখনও দেখেছিস—...একটু আধটু মধ্যে মধ্যে খেলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় না।'

সে দিদিকে চেপে ধরেছে হাজার তিন-চার টাকার জন্যে। এই টাকাটা পেলে সে সাজপাট কিনে সাহেবদের মতো ম্যাজিক দেখাবার দল করবে আলাদা। জাদুকর গণেশ চক্রবর্তী কি জাদু-সম্রাট গণেশ চক্রবর্তী বলে তার নাম হবে। চারদিকে প্ল্যাকার্ড পড়বে, দেশ-বিদেশে নাম ছড়াবে, রাজামহারাজাদের বাড়ি থেকে 'কল্' আসবে, তখন তাকে পায় কে! দিদিরা যাকে মুজরো বা বায়না বলে—তা-ই নাকি 'কল্'। বহু-দিনের স্বপ্ন ওর, অনেকদিনের সাধ। দেশে দেশে ঘুরে বেড়াবে সে, এখান থেকে খেলা দেখাতে দেখাতে জাভা, সুমাত্রা, সিঙ্গাপুর যাবে, শ্যামদেশে যাবে, রেঙ্গুন মান্দালে মৌলমেন। আরও কত জায়গার নাম করে সে—বহুদূরে সাগরের পারে সে সব দেশ, কস্মিনকালে নামও শোনেনি সুরবালা, ধারণাও নেই, সে কোথায় কতদূরে হতে পারে। ওকে বোঝাতে উৎসাহে কোথা থেকে একটা ভূচিত্রাবলী যোগাড় করে এনে খুলে বোঝাতে চেষ্টা করে—কোন দেশটা কোথায়, এখান থেকে কতটা দূরে হতে পারে।

তাও ভাল বুঝতে পারে না সুরবালা। তবু, টাকাটা হয়ত দিয়েই দিত সুরো, নিস্তারিণী আড়ালে বারণ করে, 'খবরদার দিসনি, আমাকে কিরণ বলেছে, ও নাকি অনেক দূর দেশ সব, বড় বড় সাহেবদের জাহাজে চেপে সমুদ্দুর পেরিয়ে যেতে হয়, এক মাস দেড় মাসের পথ। সেখানে নাকি সব মানুষখেকো লোক থাকে, তারা কাঁচা মানুষের মাংস খায়—আর তাদের রাক্কুসীরা সব দিনের বেলায় পরী সেজে ঘুরে বেড়ায়, সোন্দর পুরুষ বিশেষ বাঙালী দেখলে ভুলিয়ে নে যায়। ওখানে গেলে বাছা আমার ফিরবে না। ওর ছন্নমতি হয়েছে তাই ঐসব বায়না ধরেছে!'

এতটা বিশ্বাস করে না সুরো, তবু ঐ ভূচিত্রাবলী দেখে সেও একটু ঘাবড়ে যায়। ঐটেই কতকটা কাল হল গণেশের, দেশ-গুলো যে বহু বহু দূরে, সে সম্বন্ধে একটা আবছা অস্পষ্ট ধারণা হয়। সেও ইতস্তত করে। সত্যিই যদি জন্মের মতো দেশভুঁই ছেড়ে চলে যায় ভাই?...মাগো! আর কখনও দেখতে পর্যন্ত পাবে না তাকে? ঐ দেশে ঐসব মেয়েছেলে বিয়ে-থা করে ঘর বেঁধে বসবে।...ভাইয়ের পীড়াপীড়ির মুখে বলেও ফেলে দ্বিধার কারণটা। গণেশ হাসে হা-হা করে, বলে, 'দূর পাগল! ঘর বেঁধে বসব তো অসভ্য ঘর ছেড়ে যাচ্ছি কেন? ওসব আমার পোষায় না। দেশ-বিদেশ ঘুরব, দেশ-বিদেশের বাহবা নেব, লোকে বলবে এ লোকটা নেটিভ কালা-আদমী হলেও সাহেব ম্যাজিকওলার চেয়ে কম যায় না কোন দিকে—এই নাম-যশেই আমার লোভ। ওদিকে যাবার কথা কেন বলি জানিস? শুনেছি, অনেকের কাছেই শুনেছি—ঐসব দেশের লোক ম্যাজিক আর সার্কাস দেখার জন্যে পাগল। ওরা অন্য কোন ফুর্তি জানে না, আর কিছুর তোয়াক্কা করে না। নিতান্ত না খেলে নয়, তাই খাওয়ার জন্যে যেকটা পয়সা খরচা করে, পোশাকের নাকি বালাই-ই নেই—কোনমতে লজ্জা নিবারণ করে শুধু, বাকী যা পয়সা—প্রতিদিনের রোজগার প্রতিদিন ফুর্তি করে উড়িয়ে দেয়। সে ফুর্তির মধ্যে আবার এই দুটোই ওদের বেশী পছন্দ। পরের দিন কি খাবে তা সে কথা কখনও ভাবে না।...সেইজন্যেই এই সব দেশে যেতে চাই, একবার গিয়ে পড়তে পারলে আর কোন ভাবনা থাকবে না।... হ্যাঁ, ওদের মেয়েরা খুব সুন্দর হয় শুনেছি, কিন্তু সে আমি তোকে কথা দিচ্ছি, যা করি, ওদের নিয়ে ঘর বাঁধব না কোনদিন। যদি কাউকে নিয়ে ঘর বাঁধি দেশের মেয়ে নিয়েই বাঁধব, দেশেও ফিরব মাঝে মাঝে। দে না ভাই, তোর তো এখন অভাব নেই কিছু, আমার কিন্তু অনেক দিনের সাধ। সাজপাট যদি কিছু কিনতে পারি—দুনিয়ার ভেলকিওলাদের ভেলকি লাগিয়ে দেব।'

অভাব নেই সেটা সত্যি কথা। তা সুরোও মানে। এতদিন পরে যেন সতীমা সত্যিই মুখ তুলে চেয়েছেন। মুজরো এক-রকম বাঁধা—মাসে অন্তত কুড়ি দিন গাওনা থাকে। বেশী বা কম—কিন্তু রোজগার কোনটাতেই একেবারে কম হয় না। মুজরোর চুক্তিতে যেদিন অঙ্ক কম থাকে—সেদিনই হয়ত পেলা বেশী পড়ে। মতিও এখন বায়না নেওয়া শুরু করেছে—কিন্তু তাতে সুরোর ডাক কিছুমাত্র কমে নি। এখন তার আলাদা নাম হয়ে গেছে। রূপসী মেয়ে, তৈরী গলা, অল্প বয়স—তার দাম আলাদা। মতির যতই পুরনো নাম-ডাক হোক, সুরোকেই যেন লোকে চায় বেশী। অনেকে পর পর দুদিন দুজনের গান দেয়—মিলিয়ে দেখবে বলে।

অভাবও যেমন নেই, লোভও নেই তেমন, অথচ এই লোভটাই নাকি দুর্নিবার। টাকাতেই টাকার লোভ বেড়ে যায়। যতই পাও—পাওয়ার তৃষ্ণা কমে না। আর তাতেই যা কিছু অশান্তি ভোগ করতে হয়। তার সাক্ষী এই তো নিস্তারিণীই। এত আসছে বলেই যেন নিস্তারিণীর আকাঙ্ক্ষা বাড়ে। সে মেয়েকে বুদ্ধি দিতে আসে, 'এখন তো মতি ভাল হয়ে গেছে, নিজে গাইছে—তবে আবার তুই তাকে নিজের টাকার ভাগ দিতে যাবি কেন? এখন তো আর তার এস্তাজারিতেও নেই, এখন তো দালালরা তোর কাছেই সোজা আসে, বন্দোবস্ত করে। মতি এখন তোর কি কাজে আসছে শুনি?'

এতখানি জিভ কাটে সুরো, বলে, 'ছিঃ! ওসব কথা আমাকে শুনিও না মা। ও মহা-পাপ! পাপের পয়সাই যদি খাবো তো এত-দিন এত কাণ্ড করলুম কেন? ঘরে খাবু বসালেই তো বাড়ি-ঘর করে গয়না-টাকার



আয়ুর্বেদীয় উপাদানে প্রস্তুত
বলডেক্স
চুল ওঠা বন্ধ করে
নতুন চুল গজায়
বেঙ্গল কেমিক্যাল কর্পোরেশন·কলিকাতা-৩৭

আশ্চিলে বসে থাকতে পারতুম। কথা দিয়েছি, দিব্যি গেলেছি, যতদিন সে বেঁচে থাকবে কিম্বা যতদিন আমি বেঁচে থাকব—রোজগারের ভাগ তাকে দোব। তবু তো পেলার এক পয়সা সে ছোঁয় না, তাও তো আমি তাকে দিতে গেছলুম।'

নিস্তারিণী গজগজ করে, পাঁড় বোকা বলে গাল দেয় মেয়েকে।

মেয়ে ওদের পুরনো পাড়ায় একটা ছোট বাড়ি বায়না করেছে কিনবে বলে—তাতেও যেন মনে বিশেষ সান্ত্বনা পায় না। বলে, 'ওর বাপ মিনসে চিরকাল আমার হাড় ভাজা-ভাজা করে জ্বালিয়ে খেয়েছে—ও আর খাবে না! নইলে আমার বরাতের লেখন খোলতাই হবে কেন? আমার পাওনাটা যাবে কোথায়?...যেমনে দিয়ে যা হোক, আমাকে জ্বলতেই হবে।...ভাবছে চিরকাল এমনি যাবে! মতিকে দেখেও চৈতন্য হল না আশ্চর্য! গতর খাটিয়ে রোজগার কি একটা রোজগার? না, তার কোন ভাষ্যি আছে? বলি গলা ফাটিয়ে পরবেলা চেঁচিয়ে তো ঐকটা টাকা ঘরে আনিস। আজ যদি গলাটা ভেঙে থাকে এক মাস তো এক পয়সা ঘরে আসবে না। যদ্দিন পাচ্ছিস—দিন কিনে নে, তা নয়।...আমারই ভুল, বলতে যাওয়াই অন্যায়। চোরা না শোনে— ধম্মের কাহিনী, এ তো জানা কথাই।'

সুরবালা আর কথা বাড়ায় না। 'ধম্মের কাহিনী' শব্দ দুটো শুনে হাসি পেলেও সে হাসি চেপেই যায়। সে দেখেছে যে, নিস্তারিণীর সঙ্গে কিছু আলোচনা করতে যাওয়া বা কোন যুক্তি দেখাতে যাওয়া নিরর্থক। মিছিমিছি নিজেরই কষ্ট। এক-আধ দিন তবু সে বোঝাতে চেষ্টা করেছে এর আগে, শশীবৌদিদের দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে কিন্তু বিশেষ কোন ফল হয় নি। তাই এখন আর কিছু বলে না।...

হাওড়া কুষ্ঠ কুটির

৭২ বৎসরের প্রাচীন এই চিকিৎসাকেন্দ্রে সর্বপ্রকার চর্মরোগ, বাতরক্ত, অসাড়তা, ফুলা, একজিমা, সোরাইসিস, দূষিত ক্ষতাদি আরোগ্যের জন্য সাক্ষাতে অথবা পত্রে ব্যবস্থা লউন। প্রতিষ্ঠাতা : পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা কবিরাজ ১নং মাধব ঘোষ লেন খুরুট, হাওড়া। শাখা : ৩৬, মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা—৯। ফোন : ৬৭-২৩৫৯

শশীবৌদিদের সে কথাটা সে কোন দিন ভুলবে না। ও'দের আগেকার ধোপানী চারুবাবুর কাছে তার গোপন কিছু সঞ্চয় জমা রাখত। কত রাখত মানে কত জমছে তা সে কখনও হিসেব রাখে নি, যখন যা পেত—দু টাকা এক টাকা দু আনা চার আনা, এনে ফেলে দিয়ে চলে যেত, কত কি জমছে কখনও জিজ্ঞাসাও করে নি। চারুবাবুই গুনে গেঁথে একটা খাতাতে জমা করতেন, ওর জন্যে একটা আলাদা ছোট্ট খাতা করেছিলেন খেরো বাঁধানো, একটা টিনের কৌটো করেছিলেন, তাতেই ঐ টাকাটা রেখে নিজেদের দেরাজের এক কোণে রেখে দিতেন। হঠাৎ কি হল, সে ধোপাবৌ আর এল না। কাপড়গুলো যা নিয়ে গিয়েছিল, কে একটি ছেলে এসে দিয়ে গেল, বলে গেল বৌ দিন দুই পরে এসে ও'দের ময়লা কাপড় নিয়ে যাবে। আর সে এল না। সেও-না, ঐ ছেলেটাও নয়—তার বাড়ি থেকে কেউই এল না। তার খবরও নিতে পারলেন না চারুবাবুরা, কারণ আগের যে ঠিকানা জানতেন সে বস্তি ভেঙে দেওয়া হচ্ছে বলে তারা উঠে গেছে কদিন আগেই, কোথায় গেছে নিহাৎ গড়িমসি করেই সেটা লিখে রাখা হয় নি।...অনেক দিন দেখে দেখে নতুন রজক ঠিক করেছেন চারুবাবু, করতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু আগেকার সেই বৌয়ের গচ্ছিত টাকা আর শেষ কদিনের খানা-ত্রিশ-চল্লিশ কাপড়ের ক গন্ডা পয়সা থেকেই গেছে ও'দের কাছে।

সুরোর মনে আছে, একবার ও'দের খুব অনটন যাচ্ছিল, কী কারণে মাইনে পেতে দেরি হয়েছিল চারুবাবুর কদিন, ঘরে কিছুই ছিল না। শেষে এমন হল একদিন ঘরে হাঁড়িই চড়ে না—মুদীর দোকানে কত ধার করা উচিত সে সম্বন্ধে চারুবাবুর আইন খুব কড়া ছিল—সেদিন সুরোই মনে করিয়ে দিয়েছিল, 'সেই ধোপা-বৌয়ের টাকাটা তো আছে, তা থেকে একটা টাকা নিয়ে এখন চালান না, পরে হাতে এলে আবার পুরিয়ে রেখে দেবেন!'

চারুবাবু যেন শিউরে উঠেছিলেন, বলেছিলেন, 'তাই কখনও পারি! বাপরে, ও যে পরের গচ্ছিত করা টাকা। বিশ্বাস করে আমার কাছে রেখে গেছে। ও টাকা খাওয়া আর গোমাংস খাওয়া একই কথা!'

সুরো তবু তর্ক করেছিল, 'আপনি তো তাকে ফাঁকি দিচ্ছেন না, চুরিও করছেন না। হাতে এলেই আবার জোগান করে রাখবেন—তাতে দোষটা কি?...তাছাড়া সে কোথায়? বেঁচে আছে কিনা তাই দেখুন। সে কি আর কোনকালে ঐ টাকা চাইতে আসবে আবার?'

'যদি বেঁচে থাকে? যদি কালই সে নিতে আসে? তার মধ্যে যদি পুরিয়ে রাখতে না পারি? একটা টাকা ভেঙেছি শুনলে তার মনে হবে হয়ত আরও ভেঙেছি—মুখে বলছি এক টাকা!'

'বলবারই বা দরকার কি! সে তো জানেও না কী আছে কত আছে। পরে বরং অন্য ছুতোয় ঐ টাকাটা ফিরিয়ে দেবেন!'

'সেই তো আরও বিপদ। সে জানে না বলেই তো আমার এতখানি দায়িত্ব। এ টাকা স্বয়ং ভগবান পাহারা দিচ্ছেন তার হয়ে, তিনিই হিসেব রাখছেন। সেইজন্যে তো আরও সাবধানে থাকা দরকার। মিথ্যে বললে কি গোপন করলে তার আর কতটুকু ক্ষতি, আমারই মনুষ্যত্ব চলে গেল তো!...তাছাড়া কি জানিস, এ অব্যেসটাই খারাপ। একবার ভাঙলেই জিনিসটা সহজ হয়ে যাবে, তখন সামান্য দরকারেই আগে ঐ টাকাটার কথা মনে পড়বে। নেবও তখন। আর বার বার নিতে নিতে একবার হয়ত লিখতেই ভুলে যাব, হিসেব থাকবে না—হয়ত আর সেটা ফিরিয়ে দেওয়াই হবে না।, না সুরো, তার চেয়ে না খেতে পেয়ে মরে যাওয়াও ভাল।'

'আর যদি সে কোনদিনই না আসে? এত তো বুক দিয়ে আগলে রাখছেন!'

'আমি যতদিন বাঁচব ততদিন আমার দায়িত্ব, তারপর আমার ছেলে বুঝবে। কিম্বা আর যে মালিক হবে তখন সে বুঝবে। আমি বলে যাবো—ও টাকা কোন অনাথ আশ্রমে কি কোন দাতব্য আতুরালয়ে দিয়ে দিতে। তারপর তার ধর্ম'!'

'তা আপনার একটা মেহনতানাও তো আছে। একটা টাকা একদিন ধার করলেই একেবারে যত অধম্ম হয়ে গেল!' সুরো জেদ করে।

এর উত্তরে হেসেছিলেন চারুবাবু, 'ধার করার কথা বলছিস? তবে শোন্ বলি একটা গপ্প। দিল্লীতে এক সুলতান ছিল জানিস, তিনি জানতেন রাজকোষের টাকা জনসাধারণের টাকা, রাজাবাদশা তার জিম্মাদার মাত্র। তিনি সুলতান হিসেবে খাটতেন, অন্য রোজগারের সময় ছিল না বলে তিনি দৈনিক এক টাকা হিসেবে মাইনে বা তনখা নিতেন। তাঁর স্ত্রী নিজে হাত পুড়িয়ে রান্না করতেন। একবার রান্না করার সময় বেগমসাহেবার সত্যিই হাত পুড়ে যায়—তিনি সুলতানকে গিয়ে ধরেন, 'অন্তত দু-তিন দিনের জন্যে একটা ঝি রাখার হুকুম দাও।' 'টাকা?' শুধোলেন সুলতান 'বেশী টাকা আমি দিতে পারব না।' বেগম বললেন, 'বেশ, তুমি সাত দিনের টাকা আমাকে আগাম দাও, আমি ঐ থেকেই

বাঁচিয়ে ওর খরচাটা বার করে নেব।' সুলতান নির্বিকার মুখে বললেন, 'তাতে আমার কোনই আপত্তি নেই, শুধু যদি তুমি একটু কষ্ট করে আল্লার কাছ থেকে একটা ফর্মান এনে দাও যে, এই কটা দিন আমি নিশ্চিত বাঁচব, তাহলেই টাকাটা আমি রাজকোষ থেকে আগাম নিতে পারি, নইলে কোন্ ভরসায় নেব বলো?' তা আমারও সেই কথা, টাকাটা ভেংগে কালই যদি আমি মরে যাই—বৌ যদি আর শোধ করতে না পারে? কি ওর মনে না থাকে?'

সেদিন সুরেন অবশ্য মনে হয়েছিল, বড্ড বাড়াবাড়ি। তবু কথাটা ভোলে নি।

আজও মনে আছে সে কথা। এখন যেন এই বাড়াবাড়ির কারণটাও কতক বুঝতে পারে। সাংঘাতিক নেশা টাকার। নেশা আর লোভ। টাকার লোভই মানুষকে সবচেয়ে নিচে নামিয়ে আনে।

আরও বলেন চারুবাবু, 'ঈমান বিশ্বাস—এ বড় যত্নের জিনিস, সর্বদা কড়া পাহারায় রাখতে হয়। পরে না জানতে পারলেও নিজের কাছে তো আর চাপা থাকবে না। মনের অগোচরে পাপ নেই। এগুলো হারালে নিজের কাছে নিজেই তো ছোট হয়ে যাবে। আর একবার এপথ থেকে সরে এলে নামতে শুরু করলে নামার কোন শেষ নেই দেখবি। কোথায় গিয়ে যে ঠেকবি তা তুই নিজেও ভাবতে পারবি না।'

সবটা না হলেও কতকটা বোঝে একথা।

অনেক দুর্দিন সে পেরিয়ে এসেছে, অনেক দুর্দশা। সে সব দিন যিনি চালিয়ে নিয়েছেন, যিনি হাল ধরে পার করে এনেছেন সেই একান্ত নিঃস্বতার ভয়াবহ কাল—তিনিই চালিয়ে দেবেন, যদি ভবিষ্যতে আরও তেমন কোন অভাব কি সংকটের দিন দেখা দেয়। এই মনের জোরটা ইদানীং তার হয়েছে খুব। না খেয়ে মরবার হলে এবারেই মরত। আর অসুখ-বিসুখ? হয়ত সইতে হবে। অদৃষ্টে যা আছে তা সইতে হবেই। তার ভয়ে আগে থাকতে ধর্ম হারাবে না সে কিছুতেই। কথা যা দিয়েছে, নিজে মেনেছে যা—তা থেকে অন্তত জ্ঞানত একচুল নড়বে না। যার যেটুকু প্রাপ্য ভগবানই তা হিসেব করে দিয়ে পাঠান, সেইটুকুই সে পায়—কমও না বেশীও না। আজ মতির সংগে বেইমানী করলে কে জানে কাল থেকেই বায়না কমতে শুরু করবে কিনা কিম্বা কোন সাংঘাতিক অসুখে শয্যাশায়ী হয়ে পড়বে কিনা।

দিন ভগবানই চালান, সেই বিশ্বাসটা সম্প্রতি বদ্ধমূল হয়েছে। এই তো সেদিনই শুনেছিল। এক বিখ্যাত বাঈজী, কোথাকার কে এক গরীব বয়সে তার থেকে অনেক ছোট ছোকরাকে বিয়ে করেছিল, শুধু তার পীড়াপীড়িতে আর অনুরোধ-উপরোধে পড়ে। খুবই গরীব—তবে বড় ঘরের ছেলে, এককালে অবস্থা ভাল ছিল। এই বিয়েতে সকলের আপত্তি ছিল, সবাই ছিঃ ছিঃ করেছিল। ভয় দেখিয়েছিল যে তোমার টাকার লোভেই এই কাজ করতে এসেছে, বিয়ের পর গলা টিপে মেরে ফেলবে দেখো। কারও কথাই শোনে নি বাঈজী। ছেলেটা বলেছিল তুমি চাও তো তোমার সব টাকা বিলিয়ে দিয়ে এসো, আমি তোমাকে মোট বয়ে খাওয়াবো। আমি তোমাকে সাদী করছি তোমার গলার জন্যে। বিয়ের পর বাঈজী কলকাতায় এসে আর্মানীটোলায় একটা বাড়ি কিনে গেরস্তর মতো বসবাস শুরু করল—বরকে কিছু টাকা দিয়ে শুকনো মেওয়া ফলের আড়তদারী কারবার ধরিয়ে দিল। কিন্তু তার পরই সেই বাঈজীর গলায় হল ঘা, কর্কট রোগ না কি বলে—দুরারোগ্য ব্যাধি, সেই ছোকরা বর কী সেবাই না করল তার, দু হাতে রক্ত-পুঁজ-ময়লা ঘেঁটেছে, দিন-রাত শিয়রে বসে রাত জেগেছে, বড় বড় ডাক্তার দেখিয়েছে। টাকাটা থাকলে তারই থাকবে তা একবারও ভাবে নি। বৌ মরবার পর তার জন্মস্থানে বিপুল টাকা খরচ করে নাকি হাসপাতাল করে দিয়েছে। পেটের ছেলে কি কোন নিকটআত্মীয় থাকলেও এতটা করত না। ভগবান কাকে দিয়ে কি করিয়ে নেন কেউ বলতে পারে?...

না, টাকার মায়া অত নেই সত্যি কথা। গণেশকে যে টাকাটা দিতে ইতস্তত করছিল তা অভাব কি টাকার মায়ার জন্যে নয়—ইতস্তত করছিল গণেশের জন্যেই। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তাও আর করল না। অনেক ভেবে দেখল—ও যা ধরেছে তা করবেই, যেমন করেই হোক। মাঝখান থেকে ঠিক-মত সাজসরঞ্জামের অভাবে হয়ত ভাল করে কিছুই করতে পারবে না, জীবনটা সত্যি-সত্যিই বরবাদ হয়ে যাবে। মাঝখান থেকে এই চেষ্টায় আরও হয়ত অনর্থক নিচে নামবে, পাঁক ঘাটবে—আরও বেশী উচ্ছন্নয় যাবে। সে গণেশকে ডেকে ভাল করে হিসেব করিয়ে টেনেটুনে কতটুকু না হলে নয় জেনে টাকাটা সব বার করেই দিল।

গণেশের সে কী হাসি, সে কী আনন্দ! বলে, 'দিদি, যা ভুলি ভুলি, তোর এ ঋণ কখনও ভুলব না!...দেখিস তুই—তুইও যেমন একদিকে নাম করেছিস, আর এক-দিকে আমিও নাম করব। তোর তো এই কলকাতা শহর ভরসা, আমার নাম হবে জগৎজোড়া। আমার নাম করতে বুক তোর দশ হাত হবে—সেই হবে আমার যথার্থ দেনা শোধ।'

তার সেই সময়কার আনন্দ-উদ্ভাসিত সুন্দর মুখের দিকে চেয়ে সুরোবালাও তৃপ্তিবোধ করে, মনে হয় টাকাটা দেওয়া সার্থক হয়েছে তার।

এ ভাইকে বেঁধে রাখা যাবে না—তা যা যাই বলুক। এর মায়া-দয়া-বন্ধন কিছুই নেই। জাত-ভবঘুরে হয়েই জন্মেছে।...

সেই যে টাকাটা নিয়ে চলে গেল, কদিন আর কোন পাত্তা রইল না। খেতে কি শুতেও এল না, রাঁধা ভাত নষ্ট হতে লাগল দুবেলা। এল একেবারে কুড়ি-একুশ দিন বাদে—ঝড়ের মতো। ঝড়ো কাকের মতো চেহারা, খসকোখুসকো চুল, আরক্ত চোখ। বলল, 'আমার মরবার ফুরসৎ নেই। সব জোগাড় হয়ে গেছে একটা ঘর ভাড়া করে সেইখানে সব মাল জড়ো করছি, সেখানেই থাকি রাত্তিরে। গঙ্গার ধারে জাহাজঘাটার কাছে ঘর, কেউ না থাকলে সব চুরি হয়ে যাবে। এক বেটা আমার পেছনেও লেগেছে খুব, মালপত্র দেখলেই অনেক খেলা শিখে যাবে—সেই বেটাই চুরির তালে ঘুরছে। সে আমি হতে দিচ্ছি না। এই তাই একজনকে বসিয়ে রেখে এসেছি। শুধু কিরণের জন্যেই আসা। কিরণকে খবরটা দিস, যেখানে দেখা করার কথা বলেছিলুম, কালই যেন সেখানে যায় এক-বার। সব বলা-কওয়া আছে, নতুন বইতে কমিক পার্ট দেবে নিশ্চয়।

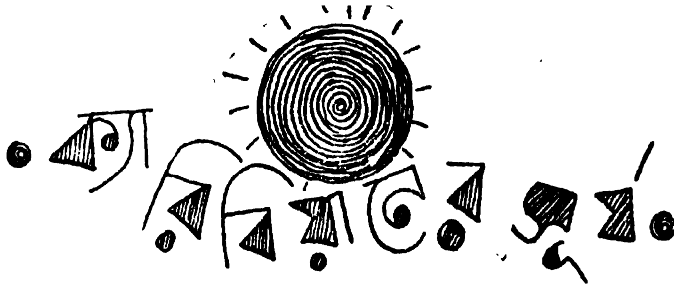
তখনই চলে যেতে চায় সে, সেই অবস্থায় অনেক অনুনয় বিনয় ধরপাকড়ের পর শুধু কোনমতে স্নান করে একটু জল-খাবার খেয়ে গেল। ভাতও তৈরী ছিল, খেল না। ভাতে নাকি বড় নেশা লাগে, শরীর ভার বোধহয়। খাটা যায় না। আগের দিন সুবোবালা কোথায় গাইতে গিয়ে খাবার এনেছিল—সেই বাসি লুচি আর সন্দেশ খেয়ে চলে গেল।

চলে গেল একেবারে দীর্ঘকালের মত। বাইরে যাবার আগে একবার দেখা করে যাবে বলে গিয়েছিল, সেও আর বোধহয় হয়ে উঠল না। মাস দুই পরে রেঙ্গুন থেকে একটা চিঠি পেল ওরা। খুবই সংক্ষিপ্ত চিঠি। আলাদা দলটল হয়ে ওঠে নি। টাকা অনেকটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। চুরিও হয়েছে কিছু। এক বাঙালী সার্কাসওলাকে কিছু টাকা দিয়ে বখরা বন্দোবস্তে তব দলের সংগেই বেরিয়ে পড়েছে। কপালে থাকে এইখান থেকেই টাকা জমিয়ে আলাদা চেষ্টা করে দেখবে একবার। যাই হোক চিন্তার কোন কারণ নেই, যখন যেখানে থাক মধ্যে মধ্যে খবর দেবে সে।

সে খবর অবশ্য এরা আর আশা করে নি। আসেও নি তা। দিন সপ্তাহ মাস বছর গড়িয়ে গেল ক্রমে। না চিঠি, না খবর। নিস্তারিণীও এবার আর অত কাতর হয় নি। বেঁচে আছে, থাকবেও। মায়ের মন তার ছেলে, ওর কোন অনিষ্ট হবে না।

তবে এবার সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, দু বছর পরে হোক, তিন বছর পরে হোক—যখনই ফিরুক, সঘরের একটি মেয়ে দেখে গলায় পাথর ঝুলিয়ে দেবে সে—যেমন করেই হোক। তারপর দেখে নেবে ছেলের এই উড়ু-উড়ু মন কদিন থাকে।

(ক্রমশ)



ব্রজমাধব ভট্টাচার্য

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ধিক্কার এলো ফ্রাঁসোয়ার। ওদের বাড়ীতে আসতেন ফরাসী বৃদ্ধ মনীষী স্ক্যারণ। রাজ-দরবারে খ্যাতি। রাজার সোহাগিনী মাদাম মন্তেস্প্যানের আদরের সামগ্রী। মস্ত আড্ডা বসে স্ক্যারণের বাড়ী। রাজ্যের শিল্পী, কবি, গুণী সবাই যায়। ফ্রাঁসোয়া এই অশীতিপর বৃদ্ধের পাণি-পীড়ন ক'রে তার যা সেবা যত্ন করলো দেখে মাদাম মন্তেস্পান তো থ'।

স্কারেন মারা গেলো। ফ্রাঁসোয়া সেই আড্ডা বজায় রাখলো, বিয়ে করলো না। রাণী মারিয়া থেরেসার সময় কাটতে চায় না। মাদাম মন্তেস্পান বুদ্ধি করে ফ্রাঁসোয়াকে দিলো রাণীর সঙ্গিনীর কাজে বহাল করে। ফ্রাঁসোয়া হয়ে গেলো মাদাম মেন্তেনান্। মেন্তেনানে ফ্রাঁসোয়ার অট্টালিকা। রাজা ঘন ঘন যান।

মন্তেস্পান প্রথমে রাগ, পরে ঝগড়া আরও পরে চক্রান্ত করলো। কিন্তু মেন্তেনান সত্যিই তখনও খাঁটি মেয়ে। রাজার প্রলোভনেও রাজাকে সে প্রশ্রয় দেয়নি। রাণীর পরিচর্যা মন দিয়ে করে। এমন সে পরিচর্যা যা ক্যারিবিয়ান ক্রিওল্‌ই করতে পারে। রাণী বলতেন, "বিয়ের পর থেকে আজ অবধি যদি সুখ পেয়ে থাকি, ফ্রাঁসোয়ার জন্য; স্বামী পেয়ে থাকি, ফ্রাঁসোয়ার জন্য। এমনই অদ্ভুত মায়াবিনী সেই ক্রিওল্‌-কন্যা, সেই মার্তিনিকান। যে রাজা সব ছেড়ে, মন্তেস্পানকেও ছেড়ে রাণীর মহালে দিনে তো থাকতেই, রাতেও থাকতেন।

সেই সুখের মধ্যে মরে গেলেন মেরিয়া থেরেসা। রাজা তখন অঙ্ক পাতলেন সেই সূর্যকন্যাকে ধরার জন্য। মার্তিনিকান মেয়ে রাজার বারবনিতা খ্যাতি হজম করেছিলো, কিন্তু বৃত্তিতে তখনও সে ক্যাথলিক ফ্রাঁসোয়া। বিবাহ না করলে অঙ্গস্পর্শ হতে দেবে না। সেই বিয়ে হয়েছিলো,—গোপনে হলেও, হতে হয়েছিলো। এবং তারপর থেকে লুঈয়ের মৃত্যু পর্যন্ত ফরাসী রাজ্যের পরিচালনার ভার বহন করেছিলো সেই 'মাদাম', নামে যিনি রক্ষিতা,—কিন্তু ধর্মে তিনি ক্যাথলিক, খাঁটি।

আমরা এখনও জোসেফিনের কথা বলি, ফ্রাঁসোয়ার কথা বলি, আর এই দেহ পেতে দিই রাতের পর রাত রবাহূত বুভুক্ষুদের অপরিমেয় ক্ষুধার ভার বহন করতে, রোগে জীর্ণ হয়ে মরি, কয়লাঘাটায় কয়লা বই।

অথচ আমিই ফ্রাঁসোয়া। আমিই মাদাম মেন্তেনান্,—বিশ্বাস করো?

আমি অবাক হয়ে চেয়ে থাকি।

উনিশ শো দুই সালের কথা। কদিন ধরে সেন্ট পিয়েরে শহরের পূবে পেলী পাহাড়ের চূড়া থেকে ক্রমাগত ধোঁয়া আর মাটি ছড়াতে লাগলো আকাশে। আকাশ লাল হয়ে গেলো। সেন্ট পিয়েরে তখনকার দিনে সব সে সেরা নগর ছিলো মার্তিনিকের। গান, হাসি, হৈ-হুল্লোড়,—সেন্ট পীয়েরের মতো নগরী আর ওয়েস্ট ইন্ডিজে ছিলো না। সব ঢেকে গেলো ছাইয়ে, বালুতে। নদীর জল ফুলে উঠলো, কেবল কাদা ফুটতে লাগলো টগবগ করে। লোকে উদ্বাস্ত হোলো, ব্যস্ত হোলো না। পেলী আগ্নেয়গিরি। একটু উৎপাত করবে বৈকি! চল্লিশ হাজার লোকের বাস ছিলো সেন্ট পীয়েরেতে। আমাদের বসতভূমি, বাবার ব্যবসা সব ছিলো সেখানে। আজ আছি আমি। মেয়র অভয় দিয়েছিলেন ওসব কিছু নয়। এবং ৮ই মে সকালবেলায় লোকে তাই ভেবেছিলো। কদিন পরে সূর্যের স্নিগ্ধ আলো পড়েছে সেন্ট পীয়েরের পথে। 'এসেনশন্‌-ডে'র আমোদে দলে দলে লোক রং-চং সাজ পরে ঝলমলে হয়ে বার হয়েছে। হঠাৎ পর পর দুটো শব্দ। ডোমিনিকা, সেন্ট লুসিয়ায় সে শব্দ শোনা গেছিলো। পেলী পাহাড় ফেটে দু-ফাঁক হয়ে গেছিলো।—একটা কালো দ্যাল ধীরে ধীরে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসতে লাগলো; আগুন নয়, লাভা নয়; কুণ্ডলী পাকানো রাশি রাশি ধোঁয়া,—ধোঁয়ার দেয়াল,—একটা লাইন করে আকাশ অবধি উঁচু হয়ে নেমে আসতে লাগলো। যতদূরে নামে নিরন্ধ্র অন্ধকার, আর অন্ধকার। কেউ কাউকে দেখেনি; একটি শব্দ করেনি। বিষাক্ত তীব্র গ্যাসের সঙ্গে বালুর কণা হৃদপিন্ড, শ্বাস-যন্ত্রে ঢুকে পলকের মধ্যে যন্ত্রণাহীন, শব্দহীন মৃত্যু এনে দিয়েছিলো। সেই চল্লিশ হাজারের মধ্যে একটি প্রাণীও বাঁচেনি। সেন্ট পীয়েরে ছাই হয়ে ঢাকা আছে। আছে বলছি; ছিলো। এখন এই নব পম্পিয়াই আবার খোঁড়া হচ্ছে। ডক্টর ভ্যান পেয়েক মুজি ভলকানোলজিক আছে সেন্ট পীয়েরেতে। যেও। সেন্ট পীয়েরের কণ্ঠমালা পারে। সেই নিদারুণ বিভীষিকা আগ্নেয়গিরির ইতিহাসে একক হয়ে আছে। অমন গ্যাস-সর্বস্ব লাভাহীন বিস্ফোরণ আজ অবধি 'পেলিয়ান্‌-টাইপ্‌' বিস্ফোরণ নামে চিহ্নিত। ভলকানোলজিস্টের আতঙ্ক।

সভ্য দুনিয়ায় যখন প্রথম এ-খবর পেঁাছুলো প্রথমটায় কেউ বিশ্বাস করেনি। কেবল বন্দরের বাইরে একটা ইয়াটে জন-চার খালাসী বেঁচেছিলো। এনস্যান্ট মারিনারের ভূতুড়ে জাহাজের মতো সেই প্রেত-জাহাজ যখন ফোর্ট দা ফ্রাঁতে পেঁাছুলো, লোকে বললে, সেন্ট পীয়েরের খবর কী? খালাসীরা বললো, সেন্ট পীয়েরে ছিলো, আর নেই। নরক থেকে শয়তানের দলকে দল এসে গোটা শহরটাকে নরকেই টেনে নিয়ে গিয়েছে।

দোহাই তোমার হিন্দু। মাতাল হইনি আমি। সত্যি কথা বলছি। বলেন ধরেই তো সেন্ট পীয়েরের আকাশে বাজিব উৎপাতের কথা সবাই বলাবলি করছিলো। হঠাৎ বেলা ন'টা সাড়ে ন'টায় টেলিগ্রাফের দপ্তর আধা খবর দিতে দিতে বন্ধ। তারপর কতো ডাকাডাকি। কোনো পাত্তা নেই। বেলা এগারোটা আন্দাজ সবাই বলাবলি করছে—"শুনেছি সেন্ট পীয়েরেতে কী হয়েছে।" বেলা দুটো নাগাদ ঐ ভূতুড়ে ইয়াট্‌ এলো। তারপর থেকেই হায় হায় সুরু হোলো।

কিন্তু সে তো প্রায় ষাট বছর আগের কথা। তোমার বয়স তো সবে বাইশ কি তেইশ!

তেইশ নই আমি। তেত্রিশ। তেইশ না সাজলে তোমাকে ধরতাম কী করে? বাবা সেদিন এসেছিলেন মায়ের জন্মদিনের জন্য জিনিস কিনতে। আমার তিন ভাই-বোন ছিলো মায়ের সঙ্গে। সেই ভীষণ খবর পাবার পর বাবা সেন্ট পীয়েরেতে যাবেন বলে ছুটেছিলেন। কিন্তু সারা পৃথিবীতেই তখন আর সেন্ট পীয়েরে ছিলো না। সে শহরের বুকে তখন ছাই আর ছাই।

বাবা পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। এসে পড়েছিলেন এই দেলিসেস-দ্যু-লুদোয়। এবং ফাঁদে পড়লেন একটি বারবনিতার। নাম তার মলি লত্রেক্‌। মলি লত্রেক্‌ জানতো তখনও বাবার হাতে অনেক টাকা। সে বাবাকে আর ছাড়লো না। বাবার বয়স তখন পঁয়তাল্লিশ তো হয়েই গেছে। তারও কিছুদিন পরে মলি লত্রেকের কন্যা হয়। মলি লত্রেক সেই কন্যাকে বড়ো করে। স্কুলে পাঠায়। বাবা সে মেয়েকে আদর করতেন; পাগলামি সেরে গিয়েছিলো প্রায়। কিন্তু তখন বাবা নিঃস্ব। সমস্ত দেনা শোধ করার পর মলি লত্রেককে খাই-খরচা ঘরভাড়াও দিতে পারতেন না তিনি। মলি লত্রেককে আবার পথে নামতে হয়। আবার ঘরে মানুষ ডাকতে হয়। সেই শোকেই মলি

লব্রেকে মরে যায়।......আমি জানতাম মলি লব্রেক আমার পরিচারিকা। কারণ, মলি লব্রেক ছিলো নিগ্রো। আমার সেই নিগ্রো পরিচারিকা মলি লব্রেক, বাবা যাকে একদিনও স্ত্রীর মর্যাদা দেননি, এবং গোপনে যে দু-হাত দিয়ে আগলে রেখেছিলো সেন্ট পীয়েরের আগুন খেলা, মারা গেলো একদিন। মলি লব্রেক মারা গেলো বিনা চিকিৎসায়, বিনা পথ্যে। তখনও আমি এপথে নামিনি ; তখনও আমার রোজগার ছিলো না। তখনও সমাজ-সংস্কার-ভদ্রতার ঠাট, ভন্ডামি,—এসব আমাকে ত্যাগ করেনি।

জানো সেই নিগ্রো মলি লেব্রেক-কে আমি কখনও মা বলে ডাকিনি। একটি দিনও না। আমার গায়ের এই জলপাই-রং তার দেওয়া ; আমার নাকি চেহারার মধ্যে 'ডিগ্‌নিটী' আছে, 'পার্সোনালিটি' আছে ! মলি লেব্রেকেরও এসব ছিলো। শুধু যখন বাবা মারা যান, আমাকে সেই আগুনঝরা সংবাদ জানিয়ে গেলেন। পেলীর বিষ-বাষ্প সেন্ট পীয়েরেকে খাক করে দিয়েছে ; বাবার মৃত্যুকালীন সেই স্তব্ধ-নিঃশ্বাস স্বীকৃতি আমার সারাজীবন খাক করে দিয়েছে। কেন যে বাবা আমাকে তা বললেন, আজও আমি ভাবি, বুঝি না। ভাবি মলির মেয়ে মলি আমি ; আমি তো দোলিসেস্-দ্যু-লুদে পাড়ারই মেয়ে। মায়ের দেওয়া রংয়ের দৌলতই তো আমার দৌলত ; সেই স্বাস্থ্যই

Shilpi bob 10A/67 Ben.



সময় পাচ্ছেন আপনার ঝঞ্ঝাট ব্যাঙ্ক অব বরোদার ওপর ছেড়ে দিন।

আজই আমাদের ব্যাঙ্কে একটা কারেন্ট অ্যাকাউন্ট খুলুন।

আপনি ব্যস্ত মানুষ। অফিসের কাজ, বাড়ীর ঝামেলা, ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে ছুটাছুটি, সামাজিক কর্তব্য—এসব হাজার কাজে আপনি জড়িত। ইনসিওরেন্সের প্রিমিয়াম, বাড়ীভাড়া, ক্লাবের বিল, বাচ্চাদের স্কুলের বেতন দেওয়া অথবা ডিভিডেণ্ড ও অন্যান্য প্রাপ্য আদায়ের মতো রুটিন-বাঁধা কাজের জন্য সময় আপনার অতি অল্পই রয়েছে।

এসব ছোটখাট ঝামেলার কাজ উত্তম যত্ন নিয়ে ব্যাঙ্ক অব বরোদা করে দেয়। আজই আপনি আমাদের এখানে একটা কারেন্ট অ্যাকাউণ্ট খুলুন। আপনি অবশ্যই চেক বই পাবেন। এবং চেকই হচ্ছে দেনা-পাওনার সর্বোত্তম পদ্ধতি। কারণ, এ হচ্ছে বিল পরিশোধের প্রমাণ তথা দৈনন্দিন ব্যয়ের এক নিদর্শন।



চিরসমৃদ্ধির সোপান

দি ব্যাঙ্ক অব বরোদা লিমিটেড

(স্থাপিত: ১৯০৮) রেজিষ্টার্ড অফিস: মাণ্ডবী, বরোদা।
ভারত ও বহির্ভারতে তিন শতের অধিক শাখা আছে।

কাছাকাছি কোনও শাখা থেকে "আমরা আপনাকে সাহায্য করতে পারি" নামক বিনামূল্যের পুস্তিকাটি চেয়ে নিন বা চেয়ে পাঠান।

তো—তোমার চোখে আমাকে আজও বিশ-রাইশের ধাঁধা লাগিয়েছে।

আমি জানি সেন্ট পীয়েরেতে যাবে তুমি। পর্যটকরা যায়। পম্পিয়াই দেখতে যায় যেমন। ছাইয়ের পাহাড়ের তলায় চাপা পড়া ঘর-সংসার দেখার উত্তেজনাও যেমন, তার জন্য একটু আধটু হায় হায় করাও তেমন। যাবে, যেও। আমার মা চার্চের খাতায় বারবনিতা ছিলো। চার্চের পূত কবরস্তানে তার স্থান হয়নি : চার্চের পাশে পপার্স সেমেট্রীতে নামহীন কবর পাবে।... তবু নাম আছে। বাবার যথেষ্ট দান ছিলো সেন্ট পীয়েরের চার্চে। তাঁর কবর পূত-পবিত্র দেয়াল-গাঁথা ভাগ্যবতী-ভূমিতেই হতে পারতো। বাবা তো ইদানীং পাগলই হয়েছিলেন। পাগলামি করলেন। বলে গেলেন পপার্স সেমেট্রীতে আমার মায়ের কবরের পাশে যেন তাঁর কবর হয়। সেইখানে একটি ফলকে নাম পাবে—

Her lies one who was loved by Molly Leterec, a street woman.

[পথের মেয়ে মলি লেত্রেক যাকে ভালোবাসতো সে এখানে ঘুমিয়ে আছে]।

একটু থামে মলি। অনেক মার্টিনি খেয়েছে। সিগারেটের ট্রে ভরে উঠেছে ছাই-পাঁশে। মলির গলার শব্দ ঘষা ঘষা মোদো গলার জড়তা যেমন হয়। আধো-আঁধারী কোনটা ভিজে ভিজে। সমুদ্রের বুকে চাঁদের আলো দেখা দিয়েছে।

মলি হেসে বলে,—এবং আমারও প্রায় নিশ্চিত বিশ্বাস তোমাদের ধর্ম, গির্জা, সমাজ কিছুতেই আমাকে ভাগ্যবতী গতি দিতে পারবে না। আমিও স্থান পাবো ঐ পপার্স সেমেট্রীতে। আমি সেন্ট পীয়েরের মেয়ে। সেখানকার প্যারিস চার্চের সভ্যা। চার্চে টাকা দিই শুধু এই দয়াটুকু প্রত্যাশা করে যে যদি বা কোনোদিন এই দেহখানা ঐ চার্চের দরজায় উপস্থিত করা হয় যেন কোনো ঈশ্বরের কাছাকাছি আমার দেহটাকে পুঁতে রাখার ব্যবস্থা না করা হয়। আমার মুক্তি ঐ পপার্স সেমেট্রীতেই।

চলো, উঠি। তুমি তো আবার মেয়ে-মানুষ জড়িয়ে প্রকৃতির শোভা দেখতেও বিষম খাও। ভদ্রতার মানেই ভন্ডামি। তোমরা অন্ততঃ তাই করে তুলেছো। এতোক্ষণ আমার সঙ্গে থেকে তোমার দার্শনিক মনের শোভা কতোই না জানি কমে গেলো।

গাড়ী থেকে মলিকে নামিয়ে দিলাম ওর বাড়ীর দোরে। বললাম, আমার কোটের ল্যাপেলে একটা সুন্দর সোনার পিন আছে, ও' লেখা।

সে কি?

আমাদের ধর্মে পরমা শান্তি চরম মুক্তির বাণীরূপ। যদি রাখো বড়ো ভালো লাগবে।

তবে নাকি জড়াও না? জড়াও ঠিকই তবে হিন্দু মতে।...

আমি ওর মাথায় বাঁধা রুমালে যখন পিনটা গুঁজে দিতে থাকি তখন ঐ কথা কটা বলে ও চলে গেলো।

বাড়ীতে সবাই ঘুমিয়ে। বাইরের দিকে আমার ঘরের দরজা ভেজানো। বিছানায় গা দিতে না দিতেই ঘুম। সে ঘুম ভাঙলো পীয়েরের ডাকাডাকিতে। তখন বেলা ন'টা।

টেবিলে এসেও যখন বসলাম তখনও যেন মলি আমাকে ছাড়েনি; মার্টিনী খেলো মলি। নেশা হয়েছে আমার।

পীয়েরে বললো, চলো আজ যাই মাউন্ট পেলীর কবর সেন্ট পীয়েরে দেখতে। শ্রীমতীরা কেউ যাচ্ছেন না। ক্যাথী যাচ্ছে না, কারণ ওর গায়ে গতরে ব্যথা; আর ভি-ভি যাচ্ছে না কারণ ও বুঝেছে তোমার সঙ্গে গেলেও ওর যা ভবিষ্যৎ, না গেলেও তাই।

পথ খারাপ নয়। নারকোল এস্টেট-গুলো বাঁদিকে। ডান দিকে কেবল আখ-ক্ষেত। সমুদ্রের ধারে জাল শুকোয়। দূরে দূরে জেলে ডিঙিগ। সব ডিঙিগতেই মোটর লাগানো। মাছ ধরা জালও নাইলনের বোনা। মানুষের দেহশক্তি ক্রমশঃ যন্ত্রশক্তির প্রসাদে ফালতু হয়ে পড়ছে।

মাঞ্জানীলো, লা-নিবার্তাদ' সাঁ-মায়ী, ত্রয়-ইল্লের মতো মাছ-ধরা ছোট্টো শহরের চেয়ে বড় নয় লা পীয়েরে আজ। এককালে রবরবা শহর ছিলো: জম-জমাট ছিলো এর বাজার-হাট। লেন্টের আগে এখানে যে কার্ণিভাল নাচ হোতো তার খ্যাতি ছিলো ক্যারিবিয়ান-ময়। এখন ইতি-উতি কাফে দু-একটা—দা-সার্কল সিলেকট তাঙ্গো, স্ক্যোর-বিপণী, প্রসাধন-দোকান, চৌর্শ-পশারীর দোকান সুপার মারকেটের অনুকরণে ইউনিভার্সাল স্টোর্স—বাস।

মাঝে মাঝে ঐ দীন-দরিদ্র শহরের মধ্যেই দেখা যায় তিনটে চমৎকার কাটা পাথরের থাম থামের মাঝে কাদা—আর পাথর গুঁজে একখানা দীন-দরিদ্র বাড়ী; একটা কাঠের বাড়ী টিনের ছাদের তলার চবুতরা আগাগোড়া শাদা মার্বেলের, সিঁড়িগুলো মার্বেল মোড়া। ঘিঞ্জি একটা বস্তিতে ঢোকার পথে মনোরম একটা তোরণ —মনে করিয়ে দেয় রোমের পথে তোরণ। হঠাৎ-দেখা এইসব অকিঞ্চিৎকর বি-সমতালিক মুদ্রাকরপ্রমাদগুলোই বর্তমানে সাক্ষা হয়ে আছে অতীতের।

যতো এগুই ক্রমশঃ চোখে পড়ে নতুন বলতে এ শহরে যা, সবই কুৎসিত, দীন, নগণ্য। যেখানে যা আঢ্য, দীপ্ত, সম্পন্ন, উদার সবই,—প্রত্যেকটি কালান্তর থেকে এসেছে অগ্নিস্নান সেরে, তাই তাদের নামে মেকির ফাঁকি নেই; ব্যবসায়ীর কোলাহলমুখর স্পর্ধাবাণী স্বাক্ষরিত নেই রং-তামাসায় বোনা প্রাচীর-পত্রে।

পথ উঠে গেছে ওপরে আরও ওপরে। সেই পাহাড়ী ঢলের ওপর বন্ধুর রুক্ষতা;

কিন্তু কর্কট-মকরক্রান্তি ঘেরা মধ্যবিষুবের গর্ভকোষে জীবন-রস উচ্ছল; প্রবল। তাই শষ্প, গুল্ম, লতাও যেমন, ফুলের সম্ভারে প্রজাপতির মেলাও তেমনি।

নীচে বিস্তীর্ণ পর্বত-বলয়-ধৃত এক-খন্ড শ্যামল উপত্যকা। যেন মা তার আঁচল দিয়ে ঢেকে রেখেছে মৃত সন্তানকে। ঐ শ্যামলের তলায় রাশি রাশি বালু-ভস্ম স্তূপের তলে চিরকালে মিশে গিয়েছে রূপোচ্ছলা, অলঙ্কার-বিভূষিতা, নগর-নাগরী ক্যারিবিয়ানের পারী সেন্ট পিয়েরে। যার বন্দরে জাহাজ ভিড়লে দেশ-বিদেশের লস্করদল নিজেদের সৌভাগ্যে নিজেরাই টলোমলো করতো।

তবু সব ঢাকা পড়েনি। পর পর দেখা যায় বন-বিটপী নগর সমুদ্র ঠেলে ঠেলে কোথাও থাম, কোথাও ছাদ, কোথাও অলিন্দ,—মানুষের বাসবাসের পিন্ডময় চিহ্ন সারি সারি ছড়িয়ে আছে দিগন্তে বিধৃত সমুদ্র-সৈকত অবধি।

বৃহৎ একটা সর্বনাশের সম্মুখে দাঁড়ালে চিত্ত ভাবে গদ-গদ হয়ে ওঠে; ব্যথায় বিধুর হয়; দার্শনিক তত্ত্বের দিকে দৌড়োয়। আমার মনে হোলো ঐ ভস্ম-ভীষণের করাল গ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে মলি নামক একটি অমরাবতীর বীণা। মলির বা মলিদের কতো-কতো মলিদের দারুণ আক্রোশ নীল বিষ হয়ে মার্তিনিকের নব-নব শহরে ছড়িয়ে পড়েছে। যে বিবিক্ত নিরাসক্ত সর্বহারা নির্বেদ জীবনরসের প্রতি তিতিক্ষা মলির মধ্যে দেখেছি তার প্রাচীন-লিপি পড়তে গেলে ঐ শ্যাম-স্তব্ধ ভান্ডের তলায় অবগুপ্ত কোনো 'রসেটা' শিলালিপি উদ্ধার করতে হবে।

...আরও মনে হয় বর্তমান সভ্য দুনিয়ার ভান্ডে যে আজ এতো ক্লেদ, এতো আত্ম-বিলোপের সাধন জমা হয়েছে তাও তো সেই কোন প্রাচীন সামন্ত যুগের বিষোদগারের তলায় চাপা পড়া বণিক-সভ্যতার অনিবার্য অভিযানের হলাহল-ফল। যে বি-সমতা সমাজের স্তরে স্তরে জমা হয়েছে, তাতো বর্তমানের সঞ্চয় নয়, এ-কালের ফসল নয়। সমস্ত ভাবীকালের ফলের চাষ ভূতকালে হয়ে আছে। বিগত পাপের অগ্নিস্তূপে চাপা পড়েছে ভবিষ্যতের সম্ভাবনা। আবার সেন্ট পীয়েরে বসত গেড়েছে। তবু এ সে-সেন্ট পীয়েরে নয়; আবার মাউন্ট পেলী অগ্নি-উদ্গার করবে। এ সেন্ট পীয়েরেও থাকবে না।

তবু জল পড়ে, পাতা নড়ে। বিশ্ব-কর্মার কর্মশালায় রচন-মোচনের চাকা ঘুরছে, অক্লান্ত।

অদ্ভুত লেগেছিলো যখন এই পাহাড়ী পথ বেয়ে নেমে ঐ বলয়-ভান্ডের তলায় ঢুকে পড়লাম। কোথাও আর কোনো কোলাহল নেই। সেই বিপণী নেই; সেই বিস্তীর্ণ রাজপথ; সেই দলে দলে বণিকের

আনাগোনা। অলি-গলিতে ছেলের দল খেলা করছে না; মেয়েরা ফুলার্দে বেঁধে ফুটপাথ আলো করে ঘুরছে না; পার্কে দাঁড়িয়ে কেউ বক্তৃতা দিচ্ছে না। সব থেমে গেছে; নিবে গেছে, স্তব্ধ হয়ে গেছে।

তবু স্তব্ধ নয়।

একটা অঝোর-ঝরণ কল-কল ধ্বনি করুণ বিলাপ তুলেছে এই শ্মশান-প্রান্তরের বুকে। আমি থেমে যাই।

পীয়েরে বলে,—সেন্ট পীয়েরের হাসি বলতো সেকালে এই শব্দকে; আজ বলে কান্না। পাহাড় থেকে নদী নেমে আসে। মার্তিনীকে অনেক নদী। সেন্ট পীয়েরেতে চারধার থেকে নদীর জল নেমে আসে। নদীর নাম রিভিয়ের রানশের। সেই নদীর স্রোত ধাপে ধাপে নামিয়ে শহর, বাগান, প্রাসাদ, হাট সাজিয়ে রেখেছিলো সেকালের ফরাসীরা। এখন এই জঙ্গল আর ছাই চাপা কান্নাই শোনো।

সেকালের থিয়েটার, অপেরা, প্রাসাদ, নানা অট্টালিকা নীচে নেমে সবই দেখা গেলো। শহরের বাইরে মর্গ্যুজখানাও দেখা গেলো। "জানো!" পীয়েরে হঠাৎ বললো "সেন্ট পীয়ারের আগুন থেকে রক্ষা পেয়েছিলো একজন সাইপারিস! জেলের ঐ মোটা মোটা দেয়াল দেখলে তো ওর ভেতরে ঘরের ভেতর ঘরে মাটির প্রায় তলায় সাইপারিস একটা খুনে ফাঁসির আসামী। লোকে বলে অতোগুলো দেয়ালের আবডালে থাকার দরুন সে বেঁচেছিলো। আর বেঁচেছিলো ঐ একটি জাহাজ "রডাস"। চল্লিশ লক্ষ পাউন্ডের সেই ক্ষতি থেকে আজও মার্তিনীক মুক্তি পায়নি। মঁসিয়ে দেসনাম্বু এবং মঁসিয়ে দুপারকোয়ে—এই দুই ফরাসী পত্তন করেছিলো সহর। ডোমেনিকার সঙ্গে চোরাই কারবার করার আড্ডা ছিলো এটা। আর সেদিন আসবে না।"

দেখেছি মার্তিনীকের লোকেরা মার্তিনীকের বহু দুঃখ দৈন্য দুর্দশার কারণ হিসেবে ১৯০২-এর এই সর্বনাশাকেই দায়ী করে। তবু নতুন সেন্ট পীয়েরে গড়ে উঠছে। ছোটো শহর হলেও লোকের বসতি তো বটেই। ওদের ভয় করে না? ভিসুভিয়াসের পাশে আর শহর জমে উঠতে পারেনি। একজনকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম "তোমাদের ভয় করে না;—পেলীর পাহাড় যদি আবার জাগে!"

"কর্তা এখন কয়েক শতকের মতো ঘুমিয়ে পড়েছে।"

আমি শাদা চার্চ। অনেক দূরে পপাস সেমেট্রি। নাম শুনেছি দেখে পীয়েরে ভাবছে আমি পাগল হয়ে গেছি।

কিন্তু কী আশ্চর্য। কবরটার ওপর রাখা ঝরঝরে এক ঝাঁক শাদা গোলাপ। তার সঙ্গে গাঁথা সোনার পিন, ও' লেখা!

বেশ চমক খাই।

বলি পিয়েরে, ভাই—আমাকে এখানকার দু-চারটে পাবে নিয়ে যেতে হবে। কিংবা—কোনো মেয়েপাড়ায়।

আমার দিকে চেয়ে পিয়েরে বললো। সে-কি! তোমার আবার কী হোলো?

হাতটা চেপে ধরলাম, চলো না।

কিন্তু ভাবছিলাম যাবো অনেক দূরে। দক্ষিণের একটা জায়গায়, সারা বন পাথর হয়ে গেছে যেখানে।

সে হবে পরে। ডায়মণ্ড রকও দেখতে হবে। পরে হবে।

চলো যাই। কিন্তু আমার এক বন্ধু থাকে। থাকে ফোন করেছিলাম তোমাদের নিয়ে যাবো। আগে চলো সেখানে, তারপর।

বহুকষ্টে তাই স্বীকার করলাম।

নীচে নেমে গাড়ীতে চেপেছি। বন্ধুটির পরিচয় দিচ্ছিলো পিয়েরে। ডক্টর সিওর বেলী,—রিটায়ার্ড সিভিল ডাক্তার। উপস্থিত বিনাপয়সায় চিকিৎসায় রত। বৃদ্ধ মোলাটো। ভারতীয় দর্শনের ওপর প্রগাঢ় আস্থা। রমাঁ রলাঁর বই পড়ার পর থেকে ভারত সম্বন্ধে কৌতূহল।

গাড়ী থেমেছে একটুর জন্যে একটা চৌমাথায়। পথের ধারে ফুটপাথের ওপর দিয়ে তিন-চারটে শাদা খামারী চলেছে দূর থেকে দেখতে পাচ্ছি একটা হৈ-হৈ। একদল লোক দৌড়ুচ্ছে দলটার পিছু পিছু। তখন লক্ষ্য করলাম তারা কাবে-হাত করে বহন করে নিয়ে চলেছে একটি নারী—দীর্ঘাঙ্গী, সবুজ-হলদে পোষাকে ঢাকা, জলপাই-পালিশ দারুচিনি রং,—দীর্ঘ তার দেহ, মাথায় বাঁধা ফুলাদের তিনটে কোণ আজ চারটে হয়ে গেছে।

পিয়েরে বললো, "অমন হা করে চেয়ে দেখছো কি! এই তো পাড়া; আসতে চাইছিলে!—"

ক্লান্ত গলায় বলি,—"না, আর আমার দরকার হবে না।"

আপন মনে পিয়েরে বলে, "ওটা পারতে। আজ মলী আছে এ-তল্লাটে। ও মেয়েটা সহজে ধরা দেয় না। একটা-দুটো কাহিনী দিলে অনেকক্ষণ সদালাপ করা যায়।"

আক্রোশ বিধে রুক্ষ গলায় বলি বাজারের মেয়ের মন, যে চায় সে বোকা যে পায় সে উম্মাদ-অন্ধ!"

পিয়েরে হেসে বলে—"মলীকে অভিজ্ঞতা না থাকলে ফিলজফি হয় না স্পেকুলেশন।"

উত্তর দিই না।

ভিড়টা অনেকক্ষণ পিছনে পড়েছে।

চমৎকার মানুষ এই ডাক্তার। শান্তি-নিকেতনে যানার, যানার সৈয়দ মুজতবার আড্ডায়। বিস্ময়য় গতি যার মন, দৃষ্টি যার একাল-ওকাল। চিন্তা করে বসন্তে ও শীতে দুঃখ-সুখ, আকাশ-পাতাল।

হেইতির কথা পরে আসবে। কিন্তু এ-নিগ্রো হেইতির নিগ্রো নয়। হেইতির নিগ্রোরা যে নিগ্রো তা-ই যেন ভুলতে চায়। যে যতো কালো সে ততো আফ্রিকা-বিদ্বেষী। শাদাই যে তারা বসনে, ভূষণে, কর্মে, মর্মে হেইতি শ্বেতদ্বীপের পারঙ্গমতা আয়ত্ত করতে পেরে জয়ী। ওরা জিতে স্বাধীন। হেইতি আজ নিজ সত্তার স্বাধীন। কিন্তু এ-ধরনের চিন্তা যারা করে, তারা হেইতি সমাজের উঁচু ধাপের চাঁই। তারা সম্পূর্ণভাবে নীচের তলা থেকে বিচ্ছিন্ন এবং এই নীচের তলার লক্ষ লক্ষ লোকেরা নেশায়, মদে, জুয়ায়, বন্য-সংস্কার ও সংস্কৃতিতে ঠাস বুনোন একটা গ্রাণাইট কিংবা ডায়োরাইট স্তর। অনেক গভীরে। কোনো দিন যদি বিস্ফোরণ হয়, হেইতি সমাজ আগাগোড়া ফেটে ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।

ডাক্তার সীওর বেলীও নিগ্রো। কিন্তু আফ্রিকার অরণ্যের সঞ্জীবতা শুধু মনে। অতলান্তিক আর ভারত মহাসাগর, পশ্চিম আর পূবের সূর্যালোকে উদ্ভাসিত ওর চিন্তা, মনন, অনুশীলন। যে চমৎকার পরিচ্ছন্ন সংযতবাক রুচির স্নিগ্ধতায় গুয়েনার এডগার উইলসন, আর্থার সেচারে আমার মনকে ভরিয়ে দিয়েছে, যে সহিষ্ণু, বদান্য, উদারতা পেয়েছি ত্রিনিদাদের পীটার ডেলিমাক, ডাক্তার এরিস্টন রিচার্ডসনের মধ্যে—সেই স্বচ্ছ উদার চিন্তা, সহজ সহিষ্ণু মন এই বেলীর। নিগ্রোরা যে এক-কালে দাস ছিলো এ-কথা এরা ভোলেনি। সেই আদিম বেদনার দানে ওরা বিনীত, সংহত; অথচ যে-সংগ্রামের ফলে ওদের মুক্তি এসেছে সেই সংগ্রামের রক্তক্ষরী ইতিহাস ওদের চিত্তকে সমৃদ্ধ করেছে। ওরা ক্ষমায় ভরে যেতে চায়। ওরা পূবের বাতাস, পূবের আলো পেতে চায় আফ্রিকার আরণ্যক অন্ধকার ভেদ করে। ওদের বুকে ওরা নালিশ রাখতে চায় না। ওরা বলতে চায় দাস-ব্যবসায়ের গোড়ার ইতিহাসের গোড়ায় আফ্রিকা, আরব, মিশর, রোমে পোতা ছিলো। দাসবাহী প্রতিটি জাহাজের দুর্গতি হোতো চরম কিন্তু সে-সময় সব জাহাজেই লস্করদের অবস্থাও অনুরূপই ছিলো। রোমের গ্যালী-বওয়া দাসদের অবস্থা ক্রুসেডের যুদ্ধে সৈন্য-শিবিরে সৈন্যদের অবস্থা—একবারও ভেবে দেখলে বোঝা যায় এটা শাদা-কালোর সংঘাত নয়, প্রাচীন-আধুনিকের সংঘাত; সভ্যতা-সংস্কৃতির ক্রমবিবর্তনের ধারা। এতে ব্যর্থ আক্রোশ করে লাভ নেই, ক্রূর বিদ্বেষ ধরে



সে অনেকদিন আগের কথা। তখন আমরা নর্থ বিহারের এক গাঁয়ে থাকতুম। বাবা ছিলেন ডাক্তার। পসার প্রতিপত্তি সবই ছিল। আর ছিল গোয়ালে গরু, চাষের হাল—এদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অনেক জনমজুর—সব মিলিয়ে আমাদের আটচালাকে ঘিরে বেশ জমজমাট অবস্থা।

কোকোবা ছিল আমার খাস ভৃত্য। ওর মা বহেরীও তখন আমাদের বাড়ীতেই কাজ করতো। এই কোকোবার কথা ভেবে কত বিনিদ্র রাত কেটেছে। সতের বছরের শক্ত-সমর্থ বিহারী ছেলেটির কথা ভেবে বাড়ীর সকলে বিশেষ করে আমার স্ত্রী আজও দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। সে যে আমাদের কতটা জুড়ে ছিল তাকে হারানোর পরে সে কথা বুঝেছি।

প্রায় ত্রিশ বছর আগের কথা। কিন্তু অনেককিছু উত্থানপতনের মধ্যেও যে মানুষ আজও স্মৃতির সব কটি পাতা জুড়ে রয়েছে সে কোকোবা। তার কথাই আজ বলবো বলে কলম ধরেছি।

তখন বর্ষাকাল। সকাল থেকেই সেদিন ঘন মেঘে আকাশ ঢাকা। রাত্রি নটা নাগাদ কোকোবাকে আটচালার বৈঠকখানা ঘরে বিছানা পাততে বলে এক-খানা মাসিক পত্রিকা টেনে ঘরের কোণে রাখা ইজিচেয়ারটায় বসে পড়লুম। বাইরে ঝিরঝির করে অবিরাম বৃষ্টি পড়ছে। আমাকে কিছু সময় অপেক্ষা করতে বলে কোকোবা বাইরে চলে গেল। ওর উদ্দেশ্য বুঝলুম। সকালের গরু মহিষের 'জাবর' ঠিক করতে বিচুলি গাদায় খড় আনতে গেছে। ঘরে বসেই ওর খড় টানার শব্দ পাচ্ছিলুম। চমকে উঠলাম ওর কাতর ডাক শুনে, 'এ বাবুজী হমকে রেঙ কাটলবে।' ধড়মড়িয়ে বাইরে এসে যারা শুয়েছিল তাদের ওঠালুম। ওরা প্রথমটা কিছুই বুঝতে না পেরে বোকার মত আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। বললুম হাঁ করে দেখছিস কি? শিগগীর কোকোবাকে ধরে নিয়ে আয় বৈঠকখানায়।' ওরা কোকোবাকে আমার কাছে যখন ধরে নিয়ে এলো, পেট্রোম্যাক্সের আলোয় দেখলুম পায়ের পাতার ওপরেই দুটো ক্ষত-চিহ্ন। শিউরে উঠলুম। কোকোবা 'রেঙ' বলে যা মনে করেছে সে যে কত বড় ভুল ওর মুখের চেহারা দেখেই সেটা বোঝা যাচ্ছিল। কাছেই একজন মজুর দাঁড়িয়ে-ছিল। বললুম, শিগ্গীর ক্ষতের ওপরে দুতিনটে শক্ত করে তাগা বেঁধে ওঝার বাড়ীতে নিয়ে চল।'

আমাদের বাড়ীর কিছু দূরেই থাকতো গাঁয়ের মোড়ল। সে ছিল আবার সাপেরও ওঝা। কোকোবাকে ধরাধরি করে মোড়লের কাছে নিয়ে যাওয়া হোল। হাঁকডাকে মোড়ল উঠে এলে বললুম, 'মোড়ল ও বলছে রেঙ কেটেছে। একটু দেখ তো বাপু।'

মোড়ল আমার কথা শুনে বললে, 'ও কিছু নয় বাবুজী। ও যা বলছে তাই সত্যি। তবে বাবুজী যখন বলছেন একটু ঝাড়ফুক করে দেখি।'

মোড়ল অনেকক্ষণ ধরে বিড় বিড় করে কি সব আওড়ালে। প্রায় আধ ঘন্টা পরে পায়ের বাঁধনগুলো খুলে দিয়ে বললে, ওকে নিয়ে যান বাবুজী। 'কাল' এবারের মত ওকে রেয়াত করেছে।' মোড়ল কোকোবাকে পুকুরের জলে পা ধুয়ে আসতে বললে।

কোকোবা ফিরে আসতেই জিজ্ঞেস করলুম, 'ফিরে কেমন বুঝছিস?'

কোকোবা বললে, 'লাহুড়তা হ্যায় বাবুজী।'

মোড়লের দিকে ফিরে বললুম, 'কাজটা কিন্তু সত্যিই ভাল হোল না মোড়ল। ওর তো জ্বালা করছে।'

মোড়ল মৃদু হেসে বললে, 'বাঙালী-বাবুরা বড়ই ভীতু হয় বাবুজী। ওর ক্ষতে বিষ নেই। ক্ষত স্থানে 'পানি' লাগলে 'ছাবছানাবে' বাবুজী। ডরের কি আছে?'

কোকোবাকে নিয়ে ফিরে এলুম। কোকোবা যে সুস্থ নেই তা ওকে দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। ও যাতে ঘুমিয়ে না পড়ে সেজন্য ওকে এটা সেটা কাজে লাগিয়ে রাখতে চেষ্টা করলুম।

রাত্রি তখন, তৃতীয় যামে। বাইরে বৃষ্টি থেমেছে। কোকোবা বললে, 'এ বাবুজী নাক মে এ ক্যা ঘুসজবা।' ও নাক চেপে ধরলো। ওর নাকিস্বর শুনেই বুঝলুম বিষের ক্রিয়া তীব্রতর হয়েছে। আবার সকলে কোকোবাকে নিয়ে মোড়লের কাছে এলুম।

বললুম, 'মোড়ল তখন আমার কথা শুনলে না। এখন তোমার জন্যই একটা প্রাণ যাচ্ছে।'

মোড়ল আমার দিকে খানিকক্ষণ ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

বললে, 'ইসকে সচমুচ কাল কাটলবা বাবুজী।'

কালে যে কেটেছে সে তো আমি সুরু থেকেই বুঝতে পেরেছিলুম। মোড়ল পুনরায় মন্ত্র আওড়াতে সুরু করলে। আমি নিঃশব্দে সরে এলুম এদিকটায়। সেখানে দাঁড়িয়ে শূন্য আকাশটা অনেকদূর পর্যন্ত দেখা যায়। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তাকিয়ে রইলুম ভোরের আকাশটার দিকে। তখন রাত শেষ হয়ে এসেছে। পুবের আকাশটায় লেগেছে আভা। কি বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারলুম না। ফিরে এলুম আবার কোকোবার কাছে। ফিরে গিয়ে দেখলুম এক বীভৎস দৃশ্য। সারা শরীর কোকোবার নীল। মুখে বড় বড় ফেনা ঝরছে। আমাকে দেখে একটু হাসলে কোকোবা। হাত দুটো তুলে বোধহয় প্রণাম করতে চেয়েছিল। কিন্তু হাত দুটো আর ওঠেনি। ঘাড়টা কাত হয়ে পড়েছিল সঙ্গে সঙ্গে।

পুলিশকে খবর পাঠিয়ে শূন্য মনটাকে নিয়ে বাড়ী ফিরে এলুম। আমার প্রিয় ভৃত্য কোকোবা আর নেই একথা ভাবতেই মনটা হু হু করে উঠলো। বাড়ীর ভেতর থেকে একটা কান্নার শব্দ শুনতে পেলুম। বুঝলুম বহেরী কাঁদছে।

অনেকদিন ভেবেছি উঠোনের পাশ থেকে বিচুলির গাদাটা সরিয়ে ফেলবো। নানা কাজে হয়ে আর উঠছিল না। একদিন রামধারী আর মাহিন্দর মজুর দুটোকে ডেকে বলে দিলুম ওটাকে সরিয়ে ফেলতে।

শীতের সকাল। শহরের কাজ সেরে ঘোড়ায় ফিরছিলুম। রুক্ষ কনকনে হাওয়ায় সব কিছুই কেমন যেন ম্লান। মুখ বিহারের



এ সময়টা উদাসী বাউলের মত। সবই আছে অথচ কিছুই নেই।

ঘোড়া চলছিল দুলকি চালে। রামধারী ও মাহিন্দর হয়ত এতক্ষণে বিচুলির গাদাটা সরিয়ে ফেলেছে। ওটা ক্রমশই অসহ্য হয়ে উঠছে। কোকোবার স্মৃতি ওই বিচুলির গাদার সঙ্গে বড় বেশী জড়িত। আনমনা হয়ে পড়েছিলুম। কখন ঘোড়াটা এসে উঠোনে দাঁড়িয়েছে টের পাইনি। সম্বিৎ ফিরলো রামধারীর ডাকে, 'বাবুজী।'

ঘোড়া থেকে নেমে ওদের কাজটা দেখে এলুম। অনেকখানি হয়ে গেছে। বললুম গাদা সরিয়ে মাটিটাও বেশ গভীর করে খুঁড়ে দিস।

ওদের সব কিছু বুঝিয়ে দিয়ে বৈঠকখানার দাওয়ায় রাখা ইজিচেয়ারটায় এসে বসলুম। বসে বসে ওদের মাটি কোপানো দেখতে লাগলুম। ওপাশে ঠকবা কচা পুঁতছিল ওর বাগানে। বেলা গড়িয়ে গেছে। উঠোনের রোদটাও ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে। সরতে সরতে যখন টুপ করে নিভে যাবে এক সময়। তারপর চারিদিক ঘিরে সন্ধ্যা নামবে। রাত হবে। শেষে সব অন্ধকারে একাকার।

একটু তন্দ্রা মত এসেছিল। চিৎকার চেঁচামেচিতে জেগে যা দেখলুম সে কথা মনে হলে আজও গা শিউরে ওঠে। দেখলুম একটি প্রকাণ্ড শংখচূড় জাতীয় গোখরো সাপের ফণা দুলছে রামধারীর কিছুটা দূরেই। ঠকবা মজুরও ততক্ষণে ওদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ওদের কথাবার্তা শুনে বুঝলুম ওরা মাটি কাটতে কাটতে গোখরো সাপটার শরীরটা প্রথমে দেখতে পায়। রামধারীর ডাকে ঠকবা ওর খন্তা দিয়ে শরীরটা চেপে ধরতেই সাপটা সপাৎ করে মাটির ভেতর থেকে ফণাটা তুলে ওই ভাবে ফুঁসছে।

চিৎকার করে রামধারীকে বললুম, 'শিগ্গীর ফণাটার মাথায় কোপ দে'।

রামধারী হাতজোড় করে বললে, 'না বাবুজী। আমরা সাপের পুজো করি। ও কাজ আমরা পারব না।'

বললুম 'শয়তান! যদি কারো কিছু হয় তবে তোকে নির্ঘাত জেলে দেব।'

পুলিশের ভয়েই হোক অথবা যে কারণেই হোক রামধারী আর দ্বিরুক্তি না করে ফণাটার মাথায় ওর মুসল বসিয়ে দিতেই সাপটা দু টুকরো হয়ে গেল। মাথাটা দুবার লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে শেষে স্থির হয়ে গেল।

মনে করেছিলুম ওর জোড়াটাও নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু না। অনেক খুঁজেও জোড়াটিকে পাওয়া গেল না।

মাটি খুঁড়ে লেজ শরীর এবং মাথাটা রামধারী যখন জুড়লো দেখলুম 'কালই' বটে। মোড়ল ঠিকই বলেছিল, 'ওকে কালে কেটেছে বাবুজী।' মেপে দেখা গেল লম্বায় ছয় সাত হাত।

প্রদর্শনী

পরিক্রমা

চিত্ররসিক



পশ্চিম ইয়োরোপের গ্রাফিকস-এর মত স্লোভাক গ্রাফিকস ধীরে ধীরে গঠিত হয়ে ওঠেনি। এর বর্তমান চেহারা দেখা গিয়েছে এই শতাব্দীর দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকের মধ্যে। আধুনিক স্লোভাকিয়ার গ্রাফিকসের জন্মদাতা হিসেবে মিকুলাস গালান্দা, লুদোভিট ফুল্লা এবং কোলোমান সাকোলের অবদান অনেকখানি। এঁরাই সমকালীন ইয়োরোপের গ্রাফিকসের বিবর্তনের সঙ্গে স্লোভাকিয়ার পরিচয় ঘনিষ্ঠতর করেন। অল ইন্ডিয়া ফাইন আর্টস অ্যান্ড ক্র্যাফটস সোসাইটি ও ভারত সরকারের শিক্ষাবিভাগের উদ্যোগে সরকারী চারু ও কারু মহাবিদ্যালয়ে যে শতাধিক গ্রাফিকসের প্রদর্শনী হল তাতে মোটামুটি ইউরোপীয় এক্সপ্রেশনিস্টিক, সুররিয়্যালিস্টিক এবং পূর্ব ইউরোপের লোকশিল্পের অনুপ্রেরণায় তৈরী অনেকগুলি চমৎকার গ্রাফিকসের নিদর্শন দেখা গেল। প্রথমেই লক্ষ্য করা যায় যে ছবিগুলির উঁচুদরের ক্রাফটসম্যানশিপ। লিনোকাট, উডকাট এচিং বা লিথোগ্রাফি যে বিভাগের কাজই হোক না কেন ঢিলেঢালা বা ফাঁকির কাজ নেই। যে তেরজন শিল্পীর কাজ উপস্থিত করা হয়েছিল তাঁদের মধ্যে তিন-চারজন ছাড়া সকলেই ১৯৩০-এর পরে জন্মেছেন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসকারী রূপের প্রভাব তাঁদের কাজের মধ্যে সুস্পষ্ট। প্রবীণদের মধ্যে ফুল্লার নিখুঁত পরিচ্ছন্ন রঙীন লিনোকাট নিসর্গদৃশ্যগুলির মধ্যেই একটা শান্ত বর্ণোজ্জ্বল জগতের সন্ধান পাওয়া যায়। জুলিয়াস জাকোবো মানবজীবনের দুঃখ ও নিষ্ঠুরতার মধ্যে একটা আশার বাণী খোঁজবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর উডকাটগুলির সূক্ষ্মতা ও গভীরতা রেখাপাত করে। এঁর কাজগুলি কতকটা ইলাস্ট্রেশনধর্মী। ইগোক্রানিক-এর লিথো এবং এচিংগুলি অনেক ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত রূপকের আবরণে ঢাকা। তাঁর 'সাঁলস সিরিজের এচিংগুলি চমৎকার লাগলো। এরনেস্ট জমেতাকের উডকাটগুলিতে লোকশিল্পের প্রভাব সুস্পষ্ট। ঘন কালো জমিতে গুটিকয়েক মোটা শাদা রেখার সাহায্যে বুধার ছবিটি অনবদ্য হয়েছে। এছাড়া লোকগাথার ওপর কয়েকখানি ছবিতেও এই গুণ সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। ভিয়েরা গেরগেল ওভার লিথোগুলির সূক্ষ্ম টোনের কাজ এবং বিষণ্ণ মুখের প্রতিচ্ছবি দীর্ঘকাল মনে থাকার মত। য়ান লেবিস মূলত বাইজান্টাইন রীতি প্রভাবিত লোকশিল্পের অনুসরণে সার্কাস, লাভার্স, টক ১ ও ২ প্রভৃতি ছবিতে চমৎকার ডেকরেশনের সঙ্গে একটা রহস্যময় ভাব আনতে সমর্থ হয়েছেন। ভেরা কেমবোভার আধা অ্যাবস্ট্রাক্ট লিথো এবং য়ারোশলাভ কোসিকসের জ্যামিতিক সরল গঠনের মনোটাইপের মধ্যে এঁদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিভিন্নতার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। আলবিন ব্রুনোভস্কির এচিংগুলি সুররিয়্যালিজম অনুপ্রেরিত। সমস্ত ফিগারগুলির মধ্যে মানবমনের গভীর অন্ধকার রাজ্যে প্রবেশের চেষ্টা থাকলেও অনেকসময় তার ভেতরেও কোথাও কোথাও হাস্যরসের একটু বিদ্রুপের সুরও রাখা হয়েছে। 'ডিসকাসন' বা 'নুমিসম্যাটিস্টস কংগ্রেস' ছবিতে তার নিদর্শন পাওয়া যায়। 'ডান সাহস সাফারিং' আরেকটি উল্লেখযোগ্য ছবি। এই স্বল্পপরিসর প্রদর্শনীতে স্লোভাক গ্রাফিকসের যে বৈচিত্র্য উপস্থিত করা হয়েছে তার বিস্তার অনেকখানি এবং গভীরতাও অল্প নয়।

*

এসপ্লানেড ইস্টের চিত্রদাকারী গ্যালারীতে শিল্পী গোপাল ঘোষের আরেকটি চিত্র প্রদর্শনী ৬ থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হল। প্রদর্শনীতে ষোলখানি জলরং ও প্যাস্টেলের নিসর্গ দৃশ্য ছাড়া অনেকগুলি স্কেচ ও ছোট ছবি ছিল। বর্তমান প্রদর্শনীতেও গোপাল ঘোষের চিরপরিচিত ভঙ্গীতে আঁকা কাজের নমুনা দেখা গেল। অত্যন্ত ক্ষিপ্র হাতের কাজ খানিকটা ঢিলে-ঢালা ভঙ্গীতে আঁকা, বনভূমি, গাছপালা, পার্বত্য দৃশ্য ইত্যাদি নিয়ে তাঁর ছবির বিষয়বস্তু। তাঁর গোড়ার দিকের কিছু কাজও আছে। প্যাস্টেলে আঁকা দুখানি গাছের ছবি বিশেষভাবে চোখে পড়ল। তবে জলরং ও টেম্পারায় আঁকা ছবিগুলিই বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। এখানে হাল্কা চালে আঁকা কয়েকটি ছবিতে দ্রুত ক্যালিগ্রাফিক কাজ ভাল লাগল। ১৬ নম্বরের ছবিতে মনোক্রোম মেঘ পার্বত্য দৃশ্যে কতকটা রহস্যময় ভাব ভাল লাগে। এছাড়া ১২, ১৩ ও ১৫ নম্বরের নিসর্গ দৃশ্যগুলি বিশেষভাবে ভাল লাগল।

অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে ৩০ জানুয়ারী থেকে ৫ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত শিল্পী এস. কে চিরিমার-এর পঁচিশখানির মত ছবির একটি প্রদর্শনী হয়ে গেল। শিল্পী চিরিমার ১৯৫৪ সালে ইংলণ্ডে যান এবং সেখানে প্রায় দশ বছর তিনি শিল্পশিক্ষা লাভ করেন। মনস্তত্ত্বের দিকে তাঁর ঝোঁক আছে এবং হয়ত বা সেই কারণেই তাঁর শিল্পের কোন কোন স্থলে তন্ত্রশাস্ত্রের প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। শিল্পীর কতকগুলি সাদা কালো ডিজাইনে গ্রাফিকধর্মীতার ছাপ দেখতে পাওয়া যায়। ডেকরেটিভ ডিজাইন হিসেবে এগুলি বিশেষ আকর্ষণীয় হয়েছে। অন্যান্য ছবিতেও ফ্ল্যাট এবং জ্যামিতিক বিভাগে রঙের প্রয়োগ এই গ্রাফিকধর্মীতার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। ১০, ৫, ১৩, ১৮, ১৯ এবং ২১ নম্বরের ছবিগুলি এদিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য। শিল্পী ছবিগুলির নামের সঙ্গে ছোট ছোট কবিতা দিয়ে ব্যাখ্যা করে দেবার চেষ্টাও করেছেন।

*

শিল্পী বাণীপ্রসন্ন ৩ থেকে ১১ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত অ্যাকাডেমিতে তাঁর ত্রিশখানির মত তৈলচিত্র এবং অনেকগুলি ড্রয়িং রঙীন স্কেচ এবং কবিতা সহযোগে স্কেচের প্রদর্শনী করলেন। বাণীপ্রসন্নের আত্মপ্রকাশের একেব বৈচিত্র্য ও ক্ষেত্র বিশেষে প্যাটার্ণের গতিময়তা মন্দ লাগল না। তবে তাঁর ছোট স্টেইন্ড গ্লাসধর্মী স্কেচগুলি রঙীন ডিজাইনের নীল, বেগনী, লাল ও হলুদের উজ্জ্বল বর্ণসমারোহ ভাল লাগল। তাঁর রেখাচিত্রগুলির মধ্যে পল ক্লী ধরনের স্বচ্ছন্দগতির রেখাপাতের প্রয়াস দেখা গেল। কয়েকটি ড্রয়িং-এর মুন্সীয়ানা ভাল লাগল।

শিশুশিল্পী অনামিত্র চক্রবর্তীর ১০৫ খানি ছবি নিয়ে একটি বৃহৎ প্রদর্শনী ৫ থেকে ১৭ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত অ্যাকাডেমির সামনের তিনখানি হলঘর জুড়ে অনুষ্ঠিত হল। অনমিত্রের বিস্ময়কর কাজের সঙ্গে যারা পরিচিত হয়েছেন তাঁদের কাছে তার নতুন কাজগুলি আবার নতুন করে ভাল লাগবে। আগেরবারের মত এবারেও তার নৌকা, গাড়ির চাকা, ধানক্ষেতের দৃশ্য প্রভৃতি ব্যক্তিগত প্রতীকের ছবি ত আছেই—এছাড়া তার কাজের মধ্যে কয়েকটি নতুন বৈশিষ্ট্যের আভাস চোখে পড়ল। 'ময়ূর' ছবিটিতে রং একটা বিশেষ প্যাটার্ণ এবং ঔজ্জ্বল্য নিয়েছে। আবার 'ফুজয়মহলের' রূপ আঁকতে গিয়ে সে একটা আশ্চর্যজনক সরলীকরণের সাহায্য নিয়েছে যার পরিষ্কার ব্যাখ্যা হয়ত মনস্তাত্ত্বিকরা ভালভাবে করতে পারেন। কয়েকটি রাজহাঁসের রূপের মধ্যে রূপকথার রাজ্যের আভাস এবং একটি কালো রাজহাঁসের ছবির অসাধারণ কম্পোজিশন একাধিকবার লক্ষ্য করবার মত। বরফের দৃশ্যের প্যাটার্ণ এবং চাঁদ আর নৌকার ছবি আর রাত্রের একটি ছবির টোনের গভীরতা ছোট ছেলের কাজের পক্ষে বিস্ময়কর লাগে। ১২, ২০, ২৮, ৫৯, ৭০, ৮০, ৮১, ৮৭, ৯৪, ১০৩-১০৫ সংখ্যক ছবিগুলি বিশেষভাবে ভালো লাগল।

*

নয়াদিল্লী গত ১০ ফেব্রুয়ারীতে সমকালীন শিল্পের যে ট্রিয়েনালে প্রদর্শনী হল তাতে ব্রিটিশ চিত্রকর সেরি রিচার্ডসের 'লা কাথেড্রাল অংগলুতি' ছবিটি প্রথম পুরস্কার লাভ করেছে। দশজন ইংরেজ শিল্পী এতে অংশগ্রহণ করেন। রিচার্ডসের কুড়িখানি ছবি ও প্রিন্ট এখানে প্রদর্শিত হয়। শিল্পীর জন্ম হয় ১৯০৩ সালে ওয়েলসে। ১৯৩৬-এ তিনি সুররিয়্যালিস্ট গ্রুপের সঙ্গে চিত্রপ্রদর্শনী করেন এবং প্রথম একক প্রদর্শনী হয় ১৯৭২-এ লণ্ডনে। ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৫ পর্যন্ত তিনি টেট গ্যালারীর ট্রাস্টি হিসেবে কাজ করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে ওয়েলসের কবি ডিলান টমাসের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল এবং তাঁর কবিতা থেকে শিল্পী অনেকগুলি ছবির অনুপ্রেরণাও লাভ করেছেন। শেকসপীয়রের চারিশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে স্ট্র্যাটফোর্ডে একটি ম্যুরাল ছাড়াও আরো কতকগুলি বড় ম্যুরাল তিনি এঁকেছেন।

*

অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে ২৫ থেকে ৩০ জানুয়ারী প্রভা দাশগুপ্তের তেইশখানি তৈলচিত্রের একটি একক প্রদর্শনী হয়ে গেল। শ্রীমতী দাশগুপ্ত নিসর্গ, প্রতিকৃতি, নৃত্য এবং রূপকথা এই সবকিছু বিষয় নিয়েই ছবি এঁকেছেন। তবে দুঃখের বিষয় আকার দিকেই মনোযোগ একটু কম দিয়েছেন। ফলে ছবিগুলি অগঠিত এবং একটু বেশীমাত্রায় ম্যাটম্যাটে ভাব পরিস্ফুট হয়েছে। নৃত্যকলার বর্ণনা করে আঁকা কয়েকটি ছবির গতিভঙ্গী এবং ছন্দবোধ মন্দ লাগে নি।

*

২২ থেকে ২৮ জানুয়ারী পর্যন্ত অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসের পূর্বদিকের গ্যালারীর ওপরতলার একটি পুস্তক প্রদর্শনী হয়ে গেল। প্রধানত শিল্পবিষয়ের বই—তবে অন্যান্য বিষয়ের বই এবং কিছু পেপার ব্যাক বইও ছিল। বিদেশী ছবির বই আজকাল অপেক্ষাকৃত দুষ্প্রাপ্য এবং দুর্মূল্যও বটে। এখানে এ ধরনের কিছু দুর্মূল্য বইয়ের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যের বইও কিছু কিছু ছিল। তাছাড়া প্রাচ্যশিল্পের বইগুলিও একেবারে উপেক্ষিত হয়নি।

*

মোনালিসা গ্যালারীতে ২৮শে জানুয়ারী থেকে ৩রা ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বারীন দে'র একটি চিত্রপ্রদর্শনী হল। আটখানি তৈলচিত্রে তিনি বিভিন্ন প্রতীক উপস্থিত করে অনন্ত, নাচঘর, দর্পণ, নিঃশব্দতা প্রভৃতি বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। ছবিগুলিতে একটা ধোঁয়াটে রঙীন বাষ্পের ভেতর থেকে কোথাও বা একটি মুখ (কতকটা ক্যালেণ্ডারের ছবির মত) কোথাও বা দেহের অংশ ফুটে বেরিয়ে আসছে। তার মধ্যে ক্ষেত্রবিশেষে অনেকখানি আবেদন আনবার চেষ্টা আছে। রঙ প্রায় সব ছবিতেই একই ধরনের। গতবার তাঁর একক প্রদর্শনীতে এ ধরনের দু' একটি ছবি ছিল। এবারে প্রায় সবগুলিতেই সেই রীতির পরীক্ষা তিনি করেছেন।

*

চিত্রায়ণ সংস্থা প্রায় এক বছর হল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পাঁচ থেকে ষোল বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের এখানে সাধারণত ভর্তি করা হয়। ৫০ নম্বর ল্যান্সডাউন প্লেসে এদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এখানেও পাঁচ থেকে বারো-তেরো বছরের ছেলেমেয়েদের কাজ সবচেয়ে আকর্ষণীয় লাগল। খেলা, স্কুলের ছুটি, দেওয়ালী, বেলুনওয়ালা, শোবার ঘর ইত্যাদি নিয়ে কয়েকটি ছাত্রছাত্রী বেশ কৌতূহলোদ্দীপক ছবি এঁকেছে। আবার ভারতীয় শিল্পরীতিতে বড়দের কাজের অনুসরণে কয়েকটি কাজ বড় নিস্তেজ লাগল।





হমরাজ চিত্রে রাজকুমার এবং ভিমি

প্রেক্ষাগৃহ

সমালোচনা :

চারণকবি মুকুন্দ দাস (বাঙলা) : ফিল্ম ক্লাসিকস্-এর নিবেদন; ৩,৭৯৫·০৬ মিটার দীর্ঘ এবং ১৪ রীলে সমাপ্ত; কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : নির্মল চৌধুরী; সংলাপ : পরেশ ভট্টাচার্য ও হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়; সঙ্গীত-পরিচালনা : পবিত্র চট্টোপাধ্যায়; গীতরচনা : রবীন্দ্রনাথ, হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও মুকুন্দ দাস; চিত্রগ্রহণ : রামানন্দ সেনগুপ্ত; শব্দানুলেখন : নৃপেন পাল (অন্তর্দৃশ্য) এবং ইন্দু অধিকারী (বহির্দৃশ্য); সঙ্গীতানুলেখন ও শব্দ-পুনর্যোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ, শিল্প-নির্দেশনা : সত্যেন রায়চৌধুরী; সম্পাদনা : দুলাল দত্ত; নেপথ্য কণ্ঠসঙ্গীত : সবিতাব্রত দত্ত, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র ও নির্মলেন্দু চৌধুরী; রূপায়ণ : সবিতাব্রত দত্ত, জহর গাঙ্গুলী, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, দ্বিজু ভাওয়াল, শিবেন বন্দ্যোপাধ্যায়, সমরকুমার চট্টোপাধ্যায়, সমীর লাহিড়ী, মিঃ জর্ডন, মিঃ রেন কণ্টার, মিঃ হ্যারিস, মিঃ মাস্টারম্যান, মাঃ শঙ্কর, ছায়া দেবী, তৃপ্তি মিত্র, গীতা দে প্রভৃতি। চণ্ডীমাতা ফিল্মস প্রাঃ লিমিটেড-এর পরিবেশনায় গেল ১৬ই ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার থেকে রাধা, পূর্ণ, আলোছায়া এবং অপরাপর চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করেছে।

চারণকবি মুকুন্দ দাসের "মাতৃপূজা", "জাগরণ" প্রভৃতি স্বদেশী যাত্রাভিনয় দেখবার সৌভাগ্য এই কলকাতায় বসে আমাদেরও হয়েছিল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের দিনে বাঙলার অগণিত জনগণের মনকে স্বাদেশিকতার বীজমন্ত্রে দীক্ষিত করবার জন্যে যে-যাত্রাভিনয়ের উদ্ভব, মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অহিংস আন্দোলনের পথে আসমুদ্রহিমাচল ভারতবাসীর স্বরাজসাধনার যুগে সেই যাত্রাভিনয়ই তখন কলকাতা শহরের পাড়ায় পাড়ায় আসর বসাচ্ছিল শ্রোতৃবৃন্দের মনে স্বাধীনতার দাবানল প্রজ্জ্বলিত করবার জন্যে। মুকুন্দ দাসের তেজোদৃপ্ত কণ্ঠে "সাবধান, সাবধান, আসিছে নামিয়া ন্যায়ের দণ্ড রুদ্র দীপ্ত মূর্তিমান!" গান আসরে উপস্থিত দর্শক-সমাজে কি অভাবনীয় উত্তেজনার সঞ্চার করত, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। যে-যুগে রাজপথে "বন্দে মাতরম্" ধ্বনিও ইংরাজ সরকারের পুলিশবাহিনীকে ক্ষিপ্ত করে তুলত, সেই যুগে বাজারে, মাঠে, ময়দানে স্বদেশী যাত্রাভিনয়ের আসর বসানো যে কি অসমসাহসিকতার পরিচায়ক, তা আজকের দিনের লোক কল্পনাও করতে পারবেন না।

দুঃখের বিষয়, এমন যে মুকুন্দ দাস, যিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বরিশালের কোথাও জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং আজ থেকে মাত্র তেত্রিশ কি চৌত্রিশ বছর আগে ১৯৩৪ সালের কোনো এক দিন ইহলীলা সাঙ্গ করেন, তাঁর একটি তথ্যনিষ্ঠ জীবনী আজও রচিত হয়নি এবং কোনো দিন রচিত হবে কিনা, সে-বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ। আছে। এমন কি, তাঁর রচিত পালাগুলির পাণ্ডুলিপি কয়টি উদ্ধারের সম্যক প্রচেষ্টা হয়েছে বলেও জানা নেই।

ধান ভানতে শিবের গীতের মতো শোনালেও এত কথা বলতে হল এই কারণে যে, ফিল্ম ক্লাসিকস্ নিবেদিত "চারণকবি মুকুন্দ দাস" চিত্রের এবং রাজাবাজারস্থ প্রতাপ মেমোরিয়াল হলে নান্দিক প্রযোজিত "চারণকবি মুকুন্দ দাস" নাটকের কাহিনী দুটির মধ্যে কিছু কিছু মিল দেখা গেলেও যথেষ্ট পার্থক্যও লক্ষ্য করা যায় এবং তা থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, উভয় কাহিনীকারই মুকুন্দ দাসের জীবনকাহিনী রচনায় যথেষ্ট কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। চারণকবির জীবনী সম্বন্ধে যথেষ্ট উপাদান সংগ্রহ করতে অসমর্থ হয়েই যে তাঁরা এই কাজ করেছেন, তা বলাই বাহুল্য।

বরিশাল ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের ছাত্র যজ্ঞেশ্বর দে একদিন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের যুগের দেশনেতা মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের কাছ থেকে প্রেরণা পেয়ে মুকুন্দ দাস নামে নিজেকে অভিহিত করে স্বরচিত গান গেয়ে দেশের লোককে উদ্বুদ্ধ করার মহান কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং পরে স্বদেশী যাত্রার দল খুলে সমগ্র বাঙলাদেশের প্রপীড়িত আবালবৃদ্ধ নরনারীকে বিদেশী শাসক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতালাভের জন্যে মরণপণ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে উৎসাহিত করেছিলেন এই ঐতিহাসিক তথ্যের উপর নির্ভর করে মঞ্চ ও চিত্র উভয় কাহিনীই রচিত হয়েছে। কিন্তু যে স্বাদেশিকতার প্রভাবকে তিনি জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করেছিলেন, সেই কর্তব্যপথে দৃঢ়পদে চলতে গিয়ে বিদেশী রাজশক্তির কাছ থেকে বারংবার তিনি কি ভাবে বাধা পেয়েছিলেন এবং সেই বাধাকে অবহেলায় অতিক্রম করে তিনি নিজেকে কেমন করে লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে দেননি, তথ্যনিষ্ঠ উপাদান এবং উপযুক্ত কল্পনাশক্তির অভাবে সেই অত্যন্ত বাস্তব অথচ নাটকীয় কাহিনীটিই মঞ্চনাটক এবং চলচ্চিত্রে অকথিত থেকে গেছে। চলচ্চিত্রের কাহিনীটিকে তো কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার মালা বা এপিসোডিক্যাল বলাই সংগত। মুকুন্দ দাসের গ্রেপ্তার ও কারাবরণের ঘটনাটিকেও বিশ্বাসযোগ্যভাবে নাটকীয় করবার সুযোগ গ্রহণ করেননি কাহিনী ও চিত্রনাট্যকার। দুর্বল কাহিনী "চারণকবি মুকুন্দদাস" চলচ্চিত্রটিকে দর্শকদের হৃদয়ের গভীরে পৌঁছে দিতে সাহায্য করেনি।

নাম-ভূমিকায় প্রথমাংশে অভিনয় করেছেন মাস্টার শঙ্কর এবং দ্বিতীয়াংশে সবিতাব্রত দত্ত। স্বাভাবিকভাবেই দ্বিতীয়াংশটাই ছবির বেশীর ভাগ স্থান জুড়ে আছে। সবিতাব্রত গৃহীত চরিত্রের আন্তরিক দেশপ্রীতিকে তাঁর অভিনয়ের মাধ্যমে মূর্ত করে তুলেছেন; মিথ্যাচার, কপটতা ইত্যাদির বিরুদ্ধে তাঁর সমাজসংস্কারকের রূপটিকেও তিনি উপস্থাপিত করতে ত্রুটি করেননি। তাঁর সতেজ কণ্ঠের গানগুলি মুকুন্দ দাসের তেজোদৃপ্ত কণ্ঠটিকে বারে বারে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল; আমাদের ধারণা, গানের সহগামী যন্ত্রসঙ্গীতকে অধিকতর অবদমিত করতে পারলে তাঁর গানের আবেদন বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেত। প্রথমাংশে অর্থাৎ যখন মুকুন্দ যজ্ঞেশ্বর নামে বিদ্যালয়ের ছাত্র এবং পড়াশুনার চেয়ে তার গানের প্রতিই আসক্তি বেশী, সেই অংশে ঘটনা উপস্থাপনা এবং মাস্টার শঙ্করের অভিনয়গুণে যজ্ঞেশ্বর যেন বড্ড বেশী শান্ত। মুকুন্দ দাস যাঁর কাছ থেকে স্বাদেশিকতার প্রেরণা পেয়েছিলেন, সেই দেশনেতা অশ্বিনীকুমার দত্তের চরিত্রটি নিষ্ঠার সঙ্গে সার্থকভাবে চিত্রিত করেছেন রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়; তাঁর ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক সুকণ্ঠ চরিত্রটিকে জীবন্ত করে তুলেছিল। মুকুন্দ দাসের গান-লেখক বন্ধুর ছোট ভূমিকায় দিলীপ রায় চরিত্রোচিত সুঅভিনয় করেছেন। আশ্চর্য দরদী ও প্রাণবন্ত অভিনয় করেছেন মুকুন্দর মা শ্যামাসুন্দরীর ভূমিকায় ছায়া দেবী। প্রতিটি দৃশ্যে তাঁর বাচন ও ভাবপ্রকাশক ভঙ্গী ভূমিকাটিকে একটি বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করেছে। মুকুন্দের স্ত্রী শুভারূপে তৃপ্তি মিত্রের অভিনয় হৃদয়গ্রাহী হওয়ার অবকাশ পায়নি। অপরাপর ভূমিকায় জহর গাঙ্গুলী (মুকুন্দর বাবা গুরুদয়াল), দ্বিজু ভাওয়াল (ছোট ভাই রমেশ), গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (বৈরাগী রামানন্দ), ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেটের ভূমিকাভিনেতা, মাঝির ভূমিকাভিনেতা, শিবেন বন্দ্যোপাধ্যায় (চিত্তরঞ্জন), সমর চট্টোপাধ্যায় (সুভাষচন্দ্র) প্রভৃতি উল্লেখ্য অভিনয় করেছেন।

ছবিটির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগে একটি মধ্যমান রক্ষিত হয়েছে। ছবির

২৩শে ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার শুভমুক্তি!
অনেক নিপুণ সতর্কতাও কত গোপন সত্যকে ফাঁস করে দেয়
সুনীল দত্ত
রাজকুমার
মুমতাজ
বলরাজ সাহানী
ও প্রিমী
অভিনীত
হামরাজ
ইউনাইটেড কলার
প্রযোজনা-পরিচালনা বী. আর. চোপড়া
সংগীত রবি গীত সাহির
ওরিয়েণ্ট - ম্যাজেস্টিক - প্রিয়া - মেনকা - প্রভাত
পূর্ণশ্রী - ইণ্টালী - প্যারামাউণ্ট
বঙ্গবাসী - অশোক (হাওড়া) (শালকিয়া)
ন্যাশনাল — পি-সন — জয়া — সন্ধ্যা — রজনী — জয়ন্তী — অনুরাধা
(খিদিরপুর) (মেটেবুরুজ) (দমদম) (খড়দহ) (জগদ্দল) (রিষড়া) (দুর্গাপুর)
ও অন্যান্য চিত্রগৃহে ০ প্রভা পিকচার্স পরিবেশনা ০

আঠারোখানি গানের মধ্যে সবিতাব্রত দত্তর মুখেই আছে তেরখানি গান। এর মধ্যে একখানি বৈষ্ণব পদাবলী। বাকীগুলি হয় মুকুন্দ দাস, নয় হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের রচনা। রবীন্দ্ররচনা "বিধির বাঁধন" গানটি সমবেতকণ্ঠে গীত। সংগীত-পরিচালক সহযোগী যন্ত্রসংগীত সম্পর্কে আরও অবহিত হতে পারতেন। আগেই বলেছি, যন্ত্রসংগীত কণ্ঠসংগীতকে বহুস্থানে ব্যাহত করেছে।

ফিল্ম ক্লাসিকস্-এর "চারণকবি মুকুন্দ দাস" দেশাত্মবোধক ছবি হিসেবে দর্শকদের মধ্যে উদ্দীপনা জাগাতে সমর্থ হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

—নান্দীকর

দেশী ছবির খবর

ইকনমিক প্রোডাকসন্সের 'পরিশোধ' ছবিটি এ-সপ্তাহের ২৩ ফেব্রুয়ারী কলকাতার উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলা চিত্রগৃহে শুভমুক্তি লাভ করছে। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় রচিত এ-কাহিনীটির চিত্ররূপ দিয়েছেন পরিচালক অর্ধেন্দু সেন। এই অনুপম কাহিনীর প্রধান চরিত্রাবলীতে রূপদান করেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায়, সুলতা চৌধুরী, দিলীপ রায়, তরুণকুমার, মলিনা দেবী, জহর রায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায় ও নরেশ মিত্র। ছবিটির সুরসৃষ্টি করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। ইকনমিক পিকচার্স ছবিটির পরিবেশক।

এ-মাসের তেইশ তারিখে হিন্দী ছবি 'হামরাজ' ওরিয়েন্ট, ম্যাজেস্টিক, মেনকা প্রভৃতি চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করছে। বোম্বাইয়ে নির্মিত এ-ছবিটির পরিচালক হলেন বি আর চোপড়া। বি আর ফিল্মসের এই রঙিন চিত্রে প্রধান কয়েকটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন সুনীল দত্ত, রাজকুমার, মমতাজ, বলরাজ সাহানী এবং ভিম্মী। ছবিটির সুরকার হলেন রবি।

দেশী ছবির খবরাখবরের মধ্যে একটি নতুন ছবির পরিকল্পনা সম্প্রতি রূপ নিয়েছে। ছবিটির নাম 'পরিণীতা'। শরৎচন্দ্রের কাহিনী অবলম্বনে এটির চিত্রনাট্য রচিত হয়েছে। এ-কাহিনীর ললিতা চরিত্রে মনোনীতা হয়েছে বালিকা বধূ-র নবাগতা নায়িকা মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়। এছাড়া কয়েকটি মুখ্য চরিত্রে রয়েছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, সোমিত ভঞ্জ, ছায়া দেবী ও নীরা মালিয়া।

জীবনীচিত্র হিসেবে 'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন' একটি উল্লেখযোগ্য প্রয়াস বলা যেতে পারে। সম্প্রতি ছবিটির কাজ শুরু করেছেন পরিচালক অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়। ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। নাম-ভূমিকায় রূপদান করছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়। এছাড়া রয়েছেন দিলীপ চক্রবর্তী, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্রিতা মন্ডল, তন্দ্রা বর্মন, নির্মল চট্টোপাধ্যায়, জীবেন বসু প্রমুখ শিল্পিবৃন্দ। সুরসৃষ্টির দায়িত্ব নিয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

অজিত গাঙ্গুলী পরিচালিত ও রচিত 'দাদু' ছবিটির চিত্রগ্রহণ বর্তমানে টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওয় সুসম্পন্ন হচ্ছে। শ্রীরঞ্জিত-মল কাঁকারিয়া ছবিটির প্রযোজক। ছবিটির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন বিকাশ রায়, অনুপকুমার, সন্ধ্যা রায়, অনুভা গুপ্ত, ললিতা চট্টোপাধ্যায়, কবিতা চট্টোপাধ্যায়, কল্যাণী ঘোষ, শিবানী বসু, পদ্মা দেবী, অজয় গাঙ্গুলী, জহর গাঙ্গুলী, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। কালীপদ সেন ছবিটির সুরকার।

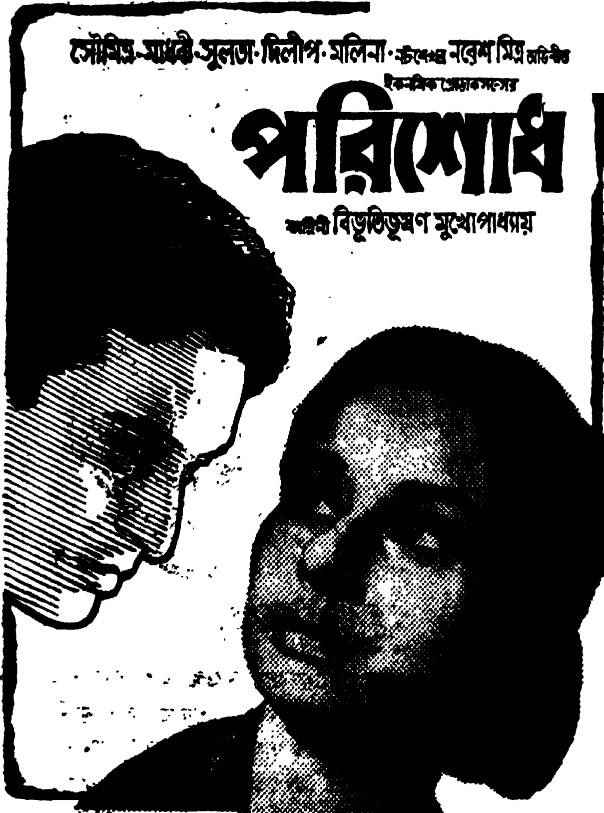
পরিচালক অসিত সেন এল বি ফিল্মসের 'আনোখী রাত' ছবিটির কাজ শুরু করেছেন। পরলোকগত সুরকার রোশন ছবিটির সংগীত-পরিচালক। সম্প্রতি ফেমাস সিনে ল্যাবরেটরীতে রোশন সুরকৃত একটি গানে কণ্ঠদান করলেন লতা মঙ্গেশকর। এ-ছবির প্রধান চরিত্রে রূপদান করছেন সঞ্জীবকুমার, নবাগতা জাহিদা, পরীক্ষিৎ সাহানী, অরুণা ইরাণী, আনোয়ার, মুকরী, তরুণ বোস এবং বিজয় খোটে।

পরিচালক প্রকাশ মেহরা তাঁর নতুন ছবি 'হাসিনা মান যায়েগী'-র চিত্রগ্রহণ একটানা শুরু করেছেন রূপতারা স্টুডিওয়। কল্যাণজী আনন্দজী সুরকৃত এ-ছবির মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করছেন শাম্মি কাপুর, ববিতা, অমিতা, মনমোহন কৃষ্ণ, নিরঞ্জন শর্মা, সাপ্রু ও জনি ওয়াকর।

বাংলাদেশের তরুণ নায়িকা অপর্ণা সেনের প্রথম হিন্দী ছবিটির নাম হল 'বিশ্বাস'। এই রঙিন ছবিটি পরিচালনা করছেন কেওয়াল পি কাশ্যপ। শ্রীমতী সেনের বিপরীত নায়ক চরিত্রে অভিনয় করছেন জিতেন্দ্র। বর্তমানে ছবিটির বহির্দৃশ্য দেরাদুন এবং হৃষীকেশ অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এ-ছবিটির সুরকার হলেন কল্যাণজী-আনন্দজী।

মহাসমারোহে শুভমুক্তি ২৩শে ফেব্রুয়ারী!

পারিবারিক মর্যাদার দুর্লঙ্ঘ্য প্রতিবন্ধতায় বিপর্যস্ত দুটি প্রেম-মুকুলিত সুকুমার হৃদয়ের নিরুপম কাব্য-নির্ঝর......



উত্তরা - পূরবী - উজ্জ্বলা ও অন্যান্য বহু বিশিষ্ট চিত্রগৃহে

বিদেশী ছবির খবর

ফেদারিকো ফেল্লিনি আবার ফিরে আসছেন প্রায় আড়াই বছর বাদে চিত্র-পরিচালনার ক্ষেত্রে। ছবিটা এডগার এলেন পো'র একটি ছোটগল্প অবলম্বনে রচিত, নাম—'থ্রি স্টেপস্ ইন ডেলিরিয়াম'। ঠিক ছিল আগে উনি 'দি মাস্ত্রোজ জার্নি' ছবিটা আগে করবেন, তা আর হোল না। 'থ্রি স্টেপস্' করেও এ-ছবিতে হাত দিতে পারবেন কিনা স্থিরতা নেই। কারণ, পারু-নিগ্রিফির একটা গল্প নিয়ে তাঁর ছবি করবার ইচ্ছা বহুদিনের।

পিয়ের পাওলো পাসোলিনী তাঁর নতুন ছবি 'থিওরেম' ছবির কাজের শুরুতেই বলেছেন যে, তাঁর এ ছবির মূল বিষয় হোল বর্তমান যুগের এক খ্যাতনামা ব্যবসায়ীর গৃহে ভগবানের আকস্মিক আবির্ভাব। মিলান ও নিউয়র্কের লোকেশনে ছবির কাজ হবে। পাসোলিনি সম্প্রতি যাজক [illegible] জীবনী অবলম্বনে ছবি করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

জেমস বণ্ড জাতীয় ছবিতে [illegible] কি সহজে অবলীলাক্রমে ছবির নামে [illegible] চালিয়ে যাচ্ছেন, [illegible] নেই তাঁদের মনে। লুইগি কোমেন [illegible] এখন যে ছবিটা তুলছেন, [illegible] যদিও 'ইতালীয়ান সিক্রেট সার্ভিস' [illegible] বণ্ড ফিল্মের সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্র [illegible]। পরিচালক [illegible] এগেনস্ট ভায়োলেন্স, [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] এখন সম্পাদকের টেবিলে, [illegible] আর পর্দায় ৭০ মিমিতে [illegible] ডিলাক্স কলার ফিল্মটার বিভিন্ন চরিত্রে আছেন জুল এণ্ড্রুস, রিচার্ড ক্রেনা, মাইকেল [illegible] ও ড্যানিয়েল ম্যাসি। পরিচালক [illegible] ওয়াইজ ও নায়িকা জুলি এণ্ড্রুস [illegible] এ-ছবির অন্যতম আকর্ষণ [illegible] সংগীত-পরিচালক লেনি হেটন-এর পরিচালনায় ষোলখানি গান।

লণ্ডনস্থিত বাঙালী চিত্র-পরিবেশক বাচ্চু সেন নর্ম্যান ওয়ারেন-এর পরিচালনায় প্রথম যে-ছবিটা প্রযোজনা করছেন, তার নাম 'হার প্রাইভেট হেল', সাদা-কালোয় তোলা এ-ছবি জনৈকা মডেলের জীবন-বৃত্তান্তের কাহিনী। ছবির নায়ক-নায়িকা চরিত্রে আছেন ইতালীর চিত্রাভিনেত্রী লুসিয়া মোদনো, ফরাসী অভিনেতা ড্যানিয়েল এলিয়েন ও ব্রিটিশ মঞ্চাভিনেতা জেরী ফেকস্টন।

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে ধীরেন্দ্রলাল ঘোষ :

বিগত কুড়ি ও তিরিশ দশকে কলকাতা ও শহরতলীর যেখানেই কোনো বিচিত্রানুষ্ঠানের (ভ্যারাইটি এনটারটেনমেন্ট-এর) আয়োজন করা হত, সেখানে কণ্ঠ-সংগীত যন্ত্রসংগীত এবং আবৃত্তির সংগে আর একটি প্রমোদসূচী থাকত। তার নাম ছিল হাস্যকৌতুক (কমিক স্কিট)। বাংলা হাস্য-কৌতুকের রাজা ছিলেন চিত্তরঞ্জন গোস্বামী এবং ইংরাজীর ছিলেন ফানি-ম্যান। কিন্তু রাজা ছাড়াও যে-সব মন্ত্রী, উপমন্ত্রী সে যুগে আসর জমাতেন, তার মধ্যে পরলোকগত ইম্প্রেসারিও হরেন্দ্রলাল ঘোষের মধ্যম ভ্রাতা ধীরেন্দ্রলাল ঘোষ অন্যতম। কোনোরকম সাজপোজের আশ্রয় না নিয়েও ধীরেন্দ্রলাল মাত্র বাচনভঙ্গিমার সাহায্যে শ্রোতৃবৃন্দকে যে আশ্চর্য ভাবে হাসির তোড়ে লুটোপুটি খাওয়াতেন তার তুলনা নেই। তিনি অগ্রজের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ইম্প্রেসারিওর কাজও করেছিলেন সাফল্যের সঙ্গে। এ ছাড়া অধুনালুপ্ত বিখ্যাত মঞ্চ ও চলচ্চিত্র সাপ্তাহিক নাচঘর"-এর প্রকাশক হিসেবেও তিনি বহুদিন কাজ করেছিলেন। সম্প্রতি ১৫ই ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার, বেলা সাড়ে দশটার সময়ে

আপনার প্রিয় মাসিক পত্রিকা

নবকল্লোল

পরবর্তী ফাল্গুন সংখ্যায় লিখছেন
২টি উপন্যাস • রাজকুমার মৈত্র
॥ পরেশ ভট্টাচার্য
২টি বড় গল্প • নারায়ণ গাঙ্গুলী
॥ রবি সেনগুপ্ত
২টি নাটক • ইন্দ্রনাথ উপাধ্যায়
॥ শক্তিপ্রসাদ রায় বর্মা
১টি মনোজ্ঞ অনুবাদ গল্প • বরুণ সেন ॥
১টি রহস্য বড় গল্প • লিপিকার ॥
অগ্নিযুগের এক ঐতিহাসিক অধ্যায় নিয়ে লিখেছেন বিপ্লবী নায়ক :
ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায় ॥
বিভীষণের নামের আড়ালে খ্যাতনামা এক সাহিত্যিক লিখবেন নিয়মিতভাবে রম্য-রচনা ॥ চিরজিবের অলিন্দে নারক ॥ সমর বানার্জির মনের আয়নায় ॥ ডাঃ সান্যালের চেম্বার থেকে ॥ চিত্রস্থান ॥ প্রশ্ন উত্তর ॥ ছবির গানের স্বরলিপি ॥ কমলেশ মিত্রের আইন আদালত ॥ মণ্ড-জগৎ ॥ অশোক রায়ের বিদেশী রচনা ॥

বিজ্ঞাপনদাতা ও এজেন্টগণ যোগাযোগ করুন : ক্যালকাটা ম্যাগাজিনস্, ১।২সি কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ॥
ফোন : ৩৪-৯০৮০



ডাক্তারের আস্থিতম রসায়ন

চ্যবনপ্রাশ

আয়ুর্বেদোক্ত বিশুদ্ধ উপাদানে প্রস্তুত
চ্যবনপ্রাশ নূতন ও পুরাতন সর্দি কাশি, যক্ষ্মা ও শ্বাসযন্ত্রের পীড়ায় বিশেষ উপকারী।
টনিক হিসাবে নিয়মিত ব্যবহারে দেহের দৌর্বল্য ও রুগ্নতা দূর করে ও শরীরের পুষ্টি সাধন করিয়া স্বাস্থ্যশ্রীর পুনরুদ্ধার করে।



বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা - বোম্বাই - কানপুর

দীর্ঘদিন রোগভোগের পর ধীরেন্দ্রলাল পরলোকগমন করেছেন। আমরা তাঁর শোক-সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করছি এবং তাঁর পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি।

দুটি মনোজ্ঞ প্রামাণ্য চিত্র

প্রামাণ্য চিত্র নির্মাণে শ্রীবিভূতি রায় নবাগত নন, তবু নতুন ছবিদুটিও ('আপাহি সব কুছ' ও 'খতরা তেরে পিছে') তাঁর পূর্বসুনাম অনুযায়ী নতুনত্বের স্বাদ বহন করে। খনির শ্রমিকদের নিরাপত্তার দিকে দৃষ্টি রেখেই ছবিদুটির বিষয়বস্তুকে রাখা হয়েছে এবং সম্ভবত ভাষ্য ও সংলাপও তাই হিন্দীতে। প্রথম ছবিতে দুই বিপরীত চরিত্রের শ্রমিকের জীবনযাত্রা ও ফলস্বরূপ তাদের মানসিক উন্নতি অবনতির সংগে আকস্মিক দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে মানুষের ভাগ্যের বিপর্যয়কে চিত্রায়িত করা হয়েছে। দ্বিতীয়টিতে প্রথমটি অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত নাট্য ও অতিনাটকীয় রসের প্রাধান্য, তবে সেটা বরং অশিক্ষিত খনি-শ্রমিকদের শিক্ষাদানের ব্যাপারে অতিপ্রয়োজনীয়। ফ্লাশব্যাক পদ্ধতিতে জনৈক শ্রমিকের অসাবধানতা ও সময়ানুবর্তী না হওয়ায় তার ফলস্বরূপ তাকে কিভাবে একটি পা হারিয়ে ভিখারী সাজতে হোল তারই কাহিনী।

ছবিদুটি যদিও প্রামাণ্য চিত্র, তবে দেখতে বসে কিন্তু কাহিনীচিত্রেরই স্বাদ পাওয়া গেছে। টি ভি ফিল্মের দিকে দৃষ্টি রেখেই ছবিদুটো সম্পূর্ণ আগাগোড়া ষোল মিমি-তে তোলা হয়েছে এবং সে-ব্যাপারে টেকনিক্যাল দিকে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হলেও ক্যামেরার কাজে শ্রীঅঞ্জন গুপ্ত যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সম্পাদনা (রমেশ যোশী) ও অন্যান্য বিভাগের কাজ যথাযথ। সংগীতের ব্যবহার সুখশ্রাব্য (মৃণাল চক্রবর্তীর পরিচালনায়)। ভারত সরকারের খনি সুরক্ষা সংস্থার প্রযোজনায় শ্রীবিভূতি রায়ের এ-ছবিদুটি শুধুমাত্র খনি-শ্রমিকদের কেন, সাধারণের কাছেও আকর্ষণীয় হবে।

ইস্ট ক্যালকাটা সিনে ক্লাব

ইস্ট ক্যালকাটা সিনে ক্লাব ১৮ই ও ২৫ ফেব্রুয়ারী সকাল দশটায় ইন্টালী টকীজ ও প্রতাপ মেমোরিয়াল হলে যথাক্রমে দুটি চেক চিত্র (১) দি ট্র্যাপ, ও (২) রোমিও জুলিয়েট এ্যাণ্ড ডার্কনেস কেবলমাত্র সদস্যদের জন্য প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেছেন।

সায়ান্স ফিকশ্যান সিনে ক্লাব

আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারী রবিবার সকালে প্রাচী সিনেমায় "স্ট্যানলী কুব্রিক" পরিচালিত 'ডক্টর স্ট্রেঞ্জলাভ' ছবিটি দেখানো হবে।

'ডক্টর স্ট্রেঞ্জলাভ' যুদ্ধোবিজ্ঞান কাহিনীর মজাদার ছবি। উন্মাদ রোগগ্রস্ত এক বিমান-সেনাধ্যক্ষ নির্দেশ দিলেন রাশিয়ায় হাইড্রোজেন বোমাবর্ষণের...সে নির্দেশ যান্ত্রিক নির্দেশ, কিছুতেই কেউ রোধ করতে পারে না। এমনকি আমেরিকার প্রেসিডেন্টও বোমা বোঝাই বিমানগুলোকে ফিরিয়ে আনতে না পেরে রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর সংগে সহযোগিতা করতে বাধ্য হলেন পৃথিবীকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে।

গত রবিবার ১১ ফেব্রুয়ারী মেট্রো সিনেমায় 'ফারেনহাইট-৪৫১' ফিল্মের প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত চলচ্চিত্র সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে যে কয়েকটি অশিষ্ট মন্তব্য জনৈক সদস্যের মুখে শোনা গিয়েছিল, আশাকরি যাতে তার পুনরাবৃত্তি না ঘটে, সে বিষয়ে ক্লাব কর্তৃপক্ষ সজাগ থাকবেন।

কোন্নগর, বিবেকানন্দ ক্লাব 'যুগসারথি'

স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব থেকে তিরোধান জীবনকাহিনীকে কেন্দ্র করে রচিত শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর যুগসারথি সুযোগপযোগী নাটক অভিনয় করে ক্লাব সদস্যগণ যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করেন। নাটকটি পরিচালনা করেন নাট্যকার স্বয়ং। বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রায় কয়েক সহস্র দর্শক সমক্ষে দীর্ঘ সাতঘণ্টাব্যাপী নাটকের এই প্রথম অভিনয়। প্রতিটি দৃশ্যই দর্শকমন জয় করে। এই দীর্ঘ নাটকে কোথাও দর্শকবৃন্দ অসঙ্গতি মনে করেননি।

আজকের দিনে বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ, কেশব সেন, গিরিশ ঘোষের বক্তব্যসমূহ জনসমক্ষে তুলে ধরার যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন নাট্যকার। স্বামীজীর চিন্তা আজ ভারতচিন্তা হোক নাটকের মধ্যে বার বার এ বক্তব্য প্রকট হয়ে উঠেছে। প্রশংসনীয় অভিনয় করেন (রামকৃষ্ণ) অমিয় গঙ্গোপাধ্যায়, (বিলে) বিদ্যা মুখার্জি (বিবেকানন্দ) প্রদ্যোৎশঙ্কর দাশগুপ্ত, (গিরিশ) অনুপ কানুনগো, (নিরঞ্জনানন্দ) সুখেন্দু চৌধুরী, (ভুবনেশ্বরী) সেবা দাস (নিবেদিতা) বাণী লাহা (বাউল) রাখাল কুণ্ডু (আলোয়ার মহারাজ) দীপক দত্ত।

আবহসংগীত, আলোকসম্পাত, মঞ্চ-পরিচালনা, খুবই প্রশংসনীয়। নাট্যনির্দেশনায় শ্রীচক্রবর্তী মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন—প্রথম দৃশ্যটি মনে রাখবার মত। কাহিনীর গতির সাথে অভিনয়ের সুরটি যেন একই সুরে বাঁধা। যার ফলে নাটকীয় সংঘাত ও নাট্যছন্দগুলি উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। দলগত অভিনয় এই নাট্যগোষ্ঠীর সম্পদ।

ব্যাঙ্গালোরে সি-এল-টি :

প্রাক্-বিদ্যালয় শিক্ষা সমিতির নিমন্ত্রণে শিশু রঙমহলের একটি দল ব্যাঙ্গালোরে অনুষ্ঠান করবার জন্যে আমন্ত্রিত হন। ২৭ ও ২৮এ জানুয়ারী রবীন্দ্র কলাক্ষেত্রে সি-এল-টির তিনটি বিশেষ অনুষ্ঠান হয়। লাল নূপুর, জিজো, বুড়ো আংলা, আনন্দ ও লালচে বুড়ো ব্যাঙ্গালোরের সুধী মহলকে এক নতুন জগতে নিয়ে গিয়েছিল। "এমনটি কখনো দেখিনি" এই কথাই তাঁরা বারংবার বলেছেন। প্রেক্ষাগৃহে তিলধারণের স্থান ছিল না।

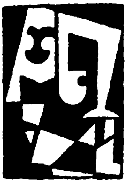
২৬ ও ২৫ তারিখে শিশু রঙমহলকে এক বৈকালিক চা-পানে নিমন্ত্রণ করেন যথাক্রমে জুনিয়ার চেম্বার ও মহীশূর সরকার। ৮০ জনের এই দলটিকে [illegible] হিসেবও নিয়ে যাওয়া হয়। মহীশূর [illegible] আন্দোলনের জন্য বৃন্দাবন উদ্যান [illegible] সম্ভব হয়নি। ব্যাঙ্গালোরের স্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রীমতী রাধা বসু, [illegible] টাকার (Tucker) শ্রীগুপ্ত, শ্রী[illegible] পালিয়া ইত্যাদি সমাজসেবীরা [illegible] রঙমহলের গ্রুপটিকে নিজেদের পরমাত্মীয়ের মত যত্ন করেছিলেন।

শিবরাত্রিতে সারা রাত ধরে যাত্রা গান

শিবরাত্রি উপলক্ষে ২৬শে ফেব্রুয়ারী রাত ৯টা থেকে পূর্ণশ্রী প্রেক্ষাগৃহে সারা রাত ধরে যাত্রাভিনয়ের আয়োজন হয়েছে। এ বছরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যাত্রা দল নব রঞ্জন অপেরা দুটি নতুন পালা 'মাইকেল মধুসূদন' (অসাধারণ জীবননাট্যের [illegible]) অভিনয় আসবে এবং 'দেবীগর্ভ' অভিনয় করবেন। ওই সংগে অতিরিক্ত আকর্ষণ থাকছে ক্যালকাটা মেরী মেকার্স কর্তৃক রংগরসেভরা পিকলু নিয়োগীর পরিচালনায় নৃত্যগীতবহুল নাটক 'ঝুমুর'।

মেঘে ঢাকা তারা

আগামী বুধবার, ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৮ সাল, সন্ধ্যা ছয় ঘটিকায় এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক (শ্যামবাজার) কালচারাল এসোসিয়েশনের সভ্যবৃন্দ কর্তৃক স্টার রঙ্গমঞ্চে শ্রীশক্তিপদ রাজগুরুর 'মেঘে ঢাকা তারা' অভিনীত হবে। নাটকটি পরিচালনা করবেন বড়বাজার শাখার কর্মী শ্রীঅজিতকুমার চট্টোপাধ্যায় ও সভাপতির আসন গ্রহণ করবেন ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান শ্রী কে এম নাঞ্জাপ্পা।



৩রা মার্চ থেকে প্রতি রবিবার ৩টে ও ৬॥টায়

রবীন্দ্র সরোবর (লেক) মঞ্চে

বাদল সরকারের

কবি কাহিনী

অভিনয়ে : অশোক চট্টোঃ, বিজয়া সরকার, বাদল সরকার, রণজিৎ সরকার, সুকল্প পাল, পুতুল সরকার, পঙ্কজ মুন্সী, মনোজিৎ লাহিড়ী ও শোভন চট্টোপাধ্যায়।

টিকিট ২ থেকে ৭

হলে প্রতি রবিবার সকাল ৯॥টা থেকে, এবং "মধুবন্তী"তে (৮৬এ রাঃ বিঃ এ্যাভি) পাবেন।

নির্দেশনায়—বাদল সরকার

প্রযোজনায়—শতাব্দী

জ্যান্ত টেবল টেনিস

অজয় বসু

ইডেনের আচ্ছাদিত ক্রীড়াঙ্গনে ভারত-জাপান তৃতীয় টেবল টেনিস টেস্ট খেলা দেখতে দেখতে কতোবার মনে মনে আফশোষে ফুঁসিয়ে উঠেছি, আমাদের খেলোয়াড়েরা জিমনাসিয়ামে বা অ্যাথলেটিক ট্র্যাকের আনাচে কানাচে সময় না কাটিয়ে আন্তর্জাতিক আসরে হাজির হওয়ার স্বপ্ন দেখেন কেন?

খোলা মাঠ আর জিমনাসিয়ামের ধার ঘেঁষতে কেউ কি তাদের বারণ করেছে? তাঁদের বাড়ীর হাতায় দরকারী জিমন্যাসিয়ামটি গড়ে দিতে বা উপযুক্ত ট্র্যাক বিছিয়ে রাখতে হয়তো কেউ এগিয়ে আসেন নি। কিন্তু তাঁদের হাতের কাছে ব্যায়ামাগার বা খোলা মাঠ আদৌ নেই, এমনও তো নয়। অন্যেরা প্রশস্ত ব্যবস্থাপনা দরাজ হাতে ছড়িয়ে না দিতে পারেন। কিন্তু তাই বলে তাঁরা কেন জিমনাসিয়ামের সন্ধানে ফিরবেন না, বা ট্র্যাকমুখী হবেন না?

কথাটা টেবিল টেনিস খেলোয়াড়দের উদ্দেশে বল্লেও ব্যাপক অর্থে এটি অনেক ভারতীয় ক্রীড়াবিদের সম্পর্কেই খাটে। দেশের নামী নামী ব্যাডমিন্টন, টেনিস খেলোয়াড়, ক্রিকেটারদের দেখে প্রথম দর্শনেই মনে হয়েছে যে ব্যায়াম আর অ্যাথলেটিক চর্চার সঙ্গে তাঁরা চিরদিন আড়ি পাতিয়ে চলেছেন। ফলে তাঁদের শারীরিক সঙ্গতির অনেকখানিই ভেজাল-মিশ্রিত। ব্যাট, র‍্যাকেট ধরে হাত ছোড়ার চেষ্টা করছেন বটে কিন্তু সে চেষ্টা যেন প্রাণহীন পুতুলের পক্ষে সজীব হয়ে ওঠার মতো। নির্জীব ভাব আর কিছুই নয়, শক্তি বাঁচিয়ে রেখে [illegible]।

চোখের সামনে এমন একটি করুণ দৃশ্য দেখতে কারই বা ভাল লাগে! দেখার দুর্ভাগ্য কি ছাই বিক্ষিপ্ত। একেবারে নিত্যকার ব্যাপার। যেহেতু আমাদের দেশে আজকাল আন্তর্জাতিক খেলাধুলোর হিড়িক পড়ে গিয়েছে। কিন্তু চোখের সামনেকার ছবিটিকে বদলে দেবার কোনো চেষ্টা করা হচ্ছে না। ছবিটির ওপরে যোগ্যতা, দক্ষতার রং পড়বে কবে? এই-সব খেলোয়াড়দের এবং যাঁরা এগিয়ে আসছেন তাঁদের যদি ধরে বেঁধে এখুনিই জিমনাসিয়াম আর অ্যাথলেটিক ট্র্যাকে না পাঠানো হয় তাহলে সেই সুদিন আমাদের জাতীয় ক্রীড়াজীবনে কোনোদিনই আসবে না। আমাদের টেবল টেনিসেরই নয়, অন্য অনেক খেলারই বর্তমান নেই। ভবিষ্যতও অন্ধকার।

বর্তমান নেই? পাল্টা প্রশ্ন তুলে হয়তো কেউ কেউ কাদের খোদাইজির দিকে আঙুল বাড়াতে চাইবেন। হয়তো জোর গলায় শুনিয়েও দেবেন, জানেন, খোদাইজি বিশ্ব টেবল টেনিসের বিগত অনুষ্ঠানে মোট চব্বিশটি ম্যাচ খেলে বাইশটিতে জিতেছিলেন? তা জিতেছিলেন, সত্যি। কিন্তু তিনি খেলেছিলেন কাদের সঙ্গে? বেশির ভাগই অনুন্নত মানের প্রতিযোগী। তাঁরা দেশের কেউ-কেটা হলেও আন্তর্জাতিক মানের কোনো শরিকই নন। যেমন খোদাইজি নিজের একজন। তিনিও স্বদেশের সেরা। অথচ জাপানীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সামনে কেউ নন। কিছু নন। যে খোদাইজি বিশ্ব প্রতিযোগিতার বিগত অনুষ্ঠানে চব্বিশটির মধ্যে বাইশটি খেলায় জিতেছিলেন, সেই খোদাইজি জাপ-ভারত টেস্টে এযাবৎ যে কটি ম্যাচ খেলেছেন তার সব কটিতেই হেরেছেন। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের বিগত অনুষ্ঠানে খোদাইজির ভূমিকার কথা যাঁরা জোর গলায় বলে বেড়ান, তাঁরা এই জাপ-ভারত টেবল টেনিস টেস্টের ফলাফল অতো সহজে ভুলে যান কেন?

হার এবং হার। তিন তিনটি টেস্টেই পরাজয়। বিশ্ব শ্রেষ্ঠদের ক্রমপর্যায় তালিকায় যেসব জাপানী খেলোয়াড় স্বীকৃত তাঁরা কেউ সফরকারী জাপ দলের পক্ষে ভারতে আসেন নি। তবু তিনটি টেস্টেই ভারতকে সরাসরি ৫-০ ম্যাচের ব্যবধানে হারাতে জাপানীদের বেগ পেতে হয়নি। ভারত ও জাপানের ক্রীড়া মানে কতো তফাৎ!

দুপক্ষে এই ব্যবধানের নানা কারণ থাকলেও মূল কারণ, খেলোয়াড়ে খেলোয়াড়ে শারীরিক সঙ্গতির ফারাক। অ্যাথলেটিক চর্চার সঙ্গে ভারতীয় টেবল টেনিস খেলোয়াড়দের সম্পর্ক নেই বলেই তাঁদের শারীরিক সক্ষমতা বাড়েনি। তাই শরীরকে না ছুটিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই অন্ধ র‍্যাকেটটিকে এলোপাতাড়ি ছুঁড়েই তাঁরা মতলব হাসিলের একমাত্র পথ বলে মনে করেন। আর জাপানীরা?

যতো না খেলেন তার চেয়ে বেশি শরীরকে ছোটান। টেবলের এপাশ ওপাশ ছুটছেন তো ছুটছেনই। লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে এগোতে পেছোতে এতোটুকু কুণ্ঠা নেই। মানুষ তো নন, যেন মেশিন! অলক্ষ্যে বোতাম টেপার সঙ্গে সঙ্গেই স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রগুলির কাজ সুরু হয়ে যায়। যতো সময় বাড়ে ততোই বেশি করে যেন প্রাণের উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ে। এই অফুরাণ প্রাণশক্তির পরিচয় তাঁদের আক্রমণাত্মক মেজাজে, তাঁদের ক্ষিপ্র গতিতে। তাঁদের তৎপরতায়।

টেবল টেনিস যেকালে ছিল সৌখিন পিং-পং, সেকাল অনেকদিন অতিক্রান্ত। এখানকার টেবল টেনিস শুধু কর্মীদেরই কর্মকাণ্ডের পরিচয়। আর কর্মের উৎসই তো শরীরের সঙ্গতি। জাপানীরা তাই প্রথমেই শরীরকে মনোমত করে গড়েছেন। তারপর প্রথা-প্রকরণে রপ্ত হতে উচ্চতর পাঠ নিয়েছেন। উচ্চতর পাঠ নিতে ভারতীয়দের আগ্রহ কম নয়। সেই আগ্রহেই হয়তো তাঁরা বছর বছর বিদেশ যাচ্ছেন। কিন্তু শরীরকে মজবুত করে তোলায় যে গোড়ার কাজ রয়ে গিয়েছে সেই কাজে তাঁদের হাত পড়ছে না। গাড়ীর আগে ঘোড়া না জুতে, ঘোড়ার সামনে গাড়ীটিকে জুতে দিলে কি মুস্কিল আসান হয়? হয় না। তাই এতো সফর ও এতো অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও ভারতীয় টেবল টেনিসের ভাগ্য আজও ফেরেনি।

আমাদের দেশের খেলাধুলোর নিম্নমুখী মানের প্রসঙ্গে বিভিন্ন মহল থেকে প্রায়ই বলা হয়ে থাকে যে, সুযোগ সুবিধের অভাব, প্রশিক্ষণে অব্যবস্থা ইত্যাদিই হলো কারণ। কথাটা অসত্য নয়। কিন্তু এইটিই যে একমাত্র কারণ তাও নয়।

সুযোগ সুবিধের অভাবে আর প্রশিক্ষণে অব্যবস্থার জন্যে নীচের মহলই বেশি ভুগছে। নীচের দিকে যারা রয়েছে তাদের এগিয়ে আসার পথ প্রশস্ত হচ্ছে না। কিন্তু যাঁরা ইতিমধ্যেই সামনের দিকে এসে পড়েছেন তাঁরা যে কোনো সুযোগ সুবিধে পাচ্ছেন না, একথা ভাবলে ভুল করা হবে। তাঁরা সুযোগ পাচ্ছেন। বছর বছর বিদেশে যাচ্ছেন। দেশী বিদেশী আসরে বড় বড় খেলোয়াড়দের খেলা দেখছেন, তাঁদের সঙ্গে খেলছেনও। অন্তত আগের অনুপাতে এখনকার প্রথম সারির খেলোয়াড়েরা অনেক বেশি সুযোগ পাচ্ছেন। কিন্তু এই সুযোগ সুবিধে পাওয়া সত্ত্বেও শীর্ষপর্যায়ের ভারতীয় খেলোয়াড়েরা কি সুযোগ সুবিধার যথার্থ সদ্ব্যবহার করতে পারছেন? পারছেন না। পারার কোন চেষ্টাই নেই বুঝি!

ধরা যাক, মন্টি মার্চেন্ট আর মীর কাশিম আলির ওই ইডেন উদ্যানের ভূমিকার কথা। জাপানীদের সঙ্গে খেলতে নামলেন ও'রা। মার্চেন্ট বা মীর কাশিম আলি সেদিন জিতবেন এমন প্রত্যাশা কারুরই ছিল না। তবু আশা করেছিলাম যে ও'রা দুজনে লড়াই বাধাবার জন্যে চেষ্টা করবেন। কিন্তু চেষ্টার বহর দেখে চক্ষু স্থির হয়ে গেল!

দুজনেই কোর্টে দেখা দিলেন, দরাজ মেজাজে পয়েন্ট ওড়ালেন এবং তারপর পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলেন। যেন স্রেফ নিয়ম রক্ষার জন্যেই ও'দের আবির্ভাব। মন দিয়ে খেলা, যুদ্ধ করে প্রতি-

প্রতিদ্বন্দ্বীদের ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা, প্রাণপাত পরিশ্রম করে পয়েন্ট ছিনিয়ে নেওয়ার প্রয়াস, কোনো কিছুরই লক্ষণ তাঁদের আচরণে স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারেনি। অথচ চেষ্টা থাকলে এবং বুদ্ধিতে টান না পড়লে মণ্টি মার্চেণ্ট অন্ততঃ সেদিন আরও কিছু পয়েন্ট পেতে পারতেন বা সত্যিকারের উপভোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়তে পারতেন। কারণ, দু-একবার তিনি বিনা নোটিশে ব্যাকহ্যাণ্ড ফ্লিকে প্রতিদ্বন্দ্বিদের অবাক করে দিয়েছিলেন।

জাপানী প্রতিদ্বন্দ্বীরা মার্চেণ্টের দক্ষতার ওপর এতোটুকু শ্রদ্ধা না রেখেই অনেকবার আলগা ভাবে বল তুলে মার্চেণ্টকে ব্যাকহ্যাণ্ড চালাবার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু সে সব সুযোগ সদ্ব্যবহারে মার্চেণ্টের মন কোথায়? খেলতে হয় তাই যেন তিনি কোর্টে নেমেছিলেন। মীর কাশিম আলিও অবিকল তাই। পারা না পারা স্বতন্ত্র কথা, চেষ্টায় ও পরিশ্রমে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার সর্বাত্মক পণে তিনিও উজ্জীবিত হতে পারেন নি।

দেখে মনে হলো যে মনের দিক থেকে তাঁরা রীতিমতো আলগা। প্রতিযোগিতার আসরে এসে যাঁরা মনের এমন শিথিল ভাব বজায় রাখতে চান তাঁদের দিয়ে কোনো সমস্যারই সমাধান হবে না, তা তাঁদের জন্যে যতোই কেন না সুযোগ সুবিধে ছড়িয়ে রাখা হোক্।

সেদিক থেকে অনেক সিরিয়াস কাযুকু খোদাইজি। তাই তিনি অন্ততঃ একটি ক্ষেত্রে নজরে পড়ার মতো প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়তে পেরেছিলেন। কলকাতায় খোদাইজির সেরা খেলা সিগেও ইতোর বিরুদ্ধে। দুজনেই দু দেশের জাতীয় চ্যাম্পিয়ান। ইতো রাশ আলগা করেননি। তবুও খোদাইজির পক্ষে একটি গেম ছিনিয়ে নেওয়া সম্ভবপর হয়েছিল। খোদাইজি তিন নম্বরী জাপানী তোকুয়াস নিসির কাছ থেকেও একটি গেম পেয়েছিলেন, কিন্তু সেটি একেবারেই কাঁকতালে তাঁর পক্ষে এসে যায়। কারণ ১৭-৯ পয়েন্টে এগিয়ে থাকার পর নিসি গ্যালারির দিকে চোখ রেখে হঠাৎ আলগা হাতে ঠুনকো, চটকদার মার মারার বিলাসিতাকে মাথায় তুলে নেন। আর সেই ফাঁকেই খোদাইজি গুটি গুটি পায়ে এগোতে থাকেন। খোদাইজির পয়েন্ট যখন চোদ্দ আর নিসির কুড়ি তখনও নিসির মাথায় পোকাটি নড়ে-চড়ে তাঁকে নিরর্থক বাহারি খেলা খেলার জন্যে তাগিদ জানাচ্ছিল। নিসি সেই ডাকে সাড়া দিতেই দ্বিতীয় গেমটি তাঁর বেহাত হয়ে যায়।

এই গেম পাওয়াতে নয়, সিগেও ইতোর কাছ থেকে একটি গেম ছিনিয়ে নেওয়াতেই খোদাইজির যতো বাহাদুরী। যে দেশে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের বাস সে দেশের পয়লা নম্বর খেলোয়াড় যে কি বস্তু চোখে না দেখেও তা আন্দাজ করা যেতে পারে। তাই ওই মুহূর্তে খোদাইজিকে যাঁরা দেখেননি তাঁরাও দূর থেকে খোদাইজির তারিফে অসংকোচে তালি বাজাতে পারেন। তবে ওই খোদাইজিই হলেন ভারতীয় টেবল টেনিসের প্রথম সারির খেলোয়াড় গোষ্ঠীতে সবেধন নীলমণি! অবশিষ্টরা যদি মনের দিক থেকে এখুনিই আঁটোসাটো হয়ে মেহনতে গা ঢালতে না চান, তাহলে বর্তমানে তো নয়ই, ভবিষ্যতের কোনো স্বপ্নের আশায়ও ওঁদের দিকে আমাদের না তাকানোই ভাল।

আধুনিক কালে যে কোনো প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়াভূমিতে হালকা মন আর আলগা কাঠামোর ক্রীড়াবিদ বেমানান। চাহিদা শুধু শক্ত সমর্থ, রীতিমতো মজবুত চরিত্রদেরই। দরকার সামগ্রিক কাঠিন্যের। সেই প্রয়োজনীয় বস্তুটির সন্ধানেই আমার সুপারিশ এই যে, যেসব ভারতীয়দের বিদেশে পাঠানো হবে বা বিদেশীদের সামনে দাঁড় করানো হবে তাঁদের যেন অনেক আগেই জিমনাসিয়ামে বা অ্যাথলিট ট্র্যাকে খাটতে পাঠানো হয়। তাঁদের মুখের ওপর বলা হোক, পাশপোর্ট চাও তো মেহনত করো।

জাপানীরা খেটেছেন, আজও খাটছেন। তাই তাঁরা থাকতে মাঝকোর্টে উজ্জ্বল প্রাণবন্যায় ভাঁটা পড়ে না। এমন জ্যান্ত ভূমিকা শুধু কার্যকরই নয়, নয়নাভিরাম। খাটতে খাটতে তাঁরা শারীরিক সঙ্গতি এমন বাড়িয়েছেন যে মার মারবার সময় অসহজ পথে পা মেলেও কাজের কাজ গুছিয়ে নিতেও তাঁদের আটকায় না। নজীরটি তাক লাগালো এবং মস্তো চিন্তার খোরাক। দৃষ্টান্তটিকে কিঞ্চিৎ খুঁটিয়ে দেখা যাক্।

শেকহ্যাণ্ড নয়, জাপানীরা অনেকটা পেন-হোল্ডার গ্রিপে খেলেন। কলম ধরে লেখার রীতি অনুসরণ করেই তাঁরা র‍্যাকেটটি ধরেন। ধরা তো নয়, যেন বজ্রআঁটুনি! খেলা চলতে থাকার সময় মুঠি শিথিল করে বাঁধন বা গ্রিপ বদলে নেওয়া যায় না। কাজেই ব্যাকহ্যাণ্ডে সট মারা ওঁদের পক্ষে সম্ভবও নয়। অথচ ব্যাকহ্যাণ্ডে বল আসে নিত্য নিয়মিত; কি করে সামাল দেন? সামাল দেন ব্যাকহ্যাণ্ডকে ফোরহ্যাণ্ডে সাজিয়ে নিয়ে।

ব্যাকহ্যাণ্ডকে ফোরহ্যাণ্ড বানাতে চোখের পলকে শরীরটিকে এক ধারে, টেবল ছেড়ে আরও দূরে টেনে নিয়ে যেতে হয়। তার জন্যে যে পরিমাণ তৎপরতা, ক্ষিপ্রকারিতা ও গতির প্রয়োজন তা ওঁরা ছুটে, খেটেই জোগাড় করে নিয়েছেন। শেকহ্যাণ্ড গ্রিপে খেলতে বাড়তি মূলধন জোগাড়ে অস্বাভাবিক পরিশ্রম হয়তো করতেই হোতো না। কিন্তু বাড়তি মেহনত ওঁরা হাসিমুখেই মেনে নিয়েছেন। ওঁদের দেখাদেখি চীন, উত্তর কোরিয়া এবং প্রাচ্যের আরও কটি দেশ।

এই শারীরিক সঙ্গতিই যে মূল মূলধন সে কথা জাপান ও প্রাচ্যের আরও কটি দেশ জানে। তাই র‍্যাকেটের একপাশ থেকে স্পঞ্জ, রাবার ইত্যাদি ছেঁটে ফেলে দিতে তাঁদের কুণ্ঠা জাগেনি। ওগুলো ওঁদের কোনো কাজেই আসে না। র‍্যাকেটের একটি পিঠ তাঁরা ব্যবহারই করেন না। তাই তাঁদের সব মারের প্রয়োগই ফোরহ্যাণ্ডে। হাতের র‍্যাকেটের অকেজো পিঠটিকে দেখলেই বোঝা যায় যে, অসহজ পথ পরিক্রমায় র‍্যাকেটধারীরা আগে থেকেই বাড়তি পরিশ্রম করতে প্রস্তুত। আর সেই প্রস্তুতি একদিনের নয়। প্রস্তুত হবার পথে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে ওঁরা মাসের পর মাস, বছরের পর বছরও কাটিয়ে দিয়েছেন।

একালের ক্রীড়া মহলে এই কথাটি বহুল প্রচারিত ও প্রচলিত যে, পরিশ্রমের কোনো বিকল্প নেই। আমাদের খেলোয়াড়েরা কবে সেই পরিচিত বাক্যের মূল্য ধরে দিতে এগোবেন? ওঁরা যদি সাবেকী র‍্যাকেট ছেড়ে একপিঠ অকেজো র‍্যাকেট হাতে তুলে নেন তাহলে বোধ হয় অবস্থার চাপে পড়ে, ব্যাকহ্যাণ্ডকে ফোরহ্যাণ্ড বানাতে নড়াচড়া, ছুটোছুটি করতে বাধ্য হবেন। তাই প্রশ্ন, জাপানী-চীনা র‍্যাকেট কি আমাদের টেবল টেনিসের ব্যাধি উপশমে বড় দাওয়াই?

ভিক্টর বার্ণা একদিন বলেছিলেন যে চীনা-জাপানীরা কেন পেনহোল্ডার গ্রিপে র‍্যাকেট ধরে সহজ পথটি অসহজ করে তুলছেন জানি না। শেকহ্যাণ্ড গ্রিপে র‍্যাকেট ধরলে কি তাঁরা সহজেই আরও ভাল খেলতে পারবেন না? হয়তো পারবেন। কিন্তু তা করলে হয়তো চীনা জাপানীরা এতোটা খাটার কোনো তাগিদ অনুভব করতে পারতেন না। তাঁরা ইচ্ছে করেই কঠিনতর পন্থা নেছে নিজেদের ফাঁকি দিতে চাননি। তাই নিজেরাও ফাঁকিতে পড়েননি। তাঁরা যে এক আদর্শ তাতে কোনো সন্দেহই নেই।

তাঁরা কেউ ফুলদানীর ফুল নন। শুধু শোভাবর্ধন করতেই তাঁরা কোর্টে নামেন না। তাঁরা সব জীবন্ত চরিত্র। প্রাণের উষ্ণ আমেজেই পারিপার্শ্বিকে ভরিয়ে তোলাই তাঁদের লক্ষ্য। কে অস্বীকার করবে যে তাঁরা এই লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেননি?

খেলাধূলা

দর্শক

ইংল্যাণ্ড বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

দ্বিতীয় টেস্ট খেলা

ইংল্যান্ড ঃ ৩৭৬ রান (কলিন কাউড্রে ১০১, জন এডরিচ ৯৬ এবং কেন ব্যারিংটন ৬৩ রান। হল ৬৩ রানে ৪ এবং হলফোর্ড ৭১ রানে ৩ উইকেট)

ও ৬৮ রান (৮ উইকেটে। গ্রেভনী ২১ রান। সোবার্স ৩৩ রানে ৩ এবং গিবস ১১ রানে ৩ উইকেট)

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ঃ ১৪৩ রান (ক্লাইভ লয়েড নট আউট ৩৪ রান। জন স্নো ৪৯ রানে ৭ এবং জেফ জোন্স ৩৯ রানে ২ উইকেট)।

ও ৩৯১ রান (৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। গারফিল্ড সোবার্স নট আউট ১১৩ এবং সেমুর নার্স ৭৩ রান। জোন্স ৯০ রানে ৩, ডি' ওলিভিয়েরা ৫১ রানে ২ এবং ব্রাউন ৬৫ রানে ২ উইকেট)

কিংস্টনের (জামাইকা) সাবিনা পার্কে অনুষ্ঠিত ইংল্যান্ড বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের ১৯৬৮ সালের টেস্ট সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট খেলাটিও প্রথমটির মত অমীমাংসিত থেকে গেছে। পোর্ট অব স্পেনের প্রথম টেস্ট খেলার মতই কিংস্টনের দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় অধিনায়ক গারফিল্ড সোবার্সের চিত্তাকর্ষক এবং দৃঢ়তাপূর্ণ খেলার দরুণই ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল শেষ-পর্যন্ত পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। অথচ এই দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম চারদিনের খেলায় ইংল্যান্ড বিশেষ প্রাধান্য বিস্তার করেও তা বজায় রাখতে পারেনি, বরং খেলার পঞ্চম দিনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ তাদের দ্বিতীয় ইনিংসে খেলার মোড় এমনভাবে ঘুরিয়ে দেয় যে শেষপর্যন্ত ইংল্যান্ডকেই পরাজয়ের মুখে দাঁড়াতে হয়। পঞ্চম দিনের ৮০ মিনিট এবং ষষ্ঠ দিনের ৭৫ মিনিটের খেলার ঘটনাপ্রবাহ বিচার করলে নিঃসন্দেহে বলা চলে, ইংল্যান্ড এ যাত্রা পরাজয়ের হাত থেকে খুব জোর রক্ষা পেয়েছে। আর সকলেই একবাক্যে স্বীকার করবেন—ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের অধিনায়ক গারফিল্ড সোবার্সের অনবদ্য খেলা। আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে ব্যক্তিগত কীর্তাকীর্তির স্বীকৃতিতে সমগ্র এই দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচটি 'সোবার্সের খেলা' নামে বিশেষ স্থান পাবে। টেস্ট ক্রিকেট খেলায় বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের অধিনায়ক গারফিল্ড সোবার্স আজ দলের পক্ষে 'একাই একশো'। তাছাড়া তিনি বিশ্ব টেস্ট ক্রিকেট খেলার আসরে সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'অল রাউণ্ডার'।

ইংল্যান্ড টেস্ট ক্রিকেট দলের অধিনায়ক কলিন কাউড্রে টসে জয়ী হয়ে প্রথম ব্যাট করার দান নেন। প্রথম দিনের খেলায় ইংল্যান্ডের দুটো উইকেট পড়ে ২২২ রান উঠেছিল। খেলায় অপরাজিত ছিলেন কাউড্রে (৬৯ রান) এবং ব্যারিংটন (২৪ রান)। ওপনিং ব্যাটসম্যান জন এডরিচ মাত্র চার রানের জন্যে তাঁর সেঞ্চুরী করতে পারেন নি।

খেলার দ্বিতীয় দিনে ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস ৩৭৬ রানের মাথায় শেষ হয়। অধিনায়ক কাউড্রে ১০১ রান করেন—টেস্ট ক্রিকেটে তাঁর এই ঊনবিংশ সেঞ্চুরী। ৩য় উইকেটের জুটিতে ব্যারিংটন এবং কাউড্রে দলের ১০১ রান তুলে দেন। দ্বিতীয় দিনের খেলার বাকি সময়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দুটো উইকেট খুইয়ে মাত্র ২৭ রান সংগ্রহ করেছিল।

খেলার তৃতীয় দিনে ১৪৩ রানের মাথায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের প্রথম ইনিংসের যবনিকাপাত হয়। টেস্ট ক্রিকেটে বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ান ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের ব্যাটিংয়ের কি শোচনীয় ব্যর্থতা! ইংল্যান্ডের জন স্নো তাঁর বোলিংয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের এই কাহিল অবস্থা দাঁড় করান। তিনি মাত্র ৪৯ রানের বিনিময়ে ৭টা উইকেট পান—স্নোর টেস্ট ক্রিকেট-খেলোয়াড় জীবনের শ্রেষ্ঠ সাফল্য। ক্লাইভ লয়েডের নট আউট ৩৪ রানই ছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের প্রথম ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড। ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে বেসিল বুচার এবং লয়েড দলের অতি মূল্যবান ৪০ রান সংগ্রহ করেছিলেন। অপর কোন উইকেটের জুটিতে এত রান ওঠেনি।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল প্রথম ইনিংসের খেলায় ইংল্যান্ডের থেকে ২৩৩ রানের পিছনে পড়ে 'ফলো-অন' করে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নেমে কোন উইকেট না-খুইয়ে ৮১ রান করে। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের এই নিয়ে উপর্যুপরি তৃতীয় 'ফলো-অন'—১৯৬৬ সালের টেস্ট সিরিজের ৫ম টেস্ট এবং চলতি ১৯৬৮ সালের টেস্ট সিরিজের ১ম ও ২য় টেস্ট খেলায়।

চতুর্থ দিনে এক শ্রেণীর দর্শকদের মাঠে অনুপ্রবেশ, বোতল নিক্ষেপ এবং প্রচণ্ড বিক্ষোভ প্রদর্শনের ফলে পুরো সময় খেলা হয়নি, ৮০ মিনিট খেলা বন্ধ ছিল। দুই দলের অধিনায়ক—কলিন কাউড্রে এবং গারফিল্ড সোবার্স বেড়ার ধারে ক্ষুব্ধ দর্শকদের শান্ত করতে ছুটে যান। বেসিল বুচারের আউট নিয়েই এই গোলমাল। অধিনায়ক সোবার্স চিৎকার করে দর্শকদের কাছে ঘোষণা করেন 'বেসিল বুচার আইন সঙ্গতভাবেই আউট হয়েছেন'। কিন্তু দর্শকরা তাঁর কথাতেও কর্ণপাত করেননি। লাঞ্চের সময় ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের রান ছিল ৩ উইকেট পড়ে ১৭৩। দলের ২০৪ রানের মাথায় উইকেটরক্ষক জিম পার্কস ঝাঁপিয়ে পড়ে বুচারের যে ক্যাচ ধরেন তা আম্পায়ার 'আউটের' নির্দেশ দেন। আম্পায়ারের এই সিদ্ধান্তে সারা মাঠ ফেটে পড়ে। খেলা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের এক দল গোঁড়া সমর্থক মাঠে নেমে পড়ে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ রীতি অনুযায়ী মাঠে বোতল-বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়। অপরদিকে ক্ষিপ্ত দর্শকদের ঠাণ্ডা করতে পুলিশের বন্দুকের নল থেকে 'টিয়ার গ্যাসের সেল' ছুটতে থাকে। তৎক্ষণে খেলোয়াড়রা আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে প্যাভিলিয়নে আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁরা ৮০ মিনিট পর পুনরায় মাঠে খেলাতে নামেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের ২৫৮ রানের (৫ উইকেটে) মাথায় অভিশপ্ত চতুর্থ দিনের খেলা শেষ হয়। প্রথম টেস্টের ত্রাণকর্তা অধিনায়ক সোবার্স ৪৮ রান করে নট-আউট থাকেন। তাঁর ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটি হলফোর্ডের রান ছিল ১৪। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের হাতে জমা ছিল আর ৫টি উইকেট। চতুর্থ দিনের খেলার শেষেও ইংল্যান্ডের প্রাধান্য বজায় ছিল।

চতুর্থ দিনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের অধিনায়ক গ্যারফিল্ড সোবার্স যেন 'বেড়ালের প্রাণ' হাতে নিয়ে খেলতে নেমেছিলেন। নিজের মাত্র ৭ রানের মাথায় সোবার্স একবার আউট থেকে খুব বেঁচে যান। সেকেণ্ড স্লিপে তাঁর বল (যেটা ক্যাচ ছিল না) গ্রেভনীর আঙুলে প্রচণ্ড কামড় দিয়ে সোজা বাউন্ডারী সীমানায় ছুটে যায়। ব্রাউনের পরের বলটাই সোবার্স সোজা ডি' ওলিভিয়েরার হাতে তুলে দেন; কিন্তু বিস্ময়ের কথা ওলিভিয়েরা এই সহজ ক্যাচটা হাতে ধরে রাখতে পারেননি, বলটা মাটিতে ফেলে দেন। এই দারুণ ফাঁড়া কাটিয়ে সোবার্স তাঁর আসল মূর্তি ধরে ৪৮ রান করে অপরাজিত থাকেন।

পঞ্চম দিনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল পূর্ব-দিনের ২৫৮ রানের (৫ উইকেটে) পুঁজি নিয়ে খেলতে নেমেছিল। আর কোন উইকেট না-পড়ে লাঞ্চের সময় তাদের রান দাঁড়ায় ৩১৪ (৫ উইকেটে)। শেষ পর্যন্ত দলের ৩৯১ রানের (৯ উইকেটে) মাথায় অধিনায়ক সোবার্স দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে দেন—তাঁর এই সিদ্ধান্ত খুবই খেলোয়াড়োচিত মনোভাবের পরিচয় দেয়। বস্তুতঃ কি, সোবার্সের দৃঢ়তাপূর্ণ খেলার জন্যেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল এযাত্রা পরাজয় থেকে উদ্ধার পায়। সোবার্স তাঁর ঐতিহাসিক ৩৬৫ মিনিটের খেলায় যে নট-আউট ১১৩ রান করেন তার মধ্যে ছিল ১৪টা বাউণ্ডারী এবং একটা ওভার-বাউন্ডারী। তাছাড়া তিনি ডেভিড হলফোর্ডের সহযোগিতায় ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে দলের ১১০ রান তুলেছিলেন। ইংল্যান্ডের অধিনায়ক কলিন কাউড্রের সর্বপ্রকার আক্রমণাত্মক কৌশল ব্যর্থ করে দিয়ে সোবার্স যে দৃঢ়তার পরিচয়ে সেঞ্চুরী রান সংগ্রহ করেন তার স্মৃতি দর্শকদের চিরকাল স্মরণে থাকবে। শুধু ব্যাটিংয়েই নয়, বোলিংয়েও তিনি ঐতিহাসিক কৃতিত্বের পরিচয় দেন। ইংল্যান্ড যখন দ্বিতীয় ইনিংসের দান হাতে পায় তখন খেলার সময় ছিল ১৫৫ মিনিট এবং খেলায় ইংল্যান্ডের জয়লাভের জন্যে ১৫৯ রান করার প্রয়োজন ছিল। ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায়

সূচনাতেই বল করতে নামেন অধিনায়ক সোবার্স। দলের অত্যন্ত দুর্যোগ সময়ে দীর্ঘ ৩৬৫ মিনিট ব্যাট করে এবার তিনি ব্যাট ছেড়ে বল দিতে নেমেছেন। ব্যাট ও প্যাড ছাড়ার জন্যে মাঝে যা মাত্র ২০ মিনিট বিশ্রামের সময় হাতে পান। মাঠের দর্শকেরা বিরাট প্রত্যাশা নিয়ে সোবার্সের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন—তিনি যে বর্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ 'অল-রাউন্ডার'। নট আউট ১১৩ রান করে ব্যাটিংয়ে তিনি তার প্রমাণ দিয়েছেন এবার বোলিং বাকি। সোবার্স তাঁর দলের সমর্থকদের নিরাশ করেননি। তাঁর ইনিংসের প্রারম্ভিক ওভারেই সোবার্স মাত্র তিনটি বল দিয়ে বয়কট এবং ইংল্যান্ডের অধিনায়ক কাউড্রের উইকেট পান—ইংল্যান্ডের রানের ঘরের অবস্থা তখন 'ভাঁড়ে মা ভবানী' অর্থাৎ শূন্য। সোবার্সের এই মারাত্মক বোলিংয়ে ইংল্যান্ডের জয়লাভের আশা নির্মূল হয়ে যায়। ইংল্যান্ড তাদের এই প্রারম্ভিক বিপর্যয় রুখতে পারেনি. ১৯ রানের মাথায় আরও দুটো উইকেট (৩য় ও ৪র্থ) পড়ে যায়। আলোর অভাবে খেলতে অসুবিধা হচ্ছে জানিয়ে টম গ্রেভনী যে আবেদন করেন তা মঞ্জুর হলে ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের ১৯ রানের (৪ উইকেটে) মাথায় ৫ম দিনের খেলা শেষ হয়। খেলার এই অবস্থায় ইংল্যান্ডের মাথায় জয়লাভের কোন চিন্তা ছিল না ; ৬ষ্ঠ দিনের ৭৫ মিনিটের খেলা পর্যন্ত ইংল্যান্ড যদি টিকে থাকে তাহলে তারা খুবই বর্তে যায়। অর্থাৎ কোন রকমে খেলাটা ড্র করা।

চতুর্থ দিনে হাঙ্গামার দরুণ খেলার যে ৭৫ মিনিট সময়টা নষ্ট হয়েছিল তা ফেলা যায়নি। ফলে নির্দিষ্ট পাঁচদিনের খেলাটা ৬ষ্ঠ দিন পর্যন্ত গড়িয়েছিল। ৬ষ্ঠ দিনের নির্দিষ্ট ৭৫ মিনিটের খেলাতে ইংল্যান্ডকে ইষ্টনাম জপ করতে হয়েছিল। এইদিনের খেলায় ইংল্যান্ডের আরও চারটে উইকেট পড়ে যায়। ৬৮ রানের (৮ উইকেটে) মাথায় যখন খেলা শেষ হয় তখন ইংল্যান্ডের হাতে জমা ছিল মাত্র দুটো উইকেট এবং জয়লাভের প্রয়োজনীয় ১৫৯ রানের থেকে ৯১ রান কম। ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের ৬৮ রানের মাথায় সোবার্সের বলে ইংল্যান্ডের ৮ম উইকেট (ডেভিড ব্রাউন) পড়ে যায়। সোবার্সের এই শেষ ওভারের একটা বল দিতে বাকি থাকলেও ইংল্যান্ডের এই ৬৮ রানের মাথাতেই খেলা শেষ হয়। বেসিল ডি' ওলিভিয়েরা তাঁর ১৩ রান করে অপরাজিত থেকে যান। এই ডি' ওলিভিয়েরাকেই তাঁর বাকি টেস্ট খেলোয়াড়-জীবনে ইংল্যান্ডের সমর্থকদের কাছে লজ্জায় মাথা নীচু করে থাকতে হবে। চতুর্থ দিনে সোবার্স তাঁর মাত্র ৭ রানের মাথায় ডি' ওলিভিয়েরার হাত থেকে ছাড়া পেয়ে শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় ইনিংসে ১১৩ রান করে অপরাজিত থাকেন। সোবার্সই ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের পরিত্রাতার প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন। সুতরাং ইংল্যান্ডের সমর্থকরা যদি অভিযোগ করেন, ডি' ওলিভিয়েরার এই অক্ষমতার দরুণই ইংল্যান্ড শেষ পর্যন্ত জয়লাভ থেকে বঞ্চিত হয়েছে তা হ'লে তা খুব অন্যায় বলা হবে না।

আলোচ্য দ্বিতীয় টেস্ট খেলার চতুর্থ দিনে মুষ্টিমেয় গোঁড়া দর্শকদের বিক্ষোভ প্রদর্শনে যে অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তার জন্য স্থানীয় সরকারপক্ষ থেকে ইংল্যান্ড দলের অধিনায়ক এবং খেলোয়াড়দের কাছে লিখিতভাবে দুঃখ প্রকাশ করে ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়। তাছাড়া স্যার লিয়ারী কনস্টানটাইন, কনরাড হান্ট প্রমুখ ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের বিশ্ববিশ্রুত প্রাক্তন টেস্ট খেলোয়াড়রা সমর্থকদের বিক্ষোভ প্রদর্শনের তীব্র নিন্দা করে বিবৃতি দান করেন।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ১৯৫৯-৬০ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষেই পোর্ট অব স্পেনের দ্বিতীয় টেস্ট খেলার তৃতীয় দিনে আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত নিয়েই বিরাট আকারের দাঙ্গা-হাঙ্গামা বেঁধেছিল। প্রায় ত্রিশ হাজার মারমুখী দর্শক দাঙ্গা-হাঙ্গামায় অংশ নিয়ে তৃতীয় দিনের খেলা বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

কলকাতার হকি মরসুম

কলকাতার হকি মরসুম সরকারীভাবে গত ৮ ফেব্রুয়ারী থেকে আরম্ভ হয়েছে। প্রথম বিভাগের হকি লীগ খেলা সুরু হয়েছে ১৩ ফেব্রুয়ারী। তবে এখনও খেলা মোটেই জমেনি। কারণ, জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান শেষ করে বাংলা দল কলকাতায় ফিরে এলে বি এন আর, মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, ইস্টার্ণ রেলওয়ে এবং কাস্টমসের খেলা লীগ তালিকায় স্থান পাবে। এইসব ক্লাবের খেলোয়াড় নিয়েই বাংলার হকি দল তৈরী হয়েছে।

গত তিন বছরের (১৯৬৫-৬৭) প্রথম বিভাগের হকি লীগ চ্যাম্পিয়ান বি এন আর, ১৯৬৭ সালের বেটন কাপ বিজয়ী ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান, প্রথম বিভাগের নতুন দল ইস্টার্ণ রেলওয়ে—এই চারটি দলের মধ্যে লীগ চ্যাম্পিয়ানশিপ নিয়ে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে বলে অনেকেরই ধারণা। কাগজে-কলমে মোহনবাগান ক্লাব খুবই শক্তিশালী। খ্যাতনামা গুরুবক্স সিং (এবছরের বাংলা দলের অধিনায়ক) এবং মুখাপ্পা তো আছেনই, সেই সঙ্গে নতুন দুই নামকরা খেলোয়াড়—ইনামুর রহমন এবং ভি পেস দলে যোগদান ক'রে যথেষ্ট শক্তি বৃদ্ধি করেছেন। তবে দলে নামকরা খেলোয়াড় আমদানী করে যে সব সময় লীগ চ্যাম্পিয়ান হওয়া যায় না তা বহুবার দেখা গেছে। তা দেখেও কলকাতার জনপ্রিয় নামী দলগুলি স্থানীয় খেলোয়াড়দের উপেক্ষা করে বাংলার বাইরে থেকে খেলোয়াড় আমদানীর নীতি ত্যাগ করতে পারেনি।



পরলোকে চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়

বেশ কিছুদিন রোগ ভোগের পর গত ৫ ফেব্রুয়ারী বাংলাদেশের প্রবীণ ক্রীড়া-সাংবাদিক ও সংগীত-সমালোচক শ্রীচণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায় পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর।

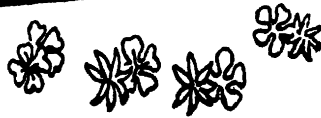
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত 'ফরওয়ার্ড' কাগজের রিপোর্টার হিসেবেই তিনি প্রথম সাংবাদিকতার কাজ করেন। সেটা বিশ দশকের মাঝামাঝি। এর পর কিছুদিন সারভেন্ট, ইংলিশম্যান ও লিবার্টিতে কাজ করে ১৯৩৬ সালে তিনি অমৃতবাজার পত্রিকায় যোগ দেন। ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত তিনি ঐ পত্রিকায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করেন। যুগান্তরের গোড়াপত্তনেও তিনি এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

বাঙলা ক্রীড়া সাংবাদিকতার অন্যতম পথিকৃৎ চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায় ফুটবল ও রাগবী খেলায় বেশ অনুরাগী ছিলেন। ১৯২৬-২৭ সালে বাঙালী রাগবী দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন তিনি। সেকালের ইউরোপীয় ক্রীড়ামহলে 'চাঁদু' হিসেবে পরিচিত চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়কে অনেকেই বলতেন, কলকাতার খেলাধুলোর 'জীবন্ত এনসাইক্লোপিডিয়া'। পশ্চিমবাংলার ক্রীড়া-সাংবাদিক সংঘের ছিলেন তিনি আজীবন সদস্য।

শুধু খেলাধুলোর জগতেই নয়, গান-বাজনার আসরেও এই দিলখোলা মানুষটি ছিলেন সকলের চণ্ডীদা। অমৃতবাজার পত্রিকায় নিয়মিতভাবে তিনি সংগীত-সমালোচনা করতেন। বাংলাদেশের প্রায় সব সংগীতশিল্পীর সঙ্গেই ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। জীবনের শেষদিকটায় সংগীতে তাঁর অনুরাগ অত্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠে।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

প্রতিদিন
প্রতিঘরে





লক্ষ্মী ঘি
সকলকে তৃপ্তি দেয়

লক্ষ্মী ঘিয়ে তৈরী
খাবার বেশ
সুস্বাদু ও হৃদ্য হয়

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের

বিচিত্র কাহিনী

(৪র্থ সংস্করণ)

নবীন ও প্রবীণদের সমান

আকর্ষণীয়

অজস্র চিত্র সম্বলিত

বিচিত্র গল্পগ্রন্থ। মূল্যঃ দুই টাকা

লেখকের

আর একখানা বই

আরও বিচিত্র কাহিনী

অসংখ্য ছবিতে পরিপূর্ণ

দাম ঃ তিন টাকা

প্রকাশক ঃ

এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স

প্রাইভেট লিমিটেড

সকল পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

গল্প পঞ্চাশৎ ২০·০০

রাহুল সাংকৃত্যায়নের

বিস্মৃত যাত্রী ৪·৫০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের

লাল মাটি ৫·০০

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের

ভাগ্য বলাকা ৬·০০

জিম করবেটের

টেম্পল টাইগার ৫·০০

কানাই পাকড়াশীর

নীলানালার বাঘ ৩·০০

দক্ষিণারঞ্জন বসুর

সাগর রাণীর দেশে ৪·০০

রায় মশাইয়ের

রক্ত শুধু রক্ত ৫·০০

শ্রীনিবাস ওঝার

ঐতিহাসিক খুনী ৩·০০

গোলাম কুদ্দুসের

বাঁদী ৬·৫০

সম্বোধন ৪·০০

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের

দ্বীপপুঞ্জ ৪·০০

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

রাণুর দ্বিতীয় ভাগ ৪·৫০

রাণুর তৃতীয় ভাগ ৪·৫০

সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলঙ্কডোর ৪·০০

গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

পিকলুর সেই ছোট্‌কা ২·৫০

জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়ের

এক কুমীর এক চোর ৩·০০

আশা দেবীর

রঙ বেরঙের ফুল ২·০০

মুকুন্দ পাবলিশার্স ॥ ৪৮ বিধান সরণী ॥ কলি—৪ ॥ ফোন ৫৫-০২৩৪

ফার্গো

গ্যাস ম্যান্টল্‌স্

FARGO

উজ্জলতর আলো

এবং দীর্ঘকাল ব্যবহারের জন্য

প্রস্তুতকারক:

ফার্গো ম্যান্টল্‌স্ প্রোডাক্টস

সর্ব্বোদয় ভূবন, ৩৮/১০ আদর্শ কলোনী

লিবার্টি গার্ডেনের নিকট, মালাড (পশ্চিম) বম্বে-৬৪ এন্.বি

৭ম বর্ষ ৪র্থ খণ্ড

অমৃত

৪৩শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday 1st March, 1968. শুক্রবার, ১৭ই ফাল্গুন, ১৩৭৪ 40 Paise

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীজয়ন্তকুমার বিশ্বাস

সাপ্তাহিক অমৃতের স্বত্বাধিকারিবৃন্দ এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্যের বিবরণ। প্রতি বৎসর ফেব্রুয়ারীর শেষ তারিখের পরবর্তী প্রথম সংখ্যায় ইহা প্রকাশিতব্য।

ফর্ম ৪
(রুল ৮ দ্রষ্টব্য)

১। প্রকাশনের স্থান—১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩।

২। প্রকাশনার সময়ক্রম—সাপ্তাহিক, প্রতি শুক্রবারে প্রকাশিতব্য।

৩। মুদ্রকের নাম—শ্রীসুপ্রিয় সরকার। নাগরিকত্ব ভারতীয়। ঠিকানা ১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩।

৪। প্রকাশকের নাম—শ্রীসুপ্রিয় সরকার। নাগরিকত্ব ভারতীয়। ঠিকানা ১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩।

৫। সম্পাদকের নাম—শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ। নাগরিকত্ব ভারতীয়। ঠিকানা ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩।

৬। যে সব ব্যক্তি পত্রিকাটির অংশীদার বা শতকরা এক অংশের বেশী শেয়ারের অধিকারী তাঁদের নাম ও ঠিকানা : সর্বশ্রী সুধীরচন্দ্র সরকার, ১৭১এ ল্যান্সডাউন রোড, কলিকাতা-২৬; প্রাণতোষ ঘটক, ১১১ বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা-৯; মুরারিবিলাস রায়-চৌধুরী, ৭৫ বনমালী নস্কর রোড, কলিকাতা-৩৪; মনোজ বসু, 'প'-৫৬০, লেক রোড, কলিকাতা-২৯; গজেন্দ্রকুমার মিত্র, কেয়ার অব মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২; সুমথনাথ ঘোষ, কেয়ার অব মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২; বিশু মুখোপাধ্যায়, ১২ডি রাজা কালীকিষণ লেন, কলিকাতা-৫; ভবানী মুখোপাধ্যায়, ১৬ অভয় বিদ্যালঙ্কার রোড, কলিকাতা-৩৪; তুলসীকান্তি দে বিশ্বাস, ৬, শিবশংকর মল্লিক লেন কলিকাতা-৪; অমৃতবাজার পত্রিকা প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩। তুষারকান্তি ঘোষ, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩; শচীবিলাস রায়-চৌধুরী, ৭৫, বনমালী নস্কর রোড, কলিকাতা-৩৪ ও প্রফুল্লকান্তি ঘোষ, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩।

আমি সুপ্রিয় সরকার এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান-বিশ্বাস অনুযায়ী সর্বৈব সত্য।
তাং ২৬-২-৬৮ স্বাঃ/ শ্রীসুপ্রিয় সরকার

পত্র • চিঠিপত্র • চিঠিপত্র • চিঠিপত্র • চিঠিপত্র • চিঠি

গানের জলসার চিঠির জবাব

গত সপ্তায় শ্রীমতী বাণী বোস-এর চিঠিখানা পড়লাম। তিনি যে 'গানের জলসায়' প্রকাশিত কানন দেবী পরিবেশিত 'জয়মালা' অনুষ্ঠানের আলোচনা মন দিয়ে পড়েছেন—এটা নিঃসন্দেহে আনন্দের। তবে আমাদের পরিবেশিত তথ্যের প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি বলেছেন, কানন দেবীই এই অনুষ্ঠানের পরিবেশিকা প্রথম মহিলা শিল্পী নন, ইতিপূর্বে রুমা গুহঠাকুরতাও এই অনুষ্ঠান যোগ্যতার সঙ্গেই পরিচালনা করেছেন।

এর উত্তরে আমাদের জ্ঞাতব্য তথ্য হোলো এই যে, এ তথ্য উক্ত বিভাগীয় ব্যবস্থাপিকা শ্রীমতী পুষ্প বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে পাওয়া। পত্রলেখিকার পত্রপাঠান্তে শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আরও বিশদ-ভাবে খবর নিয়ে জানা গেল, শ্রীমতী বোস কথিত রুমা দেবীর অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ ভিন্ন-গোত্রের। 'চিত্রশালা' শীর্ষক শিল্পীদের সঙ্গে পাঁচ মিনিট সাক্ষাৎকারের পূর্বপ্রচলিত একটি অনুষ্ঠানে কানন দেবী, রুমা দেবী এবং আরও অনেক শিল্পীকেই উপস্থিত করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানটি সে অনুষ্ঠান নয়। জওয়ানদের জন্য প্রচারিত 'জয়মালা' অনুষ্ঠানের পরিবেশনা বাংলা চিত্রজগতের প্রথম মহিলা-শিল্পী কানন দেবীর দ্বারাই সর্বপ্রথম শুরু হয়েছে। এ তথ্যে কোনো ভুল নেই।

চিত্রাঙ্গদা

অনুবাদ প্রসঙ্গ

'অমৃত'র গত ৯ই ফেব্রুয়ারীর সংখ্যায় শ্রীঅভয়ঙ্কর সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত ওয়েস্ট বেঙ্গল রাইটার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি কর্তৃক অনুবাদ সাহিত্য প্রকাশের পরিকল্পনা সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ আলো-চনা করেছেন। এর আগেও তিনি 'অমৃত'তে এ-সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে বহু তথ্যবহুল রচনা প্রকাশ করেছেন। বাংলা বই-এর অনুবাদের ব্যাপারে তাঁর ও 'অমৃত' সম্পাদকের সমর্থন বাংলা-সাহিত্য অনু-রাগীদের প্রশংসার দাবী রাখে। এর জন্যে তাঁরা বাঙালী মাত্রেরই ধন্যবাদার্হ।

এই নতুন লেখক সমবায় সংস্থার অন্যতম উদ্যোক্তা ও সম্পাদক হিসাবে আমি কয়েকটি বক্তব্য পেশ করতে চাই।

আমাদের দেশে এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁদের ধারণা অনুবাদ অতি সহজ কর্ম। স্কুলের পড়ায় ও বই-এর মাধ্যমে অনুবাদ করতে আমরা সকলেই ছেলে-বেলা থেকে শিখি বলে এবিষয়ে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা এই কাজটিকে কোনো গুরুত্ব দেন না। মূল্য ত নয়ই। কিন্তু এবিষয়ে যাঁরা অভিজ্ঞ, যাঁরা কোনো প্রকাশক, লেখক বা সাহিত্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত, তাঁরাই জানেন নির্ভরযোগ্য অনুবাদ কত কঠিন কাজ আর সে কাজের জন্যে যোগ্য লোকের কত অভাব এ-দেশে। যেমন তেমন করে লাইনের পর লাইন অনুবাদ করার কথা বলছি না। সত্যিকার অনুবাদ হচ্ছে লেখকের ভাব, ভাষা, তাঁর চিন্তা ও বক্তব্যের যথার্থ অনুবাদ। সে কাজটা তিনিই করতে পারেন, যাঁর দু'টি ভাষাতেই (মূল রচনার ভাষা এবং যে ভাষাতে অনুবাদ করা হবে) সমান দখল প্রয়োজন। লেখকের সাহিত্যসাধনা, তাঁর ধ্যান-ধারণার সঙ্গে, তাঁর চিন্তার গভীরতা সম্বন্ধে এবং সর্বো-পরি লেখকের জাতীয় বৈশিষ্ট্য, সেই দেশের আচার-রীতি-নীতি সমাজ-ব্যবস্থা সম্পর্কেও অনুবাদককে যথেষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন হতে হবে। নইলে সার্থক অনুবাদ সম্ভব নয়!

এই সম্পর্কে একটি ছোট্ট উদাহরণ দিই। শ্রদ্ধেয় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গণদেবতা' আজ ভারত-বিখ্যাত। 'ভারতীয় জ্ঞানপীঠ' পুরস্কারের জন্যে আজ এই বইটি সর্বভারতীয় সাহিত্যে একটি বিশেষ মর্যাদা পেয়েছে। অনেকে হয়তো জানেন না, একটি বিখ্যাত প্রকাশক সংস্থার পক্ষ থেকে 'গণদেবতা'র ইংরেজি অনু-বাদের ব্যবস্থা হয়েছে। যাঁরা এই বইটি পড়েছেন, তাঁরা বুঝতে পারবেন, অনুবাদে, বিশেষ ইংরেজি অনুবাদে এই বই-এর মর্ম প্রকাশ করা কত দুঃসাধ্য ব্যাপার! 'গণ-দেবতার' পটভূমিকে গভীরভাবে না জানলে এবং চরিত্রগুলির সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় না থাকলে শুধু বইটির আক্ষরিক অনুবাদে লেখকের প্রতি অবিচারই করা হত। সেজন্যে কাজটির ভার দেওয়া হ'য়েছে শ্রীমতী লীলা রায়কে। বাংলা ও ইংরেজিতে তিনি যেমন দক্ষ, তেমনি বীরভূমের ঐ পটভূমিকা, তার মানুষগুলিকেও তিনি গভীরভাবে চেনেন জানেন। সেজন্যেই ইংরেজিতে এই অনুবাদ সার্থক হয়েছে।

কাজেই অনুবাদের কাজে এক প্রান্তে আছেন লেখক, অন্য প্রান্তে অনুবাদক—কিন্তু মাঝখানে যে সেতুবন্ধ রয়েছে—সেই সেতুবন্ধটি লেখকের সঙ্গে অনুবাদকের আত্মিক যোগসূত্র। লেখকের বইটিই শুধু নয়, লেখকের সব কিছুকে জানতে হবে অনুবাদকের, নইলে এ-কাজে ব্যর্থতা আসবে। আর সেই কারণেই বাংলা থেকে ইংরেজিতে বা ইংরেজি থেকে বাংলায় যেসব অনুবাদ এপর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে, মাত্র হাতে গোনা কয়েকটি ক্ষেত্রে ছাড়া সবই নিরর্থক ও ব্যর্থ হয়েছে। অনুবাদ হয়েছে, আক্ষরিক, সাহিত্য হয়নি। তাই পাঠক বাংলা অনুবাদে কোনো বিখ্যাত ইংরেজি বা অন্য ভাষার বই পড়তে চায় না। রস পায় না বলেই।

অনুবাদ কর্মের যে সমস্ত সমস্যা আছে, সেগুলির আলোচনা এবং অনুবাদ সম্বন্ধে একটি বৈজ্ঞানিক অনুশীলন ও চর্চার জন্যে 'রাইটার্স গিল্ড'-এর উদ্যোগে সম্প্রতি কলকাতায় "'ট্র্যান্সলেটার্স ক্লাব" প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর মধ্যে আছেন বহু বিখ্যাত ভারতীয় ও বিদেশী ভাষা অভিজ্ঞ পুরুষ ও মহিলা ও অনুবাদকরা। আশা করা যায় এই 'ক্লাব' অনুবাদ-কর্ম সম্বন্ধে কিছু ভাল কাজ করতে সক্ষম হবে।

শেখর সেন
যুক্ত সম্পাদক, রাইটার্স গিল্ড
সেক্রেটারি, ওয়েস্ট বেঙ্গল
রাইটার্স কো-অপারেটিভ
সোসাইটি লিঃ।

ছোট্ট জিজ্ঞাসা

'অমৃতে' চিত্র সমালোচনা বিভাগে 'ছোট্ট জিজ্ঞাসা' ছবিটির সমালোচনা পড়ে চিত্রটি দেখতে গিয়েছিলাম, ছবিটি দেখে এসে আর একবার পড়লাম। 'ছোট্ট জিজ্ঞাসা'র কথা ছোট্ট কথায় বলতে গেলে বলতে হয়, ছোট্ট হলেও ছবিটি চমৎকার। আরও চমৎকার গীতা'র ভূমিকা। সংবেদন-শীল গীতা'র ভূমিকায় মাধবী মুখোপাধ্যায় ও বোম্বা'র ভূমিকায় শ্রীমান প্রসেনজিৎ-এর অভিনয় বহুদিন মনে থাকবে। 'কোন গানই কাহিনীর প্রয়োজন মিটিয়ে ছবিটি'র অগ্র-গতিকে সাহায্য করেনি,' কথাটা ঠিক হলেও ছবিটি পরিচ্ছন্ন বা স্বচ্ছ হতে কোথায় বাধে নি। বেধেছে 'বোম্বা'র টুইস্ট নৃত্য। দৃষ্টিকটু, বেদনাদায়ক ও হাস্যকর। ঐ অংশটি না যুক্ত করলে ভাল হতো। অথবা দেশাত্মবোধক কোন মিউজিকের সঙ্গে 'বোম্বা'র কণ্ঠ মেলাতে সাহায্য করলে ছবিটি নিশ্চিত অপূর্ব হতো। যেমন অপূর্ব হয়েছে নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও মহাত্মা গান্ধীর মূর্তি'র সঙ্গে বোম্বা'র পরিচয় করিয়ে দেওয়া।

দিলীপকুমার মিত্র,
সেবালয়, চব্বিশ পরগণা।

অমৃত

সম্পাদকীয়

সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন শাসন

এই প্রথম পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচিত সরকারের বদলে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হল। জরুরী অবস্থার জন্যই সংবিধানে এই ব্যবস্থা আছে। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে এমন একটা অনিশ্চিত আবহাওয়া বিরাজ করছিল যে, রাজ্যপালের পক্ষে এই ব্যবস্থা সুপারিশ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। সাংবিধানিক গণতন্ত্র জনগণের ইচ্ছা ও সহযোগিতার ওপর নির্ভর করে। সংবিধানের ওপর বিশ্বাস না রাখলে এক মুহূর্তও আর তা চলবে না। তখন শুরু হয় তার কুব্যাখ্যা, শুরু হয় ক্ষমতার অপব্যবহার। পশ্চিমবঙ্গে গত ক'মাস সুস্থভাবে শাসনকার্য চালানোই কঠিন হয়ে পড়েছিল। মন্ত্রীরা সর্বদাই শঙ্কিত থাকতেন কখন দলত্যাগ ঘটে এবং কখন তাঁদের বিদায় নিতে হয়। দুঃখের বিষয় বিধানসভার অধিবেশন হতেই পারল না এক শ্রেণীর সদস্যের বাধাদানের ফলে এবং স্পীকারের বিতর্কিত রুলিং-এর জট না খুলতে পারার জন্য।

রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তনের ফলে জনসাধারণের মন থেকে সেই অস্বস্তির ভাব কেটে গেছে। অন্তত এখন প্রতিদিন আইন অমান্য, প্রতিদিন ১৪৪ ধারার শাসন নাগরিকদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিপন্ন করবে না। শাসনভার প্রত্যক্ষভাবে হাতে নিয়েই রাজ্যপাল সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির আদেশ দিয়েছেন এবং সভাসমাবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। এতে বিরোধীপক্ষের বিক্ষোভ কমবে আশা করা যায়। বর্তমান রাজ্যপাল যখন পাঞ্জাবে ছিলেন তখন মজুতদার-কালোবাজারীদের তিনি শাস্তি দিয়েছিলেন খাদ্যশস্য নিয়ে মুনাফাবাজী করার জন্য। এখানেও তিনি হুঁসিয়ারী দিয়েছেন মজুতদারদের। খাদ্যসংকট নিয়েই পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে বেশী গোলমাল ঘটছে গত কয়েক বৎসর ধরে। খাদ্যসংগ্রহে ব্যর্থতার দরুণ চরম দুর্দশা ভোগ করতে হয়েছিল গত বৎসর এ রাজ্যের জনসাধারণকে। এবারেও সংগ্রহের পরিমাণ আশানুরূপ নয়। গত তিনমাস বিদায়ী কোয়ালিশন সরকার প্রতি মুহূর্তেই বসেছিলেন তোপের মুখে। তাঁদের পক্ষে নিশ্চিন্তে এবং কঠোরভাবে গ্রামাঞ্চল থেকে উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। রাজ্যপালকে এখন এই দায়িত্ব নিতে হবে।

রাজ্যপাল শক্ত লোক। রাজনীতিকরা অনেক সময় নানান চাপে পড়ে সৎ উদ্দেশ্য থাকা সত্ত্বেও তাকে কার্যে পরিণত করতে পারেন না। রাজ্যপালের পক্ষে সেদিক দিয়ে কাজ করার সুবিধা। তিনি ইতিমধ্যেই জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের নির্দেশ দিয়েছেন লেভির চাল আদায় করার জন্য। মজুতদার ও জোতদাররা এ নিয়ে কত টালবাহানাই না করেছে। দুটো মন্ত্রিসভা হিমসিম খেয়ে গেছে ন্যায্যমূল্যে উৎপাদকদের কাছ থেকে উদ্বৃত্ত চাল আদায় করতে। এবারে রাজ্যপালের কড়া হুকুম, দরকার হলে আটক আইন প্রয়োগ করে লেভির চাল আদায় ও মজুত উদ্ধার করতে হবে।

পশ্চিমবাংলার আরেক সমস্যা বেকারসংখ্যাবৃদ্ধি এবং কলকারখানায় অনিয়মিত উৎপাদন। যুক্তফ্রন্টের আমলে এবং তারও আগে থেকে অনেক কলকারখানা বন্ধ হয়ে আছে শিল্পে মন্দা এবং ঘেরাও নীতির জন্য। তার ফলে শিল্প-নির্ভর পশ্চিমবঙ্গে চরম সংকট দেখা দিয়েছে। বহু শ্রমিক বেকার, শিল্পের উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে। সমাজের অর্থনীতিতে তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে বাধ্য। আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যের যা আয় হয় তার চল্লিশ শতাংশ হয় পশ্চিমবঙ্গের শিল্প থেকে। সুতরাং ক্ষতিটা একা পশ্চিমবঙ্গের নয়, গোটা দেশের। রাজ্যপালকে এখন তাই জাতির স্বার্থে শিল্পপ্রচেষ্টা পুনরুজ্জীবনের জন্য সযত্ন দৃষ্টি দিতে হবে। কৃষি এবং শিল্প—এই দুইয়ের সমস্যা না মেটাতে পারলে পশ্চিমবঙ্গের সংকট কাটবে না। রাজ্যপাল তা জানেন বলেই প্রথমেই এই দুই দিকে নজর দিয়েছেন। এই কাজে আশা করি তিনি দেশের সুস্থবুদ্ধি মানুষের সমর্থন ও সহযোগিতা পাবেন।

এর পরে আসছে অন্তবর্তীকালীন নির্বাচনের কথা। রাষ্ট্রপতির শাসন চিরস্থায়ী নয়। কিন্তু অবস্থা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক না হলে তড়িঘড়ি নির্বাচন করলেই যে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে তা মনে করার কোনো কারণ নেই। কেরলে একবার অন্তবর্তীকালীন নির্বাচন করেও কোনো দলের পক্ষে মন্ত্রিসভা গঠন করা সম্ভব হয়নি। পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে পরস্পর খেওখেওয়ি দূর না হলে এবং সুস্থ প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব গড়ে না উঠলে হাজারটা দলের প্রতিনিধি নিয়ে কোনোদিনই স্থায়ী সরকার গঠন করা সম্ভব হবে না। সাধারণ মানুষ চায় পরিচ্ছন্ন রাজনৈতিক পরিবেশে সুস্থ গণতান্ত্রিক লড়াইয়ের মাধ্যমে সৎ ও স্থায়ী সরকার গঠন। রাষ্ট্রপতির শাসন যদি রাজনৈতিক দলগুলোর চৈতন্যোদয় করতে সমর্থ হয় তাহলেই এই পরীক্ষা সার্থক এবং কল্যাণকর হবে পশ্চিমবঙ্গবাসীদের কাছে।

ফ্যাশান প্যারেড







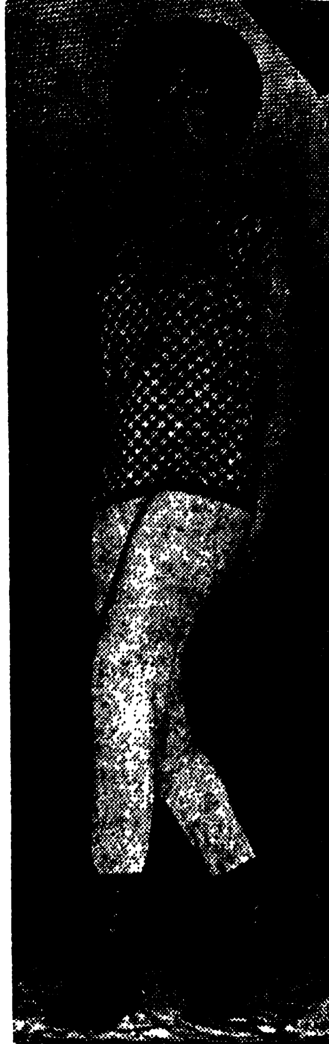
সবাই বলে, আমরা পুরোদস্তুর ফ্যাশানেবল। ফ্যাশানের জগতেই আমাদের বাস। তাই ফ্যাশানেবল হতে আমরা বাধ্য। চোখ মেলে, কান খাড়া করে সব সময় সজাগ থাকতে হয়। কখনো পা টিপে টিপে চলতে হয়, আবার কখনো জোর কদমে দৌড়দৌড় জুড়তে হয়। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গেলে এরকম করতেই হবে। আর না হলেই কানমলা খেয়ে বসে পড়তে হবে। স্বীকার করতে হবে আমি হেরে গেলাম, পারলাম না। কিন্তু বাঁচতে গেলে হার স্বীকার করলে চলবে না—বসে পড়লে অস্তিত্ব বজায় রাখা যাবে না। তাই যেমন চালাবে তেমনি চলতে হবে। এবং এই যেমন চালানো তেমনি চলাটাই হলো ফ্যাশান।

ভবতোষ সাহা

আধুনিক যুগই হলো ফ্যাশানের যুগ। চোখের নিমেষে নতুন ফ্যাশান পুরনো হয়—পুরনো ফ্যাশান রূপ বদল করে এসে আসর জাঁকিয়ে বসে। যতদিন উত্তেজনা থাকে ততদিন সবাই বেশ সে আগুনে হাত-পা সেঁকে নেয়। তারপর ঠান্ডা হয়ে এলেই পরমগতি। ঝোঁকটা আমাদের কোন দিকে সেটা ঠিক ঠিক ঠাউরে ওঠাই মুশকিল। এদিকে ফ্যাশানের জন্য চোখের ঘুমকে ছুটি দিয়ে বসে আছি, আর ওদিকে হুজুগে মত্ত হয়ে হয় নয় করে চলেছি। ফ্যাশানের চেয়ে হুজুগটাই বুঝি আজকের দিনের মুখ্য শিরোমণির জায়গা নিয়ে বসেছে। সেটা বেশ বোঝা যায়, যখন যেটা বাজারে আসে ভালোমন্দ বিচার না করে আমরা সেটা নিয়ে মত্ত হয়ে পড়ি। আসল কথা, ভালো-মন্দর বিচারের অবসরই পাই না। তারপর যখন দেখি জোয়ার নেমে যাচ্ছে, ভাটার টান

শুরু হয়েছে, তখন আমরাও হাত-পা গুটিয়ে বসি। ইতিমধ্যে বাজার চনচনে ফ্যাশানে বনবন ঘুরছে। অথচ কে যে এটা ফ্যাশান বলে মাথায় ঢোকালো আবার কখন নামিয়ে দিল সবই দুর্বোধ্য রয়ে গেল। এ যেন সেই শোনা কথাটার মতো, রামবাবু বললেন রামবাবু বাড়ি নেই। আমরা যেন নিজেদের মধ্যে থেকেও নেই। ভাববার অবকাশ পাচ্ছি না। সবাই যেদিকে ছুটছে আমরাও সেদিকে ছুটছি। আর মুখে বলি, যুগের সঙ্গে তাল রাখছি। অথচ তাল রাখতে গিয়ে যে নিজেরাই তাল কেটে বসে আছি সেটুকু বুঝতে পারি না—বুঝলেও কিছু করতে পারি না।

অথচ আগাগোড়া ফ্যাশান মানবেতিহাসের সঙ্গে অচ্ছেদ্য। ফ্যাশান বাদ দিয়ে ইতিহাস ভাবা যায় না। ছাল-বাকল পরার







পর থেকে ফ্যাশানের ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটে গেছে। যুগে যুগে দেশে দেশে গড়ে উঠেছে ফ্যাশান, নিজস্ব সংস্কৃতি এবং রুচির সমন্বয়ে। এক দেশের ফ্যাশান আরেক দেশের ঈর্ষার কারণ ঘটিয়েছে। ফ্যাশানে ফ্যাশানে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও কম হয়নি। প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে গিয়ে হাই হিল জুতোর আবিষ্কার। পুরনো কাসুন্দি বেশি ঘেঁটে লাভ নেই। তবু বলা অসঙ্গত নয় যে, ফ্যাশানের রাজ্যে আমাদের সবচেয়ে বড় দান শাড়ি—যার মহিমা কিনা বিশ শতকের শেষার্ধেও বিন্দুমাত্র হ্রাস পায়নি বরং বেড়েই চলেছে। তাছাড়া অতীতে আমাদের ফ্যাশানের ঐতিহ্য বহন করে বেড়িয়েছে অনেকে। পাশ্চাত্যের গাউন নারীমহলে সমাদর লাভ করেছে কিন্তু প্রাদুর্ভাব বিস্তার করতে পারেনি। আজ অবশ্য কোন দেশের নিজস্ব ফ্যাশান পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে। এই ফ্যাশানকে বলে, সেকেলে। ভারতে শাড়ী, জাপানে কিমোনো, আরবদের আঙরাখা নিজস্ব আজো সচল। কিন্তু কালের দুর্বার গতিতে এসব কি রূপ নেবে এখুনি তা বলা সম্ভব নয়। কারণ ফ্যাশানের কর্তৃত্ব আজ পুরোপুরি চলে গেছে পশ্চিমী দেশগুলির হাতে এবং তারাই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পোশাকের তথা ফ্যাশানের নিয়ামক।

এই কিছুদিন আগে স্লিভলেস, ব্যাকলেশ এবং টপলেশ ব্লাউজ নিয়ে দেশে তুমুল আলোড়ন হয়ে গেল। মিনি পোশাক নিয়ে দেশ-বিদেশে আবার তেমনি হৈচৈ। কিন্তু সবই বহবারম্ভে লঘুক্রিয়া। পোশাকগুলি বাজারে ঠিকই চলছে। এই হট্টগোলের মধ্যে একটা মজার ঘটনা ঘটে গেল ইংল্যান্ডে। রাজকুমারী মার্গারেট একটি সান্ধ্য অনুষ্ঠানে যোগদান করেছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রচলিত এক ফ্যাশানে। সেটা নিয়ে রাজকুমারীর বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ আনা হলো। অথচ সেই পোশাকের ঝুল ছিল পা পর্যন্ত। সুতরাং আজকের যুগে বল করে কেন ফ্যাশান বা পোশাকটা ঠিক অশ্লীলতার পর্যায়ে পড়ে এবং কোন পোশাক শ্লীলতার গণ্ডি মেনে চলে বলা বড় কঠিন। আজকের যদি অজন্তা বা ইলোরার গুহাগাত্রে ক্ষোদিত মূর্তিরা সেই ফ্যাশানে জীবন্ত হয়ে আমাদের মাঝে ঘুরে বেড়াতে শুরু করে তবে নিশ্চয়ই আমরা খুব লজ্জায় পড়ে

যাব। অথচ সে যুগে এই পোশাক চালু ছিল এবং যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল। না হলে রাজানুগৃহীত ভাস্কর এই পোশাকপরা নারীমূর্তি আঁকার প্রেরণা পেলেন কোথেকে? আমরা সভ্যতায় তখন অনেক দেশের গুরুর পদ অধিকার করেছিলাম। সেদিন যা সম্ভব হয়েছিল আজ সেটা সম্ভব নয়। এজন্য দায়ী কি রুচি? ইতিমধ্যে জগৎময় শিক্ষা বিস্তৃতি লাভ করেছে। রুচি নিশ্চয়ই পরিশীলিত হয়েছে। তাই যথাসম্ভব দেহের মর্যাদা রক্ষাকারী পোশাকই হবে আমাদের ফ্যাশান। আমরা নিশ্চয়ই আবার সেই ছাল-বাকল পরতে চাই না এবং গুহাজীবনও ফিরে পেতে চাই না। সুস্থ-সবল এবং রুচিবান হয়ে বেঁচে থাকতে চাই। মানবসভ্যতার তুঙ্গে উঠে এটাই আমাদের এখন একমাত্র প্রার্থনা হওয়া উচিত।

কয়েকটি দেশ আবার পোশাক-আশাক সম্বন্ধে কিছুটা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে। পোশাকে আধুনিক হওয়া যায় অথচ রুচি বজায় রাখা যায়, এদিকে তারা নজর দিয়েছে। আমাদের দেশে ব্যাকলেশ-শিলভলেশের দৌরাত্ম্য যা কিছুটা অনুভূত হয়েছে। অন্যসব তেমন খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারেনি। শাড়ি এখনো বহাল তবিয়তে নিজের একচ্ছত্র রাজত্ব চালিয়ে যাচ্ছে। তবে চলতি দুনিয়ার ফ্যাশানের দিকে নজর রেখে বলা যায় যে, নগ্নতার প্রকাশই আজকের ফ্যাশানের মূল কথা। অথচ ফ্যাশান হচ্ছে জাতীয় তথা অগ্রগতির একটি উল্লেখযোগ্য [illegible]। বাঁচতে হলে ফ্যাশান বজায় রাখতে হবেই। [illegible] কাজে ইতিমধ্যে রাশিয়া সবচেয়ে বেশি কৃতিত্ব দেখিয়েছে। অবশ্য রাশিয়ার [illegible] ঐতিহ্য খুবই পুরানো। তাকে স্বীকার করে নতুন রূপ দেওয়া নিশ্চয়ই কৃতিত্বের। তবে ফ্যাশান আবিষ্কার এবং [illegible] ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি কৃতিত্ব পশ্চিম জার্মানীর। ফ্যাশানের বাজারে এরা সব সময়ই একটা বড়ো বাতাস বইয়ে চলেছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কিছুটা ধীরস্থির



পদক্ষেপ বাঞ্ছনীয়। ফ্যাশান নিয়ে এত যে ঝামেলা সে কথা মনে রেখেই পশ্চিম জার্মানীর এদিকে চিন্তা করা উচিত। তবে এদের টুপির ফ্যাশান প্রশংসনীয়। আধুনিকাদের রুচিমাফিক টুপি তৈরি করার দিক থেকে কৃতিত্ব এদের অবশ্য স্বীকার্য আর সেই সংগে কয়েকটি ফ্যাশান—যার মধ্যে সত্যিকার শিল্পীমনের পরিচয় আছে।

কিন্তু সব মিলিয়ে আজকের ফ্যাশান কি দাঁড়াচ্ছে তা একসঙ্গে প্রত্যক্ষ করার ইচ্ছে ছিল দীর্ঘদিনের। না হলে আজকের বহু বিতর্কিত ফ্যাশানের পুরো চেহারাটা জানা হচ্ছিল না। সেই সঙ্গে আরো জানা প্রয়োজন ছিল ভারতীয় পটভূমিতে তা কি রূপ নিচ্ছে। মিনি পোশাকের পাশাপাশি শাড়ির বাহার খুলেছে না আরো ঝিমিয়ে পড়ছে কিনা জানার সুযোগ করে দিল জে. কে. হেলেন কার্টিস ও ফেমিনা আয়োজিত ফ্যাশান প্যারেড—ভারতীয় এবং পশ্চিমী ফ্যাশানের এক মনোজ্ঞ প্রদর্শনী।

ফ্যাশান প্যারেডের নাম ছিল স্প্রিং টু উইন্টার। পরিচালকের ঘোষণায় কান পাতলাম। হানিমুন স্পেশাল পোশাকে মডেলের উচ্চকিত পদচারণা এবং মৃদু বাজনার তালে পরিবেশ তখন গভীর আবেশ বিস্তার করেছে। হানিমুনে আঁটোসাটো পোশাকের সুন্দর বৈশিষ্ট্য—পুরোটাই ইউরোপীয়। মনে হলো হানিমুন ব্যাপারটাই তো পরদেশী। তারপর সুইম-স্যুট, প্লে-স্যুট চোখে বেশ কিছুটা মায়াঞ্জন পরিয়ে দিল। অনেক দেশে এ দুটি নিষ



বেশ কথা উঠেছে। বিতর্কিত এই ফ্যাশান দুটি দেখে অনেক না দেখার সাধ পূরণ হলো। মাঝে মাঝে আসে আবার শাড়ির প্রদর্শনী। হালফ্যাশানে শাড়ি কতটা সহযোগী হয়েছে অথবা আরো কি নতুন রূপ নিচ্ছে এই ফ্যাশান প্যারেড থেকে তা স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়। শাড়ির পাশাপাশি চুড়িদার কামিজও ভারতীয় ললনাদের অঙ্গাবাসে একটি বিশিষ্ট ভূমিকার অধিকারী—পাশাপাশি এই দুয়ের তুলনামূলক সৌন্দর্য মনকে টানে। এই কথা ভাবতে ভাবতেই মঞ্চে এসে হাজির হয়েছে স্ল্যাকস অ্যান্ড টপ অথবা ককটেল কোট-এ সজ্জিতা মডেল 'ইভনিং ড্রেস' সম্বন্ধে আমরা নিজেদের এখনো সম্পূর্ণ সচেতন করতে পারিনি। তাই নানাভাবে এর প্রদর্শনী চাচ্ছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে কি রকম একটু চাঁফ ধরেছিল। হঠাৎ চোখটা নড়েচড়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। পরিচালকের ঘোষণা এবং প্রোগ্রাম বইয়ের দিকে তখন নজর নেই। মিনি ড্রেস'-এর প্রদর্শনী ঠিক ধরতে পেরেছি। এরপর আবার মিনি ককটেল। শ্লীল-অশ্লীলের জন্য আমার অত মাথাব্যথা নেই আর সে রকম মনেও হলো না। আমি পোশাকে সৌন্দর্য দেখছিলাম কিন্তু মনে সেরকম সাড়া দিল না। ... রকম ... প্রদর্শনী ... বেশ ... রেনকোট মন্দ লাগেনি।

ওমর খৈয়াম-এ সেই ওড়না পরা মেয়ে হঠাৎ যেন কি এক আবেশ বয়ে আনে। মন চঞ্চল হয়ে ওঠে মদিরার অপরূপ আবেশে। ... -এ ... সৌন্দর্য ... এক অদ্ভুত ... পৌরালোকে ... এবং ... মনকে ... ধরে। ... যায় না। ... ইভনিং গাউন সত্যি সত্যি ... এবং প্রদর্শিত অনেক গাউনের মধ্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। সবচেয়ে মজা লাগলো ... -এর মডেলকে দেখে। চাঁদের অভিযান এখন নক্ষত্রে গিয়ে পৌঁছেছে তা আমরা জানতেও পারিনি, বিশেষ করে ফ্যাশানের ক্ষেত্রে। এক্ষেত্রে ফ্যাশানধারিণী শাড়ি পরিহিতা—নক্ষত্র অভিযানের তার দুর্জয় সাহসকে স্বাগত জানাই। হিপ্পি হপ-এ চুড়িদার কামিজ ফ্যাশানে নতুন সংযোজন ও ভাবনার খোরাক। তবে মনে মঞ্চে এবং সমস্ত আবেশ একসঙ্গে মনকে ঘিরে ধরে ব্রাইডাল ব্রাইডকে দেখার পর। চুড়িদার কামিজে লজ্জাবনতা ... রূপটি সত্যি ভোলবার নয়। আর মনে ... আর একটি প্রদর্শনী হচ্ছে সেই লাল ... এবং সোনালি জরির কাজ। গোল্ড ডাস্ট-এর সুন্দর শরীরে শাড়ির বাহার খুলেছিল অপূর্ব। উৎসবে প্রদর্শিত হয় শতাধিক ফ্যাশানের নমুনা। এসব ফ্যাশান ভারতীয় বস্ত্র ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের কাপড়ে প্রস্তুত।

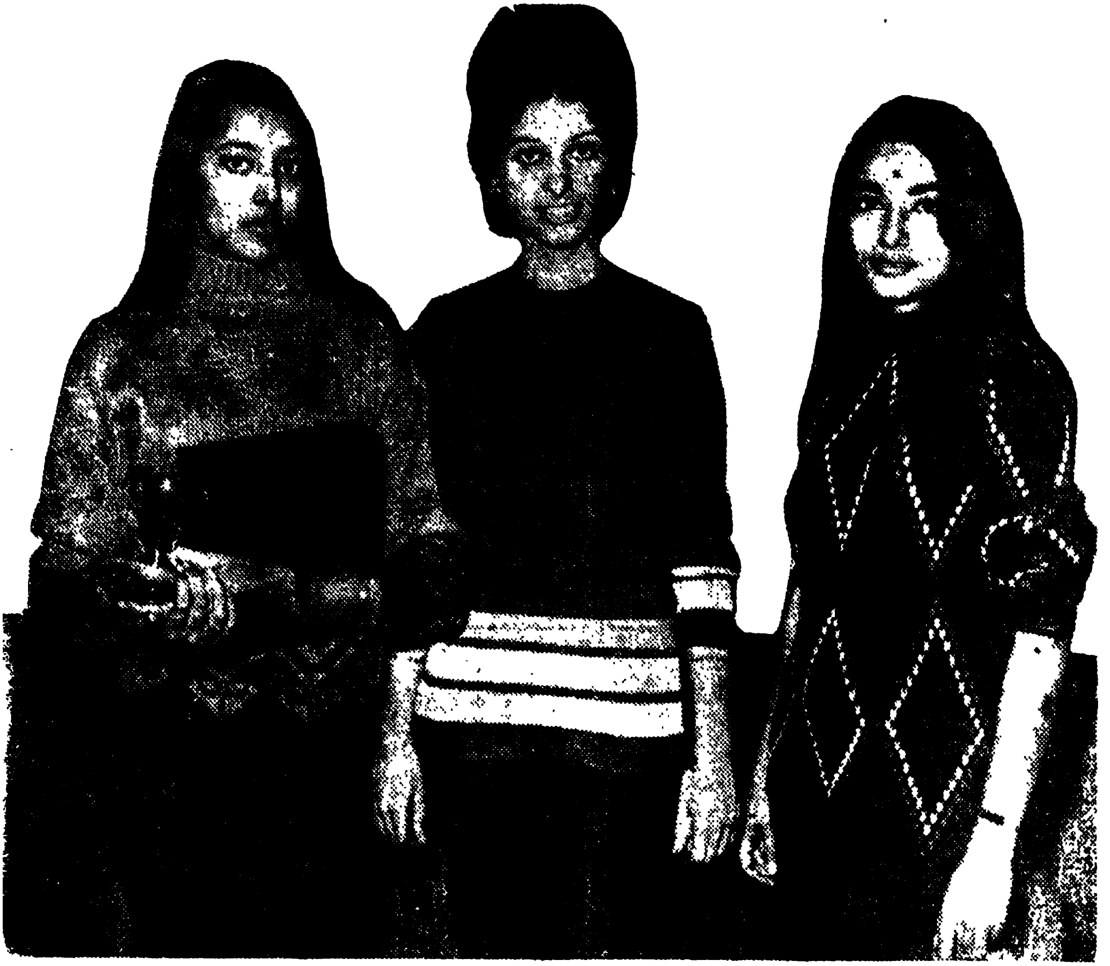
ফ্যাশান প্যারেডের আয়োজন নানাদিক থেকেই বিচিত্র অভিজ্ঞতায় ভরা। একসঙ্গে এত ফ্যাশানের আয়োজন অবশ্য এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক। বিতর্কিত ফ্যাশানের মার্জিত রূপ অবশ্য দৃষ্টি এড়ায় না। সেই সঙ্গে আর একটা কথা বলা প্রয়োজন যে, ফ্যাশান সম্পর্কে পুরো ধারণা আমাদের অনেকেরই নেই—তাছাড়া সময় অনুযায়ী পোশাক পরা এবং পোশাকে দেহ-... কিভাবে সুদৃশ্য হয়, এসব প্রদর্শনীতে এই একটা জিনিস অনেকেরই জানা হয়ে যায়। তাছাড়া হালের ফ্যাশান সম্বন্ধেও আমাদের জানান দেওয়ার দায়িত্ব এদের। এরা সে দায়িত্বও পালন করে। সেই সঙ্গে একটি পরিচ্ছন্ন রুচি গড়ে তোলার ব্যাপারে এই প্রদর্শনীর অবদান রয়েছে। সবদিক মিলিয়ে কলকাতার মত ফ্যাশান-সহজ শহরে এরকম ফ্যাশান প্যারেডের আরো আয়োজন উৎসাহীদের মন জোগাতে সক্ষম হবে।

মনের মতন গহনা
বি. সরকার
সন অব লেট এম. বি. সরকার
১২৪, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলিকাতা-১২, ফোন: ৩৪-৯২০৩

স্বাস্থ্যকে
অটুট রাখবার জন্য আপনার
প্রতিদিন দরকার অপরিহার্য
ভিটামিন এবং
খনিজ পদার্থ সমূহ
অর্থাৎ



ভিমগ্র্যানের
একটি মাত্র ট্যাবলেট।
ভিমগ্র্যানের একটি মাত্র ট্যাবলেটে ১১ প্রকারের অপরিহার্য ভিটামিন ও ৮ প্রকারের খনিজ পদার্থ রয়েছে।
ভিমগ্র্যানের একটি মাত্র ট্যাবলেট আপনাকে সারা দিন কর্মক্ষম রাখবে। আজই ভিমগ্র্যান কিনুন।
SARABHAI CHEMICALS
®রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক



শ্রীমতী গৌরী সান্যাল, আর্নাভাস মুগ্গল ও পিয়া ঘোষ

বিউটি কনটেস্ট

নন্দিতা সেন

উত্তুরে হাওয়ার প্রচণ্ডতায় শীত-কাতুরে প্রকৃতি একান্ত রিক্ত। তবু নিজেকে সাজানোর চেষ্টায় তার কসুর নেই। মরশুমী ফুলের বাহারে সে নিজের দৈন্য ঢাকবার চেষ্টা করে। প্রকৃতির এই নতুন আভরণ মানুষকেও টানে। শীতে সবাই তাই সাজগোজ করে। কিন্তু সুন্দরের অনুপস্থিতিতে সৌন্দর্য তখন চাপা পড়ে থাকে। চলে প্রহর গণনা। তারপর একসময় ঢাকনাটুকু সরে যায়, প্রতীক্ষার অবসান হয়। শীতের কুহেলি পথ বেয়ে বসন্ত আত্মপ্রকাশ করে। সুন্দরের স্পর্শে সুন্দর উন্মুখ, চোখ মেলে ধরে—সৌন্দর্যের প্রকাশ ঘটে। এমনি চলে আসছে আবহমানকাল ধরে শীতে যা থাকে, চাপাচুপি দেওয়া বসন্তে জীয়ন কাঠির ছোঁয়া লেগে তা জেগে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়, এ-কি রূপ দেখলুম আজ। সারা শীত ধরে যার প্রস্তুতি বসন্তে হয় তারই সামগান। বসন্ত তাই মধু-ঋতু। সুন্দরের উপলব্ধিতে সৌন্দর্য উপভোগের চেতনা আমাদের ইন্দ্রিয়কে আপ্লুত করে, রসে অবশ-বিবশ করে।

শীত যখন ফিকে হয়ে এসেছে বসন্তের মৃদুমন্দ বাতাস মনে রঙের মায়াজাল বিস্তারের চেষ্টা করছে, তখনই ধুম পড়ে গেল রূপসী নির্বাচনের। রূপসীরাও হঠাৎ যেন সচেতন হয়ে উঠলেন নিজেদের রূপের যশ সম্পর্কে। তাই যাচাই করে নেবার জন্য আর তর সয় না। একে একে এসে হাজির হলেন—রূপের খ্যাতিতে কে আগে যায়। রূপে পাল্লা দিয়ে নিজেকে সবার উপরে প্রতিষ্ঠিত করার এ সেই চিরন্তন বাসনা। পৃথিবীর সব দেশের মেয়েদের মধ্যেই এই বাসনা দিনকে দিন বলবতী হচ্ছে। সবকিছুর যখন বিচার হয় এবং নির্দিষ্ট মানদণ্ডে পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা আছে, তখন সৌন্দর্য কেন পিছনে পড়ে থাকবে! তাই সে সজাগ হয়েছে। সুন্দরীরা এগিয়ে এসেছে। নিজেদের সৌন্দর্য প্রমাণে তাদের ঔৎসুক্য আজ নিছক সখমাত্র নয়,—গভীর অর্থ বহন করে আনে এই সৌন্দর্যের বিচার এবং প্রতিযোগিতার আসর।

সৌন্দর্যের এমন নিরিখ অবশ্য আগে ছিল না। অতীতের পৃষ্ঠায় চোখ বুলিয়ে

গেলে সৌন্দর্য-সাধনা এবং উপকরণের অন্তহীন বিবরণ পাওয়া যাবে। কুসুমে অলংকার থেকে শুরু করে রত্ন আভরণ সবই ছিল সেদিন সাজিয়ে গুছিয়ে মনোমত করে তোলার উপকরণ। সেদিন নারী সেজেছে, রূপে একে অপরকে টেক্কা যে দিতে না চেয়েছে এমন নয়। বরং রূপ সচেতনতা সেদিন যেমন ছিল আজও তেমনি আছে। সুন্দরের বন্দনা গান আমাদের সেকথা বারবার মনে পড়িয়ে দেয়। কালিদাসের কালে সুন্দরী অগুরু মেশানো জলে স্নান সেরে ধূপের ধোঁয়ায় শুকিয়ে নিতো চুল। তারপর চলতো প্রসাধনপর্ব। কর্ণে কুণ্ডল, গলায় রত্নহার, হাতে বাজুবন্ধ, বেণীবন্ধে শোভা পেত কুরুবক ফুল, অঙ্গে চন্দনের প্রলেপ। তারপর বদ্ধ জলাশয়ের ধারে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে নিজেই হয়তো চমকে উঠতো—এতো যে তার রূপ তা অজানা রয়ে গেল অনেকের কাছে। বহুজন তার রূপের তারিফ করলো না। শুধুমাত্র গৃহকোণে বসে নিজের রূপে নিজেই সে চমৎকৃত হলো অথবা সীমিত কয়েকজন। তবু মাঝে-মধ্যে রূপের খ্যাতি উঠোনের সীমান্ত পেরিয়ে অনেকের কানে গিয়ে উঠতো। আর তখনই বাধতো অনর্থ। দুর্বলের উপর শক্তিমানের অত্যাচার তার শান্তিটুকু কেড়ে নিত। আবার উভয়পক্ষ শক্তিমান হলে তো কথাই ছিল না। এমনি হয়েছিল চিতোরের রাণী পদ্মিনীকে নিয়ে। সেকথা ইতিহাস সগৌরবে ঘোষণা করে চলেছে যুগ থেকে যুগান্তরে। এমনি করেই রূপের জৌলুষ ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। শুধু ভারতবর্ষে নয় ক্লিওপেট্রা এবং হেলেনও এই ইতিহাসে উপকরণ যুগিয়েছে। আবার মহাভারতের পাতায় সুভদ্রা-হরণেও অর্জুনের এই রূপ-তৃষ্ণার কথাই আমাদের মনে পড়ে যায়। রূপের আকর্ষণ মানুষের স্বাভাবিক এবং রূপচর্চা নারীর ততোধিক। নতুন দিন আসবে, ইতিহাসের পাতা ওল্টাবে কিন্তু রূপতৃষ্ণার এই চিরন্তনতা কোনদিন ক্ষুণ্ণ হবে না। আদ্যোপান্ত ঘটনায় তাই মনে হয়।

সেই অতীত দিনের তুলনায় আজকের পৃথিবী অনেক ভিন্ন। সেদিনের কোনকিছুর সঙ্গে আজকের মিল খুঁজে পাওয়া ভার। তবু মিল আছে, আর সে মিলের একটি হলো রূপ-তৃষ্ণা। মানুষ আজ সব ব্যাপারেই পরীক্ষার সম্মুখীন হচ্ছে। বিদ্যা-বুদ্ধি,



প্রথম
মগরিন আরিফ

কুশলতা এবং শক্তিমত্তায় নিজের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দেওয়ার সুযোগ তার অজস্র-অসংখ্য। তাই রূপ নিয়েই বা সে পিছিয়ে থাকবে কেন? বিদ্যা-বুদ্ধির খুব একটা তীক্ষ্ণতা না থাকলেও রূপের ধার থাকতে পারে। তখন এই ধারালো রূপই তার ।। এতেই বিশ্বের বাজারে সে বাজি

মাৎ করে দিতে পারে। বিশ্ব-সুন্দরী রীতা ফরিয়া এই রূপের জোরেই সারা পৃথিবীতে এত নাম-ডাক করেছে। অর্থ উপার্জনের পথও তার অজস্র। সিনেমা, থিয়েটার, টেলিভিসন, মডেল এবং ফ্যাশান-শোয়ে তার কত কদর। তার এক-একটি লেখার দাম কয়েক হাজার টাকা। সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় একবার উৎরে যেতে পারলে এইসব সম্মান আসে একসঙ্গে এবং অভাবনীয়ের মত। এতটা অবশ্য হয় কেবলমাত্র বিশ্ব-সুন্দরীর বেলায়। কিন্তু অন্যান্য নির্বাচিত সুন্দরীরাও নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার অজস্র সুযোগ পায়। তাই হাতের কাছে এমন সুযোগ পেয়ে কে আর হাতছাড়া করতে চায়। বরং রূপসী প্রতিযোগিতায় নেমে বরাত ঠুকে দেখা অনেক ভাল। 'সিসেম ফাঁক' যদি হয় তো ভালই, না হলেও 'সিসেম বন্ধ' হওয়ার কারণ নেই। সবাই তো আর শুধু রূপের মোহ ছড়িয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় না এবং সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় সেজন্য যোগদানও করে না। তারা চায় নিছক স্বীকৃতি। যে রূপকে তারা দিনে দিনে করে তুলেছে অপরূপ, তার সহর্ষ অভিনন্দন, এই সঙ্গে আছে দেশ বেড়ানোর এক দুর্বার আকর্ষণ। সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার আসরে রূপসীদের তাই ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি। বম্বের বিজয়ী ভারত-সুন্দরী শ্রীমতী সুস্মিতা সেন তো বলেই ফেলেছে, ক্যালিফোর্ণিয়ার সমুদ্র, হ্রদ, পাহাড়, অরণ্য আমায় যেন ডাক দিচ্ছে এবং আমি ক্রমাগত রোমাঞ্চিত হচ্ছি যে, বিশ্বের দরবারে আমাকে দাঁড়াতে হবে—বিশ্ব-সুন্দরী প্রতিযোগিতার আসরে। উনিশ বছরের তন্বী শ্রীমতী সুস্মিতা পেশায় রিসেপসনিস্ট। আগামী এপ্রিল মাসে ক্যালিফোর্ণিয়ার লঙবীচে অনুষ্ঠিত মিস ইন্টারন্যাশনাল প্রতিযোগিতায় তিনি অংশ নেবেন। এর ওপরে আছে নগদ পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার। সেদিক থেকে বিচার করে সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় আমাদের মেয়েদের যোগদান খুবই ভাবালুতাপ্রবণ মনের পরিচয় বহন করে। তবু সব জড়তা কাটিয়ে, সংশয় জয় করে তারা পাদ-প্রদীপের সামনে দাঁড়াচ্ছে এটা আশার কথা। পরের কথা পরে বিবেচনা করা যাবে। সুযোগ পেলে যে তারা হাতছাড়া করবে না সেকথা বলাই বাহুল্য।

মধুমাসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এবার কলকাতা শহরে তিনটি সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার আসর বসে। প্রথমটির আয়োজন করেন প্রসাধন-দ্রব্য প্রস্তুতকারক সাহিব সিং-এর সহযোগিতায় 'ইভস উইক্লি'

পত্রিকা। শ্রীমতী মালা প্রধান এই প্রতিযোগিতায় বিজয়িনী হন।

অপর দুটি প্রতিযোগিতার আসর বসান প্রসাধনদ্রব্য প্রস্তুতকারক জে কে হেলেন কার্টিসের সহযোগিতায় ফেমিনা পত্রিকা। এর প্রথমটা হলো 'টিনস বিউটি কনটেস্ট'। গতবারেও এই প্রতিযোগিতায় সাড়া বেশ ভালই পাওয়া গিয়েছিল। এবছর প্রতিযোগীর সংখ্যা মন্দ ছিল না। প্রতিযোগীদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রতিযোগিতার প্রাণ-ধর্মকেই সূচিত করছিল। এতে প্রথম স্থান অধিকার করে গৌরী সান্ডেল এবং প্রথম ও দ্বিতীয় হয় যথাক্রমে আর্গাভাস মন্ডল ও পিয়া ঘোষ। এদের সবাই এবার পুরস্কারে সন্তুষ্ট। বৃহত্তর প্রতিযোগিতার আহ্বান এদের আসবে আগামী বছরগুলিতে। সেদিন এদের উৎকর্ষ দেখবার আশায় আমরা এখন থেকেই প্রস্তুত হয়ে রইলাম।



তৃতীয়
জয়শ্রী দাশগুপ্ত

এবার আসা যাক কলকাতা রূপসীর কথায়। প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল কুড়িজন। সবাই বেশ সপ্রতিভ। ওদের গতিভঙ্গী এবং স্মার্টনেশ পরীক্ষা করার ছলে পরিচালক যখন ওদের সংগে হাস্যমুখর বাক্যালাপ করছিলেন, তখনই এটা বেশ বোঝা গেল। সবাই বেশ চটপটে এবং সৌন্দর্যের মাত্রাজ্ঞানে বেশ অভিজ্ঞ। পরিমিত হাসি এবং তেমনি চটুল ভঙ্গিতে ওরা পরিচালকের কথার উত্তর দিচ্ছিল। ফলে সারাক্ষণ অনুষ্ঠানের মধ্যে বেশ একটা প্রাণের আমেজ অনুভব করা গেছে। বাছাই চলে দু'বার। তৃতীয়বারে হয় চূড়ান্ত নির্বাচন। প্রতিযোগীর সংখ্যা তখন স্বাভাবিকভাবেই অনেক কমে এসেছে। সকলেরই বুক দুরু-দুরু। কিন্তু মুখে সেই মিষ্টি হাসি, চলাফেরায় একই স্মার্টনেশ। এইভাবে তৃতীয় পর্যায় সমাপ্ত হলো।

বিচারকের রায় ঘোষিত হলো। অপেক্ষাকুল দর্শকেরা প্রচন্ড হাততালিতে ফেটে পড়লেন। কলকাতার 'মিস্ ফেমিনা' নির্বাচিত হলেন শ্রীমতী নগরিন অরিফ তাকে বিজয় মুকুট পরিয়ে দিল গত বছরের কলকাতা রূপসী শ্রীমতী নাতালি উড। এছাড়াও শ্রীমতী অরিফ পেল নগদ পাঁচশো টাকা, উষা সেলাইকল এবং নানাবিধ প্রসাধন সামগ্রী। শ্রীমতী ফ্লোরেন্স এজেকেল এবং শ্রীমতী জয়শ্রী দাশগুপ্ত যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় হন। সবাইকে পুরস্কার দেন টাইমস অব ইন্ডিয়ার সংবাদপত্র গোষ্ঠীর ডিরেক্টর শ্রীমতী রমা জৈন।



দ্বিতীয়
ফ্লোরেন্স এজেকেল

বিজয়িনীদের একটু বিস্তৃত পরিচয় দিই। শ্রীমতী অরিফ স্কুল-জীবন শেষ করে গৃহসজ্জায় তালিম নিচ্ছে। আমেরিকায় তার গৃহসজ্জা ও সৌন্দর্য-চর্চা শিখতে যাওয়ার ইচ্ছে আছে। শ্রীমতী এজেকেল সর্টহ্যান্ড ও টাইপরাইটিং শিখছে আর শ্রীমতী জয়শ্রী স্কুলের ছাত্রী।

শ্রীমতী অরিফের প্রসঙ্গে আবার একটু আসা যাক। তার প্রতিযোগিতা কিন্তু এখানেই শেষ হলো না। বরং এই প্রতিযোগিতায় বিজয়িনী হয়ে তার প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র আরো প্রসারিত হলো। এরপর 'মিস ইন্ডিয়া' নির্বাচন হবে। সে প্রতিযোগিতার আসর পড়বে বোম্বাইয়ে মার্চ-এর শেষে।

শ্রীমতী অরিফ, শ্রীমতী এজেকেল ও তৃতীয় শ্রীমতী জয়শ্রী দাশগুপ্ত সহ বিচারকমণ্ডলীর অন্যতম (ডানদিক থেকে দ্বিতীয়) শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ ও তাঁর বামে শ্রীরেমো ডিলে-কেও দেখা যাচ্ছে।



সেখানে কলকাতার প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্ব শ্রীমতী আরিফের। ভারতের মোট নয়টি শহরের সুন্দরীরা এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশ নেবেন। বিজয়িনীর মুকুট এখানে যার মাথায় শোভা পাবে সেই সৌভাগ্যবতী আমেরিকার মায়ামী সমুদ্রবেলায় 'মিস ইউনিভারস' প্রতিযোগিতায় ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবে। এ সম্মান নিশ্চয়ই দুর্লভ।

দুর্লভ এই সম্মানের আহ্বান আজ মেয়েদের কাছে উপস্থিত। সে দায়িত্ব পালন করতে তাঁরা এগিয়ে আসছেন। প্রতিযোগীর সংখ্যাও বাড়ছে। তবু নিরিখে সৌন্দর্যের বিচারে অনেকের যেন কোথায় আপত্তি। তাই তারা নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখতে চায় নিজেদের সৌন্দর্য নিয়ে প্রতিযোগিতার মুখোমুখি দাঁড়াতে ভয় পায়। তবে এসব ক্ষেত্রে যতটা না ভয় সংকোচ তার চেয়ে অনেক বেশি। আর সেজন্যই সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা সর্বত্র খুব একটা সাড়া জাগাতে পারছে না। কিন্তু এই আশংকাটুকু দূরে সরিয়ে রেখে একবার সবটা ভেবে দেখলে এ সমস্যার একটা সুষ্ঠু পথ পাওয়া যেতে পারে। সর্বকিছু ছেড়ে দিয়েও এর মাধ্যমে দেশের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে। সেটা কম বড় সৌভাগ্যের কথা নয়। বিশেষ করে আজকের দিনে আমরা সবাই যখন বিদেশে নিজের দেশের দূত। সেই সুযোগটুকু নিতে আমরা পিছিয়ে থাকবো কেন? আর সৌন্দর্যচর্চা আমাদের চিরন্তন সম্পদ। ভারতের অতীত ঐতিহ্য এই রূপ-চেতনায় কোন ক্ষেত্রে দীন নয় এবং অনেকের ঈর্ষার পাত্র। তাহলে আমরাই বা সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার আসর থেকে দূরে সরে থাকবো কেন? সর্বোপরি যে নতুন জীবনের এবং প্রতিষ্ঠার হাতছানি এর মধ্যে রয়েছে তাও তো উপেক্ষার নয়। বিভিন্ন দেশের মেয়েরা এই সুযোগ নিয়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করছে। তবে আমরাই বা সেই সুযোগ নেব না কেন? একবার এই সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা উপলক্ষে সাংবাদিক সম্মেলনে একজন কর্মকর্তা বলেছিলেন, রক্ষণশীল মনোভাবের জন্যই প্রতিযোগী বাঙালী মেয়ে এত কম। প্রতিযোগীর সংখ্যাল্পতায় এবারও সেকথাই প্রমাণিত হলো। অথচ আমরা প্রতিযোগিতার এই বৃহৎ অংগনে রক্ষণশীল এই অভিযোগ নিশ্চয়ই অনেকে মানতে চাইবেন না। কিন্তু প্রতিযোগীর সংখ্যা যেদিন বেশি হবে সেদিনই আমাদের প্রতিবাদ সোচ্চার হবে, তার আগে নয়। যে কথাটা সেদিন নীরবে হজম করতে হয়েছে তার জবাবটা তেমনি নীরবেই দেওয়া সম্ভব হবে। এজন্য প্রয়োজন মানসিক প্রস্তুতির। অনেককিছুর মত সৌন্দর্য প্রতিযোগিতাকে স্পোর্ট হিসেবে নিলে আর ভাবনাই থাকবে না। সংকোচ দূরে সরে যাবে এবং উদ্দেশ্যও সফল হবে।

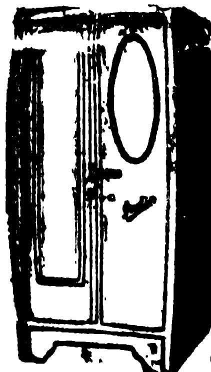
ফ্যাশান প্যারেড ও বিউটি কনটেস্টের আলোকচিত্র সুকুমার রায় গৃহীত।



সকল প্রকার অফিস ষ্টেশনারী সার্ভেইং ড্রইং ও ইঞ্জিনীয়ারিং।
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

কুইন ষ্টেশনারী ষ্টোর্স
প্রাঃ লিঃ

৬৩-বি, রাধাবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা-১
ফোন : অফিস—২২-৪৫৮৮ (২ লাইন)
২২-৬৩০২
ওয়ার্কশপ—৬৭-৪৬৬৪ (২ লাইন)



আপনার মেয়ের বিয়েতে উপহার দিন—

ইণ্ডিয়া ষ্টীল আলমারি

● মজবুত ফিটিংস ● ভাল জিনিষ
● নকল চাবি লাগবে না, সেজন্য গ্যারান্টি দিচ্ছি।

ইণ্ডিয়া ষ্টীল ফার্ণিচার
ম্যানুঃ কোং

১৫, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭
'গ্রেস' সিনেমার পশ্চিমে — ফোন ৩৪-৭৫৯২

আলোর সহোদরী

মিহির আচার্য

॥প্রথম তরঙ্গ॥

'তুই শেষ পর্যন্ত এমন ভুল করলি? তোর মতন তেজী মেয়ে...' অংশুলা বলল।

স্বাতী উদাস হেসে বলল, 'সব সময় কী হিসেব করে চলা যায় ভাই। না হিসেব করতে ভালো লাগে?'

'তাই বলে ভবিষ্যত ভাববিনে তুই? পরিণাম?'

'কী জানি কী করে যে হল। শিমুলতলায় সেবার আমার অসুখের সময় অযাচিতভাবে যা করেছিল, তার জন্যে কৃতজ্ঞতা জন্মেছিল আমার হৃদয়ে। কিন্তু বুঝতে পারিনি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আমার রক্তে লোভও উসকে উঠেছিল। তুই জানিস আমার চাকরিতে আনন্দ নেই, প্রাণ নেই। আমি ভেতরে ভেতরে শুকিয়ে যাচ্ছিলাম. একটু আলোর জন্যে আমি যে কত কাঙ্গাল ছিলাম সুব্রত আমাকে তা বোঝাল।'

অংশুলা বলল, 'কিন্তু তুই তো জানতিস সুব্রত বিবাহিত। একটি বাচ্চাও আছে। যতদূর মনে হয় ওদের সুখের সংসার...'

স্বাতী বলল, 'সেইটেই তো কাল হল। ওর সুখের চেহারাটাই আমাকে বারবার নাড়া দিচ্ছিল। সত্যি বলতে কী, ওর সুখটাকেই আমি ভালোবাসতাম। সুব্রত প্রথম দিন থেকেই আমাকে চিনেছিল, চোখ দেখে কিনা জানিনে। আমাকে ঘিরে সব ব্যাপারেই ওর যত্নের বাড়াবাড়ি ছিল, প্রশ্রয়ও ছিল না এমন নয়। আমার সাহস বাড়ল। লোভ থেকে সাহস, অদ্ভুত রোমাঞ্চ বোধ করলাম। তারপর ও একদিন গাড়িতে লিফ্ট দেবার সময় আমাকে বলেই ফেলল। কী জানিস, অনেকদিন গুমটের পর হঠাৎ বৃষ্টি নামলে যেমন হয়, তেমনি একটা ভালো-লাগা খর অনুভূতি আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। আমি ওর মণিবন্ধে টোকা দিয়ে বললাম : জানি। বললাম : আমাকে আঘাত দিতে চাও দিয়ো, কোনোদিন অবহেলা কোরো না, আমার সহ্য হবে না।



ওদের নির্জন বালিগঞ্জ প্লেসে টুপটাপ করে সন্ধ্যা নামছিল।'

অংশুলা বলল, 'কী করে জানলি লোকটা চীট্ নয়। নিজের স্ত্রীকে—'

স্বাতী হাসল। 'চীট্ কেন হবে? ও তো আমার কাছে কিছু লুকোয়নি। বরং অন্যায় যদি কারুর হয়ে থাকে তা আমার। আমি কেন সব জেনেও ওর জীবনে প্রবেশ করলাম। ও স্ত্রীকে নিয়ে সুখী কিনা জানিনে, জানতেও চাইনে। তবে এটা বুঝলাম সুখের তৃপ্তির চেয়েও মানুষ অন্য কিছু খোঁজে। নইলে ও আমাকে আকাঙ্ক্ষা করল কেন? আশ্চর্য জটিল লাগে এই জীবনটা।'

'জটিল করতে চাইলে জীবন তাই হবে।' অংশুলা বলল।

'কী জানি, তাই হবে।' স্বাতী মুখ নীচু করল : 'আমি বুঝতে পারিনে ও আমাকে এমন করে কেন আকর্ষণ করে, ও দিনান্তে একবার আমার কাছে আসতে চায় কেন? ও আমার বিছানায় শরীর ছড়িয়ে দিয়ে শুয়ে থাকে, সিগারেট খায়, বেশি কথা বলে না। তবে আমার পরিচর্যাগুলো উপভোগ করে। আমি তাড়া না দিলে ও বাড়ি ফেরার উৎসাহ পায় না। বাড়ি ফেরার কথা মনে করিয়ে দিলে সে আর অপেক্ষা করে না, উঠে দাঁড়ায়, হাসে, তারপর চলে যায়। একদিন কী হল জানিস? বলল : আজ রাত্রিরে থাকব। আমি বুঝলাম, ও আমাকে পরীক্ষা করতে চায়। বললাম : বেশ তো। খাবার ব্যবস্থা করি। ও বসে বসে আমার রান্না দেখল। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল : চলি। আমি তো অবাক। ও হাসল, আমিও হাসলাম। তারপর হাসতে হাসতে ও বেরিয়ে গেল।'

অংশুলা মুখ কালো করে বলল, 'নাটক।'

স্বাতী বলল, 'সেদিন ও অমন করে চলে যেতে পারল দেখে আমার শ্রদ্ধা আরো বেড়ে গেল। ওর চরিত্রের এই সীমা-বোধ—'

'সীমা-বোধ!' মুখ বেঁকালো অংশুলা : 'কতদিন থাকবে? ওটা তো দুপক্ষের ব্যাপার। তুই নিজে কোনোদিন সীমা ভাঙবিনে শপথ করে বলতে পারিস?'

স্বাতী হেসে বলল, 'দুর্বল লোকেরা শপথ করে। ভালোবাসা শুধু লোভ সৃষ্টি করে না অংশুলা। একেক সময় ভুলে যাই আমি মেয়ে। সে-ও মনে করিয়ে দেবার চেষ্টা করে না।'

'কিন্তু এ-সম্পর্ক মিথ্যা, অর্থহীন। তোরা পরস্পরকে ছলনা করিস।'

'না, তা নয়।' স্বাতী সজোরে মাথা নাড়ল : 'সারাদিনের কর্ম-ব্যস্ততার পর দুজনে এত ক্লান্ত থাকি যে চুপচাপ বসে উভয়ের সান্নিধ্যকে উপভোগ করতে ভালোবাসি। এটা অনেকটা কর্মক্লান্ত মানুষের মাঠে বসে সূর্যাস্তের সৌন্দর্য উপভোগ করবার মতন।'

অংশুলা বলল, 'ভণ্ডামি।'

স্বাতী বলল, 'তোমাকে আমি বোঝাতে পারব না। তাহলে তোমার পরিস্থিতিটা বোঝার দরকার। সত্যিই বলছি, আমরা উত্তেজিত হবার অবকাশ পাইনে। ধার-করা উত্তেজনার আগুনে জ্বলার লজ্জা আমরা কেউই পেতে চাইনে।'

অংশুলা বলল, 'তাহলে স্পষ্ট করে বলি। সুব্রতর না হয় স্ত্রী আছে, তোর?'

'বারে, আমার সুব্রত আছে। জানো চোখ বন্ধ করলেও ওকে আমি দেখতে পাই।'

'তুই সংসার চাসনে, মা হতে চাসনে?'

'কেন চাইব না?'

'তবে এ-ইয়ারকির মানে কী? সুব্রত তোকে সংসার দেবে না, মা হতে দেবে না। কেবল কৃষ্ণচূড়ার মতন শোভা ছড়িয়ে তোর কী করে চলবে?'

'সংসারের কথা আমি ভাবিনে। আর মা-হওয়ার কথা, সে তো অন্য জিনিস।'

'সুব্রত বুঝি এসব বুঝিয়েছে তোকে?'

'সুব্রত কেন, আমি নিজেই বুঝেছি। আমার পক্ষে অন্য কোনো পুরুষকে ধরে সংসার কী সন্তান লাভ করা হয়তো অসম্ভব ছিল না। আমার রূপ আছে, রোজগারও করি। কিন্তু ওই দুটো পাবার জন্যে বিয়ে করা আমার কাছে ছোটো ব্যাপার বলে মনে হয়। একটা জীবনে অঞ্জলি ভরে সর্বকিছু পাব এমন দুরাশা কেন করব, যা পেয়েছি তাকে অনাদর করব এমন ধনী আমি নই। সুব্রত আমাকে ভালোবাসা দিয়েছে। জীবনে এত ঐশ্বর্য কার আছে?'

অংশুলা বলল, 'সে-ভালোবাসা ওর স্ত্রীকেও দিয়েছে।'

স্বাতী বলল, 'ওর যদি অনেক থাকে দিক না। আমাকে তো ফাঁকি দিচ্ছে না কিছু।'

'তাহলে তুই জেনেশুনেই'—অংশুলা বলল, 'আচ্ছা ধর, ওর স্ত্রী জানতে পারল। জেনে যদি তোদের সম্পর্কতে আপত্তি জানায়। আর সুব্রত যদি স্ত্রীকে না ছাড়ে—'

স্বাতী হাসল। 'এত যদির নিশ্চিত উত্তর কী করে দেবো? সুব্রত এখন যা বিবেচনা করবে তাই হবে। ভালোবাসা কর্তব্যকে বাধা দেবে না নিশ্চয়ই।'

'তবে ভেবে দ্যাখ। মানুষ সামাজিক মর্যাদাকে বড় করে দ্যাখে।'

'তবু সুব্রত আমার কাছেই থাকবে। আমার ভালোবাসার ভেতরে, আমার সৌন্দর্যবোধের ভেতরে। আর মানুষ যতদিন বাঁচে তার সৌন্দর্যবোধ মরে না। যে-ভালোবাসা হিসেব করে না, লোভ করে না, তাকে কে ছিনিয়ে নেবে?'

'তুই কী বলছিস নিজেই জানিসনে।'

'বেশ তো। তুমি হলে কী করতে বলো?'

'আমি বলতাম দুমুখো খেলা চলবে না। একদিক বেছে নিতে হবে।'

'ও যদি বলত আমার দুদিকই চাই। বর্ষাও চাই, বসন্তও চাই।'

'বলতাম পথ দ্যাখো।'

'এটা তো অংক হল। সমস্যার সমাধান কী করলে?'

অংশুলা বলল, 'সমাজ বাঁচল।'

স্বাতী চুপ।

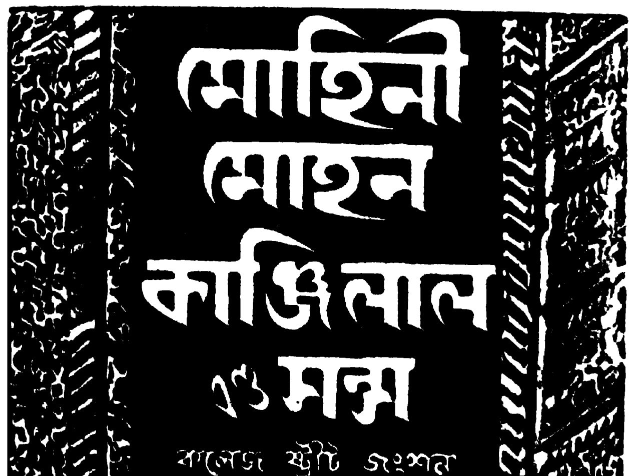
অংশুলা বলল, 'সামাজিক নৈতিকতা বলে একটা জিনিস আছে। সভ্য মানুষকে তা মানতে হবে।'

স্বাতী বলল, 'আমার মন কে সৃষ্টি করল, যে-মন সুব্রতকে ভালোবাসল?'

অংশুলা বলল, 'তুমি ব্যক্তিগত আবেগে ভেসে গেছ। তোমার সামাজিক মন নিশ্চয়ই তোমাকে বাধা দিয়েছে। তুমি তার কথা শোননি।'

'আচ্ছা সুব্রত বিবাহিত বলেই তোমার আপত্তি?'

'হয়তো তাই। আরো আপত্তি সে একজন দায়িত্বশীল অফিসার, তার কাছে



সমাজ বেশি সংযম আশা করে। এইসব মানুষের হাতে সমাজ বিপন্ন হয়।'

স্বাতী বিবর্ণ হাসল। 'ভালোবাসবার আগে তোমার কাছে পরামর্শ নিলে ভালো হত দেখছি। এখন আমি কী করি বলো তো?'

অংশুলা বলল, 'যা হয়েছে ফেরানো যাবে না। এখন তোর উচিত সরে দাঁড়ানো। চোখের আড়াল হলে মনের আড়াল হয়।'

স্বাতী বলল, 'কথাটা মন্দ বলোনি। দেখি ভেবে। কিন্তু কাজটা খুব ছেলে-মানুষি হবে না? ভীতু কাপুরুষের মতন? ধরো ওকে ছেড়ে যদি না-থাকতে পারি? যদি—'

অংশুলা বলল, 'মেয়েরা সব সহ্য করতে পারে। সেইজন্যেই তাদের শক্তি বলে।'

স্বাতী বলল, 'আমি দূরে চলে গেলাম আর ও যদি আমার ত্যাগ বুঝতে না পারে, যদি ভুল বোঝে? আমাকে যদি ও বাজে খেলো মেয়ে ভাবে? তার চেয়ে ওকে পরিষ্কার করে বলা ভালো, তাই না?'

অংশুলা বলল 'সংসারে অনেক জিনিস আছে যা পরিষ্কার করতে যাওয়া বিপদ।'

'তাই বলে পালাতে হবে আমার প্রিয়-জনের কাছ থেকে?' স্বাতী উষ্ণ হল।

'স্থায়ী মঙ্গলের জন্যে পালানোতে অপরাধ নেই।'

'কিন্তু ও যদি জবাবদিহি চায়? যদি প্রশ্ন করে ওর অপরাধ কী! কী বলব তাকে? বলব : ভুল করে এগিয়েছিলাম, এখন ভুলকে সংশোধন করতে দাও, এই তো? কিন্তু তুমি জানো ভুল আমরা কেউই করিনি। আমার ত্রিশ বছর বয়েসটা আর যাই হোক, ভুল করার নয়।'

অংশুলা বলল, 'মানুষ সারাজীবন ভুল করতে পারে। তার আবার বয়স কী।'

স্বাতী মাথা চুলকোলো। 'তাই তো। আচ্ছা এখন চলি। পরে দেখা হবে।'

স্বাতী চিন্তিত হয়ে বেরিয়ে গেল।

।। দ্বিতীয় তরঙ্গ ।।

রাত্রিতে সুব্রত এলে স্বাতী আয়নায় মুখ মুছতে-মুছতে বলল : 'জানো আমি চলে যাচ্ছি।'

সুব্রত বিছানায় শুয়ে সিগারেট খাচ্ছিল। অন্যমনস্ক। শুনতে পেল কিনা কে জানে।

স্বাতী ঘাড় ঘুরিয়ে ওকে দেখল। তারপর আবার বলল, 'শুনছেন মশায়?'

'কই দাও।' সুব্রত হাত বাড়িয়ে দিল। তারপর প্রসারিত হাতে কিছু এল না দেখে সবিস্ময়ে ওর দিকে তাকাল। হাসল। 'আমি ভাবলাম কফি এনেছ।'

স্বাতীর এবার দমে-যাবার পালা। 'কী হয়েছে? তোমাকে অমন দেখাচ্ছে কেন?'

সুব্রত বলল, 'আমার পাশের ফ্ল্যাটে একটি মৃত্যু দেখলাম। বকুলা, নতুন বিয়ে হয়েছিল।'

স্বাতী হিটারের সুইচ অফ করল। গম্ভীর, বিমর্ষ।

'ওর যুবক স্বামীকে যদি দেখতে। বেচারী...'

'এই নাও কফি।'

'আমার কাছে বোসো।'

'বারে, আমার কাজ নেই বুঝি?'

'তোমাকে আজ কোনো কাজ করতে দেবো না।' সুব্রত ওর হাত ধরল। ওর মুখের দিকে কেমন করে চেয়ে রইল।

স্বাতী বসল।

সুব্রত ওর ঘাড়ে মুখ ঘষল, চুলে আঙুল রাখল।

'জানো মানুষ জীবনে কত স্বপ্ন দ্যাখে—' সুব্রত বৃষ্টির মতন গলায় বলল : 'কত আশা-আনন্দ, তারপর যত বেলা বাড়ে স্বপ্নের শিশির শুকিয়ে যায়।'

'কী স্বপ্ন দেখতে আমাকে বলো না?' স্বাতী আদরে গলায় জিগ্যেস করল।

সুব্রত বলল : 'এই মানুষের সম্পর্কে প্রকৃতির সম্পর্কে। কেমন মনে হত এই জগতটা একটা অদ্ভুত সংগতি আর সুষমায় ভরা। সূর্য দেখলে আনন্দ হত, মেঘ দেখলে, সবুজ অরণ্য, সমুদ্র, চাঁদ, পাখি, ফুল—অহরহ চলেছে আনন্দের মহোৎসব। আর মানুষ এই উৎসব থেকে তার আনন্দকে নেবে ছিনিয়ে, যেমন করে সে আকাশের বিদ্যুতকে ছিনিয়ে নিয়েছে। মনে হত প্রকৃতির অজস্র ঐশ্বর্যকে মানুষ প্রতীক করে নিজের জীবনে ব্যবহার করেছে। মানুষ সূর্য হয়, অরণ্য হয়, পাখি ফুল চাঁদ হয়...'

'তারপর—' স্বাতী কাত হয়ে পড়ল বিছানায়, তার দেহকে বিকশিত করে দিল পরম রহস্যে : 'আর মানুষ সমুদ্র হয় না?'

সুব্রত ওর কপোলে হাত রাখল, গ্রীবায়, চোখের পাতায় : 'হয়। হতে চেষ্টা করে।'

'জানো আমি কোনোদিন সমুদ্রে যাইনি।'

'যাবে। সকলকেই সমুদ্রে যেতে হবে।'

'তারপর কী হল বলো?' সুব্রতর আঙুল স্বাতীর আঙুলে।

সুব্রত বলল : 'স্বপ্ন ছিঁড়ে গেল। দেখলাম মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির কোনো সংগতি নেই। মানুষের জীবন অসামঞ্জস্যে ভরে উঠেছে। জানো : ইচ্ছে ছিল দর্শন পড়ব, আমাকে ওরা ইঞ্জিনিয়ার করল। কিন্তু আমার দার্শনিকতাকে তো আমি ছাড়তে পারলাম না। নিজের কাজে ডুবে থাকতে থাকতে কখন ভুলে গেলাম পৃথিবীতে লোক আছে, তারা আজো স্বপ্ন দ্যাখে, সংগতি খুঁজে পাবার চেষ্টা করে। আমার কী দুঃখ জানো, মানুষ সুস্থ হলে আর আমার কাছে আসে না। আমার স্বপ্নগুলো আমি কাকে দেবো?'

সুব্রতর মুখের ওপর স্বাতীর চোখের তারা দুটো সন্ধ্যার আকাশের মতন চকচক করছিল। স্বাতী ভারি নিশ্বাস ফেলল।

[illegible]—
[illegible]?'

'ওই সূর্য-চন্দ্র-পৃথিবী কক্ষচ্যুত হয়ে যদি কোনোদিন স্খলিত হয়ে পড়ে—'

সুব্রত বলল, 'কী করে হবে? ওরা যে পরস্পরের আকর্ষণে ঘুরছে। কারুর স্খলিত হবার উপায় নেই।'

আলোতে স্বাতীর দাঁত ঝিকিয়ে উঠল। একটু মৌন থেকে বলল : 'তোমাকে একটা কথা বলিনি। আমি বাইরে একটা চাকরি পেয়েছি।'

সুব্রত বলল, 'সে কী করে হয়।'

'কেন? আমার কেরিয়ারের দরকার নেই? সারা জীবন ছোটো হয়ে থাকব। আমার উন্নতি তুমি চাও না?'

সুব্রত অনেকক্ষণ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর হাসল। 'আমি বুঝতে পারিনি। কবে যাবে?'

'তুমি ছুটি দিলেই যাব।'

'তার কী দরকার আছে কোনো?' সুব্রত হাসল ফের : 'মানুষের উন্নতির ব্যাপারটা তার একার, সম্পূর্ণ নিজস্ব।'

'আর কোনোদিন হয়তো ফিরতে পারবো না।' স্বাতী বলল।

'সেখানে ভালো লেগে গেলে আর ফিরবে কেন?' সুব্রত নিশ্চিন্ত জবাব দিল।

অবিশ্বাসের চোখে স্বাতী প্রশ্ন করল : 'তোমার কষ্ট হবে না?'

'না।'

'তুমি আমাকে ভালোবাসো না?'

'বাসি।'

'ভালোবাসলে ছেড়ে থাকতে পারা যায়?'

'না-পারলে তুমি যাচ্ছ কী করে?' সুব্রত হাসল : 'মানুষের উন্নতি চাই চাইনে?'

'জানিনে।' স্বাতী ধড়মড় করে উঠে বসল। বিস্রস্ত চুলগুলি ঠিক করে নিল : 'কেন তোমার জোর নেই, আমার ওপর অধিকার নেই?'

সুব্রত সিগারেট ধরাল। 'আমি তোমাকে কোনো অধিকার দিতে পারিনি। তোমার দায়-দায়িত্ব মর্যাদা কিছুই আমি বহন করতে পারিনি। না; ছোট্ট একটি সংসারও নয়।'

স্বাতী বলল, 'হয়তো এই ভালো হয়েছে। তোমার সঙ্গে সংসার করলে তোমাকে হারাতাম। যেমন করে তোমার স্ত্রী হারিয়েছেন। যখন ইচ্ছে আমরা কাছে আসতে পারছি, বাইরে থেকে চাপানো কোনো সর্ত আমাদের তিলে তিলে চেপে মারছে না। আমরা যত পরিমাণে স্বাধীন তত বেশি আসক্ত। সব মানুষের কাছে সুখের চেহারা কী একরকম সুব্রত? একেক জন একেক রকমে সুখী হয়। কেউ বন্ধনে কেউ মুক্তিতে।'

সুব্রত বলল, 'শোনো। ললিতা সব জানতে পেরেছে।'

স্বাতী এক মুহূর্ত রক্তহীন হয়ে রইল। কোনো কথা বলতে পারল না।

সুব্রত আবার বলল, 'আমার ট্রাউজারের পকেটে কী করে তোমার চুলের কাঁটা চালান হয়ে গিয়েছিল।'

স্বাতী ফাঁসা গলায় বলল, 'আমি, আমি তো রাখিনি।'

'কে বলেছে তুমি রেখেছ?' সুব্রত হাসল। 'কথাটা হচ্ছে ললিতা সব জানতে পেরেছে। জ্যান্ত একটা প্রমাণ পেয়েও সে বিশ্বাস করেনি। কারণ ও জানে আমি কোনোদিন অভিনয় করিনি। আমি যে কোথাও অভিনয় করতে পারিনে সেটাও ও জানে।'

'থামো।' স্বাতী চিৎকার করে উঠল। 'তোমার দাম্পত্য-সংলাপ আমাকে শুনিয়ে লাভ কী? উনি ভালো হোন খারাপ হোন আমার কী যায় আসে।'

সুব্রত আহত হয়ে চুপ করে গেল।

'তোমার স্ত্রী উদার হতে পারেন, কারণ তাঁর কোনো ক্ষতি নেই। বাইরের থেকে তুমি যে-আনন্দ যে-উত্তেজনা কুড়িয়ে নিয়ে যাও তিনি তার ভাগ পান।'

'স্বাতী!'

'আমাকে থামিয়ে দিতে পারবে না। আমি ছায়া হতে পারিনে, মিথ্যে হতে পারিনে। আমার ইচ্ছের সলতে পুড়িয়ে আর কেউ প্রদীপ জ্বালবে, আমি তা সইব না। তুমি যখন আমার কাছে, তখন সম্পূর্ণ আমার, আমার নিজস্ব, সেখানে আমি কাউকে হাত বাড়াতে দেবো না। আর যখন চলে যাবে তখন তোমার অস্তিত্বকে আমি আমারি কাছে বন্দী করে রাখব।

সুব্রত স্থির বসে রইল।

।। তৃতীয় তরঙ্গ ।।

"উত্তর বাঙলার এই ছোট্ট শহর আমার কর্মস্থলের পরিচয় তোমাকে আগেই দিয়েছি—" স্বাতী লিখেছে : "এমন বোবাধরা গুমট শহর আমি বেশি দেখিনি। না-আছে একটা নদী না-পাহাড়, কাজে যাচ্ছি আর ফিরছি। লোকগুলোর চাহিতে এমন একটা জিনিস আছে যে বুকের রক্তকে পর্যন্ত হিম করে দেয়। আমিও যেন ক্রমশ গুমটের কঠিন আচ্ছাদনে জড়িয়ে বন্দী হয়ে পড়ছি।

"এক ছুটির দিনে ট্রেনে করে কাছেই একটা অরণ্য আছে শুনে বেড়াতে গিয়েছিলাম। আর সেখানে দীর্ঘদিন পরে হঠাৎ-দেখা চন্দন সোমের সঙ্গে। সে এখানকার অরণ্যের সরকারি অফিসার। চন্দনকে মনে আছে তোমার? আমার ছোটোকাকার বন্ধু, আমার চেয়ে বছর কয়েকের ছোটোই হবে। ভালো সেতার বাজাতো। জানো : কী প্রকাণ্ড পুরুষের মতন চেহারা হয়েছে ওর। যেমন স্বাস্থ্য তেমনি উচ্ছলতা। সর্বাঙ্গ দিয়ে দিগন্ত ছাড়িয়ে হাসতে পারে। যেন কোনো অর্গল মানবে না।

"আমাকে ধরে নিয়ে গেল ওর কোয়ার্টার্সে। কী সুন্দর সাজিয়েছে ওর কোয়ার্টার্সটাকে। যেমন নিভৃত তেমনি উষ্ণ। মনে হয় না যে একটা অরণ্যে রয়েছি। গ্রামদেশের ঘরোয়া নিরাপত্তার কথা মনে পড়ে যায়। জানো তো মেয়েদের স্বভাব; আমার নিরবচ্ছিন্ন গুমটের পর ওর এই বন্ধুত্ব আমাকে হালকা মুক্ত করে তুলছিল। আমি যেন অধিক লোভী হয়ে পড়ছিলাম। আর, চন্দন যেন আমাকে পেয়ে কী করবে ভেবে না পেয়ে অস্থির হয়ে উঠছিল। ওর এই উত্তেজিত-সুখ আমাকে আনন্দ দিচ্ছিল বইকি।

"তারপর পুরনো দিনের এলোমেলো কথা। হাসি। কফির পাত্র। স্যান্ডউইচ। নাঃ এখানে সে সেতার ছাড়েনি।

"একবার কৌতূহল হয়েছিল জিগ্যেস করতে কেন সে বিয়ে করেনি। কিন্তু ভয়ে করিনি। কারণ পাল্টা জিজ্ঞাসা সে আমাকেও করতে পারত। কে বিশ্বাস করবে, আমার এই বয়সে পিছনের কোনো ইতিহাস নেই।

"আমি ওর নরম বিছানায় শুয়ে ছিলাম, আর ও চৌকিতে বসে সেতারে ঝংকার তুলছিল।

"কতক্ষণ যে ওইভাবে কাটল জানিনে। সুর থামলে পর তার রেশ দীর্ঘস্থায়ী হয়ে আটকে রইল বিকেলের রঙঢালা বিচিত্র আকাশে। মনে হল হাজারো গল্প করেও যে সময়ের ব্যবধানকে আমরা পার হয়ে আসতে পারতাম না তারের সুরে সে দ্বিধাগুলো কাটিয়ে দিল।

"ওকে বললাম : 'এবার ফিরতে হবে। নইলে ফেরার ট্রেন পাব না।'

"চন্দন হাসল। বলল : 'আবার কবে দেখা পাচ্ছি?'



বেঙ্গল কেমিক্যালের

সুবাসিত ব্রাহ্মী

হেয়ার অয়েল

আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে

আয়ুর্বেদ-নির্দেশিত উপকরণে প্রস্তুত



বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর • দিল্লী

Progressive/BC

"আমার ভেতরে একটা কাঁপুনি জাগল।

বললাম : 'অমন করে বলতে নেই। ভুলে গেছ আমাকে তুমি দিদি বলতে।'

"চন্দন হেসে আমাকে স্টেশনের পথে এগিয়ে দিতে এল।

"ট্রেনের জানালার নীচে চন্দন দাঁড়িয়ে। ট্রেনের হুইশল দিল। চন্দনের আঙুলগুলো আমার বাহুর ওপর। আর, আমি আশ্চর্য স্থির দৃষ্টিতে ওর মুখের দিতে তাকিয়ে।

"বাড়ি ফিরে সেদিন রাত্রে নিজের আচরণেই আমি অবাক হয়ে গেলাম। আমি কী সত্যিই ওর সংগে দিদির সাবধানতার ব্যবহার করেছি? আমার কথাবার্তায় এমন কিছু কী প্রকাশ পায়নি যার ফলে ও দ্বিধাগুলো ভেঙে এগিয়ে এসেছে। ওর চোখেমুখে মুগ্ধতা ছিল, কে বলতে পারে আমার চোখমুখ সজ্ঞানেই তাব প্রশ্রয় দেয়নি। তবে কী আমার অভিজ্ঞতা, আমার অনেক জীবনদেখা, কৌশলে ওকে আমার বাধ্য করেছে। আমি কী নারী হয়েই সচেতনভাবে ওকে প্রভাবিত করবার চেষ্টা করিনি। না কি আমিও এক নেশার আগুনে দগ্ধ হয়েছি।

"চন্দন আসেনি। যদিও কথা ছিল ইচ্ছে করলেই জিপ নিয়ে সে আমার কোয়ার্টার্সে হানা দেবে। হানা দেয়নি।

"অপেক্ষা করে করে আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললাম, যাক বাঁচা গেল। আমি বুঝতে পারছিলাম এই কয়েকদিন, আমিও একটা বিশ্রী জালে জড়িয়ে পড়ছিলাম। চন্দন যে জাল কেটেছে সেজন্যে আমিও নিরুদ্বিগ্ন হলাম।

"হঠাৎ সেদিন শেষ-বিকেলে চন্দন এসে হাজির। জিপে নয়, ট্রেনে এসেছে। বলল : জিপটা একটা গন্ধমাদনের মতন, বড় স্থূলে ওর অস্তিত্ব।'

"বললাম : 'হঠাৎ কী মনে করে?'

"ও বলল : 'কী জানি মনে হল তোমার কাছে আসার দরকার।'

"হেসে বললাম : 'হাত গুণতে জানো নাকি?'

"চন্দন বলল : 'না, সময় কোথায়। মনটাই বিশ্রী তাড়া দিয়ে নিয়ে এল। কিন্তু আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে।'

"সেদিন রাত্রে চন্দনকে আর ফিরতে দেইনি। ও যখন আমাকে অবাক করে একেবারে কাছে টেনে নিল তখনি বুঝতে পারলাম ওর শরীরে ভীষণ জ্বর। সারা রাত্রি বিছানায় সে ছটফট করেছে, ভুল বকেছে, মাথায় জলপটি দিয়ে, হাওয়া করে আমি রাত জেগেছি। ভোররাত্রে অবশ্য জ্বর কমেছে। ও আর অপেক্ষা করেনি, জরুরি কাজ আছে বলে চলে গেছে।

"চন্দনকে আমি ভালোবাসলাম। শুদ্ধ করে বলতে গেলে : আমিই ওকে আমাকে ভালোবাসতে সাহায্য করলাম। কিংবা হয়তো আমরা উভয়েই মনের দিক দিয়ে এমন প্রস্তুত ছিলাম যে প্রেমে না পড়লে আমাদের চলত না। হ্যাঁ : যদি একে তুমি প্রেমই বলো।

"ব্যাপারটা সম্পর্কে আমি পরে আরও ভেবেছি কেন এমন হল। আমার মতন মেয়ে যে জীবনে ঘা খেয়েছে, তার এই পরিণতি হল কেন? তার উত্তর হয়তো এই হবে : প্রকান্ড নির্জনতা, নতুন পরিবেশ যা আমাকে নিরাশ্রয় করে তুলেছিল, সেই মনটা একটা আশ্রয় চাইছিল, যা প্রত্যক্ষ, যা আত্মীয়, যা স্থায়ী। চন্দনও নিশ্চয় একই কারণে উৎপীড়িত হচ্ছিল। তাই আমিই তার কাছে একমাত্র আশ্রয়, যার সংগে তার দীর্ঘকালের পরিচয়। হঠাৎ এই পরিচয়-সূত্রটাই লাফিয়ে উঠে আমাদের পরস্পরের বিশ্বাসের জমিটা তৈরি করে দিল।

"তুমি বলবে : একটা জীবনে মানুষে কতবার ভালোবাসে। এর উত্তর একেকজন মানুষেব কাছে একেক রকমের। রাঢ় অঞ্চলের জমিগুলো যেমন এক ফসলের, উত্তর বাঙলার জমিগুলো দুফসলের।

"লজ্জা পেয়ে লাভ নেই, চন্দন আমাকে যেন প্রবল জোয়ারে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। আমার মতন বয়েসে এই আবেগ একটা বাড়াবাড়ি। কিন্তু ওকে বোঝাব কী করে? ওর তরুণ ইচ্ছাগুলো হঠাৎ-জাগা গবুড়ের ক্ষুধার মতন আমাকে বেসামাল করে দিল। জানো : এইভাবে এই বয়েসে শরীব-সচেতন হওয়াটা ভীষণ গোলমালের ব্যাপার। আমি দীর্ণ হয়ে পড়ি, কিন্তু ওর অজস্র ইচ্ছার ছোবলগুলো ফেরাতে পারিনে। কারণ এই সৃষ্টি আমার, তারি বাঁধনে আমি জড়িয়ে পড়েছি।

"সেদিন সুব্রতর কথা হঠাৎ মনে পড়ল। আশ্চর্য, সুব্রতর কাছ থেকে পালিয়ে এসেও সে একটা স্থির আলোর মতন আমার মনের রেলিঙে দাঁড়িয়ে রয়েছে। চন্দনের খেপাটেপনাও ওই আলোক-প্রভাকে বিচলিত করতে পারে না। সুব্রতর আচরণের সীমাবোধগুলো আমাকে একটা নির্দিষ্ট খোঁটায় বেঁধে রেখেছিল। আমি ভেবেছিলাম ওটাই আমার স্থান, ওইখানেই আমার মুক্তি। তার ফলে ওর সংগের জীবনটা আমার ছিল অনেকটা অন্য নাট্যকারের পালায় অভিনয় করার মতন। কিন্তু চন্দনের সংগে সম্পর্কের নাট্যকার আমরা উভয়েই, তাই সংলাপ মুখস্ত করার প্রয়োজনীয়তা নেই।

"বস্তুত চন্দন আমাকে সম্পূর্ণভাবে অধিকার করে বসেছে। যা সুব্রত পাঁচ বছরের আলাপে পারেনি। বলতে পারো এর কারণ কী? নাঃ তোমার কাছে বলতে আর সংকোচ করব না। বোধহয় প্রকৃতিগত গঠনের কারণেই মেয়েদের কাছে শরীর সম্পর্কটা তার স্বভাবের একটা প্রধান অংশ। এবং এই স্বভাবের কষ্টিপাথরেই সম্পর্কের গভীরতা দৃঢ় ও স্থায়ী হয়। সুব্রতর সংগে সম্পর্কে এই বিশ্বাস কোনোদিনই জন্মায়নি। তার অর্থ সুব্রত সম্পূর্ণ আমার দায়িত্ব নিতে দ্বিধা করেছে। অথচ সে-দায়িত্ব না নিলে আমি সম্পূর্ণ হইনে।

"আমি নিজেকে এতদিন অসাধারণ ভাবতাম। কিন্তু আসলে এই অসাধারণ বোধটুকু ছিল আমার ভান। এক ধরনের আত্মরক্ষাও বলতে পারো। অহরহ কানের কাছে স্তব শুনে শুনে যেমন মানুষ বিশ্বাস করে যা সে নয় তাই, তেমনি আমি সাধের বাইরে নিজের সম্পর্কে উচ্চধারণা পোষণ করেছিলাম। এ এক ধরনেব অন্ধ আদর্শের প্রতি বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ। আমি ভেতরে ভেতরে কত দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম বুঝতে পারিনি। আমি যে শেষপর্যন্ত একটি মেয়ে এবং আমারো সীমাবদ্ধতা আছে, চাওয়া পাওয়ার একটা নির্দিষ্ট জমাখরচ আছে, বুঝিনি।

"তাই কত দ্রুত আমি নিজের স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হলাম। এখানে আমাকে কোনো আদর্শবাদের চূড়া অঙ্গুলিসংকেত করে না, মনের ওপরও অত্যধিক কোনো চাপ নেই, বানানো উত্তেজনা পর্যন্ত না।

"চন্দন আর কোনো বাধা শুনতে চায় না। আর কেনই বা ওকে বাধা দেবো? আমার ভেতরেও কোনো বাধা নেই।

"হ্যাঁ। আমরা বিয়ে করছি। চন্দন যাবতীয় ব্যবস্থাই করে ফেলেছে। আশাকরি আমাদের এই সিদ্ধান্তে তোমার অনুমোদন থাকবে।"

অংশুলা স্বাতীর দীর্ঘ চিঠিখানা মুড়ে রাখতে গিয়ে হঠাৎ নজরে পড়ল পৃষ্ঠার শেষেব দিকে উল্টো করে আরও কয়েক লাইন লিখেছে সে।

লিখেছে : "চিঠি শেষ করার মুহূর্তে হঠাৎ সুব্রতর অপ্রত্যাশিত পত্র। জানিয়েছে : সম্প্রতি একটি পুত্রসন্তানের সে জনক হয়েছে। আচ্ছা বলতে পারো, এ খবর সে আমাকে কেন জানাল। আট বছর পর এই তার দ্বিতীয় সন্তান। কী জানো, আমার মনে হচ্ছে এই ঘটনাটা ওর কাছে সাঁকোর মূল্য পেয়েছে। বোধহয় এই নবজাতককে কেন্দ্র করে সে পুনর্বার তার স্ত্রীকে প্রকৃত-ভাবে ভালোবাসতে শিখল।"

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

স্মরণীয় শিল্পীর জীবনীগ্রন্থ

শিল্পী অবরে বিয়ার্ডসলী একদা শুধু লন্ডন নয়, সমকালীন মার্কিন ও ফরাসী শিল্পীদেরও প্রভাবিত করেছিলেন অসামান্য শিল্পকুশলতায়।

১৯১১ খৃস্টাব্দে ডি এচ লরেন্স তাঁর 'দি হোয়াইট পিককে" লিখেছেন ঃ

"ঘটনাক্রমে, অন্ত্যেষ্টির পরদিনই অবরে বিয়ার্ডসলীর আঁকা 'অ্যাটল্যান্টা'র একটি প্রতিলিপি এবং 'সালোমে'র একটি পৃষ্ঠচিত্র এবং আরো কয়েকটি ছবি আমার চোখে পড়ল। আমি বসে বসে দেখতে লাগলাম, আমার অন্তর এক নতুন কিছুর জন্য যেন উচ্ছ্বলিত হয়ে উঠল। আমি অভিভূত, বিস্মিত, চঞ্চল এবং মোহিত হয়ে অনেকক্ষণ ধরে ছবি দেখতে লাগলাম, কিন্তু আমার মন বা আমার আত্মা কিছুতেই যেন প্রকৃতিস্থ হতে চায় না। আমি মুগ্ধ ও অভিভূত হয়ে পড়েছি তথাপি আমার মধ্যে একটা প্রতিহত করার মত দৃঢ়তা রয়েছে . আমি সোজা এমিলির কাছে চলে গেলাম। সে চেয়ারে হেলান দিয়ে পড়েছিল। আমি তার চোখের সামনে 'সালোমে' খুলে ধরলাম।

আমি বলি, 'দেখো, এই দেখো।'

ও তাকালো, কাছের জিনিস ও ভালো দেখে না, তাই বেশী কাছে এনে ভালো করে দেখে। এদিকে ওর কথা শোনার জন্য আমি অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছি। অনেক পরে বই থেকে মুখ সরিয়ে আমার দিকে সে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল।

আমি বলি, 'কেমন?'

সে বেশ কোমল গলায় বলল, 'বেশ ভীতিজনক নয় কি?'

'না, তা কেন হবে?'

'সেইরকম ত' মনে করায়। তুমি কেন এনেছ?'

'তোমাকে দেখানোর জন্য, আমার মনে হল তুমি দেখো।'

ইতিমধ্যে আমি বেশ স্বস্তি অনুভব করছিলাম, ওর মনেও ঘোর লেগেছে দেখে আমিও স্বস্তি পেলাম।

বইটার জন্য হাত বাড়িয়ে জর্জ বলল, 'দাওনা—বইটা আমাকে দেবে?' আমি দিলাম, এবং জর্জ ছবিগুলি দেখতে বসল, 'আমি সব কিছুর চাইতে ওকেই চাই, আর এইসব নগ্ন রেখার দিকে যতই তাকাই, ততই ওকে পাবার আকুলতা জাগে। এ এক তীব্র তীক্ষ্ণ অনুভূতি, অনেকটা ঐ বক্র-রেখার মত। কি যে বলছি জানি না, কিন্তু তোমার কি মনে হয় ও ধরা দেবে আমার কাছে? এই ছবি কি ও দেখেছে?'

'না।'

'যদি দেখত, তাহলে হয়ত আমাকে কামনা করত—মানে, তার মনে এমনই তীক্ষ্ণ স্পষ্ট, তীব্র আবেগ সঞ্চারিত হত।'

'তাহলে ওকে ছবিগুলি দেখাব এবং দেখব কি হয়।'

অবরে বিয়ার্ডসলীর আঁকা ছবির এমনই ছিল সত্যিই আকর্ষণ। বিখ্যাত চিত্র-সমালোচক স্যার কেনেথ ক্লার্ক ১৯৬৬ খৃস্টাব্দের ৮ই মে তারিখের 'দি সানডে টাইমসে' লিখেছেন—

"No wonder Beardsley's drawings became a kind of Catmint to adolescents and continued to be so for almost 30 years I was one of the adolescents thus bewitched"

অবরে বিয়ার্ডসলী ছাব্বিশ বছর বয়সে পৌঁছানোর আগেই পরলোক গমন করেন। বাল্য থেকেই তিনি ক্ষয়রোগী ছিলেন এবং সংক্ষিপ্ত জীবনে এতটুকু সুস্থির থাকেন নি। বিয়ার্ডসলী অতিশয় আত্মসচেতন ছিলেন এবং নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধির বিকাশের জন্য সদা সচেষ্ট থাকতেন। প্রচুর পড়তেন, সঙ্গীতে ছিল প্রচন্ড অনুরাগ এবং রঙ্গমঞ্চে আগ্রহ। বিদ্যালয়ের পড়াশোনা তেমন অগ্রসর হয়নি এবং তার স্থায়িত্বও অনেক কম তথাপি বিয়ার্ডসলী অশেষ জ্ঞানের অধিকারী হয়েছিলেন।

স্কুল ছাড়ার পর অবস্থার ফেরে বিয়ার্ডসলী একটি ইনসিওরেন্স কোম্পানীর অফিসে কেরানীর কাজ পেয়েছিলেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ছবিও আঁকতেন। অতি অল্পকালের মধ্যেই তাঁর ছবির খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল এবং Morte d' Arthur নামক গ্রন্থটির এক লোভন সংস্করণের জন্য অনেকগুলি ছবি আঁকার কাজ পেলেন বিয়ার্ডসলী। এই কাজটি অচিরাৎ বিয়ার্ডসলীকে প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর মর্যাদা দান করল। শুধু লন্ডনের শিল্পীমহল নয়, সাগরপারেও তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। বিয়ার্ডসলীর বয়স তখনও কুড়ির নীচে।

সাফল্যের স্রোতে ভাসলেন বিয়ার্ডসলী। তাঁর প্রতিটি ছবি সমাদৃত হতে থাকে। সেই সময়টি কালান্তরের যুগ হিসাবে চিহ্নিত, এই কালান্তরের সমাজে বিয়ার্ডসলী মিশে গেলেন অতি সহজেই।

তখন হুইসলারের প্রচন্ড খ্যাতি। হুইসলার শিল্পী হিসাবে যেমন কৃতী ছিলেন, তেমনই চটকদার সরস রসিকতার খ্যাতি ছিল তাঁর। ওয়াইলড্ প্রথম দিকে হুইসলারের এই বাক্যবাগীশতায় আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এই হুইসলার বিয়ার্ডসলীর আদর্শ হলেন। বিয়ার্ডসলী তখনকার নন্দনবাদী ভঙ্গী আয়ত্ত করলেন এবং আপনাকে সেইভাবে গড়ে তুললেন। নিজের স্টুডিয়োতে চমৎকার পার্টি দিতেন, সেই সময় স্টুডিয়ো সাজানো হত কমলা ও কালো রঙে। বিয়ার্ডসলীকে কেউ কখনো ছবি আঁকতে দেখেনি। তিনি যে অনায়াসে এবং বিনাশ্রমে ছবি আঁকেন এমনই একটা ধারণা সৃষ্টি করা ছিল উদ্দেশ্য। আসলে কিন্তু তাঁর ছবির পিছনে থাকত অসামান্য নিষ্ঠা ও যত্ন। গভীর রাত্রে বাতি জেলে তিনি ছবি আঁকতেন। এই বাতিদানই ছিল তাঁর অংকন প্রতীক, হুইসলারের ছিল প্রজাপতি।

বিয়ার্ডসলী কদাচিৎ রঙিন ছবি এঁকেছেন, তাঁর অধিকাংশ কাজই ছিল কালি ও কলমের রেখাচিত্র। তাঁর আঁকা ছবিগুলির সংযম এবং নিপুণতায় আশ্চর্য হতে হয়। Morte d' Arthur গ্রন্থটির ছবি আঁকার পর বিয়ার্ডসলী অস্কার ওয়াইলডের 'সালোমে' নাটকের অলংকরণের ভার পেলেন।

এই 'সালোমে'র ছবিগুলিই বিয়ার্ডসলীর খ্যাতি বিশেষভাবে সর্বত্র ছড়িয়ে দিল। বিয়ার্ডসলীর সুনাম বদনামে রূপান্তরিত হল, এবং বিশেষ করে অস্কার ওয়াইলডের অখ্যাতির সঙ্গে তিনিও জড়িয়ে পড়লেন।

এই সেদিন ১৯৬৬-তে ভিক্টোরিয়া ও অ্যালবার্ট মিউজিয়মে যখন বিয়ার্ডসলীর আঁকা ছবিগুলি জাতীয় সম্পদ হিসাবে প্রদর্শিত হচ্ছিল তখন লন্ডনের পুলিশ একটি বইয়ের দোকানে হানা দিয়ে বিয়ার্ডসলীর আঁকা ছবির কিছু প্রতিলিপি অশ্লীল চিত্র বলে বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে গিয়েছিল। বিয়ার্ডসলীর সঙ্গে কিন্তু অস্কারের তেমন সৌহার্দ্য ছিল না, তথাপি এই বদনাম।

বিয়ার্ডসলীর আঁকা মেবেল বিয়ার্ডসলীর ছবিখানি সেইকালে ইয়েটস থেকে পাউন্ড সকল কবিকেই চঞ্চল করে তুলেছিল। এজরা পাউন্ড তাঁর The Pisan Cantos -এ লিখেছিলেন—

— and
The proud shall not be
by the proud
Amid dim green lighted
with candles
Mabel Beardsley's
red head for a glory . . .

হিজ ম্যাজেস্টিজ স্টেশনারী অফিসের তরফ থেকে ব্রায়ান রীড ও ফ্র্যাংক ডিকিনসন ১৯৬৬ র এই প্রদর্শনীর যে ক্যাটালগ প্রণয়ন করেন তা বিশেষ মূল্যবান। আগামী সংখ্যায় সেই ক্যাটালগ এবং মিঃ স্ট্যানলী উইনট্রাব প্রণীত জীবনীগ্রন্থ 'বিয়ার্ডসলী'র প্রসঙ্গে আলোচনা প্রকাশিত হবে।

—অভয়ঙ্কর

ভারতীয় সাহিত্য

মারাঠি লেখকের জীবনাবসান ॥

প্রখ্যাত মারাঠি লেখক শ্রীগোপালকৃষ্ণ ভোবে গত ১২ ফেব্রুয়ারী গোয়ার একটি হাসপাতালে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যু-কালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৪৯ বৎসর। গোয়া তাঁর জন্মভূমি। তিনি এখানে এসে-ছিলেন "মারাঠি নাট্য সম্মেলনে" অংশ গ্রহণের জন্য। তিনি যখন একটি মারাঠি সংগীতানুষ্ঠান শুনছিলেন, ঠিক সেই সময়ই অসুস্থতা বোধ করেন। তাঁকে সংগে সংগে স্থানীয় "মাবগোয়া" হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও তাঁর জীবন রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। তাঁর মৃত্যুতে মারাঠি-সাহিত্যের যে ক্ষতি হয়েছে, তা অপূরণীয়।

বাংলা ভাষা শহিদ দিবসে কলকাতায় অনুষ্ঠান ॥

বাংলা দেশ বিভক্ত হয়েছে বটে, তবু সে তার সাংস্কৃতিক ঐক্যকে ভুলে যায়নি। উভয় বাংলার ভাষা ও সংস্কৃতি এক। এপারে যে বাংলা; ওপারেও সেই একই বাংলা। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী বাংলা ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠায় পূর্ব বাংলার রাজপথ রঞ্জিত হয়েছিল, শত শহিদের রক্তে। উভয় বাংলার মানুষের বুকে সেই আত্মত্যাগের কাহিনী এখনও সমান ভাবে প্রবাহিত। পশ্চিম বাংলার মানুষ যে আজও কৃতজ্ঞতায় সংগে তা স্মরণ করে, তার প্রমাণ গত ২১ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় "ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে" অনুষ্ঠিত সভাটি। 'বাংলা ভাষা দিবস' উপলক্ষে আয়োজিত এই সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীতারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়। সভাপতির ভাষণে শ্রীবন্দ্যো-পাধ্যায় বলেন—"পশ্চিম বঙ্গের সাহিত্য ও সংস্কৃতি যেমন আমাদের অনুপ্রাণিত করে, তেমনি পূর্ব বাংলার মানুষকেও। ঠিক তেমনি ভাবেই পূর্ব বাংলার মানু-ষেরও সমান আবেদন আমাদের কাছে। উভয় বঙ্গের সাহিত্য ও শিল্প-সাধনা উভয় বঙ্গের সম্পদ।"

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন, "পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার লোক-সাহিত্যের উপ-করণ সংগ্রহ এবং সেইসব উপকরণ নিয়ে সাম্প্রতিক কালে যে গবেষণা চলছে, তাতে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের গবেষকদের মধ্যে বিশেষ কোনও যোগসূত্র থাকছে না। এ ব্যাপারে বিশেষ সক্রিয় হওয়া দরকার। যদি উভয় বঙ্গের সাংস্কৃতিক ঐক্য বজায় না থাকে, তাহলে তা ভবিষ্যতে বিচ্ছিন্নতার নামান্তর হবে।"

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "পূর্ব বাংলার শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন তখনই সার্থক হবে, যখন তাঁদের আত্ম-ত্যাগের প্রেরণায় আমরা কোন মহৎ কাজে এগিয়ে আসতে পারবো। ইংরেজিকে যাঁরা হটিয়ে দিতে চান, আমি তাঁদের সংগে একমত নই। তবু মাতৃ-ভাষাই উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হওয়া উচিৎ বলে আমি মনে করি। শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন তখনই সার্থক হবে, যখন আমরা মাতৃভাষাকে সম্মানের আসন দিতে পারবো।"

সর্বশ্রী জগদীশ ভট্টাচার্য, সত্যেন মৈত্র, গোপাল হালদার, পান্নালাল দাশগুপ্ত, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, ডঃ সুহাস ভট্টাচার্য প্রমুখও সভায় ভাষণ দেন। কাজী সব্যসাচী পূর্ব বাংলার কবিদের কবিতা পাঠ করেন এবং সত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায় সংগীত পরিবেশন করেন।

সর্বভারতীয় কবি সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য অবাঙ্গালীদের প্রয়াস ॥

সর্বভারতীয় কবি সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য গত ৮৯ ফেব্রুয়ারী কলকাতায় অবাঙ্গালী লেখক, সাংবাদিক এবং শিক্ষাবিদদের এক সভা

মনস্বী প্রেমচন্দ-এর 'রঙ্গভূমি'র রুশ অনুবাদ ॥

মনশী প্রেমচন্দ রুশ-পাঠকদের কাছে বর্তমানে একটি অতি প্রিয় নাম। সম্প্রতি তাঁর বিখ্যাত 'রঙ্গভূমি' হিন্দী থেকে রুশ ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত-হয়েছে। উপন্যাসটি অনুবাদ করেছেন তিনজন হিন্দীভাষা ও সাহিত্যবিদ—ই, বোরোভিক, ভি মাখোতিন, ভি ক্রাসোনিন-নিকয়। ভূমিকা লিখেছেন, হিন্দী সাহিত্য-গবেষক ভি বালিন। পূর্বেও ভি বালিন প্রেমচন্দ-এর সাহিত্য সম্পর্কে বহু নিবন্ধ লিখেছেন।

গত দশ বছর ধরে সোভিয়েত ইউ-নিয়নের বিভিন্ন শহর থেকে প্রকাশিত বহু পত্র-পত্রিকায় প্রেমচন্দ-এর গল্পের অনুবাদ প্রকাশিত হয়ে আসছে। ইতি-পূর্বে তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'গোদান' 'নির্মলা' প্রভৃতি সোভিয়েত পাঠকদের কাছে জনপ্রিয় হয়েছে। তাঁর গল্পের অনেকগুলি অনুবাদ সংকলনও বেরিয়েছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যান্য প্রজা-তন্ত্রের ভাষাগুলিতেও প্রেমচন্দ অপরি-চিত নন। উজবেক, তাজিক, তুর্কমেন, তাতার, কাজাখ, কির্ঘিজ, আর্মেনীয়, জর্জীয়, আজারবাইজানী, য়ুক্রেনীয় এবং এস্তোনীয় প্রভৃতি ভাষায় তাঁর গল্প ও সাহিত্যের অনুবাদ হয়ে চলেছে। হিন্দী-লেখক শ্রীহংসরাজ রহবার লেখা 'প্রেমচন্দ-এর জীবন ও সাহিত্য" নামক গ্রন্থটিও রুশ ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটির অনুবাদ করেছেন ই বোরোভিক ও ভি মাখোতিন।

গোরভিদাল-এর নতুন উপন্যাস ॥

গোর ভিদাল সাম্প্রতিক পাশ্চাত্য-সাহিত্যে একটি বিতর্কিত নাম। তাঁর 'মায়রা ব্রেকিনরিজ' উপন্যাসের বিক্রয়সংখ্যা চল্লিশ হাজার ছাড়িয়ে গেছে।

এ উপন্যাসের নায়িকা মায়রা। উপর-তলার একটি ঘরে কাহিনীর সূত্রপাত। নায়ক তাকে প্রথমে তার খাস কামরায় শুধু বস্ত্রহীনা করেনি, গলার চারপাশে একটি ধাতব হ্যাংগার পেঁচিয়ে তার ওপর ব্যভিচার করেছে। সে তখন নিঃশ্বাস নিতে পারছিল না।

এইসব কৌতুককর ঘটনার সমাহারে 'মায়রা ব্রেকিনরিজ' ভরপুর। একেকটি ঘটনা স্বচ্ছন্দে গড়িয়ে গেছে পরবর্তী ঘটনার দিকে। পাশ্চাত্য সমালোচকবর্গ এ ব্যাপারে নিরুত্তর থাকতে পারেননি। তাঁদের মনেও জিজ্ঞাসার সূত্রপাত হয়েছে, তা হলে কি সাহিত্যের শালীনতাবোধ নিম্ন-মুখী? না, ফ্যাসনেবল ক্যাম্প-এর প্রাধান্য-উচ্চচূড়?

গোর ভিদাল ছিলেন মূলতঃ সিরিয়াস লেখক। তাঁর ঘটনাক্রম অনেক সময় এলো-মেলো মনে হলেও অপ্রাসঙ্গিক নয়। একদা তিনি রাজনীতির আসরে নেমেছিলেন একজন ডেমোক্র্যাট হিসেবে। তাঁর পূর্ব-বর্তী রচনা—উপন্যাস (জুলিয়ান), চিত্রনাট্য (ভিজিট টু এ স্মল প্লানেট), এবং সমা-লোচনার গ্রন্থ (রকিং দি বোট)।

এইসব রচনায় মায়রা ব্রেকিনরিজের কোন প্রস্তুতি নেই। ভিদাল ও তাঁর প্রকাশক উপন্যাসটির উপভোগে নাম-চরিত্রের যৌন-সমস্যার একটি স-সংশয় উপাদানের দিকেই অঙ্গুলি-সংকেত করেছেন। এবং চতুর ভাবে বোঝাতে চেয়েছেন যে গ্রন্থটি আদৌ সমালোচনার জন্য নয়। যে কোনো বিবেকবান পাঠকের কাছে মায়রার যৌন-পরিচিতির চাবিকাঠি ইঙ্গিতময় ধ্বনি-সংকেতের আবহে সংকট-জনক। নায়িকা 'মায়রা হলিউডী মানসিক-তার দ্বারা তাড়িত এবং যৌন-ব্যাপারে অসতর্ক ও গোড়ামিহীন পুরুষদের দ্বারা বেপরোয়া ভাবে ধর্ষিতা। মায়রার কাছে যৌনতাই শক্তির উৎস।

ভিদাল ঘটনাক্রমে হিউমার ও মন-স্তাত্ত্বিক উত্তেজনার সুযোগ গ্রহণ করেছেন। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন; সাহিত্য নয়, পর্দাই এ যুগের লেখকের নির্দিষ্ট চেহারায় পরিচালিত করছে। পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্যও ভিদাল চিন্তিত। হোমোসেক্সুয়ালিটির প্রসারের

অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন শ্রীকল্যাণমল লোড়া। সম্মেলনের সভাপতি শ্রীসতীকান্ত গুহ সম্মেলনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে ভাষণ দেন। শ্রীসীতারাম সাকসেরিয়া এই প্রথম সর্ব-ভারতীয় সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য আবেদন জানান। তিনি বলেন, "সরকারী প্রচেষ্টায় যে সব সম্মেলন হয়, তাতে খুব প্রাণ থাকে না। এই কারণেই বেসরকারী প্রচেষ্টায় আয়োজিত এই সম্মেলনের খুবই প্রয়োজনীয়তা আছে।"

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র বলেন, "এই কবি সম্মেলন যেন তথাকথিত সম্মেলনে পর্যবসিত না হয়। এখানে যেন তরুণ লেখকরা সমবেত হয়ে একে প্রাণবন্ত করে তোলে।" শ্রীআশিস সান্যাল সম্মেলনের সম্পাদকীয় রিপোর্ট দেন। ভারতী তামিল সঙ্ঘের সম্পাদক শ্রীবি শংকরনারায়ণম, মালয়ালী সমাজের সম্পাদক শ্রীএন চন্দ্রশেখরম, হিন্দি কবি শ্রীকুমারেন্দ্র পরেশনাথ সিং ও শ্রীমতী কিরণ জৈন, উর্দু কবি শামসুর জামান, ডঃ মোহিত লাহিড়ী, কবিতা সিংহ, রজনী পাণিকর শ্যামল বসু প্রমুখও আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

শিশু সাহিত্যে পুরস্কার ॥

আধুনিক ভারতের বিভিন্ন ভাষায় শিশু-সাহিত্য রচনার জন্য ভারত সরকারের শিক্ষা-মন্ত্রক থেকে পনেরজনকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। প্রত্যেকে এক হাজার করে টাকা পেয়েছেন। বাংলায় পুরস্কার পেয়েছেন শ্রীশৈলেন ঘোষ "মিতুল নামে পুতুলটি" গ্রন্থের জন্য। নিচে পুরস্কার-প্রাপ্ত লেখকদের নাম এবং গ্রন্থের নাম দেওয়া যাচ্ছে—

অসমীয়া—"মনি বাণী আর আখন ফুলানি" গ্রন্থের জন্য শ্রীসান্ত্বনু তামুলি।

গুজরাটি—"সচরাচর নিধারা কুণ্ডাটি" গ্রন্থের জন্য শ্রীশোলি পার্ভরি এবং শ্রীরসিক শাহ্।

হিন্দি—"টিক টিক টুন টুন" গ্রন্থের জন্য শ্রীমতী সাকুন জৈন এবং 'দুরবিন কি কাহিনী" গ্রন্থের জন্য শ্রীবেদ মিত্র।

কানাড়া—"আমা-এ পুত্তপ্রমিংগলু" গ্রন্থের জন্য শ্রীজে এন বব্বলাপাবু।

কাশ্মীরী—"ডন কুইক্সোট" গ্রন্থের অনুবাদের জন্য শ্রীএস এল সাধু।

মারাঠি—"গোগরামচা চাটার" গ্রন্থের জন্য শ্রীনারায়ণগোপাল ধরুপ।

ওড়িয়া—"ছাবিটিকি গপটিক" গ্রন্থের জন্য শ্রীঅনন্ত পটনায়ক।

পাঞ্জাবী—"ফুলের যুগ আছে" গ্রন্থের জন্য শ্রীএস হবিন্দর সিং।

সিন্ধি—"মুরবদার মুখবন্ধ" গ্রন্থের জন্য শ্রীলক্ষণ বাম্ভানি।

তেলুগু—"নারথানা কথা" গ্রন্থের জন্য শ্রীনটরাজ রামকৃষ্ণ।

তামিল—"নাদু কচা নল্লভারগল" গ্রন্থের জন্য শ্রীটি এম কালিয়া পারুমাল।

উর্দু—"হামারা হিন্দুস্তান" গ্রন্থের জন্য শ্রীআর্থার পারভিজ।

প্রশংসনীয় উদ্যোগ ॥

শান্তি লাহিড়ী আবার একটি প্রশংসনীয় কাজে হাত দিয়েছেন। কিছুদিন আগে তাঁর প্রচেষ্টায় আধুনিক 'কবিতার যে লং প্লেয়িং রেকর্ড বেরিয়েছিল তা বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এই সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়েই তিনি তাঁর দ্বিতীয় লং প্লেয়িং রেকর্ড প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছেন। এবারের উদ্যোগে আরও কিছুটা অভিনবত্ব আছে। শুধুই প্রেমের কবিতার রেকর্ড হবে এবার। মাইকেল থেকে আরম্ভ করে তরুণতর কয়েকজন কবি এরই মধ্যে রেকর্ড করবার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছেন। এবার কবিতার সঙ্গে ব্যাক গ্রাউন্ড মিউজিক'ও ব্যবহার করা হবে। আধুনিক কবিতাকে জনপ্রিয় করে তোলার ব্যাপারে তাঁর প্রচেষ্টা কবিতা-অনুরাগীদের সহযোগিতা লাভ করবে বলে আশা করা যায়।

দ্বারাই তিনি এ সমস্যাটির সমাধান করতে চান।

ভিদালের মতে, উপন্যাসের বিষয়টি নিয়ে একটি চলচ্চিত্র হতে পারে। এই উদ্দেশ্যে তিনি আন্দ্রেই কেন্দ্রাকে উপন্যাসটি দেখিয়েছিলেন। কিন্তু কন্দ্রা বুঝতে পারেননি, এটে কিভাবে অভিনয় করা যায়।

কবি ক্রিস্টোফ মেকেল ॥

কবি ক্রিস্টোফ মেকেল-এর নতুন কাব্যগ্রন্থের নাম 'বেই লেবাজেবেন জু সিংগেন'। সমালোচক অগাস্ট উলকে-এর মতে, এই গ্রন্থের পাঠক প্রাতভাবান একজন কবির সান্নিধ্য অনুভব করবে।

মেকেলের কবিতায় যৌবন, শক্তি ও সজীবতার প্রাচুর্য। এই গ্রন্থ প্রকরণগত পার্থক্যে তাঁর পূর্ববর্তী রচনা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

মেকেল এই সংকলনে মুক্তছন্দের পরিবর্তে সনেট ও ব্যালাডের কঠোর রীতিটিই গ্রহণ করেছেন।

আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস : স্প্রিং রিভার ॥

লুথিয়ান লেখক আন্তানস্ ভেনক্রোভার আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস 'স্প্রিং রিভার' সম্প্রতি রাশিয়ান ভাষায় অনুদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। উপন্যাসটি দুই ভাগে বিভক্ত। ভেন ক্রোভা লিখেছেন, প্রতিটি ঘণ্টা, দিন, মাস বয়ে যাচ্ছে। সুখ-দুঃখ কিছুই আর ফিরে আসে না।" সেজন্যেই তাঁর জিজ্ঞাসা, মানুষের জীবন কি নদীর মতো নয়? শৈশব কিংবা যৌবন কি পুনরায় ফিরে আসে? বসন্তের নদীর মতোই জীবনের এই সময় সূর্যালোক-মণ্ডিত। বসন্তে যেমন নদীর ধার ফুলে ফুলে ঢেকে যায়, উঁচু আকাশ ঢেউয়ের ওপরে ঝিকমিকিয়ে ওঠে, তেমনি জীবনের এই কালটা বহু বৃহত্তর সম্ভাবনার প্রতিফলনে ধন্য।

এই জন্যই ভেনক্রোভা বসন্ত-নদীর বিপুল জলরাশির গতিবেগে সঞ্চারিত করেছেন উপন্যাসের সর্বত্র। সেন্ট একসুপেরির কথা দিয়ে কাহিনী আরম্ভ করেছেন, "সাত্যকারের অলৌকিকতা কতো শব্দহীন' জীবনের মূল ঘটনাগুলি অত্যাশ্চর্যরূপে কতো সরল! এইসব মুহূর্তের মধ্যে কতটুকুই বা আমি বলতে পারি! কতটুকুই বা আমার স্বপ্নে মূর্ত্তি দেবো!"

লেখক অত্যন্ত সহজ ভাবে সেই অতীত দিনের দ্বার-উদ্ঘাটন করেছেন। তাঁর শৈশবের ঘর, জ্বলন্ত উনুনের ওপরে

বিদেশী সাহিত্য

লোহার কেটলি, মায়ের গরম হাত, দুধের মিষ্টি গন্ধ, বাবার গম্ভীর গলা কাপড়-কাচার টবে স্নান করা, হ্রদের ওপরে বিদ্যুৎ ও রামধনুর দৃশ্যাবলী তিনি অকপট আন্তরিকতার সঙ্গে অংকন করেছেন। তারপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধে কাইজারের সৈন্যদের লুণ্ঠিয়ানা বিজয়, ছাত্রজীবন, পিতার মৃত্যু ও জীবিকার প্রয়োজনে উপন্যাস লিখতে বাধ্য হওয়ার ঘটনা পর্যন্ত—এই উপন্যাসের কাহিনী প্রসারিত।

পাঠক এই উপন্যাসে কোন ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ পান না অথচ অজস্র ঘটনা তার চারদিকে ছবির মতো ভেসে ওঠে। সব-চাইতে লক্ষণীয় বিষয় স্প্রিং-রিভারের নায়ক নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও নিজেকে অক্ষত রেখে জীবনের পথে অগ্রসর হয়ে এসেছে। নদীর মতোই তার জীবনও উৎসস্থলের সংকীর্ণতাকে অতিক্রম করে ক্রমশঃ প্রসারিত ও বেগবান।

'একুশে ফেব্রুয়ারী' স্মরণে কলিকাতায় আয়োজিত জনসভায় ভাষণ দিচ্ছেন শ্রীতারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়। মঞ্চে অগ্রগণ্য আরও কয়েকজন সাহিত্যসেবীকে দেখা যাচ্ছে।



নতুন বই

সাংবাদিকতার গোড়ার কথা (আলোচনা) — এফ ফ্রেজার বণ্ড। অনুবাদ : সন্তোষকুমার দে। এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা—১২। দাম—চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

বিশ শতকের প্রথম থেকেই সাংবাদিকতার ওপর দেশেবিদেশে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হতে থাকে। যদিও সংবাদপত্রের বিকাশ আরও অনেককাল আগেকার কথা। সমগ্র বিশ্বের দ্রুত অগ্রগতি এবং আন্তর্জাতিক উত্তেজনা সংবাদপত্রের মূল্য বাড়িয়েছে। বর্তমানে আমাদের দেশের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতার ক্লাশ চালু হয়েছে। সেখানে ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যাও ক্রমশ বৃদ্ধির দিকে। সাংবাদিকতা কেবল গ্রন্থ পাঠে শেখা যায় না, তার জন্য প্রয়োজন প্র্যাকটিক্যাল জ্ঞানের। সেগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমও বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে।

এফ ফ্রেজার বণ্ড রচিত 'অ্যান ইনট্রোডাকশন টু জার্নালিজম' গ্রন্থখানি মার্কিন দেশে বিশেষ সমাদৃত। এই সুদীর্ঘ গ্রন্থে বিষয়-বিন্যাস এবং আলোচনাভঙ্গী বৈজ্ঞানিক এবং আধুনিক তথ্যনিষ্ঠ। সাংবাদিকতার প্রকৃতি, মাধ্যম, স্টাইল, পেশাগত ভাষা, জনগণের রুচি পাঠক ও তাদের কৌতূহল, সংবাদের প্রকৃতি, সংবাদকাহিনী, সংবাদকাহিনীর প্রধান শ্রেণী, সংবাদ কিভাবে ব্যাপক মাধ্যমে পৌঁছায়। প্রধান প্রধান সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান, সংবাদপত্রের উদ্দেশ্য ও পরিচালনা সম্পাদনা ও মুদ্রণ, শিল্প ও ব্যবসায় সংক্রান্ত সাংবাদিকতা, সম্পাদকীয় প্রবন্ধ, এবং পৃষ্ঠা, কলম, প্রবন্ধকার, ভাষ্যকার, চিত্তবিনোদনে সাংবাদিকতা, জনসেবায় সাংবাদিকতা, চিত্রে সাংবাদিকতা, সাংবাদিকতা ও আইন, রেডিও এবং টেলিভিশনে সাংবাদিকতা, ব্যাপক প্রচার মাধ্যমে বিজ্ঞাপন, জনসংযোগের ক্ষেত্র, মর্গ বা শবাধার এবং তথ্য গ্রন্থশালা, বিবিধ শিল্পের সমালোচনা প্রভৃতির আলোচনা আছে বর্তমান গ্রন্থে। সংবাদপত্রের ক্রমবিকাশ থেকে তার আধুনিক রূপ এবং প্রত্যাহের জীবনধারায় তার ভূমিকা বর্তমান গ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

সাংবাদিকতার ছাত্রদের প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে গ্রন্থখানি রচিত। গ্রন্থকার দীর্ঘকাল নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগে অধ্যাপনা করেন। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত হওয়ায় শিক্ষানবিশীদের পক্ষে 'সাংবাদিকতার গোড়ার কথা'র প্রয়োজনীয়তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। বিশেষ করে আমাদের দেশে সাংবাদিকতা পড়াবার ব্যবস্থা থাকলেও উপযুক্ত গ্রন্থের অভাব লক্ষ্য করা যায়। ছাত্রছাত্রীদেরও তার জন্য অনেক দুর্ভোগ ভুগতে হয়। সে ক্ষেত্রে গ্রন্থখানি নানাধরনের প্রয়োজন মেটাতে পারবে। সহজে বোঝবার জন্য বিভিন্ন চিত্রাদিও রয়েছে। এই মূল্যবান গ্রন্থখানি বাঙলা ভাষায় প্রকাশের জন্য প্রকাশককে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

যোগীন্দ্রনাথ সরকার শতবার্ষিকী স্মরণী— কার্তিক ১৩৭৪। সিটি বুক সোসাইটি। ৬৪ কলেজ স্ট্রীট। কলকাতা—১২। দাম—চার টাকা।

শিশুসাহিত্যিক যোগীন্দ্রনাথ সরকারের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে শতবার্ষিকী জয়ন্তী সমিতি এই স্মারক গ্রন্থখানি প্রকাশ করেছেন। লিখেছেন যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অন্নদাশংকর রায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, লীলা মজুমদার, বিমল ঘোষ (মৌমাছি), পরিমল গোস্বামী, স্বপনবুড়ো, বুদ্ধদেব বসু, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, কিরণকুমার রায়, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, নিখিলরঞ্জন রায়, নরেন্দ্র দেব, বনফুল, বিভূতিবিহারী ভট্টাচার্য, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আশা দেবী, রবীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনির্মল বসু, সুধীরঞ্জন দাস, সজনীকান্ত দাস, আশাপূর্ণা দেবী এবং আরো অনেকে। সম্পাদনা করেছেন শ্রীহীর গঙ্গোপাধ্যায়।



তস্য তস্য অথবা সূর্য কাঁদলে সোনা

[উপন্যাস]

প্রেমেন্দ্র মিত্র

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তিনি নিজেও হাতে আঁকশি নিয়ে জল ঠেঙাচ্ছেন না কি? ঠেঙালে জল সরে, না, সমান জোরে পাল্টা ঘা দেয়?

নতুন দেশের মানুষ সম্বন্ধে পিজারোর নীতি সেইদিন থেকেই বদলেছে। বদলেছে অন্ততঃ তখনকার মত।

আর মারকাট লুট-তরাজ নয়। বন্ধুর মত প্রীতির হাত বাড়িয়ে দিয়ে অজানা দেশের রহস্যময় দুর্গমতা জয় করতে এগিয়ে যাওয়া।

পিজারো পোনেরোশ বত্রিশ খৃস্টাব্দের মে মাসে টাম্বেজ শহরে সামান্য কিছু অক্ষম রুগ্নকে রেখে ইংকা সাম্রাজ্যের হৃদয়স্থল খুঁজতে তুম্বায় কিরাটী কাথি-সিরেবাসের দিকে যাত্রা সুরু করেন।

পথে টাম্বেজ থেকে নব্বই মাইল দূরে সান মিগুয়েল নামে একটি নতুন শহরেরও পত্তন করে যান। এ শহর ছাড়বার আগে এ পর্যন্ত যা কিছু সংগ্রহ হয়েছে সমস্ত সোনা রুপো গালিয়ে তার পাঁচভাগের একভাগ যথারীতি সম্রাটের জন্য বরাদ্দ করে বাকি সব কিছু দেনা শোধের জন্যে তিনি পানামায় পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। দেনা তো কম নয়, জাহাজ যার কাছে কেনা হয়েছে তার কাছে যেমন, তেমনি মালপত্র অস্ত্র-শস্ত্র সব কিছুর যোগানদারদের কাছেই তখনও তাঁরা বাকি দামের জন্যে দেনদার। সে দেনার টাকা মেটাবার জন্যে তাঁর লোক-লস্করদের ভাগের সোনাদানাও তাঁকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিতে হয়েছে। তারা যে পিজারোর কথায় বিশ্বাস করে ভবিষ্যতের আশায় অত কষ্টের ও সাধের বখরা ছাড়তে রাজী হয়েছে এতেই অভিযাত্রীদের মধ্যে তখন নতুন উৎসাহের সঞ্চার হয়েছে বলে বোঝা যায়।

এ উৎসাহ তারপর ম্লান না হয়ে আরো তীব্র হবার কারণই ঘটেছে।

প্রায় আধা-মরুর তীরভূমি ছেড়ে যত তারা আকাশছোঁয়া পাহাড়ের দেশে এগিয়েছে তত মধুর অপরূপ হয়ে উঠেছে তাদের পরিবেশ। আর সেই ভাপসা জলা-জংলার দুর্দশা নয়, চারিদিকে যেন স্বপ্ন-রাজ্যের ক্ষেত-খামার বাগান বিছানো। এদেশের লোক পাহাড়ী নদীকে বাগ মানিয়ে চাষের জন্যে সেচের কাজে লাগাতে শিখেছে, পাহাড়কে খাঁজে খাঁজে কেটে ফসলের ক্ষেত বানাবার কৌশল তারা জানে। যেখানে ক্ষেত খামার গ্রাম নেই সেখানে বিরাট সব অজানা মহীরুহের অরণ্য আর ঢেউ-এর পর ঢেউ তোলা পাহাড়ের সারির মহিমাময় রূপ। ইংকাদের প্রতাপ যেন সে নিসর্গ শোভার মধ্যে ফুটে উঠেছে।

সুষ্ঠুভাবে অগ্রসর হবার জন্যে পিজারোর বাহিনী প্রায় সর্বত্রই সাদর অভ্যর্থনা পেয়েছে এবার। যেখান দিয়ে তারা গেছে সেখানকার বসতির লোকেরা অতিথি হিসেবে তাদের সৎকারের কোনো ত্রুটি রাখেনি।

যাত্রাপথে পার্বত্য উপত্যকায় এই সব বসতিতে পিজারো যা দেখেছেন শুনেছেন তা বেশ একটু ভয়-ভাবনা জাগাবার মত। ইংকা সাম্রাজ্যের বিধি-ব্যবস্থা যে কিরকম উঁচুদরের তীরভূমি থেকে পাহাড়ের দেশে আসবার পথে পদে পদে তার নিদর্শন মিলেছে। পার্বত্য নদী কোথাও বেঁধে কোথাও সুড়ঙ্গপথে চালিয়ে তাদের সেচের ব্যবস্থা তাঁর নিজের দেশকেও লজ্জা দেবার মত। তীরভূমি থেকে সমস্ত পার্বত্য অঞ্চলে দূর-দূরান্তরের যোগাযোগের জন্যে যেভাবে রাস্তাঘাট তৈরী ও তা রক্ষার ব্যবস্থা চালু রাখা হয়েছে তা সত্যিই বিস্ময়কর। নিরক্ষর পিজারোর পূর্তবিদ্যা সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান না থাকলেও এ সব দুঃসাধ্য কারিগরির অসাধারণত্ব বুঝতে কষ্ট হয় নি। নেহাৎ নগণ্য না হলে পার্বত্য পথের প্রতি জনপদে পিজারো ইংকা নরেশের জন্যে নির্দিষ্ট বিশাল সব পান্থ নিবাসই শুধু দেখেন নি, দেখেছেন প্রতিরক্ষার সুনির্মিত সব দুর্গ।

জনপদের অধিবাসীদের কাছে ইংকা সাম্রাজ্যের কিছু কিছু বিবরণও তিনি সংগ্রহ করেছেন। মাত্র বাষট্টিজন ঘোড়সওয়ার নিয়ে সবশুদ্ধ একশ আটষট্টি জন সেনা যার সম্বল তাঁর পক্ষে সে বিবরণ একেবারেই মনোরম নয়।

ইংকা সাম্রাজ্য কত বড় আর কতখানি তার ঐশ্বর্য এ সবের চেয়ে ইংকা নরেশের সৈন্যবল কত ও কি দরের সেই কথা জানবার আগ্রহই পিজারোর তখন বেশী। সঠিক খবর পাওয়া না গেলেও তাঁর মুষ্টিমেয় বাহিনীকে ইংকা সাম্রাজ্যের বিরাট সেনাদল যে পায়ে মাড়িয়েই শেষ করে দিতে পারে এটুকু পিজারো জেনেছেন।

সৈন্যবল কত ইংকা নরেশের? কেউ তা ঠিকমত বলতে পারে না কিন্তু এটুকু তারই মধ্যে জানা গেছে যে সম্প্রতি ইংকা সম্রাট যেখানে শরীর সারাবার জন্যে

আস্তানা নিয়েছেন সেখানেই তাঁর সংগে আছে অন্ততঃ হাজার পঞ্চাশ সেপাই।

পিজারোর কি এবার মানে মানে ফিরে যাবার ব্যবস্থাই করা উচিত ছিল না?

কিন্তু তিনি তা করলেন কই? একশ' আটষট্টি জন সৈন্য সংগে নিয়েই তিনি আতাহুয়ালপার সংগে দেখা করবার জন্য কাক্‌সামালকার উদ্দেশে এগিয়ে চললেন।

আতাহুয়ালপা কে তা বোধহয় আর বলতে হবে না।

তিনিই হলেন সূর্যপ্রভব ইংকা সাম্রাজ্যের অধীশ্বর, আর কাক্সামালকা হ'ল পেরুর এক আশ্চর্য ঝরণা-জলের শহর, তখনকার ইংকা নরেশদের মত এখনও মানুষ যেখানে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্যে যায়।

ইংকা আতাহুয়ালপার নিজের ডেরায় কর্ডিলিয়েরাস-এর পার্বত্য গোলোকধাঁধা ভেদ করে এ ভাবে যাওয়া এক হিসেবে বাতুল গোঁয়ার্তুমি ছাড়া কিছু নয়। কি করবেন পিজারো তাঁর ওই কটা সংগী নিয়ে সেই ইংকা সম্রাটের কাছে উপস্থিত হয়ে? তিনি কি শুধু সেই মহামহিমের দর্শনলাভের জন্যেই যাচ্ছেন? অকূল সাগর আর দুর্গম গিরি-মরু পেরিয়ে এসেছেন শুধু কিছু অনুগ্রহ ভিক্ষা করতে?

সে অনুগ্রহ চাইলেই যে পাবেন তারই বা ভরসা কি? রাজা-গজার মেজাজের কিছু ঠিক আছে! পিজারো আর তাঁর দলবল এ অজানা দেশের রেওয়াজ দস্তুর আদব-কায়দা কিছুই জানেন না বললে হয়। সামান্য একটু ভুলচুক হওয়া আশ্চর্য কি! আর তাতেই ইংকা রাজ্যেশ্বরের মেজাজ যদি বিগড়ে যায়, তখন? যে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য ইংকা আতাহুয়ালপার সংগে রক্ষী হিসেবে আছে তারা সবাই একটা করে টোকা দিলেই ত তাঁরা গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে যাবেন। যদি বা তাদের এড়িয়ে কোনমতে কাক্সামালকা থেকে পালাতে পারেন, তারপর নিস্তার পাবেন কি? এ পাহাড়ী গোলকধাঁধার রাজ্যে পথে পথে দুর্গের পাহারা। তা ছাড়া দূর-দূরান্তরে রাজাদেশ নিয়ে যাওয়া ও খবর দেওয়া নেওয়ার জন্যে দৌড়বাজ দূতের ব্যবস্থা আছে। তাঁর পাঁচ পা না যেতে যেতেই তাঁদের খবর পাহাড় থেকে সাগর-তীর পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।

এ সব কথা একেবারেই ভাবেন নি পিজারো এমন নির্বোধ গোঁয়ার সাঁত্যই নয়। তবু তিনি যে অটল সংকল্প নিয়ে কাক্সামালকা শহরের দিকে এগিয়ে গেছেন তা শুধু বাতুল জেদের জন্যই বোধহয় নয়। ভরসা পাবার মত কিছু একটা তিনি সম্ভবতঃ জেনেছিলেন।

ভরসা যা থেকে পেয়েছিলেন তা কি ইংকা সাম্রাজ্যের সাম্প্রতিক ইতিহাস? মনে হয় তাই। এ বিশাল বহুসাময় সাম্রাজ্যের ভয়-জাগানো নানা বিবরণের মধ্যে আতাহুয়ালপার রাজ্যেশ্বর হওয়ার কাহিনীটুকুই হয়ত তাঁকে কিছুটা আশা দিয়ে থাকতে পারে।

আশা এই কারণে যে আতাহুয়ালপার ভাগ্যে নিরংকুশ সাম্রাজ্য লাভ ঘটে নি। রক্ত-সমুদ্র পার হয়ে তাঁকে সিংহাসনে পৌঁছোতে হয়েছে। আর তাও তিনি পৌঁছেছেন মাত্র সেদিন ভ্রাতৃহত্যার পাতকে কলঙ্কিত হয়ে।

ইতিহাসের জ্ঞান নিরক্ষর পিজারোর ছিল না বটে কিন্তু ধূর্ত বিচক্ষণতা নিশ্চয় ছিল যাতে ঘরোয়া খুনোখুনিই যে বাইরের দুষমণির রাস্তা সাফ করে দেয় তা তিনি বুঝতেন।

সাম্রাজ্য নিয়ে যে ঘরোয়া সংগ্রামে আতাহুয়ালপাকে ভ্রাতৃহত্যার পাতকী হতে হয় ইংকা রাজবংশের ইতিহাসে তা অভাবনীয়।

ইংকাদের আদি অভ্যুত্থান টিটিকাকা হ্রদের তীরের সময়ের কুজ্ঝটিকায় অস্পষ্ট। নিজেদের যাঁরা সূর্যের সন্তান বলতেন সেই ইংকা রাজবংশের ইংকা টুপান যুপানকি ছিলেন এক অসামান্য পুরুষ। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে তাঁর মৃত্যু হয়। তার আগেই ইংকা সাম্রাজ্য তাঁর বাহুবলে উত্তরে বর্তমান ইকোয়েডরের কুইটো থেকে দক্ষিণে এখাকার চিলি রাজ্যের মরুপ্রায় তীরভূমি আতাকামা ছাড়িয়েও বিস্তৃত হয়েছে।

ইংকা যুপানকির পুত্র ও উত্তরাধিকারী হুয়াইনা কাপাক, কীর্তিতে পিতাকেও তারপর ছাড়িয়ে গেছেন। ইংকা সাম্রাজ্যের সবচেয়ে সুখ শান্তি ও সম্মানের যুগ তাঁর রাজত্বকালেই এসেছিল কিন্তু এ সাম্রাজ্যের ধ্বংসের বীজও তিনি নিজের অজ্ঞাতে রোপণ করে গিয়েছিলেন।

পোনেরোশ চব্বিশের নভেম্বর মাসে পিজারো যখন প্রথম পানামা বন্দর থেকে 'সুর' কাদিলে সোনার দেশ আবিষ্কারের আশায় পাড়ি দেন, হুয়াইনা কাপাক তখনও জীবিত।

নূতন মহাদেশে শ্বেতাঙ্গ সম্পূর্ণ অপরিচিত এক জাতের বিদেশী মানুষের পদার্পণের কথা তিনি জেনে গিয়েছিলেন বলে শোনা যায়। জেনেছিলেন সম্ভবত পিজারোর প্রথম অভিযান সুরু হবার আগেই বালবোয়া প্রশান্ত মহাসাগর আবিষ্কার করে সেণ্ট মাইকেল উপসাগর পার হয়ে ইংকা সাম্রাজ্যের প্রথম কিংবদন্তী যখন শোনেন তখনই এই অচেনা আগন্তুকদের খবর হয়ত হুয়াইনা কাপাকের কানে পৌঁছেছিল। তখন যদি এ খবর নাও পেয়ে থাকেন, পিজারো আর আলমাগ্রো তাঁদের প্রথম অভিযানে রিও দে সান খুয়ান নদী পর্যন্ত পৌঁছোলে তার বিবরণ হুয়াইনা কাপাক নিশ্চয় পেয়েছিলেন। শোনা যায় এ বিবরণ শুনে তিনি নাকি বেশ একটু বিচলিত হয়েছিলেন ভবিষ্যতের কথা ভেবে। পিজারোর সৈনাদের বন্দুক ও সওয়ারী ঘোড়ার বর্ণনা বেশ একটু অতিরঞ্জিতভাবেই কাপাক শুনেছিলেন নিশ্চয়। এ রকম অদ্ভুত যাদের শক্তি তাদের নাস্তানাবুদ হওয়া আর ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাওয়ার কথা জেনেও হুয়াইনা কাপাক নিশ্চিন্ত হননি। দিকচক্রবালে সামান্য একটা কালো ফোঁটা থেকেই ইংকা সাম্রাজ্যের ভিৎ নাড়ানো প্রলয়-তুফানের আবির্ভাব তিনি নাকি অনুমান করেছিলেন।

নিজের অনুমান সত্য হয়ে ওঠা দেখে যাবার দুর্ভাগ্য তাঁর হয়নি। সঠিক তারিখ নিয়ে কিছু মতভেদ আছে তবু পোনেরোশ পঁচিশ কি ছাব্বিশে তিনি মারা যান।

মারা যাবার আগে এমন একটি কাজ তিনি করে যান যা ইংকা রাজবংশের চিরকালের রীতি ও সংস্কারের বিরোধী। ইংকা রাজবংশের প্রাচীন রীতি অনুসারে ইংকা নরেশের নিজের ভগিনীই একমাত্র খাসরাণী হবার যোগ্য এবং তারই প্রথম পুত্রসন্তান রাজশক্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী।

সে হিসেবে হুয়াইনা কাপাকের সাম্রাজ্য তাঁর বৈধ বিবাহজাত জ্যেষ্ঠ পুত্র হুয়াসকারের ওপরই বর্তাবার কথা। হুয়াসকার পুত্র হিসেবে কাপাকের অপ্রিয়ও ছিলেন না। তাঁর হুয়াসকার নামের কুইচুয়া ভাষার অর্থ হল শৃংখল। এরকম অদ্ভুত নাম রাখবার কারণ এই যে হুয়াসকারের জন্মোৎসবের নাচের আসরে অভিজাত খানদানীদের জাতীয় নৃত্যের সময় ধরবার জন্যে হুয়াইনা কাপাক চারশ হাতেরও বেশী লম্বা ও জোয়ান মানুষের কব্জির মত মোটা একটি স্বর্ণশৃংখল তৈরী করিয়েছিলেন।

হুয়াসকারের প্রতি তাঁর স্নেহের অভাব তারপর ঘটেনি, কিন্তু আর এক টান তাঁর ছিল প্রবলতর।

হুয়াইনা কাপাক উত্তরের কুইটো জয় করবার পর সে রাজ্যের শেষ স্কিরি বা অধীশ্বর পরাধীনতার দুঃখেই মারা যান। কাপাক তাঁর কন্যাকে তখন বিয়ে করেন। তখনকার যুগের প্রায় সব দেশের বাজাবাদশার মত ইংকাদের বৈধ মহিষী ছাড়া অন্য রাণী ও শয্যাসঙ্গিনী থাকত অসংখ্য। কাপাকের সবচেয়ে প্রিয় রাণী ছিল কিন্তু কুইটোর এই রাজকন্যা। এরই প্রেমে শেষ জীবনটা তিনি নিজের রাজধানী ছেড়ে কুইটো থেকেই শাসনকার্য চালিয়েছেন।

কুইটোর এই রাজকন্যাই আতাহুয়ালপার জননী। ছেলেবেলা থেকে আতাহুয়ালপা বাপের সঙ্গে সংগেই থেকেছে। বড় হয়ে উঠেছে তাঁরই শিক্ষায় দীক্ষায় স্নেহের প্রশ্রয়ে। ইংকা ছাড়া আতাহুয়ালপার শরীরে অন্য রক্ত ছিল বলেই বোধহয় ছেলেবেলা থেকে তার মধ্যে একটা অতিরিক্ত বুদ্ধির উজ্জ্বলতা আর প্রাণের উচ্ছলতা দেখা গেছে। দিনে দিনে পুত্রস্নেহাতুর হুয়াইনা কাপাকের তিনি নয়নের মণি হয়ে উঠেছেন। মৃত্যুকালে স্নেহান্ধ হয়েই হুয়াইনা কাপাক ইংকা রাজবংশের সমস্ত বিধিনিষেধ লংঘন করে সমস্ত সাম্রাজ্য বৈধ উত্তরাধিকারী হুয়াসকার আর আতাহুয়ালপার মধ্যে ভাগ করে দিয়েছেন। ধ্বংসের বীজ রোপিত হয়েছে তখনই। (ক্রমশঃ)

শতবর্ষ পরে

অন্নদাশঙ্কর রায়

ভারতবর্ষের ইতিহাসকে সাধারণত হিন্দু, মুসলিম ও ব্রিটিশ এই তিন যুগে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। সেদিক থেকে বিচার করলে ব্রিটিশ অপসরণের সঙ্গে সঙ্গে একটি ঐতিহাসিক যুগের অবসান ঘটেছে। আমরা নতুন একটি ঐতিহাসিক যুগের বিশ বছর অতিক্রম করে এসেছি।

কিন্তু অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশের ইতিহাসকেও প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক এই তিন যুগে বিভক্ত করা যায়। তা যদি করি তবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য অস্তমিত হলেও আধুনিক যুগ সমাপ্ত হয়নি। আধুনিক যুগের একটি অধ্যায় সারা হয়েছে। আর একটি অধ্যায় শুরু হয়েছে। রাতের অন্ধকার থেকে আমরা দিনের আলোয় আসিনি। একান্ত মন্দের থেকে আমরা অত্যন্ত ভালোয় আসিনি। দুই অধ্যায়ের প্রভেদটাকে বয়সের প্রভেদ বলা যেতে পারে, কিন্তু নাবালক যদি সাবালক হয় তবে তার রূপান্তর ঘটে না।

রূপান্তর কিন্তু ঘটেছিল মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণের সময়। আধুনিক যুগ পূর্ব দিকে উদয় না হয়ে পশ্চিম দিগন্তে উদয় হয়। তারপর পশ্চিম থেকে পূর্ব মুখে আসে। আমরা যদি জাপানের মতো স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আধুনিক হতুম তাহলে আমাদের আধুনিক করার জন্যে ইংরেজের বা ফরাসীর প্রয়োজন হতো না, তাদের মধ্যে ইংরেজ প্রবলতর হতো না, বণিক ইংরেজ শাসক ইংরেজ হতো না, সুতরাং ব্রিটিশ যুগ বলে ইতিহাসের কয়েকটি পৃষ্ঠা চিহ্নিত হতো না। পলাশীর বহু পূর্বে পিটার দি গ্রেট রাশিয়াকে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আধুনিক যুগে উত্তীর্ণ করে দেন। পলাশীর পরেও মুঘল বাদশাহ বা মরাঠা পেশোয়া পিটারের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেননি। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে শিখ রাজা রণজিৎ সিংহ ইউরোপীয়দের সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু আধুনিক যুগের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করেননি।

রাশিয়ায় ও জাপানে যা স্বেচ্ছামূলক ভারতে তা অনিচ্ছাপূর্বক। ইংরেজরাও হিন্দুদের বা মুসলমানদের উপর জোর করে আধুনিকতা চাপাতে যায়নি। পাছে সেটাকে খৃষ্টীয়তা বলে ভুল বোঝা হয়। ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন হিন্দুদেরই আগ্রহে। মুসলমানদের আগ্রহ জাগে এক পুরুষ বা দুই পুরুষ বাদে। বিধবা বিবাহের প্রবর্তন হয় হিন্দুদেরই উদ্যোগে। সিপাহী-বিদ্রোহের পর ইংরেজরা আরো সতর্ক হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুবিবাহ বন্ধ করার আইন আশা করে নিরাশ হন। ইংরেজ নারাজ। তারা এমন কিছু করবে না যার জন্যে সিপাহীরা বা প্রতিক্রিয়াশীলরা তাদেরকেই দায়ী করবে ও তাদের বিরুদ্ধে আবার বিদ্রোহ করবে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ যেমন প্রতিশ্রুতিময় দ্বিতীয়ার্ধ তেমনি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অভিযোগে মুখর।

ইংরেজদের মনোভাব হলো, আমরা এসেছি বাণিজ্য করতে ও ঘটনাচক্রে রাজত্ব করতে। আমাদের কিসের গরজ? কেন আমরা তোমাদের কথায় ভীমরুলের চাকে ঘা দেব? ভারতীয়দের কথা হলো, বেশ তো, আমরাই সংস্কার করব। কিন্তু তার আগে আমাদেরও একটা পার্লামেন্ট চাই, আমাদেরও একটা নির্বাচকমণ্ডলী চাই।

শতবর্ষ পূর্বে এইভাবেই জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয়। অগ্রণীদের প্রায় সকলেই ইংরেজীশিক্ষিত। ইংরেজদের স্বদেশের প্রতিষ্ঠানগুলিই তাঁদের আদর্শ ও অভিষ্ট। মুঘল ও মরাঠা রাজত্বে ফিরে যাবার অভিপ্রায় তাঁদের বিশেষ কারো ছিল না। তাঁরা মনে-প্রাণে আধুনিক যুগের সন্তান। এ-যুগের হাওয়ায় তাঁদের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস। সেই-সঙ্গে তাঁরা ভারতেরও সন্তান। ইংরেজরা তাঁদের সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করলে ভারতের স্বায়ত্তশাসন ঊনবিংশ শতাব্দীতে ঘটতে পারত। আরো অর্ধ শতাব্দী বিলম্বিত হবার তেমন কোনো ন্যায্য কারণ ছিল না। কিন্তু বিলম্বের ফলে ইংরেজ-বিরোধী মনোভাব ক্রমে ক্রমে পাশ্চাত্য-বিরোধী ও আধুনিকবিরোধী মনোভাবে পরিণত হয়

ওই ইংরেজীশিক্ষিতদেরই একভাগ সবরকম ইংরেজীয়ানা ত্যাগ করে বৈদিক-যুগে ফিরে চলেন। সেই সঙ্গে শহর ছেড়ে অরণ্যে বা গ্রামে ভারতীয়ত্বের সংজ্ঞা স্থির হয়ে যায় প্রাচীনরা যে পথে গেছেন সেই পথ। মুসলমানরা সে পথে চলেনি। তাই তাদের বাদ দিয়ে ভাবতে হয়। তারাও সে পথে চলতে নারাজ। তাদের পথ চলতে বোঝায় মহম্মদ যে পথে চলতে বলেছেন সেই পথ। ইংরেজের দিকে পিঠ ফিরিয়ে হিন্দু মুসলমান পরস্পরের দিকেও পিঠ ফেরায়।

শাসনতান্ত্রিক আন্দোলন বন্ধ্যা। সহিংস আন্দোলন নিষ্ফল। এই অচল অবস্থায় সহসা এক মহাপুরুষের আবির্ভাব। তিনি ঠিক রাজনীতির লোক নন, তবু রাজনীতিও তাঁর এলাকার বাইরে নয়। রাজনীতির নেতৃত্ব হাতে নিয়ে তিনি সমাজ-সংস্কারেরও চূড়ান্ত করেন। নারী তার অবরোধ ছেড়ে সংগ্রামে ঝাঁপ দেয়। ছোটলোক বলে যারা হেয় ছিল, তারাই হয়ে ওঠে গণদেবতা। হিন্দু মুসলমান একসঙ্গে পংক্তি ভোজনে বসে যায়। ঢাল নেই, তরোয়াল নেই, নিধিরামের দল মার্চ করে চলে মাঠে ঘাটে রাস্তায় রাস্তায়। কারাগারের, মেশিনগানের ভয় ভেঙে যায়। অবশেষে ইংরেজকেই অপসরণ করতে হয়।

কিন্তু এই বলপরীক্ষাটা আংশিকভাবে অতীতের সঙ্গে বর্তমানের। সে অতীত এত সুদূর অতীত যে তাতে মুসলমানের যোগ ছিল না। দেশ ভাগাভাগির এটাও একটা কারণ। সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ উপায় যে অহিংসা ও সত্য মহাত্মার এ শিক্ষা দেশোপযোগী ও কালোপযোগী। কিন্তু উপায় সম্বন্ধে তিনি যেমন সুনিশ্চিত ছিলেন উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তেমন নয়। ভারতের জনগণ নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণ করবে, এই পর্যন্ত বোঝা যায়। কিন্তু তারা যদি অধিকাংশের ভোটে পিছু হটার সিদ্ধান্ত নেয় ও পিছু হটতে হটতে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফিরে চলে তা হলে কী উপায়?

গত বিশ বছরে আমরা এক অপরূপ সার্কাস নিরীক্ষণ করলাম। এক পা এগিয়ে চলেছে সামনের থেকে আরো সামনে। আর এক পা পেছিয়ে চলেছে পেছনের থেকে আরো পেছনে। আধুনিকতম মহলের কান ধরে ওঠ-বস করাচ্ছে প্রাচীনতম মহল। পাছে ওরা ভোট না দেয় বলে যা ওরা করতে বলবে, তাই করতে হবে। গণতন্ত্রের প্রয়োজন যেন অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে যাবার জন্যে নয়, আলোক থেকে অন্ধকারে নিয়ে যাবার জন্যে। জাতীয়তার প্রয়োজন যেন নব নব সৃষ্টির জন্যে নয়, পুরাতনের পুনরাবৃত্তির জন্যে।

শ্রমিকদের বারোয়ারি পুজোর ধুম দেখে কে বলবে যে এরা মার্কস লেনিনের বিপ্লবের অগ্রগামী বাহিনী। এদের পিছু পিছু চললে আমরা হয়তো হিন্দুযুগে ফিরে যাব। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এসে আমরা তা হলে পশ্চাদপসরণ করব। ইংরেজদের পশ্চাদপসরণ কি তবে আমাদেরও পশ্চাদপসরণ? আমরা যারা আধুনিকতায় বিশ্বাস করি, তারা যেন ধরে না নিই যে, দুই সভ্যতার চকমকি ঠুকে যে রোশনাই জ্বলেছিল এক সভ্যতার অন্তর্ধানে সে রোশনাই আপনা আপনি জ্বলবে।

আধুনিকতারও বাহিনী চাই। দেশের কবি ও মনীষীরাই সে বাহিনী। তাঁরাই যদি অন্ধ হন, তবে কে কাকে পথ দেখাবে? শতবর্ষ পূর্বে যে জাতীয়তাবাদের সূচনা হয়েছিল তা একদিক থেকে সার্থক হয়েছে, কিন্তু এখনো তার সম্বল দুই সভ্যতার চকমকি ঠোকাঠুকির রোশনাই। একে নিবিয়ে দিলে সে নিঃসম্বল হতে পারে। চৌদ্দ-পনেরোজন মিলে প্রাণপণে ফু দিলে নিবে যেতে কতক্ষণ?



মহাত্মা শিশিরকুমার

অমৃতবাজার পত্রিকার শতবার্ষিক স্মরণোৎসবে শ্রদ্ধাঞ্জলি

কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

পূর্ণ শত বৎসরের পরে এই স্মৃতি মহোৎসব
তব সুবিশ্রুত নাম সমুজ্জ্বল ইতিহাস পটে
অবিস্মরণীয় মূর্তি অলোকসামান্য কীর্তি রটে
বঙ্গ মহারঙ্গভূমে সার্বভৌম জাতীয় গৌরব।

'অমৃত বাজার' পত্রে, এক রাত্রে—সে কী অসম্ভব!
বঙ্গভাষা ইংগ হল! তোমার ইঙ্গিতে কিনা ঘটে
অঘটন পটীয়ান, হে মহান্, তোমার দাপটে
প্রজাশক্তি উঠে জাগি, রাজশক্তি মানে পরাভব।

'অমিয়-নিমাই' কথা মহাভাব প্রেম চিন্তামণি
'নাম ব্রহ্ম'-জয়ধ্বজা, ধর তুলি পথে ও প্রাঙ্গণে
কালাচাঁদ-গীতা তব গোরাচাঁদ-সৌন্দর্যের খনি
নিতাইয়ের প্রেমবন্যা বহাইলে গৌড় বৃন্দাবনে।

'শিশিরকুমার' তুমি শিশিরেরও চেয়ে সুকুমার
বজ্রগর্ভ বিজলীর প্রতিভার প্রভাব দুর্বার।

রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন রবীন্দ্র স্টেডিয়ামে অমৃতবাজার পত্রিকা শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। রাষ্ট্রপতির পাশে পত্রিকার সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ।



পত্রিকা শতবার্ষিকী উৎসব

বিশে ফেব্রুয়ারি রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে দেখা গিয়েছিল এক বিশাল জনসমুদ্র। সারা দিন ধরে অন্তহীন মানুষের স্রোত এগিয়ে চলেছিল রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামের দিকে। উচ্ছল উৎসবের সেই স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ বহুকাল দেখা যায় নি কলকাতার জনজীবনে। ভারতের বহু জ্ঞানী-গুণী ও বিদেশী অভ্যাগতদের আগমনে উৎসব-প্রাঙ্গণ হয়ে উঠেছিল মুখর।

এ এক পরম পবিত্র দিন।

শতবর্ষ পূর্বে যশোর শহরে, কার্তিকে অমৃতবাজার পত্রিকা পর্বে বাঙলার এক অখ্যাত গ্রামে, আজ তার নাম বিশ্ববিদিত। মানুষের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতাই হোল এর একমাত্র পাথেয়। দেশের মানুষের বাঁচার আন্দোলনে অমৃতবাজার সঙ্গী হয়েছে। তার শতবর্ষপূর্তি উৎসবে যোগদানের সুযোগ দুর্লভ। কলকাতার মানুষ সে সুযোগ হারায় নি।

শতবার্ষিকীপূর্তি উৎসব উদ্বোধন করেন ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন। তিনি দমদম বিমানবন্দর থেকে রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে পৌঁছান সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ। রাষ্ট্রপতি, যখন রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর ও শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের সঙ্গে মঞ্চে উপস্থিত হন, তখন সমবেত জনতা বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জানান। জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয়। তারপর উৎসবমঞ্চে রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে জনতা রাষ্ট্রপতির ভাষণ শুনলেন। তাঁর কণ্ঠে সেদিন অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতি গভীর অনুরাগ ও শ্রদ্ধার প্রকাশ ঘটেছিল।

তিনি বলেছেন, মানুষের প্রতি দরদ-বোধ এবং জনকল্যাণে আন্তরিকতা অবশ্যই গণতন্ত্র স্থায়িত্ব দৃঢ় করতে পারে। রাজনৈতিক দলগুলি এবং এর নেতাদের কাছে রাষ্ট্রপতির আবেদন : দেশের নিজ সমস্যাগুলির বিচার করুন, শুধু অগ্রাধিকার বড়মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে নয়।

দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দৃঢ় আস্থা প্রকাশ করে রাষ্ট্রপতি বক্তৃতা [illegible]

মানুষের ওপর তাঁর আশা আছে, ভরসা আছে। তাঁদের বিচার-বুদ্ধি আছে যেসব হতাশাবাদী এই দেশে মারামারি, কাটাকাটি ও সংঘাতের ফলে গণতন্ত্র ভেঙে পড়ার স্বপ্ন দেখেন, তাঁদের মনে রাখা উচিত যে, অস্বাভাবিক এবং অসাধারণ পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্যে আমাদের সংবিধানের সামর্থ্য আছে। শুধু তাই নয়। গান্ধীজীর নেতৃত্বে দেশের মানুষ যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির পরিচয় দিয়েছিল, তা নষ্ট হবার নয়, তা বেঁচে আছে।

ভারতের মহান ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন যে, যুগে যুগে ভারতবর্ষ সহনশীলতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও বোঝাপড়ার আদর্শ সামনে রেখেছে। সাহস, বিশ্বাস এবং সংহত প্রচেষ্টাকে পাথেয় করে যদি আমরা অগ্রসর হতে পারি, তাহলেই আমাদের বর্তমান দুর্দশা অতীতের বস্তু হবে এবং আমরা উন্নতির মুক্তাঙ্গনে পৌঁছে যেতে পারি। আমাদের সমাজকে গতিশীল করবার অশেষ প্রচেষ্টার উপাদান সংগ্রহে সংবাদপত্র ও অন্যান্য জনসংযোগ-মূলক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এখন সময় হয়েছে গ্রাম্য সমাজকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার।

জাতির স্বার্থে মহান সেবার জন্যে রাষ্ট্রপতি 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। তিনি বলেন অমৃতবাজার পত্রিকার শতবার্ষিকী পালনে অংশগ্রহণ করতে পেরে তিনি আনন্দিত। অমৃতবাজার পত্রিকার ইতিহাস স্মরণ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, একটি প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসের পক্ষে শতবর্ষ পালন সত্যিই এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আগে নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষকদের সংগঠিত করেছিলেন শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ। সে সময় যশোর থেকে শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ ও তাঁর ভাইয়েরা এই সব পীড়িত জনগণের মুখপত্র হিসেবে অমৃতবাজার পত্রিকা নামে একটি বাংলা সাপ্তাহিক বের করতে শুরু করেন। পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যায় শ্রীশিশিরকুমার এই পত্রিকার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। তাঁর সাহস ও দূরদৃষ্টি ছিল স্মরণীয়। তিন বছর পরে পত্রিকাটি কলকাতা থেকে প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয় এবং শীগগিরই এটি একটি ইংরেজি সাপ্তাহিকে রূপান্তরিত হয়। ১৮৯১ সালে পত্রিকা দৈনিকে পরিণত হয়। আমাদের জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে এই পত্রিকাও বেড়ে ওঠে। আমাদের স্বাধীনতাসংগ্রামে অমৃতবাজার পত্রিকা গ্রহণ করলো এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। সমকালীন প্রশাসকরা পত্রিকাটির কণ্ঠরোধ-প্রয়াসী হয়েছিলেন অনেকবার। কিন্তু তা সত্ত্বেও অমৃতবাজার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিই লাভ করল। কারণ এই পত্রিকা এক মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে সংগ্রাম করছিল। আর জনগণ ছিল এই পত্রিকার পৃষ্ঠপোষক।

স্বাধীনতা-উত্তরকালেও জনমত সৃষ্টির ক্ষেত্রে দেশে এই পত্রিকার ভূমিকা হয়ে উঠেছে অগ্রগণ্য। গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সেবায় সুদৃঢ়ভাবে এগিয়ে চলেছে অমৃত-বাজার পত্রিকা।

কলকাতায় শান্তি ফিরিয়ে আনবার জন্য গান্ধীজী যখন আপ্রাণ চেষ্টা করছেন তখন 'পত্রিকার' সাংবাদিকরাও সাম্প্রদায়িক ঐক্যের বাণী প্রচার করেছেন। জাতির পিতার কাছ থেকে পত্রিকাটি তখন যথা-সম্মান লাভ করে। তিনি বলেছিলেন যে, অমৃতবাজার পত্রিকা সত্যই 'অমৃত'।

রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেনের পর জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুনীতিকুমার চট্টো-পাধ্যায় বলেন যে, অমৃতবাজার পত্রিকার গত একশ বছরের ইতিহাস হচ্ছে সারা দেশের চিন্তা, রাজনীতি ও প্রগতির ইতিহাস। তিনি বলেন, লক্ষ লক্ষ মানুষ আজ সমবেত হয়েছে পত্রিকার প্রতি শুভেচ্ছা জানাতে, ধর্ম, মত, রাজনীতি নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষ সমবেত হয়েছেন — অমৃতবাজার চিরজীবী হোক।

পত্রিকা সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ অভ্যাগতদের স্বাগত জানাতে গিয়ে বলেন যে, এই পুণ্য অনুষ্ঠানে পরম দয়াল ঈশ্বরের আশীর্বাদের জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছি



ডঃ সুনীতি চ্যাটার্জি রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে পত্রিকা শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে এক বিরাট সভায় ভাষণ দিচ্ছেন। (বাম থেকে ডানে) শ্রীবিজয় ব্যানার্জি, রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন, মেয়র শ্রীগোবিন্দ দে, প্রধান বিচার-পতি ডি এন সিংহ। পিছনে দন্ডায়মান শ্রীসুকমলকান্তি ঘোষ।

এবং দেশবাসীর শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা কামনা করছি।

তিনি বলেন যে, আজ থেকে ঠিক একশ বছর আগে যশোরের এক সুদূর গ্রামে অমৃতবাজার পত্রিকার জন্ম। উদ্দেশ্য ঃ ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রামে সাহায্য এবং অত্যাচারিত জনসাধারণের স্বার্থকে সমর্থন। বিদেশী শাসকের ভ্রূকুটি সত্ত্বেও পত্রিকা উত্তরোত্তর উন্নতি করেছে। কারণ, পত্রিকাকে পুষ্ট করেছে দেশবাসীর ভালবাসা ও সহযোগিতা। তাঁর আশা ঃ পত্রিকার ভবিষ্যৎ অগ্রগতিতে দেশের মানুষের ভালবাসা ও সহযোগিতা থাকবে অবিচল।

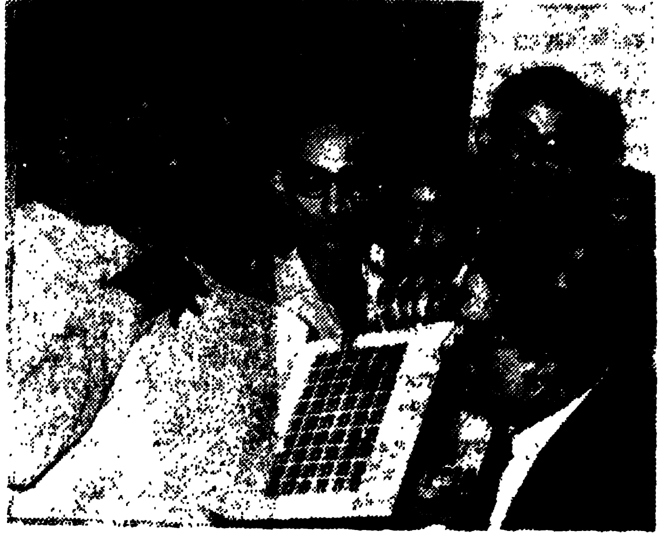
দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় বলেন, অমৃতবাজার পত্রিকার ইতিহাস যেমন রোমাণ্টিক তেমনই শিক্ষাপ্রদ। গত শতাব্দীতে বহু পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু একশো বছর কোন পত্রিকা টেকে নি। যে কোন দৈনিক সংবাদপত্রের পক্ষে একশো বছর পূর্ণ হওয়া গৌরবের কথা। শুধু বাংলা দেশ বা ভারতবর্ষ নয়—অমৃতবাজার বিশ্বের দরবারে সম্মান লাভ করেছে।

যশোরের এক গ্রামে যে বীজ বপন হয়েছিল, একশো বছর আগে, আজ তা বিশাল মহীরুহে পরিণত। অমৃতবাজার জাতীয় জীবনের সঙ্গেও একশো বছর ধরে যুক্ত। তিনি অমৃতবাজার পত্রিকা প্রকাশনের ইতিহাস বর্ণনা করে বলেন, সে এক রোমাণ্টিক ইতিহাস। সেই সঙ্গে অমৃতবাজার পত্রিকার ইতিহাস সাহসিকতার ইতিহাস। এর কর্তৃপক্ষ কখনও নতিস্বীকার করেন নি কারো কাছে। অত্যন্ত দুরূহ কাজ তাঁরা করেছেন। এ কাজ একদিনে হয় নি। সংগ্রাম এবং বিপদ বরণ করে তবে এ কাজ সম্ভব হয়েছে।

তিনি বলেন, অমৃতবাজারের কর্তৃপক্ষ প্রলোভন কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন, সহ্য করেছেন সরকারী আঘাত। ভার্নাকুলার আইনের বিরুদ্ধে রাতারাতি ইংরাজীতে রূপান্তর এক অসামান্য কাজ। গত একশো বছর তাঁরা নানা বাধা অতিক্রম করেছেন। এই সময়ের মধ্যে বিশ্বে নানা পরিবর্তনও ঘটে গেছে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লব ঘটে গেছে। দেশের দুর্দশার অবসান ঘটাবার ব্রত নিয়ে অমৃতবাজার পত্রিকার যাত্রা শুরু হয়েছিল। এর পিছনে কোন ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি ছিল না।

তিনি বলেন, ভারতীয় সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে পূর্বাচার্য শিশিরকুমার ও মতিলালের আদর্শ যেন আমরা ভুলে না যাই। আজ অমৃতবাজার দেশের অন্যতম প্রধান পত্রিকা। এক আশ্চর্য তপস্যা নিয়ে এর জন্ম। বৈষয়িক দিক দিয়ে আজ অমৃতবাজার অনেক বৃদ্ধি লাভ করেছে। প্রাণদাতা পূর্বপুরুষদের সে আদর্শ বর্তমান পুরুষদের অনুপ্রাণিত করবে।

পত্রিকা-ভবনে শতবার্ষিকী ডাকটিকিট কেনার পর একটি এলবাম গ্রহণ করছেন শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ।



তিনি বলেন, একশ বছর ধরে বহু কর্মী, সাংবাদিকের অক্লান্ত পরিশ্রমে অমৃতবাজার ধন্য হয়েছে, বৃদ্ধি লাভ করেছে। প্রার্থনা জানাই অমৃতবাজার আরও গৌরবমণ্ডিত হয়ে উঠুক।

তৃতীয় দিন বৃহস্পতিবার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদ তাঁদের ভাষণে পত্রিকার অতীত ইতিহাস শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে এর উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের জন্য শুভকামনা জানান।

অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্য বলেন যে, ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রামের ইতিহাস অমৃতবাজার পত্রিকার ইতিহাস। স্বাধীনতার কথা অন্য কেউ যখন ভাবেনি, সেই সময় পত্রিকা স্বরাজলাভের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে দেশের মানুষকে তৈরী করার সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন। বাংলা দেশের মানুষ আজ তাই কৃতজ্ঞচিত্তে পত্রিকার অবদানের কথা স্মরণ করে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে, কোন ব্যবসা-বুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত না হয়ে এর প্রতিষ্ঠাতারা পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। একদিন ঘোষ পরিবারের চার ভায়ের মধ্যে শিশিরকুমার রাস্তায় দেখতে পেয়েছিলেন কয়েকজন কৃষককে নীলকর সাহেবরা বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে। তাঁর মন কেঁদে উঠেছিল। তিনি ফিরে গিয়ে সকলকে জিজ্ঞাসা করেন এই অত্যাচারের শেষ কোথায়? এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে কি কলম ধরা যায় না?—শিশিরকুমারের এই প্রেরণাই অমৃতবাজার পত্রিকা সৃষ্টির গোড়ার কথা। পত্রিকা গত ২০শে ফেব্রুয়ারী একশ বছর শেষ করে দু'শত বছরের দিকে শুভযাত্রা শুরু করেছে। এর যাত্রাপথ শুভ হোক, আজকের দিনে এই কামনাই জানাই।

পত্রিকার সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ এই উৎসব সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার জন্য সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ দেন। তাঁর বক্তৃতায় দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম নাগরিক কমিটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্য, ডাঃ পি কে রায়চৌধুরী, দক্ষিণ-পূর্ব কমিটির সম্পাদক শ্রীশ্যামল দত্ত, স্বেচ্ছাসেবক কমিটির শ্রীরামকৃষ্ণ মিত্র, স্বেচ্ছাসেবকদের অধিনায়ক অধ্যাপক অনিল বসু, পুলিশ বাহিনী, কলকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট, এন সি সি, সেণ্ট জন অ্যাম্বুলেন্স, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ও শিল্পীদের পৃথক পৃথকভাবে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, এঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম ছাড়া এ অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত হত না।

প্রথম দিন বিশ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবারের অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেছিলেন বিশিষ্ট শিল্পী সর্বশ্রী শচীনদেব বর্মণ, হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায় ও ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়। সাজ-ও-আওয়াজ পরিবেশিত হয় 'অমৃত নির্ঝর' সঙ্গীতাংশ দিয়ে। সঙ্গীতাংশ গঠনের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব প্রখ্যাত যন্ত্রশিল্পী সঙ্গীতপরিচালক ভি বালসারার। এই অভিনব ঐকতান বাদনটি সকলকে আনন্দের অনাবিল ধারায় অভিষিক্ত করে।

এর পর মঞ্চস্থ হয় মধুসংলাপী বিধায়ক ভট্টাচার্যের রচিত নাটক 'অমৃতস্য-পুত্রা'। এটি পরিচালনা করেন প্রবীণ নাট্য-পরিচালক নরেশচন্দ্র মিত্র এবং সঙ্গীত-পরিচালনায় ছিলেন অমিল বাগচী। বাংলা রঙ্গমঞ্চের শ্রেষ্ঠতম শিল্পী সমন্বয়ে পরিবেশিত এ নাটকে বলা হয়েছে জনগণের সেবায় পত্রিকা কি করেছে বা করতে চায়। অভিনয়ে শিশিরকুমারের ভূমিকায় সবিতা-

ব্রত দত্ত অপূর্ব। মহান দেশপ্রেমিক ভগবংভক্ত শিশিরকুমার সবিতাব্রতের অভিনয়ে মূর্ত হয়ে ওঠে। এ অভিনয়কে আরও উজ্জ্বলতর করে তোলে তাপস সেনের আলোক-সম্পাত। অন্যান্য ভূমিকায় চরিত্রানুগ সফল অভিনয় করেন জহর গাঙ্গুলী, তরুণ মিত্র, কালীপদ চক্রবর্তী, পার্থ মুখার্জি, নিখিল বোস, দেবব্রত দে, সীতেশ চক্রবর্তী, তরুণ রায়, ক্ষিতীশ উপাধ্যায়, গৌর গাঙ্গুলী, পরিমল সেন, নিতাই দাস, কেতকী দত্ত, অরুণ গাঙ্গুলী প্রভৃতি। সেদিন স্টেডিয়ামে পরিবেশিত এই নাটকটি সমবেত জনতার চোখের সামনে অমৃতবাজারের স্বাধীনতাসংগ্রামের ভূমিকাটি তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে।

দ্বিতীয় দিন একুশ ফেব্রুয়ারী বুধবার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেন গীতবিতানের শিল্পীরা এবং সর্বশ্রী দেবব্রত বিশ্বাস, ঋতু গুহ, এ কানন, মালবিকা কানন, চিন্ময় লাহিড়ী, বাঁশরী লাহিড়ী, কণিকা সব্যসাচী, কৃষ্ণা দাশগুপ্ত, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নিমাই ভট্টাচার্য, শ্যামল মুখোপাধ্যায়, বাপী লাহিড়ী ও নারেন সরকার। এদিন 'শতবর্ষের সেরা' ইংরেজী ডকুমেন্টারী চিত্র দেখানো হয়।

তৃতীয় দিনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেন সর্বশ্রী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, লালিতা ঘোষ, কণা ঠাকুর, পূরবী চট্টোপাধ্যায়, সলিল মিত্র, সবিত্রী ঘোষ, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, নিমাই ভট্টাচার্য, চন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, সমর দত্ত, নীলকণ্ঠ নন্দী, মহেশ প্রসাদ।

দক্ষিণী সঙ্গীত শিক্ষায়তনের ছাত্রছাত্রীরাও অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

পত্রিকার শতবার্ষিকী উপলক্ষে ভারত সরকারের ডাক ও তার বিভাগ বিশে ফেব্রুয়ারী পনের পয়সার ডাক-টিকিট প্রকাশ করেন। শতবার্ষিকী প্রতীক-সম্বলিত এই সুদৃশ্য ডাকটিকিট কেনবার জন্য সাধারণের প্রবল উৎসাহ দেখা গিয়েছিল। নাসিকের ইন্ডিয়া সিকুরিটি প্রেস থেকে দু' মিলিয়ন টিকিট ছাপা হয়েছে। ডাক ও তার বিভাগ এই উপলক্ষে জি পি ও এবং অমৃতবাজার পত্রিকা অফিসে দুটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। জি-পি-ওতে একটি ছোট অথচ মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে টেলিকম্যুনিকেশন্‌স মিনিস্টার, পি-অ্যান্ড-টি সিনিয়র মেম্বার শ্রীসুধীর কাঞ্জিলালের কাছ থেকে প্রথম টিকিটটি কেনেন শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ। পত্রিকা-ভবনের অনুষ্ঠানে শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ পশ্চিমবঙ্গ সার্কেলের পোস্ট-মাস্টার জেনারেল শ্রী এ এন বিশ্বাসের কাছ থেকে প্রথম টিকিটটি কেনেন। শ্রীবিশ্বাস এই সময় তাঁকে একটি সুদৃশ্য অ্যালবাম উপহার দেন।

দিল্লী রওনা হওয়ার পূর্বে দমদম বিমানবন্দরে রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেনকে শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ 'পত্রিকা' শতবার্ষিকী ক্রোড়পত্র দেখাচ্ছেন।



সম্বর্ধনা

২১শে ... পত্রিকার শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে গুজরাটি সাহিত্যমন্ডল সহ কলকাতার বিভিন্ন গুজরাটি সংস্থার পক্ষ থেকে পত্রিকা-সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষকে ২৬শে ফেব্রুয়ারী সম্বর্ধিত করা হয়।

পন্ডিত কৃষ্ণশংকর শাস্ত্রী গুজরাটিদের শুভ প্রতীক 'তোরণ' শ্রীঘোষের হাতে তুলে দিয়ে বলেন, অমৃতবাজার পত্রিকা ভারতবাসীর চোখের মণি। এ মণির দৃষ্টিশক্তি রক্ষা করবার জন্য তিনি মহাত্মা শিশিরকুমারের আদর্শে পত্রিকার বর্তমান সেবকদের উদ্বুদ্ধ প্রাণিত হতে আহ্বান জানান।

ভবানীপুর এডুকেশন সোসাইটি কলেজে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শ্রীরমণলাল বি শাহ। তিনি বলেন, পরাধীনতার যুগে অমৃতবাজার পত্রিকা ভারতের ৫ অত্যাচরিত জনসাধারণের মুক্তির স্বার্থে যে নির্ভীক ভূমিকা নিয়েছিল, স্বাধীন ভারতের অধিবাসীদের উন্নতির জন্য পত্রিকা আজও সে নির্ভীক ভূমিকাই নিয়ে আছে। এ জন্যই অমৃতবাজার পত্রিকা সাধারণ মানুষের একান্ত আপনার পত্রিকা। তিনি বলেন, লোকমান্য তিলক মহাত্মা শিশিরকুমারকে গুরু হিসেবে সম্মান করতেন।

শ্রীচতুর জালওয়ালা তাঁর বক্তৃতায় শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত গুজরাটি ও বাঙালীর আপনার সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, মহাত্মা শিশিরকুমার ও তাঁর ভাইয়েরা সেবার যে মশাল জ্বালিয়ে গিয়েছিলেন, আজও পত্রিকাগোষ্ঠী তা প্রজ্বলিত করে রেখেছেন।

শ্রীরসিকলাল দোশী বলেন, মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাবের পূর্বে ও জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পূর্বে ভারতের ভাগ্যাকাশ যখন কুজ্ঝটিকায় ঢেকে গিয়েছিল, তখন ...

অমৃতবাজার পত্রিকার শতবার্ষিকী জয়যাত্রার তোরণ প্রতীক—কলকাতা গুজরাটি সমাজের পক্ষ থেকে গুজরাটিদের শুভপ্রতীক এই তোরণচিত্রটি অমৃতবাজার পত্রিকায় শতবার্ষিকী জয়যাত্রা উপলক্ষে পত্রিকা সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের হাতে অর্পণ করেন গুজরাটি পন্ডিত শ্রীকৃষ্ণশঙ্কর শাস্ত্রী। চিত্রে (বামদিক থেকে) রয়েছেন—শ্রীঅমজারিওয়ালা, শ্রী আর বি শা, শ্রীনাত্থাল কাপ্গা, শ্রীরাসিকলাল দোশী, পন্ডিত কৃষ্ণশঙ্কর শাস্ত্রী ও শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ।



শিশিরকুমার, মতিলাল ঘোষ প্রমুখ কয়েক জন যশোহর জেলার গ্রাম থেকে অমৃতবাজার প্রকাশ করে যে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তার জন্য দেশবাসী তাঁদের কৃতজ্ঞচিত্তে চিরকাল স্মরণ করবেন।

সম্বর্ধনার উত্তরে শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ বলেন, প্রগতির স্বার্থে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন ভাষাভাষী অধিবাসীদের এক পরিবারের সদস্য হয়ে উঠতে হবে। ভারতবাসীর মধ্যে একতার মনোভাব সৃষ্টি করে তোলায় অমৃতবাজার পত্রিকার গৌরবময় ভূমিকার কথা তিনি উল্লেখ করেন। কলকাতার গুজরাটি অধিবাসীরা অমৃতবাজার পত্রিকাকে নিজেদের পত্রিকা বলে মনে করেন। শতবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁদের এ অনুষ্ঠান এ-কথাই প্রমাণ করে বলে শ্রীঘোষ মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, ১৮৫৭ সালে প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে যাবার পর দেশবাসীকে নিজেদের অধিকার ও সম্ভ্রম সম্পর্কে সচেতন করবার স্বপ্ন নিয়ে অমৃতবাজার পত্রিকার জন্ম। সে কাজে অমৃতবাজার পত্রিকাকে নানা পদে বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। জন্মলগ্নের চার মাসের মধ্যেই জনৈকা মহিলার সঙ্গে অশালীন ব্যবহার করায় অমৃতবাজার পত্রিকা একজন বিদেশী ম্যাজিস্ট্রেটের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা করে মামলার বোঝা তুলে নেয়। অমৃতবাজার পত্রিকার সামনে সে সময় যে আদর্শ ছিল তা দেশকে স্বাধীন করা। শ্রীঘোষ বলেন, আজ দেশ স্বাধীন হয়েছে, কিন্তু এখনও দেশবাসীর চরম সুখের দিন আসেনি, এখনও আমরা বিদেশী সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল। চরম উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য অমৃতবাজার সংগ্রাম চালিয়ে যাবে বলে শ্রীঘোষ মন্তব্য করেন।

অমৃতবাজার পত্রিকা শতবর্ষ উপলক্ষে ২৩শে ফেব্রুয়ারী কলকাতা জুনিয়ার চেম্বার ও দক্ষিণ কলকাতা জেসির বিশিষ্ট সদস্যগণ পত্রিকাকে সম্বর্ধনা জানান।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। প্রখ্যাত সাংবাদিক এবং বর্তমানে স্টেটসম্যানের চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার শ্রীকেদার ঘোষ বলেন, অমৃতবাজার পত্রিকার জনসেবার ইতিহাস সকলের কাছে আনন্দ এবং গর্বের বস্তু। পত্রিকার এই 'ট্রাডিশন' চিরজীবী হোক। শ্রীঘোষ বলেন, সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে যখন দেশের মানুষ প্রতিবাদ করতে পারত না, তখন পত্রিকার জন্ম হয়। পত্রিকা সুবিচার এবং স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছে। ১৯৩৭-৩৮ সালে পত্রিকা এবং যুগান্তরের সঙ্গে শ্রীঘোষ যুক্ত ছিলেন। শ্রীঘোষ বলেন যে, ভারতের স্বাধীনতার পর এখানকার সংবাদপত্রের উপর এসেছে নতুন দায়িত্ব।

কলকাতা জুনিয়ার চেম্বারের সভাপতি শ্রীরতনকুমার নাগ সকলকে সম্বর্ধনা জানাতে গিয়ে একশ বছরের পত্রিকার জনসেবার ইতিহাস বর্ণনা করেন।

দক্ষিণ কলকাতার জে-সি'র সভাপতি শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি মহাত্মা শিশিরকুমার, গোলাপলাল ঘোষ, মতিলাল ঘোষের নির্ভীক সাংবাদিকতার কথা উল্লেখ করেন। কলকাতা জুনিয়ার চেম্বার ও দক্ষিণ কলকাতা জে-সি'র পক্ষ থেকে পত্রিকা শতবার্ষিকী উপলক্ষে শ্রীতুষারকান্তি ঘোষকে একটি 'স্মারক' দেওয়া হয়। শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ বলেন, মহাত্মা শিশিরকুমার কখনও গোপন করেননি এবং যা সত্য তাকেই তিনি নির্ভীক ভাবে তুলে ধরেছেন। পত্রিকার এই গৌরবময় 'ট্রাডিশন' যাতে রক্ষা হয়, তার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। নির্ভীক সাংবাদিকতার আদর্শ থেকে তিনি কখনও বিচ্যুত হবেন না। তাঁর পিতা শিশিরকুমার, গোলাপলাল ঘোষ ও মতিলাল ঘোষ এই আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন।

কেপটাউনের ডঃ ফিলিপ ব্লেবার্গ, অপরের হৃদযন্ত্র এ'র দেহে সংযোজনের পর তিনি বেশ সুস্থ এবং স্বাভাবিক হয়ে উঠেছেন। নিজের কাজ এখন নিজেই করছেন।



দেশে বিদেশে

কচ্ছের নোনা জলে

এককালের সামন্ত রাজ্য, আজ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম অঙ্গরাজ্য গুজরাটের একটি জেলা—যার নাম কচ্ছ। সেই কচ্ছের একটা অংশ—আয়তনে ৮ হাজার বর্গ মাইলের কিছু অংশ—বছরের অধিকাংশ সময় যার অধিকাংশ অঞ্চল সমুদ্রের নোনা জলের নীচে ডুবে থাকে—সেই মরুভূমি-সদৃশ জমিরই কচ্ছি ভাষায় নাম হচ্ছে "রান"।

এই কচ্ছের রানের আধাআধি দাবী করে পাকিস্থান যখন তার সৈন্যবাহিনী ঢুকিয়ে সেখানে নিজের দখল জারী করার চেষ্টা করেছিল এবং ভারতীয় জওয়ানদের হাতে মার খাওয়ার পর যখন তার দাবী বিচার করে দেখার জন্য এই "বিরোধ" একটা আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালের সামনে পেশ করতে সম্মত হয়েছিল তখন পাকিস্থানের কোনকিছুই হারাবার ভয় ছিল না—একমাত্র ভারতের কাছে সামরিক পরাজয়ের গ্লানি ছাড়া। কেননা, কচ্ছের রান প্রকৃতপক্ষে ভারতেরই অধিকারে ছিল। পাকিস্থান অস্ত্রের জোরে ভারতের কাছ থেকে যা আদায় করতে পারেনি তার যতটুকু অংশই সে ট্রাইব্যুনালের কাছ থেকে আদায় করে নিয়ে আসতে পারবে ততটুকুই তার লাভ।

সুতরাং আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে, লাগারগ্রেন ট্রাইব্যুনালে পাকিস্থানের দাবীর ৯০ শতাংশ প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পরও প্রেসিডেন্ট আয়ুব এই ট্রাইব্যুনালের রোয়েদাদ পুরোপুরি কার্যকর করার জন্য দাবী জানাচ্ছেন আর ভারত সরকারকে বিরুদ্ধ সমালোচনার আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক চুক্তির পবিত্রতার দোহাই পাড়তে হচ্ছে। কচ্ছের রানের অর্ধেক কেন, তার দশ ভাগের এক ভাগও ঐ আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালের রোয়েদাদে পাকিস্থানের জন্য বরাদ্দ করা হয় নি। তবুও, হেরেও পাকিস্থানের জয় হয়েছে আর জিতেও ভারতের হার হয়েছে।

এই হারের ভূমিকা অবশ্য অনেক দিন আগেই তৈরী হয়েছে। ১৯৫৬ সালের জানুয়ারী মাস থেকে কচ্ছের রানে পাকিস্থানী অনুপ্রবেশের সংবাদ পাওয়া যাচ্ছিল। ঐ বছর ফেব্রুয়ারী মাসে ছাড়বেতে পাকিস্থানী সৈন্যরা ভারতীয় টহলদারদের উপর গুলি চালায়। ১৯৫৯ সালের অক্টোবর মাসে ভারতের মন্ত্রী সর্দার স্বরণ সিং আর পাকিস্থানের মন্ত্রী জেনারেল কে এম শেখ মিলিত হয়ে স্থির করলেন যে, দুই দেশের সীমান্ত সংক্রান্ত সকল বিরোধ পারস্পরিক আলোচনার দ্বারা মিটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হবে এবং সেভাবে কোন বিরোধের নিষ্পত্তি সম্ভব না হলে সালিশীর জন্য সেই বিরোধ কোন ট্রাইব্যুনালের পাঠান হবে। ১৯৬০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে লোকসভার এক বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু স্বীকার করে নিলেন যে, যে সব সীমান্ত নিয়ে পাকিস্থানের সঙ্গে ভারতের বিরোধ আছে কচ্ছের সীমান্ত তাদের অন্যতম। তারপর ১৯৬৫ সালের গোড়ার দিকে শুরু হল মার্কিন ও বৃটিশ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্থানী বাহিনীর হামলা। তার আগের থেকেই সীমান্তের প্রায় ১৮ মাইল জুড়ে ভারতীয় সীমান্তের দেড় মাইল ভিতর পর্যন্ত পাকিস্থানীরা ঢুকে গিয়েছিল। ফেব্রুয়ারী মাসে পাকিস্থান বাহিনী কঞ্জরকোট দখল করে নিল। তারা সরদারে ভারতীয় ঘাঁটিও আক্রমণ করল। ভারতীয় বাহিনী পাকিস্থানীদের হটিয়ে দিল বটে, কিন্তু অন্য ধরনের রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু হয়ে গেল। পাকিস্থানের সঙ্গে একটা যুদ্ধবিরতি চুক্তি করতে বাধ্য করার জন্য বৃটিশ সরকার ভারতের উপর চাপ দিলেন। ১৯৬৫ সালের ৩০ জুন তারিখে স্বাক্ষরিত এই ভারত-পাকিস্থান চুক্তিতে মেনে নেওয়া হল যে, দুই দেশ নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে কচ্ছের সীমানা নির্ধারণ করতে না পারলে এই সীমানা সমস্যা তিনজন সদস্য নিয়ে গঠিত একটি আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালে বিচারের জন্য পাঠান হবে। এই চুক্তি অনুসারেই ভারতের দ্বারা মনোনীত বিচারপতি যুগোশ্লাভিয়ার ডাঃ আলেস বেবলার, পাকিস্থানের দ্বারা মনোনীত বিচারপতি ইরানের নসরুল্লা এন্তেজাম এবং এই দুইজনের দ্বারা মনোনীত সুইডেনের বিচারপতি গুণার লাগারগ্রেন এই তিনজনকে নিয়ে ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়েছিল। বিচারপতি লাগারগ্রেন ট্রাইব্যুনালের রোয়েদাদ মেনে নিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। দুই দেশের মধ্যে চুক্তির আরও সর্ত হচ্ছে এই

যে, রায় দিয়েই ট্রাইব্যুনালের কাজ শেষ হবে না, তিন মাসের মধ্যে এই রায় কার্যকর করতে হবে অর্থাৎ রায় অনুযায়ী জমির উপর সীমানা চিহ্নিত করা হবে এবং এই রায় কার্যকর করা হচ্ছে কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য রায় ঘোষণা করার পরও ট্রাইব্যুনাল বহাল থাকবে।

ভারত কেন কচ্ছের রানকে একটা বিরোধভুক্ত অঞ্চল বলে স্বীকার করে নিল, কেনই বা সে একটা আন্তর্জাতিক সালিশীর ব্যবস্থা স্বীকার করে নিল, ভারতবর্ষে সেই প্রশ্ন আগে উঠেছিল, এখনও উঠছে। লাগারগ্রেন ট্রাইব্যুনালের রোয়েদাদ সর্বসম্মত নয়। বিচারপতি লাগারগ্রেনের সুপারিশের সঙ্গে বিচারপতি এন্তেজাম একমত হলেও, ডাঃ বেবলার তার সঙ্গে ভিন্নমত। কিন্তু এক বিষয়ে তিনজন বিচারপতিই সহমত হয়েছে। সেটা এই যে, কচ্ছের রান এলাকাটি সম্পূর্ণভাবে ভারতেরই এবং পাকিস্থানের এই দাবী নিতান্তই অসার যে, এলাকাটি আসলে একটা সমুদ্রের খাঁড়ি, অতএব আন্তর্জাতিক সীমানা নির্ধারণের স্বীকৃত নীতি অনুযায়ী এর মাঝামাঝি ২৪ ডিগ্রী অক্ষরেখা বরাবর একটা রেখা টেনে ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে সমানভাবে এলাকাটিকে ভাগ করে দিতে হবে। অন্য দুজন সদস্যের সঙ্গে ভিন্নমত হয়ে বিচারপতি ডাঃ বেবলার আরও পরিষ্কারভাবে ভারতের বক্তব্য মেনে নিয়েছেন। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের সময় সামন্তরাজ্য কচ্ছের সঙ্গে তৎকালীন বৃটিশ ভারতের সিন্ধুপ্রদেশের সীমানা কোথায় ছিল সেটাই ট্রাইব্যুনালকে নির্ধারণ করতে বলা হয়েছে, একথার উল্লেখ করে ডাঃ বেবলার বলেছেন যে, একটা সামন্তরাজ্যের সঙ্গে বৃটিশ ভারতের ঐ সীমান্ত আন্তর্জাতিক সীমান্তরূপেই গণ্য। যে সীমান্ত দুই দেশ মেনে নেয় সেটাই আন্তর্জাতিক সীমান্ত। কচ্ছ-সিন্ধু সীমান্ত সম্পর্কে দেখা যাচ্ছে যে, তৎকালীন বৃটিশ ভারতের সরকারেরই একটি বিভাগ সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার পক্ষ থেকে প্রকাশিত মানচিত্রে কচ্ছের রান পুরোপুরি কচ্ছ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সুতরাং রানের উত্তর প্রান্তই স্বীকৃত কচ্ছ-সিন্ধু সীমান্ত। কচ্ছের রান এলাকাটির উপর ভারতের অধিকার স্বীকার করে নিয়েও তার একটি অংশ ট্রাইব্যুনাল কেন পাকিস্থানকে দিয়ে দিল? এই ব্যাপারে ট্রাইব্যুনাল যে সব যুক্তি দিয়েছে তাদের মধ্যে একটি অতি বিচিত্র। বিচারপতি লাগারগ্রেন বলেছেন, ঐ সব অংশে পাকিস্থানকে অধিকার না দিলে সংঘর্ষ ও সংঘাতের সৃষ্টি হতে পারে। তিনি আরও বলেছেন যে যে খাড়ীগুলি পাকিস্থানের দ্বারা পরিবেষ্টিত সেগুলিকে শান্তি ও স্থায়িত্বের খাতিরে পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত বলেই গণ্য করা উচিত।

কিন্তু এটা কি ধরনের যুক্তি? এটা কি একটা আইনের যুক্তি, না, রাজনৈতিক যুক্তি। বিচারকদের নিয়ে গঠিত একটা আন্তর্জাতিক সালিশী আদালতের কি অধিকার আছে আইনের ব্যাখ্যার বাইরে গিয়ে একটা রাজনৈতিক যুক্তি উপস্থিত করার? কচ্ছের নোনা জলে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে যখন হাবুডুবু খেতে হচ্ছে তখন এই সব প্রশ্ন উঠছে। প্রাক্তন মন্ত্রী এম সি চাগলা রাজ্যসভায় একটি কড়া বক্তৃতায় বলেছেন, ট্রাইব্যুনাল তার এক্তিয়ার ছাড়িয়ে একটা রাজনৈতিক রোয়েদাদ দিয়েছে, এই যুক্তিতে ভারত এই রোয়েদাদ মেনে নিতে অস্বীকার করতে পারে।

চাগলা আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি বলেছেন, ট্রাইব্যুনালের রায় অনুসারে কচ্ছ সীমানা চিহ্নিত করতে গেলে সেটা শুধু সীমানার পুনর্বিন্যাসই হবে না, ভারতবর্ষের কিছু অংশ পাকিস্থানকে দিয়ে দেওয়া হবে। চাগলার মতে সংবিধান সংশোধন না করে এটা করা যাবে না।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী লোকসভায় বলেছেন ভারতবর্ষকে ট্রাইব্যুনালের রায় মেনে নিয়ে তার আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতির মর্যাদা রক্ষা করতেই হবে। কংগ্রেস পার্লামেন্টারি পার্টির সভায় ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায়ও এই ধরনের অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে—যদিও ভারত সরকার আগে কচ্ছের বিরোধ নিয়ে পাকিস্থানের কাছে চালে হেরে গেছেন তাতে দলের মধ্যে



ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে। অন্যদিকে, এই ব্যাপারে ভারত সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশের জন্য জনসঙ্ঘ উদ্যোগী হয়েছে। স্বতন্ত্র দলের পক্ষ থেকে শ্রীমতী গান্ধীকে পদত্যাগ করতে বলা হয়েছে। জনসংঘের শ্রীঅটলবিহারী বাজপেয়ী ও সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টির শ্রীমধু লিমায়ে যৌথ-ভাবে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর কাছে একটি পত্র লিখে তাঁকে ট্রাইব্যুনালের রায় প্রত্যাখ্যান করার পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন যে, ওপেনহাইম, সিমসন, ফক্স প্রভৃতি আন্তর্জাতিক আইনের বিশেষজ্ঞদের অভিমতেও এই ধরনের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সালিশীর রোয়েদাদ প্রত্যাখ্যানের সমর্থন পাওয়া যাবে। জনসংঘের পার্লামেন্টারি পার্টির কার্যনির্বাহক সমিতির সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয়েছে, কচ্ছ রোয়েদাদ ভারতের পক্ষে "ঘোর আনা বিপর্যয়"। শ্রীমধু লিমায়ে এক বিবৃতিতে বলেছেন যে, এই রোয়েদাদ যাতে গৃহীত না হয় সেজন্য তাঁরা "সংসদের ভিতরে ও বাইরে" লড়াই করবেন।

কচ্ছ নিয়ে শ্রীমতী গান্ধীকে অদূর ভবিষ্যতে তাঁর নিজের দলের ভিতরে ও বাইরে বিপদে পড়তে হবে বলে মনে হচ্ছে। যদিও কচ্ছ ট্রাইব্যুনাল যখন গঠিত হয় তখন লালবাহাদুর শাস্ত্রী ছিলেন প্রধান-মন্ত্রী তথাপি এই ট্রাইব্যুনালের রায় কার্যকর করার ভার ঘটনাক্রমে শ্রীমতী গান্ধীর সরকারের উপর এসে পড়েছে। তাঁর সরকার যদি এই রোয়েদাদ মানতে অস্বীকার করেন তাহলে বিশ্বের দরবারে, বিশেষ করে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির কাছে ভারত-বর্ষকে প্রতিশ্রুতিভঙ্গের দায়ে দায়ী হতে হবে। আর সেই রোয়েদাদ মানতে গেলে তাঁর সরকারকে দেশের ভিতরেই প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হতে হবে। দুই কম্যুনিস্ট পার্টি হয়ত এই ব্যাপারে বিশেষ কিছু উচ্চবাক্য করবে না, কিন্তু জনসংঘ, সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী প্রভৃতি দল আদালতের মারফৎ এবং আন্দোলন চালিয়ে শ্রীমতী গান্ধীর সরকারকে অপদস্থ করার চেষ্টার ত্রুটি করবে না, এমন কি কংগ্রেস দলের মধ্যে যাঁরা শ্রীমতী গান্ধীর প্রতিপক্ষ তাঁরাও এই সুযোগ সহজে ছাড়বেন বলে মনে হয় না।

বৈষয়িক প্রসঙ্গ

প্রয়োজনীয় আপ্তবাক্য

ভারতবর্ষ যদি কৃষিক্ষেত্রে বিপ্লব আনতে পারে তাহলে তার ভবিষ্যতের চেহারা আমূল পাল্টে যাবে এবং সমগ্র অর্থনীতিই দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে।

গত সপ্তাহে বোম্বাইয়ে ইণ্ডিয়ান মার্চেন্টস চেম্বারের বার্ষিক অধিবেশনে ভাষণ দিতে গিয়ে বিখ্যাত শিল্পপতি শ্রীজে আর ডি টাটা এই মন্তব্য করেন।

শ্রীটাটার এই কথার সংগে দ্বিমত হবার কোন প্রশ্নই নেই। কারণ বিভিন্ন মহল থেকে এই কথাটা এতদিন এতবার বলা হয়েছে যে আজ এটা অনেকটা আপ্তবাক্যের মত হয়ে গেছে। কিন্তু এই আপ্তবাক্য বার-বার বলে যেতেই হবে, কেননা কৃষি-প্রধান দেশ ভারতবর্ষে কৃষিব্যবস্থাই আগাগোড়া এবং সবচেয়ে বেশী উপেক্ষিত হয়ে এসেছে।

শ্রীটাটা বলেছেন, যদি দেশে একটা কৃষি-বিপ্লব সংগঠিত করা যায় তাহলে সাম্প্রতিক কালের ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম গ্রামীণ মানুষের হাতে বছরের পরেও এমন কিছু উদ্বৃত্ত অর্থ থাকবে যা শিল্পের একটা বিরাট নতুন বাজার সৃষ্টি করতে পারে।

"যদি কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে আর মাত্র ১০ শতাংশ বেশী লোক শিল্পদ্রব্যের নিয়মিত খদ্দের হয় তাহলে বর্তমান বাজারের সংগে আরো ৫ কোটি নতুন ক্রেতা যুক্ত হবে।"

এই কৃষিবিপ্লব সৃষ্টির মাধ্যমে শিল্পের উন্নতি ঘটানোর জন্যে শ্রীটাটা উন্নত বীজ ও পদ্ধতি এবং পর্যাপ্ত সেচের জল ও সারের ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বাড়ানো ছাড়াও আরো কয়েকটি সুপারিশ করেছেন। যেমন :

- ভোগ্যপণ্যের শিল্পের প্রসারকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে।
- খাদ্যাঞ্চল যদি সম্পূর্ণ বিলোপ করা না যায় তাহলে বর্তমান রাজ্যভিত্তিক অঞ্চল ব্যবস্থা বাতিল করে দিয়ে কয়েকটি রাজ্য নিয়ে এক-একটি অঞ্চল গঠন করতে হবে। এর ফলে খাদ্যের দামের ওপর চাপ কমবে আর তার ফলে শিল্পে বেতনের দাবীও কমবে।
- জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর মাধ্যমে চাষ প্রথা প্রবর্তন করতে হবে এবং অবিলম্বে করতে হবে।
- গ্রামাঞ্চলের সংগে শহরাঞ্চলের যোগাযোগের জন্যে নতুন নতুন সড়ক নির্মাণ করতে হবে। সেই সংগে জাতীয় মজুত ভাণ্ডার পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্যে শত শত সাইলো ও গুদাম তৈরী করতে হবে। এর দ্বারা যে সব শিল্প এখন মন্দার মুখে পড়েছে সেগুলি আবার চাঙ্গা করা যাবে।

শ্রীটাটা এই কৃষিবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করবার জন্যে শিল্পপতিদের আহ্বান জানান। কিন্তু কৃষিবিপ্লব শুধু শিল্প-পতিদের দায়িত্ব নয়। এই বিপ্লব সৃষ্টির জন্যে প্রধান ভূমিকা রয়েছে সরকারের। এই ভূমিকা সরকার কিভাবে পালন করতে ইচ্ছুক তার ইঙ্গিত পাওয়া গেছে গত ২২ ফেব্রুয়ারী লোকসভায় কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীজগজীবন রামের বক্তৃতা থেকে।

শ্রীরাম প্রকারান্তরে এই কথা জানান যে, রবি ফসলের পাট চুকে যাবার পর খাদ্য সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণাদির সমগ্র প্রশ্নটি পুনর্বিবেচনা করে দেখা হবে। এই জন্যে মুখ্যমন্ত্রীদের একটি সম্মেলন ডাকা হচ্ছে।

শ্রীরাম যা বলেন তাতে মনে হয় খাদ্য চলাচল সহ খাদ্যের ওপর সর্বপ্রকার নিয়ন্ত্রণ তুলে দেওয়া হবে। দিল্লী ও অন্যত্র খাদ্য চলাচল ও রেশনের ব্যবস্থা তুলে নিয়ে সম্ভবত এর কাজ আরম্ভ করা হয়েছে।

তবে তিনি বলেন, একটি মজুত ভাণ্ডার গড়ে না তোলা পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ তুলে দেওয়া সম্ভব নয়। ঘাটতি রাজ্যগুলির স্বার্থে খাদ্যসংগ্রহের কাজ চালিয়ে যাওয়াও সরকারের উদ্দেশ্য।

কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী বলেন, আর্থিক অবস্থা খারাপ হওয়া সত্ত্বেও নতুন নতুন সেচ প্রকল্প রূপায়ণের জন্যে পর্যাপ্ত অর্থ জোগাড় করা সম্ভব হবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন। তিনি জানান, ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের ওপরেই জোর দেওয়া হবে। এর জন্যে ১১২ কোটি টাকার বরাদ্দ তিনি আদায় করতে পেরেছেন।

সেই সংগে উৎপাদককে উপযুক্ত মূল্যও দেওয়া হবে বলেও তিনি জানান। কিছুতেই যাতে চাষীরা ন্যূনতম মূল্যের চেয়ে কম দেওয়া হবে না। এই উদ্দেশ্যেই সরকার সম্প্রতি বাদাম ও বাদাম তেল রপ্তানীর অনুমতি দিয়েছেন।

ঐ দিনই নয়াদিল্লীতে নিবিড় চাষ কর্মসূচীর সংগে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের এক সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে সরকারের আরো কয়েকটি উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত করেন। যেমন চাষীরা যাতে সহজ সর্তে ঋণ পায় তার ব্যবস্থা করা হবে। উন্নত ধরনের ও অধিক ফলনক্ষম বীজের আরো ব্যাপক ব্যবহার করা হবে। আধুনিক পদ্ধতি যতদূর সম্ভব প্রয়োগ করা হবে। অ-সেচ এলাকার চাষীদেরও উপযুক্ত পরামর্শ ও সাহায্য দিয়ে উৎসাহ দেওয়া হবে।

এই ব্যবস্থাগুলি যদি নেওয়া হয় তাহলে যে ভারতের কৃষিতে রূপান্তর ঘটানো যাবে তাতে আমাদের কোন সন্দেহ নেই। কথা হচ্ছে নেওয়া যাবে কিনা। এর উত্তরের ওপরেই চূড়ান্ত বিচারে ভারতের কৃষি-বিপ্লব নির্ভর করছে। এখন পর্যন্ত কেবল সদিচ্ছা ছাড়া সরকারের এমন কোন নেতৃত্বের পরিচয় পাওয়া যায়নি যার ওপর আমরা আস্থা রাখতে পারি।

তুঙ্গনাথ

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

॥ ১ ॥

কেদারনাথের পথে যেতে গুপ্তকাশী ছাড়িয়ে এসে প্রায়ই দেখা যায়,—পিছনে দূরে নীল-আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে গাঢ়-নীল এক উঁচু পাহাড়। শিখর-দেশে কখনো বা শীতের শেষের অল্প তুষারের শুভ্র প্রলেপ। হঠাৎ বৃষ্টি হলেও হয়ত আবার নতুন বরফ পড়ে। বৃদ্ধ যেন শীতের ভয়ে মাথায় সাদা চাদর জড়ান। মেঘ ও কুয়াসায় সারা-দেহ কখন হয়ত ঢাকা থাকে। আবরণ সরে গেলেই আবার দর্শন দেন,—উন্নত শির [illegible] শৈলরাজ।

ইনিই পঞ্চকেদারের তৃতীয় কেদার—তুঙ্গনাথ।

কেদার-বদরীর তীর্থপথে এই অঞ্চলের সবচেয়ে উঁচু [illegible] ১২,০৭২ ফুট [illegible]। [illegible] হয়ত সেই কারণেই তুঙ্গনাথ। [illegible] আরও প্রায় এক হাজার ফুট উপরে সেই পাহাড়ের চূড়া। চন্দ্রশিলা। [illegible] প্রায় ১৩,০০০ ফুট। কেদার-মন্দির—১১,৭৫০ বদরীনাথ—১০,২৪৪ ফুট। মদমহেশ্বর, রুদ্রনাথ ও কল্পেশ্বরের [illegible] বহু যাত্রীর কাছে আসে না। কিন্তু তুঙ্গনাথের [illegible] সকল যাত্রীর [illegible] [illegible]।

কেদারের পথে গুপ্তকাশী। গুপ্তকাশীর [illegible] চটি [illegible]। কেদারনাথের পথ ছেড়ে [illegible] আর এক পথ [illegible] [illegible]। [illegible] উখীমঠ।

[illegible] উখীমঠ যাওয়ার পথ।

বাস চালু হওয়ার আগে কেদার [illegible] সব যাত্রী [illegible] উখীমঠের পথ ধরতেন। সেখান থেকে আবার তুঙ্গনাথের পাহাড় পার হয়ে গোপেশ্বর পেরিয়ে [illegible] অলকানন্দার তীরে বদরীনাথের পথ পেতেন। কেদার [illegible] বদরীনাথ আসার [illegible]। উখীমঠ-তুঙ্গনাথ চামোলীর পথে কেদার-বদরীর দূরত্ব অনেক কম। উখীমঠ ও তুঙ্গনাথ দর্শনও হয়।

কিন্তু এখন বাস চলাচলের যুগ। তাই যাত্রীরাও অনেকেই কেদার থেকে গুপ্তকাশীতে ফিরে বাস-এ চাপেন। বাস চলে আসে একেবারে বদরীনাথে। গাড়ী থেকে নেমেই মন্দিরে বদরীনাথ-দর্শন। তাই তো যাত্রীরা বলেন কী সুবিধাই না হয়েছে—পাহাড়ের চড়াই-ওঠা, পায়ে-হাঁটা সবখানি বাঁচল!

বাঁচে সত্যই। কেন না, তুঙ্গনাথের চড়াই সে তো সামান্য নয়।

কিন্তু হিমালয়ে ঘুরতে এসে বাস-এর সুবিধাবোধে ও চড়াই-এর ত্রাসে এই তিন-দিনের হাঁটা পথটুকুকে এড়িয়ে গেলে নিজেকেই অপার আনন্দ থেকে বঞ্চিত করা হয়। তুঙ্গনাথ থেকে দিগন্ত বিস্তৃত তুষার-গিরিশ্রেণীর যে অপরূপ দৃশ্য দেখা যায়, কেদার-বদরীর যাত্রাপথে আর কোথাও তেমন পাওয়া যায় না।

তুঙ্গনাথ থেকে নামার পথটিও নিবিড় অরণ্যের মধ্যে দিয়ে যায়। এমন গভীর [illegible] এই যাত্রা-পথে বিরল। ভয়ের কোন কারণ নেই। বন্য জন্তুর অত্যাচার নেই। [illegible] পথ-ভোলারও আশঙ্কা নেই। শান্ত শীতল [illegible], [illegible] পার্বত্য ঝর্ণার উচ্ছল-কল্লোল-মুখরিত এই আদিম অরণ্যানীরও এক মহান রূপ আছে।

অথচ এখন [illegible] তুঙ্গনাথের পথ। [illegible] তীর্থ উখীমঠও যাত্রীবিরল।

তবে, বাস-এর পথ এদিকেও [illegible] আসে। কুণ্ডচটির অপর পার থেকে [illegible] উখীমঠের নীচে, তুঙ্গনাথের [illegible] চমোলীতে বদরীনাথের [illegible] মিলেছে। কয়েক বছরের মধ্যেই [illegible] বাস ছুটবে। কিন্তু [illegible] আরেক [illegible] যাত্রী [illegible] [illegible]।

॥ ২ ॥

[illegible] পথে [illegible] কেদার [illegible] উখীমঠ। শঙ্করাচার্যের প্রতিষ্ঠিত। কার্তিকে যখন কেদারনাথ মন্দির বন্ধ হয়ে যায়, উখীমঠে সেই ছয় মাস পূজা হয়। কেদারনাথের ভোগমূর্তি এইখানে আসেন।

উখীমঠ—ঊষামঠের অপভ্রংশ। কৃষ্ণ [illegible] বাণরাজা। তারই সুন্দরী কন্যা ঊষা। সেই রাজকন্যা প্রেমে পড়েন কৃষ্ণপৌত্র অনিরুদ্ধের। প্রিয়সখী চিত্রলেখা দূতী হন। প্রাচীন প্রেমকথার ইতিহাসে অনিরুদ্ধ-ঊষার উপাখ্যান সুবিদিত। এই নিয়েই যুদ্ধ বাধে বাণরাজার সঙ্গে কৃষ্ণ ভগবানের। এই উখীমঠ অঞ্চলে—শোণিতপুরে। এইখানেই ছিল বাণরাজার রাজ্য। এখনও শোণিতপুরের [illegible] দেখায়।

[illegible] মন্দিরও [illegible] মধ্যে। প্রকাণ্ড তোরণ। ভিতরে বিস্তীর্ণ অঙ্গন। চারপাশে সারি সারি ঘরবাড়ী। মাঝখানে মন্দির। প্রাচীন তীর্থস্থানের স্পষ্ট পরিচয়। ওঙ্কারেশ্বর শিব। অন্যান্য দেবদেবীরও মূর্তি। কেদারনাথের গদি। পঞ্চমুখ শিবের রৌপ্যমূর্তি। পঞ্চকেদারের প্রতিমূর্তি।

কেদারনাথের প্রধান পূজারী রাওলজীর এইখানে বাস। [illegible]। [illegible] রাওয়ালজীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। সেই সূত্রে যাতায়াতের পথে বহুবারই এখানে কয়েকদিন করে কাটাই। তারই প্রেরণায় ও ব্যবস্থায় আমার প্রথম মদমহেশ্বর-দর্শন হয়।

এক বছর দিওড়িতালও এখান থেকে দেখতে যাই। উখীমঠের উত্তর-পূর্বদিকে পাহাড়ের মাথায় মনোরম হ্রদ। অতি অনায়াসে ঘুরে আসা যায় একদিনের মধ্যেই। তুঙ্গনাথের যাত্রা-পথে অল্প গিয়ে বড় রাস্তা ছেড়ে বাঁ দিকে পাহাড়ে ওঠা। পায়ে হাঁটা সরু পথ। বনজঙ্গল। তাই গাইড-এর প্রয়োজন। রাওয়ালজী তাঁরই এক লোককে সঙ্গে দেন। কেউ বলে উখীমঠ থেকে মাইল ছয়েক, কেউ বা বলেন মাইল তিন চার মাত্র। পাহাড়ের গা বেয়ে চড়াই। উপরে খানিক সমতল পথ। চারদিকে গহন বন। বড় বড় গাছ। অতি শান্ত নির্জন পরিবেশ। হঠাৎ কানে আসে জলচর পাখীদের কলরব। পাহাড়ের বাঁক ঘুরতেই গাছের সারির ঘন পর্দা সরে যায়—সামনে দেখি বিস্তৃত জলরাশি। প্রায় ৮ হাজার ফুট উঁচুতে। দৈর্ঘ্য লম্বা প্রায় আধ মাইল ও চওড়া প্রায় [illegible]। [illegible] চৌখাম্বা [illegible] তুষার [illegible] দেখা যায়। কেদারশৃঙ্গও। হ্রদের স্বচ্ছ জলে শুভ্র তুষারশৃঙ্গের প্রতিবিম্ব পড়েছে। [illegible] যেন [illegible] মনোহর রূপ দেখেন।

এই হ্রদের তীরে এক সাধু বারেক বছর কুটির বেঁধে থাকতেন। একান্তে নিভৃতে সদা ভজন করতেন। [illegible]

উখীমঠে কতো শান্ত মধুর দিন কাটাই। একবার মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায় কিসের যেন ঝাঁকানিতে। [illegible]। মনে হয় পাহাড়ের অন্তস্তল থেকে অদ্ভুত এক আওয়াজ ওঠে, [illegible] চলে [illegible] হয়। অন্ধকার ঘর, তবু বেশ বুঝতে পারি—খাটিয়া নড়ে, পাশের কাঠের চেয়ার [illegible] দরজা জানলা কেঁপে ওঠে। মাথার উপর ছাদের টিন-এর ঝনঝন, [illegible] একটা পাথর [illegible] [illegible]।

হিমালয়ে ভূকম্পন এই প্রথম দেখি। চুপ করে শুয়ে থাকি। ভাবি, সমতল ভূমি হলে সাবধানী লোক বাড়ীর বাইরে গিয়ে দাঁড়ায়। হিমালয়ে ঘরের বাইরে পাহাড় ভেঙে পড়তে পারে, পাথর গড়িয়ে আসা খুবই স্বাভাবিক। যা হবার হোক—এইখানে, এইভাবেই।

থেকে থেকে ভূমিকম্প কয়েকবারই হয়,—চারদিকে টিন-এর ঝনঝন আওয়াজ, পাহাড়ের অরণ্য অতল গর্ভে সেই এক আশ্চর্য গুরুগুরু [illegible]

ভোরে উঠে শুনি সকলের মুখেই সেই

একই কথা। শহরে বিশেষ কোন ক্ষতির খবর পাই না।

এর পরেও দু' তিনদিন অল্প দু'-একবার ভূমিকম্পন চলে।

॥ ৩ ॥

মন্দির-এলাকার মধ্যে রাত-কাটানোর মাধুর্য আছে। হিমালয়ের নিস্তব্ধ রজনী। তখনো আঁধার কাটে নি। হঠাৎ দামামার শব্দ ওঠে। পূজারী মন্দির দুয়ার খোলেন। অতি প্রত্যুষে শুরু হয় দেবতার মঙ্গল আরতি। কম্বল শয্যায় শুয়ে শুয়ে শুনি ঘণ্টার মধুর ধ্বনি। ভূ-কম্পন নয়, তবু, সারা হিমালয়ে যেন সেই ধ্বনির অনুরণন ওঠে, আমারও হৃদয়-অভ্যন্তরে পরম আনন্দের হিল্লোল তোলে। কান পেতে শুনি। দেহমন গভীর তৃপ্তিতে ভরে ওঠে।

পূজা সাঙ্গ হয়। আবার নিস্তব্ধ নিঝুম।

হঠাৎ মনে আসে Ben Jonson এর মন্তব্য— Bells are profane, a tune may be religious

ভাবি, তাই কি ঠিক? ঘণ্টার মধ্যে ত শুনি অমৃতময় বাণী।

আবার বাইরে ঘণ্টা বাজে। এবার মন্দিরে নয়, পথে। বুঝতে পারি, ভেড়া-ছাগলের পাল চলে পিঠে বোঝা নিয়ে। গলায় তাদের ঘণ্টা দোলে, টুংটাং শব্দ তোলে। শব্দহীন শান্ত হিমালয়-পথের এও এক মধুর বাণী। স্বর্গীয় ভাব নয়, পথচলার আনন্দ-গীতি। যেন, স্তব্ধ বনে পাখীর কাকলি।

একই তারের যন্ত্রে বিভিন্ন সুর শব্দ ভিন্ন রাগ-রাগিণী একই মনে বিভিন্ন ভাব জাগায়; তেমনি বিভিন্ন ঘণ্টার ধ্বনি মনেও কতো বিচিত্র ভাবের সঞ্চার করে!

শুয়ে শুয়ে সেই কথাই ভাবি।

ছেলেবেলা। কলকাতা শহর। বাড়ীর প্রায় সামনা-সামনি ভবানীপুরের তখনকার থানা। থানাবাড়ীর তিনতলার ছাদে কাঠের মাথা-উঁচু ছাউনি—যেন নহবৎখানা। সেখানে প্রকাণ্ড এক ঘণ্টা ঝোলে। সব সময়ে লাল-পাগড়ি পুলিশ একজন হাজিরা দেয়, প্রহরে প্রহরে ঘণ্টা বাজায়। মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভাঙে। অন্ধকার ঘরে বড় রাস্তার আবছা আলো। নিঝুম বাড়ী। সবাই ঘুমে অচেতন। থানার ঘণ্টা-পেটার শব্দ ওঠে—রাত দুটো। নিস্তব্ধতার কালো দেহে হঠাৎ যেন বাঘের দুটো চোখ জ্বলে ওঠে। কুঁকড়ে পাশ ফিরে শুই। আবার দিনের আলোতে শহরের কোলাহলে থানার ঘণ্টা হারিয়ে যায়। সকালে ঘোড়ার গাড়ীর ঘণ্টা। রাস্তার বহু গাড়ীর ঘণ্টার মধ্যেও সেই পরিচিত ঘণ্টার শব্দ চিনতে কখনো ভুল হোত না। ভোরে গড়ের মাঠে বেড়িয়ে বাবা বাড়ী ফেরেন। বড় রাস্তায় গাড়ী ছেড়ে দেন। গাড়ীর ঘণ্টা ত নয় বাবার যেন পদধ্বনি। একটু পরেই আসবেন পাশের প্রকাণ্ড বই-ভরা হল-এ। একমনে নিজের কাজে বসবেন। পাশে আমার পড়ার ঘরে ছোট্ট বইখানি নিয়ে আমিও বসি। তাঁর বিরাট আলোর দীপ্তি থেকে আমার খেলার মাটির প্রদীপ যেন জ্বালিয়ে রাখি।

দুপুরে স্কুলের ঘণ্টা। ক্লাস শুরু হওয়ার ঘণ্টার সুর কানে বাজে একভাবে, শেষ হওয়ার ধ্বনি মনে ভিন্ন ভাব আনে। যে-ক্লাস ভাল লাগে, ঘণ্টাশেষে কি যেন হারিয়ে যাওয়ার দুঃখ জাগে। যে-ক্লাসে মন বসে না, ঘণ্টা বেজে স্বস্তি আনে। আবার মনে পড়ে, এই ঘণ্টাধ্বনিও হারিয়ে যায়। কলেজে মাস্টারমহাশয়ের ক্লাস। শেকস্‌পীয়র পড়ানোর গভীর সরস ভঙ্গী। অবাক বিস্ময়ে শুনি মনপ্রাণ চলে যায় সেই যুগে। চোখের সামনে ফুটে ওঠে নাটকের চরিত্র ও ঘটনাগুলি। কখন ঘণ্টা বেজে যায়, কেউ শোনে না। পরের ক্লাসের প্রোফেসার এসে দরজার বাইরে দাঁড়ান, সবাই সজাগ হই। ঘণ্টাধ্বনি এমনি করেও হারায় দেখি!

স্টেশনে বা জাহাজ-ঘাটে ঘণ্টাধ্বনির আর এক বাণী। যাত্রীমহলে অতি-ব্যস্ততায় সাড়া তোলে। হুড়োহুড়ি, ছুটোছুটি। এই বুঝি ট্রেন আসে, এই বুঝি ছেড়ে যায়! কথায় বলে, ট্রেনের ঘণ্টা!

মধুর বাজে হিমালয়-পথে ঘণ্টার ধ্বনি। নিস্তব্ধ পথ। নির্জন বন। ঠুংঠাং শব্দ ওঠে। অদৃশ্যে যেন জলতরঙ্গ বাজে। ভেড়া-ছাগলের পাল দেখা যায়। পথ জুড়ে এগিয়ে আসে। পাহাড়ের একপাশে সরে দাঁড়াই। লোমভরা দেহ দুলিয়ে—হয়ত পায়ের উপর ধাক্কা মেরে—ভিড় করে পাহাড়ী পথে এগিয়ে চলে ঘণ্টার টুং টুং শব্দ তুলে।

কৈলাস-মানস সরোবর যেতে হিমালয়ের পথে শুনি আর এক ঘণ্টার ধ্বনি। ডাকহরকরা চলে ডাকের ঝোলা পিঠে। হাতে-ধরা লম্বা-লাঠির মাথায় বাঁধা ছোট ছোট ঘণ্টা। পিয়ন চলে তাড়াতাড়ি পা ফেলে। পদক্ষেপের তালে ঘণ্টা বাজে ঝুন্‌ঝুন্‌ শব্দ তুলে। তাকিয়ে থাকি, তার চিঠির থলির দিকে। একমনে সে ছুটে চলে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। ঘণ্টার ধ্বনি ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়। পিয়নের পিঠে চিঠির থলি দেখে ঘর-ছাড়া মনে হঠাৎ ঘরের কথা ভেসে ওঠে।

ঘণ্টার ধ্বনির মধ্যে সন্ধ্যার অপর এক অমৃতময়ী মূর্তিও দেখি। হরিদ্বার বা কাশীর গঙ্গার ঘাট। জলে সন্ধ্যার ছায়া নামে। চারিদিকে—নিকটে দূরে—মন্দিরে মন্দিরে ঘণ্টার ধ্বনি ওঠে। গঙ্গার স্রোতে ভেসে চলে হেলে দুলে সারি সারি ফুলের ডালি। ছোট্ট দীপের ক্ষীণশিখা ফুলের মাঝে থরথর কাঁপতে থাকে। সহস্র-দীপ হাতে শান্ত সন্ধ্যা যেন ঘণ্টার উদাত্ত রোলে গঙ্গার আরতির স্তবগান করেন।

উখীমঠের আরতির ঘণ্টাও সেই স্মৃতিই মনে আনে।

॥ ৪ ॥

উখীমঠ ছেড়ে এগিয়ে চলি। পাহাড়ের গা দিয়ে অনেকখানি সমতল পথ। ঘুরে ঘুরে চলে। সামনে দূরে মাথা তুলে তুঙ্গনাথের বিরাট পাহাড়। পথের ডানদিকে বহু নীচে নদীর উপত্যকা। তুঙ্গনাথ থেকে নেমে ঐ পথে চলেন আকাশ-গঙ্গা। পিছন ফিরলে চোখে পড়ে দূরে মন্দাকিনীর ক্ষীণ ধারা। স্বর্গের দুই নদী, যেন দুই সখী ধরায় এসে মেলেন। মন্দাকিনীর অপর পারে পাহাড়ের গায়ে গ্রামের ঘরবাড়ী। গুপ্তকাশী আর নালামঠ। তুঙ্গনাথের পাণ্ডাদের ঐ গ্রামে বাস। শীতকালে তুঙ্গনাথের পূজাও হয় সেইখানে।

পাঁচ মাইল গিয়ে পাহাড়ের বাঁকে গণেশ চটি। আকাশগঙ্গার ধারে নেমে আসি। পুল পার হয়ে শুরু হয় তুঙ্গনাথের পথে চোপ্‌তার চড়াই। পাহাড়ের খানিক উপরে উঠেই অতি রমণীয় অরণ্য। বড় বড় গাছের ছায়া। ধীরে ধীরে পথ উঠেই চলে। অতি শান্ত নির্জন পথ। দু' মাইল গিয়ে গোলিয়া-বগড়। আরও তিন মাইল দূরে পোখীবাসা। আবার মাইল দেড় চলে দোগলভিটা। সেখান থেকে বানিয়াকুণ্ড আরও এক মাইলের উপর। মাইলের দূরত্বে চটিগুলি কাছাকাছি। কিন্তু চড়াই-পথে চলতে মনে হয় পথ যেন শেষই হয় না। যেমন, কষ্টের দিন কাটতেই চায় না। অথচ, এখানে পথের শেষ না আসায় মনে দুঃখ জাগে না। চারিদিকে গভীর বনের ছায়া-শীতল এমনি স্নেহাচ্ছন্ন মায়া। যেন, প্রিয় বন্ধুর মধুর সুখ-সঙ্গ।

তুঙ্গনাথ পাহাড়ের কাঁধের উপর এসে অর্ধচন্দ্রাকারে প্রকাণ্ড বাঁক। মোড় ঘুরতেই হঠাৎ দেখা দেয় বানিয়াকুণ্ড। চোপ্‌তার চড়াই এইখানে শেষ। শ্রান্ত যাত্রী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। সামনেই দেখে পাহাড়ের কোণে অনেকখানি সমতলভূমি। সবুজ ঘাস। ছোট ধারা। নিকটেই বড় বড় গাছ। সবুজ ডালপালা। স্নিগ্ধ শান্ত মনোরম পরিবেশ। ইচ্ছা হয়, কাটিয়ে যাই এইখানে কয়েকদিনই।

আট নয় হাজার ফুট উচ্চতা হবে। বেশ শীত আছে। কালীকম্‌লির দোতলা ধর্মশালা। তাই থাকার অসুবিধা নেই। এই ধর্মশালায় একবার এক ছোট ঘটনা ঘটে।

একা আছি দোতলায় একটা ঘরে। যাত্রীর ভিড় নেই। অপরদিকের ঘরে আর কে যেন আছেন। কথা শোনা যায়: বাঙ্গালী। ভদ্রলোক কঠোর ভাষায় কাকে গালি দেন। মাঝে মাঝে চাপা মহিলাকণ্ঠের দু' একটা কথা ভেসে আসে। হিমালয়ের শান্ত নিভৃতিতে মানুষের দুর্বল স্বভাবের রূঢ় প্রকাশ আমার মনে অস্বস্তি জাগায়।

একটু পরেই পরিচয়ের সুযোগ ঘটে। রাগের মাথায় নীচে চলেন। সিঁড়ি থেকে এদিকে আমাকে দেখে এগিয়ে আসেন। বলেন, বাঙ্গালী না? দেখেছেন কুলিটার কাণ্ড' —মশাই ব্রাহ্মণ মনে হচ্ছে। দাঁড়ান দাঁড়ান আগে প্রণাম নিন।

বাধা দিই। কম্বলে বসাই। ঘটনাটা বলেন। এমন কিছুই নয়। ভারী বোঝা নিয়ে চড়াই ভেঙে আসতে তাঁর মোট-বাহকের দেরি হয়। ওঁদেরও তাই খুব অসুবিধা রাগের এই হেতু। নিজেই লজ্জিত হয়ে বলেন, ওপরচারীরও কষ্ট, বুঝতে পারি ভাব, বাগরো না কিন্তু সামলাতে পারি কই' মানুষ বুঝেছেন বড় দুর্বল।

কালো রোগা চেহারা। বছর ষাট বয়স মুখ চোখ বসা। শীতে আপাদমস্তক মুড়ি দেওয়া। কথা বলতে দাঁতগুলি দেখা যায় পানের ছোপ লাগা দাঁত। কুঁচনো কাপড় ধুতি পরনে। বোঝা যায়, এ-পাহাড়ে মাঝে মাঝে ব্যবহার করে তুলে রাখেন।

কলকাতা থেকে এসেছেন। খাস কলকাতার লোক। টাকাকড়ির অভাব নেই। এখন তীর্থ করতে এসেছেন। 'সবকিছুই একপাতে বসে, জীবনে ভোগ করেছি, মশাই,

অনেক। পাপপুণ্য কিছুই বিচার করি নি। কিন্তু এই কয়টা বছরে এমন আঘাতটা পেলাম, এখন হুঁস হয়েছে, জীবনের ধারা ঘোরাবার চেষ্টা করছি। প্রত্যেক তীর্থে গিয়ে এক একটা নেশা ত্যাগ করছি—একে একে সব ছাড়ব।

হেসে বলি, পানটা ত এখনও এখনে খাচ্ছেন দেখছি।

বলেন, হাঁ, এটাও ছাড়ব। কিন্তু সব শেষে, ধরাও ত সেই প্রথম বয়সে কিনা। মুখে পান নিয়ে রাত্রে ঘুমুই। —বলে তিনিও হাসেন, হঠাৎ গম্ভীর হন, দেখুন, সংসারের মায়াও কাটিয়ে ফেলেছি, মানে—তিনিই কাটিয়ে দিয়েছেন। ক' বছর আগে স্ত্রীকে হারিয়েছি। একমাত্র ছেলেটাও হঠাৎ মারা গেল—এই ক'মাস আগে। তার পরেই ত তীর্থে যাত্রা হওয়া। সঙ্গে যে মেয়েটিকে এনেছি, ও আমার কেউ নয়। ছোটবেলা থেকে আমার বাড়ীতেই মানুষ, ঘরের মেয়ের মত। বালবিধবা, ব্রাহ্মণী। ওর মা কাজ করতো আমার বাড়ীতে। ওকে রেখে মারা যায়। গৃহদেবতা গোবিন্দ। তাঁর সেবা-পূজা করে। আমারও এখন দেখাশুনা কাজকর্ম ও-ই করে দেয়। তাইতো ওকে সঙ্গে আনা, গোবিন্দও চলেছেন কিনা। মেয়েটিরও তীর্থ হয়ে যাবে। একা ফেলেই বা আসব কার কাছে?

চুপ করে কি যেন ভাবেন; নিজে থেকেই আবার বলেন, দেখুন মশাই, ত্যাগের কথা বলছিলাম, ছাড়ছি বটে এক এক করে, আপনা থেকেই স্ত্রী-পুত্র ত্যাগ হয়ে গেল, কিন্তু আবার এখন দেখছি, নতুন মায়ার বাঁধন জড়াচ্ছে—এই অনাথা মেয়েটিকে নিয়ে। পুত্রশোক—সে-ও, মশাই, ভুলতে পারি কই? যায় কি কখনো ভোলা?

তাকিয়ে দেখি। চেহারা বেশভূষা দেখে বোঝাই যায় না—মানুষের মনের গতিবিধি, অন্তরের গোপন ব্যথা, আসক্তি কাটিয়ে ওঠার উদ্দাম প্রচেষ্টা।

তাঁকে বলি, একটা ঘটনা শোনাই আপনাকে। হিমালয় নয়, তীর্থপথ নয়,—কলকাতা শহর। বাড়ীতে কীর্তনের আসর বসেছে। শ্রীখোল বাজাবেন একজন নাম-করা বৈষ্ণব ভক্ত মৃদঙ্গ-বাদক। সময় বয়ে যায়। তাঁর দেখা নেই। শ্রোতারা বলেন, হয়ত ভুলেই গেছেন। দেরি দেখে অগত্যা তাঁদেরই একজন সঙ্গত সুরু করেন। কীর্তন চলতে থাকে। অনেকক্ষণ পরে সেই বৈষ্ণব আসেন। সকলে সাগ্রহে আসরে তাঁর পথ করে দেন। ছোট্ট মানুষ, তবুও শরীর বেঁকিয়ে, ছোট হয়ে, দু হাত বাড়িয়ে বিনীতভাবে ভিড়ের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে আসেন সভার মধ্যখানে। প্রণাম করে খোল কোলে তুলে নেন। কীর্তনগায়ক আবার সুর ধরেন। শ্রীখোলেও বোল ওঠে। মুহূর্তে আসর জমে যায়। ভক্তিপ্লুত মধুর ধ্বনি। ভাবে উদ্ভ্রান্ত খোল বাদক। মুগ্ধ হয়ে সবাই তাঁকে দেখে, তাঁর প্রাণমাতানো সঙ্গত শোনে। শ্রীখোল যেন মূর্তি ধরে স্পষ্ট ভাষায় পদ-গানের ধুয়া ধরে, মধুর-রবে রাধা-কৃষ্ণ নাম বলে। বাদ্য, বাদক ও সুরের ধারা ভক্তি-রসে একাকার হয়। স্তব্ধ শ্রোতাও অজানা আনন্দলোকে বিচরণ করেন। কোথা দিয়ে সময় কাটে। রাত গভীর হয়। সকলের চমক ভাঙে। কীর্তনের আসরও শেষ করতে হয়। ভক্তিগদগদভাবে সকলে বৈষ্ণব-বাদককে ঘিরে কাছে আসেন, আন্তরিক শ্রদ্ধা জানান। সকলেই মন্তব্য করেন, যা শোনালেন, জীবনে ভোলবার নয়। একজন বলেন, আজ আপনার জন্যে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করা হয়েছিল—

তিনি চোখ তুলে তাকান। প্রেমাচ্ছন্ন মুখে ম্লান হাসি ফোটে, বলেন, ওঃ! হাঁ, তাই-তো! আসতে দেরিই হয়েছিল খুব।

হঠাৎ ছোট ছেলেটি মারা গেল কিনা,—তাকে নিয়ে শ্মশানে যেতে হোল,—সব শেষ করে সেইখান থেকেই সোজা চলে এসেছি এইখানে—কথা বলে না কেউ আর। তিনিও নন। কীর্তন শোনার মতই সভাস্থল আবার স্তব্ধ হয়ে যায়!

॥ ৫ ॥

বানিয়াকুণ্ড থেকে সোজা পথ—চোপতা। মাইলখানেক। দু'তিনটা চায়ের দোকান, চটি। এখান থেকে একটা পথ উঠে যায় তুঙ্গনাথের চূড়ায়। এ-পথের শেষ চড়াই। আর একটা পথ পাহাড় ঘুরে ডানদিকে সোজা এগিয়ে চলে, মাইল খানেক দূরে ভুলকোনায়। সেখান থেকে পাঙ্গরবাসায়। গভীর বনের মধ্যে দিয়ে পথ, যেন বিজন অরণ্যে এঁকে বেঁকে অজগর সাপ নামে। নীচে বনের শেষে মণ্ডল চটি, বালাখিল্য গঙ্গার ধারে। পরে গোপেশ্বর হয়ে চামোলী। চোপতা থেকে যারা তুঙ্গনাথের দর্শনে যান, তাদের আর চোপতাতে ফিরতে হয় না, পাহাড়ের অপর দিক দিয়ে সোজা নামেন ভুলকোনায়। খাড়া উৎরাই সে-পথ,—কে যেন ঠেলে নীচে গড়িয়ে নামিয়ে দেয়। তুঙ্গনাথ থেকে [illegible] মাইল আড়াই হবে।

চোপতা থেকে তুঙ্গনাথের শেষ চড়াই ধীরে কেবলি উঠে চলে—প্রায় হাজার তিনেক ফুট। তাই, তিন মাইল মাত্র পথ হলেও সময় লাগে। কিন্তু সময় কেটে যায় কোথা দিয়ে, শান্ত নদীর ধীর স্রোতের মত। পথের অপার্থিব সৌন্দর্য মন ভুলিয়ে রাখে। গাছপালার ফাঁকের মাঝ দিয়ে দূরে দেখা যায় সারি সারি বরফের চূড়া—কেদার-বদরীর শিখর। গাছের সবুজ-পাতার রঙে সাজানো অতি মনোহর দৃশ্য। মনে হয়, চিত্রশালার বিরাট মণ্ডপ। অতি-যত্নে শিল্পীর কারিগর দিয়ে যেন দেখাতে দেখাতে এগিয়ে চলি আকাশের নীল-দেওয়ালে ঝোলানো বিশ্বশিল্পীর হাতে-আঁকা অপূর্ব নিখুঁত ছবি। ক্রমে গাছপালা শেষ হয়। তখন দেখা যায় ঘাসের উপর ফুলের মেলা। মাঝে মাঝে জলধারা। উপরে উন্মুক্ত উদার আকাশ। দূরে দিগন্ত বিস্তৃত তুষারশৈল মালা। মনে হয়, পাহাড়ের মাথায় হাঁস ডানা ছড়িয়ে বসে—আকাশ-পানে মুখ তুলে,—এই বুঝি বা নীল-সাগরে ভাসে!

মন্দিরে পৌঁছবার আগেই ঝরনা—আকাশগঙ্গা। পাহাড়ের গায়ে খানকয়েক বাড়ী। দু'একটা দোকান। ধর্মশালা। দূরে বরফের পাহাড়—তারই পটভূমিতে সুন্দর মন্দির। মনে হয়, অতিকায় শিবলিঙ্গ।

মন্দিরে স্বয়ম্ভূলিঙ্গ। মহিষরূপী পলাতক সেই মহাদেবের বাহুভাগ। পঞ্চ-কেদারের অপর চার অংশের মূর্তিগুলিও বিরাজ করেন।

তুঙ্গনাথ অতি শান্ত স্থান। বারো হাজার ফুট-এর উপর,—তাই শীতও প্রবল। যাত্রীরা প্রায় কেউই রাত্রিবাস করে না।

দর্শন পূজো সাঙ্গ করে নেমে যান নীচে ভুলকোনায় বা পাঙ্গরবাসায়, অথবা মণ্ডলচটিতেও।

তুঙ্গনাথের আরও উপরে পাহাড়ের একেবারে চূড়ায়—চন্দ্রশিলা। পায়ে হাঁটা সরু পথ—কোথাও বা তারও রেখা নেই—ধীরে উঠে চলে। প্রায় মাইল খানেকে এক হাজার ফুট ওঠা। পথের আশপাশে ঘাস, পাথর, কোথাও বা মৃদু মন্দ জলধারা। ঘাসের মধ্যে নানান্ রঙের ছোট ছোট ফুল। বেগুনী রঙের গোরীফল—অম্লমধুর স্বাদ।

শিখরে পৌঁছে অল্পখানিকটা সমতল ভূমি। বড় বড় শিলাস্তূপ। কয়েকটা পাথর এমনভাবে সাজানো—দেখে সন্দেহ হয় ঘর বাড়ী বা দুর্গের ভাঙা অংশ। তিব্বত-পথে বা হিমালয়ের গিরি-সংকটে যেমন নানা-রঙের কাপড়ের টুকরা, কাগজের নিশান ওড়ে, এখানেও সেই ধরনের পতাকা ঝোলে। নিকটে এর মতো উঁচু শিখর নেই—প্রায় তেরো হাজার ফুট। তাই অবারিত দিঙ্‌মণ্ডল। অবাধ দৃষ্টি চলে চারিদিকে।

দূরে আকাশের গায়ে সারি সারি বরফের চূড়া—বান্দরপুঞ্ছ, গঙ্গোত্রী, কেদার, চৌখাম্বার শিখর শ্রেণী। আবার, নন্দা-ঘুন্টি, ত্রিশূল, দুনাগিরি, নন্দাদেবীর শ্বেত প্রাচীর। যেন নীল শ্লেটের গায়ে সাদা খড়ির রেখা চিত্র।

নীচের দিকে তাকালে দেখা যায়—যেন পাতালগর্ভে পার্বত্য উপত্যকা। গিরি-নদীর অতিক্ষীণ রেখা—যেন এক ফালি সরু শাদা ফিতা। পাহাড়ের ঢালু গায়ে কোথাও বা ঘন বনের স্নিগ্ধ শ্যাম শোভা। মাঝে মাঝে কঠিন রুক্ষ ধূসর পাথরের উগ্ররূপ। বহুদূরে নীচে দু'একটা গ্রাম। গ্রামের কাছে ক্ষেতের জমি, যেন সবুজ আসন পাতা। সেখানে যেন সব খেলাঘর। মানুষের নয়, বিশ্ব-প্রকৃতির মায়ার খেলা। হঠাৎ শোনা যায় দু'একটা কুকুরের অস্পষ্ট ডাক,—সুদূর কোন গ্রাম থেকে ভেসে আসে, মনে হয়, ঘুমন্ত পাহাড়ই বুঝি অস্ফুট শব্দ তোলে।

কেদারনাথের যাত্রা-পথ থেকে তুঙ্গ-নাথের আকাশ-জোড়া শিখর দেখি। কিন্তু শিখরে এসে দেখি সেই দীর্ঘ যাত্রা-পথ হিমালয়ের বিস্তীর্ণ বিশালতায় কোথায় হারিয়ে যায়।

স্থির হয়ে বসে চারিদিক দেখতে আমারও ক্ষুদ্র মন হারিয়ে ফেলি। কী নিবিড় নিঃসীম নিস্তব্ধতা। সুগম্ভীর প্রশান্ত শান্তি।

চন্দ্রশিলাই তুঙ্গনাথ-যাত্রার অক্লান্ত পরিশ্রমের শ্রেষ্ঠ দান।

মেমসাহেব

নিমাই ভট্টাচার্য

ওয়েস্টার্ন কোর্ট
জনপথ : নিউ দিল্লী

দোলা বৌদি

সেদিন কি তিথি, কি নক্ষত্র, কি লগ্ন ছিল, তা আমি জানি না। জীবন-নদীতে এত দীর্ঘদিন উজান বইবার পর বেশ বুঝতে পারছি যে সেদিন বিশেষ শুভলগ্নে আমি পৃথিবীর প্রথম আলো দেখিনি। এই পৃথিবীর বিরাট স্টেজে বিচিত্র পরিবেশে অভিনয় করার জন্য আমার প্রবেশের কিছুকালের মধ্যেই মাতৃদেবী প্রস্থান করলেন। একমাত্র দিদিও আমার জীবন-নাট্যের প্রথম অঙ্কেই জামাইবাবুর হাত ধরে শ্বশুরবাড়ী চলে পড়ল। আমার জীবনের সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আমি নারী-ভূমিকা-বর্জিত নাটকে অভিনয় শুরু করেছি।

ছোটবেলায় আমি বোবা বা বিকলাঙ্গ ছিলাম না, কিন্তু মা বলে কোন শব্দ উচ্চারণ করতে সেদিনও পারিনি আজও পারি না। ভাবষ্যতেও পারব বলে আশা করি না। শ্রদ্ধানন্দ পার্কে আমি যেসব ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলা করতাম, তাদের বিচিত্র আচরণ দেখে স্তম্ভিত না হয়ে পারতাম না। পাঁচ-ছ বছর বয়সে আমি নিজে গিয়ে বৈঠকখানা বাজারের বিরজা মিষ্টান্ন ভাণ্ডার থেকে খাবার কিনে এনে একলা একলা খেতাম কিন্তু আমার ঐ খেলার সঙ্গীরা সব সময় মায়ের বা দিদির হাতে খেতো। খেলতে খেলতে একটু পড়ে গিয়ে যদি কারুর হাত-পা একটু ছড়ে যেত তবে সঙ্গে সঙ্গে সে মার কোলে চড়ে বাড়ী চলে যেত। ওরা মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদত কিন্তু এক পাও হাঁটতে পারত না। অনেক দিন আমারও অমনি কেটে গেছে, রক্ত বেরিয়েছে, কিন্তু কই আমি তো কাঁদিনি! আমি তো কারুর কোলে চড়ে বাড়ী যাইনি! আমার নিশ্চয়ই ব্যথা লাগত না। ছোটবেলায় মাকে হারালে শিশুদের নিশ্চয়ই ব্যথা-ট্যাথা লাগে না তাই না দোলাবৌদি?

বলতে পারেন কেন এত দীর্ঘ সময় বইয়ে কাটালেন যে আমার বেশ মজা হতো। আশপাশের বাড়ীতে ঘুরে ঘুরে আমি অনেক মজা দেখতাম। সন্ধ্যার অন্ধকার একটু গাঢ় হলেই আশপাশের বাড়ীর ওরা সবাই ঘুমে ঢুলে পড়ত কিন্তু কই আমার তো ঘুম পেত না। আমি তো রোজ রাত্রি দশটা—সাড়ে দশটা পর্যন্ত জেগে বসে থাকতাম বাবার জন্য।

সব চাইতে মজা হতো স্কুলের পরীক্ষার সময়। আমার প্রায় সব বন্ধুদেরই মা এক হাতে এক গেলাস দুধ আর অন্যহাতে কিছু খাবার নিয়ে লোহার বড় গেটটার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতেন। ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেগুলো হুড়মুড় করে দৌড়ে গিয়ে দুধ-মিষ্টি খেতো। কিন্তু কই, আমার জন্য তো কেউ কোনদিন দুধের গেলাস হাতে দাঁড়িয়ে থাকত না। ঘণ্টা পড়লে আমি তো কোনদিন হুড়মুড় করে ছুটে গিয়ে দুধ-মিষ্টি খেতে পেতাম না।

পুজোর সময় সবাই কত দামী দামী সুন্দর চকচকে জামা পরত। সন্ধ্যার পর ওরা সবাই ঐসব জামাকাপড় পরে ফিটফাট সেজেগুজে মার হাত ধরে, দিদির কোলে চড়ে দুর্গাঠাকুর দেখতে বেরুত। আমি আগরপাড়ায় ইঞ্জিন আর সাতটা পরে সকালে দুপুরে এত ঘোরাঘুরি করতাম যে সন্ধ্যার সময় বেশ আরামে ঘুমুতে পারতাম। বিজয়ার দিন ওদের সবাইকে কত্তজনে আশীর্বাদ করত, কত মিষ্টি দিত কিন্তু বাবা ছাড়া আমাকে আর কেউ আশীর্বাদও করত না, মিষ্টিও দিত না।

এমনি করেই কেটেছে আমার শৈশব, কৈশোর। সেদিন বুঝিনি কিন্তু আজ বুঝেছি যে গাছ থেকে ভাল ফুল, ফল পেতে হলে একটু সার দেবার দরকার। শৈশবে মা'র ভালবাসার ঐ একটু সার পেলে হয়ত আজ আমি এমন নীরস শুষ্ক বাবলা গাছ হতাম না। আমার জীবনটাও হয়ত অনন্ত দিগন্তবিস্তৃত মরুপ্রান্তর হয়ে উঠত না।

সব মানুষই মাকে হারায়। কেউ শৈশবে কেউ কৈশোরে, কেউ যৌবনে, কেউবা প্রৌঢ়ত্বে বা বার্ধক্যে। কৈশোর বা যৌবনে, প্রৌঢ়ত্বে বা বার্ধক্যে মাকে হারালেও অল্পবিস্তর কিছু সান্ত্বনা আছে। কিন্তু আমার মত যে শৈশবে মাকে হারায়, মাতৃ-স্নেহের স্বাদ উপলব্ধি করার পর্যন্ত যার ক্ষমতা হয়নি সে যদি মাতৃহীন, তবে তার কি সান্ত্বনা?

অনেকে মাকে পায় না কিন্তু তাঁর স্মৃতির স্পর্শ পায় প্রতি পদক্ষেপে। মা'র ঘর, মা'র বিছানা, মা'র বাক্স, মা'র ফার্নিচার, মা'র ফটো থাকলেও মা'র একটা আবছা ছবি মনের পর্দায় উঁকি দেবার অবকাশ পায়। আমার পোড়াকপালে তাও সম্ভব হয়নি। নিমতলা শ্মশানঘাটে মা'র একটা ফটো তোলা হয়েছিল। পাঁচ টাকা দিয়ে তিনটে কপিও পাওয়া গিয়েছিল। নিয়মিত বাসাবদলের দৌলতে দু'টি কপি নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। তৃতীয় কপিটি দীর্ঘদিন সংসারে ক্ষুধার্ত উইপোকার উদরে জ্বালা মেটাচ্ছে। মানুষের জীবনে প্রথম ও প্রধান নারী হচ্ছে মা। তাঁর স্নেহ, তাঁর ভালবাসা তাঁর চরিত্র আদর্শ প্রতি পুরুষের জীবনেই প্রথম ও প্রধান সম্পদ। আমি সেই স্নেহস্পর্শ ভালবাসা ও সম্পদ থেকে চিরবঞ্চিত থেকে গেছি। তাইতো আমার জীবনে নারীর প্রয়োজন ও গুরুত্ব উপলব্ধিতে অনেক সময় লেগেছে।

ছোটবেলায় মাকে হারিয়ে ও আশপাশে কোন বোন বা অন্য কোন নারীচরিত্র না থাকায় মেয়েদের সম্পর্কে আমার শংকা ও সংকোচ বহুদিন কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। আমার কৈশোরের সেই দিনগুলোর কথা মনে হলে আজও হাসি পায়। ...

তখন প্রথম নাকের নীচে গোঁফের রেখা উঠেছে। সবে পায়জামা পরা শুরু হয়েছে। হাফ প্যান্ট ছেড়ে মাল কোঁচা দিয়ে ধুতি পরা ধরেছি। ফুলহাতা সার্টের হাতা না গুটিয়ে পরলে বোকা বোকা মনে হয়। শ্রদ্ধানন্দ পার্কে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে ফুটবল পেটাতে বেশ আত্মসম্মানে লাগে। বিকেলবেলার একমাত্র 'রিক্রিয়েশন' দু'চারজন বন্ধু মিলে পাড়ার এদিক-ওদিক ঘুরে ফিরে আড্ডা দেওয়া। মজুমদার বাড়ীতে আমার যাতায়াত বেশ ঘনিষ্ঠ ছিল। দু'একবার পৌষ-সংক্রান্তির দিন মজুমদার মা আমাকে আদর করে পিঠে-পায়েসও খাইয়েছেন। শুনেছি দিদির বিয়ের সময় মজুমদারদের বাড়ীর সবাই খুব সাহায্য করেছিলেন। ঐ বাড়ীর সবার সঙ্গেই আমার পরিচয় ছিল, ওদের পরিবারের অনেক খবরই আমি জানতাম। জানতাম না শুধু নন্দিনীর কথা। ছোট-নাগপুরের মালভূমি থেকে মজুমদার এই চঞ্চলা কিশোরী ভাইঝি কবে অকস্মাৎ মহানগরীতে আবির্ভূতা হয়েছিলেন, সে

খবর আমি রাখিনি। তিনিও যে নাইন থেকে ট্রেন'এ উঠে মীর্জাপুরের বীণাপাণি বালিকা বিদ্যালয়কে ধন্য করার জন্য কলকাতা এসেছেন, তাও জানতাম না। জানতাম না আরো অনেক কিছু। জানতে পারিনি যে চোদ্দ বছর বয়সেই তিনি তার জীবন-নাট্যের নায়ক খুঁজতে বেরিয়েছেন। এসব কিছুই আমি জানতাম না।

একদিন মন্টুদাদের বাড়ী থেকে দু' একটা গল্পের বই নিয়ে বেরুবার সময় মাথার পর একটা কাগজের প্যাকেট এসে পড়ায় চমকে গেলাম। কুড়িয়ে নিয়ে দেখলাম একটা খাম। নাম ঠিকানা কিছুই লেখা ছিল না। শুধু লেখা ছিল, 'তোমার চিঠি'। তোমার চিঠি। মানে আমার চিঠি। মুহূর্তের জন্য ঘাবড়ে গেলাম। দু'এক মিনিট বোধহয় থমকে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আর একটু হলেই চীৎকার করে মন্টুদাকে ডাক দিতাম। কিন্তু হঠাৎ যেন কে আমার মাথায় বুদ্ধি জোগাল। চারপাশটা একনজর দেখে নিলাম। শুধু বুড়ো কাকাতুয়া পাখীটা ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেলাম না। খামটা নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করলাম। উপরের লেখাটা বারকয়েক পড়লাম, তোমার চিঠি। তারপর দৃষ্টিটা দোতলার দিকে ঘুরিয়ে নিতেই কোনার ঘরের জানলায় হাসিখুশীভরা একটা সুন্দরী কিশোরীকে দেখলাম।

অনেকদিন আগেকার কথা। সবকিছু ঠিক মনে নেই। তবে আবছা আবছা মনে পড়ে কি যেন একটা ইশারা করে নন্দিনী লুকিয়েছিল। নারী চরিত্র সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতা না থাকলেও আমার বুঝতে কষ্ট হয়নি চিঠিটি নন্দিনীরই লেখা।

প্রায় ছুটতে ছুটতে বাসায় এলাম। খবর খিল বন্ধ করে চিঠিটা একবার নয়, অনেক বার পড়লাম। চিঠির ভাষাটা আজ আর মনে নেই কিন্তু ভাবটা একটু একটু মনে পড়ে। কিছুটা উচ্ছ্বাস, কিছুটা আবেগ ছিল চপলা কিশোরী নন্দিনীর ঐ চিঠিতে। চিঠিটা পেয়ে ভালও লেগেছিল, ভয়ও লেগেছিল। তার চাইতে আরো বেশী লেগেছিল অবাক। ধনীর দুলালীর জীবন-উৎসবে আমার আমন্ত্রণ! আমার মত একটা ভাঙা ডিঙি নৌকা চড়ে নন্দিনী জীবন-সাগর পাড়ি দেবে? আমি কল্পনাও করতে পারিনি।

নন্দিনী চিঠির উত্তর চেয়েছিল কিন্তু আমার সাহস হয়নি। উৎসাহও আসেনি। উত্তর দিইনি, তবুও আবার চিঠি পেয়েছিলাম। ইঙ্গিত পেয়েছিলাম, আমি নাকি তার মানসরাজ্যের রাজপুত্তুর। পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে নন্দিনীকে নিয়ে অভিসারা করব আমার জীবন-সঙ্গিনীরূপে। আরো অনেক স্বপ্ন দেখেছিল সে। জীবন যার প্রাচুর্যে ভরা, বিলাসিতা করা যার স্বভাব, তার পক্ষে এমন অহেতুক স্বপ্ন দেখা হয়ত স্বাভাবিক। কিন্তু আমার মত দৈন্যভরা কিশোরের পক্ষে এমন স্বপ্ন দেখা সম্ভব ছিল না। তাইতো তাঁর সে আমন্ত্রণ আমি গ্রহণ করতে পারিনি। সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করার ক্ষমতা বা সাহসও আমার ছিল না।

নন্দিনীকে আমি ভালবাসিনি। কিন্তু প্রাণচঞ্চলা এই কিশোরীকে ভুলব না কোনদিন। সে আমার জীবনযজ্ঞের উদ্বোধন-সঙ্গীত গেয়েছিল। এই কিশোরী আমার জীবন-নাট্যমঞ্চে শুধু একটু উঁকি দিয়েই সরে গিয়েছিল, বিশেষ কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অভিনয় করার অবকাশ পায়নি, কিন্তু তবু তার এক অনন্য ভূমিকা রয়ে গেছে আমার কাছে। বি-এ বা এম-এ পাশ করার পর জীবনের বৃহত্তর পটভূমিকায় অতীতের অনেক স্মৃতি হারিয়ে যায়, কিন্তু হারিয়ে যায় না পাঠশালার গুরুমশায়ের স্মৃতি।' নন্দিনী আমার তেমনি একটি অমূল্য স্মৃতি। সে আমার ভোরের আকাশের একটি তারা। সে তারার জ্যোতিতে আমি আমার জীবন-পথ চলতে পারিনি বা তার প্রয়োজন হয়নি। তা না হোক। তবুও সে আমার জীবন দিগ্‌-দর্শনে সাহায্য করেছিল। সর্বোপরি সে আমাকে আমার আমিত্ব আবিষ্কারে সাহায্য করেছিল।

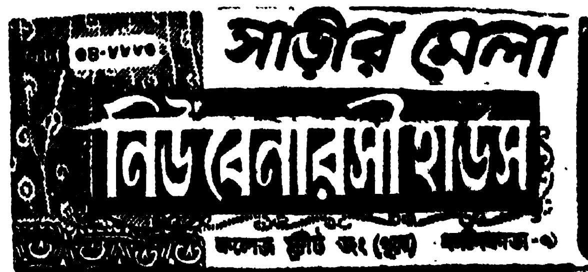
ভালবাসা কি এবং তার কি প্রয়োজন, সেদিন আমি বুঝিনি, জানিনি। নন্দিনী কেন আমাকে ভালবেসেছিল, কি সে চেয়েছিল, কি পেয়েছিল—কিছুই আমি জানি না। শুধু এইটুকুই জানি আমার সুখে সে সুখী হতো, আমার দুঃখে সে লুকিয়ে লুকিয়ে চোখের জলও ফেলেছে। ছন্দবদ্ধভাবে এইসব অনুভূতি প্রকাশ করবার সুযোগ কোনদিনই সে পায়নি। কিন্তু যখনই সে সুযোগ এসেছে, নন্দিনী তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছে।

সরস্বতী পূজার আগের কদিন মরবার অবকাশ থাকত না। খাওয়া-দাওয়া তো দূরের কথা ঘুমুবার পর্যন্ত সময় পেতাম না। সারা দিন-রাত্তিরই রিপন স্কুলে কাটাতাম। নন্দিনী ঠিক জানত আমি কোন গরম জামা নিয়ে যাইনি। সন্ধ্যার পর এক ফাঁকে একটা আলোয়ান নিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে আমাকে দিয়ে আসত। বলত, তোমার কি ঠান্ডাও লাগে না? যদি জ্বরে পড়, তাহলে কি হবে বল তো!

একবার সত্যিসত্যিই আমি খুব অসুস্থ হয়েছিলাম। ন'টা বাজতে না বাজতেই বাবা বিদায় নিতেন। ফিরতে ফিরতে সেই রাত দশটা! অখিল মিস্ত্রী লেনের ঐ বিখ্যাত ভাঙা বাড়ীটার অন্ধকার কক্ষে আমি একলা থেকেছি। মন্টুদাদের বাড়ী থেকে আমার পথ্য সরবরাহের ব্যবস্থা হয়েছিল নন্দিনীর আগ্রহেই। দু'বেলা স্কুলে যাতায়াতের পথে নন্দিনী আমাকে দেখে যেত। হয়ত একটু সেবা-যত্নও করত।

এসব অভিজ্ঞতা আমার ছিল না। শুধু আমার জন্য একজন পথ চেয়ে বসে থাকবে, আমাকে ভালবেসে, সেবা করে, যত্ন করে, কেউ মনে মনে তৃপ্তি পাবে, আমি ভাবতে পারতাম না। নন্দিনী আমার জীবনে সেই অভাবিত অধ্যায়ের সূচনা করে।

ম্যাট্রিক পাশ করার পরই নন্দিনী দেশে চলে গেল। আমার জীবনের সেই ক্ষণস্থায়ী অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটল। কিন্তু তবুও সে আমার জীবন থেকে একেবারে বিদায় নিল না। চিঠিপত্র নিয়মিত আসত। আর আসত আমার জন্মদিনে একটা শুভেচ্ছা। আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বা নেতাজী নই। আমার মত সাধারণ মানুষের জন্মদিনে যে কোন উৎসব বা অনুষ্ঠান হতে পারে, তা আমার কল্পনার বাইরে ছিল। আমার জন্মদিনে বাবা ধান-দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করেই অফিসে দৌড় দিতেন। সেবারেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি। বিকেলবেলায় নন্দিনী টিফিনের



পয়সা বাঁচিয়ে আমার জন্য সামান্য কিছু উপহার এনে চমকে দিয়েছিল।

নন্দিনী আজ অনেক দূরে চলে গেছে। সুখে-শান্তিতে স্বামী-পুত্র নিয়ে ঘর-সংসার করছে। তার আজ কত কাজ, কত দায়িত্ব। কিন্তু তবুও একটা গ্রীটিংস টেলিগ্রাম পাঠাতে ভোলে না আমার জন্মদিনে।

কলকাতা থেকে বিদায় নেবার পর আমার সংগে নন্দিনীর আর দেখা হয়নি। এম-এ পড়বার সময় ওর বিয়ে হলো এক আই-এ-এস পাত্রের সংগে। নিমন্ত্রণপত্রের সংগে একটা ব্যক্তিগত অনুরোধ-পত্রও এসেছিল। কিন্তু আমার পক্ষে তখন বোম্বে যাওয়া আদৌ সম্ভব ছিল না। টিউশানির টাকা আগাম নিয়ে পনের টাকা দামের একটা তাঁতের শাড়ী পাঠিয়েছিলাম। ইতিমধ্যে আমি আমার জীবন-যুদ্ধে এমন মেতে উঠেছিলাম যে নন্দিনীকে মনে করার পর্যন্ত ফুরসত পেতাম না।

প্রায় বছর দশেক পরে আমি গ্যাংটক গিয়েছিলাম কি একটা কাজে। তিন-চারদিন পরে কলকাতার পথে শিলিগুড়ি ফিরছিলাম। পথে আটকে পড়লাম। সেবক ব্রীজের কিছুটা ধ্বস নেমে রাস্তা বন্ধ হয়েছিল। কুলি-মজুরের দল রাস্তা পরিষ্কারে ব্যস্ত। আমার মত অনেকেই প্রকৃতির এই খামখেয়ালীপনায় বিরক্ত হয়ে এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করছিলেন। রাস্তা পরিষ্কার হতে আরো ঘণ্টা দুয়েক লাগবে। এই দীর্ঘ অবসরে অনেকের সংগেই আলাপ-পরিচয় হলো। কার্শিয়াং-এর তরুণ এস-ডি-ও'র সংগেও বেশ ভাব হয়ে গেল।

মাসকয়েক পর আবার কর্মব্যাপদেশে দার্জিলিং যাচ্ছিলাম। পথে কার্শিয়াং পড়বে। মনে মনে ঠিক করেছিলাম এস-ডি-ও সাহেবের সংগে দেখা করব। শিলিগুড়ি থেকে কার্শিয়াং এলাম। হঠাৎ অফিসে গিয়ে হাজির হওয়ায় এস-ডি-ও সাহেব চমকে গেলেন। পর পর দু'কাপ কফি গিলেই পালাবার উপক্রম করছিলাম কিন্তু এস-ডি-ও সাহেব বললেন, তা কি হয়। আমার কোয়ার্টারে যাবেন, লাঞ্চ খাবেন। তারপর বিকেলের দিকে দার্জিলিং যাবেন।

'আমার কোন উত্তরের অপেক্ষা না করেই এস-ডি-ও সাহেব কোয়ার্টারে টেলিফোনে স্ত্রীকে জানালেন, নন্দা, আমার এক বন্ধু এসেছেন কলকাতা থেকে। লাঞ্চে নিয়ে আসছি। তুমি একটু ব্যবস্থা করো।

গোটা বারো নাগাদ এস-ডি-ও সাহেব আমাকে নিয়ে কোয়ার্টারে গেলেন। ড্রইং-রুমে আমাকে বসিয়ে রেখে স্নান করবার জন্য বিদায় নিলেন। মিনিট কয়েক পরে আর কেউ নয়, স্বয়ং নন্দিনী কফির কাপ হাতে নিয়ে আমার সামনে হাজির হলো। দুজনেই একসংগে বলেছিলাম, তুমি?

সেদিন কার্শিয়াং পাহাড়ের সমস্ত কুয়াশা ভেদ করেও নন্দিনীর চোখেমুখে যে উজ্জ্বলতা, যে আনন্দ দেখেছিলাম, তা কোনদিন ভুলব না। এস-ডি-ও সাহেবকে বলেছিলাম, আপনি যে মন্টুদাদের বাড়ীর জামাই, তা তো জানতাম না। সংক্ষেপে জানালাম ওর শ্বশুরবাড়ীর সংগে আমাদের হৃদ্যতার কথা। গোপন করিনি যে তাঁর স্ত্রীর সংগে ছোটবেলায় খেলাধুলো করেছি।

এস-ডি-ও আমাকে শ্বশুরবাড়ীর দূত মনে করে আনন্দে মেতে উঠলেন। লাঞ্চের টেবিলে এক গেলাস স্কোয়াস হাতে নিয়ে আমার হেলথ'এর জন্য প্রপোজ করতে গিয়ে ঘোষণা করলেন, মিস্টার জার্নালিস্ট আজ রাত্রে এক স্পেশ্যাল মিস্টার জার্নালিস্ট আজ রাত্রে এক স্পেশ্যাল ডিনারে চীফ গেস্ট হবেন এবং কার্শিয়াং'এ রাত্রিবাস করবেন।

আমি বললাম, তা কি হয়।

এস-ডি-ও সাহেব বললেন, ভুলে যাবেন না আমি শুধু অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চালাই তা নয়, বিচারও করি। আমি কার্শিয়াং-এর চীফ জাস্টিস কাম প্রাইম মিনিস্টার।

নন্দিনী বলল, এতদিন পর যখন দেখা হলো, একটা দিন থাকলে কি তোমার খুব ক্ষতি বা কষ্ট হবে?

সত্যি খুব আনন্দ করে সেই দিনটি কাটিয়েছিলাম। নন্দিনী ঠিক এতটা আদর-যত্ন করবে, ভাবতে পারিনি।

কর্মজীবনের পাপচক্রে আমি ছিটকে পড়েছি বহুদূরে। নন্দিনীর সংগে আর আমার দেখা হয়নি, ভবিষ্যতে কোনদিন দেখা হবে কিনা, তাও জানি না। তবে ভুলব না তার স্মৃতি।

জান দোলাবৌদি, আমি কার্শিয়াং ত্যাগের আগে নন্দিনী বলেছিল, একটা অনুরোধ করব?

আমি বলেছিলাম, তার জন্য কি অনুমতির প্রয়োজন?

'না তা নয়। তবে বলো আমার অনুরোধটা রাখবে।'

বিদায় নেবার প্রাক্কালে মনটা নরম হয়েছিল। কোনকিছু তর্ক করার প্রবৃত্তি ছিল না। বললাম, নিশ্চয়ই রাখব।

'তোমার পুত্রবধূর নাম রেখো নন্দিতা। রাখবে তো?'

আমি স্তম্ভিত হয়েছিলাম ওর ঐ বিচিত্র অনুরোধ করার জন্য। ঠোঁটটা কামড়াতে কামড়াতে কথা বলতে পারিনি। শুধু মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়েছিলাম।

এই চিঠি আর দীর্ঘ করব না। তাছাড়া তুমি তো আমার চিঠি একবার পড়ে ক্ষান্ত হও না। আর যাই কর আমার এসব চিঠি তুমি কলেজে নিয়ে ক্লাশে বসে পড়ো না। তিন-চারদিনের জন্য এলাহাবাদে যাচ্ছি। ফিরে এসে আবার চিঠি দেব।

তোমাদের বাচ্চু

চট্‌পট্‌ কাজ?
মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্কে
পাবেন

প্রতিটি শাখায়
প্রত্যেকের সুযোগ সুবিধা
লক্ষ্য রাখার জন্য
সুদক্ষ কর্মচারী আছেন



মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্ক লিঃ
(রেজিষ্টার্ড অফিস)
কলিকাতা
ডিলাওয়ার হাউস,
স্থানীয় শাখা:
কলিকাতা-৫৩

ফ্যাদার ঘনশ্যামের রোমাঞ্চ

কাহিনী (৯)

বিষের বোতল

নির্জনসৈকতে নীরব প্রহরীর মত দাঁড়িয়েছিল হোটেলটা।

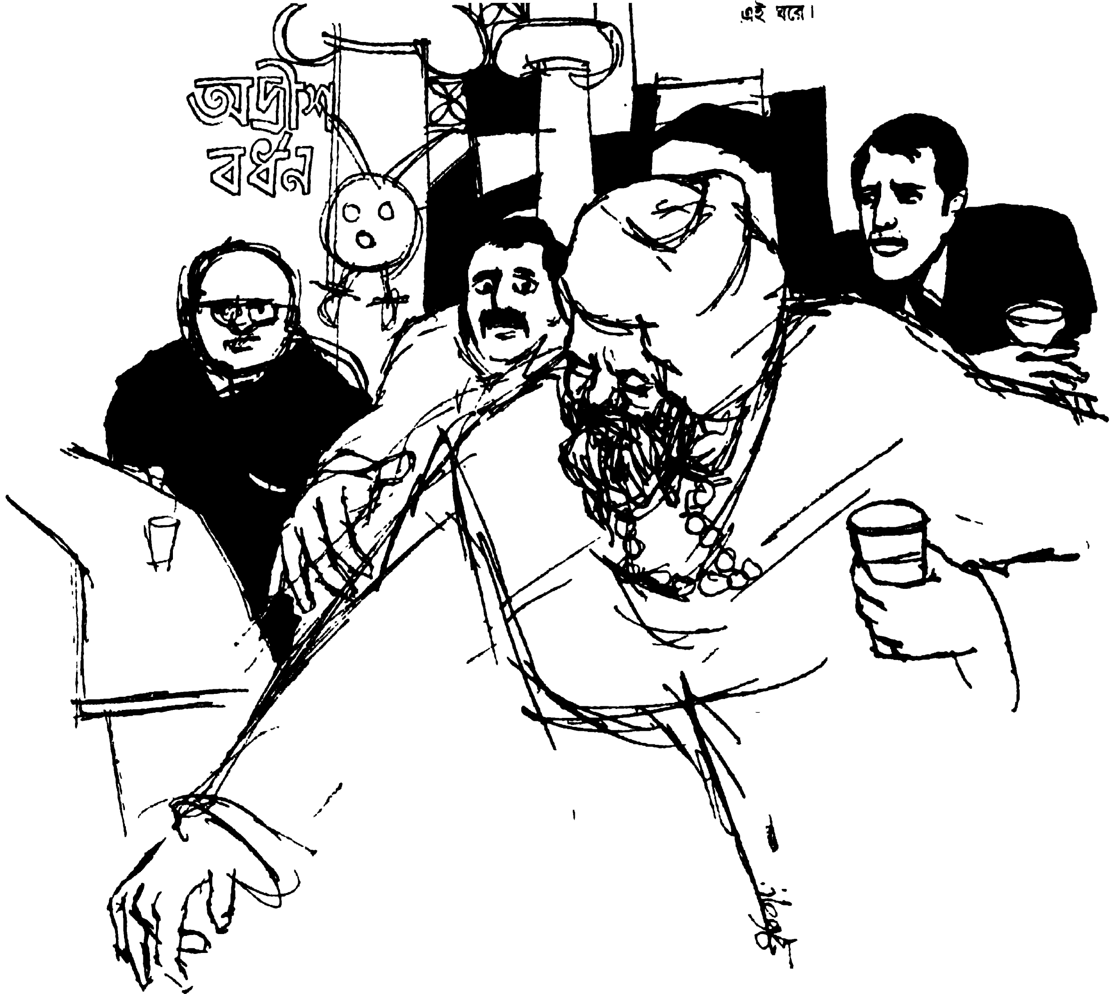
সামনে নীলসমুদ্র। ওপরে নীল আকাশ। বালির ওপর শুধু একটা বাড়ী। এই হোটেল।

হোটেলে বারো মাসই ভীড় লেগে থাকে। কেউ আসে জীর্ণ শরীরের কমজোরি কলকব্জাগুলোকে মেরামত করে নিতে। কেউ আসে স্রেফ হুল্লোড় করতে। কেউ আসে বউ অথবা বান্ধবীকে নিয়ে নিরিবিলিতে কূজন করতে।

ছত্রিশ জাতের লোকের হাজারো চাহিদা মেটাবার সব আয়োজনই আছে এ হোটেলে। নাচঘর থেকে শুরু করে পানঘর পর্যন্ত কিছুই বাকী নেই।

এ কাহিনী ঘটেছিল এই হোটেলের পানঘরেই।

সুরাপানের কক্ষটি হোটেলের এক-তলায়। সেদিন অপরাহ্নে দুটি মূর্তি ঢুকল এই ঘরে।



দুজনের দুরকম চেহারা। একজন মাথায় কম করে সাত ফুট। ব্যায়ামপুষ্ট দেহ। হাতের ডুমো ডুমো মাংসপেশী আর বুকের পাটা দেখলে মনে হয়, হ্যাঁ, পুরুষ বটে। শুধু পুরুষ নয়, পুরুষসিংহ।

অপরজন যেন আবলুসকাঠ কুঁদে তৈরী। এরকম নিকষকালো রং বড় একটা দেখা যায় না। উচ্চতায় মাঝারি। মুখের অধিকাংশ দাড়িগোঁফের জঙ্গলে ঢাকা পড়ে গেছে। মাথায় বিশাল পাগড়ী। শুধু দেখা যাচ্ছে এক জোড়া চোখ।

সে চোখ হঠাৎ দেখলে শিউরে উঠতে হয়। কাচের মত স্বচ্ছ, ড্যাবডেবে। আর চাউনি তো নয়, যেন মড়ামানুষের তাকিয়ে থাকা। রক্ত হিম করে দেয়। সে চোখের দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না। মনে হয় যেন সর্বাঙ্গ অসাড় হয়ে আসছে।

ভয়ংকর চোখের অধিকারী কুচকুচে কালো এই মানুষটি নাকি নীলগিরির বাসিন্দা। অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী।

সঙ্গের পুরুষসিংহটি একজন বিদেশী টুরিস্ট। নীলগিরিতে গিয়ে যোগীর অলৌকিক কাণ্ডকারখানা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। তাই কৃষ্ণকায় অতি-মানুষটিকে নিয়ে ঘুরছে দেশদেশান্তরে— কালো মানুষের আশ্চর্য ক্ষমতার ভেল্‌কি দেখানোর জন্যে।

হেমন্তের এক অভিশপ্ত অপরাহ্ণে এ দুই মূর্তিই এসে ঢুকল নির্জনসৈকতে হোটেলে—গেল সুরাপানের কক্ষে।

এইখানেই কিন্তু কাহিনীর শুরু নয় এই হল ক্লাইমাক্স!

*

কাহিনীর শুরু তারও কিছুক্ষণ আগে।

আরও দুটি মূর্তি প্রবেশ করেছিল নিরিবিলি হোটেলটিতে। সটান এসে বসেছিল সুরাপানের কক্ষে।

... নড়ে ঝাঁটার মত গোঁফ। বাঁধুয়া তামাশা করে—ঠিক যেন শিকারী বেড়াল।

শুনে রাগ করত না ঝাঁটা-গোঁফের অধিকারী। বরং মুচকি হাসত। কেননা, তার পেশাই তো তাই। শিকার খুঁজে বেড়ানো। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেখানে যত দুর্নীতি, পাপ, অন্যায়—সবকিছুর মূলোচ্ছেদ করাই তার জীবনের ব্রত।

শাদা কথায়, লোকটি পুলিশ দারোগা। নাম গোকুল শীল।

সঙ্গের মানুষটি গোকুল শীলের তুলনায় অতি নগণ্য। গোকুল শীল যদি টিলা হয়, সঙ্গের মানুষটি তাহলে উইয়ের ঢিবি। যেমন বেঁটে, তেমনি শ্রীহীন। একমাথা টাক; বিপুল উদর; চোখে ডাঁটি ভাঙা চশমা; আর মুখে বোকা বোকা হাসি—যেন আঠা দিয়ে লাগানো।

খর্বকায় লোকটার ঝলমলে কালো আলখাল্লা আর বুকে ঝোলানো ক্রুশ দেখলেই বোঝা যায়, ধর্মে সে খৃস্টান। নাম পাদার ঘনশ্যাম মণ্ডল।

এই দুই অভিনব মূর্তি যখন হোটেলের 'বারে' প্রবেশ করল, 'বার' তখন শূন্য। জনপ্রাণী নেই। কাউন্টারেও কেউ নেই।

পালিশকরা কাউন্টারের ওপর রয়েছে শুধু একটি কাচের গেলাস।

পানাগারটির সাজসজ্জা বড়ই বিচিত্র। স্পষ্টই বলা যায়। প্লাস্টিক পেন্টের ...লায়েম প্রলেপ দেওয়ালে, থামে। এক এক ...য়গায় এক-এক রঙ। যেখানকার রং রক্তের ...ত লাল, সেখানে থাম থেকে ঝুলছে বল্লম, ...রবারি, ঢাল। কোথাও রণকুঠার, কোথাও ...দুশো ছুরিকা। যেখানকার রঙ মেঘের মত ... ধূসর, সেখানে ঝুলছে শাদা করোটি—পাশে প্লাস্টার জমানো ভীষণ মূর্তি। কোথাও ফ্র্যাংকেনস্টাইনের ...ত গড়া এক নরদানব; আবার কোথাও ...হেসে সুন্দরী তরুণীর রক্তশোষণে মত্ত ...লার রক্তজমানো মূর্তি; কোথাও ...চর নৃত্য; কোথাও দানবের উল্লাস। সব ...দয়ে এমন একটা ভয়ানক পরিবেশ, ...নে প্রবেশ করলেই গা ছমছম করে ...; সুস্থ স্নায়ু অসুস্থ হয়ে যায় এবং ...কারণেই বুঝি মদ্যপানের প্রয়োজন পড়ে।

...দার ঘনশ্যামও বুঝি তাই ভাবছিল। ...কারণেই চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে "খুন করার উপযুক্ত জায়গা বটে।"

•

...নে অবাক হল না গোকুল শীল। ...রণ, এমনি আচমকা কথা বলার ... ঘনশ্যাম পাদরীর আজকের নয়—...দনের। তবে কাকতালীয় কিনা জানা ...ন্তু এরকম খাপছাড়া কথা যখনই ...শ্যাম মণ্ডল, তখনি একটা না একটা ...ঘটতে দেখা যায়।

... ভুরু কুঁচকে বলল বিশালদেহী দারোগা, "মন্ত্র ইন্দ্রিয় আবার ...ল নাকি?"

..., ..., আমি সেভাবে বলি নি। তবে যাই বলো ভায়া, জায়গাটা সুবিধের নয়। এখানে এলেই রক্তের ঘুমন্ত কুবুদ্ধিগুলো মাথা চাড়া দিতে চায়। তাই বললাম।"

ঠাট্টার সুরে গোকুল দারোগা আরো কিছু টিপ্পনী কাটল। ফাদার ঘনশ্যামও নিরীহ কণ্ঠে তার জবাব দিল। ইত্যবসরে জনশূন্য পানাগারকক্ষে একে একে বিভিন্ন ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটতে লাগল।

প্রথমেই ঢুকল কয়েকজন সেলসম্যান। হরেকরকম বস্তু বিক্রয় করাই তাদের পেশা। তামাকপাতা থেকে শুরু করে প্রসাধন দ্রব্য এবং সিগারেট থেকে শুরু করে মদ—সবরকম কোম্পানীর সেলসম্যানই ছিল সেই দলে।

তারপরেই ঢুকল গোরা টুরিস্টের সঙ্গে নীলগিরির সেই কৃষ্ণকায় যোগী। সবশেষে এক গুঁফো ভদ্রলোক। প্রৌঢ়। পরনে খদ্দরের ধুতি ও পাঞ্জাবি। চোখেমুখে সাত্ত্বিকভাব। নাম মহেশ হালদার।

শেষোক্ত ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রয়োজন। মহেশ হালদার স্থানীয় বাসিন্দা। প্রচণ্ড নীতিবাগিশ। জীবনে পানদোক্তার স্বাদ গ্রহণ করেন নি। সুরা তো দূরের কথা। তাই 'মদ বর্জন' আন্দোলনের তিনি পুরোধা। তাঁর সভাপতিত্বে একটা সমিতিও গড়ে উঠেছে এ অঞ্চলে। সমিতির কাজ হল যেনতেন প্রকারেণ মদের কারবারীদের এ অঞ্চল থেকে তাড়ানো।

এহেন মহেশ হালদারই সেদিন ভোজপুরী গোঁফে তা দিতে দিতে বুক ফুলিয়ে ঢুকলেন হোটেলের মদ্যপানের ঘরে।

ততক্ষণে কাউন্টারে লোক এসে গেছে। মহেশ হালদারকে দেখে শঙ্কিত হল সে। ম্যানেজারও প্রমাদ গুনল। কারণ, নীতিবাগিশ মহেশ হালদারের আবির্ভাব মানেই একটা কেলেংকারী। তাছাড়া ভদ্রলোক যেরকম সদর্পে আবির্ভূত হলেন, মনে হল একটা উৎপাতের পরিকল্পনা নিয়েই তিনি এসেছেন।

সেই আশংকাই সত্য হল। কেলেংকারী বাস্তবিকই ঘটল। কিন্তু সে কেলেংকারী যে এমন মর্মান্তিক কেলেংকারী, তা কে জানত!

•

মহেশ হালদার যখন গোঁফ খাড়া করে চোখ পাকিয়ে ঘরে ঢুকলেন, তখন সোফাসেটে গা এলিয়ে দিয়ে মদ্যপান করছে বিদেশী টুরিস্ট, পাশে দুধের গেলাস নিয়ে চুমুক দিচ্ছে কৃষ্ণকায় অলৌকিক ক্ষমতাধর। সেলসম্যানেরা প্রত্যেকেই এক একটি মদিরা পাত্র হাতে নিয়ে ঠোঁটে সিগারেট ঝুলিয়ে হাসিমস্করা করছে।

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে সমস্ত দৃশ্যটা দেখলেন মহেশ হালদার। তারপর গটগট করে কাউন্টারে গিয়ে চাইলেন এক গেলাস পাইন অ্যাপল। মহেশ হালদারের প্রিয় পানীয়। সব পানাগারে গিয়েই তিনি এই নির্দোষ পানীয়টি পান করেন এবং তারপরেই শুরু করেন লেকচার। সে লেকচার শুনতে শুনতে বিস্কুটির জ্বালা ধরে যায় মাতালের গায়েও। ততক্ষণ না একটা বিরাট কাণ্ড ঘটে, ততক্ষণ এমনি উৎপাত করেন মহেশ হালদার।

সেদিনও চোঁ চোঁ করে পাইন অ্যাপল গিলে বক্তৃতা আরম্ভ করলেন মহেশ হালদার। প্রথমেই চাঁচাছোলা গলায় একটা ব্যঙ্গবঙ্কিম গৌরচন্দ্রিকা। তারপরেই টার্গেট হল গেলাসধারীরা।

মদের নেশা ছুটে যাওয়ার উপক্রম হল মহেশবাবুর আঁতে-ঘা-দেওয়া বক্তৃতা শুনতে শুনতে। কিন্তু বাধা দেওয়ার সাহস কারুরই হল না। প্রথমত বিবেকের কাছে যারা অপরাধী, তারা এমনিতেই হয় ভীরু। তারওপর দোর্দণ্ডপ্রতাপ মহেশ হালদারের বাক্যস্রোতে বাধা দেওয়া মানেই যে মহাপ্রলয় ঘটিয়ে দেওয়া, তা আর কারো জানতে বাকী নেই। এরকম কাণ্ড একবার ঘটেছিল। এক মাতাল ধমকে উঠেছিল মহেশবাবুকে। বাস, সঙ্গে সঙ্গে স্তব্ধ হয়ে গেলেন মহেশ হালদার। পরক্ষণেই যেন একযোগে বেজে উঠল শাঁখ ঘণ্টা ঢাক ঢোল কাড়ানাকাড়া তূরীভেরী দামামা কাঁসি বাঁশি কাঁসর খোল-করতাল মৃদঙ্গ জগঝম্প মাদল জয়ঢাক।

আচম্বিতে পিলে চমকানো সেই একটি মাত্র হুংকারেই কাজ হল। সেই থেকে মহেশ হালদারের বক্তৃতায় বাধা দেওয়ার দুঃসাহস কারো হয় না।

কিন্তু সেদিন বারবেলায় হোটেলবারে এই দুঃসাহসই দেখিয়ে বসল একজন। মুখে নয়; কাজে।

অসমসাহসিক এই লোকটি নীলগিরির সেই যোগীপুরুষ—রঙ যার মিশমিশে কালো, মাথায় যার বিশাল পাগড়ী, চোখ যার মড়ার চোখের মত ভয়ংকর।

•

যোগীরই দোষ কি? আপন মনে দুধে চুমুক দিচ্ছিল লোকটা। ফলে পাগড়ী আর দাড়িগোঁফের জঙ্গল ভেদ করে অদ্ভুত চোখ দুটো ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। ঠিক এমনি সময়ে আচমকা তাকেই আক্রমণ করে বসলেন মহেশ হালদার।

মদের আড্ডায় যারা দুধ খেতে আসে, তারা দাড়িই রাখুক আর পাগড়ীই পরুক, তাদের চরিত্র চিনতে বেশি দেরি হয় না। সাপে চেনে বেদের হাঁচি, জহুরী চেনে জহর। সাত্ত্বিক সাজবার ভড়ং যতই থাকুক না কেন, আজকাল এই এক ভণ্ডের দল ছেয়ে ফেলেছে দেশটা—

এই পর্যন্ত বলার পরেই ঘটল অঘটনটা।

যোগীপুরুষের অর্ধনিমীলিত চক্ষুপল্লব অকস্মাৎ পুরোপুরি খুলে গেল। মড়ার মত নিষ্প্রাণ চোখে দপ করে জ্বলে উঠল ক্রোধের আগুন। গনগনে অঙ্গারের মত সেই রক্তহিমকরা ভয়ংকর চোখের চাউনি তেড়ে গেল মহেশ হালদারকে লক্ষ্য করে।

পরক্ষণেই, ছিলেছেঁড়া ধনুকের মত লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল কৃষ্ণকায় যোগী। চোখের পলক ফেলার আগেই সামনের থামে ঝুলোনো একটা ভোজালী টেনে নিয়ে প্রচণ্ড বেগে নিক্ষেপ করল মহেশবাবুর দিকে!

কিন্তু গোকুল শীলের পর্বতশরীরে যে অমন ক্ষিপ্রতা লুকিয়ে ছিল, তা কে জানত।

যে মুহূর্তে যোগীপুরুষ হাত বাড়িয়েছিল থামে ঝোলানো ভোজালীর দিকে, সেই মুহূর্তেই সটান দাঁড়িয়ে উঠেছিল গোকুল দারোগা। ওই ভোজালী নিক্ষেপের ঠিক পূর্বমুহূর্তেই যোগীপুরুষের কনুই খামচে ধরেছিল গোকুল শীল। ফলে ভোজালীটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হল।

মহেশ হালদারের গলার ঠিক দু' ইঞ্চি তফাৎ দিয়ে বাতাস কেটে বেরিয়ে গেল শানিত ভোজালী—গেঁথে গেল পেছনের কাঠের পার্টিশনে।

ঘরশুদ্ধ লোক বিমূঢ়, স্তম্ভিত, হতচকিত। গুরুতর আঘাতে স্নায়ু অবশ হয়, প্রথম বেদনা টের পাওয়া যায় না। তেমনি ঘটনার আকস্মিকতার প্রত্যেকেরই বোধশক্তি কেড়ে নিল সাময়িকভাবে।

আর পাথর-কঠিন অঙ্গার চোখে এক দৃষ্টে চেয়ে রইল যোগীপুরুষ।

তারপরেই [illegible] ভেঙে গেল উচ্চ অট্টহাসিতে।

মহেশ হালদার হাসছেন। পুরো এক মিনিট ধরে চলল সেই হাসি। ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল হাসি। সেই সঙ্গে স্তিমিত হয়ে এল যোগীর অঙ্গারচক্ষু।

হাসি থামিয়ে মহেশ হালদার শুধু বললেন, "সাবাস! একেই বলে সাক্ষা-[illegible]। মনে পাপ থাকলে এরকম ফুঁসে ওঠার সাহস কি কারো থাকে?"

•

[illegible] পালাসমাপ্তি এইখানেই নয়, তারও অনেক পরে।

পরের দিন দুপুর [illegible] আগেই [illegible] সেই পানাগার কক্ষে প্রবেশ করল ফাদার ঘনশ্যাম মণ্ডল। সঙ্গে গোকুল শীল।

[illegible]

মহেশ হালদার তখনও বসেছিলেন সোফাসেটে। দুই চোখ বন্ধ। যেন ঘুমোচ্ছেন। কিন্তু সে ঘুম সাধারণ ঘুম নয়, চিরঘুম। কেননা, মহেশবাবুর বুকে বিঁধে ছিল একটা ভোজালী।

পরিচিত ভোজালী। গতকাল এই ভোজালীটাই যোগীপুরুষ নিক্ষেপ করেছিল মহেশবাবুর কণ্ঠ লক্ষ্য করে। আজ তা বক্ষ বিদ্ধ!

•

ফাদার ঘনশ্যাম কিন্তু অনেকক্ষণ স্তব্ধ-বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পর বলল, "যোগী কিন্তু খুন করে নি।"

"ঠিক ধরেছেন," সায় দিল গোকুল দারোগা। "করলে রক্ত থাকত।"

"রক্ত নেই। বুকে ভোজালী বিঁধেছে অথচ রক্ত বেরোয়নি। কেন বেরোয়নি? না, মহেশ হালদার অনেক আগেই মরে কাঠ হয়ে গেছিলেন। মড়ার বুকে ছোরা বিঁধিয়ে গেছে অন্য কেউ।"

[illegible] পানাগারের সবকটা কোণে কোণে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে গোকুল দারোগা বলল, "ছোরার বাঁটে আঙুলের ছাপ পাওয়া যেতে পারে।"

"নাও পাওয়া যেতে পারে। ভোজালী যে বিঁধিয়েছে, সে যোগীপুরুষের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দেওয়ার মতলবেই কাজটা করেছে। সুতরাং সে হুঁসিয়ার হয়েছে গোড়া থেকেই। অর্থাৎ ছোরার বাঁটে তার আঙুলের ছাপ পাওয়া যাবে না।"

"তাহলে?"

"গোকুল," চোখ মিটমিট করে বলল ফাদার ঘনশ্যাম, "আমাদের দরকার মিঃ স্মার্টকে।"

"মিঃ স্মার্ট? সে আবার কে?" হকচকিয়ে প্রশ্ন করল গোকুল শীল।

"মিঃ স্মার্ট হল খুবই স্মার্ট পুরুষ। গতকাল আমাদের আগেই যে এ ঘরে ঢুকেছে ঝড়ের মত, গলায় এক গেলাস মদ ঢেলেই আবার ঝড়ের মত বেরিয়ে গেছে। মাথায় তার ফেল্টহ্যাট ছিল। সমস্ত কাজটাই সে করেছে খুব স্মার্টলি—তাই তার নাম স্মার্ট। বিলিতি সাহেব।"

দুই চোখ ছোট করে গোকুল বলল, "নামকরণের তাৎপর্য না হয় বোঝা গেল। কিন্তু সে যে এসেছিল, মদ খেয়েছিল, তা আপনি কি করে জানলেন?"

"কালকে যখন বেরোচ্ছি এখান থেকে, তখন দেখলাম দরজার পাশে মদন বসে। মদন জুতো পালিশ করে। আমাকে খুব ভক্তিশ্রদ্ধা করে। তাই ছাড়ল না কিছুতেই। জোড়া জুতোতেই পালিশ করতে লাগল। হাত চালাতে চালাতে আপন মনেই বকবক করছিল মদন। বলছিল, "সব সাহেবেরই মেজাজ দিলদরিয়া। কাল আপনাদের আসার আগেই ফেল্টহ্যাট পরা এক সাহেব বাই বাই করে ভেতরে ঢুকল, বাই বাই করে বেরিয়ে এল। মদন তার জুতো পালিশ করতে গেল। কিন্তু সাহেব না দাঁড়িয়েই একটা পাঁচ টাকার নোট ছুঁড়ে দিয়ে চলে গেল।'"

গোকুল বলল, "কিন্তু সে যে মদ খেয়েছে, তা জানলেন কি করে?"

"কেন আমরা ঢুকেই তো দেখলাম একটা খালি গেলাস কাউন্টারে পড়ে।"

"তা। তাহলে স্মার্ট সাহেবকেই পাকড়াও করার ব্যবস্থা করি?"

"অবশ্যই। এক মুহূর্ত দেরী করো না। [illegible] আমার নির্দেশ [illegible]। সবকটা স্টেশনে, মোটর [illegible] খবর পাঠাও। মিঃ স্মার্টকে আমার চাই-ই চাই।"

•

সেই অনুযায়ী দিকে দিকে পুলিশ পাঠিয়ে দিল গোকুল শীল। তারপর ঢুকল ম্যানেজারের ঘরে। [illegible] হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এল ঘনশ্যাম পাদরীর কাছে।

ফাদার ঘনশ্যাম তখন একটা উঁচু টুলে বসে পা দোলাচ্ছিল। আর একটা খাতা পড়ছিল। নীতিবাগীশ মহেশ হালদারের আত্মজীবনী পাওয়া গেছে মহেশবাবুর পকেটে। ঊর্ধ্বশ্বাসে গোকুলকে ছুটে আসতে দেখে বলল "হলো কী?"

"ম্যানেজার! ম্যানেজারই বুকে ছোরা বসিয়েছে।"

"সেটা আর নতুন কথা কী? অনেক আগেই জানি।"

"অনেক আগেই জানেন!" নিমেষে চুপসে গেল গোকুল শীল। সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে বলল, "কি করে জানলেন? খড়ি পেতে?"

"আরে না, না। ঠাণ্ডা মাথায় একটু ভাবলেই বুঝবে। হোটেলে খুনজখম হওয়া মানেই পুলিশ প্রথমেই সন্দেহ করবে ম্যানেজারকে। আর পানীয়ের সঙ্গে বিষ মেশানো থাকলে বারম্যানকে। এক্ষেত্রেও মহেশ হালদারকে প্রথমে খুন করা হয়েছে বিষ খাইয়ে। সুতরাং পুলিশ সন্দেহ করবে বারম্যানকে—কেননা সেই পাইনঅ্যাপল দিয়েছে মহেশবাবুকে। কিন্তু বারম্যান কি এতই উজবুক? সুতরাং সে নির্দোষ—এ [illegible]। অথচ বিষ খেয়ে মারা গেছেন মহেশবাবু। সারারাত তার লাশ পড়ে রইল এ ঘরে। ভোরবেলা তাই দেখেই চক্ষুস্থির হয়ে গেল ম্যানেজারের। পুলিশ দেখলেই তো আগে তাকে টানাহ্যাঁচড়া করবে। কি করা যায়? গতকাল মহেশবাবুকে প্রাণে মারতে গেছিল যে, এ কাজ নিশ্চয় তারই। তাহলেও পুলিশের যাতে তিলমাত্র সন্দেহ না থাকে, তাই গতকালের ভোজালীটাই এনে মড়ার বুকে বিঁধিয়ে দিল ম্যানেজার। কিন্তু সে কথা যাক, মিঃ স্মার্ট কই?"

উত্তরটা এল টেলিফোনের মধ্যে দিয়ে। ঠিক এই সময়ে ঝনঝন শব্দে টেলিফোন বাজতেই ছুটে গেল গোকুল শীল। ফিরে এল একটু পরেই। আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে বললে, "মিঃ স্মার্ট রেলস্টেশনে ধরা পড়েছে। ডাকাবুকো লোক তো, খুব মারপিট করেছে। এখানেই আনতে বললাম। আপনি [illegible] ঠিক ফাদার, যে লোক একাই দশ-[illegible] কনস্টেবলকে [illegible] করে, সে নির্ঘাৎ খুনী। মহেশ হালদারকে সাবাড় করে কেটে পড়ার মতলবে ছিল, ভাগ্যিস আপনি [illegible]।"

গ্যাসভরা একটা বেলুনে আলপিন বসিয়ে দিলে যেমন ধীরে ধীরে চুপসে সরু হয়ে যায়, গোকুল শীলের কথা শুনতে শুনতে ফাদার ঘনশ্যামের মুখের চেহারা হল ঠিক সেইরকমই। চোয়াল ঝুলে পড়ল, মুখ হাঁ হয়ে গেল, চোখ ছানাবড়ার মত বড় বড় হয়ে গেল। পরক্ষণেই দুহাতে টাক খামচে ধরে কঁকিয়ে উঠল, "আবার! আবার সেই ভুলই করলাম আমি! ও গড! কেন এমন হয়? কেন বার বার আমি এমনি করি? কেন আমি যা বলি লোকে তাই বোঝে—কিন্তু যা বোঝাতে চাই তা বোঝে না। ও গড ও গড!"

হকচকিয়ে গিয়ে গোকুল শীল বলল, "কি বলছেন ফাদার? কি ভুল করলেন? আপনিই তো বললেন মিঃ স্মার্ট খুনী, তাকে ধরে আনতে।"

"না, না, না। আমি তা বলি নি। আমি শুধু বলেছি তাকে ধরে আনতে—কেননা সে-ই জানে মহেশ হালদারকে খুন করেছে কে?" গর্জিয়ে উঠল ফাদার ঘনশ্যাম। "তাকে দরকার খুনী হিসেবে নয়, দরকার সাক্ষী হিসেবে।"

বেচারা গোকুল শীল!

এরকম হতভম্ব সে জীবনে হয় নি। বেশ কিছুক্ষণ হাঁ করে থাকার পর বলল আমতা আমতা করে, "সাক্ষী হিসেবে?"

"গোকুল, তোমার মনে পড়ে এ ঘরে ঢুকেই আমি বলেছিলাম জায়গাটা খুন করার উপযুক্ত?"

"বলেছিলেন?"

"বলেছিলাম অনেক কারণে। তার মধ্যে একটা কারণ হচ্ছে, ঘরে সাক্ষীর অভাব, কেউ যদি এমন নিরিবিলিতে গলাটিও টিপে রেখে যায়, কেউ জানতে পারবে না। কেননা ঘরে কেউ ছিল না। অথচ একটা খালি গেলাস কাউন্টারে ছিল। তার মানে, শূন্য ঘরে কেউ এসে এক গেলাস মদ খেয়ে গেছে। কাউন্টার থেকে নিশ্চয় কেউ তাকে মদ সার্ভ করেছে। সে লোকটি কে? যে মিঃ স্মার্টকে মদ দিয়েছে, নির্জন ঘরে সে-ই তো পাইনঅ্যাপলের বোতল পালটে রেখে যেতে পারে? পাইনঅ্যাপল নির্দোষ পানীয়, মদের আড্ডায় তেমন কেউ যায় না। কিন্তু এ অঞ্চলে একজনেই সব 'বারে' ঢুকে পাইন-অ্যাপল খেতেন, তিনি মহেশ হালদার। সুতরাং বিষমিশোনো এক বোতল পাইন-অ্যাপল রেখে ভালো বোতলটা যে সরিয়ে রেখেছে—সেই ব্যক্তিই মদ সার্ভ করেছে মিঃ স্মার্টকে। তারপর সময়মত আবার বিষ-মিশানো পাইনঅ্যাপল বোতল সরিয়ে নিয়েছে, রেখেছে ভাল বোতলটি। আসল খুনী সে-ই, কিন্তু তাকে দেখেছে শুধু একজনই, সে মিঃ স্মার্ট। তাই তাকে ধরে আনতে বলেছিলাম; নিজে হাতকড়া পরার জন্যে নয়—খুনীকে হাতকড়া পরানোর জন্যে।"

•

হুড়মুড় করে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল এক দঙ্গল পুলিশ। টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এল সাজেকটকে এক সাহেবকে। ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মতই ফুঁসছিল সাহেব। জামার বোতাম ছিঁড়ে উড়ে গেছে, মাথার চুল উস্কো-খুস্কো। চোখের নিচে কালসিটার দাগ। মণিবন্ধে হাতকড়া।

দেখেই তো মুখ আমসি হয়ে গেল গোকুল শীলের। কিন্তু আর কেলেঙ্কারী বাড়তে দিল না ফাদার ঘনশ্যাম। খুলে দেওয়া হল সাহেবের হাতকড়া। খবর পাঠানো হল হোটেলের সবাইকে। সবাই এসে দাঁড়ালে গোকুল শীল সাহেবকে জিজ্ঞেস করল, "বলুন দেখি, এঁদের মধ্যে কে আপনাকে কালকে ড্রিংক সার্ভ করেছিল?"

তেরিয়া মেজাজে সাহেব জবাব দিল, "আপনার ঐ শুওরের মত বাঁধ আর মোষের মত চেহারা দেখি লোকের তো চিনে না!"

শুনেই চাইয়ের মত সাদা হয়ে গেল গোকুল শীলের মুখ।

মোলায়েম কণ্ঠে ঘনশ্যাম বললে, "ওঁর হয়ে আমি ক্ষমা চাইছি। কিন্তু আপনি শুধু দেখিয়ে দিন এঁদের মধ্যে কে আপনাকে গতকাল গেলাস ভরে দিয়েছিল।"

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে সাহেব অঙ্গুলি-নির্দেশ করল যেদিকে, সেদিকে নিমেষে ঘুরে গেল বহু জোড়া চক্ষু। সঙ্গে সঙ্গে ভীমবিক্রমে কনস্টেবলরা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল—সে একজন সেলস্‌ম্যান—বিলিতি মদ কারবারীর প্রতিনিধি। আকারে প্রকারে অনেকটা গোকুল শীলের মতই।

*

ফাদার ঘনশ্যাম বলল, "এ হোটেলে বেশ কিছুদিন ধরে চোলাই মদের কারবার চলছিল। তাছাড়া, বাইরে থেকে শুল্ক ফাঁকি দিয়ে বিস্তর বিলিতি মদ আসত এখানে। এ সবের মূলে ছিল ঐ সেলস্‌-ম্যান। হাজার হাজার টাকা মুনাফা লুটতো লোকটা চোরাইপথে। কিন্তু যেভাবেই



মদ্যার বুকে ছোরা বিঁধিয়ে গেছে 'অ্যা যেউ।'

হোক, সমস্ত ব্যাপারটা ধরে ফেলেন মহেশ হালদার। নীতিবাগীশ মহেশবাবু তখন একদিন হাটে হাঁড়ি ভাঙবার প্ল্যান করেন। প্ল্যান ছিল ঘণ্টা দুয়েক লেকচার দেওয়ার পর কাজের কথায় আসবেন। এজন্যে এমন একদিন তিনি বেছে নিলেন যেদিন হোটেলবারে উপস্থিত থাকবে একজন পুলিশ দারোগা। কিন্তু সেলসম্যান লোকটা অতিশয় ধুরন্ধর। চর মারফৎ খবর পেয়ে মহেশ হালদারের মুখ চিরতরে বন্ধ করার প্ল্যান আঁটে। ফাঁকা ঘরে যখন বিষ-মিশোনো পাইনঅ্যাপল-এর বোতল রাখছে ভালো বোতলের জায়গায়, ঠিক তখনি একজন সাহেব ঢুকল ভেতরে, সোজা কাউন্টারে এসে চাইল এক পেগ হুইস্কি। সেলস্‌ম্যানকে বারম্যান মনে করেছিল সাহেব। ধূর্ত সেলস্‌ম্যান তাই বারম্যানের অভিনয়ই করে গেল। হুইস্কি ঢেলে দিলে গেলাসে। ভাগ্য ভাল। তাই চটপট খেয়েই উধাও হয়ে গেল সাহেব। সেলস্‌ম্যানও সরে পড়ল।"

গোকুল শীল বলল, "নীতিবাগীশ মহেশ হালদার আমার সামনেই হাটে হাঁড়ি ভাঙবার প্ল্যান করেছিল—এ খবরটা পেলেন কোত্থেকে? মহেশবাবু তো মারা গেছেন।"

"মারা গেলেও তাঁর আত্মজীবনী আছে। এধরনের মানুষেরা তাঁদের দৈনিক সংকর্মের বিবরণী লিখে রাখেন ডায়েরীতে। মহেশ-বাবুর পকেটে সেই আত্মজীবনী পড়তেই রহস্য পরিষ্কার হয়ে গেল। তবে কি জানো," বলে ম্লান হাসল ফাদার ঘনশ্যাম, "মানুষকে যারা ভালবাসেন মানুষের জীবনকে যাঁরা সুন্দর করে তুলতে চান, মানুষের হাতেই তাঁদের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। যুগে যুগে এমনি ঘটনাই ঘটেছে, ঘটছে, ঘটবে।"*

---

* বিদেশী ছায়ায়

গৌরাঙ্গ পরিজন

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

(৬৮)

প্রকাশানন্দ সরস্বতী

(খ)

কী বলে এই বাঙালি ভাবুক সন্ন্যাসী? শুধু কথার কথা বলে না, প্রত্যক্ষ অনুভূতি নিয়ে বলে। তাই এমন সাধ্য নেই কেউ অতিক্রম করে। ব্রহ্ম বৃহৎ বস্তু সন্দেহ নেই আর এই ব্রহ্মই ভগবান। বহুবিধ ঐশ্বর্যপূর্ণ। সেই ঈশ্বরকেই বন্দনা করি যিনি কমলনয়ন মেঘশ্যামল পীতবসন বনমালী। ভক্তিই সেই ভগবৎপ্রাপ্তির সহায়। সর্ববেদের অভিধেয়। আর ভক্তি থেকে প্রেম, প্রেম থেকেই সেবাবাসনা। আর উপাসনা ছাড়া সেবা হয় কী করে? উপাসনার মন্ত্র কী? হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং। কলিকালে এ ছাড়া আর গতি নেই। নেই নেই কিছুতেই নেই। 'কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।' তাই কলিকালে নামই একমাত্র সাধনা।

কী ভাবে নাম করবে? তৃণ হতে নীচ হয়ে, বৃক্ষের মত সহিষ্ণু হয়ে, নিজে সম্মান কামনা না করে, অন্য সকলকে সম্মান দেখিয়ে।

আর বুঝি নিজেকে ঠেকানো গেল না। প্রকাশানন্দ বিচলিত হল। বিনয় করে বললে, তুমি বেদময় মূর্তি, সাক্ষাৎ নারায়ণ। আগে যে নিন্দা করেছি তার জন্যে ক্ষমা চাই।

তাহলে এবার কৃষ্ণধ্বনি তোলো।

সন্ন্যাসীরা কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলতে লাগল।

মহারাষ্ট্রী বিপ্রের ঘরে সন্ন্যাসীদের মধ্যে বসিয়ে প্রভুকে ভিক্ষা করাল প্রকাশানন্দ। সমস্ত কাশী প্রভুর প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠল। যেখানে যান সেখানেই লোকের ভিড়। বিশ্বনাথের মন্দিরেই হোক বা গঙ্গায়ই হোক হরিধ্বনি করেন প্রভু আর জনতা প্রতিধ্বনি তোলে।

একদিন পঞ্চগঙ্গাঘাটে স্নান করে প্রভু বিন্দুমাধব দর্শনে গেলেন। মাধবের সৌন্দর্য দেখে ভাবাবিষ্ট হয়ে অঙ্গনে নাচতে লাগলেন। চন্দ্রশেখর পরমানন্দ তপন আর সনাতনও কীর্তনে যোগ দিল। চতুর্দিক হতে কত লোক যে ছুটে এল তার লেখাজোখা নেই।

প্রেমোন্মত্ত হয়ে প্রভু গান ধরলেন:
হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ। গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।

হরি হরি। স্বর্গ-মর্ত ভরে মঙ্গলধ্বনি উঠল। প্রতিধ্বনি হল হাজার লোকের কণ্ঠে।

প্রকাশানন্দের আশ্রম মন্দির থেকে বেশি দূরে নয়। সে-নামধ্বনি শুনে প্রকাশানন্দ চঞ্চল হয়ে উঠল। শিষ্যদের বললে, চলো দেখে আসি।

আর বুঝি এ ভাবুকের ভাবকালি নয়, এ 'কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ।' এ বুঝি প্রাণ ধরে টান মারা। 'চিত্ত আকর্ষিয়া করে কৃষ্ণপ্রেমোদয়।'

'কন্তু এ কী দেখছি! প্রভু নৃত্য করছেন। শুধু কীর্তন নয়, নর্তন। অনন্ত সৌন্দর্যের নিকেতন দেহভঙ্গিতে কী অনির্বচনীয় মাধুরী!'

প্রকাশানন্দ আত্মহারার মত বলে উঠল: হরি হরি। তার শিষ্যেরাও গর্জন করে উঠল: হরি-হরি।

প্রকাশানন্দ শুধু ধ্বনিত হল না, তার সর্বাঙ্গে সাত্ত্বিকভাব ফুটে উঠল। শুধু শব্দ নয়, সে জানতে লাগল দীনহীনের পথ।

কাশীবাসীদের বিস্ময়ের অবধি রইল না। যে-সব ভাবুকদের চিরকাল বিদ্রূপ করেছে, বক্তৃতা দিয়ে বেড়িয়েছে, নিজেই কিনা সেসব আচরণ করছে প্রকাশ্যে। এত বড় পণ্ডিত যার জ্ঞান পর্বতাকার, তার এ কী বিপর্যয়! কোথায় তার গাম্ভীর্য, কোথায় তার বিবেক! এ যে দেখছি সে নৃত্যে দূরে করে দিয়েছে।

সত্যিই বুঝি সে আজ প্রকাশানন্দ। শুষ্ক জ্ঞানের কঠিন আবরণ সরিয়ে সে আজ ভক্তিতে প্রকাশিত, আনন্দে প্রকাশিত। সে আজ সার্থকনামা।

লোকসংঘট্ট দেখে প্রভুর বাহ্যস্মৃতি ফিরে এল। সন্ন্যাসীদের দেখে ভাব সংবরণ করলেন। তাঁর অন্তরঙ্গ রাধাভাব, তাঁর হৃদয়ের গোপননিধি —এ সকলের সামনে অনাবৃত করবার নয়।

প্রকাশানন্দকে প্রণাম করলেন প্রভু। প্রকাশানন্দ প্রভুর চরণযুগল ধারণ করল।

প্রভু বললেন, আপনি জগদ্গুরু, পূজ্যশ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মের সমান, মায়াতীত। আর আমি অজ্ঞ, হীন, মায়াবদ্ধ। আপনার শিষ্যের শিষ্য। আমি আপনার প্রণামের যোগ্য নই। আপনি শ্রেষ্ঠ হয়ে আমার মত হীনজনকে যদি প্রণাম করেন, তাহলে আমার সর্বনাশ হবে। আপনি ব্রহ্মতুল্য বলে সমস্ত কিছু ব্রহ্মময় দেখছেন, তাই বলে লোকশিক্ষার জন্যেও সকলকে বন্দনা করা উচিত নয়।

তোমাকে আমি আগে-আগে অনেক নিন্দা করেছি, বললে প্রকাশানন্দ, তার থেকে মুক্ত হবার জন্যেই আমি তোমার চরণস্পর্শ করলাম। তুমি সাক্ষাৎ ভগবান। আর ভগবৎচরণ স্পর্শেই সমস্ত অপরাধের নিস্তার।

প্রভু বললেন, আমি ক্ষুদ্র জীব। জীবকে বিষ্ণু মনে করলে অপরাধ হয়। ব্রহ্মা যে সৃষ্টিকর্তা আর রুদ্র যে সংহারকর্তা তাদেরকেই নারায়ণের সমান বলে মনে করলে অপরাধ হয়, আর জীব তো সামান্য কথা।

তুমি যে সাক্ষাৎ ভগবান তাতে সন্দেহ নেই, বললে প্রকাশানন্দ, তবু যদি জীব-শিক্ষার জন্যে নিজেকে কৃষ্ণদাস বা ভগবানের ভক্ত বলে মনে করো, তা হলেও তুমি আমাদের চেয়ে বড়, আমাদের পূজনীয়। তোমাকে নিন্দা করেছি, ভক্ত নিন্দাতেও জীবের সর্বনাশ ঘটে। সুতরাং সে অপরাধে সে সর্বনাশ থেকে ত্রাণ পাবার জন্যেও তোমার চরণস্পর্শের প্রয়োজন।

কী বলছে ভাগবত?

যারা মহৎ তাদের অবমাননায় মানুষের আয়ু শ্রী যশ সমস্ত নষ্ট হয়ে যায়।

তোমার চরণস্পর্শে আমার নিন্দাপরাধ খণ্ডন হয়েছে বলে চিত্তে ভক্তির উন্মেষ হবে। বললে প্রকাশানন্দ, তাই তো তোমার পা ছুঁয়ে প্রণাম করছি।

মহৎ কৃপা ছাড়া জীবের সংসারনিবৃত্তি নেই। সজ্জনসংগতিই ভবার্ণবতরণের

...প্রভুর ভাগবত নিয়ে আরো আলোচনা হল। শ্রুতিবাক্য আর ব্রহ্মসূত্রের সঙ্গে ভাগবতের ঐক্য প্রমাণ করলেন প্রভু। ভাগবত আর বেদান্ত দুই-ই ব্যাসের রচনা—ভাগবতই বেদান্তের ভাষ্য। ভাগবতই সর্ববেদান্তসার। প্রকাশানন্দের অন্তরে প্রভু ভক্তি জাগিয়ে দিলেন। জাগিয়ে দিলেন আনন্দ। প্রকাশিত আনন্দের প্রতিমূর্তি বলেই প্রকাশানন্দ।

প্রভু বললেন, ভাগবতের প্রতি শ্লোকে ভক্তি ব্যাপ্ত হয়ে আছে—শুধু ভাগবতই বিচার করো, তা থেকেই বেদ-উপনিষদের সার রহস্য বুঝতে পারবে।

কাশীবাসী সন্ন্যাসীরা ভাগবতচর্চায় মন দিল। আরম্ভ করল নামকীর্তন। বারাণসী দ্বিতীয় নবদ্বীপ হয়ে গেল।

প্রভু পরিহাস করে বললেন, কাশীতে আমি ভাবকালি বেচতে এসেছিলাম, শুনেছিলাম গ্রাহক নেই, বস্তু বিকোবে না এখানে। কিন্তু তাই বলে কি মাল আবার দেশে ফেরত নিয়ে যাওয়া চলে? মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ আর তপন মিশ্রকে লক্ষ্য করলেন:

ব্রণ
দূর করবার জন্য
লিচেনসা
Lichensa
● ১০৮ টি দেশে ডাক্তাররা প্রেসক্রিপশন করেছেন।
● যে কোন নামকরা ওষুধের দোকানেই পাওয়া যায়।
DZ-1676 R-BEN

তোমাদের দুঃখ হল যে-বোঝা নিয়ে ফিরে যাব তাই তোমাদের ইচ্ছায় সব উজাড় করে বেনামখেলো বিলিয়ে দিলাম।

(৬৯)

কাশীশ্বর ব্রহ্মচারী

কাশীশ্বর ঈশ্বর পুরীর শিষ্য, তার গোবিন্দ অনুচর। মহাপ্রভু যখন ... তখন ঈশ্বর কাশীশ্বরকে বললেন নীলাচলে যাও, সেখানে গিয়ে চৈতন্যের সেবা করো। আর গোবিন্দকে বললেন, তুমিও যাও, তুমি চৈতন্যের অঙ্গসেবক হও।

দাক্ষিণাত্য হতে ফিরেছেন প্রভু, গোবিন্দ প্রণাম করে সামনে দাঁড়াল।

আমি গোবিন্দ, ঈশ্বর পুরীর ভৃত্য। তিরোধানকালে বলে গিয়েছেন নীলাচলে গিয়ে চৈতন্যের অঙ্গসেবা করো। তাই এসেছি। তাঁর আর এক সেবক কাশীশ্বর তাকেও আপনার সেবায় নিযুক্ত করেছেন। সে পথে তীর্থ করছে। সেও শিগগির এসে পড়বে।

প্রভু বললেন, আমার প্রতি পুরীশ্বরের কী কৃপা, কী স্নেহ। তাঁর নিজের ভৃত্যকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু গোবিন্দ তো শূদ্র। সার্বভৌম কাছে ছিল, আপত্তি করল। শূদ্রের সেবা পুরীগোসাই অঙ্গীকৃত করলেন কী করে?

প্রভু বললেন, ঈশ্বরের কৃপা জাতিকুল মানে না। বিদুরের ঘরে কৃষ্ণ ভোজন করলেন। কৃষ্ণ শুধু ভক্তির অপেক্ষা। কিন্তু আমি ভাবছি, গোবিন্দ আমার গুরুর সেবক মান্যপাত্র। তাকে দিয়ে অঙ্গসেবা করালে কি সঙ্গত হবে?

তখন সার্বভৌম বললে, কিন্তু গুরুর আদেশ যে লঙ্ঘন করবার নয়।

ঠিক বলেছ। গোবিন্দকে প্রভু আলিঙ্গন করলেন। দিলেন তাকে অঙ্গসেবার অধিকার।

যথাদিনে কাশীশ্বর এসে পৌঁছুল। বিশালকায় বলবান পুরুষ।

গোবিন্দ তো প্রভুর পা-হাত-পা টিপবে আহারের ব্যবস্থা করবে যে যা দেবে তার ভার নেবে। কেউ দেখা করতে এলে তারও তত্ত্বাবধান করবে। প্রভুর কিসে আরাম হবে তার চিন্তাই হবে সবক্ষণ। কিন্তু কাশীশ্বর করবে কী? প্রভু যখন জগন্নাথ দর্শনে যাবেন তখন সে ভিড় সরিয়ে প্রভুর জন্যে পথ করে দেবে। তার দেহে সামর্থ্য আছে, দরকার হলে ঠেলাঠেলিতেও সে পেছপা হবে না।

ভিড় ঠেলে পথ তৈরি করতে লাগল কাশীশ্বর। মনুষ্যেরা যে প্রভুর যাবার পথ করে দেওয়া কাজ। এই সরে যাও, পথ দাও, ছুঁয়ো না, গায়ে পোড়ো না, কথা শুনবে না তো ধাক্কা মেরে সরিয়ে দেব।

কাশীশ্বরের আর কী কাজ?

ভক্তদের সঙ্গে প্রভু যখন ভোজনে বসেন তখন কাশীশ্বর পরিবেশন করে।

কাশীশ্বর প্রভুর পরিবারের একজন হয়ে গেল। 'প্রভুর নিমন্ত্রণে লাগে কোড়ি চারি পণ'। প্রভু কাশীশ্বর গোবিন্দ খান তিনজনে।

প্রভু বললেন, হরিদাস ঠাকুরের কৃপাতেই আমি নামের মহিমা শিখেছি। আর কৃষ্ণভক্তি শিক্ষা করেছি গৌড়ীয় ভক্তদের সঙ্গ করে।

গৌড়ীয় ভক্তদের নাম করলেন প্রভু। তার মধ্যে কাশীশ্বর একজন।

নবদ্বীপে নিমাইয়ের বাললীলার সঙ্গী কাশীশ্বর। শ্রীবাসের কীর্তন আসরে গঙ্গার কলকণ্ঠ। শ্রীবাসের বাড়িতে প্রভুর প্রকাশ কালে সে উপস্থিত। তারপর ... একসঙ্গে ঈশ্বর পুরীর কাছে দীক্ষা নিয়ে তাঁরই সেবায় আত্মনিয়োগ করল। তারপরে পুরীর আদেশে নীলাচলে এসে প্রভুর পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ।

বৃন্দাবনে রূপগোস্বামী গোবিন্দ-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করল। প্রভুর কাছে সে সংবাদ পৌঁছুলো। প্রভু কাশীশ্বরকে বৃন্দাবনে যেতে বললেন। প্রভুকে ছেড়ে যেতে কাশীশ্বরের মর্মান্তিক দুঃখ হল। প্রভু তাকে তাঁর নিজস্বরূপ বিগ্রহ বলে একটি বিগ্রহ দিলেন তার হাতে, বললেন, একে তোমার গোবিন্দ আখ্যা দিয়ে নিত্য সেবা কোরো।

কাশীশ্বর বৃন্দাবনকে আর প্রত্যাখ্যান করতে পারল না। বললে, প্রভু যেখানেই আমাকে রাখো ভাবতে দিও তোমার চরণেই আমি আছি।

ব্রহ্মচারী কাশীশ্বর বৃন্দাবনে গোকনাথ ... সঙ্গে যুক্ত হল।

(৭০)

কাশী মিশ্র

উৎকলবাসী ব্রাহ্মণ রাজা প্রতাপরুদ্রের গুরু। তাই সহজেই অন্যের কাছে বড় মাননীয় ব্যক্তি।

আয়ুর্বেদীয় উপাদানে প্রস্তুত
বলডেক্স
চুল ওঠা বন্ধ করে
নতুন চুল গজায়
BALDEX
বেঙ্গল কেমিক্যাল কর্পোরেশন • কলিকাতা-৩৭

শুধু রাজার রাজা নয়, জগন্নাথের সেবার অধ্যক্ষ। রাজা যখন শ্রীক্ষেত্রে থাকেন প্রত্যহ গুরুর পা টিপে দেন ও জগন্নাথ-সেবার কী রকম তিয়েন হল তাই শোনেন।

এ হেন কাশী মিশ্র অবাক্যব্যয়ে প্রভুর চরণে শরণ নিল।

প্রভুর থাকবার জন্যে একটি নির্জন ঘর দরকার, সার্বভৌমের ইঙ্গিতে কাশী মিশ্র তার নিজের বাড়িতে স্থান করে দিল।

আমার মত ভাগ্যবান আর কে আছে, আমার বাড়িতে প্রভু থাকবেন। শুধু গৃহ নয়, দেহ-মন-আত্মা সর্বস্ব কাশী মিশ্র প্রভুকে নিবেদন করে দিল।

প্রভু তাকে তাঁর চতুর্ভুজ মূর্তি দেখালেন। সত্যি কাশী মিশ্রের মত ভাগ্যবান আর কে আছে। তারপর তাকে আলিঙ্গন করে আত্মসাৎ করে নিলেন।

পরমানন্দ পুরী এসেছে—থাকবে কোথায়? প্রভু কাশী মিশ্রের বাড়িতেই একটি নিভৃত ঘর ঠিক করে দিলেন। তারপর গৌড় থেকে হরিদাস ঠাকুর যখন এল তখন তার থাকবার জন্যে কাশী মিশ্রের আরেকটি কুটির চাইতে গেলেন প্রভু। কাশী মিশ্র বললে, আমার যা কিছু আছে সমস্ত তোমার। তুমি চাইবে কেন? যা তোমার ইচ্ছে তুমি নিয়ে নেবে, দ্বিধা করবে না।

রথযাত্রার কদিন আগে প্রভু কাশী মিশ্রকে ডাকালেন। বললেন, গুণ্ডিচা-মন্দির মার্জনের অনুমতি চাই।

পড়িছা-পাত্র আর সার্বভৌমকেও খবর দেওয়া হল। পড়িছা বললে, রাজার আদেশে তোমার সমস্ত ইচ্ছাই আমাদের কর্তব্য বলে ধার্য হয়েছে। সুতরাং মন্দির মার্জন করতে চাও, যথাযোগ্য ব্যবস্থা করে দেব। কিন্তু যাই বলো, মন্দির সাফ করবার কাজ তোমাকে মানায় না।

প্রভু নীরবে একটু হাসলেন।

বুঝেছি এ তোমার এক লীলা। শুধু তো তুমি নও তোমার ভক্তেরাও এ প্রক্ষালনে অংশ নেবে। বেশ, তবে আদেশ করো। একশো ঘট আর একশো ঝাঁটা নিয়ে আসি।

মার্জন লীলা শেষ হবার পর সরোবরে জলক্রীড়া হল। তারপর পাঁচশো ভক্তকে প্রসাদ বিতরণ করা হল। রামানন্দের ভাই বাণীনাথ প্রসাদ নিয়ে এল আর পরিবেশনের তদারক করল কাশী মিশ্র।

একদিকে রাজা, আরেক দিকে প্রভু। দুদিকে সমান দায়িত্ব পালন করছে কাশী মিশ্র। দেহে কত শক্তি ও মনে কত আগ্রহ থাকলে এ সম্ভব তা কে বলবে। দক্ষতা ও চাতুর্যই যে কর্মোদযাপনের প্রাণ তা কাশী মিশ্রের চেয়ে বেশি আর কে জানে।

রথের উৎসবের সময় সাত সম্প্রদায় কীর্তন করছে—চার দল রথের সামনে, দু দল রথের দু-পাশে আর একদল রথের পিছনে। রাজা প্রতাপরুদ্র দেখতে পেল প্রভু সাত দলেই উপস্থিত আছেন, সাত দলেই বিলাস করছেন। অথচ প্রত্যেক দল ভাবছে, প্রভু শুধু আমারই গোষ্ঠীভুক্ত।

রাজা কাশী মিশ্রকে এ অপূর্ব দর্শনের কথা বললে।

কাশী মিশ্র বললে, তোমার ভাগ্যের সীমা নেই। তোমাকে সাক্ষাৎদর্শন না দিলেও দেখাচ্ছেন এই লীলা-বিলাস। তাঁর কৃপা বিস্ময়কর।

কাশী মিশ্র যে প্রভুর চতুর্ভুজ মূর্তি দেখল সেও তো প্রভুর অহেতুক করুণা।

তারপর জন্মাষ্টমীতে কাশী মিশ্র গোপবেশ পরল। সে একা নয়, পরল প্রতাপরুদ্র, তুলসী পড়িছা আর সার্বভৌম। স্বয়ং প্রভু এদের সঙ্গে নৃত্য করলেন। দুধ দই আর হলুদ-জলে সকলের অঙ্গ ভিজে গেল।

রামানন্দের ভাই গোপীনাথ রাজার প্রাপ্য ধন দিচ্ছে না, তাই তার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়েছে। আরেক ভাই বাণীনাথকেও বেঁধে নিয়েছে। এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার জন্যে প্রভুর কাছে অনুরোধ এল। প্রভু বিরক্ত হয়ে বললেন, রাজাকে তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করবে, তারপর বিচারে দণ্ড হলে আমার কাছে নালিশ জানাবে! এ সব বিষয়-বার্তা আমি শুনতে পারব না, আমি শ্রীক্ষেত্র ছেড়ে আলালনাথে চলে যাব।

তখন তাঁকে নিরস্ত করবার জন্যে কাশী মিশ্র মিনতি করতে বসল। তুমি ভুল বুঝছ কেন? গোপীনাথ তোমার কাছে বিষয়-আকাঙ্ক্ষা করে না, সে তোমার অনন্যশরণ ভক্ত বলে তার সেবকেরা তোমাকে জানিয়েছে। যে তোমাকে তোমার জন্যেই ভজনা করে সে তার দুঃখের দিনে তোমাকে জানাবে না তো কাকে জানাবে? ভয় নেই, তোমাকে কেউ বিষয়ের কথা বলবে না, তুমি এখানেই থাকো।

কাশী মিশ্র তখন রাজাকে গিয়ে ধরল। রাজা গোপীনাথের ঋণ মকুব করে দিল।

প্রভু আবার বিরক্ত হলেন। কাশী মিশ্রকে ডেকে বললেন, এ তুমি কী করালে? রাজার থেকে আমাকে তুমি দান নেওয়ালে?

কাশী মিশ্র আবার প্রভুকে বোঝাতে বসল। রাজা বলে দিয়েছে আপনি যেন এ কথা মনে না করেন যে আপনার দিকে তাকিয়ে রাজা তার দাবি ছেড়ে দিয়েছে ভবানন্দের ছেলেরা তার প্রিয়পাত্র বলেই এই অনুগ্রহ।

ভবানন্দের ছেলেরা এসে প্রভুর পায়ে পড়ল। চরণস্মরণের ফল কী, পেয়ে গেল হাতে হাতে।

প্রভু ভক্ত-বাৎসল্য প্রকট করলেন। থেকে গেলেন নীলাচলে।

যার যা ন্যায্য প্রাপ্য তাকে তা দেবে, সঙ্গত উপায়ে যা লাভ থাকে তা ধর্মকর্মে ব্যয় করবে, কদাচ অপব্যয় করবে না।

কাশী মিশ্র দুকূল বজায় রাখল। এক কূল রাজানুগত্য আরেককূল ঈশ্বর-ভক্তি। আর বুঝল - কাকে বলে শুদ্ধভক্ত। 'সেই শুদ্ধ ভক্ত—তোমা ভজে তোমা লাগি আপনার সুখদুঃখে হয় ভোগভোগী॥'

প্রভুর তিরোভাবের সময় কাশী মিশ্র বর্তমান ছিল। শ্রীনিবাস যখন নীলাচলে এল তখন আর তাকে দেখা যায়নি।

ডাঃ পি ব্যানার্জী (মিহিজাম)
লিখিত গৃহচিকিৎসার বই

আধুনিক চিকিৎসা

মূল্য ছ'টাকা, ডাক খরচা আলাদা

ডাঃ পি. ব্যানার্জি
৫৩, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬
এবং
১১৪এ, আশুতোষ মুখার্জি রোড,
কলিকাতা—২৫

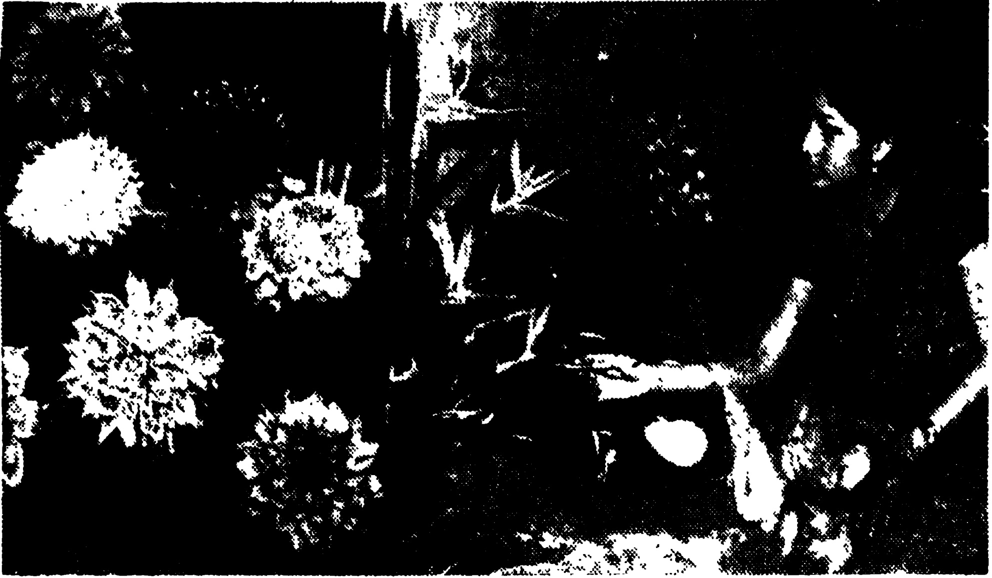
দ্রষ্টব্য :—বর্তমানে মিহিজামে আমাদের অফিস নাই। লেশ্রিন, নার্ভল টনসিলিন, ঔষধাদি এখন কলিকাতা হইতে পাওয়া যায়।



কেশুত

কলিকাতা-১

শীত হোল ফুলের মরশুম। রকমারি ফুলের শোভায় প্রকৃতির রূপ যায় পাল্টে। চারদিকে নর-নারীর মনে যেমন রঙিন পোষাকে নতুন করে সাজবার সাড়া জাগে, প্রকৃতিও তেমনি যেন নিজেকে নতুন করে সাজায়। প্রকৃতিকে মানুষ তুলে নিয়ে আসে তার আঙিনায়। ঘরে ঘরে ভরে ওঠে ফুলের মনোরম ছবি। তারই সুন্দর রূপ দেখা গিয়েছিল রয়াল এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটিতে। দেশবিদেশের বিচিত্র ফুল প্রতিটি পুষ্পপ্রেমিককে মুগ্ধ করে। প্রদর্শনীতে এমন সব ফুল দেখা গিয়েছিল যা বিদেশ থেকে আনা হয়েছে এবারই সর্বপ্রথম।



সাধনার পুরস্কার

বিধিলিপি না মানলেও অদৃষ্টলিপি মেনে চলতে হয়। ভাগ্যকে জয় করা যায় কিন্তু ভাগ্য পরিচালনার অধিকার নিজের হাতে নেওয়া সম্ভব নয়। মানুষ চলতে চেয়েছে এক পথে, ভাগ্য তাকে নিয়ে দাঁড় করিয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্নপথে। এরকম ঘটনা বহু ঘটেছে। আবার অনেক সময় হয়তো কেউ নিজের চলার পথেই ভাগ্যের প্রসন্নতার ইংগিত পেয়েছে—জীবনের সাধ-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করে স্বপ্রতিষ্ঠার মহিমায় উজ্জ্বল হয়েছে। এরকমই জীবনেতিহাস হচ্ছে শ্রীমতী হাইল্ড কোরবার-এর। চলার পথে জীবনে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন এবং তারপর ভাগ্যের প্রসন্নতায় জীবনের লক্ষ্যপথে পৌঁছে গেছেন প্রায়। এখন তিনি নিজেই এক সম্পূর্ণ ইতিহাস।

মাত্র নয় বছর বয়সে তিনি মঞ্চে নামেন। নারী হয়েও সেদিন তার ভূমিকা ছিল উইলিয়ম টেল-এর ছেলের। তার মা-বা এখবরটা জানতেন না। চোদ্দ বছর বয়সে তিনি ঢুকলেন স্টেট একাদেমীতে—স্বাভাবিক অপেক্ষা তখন তার বয়স দু'বছর কম। মাত্র ষোল বছর বয়সে তিনি নিজের জীবিকা বেছে নিলেন। একটি ট্রাভেলিং গ্রুপ-এ তিনি অভিনয় শুরু করলেন। জীবন ভিন্নপথে মোড় নিল। ভাগ্য তখন হয়তো বাঁকা হাসি হাসছে। হাইল্ড-এর জীবন সম্পর্কে কয়েকজনের কিছুটা যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তারা সব গুটিয়ে রাখলেন হয়তো হাইল্ড নিজে। কিন্তু পনেরো বছরের মধ্যেই ইতিহাস বদলে গেল। অথচ সেদিন কেউ ভাবেনি যে, এই পনেরো বছরে ইতিহাস এত বদলে যাবে—জার্মানীর একজন খ্যাতনামা অভিনেত্রীর মর্যাদা লাভ করবেন।

সেটা ১৯২৪ সাল। হাইল্ড-এর বয়স তখন আঠারো। অভিনয়ে ইতিমধ্যেই তিনি বেশ সাড়া জাগিয়েছেন। স্টুটগার্ট এবং জুরিখে বেশ নামও করেছেন। চোখে তখন তাঁর স্বপ্ন। পাড়ি জমালেন বার্লিনে। এখানে তাঁর চটপট উন্নতি অনেককে অবাক করে দিল। ম্যাকস্ রেইনহার্ডটের শিক্ষাধীন ছিলেন তিনি। সবরকম ভূমিকার অভিনয়ে নিজেকে তিনি দক্ষ অভিনেত্রী করে গড়ে তোলেন। দিন কাটে, অভিনয়ে তাঁর নাম ততই উজ্জ্বল হয়। কয়েক বছরের মধ্যেই সারা ইউরোপে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো। এজন্য ম্যাক্স রেইনহার্ডটের থিয়েটার অনেকখানি কৃতিত্বের অধিকারী। এই থিয়েটার ছিল ইউরোপের 'ফোকাল পয়েন্ট'।

এবার স্টেজ ছেড়ে সিনেমায় আত্মপ্রকাশ করলেন হাইল্ড। একজন বিখ্যাত পরিচালকের সংগে এবারও সাক্ষাৎ হয়ে গেল। এই পরিচালক হলেন ভেট হার্লান। পরে তাঁরা পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। পরিচালক হিসেবে ভেট হার্লান-এর দক্ষতা এবং যোগ্যতা প্রশ্নাতীত। কিন্তু হিটলারের প্রতি আনুগত্যের জন্য তাঁকে প্রায়ই নিন্দাবাদের সম্মুখীন হতে হতো। তাদের দাম্পত্যজীবনেও ঘনিয়ে এলো দুর্যোগের মেঘ। বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে গেল। দুটি মেয়ে এবং একটি ছেলে, হাইল্ড রইলেন একা।

স্টেজে প্রায় দু-হাজার চরিত্রে রূপদান করেছেন হাইল্ড। রাজনীতিতেও তাঁর আগ্রহ বেশ। ১৯৪০ থেকে ১৯৫১ পর্যন্ত তিনি বার্লিন চেম্বার অব ডেপুটিস-এ ছিলেন শহর প্রতিনিধি। লেখক এবং কবি হিসেবে স্বীকৃতিও তাঁর আছে। ১৯৫১ সালে তিনি রেইনহার্ডট স্কুলের প্রধান পদে অধিষ্ঠিতা হন এবং জার্মানীর তরুণ অভিনয় শিক্ষার্থীদের স্কুলের মধ্যে এটি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। চোদ্দ বছর

রয়্যাল এগ্রি-হর্টিকালচারেল সোসাইটির ১৯৬৮ সালের পুষ্পপ্রদর্শনীর এয়ার-ইণ্ডিয়ার প্যাভেলিয়নটি উদ্বোধন করেন রাজ্যপাল শ্রীধরমবীর। অনুষ্ঠানে সিকিমের ছোগিয়াল, সন্তোষের রাজা, ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্স কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান শ্রীভারতরাম এবং যুগান্তর সম্পাদক শ্রীসুকুমলকান্তি ঘোষ প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।



যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করে নিজের ৫৮ বছর বয়সে তিনি অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

আজ কিন্তু ইতিহাস বদলে গেছে। শ্রীমতী হাইণ্ড-এর জীবন-সাধনা সার্থক হয়েছে। এখন তিনি জার্মান থিয়েটারের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। অবশ্যই বিচ্ছিন্ন অঙ্গ নন, আগামী বংশধরদের অনেকেই তাঁর কাছে অভিনয় শিক্ষা করবেন। জার্মান যুব-সমাজ এবং জার্মান ফিল্মের প্রতি তাঁর সেবার নিদর্শন স্বরূপ তিনি বার বৎসর পূর্বে প্রথম শ্রেণীর ফেডারেল অডার অব মেরিটে ভূষিতা হন একজন আত্ম-নিবেদিত শিল্পীর এ সম্মান সত্যি অসাধারণ। বিশেষ করে নয় বছর বয়সে প্রচলিত সংস্কার ভেঙে যিনি মঞ্চে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, 'মারিয়া স্টুয়ার্ট' অভিনয়ের পর অভিনেত্রী জীবন বেছে নেন।



অঙ্গনা

প্রমীলা

কেশ ও কেশ প্রসাধনী

মানুষের বিশেষ করে স্ত্রীলোকের চুলের কদর পৃথিবীর সব দেশেই আছে; বিশ্বের বিভিন্ন সাহিত্যিক তাঁদের কাব্য, নাটক ইত্যাদির মধ্য দিয়ে নারীর কেশের বর্ণনা করে গেছেন; চুলের তুলনা করতে গিয়ে তাঁরা যে কত উপমার প্রয়োগ করেছেন, তার সংখ্যা নেই; কাজলকালো কেশ, মেঘবরণ কেশ, ভ্রমরকুন্তল ইত্যাদি নানা উপমার সাহায্যে চুলের সৌন্দর্য প্রকাশের চেষ্টা দেখা যায়। এইসব তুলনার মধ্যে কিছু কাব্যিক উচ্ছ্বাস হয়ত দেখা যায় তবু এর বৈজ্ঞানিক দিকটার কথাও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। কারণ, মানুষের সৌন্দর্য ও মুখশ্রী বহুলাংশে নির্ভর করে তার চুলের ওপর। কেশ-বিন্যাসের রকম-ফের এবং খোঁপা বাঁধার ভঙ্গী মানুষের বাহ্যিক আকৃতি আমূল বদলে দিতে পারে। বর্তমান প্রসাধন ও সৌন্দর্য বিশেষজ্ঞরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন, তাই আজকাল বাজারে কেশ প্রসাধনীর প্রচুর সমাবেশ দেখা যায়। এর ফলে কিন্তু ক্ষতি ছাড়া লাভ কিছু হয় নি, কারণ প্রসাধনীর এই বিরাট অরণ্যের

ভিতর থেকে যথার্থ ভাল ও উপকারী জিনিসটি বেছে নেওয়া সাধারণ লোকের পক্ষে কঠিন। এর মধ্যে এমন বহু প্রসাধনী আছে যা চুলের উপকার দূরের কথা বরং অনেক সময় স্থায়ীভাবে চুলের ক্ষতি করে। ভাল জিনিসও বাজারে যথেষ্টই পাওয়া যায়, তবে সেগুলির দাম স্বভাবতই এত বেশী যে নিম্ন মধ্যবিত্তদের পক্ষে তা কেনা অনেক সময় কষ্টকর হয়ে পড়ে। এই অসুবিধার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় বাড়ীতে কিছু কিছু কেশ প্রসাধনী তৈরী করে নেওয়া। কিন্তু এতেও অসুবিধা আছে অনেক। কারণ ভাল একটা প্রসাধনীর প্রস্তুত প্রণালী যেমন জটিল, তেমনি প্রয়োজনীয় উপকরণও সব সময় বাজারে পাওয়া শক্ত। তবু এর মধ্যে একাধিক প্রসাধনী আছে, যেগুলি সহজপ্রাপ্য উপাদানে ও সরল পদ্ধতিতে তৈরী করা যেতে পারে। গৃহে প্রস্তুত উপযোগী এমনি কয়েকটি কেশ প্রসাধনীর নির্মাণপ্রণালী নিয়ে আলোচনা করা যাক।

একটা জিনিস বোধ হয় অনেকেই লক্ষ্য করেছেন; স্ত্রী-পুরুষ সকলের মুখেই আজকাল চুল উঠে যাওয়ার অভিযোগ শুনতে পাওয়া যায়। সাধারণভাবে এর হেতু নির্দেশ করা মুস্কিল। অনেকগুলি কারণের মধ্যে শারীরিক দুর্বলতা এবং চুলের প্রতি অযত্ন ছাড়াও অনেকে পারিবারিক সূত্রেও এ দোষ পেয়ে থাকেন। তবে কারণ যাই হোক না কেন, চুল ওঠা রোগ দূর করার জন্য কেশ-বিশেষজ্ঞরা যে সুন্দর প্রসাধনীটির সুপারিশ করেছেন, সেটা ব্যবহার করে দেখতে পারেন। এর জন্য দরকার—হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিড—৫ গ্রাম এবং অ্যালকহল—১৫০ গ্রাম। এই দুটি জিনিস একসঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে লোশনের মত একটা জিনিস পাবেন; রোজ রাত্রে শুতে যাবার আগে চুলের গোড়ায় অল্প পরিমাণে এটি প্রয়োগ করলে চুল ওঠায় অনেক উপকার হয়।

শ্যাম্পু চুলের পক্ষে বিশেষ উপকারী। বাজার থেকে বহু লোকই শ্যাম্পু কিনে ব্যবহার করেন। মাঝে মাঝে প্রয়োজনীয় মাত্রায় এটি চুলে লাগালে মাথায় আঠা হয় না, চুলও নরম এবং হালকা থাকে। বাজার থেকে কোন দামী শ্যাম্পু কেনার আগে বাড়ীতে তৈরী এই শ্যাম্পুটি ব্যবহার করে দেখতে পারেন। যথেষ্ট সুফল পাবেন। এর জন্য যেসব উপকরণ দরকার সেগুলি হল :—

গুঁড়ো সাবান—১০ গ্রাম
গোলাপ জল—১৫০ গ্রাম
এ্যালকহল—৭৫ গ্রাম
চুলের পক্ষে নির্দোষ
যে-কোন সেন্ট—৫ গ্রাম
ডিস্টিল্ড ওয়াটার

শ্যাম্পুটি তৈরী করতে হলে দুটি পর্যায়ে অগ্রসর হতে হবে, প্রথমে গোলাপ জলে গুঁড়ো সাবান ঢেলে একটা মিশ্রণ তৈরী করে নিন। অন্য একটি পাত্রে এ্যালকহলের সঙ্গে সেন্টটি মিশিয়ে আর একটা মিশ্রণ তৈরী করুন। তারপর দুটি মিশ্রণই একসঙ্গে মিশ্রিত করে তাতে ডিস্টিল্ড ওয়াটার এমন পরিমাণে ঢালুন, যাতে মিশ্রণটি সবশুদ্ধ ১০০ গুণ বর্ধিত হয়। স্নানের আগে কিছু পরিমাণ এটি নিয়ে ভাল করে চুলে ঘষে নেবেন। উপকারিতার দিক থেকে বাজারের অনেক নামী ও দামী শ্যাম্পুর চেয়ে বাড়ীতে প্রস্তুত এই শ্যাম্পুটি কোন অংশে খারাপ নয়।

একটি ভাল হেয়ার লোশনের প্রস্তুত-প্রণালী এবার বলব। চুলের পক্ষে বিশেষ উপকারী এই লোশনটি চুল ওঠা, চুল বিবর্ণ হয়ে যাওয়া, খুস্কি প্রভৃতি চুলের নানা রকম রোগে কেশবিশেষজ্ঞরা এটি সুপারিশ করেছেন। এর জন্য দরকার :—

গ্লিসারিন—৮½ গ্রাম
বোর্যাক্স—৭ গ্রাম
এ্যালকহল—১৫ গ্রাম
গোলাপ জল—১ গ্রাম
ডিস্টিল্ড ওয়াটার

প্রথমে অল্প পরিমাণ জলে বোর্যাক্স ও গ্লিসারিন মিশিয়ে আলাদা করে রাখুন। কিছু পরে এর মধ্যে গোলাপ জল ও এ্যালকহল ঢেলে তাতে ডিস্টিল্ড ওয়াটার এমন পরিমাণে দিন যাতে সমস্ত মিশ্রণটির পরিমাণ ১০০ গুণ দাঁড়ায়। রোজ সকালে ও বিকালে অল্প পরিমাণে এটি প্রয়োগ করলে চুলের নানা ব্যাধিতে সুফল পাবেন।

খুস্কী দূর করতে এই লোশনটি ব্যবহার করে দেখতে পারেন। সামান্য পরিমাণ মেথি অল্প জলের মধ্যে ৩০ মিনিট ভিজিয়ে রাখুন; তারপর তাতে কয়েক ফোঁটা মধু ঢেলে সেটি চুলে প্রয়োগ করুন, লোশনটি আধ ঘণ্টা চুলে লাগিয়ে রাখুন, পরে ধুয়ে দিন। কয়েকবার এটি মাথায় লাগালে খুস্কীর হাত থেকে রক্ষা পাবেন।

—ইন্দ্রজিত সেন



পুষ্পসজ্জা

এবার শীতে মরশুমী ফুলের বাহারে শহরে বেশ কয়েকটি পুষ্পসজ্জার আয়োজন হয়েছিল। এর মধ্যে সাম্বাৎসরিক দু-একটির কথা ছেড়ে দিয়ে ইনফরমেশন সেন্টারে শ্রীমতী উমা বসুর পুষ্পসজ্জা বিশেষ আগ্রহের সৃষ্টি করে।

দিল্লী, কলকাতা, বোম্বে ও মাদ্রাজ—ভারতের এই চারটি ঐতিহ্যমণ্ডিত নগরীর ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহ এবং কীর্তিমণ্ডিত ভাবধারাকে রূপদানের চেষ্টা করেছেন তিনি পুষ্পসজ্জার মাধ্যমে। দিল্লীর ঐতিহাসিক রূপান্তর, মাদ্রাজের ধর্মীয় ঐতিহ্য, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের যোগসূত্র বোম্বে এবং সব কিছুর মিলন সেতু এই পুষ্পসজ্জায় শিল্পীসুলভ রূপে বিকশিত হয়েছে।

চিন্তার সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্য শ্রীমতী বসু ব্যবহার করেছেন ফল, পাতা, কুঁড়ি ছাড়াও নিজের আঁকা কিছু ক্যানভাস এবং কাঠ-পাথরের খোদাই করা জিনিষপত্র।

শ্রীমতী উমা বসুর এই উদ্যম সার্বিক সফল হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর।



॥ ২৮ ॥

[illegible] অভ্যেসের জন্যে, [illegible] ঠিক, তবুও [illegible] অবসর পায়নি সুরবালা। মানুষের যে ভাব নিয়ে থাকতে পারে তা জানতেও না [illegible]। বিশেষ অল্পবয়সী মেয়েদের [illegible] স্বাভাবিক, [illegible] ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত, সেও [illegible] অনুভব করে। [illegible] কোনদিন। শুধু একমনে [illegible] গানের কথাটাই ভেবেছে, উন্নতির কথা চিন্তা করেছে। [illegible] লোককে, লোককে [illegible] কিন্তু এখন [illegible] শিক্ষাটা [illegible] হয়েছে, সে যা শিখেছে অনেক [illegible] গাইয়েও তা জানে না; [illegible] দুঃখ তো ঘুচেইছে। দিন-আনা দিন-খাওয়ার অবস্থাও আর নেই, [illegible] জমেছে তাতে বছর-দুই বসে খেলেও আটকাবে না। এইবার সে যেন [illegible] পৃথিবীর দিকে, নিজের দিকে চেয়ে দেখবার অবসর পেল—আর সঙ্গে সঙ্গেই বুঝল, অভাবের যেমন কিছু কিছু নিজস্ব সমস্যা আছে, তেমনি প্রাচুর্যেরও আছে কিছু কিছু উপসর্গ, যা অবসর থাকলেই এসে জোটে।

কেমন যেন সবটা ফাঁকা ফাঁকা [illegible] আজকাল। কী যেন নেই, কী যেন পেলে ভাল হত। একা থাকলেই যেন এই ফাঁকা ফাঁকা ভাবটা আরও চেপে ধরে। নিজের বাড়ি কিনে উঠে এসেছে ভাল পাড়ায়, মতির বাড়ির কাছাকাছি। ছোট বাড়ি হবে, নিচে একঘর ভাড়াটে রেখেছে সে ইচ্ছে করেই। একা থাকার ভয় এড়াতে। [illegible] ভাল না। অবশ্য লালুও সে-কথাটা [illegible] দিয়েছে। সেই জোর করে [illegible] ভাড়াটে এনে বসিয়ে দিয়ে গেছে [illegible]। বাড়ি তৈরিকেই তো বেশীক্ষণ [illegible] ঠকবার [illegible]। [illegible] একটা পয়সার কথাও [illegible]। ধন-অপবাদ বড় সাংঘাতিক। [illegible] চোর-ডাকাত তো আছে। [illegible] যে কি জানোয়ার [illegible] নিয়ে যাবে, [illegible] বুড়ো বয়সে অপঘাতে জানটা [illegible] বুঝেছে কথাটা, [illegible] হয়নি।

প্রতিবাদ করে [illegible] অন্য কারণ, নিজের বাড়িতে [illegible]। কেবল ভাড়াটে ঠিক করবার সময় একবার ভেবেছিল মতিদিদেরই এসে থাকতে বলবে—বেশ হয় তাহলে, [illegible] মনের কথা কইবার লোক হয়—কিন্তু তার পরই মনে হয়েছে, বড় বেশী আস্পর্ধা [illegible] শোনাবে। কী মনে করবেন ওঁরা, ভাববেন তাঁদেরও পয়সার জাঁক দেখাচ্ছে। তিনি ভাড়াতেও ও-পাড়ায় থাকলে তবু [illegible] পারে মধ্যে মধ্যে, এখন [illegible] মধ্যে মধ্যে দু-এক [illegible] বর্ণালীকের কোলে এসে বসে হয়। এখানে উঠে এলে সেটাও বন্ধ হবে। [illegible] কথা বলতে দেয় না, [illegible] এখন ভরসা এই খবরটুকুই।

কথা বলার জন্যেই ভাড়াটে রাখা, কিন্তু [illegible] পর কারও সঙ্গেই কথা বলতে আর ইচ্ছা হয় না সুরোর। না মা—না ভাড়াটে বৌ। মধ্যে মধ্যে মতির বাড়ি যায়—কিন্তু সেইসব সন্ধ্যে, সেইসব কথাবার্তা—[illegible] একমাত্র বন্ধু পাবেন, [illegible]। [illegible] এমন কি অত যে প্রিয় তার গান তাতেও যেন [illegible] অনুভব করে না আর। [illegible] কখনও একেবারেই যন্ত্রের মতো গাইছে, গাইতে হচ্ছে তাই গাওয়া—এমনি মনে হয়। শুধু এক-একদিন গাইতে গাইতে [illegible] বাস কি লোকাধিবাসের পালায় যখন রাধা বা [illegible] গোপীদের আকুতি, তার চেয়েও বেশী আকুলতা, ফুটিয়ে তুলতে থাকত, তখন হঠাৎ এক-এক সময় কেমন [illegible] মনে হত এ শুধু তার গান নয়—সে-ই যেন [illegible] চাইছে কাকে। তাঁকে ধরতে পারলে, তাঁকে স্পর্শ করতে পেলে, তাঁকে [illegible] করতে পারলে এই গান গাওয়া সার্থক হত, এই দেহও ধন্য হত। সেই সময়টা অপরূপ-আবেশে যেন অবশ বিহ্বল হয়ে পড়ত সে, সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত শিহরিত হতে থাকত বারবার, সমস্ত দেহের প্রতিটি বিন্দু যেন অকূল হয়ে উঠত সে সময়। [illegible] সেই [illegible] একটি মানুষের [illegible] আর কিছুতে নেই। [illegible] তার জৈবিক, সত্যকার কামনা—সেটা সে নিজেও বুঝতে পারে না, মনে করে এটা [illegible]। তাকেও এমন ভাবে স্পর্শ করতে একটু একটু করে নিজেকে প্রতারণা করে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে, প্রতারিত হয় [illegible] তবুও, হয়ত এটাকে ভাবাবেশ [illegible] মনে করে [illegible] করতে করতে কাছে গিয়ে কানের কাছে হরিনাম শুনিয়ে তার চৈতন্য ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করে। শ্রোতারাও তাই মনে করেন—এই অল্পবয়সী সুশ্রী একটি মেয়ে, এত ভক্তি

দেখে অভিভূত হন তাঁরাও। বাহবা দেন খুব, পেলাও দেন বেশী করে।

সে-সব দিনগুলোতে বাড়ি ফিরে রাত্রে আর কিছুতে ঘুম আসত না। কী যেন এক দুঃসহ যন্ত্রণায় শয্যাকণ্টকীতে ছটফট করত। বৃথা খানিকটা এপাশ-ওপাশ করার পর উঠে বারবার জল খাবড়ে আসত মাথায়। একেবারে শেষ রাত্রে কি রাত্রি শেষ হলে ঘুম আসত হয়ত, বেলায় উঠে দেখত চোখের কোলে গভীর কালি, সমস্ত দেহে মনে অসম্ভব অবসাদ।

সে-অবস্থা নিস্তারিণীর চোখে পড়লে সে ডাব কি মিশ্রীর জলের ব্যবস্থা করত, বলত, শরীর গরম হয়ে আছে। আর নানুর চোখে পড়লে মুচকি হেসে থিয়েটারী ঢঙে বলত, 'আজও প্রতীক্ষিছে দাস তব সুবদনী, আজ্ঞা দেহ পুরাইব সকল বাসনা, নিভাইব মনের আগুন।' তারপর চুপিচুপি বলত, 'মরুক গে, নিতান্তই আমাকে যদি পছন্দ না হয়, কোন ফুটফুটে ছোকরা দেখব নাকি?'

এদেরই কথাবার্তায়—নানু ছাড়াও নিচের ভাড়াটে বৌও এই ধরনের ইঙ্গিত দিত। বলত, 'এসব বয়সের গরম ভাই, দেহের একটা ধর্ম তো আছে।'—ইদানীং ব্যাপারটা ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা রকমের পরিষ্কার হচ্ছে সুরোর কাছে। অন্ন-বস্ত্র, মাথার ওপর একটা আচ্ছাদন—এছাড়াও কিছু অভাব আছে মানুষের। মানুষের অভাব। মানুষকেও মানুষের কম প্রয়োজন নয়। মনের মতো মানুষ, জীবনের সঙ্গী একজন। খ্যাতি, অর্থ, যশ ছাড়াও কিছু কাম্য আছে—বিশেষ মেয়েদের। একটি অবলম্বন।

কিন্তু এসব চিন্তাকে সে আমল দিতে চাইত না, স্বীকার করতে চাইত না। এই কামনার আড়ালেই যেন নিজেকে অপবিত্র, নোংরা মনে হত, সমস্ত ব্যাপারটা কলুষিত মনের জিনিস বলে ভাবত। সে নিজেকে বেশী করে ডুবিয়ে দেবার চেষ্টা করত তার কাজের মধ্যে, গানের মধ্যে। এই গানের যিনি লক্ষ্য, যিনি এর দেবতা—তাঁর কাছে শরণ নিতে চাইত। মনকে বোঝাতে চাইত যে মানুষের আসঙ্গলিপ্সা নয়—আসলে এটা তার ঈশ্বররতিই। তাঁর গান তাঁদের গান গাইতে গাইতে তখন সে ঐ কল্পনার গোপিনীদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে—তাই তার আর শুধু শব্দ উচ্চারণে মন ভরছে না, কিছু উপলব্ধিতেও সাধ হয়েছে।...

এরই মধ্যে একদিন আহিরীটোলার রাজবাড়ি থেকে বায়না এল সুরবালার। রাজাবাহাদুরের বড় নাতির অন্নপ্রাশন। মেয়ে ছেলে মিলিয়েও এই প্রথম নাতি বাড়ির —খুব নাকি ঘটা হবে। যাত্রা-থিয়েটার তো আছেই—বড় বড় পেশাদারী দল বায়না করা হয়েছে; এছাড়া বাইনাচ, খেমটা নাচ, তরজা, কবির লড়াই, কীর্তন, ঢপ্—আর পুতুলনাচ পর্যন্ত—প্রমোদ-উৎসবে কোন ত্রুটি রাখা হয়নি। 'মকশুদোবাদ না কোথা থেকে পুতুলনাচের দলই এসেছে দুতিনটে, রাঢ় দেশ কোথায়—সেখান থেকে এসেছে কবির দল, তরজার দল, ঝুমুর নাচের দল। নবদ্বীপ শান্তিপুর থেকে পাঁচালী-গাইয়েরা এসেছে, গম্ভীরা নাকি এক নাচের দল। এছাড়া কলকাতার বিখ্যাত বাইউলী-কীর্তনউলী বায়না করা হয়েছে। স্বয়ং মালকাজান গাইবে, তার সঙ্গে মেয়ে গহরজানও। গহরজানও এর মধ্যেই বেশ নাম করে ফেলেছে। কেত্তনে ধরো, মতি পান্না আসবে—তুমি তো আছই—রাজাবাবুর আবার কেত্তনের শখ খুব—তিনজনকেই চান তিনি। কে কী গাইবে জানলে সময় ঠিক করবেন তাঁরা সেইমতো।' দুই চোখ বিস্ফারিত করে ফিরিস্তি দেয় দালাল রঘুবাবু।

সুরবালা স্থির হয়ে বসে শুনল সব। রঘুবাবু খোদ ওদের ম্যানেজারকে ধরে এনেছে। সুরবালা নতুন চেয়ার কিনেছে—সেইখানে এনে বসিয়েছে সে সমাদরে। আজকাল রাত-দিনের ঝি রেখেছে সুরো। আরও এই লোকজনের আসা-যাওয়ার জন্যেই রাখতে হয়েছে—ঝি রুপোবাঁধানো হুঁকোতে তামাক সেজে এনে দিয়েছে। হুঁকো—কিন্তু শুখো, জল নেই। সকলে যার-তার হাতে জলভরতি হুঁকোয় তামাক খায় না। আর এখানে তো নিত্যি নানান্ জাতের আনাগোনা। ব্রাহ্মণের জন্যে আলাদা হুঁকো আছে। রঘুবাবু বা বাজনদারদের জন্যে একটা থেলো হুঁকোর ব্যবস্থা—বাকী বাবুভাইদের জন্যে এই রুপো-বাঁধানো হুঁকো। জল দিলেই বিপদ, সোনার বেনের ব্যবহৃত করা কি কায়স্থর—এই ধরনের প্রশ্ন উঠবে।

প্রাথমিক আপ্যায়ন শেষ হতে সুরবালা প্রশ্ন তুলল, কে কী গাইবে কিছু স্থির হয়েছে কিনা।

'হ্যাঁ—তাও স্থির হয়েছে। পান্না নিয়েছে রাস, মতি বাল্যলীলা। এখন তুমি কি গাইবে তাই বলো।'

সুরবালা হেসে বলল, 'তাহলে আমার তো দেখছি গোষ্ঠ ছাড়া কিছু নেবার নেই। অন্নপ্রাশনে গিয়ে তো আর মাথুর গাইব না। পূর্বরাগ কি মানও আমার ভাল লাগে না। আজকাল নিজের বড় শরীর খারাপ হয়ে যায় ঐসব পালা গাইলে। তাছাড়া অন্নপ্রাশনের ব্যাপার—গোষ্ঠই ভাল। তবে সকাল ছাড়া গোষ্ঠ গাওয়া চলবে না।

সে একটু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইল ম্যানেজারবাবুর দিকে।

'সে তো ভালই হয়—আমাদের দিক দিয়েও', সোৎসাহে মাথা নাড়েন ম্যানেজারবাবু, তাঁর কাঁচাপাকা চুলে মোষের শিংয়ের মতো পাকানো টেরি দুলে দুলে ওঠে সেই ঝোঁকে, ওরা একজন নিয়েছে রাত্তির, একজন বিকেল। পান্না গাইবে রাত্তিরে—মতি বিকেলে। তুমি একদিন সকালে গাইলে আমারও বেশ মানানসই হয়। তাই হবে। তা, তাহলে এই সামনের শুক্রুরবার?'

পাঁজিটা দেখে নিয়ে—পাঁজির পাশে-পাশেই লেখা থাকে কোনদিন কোথায় কি বায়না,—রাজী হয়ে যায় সুরো। বলে, 'হ্যাঁ, শুক্রুরবারেই ভাল, শনিবার সকালে আর একটা বায়না রয়েছে কম্বুলেটোলায়—'

'তাহলে ঐ কথাই ঠিক রইল' বলে কথা শেষ করলেন ম্যানেজারবাবু, এবার ওঠাই উচিত কিন্তু উঠলেন না, এবার রঘুবাবুর মুখের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, 'তা ওটার কথা গানে কি দিতে টিতে হবে—?'

রঘু তাকায় সুরোর দিকে। আজকাল কোন্ দৃষ্টির কি অর্থ তা বোঝা হয়ে গেছে সুরবালার। আজকের এ-চাউনির অর্থ হল, 'মক্কেল শাঁসালো, বেশ করে দুয়ে নিতে পারো। সস্তায় ছেড়ো না।' কিন্তু সুরবালার হঠাৎ কী হল আজ, সে ঘাড় নেড়ে বললে, 'অত বড় লোকের বাড়ি আবার দামদস্তুর করে কি যাবো? গান শুনে রাজাবাবুর যা ন্যায্য বলে মনে হয় তুষ্ট দেবেন!'

রঘু মেয়েটার বেকামি দেখে মনে মনে ব্যস্ত হয়ে ওঠে. 'ওমা, তাই কখনও হয়! যা হয় একটা কিছু বলো তুমি, পছন্দ হয় —সে তো আলাদা পাওনা রইলই—বকশিস হিসেবে। মজুরি একটা কিছু ঠিক করে নাও!'

দৃঢ়ভাব সঙ্গেই ঘাড় নাড়ে সুরো 'উঁহু। মজুরী বকশিস সব আমি তাঁর ওপরই ছেড়ে দিলুম। তিনি গান ভালবাসেন কীর্তন গান—তাঁকে শোনাব। যা দেবার তিনি ঠিক করবেন। তিনি তো এত দিচ্ছেন—কার কি রেট তিনিই তো জানেন। তাঁর কাছে দাম করে খেলো হবো কেন?'

'এই তো প্যাঁচে ফেললে মা!' ম্যানেজারবাবু হাসেন, 'তা ধরো যদি রাজাবাবু পঁচিশ টাকাই ধার্য করেন তোমার মজুরী—তখন নিতে পারবে? আমরা জাতে বেনে, তা জানোতো মা, সহজে পয়সা বার করতে চাই না। যেখানে এক পয়সায় কাজ চলে যায়—সেখানে দেড় পয়সা খরচ করা আমাদের স্বভাবে নেই।'

'সে কি কথা! পঁচিশ কেন, রাজাবাবুর বিবেচনায় যদি পাঁচ টাকাই আমার মজুরী ধার্য হয়—মাথায় করে নেব। বলেছি যখন তখন জবান ফিরোব না এটা ঠিক, আর অতবড় লোকের অসম্মানও করব না—তখন ঐ নিয়ে কেজিয়া করে। আমাদেরও সে স্বভাব নয় ম্যানেজারবাবু। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

'তাহলে তাই হবে। রাজাবাহাদুরকে যেয়ে তাই বলব।' ম্যানেজারবাবু ধীরে-সুস্থে পকেট থেকে ডিবে বার করে সুগন্ধি পানের মিষ্টি সুবাসে ঘর পূর্ণ করে নিজে একটা মুখে পুরলেন, রঘুকেও একটা দিলেন, তারপর যথোপযুক্ত সম্ভাষণ করে বিদায় নিলেন।

রঘু তাঁর সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে গাড়ি অবধি পৌঁছে দিয়ে ফিরে এসে অপ্রসন্ন ব্যাজার মুখে বললে, 'হঠাৎ আবার কী হল তোর আজ? একেবারে রাণীভবানী হয়ে উঠলি যে! তারপর? ওরা হল ডাকসাইটে কিপ্‌টের জাত, যদি সত্যিই পঁচিশ তিরিশ টাকা ঠেকায়?'

'সে সবটাই তোমাকে ধরে দেব—তোমার দালালী। তাহলেই হল তো?' সুরবালা হেসে জবাব দেয়।

এ বাড়িতে মুজরো এই প্রথম। এর আগে আর কখনও আসেনি, যোগাযোগ হয়নি তেমন। মস্ত বড় বাড়ি, সে মাপেও বেশ বড় উঠোন। উঠোন ঠাকুর দালান ও চারদিকের রোয়াক মিলিয়ে বোধহয় হাজার লোক বসেছে—মেয়েতে পুরুষে। ঠাকুর দালান ও রোয়াকগুলোয় চিক টাঙিয়ে মেয়েদের বসার ব্যবস্থা কিন্তু সকালবেলা বলে চিকের বাইরে থেকেও দেখা যাচ্ছে, সেখানেও এতটুকু জায়গা খালি নেই।

দেখেই প্রসন্ন হয়ে উঠল মন। শ্রোতা বেশী থাকলে মনে হয় গাওয়া সার্থক হল। আজকাল ছোট আসরে দেড়শ' দুশ' লোকের সামনে গাইতে ইচ্ছে করে না, জমেও না তেমন। মেহনৎ বাড়ো খরচ বলে মনে হয়।... মাঝখানে আসর, শ্রোতাদের সব মেঝেতে ফরাস পেতে বসবার ব্যবস্থা। কেবল এক কোণে, বড় জোড়া থামের সামনে—পিছনের কারও দেখার না ব্যাঘাত ঘটে সেইটে বাঁচিয়ে খানতিনেক চেয়ার। স্বয়ং রাজাবাহাদুর আর তাঁর জন দুই মান্যগণ্য অতিথির জন্যে।

সুরো যখন গেছে তখনও সে চেয়ার খালি। গৌরচন্দ্রিকা ধরার পর রাজাবাহাদুর এসে বসলেন, সঙ্গে দুজন সাহেব। বোঝা গেল সাহেবদের জন্যেই চেয়ারের ব্যবস্থা করতে হয়েছে।... এসে বসা মাত্রই কিছু ভাল করে চেয়ে দেখা যায় না, তা ছাড়া সুরোর অত কৌতূহলও ছিল না। এত বড় আসর—একটু গোলমাল, খোশগল্পের গুঞ্জনধ্বনি উঠবেই- মন ছিল সেইদিকেই। এমন সুর ধরতে হবে যাতে প্রথমেই চড়া তাল তোলা যায়। চড়া তাল না ধরলে গোলমাল থামানো যায় না চট করে।

ভাল সুগন্ধি ফুলের মালা দিয়েছিল, সুরো খোলেনি গলা থেকে। ওর দলই থাকে, আসরে হয় রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি নয়তো মহাপ্রভুর পট রাখতে হবে। আর, গাইয়ের মালা ছাড়াও একগাছি অতিরিক্ত গোড়ে মালা। সেই মালা সে নিজে হাতে পটের চরণে—না, গলায় নয়, পটই হোক মূর্তিই হোক—বাবা বলে দিয়েছেন মেয়েদের কখনও ঠাকুরকে মালা পরাতে নেই—পায়ের কাছেই রেখে দেয় সুরবালা গান শুরু করার আগে। ঠাকুরের পায়ে আলাদা মালা দেয় বলেই নিজের গলারটা খোলে না। আজকের গোড়ে মালা দুটোই বেশ ভাল, টাটকা তাজা সুগন্ধি ফুলের মালা, সম্ভবত জুঁই। সম্ভবত এইজন্যে যে, জুঁই হলে এত বড় জুঁই আগে কখনও দেখেনি সে। তাজা ফুলে আর সদ্য পেষা চন্দনের তিলক তার সঙ্গে। আসরের চারিদিকেও সুগন্ধি ফুলের মালা দিয়ে ঝালর ঝোলানো হয়েছে। শুনল, বাজনদার দুকোড়ি বলল চুপিচুপি, রাজাবাহাদুরের বাগানেই এত ফুল ফোটে প্রত্যহ। শেষরাত্রে মালি দিয়ে যায় তুলে।

পুষ্পচন্দনের মিলিত সুবাস, ঝলমলে প্রভাতের আলো, সুবেশ সুকান্তি শ্রোতার ভীড়—মন প্রথম থেকেই খুশী ছিল। গলাও ছিল পরিষ্কার। গান ধরতে নিজের কানেই ভাল শোনাল। ফলে দেখতে দেখতে চারিদিকের গুঞ্জরণ থেমে গেল—আসরের এমন অবস্থা হল যে সেই প্রবাদবাক্যের মতোই একটি ছুঁচ পড়লেও তার শব্দ শোনা যায়।

এইবার ধীরে সুস্থে চারিদিকে তাকাবার অবসর মিলল। গাইতে গাইতে এটা অভ্যাস হয়ে যায়, গানের কোনরকম ক্ষতি না করেই ঘর বাড়ি চারিদিকের মানুষ সব লক্ষ্য করা যায়। দেখতে দেখতে চোখটা রাজাবাহাদুরের দিকে একটু বিশেষভাবে পড়বে সেও স্বাভাবিক। দেখল ফিট গৌরবর্ণ, সুপুরুষ প্রৌঢ় ব্যক্তি। বয়স হয়ত পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশ হবে—কিম্বা দু' এক বছর এদিক ওদিক কম বা বেশী। কিন্তু বয়সে প্রৌঢ় কি যুবা—সে মুখের দিকে মানুষটার দিকে চেয়ে কিছুই মনে থাকে না। অন্ততঃ সুরবালার মনে রইল না। সুপুরুষ বললেও কিছু বোঝানো যায় না। সুন্দর পুরুষ। অতি সুন্দর। সে যে গান গায়—সেই গানে শ্রীরাধা বা শ্রীকৃষ্ণ কেউই পরস্পরের চেহারার কোন নিখুঁৎ হিসেব করা বর্ণনা দিতে পারেন নি—মনের আবেগ-বিহ্বলতায় যেন সব হিসেব সব তথ্য গোলমাল হয়ে গেছে কবির লেখনীতে। আজ এই মুহূর্তে সুরবালা ব্যাপারটা বুঝল। মোম দিয়ে পাকানো গোঁফ, কফ দেওয়া শার্টের ওপর কুঁচনো চুনোটকরা চাদর—মনোহর কোন নবযুবকের বেশ নয়। মেয়েদের মন ভুলনোর জন্যে ছেলেছোকরারা যেভাবে কাপড় জামা পরে—সে দিকেও যাননি। সাধারণ সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের মতোই সাজসজ্জা। এমন কি গায়ের জামাটাও রেশমের নয়। ধুতিখানা ফরাসডাঙারই হয়ত—কিন্তু আশ্চর্য এমন কিছু মূল্যবান কাপড় নয়, নেহাৎই সাধারণ।

ছোকরা সাজার চেষ্টা কোথাও নেই। বয়স গোপন করারও না। তাহলে বোধহয় নাতির ভাতে এত উৎসব সমারোহ করতেন না, নিজের পিতামহত্ব প্রচার করতেন না। শান্ত গম্ভীর মুখ, গম্ভীর কিন্তু উদ্ধত বা কঠোর নয়। সে মুখ বিশেষ সে চোখের দিকে চেয়ে ভয় করে না—কোথায় যেন একটা আশ্বাস বা অভয় পাওয়া যায়। তার কারণ ওঁর দৃষ্টি। চোখের চাউনিতে এমন একটি উদার প্রসন্নতা আছে যে দেখামাত্র নিমেষে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়।

মুগ্ধ হল সুরবালাও। সেদিক থেকে চোখ ফেরাতে পারল না। ফেরাবার ইচ্ছা শুধু নয়—শক্তিও রইল না। কী গাইছে, কোন পালা তাও যেন খেয়াল রইল না, নিতান্ত অভ্যাসেই গেয়ে যেতে লাগল; অনেকদিনের গাওয়া গান—আপনিই এক পংক্তির পর আর এক পংক্তি মুখে এসে যায়, আখরসুদ্ধ, কোন প্রয়াস না করলেও চলে তাই গাইতে পারছিল, বাইরের কোন লোক কোন ত্রুটি ধরতে পারছিল না। তার তখন অন্য সব গানের কথা মনে পড়ছে। "নাহি জানিনু সোহি পুরুষ কি নারী, নয়ানে লাগল রূপ হামারি।" ইচ্ছে করছে গাইতে—"আঁখি আঁখি লাগি রহল, পলক পড়ল না, পড়ল না!" অর্থাৎ ইচ্ছে করছে গোষ্ঠ নয়, সোজাসুজি পূর্বরাগই গাইতে।

ফলে, যে প্রভাত সদ্য ফোটা সুগন্ধি ফুলের মতো আজ তার জীবনে উন্মীলিত হয়েছিল, সেই প্রভাতটিই তেজস্কর সুরার মতো এক সকলচৈতন্য একাকার করা তীব্র নেশায় আচ্ছন্ন করল ওকে। যূথিকার গন্ধ মহুয়ার গন্ধে রূপান্তরিত হল। সকালের এই উজ্জ্বল বেলা, চারিদিকের ঝাড়ে ঝোলানো সহস্র আলোর শিখার সঙ্গে মিশে, ঝালরে ঝোলানো বেল জুঁই মল্লিকার গন্ধের সঙ্গে ধূপধুনোর কৃত্রিম গন্ধ মিলে—সবটা যেন কেমন অবাস্তব দিবাস্বপ্নের মতো মনে হতে লাগল। হঠাৎ মনে হল—এই মানুষটির জন্যেই তার এত দিনের গান গাওয়া গান শেখা—সঙ্গীতের সাধনা, তবু পরিপূর্ণ শক্তি ও সামর্থ্য দিয়ে গান শোনানোরও ক্ষমতা আজ যেন আর তার নেই, সে শক্তি সে শিক্ষা গেছে হারিয়ে;

* নিত্যপাঠ্য তিনখানি গ্রন্থ *

সারদা-রামকৃষ্ণ

—সন্ন্যাসিনী শ্রীদুর্গামাতা রচিত—

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের জনৈক সন্ন্যাসী লিখিয়াছেন :—পড়িতে পড়িতে তন্ময় হইয়া শ্রীশ্রীমায়ের ও শ্রীশ্রীঠাকুরের যেন জীবন্ত স্পর্শ অনুভব করিয়াছি।

যুগান্তর :—সর্বাঙ্গসুন্দর জীবনচরিত...... গ্রন্থখানি সর্বপ্রকারে উৎকৃষ্ট হইয়াছে ॥

সপ্তমবার মুদ্রিত হইল—৮.

গৌরীমা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যার অপূর্ব জীবনচরিত

আনন্দবাজার পত্রিকা :—ইঁহারা জাতির ভাগে শতাব্দীর ইতিহাসে আবির্ভূতা হন ॥

পঞ্চমবার মুদ্রিত হইয়াছে—৫.

সাধনা

বসুমতী : এমন মনোরম স্তোত্রগীত-পুস্তক বাঙ্গালায় আর দেখি নাই ॥

পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ—৪.

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম

২৬ মহারাণী হেমন্তকুমারী স্ট্রীট, কলিকাতা

কী এক মাদকরসে, অজানা এক নেশায় বুঁদ হয়ে উঠেছে সে। গাইছে যে—সে আর কেউ। সে শুধু সুরবালার এতদিনের অভ্যাস, এতদিনের চর্চা—তার সঙ্গে সাধনা শিক্ষা বা ইচ্ছা কোনটারই যোগ নেই আজ।...

তবু বোধকরি শ্রোতারা মুগ্ধই হল। ঘন ঘন বাহবায় বলিহারি শব্দে আর হরি-ধ্বনিতে তাই মনে হল। কোন কোন শ্রোতা—বিশেষ শ্রোত্রীরা হয়ত কীর্তন-উলীকে নির্লজ্জ বেহায়া ভাবল কিছুটা, অমন সকলের দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে একদৃষ্টে রাজাবাবুর দিকে চেয়ে থাকায়—দোয়ার বাজনদাররাও হয়ত বিস্মিত হল, কারণ এটা ঠিক সুরবালার স্বভাব নয়, এতদিনের মধ্যে এরকম কোথাও দেখেনি তারা কেউ; অন্য কোন তরুণ যুবাপুরুষ হলেও না হয় কথা ছিল—এক প্রৌঢ়ের মুখে সুরবালার মতো নবযুবতীর আকর্ষণের কিছু থাকতে পারে তা তাদের চিন্তারও অতীত; কিন্তু তবু এত লক্ষ্য করার মতো লোক খুব বেশী ছিল না সে আসরে। ধনী গৃহস্বামীর মুখের দিকে চেয়ে, বেশী করে বিশেষভাবে তাঁকে শোনাবার জন্যেই পেশাদার গায়িকা গান গাইবে—এ এমন একটা কিছু আশ্চর্য ঘটনা কি দুর্লভ দৃশ্য নয়। সাধারণ লোকেও এইটেই আশা করে।

রাজাবাহাদুর কী ভাবলেন তা তাঁর মুখের সেই শান্ত প্রসন্নতায় বোঝা গেল না। তবে তাঁর যাবা অন্তরঙ্গ তারা লক্ষ্য করলে বুঝত যে গান শুনে তিনিও মুগ্ধ হয়েছেন। কারণ তাঁরও দৃষ্টি অন্য কোন দিকে ছিল না—ঐ গায়িকার মুখের দিক ছাড়া। এটা তাঁর পক্ষেও অস্বাভাবিক ঘটনা। অতিথি অভ্যাগতদের দিকে দৃষ্টি রাখা, তারা ঠিকমতো পান জল পাচ্ছে কিনা, সম্মানিত বা আমন্ত্রিত যাঁরা তাঁদের সামনে দিয়ে সাজা কলকে ও হুঁকো ঠিক-মতো ঘুরছে কিনা—অন্যদিন এইদিকেই তাঁর নজর থাকে বেশী। বিশেষ আজ যে দুজন সাহেব শ্রোতা এসেছেন—ব্যবসা সম্পর্কে এঁদের দুজনের সঙ্গেই রাজা-বাহাদুরের খুব অন্তরঙ্গতা, এবং সেই হিসেবে বিশেষ মাননীয় অতিথি। অনেক বাধ্যবাধকতা এঁদের সঙ্গে। গড়গড়া বা পানীয় ইত্যাদি সরবরাহে ভুল না হলেও যেটুকু ব্যক্তিগত মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন সেটুকুও দিতে ভুল হয়ে যাচ্ছে। সব সময় তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়াও হয়ে উঠছে না, দিলেও অযথা বিলম্ব হচ্ছে।

মুগ্ধ যে হয়েছেন রাজাবাবু তা আরও বোঝা গেল পেলা দেবার সময়। কাল পরশু দুদিনই তিনি পেলা দিয়েছেন—জোড়া গিনি নতুন রুমালে বেঁধে। আজও সেই মতো সরকারমশাই একখানা নতুন রুমালে বেঁধে দুটি গিনি রেখে গেছেন এক সময়, তা জেবএও পুরেছেন কামিজের। সাহেবরাও সঙ্গে গিনি এনেছিলেন, কিছুক্ষণ গান শুনে উঠে যাবার সময় অবার্থ লক্ষ্যে একখানা করে ছুঁড়ে দিয়ে চলে গেলেন। কিন্তু রাজাবাবুর যখন পেলা দেবার সময় এল তখন দেখা গেল যে সেই সাধারণ মামুলী পেলা দিতে ঠিক যেন মন উঠল না তাঁর। এগিয়ে গিয়ে জেবএ হাত পুরেও একটু যেন ইতস্তত করলেন, তারপর গলা থেকে তাঁর ভারী মোটা সোনার হার তুলে খুলে সুরবালার হাতে দিলেন।

সুরবালা খুশী হল, খুশী হবারই কথা, সমবেত জনসমুদ্রেও যেন বাহবার ঢেউ ভাঙল রাজাবাবুর এই উদার স্বীকৃতিতে, গুণের এই যথার্থ সমাদরে—কিন্তু কে জানে কেন যে সে লজ্জাতে রাঙা হয়ে উঠল অকস্মাৎ—অকারণেই। এ পেলা যে কপালে ঠেকিয়ে স্বীকার করে নিতে হয়—(এইটেই ধন্যবাদ জানানোর রীতি) তাও ভুলে গেল কয়েক মুহূর্তের জন্য, ঠিক সেই সময়টা খুশীতে লজ্জায় যেন তার দৃষ্টি বুদ্ধি সব ঝাপসা একাকার হয়ে গিছল—যখন মনে পড়ল, শিথিল হাত দুটো তুলে কপালে ঠেকাল, তখন রাজাবাবু আবার পিছন ফিরেছেন, স্বস্থানে ফিরে আসতে।

দেওয়া সম্ভব নয়, নিলে অশোভনই হয়ে পড়ত ব্যাপারটা, সুরবালারও তখন অপমানকর মনে হত সম্মানের এই নিদর্শনটা—তবু বিচিত্র কারণেই সুরবালার এক একবার মনে হতে লাগল এ হার রাজাবাবু তার গলায় পরিয়ে দিলে সে বেশী খুশী হত।

বাড়ি ফেরার আগে মতির কাছে গিয়ে দেখা করে যাওয়া তার চিরদিনের অভ্যাস। মতির যা প্রাপ্য তা ফেরার পথেই চুকিয়ে দিয়ে যায় সে। না দিলেও চলে, ইদানীং আর বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন নেই। মতির দিক থেকে অনেকদিনই চলে গেছে সে সংশয়, সুরোকে ও চিনে নিয়েছে ভাল করেই, এক আধলাও তঞ্চকতা করার মেয়ে নয় সে—সুরবালার মনেও 'মতি কি ভাববে' 'মতি কোন সন্দেহ করবে'—এ ধরনের কোন কুণ্ঠা নেই, তবুও এ পাট চুকিয়েই যায় সে টাটকা টাটকা। কেমন গান হল, কী রকম আসর জমেছিল, কী রকম বাহবা পাওয়া গেল—এটা মতিকে না শোনালে যেন তৃপ্তি হত না। কাউকে শোনানো দরকার। শিল্পীর গরজ এটা। কোন শিল্পীই তার শিল্পকর্ম কোন সমানধর্মী বা বোদ্ধার সঙ্গে আলোচনা করতে না পারলে তৃপ্তি বোধ করে না। যার সে সুযোগ নেই সে নিতান্তই হতভাগ্য। এমন কি ঈর্ষী প্রতিদ্বন্দ্বী কি প্রতিযোগীর কাছে বলতে পারলেও সুখ হয় খানিকটা—অনিষ্ট হতে পারে বা সে বিশ্বাস করবে না জেনেও। সেই কারণেই আরও সুরবালার মতির কাছে ছুটে আসা। বাড়িতে মা আছে একমাত্র—সে এসব রসে বঞ্চিত। গানের কিছুই বোঝে না—বোঝে নগদ কি এল সেই পাওনাটা। কদাচিত কোনদিন নাল্লু এলে তবু একটু গল্প করে বাঁচে। নাল্লু যে কীর্তনের কিছু বোঝে তা নয়—সে শিল্পীর মনটা বোঝে, তার সুখদুঃখ বোঝে, তাই তার কাছে গল্প করেও কিছুটা শান্তি।

ইদানীং মতিকে সবদিন পায় না। এমন হয় যে সুরবালা যখন ফিরল মতি তখন তার মুজরোয় বেরিয়ে গেছে বা তখনও ফেরেনি। সে সব দিনগুলোয় ভারী খারাপ লাগে সুরবালার। আজ সৌভাগ্যক্রমে মতি বাড়ি ছিল। খবর পেয়ে—প্রায় ছুটতে ছুটতে ওপরে উঠল সুরো, 'মাসী আজ কি পেয়েছি দ্যাখো, তোমার গান শেখানো সার্থক হয়েছে। এটা তুমি রাখো—তোমার গুরু দক্ষিণে।'

মতি ওর মুখের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে ওঠে। সুরো যে অনেক পেয়েছে তো নানান জায়গায় গান গেয়ে বিচিত্র পুরস্কার পেয়েছে। গয়না পাওয়াও নতুন নয়। টাকা পেলা গিনি শাড়ি শাল—অনেক পেয়েছে। তবে আজ এমন কি অভাবনীয় জিনিস পেল যে এত খুশি? খুশির এমন চেহারা এর আগে চোখে পড়েনি এটা ঠিক। ওর মুখের দিকেই প্রথম কিছুক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে রইল সে। তখন বেলা চারটে বাজে, তার মানে আড়াইটে পর্যন্ত গানই চলেছে বোধহয়। সে ক্লান্তির ছাপও স্পষ্ট, তবু তারই মধ্যে কী এক নবীন পুলক লুকোনো সুখের আবেশে ঝলমল করছে তার মুখ-খানা, টলমল করছে তার কান্তি। কেন কি উত্তেজনা কে জানে—কিন্তু মনে হচ্ছে ওর সর্বাঙ্গে যেন কে যেন মুঠো মুঠো আবীর মাখিয়ে দিয়েছে—এত লাল। এর সবটাই পরিশ্রম হতে পারে না। ওর কপালে জড়ানো অবিন্যস্ত চুলের প্রান্তে, গালের পাশে যে স্বেদরেখা—বুকে যে ঘন ঘন নিঃশ্বাস তারও যে সবটা পরিশ্রম, এই সিঁড়ি ভেঙে ছুটে আসার ফল—তাও মনে হল না মতির। মনে হল এ উত্তেজনার কোন কারণ ঘটেছে। অভূতপূর্ব কিছু।

সুরবালা মতির এ বিস্ময় লক্ষ্য করেনি। সে নিজের সুখেই মশগুল ছিল। মতির সামনে চটি ছেড়ে বসে জামার নিচে হাত পুরে বুকের কাছ থেকে হারটা বার করে আর এক হাতে মতির

হাওড়া
কুষ্ঠ কুটির
৫২ বৎসরের প্রাচীন এই চিকিৎসাকেন্দ্রে সর্ব-প্রকার চর্মরোগ, বাতরক্ত, অসাড়তা, ফুলা, একজিমা, সোরাইসিস, দুষ্টক্ষত আরোগ্যের জন্য সাক্ষাতে অথবা পত্রে ব্যবস্থা লউন। প্রতিষ্ঠাতা : পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা কবিরাজ ১নং মাধব ঘোষ লেন খুরুট, হাওড়া। শাখা : ৩৬, মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা—৯। ফোন : ৬৭-২৩৫৯

হাতটা জোর করে তুলে ধরে তার মধ্যে গুঁজে দিল। বলল, 'এই নাও মাসী, তোমার রাজাবাবু নিজের গলা থেকে খুলে পেলা দিয়েছেন। টাকা নয়, গিনি নয়—আলাদা গড়ানো নয়, বৌদের গলা থেকে খুলে দেওয়া নয়—খোদ মালিকের গলার হার, নিজে খুলে দিয়েছেন সকলের সামনে!... এবার আর তুমি না বলতে পারবে না!'

বলে যেন উত্তেজনায় উচ্ছ্বাসে, আবেগে, শ্রান্তিতে হাঁপাতে লাগল সে।...

নিজের খুশিতে যথেষ্ট মশগুল ও কিছুটা অপ্রকৃতিস্থ না থাকলে হয়ত এতটা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করত না। অথবা এখনও লক্ষ্য করত যে কয়েক লহমার জন্য মতির মুখখানা কী ভয়ঙ্কর কালো হয়ে গেল। কিন্তু আজ সে সব কিছুই চোখে পড়ল না সুরোর, বরং ছেলেমানুষের মতোই, বাল্যকালের মতোই মতির কোলে মুখটা গুঁজে দিয়ে বলল, 'তুমি খুশি হওনি মাসী?... আর রঘুবাবু কোথায় গেল, তার তো ভাবনায় ঘুম হচ্ছিল না, তাকে বলো মজুরী হিসেবে পুরো আড়াইশো টাকা ধরে দিয়েছেন রাজাবাবু। চাইলে আর কতই বা চাইতুম, বড়জোর দুশো টাকা। এর বেশী তো তোমরাও চাইতে পারো না গো!'

মতিরও বহুদিনের শিক্ষা। আঘাতো সামলে নিতে তার কয়েক মুহূর্তের বেশী সময় লাগেনি। অপমানটা জানতে পারলে অধিকতর আঘাত লাগবে। সে হেসে বলল, 'তবে আর কি, এবার তোর কপাল ফিরল বুঝি দ্যাখ। রাজাবাবুর গাড়ি এসে নিত্য দোরে দাঁড়াবে এবার। শুনেছি ও'র অনেক টাকা, ভাল করে দুয়ে নিতে পারিস তো রাজরাণী। খেটে খেতে হবে না আর জীবনে।...তা হার ছাড়া আমাকে দিচ্ছিস কেন, এ তো আরও তোর কাছে রাখবি যত্ন করে।... গলায় পরিয়ে দিতে পারেনি এই আপসোস? আমিই না হয় পরিয়ে দিচ্ছি আয়। এটা পরেই থাক, রাজারাজড়ার ব্যাভার করা হার—এর আরপয় কত!'

মতি সত্যিই একরকম জোর করে হারটা ওর গলায় পরিয়ে দেয়।

'পোড়া কপাল আমার! অমন কপাল তোমার ফিরুক জন্ম-জন্ম।... ভাল বলতে গেলে মন্দ হয় এদের। আমি কি বলতে গেলুম উনি তার কি মানে ধরলেন। পুরুষমানুষের গলায় বারোমেসে হার, ছিরি নেই, ছন্দ নেই—ভারী পাথরের মতো হার—ও-ই গলায় ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়াবার জন্যে তো আমার প্রাণ ছটফট করছে একেবারে!... বাড়ি না গিয়ে ছুটে এলুম বলে—গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, কখন একখানা পরোটা খেয়ে বেরিয়েছি সেই কোন ভোরে—উনি এলেন এখন রস করতে!'

গজ গজ করতে করতে টাকা কটা গুনে আঁচলে বেঁধে নেমে যায় সুরো।

মতি পিছন থেকে একটু চেষ্টা করেই হাসে, লজ্জাটা যাতে নিচে পর্যন্ত পৌঁছয়।...

কিন্তু সুরোর গাড়ি গলির মোড় পেরনোর আগেই আবার ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে তার মুখ। রাগে দাঁত কিড়মিড় করতে থাকে, 'বুড়োর নির্ঘাৎ ভীমরতি ধরেছে! হিম্বিদীঘ্ঘি জ্ঞান নেই। মানীর মান-মর্য্যাদাও ভুলে গেল এতকাল পরে। সেদিনের ছুঁড়ি—আমাদের ডিঙিয়ে আমাদের অপমান্যি করে তাকে তুই বেশী মজুরী, বেশী পেলা দিস কোন্ আক্কেলে...কাঁচা বয়েস আর চাঁদপানা মুখ দেখে সব ভুল হয়ে গেল! জ্ঞানগম্মি হারিয়ে বসে রইলি! মরণদশা আর কি! সেই যে বলে না—মরণের ভগ্নদশা, মুখে আগুন দিয়ে বাইরে বসা—তাই হয়েছে বুড়োর। জ্যান্তে মুখে নুড়ো জেলে দিতে হয় অমন একচোকো মিন্সের!'

বাড়িতে এসে মায়ের কাছেও করে সুরবালা। হার খুলে দেখায় তাকে। মতিকে যাই বলে আসুক, গলা থেকে হারটা খোলেনি, পরেই ছিল। এখনও মাকে দেখিয়ে আবার গলায় পরে। নিস্তারিণী কিন্তু ঠিক অতটা উচ্ছ্বাসে সায় দিতে পারে না, শেষ অপরাহ্নের ম্লান আলোয় ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে বলে, 'কে জানে বাবা, কেমন রাজা-রাজড়ার গলার হার, যেন ম্যাড়ম্যাড় করছে। নিশ্চয় মরা সোনা—আমি বেশ বলতে পারি!'

সুরবালা রাগ করে উঠে চলে গেল সেখান থেকে। 'ওর মনের তন্ত্রীতে যে-গোপন মধুর সুরটি বেজেছে—সেটির কথা কাউকেই বোঝাতে পারল না সে। তার অনুরণন আর কারও প্রাণেই প্রতিধ্বনি তুলল না। এ যে কী একটা অভাবনীয় সম্মান সেটা তার মায়ের বোঝার ক্ষমতা নেই সাত্য কথা—কিন্তু মাসীও বুঝল না। আশ্চর্য!...

সেই অবস্থাতেই কাপড়চোপড় ছাড়বার চেষ্টা না করেই, অনেকক্ষণ বসে রইল সুরবালা। ঠিক এখনই কিছু করতে ইচ্ছে করছে না তার। স্নানাহারের তোড়জোড় তো নয়ই। ইচ্ছে করছে কোথাও নির্জনে বসে এইমাত্র যে অঘটন ঘটে গেল, তার জীবনে, সেইটে উপলব্ধি করার চেষ্টা করে একটু নিভৃতে বসে মনের মধ্যে ঘটনাটা আদ্যোপান্ত আবার পুনর্গঠিত করার চেষ্টা করে সে। সকালের প্রতিটি মুহূর্ত আবার ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়।

কেন যে অঘটন, কেন যে অভাবনীয়—তা কেউ জেরা করলে তখন বোঝাতে পারত না। এ-আলোড়ন মনের মধ্যে কিসের জন্যে—পাওয়াটা, না দাতা মানুষটা—কী তাকে এমন উত্তেজিত করে তুলেছে, তা তখন নিজেও বুঝতে পারেনি। আসলে এ যে তার জীবনেই একটা বিরাট অঘটন ঘটে গেল—আর সেইটেই যে সে একান্ত মনে অনুভব করতে চায়, বুঝতে চায়, ধারণা করতে চায় মনে মনে, আস্বাদন করতে চায় তার প্রতি বিন্দু রস—সেটুকু বোঝার মতো শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা কোনটাই লাভ হয়নি বলেই তার এই আপাত অর্থহীন আকুলতা।

অবশেষে অনেকক্ষণ পরে—মার তাগাদা ও সহস্র প্রশ্নে বিব্রত ও বিরক্ত হয়ে উঠতেই হল তাকে। প্রশ্ন যে, আজ ওর হল কি? কিছুই তো খেয়ে যায়নি বলতে গেলে সকালে—দুপুরের ভাতও তো কড়কড়িয়ে গেল, পেটে একদানা পড়ল না,—এখনও কি খিদেতেষ্টা বলতে কিছু বোধ হচ্ছে না? ওখান থেকেও একরাশ খাবার এসেছে। সুরোর সঙ্গে কিছু দেননি তাঁরা, দারোয়ানের সঙ্গে ব্রাহ্মণ দিয়ে এক বাঁক—দু'ঝুড়ি খাবার পাঠিয়ে দিয়েছেন। সব গরম, এ-বেলার তৈরি—সেগুলোর বা কি হবে? সুরো কিছু খাবে, না সব বিলানো হবে? না কি কিছু সকালের জন্যে থাকবে? নিস্তারিণীও তো এ-বেলার জন্যে আবার নতুন করে ঝোলভাত রেঁধেছে—সুরবালা কি তাই খাবে এখন? অমন ধুম হয়ে বসে আছে কেন? অত ঘামছেই বা কেন বসে বসে? তেমন গরমও তো নেই। শরীর খারাপ লাগছে না তো? কাপড় ছাড়া থাকলেও না হয় নিস্তারিণী গায়ে হাত দিয়ে দেখতে পারত—ও তো সেই রাজার জাত-ছোঁয়া কাপড়—এখন গায়ে হাত দিলে তাকে আবার কাপড় কাচতে হবে। কী বুঝছে সুরো—ঝিকে পাঠিয়ে কি



মোড়ের ডাক্তারবাবুকে ডাকতে পাঠাবে? না, নান্দুকে খবর দেবে একটা? ইত্যাদি—

তিতিবিরক্ত হয়েই উঠে পড়তে হয় অগত্যা। ওঠা দরকার অবশ্য। সন্ধ্যে উৎরে যাবার পর গায়ে জল ঢাললে হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে যাবার ভয় আছে। গলার জন্যে সর্বদা ওদের সতর্ক থাকতে হয়। কিন্তু কাপড় কেচে গা ধুয়ে এসে আয়নার সামনে বেশ পরিবর্তন করতে গিয়ে আবারও অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। বড় আয়না কিনেছে একটা সম্প্রতি, নান্দুই কিনে দিয়েছে কোন্ সায়েববাড়ি থেকে—জামা পরতে পরতে সেই দর্পণে প্রতিবিম্বিত নিজের দেহের দিকে চেয়ে থাকে আপন মনে।...সত্যিই কি সে ভাল দেখতে? লোকে তাকে সুন্দরী বলে, ছেলে-বেলা থেকেই শুনে আসছে সে—কথাটা কি ঠিক? তাকে দেখে পুরুষ ভুলবে? সে-কোন পুরুষ? ঐ রাজাবাবুর মতো শান্ত-সৌম্য-গম্ভীর বয়স্ক লোকও ভুলবে? কতখানি ভুলবে—কতটা ভোলা সম্ভব পুরুষের পক্ষে?...

নিচে থেকে নিস্তারিণীর কণ্ঠ ভেসে আসে, 'বলি আমি কি সারারাত হাঁড়ি-হেঁসেল নিয়ে বসে থাকব? সারাদিন তো পেহারী গেল, না পারি বসতে, না পারি শুতে—কেবল ঘরবার করে মরছি, তা রাতেও কি একটু সকাল সকাল রেহাই মিলবে না? যা খাবে, খেয়ে নিয়ে অব্যাহতি দিলেই হয়—না খাও তো তাও বলে দাও একটা কথা, যে আমার আর খাবার দরকার নেই, বাতাস খেলেই চলে যাবে আমার মা-দুগ্‌গার মতো। এরপরেও আমার অনেক কাজ পড়ে থাকবে। এখন বাড়ি ফিরে আবার এত কিসের ভাবন তাও তো জানি না—কোন্ রসের নাগর আসবে এখন।''

লজ্জিত সুরবালা তাড়াতাড়ি আঁচলটা গায়ে জড়িয়ে নেমে যায়।

সকল ঋতুতে অপরিবর্তিত ও অপরিহার্য পানীয়

চা

কেনবার সময় 'অলকানন্দার' এই সব বিক্রয় কেন্দ্রে আসবেন

অলকানন্দা টি হাউস

৭, পোলক স্ট্রীট কলিকাতা-১

২, লালবাজার স্ট্রীট কলিকাতা-১

৫৬, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ কলিকাতা-১২

॥ পাইকারী ও খুচরা ক্রেতাদের অন্যতম বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান ॥

খাওয়া সেরে সকাল করেই শুয়ে পড়ে। দিন-রাত্তের মতোই খাওয়া। সন্ধ্যের পর ভাত খেয়ে আর রাত্রে খাবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। ক্লান্তিও বোধহয় অপরিসীম। পরিশ্রম বা সারাদিনের অনাহারই শুধু নয়—মানসিক উত্তেজনাও ক্লান্তির আর একটা কারণ।...তবু শুয়ে পড়লেই কিছু ঘুম আসে না। অথবা ক্লান্ত হয়ে পড়লেই যে ঘুম আসবে তারও কোন অর্থ নেই। সুর-বালাও বহু রাত্রি পর্যন্ত ঘুমোতে পারল না। মার কাজ সারা হল, যথেষ্ট গজগজ করতে করতে ঘরদোর সেরে, খাবার ইত্যাদি গুছিয়ে, দোরে দোরে তালা দিয়ে এক সময় এসে শুয়ে পড়ল সে, একটু পরেই নাক ডাকতে শুরু করল তার ফুরুৎ ফুরুৎ করে। বড় রাস্তায় ছ্যাকড়া গাড়ির শব্দ কমে এল, ফিরিওলার ডাকও। আশপাশের বাড়িতেও ঘরে ঘরে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। স্তিমিত হয়ে এল তাদের মিলিতকণ্ঠের গুঞ্জন। পথ জনবিরল শব্দ-বিরল হয়ে এল, তবু সুরোর চোখে তন্দ্রা নামল না। কেন তা সে জানে না। হয়ত ঘুমোতে পারত না সে। কেবলই মনে হয় আজ অনাস্বাদিত-পূর্ব যে অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে তার, যে অচিন্তিত ঘটনা ঘটে গেছে, ঘুমোলেই তার অভিনবত্ব চলে যাবে, আস্বাদনের বৈচিত্র্য নষ্ট হবে। সকালের সেই প্রথম-দেখা থেকে কী কী ঘটেছিল, পারম্পর্য বজায় রেখে যতবার মনের মধ্যে গুছিয়ে সাজাতে যায়—ততবারই যেন গোলমাল হয়ে যায় সব। আবার নতুন করে শুরু করতে হয় তাই।

তবু বয়সের, স্বাস্থ্যের একটা ধর্ম আছে। সেই চিন্তাস্বপ্নের মধ্যেই ঘুমিয়েও পড়ে এক সময়। কিন্তু চিন্তাটা, জেগে থাকার ইচ্ছাটা প্রবল বলেই বোধহয় ঘুমটা খুব গাঢ় হয় না। স্বপ্নই দেখে বেশী, স্বপ্ন দেখে চমকেও ওঠে মধ্যে মধ্যে। শেষ রাত্রের দিকে দেখে যে ওর বিয়ে হচ্ছে। প্রথমটা খুবই দুঃখ হচ্ছিল, মনে হচ্ছিল এ-বিয়ে হওয়ার চেয়ে মরে যাওয়াই ভাল ছিল তবু কিন্তু শুভদৃষ্টির সময় বরের দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য রকম শান্ত হয়ে গেল তার মন। বরের মোম দিয়ে পাকানো গোঁফ, গায়ে কামিজের ওপর কুঁচনো চাদর—চোখে আশ্চর্য এক উদার প্রসন্নতা।...

সকালে উঠে লজ্জায় স্বপ্নের কথাটা কাউকে বলতে পারল না। অথচ গতদিনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা কারও সঙ্গে আলোচনা না করেও থাকা সম্ভব নয়। আজ তার কেবলই মনে পড়ছে শশীবৌদির কথা। তাঁরা যদি কাছাকাছি থাকতেন, ছুটে গিয়ে তাঁকেই বলত সে সকলের আগে। তিনি বুঝতেন—কী এক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে গেল ওর জীবনে। বুঝতেন, উপদেশ দিতেন। মনকে শান্ত করে দিতেন। তিনি জানেন ওর মনের শান্তির চাবিকাঠি কি। নিচে ভাড়াটের বৌ আছে কিন্তু সে তার সংসার নিয়ে বড়ই ব্যস্ত। তাছাড়া সে বড্ডই গোলা মেয়েছেলে—নিজের স্বামী-পুত্রের বাইরে কোন জগতই তার নেই।

অগত্যা মা। মার তবু এতদিনে মেয়ের কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে কিছু একটা ধারণা হয়েছে—ঝাপ্‌সা-ঝাপ্‌সা গোছের। সকালে দুধ খেতে বসে মাকেই শোনায় সে কালকে কেমন গান হল তার বিবরণ। ও'দের বাড়ি কেমন সাজিয়েছিল, সব টাটকা জুঁই বেল মতিয়ার গোড়ে দিয়ে; সব মালাই নাকি ও'দের নিজস্ব বাগানের, কিনতে হয়নি এক পয়সারও ফুল; ও'দের নাকি মস্তবড় বাগান, একটা গ্রাম বসানো যায় এতবড়; বারো-তেরোজন মালীই আছে মাইনে-করা।...যাই বলো বাপু, এই তো এত জায়গায় যাচ্ছে সুরো গান গাইতে—কত তাবড় তাবড় লোকের বাড়িও তো গেল—রাজা-মহারাজা—অবিশ্যি হ্যাঁ, কলকাতার বাইরে মুজরো সে নেয় না বড় একটা, সঙ্গে অভি-ভাবক হয়ে যাবার তেমন লোক নেই বলে; মতি নেয়—তার বয়স এবং অভিজ্ঞতা অনেক বেশী, তাছাড়া অল্পবয়সের যা ভয় সে-বয়সে মতির সে-ভয়ও ছিল না অত—সে যাক গে, তা কলকাতাতেও তো কম দেখল না—কৈ, এমন সুন্দর রুচি এমন চমৎকার করে বাড়ি সাজানো—আর তো কোথাও চোখে পড়েনি এই এতকালের মধ্যে।

বাড়ি থেকে প্রসঙ্গটা বাড়ির মালিকে কখন চলে আসে, সুরো টের পায় না। সে উৎসাহের সঙ্গেই বলে যায়, 'রাজাবাবুর চেহারাও তেমনি। কী সুন্দর দেখতে কি বলব মা! ধপধপ করছে রঙ, মোটা নয়—তবে পুরুষসই চেহারা—সর্বদিকেই মানান-সই। চোখ মুখ গড়ন কোনটাই খুব অহা-মরি নয়, তবে দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। যেখানে যা সাজে, যা দিলে ঠিক মানায়—বিধেতা যেন ঠিক সেইখানে সেই জিনিসটাই দিয়ে পাঠিয়েছেন। আর কী সুন্দর চাউনিই বা! দেখলেই বোঝা যায়—হ্যাঁ, খানদানী বংশের লোক বটে, রাজা খেতাব সার্থক। আর অত পয়সা তো, এতটুকু দেমাক নেই, একটা শৌখিন জামা পর্যন্ত পরে না। উঠে এসে এই যে এত টাকার জিনিসটা দিয়ে গেল তা একটু হ্যালদোল নেই। অহঙ্কারের অ পর্যন্ত নেই। আসবার সময় জনে জনে সবাইকে জিজ্ঞাসা—কিছু অসুবিধে হয়নি তো। কোন কষ্ট হয়নি তো, খাওয়া হয়েছে তো সকলকার—এইসব! আর কি বিবেচনা আমার জন্যে—তখনই গাড়িতে খাবার তুলে দিচ্ছিল, উনিই তো বারণ করলেন। বললেন, এই তিনটে বেজে গেল—এখন বাড়ি গিয়ে কি আর ঐ ঠাণ্ডা লুচি-তরকারী খাবে। তুমি ও রেখে দাওগে সরকারমশাই, রাত্রে আবার টাটকা সব তৈরি হলে পাঠিয়ে দেব!'

নিজের উৎসাহে ও আনন্দে বকে যাচ্ছিল সুরবালা। অত লক্ষ্য করেনি যে, শুনতে শুনতে অনেকক্ষণ ধরেই নিস্তারিণীর ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসির রেখা ফুটে উঠছে। এবার তার অর্থটা প্রকাশ পেল। সুরবালা একটু থামতেই সে বলে উঠল, 'পোড়ার দশা আর কি! তুই যে দেখছি তার পীরিতে পড়ে গেলি একে-বারে! সকালবেলা উঠে ঠাকুর-দেবতার নাম

চুলোয় গেল—বুড়োর নামই দশকাহন শুরু করলি। অষ্টোত্তর শত নামেও তো কুলোবে না দেখতে পাই। আরে তার কি বয়সের গাছ-পাথর আছে, তার মধ্যে এত রূপ কি দেখলি!...বলি তারই তো নাতির ভাত লো। ছেলে উপযুক্ত না হলে তার আবার ছেলে হয় কি করে? আর রাজা তো ছাই। নামেই লোকে বলে রাজাবাবু, রাজাবাহাদুর। কোম্পানীর খেতাবটেতাব কিছু নেই—কালাই রঘু বলছিল। জমিদারও এমন কিছু বড় নয়। পয়সা ওদের এই এক-পুরুষেই, কারবার করে। ওরা আবার রাজা। ছ্যা।'

সুরবালা ক্ষুণ্ণ হয়ে চুপ করল। আশ্চর্য, ওর কথাটা এরা কেউই বুঝতে পারল না। সুন্দরকে সুন্দর বললেই বুঝি অমনি পীরিতে পড়া হয়ে গেল! মাসী কাল দুম্ করে একটা কথা বলে বসল, 'দ্যাখ্, এবার বুঝি রাজাবাবুর গাড়ি এসে তোর দোরে দাঁড়াতে শুরু করে।'...এরা মানুষের সব আচরণেরই ঐ একটা ব্যাখ্যা ধরে রেখেছে। ওর গান যদি তাঁর সত্যিই ভাল লেগে থাকে, তিনি বকশিস দেবার সময় সেটা আর বকশিস হবে কি—একটু বিশেষ ধরনের বকশিস দিয়ে থাকেন অমনি সঙ্গে সঙ্গে ধরে নিতে হবে যে, ওর চেহারাটাও তাঁর মনে ধরেছে সেইজন্যেই মোটা বকশিস, ওর গানটা কিছু নয়। তাহলে এতকাল কি দেখল মাসী?...আর ওরও যেন খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, ও শুধু পীরিত করবার জন্যেই ছটফটিয়ে বেড়াচ্ছে! যাকে হোক একটা পেলেই হল। মা মুখে আনল কী বলে কথাটা। এই তো এতকাল দেখছে ওকে। পীরিত করার ইচ্ছে থাকলে এতদিন দুপায়ে জড়ো করতে পারত বাঘা বাঘা পুরুষকে।

সুরবালা মনে মনে গজরাতে থাকে।...

বিকেলের দিকে আর থাকতে না পেরে একখানা পাল্‌কী ডাকিয়ে সটান সটান শশীবৌদিদের বাড়ি গেল—কিন্তু গিয়ে দেখল তাঁদের ঘরে তালা বন্ধ। নিচের তলার ভাড়াটেদের কাছে শুনল, ছেলের কল্যাণে বৌদি তারকেশ্বরে গেছেন ধন্না দিতে। অগত্যা ফিরে আসতে হল তখনই—অনালোচিত সেই বিশেষ প্রসঙ্গের গুরুভার বুকে নিয়ে। তবে আজ মন অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছে, চিন্তাটা অন্তর্মুখী হতে পেরেছে বলেই শান্তি। বুঝেছে এসব কথা নিজে নিজে ভাবার অনেক সুখ। যারা বুঝবে না, অনধিকারী—তাদের সঙ্গে এসব কথা আলোচনা না করাই ভাল। সেই কারণেই নানুকেও ডাকতে পাঠাল না, আগে ভেবেছিল একবার ডাকতে পাঠাবে—সেও হয়ত উল্টো বুঝত, ঠাট্টা-তামাশা করত, পাঁচ জায়গায় বলে বেড়াত। মাগো, যদি এসব ঠাট্টা রাজাবাবুর কানে ওঠে! ভাবতেই শরীরে কেমন করে ওঠে।

সেদিন রাত্রেও রাজাবাবুকে স্বপ্ন দেখল। কী সব এলোমেলো স্বপ্ন। সব মনেও রইল না সকাল পর্যন্ত। কিন্তু সেই আসর আর সেই মানুষকে যে বার বার দেখেছে—এটা মনে আছে। এখন যেন লোকটার মুখচোখ আর তেমন পরিষ্কার ভাবতে পারছে না—তবু আদলটা ঠিক আছে।

সেদিনও সকালে গান ছিল এক জায়গায়। ভোর থেকে উঠে আর বিশেষ কিছু ভাববার সময় পায়নি। কিন্তু সেদিন তাড়াতাড়ি গান শেষ করে বেলা দেড়টার মধ্যে বাড়ি ফিরে এল। তারপর খেয়েদেয়ে মাদুর পেতে ঘর অন্ধকার করে শুয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আবার ভাবতে শুরু করল পরশুর কথাটা। দূর ছাই, এত কি ভাববারই বা আছে। সত্যিই তো, সে যেন একটু বাড়াবাড়িই করছে। লোকে যদি পাগল বলে তো দোষ দেবার কিছু নেই। এক আধবুড়ো মিনসে টাকা না দিয়ে এক গাছা হার পেলা দিয়েছে—এই তো!

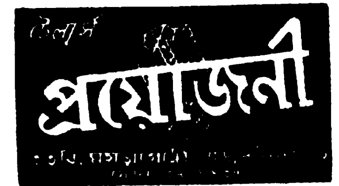
না, তা নয় অবশ্য। সব দিক মিলিয়ে—। এই তো আজকের এরা, বামুন বাড়ি, এরাও যেন কোথাকার জমিদার। কেমন বাড়ি, তেমনি বিশ্রী করে সাজিয়েছে। হোকগে শ্রাদ্ধ বাড়ি, তবু কত তো শ্রাদ্ধ বাড়িও কেমন সুন্দর করে সাজায়! ওরই মধ্যে আর একটু ভাল ব্যবস্থা করলে কি এমন খরচা বেশি হত।...এই প্রসঙ্গেই আবার রাজাবাবুর আসর-সজ্জা এবং শেষ পর্যন্ত তখন মানুষটার চিন্তায় চলে যায় সে—টেরও পায় না। নির্জনে নিভৃতে শুয়ে শুয়ে ভাবতে খুব ভাল লাগল আজ। ভাবতে ভাবতে উদ্বেলিত আবেগে যেন অকস্মাৎ ঘেমে নেয়ে উঠল। এবার মনের কাছে স্বীকার করতে বাধা হল যে আর একটিবার অন্তত দেখতে চায় তাঁকে। কেন? সত্যিই কি তাঁর প্রেমে পড়ল? দূর! তা কেন, এমনি। এমনি কি কোন মানুষকে দেখতে ইচ্ছে করে না? খুব ইচ্ছে করছে সত্যি। মাসি বলেছে, এবার রাজাবাবুর গাড়ি এসে তার দোরে দাঁড়াতে শুরু করবে। রোজ রোজ দাঁড়াবার দরকার নেই, তবে একবার এসে দাঁড়ালে খুশি হত সে। আর একদিন যদি মুজরো পেত ওখানে—! এবার আর লজ্জা করবে না, ভাল করে চেয়ে দেখত, দুটো কথাও কয়ে নিত কোন ছুতোয়।

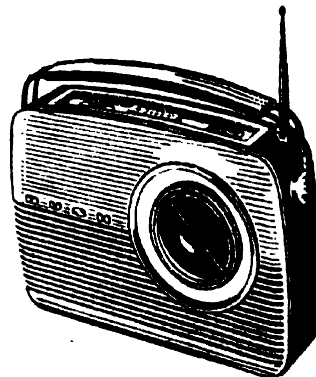
আচ্ছা, এমন তো কত লোকের কত কথা ফলে যায়, হঠাৎই ফলে যায়। বাবা বলতেন, 'ক্যাণে কথা জাগে'। শিব নাকি মধ্যে মধ্যে 'স্বস্তি' 'স্বস্তি' বলে ওঠেন, সেই ক্ষণটিতে যে যা বলে ঠিক ফলে যায়। মাসির কথাটা যদি ফলে তো মন্দ হয় না।...

ভাবতে ভাবতে কখন—ঠিক ঘুম নয়—মা যাকে বলে 'আবিলা' অর্থাৎ একটু আচ্ছন্ন ভাব এসেছে, টের পায়নি। হঠাৎ ঝি এসে গা ঠেলতে একেবারে খেয়াল হল, ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। শুনল, ঝি যেন বলছে 'দিদি, কী যেন আইরিটেসা না কি যেন বাপু, বললে, সেখানকার রাজবাড়ি থেকে পেল্লায় এক গাড়িতে চেপে এক ভদ্দরলোক এসেছেন। সইস বলছে রাজাবাবু। রাজাবাবু নিজে এসেছেন নাকি তোমার সঙ্গে দেখা করতে? মা ডেকে দিতে বললে তোমাকে। আর জিগ্যেস করতে বললে, ওপরের ঘরে এনে কি তেনাকে বসানো হবে?'

মাসি যখন কথাগুলো বলছিল, কে জানে সেই ক্ষণেই ঠিক শিব 'স্বস্তি' শব্দটা উচ্চারণ করেছিলেন কিনা!

সেই আচ্ছন্ন, কাঁচা ঘুমে অবশ চৈতন্যের মধ্যেও এই কথাটাই প্রথম মনে পড়ল সুরবালার। (ক্রমশঃ)




'বুশ' ট্রানজিসটর রেডিও।

অনেক রকমের

রেডিও, রেডিওগ্রাম, রেকর্ড প্লেয়ার, রেকর্ড চেঞ্জার রেকর্ড রিপ্রডিউসর, গ্রামোফোন রেকর্ড, ট্রানজিসটর রেডিও, ও রেডিওগ্রাম, টেপ রেকর্ডার এমপ্লিফায়ার ইত্যাদি নগদ ও কিস্তিতে বিক্রি করা হয়।

মেরামতের সুবন্দোবস্ত আছে

ফোন : ২৪-৪৭১৩

রেডিও এণ্ড ফ্যান্সী ষ্টোরস

৬৫নং গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা—১৩



ব্রজমাধব ভট্টাচার্য

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এতোখানি ভুলে যাওয়া মানুষের স্বভাব নয়। এতোখানি ক্ষমা মানুষের ধমস্তে অবাস্তব। তবু এ-কথা সত্য ডাক্তার সীওর বেলী যা বলছিলেন সত্য বোধ থেকেই বলছিলেন। তার কারণ ফরাসী উপনিবেশ পরিচালনার প্রকৃতি ব্রিটিশ বা ডাচ উপনিবেশের প্রকৃতি থেকে স্বতন্ত্র। ফরাসীরা রং নিয়ে শুচিবাইগ্রস্ত নয়, আদৌ নয়। ওদের প্রাণে, মননে, সংস্কৃতিতে আগাগোড়া ইকোয়ালিটি-ফ্রেটারনিটির ছন্দ ছিলোই। অন্যান্য দেশে ফরাসী বিদ্রোহের বুলি রাজনীতির ফাঁকা আওয়াজ, কিন্তু ফ্রান্সের অন্তর আত্মা থেকে, ফ্রান্সের মহাত্মা মনীষী থেকে এই বাণী জাতির দর্শনের মতো আত্মার অধিকার নিয়ে উদ্‌গীত হয়েছে। তাই এই ফরাসী দ্বীপগুলোয় নিগ্রোরা বেপরোয়া এবং দাস-জীবন নিয়ে ওদের কোনো কম্‌প্লেক্স্ নেই। জেনারেল দ্য গল-কেও আলজিরিয়া নিয়ে বিষম সমস্যায় পড়তে হয়েছিলো, যেমন উইলসনকে পড়তে হয়েছে রোডেশিয়া নিয়ে। ইংরেজ কমপ্লেক্সে ভোগে, সে-কমপ্লেক্স্ শাদা-কালোর, ঠাট-বাটের, বাণিজ্য-বেসাতির। ইংরেজ মানবতায় বদান্য হতে তখনই পাবে যখন পকেটে হাত না পড়ে, আর ডিনার-টেবিলের কায়দায় ফাটল না ধরে। ফরাসী সে-কমপ্লেক্সে ভোগে না। কাজেই আলজেরিয়ার দুরন্ত শ্বেত বিদ্রোহকে দুরন্ততর দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি দমন করলেন। রোডেশিয়া নিয়ে বুড়ো সিংহ লেজে-গোবরে, কারণ ভণ্ডামি দিয়ে বেনেদী স্বার্থ চাপা দেবার ব্যাপারে ইংরেজনন্দন নম্বরী গিরগিটি।

মার্তিনিকে কালো থেকে শাদা রংয়ে যতো রকম স্তর-বিভাগ দেখেছি, কুরাপি তা দেখিনি। কাজেই কী ত্রিনিদাদে কী গুয়ানায়, কী সেন্ট লুসিয়ায়, কী বার্বাডোজে বার্মুদায়,—রং-সমস্যা সমস্যা হয়েই আছে। ধর্মে, কর্মে, রাজনীতিতে, সমাজে, আচারে, ব্যবহারে। ফল সেন্টস আইলগুলোর পুয়োর হোয়াইটসদের অধোবিবর্তনতা, বার্বাডিয়ান রেড-লেগসদের নিদারুণ দৈন্য, গ্রীনাদিয়ানদের দারিদ্র্য বা ওয়েস্ট-ইন্ডিয়ান কৃষ্ণ-ভারতীয়দের হীনচিত্ততা, এক একটি সমস্যা হয়ে রয়েছে। এ-সমস্যা এখনও কায়ুরে মগজে ফাটল ধরাচ্ছে না ঠিক, কিন্তু সমাজ-দেহের বীজ মগজের টিউমারের মতো। শুরুতে বটের বীজ, অবশেষে সর্বনাশ। শিশু-সভ্যতার হাতে আজ যা সাবান-গোলা বুদ্বুদ, একদিন তা ফাটবেই। তখনকার ইতিহাসই হবে ক্যারিবিয়ান সভ্যতার ইতিহাসের গোড়াপত্তন; তার কাছে আজকের ফ্যাকাশে ইতিহাস হয়ে দাঁড়াবে প্রাগৈতিহাসিক হিকড়ি-মিকড়ি।

ডাক্তার বেলার ভাষ্য জোরালো। তিনি বলতে লাগলেন—"যদিও আমি এইসব আগাছা তুলতেই ব্যস্ত, এগুলো মূল ধরেই উপড়ে ফেলতে চাই এই রং নিয়ে বেদনার উচ্ছ্বাস, এই শাদা-কালোর দ্বন্দ্ব! এইসব অমানুষী প্রস্তরযুগীয় গুহামানবিক সমস্যা। বন্য, আরণ্যক, আদিম। আমরা যে স্পেশ যুগে এসে গেছি। মানুষের আত্মার জেরুজালেমেই যীশুখৃস্টের পুনর্ভবতা। সে-সত্যকে স্বীকার না করা পর্যন্ত এই কয়েদী সভ্যতার মুক্তি কই?"

আমি যখন ডাক্তার বেলাকে অনুবাদ করে শোনালাম রবীন্দ্রনাথের দুটি কবিতা: 'আফ্রিকা', আর 'ওরা কাজ করে'—অভিভূত হয়ে গেলেন বৃদ্ধ। কেবল বলতে লাগলেন, "আমি জানি সত্যিকার মানুষ আসবে ঐ গঙ্গার ধারা থেকে, যমুনার ধারা থেকে। যারা গায়ত্রীর মতো মন্ত্র রচনা করতে পারে, বেদান্তের মতো চিন্তাধারায় আত্ম-সমাহিত হতে পারে, তারাই অমৃত। আমাকে হয়তো আপনি ভাবপ্রবণ ভাবলেন। প্রথমত বয়স হয়েছে, দ্বিতীয়ত এ সব কথাও মুক্তি খোঁজে, তৃতীয়ত, পাত্র পাই না। এমনি জোর দিয়েই কথা বলি আমি। আত্মিক উপলব্ধি। য়েনেগুয়েনোর লেখাপড়া আছে? ফরাসী মনীষী? লেভী? ফিথফ জুনোলী? কুমারস্বামী? শপেনহর?—কী বলবেন? ইমোশনাল? না—না। অন্ধকার থেকে আলোয় যেতে হবে। যাতে করে আমি অমৃত হবো না, তা দিয়ে আমার কী কাজ? সত্য, কেবল সত্য, স্থির লক্ষ্য রাখতে হবে। ইমোশন নয়।'

ডাক্তার বেলার বাড়ী থেকে ফিরে সেদিন আর দক্ষিণে যাইনি। দক্ষিণে গেলাম পরের দিন।

আজ আমার চোখ খোলা। আকাশও স্বচ্ছ। আজ চিত্ত কোনো অনুভব-বেদনায় ঝাপসা হয়ে নেই। খোলা চোখে পরিচিত ওয়েস্ট ইন্ডিজের দৈনন্দিন ছবি দেখছি। হঠাৎ মনে হোলো ডাঃ বেলা-জাতের লোকেরা নিগ্রো কেন? কই ওয়েস্ট ইন্ডিজে এমন তত্ত্বজ্ঞানী ভারতীয় দেখেছি বলে মনে পড়ে না তো। ইংরেজদের ওয়েস্ট ইন্ডিজে বিচক্ষণ, মহৎ, বিদ্বান, নিগ্রো দেখেছি। কিন্তু ডাক্তার বেলা দেখিনি। তখনই মনে হোলো এর একটি কারণ আছে। ইংরেজ-অধ্যুষিত অঞ্চলে দাসেরা প্রথম মুক্তি পেলো, চোঁ-চাঁ দৌড় লাগালো। বোধহয় দৌড় লাগিয়ে উপলব্ধি করতে চাইলো সেই অবিশ্বসনীয়তার সত্যতা। এমন দৌড় লাগালো যে গভীর বনে ঢুকে বসে রইলো। আর মুখোর নাম করে না। কতো জারি, কতো জুলুম, কতো ফিকির করলো চিনি-কলের মালিকরা। নাঃ, সব বৃথা। ওরা ফেরে না।...তাতেই তো তখন হংকং থেকে চীনা মজুরের আমদানী, ভারতবর্ষ থেকে কুলী আমদানি। ডাচ-গুয়ানাতে তো অদ্যাবধি 'বুশ-নিগ্রো'রা বাস করছে তোফা নগ্ন প্রকৃতিতে। তাদের সমাজ-সংস্কৃতিধারা সবই স্বতন্ত্র। তাদের পরিবাদ সভ্য-জগৎ নামক ধাপ্পাবাজদের বিরুদ্ধে।

ফরাসী-অধ্যুষিত দ্বীপগুলোয় তা তো হয়-ই নি, উপরন্তু মুক্তি পেয়েও দাসেরা বুঝতেই পারেনি ব্যতিক্রমটা হোলো কি! তারা বুঝলো শরীরের অঙ্গ যেমন মাথা-পা-হাত, তেমনি সমাজের অঙ্গ শাসন-অশন-কর্ম-বাসন। এজন্য শাদাই বা কি, কালোই বা কি! চিনি-কলে কাজ করি, কফি-ক্ষেতে কাজ করি, নুন চাষ করি আর দারুচিনির বাকল ছাড়াই—সোজা কথা কাজ করতেই হবে। ফরাসী শাদারা যেহেতু উন্নাসিক ইংরেজদের মতো ভণ্ডামি নিয়ে কালোদের হ্যাক্-থুঃ করতো না, কাজেই মার্তিনিক, গুয়াদেলুপ, মেরী গ্যালান্তের সমাজের অঙ্গে হাত-পার মতো লেগে রইলো। মাথা না হবার জন্য ওদের দুঃখ এই কারণে নেই যে, ওরা বুঝতো মাথাটাও কতো নির্ভর হাত-পায়ের কাছে। এবং এ-কথা মাথারা বারবার হাতকে মাথায় ঠেকিয়ে প্রণতি জানিয়ে, বুকাকে বুকে ধরে প্রণয় জানিয়ে স্বীকার করেছে।

তবু সমাজটাই যে অর্থ-বৈষম্যের সমাজ। আগাগোড়াই এটা ধাপে ধাপে। সমতল নয়, বোধকরি হবেও না কোনোদিন। সমতলতা প্রকৃতির অপ্রিয়।

তাই বিস্তীর্ণ আখক্ষেতের পর আখ-ক্ষেত পার হতে হতে দেখি পাতার বোনা টুপি মাথায় খচ্চরের গাড়ীতে কাসাভা, কুমড়ো, ডাঙ্গেরীন, ডাব, গ্রেড স্যাটাইন, ক্রিস্টোফীন—নানা ফল-সব্জী নিয়ে ওরা চলেছে শহরের বাজারে; দেখি পর পর মাথায় ঝুড়ি নিয়ে সাঁওতাল মেয়েদের মতো নিগ্রো মেয়েরা চলেছে। মাঝে মাঝে ফুঁদে ফুঁদে গাঁ বস্ত। তার চলে ন্যাংটো ছেলেমেয়েরা বাতাবী লেবু দিয়ে বল খেলছে। একটু খোলামেলা ঘাসের চত্বরে

পড়েছে ত্রিনাটে ত্রিনাটে মারকোল পাতার শিরদাঁড়া; সেই উইকেটে পড়ছে এসে ব্রেড-ফ্রুটের রস-পাকানো বল; আর হাঁকড়াচ্ছে একখণ্ড তক্তা যা কোনো গাছের ডাল দিয়ে। ফরাসী দ্বীপগুলোতে ক্রিকেটের প্রচলন প্রায় অসাধ্যসাধন; তবুও ক্যারিবিয়ানের বাতাসে ওড়ে ক্রিকেটের মঞ্জরী। যখন ছড়িয়ে পড়ে বড়োরা টের না পেলেও কিশোরের রক্তে মাতন ধরায়।

ক্ষেতের পর ক্ষেত। কাজ করছে লোক দলে দলে। কোকাকোলার বিজ্ঞাপন, শেল অয়েলের বিজ্ঞাপন, মাঝে মাঝে সিনেমার প্রাচীরপত্র। লামেন্তীন, দ্যুকো—পরপর মিষ্টি-মধুর শহরদুটো পেরুতেই খানিক পরে এসে গেলো জোলো স্যাঁতানে সমতল। নহর কেটে কেটে জলনিকাশীর ব্যবস্থা। সেইসব নহরভর্তি ফুটে আছে পদ্মফুল, শালুক। আখক্ষেত যেন বিপুলা পৃথ্বীর নিরবধি আস্তরণ।

তারপর এসে গেলো ঢলের পর ঢল বালিয়াড়ী—গাড়ী চলার পথ আছে। পথে অজস্র কাঁকড়া,—নীল, কালো, লাল। অজস্র। বাঁশঝাড়ের তলায় তলায় গর্ত-করা বাসা। বড়ো বড়ো গর্ত দেখা যায়। কাঁকড়া থাকার সুবিধে, সাপ নেই। রিভিয়েরে পিলোতের একটু পুবে পাথুরে একটা বিরাট বিস্তৃতি। এখানেই Morne de Petrefication—প্রস্তরীভূত, শিলীভূত একটা বন। একটিও জীবন্ত গাছ নেই এখানে। পাথরের ফাঁকে ফাঁকে সাগরচিলের বাসা; এধার-ওধার নানাবিধ ক্যাকটাস্। সেলেনিসেরাস্ গ্র্যান্ডি-ফোথাসের রাঙা টকটকে ফুল অনেক হয়ে আছে। বড়ো বড়ো কাঁটাওলা ওপুন্টিয়ার মাথায় হলুদ ফুল। ঢোঙা ঢোঙা বর্লান্ডিয়ানা ক্যাকটাসের ছড়াছড়ি। গায়ে গায়ে বড়ো বড়ো চাঁপাবরণ ফুল। কাছে যাওয়ার উপায় নেই, কারণ? মনসা-জাতের নামই ফণী-মনসা! ও-সব তল্লাটে যমও যায় না। কিন্তু বিচিত্র এ-প্রান্তর। সমুদ্রের তলায় ছিলো একদা এই ভূমিখণ্ড। যখন জল নেমে গেছে কোনো আগ্নেয় কম্পনের ফলে তখন এই বনভূমি ক্রমশঃ শিলীভূত হয়ে গেছে। ফেরার পথে প্রথম দেখলাম পাথরে বস্তিতে কাদার গড়া মোটা দ্যালের এবড়ো-খেবড়ো চৌকো চৌকো ছাদওলা বাড়ী। গরীবদের, আদিবাসী সংকর জাতের গাঁ। সমুদ্রই এদের উপজীবিকা। কিন্তু মনে হোলো এ-দেশের পক্ষে এমন বাড়ীই নৈসর্গিক স্থাপত্য। কাঠ আর করগেট টিনের কোণ-ছাদওলা বাড়ী বৃষ্টির সময়ে শব্দ তোলে হেজায়, গরমে তাতে ভীষণ। কিন্তু য়োরোপ যেখানে গেছে য়োরোপকেই পিঠে বেঁধে নিয়ে গিয়েছে। আনয়োরোপকে ইয়োরোপিত করার পর যা বদানাত্তা করা যায় তা ওরা করবেই। না-চাইলেও সভা-সমিতি ফেঁদে হলেও, জবরদস্তি করেও করবে।

একটি আরও জিনিস দেখে ফিরতে হোলো। সেটি H.M.S. Diamond Rock: ব্রিটিশ নেভীর একমাত্র জাহাজ যা কখনও জলে থেকেও ভাসেওনি, নড়েওনি।—এক ইঞ্চিও নড়েনি!! যেমন ছিলো অষ্টাদশ শতাব্দীতে, তেমনি আজও!!

এক মাইল ব্যাসের একটি গ্রানাইট রক, কবে কোন্ আগ্নেয় উৎপাতে সমুদ্রগর্ভ থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়েছিলো। আসল দ্বীপ থেকে মাইল-দেড়েক দূরে সোজা-খাড়াই নিয়ে উঠে গেছে একটা চাঁই ঢিবি, ওপরটায় কাছিমের খোলার মতো সামান্য একটু ঢল। অনেকে বলে ওটা একটা অতিকায় কুকুর, সাঁতার দিতে দিতে আটকে গেছে। কোনো একটা বিশেষ দিক থেকে দেখলে কুকুরের মুখের মতো দেখায় বটে।

যখন নেপোলিয়নের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ চলছিলো, তখন এ্যাডমিরাল হুড এসে এই সাংঘাতিক রকটি অধিকার করে বসেন। হুডের সঙ্গে ক্যারিবিয়ানের পরিচয় বহুকালের। বেশ ব্যবস্থা-পাতি সঙ্গে নিয়েই এসেছিলেন। ডায়মন্ড রকের আবডালে থেকে মার্তিনীক হুডের আক্রমণকে কাঁচকলা দেখাচ্ছিলো। অবশেষে রাতারাতি জনকয় লস্করকে পাথরের গা বেয়ে ওপরে উঠতে বললেন। তারা উঠে ওপর থেকে দড়ি ফেললো। সেই দড়িতে দড়ির মই লাগিয়ে বহু সৈন্য উঠলো। আশ্চর্য এই যে, অমনি করেই জগদ্দল পাঁচটি কামানও তোলা হয়েছিলো। একশ' কুড়িজন সৈন্য, প্রচুর বারুদ, খাদ্য এবং জল —এক কথায় জাহাজী ব্যবস্থায় হুড অধিকার করলেন ঐ রক। সতেরো মাস ধরে ফরাসী জাহাজ ধ্বংস করেছে তারা। একটি সৈন্যের গায়ে একটি আঁচড় লাগেনি। অবশেষে বিশাল এক ফরাসী নৌ-বাহিনী ওদের ঘিরলো। তখন ওদের জল নেই, বারুদ ফুরিয়েছে। আত্মসমর্পণ করলো। কিন্তু মাত্র দুজন মরেছে, একজন আহত। ফরাসীদের গেছে সেই একটি যুদ্ধে দুখানা বড়ো জাহাজ, একটি ফ্রিগেট, একটি কোর-ভেট, একটি স্কুনার এবং এগারটি গানবোট!

এবার ফেরার পালা। বললাম, যাবার পথে আবার একটিবার লা-পাজেরীতে যাই। সেই নদীর কলতান, পাহাড়ী পথে বাঁশের ছায়া, বন-বাণীর মৃদু-গম্ভীর আলাপন। লা-পাজেরী, জোসেফিনের গাঁ। জোসেফিনের মা বরাবর এখানেই ছিলেন। জোসেফিন সম্রাজ্ঞী হবার পর এসেছিলেন। আবার যাই! ভালো করে একবার দেখে নিই। শহর পালা এবার। মার্তিনীক শেষ।

আমী ট্যাস্কার, বুহার্ণে—দুটি পরি-বার। দূরে ঐ ছোটো টিলার ওপরে গির্জা। নদীর ওপারে ঘন বন, পাহাড়ের ভাঁজে শষ্প-পরিপূর খাদ, সেই খাদের সংবৃত রহস্যকে নিবিড়তর রহস্যে ভরেছে গুহা। সে-সব দিনে এইসব গুহায় থাকতো সিদ্ধ নাগিনী, ডাকিনী, প্রেতিনী। আর সেই মেয়েদুটি হয়তো এধার-ওধার।

খোলা গা, মাথায় টুপি একটা বুড়ো নদীর জলে বসে বসে হাত-ছিপ দিয়ে মাছ ধরছে। আমাদের দেখে টুপি ছুঁয়ে বলে 'নমস্কার।'

আমি হাত নেড়ে জানাই, ফরাসী জানি না।

পিয়েরে হেসে আমার পরিচয় করিয়ে দিতেই ও টপাটপ নিজের মালপত্র ভরে নিলো ঝুড়িতে। ভাঙা ভাঙা ক্রিওল্ পাতোয়া ভাষায় বললো,—নিশ্চয়, নিশ্চয়। ভগবান, ভগবান। ভারতবর্ষের লোক। নিশ্চয় —নিশ্চয়। জোসেফি'য়ের গাই তো এটা। আমার ঠাকুমা তো জোসফিয়ে'র মাকে জানতেন অবধি' চলুন চলুন, সব দেখাবো আমি, আর কেউ দেখাবে না। হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমি,—আঁরি পীলা, আমি দেখাবো। ভগবান, ভগবান"

নড়বড় নড়বড় করতে মশিয়ে পীলা পাহাড়ী পথ বেয়ে উঠতে লাগলো। আমরা পিছু পিছু। জবায় জবায় লাল পথ। ওপারে জেগে আছে আকাশছোঁয়া মেহগনী আর সীডারের ভীড়। লীয়ানার লতা নেমে এসেছে। পাকিয়ে ধরেছে নীচের জঙ্গল।

দেবদারু, তুমি মহাবাণী
দিয়েছো মৌনের বক্ষে স্পন্দন আনি...
যে পতাকা ঊর্ধ্বপানে
তুলেছিলে নিরলস,
বলো কে জানিত তাহা নিরন্তর
যুদ্ধের পতাকা,
সৌম্যকান্তি দিয়ে ঢাকা।...

মাঝে মাঝে আমি আশ্চর্য হয়ে ভাবি এই যে আমাদের কবি এ কি তাঁর ধ্যান-দীপ্ত দৃষ্টির প্রসন্ন জ্যোতিতে ইহকাল-পরকাল, এদেশ-ওদেশ, এ মন ও মন,—সবই দেখেছিলো অচৈতন্য অন্ধকার থেকে অবচেতনের সত্যলোক পর্যন্ত? কোথায় গেছি যেখানে পাই নি? কী দেখেছি যা কবির দৃষ্টিপাতে সঙ্গীতের মাধুরীতে ভরে ওঠেনি?

এ বিস্তীর্ণ প্রান্তরকে গ্রাস করেছে অরণ্যক ক্ষুধার লালায়িত কবল। দিকে দিকে, ভাঁজে ভাঁজে খাঁজে খাঁজে—হাতছানির নিরন্তর লোভ তার আঙুলগুলো ঢুকিয়ে দিয়েছে, খসিয়ে আনছে মানুষের গড়া ইতিহাসের সব আবরণ। এক দুটি ভাই, বিটায়াড অফিসার এই জমি প্রান্তর, পাহাড় কিনেছে। তারা সবদাই যুদ্ধে যুদ্ধে সংগ্রাম করছে এই দানবের হাত থেকে জোসেফিন বুহার্ণের বাল্যস্মৃতি রক্ষা করতে। ডাক্তার রসেট। যে পাথর গড়িয়ে পড়ছে দেয়াল থেকে তাকে আবার তুলে গেঁথে রাখেন; যে শিকড় ঢুকে গেছে প্রাচীরে তাকে কেটে দেন; যে লোভাতুর বন্য আক্রমণ ঢাকা দিয়েছে জোসেফিনের শোবার ঘরের ছাদ তাকে কেটে পরিষ্কার করে বাঁচিয়ে রাখেন স্মৃতি।

আমার আগ্রহে একটি জিনিস দেখালেন ডাক্তার রসেট। জোসেফিনের মা মারা যাবার আগে তাঁর সম্পত্তির একটি ফিরিস্তি রেখে যান। পার্চমেন্টে লেখা সেই ফিরিস্তিখানা। পড়ছি,—

"The year eighteen hundred and seven, and the third of the Emperor Napoleon......The de-

ceased lady, Rose du Verger de Sauvis,......and Mother of Her Majesty the Empress of the French, Queen of Italy......"

পড়তে পড়তে আত্মহারা হয়ে যাই।

জোসেফিনের মা সমৃদ্ধ মহিলা ছিলেন না। বিশেষ কোনো সম্পত্তি ছিলো না তাঁর। অনেকে বলে তাঁর নিজের বহু ক্রীতদাস-দাসী ছিলো বলেই নেপোলিয়ন দাসপ্রথা পুনরায় চালু করে ছিলেন। (রিপাবলিকান বিদ্রোহের আঙ্গিক হিসেবে দাসপ্রথা রোধ হয়ে গিয়েছিলো গণতান্ত্রিক ফ্রান্সে)। দেখা যায় মরার কিছুদিন আগেও পাঁচজন নতুন দাস কিনেছিলেন Rose du Verger; এসব দাস সদ্য সদ্য আফ্রিকা থেকে আমদানী! একটি 'দান' ভারী মজার। ছোট্টো ভাইপোকে দিচ্ছেন ছোট্টো একটি নিগ্রো-বালক আর ছোট্টো একটি ঘোড়া। ওরা বোধহয় একজুটী হয়ে খেলাধুলো করতো। বৃদ্ধা বোধহয় সেই জুটীটা চান নি।

ডাক্তার রসেটের বাড়ীতে আমরা সবাই চিংড়ি এবং কানালু খেলাম। আর খেলাম চমৎকার একটি খাদ্য। গোটা একটি পাম-গাছ কেটে তার ভেতরের শাঁসটা (কলা হলে 'থোড়' বলতাম) যেখান থেকে পাতা বার হয়, ঠিক তার নীচের অংশটা, চিংড়ি দিয়ে রান্না। সুখাদ্য, সন্দেহ নেই; অসুবিধা এই যে গোটা পাম গাছটির মৃত্যু।

জোসেফিন সম্রাজ্ঞী হয়ে আসার পর তাঁর থাকার জন্য বাড়ী হয়ে ছিলো। সে বাড়ীর দ্যাল, আউট হাউসগুলো, ধোবার ঘর, সবই আছে। যেন কঙ্কাল। জানলা দরজা ঝুলে পড়েছে। গাছ-গাছাড়ি জমেছে। একটি ঘরের মেঝেয় একখানা বড় পাথর বাঁধানো। পীঁয়্যা মাথা নেড়ে নেড়ে বোঝায় এইখানে জোসেফিন ভূমিষ্ঠা হয়ে ছিলেন। প্রকাণ্ড একটি বট জাতীয় গাছের শেকড় আষ্টেপৃষ্ঠে পাকিয়ে ধরেছে ঘরখানা।

বাইরে গরু চরছে। ছেলেরা খেলা করছে। পুরাতন চিনির কলের চিমনীটা ছাড়া আর কিছু নেই। কয়েকটি আম গাছে টিয়ার ঝাঁক বসেছে।

পীঁয়্যা বিদায় নিলো গাড়ীর কাছে এসে। পীয়েরে তাকে একটা গোটা বোতল দিতে সে দু-কান জোড়া হাসিতে ভরিয়ে দিলো লা-প্যাজেরীর আকাশ।

বাড়ী ফিরে আর সময় ছিলো না। সন্ধ্যা আটটায় যে প্লেনখানা ছাড়বে তাতে যাবো গুয়েডালুপ। সেখানে কোনো হোটেল নেই। পীয়েরে আমাকে একটা ঠিকানা দিলো। ভদ্রলোকের কারবার নৌকোর।—ইংরেজ পরিবার। তিন পুরুষ গুয়েদালুপে আছে। কোনো কষ্ট হবে না। সমুদ্রের ধারে তার ছোট্টো বাড়ী আছে। সেখানে থাকলেই চলে যাবে। মিস্টার হেনরীর ম্যাকবার্নী।

গুয়েদালুপ

আকাশ থেকে গুয়েদালুপকে দেখায় যেন নীল জলের ওপর অতিকায় একটা প্রজাপতি পাখা মেলে বসেছে। দুটি দ্বীপ। জোড়া আছে একটি প্রণালী দিয়ে, নাম রিভিয়েরে স্যালী। রিভেয়রে স্যালী এখন মাটি চাপা পড়ে ব্রীজ বাঁধা পড়লেও, দুধারের দুটি উপসাগরের নাম গ্রাণ্ড স্যালী গালফ এবং পেটী স্যালী গালফে। প্রজাপতির বুক যদি হয় রিভিয়েরে স্যালী তবে পশ্চিমের পাখাটর নাম 'ছোটো-মাটি' অর্থাৎ Basse Terre এবং পূর্বের পাখাটার নাম মস্তো-মাটি, Grand Terre এরই আরও পশ্চিমে মাইল পাঁচেক দূরে 'দেজিরেদ' লম্বাটে একটা ছোটো দ্বীপ; আর মাইল আষ্টেক দক্ষিণে 'মারী গ্যালান্তে' দ্বীপ প্রায় পঞ্চাশ বর্গমাইল। এছাড়া গুয়েদালুপের সঙ্গী সাত-আটটি তারো দ্বীপ আছে। গুয়েদালুপের উত্তরে মণ্টসেরাট এবং দক্ষিণে ডোমিনিকা বড়ো দ্বীপ। দুটোই ইংরেজদের। ডোমিনিকার কথা পরে বলা যাবে। মার্তিনীক থেকে গুয়েদালুপ যখন এলাম তখন ডোমিনিকার ওপর দিয়েই এসেছিলাম। কিন্তু ফরাসী বিমান, ডোমিনিকায় নামেনি। মণ্টসেরাটের দক্ষিণে এবং গুয়েদালুপের উত্তরে সাগরটির নাম গুয়েদালুপ-প্যাসেজ। এবং দক্ষিণের সাগরটার নাম ডোমিনিকা-প্যাসেজ। এইসব প্যাসেজ-গুলোতে সদা সর্বদাই মেছো ডিঙি ঘোরা ফেরা করছে। সাধারণভাবে স্মাগলিংয়ের সদর কাছারী এইসব দ্বীপগুলো। ইংরেজ ফরাসী ভেদাভেদ থাকার দরুন দ্বীপে দ্বীপে স্মাগলিং জীবিকার্জনের একটা বড়ো উপায়।

পরে আবিষ্কার করেছিলাম হেনরী ম্যাকবার্ণীর কতোখানি প্রতিপত্তি ছিলো এই সব স্মাগলারদের ওপরে। অনেক নৌকোর মালিক ও। জেলেদের নৌকো দিতো দৈনিক ভাড়ায়। এই ছিলো ম্যাকবার্ণির মুখ্য ব্যবসা। নিজের ছিলো একখানা ক্রুইজ-বোট। সৌখীন যাত্রীদের কোষ্টাল দ্বীপে ঘোরাতো; এবং কখনও কখনও বোট-পার্টিতে ভাড়া খাটাতো। বোটখানার নাম 'লিদো'।

আমি যখন যাচ্ছি, তখন ওর বীচ-হাউসের একখানাও খালি ছিলো না। ওর নিজের জন্য তিনখানা ঘরের একটা ক্যাম্প-বাসা ছিলো। তারই একখানা আমার। কোনোই কষ্ট নেই। সমুদ্রের ওপরে খোলা জানলা। টেবিল-চেয়ার, বিছানা; সবসে সেরা এক হ্যামক। স্টোভ, কফীর সরঞ্জাম, ব্যস!

ম্যাকবার্ণী মাই ডিয়ার লোক। মোটা, ঘাড়ে-গর্দানে। খুব ছোটো করে ছাঁটা চুলে পাক ধরেছে। চিবুকের তলায় থোলো থোলো কয়েক থর চর্বির ভাঁজ। কথা বলতে গেলে বোঝা যায় ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিচ্ছে মুখ দিয়েই। নাক প্রায় বন্ধ। সদা-সর্বদা মুখে পাইপ। মোটা মোটা ভ্রূ, দুই রগকে যেন আঁকশি দিয়ে টিপে আছে। ওকে বরাবরই নীল-রংয়ের জিন-কাপড়ে পুরু সেলাই-করা জামা-পাজামা এক-করা নিকার-বুকার ধরনের পোষাকে দেখেছি। হাত-কারিগর, খাটিয়ে, যন্ত্রচালিয়েদের সবারই এই পোষাক। কেবল মাথার টুপিটি খাঁটি ফরাসী প্রথায় একটু তেরছা, সৌখিন এবং পালক গোঁজা। ইংরিজী যা বলতো, থেমে থেমে—একসেণ্ট নেই বললেই চলে। টাইম্‌কে-কে তাইম না বলে পারতো না। রাইস বলতে গিয়ে গাইস্‌ই বলতো।

পয়েণ্ট পিত্রে প্রধান বন্দর। আমাদের আড্ডা একটু দূরে পেটীবুর্গে। "কৃষ্ণাঙ্গী-ধরা" Basse Terre -তেই গুয়াদালুপের বিখ্যাত পাহাড়ী অংশ। লা সুফ্রিয়েরে ৪৮৭০ ফুট, সাঁ-তুষে ৪৮৫৫ ফুট। গুয়াদালুপের রাজধানী Basse-Terre ও Basse-Terre দ্বীপেই।

প্লেন নামে পয়েণ্ট পিত্রে-তেই। পয়েণ্ট পিত্রে থেকে বাস-এ তেরে যাবার পথটা মনোরম। গুয়াদালুপের বেশীর ভাগ বিচিত্র বাহর্দৃশ্য এই পথটাতেই দেখা যায়। মনে হয় কর্তারা ভেবেচিন্তেই পথটাকে এই-ভাবে তৈরি করিয়েছিলেন।

দ্বীপটার নাম কলম্বাস কেন গুয়েদালুপ রেখেছিলেন তার একটা ইতিহাস আছে। Estremadura স্পেনের একটা প্রদেশ। এখানেই গুয়েদালুপে নামে একটা খৃষ্ট-বিহার আছে। কলম্বাস এই দ্বীপটার নাম গুয়েদালুপ রেখে সেই বিহারে প্রতি-শ্রুত অঙ্গীকার পালন করেছিলেন। ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর কলম্বাস এই দ্বীপ আবিষ্কার করেন। তার আগের রোববারে আর একটি দ্বীপ আবিষ্কার করে সেই তিথিটিকে মর্যাদা দেন দ্বীপটির নাম 'ডোমিনিকা' রেখে। গুয়াদালুপ সংলগ্ন মারী গ্যালাণ্টে দ্বীপটির নামকরণ করে ছিলেন তাঁর নিজের জাহাজটির নামে। ১৪৯৩ থেকে ১৬০৪ পর্যন্ত স্পেনীয়রা এই দ্বীপে বসত করতে গিয়ে ক্যারিবদের হাতে নাজেহাল। ক্যারিবরা ছিলো দুর্ধর্ষ বন্য জাত। কিন্তু স্পানীয়রা সরে যাবার পর এলো ফরাসীরা। সেটা ১৬৩৫ খৃষ্টাব্দ। ১৬৩৫ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮১৫ পর্যন্ত ইংরেজ ও ফরাসী গুয়েদালুপ নিয়ে নাগরদোলা খেলেছে। ১৮১৫-তে ভিয়েনা কংগ্রেসে গুয়েদালুপ পাকাপাকি ফরাসী হোলো। কিন্তু ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে এটা ফ্রান্স'ই হয়ে গেলো! ফ্রান্সের অন্যতম প্রদেশ! গুয়েদালুপের প্রত্যেকটি মানুষ ফরাসী!! সেণ্টস্ আইল্যাণ্ডস্, সেণ্ট বার্থলেমী, মারী গ্যালান্তে, সেণ্ট মার্টিন্‌—সবই ফ্রান্স!!

কিন্তু এ-ফরাসীরা ফ্রান্সের ফরাসী থেকে ফরাসীতর। এদের ব্রডকাস্টিং রেডিওতে ধরলে পাকা বৈয়াকরণিক ফরাসী শোনা যাবে, যা স্বয়ং পারীও শোনাতে পারবেন না। যে-অর্থে বারবাডোজ এবং বিশেষ করে বার্মুদা আজও "ইংরেজ", সেই অর্থে গুয়েদালুপ জবরদস্ত ফরাসী।

কিন্তু "প্যারী" যেমন দুনিয়ার তাবৎ গুণী-ধনী-জ্ঞানীজনকে ভোলাবার অধ্যবসায়ে নিজেকে যুগের পর যুগ ধরে সাজিয়েছে, তেমনিই এই দুয়োরাণীর সন্তানদের যুগের পর যুগ অবহেলা অবজ্ঞা করেছে। ফলে এদের বাইরের পোশাক ছেঁড়া-খোঁড়া-নোংরা। পর্যটকদের ভোলায় না। তবে এর আসল চেহারাটা, যা দেখা যায় সেই ছেঁড়া-খোঁড়ার ফাঁকে, এমনই উজ্জ্বল যে হোটেল-বিহীন, পথ-বিহীন, মোটর-বিহীন এই দেশটিতে অনেক সময়ে মনে হয়েছে "এমনটি আর দেখিনি।" ধরা-ছোঁয়ার অতীত মাধুরীর স্বাদ পাওয়া যায়।

ম্যাকবার্নিবা মহাখুশী দা-গ্যল সম্প্রতি ঘুরে গেলেন ফ্রেঞ্চ এ্যান্টিলিস। তার পর থেকে গুয়েদালুপে হোটেল-ব্যবসা হবার কথা শুধু চলছে তাই নয়,—এডমণ্ড রথস্‌চাইল্ডস্ এবং ল্যারান্স রকফেলারের মতো কুবের-বন্ধবা গুয়েদালুপ এবং সেন্ট বার্থোলমিউর নিরাবরণ সৈকত-ক্রোড় দেখে চঞ্চল হয়ে উঠেছেন, মিয়ামী এবং প্যারো-ডি-জেনেরোর মতো এদেরও আশ্রেকা রুচি-যোগ্য করে তুলবেন। শুনে আমি থ'। গুয়েদালুপও যদি মীয়ামীই হয়ে গেলো, তখন আর গুয়েদালুপে থাকবে কী!

আমি যে কেন খুশী হই না এমন খবরে, কে জানে? বোধ করি মাস্টার বলে, ভারতীয় বলে,—ভারতীয়-মাস্টার বলে! তা ভোগ করার মতো দৃশ্য প্রকৃতি গড়ে রেখেছেন গুয়েদালুপে। সারাই অক্ষত রেখে চকন-সোনা-লিখন-লেখ, সৈকতের প্রান্তে সবুজের ভাঁজে ভাঁজে ঘন-সবুজ রংগীন ছায়া ফেলা রহস্য, পাহাড়ের পর পাহাড়ের গা ঢাকা ট্রপিক্যাল বন; আর সেই বনের গায়ে এলিয়ে পড়ছে নীল জলের ঢেউ; অতলান্তিকের পুবে বাতাস দুলিয়ে দিচ্ছে বনের পাতা। নীচে সমুদ্র কল্লোল; ওপরে বাতাসের শব্দ; দূরে আদিগন্ত বিস্তৃত বালুবেলা। নির্জনতা যাদের প্রিয়, প্রকৃতিকে যারা একান্ত বিলাসিনী রূপে দেখতে ভালোবাসে গুয়েদালুপে, বিশেষ করে Basse Terre তাদের বড়ো ভালো লাগবে। Basse Terre যদি এ প্রকৃতির প্রথম নয়নপাতে মধুময় হয়ে ওঠে, তখন দেজেরেদ কিংবা সেন্ট বার্থোলেমিউতে গেলে পাওয়া যাবে প্রকৃতির স্বহস্তে রচিত একান্ত গোপন বাসর শয্যা, সূর্যকিরণে উদ্ভাসিত, মধুতাপে উত্তপ্ত, পুষ্প-পরাগে সুরভিত, পাখী প্রজাপতিদের চঞ্চল বাস্তুতায় প্রাণবন্ত।

আমার এক এক সময়ে ইচ্ছে হয়েছে সাউথ আফ্রিকার ডক্টর ফেরভুড' কিংবা রোডেশিয়ার ইয়ান স্মিথকে এই সব সিন্ধু-সৈকতে ফেলে দিয়ে দেখি। বড়ো বড়ো সায়েবকে দেখেছি এ দেশের দারুচিনি বর্ণাদের সু-বলয়িত লীলা-ভঙ্গিম দেহমধুর পিপাসায় ডগমগ হয়ে থাকতে। মার্তিনিকের বেলায় যে কথা বলা গেছে। বাকী ফরাসী দ্বীপগুলোর বেলায় ঐ সব কথাই খাটবে। তফাৎটা কেবল মার্তিনিব আর কপাল-কুণ্ডলার। যাঁরা মার্তিনিব চান সেই সব দারুণ পাঠানী সমঝদারেরা যাবেন মার্তিনিকে, যাঁরা কপালকুণ্ডলাকে ভালো-বাসতে চাইবেন, তেমন চিরনবকুমারেরা যাবেন ফরাসী-এণ্টিলিসের অ-প্রখ্যাত, নীরব দরিদ্র, একটেরে দ্বীপগুলোতে।

সকালটায় হঠাৎ আমার মনে হোলো আমি বড়ো ক্লান্ত। নড়তে ইচ্ছে করছে না। সমুদ্রের ওপরে সকালের রোদহীন আকাশ। পূর্বদিকের পাহাড় আর বন পার করে রোদ এখনও জলের ওপরেই পড়েনি। ছোটো-মাপের সমুদ্রের বুকভরা নৌকো। ম্যাক্ তৈরী হচ্ছে ওর নিত্যকার কাজে। বাড়ী থেকে যে পোশাকে এসেছে বদলে নীল পোশাক পরছে। আমাকে শুতে দেখে হেসে বললো, "সেই ভালো। ছুটি মানে পায়ে চরকি বেঁধে ঘুরে মরা, ও আমি দেখতে পারি না। আমি বছর কয়েক আগে ছুটিতে গিয়েছিলুম হনোলুলু। সাতদিন ছিলুম। তার তিন দিন বিছানা থেকে উঠিনি; আর চারদিন পড়েছিলুম বীচের ওপরে।.. অমন ছুটি হয় না।. অন্ততঃ মনে হয় ছুটিটা বড়ো হলে ভালো হোতো. মনে হয় আবার হনলুলু আসবো।... তা নয় মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ছুটি! বাপরে বাপ্। মানুষে পারে। কী খাবে বলো। আমি এখন খাবো।"

সেই খাবার মধ্যে সবচেয়ে অখসেব এই যে শার্ট পরে আর গেঞ্জী গায়ে বিছানায় কাৎ হয়ে বালিশে ভর দিয়ে খেয়েছিলুম। ম্যাকও যেন এইটাই চাইছিলো। বলছিলো,—হ্যাঁ 'বড়ীতেই আছে' এই ভাবটা না হলে আবার ছুটি কী? . আর আমি যদি তেমনি ঢিলেঢালা মেজাজে তোমাকে পৌঁছে দিতে না পারলুম, কেমন অতিথি সৎকার করলুম!"

খেতে খেতেই জিজ্ঞাসা করি গুয়েদা-লুপে দেখার কি আছে?

ম্যাক মুখ ভর্তি রুটি আর বেকন নিয়ে বড়ো বড়ো চোখ করে চাইলো। খাওয়া আর মুখে নিঃশ্বাস নেওয়া যখন একসাথে চলে এবং যখন মুখে ঠাসা মাল দু-গাল ফেটে বেরুতে চায়, তখনকার চেহারা মনে করলে চোখের চাউনিটা আরও স্পষ্ট হবে। উত্তর দিতে সময় নেবে।

আমি নীরবে ডিমের টুকরোটার বুকে ফর্ক গাঁথি। ও আরম্ভ করে দেয় ওর বাকি কথা: "গ্রা-তেরে, উর্বর খুব; মধুর, চিনি ফলায়; মদ চোলায়; ছেলে ভোলায়; বুদ্ধি ঘোলায়; বেস্-তেরে কেবল ওঠো-নামো, চক্কর খাও; বনবাদাড় ঘাঁটো; পাহাড় চড়ো; হাঁপাও; মাঝে মাঝে বলো,—আহা প্রকৃতির কী আদিম উলঙ্গ বর্বর সৌন্দর্য গো! দুটোর মাঝে হিংসের মতো ঘন, থকথকে সবুজ এক নালী জল, গাঁথা আছে দু ব্রীজ দিয়ে; দেখো, বলো,— কে বলবে ফরাসীরা গুয়েদালুপেকে দুয়োরাণী করে রেখেছে। পয়েন্তা-পেত্রেকে শহর বলতে চাও বলো, নরক বলতে চাও বলো, বাজার বলতে চাও বলো, সব চলবে। কবি হও ওপারে দেখো, আকাশের চোখ-নাক যদি সর্দিতে না বোজা থাকে দেখতে পাবে ঘাস ঢাকা লা-শৌফ্রিয়েরে অগ্নিগর্ভ গিরিচূড়া। তবে যদি আমাকে বলো, আমি বলবো, মারো গোলি,—বোসো। পের্গোলা রেন্ডোরাঁর রঙীন ছাতার তলায় জুৎসই হয়ে বোসো। চিকেন-পেত্রেলুৎসী এবং অইন্ডারেন্ ব্রুশের অর্ডার দিয়ে দুটো মার্টিনীকে ডাকো। তা কেউ করে না। ছোটে। সাঁ-এনী ছোট্টো শহরে যায়; চিংড়ির কল দেখে! মাঝে মাঝে লঙ্কার বাগান দেখে আর বলে, অহো কিমাশ্চর্যম্, হৃদয়-বিস্ফারক দৃশ্য! কিন্তু কতদূর যাবে? সাঁ ফ্রাঁসোয়া? বড়ো জোর পন্টে শাতু! সমুদ্দুরের মাঝে ঢিবি ঢিবি রাশ-টাই। তার গায়ে জল আছড়াচ্ছে। কাঁকড়ার ছড়াছড়ি। অক্টোপাস খাবি খাচ্ছে। দেখবে আর বলবে, অহো কিমাশ্চর্যম্! এমন কর্কশ-মধুরী কুত্রাপি পরিলক্ষিত হয় নি! বাজে কথা। যে কোনো পাহাড়ী দ্বীপেই অমন করখলো হামেহাল পাবে। আমাদের স্কটল্যাণ্ডে তো ঝুড়ি ঝুড়ি। তবে সে সব পাথরে বসতে পাবে না সমুদ্র-চিলের উৎপাতে।

বাধা দিয়ে বলি,—"তোমার ওই টুরিস্ট জাহাজে যাত্রী ঘোরাতে ঘোরাতে এ সব কথা বুঝি অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে?"

"আগে বলতাম। কিন্তু মিথ্যে যারা বলে না তারা বুঝতে পারে না একই মিথ্যে বার বার বলতে বলতে মিথ্যে বলার সুখ নষ্ট হয়ে যায়। তাতে আর মিথ্যের স্বাদ থাকে না।"

"তা বটে! হিটলার বলতো জোর গলায় বারংবার মিথ্যে বলতে বলতে মিথ্যেকেই সত্য বলে দাঁড় করানো যায়।"

"ভুল বললে, সত্য পাখা গজিয়ে উড়ে যায়। মিথ্যে চার পায়ে শিং তুলে ল্যাজ পাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বাইবেলে তো তাই বলে। এঞ্জেলের বেলায় পাখা; শয়তানের বেলায় ক্ষুর আর শিং। কেমন? তাই কি-না বলো! নৈলে সত্যকে দাঁড় করানো কার সাধ্য। সত্য আর মিথ্যের তফাতই এই যে বার বার বললে সত্য ধন হতে থাকে; মোটা হতে থাকে; যেমন আমি সত্য। চোয় দেখো; ঘাড়ে গর্দানে মৌলিক সত্য। বারবার বললে মিথ্যেও ফিকে হয়ে যায়। এমন হরদম করে কথাটা তোমাকেই বলছি। নৈলে যাত্রী ফাঁসবার পাঁচডলারী মিথ্যে টেপ রেকর্ড শোনাই, বসি না।"

"বলো শুনি। পাঁচডলারী মাল পেলো না। যেমন বলছিলে--"

"তাতো বটেই। তারপর যাও দেজিরেদ গিয়ে কিঞ্চিৎ কুষ্ঠরোগীদের দেখে ছাড়ো। অসুস্থ মানবকদের কতোই দুঃখ! পিকচার অব ডোরিয়েন গ্রে পড়া আছে? তবে পরে পাথক যদি তুমি লাই মেল, এই না গেলে মেলেই বা ক্ষতি কি ছিলো? পরে সমুদ্দুরের কিনারে প্রশস্ত এবং প্রেমছন্ন সৈকত-জঙ্ঘা। বড়ো খুশী বিচরণ করো

এবং ভাবো হেন বীচিমালা সমাদৃত। শতধৌতা সমুদ্রসৈকত আর দেখিনি।......
...দুঃসহ সমুদ্র ধানুকী ভঙ্গীতে প্রবেশ করেছে পুষ্পবতী ধরণীকে ঋতুগৌরবে ভরে তোলার আগ্রহে। সুবর্ণ-বর্ণিত এই সৈকত-তটের কুমারীত্ব বারবার লাঞ্ছিত পর্যুদস্ত হয়েছে শ্বেতাঙ্গদের লালসায়। এ পাপ, বহু শতাব্দী ধরেই হয়ে আসছে। এখানেই ক্যারিব এবং স্পানিশদের বহু যুদ্ধ হয়ে গেছে; শত শত ক্যারিব কচুকাটা হয়েছে; মুর্খেরা জানতো না সভ্যরা অসভ্যদের দেশে কেন অসভ্যদের থাকতে দেবে? সে কি সম্ভব। বিশেষ তাদের পক্ষে যারা তামাম দুনিয়া সভ্য করতে এগিয়ে এসেছে। স্পেন, ফ্রান্স, ইংলণ্ডের পরম-সজ্জ্য নরক থেকে? অতঃপর এখানেই ইংরেজ-ফরাসীর যুদ্ধ-যুদ্ধ দোলন-খেলন চললো। এতো বিষ, এতো পাপ যে সমুদ্র এ দিকটা একদিন ভুল করে যদি বা পুরো গিলে ফেলেছিলো, পারলো না হজম করতে; আবার এখন উগরে দিয়েছে। ফলে ভাগ্যবান যাত্রীর পুণ্যবলে কখনও কখনও বালির মধ্য থেকে সে কুড়িয়ে পায় চার শতাব্দীর আগের করোটী! তুলে ভাবে এটা সভ্য ফ্রান্সের, না সভ্য স্পেনের, না অসভ্য কারীবের। জীবন্ত অসভ্য কারীবের দাম জীবন্ত সভ্য য়োরোপীয়ের চেয়ে ঢের কম হলেও, মৃত কারীবের করোটীর দাম সভ্য করোটীর দশ গুণ! যাবে নাকি? গোটা চারেক জোগাড় করতে পারো, লাল হয়ে যাবে।

"...তারপরে পথিক চল্লিশ মাইল চলো; এসো বাসেত্তেরেতে, গায়ুয়েদালায়ুপের রাজ-নগরীতে। তা বলে চিনির কলও পাবে, আখের ক্ষেতও পাবে! গুটি সত্তর নদী-ধারায় সিঞ্চিত এই দ্বীপের স্যাভানেতম অংশের সবুজিমা দেখে ধন্য ধন্য বলবে। পথে হয়তো কোথাও সাপে-বেজীর লড়াই দেখবে। সাপটাই মরবে। নিগ্রোদের চিৎকার শুনবে। দোটো নেবে। নিগ্রোরা কেমন সুন্দর-অসভ্যের মতো বিকট উল্লাস করছে। ঠিক এমনটিই আশা করেছিলাম। যদি এটা নিউইয়র্কের মতো কেতা-দুরস্ত হোতো, কিংবা প্যারীর মতো ভণ্ডামি-পোষ্য হোতো, হায় হায়, কী আফশোষই হোতো। এতেকাল ফরাসী আওতায় থেকেও এরা কেমন অবিকল বুনো আছে। ফরাসী ধন্য জাত!

"...গয়াভী নামক শহরটার খ্যাতি নাকি তার ছিমছাম বনেদী পালিশে; যদি ঝোপ-ঝাড় এবং ওলটানো ডাস্টবিনকেও বনেদী ওলটানো বলতে চাও তো সেই ছিমছামই দেখতে দেখতে পৌঁছুবে ইতিহাসের অন্যতম তীর্থস্থান সাঁ-মারীতে। এখানেই যখন কলম্বাস প্রথম আসে কারীবরা ঝাঁক ঝাঁক তীর দিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করেছিলো। এমন রক্তাক্ত অভ্যর্থনা কলম্বাসের সেই প্রথম। বুঝতেই পারছো মাত্র ক' বছরের মধ্যে ভদ্র স্পানিশরা অভদ্রদের মধ্যে কেমন সুনাম কিনেছিলো। দ্বীপ থেকে দ্বীপে সাড়া পড়ে গিয়েছিলো নয়া-আদমীদের ছল-বল-কৌশলের অপকীর্তি। আমি মাঝে মাঝে সাঁ-মারীতে যাই। ওখানকার বালিতে ভুয়োদর্শনের মাহাত্ম্য আছে। কারীব নেই; কিন্তু বালির চরের বুকে কান পাতলে কারীবদের গোমরানি শোনা যায়।......

"ওদিকে তোমার সাঙ্গাৎদের পাবে চন্দননগর আর পণ্ডিশেরীর মাল। স্যামুয়েল ভীরাঘামী, জন বিরুধাশারী, কেনেথ আম্নামানথাড়ু, ভিভিয়ে রাখাল,—এদের ছেঁড়া খোঁড়া কবর পাবে। রুটি গড়ে, দালে ভিজিয়ে খায়। খাবার আগে দু' তিন টুকরো মাটিতে ফেলে মাথায় হাত ঠেকায়। জবরে ভুগলে গাছের ডগায় ঝাণ্ডী বেঁধে, ঢোলক বাজিয়ে, নেচে কুঁদে একটা দুটো মুর্গীর মাথা ছেঁড়ে! মাঝে তো নিগ্রো বিদ্রোহের ঝামেলা গেছিলো। তখনই ওদের আমদানী করা হয়েছিলো।... মাভুবাতে যেও। ওদের কাছে খাতির পাবে। সাঁ-সুদ না দেখে বেসে-তেরেয় পর ত্রর-রিভিয়েরে যেও।... সময় পাও সেণ্টস-আইল্যাণ্ডসে চলে যেও। নৈলে ভ্যালী অব দি ক্যারীবসে গিয়ে পাহাড়ের গায়ে ইকড়ি-মিকড়ি-চাম-চিকড়ি আঁকিড়ি-মাকড়ি দেখবে। জন্তু পাখী এইসব কোঁদা। পর্যটকরা দেখে এবং খাসা প্রত্নতত্ত্ববিদ বনে যায়, অখণ্ড পাঁচ-দশ মিনিটের মতো। গরমজলের প্রস্রবণে অবশ্যই যাবে। স্নানও অবশ্যই করবে। গুর্ভিয়রে গাঁয়ের নাম ঐ জন্যেই। সেখান থেকেই বাস-ডেরের ফোর্ট রিশপান্সীব দুষমন চেহারা দেখতে পাবে। সাঁ-ক্লদ ধরে গিয়ে বাস-তেরের ধনী-পাড়া। অন্য শহর। সদাগরদের বাসা। যাবৎ চিনি-কোকো-তুলো-রবার গুণীরা এখানে হাঁকড়ে বসে আছেন। সাঁ-কুদ থেকে এবার চড়াই।

"...সাফ্রিয়েরে আগ্নেয়গিরিতে চড়ার পথ। রিভেয়ে নোইর রিভিয়ে রুজ পার করে ঘন-বন-সঙ্কুল বিপুল অরণ্য ভেদ করে পথ। সূর্যবিহীন সদা-বর্ষণত্রস্ত এই পথে এক মাথা খারাপ পর্যটক ছাড়া লোভী সওদাগররা পর্যন্ত পা দেয় না। নৈলে তোফা তোফা কাঠ ভর্তি বন। কেউ তাকায়ও না ফিরে। তুমি পর্যটক; তুমি তাকাবে। তবে কি জানো ওই কীটশের ক্রীচার অব অ্যান আওয়ার। আসল গহন গহীন যে বন তা কেউ দেখেনি। পাহাড়ী খাড়গুলো অতি ভয়ানক। চার হাজার নশো ফুট এই গিরিশৃঙ্গটি এখনও টগবগ করে, তবে আঠারোশো তেতাল্লিশের পর আর আগুন ছোড়েনি। তা সেবারে খান কয় শহর মুছে ফেলেছিলো। মানুষ ফের ওই খাবায় ঘর বসত বসিয়েছে। পাহাড়ী সরু পথ ধরে ঘণ্টা দুই চললেই টিকিতে পৌঁছুবে। সেখান থেকে দৃশ্য দেখবে আর বলবে—দুনিয়ার ছাদ, দুনিয়া-ছাদ,—টপ-বু দ্য-ওয়ার্ল্ড! আমি কী অসম্ভব রকম বিরাট রে! জবর দেখা দেখেছি!... দেখো ভাই, দেখো। আমি ও পথে তোমায় নিয়ে যাবো না। আমি নড়জোর আমার ঘোড়াটি দিতে পারি। বন্দুকও একটা। থলে ভর্তি খাবার। তার পর যদি চাও একটা বুড়ো সাথীও দিতে পারি। তবে তার মাথা যে খারাপ তা বোঝা যায়।... কাজেই ভয় নেই। আমি আতিথেয়তা-কেরতা বুঝিনে। আমার রোগ অতি পেরতা! আমাকে আজ বধ চাইলেও পাবে না। ঐ দেখো আমার লোক-জন সব আসতে আরম্ভ হয়েছে। আমি চলি। বুড়ো নিকি-টাইপারকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তারপর যা করো।... উঠবে, না শুয়ে থাকবে?"

আমি হাসতে হাসতে বলি, 'উঠি।'

খাওয়া বেশী হয়ে গিয়েছিলো। বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবছিলুম আর কারুর কথা নয়, ম্যাকবানীর কথা। মোটা থস্‌থসে ঠোঁট। ঘাড়ে-গর্দানে সমান। সমস্ত গা-বুক-হাত যেন কার্পেট বোনানো। অনবরত খাচ্ছে; কথা বলছে। অথচ চলছে চটপট; কাজকর্ম করছে অদ্ভুত ক্ষিপ্রতা-তৎপরতার সঙ্গে। মনে-প্রাণে বিরক্ত বৈরাগী। সংসার, পরিবার, ছেলেমেয়ে সব আছে। গলগল করে আমাকে যা বলে গেলো অমৃত-গরল; গরলই বেশী।

ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছি। বিশ্রী একটা স্বপ্ন দেখছিলাম। সমুদ্রতীর। সারি সারি স্পানিয়ার্ডরা দাঁড়িয়ে। কার্বিবরা ফায়ারিং স্কোয়াড করে কলম্বাস ও তার সঙ্গীদের গুলি করছে। পৃথিবী টলছে। আকাশময় আগুন। ম্যাকবানী কারিব হয়ে গেছে। হুকুম দিচ্ছে। আমি দাঁড়িয়ে আছি কলম্বাসের সঙ্গে হাত-পা বাঁধা। পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছি ম্যাকবানী! ম্যাকবানী!

...গায়ে ধাক্কা লেগেছে। উঠে বসেছি। পাইপটা না নামিয়েই ম্যাকবানী বললো, একটা ফালতু জায়গা পেলাম বন্ধু পেপার-এর মোটরবোটে। ওর দোকান আছে সেণ্টসে। যাবে নাকি? কালই ফেরৎ আসবে। ঘুমুতে পারবে বোটে। হ্যামক আছে।

পেপার সাধারণ ব্যবসায়ী। গ্রসারি আছে। পয়েণ্ট-এ-পিত্রে থেকে মাল নিয়ে চলেছে। ঘণ্টা চারেক লাগবে। বেলা চারটে পাঁচটা আন্দাজ পৌঁছে যাওয়া যাবে।

ছোট্টো জায়গা। বিশেষত্ব হাজারখানেক লোকের মধ্যে প্রায় শ' চারেক আদিম ফরাসী—ব্রিটনী এবং নর্মাণ্ডীর লোক। এদেরই পূর্বপুরুষ ইংলণ্ড দখল করেছিলো। এরা এসেছিলো শুধু নাবিক বলেই। সাগর-পিপাসা এদের রক্তে। টুকটুকে গাল, ঘন নীল চোখ, অপরূপ স্বর্ণবরণ চুল। কেন ভাইকিংদের এ্যাডভেঞ্চারের পাড়া ফুঁড়ে বার হয়ে এসেছে ঝাঁকে ঝাঁকে। পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে এমন দুর্ধর্ষ সমুদ্র-বিদ্ নাবিক জাত নেই।

আমি ভাবিনি বেলা পাঁচটা থেকে ছটার মধ্যে সম্পূর্ণ নতুন একটা আজব দুনিয়া আমি দেখতে পাবো। পরিচিত পৃথিবী এখান থেকে কতদূরে। কবে কোন্ ফরাসী মিশনারী ইন্দোচায়না থেকে সেখানকার বেতে-ঘাসে বোনা বিচিত্র চাউল-ঢাকার টুপী পরে এখানে এসেছিলো। সেই টুপীই এখানকার এই বিষম কড়া রোদে এদের দিয়েছিলো প্রাণধারক ছায়া। শ্যামদেশীয় বাঁশ-বেত-ঘাস-পাতা দিয়ে বানানো হ্যাট কালে কালে শিল্পান্তরিত হয়ে এদের মাথায় এখন কী শোভাই ধারণ করেছে। ছেলেমেয়ে সবাই এই সাভাকো-হ্যাট মাথায় দিয়ে কাজ করে' (ক্রমশঃ)

শিল্পী : ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ



প্রদর্শনী পরিক্রমা

চিত্ররসিক

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পরিচালনার সময় ইংলণ্ডের কর্মক্লান্ত প্রধানমন্ত্রী চার্চিল একদিন তাঁর নাতি-নাতনীদের ঘরে বসে তাদের রঙের বাক্‌স নিয়ে খেলা করতে শুরু করেন। তখন হঠাৎ তিনি আবিষ্কার করলেন যে এই রং তুলি নিয়ে খেলার মধ্যে নৈমিত্তিক অশান্তিকে ভুলিয়ে স্নায়ুকে সহজ করবার একটা উপায় রয়েছে। প্রবীণ বয়সে ছবি আঁকার বাতিক তাঁকে পেয়ে বসল এবং শেষ পর্যন্ত শিল্পী হিসেবে স্বীকৃতিও তিনি পেলেন। অশান্ত মনকে শান্ত করবার জন্যে ডি এইচ লরেন্সও তুলি ধরেছিলেন। আর ঘরের কাছে আমাদের রবীন্দ্রনাথ ত রয়েছেনই। আমেরিকায় এক কৃষকদুহিতা সারাজীবন ক্ষেতখামারের কাজ দেখে অতি প্রবীণ বয়সে অবসর নিয়ে তাঁর শৈশব জীবনে দেখা দৃশ্যাবলীর ছবি এঁকে প্রায় নব্বই বছর বয়সে শিল্পী-খ্যাতি লাভ করেছিলেন। সত্যি ছবি আঁকা শুরু করবার জন্যে অনেক ক্ষেত্রে বয়স বা কোনরকম প্রথাগত শিক্ষালাভের দরকার হয় না। অন্ততঃ এ ধরনের কয়েকজনকে দেখলে তাই মনে হয়। এরূপই আর এক বিস্ময়কর নিদর্শন দেখা গেল গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে।

সুসঙ্গের মহারাজা ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহের জন্ম হয় ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে। জীবনের অধিকাংশ সময়ই তিনি গারো পাহাড়ে বন্য জীবজন্তুর জীবন খুঁটিয়ে দেখেছেন তাঁর বাবা কুমুদচন্দ্রের অনুপ্রেরণায়। স্কুলে পড়বার সময় তিনি ভাল ছবি আঁকতে পারতেন বটে তবে পরবর্তী জীবনে মাঝে মাঝে স্কেচ করা ছাড়া কোনরকম ছবি আঁকার কাজে হাত দেননি। দেশবিভাগের ফলে তাঁকে কলকাতায় চলে আসতে হয় এবং নিজের জমিদারী ও জন্মস্থানের সঙ্গে সম্পর্ক ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসে। এই অবস্থায় নতুন পরিবেশের সঙ্গে প্রবীণ বয়সে খাপ খাওয়ানোর কাজ যে কতখানি দুরূহ তা যাদের এই দুর্ভাগ্য হয়েছে একমাত্র তাঁরাই অনুমান করতে পারেন। এই দুঃসময়ে, প্রায় দশ বছর আগে, তিনি নিজের মানসিক শান্তি আনবার জন্যে হঠাৎ ছবি আঁকায় মন দিলেন। সারাজীবন যা দেখে এসেছেন বা যা দেখতে তাঁর সবচেয়ে ভাল লেগেছে তাকেই প্রায় বিরহী দুষ্মন্তের মত চিত্রপটে রূপ দিতে শুরু করলেন। সুসঙ্গের প্রাকৃতিক দৃশ্য, শিকার, বন্য জীবজন্তু, হাতী-ধরা, গারো পাহাড়ের আদিবাসীদের জীবনযাত্রা, সুসঙ্গের পাখি এবং নিজের পোষা নানা দেশের পাখির ছবি আঁকতে শুরু করলেন। ছোট ছোট ছবি, মিনিয়েচারের মত কিন্তু ছবির স্কেল বড় ছবির মতই। গত দশ বছরের আঁকা ছবির থেকে ১৬খানি ছবি নিয়ে এই প্রদর্শনী সাজানো হয়েছিল।

মানুষের মনে বিগত দিনের স্মৃতি কতখানি নিখুঁত এবং উজ্জ্বলভাবে মুদ্রিত থাকে ছবিগুলি দেখতে দেখতে সে কথাই বার বার মনে হয়। পাহাড়ী ঝর্ণার প্রতিটি পাথর, প্রতিটি জলকণা, হাতীর চলবার বহুরকম ভঙ্গী, বনমহিষের উৎকর্ণ ভাব, শিকারের সন্ধানে বাঘের সন্তর্পণ একাগ্র গতি এই দীর্ঘকাল পরেও শিল্পীর মন থেকে মুছে যায়নি। সবগুলিই মন থেকে আঁকা। প্রদর্শনীর প্রধান আকর্ষণই ছিল কতকগুলি অনবদ্য নিসর্গ দৃশ্য এবং হাতীধরা ও হাতীর পালের বিভিন্ন দৃশ্য। হাতীর স্নান আর খেদার ছবিগুলোর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা থেকে শিল্পীর স্মৃতিশক্তির তারিফ করতে হয়। মাঠেঘাটে চাঁদের আলোয় দেখা হরিণের রূপ, জাঁকরে রাণগ্রামের দৃশ্য, রাঙা খোয়া, সিজুর খরস্রোত প্রভৃতি ছবিগুলি উপস্থাপনের আন্তরিকতায় অনবদ্য হয়েছে। প্রথাগত শিক্ষালাভ না করার ফলে তেলরং ও জলরং একইভাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

শিল্পীঃ ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ



কিন্তু বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই এরজন্যে ছবির কোন ক্ষতি হয়নি। বুনো হাতী ধরার অনেকগুলি দৃশ্যে তাঁর হাতীর চালচলনের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের নিদর্শন দেখা গেল। খেদার একটি ছবি ও একটি অতি ক্ষুদ্র স্কেচ দেখবার মত। রজ্জুবদ্ধ দাঁতাল হাতী এবং সুসঙের রাজাদের হস্তীপৃষ্ঠে ভ্রমণ ও হাতীর পালের স্নান মনে রাখার মত ছবি।

গারো পাহাড়ের আদিবাসী জীবনের দৈনন্দিন দৃশ্যও একই অনুরাগের সঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে। দেহাকৃতি অঙ্কনের হাত যদিও জীবজন্তুর ছবির মত তত উৎকৃষ্ট নয় তবু হাজং মেয়েদের মাছ ধরা, গারোদের যৌথ মাছ ধরা এবং টোটা দিয়ে মাছ ধরার দৃশ্যগুলি সুন্দর লাগল। দোয়েল, শ্যামা, কাকাতুয়া প্রভৃতি পাখীর ছবির নিখুঁত বর্ণনা কতকটা প্রাচীন মিনিয়েচারের ভঙ্গীতে আঁকা। শিল্পীর আন্তরিকতার গুণে প্রদর্শনীটি দীর্ঘকাল মনে রাখার মত হয়েছিল। ছবি আঁকা ছাড়া সুসঙের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন নিয়ে 'চোঙ্গিং টাইমস্' নামে একটি বইও তিনি ভারতীয় নৃতত্ত্ব বিভাগ থেকে প্রকাশ করেছেন। মহারাজা বীরেন্দ্র চন্দ্রকে পরিপূর্ণমাত্রায় রিজিওনাল আর্টিস্ট বললে অত্যুক্তি হবে না।

●

১৭ থেকে ২৪ ফেব্রুয়ারী দক্ষিণের গ্যালারীতে তরুণ শিল্পী অশোক দেবের ২০খানি অয়েলের প্রদর্শনী হয়ে গেল। কোথাও একসপ্রেশানিস্ট ভঙ্গীর তুলি চালান কোথাও বা কিউবিস্ট রীতির প্রয়োগ করা হয়েছে শেষোক্ত রীতির কয়েকটি কাজ মন্দ লাগল না। 'এ ড্রীম আইডিয়া', 'কাস্‌ল', 'মিস্টিক হাউস', 'মুন অ্যান্ড মাইন্ড', 'স্প্রিং' প্রভৃতি কয়েকটি ছবি উল্লেখযোগ্য।

●

শ্রীমতী কমলা ঘোষের ২১খানি ছবির প্রদর্শনী এই সময়ের মধ্যেই অ্যাকাডেমির সামনের ঘরে দেখা গেল। শ্রীমতী ঘোষও কোন শিল্পবিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেননি। তাঁর তৈলচিত্রগুলির মধ্যে সরলতাটাই প্রধানভাবে ফুটে উঠেছে। নিসর্গ দৃশ্য, গ্রামের ছবি এবং সুসজ্জিত কয়েকটি স্টিল লাইফ তিনি উপস্থিত করেছিলেন। মাঝে মাঝে আঙ্গিকের অপরিণতির ফলে তাঁর দুএকটি ছবির রস বাধাপ্রাপ্ত হয়ে থাকলেও অনেক ক্ষেত্রেই সে বাধা তিনি তাঁর স্বতঃস্ফূর্তিভাব গুণে কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন। বাস্তব হাত তাঁর সম্ভাবনাময়। তিনটি স্টিল লাইফ এবং 'ফার ফ্রম দি সিটি', 'ইভনিং গ্লো' এবং 'ওয়েসাইড স্টলস্ অ্যাট নাইট' ছবিগুলি বিশেষভাবে ভাল লাগল।

●

ধর্মতলা স্ট্রীটের ইন্ডিয়ান কলেজ অব আর্ট অ্যান্ড ড্রাফটসম্যানশিপের ছাত্র-ছাত্রীদের বার্ষিক প্রদর্শনী ৫ ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। চিত্র ভাস্কর্য এবং বিজ্ঞাপন শিল্প নিয়ে দুশোর ওপর শিল্পবস্তুর নিদর্শন এ বছর উপস্থিত করা হয়েছিল। চারুকলা বিভাগে রবীন ঘোষের 'অ্যাগনি অব ইয়ুথ', অমর দেবের 'ট্রাপ' এবং প্রদীপকুমার নন্দীর 'দি সাইড অব দি গঙ্গা' উল্লেখযোগ্য ছবি। জলরং-এর কাজের মধ্যে সরল ঘোষ ও বিমল দাসের কাজগুলির কম্পোজিশন ও আলোছায়া বিশেষ ভাল লাগল। ভাস্কর্যের মধ্যে "বিং মাস্টার" কাজটি নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। শরদিন্দু অধিকারীর লিনোকাট বেশ পরিচ্ছন্ন। বিজ্ঞাপনশিল্পের কাজে অনেকগুলি সুপরিকল্পিত নমুনা দেখা গেল ভ্রমণবিষয়ক কয়েকটি পোস্টার বেশ দৃষ্টি আকর্ষণকারী। পরিমল চৌধুরীর "সুইট হার্ট" ও "আনটোল্ড স্টোরীর" কভার ডিজাইনে মৌলিকতা ও মুন্সীয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। প্যাকেজিং-এর কাজগুলিও পরিচ্ছন্ন হয়েছে। প্রদর্শনীর কাজের মোটামুটি স্টান্ডার্ড ভালই লাগল।

শিল্পী সরল ঘোষের একটি
জল রং-এর ছবি



লীনোকাট গ্রাফিক্স
শিল্পীঃ শরদিন্দু অধিকারী



ট্যুরিস্ট ব্যুরোর একটি পোস্টার
শিল্পীঃ শৈলেন সাহা।



পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি

অন্তর্বর্তী নির্বাচন কবে?

মহেন্দ্র চক্রবর্তী

রাষ্ট্রপতির শাসন চালু হবার কয়েক-দিনের মধ্যেই একজন ডিভিশনাল কমিশনার রাজ্যপালকে তাঁর বক্তব্য জানিয়ে দিয়েছেন, 'আসছে ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া সম্ভব।' এটা বলা বাহুল্য, বিভিন্ন বিভাগের উচ্চপদস্থ অফিসারের মতামত জানবার পর রাজ্যপাল দিল্লীর নিকট তাঁর সুপারিশ পাঠাবেন।

এ-কথা আজ পরিষ্কার হয়ে উঠেছে যে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মতই কেন্দ্রের কংগ্রেসী সরকার বিশেষভাবে চাইছেন, যত শীঘ্র সম্ভব জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়। নচেৎ ভারত সরকারকে সর্বদিক থেকে যে-ঝুঁকি নিতে হবে, তা বিপদের সূচনা করতে পারে। সাধারণ মানুষের রাগ বা আক্রোশ ক্রমে ক্রমে দেখা যাবে রাজনৈতিক পার্টিগুলির ওপর থেকে সরে গিয়ে কেন্দ্রের ঘাড়ে পড়ছে। এবং তাতে যে অসহনীয় অবস্থা দেখা যাবে, তার ধাক্কা সামলানো কেন্দ্রের কংগ্রেসী সরকারের পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে।

উক্ত ডিভিশনাল কমিশনার নাকি তাঁর রিপোর্টে এ-কথাও বলেছেন, নির্বাচনের ব্যবস্থা করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটা স্থায়ী বিভাগ আছে। এবং এই বিভাগ যথারীতি তাদের কাজ সম্পাদনা করে চলেছেন। অতএব ফেব্রুয়ারী মাসে যদি নির্বাচনের ব্যবস্থা করার নির্দেশ আসে, তবে তা বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি করবে না। বিশেষ করে জেলাগুলিতে নির্বাচন বিষয়ে তদারক করে থাকেন জেলা-শাসকেরা। তিনি তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারেন, জেলা-শাসকেরা এই অতিরিক্ত পরিশ্রমের দায়িত্ব নিতে কোনমতেই কুণ্ঠিত নন।

আর অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে, কংগ্রেস ছাড়া অন্যান্য বড় রাজনৈতিক পার্টিগুলি ইতিমধ্যে জুন-জুলাই-এর মধ্যেই নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করার দাবী জানাতে শুরু করে দিয়েছেন। এ-কথা সত্য, বৃটিশ আমলের কেতাদুরস্ত দু-চারজন অফিসার অবশ্য এ-অবস্থাতেই আর একটা নির্বাচনের ব্যবস্থা করার পক্ষপাতী নন। কিন্তু যখন তাঁদের সামনে প্রশ্ন তুলে ধরা হচ্ছে, সমস্যা-সঙ্কুল এই সীমান্ত রাজ্যে সীমিত অর্থ-বলের সাহায্যে সকল সমস্যার সমাধান সম্ভব কি? তখন দেখা যাচ্ছে, সেই সকল অফিসার কিঞ্চিৎ চিন্তিত হয়ে আমতা আমতা করতে শুরু করে দিচ্ছেন।

আজ আর একটা প্রশ্ন সর্বত্র শোনা যাচ্ছে, অন্তর্বর্তী নির্বাচনের পর কি পশ্চিমবঙ্গে স্থায়ী সরকার সম্ভব? এ-প্রসঙ্গে অ-কম্যুনিস্ট রাজনৈতিক দলগুলির কেউ কেউ বলতে শুরু করেছেন, 'পোলারি-জেশন' না হলে দেশের সর্বনাশ হবে। কম্যুনিস্ট ভাবাপন্ন দলগুলি অবশ্য প্রকাশ্যে এখনও সে-কথা উচ্চারণ করছেন না। তাঁরা এক কর্মসূচীর ভিত্তিতে 'জাতীয়তাবাদী' দলগুলির সঙ্গে কাজ চালিয়ে যেতে চাইছেন। তবে তাঁরাও যে 'পোলারিজেশনে' বিশ্বাস করেন, সারা বিশ্বের কম্যুনিজমের আন্দোলনের ইতিহাসই তার প্রমাণ বহন করে।

ঐ ডিভিশনাল কমিশনার আসন্ন নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী করতে গিয়ে বলেছেন, কংগ্রেসের যে হার্ডকোর আছে, তার সাহায্যে সকল অবস্থাতেই কংগ্রেস পঞ্চাশটা আসন পাবেই, আর বামপন্থী কম্যুনিস্টরা পাবেন ত্রিশটা ও দক্ষিণপন্থী কম্যুনিস্টরা দখল করতে পারবেন আরো দশটা। তিনি মনে করেন, বামপন্থী কম্যুনিস্ট পার্টি এতদিন 'মিডল ক্লাসের' ওপর প্রভাব বিস্তার করে-ছিল, তারা তা এখন আস্তে আস্তে গুটিয়ে নেবার চেষ্টা করছেন। অর্থাৎ আসছে তিন-চার বছরের মধ্যে কলকাতা ও তার পার্শ্ব-বর্তী অঞ্চলে আন্দোলনের চাপটা কিছু কম থাকবে। তারা এখন গ্রামাঞ্চলে পেটে খেতে পায় এমন শ্রেণীর কৃষকদের সঙ্গে গাটছড়া বাঁধার চেষ্টা করছেন। ঐ অফিসার মনে করেন, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার ২৮০টি আসনের মধ্যে কংগ্রেসের পক্ষে ১০০টি আসনের চেয়ে বেশী পাওয়া দুষ্কর হবে। কম্যুনিস্টভাবাপন্ন দলগুলি একত্রে ৮০-৯০টা সীট দখল করবে। তবে প্রাক্তন মুখ্য-মন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় যে-দলে যাবেন, সে-দলও দশ-পনেরোটা আসন পাবে। কারণ, শ্রীমুখোপাধ্যায় সম্পর্কে এখনও জনগণের আস্থা আছে। ঐ অফিসার যে-আশঙ্কার কথা প্রকাশ করেছেন, তা হচ্ছে, দলমতনিরপেক্ষ বিশিষ্ট জনপ্রতিনিধিরা এবার বেশী সংখ্যায় নির্বাচিত হবেন। এবং তাঁদের সংখ্যা এমনকি পঞ্চাশ-ষাটজনও হতে পারে। তার ফলে স্থায়ী সরকার গঠনের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি হবার আশংকা আছে। তিনি আরো মনে করছেন, খুচরো পার্টিগুলির ভবিষ্যৎ নেই।

কংগ্রেস বা কম্যুনিস্ট ছাড়া যে জাতীয় সরকার গঠন করা সম্ভব, তা প্রমাণ দেবার জন্য ইতিমধ্যেই অ-কম্যুনিস্ট দলগুলির অনেক নেতা গোপনে শলাপরামর্শ চালিয়ে যাচ্ছেন।

সেদিন কলকাতার রাজভবনে পশ্চিম-বাংলা সরকারের বিভাগীয় সেক্রেটারীরা পাঞ্জাবের পুরনো রাজ্যপাল সেই শ্রীধর্ম-বীরের দেখা পেয়েছিলেন। পরিষ্কারভাবে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, এখন থেকে মন্ত্রীদের দায়িত্বভার তাঁদের বুঝে নিতে হবে।

অবশ্য কয়েকজন সেক্রেটারী হাসিঠাট্টা করে নিজেদের মধ্যে গল্পগুজব করার সময় বলে বেড়াচ্ছেন, 'আমাদের পাঞ্জাবের মন্ত্রী-দের মত ক্ল্যাম দিতে হবে। আর সাম্চুরি এলাওয়েন্স চাই।' কিন্তু যে-সকল সেক্রেটারী তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে ওয়াকি-বহাল, তাঁদের মুখে চিন্তার রেখা ফুটে উঠেছে। 'এতদিন ধরে জনসাধারণের সঙ্গে তাঁদের সরাসরি কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল না। জনপ্রতিনিধিরা 'সক্ অ্যাবজরভারের' কাজ করতেন। আজ অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সমস্যার জটিলতাও বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।'

রাষ্ট্রপতির শাসন চালু হবার পর থেকে দেখতে দেখতে সেক্রেটারিয়েটে সাধারণ লোকের যাতায়াত কমে কমে আসছে; দৈনন্দিন রুটিন কাজের ব্যাপারে ভিজিটার-দের সাক্ষাতের ধাক্কা থেকে অফিসাররা নিজেদের বাঁচাতে সক্ষম হয়েছেন। তবে কি ধরে নিতে হবে, সাধারণ মানুষের অভাব-অভিযোগ সব রাষ্ট্রপতির শাসন চালু হবার যাদুস্পর্শেই দূর হয়ে গেছে? যদি তা না হয়, তবে অদূরভবিষ্যতে এই সকল পুঞ্জীভূত অভিযোগ একদিন জনজীবনে দাবানলের যে সূচনা করতে পারে, সে সম্পর্কে অভিজ্ঞ সেক্রেটারীরা অবশ্যই চিন্তা করেছেন বা করছেন। তবে এ-কথা সত্য যে, কোন ব্যবস্থা গ্রহণের মধ্য দিয়ে তারা যে জনসাধারণের প্রত্যক্ষ সংযোগের সামনে আসবেন, সে-বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোন সঠিক সিদ্ধান্তে তাঁরা এসে পৌঁছতে পারেননি।

যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বাতিল করা এবং পি ডি এফ কোয়ালিশনের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই দিল্লীকে পরিষ্কারভাবে খবর পাঠানো —এই দুই কাজের মধ্য দিয়ে রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর বড় বড় রাজনৈতিক পার্টিগুলির কাছে কিছুটা বিরাগভাজন হয়ে পড়ে-ছিলেন। আর এই সকল পার্টির কর্মী ও নেতারা মুখে মুখে কথায় কথায় রাজ্যপালের নামে বিষোদ্গার করে চলেছিলেন। তাছাড়া সভা-সমিতির কথা তো বাদই দেওয়া গেলো। কিন্তু যেইমাত্র রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত করা হলো, সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যপাল বোধহয় তাঁর হৃত সুনাম ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় বদ্ধপরিকর হয়ে উঠলেন। এ-কথা অত্যন্ত সত্য যে, পাঞ্জাবে রাজ্যপাল থাকাকালীন মুনাফা ও চোরাকারবারীদের বিরুদ্ধে সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার সংবাদ যখন কল-কাতায় এসে পৌঁছেছিল, তখন এখানে সাধারণ মানুষ তাঁকে সাধুবাদ দিয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের জটিল খাদ্য সমস্যায় ইতি-মধ্যেই শ্রীধর্মবীর কিছুটা চিন্তিত হয়ে উঠেছেন। অন্য কাজে দিল্লীতে গেলেও কেন্দ্রের কর্মকর্তাদের সঙ্গে এ-বিষয়ে তিনি কথা বলে যে আসবেন, সে-বিষয়ে সকলে সুনিশ্চিত। খাদ্য সমস্যা সমাধানে যুক্তফ্রন্ট ইতিমধ্যে এক প্রস্তাবও গ্রহণ করেছেন। এর ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচারের সুবিধা হবে যে, তাঁরা খাদ্যকে রাজনীতির ওপরে স্থান দেন। কিন্তু কংগ্রেস এ-ব্যাপারে চুপ করে বসে আছেন। রাজ-নৈতিক মহল এ-প্রসঙ্গে তাই মনে করছেন, "এটা ভুল স্ট্র্যাটেজি।"



বাংলা ও হিন্দী চিত্রের দুই নায়ক-নায়িকা লোলিতা ও সর্বেন্দু

প্রেক্ষাগৃহ

চিত্র-সমালোচনা :

হংসমিথুন (বাঙলা) : গীতছন্দম্-এর নিবেদন; ৪,২৯৪·৩৩ মিটার দীর্ঘ এবং ১৩ রীলে সম্পূর্ণ; প্রযোজনা : সনাতন মুখোপাধ্যায়; কাহিনী, সংলাপ, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : পার্থপ্রতিম চৌধুরী; সংগীত-পরিচালনা : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

গীতছন্দম্ নিবেদিত "হংসমিথুন" চিত্রের কাহিনীর অকুস্থান হচ্ছে স্কটিশ চার্চ কলেজ কল্পনা করা হয়েছে,—যেখানে সহশিক্ষা বা কো-এডুকেশন চালু আছে। নায়িকা শ্রীচৌধুরী ঐ কলেজের কলা-বিভাগের ছাত্রী। নায়িকার পিতা ব্যারিস্টার সঞ্জয় চৌধুরীর কথা থেকে প্রকাশ, শ্রী চৌধুরী ১৯৫৮ সালের ১লা জুন স্কটিশ চার্চ কলেজের কলাবিভাগের ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হয়েছিল। —ব্যস, কাহিনীর এইটুকুই হচ্ছে বাস্তব পটভূমিকা। —এ ছাড়া সব কিছুই হচ্ছে কল্পনা, নিছক কল্পনা।

ক্লাশে একটি সুশ্রী মেয়েকে দেখতে পেলে বহু ছেলেই তার সঙ্গে ভাব জমাবার চেষ্টা করে থাকে বিভিন্ন পথ ধরে। তার মধ্যে একটি পথ হল—নানা অছিলায় মেয়েটির বিরক্তি উৎপাদন করা। সেই পথ ধরেই "হংসমিথুন"-এর নায়ক দিব্যেন্দু শ্রীর সঙ্গে পরিচিত হয় এবং তাকে সম্পূর্ণভাবে বিস্মিত করে তার বাবা সঞ্জয় চৌধুরীর কাছে আইনের ছাত্ররূপে আলোচনা করতে আসে। তাকে নিজেদের বাড়ীতে দেখে এবং নিজের বাবার সংগে তার আইনবিষয়ক আলোচনা শুনে শ্রী দিব্যেন্দুর দুঃসাহসিকতার সঙ্গে তার বুদ্ধিমত্তা, শিক্ষা সংক্রান্ত জ্ঞান প্রভৃতির তারিফ না করে পারে না। এর পরে দিব্যেন্দু যখন তার কাছে আলাদাভাবে কবুল করে, তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার অভিপ্রায়েই তাকে বহুপ্রকার অসাধ্য সাধন করতে হয়েছে, তখন দিব্যেন্দু শ্রীর মনে রীতিমত রোমাঞ্চ জাগায়। ফলে শ্রী ও দিব্যেন্দু ক্রমেই দু'জনের কাছাকাছি আসতে থাকে—অবাধ হয় তাদের মেলামেশা। শ্রী দিব্যেন্দুকে আবার নতুনরূপে আবিষ্কার করে, যখন এক সন্ধ্যায় তার সন্ধানে বেরিয়ে সে দেখে, স্কটিশ কলেজ ছাত্র পরিষদ পরিচালিত 'অবৈতনিক নৈশ বিদ্যালয়'-এর (কাহিনীর এইখানে আবার একটু বাস্তবের ছোঁয়াচ) সেই হচ্ছে প্রধান শিক্ষক ও পরিচালক। তখন সে ভেবে ওঠে : কেন এত সুন্দর যে মনে হয়। দুজনেই দুজনকে জীবনসাথীরূপে পেতে আগ্রহান্বিত হয়ে ওঠে। কিন্তু দিব্যেন্দু এরই মধ্যে জেনে ফেলেছে, শ্রী ওদের পাল্টি ঘরের মেয়ে হলেও ওদের মধ্যে সামাজিক বিবাহ হবার পথে একটি বিরাট বাধা আছে; সে জানে, তার বাবা উকীল প্রমথ মল্লিক হচ্ছেন শ্রীর বাবা ব্যারিস্টার সঞ্জয় চৌধুরীর চির-প্রতিদ্বন্দ্বী এবং সেই কারণে তিনি কিছুতেই সঞ্জয় চৌধুরীর কাছে তার কন্যাকে বধূরূপে গ্রহণ করবার প্রস্তাব করতে সম্মত হবেন না। অতএব সে শ্রীর কাছে প্রস্তাব করে রেজেস্ট্রী বিবাহের। কিন্তু শ্রী হচ্ছে ধনীকন্যা এবং সে তার নিজের বিবাহ যথারীতি জাঁকজমকের সংগে সম্পন্ন হবে না, এ-কথায় সায় দিতে পারে না। —এর পর দিব্যেন্দুর দাদা বৌদির সাহায্যে ওরা কেমন করে সকল বাধা অতিক্রমের পর মিলিত হল, এই নিয়েই ছবির শেষ অধ্যায়টি রচিত।

"হংসমিথুন" ছবিটিকে একটি পুরো-পুরো স্ল্যাপস্টিক কমেডির আকার দেবার যথেষ্ট সুযোগ ছিল। ছবিটি আরম্ভ করা হয়েছিলও সেইভাবেই। কিন্তু নিতান্ত অনাবশ্যকভাবেই তার সুর পরিবর্তন করেছেন কাহিনীকার পরিচালক নায়ক দিব্যেন্দুর দাদা নবেন্দু ও তার স্ত্রী

সরমার মধ্যে সন্তান-না-হওয়াজনিত বিক্ষোভের পর্বটিকে টেনে এনে। এ-ছাড়া নায়ক-নায়িকার রোমান্সকেও প্রায়ই অত্যন্ত গুরুগম্ভীর রূপ দেওয়া হয়েছে। স্ল্যাপস্টিক ছবির কোনো কোনো পরিস্থিতি অবিশ্বাস্য হলেও এবং চরিত্রগুলির ব্যবহারে কিছুটা বাড়াবাড়ি এবং অস্বাভাবিকতা থাকলেও ক্ষতি হয় না; কিন্তু যদি সেই ছবিতে বাস্তব পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়াস পাওয়া যায়, তাহলে তা' স্ল্যাপস্টিক ছবির ধর্মকে বিনষ্ট করে। বর্তমান ছবির ক্ষেত্রে বারংবার দর্শককে মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে, কাহিনীর নায়ক-নায়িকা এবং তাদের সঙ্গীরা স্কটিশ চার্চ কলেজের ছাত্র-ছাত্রী। সঙ্গে সঙ্গে দর্শকের মনে অতি স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে, কাহিনীটির কলেজ পরিবেশে যে-সব ঘটনা ঘটতে দেখা যায়, তা' সত্যিই কোনো সহশিক্ষাদায়ক কলেজে ঘটে কিনা। এবং যদি ঘটে, তা'হলে সে-কলেজে সভ্যতা ভব্যতা সংক্রান্ত আইন-কানুন কি অনুপস্থিত? এই সঙ্গে আদালতে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী আইনজীবীর কোনো মোকদ্দমা করতে প্রেম সম্বন্ধে অবান্তর আলোচনা শিষ্টাচারসম্মত কিনা, সে প্রশ্নও করা যেতে পারে। —একটি স্ল্যাপস্টিক কমেডিতে বাস্তবতার ছোঁয়া দিতে গিয়েই এই সব বিপত্তি যে ঘটেছে, সে-কথা বলাই বাহুল্য।

পাত্রপাত্রীদের অভিনয় সম্বন্ধে বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয়, নায়িকা শ্রীর ভূমিকায় অপর্ণা দাশগুপ্তের কথা। প্রতিটি দৃশ্যে তিনি ঠিক যেন পরিস্থিতি অনুযায়ী মেপে অভিনয় করেছেন; যেমন অহেতুক সংযম নেই, তেমনই নেই অতি-অভিনয়। ঠিক যেখানে যেমনটি দরকার, ঠিক তেমনটি করেছেন। তাঁর মতো অল্পবয়স্কা নায়িকার পক্ষে এমন নিখুঁত মনোগ্রাহী অভিনয়-নৈপুণ্য প্রদর্শন আমাদের রীতিমত বিস্মিত ও মুগ্ধ করেছে। শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় নায়ক দিব্যেন্দু বেশে কলেজিয়ানাকে প্রকাশ করেছেন যতখানি, ঠিক ততখানি চরিত্র-সৃষ্টির দিকে অগ্রসর হননি। এবং নায়িকার কাছে তিনি বেশী করে পরাস্ত হয়েছেন চেহারার দিক দিয়ে। ব্যারিস্টার সঞ্জয় চৌধুরী এবং উকীল প্রমথ মল্লিক বেশে যথাক্রমে বিকাশ রায় ও প্রসাদ মুখোপাধ্যায় চূড়ান্ত হাসির রসদ জুগিয়েছেন। নায়কের দাদা নবেন্দুর ভূমিকায় কালী বন্দ্যোপাধ্যায় হাসির ছবির ডাক্তার হিসেবে মনোরম। কিন্তু তিনি ও সবিতা বসু ছেলে না হওয়ার শোকে যা করেছেন, তা নিছক মেলোড্রামা। কলেজ-পড়ুয়া সাতকড়ি মহাপাত্র ও তার জুড়ীর ভূমিকায় রবি ঘোষ এবং অমিয়কান্তি ভাড়ের অভিনয় করেছেন সার্থকভাবে। অপরাপর ভূমিকায় সবিতা বসু (সরমা), জহর রায় ও হরিধন মুখোপাধ্যায় (দুই তরজাওয়ালা), জহর গাঙ্গুলী (দাদু), অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় (অধ্যাপক), দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (অধ্যাপক) প্রভৃতি উল্লেখ্য অভিনয় করেছেন। মূকাভিনেতা যোগেশ দত্ত তাঁর কাজ ভালই করেছেন।

তিন অধ্যায় চিত্রে সুপ্রিয়া দেবী এবং অজয় গঙ্গোপাধ্যায়



ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগে একটি উচ্চমান বজায় রাখবার প্রয়াস দেখা যায়। চিত্রগ্রহণের স্থানে স্থানে ইঙ্গিত-ধর্মিতার পরিচয় আছে। রামানন্দ সেনগুপ্ত কিন্তু বাস্তব পরিবেশে সর্বত্র সূর্যালোককে বশে রাখতে সমর্থ হননি। ছবিটির ছ'খানি গানের মধ্যে "কেন এত সুন্দর যে মনে হয়" (সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়) এবং "আজ কৃষ্ণচূড়ার আবির নিয়ে" (হেমন্ত ও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়) গান দু'খানি হৃদয়গ্রাহী।

"হংসমিথুন" ছবির নায়িকার ভূমিকায় অপর্ণা দাশগুপ্তকে দেখতে চাইবেন সকল চিত্ররসিকই।

পরিশোধ (বাংলা) : ইকনমিক পিকচার্স-এর নিবেদন; ৪,৯৮৪ মিটার দীর্ঘ এবং ১৪ রীলে সম্পূর্ণ: পরিচালনা : অর্ধেন্দু সেন; কাহিনী : বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়; চিত্রনাট্য : মনোজ ভট্টাচার্য।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় রচিত কাহিনীটি অবলম্বন করে যেভাবে ইকনমিক পিকচার্স-এর দ্বিতীয় নিবেদন 'পরিশোধ'

৩য় সপ্তাহ! হাসি-গানে সারা শহর মাতিয়ে তুলেছে!



প্রত্যহ ৩, ৬, ৯ রূপবাণী : ভারতী : অরুণা
এবং শহরতলীর অন্যান্য চিত্রগৃহে ॥ মিতালী পরিবেশনা

ছবিখানি গড়ে উঠেছে, তাতে বিশেষ করে ধরা পড়েছে চিত্রনাট্যের দুর্বলতা। যে-কাহিনীর ভিতরে পিতার পাপের জন্যে সন্তানকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়, সেই বিশেষ ধরনের কাহিনীকে ছবির পর্দায় কি ভাবে বিবৃত করা উচিত, সেই টেকনিকটি কি চিত্রনাট্যকার, কি পরিচালক, কারুরই আয়ত্তে না থাকায় যে-কাহিনীর চিত্ররূপে দর্শককে ক্রমবর্ধমান কৌতূহলপীড়িত হয়ে রুদ্ধ-নিশ্বাসে দেখতে হত, তাই হয়ে পড়েছে বহুলাংশে ক্লান্তি ও বিরক্তি উৎপাদনকারী এবং নিতান্ত গতানুগতিক। একদা-সমৃদ্ধ এবং বর্তমানে বিত্তহীন দারুকেশ স্থানীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকতাপদে নিযুক্ত করবার পর্বটি কয়েকটি এক মিনিট বা দেড় মিনিট স্থায়ী দৃশ্যের সাহায্যে চিত্রায়িত করার ব্যাপারটিকে নজীর হিসেবে উপস্থাপিত করা যায়। একেবারে শেষভাগে, যেখানে পরলোকগত দারুকেশ লাহিড়ী কীর্তিকলাপ কতকগুলি অর্ধদগ্ধ চিঠিপত্রের মাধ্যমে তার সন্তান এবং ছবির নায়ক প্রশান্তর কাছে ধরা পড়ল, তখন থেকে দর্শকচিত্তে কিছুটা আগ্রহের সৃষ্টি হয়। কিন্তু আবার যেভাবে নায়ক-নায়িকার মিলন ঘটিয়ে ছবিতে পরিসমাপ্তি টানা হয়েছে, তা রীতিমত হাস্যকর। যেখানে দর্শক ভেবেছে, নায়কের সন্ধান পেতে নায়িকাকে স্বর্গ-মর্ত-পাতাল অনুসন্ধান করে ঘুরতে হবে, সেখানে দেখা যায়, নায়িকার পরিশ্রম বাঁচাবার জন্যে নায়ক গৃহপ্রাঙ্গণেই অপেক্ষা করছে নায়িকার জন্যে।

বলা বাহুল্য, এই ধরনের অসার্থক ছবিতে নাট্যনৈপুণ্য প্রদর্শনের সুযোগ সামান্যই পাওয়া যায়। তবুও নায়িকা স্বাতীর ভূমিকায় মাধবী মুখোপাধ্যায় বাচনে যতটা না হোক, তাঁর নীরব, অর্থ-ব্যঞ্জক দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে তাঁর শিল্পি-সত্তার পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছেন। নায়ক প্রশান্তরূপে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ছবির অনেকখানি স্থান জুড়ে আছেন এবং বহু দৃশ্যে বহুভাবে তাঁর আবির্ভাব ঘটেছে। কিন্তু এমন কোনো নাট্যমুহূর্ত তাঁর অদৃষ্টে জোটে নি, যেটা তাঁর অভিনয়-সৌকর্য প্রকাশের সহায়ক। বরং দুশ্চিন্তা-পীড়িত দারুকেশ লাহিড়ীর ভূমিকায় সে-সুযোগ ছিল এবং ঐ ভূমিকাভিনেতা নরেশচন্দ্র মিত্র অনেকটা মঞ্চরীতিতে অভিনয়ের মারফত সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছেন। নায়কের ডাক্তারবন্ধু রঞ্জতের ভূমিকায় তরুণকুমার তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে অভিনয় করেছেন। কিন্তু রঞ্জতের ভগ্নী বিশাখারূপে সুলতা চৌধুরী চলনসৈয়ের পর্যায়ের উপরে উঠতে পারেন নি। অপরাপর ভূমিকায় মলিনা দেবী (নায়কের মা), দিলীপ রায় (বিশাখার প্রেমিক বিমান), জহর রায় (অনাথ লাঠিয়াল), শিশির বটব্যাল (স্কুল প্রেসিডেন্ট মহেশচন্দ্র) প্রভৃতি উল্লেখ্য অভিনয় করেছেন।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজে একটি মধ্যমান রক্ষিত হয়েছে। ছবিটিতে চারখানি গান আছে; কাহিনীর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে নেই, ছবিতে গান থাকতে হয়, তাই আছে। গান কখানির রচনা ভালো, সুরসংযোজনাও ভালো, নেপথ্য-শিল্পীদের গাওয়াও ভালো এবং সঙ্গীতানু-লেখনও (রেকর্ডিং) ভালো। গান চারখানই শোনবার মতো।

ফিল্মস্-এর নিবেদন, এবং ১৭ রীলে সম্পূর্ণ; প্রযোজনা ও পরিচালনা : বি আর চোপড়া; কাহিনী : সি জে পাভ্‌রী;

বি আর চোপড়া প্রযোজিত 'কানুন' প্রমুখ পূর্ববর্তী চলচ্চিত্রগুলিতে সাধারণত যে সামাজিক চিন্তাশীলতা ও সংস্কার-ধর্মিতার পরিচয় পাওয়া যেত, তাঁর 'হামরাজ' ছবিখানি তার থেকে সম্পূর্ণ বিমুক্ত। 'হামরাজ'-এর দুই প্রধান উপাদান হচ্ছে—প্রণয় ও সাসপেন্স। শেষ বরাবর ছবিটি প্রায় গোয়েন্দা চিত্রের রূপ পরিগ্রহ করেছে।

ভারত-চীন সংঘর্ষের সময়ে মৃতদের একটি তালিকায় যখন ক্যাপ্টেন রাজেশ-এর নাম ঘোষিত হল, তখন ধনী-দুহিতা মীনার চোখে নেমে এল বিষাদের ছায়া; সদ্যজাত কন্যাটিও মারা যাওয়ায় সে তখন যথেষ্টই অসুস্থ। পিতা মিঃ বার্মার চেষ্টায় সে শারীরিক সুস্থতা ফিরে পেল বটে, কিন্তু মনের দিক থেকে সে হয়ে রইল সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ। এমনই সময়ে তার চোখের সামনে মঞ্চাভিনেতার সকল ঔজ্জ্বল্য নিয়ে উপস্থিত হল মিঃ কুমার—স্বাস্থ্যবান, রূপবান, সুগায়ক এবং নিপুণ অভিনেতা মিঃ কুমার।



চিত্ত বসু পরিচালিত লালবাঈ চিত্রে শবনম



অজয়কর পরিচালিত **পরিণীতা** চিত্রের নায়ক নায়িকা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়। ফটো : অমৃত

ধীরে ধীরে কুমার মীনার মন হরণ করে নিতে সমর্থ হল। মিঃ বর্মা এতে খুশী—তাঁর মনমরা কন্যার মুখেও খুশীর আভাস, যদিও রাজেশের স্মৃতি তাকে তখনও পীড়িত করছে। কিন্তু তাঁর ধনদৌলতের একমাত্র উত্তরাধিকারিণীকে তিনি সুখী না দেখে নিশ্চিন্ত হতে পারেন না; তাই তারই চেষ্টায় মীনার বিবাহ হয় কুমারের সঙ্গে। দিন সুখেই কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু সহসা পরলোক যাবার পরোয়ানা এল মিঃ বর্মার এবং মৃত্যুপথযাত্রী বর্মা কন্যা মীনাকে জানিয়ে গেলেন : তার যে মেয়ে জন্মেছিল, সে মারা যায় নি, একটি অনাথ আশ্রমে সে মানুষ হচ্ছে। মীনার মাতৃহৃদয় ব্যথিত হয়ে উঠল; মেয়েকে সে নিয়ে এল বাড়ীতে। সুন্দর ফুটফুটে মেয়েকে কুমারেরও ভালো লাগল; তিনজন মিলে হৈ-হৈ করে হোমমুভীতে ছবিও তোলা হল। কিন্তু অনাথ-আশ্রম থেকে নিয়ে আসা মেয়েকে যখন নিজেদের মেয়ে করে নেবার প্রস্তাব করল মীনা, তখন কুমার তাতে অসম্মতি জানাল এই বলে যে, পরের মেয়ের মুখের মা-ডাক ততক্ষণই ভালো লাগে, যতক্ষণ না নিজের মেয়ের মুখ থেকে ঐ মধুর সম্বোধনটি শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। মীনা কুমারকে সাহস করে জানাতে পারে নি, মেয়েটি তারই গর্ভজাত সন্তান। দুঃখিত অন্তরে সে ফিরিয়ে দিয়ে এল মেয়েকে অনাথ আশ্রমে। কিন্তু এইখানেই মীনার দুঃখের সমাপ্তি ঘটল না। আচম্বিতে সে জানল, রাজেশের মৃত্যুসংবাদ মিথ্যা; চীনাদের হাতে বন্দী অবস্থা থেকে মুক্তি পেয়ে সে ফিরে এসেছে। শুধু তাই নয়, অন্যের স্ত্রী জেনেও সে মীনার সঙ্গে দেখা করতে উৎসুক হয়ে টেলিফোনযোগে মীনাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাল। এ আহ্বান উপেক্ষা করবার সাধ্য মীনার ছিল না। কাজেই কুমারের সঙ্গে তাকে খেলতে হল লুকোচুরি। এবং এই লুকোচুরি খেলাই একদিন তার কাল হয়ে উঠল। সে আততায়ীর হস্তে নিহত হল। হত্যাকারী কে? —এরই সমাধানে ছবির শেষ উত্তেজক অংশটি গড়ে উঠেছে রাজেশ ও কুমারের সম্মিলিত অভিযানকে সফল করে।

অভিনয়ে সবচেয়ে বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন রাজেশের গৌণ ভূমিকায় রাজকুমার তাঁর অনবদ্য অভিনয়কুশলতার গুণে। সহজাত শিল্পপ্রতিভার পরিচয় তাঁর প্রতিটি ভঙ্গীতে, বাচনে। নবাগতা সুন্দরী প্রিয়া নায়িকার ভূমিকায় অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ সাবলীল অভিনয় করেছেন, তিনি যে একজন নবাগতা, তা তিনি কোথাও বোঝবার সুযোগ দেন নি। নায়ক কুমারবেশে সুনীল দত্ত ছবির অনেকখানি অংশ জুড়ে আছেন এবং 'ওথেলো' বেশে প্রচুর অভিনয় কসরত দেখিয়েছেন; কিন্তু তিনি যে একজন 'জাত'-অভিনেতা নন, সেই তথ্য ধরা পড়ে গেছে, যখনই তিনি রাজকুমারের সম্মুখীন হয়েছেন। নায়িকার পিতা মিঃ বর্মাবেশে মনোমোহনকৃষ্ণ চরিত্রোচিত সুঅভিনয় করেছেন। কুমারের দলের মঞ্চ-নায়িকা শবনামের ভূমিকায় মমতাজ সহজ, স্বাভাবিক অভিনয় দ্বারা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। পুলিশ ইন্সপেক্টাররূপে বলরাজ সাহনী তাঁর নাটনৈপুণ্য প্রদর্শনের বিশেষ কোনো সুযোগ পান নি। নায়িকা মীনার কন্যার ভূমিকায় বেবী সরিকা প্রীতিপ্রদ। অপরাপর ভূমিকায় জীবন (মঞ্চের ইয়াগো), মদনপুরী (খলচরিত্র তেজপাল), অচলা সচদেব (অনাথ-আশ্রমপালিকা) প্রভৃতি উল্লেখ্য অভিনয় করেছেন। সমবেত নৃত্যের মুখ্যাংশে মধুমতী ও গোপীকৃষ্ণ দর্শকসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

এই সুদীর্ঘ রঙীন ছবিটির কলা-কৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজে শিল্পগত উচ্চমান পরিলক্ষিত হয়। ছবির গানগুলি সুগীত।

'হামরাজ' দর্শকসাধারণের কাছে প্রণয়-মধুর ও সাসপেন্সধর্মী চিত্ররূপে আদৃত হবে।

—নান্দীকর

৫ই মার্চ ৭টায় মুক্ত অঙ্গনে



নান্দীকার

যখন একা

অভিনয়ে :—শেলী পাল, বরুণ সেন, দীপালি চক্রবর্তী, মঞ্জু ভট্টাচার্য, রুদ্র সেনগুপ্ত, অরুণ চট্টোপাধ্যায়, কবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, রণজিৎ ঘোষ।

মঞ্চ : রাধারমণ তপাদার।

নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

টিকিট পাওয়া যাচ্ছে।

পূর্ণেন্দু রায়চৌধুরী পরিচালিত ভানু গোয়েন্দা জহর অ্যাসিসট্যান্ট চিত্রে নীলিমা চট্টোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও জহর রায়



দেশী ছবির খবর

ছবির চাকা ঘুরেছে। দেশী ছবির খবরে নির্মীয়মান এবং মুক্তিপ্রতীক্ষিত অনেক ছবির নাম যুক্ত হয়েছে। বাংলাদেশের ছবির কথা আগে বলি। তারপর বোম্বাইয়ে নির্মিত হিন্দী ছবির খবরে আসছি।

বর্তমানে অভিনেত্রী-পরিচালিকা অরুন্ধতী দেবী বনফুল রচিত মুগয়া কাহিনীর চিত্রনাট্য রচনার কাজ শেষ করেছেন। সম্প্রতি এ ছবির বহির্দৃশ্যের জন্য মেদিনীপুর, ওড়িষ্যা এবং উত্তরবঙ্গের কয়েকটি স্থান পরিচালিকা নির্বাচিত করেছেন। এ ছবিতে বহু পাত্র-পাত্রী যুক্ত হবে বলে জানা গেছে। ইতিমধ্যে শিল্পী নির্বাচনের মোটামুটি কাজও শেষ হয়েছে। সম্ভবত এ ছবিতে উত্তমকুমার, অনিল চট্টোপাধ্যায়, অরুন্ধতী দেবী, নির্মল চট্টোপাধ্যায়, অপর্ণা সেন, ছায়া দেবী, দিলীপ রায়, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, চিন্ময় রায়, মৃণাল মুখোপাধ্যায় এবং নবাগত স্বরূপ দত্ত প্রভৃতি শিল্পীকে দেখতে পাওয়া যাবে। এখনও ভূমিকালিপি সম্পূর্ণ হয়নি। সম্ভাব্য নামগুলো আপনাদের আগেভাগে জানিয়ে রাখলাম। নামের পরিবর্তন হতে পারে। ছবির সঙ্গীতপরিচালনা করবেন পরিচালিকা অরুন্ধতী দেবী।

বাংলাদেশের প্রথম অভিনেত্রী পরিচালিকা হলেন মঞ্জু দে। অভিশপ্ত চম্বল চিত্রের সাফল্যের পর তিনি বর্তমানে শুরু করেছেন 'শজারুর কাঁটা'। এটি একটি রহস্যমূলক চিত্র। কাহিনীকার হলেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। এ ছবির প্রধান চরিত্রাবলীতে রূপদান করছেন বাসবী নন্দী, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, পাহাড়ী সান্যাল, মঞ্জু দে, নীলিমা দাস প্রভৃতি। এ ছবির সুর-সৃষ্টি করেছেন সুধীন দাশগুপ্ত। সুভোগা ডিস্ট্রিবিউটার্স ছবিটির পরিবেশক।

চলচ্চিত্র ভারতীর 'কখনো মেঘ' বর্তমানে মুক্তিপ্রতীক্ষিত। অগ্রদূত পরিচালিত এ ছবির প্রধান চরিত্রে রূপদান করেছেন উত্তমকুমার, অঞ্জনা ভৌমিক, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, শোভা সেন, প্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও বঙ্কিম ঘোষ। ডি লুক্স ফিল্ম পরিবেশিত এ ছবির সুরকার হলেন সুধীন দাশগুপ্ত।

এবারে হিন্দী ছবির খবরে আসা যাক। আগেই বলেছি হিন্দী ছবির প্রধান নির্মাণ-স্থল বোম্বাই। বর্তমানে যে নতুন ছবিগুলোর কাজ শুরু হয়েছে তার খবরা-খবর আপনাদের জানাচ্ছি। তার আগে দুটি জনপ্রিয় নায়িকার বিবাহ-সংবাদ জানিয়ে রাখি।

সম্প্রতি মালা সিনহার শুভ-বিবাহ সুসম্পন্ন হল নেপালী চিত্রের নায়ক চিদাম্বর প্রসাদ লোহানির সঙ্গে। ভালবাসা থেকেই এ মিলনের সূত্রপাত। নেপালী চিত্র 'মাইটি ঘর'-এ মালা সিনহার বিপরীতে সি পি লোহানি প্রথম অভিনয় করেছিলেন। এখন মালা ও'র ব্যক্তিগত জীবনের নায়িকা হলেন।

বৈজয়ন্তীমালাও এ মাসের দশ তারিখে পূর্বঘোষিত পাত্র ডাঃ সি এল বালীর সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হচ্ছেন। মাদ্রাজে বিবাহবাসর বসবে আর প্রীতিভোজের আয়োজন হয়েছে বোম্বাইয়ে। যেভাবে বিবাহের ঢেউ বইছে তাতে মনে হয় বোম্বাইয়ে আর কোন কুমারী নায়িকাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

পরিচালক এ ভীম সিংহ বোম্বাই অঞ্চলে তাঁর রঙীন ছবি 'ভাই বহেন'-র বহির্দৃশ্য গ্রহণ করার পর সম্প্রতি শ্রীসাউন্ড স্টুডিওয় অন্তর্দৃশ্যের কাজ শুরু করেছেন। ছবির মুখ্য অংশে রূপদান করছেন সুনীল দত্ত, নতুন, অশোককুমার প্রাণ, হেলেন, পদ্মিনী, জীবন, মুকরি, বি বি ভাল্লা ভাল্লা এবং নবাগত দিবাকর বালী। শংকর-জয়কিষণ ছবিটির সুরকার।

কাহিনীর পরিচালক দুলাল গুহ তাঁর নতুন ছবি 'ধরতি কহে পুকার কে'-র চিত্রগ্রহণ শ্রীসাউন্ড স্টুডিওয় শুরু করেছেন। ছবির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন নন্দা, সঞ্জীবকুমার, অভি ভট্টাচার্য মালিনী, তরুণ বোস, দুর্গা খোটে, লীলা মিশ্র, তিওয়ারী ও কানহাইলাল। লক্ষ্মীকান্ত-প্যারেলাল ছবিটির সুরকার।

দেব আনন্দ ও বৈজয়ন্তীমালা অভিনীত 'দুনিয়া' চিত্রের দৃশ্যগ্রহণ সম্প্রতি মেহেবুব স্টুডিওয় শুরু করেছেন পরিচালক টি প্রকাশ রাও। উল্লেখযোগ্য চরিত্রে রূপদান করছেন বলরাজ সাহানি, সুপ্রিয়া, জনি ওয়াকার, প্রেম চোপরা ও সুরেশ। সঙ্গীতপরিচালনায় রয়েছেন শংকর-জয়কিষণ।

সাধারণতঃ শীতের মরশুমে বাইরে ঘুরে আসার একটা হিড়ক পড়ে যায়। স্বাস্থ্য-উদ্ধারের আশায় নয় বৈচিত্র্যের পিপাসাই মূলতঃ এর কারণ। ইদানীংকালে পুরী এ ব্যাপারে সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। গত জানুয়ারী মাসের কয়েকটা দিন পুরী যখন এই ধরনের বহিরাগতদের ভীড়ে জমজমাট, তখন এক প্রবল জনস্রোত দেখা গিয়েছিল পুরীর সমুদ্রসৈকতে। ঝাউবনের মাথায় রোদের স্পর্শ লাগার মুহূর্ত থেকে রৌদ্রস্নাত বালুবেলায় মধ্যাহ্নের পর পর্যন্ত অগণিত মানুষের জনতা জমায়েত হয়েছিল। মেয়ে পুরুষ কিশোর যুবা নানা বয়সের নানা দেশের লোক। তাঁদের কেউ এসেছেন কটক থেকে, কেউ বা এসেছেন ভুবনেশ্বর থেকে।

ভুবনেশ্বরের মন্দির, চিল্কার হ্রদ, কোণারকের সূর্যমন্দির, উদয়গিরি খণ্ডগিরি মহাপ্রভু জগন্নাথের চেয়েও বিশিষ্ট আকর্ষণ আজ সমুদ্রবেলায়। উঁচু উঁচু ব্রেকারের মাঝখানে ভেসে উঠছে একটি তরুণ আর তরুণী—সুইমিং কস্টিউমপরা বরতনু।

বাঙলা দেশ এঁদের ভাল করেই চেনেন, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লোকেদের কাছেও এঁরা অপরিচিত নন। তারা দেখল সুইমিং-কস্টিউম পরা উত্তমকুমারকে, দেখল অভিনয়-

সঙ্গিনী যৌবনময়ী অপর্ণা সেনকে। দেখল সাগরজলে সিনান করা রূপছবি। ঝাউগাছের ফিস্‌ফিসানির মাঝখানে ডুবে যাওয়া নীচু গলায় প্রেম-নিবেদনের স্বপ্নমধুর আলাপ এল সকলের কানে।

উত্তমকুমার, অপর্ণা সেন সম্বন্ধে জনসমাবেশের মধ্যে যে উদ্দীপনা জেগেছিল তা আরও বর্ধিত হ'ল, সৌমিত্র চ্যাটার্জি, সন্ধ্যা রায় ও তরুণকুমারের আবির্ভাবে।

এ'দের নিয়ে সলিল দত্তের পরিচালনায় আর ডি প্রোডাকসন্সের সমরেশ বসু রচিত 'অপরিচিত' চিত্রের পুরীতে চিত্রগ্রহণ শেষ হয়ে গেছে। রবীন চ্যাটার্জি এই চিত্রে সুর-সংযোজনা করেছেন।

গিরীন্দ্র সিংহ প্রযোজিত ও বিজয় বসু পরিচালিত এস এম ফিল্মসের 'বাঘিনী' চিত্রটি মিনার, বিজলী ও ছবিঘরে পরবর্তী আকর্ষণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। সমরেশ বসু রচিত এ কাহিনীর প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, বিকাশ রায়, রুমা গুহঠাকুরতা, অজয় গাঙ্গুলী, রবি ঘোষ, শমিতা বিশ্বাস, ছায়া দেবী, জহর রায়, শর্বরী নন্দী, তরুণকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিম ঘোষ, রেণুকা রায়, অমর মল্লিক ও সুখেন দাস। চণ্ডীমাতা ফিল্মস পরিবেশিত এ ছবির সুরসৃষ্টি করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

প্রযোজক-পরিচালক মোহন সেহগল তাঁর 'সজন' ছবিটির চিত্রগ্রহণ রূপতারা স্টুডিওর শুরু করেছেন। প্রধান চরিত্রালীতে রূপদান করছেন মনোজকুমার, আশা পারেখ, রাজমেহরা, ওমপ্রকাশ, মদনপুরী, সুলোচনা, শবনম, সাপ্রু ও নবাগতা সাধনা। লক্ষ্মীকান্ত-প্যারেলাল ছবিটির সুরকার।

এ ভি এম-এর 'দো কলিয়াঁ' ছবিটি বর্তমানে মুক্তিপ্রতীক্ষিত। এই রঙিন ছবিটি পরিচালনা করেছেন কৃষান পাঞ্জু। প্রধান চরিত্রলিপিতে অংশগ্রহণ করেছেন বিশ্বজিৎ, মালা সিনহা, মেহমুদ, ওমপ্রকাশ, গীতাঞ্জলি, নবাগতা সুলতানা ও শিশুশিল্পী সোনিয়া। সুরকার রবি ছবিটির সংগীত-পরিচালক।

বিদেশী ছবির খবর

ভিট্টোরিও ডি সিকা 'ক্যারলিন চেরী' ছবির নতুন ভার্সানে পিতার চরিত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন। উনি আগামী বসন্তে সুইডেনের ইতালীয়ান পল্লীতে একটি ছবি তুলবেন। ছবির প্রাথমিক কাজ হিসাবে সিজার জাভাত্তিনী চিত্রনাট্যের কাজ সম্পূর্ণ করেছেন, আর ইতিমধ্যে ডি সিকাও স্টকহোম ও অন্যান্য আশেপাশের কিছু আউটডোর লোকেশন স্পট বেছে এসেছেন। এখনও স্থির সিদ্ধান্ত যদিও নেওয়া হয়নি, তবে সম্ভবত সোফিয়া লোরেন এ-ছবির নায়িকা।

পরিশোধ চিত্রে মাধবী মুখোপাধ্যায় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সুলতা চৌধুরী ও দিলীপ রায়



লুইগি কোমেনসিনির প্রথম ছবি 'সির্টলিং ফরবিডন' কোনরকম রং না চড়িয়ে সম্পূর্ণ বাস্তব পটভূমিকায় তৈরি হলেও প্রযোজকের ভাগ্যে খুব একটা লাভ হয়ে ওঠেনি এ-ছবি থেকে, কিন্তু তবুও কোমেনসিনি দমে যাননি, নিজেকে কোন বিকৃত স্বার্থের কাছে বলি দেননি, আর তাই তিনি ১৯৪১-এ তোতোকে নিয়ে তুললেন 'এম্পারার অফ ক্যাপ্রি'; ইতালীর এই প্রৌঢ় পরিচালক চিন্তায় অস্তিত্ববাদী, ভাবে কবি, কর্মে নিরলস, কোন আন্দোলনে (নিও-রিয়ালিজম জাতীয়) বিশ্বাসী নন। কিন্তু বিশেষ কোন কারণে একটা ছবিতে মনস্তত্ত্বের সঙ্গে সাধারণ ছবির একান্তর করতে হয়েছিল, তার ফলে তাঁর পরের ছবি 'দি বিউটি অফ রোম' তাঁর সেই আগেকার আনন্দ সরলতাকে বহন করল না। 'দি উইণ্ডো অফ লুনা পার্ক' ব্যর্থ হল। কিন্তু তার দু' বছর বাদেই একটি শিশু ও একজন লোকের চরিত্র নিয়ে 'হাসব্যাণ্ড এণ্ড দি সিটি' ছবি তার পুরোনো সুনাম ফিরিয়ে দিয়েছিল। এর পরের তাঁর সব ছবিতেই নিজস্ব স্টাইল-এ পরিপূর্ণতা ও নতুনত্ব লক্ষ্য করা গেছে। ও'র সর্বশেষ ছবি হল 'মিস-আণ্ডারস্টুড'।

শুধুমাত্র ইতালীর বলি কেন হলিউডেরও মক্ষিরাণী রোসানা স্কিফিয়ানো আবার ইতালীতে ফিরে এসেছে। গিউসিপ্প পাত্রনি গ্রিফির বিখ্যাত নাটক 'ওয়ান ডাইজ অফ লভ' অবলম্বনে এডওয়ার্ড ডিমিত্রিক [illegible] করছেন, তার নায়িকা চরিত্রে আছে মিস্ স্কিফিয়ানো। খুব সম্ভব স্কিফিয়ানোর বিপরীতে থাকছেন হলিউডের জর্জ পেপার্ড, ছবিটাও ইংরাজীতে তোলা হবে।

রোজার স্মিথ এখনও লাইফ পার্টনার অ্যান মার্গারেটকে নিয়ে বরেলসআসেই রয়েছেন। ওখানে 'অ্যানড্যাণ্ট' ছবিতে কাজ করছেন দুজনে। এ-ছবি থেকে ও'রা দুজনে বেশ মোটা পরিমাণ টাকা পাবেন। কারণ, গল্প রোজারের লেখা, তার জন্য ইতিমধ্যে তিনি প্রায় ছ' লক্ষ টাকা পেয়েছেন, তাছাড়া ও'রা দুজনেই ছবিতে অভিনয় করছেন, তার পারিশ্রমিকের পরিমাণ খুব একটা কম হবে না।



আজ এবং প্রতি রবিবার ৩টে ও ৬।টায়

রবীন্দ্র সরোবর (লেক) মঞ্চে

বাদল সরকারের

কবি কাহিনী

টিকিট ২্ থেকে ৭্, হলে প্রতি রবিবার সকাল ৯।টা থেকে রাত ৮।টা, এবং "মধুক্ষরা"য় (৮৬এ রাঃ বিঃ এ্যাভি) প্রতিদিন পাবেন। নির্দেশনায় বাদল সরকার।

প্রযোজনায়— শতাব্দী



আশু বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত তিন ভুবনের পারে চিত্রে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও তনুজা। ফটো : অমৃত

স্টুডিও থেকে বলছি

শট নং—১১০

ক্যামেরার ফ্রেমে গৌরাঙ্গ আর মণ্টু। মিড ক্লোজ শট।

মণ্টু—গৌরাঙ্গ, বৌদি কোথায়?

গৌরাঙ্গ (বিস্ময়ের সুরে)—কেন, ঘরে নেই?

মণ্টু—না তো!

গৌরাঙ্গ—দেখি (এগিয়ে যেতে উদ্যত বারান্দার দিকে)।

মণ্টু—থাক, আমিই দেখছি। ক্যামেরা এগিয়ে আসে মণ্টুর দিকে। মণ্টু ডানদিক ঘুরে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যায়। কাট্।

মিড ক্লোজ শট। মণ্টু সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়ে ক্যামেরার দিকে পেছন ফিরে। বাঁ হাত দিয়ে সুইচ টিপে আলো জ্বালে। কাট্।

এবার ক্যামেরা সিঁড়ির ওপরে। মণ্টু ওপরের দিকে তাকায়, তারপর উঠে আসে ওপরে। কাট্।

কাট নং—১১১

মিড্ ক্লোজ শট্। সরসী দাঁড়িয়ে আছে ছাদে। দূরে আশেপাশের বাড়ীর আলো দেখা যায়। মণ্টু ডানদিক থেকে ফ্রেমে ঢোকে। ধীর পায়ে এগিয়ে যায় সরসীর দিকে, ক্যামেরাও এগিয়ে আসে ওদের ফ্রেমে ধরে। কাট্।

ক্লোজ শট্। ফ্রেমে মণ্টু আর সরসী।

মণ্টু—ট্রানস্লেসন কেমন হয়েছে তা বললে না?

সরসী—বললুম তো খুউব ভালো হয়েছে।

মণ্টু—তাহলে আমার পাওনা দিলে না।

মণ্টু দুহাত দিয়ে আবেগভরে সরসীকে কাছে টেনে নেয়।

বিগ ক্লোজ আপ্। সরসীর উদাস জল-ভরা চোখ। মিড ক্লোজ শট্। সরসী বাধা দিতে চায়, পারে না।

কাট্।

ঐ একই ফ্রেম। ক্লোজ শট্।

সরসী—না-না—

মণ্টু—রাগ কোরো না সরো।

সরসী—রাগ তো আমি করিনি, তুমিই করেছ।

মণ্টু—সে তো অনেক আগে, এখন তো দেখছি তুমিই রাগ করেছে।

মণ্টু সরসীর দিকে তাকায়। কাট্।

ক্যামেরা এবার ওদের দুজনকে একই ফ্রেমে রেখে একটু ডাইনে। ক্লোজ শট্।

সরসী—আমি করেছি কারণে, তুমি করেছ অকারণে। পড়া তো তোমার......

বলতে বলতে মণ্টু জড়িয়ে ধরে সরসীকে। গলা তার উত্তাপে ভারী হয়ে যায়। কাট্।

ক্লোজ শট্। মণ্টু। তাকিয়ে আছে সরসীর দিকে।

মণ্টু—তুমি খালি আমার রাগটাই দেখছ, কষ্টটা দেখছ না। কতদিন আমি ওদের সঙ্গে একটু আড্ডা মারিনি। কাট্।

ক্লোজ শট্। সরসী। আদরের সুরে আর দৃষ্টিতে তাকায়, বলে।

সরসী—আমারও কি ইচ্ছে করে না? তবে জীবনে কোন ব্রত গ্রহণ করবার কি দরকার ছিল?

(সরসীর গলা কান্নায় ভিজে আসে)। তুমি আবার চিৎকার করবে, যা-তা কথা বলবে। অফ্ ভয়েস। গৌরাঙ্গ ডাকে ওদের। দুজনেই ছেড়ে দেয় দুজনকে। ফেড্ আউট।

শট নং—১১২

ফেড্ ইন। দেখা যায় বাগানে একরাশ মাটি ফেলা রয়েছে। এদিক-ওদিকে কিছু খালি টব আবার কিছু টব মাটি-ভরা। ক্যামেরা যায় বাগানটা প্যান করে ঘোরে। আরও একটু বাঁদিকে প্যান করতেই ফ্রেমে এসে পড়ে মণ্টু আর সরসী।

মিড ক্লোজ শট্। সরসী আর মণ্টু একটা টবে মাটি ভরে গোলাপের চারা পুঁতছে। কাট্।

মিড্ ক্লোজ শট্। সরসী ঘটি করে জল ঢালছে, হাসছে সাফল্যের হাসি। কাট্।

মণ্টু সরসী দুজনেই বসে আছে গাছটার দিকে চেয়ে। মিড ক্লোজ শট্।

ক্লোজ শট্। মণ্টু।

মণ্টু—এখন চারাগাছ, যখন ফুলে ভরে যাবে কেমন লাগবে সরো।

ক্লোজ শট্। সরসী।

সরসী—আগে ফুল ফুটুক, তবে তো।

কাট্।

ওরা দুজনেই উঠে পড়ে। ক্যামেরা প্যান করে ডানদিকে। মণ্টু হাত ধোয়। মিড ক্লোজ শট্।

ক্লোজ শট্। সরসী জল ঢেলে দিতে থাকে। ফেড আউট।

যে-তিনটে দৃশ্যের কথা বললাম, এগুলো হল আলোছায়া প্রোডাকসন্সের নতুন নির্মীয়মান ছবি 'তিন ভুবনের পারে'-এর কথা-সাহিত্যিক সমরেশ বসুর কাহিনী অবলম্বনে এ-ছবির পরিচালনার ভার নিয়েছেন আশু বন্দ্যোপাধ্যায়।

উপরোক্ত কটি দৃশ্যের টেকিং হল কয়েকদিন আগে টেকনিসিয়ানস্ স্টুডিওতে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও তনুজার সুন্দর অভিনয়ের মধ্য দিয়ে। গত সপ্তাহে এক বিরাট সেট পড়েছিল স্টুডিওর সামনে। একটা গান ও আরও কয়েকটা আকর্ষণীয় দৃশ্য গৃহীত হল ঐ সেটে। ছবিতে অন্যান্য চরিত্রে আছেন রবি ঘোষ ও অন্যান্যরা।

তপন সিংহ পরিচালিত আপনজন চিত্রে স্বরূপ দত্ত ও ছুটু বন্দ্যোপাধ্যায়।
ফটো :



মঞ্চাভিনয়

ক্যালকামকো প্রযোজিত অভিনয়

ক্যালকোমকো সেলস অ্যান্ড অ্যাডভারটাইজিং ক্লাবের সদস্যগণ সম্প্রতি আকাদমি অব ফাইন আর্টস মঞ্চে ক্লাবের অন্যতম সদস্য শ্রীসুনীল চট্টোপাধ্যায় রচিত 'ছিল আছে থাকবে' নাটকটি বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন।

সমীরের ভূমিকায় শ্রীসত্যব্রত মৌলিক, সত্যরঞ্জনের ভূমিকায় শ্রীসুনীল চট্টোপাধ্যায়, অভয়ের ভূমিকায় শ্রীমিহির রায়, মিঃ মজুমদারের ভূমিকায় শ্রীসুকৃতিমোহন ভৌমিক, নিত্যানন্দের ভূমিকায় শ্রীউদয়তপন দাশগুপ্ত এবং মেজদার ভূমিকায় শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়ের প্রাণবন্ত অভিনয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য ভূমিকায় শ্রীশিশির চট্টোপাধ্যায় (কল্যাণ), শ্রীঅসীম নিয়োগী (গোপাল) এবং শ্রীঅমিতাভ সান্যাল (মিঃ সেন)-এর ভূমিকায় অভিনয় চরিত্রানুগ। রেখা ও সুমিত্রার ভূমিকায় যথাক্রমে শ্রীমতী সীমা রায়চৌধুরী এবং শ্রীমতী কল্যাণী অধিকারীর অভিনয় মর্মস্পর্শী হয়েছিল।

ইউকো ব্যাঙ্ক প্রযোজিত সাহেব-বিবি-গোলাম

রঙমহল রঙ্গমঞ্চে ইউকো ব্যাঙ্কের কর্মিবৃন্দ অভিনীত 'সাহেব বিবি গোলামে'র প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় পটেশ্বরী বৌঠানের ভূমিকায় বসন্তী চাটার্জির অভিনয়।

বহির্মুখী, আত্মসর্বস্ব স্বামীর প্রেমমুখী করবার দুঃসহ সাধনায় ব্যর্থ নারীর ... ...পাধ্যায়ের অভিনয় প্রশংসিত হয়ে উঠেছে। স্বল্পপরিসরের মধ্যেও চুনীদাসীর ভূমিকায় সবিতা মুখার্জি মনে রেখাপাত করেছে। বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে ভূতনাথের ভূমিকায় নির্মলেন্দু মালাকারের অভিনয়। পরিবেশের হাতে ক্রীড়নক ভূতনাথ চারপাশের ঘটনার ... নীরব দর্শক। অসহায় নারীর প্রতি পুরুষের নির্মম অবিচারের বিরুদ্ধে চিত্ত বিদ্রোহী হলেও প্রতিবাদ করবার অধিকার নেই। আপন বিবাহিতা পত্নী বোবাকে অন্যের হাতে সমর্পণের আত্মপ্রচারবিমুখী উদারতা, অন্যান্য চরিত্র ও ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে নিশ্চল। এই প্রকাশহীন চরিত্রের সকল অনুভূতি, বেদনা ও বিহ্বলতার মূক অভিব্যক্তি শ্রীমালাকারের অভিনয়ে প্রাণস্পর্শী হয়ে উঠেছে।

অন্যান্য অভিনয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন হিরণ্যমণির ভূমিকায় বিমল মিত্র, কেতুভমণির ভূমিকায় অমলেন্দু ব্যানার্জি, মদন মণ্ডলের ভূমিকায় বদরিক, ভৈরব—নারায়ণ ভট্টাচার্য, ...—বিমল চক্রবর্তী, বেণী—মহেন্দ্র হাজী, বংশী—প্রভাতচন্দ্র, ইব্রিস—নারায়ণ ভট্টাচার্য। শ্রীভবনের পরিচালনা ... সুষ্ঠু। ... গানের দৃশ্যে জমিদারের দিকে পেছন করে দর্শকের সম্মুখীন হয়ে গান গাওয়াটা শুধু অস্বাভাবিক নয়, বিসদৃশও বিশেষ গানটি যখন জমিদারের উদ্দেশ্যে গাওয়া।

বান্ধব প্রযোজিত নাট্যোৎসব

একটি স্বপ্নাহত মেয়ের ছায়া, কতগুলি ...িত অবক্ষয় জীবনের ছায়া ও সমাজের বিচারের আসামীদের ছায়া নিয়ে বান্ধব মঞ্চস্থ করলো তিনটি নাটক। এ-নাটক তিনটি অভিনয়গুণে দাগ কেটেছিল নাট্যামোদীদের মনে। এই নাট্যোৎসবে ৯ই ও ১০ই ফেব্রুয়ারী অমরনাথ মৈত্রের 'জীবনজুয়া' ও 'বিবরের অন্তরালে' এবং ১১ই ফেব্রুয়ারী জরাসন্ধের 'লৌহকপাট' অভিনয় তুলেছিল। যথাক্রমে যাঁরা অভিনয় করেছিলেন : হরিপদ কুণ্ডু, নারায়ণ কুণ্ডু, বিমল পুরকায়স্থ, সুকুমার দাস, ননীগোপাল দাস, অমরনাথ মৈত্র, জীবনকৃষ্ণ দে, নবীন দাস, লক্ষ্মীনারায়ণ নন্দী, মৃণালকান্তি ভড়, শঙ্কর প্রামাণিক, ব্যোমকেশ সেন, আশুতোষ দত্ত, রণজিৎ ... অশোক ভট্টাচার্য, অজয় দে, সুজিত মজুমদার, সুশীল মণ্ডল, স্বপ্না মুখার্জি, মেনকা বন্দ্যোপাধ্যায়, আরতি মজুমদার। নাটক তিনটি পরিচালনা করেন অমরনাথ মৈত্র। এ-নাটকগুলি বরানগর থানার প্রাঙ্গণে মঞ্চস্থ হয়।

শিল্পী দলের নতুন নাটক

বেহালার সুখ্যাত নাট্যসংস্থা 'শিল্পী-দল' এবার যে নতুন নাটকটি মঞ্চস্থ করবার আয়োজন করেছেন তার নাম 'শুরুতেই শেষ'। প্রখ্যাত নাট্যকার সুনীল চক্রবর্তী এই নাটকে ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ ও শ্লেষের মাধ্যমে আধুনিক সমাজজীবনের একটি বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন। শিল্পীদের মধ্যে আছেন অনিলকুমার চট্টোপাধ্যায়, ... দাশগুপ্ত, চিত্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিমল ধর, অনাদি রায়চৌধুরী, বিকাশ মুখোপাধ্যায়, অমর দাস, অনুতোষ চক্রবর্তী, সুধীর পাল, শিশির ঘোষ, অনুতোষ চক্রবর্তী, দীপালী চট্টোপাধ্যায় ও কৃষ্ণা গুহ। মঞ্চ ও রূপসজ্জার দায়িত্বে গোপাল মুখোপাধ্যায় (মঞ্চমায়া), বিজয় পাল ও সুনীল চক্রবর্তী (লাইট হাউস)। পরিচালনার দায়িত্বে অনিলকুমার

মহাবিপ্লবী অরবিন্দ চিত্রে অরবিন্দ চরিত্রে দিলীপ রায় এবং নিবেদিতা চরিত্রে শ্রীমতী ডিভালো



চট্টোপাধ্যায়ের। প্রথম অভিনয় ১৭ই ফেব্রুয়ারী, শনিবার সন্ধ্যা ৬-৩০টায় রবীন্দ্র সরোবর মৌঁচাক মঞ্চে।

স্বর-গরল

মুর্শিদাবাদ জেলার প্রখ্যাত সাংস্কৃতিক সংস্থা 'অগ্রমুখী' সম্প্রতি 'স্বর-গরল' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন। নাট্যকার স্বরাজব্রত সেনগুপ্ত স্বয়ং নাট্য-নির্দেশনার দায়িত্ব পালন করেন, তাঁর প্রয়োগ-পরিকল্পনায় পরিচ্ছন্ন শিল্প-বোধের ছাপ ছিল।

নাট্য

নাট্য সম্মেলনের ৪র্থ বার্ষিক অধি-বেশন এবার বসছে শ্যাম স্কোয়ারে (সুভাষ বাগ) মার্চের প্রথম সপ্তাহে। এবারেও অনুষ্ঠানসূচীতে অনেক বৈশিষ্ট্য দেখা যাবে। অনুষ্ঠানও চলবে পনেরো দিনব্যাপী।

সম্প্রতি পার্ক স্ট্রীট রিক্রিয়েশন (মাহীন্দ্র অ্যান্ড মাহীন্দ্র লিঃ) ক্লাবের সভ্যবৃন্দ 'স্টার' রঙ্গমঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেছেন পৃথ্বীশ সরকারের 'অবশেষে' নাটকটি। নাট্য নির্দেশনার দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন শ্রীকমল চট্টো-পাধ্যায়। তাঁর সূক্ষ্ম শিল্পবোধ অভিনয়ের অনেক জায়গাতেই সুন্দরভাবে মূর্ত হয়ে ওঠে। দলগত অভিনয় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মোটামুটি বলিষ্ঠই থাকে বলতে হবে। অভিনয়ের দিক দিয়ে সবচেয়ে বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করেন সুশান্ত বসু (প্রসেনজিৎ), প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (অরুণ), নীলু রায়চৌধুরী (বলাই), বসন্ত চৌধুরী (বিনয়), দেবু মুখোপাধ্যায় (বিজয়), অপূর্ব ভট্টাচার্য (গোকুল), সুতপা ভট্টাচার্য (বাণী) সুঅভিনয়ের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করতে পেরেছেন।

নায়িকা বিদায়

কিছুদিন আগে 'কল্পতরু'র প্রযো-জনায় মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হল বসন্ত ভট্টাচার্যের কৌতুকরসাশ্রিত নাটক 'নায়িকা বিদায়'। নাট্যকার স্বয়ং নির্দেশনার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে বহন করেন। প্রতিটি শিল্পীই প্রাণ-ঢেলে অভিনয় করেছেন বলে দলগত অভিনয়ে সব সময়েই একটা সজীবতা স্পষ্ট হয়ে উঠতে পেরেছে। অভিনয়ে যাঁরা দক্ষতা দেখিয়েছেন তাঁরা হলেন—রাজকুমার বসু (কার্তিক), সুমন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় (বাদল), নীতিশ সান্যাল (সৌম্যেন), তৃপ্তি দাস (অঞ্জলি)। অন্যান্য চরিত্রে রূপ দেন—বিশ্বনাথ বসাক, পুলক সেন, অরুণ চক্রবর্তী। আবহসঙ্গীত ও মঞ্চস্থাপত্যে সহায়তা করেন সুকুমার লাহা ও সুনীল মোদক।

তটিনীর বিচার

হিন্দুস্থান বিল্ডিং পোস্টাল রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভ্যবৃন্দ সম্প্রতি 'রঙমহলে' শচীন সেনগুপ্তের 'তটিনীর বিচার' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। নাট্যপরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন শ্রীকালিপদ চক্রবর্তী। তাঁর প্রয়োগ-পরিকল্পনায় স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা গেছে। বিভিন্ন ভূমিকায় রূপ দেন—সীতাংশু বন্দ্যোপাধ্যায়, বনমালী গড়ে, শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, গোবিন্দ ঘোষ, সাধনকুমার চক্রবর্তী, গোবিন্দলাল বসু, সান্ত্বনা ঘোষ, মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায়, অজয় ভট্টাচার্য।

বিবিধ সংবাদ

দশরূপকের নতুন নাটক 'শেভচেঙ্কো'

দশরূপক নাট্যগোষ্ঠী এবার একখানা নতুন ধরনের নাটক নিয়ে মিনার্ভা রংগমঞ্চে অবতীর্ণ হচ্ছেন আগামী ৬ই মার্চ সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায়। শ্রীমন্মথ রায় রচিত সোভিয়েত দেশ নেহেরু পুরস্কারপ্রাপ্ত এই নাটকখানির নাম 'শেভচেঙ্কো'। এই নাটকের গান ও কবিতাগুলি বাংলায় রূপায়িত করেছেন কবি রাম বসু। নাট্যনির্দেশনায় আছেন ভরদ্বাজ এবং সঙ্গীত পরিচালনায় পরেশ ধর।

বোকারোয় আনন্দানুষ্ঠান

ডি ভি সি বোকারো শিশু-শিল্পীদের নিয়ে যে কত সুন্দর মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান করা যায়, তার প্রমাণ রাখলেন বোকারোর 'হাসি-খুশীর আসর'। গত ৫ই ফেব্রুয়ারী বোকারো ক্লাবের প্রযোজনায় ক্লাবের স্থানীয় রঙ্গমঞ্চে এই সংস্থাটি এ মনোজ্ঞ অনু-ষ্ঠানের আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় ছোট্ট দুটি মেয়ে সুদীপা ভট্টাচার্য এবং শম্পা তরফদারের নয়নাভিরাম বাউল নৃত্যের মাধ্যমে। পরবর্তী প্রীতি গুপ্ত এবং সিমন্তী চ্যাটার্জির মিলিত নৃত্য দর্শকবৃন্দের প্রশংসা অর্জন করে। উক্ত দুটি নৃত্যের সঙ্গে নেপথ্য কণ্ঠসঙ্গীতে এবং সঙ্গতে ছিলেন যথাক্রমে শ্রীমতী দীপালী ভট্টাচার্য, শ্রীমতী মঞ্জু ব্যানার্জি এবং শ্রীসুধীর ভট্টাচার্য। ছোট মেয়ে চৈতালী মিত্রের 'লিচু চোর' আবৃত্তি অবাক করে দেবার মত। জ্যোৎস্না পাল (ধানবাদ)-এর তাসখন্দের উপর দেশাত্ম-বোধক সঙ্গীতটি উপেক্ষা করবার মত নয়। এ শিশু-শিল্পীর সঙ্গে হারমোনিয়াম ও তবলা সহযোগিতায় যথাক্রমে ছিলেন শ্রীকাশীনাথ মুখার্জি এবং শ্রীসুধীর ভট্টাচার্য। বিশেষ অনুরোধে শ্রীমতী দীপালী ভট্টাচার্য একখানি সংগীত পরিবেশন করে উপস্থিত দর্শকবৃন্দকে প্রচুর আনন্দ দেন। মাঃ ইন্দ্রজিৎ এবং মাঃ প্রসেনজিৎ ব্যানার্জি এ দুই জিৎ সহোদর মিলে পিয়ানো একর্ডিয়ানের তালে তালে টুইস্ট নৃত্য দর্শকবৃন্দের মধ্যে খুশীর জোয়ার বইয়ে দেন। এ দুই শিশু-শিল্পীর সঙ্গে পিয়ানো একর্ডিয়ানে ছিলেন শ্রীকমল দে। এরপর শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী রচিত বহু প্রতীক্ষীত 'পন্ডিত বিদায়' প্রহসনটি শ্রীগোপাল দে-র পরিচালনায় সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়। এর বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন : সর্বশ্রী কৃষ্ণা ব্যানার্জি (হেডমাস্টার), সিমন্তী চ্যাটার্জি (ইন্সপেক্টর), আরতি শান্তিকারী (জংলী), মধুমিতা চৌধুরী (পদ্মলোচন), কান্তি গুপ্ত (সলিল), চিন্টু রায় (হেগেন),

বাপ্পা মুখার্জি (মানস), শর্মিলা বৈদ্যরায় (পিওন), শুভেন্দু মুখার্জি (কেরানী) এবং পন্ডিতমশাইয়ের ভূমিকায় শ্রীগোপাল দে। অনুষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনায় ছিলেন শ্রীহীরালাল ব্যানার্জি।

শিল্পী দলের অভিনয়

সুনীল চক্রবর্তীর নতুন নাটক 'শুরুতেই শেষ' হাসির ভিতর দিয়ে যুবজীবনের ব্যর্থ নাট্য-প্রচেষ্টার একটি বাস্তব আলেখ্য।

শিল্পীদলের সভ্যদের দ্বারা বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে এই নাটকটি অভিনীত হল রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম মঞ্চে গেল ১৭ই ফেব্রুয়ারী, শনিবার।

ক্ষণে-ক্ষণে হাসি এবং মধ্যে মধ্যে কিছু বিষাদের সুর নিয়ে নাটকটির গতি দ্রুত। দলগত অভিনয়ই এই ধরনের নাটকের সাফল্যের ভিত্তি। বলতে বাধা নেই, সেদিক থেকে সংস্থার শিল্পীরা সেদিনকার অভিনয়ে বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, মন্টু দাশগুপ্ত, বিলাস মুখোপাধ্যায়, অনাদি রায়চৌধুরী, চিত্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, পরিমল ধর, শিশির ঘোষ, উমেশ মজুমদার, অমর দাস, অনুতোষ চক্রবর্তী, সুধীর পাল, দীপালি চট্টোপাধ্যায় ও কৃষ্ণা গুহ।

বাঙালী যাত্রানুষ্ঠান

বিড়শা আসরের অষ্টাদশ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে আগামী শনিবার রাত্রি ৭টায় বড়িশা আসরের সভ্যরা শ্রীব্রজসুন্দর দাসের নির্দেশনায় 'বাঙালী' যাত্রাভিনয় করবে। অভিনয়ে অংশগ্রহণ করবেন সর্বশ্রী দুলাল মিত্র, সমীর দত্ত, শ্যামাপ্রসাদ সরকার, রাজকুমার সরকার, শচীন ভট্টাচার্য, নির্মল চট্টোপাধ্যায়, সমীর ভট্টাচার্য, আশীষ গুহ, অসিত সান্যাল, রত্না চ্যাটার্জি, সন্ধ্যা মুখার্জি, বাসবী চ্যাটার্জি প্রভৃতি।

পরীক্ষামূলক নাটকাভিনয়

বাণীপুর ২নং নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের পুনর্মিলন উৎসব উপলক্ষে ছাত্রবৃন্দ শ্রীউৎপল চক্রবর্তী রচিত পরীক্ষামূলক নাটক 'নাটক হবে না' মঞ্চস্থ করেন।

ছাত্রীবৃন্দ অধ্যক্ষা শ্রীমতী কমলা লালার পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথের 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যটি মঞ্চস্থ করেন। সঙ্গীত পরিচালনায় ছিলেন সংগীত অধ্যাপক শ্রীকরুণাকান্তি ভট্টাচার্য। বিভিন্ন ভূমিকায় সীমা চক্রবর্তী, রমা চক্রবর্তী, সীতা হালদার, মমতা চৌধুরী, কমলা রায় বার্মা, প্রতিমা রায়, চিনু ভট্টাচার্য প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেন।

যাদুবিদ্যা প্রদর্শনী

বহুবাজার অগ্রণী সঙ্ঘ সরস্বতী পূজা উপলক্ষে এক আনন্দানুষ্ঠান-এর আয়োজন করেছিলেন বিশ্বনাথ মতিলাল লেনে। আন্তর্জাতিক যাদুকর সংস্থা ইন্ডিয়া রিং-এর সভ্যরা এই অনুষ্ঠানে যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করেন। বিশেষ আকর্ষণ ছিল যাদুকর দি গ্রেট সুশীলের যাদুবিদ্যা। গ্রেট সুশীলের খেলাগুলি সত্যই আনন্দদায়ক। এছাড়াও যাদুকর এস কে সাহা, মিস স্মিতা, সুবোধ ব্যানার্জি ও এস কুমার।



স্পাই ইন রোম চিত্রে দেবকুমার এবং জয়মালা

হিন্দোলী

সম্প্রতি দু দিনব্যাপী 'নিখিল বঙ্গ মূকাভিনয় প্রতিযোগিতা দুর্দান্ত উত্তেজনার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বনানগর পৌর বিদ্যালয় ভবনে। প্রতিযোগিতা আয়োজন করেছিলেন শহর কলকাতার অন্যতম সাংস্কৃতিক সংস্থা হিন্দোলী তাঁদের পরলোকগত সদস্য মূকাভিনেতা অরুণাভ মজুমদারের স্মৃতিরক্ষার্থে।

প্রতিযোগিতার ফলাফলে জানা গেছে বৈদ্যবাটীর অরুণ নাগ 'রহস্য উপন্যাস পড়ুয়া' মূকাভিনয় পরিবেশন করে প্রথম পুরস্কার লাভ করেছেন। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে করেছেন দুর্গাপুরের স্বপন মিত্র। তাঁর অভিনয়ের ফিচার ছিল 'দুর্ভাগা'। কলকাতার স্বপন সেনগুপ্ত তৃতীয় স্থানাধিকারী প্রতিযোগী। তিনি 'একটি বেকার কেন পাগল হলো' ফিচারটি অভিনয় করে এই সম্মান লাভ করেন।

দুটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান

গত ১০ ও ১১ ফেব্রুয়ারী বোড়াল উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মঞ্চে অনুষ্ঠিত দুটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে যথেষ্ট আনন্দ ও উৎসাহের সঞ্চার করে।

স্থানীয় (আতাবাগান) সংস্কৃতি সংস্থা 'অভিযানে'র পরিচালনায় প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা জন্ম-জয়ন্তীসহ সংস্থার দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসব উদযাপিত হয়। এই উপলক্ষে ভগিনী নিবেদিতার জীবন-কাহিনীর এক চিত্রপ্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। বাণী, রচনা, চিত্রাঙ্কন ও হস্তশিল্পের এক প্রতিযোগিতাও হয়। বিভিন্ন বিষয়ের বিজয়ী প্রতিযোগিদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়। সংস্থার সভ্য-সভ্যারা সঙ্গীত ইত্যাদি পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানে যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন নেন শ্রীস্বদেশরঞ্জন চন্দ্র-চৌধুরী ও অধ্যাপক কমলাকান্ত ঘোষ।

দ্বিতীয় দিনে বোড়াল উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রাক্তন ছাত্রবৃন্দ একটি 'নকল-সংসদ' তৈরী করেন। সেখানে সরকার পক্ষ ইংরাজীকে জাতীয় ও রাষ্ট্রের সরকারী ভাষা করার জন্য একটি ভাষা বিল আনেন। সরকার ও বিরোধীপক্ষ প্রচন্ড উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে ইংরাজীর পক্ষে ও বিরুদ্ধে বিতর্কের অবতারণা করেন। পরে সংসদ সদস্যদের ভোটে ইংরাজীর পক্ষেই বিলটি গৃহীত হয়। এই অনুষ্ঠানটি বিশেষ আকর্ষণীয় হয়েছিল। পরে সঙ্গীতানুষ্ঠান হয়।

জলসা

সুরেশ সঙ্গীত সংসদ

ছাব্বিশতম ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ স্মৃতিবার্ষিকী উপলক্ষে উত্তরা সিনেমা হলে সুরেশ সঙ্গীত সংসদের চতুর্থ অধিবেশন সুরু হয় ওঙ্কারনাথের গাওয়া বন্দেমাতরম রেকর্ড বাজিয়ে। সাধককণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীতের ভাব আবেগ ও দীপ্তি মিলে এক—সুরসমৃদ্ধ গম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল।

তারপর ভূপেন্দ্রবন্দনা। 'ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ স্মরণে রচিত এই গানটির রচয়িতা ও সুরকার শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়। কেদার, আলাহিয়া বিলাবল, ভাটিয়ার ও বসন্ত রাগভিত্তিতে রচিত—শ্রীমতী মীরা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত ও মঞ্জু ভট্টাচার্য, রবি চন্দ, গোপা চট্টোপাধ্যায় ও রাধা চৌধুরী গীত এই অনুষ্ঠান খুব উপভোগ্য হয়েছে ও গুণীজনের প্রশংসা অর্জন করেছে।

আলাপ ও ধ্রুপদ গেয়ে শোনালেন ওস্তাদ রুহিমুদ্দিন ডাগর। রাগ টোরী। ধ্রুপদের ভাবসমৃদ্ধ বিরাট পটভূমিকায় টোরির বিষন্ন গাম্ভীর্য ডাগরবাণী বাজের সরল আবেগে মাধুর্যে এবং শিল্পীর শান্ত আত্মসমাহিত পরিবেশনায় এক মর্যাদা-গম্ভীর রসসমৃদ্ধ পরিবেশ রচনা করেছে। বিঠলদাস গুজরাটীর পাখোয়াজ সঙ্গত সঙ্গীতের উপযুক্ত ছন্দসৌষ্ঠব রচনা করেছে। সঙ্গীতসূত্রটিকে শিল্পসুন্দর সার্থকতার দিকে এগিয়ে নিয়ে গেল শ্রীনির্মলচন্দ্র চক্রবর্তীর সেতার: ইনি বাজালেন কোমল আশাবরী। আশাবরীর এই প্রাচীন রূপটির শুদ্ধ রূপায়ণ আলাপের সুচিন্তিত বিস্তার এবং অতিরঞ্জনবর্জিত অতিদীর্ঘ গতের আধারে সুপরিবেশিত। রাগের অন্তর্নিহিত সচপল বেদনা কোমল রেখাবের শ্রুতিতে কোমল মাধুর্যের ব্যঞ্জনায় পরিব্যাপ্ত। শ্রীসুধীর চ্যাটার্জীর তবলা-সঙ্গত সংযত ও সুন্দর।

এই অধিবেশনের বিশেষ অনুষ্ঠান ছিল শ্রীউদয়শঙ্করের সম্বর্ধনাসভা ও সঙ্গীত-শাস্ত্রী কুমার বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীকে সংসদের পক্ষ থেকে 'মিউজিশিয়ান অফ বেঙ্গল' (১৯৬৮) রূপে ঘোষণা এবং স্বর্ণ-পদক দান।

স্রষ্টা ও শিল্পী উদয়শঙ্করকে মাল্য-ভূষিত করে তাঁর হাতে মানপত্র প্রদান করেন সংসদের সভাপতি শ্রীমন্মথ ঘোষ। এই উপলক্ষে উদয়শঙ্করের 'কল্পনা' চিত্রের কিয়দংশ দেখানো হয়। সৃষ্টির প্রতি যথোচিত সম্মানপ্রদর্শন করে স্রষ্টাকে অভিনন্দনজ্ঞাপনের মহৎ পরিকল্পনা সম্রদ্ধ উল্লেখের দাবী রাখে।

কুমার বীরেন্দ্রকিশোরকে 'মিউজিশিয়ান অফ বেঙ্গল' রূপে ঘোষণা অত্যন্ত যুক্তি-সঙ্গত ও বিদগ্ধের পরিচায়ক। তবে এই প্রসঙ্গে যদি বাংলাদেশের গৌরবময় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অধ্যায়ে রায়চৌধুরী পরিবারের নিরলস শিল্পসাধনা পৃষ্ঠ-পোষকতা ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুবিপুল অবদানের উল্লেখ করলে আরো সুশোভন হোত। ভারতের শিল্পাকুল গৌরীপুর স্টেটের আনুকূল্য অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে আজও স্মরণ করেন।

অনুষ্ঠানটিতে সভাপতিত্ব করেন শ্রীঅশোককুমার সরকার।

ওস্তাদ আমীর খাঁর গান দিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

সর্বভারতীয় সঙ্গীত সমাজ

শিল্পীসংখ্যা-ভারাক্রান্ত সর্বভারতীয় সঙ্গীত সমাজ ঢিমে তেতালাছন্দে যথা-রীতি শ্রোতা ও দর্শকদের বিরক্তি উৎপাদন করে দীর্ঘ সাতদিন ধরে চলেছিল। নতুনত্বের মধ্যে এবারের সঙ্গীতসভা বসেছে মহম্মদ আলি পার্কের সুবৃহৎ চত্বরে। পরিস্থিতির অনিশ্চয়তায় সব অনুষ্ঠান শোনা সম্ভব হয়নি। যেটুকু শুনেছি তার মধ্যে কিছুই যে উপভোগ্য হয়নি তাও নয়। যেমন সারা-রাত্রিব্যাপী অনুষ্ঠানে ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ ও পদ্মশ্রী নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরোদ ও সেতার। ওস্তাদ বাহাদুর খাঁর অনুষ্ঠান ছিল প্রথমার্ধে। বেহাগে আলাপ বাজিয়ে মারু বেহাগে গৎ শোনালেন। আলাপের বিস্তারে গায়কী অঙ্গের সঙ্গে রবাবের ধ্রুপদী বিস্তারে যেমন মননশীলতার পরিচয় মুদ্রিত তেমনই চিত্তগ্রাহী অনিল ভট্টাচার্যের তবলাসঙ্গতে গতের ছন্দ-বৈচিত্র্য।

আমেরিকা সফরের পর নিখিল বন্দ্যো-পাধ্যায়ের অনুষ্ঠান এই প্রথম শোনা গেল। ললিত রাগের শান্ত করুণ রস যুগল মধ্যমের শুদ্ধ, গম্ভীর শ্রুতিতে যেমন নিটোল হয়ে দানা বেঁধেছে তেমনই রং-বাহারের ঝিকিমিকি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে সিন্ধুভৈরবীর চিত্তহারী বিস্তার ও তান-বৈচিত্র্যে। শিল্পীর মেজাজে উপযুক্ত সহায়তা করেছে শ্রীশ্যামল বসুর তবলা-সঙ্গত।

শ্রীবলরাম পাঠকের সেতারবাদন তানসেন সঙ্গীত সম্মেলনের উচ্চমানে সুপ্রতিষ্ঠিত।

তরুণ শিল্পী মণিলাল নাগ—'বাগেশ্রী' বাজালেন। আলাপ ও জোড়ের অঙ্গে বিদগ্ধ ও অনুশীলনীর প্রশংসনীয় ছাপ, গতের অঙ্গও রসসমৃদ্ধ। উদীয়মান সেতার-বাদক সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নন্দকোষ' রাগ শ্রোতাদের প্রচুর প্রশংসা আদায় করেছে। 'সুরেশ চক্রবর্তী সৃষ্ট এই রাগ কণ্ঠসঙ্গীতে দু-এক শিল্পীকে গাইতে শোনা গেছে। কিন্তু সেতারে বোধহয় এই প্রথম।

হিমাংশু বিশ্বাসের 'নায়কী কানাড়া'য় তাঁর উচ্চমান অনাহত ছিল।

আর একটি তরুণ শিল্পীর অনুষ্ঠান সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সেটি হোল আশীষ গুপ্তের গীটার। গীটারের সমস্ত অবয়ব বজায় রেখেও রাগসঙ্গীতের পরিচ্ছন্ন পরিবেশনা খুব আনন্দদায়ক।

কণ্ঠসঙ্গীতের আসরে ওস্তাদ আমীর খাঁর শুদ্ধকল্যাণ ও দরবারী কানাড়া ও তারাপদ চক্রবর্তীর গুঞ্জিকানাড়া মনে রাখবার মত। একজনের নিরুত্তাপ শান্ত-বিস্তার অপরজনের তানসমৃদ্ধ ওজস। একজনের ধ্যান অপরজনের ধারণা—সঙ্গীতের এই দুটি দিক সম্বন্ধে দুই শিল্পী আমাদের অবহিত করেছিলেন। নাসির আমেদের তানের চর্কীবাজি তাক লাগাবার মতই। এম আর গৌতমের শ্যাম কল্যাণ, টপ্পা ও ঠুংরি সুরেলা কণ্ঠের মাধুর্য মন কেড়ে নিয়েছে। প্রসূন বন্দ্যো-পাধ্যায় বাগেশ্রী-এ নিষ্ঠা ও রূপদক্ষতা যথেষ্ট। মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'যোগ' তাঁর উপযুক্ত মানে পরিবেশিত।

নবাগতা শিল্পীদের মধ্যে শ্রীলা চক্রবর্তীর মালকোষ'-এ প্রতিশ্রুতির পরিচয় সুস্পষ্ট। নিদানবন্ধু বন্দ্যো-পাধ্যায়ের গানও আমাদের ভাল লেগেছে। এত বড় সম্মেলন আরও শৃঙ্খলাসুষ্ঠু হওয়া উচিত। সাংবাদিকবৃন্দের আসন আর সম্মেলন আরোও একটু ভালো হলে ক্ষতি কি? বিশেষ প্যাণ্ডেলে?

সুরমঞ্জরী বিদ্যায়তনের 'তাসের দেশ'

গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী বালিগঞ্জ শিক্ষা-সদন হলে আয়োজিত সুরমঞ্জরীর তাসের দেশ নৃত্যনাট্য উল্লেখের দাবী রাখে। হরতনীর ভূমিকায় মিতা রায়-চৌধুরীর নৃত্য অনবদ্য। রাজপুত্রের ভূমিকায় শাশ্বতা সানা ও রুইতনের ভূমিকায় শিবানী মিত্রের অভিনয় কৃতিত্বের দাবী রাখে। এছাড়া রুণা চক্রবর্তী, সুস্মিতা সোম, সম্পর্ণা লাহিড়ী প্রভৃতি স্ব-স্ব ভূমিকায় অভিনয়ে সাবলীল। সংগীত পরি-চালনায় শ্রীসৌরেন রায় শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখেন। সংগীতে কুঞ্জবিহারী সিংহ, সৌমেন ঘোষ, স্বাগতা সানা ও জয়শ্রী সেন-গুপ্ত প্রভৃতির গান উল্লেখের দাবী রাখে।

ইয়ং স্পোর্টিং ক্লাবের সঙ্গীতানুষ্ঠান

গত ২ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৮ ভবানীপুরে ইয়ং স্পোর্টিং ক্লাবের পুজোপ্রাঙ্গণে একটি বিরাট উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন

করা হয়। গতবারের ন্যায় এবারও অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন তবলা বাদক শ্রীগুলু চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন কণ্ঠসংগীতে প্রোঃ এ টি কানন, শ্রীমতী মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রো শচীন বসু, যন্ত্র-সংগীতে অংশ গ্রহণ করেন পণ্ডিত ভি জি যোগ, প্রোঃ জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, পণ্ডিত মহাপুরুষ মিশ্র, শ্রীমতী কল্যাণী রায় প্রো শংকর ঘোষ, প্রো চন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী, প্রো সুখেন্দু কর্মকার শ্রীবিশ্বনাথ সুর, শ্রীরঘুনাথ ভট্টাচার্য, শ্রীদেবু চ্যাটার্জী প্রভৃতি শিল্পীবৃন্দ ব্যবস্থাপনায় ছিলেন ক্লাবের সভ্যবৃন্দরা।

নিখিল ভারত সংগীত প্রতিযোগিতা

সুরসাগর হিমাংশু সংগীত সম্মেলনের উদ্যোগে নবম বার্ষিক নিখিল ভারত সংগীত প্রতিযোগিতা শীঘ্রই অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিযোগিতার বিষয়—কণ্ঠসংগীতঃ খেয়াল, ভজন, রাগপ্রধান, রবীন্দ্রসংগীত, আধুনিক, পল্লীগীতি, শ্যামাসংগীত, অতুলপ্রসাদ ও হিমাংশু গীতি। যন্ত্র-সংগীতঃ সেতার ও গীটার। যোগাযোগের ঠিকানাঃ রথীন চৌধুরী, সম্পাদক, ২১ই দেশপ্রিয় পার্ক রোড, কলিঃ-২৬।

বিচিত্রানুষ্ঠান

গত ৫ই ফেব্রুয়ারী বাগবাজার তরুণ পাঠাগার ও সমন্বয়ের উদ্যোগে একটি বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সংগীতে অংশগ্রহণ করেন ঃ সর্বশ্রী তপন গোস্বামী, দেবীদাস ঘোষাল, শঙ্কর দাস, অশোক দাস, হরেন গুহ, মলয় রাহা, রীতা হালদার, সুশান্ত পাল, রঞ্জিৎ বসুরায়, বিজন দত্ত, এ এস অর্কেস্ট্রা, সিন্ধময় ঘোষ, তারক সাহা (সংগতে) অরুণ চ্যাটার্জি (কৌতুক) ও বেণু সেনগুপ্ত। পরিচালনায় শ্রীকাশীনাথ।

বিদেশে ভারতীয় নৃত্যশিল্পী



নিউইয়র্ক স্টেটের উড্স্টক এদেশের সাংস্কৃতিক মহলে সুপরিচিত। গত গ্রীষ্মে ও শরতে কলকাতার নৃত্যশিল্পী শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী চাকী সরকারের দুটি নৃত্যানুষ্ঠানের পর এ অঞ্চলে ভারতীয় নৃত্য সম্বন্ধে একটি গভীর আগ্রহ ও ঔৎসুক্যের সঞ্চার হয়েছে। উডস্টকের বিখ্যাত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'পারফরমিং আর্টস অব্ ওয়ার্কশপ' উদ্বোধন করেছে। 'ওয়ার্কশপ' অর্থে এদেশে শিক্ষা-চর্চার ব্যাপক গবেষণামূলক ধারাই বোঝায়। 'পারফরমিং আর্টস অব্ উড্স্টকের আমন্ত্রণে এর পরিচালনার ভার নিয়েছেন শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী চাকীসরকার।

কেবলমাত্র ভারতীয় নৃত্য শিক্ষাদানই এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য নয়, ভারতবর্ষের সংস্কৃতির ইতিহাসে ভারতীয় নৃত্যের বিভিন্ন ভূমিকার বিশ্লেষণ, ভারতের ধর্ম-জীবনের সংগে নৃত্যের যোগাযোগ বর্ণন—এক কথায় ইতিহাসের বিস্তৃত পটভূমিকায় ভারতীয় নৃত্যের সংগে বিদেশী ছাত্রছাত্রী-দের পরিচয়সাধনই এর লক্ষ্য। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কুশলী ব্যালে শিল্পী, আধুনিক নৃত্যশিল্পী কয়েকজন আছেন।

সম্প্রতি ভারতের মন্দির ভাস্কর্যের রঙীন স্লাইডে নৃত্যভঙ্গীর বিশ্লেষণ করে শ্রীমতী সরকার কয়েকটি নূতন নৃত্য পরিকল্পনা করেছেন। কিছুদিন যাবৎ শ্রীমতী সরকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণে ভারতীয় নৃত্য পরিবেশন ও নৃত্য বিষয়ক বক্তৃতা দিয়ে আসছেন। ভবিষ্যতে ছাত্রছাত্রী সহযোগে নৃত্যানুষ্ঠানের পরিকল্পনা করছেন শ্রীমতী সরকার।



কলকাতার পৌর সম্বর্ধনা-সভায় মেয়র শ্রীগোবিন্দ দে ১৯৬৭ সালের রোভার্স এবং ডুরাণ্ড কাপ বিজয়ী ইস্টবেঙ্গল দলের অধিনায়ক প্রশান্ত সিংহকে স্মারক ট্রফি উপহার দিচ্ছেন।

খেলাধূলা

দর্শক

ভারতবর্ষ বনাম নিউজিল্যান্ড

প্রথম টেস্ট ম্যাচ

নিউজিল্যান্ড : ৩৫০ রান (গ্রাহাম ডাউলিং ১৪৩, বি ই কংডন ৫৮ এবং এম বার্জেস ৫০ রান। আবিদ আলী ২৪ রানে ৪, দেশাই ৬১ রানে ২ এবং নাদকার্নী ৩১ রানে ২ উইকেট)

ও ২০৮ রান (বি এ জি মারে ৫৪ রান। প্রসন্ন ৯৪ রানে ৬ উইকেট)

ভারতবর্ষ : ৩৫৯ রান (ওয়াদেকার ৮০ এবং ইঞ্জিনীয়ার ৬৩ রান। মজ ৮৬ রানে ৫ এবং এলাবেস্টার ৬৬ রানে ৩ উইকেট)

ও ২০০ রান (৫ উইকেটে। ওয়াদেকার ৭১ রান। এলাবেস্টার ৪৮ রানে ৩ উইকেট)

ভারতীয় ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে একটি গৌরবোজ্জল তারিখ যুক্ত হল—১৯৬৮ সালের ২০ ফেব্রুয়ারী। এইদিন ডুনেডিনের প্রথম টেস্ট খেলায় নিউ-জিল্যান্ডকে ৫ উইকেটে পরাজিত করার সূত্রে বিদেশের মাটিতে অনুষ্ঠিত সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ভারতবর্ষ প্রথম জয়ী হল। পতৌদির নবাব মনসুর আলী খুবই ভাগ্যবান, তাঁরই নেতৃত্বে ভারতবর্ষের এই জয়। পতৌদির নবাবের নেতৃত্বে ভারতবর্ষের সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলার ফলাফল দাঁড়াল: খেলা ২৬, জয় ৩, হার ১৩ এবং ড্র ১০। অর্থাৎ তাঁর নেতৃত্বে ভারতবর্ষের শতকরা ১১·৫৩ জয়। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে এই প্রথম টেস্ট ম্যাচ ধরে ভারত-বর্ষের সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলার সংখ্যা দাঁড়ালো ১০৫ এবং তার ফলাফল—ভারতবর্ষের জয় ১১, পরাজয় ৪৪ এবং ড্র ৫০। এই প্রসঙ্গে ভারতীয় সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলার ঘটনাপঞ্জীর ওপর চোখ বুলিয়ে পেলাম: (১) ১৯৩২ সালের ২৫ জুন, লর্ডস মাঠে ইংল্যান্ড-ভারতবর্ষের প্রথম টেস্ট খেলার উদ্বোধন—আন্তর্জাতিক সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলার আসরে কর্ণেল সি কে নাইডুর নেতৃত্বে ভারতবর্ষের প্রথম আবির্ভাব, (২) ১৯৫২ সালের ১০ ফেব্রুয়ারী—মাদ্রাজের পঞ্চম টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষের কাছে ইংল্যান্ডের এক ইনিংস ও ৮ রানে পরাজয়—সরকারী টেস্ট ক্রিকেটে ভারতবর্ষের প্রথম জয়—বিজয়ী ভারতবর্ষের অধিনায়ক ছিলেন বিজয় হাজারে এবং (৩) পাকিস্তানের বিপক্ষে ১৯৫২-৫৩ সালের টেস্ট সিরিজে ২-১ খেলায় (ড্র ২) জয়লাভের সূত্রে সরকারী টেস্ট ক্রিকেট সিরিজে ভারতবর্ষের প্রথম 'রাবার জয়'। এক্ষেত্রে লালা অমরনাথ ছিলেন ভারতবর্ষের অধিনায়ক। ভারতবর্ষের সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলার ঘটনাপঞ্জীতে এখনও যা প্রধান বাকি আছে তা বিদেশের মাটিতে ভারতবর্ষের টেস্ট সিরিজ জয়।

ডুনেডিনের প্রথম টেস্ট খেলায় নিউ-জিল্যান্ডের অধিনায়ক বেরী সিনক্লেয়ার টসে জয়ী হয়ে প্রথম সহড়ায় ব্যাট করার দান নিয়েছিলেন। তাদের ১ম উইকেট পড়ে যায় ৪৫ রানের মাথায়। ২য় উইকেটের জুটিতে বি ই কংডন (৫৮ রান) এবং গ্রাহাম ডাউলিং দলের ১৫৫ রান তুলে প্রাথমিক বিপর্যয় থেকে দলকে উদ্ধার করলেও পরবর্তী খেলায় পুনরায় বিপর্যয় দেখা দেয়—২০০ রানের মাথায় ২য়, ২০১ রানের মাথায় ৩য়, ২৪৩ রানের মাথায় ৪র্থ এবং ২৪৬ রানের মাথায় ৫ম উইকেট পড়ে যায়। চা-পানের সময় নিউ-জিল্যান্ডের রান ছিল ১৬৩ (১ উইকেটে)। প্রথম দিনে তাদের রান উঠেছিল ২৪৮ (৫ উইকেটে)। গ্রাহাম ডাউলিং শত রান (১৪৩) করেন।

দ্বিতীয় দিনের লাঞ্চের কিছু পরে ৩৫০ রানের মাথায় নিউজিল্যান্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হয়। অর্থাৎ এইদিনে তারা বাকি ৫ উইকেটের বিনিময়ে ১০২ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিল। আবিদ আলী ২৪ রানে ৪টে উইকেট পান—প্রথম-দিনে পান ৪ রানে ২-টো। দ্বিতীয় দিনের বাকি সময়ের খেলায় ভাবতবর্ষ প্রথম ইনিংসের ৩-টে উইকেট খুইয়ে ২০২ রান সংগ্রহ করে। ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসের সূচনা ভাল হয়নি—৩৯ রানের মাথায় ১ম উইকেট পড়েছিল। ২য় উইকেটের জুটিতে ফারুক ইঞ্জিনীয়ার (৬৩ রান) এবং অজিত ওয়াদেকার দলের ৭৯ রান যোগ করে-ছিলেন। অপর দিকে ৩য় উইকেটের জুটিতে ওয়াদেকার এবং সুর্তি সংগ্রহ করেছিলেন ৫৪ রান। দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষের ১০ মিনিট আগে ওয়াদেকার তাঁর ৮০ রান করে আউট হন। সুর্তি ২৬ রান করে অপরাজিত থাকেন।

তৃতীয় দিনে চা-পানের ঠিক আগে ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস ৩৫৯ রানের মাথায় শেষ হলে ভারতবর্ষ ৯ রানে অগ্রগামী হয়। ভারতবর্ষের ৩০২ রানের মাথায় ৯ম উইকেট পড়েছিল। শেষ ১০ম উইকেটে দেশাই এবং বেদী জুটি বাঁধেন। ভাবতবর্ষ তখনও নিউজিল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের ৩৫০ রানের থেকে ৪৮ রান পিছনে। ১০ম উইকেটের জুটিতে বেদী (২২ রান) এবং দেশাই (নটআউট ৩২ রান) দলের অতি মূল্যবান ৫৭ রান যোগ করে দলকে প্রথম ইনিংসের খেলায় অগ্রগামী হতে সাহায্য করেন। ডিক মজের বলে চোয়ালে দারুন আঘাত পেয়েও আহত দেশাই ব্যক্তিগত ৩২ রান করে যে অপরাজিত থাকেন তা তাঁর দৃঢ়তা এবং ক্ষাত্রত্বেরই পরিচয়। তৃতীয় দিনের বাকি খেলার সময়ে নিউজিল্যান্ড ২য় ইনিংসের ৩ উইকেট খুইয়ে ৮৪ রান সংগ্রহ করেছিল।

চতুর্থ দিনে লাঞ্চের পর ২০৮ রানের মাথায় নিউজিল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শেষ হয়। ৯১ রানের মাথায় ৪র্থ

এবং ৯২ রানের মাথায় ৫ম উইকেট পড়ে যায়।

খেলায় জয়লাভের প্রয়োজনীয় ২০০ রান সংগ্রহ করতে ভারতবর্ষ দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে এবং ৩ উইকেটের বিনিময়ে ১৬১ রান করে। দলের ৩০ রানের মাথায় ১ম এবং ৪৯ রানের মাথায় ২য় উইকেট পড়েছিল। ৩য় উইকেটের জুটিতে সুর্তি (৪৪ রান) এবং ওয়াদেকার দলের ১০৩ রান তুলে ভারতবর্ষকে জয়লাভের পথে এগিয়ে নিয়ে যান। এইদিন আলোর অভাবে ৬ মিনিট আগে খেলা বন্ধ হয়ে যায়। খেলায় অপরাজিত থাকেন ওয়াদেকার (৭১ রান) এবং পতৌদি (৩ রান)।

আগের দিনের রাত্রে বৃষ্টির দরুন ৫ম দিনের খেলা নির্দিষ্ট সময়ে আরম্ভ হয়নি। এইদিন খেলার গোড়ার দিকে ভারতবর্ষের দুটো উইকেট খুব তাড়াতাড়ি পড়ে যায়—দলের ১৬৩ রানের মাথায় ৪র্থ (ওয়াদেকার) এবং ১৬৯ রানের মাথায় ৫ম উইকেট (পাতৌদি) পড়েছিল। এদিকে পূর্বদিনের ১৬১ রানের (৩ উইকেটে) সঙ্গে মাত্র ৮ রান যোগ হয়েছিল। লাঞ্চের সময় ভারতবর্ষের রান ছিল ১৯৪ (৫ উইকেটে)। তখনও জয়লাভের প্রয়োজনীয় ২০০ রাণে পৌঁছতে ৬ রাণের প্রয়োজন ছিল. এদিকে হাতে জমা ছিল ৫টা উইকেট। লাঞ্চের পরই ভারতবর্ষ ২০০ রান পূর্ণ করে ৫ উইকেটে জয়ী হয়।

রঞ্জি ট্রফি ফাইনাল

মাদ্রাজ: ২৫৮ রান (প্রভাকর ৬৭ এবং ভাস্কর নটআউট ৭৬ রান। ভার্দে ৪৫ রাণে ৪ ও বালু গুপ্তে ৫৯ রাণে ৩ উইকেট)—৫ উইকেটে।

ও ৩০২ রাণ (রাজাগোপাল ৭৩, বেলিয়াপ্পা ৫১ এবং দলভি ৫১ রান। সিভালকার ৮৬ রানে ৩ এবং গুপ্তে ১২৮ রানে ৩ উইকেট)

বোম্বাই: ৩১২ রাণ (অশোক মানকাদ ১১২, মনোহর হার্দিকার ৭৩ এবং ডি আর কারথানিস ৫৩ রাণ। ভাস্কর ৬৮ রানে ৪ উইকেট)

ও ২২৫ রাণ (কারথানিস ৪৩, হার্দিকার নটআউট ৬২ এবং সোলকার নটআউট ৫৫ রান। ভেঙ্কটরাঘবন ৮৫ রানে ২ এবং কুমার ৮১ রানে ২ উইকেট)

ব্রেবোর্ণ স্টেডিয়ামে ১৯৬৭-৬৮ সালের জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে বোম্বাই প্রথম ইনিংসের রানে মাদ্রাজকে পরাজিত করে উপর্যুপরি ১০-বার রঞ্জি ট্রফি জয়ী হয়েছে এবং সেই সূত্রে একটানা বেশীবার জাতীয় ক্রিকেট চ্যাম্পিয়ান হওয়ার বিশ্ব রেকর্ড করেছে। ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড এবং পাকিস্তান—এই পাঁচটি দেশের জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার কোন একদলের পক্ষে উপর্যুপরি ১০ বার জাতীয় চ্যাম্পিয়ান হওয়া সম্ভব



রঞ্জি ট্রফি

হয়নি। গত বছর বোম্বাই রঞ্জি ট্রফি জয়লাভের সূত্রে অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলসের বিশ্ব রেকর্ড (উপর্যুপরি ৯-বার জাতীয় ক্রিকেট চ্যাম্পিয়ান) স্পর্শ করেছিল। এ বিষয়ে পূর্বের বিশ্ব রেকর্ড ছিল ইংলিশ কাউন্টি ক্রিকেট লীগে সারে দলের—উপর্যুপরি ৭-বার কাউন্টি লীগ চ্যাম্পিয়ান (১৯৫২-৫৮)। সারে দলের এই বিশ্ব রেকর্ড ভেঙেছিল নিউসাউথ ওয়েলস ১৯৬১ সালে—উপর্যুপরি ৮-বার শেফিল্ড শীল্ড জয় করার সূত্রে। নিউসাউথ ওয়েলস ১৯৬২ সালেও শেফিল্ড শীল্ড জয়ী হয়েছিল।

আলোচ্য ১৯৬৭-৬৮ সালের জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় বোম্বাই দলের পক্ষে রঞ্জি ট্রফি জয় খুবই কৃতিত্বের পরিচয় এই কারণে যে, তাদের ৬ জন খ্যাতনামা খেলোয়াড় খেলেননি, তাঁরা ভারতীয় ক্রিকেট দলের সঙ্গে নিউজিল্যান্ড সফর করছেন।

বোম্বাই দলের অধিনায়ক মনোহর হার্দিকার টসে জয়ী হয়েও মাদ্রাজ দলকে ব্যাট করার দান ছেড়ে দেন। মাদ্রাজের প্রথম ইনিংসের সূচনা মোটেই সুবিধার হয়নি: মাত্র ৫৫ রানের মাথায় ৫ম উইকেট পড়ে যায়। শেষপর্যন্ত নীচের দিকের তিনজন খেলোয়াড় মাদ্রাজের মুখরক্ষা করেছিলেন। ৯ম উইকেটের জুটিতে প্রভাকর এবং ভাস্কর ৮৭ রান এবং ১০ম উইকেটের জুটিতে কুমার এবং ভাস্কর ৬২ রান যোগ করেছিলেন। ভাস্কর ৭৬ রান করে অপরাজিত থাকেন। প্রথম দিনেই ২৫৮ রানের মাথায় মাদ্রাজের প্রথম ইনিংস শেষ হলে বোম্বাই দুটো উইকেট খুইয়ে মাত্র ৭ রান সংগ্রহ করেছিল।

দ্বিতীয় দিনে বোম্বাইয়ের ২১৪ রান (৪ উইকেটে) দাঁড়ায়। ৪র্থ উইকেটের জুটিতে তরুণ খেলোয়াড় অশোক মানকাদ (১১২ রান) এবং অধিনায়ক হার্দিকার দলের ১৬৮ রান যোগ করেন।

তৃতীয় দিনে ৩১২ রানের মাথায় বোম্বাইয়ের প্রথম ইনিংস শেষ হলে তারা ৫৪ রানে অগ্রগামী হয়। অপরদিকে মাদ্রাজ দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় কোন উইকেট না খুইয়ে ১১১ রান সংগ্রহ করেছিল।

চতুর্থ দিনে মাদ্রাজ তাদের প্রাধান্য বজায় রাখতে পারেনি। তাদের দ্বিতীয় ইনিংস চা-পানের ১৫ মিনিট পর ৩০২ রানের মাথায় শেষ হয়। চতুর্থ দিনে ১৯১ রানের বিনিময়ে তাদের ২য় ইনিংসের ১০টা উইকেট পড়ে যায়—৮৭·৪ ওভারের খেলায়। খেলায় সরাসরি জয়লাভের প্রয়োজনীয় ২৪৯ রান তুলতে বোম্বাই দ্বিতীয় ইনিংস

'রূপা'র বই

॥ জীবনী ॥

এস· কে· প্যাডোভার

অনু: অজিতকৃষ্ণ বসু

দ্বাদশ সূর্য

সূর্যালোকের মতই মহান মানুষের মহৎ ভাবনার আলোকধারা দূর করে অজ্ঞানতার অন্ধ-তামস। দেশ কাল ব্যক্তির ওপর তার পক্ষপাতহীন অসীম প্রভাব। ..'দ্বাদশ সূর্য' তেমনি বারোজন মনীষীর কালোত্তীর্ণ চিন্তাধারার অসামান্য আলোক-বিচ্ছুরণ।

[৪·৫০]

আমাদের প্রকাশনায় অনুবাদকের আরও কয়েকখানি গ্রন্থ:—

হেনরি জেমস-এর

প্রেম এক মন্ত্র (উপন্যাস) ৪·৫০

শেষ বসন্ত (উপন্যাস) ৪·০০

শহরতলির শয়তান (গল্প) ৪·৫০

যাদু-কাহিনী (যাদুকর ও যাদুবিদ্যার বিচিত্র কথা। নরসিংদাস পুরস্কারপ্রাপ্ত)। ৮·০০

আমাদের পূর্ণ গ্রন্থতালিকার জন্য লিখুন



রূপা অ্যান্ড কোম্পানী

১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২

Phone : 34-4821 • 34-6305



জাপানের টেবল টেনিস দল : ভারত সফরে তারা পাঁচটি টেস্টের প্রতিটিতে ৫-০ খেলায় ভারতবর্ষকে পরাজিত করে 'রাবার' জয়ী হয়েছে। দলের সঙ্গে ৩ জন ভারতীয় খেলোয়াড় আছেন।

খেলতে নেমে একটা উইকেট খুইয়ে ৪৫ রান তুলেছিল।

পঞ্চম অর্থাৎ শেষ দিনে বোম্বাই দলের দ্বিতীয় ইনিংসের ২২৫ রানের (৫ উইকেটে) মাথায় খেলা শেষ হলে বোম্বাইয়ের সরাসরি জয়লাভ হল না, আরও ২৪ রান করার প্রয়োজন ছিল। এই দিন বোম্বাই দারুণ বিপর্যয়ের মুখে পড়েছিল—যেখানে এক সময়ে ১ উইকেট পড়ে তাদের ৯৪ রান ছিল, সেখানে দেখা গেল ১০৯ রানের মাথায় ৫ম উইকেট পড়েছে। শেষ-পর্যন্ত ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে হরদিকার (নট আউট ৬২) এবং সোলকার (নট আউট ৫৫) দলের পতন রোধ করেন। তাঁরা ২৩২ মিনিটে দলের ১১৬ রান তুলে দিয়ে অপরাজিত থাকেন।

জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা

ওয়েলিংটনে (উতকামণ্ড) ১৯৬৮ সালের জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে রেলওয়ে দল ১—০ গোলে মহীশূরকে পরাজিত করে দ্বিতীয়বার উপর্যুপরি তিন বছর রঙ্গস্বামী কাপ জয়ের গৌরব লাভ করেছে। ১৯৬৬ সালে সার্ভিসেস এবং ১৯৬৭ সালে মাদ্রাজ দলের সঙ্গে তারা যুগ্ম-বিজয়ী হয়েছিল। তবে রেলওয়ে ইতিপূর্বে একক দল হিসাবে উপর্যুপরি তিন বছর (১৯৫৭—৫৯) রঙ্গস্বামী কাপ জয়ী হয়েছে। তারা জাতীয় হকি প্রতিযোগিতায় প্রথম চ্যাম্পিয়ান হয় ১৯৩০ সালে, প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় বছরে। এপর্যন্ত রেলওয়ে দল ১০-বার জাতীয় হকি চ্যাম্পিয়ান হয়ে সর্বাধিকবার খেতাব জয়ের রেকর্ড করেছে। তাদের পরই পাঞ্জাবের সাফল্য—৯-বার জয়।

বাংলার খেলা

বাংলা দল 'গ' অঞ্চলের লীগ খেলায় অংশগ্রহণ করে চ্যাম্পিয়ান দল হিসাবে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছিল। কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ২—২ ও ০—৪ গোলে রেলওয়ে দলের কাছে পরাজিত হয়। এপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, বাংলা দল এপর্যন্ত তিনবার (১৯৩৬, ১৯৩৮ ও ১৯৫২/ জাতীয় হকি চ্যাম্পিয়ান হয়েছে।

উতকামণ্ডের নিকটবর্তী আরাভান-কাডু এবং ওয়েলিংটনে ১৯৬৮ সালের জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার আসর বসে। গত ১লা ফেব্রুয়ারী থেকে অলিম্পিক প্রথায় প্রতিযোগিতার খেলা সুরু হয়েছিল। প্রথমে মোট ২৬টি দল প্রতিযোগিতায় নাম দিয়েছিল; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনটি দল—বিহার, রাজস্থান এবং সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় দল প্রতিযোগিতা থেকে নাম প্রত্যাহার ক'রে নেওয়াতে অবশিষ্ট ২৩টি দলকে ৪টি অঞ্চলে ভাগ ক'রে লীগ প্রথায় খেলানো হয়েছিল। প্রতি অঞ্চলের চ্যাম্পিয়ান এবং রানার্স-আপ দল কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করে।

আঞ্চলিক লীগ পর্যায়ের খেলার তালিকা এইভাবে তৈরী হয়েছিল :

'ক' অঞ্চল (দক্ষিণ) : মহীশূর, হায়দরাবাদ, মাদ্রাজ, অন্ধ্র এবং কেরালা

'খ' অঞ্চল (উত্তর) : সার্ভিসেস, পাঞ্জাব, ভূপাল, মধ্যভারত, দিল্লী, পাতিয়ালা এবং জম্মু-কাশ্মীর

'গ' অঞ্চল (পূর্ব) : বাংলা, উত্তরপ্রদেশ আসাম, উড়িষ্যা এবং মধ্যপ্রদেশ

'ঘ' অঞ্চল (পশ্চিম) : রেলওয়ে, বোম্বাই, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, গোয়া এবং বিদর্ভ

কোয়ার্টার ফাইনাল

লীগের খেলায় 'ক' অঞ্চল থেকে মহীশূর এবং হায়দরাবাদ, 'খ' অঞ্চল থেকে সার্ভিসেস এবং পাঞ্জাব, 'গ' অঞ্চল থেকে বাংলা এবং উত্তর প্রদেশ এবং 'ঘ' অঞ্চল থেকে রেলওয়ে এবং বোম্বাই দল কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছিল। কোয়ার্টার ফাইনালের খেলায় পাঞ্জাব ২-১ গোলে হায়দরাবাদ, মহীশূর ১—০ গোলে সার্ভিসেস, রেলওয়ে ২—২ ও ৪—০ গোলে বাংলা এবং বোম্বাই ০—০ ও ২—১ গোলে উত্তরপ্রদেশকে পরাজিত করে সেমি-ফাইনালে উঠেছিল। সেমি-ফাইনালে রেলওয়ে ১—০ গোলে পাঞ্জাব এবং মহীশূর ১—০ গোলে বোম্বাইকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছিল। মহীশূরের পক্ষে এই প্রথম ফাইনাল খেলা।

অমৃত পাবলিকেশন্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

॥ নূতন বই ॥

নীরদচন্দ্র চৌধুরীর প্রথম বাংলা বই

বাঙালী জীবনে রমণী ৯·০০

লীলা মজুমদারের সুধাক্ষরা লেখনীর
সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান
আর কোনোখানে ৫৲

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
নূতন উপন্যাস
আঁধি ৭৲

প্রবোধকুমার সান্যালের
চাঞ্চল্যকর নূতন উপন্যাস
নগরে অনেক রাত ৪·৫০

রমাপদ চৌধুরীর নূতন উপন্যাস
জরির আঁচল ৪৲

জরাসন্ধের উপন্যাস
বন্যা (মুদ্রণ নূতন) ৪৲

তারাশঙ্করের চিরনূতন উপন্যাস
রাধা (নূতন মুদ্রণ) ৮৲

উত্তরায়ণ ৫॥০ অভিযান ৫৲

॥ নূতন মুদ্রণ ॥

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
অপরাজিত ১০৲

প্রবোধকুমার সান্যালের
বিবাগী ভ্রমর ৮৲

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের
বহু প্রশংসিত উপন্যাস
ঈষ্ট বাকল্যাণ্ড রোড (সংশোধিত নূতন সং) ৮৲

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের জীবন-মহাকাব্য
পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ (১ম খণ্ড) ৬৲
দ্বিতীয় খণ্ড—৬৲ ঃ তৃতীয় খণ্ড—৬৲ ঃ চতুর্থ খণ্ড—৬৲

প্রমথনাথ বিশীর
সিন্ধুনদের প্রহরী ৩॥
রবীন্দ্র সরণী ১০৲

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
একদা কী করিয়া ১৩৲

আশাপূর্ণা দেবীর
সুবর্ণলতা (নূতন মুদ্রণ যন্ত্রস্থ) ১৩৲

ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের
ধর্মে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ৫৲

সুমথনাথ ঘোষের
বনরাজীনীলা ৭৲ বাঁকাস্রোত ৬॥০

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
নগরপারে রূপনগর (দ্বিতীয় মুদ্রণ) ১৮৲

জরাসন্ধের
লৌহকপাট (সম্পূর্ণ) ২০৲

বিমল মিত্রের
একক দশক শতক ১৪৲
সখী সমাচার ৬৲ বেনারসী ৫৲

তারাশঙ্করের
গন্নাবেগম ৮৲ শুকসারী কথা ৮॥০

মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২ ফোন ঃ ৩৪-৩৪৯২ ৩৪-৮৭৯১



নির্মল বার সাবানে কাচালে
আপনার কাপড়-জামা হবে
ধবধবে ফরসা
হালকা সুগন্ধে ভরপুর





— বার সাবানে কাচা কাপড়-জামা দেখতে ঝকঝকে পরিষ্কার হয়, আর সদ্য ধোয়ার সুগন্ধে ভরে উঠে।

নির্মল বার সাবানে চটপট ফেনায় ফেনা হয় আর সেই ফেনায় তেলকালি ও ধুলোময়লা অনায়াসে বেরিয়ে যায়। আপনার কাপড়-জামা ঝকঝকে তকতকে দেখায়, সদ্য ধোপ দেওয়ার সুবাসে ভরে থাকে।

নির্মল দিয়ে কাচলে পয়সারও সাশ্রয় হয়। সে বেশী দিন চলে—সাবানটি শক্ত থাকে, তাড়াতাড়ি ক্ষয়ে যায় না।

নির্মল
—পূর্ব ভারতে এই বার সাবানই
কাটতিতে সবার ওপরে

কুসুম প্রোডাক্টস লিমিটেড, কলিকাতা-১

৭ম বর্ষ
৪র্থ খণ্ড

অমৃত

৪৪শ সংখ্যা
মূল্য
৪০

Friday, 8th March 1968. শুক্রবার, ২৪শে ফাল্গুন, ১৩৭৪ 40 Paise.

দোলে ফাল্গুন-চৈত্রব্যাপী
১৫% কমিশন
ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথ-কৃত
শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
৬খণ্ড • ৪র্থ সংস্করণ • ১২৫ স্থলে ১০৩.২৫
শ্রীচৈতন্যভাগবত
৬খণ্ড • প্রথম প্রকাশ • ৯৮ স্থলে ৮৩.০০
মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ
৪০ স্থলে ৩৪.০০
রাজমোহন নাথ-কৃত
প্রাথপথের প্রাচীন পুঁথি ৬.৫০
RIGVEDA SUMMARY 8.00
KESHOBKANTO'S
MESSAGE OF THE GITA 12.00
সাধনা প্রকাশনী
৬১ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট: কলি ৯
ফোন : ৩৪-৩১৬৬

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীধ্রুব রায়

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের
বিচিত্র কাহিনী
(৪র্থ সংস্করণ)
নবীন ও প্রবীণদের সমান
আকর্ষণীয়
অজস্র চিত্র সম্বলিত
বিচিত্র গল্পগ্রন্থ। মূল্য : দুই টাকা
লেখকের
আর একখানা বই
আরও বিচিত্র কাহিনী
অসংখ্য ছবিতে পরিপূর্ণ
দাম : তিন টাকা
প্রকাশক :
এম সি. সরকার এণ্ড সন্স
প্রাইভেট লিমিটেড
সকল পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

অমৃতবাজার পত্রিকা শতবর্ষ সংখ্যা প্রসঙ্গে

(১)

বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ জাতীয়তাবাদী পত্রিকার সম্মান অমৃতবাজার পত্রিকার। বৃটিশ শাসন এবং শোষণের দিনগুলিতে একনিষ্ঠভাবে জাতীয় জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং ব্যথা-বেদনাকে প্রকাশ করে অমৃতবাজার এই দুর্লভ সম্মান অর্জন করেছিল। সেই পত্রিকার শতবার্ষিকী নিঃসন্দেহে জাতীয় উৎসব। সেই উৎসবের ব্যাপকতার মধ্যে অমৃতের অমৃতবাজার পত্রিকা শতবর্ষ সংখ্যাটি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী।

এই পত্রিকা সম্পর্কে জ্ঞাত-অজ্ঞাত অনেক তথ্যে এই সংখ্যাটি সমৃদ্ধ। স্বদেশে বিদেশে এই পত্রিকার প্রকাশিত সংবাদ তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এ সম্পর্কে রুশ বিপ্লবের নায়ক মহামতি লেনিনের উক্তি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। পত্রিকায় প্রকাশিত জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিবরণ পড়ে তিনি একে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় পত্রিকা বলে অভিহিত করেছেন।

বিদেশী শাসকদের অত্যাচার এবং এবং অনাচারের বিরুদ্ধেই পত্রিকার অভিযান ছিল সর্বাপেক্ষা সোচ্চার। ইংরেজ রাজপুরুষেরা পত্রিকার প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে সর্বদা তটস্থ থাকতেন। পত্রিকা যেন তাঁদের চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। তাঁরা অনেক চেষ্টা করেও পত্রিকাকে বাগে আনতে পারেননি। আর পারবেনই বা কি করে। শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্যই তো অমৃতবাজারের জন্ম। নীলকর সাহেবদের অত্যাচার-পীড়িত চাষীদের কথা সভ্যসমাজে প্রকাশ করার সংকল্প নিয়েই যে মহাত্মা শিশিরকুমার এই পত্রিকার সূচনা করেন। বর্তমান কালের ব্যক্তিদের মতামত এসম্পর্কে যথেষ্ট কৌতূহল সঞ্চার করে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 'অমৃতবাজার পত্রিকা শতবার্ষিকী স্মরণে' প্রবন্ধে বলেছেন, 'দেশের দরিদ্র, আর্ত সাধারণ মানুষের উপর রাজশক্তি বা রাজকর্মচারীদের যে উদ্ধত অত্যাচার তার প্রতিকারে কেউ এক পা বাড়াতেন না বা একটি কণ্ঠেও প্রতিবাদ বাণী ধ্বনিত হত না। অমৃতবাজার প্রকাশ করেছিলেন ঘোষ ভ্রাতৃবৃন্দ, এই বোবা বেদনা ও ক্ষোভকে ভাষা দেবার জন্য।' অমৃতবাজারের পক্ষে এই উক্তি যে কি বিরাট সত্য বহন করে তা শতবর্ষের পরিচয়ে স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারা যায়।

বিদেশী শাসকদের নিগ্রহের ভয়ে সত্য প্রকাশে অমৃতবাজার কখনও বিরত বা পেছপা হয়নি। বরং সাহসের সঙ্গে সত্য প্রকাশ করে এই পত্রিকার রাজরোষে পড়ার কাহিনী সর্বজনবিদিত। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের সংবাদ প্রকাশের পর পত্রিকার উপর রাজরোষ নেমে আসে এবং জামানত বাজেয়াপ্ত হয়। আবার একবার বিচারপতি ও সরকারী কর্মচারীদের সম্পর্ক নিয়ে একটি সংবাদ প্রকাশ করায় সম্পাদক ও মুদ্রাকর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। তবু রাজপুরুষদের অনেকে এই পত্রিকার আত্মমর্যাদাবোধ এবং স্বাধীনতা-প্রীতিকে গভীর মর্যাদার চোখে দেখতেন। জনৈক ইংরেজ বড়লাটের উক্তি এক্ষেত্রে স্মরণীয়। তিনি বলেছিলেন, সকালে অমৃতবাজার পত্রিকা না দেখলে গোটা দিনটাই তার ফাঁকা ফাঁকা লাগে। এই তথ্যটি আমরা জানতে পারি স্বর্গত সুধীরচন্দ্র সরকারের সাক্ষাৎকার থেকে। এই প্রশস্তি সে সময়ে অচিন্ত্যনীয় কারণ বৃটিশ সরকারের সবচেয়ে কড়া সমালোচক ছিল অমৃতবাজার। কিন্তু জাতির জীবনে এর স্থানকে স্বীকার করে লাটসাহেব একথা বলেছিলেন।

'পুরাণ-মহিমায়' সামান্য কটি কথায় পত্রিকার সুবিস্তৃত জীবনের পরিচয় দিতে গিয়ে শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র বলেছেন, 'নীলকরের অত্যাচারের বিরুদ্ধে এ কাগজ আগুন হয়ে জ্বলেছে। ভার্ণাকুলার প্রেস অ্যাক্টের অপমান ও নির্লজ্জ অবিচারের জবাব দিয়েছে রাতকে দিন করার মত অবিশ্বাস্য অসাধ্য সাধনে। ইলবার্ট বিল আন্দোলনের সমর্থনে সমস্ত দেশের আত্মমর্যাদাবোধ তীব্র করে তুলেছে, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের বিবরণ শোনাবার গৌরব লাভ করেছে, বঙ্গ-ভঙ্গের আন্দোলনে জয়-পতাকার উদ্দীপনা সঞ্চারিত করেছে সমস্ত দেশবাসীর চিত্তে। শতবর্ষের সাধনায় বাঙালী তথা ভারতীয় জীবনে পত্রিকা যে কি বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে এ থেকে তা বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না। পত্রিকার নিগ্রহ ও আত্মরক্ষার কাহিনী এর জীবনবেদকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। সেই সঙ্গে প্রায় সমগ্র দেশের মতামতকে প্রতিফলিত করার চেষ্টা হয়েছে 'অমৃতের' এই সংখ্যায়। জাতীয় পত্রিকা অমৃতবাজারের মহিমা-কীর্তনে 'অমৃতে'র এই সাধু প্রয়াস সম্পূর্ণ সফল হয়েছে একথা বলতে কোন আপত্তি নেই। সময়োপযোগী এই সংখ্যাটির জন্য 'অমৃত' কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ।

রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
কলকাতা-২৯।

(২)

গত ৩রা ফাল্গুনে ১৭৪ এবং অমৃতবাজার পত্রিকার শতবর্ষ উপলক্ষে 'অমৃতে'র বিশেষ সংখ্যাটি পাঠ করে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করলাম। মনটা গর্বে ও আনন্দে ভরে উঠলো যখন ভাবলাম যে বাঙালী প্রতিষ্ঠিত এক ইংরেজী সংবাদপত্র তার শতবর্ষপূর্তি উৎসব উদযাপন করছে। উক্ত সংখ্যার প্রতিটি রচনা তথ্যপূর্ণ, সুচিন্তিত ও মনোজ্ঞ। কৌতূহলী পাঠকের অমূল্য-সম্পদ। চিত্রের মাধ্যমে নানা উল্লেখযোগ্য ঘটনার সার্থক পরিবেশন অপূর্ব।

শতবর্ষ পূর্বে যে পরিবেশে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র শুভাবির্ভাব তা সত্যই আজ আমাদের স্মরণীয়। পরাধীন ভারতবর্ষ। বিদেশী শাসকের শোষণে সমগ্র জাতি নিপীড়িত অত্যাচারিত। বেদনার ভাষা প্রকাশের সার্থক বাহনের অভাব। সেই সময়ে এর জন্ম। এক গ্রামে। নানা অত্যাচারে নিপীড়িত ভারতবাসীর পরম কল্যাণকামী সার্থক বন্ধু এই পত্রিকা।

যে কোন জাতিকে সার্থকভাবে গড়ে ওঠার কাজে সংবাদপত্রের এক বিশেষ ভূমিকা আছে। সংবাদপত্র জাতিকে সকল প্রকার কুসংস্কার ও সংকীর্ণতার অন্ধকারময় পরিবেশ থেকে মুক্ত করে এক মহান উদার উন্নত জাতিতে পরিণত হবার পথ নির্দেশ দেয়। অমৃতবাজার পত্রিকা এ সত্য প্রমাণিত করেছে। পত্রিকাটি পরাধীন জাতিকে বিদেশী শাসকের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে আহ্বান জানিয়েছে আবার স্বাধীন ভারতকে কিভাবে আরও উন্নত ও সমৃদ্ধ করা যায় তার জন্য সুচিন্তিত পথনির্দেশ দিয়ে চলেছে।

অমৃতবাজার পত্রিকার শতবর্ষের ইতিহাস এক সংগ্রামের ইতিহাস। পত্রিকাটির স্পষ্টবাদিতা ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভংগি প্রতিটি পাঠক-মনে গভীর রেখাপাত করে।

আজ সশ্রদ্ধ-চিত্তে স্মরণ করি পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষকে।

রাধারাণী দেবীর কথা উচ্চারণ করে বলি—অনেক দুঃখ লাঞ্ছনা, ক্ষয়ক্ষতি দুর্যোগ উদ্বেগের কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে অমৃতবাজারকে একশো বছর হেঁটে আসতে হয়েছে। আজ সমস্ত দেশবাসীর উচিত তাঁকে আন্তরিক শ্রদ্ধা-অভিনন্দনে অভিনন্দিত করে জয়ধ্বনি উচ্চারণ করা। কারণ, এই কাগজটির সংগে কেবলমাত্র বাঙালী জাতিরই নয়, সারা ভারতবাসীরই পুরুষানুক্রমিক যোগ।

অমৃতে'র বিশেষ সংখ্যাটির জন্য ধন্যবাদ জানাই।

বিদ্যুৎকুমার চট্টোপাধ্যায়,
আমতা ঃ হাওড়া।

সম্পাদকীয়

নিজের এলাকার অধিকার

ঘটনাটি হয়তো সরকারী দৃষ্টিতে সামান্য, কিন্তু জনসাধারণের কাছে তাই হয়ে দাঁড়িয়েছে উদ্বেগের কারণ। তিন বছর আগে কচ্ছের রান নিয়ে যখন পাকিস্থান গোলমাল শুরু করে এবং পরে চালায় সামরিক আক্রমণ, তখনও জনসাধারণ জানতই না যে, সীমানা নিয়ে কোনো বিরোধ আছে কচ্ছ অঞ্চলে। পরে ধীরে ধীরে প্রকাশ পায় যে, কয়েক বছর আগেই একবার সর্দার স্বরণ সিং মহাশয় রাওয়ালপিন্ডিতে গিয়ে আলোচনার সময় বলে এসেছিলেন যে, কচ্ছের রান এলাকার সীমারেখা নির্ধারণে পাকিস্থানের সঙ্গে আলোচনায় ভারত রাজী। সেখানেই তো পরোক্ষভাবে বিরোধের সমস্যা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল।

একই ব্যাপার ঘটেছিল বেরুবাড়ির বেলায়। পাকিস্থান বলেছিল, পশ্চিমবঙ্গের এই সীমান্ত গ্রামটি নিয়ে বিরোধ আছে। ভারত সরকার তা স্বীকার করে নিয়ে বেরুবাড়ি তাদের হাতে তুলে দেবার জন্য প্রস্তুত হলেন। জনসাধারণের পক্ষ থেকে আপত্তি না তুললে এতদিনে বেরুবাড়িতে পাকিস্থানের প্রভুত্ব কায়েম হত। আকসাই চীনের সড়ক নির্মাণের ঘটনা তো কর্তব্যচ্যুতি ও গাফিলতির ঐতিহাসিক নজীর হয়ে আছে।

সরকারপক্ষ থেকে বলা হয় যে, আন্তর্জাতিক চুক্তি বা সালিশীর রায় ভারতকে মানতে হবে। নতুবা দুনিয়ার সামনে ভারতের মর্যাদাহানি ঘটবে। এই কথাগুলো শুনতে ভাল। ন্যায়নীতি অনুসরণ করা সবারই উচিত। কিন্তু সরকারী গাফিলতি বা অক্ষমতার ফলে যদি দেশের মানুষের ক্ষতি হয়, তাহলে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার অধিকার জনসাধারণের আছে। "সদা সতর্কতাই স্বাধীনতার মাশুল" একথা একটি শিশুরাষ্ট্র পর্যন্ত জানে। ভারত সরকারের নেতাদের মুখেও আমরা হরদম এই ধরনের আপ্তবাক্য শুনতে অভ্যস্ত। এই সতর্কতা শুধু কামান-বন্দুক-ফৌজ দিয়ে সীমান্ত পাহারা দিলেই হয় না। রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান, তার ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক ও চিরাচরিত অধিকার সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকাও রাষ্ট্রনেতাদের উচিত।

সম্প্রতি পক প্রণালীতে অবস্থিত একটি ছোট দ্বীপ, যার নাম কচ্ছতিভু, নিয়ে তেমনি এক দুশ্চিন্তা দেখা দিয়েছে। এ নিয়ে লোকসভায় তুমুল বিতর্ক হয়ে গেছে। সরকারপক্ষ কোনো সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেননি। দ্বীপটি আকারে ছোট, তাতে কোনো জনবসতি নেই বলে প্রকাশ। থাকার মধ্যে রোমান ক্যাথলিকদের একটি গীর্জা। প্রতি বৎসর মার্চ মাসে এই দ্বীপের গীর্জায় সন্ত এন্টনীর স্মরণোৎসব উদ্যাপন করতে ভারত ও সিংহল উভয় দেশ থেকেই লোক যায়। এবারে সিংহল সরকার নাকি দ্বীপটির ওপর তাদের অধিকার কায়েম করার জন্য ক্যাথলিক উৎসবের সময়ে পুলিশ-পেয়াদা পাঠাবেন। সিংহলের একটি পত্রিকায় খবরটি বের না হলে হয়তো ভারত সরকার জানতেই পারতেন না ওই দূরতর নির্জন দ্বীপে কী ঘটতে চলেছে।

ভারত সরকার অবশ্য বলছেন যে, উদ্বেগের কোনো কারণ নেই। সিংহল সরকার একতরফা কিছু করবেন না বলে তাদের বিশ্বাস। তা বিশ্বাস করে সরকার যদি স্বস্তি পান বলার কিছু নেই। কিন্তু জনসাধারণের উদ্বেগও যথার্থ। কারণ, এ ধরনের ঘটনা আগে ঘটেছে এবং প্রতিবারেই ভারতকে অনেক খেসারৎ দিতে হয়েছে গাফিলতির জন্য। এবারেও যে তারই পুনরাবৃত্তি ঘটবে না, নিশ্চয়তা কি? শোনা যাচ্ছে, ভারত সরকার নাকি এ নিয়ে সিংহল সরকারের সঙ্গে আলোচনার উদ্যোগ করছেন। যদি দ্বীপটি ভারতেরই হয়, তাহলে আর আলোচনা কেন, তাকে দখলে রাখার জন্য ব্যবস্থা অবিলম্বে নিতে বাধা কোথায়? আর যদি এ নিয়ে বিরোধ থাকে, তাহলে এতদিন তা নিষ্পত্তি না করে ফেলে রাখা হয়েছে কেন? অমীমাংসিত বিরোধের ক্ষত কতদূর প্রসারিত হতে পারে তার জ্বলন্ত প্রমাণ কাশ্মীর। সালিশীতে গেলে কী ফল হয়, তার নজীর কচ্ছ ট্রাইব্যুনাল। এরপরেও কি আমাদের বলতে হবে যে, আমাদের রাষ্ট্র-পরিচালকরা নিজের দেশের সার্বভৌম অধিকারের সীমানা সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিফহাল? নিজের এলাকা সম্পর্কে নিজেদের ধারণা যদি স্পষ্ট না থাকে তাহলে এমন বিড়ম্বনা ঘটবেই। যে-কোনো স্বাধীন দেশের পক্ষে এ ধরনের শিথিলতা অত্যন্ত লজ্জাকর। ভারতের জনসাধারণ তার সরকারকে যথাসময়ে সতর্ক করে দিয়েছে। এখন সরকারকে তার দায়িত্ব পালন করতে হবে। প্রতিবেশীর সঙ্গে সৌহার্দ্য বজায় রাখতে আমরা নিশ্চয়ই চাইব। কিন্তু নিজের জমির বিনিময়ে, নিজের সার্বভৌম অধিকার খর্ব করে তা কখনই চাইব না। ভারত সরকার এ বিষয়ে সতর্ক হোন। ছোট বিরোধ থেকেই বৃহত্তর বিরোধের উৎপত্তি হয়। তাকে অবহেলা করা নিজের নিরাপত্তাকেই বিঘ্নিত করার শামিল।



ভিয়েৎনাম : পঁচিশ বছরের লড়াই

সুধীরকুমার সেন

১৯৫০ সালে ফরাসী প্রধানমন্ত্রী রেনে প্লেভার ওয়াশিংটনে বলেছিলেন যে, কম্যুনিজম যাতে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া গ্রাস এবং ভারতের পার্শ্বদেশ বিপন্ন না করতে পারে সেই জন্যই ফ্রান্স ভিয়েৎনামে যুদ্ধ করছে।

কথাটা অবশ্য সত্য ছিলো না। ফ্রান্স লড়াই করেছিল ভিয়েৎনামে থাকার জন্য। কিন্তু থাকা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি, পর [illegible] দিয়েনবিয়েনফুর বিপর্যয়ের পর ইন্দোচীন থেকে তাকে বিদায় নিতে হয়। ফ্রান্সের সেদিনকার আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ঘটনাও সেই বিদায়কে আরো অপরিহার্য করে নিশ্চিত করেছিল। কিন্তু ভিয়েৎনামে আমেরিকা আজ যে লড়াই করছে তাকি সেখানে থাকার জন্যে না বেরিয়ে আসার জন্যে? দেশে ও বিদেশে—এমনকি খাস ভিয়েৎনামেও ঘটনাচক্র আজ তার এমন প্রতিকূলে যে ভিয়েৎনামে আবার সেই দিয়েনবিয়েনফুর পুনরাবৃত্তির সন্দেহ অনেকের মনে দোলা দিচ্ছে। শঙ্কা যে শুধু অপরের তা নয়, সম্ভবত প্রেসিডেন্ট জনসনেরও, যেজন্য তিনি খে সানের গুরুত্বপূর্ণ মার্কিন ঘাঁটি-রক্ষী সেনাপতিদের কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি আদায় করেছেন যে, খে সান তারা প্রাণপণে রক্ষা করবেন। মার্কিন সমরনায়করা বলছেন, খে সানে দিয়েনবিয়েনফু হবে না, বরং এই আক্রমণ কম্যুনিস্টদের পক্ষে 'বে অব পিগস' (কেনেডির হুমকীতে ক্রুশ্চেভের কিউবা থেকে সোভিয়েট মিসাইল অপসারণের ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত) হবে। দুই পক্ষেরই এই দাবী ও পাল্টা দাবীর অন্তরালে ভাগ্যদেবতা ভিয়েৎনামবাসীদের জন্য নতুন কোন দুর্ভাগ্য অথবা সৌভাগ্যের ভূমিকা রচনা করছেন তা অবশ্য আজ সকলেরই অগোচরে।

পঁচিশ বছরের যুদ্ধ

ভিয়েৎনামবাসীদের দুর্ভাগ্য অবশ্য নতুন নয়। দঃ ভিয়েৎনামে আজ যাদের বয়স পঁচিশ বছর হয়েছে তারাও সেই যুদ্ধের মধ্যেই জন্মেছিল। এই নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধের মধ্যে দেশ পুনর্গঠনের কোনো অবকাশ আসে না। দঃ ভিয়েৎনামের এক কোটি সত্তর লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে প্রায় এক-চতুর্থাংশই (চল্লিশ লক্ষ) আজ উদ্বাস্তু। শস্যক্ষেত্র উজাড়, শিল্প বিধ্বস্ত। যুদ্ধ চালাতে মার্কিন সরকার দিনে যে ২০ লক্ষ ডলার ভিয়েৎনামে খরচ করে তারি ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে, ভিয়েৎনামীদের জীবন, সরকারী কর্মচারীদের বিলাসব্যসন, দুর্নীতি, ব্যবসায়ীদের মুনাফাবাজি, কালোবাজার।

ফরাসী বিদায়

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ইউরোপে ফরাসী শক্তির পতনের পরই জাপান এসে ইন্দোচীন দখল করে। ১৯৪৫ সালে জাপানের পরাজয়ের পর ফরাসী শক্তি ইন্দোচীনে ফিরে আসে। ১৯৪৬ সালে কম্যুনিস্ট মুক্তিযোদ্ধাদের নায়করূপে ভো নুয়েন গিয়াপ নামে এক অজ্ঞাতপরিচয় সেনানী জাপানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। এই যুদ্ধ চললো ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত যখন গিয়াপ (৫৬, এখন উত্তর ভিয়েৎনামের প্রতিরক্ষামন্ত্রী) দিয়েনবিয়েনফুর যুদ্ধে ফরাসীদের ওপর চরম আঘাত



সায়গনের ৩৬০ মাইল দূরবর্তী একটি যুদ্ধক্ষেত্রে দুজন মারাত্মকভাবে আহত ভিয়েৎকং যুদ্ধবন্দীকে হেলিকপ্টারে করে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে।



উত্তর ভিয়েৎনামীদের তীব্র আক্রমণ প্রতিরোধরত মার্কিনী সৈন্য

হানলেন। ডিয়েনবিয়েনফুতে ফরাসী সেনাপতি জেনারেল আঁরি নাভারের শোচনীয় পরাজয় প্রমাণ করলো যে এশিয়ায় শ্বেতজাতি আর অপরাজেয় নয়।

জেনেভা চুক্তি

ভিয়েৎমিনদের বিরুদ্ধে লড়াই-এ ৮ বছরে ফরাসীদের ১,৭২,০০০ সৈন্য হতাহত হয়, খরচ হয় ৫০০ কোটি ডলার। ডিয়েনবিয়েনফু দুর্গের পতনের পর তাদের মনোবল ভেঙে গেল। এই সময়ে ইন্দোচীনের যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে জেনেভায় যে চুক্তি করা হয়, ফ্রান্স, বৃটেন, সোভিয়েট, কম্যুনিস্ট চীন, কাম্বোডিয়া, লাওস ও উঃ ভিয়েৎনাম তাতে স্বাক্ষর করে। যুক্তরাষ্ট্র ও দঃ ভিয়েৎনাম সম্মেলনে যোগ দিলেও চুক্তিতে স্বাক্ষর করলো না, কারণ, তাদের মতে, এতে কম্যুনিস্টদের বেশী সুবিধা দেওয়া হয়েছিল।

চুক্তিতে কম্বোডিয়া ও লাওসকে স্বাধীনতা দেওয়া হলো এবং ভিয়েৎনামের উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলকে সাময়িকভাবে ১৭শ প্যারালেলে বিভক্ত করা হলো। ভিয়েৎমিন কম্যুনিস্টরা উত্তরাঞ্চলে চলে গেলো এবং নবগঠিত সমস্ত রাজ্যগুলো থেকে ফরাসী সৈন্য সরিয়ে নিতে হলো। চুক্তির আর এক ব্যবস্থা এই যে, উভয় ভিয়েৎনামের সংযুক্তির জন্য দু' বছরের মধ্যেই নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে হবে (যা এখন পর্যন্তও হয়নি)।

বৃটেন ও সোভিয়েট হলো এই সম্মেলনের যুগ্ম-সভাপতি। চুক্তির ব্যবস্থা কার্যকরী করার জন্য ক্যানাডা, ভারত ও পোল্যান্ডকে নিয়ে এক আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কমিশন গঠিত হলো।

দ্বিতীয় সম্মেলন

পরবর্তীকালে লাওসে আবার দক্ষিণ-পন্থী, নিরপেক্ষতাবাদী এবং কম্যুনিস্ট প্যাথেট লাও-এর মধ্যে সংঘর্ষ দেখা দিলে ১৯৬১ সালে জেনেভায় আবার এই সম্মেলন বসে এবং পরবছর লাওসের নিরপেক্ষতা মান্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিতে বর্মা ও থাইল্যান্ডও ছিলো স্বাক্ষরকারী।

কিন্তু দঃ ভিয়েৎনামে শান্তি এলো না। ফরাসীদের সঙ্গে যুদ্ধবিরতির পর হাজার হাজার ভিয়েৎমিন চলে গেলো উত্তরী রাজ্য গড়তে, কিছু রয়ে গেলো দক্ষিণে। জেনেভা চুক্তি অনুযায়ী হো চি মিনকে অনেকখানি ভূমি ছেড়ে দিতে হলো। তবে তাঁর আশা ছিলো যে ১৯৬৫ সালের নির্বাচনে সমগ্র দেশকেই তিনি কম্যুনিস্ট শাসনের আওতায় ঐক্যবদ্ধ করতে সমর্থ হবেন। কিন্তু নির্বাচন হলো না। দক্ষিণ ভিয়েৎনামের রাষ্ট্রপ্রধান মার্কিন সমর্থনপুষ্ট দিয়েম বললেন যে চুক্তি করেছে ফরাসীরা ভিয়েৎনামের জাতীয় স্বার্থ অবজ্ঞা করে। কাজেই সে চুক্তি তিনি মানতে বাধ্য নন।



ভিয়েৎকং বাহিনীর ডেপুটি কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল চ্যান দো। সাম্প্রতিক যুদ্ধে ইনি নিহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।



একজন ভিয়েৎকং যুদ্ধবন্দীকে মার্কিনী শিরস্ত্রাণ এবং অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্রসজ্জিত অবস্থায় একজন মার্কিনী সৈন্য পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

নির্বাচনের ঘোষিত তারিখ কেটে যাওয়ার পর থেকে দঃ ভিয়েৎনামে কম্যুনিস্ট (নতুন নাম ভিয়েৎকং) বিদ্রোহ ধীরে ধীরে দানা বেঁধে উঠতে থাকে। কম্যুনিস্টদের মোকাবিলা করার সামর্থ্য দিয়েমের ছিলো না। কাজেই তিনি আমেরিকার সাহায্য প্রার্থনা করলেন। আমেরিকা দঃ ভিয়েৎনামের বাহিনীকে সংগঠনের জন্য অর্থসাহায্য ও সামরিক উপদেষ্টা পাঠাতে রাজী হলো। ১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সায়গনে মার্কিন সেনাপতি লেঃ জেঃ জন ডবলিউ ও' ড্যানিয়েলের নেতৃত্বে তিনশ' সেনানী ও সৈন্যের একটি মিশন হাজির হলো। ভিয়েৎনামের গৃহযুদ্ধে মার্কিনের জড়িয়ে পড়ার এইভাবেই হলো সূচনা।

প্রেসিডেন্ট দিয়েম (ভিয়েৎনামী উচ্চারণ এম) ছিলেন কড়া ডিক্টেটর। যে আট বছর তিনি তক্তে অধিষ্ঠিত ছিলেন তার মধ্যে দেশে কোনো রাজনৈতিক বিক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ সম্ভব হয়নি। কিন্তু কোনো ডিক্টেটরই চিরকাল নিরঙ্কুশ নন। ভিয়েৎনামের জনগণ ধর্মের দিক থেকে দুভাগে বিভক্ত—বৌদ্ধ ও রোম্যান ক্যাথলিক, যার মধ্যে বৌদ্ধরাই অতিমাত্রায় সংখ্যাগরিষ্ঠ (মোট ১ কোটি ৭০ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে বৌদ্ধের সংখ্যা ১ কোটি ৩০ লক্ষ)। ১৯৬৩ সালে দিয়েমের বিরুদ্ধে এক প্রবল আন্দোলন শুরু হলো বৌদ্ধদের ওপর ধর্মীয় নিপীড়নের অভিযোগে, যার পরিণতিতে দিয়েম শেষপর্যন্ত গদীচ্যুত এবং প্রায় সপরিবারে নিহত হলেন।

দিয়েমের উচ্ছেদে বৌদ্ধদের পিছনে শক্তির মূল উৎস ছিলো যে সেনাপতিগোষ্ঠী, আমেরিকা তলে তলে তাদের উৎসাহ যুগিয়েছিল। কিন্তু এদের কর্তৃত্ব বেশীদিন রইলো না। ১৯৬৪ সালের ৩০শে জানুয়ারী নুয়েন খান নামে এক তরুণ সেনাপতি এদের বরবাদ করে সামরিক শাসন কায়েম করলো। আবার আমেরিকা তার পেছনে। তারপর আবার শুরু হলো সায়গনের রাস্তায় জনতার সঙ্গে সংঘাত, যাতে সামিল হলো বৌদ্ধ ও বিক্ষুব্ধ সেনানীরা। খানের তক্ত ওলটালো, নভেম্বর মাসে প্রতিষ্ঠিত হলো পশ্চিমী ধাঁচের এক অসামরিক সরকার প্রধানমন্ত্রী ত্রান ভান হুয়ং-এর নেতৃত্বে।

কিন্তু বৌদ্ধদের আন্দোলন থামলো না, তাদের দাবী, রাষ্ট্রশাসনে অংশীদারী। ফলে, হুয়ং-এর বিরুদ্ধে এক শ্রেণীর তরুণ সেনানীদের বিক্ষোভ মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো, অভিযোগ বৌদ্ধদের রাষ্ট্রশাসনে কর্তৃত্ব দেওয়া হলে কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে লড়াই ব্যাহত হবে, কারণ তাদের অনেকে কম্যুনিস্টদের প্রতি সহানুভূতিশীল। জেনারেল খান (তখন প্রধান সেনাপতি) তলে তলে তাদের প্ররোচনা দিতে লাগলেন।

সায়গনে প্রচন্ড লড়াই-এর সময় এই মহিলা ও শিশুটি থানকোয়াং প্যাগোডায় পিছনে করে বসতি এলাকা থেকে পালিয়ে এসেছে। রোরুদ্যমানা নারী ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছে, আর ছোট ছেলেটি মুখ ঢেকে বসে আছে।



কাও কির আবির্ভাব

দক্ষিণ ভিয়েৎনামের এই অস্থায়ী রাজনীতির মধ্যে ১৯৬৫ সালের মাঝামাঝি বিমানবাহিনীর অধিনায়ক কাও কি অকস্মাৎ ক্ষমতা দখল করলেন।

দঃ ভিয়েৎনামের রাজনৈতিক মঞ্চে এই নিরবচ্ছিন্ন ওঠানামার পালার সমাপ্তি ঘটাবার জন্য আমেরিকা কিছুদিন থেকেই বিশেষ উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছিল। কাও কি'র ক্ষমতা দখলের পর থেকেই দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য আমেরিকার কাছ থেকে প্রবল চাপ আসতে থাকে। কাও কি নির্বাচনকে বিলম্বিত করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন। তবুও শেষপর্যন্ত এড়ানো গেলো না, কাও কির ইচ্ছা ছিলো তিনিই আবার প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হবেন, কিন্তু শেষপর্যন্ত জেনারেল নুয়েন ভান থিউকে প্রেসিডেন্টের পদ ছেড়ে দিয়ে নিজে ভাইস-প্রেসিডেন্টের পদ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য হন। আমেরিকার আশা ছিলো যে, এই নির্বাচনে থিউ-কাই'র শক্তি বৃদ্ধি পাবে, কম্যুনিস্টদের সঙ্গে বোঝাপড়ায় তাদের হাত জোরদার করা হবে। কিন্তু তবুও ভোটের ফল আমেরিকার আশানুরূপ হলো না। প্রথমত দঃ ভিয়েৎনামবাসীদের গরিষ্ঠাংশ ভিয়েৎকং প্রভাবিত অঞ্চলে থাকায়, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ভোটে অংশগ্রহণ করেনি। কিন্তু ভোটে যারা অংশগ্রহণ করে তাদের মধ্যেও থিউ-কাই'র জনপ্রিয়তা

বেশী নয়, কারণ, মোট ভোটের মাত্র ৩৫ শতাংশ পেয়ে এ'রা নির্বাচিত হন। নির্বাচনে বিরোধীপক্ষীয়রা জোট বে'ধেছিলেন ডেমোক্রেটিক অপোজিশন ফ্রন্ট নামক দলে। নির্বাচনের পরে এই দলের নেতারা নানা দুর্নীতির অভিযোগ করে সায়গনস্থ মার্কিন দূতের কাছে পত্র লেখেন এবং দঃ ভিয়েৎনামের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মার্কিন হস্তক্ষেপ বন্ধ করার দাবী জানান। নির্বাচনের প্রহসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সায়গনের রাজপথে ছাত্ররা বিক্ষোভ করে। এমনকি, বৌদ্ধরাও এই নির্বাচনে খুশী হয়নি।

নোংরা কুশ্রী যুদ্ধ

এবং ভিয়েৎনামের এই অস্থির রাজনীতিকে আবর্তন করেই যুদ্ধ চলছে, যে যুদ্ধ মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডিন রাস্কের ভাষায়—'নোংরা, কুশ্রী, অনাকাঙ্ক্ষিত; তরাই, পর্বত, জলা-জঙ্গলের যুদ্ধ যাতে গেরিলাদের চোরাগোপ্তা লড়াই-এর সুবিধা বেশী; আর যারা তাদের হঠিয়ে দিতে চায় তাদের পক্ষে নৈরাশ্যের অন্ত থাকে না।'

রাস্ক যে অনাকাঙ্ক্ষিত নৈরাশ্যজনক যুদ্ধের উল্লেখ করেছেন আমেরিকা তাতে প্রত্যক্ষভাবে অবতীর্ণ হলো ১৯৬৫-র মার্চে যখন দঃ ভিয়েৎনামে প্রথম মার্কিন স্থলবাহিনী প্রেরণের সিদ্ধান্ত হলো, যারা সরকারী সৈন্যদের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে লড়বে।

ডিয়েমের উচ্ছেদ এবং পরবর্তীকালে ভিয়েৎনামের অস্থির রাজনীতির মধ্যে ভিয়েৎকংদের সাফল্য এমন আশংকাজনক হয়ে দেখা দিলো যে ১৯৬৫ সালের গোড়ার দিকে দঃ ভিয়েৎনাম বাহিনী সপ্তাহে এক ব্যাটেলিয়ন সৈন্য এবং একটা করে প্রাদেশিক রাজধানী খোয়াতে লাগলো। সরকারী বাহিনীকে বিপর্যয় থেকে রক্ষার জন্য এইসময় থেকে আমেরিকা ভিয়েৎনামে মার্কিন সৈন্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে শুরু করে। ১৯৫৫ সালে যখন প্রথম মার্কিন সামরিক উপদেষ্টা মিশন সায়গনে পদার্পণ করে তখন তাদের সংখ্যা ছিলো মাত্র তিনশ'। ১৯৬৫-র জানুয়ারীতে এই সংখ্যা পৌঁছেছিল ২৩ হাজারে, যারা তখনো নামে উপদেষ্টা ও টেকনিশিয়ান। তারপর এলো স্থলসৈন্য পাঠাবার সেই মারাত্মক সিদ্ধান্ত। ১৯৬৫-র জুনে ভিয়েৎনামে মার্কিন সৈন্যের সংখ্যা দাঁড়ালো ৫১,০০০-এ; '৬৬-র জানুয়ারীতে ২,৬৭,০০০; '৬৭-র জানুয়ারীতে ৩,৫০,০০০; এবং ১৯৬৮-র ফেব্রুয়ারীতে এই সংখ্যা পৌঁছেছে ৫,২৫,০০০-এ: যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দঃ ভিয়েৎনামের সাত লক্ষ সরকারী সৈন্য ও ৫৮ হাজার মিত্র সৈন্য। অপরপক্ষে মার্কিন হিসেবেই, দক্ষিণ ভিয়েৎনামে যুদ্ধরত ভিয়েৎকং ও উত্তর ভিয়েৎনামী সৈন্যের মোট সংখ্যা মাত্র ৩,৭৮,০০০।

জেঃ ওয়েস্টমোর ল্যান্ড

১৯৬৪ সালের মাঝামাঝি মার্কিন সেনাপতি জেনারেল ওয়েস্টমোরল্যান্ডকে কম্যান্ড দিয়ে পাঠানো হয়। ওয়েস্টমোরল্যান্ড এসে যুদ্ধের রীতি বদলে দেন, ভিয়েৎনামের যুদ্ধ পুরোদস্তুর আধুনিক যুদ্ধে রূপান্তরিত হয়। প্রথমে এতে যে সাফল্য দেখা দেয়নি তা নয়। ১৯৬৫-র শেষার্ধ থেকে মার্কিন অগ্নিবর্ষণক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে কম্যুনিস্টরা যুদ্ধের পর যুদ্ধে বিপর্যস্ত হতে লাগলো। এবং এইরকমও একটা আভাস দেখা দিলো যে ক্রমাগত বিপুল সৈন্যক্ষয়ের সম্মুখীন হয়ে কম্যুনিস্টদের মনোবল ভেঙে পড়ছে। এর ফলে অতিমাত্রায় আশান্বিত হয়ে ১৯৬৭-র বসন্তকালে ওয়েস্টমোরল্যান্ড স্বদেশবাসীদের প্রকাশ্যভাবে এই আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, আগামী দু' বছর বা তারও আগেই মার্কিন সৈন্যদের পর্যায়ক্রমে দঃ ভিয়েৎনাম থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার কথা চিন্তা করাও এখন সম্ভব হতে পারে।

ভিয়েৎকং রণনীতি পরিবর্তন

কিন্তু বছরখানেক আগে ভিয়েৎকংদের যুদ্ধরীতিতে এমন একটা পরিবর্তন ঘটলো যা যুদ্ধক্ষেত্রের চেহারা আমূল পাল্টে দিলো। এযাবত ভিয়েৎকংরা যুদ্ধ করছিল নিছক গেরিলা কৌশল অনুসরণে, যাকে বলা যায় 'আকস্মিক আঘাত ও অন্তর্ধানের রীতি'। এখন থেকে শুরু হলো এর পরিবর্তে উভয় ভিয়েৎনামের মধ্যবর্তী সৈন্যমুক্ত এলাকায় মার্কিন ঘাঁটিগুলোর ওপর

*

দক্ষিণ ভিয়েৎনামে কম্যুনিস্ট সৈন্যরা যুদ্ধ করছে।

*



ভিয়েৎকংরা দা নাংয়ের ওপর আক্রমণ চালাবার পর উভয় পক্ষের সংঘর্ষে বহু ভিয়েৎকং নিহত হয়।



একাদিক্রমে প্রচন্ড রকমের সুপরিকল্পিত অভিযান। এরি সংগে আরম্ভ হলো কাম্বোডিয়া ও লাওস সীমান্তের দিক থেকে মার্কিনদের লক নিন ও ডাক টো ঘাঁটির ওপর আক্রমণ। মার্কিন সেনাপতি ভিয়েৎকংদের খন্ডযুদ্ধে পাওয়ার এই সম্ভাবনাকে বড়ো সুযোগ মনে করলেন এবং হাজারে হাজারে সৈন্য সীমান্তের দিকে পাঠাতে লাগলেন, এমনকি, উত্তর রাজ্যের সীমানা অতিক্রম করে ভিয়েৎকংদের নিরাপদ আশ্রয়ে হানা দেবারও হুমকী দিলেন। এই সময়েই দঃ ভিয়েৎনামের শহরগুলোর ওপর আক্রমণ চালাবার জন্য ভিয়েৎকংরা তৈরী হতে থাকে।

জেঃ গিয়াপের নেতৃত্ব

মার্কিন কর্তৃপক্ষের ধরাণা যে, এক বছর আগে ভিয়েৎকংদের রণনীতিতে যখন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা দেয় তখনই উঃ ভিয়েৎনামের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জেঃ গিয়াপ ভিয়েৎকংদের সক্রিয় নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। অবশ্য এই ধারণা অহেতুকও নয়, কারণ গিয়াপের সম্ভাব্য নেতৃত্ব গ্রহণের প্ররোচনাও এসেছিল মার্কিন তরফ থেকে।

এই প্ররোচনা হলো মার্কিন কংগ্রেসের তথাকথিত টঁকিন উপসাগরের প্রস্তাব যার ফলে ১৯৬৫ সালের প্রথম ভাগ থেকে যুক্তরাষ্ট্র উত্তর ভিয়েৎনামের শহর ও বন্দরগুলোর ওপর বোমাবর্ষণ আরম্ভ করে। লক্ষ্য দুটি : উত্তর থেকে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে সৈন্য, সমরোপকরণ প্রেরণে বাধা দেওয়া; হ্যানয়কে আলোচনার টেবিলে আসতে বাধ্য করা।

মার্কিন কংগ্রেসের টঁকিন প্রস্তাবের কথা এখানে প্রসঙ্গতই আসবে। ভিয়েৎনামের টঁকিন উপসাগরে মার্কিন নৌবহরের একটা টহলদারীর ব্যবস্থা আছে যাতে উঃ ভিয়েৎনাম ভিয়েৎকংদের সাহায্যে সৈন্য ও অস্ত্রসাহায্য না পাঠাতে পারে। ১৯৬৪-র আগস্টে উত্তর ভিয়েৎনামের কয়েকখানা টর্পেডো বোট দু' দফায় এখানে টহলরত মার্কিন ডেস্ট্রয়ারের ওপর আক্রমণ চালায়। এই ঘটনার পর প্রেসিডেন্ট জনসন মার্কিন নৌবাহিত বিমানগুলোকে উত্তর ভিয়েৎনামের উপকূলস্থ সামরিক ঘাঁটিগুলোর ওপর আক্রমণের নির্দেশ দেন। এই ঘটনাগুলোর পরিপ্রেক্ষিতেই মার্কিন কংগ্রেস ঐ মাসেই টঁকিন উপসাগর প্রস্তাব গ্রহণ করে। এই প্রস্তাবে মার্কিন সৈন্যদের ওপর যে কোনো আক্রমণ প্রতিরোধ এবং দঃ পূঃ এশিয়া যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তিভুক্ত কোনো রাষ্ট্রের স্বাধীনতা রক্ষায় প্রেসিডেন্টকে সর্বপ্রকার ক্ষমতা দেওয়া হয়।

ভিয়েৎনাম নীতিতে পরিবর্তন

মার্কিন ভিয়েৎনাম নীতিতে এই-সব পরিবর্তনের সূচনা হয় ১৯৬৪ সালে জনসন প্রেসিডেন্ট পদে পুনর্নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে। হ্যানয়ের সঙ্গে সরাসরি আলোচনার সুযোগ প্রত্যাখ্যাত হয়, এশিয়ার যুদ্ধে স্থলসৈন্য প্রেরণ এবং উত্তর ভিয়েৎনামে বোমাবর্ষণের সিদ্ধান্তও এই নির্বাচনোত্তর কালেরই নীতি।

কিন্তু এই যুদ্ধ দুবছর চলার পরও দেখা গেলো, ভিয়েৎকং-এর শক্তি হ্রাস না পেয়ে বরং আমেরিকার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে বেড়ে যেতে লাগলো মার্কিনের যুদ্ধের ব্যয় ও সৈন্যক্ষয়।

আপোষ চেষ্টা

৬৭'র বসন্তকালে উত্তর ভিয়েৎনাম প্রথম আমেরিকার সংগে আলোচনার আগ্রহ প্রকাশ করলো। কিন্তু মার্কিন কর্তৃপক্ষ এর উত্তর দিলেন আলোচনার শর্ত আরও কড়া করে। এই সংগে হ্যানয়কেও বোমার আওতায় আনা হলো। ফলে, পোলিশ প্রধানমন্ত্রী ব্যাপক আপোষ-আলোচনার জন্য যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন তা ব্যর্থ হলো।

১৯৬৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন আভাস দিলেন যে, বোমাবর্ষণ থামলে হ্যানয় আলোচনায় রাজী হবে। এই সময়ে প্রেসিডেন্ট জনসন হো চি মিনের মনের ভাব জানতে চেয়ে তাঁকে একখানা পত্র দিয়েছিলেন এবং



ভিয়েৎকংরা গ্রাম আক্রমণ করলে একজন সরকারী সৈন্য শিশু দুটিকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাচ্ছে।

দেওয়ার সুযোগ হিসেবে ৪০ ঘন্টা-কাল বোমাবর্ষণ বিরতির আদেশ দিয়েছিলেন। এইসময় উত্তর দেওয়ার পক্ষে পর্যাপ্ত নয় বলে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী উইলসন প্রেসিডেন্ট জনসনকে অনুরোধ করেন হো চি মিনকে আর একটু বেশী সময় দিতে। কিন্তু উইলসনের সেই অনুরোধ মার্কিনরা প্রত্যাখ্যান করে।

এরি কিছুদিন পরে এলো হ্যানয়ের সাম্প্রতিক প্রস্তাব। জানুয়ারীর মাঝামাঝি প্যারিসস্থ প্রতিনিধি মাই ভান ভো প্রস্তাব করেন যে, উত্তর ভিয়েৎনামে বোমাবর্ষণ বন্ধ হলে উপযুক্ত সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা আরম্ভ করা যেতে পারে। উত্তর ভিয়েৎনামের এই প্রস্তাবে তার পূর্বেকার দাবী (মার্কিন সৈন্যদের ভিয়েৎনাম ত্যাগ এবং ভিয়েৎকংদের রাজনৈতিক সংস্থা ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্টকে স্বীকৃতি দান) যে উত্থাপন করা হয়নি, নিছক বোমাবর্ষণ বন্ধেই আলোচনার ইচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে, এই বিষয়টা সকলেরি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এবং মার্কিনের মিত্ররাষ্ট্রও এতে আপোষ-আলোচনায় হ্যানয়ের প্রকৃত আগ্রহের আভাস লক্ষ্য করেছিলেন। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সাড়া এলো দ্বিধাবিভক্ত। জনসন এতে হ্যানয়ের দুর্বলতার ইঙ্গিত অনুমান করলেন, তিনি বললেন; যে কোনো আলোচনার প্রথম সর্ত হবে খাঁটি যুদ্ধ-বিরতি। মার্কিন পদস্থ ব্যক্তিরা এর তাৎপর্য ব্যাখ্যায় বললেন যে, আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ থেকে কম্যুনিস্টদের বঞ্চিত করাই এর উদ্দেশ্য।

চান্দ্র নববর্ষের অভিযান

ভিয়েৎকংও মার্কিনের বাক্যালাপে আলোচনার ইচ্ছার কোনো আভাস পেল না। বিগত ৩০শে জানুয়ারী ভিয়েৎনামের ধর্মীয় উৎসব চান্দ্র নববর্ষ পড়েছিল। ৩১শে জানুয়ারী তারিখেই দঃ ভিয়েৎনামের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ভিয়েৎকংদের ব্যাপক আক্রমণ শুরু হলো।

আক্রমণের তৃতীয় দিনেই দঃ ভিয়েৎনামের ২৬টা প্রাদেশিক রাজধানী তাদের মর্টার ও রকেটবর্ষণের সম্মুখীন হলো, দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী দানাং-এর রাজপথে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলতে লাগলো, সম্রাটদের প্রাচীন রাজধানী হুয়ে অবরুদ্ধ হলো।

আক্রমণ আরো চমকপ্রদ হলো সায়গনে। এখানে মাত্র ২০জন ভিয়েৎকং মার্কিন দূতাবাসে ঢুকে ছ' ঘন্টাকাল তাকে আংশিকভাবে দখল করে রইল, বেতারঘাঁটিতে হানা দিলো, আর একদল দেখা দিলো প্রেসিডেন্টের প্রাসাদের প্রাঙ্গণে।

এবং ভিয়েৎকংদের এই আক্রমণে সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় হলো আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের পর্যাপ্ত প্রয়োগ। সোভিয়েট ও চীনের কাছ থেকে পাওয়া রকেট ও মর্টার এবারকার যুদ্ধে বিশেষ গুরুত্ব নিয়েছে। খে সানে মার্কিন মেরিন সৈন্যদের যে গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি রয়েছে তার ওপর আক্রমণের জন্য ৪০,০০০ উত্তর ভিয়েৎনামী সৈন্য সমাবেশ করা হয়েছে। সোভিয়েট-প্রদত্ত ট্যাঙ্কের সাহায্যে কম্যুনিস্টরা খে সানের অদূরবর্তী ল্যাং ভেইস্থ মার্কিন ঘাঁটি দখল করে। এই যুদ্ধে ভিয়েৎকংদের পক্ষে সোভিয়েট মিগ জেট বিমানও দেখা দিলো। দঃ ভিয়েৎনামের রণাঙ্গনে এই প্রথম ভিয়েৎকংদের ট্যাংক ও বিমানের আবির্ভাব।

খে সানের ভবিষ্যৎ

খে সানের যুদ্ধ কি পরিণতি নেবে তা অবশ্য এখনো (অর্থাৎ ২০-২-৬৮ পর্যন্ত।) ভবিষ্যতের গর্ভে। তবে ল্যাং ভেইর পতনে মার্কিন মনোবলের যে হানি হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। তবুও মার্কিন সেনানায়করা দৃঢ়পণ, তাঁরা খে সানকে যে কোনোভাবে রক্ষা করবেন। তার কারণ, মার্কিন রণনীতিবিদদের মতে, খে সানের সামরিক গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। মার্কিন জয়েন্ট চীফ অব স্টাফের চেয়ারম্যান জেনারেল আর্ল হুইলার বলেছেন, খে সানের অবস্থিতি রণনীতির দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সৈন্যমুক্ত এলাকা বরাবর আমাদের যে প্রতিরক্ষাব্যূহ রয়েছে খে সান তার পশ্চিমী নোঙর। মনস্তাত্ত্বিকভাবেও এর গুরুত্ব অত্যধিক, কারণ, খে সান গেলে উত্তর ভিয়েৎনামের সৈন্যরা দক্ষিণ ভিয়েৎনামের গভীর অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করতে পারবে, উপকূলভাগের জনবহুল এলাকাগুলোর কাছে এসে পড়বে এবং দক্ষিণ ভিয়েৎনামীদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করবে।





তিনজন মহিলাকে ভিয়েৎকং সন্দেহে আটক করা হয়েছে। অদূরে মার্কিনী ট্যাঙ্ক। মহিলারা ক্রন্দনরত।

হয়েছে তাদের জন্য দঃ ভিয়েৎনামে ৪০২টি ক্যাম্প আছে। এই ক্যাম্পে বর্তমানে বাসিন্দার সংখ্যা ৩,৯০,০০০। আরো ৪,৭৫,০০০ উদ্বাস্তু আছে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের বাড়ীতে। সরকারের মতে গত ৪ বছরে ভিয়েৎনামে ২১ লক্ষ লোক উদ্বাস্তু হয়েছে। কিন্তু অন্য অনেক জিনিসের মতোই সরকারের এই তথ্যও ঠিক নয় এবং অভিজ্ঞ মহলের মতে, যুদ্ধের ফলে দঃ ভিয়েৎনামে চল্লিশ লক্ষ লোক গৃহহীন হয়েছে, যারা মোট জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ। এবং যুদ্ধ যত চলবে, ততো আরো মানুষ নিরাশ্রয় হবে এবং যাদের মুক্তির জন্য দঃ ভিয়েৎনামের জলাজঙ্গল পর্বত তরাই-এ আজ লড়াই চলছে তাদের মাথার ওপর মুক্ত আকাশ ছাড়া হয়তো শেষপর্যন্ত আর কোনো আচ্ছাদন থাকবে না।

ডিয়েন বিয়েন ফুর স্মৃতি

খে সানে ভিয়েৎকং কর্তৃক মার্কিন ঘাঁটি পরিবেষ্টন থেকে ডিয়েনবিয়েনফুর যুদ্ধের স্মৃতি স্বতঃই মনে আসবে। এই দুর্গ যে উপত্যকায় অবস্থিত তা এখন উত্তর ভিয়েৎনামের এলাকা। ১৯৫৩-র শেষভাগ থেকে ছ' মাস কাল ভিয়েৎমিন অধিনায়ক জেঃ গিয়াপ এই দুর্গের বিরুদ্ধে অবরোধ চালান। ফরাসী অধিনায়ক জেঃ আঁরি নাভারে ১৭,০০০ সৈন্য সমাবেশ করে ভিয়েৎনামীদের সম্মুখযুদ্ধে প্রবৃত্ত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু গিয়াপ নাভারের ফাঁদে পা দিলেন না। তিনি দুর্গের চারদিকে কামান-সন্নিবেশ করে প্রচন্ড গোলাবর্ষণে তাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেন এবং পরে ঝাঁকে ঝাঁকে সৈন্য পাঠিয়ে দুর্গ দখল করেন।

খে সানের সামরিক গুরুত্ব সম্পর্কে রণনীতিবিদদের মধ্যে মতানৈক্য থাকলেও একথা অস্বীকার করা যাবে না যে, তার পতনে এশিয়ায় মার্কিন মর্যাদায় গুরুতর আঘাত লাগবে। মার্কিন মুলুকে ইতিমধ্যেই অনেকে জেনারেল ওয়েস্টমোরল্যান্ডের বিচক্ষণতার সন্দেহ প্রকাশ করে ফরাসী সেনাপতি নাভারের সংগে তার তুলনা আরম্ভ করেছেন। ভিয়েৎনামের রণক্ষেত্রে মার্কিন উপস্থিতি, রক্ত ও অর্থক্ষয়ের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মার্কিন জনগণের মধ্যে আজ যে তীব্র বিতর্ক ও গুরুতর সন্দেহ দেখা দিয়েছে, বর্তমান বিপর্যয়ের পটভূমিকায় তা মার্কিন সমালোচনাকে আরো সোচ্চার করে তুলেছে।

লড়াই কাদের জন্য

আর এই বিতর্ক, বিপর্যয়ের অন্তরালে ভিয়েৎনামবাসীদের জীবনে চলেছে, ক্ষুধা, আশ্রয়হীনতা, রোগ, মৃত্যু, শোকের এক নিরবচ্ছিন্ন নাটক যার শুধু আরোহণই আছে, অবরোহণ নেই। যুদ্ধের ফলে যারা নিরাশ্রয়



মনের মতন গহনা
বি. সরকার এন্ড সন্স
সন অব লেট এম. বি. সরকার
১২৪, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলিকাতা-১২, ফোন: ৩৪-৯২০৩



প্রস্তুতকারক ঃ
কিং এণ্ড কোং কলিকাতা
(হোমিও কেমিস্টস, স্থাপিত—১৮৯৪ সাল)

কিং কো'র
আর্ণিকা
হেয়ার অয়েল
একমাত্র পরিবেশক ঃ
আর. ডি. এম এণ্ড কোং
১৭, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬
ফোন ঃ ৩৪-৩৮৩৬

ভিয়েৎনামে আমেরিকা



পরোক্ষ আগ্রহ থেকে সক্রিয় ভূমিকায়

বরুণ রায়

একথা আজ হয়ত অবিশ্বাস্য মনে হবে, কিন্তু ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত ভিয়েৎনাম সম্পর্কে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাব একজন বাইরের পর্যবেক্ষকের পরোক্ষ আগ্রহের ছাড়া আর কিছু ছিল না।

বরং প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট (১৯৩৩-৪৫) এই কথাই মনে করতেন যে, ফরাসীরা ভিয়েৎনামে এত অপশাসন করেছে এবং ভিয়েৎনামীদের এত বেশী রকম শোষণ করেছে যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে জাপানের আত্মসমর্পণের পর (জাপান ১৯৪০ সালে ভিয়েৎনাম দখল করে নিয়েছিল) ফরাসীদের আর সেখানে ফিরে যাবার কোন অধিকারই নেই।

এমন কি ফরাসীরা যাতে আর ভিয়েৎনাম দখল করতে না পারে সেজন্যে তিনি ভিয়েৎনামকে সরাসরি চিয়াং কাই-শেকের হাতে তুলে দিতে চেয়েছিলেন। ভিয়েৎনামের চীন-বিরোধী মনোভাবের কথা মনে রেখে চিয়াং ঐ প্রস্তাবে রাজী হন নি। পরে ১৯৪৩ সালে তেহেরান সম্মেলনে ও ১৯৪৫ সালে পটসডাম সম্মেলনে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাব অনুযায়ীই সিদ্ধান্ত হয় যে, ষোড়শ সমান্তরালের উত্তরে চীনের এবং দক্ষিণে ভারত ও বৃটেনের অছি শাসন প্রবর্তিত হবে। এক সময় হো চি মিনের প্রতি আমেরিকার সমর্থন এত বেশী ছিল যে, মার্কিণ কর্তৃপক্ষ অন্তত ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত বার-বার এই দাবী জানিয়ে এসেছেন যে, হো'র বিরুদ্ধে ফরাসীরা বৃটেনের দেওয়া যেসব বিমান ব্যবহার করছেন, সেগুলি থেকে মার্কিণ-নির্মিত প্রপেলার খুলে ফেলা হোক।

১৯৪৯ সালে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে গেল। চীনের আকাশে রক্ত তারকার অভ্যুদয়। পিকিং, নানকিং ও সাংহাই দখল করার পর মাও সে-তুংয়ের লালফৌজ ডিসেম্বরে ভিয়েৎনামের সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছল। ভিয়েৎনামে তখন হো চি-মিনের সৈন্যদের সঙ্গে ফরাসীদের প্রচন্ড লড়াই চলছে। স্বভাবতই চীনে কম্যুনিস্টদের সাফল্যে হো চি মিনকে উৎসাহিত করেছিল।

কিন্তু লালফৌজের এই সাফল্যের চাইতেও অন্য আরেকটি বিষয়ে সে-দিন ওয়াশিংটনে বেশ কিছু সংখ্যক ভুরু কুঞ্চিত হয়েছিল। ১৯৫০ সালের জানুয়ারী মাসে হো চি মিন মাও সে-তুংয়ের শাসনকে স্বীকার করে নিলেন। বিনিময়ে চীন হো'র কর্তৃাধীন ভিয়েৎনামকেই একমাত্র ভিয়েৎনাম বলে স্বীকৃতি দিলেন। ৩১ জানুয়ারী সোভিয়েট ইউনিয়ন স্বীকার করলেন ডেমোক্রাটিক রিপাবলিক অব ভিয়েৎনামকে।

ডীন অ্যাচিসন তখন আমেরিকার পররাষ্ট্র সচিব। তিনি বললেন : "হো চি মিনের 'জাতীয়তাবাদী' লক্ষ্য সম্পর্কে যদি কোন রঙীন ধারণা কারো থেকে থাকে তবে এরপর তা দূর হওয়া উচিত। এর দ্বারা হো তাঁর আসল রূপে, ইন্দোচীনের নিজস্ব স্বাধীনতার শত্রু হিসেবে আবির্ভূত হলেন।"

অতীতে ভিয়েৎনামের সম্রাটদের প্রাচীন রাজধানী হুয়েতে সুরক্ষিত ঘাঁটি তৈরী করে অবস্থানকারী কম্যুনিস্টদের স্থানচ্যুত করার চেষ্টায় পথে পথে লড়াইয়ের সময় মার্কিন নৌ-সেনাদের এগিয়ে যেতে দেখা যাচ্ছে।



অদ্ভুত যুক্তি

একটা দেশকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিলেই তার কাছে নিজের দেশকে বিক্রি করে দেওয়া হয় এ-বড় অদ্ভুত যুক্তি। তাছাড়া চীনের ভূখন্ডে কম্যুনিস্টদের সাফল্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় রাজনৈতিক ভারসাম্যে যে বিরাট পরিবর্তন এনেছিল ফরাসীদের বিরুদ্ধে জীবন-মরণ সংগ্রামে হো চি মিন তার সুযোগ নিতে চাইবেন, এর মধ্যে অস্বাভাবিক কি আছে তা বোধের অগম্য। কিন্তু আমেরিকা যে কারণেই হোক ধরে নিল যে, মাও সে-তুং ও হো চি মিন একটা ষড়যন্ত্রের সামিল হয়েছেন এবং আন্তর্জাতিক কম্যুনিজম এইভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তার এলাকা প্রসারিত করতে চাইছে।

অতএব তা ঠেকাতেই হবে। কারণ মাত্র বছর তিনেক আগে আমেরিকা কম্যুনিজম ঠেকাবার একটা নীতি সাধারণভাবে গ্রহণ করেছিল। তুরস্ক ও গ্রীসে কম্যুনিস্ট-

ওয়াশিংটনে লিংকন স্মৃতিসৌধের সামনে ভিয়েৎনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন।



বিরোধিতার জন্যে সাহায্য দেওয়া থেকেই এই নীতির সূত্রপাত। ১৯৪৭ সালের ১২ মার্চ এই সাহায্য চেয়ে কংগ্রেসের কাছে প্রেসিডেন্ট হ্যারি ট্রুম্যান যে-কথা বলেছিলেন, তা-ই আজ 'ট্রুম্যান ডকট্রিন' নামে বিখ্যাত। তিনি বলেছিলেন : "আমি বিশ্বাস করি, যুক্ত যে-সব জাতি সশস্ত্র সংখ্যালঘুর ক্ষমতা দখলের কিংবা বাইরের চাপের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ চালিয়ে যাচ্ছে তাদের সমর্থন করাই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নীতি হওয়া উচিত।"

ইতিমধ্যে হো চি মিনের প্রভাব খর্ব করার উদ্দেশ্য নিয়ে ফরাসীরা ক্ষমতাচ্যুত সম্রাট বাও দাইকে দেশে ফিরিয়ে এনে ১৯৪৯ সালে যখন সায়গনে পাল্টা সরকার গঠন করলেন তখন এই নীতি অনুসারেই আমেরিকা তার প্রতি সহানুভূতি জানিয়েছিল। কিন্তু এরপর ওয়াশিংটন বাও দাইকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন জানাতে আরম্ভ করল। ডীন অ্যাচিসন এক বার্তা পাঠিয়ে জানালেন আমেরিকা বাও দাই সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করতে আগ্রহী।

৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৫০ সালে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র বাও দাই সরকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিল।

এই স্বীকৃতির পরেই মার্কিণ কর্তৃপক্ষ হো চি মিনের বিরুদ্ধে লড়াই চালাবার জন্যে ফ্রান্স ও বাও দাই সরকারকে সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য দেবার সিদ্ধান্ত নেন। মে মাসে প্যারিসে ফ্রান্স ও আমেরিকার মধ্যে মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে মিঃ অ্যাচিসন এই মর্মে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করলেন। তিনি বললেন : "মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র মনে করে যে, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা পুনরুদ্ধার এবং প্রকৃত জাতীয়তাবাদীদের বিকাশের ওপরেই ইন্দোচীনের সমস্যার সমাধান নির্ভরশীল, এবং এই প্রধান লক্ষ্যগুলি অর্জনে আমেরিকা সাহায্য করতে পারে ও করা উচিত।"

দ্রুততর সাহায্য

২৫ জুন কম্যুনিস্ট উত্তর কোরিয়া ৩৮ অক্ষরেখা অতিক্রম করে দক্ষিণ কোরিয়া আক্রমণ করলে মার্কিণ সরকার এই সংকল্পে দৃঢ়তর হলেন। ২৭ জুন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ঘোষণা করলেন যে, আমেরিকা ফ্রান্স ও বাও দাই'র সৈন্যবাহিনীকে দ্রুততর সামরিক সাহায্য দেবে এবং ঐসব বাহিনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার জন্যে একটি সামরিক মিশন পাঠাবে।

ভিয়েৎনামের জলে ও জঙ্গলে আমেরিকা এখন যে রকম বিরাটভাবে জড়িয়ে পড়েছে তার সূত্রপাত হয়েছিল এইভাবে, ধীরে ধীরে।

১৯৫২ সালের ১৮ ডিসেম্বর মার্কিণ সরকার ইন্দোচীনের জন্যে একটি বিশেষ প্রতিরক্ষা সাহায্য কার্যসূচীর কথা ঘোষণা করলেন এবং জানালেন তাঁরা কাজ আরম্ভ করবার জন্যে সাড়ে তিন কোটি ডলার বরাদ্দ করেছেন।

তারপর এলেন ডালেস, জন ফস্টার ডালেস, ১৯৫৩ সালে নতুন প্রেসিডেন্ট মিঃ আইজেনহাওয়ারে পররাষ্ট্র সচিব হয়ে।

ভিয়েৎনামে মার্কিণ নীতি পরে যে কুখ্যাতি লাভ করে, তার গোড়াপত্তন করেছিলেন এই ডালেস। তাঁর আমলেই আমেরিকা ভিয়েৎনামে সামরিক দিক দিয়ে আরো গভীরভাবে জড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করে। তাঁর আমলেই ফরাসীদের প্রতি মার্কিণ সামরিক সাহায্যের পরিমাণ ৭৫ কোটি ডলারে গিয়ে দাঁড়ায়। তাঁরই প্ররোচনায় ১৯৫৩ সালের মে মাসে প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার "আমাদের নিজেদের স্বার্থে" ফরাসীদের সর্বাত্মক সাহায্য দেবার নীতি প্রথম ঘোষণা করেন। তারই উদ্যোগে ভিয়েৎনামে কম্যুনিজম ঠেকাবার নীতি



(ওপরে) বন্দী ভিয়েৎকং সৈন্যদের দড়ি-বাঁধা অবস্থায় সার বেঁধে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। (নীচে) জনৈক ভিয়েৎকং নারী সৈনিক মার্কিন পাইলট লেঃ গের্লার্ড সান্টো ভেনেজীকে প্রহরা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।



মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতির অন্যতম ভিত্তি হয়ে উঠল।

১৯৫৪ সালের মার্চ নাগাদ মার্কিণ সাহায্যের পরিমাণ গিয়ে দাঁড়াল ১৪০ কোটি ডলারে।

তার আগেই যুদ্ধের গতি নিশ্চিতভাবে যেতে আরম্ভ করেছিল ফরাসীদের বিরুদ্ধে। বিপদ বুঝে ফরাসী সরকার একটি নতুন সামরিক পরিকল্পনা নিয়ে জেনারেল আঁরি নাভারকে ভিয়েৎনামে পাঠালেন। এই পরিকল্পনা ছিল এই রকম: ফরাসীরা প্রতিরক্ষামূলক রণকৌশল অবলম্বন করে যুদ্ধকে উত্তরাঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করবে এবং সেই সুযোগে দক্ষিণে ভিয়েৎনামী সৈন্যদের উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে একটি শক্তিশালী বাহিনী গড়ে তোলা হবে।

কিন্তু ঘটনাচক্রে ইতিহাসের গতি হল অন্য রকম। জেনারেল নাভার তাঁর ঝানু সৈন্যদের দিয়েনবিয়েনফুতে জড়ো করে ভিয়েৎমিনদের সঙ্গে চূড়ান্ত শক্তি পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলেন। কিন্তু তিনি শীগ্গিরই বুঝতে পারলেন যে, বাইরের থেকে যদি ব্যাপক সাহায্য না পাওয়া যায় তাহলে দিয়েনবিয়েনফুর যুদ্ধ জেতার কোন আশা নেই, তাঁদের ঠায় দাঁড়িয়ে মরতে হবে।

নাভারের এস-ও-এস

জেনারেল নাভার প্যারিসের কাছে মার্কিণ সাহায্যের জন্যে এস-ও-এস পাঠালেন। সেই এস-ও-এস নিয়ে ১৯৫৪ সালের



একজন ভিয়েৎকং সৈন্যকে গলায় দড়ি বেঁধে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে জেনারেল এলি গেলেন ওয়াশিংটনে। সেখানে জেনারেলের সামনেই প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার অ্যাডমিরাল র‍্যাডফোর্ডকে নির্দেশ দিলেন দিয়েনবিয়েনফু রক্ষার জন্যে যা কিছু করা প্রয়োজন তা সবই যেন করা হয়। অস্ত্রশস্ত্র, বিমান যা চাওয়া হবে তাই যেন দেওয়া হয়। অ্যাডমিরাল র‍্যাডফোর্ড জেনারেল এলিকে জানালেন, ফরাসী সরকার যদি আমেরিকার প্রত্যক্ষ সামরিক হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করে তাহলে আমেরিকা হস্তক্ষেপ করতে প্রস্তুত।

প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার এই সময়েই তাঁর বিখ্যাত 'ডোমনো থিয়োরী'র প্রবর্তন করেন। এই থিয়োরীর বক্তব্য হল, যদি ইন্দোচীনের পতন ঘটে তাহলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সবগুলি দেশই একে-একে বিপন্ন হয়ে পড়বে। মিঃ ডালেস বললেন, যে কোন উপায়েই হোক এই সম্ভাবনা ঠেকাতে হবে। "দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় রুশ ও চীনা ধর্মী রাজনৈতিক ব্যবস্থা কায়েম হলে সমগ্র মুক্ত দুনিয়াই বিপন্ন হয়ে পড়বে। এই সম্ভাবনাকে সম্মিলিত ব্যবস্থার দ্বারা রোধ করতেই হবে। এর জন্যে গুরুতর ঝুঁকি নিতে হতে পারে। কিন্তু এখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ না হলে কয়েক বছর পরে আমাদের যে ঝুঁকির সম্মুখীন হতে হবে, সে তুলনায় এই ঝুঁকি কিছুই নয়।"

৩ এপ্রিল, ১৯৫৪, শনিবার জন ফস্টার ডালেস মার্কিণ কংগ্রেসের আটজন প্রভাবশালী সদস্যকে নিয়ে এক গোপন বৈঠকে মিলিত হলেন। উদ্দেশ্য : ভিয়েৎনামে নৌ ও বিমান শক্তি ব্যবহার করার জন্যে তাঁদের সম্মতি আদায় করা। এছাড়া, তিনি বললেন, দিয়েনবিয়েনফুকে রক্ষা করার কোন উপায় নেই।

ঐ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন অ্যাডমিরাল র‍্যাডফোর্ডও। তিনি তাঁদের পরিকল্পনার কথা জানালেন : বিমানবাহী জাহাজ 'এসেক্স' ও 'বক্সার' থেকে ২০০ বিমান এবং ফিলিপিনের ঘাঁটি থেকে আরো কিছু বিমান একযোগে শুধু একবার গিয়ে দিয়েনবিয়েনফু এলাকায় হানা দেবে। তাতেই কাজ হবে।

এই পরিকল্পনা অবশ্য শেষ পর্যন্ত কাজে লাগানো হয় নি, কারণ (১) মার্কিণ কংগ্রেস এটি অনুমোদন করে নি, (২) বৃটেন এই পরিকল্পনা সমর্থন করতে অস্বীকার করে, এবং (৩) এর জন্যে আমেরিকা যে শর্তগুলি দিয়েছিল ফ্রান্স তা গ্রহণ করেনি।

আমেরিকার শর্তগুলি ছিল এই রকম : এই যুদ্ধে অংশ নেবার জন্যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং সেই সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজীল্যান্ডকে আনুষ্ঠানিকভাবে আমন্ত্রণ জানাতে হবে; ভিয়েৎনাম ও ইন্দোচীনের অন্যান্য দেশকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে; আমেরিকা ফরাসীদের বিকল্প হিসেবে নয় অতিরিক্ত হিসেবে এবং প্রধানত সমুদ্র ও আকাশ থেকে যুদ্ধ করবে; স্থানীয় সৈন্যদের প্রশিক্ষণের ভার আমেরিকার হাতে দিতে হবে; এবং যুদ্ধ পরিচালনার পূর্ণ, না হলে প্রধান কর্তৃত্ব আমেরিকাকে দিতে হবে।

প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার এ-সম্পর্কেই পরে লিখেছিলেন : ফরাসীদের হাতে তাদের খুশি মত ব্যবহৃত হবার জন্যে আমি আমাদের সৈন্য পাঠাতে কখনই রাজী হব না।"

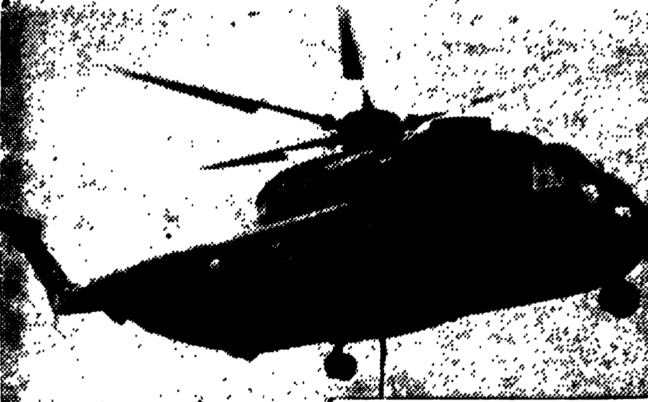
দিয়েন বিয়েনফুর পর

ফরাসীরা আমেরিকার শর্তে রাজী হলে ভিয়েৎনামের ইতিহাস অন্যভাবে লিখিত হত কিনা সে প্রশ্ন এখন অবান্তর। আমাদের সামনে যে ইতিহাস রয়েছে, তা হল এক শোচনীয় সামরিক ব্যর্থতার, ১৯৫৪ সালের ৭ মে ভিয়েৎমিন গেরিলারা যা ফরাসীদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিল। দিয়েনবিয়েনফুর পতন ইন্দোচীনে ফরাসীদের ভাগ্য চূড়ান্তভাবে খতম করে দিয়েছিল।

এরপর ঘটনা দ্রুত তালে প্রবাহিত হতে থাকে। কারণ ওয়াশিংটন ফরাসীদের পরাজয়ের পরিণতির কথা চিন্তা করে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন।

একথা আজ লিখতে কোন বাধা নেই যে, দিয়েনবিয়েনফুর পতনের পরে জেনেভায় ইন্দোচীনের সমস্যার মীমাংসার জন্যে যে আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়েছিল, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তার প্রতি মোটেই প্রসন্ন ছিল না। কারণ আমেরিকার একমাত্র লক্ষ্য ভিয়েৎনামকে পুরোপুরি কম্যুনিস্ট নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করা। মীমাংসা আলোচনায় সমর্থন জানানোর অর্থ হল হো চি মিনের সঙ্গে আপোস করার প্রস্তাব স্বীকার করে নেওয়া। আমেরিকা তা করতে মোটেই রাজী ছিল না। কোন রকম আপোস করার বিরুদ্ধে আমেরিকার মনোভাব এতই প্রবল ছিল যে, আমেরিকা জেনিভা সম্মেলনের প্রস্তাবে স্বাক্ষর করতেও অস্বীকার করেছিল।

উল্টে সেপ্টেম্বরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া চুক্তি সংস্থা নামে একটি সামরিক সংস্থা গঠন করে জেনিভা চুক্তির জবাব দিয়েছিল।





মুহূর্তের জন্য ঘুমের কোলে ঢলে পড়েছে জনৈক মার্কিন সৈনিক।

জেনিভা সম্মেলনের প্রস্তাব ছিল সপ্তদশ সমান্তরাল বরাবর ভিয়েৎনামকে সাময়িকভাবে দু'ভাগ করা হবে, এবং দু'বছর পর, ১৯৫৬ সালের জুলাই মাসে, আন্তর্জাতিক কমিশনের তত্ত্বাবধানে সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে দেশবাসীর ইচ্ছা—তারা দু'ভাগই থাকবে না, আবার একত্রিত হবে—যাচাই করা হবে।

সেই নির্বাচন আর হয় নি। কারণ জেনিভা চুক্তির প্রতি আমেরিকার কোন দায়িত্ব ছিল না। দায়িত্ব ছিল না ফরাসীদেরও। কারণ আমেরিকা বাও দাইকে সরিয়ে তার নিজের লোক নো দিন দিয়েমকে ক্ষমতায় বসিয়ে (১৯৫৫ সাল) দক্ষিণ ভিয়েৎনামের ওপর মার্কিণ কর্তৃত্ব কায়েম করছিল। নির্বাচনের তারিখের ঠিক প্রাক্কালে ফরাসীরা ভিয়েৎনাম থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে চলে যায়। জেনিভা সম্মেলনে সায়গনের প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ জানানো হয় নি এই যুক্তিতে দিয়েমও নির্বাচন করতে অস্বীকার করলেন। কারণ তিনি জানতেন, নির্বাচন হলে দেশ একত্রিত হবেই এবং সেই একত্রিত ভিয়েৎনামের নেতা হবেন হো চি মিন। আর যদি নির্বাচন না হয় তাহলে আমেরিকার সহযোগিতায় তিনি দক্ষিণাঞ্চলের সর্বময় কর্তা হয়ে থাকতে পারেন।

মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্র সচিব মিঃ ওয়াল্টার এস রবার্টসন নির্বাচন না করার পক্ষে দিয়েমের সিদ্ধান্তকে প্রকাশ্যে পূর্ণ সমর্থন জানালেন। কারণ আমেরিকাও জানত নির্বাচন হলে হো চি মিনের প্রতিষ্ঠা কেউ রুখতে পারবে না। আর হো চি মিনের শাসন মানেই তার বিচারে আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট শাসন। গোটা ভিয়েৎনাম যখন কম্যুনিস্টদের হাত থেকে রক্ষা করা গেল না তখন আধখানা ভিয়েৎনাম কব্জা করার সুযোগ হাতে পেয়ে তা হারানোর কোন অর্থ হয় না।

ফরাসীদের পরিত্যক্ত আসনে

এইভাবে ক্রমে ফরাসীদের পরিত্যক্ত আসনে আমেরিকা কায়েম হয়ে বসল। আমেরিকা হয়ত এর দ্বারা তার স্বার্থ আরো ভালোভাবে রক্ষা করতে পারবে ভেবেছিল। কিন্তু জেনিভা সম্মেলনের সময় ও পরে তার ভূমিকার যে পরিচয় আমরা পেয়েছি তাকে কোন মতেই বিশ্ব-শান্তির পরিপোষক বলা যায় না।

হো চি মিনের ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী সংগ্রামের বিরুদ্ধে ফরাসীদের সাহায্য করে আমেরিকা যে ভুল করেছিল এবং তার যে সুনাম নষ্ট করেছিল, ১৯৫৪ সালের মে-জুলাই মাসে জেনিভায় তা সংশোধন করার একটা সুযোগ তার সামনে এসেছিল। কিন্তু আমেরিকা তা গ্রহণ করে নি।

এর পরিণতি কি হয়েছে তা আমরা দেখেছি। দিয়েমের মত একজন অপদার্থ,



মৃত সহযোদ্ধাদের দেহ জড়ো করছে মার্কিনী সৈনিকরা.

অত্যাচারী লোককে মদত দিতে গিয়ে আমেরিকা শুধু নিজেকে আরো অপ্রিয় করে নি, জনমতের যে অংশ তখনও দায়েমনের সমর্থক ছিল তাকেও হারিয়েছে। দিয়েমকে উৎখাতের জন্যে বার-বার চেষ্টা হয়েছে। বারবার আমেরিকাকে আরও, বেশী অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য দিয়ে দিয়েমকে রক্ষা করতে হয়েছে। এবং মার্কিণ রসদ যত বেশী ভিয়েৎনামে এসে পৌঁছেছে, ওয়াশিংটন ও তার তাঁবেদার দিয়েম-চক্র ততই দেশবাসীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

ফলে ১৯৬০ সালে জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট গঠন করে হো চি মিনের প্রেরণায় গেরিলারা যখন দক্ষিণ ভিয়েৎনামকে (যাকে তারা এখনও পরাধীন মনে করে) মুক্ত করার জন্যে নিয়মিতভাবে সর্বাত্মক তৎপরতা আরম্ভ করল, তখন আমেরিকা আর হালে পানি পেল না। প্রথম কয়েক বছর দক্ষিণ ভিয়েৎনামী সরকারী সৈন্যদের উপদেষ্টা হিসেবে থেকে এখন পুরোপুরি যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়েছে।

এই সক্রিয়, সর্বাত্মক অংশগ্রহণের সূত্রপাত হয় ১৯৬৪ সালের আগস্ট মাসে একটি ঘটনার মধ্যে দিয়ে। মিঃ লিন্ডন বেন্জ্ জনসন তখন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট।

২ আগস্ট পেন্টাগন থেকে ঘোষণা করা হল যে, তিনটি উত্তর ভিয়েৎনামী টর্পেডো বোট উত্তর ভিয়েৎনামের উপকূল থেকে ৩০ মাইল দূরে টংকিন উপসাগরে মার্কিন ডেস্ট্রয়ার ম্যাডক্স-কে আক্রমণ করে। ম্যাডক্স্ নাকি ঐ সময় সেখানে রুটিন-মাফিক টহল দিচ্ছিল, এবং পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে উত্তর ভিয়েৎনামী আক্রমণকারীদের প্রতিহত করে।

দুদিন পর পেন্টাগন আবার জানায় যে, "অনির্দিষ্টসংখ্যক উত্তর ভিয়েৎনামী টর্পেডো বোট ম্যাডক্স্ ও অন্য একটি ডেস্ট্রয়ার সি, টার্নার জয়ের বিরুদ্ধে আরেকদফা আক্রমণ চালায়। তবে মার্কিন জাহাজের কোন ক্ষতি হয়নি।

ঐ রাত্রে এক টেলিভিশন বক্তৃতায় প্রেসিডেন্ট জনসন ঘোষণা করলেন যে, "মার্কিন সশস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে বারবার আক্রমণের" কথা বিবেচনা করে তিনি উত্তর ভিয়েৎনামের উপকূলবর্তী ঘাঁটি ও তেলের ভান্ডারগুলির ওপর বিমান আক্রমণের নির্দেশ দিয়েছেন। আক্রমণ অবশ্য তার আগেই আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল।



মার্কিণ প্যারা সৈনিকদের অবতরণের সম্ভাবনায় উত্তর ভিয়েৎনামী সৈনিকরা বল্লম দিয়ে সমতলভূমি আবৃত করছে।

এবং তিনি জানান, এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার জন্যে প্রয়োজনীয় ক্ষমতার জন্যে তিনি কংগ্রেসের দ্বারস্থ হবেন।

৭ আগস্ট কংগ্রেস তাঁকে এই ক্ষমতা দেয়। সেনেটে এ সংক্রান্ত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দুটি ভোট পড়েছিল, হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভসে একটিও পড়েনি।

এই প্রস্তাবের ওপর নির্ভর করেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৬৫ সালের ফেব্রুয়ারীতে বিমান আক্রমণ আরম্ভ করে এবং এখন পর্যন্ত তারই জের টেনে চলেছে। কিন্তু যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমেরিকা ভিয়েৎনামে সর্বাত্মকভাবে জড়িয়ে পড়েছে, সেই ঘটনার প্রকৃত পরিস্থিতি এখনো রহস্যাচ্ছাদিত। সেনেটার ফুলব্রাইট, যিনি কংগ্রেসে টংকিন উপসাগর সংক্রান্ত প্রস্তাব পাশ করাতে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, দু' বছর পরে তিনিই এখন ঐ ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন: "ঠিক ঠিক কি ঘটেছিল তা জানবার আর কোন উপায়ই নেই। আমি জানিনা ঐ আক্রমণের প্ররোচনা আমরাই দিয়েছিলাম কিনা।"

ভিয়েৎনামে এখন মার্কিণ সৈন্যের সংখ্যা প্রায় সোয়া পাঁচ লাখ। এবং ১৯৬৫ আর্থিক বছরেও যেখানে যুদ্ধ চালাতে খরচা হয়েছিল ১০ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার, সেখানে ১৯৬৭ সালে খরচার পরিমাণ ছিল ২,২০০ কোটি ডলারেরও বেশি। যুদ্ধে সাহায্য করে গেলেও যে যুদ্ধ প্রেসিডেন্ট কেনেডির আমল পর্যন্ত ছিল প্রধানত সায়গনের যুদ্ধ, প্রেসিডেন্ট জনসনের আমলে এসে সে যুদ্ধ এখন আমেরিকার যুদ্ধে পরিণত হয়ে গেছে।



রাশিয়ায় শিক্ষাপ্রাপ্ত উঃ ভিয়েৎনামী দু'জন পাইলট পরামর্শরত। পেছনে একটি মিগ—১৭ বিমান।

ভিয়েৎনাম এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন

বিশ্বজিৎ রায়

ভিয়েৎনামের যুদ্ধ। ডেভিড আর গোলিয়াথের সংঘর্ষ যেন! তবে বহুগুণ বৃহত্তর, বিস্তৃততর, বীভৎসতর। কিন্তু ডেভিডই বা কে আর গোলিয়াথই বা কে? লড়াইটাই বা হচ্ছে কোথায়? এইসব প্রশ্নের সোভিয়েৎ তরফের উত্তর পেলে বোঝা যাবে ভিয়েৎনাম-যুদ্ধ সম্পর্কে সোভিয়েত মনোভাব এবং স্বেচ্ছাগৃহীত সোভিয়েত বাধ্য-বাধকতার স্বরূপ।

সোভিয়েত ইউনিয়ন এ-প্রসঙ্গে যে বক্তব্য উপস্থাপন করে এসেছে তার সারমর্ম হলো এই যে, ভিয়েৎনামে ডেভিড হলো দক্ষিণ ভিয়েৎনামের জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট এবং গোলিয়াথ হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু তাহলে তো যুদ্ধ দক্ষিণ ভিয়েৎনামেই সীমিত থাকার কথা, খামোকা উত্তর ভিয়েৎনাম বোমা খেতে যায় কেন? প্রশ্নটার জটিলতার শুরু ওইখানেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা হলো এই যে, জেনেভা-চুক্তি অনুযায়ী ভিয়েৎনাম বিভক্ত হয় এবং তারপরে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে ন্‌গো দিন দিয়েম গদিতে আসীন হন আইনসঙ্গতভাবে। কিন্তু দক্ষিণ ভিয়েৎনামবাসীদের স্বাধীনতা এবং মতামতকে লঙ্ঘন করে উত্তর ভিয়েৎনাম দক্ষিণে আক্রমণ চালাতে থাকে এবং তখনই সাইগন সরকারের আমন্ত্রণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাকে বাঁচাতে এগিয়ে আসে আর সেই রক্ষণ-কর্তব্যেরই বিস্তৃতি ঘটেছে উত্তর ভিয়েৎনামের ওপর বোমাবর্ষণে।

বলা বাহুল্য সোভিয়েত ইউনিয়ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই কৈফিয়ৎ স্বীকার করে না। তার প্রধান যুক্তি হচ্ছে এই যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিয়েৎনামে যুদ্ধ করতে আসার কোন নৈতিক অধিকারই নেই। সে ভিয়েৎনামে পরাজিত ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের স্থান গ্রহণ করে নিজের আন্তর্জাতিক পুলিশ-রূপ প্রকট করেছে। সে যে ন্‌গো দিন দিয়েমকে সাইগনে তখ্‌তে চড়িয়েছিল সে ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতের পুতুল এবং তার এ-হেন উন্নতির পশ্চাৎপটটি ছিল এই যে, —এবিষয়ে 'লুক' নামে মার্কিনী পত্রিকা থেকে কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া হচ্ছে— "পররাষ্ট্র সচিব জন ফস্টার ডালেস তাঁকে খুঁজে বের করেন, সেনেটর মাইক ম্যান্সফিল্ড তাঁকে সমর্থন করেন, ফ্রান্সিস কার্ডিনাল স্পেলম্যান তার প্রশস্তি করেন, উপ-রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিক্সন তাকে পছন্দ হয়েছে বলে জানান, এবং রাষ্ট্রপতি আইজেন হাওয়ার তার মনোনয়নে সায় দেন।"

উত্তর ভিয়েৎনামের দু'জন নারী সৈনিক হ্যানয়ের আকাশে মার্কিণ বিমানের সম্ভাব্য আবির্ভাবের জন্য তৈরী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সম্প্রতি হ্যানয়ে বিমানধ্বংসী কামানের তৎপরতা বৃদ্ধির জন্য বোমাবর্ষণ অপেক্ষাকৃত কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।





কম্যুনিষ্ট সৈনিকদের রকেট আক্রমণে বিধ্বস্ত মার্কিণী সি—১৩০ বিমান।

নুগো দিন দিয়েম গণপ্রতিভূ কখনোই ছিল না এবং তার অবিচার-অত্যাচারে ধৈর্য হারিয়ে ফেলে দক্ষিণ ভিয়েৎনামবাসীরা নিজেদের জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট গঠন করেন; সুতরাং ভিয়েৎনামের দ্বন্দ্ব আসলে হচ্ছে দক্ষিণ ভিয়েৎনামবাসী এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে, আর যেহেতু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হ্যানয়ের জনপ্রিয় ও আইনসংগত শাসন-ব্যবস্থার পতন ঘটাতে চায় যেন তেন প্রকারেন, তাই সে একই সঙ্গে তার বিরুদ্ধেও আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে এই ছুতোয় যে সাইগন সরকারের নিরাপত্তা বিপন্ন করেছে হ্যানয় তার সৈন্যদের অনুপ্রবেশের দ্বারা।

এখন সর্বসমক্ষে এই অতি তীব্র মার্কিণ-বিরোধিতা সোভিয়েত ইউনিয়নের ঠান্ডা লড়াইপ্রসূত এক মনোভাবের অভিব্যক্তি কিম্বা আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে চীনা বৈপ্লবিকতার পাশে নিজেদের যাতে ম্লান না হয়ে যেতে হয় সেই প্রচেষ্টার প্রকাশ সে সম্পর্কে অনেকে জল্পনা-কল্পনা করে থাকেন। কারণ অনেকেই নুগো দিন দিয়েম কিম্বা তার পরবর্তী বর্তমানের শাসকচক্রকে যেমন গণতান্ত্রিক আদর্শের আইন এবং নীতিসংগত ধারক আর বাহক হিসেবে ধরেন না তেমনি দক্ষিণ ভিয়েৎনামের জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টকেও কেবল উত্তর ভিয়েৎনামের অনুপ্রেবণা-পুষ্ট বলেও মনে করেন না; আর তাঁদের ধারণা যে সোভিয়েত ইউনিয়নও সেকথা জানে এবং সে হ্যানয়ের চীন-উদ্দীপিত এ-হেন পদক্ষেপে সম্পূর্ণ আগ্রহী নয়।

একথা অবশ্য ঠিকই যে চীনকে সোভিয়েত ইউনিয়ন সুনজরে দেখে না। মাও-সে তুং-এর মতবাদ তার কাছে প্রলাপ এবং সে মতবাদের অ্যাডভেঞ্চারমূলক ভিত্তির ভয়াবহ সম্ভাবনা সম্বন্ধে তার সচেতনতা যথেষ্ট। তাছাড়া, ভিয়েৎনামের মাটিতে মার্কিন-সোভিয়েত লড়াই লাগিয়ে দিয়ে নিজের স্থিতি সুদৃঢ় করতে চীনের গূঢ় উদ্দেশ্য থাকাটা সোভিয়েত ইউনিয়ন একেবারে অসম্ভব বলে মনে করে না। কিন্তু চীনের অভিসন্ধি এবং অভিশংসনে সোভিয়েত ইউনিয়ন যতই বিচলিত হোক না কেন সে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সর্বথা সমর্থন করে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন উভয়েরই যা লক্ষ্য—সোভিয়েত ইউনিয়নকে বিপ্লববিমুখ হিসেবে প্রতিভাত করা—তা কিছুতেই সাধিত হতে দেবে না। তার সবচেয়ে বড় কারণ সোভিয়েত নেতৃবর্গ মনে করেন যে, তাঁরা নতুন পন্থা অবলম্বন করলেও—যাকে বলা হয় মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সৃজনশীল বিকাশ—তাঁরা বিপ্লবের পথ থেকে বিচ্যুত হননি, হতে চান-ও না। তাঁদের একদিকে যেমন আমেরিকার হাত থেকে নিজেদের নিরাপদ করতে হচ্ছে তেমনি সুরক্ষিত হতে হচ্ছে চীনের বিরুদ্ধেও। সেইজন্যই তাঁদের পাকিস্তানের মন জয় করার আধুনিক প্রয়াস কিম্বা মঙ্গোলিয়ার সঙ্গে আরক্ষা-চুক্তি সম্পাদন। ওই একই কারণে সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে ব্যাপকভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে চীন অথবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একান্ত প্রভাবাধীন অবস্থায় পরিত্যাগ করে যাওয়া সমীচীন নয় বলে তারা মনে করে। সুতরাং ভিয়েৎনামে তার উপস্থিতি তার পক্ষে অবশ্য-প্রয়োজনীয়। খ্রুশ্চোভ-যুগে অবশ্য এই বোধ সোভিয়েত নেতৃত্বের ততটা গভীর ছিল না এবং ভিয়েৎনামে তাঁরা সোভিয়েত ইউনিয়নকে বিশেষভাবে জড়িত করতে চান নি। কিন্তু খ্রুশ্চোভোত্তর কালে সোভিয়েত নীতি এই ঔদাসীন্য পরিহার করল। তার অন্যবিধ গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল। ভিয়েৎ-

উত্তর ভিয়েৎনামী বাহিনীর মর্টারের গোলা উপস্থিত অস্ত্রাগারে এসে পড়লে বিস্ফোরণ-জনিত ধোঁয়ার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য মার্কিণ সৈন্যরা বসে পড়ে।





আহত সহযোদ্ধাকে বয়ে নিয়ে চলেছে মার্কিনী সৈন্যরা।



নামের যিনি অবিসম্বাদী নেতা ডঃ হো চি মিন, তিনি মাও-এর মুখাপেক্ষী হয়ে চলার মানুষ নন। বিভিন্ন দেশে এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে তিনি দীর্ঘকালীন অভিজ্ঞতা, সংগঠন ক্ষমতা এবং মনীষার জন্য সম্মানে মাও-এর চেয়ে নিম্নস্থানে অধিষ্ঠিত নন। তাছাড়া ভিয়েৎনামবাসীদের স্বাভাবিক প্রবল জাতীয়তাবাদী মনোভাব পারতপক্ষে ডঃ হো চি মিনকে এমন অবস্থায় আসতে দেবে না যার ফলে ভিয়েৎনাম চীনের কুক্ষিগত হয়ে পড়ে। যুগোশ্লাভিয়ার উদাহরণ মনে রেখে তাই সোভিয়েত ইউনিয়ন মনে করতে সাহসী হয়েছে যে, ডঃ হো চি মিনকে সে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার তিতো হিসেবে দেখতে পাবে যদি মার্কিনী হস্তক্ষেপের কারণে চীনের খপ্পরে পড়তে বাধ্য হওয়ার বিপদ থেকে ভিয়েৎনামকে বাঁচান যায়। তাছাড়া যুদ্ধে ভিয়েৎনামের যত লোকবলহানি হবে সেখানে চীনের প্রবেশের এবং উপনিবেশ স্থাপনের সুবিধে তত বাড়বে। তাই সোভিয়েত ইউনিয়নকে এই যুদ্ধে ভিয়েৎনামবাসীদের পেছনে এসে দাঁড়াতে হয়েছে।

আরেকটি কারণে ভিয়েৎনাম যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন পরোক্ষভাবে লিপ্ত হয়েছে। তা হচ্ছে চীনকে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে কোণঠাসা করা। চীন-সোভিয়েত মনান্তর যখন একেবারে চরম রূপ নিল তখন সোভিয়েত ইউনিয়নের হাতে ভিয়েৎনামের যুদ্ধ এক মহা সুযোগ এনে দিল, যার দ্বারা সে জগতকে দেখাতে পারে যে চীনই আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঐক্য ভঙ্গ করছে এবং ভিয়েৎনামের কঠিন বিপদ সত্ত্বেও সে একতার পথে না-আসতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সোভিয়েত ইউনিয়নকে বিশেষ কিছু কৌশল করতে হয়নি। চীন ভিয়েৎনামের প্রতি তার প্রকৃত ভ্রাতৃপ্রতিম সংহতি দেখাল যখন সে সোভিয়েত ইউনিয়নকে ভিয়েৎনামে কিছুতেই কোন সামরিক কেন্দ্র বানাতে দিল না এশিয়ার কোন দেশে কোন শ্বেতশক্তির এহেন কেন্দ্রস্থাপন তার স্বার্থবিরোধী বলে রব তুলে। তাই প্রতি আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সমাবেশে সোভিয়েত তরফ থেকে ঐক্যের আহ্বান জানিয়ে চীনের বিচ্ছিন্নতামূলক এবং কপট মনোভঙ্গীকে প্রকাশ করে দেওয়া হয়।

অবশ্য উত্তর ভিয়েৎনাম এবং জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টও মতাদর্শগত কারণে সাহায্যলাভ করছিল বহুকাল থেকেই। কিন্তু রাষ্ট্রপতি জনসন যেদিন থেকে উত্তর ভিয়েৎনামের ওপরে আরেকটি কারণে বোমাবর্ষণ শুরু করে যুদ্ধকে ধাপে ধাপে তীব্রতর করে তুলতে শুরু করলেন সেদিন থেকে খোলাখুলিভাবেই সোভিয়েত সমর্থনের অঙ্গীভূত হলো সামরিক দ্রব্য সরবরাহ।

এক্ষেত্রে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সাম্প্রতিক সমৃদ্ধি বিস্ময়কর হলেও তাকে এখনো অনেকটা পথ এগোতে হবে। বিভিন্ন দেশকে বৈষয়িক সাহায্যদান তার পক্ষে নিতান্ত সহজ ব্যাপার নয়। এর ফলে জনসমাজের ওপর যে আর্থিক চাপ পড়ে সেটা সকলেই প্রসন্নমনে মেনে নিতে পারেন না। তাই ভিয়েৎনামকে বিপুলভাবে সাহায্য করার জন্য সমস্ত দেশে একটা উদ্দীপনা-সৃষ্টিকারী আন্দোলন শুরু করতে হয়েছিল। তাতে সোভিয়েত নাগরিকরা যেভাবে সাড়া দিয়েছেন তা আশাতিরিক্ত হয়েছে বললে অত্যুক্তি হবে না। বহু কলকারখানাই ভিয়েৎনামে প্রেরণের জন্য যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করেছে নির্ধারিত সময়ের আগে। অনেক প্রতিষ্ঠান এবং অফিসে কর্মীরা অকাতরে তাঁদের একদিনের বেতন ভিয়েৎনামের সাহায্যভান্ডারে অজস্রহাতে দান করেছেন এবং সেই অর্থে প্রচুর পরিমাণে ওষুধপত্র, কাপড়চোপড় ভিয়েৎনামবাসীরা পেয়েছেন। শুধু অর্থনীতিকই নয়, সামরিক দিক থেকেও সোভিয়েত সহায়তা যেমন বিচিত্র তেমনি বিরাট। অসংখ্য ভিয়েৎনামী সৈনিক, নাবিক এবং বৈমানিক সোভিয়েত দেশে এসে শিক্ষালাভ করে গেছেন। চীন অবশ্য সোভিয়েত সমরসম্ভার যাতে যথাসময়ে ভিয়েতনামে না পৌঁছতে পারে তার জন্য বহু বাধা সৃষ্টি করেছে। তারা এমন কি শুল্ক পর্যন্ত দাবী করেছে তাদের ভ্রাতৃপ্রতিম ভিয়েৎনামবাসীদের কাছ থেকে। সেজন্যে এখন ঘুরপথে সামুদ্রিক রাস্তায় সোভিয়েত সামরিক সাহায্য আসছে। মার্কিনী বি-৫২ মার্কার বিমান ভূপাতিত হচ্ছে সোভিয়েত রকেটে আর সেইজন্যেই সামরিক রসদ আমদানীর বন্দর হাইফং মার্কিনী বিমানবাহিনীর অন্যতম লক্ষ্য। তবে সুখের বিষয় আজও কোন প্রত্যক্ষ মার্কিন-সোভিয়েত সংঘর্ষ ভিয়েৎনামে ঘটে নি। সে ঘটলে জগতের সর্বনাশ, কিন্তু চীনের পৌষমাস।



একই রাস্তায় যুদ্ধের প্রস্তুতি ও জনসাধারণের নিরুদ্বেগে চলা-ফেরা

ফরাসীদের চোখে ভিয়েৎনামের লড়াই

দিবীশ [illegible]

আজকের ভিয়েৎনামের লড়াই মুখ্যত ভিয়েৎকংদের সঙ্গে মার্কিনদের কিন্তু ভিয়েৎনামের লড়াই শুরু হয়নি প্রথমে আমেরিকানদের নিয়ে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ১৯৪৫ সালেই শুরু হয় ভিয়েৎনামে স্বাধীনতার লড়াই। সে লড়াই ছিল উপনিবেশবাদ উচ্ছেদের লড়াই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগেই ভিয়েৎনামে ফরাসী উপনিবেশবাদ শতাব্দী পূর্ণ করে। ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে ভিয়েৎনাম বলে কোনো রাষ্ট্র জানা ছিল না। একালের উত্তর-দক্ষিণ ভিয়েৎনাম, লাওস ও কম্বোজ মিলে একটি উপনিবেশ ছিল ফরাসীদের কাছে পরিচিত। যার অপর নাম ফরাসী ইন্দোচীন। তিন-চারটে ভৌগলিক পরিধিতে ভাগ করে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা, যেমন কোচীন-চীন, টংকিন, লাওস, কম্বোজ। ছিল আরও ছোটখাট রাজ্য ও রাজা। একদিকে ফরাসীদের সাম্রাজ্যবাদী আমলা, আরেকদিকে রাজা-মহারাজা, রাজকুমারদের খামখেয়ালিতে চলত প্রজাশাসন। সমগ্র ইন্দোচীন ছিল ফরাসী আমলা ও রাজা মহারাজাদের কাছে সোনার-খনি বিশেষ। দারিদ্র্য ছিল, কিন্তু অভাব ছিল না। চালের ফলন যেমন পর্যাপ্ত তেমনি ছিল মাছ-মাংস কৃষিজ পণ্য জাতও। সবচেয়ে বড় ব্যবসা ছিল ফরাসী বণিকদের রবার রপ্তানি। বিশ্বের বাজারে রবার ব্যবসায়ে এখনো ইন্দোচীনের রবার সকলের ওপরে। তার ওপর রয়েছে খনিজ দ্রব্য। কয়লাও প্রচুর। এসবের ব্যবসায়ে ফরাসী বণিক আর ওখানকার রাজা-মহারাজারা থলে ভর্তি করে প্যারিসে বসে স্ফূর্তিতে দিন কাটাত। অধিকাংশ রাজা-মহারাজাদের বিরাট প্রাসাদ গড়ে ওঠে দক্ষিণ ফ্রান্সের রিভিয়েরা অঞ্চলে। প্যারিসের কথা না বলাই ভাল। তাদের সম্পত্তি এখনও রয়েছে সেখানে। ইন্দোচীনের অতুল ঐশ্বর্য ভোগ করার অধিকার ছিল না সেখানকার জনগণের। তারই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ আন্দোলন শুরু হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে হ্যানয় ও সায়গনে হো চি মিনের পরিচালনায়। হো চি মিন তখনও কম্যুনিস্ট, এখনও তাই। ইন্দোচীনে রাজনৈতিক আন্দোলনে কম্যুনিস্ট পার্টির দান অনেকখানি বলেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাপ-বিরোধী সশস্ত্র আন্দোলন যেমন বাড়ে তেমনি যুদ্ধের শেষে উত্তরাঞ্চলে অনেক সেতুতে গড়ে ওঠে ফরাসী উপনিবেশবাদ-বিরোধী আন্দোলন। সেই যে শুরু হয়েছে লড়াই, তার জের চলেছে এখনও। এবং কবে যে সে লড়াই শেষ হবে কোনো বিশেষজ্ঞই তার সঠিক দিন-তারিখ বলতে পারেন না।

ভিয়েৎনামের লড়াই যাদের নিয়ে শুরু তেইশ বছর আগে, সেই ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী সরকারের মতিগতির পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটেছে গত তেইশ বছরে অনেকবার। আজ থেকে পনের-বিশ বছর আগে ফরাসী জনগণের এবং কতিপয় রাজনৈতিক দলের যে মনোভাব ছিল ভিয়েৎনাম স্বাধীনতা লড়াই সম্পর্কে, আজ তাদের মনোভাব পুরোপুরি বদলেছে। পনর বছর আগে আমি নিজেই দেখেছি ফরাসী দেশে কিছু সংখ্যক উপনিবেশবাদী জনগণ ও দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দল চাইত ইন্দোচীনে তাদের সাম্রাজ্য যেন আরও কায়েম হয়ে বসে থাকে। এখন বামপন্থী, মধ্যপন্থী, দক্ষিণপন্থীরা তো সমস্বরে বলছে ভিয়েৎনামে লড়াই থামাও। বিদেশী রাষ্ট্রেরা ওখানে নৃশংস অত্যাচার বন্ধ কর। কিন্তু পনের বছর আগের সেইসব উপনিবেশবাদী ও



দক্ষিণ ভিয়েৎনামে ভিয়েৎকং সন্দেহে ধৃত এক ব্যক্তির মুখের সামনে ছুরি ধরে স্বীকৃতি আদায় করা হচ্ছে



ভিয়েৎকং সন্দেহে ধৃত জনৈক মহিলাকে মার্কিন সৈনিকদের একজন তাকে নানাভাবে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে।

দক্ষিণপন্থীরা আজকাল আর আগের মতন উপনিবেশের পক্ষে ওকালতি করে না। তারা এখন প্রায় চুপচাপ। অর্থাৎ পরোক্ষে ভিয়েৎনামে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে দ্যগল নীতির প্রতি সমর্থন রয়েছে তাদেরও।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরেই ইন্দোচীনে স্বাধীনতার লড়াই ও ফরাসী উপনিবেশ অবসানের প্রতি প্রত্যক্ষ সমর্থন ছিল ফরাসী কম্যুনিস্ট দলের। সোস্যালিস্ট ও অন্যান্য মধ্য-বামপন্থীরা তখনও উপনিবেশবাদের পক্ষে ওকালতি করে। দক্ষিণপন্থীদের কথা না বলাই ভাল। যাই হোক ভিয়েৎনাম ইতিহাসের মোড় ঘোরে ১৯৫২-৫৩ সালে। অতি-আধুনিক অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত ফরাসী সামরিক বাহিনীকে ঘায়েল করে ভিয়েৎকং বাহিনী তাদের সংখ্যাল্প ও পুরোনো অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে। দিয়েন বিয়েন ফু হল তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। দিয়েন বিয়েন ফু লড়াই সম্বন্ধে আমাকে এক ফরাসী সমরনেতা প্রসঙ্গক্রমে বলেছিলেন যে, দিয়েন বিয়েন ফু ঘাঁটিটা ছিল ফরাসী সামরিক বাহিনীর গৌরব। ওই অঞ্চলটাকে তারা দুর্গের মতন করে গড়ে তোলে। সেখানে ছিল প্রচুর অস্ত্র ও রসদ। তারা ভেবেছিল যে, ভিয়েৎকংরা সাঁজোয়া বাহিনী নিয়ে এসে তাদের আক্রমণ করবে এবং সেই সম্মুখ সমরে ভিয়েৎকংরা সমুচিত শিক্ষা পাবে। ফল হল উল্টো। ভিয়েৎকংদের সেনাপতি গিয়াপ তার কৃষক-সৈনিকদের সাইকেলে চাপিয়ে বন-জঙ্গলের পথ ধরে এনে হাজির করেন দিয়েন বিয়েন ফুতে। কোনো ভারী কামান নেই, নেই সাঁজোয়া গাড়ী বা ট্যাঙ্ক। সাইকেলে-চড়া সৈনিক। রাত্রে যখন ফরাসী সৈনিকরা বিশ্রাম করছিল তখন সাইকেলআরোহী ভিয়েৎকং সৈনিকরা দিয়েন বিয়েন ফুর চারপাশে বেষ্টন করে গুলি চালাতে শুরু করে। ভোরবেলা শুরু হল ফরাসী-ভিয়েৎকং সৈনিকের হাতে হাতে সম্মুখ লড়াই। সে লড়াইয়ের ইতিহাস সব ফরাসীর কাছেই জাজ্বল্যমান হয়ে আছে। সে লড়াই পরাজয়ের লড়াই। তারপরেই ফরাসী রাজনীতির মোড় ঘোরে। এর মধ্যে প্রধান ছিলেন কূটনীতিবিদ প্রধানমন্ত্রী মন্দেস ফ্রাঁস। মন্দেস ফ্রাঁস দেখলেন যে এভাবে লড়ে


অস্ত্রের ভারে ক্লান্ত মার্কিন-সৈনিক।


দং হো এলাকায় উত্তর-ভিয়েৎনামীরা মাইন পুঁতে রাখছে।

হিউ-এর হ্রদের ধারে মার্কিন সৈন্য একটি ভাঙা দেওয়ালের আড়াল থেকে শত্রু পক্ষের সৈন্যদের প্রতি লক্ষ্য রাখছে।



কোনো লাভ নেই। উপনিবেশ যখন ছাড়তেই হবে তখন একটা রফা করে সসম্মানে চলে যাওয়াই ভাল। তাই ১৯৫৪ সালে শুরু হল দুই পক্ষে জেনেভা সম্মেলন। আর ১৯৫৫ সালের গোড়ায় মন্দেস ফ্রাঁসের মন্ত্রিত্ব-কালেই ইন্দোচীনে ফরাসী উপনিবেশ-বাদ অবসানকল্পে নতুন নীতি অবলম্বন করা হয়। ১৯৫৫ সালের জুন মাসে জেনেভা সম্মেলনে তার একটা আধা রকম হল। ফরাসী সামরিক বাহিনী ইন্দো-চীন ত্যাগ করল। নতুন রাষ্ট্রও গড়ে উঠল সেখানে। প্রবেশ করল আমেরিকানরা।

উত্তর ভিয়েৎনামে চলল হো চি মিনের রাজত্ব আর দক্ষিণে দিয়েমের। দিয়েম প্রথম-দিকে ছিলেন ফরাসী ঘেঁষা, পরে হয়ে যান মার্কিনপন্থী। মার্কিনদের প্রবেশ আরও বাড়ল। তারা ভিয়েৎনাম যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল।

১৯৫৫ হতে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত ফরাসী সরকার ভিয়েৎনামে মার্কিনদের সমর্থন করে এসেছে। ১৯৫৮ সালের মে মাসে ফরাসী সরকারে প্রবেশ ঘটল জেনারেল দ্যগলের। ১৯৫৯ সাল থেকে শুরু হল দ্যগলের সঙ্গে মার্কিন সরকারের মতবিরোধ। তখন অবশ্য ভিয়েৎনাম নিয়ে নয়। আলজেরিয়া ও ইউরোপীয় রাজনীতি নিয়ে। আলজেরিয়া লড়াই শেষ হল ১৯৬২ সালে। আলজেরিয়া স্বাধীন হল। উত্তর আফ্রিকা সমস্যা ঘুচল। ১৯৬৩ সালে ভিয়েৎনামে দিয়েমকে নিয়ে গন্ডগোল শুরু হল আমেরিকানদের সঙ্গে। দিয়েমের ভাই-বৌ মাদাম নু প্যারিসে এলেন আমে-রিকানদের বিরুদ্ধে বলতে। দ্যগলের দৃষ্টি গেল ভিয়েৎনামের দিকে। ১৯৬৩ সালে দ্যগল ভিয়েৎনাম সম্বন্ধে কোনো সুস্পষ্ট মত ব্যক্ত করেন নি। ১৯৬৪ সালে তিনি স্পষ্টই বলে ফেললেন, ভিয়েৎনামে লড়াই করে কোনো লাভ নেই। আমেরিকানরা অর্থহীন একটি যুদ্ধের জন্যে লড়ছে। তারা সুবিধে করতে পারবে না। তার চেয়ে ভাল হবে সব বিদেশী রাষ্ট্র সেখান থেকে সরে গেলে। অর্থাৎ চীন ও আমেরিকা যদি শুধুশুধু ভিয়েৎনামবাসীদের ওপর হামলা না চালায় তাহলেই ভিয়েৎনামে শান্তি ফিরে আসবে। একথায় চীনারা খুব খুশি হয়নি। সবচেয়ে বেশী চটে আমেরিকান সরকার। ভিয়েৎনাম নিয়ে দ্যগলের সঙ্গে আমে-রিকানদের মনকষাকষি শুরু হল সেই থেকে। দ্যগলকে সমর্থন জানায় হো চি মিনের ভিয়েৎমিন সরকার। দক্ষিণ ভিয়েৎ-নাম সরকার দ্যগলকে কঠোরভাবে সমা-লোচনা শুরু করে দেয়। মার্কিন-ঘেঁষা দক্ষিণ ভিয়েৎনাম সরকার দ্যগলকে শত্রুর মতন ঘৃণা করে। তারা জানে যে দ্যগলের নিরপেক্ষ প্রস্তাব গ্রহণ করলে এবং মার্কিন সামরিক বাহিনী চলে গেলে তাদের পক্ষে ভিয়েৎকংদের সঙ্গে লড়াই করা সম্ভব হবে না। পরাজয় অনিবার্য। আর দ্যগল ভাবেন যে, বিদেশী রাষ্ট্রগুলো চলে গেলে উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েৎনামে প্রয়োজন হবে উন্নত-প্রগতিশীল কিন্তু নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের যাদের সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্য অতি জরুরী। সেই দিক থেকে ফ্রান্স সে অভাব পূরণ করতে পারবে। ভিয়েৎনামের জনগণ, কী উত্তর কী দক্ষিণের সবাই আজ রণক্লান্ত। তারা চায় একটু শান্তি। শান্ত পরিবেশ। ভিয়েৎনামে শান্তি প্রস্তাবে দ্যগল যা বলেছেন তা উত্তর-দক্ষিণ ভিয়েৎনামের বহু নেতাই সমর্থন করেন। ভিয়েৎনামে শান্তি প্রতিষ্ঠা হলে ফরাসীরা যদি দিনকয়েকের জন্যে একটু মাতব্বরি ও ব্যবসাবাণিজ্য করে তাতে ভিয়েৎনামিদের তেমন আপত্তি নেই আপাতত। পরের কথা পরে হবে এমনি তাদের মনোভাব।

প্রচন্ড যুদ্ধকালে দানাং-এর ত্রিশ মাইল উত্তরে এই সমস্ত শিশু ও জননীরা মার্কিন সৈন্যদের আশ্রয়ে রয়েছে।





দা নাং—দক্ষিণ ভিয়েতনামের একটি মেয়েকে চুরুট খেতে দেখা যাচ্ছে। পিছনে মার্কিন সেনেটর টেড কেনেডিকে এক শরণার্থী শিবিরের জনৈক চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলতে দেখা যাচ্ছে। এই শিবিরে ৩৩ হাজার শরণার্থী আছে।

তেলআভিভে ভিয়েৎনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশ করা হচ্ছে।



ভিয়েৎনাম বৃটেনের নীতি

প্রতীক ভৌমিক

বৃটেনের ভিয়েৎনাম নীতি বর্তমান বৎসরের দুটি ঘটনা থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। জানুয়ারী এবং ফেব্রুয়ারী মাসে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ উইলসন গিয়েছিলেন মস্কো এবং ওয়াশিংটন। সে সময়ে প্রচারিত হয় দুটি বিবৃতি।

জানুয়ারী মাসে প্রধানমন্ত্রী মিঃ উইলসন মস্কো যান। সেই সময়ে দুটি দেশের একটি যুক্ত বিবৃতি প্রচারিত হয়। ঐ বিবৃতিতে ভিয়েৎনাম বিরোধের রাজনৈতিক সমাধানের জন্য আহ্বান জানান হয়। নিজেদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার সম্পূর্ণ এবং অবিচ্ছেদ্য অধিকার একমাত্র সেই অঞ্চলের জনগণেরই আছে। এই নীতির ভিত্তিতেই এই বিরোধের সমাধান করতে হবে। বৃটেন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৫৪ সালের ইন্দোচীন সম্পর্কিত জেনেভা সম্মেলনের চেয়ারম্যান। দুই রাষ্ট্রই এই সুদৃঢ় অভিপ্রায় প্রকাশ করেছেন যে, উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য তারা একক এবং যুক্তভাবে তাদের সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করবেন।

পর্যবেক্ষক মহল বলছেন যে উইলসন কোসিগিনের যুক্ত বিবৃতি এবং উইলসনের প্রকাশ্য বিবৃতি থেকে মনে হয় যে, মিঃ উইলসনের যদি ভিয়েৎনাম সম্পর্কে সোভিয়েত নীতি কিছুটা মোলায়েম করার ইচ্ছা থেকেও থাকে তাতে তিনি আদৌ সফল হননি। তবে তাঁরা একথাও বলেছেন যে, যুক্ত বিবৃতিতে যা প্রকাশ পায়নি যা প্রকাশ্যে যা বলা হয়নি তা আরও তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এরপরই ওয়াশিংটন সফরে যান এবং তিনি বিশেষ জোর দিয়েই বলেন যে, ভিয়েৎনাম সম্পর্কে পূর্ব ও পশ্চিমের বিরোধ ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এই সময়ে এক সাংবাদিক বৈঠকে মিঃ উইলসন বলেন যে, যুদ্ধের পথে ভিয়েৎনাম সমস্যার সমাধান কিছুতেই করা যাবে না।

তিনি বলেন যে, সোভিয়েত নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনাকালে বেশির ভাগ সময় স্বভাবতই ভিয়েৎনাম প্রসঙ্গ নিয়েই আলোচনা হয়, কারণ আজকের পৃথিবীতে ভিয়েৎনাম সমস্যার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা আর কিছু নেই। এ ব্যাপারে প্রধান কর্তব্য হচ্ছে এই সমস্যার ন্যায়সঙ্গত সমাধানের পথ খুঁজে বার করা, তবে সে সমাধান যে রাজনৈতিক পথে হবে না, এ সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নেই।

এরপরই মিঃ উইলসন ওয়াশিংটন যান। সেখানে তিনি তিনটি কথা জানান ঃ

তিনি বিশ্বাস করেন যে, বর্তমান সামরিক নীতি— [illegible] ।সে

দুজনেই যুবক : একজন মার্কিনী অপরজন ভিয়েৎকং বন্দী।



নীতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে—ভিয়েৎনামে শান্তি প্রতিষ্ঠার তাই ঠিক পথ;

এই বিশ্বাস থেকে তিনি সরে দাঁড়াতে চান না, আমেরিকা অথবা ব্রিটেন থেকে যত চাপই আসুক না কেন;

তাছাড়া তিনি মার্কিন সরকারকে বরাবরের মত সমর্থন জানিয়ে যাবেন এমন কথাও বলবেন না।

মার্কিন টেলিভিশনে তিনি স্পষ্টই বলেছিলেন যে, আমেরিকানরা যদি এমন কোন পথ গ্রহণ করেন যা ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট কোনমতেই অনুমোদন করতে পারেন না তাহলে তা প্রেসিডেন্ট জনসনকে জানিয়ে দেওয়া হবে।

তিনি কলাম্বিয়া ব্রডকাস্টিং সিস্টেমের "ফেস দি নেশন" প্রোগ্রাম-এ বলেন : "আমাদের মত হল যতদিন আমরা একে শান্তির শ্রেষ্ঠ পথ মনে করব ততদিন এই পথেই চলব।"

প্রেসিডেন্ট লিন্ডন জনসনের ঘনিষ্ঠ মহলের অনেকেই ওয়াশিংটনে মিঃ হ্যারল্ড উইলসনের বক্তৃতায় সাহসিকতার যে সুর প্রকাশ পেয়েছিল তার প্রশংসা করেন।

পার্লামেন্টে যখন মিঃ উইলসনের প্রায় শতাধিক সমর্থক ভিয়েৎনামে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক ধাপ হিসাবে নীতি থেকে বৃটেনকে সরে আসবার জন্য দাবী জানাচ্ছিলেন এবং যখন বিরোধী নেতারা মার্কিন নীতির প্রতি পূর্ণ সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করছিলেন তখনই তিনি বৃটেন থেকে উড়ে যান ওয়াশিংটনে।

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তৃতায় সন্দেহের কোন অবকাশ রাখেন নি যে তাঁর গবর্ণমেন্ট সংযমের মধ্য দিয়েই আলোচনার পথে অগ্রসর হতে চান। তিনি ভিয়েৎনাম যুদ্ধ-বিস্তারের সম্ভাবনায় বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সঙ্গে তাঁর মত ব্যক্ত করেন।

টেলিভিশনে মিঃ উইলসন স্পষ্টই বলেন, ভিয়েৎনাম যুদ্ধ প্রসারের চেষ্টা বিপজ্জনক হবে। ভিয়েৎনামে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের জন্য চাপ দেওয়ার কোন প্রস্তাব হয়েছে কিনা এরূপ প্রশ্ন করা হলে তিনি সরাসরি বলেন সেটা 'পাগলামি' হবে—পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহার কেবল আমেরিকার পক্ষেই যে বিপজ্জনক তা নয়, সারা বিশ্বেরও যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার বড় রকমের ঝুঁকি দেখা দেবে।

সান এন্টোনিও প্রস্তাব

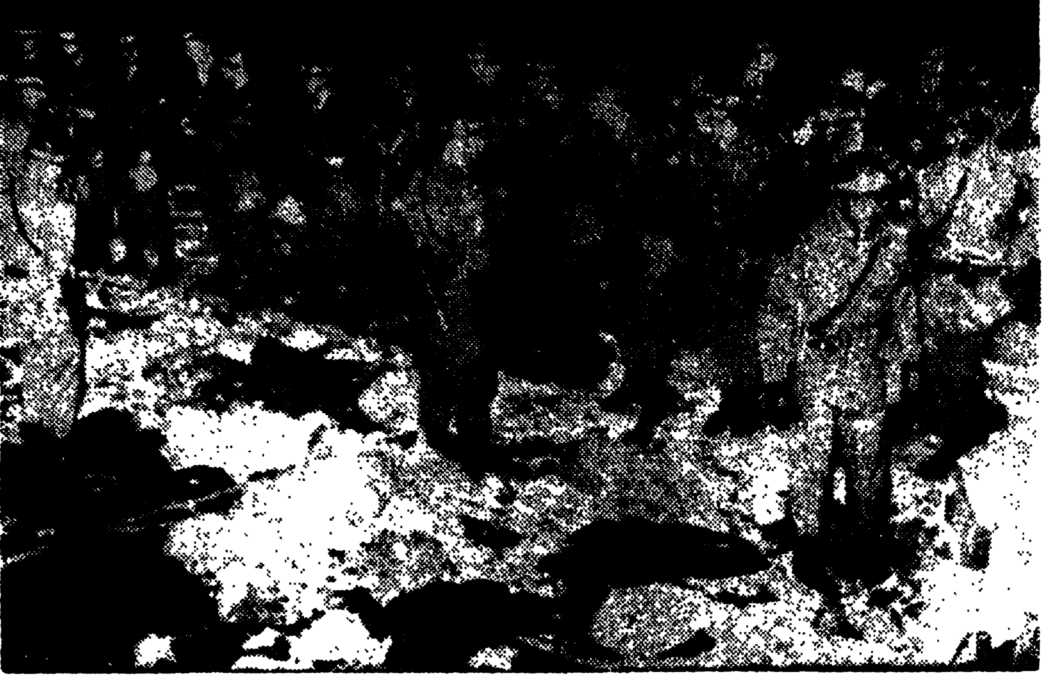
ভিয়েৎনাম সমস্যা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করে তিনি বুঝেছেন যে, সান এন্টোনিও প্রস্তাবই—বোমা বন্ধ করে তাড়াতাড়ি আলোচনায় বসা, অবশ্য এই মনোভাব নিয়েই আলোচনায় বসা হবে যে, হ্যানয় বোমাবন্ধের সুযোগ নেবে না—এইটেই সমস্যা সমাধানের প্রকৃত পথ

সান এন্টোনিও প্রস্তাব নিয়ে তিনি বলেন, শান্তির পথ মোটামুটিভাবে বের করা গেছে এবং এই পথে অগ্রসর হওয়া আগের চেয়ে অনেক সহজ হবে বলেই মনে করা যাচ্ছে। ভিয়েৎনামের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী যে খবরের ইঙ্গিতই বহন করুক না কেন তিনি সত্য সত্যই বিশ্বাস করেন, শান্তি স্থাপিত হতে পারে।

মস্কো এবং হ্যানয়ে যাঁরা মনে করেন যে, সান এন্টোনিও প্রস্তাবের অর্থ হল যুক্তরাষ্ট্র আলোচনার ফলাফলকে পূর্ব শর্ত হিসাবে গ্রহণ করে বোমাবর্ষণ বন্ধে রাজি হবে, তাঁরা ভুল করছেন—এই কথাই তিনি তাঁদের জানান।

মিঃ উইলসন বলেছেন, রাজনৈতিক মীমাংসার জন্য আলোচনা একান্ত প্রয়োজন, এবং এই আলোচনা এক একটি দিন বিলম্বিত হওয়ার অর্থ হল দুর্দশা বৃদ্ধি; তিনি আরও বলেন যে, মীমাংসার সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে একটিমাত্র মৌলনীতি। তা হল, গণতান্ত্রিক ও নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ঐ এলাকার জাতিসমূহের নিজেদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের অধিকার।

পেন্টাগনের সামনে ভিয়েৎনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানানোর সময় মিলিটারী পুলিসদের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পোস্টারের মধ্যে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যাচ্ছে।





সায়গন শহরের পশ্চিমাঞ্চলে কম্যুনিস্টরা মর্টার কামানের আক্রমণ চালালে সরকারী বাহিনীর একটা ট্যাঙ্ক এগিয়ে ।। কিন্তু স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত বাড়ীতে আশ্রয় নেবার বদলে ট্যাঙ্ক দেখার জন্য বেরিয়ে পড়ে।

ইউ পি আই রেডিও ফটো

সত্তা

সত্যেন রায়





বকুলদি বলছিলেন।

রাত আটটা। শীতটা যাবো যাবো করেও যায় নি। গায়ে একটা পাতলা চাদর দিয়ে অলসভাবে বসে আছেন বকুলদি। সামনে চায়ের কাপ। আমি আরাম করে ইজি-চেয়ারটায় শুয়ে। সিগারেট টানছি। বেশ শান্ত পরিবেশ।

তাহলে জীবন, তুমি বিয়ে করছো না, বললেন বকুলদি।

আমি উত্তর দিই, না বকুলদি, আমার জীবনে আর বিয়ে করা সম্ভব নয়।

কেন? কোথাও গোপনে কিছু করছো নাকি, চোখটা একটু বেঁকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন বকুলদি।

না, তেমন কিছু নয়, তবে জীবনে কখনও কখনও এমন ঘটনা ঘটে যায় যার কোন ব্যাখ্যা নেই, আমারও ঠিক তাই। বকুলদি, ঠিক গুছিয়ে বলতে পারবো না, আমার বলার মতন সৎসাহসও নেই, তাই ওটা উহ্যই থাক।

জীবন, খুব কাব্য করতে শিখেছো তাই না, মৃদু হেসে বকুলদি বললেন।

আচ্ছা, আপনি কি আপনার সবচেয়ে গোপন কথাটি আমাকে বলতে পারেন, বলি আমি।

কেন পারবো না, বকুলদি জানান, কি শুনতে চাও বলো, আমি সবকিছু বলতে পারি।

আমি ঠিক সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে পারি না। বকুলদিকে দেখছি আজ প্রায় পাঁচ বছর। এখানে মেয়েদের স্কুলের হেড-মিস্ট্রেস হয়ে এলেন যেদিন, সেদিন বেশ সোরগোল উঠেছিল। কারণ অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমিস্ট্রেস জ্যোৎস্নাদির সেই পোস্টে যাওয়ার কথা কিন্তু স্কুলকমিটি ওঁকে না দিয়ে বাইরে থেকে বিজ্ঞাপন মারফৎ নতুন হেডমিস্ট্রেস বকুলদিকে নিয়োগ করলেন। বকুলদি এলেন। বয়স মাত্র একত্রিশ বছর।

চেহারাটা বকুলদির চোখে পড়বার মত। লম্বা চেহারা, হাত পা বুক সমস্ত যেন গ্রীক-ভাস্কর্য। দেখলেই তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। অন্য কারুর চোখে হয়তো অন্য রকম ভাসতে পারে। আমি কিন্তু কোন দিন সে রকম চোখে দেখিনি, কিম্বা ভাবতেও পারি নি। আমি ভালো গান করি, অন্ততঃ সবাই তাই বলে। মেয়েদের স্কুলের পুরস্কার বিতরণী সভায় মেয়েরা কয়েকটি গান গাইবে, তাই আমার ডাক পড়েছিলো। প্রথম দিন যেতেই বকুলদি এগিয়ে এলেন। নমস্কার করে বললেন, আমার স্কুলের মেয়েদের যদি একটু কষ্ট করে আপনি গানগুলো শিখিয়ে দেন তবে খুব ভালো হয়। তারপর অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু মিস বকুল দত্ত কখন যে আমার কাছে বকুলদি হয়ে গেছে সেটা টেরও পাই নি। তারপর প্রায়ই বকুলদি ডেকে পাঠাতেন। যেতাম, গল্প করতাম। চা-জলখাবারও জুটতো। আস্তে আস্তে বকুলদির সঙ্গে অনেকটা বন্ধুর মতই হয়ে গেলাম। কোন দিন রাজনীতি, কোন দিন ফ্রয়েড, কোন দিন শিক্ষা সব বিষয়েই আলোচনা করতাম। আমার বয়স এখন কত? তা গত মাঘ মাসে সাতাশে পড়েছি। আর এই পাঁচ বছরে বকুলদির বয়স ছত্রিশ দাঁড়ালো। তবে বকুলদিকে দেখলে মনে হবে খুব জোর ত্রিশ বছর।

মালদহ থেকে জামাইবাবু এসেছিলেন আমার বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে। বাবা, মা আগেই দেহরক্ষা করেছেন। বাসায় থাকার মধ্যে আছে এক পিসি। বোন দুটিকে বাবা আগেই পার করে গেছেন। অবশ্য ভালোই করে গেছেন। নইলে আমার মতন লোকের ক্ষমতা ছিলো না যে বোনদের বিয়ে দেবো। বেশ আছি।

বকুলদিকে আগেই সব কথা জানিয়ে ছিলাম। ফাইনাল 'না' করেছি গত পরশু জামাইবাবুকে। তাই আজ এ প্রসঙ্গ উঠলো।

কি ভাবছো কি অত, একেবারে বোবা হয়ে গেলে যে, বকুলদি বললেন।

না বকুলদি, ঠিক তা নয়, তবে এরপর একদিন নিশ্চয়ই বলবো। এবারে আমি বেশ জোর দিয়ে বলি, তা আপনি তো বললেন না, আপনার সব কথাই খুলে বলতে পারেন। এবার আমি যদি বলি, বলুন দেখি আপনার কোন গোপন কথা।

বকুলদি বললেন, কি সম্বন্ধে শুনতে চাও বলো।

আমি বেশ গম্ভীর গলায় বলি, এমন এক ঘটনা বলুন যা আপনার কাছে সবচেয়ে গোপনীয়, আবার সবচেয়ে মধুময়। যা কিছুতেই আপনি মন থেকে মুছে ফেলতে পারেন নি।

চা ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিলো। বকুলদি উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, আগে গরম করে চা বানিয়ে আনি, তারপর বেশ মজিয়ে গল্প করবো। পাশের ঘরে ইলেকট্রিক হিটার রয়েছে। বকুলদি জল চড়িয়ে দিলেন। ৫ মিনিটের মধ্যেই চা করে নিয়ে এলেন। আমি এর মধ্যে উঠে একটু পায়চারি করে নিলাম। এবারে ইজিচেয়ারে না বসে ড্রেসিং টেবিলের পাশে ছোট টুলটায় বসলাম। বকুলদিকে বললাম, আপনি ওই ইজিচেয়ারে বসুন, আমার পিঠ ধরে গেছে। আমি জানালার পাশে বসলাম।

বকুলদি চায়ের কাপটা আমার হাতে দিলেন। আর একটা কাপ নিজে নিয়ে বসলেন। আলতো একটি চুমুক দিয়ে আর বলে মাথাটা ইজিচেয়ারের ওপর পেতে

দিলেন। আমি এদিকে বসে ভাবছি বকুলদি কি বলবেন। যতটুকু দেখেছি তাতে মনে হয় প্রেম সংক্রান্ত ব্যাপারে বকুলদির কোন দুর্বলতা নেই। চেহারার বাঁধন দেখলেও বোঝা যায়, এ দেহে কারুর হাত পড়ে নি। তাই ভাবছি বকুলদি কি বলবেন।

তাকিয়ে দেখি বকুলদি চোখ বুজে শুয়ে আছেন। হাত দুটো দুপাশে ঝুলিয়ে দিয়েছেন। মনে হচ্ছে যেন কোন অতীতের কথা বলার জন্য সেই পুরানো দৃশ্যপটগুলি দেখে নিচ্ছেন। আমি বললাম, কি ব্যাপার বকুলদি, এবারে যে আপনিই চুপ করে গেলেন।

না ভাই, চিন্তা করে নিলাম, একথা বলবো কিনা, কিম্বা তোমাকে বলা ঠিক হবে কিনা। তা যাই হোক জীবন, আমি ঠিক করে ফেলেছি তোমাকে বলবোই। কারণ কাউকে না বললে আমি স্বস্তি পাচ্ছি না।

আমি কোন উত্তর দিলাম না। বকুলদি এবারে পা দুটো লম্বা করে ছড়িয়ে দিলেন। সামনে ছোট জলচৌকিটার ওপর পায়ের গোড়ালি দুটো তুলে দিলেন। দূরে বোধ হয় সিনেমার ইভিনিং শো শেষ হলো। রিকশার হর্ণ শোনা যাচ্ছে। তারপর ৩।৪ মিনিট পর চারদিক নিঝুম হয়ে এলো। ঘরের মধ্যে বোধ হয় আমাদের নিঃশ্বাসটুকু ছাড়া আর কোন শব্দই পাওয়া যাচ্ছে না।

শোন জীবন, বকুলদি যেন কোন দূরে দেশ থেকে কথা বলছেন, ঢাকায় আমাদের আদৎ বাড়ি। ওখানেই মানুষ হয়েছি। দেশ বিভাগের পরও আমরা ঢাকায় থেকে গেলাম।

স্কুল পাশ করে ঢাকা কলেজে ভর্তি হলাম। ছোট ভাই ক্লাস টেন-এ উঠলো। প্রথম প্রথম ভালোই ছিলাম। কলেজ যেতে শুধু মাঝে মাঝে টিটকারি দিতো। আমি ওসব লক্ষ্যই করতাম না। তবে অনেকের চেয়ে আমি সুন্দরীই ছিলাম।

আপনি এখনও তেমনি আছেন, হঠাৎ বলে ফেলি আমি।

কি যে বলো জীবন, আজ আমার বয়স কতো জানো? বকুলদি বলেন।

জানি বকুলদি, জানি বলেই বলছি।

ছাই জানো, বকুলদি উত্তর করেন, এখন আমার ছত্রিশ বছর চলছে। তুমি খুব না হলেও আমার থেকে ন'বছরের ছোট।

তাহলেও আপনাকে দেখলে আমার চাইতে দু-এক বছরের বড় দেখায়, বেশ আমতা আমতা করে বলে ফেলি।

বকুলদি আর কথা বলেন না। আবার সেই পুরানো স্মৃতিতে ফিরে গেলেন। জানো জীবন, বকুলদি আবার আরম্ভ করলেন, কলেজে পড়ার সময় আমার দু-চারজন বান্ধবী লুকিয়ে তাদের প্রেমিকদের চিঠি দিতো। অনেক সময় আমাকে পড়তে দিতো। সে কি ভাবের জোয়ার। পড়তাম, কিন্তু আমার মনে কোনই দাগ কাটতো না। রেণু বলে আমার এক সহপাঠিনী ছিলো। ও এক ছেলের সঙ্গে প্রথম প্রেম করা আরম্ভ করলো। তারপর একদিন অন্তঃসত্ত্বা হল রেণু। কী করে হলো সবই আমাকে বলেছিলো। কখন প্রথম চুমু খেয়েছিলো, কবে কোথায় কিভাবে দেহ দান করেছিলো সবই বিস্তারিত আমাকে জানিয়েছিলো। কিন্তু বিশ্বাস করো ভাইটি, আমার মনে এ নিয়ে কোন চঞ্চল্য হতো না। আমি শুনেই যেতাম।

তখন থার্ড ইয়ারে পড়ি। ইতিমধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়ে গেছে। দেশ বিভাগের অভিশাপ এবার স্পষ্ট দেখতে পেলাম। অনেকেই শিকার হলেন এই রক্ত-করা ঘটনায়। আর তর সইল না আমাদের। চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই সমস্ত মালপত্র বাঁধা-বাঁধি আরম্ভ করলেন বাবা। ঠিক হলো আমি আমার ভাই-বোনদের নিয়ে আগে রওনা হবো। বাবা পিসিমাকে নিয়ে পরে।

মাঘ মাস তখন। বেশ কনকনে হাওয়া বইছে। স্টীমার ঘাটে এসে দেখি ভীষণ ভিড়। অনেক কষ্টে ডেকের একপাশে জায়গা করা হলো। কিন্তু লোকের পর লোক। চারিদিকে চেঁচামেচি, কেউ কাকে ডাকছে। ভোম্বা গেলো কই, ওরে ময়না কোথায় গেল, আরে আচারের বোতলটা ফেলেই এলাম। কেউ আবার সরোষে কান্না। সব মিলিয়ে একটা বীভৎস ব্যাপার। এর মধ্যে আবার প্রায় ৫০।৬০ জন যাত্রী উঠলো। আমার ছোট ভাই বললো, দিদি কলঘরের পাশে লম্বা একফালি জায়গা খালি আছে। চল ওখানে যাই। ওদিকটায় একটু অন্ধকার মতন। চলে এলাম বাক্স-পেটরা নিয়ে। লম্বা হাত দশেকের মতন জায়গা। অর্ধেকটা অন্য এক পরিবার দখল করে রয়েছে। একটি বছর আঠারো ছেলে। তার সঙ্গে রয়েছে দুটি বোন। বোধ হয় পিঠাপিঠি। সঙ্গে মা রয়েছেন। আমাদের মতনই কোন পরিবার।

খোলা জায়গায় ঠাণ্ডা বেশী লাগতে পারে তাই বোনগুলোকে কলঘরের গা-ঘেঁসে শোয়ানোর ব্যবস্থা করলাম। আমি ঠিক করলাম স্টীমারের রেলিং-এর পাশে শুয়ে থাকবো, ঘুম তো হবে না জানি। ছোটভাই অবস্থা দেখে বললো, দিদি, আমি ও-পাশের ডেকে যাচ্ছি। ওখানে সুনীলরা রয়েছে, ওদের সঙ্গে বসে গল্প করেই রাত কাটিয়ে দেবো। তুই শুয়ে পড়। ভাই চলে গেল ওদিকটায়। এর মধ্যে দেখি পাশের পরিবার বিছানা পেতে ফেলেছে। ওদের মা কলঘর ঘেঁসে শুয়ে পড়লেন। তার পাশে দুটি মেয়েকে শোয়ালেন। বাকি রইলো ছেলেটি। সেও আর দ্বিরুক্তি না করে তাদের পাশেই শুয়ে পড়লো। এখন অবস্থাটা দাঁড়ালো এমন যে, আমাকে শুতে হলে ওই ছেলেটির পাশেই শুয়ে পড়তে হয়। মাঝ-খানে এক হাতেরও কম জায়গা থাকে।

একটানা স্টীমার চলেছে। যাত্রীদের কলকোলানিও থেমে গেছে। রাত প্রায় একটা। সবাই ঘুমে ঢুলছে। আমি কিন্তু ঘুমুতে পারছি না। ঢাকা শহরের সবকিছু ছেড়ে যেতে হচ্ছে। বাবা পিসিমার জন্যও মন খারাপ লাগছে। সুটকেস খুললাম। ভাবলাম একটা বই নিয়ে পড়ি। হাতের সামনে একটি বই উঠে এলো। রেণু পড়তে দিয়েছিলো। দু-এক পৃষ্ঠা পড়েওছিলাম। ভালো লাগে নি। বইটা আর ফেরৎ দেওয়া হয় নি। কেমন করে প্রেম করতে হয়, ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে লেখা। আবার কিছু চুম্বন অবস্থায় ছবিও ছিলো। সময়তো কাটাতেই হবে। শুতেও কেমন লজ্জা করছে। পাশেই ছেলেটি শুয়ে রয়েছে। যদিও আমি ওর দিদির বয়সী।

বইটা খুললাম। দেখি এক ছবি। চুম্বনরত অবস্থায় নারী ও পুরুষ। তারপর দু লাইন পড়তে দেখি চুম্বন কিভাবে করতে হয়, কোন অবস্থায় চুম্বন মধুর হয়ে ওঠে, এইসব লেখা। আবার পৃষ্ঠা ওল্টালাম। এবারকার ছবিটা দেখে মাথা ঝিম্ঝিম্ করে উঠলো। শরীরটাও কেমন জানি করে উঠলো। নাঃ, বইটা আর পড়বো না। বন্ধ করে রাখলাম। কিছুক্ষণ ধরে ওই সব ছবির কথা বারবার মনে হতে লাগলো। হাত বাড়িয়ে জলের ঘটিটা নিয়ে চোখেমুখে জল দিলাম। পাশে তাকিয়ে দেখি ছেলেটি অঘোরে ঘুমুচ্ছে। মুখটা বেশ সুন্দর। স্টীমারের হাওয়ায় চুলগুলো একটু একটু উড়ছে।

স্টীমারটা এগিয়ে চলেছে। একেই কম আলো। তারপর বাতির জোরও যেন কমে এলো। ফলে আমাদের এদিকটায় আরও অন্ধকার দেখাচ্ছে। আমার খোঁপাটা খুলে পড়েছিলো। বেশ করে আবার বাঁধলাম। বুকের ভেতর একটু ঠাণ্ডাও লাগছে। ব্লাউজের বোতাম কয়টা বন্ধ করে দিলাম। গায়ে কম্বলটা টেনে বসলাম।

অন্ধকারে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে ইঞ্জিন-ঘরের দরজা খুলে কয়লা দেওয়া হচ্ছে, সেই সময় আলো এসে পড়ছে। ছেলেটি ঘুমাচ্ছে, আর সেই আলো ওর মুখে এসে পড়ছে। একেই ছেলেটির রং ফরসা, তারপর যখন লাল আলো এসে পড়ছে তখন মনে হচ্ছে যেন এক রাজপুত্র শুয়ে রয়েছে। খুব ভালো লাগছে। আজিও তাকিয়ে দেখছি। ছেলেটির সবচেয়ে যেটা চোখে পড়বার, তা হচ্ছে ওর ঠোঁট দুটি। ঠিক যেন মেয়েদের ঠোঁট। বইটায় যে ছবি দেখেছিলাম, মনে হলো, ওর ঠোঁটে বুঝি সেই মধু মাখানো রয়েছে। আমার বুকটা কেমন জানি কেঁপে উঠলো। মনে হলো এই মুহূর্তে বোধ হয় নিজেকে হারিয়ে ফেলবো। কিন্তু আমি ভাবছি কি? শত হলেও ওর থেকে বয়সে বড়, তাছাড়া ও কেবা কে? এসব ভাবাই অন্যায়। লেখাপড়া শিখেছি, সংযম কোন দিনই হারাই নি। জীবনে কাউকে একটা প্রেমপত্রও লিখি নি।

যে বয়সে মেয়েরা সবচেয়ে বেশী ভুল করে, সে বয়স তো পার করে এসেছি, তবুও আজ এই অদ্ভুত পরিবেশে এসব আমি ভাবছি কি? ছি ছি, নিজেকে বড় ছোট মনে হতে লাগলো। উল্টোদিকে ঘুরে বসলাম। না আর ছেলেটির দিকে তাকাবো না। ওর মুখটা দেখলেই কেমন যেন মনে হচ্ছে। কিন্তু ঘুরে না বসলেই ভালো করতাম। জানো জীবন, সেদিন যদি ঘুরে না বসতাম তাহলে এই কাহিনী বলার মতন কিছুই থাকতো না।

সামান্য একটু থেমে আবার বলতে শুরু করলেন বকুলদি। কি দেখলাম জানো। কলঘরের ও পাশটায় একটি ছেলে আর একটি মেয়ে পাশাপাশি বসে রয়েছে। অন্য সবাই ঘুমে অচেতন। আর ওরা দুজনে জেগে থেকে কি করছে? দেখি মেয়েটাকে টেনে নিয়ে ছেলেটি এক চুমু দিয়ে বসলো। মেয়েটিও কেমন যেন লাতিয়ে ছেলেটির গায়ে এলিয়ে পড়লো। এবারে মেয়েটির মুখ আমার দিকে ফিরলো। পাছে দেখে ফেলে তাই আমিও চট করে কম্বলটা টেনে নিয়ে আমার জায়গায় শুয়ে পড়লাম। মুখটা একটু বের করে ওদের ব্যাপারটা লক্ষ্য করে যেতে লাগলাম। আমার পাশে ছেলেটির নিঃশ্বাস পর্যন্ত শুনতে পাচ্ছি। একটু পরে ঘুমের ঘোরেই ছেলেটির হাত আমার গায়ে এসে পড়লো। আমি আস্তে করে ওর হাতটা সরিয়ে দিলাম।

কিন্তু আমার ঘুম নেই। এবারে দেখি ছেলেটি তার জায়গায় শুইয়ে দিলে মেয়েটিকে। তারপর দুহাত দিয়ে সজোরে মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরে আবার চুমু খেলো। মেয়েটি কেমন যেন অসার হয়ে শুয়ে রয়েছে। তারপর দেখি ছেলেটি গায়ের লেপটি নিজের গায়ের ওপর লম্বা করে ঢেকে দিলে। মেয়েটি ও ছেলেটিকে আর দেখা গেলো না। আমার শরীরটা কাঁপতে লাগলো। বুকটা, ঠোঁট দুটো কেমন যেন হয়ে উঠলো। আমি যে নারী সেটা যেন আমার মধ্যে জাগ্রত হয়ে উঠলো। প্রেম কী জিনিস, তা জানি না। কিন্তু এই মুহূর্তে কেন জানি কোন পুরুষের বাহুবন্ধনে নিজেকে নিষ্পেষিত করতে ইচ্ছা হলো। আমার সংস্কার, আমার শিক্ষা, আমার সংযম কোথায় যেন হারিয়ে গেলো। দুর্বার কামনা জেগে উঠছে আমার শরীরে। আর নিজেকে সংযত করতে পারছি না। পাগল হয়ে গেলাম আমি। ছেলেটিকে সজোরে আকর্ষণ করে নিলাম আমার বুকে। প্রথমে ছেলেটি বুঝতে পারে নি। কিন্তু একটু পরেই ওর ঘুম ভেঙ্গে যায়। সজোরে ছেলেটি আমাকে জড়িয়ে ধরল।

বকুলদি বেশ হাঁপাচ্ছেন। কান লাল হয়ে উঠেছে। বুকটা জোরে ওঠা-নামা করছে। হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে বকুলদি বললেন একি জীবন, তুমি অমন কাঁপছ কেন? শরীরটা কি ভালো নেই?

কি জানি বকুলদি, হঠাৎ মাথাটা কেমন জানি ঘুরে উঠলো। আমি বাসায় চললাম, বলে আমি উঠে দাঁড়ালাম।

বকুলদি আমার মাথায় হাত দিয়ে দেখলেন, কই জ্বর বলে তো মনে হচ্ছে না।

আমি রুমাল দিয়ে মুখটা ঢেকে দ্রুত বললাম, বকুলদি আমি চললাম। খুব মাথা ঘুরছে এরপর হয়তো বাসায় পৌঁছাতে পারবো না।

টলতে টলতে এক রকম পালিয়েই এলাম বকুলদির ঘর থেকে। বোধ হয় এই শেষ আসা। কেমন করে বলবো সে দিনের সেই ছেলেটিই আমি। প্রথম যৌবনে একবারের জন্য যে নারীকে পেয়েছিলাম, যার স্মৃতি আমি বহন করে এসেছি এত বৎসর, ভেবেছিলাম যদি কোন দিন সেই নারীর দেখা পাই তবে তাকে নিজের করে নেবোই। কিন্তু বকুলদি যে সেই, এটা আমার কল্পনারও বাইরে। তাই আর থাকতে পারলাম না। ছুটে বেরিয়ে এলাম। দূরে অনেক দূরে কোথাও চলে যেতে হবে। বকুলদিকে তো আর এ ঘটনা বলা যাবে না কখনো।

সমরেশ বসুর **জগদ্দল** ১৫·০০

দীপক চৌধুরীর **আবৃত আকাশ** ২য় সং ১০·০০

বিমল মিত্রের **এর নাম সংসার** ৪র্থ সং ৮·৫০ **গল্পসম্ভার** দাম ঃ ১৬·০০ **শ্রী** ৫ম সং ৪·৫০

শংকর-এর

মানচিত্র ॥ ১৪শ সং প্রকাশিত হল ॥ **চৌরঙ্গী** ॥ ১৯শ সং ॥ **রূপতাপস** ॥ ৫ম সং প্রকাশিত হল ॥

সাংস্কৃতিকী ২য় খণ্ড ॥ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ॥ ৬·৫০
রবীন্দ্রায়ণ ॥ শ্রীপুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত ॥ ১ম খণ্ড ১২·০০ ২য় খণ্ড ১০·০০
এক ঝাঁক খঞ্জন ॥ বনফুল ॥ ৪·০০
আকাশভরা সূর্যতারা ॥ নিমাই ভট্টাচার্য ॥ ৪·০০
নাম ভূমিকায় ॥ শ্রীপান্থ ॥ ১৫·০০

জরাসন্ধ-র

মসিরেখা ৫ম সং ৯·০০ **আশ্রয়** ৭ম সং ৩·৫০ **মহাশ্বেতার ডায়েরী** ২য় সং ৪·০০

সতীনাথ ভাদুড়ীর **অলোক দৃষ্টি** দাম ঃ ৭·৫০
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের **হসন্তী** ৩য় সং ৪·৫০
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের **নিশিপদ্ম** ৮ম সং ৪·০০
দিলীপকুমার রায়ের **অভাবনীয়** ২য় সং ১০·০০

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের **দ্বিতীয় অন্তর** ২য় সং ১০·০০
বসু বসুর **আমার জীবন** সচিত্র সং ১৫·০০
চাণক্য সেনের **তিনতরঙ্গ** ২য় সং ৬·০০

ভবঘুরে ও অন্যান্য ৪র্থ সং ॥ সৈয়দ মুজতবা আলী ॥ ৬·৫০
আমেরিকায় ডায়েরী ২য় সং ॥ দেবজ্যোতি বর্মণ ॥ ৭·৫০
সাহিত্য-সংস্কৃতি-সময় ॥ নন্দগোপাল সেনগুপ্ত ॥ ৪·০০
বিশ্বসাহিত্যের সূচীপত্র ॥ নীলকণ্ঠ ॥ ৮·০০
সমাজবিজ্ঞান প্রসঙ্গ ॥ মন্মথনাথ রায় ॥ ৩·৫০

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের **পৌষ ফাগুনের পালা** ৪র্থ সং ১৫·০০

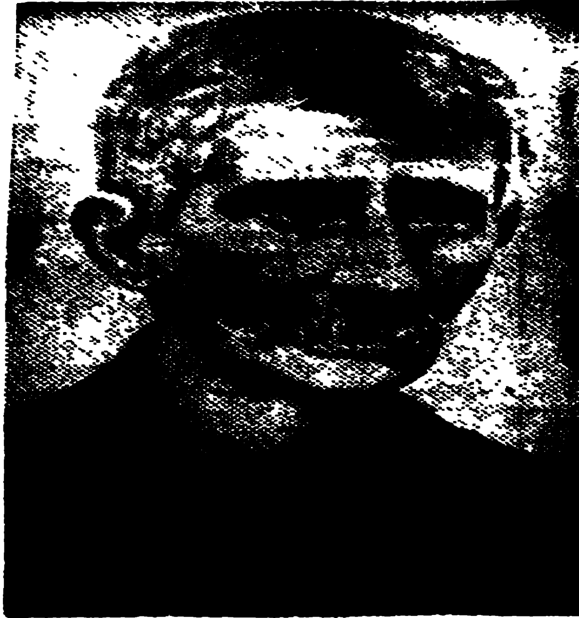
বনফুলের **দূরবীন** ৩য় সং ৪·৫০

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সর্বাধ্যক্ষ স্বামী বিরেশ্বরানন্দের আশীর্বাদধন্য মালতী গুহরায়ের **ভারতী নিবেদিতা** ৬·৫০

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্করী-প্রসাদ বসু ও শংকর সম্পাদিত **বিশ্ববিবেক** ২য় সং ১২·০০

বাক্-সাহিত্য ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

[illegible] **দাবী** নাটক ৩·০০



শতাব্দীর পারে ॥ ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

অমৃত অমৃতমাঝে শতাব্দী ধরিয়া
পাঞ্চজন্যে বিঘোষিল সত্যের মহিমা;
অধর্মের রাজরোষ উপেক্ষা করিয়া
দৃপ্ততেজে উদ্ভাসিল শিশির-গরিমা!
ধ্বনিত হয়েছে সেথা গণমানসের
আশা ও আকাঙ্ক্ষাভরা ব্যর্থ আকুলতা—
চিহ্নিত রয়েছে বুকে মুক্তি-সংগ্রামের
জ্বলন্ত কাহিনী মাঝে দুর্জয় বারতা।

আজিও কল্যাণময়ী মূরতি তাহার
যে গান শোনাতে চায় নবীন ভারতে,
ঝঙ্কারি উঠিছে সেই স্বর মূর্ছনার
জনগণ-অধ্যুষিত মুক্ত রাজপথে!
শতাব্দীর পারে সেই অমৃতবাজার
যৌবনের দীপ্তরূপে জ্বলিছে আবার।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

স্মরণীয় শিল্পীর জীবনী গ্রন্থ—(২)

হার ম্যাজেস্টিস স্টেশনারী অফিস থেকে ১৯৬৬-তে "অব্রে বিয়ার্ডসলী একজিবিসন অ্যাট দি ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড আলবার্ট মিউজিয়ম" এই নামে যে ক্যাটালগ প্রকাশিত হয়েছিল তা সম্পাদনা করেছেন ব্রায়ান রীড এবং ফ্রাঙ্ক ডিকিনসন। এই ক্যাটালগটি বিশেষ মূল্যবান, কারণ এই গ্রন্থে মূলে চিত্রতালিকা, চিঠিপত্র, পাণ্ডুলিপি, ছবির প্রতিলিপি, কিছু বই, পোস্টার, ফটোগ্রাফ এবং বিভিন্ন দলিলপত্র আছে। এই প্রদর্শনীতে ছিল মেবেল বিয়ার্ডসলীর ছবি, অস্টিন স্পেয়ারকৃত (অব্রের আঁকা নয়)। মেবেল ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হয়ে ১৯১৬-তে মারা গিয়েছেন, তার দশ বছর আগে এই ছবি আঁকা হয়েছিল। ক্যানন জন গ্রে তাঁর বন্ধু আঁদ্রে র‍্যাফেলোভিচের স্মরণে এই ছবিটি দান করেছেন। মেবেলের রোগশয্যা নাকি লন্ডনের সাংস্কৃতিক সমাজের মিলনকেন্দ্রে পরিণত হয়। চার্লস রিকেট মেবেলের জন্য "বিয়ার্ডসলী" পুতুল তৈরী করেছিলেন। ইয়েটস মেবেলের জন্য বিশেষভাবে রচিত দুটি কবিতা উপহার দেন। পাউন্ডের কবিতার কথা আগেই বলা হয়েছে। আলবার্ট ভিক্টোরিয়া মিউজিয়মে সিকার্টের আঁকা বিয়ার্ডসলীর পোর্টরেটও সাজানো ছিল, সেই ছবিটি—

> "Full length, bareheaded, holding cane and gloves, among tombs : 1894 —"

আর ছিল ম্যাক্স বীরবোমের আঁকা একটি ব্যঙ্গ চিত্র। ইয়েটস লিখেছিলেন :

> "He puts his hand upon the wall and stares in the mirror. He mutters 'yes, yes, I look Sodomite' which he certainly did not 'But no, I am not that', and then begins ranting against his ancestors, accusing them of that and this . . .

১৮৯৮ খৃস্টাব্দে ম্যাক্স বীরবোম বীয়ার্ডসলীর মৃত্যুতে যে শোক-প্রশস্তি রচনা করেন তাতে তিনি বলেছেন বীয়ার্ডসলীর এই অসামান্য চাহিদা তাঁর মৃত্যুর আগেই শেষ হয়ে যায়, তিনি বলেছেন :

> "The Beardsley boom" as it was called, had begun with "The Yellow Book", and it had ceased with "The Savoy" and Beardsley had, to all intents and purposes, been forgotten by the general public . . ."

প্রায় বৎসরাধিককাল ধরে বীয়ার্ডসলী অসুস্থ অবস্থায় বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ঘুরেছেন। সেইকালে লন্ডনের দেয়ালগাত্রে নতুন কোন পোস্টার-চিত্র প্রকাশিত হয়ে হৈ-চৈ সৃষ্টি করে নি, কিন্তু বীয়ার্ডসলীর পোস্টার লন্ডনের চিত্র-সমালোচকদের দৃষ্টি বিস্ফারিত করেছিল।

অভিনেত্রী ফ্লোরেন্স ফারের ছবি এঁকেছিলেন পোস্টারে, লন্ডন থিয়েটারের একটা নতুন ধরনের বিজ্ঞাপন। প্যারিসে তুলোস লুত্রেক পোস্টারকে আর্টের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, বীয়ার্ডসলী লন্ডনে তাই করলেন। ১৮৯৪ খৃস্টাব্দের "দি গ্লোব" পত্রিকা লিখলেন :

> ". . . an ingenious piece of arrangement, attractive by its novelty and cleverly imagined. The mysterious female who looms vaguely through the transparent curtain is, however, unnecessarily repulsive in facial type . ."

এই বছর এপ্রিল মাসের শেষে "ইয়োলো বুকে"র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ১৮৯২ খৃস্টাব্দে ওয়াইল্ডের "সালোমে" লর্ড চেম্বারলেনের আদেশে নিষিদ্ধ হয়, সারা বার্ণহার্ড তখনও এই নাটকের মহলা দিচ্ছেন। এর পর ওয়াইল্ড যে কমেডি লিখেছিলেন তা এক বছর পরে অভিনীত হয়। ১৮৯৩ খৃস্টাব্দে যখন এই 'সালোমে' নাটকের ফরাসী সংস্করণ প্রকাশিত হল তখন "দি টাইমস" পত্রিকা ক্ষিপ্ত হয়ে লিখলেন :

> 'It is an arrangement in blood and ferocity, morbid, bizzare, repulsive . . .'

১৮৯৪ খৃস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রকাশক এলান লেন ধনী ক্রেতার জন্য ইংরাজীতে ৫০০ কপি 'সালোমে' প্রকাশ করলেন, তার ছবি আঁকলেন বীয়ার্ডসলী। তবে, টাইটেল পেজের জন্য আঁকা ছবিখানি লেন নিজেই ছাপতে রাজী হলেন না। ৮ই মার্চ ১৮৯৪ তারিখে "দি টাইমসে" আর এক ক্ষিপ্ত মন্তব্য প্রকাশিত হল—

> "Fantastic, grotesque, unintelligible for the most part, and so far they are intelligible, repulsive —"

এর এক মাসের মধ্যে "দি ইয়োলো বুক" প্রকাশিত হয়। সম্পাদক হলেন হেনরী হারল্যান্ড আর কলা সম্পাদক অব্রে বীয়ার্ডসলী, ত্রৈমাসিক, বোর্ড বাঁধাই প্রতি খণ্ডের দাম পাঁচ সিলিং। হরিদ্রা বর্ণ নন্দনতাত্ত্বিক বর্ণ, সূর্যমুখী ফুলের রঙ, সস্তা দামের উপন্যাসের রঙ, ফরাসী উপন্যাসের রঙ। বীয়ার্ডসলী একটি হরিদ্রাভ ক্ষুদ্র পোস্টার আঁকলেন, বসন্ত আর সাহসের রঙ। এপ্রিল মাসে ইংলণ্ডে ডাফোডিল ফোটে, সেই প্রতীক ব্যবহার করলেন বীয়ার্ডসলী।

দি টাইমস এইবার জ্বলে উঠে লিখলেন :

> "Its role seems to be a combination of English rowdyism with French lubricity . . ."

অনেকে পার্লামেন্টে আইন করে এই জাতীয় শিল্পচর্চা নিষিদ্ধ করার দাবীও তুললেন। ওয়াইল্ডকে যখন গ্রেপ্তার করা হয় তাঁর হাতে এক খণ্ড 'ইয়োলো বুক' ছিল বলে কোন কোন সংবাদপত্রে প্রচারিত হলেও সেই সময় তাঁর হাতে ছিল, এক খণ্ড পীয়ের লুইকৃত "আফ্রোদিতে"।

এর পর বীয়ার্ডসলীর চাকরী গেল। কিন্তু শিল্পী হিসাবে বীয়ার্ডসলীর পরিণতি ঘটেছিল আশ্চর্যভাবে, প্রি-র‍্যাফেলাইট আঙ্গিক পরিহার করে বর্ণ নির্বাচনে অসামান্য সংযম এনেছিলেন।

অস্কার ওয়াইল্ডের বিচার শেষে "দি ইয়োলো বুক" লুপ্ত হল। প্রকাশক লেন ত' সর্বাগ্রে কুখ্যাত সাহিত্যিক ও শিল্পীদের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করলেন। এদিকে হাত থেকে সব কাজকর্ম এমন আকস্মিকভাবে চলে যাওয়ায় বীয়ার্ডসলী প্রচণ্ড অর্থাভাবে পড়লেন।

অবশেষে স্মিথার্স নামক জনৈক প্রকাশক 'দি ইয়োলো বুক' জাতীয় একটি পত্রিকা প্রকাশ করা স্থির করেন, তার নাম "দি স্যাভয়"। এবার আবার বীয়ার্ডসলী হলেন কলা সম্পাদক। বীয়ার্ডসলীর প্রতিভার হ্রাস হয় নি, তাঁর অংকনকুশলতা বরং অধিকতর সাফল্য লাভ করেছিল, কিন্তু আর তেমন জমল না। স্মিথার্সের ব্যবহার ভাল ছিল, তাঁর মনোভঙ্গী অনেক উদার, তিনি অবশ্য বীয়ার্ডসলীর ছবির উত্তেজক দিকটাই বেশী পছন্দ করতেন। এদিকে অসুস্থ বীয়ার্ডসলী এখানে-ওখানে ঘুরে ১৮৯৮ খৃস্টাব্দে দক্ষিণ ফ্রান্সে পরলোকগমন করলেন।

মিঃ উইনট্রাউবের বীয়ার্ডসলী জীবনীটির সাহিত্যিক মূল্য অবশ্যই আছে কিন্তু চরিত্র বিশ্লেষণে ও পারিপার্শ্বিকতার বিচার কিঞ্চিৎ দুর্বল হয়েছে। সেই তুলনায় কিন্তু হার ম্যাজেস্টির স্টেশনারী অফিস কর্তৃক প্রকাশিত ক্যাটালগ অনেক তথ্যপূর্ণ এবং পূর্ণাঙ্গ জীবনীগ্রন্থের সমতুল হয়েছে বলা যায়।

—অভয়ঙ্কর

(1) BEARDSLEY : A Biography by Stanley Weintraub. (William Heinemann : 35 shillings).

(2) AUBREY BEARDSLEY EXHIBITION AT THE VICTORIA & ALBERT MUSEUM — 1966 : (Catalogue) by Brian Reade & Frank Dickinson. H. M. Stationery Office. Price 7 shillings.

ভারতীয় সাহিত্য

তেলুগু ভাষায় বাংলা কবিতা ॥

রবীন্দ্রনাথের পর প্রায় কোনও বাঙালী লেখকের রচনাই তেলুগু ভাষায় অনূদিত হয়নি। সম্প্রতি আধুনিক বাঙালী কবিদের কবিতার অনুবাদ প্রকাশ করবার জন্য 'দিগম্বর কভুলু' কবি সমাজ এগিয়ে এসেছেন। এর মধ্যেই তাঁরা কয়েকজনের কবিতার অনুবাদ করে ফেলেছেন। তাঁরা এইসব অনূদিত কবিতা নিয়ে একটি সংকলন গ্রন্থও প্রকাশ করবেন।

শুভবন্তু সাহিত্যসভা ॥

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছুসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী মিলে কিছুকাল আগেই সংগঠিত করেন শুভবন্তু সাহিত্যসভা। আশুতোষ ভট্টাচার্য, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু, রথীন্দ্রনাথ রায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সাধন ভট্টাচার্য, রমেশ মাথুর, চন্ডী লাহিড়ী প্রমুখ এই পাক্ষিক সাহিত্যসভার সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত। কলকাতার বিভিন্ন কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্যানুরাগী বর্তমান বা প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীগণ ইচ্ছে করলে এই আলোচনা-সভায় অংশগ্রহণ করতে পারেন। সংস্থার পক্ষ থেকে প্রকাশিত একটি বিবৃতিতে সাহিত্যানুরাগীদের ৬৫ গোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা ১২-য় সংস্থার সম্পাদক অসিত পালের সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হয়েছে।

অনুবাদ সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা ॥

'ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার প্রতিবেশী সাহিত্যের অনুবাদের মাধ্যমেই পরস্পরের সমৃদ্ধি ও পুষ্টিলাভ সম্ভব। এভাবেই একদিন ভারতীয় সংস্কৃতির পথ আরও প্রশস্ত হবে।'—বলেছেন শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ। গত ১৪ ফেব্রুয়ারী এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গ-সাহিত্য পরিষদের সুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত এক সভায় প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি উপরের মন্তব্যটি করেন। তিনি বলেন যে, "বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যাংশের অনুবাদের দ্বারা সাহিত্য আরও সমৃদ্ধ হতে পারে।" এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে বি-এ ও এম-এ পরীক্ষায় বাংলা ভাষাকে যাতে ঐচ্ছিক বিষয়রূপে স্থান দেওয়া হয়, তার জন্যও তিনি চেষ্টা করবেন বলে জানান।

অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রীকিরণকুমার ভট্টাচার্য। পরিষদের সহ-সভাপতি শ্রীতরুণকান্তি ভট্টাচার্য এবং সম্পাদক শ্রী দেবেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ও ভাষণ দেন। অনুষ্ঠানে এলাহাবাদের বহু শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিকের সমাবেশ ঘটে।

কলকাতায় ব্রিটিশ পুস্তক প্রকাশক

লন্ডনের বি পি সি পাবলিশিং লিমিটেডের রপ্তানী ম্যানেজার মিঃ টম বোর্ডম্যান গত ২ মার্চ বোম্বাই থেকে দুদিনের জন্য কলকাতায় এসেছিলেন। তিনি এখানে তাঁর প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে যাঁদের যোগাযোগ রয়েছে তাঁদের সঙ্গে দেখা করেন ও আলোচনা করেন।

তাঁর এই সফরের উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন পুস্তকপ্রকাশক ও পুস্তকবিক্রেতাদের সঙ্গে কোম্পানীর সম্পর্ক সুদৃঢ় করা এবং কোম্পানীর নতুন রেফারেন্স পুস্তক 'দি হিস্ট্রি অব দি টুয়েনটিয়েথ সেনচুরি'র বন্টন ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করা।

মিঃ বোর্ডম্যান মনে করেন শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে সাহিত্য-পুস্তকের বিক্রি ক্রমশ বেড়ে যেতে থাকবে।

সত্যেন্দ্র সাহিত্য সংবাদ ॥

গত ১৩ ফেব্রুয়ারী কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের জন্মস্থান নিমতায় হাইস্কুল প্রাঙ্গণে কবির ৮৭তম জন্মদিবস পালন করা হয়।

ভিয়েতনামের ওপর দৃষ্টি ॥

ভিয়েতনামের দিকে আজ সারা পৃথিবীর চোখ। যাঁরা রাজনীতি করেন, আর যাঁরা রাজনীতি করেন না—তাঁদের সকলের কাছেই এটি একটি সমস্যা। এই বিষয়টির ওপরে বহু প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচিত হয়েছে। সম্প্রতি বেরিয়েছে ডীন ব্রেলিসের লেখা 'দি ফেস অব সাউথ ভিয়েতনাম' নামে একটি সচিত্র গ্রন্থ। মিস জিল ক্রেমেন্তজ-এর তোলা অজস্র ছবিতে বইটি আকর্ষণীয়।

ফ্রি-ল্যান্স ফটোগ্রাফার হিসেবে মিস ক্রেমেন্তজ দক্ষিণ ভিয়েতনামের সর্বত্র ঘুরে বেড়িয়েছেন। তাঁর মতে, যুদ্ধই প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধের সারকথা নয়। মানুষের ওপর যুদ্ধের প্রতিফলন ও প্রতিক্রিয়া প্রদর্শনই তাঁর ছবি তোলার আসল কারণ। সেইজন্যই, যুদ্ধের মানুষের ভয়াবহ দিনযাপনের পাশাপাশি সাধারণ জনজীবনের উদ্দীপক চিত্রাবলীও তিনি স্বচ্ছন্দে তুলে গেছেন। যুদ্ধের ব্যাপারে তাঁর কোন আদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গি ছিল না। সৈনিকদের আহার-বিহার, আমোদ-প্রমোদ, খেলাধুলা প্রভৃতি যেমন তাঁর ছবির উপকরণ —তেমনি আহত সৈনিকদের হতাশা, ক্লান্তি ও স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের ব্যাকুলতাও সমভাবে আকর্ষণীয়।

গ্রন্থকার ডীন ব্রেলিস একজন সাংবাদিক। তিনি চিত্রপরিবেশ তথা সরবরাহ করেছেন। হো চি মিনকে তিনি জন জনগণের মত গল্পের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়ক হিসেবে অঙ্কিত করেছেন। দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রধানমন্ত্রী কী সম্পর্কেও অনুরূপ গল্পের অবতারণা। ব্রেলিস ভিয়েতকংদের এলাকায় প্রবেশের সুযোগ পাননি। তবে, ভিয়েতকংদের হাতে বন্দী হয়েছিলেন এমন একজন সদ্য-বিবাহিত নিগ্রো-সার্জেন্ট ও সবে-গোঁফওঠা একজন আমেরিকান তরুণের গল্প করেছেন। অবশ্য, এরা দুজনেই ভিয়েতকংদের কাছ থেকে পালিয়ে আসতে পেরেছিলেন।

মিস ক্রেমেন্তজ এখন নু-ইয়র্কে আছেন। ব্রেলিস গ্রন্থ শেষ করেছেন এই বলে —"এবং এখনও যুদ্ধ চলছে...।"

গ্রন্থটি উপন্যাসের মতো ঘটনাবহুল।

পরলোকে অধ্যাপক পিতিরিম এ সোরোকিন ॥

প্রখ্যাত দার্শনিক অধ্যাপক পিতিরিম এ সোরোকিন সম্প্রতি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। ১৯৩১ সাল থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত তিনি ম্যাসেচুসেটসে হার্ভার্ড অধ্যাপকরূপে কাজ করেছিলেন। ঐতিহাসিক বিবর্তনের ওপরে তাঁর জীবনব্যাপী অনুচিন্তনের সার্থক ফলশ্রুতি 'সোস্যাল অ্যান্ড কালচারাল ডাইনামিকস'। বস্তুতান্ত্রিক জীবন-চেতনা এবং ভাববাদী প্রেম ও বিশ্বাসের মৌল ধারণার পার্থক্য নির্ণয়ে তাঁর চিন্তা কেন্দ্রায়িত ছিল। সোরোকিনের মতে, পাশ্চাত্য-সভ্যতা ভাবপ্রধান। তিনি তাঁর দীর্ঘজীবনে প্রায় তিরিশটি গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। এইসব গ্রন্থ উত্থান-পতনময় মানবজাতির আত্মধ্বংসী প্রবণতাসমূহকে উদ্দেশ্য করে লেখা।

থিয়োডোর স্টর্ম-এর জন্মদিবস পালন

জার্মানীর প্রখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক থিয়োডোর স্টর্ম-এর ১৫০তম জন্মদিবস পালিত হয়ে গেলো কিছুদিন আগে, তাঁর জন্মস্থান উত্তর সাগরের উপকূলে অবস্থিত হুসুম-এ। এই উপলক্ষে স্টর্ম ও তাঁর দ্বারা প্রভাবিত অন্যান্য সাহিত্যকৃতির একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সারা পৃথিবীর জার্মান কবি-সাহিত্যিকরা এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। জাপানের অধ্যাপক তাকাহাসি জাপানী-সাহিত্যে স্টর্ম-এর প্রভাব সম্পর্কে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। স্টর্মের বর্ণনাধর্মী শিল্পচেতনার প্রেক্ষাপটের ওপর সুবিস্তৃত আলোচনা করেন কনস্টানজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডব্লিউ প্রিসেনডানজ। টমাস মান তাঁর গ্রন্থে স্টর্মকে উনিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

উদ্যোক্তা সত্যেন্দ্র সাহিত্য সংসদ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মণীন্দ্র দত্ত এবং প্রধান অতিথি ছিলেন নন্দগোপাল সেনগুপ্ত। এই অনুষ্ঠানে সত্যেন্দ্র আসরের উদ্বোধন করেন স্বপনবুড়ো। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন বিষ্ণু সরস্বতী, সন্তোষ দত্ত, রেবতীভূষণ এবং আরও অনেকে। আবৃত্তি করেন শর্মিলা দত্ত, পরিতোষ মুখার্জি ও ফাল্গুনী দত্ত। সঙ্গীত পরিবেশন ও অন্যান্য কার্যে সহযোগিতা করেন অরুণ ব্যানার্জি, প্রবীর রায়, শোভনা ঘোষ এবং আরও অনেকে।

যুগোশ্লাভ লেখকদের সঙ্গে বাঙালী কবিদের আলোচনা ॥

গত ১ মার্চ সন্ধ্যায় নিখিল ভারত কবি সম্মেলনের দপ্তরে যুগোশ্লাভ লেখক আইভান ব্রাট্‌কো বাঙালী কবিদের সঙ্গে মিলিত হন। সম্মেলনের সভাপতি সতীকান্ত গুহ ব্রাটকোকে সমবেত কবিদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। সম্মেলনের সম্পাদক আশিস সান্যাল 'বেঙ্গলী লিটারেচার' পত্রিকাটি উপহার দেন।

ডঃ ব্রাটকো তাঁর ভাষণে যুগোশ্লাভিয়ার বর্তমান সাহিত্য আন্দোলনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। প্রসঙ্গত তিনি জানান যে, যুগোশ্লাভিয়ায় অনুবাদের কাজ খুব দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে এবং অধিকাংশ অনুবাদই ইংরেজী থেকে হয়।

আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন গোপাল ভৌমিক, মণীন্দ্র রায়, ডঃ মোহিত লাহিড়ী, ডঃ জগন্নাথ চক্রবর্তী, শান্তি লাহিড়ী, গণেশ বসু, যোগব্রত চক্রবর্তী, শ্যামল বসু, বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কবি ও অনুবাদকগণ।

অসমীয়া সাহিত্যিকের জন্মশতবর্ষ অনুষ্ঠান ॥

'সাহিত্য সেবা সমিতি' আসামের ডিগবয়ের একটি বিশিষ্ট সাহিত্য প্রতিষ্ঠান। সম্প্রতি এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে আসামের দুইজন সাহিত্যিকের জন্মশতবার্ষিকী উৎসব পালন করা হয়। এই সাহিত্যিক দুজন হলেন রজনীকান্ত বরদলুই ও চন্দ্রকুমার আগরওয়াল।

এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শ্রী আর এল বড়ুয়া। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন শ্রী পি এন দাসতালুকদার। ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অসমীয়া ভাষা ও সাহিত্যের প্রধান শ্রীসত্যেন্দ্রনারায়ণ গোস্বামী উপরের দুজন সাহিত্যিকের রচনা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডুমা কলেজের উপাধ্যক্ষ শ্রীরবীন চৌধুরী। শ্রীমতী সান্ত্বনা বড়ুয়া, অধ্যাপক অহেলা খানমান এবং অধ্যাপক বরদলুই প্রবন্ধ পাঠ করেন। সমিতির সম্পাদক শ্রী বি কে গোস্বামী সকলকে অভিনন্দন জানান।

শ্মশান পিড়ি ॥

হিন্দি কবিতায় হৈ-হুল্লোড়ের অন্ত অভাব নেই। এখন আবার এরকম হৈ-চৈ-এর একটি সংবাদ পাওয়া গেছে। নির্ভয় মল্লিক এবং তাঁর সহযোগী কয়েকজন কবি শ্মশান কাব্য রচনা আরম্ভ করেছেন। তাঁদের উদ্দেশ্য কি, তা তাঁদের প্রকাশিত গ্রন্থ থেকে খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। এঁরা রাত বারোটায় শ্মশানে গিয়ে কাব্য রচনা করবার চেষ্টা করবেন বলে স্থির করেছেন।

হিন্দি কবিতার ইংরেজি অনুবাদ ॥

হিন্দি কবিতাকে অহিন্দীভাষীদের মধ্যে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব নিয়ে "রূপাম্বরা" নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। পত্রিকাটির সম্পাদক শ্রীস্বদেশ ভারতী। সম্প্রতি পত্রিকাটির দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম সংখ্যার চেয়ে দ্বিতীয় সংখ্যা সবদিক থেকেই উন্নত মনে হল। দ্বিতীয় সংখ্যার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কবিতা হচ্ছে কুমারেন্দ্র পারেশনাথ সিংয়ের। আমরা উদ্যোক্তাদের স্বাগত জানাই।

স্টর্ম বাস্তববাদী সাহিত্যিক হলেও তাঁর রচনায় ইম্প্রেসানিজমের পদধ্বনি শোনা যায়। আসলে, তিনি ছিলেন বিষাদাচ্ছন্ন মানুষ। প্রকৃতি ও ভালোবাসার জাদুস্পর্শেই ছিল তাঁর স্বাভাবিক মুক্তি। জার্মান ভাষায় তাঁর রচনা সংগ্রহ আট খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। তা ছাড়া ইটালী, আমেরিকা, ফরাসী ভাষায় তাঁর রচনাবলীর অনুবাদ ও তাঁর রচনা সম্পর্কে আলোচনা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

রল্‌ফ হাফস্‌-এর কাব্যগ্রন্থ ॥

কবি রল্‌ফ হাফ্‌স একজন শহর-বিরক্ত মানুষ। তবু তাঁর কবিতার প্রেক্ষাপটে রয়েছে শহর। আধুনিকতার প্রভাবও কম নয় তাঁর কাব্যে। ১৯৬০ সাল থেকে তিনি বার্লিনের বাসিন্দা। জন্ম ১৯০৫ সালে। সম্প্রতি তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটির নাম 'ডোরস্তাদ্‌বিচ্‌তে'।

রল্‌ফ হাফ্‌স-এর মতে শহর একটি স্ব-নির্বাচিত কারাগার। এখানে মানুষ ব্যস্ত, কোলাহলমুখর এবং উত্তেজিত। চারদিকে কেবল কাজের ভিড়। এখানে মানুষ বস্তুকে দেখে, উপলব্ধি করে কিন্তু তার সঠিক ব্যাখ্যা জানে না।

জগৎ ও জীবন সম্পর্কে রল্‌ফ প্রায় নির্মোহ দৃষ্টির অধিকারী। কোনোপ্রকার কাব্যিক ভাবালুতা তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না। সমালোচক কার্ল কোলো লিখেছেন, তাঁর সতর্কতা ও পর্যবেক্ষণশক্তি অসাধারণ। কোনো প্রকারেই তিনি একঘেয়ে বা বিরক্তিকর নন। তিনি যা দেখেন, তা পাঠকেরও চিন্তাশক্তির উদ্বোধক।

ম্যাকিন্‌লে কান্টোর নতুন উপন্যাস ॥

'অ্যান্ডারসন্‌ভিল' উপন্যাসের জন্য একদা ম্যাকিন্‌লে কান্টোর পুলিৎসার পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছিলেন। সম্প্রতি তাঁর নতুন উপন্যাস 'বিউটি বিস্ট' প্রকাশিত হয়েছে।

এই উপন্যাসের কাহিনী অত্যন্ত সরল। নায়িকা সিডনী স্যাল্‌প্‌ দুবার বিধবা হওয়া একজন শ্বেতাঙ্গ রমণী। স্বামীর মৃত্যুর পর সে তার পাচকের প্রেমে পড়ে যায়। অবশ্য চেহারা চরিত্রে পাচকটি নিতান্ত কুশ্রী নয়। সে সুন্দর, ভাগ্যবান এবং 'বিউটি বিস্ট'-এর তাৎপর্যে বিচিত্র প্রতিভার অধিকারী। সে জানে, কি করে ফরাসী সমাজের সঙ্গে পাল্লা দিতে হয়। সে মোজার্ট এবং পিয়ানো বাজাতে পারে। তার মনিব সিডনী স্যাল্‌প্‌-এর চাইতে চলনসই কোনো প্রেমিকের কথা ভাবতেও পারেনি।

বিদেশী সাহিত্য

অবশ্য সিডনীর সুখী জীবন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। তার বাহ্যিক সৌন্দর্যের মোহ একদিন স্বাভাবিকভাবেই কেটে গেল। আর, নায়ক তার সকল অহংকার ও কুকর্ম নিয়ে পা বাড়ালো মৃত্যুর দিকে।

এ উপন্যাসের কোনো ঘটনাই আকস্মিক বা অপ্রত্যাশিত নয়। পাঠক যেন সব কথাই আগের থেকে জানেন। প্রকাশভঙ্গি ইঙ্গিতবহ।

গুন্টার কুনার্ট-এর উপন্যাস ॥

পূর্ব-বার্লিনের বাসিন্দা গুন্টার কুনার্ট-এর প্রথম উপন্যাস—'ইম নামেন দের হিউটে' প্রকাশিত হয়েছে মিউনিক থেকে। এই উপন্যাসের পটভূমিতে রয়েছে ১৯৪৫ সালের বার্লিন যুদ্ধের বিপর্যয়কারী শেষ ও তার পরবর্তী কয়েকদিন। নায়ক হেনরি একজন অমানুষিক শক্তিসম্পন্ন পুরুষ। যে মুহূর্তে তিনি অপরের টুপি নিজের মাথায় পরেন, সেই মুহূর্তেই তার মনের কথা বুঝতে পারেন। কুনার্ট এই কাহিনীর প্রেরণা পেয়েছেন গ্রীস এর [illegible]

নয়াদিল্লীতে এক অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন কয়েকজন শিল্পীকে ১৯৬৭-৬৮ সালের সংগীত নাটক আকাদেমি পুরস্কার দেন। চিত্রে কয়েকজন পুরস্কৃত শিল্পীকে দেখা যাচ্ছে।



নতুন বই

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু প্রথম খণ্ড (জীবনী)—মনোজ রায় ও গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য। আচার্য জগদীশচন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকী প্রকাশনী সংস্থা। ৯৩।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। কলকাতা—৯। দাম—পাঁচ টাকা।

আচার্য জগদীশচন্দ্রের গবেষণা ও আবিষ্কার সম্পর্কে বাঙলায় তেমন কোন উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচিত হয়নি। এই বিশ্ব-খ্যাত বিজ্ঞানী যে বাঙালীর কতখানি গৌরবের সে সম্পর্কেই যেন আমরা যথেষ্ট সচেতন হতে পারিনি। জগদীশচন্দ্র ছিলেন এদেশের বিজ্ঞান জগতের অন্যতম পথিকৃৎ। তিনি কাবের অধ্যবসায় ও বিজ্ঞানের অনুশীলনে আমাদের নমস্য। প্রবল প্রতি-কূলতার মধ্যে অনন্য মনীষাই তাঁকে এনে দিয়েছিল চরম সার্থকতা।

বর্তমান গ্রন্থে জগদীশচন্দ্রের কর্মময় জীবনকথা বর্ণনা করা হয়েছে। শৈশবশিক্ষা থেকে শুরু করে লন্ডন কেম্ব্রিজের ছাত্র-জীবন, কর্মারম্ভ, বৈজ্ঞানিক গবেষণার সূচনা, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েল সোসাইটীতে বক্তৃতা, বিভিন্ন বিজ্ঞানীর সান্নিধ্য, গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশ, বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা, রয়েল সোসাইটির সদস্যপদ লাভ, নির্বাক জীবনের অভিব্যক্তির বিষয়ে আলোচনা, বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা, বিদেশ ভ্রমণ প্রভৃতি থেকে জীবনের শেষ অধ্যায় পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এই বইতে।

গ্রন্থকার দুজনেই বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কৃতী ব্যক্তি। তাঁরা বিশ্লেষণের ভঙ্গীতেই জগদীশচন্দ্রের জীবন ব্যাখ্যা করেছেন। বহু স্থানে জগদীশচন্দ্রের উদ্ধৃতি তাঁদের আলোচনাকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। ভাষা অত্যন্ত স্বচ্ছ এবং সাবলীল। অনেকগুলি চিত্র আছে। গ্রন্থখানি সমাদৃত হবে।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

মানব মন (৫ম বর্ষ ঃ ১ম সংখ্যা) সম্পাদক ঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ১৩২।১এ, বিধান সরণী, দাম—১·২৫ টাকা।

ঠিক সাত বছর আগে মনোবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের আধুনিক চিন্তাধারাকে সহজভাবে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার গুরুদায়িত্ব নিয়েছিলেন মানব মন পত্রিকাগোষ্ঠী। বলাবাহুল্য, আজো যেভাবে তাঁরা নিয়মিত এই কাজটি করে যাচ্ছেন, তা নিঃসন্দেহেই প্রশংসার্হ। সম্প্রতি প্রকাশিত সংখ্যায় লিখেছেন তরুণ চট্টো-পাধ্যায়, কালিদাস বসু, সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার, ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়, ইভগেনি নাসাগর্শাইন, ইগারকিনা ও আলেগা আজভেরোভিচ।

●

অভিযান (ফাল্গুন সংখ্যা) সম্পাদক—তপন-কিরণ রায় ও জয়নারায়ণ সাহা; রায়গঞ্জ, পশ্চিম দিনাজপুর। দাম—৫০ পয়সা।

গ্রাম বাংলা থেকে প্রকাশিত সাহিত্য পত্রিকা খুব বেশি দেখা যায় না। 'অভিযান' কাগজটি হল সেই গুটিকয়েক উল্লেখযোগ্য পত্রিকার অন্যতম। নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, শুদ্ধসত্ত্ব বসু প্রমুখ কয়েক-জন ছাড়া বেশির ভাগ লেখকই নতুন। তবে এই নবাগতদের মধ্যেও কিছু প্রতিশ্রুতির ছাপ রয়েছে।

●

বানপ্রস্থ (১ম বর্ষ।। ১ম সংখ্যা)—সম্পাদক রমণীরঞ্জন সেনগুপ্ত। পি-৭ রাজা সুবোধ মল্লিক রোড। কলকাতা-৩২। পঞ্চাশ পয়সা।

প্রথম সংখ্যায় লিখেছেন যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য, অমরপ্রসাদ ভট্টাচার্য, পশুপতি-রঞ্জন মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রমোহন শাস্ত্রী, প্রিয়দারঞ্জন রায়, জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী রমা চৌধুরী, রমণীরঞ্জন সেনগুপ্ত, ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী এবং আরো কয়েকজন। পঞ্চাশোর্ধ ব্যক্তিদের জন্য এই পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছে।

●

কালি ও কলম (১ম বর্ষ।। ৬ষ্ঠ সংখ্যা)—সম্পাদকঃ বিমল মিত্র। ২৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট। কলকাতা-১১। দাম ৬২ পয়সা।

বর্তমান সংখ্যায় লিখেছেন অশোক ভট্টাচার্য, রণেন গুপ্ত, সুভাষ সমাজদার, প্রলয় সেন, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুকোমল বসু, দেবনারায়ণ গুপ্ত, নির্মলেন্দু গৌতম, মৃত্যুঞ্জয় মাইতি জরাসন্ধ, যজ্ঞেশ্বর রায়, পুলিনবিহারী সেন, বিমল মিত্র।

তস্যতস্য অথবা সূর্য কাঁদলে সোনা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

[উপন্যাস]



(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

হুয়াইনা কাপাকের মৃত্যুর পর প্রথম পাঁচ বছর একরকম নির্ঝঞ্ঝাটেই কেটেছে। হুয়াসকার দক্ষিণে আর আতাহুয়ালপা উত্তরে নিজের নিজের অংশে রাজত্ব করেছেন পরস্পরের সম্মান রেখে। কিন্তু বিরোধের ওরুণ দেখা দিতে দেরী হয়নি।

হুয়াসকার আতাহুয়ালপার চেয়ে বয়সে বছর চার-পাঁচের বড়। বিধিসম্মতভাবে একমাত্র ন্যায্য উত্তরাধিকারী হলেও প্রকৃতিটা শক্তিশিষ্ট হওয়ার দরুণ পিতার অন্যায় পক্ষপাতিত্ব মেনে নিয়ে তিনি হয়ত নির্বিরোধে নিজের অংশটুকুর ওপরে রাজত্ব করেই সুখী থাকতে পারতেন কিন্তু আতাহুয়ালপার সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রের জন্যেই তা সম্ভব হয়নি।

বাইরে থেকে দেখলে বিরোধের প্রথম প্রত্যক্ষ সূত্রপাত হুয়াসকারই করেছেন কিন্তু করেছেন অনেক কিছুতে ধৈর্য হারিয়ে।

আতাহুয়ালপার প্রকৃতি হুয়াসকারের ঠিক উল্টো। সুখেস্বচ্ছন্দে শান্তিতে রাজত্ব করবার মানুষ তিনি নন। রাজ্য পেয়েই তিনি তা বাড়াবার জন্যে নানাদিকে সৈন্যসামন্ত নিয়ে হানা দিতে শুরু করেছেন। প্রথমে হুয়াসকার-এর এলাকায় হাত না বাড়ালেও অন্যদিকে তাঁর দুর্দান্ত সব অভিযানের সাফল্যের খবর হুয়াসকারকে ভাবিত করে তুলেছে। রাজসভায় তাঁকে উস্কে দেবার লোকেরও অভাব হয়নি। তারা বুঝিয়েছে যে, গোড়াতেই বিষদাঁত না উপড়ে নিলে এ-সাপ বড় হয়ে একদিন হুয়াসকারের রাজধানী কুজকোর ওপরও ছোবল দেবে।

আতাহুয়ালপার চালচলন ভাবগতিক দেখে এ-সন্দেহ আরো জোরদার হয়েছে। শেষপর্যন্ত হুয়াসকার আতাহুয়ালপার রাজধানী কুইটোতে দূত পাঠিয়েছেন।

এসপানিওলদের এ-রাজ্যে পা দেওয়ার কিছুদিন মাত্র আগের ঘটনা। তবু পেরুর রাজত্ব নিয়ে দুই ভাই-এর সংগ্রামের সঠিক বিবরণ কেউ সংগ্রহ করতে পারেনি। এক মত অনুসারে হুয়াসকার কুইটোতে দূত পাঠিয়ে আতাহুয়ালপাকে খুশিমত নিজের রাজ্যের বাইরে চড়াও হতে মানা করেছিলেন আর তাঁর কাছে বশ্যতার প্রমাণস্বরূপ রাজস্ব চেয়েছিলেন। অন্য এক বিবরণে পাওয়া যায় যে, ঝগড়ার সূত্রপাত টুমেবাম্বা নামে এক প্রদেশ নিয়ে। আতাহুয়ালপার অধিকারে থাকলেও সেটি তাঁর প্রাপ্য বলে দাবী করেই নাকি হুয়াসকার দূত পাঠান।

কারণ যা-ই হোক ভেতরে ভেতরে যা ধোঁয়াচ্ছিল সে-বিরোধের আগুন দাউ-দাউ করে এবারে জ্বলে ওঠে।

আতাহুয়ালপা প্রথম দিকে এ-লড়াই-এ সুবিধে করতে পারেননি। যে টুমেবাম্বা নিয়ে বিরোধ, সেই জায়গাতেই হুয়াসকারের কাছে যুদ্ধে হেরে গিয়ে তিনি বন্দী হন।

পেরুর ভাগ্য নির্ণয় অত সহজে কিন্তু হয়ে যায়নি। আতাহুয়ালপা বন্দীশিবির থেকে পালাবার সুযোগ পেয়েছেন আর তারপর নিজের রাজধানী কুইটোয় ফিরে গিয়ে দুই প্রবীণ বিচক্ষণ সেনাপতির সাহায্যে এমন এক বাহিনী গড়ে তুলেছেন, যা প্রলয়ের ঢেউয়ের মত দুর্বার গতিতে হুয়াসকারের রাজধানী কুজকো পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।

আতাহুয়ালপার সহায় এই দুই প্রবীণ সেনাপতির একজন হলেন তাঁর বাবা হুয়াইনা কাপাকেরই বন্ধু কুইজকুইথ, আর দ্বিতীয়জন আতাহুয়ালপার মাতুল চালিকুচিমা।

আতাহুয়ালপার বাহিনী রাজধানী কুজকোর কাছের প্রান্তর কুইপেইপান-এ এসে পৌঁছে গেলেও হুয়াসকার ভয় পাননি। শত্রুকে একেবারে নিজের এলাকায় মুঠোর মধ্যে এনে ফেলাই নাকি ছিল তাঁর গোপন অভিসন্ধি। কোন নিপুণ অভিজ্ঞ সেনাপতি নয়, এ রণ-কৌশলের পরামর্শ তাঁকে দিয়েছিলেন সূর্যমন্দিরের পুরোহিতেরা।

এ-পরামর্শ হুয়াসকারের পক্ষে সর্বনাশা হয়ে দাঁড়ায়। কুইপেইপান-এর যুদ্ধে হুয়াসকারের সৈন্যবাহিনী বিশ্বাসঘাতকতা করেনি, প্রাণ দিয়ে তারা লড়েছে, বিশুদ্ধ ইংকা রক্ত যাঁর মধ্যে বইছে, সাম্রাজ্যের সেই যথার্থ অধীশ্বরের জন্যে, কিন্তু আতাহুয়ালপার সৈনিকদের শিক্ষা ও শৃঙ্খলা অনেক উঁচু দরের। মাতুল চালিকুচিমা আর পিতৃবন্ধু কুইজকুইৎ-এর রণকৌশলও অনেক শ্রেষ্ঠ। হুয়াসকারের বাহিনী মৃত্যুপণ করে যুঝেও তাদের সামনে দাঁড়াতে না পেরে ছারখার হয়ে গেছে।

হুয়াসকার হাজারখানেক সেনার ছোট একটি অনুগত দল নিয়ে পালাবার চেষ্টা করে সফল হতে পারেননি। তাঁকে বন্দী করে বিজয়ী বাহিনী কুজকো নগর দখল করেছে।

এর পরেকার যে-ইতিহাস পাওয়া যায় তা হয়ত অতিরঞ্জিত কিন্তু তার মধ্যে আতাহুয়ালপার নৃশংসতার সব বিবরণ সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করা যায় না।

আতাহুয়ালপা প্রথমে হুয়াসকারকে যথাযোগ্য সম্মান দিয়েই নাকি বন্দী করে রাখবার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু সে-ব্যবস্থা হয়ত একটা ধূর্ত রাজনীতির চাল মাত্র। হুয়াসকারের হিতৈষী অন্য অভিজাত ইংকা-প্রধানরা তাতে বেশ কিছুটা আশ্বস্ত যে হয়েছিলেন, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

তা না হলে সমস্ত দেশের দূরদূরান্তর থেকে কুজকো নগরে এসে সমবেত হতে তাঁরা রাজী হবেন কেন!

আতাহুয়ালপা তাঁদের ডেকে পাঠিয়েছিলেন পেরু সাম্রাজ্য দুই ভাই-এর মধ্যে ন্যায্যভাবে ভাগবাটোয়ারায় সাহায্য করবার জন্যে। এমন ভাগাভাগি তিনি চান ভবিষ্যতে যাতে বিরোধের কোনো জড় আর না থাকে।

বিশ্বাস করে যাঁরা কুজকো নগরে সেদিন জড় হয়েছিলেন, তাঁদের কেউই আর নিজের ঘরে ফিরে যেতে পারেননি।

আতাহুয়ালপার সৈন্যেরা তাঁদের ঘেরাও করে প্রত্যেককে নির্মমভাবে হত্যা করেছে।

শুধু এই ইংকা-প্রধানদেরই নয়, ইংকা রক্তে যাদের জন্ম ও এ-রক্ত ভবিষ্যতে যাদের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে, এমন বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা কাউকে জীবিত থাকতে দেওয়া হয়নি। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে সাম্রাজ্যের অধিকার দাবী করতে পারে এমন সব বংশধারা আতাহুয়ালপা নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন।

এ-বিবরণ আর কারুর কাছে নয়, ইংকা বংশেরই উত্তরপুরুষ স্বয়ং সার্সিলাসো দে লা ভেগা-র কাছে পাওয়া বলে একেবারে উড়িয়ে দেবার নয়।

এসব ঘটনার মাত্র কিছুদিন বাদে পেরুতে পৌঁছে পিজারোর যত বিকৃত জটিলভাবেই হোক কোন বিবরণ শুনেতে নিশ্চয় বাকি থাকেনি। ভাইএ ভাইএ এই ঘরোয়া লড়াই আর দুপক্ষের দলাদলির খবরই তাঁকে উৎসাহিত করেছে। সাম্রাজ্য বিরাট হতে পারে কিন্তু তার মাঝখানে এই সর্বনাশা ফাটল যখন ধরেছে তখন তার ধ্বংস একেবারে অসম্ভব কিছু হয়ত নয়।

তাঁর সেনাদল নিয়ে পিজারো তখন থারান বলে এক পাহাড়ী শহরে আস্তানা পেতেছেন। তাঁর আস্তানা ইংকা রাজপুরুষদের ব্যবহারের জন্যে নির্দিষ্ট একটি চমৎকার সরাইখানা। সে শহরের কুরাকা মানে মোড়ল পিজারো ও তাঁর লোকজনের যথাসম্ভব পরিচর্যাই করেছে।

কিন্তু সে আদর আপ্যায়নে পিজারোর উদ্বেল অশান্তি আরো বেড়েছে।

সমুদ্রের তীরভূমি থেকে তুষার ঢাকা পাহাড়ে অনেক দূর পর্যন্ত ত উঠে এসেছেন, এখনও ইংকা আতাহুয়ালপার কোনো সাড়া-শব্দ নেই কেন?

এই পাহাড়ী চড়াই উৎরাই-এর গোলকধাঁধার রাজ্যে পিজারো আর তাঁর দলবলের জন্যে নতুন ধরনের কোন ফাঁদ পাতা হচ্ছে কি?

থারান ছেড়ে নিজে আর না অগ্রসর হয়ে পিজারো তাঁর বিশ্বস্ত বুদ্ধিমান সহকারী হার্নান্দো দে সটোকে কয়েকজন অনুচর সঙ্গে নিয়ে সামনের পথে কিছুদূর পর্যন্ত টহল দিয়ে আসতে বলেছেন। টহল দিতে পাঠাবার উদ্দেশ্য কাক্সাস বলে একটি জায়গার খবর নেওয়া। পিজারো কয়েকজনের মুখে শুনেছেন যে কাক্সাস-এ ইংকা সেনাদের একটি বড় গুপ্ত ঘাঁটি আছে। এ সব ঘাঁটি কি ধরনের, সেখানকার অস্ত্রশস্ত্র ও লোকবল কি রকম তার একটু আভাস না পেলে অন্ধের মত সদলবলে এগিয়ে যাওয়া অত্যন্ত আহাম্মকী হবে।

কিন্তু দে সটো সেই যে গেছে তার আর ফেরবার নাম নেই। একদিন দুদিন করে পুরো হপ্তাই কেটে গেছে, দে সটোর কোন সাড়া-শব্দই মেলে নি।

এই পাহাড়ী গোলকধাঁধায় সে তার দলবল সমেত কোথাও গুম হয়ে গেল নাকি!

পিজারো যখন রীতিমত শঙ্কিত হয়ে উঠে সদলে এগোবেন না পেছোবেন মনে মনে তোলাপাড়া করছেন তখন দে সটো হঠাৎ আশাতীতভাবে ফিরে এসেছে। ফিরে এসেছে একা নয় সঙ্গে তার স্বয়ং ইংকা আতাহুয়ালপারই এক রাজদূত।

রাজদূত যে পেরুর বড় ঘরোয়ানা তা তাঁর চেহারা পোশাকেই বোঝা গেছে। তাঁর সঙ্গে অনুচরই এসেছে বেশ কয়েকজন। কাক্সাস দুর্গ-শহরে দে সটোর সঙ্গে দেখা হবার পর ইংকা রাজ্যেশ্বরের বার্তা আর উপহার তিনি পিজারোর কাছে পৌঁছে দিতে এসেছেন।

উপহার যা তিনি এনেছেন তা যেমন দামী ও অদ্ভুত। এনেছেন আলপাকা আর ভিকুয়ানার পশমে বোনা সোনা রুপোর জরির কাজ করা পোশাক, খাবার জন্যে নয়, গুঁড়িয়ে সুগন্ধ হিসেবে ব্যবহার করবার জন্যে মশলা মাখা শুখানো বিচিত্র একতাল হাঁসের মাংস আর দুটি পাথরের তৈরী ফোয়ারা। এই শেষের উপহার দুটিই একটু উদ্বিগ্ন করে তোলার মত। খেলনা ফোয়ারা দুটি দুর্গের আকারে তৈরী। এই দুর্গাকার খেলনা উপহার হিসেবে পাঠাবার মধ্যে কোন গূঢ় ইঙ্গিত আছে কি না পিজারোকে ভাবতে হয়েছে।

ইংকার রাজদূত যে শুধু পেরু সম্রাটের আমন্ত্রণবার্তা নিয়ে সৌজন্য দেখাতে আসেন নি, এসপানিওলদের খোঁজখবর নিয়ে তাদের ক্ষমতার বহর জেনে যাওয়াই যে তাঁর আসল উদ্দেশ্য পিজারোর তা বুঝতে দেরী হয় নি। মনের কথা মনেই চেপে রেখে বাইরে পিজারো যথাসাধ্য সমাদরই করেছেন রাজদূত আর তাঁর অনুচরদের। রাজদূতকে বিদায় দেবার সময় উপহারের বদলি উপহার দিতেও ভোলেন নি। সেই সঙ্গে সবিনয়ে জানিয়েছেন যে সুদূর অকূল সমুদ্রপারের এক দেশের মহামহিম অধীশ্বরের প্রজা হিসেবে এই অজানা দেশে এসে ইংকা আতাহুয়ালপার আশ্চর্য বীরত্বের বহু কাহিনী তাঁরা শুনেছেন। তাই শুনে আতাহুয়ালপাকে শত্রু দমনে সাহায্য করতে পিজারো সদলবলে উৎসুক। ইংকা রাজ্যেশ্বরের আমন্ত্রণ পাবার সৌভাগ্য যখন তাঁদের হয়েছে তখন তাঁরা রাজসন্দর্শনে যেতে আর একমুহূর্ত বিলম্ব করবেন না।

তা, বিলম্ব করবেন না ঠিকই, কিন্তু রাজসন্দর্শনে যাবেন কোথায়? ইংকা রাজ্যেশ্বরের দূত তার হদিস ত দিয়ে যায় নি!



শেষ পর্যন্ত সে হদিস পাওয়া গেছে। জানা গেছে যে ইংকা রাজ্যেশ্বর বিরাট এক বাহিনী নিয়ে কাক্সামালকায় বিশ্রাম করছেন। হ্যাঁ, সেই স্বাভাবিক উষ্ণপ্রস্রবণের শহর কাক্সামালকা তখনকার ইংকা সম্রাটদের মত আজও যেখানে ধনী-মানীরা স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্যে যায়।

অনেক দ্বিধা সংশয় দমন করে অনেক বাধা বিপত্তি কাটিয়ে পিজারোর বাহিনী একদিন সেই কাক্সামালকার নগর সীমান্তেই উপস্থিত হয়েছে। কাক্সামালকায় পেঁছোতে পাহাড়ের ওপর থেকে উংরাই-এর পথে নামতে হয়। নামতে নামতে যে দৃশ্য চোখে পড়ে তা অপূর্ব। চারিদিকে অভ্রভেদী পর্বত প্রাচীরে ঘেরা নাতিপ্রশস্ত একটি ডিম্বাকৃতি উপত্যকা। লম্বায় আন্দাজ সাড়ে চার ক্রোশ আর চওড়ায় তিন। এ উপত্যকার মাঝখান দিয়ে বেশ বড় ও চওড়া একটি নদী বয়ে গেছে। এই মনোহর উপত্যকার মধ্যে পরিচ্ছন্ন যেন দুধে ধোওয়া সব বাড়ি দিয়ে সাজান নগর কাক্সামালকা।

পিজারো তাঁর বাহিনীর সঙ্গে পাহাড়-ঘেরা উপত্যকার সৌন্দর্য আর নীল আকাশে পতাকার মত উষ্ণ প্রস্রবণের শাদা ধোঁয়ার কুণ্ডলী তোলা শহরের শোভা দেখে মুগ্ধ হবার অবসর কিন্তু পান নি। নিচের শহরের দিকে চেয়ে আরেকটি যে দৃশ্য তাদের চোখে পড়েছে তাতেই বুক তাঁদের তখন কেঁপে উঠেছে নিশ্চয়।

শহর ঘিরে যে সব পাহাড়ের দেয়াল উঠে গেছে তার কোলে কোলে ক্রোশের পর ক্রোশ মুঠো মুঠো করে ছড়ানো শাদা তুষারের মত ওগুলো কি?

ওগুলো যে কি তা বুঝতে দেরী হয় নি। ওগুলো আর কিছু নয় ইংকা আতাহুয়ালপার বিরাট সৈনাবাহিনীর অগণন সব তুষারশুভ্র শিবির।

শিবিরই যেখানে অমন অগুণতি সেখানে সৈন্য যে কত তা বুঝে পিজারোর লোকেদের বুক যদি বেশ দমে গিয়ে থাকে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। উপায় থাকলে তাদের ক'জন ওই উংরাই-এর পথে নিচের উপত্যকায় তখন নামত তা বলা কঠিন। ইংকা আতাহুয়ালপার ওই সৈন্যসমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়া মানে নিশ্চিত নিষ্ফল আত্মহত্যা বুঝে অনেকের মনেই ফিরে যাওয়ার আকুলতা যে জেগেছিল 'কনকুইস্তেদর' মানে অভিযাত্রীদের একজনই তা স্বীকার করে গেছেন তাঁর লেখায়।

'ভয় যতই হোক'—তিনি লিখে গেছেন, 'ফিরে যাওয়ার তখন আর সময় নেই। এতটুকু দ্বিধা দুর্বলতা দেখালেও সর্বনাশ। সঙ্গে ওদেশী যেসব লোকজন আছে তারাই তাহলে আমাদের ওপর প্রথমে চড়াও হবে। সুতরাং যথাসাধ্য মনের ভাব মনেই চেপে আমরা উংরাই-এর পথে নামতে শুরু করলাম।'

পোনেরো শ বত্রিশের পোনেরই নভেম্বর।

মাত্র দু' বছর আগে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ভারতবিজেতা বাবর আটচল্লিশ বছর বয়সে আগ্রা শহরে মারা গেছেন। তাঁর পুত্র ও উত্তরাধিকারী হুমায়ুন আফগান সর্দার শের শাহকে সায়েস্তা করবার উদ্দেশ্যে চুণার দুর্গ অবরোধ করে তাকে সাময়িক বশ্যতা স্বীকার করিয়েছেন মাত্র এক বছর আগে।

ইওরোপে তিন বছর আগে তুর্কীরা ভিয়েনা দখল করেছে। ভয়ঙ্কর আইভান বলে সে যুগে যিনি পরিচিত সেই চতুর্থ আইভানের রাশিয়ার জারের সিংহাসনে বসতে আর এক বছর মাত্র বাকি।

চীনে পোর্টুগীজরা ইওরোপের প্রতিনিধি হিসেবে মাত্র আঠারো বছর আগে পা দিয়েছে কিন্তু নিজেদের জুলুম জবরদস্তির দোষে কোথাও স্থায়ীভাবে বাস করবার সুযোগ পায় নি। কোথাও তাদের মেরে শেষ করা হয়েছে আর কোথাও থেকে হয়েছে বিতাড়িত। কান্টনের দক্ষিণে ছোট্ট দ্বীপ সাংচুয়ান থেকে তারা কোনরকমে ব্যবসা চালাচ্ছে।

পৃথিবীর ইতিহাসের নানাদিক দিয়ে স্মরণীয় এই সময়ে ওই তারিখে সুদূর সাগরপারের এক দেশ থেকে মুষ্টিমেয় কটি সৈন্য নিয়ে পিজারো অজানা রহস্যময় পেরু সাম্রাজ্যের অধীশ্বর আতাহুয়ালপার সম্পূর্ণ নিরাপদ পাহাড়ঘেরা সুরক্ষিত দুর্গনগরে মরবার জন্যে পা বাড়ালেন।

কি আছে ভবিষ্যতের গর্ভে তার কোনো আভাস কি পিজারো পেয়েছিলেন?

নইলে তিনি সেদিন যা করেছিলেন তাকে ত' উন্মত্ত আত্মঘাতী বাতুলতা ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

পাহাড়ের ঢালু পথে যখন পিজারো তাঁর দলবল নিয়ে নিচের শহরে নামছেন তখন বিকেল হয়ে এসেছে।

সারাদিন আকাশ পরিষ্কার ছিল হঠাৎ সেই সময় যেন নিয়তির ইঙ্গিত নিয়ে ঝড় উঠল। ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টি। শুধু জলের ফোঁটা নয় শিলাবৃষ্টিও সেই সঙ্গে আর হাড়-কাঁপানো শীত যা ভয়ের কাঁপুনি লুকোবার সুযোগ দিয়েছে কাউকে কাউকে।

তিনটি দলে ভাগ হয়ে পিজারো নামছিলেন। শহরে নেমে তিনি নিজের দল নিয়ে তাঁর বিশ্রামের জন্যে নির্দিষ্ট পান্থনিবাসে গেলেও তৎক্ষণাৎ দে সটোকে পোনেরোজন সওয়ার সমেত ইংকা আতাহুয়ালপার কাছে সেলাম দিতে পাঠিয়েছেন। শুধু দে সটোর দলকে পাঠিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি। নিজের ভাই হার্নান্ডোকেও তার পিছনে বিশজন সওয়ার নিয়ে সহায় স্বরূপ যেতে বলেছেন।

দে সটোর পোনেরো আর হার্নান্ডোর কুড়ি এই মোট পঁইত্রিশ জন ত' সওয়ার। সাত্যই যদি বিপদ কিছু ঘটে, কে কাকে কি সাহায্য করবে।

বিপদ কিন্তু কিছু ঘটেনি। পিজারোর প্রতিনিধিরা নিরাপদে বহাল তবিয়তেই ফিরে এসেছে। ইংকা নরেশ তাঁর শিবির ফেলেছেন নগরের বাইরে পাহাড়ের কোলের মুক্ত প্রান্তরে গরম জলের স্বাভাবিক ফোয়ারাগুলির কাছে। সেখান থেকে ফিরে দে সটো আর হার্নান্ডো ইংকা আতাহুয়ালপার চরিত্র চেহারা ও ব্যবহারের বিবরণ দিয়ে যে খবর জানিয়েছে তা শুনে পিজারো সেই রাত্রেই তাঁর বাহিনীর প্রধানদের এক গোপন মন্ত্রণাসভা ডেকেছেন। (ক্রমশঃ)

'রূপা'র বই

॥ স্মৃতিকথা ॥

মৈত্রেয়ী দেবী

মংপুতে রবীন্দ্রনাথ

মংপুর পাহাড় আর অরণ্য-ঘেরা কবিকুঞ্জে এক সময় বাক্‌পতি রবীন্দ্রনাথ চলতি কথার যে কুসুম ছড়িয়েছিলেন, তাকে কুড়িয়ে নিপুণ হাতে মালা গেঁথেছেন লেখিকা: এমন অম্লান কথার কুসুম-সঞ্চয় বাংলা সাহিত্যে তুলনা রহিত। নতুন 'রূপা' সংস্করণ। [১০·০০]

লেখিকাকৃত ঐ গ্রন্থের ইংরাজি রূপান্তর:

TAGORE BY FIRESIDE
2nd Edition Rs. 6.00

আমাদের পূর্ণ গ্রন্থতালিকার জন্য লিখুন



রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী
১৫ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট * কলকাতা-১২
Phone : 34-4821 • 34-6305

দেশে-বিদেশে



কচ্ছের পর কচ্ছাতিভু

পক প্রণালী নামে যে সংকীর্ণ জলরাশি সিংহল ও ভারতের মধ্যে ব্যবধান রচনা করেছে, সেই সমুদ্রের একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের নাম কচ্ছাতিভু। প্রাক্তন রামনাদের রাজার জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত এই দ্বীপ বালুকাময় ও জলহীন। তার আয়তন--দৈর্ঘ্যে এক মাইল, প্রস্থে তিনশ' গজ। এই দ্বীপে জনবসতি নেই। শুধু একটি গীর্জা আছে। ভারত ও সিংহল, দুই দেশ থেকেই ক্যাথলিকরা তাঁদের ধর্মীয় পাল-পার্বন উপলক্ষে কচ্ছাতিভুতে যান। আগামী ১৭ মার্চ তারিখে সেখানে সন্ত অ্যান্টনির উৎসব হওয়ার কথা। ঠিক তার প্রাক্কালে সিংহল সরকার ঐ জনবসতিহীন দ্বীপটিতে পুলিশ-পেয়াদা পাঠিয়ে দ্বীপটির দখল নিয়েছেন। সিংহলের 'সান' পত্রিকার সংবাদটি প্রকাশ করে বলা হয় যে, সিংহল সরকারের পররাষ্ট্র দপ্তরের স্থায়ী সেক্রেটারী দাবী করেছেন, কচ্ছাতিভু দ্বীপটি পুরোপুরি সিংহলের। আরও খবর দেওয়া হয় যে, দ্বীপটিকে সিংহল তার বিমান মহড়ার জন্য ব্যবহার করতে চায়।

'সান' পত্রিকায় প্রকাশিত এই সংবাদ গত সপ্তাহে ভারতবর্ষের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলে দেশে হৈ-চৈ পড়ে যায়। লোকসভায় এস-এস-পি ও জনসংঘের কয়েকজন সদস্য সরকারকে শক্ত করে চেপে ধরেন।

'আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুন্যালের রায় মেনে কচ্ছের রানের একাংশ পাকিস্থানকে খয়রাত করা ছাড়া এখন আর ভারত সরকারের অন্য উপায় নেই'—এই কৈফিয়ৎ দিয়ে পার্লামেন্টে একটা অনাস্থা প্রস্তাবের ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সরকারকে এইভাবে আর একটা জবাবদিহির মধ্যে পড়তে হল।

লোকসভায় উত্তেজিত সদস্যদের উদ্বিগ্ন প্রশ্নের উত্তরে পররাষ্ট্র বিভাগের প্রতিমন্ত্রী শ্রী বি আর ভগৎ একটি বেফাঁস উক্তি করে শ্রীমতী গান্ধীর কাজ আরও কঠিন করে দিয়েছেন। শ্রীভগৎ ১ মার্চ তারিখে লোকসভায় বলেছেন যে, দ্বীপটি সিংহলেরও দখলে নেই, ভারতেরও দখলে নেই। একজন সরকারী মুখপাত্রের এই ধরনের উক্তিতে সদস্যরা অত্যন্ত ক্ষোভ প্রকাশ করলে প্রধানমন্ত্রী ব্যাখ্যা দেন যে, ঐ দ্বীপে কোন পক্ষেরই সামরিক বা পুলিশ ঘাঁটি নেই, এই অর্থে সেটি কোন দেশের দখলে নয়। শ্রীমতী গান্ধী সদস্যদের বলেন যে, এই সংবাদ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানবার জন্য সিংহলস্থিত ভারতীয় হাই-কমিশনারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দুই দেশের মধ্যে যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আছে, তার কথা মনে রেখে শ্রীমতী গান্ধী সদস্যদের ধৈর্য ধারণ করতে উপদেশ দিয়েছেন।

কিন্তু, এটা লক্ষণীয় যে, শ্রীমতী গান্ধী পরিষ্কার করে বলেন নি, দ্বীপটি ভারতের এবং ভারতবর্ষ এই দ্বীপের উপর তার অধিকার বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় যে-কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করবে।

শ্রীমতী গান্ধীর এই বিবৃতির সুর থেকেই সন্দেহ হচ্ছে যে, প্রতিবেশী রাষ্ট্রের চাপের কাছে আত্মসমর্পণ করে ভারতবর্ষ হয়ত আর এক দফা ভূদানের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

কচ্ছাতিভু দ্বীপের মালিকানা নিয়ে ভারত ও সিংহলের মধ্যে দীর্ঘকালের পুরানো বিরোধ আছে এবং এই দ্বীপটি একটি ক্ষুদ্র, জনবসতিহীন, ঊষর ভূখন্ড মাত্র—এই কথাগুলি এ ব্যাপারে বড় নয়। বড় কথা হল, ভারতবর্ষ যে ভূখন্ডকে তার আঞ্চলিক সীমানার অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করে তার উপর তার নিজের সার্বভৌম অধিকার সে প্রয়োগ ও রক্ষা করবে কিনা।

লোকসভায় এই প্রশ্নের কোন স্পষ্ট উত্তর পাওয়া যায়নি, এটাই উদ্বেগের কথা।

জাপান সমুদ্রের তরঙ্গ

উত্তর কোরিয়ার নৌবাহিনী কর্তৃক মার্কিন গোয়েন্দা জাহাজ 'পুয়েবলো' আটকের ঘটনায় জাপান সমুদ্র আলোড়িত হয়েছিল। সেই আলোড়নের তরঙ্গ অন্যান্য দেশের মধ্যে জাপানকেও আঘাত করেছে—যার ফলে জাপানের সাতো মন্ত্রিসভা বিপন্ন হয়ে পড়েছেন এবং ঐ মন্ত্রিসভা থেকে কৃষি ও বনমন্ত্রী তাদাও কুরাইশি পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন।

ঘটনাটা ঘটেছে এইভাবেঃ—

জাপানীরা মাছের ভক্ত। বাঙালীর মতই জাপানীদেরও খাদ্যের তালিকায় মাছ একটি অপরিহার্য পদ। জাপানের বাজারে এহেন মাছের দাম জানুয়ারী মাসের শেষে ও ফেব্রুয়ারী মাসের গোড়ায় খুব বেড়ে গেল। বনমন্ত্রী তাদাও কুরাইশির তলব পড়ল। অনুসন্ধানে প্রকাশ পেল, 'পুয়েবলো' আটকের ঘটনার পর জাপান সমুদ্রে বৃহৎ মার্কিন ও সোভিয়েট রণতরীর টহলদারি বেড়ে গেছে। তার ফলে জাপানী জেলেরা ডিঙ্গি নিয়ে সমুদ্রে মাছ ধরতে যেতে আর বিশেষ ভরসা পাচ্ছে না এবং সেই কারণেই বাজারে মাছের যোগান কমে গেছে।

৬ ফেব্রুয়ারী তারিখে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জাপানী সাংবাদিকরা সমুদ্রগামী মাছধরা ডিঙ্গির জেলেদের নিরাপত্তার প্রশ্নটি তুললেন। কৃষিমন্ত্রী কুরাইশি বললেন, 'জেলে নৌকাগুলির নিরাপত্তা বিধান করতে হলে পিছনে যুদ্ধজাহাজ ও কামান থাকা প্রয়োজন।' তিনি আরও বললেন, 'আমাদের যদি পরমাণু বোমা ও তিন লক্ষ সৈন্য থাকত ...'

কুরাইশির এই উক্তিতে যেন আগুনে ঘৃতাহুতি দিল। দ্বিতীয় যুদ্ধের পর গৃহীত জাপানের সংবিধানের নবম অনুচ্ছেদে বলা আছে যে, জাপান কখনও সামরিক শক্তি হওয়ার চেষ্টা করবে না এবং কখনও পারমাণবিক অস্ত্র তৈরী, সংগ্রহ বা ব্যবহার করার চেষ্টা করবে না। জাপানী সংবিধানের এই অনুচ্ছেদে ঐ সংবিধানের একটি মূল ধারা। জাপান পৃথিবীর একমাত্র দেশ যার উপর পরমাণু বোমা পড়েছে। ভবিষ্যতে যাতে আর একটা পরমাণু যুদ্ধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে না হয়, সেজন্য জাপানের মানুষের আগ্রহ খুবই বেশী। প্রধানমন্ত্রী আইসাকু সাতো গত নভেম্বর মাসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জনসনের সঙ্গে কথা বলে দেশে ফিরে আসার পর জাপানের সংবিধানের এই যুদ্ধবিরোধী ধারা সম্পর্কে জনমত সংগ্রহ করা হয়। তাতে দেখা যায়, প্রতি দশজন জাপানীর মধ্যে নয়জন সংবিধানের এই নবম অনুচ্ছেদ বহাল রাখার পক্ষপাতী।

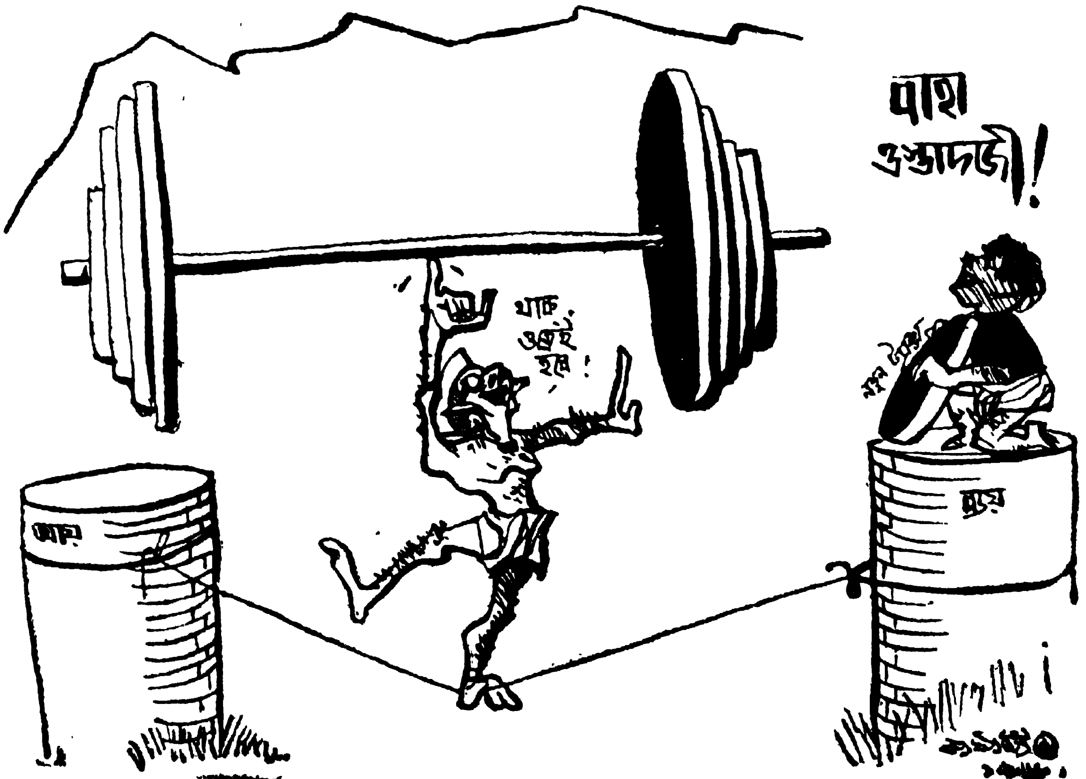
সাতো মন্ত্রিসভার বিরোধীরা জাপানী জনমতের এই শান্তিকামী আগ্রহ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। কুরাইশির বিবৃতি

প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা বিতর্কে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এই বলে তাঁরা সেই বিবৃতির বিরোধিতা করলেন যে, কুরাইশি জাপানী সংবিধানকে পদদলিত করেছেন।

জাপানী সংবিধান সম্পর্কে কুরাইশির মন্তব্যঃ—'এই সংবিধান মুখোঁচিত। এই সংবিধান জাপানকে রক্ষিতা করে রেখেছে। স্বাধীনতার কোন দৃঢ় ভিত্তি এর মধ্যে নেই।' তাঁরা দাবী করলেন, কুরাইশিকে বরখাস্ত করতে হবে। 'ডায়েট' অর্থাৎ জাপানী পার্লামেন্টের তিনটি প্রধান বিরোধী দল জাপান সোস্যালিস্ট পার্টি, জাপান কম্যুনিস্ট পার্টি ও কোমাইতো ('সৎ সরকার দল') মিলে এই মর্মে একটি প্রস্তাব আনলেন যে, জাপানকে সম্পূর্ণরূপে পরমাণু অস্ত্রমুক্ত রাখার সংকল্প ঘোষণা করা হোক। তাঁদের প্রস্তাবে একথা পরিষ্কার করে ঘোষণা করতে বলা হল যে, জাপান যে শুধু পারমাণবিক অস্ত্রের সর্বপ্রকার পরীক্ষা, নির্মাণ, অধিকার অথবা ব্যবহার বর্জন করবে তাই নয় জাপানে কোন পারমাণবিক অস্ত্র প্রবেশও করতে দেবে না।

প্রধানমন্ত্রী সাতো বিরোধীদের এই প্রস্তাব মানতে বা কুরাইশিকে অপসারণ করতে রাজী হলেন না। তাঁর কথা হল জাপানের যুদ্ধ-বর্জনের যে সংকল্প সংবিধানে ঘোষণা করা হয়েছে, তার অতিরিক্ত আর কিছু করার প্রয়োজন নেই। কুরাইশির উক্তিটি অবাঞ্ছনীয় হয়েছে, একথা স্বীকার করেও তিনি তাঁকে বরখাস্ত করতে স্বীকৃত হলেন না। সরকার পক্ষ আর বিরোধী পক্ষের মধ্যে এই মতান্তরের ফলে ডায়েট প্রায় তিন সপ্তাহকাল অচল হয়ে রইল, ১৯৬৮-৬৯ সালের বাজেট পাশ করান যাবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ দেখা দিল।

শেষ পর্যন্ত কুরাইশি ইস্তফা দেওয়ার ফলে অবশ্য এই সংকটের অবসান ঘটেছে। কিন্তু এই ঘটনায় জাপানের জাতীয় রাজনীতিতে একটা বৃহৎ বিতর্কের অভিব্যক্তি হয়েছে—যে বিতর্ক আগামী দিনে আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে নিশ্চয়ই প্রভাবিত করবে। এশিয়া থেকে সামরিক শক্তি হিসাবে বৃটেন সরে যাচ্ছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেই শূন্যস্থান দখল করতে যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে সে চাইছে পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত দেশগুলির অন্যতম জাপান এশিয়ায় তার দায়িত্বের বোঝা লাঘব করুক। এক সময় তৎকালীন মার্কিন ভাইস-প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিকসন যখন জাপানের পুনরস্ত্রীকরণের প্রস্তাব করেছিলেন, তখন জাপানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শিগেরু য়োশিদা বলেছিলেন যে, এই প্রস্তাব অবাস্তব; কেননা জাপানী জনমত এটা সহ্য করবে না। আজ জাপানের ক্ষমতাসীন লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক দলের একটা অংশ মনে করছেন যে, জাপানের যুদ্ধ-বর্জন নীতির সার্থকতা নষ্ট হয়ে গেছে, সামরিক শক্তি পিছনে না থাকলে আজ জাপানের পক্ষে কূটনৈতিক জগতে নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা সম্ভব নয়। প্রধানমন্ত্রী সাতোর লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক দলে ফ্রান্সের দ্য গলের ধরনের কট্টর স্বাতন্ত্র্যবাদীও আছেন। তাঁরা জাপানের রক্ষা-ব্যবস্থাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল রাখতে চান না। জাপানের ছাত্ররা যখন সাসেবো উপসাগরে পারমাণবিক শক্তি-চালিত মার্কিন বিমানবাহী জাহাজ 'এন্টারপ্রাইজ'এর উপস্থিতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছেন, ওকিনাওয়া দ্বীপের অধিবাসীরা যখন সেখানকার কাদেনা বিমানঘাঁটিতে মার্কিন বি-৫২ বোমারু বিমান সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার দাবী করছেন, তখন সাতো মন্ত্রিসভা ওকিনাওয়া দ্বীপের অধিকার আমেরিকার হাত থেকে জাপানের হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার বিনিময়ে সেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বিমানঘাঁটি ব্যবহারের সুবিধা দেওয়ার প্রস্তাবও বিবেচনা করতে রাজী আছেন। জাপানের রাজনীতির এই দিক-পরিবর্তন সেখানে লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির দীর্ঘ একটানা ক্ষমতার অবসান ঘটাবে কিনা এবং টোকিওতে অধিকতর বামপন্থী কোন সরকার অদূর ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে কিনা সেটা লক্ষ্য করার বিষয়।



বৈষয়িক প্রসঙ্গ

শ্রীদেশাইয়ের প্লাস্টিক সার্জারি



কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই ১৯৬৮-৬৯ সালের জন্যে একটি সাবধানী বাজেট সংসদে পেশ করেছেন। তাঁর নিজেরই কথায় এই বাজেট একটি ছোটখাটো ধরনের প্লাস্টিক সার্জারি ছাড়া আর কিছুই নয়—তিনি নতুন কোন ঝুঁকি নিতে চাননি, কেবল এখান থেকে খানিকটা মাংস নিয়ে ওখানে লাগিয়ে বাজেট মোটামুটি আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টা করেছেন মাত্র।

কিন্তু তার ফলে একটা বিরাট ঘাটতি বাজেটে থেকে গেছে যা সকলকে উদ্বিগ্ন করবে। ১৯৬৭-৬৮ সালের জন্যে তিনি প্রথমে যে বাজেট রচনা করেছিলেন তাতে তিনি এই সংকল্প ঘোষণা করেছিলেন যে, বাজেটে ঘাটতি তিনি যে কোন উপায়েই হোক রোধ করবেন। পরে সংশোধিত হিসেবে দেখা গেল যে, তাতে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩০০ কোটি টাকা। এখন ১৯৬৮-৬৯ সালের জন্যে যে বাজেট তিনি ২৯ ফেব্রুয়ারী লোকসভায় পেশ করেছেন তাতেও দেখা যাচ্ছে আয় ও ব্যয়ের মধ্যে ঘাটতি হচ্ছে ৩১৫ কোটি টাকা। বাজেটে রাজস্ব ও মূলধনী খাত মিলিয়ে আয় দেখানো হয়েছে ৪,৩৮৫ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা, আর ব্যয় দেখানো হয়েছে ৪,৭০০ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা।

এই বিপুল পরিমাণ ঘাটতির সবটা, এমন কি উল্লেখযোগ্যভাবে পূরণের জন্যেও শ্রীদেশাই চেষ্টা করেননি। তিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের মাধ্যমে মাত্র ৬৫ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা আদায়ের ব্যবস্থা করেছেন। এর মধ্যে ১০ কোটি টাকা প্রত্যক্ষ কর থেকে ৩৬ কোটি ৪ লক্ষ টাকা উৎপাদন শুল্ক থেকে ১৯ কোটি ৩ লক্ষ টাকা কাস্টমস্ থেকে পাওয়া যাবে। এই অতিরিক্ত কর থেকে রাজ্য সরকারগুলির প্রাপ্য অংশ ও বাজেটে অন্যান্য ক্ষেত্রে যেসব সুবিধে দেওয়া হয়েছে সেগুলি বাদ দিলে কেন্দ্রীয় ভাণ্ডারে জমা পড়বে মাত্র ২৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ ঘাটতি ২৫ কোটি টাকা কমবে। কিন্তু তারপরেও ২৯০ কোটি টাকা ঘাটতি থেকেই যাচ্ছে।

এই বিপুল পরিমাণ ঘাটতি মেনে নিয়ে শ্রীদেশাই নিঃসন্দেহে সংযমের পরিচয় দিয়েছেন। যে-কোন অর্থমন্ত্রী তিনি নিজেই বলেছেন, এই অবস্থায় পড়লে অস্ত্র শানিয়ে বড় গোছের একটা অপারেশনের জন্যে প্রস্তুত হতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। তিনি একটি ছোটখাটো প্লাস্টিক সার্জারি করেই সন্তুষ্ট থেকেছেন। কারণ তা না করে তিনি যদি এই ঘাটতি করধার্য করে পুষিয়ে নিতে চাইতেন তাহলে অর্থনীতি আরও বিপদাপন্ন হয়ে পড়ত। তাঁর সামনে আরেকটি বিকল্প ছিলঃ সরকারী কাজ-কর্মের ছাঁট-কাট করে বাজেটে সমতা বিধান করা। কিন্তু তা করতে গেলে অর্থনীতি শ্লথগতি হয়ে পড়ত এবং মন্দার অবস্থা আরও অবনত হত। গত দু বছরের খরার পর এ বছর ভালো বৃষ্টি হওয়ায় কৃষির ফলন এবার ভালোই হয়েছে। তার প্রভাব সমগ্র অর্থনীতির ওপর প্রতিফলিত হতে চলেছে। জিনিসপত্রের দাম কমার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পগুলির, বিশেষ করে ভোগ্যপণ্যের শিল্পের উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এই অবস্থায় অর্থনীতিকে স্থিতিশীল হতে না দিলে ভবিষ্যতে গুরুতর বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে। তাছাড়া আগামী বছরেও যে ভালো বৃষ্টি হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। সুতরাং এক বছরের সুলক্ষণের ওপর নির্ভর করে সম্প্রসারণের কাজে হাত দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

সুতরাং বিপুল ঘাটতির ঝুঁকি নিয়েও শ্রীদেশাই তাঁর বাজেটকে মোটামুটি বর্তমান বছরের স্তরেই রেখেছেন। তাঁর এই সাবধানতা এই থেকেই বোঝা যাবে যে, বর্তমান বছরের তুলনায় আগামী বছর পরিকল্পনা খাতে মাত্র ৫০ কোটি টাকা বেশি ব্যয় করা হবে। এই সাবধানতা একদিকে যেমন অর্থনীতিকে সংহত করার একটা সুযোগ এনে দেবে (যাতে ১৯৬৯-৭০ সালে চতুর্থ পরিকল্পনার আরম্ভের সময় বড় রকমের উন্নয়নের কাজে হাত দিতে কোন অসুবিধা হবে না), অন্যদিকে তিনি কোম্পানীগুলিকে যে সব সুবিধা দিয়েছেন তা সামান্য হলেও মূলধন সৃষ্টির ও বিনিয়োগের একটা অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করবে।

তিনি বিরক্তিকর অ্যানুয়িটি ডিপোজিট স্কীমটি বাতিল করেছেন, কোম্পানী ডিভিডেন্ডের প্রথম ৫০০ টাকা পর্যন্ত আয়কর-রহিত করেছেন (আগে কেবল ৫০০ টাকা পর্যন্ত ডিভিডেন্ডকে আয়কর থেকে রেহাই দেওয়া হত), নির্দিষ্ট সীমার ঊর্ধ্বে অর্জিত অনর্জিত আয়ের ওপর পৃথক লেভি বাতিল করেছেন, ডিভিডেন্ড ট্যাক্স বাতিল করেছেন, কোম্পানী আয়ের ওপর সারট্যাক্স ৩৫ শতাংশ থেকে ২৫ শতাংশে কমিয়ে এনেছেন, কৃষির সহায়তায় নিযুক্ত শিল্পগুলির ব্যবসায়িক লভ্যাংশ থেকে ঐ কাজের জন্যে খরচার এক-পঞ্চমাংশ বাদ দিতে দেবেন, রপ্তানী বাজার তৈরীর জন্যে বিশেষ ভাতা দেওয়া হবে এবং রপ্তানী বৃদ্ধির জন্যেও আরও কয়েকটি সুবিধে দেওয়া হবে।

শ্রীদেশাই আশা করছেন এই সব সুবিধে দেওয়ার ফলে এবং কৃষির উন্নতির দরুণ অর্থনীতির স্রোত এখনও অনুকূল খাতে বইতে আরম্ভ করবে এবং তার ফলে রাজস্ব আদায় বেড়ে ঘাটতিও বছরের শেষে কিছুটা কমবে। তাঁর আরেকটা আশা, তিনি যে দুটি নতুন সঞ্চয় পরিকল্পনা চালু করেছেন তা থেকেও ঘাটতি বেশ কিছুটা মেটানো যাবে। একটি পরিকল্পনা হল পাঁচশালা ডিপোজিট স্কীম যার ওপর শতকরা সাড়ে চার ভাগ আয়কর রহিত সুদ পাওয়া যাবে, এবং একটি গোষ্ঠীব প্রভিডেন্ড ফান্ড যার মেয়াদান্তেও নিয়মানুযায়ী আয়কর থেকে ছাড় দেওয়া হবে। শ্রীদেশাইর তৃতীয় আশা, তিনি কর আইনে এমন কিছু পরিবর্তন করেছেন ও এমন কঠোর শাস্তির বিধান রেখেছেন যার ফলে করের আদায়ও বাড়বে।

অর্থমন্ত্রীর এই আশা পূর্ণ হবে কিনা তা এখনই বলা যায় না। অনেকখানি নির্ভর করবে আগামী বছর কি রকম বৃষ্টি হয় তার ওপর। তাছাড়া শিল্পের উন্নতির জন্যে তিনি যেসব সুবিধে দিয়েছেন সেগুলি মূল্যবান হলেও যথেষ্ট কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। তাছাড়া তিনি যে সব কর প্রস্তাব করেছেন তার ফলে দ্রব্যমূল্যের সূচক সংখ্যা বাড়তে বাধ্য। তিনি কনফেকশনারী ও চকোলেটের, এসেনশিয়াল অয়েল, স্টীল ফার্ণিচার, চামড়ার কাপড়, ভাল্ব ও ট্রানজিস্টার, কাঁচা তামাক, চটজাত দ্রব্য, রেফ্রিজারেটার, এয়ার-কণ্ডিশনার, মোটর স্পিরিট ও ডিজেল তেলের উৎপাদন শুল্ক, বিলিতি মদ, লবঙ্গ-দারচিনি, রাসায়নিক দ্রব্য, প্লাস্টিক, লৌহ ও ইস্পাত সামগ্রীর আমদানী শুল্ক, এবং খাম-পোস্টকার্ড, ইনল্যাণ্ড লেটার, টেলিগ্রাম ইত্যাদির মাশুল বাড়িয়ে দিয়েছেন। বিশেষ করে ডাকমাশুলের এই বৃদ্ধি সাধারণ মানুষের সীমাবদ্ধ আয়ের ওপর একটা দুর্বহ বোঝা চাপিয়ে দেবে। একটি খামের দাম এখন হবে ২০ পয়সা, পোস্টকার্ডের ১০ পয়সা এবং ইনল্যাণ্ড লেটার ১৫ পয়সা।

কলকাতা শেয়ার মার্কেটে কেন্দ্রীয় বাজেটের প্রতিক্রিয়া।



এর ফলে জিনিসপত্রের দাম সাধারণ-ভাবে আরো বাড়তে বাধ্য। এইভাবে যদি দাম ক্রমাগত বাড়তে থাকে, যদি জন-সাধারণের উদ্বৃত্ত আয়ের সুযোগ ক্রমেই কমতে থাকে তাহলে শ্রীদেশাইয়ের সঞ্চয় পরিকল্পনা সফল হবে কি করে?

যদি না হয়, যদি শ্রীদেশাইয়ের সমস্ত হিসাব শেষ পর্যন্ত ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়, তাহলে ঐ ২৯০ কোটি টাকার ঘাটতি পূরণের জন্যে নোট ছাপানো ছাড়া তাঁর আর উপায়ান্তর থাকবে না। সেক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফীতি বেড়ে গিয়ে অর্থনীতির আলো ভিতর সঙ্কট ডেকে আনতে বাধ্য।

বাজেটে দেখা যাচ্ছে আগামী বছর প্রতিরক্ষা খাতে মোট ১,০১৫ কোটি টাকা ব্যয় হবে। এই অঙ্ক বর্তমান বছরের তুলনায় ৪৫ কোটি টাকা বেশি। পরিকল্পনা বাবদ বরাদ্দ করা হয়েছে ১,৮৫৯ কোটি টাকা। তার মধ্যে রাজ্যগুলির জন্যে রয়েছে ৬১৫ কোটি টাকা এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির জন্যে ৬৫ কোটি টাকা। এই টাকা বাদ দিলে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার জন্যে থাকে ১,১৭৯ কোটি টাকা। এর মধ্যে রেলের জন্যে ১৭২ কোটি টাকা, লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের জন্যে ১৫৩ কোটি টাকা (বোকারোর জন্যে ১১০ কোটি টাকা নিয়ে), পেট্রোলিয়াম শিল্পের জন্যে ৮২ কোটি টাকা, রাসায়নিক শিল্পের জন্যে ৭০ কোটি টাকা (সার নিয়ে), কৃষির জন্যে ৫৩ কোটি টাকা, ডাক ও তার বিভাগের জন্যে ৪৮ কোটি টাকা এবং অর্থসাহায্য-কারী সংস্থাগুলির জন্যে ৩৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

১৯৬৮-৬৯ সালের জন্যে বৈদেশিক সাহায্য ধরা হয়েছে ৭৭৫ কোটি টাকা। পি-এল ৪৮০ বাবদ পাওয়া যাবে ২৭৪ কোটি টাকা। এবছর ৩৬৬ কোটি টাকা পাওয়া গিয়েছিল।

সিউলে সম্প্রতি একটি বড় আকারের বিবাহ অনুষ্ঠান হয়। বিবাহ অনুষ্ঠানের এই বিরাট পর্বে ৪৩০টি দম্পতি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। এর উদ্যোক্তা ছিলেন হোলি স্পিরিট অ্যাসোসিয়েশন অব ওয়ার্ল্ড ক্রিশ্চিয়ানিটি। একটি বড় হলঘরে একসঙ্গে অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়। ফটোতে একদল বর ও কনেকে একটি বাসে বিবাহকেন্দ্রে আসতে দেখা যাচ্ছে।



অঙ্গনা

প্রমীলা

ইচ্ছা-অনিচ্ছা

সাংবাদিকদের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে নিজের মনের অভিলাষ ব্যক্ত করে সম্প্রতি নির্বাচিত ভারত সুন্দরী শ্রীমতী সুস্মিতা সেন বলেছেন যে, আপাতত বিয়ের আমার ইচ্ছে নেই। অদূর ভবিষ্যতেও এ নিয়ে আমার মাথা ঘামানোর ইচ্ছে নেই। কথাটা মূল্যবান এবং সম্পূর্ণভাবেই বর্তমান যুগের মানসধর্মী। মনে পড়ে কলেজ-জীবনের একটি ঘটনা—সে এক অভিজ্ঞতাও বটে। কলেজের প্রথম দিনের প্রথম ক্লাশেই ঘটনাটা ঘটল। অধ্যাপকমশাই ক্লাশে ঢুকলেন। একটু পরেই শুরু হল আলাপ-পরিচয়ের পালা। আমরা দূরু দূরু বুকে প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। একটি ছেলের কাছে এসে তিনি একটু থামলেন। যেন দম নিলেন মনে হল। তারপরই জিজ্ঞেস করলেন, আর ইউ ম্যারেড? ছেলেটি একটু মোটাসোটা এবং গম্ভীর ধরনের, চোখে মোটা লেন্সের পুরু চশমা। সব মিলিয়ে মানিয়েছে বেশ। কিন্তু এরকম একটি বেমক্কা প্রশ্নের জন্য সে মোটেই তৈরী ছিল না, বেশ কিছুটা নার্ভাস মনে হল। বিশেষ করে কো-এডুকেশন ক্লাশ। ছেলেটির কপালে ততক্ষণে বিন্দু বিন্দু ঘাম বেশ স্পষ্ট হচ্ছে। বার-কয়েক ঢোক গিলে সে কোনমতে উত্তর দিল, নো। ক্লাশশুদ্ধ ছেলে-মেয়ের দৃষ্টি তখন তার উপর। সে বসে পড়ে বাঁচে। কিন্তু মারিয়া না মরে রাম এ কেমন বৈরী? অধ্যাপকমশাই নিরস্ত হলেন না। তিনি দ্বিগুণ বেগে প্রশ্ন করলেন, বয়স কত? ঘামে ছেলেটির জামা ভিজে চপচপে হয়ে গেছে। কোনমতে উঠে দাঁড়িয়ে সে বলল, একুশ। সবাই চুপ। অধ্যাপকমশাইও নীরব। এদিকে ছেলেটির অবস্থা শোচনীয়। নীরবতা ভঙ্গ করে তিনিই শুরু করলেন, 'এই আজকের দেশের অবস্থা। ছেলেরা বিয়ে করতে চায় না, মেয়েরা সংসারের দায়িত্ব নেবার ভয়ে বিয়ের কথাটা ভালভাবে উচ্চারণ করতে পর্যন্ত পারে না। অথচ জীবনের একটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিককে অস্বীকার করে তারা এগিয়ে চলতে চাইছে। কোথায় এবং কোনদিকে এগুবে তা তারা নিজেরাই জানে না। জীবনের মোল প্রশ্নই যে অনুপস্থিত। কিন্তু আমরা তা করিনি। আমাদের মত ও পথ ছিল ভিন্ন। সময়কে আমরা মূল্য দিয়েছি এবং দায়িত্বকে মর্যাদা-মণ্ডিত করেছি। তাই কোনদিন কোথাও আটকালো না।' কথাগুলি বলে এবার তিনি পরিপূর্ণ নয়নে মেয়েদের দিকে তাকালেন। হতাশার স্বরে বললেন, এখানেও তো দেখছি একই অবস্থা। জীবনসংগ্রামের দ্বারপ্রান্তে গিয়েও তোমরা মন্ত্র ভুলে গেলে মা। মৃতদেহে প্রাণের সঞ্চার তবে ঘটবে কি করে? মেয়েরা লজ্জায় মাথা নোয়ায়। ছেলেরা মিটি-মিটি মেয়েদের অবস্থাটা উপভোগ করছে।

অধ্যাপকমশাই বক্তৃতাকে আরও দীর্ঘ করলেন। প্রসঙ্গের বিস্তার করে তিনি বিয়েতে অনিচ্ছার সঙ্গে অর্থনৈতিক সঙ্কটকে যুক্ত করে মূল সমস্যাটাকে বেশ জোরাল করে তুললেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আজকের দিনের ছেলে-মেয়েদের সম্পর্কে নানা সরস ও বিরস মন্তব্য করলেন। ইতি-মধ্যে ঘণ্টা পড়ে গেছে। তিনিও উঠলেন। আমরাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

কিন্তু সমস্যাটা যে ক্রমশ আমাদের বিস্তৃত পরিধিতে গ্রাস করে চলেছে সেদিন তা ভেবে দেখে নি এবং অতটা ভেবে দেখার মত মনও তখন ছিল না। অধ্যাপকমশাইর বক্তৃতার অসারতাই সেদিন ছিল আমাদের প্রতিপাদ্য। এখন কলেজ ছেড়ে বাইরে এসেছি। বৃহৎ পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করার সুযোগ পাচ্ছি। তাই সমস্যার ইতরবিশেষ বাদ দিয়ে সবকিছুই বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করি—মনে মনে চিন্তা করি এরকম কেন হল? আজকের দিনের সামনে এও সেরকমই একটা প্রশ্ন। সবাই এড়িয়ে যেতে চায়। কেউ প্রায় ধরা দিতে চায় না। বিয়ে করা আর ভূত দেখা দুই-ই সমান পর্যায়ে গিয়ে পৌঁচেছে। সাধ করে হাঁড়িকাঠে মাথা পেতে বলিপ্রদত্ত হতে কেউ চায় না। এতদিন ছেলেরাই এ ব্যাপারে অগ্রণী ছিল। এখন আর মেয়েরাও পিছিয়ে নেই। সমানে সমানে তাঁরাও ধ্বনি তুলেছেন বিয়ের কথা এখন আমাদের চিন্তায় অনুপস্থিত।

এমন একদিন ছিল যখন ছেলেমেয়ের বিয়ের জন্য মাথা ব্যথা করতেন অভিভাবকেরা। সেদিন অভিভাবকের রায় মাথা পেতে নেওয়া ছাড়া কোন উপায় ছিল না—ছেলেমেয়েদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার তোয়াক্কাও করতো না কেউ। দায়িত্ব আপনা থেকে কাঁধে চেপে বসতো। ছেলেমেয়েকে সংসারে জুড়ে দিয়ে মা-বাবাও পেতেন অপার আনন্দ। আমাদের উপরোক্ত অধ্যাপকমশাই সেরকম কথাই বলছিলেন। কিন্তু আজকাল আর সেরকম হয় না। দিনকাল অনেক বদলেছে, [illegible] মানুষই নিজের ব্যক্তিসত্তা সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে। নিজের মতামতকে সবাই প্রাধান্য দিতে চায়। সেইসঙ্গে একগাদা সমস্যা এসে ভিড় করেছে। তখনকার দিনে [illegible] নিয়ে এরা মাথা ঘামাতেন না। বিয়ে করিয়ে ছেলেকে সংসারী করা [illegible] চালানোর উপযুক্ত ব্যবস্থা নিজেরাই করে যেতেন। বাকীটা ছেড়ে দিতেন ভাগ্যের উপর। মা-বাবা মেয়ের জন্য ছেলের তত্ত্ব তল্লাস নিয়ে ততটা মাথা ঘামাতেন না যতটা কিনা পাত্রপক্ষ সম্বন্ধে। সাংসারিক অবস্থা মোটের উপর সচ্ছল হলে আর কোন কথাই উঠতো না, বিয়ে হয়ে যেতো। সংসারও সেদিন জমজমাট ছিল। নানা সমস্যা আজকের মত সেদিনও অনেক ঝামেলার সৃষ্টি করতো। সবকিছু আবার ঠিক হয়ে যেত। এইভাবে সংসার হয়ে উঠেছিল শান্তির নীড়। বাইরে কত ঝঞ্ঝাট। কিন্তু বাইরের ঝামেলা সংসারে প্রবেশ করতে পারে না। স্বামী-স্ত্রীর পারিবারিক বোঝাপড়াও ছিল বেশ স্বচ্ছ। তাই সহসা উটকো ঝামেলায় সংসারে কলরোল তুলতো না—পারস্পরিক সম্পর্ক [illegible] না। এই [illegible]

প্রধানমন্ত্রীর জ্যেষ্ঠপুত্র রাজীব গান্ধী ও পুত্রবধূ শ্রীমতী সোনিয়া। গত ২৬ ফেব্রুয়ারী নয়াদিল্লীর হায়দরাবাদ হাউসে রাজীব ও সোনিয়ার বিবাহোপলক্ষে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যে প্রীতি-সম্মেলনের আয়োজন করেন সেখানে এই ফটো তোলা হয়।



[illegible] ঠিক এমনিভাবেই প্রভাব বিস্তার করতো [illegible] এবং [illegible] মাঝে। [illegible] পরিবেশে বসবাস করতে [illegible] ও শিক্ষা [illegible] পেয়ে যাবার ফলে সংসারনির্বাহ হয়ে উঠেছিল শান্তির নীড়।

[illegible] সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। পুরানো সমাজব্যবস্থা দ্রুত নিঃশেষের পথে। [illegible] বিরাজমান। [illegible] দিনে দিনে অভিভাবকদের সেই প্রভাব প্রতিপত্তি এবং সামাজিক [illegible]। আর্থিক ক্ষমতাও তাদের নতুন মোড় নিয়েছে। জমিজমা এবং [illegible] মহিমা হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা যেন অনেকখানি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন। তাই ছেলে বা মেয়েকে ডিঙিয়ে চট করে কিছু করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। আর করলেও ছেলেমেয়েরা মেনে নেবে সে ভরসা সেদিনের মত তাঁদের মনে আর অতটা দৃঢ় নয়। বরং মতামত এবং ইচ্ছা-অনিচ্ছা জেনেই এগুনো ভাল।

আজকের সমস্যা মুখ্যত অর্থনৈতিক। এজন্যই অনেকে সাহস করে সংসারী হতে চায় না। আমাদের অধিকাংশই চাকরীজীবি। আর স্বাভাবিকভাবেই সীমাবদ্ধ। যে আয়ে নিজের চলাই দায় সে আয়ে নতুন অতিথি নিয়ে ভরসা হওয়ার কথাও নয়। অনেকেই আজ তাই ভারমুক্ত থাকতে চায়—দায়িত্বের পরিধি আর বাড়াতে চায় না। কারণ এই আয়ের উপর নির্ভর করে ছেলেপুলে নিয়ে সংসার চালানো যে কি দুরবস্থা সেকথা আমরা অনেকেই জানি। এরকম অর্থনৈতিক চাপে বিব্রত সংসারী লোকজনের সঙ্গে পরিচয় আমাদের নিত্য হয়ে থাকে। তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা সংসারের চাকায় দারুণভাবে নিষ্পিষ্ট হচ্ছে। প্রতিনিয়ত সংসারের ভার বয়ে বয়ে তাঁরা নাজেহাল। নিজের কথা ছেড়ে সবসময় ছেলেমেয়ের কথা ভাবেন। তাদের মানুষ করে তোলার চিন্তা করতে করতেই সময় কেটে যায়। এরকম অবস্থা দেখেশুনে কেউ যে আর এই পাঠশালায় নাম লেখাতে রাজী হবেন না এটাই স্বাভাবিক। তাই দিনে দিনে কথাটা সোচ্চার হচ্ছে, আপাতত বিয়ের আমার ইচ্ছে নেই। কথাটা অবশ্যই ভীষণ মেকানিকাল শোনায়। কিন্তু বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার আর মুখের কথায় খুব একটা ফারাক চোখেও পড়ে না। তাছাড়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রশ্ন। নিজের ব্যক্তিসত্তাকে বিসর্জন দিতে কেউ প্রস্তুত নয়। অবশ্য তা উচিতও নয়। কিন্তু সবকিছু বাঁচিয়ে মিলেমিশে থাকা আজকের দিনে যেন উধাও হয়ে গেছে। সবাই নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলতে চায়। [illegible]

অবশ্যম্ভাবীরূপে দেখা দেয় সংঘাত। এর জের গড়িয়ে চলে বহুদূর। ফলাফল খুব একটা ভাল হয় না। অনেকসময় বিবাহ-বিচ্ছেদ এই সংঘাতের চূড়ান্ত রূপ নেয় এবং স্বামী-স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। সংসার ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। সাধস্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে পথে গড়াগড়ি খায়। এর সবচেয়ে করুণ শিকার হচ্ছে সন্তানসন্ততি—তাদের জীবনে প্রায়ই ঘনিয়ে আসে বিরাট দুর্যোগ। অথচ এই সংঘাত এবং দুর্যোগের বিন্দুবিসর্গের জন্যও তারা দায়ী নয়। আধুনিক নগরসভ্যতায় এরকম উদাহরণ আজ আর বিরল নয়। এমনও দেখা গেছে যে বিয়ের কিছুদিনের মধ্যেই মনের অমিল চরমে উঠেছে। সেখানে প্রতিক্রিয়া খুব সাংঘাতিক। বিশেষভাবে অবিবাহিতদের উপর। সব দেখেশুনে বিবাহিত জীবনের উপর তাদের ঘেন্না ধরে যাচ্ছে। অনেকে প্রকাশ্যে বলেই ফেলেন, এর পরেও বিয়ে করতে হবে। এরচেয়ে বরং চিরকাল আই-বুড়ো-আইবুড়ী হয়ে থাকবো, সেও ভাল। কিন্তু এপথে আর নয়। শান্তির নামে অশান্তি সৃষ্টি করে নিজেকেও নষ্ট করা এবং আর একজনকেও জ্বালানো উচিত নয়।

এই যদি অবস্থা হয় তাহলে চিন্তার কারণ যথেষ্ট আছে। বিয়ের প্রসঙ্গকে আজ আর কেউ আমলই দিতে চায় না। ওটা যেন কোন ব্যাপারই নয়। জীবনে সংসারের প্রয়োজনকে আমরা প্রায় নস্যাৎ করে দিতে বসেছি। বয়স যখন বেড়ে যায় তখন মনে হয় এভাবে একা একা আর চলে না। সেই-সময় বিয়ে প্রচন্ড বিড়ম্বনা ছাড়া আর কি? অথচ সেই বিড়ম্বনাকে স্বাগত জানাবার জন্যই যেন আমরা হাত-পা ধুয়ে বসে আছি। এরকমভাবে চললে সমাজদেহে সুস্বাস্থ্য বজায় রাখা সম্ভব নয়। কিন্তু সমস্যাগুলিও যে বিরাট বিরাট পাহাড়ের মত পথ আগলে আছে। ইদানীং অবশ্য ছেলেমেয়েরা যৌথ আয়ে সংসার বাঁধার চেষ্টা দেখা যাচ্ছে। এটা নিশ্চয়ই সুলক্ষণ। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রশ্নেও সমঝোতা দরকার। সেদিকটাও ভেবে দেখতে হবে। তাহলে হয়তো সমস্যার আলো পাওয়া যাবে।

নতুন রূপে

বছর দুয়েক আগে বিউটি কন্টেস্টে শ্রীমতী নীতা ভান্ডারী ছিল অনন্যা। ছিপছিপে পাতলা মেয়ে নীতা কিন্তু গড়নে চৌকষ। স্বাভাবিকভাবেই সুন্দরীদের মধ্যে অগ্র স্থান নির্দিষ্ট। হলোও তাই। ১৯৬৬ সালে কলকাতার বিউটি কন্টেস্টে নীতার জয়জয়কার। এটা ছিল আঞ্চলিক প্রতি-যোগিতায়। মূল প্রতিযোগিতায় যোগদানের উদ্দেশ্যে সর্বভারতীয় সৌন্দর্য বিচারের আসর বসলো বোম্বাইয়ে। 'মিস ইন্ডিয়া' কন্টেস্টে মুখোমুখি দাঁড়ালো শ্রীমতী নীতা এবং শ্রীমতী রীতা। বিচারকদের সামনে সেদিন কঠিন সমস্যা। রূপের উৎকর্ষে দু'জনেই সমান সমান। শুরু হলো চুল-চেরা বিচার। শ্রীমতী নীতা হলো রানার্স-আপ। আর বিজয়িনীর সম্মান পেল শ্রীমতী রীতা ফারিয়া এবং আন্তর্জাতিক সম্মান বিশ্বসুন্দরী।

শ্রীমতী নীতার বিউটি কন্টেস্টের এখানেই শেষ নয়। এবার সে পাড়ি জমালো ব্যাঙ্ককে 'মিস এশিয়া' প্রতিযোগিতায় যোগ-দানের জন্য। রূপসীর স্বীকৃতিতে সে এখানেও অগ্রবর্তীদের মধ্যেই স্থান করে নিতে পেরেছিল।

এইভাবে ছন্দিত-নন্দিত হয়েছে সুন্দরী নীতার সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় পালাগান। সে দিনগুলি তার স্মৃতির অক্ষয় সম্পদ।



বিংশতিবর্ষীয়া তন্বী নীতা এবার মডেল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এখানে একটা কথা উল্লেখ্য যে, মডেলকে পেশা হিসেবে অনেকেই আজো গ্রহণ করতে পারেনি। সব সংস্কার অনায়াসে জয় করে নীতা ইম্পিরিয়াল টোবাকো, ল ওয়ালেশ, টৌজিকাফেন-এর মডেল হবার আহবানে সাগ্রহে সাড়া দিয়েছে—সেই মেয়ে নীতাকে আমরা অনেকেই চিনি। এখন আবার সে পেশা বদল করেছে। মডেলের কাজ থেকে অবসর নিয়ে এবার সে চাকরী নিয়েছে রিসেপসনিস্টের। এটা হয়তো তার সাময়িক অবসর। নয়তো বা পেশায় মধুস্বাদ আস্বাদ করা। সে যা হোক শ্রীমতী নীতা এখন কলকাতার এয়ার ইন্ডিয়ার রিসেপ-শনিস্ট। নতুন চাকরীর কথায় সে বলেছে, এ চাকরী সম্পর্কে আমার আগ্রহ বরাবরের। দেশবিদেশে ঘোরার এই সুযোগ হাতছাড়া করতে আমি রাজী নই। দেশে দেশে ঘুরবো, অজানাকে জানবো, জন্ম সার্থক করবো। তাই এই চাকরী আমার খুব প্রিয়। এত-দিনে আমার সাধপূরণের পথ খুঁজে পেলাম।

শ্রীমতী নীতার জন্ম বোম্বাইয়ে, স্কুল ও কলেজ-জীবন কেটেছে কলকাতায়। বলতে গেলে নীতা কলকাতারই মেয়ে।

গুণের দিক থেকেও নীতা অনেকের ঈর্ষার পাত্রী। সে আঁকতে পারে। ফ্লাওয়ার অ্যারেঞ্জমেন্টে তার রীতিমত দক্ষতা আছে। ব্যালে ডান্সেও সে কৃতী। পড়ার নেশা তার আশৈশব এবং চিরকালীন ভারতীয় নারীর মত রান্নাতেও সে সমান প্রশংসনীয়।

মেমসাহেব

নিমাই ভট্টাচার্য

(৪)

দোলাবৌদি

ভেবেছিলাম তিন-চার দিনের মধ্যেই এলাহাবাদ-বাস শেষ হবে। আশা করেছিলাম এই ক'দিনের মধ্যেই ভারতবর্ষের ভাষা সমস্যার একটা হিল্লে হবে। দেশটা এমন একটা স্তরে এসে পৌঁচেছে যে আমাদের কোন আশাই যেন আর কোনদিন পূর্ণ হবে বলে মনে হয় না। ভাষা নিয়েও তাই আমাদের আশা পূর্ণ হলো না এবং আমার এলাহাবাদ ত্যাগ করাও সম্ভব হয়নি। আমি আজও এলাহাবাদে আছি; আগামী কাল ও পরশুও আছি। হয়ত আরো অনেক দিন থাকতে পারি।

ক'দিন শুধু টাইপরাইটার খট্‌খট্‌ করে প্রায় আজাতি' হবার উপক্রম হয়েছে। তাইতো একটু মুখ পাল্টে নেবার জন্য তোমাকে আমার মেমসাহেবের কাহিনী আবার লিখতে শুরু করলাম।

নন্দিনীর বিদায়ের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আমার জীবন সংগ্রামের শুরু হলো। তুমি তো জান বাংলাদেশটা দু'টুকরো হবার সঙ্গে সঙ্গে আমার মত লক্ষ লক্ষ বাঙালী যুবক-যুবতীদের অদৃষ্টও টুকরো টুকরো হয়ে গেল। কোনদিন স্বপ্নেও ভাবিনি কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে এমন করে কাল-বৈশাখী দেখা দেবে। ভাবিনি জীবনের সমস্ত দিগন্ত এমনভাবে অন্ধকারে ভরে যাবে।

রিপন স্কুল ত্যাগ করে রিপন কলেজে ভর্তি হলাম। সবার মুখেই শুনেছিলাম আর্টস পড়লে কোন ভবিষ্যত নেই; সায়েন্স না পড়লে দেশ ও দেশের যুবকদের মুক্তির কোন উপায় নেই। বাপ-ঠাকুর্দা'র সঙ্গে জ্ঞানের পরিচয় থাকলেও চোদ্দ-পুরুষের সঙ্গে বিজ্ঞানের কোন সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু তবুও আমি বিজ্ঞান সাধনা শুরু করলাম। তবে দেশের অবস্থা এমন অদ্ভুত জটিল হয়েছিল যে শুধু বিজ্ঞান সাধনা করেই দিন কাটান সম্ভব ছিল না, লক্ষ্মীর সাধনাও শুরু করলাম।

কলেজে গিয়ে লেখাপড়া করা মুখ্য হলেও সকাল-সন্ধ্যায় টিউশনি করে রসদ জোগাড় করার কাজটাও কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। এই দোটানার মধ্যে প্রাণান্ত হবার উপক্রম হয়েছিল। নিজের দিকে ফিরে তাকাবার অবকাশ পাচ্ছিলাম না। ছোটবেলায় কলেজ জীবন সম্পর্কে অনেক রূপকথার কাহিনী শুনতাম। স্কুলে পড়বার সময় তাই অনেক স্বপ্ন দেখেছিলাম। স্বপ্ন দেখতাম, ধুতি-পাঞ্জাবি পরে হাতে খাতা দোলাতে দোলাতে কলেজে ঘুরে বেড়াচ্ছি, মাস্টার মশাইদের মত প্রফেসররা অযথা ছাত্রদের বকাবকি করছেন না, ক্লাশ ফাঁকি দেবার অবাধ স্বাধীনতা এবং আরো অনেক কিছু। আশা করেছিলাম কলেজ জীবন সাফল্যপূর্ণ বৃহত্তর জীবনের পাশপোর্ট তুলে দেবে আমার হাতে। এই ক'বছরের শিক্ষা-দীক্ষা ও সর্বোপরি অভিজ্ঞতা আমার চোখে নতুন স্বপ্ন, নতুন আশা এনে দেবে, সম্ভব করে তুলবে তাদের বাস্তব রূপায়ণ। লুকিয়ে লুকিয়ে মনে মনে হয়ত এ আশাও করেছিলাম আমি সার্থক, সাফল্যপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ মানুষ হয়ে সগর্বে এগিয়ে যাব আগামী দিনের দিকে।

সেদিন জানতাম না বাংলা দেশের সব যুবকই কলেজ জীবনের শুরুতে এমনি অনেক স্বপ্ন দেখে এবং সে স্বপ্ন চিরকাল শুধু স্বপ্নই থেকে যায়। বোধহয় এক-জনের জীবনেও এসব স্বপ্ন বাস্তব হয়ে দেখা দেয়নি। তবুও বাঙালীর ছেলে স্বপ্ন দেখে, স্বপ্ন দেখে হাসিতে গানে ভরে উঠবে তার জীবন। জীবন পথের চড়াই-উত্‌রাই পার করতে সাহায্য করবে আদর্শ-বতী জীবন-সঙ্গিনী এবং আরো অনেক কিছু।

লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বাঙালী যুবকদের মত হয়ত আমিও এমনি স্বপ্ন দেখেছিলাম কোন দুর্বল মুহূর্তে। অতীতের ব্যর্থতার ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিইনি। পূর্বসূরীদের অভিজ্ঞতা আমাকে শাসন করতে পারেনি, সংযত করতে পারেনি।

তবে আমি আমার কল্পনার উড়োজাহাজ উড়িয়ে বেশী দূর উড়ে যাইনি। রিপন কলেজের এয়ারপোর্ট থেকে টেক্‌ অফ্‌ করার পরপরই ক্রাশ ল্যান্ড করে সম্বিত ফিরে পেয়েছিলাম।

একদিকে অর্থ চিন্তা ও অন্যদিকে ভবিষ্যতের চিন্তায় আমি এমন প্রমত্ত থাকতাম যে আশ-পাশে কোন ভ্রমর আমার মধু খাবার জন্য উড়ছে কিনা, সে খেয়াল করার সুযোগ পেতাম না। জীবনটার সঙ্গে সঙ্গে মনটাও কেমন যেন সঙ্কুচিত হয়ে গিয়েছিল। আমার সীমিত জীবনের মধ্যে যে কটি নারী-পুরুষের আনাগোনা ছিল তাদের দিকে ফিরে তাকাবারও কোন আগ্রহ বা উৎসাহ ছিল না।

কিন্তু কি আশ্চর্য, কিছুকাল পর হঠাৎ আবিষ্কার করলাম কে যেন আমার মনোবীণার তারে মাঝে মাঝে ঝঙ্কার দিচ্ছে। চোখের দৃষ্টিটা কেমন যেন একটু রঙীন মনে হলো। ক'দিন আগে পর্যন্ত যে আমার মুহূর্তের ফুরসত ছিল না নিজের দিকে তাকাবার, সেই আমি নিজের দিকে ফিরে তাকান শুরু করলাম। আরো একটা গেরুয়া পাঞ্জাবি তৈরী করলাম। কায়দা করে ধুতি পরাও ধরলাম। পাড়ার সেলুনে চুল কাটা আর রুচিসম্মত মনে হলো না। পরের মাসে টিউশনির মাইনে পাবার পর একজোড়া হাল ফ্যাশনের কোলাপুরী চটিও কিনলাম।

এমনি আরো অনেক ছোট খাট পরিবর্তন এলো আমার দৈনন্দিন জীবনে। আগে দুটো একটা বই আর খাতা নিয়ে কলেজে যেতাম। এখন বই হাতে করে কলেজ যেতে আত্মসম্মানে বাধতে লাগল। বই নেওয়া ত্যাগ করে শুধু খাতা হাতে করে কলেজ যাওয়ার নিয়মটা পাকাপাকি করে নিলাম। মোদ্দা কথা আমি এক নতুন ধর্মে দীক্ষিত হলাম। বাসংসি জীর্ণানি করে আমি এক নতুন আমি হলাম।

অদৃষ্ট নেহাতই ভাল। বেশী দূর এগুতে হলো না। হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলাম। আজ আত্মজীবনীর সেই রঙীন দিনগুলোর কথা মনে হলে হাসি পায়। সেদিন কিন্তু হাসি পায়নি। মরীচিকাকেই সেদিন জীবনের চরম সত্য বলে মনে করে ছুটেছিলাম। ঘটনাটা নেহাতই সামান্য।

বারাকপুর-টিটাগড় বা খিদিরপুরের বড় বড় কলকারখানার মত তখন আমাদের কলেজও তিন শিফ্‌ট'এ হতো। সকালে মেয়েদের, দুপুরে ছেলেদের, রাত্রিতে প্রৌঢ়দের ক্লাশ হতো। বেথুন বা লেডী ব্রাবোর্নের ছাত্রীদের মধ্যে যুবতী কুমারীদের মেজরিটি থাকলেও আমাদের কলেজের মর্নিং সেক্‌সনের চেহারা ছিল আলাদা। নীলিমা সরকারের মত সদা প্রস্ফুটিত গোলাপের সংখ্যা খুব বেশী ছিল না। দেশটা স্বাধীন হবার পর অনেকের সংসারেই আগুন লাগল। এক টুকরো বস্ত্র আর এক মুষ্টি অন্নের জন্য, রুগ্ন শিশুর একটু পথ্যের জন্য, জীবন ধারণের নিতান্ত প্রয়োজনীয় দাবী মেটাবার জন্য বাংলা দেশের হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ গৃহস্থ বধূদের ডালহৌসী স্কোয়ারের রঙ্গমঞ্চে নামতে হলো। তাইতো এই ডালহৌসী রঙ্গমঞ্চে আসবার পাশপোর্ট জোগাড় করার জন্য অনেক বৌদি আর ছোট মাসিমারাই আবার কলেজে পড়া শুরু করলেন। তাছাড়া আর একদল মেয়েরা নতুন করে উচ্চ শিক্ষা নিতে সে সময় শুরু করলেন। দেশটা স্বাধীন হবার পর অনেক অন্ধকার ঘরেই হঠাৎ বিংশ শতাব্দীর আলো ছড়িয়ে পড়ল। আমাদের কলেজের বীণামাসির মত যাঁরা কোন অন্যায় না করেও স্বামী ও শ্বশুর-বাড়ীর অকথ্য অত্যাচার দিনের পর দিন, বছরের পর বছর সহ্য করেছেন, যাঁরা বিবাহিতা হয়েও স্ত্রীর মর্যাদা পাননি, স্বামীর ভালবাসা পাননি, সন্তানের জননী হয়েও যাঁরা মা

হবার গৌরব থেকে বঞ্চিতা হয়েছিলেন, তাঁদের অনেকেই বন্দীশালার অন্ধকূপ থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলেন। অজানা, অজ্ঞাত, ভবিষ্যতের সংগে মোকাবিলা করবার জন্য এ'দের অনেকেই আবার কলেজে ভর্তি হলেন। আমাদের কলেজেও অনেকে ভর্তি হয়েছিলেন।

দিনের বেলায় হাফ্ আদর্শবাদী, হাফ্ ভাবুক, হাফ পলিটিসিয়ান, হাফ অভিনেতা, হাফ গায়ক, হাফ খেলোয়াড়দেরই সংখ্যা ছিল বেশী। সন্ধ্যার পর যাঁরা আসতেন তাঁদের অধিকাংশই ডালহৌসী-ক্যানিং স্ট্রীট-ক্লাইভ স্ট্রীট থেকে অর্ধমৃত অবস্থায় ছুটতে ছুটতে কলেজে আসতেন।

সওয়া দশটায় মেয়েদের ক্লাশ শেষ হতো আর ছেলেদের ক্লাশ শুরু হতো। আমার ক্লাশ কোনদিন সওয়া দশটায়, কোনদিন এগারটায় শুরু হতো। সওয়া দশটায় ক্লাশ থাকলে ছেলেরা কোনদিন লেট করত না। বরং দশটা বাজতে বাজতেই কমনরুম ছেড়ে দোতলা-তিনতলার দিকে পা বাড়াত। সওয়া দশটার সন্ধিলগ্নের প্রতি অন্যান্য ছাত্রদের মত আমারও আকর্ষণ ছিল কিন্তু সকালবেলায় দু-দুটো টিউশনি করে কলেজে আসতে আসতে প্রায় সাড়ে দশটা হয়ে যেত। তাইতো সওয়া দশটার ক্ষণিক বসন্তের হাওয়া আমার উপভোগ করার সুযোগ নিয়মিত হতো না।

বীণামাসির সংগে প্রায়ই পূরবী সিনেমার কাছাকাছি দেখা হতো। বীণামাসি বিবাহিতা যুবতী কিন্তু সিঁদুর পরত না। বীণামাসি বলত, বিয়ে করেও যখন স্বামীকে পেলাম না, শ্বশুরবাড়ীতেও স্থান পেলাম না, তখন সিঁদুর পরব কার জন্য? কিসের জন্য? ফুটপাতের এক পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমরা দু'চার মিনিট কথাবার্তা বলতাম। কলেজের ছোকরা অধ্যাপক ও ছাত্রদের কেউ কেউ পাশ দিয়ে যাবার সময় একটু সরস দৃষ্টি দিয়ে চাইতেন। বীণামাসি ও আমি দুজনেই তা লক্ষ্য করতাম কিন্তু গ্রাহ্য করতাম না।

পর পর কদিন বীণামাসির সংগে দেখা হলো না। প্রথম কদিন বিশেষ কিছু ভাবিনি। পুরো একটা সপ্তাহ দেখা না হবার পর একটু চিন্তিত না হয়ে পারলাম না। অথচ বীণামাসিদের বাড়ী গিয়ে খোঁজ করব সে সময়ও হয় না। কলেজ শেষ হতে না হতেই আবার টিউশনি করতে ছুটতে হয়।

সেদিনও কলেজে আসবার পথে বীণামাসির দেখা পেলাম না। কিন্তু ঐ পূরবী সিনেমার কাছাকাছিই হঠাৎ একটা জীবন্ত বারুদের স্তূপ আমার সামনে থমকে দাঁড়াল। বল্লো, শুনুন। বীণাদির খুব অসুখ। আপনাকে যেতে বলেছেন।

সকাল সাড়ে দশটার সময় হ্যারিসন রোডের পর পূরবী সিনেমার পাশে এমনভাবে একজন সুন্দরী আমাকে বীণামাসির সমন জারী করবে, কল্পনাও করতে পারিনি। মুহূর্তের জন্য ভড়কে চমকে গিয়েছিলাম। একটু সামলে নেবার পর অনেক প্রশ্ন মনে এসেছিল কিন্তু গলা দিয়ে সেসব প্রশ্ন বেরুতে সাহস পায়নি। শুধু বলেছিলাম, আপনি জানলেন কি করে?

—আমি বীণাদির বাড়ী গিয়েছিলাম।

সেই দিনই বিকেল বেলা বীণামাসিকে দেখতে গিয়েছিলাম। আমি যেতেই বীণামাসি আমাকে প্রশ্ন করল, 'নীলিমার কাছে খবর পেয়েছিস বুঝি?'

আমি বল্লাম, 'কোন নীলিমা?'

'ঐ যে আমাদের সংগে পড়ে নীলিমা সরকার...'

'ও, চিনিনে, তবে এতো সকালেই পূরবীর কাছে একটা সুন্দর বয়সের মেয়ে...'

বীণামাসি আর এগুতে দিল না। বল্লো, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ ঐ তো নীলিমা।'

আমি বল্লাম, 'তাই নাকি!'

বীণামাসির কাছে আমি আমার চিত্ত চাঞ্চল্যের বিন্দুমাত্র আভাস দিলাম না। নিজেকে সংযত করে নিলাম। কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে সেদিনের মত বিদায় নেবার আগে বীণামাসিকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কলেজ থেকে কেউ তোমাকে দেখতে আসেন না?'

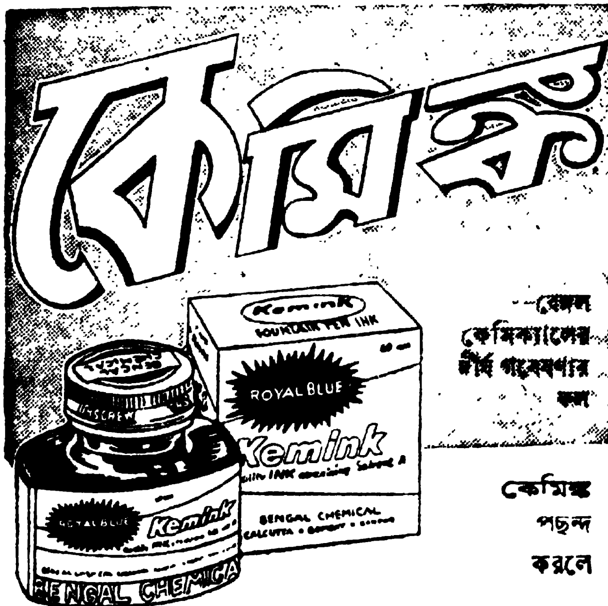
'হ্যাঁ, অনেকেই আসে।'

তিন-চারদিন পরে আবার বীণামাসিকে দেখতে গেলাম। গিয়ে দেখি সেদিনের সেই নীলিমা সরকারও বসে আছেন। নমস্কার বিনিময় করে আমি পাশের চেয়ারটায় বসলাম। বীণামাসি চাদরটা গলা পর্যন্ত টেনে নিয়ে পাশ ফিরে বল্লো 'জানিস নীলিমা, বাচ্চু আগে আমাদের পাড়াতেই থাকত। আমাদের এই পাড়ায় থাকবার সময়ই ওর মা মারা যান... ...'

নীলিমা বল্লো, 'তাই নাকি?'

আমি বল্লাম, 'আমার জীবন কাহিনী শোনার অনেক অবকাশ পাবেন, আজ থাক। যদি লিখতে পারত তবে বীণামাসি আমার জীবন নিয়ে একটা রামায়ণ লিখত। ভাগ্য ভাল বীণামাসির কলম চলে না, শুধু মুখ চলে। কিন্তু তার ঠেলাতেই আমি অস্থির।'

নীলিমার সংগে সেই আমার প্রথম আলাপ-পরিচয় হলো। দশ-বারো দিন পরে বীণামাসির ওখানেই আমাদের আবার দেখা। সেদিন দুজনেই একসংগে বেরুলাম। কলেজ স্কোয়ার পর্যন্ত একসংগে



আপনার ইচ্ছেমত সস্তা বা দামী যে' কোন কলম আপনি পছন্দ করতে পারেন ; কারণ,

কেমিঙ্ক —তাড়াতাড়ি শুকোয়, অবাধে লেখা হয় এবং জমাট বাঁধেনা। সেই জন্য কেমিঙ্ক সব রকম কলমের পক্ষে উপযোগী।

সলভেন্ট 'এ'—যুক্ত কেমিঙ্ক দিয়ে লিখে আপনার কলমের উপযুক্ত ব্যবহার করুন।

—লিখে আনন্দ কেমিঙ্কে

বেঙ্গল কেমিক্যাল কলিকাতা, কানপুর, দিল্লী, বোম্বাই।

হে'টে গিয়ে দ্বজনে দ্বদিকে চলে গেলাম।

ঐ সামান্য আলাপ-পরিচয়তেই আমি যেন কেমন পালটে গেলাম। সকালবেলার টিউশনিতে একট্ব একট্ব ফাঁকি দিয়ে ও স্নান-আহারের পর্ব কিঞ্চিৎ ত্বরান্বিত করে দৌড়ে দৌড়ে সওয়া দশটার আগেই কলেজে আসা শ্বর্ব করলাম। কোন দিন দেখা হয়, কোনদিন হয় না ; কোনদিন কথা হয়, কোনদিন হয় না। কোনদিন আবার দ্বর থেকে একট্ব তির্যক দ্বষ্টি আর ম্বচকি হাসি বিনিময়। তার বেশী আর কিছ্ব নয় কিন্তু তব্বও আমি কেমন স্বপ্নাতুর হয়ে পড়লাম। নীলিমাকে কো-পাইলট করে আমি আমার কল্পনার উড়ো-জাহাজ নিয়ে টেক অফ্ করলাম। ভাব-সম্বদ্রে ভেসে বেড়ালাম।

ঐ শ্বধ্ব একট্ব ম্বচকি হাসি ও ক্ষণিকের দ্বষ্টি-বিনিময়কে ম্বলধন করে আমি অনেক, অনেক দ্বর এগিয়ে গেলাম। টোপর মাথায় দিয়ে নীলিমার গলায় মালা পরিয়েছিলাম, পাশে বসে বাসর জেগেছিলাম। বৌভাত-ফ্বলশয্যার দিন গভীর রাত্রে অতিথিদের বিদায় জানিয়ে আমি নীলিমার ঘরে এসে দরজাটা বন্ধ করলাম। নীলিমার পাশে বসে একট্ব আদর করলাম। তারপর ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে স্বইচটা অফ্ করতে গিয়েই দারুণ শক্ লাগল। আমার কল্পনার উড়ো জাহাজ ক্র্যাশ ল্যান্ড করল। কো-পাইলট নীলিমাকে আর কোথাও খ্বজে পেলাম না।

সাহস করে বাড়ীকে কিছ্ব জিজ্ঞাসা করতে পারিনি। দারুণ উৎকণ্ঠায় দিন কাটছিল নীলিমা-বিহীন জীবন প্রায় অসহ্য হয়ে উঠল। বৈরাগ্যের ভাব মনের মধ্যে মাঝে মাঝেই উঁকি দিতে লাগল। আর কয়েক দিনের মধ্যে খবর না পেলে হয়ত কেদার-বদ্রীর পথেই পা বাড়াতাম। ভগবান করুণাময়! তাই সে যাত্রায় আর সংসার ত্যাগ করতে হলো না, নীলিমার দেখা পেয়ে গেলাম।

দেখা পেলাম বীণামাসির বাড়ীতেই। নীলিমার কপালে অত বড় একটা সিঁদ্বরের টিপ দেখে বেশ আঘাত পেয়েছিলাম মনে মনে। প্রথমে ঠিক সহজ হয়ে কথাবার্তাও বলতে পারিনি। নীলিমা বোধহয় আমার মানসিক স্পন্দনের ভাষা ব্বঝেছিল। তাই সে নিজেই বেশ সহজ সরল হয়েছিল আমার সঙ্গে।

জান দোলাবৌদি, নীলিমার বিয়ে হবার পরই আমাদের দ্বজনের বন্ধ্বত্ব হলো। কোন কাজে-কর্মে সাউথে গেলেই কালীঘাটে নীলিমার সঙ্গে দেখা করে এসেছি। নীলিমার স্বামী সন্তোষবাব্ব আজ আমার অন্যতম বিশেষ বন্ধ্ব ও শ্বভাকাঙ্ক্ষী। ওরা এখন আমেদাবাদে আছেন। সন্তোষবাব্ব একটা বিরাট টেক্সটাইল মিলের চীফ্ অ্যাকাউন্ট্যান্ট। এক গাদা টাকা মাইনে পান। নীলিমা আমেদাবাদ টেগোর সোসাইটির সেক্রেটারী। তোমার বোধহয় মনে আছে সেবার গোয়া অপারেশনস্ কভার করে দিল্লী ফেরার পথে দমন গিয়েছিলাম এবং আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি।

গত্যন্তর না পেয়ে সন্তোষবাব্বকেই একটা আর্জেন্ট টেলিগ্রাম পাঠাই। স্বামী-স্ত্রী দ্বজনেই ছ্বটে এসেছিলেন আমাকে নিয়ে যাবার জন্য। দ্ব-সপ্তাহ ওদের সেবা-যত্নে আমি স্বস্থ হবার পর নীলিমা মেমসাহেবকে আমেদাবাদ আনিয়েছিল। দ্ব'সপ্তাহ অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও কোন খবর না দেবার জন্য মেমসাহেব ভীষণ রেগে গিয়েছিল। আমি কিছ্ব জবাব দিতে পারিনি। নীলিমা ওর দ্বটি হাত ধরে বলেছিল, 'তোমার সেবা পাবার মত অসুখ হলে নিশ্চয়ই খবর দিতাম। ডকটর মৈত্রকে জিজ্ঞাসাও করেছিলাম। উনি বল্লেন, তাড়াহ্বড়ো করে ওকে আনবার কোন কারণ দেখি না। একট্ব স্বস্থ হলেই খবর দেবেন।'

একট্ব থেমে দ্বহাত দিয়ে মেমসাহেবের ম্বখটি তুলে ধরে নীলিমা বলেছিল, 'তাছাড়া ভাই, আমি বা তোমার দাদাও বাচ্চুকে ভালবাসি। তোমার অভাব আমাদের দ্বারা না মিটলেও ওর সেবা-যত্নের কোন ত্রুটি করিনি আমরা।'

মেমসাহেব তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে হাসিতে ভরিয়ে তুল্লো নিজের মুখটা। বল্লো, নীলিমাদি, আমি তো আপনাদের দোষ দিতে চাইনি। তবে অনেক দূরে থাকি, মন মানে না, একটু ... পেলেই ভয় হয় ...'

নীলিমা আর কোন কথা বলেনি। ঐ প্রসঙ্গের ওখানেই সমাপ্তি হলো।

তারপর আরো এক সপ্তাহ ছিলাম আমেদাবাদে। কাঁকারিয়ার লেকের ধারে রোজ বেড়িয়েছি আমরা। কত আনন্দ, কত হৈ চৈ করেছি আমরা। সেসব কথা।

নীলিমা যখন আমার জীবনে উঁকি দিয়েছিল, তখন আমি চমকে গিয়েছিলাম। ভাবতে পারিনি, কল্পনার সাহস হয়নি যে একটি মেয়ে আমার জীবনে আসতে পারে বা আমাকে কোন মেয়ে তার জীবনরথের সারথী করতে পারে। যেদিন নীলিমার দেখা পেলাম, সেদিন কি করে এই সংশয়ের মেঘ কেটে গেল জানি না। তবে একথা সত্য যে রূপকথার রাজকুমারীর মত নীলিমার ছোঁয়ায় আমার ঘুম ভেঙেছিল, আমি কৈশোর থেকে সাঁত্য সাঁত্যই যৌবনের সিংহদ্বারে এসে উপস্থিত হলাম।

নীলিমার কথা আজ পর্যন্ত কাউকে জানাইনি। এসব জানাবার নয়। এ আমার একান্তই নিজস্ব ব্যাপার। এমন কি নীলিমাও জানে না, হয়ত ভবিষ্যতেও জানতে পারবে না।

তবে মেমসাহেবকে বলেছিলাম। মেমসাহেব কি বলেছিল জান? বলেছিল, সুন্দরী মেয়ে দেখলে যে তোমার মাথাটা ঘুরে যায়, তা আমি জানি। আমার মত কালো-কুচ্ছিৎ মেয়েকে যে তোমার পছন্দ হয় না, সে কথাটা অত ঘুরিয়ে বলার কি দরকার?'

আমি শুধু বলেছিলাম :

"প্রহর শেষের আলোয় রাঙা সেদিন চৈত্র মাস—
তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ।।
এ সংসারের নিত্য খেলায় প্রতিদিনের প্রাণের মেলায়
বাটে ঘাটে হাজার লোকের হাস্য-পরিহাস—
মাঝখানে তার তোমার চোখে আমার সর্বনাশ।।"

একটা চাপা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বলেছিলাম, 'তোমার পোড়া কপাল! কি করবে বল, যদি পর পালটে নেবার চেষ্টা কর।'

আলোচনা আর দীর্ঘ না করে মেমসাহেব মুচকি হেসে জিভ ভেংচি কেটে পালিয়ে যেত।

খোকনদার কি ব্যাপার? বহুকাল কোন চিঠিপত্র দেয় না। বুড়ো বয়সে তোমাকে নিয়ে খুব বেশী মাতামাতি শুরু করেছে?

চিঠি দিও।

তোমাদের বাচ্চু

বেনারসী শাড়ী
ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা

দাঁতে চিবুই স্বপ্ন, কুটো ঘাস॥

কৃষ্ণ ধর

ঝরণাতলায় শুয়ে শুয়ে আপন মনে দাঁতে চিবুই
স্বপ্ন, কুটো ঘাস
দেখি দূরে ঘষা কাচের ভিতর দিয়ে রুমিং মিলের
ফুল ফোটানো আকাশ।
মনের ভিতর হাঁটতে থাকি সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকি
অন্ধকারে গুহায়—
হঠাৎ কখন চমক লাগে পায়ের শব্দ শুনলে পরে
চেঁচিয়ে বলি, কে যায়?
অনেক দিনের অমার্জিত উঠোন কোণে দেখতে পেলাম
সিঁদুর মাখা পিঁড়ি
দেখেই আমি চিনতে পারি, মনে পড়ে এইখানেতে
করেছিলাম যুগল হারাকিরি।
নিজের শবকে তারপরেতে কাফন দিয়ে গভীর হাতে
আলতো করে ঢাকি
না তাকিয়ে চিনতে পারি কে শুয়েছে আমার পাশে
সন্ধ্যামণির সুবাস গায়ে মাখি।
নির্জনতা ঘুম ভাঙে না শিশির ঝরে বিলাপ করে
সন্ধ্যা আতুর আকাশ
আমি তখন ফিরে গিয়ে ঝরণাতলায় শুয়ে শুয়ে
দাঁতে চিবুই স্বপ্ন, কুটো ঘাস।

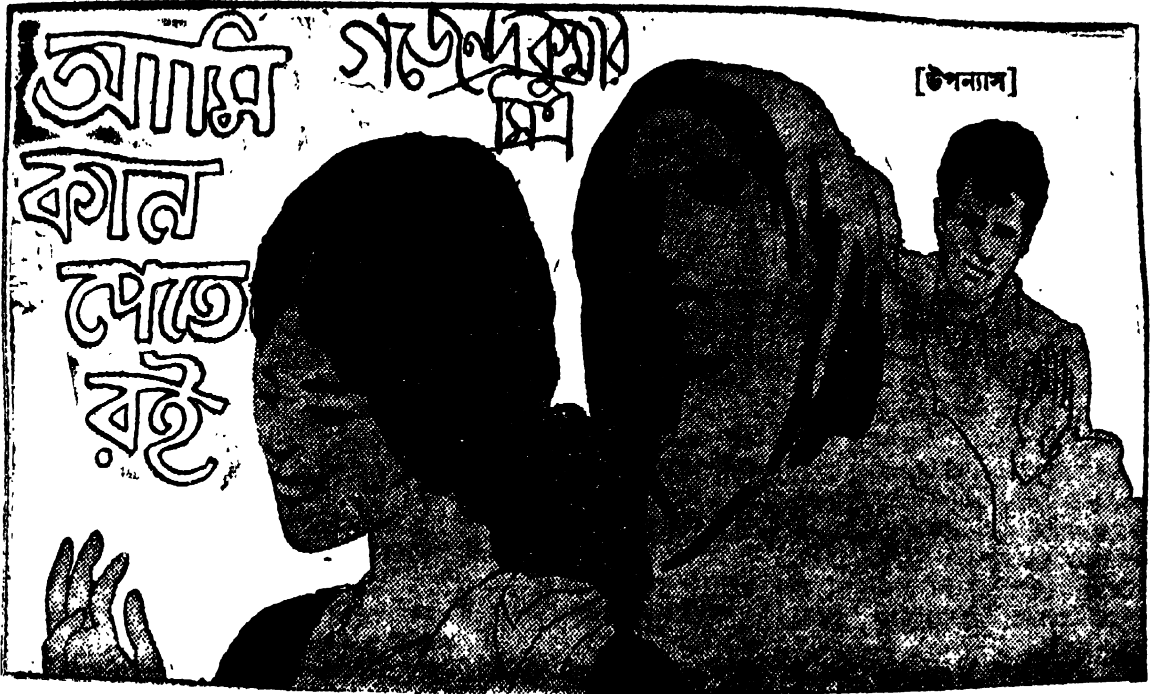
এতো বিষ ঢালে কি নাগিনী॥

মনোরমা সিংহ রায়

হিংস্র দিন কী যে আনে শুধু বুঝি নাগিনী সে তার
বিষ ঢেলে দিয়ে দিয়ে ফিরে যায় বিবরে আবার।
মৃত্যু নীল মুহূর্তের বিলাপের শেষ অঙ্ক পরে
ধূসর ম্লানিমা সব ঢেকে দেয়। শুধু অশ্রু ঝরে।।
তারপর বাকী থাকে নাগালের বাহিরে তখন
অনুদ্দিষ্ট সুখ তার নিয়ে কিছু চারু আকর্ষণ।।
অনিন্দ্য সকাল ব্যর্থ। বেদনায় কল্পনা বিলীন,
তবু কি হৃদয় ভেঙে কিছু রেখে যায় না এ দিন।

আলোঝরা অপরাহ্ণ আসে নেমে, মায়াবী তুলিকা
অপরূপ কারুকার্য এঁকে দিয়ে জ্বালে দীপশিখা
নক্ষত্রের আলো নিয়ে। অনুপম মাধুরী শিল্পের
মোহিনী হাসির আভা রেখে যায় যেন ললাটের
উপরে দু'হাত রেখে। সে এক পবিত্র আশীর্বাদ,
সব বিষ বিদূরিত করে নাকি সে অমৃত স্বাদ।

তারপর ঘুম নিয়ে আসে যদি নির্মল যামিনী
তখনো হও না শান্ত, এতো বিষ ঢালে কি নাগিনী।



(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। ১৮ ।।

কথাটা শুনতে, বুঝতে—সর্বোপরি বিশ্বাস হতেও অনেক খানিকটা সময় লাগল সুরবালার। প্রথমটা তো শুধু বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়েই রইল ঝিয়ের মুখের দিকে। অসমাপ্ত নিদ্রার বিহ্বলতা তো আছেই, ঝিয়ের মুখে যে বার্তা শুনেছে বলে ওর ধারণা—তার আকস্মিকতা ও অবিশ্বাস্যতাও কম বিহ্বলকর নয়। মানুষ যখন দুর্লভ কোন বস্তু প্রাপ্তির কল্পনা করে—ভাবে এটা পেলে ভাল হত, আমি তাহলে অমুক করতুম ইত্যাদি—তখন তা সুদূর, দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য জেনেই করে। সেটা পেলেও সহজে পাবে না—এটুকু জানা থাকে বলেই তাকে ঘিরে এত কল্পনা, এত আকাঙ্ক্ষা। সুতরাং সেটা সেই কল্পনার সঙ্গে সঙ্গে হাতে এসে গেলে চোখে দেখেও বিশ্বাস হতে চায় না। সুরবালারও সেই অবস্থা। কি শুনেছে তা বুঝতেও যেমন দেরি হচ্ছে, বিশ্বাস করতেও। অথচ আর একবার প্রশ্ন করতেও যেন সাহস হচ্ছে না—পাছে এবার অন্য কথা শোনে।

ঝিয়ের এত কথা জানা বা বোঝার অবস্থা নয়, সে একটু অসহিষ্ণুভাবেই প্রশ্ন করল, 'তা কি বলব ছেনাকে? ওপরে এনে বসাবো? দেখা করবে না কি বলো বাপু। অতবড় একটা মানিব্বর লোক গাড়িতে বসে আছে ঠায়। মা জিজ্ঞেস করতে বলল।'

'কে, কে এসেছে বললি?' অতিকষ্টে সুরবালা যেন স্বর খুঁজে পায় গলায়।

'ঐ যে বলনু বাপু!' ঝি এবার বিরক্ত [illegible] চৌগ্গা না কি, সেখানকার রাজাবাবু। তুমি সেখানে গিছলে নাকি গাওনা করতে, তেনাকে চেনো—সইস বললে।'

'ওমা, তা অত বড় একটা লোক এসেছেন, বসাবি কিনা জিজ্ঞেস করছিস?.. বায়না দিতে যাঁরা আসেন তাঁদের সবাইকেই তো বসানো হয়। এ তো পুরনো ঘর। মার আজ হল কি, এখনও তাঁকে গাড়িতে বসিয়ে রেখেছে! যা, ওপরে এনে বসাগে যা।.. আর কী কালো কাপড় পরে থাকিস দামিনী! হপ্তায় একদিন করে ফুটিয়ে নিতে পারিস না? এই চেহারায় গিয়ে দাঁড়াবি—কী মনে করবেন ও'রা বল তো!'

ঝি একটু অবাকই হয়ে যায়। এতকালের মধ্যে—এত লোক এসেছে গেছে—কৈ, তার কাপড়ের কথা তো মনে হয় নি দিদির।... অবিশ্যি, মনকে বোঝায়, —আসে তো বাবুদের লোকই, বড় বড় বাবু, এমন রাজা-রাজড়ারা নিজে আসে না এটা ঠিক।

তন্দ্রার জড়তা কেটে গেছে কিন্তু তার জায়গায় নতুন এক জড়তা বিহ্বলতা পেয়ে বসেছে যেন। এর আগে বহু লোকই এসেছে বায়না দিতে, সব ক্ষেত্রেই যে ম্যানেজার কি সরকার আসে তা নয়—বাবুরাও আসেন মধ্যে মধ্যে—কিন্তু আর কখনও তো সুরোর এমন অবস্থা হয়নি। এ কি অসময়ে কাঁচা ঘুম ভাঙার জন্যেই? বুকের মধ্যে যেন ঢেঁকির পাড় পড়ছে, এত বুক ধড়ফড় করছে যে নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে এক এক সময়। আর ঘাম, এত ঘাম কোথা থেকে আসছে কে জানে! ঝি এসে খবর দেওয়ার পর এই চার পাঁচ মিনিটেই যেন স্নান করে উঠল।...

অত বড় 'মানিব্বর' লোক বসে আছেন—কথাটা ঠিকই। কিন্তু যত তাড়াতাড়ি করতে যায়—ততই যেন দেরি হয় আরও। মনে হল একবার কলতলায় চলে গিয়ে মুখহাতটা একটু ধুয়ে নেয়। সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল—কলতলায় যেতে গেলে ঐ পাশের ঘরের সামনে দিয়েই নেমে যেতে হবে। পুরো সামনে না হলেও—কোণ থেকে দেখা যায়। দামিনীকে কতবার বলে দিয়েছে, কেউ এসে বসলে—বাবুভাইরা—সঙ্গে সঙ্গে দরজা ভেজিয়ে দেবে, আজও সেটা মুখস্থ হল না ওর।

এমনিই—কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে নিয়ে মুখে চোখে একটু দিয়ে—ঢকঢক করে খেয়ে নিল খানিকটা, তারপর মুখখানা গামছায় ঘষে ঘষে মুছে ফেলে আয়নার সামনে দাঁড়াল। ইচ্ছা—একটু প্রসাধন করে যায়। মতি আর নান্নুর দৌলতে নানান বিলাস-দ্রব্য জড়োও হয়েছে আজকাল। ব্যবহারও যে করতে জানে না, তাও নয়—কিন্তু এখন কতটুকু করবে, কোনটা মাখবে কিছুই যেন মাথাতে গেল না। হাত-পাও এমন কাঁপছে থরথর করে—পারতও না মাখতে, শিশিতে হাত দিতে গেলে হাত থেকে পড়ে বোধ হয় ভেঙে যেত।

কিছুই করা হল না—শাড়িখানা পাল্টানো ছাড়া। তাও যে সব শাড়ি ধোপা-বৌ কুঁচিয়ে দিয়ে গেছে—তার একটাও যেন এখন পছন্দ হল না। নতুন-পাওনা একখানা আড়ংধোলাই শাড়ি পাট ভেঙে হাত-কুঁচনো করে পরে—পাতা কাটা চুল—কোনমতে জড়িয়ে নিয়ে এক সময় সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বুকের রক্তস্রোত আরও উত্তাল হয়ে উঠেছে। [illegible]

গেছে, হাত পা আরও বেশী কাঁপছে। তবু উপায়ও আর নেই। আর বেশীক্ষণ ও'কে বসিয়ে রাখলে অপমান করার সামিল হবে। ইস—আর কেউ যদি থাকত, একটা কোন তৃতীয় ব্যক্তি। নান্ন, এমন কি রঘুবাবুও যদি এসে পড়ত। গণেশের কথাই বেশী করে মনে পড়ছে তার, বলিয়ে-কইয়ে ছেলে, সে থাকলে এতক্ষণে জমিয়ে নিতে পারত।

ওর সে দুরবস্থা রাজাবাবু লক্ষ্য করলেন কিনা কে জানে, তাঁর ব্যবহারে কিছু বোঝা গেল না। ব্রাহ্মণের মেয়ে সে, হাত তুলে নমস্কার করা উচিত হবে কিনা বুঝতে না পেরে হাতটা তুলতে গিয়েও যে নামিয়ে নিল সুরো, তাও বোধহয় বুঝতে পারলেন না অত, (মনে মনে ঠাকুরকে ডাকছিল সুরো, বুঝতে যাতে না পেরে থাকেন) স্নিগ্ধকণ্ঠে শুধু বললেন, 'এসো, বসো। না না, লজ্জার কোন কারণ নেই, ঐখানেই না হয় বসো। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে, আমি এসেছি দুটো কাজের কথা বলব বলে, ঠিক দু' মিনিটেই চলে যাচ্ছি না। বসো।... ইস, তোমার পা যে কাঁপছে দেখছি। শরীর-টরীর খারাপ করেনি তো?'...

ওরে হতভাগী, এই তো তোর সেই বহু ঈপ্সিত সুযোগ, চোখ তুলে ভাল করে দেখার, দুটো কথা বলার! এ তোর হল কি? নিজেকেই নিজে গাল দেয় সে! কিন্তু তবু কিছুতেই মুখটা তুলতে পারে না। কোনমতে সেইখানে মাটিতেই বসে পড়ে, না বসে উপায় ছিল না বলেই বসতে হয়। পা দুটো অবশ হয়ে আসছিল ক্রমশ, দাঁড়াবার মতো এতটুকু শক্তি আর অবশিষ্ট ছিল না।

'আহা-হা, মেঝেতেই বসলে! মাদুরটা টেনে নিয়ে তো—'

সুরবালা এবার কথা বলার চেষ্টা করে কিন্তু পারে না। অস্ফুট একটা শব্দ শুধু বেরোয় মুখ দিয়ে। কোনমতে ঘাড় নেড়ে বোঝাবার চেষ্টা করে যে সে বেশ বসেছে, তার জন্যে চিন্তা কি উদ্বেগের কোন কারণ নেই। নিজের ব্যাপার দেখে ওর মধ্যে একটু হাসিও পায় তার; সে যেন কনে-দেখা দিতে বসেছে।

বিনা অস্ত্রোপচারে
অর্শ থেকে
আরাম পাবার
জন্য
থ্যাডেলসা
ব্যবহার করুন।

এত রাজ্যের লজ্জা আর সংকোচ কোথা থেকে এসে জড়ো হল আজ তার দেহে, তাকে পেয়ে বসল। আজ তাকে এই অবস্থায় দেখলে মতি আর রঘু দুজনেই চমকে উঠত। কে বলবে যে এই লোকই কেউ বায়না দিতে এলে অমন নির্লজ্জের মতো দর কষাকষি করে।

হয়ত এতক্ষণে ওর এই বেপথুমানা অবস্থা লক্ষ্য করে থাকবেন রাজাবাবু, তিনি ওর তরফ থেকে কোন কুশল প্রশ্ন বা কোন সাদর সম্ভাষণের অপেক্ষাও রাখলেন না। নিজেই কথা শুরু করলেন, 'তারপর? সেদিন কোন অসুবিধে হয়নি তো? অত বেলায় ফিরলে—চান-খাওয়া সব অনিয়ম হয়ে গেল, শরীরটরীর খারাপ হয়নি তো?'

এবার সুরবালা কথা খুঁজে পেল, বলল—অবশ্য সেই করুণাপ্রার্থিণী নবীনা পাত্রীর মতো নতমস্তকে এবং জড়িত কণ্ঠেই, 'না, ও আমাদের অভ্যেস আছে। প্রায়ই তো সকালে গাইতে হয়!'

'হ্যাঁ, তা হয়। তবে সেদিন একটু বেশী দেরি হয়ে গিয়েছিল তো—!'

'সবদিন তো সমান গান হয় না, অত সময় হিসেব করেও পাওয়া যায় না। যেদিন মন লেগে যায় সেদিন দেরি হয়ে পড়ে। আসর ভাল দেখলে ভাল করে বেশীক্ষণ ধরে গাইতে ইচ্ছে করে।'

'আমাদের আসর তাহলে সেদিন ভাল লেগেছিল তোমার?'

কী মিষ্টি গলা, আর কী মিষ্টি কথা-বার্তা! —সুরো মনে মনে বলে। কে বলবে এত বড় লোক। দাসী আর মাকে ডেকে এনে শোনাতে ইচ্ছে করে। কেন যে তার অত ভাল লেগেছিল, এখন এসে এঁর কথা শুনলে বুঝতে পারত।

মুখে বলল, 'খুব। খুব ভালো লেগে ছিল। অনেকদিন অত লোকেও পাইনি। আর খুব সুন্দর সাজানো হয়েছিল।'

'আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সাজাই।' হেসে বললেন রাজাবাবু, 'ও শখ আমারই। লোকজনের ওপর ছেড়ে দিলে চলে না।... বক তবু যে তোমার ভাল লেগেছিল শুনেও তৃপ্তি। কেউ তো অত লক্ষ্যও করে না বোধহয়।'

এতক্ষণে মুখ তুলে তাকায় সুরো। এঁর প্রশ্রয়স্নিগ্ধ কণ্ঠে ও ভাষায় যেন মনে মনে কোথায় আশ্রয়লাভ করে একটা। তাকায়, তবে বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারে না, প্রাণভরে দেখা হয় না—তখনই আবার চোখ নেমে আসে লজ্জা ও সংকোচে।

সেই মুখ, সেই বেশ। সেদিন যা দেখেছিল। কিছুই এমন 'আহামরি' করার মতো নয়। এর আগে এই রকম বেশভূষা নিয়ে কত ঠাট্টা তামাশা করেছে সে অপরের ক্ষেত্রে। কিন্তু আজ মনে হল চোখ জুড়িয়ে গেল তার। সে মুখের দিকে সেই ক্ষণিকের জন্যে চেয়েই যেন বুকের রক্ত উত্তাল হয়ে উঠল আবার, আরও প্রবলধারায় ঘাম ঝরতে লাগল কণ্ঠ কপোল ললাট বেয়ে।

ইস্—কী ঘামছ তুমি! পাখা—ও, টানা পাখা তো নেই। একখানা হাতপাখাও পেলেও হত!

কথাটা তুলে দিল সুরবালা। টানাপাখার বাতাসে অভ্যস্ত এঁরা, গরীবের এই ছোট ঘরে বসে অস্বস্তি হবারই কথা। বিপন্নভাবে এদিক ওদিক চেয়ে সে একটা বাঁধানো ছবির পেছন থেকে একখানা পাখা টেনে নিয়ে তাড়াতাড়ি বাতাস করতে গেল ও'কে—কিন্তু অবাধ্য হাতে পাখা কেঁপে প্রথমেই ঠক করে লাগল ও'র গায়ে।

চোখের নিমেষে পাখাখানা ওর প্রায় শিথিল হাত থেকে টেনে নিলেন রাজাবাবু, নিজেই ওকে জোরে জোরে বাতাস করলেন খানিকটা। বাতাস করতে করতেই বললেন, 'আরে না না, আমি নিজের জন্যে বলিনি। পাখাটা তোমারই দরকার। তুমি যে নেয়ে উঠলে একেবারে।... বাবা, তোমার হাতও তো কাঁপছে দেখতে পাই—থরথর করে।... এ কি আমার জন্যে? হরি হরি।... আমাকে দেখে কি খুব ভয় করছে তোমার? আমার চেহারা কি এমনই ভয়ানক! না কি মনে করলে আমি তোমার গানের নিন্দে করতে এসেছি?... এ তো তোমাকে খুব কষ্ট দিলুম দেখছি। এমন অবস্থায় পড়বে জানলে আসতুম না কখখনো!'

ঐ পাখা ও'র হাত থেকে [illegible] কেড়ে নেওয়াই [illegible] উনি বাতাস করবেন আর সে [illegible] —ওর দিক থেকে এ অসহ্য বেয়াদবি একটা [illegible] মেয়ে হলেও বেয়াদবি। ঐ পাখা নিয়ে ও'কে বাতাস করাই উচিত। উনি [illegible] নিজের [illegible] বলাও উচিত যে, [illegible] ফেলেন নি। এ [illegible] ও সংকোচ, [illegible] সৌভাগ্যেরই [illegible] বন্ধু — [illegible] পাওয়ারই [illegible] সুরবালা একটা [illegible] বুঝতে সেই [illegible] কিছু মনে না করেন এ [illegible] [illegible] করেন।

[illegible] উচিত ছিল এমন-কিছু কিছুই বলা হল না। আরও সংকোচ, [illegible] এসে যেন [illegible] নীরব করে দিল তাকে সেই মুহূর্তে।

রাজাবাবুও [illegible] [illegible] বুঝেই খুশী হলেন। [illegible] পেশাদার গায়িকার মধ্যে নবীনা কিশোরীর এই ব্রীড়ানম্র ভাবটি দেখবেন বলে তিনিও আশা করেন নি। আরও মুগ্ধ হলেন। [illegible] হলেন কিছুটা। রত্ন চিনতে ভুল করেন নি বলে গর্বিতও বোধ করলেন। আর— [illegible] হয়ত আশান্বিতও হলেন খানিকটা।...বহুদর্শী লোক তিনি, বিচক্ষণ [illegible] চিনতেও যেমন ভুল হয় না—তাদের ভাব [illegible] না। বুঝলেন একেবারে পাথরে মাথা ঠুকতে তিনি আসেন নি।

আরও কোমল, আরও স্নিগ্ধ কণ্ঠে তিনি বললেন, 'শোন, তোমার অবস্থা বুঝতে পারছি, আমি না গেলে তোমার এ অস্বস্তি ঘুচবে না। কাজের কথা সেরে নিই।'

এই বলে তবু থামলেন একবার। যেন একটা উত্তর প্রত্যাশা করলেন এ তরফ থেকে। উত্তর দেবার জন্য যে ব্যাকুল হয়ে উঠল সুরবালা তাও লক্ষ্য করলেন। তখন সেই ভাষাহীন আকুলতাই অনুকূল প্রস্তাব বলে ধরে নিয়ে বললেন, 'আমি একটা অদ্ভুত প্রস্তাব নিয়ে এসেছি কিন্তু। আমাকে পাগল-টাগল ঠাউরো না বাপু। উদ্ভট কথা বলেই নিজে এসেছি বলতে—এসব কথা সরকার কি ম্যানেজারকে দিয়ে হয় না।'

এই বলে আবারও চুপ করলেন। হাসলেন একটু। কেমন একরকম অপ্রতিভের হাসি। সোজাসুজি মুখ তুলে চাইতে না পারুক — এবার সুরবালা একটু অপাঙ্গে চেয়ে দেখতে পারছে। দেখছেও। সে একটু শঙ্কিত হয়ে উঠল ওঁর এই ঈষৎ অপ্রতিভ হাসি দেখে। কী এমন কথা যে বলতে উনি এত সংকোচ বোধ করছেন। আশঙ্কাটা কোন আকার না নিলেও কেমন যেন পরিচিত বোধ হল, মনের অবচেতনেই। সামান্য একটু শিউরে কেঁপে উঠল সে।

তবে বেশীক্ষণ সংশয় বা শঙ্কার মধ্যে রাখলেন না রাজাবাবু, একটু কেশে কণ্ঠের আপাত-অনুপস্থিত জড়তা কাটিয়ে নিয়ে বললেন তোমার সেদিনের গান আমার খুব ভাল লেগেছিল। সত্যিই বলছি। তোমার আগে দুদিন বাঘা বাঘা গাইয়ে গাইল বটে—তবে তারা যেন মনে হল কাজের দায় সেরে গেল—পয়সা নিয়ে গাইলে যেমন হয় তেমনিই। গান খারাপ হয়েছিল বলব না, ভুল ত্রুটিও, কিছু হয় নি—সেদিক দিয়ে নিখুঁত—কিন্তু ঠিক যেন আমার মন ভরে নি। তোমার গানে আমার মন ভরেছে, যেটা চাইছিলুম সেইটেই পেয়েছি। মানে তোমার গলাই শুধু গায় নি—মনে হল তোমার মনও গাইছে। আমার কানকে ফাঁকি দেওয়া অত সহজ নয়। আমরা সাত পুরুষে বৈষ্ণব, বাড়িতে বিগ্রহ আছেন ঠাকুর্দা মশাই আর তাঁর বাবা, কর্তাবাবা—বৃন্দাবনে নবদ্বীপে ঠাকুরবাড়ি করে দিয়ে গেছেন। আমার নাম রাধিকাপ্রসাদ রাধিকাপ্রসাদ রায়। কে পয়সার জন্যে গাইছে আর কার প্রাণে এ রস আছে কিছুটা—আমরা শুনলেই বুঝতে পারি। তোমার ওপর রাধারাণীর কৃপা আছে, নইলে এ বয়সে গাইতে গাইতে চোখে জল আসে না তোমার মত ভাবে বিভোর হয়েও যায় না।'

বলতে বলতে থামলেন আর একবার। নিজের প্রশংসা—যেটা ওর প্রাপ্য মনে করে সুরবালা, ওর যা নিজেরও বিশ্বাস—শুনতে শুনতে কখন সংকোচ একটু কেটেছে, লজ্জা কিছু ভেঙেছে, সেও এবার চোখ তুলে চেয়েছে। চেয়ে আছে। দুই চোখ দিয়ে আর দুই কান দিয়ে যেন পান করছে—এই দুদিনের আহোরাত্র কল্পনাচিন্তার মানুষটির মুখ দিয়ে বেরুনো প্রশংসার মধু তন্ময় হয়ে শুনছে বলেই কখন যে দুই চোখ মিলেছে তা বুঝতে পারে নি। বুঝতে পারল যখন রাজাবাবুর দৃষ্টিতে মুগ্ধতা ফুটে উঠতে দেখল, বুঝল ওকে দেখতে দেখতে দৃষ্টি স্থির হয়ে গেছে বলেই কথাটা বন্ধ হয়েছে। সে আরও লজ্জা পেয়ে চোখ নামিয়ে নিল আবার।

আর তাইতেই চমক ভাঙল রাজাবাবুরও। তিনিও এবার লজ্জিত বোধ করলেন, সুরোর মুখের গভীর রক্তাভা তাঁর মুখেও রক্তোচ্ছ্বাসের কারণ ঘটল। একটা ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলে যেন কোন বিপুল হৃদয়াবেগ দমন করে নিলেন। তারপর বললেন, 'তাই আমার ইচ্ছে তোমার কীর্তন গান আরও শুনি। তা রোজ তো আর বাড়িতে গান দেওয়া সম্ভব নয়—তেমন কোন ক্রিয়াকর্মের অজুহাত থাকলেও না হয় কথা ছিল। কিছুই তো দেখছি না সে রকম। থামকা একটা আসর করে তো আর কীর্তন দেওয়া যায় না—লোকে বলবে কি আমার বা বাড়িতে আত্মীয়স্বজনদের কি বলব?.. তার চেয়ে আমি বলি কি আমি যদি মধ্যে মধ্যে এক-আধদিন তোমার বাড়িতে এসে—তোমার সময় মত অবশ্য—দু-একখানা গান শুনে যাই—ক্ষতি কি? যেদিন তোমার বাইরে কোথাও বায়না থাকবে না আমি আগে জেনে যাবো—আমারও বিকেলে বা সকালে যেদিন যেমন অবসর থাকবে—চট করে এসে একখানা কি দুখানা পদ শুনে যাবো—এ্যাঁ? আধ ঘন্টার বেশী থাকব না তোমাকে সেজন্যে বিব্রত হতে হবে না। বলি দেওয়াস্তও তো করতে হয় তোমাদের শুনেছি তাই কেন ধরে নাও না।'

প্রস্তাবটা অভাবনীয় শুধু নয়—এতই অপ্রত্যাশিত যে সুরবালা ক্ষণেকের জন্যে তার লজ্জা সংকোচ সব ভুলে গেল। বিস্মিত হয়ে মুখ তুলে তাকাল প্রস্তাবকারীর দিকে। পুরোপুরি কথাটাও সে ধরতে পারে নি তখনও পর্যন্ত—ঠিক কি উনি বোঝাতে চাইছেন। এ কি সবই বিনা পয়সায় সারতে চান নাকি?

তার সেই ভ্রূকুটি ও বিস্মিত চাহনির অর্থ বুঝতে দেরি হল না রাজাবাবুর। তিনি তাড়াতাড়ি যোগ করলেন, 'আমি এমনি মেহনৎ করাব না তোমাকে দিয়ে—আমি, ধরো যেদিন গান শুনতে আসব—পঁচিশ টাকা করে দিয়ে যাবো? কম হবে?'

ব্যবসার কথায়, নিজের বৃত্তির প্রসঙ্গে সুরবালা যেন তার স্বরূপে ফিরে আসে খানিকটা। বলে 'আমার এখানে আসর বসাবার জায়গা কোথায়? অতগুলো বাজনদার দোয়ার বসবারই তো জায়গা নেই। সেই জন্যে রোজ আমায় মতিমাসীর কাছে দৌড়তে হয় রেওয়াজ করতে।'

'উঁহু, উঁহু—দোয়ার বাজনদার কিছু চাই না কারুর থাকবার দরকার নেই। আমি শুধু তোমার গান শুনব, খালি গলার গান—একখানা কি বড়জোর দুখানা। দোয়ার বাজনদারদের দিয়ে কি আর ঐ টাকায় গান হয়? সেটুকু বিবেচনা আমার আছে।...না না শুধু তুমি যা পারো তাই। আর কারও গলা এর মধ্যে শুনতে চাই না আমি। দাবী ভেবে দ্যাখো—যদি খুব কম মনে করো আরও পাঁচ-সাত টাকা বেশী দিতেও রাজী আছি। কদিনই বা হবে, তোমার আর আমার দুজনেরই অবসর মেলা তো আর চাট্টিখানি কথা নয়। হপ্তায় এক দিন হয় কিনা সন্দেহ—এতে আর আপত্তিরই বা কি আছে?'

'ওমা বাজনা নেই দোহার নেই—খালি গলায় কি গান হবে?'

'খুব হবে। যা হয় তাই আমার ভাল। বলি গুনগুনিয়ে তো গাও মধ্যে মধ্যে—সেই-

॥ প্রকাশিত হ'লো ॥

হ্যেল্ডার্লিন-এর কবিতা

অনুবাদ ভূমিকা ও টীকা

বুদ্ধদেব বসু

প্রেমিক, ধ্যানী, ভগবদ্ভক্ত, খাঁটি রোমাণ্টিক কবি ছিলেন জার্মানীর ফ্রীডরিশ হ্যেল্ডার্লিন। যেমন আশ্চর্য তাঁর কবিতা তেমনি তাঁর জীবনও অসাধারণ: মাত্র সাত বছরের জন্য পেয়েছিলেন সৃষ্টিশীল কবিপ্রতিভা তারপর ছত্রিশ বছর উন্মাদ হয়ে বেঁচেছিলেন। জীবিতকালে না পেয়েছেন তিনি পরিবার-বেষ্টিত জীবন না আর্থিক স্বাচ্ছল্য বা সাহিত্যিক সম্মান। অথচ মৃত্যুর প্রায় এক শতাব্দী পরে আজ তিনি য়োরোপের একজন শ্রেষ্ঠ কবিরূপে স্বীকৃত। একজন আধুনিক জর্মান সমালোচকের মতে গ্যেটের 'ছিল সম্পদের দারিদ্র্য' আর হ্যেল্ডার্লিনের ছিল 'দারিদ্র্যের সম্পদ'। সেই সম্পদের পরিচয় আজ অনবদ্য অনুবাদে বাঙালির কাছে প্রকাশ করলেন বুদ্ধদেব বসু। বইয়ের ভূমিকায় আছে কবির জীবনী ও তাঁর রচনার মর্মকথা আর টীকা অংশে বহু প্রয়োজনীয় তথ্য। বইটি বাংলা ভাষার কবিতায় একটি মনোজ্ঞ সংযোজন, আর বিশ্বের সঙ্গে বাঙালির চিত্তের আরো একটি ফলপ্রসূ যোগসূত্র।

তিনখানা চিত্র সংবলিত ● দাম : ৩·৫০

এম. সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট · কলিকাতা—১২

ভাবেই গেও। তার চেয়ে বেশী কারদানি আমি চাই না। বলেছি তো, আমি চাই মনের গান—যন্তরের গানে রুচি নেই আমার।'

সুরো বিপন্ন মুখে চুপ করে বসে থাকে। এ প্রস্তাব এতই অভিনব, এত উদ্ভট যে, এ সম্পর্কে কোন উত্তর তাড়াতাড়ি মাথাতে আসার কথাও না। এতক্ষণ অন্য যা-ই ভেবে থাক অসময়ে ওঁর আগমন নিয়ে—এমন একটা প্রস্তাব উঠবে উঠতে পারে, তা কখনও ভাবে নি। কী উত্তর দেবে ভেবে পায় না। তার আগে মনের মধ্যে এই প্রস্তাবের আড়ালে কী কথা থাকতে পারে, কোন অভিসন্ধি — তাই খুঁজে বেড়ায় সে।

রাজাবাবু খানিকটা অপেক্ষা করে থেকে বুদ্ধি দেন। 'তোমার অভিভাবক কে? মা আছেন শুনেছি না? তাঁর সঙ্গে একটু পরামর্শ করে দ্যাখো না।'

সুরো যেন অগাধ সমুদ্রে কূলের আভাস দেখতে পায়। তাড়াতাড়ি উঠে ভেতরে আসে।

নিস্তারিণী আড়াল থেকে কতক কতক শুনেছে। আগেকার কথাগুলো না হোক আসল প্রস্তাবটা গোড়া থেকেই শুনেছে। কিন্তু কি বলা উচিত তা ভেবে ঠিক করতে পারে নি সেও। এখন সুরবালার মুখেও শুনল আর একবার। তাতেও কোন সুবিধে হল না। বিপন্ন মুখে মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে রইল। সুরবালা যদি এতটুকু আগ্রহ বা ঔৎসুক্য প্রকাশ করত তাহলেই বিরূপ হয়ে উঠত সে—জোর করে নিষেধ করত সুরবালা কতকটা নির্বিকার। তার মনে সেও কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এ প্রস্তাবের কত দূর কী অর্থ এর কি সুদূরপ্রসারী ফলাফল সে সম্বন্ধে তার কোন ধারণাই নেই। যে

চাইছে তাকে কোন কিছুতেই বিমুখ করার কথা যেন ভাবা যায় না, অথচ যা চাইছে তা একেবারেই অচিন্তিতপূর্ব; এমন কেউ কখনও প্রস্তাব করে নি, কেউ করতে পারে, তাও জানা ছিল না। একটা অজ্ঞাত সম্ভাবনায় দুশ্চিন্তায় মন শঙ্কিত হচ্ছে—অথচ পরক্ষণেই এও মনে হচ্ছে যে 'না' বললে এর পর আপসোস করতে হবে না তো?

'কী বলব বলো!' একটু পরে অসহিষ্ণু সুরবালা প্রশ্ন করে।

'তাই তো! কি বলব বলো বাছা! এ আবার কি উৎপরীক্ষে শখ তাও তো জানি না।...তা আজই বলতে হবে? দুদিন সময় নে না। কাউকে জিজ্ঞেস করে দ্যাখনা একটু, জবাব দেবার আগে।'

'সে কখনও হয়। উনি নিজে এসেছেন—অত বড় একটা লোক! ওঁকে কি আর ভেবে জবাব দেব বলে পাঁচ দিন ঘোরান যায়! আর জিজ্ঞেসা কাকে করব বলো, যাকে বলতে যাবো সে-ই উল্টো মানে করে পাঁচ রকম ব্যাখ্যানা করবে।...তার চেয়ে না-ই বলে দিই বরং।'

'না বলবি?' নিস্তারিণী সঙ্গে সঙ্গে যেন 'হ্যাঁ'র দিকে বেশী ঝুঁকে পড়ে, 'ভেবে দ্যাখ বাপু ভাল করে, এর পর আমাকে দোষ দিস নি। আধ ঘণ্টা গান গেয়ে পাঁচশটে টাকা রোজগার বড় চাট্টিখানি কথা নয়। একটা কেরানীর পুরো মাসের মাইনে!'

'কিন্তু লোকে যদি পাঁচ রকম বদনাম দেয়?' সুরবালা সংশয়-কণ্টকিত উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করে। আসলে ভয় তার দুদিকেই। এ যেন যদি এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে আর হয়ত জীবনে ও মানুষটার সঙ্গে দেখাই হবে না। কী এমন কারণটাই বা ঘটবে দেখা হওয়ার! এক কোন পালে-পার্বনে গানের ডাক পড়তে পারে। কিন্তু আজ অপমানিত হয়ে ফিরে গেলে কি আর তাকে ডাকবেন কোন দিন?

'তা অবিশ্যি দিতে পারে।' নিস্তারিণী সায় দেয়, যা সব হিতেকাঙ্ক্ষী সুহৃৎ সব। তা এক কাজ কর না। বলছে তো আধ ঘণ্টা। তা বল না যে যেদিন আপনি গান শুনতে আসবেন সেদিন কিন্তু মাও উপস্থিত থাকবে মার সামনে গাইব। একা গাইব না। তাতে রাজী থাকেন তো দেখুন।'

সুরবালা সঙ্গে সঙ্গে খুশী হয়ে ওঠে।

মা যে এমন চমৎকার একটা বুদ্ধি বাতলাবে—তা ভাবতেও পারে নি। এই বোধহয় প্রথম দেখল মা একটা বুদ্ধিমতীর মত প্রস্তাব করেছে। একথা তার মাথাতে যেত না—হাজার ভাবলেও। আর মা গিয়ে আধ ঘণ্টা ঠায় বসে থাকতে রাজী হবে, এও ভাবতে পারত না।

সমাধানটা ওর কাছে যতই সমীচিন ও সহজ মনে হোক—রাজাবাবু কী ভাবে নেবেন—সে বিষয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে আবার একটা নতুন সংশয় দেখা দিল। এ এক রকমের—একটা বিশেষ দিকে বিষম অবিশ্বাস প্রকাশ করা হচ্ছে। এতে উনি অপমানিত বোধ করেন যদি?...বলতে গিয়েও যেন কথাটা মুখে আটকে যায়। অথচ, এ ছাড়া অন্য কী উপায়ই বা আছে, সোজাসুজি 'না' বলা ছাড়া!...

কে জানে ওর সেই লজ্জারক্তিম দ্বিধা-গ্রস্ত মুখের দিকে চেয়ে, ইতস্তত বিপন্ন ভঙ্গীতে কি বুঝলেন রাজাবাবু। তিনি নিজেই কিন্তু বাঁচিয়ে দিলেন শেষ পর্যন্ত। বললেন, 'ওহো, দ্যাখো একটা কথা বলা হয় নি তোমাকে। বলছিলুম দোয়ার বাজনদারে দরকার নেই—কিন্তু তাছাড়া যদি মনে করো যে আমি যে সময় গান শুনতে থাকব সে সময় অন্য কাউকে — মা কি তোমার দিদি কিম্বা কোন বোনটোনকে ডাকতে চাও কি গানের সময় পাশে রাখতে চাও—অনায়াসে রাখতে পারো। মানে যদি মনে করো যে, তাতে তোমার কোন সাহায্য কি সুবিধে হবে। সে ছাড়াও—আমার জন্যে তোমার একটা মিথ্যে বদনাম হয়, তাও আমি চাই না।'

সুরবালা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে। বলে, 'বেশ, সেই ভাল তাহলে। বোন কি দিদি আমার নেই, মা-ই থাকবেন। মাও সেই কথাই বলছিলেন।'

'খুব ভাল কথা। তাহলে তো কথাই নেই। তা এর মধ্যে কবে তোমার সুবিধে হতে পারে বলো।'

একটু ভেবে নিয়ে সুরবালা বলে, 'পরশু দিন এমনি সময়ে আসতে পারেন। সে দিনও সকালে আমার গান আছে। বিকেলে মাসীর বাড়ি যাবার কথা—মানে সাধারণত যাই আমি, তা সেদিন না গেলেও চলবে।'

'পরশুই আসব তাহলে।'

উঠে দাঁড়িয়ে দরজার কাছ পর্যন্ত গিয়ে বলেন, 'কিছু টাকা রাখবে নাকি—আগাম? শ' খানেক? আগাম না ধরে মর্যাদাও ধরে নিতে পারো—'

এইবার, এই প্রথম সুরবালা তার অভ্যস্ত এলাকা খুঁজে পায়, দৃঢ় কণ্ঠে বলে, 'গান না গেয়ে টাকা আমি নিতে পারব না। অমন টাকা নিলে আজ আর মুজরো করার দরকার হত না।'

তার সেই দৃপ্ত ভঙ্গী ও প্রদীপ্ত কণ্ঠে কী ভাবলেন কে জানে রাজাবাবু, বেশ বিনতভাবেই বললেন, 'আমি কিন্তু সে ভাবে বলি নি। কিছু মনে করো না লক্ষ্মীটি!... আমি গুণীর মর্যাদা হিসেবেই দিতে চেয়ে-ছিলুম সত্যি-সত্যিই।...আচ্ছা, আসি।'

তিনি ধীর গম্ভীর পদক্ষেপেই বেরিয়ে চলে গেলেন।

সুরবালার মনে হতে লাগল — একটু বেশী বলা হয়ে গেল না তো? কিছু মনে করলেন না তো—অত বড় লোকটা? আবার ভাবল, ভালই হয়েছে, আমি যে ভিখিরী কি লুভী নই—ঠিক টাকার জন্যে রাজী হই নি—বুঝুক কতকটা।'

(ক্রমশঃ)

সকল ঋতুতে অপরিবর্তিত ও অপরিহার্য পানীয়

চা

কেনবার সময় 'অলকানন্দার' এই সব বিক্রয় কেন্দ্রে আসবেন

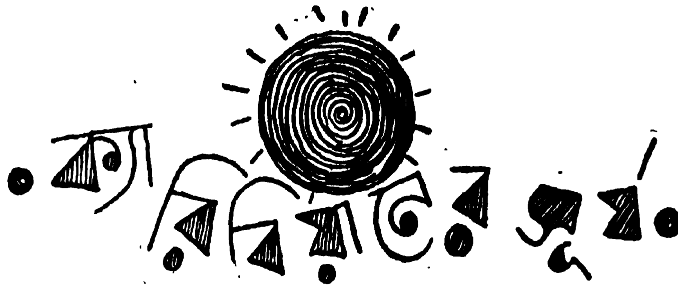
অলকানন্দা টি হাউস

৭, পোলক স্ট্রীট কলিকাতা-১

২, লালবাজার স্ট্রীট কলিকাতা-১

৫৬, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ কলিকাতা-১২

॥ পাইকারী ও খুচরা ক্রেতাদের অন্যতম বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান ॥



ব্রজমাধব ভট্টাচার্য

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সেন্টস আর ডোমিনিকার মধ্যে রীতিমত ভাবে খানদানী স্মাগলিং এদের ব্যবসা। ডোমিনিকা ব্রিটিশ। সেন্টস ফরাসী। তখন বুঝলাম পেপার তার মোটরবোটে পয়েন্ট পিত্রে থেকে পেতী বুর্গ হয়ে কেন আনলো। সাধারণভাবে গাদুয়েদালাুপ থেকে সেন্টসে আসার ফেরী ত্রয় রিভিয়ে থেকে ছাড়ে। পেপার এই মাল গাদুয়েদালাুপে নিয়ে যায় এবং পশারী মাল কিনে আনে। মোটামুটি খানকয় শাদায় নীলে রঙ করা একতালা বাড়ী নিয়ে পেতীবুর্গ শহরকে শহর বলা যায় না। ছোটো পথের একটিই ফুটপাথ। সেই ধারেই কিছু কিছু দোকান। বেশীর ভাগ মানুষই সমুদ্রের কিনারে কিনারে পদ্মপত্রে জলের ফোঁটার মতো সংসারে মায়া-গৃহ সৃষ্টি করে বসবাস করছে। সমুদ্রই মাতা-পিতা-বন্ধু-সখা-দুর্দিন-বিদায়। রাঁচীতে জাহাজের ধরনে গড়া একখানা বাড়ী দেখে-ছিলাম। পেতীদুর্গ-এও এমনি একখানা বাড়ী দেখলাম। সিমেন্টের বাড়ী হলেও জাহাজ ছাড়েনি এই সমুদ্রপ্রিয় জাত।

এই ছোট্টো শহরে কলের জল, বিজলী, দু-চারখানা জীপ আর মোটরগাড়ী না থাকলে বলা যেতো যে নেপোলিয়নের পরে এখানে আর সূর্যোদয় হয়নি। দুর্গের ছোটো দেহের ওপরে ফোর্ট নেপোলিয়নের বিশাল ছায়া। মহাকায় দৈত্যের মতো এই ক্যাস্‌ল-মার্কা জীর্ণ প্রাচীনতা এখন এমনি পড়ে আছে। বিশেষ দেখারও কিছু নেই; দেখাবার ব্যবস্থাও পাকাপাকি নয়। নেপো-লিয়ন দাসদের খাটিয়ে পাথর কেটে এই দুর্গ রচনা করান; পরে গত মহাযুদ্ধে কনসেন্ট্রেশান ক্যাম্প হয়েছিলো। দিল্লীর পুরানা কেল্লায়ও এমনি কনসেনট্রেশন ক্যাম্প হয়েছিলো। এখান থেকে সেই জাহাজ-বাড়ীটা দেখলে ধাঁধাঁ লাগে। হঠাৎ মনে হয় শাদা-ধবধবে একটা জাহাজ পাহাড়ের বুক ফেটে বার হচ্ছে!

এই তো সামান্য সময় দ্বীপটায় এসেছি। এরই মধ্যে দেখলাম, পথের ওপরে দু-হাত ওপরের দিকে ছুঁড়ে বছর ত্রিশ বয়সের একটি লোক আকাশকে গাল পাড়ছে। একদল ছেলে তার পেছনে দূরে থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা ভোগ করছে। বোঝা যাচ্ছে ব্যবহারে, এবং কথাতেও খুবই কুৎসিৎ ভাষা প্রয়োগ করছে। আর খানিক পরে দেখলাম একটা দোকানের সামনে থামের ঠেকনোয় শুয়ে লোল-চর্মসার একটি চেহারা। এককালে নারী ছিলো। আজ চোখে যেন অভ্রের আঁশ। মাঝে মাঝে নিদারুণ কর্কশ মর্মছেঁড়া চিৎকার করে উঠছে; তারপরেই হাঁ দিয়ে থেমে যাচ্ছে; ধুঁকছে এবং গুন-গুন করে গান করছে। দুটি পায়ে গোদ।...ভদ্রলোকের বাড়ী। সামনে একটু বাগান। বাগানের চারধারে জাল আর কাঠের বেড়া। বাগান আর ঘরের মাঝে একটু বারান্দা। সেই বারান্দায় ইনভ্যালিড চেয়ারে বসা এক বৃদ্ধ। গায়ে পরিষ্কার শাদা শার্ট। পরনে নীল পাজামা; সেই চেয়ারে বসে বসে অনর্গল হুকুম দিয়ে চলেছে; কখনও মিলিটারি কম্যান্ড। কখনও কাপ্তেনের কম্যান্ড। যাই চলুক চিৎকার করে গাল দিচ্ছে। বাগানে বাচ্চারা খেলছে। ঘরের মধ্যে দুটি বয়স্থা নারী হাসিখুশী গল্প করছে।

তখন মনে পড়ে যায় বার্বাডোজে ডোরা বলেছিলো, "পুয়োর হোয়াইট্‌স্" দেখতে চাও সেন্টস্ আইল্যান্ডে যাও। এখানে চামড়ায় আঁশ ওঠে; গোদ-ছাড়া মেয়ে প্রায় নেই; মানুষগুলো হঠাৎ পাগল হয়ে যায়। রোগে, দৈন্যে, অল্প জায়গায় থেকে থেকে মানসিক অপরিসরতার চাপে যারা ছিলো নর্ম্যাল, তারা আজ ক্ষয়িষ্ণু একটা জাত।

অন্ধকার হয়ে এসেছে। পথ তো একটাই। এমনি ঘুরছি। গির্জা আছে যখন পাদ্রীও আছে; পাদ্রী যখন, তখন লেখা-পড়াও জানে। সেন্টস্ আইলে এখনও কাউকে দেখিনি যে লেখাপড়া জানে। ভাবছি গির্জার মধ্যে যাই। গির্জার দোর অবধি গেছি। খাটো চেহারার এক মনিষ্যি বৃহৎ আম্রামীয় টুপীটাকে ঠেলে পিছনের দিকে ঝুলিয়ে দিয়ে যা বললো তা নিশ্চয় আমার পক্ষে পরম হিতকর। কিন্তু হায় বুঝিনি কিছু। ওরা কথা কয় ফরাসী-পাতোয়া, তাও ওদের দ্বীপেরই ভাষা। কিছুই বুঝতে পারি না। তৎক্ষণাৎ লোকটি বদলে ফেলে ভাষা। লক্ষ্য করে ধারণা করা গেলো ইংরিজী। নেহাৎ আমি ইংরিজী ভালো জানি না তাই বুঝতে পারলাম; পাকা ইংরেজ ও ভাষার স্থান তার বিছানার তলায় রাখা নাইট-পটেও দিতো না।

শুনে বলি, খেতেও হবে। শুতেও হবে। শোবো মোটর বোটে। কিন্তু চলো-না......

ও আমাকে আনলো কাফে রিপাব-লিকে প্রকাণ্ড লম্বা কাউন্টারের সামনে চেয়ার নেই। থার্ড ক্লাস বুকিং অফিসের সামনে যেমন রেলিং তেমনি রেলিং। তবে দু-থাক। একটায় বসে, অন্যটায় পা রাখে। লেগহর্ণ মুর্গীর মতো সব সারি সারি বসে আছে। রাম খাচ্ছে, নিকৃষ্ট সুরের আদি-রসাত্মক ফরাসী গান বাজছে একটা গ্রামো-ফোনে। কাউন্টারের ওপারে পুরুষ বলতে একজন। তিনি হিসেব লেন-দেন করছেন। মেয়েরা সাবলীল ভাবে নগ্ন রসিকতা ও ভাঁড়ামির শরীক হচ্ছে। আমি পুরো এক বোতল এ্যাপল-সাইডার নিয়ে বসলুম। একটা প্লেটে খেজুর, বাদাম, কিসমিস আনারসের টুকরো এবং প্রুনস নিয়ে আসতে বললুম। শ্রীমান খাতোকে বললুম যা চাও খাও। ও রাম এবং কোক নিয়ে বসলো।

কথা চলতে পারে না। গোলমাল; ধোঁয়া, গায়ের এবং মুখের গন্ধ ছাড়া রসুনের চড়া গন্ধ। তদুপরি স্ল্যাং রসিকতার নাচ-গান এবং ঐ গান! মশিয়ে খাটো ইংরিজী যদি বা বলে, চীনের দেয়ালের মতো আমার পক্ষে তা দুর্লঙ্ঘ্য।

মেয়েটি সব গুছিয়ে দিয়ে গেলো একটা কোণে। বিদেশী, এবং ভেজিটে-রিয়ান—দেখে ওরা সকলেই এমনভাবে তাকালো যে মনে হোলো পালাই। পালাইনি, তার একটিই কারণ; জানতাম সেন্টস্ আইলে না আছে জীবন্ত, না মরন্ত আজব ঘর।

ভাবছি এই সংকর জাতির কথা। এরা জামায়কায় শ্বেতাঙ্গদের মতো ক্রমওয়েলের পাল্লায় পড়ে পালিয়ে আসেনি; বার্বা-ডোজের রেড-লেগসদের মতো জাজ্ জেফ্রীদের অত্যাচার থেকে পরিত্রাণ পেতে আসেনি। এরা এসেছিলো "ওয়েস্ট ওয়ার্ড হো"-র নেশায় উন্মত্ত ভাইকিংদের মতো নর্মান্ডী, ব্রিটানীর কূল ত্যাগ করে। তখন তো ওরা সঙ্গে স্ত্রী আনেনি। তারপর কিছু কিছু মেয়ে এলো। যেসব পাইরেটরা জাহাজে হানা দিয়ে লুটতো তারা জাহাজী মালের সঙ্গে মেয়েদের শিশুদের বেচতো। পুরুষদের অবশ্য মেরেই ফেলতো। সেসব মেয়ে কটাই বা। পরে সেই মেয়েদের সন্তানরাই আবার আপোষে বিয়ে করেছে। বেশীর ভাগই বিয়ে করেনি। কারণ চার্চে সে সব বিয়ে হতে পারতো না। সম্পর্কে বাধতো।

এরা ভাষায়, ব্যবহারে, চিন্তায়, রুচিতে পুরোপুরি নিগ্রো। অনেক নিগ্রো দেখেছি জর্জটাউনে, পোর্ট-অব-স্পেনে, সান ফার্ণা-ন্ডোতে,—যাদের অনায়াসে কালো ইংরেজ বলা চলে। তেমনি এদের এই সব শাদা নর্মানদের অক্লেশে শাদা নিগ্রো বলা চলে। যদি আজ মানবতা-পরবশ হয়ে ইউ এন ও

এই সব দ্বীপের বাসিন্দাদের নিজ নিজ বাসভূমিতে ফিরিয়ে নিয়ে পুনর্বসতির প্রস্তাব করেন,—আমার দৃঢ় বিশ্বাস সেন্টস্ আইল্যান্ডের শাদারা আফ্রিকার নিবিড় জঙ্গলে গেলেই নিজেদের আত্মিক কেন্দ্র খুঁজে পাবে।

শাদা-রংয়ের উৎকর্ষ সম্বন্ধে আমাদের দেশের অনেকেই আজও লেজ আছড়ান;—আসল কথা নয় শাদা, না কালো,—মানুষের আত্মার বিকাশ যখন পার্থিব-পুষ্টি সম্পন্ন হয়ে ওঠে এবং পার্থিব বিকাশে যখন আত্মার তুষ্টি সমগ্রতা পায়,—তখনই মানুষ সমাজে, রাষ্ট্রে, সাহিত্যে, শিল্পে স্বকীয় পরিণতির শিখরে ওঠে। সাম্প্রতিক কালে Race নিয়ে বহু গবেষক বহু তত্ত্ব প্রস্তুত করেছেন। তার মধ্যে সর্বজনগ্রাহ্য সূত্র বলে,—চামড়া বা ভৌগোলিক বাহ্য-নিদান কৃষ্টি ও মননের উৎকর্ষ-অপকর্ষের মাপকাঠি নয়। নৃতত্ত্ববিদ্‌রা হয়তো নরকরোটীর সূক্ষ্ম বিচারেই মনীষা, স্নায়ু-স্ফূর্তি এবং আবেগপ্রবণতার পর্যায়-ভাগ করবেন। তা করলেও দেখা যাবে সম্পূর্ণ মহামানবিক জাত বলতে কোনো জাতই নেই। যদি ভবিষ্যতে তেমন কোনও মহামানবিক জাত জন্মায়ও, তা না হবে ষোলোকলা ধলা চাঁদ, বা ষোলোকলা কালা-চাঁদ। যে গ্রহের ভবিষ্যৎ প্রাণ স্তব্ধ হয়ে গেছে সেই গ্রহই চিরকাল আধা-শাদা, এবং আধা-কালোয় ভাগ হয়ে থাকবে। ভবিষ্যৎ মহাপ্রাণ অতিমানবকে বত্রিশ কলায় পূর্ণতা লাভ করতে হবে।

খাটোর সঙ্গে কি সূত্রে হঠাৎ যুদ্ধের কথাই সুরু হোলো। দেখলাম ১৭৮২-র সেই প্রসিদ্ধ নৌ-যুদ্ধের কোনো খবর রাখে না আদৌ। এডমিরাল রডনীর নামও শোনে নি। সেই একটি নৌ-যুদ্ধে এরই পূর্ব পুরুষেরা কম্‌তে-দ্য-গ্রাস-এর নেতৃত্বে চোদ্দ হাজার প্রাণ বলি দিয়েছিলো। পাঁচ হাজার কামান গর্জেছিলো সমুদ্রের বুকে। কম্‌তে-দ্য-গ্রাসকে রডনী দেখতে পেয়েছিলেন সন্ধ্যার খানিক আগে। তখন ফরাসী বহরের মধ্যে কেবল ফ্লাগ-শীপটায় সেই কমান্ডার ছাড়া মাত্র দু-জন অক্ষত দেহ সেনানী রয়ে গেছিলো। সেই দু-জনকে নিয়েই স্বয়ং কম্যান্ডার যখন কামানের মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়ালেন, এ্যাডমিরাল রডনী শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে কমতে-দ্য-গ্রাসকে নিমন্ত্রণ জানালেন। সে সন্ধ্যায় ইংরেজ জাহাজের ডেকে দুই মহাবীর পরম শ্রদ্ধায় দুজনকে জড়িয়ে ধরে ছিলেন। ......কিছুই জানে না খাটো।

বললাম—দু পক্ষ মিলে নিদেন পনেরো হাজার মরেছিলো। তাদের তো একটা কবর আছে কোথাও। তা জানো না।

এমন পর্যটক খাটো আগে আবিষ্কার করে নি। জীবন্ত লুব্ধেলুপী হুরী চায় না; ফরাসী মদ্য ফেলে সীড়ার পান করে: অথচ মৃতের কবরের জন্য এতো অনুরাগ।

তবু পরদিন প্রাতঃকালে ঝোপে ঝাড়ে ঢাকা একটা স্যাঁৎসেঁতে জলায় আমি রাশি রাশি কবর আবিষ্কার করেছিলুম। পোকায় খাওয়া, পচে-ধ্বসে যাওয়া ক্রুশগুলোর একটাও দাঁড়িয়ে নেই। কোনোটার ওপরে কোনো শিলাস্তরণ নেই। কোনো কোনোটায় নাম আছে। কোনো কোনোটা ঘিরে দেওয়া আছে সুন্দর শঙ্খ দিয়ে। এন্টিলিসের প্রত্যেক দ্বীপেই প্রচুর শঙ্খ। লালপেটে শঙ্খ, আর সাদা শঙ্খও; বৃহৎ থেকে সুবৃহৎ আকারে। দক্ষিণাবর্ত বহু শঙ্খও মাঝে মাঝে দেখলাম। সেই শঙ্খের দেয়ালের মধ্যে চারশো বছরের পুরানো মহাশঙ্খ শুয়ে আছে সেই রডনীর সময় থেকে।

একটা বীভৎস কবর দেখলাম।

কালো ক্রুশ-কাঠখানা বেঁকে আছে। লতাগুল্মে ঢাকা বালিয়াড়ী জমির গা ঘেঁষে গোটা দু-তিন নারকেল গাছ হেলে পড়েছে। আগামী দু-তিন জোয়ারের পর ভেঙে উপড়ে পড়ে যাবে। যেমন পড়ে আছে পর পর অনেকগুলো গাছ। তারই পাশে বালির পাহাড় মতো মানুষের হাতে উঁচু করা ঢিবি। কবর।

এ মানুষটাকে কেউ জানে না। অজ্ঞাত নাবিকের ভেসে আসা মৃতদেহ। এমনি মৃতদেহ শতাব্দীর পর শতাব্দী অনেকই ভেসে এসেছে এবং আসবে। জোয়ারের ঢেউ যখন খাঁড়িতে ঢুকবে, তখন খাঁড়ির আঁকশিতে আটকে থাকবে। জল যাবে নেমে। দেহটাকে ছিঁড়ে খাবে কাকে-শকুনে। জেলেরা গন্ধে টের পেয়ে আসবে। নারকেল গাছের শুকনো ডোগা দিয়ে খুঁড়ে খুঁড়ে কবর করবে। দুটো নারকেল পাতার শিরদাঁড়া বেঁধে ক্রুশ করে গেঁথে দেবে। নারকেল পাতা ঘিরে দেবে। বহু বর্ষায় ধুয়ে ধুয়ে বালি সরে যাবে। বহু কাল পরে কংকালটা বার যদি হয়,—তখন আবার পুঁতে দেবে। মাঝে মাঝে এমনি লেখা আছে ইতস্ততঃ। নারকোল ডোঙ্গার গায়ে এ কালীন তেল-রংয়ে লেখা "হায় অজ্ঞাত নাবিক! জল ছেড়ে ডাঙ্গায় কেন এলে?"

কিন্তু এ কবরটা আরও ভীষণ।

চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম।

আজ আর আমার সঙ্গে কেউ নেই। তাই আজ আমার মন-ভরা ভীড়; চোখ-ভরা চাওয়া; চিত্ত-ভরা স্পর্শ-কাতর মৃদু সংকেত গুঞ্জরণ। পরিপূর্ণ আকাশ একেবারে ধোয়া গাঢ় নীলে প্রোজ্জ্বল; মাঝে মাঝে ক্যারিবিয়ানের দৃঢ়পুঞ্জিত মেঘের শাদা ধবধবে পিরামিড; আকাশ-ভূতলকে গ্রথিত করে ভেসে চলেছে। তার কোলে কোলে নানা রংয়ের সাগর চিল। ঝুপ করে শূন্য থেকে তীরবেগে জলে ঢুকিয়ে দিচ্ছে ফলার মতো মাথাটা; বার করে আনছে মাছ। যেখানে ঢেউ ভাঙছে সেখানেই ওদের বেশী পরাক্রম।

আরও দূরে বলয়িত শ্যামরেখা। গভীর সবুজ বনের গায়ে নারিকেলবনরাজিনীলা [illegible] জল ছেড়ে ছেড়ে মাঝে মাঝে আতঙ্কে কাঁকড়া উঠে আসছে। কুৎসিত চেহারা। বাতব্যাধিগ্রস্ত আর্থ্রাইটিস রোগীর চলনে দুলিয়ে দুলিয়ে নড়বড় করতে করতে তুলে নিয়ে যাচ্ছে বনের দিকে। কোথাও বালি খুঁড়ে বসবে। ডিম পাড়বে। বালি দিয়ে ঢাকবে। চলে যাবে জলে। আকছার এ দৃশ্য।

তার মধ্যে এই সেই কবরটি। শাদা চুন লেপা। অসংখ্য শামুক ঝিনুক চাপা। কেবল শামুক ঝিনুকের কবর। তার গায়ে ক্রুশ। One that the Sea refused —সমুদ্রও যাকে ফিরিয়ে দিয়েছে!

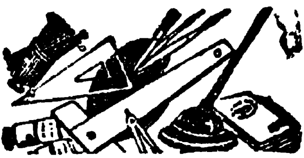
বহুকাল আগে একটা মৃতদেহ সমুদ্রের চড়ায় পড়ে থাকতে দেখে লোকেরা সেটাকে বালিতে কবর দিয়েছে। ভীষণ ঝড়-বৃষ্টি চলেছে দুদিন। তারপর লোকেরা দেখেছে কবর খালি। দেহটা নেই।—নেই তো নেই কেউ তেমন কিছু মনে করে নি। কিন্তু আবার কয়েক দিন পরে দেহটাকে খাঁড়ির মধ্যে জামরুল গাছের তলায় দেখা গেলো। তা অমন দেখা যায়, এমন আর কী!

কিন্তু এ তো সে দেখা নয়! এ দেহটি কেউ স্পর্শও করেনি যেন; না মাছ, না হাঙ্গর, না জল, না বাতাস। ঠিক যেমন নিষ্ক্রমণ, তেমনি বহাল তবিয়তে আবির্ভাব। চক্ষুস্থির ভাবৎ মৎস্যজীবীদের। পাদ্রী বোলাও, মন্ত্র ফোঁকো। তোড়জোড় করে আবার কবরে পাচার করা হোলো। কিন্তু আবার কিছুদিন পরে কবর খালি। দেহ উধাও। জলে ভর্তি কবর বলতে যা আছে। কেউ দেখে; তাড়াতাড়ি মাথা-বুক-কাঁধে ক্রুশ আঁকে। মনে মনে ডাকে সাঁতা মারিয়া!

কিন্তু পলাতক শব পুনশ্চ সেই জামরুলতলায়। সেই অক্ষত। পুনশ্চ পাদ্রী, সমাধি এবং যথারীতি অন্তর্ধান।

(ক্রমশ)

হার্ণিয়া হাইড্রোসিল একশিরা, রসবাত গর্ভাশয়, কপচক্ষর ও অনুষাঙ্গিক যাবতীয় সকল প্রকার স্থায়ী প্রতিকারের জন্য আধুনিক বিজ্ঞানানুমোদিত চিকিৎসার নিশ্চিত ফল প্রত্যক্ষ করুন। পত্রে অথবা সাক্ষাতে ব্যবস্থা লউন। নিরাশ রোগীর একমাত্র নির্ভরযোগ্য চিকিৎসাকেন্দ্র
হিন্দ রিসার্চ হোম
১৫, শিবতলা লেন শিবপুর হাওড়া
ফোন : ৬৭-২৭৫৫



সকল প্রকার অফিস ষ্টেশনারী কাগজ সার্ভেইং ড্রইং ও ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্যাদির সুলভ প্রতিষ্ঠান।
কুইন ষ্টেশনারী ষ্টোর্স প্রাঃ লিঃ
৬৩-ই, রাধাবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা-১
ফোন : অফিস—২২-৪৫৪৮ (২ লাইন)
২২-৬০৩২
ওয়ার্কসপ—৬৭-৫৬৬৪ (২ লাইন)



প্রেত পুঁথির রহস্য

ফাদার ঘনশ্যামের

রোমাঞ্চ কাহিনী (১০)

অদ্রীশ বর্ধন

ভূত আছে কি নেই?

অনেক পুরোনো প্রশ্ন। এ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক আলোচনা-সভা প্রবন্ধ-গল্পের ইয়ত্তা নেই। কেউ প্রেতাত্মায় বিশ্বাসী, কেউ অবিশ্বাসী। কেউ প্রেত-তত্ত্বে মহা পন্ডিত, কেউ পন্ডিত-মূর্খ।

কিন্তু রেবতীশংকর মুখুজ্যের মত চরিত্র বুঝি দুনিয়ায় আর দুটি নেই। কেউ যদি তাঁকে বলত, 'মুখুজ্যোমশায়, আপনি বুঝি ভূত মানেন? ভূত-বিজ্ঞানে খুব দখল আছে নাকি আপনার?' তাহলেই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠতেন রেবতী মুখুজ্যো। এরপরও যদি কেউ সান্ত্বনা দেবার জন্যে বলত, 'ওহো, তাই বলুন, আপনি তাহলে প্রেতাত্মা মানেন না?' তৎক্ষণাৎ আর একবার বোমার মত তিনি ফেটে পড়তেন।

বিশ্বাসী বললেও রেগে তিনটে হতেন, অবিশ্বাসী বললেও চটে লাল হতেন। এ হেন চরিত্রের মানুষ রেবতী মুখুজ্যেকে যারা চিনত, তারা তাঁকে আদৌ ঘাঁটাতে চাইত না।

কারণ, রেবতী মুখুজ্যের বাপ-ঠাকুর্দা অনেক পয়সা জমিয়ে গেছেন—ওড়াতে পারেননি। একমাত্র বংশধর রেবতী মুখুজ্যে অগাধ সম্পত্তির মালিক হয়েও রাতারাতি

টাকা ওড়ানোর কোনো কৌশলটাই রপ্ত করতে পারলেন না। কাজেই সারাজীবন নিষ্কর্মা হয়ে বসে না থেকে এমন একটা গুরুতর বিষয় নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করলেন, যা নিয়ে জীবন ভোর খেটে গেলেও কোনো সুরাহার সম্ভাবনা নেই।

বিষয়টি হল প্রেততত্ত্ব। দিশি-বিলিতি অনেকে বইটই পড়বার পর রেবতী মুখুজ্যে কয়েকটি প্রেতচক্রে যোগদান করলেন। প্ল্যানচেট, মিডিয়মের সঙ্গেও যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় লাভ ঘটল। তারপরেই তিনি আবিষ্কার করলেন, সবই অনিশ্চিত।

ভূত মানেই আলো-ছায়া, সাজানো মানুষ আর বিভিন্ন শব্দতরংগের ভেলকি। মিডিয়ম মানেই এটা-ওটার কারসাজি।

সত্যান্বেষী রেবতী মুখুজ্যে সেদিন প্রচণ্ড শক পেলেন। তারপর থেকেই তাঁর গবেষণা বইল অন্য খাতে। যেখানে যত প্রেতচক্র আছে, খুঁজে পেতে তাদের ঠিকানা বার করে হাটে হাঁড়ি ভাঙতে লাগলেন। সেই সব নিয়ে কাগজে কাগজে লেখালেখি করতে লাগলেন। ভারতের তাবৎ মিডিয়মের কাছে ক্ষুদে কালাপাহাড়ের মত এক প্রচণ্ড বিভীষিকা হয়ে দাঁড়ালেন।

মুখুজ্যে মশায়কে ভয় পেত না এমনি মিডিয়ম পাওয়াই দুর্ঘট হয়ে পড়ল। তাঁর সার্চলাইটের মত চোখ কখন হত মাইক্রোসকোপের চেয়েও সূক্ষ্মদর্শী, কখনো হত এক্স-রের মত অন্তর্ভেদী। মর্মভেদী সেই চোখজোড়া দেখেই প্রতারকের হৃদকম্প হত, প্রতারণা ধরা পড়ে যেত।

কিন্তু এ হেন বাঘের মত রেবতী মুখুজ্যের জীবনে এমন একটা ঘটনা ঘটল যা তাঁর সমস্ত দম্ভ, সমস্ত অভিজ্ঞতা, সমস্ত বিশ্বাসকে ধুলোয় লুটিয়ে দিল। লোমহর্ষক, রোমাঞ্চকর, ভয়ংকর সেই অলৌকিক ঘটনাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, এমন অনেক অসম্ভব ব্যাপার দুনিয়ায় আছে যা আমরা দেখেও দেখি না, জেনেও জানি না।

সেই ঘটনাই শোনাই এবার।

*

রেড রোড দিয়ে গাড়ী হাঁকিয়ে যাচ্ছিলেন রেবতী মুখুজ্যে। চলন্ত গাড়ী থেকে হঠাৎ দেখলেন, পথের পাশে গাছ তলায় পা ছড়িয়ে বসে এক বিচিত্র মূর্তি। মাথার চকচকে টাকে সকালের রোদ পড়ে ঠিকরে যাচ্ছে। বেঁটে, মোটা, কদাকার চেহারা। কালো আলখাল্লায় ঢাকা মেদবহুল বপু। লোকটা আলখাল্লার কোণ দিয়ে একটা ভিখিরির মেয়ের চোখ মুছিয়ে দিচ্ছে। লোকটার নির্বোধ মুখমণ্ডলে ভাসছে পরম পরিতৃপ্তির আমেজ।

ধূসর রোদে বৃক্ষতলে সেই অপরূপ মূর্তি দেখেই ব্রেক কষলেন রেবতী মুখুজ্যে। স্টীয়ারিং ছেড়ে হন্তদন্ত হয়ে মালা টপকে এসে দাঁড়ালেন গাছতলায়। ডাকলেন, "ফাদার ঘনশ্যাম মণ্ডল।"

চোখ তুলল ফাদার ঘনশ্যাম। রেবতীবাবু দেখলেন, সেই চোখ শান্ত আনন্দে বিনম্র। ভেতরের কী একটা শক্তিতে ছোট ছোট সেই চোখ দুটি—যেন কোন দূরের জিনিসকে কাছে এনে দেখছে। বলিষ্ঠ নিঃসঙ্কোচ সেই চাউনির মধ্যে দিয়ে রেবতী মুখুজ্যে যেন দেখা পেলেন তাঁর সহজ-আনন্দময় জীবনেশ্বরের।

মৃদু কোমল কণ্ঠে বলল ঘনশ্যাম পাদরী, "রেবতীবাবু যে, কী ব্যাপার ভাই?"

"এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম। দেখলাম আপনি বসে। তাই নামলাম।"

"আমিও হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছিলাম। মেয়েটাকে দেখে একটু বসেছি। চলুন।"

"নিরিবিলিতে ময়দানে একটু বেড়াই, আপত্তি আছে?"

"মোটেই নেই। কিন্তু মনে হচ্ছে আপনার কিছু মতলব আছে।"

ফাদার ঘনশ্যামের সঙ্গে চোখোচোখি হল রেবতী মুখুজ্যের। হেসে ফেলেন রেবতীবাবু। বললেন, "ঠিক ধরেছেন। একটা অলৌকিক ঘটনা শোনাবো আপনাকে।"

"মানে, 'ঠিক দুপুরবেলা, ভূতে মারে ঢেলা' জাতীয় গল্প?" চোখ নাচিয়ে বলল ফাদার ঘনশ্যাম।

"শুনুনই না। খুবই ইন্টারেস্টিং কাহিনী। এতদিন প্রেতাত্মা নিয়ে নাড়াচাড়া করছি, অনেক চারশো বিশকেও ধরেছি, কিন্তু এমন ঘটনা কখনো শুনিনি।"

"তাহলে বলেই ফেলুন।"

গাছের ছায়ায় পাশাপাশি হাঁটতে লাগল দুই মূর্তি। শুভ্র কুয়াশার চাদর বিধবার ঘোমটার মত গাছগুলির ওপর তখন টানা ছিল। রৌদ্রালোকিত সেই উজ্জ্বল কুয়াশার মধ্য দিয়ে দুটি সচল কুয়াশার মূর্তির মতই এগিয়ে গেল দুজনে।

গল্পটি একটি পুঁথির। বহু পুরোনো পুঁথির। সাল তারিখ জানা নেই।

পুঁথিটি সম্প্রতি হাতে এসেছে যাঁর তিনিই একটি চিঠি লিখেছেন রেবতী মুখুজ্যেকে। চিঠির বিষয়বস্তু অতি সরল।

পত্রলেখকের নাম রেভারেন্ড প্রদীপ ডেভিড। আজ সকালেই তিনি আসছেন রেবতী মুখুজ্যের সঙ্গে দেখা করতে। আর আনছেন সেই পুঁথি যা বহু মানুষকে অদৃশ্য করে দিয়েছে ধরাধাম থেকে।

শুনে চোখ কুঁচকে ফাদার ঘনশ্যাম বলল, "মানুষকে অদৃশ্য করে দিয়েছে মানে?"

"সেইটাই পরিষ্কার করে বলার জন্যে রেভারেন্ড প্রদীপ ডেভিড আসছেন আমার অফিসে সকাল দশটায়। দুপুর নাগাদ আপনাকে কোথায় পাওয়া যাবে বলুন। রেভারেন্ডের কাছে যা শুনব, আপনাকে তখন সব বলব।"

চৌরঙ্গীর একটি অভিজাত রেস্তোরাঁর নাম বলল ঘনশ্যাম পাদরী। বলল, "ওখানকার বাবুর্চি আমার বন্ধু। অনেকদিন ধরে যেতে বলছে। আজ বরং আমি ওখানেই থাকব। আপনিও চলে আসুন।"

যথাসময়ে মধ্য কলকাতার একটা এঁদো গলিতে পৌঁছোলেন রেবতী মুখুজ্যে। এই গলিরই একটা দাঁত বার করা বাড়ীতে মুখুজ্যে মশায়ের ছোট্ট অফিস।

মুখুজ্যে মশায় চাকরীবাকরী করেন না, কারবারও নেই। তবুও গ্যাঁটের কড়ি খরচ করে ছোট্ট এই অফিসটা তিনি রেখেছেন। কারণ, প্রেতের কারবারীদের মুখোশ খুলে ধরার জন্যে একটা পত্রিকা বার করতেন রেবতীবাবু। অনিয়মিত হলেও প্রায়ই প্রকাশিত হত কাগজটা। কাগজ সংক্রান্ত কাজ-কর্ম দেখাশুনার জন্যে একজন কেরাণীও রেখেছিলেন। লোকটির নাম অভিরাম দাশ। প্রৌঢ়। মিতবাক। ঠিক যেন একটা কলের মানুষ। কাজ ছাড়া কিছু বোঝে না, কাজ ছাড়া কথাও বলে না।

রেবতী মুখুজ্যে যখন অফিসে ঢুকলেন ঘাড় হেঁট করে, অভিরাম দাশ তখন অভ্যেসমত কোণের ছোট্ট ডেস্কে কাগজপত্রের মধ্যে নাক ডুবিয়ে বসে কাজ করে চলেছে মেসিনের মত। রেভারেণ্ড প্রদীপ ডেভিডের বিদঘুটে চিঠিটার কথা ভাবতে ভাবতে আপিস ঘরের মধ্যে দিয়ে নিজের স্পেশাল চেম্বারের দিকে এগুলেন রেবতী মুখুজ্যে। এগোতে এগোতে মাথা না তুলেই জিজ্ঞেস করলেন, "রেভারেণ্ড এসেছিলেন?"

"আজ্ঞে না।" যন্ত্রবৎ জবাব দিল অভিরাম দাশ।

স্পেশাল চেম্বারের চৌকাঠে পৌঁছোলেন রেবতীবাবু। তারপর হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পেছন না ফিরেই বললেন, "অভিরাম, রেভারেণ্ড এলেই তাঁকে আমার ঘরে পাঠিয়ে দিও। আর, তোমার হাতের কাজ শেষ করে টেবিলেই রেখে যেও। কাল এসেই যেন পাই।" বলে, চেম্বারে প্রবেশ করলেন রেবতীবাবু।

চেয়ারে বসলেন। ভাবতে লাগলেন রেভারেণ্ড প্রদীপ ডেভিডের কথা। চিঠিখানা টেবিলের ওপরেই ছিল। হাতে লেখা চিঠি নয়। হস্তরেখাবিশারদ রেবতী মুখুজ্যে সেক্ষেত্রে শুধু কলমের আঁচড় আর কালির কম-বেশি দেখেই অনেক কিছু আঁচ করে ফেলতে পারতেন।

কিন্তু এ চিঠি ঝরঝরে হরফে ইংরেজিতে টাইপ করা। পরিষ্কার কয়েকটি লাইন। সেদিন সকালেই রেভারেণ্ড আসছেন প্রেতবিশারদ রেবতী মুখুজ্যের সঙ্গে দেখা করতে। উদ্দেশ্য গুরুতর। জলজ্যান্ত কয়েকটি মানুষ বেমালুম অদৃশ্য হয়ে গেছে ধরাধাম থেকে। মূলে রয়েছে একটা ভৌতিক পুঁথি।

চিঠিটায় আর একবার চোখ বুলিয়ে যুগপৎ রোমাঞ্চিত ও পুলকিত হলেন রেবতী মুখুজ্যে। প্রেতাত্মাঘটিত যে

কোনো ব্যাপারের মধ্যে নাক গলাতে পারলেই বিলক্ষণ তৃপ্তি লাভ করতেন রেবতীবাবু। তার ওপর এ কেস আসছে—এমন একজনের কাছ থেকে যিনি নিজেই একজন খৃস্টান ধর্মযাজক। সুতরাং......

মুখ তুলেই রেবতী মুখুজ্যে দেখলেন অনেক আগেই ঘরের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছেন রেভারেণ্ড প্রদীপ ডেভিড স্বয়ং। নিঃশব্দে কখন যে তিনি একেবারে টেবিলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন, রেবতীবাবু জানতেও পারেননি।

কাষ্ঠ হাসি হাসলেন রেভারেণ্ড প্রদীপ ডেভিড। বললেন, "আপনার কেরাণীর কথামত সোজা এখানেই চলে এলাম।"

স্থির দৃষ্টিতে রেভারেণ্ডের কাষ্ঠহাসি লক্ষ্য করছিলেন রেবতী মুখুজ্যে। নিমেষমধ্যে সজাগ হয়ে উঠেছিল তাঁর গোয়েন্দা মন; সার্চলাইটের মত দৃষ্টি বুলিয়ে বুলিয়ে দেখছিলেন রেভারেণ্ড লোকটা আর পাঁচটা মিডিয়মের মতই নকল, না খাঁটি।

কি দেখলেন রেবতী মুখুজ্যে? দেখলেন, দেঁতো হাসি ঘিরে বলয়াকারে দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল। জঙ্গলে যারা দিন কাটায়, এরকম অযত্নবর্ধিত দাড়ির জঙ্গল তাদের গালেই দেখা যায়। অপরিস্কার নাকের ডগা ঠেলে বেরিয়ে রয়েছে চুল-দাড়ির মধ্যে থেকে। কিন্তু এহেন বন্য গোঁফ-দাড়ির ওপরে জ্বল-জ্বল করছে যে দুটি প্রত্যঙ্গ--তা একজোড়া অতি বিশুদ্ধ চক্ষু। হীরের মত ঝকঝকে—প্রতারণার ছায়াটুকুও নেই সেখানে। হাসি আর কৌতুক যেন পাশাপাশি খেলা করছে সে চোখে। এমন সহজ সুন্দর আনন্দময় চোখ বড় একটা দেখা যায় না। তাই নিমেষে আকৃষ্ট হলেন রেবতী মুখুজ্যে। কেমন জানি ধারণা হয়ে গেল, এ লোক আর যাই হোক, ঠগ-জোচ্চোর নয়।

রেভারেণ্ডের অঙ্গে গলাবন্ধ একটা পাদরী-আলখাল্লা। মাথায় বহু পুরোনো শোলার টুপী। সব মিলিয়ে কিম্ভূত-কিমাকার মূর্তি।

যেন পরম কৌতুকেই চোখ নাচিয়ে বললেন রেভারেণ্ড প্রদীপ ডেভিড, "রেবতীবাবু, মনে মনে ভাবছেন নিশ্চয় আর এক জোচ্চোরের পাল্লায় পড়লেন। তাই আপনার মুখের অবস্থা দেখে মনে মনে না হেসে পারছি না। আশা করি সেজন্যে মাপ করবেন। কিন্তু রাগই করুন আর যাই করুন, আমার কথা আপনাকে শুনতেই হবে। কেন না, আমি যা বলব, তার শতকরা একশোভাগই খাঁটি—ভেজাল নেই। আপনিও তাই—খাঁটি মানুষ—ভেজাল নেই। আমার এই কাহিনী যতখানি সত্য, ঠিক ততখানি বিয়োগান্তক। বাগাড়ম্বর না করে, সংক্ষেপেই বলি।

"আমি গিয়েছিলাম আফ্রিকার ধর্ম-প্রচারের কাজে। গভীর জঙ্গলের মধ্যে ছোট্ট একটা গাঁয়ে আস্তানা নিয়েছিলাম। গাঁয়ের নাম বললে চিনতে পারবেন না, তাই বললাম না। দুনিয়া মানুষ বলতে সেখানে ছিলেন শুধু একজন শাদা চামড়ার মানুষ। নাম তাঁর ক্যাপ্টেন উড। ক্যাপ্টেন উড নামেও যা, চেহারা ও বুদ্ধিতেও তাই। অর্থাৎ অত্যন্ত কাঠখোট্টা, রসকষবিহীন। বন-জঙ্গলে রাইফেল নিয়ে ঘোরেন, বুনো জন্তু পেলেই সাবাড় করেন। কাজেই অন্যান্য দিক দিয়ে তিনি রীতিমত ভোঁতা হয়েই গিয়েছিলেন। ভাবনা-চিন্তার বালাই ছিল না। চোখে না দেখে কিছুই বিশ্বাস করতেন না। সেই জন্যেই এ কাহিনীর শুরু এত অদ্ভুত।

"একদিন জঙ্গলের তাঁবুতে অসময়ে ফিরে এলেন ক্যাপ্টেন উড। উদভ্রান্ত চেহারা দেখে জিজ্ঞেস করলাম কি ব্যাপার। উড জানালেন, সাংঘাতিক একটা অভিজ্ঞতা লাভ করে এসেছেন তিনি। এরকম অপার্থিব অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনে এই প্রথম। বলে, টেবিলের ওপর রাখলেন কাঠ দিয়ে বাঁধানো একটা অতি পুরোনো পুঁথি। আর, একটা আরবী তরবারি। পাশেই রাখলেন নিজের রিভলবারটা।

"ক্যাপ্টেন অসংলগ্ন কথাবার্তা থেকে যা জানলাম তা সংক্ষেপে এই। হ্রদের মধ্যে গিয়েছিলেন ক্যাপ্টেন। গিয়েছিলেন এ অঞ্চলেরই নৌকায়। সঙ্গে যে ছিল সেও এ অঞ্চলের বাসিন্দা। লোকটা কথায় কথায় তাঁকে দেখায় এই পুঁথি। বলে এ পুঁথি নাকি ভূতের পুঁথি। অপদেবতা স্বয়ং রচনা করেছেন এ পুঁথির ভয়ানক মন্ত্রগুলি। তাই মানুষের অধিকার নেই সে মন্ত্র দেখার। যে দেখেছে, সেই শূন্যে মিলিয়ে গেছে। অপদেবতাই তাকে উড়িয়ে নিয়ে গেছেন।

"ক্যাপ্টেন উড ঘোর অবিশ্বাসী পুরুষ। কুসংস্কার তার দু চক্ষের বিষ। তাই ঠাট্টা করেছিলেন লোকটাকে। ইচ্ছে করেই খেপিয়ে দিয়েছিলেন। আর তার ফলেই এমন একটা অঘটন ঘটে গেল ক্যাপ্টেনের চোখের সামনেই যা নাকি তাঁর মত দুঃসাহসী পুরুষের মাথার চুলও খাড়া করে দিয়েছে।

"লোকটা প্রচণ্ড রাগে কাণ্ডজ্ঞান

সুলেখা
প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

(সারা ভারত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য)

বিষয় :

ভারতের জাতীয় সংহতি

এই একই বিষয়ে বাংলা, হিন্দী ও ইংরাজী ভাষায় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইবে।

বিচারকমণ্ডলীর সভাপতি

ইংরাজী :	অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য, এম, এস, সি
বাংলা :	অধ্যাপক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
হিন্দী :	অধ্যাপক কে, এম, লোঢ়া কলিঃ বিশ্ববিদ্যালয়

প্রতিযোগিতার জন্য প্রবন্ধ দাখিল করিবার শেষ তারিখ ১৪ই এপ্রিল, ১৯৬৮। কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

পুরস্কার

প্রথম পুরস্কার :	উপরোক্ত প্রতিটি ভাষায় : একটি স্বর্ণ পদক প্রতি মাসে ১৬ টাকা করিয়া এক বৎসর স্টাইপেণ্ড ও ৫০ টাকার বই।
দ্বিতীয় পুরস্কার :	উপরোক্ত প্রতিটি ভাষায় : একটি স্বর্ণখচিত রৌপ্য পদক, প্রতি মাসে ১২ টাকা করিয়া এক বৎসর স্টাইপেণ্ড ও ৩০ টাকা মূল্যের বই।
তৃতীয় পুরস্কার :	উপরোক্ত প্রতিটি ভাষায় : একটি রৌপ্য পদক, প্রতি মাসে ৮ টাকা করিয়া এক বৎসরের জন্য স্টাইপেণ্ড ও ২০ টাকা মূল্যের বই।

এতদ্ব্যতীত প্রতিটি ভাষায় অতিরিক্ত দশটি করিয়া যোগ্যতানুযায়ী সার্টিফিকেট অব মেরিট (প্রশংসাপত্র) ও ২৫ টাকা নগদ পুরস্কার দেওয়া হইবে।

বিশদ বিবরণ ও এনরোলমেন্ট ফরমের জন্য লিখুন :

সম্পাদক

সুলেখা প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা কমিটি

সুলেখা পার্ক, কলিকাতা—৩২

লিট্‌কুইজ নং ২৮-এ প্রাপ্ত কোন এণ্ট্রিই সর্বৈব নির্ভুল নয়। একটি ভুল হওয়া ৭ জন বিজয়ী প্রত্যেকে ২২৮৬৲ টাকা পেয়েছেন। ৩টি পুরস্কার সহ মার্ফি ট্রানজিস্টর।

LitQuiz No. 30

Rs. 32,500

FIRST PRIZE RUPEES 16,000 | RUNNERS-UP (UPTO 4 ERRORS) Rs. 8,500 | MINIQUIZ (A) All-Correct only Rs. 2,000 | MINIQUIZ (B) (UPTO 2 ERRORS) Rs. 5,000 | FOR EVERY ALL CORRECT

RELIEF FUND:— Rs. 1,000

বন্ধের শেষ তারিখ

ডাকে প্রেরিত সকল প্রবেশপত্র : ১৩-৩-৬৮

আনন্দবাজারে সমাধান : ১৯-৩-৬৮

আপনি আপনার প্রবেশপত্র পাঠাতে পারেন ধরবার ১২-৩-৬৮ তারিখে কিন্তু শুধু এক্সপ্রেস ডেলিভারীতে পাঠান।

সমাধান ফেরৎ পাইবার জন্য আপনার প্রবেশপত্রসহ নিজ ঠিকানা লিখিত ৬ পয়সার পোষ্টকার্ড পাঠান।

১৲ টাকা পাঠান এবং লিট্‌কুইজ টাইকালের ৫টি সংখ্যা লাভ করুন।

স্থানীয় এজেন্ট

নিম্নবর্ণিত এজেন্টের নিকট থেকে এনট্রি ফরম ও ক্যাশ রসিদ পাবেন :

পি, সি, অ্যান্ড কোং, ফ্ল্যাট নং ৬, ব্লক 'ই', ১৫, বেচুলাল রোড, কলিকাতা—১৪

৩০, লিট্‌কুইজের সরকারী ভর্তি ফর্ম

ADDRESS :—LITQUIZ No. 30, ALANKAR, BALARAM ST., BOMBAY-7

দ্রষ্টব্য:—(১) প্রত্যেক কলমে, আপনার বাতিল করা শব্দটি কালি দিয়ে কেটে দিন; (২) আপনি যদি সবকয়টি কুপন না পাঠান, তাহলে বাকী কুপনগুলি বাতিল করে দিন; (৩) আপনি যদি মানি অর্ডারযোগে প্রবেশমূল্য পাঠান, তাহলে এই এনট্রি ফর্মের সঙ্গে, ডাকঘর থেকে পাওয়া মানি অর্ডার রসিদটি অবশ্যই পাঠাবেন। মানি অর্ডার রসিদ ছাড়া এনট্রি বাতিল করা হবে; (৪) আই-পি-ও ক্রস করবেন না। লিট্‌কুইজ নং—৩০ বোম্বাই-৭-এর অনুকূলে টাকা পাঠান।

	1	Re. 1		2	Re. 1		3	Re. 1		4	Re. 1
1	ARTISTS	IDEALISTS	1	ARTISTS	IDEALISTS	1	ARTISTS	IDEALISTS	1	ARTISTS	IDEALISTS
2	COMMON	HUMAN	2	COMMON	HUMAN	2	COMMON	HUMAN	2	COMMON	HUMAN
3	CRIMINALITY	CRUELTY	3	CRIMINALITY	CRUELTY	3	CRIMINALITY	CRUELTY	3	CRIMINALITY	CRUELTY
4	DANGEROUS	PRECIOUS	4	DANGEROUS	PRECIOUS	4	DANGEROUS	PRECIOUS	4	DANGEROUS	PRECIOUS
5	ECONOMIC	SCIENTIFIC	5	ECONOMIC	SCIENTIFIC	5	ECONOMIC	SCIENTIFIC	5	ECONOMIC	SCIENTIFIC
6	ECONOMICALLY	ENTIRELY	6	ECONOMICALLY	ENTIRELY	6	ECONOMICALLY	ENTIRELY	6	ECONOMICALLY	ENTIRELY
7	EDUCATION	RELIGION	7	EDUCATION	RELIGION	7	EDUCATION	RELIGION	7	EDUCATION	RELIGION
8	FUTURE	PEOPLE	8	FUTURE	PEOPLE	8	FUTURE	PEOPLE	8	FUTURE	PEOPLE
9	HISTORICAL	SPIRITUAL	9	HISTORICAL	SPIRITUAL	9	HISTORICAL	SPIRITUAL	9	HISTORICAL	SPIRITUAL
10	HUMILITY	RESPONSIBILITY	10	HUMILITY	RESPONSIBILITY	10	HUMILITY	RESPONSIBILITY	10	HUMILITY	RESPONSIBILITY
11	MORALITY	PROSPERITY	11	MORALITY	PROSPERITY	11	MORALITY	PROSPERITY	11	MORALITY	PROSPERITY
12	PAIN	PLEASURE	12	PAIN	PLEASURE	12	PAIN	PLEASURE	12	PAIN	PLEASURE
13	PEACE	PRACTICE	13	PEACE	PRACTICE	13	PEACE	PRACTICE	13	PEACE	PRACTICE
14	PLANNERS	POLITICIANS	14	PLANNERS	POLITICIANS	14	PLANNERS	POLITICIANS	14	PLANNERS	POLITICIANS
15	PRODUCTIVITY	PROSPERITY	15	PRODUCTIVITY	PROSPERITY	15	PRODUCTIVITY	PROSPERITY	15	PRODUCTIVITY	PROSPERITY
16	PROPAGANDA	WAR	16	PROPAGANDA	WAR	16	PROPAGANDA	WAR	16	PROPAGANDA	WAR
17	REALITY	RELIGIOUS	17	REALITY	RELIGIOUS	17	REALITY	RELIGIOUS	17	REALITY	RELIGIOUS
18	WORSHIPS	WRONGS	18	WORSHIPS	WRONGS	18	WORSHIPS	WRONGS	18	WORSHIPS	WRONGS

SEND FIRST TWO COUPONS & ENTER MINIQUIZ (A) FREE • SEND FOUR COUPONS & ENTER BOTH MINIQUIZ (A & B) FREE

No 30

MiniQuiz (A) — 6 CLUES FREE COUPON

ARTISTS	IDEALISTS
COMMON	HUMAN
CRIMINALITY	CRUELTY
PROPAGANDA	WAR
REALITY	RELIGIOUS
WORSHIPS	WRONGS

MiniQuiz (B) — 12 CLUES FREE COUPON

DANGEROUS	PRECIOUS	HUMILITY	RESPONSIBILITY
ECONOMIC	SCIENTIFIC	MORALITY	PROSPERITY
ECONOMICALLY	ENTIRELY	PAIN	PLEASURE
EDUCATION	RELIGION	PLACE	PRACTICE
FUTURE	PEOPLE	PLANNERS	POLITICIANS
HISTORICAL	SPIRITUAL	PRODUCTIVITY	PROSPLRITY

৩০ (অমৃত)

এই কুইজে যোগদান করবার জন্য আমি নিয়ম ও সর্তাবলী পালন করতে রাজী এবং প্রতিযোগিতা সম্পাদকের বিচার চূড়ান্তভাবে ও আইনতঃ বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ করলাম। প্রত্যেক কুপনের জন্য প্রবেশ মূল্য : ১৲ টাকা, সম্পূর্ণ ফরমটির (৪টি কুপন) প্রবেশ মূল্য ৪৲ টাকা। আমি এম-ও রসিদ/আই-পি-ও/লিট্‌কুইজ ক্যাশ রসিদ/প্রাইজ কার্ড ও তার নম্বর..................পাঠাইলাম।

CAPITAL LETTERS

NAME——————————

ADDRESS——————————

——————————

এখানে কাটুন ও এই পুরো ফর্মটি পাঠান

No. 30 . 18 CLUES

(1) **Artists/Idealists** are generally classed as visionaries, unpractical people

(2) No **Common/Human** problem can be satisfactorily tackled in isolation

(3) Injustice and **Criminality/Cruelty** are inherent in a system of totalitarian dictatorship

(4) Human beings are more **Dangerous/Precious** than machines

(5) The Indian situation is in glaring contrast with the situation in modern countries where **Economic/Scientific** progress has been astounding and unprecedented.

(6) No person, man or woman who is **Economically Entirely** dependent on another can ever feel the real pleasure of freedom and equality

(7) If sound and beneficial ideas are inculcated through **Education/Religion**, many of the conflicts and dissensions of today will disappear

(8) When we plan the economic future of India we have need for three faiths, namely, faith in the **Future/People** of India, faith in economics and faith in logic

(9) It is our **Historical Spiritual** ignorance that is responsible for division and strife conflict and war

(10) Freedom implies **Humility/Responsibility**, not absolutism; it implies not the tyranny of the one, but the tolerance of the many

(11) Degeneration and decline of **Morality Prosperity** [illegible] attributed to the neglect of man's knowledge of God

(12) **Pain Pleasure** is [illegible] the [illegible] constitution of world's life

(13) Democracy is a plant of slow growth. It needs patience, **Peace Practice** and [illegible] power

(14) We are in the midst of a man-made economic [illegible] for which our **Planners Politicians** must take the largest share of responsibility

(15) On the **Productivity/Prosperity** of the cultivators depends the progress of the country

(16) The most minutely planned operation in the modern world is **Propaganda War**

(17) The highest ethical state is **Reality Religious**

(18) He who **Worship/Wrongs** no one fears no one

১। **শিল্পী / আদর্শবাদী**-দের সাধারণ কল্পনাবাদী, অবাস্তবিক লোক হিসেবে গণ্য করা হয়।

২। কোন **সাধারণ/মানবিক** সমস্যারই [illegible] সন্তোষ-জনকভাবে সমাধান করা যায় না।

৩। অন্যায় এবং **অপরাধিতা/ক্রূরতা** সর্বাধিনায়কতন্ত্রী একনায়কত্বের ধারায় অন্তর্নিহিত।

৪। মানুষ যন্ত্রের চেয়ে আরো **বিপদজনক/মূল্যবান**।

৫। ভারতীয় পরিস্থিতি আধুনিক দেশের পরিস্থিতির চেয়ে যে ভিন্ন তা সহজেই চোখে পড়ে,—যে দেশে **আর্থিক/বৈজ্ঞানিক** প্রগতি হয়েছে আশ্চর্যজনক ও অপূর্ব।

৬। যে কোন ব্যক্তি, পুরুষ অথবা স্ত্রী, যিনি **আর্থিকভাবে / পুরোপুরিভাবে** অপরের ওপর নির্ভর করেন, তিনি স্বতন্ত্রতা এবং সমানভাবে সত্যিকারের আনন্দ কখনও অনুভব করতে পারেন না।

৭। যদি **শিক্ষা/ধর্ম**-র মাধ্যমে গভীর এবং [illegible] সমস্ত ভাবে [illegible] হলে [illegible] দ্বন্দ্ব ও [illegible]।

৮। [illegible] ভারতের [illegible] কালে [illegible] কিন্তু [illegible] ভবিষ্যতের লোকের প্রতি বিশ্বাস, [illegible] প্রতি বিশ্বাস এবং [illegible] প্রতি বিশ্বাস।

৯। [illegible] **ঐতিহাসিক / আধ্যাত্মিক** [illegible] দ্বন্দ্ব [illegible]।

১০। [illegible] **নম্রতা / দায়িত্ব**-কেই [illegible]।

১১। **নৈতিকতা সমৃদ্ধি**র [illegible] ও নাশের [illegible] সম্বন্ধীয় [illegible]।

১২। [illegible] সুখ [illegible] জীবনের [illegible]।

১৩। [illegible] চায় [illegible] প্রয়োজন [illegible] শক্তি [illegible]।

১৪। [illegible] **পরিকল্পনা প্রস্তুত-কারী রাজনীতিবিদ**।

১৫। [illegible] **উৎপাদনশক্তি সমৃদ্ধির** উপর [illegible]।

১৬। [illegible] সূক্ষ্মভাবে [illegible] হয়েছে, তা [illegible] **প্রচার যুদ্ধ**।

১৭। [illegible] হল **বাস্তবতা ধার্মিক** [illegible]।

১৮। [illegible] **পূজা/ক্ষতি** করেন না, [illegible] ভয় করেন না।

দ্রষ্টব্য :—ওপরের বাক্যগুলি বিভিন্ন ভারতীয় লেখকদের লেখা থেকে নেওয়া কয়েকটি প্রশ্ন। এগুলির সব সম্পূর্ণ বাক্য ও নিজস্ব সম্পূর্ণ অর্থ বহন করে। লেখক/প্রবন্ধকারের নাম ও [illegible] নাম সরকারীভাবে সমাধানের সঙ্গে মিউ-চুয়াল উইকলিতে প্রকাশ করা হবে।

মিনিকুইজ (বি)

যাঁরা ৪টি কুপন পাঠাবেন কেবল তাঁরাই মিনিকুইজ (বি) পাঠাতে পারবেন। মিনিকুইজ প্রত্যেক অল্পসংখ্যক বিজেতা পুরস্কারের অংশ ছাড়াও একটি ফিলিপস ট্রানজিস্টর (বিজেতাদের সংখ্যার উপর মডেল নির্ভরশীল) পাবেন। ৫,০০০ টাকার পুরস্কারে ট্রানজিস্টরের মূল্য অন্তর্ভুক্ত।

হারিয়ে ফেলেছিল। তবে যে সাহেব, কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না, সাহেব তবে—' বলে নিজেই পুঁথি খুলেছিল। সঙ্গে সঙ্গে পুঁথি ফেলে দিয়ে নৌকোর পারে গিয়ে শূন্যে মিলিয়ে গেছে।"

"এক সেকেন্ড" বাধা দিয়ে বললেন রেবতী মুখুজ্যে, "জলেও তো পড়ে যেতে পারে।"

"না পড়েনি", জবাব দিলেন রেভারেন্ড। "কারণ জলে একটা আস্ত মানুষ পড়ে গেলে যে শব্দ হয়, সেরকম তো শব্দ ক্যাপ্টেন শোনেননি। এমন কি, হ্রদের নিস্তরঙ্গ শান্ত জলে এতটুকু আলোড়নও দেখেননি। শুধু দেখেছেন দিন-দুপুরে চোখের সামনে থেকে বাতাসে গলে মিলিয়ে গেছে সেই লোকটা।"

রেবতী মুখুজ্যে জিজ্ঞেস করলেন, "পুঁথিটা এল কোত্থেকে? লোকটা পেল কোত্থেকে? যাচ্ছিলই বা কোথায়?"

"সে কথাও জিজ্ঞেস করেছিলাম। পুঁথি নিয়ে লোকটা আসছিল কলকাতাতেই। ওয়াং হো'র নাম শুনেছেন নিশ্চয়। সেকেলে কিউরিওর ব্যবসা করেন ওয়াং হো। নানা দেশের মার্কেট জানেন। দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়িয়ে এখন এসেছেন কলকাতাতেই। পুঁথিটা যার কাছে পেয়েছিল লোকটা— সে-ই ওয়াং হো'র ঠিকানা দিয়েছিল। হুঁশিয়ার করে দিয়েছিল, ভুলেও যেন এই বই খোলা না হয়। খুললেই হাওয়া হয়ে যেতে হবে।"

রেবতীবাবু বললেন,—"ক্যাপ্টেন উডের কথা আপনি বিশ্বাস করেন?"

"করি। তার দুটি মোক্ষম কারণ আছে। প্রথম কারণ, ক্যাপ্টেন উড কল্পনাপ্রবণ মানুষ নন। লোকটিকে তিনি চোখের সামনেই মিলিয়ে যেতে দেখেছেন—জলে পড়ার আওয়াজ শোনেন নি।"

"দ্বিতীয় কারণটি?" প্রায় ছোট করে প্রশ্নটা ছুঁড়েছিলেন রেবতীবাবু।

'দ্বিতীয় কারণ আমি নিজে। এরপরের ঘটনাটা ঘটেছে আমার উপস্থিতিতেই।'

নৈঃশব্দ্য। গলির শেষে বড় রাস্তার ওপর থেকে ভেসে এল ট্রাম চলার ঘড়ঘড় আওয়াজ।

শ্বাসরোধী নীরবতা ভঙ্গ করে সহজ স্বচ্ছন্দ স্বরেই গল্প শুরু করলেন রেভারেন্ড প্রদীপ ডেভিড। ভাবভঙ্গী দেখে মনে হল শ্রোতার মনে বিশ্বাস উৎপাদন করানোর কোনো গরজই তাঁর নেই— যেমনটি অধিকাংশ প্রতারকই করে থাকে।

"আগেই বলেছি, ক্যাপ্টেন উড পুঁথিটা রেখেছিলেন টেবিলের ওপর আরবী তরবারির পাশে। তাঁবুতে ঢোকার পথ ছিল একটিই। আমি দাঁড়িয়েছিলাম সেখানে। ক্যাপ্টেন উডের দিকে পেছন ফিরে তাকিয়েছিলাম বাইরে জঙ্গলের দিকে। আমার পেছনেই টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে খাপছাড়াভাবে বিড়বিড় করছিলেন ক্যাপ্টেন উড। আপন মনেই গজ-গজ কর-

ছিলেন। বিংশ শতাব্দীতে বই খুললেই মানুষ অদৃশ্য হয়ে যাবে, এ রকম কথা শুনলেও লোকে সন্দেহ করবে, নিশ্চয় গাঁজা আফিমের নেশা আছে। নেহাৎ উন্মাদ না হলে এমন গাঁজাখুরী কথা কেউ রটাতেও সাহস করবে না—কান পেতে শুনতেও চাইবে না। সুতরাং নিজে খুললেই বা দোষ কী?

"এই পর্যন্ত শুনেই আমি বলেছিলাম, লাভ কী পুঁথি খুলে? তার চাইতে বরং ওয়াং হো'র কাছে ফিরিয়ে দিলেই ল্যাটা চুকে যায়।" "খুললে ক্ষতিই বা কী?" তেড়ে উঠে বলেছিলেন ক্যাপ্টেন। "ক্ষতি তো দেখেই এসেছেন", জবাব দিয়েছিলাম আমি। ক্যাপ্টেন কোনো জবাব দিলেন না। দেওয়ার কিছু ছিলও না। তবুও বললাম, ক্ষতি যদি কিছু নাই হবে তো নৌকোর সে লোকটা গেল কোথায়? এবারও উত্তর দিলেন না ক্যাপ্টেন। পেছন ফিরলাম আমি। দেখলাম ক্যাপ্টেন উড নেই।

"তাঁবু শূন্য—কেউ নেই। টেবিলের ওপর পড়ে রয়েছে পুঁথিটা—খোলা, তবে উল্টো করে রাখা। যেন পাতা খুলেই টেবিলের ওপর পাতা নিচের দিকে করে রেখে দিয়েছেন। তরোয়ালটা টেবিলে নেই। রয়েছে তাঁবুর আর একদিকে জমির ওপর। সেখানকার তাঁবুর ক্যানভ্যাস ফর্দাফাই—তরোয়ালের এককোপে কে যেন মানুষ গলবার পথ করে নিয়েছে। ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছিল বাইরের জংগলের কালো রেখা। কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে কাটা ক্যানভাসের কাছে এগিয়ে গেলাম। তাঁবুর ঠিক বাইরেই নরম ঘাসের ওপর কারো পা পড়েছে বলেও মনে হলো না। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত ক্যাপ্টেন উডের ছায়াটুকুও আর দেখিনি।

"এই ঘটনার পর ব্রাউন পেপারে মুড়লাম পুঁথিটা। ভেতরের পাতায় যাতে চোখ না পড়ে সে বিষয়ে হুঁশিয়ার রইলাম গোড়া থেকেই। তারপর সময় করে চলে এলাম কলকাতায়, পুঁথিটা আনলাম সংগে। ইচ্ছে ছিল ওয়াং হো'র হাতে তুলে দেওয়ার। কিন্তু হঠাৎ কাগজে আপনার নাম দেখলাম। এসব ব্যাপারে আপনার অভিজ্ঞতা প্রচুর। হয়তো একটা ব্যাখ্যা আপনার কাছে পাওয়া যাবে, এই আশায় সোজা এলাম আপনার কাছে। হাজার হোক, আপনার মনে কুসংস্কারের ধোঁয়া নেই, কারণ প্রতারকদের নাকের জলে চোখের জলে করাই আপনার আদর্শ।"

কলম নামিয়ে রাখলেন রেবতী মুখুজ্যে। খর চোখে তাকালেন রেভারেন্ড প্রদীপ ডেভিডের দিকে। লোকটার হাবভাবে আশ্চর্য নির্লিপ্ততা। এসব ব্যাপারে সাধারণত যে রকম আগ্রহ দেখা যায় বক্তার চোখেমুখে, তার তিলমাত্রও নেই রেভারেন্ডের হাবভাবে। শ্রোতা বিশ্বাস করল কি করল না, তা নিয়েও তাঁর মাথাব্যথা নেই। মিথ্যে কথা যারা সাজিয়ে গুছিয়ে বলে, মিথ্যেকে সত্যি প্রমাণিত করানোর ব্যগ্রতাও তাদের থাকে। কিন্তু এ লোকটা যেন কেমনতর। সাধু সাজবার কোনো প্রচেষ্টাই নেই।

আচম্বিতে বন্দুকের গুলির মত প্রশ্নটা নিক্ষেপ করলেন রেবতী মুখুজ্যে; "মিস্টার ডেভিড, পুঁথিটা কোথায়?"

দাড়ি-গোঁফ ভরা মুখে আবার ফিরে এল সেই দেঁতো হাসি।

"বাইরের ঘরে। বলতে পারেন, ভেতরে আনলাম না কেন। আনলাম না বিশেষ কারণে। ভেতরে আনাটা ঝুঁকি, বাইরে রাখাটাও ঝুঁকি। তবে প্রথমটার চাইতে দ্বিতীয় ঝুঁকিটা অনেক নিরাপদ।"

ভয়ানক ভ্রুকুটি করলেন রেবতী মুখুজ্যে, "কথাটার মানে বুঝলাম না। ভেতরে আনার ঝুঁকি বলতে কি বোঝাচ্ছেন।"

"ঝুঁকি হলেন আপনি স্বয়ং", মোলায়েম গলায় জবাব দিলেন রেভারেন্ড। "আনলেই আপনি খুলে বসতেন। কিন্তু একবার সব কাহিনী শোনার পর হয়তো আর খুলতে চাইবেন না। তাই বাইরে রেখে এলাম।"

আবার কিছুক্ষণ নীরবতা। তারপর মৃদুকণ্ঠে আবার বললেন রেভারেন্ড, "ভয় নেই, বাইরে আর কেউ নেই, আপনার ঐ কেরাণী ভদ্রলোক ছাড়া, কিন্তু সে ভদ্রলোক তাহা মাছিমারা কেরাণী বলেই মনে হল। যে রকম ঘাড় গুঁজে হিসেব করছেন, আপনার হুকুম না পেলে ও ঘাড় আর সিধে হবে না।"

প্রাণ খুলে হেসে উঠলেন রেবতী মুখুজ্যে, "তা যা বলেছেন। অভিরামকে আমি ঐ জন্যেই তো ব্যায়রাম নাম দিয়েছি। ওর ব্যায়রামই হল হুকুম মাফিক কাজ করা। হুকুম না পেলে কারও ব্রাউন পেপারের প্যাকেট খোলা তো দূরের কথা ছোঁবেও না। চলুন, আনা যাক আপনার প্রেত-পুঁথি। তবে একটা কথা আগেভাগেই বলে রাখি। ও পুঁথি এখানে খোলা হবে কি ওয়াং হো'র সামনে হাজির করা হবে, সে বিষয়ে আমি কোন কথা দিতে পারছি না।"

উঠে দাঁড়ালেন দুজনে। আগে এগোলেন রেভারেন্ড—পেছনে রেবতী মুখুজ্যে। চৌকাঠ পেরিয়েই বিকট চীৎকার করে উঠলেন প্রদীপ ডেভিড। বেগে ঘুরে দাঁড়ালেন। দেখা গেল, নিঃসীম আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে গেছে তাঁর শান্ত-কোমল হীরক-উজ্জ্বল দুটি চোখ।

তিন লাফে চৌকাঠ পেরিয়ে বাইরের ঘরে পৌঁছোলেন রেবতী মুখুজ্যে। দেখলেন, অফিসঘর শূন্য। টেবিলের ওপর ব্রাউন পেপারের খোলা প্যাকেটের পাশে পড়ে রয়েছে একটা পুঁথি। কাঠে বাঁধানো। যেন এই মাত্র খোলা হয়েছিল পুঁথির পাতা। পেছনকার একটি মাত্র কাঁচের জানলা বন্ধ। কিন্তু কাঁচের মধ্যে একটা মস্ত ফুটো। যেন একটা গোটা মানুষকে ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে জানলার মধ্যে দিয়ে বাইরে। অভিরাম দাশের চিহ্নমাত্র নেই ঘরে।

পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইলেন দুজনে। তারপরে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে কম্পিত কণ্ঠে বললেন রেবতী মুখুজ্যে "মিস্টার ডেভিড, আমি লজ্জিত। যেটুকু সন্দেহ মনে এসেছিল, লজ্জিত শুধু তার জন্যেই। এ ঘটনার পর অতিপ্রাকৃত আতংকে বিশ্বাস না এসে যায় না।"

সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বললেন রেভারেন্ড "একটু খোঁজ নিলে ভালো হয় না? ভদ্রলোকের বাড়ীতে ফোন করে দেখবেন?"

"অভিরামের টেলিফোন নেই। থাকলেও কোনো লাভ হত না। কারণ ওর তিনকুলে কেউ নেই।"

"চেহারার একটা বর্ণনাও তবু পুলিশকে দেওয়া দরকার।"

"পুলিশ!" যেন তন্দ্রা ভাঙল রেবতী মুখুজ্যের। "চেহারার বর্ণনা, আর পাঁচটা বাঙালীর মতই। শুধু গগলস ছাড়া। দাড়ি-গোঁফ কামানো। কিন্তু পুলিশ......ওরা এ ব্যাপারে নাক গলিয়ে করবেটা কী?"

"তাহলে এ কেস আমি নিয়ে চললাম ওয়াং হো'র কাছে। কাছেই থাকেন উনি। সব কথা ওঁকে বলে, পুঁথিটা ওঁরই হেপাজতে রেখে এখুনি আসছি।"

"তাই করুন" উদাসকণ্ঠে সায় দিলেন রেবতী মুখুজ্যে। ভাবখানা যেন, বাঁচা গেল! কিন্তু ভাবনা তাতে কমল না। কেন না, সিঁড়িতে রেভারেন্ড প্রদীপ ডেভিডের পায়ের শব্দ মিলিয়ে যাওয়ার অনেকক্ষণ পরেও কাঠের পুতুলের মতো খাড়া হয়ে বসে রইলেন প্রেতবিশারদ রেবতী মুখুজ্যে। হঠাৎ ঘরে ঢুকলে কারও মনে হবে যেন প্রেতাবেশ ঘটেছে মুখুজ্যে মশায়ের।

একই রকম মোহাচ্ছন্ন ভঙ্গিমায় কেটে গেল বেশ কিছুক্ষণ। তারপর আবার সিঁড়িতে শোনা গেল পায়ের শব্দ। রেভারেন্ড প্রবেশ করলেন ঘরে। তবে এবার তাঁর হাত শূন্য। প্রেত-পুঁথি নেই!

গম্ভীর গলায় বললেন রেভারেন্ড, "বইটা নিয়ে বসলেন হোয়াং হো। ঘণ্টাখানেক লাগবে ও'র। তারপর আমাদের দ্রজনকেই আসতে বললেন। ও'র ইচ্ছে, আপনার সামনেই যা বলবার বলবেন।"

নীরবে পলকহীন চোখে তাকিয়ে রইলেন রেবতী মুখুজ্যে। অনিমেষদৃষ্টি দেখে মনে হল যেন ঘাড়ের ভূত এখনো নামেনি। তারপরেই আচমকা প্রশ্ন করলেন "ওয়াং হো শয়তানটা কে শুনি?"

হেসে বললেন রেভারেন্ড, "এমনভাবে বলছেন যেন ওয়াং হো সত্যিই শয়তান। আসলে ভদ্রলোক চীন তিব্বত ঘুরে অনেক ভেল্কি শিখেছেন। সেসব নিয়েই ব্যবসা করেন দেশ-বিদেশে। হলদে মর্কটের মত চেহারা। একটা ঠ্যাং নেই—তাই কাঠের পা লাগানো। মেজাজ তিরিক্ষি। কিন্তু দেশ বিদেশের অনেক শহরেই তার পশার জমেছে। আজ পর্যন্ত ওয়াং হো-র সম্বন্ধে বেয়াড়া কিছু শুনিনি। কাঠের পুঁথির রহস্যের কিনারা করতে পারলে জানবো, লোকটা সত্যিই খাঁটি।"

স্মিত কণ্ঠে চেয়ার ছেড়ে উঠলেন রেবতী মুখুজ্যে। টেলিফোন তুলে যোগাযোগ করলেন ফাদার ঘনশ্যামের সঙ্গে। দুপুরে আর দেখা হবে না, ঐ রেস্তোরাঁতেই রাত্রে আসছেন তিনি। কথাবার্তা তখনি হবে। বিসিভার রেখে এসে বসলেন চেয়ারে। একটা চুরুট ধরিয়ে তলিয়ে গেলেন চিন্তার অতলে।

*

রাত্রি।

ফাদার ঘনশ্যাম আগেই পৌঁছেছিল রেস্তোরাঁয়। পামট্রি আর টেবিল পাতা লনের এক কোণে প্রতীক্ষায় ছিল রেবতী মুখুজ্যের। বেশ কিছুক্ষণ পরে রেভারেন্ড প্রদীপ ডেভিডকে নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে এলেন মুখুজ্যে মশায়। দেখে সবিস্ময়ে তাকিয়ে রইল ফাদার ঘনশ্যাম।

কারণ রেবতী মুখুজ্যেকে এরকম চেহারায় এই প্রথম দেখা গেল। কোটরাগত দুই চোখে অজানা আতংক। উস্কখুস্ক চুল। থর-থর করে কাঁপছে ঠোঁট আর গালের মাংসপেশী।

হ্যাঁ। রেবতী মুখুজ্যে গেছিলেন ওয়াং হো-র বাসায়। নেমপ্লেটে দেখেছিলেন ইংরেজীতে লেখা ওয়াং হো-র নাম। কিন্তু ওয়াং হো-কে দেখতে পাননি। দেখেছেন, ঘরের টেবিলে খোলা সেই প্রেত-পুঁথি, দেখেছেন পেছনকার দরজা দুহাট করে খোলা, দেখেছেন সিঁড়ির ওপর কাঠের পায়ের ছাপ; যেন দ্রুত গতিতে নেমেছেন ওয়াং হো। তিন ধাপ পরেই চতুর্থ ধাপে পাশাপাশি দুটি পদচিহ্ন (যেন লাফিয়ে উঠেছেন ওয়াং হো)। পঞ্চম ধাপ থেকে আর কোন চিহ্ন নেই। যেন শূন্যে উড়ে গেছেন ওয়াং হো।

ওয়াং হো সম্বন্ধে এর চেয়ে বেশি আর কিছুই জানা যায়নি। পুঁথি তিনি পড়েছেন। পুঁথির অভিশাপও তিনি মাথা পেতে নিয়েছেন। প্রেতলোকের পথে যাত্রা করেছে তাঁর নশ্বর দেহ।

কাহিনী শেষ হতেই ধড়াম করে পুঁথিখানা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখলেন রেভারেন্ড—যেন একটা গনগনে অংগার হাত থেকে নেমে গেল—অমনিভাবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

কৌতূহলী চোখে পুঁথির কাঠের মলাটের দিকে তাকাল ফাদার ঘনশ্যাম। আঁকাবাঁকা অক্ষরে ইংরেজীতে কে যেন চারটি পংক্তি লিখে রেখেছে মলাটে। বাংলা করলে লাইন চারটের মানে দাঁড়ায় এইরকম:

প্রেত-পুঁথির মন্ত্রঃপূত পাতায়
অদৃশ্য উড়ন্ত-বিভীষিকায়
হবে সেজন ছিন্ন ছত্রাকার
বইয়ের পাতায় মগ্ন দৃষ্টি যার।

ঠিক নিচেই ফরাসী ও সংস্কৃত ভাষাতেও লেখা একই হুঁশিয়ারি।

শুকনো মুখে রেবতীবাবু বললেন, "মিস্টার ডেভিড, আসুন কিছু খেয়ে নেওয়া যাক।'

অমায়িকভাবে রেভারেন্ড বললেন, "আজকের মত আমাকে মাপ করতে হবে। কারণ, এবার আমি এ পুঁথি নিয়ে নিজেই একটু নাড়াচাড়া করতে চাই। আপনার অফিসঘরটা ঘণ্টাখানেকের জন্যে দিতে পারেন?"

"কিন্তু অফিস তো এখন বন্ধ।"

"তাতে কী" মৃদু হেসে বললেন রেভারেন্ড। "জানালার কাঁচে মস্ত ফুটো তো রয়েছে। আমি ঠিক গলে যাবো।"



চুলের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য
ফিরে পেতে হলে
কেয়ো-
কার্পিন
ব্যবহার করুন



কেয়ো-কার্পিন
একটি বিশিষ্ট কেশ তৈল

কেয়ো-কার্পিন তেলটি মোটেই চটচটে নয়—
অথচ এতে চুল এমন ভাবে বসে যায় যে সারাদিনেও
এলোমেলো হয়না, এর গন্ধটাও মনোরম।
কেয়ো-কার্পিনে চুলের গোড়া শক্ত হয়
আর চুলও ভাল থাকে।

দে'জ মেডিকেল ষ্টোর্স
প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা · বোম্বাই · দিল্লী
মাদ্রাজ · পাটনা · গৌহাটী
কটক · জয়পুর · কানপুর
আম্বালা · সেকেন্দ্রাবাদ
ইন্দোর

বলে, আর একবার দেঁতো হাসি হেসে অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন রেভারেন্ড প্রদীপ ডেভিড।

খাবার নিয়ে এল ওয়েটার। ওয়েটারের সঙ্গে নেহাতই গোপনীয় পারিবারিক ব্যাপার নিয়ে কথা কইতে লাগল ফাদার ঘনশ্যাম। দেখে অবাক হলেন রেবতী মুখুজ্যে। অবশেষে বলেও ফেললেন, "খুব আলাপ আছে দেখছি। প্রায় আসেন নাকি?"

"না, না। দু তিন মাসে একবার আসি।" জবাব দিল ঘনশ্যাম পাদরী। "তবে এলেই কথা বলি সবার সঙ্গে।"

সপ্তাহে দু তিনবার এসেও কারও সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছে হয়নি রেবতী মুখুজ্যের। কিন্তু তা নিয়ে বেশি ভাববার আগেই টেলিফোন এল তাঁর নামে। অবরুদ্ধ কণ্ঠে কথা কইছেন রেভারেন্ড ডেভিড।

"রেবতীবাবু, আর পারছি না...এ যন্ত্রণা আর সইতে পারছি না। পুঁথিটা আমি নিজেই খুলছি। কথা বলছি আপনার অফিস থেকে। পুঁথি রয়েছে আমার সামনেই। যদি কিছু ঘটে, তাহলে এই আমার শেষ কথা। না, না, বাধা দিয়ে কোনো লাভ নেই। আপনি আসবার আগেই আমি দেখব কি আছে পুঁথির মধ্যে। এই খুললাম পুঁথি...... আমি......"

একটা বুক-ফাটা আর্ত চীৎকার ভেসে এল তারের ওদিক থেকে। লোমহর্ষক রক্ত জমানো সেই চীৎকার শোনা গেল একবারই... তারপর সব নিস্তব্ধ।

রেভারেন্ডের নাম ধরে বার কয়েক হাঁক দিলেন রেবতী মুখুজ্যে। কিন্তু কোনো সাড়া এল না। রিসিভার রেখে নীরক্তমুখে ফিরে এসে ঘনশ্যাম পাদরীর সামনে বসলেন। বললেন সব কথা। কিন্তু এবার আর গলা কাঁপলো না। তার বদলে কণ্ঠে ধ্বনিত হল চরম হতাশা। যেন এই মাত্র একটা বিরাট এক্সপেরিমেন্ট ব্যর্থ হল।

নিগূঢ় রহস্য কাহিনী নির্লিপ্ত মুখে শুনল ফাদার ঘনশ্যাম। একটা কথাও বলল না।

নিরাশ কণ্ঠে উপসংহার টানলেন রেবতী মুখুজ্যে, সবশুদ্ধ পাঁচজন অদৃশ্য হল। প্রতিটি ঘটনাই শুধু অসাধারণ নয়, জাগতিক বুদ্ধি দিয়ে অসম্ভব, অবিশ্বাস্য।



তারপর সব নিস্তব্ধ

সব চাইতে অসম্ভব আর অবিশ্বাস্য হল আমার কেরাণী অভিরাম দাশ। ওর মত একটা অদ্ভুত জীব যে এ পুঁথি দেখতে বসবে—সেইটাই হল সব চাইতে অদ্ভুত ব্যাপার।"

"তা যা বলেছেন," জবাব দিল ফাদার ঘনশ্যাম", অভিরাম দাশের পক্ষে কাজটা খুবই অদ্ভুত সন্দেহ নেই। লোকটা আর যাই হোক দারুণ বিচক্ষণ আর সাংঘাতিক হিসেবী। অফিসের কাজকর্ম থেকে নিজের শখ-টখগুলোকে এমন আলাদা করে রেখে দিয়েছিল যে কাকপক্ষীও টের পায়নি। অফিসের চৌহদ্দির বাইরে বেরোলে তার যে আর একটা জীবন আছে, সে জীবন যে আমোদ কৌতুকে মজায় টলমল, তা কি কেউ জানতেও পেরেছিল? ও রকম রঙ্গপ্রিয় আমুদে লোক বড় একটা দেখাও যায় না।"

"অভিরাম"! সবিস্ময়ে বাধা দিলেন রেবতী মুখুজ্যে। "বলছেন কি মশায়? অভিরামকে চেনেন আপনি?"

"না, না," আনমনে জবাব দিল ফাদার। "তবে কি জানেন, এ হোটেলের ওয়েটারকে যেভাবে জেনেছি, ঠিক সেইভাবেই জেনেছি অভিরাম দাশকে। আপনি না আসা পর্যন্ত অনেক দিন অভিরামের সামনে বসে থাকতে হয়েছে আমাকে। এটাসেটা কথাও হয়েছে। কি করব, সময় কাটাতে হবে তো। কথায় কথায় একবার বলেছিল অভিরাম, যে সব জিনিসের কোনো দাম নেই, সে সব জিনিস সংগ্রহ করার বিচিত্র বাতিক আছে ওর। এ বাতিক যাদের থাকে, তাদের কাছে এই বাজে জিনিসগুলোই অনেক কাজের হয়ে দাঁড়ায়।"

রেবতী মুখুজ্যে বললেন, "কি বলতে চাইছেন, তা এখনও ধরতে পারলাম না। মেনে নিলাম, অভিরামের মাথায় ছিট আছে। কিন্তু তার মাথার ছিট দিয়ে তো তার নিজের এবং আরও অনেকগুলো ধাঁধার সমাধান হচ্ছে না।"

"আরও অনেকগুলো ধাঁধা আবার কী?"

স্থির চোখে তাকালেন রেবতী মুখুজ্যে—এমনভাবে তাকালেন যেন একটা নির্বোধ বালকের আহাম্মুকি কতটা গড়াতে পারে, তা হিসেব করে দেখছেন মনে মনে।

তারপর বললেন থেমে থেমে, "মাইডিয়ার ফাদার মন্ডল, পাঁচ-পাঁচটা লোক অদৃশ্য হয়ে গেছে।"

"মাইডিয়ার রেবতী মুখুজ্যে, কোনো লোকই অদৃশ্য হয়নি।"

রেবতী মুখুজ্যের চোখে চোখ রেখে একই রকম স্বরে থেমে থেমে জবাব দিল ফাদার ঘনশ্যাম। তা সত্ত্বেও কথাটা আর একবার শুনিয়ে দিলেন রেবতী মুখুজ্যে। এবার আরও স্পষ্টভাবে, আরও জোর দিয়ে। জবাবও এল সেইভাবে—

"বললাম তো কেউই অদৃশ্য হয়নি।"...

একটু থেমে আবার বলল, ফাদার ঘনশ্যাম— "শূন্য+শূন্য+শূন্য=শূন্য এই সহজ অংকটাই বোঝানো সবচাইতে কঠিন। কতকগুলো অদ্ভুত কথা ধারাবাহিকভাবে বলে গেলে মানুষ তা বিশ্বাস করে বসে। এই কারণেই ম্যাকবেথ তিন ডাইনীর কথা বিশ্বাস করেছিলেন।"

"কি বলতে চান।"

"আপনি কাউকেই অদৃশ্য হতে দেখেননি। নৌকোয় যে ছিল, তাকে অদৃশ্য হতে দেখেননি। তাঁবুতে যে ছিল, তাকেও অদৃশ্য হতে দেখেননি। সব কিছুই নির্ভর করছে রেভারেন্ড প্রদীপ ডেভিডের কথার ওপর। এ ভদ্রলোক সম্বন্ধে এই মুহূর্তে কোনো আলোচনা করব না। কিন্তু একটা কথা আপনাকে স্বীকার করতেই হবে। ভদ্রলোকের কোনো কথাই আপনি বিশ্বাস করতেন না যদি না আপনার নিজের কেরাণীই অদৃশ্য হয়ে যেতো। এইটাই হল রেভারেন্ডের কাহিনীর প্রমাণ, অন্ততঃ আপনার কাছে।"

হাওড়া কুষ্ঠ কুটির

৭২ বৎসরের প্রাচীন এই চিকিৎসাকেন্দ্রে সর্বপ্রকার চর্মরোগ, বাতরক্ত, অসাড়তা, ফুলা, একজিমা, সোরাইসিস, দূষিত ক্ষতাদি আরোগ্যের জন্য সাক্ষাতে অথবা পত্রে ব্যবস্থা লউন। প্রতিষ্ঠাতা : পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্ম্মা কবিরাজ ১নং মাধব ঘোষ লেন খুরুট হাওড়া। শাখা : ৩৬, মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা—৯। ফোন : ৬৭-২৩৫৯

"তা তো বটেই। কিন্তু আপনি বলছেন আমি কাউকেই অদৃশ্য হতে দেখিনি। তা তো ঠিক নয়। আমি দেখেছি আমার নিজের কেরাণীকেই অদৃশ্য হয়ে যেতে।"

"অভিরাম কিন্তু অদৃশ্য হয়নি।"

"কি আবোল-তাবোল বকছেন!"

"অভিরাম অদৃশ্য হয়নি, দৃশ্যমান হয়েছে।"

পলকহীন চোখে তাকিয়ে রইলেন রেবতী মুখুজ্যে।

ফাদার বলল, "দৃশ্যমান হয়েছে আপনারই স্পেশাল চেম্বারে। তখন অবশ্য দাড়ি-গোঁফ, আলখাল্লা আর সোলার হ্যাটের ছদ্মবেশ ধারণ করে রেভারেন্ড প্রদীপ ডেভিড সেজেছিল। নিজের কেরাণীকেও কোনো দিন খুঁটিয়ে দেখবার সময় পাননি বলেই অত কাছ থেকে দেখেও বিচিত্র ছদ্মবেশ ভেদ করে চিনতে পারেননি অভিরামকে।"

"আপনার মাথা খারাপ হয়েছে নাকি?"

"না। কিন্তু পুলিশের কাছে অভিরামের চেহারার বর্ণনা দিতে পারবেন? পারবেন না। শুধু জানেন, অভিরাম গোঁফ-দাড়ি কামায় আর চোখে গগলস পরে। কাজেই গগলস পরার চাইতে খুলে ফেলাটাই হল অলপ্রুফ ছদ্মবেশ। কারণ, অভিরামের চোখ জোড়া কোনো দিনই আপনি দেখেননি, ওর মনও দেখেননি। সে চোখ ওর মনের মতই, হাসি, কৌতুক, আমোদে ভরা। বিদঘুটে পুঁথিটা সে-ই রেখেছে টেবিলে। জানলার কাঁচটা আগে থেকেই ভেঙ্গে রেখেছিল আপনি ঘাড় তুলেও দেখেননি। তাই নকল দাড়ি-গোঁফ লাগিয়ে আলখাল্লা চাপিয়ে টুপী পরে নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছে আপনার টেবিলের সামনে। দাঁড়াবার সাহস হয়েছে এই কারণেই যে ও জানে জীবনে ওর মুখের দিকে তাকাবার সময় আপনি পাননি।"

রাগে চোখ মুখ লাল করে গর্জে উঠলেন রেবতী মুখুজ্যে, "আমার সঙ্গে এই মস্করার কারণ?"

"ওর মুখের দিকে জীবনে তাকাননি বলে। ওকে আপনি কলের মানুষ বলেছেন, ব্যায়রাম বলে ব্যঙ্গ করেছেন—কেননা সে কাজ ভালবাসে; মুখ বুঁজে হুকুম তামিল করে। ওকে শুধু আপনি সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার করেছেন। কিন্তু কোনো দিন ভাবতেও পারেননি আমার মত একজন নবাগত তার সঙ্গে পাঁচ মিনিট আলাপ জমিয়ে নাড়ীনক্ষত্র জানতে পারে, অভিরাম দাশ কলের মানুষ নয়—মনের মানুষ; অভিরাম দাশ পাঁচজনের ভিড়ে হারিয়ে যাবার মত নয়—একটি স্বতন্ত্র বিশেষ চরিত্র; অভিরাম দাশ কিউরিও ভালবাসে; অভিরাম দাশ শুধু হুকুম তামিল করে না, হুজুরের যাবতীয় থিওরী, তাঁর চালচলন, তাঁর লোক চেনার ক্ষমতার ওপরে নিজস্ব অভিমত প্রকাশ করতে পারে। কিন্তু নিজের কেরাণীকে চেনবার ক্ষমতা যে হুজুরের নেই, এই পরম সত্যটা প্রমাণ করার আগ্রহ যদি তার মনে জেগে থাকে, তবে কি সেটা দোষের? অজে-বাজে জিনিসপত্র সংগ্রহ করার বাতিক তার অনেক দিনের। একটা পুরোনো নেমপ্লেট আর একটা কাঠের পা এক সময়ে স্থান পেয়েছিল তার সংগ্রহশালায়। মাত্র এই দুটি জিনিস দিয়ে সৃষ্ট হল ওয়াং হো-র মত একটি অভিনব চরিত্র; ক্যাপ্টেন উড-ও তার কল্পনা। কাঠের পা আর নেমপ্লেট নিজের বাড়ীতে রেখে—"

"ওয়াং হো-র যে বাড়ীতে আমরা গেছিলাম, সেটা কি তাহলে অভিরামের বাসা?" প্রশ্ন করলেন রেবতী মুখুজ্যে।

"তা তো বটেই। অভিরামের বাড়ী আপনি কোনো দিন যাননি। তার ঠিকানা জিজ্ঞেস করবার আগ্রহও হয়নি। তাই এই ব্যঙ্গ। যাই হোক, রেবতীবাবু, আপনার আদর্শকে আমি ছোট করছি, একথা কিন্তু ভাববেন না। আপনি সত্যের একনিষ্ঠ উপাসক। তাই মিথ্যাবাদী আপনি অজস্র দেখেছেন। কিন্তু আমার একটা অনুরোধ রাখবেন। মিথ্যাবাদীদের চুলচেরা চোখে আপনি অবশ্যই দেখবেন, সেই সঙ্গে খাঁটি লোকগুলোর ওপরেও একটু-আধটু দৃষ্টিপাত করবেন—যেমন ধরুন এই ওয়েটার।"

"অভিরাম এখন কোথায়?" বেশ কিছুক্ষণ নীরবতার পর জিজ্ঞেস করলেন রেবতী মুখুজ্যে।

"আপনার অফিসেই। যে মুহূর্তে রেভারেন্ড প্রদীপ ডেভিড সেই অন্ধকূপে পুঁথি পড়ে শূন্যে মিলিয়ে গেছেন, ঠিক সেই মুহূর্তেই পুনরাবির্ভাব ঘটেছে অভিরাম দাশের।"

আবার কিছুক্ষণ নৈঃশব্দ। তারপর অট্টহাস্য করলেন রেবতী মুখুজ্যে।

বললেন, "আমার উচিত সাজাই হয়েছে। চোখের কাছে যারা রয়েছে, তাদের না দেখার সাজা। কিন্তু একটা কথা আপনাকে মানতেই হবে ফাদার, অলৌকিক ঘটনাগুলো শোনবার পর ঐ বিদঘুটে পুঁথিটা কাছে এলেই গা শির-শির করত না?"

"টেবিলের ওপর পুঁথিটা রাখার সঙ্গে সঙ্গে আমি খুলে দেখেছিলাম", বলল ফাদার ঘনশ্যাম মণ্ডল।

"তাই নাকি? কি দেখলেন?"

"সাদা পাতা।" *

---

* বিদেশী ছায়ায়

সীমন্তিনী ॥ নীহাররঞ্জন গুপ্ত মূল্য ৬·০০
এক ভয়ংকর রসের রহস্যঘন কাহিনী

অরণ্য-বহ্নি ॥ তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় মূল্য ৫·৫০
সাঁওতাল বিদ্রোহের পটভূমিকায় লেখা ঐতিহাসিক উপন্যাস

পরকীয়া ॥ উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মূল্য ৩·৫০
পরকীয়া প্রেমের স্নিগ্ধমধুর উপাখ্যান

বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না ॥ মূল্য ৪·০০
২৬ জন প্রখ্যাত লেখক-লেখিকার অলৌকিক অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে রহস্য কাহিনীর প্রামাণ্য সংকলন

বাক্সবদল ॥ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মূল্য ২·৫০
চলচ্চিত্রে রূপায়িত প্রণয়মধুর প্রেম কাহিনী

মাণিক্যরাজ্যের প্রেমকথা ॥ বেদুইন
মধুক্ষরা প্রেম কাহিনীর অপরূপ রূপকথা মূল্য ৫·০০

একমাত্র পরিবেশক :
পত্রিকা সিণ্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড
১২/১ লিণ্ডসে স্ট্রীট কলকাতা ১৬ ফোন ২৪-৭৫৩১

ব্যাঙ্কের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ

সমীর দাশগুপ্ত

সরকারী মহলের বক্তব্য থেকে ধারণা করা যায় যে, ব্যাঙ্কের 'সামাজিক নিয়ন্ত্রণ' কথাটির অর্থ হচ্ছে ব্যাঙ্ক ক্রেডিটের চূড়ান্ত বণ্টন ও ব্যবহারের উপর সমাজের, অর্থাৎ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণ। এ-কথা অবশ্য সত্যি যে, এ-বিষয়ে নতুন কোন সরকারী আইন পাশ না-হলেও, এখনি ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলির উপর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বাহ্যত অনতিগৌণ। তথাপি যদি টাকার বাজারে এমন কোন কোন বৈশিষ্ট্য থাকে যাদের ঐসব প্রচলিত ক্ষমতার অধীনে আনা সর্বদা সম্ভব না হয়, তাহলে গুণগতভাবে নতুন কোন নিয়ন্ত্রণ-বিধির প্রশ্ন অবশ্যই উঠবে। কিন্তু সেক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের সরাসরি জাতীয়করণ পন্থা বাতিল করে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পরোক্ষ ক্ষমতা আরো কিছু বাড়ালে কি উদ্দেশ্য সফল হবে?

প্রথমেই উল্লেখযোগ্য, সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সপক্ষে আলোচ্য সুপারিশ এ-দেশের অর্থনীতিক ক্ষমতার ঘনীভবন (concentration of economic power)-এর মৌলিক প্রশ্নটিকে সযত্নে পাশ কাটিয়ে গেছে। ধনতন্ত্র বনাম সমাজ-তন্ত্রের প্রাচীন প্রশ্নটি কিন্তু এখন আর উচ্চারণ করা হচ্ছে না। বরং সামাজিক নিয়ন্ত্রণের পিছনে সরাসরি চাপ আসছে চতুর্থ পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনাধীন কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্পের আপেক্ষিক গুরুত্ব থেকে। বলা বাহুল্য, এই দুই উৎপাদনক্ষেত্রেই দাদনের (financial advances) প্রয়োজন বিরাট।

আমাদের জাতীয় উৎপাদনের ৫০ ভাগ কৃষির এবং সমগ্র শিল্পজাত আয়ের ৪০ ভাগ ক্ষুদ্র শিল্পের অবদান। অথচ প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে মোট ব্যাঙ্ক ক্রেডিটের মাত্র ০·২ শতাংশ এবং শেষোক্ত ক্ষেত্রে তার মাত্র ৬ শতাংশ বণ্টিত হয়। এ থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায় যে, বর্তমান ক্রেডিট বণ্টন পরিস্থিতিটি আর্থিক প্রগতির মোটেই অনুকূল নয়। প্রশ্ন হচ্ছে, প্রস্তাবিত সামাজিক নিয়ন্ত্রণ কি বাঞ্ছিত পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে?

অথচ আর্থিক ক্ষমতার ঘনীভবনের প্রশ্নটি কিন্তু শুধুমাত্র আদর্শগত ব্যাপারই নয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রভূত ক্ষমতা সত্ত্বেও যেসব কারণে ব্যাঙ্কের যথাযথ পরিচালন বিপর্যস্ত হয়, আর্থিক শক্তির ঘনীভবন ব্যাপারটির সঙ্গে কার্যত তাদের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক রয়েছে। এখন এই পরিস্থিতিতে ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলিকে যদি বে-সরকারী ভিত্তিতেই চলতে দেওয়া সাব্যস্ত হয়, তাহলে বড়ো এবং মাঝারি শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি তাদের পক্ষপাতিত্ব এবং ক্ষুদ্রশিল্প-বিমুখতাকে স্বীকার করে নিতেই হবে—কারণ স্পষ্টতই ক্ষুদ্রশিল্পের (এবং কৃষিরও) ঋণগ্রহণযোগ্যতা (creditworthiness) নগণ্য। অথচ ব্যবসায়ী ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থাকে বে-সরকারী ভিত্তিতে চলতে দেওয়ার মানেই হচ্ছে ভারতীয় সমাজের একটি বিশেষ লক্ষণ—বৃহৎ শিল্প, বৃহৎ ব্যবসায় এবং ব্যাঙ্কের শৃঙ্খলিত (interlocking) মালিকানা তথা পরিচালনাকে আরো সংহত ও শক্তিশালী হবার সুযোগ দেওয়া। কিছুকাল আগে শ্রীঅশোক মেহতার এক উদ্‌বেজক বক্তব্যে জানা যায় যে, দেশের ৬৫০টি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান সমগ্র ব্যাঙ্ক ক্রেডিটের দুই-তৃতীয়াংশ নিয়ে নেয়। এমতাবস্থায়, হয় সমগ্র ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের জাতীয়করণ (তথা ঘনীভূত আর্থিক শক্তির অপসারণ), অথবা কৃষি ও ক্ষুদ্রশিল্পের জন্য ক্রেডিট যোগাড়ের কাজে ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কদের কার্যকরী ক্ষমতা বাড়ানোর চেষ্টা বিকল্প হিসেবে ভাবা চলে। আলোচ্য 'সামাজিক নিয়ন্ত্রণ' এই কার্যকরী সাহায্য তো দিতে পারবেই না, উপরন্তু ব্যবসায়ী ব্যাঙ্ককে তার লাভজনক ক্ষেত্র থেকে টেনে এনে অনিশ্চয়তাপূর্ণ সামাজিক দায়িত্বে বহাল করার কিংবা দাতব্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার অপপ্রচেষ্টাতেই কার্যত নিযুক্ত হবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, বিভিন্ন প্রদেশের ক্ষুদ্রশিল্প ও কৃষির ক্রেডিট প্রয়োজন মেটাবার জন্য সরকার ইতিপূর্বে যথাক্রমে স্টেট ফিনান্শিয়াল করপোরেশন এবং স্টেট রুরাল কো-অপারেটিভ প্রতিষ্ঠানসমূহের সৃষ্টি করেছিলেন। সম্প্রতিকাল পর্যন্ত এরকম একটা ধারণাও লোকের মনে তৈরি করা হয়েছিল যে, এই বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠানগুলির বিত্তবত্তা তাদের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে যথেষ্ট, এবং সেজনাই কৃষি ও ক্ষুদ্রশিল্পের প্রতি ব্যাঙ্ক-সমুদয়ের কোন বিশেষ দায়িত্বও ছিল না। যদি এহেন সরকারী বিশ্বাস কিংবা ধারণা কালক্রমে অবাস্তব বলে প্রতীত হয়ে থাকে, সেজন্য এখন ব্যাঙ্কগোষ্ঠীকে অপবাদ দেওয়া অবশ্যই সমীচীন হবে না। বরং, এতাবৎ সরকারী অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ-বনাম-জাতীয়করণ প্রশ্নটির যথাযথ মীমাংসা করতে হবে।

এখানে বক্তব্য এই নয় যে, ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার জাতীয়করণ নীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন বাস্তব সমস্যা নেই। কারণ, কার্যত দেখা গেছে যে, বে-সরকারী ব্যাঙ্কের তুলনায় সরকারী বৃত্তের অন্তর্গত ব্যাঙ্কগুলি ক্ষুদ্রশিল্পের প্রতি মোটেই অধিকতর সদয়ভাব প্রদর্শন করেনি। ক্ষুদ্র-শিল্পক্ষেত্রে সরকারী-যুক্তগত ব্যাঙ্কের দাদন তার মোট দাদনের মাত্র ৬ শতাংশের উর্ধ্বে ওঠেনি—যার ফলে এই শ্রেণীর শিল্পগুলি তাদের চলতি পুঁজির (working capital) প্রায় পঞ্চাশ ভাগের জন্যই বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে হাত পেতেছে। অথচ এ-কথা হয়তো নির্বিবাদে বলা চলে যে, 'সামাজিক নিয়ন্ত্রণের' পরোক্ষ, যদিচ ব্যবসাদারীস্বার্থনিয়ন্ত্রক, নীতির তুলনায় সরাসরি জাতীয়করণ অনেক বেশি সাধারণ-বুদ্ধিনির্ভর।

শিল্প, বাণিজ্য ও ব্যাঙ্কের তথাকথিত শৃঙ্খলিত মালিকানা ও পরিচালন সমস্যাটির আরেক জটিল দিক এখানে আলোচনা-সাপেক্ষ—যে দিকটি প্রস্তাবিত সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় বিশেষ প্রতিবন্ধক। ভারতের অর্থনীতিক ব্যবস্থাক্ষেত্রে দুটি পৃথক টাকার বাজার বর্তমান। বিরাটায়তন বে-সরকারী ("unorganised") বাজারটি মূলত নিজের নিয়মে অথবা খেয়ালে চলে; সুতরাং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আর্থিক বিধানগুলি সেখানে প্রায় অচল। এই বাজারের চড়া সুদের হার এ-দেশের গ্রাম-ঐতিহ্যের অঙ্গবিশেষ। আশা করা গিয়েছিল যে, অর্থনীতিক পরিকল্পনা তথা সামাজিক উন্নয়নের হাত ধরে এমন কতকগুলি পরিবর্তন আসবে যার সংঘাতে সরকারী এবং বে-সরকারী টাকার বাজারের কার্যকরী সুদের হার দুটির বিরাট পার্থক্য ক্রমে কমে আসবে এবং দুটি বাজারের সমন্বয় (integration) হবে। কিন্তু সুস্থ পরিস্থিতিতে, এই প্রক্রিয়ায় বে-সরকারী সুদের হারটি ক্রমে সরকারী হারের নিকটবর্তী হতে থাকবে, বিপরীত ব্যাপারটি নয়। সরকারী হারটি যদি বে-সরকারী হারের দিকে এগোতে থাকে, তাহলে বরং অবাঞ্ছিত ফলাফলই দেখা যাবে। অর্থাৎ, সরকারী বাজার থেকে টাকা ক্রমশ বে-সরকারী বাজারে প্রবাহিত হবে এবং ফলে প্রথম বাজারটির আয়তন হ্রাস পাবে। স্পষ্টতই, এই পরিস্থিতিতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রধানুগ নিয়ন্ত্রণপরিধি সংকীর্ণতর হতে থাকবে।

দুর্ভাগ্যত, সম্প্রতিকালের ঘটনাতে দেখা যাচ্ছে যে, এ-দেশের দুটি টাকার বাজারের পারস্পরিক সম্পর্ক ক্রমাগত অসুস্থ খাতে বয়ে চলেছে। গত বছরের আর্থিক ব্যস্ততার মাসগুলিতে সুদের হার (Call rate) শতকরা ১৫ পর্যন্ত উঠে-ছিল। এই ঘটনাটি অসুস্থ, কারণ এক্ষেত্রে সরকারী সুদের হার বেড়ে গিয়ে বে-সরকারীর নিকটবর্তী হয়েছে, এবং অসুস্থ-তার আরেক প্রমাণস্বরূপ বাজারে কালো টাকার বিপুল উপস্থিতি ও প্রচলন দেখা গেছে। দেশের দীর্ঘস্থায়ী মুদ্রাস্ফীতির পরিবেশে বে-সরকারী বাজারের মাধ্যমে টাকার (এবং কালো টাকার) এই সহজলভ্যতা প্রায় অনিবার্যভাবেই খাদ্যশস্য ইত্যাদির ফাটকা মজুতদারীকে (speculative hoarding) উৎসাহিত করেছে। এবং এই অসামাজিক ক্রিয়া যত লাভজনক মনে

হয়েছে, ততই বে-সরকারী বাজারের উপর মজুতদারদের আর্থিক নির্ভরতা বিস্তৃততর হয়েছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গত কয়েক বছর যাবৎ উঁচু সুদের হার চালু রেখেছে। আশা করা গিয়েছিল যে, চড়া সুদের বোঝা মজুতদারদের বাঁধাই ক্ষমতাকে (staying power) শক্তিহীন করে দেবে। এমন কি, এই আশায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দেশের প্রধান ব্যবসা-কেন্দ্রগুলিতেও ব্যাঙ্ক ক্রেডিট মঞ্জুর করার ব্যাপারে সংকীর্ণতর নীতি অবলম্বন করেছিল—যার উদাহরণস্বরূপ স্মরণ করা যায় যে, সদস্য ব্যাঙ্কগুলির উপর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশ ছিল, তারা যেন নতুন ক্রেডিটের শতকরা ৮০ ভাগ শুধু শিল্পক্ষেত্রে (industry) মঞ্জুর করে। অথচ এসব নীতির কোন শুভফল হয়েছে কিনা সন্দেহ। সম্ভবত, মুদ্রাস্ফীতির দ্রুতহার মজুতদারের বাঁধাই ক্ষমতার অধোগতিকে ছাপিয়ে গেছে এবং প্রয়োজনীয় ঋণের সন্ধানে তাদের ক্রমাগত ব্যাঙ্ক পরিধির বাইরে যেতে উৎসাহিত করেছে। সুতরাং, যদিও ভারতবর্ষে চড়া সুদের সরকারী নীতি সাধারণভাবে সমর্থনযোগ্য হতে পারে, তথাপি এই নীতির ফলে শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি (manufacturing industries) তাদের বিনিয়োগযোগ্য ঋণের (industrial credit) জন্য ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কচক্রের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে, এবং ফলত টাকার বাজারের প্রকৃত ভূমিকা ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার বাইরে সরে যাচ্ছে। স্পষ্টতই, এই পরিবেশে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রভূত ক্ষমতা সত্ত্বেও, বে-সরকারী বাজারের দৌলতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রবলভাবে ফাটকা মজুতদারী চলেছে। প্রমাণস্বরূপ আবার বলা যায় যে, ১৯৬৬-৬৭ সনের যে-পর্যায়ে সুদের হার সবচেয়ে উঁচুতে উঠেছিল, ঠিক তখনই দেখা যায়, খাদ্যশস্যের পরিমাণগত হ্রাসের অনুপাতে খাদ্যের দাম অনেক বেশি চড়ে গিয়েছিল। যেহেতু ঐ একই সময়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তার অধীনস্থ সদস্য ব্যাঙ্কগুলিকে কড়া নির্দেশ দিয়ে রেখেছিল, তারা যেন খাদ্যদ্রব্যের কারবারে কোন ঋণ মঞ্জুর না করে, এই বিরাট ফাটকার খেলায় দরকারী টাকা তাহলে নিশ্চয়ই এসেছিল বে-সরকারী বাজার থেকে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে এ-কথাও বলা চলে যে, দেশের মুদ্রাস্ফীতির ইন্ধন জুগিয়েছে এই বে-সরকারী বাজারই—যে-বাজারের কার্যকলাপের উপর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শাসন অসম্ভব।

ব্যাঙ্ক, বৃহৎ শিল্প ও ব্যবসায়ের যে শৃঙ্খলিত মালিকানা ও পরিচালন ব্যবস্থার কথা আগেই বলা হয়েছে, সে-প্রসঙ্গে পুনর্বার ফিরে গিয়ে এখানে উল্লেখ করা উচিত যে, এই ব্যবস্থার কার্যপরিধি সরকারী ও বে-সরকারী টাকার বাজারের সীমানা মেনে চলে না। শিল্প ও ব্যবসায় সংস্থাগুলি তাই তাদের প্রয়োজনমতো দুই বাজার—এবং বিশেষত বে-সরকারী বাজার থেকেই ঋণ সংগ্রহ করতে পারে। প্রস্তাবিত সামাজিক নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তিত আইনকানুনে দিয়ে এসব কাঠামোগত (structural) সমস্যার সামান্যই নিরসন সম্ভব হবে। যথা, বৃহৎ ব্যবসায়-সংশ্লিষ্ট কোন ঋণগ্রাহকবিশেষ, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ঋণমঞ্জুর-বিরোধী আইনকে ফাঁকি দেবার কিংবা এড়ানোর উদ্দেশ্যে যদি অনেকগুলি ব্যাঙ্ক থেকে একই সঙ্গে ঋণ সংগ্রহ করে তার ইচ্ছামতো ব্যবসায়ে টাকা খাটানোর প্রয়াস পায়, তাহলে 'সামাজিক নিয়ন্ত্রণ' ব্যবস্থা ফলপ্রসূ কোন বাধা দিতে পারবে কিনা সন্দেহ। অথবা সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ফলে কি দেশের পুঁজির বাজার বলিষ্ঠতর হবে—একমাত্র যে-বলিষ্ঠতা সামগ্রিক সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে সাযুজ্য আনতে এবং তাদের উভয়কে বর্ধিত করতে পারে? এসব প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর না দিতে পারলে ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার 'সামাজিক নিয়ন্ত্রণ', ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের কাম্যতর বিকল্প হিসেবে দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হতে পারে না।

নিয়মিত ব্যবহার করলে ফরহান্স টুথপেষ্ট মাড়ির গোলযোগ ও দাঁতের ক্ষয় রোধ করে

ছোট বড় সকলেই ফরহান্স টুথপেষ্টের অযাচিত প্রশংসায় পঞ্চমুখ কারণ মাড়ির গোলযোগ আর দাঁতের ক্ষয় রোধ করতে ফরহান্স টুথপেষ্ট আশ্চর্য কাজ করেছে। এই প্রশংসাপত্রগুলি জেফ্রি ম্যানার্স এণ্ড কোং লিঃ-এর যে কোনো অফিসে দেখতে পারেন।

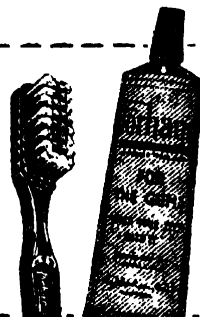
"দাঁতের রোগে কষ্ট পাচ্ছিলাম...এমন সময় ফরহান্স ব্যবহার করে দেখি...এখন আর আমার দাঁত নিয়ে কোন কষ্ট নেই। প্রায় ২০ থেকে ২২ জন লোক এখন বদলে ফরহান্স ধরেছে। আমাদের বাড়িতে এখন ফরহান্সের বেজায় আদর।"
—উদয়শঙ্কর তেওয়ারী, পাটনা।

"আপনাদের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তৈরি ফরহান্স পেস্ট আমি আজ ৫৭ বছর ধরে ব্যবহার করে আসছি। এই পেস্ট আমার মাড়ির সব রোগ নিবারণ করেছে। এখন আমাদের বাড়ির সবাই নিয়মিতভাবে ফরহান্স টুথপেস্ট দিয়ে দাঁত ব্রাশ করছে।"
—এস. এম. লাল, নয়া দিল্লী ৫

ফরহান্স

টুথপেষ্ট—এক দন্তচিকিৎসকের সৃষ্টি

দাঁতের স্থায়ী যত্ন নিতে প্রতি রাতে ও সকালে ফরহান্স টুথপেষ্ট ও ফরহান্স ডবল অ্যাকশন টুথ ব্রাশ ব্যবহার করুন আর নিয়মিতভাবে আপনার দন্তচিকিৎসকের পরামর্শ নিন।



বিনামূল্যে ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় রঙীন, পুস্তিকা-'দাঁত ও মাড়ির যত্ন'

এই কুপনের সঙ্গে ১০ পয়সার ষ্ট্যাম্প (ডাকমাশুল বাবদ) "ম্যানার্স ডেন্টাল এডভাইসরী ব্যুরো, পোস্ট ব্যাগ নং ১০০৩১ বোম্বাই-১—" এই ঠিকানায় পাঠালে আপনি এই বই পাবেন।

নাম ____________

ঠিকানা ____________

ভাষা ____________

A—7

34F-202 BEN



লালবাঈ চিত্রে শবনম

প্রেক্ষাগৃহ

চলচ্চিত্র বিষয়ক শিক্ষা

টালিগঞ্জে নির্মীয়মান একখানি ছবির চিত্রনাট্যের একটি ছোট্ট অংশ ছাপার অক্ষরে পড়বার পরেই কথাটা আবার করে মনে হল। কী নিদারুণ অজ্ঞতাকেই না সম্বল করে চিত্রনাট্য রচনার কাজে ব্রতী হওয়ার দুঃসাহসিকতা পোষণ করেন কেউ কেউ! যদিও স্বীকার করি যে, "চিত্রনাট্যের রীতি-নীতি সম্পর্কে আজ থেকে দশ বছর আগেও যে-সব কথা জোর দিয়ে বলা চলত, আজ আর তা চলে না", তবু সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও বেশ জোরের সঙ্গে বলার প্রয়োজন আছে যে কোনো কাহিনীকে ছবির পর্দায় কিভাবে বললে তা সাফল্যের সঙ্গে বলা হবে এই জ্ঞান হচ্ছে আহরণের সামগ্রী এবং এসম্পর্কে যথেষ্ট শিক্ষার অবকাশ ও প্রয়োজনীয়তা আছে। একটি কাহিনীকে দৃশ্যের পর দৃশ্যের মাধ্যমে কেমনভাবে উপস্থাপিত করা যায় এবং একটি দৃশ্যকে ক্যামেরা অবস্থান অনুযায়ী কেমনভাবে বিভিন্ন শট্-এ ভাগ করতে হয়, তা জানা ও শেখা দরকার এবং সকল বিদ্যার মতোই এ-বিদ্যা গুরুমুখী। চিত্রনাট্য রচনা বিষয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় আজ বহু পুস্তকই রচিত হয়েছে এবং এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রতিটি পুস্তকই ইংরেজী ভাষায় অনূদিত। তবুও সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে যেমন, এই চিত্রনাট্যরচনা শিক্ষার ক্ষেত্রেও তেমনই কোনো অভিজ্ঞ চিত্রনাট্যকার বা চিত্রনাট্যকার-দের কাছ থেকে এর রচনারীতি সংক্রান্ত পাঠ গ্রহণ না করলে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যাবারই সম্ভাবনা বেশী।

চিত্রনাট্যরচনার মতো, চলচ্চিত্রশিল্পের পরিচালনা, চিত্রগ্রহণ, শব্দানুলেখন, সম্পাদনা, শিল্পনির্দেশনা, সংগীতপরিচালনা, পরিস্ফুটন ও মুদ্রণ প্রভৃতি কলাকৌশলের বিভিন্ন দিক নিয়মিতভাবে শিক্ষণীয়। এই ফলিত ও যৌগিক শিল্পটির (অ্যাপ্লায়েড অ্যান্ড কম্পোজিট আর্ট) কোনো বিভাগ সম্পর্কেই আমাদের দেশে আগে কোনো শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল না। ১৯৫২ সালে গঠিত ফিল্ম এনকোয়্যারী কমিটির সুপারিশ অনুসারে মাত্র কয়েক বছর হল পুণাতে চলচ্চিত্রের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ফিল্ম ইনস্টিটিউট অব ইণ্ডিয়া স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু এখানে প্রতিটি বিষয়ে শিক্ষা দেবার জন্যে মাত্র দশটি করে ছাত্র ভর্তি করা হয়। শিক্ষাগ্রহণেচ্ছুদের তুলনায় এই সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। এছাড়া সুদূর বাঙলা আসাম, বিহার, উড়িষ্যা পাঞ্জাব, মাদ্রাজ প্রভৃতি রাজ্য থেকে পুণায় গিয়ে শিক্ষালাভ করা মাত্র আর্থিক কারণেই নয়, আরও বহুবিধ অসুবিধার জন্যে বহু শিক্ষালাভেচ্ছুকের পক্ষেই অসাধ্য। কাজেই পুণায় পাঠগ্রহণের সুবিধা বোম্বাই ও মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের অধিবাসীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ভারতে চিত্র-প্রযোজনার আর দুটি অঞ্চল—মাদ্রাজ ও কলিকাতার সন্নিকটে যদি পুণায় অনুরূপ আর দুটি চলচ্চিত্র-শিক্ষণ-কেন্দ্র খোলার ব্যবস্থা হয়, তাহলে কিছুটা সুরাহা সম্ভব।

অনেকের মুখেই প্রশ্ন শুনতে পাই, চলচ্চিত্রশিল্পের কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগে তত্ত্বীয় বা পুঁথিগত এবং ফলিত বা ব্যবহারিক (theoritical and practical) শিক্ষালাভ করলেই কি সার্থক পরিচালক, চিত্রনাট্যকার, চিত্রগ্রাহক বা ক্যামেরাম্যান, শব্দযন্ত্রী, সম্পাদক প্রভৃতি হওয়া যায়? কোনো শিক্ষণ-কেন্দ্র থেকে এই ধরনের শিক্ষালাভ না করেই তো আমাদের দেশে দেবকীকুমার বসু, প্রমথেশ বড়ুয়া, নীতীন বসু, শান্তারাম, সোরাব মোদী এবং বর্তমান যুগে



অভিসারের কাহিনী: মাধবী মুখোপাধ্যায়

সত্যজিৎ রায়, তপন সিংহ, ঋত্বিক ঘটক প্রভৃতি পরিচালক, বিমল রায়, ফণি মিস্ত্রী, রাধু কর্মকার, সুব্রত মিত্র প্রভৃতি ক্যামেরাম্যান, মুকুল বসু, নৃপেন পাল, অবধূত, ঈশান ঘোষ, রবীন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি শব্দযন্ত্রীর বিকাশ সম্ভব হয়েছে? দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তর প্রথমে দিচ্ছি। যাঁদের নাম করা হল, তাঁদের প্রত্যেকেই পড়ে, শুনে, দেখে ও ঠেকে পারদর্শিতা লাভ করেছেন। কোনো কোনো মানুষ সহজাত প্রেরণার বশে নিজেকে কোনো-না-কোনো দিক দিয়ে প্রকাশ করবার জন্যে ছটফট করে। এ'রাও সেই জাতের মানুষ; এ'রা নিজেদের প্রকাশ-পথকে গড়ে নিয়েছেন নানারকম পরীক্ষানিরীক্ষা ও ভুলভ্রান্তির ভিতর দিয়ে পাদচারণা করবার পরে। এ'দের জ্ঞান ক্রমে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিংবা হয়ত সকলের তাও হয়নি। চিত্রপরিচালকদের মধ্যে একজনের কথা জানি, যিনি চলচ্চিত্র-বিষয়ক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রস্তাব শুনে লাফিয়ে উঠে বলেছিলেন: খুব ভালো কথা। কিন্তু পড়াবে কে? যখন বলা হয়েছিল: কেন? আপনারা? তখন তিনি রীতিমত নিরুৎসাহ হয়ে বলেছিলেন: সেকি কথা? আমরাই ত' হব ফার্স্ট ব্যাচ অব স্টুডেন্টস্! পরে তিনি তাঁর মনোভাবকে ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন: পরিচালনা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান যদি বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হত, তাহলে আমাদের একখানি ছবি সাফল্যের চূড়ায় পোঁছোবার পরেই পরবর্তী ছবিটি আদৌ ছবিই নয় বলে ধিক্কৃত হত না। কিন্তু আমরা বলব, তিনি নিজের সম্বন্ধে এ-কথা বলে নিজের প্রতি অবিচারই করেছিলেন; কারণ, এমন ঘটনা তাঁর জীবনের অপরাহ্ণ-বেলার আগে কখনও ঘটেনি। আসল ব্যাপার হচ্ছে, চলচ্চিত্রপরিচালনার বৈজ্ঞানিক ভিত্তিটি ঠিক কি, এসম্পর্কে হয়ত তাঁর মনে কিছুটা সংশয় ছিল। জানি না, এই সংশয় অধিকাংশ চিত্রপরিচালকেরই অবচেতন মনে বাসা বেঁধে আছে কিনা!

এইবার দিচ্ছি প্রথম প্রশ্নের উত্তর। প্রতি বছরই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তারী বা ওকালতি পরীক্ষায় কিছু-না-কিছু ছাত্র কৃতিত্বের সংগে উত্তীর্ণ হয়। এদের সকলেই কি ভবিষ্যৎ জীবনে কৃতী ডাক্তার বা উকিল বলে স্বীকৃতি লাভ করে? অথচ এরা প্রত্যেকেই যে অধীত বিদ্যার তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক দিক সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করেছে, এ-কথা কি অস্বীকার করা যায়? এবং রীতিমত ডাক্তারী বা ওকালতি পাশ করেনি, এমন লোকের হাতে কি চিকিৎসা বা মামলার ভর ছেড়ে দেওয়া যায়? অপরদিকে আর্ট কলেজে যদি অঙ্কন বা ভাস্কর্যবিদ্যা সম্বন্ধে তত্ত্বীয় ও ফলিত জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয়, তাহলে ফিল্ম ইনস্টিটিউট অব ইণ্ডিয়াতে বা ঐ জাতীয় অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে চলচ্চিত্র-শিল্পের কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগ সংক্রান্ত জ্ঞানার্জন করার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করি কোন্ সাহসে? এটা তো ঠিক কথা যে, ভালো ইলেকট্রিক মিস্ত্রির চেয়ে ভালো ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার ঢের বেশী কাম্য। চলচ্চিত্রশিল্পের ভালো কারিগর হিসেবে এতকাল আমরা যাঁদের পেয়েছি, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই ভালো ইলেকট্রিক মিস্ত্রির বেশী কিছু নয়। আমরা এবার এই শিল্পজগতে ভালো ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারের সাক্ষাৎ পেতে চাই। এবং যতদিন তা না হচ্ছে, ততদিন ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্প বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সুদৃঢ়ভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে অপারক।

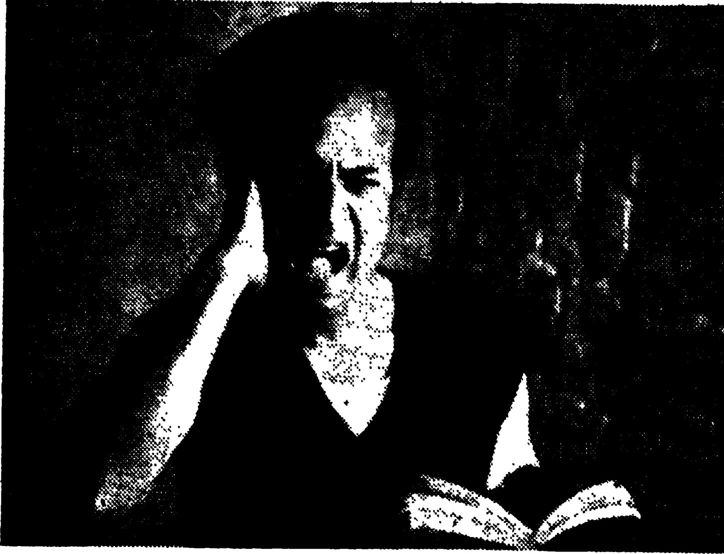
—নান্দীকর

দেশী ছবির খবর

"বর্ণালিকা" [illegible] পড়ে" —যার ভারনাম [illegible] অভিনয় করেছে [illegible] পাধ্যায়। [illegible] দেখতে পাবেন ললিতা-চরিত্রে [illegible] শরৎচন্দ্রের কাহিনী [illegible] চিত্রে ললিতা সেজেছেন মৌসুমী। চিত্রদীপ ফিল্মসের এ চিত্রটির চিত্রগ্রহণ সম্প্রতি শুরু হয়েছে নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওর এক নম্বর ফ্লোরে। ছবিটির পরিচালক হলেন অজয় কর। কাহিনীর শেখর-চরিত্রে অভিনয় করছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। এ ছাড়া অন্যান্য চরিত্রে রয়েছেন বিকাশ রায় ছায়া দেবী শমিত ভঞ্জ,

কোমল গাত্রত্বক...
বেঙ্গল কেমিক্যালের গোল্ডেন স্যাণ্ডেলউড সোপ
চন্দন-গন্ধ এই সাবান ব্যবহারে গ্রীষ্মের দিনেও আপনার গাত্র-ত্বকের কমনীয়তা ও উজ্জ্বলতা অম্লান রাখবে—এর মধুর গন্ধ আপনাকে সারাদিন প্রফুল্ল রাখবে।
বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর • দিল্লী

ধীরের প্রজাপতি চিত্রে রবি ঘোষ





দিবারাত্রির কাব্য : মাধবী মুখোপাধ্যায় ও স্বপন রায়

রোমি চৌধুরী এবং রত্না ঘোষাল। বিমল দে ও অজয় কর প্রযোজিত এ ছবির সঙ্গীত-পরিচালনায় রয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

বাংলাদেশে হিন্দী-চিত্র নির্মাণের ব্যাপারটা ব্যাপক না হলেও মাঝে-মধ্যে যে এ প্রয়াসের প্রচেষ্টা চলছে না তা নয়। ইতিপূর্বে এখানে সুচিত্রা সেন অভিনীত 'মমতা' চিত্রটি নির্মিত হয়েছিল। বর্তমানে পরিচালক তরুণ মজুমদার 'রাহগীর' হিন্দী চিত্রটি কলকাতার নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওর শুরু করেছেন।

এটি বাংলা ছবি 'পলাতক'-এর হিন্দী চিত্ররূপ। নায়ক-নায়িকা চরিত্রে অভিনয় করছেন বিশ্বজিৎ ও সন্ধ্যা রায়। বম্বের কয়েকজন শিল্পী এ ছবিতে অংশগ্রহণ করেছেন। যেমন—শশিকলা, নিরূপা রায়, ইফতেকর, কনহৈয়ালাল, অসিত সেন, সবিতা চ্যাটার্জি ও পদ্মা। দুটি বিশিষ্ট চরিত্রে রয়েছেন পাহাড়ী সান্যাল এবং জহর রায়। এই রঙিন হিন্দী ছবির সুরকার হলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

বিদেশী ছবির খবর

বুলগেরিয়া-ইতালিয়ান প্রযোজক সংস্থার যুগ্ম প্রযোজনায় সোফিয়ার নিকটবর্তী 'চিত্র নগরীতে' নতুন ছবি "গ্যালিলিও গ্যালিলি' ছবির কাজ শুরু হচ্ছে। ছবির নাম থেকেই আন্দাজ করতে অসুবিধা হয় না যে বিখ্যাত ইতালীয়ান পদার্থবিদ জ্যোতির্বিজ্ঞানী গ্যালিলিওর জীবনকাহিনীই এ ছবির বিষয়-বস্তু। ইতালীয়ান চিত্রনাট্যকার লিলিয়ানা গাভানি ও তুলিও পিনেল্লীকৃত চিত্রনাট্যে এ ছবির পরিচালক শ্রীগাভানি। ছবির চিত্রগ্রহণ কাজটিও করছেন ইতালীয় এল্ ফিও কোল্ তিনি। তবে চরিত্রচিত্রণে বেশীর ভাগই বুলগেরিয়ান। যেমন : কোলোয়ানচেভ্, নেভেনা কোকানোভা ভিক্টর জর্জিয়েভ্।

গত বছর প্রথম শ্রেণীর তিনটি উৎসবে একাধিক বুলগেরিয়ান ছবি একাধিক পুরস্কার পেয়েছে। গ্রিসা অস্ত্রোভস্কি ও টোডর স্টয়ানভ্ পরিচালিত 'দি সাইড ট্র্যাক' গত মস্কো উৎসবে পেয়েছে দুটো পুরস্কার : এক—জুরীদের বিচারে বিশেষ স্বর্ণপদক, দুই—আন্তর্জাতিক চিত্রসমালোচক সংস্থার পুরস্কার। বোরিস্লাভ শার্লিয়েভ্-এর 'নাইট উইদাউট আর্মার' ছবিতে সুন্দর অভিনয়ের জন্য শিশু চিত্রাভিনেতা ওলিগ্ কোভাচেভ পাইওনাস্কা প্রাভদা পত্রিকাপ্রদত্ত বিশেষ পুরস্কার পেয়েছে। গত ভেনিস উৎসবের স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবির বিভাগে টুডর কোভাচেভ-এর 'ফ্রেম ওয়ান টু এইট' ছবিটি দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ ছবি নির্বাচিত হওয়ায় ব্রোঞ্জ সিংহ পেয়েছে। সদ্য শেষ হওয়া পঞ্চম ট্রিয়েস্ট সায়ান্স ফিকশন চলচ্চিত্র উৎসবে বুলগেরিয়ান ছবি 'দি পাথ্ অফ দি ব্লিয়েডস' (পরিচালনা : ডিমিওর গ্রিভা, শিল্পনির্দেশনা : ভাসিল্ আইভানভ্) অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগী চিত্র হিসাবে সম্মানিত হয়েছে।

সার্গেই ইয়েৎকোভিচের আগামী ছবির নাম হচ্ছে 'থীম ফর এ সর্ট স্টোরী'। ১৮৯৬ সালের ১৭ই অক্টোবর—ঐ একটা দিনের আন্তন চেখভের জীবন নিয়ে এ ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন লিওনিড্ ম্যালিউগিন। ঐদিন সকালে সেন্ট পিটস্-বার্গের আলেকজান্দ্রিনস্কি থিয়েটারে তাঁর 'দি সী গাল্' নাটকের উদ্বোধন হবে বলে খুশীতে ভরা মন। আবার ঐদিনই সন্ধ্যা-বেলায় সব আনন্দের মুখে ছাই দিয়ে নাটকের দর্শক আকর্ষণে ব্যর্থতার সংবাদ পেয়ে মর্মাহত হলেন চেখভ। সকালের খুশী-মন বিকেলের পুরবীর সুরে বেসুরো হয়ে গিয়েছিল। বিখ্যাত জনপ্রিয় একজন ব্যক্তির জীবনে এ ধরনের একটা দিন নিঃসন্দেহে স্মরণীয়। চেখভের মন তখন তাই অস্থির হয়ে উঠেছিল, তাই বুঝি তিনি মেলেকভ থেকে চলে গিয়েছিলেন মস্কো সঙ্গে সঙ্গে।

পাঠকের চোখে

নান্দিক-প্রসঙ্গে চিঠি

'অমৃতে'র গত ১০ই ফাল্গুন সংখ্যায় 'চারণকবি মুকুন্দদাস' ফিল্মটির সমালোচনায় একটি বিস্ময়কর ভুল তথ্য পরিবেশিত হয়েছে।

সমালোচকের ভাষ্য পড়ে মনে হয় 'চারণকবি মুকুন্দদাস' নামে নাটকটি—নান্দিক সংস্থা কর্তৃক প্রযোজিত হয়েছে। কিন্তু আজকের যে কোনও নাট্যোৎসাহী বাঙালীমাত্রেই জানেন যে নান্দিক প্রযোজিত বর্তমান নাটকটির নাম 'এন্টনী কবিয়াল' এবং এই নাটক বহুদিন ধরেই কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে অভিনীত হচ্ছে (প্রতাপ মেমোরিয়াল হলে নয়)। 'এন্টনী কবিয়ালে'র দৌলতেই 'নান্দিকে'র নাম আমাদের মতো প্রবাসীজনেরও সুপরিচিত। আশাকরি 'অমৃতে'র আগামী সংখ্যায় এই পত্রটি পাঠকমণ্ডলীর ভ্রান্তি দূর করবে।

মিতা মিত্র,
কোক-ওভেন কলোনী,
দুর্গাপুর—২।

"হংসমিথুন"

'হংস-মিথুন' ছবির প্রসঙ্গে নান্দীকর যে যুক্তিসংগত কতকগুলি প্রশ্ন তুলেছেন, সেই সম্পর্কে কিছু বলতে ইচ্ছে করি। স্কটিশচার্চ কলেজকে যেভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, তাতে ঐ কলেজের সম্পর্কে যাদের কল্যাণমূলক আগ্রহ আছে, তাঁরা সংগত কারণেই ব্যথিত হবেন। প্রথমতঃ, কলেজের কোন উৎসবে জেনারেল সেক্রেটারীর এই ন্যাকামো বাস্তবে অনুপস্থিত। দ্বিতীয়তঃ, ক্লাশ রুমের মধ্যে কোন নোটীশ বেয়ারা মারফৎ দেওয়ার নিয়ম নেই। তৃতীয়তঃ, কলেজের শিক্ষকদের ইচ্ছাকৃতভাবে মনে হয় বিসদৃশভাবে তুলে ধরা হয়েছে। ক্লাশে ও পিক্‌নিক্ পার্টিতে জনৈক অধ্যাপকবেশীর উপস্থিতি এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে। রবি ঘোষকে ক্লাশের ছাত্র হিসাবে দেখিয়ে বাস্তবকে বরং অস্বীকার করাই হয়েছে—কারণ ও'কে ছাত্র হিসাবে মনে হয় নি। চতুর্থতঃ, কলেজ ইউনিয়নের চরিত্রকেও খারাপভাবে লোকে ধারণা করতে পারে। কলেজের নামটা এভাবে জড়িয়ে দিয়ে সাধারণের কাছে কলেজকে হেয় করা হয়েছে বলে মনে করি।

অভ্রুরঞ্জন পান্ডা,
কলিকাতা-৬।

ত্রুটি স্বীকার

অনবধানতা বশত গেল সংখ্যার প্রেক্ষাগৃহ বিভাগে 'হামরাজ (হিন্দী) : বি, আর, ফিল্মস্-এর নিবেদন—এই পংক্তিটি ৩৮৮ পৃষ্ঠার তৃতীয় স্তম্ভের ৬ষ্ঠ পংক্তিতে মুদ্রিত হয়নি।

মঞ্চাভিনয়

সাহেব-বিবি গোলামের অভিনয়

সম্প্রতি কলিকাতা পোর্ট কমিশনার্স চীফ ইঞ্জিনীয়ার্স অফিস রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভ্যবৃন্দ বিমল মিত্রের "সাহেব-বিবি গোলাম' অভিনয় করলেন রঙমহল মঞ্চে। উপন্যাসটির নাট্যরূপ দেন বৈদ্যনাথ দাস। একক ও দলগত অভিনয়ে সেদিনকার নাটকটি বেশ হৃদয়গ্রাহী হয়। তা সত্ত্বেও অভিনয়ে বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন গোরাচাঁদ মুখোপাধ্যায়, জয়দেব চক্রবর্তী, রঞ্জিৎ সিকদার ও দিলীপ গুহ। অন্যান্য ভূমিকায় সুঅভিনয় করেন সনৎ মুখোপাধ্যায়, দিলীপ বসু, শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, সুধাংশু রানা ও মোহন ঘোষ।

স্ত্রী চরিত্রাভিনয়ে দীপিকা দাশ এককথায় অপূর্ব! বেলা রায় ও শিখা ভট্টাচার্যের অভিনয়ও প্রশংসার দাবি রাখে। সম্পাদনায় কিছু ত্রুটি থাকলেও পরিচালনা, আবহসংগীত, মঞ্চসজ্জা ও আলোকসম্পাত উচ্চ পর্যায়ের হয়েছিল।

প্রথম বসন্ত: লিলি চক্রবর্তী



'অভিযাত্রী সংস্থার শিল্পীবৃন্দ সম্প্রতি 'এ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস্' হলে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সপ্তপদী'র নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করেছেনছ। নাট্যরূপায়ণে প্রতাপ মুখোপাধ্যায় যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় রেখেছেন, পরিচালনার দায়িত্বও তিনি নিয়েছিলেন। তাঁর পরিচ্ছন্ন শিল্পচিন্তার স্বাক্ষর নাটকের বহু জায়গায় স্বাক্ষরিত, সামগ্রিক অভিনয় ঐক্যের মধ্যেও একটা সুষ্ঠু রূপ প্রায় সব সময়েই অটুট ছিল। নাটকের প্রতিটি সংঘাতসমৃদ্ধ মুহূর্ত সুঅভিনীত এবং এ ব্যাপারে শিল্পীদের আন্তরিক নিষ্ঠা সত্যি অভিনন্দনযোগ্য। দুটি প্রধান চরিত্রের রূপকার সুজয় ঘোষ (কৃষ্ণেন্দু) ও কল্যাণী ঘোষ (রীণা ব্রাউন) উল্লেখযোগ্য অভিনয় প্রতিভার পরিচয় রেখেছেন। অন্যান্য চরিত্রে সুঅভিনয় করেন—সুবীর কুন্ডু, সোমনাথ বন্দোপাধ্যায়, দীপেন মুখোপাধ্যায়, অশোক চট্টোপাধ্যায়, অসিত বসু, সমীর ঠাকুর, পৃথিরাজ রায়, রবীন গঙ্গোপাধ্যায়, ধীরেন কুন্ডু, প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য, গৌরীশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়, নিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, দীপক গঙ্গোপাধ্যায়, ত্রিদীপ চট্টোপাধ্যায়, বসুদেব মন্ডল, সলিল চক্রবর্তী, প্রণব মুখোপাধ্যায়, স্বপ্না মিত্র, এষা চক্রবর্তী।

প্রতিযোগিতার ফলাফল

'মেরী ব্রাইট বয়েজ সোসাইটি' পরিচালিত চতুর্থ বার্ষিকী শিশির নাট্য প্রতিযোগিতা'র ফলাফল সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে :—

দলগত অভিনয় : প্রথম—কল্লোল নাট্য সংস্থা' (ইতিহাসের কাঠগড়ায়), দ্বিতীয়—শিল্পীতীর্থ (রসাভাষ), তৃতীয়—ই. রেল, ইনস্ হাওড়া (বগলার বিভ্রাট)।

শ্রেষ্ঠ অভিনেতা :—

প্রথম—অমল বসু (কল্লোল), দ্বিতীয়—পিনাকী চক্রবর্তী (নিউ বেঙ্গল ক্লাব), তৃতীয়—সত্যেন মুখার্জী (শিল্পীতীর্থ)।

শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী :—

প্রথম—শ্রীমতী মঞ্জু মজুমদার (শিল্পীতীর্থ), দ্বিতীয়—শ্রীমতী সবিতা মুখার্জী (হাওড়া পার্সেল)।

শ্রেষ্ঠ পরিচালক—সুধীরকুমার নন্দী (কল্লোল)।

(শ্রেষ্ঠ শিশু শিল্পী—অরিন্দম্ মুখার্জি, (নিউ বেঙ্গল ক্লাব)।

বিবিধ সংবাদ

শিশু স্বর্গ

মহাজাতি সদনে শিশু স্বর্গের নিয়মিত অনুষ্ঠান বসবে রবিবার (১০ই মার্চ) সকাল ৯ টায়। এদিন নতুন প্রতিভার শিশু-শিল্পীদের অনুষ্ঠান ছাড়া, শিশু সংঘ (দর্জিপাড়া) সুকুমার রায়ের হ-য-ব-র-ল পরিবেশন করবেন।

বন্ধুমিলনীর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

বন্ধুমিলনীর (খড়দহ) ৪র্থ বার্ষিকী অনুষ্ঠান উপলক্ষে গত দশ ও এগারোই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় দুটি সুন্দর সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল রহড়ায়।

প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র-সংগীত পরিবেশন করেন সর্বশ্রী দেবব্রত বিশ্বাস, সুচিত্রা মিত্র, অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমিত্রা সেন, শৈলেন দাস, অর্ঘ্য সেন, পূর্বা সিংহ, মুক্তি ঘোষ, রামগোবিন্দ চক্রবর্তী এবং সুমিত্রা ঘোষ। এবং আবৃত্তিতে অংশ নেন শ্রীদেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান শুরু হয় শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসের বাউল-সংগীত দিয়ে। এদিনের অনুষ্ঠানে সর্বশ্রী অমর পাল ও বিষ্ণুপদ দাস, শ্রীসুশীল চট্টোপাধ্যায়, বনানী ঘোষ ও দিলীপকুমার রায় অংশ নেন। এরপরে নজরুলের আসরে আবৃত্তি করে শোনান সুকবি শ্রীবাসুদেব দেব।

অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয় শ্রীছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভক্তিগীতি দিয়ে।

অনুষ্ঠান দুটি পরিচালনা করেন তপন দাস, সলিল মিত্র ও রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়।

আপনার প্রিয় মাসিক পত্রিকা

নবকল্প

ফাল্গুন সংখ্যা প্রকাশিত হলো...

লিখেছেন—

২টি উপন্যাস | রাজকুমার মৈত্র, পরেশ ভট্টাচার্য

২টি প্রবন্ধ | নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বিবেশ্বর সেনগুপ্ত

২টি বড় গল্প | শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১টি অনুবাদ গল্প | বরুণ সেন

শ্রীভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়ের অগ্নিযুগের রচনা। সুখ্যাত লেখক বিভূতিদের রম্য রচনা

এবং

নিয়মিত বিভাগগুলির চিত্তাকর্ষক রচনা
ফুল পেজ অজস্র ছবিও আছে

আপনার প্রিয় হকার্স বা ষ্টলে পাবেন

রাহগীরঃ বিশ্বজিৎ ও সবিতা চট্টোপাধ্যায়



তরুণ যাদুকর রাজকুমার

বাংলার তরুণ যাদুকর রাজকুমার সম্প্রতি নেপাল ও বিহার সফর শেষে সদলবলে কলকাতায় ফিরেছেন। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে তিনি আন্দামান যাচ্ছেন।

শৈশবাবস্থা থেকেই রাজকুমার কৃতিত্বপূর্ণ যাদুবিদ্যা প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে বাংলা ও বাংলার বাইরে বাংলার তারুণ্যের অপ্রতিহত জয়যাত্রাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হয়েছেন।

রাজকুমার বিভিন্ন চাঞ্চল্যকর খেলার মধ্যে 'ছবিতে প্রাণ-সঞ্চার' 'তাসখন্দে শাস্ত্রিজী' 'নেতাজীর অন্তর্ধান', 'শূন্যে ভাসমান তরুণী' সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ধানবাদ চাসনালা ক্লাব-এর দ্বিতীয় বার্ষিক প্রীতি-সম্মেলন ঃ

৮ই ও ৯ই মার্চ, শুক্র ও শনিবার ইণ্ডিয়ান আয়রণ-অ্যান্ড স্টীল কোম্পানীর ধানবাদ চাসনালা কোলিয়ারীর কর্মিবৃন্দের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান চাসনালা ক্লাব এর দ্বিতীয় বার্ষিক প্রীতি-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এই উপলক্ষে প্রথম দিন, শুক্রবার স্থানীয় শিল্পীরা নাট্যাভিনয় ও নৃত্য গীতাদি প্রদর্শন করবেন। দ্বিতীয় দিন শনিবার বোম্বাইয়ের সবিতা চৌধুরী ও সুবীর সেন এবং কলিকাতার বনশ্রী সেনগুপ্ত, মীরা বিশ্বাস, কমল গাঙ্গুলী ও সিমারা অর্কেস্ট্রা দর্শকদের আনন্দবিধান করবেন।

ন্যাশান্যাল অ্যান্ড গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক (চার্চ লেন) এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের বাৎসরিক নাট্যানুষ্ঠান ঃ

গেল বুধবার, ৬ই মার্চ, সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিটে ন্যাশান্যাল অ্যান্ড গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের (চার্চ লেন) সদস্যবৃন্দ কর্তৃক বীরু মুখোপাধ্যায়ের 'বন্দর' নাটকটি বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে।

টেস্ট ক্রিকেট প্রসঙ্গ

কমল ভট্টাচার্য

"খেলার খবর কিছু শুনেছেন?"

"কিসের?" খেলার প্রতি যে কতটা বিতৃষ্ণা জন্মেছে সেই কথাটাই বলতে চেয়েছিলাম।

ভদ্রলোক থতমত খেয়ে বললেন -"কেন ক্রিকেটের।"

"অর্থাৎ আপনি বলতে চাইছেন ভারতবর্ষ-নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট টেস্টের কথা।" মুখে তাচ্ছিল্যের ভাব দেখিয়ে কথাটা বললাম।

কিন্তু ভদ্রলোক তাতেও দমলেন না। বললেন: "হ্যাঁ, হ্যাঁ। কিছু জানেন?"

প্রশ্নকর্তার দিকে একবার তাকিয়ে রইলাম। বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে বললাম: "দু' উইকেটে সন্তর।"

"বলেন কি? সেই একই অবস্থা।" ভদ্রলোক যেন নিরাশ হলেন এইভাব দেখিয়ে মাথাটা নাড়িয়ে দুঃখ প্রকাশ করলেন।

আর একবার তাকালাম তাঁর দিকে। ব্যাপারটা বুঝলাম। তিনি নিরাশ হয়েছেন ভেবে বললাম: "নিউজিল্যান্ড তিন উইকেটে সন্তর। ভারতীয় দল নয়।"

ভদ্রলোক আশ্বস্ত হলেন বলে মনে হল না। একবার হাতের বুড়ো আঙ্গুল নেড়ে বললেন: "তাতেই বা কি? আমাদের অবস্থার তাতে কি কিছু হেরফের হবে? আমাদের কাছে কিবা অস্ট্রেলিয়া, কিবা নিউজিল্যান্ড। দুই সমান। কোথায় যে গলদ বুঝে উঠতে পারলাম না। আপনারা ত ক্রিকেটের বিচক্ষণ ব্যক্তি। বলতে পারেন এদের ব্যর্থতার কারণ কি?"

আলোচনাটা এমন জায়গায় এসে ঠেকেছে তাতে মুখে রা না কেটে উপায় নেই। দীর্ঘনিঃশ্বাস আমিও ফেললাম। ভদ্রলোক আমার অবস্থা দেখে মুচকি হেসে গুটিসুটি পাশে বসলেন। একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন আমার দিকে। মুখে মুখে জবাব দেওয়া আমার স্বভাব। কিন্তু এ ব্যাপারে আমি ঠেকে গেলাম। আনমনা হয়েই বলে উঠলাম: "তাইত? গলদটা কোথায়?" কিন্তু সংশয় কাটিয়ে ভদ্রলোককে বললাম: "ভারতীয় দলটি যে নেহাৎ খারাপ নয় এ-কথাটা কি আপনি বিশ্বাস করেন?"

ভদ্রলোক একটু হকচকিয়ে গেলেন। বললেন: "খারাপ বলতে পারি না। ব্যাটিং-য়ের স্ট্রেংথ নেহাৎ কম নয়। তবু খেলায় তাঁরা ঠিক সুনাম অনুযায়ী খেলতে পারছেন না। এটা যেন একটা রহস্য বলে ঠেকছে আমার কাছে।"

"রহস্যই বটে।" একটুও দেরী না করে বলে উঠলাম: "তাহলে খুলেই বলি। ভারতীয় দলে জাত ব্যাটসম্যানের অভাব নেই। ব্যাটসম্যানদের চাতুর্য দেখে বোধকরি বড় বড় বিচক্ষণরাও ঘাবড়ে গেছেন। তাঁদের মারের বহরে মাঠ গুলজার হয়ে পড়েছিল। কিন্তু সেই চৌকস মারের খেলার মেয়াদ কতটুকু! ইঞ্জিনীয়ার ঝটপট মারেন। রাণের বান ছোটান। সে খেলা দেখে সকলের চোখ ধাঁধিয়েছিল। কমেনটেটার ধারা-বিবরণী দিতে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। বলার ভাষা খুঁজে পাননি তাঁরা। মারের দৃষ্টান্ত দিয়ে পূর্বসুরী ধুরন্ধর ব্যাটসম্যানদের মারের সংগে তুলনা করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের মুখের কথা ফুরোতেই ব্যাটসম্যান আউট। চমক খেয়ে কমেনটেটার কথা খুঁজে পেলেন না। আউট হওয়ার দৃশ্যটি হয়ত তাঁদের হতবাক করে দিয়েছিল। অন্ততঃ সেই নাটকীয় দৃশ্যের জন্যে তাঁরা মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। এমনকি ক্রিকেটের অনিশ্চয়তার কথা ভেবেও। এটা ঠিক জাত ব্যাটসম্যানদের কাছে আশা করা যায় না।"

ভদ্রলোক শুধু নড়ে চড়ে বসলেন। বুঝলাম এ কথায় তাঁরও শরীর রোমাঞ্চিত হচ্ছে। একটু থেমে বললাম: "এ ধরণের ঘটনা অনেকেরই বেলা ঘটেছে। শুধু ইঞ্জিনীয়ার নন। অল্পবিস্তর সবাই। এমনকি নবাব-নন্দন অধিনায়ক পাতৌদিরও। পাতৌদি চোখ জুড়ানো খেলা খেলেন। চেয়ে দেখবার মত। কিন্তু চোখ বন্ধ করতে হয় তাঁর আউট হওয়ার দৃশ্য দেখে। এটা নবাবীয়ানা। কিন্তু ক্রিকেটের গুরু দায়িত্ব নিয়ে এ সাজ তাঁর মানায় না! এ'রা কি নিজেদের খেলা দেখাবার জন্যে বিদেশে গেছেন? দলের জন্যে কি কোন ভাবনা-চিন্তা নেই? একটু ঠান্ডা মাথায় খেললে, একটু সংযমী হলে এ'রাও কি অসাধ্য সাধন করতে পারতেন না? দুর্ধর্ষ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে জয় অবশ্যম্ভাবী ছিল একথা কেউ বলছেন না। কিন্তু খেলার মত খেল। লড়াইয়ের মত লড়াই হবে এমন আশা করা কি অন্যায়?"

ভদ্রলোক অবশেষে মুখ খুললেন, বললেন: "ইংল্যান্ডের মাটিতে তবু অজুহাত দেবার ছিল। কিন্তু অস্ট্রেলিয়া বা নিউজিল্যান্ডের আবহাওয়া প্রতিকূল ছিল কি?" ভদ্রলোক একটু ব্যঙ্গ করেই বললেন: "অধিনায়ক দুঃখ করে বলেছেন ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতাই অনর্থের মূল। এবং সেই কারণেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা জমে উঠতে পারেনি।"

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললাম: "তাই হার আমাদের সম্বল হল। ভাল খেলার সুযোগ যে আসেনি একথা বিশ্বাস করি কি করে? অধিনায়ক পাতৌদি টসে জিতে ব্যাটিং না নেওয়ার কোন যুক্তি খুঁজে পেলাম না। আবহাওয়া হয়ত খারাপ ছিল। বৃষ্টিও পড়েছিল। অস্ট্রেলিয়ার বৃষ্টিতে মাটি পাঁক হবে এই ভেবেই কি পাতৌদি টসে জিতেও ফিল্ডিং নিয়েছিলেন। ভিজে মাঠে ফাস্ট বোলিংয়ে খেলতে অসুবিধে হবে—তাই ব্যাটিং নেননি পাতৌদি। নিজের দলেও ফাস্ট বোলার নেই যাতে কাজ হাঁসিল করতে পারেন। কাজেই ফিল্ডিং নিয়ে দায়িত্ব এড়িয়ে গেলেন। আর সেই মাঠেই ব্যাটিং করে বিরুদ্ধ দল পাঁচশ রাণ করে বোকা বানিয়ে দিল। বিরাট রাণের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে আমাদের ব্যাটসম্যানরা ব্যাট করতে নামলেন দুদিনের ফিল্ডিংয়ে ক্লান্ত অবসন্ন দেহ নিয়ে। কাজেই ব্যাটস্‌ম্যানরা সংযম এবং ধৈর্য পাবেন কোথা থেকে? বরং পিটিয়ে মেরে নিজের নাম বাড়ান যাক। দেশ ও দশের কথা কে ভাবে? এই হল আমাদের ব্যাটসম্যানদের আসল চরিত্র।"

"এ বিষয়ে আমি একমত। এ'রা যেন নিজের খেলা নিয়েই খুব ব্যস্ত। ব্যাটসম্যান মারলেন ওভার-বাউন্ডারী। পরেরটাও মারতে গিয়ে আউট। জয়সীমা সেঞ্চুরী করলেন। কিন্তু পর মুহূর্তেই আউট হলেন। আবিদ আলি ভালই খেলেছেন। কিন্তু মারের বহর কমিয়ে একটু ধৈর্য ধরলে তিনি দলের প্রতি সুবিচারই করতেন।"

ভদ্রলোক বলে উঠলেন: "এদের সংগে ওয়েস্ট ইন্ডিজ খেলোয়াড়দের যথেষ্ট সাদৃশ্য মেলে। তাই না?"

তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললাম: "হ্যাঁ। এককালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ তাই ছিল। একক ক্ষমতায় তারা দুনিয়া জয় করত। কিন্তু দল হিসেবে তারা কোনদিন সুনাম পায়নি। বাছাই খেলোয়াড় ধরে নিয়ে বড় দল গড়া যায় না। দল গড়তে গেলে মন-প্রাণ সমর্পণ করতে হয়। সেই অসাধ্যসাধন করেছিলেন ফ্র্যাঙ্ক ওরেল। একটা সত্যিকারের দল গড়েছিলেন। দুরন্ত, দুর্বার খেলোয়াড়গুলোকে একসূত্রে বেঁধেছিলেন। আর তা পেরেছিলেন বলেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের গারফিল্ড সোবার্স-ওয়েসলী হল জুটি ইংলন্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট ম্যাচে নিশ্চিত হার থেকে দলকে বাঁচালেন। এর কি তুলনা হয়?

মনে আছে আপনার—গত মরশুমে মাদ্রাজে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সংগে ভারতের যে টেস্ট খেলা হয়েছিল তার কথা? সেই যে দ্বিতীয় ইনিংসের কথা। ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাতটা উইকেট পড়ে গেছে। ধুরন্ধর ব্যাটসম্যান বলতে টীমে যাদের বোঝায় তারা প্রায় সকলেই ফিরে গেছেন। আছেন শুধু মাত্র সোবার্স। আর তিনজন খেলোয়াড়—যাঁদের খ্যাতি বল ছোঁড়ার কায়দায়। মাঠের অগণিত দর্শক রুদ্ধ-শ্বাসে অপেক্ষা করছেন সেই পরম মুহূর্তটির জন্যে—শেষ উইকেটের পতন হবে—স্বচক্ষে দেখবেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের হার। লক্ষ লক্ষ লোক নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন বেতারের সামনে—ভারতবর্ষের জয়ধ্বনি শোনার জন্য। ধারা-বিবরণী দেবার জায়গায় বসে কত জল্পনা কল্পনার জাল বুনে চলেছেন

খ্যাতনামা ক্রীড়া-সমালোচকবৃন্দ। যাঁরা ধারা-বিবরণী দিচ্ছিলেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষ বক্তার আসনে বসেছিলেন বরোদার মহারাজা। আর অনেকের মধ্যে ছিলেন ক্রিকেটের স্বর্গীয় মহামানব ফ্র্যাঙ্ক ওরেল। বরোদার মহারাজা হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে ওরেলকে জিজ্ঞাসা করলেন—এ ম্যাচের শেষ পরিণতি সম্বন্ধে আপনার কি বক্তব্য? ফ্র্যাঙ্ক ওরেল নির্দ্বিধায় বল্লেন, "দেখুন, একটা বিরাট ধরণের প্রাকৃতিক বিপর্যয় মানে ঝড় কিংবা সাইক্লোন না হলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের হারকে কেউ বাঁচাতে পারবে না।" তারপর একটু থেমে বললেন—"তবে দেখুন, একটা কথা কি জানেন, যতক্ষণ গ্যারি সোবার্স ব্যাট হাতে ক্রীজে রয়েছেন ততক্ষণ এ খেলার শেষ পরিণতি সম্বন্ধে কিছু বলা মানে মূর্খতার নামান্তর মাত্র। অস..ভবকে সম্ভব করার যে দারুণ ক্ষমতা ওর আছে তাতে কারও আপত্তি করার নেই। ওর মত খেলোয়াড় আমাদের দেশে অতীতে জন্মায়নি, বর্তমানে নেই, আর ভবিষ্যতেও জন্মাবে কিনা জানি না।"—আমি কথা শেষ করার আগেই তিনি বললেন 'হ্যাঁ আমি শুনেছি সেকথা।'

—জানেন? একথা শুনতে শুনতে আমার অজান্তে চোখের কোল দুটো ভিজে গিয়েছিল শুধু এই কথা ভেবে যে, কে—কার সম্বন্ধে এ কি বলছেন। যিনি বলছেন তিনি তার কিছুদিন আগে পর্যন্ত ছিলেন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান। তিনিই ছিলেন এই দলের অধিনায়ক এবং পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ অধিনায়ক—তিনিই অধিনায়কের পদে নির্বাচিত করেছেন এই সোবার্সকে।

প্রশ্ন—বুঝলাম না আপনার কথা।

উত্তরে বললাম—হ্যাঁ, সোবার্সকে অধিনায়কের পদে বসাবার মূলে ফ্রাঙ্কের অবদানই বেশী ছিল। ব্যাপারটা কি জানেন? শোনা যায় ফ্রাঙ্ক অধিনায়ক পদ থেকে সরে আসার পর হান্টের অধিনায়ক হবার কথা ছিল এবং হয়েও গিয়েছিলেন। শুধু নির্বাচকমণ্ডলী সরকারীভাবে ঘোষণা করেননি। তাঁরা শুধু মাত্র ওরেলের সম্মতির অপেক্ষায় ছিলেন। ওরেল দেশে ছিলেন না। দেশে ফিরে এলে তাঁকে সব বলা হলো। রাজি হলেন না ওরেল। বললেন, সোবার্সই একমাত্র লোক যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের অধিনায়ক হবার সব যোগ্যতা রাখে। অবশ্যই আমার মতে। ওরেলের কথা শুনে নির্বাচকমণ্ডলী একবাক্যে সায় দিয়ে সোবার্সকেই করলেন অধিনায়ক।

ভদ্রলোক মনে মনে কি যেন ভেবে নিলেন। পরক্ষণেই বলে উঠলেন—"সে দিক দিয়ে কিন্তু আমাদের বোলাররা আশাতীত সাফল্যলাভ করেছেন।"

"অবশ্যই।" ঘাড় নেড়ে স্বীকার করলাম। বললাম: "বিশেষ করে সুর্তী, প্রসন্ন, বেদীর বোলিং প্রশংসা করার মত। কিন্তু নিরাশ করেছেন ওপনিং বোলার রামাকান্ত দেশাই। ক্রিকেটে বয়স বাড়লে বুদ্ধি বাড়ে। কিন্তু ফাস্ট বোলারদের মেয়াদ বেশী দিন থাকে না। তবুও দেশাইয়ের নির্বাচন নিয়ে কম কথা ওঠেনি। দেশাই যে অপারগ সেইটাই প্রমাণিত হল টেস্ট পর্যায়ের খেলায়।"

ভদ্রলোক এবার শেষ কথা পাড়লেন। বললেন: "নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তৃতীয় টেস্টে আমরা জিতব কিনা? ওরা যা খেলছে তাতে ভারত 'রাবার' অক্ষুন্ন রাখতে পারবে কি?"

শেষ কথা আর বাড়িয়ে লাভ নেই। তাই ভদ্রলোককে আশ্বাস দিয়েই বললাম: "নিউজিল্যান্ড এমন কিছু টিম নয় যে ভারতীয় দলকে কোনঠাসা করতে পারে। নিউজিল্যান্ড মাঠে বাণ আছে যদি অবশ্য ব্যাটসম্যানরা ধৈর্য ধরে খেলেন। আশাকরি তৃতীয় টেস্টে ভারত জিততেও পারে। আর যদি জেতে তাহলে বোলারদের দ্বারাই তা সম্ভব হবে। ব্যাটসম্যানদের ওপর কোন ভরসা নেই।"

খেলাধুলা

দর্শক

ভারতবর্ষ বনাম নিউজিল্যান্ড

দ্বিতীয় টেস্ট খেলা

নিউজিল্যান্ড: ৫০২ রান (গ্রাহাম ডাউলিং ২৩৯, ব্রুস মারে ৭৪ এবং কিথ টমসন ৬৯ রান। বিষেণ সিং বেদী ১২৭ রানে ৬ উইকেট)
ও ৮৮ রান (৪ উইকেটে। বিভান কংডন নটআউট ৬১ রান। বেদী ২১ রানে ২ উইকেট)

ভারতবর্ষ: ২৮৮ রান (রুসী সুর্তি ৬৭, পতৌদি ৫২ এবং বোরদে ৫৭ রান। ডিক মজ ৬৩ রানে ৬ এবং রিচার্ড কলিঙ্গ ৪৩ রানে ৩ উইকেট)
ও ৩০১ রান (ফারুক ইঞ্জিনীয়ার ৬৩, সুর্তি ৪৫ এবং পতৌদি ৪৭ রান। গ্যারী বার্টলেট ৩৮ রানে ৬ উইকেট)

প্রথম দিন (ফেব্রুয়ারী ২২):
নিউজিল্যান্ড প্রথম ইনিংসের ৩ উইকেট খুইয়ে ২৭০ রান সংগ্রহ করে। অপরাজিত থাকেন গ্রাহাম ডাউলিং (১৩৩ রান) এবং মার্ক বার্জেস (১৩ রান)।

দ্বিতীয় দিন (ফেব্রুয়ারী ২৩):
নিউজিল্যান্ডের প্রথম ইনিংস ৫০২ রানের মাথায় শেষ হলে ভারতবর্ষ প্রথম ইনিংসের একটা উইকেট খুইয়ে মাত্র ৮ রান সংগ্রহ করে।

তৃতীয় দিন (ফেব্রুয়ারী ২৪):
ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস ২৮৮ রানের মাথায় শেষ হলে তারা 'ফলো-অন' আইনের আওতায় পড়ে যায়। তবে এইদিন সময়ের অভাবে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে আর নামেনি।

চতুর্থ দিন (ফেব্রুয়ারী ২৬):
ভারতবর্ষ দ্বিতীয় ইনিংসের ৮টা উইকেট খুইয়ে ২৮৩ রান সংগ্রহ করেছিল।

পঞ্চম দিন (ফেব্রুয়ারী ২৭):
ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংস ৩০১ রানের মাথায় শেষ হলে নিউজিল্যান্ড দ্বিতীয় ইনিংসের ৪ উইকেটের বিনিময়ে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৮৮ রান তুলে দিয়ে ৬ উইকেটে জয়ী হয়।

নিউজিল্যান্ডের ক্রাইস্ট চার্চের ল্যাংকাস্টার পার্কে আয়োজিত নিউজিল্যান্ড বনাম ভারতবর্ষের দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় নিউজিল্যান্ড ৬ উইকেটে জয়ী হয়েছে। ভারতবর্ষের বিপক্ষে তাদের এই নিয়ে যে ১১টি সরকারী টেস্ট খেলা হল তাতে নিউজিল্যান্ডের এই প্রথম জয়। অপরদিকে ভারতবর্ষের জয় ৪ এবং খেলা ড্র ৬। এ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ্য, নিউজিল্যান্ড এই নিয়ে বিভিন্ন দেশের বিপক্ষে মোট ৮১টি টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ (সরকারী ও বেসরকারী) খেলে মাত্র ৪টি খেলায় জয়ী হল।

ভারতবর্ষের অধিনায়ক পাতৌদি টসে জয়ী হয়েও প্রথম ব্যাট করার দান নিউজিল্যান্ডকে ছেড়ে দেন। এর জন্যে ভারতবর্ষকে যথেষ্ট খেসারত দিতে হয়েছে। প্রথম দিনের খেলায় নিউজিল্যান্ড ৩ উইকেটের বিনিময়ে ২৭৩ রান তুলেছিল। নিউজিল্যান্ড দলের নির্বাচিত অধিনায়ক বেরী সিনক্লেয়ার অসুস্থ থাকায় এই দ্বিতীয় টেস্টে দলভুক্ত হননি। তাঁর অবর্তমানে গ্রাহাম ডাউলিং দলের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন। টেস্ট ক্রিকেটে ডাউলিংয়ের এই প্রথম দল পরিচালনা। প্রথম উইকেটের জুটিতে ব্রুস মারে (৭৪ রান) এবং ডাউলিং দলের ১২৬ রান তুলেছিলেন—ভারতবর্ষের বিপক্ষে টেস্ট ক্রিকেট খেলায় তাঁদের এই ১২৬ রানই নিউজিল্যান্ডের পক্ষে প্রথম উইকেট জুটির নতুন রেকর্ড রান। ২য় উইকেটের জুটিতে বিভান কংডন (২৮ রান) এবং ডাউলিং ৮২ রান তুলেন। তাছাড়া ৪র্থ উইকেটের জুটিতে ডাউলিং এবং মার্ক বার্জেস ৭৬ মিনিটে ৫০ রান তুলে দিয়ে প্রথমদিনের খেলায় অপরাজিত থাকেন। ডাউলিং তাঁর ৬১ ও ১২২ রানের

মাথায় আউট হওয়া থেকে রক্ষা পেলেও তাঁর নটআউট ১৩৫ রান দর্শকদের খুবই উপভোগ্য হয়েছিল। তিনি ২৯০ মিনিটে তাঁর যে শত রান পূর্ণ করেন তাতে ছিল ১২টা বাউন্ডারী এবং ২টো ওভার বাউন্ডারী। ডুনেডিনের প্রথম টেস্টেও ডাউলিং সেঞ্চুরী করেছিলেন। এখানে উল্লেখ্য, ডাউলিং ছাড়া ভারতবর্ষের বিপক্ষে নিউজিল্যান্ড টেস্ট ক্রিকেট দলের হয়ে উপর্যুপরি টেস্টে সেঞ্চুরী করেছেন ১৯৫৫-৫৬ সালের টেস্ট সিরিজে জন রিড —১২০ রান (কলকাতা) এবং নটআউট ১১৯ রান (নিউদিল্লী)।

দ্বিতীয় দিনে ৫০২ রানের মাথায় নিউজিল্যান্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হয়। ভারতবর্ষের বিপক্ষে টেস্টের এক ইনিংসের খেলায় নিউজিল্যান্ডের এই প্রথম ৫০০ রান সংগ্রহ করার নজির। অপরদিকে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ভারতবর্ষ এক ইনিংসের খেলায় ৫০০ রান তুলেছে ২ বার—৫৩১ (৭ উইঃ ডিক্লেঃ, নিউদিল্লী, ১৯৫৫-৫৬) এবং ৫৩৭ (৩ উইকেটে ডিক্লেঃ, মাদ্রাজ, ১৯৫৫-৫৬)।

অধিনায়ক গ্রাহাম ডাউলিং ৫৪৭ মিনিট খেলে ২৩৯ রান করে আউট হন। তাঁর রানে ছিল ২৮টা বাউন্ডারী এবং ৫টা ওভার বাউন্ডারী। ডাউলিংয়ের এই ২৩৯ রান বর্তমানে নিউজিল্যান্ডের পক্ষে এক ইনিংসের খেলায় ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের রেকর্ডে পরিণত হল। পূর্বের রেকর্ড—বি সাটক্লিফের নটআউট ২৩০ রান বিপক্ষে ভারতবর্ষ, নিউদিল্লী, ১৯৫৫-

তৃতীয় দিনে ৫ম উইকেটের জুটি ডিক টমসন ১১২ মিনিটে ৮৫ রান তুলে দিয়ে চিত্তাকর্ষক খেলার পরিচয় দিয়েছিলেন। ভারতবর্ষের পক্ষে বোলিংয়ে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন লেগ স্পিনার বিষেণ সিং বেদী (১২৭ রানে ৬ উইকেট)।

ভারতবর্ষ প্রথম ইনিংস খেলতে নেমে একটা উইকেট খুইয়ে মাত্র ৮ রান সংগ্রহ করে। আলোর অভাবে দ্বিতীয় দিনের ১ ঘণ্টার মত খেলা মাঠে মারা যায়।

তৃতীয় দিনে ২৮৮ রানের মাথায় ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস শেষ হলে তারা খেলার নিয়মে 'ফলো-অন' করতে বাধ্য হয়। নিউজিল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের ৫০২ রানের থেকে ভারতবর্ষ ২১৭ রানের পিছনে পড়ে যায়। ৪র্থ উইকেটের জুটিতে পতৌদি এবং সুর্তি দলের ১০৩ রান তুলে ভদ্রলোকের মত রানের চেহারাটা দাঁড় করিয়েছিলেন। দলের মাত্র ৫০ রানের মাথায় ৩য় উইকেট পড়েছিল। নিউজিল্যান্ডের ডিক মজ ৬৩ রানে ৬টা উইকেট নিয়ে ভারতবর্ষের মেরুদণ্ড ভেঙেছিলেন।



দক্ষিণ কালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বব্ সিগ্রেন নিউইয়র্কের মিলরোজ বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠানের পোলভল্টে ১৭ফুট ৪¾ ইঞ্চি উচ্চতা (৫·২৮৯ মিটার) অতিক্রম করে স্ব-প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব-রেকর্ড (৫·২৫৭ মিটার) ভঙ্গ করছেন।

রবিবার ছিল বিশ্রামের দিন। সোমবার—অর্থাৎ খেলার ৪র্থ দিনে ভারতবর্ষ দ্বিতীয় ইনিংসের সূচনা করে। দলের ৫৬ রানের মাথায় ১ম এবং ৮২ রানের মাথায় ২য় উইকেট পড়ে যায়। সুর্তি (৪৫ রান) এবং পতৌদি ৪র্থ উইকেটের জুটিতে দলের ৭৯ রান সংগ্রহ করেন। চা-পানের বিরতির সময় ভারতবর্ষের রান দাঁড়ায় ২০২ (৪ উইকেটে)। কিন্তু চা-পানের পরবর্তী খেলায় ভারতবর্ষের আরও ৪টে উইকেট পড়ে যায়। স্কোর বোর্ডে যেখানে এক সময়ে ভারতবর্ষের রান ছিল ৪ উইকেট পড়ে ২৩১ সেখানে দেখা গেল ৮ উইকেটে ২৪৩ রান। নিউজিল্যান্ডের শ্রেষ্ঠ ফাস্ট বোলার গ্যারী বার্টলেট এইদিন ৬৭ রানে ৪টে উইকেট পান। তিনি তাঁর এক ওভারের বোলিংয়ে ভারতবর্ষের অধিনায়ক পতৌদি (৪৭ রান) এবং সহ-অধিনায়ক বোরদেকে (৩৩ রান) বোল্ড আউট করেন।

ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংসের ২৪৩ রানের (৮ উইকেটে) মাথায় যখন চতুর্থ দিনের খেলা শেষ হয় তখন ভারতবর্ষ মাত্র ৬৯ রানে অগ্রগামী হয়েছে এবং হাতে জমা আছে মাত্র ২টো উইকেট।

পঞ্চম দিনে ভারতবর্ষ তার বাকি দুটো উইকেটের বিনিময়ে পূর্ব দিনের ২৪৩ রানের (৮ উইকেটে) সঙ্গে মাত্র ১৮ রান যোগ করেছিল—৩০১ রানের মাথায় তাদের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হলে নিউজিল্যান্ডের



শিশিরকুমার ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে বার্ষিক ১৫ কিলোমিটার যোগিতায় শীর্ষস্থানীয় তিনজন : ১ম বিমল দাস (৬নং), ২য় শচীন্দ্র ঘোষ (১১নং) এবং অরুণ দাস (৯নং)।

খেলায় জয়লাভের জন্যে ৮৮ রান করার প্রয়োজন হয়। বার্টলেট তাঁর এই দিনের তৃতীয় ওভারে ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংসের শেষ দুটো উইকেট পান। ফলে তিনি দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ৩৮ রানে ৬টা উইকেট পাওয়ার গৌরব লাভ করেন। গ্যারী বার্টলেট হলেন নিউজিল্যান্ডের শ্রেষ্ঠ ফাস্ট বোলার। তিনি ভারতবর্ষের বিপক্ষে প্রথম টেস্ট খেলায় দলভুক্ত হননি। এই দ্বিতীয় টেস্টে দলভুক্ত হয়ে তিনি ক্রীড়া-মহলে যথেষ্ট বিস্ময়ের উদ্রেক করেছিলেন। কারণ, চলতি মরশুমে প্রথম শ্রেণীর খেলায় তিনি অংশ গ্রহণ করেননি এবং শেষ টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১৯৬৬ সালের সিরিজে। আলোচ্য ২য় টেস্ট খেলায় বার্টলেটের ৩২টা 'নো-বল' হয়েছিল।

নিউজিল্যান্ড জয়লাভের প্রয়োজনে ৮৮ রান তুলতে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে। কিন্তু তাদের গোড়াপত্তন খুবই অলগা হয়েছিল। দলের কোন রান যোগ হওয়ার আগেই ১ম উইকেট পড়ে যায়। ২য় উইকেট পড়ে ৩০ রানের মাথায়। বিভান কংডন দৃঢ়তার সঙ্গে খেলেন এবং তিনিই দলের জয়সূচক রানটি সংগ্রহ করে শেষপর্যন্ত নিজস্ব ৬১ রানে অপরাজিত থাকেন। কংডন প্রথমে দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় দলে স্থান পাননি। দলের অধিনায়ক সিনক্লেয়ার শেষ সময়ে দৈহিক অপটুতার কারণে খেলায় যোগদান না করায় কংডন তাঁর শূন্যস্থানে দলভুক্ত হন।

ক্রাইস্ট চার্চের উইকেটে সবুজ ঘাসের আস্তরণ ছিল। বিশেষজ্ঞদের মতে, এইরকম তাজা উইকেটেই ফাস্ট বোলারদের সাফল্য-লাভের সম্ভাবনা খুব বেশী। টসে জয়ী হয়েও পতৌদি যে প্রথম ব্যাট করার দান ছেড়ে দেন, তার কারণ তাঁর দলের খেলোয়াড়দের ফাস্ট বোলার সম্পর্কে মজ্জাগত ভীতি। ভারতীয় ক্রিকেট দলের এ-'জুজুর ভয়' কবে ঘাড় থেকে নামবে?

উল্লেখযোগ্য টেস্ট পরিসংখ্যান

ভারতবর্ষ বনাম নিউজিল্যান্ডের বিগত ১১টি টেস্ট খেলার (১৯৬৮ সালের ফেব্রুয়ারী ২৭ পর্যন্ত) সূত্রে কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা :

(১) ১৯৫৫-৫৬ সালের মাদ্রাজের ৫ম টেস্টের প্রথম ইনিংসে ভারতবর্ষের ভিনু মানকাদ এবং পঙ্কজ রায় ৪১৩ রান সংগ্রহ করে প্রথম উইকেটের জুটিতে সর্বাধিক রান করার বিশ্ব রেকর্ড করেন—এ রেকর্ড আজও অক্ষুণ্ণ আছে।

(২) ১৯৫৫-৫৬ সালের টেস্ট সিরিজের পাঁচটি টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষ যে ৬টা ইনিংস খেলেছিল তার প্রতিটির এক ইনিংসের খেলায় ৪০০ রানের বেশী রান (তবে ৬০০ রান নয়) তুলেছিল—হায়দরাবাদের ১ম টেস্টের ১ম ইনিংসে ৪৯৮ রান (৪ উইঃ ডিক্লেঃ), বোম্বাইয়ের ২য় টেস্টের ১ম ইনিংসে ৪২১ রান (৮ উইঃ ডিক্লেঃ), নিউদিল্লীর ৩য় টেস্টের ১ম ইনিংসে ৫৩১ রান (৭ উইঃ ডিক্লেঃ), কলকাতার ৪র্থ টেস্টের ২য় ইনিংসে ৪৩৮ রান (৭ উইঃ ডিক্লেঃ) এবং মাদ্রাজের ৫ম টেস্টের ১ম ইনিংসে ৫৩৭ রান (৩ উইঃ ডিক্লেঃ)। একটি টেস্ট সিরিজের পাঁচ খেলার প্রতিটির এক ইনিংসে ৪০০ রান করার রেকর্ড টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে ভারতবর্ষই প্রথম স্থাপন করে—এ রেকর্ড আজও অক্ষুণ্ণ আছে।

(৩) ১৯৬৫ সালে কলকাতার দ্বিতীয় টেস্টে নিউজিল্যান্ডের বি আর টেলর সেঞ্চুরি (১০৫ রান) করেন এবং এক ইনিংসে ৮৬ রানে ৫টা উইকেট পান—খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলাতে [illegible] সেঞ্চুরী এবং এক ইনিংসে ৫টা উইকেট পাওয়ার নজির টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে এই প্রথম।

এক ইনিংসে দলগত সর্বোচ্চ রান

ভারতবর্ষ : ৫৩৭ রান (৩ উইঃ ডিক্লেঃ), [illegible] ৫ম টেস্টের ১ম ইনিংস, [illegible] ১৯৫৫-৫৬

নিউজিল্যান্ড : ৫০২ রান, ২য় টেস্টের [illegible] ইনিংস, ক্রাইস্ট চার্চ, ১৯৬৮

এক ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান

ভারতবর্ষ : ২৩১—ভিনু মানকাদ [illegible] ৫ম টেস্টের ১ম ইনিংস, ১৯৫৫-৫৬

নিউজিল্যান্ড : ২৩৯—গ্রাহাম [illegible] ক্রাইস্ট চার্চের ২য় টেস্টের ১ম [illegible] ১৯৬৮

টেস্ট ক্রিকেটে নিউজিল্যান্ডের [illegible]

১৯৫৫-৫৬ সাল : [illegible] শেষ ৪র্থ টেস্টে নিউজিল্যান্ড [illegible] রানে জয়। এই সিরিজে [illegible] ৩—১ খেলায় [illegible]

১৯৬১-৬২ সাল : দক্ষিণ আফ্রিকা [illegible] বে-সরকারী টেস্ট সিরিজে [illegible] ২টি—৩য় টেস্টে [illegible] এবং ৫ম টেস্টে ৪০ রানে। এই [illegible] ১ম ও ৪র্থ টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকা [illegible] হয় এবং ২য় টেস্ট ড্র যায়। [illegible] অমীমাংসিত থেকে যায়।

১৯৬৮ সাল : ভারতবর্ষের বিপক্ষে [illegible] টেস্টে নিউজিল্যান্ডের ৬ উইকেটে [illegible]

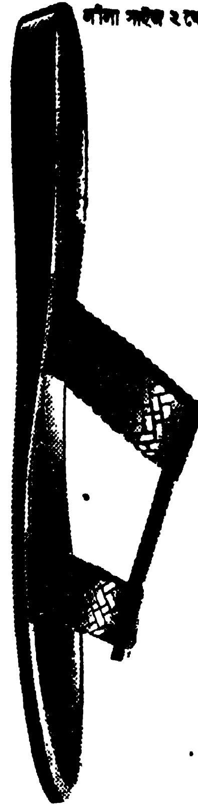
পত্রিকার শতবার্ষিকী ক্রীড়ানুষ্ঠান

অমৃতবাজার পত্রিকার শতবর্ষ [illegible] উপলক্ষে বিভিন্ন মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে কলকাতার ময়দানে [illegible] খেলার আয়োজনও হচ্ছে। পত্রিকার [illegible] বার্ষিকীর এই ক্রীড়াসূচীতে [illegible] মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল এবং মহমেডান স্পোর্টিং দলকে নিয়ে ত্রিদলীয় ফুটবল [illegible] প্রতিযোগিতা এবং বিভিন্ন খ্যাতনামা বৈদেশিক ফুটবল দলের প্রদর্শনী ফুটবল খেলা। এই উপলক্ষে সোভিয়েট ইউনিয়ন, হাঙ্গেরী, চেকোশ্লোভাকিয়া, উত্তর কোরিয়া প্রভৃতি দেশ থেকে শক্তিশালী ফুটবল দল [illegible] চেষ্টা চলছে।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

যেখানেই যান
সকলেরই মুখে বাটা
স্যানডাকের সুখ্যাতি

বাটা স্যানডাক পায়ে দেয়া মাত্রেই পাবেন নতুন ও পরিতৃপ্ত এক অভিজ্ঞতা। এর গড়ন আর উপকরণ, নির্মাণ আর নকশা সব কিছুতেই অনন্ত সজীবতা। তাই যেখানেই জনপদ, দেখবেন স্যানডাক সকলের পুরোভাগে। বাটার উন্নত বিশিষ্ট সংমিশ্রণ কেমিলনে তৈরি, এতে জুতোর গড়ন আর উজ্জ্বলতা বরাবরই একরকম থাকে, সব সময়েই মনে হয় যেন নতুন কেনা, ধুলো-ময়লা-কাদায় একটুও মলিন হয় না। সদ্য-কেনার উজ্জ্বলতা ফিরিয়ে আনতে মোটেই ঝামেলা নেই, ভেজা কাপড়ের দু-এক ঝাপটা, ব্যস্, ধুলো-কাদা, ময়লা দাগ নিমেষে উধাও। নতুন যুগের এই নতুন জুতো আপনাদের সকলকে চমৎকার মানাবে। আজই সপরিবারে আসুন বাটার দোকানে।









Bata স্যানডাক*
কেমিলন*

নতুন যুগের নতুন জুতো

*রেজিস্টার্ড ট্রেড মার্কস্

বাটা-অনুমোদিত-বিধিমতে
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রস্তুত

পোস্ট অফিস সেভিংস ব্যাংক

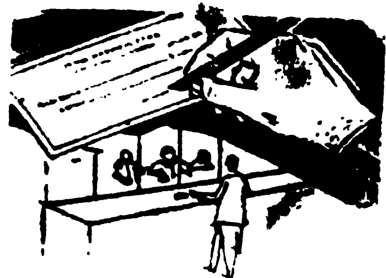
আপনার নিজস্ব ব্যাংক

কষ্ট করে জমানো আপনার টাকা যেখানে সেখানে ফেলে রেখে বিপদ ডেকে আনবেন না।





পোস্ট অফিস সেভিংস ব্যাংকে আজই আপনার জমানো টাকা নিশ্চিন্ত মনে রেখে দিন



পোস্ট অফিসে রাখা টাকা একান্ত গোপনে এবং সম্পূর্ণ নিরাপদে থাকে এবং বছরে শতকরা ৪ টাকা সুদে বাড়ে



শুধু তাই-ই নয়—
আপনি যতবার খুসী পোস্ট অফিসে টাকা রাখতে পারেন এবং আপনার ইচ্ছামত খরচ করার জন্য টাকা তুলতেও পারেন।

এ ব্যাপারে আপনার কাছাকাছি পোস্ট অফিসে অনুসন্ধান করুন।

[illegible] সরকারের পক্ষে তথ্য অধিকর্তা কর্তৃক প্রচারিত

৭ম বর্ষ
৪র্থ খণ্ড

অমৃত

৪৫শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 15th March, 1968 শুক্রবার, ১লা চৈত্র, ১৩৭৪ 40 Paise.

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক

প্রচ্ছদ : শ্রীধ্রুব রায়

'রূপা'র বই

॥ উপন্যাস ॥

হেরমান হেস/শিউলি মজুমদার
অমৃত-আলোতে ৬-০০
হেনরি জেমস্/অ-কৃ-ব
প্রেম এক মন্ত্র ৪-৫০
স্তেফান জেবায়াইগ/
দীপক চৌধুরী
উত্তরণ ॥ উন্মত্ত ॥ ত্রয়ী
প্রতিটি ৩-০০
বাণভট্ট/প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর
কাদম্বরী ১২-০০
পাস্টেরনাক/দীপক চৌধুরী
ডাক্তার জিভাগো
নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত ১২-৫০
ডস্টয়েভস্কি/সমরেশ খাসনবিশ
সম্পাদনা : গোপাল হালদার
অপমানিত ও লাঞ্ছিত ৮-০০
টমাসমান/সুধাংশুমোহন বন্দ্যোঃ
মধুর আমি নারী ৩-০০
ওসামু দাজাই/কল্পনা রায়
অস্তগামী সূর্য ৪-৫০
লারনেট-হলোনিয়া/বাণী রায়
মোনা লিসা ২-৫০
মোরাভিয়া/চিত্তরঞ্জন মাইতি
দাম্পত্য-প্রেম ৪-০০
আলব্যার কামু/প্রেমেন্দ্র মিত্র
অচেনা ৪-০০
আলব্যার কামু/
পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
পতন ৪-০০

* * *

SHADOW FROM LADAKH
A NOVEL BY
BHABANI
BHATTACHARYA

Has been selected by Sahitya Academi as the best English book written in 1967 by an Indian author. 30s

Special Indian Price Rs. 15.00

আমাদের পূর্ণ গ্রন্থতালিকার জন্য লিখুন

রূপা

রূপা অ্যান্ড কোম্পানী

কলকাতা * এলাহাবাদ * বোম্বাই * দিল্লী

'শতবর্ষ পরে' প্রবন্ধ প্রসঙ্গে

১৭ই ফাল্গুনের 'অমৃতে' (ইং ১লা মার্চ, ১৯৬৮) শ্রদ্ধেয় অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'শতবর্ষ পরে' পড়লুম। এদেশে আজ নানারূপ ধরে পুরাতনী-পশ্চাদগামিতার যে উল্টো স্রোত বইতে শুরু করেছে, তার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করায় আমরা নিশ্চয়ই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। কিন্তু আমাদের বর্তমান সমস্যা সম্বন্ধে তিনি যে সরলীকৃত বিশ্লেষণ করেছেন, সে সম্বন্ধে আমার সামান্য একটু আপত্তি জানাবার আছে।

শ্রীরায়ের বক্তব্য থেকে মনে হয় যে, তাঁর বিশ্লেষণের মূল অনুমান হচ্ছে যে, ভারতের বর্তমান সমস্যার গোড়ার কথা হল "আধুনিকতার সঙ্গে পুরাতনী-পশ্চাদগামিতার সংঘাত"। এই সংঘাতে অগ্রগমনের শক্তিকে সহায়তার জন্য তিনি "আধুনিকতার কাহিনী"তে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে ডাক দিয়েছেন দেশের কবি-মনীষীদের।

কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই, লড়াইটা কি শুধু তথাকথিত আধুনিকতার সঙ্গে প্রাচীন-পশ্চাদগামিতার? তথাকথিত আধুনিকতার শিবিরেও কি মেকী নেই, ভেজাল নেই? যদি ধরেও নিই পুরাতনী-পশ্চাদগামিতার স্রোতকে নিঃশেষে ধ্বংস করে দিতে এ-দেশ সমর্থ হল, তবে আমরা কোন দিকে যাব? আধুনিকতারও কি নানা অর্থ নেই? আমাদের দেশে 'আধুনিকতা'র নামে আজ যা-কিছু চলছে, সর্বকিছুই কি আমরা আধুনিক বলে মেনে নেব?

আধুনিকতার নামে যাঁরা জয়ধ্বনি দিলেন, আজ তাঁদের আধুনিকতার অর্থ ভেবে দেখার সময় এসেছে। আধুনিকতা মানে কি নিছক নব্যতা বা নতুনত্ব? এ-শতাব্দীর ত্রিশ দশকে নাৎসীবাদ (বা তার ইতালীয় সংস্করণ ফ্যাসীবাদ) অবশ্যই অনেকের নতুন ছিল, যেমন নতুন ছিল হিটলারের কন্‌সেন্ট্রেশন ক্যাম্পে যন্ত্রণাদানের পদ্ধতি। কিন্তু অন্নদাশঙ্কর তো সেদিন নিছক নতুন বলেই রাষ্ট্রীয় মতবাদ হিসেবে নাৎসীবাদকে বা বন্দীশালার ক্ষেত্রে হিটলারী পদ্ধতিকে আধুনিক বা শ্রেয় বলে মেনে নেননি। আজকের উদাহরণ ধরলে, 'টুইস্ট' বা 'শেক' নিশ্চয়ই নাচ হিসেবে ভরতনাট্যমের থেকে নতুনতর; যেমন নতুনতর 'পপ মিউজিক': ভারতীয় মার্গসংগীত, এমনকি রবীন্দ্রসংগীতেরও তুলনায়। তবে আধুনিকতার নামে লড়াই নিতে গিয়ে আমরা কি তাদেরই ঘরে তুলব, আর সম্মার্জনীসহযোগে বিদায় দেব ভরতনাট্যম, মার্গসংগীত ও রবীন্দ্রসংগীতকে? 'আকাশবাণী'র কলকাতা কেন্দ্রে পত্রাঘাত করে যেসব আধুনিক সংগীত-প্রেমী তরুণ রবীন্দ্রসংগীত ও মার্গসংগীতের পরিবর্তে 'আধুনিক সংগীতে'র সময়সীমা বাড়াতে চান, তাঁদের মনোভাব বুঝতে পারি, কিন্তু তাঁরাও পশ্চাদগামী-সনাতনপন্থীদের থেকে সংস্কৃতি বা কল্যাণের দিক দিয়ে কম বিপজ্জনক—এমন কথা-ই কি শ্রদ্ধেয় রায়মশাই আমাদের বলবেন?

আধুনিকতার অন্য আর এক অর্থ বলতে অনেকেই স্পষ্ট বা অস্পষ্টভাবে পাশ্চাত্যগামিতাকে ধরে থাকেন। কিন্তু পশ্চিমেও তো আজ নানা হাওয়া—তার কোন্‌টা আধুনিক বলে শিরোধার্য করব? পূর্ব-ইয়োরোপের দেশগুলিও আমাদের কাছে পশ্চিমের অংশ, যেমন পশ্চিম হল ইংরেজদের দেশ বা আমেরিকা। যদি আধুনিকতাই আমাদের চলার পথের দিগ্‌দর্শক হয়, তবে কোন্‌টা আধুনিক? যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নিই যে, আমেরিকা বা পশ্চিম-ইয়োরোপই আধুনিকতার শেষ কথা—তবুও তো রেহাই নেই। আমেরিকাতেও তো আজ ভারতীয় মার্গসংগীত আর যোগ নিয়ে হৈ-হৈ চলছে। তবে কি আমরা একই সঙ্গে এল এস ডি আর যোগ, 'পপ মিউজিক' আর শাস্ত্রীয় সংগীত, হলিউডের নগ্ন কমার্শিয়ালিজম আর পশ্চিম-ইয়োরোপের সিনেমাজগতের নতুন পরীক্ষা সবই আধুনিক বলে 'পাথেয়' করে নেব?

সংস্কৃতির কথা ছেড়ে দিয়ে যদি শিল্প-বিপ্লবকে আধুনিকতার জনক বলে মানা হয়, সেখানে আসি, তবে সেক্ষেত্রেও দেখি অন্তত এদেশে নির্বিচার অনুকরণ-প্রিয়তাকেই আধুনিকতার পোষাক পরিয়ে চালান হচ্ছে। ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনকে dualistic পদ্ধতি অনুসারে বিশ্লেষণ করার কিছু কিছু চেষ্টা চোখে পড়ে। এবই একটি পদ্ধতি অনুসারে ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোতে প্রাচীন উৎপাদন-কৌশলনির্ভর ও আধুনিক উৎপাদন-কৌশলনির্ভর দুটি সেক্টরের অস্তিত্ব বর্তমান ধরে নিয়ে, যন্ত্র-বিপ্লবের জন্য আধুনিক উৎপাদন-কৌশলনির্ভর সেক্টরের প্রসারের ওপর জোর দেওয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে এ-পদ্ধতি বহুলাংশে সঠিক হলেও, এর প্রয়োগকালে আমাদের শিল্পপতি ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপকেরা বিচারবিহীন উৎসাহে পাশ্চাত্যের অগ্রসর দেশগুলির নব্যতম উৎপাদন-কৌশল, পরিকল্পনা পদ্ধতি ও যন্ত্রাদির নির্বিচার প্রয়োগকেই আধুনিকীকরণের সমার্থক বলে জেনেছেন—যদিও উপযুক্ত কারিগর, বাজার এবং আবহাওয়াগত পারিপার্শ্বিকের অভাবে তার ফল বহুলাংশে শোকাবহ হয়েছে।

আলোচনা বোধহয় দীর্ঘ হয়ে উঠল। কিন্তু যেহেতু কোন সমস্যার অত্যধিক সরলীকরণে আমার ভীতি আছে, অতএব আলোচ্য প্রবন্ধের অগ্রণী চিন্তানায়কদের দরবারে আমার আবেদন, আমাদের ভারতের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক জীবনে যে অসংখ্য পরস্পরনির্ভর স্রোতের টানাপোড়েন চলছে, সুষ্ঠু বিচার-পদ্ধতি প্রয়োগে তার বিশ্লেষণ করে আমাদের পথ দেখান। যেহেতু আধুনিকতা নিঃসন্দেহে কাম্য, তা-ই আধুনিকতার নামে সর্বকিছু নব্যতার উৎপাত বা সমকালীনতাকেই পাশমার্ক না দিয়ে, আমরা যাতে মঙ্গলক্ষণ ও কল্যাণগত পরিণামের ভিত্তিতে আধুনিকতার সংজ্ঞা বিচার করতে পারি, সেদিকেই তাঁরা আমাদের চিন্তা করতে প্ররোচিত করুন। অন্ধতা যদি ভয়াবহ হয়, ধাঁধিয়ে যাওয়া চোখে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে দৌড়বার চেষ্টাও তো সমভাবেই বিপজ্জনক। এদিকেই আমি লেখক ও পাঠক সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

সুরেশ ঘোষ
উপাধ্যায়, অর্থনীতি বিভাগ,
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

দুই জাতের পাখি প্রসঙ্গে

অমৃত পত্রিকার ৪০ সংখ্যায় শ্রীঅজয় হোমের 'দুই জাতের পাখি' প্রবন্ধটি বেশ আকর্ষণী হয়েছে। অমৃতের পাতায় ইতিপূর্বেও তিনি এ ব্যাপারে আলোচনা করেছেন। সেসব আলোচনা নানা তথ্য সহযোগে ভালই হয়েছিল।

আলোচ্য প্রবন্ধে তিনি বনগুলী বংশের রামগাংরা এবং শিলীন্ধী বংশজাত চোরপাখি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। স্বভাবতই তিনি বিস্তৃত আলোচনার গভীরে প্রবেশ করেছেন। এই দুটি পাখি ভারতসহ পৃথিবীর অনেক দেশেই দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য দেশভেদে এদের প্রকৃতি এক নয়। তবু মোটামুটি সাদৃশ্য আছে। এদের পরিচয় পাঠকের অনেক অজানা কথার উত্তর দেয়। এদের মধ্যে দেশে দেশে কি রকম তফাৎ তা আমাদের সেই চিরাচরিত জিজ্ঞাসাকেই তুলে ধরে। পশ্চিমের পাখিরা শীতের ভয়ে খাদ্য সঞ্চয় করে। আমাদের দেশের পাখিরা তা করে না। যেহেতু নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত বলেই আমাদের দেশের পাখিরা অনারূপ আচরণ করে। আর এজন্যই দেখা যায় যে শীতে নানাদেশের পাখিরা এদেশে এসে আশ্রয় নেয়। এ শুধু আশ্রয়ের তাড়নাই নয়। এর পেছনে আছে খাদ্যের সন্ধান। এই দুটি কারণেই শীতে আমাদের দেশে পশ্চিমী পাখিদের মেলা বসে যায়। কিন্তু আমাদের দেশের পাখিদের এরকম অভ্যাস আছে কিনা সে সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় না। এই কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য লেখকের কাছে পাঠকের অনুরোধ তিনি আমাদের দেশের পাখির চরিত্র পরিচয়ও বিস্তৃত করুন।

উমা রায়
কলকাতা-১৮

সম্পাদকীয়

নবীন প্রাণের বসন্তে

বসন্তের পালাগান কী করে শুরু করা যায়, তা নিয়ে কবির মনে কত কথাই গুঞ্জরিত হয়ে ওঠে। এযুগে বসন্তোৎসবের কথা তো চিন্তাই করা যায় না, চারিদিকে এত বিপত্তির মধ্যে। বসন্তের চেয়ে বসন্তের টীকার কথা মনে পড়ে সর্বাগ্রে। তখনই হয়তো কবির সঙ্গে গলা মিলিয়ে কোনো ক্লান্ত নাগরিক বলে ওঠেন, এবারের মতো বসন্ত গত জীবনে। কিন্তু এখানেই সব কথা শেষ হয়ে যায় না। বসন্ত ঋতুর একটা গন্ধমদির আকুলতা আছে। তার আগুনভাঙা রঙের নেশা সবুজের বুককে দাউ দাউ করে জ্বালিয়ে দিয়ে যায়। এবং তখনি কবি বলেন, ওরে ভাই আগুন লেগেছে বনে বনে। এ শুধু কবির চোখ দিয়ে জগতকে দেখা নয়। জগতের যা সুন্দর, যা রমণীয়, যা স্নিগ্ধ, তাকে বরণ করাই বসন্তোৎসবের সার্থকতা। দোল-পূর্ণিমার দিনটি আমাদের কাছে বসন্তের চিরনবীন অতিথির মতো সমাগত। এই দিন ভক্ত প্রাণের কাছে পরম বাঞ্ছিত। শ্রীকৃষ্ণের হোলি খেলার দিন এটি। আমাদেরও সামনে আসে এই দিনে সবার রঙে রঙ মেশাবার আহ্বান। বসন্তের চিরজাগ্রত প্রাণ হোলির রঙে রঙে মিশে গিয়ে সকলকে রাঙিয়ে দিয়ে যায়। হোলি নবীনের, জীবনের, বসন্তের উৎসব।

এই দিনটি বাঙালীর কাছে আরও স্মরণীয় এই কারণে যে, এই দিনে নদীয়ায় আবির্ভূত হয়েছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। রাধাভাবদ্যুতি সুবাসিত তনু মহাপ্রভু ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণ করেছিলেন বাংলার এক সংকট সময়ে জন্মগ্রহণ করে। কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা শ্রীগৌরাঙ্গ বাংলাদেশে প্রেমভক্তির বন্যা প্রবাহিত করেছিলেন। তিনিও নবীন জীবনের উজ্জ্বল পথিকরূপেই এসেছিলেন আমাদের মাঝখানে। এ-জীবনের, এ-ভক্তির, এ-প্রেমের কোনো তুলনা হয় না। বৈষ্ণব কবিদের অমর লেখনীতে সুললিত ছন্দোবন্ধনে প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গের জীবনদর্শনের অপরূপ ব্যাখ্যা আমরা পাই।

শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হয়েছিলেন জগতে প্রেমধর্ম প্রচারের জন্য। যে-ধর্মে উচ্চ-নীচ, ধনী-নির্ধন, পুণ্যবান-পাপীর কোনো ভেদ নেই, সেই বিশ্বজনীন বৈষ্ণবধর্ম তিনি প্রচার করে গেছেন। তাঁর জীবন ও দর্শন বাংলার নব-জাগরণের মহৎ সূচনা। বৈষ্ণব ধর্ম থেকেই উৎসারিত অনুপম বৈষ্ণব সাহিত্য। শ্রীগৌরাঙ্গ শুধু জীর্ণ সনাতন ধর্মকেই নবীন প্রেমের জোয়ারে ভাসিয়ে নিয়ে যাননি মহত্তর লক্ষ্যের দিকে, তাঁর জীবন থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করে তৈরী হয়েছিল সাহিত্যের এক নতুন ঐতিহ্য। চৈতন্য-পরবর্তী বাংলা-সাহিত্যের রূপ, রস ও আস্বাদ এই মানবপ্রেমিক মহাপুরুষের জীবনরস স্পর্শে অভূতপূর্ব সজীবতা লাভ করেছিল। ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিনে সেই মহাপুরুষের উদ্দেশে জানাই প্রণাম।

এই বসন্তেরই জয়গান গেয়েছেন আমাদের কবি। জীর্ণ পাতার ডালে সবুজের অংকুরোদ্গম নিয়ে বসন্ত যখন আসে, তখন তাকে নতুন জীবনের অগ্রদূতরূপেই আমরা বন্দনা করি। তারুণ্যের জয়গানে আকাশ তখন মুখরিত হয়ে ওঠে। ঝরাপাতার গান শেষ করে বসন্তে বসন্তে ডাক আসে কবির প্রতি। কবি তখন বলতে চান, "জগৎটার দিকে চেয়ে দেখলে দেখা যায় যে, যদিচ তার উপর দিয়ে যুগ যুগ চলে যাচ্ছে, তবু সে জীর্ণ নয়—আকাশের আলো উজ্জ্বল, তার নীলিমা নির্মল। ধরণীর মধ্যে রিক্ততা নেই, তার শ্যামলতা অম্লান; অথচ খণ্ড খণ্ড করে দেখতে গেলে দেখি ফুল ঝরছে, পাতা শুকোচ্ছে, ডাল মরছে। জরা-মৃত্যুর আক্রমণ চারিদিকেই দিনরাত চলছে, তবুও বিশ্বের চিরনবীনতা নিঃশেষ হল না।" যখন মনে হয়েছিল, শীত যেন প্রকৃতিকে একেবারে দেউলে করে দিয়ে চলে যাচ্ছে, তখনি বসন্তের অপরূপ সমারোহ আমাদের মনে নতুনের আশ্বাস জাগিয়ে দিল।

জাতির জীবনে যদি বসন্তোৎসবকে প্রতীক হিসেবে আমরা গ্রহণ করি, তখন আমরা দেখতে পাব যে, নিঃস্বতার মুহূর্তেই নতুন কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা হয়ে ওঠে উজ্জ্বল। এই বিশ্বাস না থাকলে বসন্তোৎসব কখনো সুন্দর সার্থক হতে পারে না। আমরা জানি, জীবনের চারিদিকে আজ এত অসুন্দরের আনাগোনা, এত দীনতা ও মালিন্য যে তার মধ্যে বসন্তোৎসবের কথা বড় বেমানান, বেসুরো মনে হবে অনেকের কানে। কিন্তু আমরা রিক্ত বলেই পূর্ণকে এমনভাবে চাই। আমাদের ব্যর্থতার অঞ্জলি দিয়ে সার্থকতমকে বরণ করি। হয়তো মানুষ এখনো আনুষ্ঠানিক সংস্কারবশেই হোলির উৎসবে মাতে, আবীর ছড়িয়ে দেয় প্রিয়জনের ললাটে। তবু নবীন প্রাণের এই বসন্তকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। তাকে আমরা হৃদয়ের পদ্মাসনে আমন্ত্রণ জানাই। ব্যক্তির ও জাতির জীবনে নবীন প্রাণের প্রতীক বসন্ত সার্থকতায় দীপ্ত হয়ে উঠুক।

আজানুলম্বিত ভুজৌ কনকাবদাতৌ
সংকীর্তনৈক পিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্মপালৌ,
বন্দে জগৎপ্রিয় করৌ করুণাবতারৌ॥
অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়বতীর্ণকলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং
স্বভক্তি শ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরট-সুন্দর-দ্যুতি-কদম্ব-
সন্দীপিতঃ,
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দন॥

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু



শ্রীমতী রাধা প্রেমময়ী। শ্রীকৃষ্ণের নিকট অভিলাষ প্রকাশ করলেন লীলামূর্তিতে একাত্ম রূপ পরিগ্রহ করতে। শ্রীকৃষ্ণেরও ঐ বাসনা। শ্রীমতী রাধার বাসনা শুনে তিনি পরম সুখী ও উৎসাহিত হলেন। কিন্তু তিনি রইলেন নীরব কণ্ঠ। বিলাসান্তে উভয়ে আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় শায়িত হলেন। যোগমায়ার প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গ রূপ নিলেন। শ্রীমতী রাধা সেই রূপাবলোকন করলেন। এই লীলার পর শ্রীকৃষ্ণ প্রকট হলেন নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ রূপে। শ্রুত্বা তু প্রেয়সী বাক্যং পরম প্রীতি-সূচক, স্বস্বেচ্ছাসীদ্ যথাপূর্বে

মুৎসাহেন জগদগুরুঃ।
প্রেমালিঙ্গন যোগেন চাচিন্ত্য
শক্ত যোগতঃ।
রাধাভাব কান্তিযুক্তাং
মূর্তিমেকাং প্রকাশয়েৎ।
স্বপ্নেতু দর্শয়ামাস রাধিকায়ৌ স্বয়ং প্রভুঃ।
অঙ্গোদ্বিভাবমাপন্নং স্বয়ং
কৃষ্ণ স্বরূপতঃ।।
—অন্তঃ কৃষ্ণং বহির্গৌরং
স্বয়োর্ভক্তি পরোদ্বিজাঃ।
প্রেমভাবসমাপন্নো নিরূপাধিঃ স্বয়ং হরি।।

চৈতন্য-চরিতামৃতে আছে—

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ পর-তত্ত্ব,
পূর্ণজ্ঞান পূর্ণানন্দ পরম মহত্ত্ব।
নন্দসুত বলি যাঁরে ভাগবতে গায়,
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোসাঞী।
প্রকাশ বিশেষে তেঁহো ধরে তিন নাম,
ব্রহ্ম, পরমাত্মা, আর পূর্ণ ভগবান্।

শ্রীকৃষ্ণ হলেন স্বয়ং ভগবান। তিনিই ধরাধামে চৈতন্য মহাপ্রভুরূপে আবির্ভূত। তাঁর অন্তরে কৃষ্ণ, বাহিরে গৌরবর্ণ। রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ চৈতন্য। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ রস এক দেহে আস্বাদনের জন্য চৈতন্য প্রভুরূপে আবির্ভূত।

সেই রাধার ভাব লঞা চৈতন্যাবতার,
যুগধর্ম নাম কৈল পরচার।
সেই ভাবে নিজ বাঞ্ছা করিল পূরণ,
অবতারের এই বাঞ্ছা মূল প্রয়োজন।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য গোসাঞী, ব্রজেন্দ্রকুমার,
রসময় মূর্তি-কৃষ্ণ—সাক্ষাৎ শৃঙ্গার।
সেই রস আস্বাদিতে কৈল অবতার,
আনুসঙ্গে কৈল সব রসের প্রচার।

রাধা-কৃষ্ণের যুগল মূর্তি শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর। তিনি আবির্ভূত হয়েছেন ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের আধিক্য দূর করতে।

সর্বভাবে কৈল কৃষ্ণ এইতো নিশ্চয়,
হেনকালে আইল যুগাবতার সময়।
সেই কালে শ্রীঅদ্বৈত করেন আরাধন,
তাঁহার হুংকারে কৈল কৃষ্ণ-আকর্ষণ।
পিতা-মাতা গুরুগণ আগে অবতারি,
রাধিকার ভাব-বর্ণ অঙ্গীকার করি।
নবদ্বীপে শচীগর্ভ শুদ্ধ দুগ্ধ সিন্ধু,
তাহাতে প্রকট হইল কৃষ্ণ পূর্ণ-ইন্দু॥

মহাপ্রভু অমৃতোপম লীলা-মাধুর্য বিকাশের জন্য নবদ্বীপে শচীদেবীর গর্ভে

১৪০৭ শকে ইং ১৪৮৬ খৃঃ ফাল্গুনী শুক্লা পূর্ণিমায় আবির্ভূত হন।

চৌদ্দশত সাত শকে মাঘ যে ফাল্গুনে
পৌর্ণমাসী সন্ধ্যাকালে হৈল শুভক্ষণে॥
সিংহলগ্ন সিংহরাশি উচ্চগ্রহগণ।
ষড়বর্গ অষ্টবর্গ সর্ব সুলক্ষণ।

নিম গাছের নীচে সূতিকাগৃহ থাকায় নাম হোল নিমাই। হরিনাম শুনে ক্রন্দনরত শিশু স্তব্ধ হতেন, তাই নাম হোল গৌরহরি। গৌরাঙ্গ নাম হয় গাত্রবর্ণ ছিল স্বর্ণ কাঞ্চনের জন্য। তিনিই আবার শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য। কেননা জীবমাত্রকেই দান করবেন শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য। তিনি প্রচার করবেন মধুময় প্রেমধর্ম। তাই নামসংকীর্তন

ধ্বনিত হবে দিকে দিকে। পাপী পাপমুক্ত হবে। ধরাধামে কলুষতা বিমুক্ত নতুন যুগের অভ্যুদয় ঘটবে।

চৈতন্য সমকালে নবদ্বীপ ছিল সংস্কৃতচর্চার পীঠস্থান। নানা জাতির বাসে সমগ্র অঞ্চল ছিল সুখ-শান্তিময়। মহাপ্রভুর তখনও আবির্ভাব হয়নি। সমগ্র শাস্ত্রশিক্ষার প্রবর্তন থাকলেও নবদ্বীপে তখনও ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু ভাগবত ধর্মের প্রতি ছিল চরম উপেক্ষা। ন্যায়শাস্ত্রচর্চা আর যুক্তি-তর্ক [illegible] আসক্ত তখন অধিকাংশ [illegible] ক্রমশঃ বিস্তারমান। [illegible] বাসুদেব সার্বভৌম মিথিলা [illegible]

থেকে পণ্ডিত বাসুদেব ন্যায়শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করে আনেন। তিনি নবদ্বীপে টোল খুলে ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষা দিতে থাকেন। তাঁর শিষ্য রঘুনাথ শিরোমণি মিথিলার অদ্বিতীয় পণ্ডিত পক্ষধর মিশ্রকে ন্যায়শাস্ত্র চর্চায় পরাস্ত করেন। রঘুনাথ ভট্টাচার্য স্মার্ত চূড়ামণি স্মৃতিশাস্ত্র চর্চায় নবদ্বীপকে নতুন রূপে পরিচিত করান। নবদ্বীপের শ্রীকৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ ছিলেন তন্ত্রসার প্রণেতা।

মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বেই সেন রাজত্বের অবসান ঘটেছে। দেশ তখন মুসলমানের অধীন। রাজধানী গৌড়। নবদ্বীপের শাসনকর্তা ছিলেন নবাবের প্রতিনিধি চাঁদ কাজী। জমিদারদের অধিকাংশ ছিলেন হিন্দু কায়স্থ। কিন্তু এর আগেই বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয় হিন্দু-ধর্মের বৈদিক আচার-অনুষ্ঠানের ওপর প্রবল আঘাত হানে। কিন্তু ক্রমশঃ বৌদ্ধধর্ম তন্ত্র প্রভাবে বিকৃত রূপ নেয়। তান্ত্রিকরাও কদাচারে লিপ্ত হয়ে পড়ে। নাস্তিক হিন্দুরা তখন এমনভাবে জীবন যাপন করছিল, ধর্ম যার মধ্যে কোন প্রভাবই রাখতে পারেনি। নবদ্বীপ ভক্তবৈষ্ণব ও সাধকরা পদে পদে লাঞ্ছিত হতেন। হরি-ধ্বনি ছিল লোকের কাছে উপহাসের বস্তু। কিছুকাল এই অবস্থা চলবার পর মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব।

মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে কয়েক-জন ভক্ত বৈষ্ণব আবির্ভূত হয়েছিলেন। বীরভূমে নিত্যানন্দ প্রভু, চট্টগ্রামে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, বাসুদেব দত্ত, শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য, নবদ্বীপে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীধর, গদাধর পণ্ডিত, শ্রীহট্টে মুরারি গুপ্ত, চন্দ্রশেখর আচার্য, শ্রীবাস পণ্ডিত, এবং আরও কয়েকজন শ্রীচৈতন্যের অনুচর-পদ লীলা-সহচর [illegible] পূর্বক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন।

[illegible]

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাব মহোৎসব



দেশবন্ধু পার্ক

অনুষ্ঠান সূচী

২৯শে ফাল্গুন, ১৩৭৪ (ইং ১৩ই মার্চ, ১৯৬৮) বুধবার :

সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায়—শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবাহন-অভিষেক-অর্চনা।

সন্ধ্যা ৭টায়—অধিবাস কীর্তন।

●

৩০শে ফাল্গুন, (১৪ই মার্চ), বৃহস্পতিবার :

প্রাতঃকাল ৫ ঘটিকায়—মঙ্গলারাত্রিক অন্তে ষোল প্রহরব্যাপী শ্রীশ্রীনামযজ্ঞ আরম্ভ।

সন্ধ্যা ৬টায়—মহতী জনসভা :

সভাপতি—শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী; প্রধান অতিথি—শ্রীমৎ স্বামী অসীমানন্দ সরস্বতী; উদ্বোধক—প্রভুপাদ শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গোস্বামী; মঙ্গলাচরণ—শ্রীমৎ স্বামী চিন্ময়ানন্দজী; স্বাগত ভাষণ—প্রভুপাদ শ্রীপ্রাণকিশোর গোস্বামী; বক্তা—অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস; শ্রীঅচিন্ত্য-কুমার সেনগুপ্ত; উদ্বোধন সঙ্গীত—শ্রীমাধবী ব্রহ্ম; ধন্যবাদ জ্ঞাপন—শ্রীতুষার-কান্তি ঘোষ। রাত্রি ৮ ঘটিকায়—বিশিষ্ট শিল্পিবৃন্দের কীর্তন ও ভজন।

●

১লা চৈত্র (১৫ই মার্চ), শুক্রবার :

বৈকাল ৫টায়—শ্রীরামরতন সাংখ্যশাস্ত্রী কথক সম্রাট কর্তৃক ভাগবত পাঠ, বৈকাল ৬টায়—বাউল গানে—শ্রীঅমর পাল ও সম্প্রদায়। ভজন—শ্রীবাণী ঘোষ। রাত্রি সাতটায়—শিশিরকুমার ইনস্টিটিউটের সভ্য-বৃন্দের "শ্রীনিমাই-সন্ন্যাস" নাট্যাভিনয়।

২রা চৈত্র (১৬ই মার্চ), শনিবার :

বৈকাল পাঁচটায়—শ্রীরাধারমণ কীর্তন সমাজ কর্তৃক 'অমিয়-নিমাই' (নদীয়ালীলা) কীর্তন। সন্ধ্যা ৭টায়—হাওড়া সমাজের "নদের নিমাই" কীর্তনাভিনয়।

গৌরাঙ্গের দুটি পদ,
যার ধন সম্পদ,
সে জানে ভকতি রস-সার।।
গৌরাঙ্গের মধুর লীলা,
যার কর্ণে প্রবেশিলা,
হৃদয় নির্মল ভেল তার।।
যে গৌরাঙ্গের নাম লয়,
তার হয় প্রেমোদয়,
তারে মুই যাই বলিহারি।

গৌরাঙ্গ গুণেতে ঝুরে,
নিত্যলীলা তারে স্ফুরে,
সেজন ভকতি-অধিকারী।।
গৌরাঙ্গের সঙ্গীগণে,
নিত্যসিদ্ধ করি মানে,
সে যায় ব্রজেন্দ্রসুত পাশ।
শ্রীগৌড় মন্ডলভূমি,
যেবা জানে চিন্তামণি,
তার হয় ব্রজভূমে বাস।।



গৌরাঙ্গ পরিজন

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

(৭১)

রূপ গোস্বামী

(ক)

রামকেলিতে প্রভুর সঙ্গে দেখা হবার পর থেকেই সনাতনের সঙ্গে-সঙ্গে রূপও আরেক রকম হয়ে গিয়েছে।

চাকরিতে আর স্পৃহা নেই। চাকরির ফলে বিস্তর পয়সা হয়েছে। বিষয়ত্যাগ না করলে মনে-প্রাণে ভজন করা অসম্ভব। কিন্তু এই বিষয় নবাব বাজেয়াপ্ত করুক এও অসহ্য।

সনাতনের সঙ্গে-সঙ্গে রূপও কৃষ্ণ-মন্ত্রের পুরশ্চরণ করল যাতে অচিরে চৈতন্যচরণ পেতে পারে।

নবাবের কাছে ছুটি চেয়ে ছুটি পেল রূপ। নৌকোতে ভরে অতুল ঐশ্বর্য নিয়ে নিজের গ্রামে, মুর্শিদাবাদ জেলার মাড়গ্রামে, এসে পৌঁছুল। এত ধন নিয়ে সে কী করে, কাকে দেয়? অর্ধেক দিয়ে দিল ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের সেবায়, বাকি অর্ধেকের অর্ধেক দিল আত্মীয়-কুটুম্বকে, আর অবশিষ্ট বিশ্বাসী এক ব্রাহ্মণের কাছে গচ্ছিত রাখল যদি রাজদণ্ডে জরিমানা দিতে হয়। সনাতনের জন্যে গৌড়ে এক মুদির দোকানে দশ হাজার টাকা রেখে এসেছে।

নীলাচলে রূপ লোক পাঠাল প্রভু কখন বৃন্দাবন রওনা হন আমাকে খবর দেবে। আমি অপেক্ষা করছি।

রূপ সনাতনকে চিঠি লিখে পাঠাল: আমি আর অনুপম বৃন্দাবনে যাচ্ছি প্রভুর চরণবন্দন করতে। তুমি যেমন করে পারো চলে এস। মুদির কাছে দশ হাজার টাকা রেখে এসেছি, তাই মুক্তিপণ দিয়ে বেরিয়ে এস কারাগার থেকে।

প্রয়াগে এসে শুনল প্রভু এখানে আছেন। শুনে আনন্দের তরঙ্গে ভাসতে লাগল। আরো শুনল প্রভু চলেছেন বিন্দু-মাধবদর্শনে। দু ভাই রূপ আর অনুপম চলল এগিয়ে। দেখল পথে লক্ষ লোকের জনতা। কেউ নাচছে গাইছে কেউ-কেউ বা কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলে পথে গড়াগড়ি দিচ্ছে।

ভিড় থেকে দু ভাই সরে দাঁড়াল। তারা বুঝি পতিত, তারা বুঝি কলুষিত।

দক্ষিণ ভারতের এক বিপ্র প্রভুকে তার গৃহে নিমন্ত্রণ করে নিল। সেইখানে রূপ আর অনুপম হাজির হল। দশনে দুই গুচ্ছ তৃণ ধরে দুজনে প্রভুর উদ্দেশে দূর থেকেই পড়ল দণ্ডবৎ হয়ে।

প্রভু প্রসন্নমুখে বললেন, ওঠো, এস আমার কাছে। কৃষ্ণের করুণা অপরিসীম। তোমাদের বিষয়কূপ থেকে উদ্ধার করে এনেছেন। চতুর্বেদী ব্রাহ্মণও আমার অপ্রিয় যদি সে ভক্তিহীন হয়, আর চণ্ডালও আমার প্রিয় যদি সে আমাতে ভক্তিমান থাকে। সুতরাং সে ভক্ত চণ্ডালকেই সংপাত্র মনে করে দান করবে, তার বস্তুই গ্রহণ করবে, তাকে পূজা করবে আমার মত। বলে প্রভু দু ভাইকে আলিঙ্গন করলেন, চরণ রাখলেন মাথার উপরে। তোমরাও যে ভক্তিধনে ধনী, আমার হৃদয়গ্রাহ্য।

দুভাই প্রভুকে স্তুতি করল। কৃষ্ণ-প্রেমদাতা মহাবদান্য কৃষ্ণচৈতন্যনামধারী গৌরতনু কৃষ্ণকে প্রণাম করি।

প্রভু বললেন, সনাতনের কথা বলো।

সে তো রাজগৃহে বন্দী হয়ে আছে। বললে রূপ, তুমি যদি উদ্ধার করো তবেই তার মুক্তি সম্ভব। নচেৎ নয়।

প্রভু বললেন, ভয় নেই, শিগগিরই সনাতন মুক্ত হবে। মিলন হবে আমার সঙ্গে।

দাক্ষিণাত্যে বিপ্রের গৃহেই দুভাই স্থান পেল। তাদেরকে প্রভুর দেখা এনে দিল বল্লভ।

ত্রিবেণীসঙ্গমের কাছেই প্রভুর থাকবার জায়গা ঠিক হল। দু ভাই রূপ আর অনুপম কাছেই বাসা নিল। বিপরীত তীরের আড়েল গ্রাম থেকে দেখা করতে এল বল্লভ ভট্ট। যার এত ভাবভক্তির কথা শুনি তাকে দেখে আসি স্বচক্ষে।

দেখতে এসেই চক্ষুস্থির। কে এ সানন্দসুন্দর লাবণ্যপ্রদীপ! তখুনি দন্ডবৎ করল বল্লভ। প্রভু তাকে আলিঙ্গন করলেন। সুরু হল কৃষ্ণকথা, আর কৃষ্ণকথা সুরু হলে সাধ্য কী প্রেম সংবরণ করো!

প্রভুকে বল্লভ নিমন্ত্রণ করল নিজগৃহে। এই দুই ভাইকে দেখুন। রূপ আর অনুপম। অনুপমেরও আরেক নাম বল্লভ। বল্লভ এগিয়ে এল, দুভাই দূরে পালাল। বললে, আমরা অস্পৃশ্য পামর, আমাদের ছুঁয়ো না।

সে কী কথা! বল্লভ তাকাল প্রভুর দিকে।

পান্ডিত্যাভিমানী বল্লভের চিত্তবৃত্তি পরীক্ষা করবার জন্যে প্রভু বললেন, হ্যাঁ, ঠিকই বলেছে, তুমি বৈদিক যাজ্ঞিক কুলীন, তুমি এদের ছুঁয়ো না, এরা হীন জাতি।

হীন জাতি! বিস্ময় মানল বল্লভ: কিন্তু এদের মুখে যে কৃষ্ণনাম নর্তন করছে। এরা অধম নয়, এরা সর্বোত্তম।

হ্যাঁ, তুমি ঠিক বলেছ। বললেন প্রভু যার ভক্তি নেই তার জপতপ শাস্ত্রজ্ঞান মৃতদেহের অলংকারের মতই অসার। নীচ-কুলে জন্মেও যে ভক্ত, তার ভক্তির অগ্নিতে সমস্ত কল্মষ দগ্ধ করে দিয়েছে। সে পন্ডিতদেরও মাননীয়।

নির্জনতার আশায় প্রভু প্রয়াগে দশাশ্বমেধঘাটে এলেন। রূপকে নিলেন সঙ্গে, শিক্ষা দিতে বসলেন। কৃষ্ণতত্ত্ব, রস-তত্ত্ব, সমস্ত ভাগবত-সিদ্ধান্ত। রামানন্দের সঙ্গে বসে যত মীমাংসা করেছিলেন--সমস্ত। পরে বললেন, এবার বৃন্দাবনে যাও। শোনো তবে ভক্তিরসের লক্ষণ।

ভক্তিরস সিন্ধু, পারাপারশূন্য গম্ভীর। তোমার আস্বাদের জন্যে শুধু একবিন্দু উপহার দিচ্ছি। কেশাগ্রের শত ভাগকে বহু শত বার বিভাগ করলে যে বস্তু হয়, জীব সেই সূক্ষ্মতম বস্তু, সংখ্যার অন্তহীন। স্বীয় কর্মফলে চৌরাশি লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ করছে। সে ঈশ্বরের শাসনাধীন। ঈশ্বর নিয়ন্তা, জীব নিয়ম্য। জীবের মধ্যে আবার দুরকম ভেদ—স্থাবর আর জঙ্গম। যারা অচল, যেমন বৃক্ষ, তারা স্থাবর জীব আর যারা সচল তারাই জঙ্গম জীব। জঙ্গমে আবার তিন রকম ভেদ—জলচর স্থলচর, তির্যক। মানুষ স্থলচরের মধ্যে। সমগ্র জীবমন্ডলের তুলনায় অত্যল্প। আবার মানুষের মধ্যেও কত কম লোক বেদনিষ্ঠ। যারা বেদনিষ্ঠ অর্থাৎ যারা বেদ মানে তাদের মধ্যে অর্ধেক শুধু মুখে মানে প্রাণে মানে না, অর্থাৎ বেদনির্দিষ্ট কর্ম করে না, বরং বেদনিষিদ্ধ পাপকর্ম করে। যারা বেদবিহিত কর্ম করে তাদের মধ্যে জ্ঞানীই বা কজন? কোটি কর্মনিষ্ঠের চেয়ে একজন জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানী জীব-ব্রহ্মের অভেদ মানলেও ভক্তিহীন থাকতে পারে না জ্ঞানীও ভক্তির জোরেই ব্রহ্মের সাক্ষাৎ চায়।

কোটি-কোটি জ্ঞানীর মধ্যে বা[illegible] একজন মাত্র মুক্ত হন। আর কোটি মুক্তমধ্যে বা[illegible] একজন মাত্র কৃষ্ণভক্ত হন। [illegible] [illegible] কৃষ্ণভক্তের সংখ্যা কত সামান্য। [illegible] [illegible] [illegible]।

কৃষ্ণভক্ত [illegible] [illegible]

কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

একটি প্রাচীন চিত্র : ছয় গোঁসাই



শ্রীপাদ গোপালভট্ট গোস্বামী, শ্রীপাদ রঘুনাথভট্ট গোস্বামী, শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী, শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী, শ্রীপাদ জীব গোস্বামী, শ্রীপাদ রঘুনাথদাস গোস্বামী।

যারা ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী তারা অশান্ত। ব্রহ্মাণ্ডে নানা যোনিতে ভ্রমণ করতে-করতে কোনো ভাগ্যবান জীব গুরুকৃপায় বা কৃষ্ণ-কৃপায় ভজনাকাঙ্ক্ষা পেয়ে যায়। শুধু মহৎ-কৃপাই কৃষ্ণভক্তির উৎস।

মহৎকৃপা ছাড়া কিছু হবার নয়। 'মহৎ-কৃপা বিনা কোন ধর্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণ-ভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়।।' আর এই মহৎ-কৃপা দুই রূপে অভিব্যক্ত হয়—হয় গুরুরূপে নয় অন্তর্যামিরূপে। 'কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখায় আপনে।।' অন্ত-র্যামি বা চৈত্তাগুরুর ইঙ্গিত জীব সহজে বুঝতে পারে না, তাই কৃষ্ণ সাধারণত মহান্ত বা গুরুরূপে জীবকে কৃপা করে। 'জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরুচৈত্ত্যরূপে। শিক্ষাগুরু হয় কৃষ্ণ মহান্তস্বরূপে।।'

ভাগ্যবান হব কিসে? সাধুসঙ্গে। সাধুসঙ্গ করে মহৎকৃপা আকর্ষণ করব। আর সেই মহৎকৃপার ফলে কৃষ্ণভক্তি জাগবে। যদি সেই ভজনপ্রবৃত্তি জাগে, তবে তা ভাগ্য ছাড়া আর কী।

তারপর সেই বীজে জলসেচন করো। শ্রবণকীর্তনই সেই জলসেচন। জলে লতার বৃদ্ধি। শ্রবণকীর্তনেই ভজনেচ্ছা বলবতী। বীজ থেকে অঙ্কুর, অঙ্কুর থেকে লতা। জলসেচনে বাড়তে-বাড়তে লতা শেষপর্যন্ত কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে আরোহণ করে—বৃক্ষকে আশ্রয় করে লতা ক্রমশই বিস্তারিত হতে থাকে, পুষ্পিত ও ফলান্বিত হয়। কী ফল ধরে? আর কী! প্রেমফল।

দেখো যেন বৈষ্ণবাপরাধ করে বোসো না। বৈষ্ণবকে প্রহার করা, নিন্দা করা, দ্বেষ করা, অনাদর করা, ক্রোধ করা, বৈষ্ণবদর্শনে হর্ষ প্রকাশ না করা— এই সব বৈষ্ণবাপরাধ। বৈষ্ণবাপরাধ যেন মত্ত হাতি, অনায়াসেই ভক্তিলতার মূলোচ্ছেদ করে দিতে পারে। সুতরাং সাবধানতার বেড়া দাও। যাতে মূল না ছেঁড়ে, পাতা না শুকোয়। নিরন্তর জলসেকে লতাকে সজীব রাখো।

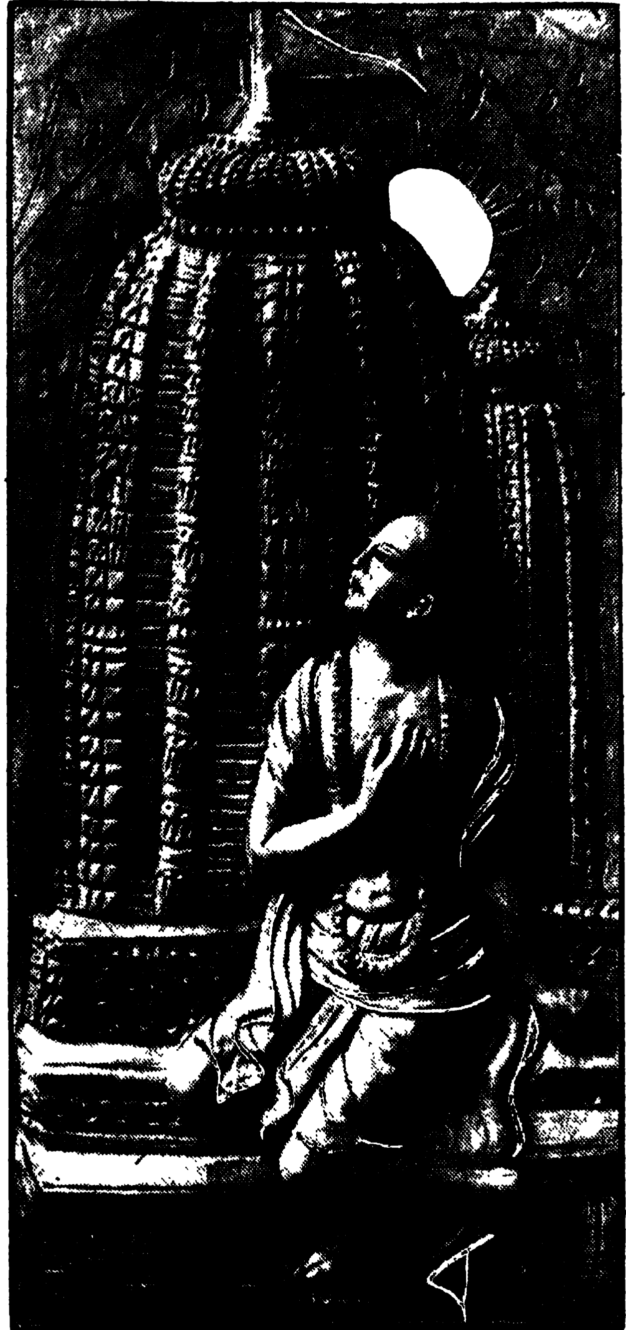
আরো দেখো—লতার অঙ্গ থেকে উপ-শাখা না ওঠে। উপশাখা কী? ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা উপশাখা। নিষিদ্ধাচার, প্রাণিহিংসা, লাভপ্রতিষ্ঠা, কুতর্ক-কুটিলতা উপশাখা। উপশাখা জন্মালে লতার পুষ্টির ব্যাঘাত ঘটে। কৃষ্ণভক্তি ছাড়া অন্য কামনাই দুর্বাসনা। আর দুর্বাসনাই দুঃসঙ্গ।

যদি দেখ উপশাখা জন্মাচ্ছে, সূচনাতেই তা ছিন্ন করবে। বাড়তে দেবে মূলশাখাকে। যত জলসেক সব এই মূলশাখায়।

তারপরেই কালক্রমে লতায় ফল ধরবে, ফল পাকবে। সেই তো প্রেমফল। পরম-ফল।

'প্রেমফল পাকি পড়ে মালী আস্বাদয়।' সেই ফলই পঞ্চম পুরুষার্থ। তার কাছে আর চার পুরুষার্থ—ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ তৃণতুল্য।

পুরীধামে মহাপ্রভু।



যে একবার কৃষ্ণপ্রেমের স্বাদ পেয়েছে তার কাছে অষ্টসিদ্ধি বা সমাধি দূরের কথা, ব্রহ্মানন্দও স্পৃহনীয় নয়।

যে শুদ্ধ ভক্ত, তার কৃষ্ণ ছাড়া অন্য বাঞ্ছা নেই, অন্য পূজা নেই। তার সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন। চোখে বিগ্রহ-দর্শন, কানে নামগুণশ্রবণ, নাকে প্রসাদী তুলসী ও ফুলের ঘ্রাণগ্রহণ, জিভে নাম-কীর্তন, ত্বকে গন্ধমাল্যের স্পর্শানুভব, হাতে মন্দিরমার্জন, পায়ে তীর্থভ্রমণ, মনে লীলাস্মরণ, বুদ্ধিতে কৃষ্ণসংকল্পগ্রহণ, অহংকারে কৃষ্ণদাসত্বের অভিমান-পোষণ আর চিত্তে কৃষ্ণানুসন্ধান। যেহেতু কৃষ্ণই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর, ইন্দ্রিয় দ্বারাই

তাঁর সেবা করবে। কৃষ্ণানুকূল্যে ইন্দ্রিয়ের যে সেবা তাই ভক্তি। স্বসুখবাসনাহীনা কৃষ্ণসুখসাধিনী সেবা। অবিচ্ছিন্না, অনিমিত্তা, অব্যবহিতা।

ব্রজগোপীরাই মধুর রসের মুখ্য ভক্ত। কৃষ্ণের ঐশ্বর্য দেখলেও তাদের প্রীতি সংকুচিত হয় না। কৃষ্ণ পরিহাস করলে রুক্মিণীর ভয় হয়, কৃষ্ণ বুঝি তাকে ত্যাগ করবে। ব্রজগোপীদের সেই ভয় নেই। কৃষ্ণের মুখে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড দেখেও যশোদা সংকুচিত হল না, আপন গর্ভের পুত্র মনে করেই বুকে চেপে ধরল, সমস্ত তত্ত্বজ্ঞানকে আড়াল করল তার বাৎসল্য। কৃষ্ণের অনেক ঐশ্বর্য জেনেও শ্রীদামের সখ্যভাব সংকুচিত হয়নি। অনায়াসে কৃষ্ণকে কাঁধে করেছে, কখনো বা নিজেই চড়েছে কৃষ্ণের কাঁধে। বনপথে চলতে-চলতে শ্রান্ত রাধিকা কৃষ্ণকে বললে, আমি আর হাঁটতে পারছি না, আমাকে বহন করে নিয়ে চলো। কৃষ্ণ বললে, বেশ, আমার কাঁধে ওঠো। রাসলীলায় কৃষ্ণের অনেক ঐশ্বর্য দেখেছে রাধা, তবু তার মধুরারতি সংকুচিত হয়নি। কে বলে কৃষ্ণ ঈশ্বর, রাধার কাছে সে তার প্রাণবল্লভ ছাড়া কিছু নয়।

ঈশ্বরে নিষ্ঠাবুদ্ধির নাম শম, ইন্দ্রিয়-সংযমের নাম দম, দুঃখসহিষ্ণুতাই তিতিক্ষা, আর জিহ্বোপস্থের জয়ই ধৃতি। শান্ত রসের কাজ কী? 'কৃষ্ণবিনা তৃষ্ণাত্যাগ।' শান্ত অকুতোভয়, স্বর্গ-অপবর্গ আর নরক সমান দেখে। কিন্তু তার কৃষ্ণে মমত্ববোধ নেই। তার শুধু কৃষ্ণের স্বরূপজ্ঞান। দাস্যে সম্ভ্রমগৌরব। অধিকন্তু সেবা। সখ্যে দাস্যের চেয়ে মমতা বেশি। পরস্পরে অপার্থক্য। সখ্য বিশ্রম্ভপ্রধান। বাৎসল্যে সখ্যের অসংকোচ সেবা তো আছেই, আছে আবার মমতা-আধিক্যে তাড়ন-ভর্ৎসন। মধুরে এ সমস্ত তো আছেই, শান্তের নিষ্ঠা, দাস্যের সেবা, সখ্যের অসংকোচ, বাৎসল্যের মমতা—সর্বোপরি আছে কান্তভাবে অঙ্গদান সেবা। মধুরেই সর্বভাবের সমাহার। 'এই মত মধুরে সর্বভাব-সমাহার। অতএব স্বাদাধিক্যে করে চমৎকার।।'

শিক্ষাদানের পর প্রভু বললেন, আমি এবার কাশী যাব।

রূপ আর অনুপম সঙ্গী হতে চাইল। প্রভু বললেন, বলেছি তোমরা বৃন্দাবনে যাবে। সেখানে কিছুদিন কৃষ্ণভজন করো। পরে নীলাচলে গিয়ে আমার সঙ্গে মিলবে।

রূপকে আলিঙ্গন করলেন প্রভু। অন্তরে শক্তি সঞ্চার করে দিলেন।

প্রভুর আজ্ঞায় বৃন্দাবনেই গেল রূপ। তার কৃষ্ণলীলা নাটক লেখবার অভিলাষ হল। গ্রন্থারম্ভের মঙ্গলাচরণ ও নান্দীশ্লোক লিখে ফেলল। কিন্তু প্রভু যদি নীলাচলে গিয়ে থাকেন, আমিও তবে সেইখানে গিয়ে আশ্রয় নিই। অনুপম বললে, আমিও যাব। দুই ভাই প্রয়াগ হয়ে কাশী হয়ে পৌঁছুল গৌড়ে। গৌড় থেকেই যাত্রা করব নীলাচল।

নবদ্বীপে পূজিত মহাপ্রভুর এই রূপবিগ্রহ শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার নির্দেশে নির্মিত হয় এবং তিনি এটির পূজা করতেন।



গৌড়ে এসে অনুপম অসুস্থ হয়ে পড়ল। রূপ অনেক পরিচর্যা করল কিন্তু অনুপম তারকব্রহ্ম নাম করতে-করতে গঙ্গা-প্রাপ্ত হল।

রূপের তাই দেরি হয়ে গেল। গৌড়ীয় ভক্তদের সঙ্গ নিতে পারল না। সে একা-একা চলল।

পথে যেতে-যেতে সে তার নাটকের কথা ভেবেছে, কখনো বা খসড়া করেছে। নাটকের কথাই তো কৃষ্ণের কথা। আর কৃষ্ণ এখন কোথায় সশরীরে?

নীলাচলে।

পথে সত্যভামাপুরে একরাত্রি বিশ্রাম করল রূপ। রাত্রে স্বপন দেখল এক দিব্য-রূপা নারী তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। জিজ্ঞেস করে জানল সে দ্বারকাধীশ কৃষ্ণের মহিষী সত্যভামা। আদেশ করল, আমার নাটক আলাদা করে লেখ, ব্রজলীলা আর দ্বারকালীলা মিশিয়ে দিও না।

এই নির্দেশের তাৎপর্য বুঝতে পারল রূপ। যেন মাধুর্য আর ঐশ্বর্যকে একত্র না করি।

ভাবতে ভাবতে রূপ হরিদাসের বাসায় এসে উঠল। আগে ভক্তকে স্বীকার করি, পরে ভগবানকে স্বীকার করব। ভাগবতেও আগে ভক্তের কথা, পরে ভগবানের।

প্রত্যহই প্রভু এসে হরিদাস ও রূপের সঙ্গে মিলিত হন, ইষ্টগোষ্ঠী করেন, অর্থাৎ করেন কৃষ্ণালোচনা। মন্দির থেকে যে প্রসাদ পান তাই বণ্টন করে দেন।

একদিন ভক্ত সমাবেশে প্রভু রূপকে উদ্দেশ করে বলে উঠলেন, কৃষ্ণকে ব্রজের

থেকে বার কোরো না। ব্রজ ছেড়ে কৃষ্ণ কোথাও কখনো যাননি।

এর তাৎপর্য কী?

তাৎপর্য প্রকট লীলায় কৃষ্ণ ব্রজ ছেড়ে অন্যত্র যান কিন্তু অপ্রকট লীলায় বৃন্দাবনেই বন্দী থাকেন। অর্থাৎ যে ঘটনার উপলক্ষে কৃষ্ণকে ব্রজ ছেড়ে অন্যত্র যেতে হচ্ছে সে সব ঘটনা তোমার নাটকে বর্ণনা কোরো না। শুধু ব্রজলীলাতেই আবদ্ধ রেখো। তোমার নাটক ব্রজলীলায় সুরু, ব্রজলীলায় শেষ। তাতে মথুরা-দ্বারকার কীর্তি-কাহিনী যেন না থাকে। তোমার নাটকে শুধু বৃন্দাবনই নন্দিত হোক।

রূপ বিস্ময় মানল। সত্যভামা বলে গেল, আমার পুরলীলার নাটক আলাদা লেখ তখন রাধাবিভাবিতচিত্ত প্রভু বলছেন, ব্রজলীলার নাটক যেন পৃথক হয়। দুই ধামের দুই কৃষ্ণপ্রেয়সী ভিন্নভাবে একই আদেশ করলেন।

তাই হবে। দুই ভাগে ভাঙব নাটককে। নান্দী-প্রস্তাবনাও আলাদা হবে। বৃন্দাবন নিয়ে লিখব 'বিদগ্ধ মাধব' আর দ্বারকা-মথুরা নিয়ে লিখব 'ললিত মাধব'।

কিন্তু রথাগ্রে নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রভু এ কোন শ্লোক আবৃত্তি করছেন? 'যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরঃ—' যে আমার কৌমারহরণ করেছিল সেই আমার মনোনীত বর। সেই চৈত্র রাত্রি মধুযামিনী উপস্থিত। সেই মালতী উন্মীলিত। সুরভিপ্রৌঢ় সেই কদম্ববনবায়ু। আমিও সেই নায়িকা সমুৎসুকা। তবুও আমার চিত্ত এ অবস্থায় সন্তুষ্ট না হয়ে রেবাতটের বেতসী তরুতলের জন্যে উৎকণ্ঠিত।

প্রভু কেন এই শ্লোক এত আদরের সঙ্গে পড়ছেন মর্মজ্ঞ রূপ সহজেই বুঝতে পারল। সে একটি সমার্থবহ শ্লোক রচনা করল, তারপর সেটি তালপত্রে লিখে কুটিরের চালায় গুঁজে রেখে সমুদ্রস্নান করতে গেল।

কুটিরে প্রভু হঠাৎ এসে উপস্থিত হলেন। চালের মধ্যে গোঁজা তালপাতার নজর পড়তেই সেটি টেনে আনলেন। দেখলেন তাতে একটি শ্লোক লেখা। আহা, কী মধুর সে শ্লোক! প্রভুর যে গোপনভাব শুধু স্বরূপ দামোদর জানে তা রূপ টের পেল কী করে?

স্নানান্তে রূপ এসে প্রণত হতেই প্রভু তাকে এক চড় মারলেন। ক্রোধের চড় নয়, স্নেহের চড়। বললেন, তুমি আমার অন্তরের গোপন কথা কী করে জানলে? তোমায় কে বলল? কে বোঝাল?

স্বরূপকে পড়তে দিলেন।

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্র-মিলিতঃ—'হে সহচরি, আমার সেই দয়িত কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে মিলিত হয়েছেন, আমিও সেই রাধা, আমাদের এই মিলনও সুখদায়ক, তবুও আমার চিত্ত চঞ্চল কৃষ্ণের মুরলী-ধ্বনিতে আনন্দপ্লাবিত কালিন্দীপুলিনের কাননের জন্যে উৎকণ্ঠিত।

প্রভু রূপকে গাঢ় আলিঙ্গন করলেন। কী করে জানতে পারলে আমার নিগূঢ় ভাব?

শুধু তোমার কৃপাশক্তিতে। বললে স্বরূপ, তোমার কৃপা ছাড়া তোমার মনের ভাব বোঝে কার সাধ্য? শ্লোক উচ্চারিত হোক, বাচ্যার্থ প্রাঞ্জল হোক, নিহিত সত্যকে বুঝতে হলে তোমার কৃপা দরকার।

আরেক দিন, নাটক লিখছে রূপ। প্রভু পাশে বসে জিজ্ঞেস করলেন, কী লিখছ? বলেই এক পত্র ধরে টান মারলেন।

কী সুন্দর হস্তাক্ষর! যেন মুক্তোর সার। প্রভু অক্ষরের স্তুতি করলেন। যেমন লিপি তেমনি রচনা! কী অপূর্ব শ্লোক! 'তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে—'

'কৃ' আর 'ষ্ণ' এই দুটি অক্ষর কী অমৃতে তৈরি বলতে পারো কেউ? এই দুটি শব্দ যদি একত্র হয়ে নাচতে আরম্ভ করে, ইচ্ছে হয় আরো শত-শত জিহ্বায় এই নাচের আসর বসুক, যদি এক কানে তা প্রবেশ করে, ইচ্ছে হয় আরো শত-শত কানে তা বিস্তৃত হোক, আর যদি একবার তা চিত্ত-প্রাঙ্গণের সঙ্গিনী হয় অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের শত-শত ঘরে খিল পড়ে যাক।

তার মানে এক মুখে কত বলব, অসংখ্য মুখ অসংখ্য জিহ্বা পাবার আকাঙ্ক্ষা হয়। দুই কানে নামসুধা কতটুকু পান করব, ধ্বনির অমৃত ধরবার জন্যে অসংখ্য কান দাও। ইন্দ্রিয়সমূহ যতই প্রবল হোক, নামের সামনে তাদের অস্তিত্ব নেই, তারা তখন মন্ত্রশান্ত, বিলয়তন্ময়। নদীতে বান এলে যেমন খাল-বিল জলা-নালা জলে একাকার হয়ে যায় তেমনি নামসমুদ্র উথলে উঠলে সমস্ত ইন্দ্রিয় ডুব মেরে তলিয়ে যায় অতলে। এমন কৃষ্ণনাম কোন মধুতে প্রস্তুত।

হরিদাস উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। বললে, শাস্ত্রে আর সাধুমুখে কৃষ্ণনামের অনেক মহিমা শুনেছি কিন্তু এমনটি কখনো শুনিনি। যেমন নাম তেমনি তার ব্যাখ্যা। মধুরে-মধুরে কোলাকুলি।

(ক্রমশঃ)

মহাপ্রভুর মিলনযাত্রা



শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমে জগাই-মাধাই'র হৃদয় পরিবর্তন।

নির্মলার এক সন্ধ্যা



শান্তি পাল

ঠিক এসময় নিজেকে খুব একা মনে হয়। যখন শেষ বেলার চিকন রোদের রঙ জানলার গরাদ থেকে কার্পেটের কোণ থেকে আস্তে আস্তে মুছে আসে। ঘরের কোণে ইতস্তত ঝুপসি ঝুপসি ছায়া ছড়ায়। তখন ভীষণ নিরাশ্রয় বোধ করে নির্মলা। ভীষণ খণ্ডিত। ধূসর হয়ে আসা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তেলচিটে পাউডারের তুলিটা চকিতে একবার বুলিয়ে নেয় গালের ওপর। চোখের কোণ দিয়ে তাকায় তক্তপোষের দিকে। ওখানে একটা মানুষ শুয়ে অথবা শুধু চাদরটা এলোমেলোভাবে বিছানো, কিছু বোঝবার উপায় নেই। অথচ দ্যাখো ঐ প্রায়-অস্তিত্বহীন রহস্য রাত্রিদিন তার দিকে তাকিয়ে আছে, পাহারা দিয়ে আছে যেন। বলে না কিছুই তবু রোগজীর্ণ অক্ষম দুটো চোখের তারা অনবরত অনু-সরণ করে ফিরছে তাকে। ব্যাধের মত, শিকারী শ্বাপদের মত। ছি, মনে মনে জিভ কাটল নির্মলা। শত হলেও জন্মদাতা বাপ। রক্তের ঋণ মানুষকে শোধ করতেই হয়। এসব কথা মা শেখায় তাকে। কিন্তু রক্তের ঋণ কি এত? মা কিসের ঋণ শোধ করছে তবে? সম্পর্কের? আমার দেখতে ইচ্ছে করে, নির্মলা ভাবল, পৃথিবীর কটা মেয়ের অদৃষ্টে এমন দুর্বহ কর্তব্যের ভার অনড় হয়ে রয়েছে। চোখ ফেটে জল আসার মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল নির্মলা। অন্য কথা ভাবার চেষ্টা করল। এসব ভাবালুতা তার ভাল লাগে না। আসলে ঠিক এই সময়টাই ওর কি যেন হয়। পৃথিবীর তাবৎ মানুষ পারিপার্শ্বিক এমনকি নিজেরও ওপর ঘৃণা জন্মে যায়। অথচ অন্য সময় বাপ-মায়ের সঙ্গে কথার একটু অন্যথা হলে ভাইদের সঙ্গে বচসা হলে চীৎকার করে রেগে কেঁদে এক কাণ্ড করে ফেলে নির্মলা। মনোভাব চেপে রাখার মত শিক্ষা কোনদিন নির্মলার নেই। রেগে গেলে ওর মুখকে পাড়া-প্রতিবেশীরা পর্যন্ত ভয় করে। ঝগড়ায় পটু বলে ওর নাম আছে পরিচিত মহলে। তা থাক। ঝগড়া করে আবার রাগ পড়ে গেলে হেসে কথা বলতেও তো দ্বিধা থাকে না নির্মলার। অসুস্থ বাপের সেবায় প্রাণ ঢেলে দিতে নির্মলা একদিনো বিরক্তি করেনি।

ঘরের কোণে কোণে ঝুলের মত জমানো আবছায়া ক্রমশ গাঢ় হয়ে ইতস্তত বিবর্ণ বস্তুগুলোকে ক্রমশ দুর্লক্ষ্য করে তুলছিল। অন্ধকার আয়নায় নিজের ছায়াটাকে অশরীরীর মতন লাগতে তাড়া-তাড়ি সরে এল নির্মলা। পায়ে পায়ে তক্তপোষের কাছে এসে দাঁড়াল। এলোমেলো বিছানো চাদরের নীচে নিবারণ এখনো দুপুরের ঘুম থেকে জাগেনি। আশ্চর্য একটা ব্যতিক্রম বলতে হবে আজ। অন্যদিন এই সময়টা, এই ঘনিয়ে আসা সন্ধ্যায় গলা পর্যন্ত মুড়ি দিয়ে কেবল ড্যাবডেবে দুটো চোখ মেলে চারিদিকে তাকিয়ে দেখে আর মাঝে মাঝে ছটফটিয়ে ওঠে নিবারণ। বলে, ও নিমি, কিছু একটা ওষুধ দে তো মা। কিংবা বলে, বড় যন্তন্না নিমি, একটু হাত বুলিয়ে দিবি। এই যন্ত্রণা শব্দটার সঙ্গে নির্মলা এত পরিচিত যে শুনতে শুনতে আজকাল মনে হয় ওটা বাবার একটা বাতিক, একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। না হলে এত ওষুধ এত সেবাতেও যন্ত্রণা সারে না মানুষের? কতরকম যন্ত্রণা, হাত-পা মাথা পিঠ পাঁজরের। আসলে ব্যথাকে যত প্রশ্রয় দেওয়া যায় ততই বাড়ে।

বুকের মধ্যে একটা অস্থির হাঁপধরা ভাব যেন দাপিয়ে উঠছিল। খুব সাবধানে নিশ্বাসটা চেপে নিল নির্মলা। সামান্য

শব্দেও যদি ঐ অনড় অস্তিত্বটা বিচলিত সশব্দ হয়ে ওঠে। একপা একপা করে সরে এল দরজার কাছে। আলো জ্বালার চেষ্টা করল না ঘরে। আস্তে আস্তে চৌকাঠের বাইরে বেরিয়ে এল। যেন অনেকটা পথ দৌড়ে পার হয়ে এসে স্থির হয়ে দাঁড়াল। মায়ের এখনো ফেরার অনেক দেরী। সত্যেন বক্সীর বাড়ীর রান্নাবাড়ার খুঁটিনাটি কাজ সেরে সকলকে খাইয়ে তবে তার ছুটি। মোটা মাইনের চাকরী। ফিরবে সেই রাত্রে প্রায় দশটা। আপাতত সন্তোষালোকের অলোক্য অন্তত নির্মলা কর্মহীন বিশ্রামের সুখ উপলব্ধি করে নিতে পারে। আর একথা ভাবার সঙ্গে ভিতরের সেই একা-একা পতিত ভাবটা আবার তার চারিপাশে ছেয়ে এল। শাওলা ধরা অন্ধকার উঠোনটার দিকে চেয়ে চেয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। সম্ভবত নিজেকে দমন করার চেষ্টা করল। ওপরে তাকালো কালচে হয়ে আসা আকাশে সদ্য ফোটা নির্বাক কিছু তারা দেখা যায়। কাদের উনুন ধরানো ধোঁয়ার গন্ধ বাতাসে ভেসে আসে। পরিবেশে কেমন এক আচ্ছন্নতা ক্রমশ জমাট হয়। ঊর্ধ্বমুখে হয়ে দোতলার বারান্দা দেখল নির্মলা। আলো জ্বলছে ঘরে বাইরে সর্বত্র। আর একবার নিজেদের ঘরের দিকে তাকিয়ে দোতলার সিঁড়ির কাছে এগোল নির্মলা। উপরের বারান্দার উজ্জ্বল আলোর নীচে পৌঁছে একবার নিজের শাড়ীটার দিকে তাকিয়ে নিল। কোথাও ছেঁড়াখোঁড়া থাকলে আত্মসম্মত ভাবে ঢেকে নিতে হবে। কাঁধের ওপর আঁচল মেলে দিয়ে এগিয়ে গেল নির্মলা। এপাশে পর্দা-টানা ঘরের ভিতর থেকে মাসীমা মেসোমশাইয়ের গল্প এবং সাংসারিক কথাবার্তার টুকরো ভেসে আসছে। অতএব বারান্দার একেবারে কোণের ঘরটার কাছে গিয়ে পর্দা সরিয়ে নির্মলা উঁকি দিল। মনোযোগ দিয়ে খাতায় কি লিখছিল রুনা। কি দ্রুত আর সুন্দর ভাবেই ওর হাতের কলম চলছিল। ওকে দেখে রুনা মৃদু হাসল।

—কি খবর, ভেতরে এস।

কি চমৎকার হাসে রুনা। এক পলক স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইল নির্মলা। তারপর ঘরে ঢুকল। রুনার কাছে টেবিলের ধারে দাঁড়াল। অত যে মুখরা চপলা মেয়ে রুনার সামনাসামনি এলে সে নির্বাক গম্ভীর হয়ে থাকে। একটা পূজারী পূজারী ভাব আপনা থেকেই মনে জন্মায় যেন।

—তোমার বাবার শরীর কেমন? লিখতে লিখতে মাথা না তুলে করেই, যেন বলতে হয় তাই, রুনা প্রশ্ন করল।

—একই রকম। নির্মলা রুনার অপূর্ব খোঁপা ঘাড় ও পিঠের ভঙ্গি লক্ষ্য করছিল।

—খুব কষ্ট পাচ্ছেন। তুমি ঐ চেয়ারটায় বোস না। রুনার সুচারু হাত আর হাতের আঙুল মসৃণ ভাবে তরতর করে লিখে চলেছে। আস্তে আস্তে টেবিলের ওপর রাখা নিজের সরু লম্বা শিরাবহুল বাঁ-হাতটা গুটিয়ে নিল নির্মলা। একেবারে পেটের কাছে কাপড়ের ভাঁজের মধ্যে লুকিয়ে ফেলল। ধীরে এগিয়ে রুনার সামনাসামনি চেয়ারটায় বসে একটা ঝকঝকে বইয়ের ওপর সাবধানে আঙুল রাখল।

—এটা কি বই?

—আমার পড়ার বই। রুনা ওর চোখে চোখ রাখল।

—পড়ার বই এত সুন্দর! আদরে বইটার গায়ে নির্মলা হাত বোলাল।

—ইকনমিকস্। তার মানে অর্থনীতি। বুঝবে না জানে তবু যেন করুণা করেই প্রাঞ্জল করার চেষ্টা করল রুনা। বিদ্যালয় পর্যন্ত হলেও কথা ছিল। অজান্তে একটু বোকা বোকা ভাব করে নির্মলা তাকিয়ে রইল বইটার দিকে।

—তোমার বাবার কাছে কে রইল, ভাই-টাই কেউ?

—না বলতে গিয়ে ইতস্তত করল নির্মলা. বাবা একাই। ঘুমোচ্ছে।

হঠাৎই অস্বস্তি বোধ করল নির্মলা। যার বাবা এমন অসুস্থ, তার ওপরে গল্প করতে উঠে আসা বোধহয় উচিত হয়নি।

—আমি এখনই নীচে যাব। নির্মলা ছাড়া ছাড়া ভাবে বলল।

—থাকো না। ঘুমোচ্ছেন যখন। তোমারও তো কিছুক্ষণ বিশ্রামের দরকার।

বেঁচে গেল নির্মলা! এমন কথা কে আর ভাবে।

—কার সঙ্গে গল্প হচ্ছে শুনি? পর্দা সরিয়ে একটি তরুণ সহাস্য পুরুষ মুখ উঁকি দিল।

—আরে এসো, বাঃ, অনেকদিন পরে এলে তো! বাতাসে ভেসে যাওয়ার মত রুনা ওর দিকে কয়েক পা এগিয়ে গেল। তারপর ছেলেটি এসে চেয়ারে বসতে ও চেয়ারের হাতল ধরে দাঁড়াল।

ছেলেটির নাম সুনন্দ। নির্মলা ওকে অনেকবার এ-বাড়ীতে আসা-যাওয়া করতে দেখেছে। রুনাদের কলেজে পড়ে। একই ক্লাশে। ঝরঝর করে পরিচ্ছন্ন হাসতে লাগল সুনন্দ।

—জানো, পরশু রাত্তেই সবে কলকাতায় ফিরলাম। কদিন যা বেড়ানো গেল না বাইরে, মার্ভেলাস। থ্রিলিং।

—পরীক্ষা সামনে আর এখন বেড়াচ্ছো এত। রুনা শাসন করল ওকে।

—আরে ওসব চিন্তা করতে গেলে জীবনের সর্বোত্তম ঋতুটাকে একেবারে মাটি করে ফেলতে হয় যে। এমন ভঙ্গি করল সুনন্দ যে রুনা, এমনকি নির্মলাও, হেসে ফেলতে বাধ্য হল। সুনন্দ সিগারেট ধরিয়ে গুনগুন করে গান ধরল—আমার এই দেহখানি তুলে ধরো, তোমার ঐ দেবালয়ের প্রদীপ করো। হঠাৎ গান থামিয়ে নির্মলার দিকে চেয়ে রুনাকে প্রশ্ন করল,

—ইনি এ-বাড়ীর নীচে থাকেন, না?

—হ্যাঁ। নির্মলা। তোমাকে ওর কথা বলেছি। রুনা বলল।

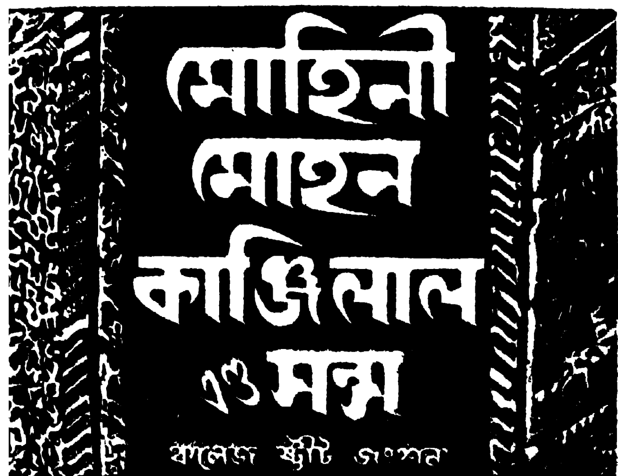
আকস্মিক নিজের উল্লেখে উঠে পড়ল নির্মলা অপ্রস্তুত বোধ করল।

—আমার মনে আছে। আমি জানি সব। আপনার কথা, আপনাদের। আপনার বাবার কথা। সত্যি ভীষণ দুঃখের ঘটনা এটা।

নির্মলা ক্রমশ নিজের মধ্যে গুটিয়ে যাচ্ছিল। না তাকিয়েও ও বুঝছিল সুনন্দ নামের ঐ সুদর্শন যুবক তার দিকে স্পষ্ট পরিষ্কার ঝকঝকে দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। সুনন্দ আবার জিজ্ঞাসা করল,

—আপনার বাবা কোথায় কাজ করতেন?

—একটা কারখানায়। প্ল্যাস্টিকের। কোনরকমে জবাব দিল নির্মলা।



—হঠাৎই এভাবে পড়ে গিয়ে প্যারা-লাইজড্ হয়ে গেলেন?

—হ্যাঁ, হঠাৎ।

—অসুখের কথা বলা যায় না, রুনার দিকে ফিরে সুনন্দ ভ্রূ কুঁচকে বলল, আর যা ভেজাল খাওয়া-দাওয়া জুটছে আজকাল কপালে। এই তো আমার নতুন মাসীমার বর—আই মীন—মেসোমশাই মাসখানেক আগেই হঠাৎ একটা স্ট্রোকে—

—ওটার অবশ্য অন্য কারণ। রুনা শুধরে দিল।

—তা বটে। ও'র ঐ ব্যবসার গোল-মালটাই কাল হল। খুব চিন্তিত ভঙ্গি করল সুনন্দ।

—তুমি বোস, আমি দু' কাপ কফি করে আনি। সুনন্দর কাঁধে মৃদু টোকা দিল রুনা। নির্মলাকে বলল, তুমি খাবে কফি?

—না, না। নির্মলা জোরে মাথা নাড়ল।

রুনা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে সুনন্দ কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক রইল। গুনগুন করল গলায়—আমার এই দেহখানি তুলে ধরো। খুব নীচু অথচ স্পষ্ট অক্ষরে। কি চমৎকার গলা। আর গানের কথা। ঠিক বোঝা যায় না তবু যেন বুকের মধ্যে কোথায় ঘা দেয়। দুর্বোধ্য কষ্টে বাজতে থাকে।

—আমি যাই এবার। নির্মলা তৎপর হল।

—বসুন না। সুনন্দ বলল খাতির করে।

হাতের পাতা ঘেমে উঠেছিল নির্মলার। বুকের মধ্যে খুব সূক্ষ্ম কয়েকটি স্নায়ু কেঁপে উঠছিল। কেন এমন হচ্ছে। রুনা তো কত সহজে হাসছে খেলছে ওর সঙ্গে। মনেই হচ্ছে না কোন ছেলের সঙ্গে আলাপ করছে। কেমন অনায়াসে কাঁধটা ছুঁয়ে দিল ওর।

—আপনি বোধহয় খুব লাজুক। কথা বলছেন না।

লাজুক। নিজের মনেই হাসল নির্মলা। একটু পরেই রুনাকে আড়ালে যদি শুধোও, শুনবে'খন ওর মুখের কথা। রুনা নিশ্চয় বলতে বলতে হাসিতে ছটফটিয়ে উঠবে।

—লাজুক কেন হব। নির্মলা তাকাল স্পষ্ট করে। আর এই প্রথম দেখল ছেলেটি কত সুন্দর। অনেকদিন আগে একটা সিনেমা দেখেছিল। তাতে যে সুন্দর ছেলেটি অভিনয় করেছিল, তাকে আজো মনে রেখেছে নির্মলা। সুনন্দর হাবভাব সাজ-পোষাক অনেকটা সেরকম।

আর এ-কথা মনে আসার সঙ্গে সঙ্গে অস্থির হয়ে উঠল নির্মলার ভেতরটা, ছুটে পালাতে চাইল ওর দৃষ্টির সামনে থেকে। মনে মনে খুব গোপন ইচ্ছে হল ছুটে গিয়ে পাশে রুনাদের শোবার ঘরের আলমারির বড় আয়নাটার সামনে উজ্জ্বল আলোর নীচে একবার দাঁড়ায়। তারপর হয়তো তার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হবে।

—আচ্ছা, এই আপনার বাবা অসুখে পড়ার পর থেকে আপনাদের সংসারে খুব অসুবিধের সৃষ্টি হয়েছে নিশ্চয়ই, তাই না?

খুব সরল খুব অন্তরঙ্গভাবে প্রশ্ন-গুলি করছিল সুনন্দ এবং সেজন্যেই নির্মলা ওকে এড়িয়ে যেতে পারছিল না।

—হ্যাঁ, খুবই। মাকে পরের বাড়ী খেটে কষ্টেসৃষ্টে সংসার চালাতে হয়। বলতে বলতে ওপাশে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল নির্মলা, যেন তাদের এমন হীনতা আর দৈন্যের কথা সুনন্দর সামনাসামনি দাঁড়িয়ে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বলা যাবে না। মুখে ক্ষোভের শব্দ করল সুনন্দ। গলাকে আরও কোমল করে বলল,

—আপনার ভাইরা এখনো কিছু কাজ করে না, না?

—করে। বড় ভাইটি। আমার থেকে বছর-তিনেকের ছোট। নতুন একটা কাজে ঢুকেছে। তা সে করলে কি হবে, এমনই নষ্ট হয়ে গেছে যে, বাড়ীর সঙ্গে তার শুধু খাওয়া আর ঘুমের সম্পর্ক। আর ছোট ভাইটি খুবই ছোট। কর্পোরেশন ইস্কুলে পড়ে।

সুনন্দ আর কথা বলল না। অনেকক্ষণ সমস্ত ঘরে নৈঃশব্দ্যের সঙ্গে একটা প্রচ্ছন্ন বিষণ্ণতার ভার ছড়িয়ে রইল। তারপর কফি নিয়ে রুনা ঘরে ঢুকতেই নির্মলা বলে উঠল—আমি এবার যাই, কেমন?

সুনন্দকে আর বলল না। কারণ, সুনন্দ আরও কিছুক্ষণ থাকতে বললে সে-প্রলোভন দমন করা অসাধ্য হবে এই ভেবে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এল নির্মলা। নীচে তখন দালান উঠোন ঘর সবকিছুর ওপর ভারী অন্ধকারের পর্দা ঝুলছিল। কেমন যেন বিবর্ণ প্রেতায়িত মনে হচ্ছিল সবকিছু। কোনক্রমে নিশ্বাস চেপে ঘরে এল নির্মলা। কে জানে নিবারণ উঠে ডেকেছিল কিনা, এক টুকরো আলোর জন্যে কাতরোক্তি করেছিল কিনা। নির্মলা অন্য কথা ভাবতে ভাবতে আলো জ্বালল। চৌকিতে লীন হয়ে থাকা অস্তিত্বে একটু স্পন্দন জাগল যেন। একবার তাকিয়ে দেখল নির্মলা। কিন্তু ডাকতে বা কোন কথা বলতে তার এখন প্রবৃত্তি হচ্ছিল না। তোমার ঐ দেবালয়ের প্রদীপ করো। সুনন্দ এখনো ওপরে আছে। ঝরঝর করে স্ফটিকস্বচ্ছ বৃষ্টি পড়ার মত অনর্গল হাসছে, কথা বলছে। কে জানে। কে জানে, হয়ত নির্মলাদের কথাই চাপা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে এখনো আলোচনা করে যাচ্ছে। কোথাকার কোন সম্পন্ন ঘরের আদুরে সুন্দর আধুনিক ছেলে, সে কবে যেন নির্মলাকে দেখেছে, তাদের কথা শুনেছে এবং হুবহু মনে করে রেখে দিয়েছে। আমার এই দেহখানি—বুকের মধ্যে একটা কেমন করা ভাব নির্মলাকে উদাস করছিল। চোখের তারায় অন্য রাজ্যের স্বপ্ন নিয়ে নির্মলা সেই বিবর্ণ মলিন জীর্ণ ঘরে খানিকক্ষণ আপন আবেগে পায়চারী করল, তারপর হঠাৎ বাইরে এসে দুমদাম দুপদাপ করে উনুন ধরাতে বসল। আজও নির্মলাকে রান্না করতে হবে, এই চুলোর সংসারে হাঁ-গুলিকে ভরাট করবার জন্য। কারো কারো অদৃষ্টে এমন হয়, নির্মলা ভাবল, এমনি [illegible] খাওয়া প্রেতিনীর মত নরকের অভিশাপে পচে মরতে হয়। নিশ্বাসের সঙ্গে বুকের ভিতর থেকে আনন্দের কিছু হালকা বেরিয়ে আসতে আসতে যেন ক্রমশ তার শরীরটাকে ভারহীন লঘু করে ফেলছিল, যেন এখুনি যে-কোন মুহূর্তে মাটিতে নিরালম্ব হয়ে পড়ে যেতে পারে। আর কোনদিন উঠবে না, আর কোনদিন এই ন্যক্কারজনক উঞ্ছ জীবন যাপন করতে আসবে না। তাই যেন হয়, হে ঈশ্বর। উপরে উঠোনের ফ্রেমের মাপের তারাজ্বলা কালচে আকাশের দিকে তাকাল নির্মলা। ধোঁয়ায় জ্বালা-করা চোখ থেকে অজস্র জল কাপড়ে মুছতে লাগল। তারপর উনুন ধরে গেলে গনগনে আগুনের সামনে বসে রান্না করতে করতে অকারণ মনে মনে দগ্ধ হতে থাকল।

রাত ঘন হয়ে আসতে একে একে ভাই দুজন এবং মা ঘরে ফিরল। বড়ভাই কলতলায় চলে গেল হিন্দী গানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে। ছোটটি একবার রান্নার দিকে তাকিয়ে আশ্বস্ত হয়ে ছেঁড়া পালকের বল নিয়ে লোফালুফি শুরু করে দিল। রোজের মত ক্লান্তিতে অস্ফুট কিছু কাতরোক্তি করল মা। আঁচল বিছিয়ে মেঝের শুয়ে পড়ল। মায়ের ঐ পরিশ্রান্ত ছড়ান-ছিটোন চেহারার দিকে তাকাতে ইচ্ছে হল না নির্মলার। যেন খুব মন দিয়ে দ্রুত রান্না করতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে ধাতস্থ হয়ে মা ফিরে তাকাল চৌকির দিকে। হ্যারি-কেনটা নীচে থাকায় ওর ওপরটা অস্পষ্ট আবছায়া জমাট বেঁধে ছিল। শোয়া অবস্থাতেই খানিকটা পিছলে ওর দিকে সরে এল মা।

—এখন এরকম চুপচাপ শুয়ে রয়েছে যে? শরীর ভাল আছে তো?

—হুঁ। নির্মলা কড়ায় ডাল ছাড়ল শব্দ করে।

মা এবার উঁচু হয়ে বসে আলোটা তুলল। নিবারণ জেগেই ছিল।

—ওষুধ খাইয়েছিলি?

না। মনে মনে জিভ কাটল নির্মলা। সন্ধ্যে থেকে একবারো স্মরণ হয়নি। অথচ ওষুধটি অত্যাবশ্যক। ওপাশে নিবারণ স্তব্ধ নিরুচ্চার। সাহস করে সত্যি কথাটা বলতে পারল না নির্মলা।

—হ্যাঁ দিয়েছি। নির্মলা অতিরিক্ত ব্যস্ততার ভঙ্গি করল।

হ্যারিকেন তখন উঁচু থাকায় নিবারণের মুখের ওপর পাণ্ডুর লালচে খানিকটা আলো। আড়চোখে এক পলক তাকিয়ে নির্মলা দেখল নিবারণ ঠাণ্ডা অবিচল দৃষ্টিতে তার দিকেই তাকিয়ে আছে। বুকের মধ্যেটা শিরশির করে উঠল নির্মলার। বাবার চোখদুটো যেন পৃথিবীর অনেক বাইরের প্রেতলোক থেকে তার দিকে নিবদ্ধ, আজীবন শরবিদ্ধ করে রাখার মতন।

—অনেক কষ্টে জোগাড় করে আনি ওষুধবিষুধ, মা আক্ষেপ করল, মানুষটা সেরে উঠলে তবেই সার্থক।

নির্মলা কোন মন্তব্য করল না। ঘরের মধ্যে একটা বিষাদাপ্লুত নীরবতা ঘুরে বেড়াতে লাগল। এমনকি, রোজ খেতে দেবার সময় কমবেশি দেওয়া নিয়ে বড়-ভাইয়ের সঙ্গে যে ঝুটোপুটি ঝগড়া লাগে, নির্মলার সেটাও আজ কোন অজ্ঞাত কারণে বন্ধ রইল। তারপর রাত গভীর আর চারিদিক নিঃশব্দ হলে একাকী শয্যায় হৃদপিণ্ডের কোন বহির্গামী শব্দকে রুদ্ধ করার জন্য তেলচিটে শক্ত বালিশটাকে প্রাণপণে কামড়ে ধরল।

—নিমি, কে এলো দ্যাখ।

জুতোর শব্দেই বুঝেছিল নির্মলা। কান্তি। নির্মলার উত্তর দেবার আগেই বাইরে জুতো ছেড়ে ঘরে ঢুকে এসেছে কান্তি। বছর সাঁইত্রিশের মাজা রঙ পুষ্ট চেহারা, গোলগাল মুখ, তেলচকচকে বাবরি চুল সটান উল্টে আঁচড়ানো। বেশ ভরাট হিসেবী মানুষ। আগে গিয়ে চৌকির ওপর নিবারণের পাশে বসল।

—আছেন কেমন, মেসোমশাই?

—আমার আর থাকা না থাকা। স্তিমিত গলায় ঘোলাটে দৃষ্টিতে বলল নিবারণ।

—দিন দিন কেমন হচ্ছে দ্যাখো না, নির্মলার মা আক্ষেপ করল, একটা কথা বলে না, একটু নড়াচড়া করে না পর্যন্ত।

—এই বয়সটা অসুখে ধরলে সহজে ছাড়তে চায় না। জড়ভরত করে দেয় মানুষকে। কান্তি কণ্ঠস্বরে চিকিৎসকের গাম্ভীর্য আনল। ঘরের মধ্যে চারিদিক দৃষ্টি বুলিয়ে নিল একবার। কান্তি নির্মলার মাসীর ভাসুরপো। সেই ক্ষীণ সম্পর্কটুকুর টানে প্রায় মাঝে মাঝে এদের কাছে আসা-যাওয়া করে। বিয়ের দু'বছর পরেই বিপত্নীক কান্তি। নিঃসন্তান, উপার্জনশীল। সেহেতু নির্মলার মা কিছু আশা রাখে তার ওপরে।

বাইরে মধ্যদুপুর হলেও ঘরের ভিতরটায় এখন তামাটে আলো। শাদা দেয়ালগুলিকে ভিজে ভিজে ছাইরঙা মনে হয়। কাঁসাইয়ের থালায় নির্মলা এবং তার মায়ের আহার্য দেখে কান্তি চোখ ঘুরিয়ে নিল। অন্যদিকে। চাপ চাপ বালিখসা কড়ি-কাঠ, রঙ উঠে যাওয়া আলনা ও জীর্ণ তোরঙ্গদুটি দেখল। পুরনো কড়িবরগার ফাঁকে ব্যস্ত চড়ুই বাসা বাঁধছে। ওরা দুজন মানুষ ক্ষুধার্ত হলেও কান্তির সামনে খেতে ঈষৎ লজ্জাবোধ করছিল। বুঝে কান্তি সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করল।

—আপনারা এত বেলায় খান, মাসীমা। আমার তো চায়ের সময় এখন। নির্মলা, তুমি উঠে আমাকে চা খাওয়াবে কিন্তু।

এমনই আন্তরিকতায় বলল যে, ওরা এবার সহজ হয়ে উঠল। খেতে খেতে নানা ধরনের গল্প করতে লাগল।

—আমি একটা স্বপ্নাদ্য ওষুধের কথা শুনলাম, মাসীমা। ভঙ্গিতে বেশ রহস্যের ভাব ফোটাবার চেষ্টা করল কান্তি।

—স্বপ্নাদ্য ওষুধ? কিসের? চোখে একরাশ কৌতূহল নিয়ে তাকাল নির্মলার মা।

—মেসোমশায়ের জন্য। কলকাতার বাইরে, কোথাকার যেন বেশ নামটা করল, ডাক্তার ওষুধে তো এত খরচ হচ্ছে, যদি ঠাকুর-দেবতায় ভাল হয় তাহলে খুবই সুখের কথা, তাই না?

—তুমি দ্যাখো না বাবা, গলার স্বরে মিনতি ঝরাল নির্মলার মা, যদি আমাদের দুঃখকষ্ট একটু লাঘব করতে পার।

—আমি নিশ্চয় চেষ্টা করব, কান্তি বলল, মেসোমশায়ের জন্য আমারও তো একটা কর্তব্য আছে, আসি যাই সবকিছু দেখি যখন।

কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে একটা স্তব্ধ গম্ভীর নীরব চিন্তার স্পন্দন খেলা করতে লাগল। নির্মলা চা তৈরী করে নিয়ে এল কান্তির কাছে। চা নিতে গিয়ে কান্তি নির্মলার ফ্যাকাশে রঙ চোয়াল-বসা মুখ লম্বাটে গড়ন এবং কাঠ কাঠ শিরাবহুল হাত ও হাতের আঙুল দেখল কয়েক পলকে।

—শুধুই চা খাবে কান্তিদা?

—আর কি আছে তোমার ঘরে? কান্তি কৌতুকে প্রশ্ন করল।

সামান্য অপ্রস্তুত হয়ে মাথা নোয়াল নির্মলা। আধখানা বিস্কুটও ওদের ঘরে থাকে না কোনদিন। নির্মলা লজ্জা দমন করতে চাইল।

—মোড়ের মাথার দোকান থেকে কিছু কিনে আনব? পয়সাটা অবশ্য তুমিই দেবে। নির্মলা পরিহাসের মত করে হাসল।

—তোমাকে যেতে হবে না, আমিই আনছি। তোমরাও খাবে।

—তাহলে একটু এগিয়ে গিয়ে বড় রাস্তা থেকে না হয় গরম চপ নিয়ে এসো। খুব সুন্দর চপ ভাজে। চকচকে চোখে প্রথমে কান্তির দিকে তাকাল নির্মলা, তার-পর নিবারণের দিকে। কান্তির সামনে ঠিক এতটা প্রগলভতা করে না নির্মলা। নিবারণ স্পষ্টতই ভ্রূ কুঁচকে অন্যদিকে চেয়েছিল। নির্মলা এবার মায়ের দিকে ঘুরল,

স্বাস্থ্যকে

অটুট রাখবার জন্য আপনার
প্রতিদিন দরকার অপরিহার্য
ভিটামিন এবং
খনিজ পদার্থ সমূহ
অর্থাৎ

Shilpi SC 53/67 Ben



ডিমগ্র্যানের

একটি মাত্র ট্যাবলেট।

ডিমগ্র্যানের একটি মাত্র ট্যাবলেটে ১১ প্রকারের অপরিহার্য ভিটামিন
ও ৮ প্রকারের খনিজ পদার্থ রয়েছে।

ডিমগ্র্যানের একটি মাত্র ট্যাবলেট আপনাকে সারা
দিন কর্মক্ষম রাখবে। আজই ডিমগ্র্যান কিনুন।

SQUIBB SARABHAI CHEMICALS　　® রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক

—ঠিক বলিনি, মা?

—তোর খাবার ইচ্ছে হয়েছে, বলেছিস। মা প্রশ্রয়ের হাসি হাসল, কান্তি তো আমাদের পর নয়, যে লজ্জা করতে হবে।

কান্তিও হাসল।—আচ্ছা কটা চপ খেতে পারো দেখছি।

হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল কান্তি। বাইরে রোদের রঙ ফিকে হয়ে আসায় ঘরের মধ্যে, কড়িকাঠে, বালিখসা দেয়ালে আস্তে আস্তে ধূসর ছায়া জমতে শুরু করেছিল। নির্মলা ঘরের জিনিসপত্রগুলি একটু এদিক ওদিক গুছোবার চেষ্টা করল। তারপর মায়ের চোখে চোখ রেখে হেসে ফেলল।

—তোকে না কতবার বলেছি এমন রঙওঠা ছেঁড়া কাপড়টা পরবি না আর। মা ওকে শাসন করল।

—কি হয়েছে? নির্মলা ঔদাসীন্য দেখাল, আমাকে এতেই মানায়।

—আহা। মা আদরের স্বর রাখল গলায়, মেয়ে কি আমার খারাপ? কেমন ফর্সা রঙ।

নির্মলা হি-হি-হি করে হেসে গড়িয়ে পড়ল। নিজেকে ব্যঙ্গ করেই। নিবারণের মাথার নীচের বালিশ চাদর সব গুছোতে লাগল।

—যে যেমনই হোক, দুনিয়ার মেয়েরা সব ফিটফাট পরিষ্কার থাকে। মায়ের ক্ষোভটা একটু একটু করে প্রকট হচ্ছিল।

—দুনিয়ার মেয়েরা লেখাপড়া করে, ইস্কুল কলেজে যায়, বেড়ায়, সাজগোজ করে, তাদের সঙ্গে আমার মেলে না।

খুব মৃদু ঝামটায় নির্মলা চুপ করিয়ে দিল মাকে। ঘরের মধ্যে একটা বুক-চাপা গুমোট ভাব আবছায়া অন্ধকারের সঙ্গে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল। ঘরের কোণে বিষণ্ণ চৌকিটা এবং তার ওপরে নিবারণের অস্তিত্ব ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে আসছিল। এখনো আলো জ্বালার সময় হয়নি। নির্মলা কলঘর থেকে মুখে চোখে জল দিয়ে এল। কাপড়ের আঁচলে পরিষ্কার করে মুখ মুছতে মুছতেই কান্তি এসে গেল জুতো মস্-মসিয়ে। বড় ভিজে ভিজে ঠোঙাটা এগিয়ে ধরল,—নাও, গরম ভেজে দিল একেবারে।

নির্মলার দিকে হাত বাড়িয়ে কেমন এক রকম অধিকারবোধের মত করে বলল কথাটা। এক মুহূর্ত দ্বিধা করল নির্মলা, তারপর লঘু হেসে ঠোঙাটা নিল। বাবার কাছে এগিয়ে গেল। নিবারণের মুখ বন্ধ চোয়াল শক্ত। আবছা থাকার দরুণ কান্তি নিবারণের মুখ দেখতে পেল না কিন্তু নির্মলা দেখল। ঝুঁকে পড়ে একটুকরো চপ মুখের কাছে ধরে অনুরোধের সুরে বলল—খাও।

লোভনীয় খাদ্যবস্তুকে আর অবহেলা করল না নিবারণ। খেতে লাগল নির্মলার হাত থেকে। তার খাওয়ার পর ওরাও নিজে-দের মধ্যে ভাগ করে নিল। খেতে খেতে কান্তি বলল,—নির্মলার চেহারাটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে দিন দিন।

মা সস্নেহে তাকাল নির্মলার দিকে। কান্তিকে শুনিয়ে আক্ষেপ করল,—সারাদিন খাটুনী, রুগীর সেবা, তারপর পেটে তো ভালমন্দ কিছু পড়ে না।

তুমি থামো তো মা, নির্মলা ঝঙ্কার দিল, আমি বেশ আছি। দেখবে আমার গায়ে কত জোর?

—না থাক। কান্তি ঠাট্টা করে উঠল, ঐ কেঠো হাতের ঘা খেলে যে কেউ কাত হয়ে পড়বে।

নির্মলা আহত হল কিনা বোঝা গেল না। ওর মুখ সামান্য ম্লান দেখাল।

—ওর জন্যে একটু চেষ্টা-চরিত্র কর না বাবা। ঘর-সংসার ওকে নইলে চলে না, তবু তো পার করার ব্যবস্থা করতে হবে।

—ওর বিয়ের কথা বলছেন? আচ্ছা সে-রকম খোঁজ পেলে বলে দেখব'খন। কান্তির গলা উদারতায় ভারী হল।

নির্মলার মা একটু থতিয়ে গেল। কান্তি জিজ্ঞাসা করল,

—ওর কোন ফটো তোলা নেই, না? থাকলে সুবিধে হত।

—কে আর তুলছে। নির্মলার মা হতা-শার ভঙ্গি করল।

—চলুক না আমার সঙ্গে তুলে দিচ্ছি দোকান থেকে।

নির্মলার মায়ের চোখ উৎসাহে ঝকঝকে দেখাল।

—বেশ তো আজই যেতে পারে। আজ তো আমি ঘরে আছি। নির্মলা হ্যারিক্যান জ্বালাচ্ছিল পেছনে ফিরে। বলল,

—আজ কাজে বেরোবে না তুমি?

—না, ওদের বাড়ীর সকলের নেমন্তন্ন। রান্নার পাট আজকে নেই সেজন্য।

—ভালই তো হল। যাবে নাকি, নির্মলা? কান্তি নির্মলার অস্পষ্ট লম্বাটে অস্তিত্বের দিকে তাকাল। নির্মলা উত্তর দিল না। হ্যারিকেন উঁচু করে তাক থেকে নিবারণের ঔষধ পাড়ল। অনুজ্জ্বল আলোয় কান্তির গোল মুখ পুষ্ট গাল ক্রমশ তেল চকচকে লাগছিল। নির্মলার সঞ্চরমানতায় দৃষ্টি সরিয়ে কান্তি বলল,

—সারাদিন এই ঘুপসী ঘরে বসে থাকো, চলো না একটু বেড়িয়ে আসবে।

নির্মলা তবু মৌন। আপন মনে কাজ করে যাচ্ছে। মা বিরক্ত হল।

—ও আবার কি। যাবি তো যা না, এত করে বলছে যখন।

—না। নির্মলা এক কথায় উত্তর দিল। ওর সমস্ত সত্তা ছেয়ে বোবা কান্নার অনু-ভূতি নামছিল। কান্তির চকচকে মুখ, ঘূর্ণায়মান চোখ, সটান চাপা চুলের মাথা গোলগাল গড়ন কোনদিনই পছন্দ হয় না ওর। লোকটার দিকে তাকালেই মনে হয় একটা শান্ত সাপ, সমস্ত শরীর অস্তিত্ব ভরে তার চাহিদা, সে যে কোন পাত্র থেকেই হোক না কেন।

—যাবি না? মার ভঙ্গিতে ভর্ৎসনা উষ্মা সব একসঙ্গে ঝরে পড়ল।

—না, আমার ভাল লাগে না। জবাব দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল নির্মলা। ঘরের মধ্যে অস্বস্তিকর নীরবতা বিরাজ করল কিছুক্ষণ। তারপর কান্তি উঠে দাঁড়িয়ে আলস্য ছাড়ল শরীরে।

—যাই তাহলে, মাসীমা?

সেই স্বপ্নাদ্য ওষুধটা—প্রায় চীৎকার করে প্রাণপণে যেন নির্মলার মা পুরনো আন্তরিকতার দাবীটুকু বজায় রাখতে চাইল।

—আমি খুবই চেষ্টা করব। যত তাড়া-তাড়ি পারি।

আশ্বস্ত করার মত করে বলল কান্তি তারপর বেড়িয়ে গেল।

কদিন থেকেই নিবারণের যেন কি হয়েছে। ক্রমশ নিস্তেজ ভাবটা সব কিছুতে ফুটে উঠছে। হয়তো এই বেঁচে থাকা এবং শুয়ে থাকার প্রতি তীব্রভাবে বীতস্পৃহ হয়ে। সম্পূর্ণ সজ্ঞান সচেতন অথচ স্বেচ্ছায় একবার নড়াচড়া করে না পর্যন্ত। কোন কথা বলার চেষ্টা করে না, কেউ বেশীবার ডাকলে বা প্রশ্ন করলে বিরক্ত হয়ে সংক্ষেপে জবাব দেয়।

যখন ঘরে খুব একা থাকে, এই বাপের দিকে চেয়ে মন খারাপ হয়ে যায় নির্মলার। বাপ তাকে খুব ভালবাসত ছোট-বেলায়, মনে পড়ে, যখন অন্য কোন সন্তান হয়নি তখন নিবারণ নির্মলার কোন আব-দার অপূর্ণ রাখেনি। তক্তপোষের একধারে বসে নির্মলা দেখল নিবারণ স্থির হয়ে ওপাশের দেয়ালের দিকে চেয়ে আছে। চোখের দৃষ্টি মৃতলোকের মত ঘোলাটে, স্থির। বুকের ভেতরটা কেমন করল নির্ম-লার। উঠে নিবারণের মাথায় হাত বুলোতে গেল ভ্রূ কুঁচকে উঠল নিবারণের অর্থাৎ তার ভাল লাগছে না। নির্মলা ঈষৎ নত হয়ে ডাকল—হাতটা টিপে দোব? বাবা, ও বাবা? কয়েকবার প্রশ্নের পর নিবারণ অস্ফুট দুর্বোধ্য কিছু শব্দ করল মুখ দিয়ে। নির্মলা বুঝল না, আস্তে আস্তে সরে এল। বাইরে দুপুর পাতলা হয়ে এসেছে। নরম রোদের পর্দা একটু একটু হাওয়ায় ক্রমশ জানলার গরাদ কার্ণিশের কোণ থেকে ক্রমশ গুটিয়ে উপর দিকে উঠে যাচ্ছিল। নির্মলার মধ্যে আবার সেই একা একা খণ্ডিত ভাবটা আস্তে আস্তে জেগে উঠে-ছিল। প্রায় নির্জন ঘরের মধ্যে একা কি করবে ভেবে না পেয়ে ছটফট করে উঠল নির্মলা। সেই অস্থিরতা অত্যন্ত গোপন মাদকের মত সমস্ত স্নায়ুশিরায় ছড়িয়ে গিয়ে নির্মলাকে দিশাহারা করে তুলল।

ওপরে আজ সুনন্দ এসেছে, একটু আগেই, দরজা দিয়ে ঢোকার সময় লক্ষ্য করেছে নির্মলা। এত-ক্ষণ হয়ত দুজনে হাসি গল্পে মেতে উঠছে চঞ্চল পাখিদের মত। বাড়ীতে ঢোকার সময় নির্মলাদের ঘরের দিকে তাকায়নি সুনন্দ, কিন্তু নির্মলাকে তো তার মনে আছে। নির্মলা অসুন্দর অশি-ক্ষিত বলে সে তো অবহেলা করে না। কত সমাদরে কথা বলে। ক্ষতি কি যদি এখন অল্প কিছু সময় ওদের মধ্যে যায় নির্মলা? কমুহূর্ত বসে গল্প করে অথবা গল্প

শুনে মনটাকে হালকা করে আসে? কি দরকার, ছি, একবার ভাববার চেষ্টা করল নির্মলা। পরক্ষণেই আবার ছটফটিয়ে উঠল। কি হবে ক্ষতিটা। মানুষ কি যায় না মানুষের কাছে।

কালো কালো বিন্দুর ছোপ-ধরা আয়নার সামনে এসে দাঁড়াল নির্মলা। পাউডারের ময়লা তুলিটা মাংসহীন গালে দুবার বুলিয়ে নিল। বাক্সের মাথা তাক সমস্ত হাতড়ে কবেকার পুরনো, বোধহয় ছোট-ভাইটার শিশুকালের এক কাজললতা বের করল। ভেতরের কাজল ধুলো পড়ে বিবর্ণ শক্ত হয়ে গেছে তাই কোনরকমে খুঁটে চোখের কোলে লাগাবার চেষ্টা করল। চুলটা সামান্য এদিক ওদিক করে নিতে নিতে আড়চোখে বাপের দিকে তাকাল একবার। নিস্তেজ আলোয় নিবারণের ওপাশে ফেরানো পান্ডুর মুখ আরও বর্ণহীন পাংশু লাগল। পায়ে পায়ে ঘর থেকে বাইরে চলে এল নির্মলা। বুকের ভেতরে নিশ্বাস চেপে ধরে সোজা দোতলায় রুনার ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। পর্দাটানা ঘরের ভেতর থেকে তখন খুশীর হাসির ছটা বাইরে ঠিকরে এসে পড়ছিল। যেন পার্থিব মালিন্যের ওপারে চঞ্চল শিশুদেব মত কোন আশ্চর্য অনাবিল আনন্দে মগ্ন ছিল ওরা। বাইরে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ দ্বিধা করল নির্মলা। ফিরে চলেই আসছিল, রুনা হঠাৎ ঘরের মধ্য থেকে প্রশ্ন করে উঠল,

—ওখানে কে? বাইরে?

বলে নিজেই এসে পর্দা সরিয়ে দিল। ক'পলক নিশ্চল স্থির দৃষ্টিতে নির্মলার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল কোমল ঠান্ডা গলায়,—ও, তুমি। কিছু বলবে আমাকে?

যেন কিছু বলা ছাড়া, কোন প্রয়োজন ব্যতীত নির্মলার ওপরে আসাটা অস্বাভাবিক। ক্ষোভে হাত কামড়াতে ইচ্ছে হল নির্মলার। নিঃসহায় রিক্ত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল পর্দার কারুকার্যের দিকে। কোন কথা কোন যুক্তি এই মুহূর্তে মনের মধ্যে খুঁজে পাওয়া গেল না।

ওর ইতস্তত ভাব দেখে একটুক্ষণ চুপ করে রইল রুনা, তারপর ঘরের দিকে পা বাড়াল।

—এস না ভিতরে। নির্মলাকে সহজ আহ্বান জানাল রুনা। একপা একপা করে ভেতরে এল নির্মলা। চলে যাবার উপায় ছিল না বলে। এতক্ষণে রুনার দিকে ভাল করে তাকিয়ে বুঝল যে, সে আজ বিশেষভাবে সাজসজ্জা করেছে। নিশ্চয়ই কোথাও বেরোবে এক্ষুনি। কি সুন্দর লাগছে ওকে উঁচু খোঁপায় সিল্কের শাড়ীতে চোখের বিশেষ ভঙ্গির কাজলে। ওদিকে পিছনকার জানলার ধারে দাঁড়িয়েছিল সুনন্দ। সুনন্দর সাজে আজ আরও উজ্জ্বলতা, আরও পারিপাট্য। হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। সম্ভবত ওরা দুজনে একসঙ্গে কোথাও যাচ্ছে। রুনা বলল সুনন্দকে,—তোমার কফিটা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে।

সুনন্দ ফিরে এল টেবিলের কাছে। চুপচাপ কফির কাপ হাতে তুলে নিল। ঈষৎ গম্ভীর। মনে কোন বিশেষ চিন্তা অথবা ভাবের উদয়ে ওর মুখটা লালচে হয়ে উঠেছিল, চকচকে চোখ, যেন এখনি কোন গোপন ইচ্ছার প্রকাশে ওর সমস্ত সত্তাটা ফেটে পড়তে পারে। বেশ দুজনে হাসছিল, কথা বলছিল, নির্মলা আসায় একটা সূক্ষ্ম নীরবতার জাল যেন ওদের ঘিরে বিছিয়ে যাচ্ছিল। নির্মলা খুবই অস্বস্তি বোধ করছিল।

—আপনার বাবা ভাল আছেন? সুনন্দ কথার কথা বলল।

নির্মলা মাথা নাড়ল,—না।

হাতঘড়ি দেখল সুনন্দ। রুনার দিকে ফিরে বলল,

—রুনা আর দেরী করলে শো কিন্তু শুরু হয়ে যাবে।

—এক মিনিট। মাকে বলে আসি।

রুনা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। নির্মলা মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে ঘেমে যাচ্ছিল। সুনন্দ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল,

—আপনি বিকেলটা অনর্থক বসে থাকেন কেন? কিছু একটা করলেও তো পারেন।

—কি করব? নির্মলা, যেন না বুঝে, অস্ফুটে জিজ্ঞাসা করল।

—এই দুস্থ মেয়েরা কত কি করে থাকে। জামার বোতাম বসানো দর্জিদের কাছ থেকে এনে ম্যান্টল তৈরী করা, ঠোঙা গড়া কত কি। এতে আপনারও সময় কাটে আপনার সংসারেরও সাশ্রয় হয়।

শিরায় শিরায় রক্ত শিরশির করে উঠল নির্মলার। সুনন্দ কি তাকে অকর্মণ্য হ্যা হ্যা করে ঘুরে বেড়ানো মেয়ে পেয়েছে? উপদেশ। ভুলটা ভেঙে দেবার জন্য উন্মুখ হয়েছিল নির্মলা এ সময় রুনা ফিরে এল। আয়নায় শেষবার দেখে নিয়ে ওরা ঘর থেকে বাইরে এল। পেছনে নির্মলা। ওরা নিজেদের মনে আপন খেয়ালে যেন হাওয়ায় কাশফুলের ওড়ার মত লঘু পদক্ষেপে বেরিয়ে গেল।

শিথিল স্খলিত পায়ে নীচে নামতে নামতে ঠোঁট কামড়ালো নির্মলা। ওর মাথার মধ্যে জ্বলছিল। বুকে হাতুড়ি পেটানো অস্থিরতা। আমার এই দেহখানি—হাসি পেল নির্মলার। তোমার ঐ দেবালয়ের না, নরকের, আগুন করো আগুন করো। অধৈর্যে চোখ কোথাও স্থির করতে পারছিল না নির্মলা। রীতিমত হাঁপাচ্ছিল। তরতর করে প্রায় ছুটে সদরের কাছে চলে এল, যেন একটুকু বাতাস পাবার প্রত্যাশায়। সেই মুহূর্তে কান্তিকে আসতে দেখল নির্মলা। নির্মলার মুখ চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তোমার ঐ—জোর করে হাসতে লাগল নির্মলার ঠোঁট মুখ সর্বাঙ্গ। কান্তিও হাসল। কাছে এসে সদরে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে নির্মলা অস্বাভাবিক জোর দিয়ে বলে উঠল,

—আমাকে বেড়াতে নিয়ে যাবে বলেছিলে না?

কান্তি থমকে গেল একটু কয়েক পলক তাকাল ওর দিকে।

— কি হয়েছে?

—কি আবার হবে। নির্মলা জোরে হেসে উঠল। এমনি, ভীষণ বেড়াতে যেতে ইচ্ছে করছে। নিয়ে যাবে?

—বেশ তো, চল। কান্তি বলল।

—আজ কিন্তু অনেকগুলো রসগোল্লা খাব। নির্মলা আবদারের মত করে বলল।

—অনেকগুলো? কান্তি প্রশ্রয়ের হাসি হাসল, সে কত? হঠাৎ এরকম শখ হল যে?

—আহা, ঠাট্টা করতে হবে না, আমার ইচ্ছে হয়েছে আমি খাব। তুমি না খাও চেয়ে চেয়ে দেখবে, কেমন?

নির্মলা কটাক্ষ করল। কান্তি ইতস্তত করছে দেখে নির্মলা বলল,—

তুমি একটু দাঁড়াও, আমি জুতোটা পরে আসি।

রাত বেশ ঘন এবং ম্লান আলো জ্বলা গলির মধ্যেটা প্রায় নিশুতি হয়ে আসার সময় নির্মলা বাড়ী ফিরল। ক্লান্ত শরীর আচ্ছন্ন দৃষ্টি রক্ত নিংড়ে নেওয়া মুখ। ঢুকেই দালানে মায়ের মুখোমুখি। মাও সেইমাত্র ঘরে ফিরেছে। নির্মলাকে দেখে বলে উঠল,—

—এ কি, ঘর অন্ধকার, তুই কোথায় ছিলি?

—বাইরে। রাস্তায়। থেমে থেমে উত্তর দিল নির্মলা।

—বাইরে, কোথায়? অতিরিক্ত বিস্ময়ে প্রশ্ন করল নির্মলার মা।

—কান্তিদার বাড়ীতে। এতক্ষণ ছিলাম। ছাড়তে চাইছিল না। খুব পরিশ্রান্ত প্রায় নির্বোধ জন্তুর মত মুখ করে কথা বলছিল নির্মলা।

—কান্তির বাড়ী? সে তো একটা মাত্র ঘর। সেখানে কান্তি একা থাকে।

আশঙ্কিত, প্রায় হাহাকারের মত শোনাল নির্মলার মায়ের গলা। নির্মলা উত্তর দিল না। আস্তে আস্তে অন্ধকার ঘরের মধ্যে চলে এল। নিঃশব্দে বসল দেয়ালের কাছে।

—কি ব্যাপার তোর? রুগী মানুষটাকে একা অন্ধকারে ফেলে রেখে প্রেম করতে বেরিয়েছিলি? চেঁচিয়ে উঠল মা। নির্মলা উত্তর দিল না দেখে আক্রোশে হাত পা ছুঁড়ে হ্যারিকেন জ্বালতে বসল। তারপর আলোটা হাতে নিয়ে তক্তপোষের দিকে এগিয়ে গেল, নিবারণকে ডেকে কিছু কথা বলতে চেয়েছিল বুঝি পরিবর্তে পরিত্রাহি দুর্বোধ্য চীৎকার করে উঠল তারপর আছড়ে পড়ল চৌকির ওপর। নির্মলা উঠল পড়ে যাওয়া আলোটা তুলে তাকাল ভাল করে। গায়ের চাপাটা খোলা নিবারণের। শীর্ণ প্রাণহীন দেহ বেঁকেচুরে গেছে অসহ্য যন্ত্রণায় অথবা কোন চাহিদায়। শুধু চোখ দুটো তেমনি খোলা, শান্ত স্থির অবিচল।

মহাপ্রভুর আবির্ভাবে

কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

প্রেমের ঠাকুর তুমি আজো পঞ্চশত বর্ষ পরে
গৌরগত প্রাণমন গৌড়জন অনুধ্যান করে
তব পুণ্য আবির্ভাব।
এসেছিলে যবে নারী নর
ধর্মহীন তমোলীন ভ্রষ্টাচার বিশ্লিষ্ট-অন্তর
সমাজ শৃঙ্খলাহীন।
তুমি জাগাইলে সংঘ বোধ
একান্ত একতা যোগে অন্যায়েরে করি প্রতিরোধ
দলিলে দুর্বৃত্ত কাজি,—দিলে নাম ব্রহ্ম উপাসনা,—
আপামর সাধারণে সাম্যসামে জাগালে চেতনা
নরে নারায়ণ-বোধ।
'হরিনাম',—সর্বপাপ হরে
সুবুদ্ধি খাঁয়েরে তাই সেই নামে সুপবিত্র করে
রাখিলে আপন পদে।
বেদান্তের ব্যাখ্যা অভিনব
ব্রহ্ম সত্য, সৃষ্টি সত্য,—এ-জগৎ সত্য সমুদ্ভব,—
স্বপ্ন নহে,—স্বপ্নবৎ; এ-জগৎ ঈশ্বরের তনু
মায়া তাঁর মহাশক্তি, প্রতি জীব তাঁর পুণ্য অণু
জন্ম হতে জীবনের জটিল পিচ্ছিল চক্রপথে
চলে তারা সেই মতে।
ভক্তজন চড়ি মনোরথে
যায় সে-পরমধামে, পায় সে শাশ্বত-নিকেতন
যে যেমন ভজে তারে তাহারেও সে ভজে তেমন।
শান্ত দাস্য সখ্যভাবে বাৎসল্যে বা অথবা মধুরে
পতি-ভর্তা-প্রভু-সাক্ষী পরমাত্মা পরাণ বঁধুরে
জ্ঞান-যোগ-ভক্তি এই সাধনার ত্রিবিধ পন্থায়
কর্মযোগে পূজা করি নিবেদন করে আপনায়
প্রিয় তিনি—প্রিয়তম,—প্রিয়তর কেহ নাহি আর
স্বরূপায় কলির জীব, একবার লহ নাম তাঁর,
ত্রিভুবনেশ্বর হরি, মানবের প্রেমের ভিখারী
প্রেমে তাঁর বাঁশী বাজে মিছে কাজে রয় নরনারী
শুনিয়া না শোনে কানে।
তাই অবতীর্ণ তিনি নিজে
প্রেমের পসরা শিরে দ্বারে দ্বারে অশ্রুনীরে ভিজে।

অকলঙ্ক পূর্ণচন্দ্র, আবির্ভূত হেরি গোরাচাঁদে,—
কলঙ্কী পূর্ণিমা চন্দ্র হরিষে বিষাদ ভরি কাঁদে।

স্বর্গ যখন নরক ॥ দক্ষিণারঞ্জন বসু

সংশয়ের অন্ধকারে হারানো আমি
পথ খুঁজে পাবো কিনা আর, সেই প্রশ্ন।
এই মর্ত্য—স্বর্গে আজ নরক গুলজার;
গণিকা পৃথিবী : অহমিকা এভারেস্ট,
অথচ আবিরে রাঙা বাসন্তী পূর্ণিমা,
আরও চিহ্নিত দিন যায় ঘুরে ঘুরে।
ডিগ্রীর কবচ-পরা বেকারের ভিড়,
মাঝে মাঝে ক্ষিপ্তপ্রায় রুক্ষ উপেক্ষায়;
খল গুরু-জ্যোতিষীর অসত্য আশ্বাস,
চারদিকে ফাঁদ পেতে রাখে মেনকারা।
লুটের মেলায় মত্ত ভণ্ড নেতা, রাষ্ট্র-ধুরন্ধর—
হৃদয় শ্মশান কিংবা শূন্য মরূদ্যান।
দিন কাটে ধীরে ধীরে ম্লান সন্ধ্যা নামে,
সবাই ভ্রূক্ষেপহীন শেষযাত্রা কুসুমশয্যায়;
আপনারে নিয়ে মত্ত আশ্চর্য ঐশ্বর্যে,
নিতান্ত সাম্রাজ্যবাদী ভোগী ভগবান।

জন্মশতবার্ষিকী স্মরণে



ম্যাক্‌সিম গোর্কী

ভবানী মুখোপাধ্যায়

।। প্রথম পর্ব ।।

১৮৬৮ খৃস্টাব্দের এক উত্তপ্ত মধ্যাহ্নে ১৪ই মার্চ তারিখে ভার্ভারা কাশিরিনা আর ম্যাক্সিম পিয়েসকভের প্রথম সন্তান অলেকসী পিয়েসকভ ভূমিষ্ঠ হলেন। সাইবেরিয়ার ভবঘুরে যুবক পিয়েসকভ নিজ্নি-নভগোরদে এসেছিলেন ছুতোর মিস্ত্রীর কাজ করতে, সেই শহরে কাশিরিন পরিবার সম্পন্ন গৃহস্থ, তাদের সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে যুবক পিয়েসকভের প্রেম। একেবারে ভবঘুরে, মাথায় একরাশ চুল, দাড়ি দিয়ে বাঁধা। জামা-কাপড় অতিমলিন এবং সাধারণ সেই একদিন এসে হাজির পাণিপ্রার্থী হয়ে। ভার্ভারার বিবাহ সম্ভব হয়েছিল তার জননীর জন্য, পিতা প্রচণ্ড বাধা দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, ম্যাক্সিমের শ্যালকরা ছিল পাঁড় মাতাল এবং অতিশয় দুর্বৃত্ত প্রকৃতির। তারা একদিন ম্যাক্সিমকে ঠাণ্ডা জলের ডোবায় খেলার নাম করে নিয়ে গিয়ে প্রায় হত্যা করেছিল, কিন্তু সেই যাত্রা ম্যাক্সিম বেঁচে গেলেন, এর কিছুকাল পরে একটা কাজ নিয়ে ম্যাক্সিম অস্ত্রাখানে চলে গেলেন, ফিরে এলেন চার বছর পরে। তখন শিশু আলেকসী একটু বড়ো হয়ে উঠেছে কিন্তু হঠাৎ তার কলেরা হল, শিশু বেঁচেও উঠল কিন্তু ম্যাক্সিম সেই রোগে আক্রান্ত হলেন। তারপর আনন্দময় পুরুষ ম্যাক্সিম সেই রোগেই মারা গেলেন।

শিশু আলেকসীর চোখের সামনে যেন জীবনের রহস্যের একটা যবনিকা উন্মোচিত হল। সদানন্দময় ম্যাক্সিম, চুপচাপ শুয়ে আছেন। আর সদ্যশোকসন্তপ্তা জননী সেই নির্জীব দেহটার পাশে পাগলিনীর মত বসে কাঁদছেন। শিশু আলেকসী ব্যাকুল হয়ে ওঠে। বুড়ি দিদিমা এসে আলেকসীকে ভোলাবার চেষ্টা করেন। এদিকে মৃতদেহটিকে কবরস্থ করার ব্যবস্থা হচ্ছে। শিশু আলেকসী ভয়ে ভয়ে একটা বিরাট ট্রাঙ্কের পাশে লুকিয়ে পড়লেন। সেই স্থান থেকে দেখা গেল এক নবজন্মের সূচনা আলেকসীর ছোট ভাইটি ভূমিষ্ঠ হচ্ছে। জন্ম ও মৃত্যু জীবনের এই দুই বিরাট রহস্য শিশু আলেকসীর চোখে যেন এক নতুন জগতের সন্ধান এনে দেয়।

যে পরিবেশে আলেকসী বড় হয়ে ওঠে, সেই পরিবেশ অতিশয় ক্লেদাক্ত। দিন-রাত্রি মারামারি আর সামান্য প্রাপ্তির লোভে কলহ। দাদামশাই কাশিরিন বদমেজাজী মানুষ। শাস্তি দেওয়ার আগ্রহ তাঁর দুরন্ত এবং সেই শাস্তিদান করার সময় তাঁর এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। একদিন আলেকসীকে শাস্তি দিতে গিয়ে তিনি অতি নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিলেন, আর বালক আলেকসীও কিন্তু মুখ বুজে সেই অত্যাচার সহ্য করল না। সে একেবারে উন্মাদের মত রুখে দাঁড়ায়। এর পর সে খুবই অসুস্থ হয়ে পড়ল। যাই হোক এইভাবে শিশু আলেকসী ক্রমশ দুঃসাহসী হয়ে উঠতে থাকেন। রাতে দিদিমার কাছে শোয় আলেকসী। দিদিমা করুণাময়ী। তিনি সকলের জন্য প্রার্থনা করেন, সকলের দুঃখে কাঁদেন। ক্রমে শিশু আলেকসীর মনেও করুণা জাগে, তবে সে প্রতিজ্ঞা করে দিদিমার মত চুপ করে সে কোন অন্যায় সহ্য করবে না। সে প্রতিশোধ নেবে সব অন্যায়ের।

বাল্যকালের নানা উত্থান-পতন জননী ভার্ভারার বিচিত্র জীবন। অত্যাচারী বৃদ্ধ দাদামশাই এবং স্নেহময়ী দিদিমা আর সেই সঙ্গে অনেক পূর্বচরিত্র বালক আলেকসীর মনকে ভারে রাখে। ভার্ভারা ম্যাক্সিমভকে বিয়ে করে চলে যায়। বুড়ো কাশিরিন বাড়ি বিক্রী করে, দিদিমাকেও মাঝে মাঝে তাড়িয়ে দেয়। ভার্ভারার স্নেহ থেকে সে বঞ্চিত। পারিবারিক জীবন অতিশয় ক্লেশকর। একদিন একটি নোট চুরি করে হ্যান্স-এণ্ডারসনের গল্পের বই কিনে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করে আলেকসী। তবু আলেকসী পড়াশোনায় ভাল। পুরস্কার পায় ভাল ছাত্র হিসাবে। আর সেই পুরস্কার পাওয়া বই বিক্রী করে রোগজীর্ণ দিদিমার সেবা করে।

কিন্তু পড়াশোনা অগ্রসর হয় না। স্কুলটা উঠে গেল। এদিকে জননী ভার্ভারারও জীর্ণ হয়ে পড়েন। ম্যাক্সিমভের দেখা পাওয়া গেল শেষ অব্দে, একটা নতুন চাকরী এবং নতুন বাসার জোগাড় করে বাড়ি এসেছেন ভার্ভারা ও ছেলেদের নিতে যেতে। আলেকসী বাড়ি ছিল না, ফিরল যখন তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। জননী ভার্ভারা অতিশয় উত্তেজিত হয়ে আলেকসীকে ধমক দিতে গিয়ে হঠাৎ মূর্ছিত হয়ে পড়েন, তারপর পুত্রের হাতে একটু জলপান করেই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

অলেকসীর জীবনের বন্ধন ক্ষয় হল। তখন অলেকসীর বয়স মাত্র দশ বছর।

।। দুই ।।

সেই দশ বছর বয়সেই একটা চাকরী জুটে গেল জুতোর দোকানে। একেবারে পাথরের মূর্তির মত চুপচাপ থাকতে হবে কর্তার হুকুম। কর্তার বাড়িই থাকে অলেকসী, সেখানে জুতো পালিশ থেকে ডিসধোয়া ইত্যাদি ছোটখাট কাজগুলো করতে হয়। এই জুতোর দোকানে মাসতুতো ভাই সাসা কেরানীর কাজ করে। সে একটু উচ্চপদস্থ, তাই একটু স্বতন্ত্র থাকতে চায়।

অলেকসী লক্ষ্য করে দোকানের মানুষগুলো কেমন বর্বর, অবলীলাক্রমে সবাইকে ঠকায় যা তা কথা বলে স্ত্রীলোকদের সম্পর্কে অসম্মানজনক উক্তি করে। তার ভাল লাগে না, সে এই পরিবেশ ত্যাগ করে অন্যত্র যেতে চায়। কিন্তু হাতে গরম সুপ পড়ে গিয়ে বাধা পড়ল। হাসপাতালে যেতে হল, সারা রাত দুঃস্বপ্নের ঘোরে কাটিয়ে ভোরবেলা জেগে দেখে সেই স্নেহময়ী দিদিমা শিয়রে বসে আছেন। প্রথম চাকুরীর এইখানেই ইতি।

কাশিরিনদের অবস্থা বিপর্যয় ঘটে গেছে। নিদারুণ অভাব। বৃদ্ধ বন থেকে কাঠ আনে। অলেকসী অব দিদিমা ফলমূল সংগ্রহ করে। দুজনের কোনমতে চলে। কাশিরিন কিন্তু আবার একটা কাজ জোগাড় করে দেয়। দিদিমার বোন বেশ অবস্থাপন্ন তাঁর পুত্র প্ল্যান তৈরী করেন। এই ছেলেটির কাছে কাজ করতে হবে। কিন্তু এ বাড়িতেও কাজ কম নয়। দিন-রাত খাটুনি। চাকরের মত সব কাজ করতে হয়। শেষ পর্যন্ত একদিন দিদিমার বোনের ছেলেটিকে বলে, 'আমি ত চাকরের কাজই করছি তোমার কাজ কিছু শেখাও।' ছেলেটির মন ভাল, সে বললে 'বেশ ত এইসব থেকে কাজ কর!' দিদিমার বোনের তা সইল না সে ভাবল ছেলেটা যদি কাজ শিখে নেয় তাহলে আমার ছেলের কি হবে, ফলে গৃহস্থালীর কাজ আরও বেড়ে গেল। অন্যায় আর অত্যাচার আর সহ্য হয় না অলেকসীর। একদিন সকালে পাউরুটি কিনতে বেরিয়ে আর ফেরে না।

নিজনিনভগোরদের শহর ভলগার তীরে অবস্থিত। সেই প্রাণ-প্রবাহিনী ভলগা বারো বছরের আলেকসীকে হাতছানি দেয়। মেসে দু রুবল মাইনে বরাদ্দ হল একটা স্টীমারে। শুরু হল আলেকসীর বিশ্বদর্শনের পালা।

স্টীমারের বাইরে ভলগা, কিন্তু ভিতরের মানুষগুলি নীচ, অতি নিম্নস্তরের। এদের মনে কোন বিকার নেই, পশুর মত নরনারীর যৌনকর্ম সর্বসমক্ষেই অহরহ ঘটে। বারো বছরে ছেলে অলেকসীর জীবনের রঙ্গমঞ্চে কি বিচিত্র হাতেখড়ি। এই স্টীমারের রাঁধুনী মিখায়েল স্মিউরি ছিলেন সেনাবাহিনীর লোক, মনে প্রচণ্ড জোর। কোন দয়া, ক্ষমার ধার ধারেন না, গায়ের জোরও কম নয়। বালক আলেকসীকে তাঁর ভাল লাগে। তিনিই আলেকসীকে ধরে-বেঁধে পড়তে বসালেন। একদিন সেই স্টীমারের কাপ্তানের স্ত্রীর কাছে তিনি একদিন গোগোলের 'তারাস বালবা' এনে দিলেন বালক আলেকসীকে। এই প্রথম পরিচয় মহৎ সাহিত্যকারের রচনার সঙ্গে। সুমধুর রচনা, সরসতায় সজীব। কাপ্তানের স্ত্রীর কাছে ক্রমে ক্রমে নেক্রাসভ, ওয়াল্টার স্কট অলেকজান্দার দুমা, প্রভৃতি বিখ্যাত লেখকের শ্রেষ্ঠ রচনা আসে। এ এক বিচিত্র জগৎ। শৈশবে দিদিমার কাছে রূপকথা শুনেছে সে এও আশ্চর্য কল্পলোক কিন্তু তার সঙ্গে বাস্তবের যোগ নেই। দুমার এ সব মানুষ রক্ত-মাংসে গড়া। বালক আলেকসীর মনে প্রশ্ন জাগে—মানুষ তাহলে শুধু মন্দ তা নয় ভাল মানুষও আছে। স্মিউরী বলে — ভাল-মন্দের বিচারে কি প্রয়োজন। কিছু মানুষ বেশ বুদ্ধিমান, বাকী সবাই গাধা!

এই স্টীমারের চাকরী থেকে একদিন মাত্র আট রুবল নিয়ে বিদায় নিতে হল অলেকসীকে মিথ্যা অপবাদ নিয়ে। চলে আসার সময় স্মিউরী বলেছিল--খুব পড়াশোনা করবি। এর চেয়ে উত্তম কাজ আর নেই।

বেশ বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছে অলেকসীর। জীবন তার প্রতি নির্মম হলেও তার অনেকখানি রহস্য এই অল্পকালের মধ্যেই ওকে দেখিয়েছে আবরণ উন্মোচন করে। এই কদিনেই সে নিয়ে ফিরেছে অনেক বছরের মূল্যবান অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। এখন আর দাদামশায়ের চোখরাঙানী সে সইবে না। সইবে না, কারও কোন অন্যায় অত্যাচার।

দাদামশায়ের কাছে এসে আবার সেই পুরাতন জীবন। সেই গ্লানিভরা দুর্বিসহ জীবন ভাল লাগে না। অলেকসী চায় নির্জনতা। নিঃসঙ্গ হয়ে সেই নীরব নির্জনে বিচরণ করতে তার মন চায়। হঠাৎ একদিন কাশিরিনের বাড়ির কাছে এক দল রুশ সেনা ও কসাক এসে শিবির বাঁধল। ওদের সঙ্গে মেলামেশা করতে গেল আলেকসী। বেশ হৃদ্যতা হয়েছে, একদিন একটা সিগার ওরা উপহার দিল, অলেকসী সিগারটা জ্বালাতেই তার ভেতরকার ঠাসা বারুদ ওর মুখটা পুড়িয়ে দিল। কি নির্মম অত্যাচার। কি নিষ্ঠুর আনন্দ উপভোগের প্রবৃত্তি এই মানুষগুলির।

এর পর কসাকদের সঙ্গে এসে মিশল অলেকসী। এরা কিন্তু মানুষ ভাল। এদের পরিবেশ বেশ ভাল লাগে অলেকসীর। কিন্তু সেই স্বপ্নও ভাঙে, একজন কসাক তার স্ত্রীকে এমনভাবে উৎপীড়ন করছিল যা কিশোর আলেকসীর মনটা বেদনায় ভরে দেয়।

বয়ঃসন্ধি কাল এসেছে। যৌনরহস্য তার অজ্ঞাত নয়, কিন্তু দেহাতীত প্রেম যা গল্প উপন্যাসে পড়েছে তাই বেশ ভাল লাগে আলেকসীর। বাড়ির সামনে থাকত এক দরজির স্ত্রী। তাকে নিয়ে সবাই নানা রকম কটু উক্তি করত, কেউ কেউ প্রেমপত্রও লিখত। কিশোর আলেকসী তাকে সতর্ক করে দেয়। তারপর একদিন সেই নারীর মধ্যেও যে কংকাল প্রকাশ পায় তা কিশোর অলেকসীকে উৎপীড়িত করে। এর কাছেও কিছু বই পাওয়া গেল, হাল্কা উপন্যাস, তবু বই।

এর পর যিনি প্রভাবিত করলেন আলেকসীকে তিনি এক পরমা সুন্দরী সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর বিধবা রমণী। তাঁর বাড়িতে একটা সাংস্কৃতিক চক্র ছিল। এই বিধবার

সোভিয়েত ইউনিয়নে গোর্কী জন্ম-শতবার্ষিকী ॥

সম্প্রতি কনস্তান্তিন ফেদিন-এর সভাপতিত্বে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের গোর্কি জয়ন্তী কমিটির এক অধিবেশন হয়। গোর্কির জন্মস্থান নিঝনি নভগরোদে শহরের বর্তমান মেয়র এ সকলোফ জানান এই উপলক্ষে শহরবাসী নানাপ্রকার বিদ্বজ্জন সম্মেলন, প্রদর্শনী ও সংগীত-উৎসবের আয়োজন করবেন। তাছাড়া, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের ও রুশ ফেডারেশনের লেখক-সমিতির একটি যুক্ত-অধিবেশনও সেখানে অনুষ্ঠিত হয়। মন্ত্রি-পরিষদের সংবাদপত্র-সম্পর্কিত কমিটির সভাপতি এন মিখাইলোফ জানান আগামী মার্চ মাসের মধ্যে মস্কোয় প্রকাশন-সংস্থাসমূহ অন্তত ৬৫টি নতুন গ্রন্থ প্রকাশ করবেন। বিভিন্ন গ্রন্থের মুদ্রণ সংখ্যা ৫০ লক্ষেরও বেশি হবে। তাছাড়া নাউক প্রকাশনী থেকে এ-বছর গোর্কির রচনাবলী ২৫ খণ্ডে প্রকাশিত হবে।

সোভিয়েত রঙ্গমঞ্চগুলিতেও গোর্কির গল্প-উপন্যাসের নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করার পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। ক্রেমলিন থিয়েটারে দশদিনব্যাপী গোর্কি-নাটোৎসব শুরু হয়েছে। গোর্কির অনেকগুলি গল্পের ভিত্তিতে 'রাশিয়া প্রদক্ষিণ' নামে এক চলচ্চিত্র তোলা হয়েছে। তাঁর 'একঘেয়েমি থেকে মুক্তির জন্য' কাহিনীর চলচ্চিত্ররূপও সম্প্রতি গৃহীত হয়েছে। তাছাড়া গোর্কি সম্পর্কে আটটি দলিলচিত্রও মুক্তি পাবে। বিশ্বসাহিত্য-সংক্রান্ত গোর্কি ইনস্টিটিউট থেকে এল নিওনোফ-এর সম্পাদনায় তিনটি সিরিজে গোর্কির সমগ্র রচনাবলী প্রকাশিত হচ্ছে। গোর্কির আমলের বিশ্লেষণমূলক পুস্তকাবলী, গোর্কির অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি ও নোটসমূহের একটি সংগ্রহপুস্তকও এই উপলক্ষে প্রকাশিত হবে।

একটি পাঁচ বছরে শিশুকন্যাকে আলেকসী রূপকথা শোনাত। সেই পাঁচ বছরের মেয়েটাই একদিন আলেকসীকে বাড়ির ভেতর টেনে নিয়ে যায়। আলেকসী ছোট ঘরের ছেলে তাই খুব সন্তুষ্ট হলেন না মেয়েটির মা, তবু সে যে পড়াশোনা ভালবাসে এটা তাঁর ভাল লাগল। আর আলেকসী এই বিধবা রমণীটিকে মনে মনে ভালবেসে ফেলেছে। এই রমণী তার চোখে মানবী নয় কল্পলোকবাসিনী দেবী। অন্য পুরুষের সঙ্গে তিনি কথা বললে তার অন্তরে ব্যথা লাগে, সে চুপ করে থাকে। কোন কোন দিন আলেকসীর সামনেই তিনি তার বুকের আবরণ উন্মোচন করেন, কোন বিকার নেই কিন্তু আলেকসীর মনে। কিন্তু একদিন সেই রমণীকে দেখা গেল একজন মিলিটারি কর্মীর নিবিড় বাহুবন্ধনে ধরা দিয়েছেন। বালক আলেকসীর কাছে রূঢ় আঘাত, মহিলাটিও বুঝলেন। ওকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিলেন। স্বপ্নভঙ্গ হলেও এই মহিলাটিকে ভুলতে পারে না আলেকসী।

ইতিমধ্যে রাশিয়ায় নেমেছে বিপ্লবের বহ্নিশোখী। বালক আলেকসী কিন্তু তার খবর রাখে না। বিপ্লবীরা সম্রাট দ্বিতীয় আলেকজান্দারকে হত্যা করেছে। আলেকসী কিছু কিছু আলোচনা শোনে, কিন্তু তার কাছে এসব কথা অর্থহীন। সে কিছুই বোঝে না। জারের অত্যাচার প্রতিরোধ করার জন্য সর্বত্র গুপ্ত সমিতি গড়ে উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে পড়াশোনা করাটা নিছক বাতুলতা। যারা পড়াশোনা করে তারাই বিপ্লবী। যে বাড়িতে থাকে তারাও পড়াশোনা পছন্দ করে না। বুড়ি রোজ মোমবাতি মেপে দাগ দিয়ে রাখে, যাতে না জ্বালান হয়। আলেকসী চাঁদের আলোয় পড়ার চেষ্টা করে কিন্তু তা হয় না।

সেই দরজীর স্ত্রীর কাছে আলেকসী সন্ধান পেয়েছিল গঙ্কুর, গ্রীন উড, বালজাকের রচনার। তারপর সেই সম্ভ্রান্ত বিধবার কাছে সন্ধান পায় পুশকিনের কবিতার। তাঁর কাছ থেকেই পাওয়া গেল তুর্গেনিভ। বালক আলেকসী আবার কল্পলোকে বিচরণ করে। তারপর আর এক চুরির দায়ে নির্বাসিত হয়ে আলেকসী বেরিয়ে পড়ল ভলগার টানে।

এইবার স্টীমারে পরিচয় হল বেকবের সঙ্গে। এ এক বিচিত্র মানুষ। কোন ন্যায়-নীতির ধার ধারে না, যেন আদিম মানুষ। পাপ-পুণ্য, ভাল-মন্দ সব তুচ্ছ তার কাছে। তার কাহিনীতেই নীতি প্রচারে প্রচেষ্টা নেই। আলেকসীর জীবনে এ আর এক সঞ্চয়।

নিজনিতে ফিরে এসে এবার একটা কাজ পেল 'আইকন' বিক্রীর দোকানে। নানা-রকম দেব-দেবীর মূর্তি, ধর্মান্ধ মানুষ কেনে তাগা-তাবিজের মত, তাদের বিশ্বাস বিপদে-আপদে এই 'আইকন' তাদের রক্ষা করবে। কিন্তু এই কাজে যারা লিপ্ত তারা অতি নোংরা প্রকৃতির। সরল গ্রাম্য লোকদের বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে তাদের ঠকায়। কারিগরগুলি অবশ্য ভাল, তারা মালিকদের মত নয়। সে 'আইকন'নির্মাতাদের কাছে গল্প ও কবিতা শোনায়। কিন্তু মন আবার উধাও হয়। এবার পারস্যে যেতে চায়। কিন্তু সেই নক্সাকার মামা একদিন একটি সিগারেট দিলেন, বললেন ওসব বাজে কথা ছাড়। আমি একটা দোকান করব মেলায়, সেখানে সাহায্য করবি চল। মামা লোক ভাল। দোকানের ছুতারদের কাজকর্ম দেখে আলেকসী। তাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে মিলিয়নস স্ট্রীটে পতিতা পল্লীতে যায়। মামা সতর্ক করে দেন। কিন্তু আলেকসী পতিতাদের দুঃখকর জীবন দেখে বেদনা বোধ করে। তাই একদিন সে পথে যাওয়া বন্ধ হল।

না আলেকসী এইবার আবার বেরিয়ে পড়বে। এমন সময় পরিচয় হল এভ্রাইনভ নামে একটি সুন্দর ছেলের সঙ্গে। তার বয়স উনিশ বছর। সে ওকে পড়াশোনায় উৎসাহিত করে। পাঁচ বছর লাগবে কলেজে যথার্থ শিক্ষালাভ করতে। এভ্রাইনভ তাকে সব দিক থেকে সহায়তা করবে।

একদিন প্রকৃত শিক্ষালাভের জন্য আলেকসী আবার স্টীমারে চড়ে বসল। সেদিন বিদায়বেলায় দিদিমা সজল চোখে বলেছিলেন—মানুষের ওপর যেন রাগ করিস নি। মানুষের বিচার ভগবান করে না ওটা শয়তানের কাজ।

কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন সুবিধা হল না পড়াশোনার, সেখানকার কর্তারা কোন সহানুভূতি দেখালেন না। গরীব ছোট-লোকেরা যাতে লেখাপড়া না শেখে কর্তৃ-পক্ষের সেই নির্দেশ। এই সময় একদিন আলাপ হল বাসকিনের সঙ্গে, লোকটার বাসনা ছিল শিক্ষক হবে, হল কিন্তু চোর। লোকটা কিন্তু বেশ ভাল গান লেখে, বেশ্যাদের জন্য সে অনেক গান লেখে। লোকটা আলেকসীকে সুনজরে দেখে। আর একজন চোরাই মাল বিক্রী করত, ঘড়ি সারানোর দোকানের আড়ালে সেই তার আসল কারবার। সে কিন্তু বলে—তুমি যেন চুরি কর না। এ কাজ তোমার নয়।

কিন্তু আরও একজন এল জীবনে। তার নাম প্লেটানভ। সেও গরীব। আলেকসীর অবস্থা জেনে সিঁড়ির তলায় যে ঘরটিতে থাকত সেখানে তারও একটা জায়গা হল। এই রাস্তায় কয়েক ঘর পতিতা থাকে। একটায় থাকেন একজন পাগল অঙ্কের পণ্ডিত। পতিতারা এই লোকটাকে দুবেলা খেতে দেয়। আলেকসীর ঠিক মাথার ওপর থাকে একজন ছাত্র, তার কাছে প্রতি রাত্রে একজন ধনী রমণী এসে প্রেম নিবেদন করে। এই বিচিত্র সংসারে আলেকসীর দিন কাটে। গুপ্ত সমিতিতে বসে এডাম স্মিথের অর্থ-নীতির গ্রন্থাদির পাঠ শোনে।

আলেকসী সন্ধান পায় ডেরেনকভের দোকানের। নানা ধরনের বিপ্লবীর সঙ্গে কয়েক দিন কাটল আলেকসীর। "নারড" বা জনগণের সম্প্রদায়কে বলা হত 'নারডনিক'। 'নারড' এক দেবতার নাম, সেইভাবে জন-গণেশের পূজা করে 'নারডনিকরা'। আলেকসীও এই জনগণেব পূজায় আত্ম-নিবেদন করে। এবার জীবন হল নূতন ধারায় প্রবাহিত।

একটা পাঁউরুটি কারখানায় কাজ পাওয়া গেল। এখানে চল্লিশজন কর্মচারী। এ আর এক জগৎ।

(আগামীবারে সমাপ্য)



সাহিত্য ও সংস্কৃতি

ভারতীয় সাহিত্য

স্বাধীনতার পরবর্তী মালয়ালম কথাসাহিত্য

স্বাধীনতার পরবর্তী মালয়ালম কথাসাহিত্য নিঃসন্দেহেই বিশিষ্টতার দাবি রাখে অবশ্য স্বাধীনতার মূল্যবোধের কোন প্রভাব মালয়ালম সাহিত্যিকদের উপর পড়েছে কিনা, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

স্বাধীনতার পরে মালয়ালম উপন্যাসে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে দিকটি চোখে পড়ে, তা হল একদিকে ফরাসী ও রুশীর উপন্যাসের প্রভাব এবং অন্যদিকে ফ্রয়েডের মনোবিজ্ঞান ও মার্ক্সবাদের প্রভাব। এ ছাড়াও দেখা গেল, যাঁরা স্বাধীনতার আগে ছোট গল্প লিখতেন, তাঁরা উপন্যাস লিখতে আরম্ভ করেছেন। এই সময়ে উপন্যাস রচনায় যাঁরা খ্যাতি অর্জন করেছেন, তাঁদের মধ্যে ওকসি ও শ্রীশিবশঙ্কর পিল্লাই খুবই উল্লেখযোগ্য। এঁদের দুজনের উপন্যাস নানা বিদেশী ভাষায় অনূদিত হয়েছে। শ্রীশিবশঙ্কর পিল্লাইয়ের উপন্যাস থেকে চলচ্চিত্রে রূপায়িত "চেম্মিন" ১৯৬৬ সালে রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক লাভ করেছে। এ ছাড়াও যাঁরা উল্লেখযোগ্য, তাঁদের মধ্যে আছেন শ্রীকেশব সেন, মহম্মদ বশীর ও পানিক্কর। শ্রীকেশব সেন তাঁর উপন্যাস "ওটপিক নিল্লু"তে একজন রিক্সাচালকের বাস্তব জীবন কাহিনী বর্ণনা করেছেন। মহম্মদ বশীরের রচনায় মুসলমান সমাজের পারিবারিক সুখ-দুঃখের কাহিনী বর্ণিত। পাণিক্কর হলেন কেরলের এককালের অন্যতম প্রিয় ঔপন্যাসিক।

ছোট গল্পের ক্ষেত্রটি উপন্যাসের মত তেমন সমৃদ্ধ নয়। একালের মালয়ালম গল্পের প্রধান বিষয় হল মনস্তত্ত্ব ও চেতনা-প্রবাহ। অবশ্য অনেক লেখক তাঁদের গল্পের পটভূমি রচনা করেছেন, ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে। কাকেসন, নন্দনার, পারপুরম প্রমুখ গল্পকারগণ যুদ্ধের পটভূমিতে তাঁদের গল্প রচনা করেছেন। এই সব গল্পের আবেদন যে অনেক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ, তাতে কোনও সন্দেহ নেই, কারণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এখানে সীমিত। মাধবী কুট্টি একালের মালয়ালম ছোট গল্পের অন্যতম লেখিকা। কমলা দাস ছদ্মনামে তিনি ইংরেজিতেও কাব্য রচনা করে থাকেন।

কৃত্তিবাসের বার্ষিক উৎসব

এবার কৃত্তিবাস পুরস্কার লাভ করেছেন শিলচরের কবি শান্তনু ঘোষ। গত ১ মার্চ কলকাতার ওভারটুন হলে এই পুরস্কার প্রদান উপলক্ষে একটি কবি সভার আয়োজন হয়। শান্তনু ঘোষ অসুস্থতার জন্য উপস্থিত হতে না পারায় তাঁর কবিতা পাঠ করে শোনান তনুশ্রী ভট্টাচার্য।

বিদেশী সাহিত্য

আন্তর্জাতিক অনুবাদক সম্মেলন ॥

কিছুদিন আগে পূর্ব-ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত লেখক ও অনুবাদকদের একটি সম্মেলন হয়ে গেল ফ্রাঙ্কফুর্টে। অনুবাদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করাই ছিল এই অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য। ফ্রাঙ্কফুর্ট সাহিত্য সংস্থার যুগ্ম-প্রতিষ্ঠাতা ও সমকালীন পোলিশ-সাহিত্যের অনুবাদক কার্ল দেদেসিয়াস উদ্বোধনী ভাষণ দেন। তিনি বলেন, অনুবাদকেরা প্রকাশকদের সহকারী নন, বরং প্রকাশকদের উচিত তাঁদের কর্তব্য সম্পাদনে সাহায্য করা। এই সম্মেলনের প্রধান বক্তা ছিলেন জিগনিস্ট হার্বার্ট। অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে চেকোশ্লোভাকিয়ার কামিলা জিরোদকোয়া এবং ইভান কুপেক, হাঙ্গেরীর সেণ্ডার ওরেস, তামার উনগোয়ারী এবং এলমার সাগ, রুমানিয়ার সোফিয়ানা সোরা ও পেতার স্টয়েকো—এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাছাড়া, বুলগারিয়া, যুগোস্লাভিয়া ও পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে বার্লিন সাহিত্য সংস্থার উলফগ্যাং মাইয়ার 'আজকের জার্মান গদ্য' সাহিত্যের সর্বশেষ ঝোঁক ও সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের একটি বিবরণ দেন। কবি কার্ল ক্রোলো সমকালীন জার্মান কবিতা সম্পর্কে একটি লিখিত ভাষণ দেন। কবি এরিখ ফ্রাইড প্রথমে একটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। পরে তার ওপরে অনুবাদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়।

বিশ্ব-সাহিত্যের ইতিহাস ।।

কিছুকাল আগে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের 'গোর্কি ইনস্টিটিউট'-এর উদ্যোগে 'এ হিস্টরি অব ওয়ার্ল্ড লিটারেচার' নামে একটি গ্রন্থ রচনার কাজ শুরু হয়েছে। তাঁরা এই পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেছিলেন, ১৯৬৫ সালের শেষের দিকে।

এই বিরাট পরিকল্পনার পদ্ধতিগত আদর্শ কি হবে— সেই সম্পর্কে কিছু কিছু খবর সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো, পৃথিবীর প্রত্যেকটি জাতীয়-সাহিত্যের ঐতিহাসিক প্রগতি-রেখা নিরূপণ করে—তাদের পারস্পরিক প্রভাব কিভাবে বিশ্বসাহিত্যের নির্মাণ ও গঠনে সহায়তা করেছে তা সাধারণ পাঠকের সামনে তুলে ধরা। এর জন্য প্রত্যেকটি জাতীয় সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস আলাদাভাবে লেখা হবে না। সবরকম ভাববাদ বিতর্ক ও বিশ্লেষণ এবং অস্ফুট ঘটনার সমাবেশকে পরিহার করে, দৃঢ় ও সুস্পষ্ট তথ্যের ভিত্তিতেই তা রচিত হবে। কেননা, বিশ্ব-সাহিত্য স্বতন্ত্রভাবে কতকগুলি জাতীয়-সাহিত্যের যোগফল নয়, বরং তাদের ঐকতানে সৃষ্ট একটি ঐতিহাসিক ফলশ্রুতি।

প্রায় ২০ জন কবি তাঁদের স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শোনান। শিবনারায়ণ রায়ের একটি কবিতা পাঠ করেন গৌরকিশোর ঘোষ। অনুষ্ঠানের অন্যতম উদ্যোক্তা তারাপদ রায়ের ঘোষণাগুলি অনুষ্ঠানটিকে প্রাণবন্ত করে রাখে।

এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় "কৃত্তিবাসে"র একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন লেখকের অসংখ্য কবিতা এতে সংকলিত হয়েছে।

ভারতীয় সাহিত্যের বঙ্গানুবাদ

বিলম্বিত হলেও সুখের খবর এই যে, সম্প্রতি ভারতীয় সাহিত্যের দিকে বাঙালী লেখক এবং অনুবাদকদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে। 'অমৃত' পত্রিকা গত বছর একটি "প্রতিবেশী" সাহিত্য সংখ্যা প্রকাশ করেছিল। তাতে কয়েকটি প্রতিবেশী সাহিত্যের উপর আলোচনা সংকলিত হয়েছিল। এখন দেখা যাচ্ছে, কয়েকটি পত্রিকাও এ ব্যাপারে সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

'দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গীয় সাহিত্য সমিতি' কর্তৃক প্রকাশিত ও অজয় মাইতি সম্পাদিত 'প্রতিধ্বনি' পত্রিকার বর্তমান সংখ্যায় মালয়ালম সাহিত্যের কিছু উল্লেখ্য অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। প্রখ্যাত মালয়ালম কবি আইয়াপ্পা পানিকর, সুগত কুমারী ও এন ভি কৃষ্ণওয়ারিয়রের তিনটি কবিতার অনুবাদ করেছেন অজয় মাইতি। মহম্মদ বশীরের 'পুরম্‌পড়ম' গল্পের অনুবাদ করেছেন আশিস ঘোষ এবং জে ও এম অনুজনের একটি প্রবন্ধের অনুবাদ করেছেন সুমঙ্গল মুখোপাধ্যায়। 'প্রতিধ্বনি' পত্রিকাটি এজন্য সকলের প্রশংসা অর্জন করবে, তাতে সন্দেহ নেই।

বিহারের বাংলা ত্রৈমাসিক 'সপ্তদ্বীপা'র অবদানও এদিক থেকে কম উল্লেখ্য নয়। রবীন দত্ত সম্পাদিত এই পত্রিকায় 'জ্ঞানপীঠ' পুরস্কার বিজয়ী জি শঙ্কর কুরুপের কবিতার অনুবাদ করেছেন সুজাতা প্রিয়ংবদা। আসাম থেকে প্রকাশিত এবং বিজিতকুমার ভট্টাচার্য ও ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহ সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রিকাতেও একটি সুন্দর প্রবন্ধ অনূদিত হয়েছে। অপূর্ব বড় ঠাকুরীয়া রচিত একটি অসমীয়া প্রবন্ধের অনুবাদ করেছেন ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহ। শুদ্ধসত্ত্ব বসু সম্পাদিত 'একক' পত্রিকাতেও ভারতীয় কবিতা অনুবাদের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। বর্তমান সংখ্যায় দুটি অসমীয়া ও দুটি নেপালী কবিতা অনূদিত হয়েছে। অসমীয়া কবি হেমেন বর গোহাঞি এবং নেপালী কবি হেম হামালের কবিতা অনুবাদ করেছেন সুজাতা প্রিয়ংবদা।

বাংলা কবিতা যেমন আজ ভারতের বিভিন্ন ভাষায় এবং পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হচ্ছে, তেমনি বাংলাতেও বিভিন্ন ভাষা থেকে অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা আছে। এতদিন পর্যন্ত বাংলায় যা-কিছু অনূদিত হয়েছে, তা বিদেশী ভাষা থেকে। এবার যে আমাদের দৃষ্টি এদিকে ফিরেছে, তা খুবই আশার কথা।

হিন্দি কবিতার ইংরেজী অনুবাদ

সমকালীন হিন্দি কবিতার গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে অহিন্দিভাষীদের ধারণা তেমন স্পষ্ট নয়। এই অসুবিধা দূরীকরণের জন্য সম্প্রতি 'রূপম্বরা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। এই পত্রিকায় সমকালীন হিন্দি কবিতার ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও আছে কবিদের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত পরিচয়। প্রথম সংখ্যায় যাঁদের রচনা সংকলিত হয়েছে, তাদের মধ্যে আছেন সর্বশ্রী অশোক বাজপেয়ী, সলভ শ্রীরাম সিং, রঘুবীর সহায়? রঞ্জিত, নীলম শ্রীবাস্তব, অলোক শর্মা, শ্রীহর্ষ, চন্দ্রকান্ত দেওতলে। কবিতাগুলি অনুবাদ করেছেন শ্রীমনমোহন ঠাকুর। তিনিই পত্রিকাটির সম্পাদক।

সংস্কৃত নাটকের ইতিহাস ॥

বোম্বাইয়ের 'পপুলার প্রকাশন সংস্থার' উদ্যোগে 'সংস্কৃত নাটকের উদ্ভব, বিকাশ ও ক্রম পরিণতির উপর একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটি লিখেছেন আদ্য রঙ্গাচার্য।

এই গ্রন্থ কয়েকটি খণ্ডে সমাপ্ত হবে। প্রতিটি খণ্ডেই থাকবে কোন একটি সুনির্দিষ্ট চিন্তনের তাৎপর্য ও পরিপ্রেক্ষিতের উদ্ঘাটন। স্থান-কাল-পাত্র ও চরিত্রের বিবর্তনে মানবীয় শিল্পচেতনার বিকাশ কিভাবে ঘটে—তাই মূলতঃ এ-সকল খণ্ডে দেখানো হবে। এই গ্রন্থের গ্রন্থকারদের কাছে সবচাইতে দুরূহ কাজ হবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সাহিত্যের সিন্থেসিসরূপে আধুনিক বিশ্বসাহিত্যের মূল্যায়নের বিষয়টি।

প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হবে শীঘ্রই। তার পাণ্ডুলিপি এখন প্রেসে দেবার জন্য প্রস্তুত। এই খণ্ডে থাকবে, প্রাচীন বিশ্বের সাহিত্যিক চিন্তা এবং আদিম মানুষের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের পথ-পদ্ধতির বিশ্লেষণ। অন্যান্য খণ্ডের আলোচ্য বিষয় এখনও জানা যায়নি। এতে নবম-দশম খণ্ডে থাকবে ১৯১৭ সাল ও তার পরবর্তী সাহিত্যানুশীলনের ইতিহাস।

মার্টিন ওয়াল্‌সার-এর নাটক ॥

মার্টিন ওয়ালসার পশ্চিম জার্মানির একজন প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক। তাঁর 'হাফ্‌-টাইম'? 'হাল্‌ব্‌-জেইট' উপন্যাসটি একাধিক ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছে। সম্প্রতি তিনি একটি নাটক লিখেছেন। বিষয়—বিবাহিত জীবনের ক্লান্তি ও জটিলতা। এবং এইসব অবাঞ্ছিত ঘটনার দুর্বিপাকে পড়ে কিভাবে একটি পরিবার অসুখী হয়ে উঠতে পারে—তারই করুণ কাহিনী এতে বর্ণিত হয়েছে। স্ট্রিণ্ডবার্গ থেকে আলবি পর্যন্ত বহু জার্মান লেখকই বিবাহিত জীবনের সমস্যা নিয়ে গ্রন্থরচনা করে গেছেন। ওয়াসলার এই নাটকে স্ট্রিণ্ডবার্গ-এর নরক ও আত্মার দ্বিখণ্ডীকরণের তত্ত্বটিকে উপজীব্য করেছেন। একটি বিবাহিত দম্পতির ভাসমান অস্তিত্ব প্রদর্শনই অবশ্য নাট্যকারের মুখ্য উদ্দেশ্য। নাটকীয় সংঘাতসমূহ প্রায়শঃ ক্লান্তি, বিষাদ ও পারস্পরিক ভ্রান্তির সূত্র থেকে সংঘটিত।

উল্‌ভিটিক স্কুরের সচিত্র-গ্রন্থ ॥

উল্‌ভিটিক স্কুরের 'ওয়াজ ইক ফুর মেইন লেবেন গার্ন টু' নামে একটি গদ্য রচনার সংকলন বেরিয়েছে বার্লিন থেকে। লেখকের আঁকা তেত্রিশটি ছবি বইটির মর্যাদা বৃদ্ধির পরিচায়ক। উল্‌ভিটিক পুরোপুরি নগরসচেতন মানুষ। তিনি যখন তাঁর কবিতায় কিংবা গল্পে অরণ্য, হ্রদ কিংবা গ্রামবাসিদের উজ্জ্বলতার প্রশংসা করেন, তখনও তাঁকে একান্তভাবেই শহরের মানুষ বলে মনে হয়। এই সংকলনের অন্তর্ভূক্ত বারটি গদ্যকবিতার মধ্যে প্রথমটির নাম অনুসারে বইটির নামকরণ করা হয়েছে। কবিতাগুলি ব্যঙ্গোক্তিপ্রধান। এবং অ্যায়লোআইরিশ লেখক জোনাথন সুইফট-এর বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে লেখা। ক্যার্থেনিয়ান পর্বতমালার প্রেক্ষাপটে লেখা একটি তিরিশ পৃষ্ঠাব্যাপী উপন্যাস দিয়ে সংকলনটি সমাপ্ত।

গ্যেটে ব্যবহৃত শব্দের অভিধান ॥

জার্মান কবি ও প্রখ্যাত দার্শনিক গ্যেটের রচনাবলী পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। সম্প্রতি তাঁর ব্যবহৃত শব্দাবলীর একটি অভিধান জার্মান ভাষায় সংকলিত হয়েছে। এই অভিধানে গ্যেটে-ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দের অর্থ ও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। গ্যেটে-জিজ্ঞাসুদের কাছে গ্রন্থটি মূল্যবান বলে বিবেচিত হবে।

হাইকে দৌতিনের রচনা-সম্মেলন ॥

মহিলা কবি হাইকে দৌতিনের একটি রচনা-সঙ্কলন প্রকাশিত হয়েছিল দু বছর আগে। সম্প্রতি 'দাস হার্জ আউফ দের লেজ' নামে তাঁর অপর একটি গদ্য-পদ্যের সঙ্কলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এই সঙ্কলনকে সব মিলিয়ে তিরিশটি লেখা স্থান পেয়েছে। প্রতিটি কবিতার বাঁ-দিকের পাতায় ডায়েরী থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ মুদ্রিত হয়েছে। তীক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তি ও সহৃদয় দৃষ্টিভঙ্গির জন্যে সমকালীন অন্যান্য কবিদের তুলনায় তাঁকে আত্মসচেতন বলা যায়।

নতুন বই

এক রাত্রির জন্য (কাব্য-নাটক)—কৃষ্ণ ধর।। প্রাপ্তিস্থান : জাতীয় সাহিত্য-পরিষদ। ১৪ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট -৯।। দাম : দুই টাকা।

বাংলা ভাষায় সার্থক নাট্যকাব্যের স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু কাব্যনাট্যের প্রচলন ও প্রবর্তন নিতান্ত আধুনিককালের ঘটনা। বোধহয়, কবি রাম বসুকেই এ ব্যাপারে অগ্রণী পুরুষ বলা যায়। প্রায় এক যুগ আগে তাঁর কাব্যনাটকের অভিনয় অনেকের মনে বিস্ময় সৃষ্টি করেছিল। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ ধরের 'একটি রাত্রির জন্য' এই ধারার-ই একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। প্রায় আট বছর আগে এটি লিখিত হয়েছিল এবং "গন্ধর্ব" নাট্যগোষ্ঠীর প্রযোজনায় ১৯৬১ সালের ১৬-ই এপ্রিল তা মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। শোনা যায়, বিপুল সংখ্যক দর্শকের প্রশংসায় তা অভিনন্দিত হয়।

এ নাটকের ঘটনাকাল (একটু বিস্তৃত-ভাবে ধরলে) একটি সূর্যাস্ত থেকে অপর একটি সূর্যোদয় পর্যন্ত প্রসারিত। এর প্রেক্ষাপটে রয়েছে একটি রাত্রির জনবিরল স্টেশন, নৈশ নিঃসঙ্গতার আবহ, সিগন্যালের লাল আলো, মালগাড়ির শান্টিং-এর শব্দ আর ওয়েটিং রুমে অপেক্ষমান একটি তরুণ ও একজন তরুণীর আত্মোদ্ঘাটনের দৃশ্য। মাঝে মাঝে আলো-আঁধারির খেলা, শাণিত কথোপকথন, চা-ওয়ালা, স্টেশন-মাস্টার ও তাঁর ভৃত্য এই নৈশ-পরিবেশকে গভীরতর করে তুলছে। বলা যায়, 'এই তো উন্মোচনের সময়।'

এই নাটকের মুখ্য-চরিত্র দুজন তরুণ-তরুণী পরস্পর পূর্ব পরিচিত নয়। তবু মুহূর্তে তারা সমস্ত-প্রকার কৃত্রিমতার খোলস ত্যাগ করে একান্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে চায়। হয়তো, পারস্পরিক নিঃসঙ্গতাই তাদের এই নৈকট্যের প্রধানতম কারণ। এ নাটকের তিন-চতুর্থাংশেরও বেশিরভাগ সংলাপে এই নিঃসঙ্গতার বেদনা সঞ্চারিত।

লক্ষ্য করার বিষয়, অনিবার্য সংঘাতের মুহূর্তেও তারা ভারসাম্যহীন নয়, বরং একটি গোপন প্রত্যয়ের সুর প্রতিটি সংলাপে অভিব্যক্ত। সেইজন্যেই, একটি নৈশ-জাগরণের পরেও তাদের জন্যে একটি মনোরম সকাল অপেক্ষা করে আছে।

এই কাব্য-নাটকটির দৃশ্য ও সংলাপ তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়। এখানে 'ট্রেন' ও 'ওয়েটিং রুম' শব্দ দুটি প্রতীক হিসেবে ইঙ্গিতময়। গন্তব্যে পৌঁছবার জন্য 'ট্রেন' অত্যাবশ্যক, আর 'ওয়েটিং রুম' সরাইখানার অনুরূপে কল্পমান। জীবনের সিদ্ধি ও সম্ভাবনার এরা দুটো দিক। নাটকের সমাপ্তিতে স্টেশন আবার যাত্রিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, আকাশ কালো আবরণ ছিঁড়ে ক্রমশঃ পরিষ্কার হয়ে আসছে, আর ঘুম-ভাঙা পাখির ডাকে সূর্যোদয়ের আলো ফুটে উঠছে চতুর্দিকে।

'প্রেম'—এ নাটকের প্রধান অবলম্বন। সবচাইতে ইঙ্গিতবহ মনে হয় তার স্মৃতিময় অতীত নয়, বরং মৃত-অতীতের জান্তব প্রতীক হিসেবে 'কল্যাণ' নামক পুরোনো প্রেমিকের দৈহিক উপস্থিতি। তার অন্ধতা শুধু চোখে নয়, মনেও। আর সেই অন্ধকারের প্রান্তে দাঁড়িয়ে দুটি তরুণ-তরুণী পবিত্রতর ঘনিষ্ঠতায় পরস্পরের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে দ্বিধাহীন ভাবে।

কবি এই নাটকে মাঝে মাঝে এমন কিছু পংক্তি ব্যবহার করেছেন, যা দীর্ঘকাল মনে রাখার যোগ্য। তবু, ঘটনা-বিন্যাসের কিছু কিছু ত্রুটি সতর্ক পাঠকের মনে প্রতিক্রিয়া সঞ্চার করতে পারে।

বিচিত্র এই দেশ [প্রবন্ধ সংকলন] কালিদাস কাঞ্জিলাল, রঞ্জন পাবলিশিং—৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলকাতা—৩৭।

এই বইটি রচনা করতে লেখককে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছে। এই বইতে নেহরু ও গান্ধীবাদ ছাড়াও বহু প্রয়োজনীয় সমস্যার কথা আছে—যে সমস্যাগুলি আজ আমাদের জাতীয় জীবনে মেরুদণ্ড ভেঙে দিচ্ছে। বাঙালী জাতির নৈতিক মান যে আজ কত নীচে নেমে গেছে, এখানে যে আজ কতদূর অধঃপতন ঘটেছে—এবং তা থেকে বাঁচবার উপায় কি সে সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিতও আছে আলোচ্য বইখানিতে। দেশের বর্তমান শিক্ষা-সমস্যা, নেতৃত্ব-সঙ্কট, ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা প্রভৃতি বহু ভিন্নতর অথচ খুবই প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনাই এ বইখানির

'নিলাজ বসন্ত' একটি কাব্যগ্রন্থ। স্বভাবকবি শ্রীভব রায় ছন্দের কবিতা লিখেছেন। তাঁর কবিতা আধ্যাত্মিক চেতনা, প্রেম, নিসর্গ চিত্র এবং সমাজ ভাবনায় উজ্জ্বল। কিন্তু আধুনিক জীবনের যে জ্বালা-যন্ত্রণা তা তিনি নিঃশব্দে পাশ কাটিয়ে গিয়েছেন। এজন্য অবশ্য তাঁকে দায়ী করা চলে না। কারণ সংঘাত থেকে দূরে সরে গিয়েও তিনি নিজের পরিমণ্ডল খুঁজে পেয়েছেন। এবং সেখানেই তাঁর কবিতা মুক্তি পেয়েছে।

নিলাজ বসন্ত : ভব রায়। প্রকাশক : শ্রীমতী ভারতী রায়, আনন্দ কুটীর, বাঁকুড়া। দাম : ৫·০০।

মন্দ মধুর (জার্নালধর্মী রচনা)—হিরন্ময় ভট্টাচার্য। মিত্র ও ঘোষ। ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলকাতা-১২। দাম সাড়ে চার টাকা।

এ যুগের মানুষ একটি নতুন জিনিসের সন্ধান পেয়েছে; তা হলো, জার্নালধর্মী রম্য-রচনার আস্বাদ। এই যান্ত্রিক জটিলতার যুগে মানুষ যখন দিশেহারা, তখন এ-ধরণের সরস রচনা পাঠককে যতটা মুক্তি দিতে পারে, তা অপর কোন সিরিয়াস লেখার পক্ষে সম্ভব নয়। আনন্দের উপকরণ হয়তো এ যুগেও দুষ্প্রাপ্য নয়, তবে তাকে খুঁজে নেওয়া দরকার। সেরূপ মন ও অন্তর্দৃষ্টি সকলের থাকে না। যাদের আছে, তারা ভাগ্যবান। শ্রীহিরন্ময় ভট্টাচার্যের 'মন্দমধুর' গ্রন্থটি পড়তে পড়তে এইরকম ধারণাই বদ্ধমূল হয়। লণ্ডন ও তার পারিপার্শ্বিক সমাজজীবনের সংগতি ও অসংগতি থেকেই লেখক আলোচ্য বিষয়ের উপাদান সংগ্রহ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ যাকে 'বাজে কথা' বলেছেন, এই গ্রন্থে সেই বাজে কথার খেলা। জীবন সম্পর্কে একটি আয়তগভীর দৃষ্টিভঙ্গী না থাকলে এ লেখা অসম্ভব। কোথাও কোন সুনির্দিষ্ট অভিপ্রায় নেই, অথচ চোখের সামনে দৃশ্যের পর দৃশ্য বদল হয়ে চলেছে। মজলিসী মেজাজের ছোঁয়ায় পাঠকও যেন সাময়িকভাবে পরিবেশ-বিস্মৃত হন। মাঝে মাঝে মনে হয়, লেখক যেন কোন বিষয়ে আসক্ত নন, কোন ঘটনায় প্রতিই তাঁর আন্তরিক আগ্রহ নেই।

টাইমস-এর পাঠক ও বিলিতি আভিজাত্যের গল্প দিয়ে গ্রন্থারম্ভ। লেখক এক জায়গায় লিখছেন, "বিলেতে ছাতা বিনা ছত্রপতি হওয়া যায় না—ছাতা আভিজাত্যের মানদণ্ড। কেউ কেউ বলে ছাতার পেছনে ইটন বা হ্যারো প্রভৃতি পাবলিক স্কুলে পড়ার ছাপ। বিলেতের পাবলিক স্কুলে কিন্তু পাবলিকের প্রবেশাধিকার নেই—অধিকার মানে অর্থনৈতিক সামর্থ্য। এসব স্কুলের প্রধান পাঠ—ক্যাপিটেলিজম বা কমিউনিজম নয়—ম্যানারিজম, যার বিষয়-বস্তু কিন্তু বৈষ্ণবশাস্ত্রের পরিপূরক নয়, বরং বলা যায় তার বিপরীত প্রতিষ্ঠা।" এবং প্রসঙ্গ শেষ করার আগেই স্বদেশের উদাহরণ সংযোগে মনোনিবেশ করেন—"বাল্মীকি আর বেদব্যাসকে আমরা এড়িয়ে চলি। কাশীরাম বহু পরিশ্রম করে সহজ সরল ভাষায় বলে গেছেন, কিন্তু তা শুনে পুণ্যবান হবার আগ্রহও আমাদের সীমাবদ্ধ। তাই বলে সাহিত্য স্থবির নয়। রামায়ণ-মহাভারতের ঘটনায় লেখকে অনু-

ঘটা। এবং তা উপভোগ করার জন্যে টীকা-টিপ্পনী লাগে না। ব্যাগমা-ব্যাগমী কি সুয়োরানী-দুয়োরানীর পরিচয় দেওয়া আমাদের কাছে অবান্তর।"

এমনি ধরনের অজস্র ঘটনায় গ্রন্থটি ভরপুর। দৃশ্যের পর দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত হয়ে চলেছে, অথচ একের সঙ্গে অপরের কোন বিরোধ নেই। আপনজনেরা যেমন ঘটনার ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দিয়ে যায়, তেমনি বইয়ের পৃথিবীর মানুষেরা। বাঙালি পাঠকের কাছে, এরা অনেকেই পরিচিত, কেউ কেউ অপরিচিত বা অর্ধ-পরিচিত। তাতে কিছু আসে যায় না। নামের সঙ্গে ঘটনার যোগ এখানে সামান্যই। সকলেরই উপস্থিতি এখানে আকস্মিক। প্রবেশ-প্রস্থানের কোন বাধা-নিষেধ নেই। ভাগ্যের উপন্যাস ছাপার খরচ হিসেব করতে করতে লেখক বিনা দ্বিধায় উইণ্ডোক্লিনারের ব্যবসা নিয়ে গল্প করতে বসেন, ভোজন-সভার বক্তৃতাপ্রসঙ্গ শেষ করার আগেই ম্যাক-মিলানের নির্বাচনী বক্তৃতার সমস্যা উপ-স্থাপিত করেন এবং গল্পের ঝোঁকে প্রায়শঃ পূর্বপ্রসঙ্গ বিস্মৃত হয়ে নতুন প্রসঙ্গের স্বচ্ছন্দ অবতারণায় মেতে ওঠেন। 'উৎসব-মুখর লণ্ডন' 'আত্মপরিচয়ে ইংরেজ' 'হাসিতে', 'স্মৃতিতে', 'নির্বাচনী', 'রি-ডিপলয়মেন্ট', 'বৌদ্ধিক বি এবং কে', 'ব্যক্তিগত', 'ভেঙে-যাওয়া ক্লাস', 'ডোভারতীর্থ উড্ডয়নে' প্রভৃতি শীর্ষক রচনায় সমকালীন রাজনীতি ও সমাজনীতির ওপরে অজস্র গল্প কিংবা ঘটনার অবতারণা করা হয়েছে, যার মূল্য সাধারণ পাঠকের কাছে তাৎক্ষণিক হলেও সহজে নিঃশেষিত হবার নয়।

বেদ পরিচয় ([illegible])—সত্যবান। দীপিকা। ৩০।১ কলেজ রো। কলকাতা—৯। দাম—পাঁচ টাকা।

চতুর্বেদের নৈতিক পরিচয় সম্বলিত 'বেদ পরিচয়' গ্রন্থখানি বাংলা সাহিত্যে একটি মূল্যবান সংযোজন। প্রাচীন সাহিত্যের মণিমুক্তা আহরণ করে ভারতীয় সংস্কৃতির বিস্মৃত রূপকে তুলে ধরেছেন গ্রন্থকার। বেদের বিভিন্ন অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ সত্য যুগ, ত্রেতা যুগ, দ্বাপর যুগ, কলি যুগ প্রভৃতি অধ্যায়ে বেদচর্চা ও প্রসারের কথা আলোচনা করেছেন। পরিশিষ্টে অনেকগুলি প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান তথ্য আছে। গ্রন্থকারের বর্ণনাভঙ্গি আকর্ষণীয়।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

মৌচাক — ফাল্গুন ১৩৭৪ — সম্পাদক : সুপ্রিয় সরকার। ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা—১২। দাম : পঞ্চাশ পয়সা।

বাঙলা দেশের বিখ্যাত শিশু ও কিশোর উপযোগী মাসিক পত্রিকা 'মৌচাকে'র সম্পাদক শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার সম্প্রতি পরলোকগমন করেছেন। তাঁর স্মরণে প্রকাশিত মৌচাক পত্রিকার ফাল্গুন সংখ্যাটি নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। শ্রীসরকার সম্পর্কে লিখেছেন প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র চারু রায়, বুদ্ধদেব বসু, গজেন্দ্রকুমার মিত্র প্রমথনাথ বিশী, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, নীরদচন্দ্র চৌধুরী, অন্নদাশঙ্কর রায় অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বিমল মিত্র, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, ভবানী মুখোপাধ্যায় মনোজ বসু, শিবরাম চক্রবর্তী নির্মল সরকার, বিশু মুখোপাধ্যায়। একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী ও কয়েকটি ছবি আছে। তাছাড়া আছে গল্প, কবিতা, নিয়মিত বিভাগ।

বিস্মৃতপ্রায় বৈমানিকের জীবন-কাহিনী

বিস্মৃতপ্রায় বৈমানিকের জীবন-কাহিনী ॥

চিরকালই মানুষ একটু হুজুগপ্রিয়। সমকালের সীমা ছাড়িয়ে একটু ভিন্নকালে পা দিলেই সে নতুনতর হুজুগে মেতে ওঠে। নইলে বিশ শতকের প্রথমার্ধে যে দুর্ধর্ষ বৈমানিক জীবন ছিল উপকথার নায়কের মতই বহুবিচিত্র, সেই চার্লস এ লিণ্ডসবার্গকে সকলেই এত সহজে ভুলবে কেন? এককালে মানুষ তাঁর নাম শুনলে রোমাঞ্চিত হতো, তাঁর প্রশংসায় মুখরিত হতো, সাংবাদিকরা সংবাদের জন্যে উৎসুক হয়ে থাকত। সেই লিণ্ডসবার্গ এখনও জীবিত কিন্তু কেউ তাঁকে নিয়ে আর কোন প্রবন্ধ-নিবন্ধ লেখে না, ফটোগ্রাফাররা তাঁর ছবি তোলার জন্য ব্যস্ত হয় না। সম্প্রতি প্রকাশিত 'দি লাস্ট হিরো : চার্লস এ লিণ্ডসবার্গ' গ্রন্থটি সারা পৃথিবীর মানুষকে সচকিত করবে। লেখক ওয়াল্টার এস রস।

লিণ্ডসবার্গের অতীত অভিজ্ঞতা যেমন রোমাঞ্চকর, বর্তমান নিঃসঙ্গতা তেমনি বেদনাদায়ক। কেউ তাঁর জীবনকাহিনী শুনতে চাইলে তিনি প্রায়ই নীরব থাকেন। মিঃ রস জীবনী রচনার অভিপ্রায় প্রকাশ করলে তিনি তাঁকে কোন সাহায্য তো করেনইনি, বরং নিরুৎসাহিত করবার চেষ্টা করেন। যে কোন প্রচারবিমুখ মানুষের জীবনী রচনায় এ হল বড় রকমের বাধা।

রসের বর্ণনা পড়তে পড়তে মনে হয়, এ গ্রন্থের পাঠক যেন কোন প্রেক্ষাগৃহে বসে একটি সজীব চলচ্চিত্র দেখছেন। ঘটনার ধারাবিবরণী যেন একটি মুদ্রিত 'নিউজ রীল'। হয়তো এসব ছবি কিছুটা দূর থেকে দেখা, তবু মূল্যবান। কেননা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই বিতর্কিত মানুষটিকে পৃথিবীর কজন লোকই-বা আর মনে রেখেছে।

চার বছর বয়সে লিণ্ডসবার্গ পিতার সঙ্গে ওয়াশিংটনে আসেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি বহু দুর্ধর্ষ ঘটনার নায়ক। কলেজের পড়া অসমাপ্ত রেখে নেব্রাস্কা এয়ারক্র্যাফট কর্পোরেশনে ভর্তি হন। 'তখনকার দিনে বিমানচালকের বৃত্তি গ্রহণ করা ছিল অত্যন্ত সাহসের কাজ। কেননা, সে সময়কার বিমানগুলি ছিল যান্ত্রিক দিক থেকে ত্রুটিপূর্ণ এবং প্রায়শঃ বিপজ্জনক। বিমান চালনায় সকল সাহস সঞ্চয়ের জন্য তিনি খানিকটা মদ খেয়ে নিতেন।

তাঁর লক্ষ্য ছিল বিমান চালনায় বিশ্ব-রেকর্ড সৃষ্টি করা। সেই উদ্দেশ্যে তিনি সেন্ট লুই থেকে চিকাগো পাড়ি জমিয়েছিলেন। তারপরের যাত্রা আরও দুঃসহ। ঠিক করলেন, নিউইয়র্ক থেকে কোথাও না থেমে প্যারিস যেতে হবে। একটা হালকা ধরনের বিমান বেছে নেওয়া হল। তার ভেতরে নির্দিষ্ট হল ১৭০ গ্যালন ওজন ও [illegible] একটি ৬ ফুট ৩ ইঞ্চির কামরা। এ যাত্রায় তিনি সর্বপ্রকার আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম, [illegible], প্যারাস্যুট, এমনকি নোট-বইয়ের অতিরিক্ত পাতা পর্যন্ত বর্জন করেন। সঙ্গে নিলেন মাত্র পাঁচটি স্যাণ্ডউইচ আর এক কোয়ার্ট জল। এই আয়োজন বিস্মিত হয়ে কেউ প্রশ্ন করলে, তিনি বলেন—"যদি আমি প্যারিসে পৌঁছতে পারি—তাহলে এ-ই যথেষ্ট; আর যদি না পারি, তাহলে তো কোন কিছুরই দরকার নেই।" ১৯২৭ সালের ২০শে মে সকাল ৭টা ২০ মিনিটে তিনি যাত্রা করেন এবং পুরো সাড়ে তেত্রিশ ঘণ্টা অবিরাম বিমান চালিয়ে ভয়াবহ ক্লান্তি আর তুষারপাতের মধ্যে তিনি প্যারিসে অবতরণ করেন।

জীবনে সুখী হবার মতো বহু লোভনীয় প্রস্তাব তিনি পেয়েছিলেন। কিন্তু বিমানচালনা ছাড়া আর কোন কিছুই তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। ১৯২৯ সালে তিনি এক ভদ্রমহিলাকে বিয়ে করে চীনে পাড়ি জমান। ১৯৩২ সালের পয়লা মার্চ তাঁর জীবনের একটি দুঃখজনক দিন। এই দিনে তাঁদের প্রথম সন্তান চুরি হয়ে যায়। পরে অবশ্য সেই চোর ধরা পড়ে এবং তার শাস্তি হয়; কিন্তু শিশু-সন্তানটিকে আর জীবিত অবস্থায় পাওয়া যায়নি। এরপরেও তাঁর জীবনে বহু নাটকীয় ঘটনা ঘটে।

বলা বাহুল্য, মিঃ রস এই গ্রন্থে এমন সব সংবাদ পরিবেশন করেছেন, যার প্রামাণিকতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়।

'বাবু'র মহিমা

অহেন্দ্র চক্রবর্তী

ইংরেজ আমলে বাবু নামের সঙ্গে পুরনো কলকাতার একটা বিশেষ সম্পর্ক ছিল এবং তা বিশেষ আমেজের। সাহেবেরা বাঙালীর কোন বিষয় পরামর্শ নেবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেই বলতেন, ওদের বাবু কি বলেন?

মোট কথা, তখনকার দিনে বাবুরা ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজে বেশ প্রভাবশালী মানুষ ছিলেন। বাঙালীরা তাদের এই স্ব্জাতি-ভায়েদের প্রাধান্য দেখে মনে মনে যে ঈর্ষান্বিত ছিলেন না, তা বলা যায় না। তবে তাঁদের খুবই ভয় করে চলতেন।

সে ইংরেজও চলে গেছে, আর এদেশের আদপ-কায়দারও পরিবর্তন হয়েছে। এখন সেই বাবুদের আদরও ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু সামাজিক জীবন থেকে তাঁদের নাম কমলে কি হয়, স্বরাজ লাভের পর দেখা যাচ্ছে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নতুনভাবে বাবুর গোষ্ঠী সৃষ্টি হয়ে চলেছে। কোন রাজ-নৈতিক দলের কর্মীরা কি করেন বা আপামর জনসাধারণ কোন সমস্যার বিষয় কি চিন্তা করছেন, তা বড় কথা নয়। আসল কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেই সকল সমস্যা বা প্রশ্নের ব্যাপারে রাজনৈতিক দলের বাবুরা কি বলছেন? এবং পরবর্তী-কালে দেখা যায়, রাজনীতিতে বাবুদের কথাই বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করছে।

উদাহরণস্বরূপ ধরা যেতে পারে বিগত নির্বাচনের কথা। এক কোটিরও বেশী লোক ভোট দিয়ে রায় দিলেন, কংগ্রেস শুধু নয় কোন বিরোধী দলের একক সংখ্যা-গরিষ্ঠতা নেই। ফলে বিরোধী দলগুলি যুক্তফ্রন্টের মোর্চায় মিলিত হয়ে সরকার গঠন করেছিলেন। নিজেদের মধ্যে আদর্শ-গত পার্থক্য, ব্যক্তিগত কারণ ইত্যাদির ফলে দেখা গেল যে, যুক্তফ্রন্টের কাজ করতে অসুবিধা হচ্ছে। আইন-শৃংখলা অবশ্যই বিঘ্নিত হয়েছিল। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা, কংগ্রেসের প্রধান 'বাবুরা' মনে করলেন, ফ্রন্টের মধ্যে দলত্যাগ করিয়ে সরকার দখল করতে হবে। একথা সত্য, সে সময় কংগ্রেসের সাধারণ কর্মীর মধ্যে বেশ কিছুটা হতাশা এসেছিল। কিন্তু তা বলে দল-ত্যাগের মধ্য দিয়ে যে সরকার দখল করা যায়, তা তাঁরা ভাবেনও নি। কিন্তু বাবু আর দাদার দল সেই ব্যবস্থা কার্যকর করার চেষ্টা করলেন এবং সাধারণ কর্মীদের তা মেনে নিতে হল। শুধু তাই নয়, কংগ্রেসের বাড়ীর ছোটতরফের এক বাবু সে সময় অজয়বাবুকে যানচাল করবার জন্য সরকারের পরিবর্তনে বাদ সাধলেন এবং ভবিষ্যতে দেখা গেছে ছোটতরফের বাবুর চেষ্টায় কংগ্রেসের ভেতরে যথার্থ এড-হক কমিটি গঠিত হল না। অজয়বাবু যুক্তফ্রন্ট সরকারের হয়ে পদত্যাগপত্র পেশ করে কংগ্রেসে ফিরে আসতে পারলেন না।

সম্প্রতি শোনা যাচ্ছে, কংগ্রেসী মেয়র গোবিন্দবাবু নাকি গোপনে মুখ্যমন্ত্রী হতে চেয়েছিলেন। এতে কংগ্রেসের অন্যান্য বাবুরা ক্ষিপ্ত। তাঁদের ক্ষোভের কথা তাঁরা গৃহিণী-দের নিকট প্রকাশ করতেও কুণ্ঠিত হন নি। যা হোক আসলে দেখা যাচ্ছে, কংগ্রেসের ভেতরে যে কোন্দল, তা বাবু অথবা বাবুদের ঘিরেই দানা বেঁধে উঠছে। সাধারণ কর্মীদের এ বিষয়ে কিছু করার নেই। তাঁরা এই সব দৃশ্যের কেবলমাত্র দর্শক। অথচ সব কিছু ন্যায় বা অন্যায় কাজ তাঁদের নামেই হচ্ছে। যুক্তফ্রন্টের দিকে তাকালে সেই একই দৃশ্য দেখা যাবে। শ্রীজাহাঙ্গীর কবিরের নতুন দল জাতীয় পার্টিকে ফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত করা হবে কিনা, এই প্রশ্ন নিয়ে তুমুল হট্টগোল। ক্রান্তি দলের শ্রীসুশীল ধাড়া চান না কবির সাহেবকে পাত্তা দিতে। শ্রীকবিরেরও ইচ্ছে সুশীলবাবুর মাতব্বরী সহ্য করব না। এ দিকে যুক্তফ্রন্টের শক্তি বৃদ্ধি হল বা কমলো তাতে কারও যায়-আসে না। ওখানেও বাবুর লড়াই চলেছে।

গত সাধারণ নির্বাচনের পর দেখা গেছে, কংগ্রেস পরিষদীয় দলের শক্তিকে অবজ্ঞা করতে কেউ যদি চেষ্টা করে থাকেন, তবে তিনি হচ্ছেন কংগ্রেস ভবনের ছোট-তরফের বাবু। কংগ্রেস যখন সরকারের গদীতে আসীন ছিলেন, তখন বড়তরফের বাবু সরকারে থাকায় ছোটতরফের বাবুই 'বড়বাবু' নামে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু সরকার হাত থেকে চলে যাবার পরই দুই বাবু কংগ্রেস ভবনে আশ্রয় নিলেন। ছোট-তরফের বাবুর ধারণা যে, এই পরিষদীয় দল কোনদিনই তাঁর নেতৃত্ব মেনে নেবেন না। ফলে ভবিষ্যতের আশায় তিনি এর সর্বনাশ করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলেন। কিন্তু সে সময় বড়তরফের বাবুর এতে সমর্থন ছিল না। ফলে কিছুটা বেগ পেতে হয়েছিল।

পরবর্তীকালে দেখা গেল যে, বড়-তরফের 'বাবু'কে তাঁর নেতৃত্বের চ্যালেঞ্জ করা হবে না বলে আশ্বাস দেওয়া হল। সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাচনের ধ্বনি কংগ্রেস ভবনে শোনা গেল। সাধারণ কর্মীরা ব্যাপারটা বুঝে উঠবার আগেই রাজনীতি দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলল।

পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন চালু হবার পর অকমুনিস্টদের নিয়ে জাতীয় সরকার গঠনের একটা জোর চেষ্টা চলেছে। গোপনে অনেকগুলি রাজনৈতিক পার্টির অনেক নেতাই শলা-পরামর্শ করছেন। তাঁদের ইচ্ছে, এই ধরনের একটা তৃতীয় শক্তি যদি গড়ে তোলা যায়, তবেই ভবিষ্যতে স্থায়ী সরকার গঠন সম্ভব। নচেৎ এই রাজ্যের ভাগ্যে বিশেষ বিপদ আছে। কারণ কংগ্রেসের পক্ষে একা সরকার গঠন করা সম্ভব নয়। কমুনিস্টরা সরকার গড়ে তুলুক, তাও অনেকে চান না।

যা হোক কোন পার্টিই তাঁদের কর্মীর সঙ্গে পরামর্শ করার কথা বিবেচনা করে-ছেন বলে মনে হয় না। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির বৈঠকে ডঃ প্রতাপ চন্দ্রের 'কোয়ালিশনের বিরোধী' তীব্রভাবে সমালোচিত হয়েছে। ডঃ চন্দ্র কারও সঙ্গে পরামর্শ না করেই নাকি ওয়ার্কিং কমিটির সামনে প্রস্তাব রেখেছিলেন।

রাজনৈতিক মহল মনে করছেন যে, পার্টিগুলি যতদিন না এই শ্রেণীর বাবুর কর্তৃত্ব হতে মুক্ত না হতে পারবে, ততদিন তাঁদের পক্ষে গণতন্ত্র রক্ষা করা সম্ভব নয়। কারণ এই 'বাবুরাই' প্রতিদিন প্রতি নিয়তই পার্টির ভেতরে গণতন্ত্রকে হত্যা করছেন। অথচ তাঁরা যখন মাঠে-ময়দানে গণতন্ত্রের কথা বলেন, তখন সাধারণ মানুষ তা বুঝতে না পারলেও পার্টির সাধারণ কর্মীরা মনে মনে মুচকে হাসেন এবং ভাবেন, এ কি পরিহাস!



দেশবন্ধু পার্কে অমৃতবাজার পত্রিকা শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে শ্রীমোরারজী দেশাই বক্তৃতা করছেন। মঞ্চের উপর বসে আছেন (দক্ষিণ থেকে বামে) মেয়র শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দে, পত্রিকা সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ, শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীহরিপদ ভারতী।

দেশে বিদেশে

ভারতের ক্রোধ

অবশেষে ভারত সরকার কেনিয়ার এশীয়দের প্রতি বৃটেনের আচরণের বিরুদ্ধে ক্রোধ প্রকাশের একটা রাস্তা খুঁজে পেয়েছেন। গত ৬ মার্চ লোকসভায় পররাষ্ট্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীবলীরাম ভগত জানান যে, ঐ আচরণের প্রতিবাদে এরপর থেকে কেনিয়ায় বসবাসকারী বৃটিশ পাশ-পোর্ট-ধারী ব্যক্তিদের ভিসা ছাড়া ভারতে ঢুকতে দেওয়া হবে না।

কমনওয়েলথের নিয়ম অনুযায়ী এখন কোন ভিসা লাগে না।

কেনীয় এশীয়দের সমস্যাটা সংক্ষেপে এই : এরা অধিকাংশই ভারতীয় এবং কিছু পাকিস্থানী বংশোদ্ভূত। সংখ্যায় প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার। কয়েক পুরুষ ধরেই প্রধানত ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত রয়েছে। ১৯৬৩ সালে কেনিয়া যখন বৃটেনের কাছ থেকে স্বাধীনতা পায়, তখন এদের বলা হয়েছিল তারা নিজেদের ইচ্ছামত কেনিয়ার নাগরিকত্ব নিতে পারে কিংবা বৃটেনের নাগরিক হতে পারে। যে কারণেই হোক তারা বৃটিশ নাগরিকত্ব নেবার পক্ষেই সিদ্ধান্ত নেয়।

গোলমাল দেখা দেয় কেনিয়া সরকার চাকরী-বাকরী ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কেনীয় নাগরিকদের প্রাধান্য দেবার নীতি গ্রহণ করার ফলে। তাঁরা এশীয়দের কেনিয়ার নাগরিকত্ব নেবার জন্যে আহ্বান জানিয়ে যথেষ্ট সময় দিয়েছিলেন। কিছুসংখ্যক এশীয় এই অনুসারে কেনিয়ার নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছিল, কিন্তু অধিকাংশই করেনি।

সম্প্রতি কেনীয় সরকার একটি আইন করেন যে, ওয়ার্ক পারমিট ছাড়া কেউ কেনিয়ায় কাজ-কর্ম করতে পারবে না এবং অ-নাগরিকদের ওয়ার্ক পারমিট দেওয়া হবে না। সুতরাং অ-নাগরিক এশীয়দের পক্ষে কেনিয়ায় থাকা অসম্ভব হয়ে উঠল। তারা তাদের বৃটিশ পাশপোর্টের অধিকারে বৃটেনে চলে যেতে আরম্ভ করল। প্রথম দিকে মাসে এক হাজার করে, শেষের দিকে সপ্তাহে এক হাজার করে এশীয়রা লণ্ডনে পৌঁছতে লাগল। বৃটিশ সরকার এতে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। অশ্বেতকায়দের এই অত্যধিক ভিড়ে বৃটেনের রক্ষণশীল শ্বেতাঙ্গ মহলে প্রতিবাদ উঠল। ঐ প্রতিবাদের চাপে মিঃ হ্যারল্ড উইলসনের শ্রমিক সরকার এশীয় আগমন নিয়ন্ত্রণের জন্যে একটি বিল আনলেন। গত ১ মার্চ রাণী ঐ বিলে স্বাক্ষর করলে তা আইনে প্রণীত হয়।

এই সময়ের মধ্যে প্রায় ১৫ হাজার এশীয় বৃটেনে পৌঁছে গেছে এবং আরো ১৫ হাজার হয়ত পোষ্য হিসেবে যেতে পারবে।

ভারত সরকার এই আইনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন এবং বৃটেনের আচরণে "গভীর ঘৃণা" বোধ করেছেন। সংসদে এই নিয়ে তুমুল হৈ-চৈ হয়েছে এবং বৃটেনের এই মানবতাবিরোধী কাজের জন্যে তার বিরুদ্ধে একটা পাল্টা ব্যবস্থা নেবার জন্যে দাবী জানানো হয়েছে।

সেই দাবী অনুসারেই ভারত সরকার কেনীয় এশীয়দের ভারতে আগমন নিয়ন্ত্রণ ও সংকোচনের জন্যে উদ্যোগী হয়েছেন। শ্রীভগত অবশ্য বলেছেন এটা বৃটেনের বিরুদ্ধে কোন পাল্টা ব্যবস্থা নয়।

পাল্টা ব্যবস্থা হোক আর নাই হোক, ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে? লক্ষ্য করার বিষয়, ভারত সরকার বৃটেনে বসবাসকারী বৃটিশ পাশপোর্টের অধিকারীদের ক্ষেত্রে ভিসার ব্যবস্থা প্রয়োগ করেননি, করেছেন কেনীয়

...শীয়দের ক্ষেত্রে যাদের প্রতি সরাসিজাতির ...দের অন্ত নেই, যাদের প্রতি অবিচারকে ...মী নিজের প্রতি অবিচার বলে মনে ...রে। এটা পরস্পর-বিরোধী বলেই মনে ...য়।

যদি বৃটেন এশীয়দের প্রবেশাধিকার সংকুচিত করে ঘোরতর অন্যায় করে থাকে, তাহলে ঐ এশীয়দের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে ভারতও বিশেষ নীতিজ্ঞানের পরিচয় দেয়নি। এটা ঝি'কে মেরে বৌকে শেখানোর মত।

আর যদি এটাই তাঁরা বলে থাকেন —শ্রীভগত লোকসভায় স্পষ্ট করেই তা বলেছেন—যে, কেনীয় এশীয়রা বৃটেনের নাগরিক, সুতরাং তাদের দায়িত্ব বৃটেনকেই নিতে হবে, তাহলে এত ক্রোধ প্রকাশ করা এবং সেই ক্রোধের বশে এই ব্যবস্থা গ্রহণের কোন দরকার ছিল না।

কিংবা তাঁরা যদি এখন বোঝাতে চান ভিসা ব্যবস্থা প্রয়োগ করলেও কাউকে আটকানো তাঁদের উদ্দেশ্য নয়, তাহলে এই ব্যবস্থার অর্থ নেই। বরং সেক্ষেত্রে সাধারণ-ভাবে সমস্ত বৃটিশ নাগরিকের সম্পর্কে ব্যবস্থা নিলে অনেক বেশী যুক্তিপূর্ণ হত।

সলসবেরীতে হত্যা

ইংলণ্ডের রাণী তাঁদের মার্জনা করা সত্ত্বেও গত ৬ মার্চ রোডেশিয়ার মিঃ ইয়েন স্মিথের অবৈধ সরকার সলসবেরীর কেন্দ্রীয় কারাগারে তিনজন আফ্রিকানকে ফাঁসি দেয়।

১৯৬৫ সালের নভেম্বরে মিঃ স্মিথ বৃটেন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একতরফা রোডেশিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা করার পর এই প্রথম রোডেশিয়ার আফ্রিকানদের ফাঁসি হল।

এই আফ্রিকান শহীদেরা হলেন ভিক্টর সিফেরানি মালাসবো, জেমস ডেভিড ধ্লামিনি ও ডুলি শাডরেক। প্রথম দু'জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ, এরা ১৯৬৪ সালে একটি পেট্রোল বোমা দিয়ে একজন শ্বেতাঙ্গ কৃষককে হত্যা করেছিল। আর ডুলি শাডরেকের বিরুদ্ধে একজন উপ-জাতীয় মোড়লকে হত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে।

এ'রা তিনজনই ক্ষমা প্রার্থনা করে-ছিলেন, কিন্তু মিঃ স্মিথের সরকার তা সরাসরি অগ্রাহ্য করেন।

অন্ততঃ আরো ১০৩ জন আফ্রিকানের ওপর অবৈধ স্মিথ সরকারের দেওয়া মৃত্যু-দণ্ড রয়েছে। পরবর্তী খবরে প্রকাশ, এ'দের মধ্যে সাতজন ক্ষমা প্রার্থনা করে যে আবেদন করেছিলেন, সে আবেদনও অগ্রাহ্য হয়ে গেছে। যে-কোনদিন এ'দেরও ফাঁসি দেওয়া হ'তে পারে।

এই হত্যাকাণ্ডে পৃথিবীর সমস্ত সভ্য ও মানবতাবাদী মহলে তীব্র ক্ষোভ ও ঘৃণার সঞ্চার হয়েছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী একে জঘন্য অপরাধ বলে বর্ণনা করেছেন। আন্তর্জাতিক বিচার কমিশন রায় দিয়েছেন যে, ঐ তিনজন আফ্রিকানের প্রাণ নেবার কোন অধিকার অবৈধ স্মিথ সরকারের নেই। বৃটেনেও এই ঘটনার তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। মিঃ স্মিথ ও তাঁর চেলাদের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ তোলা যায় কিনা তাও নাকি সে ভেবে দেখছে।

বৃটেনের পক্ষে এই ঘটনায় উত্তেজিত বোধ করার কারণ আছে, কেন না মিঃ স্মিথ বৃটেনের রাণীকে অপমান করে সমগ্র বৃটিশ





জাতিকে অপমান করেছেন। কিন্তু প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জের উত্তরে বৃটেন কি করবে?

আজ সেটাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। মিঃ স্মিথ যখন একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন, তখন বৃটেন অনেক গরম গরম কথা বললেও তার প্রতিকারের জন্যে কিছুই করেনি। অথচ বৃটেনের সৈন্যবল ব্যবহার করে স্মিথের বিদ্রোহকে খতম করে দেওয়া কিছুই কঠিন ছিল না। এমনকি রাষ্ট্র-সঙ্ঘের তরফ থেকে রোডেশিয়ার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণের যে আবেদন জানানো হয় তাকে কার্যকর করার ব্যাপারেও বৃটেন তেমন তৎপরতা দেখায়নি।

এখন যখন মিঃ স্মিথ চরম অবজ্ঞায় ইংলণ্ডের রাণীকে অপমান করে বৃটেনের মর্যাদার ভিত্তিমূলে আঘাত করেছেন, তখন বৃটেনের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হওয়া উচিত এই ঔদ্ধত্যকে শক্তি প্রয়োগ করে গুঁড়িয়ে দেওয়া। বৃটেন তা দেবে, না শ্বেতাঙ্গের রক্ত অনেক বেশী মূল্যবান এই ভেবে অপমান নীরবে হজম করবে, তা আমরা আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করব।

বৈষয়িক প্রসঙ্গ

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দাওয়াই

ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা ১৯৩৫ সালে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এযাবৎ রিজার্ভ ব্যাংক তাদের "ব্যাঙ্ক রেট" ক্রমাগত বাড়িয়েই এসেছেন। গত ২ মার্চ তারিখে সর্বপ্রথম এই নজীরের ব্যতিক্রম হল। সেদিন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে ঘোষণা করা হল যে, ব্যাঙ্ক রেট কমিয়ে বার্ষিক শতকরা ছয় টাকা থেকে কমিয়ে শতকরা পাঁচ টাকা করা হয়।

'ব্যাঙ্ক রেট' বলতে সেই সুদের হার বোঝায় যে হারে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ককে টাকা ধার দিয়ে থাকে। অর্থনীতির পক্ষে এই 'ব্যাঙ্ক রেট'-এর বিশেষ তাৎপর্য এই যে, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক-গুলি তাদের টাকা খাটিয়ে যে হারে সুদ আদায় করে তা এই 'ব্যাঙ্ক রেট'-এর উপর নির্ভর করে। যেমন, ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলির নিয়ম আছে যে, তারা যে দাদন দেবে তার জন্য তারা ব্যাঙ্ক রেটের চেয়ে অন্তত দুই শতাংশ বেশী হারে সুদ আদায় করবে। অর্থনীতির উপর প্রভাব বিস্তার করার জন্য যেসব ব্যবস্থা অবলম্বনের উপায় সরকারের হাতে আছে তাদের মধ্যে একটি হচ্ছে ব্যাঙ্ক রেট বাড়ানো বা কমানো। ব্যাঙ্ক রেট বাড়ানো মানে হচ্ছে, ব্যবসায়ীদের প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহের খরচ বাড়িয়ে দেওয়া আর ব্যাঙ্ক রেট কমানো মানে হচ্ছে সেই খরচ কমানো।

গত প্রায় তিন বছর যাবৎ ভারতবর্ষের শিল্প ও বাণিজ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মহল ব্যাংক রেট কমাবার দাবী জানিয়ে আসছিলেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল, চড়া সুদের জন্য ও নানারকম কড়াকড়ির জন্য তাঁদের পক্ষে ব্যাঙ্ক থেকে কারবার চালাবার জন্য যথেষ্ট পুঁজি সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে পড়ছে। মন্দা কাটিয়ে উঠে কল-কারখানাগুলিকে আবার চালু করতে হলে পুঁজির যোগান বাড়াতে হবে। কিন্তু এইসব বক্তব্য এতদিন শোনা হয় নি। কারণ, কথা হচ্ছিল যে, পুঁজি সুলভতর হলে মুদ্রা-স্ফীতির প্রবণতা বাড়বে। প্রকৃতপক্ষে, এই যুক্তিতেই ১৯৩৫ সাল থেকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ক্রমাগত ব্যাঙ্ক রেট বাড়িয়েই এসেছেন। ১৯৫১ সালের ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত ব্যাঙ্ক-রেট ছিল বার্ষিক শতকরা ৩ টাকা, ১৯৫১ সালের ১৫ নভেম্বর থেকে ১৯৫৭ সালের ১৫ মে অবধি বার্ষিক শতকরা ৩॥ টাকা, ১৯৫৭ সালের ১৬ মে থেকে ১৯৬৩ সালের ২ জানুয়ারী পর্যন্ত বার্ষিক শতকরা ৪ টাকা, ১৯৬৩ সালের ৩ জানুয়ারী থেকে ১৯৬৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বার্ষিক শতকরা ৪॥ টাকা, ১৯৬৪ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৬৫ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বার্ষিক শতকরা ৫ টাকা এবং ১৯৬৫ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারী থেকে বার্ষিক শতকরা ৬ টাকা।

কিন্তু, ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার যে ব্যাঙ্ক রেট কমাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন তার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছিল। অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই তাঁর বাজেট পেশ করার আগে অর্থনৈতিক সমীক্ষার যে রিপোর্ট পার্লামেন্টে দিয়েছেন তার এক জায়গায় বলা হয়েছিল, "ফলন বাড়ায় বাজারদরের ঊর্ধ্বগতি রুদ্ধ হয়েছে এবং সরকারী অর্থব্যয় আয়ত্তে রাখার সঙ্গে সঙ্গে টাকার যোগান বাড়াবার সম্পর্কে কতকটা উদারতর নীতি গ্রহণ করা এখন সম্ভবও হয়েছে, প্রয়োজনও হয়েছে।"

এই বিবৃতির কিছুদিন পরেই ব্যাঙ্ক রেট হ্রাস সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার ঘোষণা প্রকাশিত হয়েছে। ঘোষণায় মূল কথাগুলি হচ্ছে :—(১) ব্যাঙ্ক রেট কমিয়ে বার্ষিক ৬ শতাংশের স্থলে বার্ষিক ৫ শতাংশ করা হল, (২) ব্যাঙ্কের দাদনের জন্য বার্ষিক সর্বোচ্চ দশ শতাংশের স্থলে সাড়ে নয় শতাংশ সুদ নেওয়া যাবে, (৩) সেভিংস ব্যাঙ্কে জমান টাকায় সুদের হার কমিয়ে বার্ষিক শতকরা ৪ টাকার স্থলে বার্ষিক শতকরা ৩॥ টাকা হল, (৪) এক বছরের মেয়াদী আমানতে সুদের হার কমিয়ে বার্ষিক শতকরা টাকার জায়গায় বার্ষিক শতকরা টাকা কর হল, অন্যান্য স্বল্পমেয়াদী আমানতের উপর সুদের হারও বার্ষিক শতকরা ০·২৫ থেকে ০·৫ টাকা পর্যন্ত কমান হল।

ব্যাঙ্কগুলির দাদনের সুদের হার কমানর সঙ্গে সঙ্গে আমানতের উপর দেয় সুদের হার কমাবার উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যাংকগুলির আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টা করা।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার এ ঘোষণা সাধারণভাবে দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ী মহলের প্রশংসা লাভ করেছে। ইণ্ডিয়ান মার্চেন্টস চেম্বারের সভাপতি শ্রীপ্রতাপ ভোগীলাল আশা প্রকাশ করেছেন যে, দাদন দুর্মূল্য হওয়ার ফলে শিল্পগুলি যে অসুবিধা হচ্ছিল ব্যাঙ্ক রেট হ্রাসের পর তারা সেই সব অসুবিধা থেকে মুক্ত হবে। তিনি আরও আশা প্রকাশ করেন যে দাদন সম্পর্কে নূতন নীতির ফলে উৎপাদনের ব্যয় কমবে এবং তার পরিণামে শিল্পের মন্দা অবস্থা কাটবে ও রপ্তানীর সম্ভাবনা বাড়বে।

অবশ্য ভিন্নমতও প্রকাশ করা হয়েছে। যেমন, বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পি আর ব্রহ্মানন্দ বলেছেন যে ব্যাংক রেট বাড়িয়ে বর্তমান অবস্থায় ব্যাঙ্কের দাদন সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করা যাবে না। এতে শুধু এইটুকু হতে পারে যে, সংগঠিত শিল্পের শেয়ার থেকে আয়ের হার কমে যেতে পারে এবং শেয়ারের দাম বেড়ে যাওয়ায় সাময়িকভাবে টাকার অঙ্কে মূলধনের পরিমাণ বেড়ে যেতে পারে। অধ্যাপক ব্রহ্মানন্দ বলেছেন যে, এই ধরনের কৌশলের দ্বারা গৃহস্থের সঞ্চয়ের অক্ষমতা দূর করা যাবে না। অর্থমন্ত্রী নিজেই বলেছেন যে, সঞ্চয়ের হার কমে গেছে। বর্তমান নীতিগুলিতে উল্টো দিকে স্রোত বইবে না।

ব্যবসায়ী মহলের খুশির কারণ বোঝা যায়। শেয়ারের দাম বেড়ে গেছে। ফাটকা-বাজারে তৈলবীজের দাম বেড়ে গেছে। 'ইকনমিক টাইমস' পত্রিকার স্টক রিপোর্টার লিখেছেন, "যদিও এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হচ্ছে শিল্প ও ব্যবসাকে চাঙা করা তাহলেও ফাটকাবাজারও নূতন নীতির সুবিধা নেবেন বলে অনুমান করা যায়। দাদনের চড়া সুদে ফাটকাবাজরা খুবই অসুবিধায় পড়েছিলেন। এখন তাঁদের দেয় সুদের হার কমায় তাঁরা বাজারের উপর তাঁদের কব্জা আরও জোরদার করবেন।

ব্যাঙ্ক রেট হ্রাসের এই সব বিরূপ প্রতিক্রিয়া সামলাবার পর এই নীতি মন্দা-ক্রান্ত ভারতীয় অর্থনীতির বদ্ধ জলাশয়ে স্রোতের বেগ আনতে কতখানি সক্ষম হবে সেটা লক্ষ্য করার বিষয় হবে।



(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সেই দিনই বিকেলে ত সবে পিজারো কাক্সামালকা শহরে পা দিয়েছেন ইংকা নরেশের অতিথি হয়ে।

শহরে পৌঁছোবার পর কর্তব্য হিসেবে রাজদর্শনে যাদের পাঠিয়েছিলেন তারা ফিরে এসে কি এমন খবর দিলে যে পিজারো সেই রাত্রেই গোপন মন্ত্রণা সভা ডাকবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

ইংকা আতাহুয়ালপা কি রাজদর্শনে যারা গিয়েছিল তাদের ওপর জুলুম জবরদস্তি কিছু করেছেন, কিম্বা অপমান-টপমান?

না, মোটেই নয়।

তবে কি অগ্রাহ্য, অবজ্ঞা?

না, তাও নয়।

পিজারো তাঁর বিশ্বস্ত সেনাপতি দে সটোকে পাঠিয়েছিলেন ইংকা নরেশকে কুর্নিশ করে আসতে আর সেই সঙ্গে ভাই হার্নাণ্ডোকেও ভরসা দেওয়ার জন্যে সঙ্গে থাকতে বলেছিলেন।

ফিরে এসে তাঁরা যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে বিচলিত হবার কারণ অন্য।

এই নতুন মহাদেশে এ পর্যন্ত এসপানিওলরা অনেক কিছু দেখেছে, বড় ছোট অনেক মানুষের সংস্রবে এসেছে। তুষার ঢাকা অভ্রভেদী পাহাড়ের বুকে 'সূর্য কাঁদলে সোনা'র দেশ যত রহস্যময়ই হোক সত্য-মিথ্যা নানা বর্ণনা শুনে তার রাজাধিরাজ ইংকা আতাহুয়ালপা সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা তাই পিজারো আর তাঁর দলবলের মনে গড়ে উঠেছিল।

আতাহুয়ালপার চেহারা যে রূপ দেখা গেছে তার সঙ্গে সে ধারণার একেবারেই মিল নেই।

আতাহুয়ালপার মত এরকম সত্যিকার সম্রাটোচিত চেহারাই এর আগে এদেশে কোথাও পিজারো বা তার সঙ্গীদের কারুর চোখে পড়ে নি।

দে সটো আর হার্নাণ্ডো পিজারোর এই ইংকা নরেশের সামনে আপনা থেকেই নিজেদের কেমন ছোট মনে হয়েছে। নিজেদের স্বাতন্ত্র্য দেখাবার চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁদের ব্যবহারে আর কথায় সম্ভ্রম ফুটে উঠেছে আপনা থেকেই।

সত্যি কথা বলতে গেলে দে সটো ও হার্নাণ্ডো পিজারোর মনে নিজেদের শাদা চামড়া থেকে সুরু করে লম্বা চওড়া চেহারা আর গুলি-বারুদ বন্দুক আর ঘোড়া নিয়ে শক্তি সামর্থ্যের একটু গুমর ছিলই। তাঁরা ভেবেছিলেন আর কিছু না হোক এদেশের পক্ষে সম্পূর্ণ অজানা এসব জাঁক-জমক দিয়ে ইংকা নরেশকে একটু হকচকিয়ে দিতে অন্ততঃ পারবেন।

তার বদলে দে সটো আর হার্নাণ্ডোকেই ভেতরে ভেতরে বেশ একটু বিচলিত হতে হয়েছে।

বিচলিত হবার কারণ ইংকা নরেশের রাজসমারোহ কিন্তু নয়।

কাক্সামালকা নগরের বাইরে আতাহুয়ালপার সেই সময়ের শিবির এমন কিছু জমকালো নয়। বেশ বড় গোছের খোলা একটা চত্বর, তার চারিধারে ধাপে ধাপে বসবার আসনের ব্যবস্থা। চত্বরের মাঝখানে একটি জলের কুণ্ড। সুড়ঙ্গ নালী দিয়ে তাতে ঠাণ্ডা আর গরম জলের স্রোত আসে।

কিন্তু এই চত্বরে ইংকা রাজ আতাহুয়ালপার নারী-পুরুষ সব জড় হয়েছে আতাহুয়ালপার অনুচর হিসাবে পরিচর্যার জন্য।

আতাহুয়ালপা কুণ্ডের কাছে একটি নিচু আসনে বসে আছেন। তাঁর পোশাক-আশাক সভাসদদের তুলনায় বরং সাদাসিধে। শুধু তাঁর মাথায় কপাল পর্যন্ত ঢাকা ইংকা রাজশক্তির প্রতীকচিহ্ন রক্তের মত লাল 'বোর্লা'।

মাথার এই 'বোর্লা' না থাকলেও তাঁকে আলাদা করে চেনা যেত এমনি তাঁর বিরল বৈশিষ্ট্য।

দে সটো আর হার্নাণ্ডো পিজারো দু-একজন সঙ্গীকে নিয়ে ঘোড়ায় চড়েই ইংকা আতাহুয়ালপার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। নিজেদের স্বাতন্ত্র্য দেখাবার জন্যে ঘোড়া থেকে কেউই নামেন নি।

ব্যবহারের এই ঔদ্ধত্যটুকু কিন্তু গলার স্বরের স্বতস্ফূর্ত সম্ভ্রমে কাটাকাটি হয়ে গেছে।

দে সটো একটু সবিস্তারেই এ রাজ্যে তাঁদের আসার উদ্দেশ্য জানিয়েছেন। জানিয়েছেন যে, সাগর পারের এক মহান রাজ্যের সম্রাটের প্রতিনিধি হিসাবে তাঁরা এখানে এসেছেন। ইংকা নরেশের নানা বীরত্বের কীর্তিকাহিনী শুনে তাঁরা মুগ্ধ। তাঁরা ইংকা নরেশের হয়ে লড়তে চান আর পৃথিবীতে একমাত্র যা সত্য ধর্ম তার বাণী তাঁকে শোনাতে চান।

আতাহুয়ালপা কি বলেছেন এ ভাষণের জবাবে?

কিছুই নয়।

বুঝতে পারেন নি বলেই কি তিনি নীরব থেকেছেন?

তা কেন হবে। দে সটোর সব কথা দোভাষী ফেলিপিলিও ত তাদেরকে অনু-

যাস করে শুনিয়েছে। পিজারোর দলে যে কজন নামকরা দোভাষী ছিল ফেলিপিলিও তাদের মধ্যে এক রকম প্রধান। টাম্বেজ শহরে তার বাড়ি। সেখান থেকে তাকে দু-দুটো সাগর পার করে কাস্তিল-এ নিয়ে যাওয়া হয়েছিল শুধু ওস্তাদ দোভাষী বানাবার জন্যেই। সুতরাং ফেলিপিলিওর অনুবাদে কোন ত্রুটি নিশ্চয়ই ছিল না।

আতাহুয়ালপা সুতরাং সব শুনে-বুঝেও কোন জবাব দেন নি! শুধু যে তিনি নীরব থেকেছেন তা নয়, মুখের চেহারা যা করে রেখেছেন তাতে মনে হয়েছে এ সব কথা তাঁর কাছে কান দেবার উপযুক্তও নয়।

দে সটো, আর হার্নান্দো বেশ ফাঁপরে যে পড়েছেন তা বলাই বাহুল্য।

ইংকা নরেশের কঠিন নির্বিকার মুখ দেখে কি তাঁরা বুঝবেন? আতাহুয়ালপা সন্তুষ্ট না অসন্তুষ্ট? তাঁদের ওপর বিরূপ না সদয়?

আতাহুয়ালপার বদলে তাঁর এক সভাসদ সংক্ষেপে অবশ্য দুটি শব্দ উচ্চারণ করেছেন,—ঠিক আছে।

কিন্তু তাতে কি বোঝা যায়? ও দুটি কথার মানে ত দু দিকেই টানা যেতে পারে।

বেশ একটু ব্যাকুল অনুনয়ের সঙ্গে পিজারোর ভাই হার্নান্দো এবার আতাহুয়ালপাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছেন নিজের মুখে তাঁদের কিছু বলবার জন্যে।

বেশ উদ্বিগ্ন এই মুহূর্তে কি তাঁরা! আতাহুয়ালপা নিজ মুখে কিছু কি বলবেন? সে অনুগ্রহ যদি করেন তাহলেও পাবেন কি?

দে সটো আর হার্নান্দো শুধু নন ইংকা প্রধানরাও বেশ একটু শঙ্কা-সংশয় নিয়ে আতাহুয়ালপার মুখের দিকে চেয়ে থেকেছেন।

আতাহুয়ালপার নির্বিকার ভাবলেশহীন মুখে এই প্রথম ঈষৎ বাঁকা হাসির আভাস দেখা গেছে। তারপর এসপানিওলদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তিনি ধীর গম্ভীর স্বরে বলেছেন, — তোমাদের সেনাপতিকে গিয়ে বলো গে যাও যে আমি এক উপবাস ব্রত পালন করছি। এ ব্রত কাল সমাপ্ত হবে। তারপর আমার রাজপ্রধানদের নিয়ে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করব। নগরের সমস্ত রাজ-অতিথিশালা তাঁর ও তাঁর সঙ্গীদের জন্যে খুলে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। সেইখানেই তিনি যেন তাঁর অনুচরদের নিয়ে অপেক্ষা করেন।

প্রথমকার কঠিন নীরবতার পর ইংকা নরেশের এই ভাষণটুকুতেই কি পিজারো আর তাঁর সঙ্গীরা অতখানি উদ্বেগের কারণ খুঁজে পেয়েছেন?

না, তা ঠিক নয়। ইংকা নরেশ আতাহুয়ালপার চেহারা, আচরণ ও এই ভাষণ, সব কিছুর ভেতর একটা ভিন্ন অস্বস্তিকর ইঙ্গিত ফুটিয়ে তুলেছে পরের একটি ঘটনা আর তার প্রতিক্রিয়া।

ঘটনাটা ঘটেছে আতাহুয়ালপা তাঁর কথা শেষ করবার পরই।

এসপানিওলরা সবাই ঘোড়ায় চড়েই রাজদর্শনে এসেছিল। আতাহুয়ালপাকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন জানালেও ঘোড়া থেকে কেউ মাটিতে নামেন নি।

ঘোড়া জানোয়ারটিই সম্পূর্ণ অজানা বলে নতুন মহাদেশের লোকের মনে তখন গভীর বিস্ময়, কৌতূহল আর আতঙ্ক জাগায়। এসপানিওল সওয়ার সৈনিকদের মধ্যে দে সটোর ঘোড়াটিই আবার সবার সেরা। তাঁর ঘোড়াও যেমন বিরাট আর তেজী দে সটো নিজেও তেমনি ওস্তাদ সওয়ার। ঘোড়ার পিঠে ইংকা আতাহুয়ালপার সবচেয়ে কাছে তিনিই দাঁড়িয়েছিলেন।

হঠাৎ কি কারণে বলা যায় না দে সটোর তেজী ঘোড়াটি হ্রেষাধ্বনি করে একটু অস্থির হয়ে ওঠে। তারপর যা ঘটে তা কতটা দৈবাৎ আর কতটা ইচ্ছাকৃত বলা শক্ত।

দেখা যায় দুরন্ত ঘোড়াটা সামনে চাঁদিয়ে, গরম নিঃশ্বাস ছেড়ে পায়ের ক্ষুরে মাটি আঁচড়াতে আঁচড়াতে যেন অকস্মাৎ ক্ষেপে গিয়ে সামনের বিরাট চত্বরে ঝড়ের বেগে ছুটতে শুরু করেছে।

এই বার দেখা যায় দে সটোর ঘোড়সওয়ারির অদ্ভুত কৌশল। কখনো বিদ্যুৎ-বেগে ছুটিয়ে, কখনো চরকিবাজির মত ঘুরপাকের পর ঘুরপাক খাইয়ে, ঘোড়ার মুখেই ফেনার ... দিয়ে ... পা ... তুলিয়ে দে সটো সওয়ারগিরিতে তাঁর একান্ত নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন।

শুরুতে দে সটোর অভিপ্রায় ছিল ... কিন্তু ঘোড়া নিয়ে পরে ... দে সটো ইচ্ছে করেই ... ঘোড়াটা ... থেকে ... পর ... ঝাঁপ ... ইংকা প্রধানদের ... বিশেষ করে স্বয়ং আতাহুয়ালপাকে একটু ভড়কে চমকে দেওয়ার মতলব বোধহয় দে সটোর মাথায় আসে। আতাহুয়ালপার নির্বিকার ঔদাসীন্যের মুখোশটা সরে কিনা দেখবার দুষ্টবুদ্ধিও তার সঙ্গে ছিল।

চমক দেওয়ার চেষ্টাটা কিন্তু অমন মাত্রা ছাড়িয়ে যাবে দে সটোও ভাবেন নি বোধহয়। আতাহুয়ালপার একেবারে গায়ের কাছে তুফানের মত ঘোড়াটাকে হঠাৎ রুখে দাঁড় করিয়ে দিয়ে দে সটো তাঁর বাহাদুরেকা খেল শেষ করেছেন।

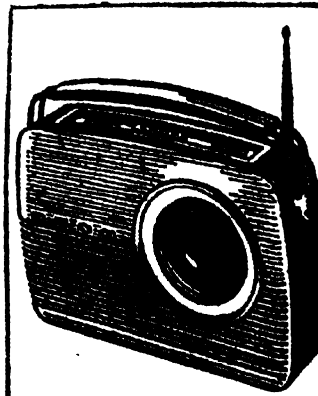
তাঁর সওয়ারগিরির আশ্চর্য কেরামতিতে ঘোড়াটা আতাহুয়ালপার প্রায় মাথার ওপর দু পা তুলে দাঁড়িয়ে উঠে আবার সামনে নিয়ে মাটির ওপর পা নামিয়ে স্থির হয়েছে সত্যি কিন্তু তেজী ছুট-করানো ঘোড়াটার মুখের কিছুটা ফেনা ইংকা নরেশের পোশাকের ওপর গিয়ে পড়েছে।

ভড়কে দিতে গিয়ে এসপানিওল সৈনিক আর হার্নান্দোর সঙ্গে দে সটো নিজেই ভড়কে গিয়ে প্রমাদ গুণেছেন। কি করবেন এবার আতাহুয়ালপা?

কিন্তু কিছুই তিনি করেন নি। তাঁর পাথরে খোদাই মূর্তির মত কঠিন মুখে সমস্ত বাহাদুরীর খেলার সময়ে ত নয়ই, শেষমুহূর্তের এই মাত্রাছাড়া উপদ্রবেও এতটুকু ভাবান্তর দেখা যায় নি। গায়ের ওপর ঘোড়া এসে পড়বার উপক্রম হওয়ার ইংকা প্রধানদের কাউকে কাউকে নিজের অনিচ্ছাতেই একটু পিছিয়ে সরে দাঁড়াতে দেখা গেছে কিন্তু আতাহুয়ালপার চোখের পাতাও একটু কাঁপে নি।

হাঁ, পোশাকে ঘোড়ার মুখের ফেনা ছিটিয়ে পড়ার পর আতাহুয়ালপা কিছুই করেন নি বলাটা ঠিক নয়। কিছু তিনি সত্যিই করেছেন। যে বেয়াদবিতে তাঁর ক্ষেপে ওঠবার কথা তা যেন লক্ষ্যই না করে তিনি অতিথিদের খাদ্য পানীয়ে আপ্যায়িত করবার আদেশ দিয়েছেন।

এসপানিওলরা ঘোড়া থেকে নামবার অনিচ্ছার দরুণ খাবার জিনিস প্রত্যাখ্যান করেছে কিন্তু ইংকা রাজপরিবারের আয়তাক্ষী সুন্দরীরা বড় বড় সব সোনার পাত্রে 'চিচা' নামের যে দেশোয়ালী সুরা



অনেক রকমের
রেডিও, রেডিওগ্রাম, রেকর্ড প্লেয়ার, রেকর্ড চেঞ্জার রেকর্ড রিপ্রডিউসার, গ্রামোফোন রেকর্ড, ট্রানজিস্টর রেডিও, ও রেডিও-গ্রাম, টেপ রেকর্ডার, এমপ্লিফায়ার ইত্যাদি নগদ ও কিস্তিতে বিক্রি করা হয়।
মেরামতের সুবন্দোবস্ত আছে
ফোন : ২৪-৪৭১০
রেডিও এণ্ড ফটো ষ্টোরস

বেশন করেছে তার প্রতি বিমুখতা ার নি।

আতাহুয়ালপাকে বিদায় অভিবাদন নিয়ে ফিরে আসবার সময় সে সুরোর াও দে সটো আর তাঁর সঙ্গীদের চাপা াতে পারে নি। সবাই বেশ একটু গুম াই ফিরেছেন।

পিজারোকে বিবরণ শোনাবার সময় দের শঙ্কিত উদ্বেগের কারণগুলো আরো ষ্ট হয়ে উঠেছে।

আতাহুয়ালপা দে সটোর বেআদবীতে কপে উঠে কিছু করলে যা মনে হত তার রে তাঁর অবিচলিত নির্বিকার ভাবটা াবহ লেগেছে আরো বেশী।

আর একটি সাংঘাতিক খবর ইতিমধ্যে জারোর বর্তমান আস্তানায় পৌঁছে গেছে। খবর পাওয়া গেছে যে, দে সটোর াড়ার খেলার যে দু-একজন ইংকা বীর াতঙ্ক গোপন করতে পারে নি, আতা-য়ালপা সরাসরি তাদের প্রাণদণ্ডের াদেশ দিয়েছেন।

এই খবরেই আতাহুয়ালপার সমস্ত বহার আর কথায় ওপরকার মোলায়েম ালসটা সরে গিয়ে ভেতরকার ভয়ঙ্কর হারাটা যেন বেরিয়ে পড়েছে।

আতাহুয়ালপা পিজারোর বাহিনীর গা ওপর থেকে দেখলে অত্যন্ত ভাল বহারই করেছেন এ পর্যন্ত। কাক্সামালকা রে তাদের রাজসমাদরে থাকবার ব্যবস্থা র দিয়েছেন। তাদের বেয়াড়া বেআদবীতে ক্ষেপ পর্যন্ত করেন নি। নিজে থেকে কা প্রধানদের নিয়ে পিজারোকে দর্শন তে আসবেন বলেছেন।

শুনতে যেমন চমৎকার ব্যাপারগুলো মন সরল সোজা কি?

রাজসমাদরে পিজারোর লোকজনদের ব্লোর ব্যবস্থা করা হয়েছে ঠিকই কিন্তু ব্যবস্থা তাদের জবাই করবারই ভূমিকা কে বলবে?

প্রতিদ্বন্দ্বী ভাই হুয়াসকার-এর ভেবী ইংকা প্রধানদেরও ডাকিয়ে এনে তাহুয়ালপা এমনি করে সসম্মানে কুজকো রে রাখবার ব্যবস্থা করেছিলেন। তারপর ব করে দিয়েছিলেন সকলকে।

হাওড়া কুষ্ঠ কুটির

২২ বৎসরের প্রাচীন এই চিকিৎসাকেন্দ্রে সব-প্রকার চর্মরোগ, বাতরক্ত, অসাড়তা, ফুলা, একজিমা, সোরাইসিস, দূষিত ক্ষতাদি আরোগ্যের জন্য সাক্ষাতে অথবা পত্রে ব্যবস্থা লউন। প্রতিষ্ঠাতা : পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা কবিরাজ, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। শাখা : ৩৬, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯। ফোন : ৬৭-২৩৫৯

সে সটোর বেয়াদবীতে ভ্রূক্ষেপ না করে যেন তা মাপ করেছেন বলেই মনে হয়েছে।

কিন্তু ভয় যারা পেয়েছিল সে সব ইংকা সভাসদদের প্রাণদণ্ড দিয়েছেন কেন?

নিজে থেকে পিজারোর সঙ্গে দেখা করতে আসবেন বলেছেন ইংকা প্রধানদের নিয়ে।

কিন্তু এ কি শুধু সম্রাটোচিত উদারতার পিজারোকে অনুগ্রহ করতে আসা? ইংকা প্রধানদের নিয়ে সদলবলে আসার আশ্বাসের মধ্যে কোন ভয়ঙ্কর গূঢ় অভিসন্ধি লুকিয়ে আছে?

না, এক মুহূর্তও আর নষ্ট করবার নয়। পিজারোকে শশব্যস্ত হয়ে মন্ত্রণা-সভা ডাকতে হয়েছে।

মন্ত্রণা-সভায় স্থির-ধীর আলোচনা সম্ভব হয় নি। সবাই কেমন দিশাহারা।

পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই এখন।—বলেছেন কাউন্সিল অফ ইন্ডিজ-এর প্রতিনিধি খাজাঞ্চী।

অনেকেই তাতে সায় দিয়েছেন। কিন্তু তাতে হবে কি?

সবাই মিলে সায় দিলেও ও পরামর্শ যে বেকার তা কারুর জানতে বাকি নেই। পালিয়ে বাঁচবার কোন আশা তাদের নেই সুতরাং অন্য কোন উপায় ভাবতে হবে।

উপায় আর কি। যতক্ষণ প্রাণ থাকবে ততক্ষণে অকাতরে লড়ে যাওয়া।—বীরের মত বলেছেন দে সটো।

আহাম্মকের মত মিছিমিছি প্রাণটা এখানে রেখে যেতে কি এতদূরে এসেছি। —দে সটোকে একটু বিদ্রূপ করেই বলেছে পিজারোর আর এক সেনাপতি জুয়ান দে হেরাদা, রাদা নামে।

বুদ্ধিমানের মত প্রাণটা লাভের সঙ্গে রাখার উপায়টা তাহলে বাতলাও শুনি। দে সটো পাল্টা খোঁচা না দিয়ে পারেন নি।

উপায় হল সিসিলির আগাথোক্লিস যা করেছিল তাই।—উদ্ধতভাবে জবাব দিয়েছে হেরাদা। অদূরভবিষ্যতের ইতিহাস গাঢ় রক্তের ছোপে সে যে কলঙ্কিত করে যাবে তার ইঙ্গিত তখনই যেন তার আলাপে আচরণে দেখা গেছে।

সিসিলির আগাথোক্লিস আবার কে? কিই বা করেছিল সে? পিজারোর মন্ত্রণা-সভার সবাই হতভম্ব হয়ে প্রশ্ন তুলেছে এবার।

সে প্রশ্নের উত্তরে হেরাদা যা বলেছে সবাই তাতে থ'।

শেষ মীমাংসা কিছুই অবশ্য তখন তখন হয় নি। কিন্তু মন্ত্রণা-সভার আর সকলের মত পিজারো নিজেও কেমন বিমূঢ় দুশ্চি-ন্তায় সে রাতটা কাটিয়েছেন।

পিজারোর এ গোপন মন্ত্রণাসভায় গানাদো নামে পরিচিত বোদিয়ার যে জায়গা হয় নি তা বলাই বাহুল্য।

সভার সব বিবরণ সেই রাত্রেই কিন্তু তিনি পেয়েছেন। পিজারোর সেনাপতিদের মধ্যে দুটি মানুষ, অন্যদের তুলনায় অনেক সরল সোজা ও সৎ। এ দুজন হলেন দামবাকার গ্রীক পেড্রো দে কান্ডিয়া আর দুর্ধর্ষ বীর [illegible]

কি কারণে সঠিক বলা শক্ত, দে সটো প্রথম পরিচয়ের পর থেকেই গানাদো নামে বোদিয়াকে একটু বেশী রকম সমীহ করেন। সময়ে-অসময়ে এই অদ্ভুত মানুষটার কাছে অত্যন্ত দামী সলাপরামর্শ পেয়েছেন বোধহয় দে সটোর শ্রদ্ধাটা অত গভীর হয়েছে।

মন্ত্রণা-সভা থেকে বেরিয়েই দে সটো প্রথমে গানাদোর খোঁজ করেছেন। তারপর একটু নিরিবিলিতে নিয়ে গিয়ে গানাদোর কাছে সভার বিবরণের সঙ্গে হেরাদা যা বলেছে তা সবই শুনিয়েছেন সবিস্তারে।

সব কিছু শোনবার পর গানাদোর মুখে একটু বিদ্রূপের হাসি দেখা গেছে।

একটু বিরক্ত হয়েই দে সটো বলেছেন, —এতে হাসবার কি পেলে?

হাসবার পেলাম আপনাদের হেরাদার ঠগবাজি!—হেসে বলেছেন গানাদো,—যে বিদ্যে জাহির করে সে আপনাদের হতভম্ব করেছে তা তার বেমালুম চুরি করা।

চুরি করা বিদ্যে? — দে সটো অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন,—তার মানে কি?

মানেটা সত্যি ভয়ানক!—এবার গম্ভীর হয়েছেন গানাদো, — সেনাপতি হেরাদা আপনাদের কাছে চুরি-করা বিদ্যেরই ভড়ং করেছে। সেটা দোষের বটে কিন্তু তারচেয়ে যা সে পরামর্শ দিয়েছে তা অনেক বেশী সাংঘাতিক। আশা করি তার কথায় কেউ কান দেবে না, কিন্তু চুরি-করা বিদ্যের জোরেই এ শয়তানীর প্যাঁচ যার মাথায় খেলে সে মানুষ সম্বন্ধে সাবধান থাকা দরকার বলে মনে করি।

হেরাদা সম্বন্ধে গানাদোর এত বিরাগের কারণটা ভাল করে না বুঝলেও দে সটো সে বিষয়ে প্রতিবাদ করবার কিছু পান নি। হেরাদা মানুষটাকে তাঁর নিজেরও কেন বলা যায় না অত্যন্ত খারাপ লাগে।

গানাদোর সঙ্গে একমত হয়ে হেরাদার বিদ্যের ভড়ং সম্বন্ধেই ঘৃণাভরে দে সটো এবার প্রশ্ন করেছেন,—যে বিদ্যে জাহির করে, তা তাহলে ওর চুরি করা?

হ্যাঁ,—হেসে বলেছেন গানাদো,—ওর চুরি ধরিয়ে দিয়ে ভড়ং ভাঙতে চান ত এক কাজ করুন। লোকের মুখে তাহলে নুন পড়বে।

কি কাজ? — আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করেছেন দে সটো।

আজ ত আবার আপনাদের মন্ত্রণা-সভা বসবে?—কৌতুকের স্বরে বলেছেন গানাদো, —আজ ওর কাছে শুধু একটা নাম উচ্চারণ করবেন। শুধু বলবেন মাকিয়াভেল্লী।

কি বললেন? মেকিয়াভেলী?

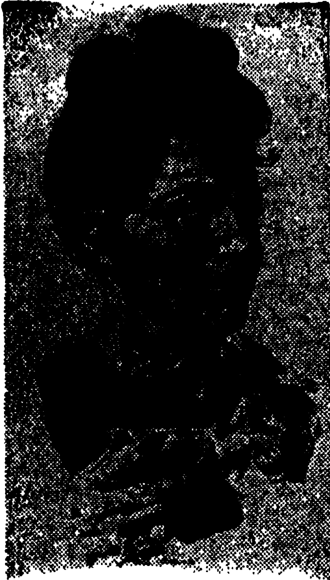
এবারের প্রশ্নটা দে সটোর নয়, মর্মরের মত মস্তক যাঁর মসৃণ সেই শিবপদবাবুর।

মেকিয়াভেলী নয়, — অনুকম্পাভরে বলেই ফেললেন দাসমশাই,—ওটা হল ইংরেজী উচ্চারণ। হেরাদা যখন পিজারোর দলের কাছে চুরি-করা বিদ্যে জাহির করেছে তখন ফ্লোরেন্সের মহাচাণক্য মাকিয়াভেল্লীর নাম ইংরেজরা শুনেছে কিনা সন্দেহ।

স্বৈরিনী ক্রিস্টিন কীলার

উত্তর চল্লিশের চিন্তা

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়



বার্ধক্যে কেমন দেখাবে তারই কল্পিত চিত্র

জীবন প্রবাহে জোয়ার ও ভাটার প্রারম্ভের মত উত্তর চতুর্দশ ও উত্তর চল্লিশ দুই বিপুল পরিবর্তন সম্ভাবনাময় কাল। যদিও মনে হয় এই দুই বয়োসন্ধি সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী।

মনে হয়, প্রথমটি যাত্রারম্ভের, দ্বিতীয়টি নোঙর ফেলার লগ্ন। প্রথমটি প্রকৃতির অন্তর্নিহিত শক্তির চেতনায় ও তার পূর্ণ-প্রয়োগের প্রেরণায় উদ্দামতায় চাঞ্চল্যকর। দ্বিতীয়টি প্রাপ্তি ও বঞ্চনায়, উদ্যমের ও হতাশার হিসাব মেলাবার সাময়িক স্থিতাবস্থা। মনে হয়, যৌবনের জোয়ারে যে উর্বরতা, যে জানা অজানা ফুল ও কাঁটার, ফসলের ও আগাছার বীজ ভাসিয়ে নিয়ে আসে পঁচিশ বছর ধরে মানব জমিনে তার আবাদ চলে। বাস্তব অভিজ্ঞতার উত্তাপের ছোঁয়ায় সে জমি কর্ষিত হয়। বন্যা এসে ক্ষেত ভাসায়, বান এসে সব ডুবোয়। গ, ছিলে দিলে আগাছা ও কাঁটার জঙ্গল সব গ্রাস করে নেয়। কঠোর সতর্কতা, সেই সঙ্গে প্রসন্ন ভাগ্যের সুযোগই, জীবন ক্ষেতে সোনা ফলায়।

অর্থাৎ পরবর্তী পঁচিশ বছর,—চল্লিশ থেকে পঁয়ষট্টি,—মানুষের কর্মজীবনের পরিপক্বতার কালে ভাগ্যে ফসল সংগ্রহটা কেমন হবে তা নির্ভর করে পূর্ববর্তী পঁচিশ বছরের ওপর।

—সম্ভবত এই ধারণায় জন্যেই দেহ ও মনোবিজ্ঞানীরা, সরকারী ও বেসরকারী সমাজসেবী ও সমাজতাত্ত্বিক গবেষকেরা বাল্য যৌবন ও বার্ধক্যের সমস্যা নিয়েই অত ব্যস্ত এবং [illegible] প্রাণ-চঞ্চল ও [illegible] উত্তরণের [illegible] ও

প্রাপ্তবার্ধক্যকাল তা উপেক্ষিত। সাহিত্যও তার ব্যতিক্রম নয়।

কিন্তু উত্তর-চল্লিশ কি সত্যিই প্রাক-চল্লিশের দ্বারা নির্ধারিতপূর্ব? তা কি শুধু পাওয়া-না-পাওয়ার হিসাব মিলানোর স্থিতাবস্থা? বিজ্ঞানআশীর্বাদিত এ যুগের দীর্ঘায়ত জীবনেও কি তা সত্যি? —না উত্তর চৌদ্দের মত উত্তর চল্লিশও পরিবর্তনের উল্লাস ও বেদনা, সমস্যা ও তার সমাধান প্রয়াসের ঘটনাবাহুল্যে অনুধাবন-যোগ্য, কখনো কখনো বা নাটকীয়?

চল্লিশ উত্তীর্ণ হবার পর মন না চাইলেও নিজের দেহ, পারিপার্শ্বিক এমন কি নিজের মনই মনে করিয়ে দেয় যে জীবনের মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ হয়ে গেল। তখন বাইরের মধ্যাহ্ন সূর্যকে অকস্মাৎ অতি জ্বলন্ত বলে মনে হতে থাকে। পারলে না বেরিয়ে ঘরের নির্জীবক আরামে তন্দ্রালস চোখে তার দহনে তীব্রতম প্রহরটুকু এড়িয়ে যেতে ইচ্ছে করে। ট্রামে বাসে বাদুড় ঝোলা বিপদজনক মনে হয় অথচ হাঁটা পথকে ক্লান্তি দূরে লাগে। আড্ডার আকর্ষণ কমে যেতে থাকে অথচ ঘরে বসে বই-পড়ার মাদকতাও ফিকে হয়ে আসে। তার একটা কারণ সময়কে অবলীলাক্রমে হরণ করে নিতে পারেন এমন লেখকের সংখ্যা হঠাৎ অবিশ্বাস্যভাবে কমে যায়।

চল্লিশ উত্তীর্ণ হয়ে আমি জানি শরৎচন্দ্র আমায় জীবনে আর কোনদিন ফিরে আসবেন না। হয়তো বহুদিন পরে প্রভাত মুখোপাধ্যায় তাঁর ছোটগল্পের ছোট ছোট সুখদুঃখের কাহিনীতে মাঝে মাঝে আমাকে হর্ষিত ও বিষণ্ণ করবেন। বঙ্কিম ও রবীন্দ্র-নাথের উপন্যাস ও প্রবন্ধ মাঝে মাঝে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ও প্রয়োজনের তাগিদে টানবে। কিন্তু 'শেষের কবিতা' কি আরেকবার মনের তাগে রাজি হয়েও শেষ করতে পারবো?

হয়তো এখনো কিছুকাল কোন কোন কবিতা ভালো লাগবে। কিন্তু আর কি সে কবিতা আমাকে বিবশ অভিভূত উদ্দীপিত ও উত্তেজিত করবে? জীবনে আর কখনো কি

কোন কবিতা স্মৃতিতে আবৃত্তিযোগ্যভাবে মুদ্রিত হয়ে যাবে? না, আবাল্য মনের আকাশে যে সব কবিতার দীপপুঞ্জ এতদিন আলো ছড়িয়েছে তাও একে একে নিভে যাবে?

বিদেশী সাহিত্যিকদের মধ্যে ডবেয়ার, লরেন্স প্রুস্ত ডস্টয়েভস্কি চিরতরে বিদায় নিলেন। বাইশ-তেইশ বছর আগে প্রেসি-ডেন্সি জেলের একটি স্বল্পালোকিত সেলে সারারাত ধরে 'ক্রাইম ও পানিসমেন্ট' পড়ার পর কয়েকটি দিন, বিশেষ করে রাত যে রকম উদভ্রান্ত, উত্তেজিত অশান্তির মধ্যে কাটিয়েছিলাম তা আরেকবার ফিরে পেতে আমি ফের জেলে যেতে রাজি আছি। কিন্তু ডস্টয়েভস্কির কোন বই কি আর শুরু করে শেষ করা সম্ভব হবে?

তার মানে অবশ্য এই নয় যে শরীরটা ভারী ও মনের গতি শ্লথ হয়েছে বলে ভারী কাজের ভার নেবার আগ্রহ কেড়েছে। মার্কসের তিন খণ্ডে ২২২৭ পৃষ্ঠায় ঠাসা অক্ষরে ছাপা, পাদটিকায় পারাভারী পাক্কা সাড়ে ছ পাউণ্ড ওজনের 'দাস্ ক্যাপিটাল' একদিন অবসর পেলে আদ্যোপান্ত পড়বার বাসনা নিয়ে দেশদেশান্তরে বয়ে বেড়িয়েছি, অবশেষে আজ এই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছি যে সে অবসর এ জীবনে আর আসবে না। সেই সঙ্গে একথাও উপলব্ধি করেছি যে জীবনে সাফল্য না হোক সামর্থ্যনির্ধারিত, বাহু যেথা স্থানে পৌঁছোতে হলে সুনির্দিষ্ট পথ ধরাটা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পণ্ডশ্রম। বা সহজ ও স্বাভাবিক তাকে গ্রহণ ও পরি-বর্জনেই সিদ্ধি ও তুষ্টি। ব্যক্তিবিশেষের চাকরি ও ক্ষমতার আয়ত্তের মধ্যে বলেই তা সহজ। তাসের খেলায় যে নিপুণ সে হয়তো হাতের তাসগুলোর দিকে তাকিয়ে এই আক্ষেপ করতে পারে যে বেছে নেবার স্বাধীনতা থাকলে সে ঐ বিশেষ তাসগুলো রাখতো না। কিন্তু আপাতত হাতের তাসগুলোর নিপুণ ব্যবহার ছাড়া আর কোন গতি নেই।

আশা ও আকাঙ্ক্ষা

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মধ্যবিত্তের [illegible] ও [illegible] [illegible]

জ্যাকি কেনেডি



বার্ধক্যের কল্পিত চিত্র

অনেক আগে থেকেই ইংরাজিতে একটি প্রবাদ আছে 'জীবন চল্লিশে শুরু।' অর্থাৎ যৌবনে দেহমনের যে পরিপক্কতার আরম্ভ চল্লিশে তার পরিপূর্ণতা। ঐ বয়সেই মানুষ অর্থে প্রতিপত্তিতে ও সিদ্ধান্তে আত্মনির্ভর ও স্বপ্রতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। সম্ভবত, এক রাজনীতি ছাড়া মানুষ পেশা, ব্যবসা, খেলা-ধুলো, সাঁতার ও প্রণয় প্রতিযোগিতা থেকে সরে দাঁড়ায়। সম্ভব ও অসম্ভবের এলাকাটা বুঝে নিয়ে যা আয়ত্তাধীন তাকেই সফল ও সার্থক করে তুলতে সচেষ্ট হয় এবং স্বর্ণ-জীবন পথ খুঁজে পেতে অতিবাহিত হয়ে গেছে,—এই কথা মনে করে শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্যে দ্বিগুণভাবে সচেষ্ট হয়।

অবশ্য পাশ্চাত্যেও জীবনের দ্বিতীয়ার্ধে মধুর ও সকরুণ দিক আছে। যেমন একটি প্রচলিত রসিকতা হচ্ছে ঐ বয়সের দুঃখটা সবচেয়ে কখন বেশি করে বাজে? —না, পথে একটি অপরিচিতা সুন্দরী তরুণীর দিকে আপনি যখন বারবার তাকাচ্ছেন কিম্বা মিষ্টি হাসির সংযোগ প্রচেষ্টা করছেন তখন সে অবাক হয়ে ভাবছে বাবার কোন বন্ধু নাকি।

তারুণ্যের অবদমিত যৌন বাসনাগুলির পুনর্জাগরণও পাশ্চাত্যে ঐ বয়সে একটা সাধারণ ঘটনা। যেমন অস্বাভাবিক ক্ষেত্রে সমলিপ্সা। অস্কার ওয়াইল্ড প্রভৃতি খ্যাত ও অখ্যাত ব্যক্তি পরিণত বয়সেই ঐ লিপ্সা চরিতার্থতা করতে গিয়ে বিড়ম্বিত হয়েছেন। সম্প্রতি অবশ্য পাশ্চাত্যে আরো অনেক দেশে প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে সমলিপ্সা চরিতার্থ করাটা আইনত স্বীকৃত হয়েছে।

জীবনের দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে দ্বিতীয়বার জীবনসঙ্গিনীর সন্ধান, দ্বিতীয় প্রণয়ের রোমাঞ্চানুভব প্রয়াসও পাশ্চাত্যে চলতি প্রথা। এ বয়সে অর্থ, প্রতিষ্ঠা ও স্বাধীনতার ফলে বাসনা চরিতার্থ, দেশভ্রমণ, রেস খেলা প্রভৃতি সব কিছুর নতুন সুযোগ দেয় এবং তার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহারই হচ্ছে 'জীবন চল্লিশে শুরুর' সার কথা।

মেয়েদের বেলায় অবশ্য ব্যাপারটা অত ফলাও ও চালাও নয়। এই বয়সে মেয়েদের দেহের বিপুল পরিবর্তন ঘটে। তাদের সন্তানধারণ ক্ষমতা তিরোহিত হয়। কিন্তু তাই বলে যৌনবাসনাও যে চলে যায় তা নয়। অনেকের কাছে তাই সেই পরিবর্তন নারীত্বের অবসানবোধজনিত বেদনার বাহক। আবার কারুর কাছে সন্তান ধারণ ও পালনের দায়িত্বমুক্ত জীবন উপভোগের শুরু। ইংলণ্ডে দেখেছি অনেক মেয়ে ঐ সময় দ্বিতীয়বার কর্মজীবনে ফিরে আসেন। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে পুরুষদের আরো অনেক বেশি বয়স পর্যন্ত নতুন সঙ্গিনী জোটার সম্ভাবনা। অথচ নারীর ক্ষেত্রে তা সীমিত। তাই পাশ্চাত্যে, যেখানে বিয়ের ভাঙাগড়া সাধারণ ঘটনা সেখানে মেয়েদের যৌবনকে ধরে রাখবার চেষ্টাও প্রবল। যদিও কখনো কখনো তা সত্যিই 'কী করুণ, আহা, অন্তরুণ তনু সাজানো।' তবু কুড়িতে বুড়ি না হওয়াটাই কাম্য এবং নিজেদের দেহটাকে সপ্রতিভ ও সতেজ রাখার জন্যে, যত্ন নেওয়াটাই পরিহাস-যোগ্য তা নয়।

ব্রিজেৎ বার্দো

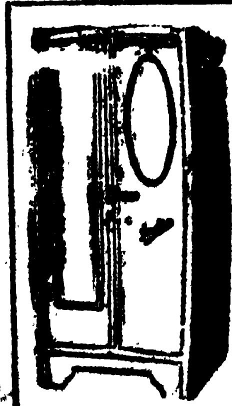


কল্পিত চিত্র

ঐ বয়সে পুরুষদেরও অদ্ভুত মুদ্রাদোষ ও উপসর্গ দেখা দেয়। তার একটা হচ্ছে, আলাপের সময় একতরফা কথা বলে যাওয়া। অনেক সময়েই তা নিজের স্মৃতিচারণ। নিজের কাছেই নিজের কথা বলা। অপরাপর উপসর্গের মধ্যে হচ্ছে হঠাৎ 'পয়সাজ্ঞানী টাকা মূর্খতা' হওয়া। নিজের স্বাস্থ্য ও শরীর সম্পর্কে অকারণ দুশ্চিন্তা করে নানা বড়ি টনিক ও টোটকা নির্ভর হয়ে পড়া এবং জীবনবীমা, প্রভৃতির শেকলে বাঁধা পড়া। যার অর্থ দাঁড়ায় বর্তমানে কষ্ট করে কোন এক কোম্পানীবিশেষকে মাসিক কিস্তিতে টাকা দিয়ে চলা, যে টাকা সে বহু বছর পরে কিম্বা দাতার মৃত্যুর শেষে উত্তরাধিকারীদের ফেরৎ দেবে। কিন্তু ততদিনে সেই টাকার ক্রয়ক্ষমতা হয়তো অর্ধেক হয়ে গিয়েছে। অবস্থাটা অনুরূপ :

বীমাই জীবন
বুঝি বটে, কিন্তু মাসে মাসে
কিস্তির যোগান
দিতে গিয়ে বাজার খরচে পড়ে টান।
অথচ ডাক্তারে বলে তত্ত্বকথা
এ বয়সে নিতান্ত নিশ্চয় :
পুষ্টিকর পথ্য বিনা অতএব
গত্যন্তর নেই।

আমাদের মত বেশির ভাগ লোককেই যাদের জীবনটা গড্ডালিকার স্রোতে কাটাতে হলো তাদের আরেকটি অধিকন্তু ঝামেলা আছে। পূর্বোক্ত স্মৃতিচারণে, হয়তো বা নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকবার জন্যেই, আমাদের সমকালে অন্য পূর্বপরিচিত যাঁরা মধ্যবয়সে উপনীত হয়ে জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান, আইনসভার সদস্য এমন কি উজীর নাজির হয়েছেন তাঁদের সঙ্গে যে একদিন পরিচয় ছিল, কি একসঙ্গে পড়তাম,—এ সব কথা বলতে ভালো লাগে। কিন্তু শ্রোতারা যদি উত্তর চতুর্দশের হয় তবে তারা মুচকি হাসে। কারণ ওদের জানার সেটা শুরু।



আপনার মেয়ের বিয়েতে উপহার দিন—

ইণ্ডিয়া ষ্টীল আলমারি

● মজবুত ফিটিংস ● ভাল ফিনিশ
● নকল চাবি লাগবে না, সেজন্য গ্যারাণ্টি দিচ্ছি।

ইণ্ডিয়া ষ্টীল ফার্ণিচার

মহম্মদ ও কোং

১৫, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭
'গ্রেস' সিনেমার পশ্চিমে — ফোন ৩৪-৭৫১২



(এক)

জলদস্যুবৃত্তি পৃথিবীর আরো অনেক বৃত্তির মতই আদিম। চুরি-ডাকাতি কিংবা ছিনতাইয়ের মতই পুরোন। বাণিজ্যের পিছু পিছু যেসব বস্তু সঙ্গোপনে হাটে, জাল জুয়াচুরি এবং চুরি-ডাকাতি তাদের মধ্যে প্রথম সারিতে পড়ে। সেকালে সওদাগর বেরোতেন বাণিজ্যে। সমুদ্রে তার সপ্তডিঙা চলত ভেসে। এক দেশ থেকে অন্য দেশ। কোথাও পণ্যসামগ্রী ক্রয়, কোথাও তা বিক্রয়। দেশে দেশে ঘুরে বেড়াত সওদাগরের ডিঙা, এক বন্দর থেকে অন্য বন্দরে। জল-পথে এইসব সওদাগরী নৌকোগুলিকে আক্রমণ করে মালপত্র ছিনিয়ে নেওয়াই কাজ হল লুঠেরাদের। পরে লুঠের মাল সুবিধে-মত কোনো বন্দরে বিক্রি করে দেওয়া। টাকাকড়ি যা পাওয়া গেল, তার বিলি-বখরা হবে দলের নিয়মানুসারে।

জলদস্যুর হাতে বন্দী হয়ে নির্যাতন এবং অকথ্য অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে সংখ্যাহীন মানুষকে। বন্দীদের শৃঙ্খলিত করে বেঁধে দেওয়া হয়েছে দাঁড়ের কাছে। দুই হাতে দাঁড় টানবে তারা। কোনোরূপ ক্লান্তি প্রকাশ করলেই শুরু হবে নির্যাতন। জল-দস্যুর হাতে কিভাবে নিপীড়ন চলে তার মর্মস্পর্শী বিবরণ দিয়েছেন একাধিক বন্দী। সুযোগ পেয়ে অনেকে পালিয়ে এসেছেন জল-দস্যুদের কবল থেকে কিংবা মুক্তিপণ দিয়ে অব্যাহতি পেয়েছেন অসহনীয় বন্দী-জীবন থেকে। অবশ্য বন্দীদের অধিকাংশ সময়ই বেচে দেওয়া হত, যারা দাস কিনতে চান, তাদের কাছে। কিংবা বন্দী করে রাখা হত কোনো মালিকের অধীনে। বারবারির উপকূল থেকে টমাস সুইট নামে এক বন্দী চিঠি লিখেছিলেন ইংলন্ডে, তার বন্ধুদের উদ্দেশ্যে। [illegible]

তারিখ ২১শে জুন, ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে। চিঠিতেই উল্লেখ রয়েছে যে এর আগে আরো অনেক পত্র লিখেছেন স্যুইট। কোনো সাড়া পাননি। টমাস স্যুইটের তখনই দীর্ঘ ছয় বৎসর বন্দী-জীবন অতিবাহিত হয়েছে। স্যুইট লিখেছেন তার বন্ধুদের উদ্দেশ্যে। তার ধারণা মনে করে ইংলণ্ডে স্যুইটের অনেক আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব। অন্তত আড়াই শ' পাউণ্ড মুক্তিপণ না দিলে তিনি এবং তার এক বন্ধু বন্দী রিচার্ড রবিনসন এই ক্লান্তিকর বন্দী-জীবনের হাত থেকে অব্যাহতি পাবেন না। যে পত্র লিখেছেন স্যুইট তার ছত্রে ছত্রে বেদনার সুর...প্রতিটি শব্দে মুক্তিলাভ করবার আকুতি। পৃথিবীর করুণতম বিষাদ-সংগীতও এর কাছে তুচ্ছ মনে হতে পারে। টমাস স্যুইট তার পত্রের একাংশে লিখছেন—

"হায় পিতা, ভ্রাতা, বন্ধু এবং পরিচিত স্বজন। আমাদের দ্রুত মুক্তিলাভের জন্য কোনো একটা ব্যবস্থা কর। কত শত বন্দী এবং দাস মুক্তি পেল দুঃখ-দুর্দশার হাত থেকে। আমাদেরই চোখের সামনে দিয়ে তারা ফিরে গেল স্বদেশে। তারপর থেকেই আমরা শুধু ভাবি যে হয়ত এবার আমাদের পালা এল। কিন্তু হায়! আমাদের সে আশা ছলনা ছাড়া অন্য কিছু মনে হয়নি। ভগবান যীশুর নামে আমরা তোমাদের অনুরোধ জানাচ্ছি। তিনি যেমন তোমাদের জন্য মুক্তি এনেছেন তেমনি আমাদের দুই বন্ধুর জন্য মুক্তির ব্যবস্থা তোমরা করে দাও।

এখানে বসে বহুবার শোনা সেই গানটা মনে হয়। তার নিগূঢ় অর্থ এমনভাবে আর কোনোদিন হৃদয়ঙ্গম করিনি। গানটা হল—'ব্যাবিলনের মাটিতে বসে তোমার কথা স্মরণ করে আমরা শুধু কেঁদেছি প্রভু। কেবল কেঁদেছি।' আমরা মনে মনে গান করি—"বারবারি উপকূলের মাটিতে বসে হে ইংলণ্ড। তোমার কথা স্মরণ করে আমরা কেবল কাঁদি, কেবলই কাঁদি।" হে বন্ধু, আমাদের এই দীর্ঘশ্বাস এবং বুকের ব্যথা নিশ্চয়ই তোমাদের কানে পৌঁছবে। তা নিশ্চয়ই তোমাদের অন্তরে করুণার সঞ্চার করে আমাদের জন্য মুক্তির ব্যবস্থা করে দেবে।

ইতি

তোমার হতভাগ্য বন্ধু এবং এক খৃষ্টান ভাই টমাস স্যুইট"



কিন্তু টমাস স্যুইট এবং তার বন্ধু রবিনসন কোনোদিন ইংলণ্ডে ফিরে আসেন নি। সম্ভবত তাদের পাঠান হয়েছিল উপকূল থেকে আরো অভ্যন্তরে। সেখান থেকে কোনো দাস বা বন্দী ফিরে আসতে পারে না।

জল-দস্যুর হাতে পড়ে সাময়িকভাবে নিগ্রহ এবং লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে দুটি জগদ্বিখ্যাত মানুষকে। একজন জুলিয়াস সীজার, ইতিহাস যাকে স্মরণ করে রেখেছে। অপরজন মিগুয়েল দ্য কারভানটিস, অমর কথা-সাহিত্যিক। কিন্তু জল-দস্যুর হাতে পড়ে নিগ্রহ এবং অত্যাচারের পরিবর্তে 'মধুর' এক অভিজ্ঞতা হয়েছে এমন কাহিনীও আছে। সে গল্প আরণ স্মিথের।

১৮২১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে আরণ স্মিথ জেফির জাহাজে চাকরী পেলেন। জাহাজের প্রথম মেট। ২৯ জুন জেফির সমুদ্রপথে রওনা হল। জামাইকার কিংস্টন বন্দর থেকে জাহাজ ছাড়ল। গন্তব্যস্থল ইংলণ্ড। জাহাজে বহু যাত্রী। মালপত্রও প্রচুর।

জাহাজ ছাড়ার পর স্মিথ দেখলেন যে ক্যাপ্টেন লামসডেন ভদ্রলোক সুবিধের নন। জ্ঞান-গরিমা কম। একটু বোকা, অথচ একগুঁয়ে। নিরাপদ পথ পরিত্যাগ করে বাদুতাড়নাহীন অন্য একটি পথ ধরলেন ক্যাপ্টেন। কারণ, পথটির দূরত্ব কম স্মিথ জানতেন দূরত্ব কম হলেও ওটা রাজপথ নয়। গলি-ঘুঁজির রাস্তা এবং জল-দস্যুর উপদ্রব সে পথে প্রায়শঃ ঘটে।

পাঁচদিন কাটবার পর জাহাজ এল দক্ষিণ কিউবার কাছে, অ্যানটনিও অন্তরীপের মুখে। ঠিক এখানেই সন্দেহজনক একটি জাহাজ দ্রুত এগিয়ে এল জেফিরের দিকে। কাছে আসতেই সকলে বুঝল ওটি জল-দস্যুদের জাহাজ। সংখ্যায় ওরা কম নয়। আক্রমণ প্রতিহত করা প্রায় অসম্ভব। ক্যাপ্টেন লামসডেন আত্মসমর্পণ করলেন। জল-দস্যুর দল উঠে এল জেফিরে। মূল্যবান যা কিছু ছিল তা নিয়ে গেল তারা। বাধা দেননি বলে কিংবা অন্য যে কারণেই হোক ক্যাপ্টেন লামসডেন এবং জেফির জাহাজকে জল-দস্যুর দল অক্ষত অবস্থায় যেতে দিল। যাত্রীদের কারো প্রতি কোনো দুর্ব্যবহার হয়নি। অল্প সময়ের মধ্যেই লুঠের মালপত্র নিয়ে জল-দস্যুদের দ্রুত-গামী জাহাজটি অন্তর্ধান করল। কিন্তু সঙ্গে করে তারা নিয়ে গেল জেফির জাহাজের প্রথম মেট আরণ স্মিথকে। একজন সুদক্ষ নাবিকের অভাব ছিল তাদের। স্মিথকে পেয়ে সে অভাব তারা পূরণ করল। জলদস্যুদের দলপতি আরণ স্মিথকে আদেশ করলেন জাহাজের স্টীয়ারিং ধরতে। কিউবার মাইও মিডিয়াস তাদের গন্তব্য-

দুপুরে লুঠের জাহাজ এল বন্দরের কাছে। স্মিথ দেখলেন যেন কয়েকটি নৌকো এবং তিন ডালের জাহাজের দিকে এগিয়ে আসছে। জলদস্যু ক্যাপ্টেন কিন্তু কিছুমাত্র চিন্তিত নন। বরং স্মিথকে তিনি একটা গোপন খবর দিলেন। এখনই জাহাজে এসে উঠবে কয়েকজন সুন্দরী স্প্যানিশ মেয়ে। অবশ্য তাদের সঙ্গে দু-তিনজন ম্যাজিস্ট্রেট এবং একজন ধর্মযাজকও এসে উঠতে পারেন জাহাজে। আরণ স্মিথ আশ্চর্য হলেন। ম্যাজিস্ট্রেটরা আসছে শুনে ক্যাপ্টেন বিন্দুমাত্র ঘাবড়াচ্ছেন না কেন? লুঠের মাল জাহাজে দেখলে তো বিপত্তি হওয়ার কথা। জলদস্যু ক্যাপ্টেন পরিষ্কার করলেন ব্যাপারটা। ম্যাজিস্ট্রেটরা তার হাতের লোক। উপহার-উপঢৌকন দিয়ে তাদের হাত করেছেন ক্যাপ্টেন। ওদের কাছ থেকেই ঝড়ের মেঘের সঙ্কেত বহু আগে সংগ্রহ হয়। না হলে হাভানায় কি সিদ্ধান্ত হল তা ক্যাপ্টেনের কানে কিভাবে পৌঁছে যায়?

নৌকোয় করে যারা এল, তারা উঠল জাহাজে। কয়েকটি সুন্দরী মেয়ে কিছু ভদ্রলোক, জন-দুই ম্যাজিস্ট্রেট এবং এক ধর্মযাজক। স্মিথের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন ক্যাপ্টেন। সকলকে জানালেন যে, এই ব্যক্তি তার একটি রংরুট এবং দক্ষ নাবিক। কেবিনে বসে সুরাপান করলেন সবাই। এক ভদ্রমহিলা প্রস্তাব করলেন নাচের আসরের। জলদস্যু ক্যাপ্টেন তখনই সানন্দে মত দিলেন তাতে। শুরু হল নাচ। ম্যাজিস্ট্রেটদের একজনের একটি সুন্দরী মেয়ে স্মিথকে চাইল নাচের সঙ্গী হিসাবে। আশাতীত মর্যাদা। আরণ স্মিথের নৃত্য করার কথা। কিন্তু স্মিথ এই মর্যাদা গ্রহণ করলেন না। মেয়েটিকে বললেন যে, তিনি বিবাহিত। বাড়ীতে তার লোকেরা নিশ্চয়ই এখন শোকে মুহ্যমান। কাজেই তার পক্ষে নৃত্য করা এখন শোভনীয় নয়।

কথা শুনে মেয়েটি হাসল। তার নামটিও ভারী মিষ্টি। সেরাফিনা—সুন্দরী সেরাফিনা। চোখ দুটি বড় বড়—আয়ত। ফর্সা দীঘল দেহলতা। স্প্যানিশ মেয়েরা যেমন হয়। সেরাফিনা বলল, একথা সে বিশ্বাস করে না। কারণ যারা সত্যি বিবাহিত তারা সুন্দরী মেয়ের সংস্পর্শে এলে ও কথাটা বেমালুম চেপে যায়।

জাহাজের এক কোণে সেরাফিনা নিয়ে গেল ইংলণ্ডের নাবিককে। শুরু হল মৃদু অথচ মধুর সংলাপ। সেরাফিনা সব কথা শুনল। বলল তার পিতাকে বলে সে স্মিথের মুক্তির জন্য বিশেষ চেষ্টা করবে।

দিন গড়িয়ে সন্ধ্যা এল বন্দরে। সমুদ্রের আকাশ সূর্যের অস্তরাগমাত্র এখন আর লাল নেই। কিন্তু সেই লাল রঙ আশ্রয় করেছে দুটি মনের কোণে। রোমান্সের রঙে সেরাফিনা আর স্মিথের হৃদয় রঙে উঠেছে গোলাপী লাল আশ্চর্য উজ্জ্বল চোখদুটি সেরাফিনার। স্মিথের মনে হল এমন দুটি চোখ সে কোনদিন দেখে নি। কখনও না।

কিছুক্ষণ নাচের পর সেরাফিনা ক্লান্তি প্রকাশ করল। দুজনে এসে বসল এক পাশে। লণ্ডন শহরটা কেমন? কত বড় হবে? ছেলেমানুষের মত অসংখ্য প্রশ্ন সেরাফিনার। আরণ স্মিথ জবাব দিতে নাজেহাল হয়ে উঠলেন।

পর দিন সকালে বিদায় নিল ওরা। জলদস্যু ক্যাপ্টেন প্রত্যেককেই কিছু

উপহার দিলেন। সেই ধর্মযাজক পেলেন এক ট্রাঙ্ক জিনেন এবং সিল্ক কাপড়। আরণ স্মিথের মাল ওটা। কিন্তু ধর্মযাজক ভারী খুশী। ক্যাপ্টেনকে আশ্বাস দিলেন ধর্মযাজক, যে মা মেরীর কাছে প্রার্থনা জানাবেন তিনি নিত্যনতুন শিকার লাভ করুন ক্যাপ্টেন। সাফল্য তার হাতের মুঠিতে থাকুক।

দুপুরের দিকে আরো অনেকগুলি নৌকো এল ভিড় করে। তাদের সঙ্গে সেরাফিনা এবং তার বাপও। অনেক লোক এসে উঠল জাহাজে। ওরা মাল কিনতে চায়। লুঠের মাল। সস্তায় নিশ্চয় মিলবে। সেরাফিনা একলা পেয়ে স্মিথকে চুপি চুপি বলল, তাকে দেখবার জন্য সেরাফিনার মা খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। খুব শীঘ্র ব্যবস্থা করবে সেরাফিনা। যাতে আরণ স্মিথ তাদের বাড়ীতে যেতে পারে।

বেচা-কেনা শুরু হল। স্মিথ পেলেন বিক্রি করবার ভার। ক্যাপ্টেন চালাক লোক। নীলাম শুরু হবার আগে একটু মদ খাইয়ে দিতে চাইলেন তিনি ক্রেতাদের। তার আদেশে আরণ স্মিথ ককটেল তৈরী করল। রাম, জিন এবং ব্র্যাণ্ডির মিশ্রণ। যা সামান্য পেটে পড়লেই উত্তেজনা এবং নেশার তুফান ছুটবে দেহের কোষে কোষে।

উপায়টা কাজে খাটল। উত্তেজনা এবং নেশার ঝোঁকে দর-দাম হাঁকতে সবাই বেপরোয়া। জলদস্যু ক্যাপ্টেন ভারী খুশী। কিন্তু আরণ স্মিথ ততক্ষণে অন্যত্র সরে পড়েছেন সেরাফিনাকে নিয়ে। উত্তেজনা এবং নেশা সেখানেও। তবে তা সুরার নয়,—প্রেমের। নেশা মাদকের নয়,—মেয়ের। দুটি হৃদয় প্রেম নিবেদন করল, একে অন্যের কাছে। তারা প্রতিজ্ঞা করল সুযোগ পেলেই পালিয়ে যাবে। বহু দূরে,—পৃথিবীর অন্য কোণে।

দু-একদিন পরেই সেরাফিনা খবর পাঠাল জাহাজের সেই ক্যাপ্টেনের কাছে, তার পিতা অসুস্থ। চিকিৎসার জন্য আরণ স্মিথকে যেন পাঠান হয়। স্মিথ যে চিকিৎসার ব্যাপার বোঝে এ খবরটা ম্যাজিস্ট্রেট আগেই পেয়েছিলেন।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও ক্যাপ্টেন রাজী হলেন। জল ছেড়ে ডাঙায় উঠলেন আরণ স্মিথ। মুক্তির নিঃশ্বাস ফেললেন মাটিতে দাঁড়িয়ে। মনে হল নীল সমুদ্র কি ভীষণ, কি ভয়ঙ্কর স্থান। প্রায়ই যেতে লাগলেন স্মিথ। চিকিৎসার প্রয়োজনে চিকিৎসককে তো ছুটতেই হবে। ক্যাপ্টেন বাধা দিতে পারেন না। বন্ধু ম্যাজিস্ট্রেট যদি মুখ ফিরিয়ে নেন, তাহলে তার সমূহ বিপদ। তৃতীয় কিম্বা চতুর্থবারে সেরাফিনা সুযোগ করে মিলিত হলেন আরণ স্মিথের সঙ্গে, নিজেদের একটি ঘরে। গভীর প্রেমের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হলেন দুজনে। কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বললেন সেরাফিনা—পর দিন সন্ধ্যায় সব প্রস্তুত। দুটি ঘোড়া এবং পথ-প্রদর্শক অপেক্ষা করবে। স্মিথ যেন বিলম্ব না করেন।

একটা অস্ত্রোপচারের অজুহাত তুলে পর দিন আরণ স্মিথ বেরিয়ে পড়লেন। সেরাফিনাকে নিয়ে বহু দূরে পালাতে হবে তাকে। মন চঞ্চল, বিক্ষিপ্ত এবং কিছুটা উত্তেজিত।

কিন্তু হায়! পথ-প্রদর্শক লোকটি হঠাৎ বেঁকে বসল। সেরাফিনা এবং আরণ স্মিথকে ফিরে আসতে হল। পালানোর প্ল্যান ভেস্তে গেল সহজে।

ইতিমধ্যে জলদস্যুর দল আরো অনেক শিকার সংগ্রহ করেছে। ছোট-বড় কয়েকটি জাহাজ তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে। রাইও মিডিয়াসে মাল বেচা-কেনার যেন শেষ নেই। মাল এল,...ফুরিয়ে গেল তা ক্রেতার কাছে। কিন্তু তাতে কি? আবার নতুন জাহাজ আসছে। লুঠের মালে ভরে উঠছে বেচাকেনার পণ্যসামগ্রী।

কিন্তু ব্যাপারটা ততদিনে হাভানায় গিয়ে পৌঁছেছে। গভর্নর এক দল পুলিশ পাঠালেন দস্যুদের তাড়িয়ে দিতে কিম্বা ধরে আনবার জন্য। কিন্তু পুলিশী অভিযানের খবর বহু পূর্বেই ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে পেয়ে গেল জলদস্যুরা। ফলে ব্যবস্থা হল যথারীতি। পুলিশ এল এবং ফিরে গেল হাভানায়। জলদস্যুদের তারা বিতাড়িত করেছে। এই খবর পেলেন গভর্নর।

ইতিমধ্যে অপর এক জলদস্যু তার মালপত্র নিয়ে হাজির হল বন্দরে। এখন আর কথা নেই। লক্ষ্মণ দোসর এসে জুটেছে। রীতিমত বাজার বসে গেল রাইও মিডিয়াসে। লুঠের মালকে পণ্যসামগ্রী সাজিয়ে। রীতিমত হৈ-চৈ ব্যাপার।

নতুন জলদস্যুর জাহাজে এলেন এক বন্দী অফিসার এবং তার স্ত্রী। ভদ্রলোক স্পেন দেশের। স্ত্রী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন বন্দরে। খোঁজ হল চিকিৎসকের। আরণ স্মিথের ডাক পড়ল। সে তো শুধু নাবিক নয়,—পারদর্শী চিকিৎসকও।

স্মিথের নাম 'প্রেম কপালে' হওয়া উচিত। ললাটে যেন প্রেম ছাড়া অন্য কথা নেই। বিবাহিতা এই স্প্যানিশ ভদ্রমহিলা মুগ্ধ হলেন স্মিথকে দেখে। ইংরেজ যে এমন সুন্দর পুরুষ হয় এ কথা তো তার জানা ছিল না। যাই হোক চিকিৎসার গুণে ভদ্রমহিলা সেরে উঠলেন শীঘ্র। আরণ স্মিথের নাম-ডাক রীতিমত ছড়িয়ে পড়ল।

জাহাজে শোবার জায়গা কম। এই তিন বন্দীকে তাই একটি কেবিনে স্থান দেওয়া হল। আরণ স্মিথ এবং স্পেনীয় দম্পতি। রাত্রে শোবার ঠিক করলেন স্মিথ। এক পাশে থাকবেন স্পেনীয় দম্পতি। অন্য পাশে তিনি। গভীর রাত। স্মিথ গাঢ় ঘুমে অচেতন। হঠাৎ উষ্ণ এক সান্নিধ্যে ঘুম ভেঙে গেল তার। বুকের কাছে কার তপ্ত নিঃশ্বাস এসে পড়ছে? আরণ স্মিথ চেয়ে দেখলেন তার রোগিণী এসে জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছেন তাকে। স্মিথ উঠে বসতেই ভদ্রমহিলা সরে গেলেন স্বামীর কাছে। কাণ্ড দেখে স্মিথ তো অবাক। কিন্তু কাকে বলা যায় এই নৈশ অভিসারের কাহিনী? কে বিশ্বাস করবে তার কথা? এবং তার নির্দোষ অন্তরকে? যাকে বলবেন মুখ টিপে সে হাসবে। মনে মনে বলবে,—ব্যাটার চতুর নাগরালি দেখ।

দু-একদিন পরে আবার সেই ঘটনা হল। আরণ স্মিথ সতর্ক ছিলেন। তবু না ঘুমিয়ে কতক্ষণ আর থাকা যায়? আরণ স্মিথ ঘুমিয়ে পড়লেন। গভীর রাতে তেমনি ঘুম ভেঙে গেল তার। কোমল একটি দেহলতা তাকে বেষ্টন করে রয়েছে। মৃণাল দুই ভুজ গলা জড়িয়ে আছে সন্তর্পণে। স্মিথ উঠে বসবেন মনে করলেন। কিন্তু হঠাৎ অন্য দিকে দৃষ্টি যেতেই তিনি চমকে উঠলেন। সেই স্প্যানিশ অফিসার জেগে রয়েছেন বসে। দুই চোখে তার শ্বাপদের জ্বালা। হয়ত এখনই একটা অঘটন করে ফেলবেন ভদ্রলোক। আরণ স্মিথ শুয়ে শুয়েই কেমন একটা অব্যক্ত আওয়াজ করলেন মুখ দিয়ে। ভদ্রমহিলা শব্দ শুনেই সভয়ে উঠলেন বসে। বিছানায় স্বামী বসে এবং স্মিথ ঐ অদ্ভুত আওয়াজ করছে দেখে তিনি ব্যাপারটা আঁচ করলেন।

সত্যি উপস্থিত বুদ্ধি ছিল ভদ্রমহিলার। নিমেষের মধ্যে স্বামীর কাছে সরে গেলেন তিনি। এবং নিজের ভুল হওয়ার কথা প্রকাশ করলেন। ঢেউয়ের তালে তালে জাহাজ দুলছিল। গড়াতে গড়াতে কখন তিনি এসে পড়েছেন এদিকে। খেয়াল করেন নি। কি লজ্জার কথা।

তবু চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙেছিল অনেকের। জলদস্যু ক্যাপ্টেন এসেছিলেন ছুটে। সমস্ত ব্যাপারটা শুনে মুচকি একটু হাসলেন ক্যাপ্টেন। ভাগ্যবান স্মিথের পিঠ চাপড়ে দিয়ে গেলেন সকলের অলক্ষ্যে।

কিন্তু আরণ স্মিথ সতর্ক রইলেন। বিবাহিতা রমণীর প্রেমে পড়লে সর্বনাশ হয়ে ওঠে। এ ব্যাপারটা তার জানা। ওদিকে সন্দিগ্ধ স্বামী। স্মিথকে দেখলে সেই



স্প্যানিশ অফিসার কেমন কটকট করে তাকান।

তবু আর একটা দুর্ঘটনা হল। একদিন সন্ধ্যের সময় স্মিথ কেবিনে বসে কি একটা ওষুধ তৈরী করতে ব্যস্ত। হঠাৎ সেই স্প্যানিশ অফিসার-গৃহিণী কেবিনে ঢুকলেন। সম্ভবত স্বামীকে ফাঁকি দিয়ে ভদ্রমহিলা এই সুযোগটার সদ্ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। কেবিনে ঢুকে তিনি আরণ স্মিথের ঘনিষ্ঠ হলেন। একটি দীর্ঘ চুম্বন এঁকে দিলেন স্মিথের ঠোঁটে—।

এমন সময় বজ্রপাত। সন্দিগ্ধ স্বামী এসে ঢুকলেন কেবিনে এবং স্ত্রীকে অনুরূপ অবস্থায় আবিষ্কার করলেন।



কেবিনে ঢুকে তিনি স্মিথের ঘনিষ্ঠ হলেন......

রাগে ফেটে পড়লেন ভদ্রলোক। চিৎকার এবং হট্টগোল শুনে জলদস্যু ক্যাপ্টেন ছুটে এলেন কেবিনে।

মহিলাটি কিন্তু আশ্চর্য বুদ্ধিমতী। ক্যাপ্টেনকে বোঝালেন তিনি। ঢেউয়ের দোলায় জাহাজটা হঠাৎ দুলে উঠল এবং টাল সামলাতে না পেরে তিনি আরণ স্মিথের গায়ে পড়ে গিয়েছিলেন। স্মিথ তাকে ধরে না ফেললে তিনি হয়ত হাত-পা ভেঙে পড়ে থাকতেন মেঝেতে।

ব্যাপারটা তখনকার মত মিটল। স্মিথ ভাবলেন, স্প্যানিশ অফিসারটি তাকে ছেড়ে কথা কইবেন না। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবেন স্বামী।

কিন্তু পরদিন সকালে ঐ স্প্যানিশ দম্পতিকে মুক্তি দিলেন জলদস্যু ক্যাপ্টেন। হাভানায় চলে গেলেন তাঁরা।

এমন সময় দুঃসংবাদ এল। হাভানার গভর্নর জলপথে এবং স্থলপথে একযোগে সৈন্য পাঠিয়েছেন, দস্যুদলকে পর্যুদস্ত করতে। সেদিন রাত্রেই রাইও মিডিয়াস ছেড়ে চলল জলদস্যুর দল। তীরে দাঁড়িয়ে সেরাফিনা রুমাল নাড়ে নি। ব্যাপারটা অতি সন্তর্পণে সমাধা করতে হল। কেউ জানত না আগে। আরণ স্মিথ খবর পাঠাবার সুযোগ পান নি।

একটু দূরে এসে তারা নোঙর করল। চার পাশে গভীর জঙ্গল। সমুদ্রপথ এবং স্থলপথ থেকে জাহাজটিকে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। গাছপালার আড়ালে জাহাজ খাড়ির মুখে আত্মগোপন করে রইল।

একদিন সন্ধ্যেয় ঝড় উঠেছে। ক্যাপ্টেন জ্বরে পড়ে রয়েছেন। কেবিনে শুয়ে প্রলাপ বকছেন তিনি। জ্বর বেশ বেড়েছে। সাঙ্গোপাঙ্গোরা মদ খেয়ে বেহুঁস। আরণ স্মিথ ভাবলেন, এই সুযোগ। কাছেই একটা জেলে নৌকো বাঁধা ছিল। সামান্য কিছু খাদ্যদ্রব্য এবং নাবিকের যন্ত্রপাতি নিয়ে আরণ স্মিথ দরিয়ায় ভাসলেন। হাভানা তার গন্তব্যস্থল। সেখান থেকে ইংলণ্ডে ফিরবেন।

দিন-রাত্রি কাটলে পর হাভানায় পৌঁছলেন স্মিথ। ভারী সুন্দর জায়গা। বড় রাস্তা দিয়ে আরণ স্মিথ হাঁটছেন আর দেখছেন শহরটাকে। হঠাৎ সেই স্প্যানিশ অফিসারের সঙ্গে দেখা হল তার। এবং সেই মুহূর্তে বিধি তার প্রতি বাম হলেন।

অফিসার ভদ্রলোক পুলিশ ডেকে এনে স্মিথকে সমর্পণ করলেন। লোকটা জলদস্যু। অনেক প্রমাণ আছে তার কাছে। সুতরাং অ্যারেস্ট করে জেলে পাঠান হল আরণ স্মিথকে। অন্ধকার কারাগারে বসে স্মিথ ভাবছিলেন সেরাফিনার আশ্চর্য সুন্দর চোখ দুটির কথা। তার মনে হল রাইও মিডিয়াস কত দূরে? সেরাফিনা সেখানে কি করছে বসে?

বিচার শুরু হল আরণ স্মিথের। কিন্তু হাভানার বিচারকরা তার বিচার করবেন কি করে? জামাইকা সরকার স্মিথকে পাঠাতে বলেছেন তাদের কাছে। স্বদেশে বিচার হবে আরণ স্মিথের। স্প্যানিশ অফিসারের অভিযোগগুলি লিপিবদ্ধ করে স্মিথকে পাঠান হল। সিবিলি জাহাজে এসে উঠলেন স্মিথ। স্প্যানিশ সৈন্যরা তাকে কড়া পাহারা দিয়ে নিয়ে এল জাহাজের কাছে। দীর্ঘদিন সমুদ্রপথ অতিক্রম করে সিবিলি এল ডেপ্ট-ফোর্ডে।

আরণ স্মিথের বিচার শুরু হল ২০ ডিসেম্বর, ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে। ওল্ড বেইলীতে হৈ-চৈ। অনেক সাক্ষীসাবুদ গ্রহণ করা হল। জুরীরা সব শুনলেন। জলদস্যু-বৃত্তির অভিযোগ রয়েছে আরণ স্মিথের নামে।

সাক্ষী দিতে এসেছিলেন একটি সুন্দরী মহিলা। বিচারক এবং জুরীরা তার সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ। এর নাম মিস সোফিয়া নাইট। ঘটনা অনেক সময় গল্পের চেয়েও রোমাঞ্চকর মনে হয়। হয়ত তাই সত্যি। সাক্ষী দিতে এসে মিস সোফিয়া নাইট বললেন যে, তিন বৎসরেরও বেশী সময় তিনি সাক্ষীকে জেনেছেন। আরণ স্মিথের বাকদত্তা তিনি। কোর্ট থেকে ছাড় পেলেই তাদের বিয়ে হতে পারে। সাক্ষীকে দেখে আরণ স্মিথ ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। এবং মহিলাও সাক্ষ্যদানের শেষে ভেঙে পড়লেন কান্নায়—।

জুরীদের মন গলল। বিচারকও সদয়। আরণ স্মিথ ছাড়া পেলেন। অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হল তাকে। তিনি মুক্ত—

কোর্ট ছেড়ে আরণ স্মিথ বেরিয়ে এলেন। নামলেন পথে। কিন্তু তারপর কোথায় গেলেন তিনি? সেরাফিনার উজ্জ্বল দুটি চোখ কি তাকে আবার নিয়ে গেল রাইও মিডিয়াসে? না হাভানার সেই স্প্যানিশ অফিসার গৃহিণীর নিষিদ্ধ আকর্ষণ তাকে পুনরায় উন্মনা করেছিল? কিম্বা মিস সোফিয়া নাইটের মৃণাল দুই ভুজের বাঁধনে আত্মসমর্পণ করলেন তিনি?

কিন্তু ইতিহাস এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব। প্রেমিক আরণ স্মিথের পরবর্তী কোন বার্তাই সেখানে লিপিবদ্ধ হয় নি।



ব্রজমাধব ভট্টাচার্য

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ওরা বলে কালক্রমে কবরের শব কঙ্কাল হয়ে গেছে। কঙ্কালও শিথিল হয়েছে। কিন্তু এই যাওয়া-আসা বজায় রেখেছে কঙ্কাল।

"শেষ কবে একে পোঁতা হয়েছিলো?" —পাশে দাঁড়িয়ে ধীবরটা। আমাকে ও-ই সব তথ্য জানাচ্ছিলো।

"শেষ?—বোধকরি বছর কুড়ি হবে। এক জবর পাদ্রী এসে ওকে সমাধিস্থ করে বহু গভীরে পুঁতে দিয়ে পাথর দিয়ে ঢেকে দেন।"

"তারপর?"

"তারপর থেকে ওই তো দেখছেন।"

কিন্তু সমুদ্রবেলায় ঘুরলে মৃত করোটী, অস্থি, দেখা যায়। কারণ সমগ্র বেলাভূমিটাই একদা ছিলো কবরস্থান। এখন সমুদ্রের বাহু প্রবেশ করছে এই ভূ-ভাগে। কাজেই এই সব ব্যাপার ঘটছে!

ফিরতে হবে। ঘোড়ার পিঠে ধীরে ধীরে এগুচ্ছি। জেনারেল দ্য গলের নির্বাচনী তকরীর চলছে সেন্টস্ আইল্যান্ডের ঘাটে ঘাটে। হাত ছুঁড়ে আকাশপানে মুঠি তুলে, চুল বাঁকিয়ে, গলার শিরা ফুলিয়ে নিগ্রো বাক্যবিশারদ প্ল্যাটফর্মশিল্পী নির্ভেজাল পলিটিক্যাল বেয়াড়া মাল ছড়াচ্ছে। লোকেরা হাসাহাসি করছে। কিন্তু ছবি তোলা নিষেধ। তা হলেই ওদের সন্দেহ যদি অন্য পার্টি জেতে এদের গর্দান যাবে।

তাই ভাবি এই যে নাম-কে-ওয়াস্তে ডেমোক্রাসী এটা দেমাক্-রাশি-র পুঞ্জীভূত জঞ্জাল কিনা। যে মোরগাই এর মাথায় চড়ে কোঁকোর-কোঁ করবে সেই পাড়া মাৎ করবে কিনা। যারা ভোট চায় এবং যারা ভোট দেয় তাদের মধ্যে কারা ব্যক্তিগত মতামতকে সশ্রদ্ধ ভাবে গ্রহণ করে। আমার এক বিশিষ্ট বন্ধু এবং বিশিষ্টতর জ্ঞানী-গুণীজন বলে থাকেন, যে কোন ডেমোক্রাসীতেই একই পার্টি যদি বারবার অবিচ্ছিন্নভাবে সরকার চালিয়ে যায়, তার ফলে সেরা সে সেরা পার্টিরও হবে বেপরোয়া অবস্থা। প্রকৃত ডেমোক্রাসীর আসলী গোড়াই নিহিত আছে অপোজিশন অর্থাৎ বিপক্ষবাদীর গুহায়। জবরদস্ত বিপক্ষ দল যদি মাঝে মাঝে শাসনযন্ত্র চালাবার ভার পায় তবেই জানা যায় কেত্তা সরষে মেঁ কেত্তা তেল। যে গভর্ণমেন্ট জেনে বসে আছে ইলেকশন মানেই অবধারিত জয়, সে গবর্ণমেন্টের কাছ থেকে হুঁশিয়ারী আশা করা এবং গাঁজা চরসে বুঁদ মাল্লের কাছ থেকে আর্যসভ্যতার ইতিহাস আশা করা একই কথা।—বন্ধুবর এ-ও বলেন,—ইংলন্ডে ডেমোক্রাসীর এতো রবরবা তার কারণ দশ থেকে পনেরোর মধ্যে ওরা একবার করে দাবার ঘুঁটিগুলো বদলায়।

সেই চার্চটায় আবার গেছি। সেন্ট্স্ আইল্যান্ড ছাড়ার আগে একবার চার্চটা ঘুরতে গেছি। না গেলে একটা চমৎকার অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হতাম।

ফাদার অফেন্দো। শান্ত, নিরীহ, সরল, আত্মসমাহিত মানুষটি। স্প্যানিশ রক্তের বাহক। কালো চুল বলতে কিছুই নেই; সব শাদা; কিন্তু চোখ দুটি কালো; তেমনি উজ্জ্বল। এ দেশের লোকজন নিয়ে কথা হোলো।

"জানো, এরা বয়েসে বেড়েছে; কিন্তু অভিজ্ঞতায় শিশু। যা করে শিশুর সরলতা, শিশুর ধৃষ্টতা, শিশুর অপরাগতা নিয়ে করে। ধীবর সমাজের মর্মান্তিক একঘেয়েপনায় যুগের পর যুগ কাটিয়ে ওরা থেমে আছে এই সমুদ্র-বলয়বেষ্টিত ক্ষুদ্রতার মধ্যে। সকাল হবার আগে নৌকা নিয়ে মাছ ধরতে যায়। সন্ধ্যার আগে ফেরে। সেই তীরে বসেই গাদি গাদি মাছ-ভাত, রুটি মাংস খায়। কচ্ছপ আর হাঙরের মাংস ওদের ভোজ্য। তার অভাবও হয় না। তার পর চলে মদ। প্রত্যেকে খাঁটি এক বোতল খাবেই। না খেয়ে করবে কি! তারপর জীবসৃষ্টিকল্পে যে আদিম আনন্দ প্রকৃতি প্রত্যেকের দেহের মধ্যে পুঁতে দিয়েছে সেই আনন্দে শিশুরই মতো আত্মহারা হয়। জন্ম-মৃত্যু, শোক-দুঃখ, গরিবী-আমিরী এ সব নিয়ে এদের মাথাবার মত মাথাই নেই। ঐ তো বললাম বয়সে শিশু ছাড়া কিছুই নয় এরা।"

রোগা-পাতলা ভাঙা চেহারার বৃদ্ধ। জীর্ণ শরীর। এদেশে থেকে থেকে উদরী হয়েছে; ম্যালেরিয়া হয়েছে; অন্যটা একেবারে [illegible] হয়ে গেছে; [illegible] হয়েছে।

"তবু মরিনি। কেন মরিনি জিজ্ঞাসা করি মাঝে মাঝে। আর তাকাই ওই শ্রেষ্ঠ করুণাঘন মানবসন্তানটির দিকে। কে যেন সাড়া দিয়ে বলে, প্রয়োজন আছে বাঁচার। বাঁচা দরকার। প্রাণের দরকার। ...তাইতো এদের এতো ভালোবাসি। মদ খায়, জুয়া খেলে, এতো অশিক্ষা এ তল্লাটে কোথাও পাবে না। সভ্যজাতের আওতায় থেকেও এদের সয়ে গেছে, বলো তো হে প্রাচীনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ, অশ্লীলকে অশ্লীল বলে বোঝাই এদের কিসের আশ্বাসে?... যে কদিন পারে দেহবাদী সুখটাকে জড়িয়ে ধরে থাকে; তারপর নিরন্তর বিষপানে মন্থর করে রাখে জীবকোষগুলোকে; স্নায়ুতে বোধ ঘুমিয়ে অচৈতন্য হয়ে থাকে।"

মৃদু হাসে ফাদার আফন্দো।

কিছু বলা দরকার বলেই বলি,—"তবু তো আপনার করুণাময় অনুগ্রহে ওদের মধ্যে কিছুটা ধর্মবুদ্ধি আছে।"

যেন মুহূর্তে রেগে ওঠেন ফাদার। তাঁর কুঞ্চিত লোল-চর্মের রেখাসন্ধিগুলি ভেদ করে একটা প্রাণবন্ত আভা মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়লো ঘরখানার মূহ্যমান আলো-আঁধারির দো-মনা আভাসে।

"ধর্ম? গরীবের আবার ধর্ম কি? নিরক্ষরের ঈশ্বর তো ভ্রূকুটি কুটিল নৃশংস অত্যাচার। ধর্ম হবে সতেজ সমাজের, সতেজ জাতির, সতেজ শিক্ষার মধ্যমণি, চূড়ান্ত শিখা। ওরা চার্চে আসে না। পাদ্রী আফ্রন্দোর কাছে আসে। না নিজেদের, না ভগবানের সন্তোষ ওরা চায়। ওরা সন্তোষ দিতে চায় ওদের ফাদার আফন্দোকে। জেনে রাখো ধর্মের একটিই নাম একটিই রূপ। সে নাম প্রেম, ভালোবাসা। যতদিন ওদের ভালোবাসার দুঃসাহস আমার বুকে ফুল ফোটাবে, ততোদিন ওরাও আমাকে বারবার ভালোবাসতে ছুটে আসবে। ভালোবাসার ভাষা সরল ভাষা। এ এ্যস্প্রান্তো সব মানুষ তো বোঝেই, পশুও বোঝে।......"

হঠাৎ থেমে যান পাদ্রী। যেন উত্তেজনায় থরথর কাঁপেন। আমি পাশে রাখা ডিকান্টার থেকে একটু ব্রান্ডী ঢেলে সোডা মিশিয়ে দিলুম। কিছু না বলে পান করলেন। কিন্তু হাসলেন না। তৃপ্তির সামান্যতম রেখাও ফুটলো না সেই জ্বালা-জ্বলন-দীপ্ত অঙ্গারখণ্ডের মতো বহ্নিমান দুর্বাসা-দৃষ্টিতে।

"...যারা প্রথম এ দেশে এসেছিলো এ দেশীয় আদিবাসীরা তাদের দেবতা বলেই অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেছিলো; মানসপূজার সেই বেদী আবহমান পরম্পরায় এরা সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছিলো। তারা ছিলো ঐ রূপ-স্নিগ্ধ প্রেমের ঠাকুরের মন্ত্র-সন্তান। কিন্তু কি দিয়েছিলো তারা? গোটা-গোটা সভ্যতাকে অসভ্য বলে কড়চা দিয়ে নিজেরাই ইতিহাসের সেরা অসভ্যতা চিরকালের জন্য দেগে রেখে গেলো। এরা দেবতা, ধর্ম, পরকাল এ

দেবের বালাই নিয়ে মাথা ঘামাতে যাবে কেন? সবার বড়ো চার্চ এই দেহ; সবার বড়ো বাইবেল এই জীবন; সবার বড়ো ধর্ম প্রেম। নিজের জীবনের বেদই প্রকৃত বেদ। জীবন একরকমের, আর ধর্ম অন্যরকমের, সে বেদ এরা পড়বে কেন?"

আমি ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করি, "এদের ভবিষ্যৎ কি?"

"একদিন মহাকারুণিক ফ্রান্স এটাকেও দেজিরেদ করে দেবে। কিছুদিনের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে জলেপচা, ঘায়েধরা, ক্লীব এই সমাজ। তখন এই দ্বীপটাকেও এরা কুষ্ঠাশ্রম কিংবা উন্মাদাশ্রম করবে। নানান দেশের লোকেরা তখন দেখতে আসবে সুব্যবস্থার বহর, এবং কেতাব লিখবে।"

"কিন্তু এদের কী কোনো উপায়ই নেই তবে? পলিটিক্সে তো এরা খুব পোক্ত দেখলুম।"

হাসেন পাদ্রী। "ওরা চেঁচায়। পলিটিকস-ই একমাত্র ওদের খেলা; প্রৌঢ় খেলা। ঐ যে দ্য-গল ক্যারিবিয়ানে সফর সেরে গেলেন, এখানে তো নিঃশ্বাস নিতেও আসেন নি। কিন্তু তবু এরা দ্য-গল, দ্য-গল করে পাগল। ছেলেমানুষের মতো সরল। ছেলেমানুষের মতো সাহসী। গত মহাযুদ্ধের সময়ে পেত্যাঁ ভিশি-তে গিয়ে জর্মনদের হয়ে ফ্রান্স-শাসনে বেই মেতে গেলেন,—তখন দ্য-গাল ইংলণ্ডে পালিয়ে গিয়ে স্বাধীন ফরাসী বাহিনী সংগঠনে মন দিলেন। তখন গণ্ডা গণ্ডা এইসব রুগ্ন-অরুগ্ন জোয়ানেরা নৌকো করে পালিয়ে গিয়েছিলো ইংরেজ-শাসিত দোমিনিকা দ্বীপে। সেখানে গিয়ে স্বাধীন ফরাসী বাহিনীতে যোগদান করেছিলো।"

"তাই নাকি?"

"তাইতো বলছি অদ্ভুত সরল। অদ্ভুত সরল। এদের ছাড়তে চাই না যে কেন তা ভগবান ছাড়া কে বুঝবে।"

'মাথা নাড়তে নাড়তে উঠে পড়লেন ফাদার। চার্চে মোমবাতি জ্বলছে। ক্রুশের ওপরে যীশুর মূর্তি। পাশের দরজা দিয়ে পাদ্রী উঠে গেলেন। আমিও চলে যাবো। বাইরে এসে গেটের কাছে দাঁড়িয়েছি। উনি ঘুরে এসে আমার হাতে এক থোলো আঙুর দিয়ে বললেন,—"এ দেশে হতে চায় না। বহু আয়াসে ফলিয়েছি। খেও। আর দাও এক শিশি মধু।"

সেই চলে এলাম। মোটর-বোট চলেছে বড় বড় ঢেউয়ের ওপর দিয়ে দুলতে দুলতে। রুক্ষ বিবর্ণ গোটস্ আইল্যাণ্ড অদৃশ্য হয়ে গেলো। অদৃশ্য হয়ে গেলো সেণ্টস্। বোটে তখন সবাই গান আরম্ভ করেছে। গাইতে গাইতে হুল্লোড়। দমকে দমকে বিস্ফোরণ হাসি।

আত্মভোলা, উদাসীন, বেপরোয়া হুল্লোড়। অথচ—অন্তহীন সমুদ্র; দুস্তর ঢেউ; নির্ভর একটি মোটর; ব্যবসায় বঞ্জা নিছক বোম্বেটেপনা,—যে কোনও সময়ে পুলিশের নৌকো আসতে পারে। কিন্তু অকুতোভয়।

পাদ্রী বলেছিলেন, নিতান্ত ছেলে-মানুষ। প্রৌঢ় ছেলেমানুষ।

জীবন নিয়ে জুয়া খেলে খেলে এখন এরা রীতিমত নির্বিষ। যতক্ষণ বাঁচার মেয়াদ ততক্ষণই সই; জীবন-মোমবাতির দু-দিক জ্বালিয়ে দিয়েই আলোর মাত্রা বাড়িয়ে দিয়ে ওদের পরমানন্দ।

সন্ধ্যার আড়ালে বোট যেখানে লাগলো সেটা পয়েণ্ট পেত্রে থেকে অনেক দূরে। ওরা তাড়াতাড়ি ওদের মাল লেন-দেন সেরে নিলো। শুধু কয়েক মিনিটের জন্য ব্যব-সায়িক ত্বরা এবং গাম্ভীর্য। ব্যস তারপরে মোটর বোট আবার সমুদ্রের বুকে। এবং তীরের মনিষ্যিরা তাদের মোটরে লম্বা। আমিই কী করব ভাবছি।

ভাববারই বা সময় কই। অন্ধকার ঘন হয়ে নামছে। পঙ্গপালের মত মশা ছেঁকে ধরেছে। দৌড়ুতে থাকি। মোটর চলছে। একটু দাঁড়াতেই বাস দাঁড়াল। বাসেদের নাম আছে। আমি চড়েছি "ক্যাণ্ডারু"তে।

কেবিনে ম্যাকবার্ণি না থাকলেও আমার অসুবিধা হল না। আমি ম্যাকবার্ণির ভাঁড়ারে যা ছিল সামান্য খেয়ে সোজা শুয়ে পড়লাম।

আকাশ ভরা তারা। পয়েন্ট পেত্রের আলোকস্তম্ভের আলো ক্ষণে ক্ষণে কালো আকাশকে চিরে চমকে দিচ্ছে। দূরে দূরে বোটের পর বোট বয়ার সঙ্গে বাঁধা। ...... আলাদা নোঙর। প্রত্যেক বয়ার ওপর লাল আলো। বলায়িত সৈকতের ধারে অস্পষ্ট ফেনরেখা। বোটের গায়ে ঢেউ-এর শব্দ ক্রমশ ঘুম-গানের মত শোনাতে লাগল।

ঘুম ভেঙেছিল অনেক সকালে।

ম্যাকবার্ণির অপেক্ষা না করেই আমি বার হয়ে যাই। কারুকে সঙ্গে নিতে চাই। আমার সেই মনের মানুষটি কে হবে?

হাঁটতে হাঁটতে চলেছি। ভালোই লাগছে। এ তল্লাটটা ফাঁকা ফাঁকা। কলা বাগান আর নারকেল বন। মাঝখানে পায়ে হাঁটার পথ। চলেছি একমনে। দূরে একটা বসতি মতো। যদি ততদূর যেতে পারি। তখন কেউ না কেউ সাথী হবেই।

পেছনে শব্দ। ঘোড়া আসছে। একটি বুড়ো ঘোড়সওয়ার নিয়ে আসছে আর একটি খালি পিঠ ঘোড়া। আমার পাশে এসে দাঁড়াল। গাল ভর্তি এডোয়ার্ডিয় দাড়ি। মাথার চুলগুলো লম্বা হয়ে কপাল ঢেকে চোখেও পড়েছে। মাথায় ঢাকা মস্ত কাণাশ-ওলা ফেলটের টুপী। সেই টুপী নামিয়ে বলল 'নেক পাইপার; আপনি বাতাশারিয়া? ...এ ঘোড়া আপনার।"

আমি ঘোড়ায় চড়তে চড়তে প্রশ্ন করি, 'ম্যাক আমাকে দেখল কোথা থেকে?'

'ম্যাক? না। ম্যাক তো আপনাকে দেখে নি। আমিই ঘোড়া নিয়ে জাহাজঘাটায় যাচ্ছিলুম। দেখলুম আপনি পথে হেঁটে চলেছেন। কাজেই ভাবলুম—সোজা আপনার কাছে আসি।'

'যদি বাতাশারিয়া না হতাম।'

'ফিরে যেতাম। তার চেয়েও বড় কথা যে, আপনি বাতাশারিয়াই হয়ে গেলেন।'

'তোমার কথা ম্যাক আমাকে বলেছিল বটে। কোথায় নিয়ে যাবে আমাকে?'

'এদিকে চলেছিলেন কোথায়?'

'কোথায়? কী জানি। এমনি হাঁটছিলুম।'

নেক কাঁধ ঝাঁকালে।

আমি বলি, 'কিন্তু কোথাও খেতে হবে নেক। কাল দুপুরের পর থেকে পেটে প্রায় কিছু পড়ে নি।'

নেক মুখে চু-চু করে একটা শব্দ করল। বোধ করি সমবেদনা জানাল। আমি বুঝে নিলুম অতঃপর আমাকে ও না খাইয়ে ছাড়বে না।

সঙ্গে সঙ্গে বললুম, 'মোটামুটি দেখার শখ মিটেছে। আজ যেমন ঘন নীল আকাশ, মনে হচ্ছে মেঘ-বৃষ্টি হবে না।...চলো মাউণ্ট সুফ্রিয়েরে ঘুরে আসা যাক। ঘোড়া আছে যখন......'

নেক ঘড়ি দেখল। সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে একটি রেডিও বার করল। বলল, 'আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে আবহাওয়ার খবর মিলবে।'

'তা মিলবে। কিন্তু তোমাদের এ তল্লাটে রেডিও খোলা মাত্রেই তো গাদি গাদি বিজ্ঞাপন শোনো।'



...চোখ হেসে বলে,—'ভ্রূ না থাকলে রোঁয়াওই থাকত না!...দাড়িই দেখা যাচ্ছে: গাল তো নয়। কিন্তু বিশ্বাস কর, গাল না থাকলে দাড়ি থাকত না।'...বলেই হাসতে আরম্ভ করল।

সমুদ্রের ধারে মস্ত একটা গাছের তলায় ছোট্ট কাঠের একটা 'ইন'। ওরা সাজিয়ে-গুছিয়ে খাবার দিল প্রচুর। মাছ ভাজা; চিকেন-রাইস; আর পাকা আম, এভোকাদো, ডাবের শাঁস, পেঁপে। অতঃপর এক গ্লাস গরম থকথকে কোকো। পেট ভরেছে মোক্ষম। কফি অবশ্য পেলুম। কিন্তু তাকেও যেন আর স্থান যোগাতে পারছিলুম না।

বিশাল অরণ্যের প্রান্তস্থল। একদিকে সমুদ্র। নেমে গেছি সমুদ্রের ধারে। গরম জলের ফোয়ারা উঠছে সমুদ্রের বুক থেকে। চার পাশেই বুদ্বুদ—বুড়বুড়ি উঠছে পাকালো। দ্বীপে দ্বীপে আগ্নেয়গিরি। নেক একটা কাঠি নিয়ে জলের মধ্যে ঢুবিয়ে দিতেই এক সঙ্গে অনেকগুলো বুড়বুড়ি উঠল। বাজি পোড়ানো গন্ধের মত গন্ধে বাতাস ঘুলিয়ে উঠল।

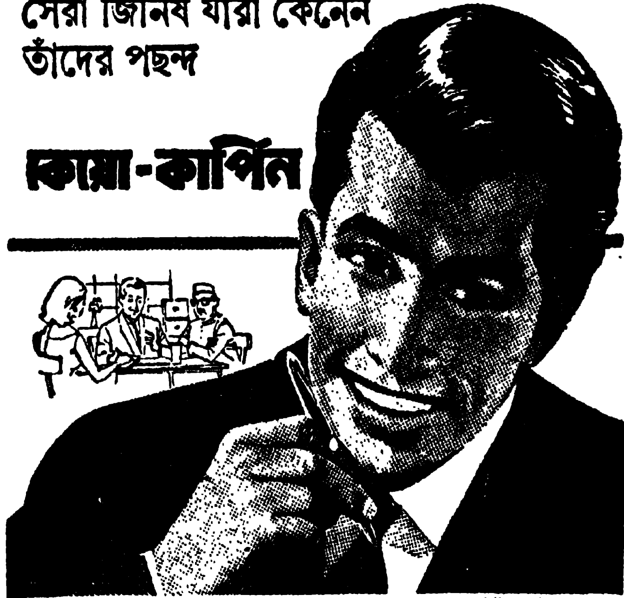
বনের পথে যেতে ওপরের দিকে এগুই—ঘন ঘিঞ্জি প্রাইমারি অরণ্য। আশে-পাশে লোহা জমার মত গোল গোল পাথর। মাঝে মাঝে তার আয়তন বেশ বড়। সুফ্রেইয়ে-র অগ্ন্যুৎপাতের ফলে কোন প্রাচীন কালে এই সব ফুটন্ত শিলাখণ্ড এত দূরে এসে পড়েছে।

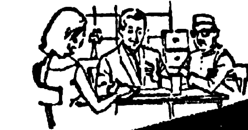
চিরকালই অরণ্য ভালবেসেছি। এ যেন সে অরণ্য নয়। এ যেন নেহাৎ ঘিঞ্জিপনা। যেন হিমালয় কিম্বা বৃটিশ গায়নার প্রাসাদের মত মহিমময় অরণ্যের পাশে বস্তি। কেবল গায়ে গায়ে জড়াজড়িই সার। যেন আমাকে ঘামে, জলে, আঁকশি দিয়ে ধরে। একটা নোংরা, স্যাঁৎসেতে, ক্লেদময় পরিস্থিতি। ঘোড়াটা শান্তভাবে পা ফেলে ফেলে চলেছে। মাঝে মাঝে লম্বা রবার-একাশিয়া-মেহগনি গাছের ভিড়ের মধ্যে থেকে বর্শার ফলার মত এক ফালি সূর্যালোক। নইলে বেশীর ভাগই আলো-ছায়ায় দোলে ছায়ার প্রাধান্য। আম-পেঁপে-আনারসের পাড় শেষ হয়ে গেছে বহুক্ষণ। বিরাট বিরাট বন-কচু। বালিজিয়ে-র ফুলের শক্ত ডাঁটালো গাছের বন, বাঁশের বন। কলাপাতার মত বড় বড় পাতার পাখনা ছড়ান রাশি রাশি পাদপপাদপ। আর দীর্ঘকায় পাম গাছ: কত রকমেরই পাম কে ইয়ত্তা করে। কিন্তু দেখলাম অতি চমৎকার ফার্ণ। দীর্ঘদেহ ফার্ণ। চক্রাকারে ছাতার মত প্রায় এক মাপে সাজান পাতার থর পর পর উঠতে উঠতে এক সময়ে থেমে গেছে মধ্যের একটি শ্যামল সবুজ পাতার অংকুরে। দেখলে মনে হয় নিখুঁত শিল্পীর গড়া একটি গম্বুজ।

এই সব জায়গায় যখন-যখন এসেছি —কাশ্মীরের গহনে-কান্তারে, কিন্নর দেশের গভীরে, গায়নার ভুবনবিদিত মহারণ্যে,— যখন দেখেছি বহু লতা, বহু পাদপ, বন্য শ্যামল বেপরোয়া বৃদ্ধি এবং প্রসার,— কেবলই একটা দুঃখ বারংবার মনকে মুষড়ে দিয়েছে। আমি এদের নাম জানি না; ভাষা জানি না। মনে আছে নেপলস থেকে ভিসুভিয়সের পথে একটা গ্রামে খানিকক্ষণ থামতে হয়েছিল। মজুররা কাজ করছিল। কিন্তু কথা বলতে পারি নি। তেমনি কত-বার হয়েছে ফ্রান্সে;—মন বলেছে সামাজিক মানুষের এসপ্রান্তো জানা দরকার।...তা নয় হল। কিন্তু এই পৃথিবীর আঁচলে ঢাকা কোটি কোটি প্রাণের পরিচয় পাবার আগ্রহ আমাকে ব্যাকুল করে তোলে। এদের নাম জানিনে, গোত্র জানিনে। কতই এদের রূপ, ভঙ্গী, বৈশিষ্ট্য, গড়ন! একদিন বৃটিশ-গায়নার এসিকুইবোর গভীরে পথের পাশে এমনি একটি বিরাট মহীরুহের পাশে দাঁড়িয়ে আমার আধ ঘণ্টা সময় কেটে যাবার পর আমার ছোট্ট ছেলেটি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল,—'বাবা কী দেখছো?' সেই বালককে বোঝাতে পারি নি ঐ গাছের বাকল ছিঁড়ে বেরুনো দণ্ডের গায়ে গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল আমার মনকে কোন গভীরে নিয়ে গিয়েছিল। জাপানে যেমন [illegible] ভাবে পুষ্পিত চালতা গাছ [illegible] বাঁচিতে। বহুক্ষণ আমি নড়তে পারি নি [illegible] ফুলের সুষমাকে উপেক্ষা করে।

নাম জানি না এদের। পরিচয় দিতে পারব না। অন্ধের হাতী দেখার মত পরিচয় দিয়েও লাভ নেই। থরে থরে দোলায়-দোলায়, তরঙ্গে-তরঙ্গে নেমে গেছে শ্যামলতার নির্ঝর। জটাবন্ধনের মত মুদু শব্দকে লিয়ানা-লতা লহরের পর লহর নামিয়ে দিয়েছে। গাছের বাকলে বাকলে নানা জাতীয় পরজীবী গাছ-গাছড়া। ব্রাহ্মীর চেয়েও ছোট পাতা থেকে মানকচুর মত বড় পাতার পরজীবী; দূর্বার চেয়েও লিকলিকে পাতা থেকে ঘোড়ের মত পীনস পাতা দেখেছি। দেখেছি ফুলের স্তবক, ফুলের বিভ্রম, ফুলের শান্ত সমাহিত স্ফূর্তি। অর্কিডের চেয়ে বিস্ময়কর মোম-গা ফুল বোধকরি আর নেই।

নীরব একটা সদাশ্ধকৃত অনালোকিত তপস্যা যেন কুম্ভক করে বসে আছে এই শ্যামলী গুহায়। এখানে অনর্গল ঘাম, বদ্ধ

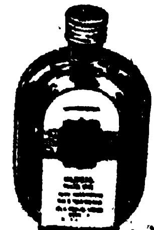




কেয়োকার্পিন তেলে চুলে আঠা হয়না—মাথা ঠাণ্ডা রাখে আর চুলও পরিপাটি থাকে। কেয়োকার্পিন নিষ্প্রভ চুলেও স্বাস্থ্য ও উজ্জ্বলতা এনে দেয়,—আর এর গন্ধটাও সত্যি মনোরম। কেয়োকার্পিন আপনার চাই-ই; আজই কিনে ফেলুন।

কেয়ো-কার্পিন

একটি বিশিষ্ট কেশ তৈল



দে'জ মেডিক্যাল ষ্টোর্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা · বোম্বাই দিল্লী · মাদ্রাজ · পাটনা গৌহাটী
কটক · জয়পুর · নাগপুর · সেকেন্দ্রাবাদ · ব্যাঙ্গালোর · ইন্দোর

...জলী। ক্রেকরিফুট খাড়া ... হয়ে সর্বাঙ্গে ... ওপরের দিকে উঠছে। ঘোড়া চড়ার পথও বন্ধ। দুটো ঘোড়াই একজায়গায় বেঁধে উঠতে লাগলাম।

চড়াই চড়তে দুহুহে কষ্ট হয়। এই চড়াই চড়তে গিয়ে একবার খাদরালায়, একবার কাঞ্চচূর প্রপাতে জীবন বিপন্ন হয়েছিল। তবু এই শিখরিণী মায়া আমার রক্তে যেন যৌবনের দুঃসাহস জ্বালিয়ে তোলে। আমি চড়ি।

এমন গভীর জঙ্গলে পাখি থাকে না। বদ্ধ বাষ্পের প্রেতকুণ্ডলীর মধ্যে পাখি বাসা বাঁধতে চায় না। কোথাও পাখির ডাক নেই। কেবল ঝিঁ ঝিঁ শব্দ; মাঝে মাঝে ভাঙা ডাল পড়ার শব্দ; ঝরা পাতার শব্দ; —আর সেই ভীষণ বিকৃত-ভৌতিক শব্দ,—নিজের পদধ্বনির। মাঝে মাঝে পায়ের স্খলনে পাথর, নুড়ি গড়িয়ে পড়ে সেই নিদারুণ নিরুৎসাহিক নির্বান্ধব শব্দ।

আরও ওপরে হঠাৎ এক জায়গায় খানিক সমতল; তারপর থেকেই পাথর-কুচিতে ঢাকা মানুষের গড়া পথ। আঠারোশো-ষাটের যুদ্ধে ফরাসীরা এখানে গোপন খবরদারী ঘাঁটি করেছিল। তারই চিহ্ন। তার পরে গিরিশৃঙ্গ। হঠাৎ খাড়াইয়ের পর সত্যিকারের গিরি-গহ্বর।

আকাশ দেখা গেল। কী যে সুন্দর লাগল ঘন নীল ঐ আকাশখানা। রোজ দেখি তাই তার আদর নেই অন্তরে, তার চমৎকারকে গ্রহণ করে না রোমান্টিক চঞ্চল মন। হঠাৎ যদি ফুরিয়ে যেত আকাশ, হঠাৎ যদি থেমে থাকত আকাশের অসীম করুণা, —তবেই আমরা বুঝতে পারতুম মনের কতখানি জুড়ে আছে প্রায়-না-দেখা এই আকাশ। কত রূপ, কত রস, কত গন্ধ, কত স্পর্শ কেবল এই আকাশের ঘিরে-রাখা মমতায়।

যেন পরিচিত পৃথিবীর সীমিক হৃদয়ে। শাদা শাদা মেঘের শামলী যেন নোঙর করে বসে আছে। 'চলা যেন বাঁধা আছে অচল শিকলে।'

ফুল হারিয়েছে তার কোমলতা। কত বর্ণের কত রূপের ফুল। কিন্তু পাপড়ি বলতে যা, তা এমন শক্ত, তীক্ষ্ণ এবং দৃঢ় যে তাকে বলতে হয় ফুল-সাম্রাজ্যের আমাজোন। দ্রৌপদীর বেশে ভীম।

গহ্বরটা বেশ বড়। চার ধারে শক্ত বাসাল্ট। শিলীভূত লাভার স্তরের পর স্তর শক্ত বলয়ে বেঁধে রেখেছে ক্রমশ নিমজ্জমান লাভাগুল্মের স্পর্ধিত দুঃসাহস। এই গুপ্তবহ্নি অগ্নিগর্ভ গিরি গত শতাধিক বৎসর পূর্বে জ্বালিয়ে দিয়েছিল বেসেতেরের শহর। আবার এ জাগবে তাও সত্য। কিন্তু মানুষ, জীবন, ঠিক নিসর্গের এই সব বোবা গাছপালার মতই আঁকড়ে ধরে রাখে যেখানে যতটুকু রস পায়।

বেশী এগুনো বিপজ্জনক। সপ্তবর্ণী শাম্বলে ঢাকা পাহাড়ের গা। নানান শাত্ব রসময়তার, নানান রাসায়নিক ভোজের কৃপায় পরিপুষ্ট হয়ে এখানে কী উদ্ভিজ, কী ফুল,—সবই বর্ণ-বৈচিত্র্যে মনোহর, দীপ্ত, কান্ড। কিন্তু পিচ্ছিল পথ। ঐ পাথরকুচি ঢাকা পথ ছাড়া পা বাড়ান গহীন শঙ্কায় বিপন্ন। পুরো পুরো খাদ লিয়ানা-লতা আর শ্যাওলায় ঢেকে জাল সৃষ্টি করে রেখেছে।

দূর থেকে দেখা যাচ্ছে একটি-দুটি দ্বীপ। মারি গ্যালান্তি, দেজিরেদ, সেন্টস,—সবগুলোই দেখা যায়। স্থূল-লোকে জড়-পথে দেশের চূড়ায় চড়ে দূর দেশ দেখতে পাচ্ছি; যদি সূক্ষ্মলোকে চৈতন্যপথে কালের চূড়ায় চড়তে পারতাম,—যদ্ ভূতং ভুবনং ভবিষ্যং — সবই দেখতে পেতাম;—হতাম ত্রিকালদর্শী, সিদ্ধ।

নিক পাইপার বুদ্ধিমান লোক। পিঠে বাঁধা ঝুড়ি থেকে ও বার করল থার্মোফ্লাস্ক এবং ওর জন্য গ্লাস। আমায় দিলে কফি, আর পেস্টেড চিকেনের একটা বড় চাঁই। শসা-লেটুশের সঙ্গে বহু-বদান্যতার পরিচর্যালিপ্ত টমাটো সস। ও নিজে স্থূলে বস্তুগুলোর সঙ্গে ঢেলে নিল মদ, বিশুদ্ধ ওয়াইন,—অরিস্ট বলি যাকে।

ওকে দিয়ে কথা বলাই। ওর কথা। ওর জীবনের কথা। পিয়েরে দেস্নাম্বুক ১৬৩৫ খৃস্টাব্দে এই সব পশ্চিম ভারতীয় ফরাসী দ্বীপগুলো অধিকার করেন। ফরাসী সাম্রাজ্য বিস্তৃতির এই পর্যায়ে বিখ্যাত কার্ডিন্যাল রিশেল্যুর প্রভূত দান। আফ্রেকী সাম্রাজ্য দখল করার মতি তাঁর ছিল প্রবল। লেনার্দ দ্য-লিভ এবং রিশল্যু-দ্যু-প্লেসী এই দুজন নৌ-সামন্ত গোড়াপত্তন করেন ফরাসী ওয়েস্ট ইন্ডিজের। এর আগে পর্তুগীজ ও স্পানীয়েরা এসব দ্বীপ অধিকার করার চেষ্টা না করেছেন তা নয়। কিন্তু কারীবদের সঙ্গে সহজে পেরে ওঠেন নি। তাছাড়া মেক্সিকো, পেরু,

গুয়াতেমালা, হণ্ডুরাস, এল-ডোরাডো পাবার পর ঐ সব ছেলেখেলা হয়ে গেল। তবে যাবার আগে একটি পরমকারুণিক খৃষ্টকর্ম এঁরা করে গেলেন। দ্বীপগুলোকে নিঃ-কারীব করে গেলেন। সেই ভাজা মাছটি উদরস্থ করতে ফ্রান্সের বেগ পেতে হয় নি।

নিক-পাইপাররা সেই চতুর্দশ-লুইয়ের সময়েই এ তল্লাটে আসে। আরও দরজন দরজন মহাবীরের মত এরাও বাদশাহী ফরমানে জমিদারী হাঁকড়ে বসে। তারপর সপ্তদশ শতাব্দীর দাস-বাণিজ্য। কিন্তু ১৮৪৮ খৃস্টাব্দ তক এই রাহাজানির দল রক্তে অর্শেছে। শাদারা ফিকে হয়ে এসেছে। বাণিজ্য দাস-ব্যবসায় বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে লাটে উঠেছে। পঞ্চ মকারের বিকৃতিতে তান্ত্রিক পতন এক চিতে রৌরবে এনে ফেলেছে। খানদানী ফরমানী জমিদার মহোদয়গণ তখন এক অঙ্গে খোলা এবং অন্য অঙ্গে মালা ধারণ করে স্রেফ নয়া ফকির বনে গেছে।

নিক-পাইপারের পূর্বপুরুষরা তবু খানদানী রাখার চেষ্টায় কানাডা থেকে গায়না অবধি ঘুরেছে।—অনেকেই ঘুরেছে। কিন্তু কোয়েবেকে ফরাসী কুরুক্ষেত্র-হার হারল; কানাডা গেল; সেন্ট-ডমিনিক অর্থাৎ হেইতিতে দাস বিদ্রোহ হল, হেইতি গেল। অ্যাংলো-ফ্রেঞ্চ যুদ্ধের পর যুদ্ধে এই সব ছড়ানো তাসের মত দ্বীপগুলো দানের পর দান হাত ফের হতে থাকল। নিক-পাইপাররা বিত্তহীন হতে থাকল।

সেই সব নর্মান, ব্রেটন, গ্যাসকান,—ফরাসীরা কালে কালে ক্ষয় থেকে ক্ষয়ে, অপচয় থেকে অপচয়ে লাট খেতে খেতে সেন্টস দ্বীপের নরক থেকে নিয়ে ফরাসী গায়নার বহু-আঁশলা দরিদ্র-শ্বেতাঙ্গ সমাজ সৃজন করেছে। এদের সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক জীবনের থরে থরে যত প্রশ্ন, যত জিজ্ঞাসা সুড়সুড়ি দেয়, সে সব বার করে থিসিস লিখলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ডক্টরেটের ছড়াছড়ি লেগে যাবে। পোর্টোরিকা, জ্যামাইকা এবং আমেরিকার বহু ছাত্ররা অধুনা এই কর্মে লিপ্ত আছে। সরকারী সাহায্য পায়। কাজও কিছুটা হয়ই; তবে ঐ পর্যন্ত। খাটতে চায় না কেউ।

কিন্তু নানান ফরাসী, আইরিশ নাম ছাড়াও এই সব দরিদ্র শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে আরও একটা শাদাটে পিপাসা খুব জাগ্রত। ওদের মানসপটে আজও ফ্রান্স, প্যারী, উলস্টার, নর্মান্ডী — এসব নাম জ্বলজ্বলে তারার মত হাতছানি দেয়। সে সব দেশের প্রশস্তি শুনতে না পেলেও শোনাতে ভালবাসে।

...এবং আরও একটা প্রত্যক্ষ জিনিস লক্ষ্য করেছি। এরা প্রত্যেকে মনে করে সেকালীন সেই সব দাসেরা আজ যে প্রতিপত্তি করে জাঁকিয়ে বসেছে এটা বাইবেলের নিদারুণ অপমান। যে-হ্যামের ওপর নোআের বিশ্রী অভিশাপ আছে, সেই কালা, হাবশী হ্যামের বংশধরেরা কিনা মোজে

ডাঃ পি ব্যানার্জী (মিহিজাম)
লিখিত গৃহচিকিৎসার বই

আধুনিক চিকিৎসা

মূল্য ছ'টাকা, ডাক খরচা আলাদা

ডাঃ পি. ব্যানার্জি
৫৩, গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা—৬
এবং
১১৪এ, আশুতোষ মুখার্জি রোড,
কলিকাতা—২৫

:—বর্তমানে মিহিজামে আমাদের শাখা নাই। লেডিজন, নার্ভাস, ইনসমনিয়া, এখন কলিকাতা হইতে যায়।

আয়ে শাদাদের কাঁচকলা দেখিয়ে, এ তত্ত্ব মোহাং না-মঞ্জুরলিন।

শাদা-কালোর স্বপ্নের এদেশে কালোরা শাদাদের ওপর দু-হাত নিচ্ছে এটা যেন আকাশ ভাঙার মত একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার। নিক তো প্রতিবাদই জানাল। 'এমনি করলে ধর্মাধর্ম কি রইল?'

ঠিক এর উল্টোটি পেয়েছি মিস্টার কোয়্যুর বচনে। কোয়্যু সাঁ-পিয়েরের ধনাঢ্য ব্যবসায়ী। থাকেন শহর থেকে দূরে, নিজের প্রশস্ত বাগান বাড়ীতে। কলার ব্যবসার আরম্ভ করেছেন সম্প্রতি। তাঁর সঙ্গে দেখাও নিক পাইপার-এর সৌজন্যে। কথাটা বলি।

পেভিং-যুগ, লামেন্তীন, পয়েন্তা-পিত্রে—প্রায় ঘোড়ার খুরের মতো বেড় দেওয়া পথ। পথ?—হ্যাঁ, পথই বলবো। মোটরও চলে, গাধা-টানা গাড়ীও চলে। ভারতবর্ষে দিল্লী-গড়মুক্তেশ্বরের পথও পথ, গড়মুক্তেশ্বর-মোরাদাবাদ পথও পথ। তবে এ পথ দিয়ে অনবরতই চলেছে অবিশ্রান্ত কালোমেয়েদের দল, মাথায় ঝাঁকা। যেন সাঁওতালী গাঁয়ের হাটবারের অবিচ্ছিন্ন মিছিল। বাঁকটার চরম মাথায় বাসে-তেরে থেকে বাসে-গ্রাঁদে আসতে গেলে মস্ত একটা ড্র-ব্রীজ পার হতে হয়।

এখানকার বসবাস, ব্যবহার লক্ষ্য করলে দারিদ্র্য অবশ্য চোখে পড়ে; কিন্তু দৈন্য বড়ো দেখিনি। মানুষগুলোর মধ্যে কেমন একটা খনেদী মর্যাদাবোধ আছেই। যা হোক তবু যা আছে,—যতটুকুই থাকুক,—গুছিয়ে গাছিয়ে একটা অনুশাসনের মধ্যে জীবনযাত্রাকে সীমায়িত করেছে। এটা হয়তো বিশিষ্ট ফরাসী ছন্দ। বাড়ী-ঘর-দোরের স্থাপত্য নেইও, থাকতেও পারে না। ভূকম্প-বহুল দ্বীপে ভালো স্থাপত্য সরকারী তৎপরতা, বৈজ্ঞানিক সহায়তা এবং জাতীয়তার গর্ববোধ না থাকলে হওয়াও সম্ভব নয়। কথাটা বলছি এই ভেবে যে জাপানও তো ভূকম্প-বহুল দেশ! ঐ কাঠের ইমারতই বেশী। ছড়ানো, থ্যাবড়া নড়বড়ে বাড়ীই বেশী। বাগানবাড়ী বাংলো যেমন। খাটো খাটো খুঁটির ওপর আলগোছে নামিয়ে বসিয়ে রাখা বাড়ীর চারধারে এক দৌড় বারান্দা। কাঠের রেলিং, টিনের ছাদ, তেল-রং দিয়ে পরিচ্ছন্ন। সামনে কয়েক ধাপ সিঁড়ি বয়ে গেলে বসার ঘর। তার পাশে পাশে দরজা। অন্য অন্য ঘর। পিছনে রান্না-খাওয়া-ভাঁড়ার। পিছনেই একটু অঙ্গন। মোটামুটি এই স্থাপত্য।

প্রত্যেক বাড়ী সংলগ্ন বাগান জমিজমা, আখ ক্ষেত, কলা-বাগান, কফি ক্ষেত। যার যেমন। যে বাগান সাজাতে আমাদের দেশে হিমসিম খেয়ে যেতে হয়, সেই বাগানই এখানে বিনা আয়াসে দেখতে দেখতে রংয়ে, রূপে, ছটায়, বিভ্রমে ভরে নেচে, গেয়ে ওঠে যেন। প্রজাপতি ডালে বসেছে না ফুল পাখা মেলেছে ধরা দায়। ধরা দায় রোদের উজ্জ্বলতা বর্ণে ফেটেছে, না বর্ণের উজ্জ্বলতা রোদে। —ঝাড়ের পর ঝাড় শুধু গোলাপ; বড়ো বড়ো গোলাপ গাছ; টগর, চাঁপা, মল্লিকা, নানা বর্ণের আকারের প্রকারের জবা, ক্যাসিয়া, পামসুটে, প্লাভিও-লাই, ক্যাকটাই, বহু-বহু-বহু অর্কিড, কৃষ্ণচূড়া, করবী, ডালিয়া এবং বিলিতি মরশুমীর দল। এর সঙ্গে আছে বর্ণাঢ্য, দীপ্ত, পীন-প্রভা, চারু-জঙ্ঘী নানাবিধ ক্রোটন, পাতাবাহার। থরে থরে, ঘরে ঘরে বাগানের শোভা-বিহীন পুষ্পরাজ্যের বিদ্রোহী বিকাশ, আলো-অন্ধকার, আকাশ-মাটির সংগ্রামে আকাশের বুকে তুলে ধরা মাটির জয়ধ্বজা।

সাঁ-মারী শহরের কাছাকাছি আসতে না আসতেই ভারতীয় মুখ দেখতে পেলাম। ক্রমশঃ ছোটো ছোটো খড়ে ছাওয়া ঘর, মাটির দেয়াল চমৎকার নিকুনো। মাঝে মাঝে বড়ো বড়ো দোতালা। মাতুবা গাঁয়ের চারপাশে থৈ-থৈ আখক্ষেত। এই সব আখক্ষেতের স্থায়ী শ্রম জোগানদার ভারতীয় পরিবারেরা। মোট প্রায় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার ভারতীয় আছে সায়া গুয়েদালুপ এবং মার্তিনিকে। প্রত্যেকের বাড়ীতেই প্রায় ঝাণ্ডী (হিন্দু-ধর্মের প্রতীক হিসেবে); প্রায় প্রত্যেকেই যেমন চার্চে যায়, তেমনি বাড়ীতে সুরয-পুরাণ, হনুমান-চালিসা পড়ে। মাঝে মাঝে 'কথা' পড়ে। রামায়ণ গান করে। মুসলমানও আছে। হিন্দু-মুসলমানে আকচার বিয়ে হচ্ছে। খৃস্টান-হিন্দু-মুসলমান সমানে বিয়ে হয়ে চলেছে। তবে বাছারা জন্মের পর মায়ের কোলে চড়ে, সুসজ্জিত বাপের সঙ্গে চার্চে যাবে; নামকরণ হবে; ব্যাপটাইজড হবে, রেজিস্টারে নাম লিখিয়ে বার্থ সার্টিফিকেট হাসিল করবে। বেশীর ভাগ বাচ্চাই 'ইললেজিটিমেট' আখ্যায় কড়চা-বন্দী থাকবে। বাপ-মায়ের বিয়ে যদি খৃস্টীয় অনুমত্যানুসারে না হয়ে থাকে—ব্যস।

ভালোর দিক এই যে সব ধর্মের লোকই চার্চে গিয়ে ব্যাপটাইজড ক্রাইসনড এবং রেজিস্টার্ড করাচ্ছে সন্তানকে। অতঃপর যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে:— অর্থাৎ যার জোয়সা মর্জি হনুমান ঝাণ্ডী চড়াচ্ছে, কুরান-কিতাব পড়ে জবেহ করছে ষণ্ড কিংবা ছাগ; অথবা জয় কালী মাঈ বলে মুরগী-হাঁস নিবেদন করছে। ঐ নিবেদনও সারা, ধর্মও সারা। অতঃপর মদ্যো-মাংসে নৃত্যো-বাদনে,—সব আবার এক হয়ে উৎসব করছে। সন্তান-দের যার যেমন ইচ্ছে ধর্ম অনুসরণ করছে। আমার বহুবার মনে হয়েছে এই সমাজের ঢিলে-ঢালাপনাটাই ভারতীয় জাতিভেদ প্রথা, ধর্ম-ষণ্ডতা এবং সামাজিক ভগ্নাংশতার প্রকৃত জবাব কিনা। ঢিলেমী এ সমাজকে শিথিল করেছে। কিন্তু সামাজিক ঢিলেমীর কারণ অর্থনৈতিক দৈন্য। যদি এই ঢিলেমীকে গোঁড়ামী দিয়ে নয়, শৃঙ্খলা দিয়ে নিয়মিত করে তোলা যায়,—তখন সেই উদার, মুক্ত সমাজটাই দেশের আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক মুক্তির পক্ষে হিতকর হবে কিনা।

অবশ্য ঔপনিবেশিক হীনমন্যতা এদের মজ্জায় মজ্জায় এদেরকে কাবু এবং অমানুষ করেছে। আমাদের দেশেও উনবিংশ শতাব্দীর ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজ এই মনুষ্যত্ব-হীন করে যাওয়া আত্মাকে ক্লিষ্ট করে তুলেছিলো। স্বাধীনতার পরের ভারতীয় সমাজেও এই হীনমন্যতা এবং ধর্মজড়তা দেখা দিয়েছে। সেটা প্রকাশ পাচ্ছে অনুকরণ-প্রিয়তায়। এদের মধ্যেও, যেমন আমাদের মধ্যে, একটু টাকার মুখ যারা দেখছে বা দেখেছে, তারাই সাহেব-সাহেব খেলায় প্রমত্ত। তারাই বেশী স্যুট-চার্চ-শ্যাম্পেনবাহিত রথে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের টিকিট খোঁজেন।

কিন্তু যারা মাটির দেয়ালের গায়ে কাদার পোঁছা লেপছে, সারাদিন আখ কাটছে, ক্ষেত নিড়ুচ্ছে, হাটবারে বোঝা বয়ে বাজারে যাচ্ছে, দালালকে সওগত বেচছে,—তারা এখনও শানকীতে ভাত খাচ্ছে; ক্যানাডিয়ান মটর ডালে ভিজিয়ে আমেরিকান ময়দার রুটি খাচ্ছে। পুরোনো হুইস্কির বড়ো বোতলে কিম্বা পেরী-কোম্পানীর চৌকো টফীর বোতলে নিমজ্জিত আম, আমড়া, করঞ্জা, কামরাঙার আচার নারকোল তেলে পিঁয়াজ-রসুনের খোশবায় দিয়ে, মেক্সিকান লঙ্কা দিয়ে জাঁকিয়ে রাখছে, দিচ্ছে খাচ্ছে।

ফরাসী ক্যারিবিয়ানের ভারতীয় সমাজ ধর্ম এবং সমাজকে একেবারে আলাদা করে বরণ করেছে। ফলে ওরা সব ধর্ম মেনেও এক সমাজ। সে সমাজের নাম,—আজও—দারিদ্রের সমাজ।

সপ্তমবার মুদ্রিত হইল

সারদা-রামকৃষ্ণ

সন্ন্যাসিনী শ্রীদুর্গামাতা রচিত

যুগান্তর.—সর্বাঙ্গসুন্দর জীবনচরিত।.. গ্রন্থখানি সর্বপ্রকারে উৎকৃষ্ট হইয়াছে।

আনন্দবাজার পত্রিকা.—ভাবময়ী লেখিকার সরস ও সরল বর্ণনাভঙ্গী গ্রন্থখানি বিশেষভাবে পাঠকের চিত্তে এক অপার্থিব ভাবলোক সৃষ্টি করে।.. অনেক কথা আছে যাহা ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয় নাই।

[illegible].—গ্রন্থটি পাঠক-মনে গভীর রেখাপাত করবে। যুগাবতার রামকৃষ্ণ-সারদা দেবীর জীবন আলেখ্যের একখানি প্রামাণিক দলিল হিসাবে বইটির বিশেষ একটি মূল্য আছে।

দৈনিক বসুমতী.—এইরকম যত্নভাবে রচিত জীবনকথা এই প্রথম প্রকাশিত হল। লেখিকা লিখিয়াছেন যে,.. তাঁরা অভিন্ন ও একাত্মা। দেশ.—তিনি জাতির মহোপকার সাধন করিয়াছেন।.. তিনি আমাদের জীবনকে অমৃতে অভিষিক্ত করিয়াছেন ॥

ডিমাই সাইজে ৪৫২ পৃষ্ঠা বত্রিশখানি ছবি একখানি ম্যাপ: বোর্ডবাঁধানো সুদৃশ্য মলাট

॥ মূল্য আট টাকা ॥

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম

২৬, মহারাণী হেমন্তকুমারী স্ট্রীট কলিকাতা

অঙ্গনা

প্রমীলা



দুস্তর বাধা পেরিয়ে

সর্বত্র নারীর সমর্তাবিধান নিঃসন্দেহে আজকের দিনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। নবজাগরণের দিনগুলি পিছনে ফেলে অগ্রগতির রথ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। তার ঘরঘর আওয়াজে গ্রাম-জনপদ জেগে উঠেছে। ধনীর প্রাসাদে তার প্রভাব ব্যাপক আর দরিদ্রের কুটিরাঙ্গনে তার ক্ষীণ ছায়া থরথর কাঁপছে। সবাই জাগছে। এই জাগরণের ইতিহাস বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। জাগরণ এখনও সম্পূর্ণ হয় নি। তাই ইতিহাস আজও অসম্পূর্ণ। পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার পক্ষে বর্তমান দিনগুলি এক বিশিষ্ট অধ্যায় হয়ে বিরাজ করবে। দীর্ঘদিনের সাধনা এই শতাব্দীতে অনেক পরিমাণে সার্থক হয়েছে। এবং সার্থকতার পরবর্তী পদক্ষেপকে দৃঢ় করেছে।

ভারত-ললনার জাগরণের কাহিনী খুব একটা পুরোনো নয়। ইতিহাসের ডানায় ভর করে সে দিনগুলিতে ফিরে গেলে দেখা যাবে আধুনিক সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র কলকাতা শহর তখন জমজমাট। আধুনিকতার ঢেউ তখন সমাজে উথাল-পাথাল করছে। স্ত্রীশিক্ষার তোড়জোড় করছেন বিদ্যাসাগর মশাই, বেথুন সাহেব স্কুল প্রতিষ্ঠা করছেন। কিন্তু ছাত্রী জোটান এক মহা সমস্যা। রক্ষণশীল সমাজ গালে হাত দিয়ে ভাবছে মেয়েরা লেখাপড়া শিখে সমাজের বিপর্যয়ের কারণ হয়ে উঠবে। তাই সাবধানতার প্রাচীরে তারা সতর্ক প্রহরার ব্যবস্থা করল। কিন্তু নতুন দিন নিজের পথ করে নিবেই। ইতিমধ্যে রক্ষণশীল সমাজে প্রগতিশীলতার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। দু-এক জন করে ছাত্রী জোগাড় হচ্ছে. সমাজের অনুশাসন উপেক্ষা করে তারা বিদ্যালয়ে যাতায়াত শুরু করল। সারা শহরে আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। কিন্তু একে আর রোধ করা গেল না। লেখাপড়া শেখার আগ্রহ মেয়েদের মধ্যে ক্রমেই বাড়তে লাগল। এবার বিদ্যালয়ে মেয়ে পাঠাতে উৎসাহী। আর কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নেই। অবশ্য যত সহজে বলে গেলাম তত সহজে হয়নি অথবা আজকাল বিদ্যালয়ে মেয়েদের ভিড় সেদিনে কল্পনা করাও যাবে না। হয়ত ব নিজের অজান্তেই ঠোঁটের ফাঁকে এক টুকরো হাসি থেকে যাবে। তারপর সে হাসি আপনা থেকেই মিলিয়ে যাবে যখন জানবে সেদিন দু-একজন ছাত্রী জোগাড় করতে বিদ্যাসাগর মশাই অথবা বেথুন সাহেবের পায়ের চামড়া ক্ষয়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল। এই সঙ্গে আরও ছিল ঈশ্বর গুপ্তের ধারালো রসিকতা। তিনি দিব্যচক্ষে প্রত্যক্ষ করছিলেন, ইংরেজী লেখাপড়া শিখে মেয়েরা বাংলা ভুলে পুরোদস্তুর মেমসাহেব হয়ে উঠবে। আর তখন নিশ্চিন্ত মনে গড়ের মাঠে হাওয়া খেয়ে বেড়াবে। এছাড়া [illegible] সৌখিন সমাজপতিরা [illegible]

সেবাদল

কেরালা থেকে দুজন নান সম্প্রতি জার্মানীতে গিয়েছেন সেখানে এক বৃদ্ধ আবাসে তাদের পরিচর্যার জন্য। ইতিমধ্যে এ ব্যাপারে তাঁরা বেশ সুনাম অর্জন করেছেন। বৃদ্ধ এবং নিঃসঙ্গ মানুষের অভাব ও প্রয়োজনের দিকে তাঁরা সব সময় সতর্ক নজর রাখেন।

এরা নান এবং নার্সও বটে। রিচার্ড ওয়েগনার প্রবর্তিত উৎসবের জন্য বিখ্যাত বেরুথ শহরে এঁরা থাকবেন এবং জার্মানীর ক্যারিটাস অ্যাসোসিয়েশন অফ দ রোমান ক্যাথলিক চার্চ পরিচালিত ওল্ড পিপলস হোমে কাজ করবেন।

বৃদ্ধদের পরিচর্যায় নিযুক্ত থাকার এঁদের সম্বন্ধে উৎসাহ এবং কৌতূহল স্বাভাবিক। কারণ আমাদের দেশের বৃদ্ধেরা পরিবারের মধ্যেই বাস করেন। কিন্তু জার্মানীতে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেখানে এমন পরিবারের সংখ্যা খুবই কম যেখানে ঠাকুর্দা এবং ঠাকুরমা পরিবারের মধ্যে বাস করেন। গত শতাব্দীতে কৃষকদের মধ্যে এরকম প্রথা ছিল এবং সম্ভবত প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে। কিন্তু বর্তমান শিল্পসভ্যতায় পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে গেছে। লিভিং স্ট্যান্ডার্ড এখন ক্রমশ উচ্চগতিমুখী। তাই যুবক এবং বৃদ্ধরা আলাদা পরিবার হিসেবে বাস করেন।

আর তখনই বৃদ্ধদের জীবনে ভিড় করে আসে নানা সমস্যা। নিঃসঙ্গতা অনেক সময়



তীব্র হয়ে ওঠে। বিশেষ করে এই সময় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কেউ যদি মারা যায় তাহলে তো কথাই নেই। নানা রকম অসুখ-বিসুখ এবং ভগ্নস্বাস্থ্য তো আছেই। তাই অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধদের পরিচর্যা এদেশে এক নিত্য সামাজিক সমস্যা। এ জন্য শুধু কর্তৃপক্ষই উদ্বিগ্ন নন গীর্জা, দাতব্য প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সংস্থা সবাই সমান উদ্বিগ্ন। তাই সমস্যার সমাধানে সবাই এগিয়ে আসে।

কেরালার এই ছ'জন নার্স এখানে আসার আগে পর্যন্ত এ সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না। তাঁরা আগ্রহের সঙ্গে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেছেন। তাঁরা লক্ষ্য করেছেন জার্মানীর বয়স্ক শিশুদের হাসপাতালে, অক্ষমদের এবং বৃদ্ধদের হোমে নার্সের একান্ত অভাব। তাই তাঁদের যখন বৃদ্ধদের পরিচর্যার প্রস্তাব দেওয়া হয় তখন তাঁরা সাগ্রহে রাজী হয়ে যান।

এই ছ'জন একসঙ্গে কাজ করছেন এবং বৃদ্ধদের পরিচর্যার একটি কোর্স শেষ করেছেন। তাঁরা আরও শিখেছেন জার্মানরা কিভাবে থাকে এবং কি খেতে ভালবাসে। এই আবাসের বৃদ্ধ বাসিন্দারা সবাই ভারতীয় নার্সদের সেবায় মুগ্ধ। বৃদ্ধদের পরিচর্যায় তাঁদের সতর্কতা, ধৈর্য এবং সহানুভূতি সকলের মন কেড়েছে। আন্তরিকতার সঙ্গে বৃদ্ধদের পরিচর্যা করে তাঁরা বুঝতে চেয়েছেন তাঁদের প্রয়োজন এবং সেইমত তাঁদের নিঃসঙ্গতা দূর করার চেষ্টা করেছেন।

একজন মহিলা মন্তব্য করেছেন, এঁরা ঠিক মেয়ের মত। একথাটি বলার সময় সেই বৃদ্ধ মহিলার ক্ষীণ দৃষ্টি কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

বেশি ভাবনায় পড়ে গিয়েছিলেন। ঈশ্বর গুপ্তের আশংকার সত্যতা বিনষ্ট হয়েছে। সমাজপতিদের সংস্কারও অদম্য ইচ্ছা-শক্তিতে কোথায় ভেসে গিয়েছে। নতুন দিন নতুন প্রহর ঘোষণা করেছে — সে সবাইকে আহ্বান জানিয়েছে এবং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে। পুরুষ জেগেছে, সে ডাকে সাড়া দিয়ে নতুন যুগের হাল ধরেছে। মেয়েরা পিছিয়ে থাকতে পারে না। নতুন যুগের শঙ্খ বইবার দায়িত্ব তাদেরও এবং সমান ভার বইতে তারাও প্রস্তুত। মেয়েরা বেরিয়ে পড়ল নতুন দিনের হাত ধরে।

তারপর থেকেই ইতিহাস নতুন কথা কইছে এবং যতদিন যাচ্ছে এই নতুন কথা বলার প্রবণতা ততই বাড়ছে। এটা পৃথিবীর নারীসমাজের পক্ষে যেমন সত্য তেমনি আমাদের দেশের নারীসমাজের পক্ষেও। সবাই জয়স্তম্ভ নির্মাণে ব্যস্ত। রামমোহন-বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টা এবং স্বামী বিবেকানন্দের বজ্রনির্ঘোষ ঘোষণা, এক পক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নয়, সমগ্র জাতিকে সচকিত করে তুলেছিল। সেদিন থেকেই নতুন যুগ মাথাচাড়া দিচ্ছে। আর আজ পর্যন্ত সে অগ্রগতির ইতিহাস অম্লান।

অবশ্য স্বীকার করতে বাধা নেই অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশের মেয়েরা অধিকারগুলি বুঝে নিতে পেরেছে অনেক তাড়াতাড়ি। এদেশের মেয়েরা এগিয়েছে লড়াই-এর মধ্য দিয়ে। প্রথমে শিরোমণিদের ভ্রূকুটি প্রদর্শনের বিরুদ্ধে এবং তারপর বৃটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে। এই লড়াইয়ের প্রেরণা তাদের মনোবলকে দৃঢ় করেছে এবং নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করেছে। রাজনৈতিক এবং সামাজিক অধিকারগুলি তাই তারা আদায় করে নিতে পেরেছে। এজন্য তাদের সুদীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হয় নি। তাদের সংগ্রামী মনোবৃত্তি এক্ষেত্রে তাদের সাহায্য করেছে। পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকারের ছাড়পত্র নিয়ে জীবন ও জীবিকার প্রশ্নে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের সভানেত্রীর পদ থেকে শুরু করে ভারতরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীর পদ নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে অনেকখানি। নারীর সাহিত্যসাধনা, সমাজচেতনা, বিজ্ঞাননিষ্ঠা সবই আজ জয়যুক্ত হতে চলেছে। তা ছাড়া নারীর অগ্রগতির পথে দেশনায়কদের অকুণ্ঠিত প্রেরণাও অবিস্মরণীয়। অধিকারের পথ বেয়ে তাদের যাত্রাপথ যাতে প্রশস্ত হয় সেজন্য চিন্তা কম ছিল না। রাজনৈতিক অধিকারের মধ্যে ভোটাধিকার তাই একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। আমেরিকা এবং ইংলণ্ডের মেয়েরা অনেক ব্যাপারে পুরুষের সমান অধিকার ভোগ, এই রাজনৈতিক অধিকার থেকে দীর্ঘদিন বঞ্চিত ছিল। এজন্য তাদের চিত্তবিক্ষোভের অন্ত ছিল না। সীমিত অধিকার তাদের বিস্তৃত হয়েছে সাম্প্রতিক কালে। সেও অনেক আন্দোলনের ঢেউ বয়ে যাবার পর। সেদিক থেকে আমরা বিশিষ্টতা অর্জন করেছি।

বিশিষ্টতা যে অর্জন করেছি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আপশোস তবু যায় নি। দেশের বৃহত্তর নারীসমাজ এই অগ্রগতির আওতায় আসে নি। এটা লজ্জার কথা হলেও নির্মম সত্য। নারীজাগরণ এবং অগ্রগতির বিরাট ইতিহাস রচিত হচ্ছে কিন্তু সীমিতের আনাগোনা সেখানে। তাই মাঝে মাঝে মনে হয় আমাদের দেশের এই বৃহত্তর নারীসমাজ কি চিরকাল উপেক্ষিত থেকে যাবে? আধুনিকতার প্রভাব যে তাদের উপর পড়ে নি তা নয়। তারা এগিয়ে আসতে চাইছে এবং ইচ্ছাশক্তির প্রাবল্যে সেদিন বান ডাকবে সেদিন তারাও এই অগ্রগতিতে সামিল হবে। কিন্তু অদূর-ভবিষ্যতে সেরকম কোন আশা দেখা যাচ্ছে না। তাই মাঝে মাঝে মনে হয় নারী-জাগরণের চটক দেখে আমরা ভুলেছি। কিন্তু চটকে ফটক পেরোন যায় না।

বিশ্বের অন্যান্য দেশে চটক কম, সে সব দেশে বরং ফটক পেরোনর তাগিদ অনেক বেশি। আর সে পথে তারা সবাইকে নিতে চায় সহযাত্রী করে। তাহলে তাদের যাত্রাপথের আপদ-বিপদ কেটে যেতে সময় নেবে না এবং সকলের মিলনের অগ্রগতিও নতুন বেগধারায় সঞ্জীবিত হবে। সমগ্র নারীসমাজের এতে অন্তর্ভুক্তি অবশ্য সম্ভব করে তোলা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। সোভিয়েত রাশিয়ার শতকরা চুরানব্বইজন মেয়ে সামাজিক জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। নভেম্বর বিপ্লবের পর সেদেশে এসেছে রূপান্তর। রাজনীতি, শিক্ষা, শাসনব্যবস্থা পরিচালনা,

ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিল্পকলার বিভিন্ন দিকে আজ তাদের প্রতিভা নিয়োজিত। বিশেষ করে জনস্বাস্থ্য রক্ষায় তাদের অপরিসীম সতর্কতা। মেয়েরা যাতে আরও বেশিভাবে সংসারের কাজের বাইরে মেলা-মেশা করতে পারে সেদিকেও এদের খেয়াল আছে। এজন্য ডোমেস্টিক সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রিজ-এর দিকে নজর দেওয়া হয়েছে। নতুন নতুন যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনের চেষ্টা হচ্ছে। শহরে ও গ্রামে অনেক বাড়িতেই আজকাল ঘরকন্নার কাজে এসব মেসিনের সাহায্য নেওয়া হয়। এই বাঁচান সময়টুকু ব্যয় করে তারা দেশের বৃহত্তর পরিকল্পনায় নিজেকে নিয়োজিত করে। সোভিয়েত পরিবার ক্রমেই এগিয়ে চলেছে সমৃদ্ধির দিকে। নারীকর্মীর সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধির দিকে। তাদের বেতন সন্তোষজনক। তাদের সন্তান-সন্ততির জন্য গড়ে উঠেছে কিন্ডারগার্টেন, নার্সারী প্রভৃতি। সম্প্রতি প্রায় পাঁচ লক্ষ মেয়ে আটশোটি পেশায় শিক্ষালাভ করছে এবং সব পেশায়ই তারা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করছে। এই অগ্রগতির আর একটা দিক হচ্ছে সোভিয়েত নারীদের কথা বলার নানা মুখপত্র। সোভিয়েত উওমেন, উওম্যান ওয়ার্কার, পিসান্ট উওমেন প্রভৃতি হচ্ছে এদেশের মেয়েদের মুখপত্র। এ ছাড়াও অসংখ্য পত্রিকা আছে বিভিন্ন প্রজাতন্ত্রের।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস অতিক্রান্ত হয়ে গেল গত ৮ মার্চ—সারা বিশ্বে এ দিনটি সমগ্র নারীসমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বহন করে আনে। সেই সঙ্গে এদিন প্রয়োজন আত্মসমীক্ষার। নিজের অগ্রগতিকে নিয়ে তুষ্ট থাকা আজকের স্বভাববিরুদ্ধ। তাই প্রত্যেককে তলিয়ে দেখতে হবে বিশ্বনারীপ্রগতিতে সে কিভাবে অংশ নিয়েছে। দেশের পশ্চাদ্বর্তী নারীসমাজের অগ্রগমনে সে কিভাবে সাহায্য করেছে। এই আত্মসমীক্ষাই হল আজকের বাঁচার মূলমন্ত্র এবং যাদের কুটিরাঙ্গনে অগ্রগতির ছায়া থরথর কাঁপছে তাদের সঙ্গী করে নেওয়ার একমাত্র উপায়। এ না হলে সমস্ত অগ্রগতি মূল্যহীন হয়ে যাবে—অগ্রগতির দুর্গতি তখন আমাদের ভয়ানকভাবে ব্যথিত করবে।

মন্ট্রেম্বলে, ক্যানাডা—প্রচণ্ড শীতের মধ্যে মিসেস জ্যাকলিন কেনেডি ছেলের হাত ধরে স্কী খেলার জন্য যাচ্ছেন। পিছনে মেয়ে ক্যারোলিন। যখন তাঁরা বেরোন তখন প্রচণ্ড তুষারপাত হচ্ছিল।



সেকালের সাহিত্যে বাঙালী মেয়ে

আমাদের দেশের মেয়েরা নানা দুঃসাহসী কাজ করছেন পুরুষদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। বিশেষতঃ শিক্ষার ক্ষেত্রে। তাঁরা শিক্ষকতা করছেন, অধ্যাপনা করছেন, উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশে গমন করছেন, দেশী-বিদেশী কোন ডিগ্রী নিতেই তাঁরা এখন পিছপা নন। যেখানে মহিলা, পুরুষ উভয়েই প্রতিযোগী, সে রকম কোনো পরীক্ষাতেও মহিলারা প্রথম স্থান অধিকার করলেও তা শুনে আজ-কাল কেউ গালে হাত দিয়ে বিস্ময়ে হতবাক হন না—এবং কাগজেও 'মহিলার অসামান্য কৃতিত্ব' শিরোনামায় সে সংবাদ ছাপা হয় না।

কিন্তু প্রায় দেড়শো বছর আগে আমাদের দেশের—বিশেষ করে সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের কথা বলছি—তাঁরা কতটুকু শিক্ষার আলো দেখেছিলেন, তা এ-যুগের মেয়েরা সহজে অনুমান করতে পারবেন না। কিছু কিছু সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েরা সুযোগ পেতেন বিদ্যাচর্চার। শিক্ষয়িত্রী গিয়ে শিক্ষা দিতেন বাড়ীর অন্দরমহলে। কিন্তু সে আর সংখ্যায় কত? আঙুলে গুণে বলা যায়। আমাদের দেশে মেয়েদের স্কুল প্রথম প্রতিষ্ঠাই হল আঠারোশো খৃস্টাব্দের গোড়ার দিকে। সে সময় স্কুলে ছাত্রীর সংখ্যাও তেমনি নগণ্য ছিল। পরে অবশ্য আরো স্কুল হয়েছে।

বাড়ীর মেয়েরা গৃহকাজ ছেড়ে কেতাব পড়বে—বাবা মা'র কাছে, স্বামীর সঙ্গে ফরফর করে ইংরাজী, ফার্সী বুলি ঝাড়বে—এসব ছিল সাধারণ লোকের স্বপ্নেরও অতীত। তাই সাধারণ ঘরে মেয়েদের লেখাপড়া শেখা নিয়ে অনেক সমস্যা ছিল। লোকনিন্দার ভয়ে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনেক মেয়ে লেখাপড়া করতে পারতেন না। সুতরাং অ-আ-ক-খ শিখতেই যে দেশের মেয়েদের সমাজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়, সে দেশের মেয়েরা বই পড়বে এবং আরো দুরূহ কাজ বই লিখবে, একথা কেউই কল্পনা করতে পারতেন না।

কিন্তু কল্পনারও অতীত অনেক সময় অনেক কিছু ঘটে। সে রকম কল্পনাতীত ঘটনা হোলো 'চিত্ত বিলাসিনী' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ। এই 'চিত্ত বিলাসিনী'ই বাঙালী মেয়ের রচিত প্রথম গ্রন্থ। এটি রচনা করেন কৃষ্ণকামিনী দাসী। প্রকাশিত হয় ১৮৫৬ খৃস্টাব্দে। এর আগে অবশ্য কোনো কোনো পত্রিকায় বাঙালী মেয়ের রচিত কবিতা বা রচনা মাঝে মাঝে দেখা গেলেও—গ্রন্থ রচনা এই প্রথম। দেশের তদানীন্তন বিদগ্ধ সমাজ এই গ্রন্থকে পরম আদরের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। তখনকার কোনো কোনো সাময়িক পত্রে সমালোচনায় এই গ্রন্থের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন ও লেখিকাকে অভিনন্দিত করেন। এর পর আরও কিছু-সংখ্যক বাঙালী মহিলার লিখিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এঁরা বেশীর ভাগই দেশের মেয়েদের অন্ধকার থেকে আলোয় আনার প্রয়াসে লেখা শুরু করেছিলেন। কেউ কেউ কবিতার বইও লিখেছিলেন।

আমাদের দেশের মহিলার লেখা প্রথম নাটক 'উর্বশী নাটক'। এই নাটক প্রকাশিত হয় ১৮৮৬ খৃস্টাব্দে। এরপর গীতিনাট্য, উপন্যাস, ঐতিহাসিক উপন্যাস, কাব্যনাট্য ইত্যাদিতে মেয়েদের উৎসাহ বিশেষভাবে দেখা যায়।

এই সময় এক আশ্চর্য প্রতিভাশালিনী বাংলার সাহিত্যভান্ডারকে তাঁর অপরিসীম দানে সমৃদ্ধ করে তোলেন। এই প্রতিভাময়ী মহিলা রবীন্দ্রনাথের অগ্রজা স্বর্ণকুমারী দেবী। তাঁর রচিত বহু উপন্যাস, গীতিনাট্য, ছোটগল্প সে সময়ে প্রকাশিত হয়। কৌতুকনাট্য রচনাতে সম্ভবতঃ ইনিই প্রথম মহিলা। 'কনে বদল' 'পকাচক্র' প্রভৃতি প্রহসনও ইনি লিখেছেন। সরস্বতীর বরপুত্রী এই মহিলা বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ 'পৃথিবী' লিখে বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ দেখিয়ে গেছেন। এছাড়া তাঁর রচিত একাধিক পাঠ্যপুস্তকও পাওয়া যায়।

ঠাকুর পরিবারের বধূ (সত্যেন্দ্রনাথের স্ত্রী) জ্ঞানদানন্দিনী দেবী এই সময় তাঁর 'সাতভাই চম্পা' প্রভৃতি কিছু শিশু-নাটিকাও রচনা করেন। এছাড়া তাঁর অনুবাদ সাহিত্যও কিছু প্রকাশিত হয়। মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায় (ডব্লিউ সি ব্যানার্জির ভগিনী), মানকুমারী বসু, কামিনী রায়, কৃষ্ণভামিনী দাস, হিরণ্ময়ী দেবী, সরলা দেবী, প্রিয়ম্বদা দেবী, লজ্জাবতী বসু প্রভৃতি বহু অন্তঃপুরবাসিনী আমাদের এ যুগের মেয়েদের সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁদের জায়গা করে নিতে সাহসী করে গিয়েছেন।

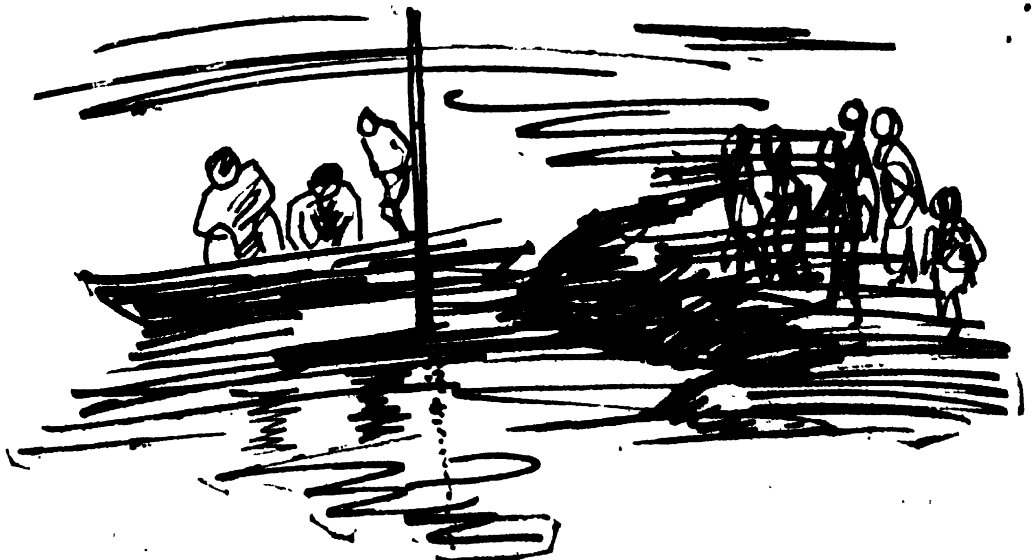
সাময়িক পত্র-পত্রিকার ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই—বিগত শতাব্দীতে সাময়িক পত্র-পত্রিকার সংখ্যা এখনকার তুলনায় নিতান্তই মুষ্টিমেয় ছিল। সুতরাং সে-যুগে মেয়েরা পত্রিকা সম্পাদনার মত পুরুষদের কাজে অগ্রসর হবেন—একথা কল্পনা করাও ছিল বাতুলতা মাত্র। কিন্তু সে ধারণাকে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করে প্রথম মহিলা পরিচালিত পত্রিকা জন্ম নিলো ১৮৭০ খৃস্টাব্দে। বাংলা ১২৭৭ সালের ১লা বৈশাখ 'বঙ্গমহিলা' নামে এই পত্রিকার প্রথম প্রকাশ। সম্ভবতঃ ডব্লিউ সি ব্যানার্জির ভগিনী মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায় এই পত্রিকার সম্পাদিকা ছিলেন। এটি ছিল একটি পাক্ষিক সংবাদপত্র। প্রথম মাসিক পত্রিকা 'অনাথিনী'র প্রকাশ হয়েছিল ১৮৭৫ খৃস্টাব্দে। এর সম্পাদিকা ছিলেন থাকমণি দেবী। এরপর 'ভারতী', 'পরিচারিকা', 'খৃস্টীয় মহিলা', 'সোহাগিনী', 'বালক', 'বিরহিনী', 'পুণ্য' ইত্যাদি মহিলা সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

মহিলা পরিচালিত প্রথম সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 'বঙ্গবাসিনী' ১৮৮৩ সনের শেষের দিকে প্রকাশিত হয়। এইসব মহিলা সম্পাদিত পত্রিকাগুলির বেশীর ভাগই সে সময়কার নারীসমাজের দুর্দশা, অভাব-অভিযোগ ও তা প্রতিকার কিভাবে হতে পারে সে সম্বন্ধেই সচেষ্ট ছিল।

এরপর থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত বহু সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, বার্ষিক ইত্যাদি মহিলা সম্পাদিত পত্রিকা সগৌরবে প্রকাশিত হতে থাকে।

বর্তমান কালে পুরুষ পরিচালিত পত্রিকার সঙ্গে সঙ্গে মহিলা পরিচালিত পত্রিকাও যথেষ্ট সংখ্যায় বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু যে অন্তরালবর্তিনীরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও দুর্দশাগ্রস্ত নারী-সমাজের মঙ্গলকামনায় আলোকবর্তিকা জ্বেলে গিয়েছেন—যার আলোয় আজ আমাদের দেশের মেয়েরা বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে কায়েমী আসন দখল করে নিয়েছেন—সেই পথপ্রদর্শিকাদের প্রতি এ যুগের শিক্ষিতা সাহিত্যানুরাগী মেয়েরা নিশ্চয় কৃতজ্ঞ থাকবেন।

—গার্গী গঙ্গোপাধ্যায়



রামকৃষ্ণ কথামৃতে রামপ্রসাদী সঙ্গীত

হরিপদ বসু

শক্তি ভিন্ন মুক্তি নেই।

তবে সে অসুর শক্তি নয়, তস্কর অতীষ্ট চৌর্যবৃত্তিও নয়। ভবের বসে ভবের ঘরে মাতৃনামে অভিসিক্ত হওয়া। 'মা' ও মাটিকে চেনবার আত্মউপলব্ধিতে বিলীন হওয়া, মা মা ধ্বনিতে নিজেকে ঐ মাতৃচরণে উৎসর্গ করবার চেতনা বা চৈতন্য।

যে মানুষ তার নিজের মায়ের স্বরূপ উপলব্ধিতে অক্ষম—হোক সে যত বড়ই উচ্চ ডিগ্রিধারী পণ্ডিত—তার সে পাণ্ডিত্য ঠিক ঐ চিঠি পড়ে বাজারে গিয়ে সওদা করবার মতই মামুলী উপলব্ধিগত।

তাই মা ও মাটির একক রূপকে অন্তরের উপলব্ধির মাধ্যমে জাগিয়ে তুলে সেই সচেতন আত্মার সঙ্গে আত্মীয়তা পাতানোই প্রকৃত মানুষের কাজ এবং প্রকৃত মনুষ্যত্ববোধের চরম সাধনার উপলব্ধি। সেই সিদ্ধি লাভ ক'রে যাঁরা ধন্য হয়েছেন তাঁরাই হলেন মাতৃসাধক।

আমাদের এই বাংলাদেশ সেই সাধক সন্তানদের পুণ্য জন্মভূমি, ভাবলীলার লীলাভূমি। আর তাঁদের সুপবিত্র পদরেণু আজো এদেশের মাটির প্রতি ধূলিকণায় ছড়িয়ে আছে। আজো যেন আমরা শুনতে পাই এঁদের মাতৃবন্দনা সংগীত। মাকে পাবার এবং মা ও মাটিকে এক করে মায়ের সঙ্গে একাত্ম হবার সাধনাই হল সে সঙ্গীতের মর্মকথা।

এই সঙ্গীত-রচয়িতারা অনেকেই হয়তো উচ্চশিক্ষিত ছিলেন না, নিরক্ষরও ছিলেন কেউ কেউ। তবু জগৎ জননীর কৃপায় মাতৃ অনুভূতির মাধ্যমে যে কৃপা তাঁরা লাভ করেছিলেন তাতে তাঁদের অনেকেরই বাণী বা কাহিনী আজ বিশ্ববরেণ্য। শুধু তাই নয় ঐ সব মাতৃভক্ত সাধকদের রচিত মাতৃসংগীত আজ ঠিক আমাদের কাছে বেদ, বেদান্ত, গীতা, উপনিষদের মতই পূজ্য ও প্রণম্য। কালের ব্যবধানে ইতিহাসের পৃষ্ঠা যতই এগিয়ে আসুক না কেন, আমাদের জাতীয় ইতিকথায় এই সব মাতৃসাধকদের কথা এবং তাঁদের কথামৃত আমাদের জাতীয় জীবনের পরম সম্পদ।

চিরকালের দেশবরেণ্য নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাই তাঁর 'বাংলার গীতি কবিতার শক্তিধারায়' রামপ্রসাদ সম্বন্ধে লিখেছিলেন, "রামপ্রসাদ একজন মাতৃসাধক ছিলেন। তাঁর সাধনাই তাঁর কাব্যে ও গানে আত্মপ্রকাশ করেছে। কালীমূর্তির ধ্যান বাঙ্গালী জাতির এক বিশেষ সাধনা, রামপ্রসাদের জীবনে ও কাব্যে তা ফুটে উঠেছে। রামপ্রসাদই বিশ্বকবি, কেন না তাঁহার কাব্যে ও সাধনায়—যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী তিনি প্রকাশ পেয়েছেন। ইংরেজ আগমনের পূর্বে বাঙালীর বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেও বাঙলায় কবি বিশ্বকবি হতে পেরেছেন।"

মানুষকে ভালবাসতে গেলে, দেশকে চিনতে হ'লে আগে দেশমাতৃকার পূজো করতে শেখা দরকার, তবেই সিদ্ধি, অন্যথায় নয়। মানুষই ভগবান, মানুষই নারায়ণ। ভগবান আর মানুষের মিলন ধ্বনিতেই জন্মগ্রহণ করেছেন—নরনারায়ণ।

আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে ভাগীরথীর কলনিনাদের মধ্যে শুনেছিলেন এই মাতৃসংগীতের সুর দক্ষিণেশ্বরে বসে শ্রীরামকৃষ্ণ দেব। শুনতে শুনতে তিনি ধ্যানস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর ব্যাকুলতার আর অন্ত ছিল না। —তাই কত বিনিদ্র রজনীর ক্লান্তি, কত অভুক্ত অবস্থার অবসাদ তুচ্ছ করেও ঐ দক্ষিণেশ্বর মহাতীর্থের পঞ্চবটী মূলে আর পুণ্যতোয়া গঙ্গাতীরের বালুকাবেলায় মুখ লুকিয়েছেন, আর কেঁদেছেন, "দেখা দে মা, দেখা দে—রামপ্রসাদকে তুই দেখা দিয়েছিলি মা, তবে আমায় কেন দেখা দিবিনে? মনের মধ্যে মাকাল হয়ে তুই আমায় দেখা দে!"

দেখা তিনি পেয়েছিলেন। তাই পরবর্তীকালে অনুভবে শ্রীরামকৃষ্ণই বলতে পেরেছিলেন, "যেই রাম সেই কৃষ্ণ, এবার একাধারে রামকৃষ্ণ। নদের গৌরাঙ্গই আমি। আমিই অদ্বৈত-চৈতন্য-নিত্যানন্দ একাধারে তিন। পুরীর জগন্নাথ ও আমি এক।"

তাই এই জাগ্রত সত্যকে প্রচার করতে, বিশ্বের সামনে নরের মধ্যে নারায়ণকে চেনাতে, মানুষের মধ্যে মানুষের ভগবানকে তুলে ধরতে শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্য নরেন্দ্রনাথকে স্বামী বিবেকানন্দরূপে নিতে হয়েছিল বিশ্ব-পরিব্রাজকের ভূমিকা।

ভগবান রামকৃষ্ণে হয়েছিল যে সত্যের প্রতিষ্ঠা বিবেকানন্দে ঘটেছিল তার প্রচার। শ্রীরামকৃষ্ণে যে উপলব্ধির বীজ, স্বামী বিবেকানন্দে তা পল্লবিত কুসুমায়িত। যুগ-দেবতা শ্রীরামকৃষ্ণ স্থাপন করলেন যার ভিত্তি, বিবেকানন্দ গড়লেন তার গগনস্পর্শী মন্দির। কাজেই রামকৃষ্ণ যার পূর্বার্ধ, স্বামীজিতে ঘটল তার সুন্দর পরিসমাপ্তি।

দেশের মানুষ যখন পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ, ভুলে যেতে বসেছে তার জাতীয় জীবনের সত্তা ঠিক সেই সময়েই আবির্ভূত হলেন যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ। ঠিক যেভাবে একদিন ভগবান যীশুকে মর্ত্যে আসতে হয়েছিল—অত্যাচারী একদল মানুষের অত্যাচারে পীড়িত আর একদল মানুষের মুক্তির পবিত্র পথপ্রদর্শক হয়ে। তাই শ্রীরামকৃষ্ণও সেই পতিতপাবন যীশুর কথাই নতুন সুরে গাইলেন তাঁর কথামৃতে "পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে নয়।" আর সেই সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্মসমন্বয়ের বাণী ধ্বনিত হয়ে উঠল, যার মূল কথা 'মা আর মাটি অভিন্ন'—তার সেই অভিন্নের সাধনায় আত্মোৎসর্গই জীবমুক্তির প্রকৃত পথ। তাই রামকৃষ্ণ কথামৃতের চরম সার্থকতা ঘটল সেইদিন যেদিন ভারতের মাটি পেরিয়ে সুদূর পাশ্চাত্যের চিকাগোর ধর্ম মহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠে উদাত্ত সুরে ধ্বনিত হয়ে উঠল,

> "Help and not Fight", "Assimilation and not Destruction" "Harmony and Peace and not Dissension."

সেদিন সারা বিশ্ববাসী বিমুগ্ধ চিত্তে ভক্তি আবেগে পরিপ্লুত হয়ে উঠেছিল, মনে মনে প্রশ্ন করেছিল—'কে এই যুগ সন্ন্যাসী?' শ্রদ্ধায় তাঁদের সকলের মস্তক অবনত হয়ে এলো এই মহান কথামৃতকারের প্রতি। আর সেই সঙ্গেই ঠিক প্রভাত-সূর্যের প্রতি সমস্ত প্রকৃতির প্রথম প্রণামার্ঘের মতই ঝরে পড়েছিল অগণিত মানুষের প্রণাম নীরব হৃদয়ের আন্তরিক অভিনন্দন নিয়ে।

একি নব-প্রভাতের গান?—"সংগ্রাম নয় সহায়তা, ধ্বংস নয় সত্যকে স্বীকার করা, কলহ নয়, মিলন এবং শান্তি।" কে এমন

কথাও এর আগে কেউ বলেনি। সব ধর্মই এক—কেউ তো বলেনি—রাম, হরি, বৌদ্ধ, আর সকলেই অভিন্ন, একের মধ্যেই বহুর ...

অবশ্য স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে প্রথম সংবাদ এসেছিল সেইদিন যখন তিনি জেনারেল অ্যাসেম্ব্লিজ ইনস্টিটিউশন কলেজের ছাত্র। কলেজের অধ্যক্ষ হেস্টি সাহেব একদিন ক্লাসে ইংরাজি পড়াতে পড়াতে ইংরাজ কবি, ওয়ার্ডসওয়ার্থ-এর কথায় বলেন, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে দেখতে কবিরও নাকি মাঝে মাঝে বাহ্যজ্ঞান লোপ পেত এবং সমাধিস্থ হয়ে পড়তেন। ঠিক যেভাবে সত্য ও সুন্দরের উপাসনা করতে করতে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের ঐ অবস্থা হচ্ছে—আর হেস্টি সাহেব নিজে চোখে তা দেখে এসেছেন।

বিদেশ থেকে স্বামীজিকে বিদায় দেবার কালে সত্তর বছরের বৃদ্ধ অধ্যাপক ম্যাক্স-মুলার সাহেব রামকৃষ্ণময় চিত্তে দু'চোখ জলে ভরিয়ে ফেলেছিলেন। তখন স্বামীজি তাঁকে বলেছিলেন, 'ভারতে চলুন না আপনি?'

বৃদ্ধ অধ্যাপক উত্তর করেছিলেন কাঁপা ঠোঁটে, 'ভারতে গেলে আর আমি ফিরব না।' ক্রমে স্বামীজির যাত্রাকাল উপস্থিত হলে স্বামীজি বললেন, 'কেন আবার আপনি এত কষ্ট করে স্টেশনে এলেন?' অশ্রুসিক্ত চোখে উত্তর এলো ম্যাক্সমুলারের কণ্ঠ থেকে,

> 'It is not every day that one meets a disciple of Rama-krishna Paramahansa.'

রামকৃষ্ণের আবির্ভাবের প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে হালিশহরের কুমারহাটিতে জন্মগ্রহণ করেন আর এক মাতৃসাধক, তিনি কবি রামপ্রসাদ। তিনিও শ্রীরামকৃষ্ণের মতই মাতৃনামে পাগল ছিলেন। দিনরাত তিনি স্বরচিত মাতৃ-সংগীতের অম্লান মাতৃঅর্ঘ্য সাজিয়ে পুজো করে গেছেন জগতজননী মায়ের।

প্রকৃতির মনমাতানো পরিবেশ থেকে অহরহ আহরণ করে গেছেন প্রসাদ-কবি তাঁর অপূর্ব মাতৃ-সংগীতের ডালি। মায়ের সংগে একাত্ম হয়ে গেছেন চরম আত্মসমর্পণের মাধ্যমে। তাই এককালে পল্লীবাংলার ঘরে ঘরে, কি ধনী, কি দরিদ্র সকলের কণ্ঠে, প্রসাদ-কবির এই মাতৃ-সংগীত মাতৃপুজোর নৈবেদ্য সাজিয়ে গেছে। তাই ভগিনী নিবেদিতা বলেছিলেন,

> "It is a reflect how a century and a half ago, almost a hundred years before the birth of European art, a great Indian singer and saint (Ramprosad) should have been deep on observation of the little ones, studying them, and sparing every feeling, almost without knowing himself."

মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ লিখেছিলেন, "ভাবের প্রভাবে মহাজনী সংগীতে গীতের এক চরণ সিদ্ধ-কবির কণ্ঠ হইতে বাহির হয়; পরে তত্ত্ব আসিলে ভবানী সম্বন্ধে এমন কথা বাহির হইয়াছে। পদ পরিবর্তন করিয়া গীত হইল।

> "মা ভবানী গো শঙ্করী
> ভবানী তোমার নাম।

রামপ্রসাদের ভাবের পদ ছিল ঃ

> "মা তারিণী গো শঙ্কর ভিখারী
> তোমার নাং।"

শোনা যায় পদ পরিবর্তনে দৈববাণী হয়েছিল, "রামপ্রসাদ আগে যাহা গাহিয়াছিলি তাহাই গা।"

রামপ্রসাদের এই সুমধুর মাতৃ-সংগীত যেদিন দেশবাসী ভুলে যেতে বসেছিল, ঠিক সেই সময় সে-সুর ধ্বনিত হয়ে উঠল রামকৃষ্ণ কথামৃতের পাতায় পাতায়। বিমুগ্ধ হয়ে গেল দেশের একদল ধর্মপ্রাণ সত্যনিষ্ঠ মানুষ—রামপ্রসাদ আর রামকৃষ্ণের মিলিত কথা আর সুরের এই মহামিলনের ঝংকার শুনে। তাই সে-সুরের সংগে সুর মেলাতে এলেন ব্রহ্মানন্দ কেশব সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ দেশের মনীষিবৃন্দ আর ঐ সংগে শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী ও গৃহী শিষ্যের দল। শ্রীরামকৃষ্ণ খোলাখুলি তাঁর কথামৃতে প্রসাদী সুরের অপূর্ব মাতৃ-সংগীত—

> "সকলি তোমারি ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।
> তোমার কর্ম তুমি কর মা,
> লোকে বলে করি আমি॥"

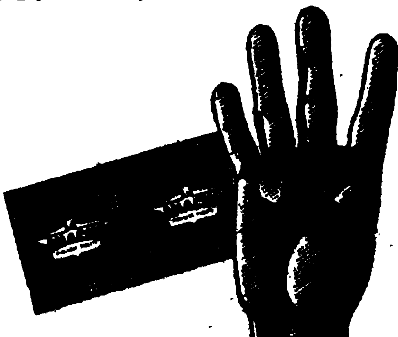
শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—"ঈশ্বর ইচ্ছাময়। সংসার ও মুক্তি দুই-ই ঈশ্বরের ইচ্ছা। তিনিই সংসারে অজ্ঞান করে রেখেছেন। আবার তিনিই ইচ্ছা করে যখন ডাকবেন, তখন মুক্তি হবে। তিনি ভব-বন্ধনের বন্ধনহারিণী—তারিণী।"

তাই প্রসাদী সংগীত এককালে যেমন লোকশিক্ষার প্রধান সহায়ক ছিল, আজো ঠিক তেমনি আছে। হয়তো শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেও সেই রামপ্রসাদেরই পরবর্তী অধ্যায়, আর রামকৃষ্ণ কথামৃত সেই প্রসাদী-সংগীতেরই নবতম অধ্যয়ন। শ্রীরামকৃষ্ণের পরবর্তীকালের সাধক ঋষি অরবিন্দ বলেছেন,

> "As an emperor Sree Rama-krishna has founded a new Empire."



মাথাধরা?
অ্যানাসিন
ব্যথা-বেদনার উপশমে
ঢের ভালো কারণ
এটি ৪-ভাবে
কাজ করে



২টি অ্যানাসিন খেলেই
খুব তাড়াতাড়ি আরাম

Regd. users Geoffrey Manners & Co. Ltd.



(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ঐটুকু গলিতে অত বড় গাড়ি যদি প্রায় একদিন-দুদিন অন্তরই এসে ঘণ্টাখানেক করে দাঁড়িয়ে থাকে, তাহলে একটু কানাকানি হয় বৈকি! তবু রাজাবাবু তাঁর পাল্কী গাড়ি আর ওয়েলার জুড়ি ছেড়ে ব্রুহাম ধরেছিলেন, কিন্তু সে ব্রুহামও সাধারণ গাড়ির থেকে বড় হবে—এ তো জানা কথাই। তা ছাড়া, খুব সাধারণ গাড়ি হলেও, একই গাড়ি যদি এক বিশেষ বাড়ির সামনে এসে প্রত্যহ দাঁড়ায়—তা লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বাধ্য। এবং বলা বাহুল্য আধ ঘণ্টাটাও ঠিক আধ ঘণ্টায় শেষ হয় না। গান দীর্ঘায়ত হয়, গানের থেকে গল্প হয় বেশী। আধ ঘণ্টা ক্রমশ এক ঘণ্টায়—কয়েক দিনের মধ্যে দেড় ঘণ্টায় পরিণত হয়। সে তথ্যটা এদের গোচরেও আসে না। কেউই সচেতন হতে পারে না—এমন কি সিস্তারিণীও না। সেও বসা ছেড়ে দিয়েছে। প্রথম দু-একদিন কাপড় পাল্টে ফর্সা থান কাপড় পরে ভাবিযুক্ত হয়ে এসে বসেছিল, কিন্তু রাজাবাবুকে দেখে, তাঁর কথাবার্তা শুনে তাঁর সম্বন্ধে কোন মন্দ ধারণা করতে পারে নি। বিশেষ সে থাকলে বাবু তার সঙ্গেই বেশী কথা বলেন, নানা ধরনের গল্প। প্রতিশ্রুতি দেন ওদের রেঙ্গুনে যে আপিস আছে সেখানে চিঠি লিখবেন—গণেশের খবরের জন্যে। এর পর এমন সম্ভ্রান্ত মানুষটা সম্বন্ধে কোন সংশয় পোষণ করে কি করে?...সে আজকাল নিজের কাজে থাকে, নয়ত একটু শুয়ে পড়ে। ফলে এদের সময়টা যে কোথা দিয়ে কেটে যায় তা কেউ টের পায় না—নবীনা গায়িকা ও প্রৌঢ়া শ্রোতা দুজনের এক-জনও না। এতে যে দোষের কিছু আছে সে সম্বন্ধেও অবহিত হতে পারে না।

সুতরাং কানাকানিটা ক্রমে কানাঘুষো শেষে টিটকারে পরিণত হল এক সময়। যখন সে সম্বন্ধে সচেতন না হয়ে আর উপায় রইল না সুরোর, তখন সে বহুদূরে চলে গেছে, হারিয়ে তলিয়ে গেছে ঐ সৌম্যকান্তি বয়স্ক লোকটার প্রসন্ন দৃষ্টির গহ্বরে তার আর ফেরার উপায় নেই। এর মধ্যে যে কিছু 'দুষ্য' আছে, এর মধ্যে যে কোন দৈহিক আকর্ষণ আছে—একেই যে প্রণয় বলে—যে 'পীরিতি'র গান গায় সে এও যে তাই—তা অবশ্য এখনও মানতে রাজী নয়, জানেও না—কিন্তু তেমনি বিনাদোষে অমন একটা মানুষকে 'আর এসো না' বলতেও প্রস্তুত নয় সে।...

মতিই প্রথম টিটকারি দেয়, 'কী লো, বলিনি যে এবার রাজাবাবুর গাড়ি তোর দোরে নিত্যি এসে দাঁড়াবে! তখন তো খুব মেজাজ দেখিয়েছিলি। এখন গরীবের কথা বাসি হলে খাটল তো?'

সুরো অরুণবর্ণ হয়ে উঠে বসে, 'কখ্‌খনো না। তুমি যেভাবে বলেছিলে সেভাবে তো নয়। এ তো কারবারের সম্বন্ধ, দেওয়া-নেওয়া। পয়সা নিই গান গাই—ফুরিয়ে গেল!'

'তা আমিই বা কি এমন অন্য কথা বলেছিলুম? ব্যাখ্যানা করে কিছু বলেছিলুম কি? গাড়ি এসে দাঁড়াবে শুধু এই কথাই বলেছিলুম।'

তারপর বলে, 'ওলো, কারবারের কথাই হচ্ছে। সবই তো কারবার। দেওয়া-নেওয়া ছাড়া কি বল? ক্যালো কাঁড় মাথো তেল! আর গান গাওয়া—ও তো হল গে ভটচাযির পত্তর আড়াল—ও আমরা খুব জানি। মনকে আঁখি ঠারা। বয়স আমাদের কম হয়নি, বুঝলি! তা নয়, কথা হচ্ছে সেই তো মল খসালি, তবে লোকটা কেন ঢলালি! সেই কাজই যদি করবি তো ঢের বড় লোক— ঢের ছোকরাবাবু জুটিয়ে দিতে পারতুম।'

'তুমি ও জিনিস বুঝবে না মাসী। ন্যাবা হলে দুনিয়াসুদ্ধ হলদে দেখে। তোমরাও তেমনি—যা জানো, যা করে এসেছ তার বাইরে কিছু দেখতে শেখোনি। তোমাদের সঙ্গে তক্ক করে কোন লাভ নেই।' রাগ করে চলে আসে সুরো।

কিন্তু মতি একাই নয়। একদিন নানু এসে বলে, 'কী রে, এসব কি শুনছি! শেষে ঐ বুড়োটার ফাঁদে ধরা পড়লি!... সাগর সমুদ্দুর সব পেরিয়ে এসে নালার জলে ডুবলি!... তাই যদি মনে ছিল রাণী, কিবা দোষ করেছিল দাস!... এখনও, প্রতীক্ষায় আছি আমি ধৈর্য ধরি, যদি কৃপা করো অধম সেবকে— নিয়োজিব তুচ্ছ এই প্রাণ তোমার সেবায়। মাইরি বলছি, ঐ বুড়োর এঁটো পেসাদেও আপত্তি নেই!'

থিয়েটারী ঢঙেই কথাগুলো বলে, অর্ধ-পরিহাসছলে কিন্তু তার মুখ দেখেই বোঝে সুরো যে সে সত্যিই দুঃখিত হয়েছে।

'তুমিও ঐসব ছাইপাঁশ বিশ্বাস করলে নানুদা! মা বসে থাকে, মা বসে থাকে মায়ের সামনে একখানা দুখানা গান শোনে তারপর পঁচিশ টাকা গুনে দিয়ে চলে যায়। এর মধ্যে দোষটা কি?'

'ঐ পঁচিশ টাকায় কি তোর খুব দরকার? না হলে চলে না?'

'ধ্যা রে। তা কেন। তা নয়। বাড়ি

রোজগার কোনটাই বা খারাপ। যদি এটা বাড়তি পাওয়া যায়—'

'নিজেকে ঠকাস নি বোন!' নান্‌র গলার সুর পাল্‌টে যায়। কদাচিৎ গম্ভীর হয় সে। সুরো জানে যে খুব বিচলিত না হলে তার ভাঁড়ের মুখোশ সহজে খোলে না। আজ সে সত্যিই খুব দুঃখিত হয়েছে নিশ্চয়। খুব আস্তে আস্তে বলে নানু, 'মানুষ তখনই সবচেয়ে অধঃপাতে গেছে বুঝতে হবে—যখন সে নিজের কাছে নিজে মিছে কথা বলতে শুরু করে!... ওরে, এখানে আসি না আসি আমার একটা চোখ একটা কান তোর কাছে থাকে সর্বদা। তোর কথা কেন ভুলতে পারি না জানিস, তোকে নিয়ে এত মাথা ঘামাই কেন? তোর মতো মেয়ে আমি আমার এ দুনিয়ায় একটাও দেখিনি। দুটি মেয়ে-ছেলেকে আমি দেবীর মতো ভক্তি করি, একটি আমার বৌ, আর একটি তুই!... তোর এই হাল হল!... এর মধ্যে ঐ লোকটার পঁচিশ টাকার জন্যে কটা মুজ্‌রো গুর্‌কিয়ে নষ্ট করেছিস বলতো! ভাবছিস যে কেউ টের পায় নি? আমি জানি, সব নাম করে করে বলে দিতে পারি!... এখন যদি আমি ঐ পঁচিশ টাকা করে দিই রোজ—তুই ওকে এসো না বলতে পারবি? মা তোর বসে থাকে না সামনে এখন আর, তাও আমি জানি। তার অত সময় নেই!... তা ছাড়া তাকেও ও মিষ্টি কথায় ভুলিয়েছে কিছু। আধঘণ্টা নয়, গাড়ি আজকাল দেড়ঘণ্টা দুঘণ্টা এখানে দাঁড়াচ্ছে, প্রায় প্রত্যহই। এর মধ্যে এমনও এক একদিন গেছে—এক কলিও গাওয়া হয় নি, গানের গুন্‌গুনুনি পর্যন্ত শোনেনি কেউ। শুধুই গল্প করেছিস বসে। টাকাও হয়ত সবদিন নিস না। না নেওয়াই উচিত। কিন্তু কিসের জন্যে এত ক্ষতি করছিস বল তো? কার জন্যে? ও তোর উপযুক্ত নয় কোন দিক দিয়েই!'

ওর এই অস্বাভাবিক—ওর পক্ষে অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে কেমন যেন ভয় পেয়ে যায় সুরো, কাঁদোকাঁদো হয়ে বলে, 'সত্যিই বলছি নানুদা, বিশ্বাস করো, তোমার কাছে মিছে বলব না—তেমন কোন অন্যায় আমি করিনি। হ্যাঁ, গল্প করেছি ঠিক কথা, সবদিন গাওয়াও হয়ে ওঠেনি; তা সে সব দিনে টাকাও নিইনি ওঁর কাছ থেকে। গল্প করতে ভাল লাগে তা মানছি। কিন্তু তার বেশী কিছু নয়!'

'তাও জানি। তার মানে লোকটা পাকা খেলোয়াড়, টোপ গিললে কতটা নোল দিতে হয় সুতোতে তা জানে। এসব এইভাবেই শুরু হয়। তোদের মতো যারা ভাল মেয়ে, সৎ মেয়ে, তাদের টাকায় কেনা যায় না তাও ও জানে। তাই এই চাল চেলেছে। কিন্তু আর কি তুই ফিরতে পারবি, বুকে হাত দিয়ে সত্যি করে বল তো!'

চুপ করে থাকে সুরো। উত্তর দিতে পারে না। ফাঁদে-পড়া বিপন্ন হরিণীর মতো অসহায়ভাবে চেয়ে থাকে শুধু।

নানু বলে, 'যদি পারিস, যদি এখনও সময় থাকে—ফিরে আয় বোন। নইলে সেই জাতও যাবে পেটও ভরবে না। এর পর দেখবি আপসোসের সীমা থাকবে না!'...

কোথা থেকে খবর পেয়ে লক্ষ্মীবৌদি একদিন আসেন দেখা করতে। পাশে বসিয়ে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন, 'চিরদিন এমনি থাকতে পারবি না জানতুম। বয়সের ধর্ম একটা আছেই। অভাব যদ্দিন ছিল যুঝতে পেরেছিলি, এখন বোঝা শক্ত তাও জানি। তবু তুইও এমনি করে নোংরা মেয়েদের খাতায় নাম লেখাবি তা ভাবিনি।... এখনও সময় আছে হয়ত—গরীবের ছেলে-টেলে দেখে একটা মালা বদল করে নে না। এমন ভাল ছেলে ঢের পাবি যাকে তোর মা ঘরজামাই রাখতে পারবে।... সে তোর কাজ-কর্ম হিসেবপত্তরগুলোও দেখতে পারত—। তাতে আর যাই হোক—এমন আঘাটায় এঁদো পুকুরে ডুবে মরতে হত না।'

'তুমিও এইসব মিথ্যে দুর্নাম বিশ্বাস করলে বৌদি!' অভিমানক্ষুন্ন কণ্ঠে সুরো বলতে যায়। ওকে থামিয়ে দিয়ে বৌদি বলেন, 'দুর্নাম একেবারে শুধু শুধু রটে না রে। তবুও প্রথমটা বিশ্বাস করিনি, যে বলতে এসেছিল তার সঙ্গে ঝগড়াই করেছি। কিন্তু কান যে আর পাতা যাচ্ছে না ভাই। তাই একবার নিজের চোখে দেখতে এসেছিলুম। দেখেও গেলুম। সবটা যে মিথ্যে তা আমিই বা বলতে পারছি কৈ?'

'তুমি—তুমি দেখলে? কী দেখলে তুমি?' উত্তেজিত হয়ে ওঠে সুরো, বিস্মিতও হয়। কথাটা বুঝতে পারে না ঠিক।

'তোকেই যে দেখলুম। তোর মুখেই পড়লুম সব ঘটনাটা। নেশায় বুঁদ হয়ে আছিস। জাতধম্মটা পুরো যায় নি, সেও চোখ দেখে বুঝতে পারতুম কিন্তু দেরিও বোধহয় আর নেই। দ্যাখ, পারিস শক্ত হতে একবার চেষ্টা করে দ্যাখ। কী আর বলব!... তবে আর হয়ত ভাই আমার আসা হবে না, তোর বিয়ে-থা না হলে তোরও আর আমাদের ওখানে না যাওয়াই ভাল। কানের কাছে কানাইয়ের বাপা—মেয়ের শ্বশুরবাড়ি—এমনিতেই দিনরাত তরস্ত থাকতে হয়। ছেলের বিয়ে দিতে হবে—'

অর্থাৎ ওর এতদিনের অভ্যস্ত পুরাতন জীবনের শেষ অবলম্বনটুকুও বুঝি আর থাকে না।

তাহলে কি সত্যিই ফাঁদে পড়েছে? একেই কি প্রেম বলে—তার গানের ভাষায় পীরিত বলে? 'ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর, পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর'—তারও কি সেই দশা হল? এতদিন যাদের আপন বলে জানত সে—তাদের সকলকে পর করে দেওয়াচ্ছে ও লোকটা কি ইচ্ছে করেই? যাতে কোন অবলম্বন বা আশ্রয় আর কোথাও না থাকে! ফেরবার সব পথ ঘুরিয়ে দিচ্ছে নিজের দিকে টেনে নেবার সুবিধে হবে বলে—এই একটিই পথ যাতে খোলা থাকে? লোকটা কি সত্যিই খেলোয়াড়?

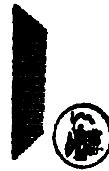
কিন্তু তা জানলেও কি এখন আর ফিরতে পারবে?

বঁড়শি বড় বেশী গেঁথে গেছে না কি?

মাও উশখুশ করছে। তার কানেও পেঁছেছে কথাটা। নিহাৎ উপরি নগদ পঁচিশটা করে টাকা আসছে বলেই কিছু বলে নি এখনও। কিন্তু যেদিন শুনবে যে এর মধ্যে সত্যিই চার পাঁচটা বায়না ফিরিয়ে দিয়েছে মেয়ে, সেদিন তুলকাম বাধিয়ে তুলবে একেবারে। হয়ত অপমানই করে বসবে অত বড় লোকটাকে। মা সব পারে। আর তখন

চটপট কাজ?
মার্কেন্টাইল
ব্যাঙ্কে
পাবেন

প্রতিটি শাখায়
প্রত্যেকের সুযোগ
সুবিধা লক্ষ্য
রাখার জন্য সুদক্ষ
কর্মচারী আছেন।



মার্কেন্টাইল লিঃ

কলিকাতা প্রধান।

৮, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১

১৪, বড়িয়াহাট রোড, কলিকাতা-১৯
পি-৩৭৫, ব্লক'বি', নিউ আলিপুর,
কলিকাতা-৫৩
২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯
৫১, গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড, হাওড়া

কেশুত
কেশুত তেল কেশ তৈল
কলিকাতা-১

সুরোরও কিছু বলবার মুখ থাকবে না। নিজের ফাঁদে সে নিজেই পড়ে গেছে।...

অনেক ভাবল সে। শশীবৌদি যেদিন গেলেন, সেদিন সারারাত ঘুমোতে পারল না—শুয়ে ছটফট করল শুধু। ঐ লোকটা আর আসবে না, আর দেখতে পাবে না কোনদিন, ভাবলেই যেন বুকের মধ্যেটায় কেমন করে, চোখ ফেটে জল আসে। প্রথম দিক আর সে আকুলতা আর নেই—অনেকটা থিতিয়ে গেছে এর মধ্যে, তাই ভেবেছিল যে নেশা কথাটা এরা ভুল বলছে। কিন্তু এখন বুঝল যে তা আরও বেড়েছে। যতক্ষণ তাঁরি সামনে থাকে গল্প করে, গান গায়—ততক্ষণ যেন অন্য জগতে থাকে সে, সবটাই তার মনের জগৎ, স্বপ্নের জগৎ। সমস্ত সময়টা এক অনির্বচনীয় সুখের মধ্যে ডুবে থাকে। কী পেল আর কী পেল না—তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। যখন উনি চলে যান তখন থেকে সারাক্ষণ আসন্ন মিলন দিনের চিন্তায় ডুবে থাকে—কী কী আজ বলা হল না, কোন কোন কথা কাল বা আগামী দিনে বলবে—শুধু এই চিন্তায় থাকে। সেও এক অতীন্দ্রিয় জগৎ। তাঁর চিন্তায় তাঁর সান্নিধ্যরসে ডুবে থাকে বলেই দৈহিক জৈবিক আকুলতা অতটা অনুভব করে না। কিন্তু এও নেশাই। নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে বলেই অপেক্ষাকৃত স্থূল আকর্ষণগুলো এড়িয়ে যেতে পারে। এখন, সেই নেশার বস্তু আর পাবে না—ভাবলেই যেন দেহের নাড়িতে নাড়িতে টান ধরে, বুকের মধ্যেটা কি যেন পিষে গুঁড়িয়ে দেয়। বোঝে যে আগের—প্রথম দিককার সে আকর্ষণ আরও বেড়েছে, প্রণয়ে পরিণত হয়েছে। কমেনি একটুও।...

তবু সারারাত ভেবে ও কেঁদে মন স্থির করেই ফেলে। আর না। এবার ছেদ টানতে হবে। পূর্ণচ্ছেদ। এমনিতেই যা ক্ষতি হবার তা হয়ে গেছে। তার এভাবে অনির্দিষ্টকাল চলতে পারে না। তার এতদিনের শিক্ষা সাধনা সব নষ্ট হতে বসেছে। নানুদা ঠিকই বলেছে, এতে কি লাভ হবে, কী পাবে সে! ঐ মানুষটাকে? কিন্তু তাহলে তো মাসির কথাই ঠিক হবে, সেই সাধারণ স্বৈরিণীর পর্যায়ে নেমে আসতে হবে। লোকে হাসবে আর টিটকিরি দেবে। কষ্ট আজ হলেও হবে, কাল হলেও হবে। যত দেরি হবে ততই বরং প্রতিকারের বাইরে চলে যাবে ব্যাপারটা। এমনিতেই যথেষ্ট হয়েছে, আর না। রঘুবাবুর মক্কেল বেশী ফেরে নি তাই রক্ষা তার স্বার্থে ঘা পড়লে সে মাকে খবরটা দিয়ে যাবেই। আর তা হলে—। না, মা বা অপর কেউ অপমান করার আগেই সে ওঁকে বুঝিয়ে বলে ইতি টেনে দেবে ওদের এই—কী বলবে? প্রণয়লীলা? না শুধু লীলায়।

সেদিন খুব মন দিয়ে গাইল সুরবালা। পর পর তিন চারখানা গান। রাজাবাবুর প্রিয় গান যেগুলো। দরদ দিয়ে, প্রাণ দিয়ে গাইল। কিন্তু শুধু কি এই পরিশ্রমেই ওর মুখে ঘন ঘন রক্তোচ্ছ্বাস ফুটে উঠছে, ললাটের প্রান্তে চূর্ণ কুন্তলগুলিকে আশ্রয় করে বার বার স্বেদরেখা দেখা দিচ্ছে—যা রাজাবাবুর অনভ্যস্ত হাতের পাখা চালানোতেও মিলোচ্ছে না? এমন গল্প বাদ দিয়ে শুধুই গান গাওয়া—এও অস্বাভাবিক কতকটা।

রাজাবাবু গানে বাধা দেন না, কিন্তু একদৃষ্টে ওর মুখের দিকে চেয়ে আজকের এই আচরণের অর্থ খোঁজবার চেষ্টা করেন। একটা বড়রকমের খট্‌কা লাগে তাঁর মনে। কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ হয়, মানসিক অস্বস্তি। কোন বিপর্যয়ের সংকেত পান—কিন্তু তার আকারটা ধরতে পারেন না।

তবু নিজে থেকে কোন প্রশ্ন করেন না। শ্রান্ত হয়ে এক সময় সুরো নিজেই থামে। বিচিত্র দৃষ্টিতে ও'র মুখের দিকে চেয়ে বলে, 'হল?'

'হল বৈকি! তা হঠাৎ আজ এত করে গান শোনানোর অর্থ?'

'গান শুনতেই তো আপনি আসেন। গান শোনানোরই তো কথা। এতগুলো করে টাকা খরচ করেন কেন নইলে?' সুরবালা তেমনিভাবেই প্রশ্ন করে, তেমনিভাবে ও'র মুখের দিকে চেয়ে থাকে। কিন্তু তবু সে যে আরও বেশী ঘামছে, এবং হাত দুটোও—প্রথম দিনের মতো অত না হলেও বেশ কাঁপছে—তাও রাজাবাবুর নজর এড়ায় না।

মুখে বলেন, 'গান ছাড়া তুমি যে কথাও এত ভাল কইতে পারো তা তো তখন জানতুম না। এমন হলে শর্তটা দুরকমই করে রাখতুম—গান গাওয়া কিম্বা গল্প করা।'

'তা হয়ত জানতেন না কিন্তু আধঘণ্টার শর্তটা মনে আছে তো? এখন কতখানি করে সময় লাগছে সেটা ভেবে দেখেছেন? আপনার ঘণ্টা কতক্ষণে হয়?'

চেষ্টা করে কঠিন হতে গিয়ে একটু বেশীই বুঝি কঠিন শোনায় গলাটা।

অন্তত সুরবালার তাই মনে হয়।

'তা বটে।' নিমেষে যেন অপ্রতিভ হয়ে ওঠেন রাজাবাবু। কোথায় কী একটা ঘটেছে অঘটন, বড় রকমের একটা কিছু গোলমাল, বুঝতে পারেন কিন্তু তা নিয়ে আর ঘাটাতে চান না। তিনি তাঁর দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় বুঝেছেন যে, এসব ব্যাপারে প্রত্যক্ষ আলোচনা এড়িয়ে যাওয়াই ভাল, সময় দিলে আপনিই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, এখন গরম অবস্থায় ঘা দিলে লাল লোহা পেটানোর মতো অবস্থা হবে, গরম লোহার টুকরোই ছিটকে উঠবে। সে টুকরো আঘাতকারীর গায়ে ছিটকে পড়াও অসম্ভব নয়। মুখে বলেন, 'খুবই অন্যায় হয়ে যাচ্ছে। বুঝতে যে পারি না তা নয়। রোজই ভাবি সামলে নেব—এখানে এলে যেন সব ভুলে যাই।... আচ্ছা, আজ উঠি—তাহলে, আজ এমনিতেই ঘণ্টাখানেক বোধহয় হয়ে গেছে।'

টাকাটা প্রত্যহ তাকিয়ার তলায় রেখে যান যাবার আগে। আজও তার অন্যথা হয়নি। কখন রেখে দেন টেরও পায় না সুরবালা। অন্যদিন হাসি হাসি মুখে সেও সঙ্গে যায় দরজা পর্যন্ত, এগিয়ে দেয়।

সকল ঋতুতে অপরিবর্তিত ও অপরিহার্য পানীয়
চা
কেনবার সময় 'অলকানন্দার' এই সব বিক্রয় কেন্দ্রে আসবেন
অলকানন্দা টি হাউস
৭, পোলক স্ট্রীট কলিকাতা-১
২, লালবাজার স্ট্রীট কলিকাতা-১
৫৬, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ কলিকাতা-১২
॥ পাইকারী ও খুচরা ক্রেতাদের অন্যতম বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান ॥

ডেন্টল
(টুথ-এক ভুপাস)
দাঁত ও মাঢ়ীর ব্যথায় দ্রুত আরাম দেয় এবং দাঁতের গোড়া ও মাঢ়ীর ফোলা দূর করে।
বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা . বোম্বাই . কানপুর . দিল্লী

আজ আর গেল না, সেইখানেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

খট্‌কাটা আরও প্রবল হয়। সংশয়টা শঙ্কায় পরিণত হতে চলেছে যে!... অজানা একটা বিপদেরই আভাস পান বুঝি।

'তাহলে কাল?' দরজার কাছে গিয়ে থমকে প্রশ্ন করেন। অন্যদিনও করেন—নিতান্তই মামুলি প্রশ্ন হিসেবে—উত্তর যে কী হবে তা জানাই থাকে। কিন্তু আজ তাঁরই কণ্ঠ কেমন দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

'না, কাল বিকেলে আমার বায়না আছে।'

কোনদিন বিকেলে মুজরো থাকলে পরের দিনের কথা সুরোই বলে দেয়। দিত অন্তত। ইদানীং তো রোজই আসছেন, সুরবালার যে মুজরো আছে বা থাকতে পারে তাই যেন তাঁরা ভুলে গেছেন। রাজাবাবুও—সুরবালা নিজেও।

রাজাবাবু আজও তাই সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। পরে কবে আসতে পারেন—পরের দিন কি না—সেটা ওর মুখ থেকেই শুনতে চান।

'দেখুন', কোনমতে যেন মরীয়া হয়েই বলে ফেলে সুরো, 'দিনকতক শখ হয়েছিল একটা, তা সেটা তো ভালভাবেই মিটেছে। এবার আমাকে বরং ছুটি দিন। আমার কাজ-কারবারের খুব ক্ষতি হচ্ছে। এর মধ্যে—এর মধ্যে অনেক কটা বিকেলের মুজরো আমি ফিরিয়ে দিয়েছি। এমন হতে থাকলে দুদিন বাদে বদনাম হয়ে যাবে যে আমি আর গাইতে পারছি না। কেউ আর ডাকবেই না।'

'তাই নাকি? ফিরিয়ে দিয়েছ? কৈ, তা তো জানতুম না। বলো নি তো একবারও। তোমার অবসর সময়ে শুনব—এই রকমই আমার ইচ্ছে ছিল—যেদিন বাইরে কোথাও গাওনা থাকবে না। সেই রকমই বলেছিলুম তোমাকে। ইস! খুব অন্যায় হয়ে গেছে। তা তুমি ফিরিয়েই বা দিলে. কেন? আমাকে বললেই পারতে।'

'কেন দিলুম তা জানি না। বোধ হয় আমার গান শোনবার শখ আপনার—তার চেয়েও বেশী শখ আমার—আপনাকে শোনানোর।... যাই হোক, এ আসরটা নেশার মতো পেয়ে বসেছে আমাকে। সেই জন্যেই বলছি—এর চেয়ে বেশী অনিষ্ট হবার আগে আমাকে অব্যাহতি দিন। আপনারা বড় মানুষ, এমন কত শখ হয় আবার মিটে যায়—এতদিনে আপনারও যাবার কথা। আর কেনই বা মিছিমিছি এই এতগুলো করে টাকা নষ্ট করবেন। আবার কোন নতুন শখ, নতুন মানুষ দেখা দেবে জীবনে—এ পালা এইখানেই চুকিয়ে দিন।'

চোখের জল অপরিহার্য, সে জল চোখের প্রান্ত পর্যন্ত এসে ছলছলও করে। কিন্তু কঠিন আসনে সেইখানেই বেঁধে রাখে সে। এখন দুর্বল হয়ে পড়লেই সর্বনাশ। লোকটা পেয়ে বসবে। কঠোর হয়ে ফেরাতে হবে, কঠোর হয়েই থাকতে হবে শেষ পর্যন্ত।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে শোনেন রাজাবাবু। আবার দু পা পিছিয়ে এসে ঘরের মেঝেতে পাতা জাজিমের ওপর এসে দাঁড়ান। একটু কি ভাবেন যেন. তারপর বলেন, 'একটা কথা বলব? আমার শখ আজও মেটেনি। বড়-লোকের দুদিনের শখ হলে তো আমিই আসা বন্ধ করতুম। বরং—বরং এ যেন আমাকেও নেশার মতো পেয়ে বসেছে। ঘড়িতে দুটো বাজলেই মৌতাতের জন্যে ছটফট করি।... আমাকে শোনানোয় যদি তুমিও আনন্দই পাও, তাহলে এক কাজ করো না কেন, ও বাইরের মুজরো তুমি ছেড়েই দাও না। আমি তোমার সঙ্গে মাসিক বন্দোবস্ত করে নিচ্ছি—ফি মাসে পাঁচশ টাকা করে দোব।... দ্যাখো, মুজরো কোন মাসে কি পেলে না পেলে—তার অনেকটা অনিশ্চিত তো। এ পাঁচশো টাকা হাজাশুকো নেই। সময়ও আমি বেশী চাইছি না—এই যেমন আসছি, তেমনিই আসব।'

'তারপর? এ কূল ও কূল যাবে যখন?' কেমন যেন যান্ত্রিকভাবেই প্রশ্নটা করে সুরবালা, রাজাবাবু যে প্রস্তাবটা দিয়েছেন তার সম্যক অর্থ বা সে কি বলছে তা না বুঝেই। কথাগুলো যেন আপনিই বেরিয়ে যায় মুখ দিয়ে।

'মানে, মরে যাবো যখন?... যদি হঠাৎ মরে যাই—তোমার নামে লেখাপড়া করে দিচ্ছি—এক বছরের মধ্যে মানে এককালীন থোক দশ হাজার টাকা তোমাকে দেবে আমার এস্টেট থেকে। আর বেশীদিন যদি বাঁচি—আমি নিজে তোমাকে বাড়ি কোম্পানীর কাগজ এমন করে দিয়ে যাবো—তোমার কোন অভাব থাকবে না।'

যেন চমকে ওঠে একটা ঘুমের ঘোর থেকে সুরবালা, বলে, 'না না—ছিঃ, আমি সে কথা বলছি না। আপনার মরবার কথা আমি একবারও ভাবিনি। আমার শিক্ষা, আমার একটা নামডাক যা হয়েছে সব খুইয়ে বসে থাকব—আপনারও শখ মিটে আসবে একদিন—সেই কথাই বলছি। না, সে হয় না। আপনি আজ আসুন—কটা দিন যাক। আমার—আমার খুব ক্ষতি হয়েছে, হচ্ছে—মাইরি বলছি। এমনভাবে চললে, মুজরো নিলেও ব্যাভ্রম হবো হয়ত—গাইতে পারব না। কতদিন মাসীর ওখানে যাইনি। সবাইকার কাছ থেকে দূরে চলে যাচ্ছি। সবাই বদনাম দিচ্ছে, অন্য বদনাম। আপনি দয়া করে এবার রেহাই দিন আমাকে।'

আর নিজেকে সামলাতে পারে না সে, এতক্ষণের বাঁধ-দেওয়া অশ্রু অঝোরধারে ঝরে পড়তে থাকে।

সেই অশ্রু আর কণ্ঠের সেই আকুলতাতে রাজাবাবুর মতো ধীর স্থির ব্যক্তিও অকস্মাৎ তাঁর সমস্ত স্বাভাবিক স্থৈর্য হারিয়ে ফেলেন বুঝি। আর তার ফলে যা কখনও করেন না—এতকালের মধ্যে যা কখনও করেন নি—তাই করে বসেন। দ্রুত কাছে এসে নিজের চুনোট করা চাদরের প্রান্তে ওর কণ্ঠ কপোল ললাট—চোখের জল আর ঘাম মুছিয়ে নিয়ে চাপা গাঢ় কণ্ঠে বলেন, 'আর তা হয় না সুরো, আমরা কেউই কাউকে ছেড়ে থাকতে পারব না। স্বয়ং রাধারাণী—আমার মদনমোহনই আমাদের বেঁধে দিয়েছেন অদৃশ্য বাঁধনে। আমি তোমাকে সময় দিচ্ছি—কথা দিচ্ছি সাতদিন আর আসব না—তুমি নিজের মন বুঝে দ্যাখো। পারো ভুলতে—ভুলে যেও। দেখাও করো না—নিচে থেকেই ফিরে যাবো। নইলে পাঁচশ কেন—যদি তোমার মাকে ভোলাতে হয় আরও একশ দুশো টাকা বেশীও দিতে রাজী আছি। ভেবে দেখো—'

এবার আর তিনি দাঁড়ান না, দ্রুত নেমে চলে যান। আর সেই বহু ঈপ্সিত অথচ অপ্রত্যাশিত দুর্লভ স্পর্শে রোমাঞ্চিত হয়ে সুরবালা দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপতে থাকে। কিছুই যেন বুঝতে পারে না, কিছুই যেন মাথাতে যায় না। দেখতেও পায় না কিছু। চোখের জলে স্বেদবিন্দু মিশে ঘরদোর আসবাব দিনের আলো—বাইরের সমস্ত পৃথিবী আর সমস্ত জীবন একাকার ঝাপসা হয়ে যায়।

(ক্রমশঃ)

— প্রকাশিত হইল —

শ্রীমণীন্দ্র চক্রবর্তী প্রণীত

ছোটদের সঙ্গীতের আর একটি অসাধারণ গ্রন্থ

গানের সহজ পাঠ

২য় ভাগ—মূল্য ৩·৫০, ঐ ১ম ভাগ—২৲

শ্রীসন্ত প্রকাশন

২৫৪, প্রিন্স আনোয়ার শা রোড,
কলিকাতা—৪৫



আয়ুর্বেদীয় উপাদানে প্রস্তুত

বলডেক্স

চুল ওঠা বন্ধ করে
নতুন চুল গজায়

বেষ্ট কেমিক্যাল কর্পোরেশন· কলিকাতা-৩৭

ব্ল্যাক ম্যাজিক

অম্বুজেন্দ্র ঘোষ

বেশ কিছুদিন আগেকার কথা। ঘটনাটা ঘটে গিয়েছিল পশ্চিমবাংলার এক অখ্যাত গাঁয়ে। সবাই হায়-হায় করে উঠেছিল। গাঁয়ের লোক একবাক্যে বললে, 'পরাণের বরাত ভাল, তাই এ যাত্রা রাধারাণীকে ফিরে পেল।'

রাধারাণী পরাণের তৃতীয় পক্ষ। কাঁচা বয়েস, তার ওপর চোখ ঝলসানো রূপ। গাঁয়ের ছেলে-বুড়ো লোলুপদৃষ্টিতে চেয়ে থাকত ওর দিকে। অথচ পোড়াকপাল মেয়েটার। সারা গ্রাম যার জন্য সব কিছু বিকিয়ে দিতে পারত, পরাণ তাকে দিলে না কিছুই। রাত্রিবেলা মদ গিলে এসে পরাণ অমানুষিক অত্যাচার করত মেয়েটার উপরে। মারধোর, অত্যাচার, বাদ ছিল না কিছুই। লাঞ্ছনা সহ্য করতে না পেরে রাধারাণী শুধু কাঁদতো, কিন্তু স্বামীকে ত্যাগ করার কথা মনেও আসেনি কোনদিন ওর। অথচ কেই বা না জানতো যে মাদার মণ্ডল, গণপতি পরামানিক এবং রতন কামারের মত ডাকাবুকো লোকেরা পর্যন্ত ওকে ফুসলে নিয়ে যাবার জন্যে কত প্রলোভনই না দেখিয়েছে।

নিঝুম দুপুরবেলা। একদিন এক সাধু এল রাধারাণীর বাড়ীতে। রাধারাণী একা। সাধু বললে, "এই নে বেটি। এই শিকড়টা রাখ। রাতে তোর স্বামী ঘুমিয়ে পড়লে, তুই চান করে শিকড়টা মাথার চুলে গুঁজে শুয়ে পড়বি। ব্যাস। দেখবি সকাল-বেলা থেকেই তোর লম্পট স্বামী বিলকুল বদলে গিয়েছে। ও তোকে ভালবাসবে—সোহাগ করবে।"

রাত দুপুরে পরাণ বুঁদ হয়ে বাড়ী ফিরেছে। তবুও রাধারাণীর মনে আজ কী আনন্দ! আজই এ রাতের কবর হবে। ভাবতে ভাবতে রাধারাণী কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে হুঁস নেই। হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দে ঘুম ভেঙে গেল ওর। ধড়মড় করে উঠে বসল পরাণও।

কড়্‌কড়্‌ কড়াৎ—মড় মড় মড়। বাইরে অদ্ভুত শব্দ। ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে এল ওরা দুজনে। আশ্চর্য! দেখল বাড়ীর চারপাশে দরমা দিয়ে ঘেরা বেড়ার দরজাটা আপনা-আপনি আছড়াচ্ছে। ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার জন্য অসম্ভব চেষ্টা করছে যেন। অথচ ধারে কাছে মানুষজন নেই কোথাও। ইতিমধ্যে ঐ শব্দে পাড়ার লোকের ঘুম ভেঙে গিয়েছে। সবাই জড়ো হয়েছে সেখানে। এতক্ষণে রাধারাণীর হুঁশ হল। স্নান করে চুলে বেঁধে রাখার জন্য যে শিকড়টা সাধু দিয়ে গিয়েছিল, রাধারাণী সেটি ঐ দরজার গায়ে গুঁজে রেখেছিল। রাতে চুলে গুঁজতে তার মনেই ছিল না। এসব তারই প্রতিক্রিয়া নয়তো!

রাধারাণীর কাছ থেকে ব্যাপারটা জানতে পেরে সবাই লাঠি আর লণ্ঠন নিয়ে তৈরী হল। বেড়ার দরজা ততক্ষণে ছিঁড়ে বেরিয়ে গিয়ে বন-বাদাড় ভেঙে হু-হু করে ছুটে চলেছে পূর্বদিকে। গাছপালা খানা-খন্দ কিছুতেই আটকাচ্ছে না। দুরন্ত গতি। পেছনে পেছনে ছুটেছে গাঁয়ের লোক। কিছু পরে দরজাটা ঢুকে গেল ছোট্ট একটা অন্ধকার ঝোপের মধ্যে। ঐখানেই শেষ। সামনেই সেই উলঙ্গ সাধু উৎকণ্ঠিতভাবে অপেক্ষারত।

আর যায় কোথায়। সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ল সাধুর উপরে। "বল, কি উদ্দেশ্য ছিল।" পিঠেও পড়ল বেশ কয়েক ঘা। বেকায়দায় পড়ে অবশেষে সাধু স্বীকার করল যে রূপসী রাধারাণীকে ফুসলে নিজের কাছে নিয়ে আসার জন্যই সাধু তাকে শিকড় দিয়েছিল চুলে গুঁজতে। ভাগ্য ভাল রাধারাণী ওটি বেড়ার গায়ে গুঁজে রেখেছিল। নতুবা নিশীথ রাতে বেড়ার বদলে রাধারাণীকেই চলে আসতে হত সাধুর আস্তানায়। মন্ত্রপড়া ঐ শিকড়টির আকর্ষণ তীব্র—অপ্রতিরোধ্য।

পাড়ার লোক সাধুকে উত্তম-মধ্যম দিয়ে সেই রাত্রেই তাকে গাঁ ছাড়া করল।

আপাতদৃষ্টিতে গল্প মনে হলেও আসলে এটি সত্য ঘটনা। সেদিন পাড়ার লোক সাধুকে মেরে গাঁ ছাড়া করলেও সাধুর ঐ 'আশ্চর্য বিদ্যা'কে একেবারে দেশছাড়া করতে পারেনি। অসংখ্য রূপ এবং বিচিত্র প্রকৃতি ও ভঙ্গির মধ্য দিয়ে সুযোগ পেলেই এ জিনিস বিকটভাবে আত্মপ্রকাশ করে। এরই নাম 'ডাইনী বিদ্যা' ভাষান্তরে 'কালো ম্যাজিক' বা 'ছু-মন্তর'।

কালো ম্যাজিক সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই যে প্রশ্নটি মনে জাগে তা হচ্ছে এই যে, এই 'উদ্ভট' যাদু কি শুধুই ভারতবর্ষের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত? বিজ্ঞান যেখানে তার অগ্রগতির সোপান গড়ে তুলেছে সেই পাশ্চাত্য মহাদেশেও কি কোনদিন এর কোনও অস্তিত্ব ছিল বা আছে? কতকগুলি ঘটনার ও তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানই বর্তমান আলোচনার উদ্দেশ্য। ওদেশ এবং এদেশে এই 'অপবিদ্যা' প্রয়োগের ভিন্নতর কারিগরীর গতি-প্রকৃতি নির্ণয় এবং তার চরিত্র বিশ্লেষণই এর লক্ষ্য। তবে একটি কথা এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে সর্বত্র ক্ষতি করার উদ্দেশ্যেই এই বিদ্যা প্রয়োগ করা হয়।

আমাদের দেশে কখনও 'মন্ত্রপড়া শিকড়, বা মাদুলী', কখনও 'দৃষ্টিপাত', কখনও 'নিশিডাক', কখনও চুলকাটা বা 'বাণমারা' ইত্যাদির মধ্য দিয়ে 'কালো ম্যাজিকের খেলা' সংঘটিত হয়। ইউরোপে সব সময় ঠিক সরাসরি এইভাবে করা হয় না। সামান্য রূপ ও রঙের বদল। আসলে উভয়েরই লক্ষ্য এক—অনিষ্ট সাধন। একটি উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটি পরিষ্কার হবে।

ইংলণ্ডে কোনও এক উইচ বা ডাইনী রুনস নামে এক ধরনের রহস্যময় হরফের সাহায্যে তাদের বিদ্যা প্রয়োগ করে। কোন কারণে কোন ব্যক্তির উপরে যদি ডাইনীদের ক্রোধ উৎপন্ন হয় তবে তারা রুনস হরফে কটি কথা লিখে (কি লেখে তা একমাত্র তারাই জানে) সেই ব্যক্তির কাছে তা যেন তেন প্রকারেণ পৌছে দেয়। লেখাগুলি পাওয়ার পর থেকেই সেই ব্যক্তি অজ্ঞানিতভাবে সমস্ত কাজেই অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। কিছু-দিন পরে ডাইনীরা একটি অদ্ভুত ধরনের ক্যালেণ্ডার লোকটির কাছে পাঠিয়ে দেয়। এই ক্যালেণ্ডারটিতে একটি বিশেষ তারিখের পরে আর কোন পাতা থাকে না। মনে করা যাক তারিখটি ৩১শে জানুয়ারী। অর্থাৎ ৩১শে জানুয়ারী পর্যন্ত ঠিক রেখে ক্যালেণ্ডারের অন্য সমস্ত পাতা ডাইনীরা ছিঁড়ে নেয়। যাই হোক, এই অদ্ভুত ক্যালেণ্ডারটি পাওয়ার পর থেকে সেই ব্যক্তির সব সময়েই মনে হয় যে তাকে কোনও 'অদৃশ্য শয়তান' যেন পাহারা দিয়ে বেড়াচ্ছে। কে যেন তাকে অনুসরণ করছে, কে যেন ডাকছে—ইশারা করছে—ইত্যাদি। ঠিক ৩১শে জানুয়ারীর দু-একদিন আগে থেকে এই অদৃশ্য শয়তান উধাও হয়ে যায়। সেই ব্যক্তির তখন আর তেমন কিছু মনে হয় না। অবশেষে ৩১শে জানুয়ারী সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। আশ্চর্য! মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তেও সে বুঝতে পারে না কেন তার এমন হল। এই হল

ডাইনীবিদ্যা বা ব্ল্যাক ম্যাজিক। এই ধরনের ডাইনীদের কথা লিখতে গিয়ে একজন প্রখ্যাত ইংরাজ লেখক ডেভিস তাঁর একখানি গ্রন্থে একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন।

একবার এক ডাইনী, ডাইনীবিদ্যার উপরে একখানি গ্রন্থ রচনা করে কোন এক সংবাদপত্র সম্পাদককে বইখানির একটি আলোচনা সংবাদপত্রে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করে। সম্পাদক মহাশয় সেই বইখানিকে গালাগালি দিয়ে একটি কড়া সমালোচনা লেখেন। স্বভাবতঃই তিনি তখন সেই ডাইনীর বিষনজরে পড়ে যান। অতঃপর ডাইনী রুনস নামক অদ্ভুত হরফের সাহায্যে সম্পাদকের প্রাণ-সংহার করেন। খাস ডাইনীই যে গ্রন্থখানির রচয়িতা সম্পাদক মহাশয় সম্ভবতঃ তা জানতেন না।

সমগ্র ইউরোপ মহাদেশে একদিন অগণিত ডাইনী ডানাপিঠেপণা করে বেড়িয়েছে। মধ্যযুগ থেকে শুরু করে ঊনিশ শতক পর্যন্ত চার শতাব্দী ধরে ওখানে ছিল ডাইনীদের দোর্দণ্ড প্রতাপ ও প্রভাব। এদের কথা লিখতে গিয়ে মিঃ গিলিয়ান টিনডেল তাঁর এ হ্যান্ডবুক অন উইচেস গ্রন্থে লিখেছেন যে—

> — Its European history, from the middle ages to the eighteenth century, belongs almost exclusively to the dark side of life : it is a saga of ignorance, distortion, fear, brutality and generally grotesque behaviour on the part of both those accused of witchcraft and those who accused them.

কোন কোন সমীক্ষকের মতে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে ইউরোপে প্রায় ৯০ লক্ষ ডাইনীর অস্তিত্ব ছিল। এখনও এদের সংখ্যা খুব কম নয়। এদের সম্পর্কে সমীক্ষা চালিয়ে সেঞ্জ ইওয়ান তাঁর উইচ হানটিং অ্যান্ড উইচ ট্রায়ালস, লন্ডন অ্যান্ড নিউ ইয়র্ক, ১৯২৯ গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে ১৫৪২ সাল থেকে ১৭৩৫ সাল পর্যন্ত ইংলণ্ডেই প্রায় এক হাজারেরও বেশী সংখ্যক ডাইনীর বিচার হয়েছে আদালতে। এখনও পর্যন্ত যে ওদেশে কিছু কিছু ডাইনীর অস্তিত্ব আছে সম্প্রতি তার একটি উল্লেখযোগ্য প্রমাণ পাওয়া গেল। একালে বৃটেনের বিজ্ঞতম এবং প্রাচীনতম উইচ বা ডাইন, ৭৬ বৎসর বয়স্ক ডাঃ গার্ডেনার বলেছেন যে, কম-বেশী ১৫০ জন ডাইনী এখনও ইংলণ্ডে আছে।

আফ্রিকা মহাদেশের দিকে দৃষ্টি মেলে ধরলে দেখতে পাব যে সেখানে ডাইনীদের প্রচণ্ড আধিপত্য। শোনা যায় যে আফ্রিকার উইচ ডক্টরদের স্থান কৃষ্ণকায় ব্যক্তিদের মধ্যে 'প্রধান'-এর ঠিক পরেই। এদের কার্যকলাপ এবং শক্তি সম্পর্কে একটি পরিচিত গল্প এস্থলে উল্লেখনীয়। একবার একজন শ্বেতকায় ব্যক্তি এক উইচ ডক্টর-এর বাড়ীতে থুথু ফেলে চলে আসে। আর যায় কোথায়! ডক্টর-এর মাথায় জ্বলে উঠলো আগুন! ব্ল্যাক-ম্যাজিকের 'ছু-মন্তর' বলে সেই শ্বেতকায় ব্যক্তির ছেলের মুখ দিয়ে অনবরত থুথু বেরোতে লাগল। ক্রমে ক্রমে ছেলেটির হল ধনুষ্টঙ্কার। ডাক্তাররা সবাই জবাব দিল। ছেলে মর-মর। অবশেষে সেই শ্বেতকায় ব্যক্তি দৌড়ে গিয়ে উইচ ডক্টর-এর পা জড়িয়ে ধরল। "দয়া করে বাঁচিয়ে দিন আমার ছেলেকে—আমার অন্যায় হয়েছে।" এতক্ষণে ডক্টর-এর রাগ কমল। নিজের মুখ থেকে খানিকটা থুথু বার করে খেতে দিল শ্বেতকায় ব্যক্তির ছেলেকে। ডাইনীর থুথু খেয়ে ছেলে সেরে উঠল। বিষে হল বিষক্ষয়।

আমাদের দেশেও অনেকটা এই ধরনের ঘটনার নিদর্শন পাওয়া গেছে। একটা ঘটনা বলি। বেশ কিছুকাল আগে ঘটনাটি ঘটে-ছিল মাদ্রাজ শহরের কাছাকাছি একটি গ্রামে।

স্থানীয় এক ভদ্রলোকের যুবতী স্ত্রী গর্ভবতী হয়েছেন। দশ মাস দশদিন কেটে গেল অথচ ভদ্রমহিলা সন্তান প্রসব করলেন না। প্রতি মুহূর্তে প্রসব বেদনা ভোগের মধ্য দিয়ে আরও দুটি মাস কাটল। অবশেষে বড় বড় ডাক্তার বদ্যি পর্যন্ত রোগের কিনারা করতে না পেরে নিয়ে আসা হল এক বুড়ো ওঝাকে। ওঝাজী ভাল করে পরীক্ষা করে নিয়ে বললেন যে গর্ভধারণের মাস তিনেকের মধ্যেই যুবতীকে কোন ডাইনী বাণ মেরেছিল। ফলে প্রসব যন্ত্রণা সত্ত্বেও সন্তান ভূমিষ্ঠ হতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত ওঝাটির পরামর্শে এবং সাহায্যে নিয়ে আসা হল আর একজন ডাইনীকে। উলটো বাণ মেরে ডাইনী বাণ তুলে আনল। মেয়েটি মা হল। এখানেও ঠিক একই অবস্থা। বিষে-বিষক্ষয়।

পৃথিবীর সব দেশের অধিকাংশ মানুষের মধ্যেই একটা 'বিশ্বাস' প্রচলিত আছে যে সাধারণতঃ সমাজের নিম্নশ্রেণীর মধ্যেই 'ডাইনী' দেখা যায়। অর্থাৎ নিম্ন-শ্রেণীর লোকেরাই ব্ল্যাক-ম্যাজিক রপ্ত করে থাকেন এবং তাঁরাই ওই ম্যাজিকের শক্তিকে বিশ্বাস করেন। এই ধারণা ' বা বিশ্বাস ভ্রান্ত। তামাম দুনিয়ার ডাইনীবিদ্যার খেলা বা ব্ল্যাক-ম্যাজিকের কুখ্যাত কেরামতির ইতিহাস উদ্ধার করে একথা প্রমাণ করে দেওয়া যায় যে একদা সমাজের উচ্চমঞ্চেও এ বিদ্যা তার আসন করে নিয়েছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপের উচ্চমহলের বেশ কিছু খানদানী লোক নিছক ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করবার জন্য ডাইনী বিদ্যার সাহায্য নিয়েছিল। ওয়েস্ট মুরল্যাণ্ড-এর আর্ল তার বাবাকে ধ্বংস করে জুয়ার দেনা মেটাবার জন্য বাবার ধন-সম্পত্তি হস্তগত করতে ব্ল্যাক-ম্যাজিকের সাহায্য নিয়েছিলেন এবং সফলও হয়েছিলেন। রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্য ডাইনীবিদ্যার আশ্রয় নেবার দৃষ্টান্তও ওদেশে আছে। এলিস কিটলার নামে এক বনেদী পরিবারের আইরিশ যুবতী তাঁর তৃতীয় স্বামীর দ্বারা অভিযুক্তা হয়ে আদালতে 'কুহকিনী নারী' হিসাবে প্রমাণিত হয়েছিলেন এবং শাস্তি পেয়েছিলেন। এই মহিলা ব্ল্যাক-ম্যাজিকের সাহায্যে তাঁর প্রথম দুই স্বামীর প্রাণ-সংহার করেন। অনেকেই সন্দেহ করেন যে নিত্য নতুন স্বামীসঙ্গ উপভোগ করার জন্যই যুবতী অনুরূপ কাজ করতেন। ভারত-বর্ষেও শিক্ষিত ও উচ্চমহলের কোন কোন ব্যক্তি যে ব্ল্যাক-ম্যাজিকের প্রলোভন ত্যাগ করতে পারেন না সম্প্রতি তার একটি উল্লেখ-যোগ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে। গত বৎসর (১৯৬৭), ২১শে অক্টোবর তারিখে কলকাতার দৈনিক যুগান্তরের প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত একটি খবরে জানা যায় যে সুরাটের অন্তর্গত বুলসারের একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট ব্ল্যাক-ম্যাজিক শেখার জন্য তাঁর আট বছরের মেয়ের মাথা কেটে ফেলেন বলে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে।

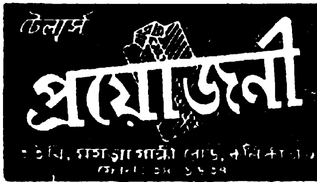
ডাইনীবিদ্যা সত্য-সত্যই এক বিচিত্র বিদ্যা। এই বিদ্যা যারা রপ্ত করে, তারা আরও বিচিত্র, আরও বিস্ময়কর। কখনও দিবালোকে, কখনও নিশুতি রাতে, কখনও একাকী, কখনও দলবদ্ধভাবে এরা এই সাংঘাতিক যাদুর খেলা প্রয়োগ করে। দলবদ্ধভাবে ইংলণ্ডের ডাইনীবিদ্যা প্রদর্শনের কথা বলতে গিয়ে ডাঃ গার্ডনার বলেছেন যে, একজন নেতাসহ ৬ জন মহিলা এবং ৬ জন পুরুষ ডাইনী তাদের নিজেদের দেবতার কাছে উৎসর্গ করা একটি ছুরি বা তরবারি দিয়ে প্রথমে মাটিতে একটি বৃত্তাকার স্থান চিহ্নিত করে নেয়। তারপর প্রচুর মদ আর কেক খেয়ে বৃত্তাকার স্থানের মধ্যে উলঙ্গ হয়ে উন্মাদের মত নাচতে নাচতে এরা যাদুশক্তি প্রয়োগ করে। এই সমস্ত ডাইনীরা যে সাধারণ স্বাভাবিক মানুষের মত দুরন্ত যৌনবাসনার দ্বারাও নিয়ন্ত্রিত তা প্রমাণিত হয় যখন ডাঃ গার্ডনার জানান যে ঐ নৃত্যরত ১২ জন উলঙ্গ যুবক-যুবতীর মধ্যে কেউ কেউ স্বামী-স্ত্রী এবং কেউ কেউ স্বামী-স্ত্রী না হয়েও পরস্পরের প্রতি এমনই অনুরক্ত থাকে যে পরবর্তীকালে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

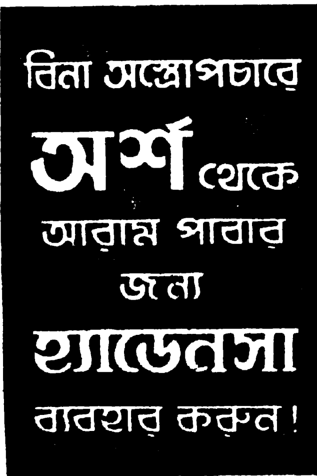
দিবালোকে দলবদ্ধভাবে যেমন ডাইনী-দের আনাগোনা চলে তেমনি নিশুতি রাতে একাকীও ক্ষতিকর ডাইনীদের কার্যকলাপের কাহিনী শুনলে রীতিমত আঁতকে উঠতে হয়। শেষোক্ত ডাইনীবিদ্যার সাংঘাতিক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ভারতবর্ষে। এখনও এদেশের অতি বড় সাহসী ব্যক্তিও 'নিশি-ডাকের' কথা শুনলে শিউরে ওঠেন। যাঁরা নিশিডাকের কথা শুনেছেন তাঁরা নিশি-ডাকের সম্ভাবনা আছে জানতে পারলে আপন সন্তান-সন্ততিদের বুকের মধ্যে আগলে রেখে সারাটি রাত দুর্গানাম জপ করতে করতে নিদ্রাহীনভাবে কাটিয়ে দেন। কি এই নিশিডাক?

নিশিডাকও এক ধরনের বিপজ্জনক ব্ল্যাক-ম্যাজিক বা বিশেষ কোনও মন্ত্রের অমঙ্গলজনক শক্তি। সুস্থ ব্যক্তির প্রাণ-সংহার করে কোন মৃত্যুমুখী অসুস্থ ব্যক্তির প্রাণরক্ষা করা হয় নিশিডাকের সাহায্যে। অমাবস্যার নিশুতি রাতে ঘুটঘুটে অন্ধকারে একটি কাঁচ ডাবের মুখ কেটে হাতে ডাবের ঢাকনী নিয়ে বেরিয়ে পড়ে নিশিডাকবিদ্যা-আয়ত্তকারী (ডাইনী?)। রাত্রির অন্ধকারে

যে কোন বাড়ীর কোন ঘুমন্ত ব্যক্তিকে তারই নিকট আত্মীয়ের কণ্ঠস্বর অবিকল নকল করে সে তার নাম ধরে ডাক দেয়। যদি কোনক্রমে সেই ঘুমন্ত ব্যক্তি ডাইনীর তিনটি ডাকের মধ্যে সাড়া দেয় তবে সে সংগে সংগে ডাবের মুখটি ঢাকনী দিয়ে বন্ধ করে ফেলে। এখানেই শেষ। এরপরেই সেই অশুভ ডাকের শক্তিতে সেই ডাবের জল পান করে মৃত্যুপথযাত্রী অসুস্থ ব্যক্তি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠে আর সেই হতভাগ্য ব্যক্তি যে তিনটি ডাকে সাড়া দিয়েছিল, সে কিছুদিনের মধ্যেই অসুস্থ হয়ে ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। এই নিশিডাকের ঘটনা ভারতবর্ষে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে অসংখ্য ঘটেছে বলে শোনা গেছে।

বিভিন্ন ধরনের ব্ল্যাক-ম্যাজিক পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বরাবরই প্রচলিত ছিল এবং এখনও আছে। এদের মধ্যে 'চুল কেটে নেওয়া', এবং 'দৃষ্টি দেওয়া' ব্ল্যাক-ম্যাজিকের উল্লেখযোগ্য প্রত্যঙ্গ। শোনা যায়, কোন কোন দুষ্ট ব্যক্তি সুযোগ পেলেই কারণে বা অকারণে অন্যের চুল কেটে নেয়। এর ফল নানান রকমের হয়। কখনও সেই চুলকাটা জায়গায় আর চুল ওঠে না, কখনও মস্তিষ্কবিকৃত হয় ইত্যাদি। অনেক সময় দেখা যায় যে কোন লোকের কোন স্থানে কেটে গেলে বা ঘা হলে কোন ন্যাকড়া বা কাপড় দিয়ে সে সেই স্থানটি বেঁধে রাখে। অনেকের কাছেই এর কারণ হচ্ছে যে ডাইনীরা যদি এইদিকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে দৃষ্টি দেয় তবে সেই স্থানটি পচতে পচতে শরীরের সর্বত্র পচন ধরে। শুধু তাই নয়, একটু অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাব যে আজও পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি সন্তানের জননী তাঁদের হৃষ্টপুষ্ট শিশুদের অত্যন্ত সাবধানে রাখতে সচেষ্ট থাকেন। তাঁদের মতে কোনক্রমে দুষ্ট ব্যক্তির অশুভ দৃষ্টি শিশুদের উপরে পড়লে এই সব শিশুরা রুগ্ন হতে থাকে এবং সময়ে সময়ে তাদের প্রাণও বিপন্ন হয়।





উইচ বা ডাইনী শব্দটি শুনলে স্বভাবতঃই ধারণা হতে পারে যে এই সব ব্ল্যাক-ম্যাজিক আয়ত্তকারীরা সকলেই মহিলা। এই ধারণা ভ্রান্ত। উইচরা পুরুষ এবং মহিলা দুই রকমেরই হতে পারে। পাশ্চাত্য দেশে, বিশেষ করে বৃটেনের মেয়ে ডাইনীরা অধিকাংশ সময়েই বিড়ালের সংগ পছন্দ করে। এদের মধ্যে অনেকেই আবার বিড়াল বা নেকড়ে বাঘের আকার ধারণ করে। ওদেশের ডাইনীদের বিড়ালসান্নিধ্য-কামনার কারণ সম্পর্কে নানা মুনি নানা মত পোষণ করেন। আমরা আপাততঃ সেই বহুবিতর্কিত মতামতের মধ্যে না গিয়ে বরং ওদের বিড়াল বা নেকড়ের আকার ধারণের কারণ অনুসন্ধান করব। অনেকেই মনে করেন যে এর কারণ দুটি। প্রথমতঃ ডাইনী যে ব্যক্তিকে ক্ষতি করতে চায়, আত্মগোপন করে তারই কাছাকাছি থাকা এবং দ্বিতীয়তঃ ডাইনী হিসাবে চিহ্নিত না করে বা ধরা না দিয়ে সাধারণ স্বাভাবিক এবং বিপন্মুক্ত জীবনযাপন করা। এ সম্পর্কে দুটি ছোট্ট ঘটনার উল্লেখ করছি।

নরওয়েতে একবার একটা মিলে অত্যন্ত রহস্যজনকভাবে পর পর দু বছর আগুন ধরে যায়। তিন বছরের মাথায় এক রাত্রিতে মিলের পাহারাদার হঠাৎ লক্ষ্য করল যে কতকগুলি বিড়াল মুখে একটি পিচ ভর্তি পাত্র নিয়ে মিলের ভিতরে ঢুকল এবং একটু পরে সেই পাত্রে আগুন ধরিয়ে দিয়ে মিলের সর্বত্র সেই আগুন লাগিয়ে দিতে আরম্ভ করল। ভয় পেয়ে পাহারাদার চিৎকার করে উঠতেই মিলের মালিক ছুটে এলেন সেখানে। বিড়ালের দল ততক্ষণে পাহারাদারকে আক্রমণ করেছে। ওদিকে আগুন জ্বলছে দাউ-দাউ করে। মিলের মালিক ছুটে গিয়ে একটি বিড়ালের পা কেটে দিতেই চিৎকার করতে করতে সব কটি বিড়াল পালিয়ে গেল। পরদিন সকালে মিল মালিক দেখল যে মিলের আর সব যেমন-তেমন আছে কিন্তু নিজের ঘরে তার স্ত্রী শয্যাশায়ী। স্ত্রীর একখানি হাত কাটা। পরে এই স্ত্রীলোকটি ডাইনী বলে প্রমাণিত হয়েছিল। বিড়ালের আকার ধারণ করে, লোকচক্ষুর অন্তরালে সে স্বামীর ক্ষতি করার জন্য ছটফট করে বেড়াচ্ছিল। অথচ বেচারী স্বামী তাকে কোনদিন সন্দেহই করতে পারেননি।

আর একটি ঘটনাও বেশ লোমহর্ষক। একবার এক শিকারী কতকগুলি নেকড়ের দ্বারা আক্রান্ত হয়। নেকড়েগুলোর সংগে লড়াই করতে করতে ভাগ্যক্রমে শিকারী একটি নেকড়ের একখানি পা কেটে ফেলতেই সব কটি নেকড়ে পালিয়ে যায়। নেকড়ের কাটা পা-টি পকেটে পুরে বাড়ী ফেরার পথে শিকারীর সংগে তার এক বন্ধুর দেখা হল। বন্ধুকে শিকারী সব ঘটনা বলতে বলতে পকেট থেকে নেকড়ের পা-টি তুলে দেখাতেই বন্ধু চমকে উঠল। দুজনেই দেখল যে পা-টি ততক্ষণে একটি মহিলার হাতের আকার ধারণ করেছে। হাতের আঙুলে লাগানো একটি আংটি শিকারীর বন্ধুর ভীষণ পরিচিত। বন্ধু কাঁপতে কাঁপতে বাড়ী ফিরে দেখে যে ঘরে তার স্ত্রী যন্ত্রণায় ছটফট করছে। তার একটি হাত কাটা। এই স্ত্রীলোকটিকে পরে পুলিশ গ্রেপ্তার করে এবং জ্যান্তো পুড়িয়ে মেরে ফেলে। আসলে ওই স্ত্রীলোকটি আত্মগোপন করে ব্ল্যাক-ম্যাজিকের চর্চা করত। ও ছিল ডাইনী।

বিবসনা কিংবা উলঙ্গ কেন?—সবশেষে আর একটি প্রসংগ তুলেই আমাদের আলোচনা শেষ করব। ইউরোপ মহাদেশের ডাইনীবিদ্যার চরিত্র বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই যে অধিকাংশ ডাইনী (পুরুষ, মহিলা নির্বিশেষে) প্রায়ই উলঙ্গ অবস্থায় বা বিবসনা হয়ে তাদের যাদুশক্তি প্রয়োগ করে। এর কারণ কি? কেউ কেউ বলেন যে, সামান্যতম গাত্রাবরণও ডাইনীদের শক্তি-প্রয়োগে বাধা সৃষ্টি করে। মিঃ টিনডল মনে করেন যে, প্রকৃতির মধ্যে সম্পূর্ণভাবে আত্মলীন থেকে যাদুশক্তি প্রয়োগ করার জন্যই এরা বিবসনা থাকে। আমাদের দেশে ব্ল্যাক-ম্যাজিকের প্রদর্শনকারীরা সর্বক্ষেত্রে উলঙ্গ না থাকলেও শোনা যায় যে এরা এদের নিজস্ব উপাসক সেই অশুভ শক্তির কাছে নির্জনে বসে বিবস্ত্র অবস্থাতেই উপাসনা করে।

নানা ঘটনা, রটনা, বিভিন্ন লেখকের তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকার যুক্তি-নির্ভর আলোচনা, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, শ্রুতিকথন ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে এই আলোচনায় যে সমস্ত দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা গেল তা থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে শুধু এদেশে নয় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই ব্ল্যাক-ম্যাজিক কিংবা ডাইনীবিদ্যার অস্তিত্ব ছিল, এখনও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকতে পারে। এ প্রশ্ন আজও অমীমাংসিত থেকে গেছে—ফ্রান্সের জোয়ান অব আর্ক (Joan of Arc) কি ডাইনী ছিলেন? যদিও তাঁকে সেই অপরাধেই পুড়িয়ে মারা হয়েছিল।

মেমসাহেব

নিমাই ভট্টাচার্য

(৫)

ওয়েস্টার্ণ কোর্ট
জনপথ
নিউ দিল্লী

দোলাবৌদি,

আমি দিল্লী ফিরে এসেছি, কিন্তু কদিন এমন অপ্রত্যাশিত ব্যস্ততার মধ্যে দিন কাটালাম যে, কিছুতেই তোমাকে চিঠি লেখার সময় পাইনি। তাছাড়া ইতিমধ্যে দুদিনের জন্য তোমাদের বন্ধু মাধুরী চ্যাটার্জি আর তাঁর স্বামী এসেছিলেন। মাধুরীকে মনে পড়ছে তোমার? প্রেসিডেন্সীতে ফিলসফি নিয়ে পড়ত। পার্ক-সার্কাস বেকবাগানের মোড়ে থাকত।

দিল্লীতে আসার পর নিত্য-নৈমিত্তিক পরিচিত আধা-পরিচিত অনেকেই আসেন আমার আস্তানায়। কেউ ইন্টারভিউ দিতে, কেউ অফিসের কাজে, কেউ বা আবার ডেরাডুন-মুসৌরী-হরিদ্বারের পথে লাল-কেল্লা-কুতুবমিনার আর রাজঘাট-শান্তিবন দেখার অভিপ্রায়ে। মাধুরী চালাক মেয়ে। হাজার হোক তোমাদেরই বন্ধু তো! স্বামী এসেছিলেন অফিসের কাজে; আর উনি এসেছিলেন স্বামীকে অনুপ্রেরণা দিতে। এখনও সেই আগের মতনই হৈ-হুল্লোড় করে। স্বামীকে সকাল বেলায় অফিসে রওনা করিয়ে দিয়ে সারা দিন নিজে হৈ-হৈ করে চক্কর কেটে বেড়াত আমার সঙ্গে। আমি ক্লান্ত হয়ে পড়তাম কিন্তু মাধুরী হতো না। বিকেল বেলায় স্বামী এলে আমাদের সেকেন্ড ইনিংস শুরু হতো।

যাই হোক বেশ কাটল দুটো দিন। মাধুরীর কাছে তোমার একটা শাড়ী আর পেটুক খোকনদার জন্য খানিকটা শোন-হালুয়া পাঠিয়েছি। শাড়ীটা তোমার পছন্দ হলো কিনা জানিও।

যাই হোক এদিকে আমার মনের পর দিয়ে নীলিমার ঝড় বয়ে যাবার পর পরই আমি হঠাৎ সাংবাদিকতা শুরু করলাম। আমার জীবনের সে এক মাহেন্দ্রক্ষণ। জীবনের সমস্ত হিসাব-নিকাশ ওলট-পালট হয়ে গেল। মধ্যবিত্ত বাঙালী ঘরের ছেলে। ম্যাট্রিক পাশ করে আই-এ পড়ে, আই-এ পাশ করে বি-এ পড়ে। তারপর বি বি দত্তর সই করা পাশপোর্ট নিয়ে চোদ্দ আনা ছেলে নেমে পড়ত জীবনযুদ্ধের পাওয়ার লীগ খেলতে। বাকি দু' আনা আরো এগিয়ে যেত। তাদের মধ্যে কেউ ফার্স্ট-ডিভিশান কেউ আই-এফ-এ শীল্ড বা রোভার্স খেলত। কেউ কেউ আবার আরো এগিয়ে যেত।

আমি পাওয়ার লীগে খেলবার জন্যই জন্মেছিলাম ও তারই প্রস্তুতি করছিলাম। মাঝে মাঝে অবশ্য স্বপ্ন দেখতাম ডাক্তার হবো, এঞ্জিনিয়ার হবো। অথবা অধ্যাপক হয়ে কোঁচা দুলিয়ে কলেজে আসব, মেয়েদের পড়াব, ছেলেদের পড়াব। ছাত্রীদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য পাবার জন্য মন আকুল ব্যাকুল হলেও আমি কিছুতেই তার প্রকাশ করব না। কিন্তু তবুও ছাত্রীরা আমার কাছে ছুটে আসবে নানা কারণে, নানা প্রয়োজনে। ইলোরাদের বাড়ী একদিন চায়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করায় অনেক সরস কাহিনী ছড়াবে সমগ্র নারী-জগতের মধ্যে। তারপর ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি আর কি।

আমাদের আত্মীয়-বন্ধুদের মধ্যে কেউ কোনদিন খবরের কাগজে চাকরি করা তো দূরের কথা, খবরের কাগজের অফিসে পর্যন্ত যায়নি। তাইতো কেউ কল্পনা করেনি তাদের বংশের এই কুলাঙ্গার খবরের কাগজে চাকরি করবে। দেশটা দুটুকরো হবার আগে আমাদের সমাজজীবন কয়েকটা পরিচিত ধারায় বয়ে গেছে। সেই পরিচিত সীমানার বাইরে যাবার প্রয়োজন বা তাগিদ বিশেষ কেউই বোধ করেননি। দেশটা স্বাধীন হবার সঙ্গে সঙ্গেই অতীত দিনের সেসব রীতিনীতি, নিয়ম-কানুন প্রয়োজন কোথায় যেন তলিয়ে গেল। এই শান্ত-স্নিগ্ধ পৃথিবীটা যেন কোটি কোটি বছর পেছিয়ে অগ্নি-বলয়ে পরিণত হলো। জৈব প্রয়োজনটা চরম নগ্নভাবে প্রকাশ করল। ইতিহাসের বলি হয়ে মানুষগুলো বাঁচবার প্রয়োজনে উন্মাদের মত ছুটে বেড়াল চারদিকে। সেদিনের সে অগ্নি-বলয়ে পৃথিবীর যে যেখানে পারল আস্তানা করে নিল। লক্ষপতির ছেলে কলেজ স্ট্রীটে হকার হলো, আমার-তোমার চাইতেও বনেদী ঘরের অনেক মেয়ে-বৌ বৌবাজার আর লিন্ডসে স্ট্রীটের ম্যাসেজ-বাথে গিয়ে দেহ বিক্রয় করতে বাধ্য হলো।

বৌবাজারের রথের মেলায় বা বিজয়া দশমীর দিন কুমরটুলীর ঘাটে লক্ষ লক্ষ লোকের ভীড়ে হারিয়ে যাওয়া ছোট্ট বাচ্চাদের দেখেছ? দেখেছ কেমন হাউ হাউ করে কাঁদে? লক্ষ করেছ বাবা-মা'কে হারিয়ে অসহায় হয়ে, ব্যাকুল হয়ে অর্থহীন ভাষায় সবার দিকেই কেমন তাকায়? আমিও সেদিন এমনি করে অর্থহীন ভাষায় চারদিকে তাকাচ্ছিলাম একটু ভবিষ্যতের আশায়। কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ, কোনটা সহজ, কোনটা কঠিন—তা ভাববার সময় বা ক্ষমতা কোনটাই সেদিন আমার ছিল না। তাইতো অপ্রত্যাশিতভাবে খবরের কাগজের রিপোর্টার হবার সুযোগ পেয়ে আমি আর দ্বিধা না করে এগিয়ে গেলাম।

রামায়ণে পড়েছি সতীত্বের প্রমাণ দেবার জন্য সীতাকে অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়েছিল। অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হয়েও স্বামীর পাশে সীতার স্থান হয়নি। রাজ-রাজেশ্বরী সন্তানসম্ভবা সীতাকে প্রিয়-হীন বন্ধুহীন নিঃস্ব হয়ে গভীর অরণ্যে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। জান দোলাবৌদি, আমার মাঝে মাঝেই মনে হয় সীতার গর্ভেই বোধহয় বাঙালীর পূর্বপুরুষদের জন্ম। তা না হলে সমগ্র বাঙালী জাতটা এমন অভিশাপগ্রস্ত কেন হলো? স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য চরম অগ্নিপরীক্ষা দেবার পরও কেন তার রাহুমুক্তি হলো না? স্বাধীন সার্বভৌম ভারতবর্ষের নাগরিক হয়েও কেন তাদের চোখের জল পড়া বন্ধ হলো না?

সত্যি দোলাবৌদি, সেদিনের কথা মনে হলে আজও শরীরটা শিউরে ওঠে, মাথাটা ঘুরে যায়, দৃষ্টিটা ঝাপসা হয়। সেই দুর্দিনের মধ্যেই আমি নতুন পথে যাত্রা শুরু করলাম। সকালবেলার টিউশানি দুটো ছাড়লাম না; কিন্তু বিকেলের ছাত্র-পড়ান বন্ধ করলাম। দুপুরে কলেজ করে সাড়ে তিনটে কি চারটে বাজতে বাজতেই নোট-বই পেন্সিল নিয়ে চলে যেতাম সভাসমিতি বা কোন প্রেস কনফারেন্সে। তারপর অফিস। রাত বারোটা-একটা পর্যন্ত রোজই কাজ করতে হতো। কোন কোনদিন আবার বাড়ী ফিরতে ফিরতে রাত তিনটে-চারটেও হয়ে যেত।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর এমনি করে চালিয়েছি। বিনিময়ে কি পেয়েছি? প্রথম বছর একটি পয়সাও পাইনি। নিজের টিউশানির রোজগার দিয়ে ট্রাম-বাসের খরচ চালিয়েছি। পরের বছর থেকে মাসিক দশ-টাকা রোজগার শুরু করলাম। ইতিমধ্যে বিজ্ঞান সাধনার প্রথম পর্ব শেষ করলাম। পিতৃদেব ফতোয়া জারী করলেন, সাংবাদিকতার খেলা শেষ করে একটা রাস্তা ধর। সত্যি তখন অর্থ-নৈতিক অবস্থা ও সামাজিক পরিস্থিতি এমন সংকটাপন্ন ছিল যে, কিছু একটা না করলে চলছিল না। আমার বন্ধু-বান্ধবরাও এই একই সমস্যার সম্মুখীন হলো। সবাই উপলব্ধি করছিল কিছু একটা করতে হবে। কিন্তু কি করতে হবে, কোথায় যেতে হবে—তা কেউই জানত না। ডাক্তারী-এঞ্জিনিয়ারিং পড়ার মত রসদ কারুরই ছিল না। তাই ওদিকে আর কেউ পা বাড়াল না। আমি রিক্রুটিং অফিস থেকে শুরু করে খিদিরপুর-বারাকপুরের সমস্ত কল-কারখানার দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়ালাম একটা পঞ্চাশ টাকার অ্যাপ্রেনটিস-শিপের জন্য। জুটল না। তাই এবার বিজ্ঞান সাধনায় ইস্তফা দিয়ে সাহিত্য-সাধনা আর সাংবাদিকতা নিয়েই পরবর্তী অধ্যায় শুরু করলাম।

তোমাকে এত কথা লিখতাম না। তাছাড়া হয়ত কিছু কিছু তুমি শুনেছ বা

জেনেছ। কিন্তু এই জন্যই এসব জানাচ্ছি যে, আমার জীবনের কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে মেমসাহেবকে পেয়েছিলাম, তা না জানলে তুমি ঠিক গুরুত্বটা উপলব্ধি করবে না।

যৌবনে প্রায় সব ছেলেমেয়েই প্রেমে পড়ে। এটা তাদের ধর্ম, কর্ম। প্রয়োজনও ঘটে কিছুটা। তাছাড়া শৈশব-কৈশোর পেরিয়ে পূর্ণতা লাভ করার এটা সব চাইতে বড় প্রমাণ। কলেজের কমনরুমে বা থিয়েটারের গ্রীনরুমে অনেক প্রেমের কাহিনীরই আদি-পর্ব রচিত হয়, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার মেয়াদ হয় ক্ষণস্থায়ী। সামান্য একটু হাসি, একটু গল্প, একটু মেলামেশার পর অনেক ছেলেমেয়েই প্রেমের নেশায় মশগুল হয়ে ওঠে। জীবনকে উপলব্ধি না করে, ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে জীবনের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হয়ে যারা প্রেম করে বলে দাবী করে, তারা হয় বোকা, নয় মিথ্যাবাদী। দুটি মন, দুটি প্রাণ দুটি ধারা, দুটি অপরিচিত মানুষ একই সঙ্গে কোরাস গাইবে অথচ তার পরিবেশ থাকবে না, প্রস্তুতি থাকবে না, তা হতে পারে না। এই পরিবেশ আর প্রস্তুতি থাকে না বলেই আমাদের দেশের কলেজ-রেস্তোরাঁর প্রেম প্রায়ই ব্যর্থ হয়। দুধ জমিয়ে ভাল মিষ্টি দই খেতে হলে অনেক তদ্বির, তদারক ও প্রস্তুতির প্রয়োজন। একটু হিসাব-নিকাশ বা তদ্বির-তদারকের গন্ডগোলে হয় দই জমে না, অথবা জমলেও দইটা টক হয়ে যায়।

দুটি নারীপুরুষকে নিয়ে একটা সুন্দর ছন্দবদ্ধ জীবন গড়ে তুলতে হলে শুধু চোখের নেশা আর দেহের ক্ষুধাই যথেষ্ট নয়। আরো অনেক কিছু চাই। তাছাড়া জীবনে এই পরম চাওয়া চাইবারও একটা সময় আছে। কিছু পেতে হলেও সে পাওয়ার অধিকার অর্জন করতে হয়।

বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে ও পরিবেশে অনেককেই অনেক সময় ভাল লাগে। হাসপাতালে হাসিখুসী ভরা নার্সদের কত আপন, কত প্রিয় মনে হয়। কিন্তু হাসপাতালের বাইরে? সমাজ-জীবনের বৃহত্তর পরিবেশে? কজন পারে তাদের আপন স্থানে সমাদর করতে?

আমার জীবনটা যদি সুন্দর, স্বাভাবিক ও ছন্দময় হয়ে এগিয়ে যেত তাহলে হয়ত যে কোন মেয়েকে দিয়েই আমার জীবনের প্রয়োজন মিটত। কিন্তু আমি জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের জন্য তিলে তিলে দগ্ধ হচ্ছিলাম। একটু সম্ভ্রমের সঙ্গে বাঁচবার জন্য অসংখ্য মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে ঘুরেও কোন ফল হয়নি। মাত্র একশ' পঁচিশ টাকার একটা সামান্য রিপোর্টারের চাকরির জন্য কতজনকে যে দিনের পর দিন তৈল-মর্দন করেছি, তার ইয়ত্তা নেই। তবুও বিদ্যাসাগর-বিবেকানন্দের যোগ্য বংশধরদের মন গলেনি।

কেন, আত্মীয়-বন্ধুর দল? পঁচিশ বা পঞ্চাশ টাকা মাইনের রিপোর্টারের সঙ্গে আবার আত্মীয়তা কিসের? নিতান্ত দু'চারজন মূর্খ বন্ধু ছাড়া আর সবার কাছেই আমি অস্পৃশ্য হয়ে গেলাম।

দোলাবৌদি, আমার সে চরম দুর্দিনের ইতিহাস তোমাকে আর বেশী লিখব না। তুমি দুঃখ পাবে। তবে জেনে রাখ তোমাদের ঐ কলকাতার রাজপথে আমি দীর্ঘদিন ধরে উন্মাদের মত ঘুরে বেড়িয়েছি, একটি পয়সার অভাবে সেকেন্ড ক্লাশ ট্রামে পর্যন্ত চড়তে পারিনি। দু'চারজন নিকট আত্মীয়ের প্রতি কর্তব্য পালন করে বহুদিন নিজের অদৃষ্টে দু'বেলা অন্ন জোটাতেও পারিনি। কিন্তু কি আশ্চর্য! বিধাতাপুরুষ যত নিষ্ঠুর হয়েছেন আমার প্রতিজ্ঞাও তত প্রবল হয়েছে। বিধাতার কাছে কিছুতেই হার মানতে চায়নি আমার মন।

এমনি করে বিধাতাপুরুষের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে খেলতে প্রায় সাত-আট বছর কেটে গেল। তবুও কোন কূল-কিনারা নজরে পড়ল না। এই সাত-আট বছরে আমার দৃষ্টিভঙ্গীর অনেক পরিবর্তন হয়েছিল। সাত-আট বছর আগে শুধু বেঁচে থাকবার জন্য আমি কর্মজীবন শুরু করেছিলাম, কিন্তু সাত-আট বছর পরে আমি শুধু বাঁচতে চাইনি। লক্ষ লক্ষ মানুষের অরণ্যের মধ্যে আমি হারিয়ে যেতে চাইনি। চাইনি শুধু অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের সমস্যার সমাধান করতে। মনে মনে আরো কিছু আশা করছিলাম।

কিন্তু আশা করলেই তো আর সবকিছু পাওয়া যায় না। তাছাড়া শুধু আশা করে আর কতদিন নিরবচ্ছিন্নভাবে সংগ্রাম করা যায়? আমি হাঁপিয়ে উঠলাম। মনের শক্তি, দেহের তেজ যেন আস্তে আস্তে হারাতে শুরু করলাম। হাজার হোক ধৈর্যেরও তো একটা সীমা আছে।

কাজকর্মে ফাঁকি দিতে শুরু করলাম। ঘুরে-ফিরে নিত্য-নতুন খবর জোগাড় করার চাইতে নিউজ ডিপার্টমেন্টে সাব-এডিটরদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়াই আমার কাছে বেশী আকর্ষণীয় হলো। শুধু আমাদের অফিসেই নয়, আরো অনেক আড্ডাখানায় যাতায়াত শুরু করলাম। ভবিষ্যত সম্পর্কে কেমন যেন দার্শনিকসুলভ ঔদাসীন্য দেখা দিল। মোদ্দা-কথায় আমি বেশ পাল্টাতে শুরু করলাম।

বেশীদিন নয়, আর কিছুকাল এমনি করে চললে আমি নিশ্চয়ই চিরকালের মত চিরদিনের জন্য হারিয়ে যেতাম। ঠিক এমনি এক চরম মুহূর্তে ঘটে গেল সেই অঘটন।

শান্তিনিকেতন থেকে ফিরছিলাম কলকাতা। বোলপুর স্টেশনে দানাপুর প্যাসেঞ্জারের আমার কামরায় আরো অনেকে উঠলেন। ভীড়ের মধ্যে কোনমতে এক পাশে একটু জায়গা করে আমি বসে পড়লাম। জানলার পাশে মাথাটা রেখে আনমনা হয়ে কিছুক্ষণ কি যে দেখছিলাম। দু'চারটে স্টেশনও পার হয়ে গেল। বীরভূমের লালমাটি আর তালগাছ কখন যে পিছনে ফেলে এসেছি, তাও খেয়াল করলাম না। বাইরে অন্ধকার নেমে এলো। উদাস দৃষ্টিটাকে ঘুরিয়ে কামরার মধ্যে নিয়ে এলাম। ভাবছিলাম কামরাটাকে একটু ভাল করে দেখে নেব। কিন্তু পারলাম না। দৃষ্টিটা সামনের দিকে এগুতে গিয়েই আটকে পড়ল। এমন বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল গভীর ঘন কালো টানা-টানা দুটি চোখ আগে কখনও দেখিনি। একবার নয়, দু'বার নয়, বার বার দেখলাম। লুকিয়ে লুকিয়ে আবার দেখলাম। আপাদ-মস্তক ভাল করে দেখলাম। অসভ্যের মত, হ্যাংলার মত আমি শুধু ঐ দিকেই চেয়ে রইলাম।

আমি যদি খোকনদার মত সাহিত্যের ভাল ছাত্র হতাম ও সংস্কৃত সাহিত্য পড়া থাকত, তাহলে হয়ত কালিদাসের মেঘদূতের উত্তরমেঘ থেকে 'কোট' করে বলতাম—

'তন্বী শ্যামা শিখরদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা

নিম্ননাভিঃ।'

কালিদাসের মত আমি আর এগিয়ে যেতে পারিনি। এইখানেই আটকে গেলাম। তাছাড়া দানাপুর প্যাসেঞ্জারের ঐ কামরার অতগুলো প্যাসেঞ্জারের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে এর চাইতে বেশী কি এগুতে পারা যায়?

পরে অবশ্য মেমসাহেবকে আমি আমার সেদিনের মনের ইচ্ছার কথা বলেছিলাম। ক'মাস পর আমি আর মেমসাহেব দানাপুর প্যাসেঞ্জারেই শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতা ফিরছিলাম। বর্ধমানে এসে কামরাটা প্রায় খালি হয়ে গেল। ও পাশের বেঞ্চিতে শুধু এক বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ছাড়া আর কোন যাত্রী ছিল না। মেমসাহেব আমার হাতের পর মুখটা রেখে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়েছিল। আমিও যেন কি ভাবছিলাম। হঠাৎ মেমসাহেব আমাকে একটু নাড়া দিয়ে বলল, শোন।

আমি ঠিক খেয়াল করিনি। মেমসাহেব আবার আমাকে ডাক দিল, শোন না!

'কিছু বলছ?'

মেমসাহেব হাত দিয়ে আমার মুখটাকে নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিল। আঙুল দিয়ে আমার কপালের পর থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিল। দু'চার মিনিট শুধু চেয়ে রইল আমার দিকে। একটু হাসল। সলজ্জ দৃষ্টিটা একটু ঘুরিয়ে নিল নিজের দিকে।

এবার আমি ওর মুখটা ঘুরিয়ে নিলাম আমার দিকে। জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কিছু বলবে?

আমার দিকে তাকাতে পারল না। ট্রেনের কামরার ঐ স্বল্প আলোয় ঠিক বুঝতে পারলাম না, কিন্তু মনে হলো যেন লজ্জায় ওর মুখটা লাল হয়ে গেছে। দেখতে বেশ লাগছিল। দু'চার মিনিট আমি ওকে প্রাণভরে দেখে নিলাম। তারপর কানে কানে ফিস ফিস করে বললাম, লজ্জা করছে?

মেমসাহেব জবাব দিল না। শুধু হাসল। একটু পরে আমার কানে কানে বলল, একটা কথা বলবে?

'বল।'

'প্রথম যেদিন তুমি আমাকে এমনি ট্রেনে যাবার সময় দেখেছিলে, সেদিন আমাকে তোমার ভাল লেগেছিল?'

'মনে হয়েছিল—
তন্বী শ্যামা শিখরদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ।
শ্রেণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং
যা তত্র স্যাদ্ যুবতিবিষয়ে
সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ।।'

মেমসাহেব ঠাস করে আমার গালে একটা চড় মেরে বলল, অসভ্য কোথাকার!

'ছি, ছি, মেমসাহেব, তুমি আমাকে অসভ্য বললে। অসভ্য বলতে হলে কালিদাসকে অসভ্য বলো।'

আমি একটু থেমে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি রামায়ণ পড়েছ?

'কেন? এবার বুঝি রামায়ণের একটা কোটেশন শোনাবে?'

'আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।'

'পড়েছি।'

'মূল রামায়ণ বা তার অনুবাদ পড়েছ?'

'মূল সংস্কৃত রামায়ণ পড়িনি, কিন্তু অনুবাদ পড়েছি।'

'ভেরী গুড! দণ্ডকারণ্যে সীতাকে প্রথম দেখার পর রাবণ কি বলেছিলেন জান?'

'সীতার রূপের তারিফ করেছিলেন কিন্তু ঠিক কি বলেছিলেন, তা মনে নেই।'

'বেশ তো আমি মনে করিয়ে দিচ্ছি। রাবণ সীতাকে বলেছিলেন—'

মেমসাহেব বাধা দিয়ে বললো, 'তোমার আর শোনাতে হবে না। ঠিক লাইনগুলো মনে না থাকলেও আমি জানি রাবণ কি ধরনের সাংঘাতিক বর্ণনা করেছিলেন।'

একটু থেমে দৃষ্টিটা একবার ঘুরিয়ে নিয়ে আমার মুখের কাছে মুখটা এনে বলল, তুমিও তো আর এক রাবণ! ডাকাত কোথাকার! দিনে দুপুরে কলকাতা শহরের মধ্যে আমাকে চুরি করল!

যাকগে সেসব কথা। সেদিন শেষ-পর্যন্ত ধরা পড়েছিলাম। চুরি করে দেখতে দেখতে একবার ধরা পড়লাম। চোখে চোখ পড়তেই আমি দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে নিলাম। কিন্তু মিনিটখানেক পরেই আবার চেয়েছি। আবার ধরা পড়েছি। আবার চেয়েছি, আবার ধরা পড়েছি।

মেমসাহেবের আর দুটি বন্ধু কিছু ধরতে না পারলেও হাওড়া স্টেশনে পৌঁছবার পর কামরা থেকে বেরুবার সময় আমার মনটা যে খারাপ হয়ে গিয়েছিল, তা ও বেশ বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু কি করা যাবে? দুজনের কেউই কিছু বলতে পারিনি। জীবনের বর্ষণমুখর পথ চলতে গিয়ে এমনি একটু-আধটু বিদ্যুতের চমকানি তো সবার জীবনেই দেখা দিতে পারে। তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। অস্বাভাবিকতাও কিছু নেই।

ওরা তিন বন্ধু কামরা থেকে নামবার বেশ কিছুক্ষণ পরে আমি নামলাম। ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চলছিলাম গেটের দিকে। আরেকবার তাকিয়ে নিলাম ওর দিকে। মনে মনে ভাবছিলাম, এইত এক্ষুণি গেট পার হলেই দুজনে হারিয়ে যাব কলকাতা শহরের জনারণ্যের মধ্যে। আর হয়ত জীবনেও কোনদিন দেখা হবে না। হয়ত কেন? নিশ্চয়ই কোনদিন দেখা হবে না। হঠাৎ গেটের দিকে তাকাতে নজর পড়ল, মেমসাহেব একবার মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরল। আমি দূর থেকে হাত নেড়ে ওকে বিদায় জানালাম।

কেউ বুঝল না, কেউ জানল না, কি ঘটে গেল। এমন কি আমিও ঠিক বুঝতে পারিনি কি হয়ে গেল। আমি তো এর আগে কোনদিন কোন মেয়ের দিকে অমন করে দেখিনি, কোন মেয়েও তো অমন করে আমাকে মাতাল করে তোলেনি। কেন এমন হলো? শুধু বুঝেছিলাম, বিধাতাপুরুষের নিশ্চয়ই কোন ইঙ্গিত আছে। আর মনে মনে জেনেছিলাম, দেখা আমাদের হবেই।

বিশ্বাস কর দোলাবৌদি, শুধু আমার চোখের নেশা নয়, শুধু মেমসাহেবের দেহের আকর্ষণও নয়, আরো কি যেন একটা আশ্চর্য টান অনুভব করেছিলাম মনের মধ্যে। মনে মনে বেশ উপলব্ধি করলাম যে, আমার জীবনযুদ্ধের নতুন সেনাপতি হাজির! এই নতুন সেনাপতি আমাকে সহজে পরাজয় বরণ করতে দেবে না, আমাকে পিছিয়ে যেতে দেবে না। আমাকে হারিয়ে যেতে দেবে না ভবিষ্যতের অন্ধকারে।

অদৃষ্ট যে মানুষকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে, কি আশ্চর্যভাবে দুটি অপরিচিত মানুষকে নিবিড় করে এক সূত্রে বেঁধে দেয়, তা ভাবলে চমকে উঠি।

পরের দিন বেশ দেরী করে অফিসে গেলাম। চীফ রিপোর্টার আশা করেননি আমি অফিসে আসব। তাই ওয়েলিংটন স্কোয়ারের মিটিং আর গোটা তিনেক প্রেস কনফারেন্স কভার করার ব্যবস্থা আগেই করেছিলেন। তবুও আমি যেতেই উনি লাফিয়ে উঠলেন, দেখে আশ্চর্য হলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার?

'তুমি দৌড়ে একবার পার্ক স্ট্রীট আর্ট ইন ইন্ডাস্ট্রীতে গিয়ে যামিনী রায়ের এক্‌জিবিশনটা দেখে এসো। আজই শেষ দিন। ওর একটা রিভিউ না বেরুলে দোতলায় উঠতে পারছি না।'

বুঝলাম উপরওয়ালারা বার বার বলা সত্ত্বেও এক্‌জিবিশনটার রিভিউ ছাপা হয়নি এবং এডিটর সাহেব বেশ অসন্তুষ্ট।

কলকাতার অন্যান্য রিপোর্টারদের মত আমিও নৃত্য-গীত বা শিল্পকলা বুঝতাম না, কিন্তু প্রয়োজনবোধে কলমের পর কলম রিপোর্ট লিখতে পারতাম ওসব নিয়ে। কেন তানসেন-সদারঙও তো কভার করেছি। বড়ে গোলাম আলি খাঁ সাহেব গাইবার আগে স্টেজের পাশে ব্ল্যাকবোর্ডে 'রাগ' ইত্যাদি লিখে দিত। আমার মত সঙ্গীত-বিশারদ রিপোর্টারের দল সেই ফর্মুলা ভাঙিয়েই বেশ এক প্যারা লিখে দিতাম। শেষে আবার বাহাদুরী করে হয়ত মন্তব্য লিখতাম, গতবারের চাইতেও এবারের খাঁ সাহেবের গান অনেক বেশী মেজাজী হয়েছিল। অথবা লিখেছি, রাগ রাগেশ্বরীতে সেতার বাজিয়ে মুগ্ধ করলেন রবিশঙ্কর। অনেকে ভিন্নমত পোষণ করলেও আমার মনে হয় রাগ রাগেশ্বরীতেই রবিশঙ্কর তাঁর শিল্পীসত্তাকে সব চাইতে বেশী প্রকাশ করতে পারেন।

কেন মহাজাতি সদনের রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মেলনে? রোজ অন্তত এক কলম লিখতেই হতো। লিখেছি, আজকের অধিবেশনের সব চাইতে উল্লেখযোগ্য শিল্পী ছিলেন দ্বিজেন মুখার্জি। বিশেষ করে তাঁর শেষ গানখানি 'ভরা থাক ভরা থাক স্মৃতি-সুধায় বিদায়ের পাত্রখানি' বহুদিন ভুলতে পারব না। গত বছরের সম্মেলনে এই গানখানিই আর একজন খ্যাতনামা শিল্পী গেয়েছিলেন। ভালই গেয়েছিলেন। কিন্তু তবুও যেন এত ভাল লাগেনি। বোধকরি দরদের অভাব ছিল। তাছাড়া কিছু কিছু গান আছে যা বিশেষ বিশেষ শিল্পীর কাছেই ভাল লাগে। 'চৈত্র দিনের ঝরা পাতার পথে' অনেকেই গাইতে পারেন, কিন্তু পঙ্কজ মল্লিকের মত কি আর কেউ গাইতে পারবেন? কেন সায়গলের গাওয়া 'আমি তোমায় যত' বা কানন দেবীর 'সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে'?...

এমনি করে কিছুটা কমনসেন্স আর কলমের জোরে রিপোর্টারের দল বেশ কাজ চালিয়ে যান। খবরে কাগজের রিপোর্টাররা অনেকটা মফস্বলের ডাক্তারবাবুদের মত। কিছুতেই বিশেষজ্ঞ নন, অথচ সব কিছু রোগেরই চিকিৎসা করেন। প্রয়োজনবোধে ছুরি-কাঁচি নিয়ে একটা ছেঁড়া অ্যাপ্রন গায় চাপিয়ে পঞ্চানন চাটুজ্যে বা মুরারী মুখার্জির ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেও দ্বিধা করেন না।

সুতরাং আমিও দ্বিধা না করে চলে গেলাম যামিনী রায়ের এক্‌জিবিশন রিভিউ করতে।

একেই এক্‌জিবিশনের শেষ দিন, তারপর আর্ট ইন ইন্ডাস্ট্রির ছোট্ট ঘর। বেশ ভীড় হয়েছিল। তবুও আমি ঘুরে ঘুরে দেখতে দেখতে কিছু কিছু নোট নিচ্ছিলাম। একটা হলের দেখা শেষ করে পাশের হলটার খাবার মুখে অকস্মাৎ দেখা পেলাম মেসাহেবের। ভাবলে আশ্চর্য লাগে. কিন্তু হাজার হোক Truth is strange than Fiction. তাই না দোলাবৌদি?

প্রায় দুজনেই একসঙ্গে বললাম, আরে, আপনি?

'আপনি বুঝি যামিনী রায়ের ভক্ত?'—আমাকে প্রশ্ন করে মেমসাহেব।

'পঞ্চাশ টাকা মাইনের রিপোর্টারী করি বলে এই আধ-ঘন্টার জন্য ভক্ত হয়েছি।'

'আপনি বুঝি রিপোর্টার?'

'নির্লজ্জ আর বেহায়াপনা দেখে এখনও বুঝতে কষ্ট হচ্ছে?'

'ছি, ছি, ওকথা কেন বলছেন?' পাশের পেন্টিংটা এক নজর দেখে মেমসাহেব মন্তব্য করল, রিপোর্টারদের তো ভারী মজা।

আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস...

শেষ করতে হয় না। তার আগেই বলল, আপনি দেখছি রবীন্দ্রনাথেরও ভক্ত।

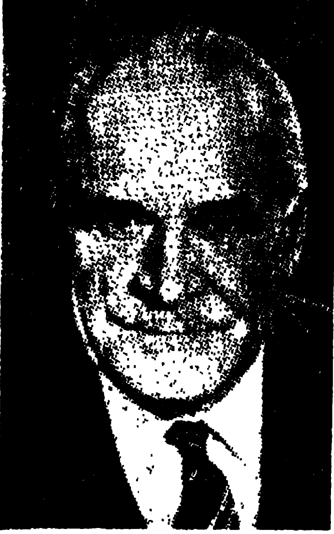
হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'আর একটু পরে দেখবেন আমি আপনারও ভক্ত।'

—ক্রমশঃ বাচ্চু।

বিজ্ঞানের কথা

রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্পর্কে অনন্য গবেষণা

অধ্যাপক রোনাল্ড নরিশ



অধ্যাপক ম্যানফ্রেড আইগেন



সে সমস্ত রাসায়নিক বিক্রিয়া অতি-দ্রুত সম্পাদিত হয় সে সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের জ্ঞান এতদিন পর্যন্ত সীমিত ছিল। এক সেকেন্ডের হাজার ভাগের এক ভাগ সময়ে যেসব রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে তা নির্ণয় করা এতদিন দুরূহ ছিল। সম্প্রতি তিনজন রসায়ন-বিজ্ঞানীর অনন্য গবেষণার ফলে অতিদ্রুত রাসায়নিক বিক্রিয়া কিভাবে ঘটে তা যথাযথভাবে জানা সম্ভব হয়েছে। এক সেকেন্ডের লক্ষ ভাগের এক ভাগ সময়ে যেসব রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে তাদের বিষয়ও এখন সঠিকভাবে জানা গেছে।

এই তিনজন রসায়ন-বিজ্ঞানী হলেন বৃটেনের কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এমারিটাস অধ্যাপক রোনাল্ড জর্জ নরিশ, লন্ডনের রয়েল ইনস্টিটিউশনের অধিকর্তা অধ্যাপক জর্জ পোর্টার এবং পশ্চিম জার্মানীর গাটিনজেনে মাকস্-প্লাক ইনস্টিটিউটের ভৌত রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক ম্যানফ্রেড আইগেন। স্বল্পস্থায়ী উচ্চশক্তি স্পন্দনের সাহায্যে রাসায়নিক বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থা ব্যাহত করে তাঁরা অতি দ্রুত সম্পাদিত রাসায়নিক বিক্রিয়ার কার্যপ্রণালী নির্ধারণ করেন।

তাঁরা যে পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন তা হচ্ছে বিক্রিয়াশীল ও বিক্রিয়ালব্ধ দ্রব্য-গুলির মধ্যে যে সাম্যাবস্থা থাকে তা প্রথমে ব্যাহত করা এবং তারপর বৈদ্যুতিক, শাব্দিক বা আলোকসংক্রান্ত উপায়ে সাম্যাবস্থা পুনঃ-প্রতিষ্ঠার সময় নির্ণয় করা। তাঁদের এই অনন্য গবেষণার ফলে এক সেকেন্ডের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ সময়ে সম্পাদিত বিক্রিয়ার কার্যপ্রণালীও যথাযথভাবে উপলব্ধি করা গেছে। আর তাঁদের এই কৃতিত্বের স্বীকৃতিতে ১৯৬৭ সালে তাঁদের তিনজনকে যৌথভাবে রসায়নশাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। প্লাস্টিক শিল্পে এবং অতিকায় অণুগঠনের বাস্তব ক্ষেত্রে তাঁদের এই গবেষণা প্রযুক্ত হয়েছে। অতিদ্রুত রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান এই গবেষণার ফলে প্রভূত বৃদ্ধি পেয়েছে। রাসায়নিক গতিবিদ্যা সম্পর্কে অনুরূপ অনুসন্ধানের জন্যে ইংলন্ডের পরলোকগত স্যার সিরিল হিনসেলউড এবং সোভিয়েত রাশিয়ার অধ্যাপক নিকোলাই সেমেনফকে ১৯৫৬ সালে রসায়নশাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। এ-থেকে রাসায়নিক বিক্রিয়া সংক্রান্ত গবেষণার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। অধ্যাপক নরিশ, অধ্যাপক পোর্টার এবং অধ্যাপক আইগেনের কর্মকৃতি সম্পর্কে এখানে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

অধ্যাপক রোনাল্ড নরিশ

অধ্যাপক নরিশ ১৮৯৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কেম্ব্রিজের পার্স স্কুলে এবং এমানুয়েল কলেজে শিক্ষা এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ-ডি এবং ডি-এস-সি ডিগ্রী লাভ করেন। এমানুয়েল কলেজের রিসার্চ ফেলো হিসাবে তাঁর গবেষক-জীবনের শুরু (১৯২৫-৩১)। এরপর কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভৌত রসায়নশাস্ত্রের লেকচাররূপে তিনি যোগদান করেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘ ২৮ বছর (১৯৩৭-৬৫) তিনি ভৌত-রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ও প্রধানরূপে কাজ করেন এবং ১৯৬৫ সালে অবসর-গ্রহণের পর এমারিটাস অধ্যাপকপদে বৃত হন। ১৯৩৬ সালে তিনি লন্ডনের রয়েল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। ভৌত রসায়নে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্যে অধ্যাপক নরিশ দেশেবিদেশের বহু সম্মাননা ও পদক লাভ করেছেন। প্যারিস, লীডস্ এবং শেফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মান-সূচক ডি-এস-সি ডিগ্রী প্রদান করেন। পোলিশ কেমিক্যাল সোসাইটি, সুইডেনের উপসালার রয়েল সোসাইটি অব সায়েন্স-এর তিনি সম্মানিত সদস্য। অধ্যাপক নরিশ এখনও ছাত্রদের সঙ্গে কাজ করেন এবং শিল্পসংস্থাসমূহ তাঁদের সমস্যা সমাধানে তাঁর পরামর্শ পেয়ে থাকে।

অধ্যাপক জর্জ পোর্টার

অধ্যাপক পোর্টার ১৯২০ সালে জন্ম-গ্রহণ করেন। তিনি শিক্ষালাভ করেন থর্ন গ্রামার স্কুল, লীডস্ বিশ্ববিদ্যালয় এবং কেম্ব্রিজের এমানুয়েল কলেজে। লীডস্ বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর গবেষক-জীবনের সূচনা। অধ্যাপক নরিশের মতো তিনিও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ-ডি এবং ডি-এস-সি ডিগ্রী লাভ করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি রাজকীয় নৌবাহিনীতে যোগদান করেছিলেন। ১৯৪৯ সালে তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভৌত রসায়ন বিভাগে যোগদান করেন এবং ১৯৫২ সাল পর্যন্ত সেখানে ছিলেন। এরপর এমানুয়েল কলেজের ফেলো এবং ভৌত রসায়ন গবেষণার উপাধ্যক্ষ হন। ১৯৫৫ সালে তিনি শেফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে

ভৌত রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হন। ১৯৬০ সালে লন্ডনের রয়েল সোসাইটি তাঁকে ফেলো নির্বাচন করেন। অন্যান্য বিদ্বৎসমাজ থেকে তিনি সম্মাননা লাভ করেছেন। 'আধুনিক জগতে রসায়ন' শীর্ষক একটি গ্রন্থের তিনি রচয়িতা।

১৯৪৯ সালে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক নরিশ এবং অধ্যাপক পোর্টার অতি-দ্রুত রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্পর্কে এক-যোগে গবেষণা শুরু করেন। ক্লোরিন গ্যাসের সাম্যাবস্থা সম্পর্কে তাঁরা অনুসন্ধান চালান। একদিকে ক্লোরিন পরমাণুর মধ্যে সংঘাত ও অণুগঠন এবং অপরদিকে অণু ভেঙে পরমাণুর সৃষ্টি নিয়ে এই সাম্যাবস্থা রচিত হয়। স্বল্পস্থায়ী অতি শক্তিসম্পন্ন বৈদ্যুতিক স্পার্কের সাহায্যে ক্লোরিন গ্যাসকে অভিঘাত করে তাঁরা সাম্যাবস্থা ব্যাহত করেন। এই বিশৃঙ্খলার ফলে সাধারণত ক্লোরিন পরমাণুর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। বিঘ্নিত অবস্থায় যে গতিতে ক্লোরিন অণু স্বাভাবিকভাবে পুনর্গঠিত হয় তা তাঁরা পরিমাপ করেন। ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত তাঁরা কেম্ব্রিজে একযোগে কাজ করেছিলেন, তারপর অধ্যাপক পোর্টার শেফিল্ডে চলে যাওয়ায় স্বতন্ত্রভাবে গবেষণা করছেন।

অধ্যাপক মানফ্রেড আইগেন

অধ্যাপক আইগেন ১৯২৭ সালে জার্মানীর বোচামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জার্মানীর কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞানীর কাছে গটিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ-বিজ্ঞান ও রসায়নশাস্ত্রে পাঠ গ্রহণ করেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌত রসায়ন বিভাগে তাঁর গবেষক-জীবনের সূচনা। ১৯৫৩ সালে গটিনজেনের মাকস্ প্লাংক ইনস্টিটুটে ভৌত রসায়ন বিভাগে সহকারী বিজ্ঞানী হিসাবে যোগদান করেন এবং বর্তমানে এই বিভাগের তিনি অধ্যক্ষ। ভৌত রসায়নে তাঁর কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্যে তাঁকে ওয়াশিংটন, হারভার্ড এবং শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডিগ্রী প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া আরও অনেক পুরস্কার তিনি পেয়েছেন। ভৌত রসায়ন সম্পর্কে একাধিক মূল্যবান গ্রন্থের তিনি রচয়িতা।

অধ্যাপক আইগেন হাইড্রোজেন গ্যাসের সাম্যাবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করেছেন। জলের অণুর ভাঙনের ফলে যে হাইড্রোজেন আয়নের সৃষ্টি হয় সে সম্পর্কে তিনি ব্যাপক গবেষণা করেন। বিস্ফোরণের স্পন্দন বা উচ্চশক্তিসম্পন্ন বৈদ্যুতিক স্পন্দনের সাহায্যে তিনি হাইড্রোজেন আয়ন গঠনের সাম্যাবস্থা ব্যাহত করেন। এই অনুসন্ধানে তিনি যে ফল লাভ করেছেন তা এখন জীবতাত্ত্বিক তন্ত্রে এনজাইম বিক্রিয়ার গতিপ্রকৃতি নির্ধারণের জন্যে প্রয়োগ করছেন। —শুভঙ্কর

ভেষজশাস্ত্রে সোনার সিঁড়ি

বিগত শতকগুলির আন্তর্জাতিক ভেষজ বিজ্ঞানের চিরায়ত সাহিত্যরাজি একটি সোনার সিঁড়ি যা বেয়ে মানবজাতি আধুনিক জ্ঞানের শিখরে আরোহণ করেছে। এসব রচনা প্রকাশে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা বিপুল প্রয়াস করেছেন। কাজটা মোটেই সহজ ছিল না। শুধু প্রাচীন গ্রীক, আরবী, লাতিন ও ইতালীয় ভাষাগুলি থেকে অনুবাদ এই প্রয়াসের অন্তর্গত ছিল না। ভেষজ ভাষা-তাত্ত্বিক ও পরিভাষাগত বিপুল গবেষণার প্রয়োজন হয়েছিল এবং তার সঙ্গে সঙ্গে যে সব জাতি এসব চিরায়ত সাহিত্য সৃষ্টি করেছিল তাদের সম্পর্কে ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক সমীক্ষা চালাতে হয়েছিল।

রাষ্ট্রীয় জীববিজ্ঞান ও ভেষজশাস্ত্র প্রকাশনা ভবনের প্রথম কৃতিত্ব ছিল তিন খণ্ডে হিপোক্রেটিস-এর রচনাবলী প্রকাশ (১৯৩৬—৪১)। মূল গ্রীক থেকে এর অনুবাদ করেছিলেন অধ্যাপক বি রুদনেভ এবং ভূমিকা ও টীকা লিখেছিলেন অধ্যাপক ভি কার্পেফ।

১৯৪৮ সালে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞান আকাদেমি প্রকাশনা ভবন রুশ ভাষায় উইলিয়ম হার্ভের 'এক্সারটাসিও আনা-টোমিকা দ্য মোতু গোর্দিস এত্ সাংগুইনিস ইন এনিমালিবাস' মুদ্রণ করে।

শরীরসংস্থান - শারীরতত্ত্ব বিষয়ক মৌলিক গবেষণার ফলশ্রুতি ছিল আন্দ্রিয়াস ভেসালিয়াসের (১৫১৪ — ১৫৬৪) 'দ্য গর্পোরিস হিউমানি ফাব্রিকা' গ্রন্থ। শরীর-সংস্থাপন বিদ্যাচর্চায় তিনি এক নতুন যুগের উদ্বোধন করেছিলেন। এই বিখ্যাত বিজ্ঞানীর গ্রন্থের প্রথম সোভিয়েত সংস্করণ সোভিয়েত বিজ্ঞান আকাদেমি প্রকাশনা ভবন ১৯৫০—৫৪ সালে প্রকাশ করে।

মধ্যযুগের ভেষজশাস্ত্রের একটি বৃহৎ কীর্তি আবু ইবন সিনার বিপুলায়তন গ্রন্থ 'চিকিৎসা সংহিতা'। এই ভেষজ বিশ্ব-কোষটির অনুবাদ করা হয় দ্বাদশ শতকের মূল আরবী পাণ্ডুলিপি থেকে। ১৯৫৪—৬০ সালে তাশখন্দে রুশ ও উজবেক ভাষায় টীকাসহ ছয়টি বৃহৎ খণ্ডে এই গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়। একালে সোভিয়েত আরবী বিশেষজ্ঞ ও চিকিৎসকের বিপুল গবেষণার ফলশ্রুতি এই অনুবাদ প্রকাশ। ইউরোপ বা আমেরিকা কোথাও এই সংহিতার পুরো অনুবাদ পাওয়া যায় না।

প্রাচ্যের এই মহান চিকিৎসকের মাথার খুলির আলোকচিত্র ও তার বিশদ বিবরণ থেকে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা তাঁর প্রকৃত চেহারা খাড়া করতে সক্ষম হয়েছেন। মধ্য-যুগে ও আধুনিককালে ইবন সিনার যত প্রতিকৃতি দেখা গেছে তার সবগুলিই শিল্পীর কল্পনাজাত। বিখ্যাত সোভিয়েত নৃতত্ত্ব বিজ্ঞানী অধ্যাপক মিখাইল গেরা-সিমোফের নেতৃত্বে পরিচালিত এই জটিল কাজটির বিবরণ রয়েছে তাঁর 'ইবন সিনার প্রতিকৃতি' বইটিতে।

গালেনাসের কালের আগে প্রাচীন রোমের ভেষজশাস্ত্রে একজন প্রতিনিধি আউলেয়াস সেলসাস। তাঁর আট খণ্ডের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'দ্য মেডিসিনা' এক দল সোভিয়েত বিশেষজ্ঞের দ্বারা অনূদিত হয়।

শরীরসংস্থান — শারীরতত্ত্ব সম্পর্কিত গবেষণার একটা বৃহৎ কীর্তি লিওনার্দো দাভিঞ্চি (১৪৫২--১৫১৯) চমৎকার রচনা-বলী। শরীরসংস্থানবিদ্যা সম্পর্কে তিনি ১২০টি নোটবই লিখেছিলেন এবং তাঁর মতে এই রচনার সময় 'তাঁর পরিশ্রমের অভাব ছিল না, অভাব ছিল সময়ের'। বর্ণনা সম্পর্কে তাঁর গবেষণা ও বিস্ময়কর ড্রইং-এর সব আমাদের হাতে আসে নি। পৃথিবীর সর্বত্র বিভিন্ন মহাফেজখানায় রক্ষিত পাণ্ডুলিপিগুলি সংগ্রহ করতে অবিশ্বাস্য রকমের জটিল ধরনের কাজ করতে হয়েছিল। ফলে 'বিজ্ঞান' প্রকাশনা ভবন ১৯৬৫ সালে রুশ ভাষায় শরীর-সংস্থান বিদ্যা সম্পর্কে এই মহান বিজ্ঞানীর রচনাবলী প্রকাশ করতে পেরেছিল। সে সময়ই এই বিজ্ঞানী আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করছিলেন। এই বিজ্ঞানী ও শিল্পীর অন্তর্জীবন, তাঁর কাজের পদ্ধতি সবই এই নোটবইয়ে প্রতিফলিত মূল ইতালীয় ভাষা থেকে অনুবাদ করে সোভিয়েত বিজ্ঞান আকাদেমি টীকাসহ এই পুস্তক প্রকাশ করে। নবীন সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের প্রশিক্ষণ দানে এই পুস্তক চমৎকার সহায়ক হিসাবে কাজ করে।

ভেষজ বিজ্ঞানের একটি প্রতি আগ্রহোদ্দীপক কীর্তি 'সালের্নো হেলথ কোড' — রচয়িতা ভিলানোভার আর্নল্ড (১২৩৫—১৩১১)। এই চিরায়ত গ্রন্থটি ১২০টি সংস্করণে প্রকাশিত হয়েছিল। লাতিন ষড়পদী ছন্দ থেকে একই ছন্দে রুশ ভাষায় এটি অনূদিত হয়। ১৯৬৪ সালে ভেষজশাস্ত্র প্রকাশনা ভবন এটি রুশ ভাষায় প্রকাশ করে। স্বাস্থ্যরক্ষার যেসব ব্যবস্থাপত্র এতে আছে তা আধুনিক পাঠকেরও যথেষ্ট কৌতূহলের সৃষ্টি করে।

রোমান ভেষজশাস্ত্রের বিশিষ্টতম প্রতি-নিধি ছিলেন ক্লডিয়াস গালেবাস। রুশ ভাষায় এই মহান চিকিৎসকের কোন রচনাই আগে প্রকাশিত হয় নি। ভেষজ শাস্ত্র প্রকাশনা ভবন এই বিজ্ঞানীর প্রধান রচনা 'মানবদেহের অংশসমূহের ব্যবহার সম্পর্কে' — এর সঠিক রুশ সংস্করণ তৈরি করেছে। ইংল্যান্ড বা আমেরিকায় ইংরেজী ভাষায় এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় নি।

কলকাতা

বিদেশিনী, তার উপর শ্বেতাঙ্গিনী, অতএব বলুন কলকাতা আপনার কেমন লাগছে, এই প্রশ্ন দিয়ে আলাপ জমাবার চেষ্টা করিনি। হুগলী বেয়ে স্টীমার চলছিল, ডেকচেয়ারে বসে দুকূলের দৃশ্য দেখতে দেখতে ভদ্রমহিলা নিজে থেকেই বললেন, "কলকাতা আর নিউ অর্লিয়ান্স কোথায় যেন মিল আছে এই দুই শহরে। কলকাতায় এলেই আমার নিউ অর্লিয়ান্সের স্মৃতি জেগে ওঠে।"

মিসিসিপির মোহানায় অদূরে উজানে নিউ অর্লিয়ান্স শহর, যেমন হুগলীর মোহানায় কলকাতা। আমেরিকার অন্যতম বৃহত্তম বন্দর নিউ অর্লিয়ান্স, যেমন কলকাতা ভারতবর্ষের। প্রায় চার হাজার মাইল পথ বয়ে মিসিসিপি তার সব জল ঢেলে দেয় অতলান্তিকের উপসাগর গালফ্ অফ্ মেক্সিকোতে—আর তার সঙ্গে বছরে চাল্লিশ কোটি টন কাদা। নিউ অর্লিয়ান্স পর্যন্ত জাহাজ চালু রাখতে চব্বিশ ঘণ্টা ড্রেজার দিয়ে কাদা পাম্প করে বার করে দিতে হয়। "হুগলীর জল কী আন্দাজ পলি বয়ে নিয়ে আসে বঙ্গোপসাগরে?" জানতে চাইলেন ভদ্রমহিলা। আমাদের স্টীমার তখন হুগলীর একটা ড্রেজারের পাশ দিয়ে জল কেটে মোহানার দিকে এগোচ্ছে।

শুধুমাত্র এইটুকু মিল না আরও কিছু, এটুকু তো প্রাথমিক ভূগোলের জ্ঞান থেকেই জানা যায়। অবশ্য প্রশ্ন করাই বিড়ম্বনা, অজান্তে কখন আলোচনা গিয়ে ঠেকবে কলকাতার আবর্জনার আর ভিখিরীতে কে জানে। কিন্তু উনি সে পথে গেলেন না। বললেন, "নিউ অর্লিয়ান্স পুরাতনকে ভালবাসে। সত্যি বলতে কী, পুরাতনকে যেন আঁকড়ে ধরে থাকতে চায়। কলকাতাও তাই। সেইজন্যই কলকাতাকে এত ভাল লাগে।"

এখানে অবশ্য একটা কথা চেপে যেতে হয়েছিলাম। কলকাতা পুরাতনকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চায় কি? কলকাতার নতুন হবার সম্ভাবনা সীমিত অতএব পুরাতনকে সহ্য করা ছাড়া তার উপায় নেই। না, বিদেশীকে ভুল তথ্য পরিবেশন করার মধ্যে কোন বুদ্ধির পরিচয় নেই। বরং সরল মনে গলদ স্বীকার করা ভাল। বললাম, "অবশ্যই এ'দের গলি আঁকড়ে ধরে থাকার প্রবৃত্তি আমাদের নেই, তবে রক ছাড়তে পারব না।"

রক মানে কি জানতে চাইলেন তিনি। ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতেই ও'র মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বললেন, "কী আশ্চর্য, এ মিলটার কথা আমিও জানতাম না। নিউ অরলিয়ান্সের ভিউ কারে (কথাটা ফরাসী, মানে পুরোনো পাড়া) রকে ভর্তি, এবং সেখানেও ঠিক এমনি রকে বসে লোকে আড্ডা দেয়।"

আরও অনেক মিলের কথা তিনি বললেন। ভারতবর্ষে এক কলকাতাই এখনও ট্রামগাড়ী ছাড়তে পারেনি, আমেরিকাতে যে মুষ্টিমেয় গুটিকয় শহরে এখনও ট্রামগাড়ী চালু আছে। শো-পিস হিসাবেও বটে, যাতায়াতের প্রয়োজনেও বটে, তার মধ্যে নিউ অরলিয়ান্স একটি (ট্রামগাড়ীকে ওখানে বলা হয় স্ট্রীট কার)।

এখানেও একটি মন্তব্য করতে গিয়ে থেমে যেতে হল। নিউ অরলিয়ান্স থেকে ট্রাম উঠে গেলে বিশেষ কেউ টের পাবে না, টুরিস্ট ছাড়া। কিন্তু কলকাতা থেকে ট্রাম উঠে গেলে? সে অবস্থার কথা কল্পনা করা যায় না।

বাজারের কথা উঠতেই ভদ্রমহিলার মুখ আর একবার উজ্জ্বল হল। বললেন, কলকাতার বাজারে ঢুকলে মনে হয় নিউ অরলিয়ান্সের বাজার। লাউ-কুমড়ো থেকে বেগুন লঙ্কা ঢ্যাঁড়স সবই নিউ অরলিয়ান্সের বাজারে মেলে, এবং বিক্রীও হয় প্রায় কলকাতার বাজারের মতই ঢেলে। আমেরিকার হালের সুপার মারকেটের সামনে নিউ অরলিয়ান্সের পুরোনো বাজার এখনও তার অতীতের প্রতি মোহের কথা মনে করিয়ে দেয়।

কলকাতার পুজোর কথা বিশেষ করে ভদ্রমহিলা বললেন, কলকাতার পুজোর উদ্দীপনার তুলনা কোথাও নেই। বরং অরলিয়ান্সের মারদি গ্রা উৎসবে যে প্রাণ-প্রাচুর্যের খানিকটা দেখা যায়। মারদি গ্রা উৎসবের অঙ্গ হিসাবে যে মুখোশ শোভাযাত্রা নিউ অরলিয়ান্সের রাস্তায় বার হয়, অনেকটা পুজোর বিসর্জনের দিনের কথা মনে করিয়ে দেয়।

●

বয়স্কা আমেরিকান ভদ্রমহিলা সম্প্রতি কলকাতায় বাংলাদেশে ছাপাখানার ইতিহাসের উপর গবেষণায় রত আছেন। ছাপাখানার ইতিহাস মানে এর যান্ত্রিক বা ব্যবসায়িক ইতিহাস নয়—মুদ্রণের "মানবিক" দিক নিয়ে তিনি চর্চা করেন। যেমন ধরুন একটা উনবিংশ শতাব্দীতে মুদ্রিত একখানা বই নিয়ে তিনি খুঁটিয়ে দেখেন এটা ছাপতে প্রিন্টারকে কী কী সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল এবং সেই সেই সমস্যার সমাধান সে কী উপায়ে করেছিল। বাড়ী অবশ্য তাঁর নিউ অরলিয়ান্সে বা লুইজিয়ানার কোথাও নয়—তিনি টেক্সাসের। কলকাতায় এর আগেও এসেছেন, এবং এবার কলকাতায় আসবার আগে ঢাকায় গ্রন্থাগার বিষয়ক ব্যাপারে অধ্যাপনা ক'রে এসেছেন।

আমাদের গন্তব্য ছিল সুন্দরবন। তিন দিন শুধু জল আর জল—দেখতে দেখতে তিনি বললেন—পূর্ব পাকিস্তানকে সব জল দিয়ে দিয়ে পশ্চিমের তোমরা যে একেবারে শুকিয়ে গেছ তা নয়—এইখানে এলে পশ্চিমবঙ্গকেও সুজলা বলতে বাধা থাকে না।

তবে একটা বড় বৈষম্য এত জল থাকা সত্ত্বেও তাঁর নজর এড়ায়নি। "এতটা জল বেয়ে এলাম, একটাও মাঝির গান শুনতে পেলাম না। পদ্মা, মেঘনা বা পূর্ব পাকিস্তানের আর আর নদীর বুকে এখনও মাঝির গান শুনতে পাবেন। বড় হন্টিং সেসব গান।"

তাঁর সব প্রশ্নের জবাব দিতে গেলে একাধারে ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক, নৃতত্ত্ব-বিদ, এবং অনেক কিছু হতে হয়। যেমন একটি প্রশ্ন : সেদ্ধ চাল কীভাবে করে। সেদ্ধ না করে চাল করা যায় কিনা, আর সেদ্ধ চাল করার তাৎপর্যটা কি।

যতদূর জানা ছিল বললাম। ধান সেদ্ধ করে নিয়ে পরে চাল কুটলে সে চাল ভাত করবার সময় বেশী শ্বেতসার মাড়ের সঙ্গে চলে যেতে পারে না। এতে অপচয় কম হয়, আর দ্বিতীয়ত আতপ চাল গুরুপাক।

সুন্দরবন অঞ্চলে যখন স্টীমার পৌঁছল তখন জলপথের দুপাশে ঘন জঙ্গলের মাঝে মাঝে খাঁড়ির ভেতর দিয়ে বনের মধ্যে যতদূর দৃষ্টিপাত করা যায় করতে করতে মাঝে মাঝে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। একটা লম্বা বাঁশ বা লাঠি কাদায় বা তীরে পোঁতা, আর তার মাথায় শাদা কাপড় নিশানের মত করে অথবা চাঁদোয়ার মত করে বাঁধা। "ওগুলো কী?" জানতে চাইলেন। তখন বলা সম্ভব হয়নি পরে জেনেছিলাম, ওগুলো স্মৃতিচিহ্ন। সুন্দরবনে নৌকা বেয়ে যারা জঙ্গলের ভিতরে ঢুকে কাঠ কাটতে যায়, তাদের মধ্যে কাউকে বাঘে নিয়ে গেলে, তার হাতের দাঁড় ঠিক যেখান থেকে তাকে বাঘে টেনে নিয়েছে সেখানে পুঁতে দেওয়া হয়। এক টুকরো শাদা কাপড়ের এক কোণে খানিকটা চাল বেঁধে, সে কাপড়টা দাঁড়ের ডগায় আটকে দেয়া হয় গাজী সাহেবের উদ্দেশ্যে। সে গাজী সাহেব সুন্দরবনের কাঠুরেদের রক্ষক। গাজী সাহেবের সম্বন্ধে নানা কিম্বদন্তী আছে, স্থানীয় লোকের বিশ্বাস, তিনি বাঘের পিঠে সওয়ার হয়ে সুন্দরবনে বিচরণ করেন আর তাঁকে অনুসরণ করে শত শত বাঘ। গাজীসাহেব কাঠুরের পুজোয় প্রসন্ন হলে বাঘেদের আদেশ করেন কাঠুরের গায়ে আঁচড়টি না দিতে।

ওই স্মৃতিদণ্ডগুলি যেমন পোঁতা আছে তেমনি রেখে দেবার নিয়ম। কেউ যদি টেনে তুলতে চেষ্টা করে তবে সে যেন একটানে তুলে ফেলে। কারণ প্রথম টানে না উঠলে অনিবার্যভাবে সে বাঘের পরবর্তী শিকার। —রেবতী

তিন অধ্যায় : সুপ্রিয়া দেবী



প্রেক্ষাগৃহ

ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাস ও ন্যাশনাল ফিল্ম আর্কাইভ

ভারতীয় চলচ্চিত্রের উৎপত্তিকালকে যদি ১৯০০ সাল ব'লে ধরা হয়, তাহ'লে গেল আটষট্টি বছর ধ'রে এই শিল্পটি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের চিত্রোৎসাহীদের অদম্য চেষ্টায় হাজারো রকম বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও সে-পথ বেয়ে বর্তমানের রূপ পরিগ্রহ করেছে, সেই পথকে জানতে ও বুঝতে গেলে সেই প্রথম দিনের হীরালাল সেন-কৃত আলিবাবা, ভ্রমর, বিষবৃক্ষ প্রভৃতি খণ্ডচিত্র থেকে শুরু ক'রে আজ পর্যন্ত ভারতের বুকে ভারতীয়দের দ্বারা যত ছবি নির্মিত হয়েছে, তাদের সবগুলিকেই চোখ ও মন দিয়ে দেখা প্রয়োজন। কিন্তু আমরা অসম্ভবের কথাই [illegible] করছি। কারণ চলচ্চিত্র-জগতের কারবার বর্তমানকে নিয়ে। কোনো চিত্র-প্রযোজক যখন একটি ছবি নির্মাণ করেন, তখন তিনি তার প্রিন্টগুলি—বাঙলা ছবির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী চোদ্দটি এবং হিন্দী ছবির ক্ষেত্রে প্রতিটি সার্কিটের জন্যে কুড়ি থেকে ত্রিশটি—সাধারণত তাঁর পরিবেশকের হাতে তুলে দেন। যতদিন সেগুলির প্রদর্শনী থেকে অর্থের আমদানী হয়, ততদিনই তিনি তাঁর ছবির খবরাখবর রাখেন, তার পরে তিনি নতুন ছবির দিকে ঝুঁকে পড়েন। আর যদি একটি ছবিতেই তিনি ঘায়েল হয়ে পড়েন, তাহ'লে তিনি ছবির জগত থেকেই স'রে যান এবং তাঁর কৃত ছবিটির অবস্থা কি হ'ল, তা' জানতেও চান না। ছবির যাঁরা পরিবেশক, তাঁরাও ছবি থেকে যতদিন অর্থাগম হচ্ছে, ততদিনই ছবি সম্বন্ধে মনোযোগী। প্রয়োজন যখন ফুরিয়ে গেল, তখন পুরোনো খবরের কাগজের মতোই ছবির প্রিন্টগুলি ওজন দরে বিক্রী হয়ে যায়। অনেক সময়ে দেখা যায়, ছবির নেগেটিভও সমান অবস্থাপ্রাপ্ত হয়েছে অর্থাৎ ওজন দরে বিক্রী হয়ে গেছে। যাঁরা ওজন দরে এই ফিল্ম কেনেন, তাঁরা [illegible] ধুয়ে তা থেকে রুপো (সিলভার নাইট্রেট) উদ্ধার ক'রে থাকেন। ফলে [illegible] ছবি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

অদ্বিতীয় : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং লিলি চক্রবর্তী ফটো : অমৃত



বোর্ড অব ফিল্ম সেন্সর-এর নিয়ম অনুসারে কোনো ছবির সেন্সর হয়ে গেলে, হয় ছবিটির একটি সম্পূর্ণ চিত্রনাট্য জমা দিতে হয়, আর নয়তো ছবির একটি প্রিন্ট সেন্সার কর্তৃপক্ষকে বরাবরের জন্যে দিয়ে দিতে হয়। আমরা জানি, বহু চিত্র-প্রযোজক জমা দেবার জন্যে পয়সা খরচ ক'রে চিত্রনাট্য লেখানোর পরিবর্তে ছবিতে শব্দ-পুনর্যোজনা করবার জন্যে যে আর-আর (রি-রেকর্ডিং) প্রিন্ট ক'রে থাকেন, সেই-টিকেই সেন্সর আপিসে জমা দিয়ে দেন। এর ফলে বহু ছবিই সেন্সার দপ্তরের হেপাজতে জমা থাকবার কথা। কিন্তু ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের জন্ম সাল ১৯৫২ থেকে শুরু ক'রে আজ পর্যন্ত বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কলকাতায় কতগুলি ছবির প্রিন্ট জমা পড়েছে এবং জমা-পড়া সেই প্রিন্ট-গুলির কি দশা হয়েছে, সে-সংবাদ সেন্সর বোর্ডের কাছ থেকে কোনোদিনই কেউ জানতে চেষ্টা করেননি।

পুরোনো চলচ্চিত্র আরও একটি বিশেষ কারণে অত্যন্ত দুর্লভ। প্রায় ১৯৫০ সাল পর্যন্ত ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত ৩৫ মিঃ মিঃ স্ট্যান্ডার্ড ফিল্মের হ'ত নাইট্রেট ফর্ম (বেস্)। এই নাইট্রেট বেস-বিশিষ্ট ফিল্মগুলি হ'ত অত্যন্ত সহজদাহ্য; সামান্য অগ্নিস্পর্শে এরা নিমিষে পুড়ে ছাই হয়ে যেত। এ-ছাড়া ছিল আপনা হ'তেই পুড়ে যাওয়ার উৎপাত, যাকে বলে— automatic combustion (স্বয়ংদাহ্যপ্রবণতা)। এই দুভাবে অতীতে কত যে ফিল্ম-ভাণ্ডার পুড়ে গেছে, তার ইয়ত্তা নেই। মনে পড়ে ১৯৪০ সালে নিউ-থিয়েটার্স' ল্যাবরেটারীতে আগুন জ্বলে উঠে মিনিট দশেকের মধ্যেই সকল ছবির নেগেটিভ ভস্মে পরিণত হয়েছিল। ম্যাডান কোম্পানীর ধর্মতলার গুদাম, অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের গুদাম, ইন্দ্রপুরী স্টুডিওর পুরোনো ফিল্মের গুদাম প্রভৃতিতে অগ্নিকাণ্ডের ফলে কত যে পুরোনো ছবি বিনষ্ট হয়েছে, তার সংখ্যা নেই। এমন অগ্ন্যুৎপাতের ঘটনা বোম্বাই ও মাদ্রাজেও ঘটেছে। অথচ আমাদের পুরোনো ছবিগুলিই আমাদের চলচ্চিত্রেতিহাসের বিশিষ্টতম উপাদান। প্রতিটি ছবির কোনো কোনো দৃশ্যের ফোটো (যাকে স্টুডিওর ভাষায় স্টীল বলা হয়) মূল ছবির অভাব কতটুকু মেটাতে পারে?

চলচ্চিত্রের সঙ্গে দেশের সাহিত্য, অভিনয়, সামাজিক রীতিনীতি, রস ও রুচিবোধ, বিভিন্ন স্তরের মানুষের সাজ-সজ্জা, পারস্পরিক ব্যবহার, প্রভৃতি বহুবিধ জিনিস অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কাজেই আমাদের দেশের সবক'টি চলচ্চিত্রকে যদি আমাদের চোখের সামনে পাওয়া যেত, তা থেকে আমরা আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের গেল আটষট্টি বছরের সামাজিক, শৈল্পিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ছবিকে আমাদের চোখের সামনে পেতে পারতুম! এই কথা মনে রেখে আজও আমাদের চেষ্টা করা উচিত, যেখান থেকে যেটুকু পাওয়া যায়, ভালোভাবে নির্বাচন করে ততটুকু চলচ্চিত্রাংশ সংগ্রহ করা। সঙ্গে সঙ্গে বর্তমানে যে-সব ছবি নির্মিত হচ্ছে, তাদের প্রত্যেকটির একটি পূর্ণাঙ্গ প্রিন্ট (রিলিজ-প্রিন্ট) যাতে পুণায় প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল ফিল্ম আর্কাইভ-এ জমা পড়ে, তার জন্য ভারত সরকারের তথ্য ও বেতার বিভাগের সক্রিয়ভাবে সচেষ্ট হওয়া উচিত। এর জন্য যদি বিশেষ কোনো আইন প্রচলনের প্রয়োজন হয়, তাও করা দরকার। শোনা যায় আমাদের এই ন্যাশনাল ফিল্ম আর্কাইভে মাত্র দুশোটি ছবি সংগৃহীত হয়েছে। অনুমান করা কঠিন নয় যে, ভারতে প্রস্তুত অগণিত ছবির তুলনায় এই সংগ্রহ অত্যন্ত নগণ্য। মাত্র ১৯৩১ থেকে ১৯৬৫ সালের মধ্যেই আমাদের দেশে ন্যূনাধিক ৮,০০০ (আট হাজার) কাহিনী-চিত্র তৈরী হয়েছে। এবং এর সবগুলিই সবাক। এছাড়া আছে তথ্য ও সংবাদচিত্র। এর আগে মাত্র কাওলা-দেশেই ১৯১৯ সাল থেকে নির্মিত হয়েছে অন্যূন একশত আটাশখানি নির্বাক ছবি। [illegible] ছবি নির্মিত হয়েছিল।

ফ্রান্সের লা সিনেমাথেক ফ্রাঁসেজে সংগৃহীত ছবির সংখ্যা হচ্ছে ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার); রাশিয়ায় সংগৃহীত হয়েছে ১৬,০০০; রুমানিয়ায় ৮,৫০০, পোলাণ্ডে ৮,০০০; চেকোশ্লোভাকিয়ায় ১৬,০০০; ইস্ট জার্মানীতে ২৬,০০০। এর থেকেই বুঝতে পারা যায়, আমাদের ভারতে সরকারী এবং বেসরকারী প্রচেষ্টায় অতীতের চলচ্চিত্র বা চলচ্চিত্রাংশ সংগ্রহের জন্যে আমাদের কত ব্যাপক অভিযান চালানো উচিত। এবং আমাদের মনে হয়, কাহিনী-চিত্র বা তথ্যচিত্র, যাই হোক না কেন, বা যেমনই হোক না কেন, সবরকম চলচ্চিত্র সংগ্রহের জন্যে আমাদের রীতিমত যত্নবান হওয়া উচিত শুধুমাত্র আমাদের দেশের একটি পূর্ণাঙ্গীন চলচ্চিত্রেতিহাস রচনা করবার জন্যে নয়, গেল আটষট্টি বছরব্যাপী আমাদের জীবন-যাত্রার একটি জীবন্ত প্রতিরূপকে আমাদের চোখের সামনে পাবার জন্যে।

চিরদিনের চিত্রের সেটে কমল মিত্র, সুপ্রিয়া দেবী, পরিচালক বিভূতি লাহা ও রূপক মজুমদার। ফটো : অমৃত



চিত্র সমালোচনা

রামরাজ্য

শ্রীপ্রকাশ পিকচার্স-এর নিবেদন: ৩,১০৫ মিটার দীর্ঘ এবং ১৬ রীলে সম্পূর্ণ; প্রযোজনা : শংকরভাই ভট্ট ও বিজয় ভট্ট; পরিচালনা : বিজয় ভট্ট; কাহিনী : বাল্মীকি রামায়ণ, তুলসী দাসের রামচরিত-মানস ও ভবভূতির উত্তররামচরিত থেকে গৃহীত; সংগীত পরিচালনা : বসন্ত দেশাই; গীত রচনা : ভারত ব্যাস; চিত্রগ্রহণ : প্রবীণ ভট্ট; শব্দানুলেখন : এন আর যোশী; সংগীতানুলেখন : কৌশিক ও মীনু কাত্রাক; শিল্প-পরিকল্পনা : কানু দেশাই; শিল্প-নির্দেশনা : শ্রীকৃষ্ণ আচরেকার; সম্পাদনা : প্রতাপ দাভে; নৃত্য পরিচালনা : গোপীকৃষ্ণ; নেপথ্য কণ্ঠসংগীত : লতা মঙ্গেশকর, মোহাম্মেদ রফী, আশা ভোঁসলে মান্না দে, সুমন কল্যাণপুর এবং ঊষা টিমোটি; রূপায়ণ : কুমার সেন, অনিল-কুমার, যন্ত্রীপ্রসাদ, ভেদ পুরী, কানহাইয়া-লাল, অরবিন্দ দেব, জয়, বিজয়, বীণা রায়, পদ্মা দেবী, স্নেহলতা, অরুণা রায়, বেবী ফরিদা, শুভাঙ্গী এবং গোপীকৃষ্ণ, সত্যবান ও জীবনকলা।

১লা মার্চ, শুক্রবার হিন্দ গণেশ, খান্না, কালিকা, ভবানী এবং অন্যান্য চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করেছে।

লংকাবিজয়ের পর সীতাকে গ্রহণের পূর্বে শ্রীরামচন্দ্র সীতার অগ্নিপরীক্ষা করেন। কিন্তু এখবর বোধকরি, অযোধ্যার প্রজাপুঞ্জের জানা ছিল না কিংবা এও হতে পারে, তারা এই অগ্নিপরীক্ষার ঘটনাটিতে আস্থা স্থাপন করতে পারেনি। সেই কারণে যখন রামচন্দ্র পুনরায় অযোধ্যা রাজ্যের শাসন ভার গ্রহণ করেন, তখন রাবণগৃহে বহুদিন বন্দিনী থাকায় সীতার চরিত্র তাঁর প্রজাদের সমালোচনার বস্তু হয়ে পড়েছিল। ফলে প্রজানুরঞ্জনের জন্যে রামচন্দ্র সন্তান-বতী সীতাকে বাল্মীকির তপোবনে নির্বাসিত করেন। যথাসময়ে সীতার দুই যমজ সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়; তাদের নাম রাখা হয় —লব ও কুশ। আশ্রম-পালিত হয়েও এই ক্ষত্রিয় সন্তানদ্বয় কালক্রমে যুদ্ধ-বিশারদ হয়ে ওঠে এবং যখন শ্রীরামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া তপোবন সান্নিধ্যে আসে, তখন যুদ্ধ অনিবার্য জেনেও তারা সেই ঘোড়া -আটক করে। ঘোরতর যুদ্ধের পর যখন প্রকাশ পায়, তারা শ্রীরামচন্দ্রেরই আত্মজ, তখন যুদ্ধের অবসান ঘটে এবং পতি-পত্নীর পুনর্মিলন হয়। কিন্তু সেই আনন্দক্ষণেই ধরিত্রী-দুহিতা সীতা ধরিত্রী-গর্ভে লীন হয়ে যান।

শ্রীরামচন্দ্রের অযোধ্যায় পুনরাগমনের পর থেকে মিলনক্ষণে সীতার পাতাল-প্রবেশ পর্যন্ত ঘটনাবলী বিজয় ভট্ট পরিচালিত শ্রীপ্রকাশ পিকচার্স-এর নবতম ইস্ট-ম্যান কলার চিত্র "রামরাজ্য"-এর বিষয়-বস্তু। কিন্তু সীতা নির্বাসনে রামকে কৃতসংকল্প করবার জন্যে রজকের মুখে তার স্ত্রীর চরিত্র সম্বন্ধে কটূক্তি দিয়ে আরম্ভ করে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়েছে, তা' সীতা নির্বাসন-রূপ গুরুতর পরিণতির পক্ষে অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর ও লঘু এবং কাহিনীরচয়িতাদের কল্পনা-শক্তির দীনতার পরিচায়ক। এ-ছাড়া গর্ভিণী সীতার প্রীত্যর্থে 'সৃষ্টির প্রথম নরের 'বহু হবার ইচ্ছায় নারীর জন্ম এবং নর-নারীর প্রেমের পরিণতিরূপে সন্তানাদি দ্বারা মনুষ্য জাতির প্রসার'-এর নৃত্য-নাট্যটি যেভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে, তা' যুগোপযোগী হয়েছে কিনা সে-বিষয়ে যথেষ্টই সন্দেহ আছে। বিজয় ভট্ট আজ থেকে অন্যূন কুড়ি বছর আগে শাদা-কালো ফোটোগ্রাফীর মাধ্যমে যে "রামরাজ্য" চিত্রসৃষ্টি করেছিলেন, কাহিনী বিস্তারের ধারাবাহিকতায় তা ঢের বেশী ঘনসন্নিবদ্ধ ও বিশ্বাস্য ছিল এবং ছবিখানি জাঁক-জমকের দিক দিয়ে বর্তমান রঙীন ছবিটির চেয়ে ঢের বেশী শোভন ও পারিপাট্যমণ্ডিত ছিল।

শ্রীরামচন্দ্রের ভূমিকায় নবাগত কুমার-সেনকে মানিয়েছে চমৎকার এবং তিনি তাঁর অভিনয়ের মাধ্যমে চরিত্রটির মর্যাদাও রক্ষা করেছেন। লক্ষ্মণের ভূমিকায় অনিল-কুমারের অভিনয়েও যথেষ্ট দরদ ফুটে উঠেছে। লব-কুশের বেশে জয় ও বিজয়ের মধ্যে বিজয়ই আকৃতি এবং অভিনয়-ভঙ্গীর মাধ্যমে বেশী হৃদয়গ্রাহী। সীতা বেশে বীণা রায় নিশ্চয়ই মাধুর্যমণ্ডিত কিছুটা মেদবহুলতা সত্ত্বেও। তবে এই রূপে সাদা-কালো "রামরাজ্য"-এর শোভনা সমর্থকে আমরা ভুলতে পারি না। সীতার সহচরী চিত্রলেখার ভূমিকায় স্নেহলতার দরদী অভিনয় প্রশংসনীয়। অপরাপর ভূমিকায় বদ্রীপ্রসাদ (বাল্মীকি), বেবী ফরিদা (আশ্রমকন্যা বাসন্তী), পদ্মা দেবী (কৌশল্যা), ভেদ পুরী (বশিষ্ঠ), কানহাই-য়ালাল (ধোবা), অরবিন্দ দেব (আশ্রম-বালক রোহিত) প্রভৃতি উল্লেখ্য অভিনয় করেছেন।

ছবিটির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগে প্রশংসনীয় দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে লব-কুশের যুদ্ধ-দৃশ্যের বিভিন্ন বান যে অংকিত, তা বুঝতে পারা যায় অনা-য়াসেই। ছবির ন'খানি দীর্ঘায়ত গান সংগীত।

বিজয় ভট্ট পরিচালিত রঙীন পৌরা-ণিক চিত্র "রামরাজ্য" আজকের সামাজিক ও সাসপেন্সধর্মী ছবির যুগে ভিন্নতর আস্বাদের সুযোগ উপস্থিত করেছে।

চৌরঙ্গী : শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম ঘোষ, তরুণকুমার ফটো : অমৃত



দেশী ছবির খবর

বাংলা ছবির দর্শক আর আগেকার মত সুচিত্রা সেনের অভিনয় ঘন ঘন দেখতে পান না। সারা বছরের মধ্যে হয়তো একটি ছবিতে শ্রীমতী সেনকে দেখতে পাওয়া যায়। যার ফলে দর্শকের চাহিদা অপূর্ণই থেকে থেকে যায়। সুচিত্রা সেন-প্রিয় দর্শকদের কাছে তাই একটা সুখবর আছে। শ্রীমতী সেন শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্বের কাহিনী অবলম্বনে 'কমললতা' ছবির নাম-ভূমিকায় অভিনয় করছেন। চিত্রগ্রহণের কাজ নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওয় সম্প্রতি শুরু করেছেন পরিচালক হরিসাধন দাশগুপ্ত। নায়ক শ্রীকান্ত-এর চরিত্রে রয়েছেন উত্তম-কুমার এবং গফুর-চরিত্রে রূপ দিচ্ছেন নির্মলকুমার। ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

বাংলা সাহিত্যে সবার প্রিয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনপ্রিয় কাহিনী 'দিবা-রাত্রির কাব্য' পড়েননি এমন সাহিত্যরসিক খুব কমই আছেন। পাঠকরা এবার এ কাহিনীটির চিত্ররূপে দেখতে পাবেন। পরি-চালনা করছেন বিমল ভৌমিক এবং নারায়ণ চক্রবর্তী। কাহিনীর কয়েকটি প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন মাধবী মুখোপাধ্যায়, বসন্ত চৌধুরী, অঞ্জনা ভৌমিক, অনুভা গুপ্তা ও কানু বন্দ্যোপাধ্যায়। সংগীত-পরিচালনায় রয়েছেন তিমিরবরণ।

প্রযোজক - পরিচালক - অভিনেতা ভি শান্তারাম এবার যে নতুন রঙিন হিন্দী ছবিটির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন তার নাম 'জাল বিন মছলী, নৃত্য বিন বিজলী'। নায়িকা-চরিত্রে মনোনীত হয়েছেন সন্ধ্যা। আগামী মে মাস থেকে ছবিটির কাজ শুরু করবেন পরিচালক শ্রীশান্তারাম।

দক্ষিণ ভারত তথা মাদ্রাজের জনপ্রিয় নায়ক শিবাজী গণেশন বোম্বাইয়ে একটি হিন্দী ছবি নির্মাণে ব্রতী হয়েছেন। ছবিটির নাম 'গৌরী'। তামিল ছবি 'শান্তি'-র কাহিনী অবলম্বনে এটির হিন্দী চিত্ররূপ দিচ্ছেন পরিচালক এ ভীমসিংহ। সম্প্রতি গুরু দত্ত স্টুডিওয় শিবাজী ফিল্মসের এই নতুন ছবিটির চিত্রগ্রহণ শুরু হয়েছে। প্রধান চরিত্রাবলীতে রূপদান করছেন সুনীল দত্ত, নূতন, সঞ্জীবকুমার, মমতাজ, ওমপ্রকাশ, রাজেন্দ্রনাথ ও শীবরাজ। সঙ্গীত-পরিচালনা করছেন রবি।

প্রযোজক-পরিবেশক আর ডি বনশল-এর প্রথম হিন্দী ছবি 'ঝুক গয়া আসমান' সম্প্রতি সেন্সারের ছাড়পত্র পেয়েছে। ছবিটি বর্তমানে মুক্তি-প্রতীক্ষিত। লেখ ট্যানডন পরিচালিত এ ছবির মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন রাজেন্দ্রকুমার, শায়রা বানু, রাজেন্দ্র-নাথ, প্রেম চোপরা, প্রভীন চৌধুরী, দুর্গা খোটে ও জগীরদার। শংকর-জয়কিষণ ছবিটির সুরকার।

বোম্বাইয়ের থৈ-থৈ ভাবটা এখন যেন থমথমে মনে হচ্ছে। পরিবেশক বনাম প্রযো-জকের একটা বিদ্রোহের লড়াই শুরু হয়ে গেছে। বিরাট অর্থব্যয়ে নির্মিত রঙিন হিন্দী ছবিগুলো দিন দিন মার খাচ্ছে। পরি-বেশকরা ছবি চালিয়ে মূলধনটুকুও ফেরৎ পাচ্ছেন না। অথচ ছবি-নির্মাণের সময় তাঁদের ডাক সবার আগে। প্রযোজকদের হাতে মিনিমাম গ্যারান্টির টাকাটা তাঁদের সবার আগে তুলে দিতে হয়। ফলে অগ্রিম অর্থপ্রাপ্তির সাফল্যে প্রযোজকরা ছবি-নির্মাণের অংক ক্রমশ বাড়িয়েই চলেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ছবিটি না চললে পরি-বেশকরাই সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হন। প্রযোজকরা তখন ক্ষতিপূরণের সংস্রব থেকে বিরত থাকেন। তাই সম্প্রতি পরি-বেশকরা মনস্থ করেছেন এম-জি দিয়ে আর ছবি নেবেন না। এখন দেখা যাক প্রযোজকরা পরিবেশকদের কি সুরাহা করেন। তবে চিত্র-নির্মাণের বহুল ব্যয় হ্রাস না করলে হিন্দী ছবির বাজার দিন দিন সংকুচিত হয়ে আসবে বলে আমাদের ধারণা।

নতুন ছবির খবরে জানাই, সম্প্রতি ফিল্মিস্তান স্টুডিওয় গোয়েল সিনে কর্পো-রেশনের রঙিন ছবি 'এক ফুল দো মালি'র জমজমাট মহরৎ সুসম্পন্ন হল। বর্তমানে ছবির নিয়মিত দৃশ্যগ্রহণ শুরু হয়ে গেছে। ছবিটির নায়ক-নায়িকা চরিত্রে অভিনয় করছেন সঞ্জয় ও সাধনা। কয়েকটি বিশিষ্ট চরিত্রে রয়েছেন বলরাজ সাহনি, দুর্গা খোটে এবং মাশুমা।

পরিচালক অমিত বসু 'অভিলাষ' ছবিটি শুরু করেছেন রাজকমল স্টুডিওয়। সম্প্রতি একটি রোমান্টিক স্বপ্ন-দৃশ্য সঞ্জয় ও নন্দাকে নিয়ে গৃহীত হয়েছে। এ ছবির প্রধান চরিত্রে রূপদান করছেন মীনাকুমারী, রেহমান, সুলচনা, কাশীনাথ, আগা, তুন-তুন, মোহনছোটি ও জান হুইস্কি। রাহুল দেব বর্মন ছবিটির সুরকার।

পরিচালক আর কে নায়ার সম্প্রতি ফিল্মালয় স্টুডিওয় 'ইনতাকোয়াম' ছবির শুভসূচনা করেছেন। ধ্রুব চট্টোপাধ্যায় রচিত চিত্রনাট্যের নায়ক-নায়িকা চরিত্রে মনোনীত হয়েছেন সাধনা ও সঞ্জয়। সংগীত-পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন লক্ষ্মীকান্ত-প্যারেলাল।

নাইট ইন লন্ডন ছবিতে বিশ্বজিৎ ও মালা সিনহা



বিদেশী ছবির খবর

সংবাদে প্রকাশ বিশ্বখ্যাত ফরাসী চিত্রসংস্থা সিনেমাথিক্ ফ্রান্সেজ্-এর প্রধান মিঃ হেনরী লেংগ্লয়েস্কে অপসারণের বিরুদ্ধে সারা প্যারী সহরের বুদ্ধিজীবীরা আন্দোলন শুরু করেছেন। ফরাসী অভিনেতা, প্রযোজক, পরিচালক ছাড়াও আন্তোনিওনি, অরসন্ ওয়েলসের মত ভিন্‌দেশী ব্যক্তিরাও এই অপসারণ আন্দোলনের বিরুদ্ধে যোগ দিয়েছেন। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী মিঃ মালোর এই অভূতপূর্ব সিদ্ধান্ত ফরাসী জাতীয় সভায় তুমুল বাগ্‌বিতণ্ডার সৃষ্টি করে। মিঃ হেনরী থাকাকালীন সিনেমাথিক্ ফ্র্যান্সেজ্-এর জনপ্রিয়তা সারা পৃথিবীতে প্রসার লাভ করে, তাই তাঁর জনপ্রিয়তা অপসারণের বিরুদ্ধে! মিঃ মালো ফরাসী বুদ্ধিজীবী মহলে বিশেষ সুপরিচিত, অথচ কি অজ্ঞাত কারণে যে তিনি মিঃ হেনরীকে অপসারণ করলেন তা রহস্যে ঘেরা।

আসন্ন চল্লিশ বর্ষ পূর্তি আমেরিকার অস্কার প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ ছবি হিসেবে প্রতিযোগিতা করার জন্য নিজের দেশের 'বনি এন্ড ক্লাইড', 'ডক্টর ডুলিটল', 'দি গ্রাজুয়েট', গেস্ হু ইজ্ কামিং টু ডিনার' ও 'ইন্ দি হীট অফ দি নাইট' ছবি কটি মনোনয়ন পেয়েছে। তবে পাঁচটা ছবির মধ্যে নিশ্চিত করে কোন ছবির নাম বলা না গেলেও 'বনি এন্ড ক্লাইড্'-এর সম্ভাবনাই বেশী অস্কার পাবার। শ্রেষ্ঠ বিদেশী হিসাবে প্রতিযোগিতা করার জন্য ফ্রান্সের 'লিভ্ ফর লাইফ', জাপানের 'পোর্টেট অফ্ 'সিস্কো', যুগোশ্লাভিয়ার 'আই ইভন্ মেট হ্যাপি জিপসীজ্', চেকোশ্লাভিয়ার 'ক্লোজলি ওয়াচড্ ট্রেনস্' ও স্পেনের 'এল অ্যামোর ব্রুজো' মনোনীত হয়েছে।

আমেরিকার চিত্রজগতে এবার তিনজন নিগ্রোর পরিচালনায় একটি নতুন চিত্র সংস্থা দি নিউ থিং ফ্লিক কোম্পানী নামে কাজ শুরু করছে। সংস্থার অন্যতম উদ্যোক্তা কলিন কেরিউ-এর মতে "যেহেতু চলচ্চিত্র প্রকাশের ও প্রচারের অন্যতম মাধ্যম ও আমরা নিগ্রোদের সক্রিয় সহযোগিতা পাচ্ছি তাই এই নতুন পরিকল্পনার রূপায়ণ।" এই নতুন সংস্থার কথা বলতে গিয়ে তিনি আরও বলেছেন যে আট মিলিমিটারে স্বল্পদৈর্ঘ্যের আটখানি ছবির কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। তাঁদের এ ছবিগুলির প্রদর্শনী শিগ্‌গির অনুষ্ঠিত হবে। এ বছরের শেষাশেষি ষোল মিমিতে কাজ শুরু করবেন। ওয়াশিংটনের এক ক্ষুদ্র পল্লীতে সংস্থার অফিস। এতবাধ আমেরিকান প্রযোজকরা নিগ্রোদের সামাজিক সমস্যা নিয়ে ছবি করতে সচেষ্ট হন নি। এ ব্যাপারে এই সংস্থা ছবি প্রযোজনায় উৎসাহী। বর্তমানে হলিউডের চিত্রজগতে নিগ্রোদের বেশ সক্রিয় আধিপত্য দেখা যাচ্ছে। ধীরে ধীরে শাদা কালোর বেড়া ভেঙে নতুন জগৎ নিগ্রোদের সামনে ধরা দিচ্ছে। বিখ্যাত নায়ক নাট্ কিং কোলের স্ত্রী মারিয়া কোলে ক্যালিফোর্নিয়ার টিভি প্রদর্শনীতে যোগ দিয়েছেন। টুয়েণ্টিথ সেঞ্চুরী ফক্স নিগ্রো ক্লন পি লুইসকে অ্যাডভার্টাইজিং ম্যানেজার নিযুক্ত করেছে, ও অন্যান্য চিত্রপ্রযোজনা পরিচালনার ব্যাপারে নিগ্রোরা সুযোগ পাচ্ছে। আর তাছাড়া অভিনেতা সিডনী পোইতিয়েরের অসাধারণ জনপ্রিয়তার কথা বাদ দিলেও নবগঠিত এই চিত্রসংস্থা আমেরিকার চিত্রজগতে এক নতুন সংযোজন।

'ক্লিয়ার স্কাই', 'ব্যালাড অফ্ এ সোলজার', 'এ্যান ইণ্ড অফ্ ল্যান্ড' প্রভৃতি বিখ্যাত রুশ ছবির চরিত্রাভিনেতা ইয়েগভনি উর্বানস্কির স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি স্বরূপ মস্‌ফিল্ম একটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি তৈরী করিয়েছেন পরিচালক ইয়েরভোরেনা নাদেস্কোয়াকে দিয়ে। উর্বানস্কির অভিনীত টিভি-চলচ্চিত্র প্রভৃতির কাটিং জুড়ে জুড়ে এ ছবিটা তৈরী। আলাদা কোন সংলাপ বা কমেন্টরী নেই ছবিতে। উর্বানস্কি যে ঐ স্বল্প ক'দিনের মধ্যে শুধুমাত্র রুশ চিত্রমোদীদের মনে নয়, সুদূর কিউবা, সাইপ্রাস, বুলগেরিয়া এমনকি আমাদের এই ভারতের চিত্ররসিকদের মনে যে স্থান করে নিয়েছিলেন তা শূন্যই রয়ে গেল।

ফরাসী চিত্রপরিচালক ক্লড লেলুশ এবার আমেরিকার ইউনাইটেড আর্টিস্টের সঙ্গে যুগ্ম প্রযোজনায় নতুন ছবির কাজ শুরু করেছেন বেশ কিছুদিন আগে। অস্কার পুরস্কারপ্রাপ্ত 'এ ম্যান এণ্ড এ ওম্যান'এর পরিচালক কিন্তু এই নতুন ছবি পরিচালনা করছেন না। ফ্রান্সের বিখ্যাত চিত্রসমালোচক মাইকেল কোর্নোংকে এই 'লেস্ গাউলয়েজস্ ব্রিউস' ছবির পরিচালনার ভার দিয়েছেন। স্বরচিত চিত্রনাট্যে এছবির বিভিন্ন ভূমিকায় থাকছেন অ্যাঁণ জিরারদো, ব্রুলো ক্র্যামার ও পিয়ের ক্যাঁফ।

রবার্ট ও রেমণ্ড হাকিম-এর প্রযোজনায় 'ইসাডোরা' চিত্রায়িত হচ্ছে। পরিচালক কার্ল বেইজ ও পতিজার আউটডোর লোকেশনে গিয়ে খ্যাতনামা যুগোশ্লাভিয়ান অভিনেতা ৎভোৎকো ক্রেৎকোকে আবিষ্কার করেন। জাগ্রেব্ এর জাতীয় নাট্যশালায় তাঁর অভিনীত নাটক বর্তমানে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে। 'ইসাডোরা' ছবিতে ক্রেৎকো ভেনসো রেডগ্রেভের বিপরীতে অভিনয় করবেন।

সুইডেনের ছবির বিষয়বস্তুতে নতুনত্ব আছে একথা স্বীকার করতেই হবে। মে জেতার্লিং-এর 'নাইট গেমস্' বা 'মাই সিস্টার মাই লভ্' ছবিতে যে শূন্যবাদের চিত্র পাওয়া যায় তা কটি ইতালীয় বা ফ্রান্সের ছবিতে পাওয়া যায়? হান্স আব্রামসনের নতুন ছবির কাহিনীতেও নতুনত্ব আছে। মা মারা যাবার পর থেকে উনিশ বছরের যুবক তার বাবার জনৈকা সঙ্গিনীর সঙ্গে প্রেম করে, শারীরিক মিলনও তাদের হয়। এবং তাদের এই মিলন বাবার সঙ্গে মেয়েটির বিয়ের পরেও চলতে থাকে। এই নতুন কাহিনীর দুঃসাহসিক চিত্রায়ন ঘটেছে 'বাস্টার্ড চাইল্ড' নামে। প্রধান চরিত্র তিনটিতে আছেন হান্স আর্নবেক, কিড্ হেজম্ ও বেনক্ত্ দেসন্দ্র।

স্টুডিও থেকে

পীযূষ বসুর পরিচালনায় সমরেশ বসু রচিত 'স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে' ছবির প্রথম দিনের শুটিং-এ যে দৃশ্যটি গৃহীত হয়েছিল সেটিই তুলে দিচ্ছি এখানে।

দার্জিলিং-এর এক হোটেল স্যুইট, সমর চেয়ারে বসে আছে চুপচাপ, অমর কথা বলছে তাই শুনছে।

দুজনের কম্পোজিট্এ মিড্ লং শট্। নং—১

অমর—নিজেকে বড় একা একা মনে হত। সাফল্যের এত বড় একটা আনন্দ যেন সেখানে পৌঁছতে পারল না।

সমর—মানুষের জীবনে কাজই সব নয় মিঃ রায়। একটা কোথাও একটা কিছু দরকার—যেটা না হলে জীবনটা বড় ফাঁকা মনে হয়। কাট্।

শট নং—২ ক্লোজ শট্।

অমর—সত্যিই তাই, কাজ ছাড়া কিছু ভাবিনি—ভাবতামও না। সমরবাবু, ভালবেসে বিয়ে করেছিলাম, তবু স্ত্রীর সংগে ভালো সম্পর্ক হলো না। হওয়া উচিত ছিল। কি জানি, আজকাল তাই বারবার মনে হয় যা আমার করা উচিত ছিল আমি তা বুঝি করিনি।

ক্যামেরা ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে চার্জ করে অমরকে।

পৃথক শট্। ক্লোজ আপ্।

অমর চেয়ারে বসে আছে, দৃষ্টি তার সামনের ফায়ার প্লেসের দিকে। কাট্।

ক্লোজ শট্। ক্যামেরা অমরের হাত ধরে প্যান করতে করতে সামনের টেবিলে রাখা সিগারেট ভর্তি টিনকে ধরে। কাট্।

ক্লোজ শট্। এ্যাসট্রে ভর্তি ছাই। ভর্তি সিগারেট টিন শূন্য এখন। অমরের চোখে রাত জাগার ছাপ। কাট্।

উঠে দাঁড়ায় অমর। পায়চারি করে সিগারেট খেতে খেতে। বড় বিষণ্ণ আর চিন্তিত দেখায়। কাট্।

ক্যামেরা ঘরের বাইরে। ক্লোজ শট্। অমর বাইরে তাকিয়ে আছে। কাট্।

দূরে দেখা যায় সুমিতা কাকলীকে নিয়ে হেঁটে চলেছে। কাট।

ক্লোজ শট্। অমর উত্তেজিত হয়ে ওঠে। চিন্তা করতে শুরু করে। ধীরে ধীরে এক অসাফল্যের অভিমানের হাসি ভেসে ওঠে তার মুখে। তারপর বেরিয়ে যায় ফ্রেম থেকে।

অমর ও সমরের চরিত্রে ছিলেন নবাগত অরূপ দত্ত ও দিলীপ রায়। সুমিতার চরিত্রে আছেন মাধবী মুখার্জি।

এ ছবির মূলে কাহিনী হোল একজন কর্মব্যস্ত, কুশলী, কাজপাগল ইঞ্জিনীয়ার ও তার স্ত্রীর মানসিক বিরোধের। অমর ভালবেসেই বিয়ে করেছিল সুমিতাকে। ভেবেছিল আর কি প্রয়োজন। নতুন যন্ত্র আবিষ্কারের খেয়ালে স্ত্রীর প্রতি অবিচার করেছিল অমর। সুমিতা তাকে বলেছে, বুঝিয়েছে, কিন্তু কোনো ফল হয় নি। নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত থেকেছে। অভিমানে, ক্ষোভে, দুঃখে সুমিতা তাই একমাত্র মেয়ে কাকলীকে নিয়ে সরে এসেছে অমরের কাছ থেকে, বলে এসেছে—তোমার কাজের পথে যখন আমি বাধা, আমি সরে গেলাম।

তারপর এতদিনের নিরলস সাধনা যখন সাফল্য নিয়ে এল তখন মনের আনন্দের ভাগীদের খুঁজতে গিয়ে দেখে সে জায়গা শূন্য। ছুটতে ছুটতে চলে আসে দার্জিলিংয়ে। সুমিতার কাছে যায়; কাকলীকে, সুমিতাকে কাছে টেনে নিতে চায়।

কিন্তু ফল হয় না। সুমিতা তখন অভিমানে অন্ধ। ভালোবাসার বন্যা তখন ব্যথাবেদনার বাঁধে আটকে থাকে। প্রত্যাখ্যাত হয়ে সে বন্ধু সমরের কাছে আসে। লেখক সমর সব শুনে ওদের দুজনের মধ্যে সেতু হয়ে দাঁড়ায়। আবার মিলিত হয় দুজনে। ক্ষোভ, দুঃখ, বেদনা ঝেড়ে ফেলে এগিয়ে আসে সুমিতা, নিজের ভুল বুঝে ভালবাসার হাত দুটো বাড়িয়ে দেয় অমর। চার হাত দুজনকে ধরে, চার চোখ মিলিত হয়।

শট্ নং—৪৩

দেহাতী এক উত্তরপ্রদেশবাসীর কুঁড়ে ঘর। ক্যামেরা শঙ্কর জগাভাই, ভাগনে রাজু আর যশোমতীকে ক্লোজে ধরে আছে। ওরা সবাই খাচ্ছে, একমাত্র রাজু ছাড়া। ও দাঁড়িয়ে আছে মুখ ভার করে।

শঙ্কর হাত ধরে বসাতে চায় রাজুকে, রাজু হাত সরিয়ে নেয়। শঙ্কর তখন খাবার নিয়ে রাজুর মুখের কাছে দেয়। এবারেও রাগভরে হাত সরিয়ে দিয়ে রাজু বলে—'তখন বকে, এখন আবার ভাব করতে এসেছে!'

ক্যামেরা পেছনে সরে আসে। মিড্ লং শট্।

দিদি খাবার হাতে নিয়ে বাঁ দিক থেকে ফ্রেমে ইন্ করতে করতে বলে—'কি রে, তোদের মামা ভাগনের ঝগড়া এখন মিটলো?'

এই কথা বলতে বলতেই দিদি খাবার থালা সামনে নিয়ে বসে থাকা চুপচাপ যশোমতীর দিকে তাকায়। ওকে অমন নীরব দেখে বিস্মিত হয়। দিদি ওর দিকে তাকিয়ে অবাক সুরে বলে—'কি ভাই, তুমি তো কিছুই খাচ্ছো না! এ সব তোমার ভাল লাগছে না বুঝি।'

দিদির একথা বলার সময় শঙ্কর যশোমতীর দিকে তাকিয়েছিল। সেই সুযোগে রাজু বসে পড়ে মামার থালা থেকে একটা আলু তুলে নেয়।

শঙ্কর তাই দেখে রাজুর দিকে স্নেহভরা ধমকের সুরে বলে ওঠে 'এই, খবরদার।'

ঐ একই সংগে দিদির প্রশ্নে নিজেকে সামলে নিয়ে সৌজন্যের হাসি হেসে যশোমতী বলে—'না না দিদি, খুব ভালো লাগছে।' কাট্।

দুটো মনিটর আর একটা টেক্ এন-জি হওয়ার পর দৃশ্যটা গৃহীত হল গত বুধবার ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওর এক নম্বর ফ্লোরে। যশোমতী, শঙ্কর, দিদি ও ভাগনে রাজুর ভূমিকায় অভিনয় করলেন যথাক্রমে সুপ্রিয়া দেবী, উত্তমকুমার, দীপ্তি রায় ও মাঃ অরিন্দম গাঙ্গুলী। সোকনাথ চিত্রমন্দিরের পতাকাতলে নির্মীয়মান এই 'সাবরমতী' ছবির পরিচালক হীরেন নাগ।



স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে : চিত্রের অন্তরতে মাধবী মুখোপাধ্যায়, আর ডি বনশাল, পরিচালক পীযূষ বসু, দিলীপ রায় এবং কালীপদ দত্তগুপ্ত

সলিল দত্ত পরিচালিত অপরিচিত চিত্রের সেটে সহকারী ক্যামেরাম্যান পঙ্কজ দাস এবং নায়িকা অপর্ণা সেন।

ফটো : অমৃত



মঞ্চাভিনয়

সমুদ্র সন্ধানে

নিরন্তর শ্রেণী-সংগ্রামের ফলে বাংলাদেশে আজো মুষ্টিমেয়র হাতে ক্রমাগত সঞ্চিত হোচ্ছে সম্পদ আর সংখ্যাহীন মানুষ প্রতিনিয়ত বঞ্চনার দুঃসহ যন্ত্রণায় হাহাকার করছে. কিন্তু সেই হাহাকার নিঃসীম শূন্যতায় বিলীন হয়ে যাচ্ছেনা শুধু, নিয়ে আসছে সুদৃঢ় প্রতিশোধের সংকেত। চারদিকের এই হিংসাশ্রয়ী আবেগের মধ্যেই নতুন প্রত্যয় আর সুগভীর জীবনবোধ নিয়ে গড়ে উঠেছে রতন ঘোষের একাঙ্ক নাটক 'সমুদ্র সন্ধানে'। সম্প্রতি গিরিশ নাট্য প্রতিযোগিতা'র পরিচালক গোষ্ঠী 'মেরী-রাইট বয়েজ সোসাইটি'র শিল্পীবৃন্দ ইস্টার্ণ রেলওয়ে ইনস্টিটিউট (হাওড়া) মঞ্চে এই দুরূহ একাঙ্কিকার সার্থক অভিনয় পরিবেশন করেছেন।

'সমুদ্র সন্ধানে' নাটকের কাহিনী ও রীতি প্রতীকধর্মী। একদল মানুষ সমুদ্রে ভেসে মাছ ধরে. কিন্তু সেই মাছ ডাঙ্গায় উঠলে মহাজন তার অধিকারী হয়। এ অনেক কালের রীতি। কিন্তু প্রতিবাদ জানালো চতুর্থ পুরুষ. তার কণ্ঠে সুস্পষ্টভাবে প্রতিধ্বনিত হোল—'মাছ আমার'। কিন্তু ভোগদখলের কারবারী মহাজন চতুর্থ পুরুষের দাবী সহ্য করতে নারাজ, তাই রাতের অন্ধকারে ষড়যন্ত্র করে ওদের বিদ্রোহী চতুর্থ পুরুষকে সমুদ্রে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিলো মহাজন। সমুদ্রে তাদের বঞ্চিত মানুষের সত্তার গভীর প্রতিশোধের আগুনে জ্বলে উঠলো, মহাজনের ওপর যে রক্তাক্ত হিংস্র করে পড়লো আর নিজেই চূর্ণ করে দিতে চাইলো মহাজনের ঔরসজাত সন্তানকে। কিন্তু না, উদ্যত রোষের আগুনে শেষ মুহূর্তে বিবেকহীন হোল না, ওরা অপাপবিদ্ধ শিশুকে বুকে তুলে এগিয়ে চললো নতুন সমুদ্র সন্ধানে. যেখানে মহাজন নেই, শাসক নেই, নেই কোন লাভ-লোকসানের চুলচেরা হিসাব।

'মেরী রাইট বয়েজ সোসাইটি' সুগভীর বাস্তবধর্মী দুরূহ একাংকিকার মঞ্চরূপায়নে যে নিষ্ঠা দেখিয়েছেন তাতে মনে হয়েছে বাংলাদেশে আজ নাটক ও নাট্যপ্রযোজনা নিয়ে যে নতুন চিন্তা বিকশিত হয়ে উঠছে তার অন্যতম শরিক এই সংস্থার শিল্পীবৃন্দ। নাট্য নির্দেশক অখিল মজুমদার দক্ষতার সংগে নাটকের মুহূর্তগুলো রচনা করেছেন, কিন্তু আরো সংঘাতসমৃদ্ধ নাট্যমুহূর্ত সৃষ্টি করার অবকাশ ছিলো নাটকটির মধ্যে। আগামী অভিনয়ে নির্দেশকের সচেতনতা এ দিকে প্রবৃত্ত হবে আশা করি। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আবহসংগীত মূল নাটকের বক্তব্যের সাথে তাল মিলিয়ে একেবারেই চলতে পারেনি, এবং শেষ মুহূর্তে আলো প্রেক্ষনেও আন্তর আবেগের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। দৃশ্যপরিকল্পনায় উন্নতধরণের শিল্প চিন্তার স্বাক্ষর রেখেছেন অনন্তলাল ভদ্র। প্রতিটি শিল্পীই চরিত্রের অতলে ডুব দিয়েছিলেন বলে সংঘবদ্ধ অভিনয়ে কোথাও শৈথিল্য আসেনি। নাটকের বিভিন্ন ভূমিকার অংশ নিয়েছিলেন পবিত্র ব্যানার্জী (মহাজন), অরুণ ঘোষ (অভি), চিত্ত মুখার্জী (সুরথ), কেষ্ট মুখার্জী (গুনিন), অজিত দে (কেশব), সুশান্ত চৌধুরী (চন্দর), অখিল মজুমদার (দশরথ), প্রশান্ত চৌধুরী (গুন্ডা), ভবেশ মুখার্জী, অনুপ চ্যাটার্জী, মাঃ রাজীব চৌধুরী।

।। রাজা বদল ।।

যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মনও বদলায়, চিন্তার জগতে আসে বিবর্তন। অতীতের কোলাহলকে মনে হয় পুরাতনের জীর্ণতায় ম্লান, বর্তমানের সাথে তাল মিলিয়ে চলে আমাদের মানসিকতা। জীবনের ধারা পরিবর্তনের সঙ্গে জীবিকাও অন্য পথে চলে, নতুন রীতিনীতি, নতুন সামাজিক পরিবেশে গড়ে উঠতে চায় মানুষ। যুগের এই চিরন্তন সত্যকেই রূপ দেওয়া হয়েছে জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রাজা বদল' নাটকে। সম্প্রতি 'বিশ্বরূপা' রঙ্গমঞ্চে এ নাটকটি মঞ্চস্থ করেছেন 'চেনা মহলে'র শিল্পিবৃন্দ।

হরিপুর জমিদার বংশের শেষ বংশধর দীপনারায়ণ বহুদিন বাইরে থাকার পর আবার যখন গ্রামে ফিরে এলেন তখন তিনি দেখলেন যে তাঁর চেনা জায়গায় এসেছে পরিবর্তনের আভাস। গ্রামের পথঘাট, কথাবার্তা সব কিছুর মধ্যেই যেন নতুনত্বের সংকেত। জমিদার বাড়ীতেও এ পরিবর্তনের সূচনা স্পষ্ট এবং একে কেন্দ্র করেই 'রাজা বদল' নাটকটির সংঘাত গড়ে উঠেছে।

[illegible] পরিকল্পনায় রচিত [illegible] এই নাটক আমাদের কোন নতুন চিন্তার ইঙ্গিত দিতে পারে না। নাটকের কাহিনীগত বস্তু সুপরিকল্পিত, কিন্তু ঘটনাবিন্যাস সুষ্ঠু না হওয়ায় প্রত্যাশিত গতিবেগ নাটকে আসেনি। অনেক অপ্রাসঙ্গিক ঘটনা এসে নাটকের গতিকে ব্যাহত করেছে, সার্থক প্রযোজনার

নাটকটি কিছুটা সম্পাদনের অপেক্ষা রাখে। কিন্তু দুঃখের বিষয় 'চেনামহলে'র নির্দেশক সুরজিৎ দত্ত এদিকে বিশেষ কোন নজর দেননি। অপ্রয়োজনীয় অংশ বাদ দিয়ে কিছু কিছু সংঘাতসমৃদ্ধ নাট্যমুহূর্ত সৃষ্টি করা যেতো, কিন্তু সেদিকেও শ্রীদত্তের সচেতনতার অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে।

সামগ্রিক বিচারে সংবন্ধ অভিনয়ও সার্থকতার সীমা স্পর্শ করতে পারেনি। প্রায় প্রতিটি শিল্পীর অভিনয়ে যথার্থ অনুশীলনের অভাব মর্মান্তিকভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। 'দীপনারায়ণ' চরিত্রে রণজিৎ দত্ত নৈপুণ্য দেখাতে পারেননি, তার কারণ মনে হয় চরিত্রটির বক্তব্যের সঙ্গে শিল্পীর উপলব্ধি নিবিড় হয়ে মিশে যেতে পারেনি। গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সেন-সাহেব' ও অঞ্জলি চট্টোপাধ্যায়ের 'রাধারাণী' ব্যর্থ চরিত্র চিত্রায়নের নজীর। একটি স্মরণীয় অভিনয়ের স্বাক্ষর রেখেছেন মেনকা বন্দ্যোপাধ্যায় 'ভোলার মা' চরিত্রে। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন—সুচেতা রায় উপেন তরফদার, নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় সঞ্জীব রায়, সঞ্জীব গুহ, রণজিত বসুমল্লিক. মনীষ লাহিড়ী, অসীম সেনগুপ্ত. বৃন্দাবন হালদার, অতুন বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিল চৌধুরী, শশাঙ্ক বিশ্বাস, দিলু ঘোষ, সোমনাথ ভট্টাচার্য।

।। অংশীদার ।।

ব্যাঙ্ক অফ বরোদা (ব্রাবোর্ণ রোড শাখা) স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাবের শিল্পিবৃন্দ সম্প্রতি 'বিশ্বরূপা' রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করলেন গঙ্গাপদ বসুর 'অংশীদার' নাটক। সামগ্রিক নাট্যপ্রযোজনায় ও পরিবেশনায় মাঝে মাঝে উন্নতধরনের শিল্পচিন্তার ছাপ দেখা গেছে। প্রতিটি শিল্পীই আন্তরিক-ভাবে চরিত্র উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন বলেই সংবন্ধ অভিনয়ে সাবলীলতা এসেছে; কয়েকটি ভূমিকায় উল্লেখযোগ্য অভিনয়-প্রতিভার নজীর রাখেন রাজকুমার ঘোষ, মতিলাল, হেমন্ত চক্রবর্তী, বীরেন ভট্টাচার্য, রাণু রায়, নারান ভাণ্ডারী, বিমল দে, গোবিন্দ মিত্র, সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, লীলাবতী।

।। 'বেকার বিদ্যালঙ্কার' ও 'কেউ দায়ী নয়' ।।

সম্প্রতি বাগনান কলেজের ছাত্রছাত্রীরা মনোজ মিত্রের 'বেকার বিদ্যালঙ্কার' ও দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কেউ দায়ী নয়' নাটক দুটি মঞ্চস্থ করেছেন। দুটি নাটকের নির্দেশনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন অধ্যাপক অমলেন্দুবিকাশ মাইতি। অভিনয়ে অংশ-গ্রহণ করেন—অসিত মিত্র, সুনীল চক্রবর্তী, আবদুর রাইহান, তপন ঘোষ, স্বস্তিকা ভট্টাচার্য, অমিতা মাইতি, কল্যাণী ঘোষ।

।। বারাসতে নাট্যোৎসব ।।

'সুভাষ ইন্‌স্টিটিউটে'র উদ্যোগে বারাসতের নবপল্লীতে 'সুভাষ ময়দানে' একটি নাট্যোৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। আগামী ১৭ই মার্চ থেকে ২১শে মার্চ পর্যন্ত পাঁচদিনব্যাপী নাট্যোৎসবে অংশগ্রহণ করবেন 'নান্দীকার' (মঞ্জরী আমের মঞ্জরী), 'রজনীগন্ধা' (অমৃতস্য পুত্রাঃ) 'রূপকার' (ব্যাপিকা বিদায় ও কালের যাত্রা), 'ইঙ্গিত' (শেষ থেকে শুরু), বহুরূপী (রাজা ওয়াদিপাউস)।

।। পূর্ণাঙ্গ নাট্য প্রতিযোগিতা ।।

প্রগতিশীল নাট্যসংস্থা 'পরিবেশকে'র পরিচালনায় একটি পূর্ণাঙ্গ নাট্য প্রতি-যোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। যোগদানের শেষ তারিখ নির্ধারিত হয়েছে ১১ই এপ্রিল ১৯৬৮। যোগাযোগের ঠিকানা : 'যুগ্ম-সম্পাদক', 'পরিবেশক' ডি, এল, ঘোষ, ১১নং সূর্যকুমার চ্যাটার্জী স্ট্রীট কলিঃ-২৫ অথবা, 'সাধারণ সম্পাদক', রেলওয়ে ইনস্টিটিউট, ১নং জি, টি, রোড, হাওড়া।

।। 'ফেরা' ।।

'শুভময়' গোষ্ঠী সম্প্রতি 'মুক্তাঙ্গনে' রতন ঘোষের রূপক নাটক 'ফেরা'র তৃতীয় পর্যায়ের অভিনয় শেষ করেছেন। শ্রীজ্যোতিপ্রকাশের সুষ্ঠু নির্দেশনায় সামগ্রিক অভিনয় যেদিন মোটামুটি ভালোই হয়েছিল। 'শর্বরী'র ভূমিকায় পুতুল চক্রবর্তীর অভিনয় আমাদের একেবারে নিরাশ করেছে। 'সর্বকাল' চরিত্রে প্রবীর রাহা নাট্যানুরাগীর প্রত্যাশা মেটাতে পারেনি। নির্দেশক জ্যোতিপ্রকাশ 'ঋত্বিকে'র ভূমিকায় স্মরণীয় অভিনয় প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন—পবিত্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীআনন্দময়, রঞ্জিতকুমার ঘোষ, সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী, অমর চট্টোপাধ্যায়, অশোককুমার দাশ, অর্ধেন্দুকুমার দাস, সুহাস ভট্টাচার্য, তপনকুমার দত্ত।

স্বীকৃতি

সম্প্রতি বেলঘরিয়া পোণ্টাল রিক্রিয়ে-শন ক্লাবের দ্বিতীয় বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে সলিল সেনের 'স্বীকৃতি' নাটক মঞ্চস্থ হয়। নাট্য-নির্দেশনায় ছিলেন মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়। অভিনয়ের ব্যাপারে মোটামুটি নৈপুণ্য দেখান অমর দত্ত, অসিত ঘোষ; বিমল দে ভৌমিক, গৌর গাঙ্গুলী, বিমল রায়চৌধুরী, গোপাল চ্যাটার্জি, শ্রীমান বাবু।

সত্য মারা গেছে

বঙ্গীয় সংস্কৃতি সংসদের শিল্পীবৃন্দ সম্প্রতি প্রতাপ মেমোরিয়াল হলে 'সত্য মারা গেছে' নাটকটি মঞ্চস্থ করেছেন। সুপ্রযোজিত এ নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেন—সিদ্ধেশ্বর সেন বসন্ত সেন কল্যাণ রায়, নরেন গঙ্গোপাধ্যায়, নবীন সিনহা, অরিন্দম রায়, মঞ্জুলা মুখার্জি, কাজল ব্যানার্জি, বিলীন দাস, দুলাল সেনগুপ্ত,



মাধবী মুখোপাধ্যায় ও সর্বেন্দু

বাঘিনী : সন্ধ্যা রায় এবং রবি ঘোষ



রবি দত্ত, বিজয় চক্রবর্তী, প্রফুল্ল রায়, ধীরেশ আচার্য।

কাল থেকে রংমহলে "মহবত" : আসচে কাল, ১৫ই মার্চ, শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় রংমহলে প্রথিতযশা নাট্য সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত নতুন নাটক "মহবত" মুক্তিলাভ করবে। নতুন আঙ্গিকের হাসি-কান্নায় ভরা এই নাটক এখন থেকে প্রতি বৃহস্পতি, শনি, রবিবার ও ছুটির দিন নিয়মিতভাবে মঞ্চস্থ হবে। নাটকখানির পরিচালনা করেছেন—নাট্যকার সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং। নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অবতীর্ণ হচ্ছেন—জহর রায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিধন মুখোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, নির্মল চট্টোপাধ্যায়, মৃণাল মুখোপাধ্যায়, মিন্টু চক্রবর্তী, অমরনাথ মুখোপাধ্যায়, গৌতম, মানস, কার্তিক, জং, সমরজিৎ, বাসুদেব, ইন্দ্রজিৎ, সুজিত, নবাগতা আরতি ভট্টাচার্য, ইন্দিরা, মমতা ও দুরবুবালা।

বায়েন

সম্প্রতি আরোহী শিল্পীগোষ্ঠী প্রতাপ মেমোরিয়াল হলে অভিনয় করলেন জ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বায়েন' নাটক। নির্দেশনায় কৃতিত্বের পরিচয় রেখেছেন শ্রীধর ভট্টাচার্য। অভিনয়ে অংশ নেন—ধীরেন দেব, বিশ্বনাথ চৌধুরী, প্রদোষ বসু, রঞ্জন বোস, নির্মল চট্টোপাধ্যায়, সুনীল মৈত্র, সুশান্ত চট্টোপাধ্যায়, গীতা হালদার, ছনীতা ঘোষ।

বিবিধ সংবাদ

বি-এফ-জে-এর বার্ষিক প্রশংসাপত্র-বিতরণী উৎসব :

বি-এফ-জে-এ (বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন) কর্তৃক নির্বাচিত ১৯৬৭ সালের শ্রেষ্ঠ ভারতীয় ও বিদেশী চলচ্চিত্র-গুলির প্রযোজক, পরিচালক, শিল্পী ও কলাকুশলীদের মধ্যে প্রশংসাপত্রবিতরণী উৎসবটি (অ্যাওয়ার্ড গিভিং ফাংশন) আসচে ২৪-এ এপ্রিল, বুধবার, সন্ধ্যায় রবীন্দ্রসদনগৃহে অনুষ্ঠিত হবে ব'লে স্থির হয়েছে।

•

কলম্বিয়া পিকচার্স-এর ২১টি অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ড নামিনেশন লাভ :

আসচে ৮ই এপ্রিল ক্যালিফোর্ণিয়ার সান্টা মোনিকাতে আমেরিকার অ্যাকাডেমি অব মোশান পিকচার আর্টস্ অ্যান্ড সায়েন্সেজ প্রবর্তিত ৪০তম বার্ষিক অস্কার অ্যাওয়ার্ড দানের অনুষ্ঠানটি বসবে, তাতে প্রতিযোগিতা করবার জন্য কলম্বিয়া পিকচার্স-এর বিভিন্ন ছবি ২১টি নমিনেশন লাভ করেছে। "গেস হু ইজ কামিং টু ডিনার" ছবিটিই পেয়েছে ১০টি নমিনেশন : শ্রেষ্ঠ চিত্র, অভিনেতা, অভিনেত্রী, সহ-অভিনেতা, সহ-অভিনেত্রী, পরিচালনা, শিল্প-নির্দেশনা, সম্পাদনা, সঙ্গীতানু-লেখন এবং কাহিনী ও চিত্রনাট্য। শ্রেষ্ঠ অভিনেতার অস্কার যদি ছবিটি পায়, তাহ'লে এই প্রথম কোনো অভিনেতা মৃত্যুর পরে এই পুরস্কার লাভ করবেন। জানা থাকতে পারে, এই ছবিতেই স্পেন্সার ট্রেসি শেষ অভিনয় করেছেন এবং তিনি ১৯৬৭-র জুন মাসে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। এই ছবিটি ছাড়া "ইন কোল্ড ব্লাড", "টেমিং অব দি শ্রু", "ক্যাসিনো রয়্যাল", "ডিভোর্স আমেরিকান স্টাইল", "এ প্লেস টু স্ট্যান্ড" (স্বল্প দৈর্ঘ্যের অ্যাকসন চিত্র ও তথ্যচিত্র) এবং "হোয়াট অন আর্থ" (কার্টুন চিত্র)।

•

'সাজ ও আওয়াজ' সম্প্রদায় কর্তৃক শিল্পিস্মৃতি অনুষ্ঠান :

আসচে ১৫ই এপ্রিল, সোমবার সন্ধ্যায় মহাজাতি সদনে পরলোকগত জয়ন্ত মুখোপাধ্যায়, অরুণাভ মজুমদার, রতন বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুশান্ত মুখোপাধ্যায়ের প্রথম বার্ষিক স্মৃতিতর্পণ অনুষ্ঠিত হবে "সাজ ও আওয়াজ" সম্প্রদায়ের উদ্যোগে। স্মরণ থাকতে পারে, এই শিল্পীরা গেল বছর ২রা বৈশাখ একটি মোটরদুর্ঘটনায় পতিত হয়ে প্রাণ হারান। সম্প্রদায়ের পক্ষে ট্রি, বালসারা সকল পেশাদারী ও সৌখীন গাইয়ে-বাজিয়েদের এই স্মৃতি অনুষ্ঠানে সমবেতভাবে সময়োপযোগী দু'টি রবীন্দ্র-সঙ্গীত পরিবেশনে যোগ দেবার আহ্বান জানিয়েছেন। বাদ্য এক্ষে

ইচ্ছুক, তাঁরা সত্বর সম্পাদকের ১৬, অক্রুর দত্ত লেন (কলিকাতা-১২; ফোন : ২৪-৪৩০১) অফিসে সবিস্তারে [illegible] করুন।

সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটার উদ্যোগে স্বল্পদৈর্ঘ্যের চিত্রপ্রদর্শনী :

আসছে ১৬ই, ১৭ই, ১৮ই ও ২৪-এ মার্চ—এই চারদিন ধরে সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা সরলা রায় মেমোরিয়াল কমিউনিটি হলে ব্রিটিশ, ডাচ ও ডেনিশ স্বল্প দৈর্ঘ্যের কতকগুলি চলচ্চিত্রের প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন। ছবিগুলি হচ্ছে :

(১) ব্রিটিশ : [illegible], ট্রিবিউট টু শেকস্পীয়র, শেকস্পীয়র্স কোর [illegible] অ্যানিভার্সারী, এডিনবরা ফেস্টিভ্যাল, ১৯৬৫-র কাপ ফাইনাল।

(২) ডাচ : ইন্টারন্যাশনাল [illegible] সিটি লাইট বিগ সিটি ব্লুজ, এ [illegible] অন দি আইল্যান্ড অব গ্র্যান্ড জ্যাটি মাস্কারেড।

(৩) ডেনিশ : ট্রিপ ট্রিপ টু ডেনমার্ক, হোয়্যার মাউন্টেনস্ ফ্লোট, ডেনিশ ডিজাইন প্রভৃতি।

•

ব্রডওয়েতে "গাইড"-এর মঞ্চাভিনয় :

গেল ২৬এ ফেব্রুয়ারী নিউ ইয়র্কের ব্রডওয়েস্থ হাডসন থিয়েটারে আর কে নারায়ণ রচিত বহুলপঠিত ইংরাজী উপন্যাস "গাইড"-এর নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করা হয়। নাট্যরূপ রচনা করেছেন হেনরী রেট ও প্যাট্রিসিয়া রাইনহার্ট এবং এর প্রধান ভূমিকাগুলিতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন জিয়া মহীউদ্দিন, টিটস [illegible] ও [illegible] কার্মেলান। নাটকটি পরিচালনা করেন [illegible] এবং [illegible]

স্বল্পদৈর্ঘ্যের পরীক্ষামূলক চলচ্চিত্র : ফিল্মাইজিং সংস্থা বর্তমানে ৮, ১৬, এবং ৩৫ মি মি-এর পরীক্ষামূলক স্বল্প দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র নির্মাণে ব্রতী হয়েছেন। এক্সপেরিমেন্টাল সিনে অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় এঁদের প্রথম পরীক্ষামূলক চলচ্চিত্র "দি আর্টিস্ট অ্যান্ড হিজ কালারস্" ছবিটির কাজ গেল ২৮-এ জানুয়ারী থেকে শুরু হয়েছে। কলকাতা এবং বাংলাদেশের গ্রামের বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে কেবলমাত্র ৮ ও ১৬ মি মি-এ এই ছবির কাজ চলছে। [illegible] তোলা "স্টিল-"এর সাহায্যে এই [illegible] ছবিটিকে [illegible] করবে; কারণ সব কিছুই [illegible]। ছবিটির চিত্রনাট্য ও পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন—দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাহিনী ও তত্ত্বাবধানে রয়েছেন অশোক মজুমদার ও সোমেন ঘোষ। সম্প্রতি এই সংস্থা এদের দ্বিতীয় পরীক্ষামূলক ছবি "[illegible]" [illegible]

ঝুক-গয়া আসমান : রাজেন্দ্রকুমার ও সায়রা বানু.

কাজ শেষ করে, আউটডোর শ্যুটিং করেছেন। মুভি ও স্টিল ক্যামেরায়ই ছবির কাজ চলছে। ছবিটির চিত্রনাট্য ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব নিয়েছেন দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়; মূলকাহিনী ও পরিচালনা করছেন—অশোক মজুমদার ও সোমেন ঘোষ।

পাঠকের চোখে

প্রমোদ কর মুক্তি

পশ্চিমবঙ্গ সরকার চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে একটি ভাল কাজ করেছেন—'চারণকবি মুকুন্দ দাস' ছবিকে প্রমোদকর মুক্তি দিয়ে। এজন্য রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানাই। ছবিটি কলাকৌশলের দিক থেকে প্রশংসনীয় বা আধুনিক না হলেও অথবা মুকুন্দ দাসের সার্বিক পরিচয়মূলক না হলেও—একটি প্রেরণামূলক ছবি। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় প্রদেশব্যাপী যে সাড়া জাগে, তার মূলে মুকুন্দ দাসের একটি সক্রিয় ভূমিকা ছিল। গানে গানে তিনি বাংলাদেশকে [illegible] শ্রীঅশ্বিনী দত্তের 'মন্ত্রশিষ্য' মুকুন্দ দাস দেশের মুক্তিসংগ্রামে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর কাজ করে গিয়েছেন। সেই স্মরণীয় চারণকবির জীবনালেখ্য এই ছবি। 'অমৃত'-এ ছবিটির আলোচনাও পড়েছি। অকুণ্ঠচিত্তে চারণকবি মুকুন্দ মুক্ত-এর প্রশংসা করছি। এরূপ ছবি—যা থেকে মুখ উঁচু করে দাঁড়াবার, নির্ভীকভাবে মতামত প্রকাশের এবং কুসংস্কার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রেরণা পাওয়া যায় সে ছবি অভিনন্দনীয়। বর্তমানকালের পটভূমিকায় আমার ছবিটিকে আরো ভাল লেগেছে।

ছবিটি ছাত্র-ছাত্রীদের অবশ্য দর্শনীয় একথা অকুণ্ঠচিত্তে বলা চলে। শুধু এই ধরনের ছবির প্রয়োজন খুবই বেশী। নিরক্ষর দেশের মানুষ এবং উদ্দেশ্যহীন তরুণসমাজ এই মহামানবের জীবনচিত্র দেখে দেশের প্রতি কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হতে পারবেন। 'চারণকবি মুকুন্দ দাস' নিঃসন্দেহে প্রত্যেককে বিশেষভাবে প্রেরণা জোগাবে, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করবে বলেই আমার বিশ্বাস।

নাম-ভূমিকায় সবিতাব্রত দত্তের অভিনয় ভাল লেগেছে। সমগ্র চিত্রটি তাঁর অভিনয়ের দীপ্তিতে আলোকিত। শ্রীদত্তের অভিনয় বহুদিন মনে থাকবে।

আশা করি, এই ধরনের শুভবুদ্ধি-সম্পন্ন, মানবিক আবেদনসম্পন্ন ও মূল্যবোধের প্রেরণামূলক ছবিগুলি রাজ্য সরকারের সমর্থন ভবিষ্যতে লাভ করবে।

বিনীত
দেবব্রত রায়।
পোঃ নবগ্রাম (কোন্নগর),
জিঃ হুগলী।

জলসা

পার্ক সার্কাস মিউজিক কনফারেন্স

স্বল্পপরিসরের মধ্যে কোয়ালিটি আর্টিস্টদের অনুষ্ঠান নিবেদন করবার অভিজাত ঐতিহ্য পার্ক সার্কাস মিউজিক কনফারেন্স আজও অব্যাহত রেখেছেন। শ্রোতাদের সময় ও অর্থের প্রতি এই সুবিবেচনা প্রদর্শনের জন্য অবশ্যই ধন্যবাদ দাবী করতে পারেন সম্মেলনকর্তা শ্রীসতীন সেন। রসপিপাসু চিত্তের উন্মেলতাকে বিরক্তিকর অনুষ্ঠানবাহুল্যে পীড়িত করে ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে দিয়ে অবশেষে রঙের টেক্কার মত দুই-একটি শ্রবণযোগ্য অনুষ্ঠান উপস্থিত করে ক্লান্তচিত্তে রসের অপচয় ঘটতে দেওয়া হয় না এমন সম্মেলনের উদাহরণ দিতে হলে পার্ক সার্কাস মিউজিক কনফারেন্সের দাবী অগ্রগণ্য নিশ্চয়ই।

কন্ঠসংগীতে ওস্তাদ আমীর খাঁর 'হিন্দোল-কল্যাণ ও 'বাগেশ্রী'—তাঁর নিজস্ব মেজাজ, পরিমিতিবোধ ও রাগশুদ্ধতায় পরিবেশিত। তবে বিস্তারে বৈচিত্র্যের অভাব থাকায় সকল শ্রেণীর শ্রোতার পক্ষে রসগ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। শ্যামল বোসের ধীর মেজাজের সংগত খাঁ সাহেবের শান্ত ভাবের অনুকূল।

মালবিকা কাননের 'শংকরা' বাহার এবং অন্যান্য রাগ—তাঁর মৃদু কিন্তু সুরেলা কণ্ঠে উপভোগ্য হয়েছে। ঠুংরীও শ্রোতাদের প্রচুর প্রশংসা অর্জন করেছে।

রাগভারের যথাযথ বিস্তারে সমস্ত প্রেক্ষাগৃহে আবেদন সঞ্চারের পরিপ্রেক্ষিতে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রোতাদের খুশী করতে পারার দিক দিয়ে বিচার করলে সুনন্দা পটুনায়কের অনুষ্ঠান অবশ্যই শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারে।

পণ্ডিত ভীমসেন যোশীর ললিত বহুশ্রুত। ঠুংরী ও ভজনও তাই। তবে তার জন্য রসোপভোগে কোনো বাধা ঘটেনি। একই রাগ বার বার গেয়েও শ্রোতাদের উচ্ছ্বসিত করতালির অভিনন্দন পাওয়া ক্ষমতার পরিচায়ক নিশ্চয়ই। তবে বড় শিল্পী বলেই ত তাঁর কাছে আমাদের আশা অনেক বড় এবং সেইজনাই তাঁর অনুষ্ঠান-পরিচিতে বিস্তৃতির অভাব দেখলে মনটা একটু ক্ষুন্ন হয়।

যন্ত্রসংগীতে প্রথমেই নাম করতে হয় পদ্মশ্রী নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ইনি বাজালেন 'বেহাগ'। লালিত্য ও গাম্ভীর্য, আঙ্গিক শৈলীর জৌলুষ ও ভাবের একাগ্রতার এমন সমন্বয় দুর্লভ। গৌরবময় বিদেশ সফরের পরও খ্যাতিপ্রশান্তিতে চাঞ্চল্যের ঢেউ লাগেনি এ অভিজ্ঞতা যথার্থই আনন্দের। সিঁড়গেতি তানের দাপট, স্পষ্টতা ও শ্রুতির রেশ, চিকারীর তারের সূক্ষ্ম সুরের মতই চিত্তে অনুরণিত হতে থাকে। সেতারের তারের সঙ্গে বাঁধা হয়ে যায় শ্রোতাদের অনুভবের তন্ত্রী। কেরামত খাঁর সুরভরা সংগত সৌন্দর্যবর্ধনের অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল।

সরোদে শ্রীরাধিকামোহন মিত্রের 'গাড়া-কানাড়া' এক রসোত্তীর্ণ অনুষ্ঠান।

আমজেদ আলি খাঁর 'যোগ'—কুশলী হাতের সুর ও বাজে আনন্দ দিলেও রাগ-প্রতিষ্ঠার দৈন্যে সঙ্কুচিত। 'যোগ' বলে চিনতে দেরী হয়েছিল। রেওয়াজের অভাব যে নেই ঝালা ও সাপট তান তার প্রমাণ। তবে রাগের ধারণা অস্পষ্ট যা তাঁর মত শিল্পীর থাকা উচিত নয়।

ওড়িষীনৃত্যসম্ভারের চিত্তহারী মাল্য-রচনা করে আমাদের উপহার দিলেন উড়িষ্যার শ্রীমতী সংযুক্তা পাণিগ্রাহী। কোলকাতার সম্মেলনে এঁর অনুষ্ঠান এই প্রথম এবং এই প্রথম অনুষ্ঠানেই ইনি দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করতে পেরেছেন। কবি জয়দেবের কান্তকোমল গীতিছন্দের ললিতসুন্দর রূপে শ্রীমতী পাণিগ্রাহীর আয়ত চক্ষুর ব্যঞ্জনায়, বিভিন্ন লয়ের ছন্দময় পদক্ষেপের লালিত্যে, দেহ-ভঙ্গির ভাস্কর্য—সৌন্দর্যের আভাসে সর্বোপরি শিল্পীর প্রকাশকুশলতার প্রাণবন্ত মাধুর্যে এই কথাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছে আমাদের জানা ক্লাসিক্যাল নৃত্য-চতুষ্টয় ছাড়াও আর একটি প্রাচীন উচ্চাঙ্গ নৃত্য আছে। সে হোলো ওড়িষী নৃত্য। 'ক্লাসিক্যাল' সৌন্দর্য ছাড়াও এ নৃত্যের একটি বৈশিষ্ট আছে। সে হোলো ওড়িষ্যার মৃত্তিকাজাত সরসতা এবং অনুভবের স্বতঃস্ফূর্ততা এই বৈশিষ্ট্য এবং মেজাজটুকুই হোলো এ নৃত্যের প্রাণ। শ্রীযুক্ত পাণিগ্রাহীর (শ্রীমতী পাণিগ্রাহীর স্বামী) সুরভরা মধুর কন্ঠের সংগত এই অনুষ্ঠানের বিশেষ সম্পদ।

পার্ক সার্কাস সংগীত সম্মেলন সর্বাঙ্গসুন্দর হোতো যদি অন্যান্য সংগীতের সঙ্গে ধ্রুপদেরও একটি অনুষ্ঠান-যুক্ত থাকত এবং যন্ত্রসংগীতের অন্যান্য ধারার সঙ্গে 'এনায়েত খাঁ ঘরানারও অন্তত একটি শিল্পীকে উপস্থিত করা হোত।

শ্রীমতী শুভলক্ষ্মীর সংগীতানুষ্ঠান

হাওড়ার সাউথ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে দক্ষিণ ভারতের সংগীতনায়িকা শ্রীমতী শুভলক্ষ্মীর কণ্ঠ-সৌন্দর্য আস্বাদন করবার সুযোগ উত্তর ভারতীয় শ্রোতাদের ঘটেছে রবীন্দ্রসদনের প্রায় তিন ঘন্টাব্যাপী আসরে তাঁর এককানুষ্ঠানে। উদ্দেশ্য—হাওড়ার এই প্রতিষ্ঠানের সাধারণ পাঠাগারের জন্য অর্থ-সংগ্রহ।

পৌঁছতে একটু দেরী হয়ে গিয়েছিল। তার জন্য আক্ষেপের কোনো কারণ নেই। কারণ সময়ে পৌঁছে অসংগীতিক গদ্যময় বক্তৃতা দিতে অনিচ্ছাকৃত মনোযোগ না দিয়ে সামান্য দেরীতে উপস্থিত হয়ে একেবারে সুরের ঐশ্বর্যে গমগমে রবীন্দ্রসদনের কাব্যময় পরিবেশ নিমেষেই যখন মনকে লুফে নিল তখন মনে হয়েছিল এ চমকপ্রদ অভিজ্ঞতার মূল্যে স্বরূপ 'ভৈরবী' বর্ণম— না হয় খোয়াই গেল। যা পেলাম ক্ষতিপূরণ ঘটাবার পক্ষে তার দামই বা কম কি?

যে অনুভব-প্রাবল্য এবং দুর্লভ প্রকাশ-বৈভবের রমণীয় আধারে দক্ষিণভারতীয় রাগসম্ভার গুচ্ছ গুচ্ছ পুষ্পস্তবকের মত ফুটে উঠেছিল আঙ্গিকানভিজ্ঞ শ্রোতার মনকেও তা সৌন্দর্যলোকে পৌঁছে দেবার শক্তি রাখে।

শ্রীমতী শুভলক্ষ্মীর গান শোনা এই প্রথম নয়। রেকর্ড ও 'মীরা' চিত্রের মাধ্যমে তাঁর জনপ্রিয়তার অকল্পনীয় বিস্তৃতির কাহিনী সর্বজনবিদিত। এছাড়া বিভিন্ন সংগীতাসরে গত পাঁচ বছর ধরে তাঁর সংগীতানুষ্ঠান শোনবার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে। তাঁর যে বৈশিষ্ট্য মনকে বিস্মিত করে তা হোল প্রতিবারই একই উন্নত মানে, কন্ঠসৌন্দর্যের উজ্জ্বল্য গায়নশিল্পী এবং সতেজ সপ্রাণ সুরসমৃদ্ধির প্রতিষ্ঠা। কোনোবারই কোনো অনুষ্ঠানে এঁকে পূর্ব অনুষ্ঠানের তুলনায় নিষ্প্রভ মনে হয়নি। এর আগের বার তাঁর পান্ত বড়ালী, কাম্ভোজী, শংকরাভরণম শুনেছি। এবার অনুষ্ঠানসূচীর উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন নতুনতর রাগসমৃদ্ধি বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে।

কর্ণাটিক রাগের দৃঢ়নিবদ্ধ নিয়ম-শৃংখলে তাঁর সংগীতগতি সুনিয়ন্ত্রিত, শুধু এই বন্ধনের মধ্যেও শিল্পীচিত্তের ঊর্ধ্বমুখী দুর্বার আকৃতি প্রতিটি শ্রোতার মনকে অনির্বচনীয় আবেগে দুলিয়ে নিয়ে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে ব্যাপকতর অর্থে সংগীতকে কেন 'বিশ্বজনীন ভাষা' বলা হয়। মিশ্ররাগ 'কমলামনোহারী' থেকে শুনেছি। এরপরই কল্যাণী'—অনেকটা আমাদের 'ইমন' এর মত। 'কল্যাণী' ৬৫ মেলকর্তা এবং দক্ষিণভারতে বহুল-প্রচলিত 'প্রতিমধ্যম' রাগ। এই ব্যাপক রাগের পরিচিত পকড় মধ্যমবক্র পকড়, স্ফুরিত এবং ত্রিপুচ্ছ গমকের সংহত গম্ভীর প্রয়োগে যেন নানারঙের আলো বিচ্ছুরিত হয়েছে।

মায়া-মালা গৌলীর সঙ্গে ভিঁরো রাগের ভাবসৌন্দর্য কোমল মধুর পরিবেশ সৃষ্টি করে। 'অগ্নিচক্র'—গোষ্ঠীর এই

১৯শে মঙ্গলবার ৭টায় মুক্তঅঙ্গনে
নান্দীকার
যখন একা
"...... Very well-produced play"
— Statesman
"...নান্দীকার জাদু জানেন" —দেশ
"...আমরা হতবাক বিস্মিত"—আনন্দবাজার
"...দলগত অভিনয় বিস্ময়কর" —যুগান্তর
"...আমাদের চমকিত করেছে"
—দৈনিক বসুমতী
নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

তৃতীয় রাগ স্বরসমন্বয়ের অপূর্ব ব্যঞ্জনায় এবং শিল্পীর আত্মপ্রত্যয়ী আলোয় আভাসিত।

মার্গসঙ্গীতের রাগের সৌন্দর্যের সঙ্গে সঙ্গে ভারও আছে। সে সম্বন্ধে বোধহয় শিল্পীও অবহিত। তাই এরপর ছন্দসমৃদ্ধ কখন কুতূহলী রাগে তাঁর কণ্ঠ যেন নেচে ছুটে গিয়ে আনন্দ উল্লাস—আবেগের জোয়ারে শ্রোতাদের মনকে মুক্তি দিলেন।

"মীরা"র জনপ্রিয় ভজনগুলি 'ভক্তি' রসে পরিবেশিত।

অন্যান্য রাগের মধ্যে ছিল 'নলিনী-কান্দি' ও 'আভোগী'।

আরও একটা আনন্দ সংবাদ এই যে কবিগুরুর গান গেয়ে শুভলক্ষ্মী বাংলাদেশের এই বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রতি প্রণতি জ্ঞাপন করতে ভোলেননি। "হে নতুন দেখা দিক আরবার" আমরা আগেই শুনেছি। এবারের অবদান হোলো "যখন প্রথম ধরেছে কলি আমার মল্লিকা বনে।"

কণ্ঠসঙ্গে ছিলেন কন্যা রাধা, মৃদঙ্গম এবং ঘটমে টি কে মূর্তি এবং বিনায়করাম।

মধ্য ইণ্টালী সাংস্কৃতিক সম্মেলন

"মধ্য ইণ্টালী সাংস্কৃতিক সম্মেলন"এর তিনদিনের অনুষ্ঠানে ছিলেন বহু নতুন শিল্পী। তাদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় শ্রীলা চক্রবর্তীর। তিনি পরিবেশন করেন 'চন্দ্রকোষ' ও ঠুংরী। প্রণতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভূপালী' ও 'দাদরা' এবং গৌরাঙ্গ সাহার 'বাগেশ্রী' প্রশংসা পেয়েছে।

বিভিন্ন আসরে নিয়মিত যাঁরা অংশ গ্রহণ করে থাকেন তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য সঙ্গীতাচার্য তারাপদ চক্রবর্তী। ইনি পরিবেশন করেন প্রথমে 'শুদ্ধ টোড়ী' এবং পরে 'তারানা'। তারাপদবাবু এদিন যে দরদপূর্ণ আবেগে সুরের মায়াজাল বিস্তার করেছিলেন তা অকল্পনীয়। দীর্ঘ সময় কিভাবে কেটে গিয়েছে তা কেউই উপলব্ধি করতে পারেন নি। মালবিকা কানন পরিবেশন করেন 'পূরিয়া কল্যাণ' রাগে খেয়াল। তিনি প্রথম থেকেই দর্শকমন জয় করে নেন। অপূর্ব বিস্তারের কাজ। শিল্পী পরবর্তী রাগ পরিবেশন করেন 'বাগেশ্রী'। আলাপের মাঝপথে হঠাৎ সেদিন শুরু হয় প্রবলধারায় বৃষ্টি। এর জন্যে কিছুটা ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। কিন্তু শ্রোতাদের অনুরোধে সম্মেলনের কর্তৃপক্ষরা অতি অল্পসময়ের মধ্যে অন্যত্র অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে দেন। মানস চক্রবর্তী গেয়ে শোনান "ললিত পঞ্চম" এবং যোগিয়া ঠুংরী। এর অনুষ্ঠানটি সেদিন প্রমাণ করেছে ভবিষ্যতে পিতার উপযুক্ত পুত্র হতে পারবেন। শিপ্রা বসু 'বিলাসখানি টোড়ী' রাগে খেয়াল এবং ভৈরবী ঠুংরী ও ভজন উপভোগ্য। এ কাননের 'মারুবেহাগ' ইতিপূর্বে বহু জায়গায় পরিবেশিত হয়েছে। কিন্তু এবারে তিনি যে সুরের মূর্ছনা সৃষ্টি করেছিলেন তা অনবদ্য। পরে 'হংসধ্বনি' ও ঠুংরী গেয়ে শোনান।

যন্ত্রসঙ্গীতের আসরে কাশীনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিটি শ্রোতাদের মন জয় করে নেন। আলাপের কাজ পরিচ্ছন্ন। গত, তোড় ও ঝালার কাজ অপূর্ব। মোহিত দাস সঙ্গীতজগতে একেবারে নতুন। তাঁর এই প্রথম অনুষ্ঠান। ইনি বেহালায় 'দরবাড়ী' বাজিয়ে শোনান। হাতটি চমৎকার ও তৈরী। তিনি অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে রাগ রূপটি ফুটিয়ে তোলেন। নাস্রার হোসেন সানাইয়ে 'মালকোষ' ও 'ধুন' পরিবেশন করেন। প্রতিমা চৌধুরী সেতারে রাগ 'হেমন্ত' বাজিয়ে দর্শকদের মুগ্ধ করেন।

বন্দনা সেনের কথক নৃত্য প্রশংসনীয়। বৈদেহী বন্দ্যোপাধ্যায় ও সীতা দাসগুপ্তের নৃত্য উল্লেখযোগ্য।

খলিফা ওয়াজেদ হোসেন খানের তবলা-লহরা স্মরণীয় অনুষ্ঠান। অল্প সময়ের অনুষ্ঠানে তিনি শ্রোতাদের চমৎকৃত করে রাখেন। বিচিত্র লয় ও ছন্দের বৈচিত্র অনবদ্য।

তবলায় সহযোগিতা করেন আফাক হোসেন, সন্দীপ দেব, দ্বিজেন ঘোষ, গোবিন্দ দাস ও ভূপাল ভট্টাচার্য। সারেঙ্গীতে ছিলেন মহেশপ্রসাদ মিশ্র ও কেদার মিশ্র।

ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ সম্বর্ধিত

সঙ্গীতজগতে ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ এক অতুলনীয় ঐতিহ্যের অধিকারী। তিনি সেতারী হিসাবে যে সুনাম অর্জন করেছেন তাও বিস্ময়কর।

সম্প্রতি হিজ মাস্টার্স ভয়েস-এর পক্ষে ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিস্টার ভাস্কর মেনন একটি রূপার তাজমহল উপহার দিয়ে ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। আলিপুরে অনুষ্ঠিত এই সান্ধ্য সম্মেলনে বহু খ্যাতনামা শিল্পী, সাংবাদিক এবং রেকর্ড ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন।

"শিল্পতীর্থ" ও "সোনামণি"র বিচিত্রানুষ্ঠান

উত্তর কলকাতার সুখ্যাত নাট্যসংস্থা "শিল্পতীর্থ" ও "সোনামণি" সাংস্কৃতিক পরিষদ যুক্তভাবে এক মনোজ্ঞ বিচিত্রানুষ্ঠান-এর আয়োজন করেছিলেন ১১ই মার্চ সন্ধ্যা ছয়টায় মহাজাতি সদনে।

গুণীজন সম্বর্ধনা, "শ্যামা" নৃত্যনাট্য, "রসাভাষ" নাট্যাভিনয় "একক নৃত্যানুষ্ঠান" ও "মূকাভিনয়" এই বিচিত্রানুষ্ঠান-এর অঙ্গীভূত ছিল।

কবিগুরুর "শ্যামা" নৃত্যনাট্য পরিচালনা করেন : শক্তি নাগ। কণ্ঠসঙ্গীতে ছিলেন : শ্যামল মিত্র, চিত্তপ্রিয় মুখার্জি, সুমিত্রা সেন, রাখাল রক্ষিত, সমীর মিত্র, তারক চন্দ। নৃত্যে ছিলেন : আরতি ব্যানার্জি, শম্ভু ভট্টাচার্য, পিনাকী রায়, সন্দীপ ব্যানার্জি, শক্তি নাগ, বিচিত্রা দে। অভিজিতের "রসাভাষ" নাট্যাভিনয় নির্দেশনায় : সত্যেন মুখার্জি। "একক নৃত্য" পরিবেশন করেন : জয়ন্তী মুখার্জি। পরিচালনায় : নৃত্যাচার্য কৃষ্ণ মহারাজ ও মণিশঙ্কর। "মূকাভিনয়" : শ্রীকাশীনাথ।

রবীন্দ্রকলাকেন্দ্রের শাপমোচন

গত ২৩ জানুয়ারী সকাল দশটায় রবীন্দ্রকলা-কেন্দ্রের শিল্পীগোষ্ঠী রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য—শাপমোচন পরিবেশন করেন। নৃত্য পরিচালনা করেন আরতি গুপ্ত ও মীরা বসাক। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন অরবিন্দ চক্রবর্তী। নৃত্যাংশে রূপদান করেন মীরা বসাক, আরতি গুপ্ত, ভারতী মজুমদার, সুনন্দা সেনগুপ্ত প্রভৃতি। কণ্ঠসংগীতে অংশ গ্রহণ করেন অরবিন্দ চক্রবর্তী, পূর্ণিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, মঞ্জুশ্রী চক্রবর্তী, প্রশান্ত গুপ্ত, কৃষ্ণা সেনগুপ্ত, মনীষা সরকার, শশাঙ্ক দত্ত, মোহন সোম, শশাংক ভট্টাচার্য ও গোপালদাস বিশ্বাস। যন্ত্রসংগীতে সহযোগিতা করেন তপন দাস, দীনেশ চন্দ্র, বিশ্বনাথ দাস ও রমেশ চন্দ্র। গ্রন্থনা করেন স্বদেশ ঘোষ দস্তিদার ও সুনন্দা সেনগুপ্ত। সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি বাদ দিলে সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুন্দর এবং মনোগ্রাহী। অরুণেশ্বরের ভূমিকায় মীরা বসাকের নৃত্য ও অরবিন্দ চক্রবর্তীর গান মনে রাখবার মত। এই অনুষ্ঠানের সূচনাতে দেবব্রত বিশ্বাস, সুচিত্রা মিত্র, অর্ঘ সেন, শৈলেন দাস ও গোরা সর্বাধিকারীর একক রবীন্দ্রসংগীত প্রশংসার দাবী রাখে।

কিশোর সঙ্ঘ

কিশোর সঙ্ঘের উদ্যোগে গত ২৫ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় সারস্বত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সঙ্ঘের নিজস্ব প্রাঙ্গণে। এই উপলক্ষ্যে একটি সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন জটিলেশ্বর মুখার্জি, সুকুমার মিত্র, সুবাস মিত্র, তৃপ্তি মিত্র, অজিত রায়, অশোক রায়, আলো রায়, বিমল দে, দীনেন্দ্র চৌধুরী, তৃপ্তি দে, অসীমা রায়, সজনী রায় ও সন্ধ্যা পাল। পরিচালনায় ছিলেন সুধেন্দু কর্মকার ও অনিল ভৌমিক। অনুষ্ঠান পরিচালনায় কৃষ্ণপদ কুণ্ডু। ব্যবস্থাপনায় ছিলেন দুলাল মিত্র ও রাজেন দত্ত।

—চিত্রাঙ্গদা



প্রতি রবিবার
৩টে ও ৬৷৷টায়
রবীন্দ্র সরোবর
(লেক) মঞ্চে
কবি কাহিনী। রচনা ও নির্দেশনায় বাদল সরকার। টিকিট ২, থেকে ৭, হলে প্রতি রবিবার বেলা ৯৷৷টা থেকে, এবং "মধুবন্দ্যা"য় (৮৬এ, রাঃ বিঃ এ্যাভি) প্রাপ্তব্য। প্রযোজনায়—**শতাব্দী**

বিপন্ন বিশ্ব ওলিম্পিক

শঙ্করবিজয় মিত্র

বিংশ শতকের অন্তিমার্ধের মধ্যভাগও প্রায় এক দশক উত্তীর্ণ হতে চলেছে। এই শতকের প্রথমার্ধে ঘটে গেছে দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধ। লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণবিনিময়ে মানুষ আজ এ সত্যটি উপলব্ধি করেছে যে, উপনিবেশবাদের যুগ অতিক্রান্ত। ভিন-দেশের মানুষের উপর প্রভুত্ব করার দিন আজ ফুরিয়েছে। সমানাধিকারের প্রশ্নই আজ বিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। মানুষে মানুষে ভেদ থাকবেই বা কেন? সকলকে সমান মর্যাদায় আসন দিতে হবে। প্রভুত্বকামী শক্তিগুলি এই সত্য উপলব্ধি করেই উপনিবেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। গত দু দশকের মধ্যে এশিয়া ও আফ্রিকায় বিদেশী প্রভুত্বের অবসান ঘটেছে। দেশে দেশে নব-লব্ধ স্বাধীনতার আনন্দ উন্মাদনার সঙ্গে নানা সমস্যা দেখা দিয়েছে সন্দেহ নেই। তবু মানুষ আজ নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও কল্যাণকর্মের কথা চিন্তা করছে। এশিয়া ও আফ্রিকায় শ্বেত জাতির প্রভুত্ব শেষ হয়েছে। কৃষ্ণকায় জাতি-গুলি আজ শ্বেতাঙ্গদের পাশাপাশি সমান মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত। সমানাধিকারের মহান উদ্দেশ্য নিয়ে রাষ্ট্রসংঘ গঠিত হলেও প্রথম দিকে বেশ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে-ছিল। এশিয়া ও আফ্রিকার নতুন স্বাধীন দেশগুলির চাপে পড়ে এখন সঠিক পথেই তাকে চলতে বাধ্য হতে হয়েছে।

শতাব্দীর বেদনাদগ্ধ এত অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও এখনও এমন দেশ আছে যেখানে শ্বেতবর্ণের গরলে তার সুস্থ চেতনা স্বাভাবিকভাবে কাজ করে না। ইতিহাসের শিক্ষা নিতে নারাজ এই দেশটির নাম দক্ষিণ আফ্রিকা। সারা বিশ্বে সমানাধিকার প্রয়োগের পথ উন্মুক্ত হলেও দক্ষিণ আফ্রিকা এই পথ রুদ্ধ করে রেখে কৃষ্ণকায় মানুষকে অচ্ছ্যুৎ করে রেখেছে।...জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাদের বঞ্চিত করে রেখে দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেত প্রভুরা ক্ষমতার তপ্ত বালুতে অস্ট্রিচ পাখীর মত মুখ গুঁজে থাকতে চেয়েছে।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মহামানব মহাত্মা গান্ধী এই দেশে কৃষ্ণকায়দের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্যে ঐতিহাসিক সংগ্রাম করেন। তাঁর সেদিনকার সংগ্রাম সারা বিশ্বের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে সাফল্যমণ্ডিত হলেও আজও দক্ষিণ আফ্রিকার শাসক সম্প্রদায় মূঢ়ের মত এক অবাস্তব নীতি অনুসরণ করে চলেছে এবং ওদের এই মনোনীতি এক অস্বাভাবিক অবস্থা ডেকে এনেছে।

দিল্লীতে বর্তমানে রাষ্ট্রসঙ্ঘের যে বাণিজ্য উন্নয়ন সম্মেলন চলেছে তাতে দক্ষিণ আফ্রিকা অধিবেশনে সদস্য রাষ্ট্রের ঘৃণা ও বিক্ষোভের পাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। সভায় দক্ষিণ আফ্রিকার সদস্য বক্তৃতা করতে উঠলেই বহু দেশের প্রতিনিধি সভাকক্ষ ত্যাগ করে তাঁদের ক্ষোভ ও ঘৃণা প্রকাশ করেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার সম্প্রতি দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার দেশীয়জন অধি-বাসীর প্রতি যে অন্যায় বিচার ও দণ্ডাদেশ প্রয়োগ করেছে সে বিষয়ে ন্যায্য বিচারের দাবী জানিয়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সভাতেও তীব্র আলোড়নের সৃষ্টি হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার এই বিচারবুদ্ধিহীন গোঁড়ানীতির কথা কিছু নতুন নয়। তাদের এই নীতির প্রতিবাদে বাণিজ্যিক বয়কটের আন্দোলনে ভারত ও পাকিস্থান যোগ দিয়েছে। তাদের বর্ণবৈষম্য নীতির জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ প্রতিবাদ জানিয়েছে, রাষ্ট্রসংঘেও সে তাড়না খেয়েছে তবুও সে অন্ধনীতি থেকে বিচ্যুত হয় নি।

খেলাধূলার ক্ষেত্রেও দক্ষিণ আফ্রিকার এই উদ্ভটনীতি প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করে এবং তারই ফলশ্রুতিতে ১৯৬০ সালে ব্যাডেন ব্যাডেনে ওলিম্পিক কমিটির সভায় দক্ষিণ আফ্রিকার ওলিম্পিক সদস্যপদ বাতিল করে দেওয়া হয়। ১৯৬৪ সালে টোকিও ওলিম্পিকের আগে দক্ষিণ আফ্রিকার এ্যামেচার এ্যাথলেটিক ফেডা-রেশনের সভাপতি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তাঁদের ওলিম্পিক দল গঠনে বর্ণবৈষম্য নীতি অনুসৃত হবে না। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার তাতে রাজী হয়নি বলে টোকিও ওলিম্পিকে দক্ষিণ আফ্রিকাকে যোগ দিতে দেওয়া হয় নি। টোকিও ওলিম্পিকের ঘটনার ফলেও সে দেশের যে কোন চৈতন্য হয়েছে তা নয়, বরং প্রবলভাবেই তারা তাদের আগেকার সেই গোঁড়ানীতি অনুসরণ করে চলেছে। পিকিং-এ আন্তর্জাতিক টেবিল টেনিসের অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্যে কৃষ্ণাঙ্গ খেলোয়াড় গঠিত একটি দল অনুমতি চাইলে দক্ষিণ আফ্রিকান সরকার তাদের পাশপোর্ট মঞ্জুর করেনি। নিউজিল্যান্ড থেকে একটি রাগবী দলের দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের কথা উঠেছিল। নিউজিল্যান্ড দলে মাওরি উপজাতীয় খেলোয়াড় থাকায় নিউ-জিল্যান্ড দল ভয়ে নিজেদের গুটিয়ে নেয় এবং শেষ পর্যন্ত দল পাঠান সম্পর্কে বিরত হয়। দক্ষিণ আফ্রিকা সফরকামী ইংলন্ডের ক্রিকেট দলে ডোলিভিয়েরাকে থাকতে দেওয়া সংগত হবে না বলে দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার নির্দেশনামা জারী করেছে।

এই পটভূমিকায় ফ্রান্সের গ্রেণেবেলে গত ১৫ ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক ওলিম্পিক কমিটি মেক্সিকো ওলিম্পিকে দক্ষিণ আফ্রিকাকে যোগদানের অনুমতি দিয়ে সমগ্র বিশ্বে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। যে দেশ দীর্ঘকাল ধরে মানবতাবিরোধী নীতি অনুসরণ করে চলেছে এবং টোকিও ওলিম্পিকের পর যে দেশে বর্ণবৈষম্য-নীতির এতটুকু পরিবর্তন ঘটেনি বরং বিদ্বেষের কৃষ্ণছায়া আরও গাঢ় হয়েছে সেখানে ওলিম্পিক কমিটির এই সিদ্ধান্ত মেক্সিকো ওলিম্পিক অনুষ্ঠানের বিপদ ডেকে আনবে সন্দেহ নেই।

বিশ্ব ওলিম্পিক এক মহান উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত হয়েছিল। অ-পেশাদার ক্রীড়া-প্রতিভার সুস্থ ও সুন্দর প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বিশ্ব স্বীকৃতির মর্যাদাদানই এর প্রকৃত উদ্দেশ্য। এর উদ্দেশ্যের গোড়ার কথাই হল মানবিকতার বিকাশে সহজ শোভন প্রতিযোগিতা। এমন কি প্রতি-যোগিতায় হার-জিতের চেয়ে বড় কথা হল এতে যোগ দেওয়ার আনন্দ, পরস্পরের মধ্যে প্রীতি ও ভালবাসার বন্ধন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ তাই এক পবিত্র মিলনভূমি হিসেবেই ওলিম্পিক অঙ্গনকে গ্রহণ করে এসেছে এবং সেই মনোভাব নিয়েই দেশের ক্রীড়া-প্রতিভাকে বিশ্বের দরবারে জাহির করে। খেলাধুলার এই পবিত্র পরিবেশে বিদ্বেষের অনুপ্রবেশ করতে দেওয়া হল—বিশেষ করে বর্ণবিদ্বেষে কলুষিত একটা দেশকে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ দেওয়া হল এটা বুঝতে কারুর কষ্ট হয় না। সমস্ত জেনে শুনে আন্তর্জাতিক ওলিম্পিক কমিটির এই সিদ্ধান্তে সমগ্র আফ্রিকায় অসন্তোষের আগুন ছড়িয়ে দিয়েছে। কঙ্গোর ব্রাজাভিলে আফ্রিকান সুপ্রীম স্পোর্টস কাউন্সিলের বত্রিশটি সদস্য রাষ্ট্রের সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে আফ্রিকার বত্রিশটি দেশ মেক্সিকো ওলম্পিকে যোগ দেবে না।

বর্ণবিদ্বেষী দক্ষিণ আফ্রিকাকে ওলি-ম্পিকের দরজা খুলে দিয়ে আন্তর্জাতিক ওলিম্পিক কমিটি বাস্তব বুদ্ধির পরিচয় দেন নি। একটা দেশের প্রতিনিধিত্বের সুযোগ করে দিয়ে সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশের প্রতিনিধিদের পথ বন্ধ করা হয়েছে। কৃষ্ণকায় মহাদেশের আত্মমর্যাদাবোধে আঘাত

দিলে তার প্রতিঘাত অবশ্যম্ভাবী এবং সেই অবিবেচনার ফল যে কতখানি সুদূরপ্রসারী হতে পারে আন্তর্জাতিক ওলিম্পিক কমিটি তা অনুধাবন করতে পারেননি। আন্তর্জাতিক কমিটির এই অবিবেচনার ফলভোগ করতে হবে মেক্সিকো সিটির ঊনবিংশ ওলিম্পিকের উদ্যোক্তাদের। অবস্থা এখন এত ঘোরাল হয়ে উঠেছে যে ওলিম্পিকের মূল অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে কিনা তাতে সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

মেক্সিকো সিটিতে ওলিম্পিক অনুষ্ঠানের আর মাত্র সাত-আট মাস বাকী। বিশ্ব ওলিম্পিক অনুষ্ঠানের স্থান নির্বাচিত হওয়ার গৌরব যে কোন দেশের পক্ষেই বরণীয়। সারা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ এ্যাথলিট ও ক্রীড়াবিদদের একত্র সমাবেশ, ও বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের আগমনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে এক নতুন শহর, নতুন কর্মোদ্যম ও জীবনচাঞ্চল্যে মুখর হয়ে ওঠে সে দেশ। এর জন্যে বহু আয়োজন, বহু পরিশ্রম ও সম্পদ বিনিয়োগ করতে হয়। এই প্রস্তুতি পর্বের জন্যে মেক্সিকোতেও কম মেহনৎ করতে হয়নি। এখন যদি মূল অনুষ্ঠানই বিঘ্নিত হয় তাহলে সে দেশের তিনউদ্যোক্তাদের মান-সম্মান কোথায় থাকে। শিল্পদক্ষিণ আফ্রিকাকে প্রতিযোগিতায় প্রবেশের হয় সম্মতি দেবার জন্যে আন্তর্জাতিক করেন ওলিম্পিক কমিটি গ্রেণেবেলে যে বৈঠক করে পাধ্যায়েমেক্সিকো সেই বৈঠকে এই সিদ্ধান্তের সাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। কিন্তু মেক্সিকোর গ্রহণ ঐ প্রতিবাদ কমিটি কানে তোলেনি। আজ উল্লেখমেক্সিকোর সংগঠকেরা তাই বিপন্ন বোধ ইনি করছেন এবং ওলিম্পিক সংগঠন কমিটির এবং সভাপতি র‍্যামিরেজকে ছোটাছুটি করতে দরদপ্হচ্ছে। না করে উপায়ই বা কি! সারা আফ্রিকা মহাদেশ ওলিম্পিক বর্জন করলে কেনিয়ার কিপচো কিনো, কিপরুগাট, ইথিওপিয়ার আবেবে বিকিলা প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত এ্যাথলিটরা আসবেন না। ফলে ওলিম্পিকের আকর্ষণ বহুলাংশে হ্রাস পাবে।

শুধু কি তাই। দক্ষিণ আফ্রিকাকে ওলিম্পিকের প্রবেশের দ্বার খুলে দেওয়ায় আফ্রিকা মহাদেশ ছাড়াও এশিয়ার বহু রাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়া বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। এরই মধ্যে আরব রাষ্ট্রসমূহ, পাকিস্থান, কিউবা প্রতি মেক্সিকো ওলিম্পিক বর্জনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাশিয়া আন্তর্জাতিক ওলিম্পিক কমিটিকে বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্যে চাপ দিয়েছে। স্পষ্ট ভাষায় রাশিয়া জানিয়ে দিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার জন্যে খোলা দ্বার আবার বন্ধ না করলে রাশিয়াও হয়ত ওলিম্পিক প্রতিযোগিতায় যোগদানে বিরত থাকবে। ভারতও আন্তর্জাতিক কমিটির উপর চাপ সৃষ্টি করছে।

এদিকে মেক্সিকো সরকারের মুখপাত্র হিসেবে পরিচিত সংবাদপত্র "এল ন্যাশনাল" আন্তর্জাতিক কমিটিকে তাদের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের সুপারিশ করে লিখেছে— "জাতীয় দল নির্বাচনে আন্তর্জাতিক ওলিম্পিক কমিটি যে নির্দেশ দিয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকা তা ভংগ করেছে। কারণ নির্বাচনী প্রতিযোগিতায় দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষ থেকে শ্বেত ও অশ্বেতকায়দের একত্রে অংশ নিতে দেওয়া হয় নাই।" বুলগেরিয়ার ওলিম্পিক কমিটির পক্ষ থেকেও ঐ সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের সুপারিশ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত দেখা গেছে যে প্রায় চল্লিশটি দেশ প্রকাশ্য প্রতিবাদ করে জানিয়েছে যে, সিদ্ধান্ত বদলানো না হলে তারা মেক্সিকো ক্রীড়ায় অংশ নেবে না।

বর্ণবৈষম্যের প্রশ্নে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেও ক্ষোভ রয়েছে এবং সেখানকার অশ্বেতকায় এ্যাথলিটরা আমেরিকার হয়ে ওলিম্পিকে যোগ দেবেন না একটা আন্দোলনও সুরু করে দিয়েছিলেন। অবশ্য তা বেশি দূর না গড়ালেও দক্ষিণ আফ্রিকাকে ওলিম্পিকে গ্রহণের প্রশ্নে সেখানেও আবার এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সোচ্চার হয়ে উঠেছে। যুক্তরাষ্ট্রের ওলিম্পিক বয়কট কমিটির সংগঠক নিগ্রো এ্যাথলিট হ্যারী এডওয়ার্ডস মেক্সিকো ওলিম্পিক বয়কটকারী দেশগুলির কেবল কৃষ্ণকায়দের নিয়ে একটি ওলিম্পিক ক্রীড়া আয়োজনের প্রস্তাব করেছেন। এক বিবৃতিতে তিনি আরও বলেছেন, তাঁর ওলিম্পিক বয়কট কমিটি শীঘ্রই কৃষ্ণকায়দের ওলিম্পিক অনুষ্ঠানের আন্দোলন সুরু করবেন। গ্রীষ্মের শেষার্ধকে আফ্রিকার কোন দেশে এই ওলিম্পিক ক্রীড়ার আসর বসলে সেখানে এ্যাথলিট এবং ছাত্ররা নির্বিঘ্নে তাতে যোগ দিতে পারবে।"

কেনিয়া আবার এক প্রস্তাব দিয়ে বলেছে যে অক্টোবরে মেক্সিকোতে ওলিম্পিক চলাকালে বয়কটকারী দেশগুলিকে নিয়ে তারা এক ক্রীড়ানুষ্ঠান করতে রাজী। কেনিয়ার এই প্রস্তাবে হয়ত তেমন সাড়া মিলবে না। কিংবা নিগ্রো ওলিম্পিকের প্রভাব কতটা কার্যকর হবে তাও বলা যায় না। তবে সব মিলিয়ে মেক্সিকো ওলিম্পিক যে এক ঘোর বিপর্যয়ের সম্মুখীন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এই সংকটের মুখেও দক্ষিণ আফ্রিকা কিন্তু তার গোঁয়ার্তুমি পরিহার করেনি। দক্ষিণ আফ্রিকার জাতীয় ওলিম্পিক কমিটির সভাপতি মিঃ ফ্রাঙ্ক বাড়ন ঘোষণা করেছেন যে তাঁর দেশ কোন অবস্থাতেই ওলিম্পিক থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেবে না। বিশ্বজনমতকে যে দেশ কোন তোয়াক্কাই করে না সে দেশের ক্রীড়ামহলের কর্তার পক্ষেই এমন স্পর্ধাপূর্ণ উক্তি সম্ভব।

চারদিকের এই চাপ, বিশ্বের জনমত ও মেক্সিকো ওলিম্পিক সংগঠন কমিটির সভাপতির পীড়াপীড়িতে আন্তর্জাতিক ওলিম্পিক কমিটির সভাপতি মিঃ আভেরী ব্রান্ডেজ নাকি বলেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রশ্নটির বিবেচনার জন্যে শীঘ্রই তিনি কমিটির এক জরুরী বৈঠক ডাকবেন। অবশ্য এই বৈঠক কবে বসবে তা জানা যায়নি। তবে তিনি নাকি মন্তব্য করেছেন, এই বৈঠক ডাকতে ত্রিশ থেকে ষাট দিন সময় লাগতে পারে।

বর্ণবিদ্বেষী দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ভারতে জনমত প্রবলভাবে বিক্ষুব্ধ হয়েছে। ভারতীয় ওলিম্পিক এসোসিয়েশন এখনও কেন মেক্সিকো ওলিম্পিক বয়কটের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেনি ভারতের সংসদে তা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে। ৬ মার্চ রাজ্যসভায় কংগ্রেসী ও বিরোধী সদস্যরা একযোগে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে জাতীয় ওলিম্পিক এসোসিয়েশনের দীর্ঘসূত্রতার তীব্র সমালোচনা করেছেন।

শিক্ষা দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী শ্রীভগবৎ ঝা রাজ্যসভায় জানান এ সম্পর্কে জাতীয় ওলিম্পিক এসোসিয়েশন আন্তর্জাতিক কমিটির কাছে প্রতিবাদ জানিয়েছে আর মেক্সিকো ক্রীড়ানুষ্ঠানে ভারত অংশ নেবে কিনা সেই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য শীঘ্রই সভা করবে।

ভারতীয় ওলিম্পিক এসোসিয়েশনের এই দীর্ঘসূত্রতার কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষী নীতির জন্য ভারত চিরকালই তার বিরোধীতা করে এসেছে। এ বিষয়ে ভারত সরকারের নীতি সুস্পষ্ট। তবুও ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় দক্ষিণ আফ্রিকার সংগে যোগ দেওয়ার প্রশ্নে সুসমঞ্জস নীতির অভাব দেখা যায়। ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় দক্ষিণ আফ্রিকাকে এড়িয়ে চললেও টেনিসে এই বর্ণবিদ্বেষী দেশের সংগে ভারতের যোগদান কোন মতেই বাঞ্ছনীয় হয়নি। ডেভিস কাপের আঞ্চলিক প্রতিযোগিতায় দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে বার্সিলোনায় গিয়ে ভারতীয় খেলোয়াড়েরা খেলে এসেছে। অন্যান্য প্রতিযোগিতাতেও ভারত দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে খেলেছে। বর্ণবিদ্বেষী দক্ষিণ আফ্রিকাকে সর্বতোভাবে বয়কট প্রয়োজন এবং ভারতের পক্ষ থেকে তেমন দৃঢ়নীতিই গৃহীত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ এই প্রশ্নে আজ বিশ্ব ওলিম্পিক বিপন্ন হতে বসেছে।

খেলাধূলা

দর্শক

ওয়েলিংটনের তৃতীয় টেস্টে ভারতবর্ষ ৮ উইকেটে নিউজিল্যাণ্ডকে পরাজিত করবার ফলে টেস্ট সিরিজে ২—১ খেলায় অগ্রগামী হলেন। পাঁচ দিনের বরাদ্দ খেলাটি চতুর্থ দিনের লাঞ্চের অব্যবহিত পর শেষ হয়।



অজিত ওয়াদেকার
(১৪৩ রান প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরী)

ভারতপক্ষে দুই স্পিন বোলার বাপু নাদকার্ণী (৬৫ রানে ৭ উইকেট) এবং ইরাপল্লী প্রসন্ন (৮৮ রানে ৮ উইকেট) ভারতবর্ষকে সাহায্য করেন।

প্রথম দিনে নিউজিল্যাণ্ড ৯ উইকেটের বিনিময়ে ১৫৭ রান তুলেছিল। বৃষ্টি এবং আলোর অভাবে প্রায় দু'ঘণ্টার মত খেলা বরবাদ হয়। নিউজিল্যাণ্ডের খেলার সূচনা ভাল হয় নি—৮৮ রানের মাথায় ৬ষ্ঠ উইকেট পড়ে যায়।

দ্বিতীয় দিনে ১৮৬ রানের মাথায় নিউজিল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ হয়। এই দিন নিউজিল্যাণ্ড তাদের বাকি ১টা উইকেটে মাত্র ৩৯ রান সংগ্রহ করেছিল। খেলার এক সময়ে দেখা গেল, প্রসন্ন ১০.২ ওভার বল দিয়ে মাত্র ১৮ রানের বিনিময়ে ৫টা উইকেট পেয়েছেন। ভারতবর্ষ এই দিনের খেলার বাকি সময়ে ৫ উইকেট খুইয়ে ২০০ রান তুলেছিল। কারণ তারা হাতে ৫টা উইকেট পেয়েছিল — নিয়ে ১৪ রানে এগিয়েছিল। অজিত ওয়াদেকার তাঁর ৭৮ রানে অপরাজিত থাকেন।

তৃতীয় দিনে ৩২৭ রানের মাথায় ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস শেষ হলে তারা ১৪১ রানে অগ্রগামী হয়। এই দিন ভারতবর্ষ তাদের বাকি ৫টা উইকেটে আরও ১২৭ রান যোগ করে। ন্যাটা খেলোয়াড় অজিত ওয়াদেকার ১৪৩ রান (১২টি বাউণ্ডারীসহ) করেন—তাঁর টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনের এই প্রথম সেঞ্চুরী। তাঁর সেঞ্চুরী রান পূর্ণ হতে ২১৭ মিনিট লাগে। নিউজিল্যাণ্ডের কোন বোলারই আগুন সেঞ্চুরী সাথে বাধা করতে পারেন নি। এম এল জয়সীমা প্রথম ইনিংসে ২০ রান করার সূত্রে তাঁর টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনে ২,০০০ রান পূর্ণ করার গৌরব লাভ করেন। এই দিন নিউজিল্যাণ্ড তাদের দ্বিতীয় ইনিংসের ৫টা উইকেট খরচ করে ১৩৩ রান তুলেছিল। এই চারটে উইকেটের মধ্যে নাদকার্ণী একাই ৩টে উইকেট পান ১০ রানে।

চতুর্থ দিনে নিউজিল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংস ১৯৯ রানের মাথায় শেষ হলে খেলায় জয়লাভের জন্য ভারতবর্ষের ৫৯ রান করার প্রয়োজন হয়। নিউজিল্যাণ্ডের বাকি ৬টা উইকেট পড়ে যায় মাত্র ৫৬ রানে। প্রবীণ খেলোয়াড় নাদকার্ণী দ্বিতীয় ইনিংসে মোট ৬টা উইকেট পান ৪৩ রানে। অপর দিকে প্রসন্ন ৩টে উইকেট, ৫৬ রানে। কোন উইকেট না পড়ে লাঞ্চের সময় ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংসের রান দাঁড়ায় ৪৩। ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংসের ৬১ রানের (২ উইকেটে) মাথায় তৃতীয় টেস্ট খেলা শেষ হয়—ভারতবর্ষের জয়লাভের প্রয়োজনের থেকে ২ রান বেশী উঠে যায়।

নিউজিল্যাণ্ডের উইকেট-কীপার রয় হারফোর্ড তৃতীয় টেস্ট খেলার ৭টা ক্যাচ ধরে (১ম ইনিংসে ৫ এবং ২য় ইনিংসে ২) অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দেন।



ইরাপল্লী প্রসন্ন
(৮৮ রানে ৮ উইকেট)

ভারতবর্ষ বনাম নিউজিল্যাণ্ড

তৃতীয় টেস্ট খেলা

নিউজিল্যাণ্ড : ১৮৬ রান (মার্ক বার্জেস ৬৬ রান। প্রসন্ন ৩২ রানে ৫ এবং নাদকার্ণী ৪৩ রানে ৩ উইকেট)

১৯৯ রান (মার্ক বার্জেস ৬০ এবং ব্রুস মারে ৫১ রান। নাদকার্ণী ৪৩ রানে ৬ এবং প্রসন্ন ৫৬ রানে ৩ উইকেট)

ভারতবর্ষ : ৩২৭ রান (অজিত ওয়াদেকার ১৪৩, ফারুক ইঞ্জিনীয়ার ৪৪ এবং মনসুর আলি খান পতৌদি ৩২ রান। ব্রুস টেলর ৬৫ রানে ৩ এবং কলিঙ্গ ৬৫ রানে ৩ উইকেট)

৬১ রান (২ উইকেটে। সর্দেশাই অপরাজিত রান)

১ম দিন (ফেব্রুয়ারী ২৯) :

নিউজিল্যাণ্ড প্রথম ইনিংসের ৯ উইকেট খুইয়ে ১৫৭ রান সংগ্রহ করে।

দ্বিতীয় দিন (মার্চ ১) :

নিউজিল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস ১৮৬ রানের মাথায় শেষ হলে ভারতবর্ষ ৫ উইকেটের বিনিময়ে ২০০ রান সংগ্রহ করে।

তৃতীয় দিন (মার্চ ২) :

ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস ৩২৭ রানের মাথায় শেষ হলে তারা ১৪১ রানে অগ্রগামী হয়। বাকি সময়ের খেলায় নিউজিল্যাণ্ড দ্বিতীয় ইনিংসের ৪টে উইকেট খুইয়ে ১৪৩ রান সংগ্রহ করে।

চতুর্থ দিন (মার্চ ৪) :

নিউজিল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংস ১৯৯ রানের মাথায় শেষ হলে ভারতবর্ষ দ্বিতীয় ইনিংসের দুটো উইকেট খুইয়ে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৫৯ রানের থেকে ২ রান বেশী তুলে ৮ উইকেটে জয়ী হয়।



বাপু নাদকার্ণী
(৬৫ রানে ৭ উইকেট)

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বনাম ইংল্যাণ্ড
তৃতীয় টেস্ট খেলা

ইণ্ডিজঃ ৩৪৯ রান (বেসিল বুচার ৮৬, গ্যারী সোবার্স ৬৮ এবং স্টেভ ক্যামাচো ৫৭ রান। জন স্নো ৮৬ রানে ৫ উইকেট)
ও ২৮৪ রান (৬ উইকেটে। ক্লাইভ লয়েড নটআউট ১১৩ এবং বুচার ৬০ রান। স্নো ৩১ রানে ৩ উইকেট)

ইংল্যাণ্ডঃ ৪৪৯ রান (জন এডরিচ ১৪৬, জিওফ বয়কট ৯০, টম গ্রেভনী ৫৫ এবং বেসিল ডি'ওলিভিয়েরা ৫১ রান। চার্লি গ্রিফিথ ৭১ রানে ৩ এবং ল্যান্স গিবস ৯৮ রানে ৩ উইকেট)

ব্রিজটাউনের কেনসিংটন ওভাল মাঠে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বনাম ইংল্যাণ্ড দলের তৃতীয় টেস্ট খেলাটি প্রথম ও দ্বিতীয় টেস্ট খেলার মত অমীমাংসিত থেকে গেছে। ফলে টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ তার বিশ্বজোড়া নামডাক অনেকটা হারিয়েছে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিশ্ববিশ্রুত প্রাক্তন টেস্ট খেলোয়াড় স্যার লিয়ারী কনস্টানটাইনের কথায় 'ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের স্বর্ণযুগের অবসান হতে চলেছে।' আগের মত তাদের ব্যাটিংয়ের দাপট নেই। সোবার্সই একমাত্র নির্ভরশীল—তিনিই এখন দলের 'সবে ধন নীলমণি'—দলের বিপদে এখন তিনি ত্রাণ কর্তার ভূমিকা নিয়েছেন। তিনি এখন ৬নং খেলোয়াড় হিসাবে খেলতে নামছেন এবং তাঁর উপযুক্ত জুটি মিলছে না। ফলে খেলায় বেশী রান উঠছে না। বোলিংয়ে তাদের আগের রুদ্রমূর্তি বর্তমানে খুবই বিনম্র চেহারায় দাঁড়িয়েছে। হল এবং গ্রিফিথের ফাস্ট বল ইংল্যাণ্ডের ব্যাটসম্যানদের 'সরষে ফুলের ক্ষেত' দেখাতে পারেনি। ইংল্যাণ্ডের খেলোয়াড়রা এ'দের বল বেশ স্বাচ্ছন্দ্যে খেলছেন। এক কথায়, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের এখন বোনেদি বাড়ীর পড়তি অবস্থা।

বৃষ্টির দরুণ প্রথম দিনে পুরো সময় খেলা হয়নি। মোট ৯০ মিনিট খেলার সময় নষ্ট হয়। খেলার মধ্যে বৃষ্টি নামার তিনবার খেলা বন্ধ হয়েছিল। তবুও প্রথম দিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ২-টো উইকেট খুইয়ে যে ৮৬ রান সংগ্রহ করেছিল তা তাদের স্বভাব বিরুদ্ধ খেলারই পরিচয়।

দ্বিতীয় দিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম ইনিংসের আরো ৪টে উইকেট পড়ে যায়। খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ে স্কোর বোর্ডে তাদের ৩১১ রান (৬ উইকেটে) দাঁড়ায়। সোবার্স ৬৪ এবং হ্যারে ২৭ রান করে অপরাজিত থাকেন। তৃতীয় উইকেটের জুটিতে স্টেভ ক্যামাচো এবং বেসিল বুচার দলের ৯৬ রান যোগ করেন। খেলার প্রথমভাগে বুচার (৮৬ রান) ছিলেন দলের মেরুদণ্ড। তারপর ত্রাণকর্তার ভূমিকায় নামেন সোবার্স। চা-পানের পরই সোবার্স তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করেন।

তৃতীয় দিনে ৩৪৯ রানের মাথায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ হয়। ইংল্যাণ্ডের ফাস্ট বোলার জন স্নো ৮৬ রানে ৫টা উইকেট পান। শেষ ১০ম উইকেটের জুটিতে চার্লি গ্রিফিথ এবং ল্যান্স গিবস অপ্রত্যাশিতভাবে ৫৫ মিনিটে ৩০ রান তুলে দেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের দুই প্রখ্যাত ফাস্ট বোলার ওয়েসলী হল এবং চার্লি গ্রিফিথ এই দিনের খেলায় আহত হন।

তৃতীয় দিনের খেলার বাকি সময়ে ইংল্যাণ্ড কোন উইকেট না খুইয়ে ১৬৯ রান সংগ্রহ করেছিল। জন এডরিচ ৬৪ রান এবং জিওফ বয়কট ৯০ রান করে নটআউট থাকেন।

খেলার তৃতীয় দিনটা ছিল ইংল্যাণ্ডের প্রাধান্যেরই দিন। খেলার সর্ববিষয়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলকে ইংল্যাণ্ড নাজেহাল করে ছেড়েছিল।

চতুর্থ দিনে ইংল্যাণ্ড প্রথম ইনিংসের ৮টা উইকেট খুইয়ে পূর্ব দিনের ১৬৯ রানের (কোন উইকেট না পড়ে) সঙ্গে ২৪৩ রান যোগ করে—খেলার শেষে ৪১২ রান (৮ উইকেটে) দাঁড়ায়। ইংল্যাণ্ডের ওপনিং ব্যাটসম্যান জন এডরিচ ১৪৬ রান করেন—ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট ক্রিকেট খেলায় তাঁর এই প্রথম সেঞ্চুরী। ১ম উইকেটের জুটিতে বয়কট এবং এডরিচ দলের ১৭২ রান সংগ্রহ করে খেলার ভিত বেশ শক্ত করেছিলেন। এরপর ৭ম উইকেটের জুটিতে এডরিচ এবং গ্রেভনী ১০৯ রান যোগ করেন।

পঞ্চম দিনে ৪৪৯ রানের মাথায় ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ হলে তারা ১০০ রানে অগ্রগামী হয়। ইংল্যাণ্ডের ১ম ইনিংসের শেষ দুটো উইকেটে ৩৭ রান উঠেছিল।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের দ্বিতীয় ইনিংসের ২৮৪ রানের (৬ উইকেটে) মাথায় তৃতীয় টেস্ট খেলা শেষ হয়। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ২৬০ মিনিটে ২য় ইনিংসের এই ২৮৪ রান সংগ্রহ করেছিল। দলের মাত্র ৭৯ রানের মাথায় ৩য় উইকেট পড়েছিল। শেষ পর্যন্ত ৪র্থ উইকেটের জুটি বেসিল বুচার (৬০ রান) এবং ক্লাইভ লয়েড ৮৬ মিনিটে দলের ১০১ রান তুলে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দেন। লয়েড ১১৩ রান করে অপরাজিত থাকেন। ইংল্যাণ্ডের ফাস্ট বোলার জন স্নো তৃতীয় টেস্ট খেলায় ১১৫ রানে ৮টা উইকেট পান (৮৬ রানে ৫ ও ৩১ রানে ৩ উইকেট)।

ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে চলতি ১৯৬৮ সালের টেস্ট সিরিজে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল মোটেই এ'টে উঠতে পারছে না। প্রথম ও দ্বিতীয় টেস্টে ইংল্যাণ্ড টসে জয়ী হয়ে প্রথম ব্যাট করার দান নেয় এবং দুবারই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলকে 'ফলো-অন' করতে বাধ্য করে। আলোচ্য তৃতীয় টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল প্রথম ব্যাট করে; কিন্তু ইংল্যাণ্ড প্রথম ইনিংসের খেলায় ১০০ রানে অগ্রগামী হয়।

শেফিল্ড শীল্ড

অস্ট্রেলিয়ার ১৯৬৭-৬৮ সালের জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভের সূত্রে শেফিল্ড শীল্ড জয়ী হয়েছে। ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া ইতিপূর্বে মাত্র একবার (১৯৪৭-৪৮) শেফিল্ড শীল্ড জয়ী হয়। এ বছর ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া দলে ইংল্যাণ্ডের প্রখ্যাত প্রাক্তন টেস্ট বোলার টনি লকের যোগদান এবং তাঁর যোগদানের প্রথম বছরেই দীর্ঘদিন পর ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া দলের শেফিল্ড শীল্ড জয়—নিঃসন্দেহে লকের কেরামতির পরিচয়। ১৯৪৭-৪৮ সালে ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া দল শেফিল্ড শীল্ড প্রতিযোগিতায় তাদের প্রথম যোগদানের বছরেই শীল্ড জয়ী হয়েছিল।

ইংল্যাণ্ডের সাসেক্স কাউণ্টি ক্রিকেট দলের তৎকালীন প্রেসিডেণ্ট লর্ড শেফিল্ড অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট খেলার উন্নতিকল্পে যে অর্থ দান করেন তা দিয়ে একটি শীল্ড তৈরী করে ১৮৯২ সালে অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার উদ্বোধন হয়। এই প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ান দলের পুরস্কারের নামকরণ হয় শেফিল্ড শীল্ড। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন বছরে তিনটি কলোনী (পরবর্তীকালে স্টেট)—ভিক্টোরিয়া, নিউ সাউথ ওয়েলস এবং সাউথ অস্ট্রেলিয়া যোগদান করেছিল। কুইন্সল্যাণ্ড ১৯২৬ এবং ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া ১৯৪৭-৪৮ সালে প্রথম অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী পাঁচটি দলের মধ্যে একমাত্র কুইন্সল্যাণ্ড দল আজও শেফিল্ড শীল্ড জয়ী হয়নি। চারটি দল প্রথম শেফিল্ড শীল্ড জয় করে—ভিক্টোরিয়া ১৮৯২-৯৩ সালে, সাউথ অস্ট্রেলিয়া ১৮৯৩-৯৪ সালে, নিউ সাউথ ওয়েলস ১৮৯৫-৯৬ সালে এবং ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া ১৯৪৭-৪৮ সালে। সর্বাধিকবার শেফিল্ড শীল্ড জয়ের রেকর্ড আছে নিউ সাউথ ওয়েলসের—৩৬ বার। তাছাড়া নিউ সাউথ ওয়েলস উপর্যুপরি ৯ বার (১৯৫৪-৬২) শেফিল্ড শীল্ড জয়ী হয়ে বিভিন্ন দেশের জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় উপর্যুপরি সর্বাধিকবার জাতীয় চ্যাম্পিয়ান হওয়ার বিশ্ব রেকর্ড করেছিল। অবিশ্যি তাদের এ রেকর্ড আজ আর নেই, ১৯৬৮ সালে বোম্বাই উপর্যুপরি ১০ বার রঞ্জি ট্রফি জয়লাভের সূত্রে তা ভেঙে দিয়েছে।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

॥ নতুন বই ॥
রমাপদ চৌধুরীর

জরির আঁচল ৪৲

নীরদচন্দ্র চৌধুরীর প্রথম বাংলা বই

বাঙালী জীবনে রমনী ৮·৫০

লীলা মজুমদারের
সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যকৃতি

আর কোনোখানে ৫৲

প্রবোধকুমার সান্যালের উপন্যাস

নগরে অনেক রাত ৪·৫০

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

আঁধি ৭·৫০

॥ নতুন মুদ্রণ ॥
জরাসন্ধের

বন্যা ৪৲

তারাশংকরের

রাধা ৮৲

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের
বহু প্রশংসিত উপন্যাস

ঈষ্ট বাকল্যান্ড রোড (নতুন মুদ্রণ) **৮৲**

জরাসন্ধের
সমগ্র

লৌহকপাট ২০৲

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

গন্নাবেগম (৩য় মুদ্রণ) **৮৲ শুকসারীকথা ৮॥**

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের

হিমালয়ের পথে পথে ৭৲

অবধূতের

নীলকণ্ঠ হিমালয় ৮॥

মহাশ্বেতা দেবীর

আঁধারমানিক ১২॥ বায়োস্কোপের বাক্স ৬৲ সন্ধ্যার কুয়াশা ৫॥

প্রবোধকুমার সান্যালের

উত্তর হিমালয় চরিত ১১৲

আশাপূর্ণা দেবীর

প্রথম প্রতিশ্রুতি ১৪৲ সুবর্ণলতা ১৩৲

প্রমথনাথ বিশীর

লালকেল্লা ১৪৲ রবীন্দ্রসরণী (৩য় মুঃ) **১০৲**

কেরী সাহেবের মুন্সী ৮॥ সিন্ধুনদের প্রহরী ৩॥

প্রফুল্ল রায়ের

পূর্ব্বপার্বতী ১১৲ কিন্নরী ৪॥৹ নাগমতী ৫৲

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

উপকণ্ঠে ৯৲ বহ্নিবন্যা ৮॥

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

অথৈ জল ৫॥ অনুবর্তন ৬৲

বিমল মিত্রের

কড়ি দিয়ে কিনলাম ১ম—১৬৲ ২য়—১৪৲

একক দশক শতক ১৪৲ সখী সমাচার ৬৲

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

স্বর্গাদপি গরীয়সী ১ম—৫৲ ২য়—৫॥ ৩য়—৬৲

বিমল করের

পরবাসে ৪॥ খোয়াই ৩৲

জীবুনায়ন ৫৲ সীমারেখা ৪॥ পান্থশালা ৩॥

মিত্র ও ঘোষ : ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ফোন : ৩৪-৩৪৯২ ৩৪-৮৭৯১

[illegible]

প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতের' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা

প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে [illegible] ১৫ দিন আগে 'অমৃতের' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতের' পাঠানো

চাঁদার হার

কলিকাতা

বার্ষিক	টাকা ২০-০০	টাকা ২২-০০
ষান্মাসিক	টাকা ১০-০০	টাকা ১১-০০
	টাকা ৫-০০	টাকা ৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,

কলিকাতা—৩

: ৩৪-৩২৩১ (১৪ লাইন)

'মিতালি'র নতুন নাটক

মনোজ মিত্রের **জন্ম মৃত্যু ভবিষ্যৎ** ৩·০০

উমানাথ ভট্টাচার্যের **ধনপতি গ্রেপ্তার** ৩·০০

জিতেন ঘোষের **দাগ** ৩·০০

পার্থপ্রতিম চৌধুরী **দি অাঁতেলেক চুয়ালস** ৩·০০

রমেন লাহিড়ীর **আমেন** ২·০০

গৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষের **জোনাকির কান্না** ২·৭৫

মিতালি প্রকাশনী ২৯, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা—৯

বিশিষ্ট গ্রন্থাগার ও ব্যক্তিগত সংগ্রহে অপরিহার্য লেখক সমবায়ের বই

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু — **বিজ্ঞানের সংকট ও অন্যান্য প্রবন্ধ** ৬·৭৫

শ্রীবিষ্ণু দে — **রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পসাহিত্যে আধুনিকতার সমস্যা** ৪·০০

শ্রীগোপাল হালদার — **ভারতের ভাষা** ৪·০০

শ্রীসুকুমার বসু — **হিমালয়** ৫·৫০

শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র — **মুঘল ভারতের সঙ্গীতচিন্তা** ৫·০০

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন — **ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা** ৫·০০

শ্রীনীহাররঞ্জন রায় — **বাঙালীর ইতিহাস ॥ আদিপর্ব সংক্ষেপিত** ১৮·০০

প্রাপ্তিস্থান

বাক্-সাহিত্য : ৩৩ কলেজ রো কলকাতা ৯ ॥ মনীষা : ৪/৩বি বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট ॥ ইণ্ডিয়ানা : ২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলকাতা—১২



লেখক সমবায় সমিতি

৭৩বি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড কলকাতা ২৬

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের

বিচিত্র কাহিনী

(৪র্থ সংস্করণ)

নবীন ও প্রবীণের সমান আকর্ষণীয় অজস্র চিত্র সম্বলিত বিচিত্র গল্পগ্রন্থ। মূল্য : দুই টাকা

লেখকের আর একখানা বই

আরও বিচিত্র কাহিনী

অসংখ্য ছবিতে পরিপূর্ণ। দাম : তিন টাকা

প্রকাশক :
এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
সকল পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

৭ম বর্ষ
৪র্থ খণ্ড

অমৃত

৪৬শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 22nd March, 1968. শুক্রবার, ৮ই চৈত্র, ১৩৭৪ 40 Paise.

নিত্য
নতুন
বই পড়ুন

বিশ্ববিধানের সন্ধানে

রিচার্ড এন গার্ডনার
অনুবাদ ॥ অনিলরঞ্জন গুহ
৩·০০

মানব ইতিহাসের সন্ধানে

কার্লটন এস কুন
অনুবাদ ॥ রবীন্দ্রনাথ সরকার
প্রথম পর্ব ৬·০০
দ্বিতীয় পর্ব ৬·০০

ভারত ও পাশ্চাত্য

নেরুলানা গেহ্ ু
অনুবাদ
নিরঞ্জন হালদার ও অমলিন গুপ্ত
৬·০০

চীনের সামাজিক রূপান্তর

চু চাই ও উইনবার্গ চাই
অনুবাদ ॥ রবীন্দ্রনাথ সরকার
৫·০০

ভিয়েৎনামের যুদ্ধ : কেন?

এম শিবরাম
অনুবাদ ॥ মণি গঙ্গোপাধ্যায়
২·০০

আত্মকাহিনী

ইলিনর রুজভেল্ট
অনুবাদ ॥ পশুপতি চট্টোপাধ্যায়
২·৫০

সাম্যবাদ

বিষয়বস্তু ও কার্যপদ্ধতি
ইনা শেলসিংগার ও জোনা ব্রাস্টেইন
অনুবাদ ॥ অমরনাথ দত্ত

একত্রে দশ টাকার অর্ডার দিলে এবং টাকা অগ্রিম পাঠালে ডাকখরচ লাগবে না। পূর্ণাঙ্গ তালিকার জন্য লিখুন।

এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি
কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা—১২ ॥ ফোন : ৩৪-২০৮৬

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীনিতাই ঘোষ

শতবার্ষিকী সংখ্যা প্রসঙ্গে

অমৃতের অমৃতবাজার শতবার্ষিকী সংখ্যাটি বিগত এক শতাব্দীর এক গৌরব-দীপ্ত অধ্যায়ের চিত্র উন্মোচিত করেছে আমার কাছে। দেশপ্রেমিক মহাত্মা শিশির-কুমার অমৃতবাজারের মাধ্যমে একদিকে অনলস সংগ্রাম করেছিলেন বিদেশী শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে, অন্যদিকে তিনি ছিলেন দেশের মননশীল শিক্ষিত সমাজের কাছে প্রেরণার বরেণ্য-উৎস। এই সংগ্রাম ও প্রেরণার সম্মিলিত ধারায় উজ্জীবিত হয়েছিল ভারতবর্ষের জনমানস। অমৃত-বাজারের শতবর্ষের ইতিহাস তাই ভারত-বর্ষের সর্বস্তরব্যাপী গণজাগৃতির ইতিহাস।

এই প্রসঙ্গে আমি মহাত্মা শিশির-কুমারের একটি পত্র এখানে উদ্ধৃত করছি। পত্রটিতে জীবন সম্বন্ধে তাঁর একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। পত্রটি তিনি লিখেছিলেন আমার পিতামহ প্রেসিডেন্সী বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত সুপারি-ন্টেন্ডেন্ট অফ পোস্ট-অফিস আনন্দগোপাল সেন কে। আনন্দগোপাল সেন ছিলেন মতি-লাল ঘোষ মহাশয়ের সহপাঠী ও শিশির-কুমারের একান্ত স্নেহভাজন। কৃতিত্বের সঙ্গে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় তিনি শিক্ষা-বিভাগে ডেপুটি ইন্সপেক্টর অফ স্কুলস পদে নিযুক্ত হন, কিন্তু আইন পাঠ সমাপ্ত করার জন্য প্রার্থিত ছুটি না পাওয়ায় পদ-ত্যাগ করেন ও পরে ডাক-বিভাগে যোগদান করেন। আনন্দগোপাল সত্যাশ্রয়ী, ধর্মানু-রাগী ও স্বাধীনচেতা ছিলেন বলে মহাত্মা শিশিরকুমার তাঁকে গভীর স্নেহ করতেন। শিশিরকুমারের নির্দেশে তিনি আজীবন অমৃতবাজারের বিশেষ সংবাদদাতারূপে কাজ করেছেন। তৎকালীন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আনন্দগোপাল সেনের ধর্ম, সাহিত্য, সমাজ-কল্যাণ প্রভৃতি বিষয়ে বহু লেখা ছড়িয়ে আছে। তাঁর রচিত 'The Post Office of India' পুস্তকটি ঐতিহাসিক মূল্য ও রচনাকুশলতার জন্য অমৃতবাজার পত্রিকায় উচ্চপ্রশংসিত হয় (২২শে জুলাই, ১৮৭৫ সংখ্যা)। স্বাধীনচিত্ততার জন্যই আনন্দ-গোপাল অবসর গ্রহণের পর তাঁকে প্রদত্ত সরকারী খেতাব প্রত্যাখ্যানের মত বৈশিষ্ট্য দেখাতে পেরেছিলেন। তাঁকে লিখিত মহাত্মা শিশিরকুমারের আলোচ্য পত্রটির তারিখ ১৬ই নভেম্বর, ১৯০৮।

প্রিয়তম আনন্দগোপাল,

তুমি কেন দুঃখ কর, বুঝিতে পারি না। মরিলে যে কিছু দুঃখ আছে দূর হইবে; আর ক্রমে মরণ নিকট হইতেছে। মরণ নিকট বলিয়া আনন্দিত হও। আমি তোমাকে ভুলি নাই। সেদিন একটা প্রস্তাব পড়িতেছিলাম। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তুমি লিখিয়াছ 'বাসনা ক্ষয় হওয়া প্রয়োজন, উহা উন্নতির বিঘ্ন।' তুমি নিকটে থাকিলে, একথা লইয়া আমি তোমার সহিত তর্ক করিতাম। আমরা ভালবাসার ভগবানকে ভালবাসা দিয়া ভজনা করি। আমাদের বাসনা ক্রমে প্রবল হইবে ও উহা প্রিয় প্রাণনাথ পূর্ণ করিবেন। তবে বাসনাগুলি ভাল হওয়া চাই। যাহার বাসনা নাই সে মৃত ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণভজন কিরূপে করিবে। বাসনা ধ্বংস কর এ জ্ঞানী লোকের কথা, ভক্তের নহে।

তোমার দাদা শিশির

এই কয়েক ছত্রের পত্রটিতে জীবনকে শিশিরকুমার কোন্ দৃষ্টিতে দেখতেন এবং জ্ঞান ও ভক্তির পার্থক্য কোথায় তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

রথীন্দ্রনাথ সেন
কলিকাতা-১৯

ভ্রমণ কাহিনী

গত সংখ্যায় প্রখ্যাত ভ্রমণ কাহিনী লেখক শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'তুঙ্গনাথ' রচনাটি পড়লাম। তাঁর অধিকাংশ ভ্রমণ কাহিনী পড়েছি। বর্তমান রচনায় পঞ্চ কেদারের তৃতীয় কেদার তুঙ্গনাথের যে রূপ তিনি তুলে ধরেছেন তা আর কারও লেখায় ফুটে ওঠেনি। প্রাকৃতিক এবং নৈসর্গিক যে চিত্র এর মধ্যে পাই, তা যেন মনকে সহজেই আকৃষ্ট করে। এই ধরনের ভ্রমণ কাহিনী প্রকাশ করে অমৃতের সুনাম বৃদ্ধি পাবে আশা করি।

এই প্রসঙ্গে শ্রীব্রজমাধব ভট্টাচার্যের 'ক্যারিবিয়ানের সূর্য' রচনাটিও বিশেষভাবে উল্লেখ্য। লেখক এক নতুন জগতের পরিচয় আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। এই বিস্তৃত অঞ্চলকে নিয়ে বাঙলা ভাষায় কোন গ্রন্থ সম্ভবত এ পর্যন্ত রচিত হয়নি। তাছাড়া শ্রীভট্টাচার্যের বর্ণনাভঙ্গী এবং ভাষাও বেশ রমণীয়। এই রমণীয়তাই তোল যে কোন গদ্য রচনার একটি প্রধান গুণ। লেখক যেভাবে সমগ্র রূপটি প্রকাশ করেছেন, আমাদের মত ঘরে আবদ্ধ বাঙালীর কাছে বিশেষ সমাদর পাবে।

এই দুটি ভ্রমণ কাহিনীর জন্য সম্পাদককে ধন্যবাদ জানাই।

শ্রীলেখা চৌধুরী
সুলেখা চৌধুরী
কলকাতা—৯

'কলকাতা' প্রসঙ্গে

রাজনীতির ডামাডোলে এখন কানপাতা দায় হয়ে উঠেছে। যেখানে যাবেন দু'দণ্ড বসতে না বসতেই আরম্ভ হলো সেই কচকচা। এর যেন আর শেষ নেই। কোথাও হয়তো সম্বর্ধনা থেকে বিদায় সম্ভাষণ পর্যন্ত একই বিষয়বস্তুর পুনরাবৃত্তি। এজন্য আজকাল আর কান পাতার জো নেই। এখান থেকে জোর করে ছুটি নিয়ে একবার তাকান শহর কলকাতার দিকে। বাইরে থেকে মনে হবে নেহাতই সেই গতানুগতিক জীবনযাত্রা—কোন বৈচিত্র্য বা ভিন্নতর স্বাদের অবকাশ নেই। কিন্তু একটু খতিয়ে দেখুন অমনি রসের প্রস্রবণের সন্ধান পাবেন। তখন আপনার ক্লান্তি কেটে যাবে, মনে মুক্ত হাওয়ার আমেজ লাগবে।

এই প্রায়-বৃদ্ধ শহরটার জীবনে বৈচিত্র্যের যেন অন্ত নেই। হাজার টানা-পোড়েনের মধ্যেও কলকাতা নিজস্ব মেজাজ বজায় রেখে বহাল তবিয়তে দিন কাটাচ্ছে। এর রোজকার জীবনে কত না বাহারী রঙের বরশুমী সমাবেশ। কত নাটকীয় ঘটনা রোজ ঘটে যাচ্ছে। কত বিদেশীর নিত্য পদপাত এই শহরে। তাঁদের কেউ শহরকে ভালবেসে সাধুবাদ জানাচ্ছে আবার কেউবা বয়সের ভারে জীর্ণ বলে অবজ্ঞা করার স্পর্ধা দেখাচ্ছে। তাতে কলকাতার মেজাজে কোন পরিবর্তন নেই এবং বিদেশী ট্যুরিস্টেরও কমতি নেই। এছাড়া এই শহরে চিন্তনীয় এবং অচিন্তনীয় অনেক ঘটনার সমাবেশ, যা আমাদের সাধা পথে পড়ে ....।

এখবর কেউ জানে, কেউ জানে না। সবাই শাদা চোখে কলকাতাকে দেখে আর হতাশ হয়। চলে তাদের দিনগত পাপক্ষয়। রোজই ঘুম থেকে উঠে তারা কলকাতাকে দেখছে, কিন্তু লক্ষণীয় কিছু যেন তাদের নজরে পড়ে না। অর্থাৎ তারা সে রসের রসিক নয়। ওরে কেউ কেউ ব্যক্তিগতভাবে বিচ্ছিন্ন দু' একটি ঘটনার সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য অর্জন করে বৈকি। কিন্তু বেশিরভাগ লোকই তার খবর পাচ্ছে না। যে কলকাতাকে নিয়ে আমাদের গর্বের সীমা পরিসীমা নেই তার বৈচিত্র্যটুকু সকলের অগোচরেই রয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি সে দায়িত্ব আপনারা নিয়েছেন। কলকাতা বিচিত্র অভিজ্ঞতার সঙ্গে পাঠকদের পরিচিত করানোর দায়িত্ব নিয়ে নিঃসন্দেহে আপনারা পাঠকদের ধন্যবাদ-ভাজন হবেন। এতে আমাদের অনেকদিনের একটি সাধ পূর্ণ হলো।

অমৃতের পাঠক হিসেবে এজন্য আপনাদের অভিনন্দন জানাই।

অমলেশ চক্রবর্তী
কলকাতা—২৯

অমৃত

সম্পাদকীয়

শাদা এবং কালো

এক পৃথিবীর স্বপ্ন দার্শনিক ও দূরদর্শীরা অনেককাল ধরেই দেখে আসছেন। বহু জাতির সমাবেশে পৃথিবী এক এবং অভিন্ন, এই রকম কল্পনা শুভ অধ্যায়ের সূচনা করে। কিন্তু বাস্তবে তা এখনো আমাদের অসাধ্যই রয়ে গেছে। আমরা যেদিকেই তাকাই মানুষে মানুষে মৈত্রী যেমন দেখি তেমনি প্রত্যক্ষ করি বিরোধ ও সংঘর্ষ। আমরা বোধহয় এখনও আদিম অন্ধতার বশীভূতই আছি কোনো কোনো বিষয়ে।

সম্প্রতি আফ্রিকার রাজ্য রোডেশিয়ায় এমনি মর্মন্তুদ ঘটনা ঘটে গেল যা সভ্য মানুষের অত্যন্ত বেদনার কারণ হয়েছে। রোডেশিয়া রাজ্যটির আফ্রিকান নাম জিমবাবুফি। ইংরেজের উপনিবেশ ছিল এতদিন। তার লোকসংখ্যার মধ্যে চল্লিশ লক্ষ কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রো। মাত্র দু লক্ষ শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিকদের বংশধর। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, আফ্রিকার অন্যান্য উপনিবেশ যে দাবীতে স্বাধীনতা লাভ করেছে, রোডেশিয়ার কালো মানুষও সেই একই দাবীতে স্বাধীনতালাভের যোগ্য। কিন্তু শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিকরা ১৯৬৫ সালে নিজেরাই একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণা করে দেয়। বৃটিশ সরকার সে-সময় অনেক হম্বিতম্বি করেছিলেন কিন্তু কিছুই হল না। রোডেশিয়ার স্বেচ্ছাবৃত প্রধানমন্ত্রী ইয়ান স্মিথ সংখ্যালঘু শাসন চালিয়ে যাচ্ছেন। বিশ্বের দরবারে এ নিয়ে নালিশ করা হয়েছিল। রাষ্ট্রসংঘের স্বস্তি পরিষদ প্রস্তাব নিয়েছিল স্মিথ সরকারের হুঁকো-নাপিত বন্ধ করা হবে। তাকে তেল দেওয়া হবে না, শুকিয়ে মারা হবে যতদিন না তাঁর বেআদপি বন্ধ হয়। কিন্তু দেখা গেল, এতে স্মিথ সরকারের মোটেই বিশেষ কোনো অসুবিধা হয় নি। কারণ, শ্বেতাঙ্গ দুনিয়ায় এমন অনেক দেশ আছে যারা মনের তলায় স্মিথ-দরদী, অনেক দেশ তো প্রকাশ্যেই এই সরকারকে তেল-জল দিয়ে বাঁচিয়ে রাখছে। শাদা ও কালোর ব্যবধান জীইয়ে রাখার জন্য শ্বেতাঙ্গ দুনিয়ায় বর্ণ-বিদ্বেষীর অভাব নেই।

একটা জাতির অধিকাংশ মানুষকে বঞ্চিত রেখে স্বাধীনতার নাম করে সংখ্যালঘু শাসন কায়েম রাখার অর্থ পরাধীনতাই। বৃটিশ উপনিবেশ থাকা কালে রোডেশিয়ার যে-দুর্দশা ছিল স্মিথ সরকারের আমলে তা আরও বেড়েছে। সম্প্রতি সলসব্যারীতে এই সরকার দুনিয়ার জনমত অগ্রাহ্য করে একের-পর-এক রোডেশীয় মুক্তিযোদ্ধাকে ফাঁসি দিয়েছে। বৃটিশ রাণীর অনুকম্পা প্রদর্শন, মহামান্য পোপের আবেদন কোনো কিছুর প্রতিই সম্মান প্রদর্শন করা রোডেশিয়ার সংখ্যালঘু সরকারের পক্ষে যুক্তিযুক্ত মনে হয় নি। অথচ এই সরকারের অবৈধ কার্যকলাপের বিরুদ্ধে মহাশক্তিশালী বৃটিশ সরকারও নিষ্ক্রিয়। এই ধরনের অবিচার চলতে দেওয়া পৃথিবীর শান্তির পক্ষে বিঘ্নকর। দক্ষিণ আফ্রিকায় সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গরা ক্ষমতা দখল করে যে নজীর স্থাপন করেছে রোডেশিয়ার স্মিথ তাকেই অনুসরণ করছে। কোনোদিন যদি পর্তুগীজ অ্যাঙ্গোলা এবং মোজাম্বিকেও অনুরূপ 'স্বাধীন সরকার' গঠিত হয় তাহলেও বলার কিছু থাকবে না।

এদিকে সভ্য রাষ্ট্রসমূহও পরোক্ষে বর্ণ-বিদ্বেষই জাগিয়ে তুলছেন। ইংলণ্ডে কেনিয়াবাসী বৃটিশ ছাড়পত্রধারীদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে সম্প্রতি। কারণ এদের গায়ের রঙ কালো। কেনিয়াবাসী শ্বেতাঙ্গরা যত খুশি ইংলণ্ডে যেতে পারেন তাতে বৃটিশ সমাজের কোনো একীকরণ সংকট দেখা দেবে না, কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গরা গেলেই মহাদুশ্চিন্তা! বৃটিশ লেবার পার্টি নিয়ন্ত্রিত সরকারের হাত দিয়ে এমন একটি বর্ণ-বৈষম্যমূলক আইন পাশ হবে তা ভাবা যায় নি। যাঁরা ইংলণ্ডকে গণতন্ত্রের স্বর্গ বলে মনে করেন এই ঘটনার পর তাঁরা নিশ্চয়ই নতুন দৃষ্টিতে বৃটেন ও তার সরকারকে বিচার করবার প্রেরণা পাবেন।

আমেরিকাতে তো শাদা ও কালোর বিরোধের কোনো স্থায়ী মীমাংসা এখন পর্যন্ত হল না। মার্কিন সরকার কাজেই নিগ্রোদের সমানাধিকার দিয়ে আইন পাশ করেছেন, কিন্তু সমাজের যে-অংশ রক্ষণশীল যারা গায়ের চামড়া দিয়ে মানুষের সংস্কৃতি বিচার করে তাদের কাছে এই আইন অর্থহীন। তাই মহামতি আব্রাহাম লিংকনের আত্মদানের পরও মার্কিন সমাজ আজ পর্যন্ত তাঁর রক্তের ঋণ শোধ করতে পারল না মুষ্টিমেয় জাত্যাভিমানী বর্ণ-বৈষম্যবাদীদের জন্য।

রাষ্ট্রসংঘ স্থাপিত হয়েছিল বিশ্বমানবের মৈত্রী ও সমানাধিকারের আদর্শের ভিত্তিতে। সেই ভিত্তি বারবার [illegible] টলে। মানুষ এক পৃথিবীর স্বপ্ন দেখলেও সেই পৃথিবীর চেহারা তাদের কাছে স্পষ্ট হয় নি। যদি হত [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] মানুষকে আজ এত নির্যাতন সহ্য করতে হত না।





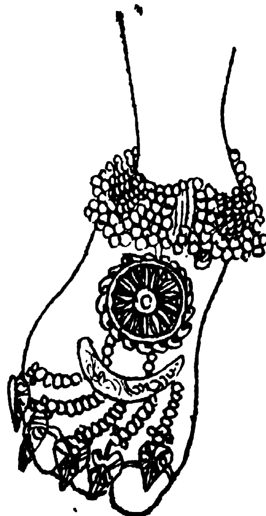
আশীষ বসু

বাঙালীর বেশভূষা

সেকালের বাঙালী ছেলেমেয়ের পোষাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে জানতে হলে চোখ ফেরাতে হবে সেকালের সমাজ-চিত্রের দিকে যা ধরা পড়েছে কবির লেখায়, শিল্পীর পট-চিত্রে, লোক-সংগীতের মাধ্যমে, মন্দিরের গায়ের ফলকে। কবি ক্ষেমেন্দ্র তাঁর 'দশোপদেশ' গ্রন্থে বাঙালী ছেলেদের সম্পর্কে বর্ণনা যা লিখেছেন, তা খুব মজার। তিনি লিখেছেন, বাঙালী ছাত্রেরা যে জুতো পরতো তাতে ময়ূরপংখী নৌকার আকারে শুঁড় তোলা থাকত, হাঁটবার সময় সে জুতোর মচমচ আওয়াজ হ'ত। তাঁদের পোষাক-পরিচ্ছদ ছিল সুবিন্যস্ত এবং পথে চলবার সময় নিজের পোষাকের দিকে তারা মধ্যে মধ্যে তাকিয়ে দেখতো। তাদের কোমর ক্ষীণ, সেই ক্ষীণ কোমরে তারা লাল রঙের কোমরবন্ধ ব্যবহার কোরতো। তাদের দুই কানেই সোনার অলঙ্কার থাকতো এবং হাতে থাকতো নক্সা-করা ছড়ি। কবি ক্ষেমেন্দ্র বলেছেন যে তাদের চালচলন দেখলে মনে হ'ত যে তারা ধনপতি কুবের। খৃষ্টীয় দশম ও একাদশ শতাব্দীতে সারা ভারতবর্ষ থেকে ছাত্রেরা কাশ্মীরে যেত পড়তে এবং কাশ্মীর প্রবাসী বাঙালী ছাত্রদের সম্পর্কেই কবির এই উক্তি।

যুগে যুগে বাঙালী তার পোষাক-পরিচ্ছদ পাল্টিয়েছে। সেলাই করা জামা পরার রেওয়াজ ভারতবর্ষে প্রায় ছিলই না বলা চলে, বাংলা দেশে তো নয়ই। বাংলা দেশের পল্লী অঞ্চলের মেয়েরা আজও সেলাই করা কাপড়-জামা পরতে চান না, কেন — ওদের ধারণা সেলাই করা জামা-কাপড় পরা মানেই দুঃখ-দারিদ্র্যকে মেনে নেওয়া। মনে হয় সেলাইকরা কামিজ পরার রীতি মুসলমান আমলেই বেশী করে চালু হয়। বাঙালী মেয়েরা চিরকালই শুধু একখানি শাড়ীই পরে এসেছেন এবং তারই আঁচল জড়িয়ে দিন কাটিয়েছেন। অপেক্ষাকৃত বিত্তবানেরা অবশ্য শাড়ীর ওপর ওড়নাও পরতেন। গ্রামের পুরুষমানুষ আট-হাতি খাটো ধুতি পরেই দিন কাটাতেন, শহরের মানুষের ধুতির বহর ছিল বেশী। যাদের অবস্থা ভালো তাঁরা অবশ্য গায়ে চাদরও দিতেন। জমিদার বা ধনী সম্প্রদায়ের বাড়ীর মেয়েরা নানা রকমের নক্সীকাজ করা বক্ষবাসও ব্যবহার করতেন।

আমরা যাকে বলি পাঞ্জাবী, পাঞ্জাবীরা সেই জামাকেই বলে বাঙালী-কুর্তা। পা ঢাকার জন্য জামা বা পাজামা তা পশ্চিম ভারতেরই দান। মুসলমান আমলে সরকারে নিযুক্ত হিন্দুদের মধ্যেও মুসলমানী ঢংয়ের পোষাক পরার রেওয়াজ চালু হয়, সেই ধরন আজও বর্তমান রয়েছে। ইংরেজ আমলেও বাঙালী-বাবু আর একবার তার পোষাক পালটেছে। পুরো হাতের সার্টের ওপর ধুতিপরা এবং তারও ওপরে গলাবন্ধ কোট চাপানো ইংরেজ সওদাগরী অফিসের বড়বাবুর চেহারাটা আজও আমাদের অনেকেরই চোখের ওপর ভাসছে। বাঙালী ভিন্ন দেশের আরও অনেক রকমের পোষাক পরেছে। গুজরাটী মেয়েদের ঢংয়ে ঘাগরা পরার কথাও শোনা গেছে বাংলাদেশে। বাঙালী মেয়ের শাড়ী ছিল নানা রকমের আর তাদের নামও ছিল কতো। যেমন—নীলাম্বরী, মেঘডম্বুর, কমলাবিলাস থেকে জামদানী, বালুচরী। বেশী দামের শাড়ী ছিল মসলিন। মসলিনে নানা রকমের বুটি তুলে তৈরী করা হোত রকমারী নক্সার শাড়ী যাকে বলা হোত জামদানী। জামদানীর সুতো খুব সরু, বুনট অত্যন্ত জমাট। এর নক্সাগুলি মূলত রেখা ভিত্তিক; কোথাও জ্যামিতিক, কোথাও গাছ বা লতাপাতাকে সাজিয়ে দেওয়া। হলদে, লাল আর সবুজ এই তিনটি রংই ছিল বেশী। বালুচর শাড়ীর বৈশিষ্ট্য তার আঁচলার নক্সায়। এই আঁচলার নক্সা-গুলি চতুষ্কোণ পর পর সাজানো খোপের মতো। এক একটি খোপে বিচিত্র নক্সা—হাতী, ঘোড়া, সওয়ার, পাখী, হুঁকা-হাতে পুরুষ ও রমণী, পালকী, রেলগাড়ী, জাহাজ ইত্যাদি অনেক কিছুই বোনা হোত।



প্রাচীনকালের শৌখীন মানুষ পুরুষ ও রমণী উভয়েই শাড়ী পরতেন। পুরুষরাও মেয়েদের মতোই অলঙ্কার পরতেন। তাঁরা অনেকেই মেয়েদের অনুকরণে মাথায় বড় বড় চুল রাখতেন এবং সেই চুল বাঁধতেনও। রামমোহন বা বঙ্কিমচন্দ্রের মাথায় পাগড়ী পরা যে ছবি দেখতে আমরা প্রায়ই অভ্যস্ত তাতে বিদেশীয়ানার ছাপ আছে মনে হয়, কেন না, বাঙালী কখনই মাথায় কিছুই পরত না। টুপী পরা মুসলমান যুগ থেকেই প্রচলিত হয়েছে।

ইংরেজদের সংস্পর্শে এসে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালীই প্রথম কোট-প্যান্ট পরতে শুরু করে। ভারতবর্ষের অন্য কোথাও তখনো কোট-প্যান্ট-টাই পরার হিড়িক পড়ে নি। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে আবার বাংলা দেশেই প্রথম বিদেশী বস্ত্র বর্জন আন্দোলন শুরু হয়।

গহনা পরার রীতি, আগেই বলেছি, পুরুষ ও মহিলা উভয়ের মধ্যেই প্রচলিত ছিল, তবে নারীর গহনা-প্রীতির কথা কে না জানে! আর সে গহনাও ছিল আপাদমস্তক। নামের লিস্টটা দেখা যাক—টিকলি, চুলের কাঁটা, চিরুণী, টায়রা, ঝাপলা, সিঁথি, কানপাশা, কানবালা বা মাকড়ি, কুণ্ডল নথ, হার, চিক, চেন, আর্মলেট, বাক, তাবিজ, মাদুলি, অনন্ত, তাগা, বাজু, কঙ্কন, চুড়ি, রতন-চূড় পাটালি, বালা, মানতাসা, রুলি, আংটি, বিছে, মল, চরণচুড় ইত্যাদি কত রকমের সোনারূপার গহনাই না ছিল! প্রায় লক্ষাধিক ব্যক্তি বাঙলা দেশের সোনারূপার ব্যবসার সঙ্গে আজও জড়িত রয়েছেন। এর থেকেই বাঙালীর গহনাপ্রীতির সন্ধান মেলে। বাংলা দেশেই বিয়ের কনের হাতে খাড়ু থাকে। অনুমান হয় এটি একটি প্রতীক মাত্র। মেয়েদের নিজেদের শত্রুর হাত থেকে বাঁচাবার জন্য অস্ত্র হিসাবে এর ব্যবহার হবার কথাই মনে হয়। দুর্গা-প্রতিমার হাতে যে জাতীয় অস্ত্র দেখা যায় এটি তারই অনুকরণে তৈরী প্রতীক মনে হয়। কারিগর শ্রেণীর মধ্যে স্বর্ণকারদের স্থান থাকায় গহনা-শিল্প যে সমাজে খুব উঁচু এবং স্বীকৃত স্থান পেয়েছিল তাই মনে হয়। সেকালের গহনার বিবরণ সম্পর্কে অধিকতর অনুসন্ধানী পাঠককে দীনেশচন্দ্র সেনের 'বৃহৎবঙ্গ' গ্রন্থটি পড়তে অনুরোধ জানাই।

নবম শতাব্দীতে আরবীয় পর্যটক সুলেমান এসেছিলেন ভারতবর্ষে। তিনি বাংলা দেশের তৈরী মসলিনের সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, 'পূর্ব বাঙলায় এত সূক্ষ্ম বস্ত্র তৈরী হয় যার একখানি প্রমাণ-সাইজের কাপড় একটি আংটির মধ্য দিয়ে সহজেই গলে যেতে পারে।' ১২৯০ সালে মার্কো পোলো, ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে র‍্যাফল ফিচ, আইন-ই-আকবরীর লেখক আবুল ফজল, বের্নিস, ট্যাভার্ণিয়ের সকলেই বাঙলার

অমল মিত্রের
কলকাতায় বিদেশী রঙ্গালয় ৬·০০
" ....আমাদের নাট্যালয়, নাট্যসাহিত্য ও নাটকখার ইতিহাস চর্চার দিগন্ত এই বইখানি বাড়িয়ে দেবে। সেদিক থেকে গবেষণাটির দাম অনেক। তাছাড়া বিলুপ্ত কলকাতার জীবন-আলেখ্য হিসাবেও এই প্রতিপাদ্যের কদর কম নয়। একাধারে ... ও লিখনশক্তি দু' কারণেই গ্রন্থকার অভিনন্দনীয়......" —যুগান্তর ...

ডঃ দিলীপ মালাকারের
নানান দেশের নানান সমাজ
দাম : ৪·০০
ডঃ নমিতা চক্রবর্তীর
শাশ্বতী

বিমল মিত্রের নতুন উপন্যাস
কথা চরিত মানস ৬·০০
ন্যায়দণ্ড

সতীনাথ ভাদুড়ীর
সতীনাথ বিচিত্রা
দাম : ৮·৫০
দিগ্‌ভ্রান্ত
জাগরী

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের
দেশ বিদেশের রূপকথা ২য় সং ৩·০০
সন্ধ্যার সুর

ধনঞ্জয় বৈরাগীর
জয়জয়ন্তী ৪·১০
স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
গোপী-সংবাদ ৩·৫০
আগুনের টাটি

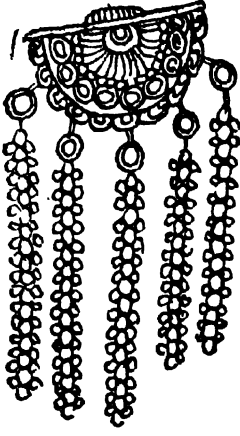
শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের
রবীন্দ্র-সঙ্গমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশ
Languages and Literatures of Modern India 18.00
বৈদেশিকী

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
বলাকার মন ৪র্থ সং ৬·০০
বিমল মিত্রের
চার চোখের খেলা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
মহাশ্বেতা ৪র্থ সং ৬·০০
অচিন্ত্যকুমার ...
প্রথম কদম ফুল

গোপাল হালদারের
ভাঙনা কূল ৪·৫০
গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
জীবন স্বপ্ন ২য় সং ৪·৫০
শরদিন্দু ...
কালের মন্দিরা

প্রকাশ ভবন ১৫, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, ...





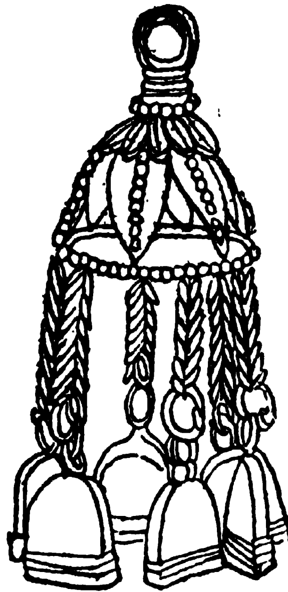
মসলিনের কথা লিখেছেন। হীরা নর্তকীর বর্ণনায় গোপীচাঁদ লিখেছেন, 'আর এক না শাড়ী পরে নিরর মেলানি, রাইত হইলে শাড়ীখানি থাকে নিয়রে ভিজিয়া, দিন হইলে মাটির শাড়ী উঠে জ্বলিয়া' ইত্যাদি। এই 'নিয়র মেলানী' শাড়ীই মসলিন। এক শ্রেণীর মসলিনের নাম 'শবনম' বা 'ভোরের শিশির' ছিল।

টোপর মাথায় দিয়ে বিয়ে শুধু বাঙালীই করে। হাতে শাঁখা, নোয়া শুধু বাঙালী মেয়েরই। এই শাঁখার ডিজাইনই তো কতো পালটিয়ে গেল আমাদের চোখের সামনে! কতো ডিজাইনই না ছিল—যেমন পাতা, মানে-না-মানা, জলতরঙ্গ, কঙ্কন, বাঁশীগিট, মটর-দানা, করোগেট, রেল-লাইন, মতিদানা কঙ্কন, কাঁথালি কঙ্কন ইত্যাদি।

গিলে-করা পাঞ্জাবী, চুনোট-করা ধুতি, পায়ে পাম্প-শু, গ্রীসিয়ান, অ্যালবার্ট বাঙালীবাবুর বাবুয়ানা নিয়ে কতোই না লেখা হয়েছে অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে। কাঁধে বুলবুলি পাখী রেখে নিমন্ত্রণে যাওয়া, সেও তো বাবু-কালচারেরই এক রূপ। জুড়ি-গাড়ী, হুঁকো, পালকী, অম্বুরী তামাক, কাশ্মীরী-শাল, তবক-দেওয়া পান, ঝাড়-বাতি সেদিনের বিত্তবান বাঙালীর একটি বড় অংশ এর মধ্যেই ডুবে ছিলেন। বুলবুলির লড়াই, টাকা বেঁধে ঘুড়ি ওড়ানো, নাচ-গান-মহফিলে সে কালটাই ছিল অন্য।

ড্রেপ করে শাড়ী পরতে ভারতবর্ষকে শিখিয়েছে বাঙলা দেশই। ঠাকুর বাড়ীতেই এ রীতির জন্ম। ছেলেদের পোষাকেরও তো কতো রকম-ফের ঘটে গেল। এই সেদিনও বড়ুয়া-কলার, জহর-কোট, রাশিয়ান-কাফ, ডবল-কাফ ইত্যাদি পরতে ছেলেরা কতোই না ভালোবাসতো! দশ আনা-ছ' আনা আর পিছন দিকে ছোট ছোট করে ছাঁটা চুলের প্যাটার্ন এখন খুবই সেকেলে বলে মনে হয় না কি।

ঘটি-হাতা ব্লাউজ, জলতরঙ্গ চুড়ি পরার দিন গেছে। ম্যাগেয়া হাতাও এখন প্রায় সেকেলে। শুনেছি এখন ছ' দিয়ে কলকেই হাত-কাটা (শিলভ-লেস) ব্লাউজ হয়ে যাচ্ছে। গহনা না পরাটাই এখন ফ্যাসান। ছেলেদের বড় ঘড়ি আজ মেয়েদের হাতে। আবার কাছিই মেয়েদের ছোট ঘড়ি আঁচরেই

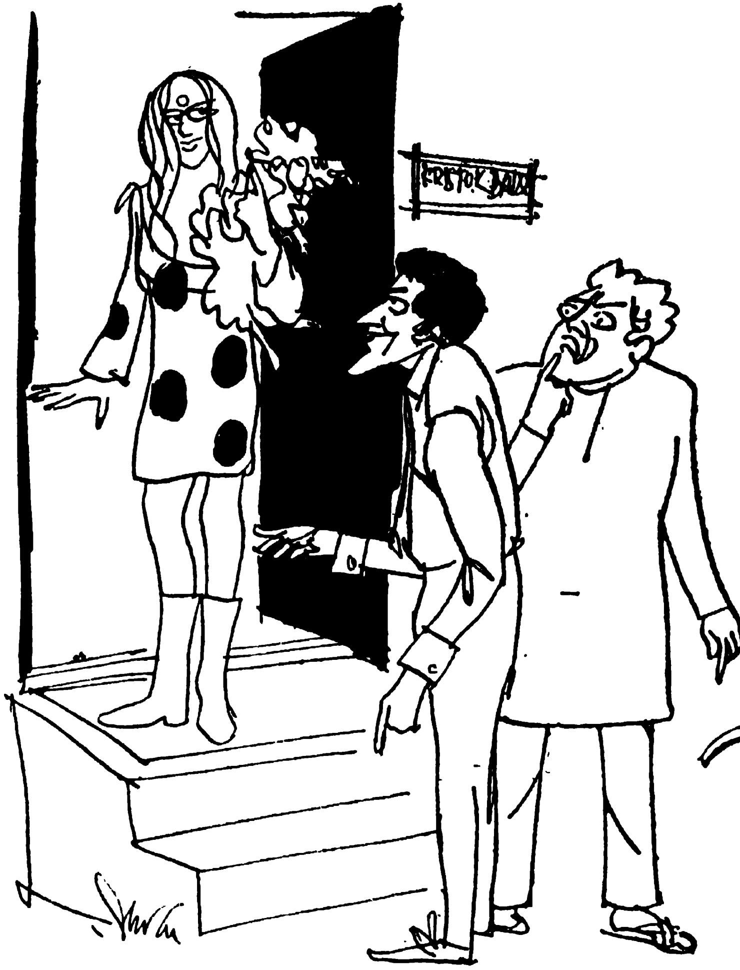


ছেলেদের হাতে হাতে ঘুরবে এবং সেটাই হবে সব চেয়ে লেটেস্ট ফ্যাসান।

'নকল হইতে সাবধান' এ বিজ্ঞাপনও পুরাতন। আজ নকল-গহনারই ছড়াছড়ি চারদিকে। হাতীর দাঁতের গহনা, সামুদ্রিক শঙ্খের গহনা, রুপোর ফিলিগ্রি করা গহনা, পাথর-বিড বসানো গহনা এ সবই মেয়েদের মধ্যে সর্বাধিক প্রচলিত।

অজন্তা চিত্রের অনুকরণে বাঁধা খোঁপা আজকাল রাস্তাঘাটে প্রায়ই চোখে পড়ছে। বাঙলা দেশের শাড়ীর মধ্যে শুধু টাঙ্গাইলই কিছু চালু, নইলে বাঙালী মেয়ে আজ সব চেয়ে বেশী কিনছে মাদ্রাজ, অন্ধ্র, বোম্বাই আর মধ্যপ্রদেশের শাড়ী। বেনারসী জামদানী, টিসু, সম্বলপুরের বাঁধনী, আউরঙ্গাবাদ, ভেঙ্কোর, চান্দেরী, মাহেশ্বরী, কোটা, হায়দ্রাবাদী প্রিণ্টস, রতন-গিরি ইত্যাদি শাড়ী আজ বাঙালী আধুনিকা রমণীর ওয়ার্ডরোবে একখানি করে থাকবে আশা করা যায়।

ছাপা কাপড়েরও প্রচলন এখানে খুব। তবে বাঙলা দেশের নিজস্ব ছাপা ডিজাইন নামাবলী, আলপনা, জংলা, স্বস্তিক ইত্যাদির চাহিদা কমছে, বাজারে এখন মিলের ছাপা প্রিণ্টসেরই কদর বেশী।



বাঙরেজী কালচার

সুবল চক্রাচার্য

"মাম্মি, ড্যাডিকে দুজন জেন্টলম্যান ডাকছেন।" স্কার্ট পরা, বব ও শ্যাম্পু করা চুলের অধিকারিণী কিশোরীটির আহ্লাদ-লব্ধ কণ্ঠস্বর এবং দরজায় 'বিওয়্যার অব ডগ'এর নিচে কৃষ্ণো কে বাউসের নেম-প্লেটের যুগপৎ আক্রমণে অনিবার্যভাবে স্নায়বিক দৌর্বল্য দেখা দিল আমার। ছুটির দিনের পায়জামা, চপ্পল এবং হাত ভাঁজ করা জামার আড়ালে হাঁটু এবং বুক দুটোই কাঁপতে শুরু করল। আমার শারীরিক অস্বস্তির কথা বুঝতে পেরে কনুই চেপে ধরল হাজারীলাল। মেয়েটি ঘরের ভেতরে উধাও হয়ে যেতে না যেতেই ধাওয়া করে এলেন জনৈকা মধ্যবয়সী মহিলা। হাজারীকে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে লিপ-স্টিকের আর টুথ পেস্টের অনেকটা বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে হাত তুলে হাঁটি হাঁটি পা পা করতে করতে একেবারে দরজার কাছে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে আশ্চর্যজনকভাবে সামলে গেলেন। পায়ের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারলাম ভদ্রমহিলা রণপায়ে চলাফেরা করেন —জুতোর হীল অত লম্বা এবং ছুঁচলো আমি এই প্রথম দেখলাম।

"হাল্লো ডার্লিং! কি মনে করে?" ভদ্রমহিলা আরেকটি আঘাত হানলেন আমার চক্রাচারিয়ান ব্রেনের ওপরে। দুই চোখ ম্যাকসিমাম লিমিট পর্যন্ত বিস্ফারিত করে তাকালাম তার সযত্নে লালিত মুখের দিকে। হাজারীলালকে আমরা ইয়ার বন্ধুরা বড় জোর হাজু পর্যন্ত ডেকেছি, কিন্তু হল্লো? নেভার—ভাবতেই কেমন যেন গা ঘিন ঘিন করতে লাগল আমার। হাজারিলাল একগাল হেসে বলল, "মেজদা নেই বৌদি?"

"ও ইয়েস, তোমার মেজদা আছেন। এসো, ভেতরে এসে বোসো।" বুঝতে পারলাম কণ্ঠস্বর মোলায়েম করে রাখার পেছনে সাধনা আছে ভদ্রমহিলার। আমার দিকে একবার কটাক্ষপাত করে সম্ভবত আমার চটি-পায়জামা-জামা কমবিনেশনের প্রতি বিরক্তি প্রদর্শন করার জন্যই ভুরু নাচকে একপাশে সরে দাঁড়ালেন তিনি। আমরা একঝলক সেন্টের গন্ধ নাকে নিয়ে কৃষ্ণো কে বাউসের ড্রইংরুমে ঢুকলাম।

ফিটফাট সাজানো ড্রইংরুম। সারা মেঝে জুড়ে কার্পেট পাতা, তার মাঝখানে লতাপাতা আঁকা ঝকঝকে সোফা সেট। চার দেয়ালের মাঝামাঝি ঠেস দেয়া চারটে হাল-ফ্যাশানের বইয়ের আলমারী।

"বোসো, আমি কৃষ্টোকে ডেকে দিচ্ছি।" ভদ্রমহিলা একটি রঙচঙে পর্দার আড়ালে চলে গেলেন। আমি হাজারীলালের কাঁধে হাত দিয়ে ওকে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিলাম। তারপর দাঁত খিঁচিয়ে বললাম, "কিরে, এই তোর জ্যাঠতুতো দাদার বাড়ি নাকি, অ্যাঁ? না কি আমাকে তিন নম্বর ভাঁওতা দিয়ে কোন বাঙ্রেজের বাড়িতে নিয়ে এসেছিস গোটা দিনটাকেই মাটি করে দেবার জন্য?"

"ব্যাঙ্‌রেজ? মানে?" জিজ্ঞেস করল হাজারীলাল।

"আরে বাবা বাঙালীই বটে, কিন্তু মনেপ্রাণে যাদের ইংরেজ বনবার ভারি সাধ!"

শহীদের মত মুখ করে জবাব দিল হাজারীলাল, "বিশ্বাস কর সুবল, এটাই আমার জ্যাঠতুতো দাদা কৃষ্ণকান্ত বসুর বাড়ি। আমার আপন জ্যাঠামশায়ের—"

ভদ্রমহিলা ঘরে ঢুকলেন আবার।

"কৃষ্টো আসছে। একি, তোমরা দাঁড়িয়ে রইলে কেন? প্লীজ বী সীটেড। তারপর—কি খাবে বলো, টী অর কফি?"

আমার দিকে তাকাল হাজারীলাল। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম ভদ্রমহিলা অতিথি আপ্যায়ন মেড ঈজির নির্দেশাদি অক্ষরে অক্ষরে পালন করছেন। আমাদের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত —এরপরই আমরা কেউ কিছু মুখ ফুটে বলার সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করবেন তিনি, "উইত অর উইদাউট সুগার?" আমি এ ছক জানি। সোফায় বসে পা নাচাতে নাচাতে বললাম, "বাংলা চা হলে এক কাপ চলতে পারে।"

ক্ষণিকের জন্য ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকিয়েই ঠোঁট ফাঁক করলেন ভদ্রমহিলা—"বাংলা চা? হাউ ফানি! (বুঝলাম আমার মস্করাটা উনি উপভোগ করেছেন) নিশ্চয়ই, ফ্রেশ ফ্রম দার্জিলিং। আমাদের লন্ডনেও এত ভালো চা পাওয়া যায় না। আচ্ছা, আমি নিয়ে আসছি।" তিনি অন্তরালে গেলেন আবার।

হাজারীলাল তার বৌদির মুখের দিকে তাকিয়ে পাঁঠার মত মিট মিট করে হাসছিল। এবার আমাকে নিয়ে পড়ল।

"সুবল, মাইরি, তুই ডোবাস না আমাকে।"

"আমি কাউকে ডোবাই না," পা নাচাতে নাচাতে জবাব দিলাম। মনে মনে দারুণ গালাগাল দিচ্ছিলাম হাজারীলালকে। শালা, কোথায় ছুটির দিনে বেশ আয়েশ করে বসে জমিয়ে আড্ডা দেব, না—

"দ্যাখ, আমার দাদা বৌদি একটু বেশি সেনসিটিভ, মানে—"

"বুঝেছি। বাঙরেজ।"

সত্যি সত্যিই এবার চোখমুখ কঠিন হয়ে এল হাজারীলালের। আমি মোটেই ঘাবড়াবার ছেলে নই। বললাম, "ভেবেছিলাম তুই আমাকে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান পাড়ায় এনে ফেলেছিস। এখন দেখছি তার চেয়েও মারাত্মক জায়গায় এসে পড়েছি। শালা! দিনটাই নষ্ট হল আমার।"

"সুবল, মুখ সামলে—" হাজারীলাল দাঁতে দাঁত ঘষল, "জানিস আমার মেজদা বার্টনসন এডভারটাইজিং-এর একজন বড় অফিসার, বিলেতে ছ'মাস কাটিয়ে এসেছেন। কত ভদ্র, কালচারড—"

'তুই থাম!" হাত তুলে বললাম ঠোঁট বেঁকিয়ে, "ছ'মাস বিলেতের জল খেয়ে যারা কৃষ্ণকান্ত বসু থেকে কৃস্টো কে বাউস হয় এবং লন্ডনকে বলে আমাদের লন্ডন তাদের পেটে বোমা মারলেও বাংরেজি কালচার ছাড়া আর কিছুই বেরোবে না।"

হাজারীলালের হাবভাব দেখে স্পষ্ট বুঝতে পারলাম ও বাংরেজ কথাটার অর্থ এখনো ঠিক হৃদয়ংগম করতে পারেনি। ওর পক্ষে অবশ্য পারা খুবই শক্ত। হাজারীলালকে হাজা বলে গালাগাল দিলেও যার প্রোটেস্টের কোন উত্তর বিশেষ হয় না তার মাথায় বুদ্ধির কণাটা খুবই ছোট।

আমি কলকাতার বিখ্যাত চক্রাচার্য ফ্যামিলির ছেলে, বাংলাদেশকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবাসি। দু'পাতা ইংরিজি আমিও পড়েছি, এবং বিলেত থেকে ঘুরে না এলেও সুট প্যান্ট চাপিয়ে গাড়ী হাঁকিয়ে আমিও চাকরী রক্ষে করি। কিন্তু তবু বাঙালীয়ানার সঙ্গে আমার রক্তের সম্বন্ধ—মরে গেলেও নাম পালটে শো বল সি চ্যাক্রিলার বা ওই রকম উদ্ভট কোন নামের তকমা বাড়ির দরজার লটকাতে পারবো না। বন্ধুমহলে শ-কার ব-কার খুব চালাতে পারবো কিন্তু হাজারীলালকে হাজা ডার্লিং' কভী নেহী।

পকেট সাইজের রেড়ুলের মত একটি [illegible] প্রাণী ঘরে এসে ঢুকল, এবং



তার পেছনে পেছনে আবির্ভূত হল সেই স্কার্ট পরিহিতা কিশোরীটি। প্রাণীটিকে খপ করে ধরে প্রায় মুখের সঙ্গে লাগিয়ে বলল মেয়েটি, "জিমি, ইউ নটি ডগ!" এবং তারপর সেটিকে গালে চেপে ধরে আমাদের দিকে সগর্বে তাকিয়ে আবার ভেতরে চলে গেল। বুঝলাম ওটা কুকুরের বিজ্ঞাপন—হাজার হোক বাইরে টাঙানো 'বিওয়্যার অব ডগ' নোটিশটার সার্থকতা বাইরের মানুষদের কাছে প্রমাণ করে দিতে হবে তো।

"ওই তোর ভাইঝি? দুচারটে বিউটি কমপিটিশনে প্রাইজ পাওয়া মেয়ে? তোকে চেনে বলেও তো মনে হল না।" বললাম হাজারীলালকে। ঢোক গিলল ও, বলল, "হ্যাঁ, ওরই নাম মিমি। মিমি বাউস।"

"মিকি মাউস।" মন্তব্য করলাম।

"কি বললি?"

"মিকি মাউস, মানে কার্টুনের সেই ইঁদুরের মত দেখতে। যাক, বাঙরেজ সোসাইটির সবচেয়ে বিউটিফুল মেয়ের নমুনা দেখলাম।"

"যাই বলিস সুবল, মেয়েটি কিন্তু বেশ।" ভাইঝির গর্বের ভাগীদার খুড়ো হাজারীলাল বেশ একটু জোরের সংগেই বলল।

"মন্দ কি", জবাব দিলাম আমি, "এবার আমাদের পাড়ার খেংতমাসীর মেয়েটিকে বলতে পারব তুমি বাঙরেজ সোসাইটির যে কোন মেয়ের চেয়ে সুন্দর। যাক গে ও কথা। তা তোর দাদা—"

সাদা আদালীর পোষাক পরা একটি লোক ট্রে হাতে নিয়ে ঢুকল। পেছনে পেছনে রণ-পায়ে এলেন হাজারীলালের বউদি। মাপা হেসে বললেন, "খাও।" তারপর আমার দিকে তাকালেন তিনি, "নেহাৎ হাজা ডার্লিং-এর সংগে যখন ঘরের মধ্যে ঢুকেই পড়েছ, তখন—, "তোমার বন্ধু জেন্টলম্যানটির সংগে তো ইনট্রোডিউস করিয়ে দিলে না আমায়।"

চায়ের কাপ হাতে নিয়ে আমিই বললাম হাজারীলালকে মুখ খুলবার সুযোগ না দিয়ে, "আমি হাজারীলালের বন্ধু ঠিকই, কিন্তু আপনাদের হাব-ভাব দেখবার পর নিজেকে জেন্টলম্যান বলতে ভরসা পাচ্ছি না—" ভদ্রমহিলার মুখের চেহারা একটু [illegible] দেখে তাড়াতাড়ি জুড়ে দিলাম, "মানে এই পায়জামা টায়জামা পরে—বুঝলেন না—' দাঁত বার করে হাসলাম অমায়িকভাবে। ব্যস, সবকিছু ঠিক হয়ে গেল।

"পায়জামা পরে রাস্তায় বেরোনটা ন্যাস্টি হ্যাবিট, ওটা এ'দেশেই চালু আছে দেখছি। তবে—", অনেকগুলো দাঁত বিকশিত হল—"এটা তো আর লন্ডন নয়, তাই এব্যাপারে কোন রিমার্ক করা উচিত হবে না। যাক। মিমিকে দেখলেন কেস টু কেস?"

"মিমি কে?" আমি অবাক হবার ভান করলাম।

"বাঃ। মিমিকে—আমার মেয়ে মিমি বাউসকে চেনেন না?" ভদ্রমহিলা অত্যন্ত মর্মাহত হলেন আমার অজ্ঞতার পরিচয় পেয়ে—"ইন্ডিয়ার বেলাইন্ডা কুইন, যার হন্ডুরাসে যাবার কথা আগামী সেপ্টেম্বরে।"

"তাই নাকি", বললাম আমি, "সরি, আমি জানতাম না। ওসব কুইন টুইনের খবর রাখতে পারি না আমি—নো টাইম। (দাঁত বার করে হাসলাম) তাছাড়া ছেলেবেলায় কুইনাইন বড়ি খেতে খেতে সব কুইনই দুচক্ষের বিষ হয়ে গেছে আমার।"

কোমরে প্রচণ্ড চিমটি কাটল হাজারীলাল। দেখলাম লজ্জায় ওর চোখমুখ লাল হয়ে গেছে। ভদ্রমহিলার মুখ কালো হয়ে উঠল। পরিবেশটাকে দুনয়নে উপভোগ করতে করতে চায়ের কাপে চুমুক দিলাম আমি। আমার প্রতি জ্বলন্ত দৃষ্টি হেনে বললেন হাজারীলালের বউদি "আমি কৃস্টোকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।" তারপর চলে গেলেন হন হন করে। আমি জানতাম উনি যাবেন। বাঙরেজ সোসাইটির কালচার কোড বইতে আমার মত আকাট মুখ্যুদের সঙ্গে কথা বলা অমার্জনীয় অপরাধ।

হঠাৎ উঠে দাঁড়াল হাজারীলাল। দারুণ উত্তেজিত হয়ে আমার দিকে চোখ পাকিয়ে বলল, "সুবল, ওঠ!"

উঠে দাঁড়ালাম।

"চল।" আমার পেছনে দাঁড়াল ও।

"তোর দাদার সংগে দেখা না করেই চলে যাবি? অভদ্রতা হবে না? জরুরী দরকার বলছিল—"

"চল বলছি!" পেছন থেকে প্রায় ঠেলতে ঠেলতে দরজার বাইরে বের করে নিয়ে আমার প্রিয় বন্ধু হাজারীলাল দরাম করে আমার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিল। আমি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। হল কি ছেলেটার?

প্রথমটা বুঝতে পারিনি। একরাশ কাঁচা খিস্তি গলা দিয়ে উঠে এসে মুখে আটকে গিয়ে আবার সুড় সুড় করে নেমে গেল। উপলব্ধি করলাম হাজারীলাল ঠিকই করেছে। সাচ্চা বন্ধুর মতই কাজ করেছে। আমি চক্রাচার্য ফ্যামিলির ছেলে, বাঙরেজ সোসাইটির কালচার কোড বুক পড়িনি, তাই লোককে এবং বিশেষ করে স্ত্রীলোককে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে অহেতুক গ্যাস দিয়ে ফুলোন আমার স্বভাববিরুদ্ধ। বাঙরেজ কালচারের প্রথম এবং শেষ কথাই ওই—অতএব আমি বাতিল। ডিসকোয়ালিফাইড। হাজারীর মেজদা কৃস্টো কে বাউসকে চাক্ষুষ দেখবার লোভ সংবরণ করে অগত্যা আমি গাড়ীতে স্টার্ট দিলাম।

পাহাড়ে অসমতল জমি। রুক্ষ পাথুরে মাটি গ্রীষ্মকালে ফেটে চৌচির হয়ে যায়। জমাট বাঁধা চাপ চাপ রক্তের মত লাল মাটির স্তর এবড়ো-খেবড়ো ঢেউখেলান। শাল আর মহুয়ার উজ্জ্বল সবুজ বন দু ধারে ছড়িয়ে আছে ক্ষতের উপর শীতল প্রলেপের মত। এরই বুক চিরে চলে গেছে কালো মসৃণ পীচবাঁধান রাস্তা। হঠাৎ দেখলে মনে হবে, একটা মিশকালো ময়াল সাপ গাছের উঁচু-নিচু ডাল বেয়ে এগিয়ে চলেছে সামনের পাখীর বাসার দিকে। কয়েক বছর আগেও এখানকার মাঠে মধ্য দুপুরে ঝোড়ো বাতাসের কান্না আকুলি-বিকুলি করত। রাত্রির নিশীথে হা-হা করে হেসে উঠত কোন অশরীরী প্রেতাত্মা। কিন্তু এখন তার কোন চিহ্ন নেই। উঁচু-নিচু পাহাড়ী জমি কেটে বসত গড়ে উঠেছে, তার চেয়েও বেশী বড় বড় কলকারখানা। আকাশ ছোঁয়া চিমনী থেকে গলগল করে কালো ধোঁয়া বেরিয়ে আকাশের তীক্ষ্ণ উজ্জ্বলতাকে ম্লান করে তুলেছে। মাঝে মাঝে শোনা যায় [illegible] সিটির গম্ভীর গলার ভোঁ [illegible] কাজে [illegible] দেবার সংকেত [illegible] ছড়িয়ে।



অপহরণের আগে

[illegible]

রাস্তার দু ধারে কয়েক শ' গজ অন্তর কর্মচারীদের কোয়াটার্স। বিভিন্ন আকারের ও বিভিন্ন রঙ-এর বড় রাস্তা থেকে সরল জ্যামিতিক রেখার মত সরু সরু পীচঢালা পথ বেরিয়ে গেছে দু ধারে। তারই দু পাশে স্টাফ-কোয়ার্টার্স। এ টাইপ কোয়ার্টার্স থেকে বি টাইপের তফাৎ কেবল মাত্র আকৃতিতে বা রঙ-এর হেরফেরেই নয়, আভিজাত্যেও। তবে, ভুলক্রমেও কোনও দিন তৈরী হবে না পাশাপাশি। নেহরু রোডের বাসিন্দারা কোনও দিনই পা দেবে না গান্ধী কলোনীতে। সমস্ত উপনগরীটিই গড়ে উঠেছে কাঞ্চন কৌলীন্যের প্রতি সচেতন দৃষ্টি রেখে। অফিসারদের কোয়ার্টার সাধারণ কর্মচারীদের আবাসস্থল থেকে কম-সে-কম তিন মাইল দূরে। উজ্জ্বল রঙ-এর বাংলো প্যাটার্নের বাড়ী, সামনে মেহেদী বেড়া দেওয়া একফালি লন। দূরে থেকে দেখলে মনে হবে এক রাশ গোলাপ ফুল সবুজ পাতার গোড়ায় ঈষৎ মুখ ঢেকে আছে।

রাতুল চাকলাদারের আস্তানা ওখান থেকে অনেক দূর। স্বল্প আয়ের কর্মচারীদের কোয়ার্টার্সের এক প্রান্তে। রাতুল এখানকার প্রধান ইস্পাত কারখানার এ্যাকাউন্টস ক্লার্ক। রোগা ডিগডিগে চেহারা, মাথায় ঝাঁকড়া চুল। গালের হনুর হাড়-দুটো অস্বাভাবিক রকমের উঁচু। কথা বলার সময় গলার অ্যাডামস অ্যাপলটা বিশ্রীভাবে বেরিয়ে আসে। রাতুল চাকলাদারকে এই তল্লাটের সবাই চেনে। রাতুল সম্পর্কে একটু বিতৃষ্ণা মেশান কৌতূহল আছে এখানকার ছাঁ-পোষা কেরানীদের মনে। রাতুল বিবাহিত কিন্তু ওর স্ত্রীকে বিশেষ কেউ দেখে নি। দেখবে কি করে? সুধা, রাতুলের বউ, প্রায়ই বাপের বাড়ী যায় আর গেলে ফেরার নাম করে না সহজে। প্রতিবেশী সহকর্মীরা প্রথমটা নিজেদের মধ্যে কানাঘুষো, ফিসফাস করত। রাতুলের আধা-ব্যাচেলার কোয়ার্টারের জানালার ফাঁক দিয়ে রঙীন শাড়ীর আঁচল নাকি দেখা গেছে দিনে-দুপুরে। তার পাশের বাড়ীর ওভারশীয়ার জগৎবাবু হলপ করে বলতে পারে যে, গভীর রাত্রে সে মেয়েলি গলার খিলখিল হাসি শুনেছে রাতুলের ঘর থেকে। অথচ ভদ্রলোকের বউকে আনবার নামগন্ধ নেই। রাতুলের স্বভাব-চরিত্র যে সন্দেহজনক তাতে এখানকার অনেক গৃহস্থই নিঃসংশয়। কাজেই মুখে সদ্ভাব বজায় রেখেও তারা অনেকেই রাতুলকে বাড়ীর কাছে ঘেঁসতে দেয় না। ডাগর মেয়ে-বউকে আড়ালে ধমকায়।

রাতুল চাকলাদারের অবশ্য এসব নিয়ে কোন মাথাব্যথা নেই। লেখাপড়া করেছে সিউড়ীতে। আই এস-সি পর্যন্ত পড়েছিল রাতুল। পরীক্ষা দেয় নি শেষ পর্যন্ত। বাবা ছিল ওখানকার ইরিগেশন প্রজেক্টের ওভারশীয়ার। ছেলের মতিগতি দেখে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন ওখানেই এ্যাকাউন্টস লাইনে। প্রথম দু-চার বছর ওদিকেই কাটিয়েছে সে, দুবরাজপুর, ইসলামবাজার, কেঁদুলী, সরকারী কাজের হিসাবপত্র করত আর ঘুরে বেড়াত ময়ূরাক্ষী আর অজয়ের ধারে ধারে। সাঁওতালদের বস্তীতে সন্ধ্যার পর আর পাঁচজনের সঙ্গে উবু হয়ে বসে কচি শাল-পাতার চারকোণা ঠোঙার মহুয়া গিলে নেশা করত। তারপর হয়ত কোনও মেঝেনকে ইতি-উতি চোখের ইশারায় রাজী করিয়ে অন্ধকারে অপেক্ষা করত কোনও কাঁদরের ধারে। এই ছিল রাতুল চাকলাদারের প্রথম যৌবন। ছেলের সংসারের দিকে মন টানবার জন্য বাপে বিয়ে দিয়েছিল সাঁইথিয়ার কোন এক বড় জোতদারের মেয়ের সঙ্গে। কিন্তু রাতুলের রক্তে যে নেশা অনেক দিন আগেই জ্বলে উঠেছিল সুধা পারে নি তা নেভাতে। অনেক ঘাটের জল খেয়ে রাতুল এখানে এসেছে চাকরী করতে। এসেছেও অনেক দিন। প্রয়োজন হলে ওরা আপনিই আসে। বাড়ীর বাইরের বারান্দায়, অবেলায় ঘুম দিয়ে ফোলা ফোলা চোখে, লুঙ্গীর কসি আঁটতে আঁটতে এসে উবু হয়ে বসে রাতুল সিগারেট ধরায়। বাসন লেবেগো, বাসন, হাঁকি ছাড়তে ছাড়তে যে দীঘল গড়নের পশ্চিমা মেয়েটি রাস্তা দিয়ে যায়, সে রাতুলের দৃষ্টিতে কি দেখে সেই জানে—নির্জন দুপুরে রাস্তাঘাট এদিক-ওদিক এক নজরে দেখে নিয়ে মুচকি হেসে সটান এসে দাঁড়ায় সামনে। এ সব ব্যাপারে খুব একটা বাছ-বিচার রাতুলের নেই।

রাতুলের অফিসটা বেশ দূরে। সাত-সকালে স্নান খাওয়া সেরে সে যখন বাসের জন্য কৃষ্ণচূড়া গাছটার নিচে এসে দাঁড়িয়ে নিশ্চিন্ত মনে সিগারেট ধরায় তখন এ পাড়ার অনেক বাবুই বাজার শেষ করে ফেরে নি। হাতের তরিতরকারীর ব্যাগ, মাছের ন্যাকড়া সামলে, জগৎ ওভারশীয়ার মুখে হাসি টেনে বলে, রাতুলবাবু, এত সাকল সকাল যে? রাতুল মৃদু হেসে সিগারেটের ছাই ঝাড়ে, কোনও জবাব দেয় না। জগৎ ওভারশীয়ারের হেসে কথা না বলে উপায় নেই। অনেক টাকার টি-এ বিল পাশ হবে রাতুলের হাত দিয়ে। শুধু জগৎবাবু কেন, আরও অনেক কেরানী, ওভারশীয়ার, সার্ভেয়ারকে রাতুলের দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করতে হয়। কাজেকর্মে চটপটে বলে উপর মহলে রাতুলের প্রতিপত্তি আছে, তাই রাতুলকে সহজে কেউ ঘাঁটাতে চায় না। রাতুল অফিস যায় আসে। ঘরে ফিরে টুকি-টাকী গৃহস্থালির কাজ করে। হাতে কাজ না থাকলে নিচু পর্দায় রেডিও খুলে গান শোনে। সুধা আবার বাপের বাড়ী গেছে। পর পর দুটো সন্তান নষ্ট হয়ে যাবার পর সুধা নানা রকম স্ত্রীরোগে ভুগছে, রাতুলের সঙ্গে বনিবনা হচ্ছে না। তাছাড়া রাতুলের স্বভাব-দোষটাও বোধহয় টের পেয়েছে সুধা। প্রতিবারেই ফিরে এসে সুধা ঘরের চারদিকে সন্দেহ-মাখা দৃষ্টিতে তাকায়, আনাচ-কানাচ খোঁজে। সোজাসুজি তাকায় না, কিন্তু রাতুল পিছন ফিরে বুঝতে পারে সুধার নিঃশব্দ ভর্ৎসনাময় দৃষ্টি তাকে অনুসরণ করছে।

গ্রীষ্মের সময়টা বড় কষ্টকর এখানে। সকাল থেকেই প্রচণ্ড রোদ্দুরের খরতাপে পথ-ঘাট তেতে ওঠে। রাস্তার পীচ গলে গড়িয়ে পড়ে মাটিতে। হু-হু করে লু বয় আগুনের শিখার মত। পথঘাট তখন-জনপ্রাণীহীন। রোদের তাপ বাড়ার আগেই রাতুল এ সময় অফিসে ছোটে। ফেরেও সন্ধ্যার পর।

তাড়াতাড়ি ঘরে তালা-চাবি বন্ধ করে বাইরের বারান্দায় এসে রাতুল দেখল অদ্ভুত কাণ্ড। ধুলোর ঝড় উঠেছে, সেই সঙ্গে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি। একটা বাচ্চা ছেলেকে টানতে টানতে দ্রুত পায়ে হাঁটতে হাঁটতে একটি বার-তেরো বছরের ফ্রক-পরা মেয়ে রাতুলের বারান্দায় এসে উঠে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে জোরে বৃষ্টি নামল। মেয়েটির হাতে আনাজ-তরকারীর থলে, বোধহয় বাজার করে ফিরছিল। চোখ কচলে, চুল সরিয়ে রাতুলকে দেখে মেয়েটা একটু সঙ্কুচিত হল। অপ্রতিভ নিচু গলায় বলল, বৃষ্টিটা এমন নামল।

রাতুল এতক্ষণ চুপ করে মেয়েটাকে লক্ষ্য করছিল, বেশ বাড়ন্ত গড়ন, সঙ্গের ছোট ছেলেটা বোধহয় ভাই। বৃষ্টি আর লাল ধুলোয় ওদের সর্বাঙ্গ মাখামাখি হয়ে গেছে। রাতুল সিগারেট নামিয়ে নরম গলায় বলল, তাতে কি হয়েছে, একটু দাঁড়িয়ে যাও। তারপর আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল, হুড়মুড় করে মেঘ ছুটে আসছে উত্তর দিক থেকে, বৃষ্টিধারায় জোগান দেবার জন্য। রাতুল একটু ইতস্তত করল, কি যেন ভাবল, তারপর আকাশের দিকে আরেকবার তাকিয়ে পকেট থেকে চাবি বার করে ঘরের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল। ছোট ছেলেটা এতক্ষণ কৌতূহলী-ভাবে রাতুলকে লক্ষ্য করছিল। রাতুল ঘরে ঢোকবার পর এক পা, দু পা করে সেও ভিতরে ঢুকে অবাক চোখে চারদিক তাকাতে লাগল। মেয়েটি হঠাৎ পিছন ফিরে ভাইকে না দেখতে পেয়ে ব্যস্তভাবে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। ঘরের ভিতর চোখ পড়াতে সংকোচ আর ভাই-এর প্রতি বিরক্তিতে অস্ফুট শব্দ করে উঠল। চাপা গলায় ডাকল, শঙ্কু, এই শঙ্কু চলে আয়! রাতুল ওপাশের বন্ধ জানালাটা খুলে দিয়ে আরেকটা সিগারেট ধরাতে যাচ্ছিল। হাতের ফাঁকে দেশলাইটা চেপে ধরে, ধীর গলায় বলল, আহা, থাক না। তুমিও এসো না ভিতরে। এ বৃষ্টি সহজে থামবে না মনে হচ্ছে।

মেয়েটি অপরিচিত লোকের মুখে 'তুমি' শুনে একটু কুঁকড়ে গেল। চকিতে একবার রাতুলের দিকে তাকিয়ে মাথা নামিয়ে নিল। রাতুল সহজ গলায় বলল, এসো, ভিতরে এসো, বসবে। কি নাম তোমার?

মেয়েটি দরজার চৌকাঠের উপর দাঁড়িয়ে পায়ের বুড়ো আঙুল ঘসছিল। রাতুলের প্রশ্নের উত্তরে লাজুক গলায় বলল, সন্ধ্যা। সন্ধ্যার ছোট ভাইটা ততক্ষণ একটা টী-পয় ধরে টানাটানি করছিল। সে দিদির নাম

শুনে দাঁড়িয়ে আধো আধো গলায় বলে উঠল, আমার নাম ছুঙ্কল। কথা বলার ভঙ্গীতে আর অযাচিত উত্তর শুনে রাতুল হো হো করে হেসে উঠল। সন্ধ্যাও ফিক করে হেসে মাথা নিচু করল। তারপর যেন অনেকটা সহজভাবেই সন্ধ্যা ঘরে ঢুকে ভাইকে কাছে টেনে ছোট তক্তপোষের কোণে জড়োসড়ো হয়ে বসল। রাতুল একটা চেয়ার টেনে বসেছিল সন্ধ্যার মুখোমুখি। এতক্ষণে খুঁটিয়ে দেখল ওকে। নেহাৎই ছেলে-মানুষ, বার-তেরোর বেশী বয়স নয়। কাঁধের উপর চোখের ভুরু দুটো টানা টানা, ভাসা ভাসা চোখ। সুডৌল চিবুক। বেশ শান্ত মুখশ্রী। রাতুলের বেশ ভাল লাগল ওর ঈষৎ অপ্রস্তুত বিপন্ন মুখটা। সন্ধ্যা মাঝে মাঝেই আকাশের দিকে তাকাচ্ছিল। রাতুল আস্তে আস্তে সন্ধ্যাদের সম্বন্ধে অনেক কথাই জানল। সন্ধ্যা এবার ক্লাশ এইটে উঠেছে। দু বোন এক ভাই। সন্ধ্যাই বড়। ওর বাবা স্টীল প্ল্যান্টের স্টোর ক্লার্ক। রাতুল ঠিক চিনতে পারল না নাম শুনে। নতুন নতুন অনেকেই এসেছে আজকাল। ওরা গান্ধী কলোনীর উত্তর দিকটায় থাকে, নতুন এসেছে।

রাতুল একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে। শঙ্কু দিদির হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ঘরময় দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছিল সন্ধ্যার চাপা তর্জন উপেক্ষা করে। রাতুল সম্বিত ফিরে পেয়ে উঠে দাঁড়াল, তারপর পাশের ঘরে গিয়ে টিনের কৌটো খুলে গোটা-কয়েক বিস্কুট বার করে এনে শঙ্কুর হাতে দুটো দিয়ে বাকিটা সন্ধ্যার সামনে ধরল। সন্ধ্যা যেন মরমে মরে গিয়ে ছিটকে সরে যেতে চাইল। তারপর দু হাত কোলে গুঁজে মাথা নিচু করে আপত্তি জানাল—না-না এসব কেন। শঙ্কু মহানন্দে বিস্কুট চিবুতে চিবুতে দিদির নির্বুদ্ধিতা দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছিল। রাতুল সস্নেহে হেসে বলল, কি হয়েছে তাতে, নাও না, সামান্য বিস্কুটই তো। নাও হাত পাতো। সন্ধ্যা ইতস্তত করে আড়চোখে দেখল বিস্কুটগুলো দামী, চকোলেট ক্রীম দেওয়া। কিছুক্ষণ উসখুশ করে তারপর অনিচ্ছা-সত্ত্বেও নিল। রাতুলের সামনে মুখে দিতে বোধহয় লজ্জা পাচ্ছিল। রাতুল সরে গিয়ে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আরেকটা সিগারেট ধরাল। বৃষ্টি আরও কিছুক্ষণ চলবে কিনা কে জানে।

সন্ধ্যা বিস্কুটের একটা কোণ ভেঙে মুখে পুরে নিঃশব্দে চিবুতে চিবুতে ঘরের চারদিক দেখছিল। ঘরটা বেশ সাজান-গোছান। দেওয়ালে সুন্দর ছবিওয়ালা ক্যালেণ্ডার,—টেবিলে সৌখীন টেবিল-ল্যাম্প ও দোয়াতদান। একটা ছোট স্ট্যাণ্ডে আটকান একটি বয়স্কা মেয়ের ফটো। সন্ধ্যা কৌতূহলী চোখে ঘাড় উঁচু করে ছবিটা দেখবার চেষ্টা করছিল। মেয়েটির সঙ্গে রাতুলের সম্পর্ক আবিষ্কারের চেষ্টায় মাঝে মাঝে অলক্ষে রাতুলকে দেখছিল। রাতুল কিন্তু ইতিমধ্যে সন্ধ্যা আর ওর ভাই-এর উপস্থিতিটা ভুলে যাচ্ছিল। অফিসের দেরী

সমালোচনা-সাহিত্য পাঠে গবেষক ও ছাত্রদের অপরিহার্য
আমাদের প্রকাশিত কয়েকখানি বই

ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের
দীর্ঘকাল গবেষণাপ্রসূত পুস্তক

বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত
১ম খণ্ড ১৫·০০, ২য় খণ্ড ১৫·০০, ৩য় খণ্ড ২৫·০০

বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত ১৩·০০

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা
(৫ম সং) ২৫·০০

শ্রীভূদেব চৌধুরী
বাংলা সাহিত্যের ছোট গল্প ও গল্পকার ১৬·০০

সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থসঙ্গমে ১২·৫০

ডঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য
ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ
(২য় সংস্করণ) ১০·০০

ভারতীয় সাহিত্যে বারমাস্যা ৬·৫০

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও
ডক্টর অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়
ঊনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন
(২য় সং) ১৩·০০

মধুসূদনের কাব্যালংকার ও কবিমানস ৬·০০

॥ সম্পূর্ণ পুস্তক তালিকার জন্য লিখুন ॥

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা—১২
ফোন : ৩৪-৩১০৫, ৩৪-৮৪৫১ গ্রাম : BIBLIOPHIL

হয়ে গেছে অনেক। জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে দেখল বর্ষাতি গায়ে, ছাতা মাথায় কিছু অফিসযাত্রী একজন-দুজন করে বাস-স্টপে জড়ো হচ্ছে। বৃষ্টি ধরে এসেছে প্রায়।

সন্ধ্যা মুখ তুলে রাতুলের মনোভাবটা বোধহয় বুঝতে পারল। হাতের বিস্কুট সবগুলো খাওয়া হয় নি। অলক্ষ্যে ফ্রকের পকেটে সেগুলো চালান করে দিয়ে কোলের উপর থেকে বিস্কুটের গুঁড়ো ঝেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় ডাকল, শঙ্কু। টিপ টিপ করে বৃষ্টি হচ্ছে সামান্য। কিন্তু লোকজন সব বেরিয়ে গেছে। শঙ্কুকে বাঁ হাতে সাপটে ধরে সন্ধ্যা ওর বাজারের থলে গুছিয়ে নিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল। রাতুলও ভাবছিল, এই ফাঁকে বেরুনো যায় কিনা। সন্ধ্যাদের দরজার চৌকাঠ পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বলল, মাঝে মাঝে ভাইকে নিয়ে এসো কেমন? সন্ধ্যা নিঃশব্দে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে নেমে যাচ্ছিল সিঁড়ি দিয়ে। রাতুল কি ভেবে এক পা এগিয়ে পকেট থেকে একটা চকচকে সিকি বার করে সন্ধ্যার হাতে গুঁজে দিয়ে মিষ্টি হেসে বলল, আমার কাছে টফি নেই, যাবার পথে শঙ্কুকে কিনে দিও। সন্ধ্যা একটু বিব্রত হচ্ছিল কিন্তু সিকিটা হাত পেতে নিয়েই মুঠিটা বন্ধ করে মাথা হেঁট করে নেমে গেল নিচে। ভেজা ঘাসের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল রাতুল পিছন ফিরে নিচু হয়ে দরজা বন্ধ করছে।

রাতুলের অফিসটা একটু দূরে হলেও বেশ ছিমছাম, নিরিবিলি। নূতন একতলা বাড়ীটার ঘরগুলো ছোট ছোট, চার পাশের জানালা দরজায় ভারী পর্দা, হঠাৎ দেখলে ফ্যামিলী কোয়ার্টার বলে মনে হবে। এক নাগাড়ে অনেকক্ষণ কাজ করে রাতুল সোজা হয়ে বসে টেবিল-ল্যাম্পের শেডটা টেনে দিয়ে চোখ আড়াল করল, তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে গা এলিয়ে দিল। সকালের ছবিটা মনে পড়ল। সন্ধ্যা আর ওর ছোট ভাই শঙ্কুর কথা। কথাটা ভাবতে ভাল লাগল রাতুলের। সন্ধ্যার অপ্রস্তুত মুখটা। বেশ ভাসা ভাসা চোখ দুটো।

বিকেল গড়িয়ে অন্ধকার হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। অফিসের বয়টা বার-দুই এসে ঘুরে গেছে। রাতুল আসেও যেমন সবার আগে যায়ও তেমনি সবার পর। সারা দিন কাজের চাপে সময় থাকে না নিঃশ্বাস ফেলবার। কোথা দিয়ে যে সময় কেটে যায় খেয়াল থাকে না। সন্ধ্যার পর ঘড়ির কাঁটা থমকে দাঁড়ায় বেতো পঙ্গু ঘোড়ার মত। সময় যেন কিছুতেই কাটতে চায় না। রাতুলের বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যা কম, তাও কাছাকাছি কেউ নেই। আর পাঁচজন যখন তাস-পাশা, দাবার আড্ডায় মশগুল, রাতুল তখন একা একা সিগারেট ধরিয়ে ঘুরে বেড়ায়। কোন কোন দিন দূরের গ্রামের দিকে রওনা দেয়। ধীরে সুস্থে হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে যায় সাঁওতাল ... কে ... চিনে গেছে সকলেই। ... বটে। কিছু কিছু কামীনের সঙ্গে রাতুলের সম্পর্ক সন্দেহজনক। কিন্তু এদের মধ্যে, বিশেষ করে শহরে যারা কাজ করতে যায়, তাদের সকলেই জানে। কাজেই বুড়ো সাঁওতাল সর্দারগুলো মদের পয়সাটা আদায় করে ছেড়ে দেয়। মুখের হম্বি-তম্বি অবশ্য ঠিক থাকে। নেশা করা লাল চোখ দুটো তুলে রাতুলকে দেখে তারপর ঘাড় গুঁজে চুপচাপ বসে থাকে। মার্চ-এপ্রিলের দিকে যখন মহুয়া পাকে, সাঁওতাল বসতিগুলোতে চোলাই মদ তৈরী হয়। রাতুল বেশ কড়া নেশা করেই বাড়ী ফেরে। ফেরবার পথে ব্রজেনবাবুর হোটেলে কষা মাংস আর রুটী। খাবারের অর্ডার শুনেই ব্রজেন কুণ্ডু ধরতে পারে রাতুলবাবু আজ কোন দিকে গিয়েছিল। বেশ যত্নআত্তি করে ওরা রাতুলকে। হোটেলের লাইসেন্সটা নাকি রাতুলই বার করে দিয়েছিল। তাই রাতুলের এখানে স্পেশাল খাতির।

এখানকার বড় রাস্তাগুলো অধিকাংশ সময়েই নির্জন, দুপুরের আলসেমীতে পড়ে পড়ে ঝিমোয়। বড় ঝাঁকড়া সেগুন গাছে ঘুঘু পাখী ডেকে ডেকে ক্লান্ত হয়ে থেমে যায়। মাঝে মাঝে এক-আধটা বাস ঝড়ের বেগে বেরিয়ে যায়, পিছনে লাল ধুলোর ঘূর্ণি তুলে। সকাল নটার পর একজন-দুজন করে বাস স্টপে জমা হতে থাকে অফিসযাত্রীরা। কিছুক্ষণের মধ্যে ছোটখাট ভীড় জমে ওঠে। খুচরো কথা-বার্তা, কুশল প্রশ্ন, ছোটখাট হাসি-ঠাট্টার মধ্যে আবহাওয়াটা সরগরম হয়ে ওঠে। ছোকরা কর্মচারীদের দল পরে ড্রেন পাইপ প্যান্ট, টি-সার্ট। মেয়েরা রঙীন প্রিন্টের শাড়ী, সেই সঙ্গে রঙ মিলিয়ে ব্লাউজ আর ভ্যানিটি ব্যাগ। ছেলে-মেয়েদের অনেকে ব্যাচেলার হওয়া সত্ত্বেও ফ্যামিলী কোয়ার্টার পেয়েছে। নিজস্ব আলাদা বাড়ী। এদের আলোচনার প্রধান ও সবচেয়ে মুখরোচক বিষয়বস্তু হল কোন ছেলেকে কোন মেয়ের সঙ্গে আজকাল বেশী ঘুরতে দেখা যাচ্ছে। কার বাড়ীর জানালায় রঙীন শাড়ীর আঁচল উড়তে দেখা গেছে, ইত্যাদি। ছোটখাট স্ক্যান্ডাল আজকাল অবশ্য তেমন একটা চাঞ্চল্য জাগায় না। বিকেলে অফিস ছুটির পরও বাস স্টপগুলির একই চেহারা। সকালের পরিচ্ছন্ন পাউডার-ঘষা মুখ বিকেলে একটু তেলতেলে দেখায়, সোজা হয়ে দাঁড়ানোর দৃপ্ত ভঙ্গীটা একটু গা এলিয়ে দেওয়ার ক্লান্তিতে নরম হয়ে পড়ে। কোন মুখরোচক খবর থাকলে অবশ্য জায়গাটা সরগরম হয়ে ওঠে নানা মন্তব্য আর টিপ্পনীতে।

রবিবার দিন সকাল। বেলা তখন প্রায় নটা। রাতুল ছোট আয়নাটার সামনে নিবিষ্ট মনে দাড়ি কামাচ্ছিল। পাশের ঘরে স্টোভের উপর কেৎলীতে চায়ের জল চাপিয়ে দিয়েছে। শোঁ-শোঁ শব্দ আসছে একটা ও-ঘর থেকে। রাতুলের মনটাও খুশীর সকালে রোদ ... গতকাল ছুটির ঠিক আগে বড়-সাহেবের অফিসে ডাক পড়েছিল রাতুলের। অনেক দিনের পুরোনো কতগুলো জটিল অডিট অবজেকশনের ব্যাপার ছিল। জি এম সাহেব রাতুলের কাজে খুব খুশী। চুরুটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে, ইঙ্গিত দিয়েছেন ভবিষ্যৎ উন্নতির। সামনের মাসেই বেশ বড় রকম ওলট-পালট হবে হেড অফিসে। দেখাই যাক, কি হয়, আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বকেই যেন রাতুল বোঝাচ্ছিল। শিশু কণ্ঠের আওয়াজ পেয়ে রাতুল বিস্মিতভাবে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল সন্ধ্যা আর ওর ভাই শঙ্কর সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে। শঙ্কর প্রাণপণে দিদির হাত ছাড়িয়ে বারান্দায় উঠে আসবার চেষ্টা করছে আর এক হাতে বাজারের থলে, অন্য হাতে শঙ্করের হাত আঁকড়ে ধরে বিব্রত আর বিরক্তভাবে সন্ধ্যা ওকে টেনে নিয়ে এগিয়ে যেতে চেষ্টা করছে। রোদের তাপে সন্ধ্যার মুখটা রাঙা, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম, উড়ো চুল এসে লেপটে পড়েছে এধার-ওধার। ছবিটা দেখতে দেখতে রাতুল একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে ক্ষুরটা নামিয়ে রেখে, তোয়ালে নিয়ে গালের সাবান মুছে বেরিয়ে এল। সন্ধ্যা অপ্রস্তুতভাবে কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই রাতুল শঙ্করকে তুলে নিল কোলে। সন্ধ্যাও নিরুপায় হয়ে পিছু পিছু ঘরে ঢুকল। কিন্তু মনে মনে খুশী হল রাতুলের আগ্রহ দেখে।

ঘরে ঢুকে ওকে নামিয়ে দিতেই শঙ্কর যথারীতি দাপাদাপি আরম্ভ করল ঘরময়। একবার লাফিয়ে বেতের চেয়ারটায় ওঠে, আবার এগিয়ে গিয়ে সৌখীন টেবিল-ল্যাম্পটার ঢাকনায় হাত দেয়। সন্ধ্যা ত্রস্ত গলায় ডাকে, শঙ্কর, কি অসভ্যতা হচ্ছে, এদিকে এসো। রাতুল মৃদু হেসে বলল, তুমি সব তাতেই এত লজ্জা পাও কেন? সন্ধ্যা মুখ লাল করে মাথা নিচু করে অস্ফুট গলায় বলল, ভারী অসভ্য।

রাতুল সন্ধ্যার অবস্থাটা বেশ উপভোগ করছিল। তরল গলায় বলল, কে অসভ্য, আমি? সন্ধ্যা একটু যেন অবাক হয়ে চকিতে রাতুলের দিকে তাকাল। এই গম্ভীর ধরনের বয়স্ক ভদ্রলোক তার সঙ্গে আবার ইয়ার্কি করতে পারে নাকি? রাতুলের কৌতুকোজ্জ্বল চোখের দিকে তাকিয়ে সন্ধ্যা যেন মরমে মরে গেল। যা, কি যে বলেন, বলে ছিটকে বেরিয়ে গেল বারান্দায়! রাতুল হাসিমুখে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ সন্ধ্যার দিকে।

ওদিকে ঘরের ভিতর শঙ্করের কাণ্ড দেখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকাও সন্ধ্যার দায় হয়ে উঠল। দরজা খোলা পেয়ে ঢুকে পড়েছে পাশের ঘরে যেখানে স্টোভে টগবগ করে চায়ের জল ফুটছে। শঙ্কর দিব্যি আলমারী খুলে বিস্কুটের টিন টেনে বার করেছে ততক্ষণ। পর্দার ফাঁক দিয়ে সব দেখতে পাচ্ছে সন্ধ্যা বারান্দায় দাঁড়িয়ে। কিছুক্ষণ উসখুশ করে আবার ঘরে ঢুকে পড়ল সন্ধ্যা। রাতুল দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম সযত্নে সরিয়ে রেখে সন্ধ্যাকে খুশী করবার

বলল, তুমি চা তৈরী করতে জান? সন্ধ্যা ঘাড় নাড়ল। রাতুল জানালার পর্দা ঠিক করতে করতে বলল, তাহলে চট করে দু কাপ চা করে আনো তো? সন্ধ্যা বিমূঢ় গলায় বলল, দু কাপ কেন? রাতুল বিস্মিত-ভাবে বলল, কেন তুমি? সন্ধ্যা লজ্জা জড়ান গলায় বলল, চা আমি বেশী খাই না। রাতুল একটু ভারিক্কে গলাতে বলল, ছোট ছেলে-মেয়েদের বেশী চা না খাওয়াই ভাল, তবে তুমি ইচ্ছে করলে আজ এক কাপ খেতে পার। সন্ধ্যা একটু একটু ইতস্তত করে পাশের ঘরে আস্তে আস্তে ঢুকে যাবার আগে রাতুলকে একবার অপাঙ্গে দেখল। ঈশ ছেলেমানুষ! নিজে ভারী বুড়োমানুষ, মেয়েদের সঙ্গে ইয়ার্কি দেয়! চা ঢালতে ঢালতে সন্ধ্যা রাতুলের রান্নাঘর কৌতূহলী চোখে দেখছিল। হাতা, খুন্তি, কড়া, ডেকচি, টোস্টার, ছোট-বড় অসংখ্য টিনের কৌটো সুন্দর করে সাজান-গোছান। বসবার ঘরের দেরাজের উপর ঐ মেয়েটার ছবি—বোধহয় সেই এই ভদ্রলোকের বউ। ছবিটা সন্ধ্যার একদম পছন্দ হয় নি। কেমন যেন ম্যাড়মেড়ে ফ্যাকাশে চেহারা।

রাতুল ততক্ষণ একটা সিগারেট ধরিয়ে গতকালের খবরের কাগজটাই উল্টেপাল্টে দেখছিল। এখানে রোজকার কাগজ আসে বিকেলের দিকে। অফিস-ফেরতা সবাই বাড়ীতে এসে কাগজ পড়ে। চায়ের পেয়ালা সন্তর্পণে টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে সন্ধ্যা দেরাজের উপর রাখা মেয়েটির ছবি আবার খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। কিছুক্ষণ ইতস্তত করে কৌতূহলী ভঙ্গীতে জিজ্ঞাসা করল, এটা কার ছবি? রাতুল কাগজ থেকে চোখ না তুলেই জবাব দিতে গিয়ে থামল। মুখ তুলে একবার সন্ধ্যাকে দেখল। স্বভাব যাবে কোথায়। রাতুল লক্ষ্য করছিল, ঘরে ঢোকবার পর থেকেই সন্ধ্যা ছবিটা বারবার দেখছে। রাতুল মৃদু হেসে বলল, ওটা তোমার বৌদির ছবি। সন্ধ্যা তবুও নড়ছে না। জিজ্ঞাসা করল, উনি কোথায় গেছেন? রাতুল সংক্ষেপে উত্তর দিল, বাপের বাড়ী। তারপরেই ব্যস্তভাবে বলল, কই তোমার দা কোথায়? আলমারী থেকে বিস্কুটের টিনটা নিয়ে এসো। পাশের ঘরের দিকে তাকিয়ে সন্ধ্যা এবার খিল খিল করে হেসে উঠল। রাতুল বিস্মিতভাবে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল শঙ্কর মাটিতে পা ছড়িয়ে বসে দু হাতে দুই বিস্কুট ধরে নিবিষ্ট মনে খেয়ে চলেছে—টিনটা উল্টে পড়ে আছে সামনে। কিছু বিস্কুট ছড়ান এদিক-ওদিক। রাতুল হো-হো করে হেসে উঠল শংকরের কাণ্ড দেখে। হাসির দমক সামলে সন্ধ্যা শঙ্করের পিঠে দুম করে একটা কিল বসিয়ে টিনটা সযত্নে তুলে আনল। রাতুলের পীড়াপীড়িতে খানকয়েক বিস্কুট তুলে নিয়ে রান্নাঘরের ভিতর চলে গেল। রাতুল বুঝল, সামনে খেতে লজ্জা পাচ্ছে সন্ধ্যা।

সব মিলিয়ে ব্যাপারটা রাতুলের বেশ ভাল লাগছিল। তার এতদিনের ভুতে-পাওয়া বাড়ীটা যেন কোন ভোজবাজীতে প্রাণ পেয়েছে। জানালা-কবাট বন্ধ এই অন্ধকার অন্ধকার বাড়ীটা সারাদিন তালা-বন্ধ অবস্থায় ঝিমোয়। এই রবিবারের সকালটার কথা টের পেয়ে রোদ্দুর যেন পর্দা ডিঙিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ঘরের ভিতর। জানালার ফ্রেমে আঁটা নীল আকাশটাও যেন রোদ্দুরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঢুকতে চাইছে ঘরের ভিতর।

রাতুল একবার উঁকি মেরে দেখল সন্ধ্যা চা খেয়ে কেতলী, কাপ-প্লেট সব পরিপাটি করে গুছিয়ে রাখছে মীটসেফের উপর। রাতুল সিগারেট ধরিয়ে বারান্দায় এল। জগৎ ওভারশীয়ারের বাড়ীতে নিজের অজান্তেই একবার চোখ পড়ল। সাত-আটটি ছেলেমেয়ে ভদ্রলোকের, অথচ বয়েস খুব বেশী নয়। ডিগডিগে পেট, কাঠি-কাঠি হাত-পা, বাচ্চাগুলো সামনের ধুলো-মাটিতে হুটোপুটি করে। বাপের বাজখাই গলার আওয়াজ পেলে এদিক-ওদিক ছুটে পালায় ঠিক খরগোসের মত।

ঘরে ঢুকে ইজিচেয়ারের আরামে ডান পা এগিয়ে দিয়ে মনে করে রাতুল যেই বসতে যাচ্ছে, দুতপায়ে সন্ধ্যা ঘরে ঢুকে বাজারের থলিটা তুলে নিল। টেবিলে রাখা টাইম-পীস ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে সন্ত্রস্ত গলায় বলল, ইস্ বড্ড দেরী হয়ে গেল, মা বকবে। তারপর ঘরে দাঁড়িয়ে শংকরকে প্রায় টেনে হিঁচড়ে দাঁড় করাল। রাতুল একটু নিরাশ হল। কিন্তু সন্ধ্যার শুকনো মুখ দেখে মায়া হল তার। আহা, বেচারী হয়তো বাজার করে ফিরতে দেরী হল বলে দু একটা চড়-চাপড়ও খেয়ে বসতে পারে বলা যায় না। একটু অনুতপ্ত গলায় বলল, তোমায় অনেক দেরী করিয়ে দিলুম তাই না? এরপর যেদিন আসবে, অনেকটা সময় নিয়ে এসো কেমন, বেশ গল্প করা যাবে। সন্ধ্যা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাবার আগেও দরজার পর্দার ফাঁক থেকে অপাঙ্গে রাতুলকে দেখল আবার। মনে মনে বলল, ইস্, গল্প করতে বয়ে গেছে আমার।

শঙ্করটা এমন বেহায়া, তাই। ওরা বেরিয়ে যাবার পর রাতুলও ধীরে ধীরে গিয়ে বারান্দায় দাঁড়াল। রাস্তা সংক্ষেপ করবার জন্য, বড় রাস্তা ছেড়ে মাঠের মধ্য দিয়ে কোনাকুনি এগিয়ে চলেছে সন্ধ্যা, ভাইকে টানতে টানতে। ঘাড় ফিরিয়ে এক-বার পিছনে তাকিয়ে দেখল রাতুলের দীর্ঘ দেহটা ঝুঁকে আছে বারান্দার উপর। সিগারেটের ধোঁয়াটা কুণ্ডলী পাকিয়ে উপরে উঠছে। শঙ্করের পিঠে একটা চড় মেরে সন্ধ্যা চাপা গলায় বলল, এক নম্বরের হ্যাংলা! শঙ্কর বিস্কুট চিবুতে চিবুতে কাঠের পুতুলের মত বলল, কে হ্যাংলা? সন্ধ্যা কোনও জবাব দিল না।

শীতের আমেজটা বেশ ভালই লাগে এই সময়। ভোর রাতে গায়ের চাদর টেনে গুটিসুটি মেরে শুতে। আশ্বিনের শেষ তখন। তীক্ষ্ণ নিকেলের মত উজ্জ্বল রোদ্দুর পর্দার ফাঁক দিয়ে বর্শার ফলার মত খোঁচা মারে। ধড়মড় করে উঠে বসতে গিয়ে মনে হয় অনেক বেলা হয়ে গেছে। অথচ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বোকা বনতে হয়, ছটা বেজে পাঁচ কি দশ বড়জোর। অফিসের কাজে রাতুল মাঝখানে বাইরে গিয়েছিল। জীপ নিয়ে ড্রাইভারের পাশে বসে ঘুরেছে অনেক। নাওয়া-খাওয়ার ঠিক নেই সকালে বোলপুর তো বিকেলে সেতাল কেলিয়ারী। মাঝে মাঝে ছুঁড়ে ছুটে যাওয়ার মত বর্ধমান কি সিউড়ী। রাতুলের বেপরোয়া ভবঘুরে বাতিকটা মাথা-চাড়া দিয়ে উঠেছিল আবার। বেছে বেছে ড্রাইভার নিয়েছিল নিজের পছন্দমত—পানু কর্মকারকে। নিজে সারাদিন এ-অফিস সে-অফিস ঘুরে লাখ লাখ টাকার বিল ভাউচার মেলাতে হিমসিম খেত—সময় পেত না। কিন্তু পানু ঠিক ব্যবস্থা পাকা করে রাখত। বেলাবেলি সাহাদের দোকান থেকে বিলাতী মদের বোতল তুলে সীটের নীচে

বেনারসী শাড়ী
ইণ্ডিয়ান
সিল্ক হাউস
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা

সাজিয়ে রাখত। তারপর রাতুলকে তুলে নিয়ে, জীপ হাঁকাত। শহর থেকে বেরিয়ে বাঁক ফিরে গাড়ীটা মাঠের ধারে কোন ঝোপের আড়ালে দাঁড় করাত পানু কর্মকার। তারপর সুইচ টিপে হেড-লাইট নিভিয়ে, ইঞ্জিন বন্ধ করে পানু ফশ্ করে দেশলাই জ্বেলে বিড়ি ধরিয়ে গা এলিয়ে দিত সীটে। হাটুরে সাঁওতাল মাঝিনগুলো গাঁয়ে ফিরতো তখন শহরের কেনাবেচা শেষ করে। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে মেয়েগুলো নিজেদের ভাষায় কল্‌কল্ করে কথা বলতে বলতে পথ চলতো। হঠাৎ ঝোপের আড়ালে দাঁড় করান গাড়ী আর আরোহীর দিকে চোখ পড়লে খিল্ খিল্ করে হেসে নিজেদের মধ্যে গা টেপাটেপি করতে করতে পথ চলতো। এখানে এভাবে অপেক্ষা করার মানে ওরা জানে। মিষ্টি হেসে বাবুরা জিজ্ঞাসা করবে, কুথাকে যাবি তোরা, ঘর কুথা বটে। চল্ পেঁছে দি। লে সিগারেট খা। যারা এ-ফাঁদে পা দেয়, জেনেশুনেই দেয়। ফিস্ ফিস্ করে কি কথাবার্তা হয় কে জানে, এবড়ো-খেবড়ো ঢেউ-খেলান মাঠের অন্ধকারে মিশে যায় দুটি মূর্তি অন্ধকারে ওদের চোখ যেন শ্বাপদের মত জ্বলে। রুক্ষ ঘাসহীন পাথুরে জমিতে গড়াগড়ি দেয় তারা। কিছুক্ষণের জন্য বুনো জানোয়ারের মত দাপাদাপি করে, তারপর ফিরে আসে তৃপ্ত ক্লান্ত দেহে।

রাতুল ঘুম ঘুম চোখে সিগারেটের প্যাকেটের থেকে একটা সিগারেট বার করে ধরাল, তারপর একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে আড় হয়ে পড়ে রইল বিছানায়। অফিস যাবার তাড়া নেই, এক সময় গিয়ে ঘুরে এলেই হবে। হঠাৎ মনে হল সন্ধ্যা আর ছোট ভাই অনেকদিন আসেনি। ওদের আসা-যাওয়াটা আজকাল বেশ সহজ হয়ে গেছে। শঙ্কর যথানিয়মে আগেভাগে বিস্কুটের টিন কি চকোলেটের বাক্স দখল করে, সন্ধ্যা আলতো পায়ে এ-ঘর ও-ঘর যাতায়াত করে, টুকিটাকি নিনিসপত্রগুলো নেড়েচেড়ে দেখে। সুধার প্রসাধনের জিনিসগুলোর দিকেই ওর নজর বেশী। তাচ্ছিল্যভরে তুলে নেড়েচেড়ে দেখতে গিয়ে সেন্টের শিশিটা নাকের সঙ্গে চেপে ধরে, পাউডারের পাফ্‌টা আলতো করে গালে বোলায়। রাতুলের কাছে একদিন ধরা পড়ে গিয়ে সন্ধ্যা গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর জেদী মেয়ের মত ঠোঁট উল্টে বলল, এসব এখানে রাখার কোন মানে হয় না। রাতুল সন্ধ্যার মনের গতিবিধিটা বোঝবার চেষ্টা করছিল। সন্ধ্যা যে সুধার অস্তিত্বটা বিশেষ পছন্দ করে না, এমন একটা সন্দেহের ছায়া রাতুলের মনে খেলা করছিল। কিছুদিন আগে রাতুল বিস্মিতভাবে লক্ষ্য করেছে, শোবার ঘরে দেওয়ালের গায়ে আটকান সুধার ছবিটা উল্টে রয়েছে। দমকা হাওয়াতেও হতে পারে, কে জানে। অকারণ ঘোরাফেরার ফাঁকে সন্ধ্যা মাঝে মাঝে নির্নিমেষে তাকিয়ে রাতুলকে লক্ষ্য করে সেটা সে খবরের কাগজের আড়াল থেকেও মাঝে মাঝে টের পায়। কোনও ব্যাপারে উৎসাহিত ভাবে কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে রাতুলকে ভ্রূ-ভঙ্গী করে। গভীর কালো চোখে কি যেন ছায়া পড়ে। তারপর মাথা নিচু করে মেঝেতে পায়ের বুড়ো আঙুল ঘসতে থাকে জোরে জোরে। কিছুক্ষণ পরে আবার হঠাৎ ঠোঁট উল্টে সরে যায় ওখান থেকে, জানালার শিক ধরে দাঁড়ায়। মাঝে মাঝে অবশ্য ওর ছেলেমানুষীতে রাতুল বেশ কৌতুক বোধ করে। লুচি বেলতে গিয়ে কিছুতেই সমান করে গোল করতে না পেরে ময়দার নেচি দুমড়ে মুচড়ে আবার নতুন করে বৃথা চেষ্টা করছে। শেষটা লজ্জা আর অপমানে মুখ রাঙা করে গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে লক্ষ্য করছে, রাতুল কেমন নিপুণ হাতে লুচি বেলে কড়াতে ফেলছে।

ধীরেসুস্থে স্নান সেরে, জামাকাপড় পরে দরজায় তালা দিয়ে রাতুল বেরুল। ব্রজেনবাবুর হোটেলে খেয়েই অফিস যাবে আজ। কতক্ষণে ফেরা যাবে কে জানে। গত কয়েক সপ্তাহের কাজের একটা রিপোর্ট লিখতে হবে। একবার বসলে আর সহজে ওঠা যাবে না। ধুলো উড়িয়ে একটা বাস আসতেই রাতুল লাফিয়ে উঠে পড়ল!

রাতুল বরাবরই কাজ-পাগলা মানুষ। যতই বাইরের টান থাক, হাতের কাজ ফেলে সে কখনই উঠতে পারে না। অফিস গিয়ে দেখল, গাঙ্গুলীসাহেব হাঁ করে বসে আছেন রাতুলের রিপোর্টের অপেক্ষায়। বেলা যে কখন গড়িয়ে গেল টেরই পেল না। কাপ-চারেক চা আর প্রায় দেড় প্যাকেট সিগারেট ধ্বংস করে রাতুল প্রায় বিশ পাতার একটা রিপোর্ট তৈরী করল। তারপর সেটা যখন টাইপিস্টের টেবিল থেকে তুলে, সংশোধন করে অফিসারের ঘরে জমা দিয়ে বাইরে বেরুল, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। আকাশে মেঘ জমেছে, টিপ টিপ বৃষ্টি দু-চার ফোঁটা করে আরম্ভ হয়েছে।

কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল রাতুল কিছুক্ষণ, তারপর হঠাৎ একটা রিক্‌সা ডেকে বাড়ীর পথ ধরল। বাজার থেকে মাঝপথে কিছু খুচরো জিনিস কিনলো, তারপর রিক্‌সায় গা এলিয়ে বসে রইল প্রশান্ত মনে। বাড়ীর সামনে কাল্‌ভার্টে একটা ঝাঁকুনী খেয়ে রিক্‌সাটা একেবারে লাফিয়ে উঠে ধীরে ধীরে থেমে গেল। এতক্ষণে সজাগ হল রাতুল। ভাড়া মিটিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে মনে হল কে যেন অন্ধকারে দেওয়ালের সঙ্গে মিশে দাঁড়িয়ে আছে। হাতের জিনিসগুলো সামলে রাতুল ঝুঁকে পড়ে দেখে সবিস্ময়ে বলে উঠল, আরে সন্ধ্যা, তুমি? কতক্ষণ এসেছো?

টিপ্ টিপ্ বৃষ্টিটা একটু যেন ঝাঁকিয়ে এল। সেই সঙ্গে জোরে হাওয়া দিচ্ছে। আকাশের দিকে তাকাল রাতুল। সহজে বৃষ্টি থামবে বলে মনে হয় না। রাতুল তালা খুলে ঘরে ঢুকে সুইচ টিপে আলো জ্বালাল। তারপর দরজার পর্দা সরিয়ে সন্ধ্যাকে ডাকল আবার। টেবিল-ল্যাম্পের আলোটা তির্যকভাবে সন্ধ্যার মুখের উপর পড়েছে। আধো আলো, আধো অন্ধকারে সন্ধ্যাকে যেন রহস্যময় মনে হচ্ছে। রাতুল আবার জিজ্ঞাসা করল, কতক্ষণ এসেছো? সন্ধ্যা পায়ের বুড়ো আঙুল মেঝেতে ঘসতে ঘসতে আবছা গলায় বলল, এই তো কিছুক্ষণ। রাতুলের বিস্মিত ভাবটা তখনও কাটেনি, বলল, শঙ্কর কোথায়, ওকে সঙ্গে আনোনি? সন্ধ্যা ভাসা ভাসা জবাব দিল, ও রাত্তির বেলা কোথায় বেরুবে, ছেলেমানুষ? রাতুল হেসে ফেলল। ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে তরল গলায় বলল, আর তুমি বুঝি খুব বুড়োমানুষ? তোমার মা গালাগাল করবে না তোমাকে? সন্ধ্যা হাল্কা গলায় বলল, জানতেই পারবে না মা, আমি এখানে আছি। মা জানে আমি আমার পিসতুতো দাদার বাড়ীতে আছি—সামনের একুশ নম্বর রাস্তায়।

রাতুল এবার স্থিরদৃষ্টিতে সন্ধ্যার দিকে তাকাল। ছেলেমানুষ, ফ্রকপড়া গোলগাল চেহারা। টিপ্‌টিপ্ বৃষ্টিতে সামনের উড়ো চুলগুলো ভিজে কপালের সঙ্গে লেপ্‌টে আছে। ভাসা ভাসা চোখদুটো কিন্তু চিক্ চিক্ করছে, মুখটা লালচে: বোধহয় বৃষ্টি এড়াবার জন্য দৌড়ে এসেছে। সন্ধ্যা ঘরের ভিতর দেওয়ালে হেলান দিয়ে আড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে একগুঁয়ে জেদী মেয়ের মত। রাতুল একবার ঘাড় ফিরিয়ে ঘড়িতে সময় দেখল, পৌনে সাতটা। সন্ধ্যার দিকে এক নজর তাকিয়ে উঠে গিয়ে রান্নাঘরে স্টোভ জ্বালিয়ে চা-এর জলের কেত্‌লী বসাল, পেয়ালা-পীরিচ সাজাতে লাগল। সন্ধ্যা কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে শোবার ঘরে ঢুকল, তারপর আলো জ্বালিয়ে ড্রেসিং টেবিলের বড় আয়নাটার সামনে দাঁড়াল। রাতুল ছোটখাট, কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে সন্ধ্যার গতিবিধিটা লক্ষ্য করছিল। সন্ধ্যা যেন একটু একটু করে রহস্যময় হয়ে উঠছে ওর কাছে। ঝুপ ঝুপ বৃষ্টি পড়ছে বাইরে, সেই সঙ্গে দমকা হাওয়ার শব্দ ঘরের ভিতর স্টোভের শোঁ-শোঁ গর্জনের সঙ্গে মিশে গেছে। একটা সিগারেট ধরিয়ে রাতুল শোবার ঘরের দরজার চৌকাঠের কাছে পর্দা সরিয়ে কবাটের পাল্লার উপর অলস হাত রেখে দাঁড়াল। আয়নাতে দেখতে পেয়েছিল সন্ধ্যা। আস্তে আস্তে ঘাড় ফিরিয়ে সেই রহস্যময় দৃষ্টিতে রাতুলের দিতে তাকাল। যেন সে জানতো, রাতুল এ-ঘরে আসবে।

রাতুল চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে ছিল। হাতের সিগারেটটা পুড়ে যাচ্ছে। অনেকদিনের পুরোনো ধূসর পাণ্ডুলিপির মত মনে পড়ছিল তার কৈশোরের স্মৃতি। সিউড়ীতে তখন থাকতো ওরা। তের-চোদ্দ বছর বয়েস, বোধহয় ক্লাশ নাইনে পড়ত। ময়ূরাক্ষী বাঁধের কাজ চলছিল তখন। ওরা থাকতো দুখানা ঘরের 'সি'-টাইপের কোয়ার্টার্স-এর শেষ প্রান্তে। ওখান থেকে আরম্ভ হয়েছে 'এ'-টাইপের বাংলো প্যাটার্নের কোয়ার্টার। ওদের পাশের বাড়ীতে ছিল মল্লিকা বৌদিরা। ইঞ্জিনীয়ার মিঃ ব্যানার্জির স্ত্রী। রাতুলের শরীরটা নিজের অজান্তে একবার থর থর করে কেঁপে উঠে স্তব্ধ হল। মল্লিকা বৌদির কথা মনে

পড়তে রাতুলের সমস্ত স্নায়ুতন্ত্র যেন একটা প্রবল আলোড়ন জেগে উঠেই মিলিয়ে গেল। হ্যাঁ, মল্লিকা বৌদি বশ করেছিল রাতুলকে, ঠিক যেমন করে একটা প্রকাণ্ড পাহাড়ী ময়াল সাপ ছাগলছানাকে সম্মোহিত করে আস্তে আস্তে গিলে ফেলে। রাতুলের ধ্যানজ্ঞান হয়ে উঠেছিল মল্লিকাবৌদি। চব্বিশঘণ্টার মধ্যে অধিকাংশ সময়েই পড়ে থাকত ওদের বাড়ীতে। চোখের আড়ালে ভাবত মল্লিকাবৌদির ছবি, হয়তো স্বপ্নেও দেখতো তাকে। ক্লাশে পড়া পারত না রাতুল। খেলাধুলোও ছেড়ে দিয়েছিল। মল্লিকাবৌদির ছোটখাট ফাইফরমাস খাটতে পেলে নিজেকে কৃতার্থ বোধ করত রাতুল। শেষপর্যন্ত রাতুল মল্লিকাবৌদির এমন ঘনিষ্ঠ পার্শ্বচর হয়ে দাঁড়াল যে, কোন দুপুরে মল্লিকাবৌদি যখন শীতলপাটি বিছিয়ে ঘরের জানালা-দরজা বন্ধ করে পুরোদমে পাখা চালিয়েও হাঁসফাঁস করছে, তখন অবলীলাক্রমে পিঠের ব্লাউজ খুলিয়ে দিয়ে বলতো, দেতো রাতু আমার ঘামাচিগুলো গেলে, পাউডার মেখে দে। এখানে আর বেশী দিন থাকলে আমি মরে যাব। রাতুল কাঁপা কাঁপা পায়ে উঠে যেত ড্রেসিং টেবিলের উপর থেকে ঘামাচিমারা ঝিনুক আনতে। চোখের পলক পড়ত না রাতুলের। যেমন ফর্সা, তেমনি মসৃণ গায়ের চামড়া বৌদির। পুরুষ্টু সম্পূর্ণ অনাবৃত পিঠটা ভারী নিঃশ্বাসের সংগে উঠতো পড়তো। রাতুল সম্মোহিত জন্তুর মত চুপ করে বসে থাকতো পাশে। মল্লিকাবৌদির গায়ের ঘামের গন্ধটা যেন মাতাল করে তুলতো রাতুলকে। কেমন অনবদ্য পচা আপেলের মত গন্ধটা। তবে অতটা ঝাঁঝাল নয়। নির্জন দুপুরের [illegible] বন্ধ ঘরে গাঢ় [illegible] জল গড়িয়ে উঠেছে কখন রাতুল টের পেত না।

প্রথমটা লক্ষ্য করেনি কেউই। রাতুলের মা খুশীই হচ্ছিল বড় অফিসারের বাড়ীতে ছেলের খাতির-যত্ন দেখে। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই রাতুলের পরিবর্তনটা সকলের চোখে পড়ল। রুক্ষ উস্কোখুস্কো চেহারা হয়েছে, চোখের কোলে কালি। বই নিয়ে বসে ঠিক, কিন্তু চোখের দৃষ্টি উধাও সেইখানে যেখানে মল্লিকা বৌদির ছবি আঁকা আছে। রাতুলের মা নানারকম করেও বন্ধ করতে পারেননি ওর ও বাড়ীতে যাওয়া। ও টিমের কেপ্টেনের সমবয়েসী ছেলেরা খেলতে এসে ফিরে যেত নিরাশ হয়ে। অনেক অনুনয় করে বলত তারা, রাতু, তুই না গেলে আমাদের টিম হচ্ছে না। কেরানীপাড়ার ছেলেদের সংগে আমাদের ম্যাচ আছে। রাতুল শীর্ণ হেসে জবাব দিত, নারে আজ আমার একটা কাজ আছে।

সবাই যে এক কথায় রাতুলকে ছেড়ে দিত তা নয়। পাম্প সুপারভাইজারের গাট্টাগোট্টা ছেলেটা রাতুলের সংগে একই ক্লাশে পড়ে। গোঁফ-দাড়ি উঠে, গলার স্বর মোটা হয়ে এসেছে এরই মধ্যে। এক দঙ্গল ছেলে নিয়ে রাস্তার মাঝখানে রাতুলকে ঘিরে দাঁড়িয়ে মজা করত ওরা। রাতুল ভয় পেয়ে যত ওদের এড়াতে চাইত, ততই পিছু লাগত ওরা। গাট্টাগোট্টা বল্টু, পালের গোদা এগিয়ে এসে রাতুলের পেটে খোঁচা মেরে বলত, এই রাতুল, তুই দিন-রাত ব্যানার্জী সাহেবের বাড়ী পড়ে থাকিস না কেন রে? ব্যানার্জীর বউ বুঝি তোকে—এই বলে একটা অশ্লীল ইংগিত করত। ছোট-বড় ছেলের দল পরম পাকার মত ফ্যাক ফ্যাক করে হেসে, এ ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ত। তারপর হঠাৎ বল্টু ঘনিষ্ঠভাবে হয়তো কাছে এসে নিচু গলায় অথচ সবাইকে শুনিয়ে বলত, এই রাতু শোন, তোর ইয়ে হয়—। রাতুল মুখ লাল করে কিছু জবাব দেবার আগেই ছেলের দল আরেক দফা হাসির হররায় লুটোপুটি খেত।

রাতুল কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী এসে মাথা হেঁট করে বসে থাকত। কতদিন প্রতিজ্ঞা করেছে আর মল্লিকাবৌদির কাছে যাবে না। কিন্তু বৃথা। এক অমোঘ শক্তির বলে মল্লিকাবৌদি রাতুলকে আকর্ষণ করেছে। স্নান করতে যাবার আগে দামী ইটালীয়ান অলিভ অয়েল সারা গায়ে ডলে ডলে মাখে মল্লিকাবৌদি। রাতুল মুগ্ধ বিস্ময়ের তাকিয়ে দেখে তার দেহের ঐশ্বর্য। সুডৌল বুক, ভারী নিতম্ব আর শংখের মত সাদা গায়ের রং। মল্লিকা মাঝে মাঝে লজ্জা পেয়ে ছদ্মকোপে বলে, এ্যাই ড্যাপো ছেলে, ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে কি দেখছিস! ব্যানার্জী-সাহেব অফিস বেরিয়ে যাবার আগে আয়নায় টাই ঠিক করতে করতে হাসতে হাসতে বলেন, ছেলেটার মাথা তুমিই খাবে দেখছি মল্লিকা। মল্লিকাবৌদি আড়চোখে রাতুলের দিকে তাকিয়ে বলে, আমি খাবার অনেক আগেই ও তৈরী হয়েছে। তারপর একটু হেসে বলে আসলে পুরুষ জাতটাই এমন হ্যাংলা। ব্যানার্জীসাহেব মৃদু হেসে বেরিয়ে যেতেন কিন্তু যাবার আগে এক মুহূর্তের জন্য সতর্ক চোখে রাতুলকে একবার দেখে নিতেন।

অনেকদিন পর আজ এই বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় রাতুল চাকলাদার তার শেষ কৈশোরের সেই ব্যর্থ দিনগুলির কথা স্মরণ করল। ব্যর্থ বই কি। অবোধ পশুর মত একটা লোভ। যন্ত্রণায় রাতুল গুমরে মরেছে তখন। কোথায় গেল সেই ভাবনা-চিন্তাহীন নির্বাধ মুক্তির দিনগুলি। স্কুল ছুটির পর ছেলেদের সংগে হুল্লোড় করতে করতে বাড়ী ফেরা। উড়ে মালীর বাগানে ঢুকে গুলতি ছুঁড়ে কাঁচা আম পেড়ে খাওয়া আর তাড়া খেয়ে বেড়া ডিংগিয়ে পগার পার।

ফুটবল মাঠে পায়ে মা'র শাড়ীর পাড়ের ব্যাণ্ডেজ জড়িয়ে সেন্টার ফরোয়ার্ড রাতুল হরিণের মত ছুটতো বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়দের কাটিয়ে। মল্লিকাবৌদি ছিনিয়ে নিয়ে গেছে রাতুলের জীবনের সবচেয়ে দামী সেই দিনগুলি।

সন্ধ্যা তখনও চুপ করে দাঁড়িয়েছিল ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে। রাতুলও একচুল নড়েনি। শোবার ঘরের দরজার চৌকাঠের উপর পর্দা সরিয়ে অলস ভঙ্গীতে কবাটে হাত রেখে চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়েছিল। দৃষ্টি স্থির নিবদ্ধ সন্ধ্যার দিকে। বাইরে অন্ধকারে ঝড়-জলের অশান্ত দাপাদাপি কমে আসছে, রিম-ঝিম বাজছে। আকাশ বাতাস যেন এতক্ষণ একটা অসহ্য যন্ত্রণার তীব্র আক্ষেপে গোঙাচ্ছিল বিকারগ্রস্ত রোগীর মত। এখন নেশাচ্ছন্ন হয়ে ঝিমিয়ে পড়ছে ধীরে ধীরে।

সন্ধ্যা আড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে ড্রেসিং টেবিলের সামনে। লম্বা আয়নাতে দরজার প্রতিবিম্ব-ফ্রেমে আঁটা রাতুলের প্রস্তরীভূত মূর্তি। যেন প্রাগৈতিহাসিক যুগের কোন ফসিল, ভাবলেশহীন মুখে শোবার ঘরের ভিতর সন্ধ্যার কাণ্ড-কারখানা লক্ষ্য করছে। সন্ধ্যা এতক্ষণ ধরে যেন একটা অস্বস্তি বোধ করছিল। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে কানের পাশ দিয়ে, কোঁকড়ান চুলের আড়াল দিয়ে ঘামের একটা ক্ষীণ স্রোত নামছিল নিচে। বুকের নিচে টেপ্-সেমিজটা ভিজে উঠেছে। সন্ধ্যা একটু অস্থির ভংগীতে ঘনঘন পায়চারী আরম্ভ করল আবার। টুকিটাকি জিনিসগুলি নাড়াচাড়া করতে করতে একটা ওষুধের শিশি ওর হাত থেকে পড়ে খান-খান হ'য়ে ভেঙে গেল। ইতস্তত মেঝেতে ছড়ান কাঁচের টুকরোগুলোর দিকে একবার ঠোঁট কুঁচকে তাকাল সন্ধ্যা, তারপর হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে নিবিষ্ট মনে দেখতে লাগল বহুবার দেখা হর-পার্বতীর যুগল মূর্তিটা।

মেঘের গর্জনটা আস্তে আস্তে নিচু পর্দায় নেমে এসেছে। তেল ফুরিয়েছে বোধহয়। কেতলীর জল টগবগ করে ফুটছিল অনেকক্ষণ, বোধহয় শুকিয়ে গিয়ে তলায় ঠেকেছে—একটানা শি-শি শব্দ উঠছে। রাতুল চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। ওর হাত-পা সারা দেহ যেন অসাড় হয়ে পড়ছিল একটু একটু করে। কেবল সূক্ষ্ম অতি সূক্ষ্ম, ফলুই মাছের কাঁটা থেকেও তীক্ষ্ণ একটা বেদনা তার বুকে অনুভব করছিল। কেউ যেন কাঁটাটা তার হৃদপিণ্ডে আলগোছে চেপে ধরে আছে, আর বেদনা একটু একটু করে ছড়িয়ে পড়ছে স্নায়ু বেয়ে রাতুলের সমস্ত অস্তিত্বে। অনেকক্ষণ পর রাতুল সম্বিত ফিরে পেল। টেবিলে রাখা টাইমপীস ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখল আটটা বেজে পনের মিনিট, সেকেণ্ডের কাঁটা তেমনি নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে। একটা ছোট নিঃশ্বাস পড়ল রাতুলের। জানালার পর্দা সরিয়ে দেখল বাইরে হাল্কা ইলশেগুঁড়ির মত বৃষ্টি এখন হাওয়ার কাঁপনে গ্রাম হ'তে দূরের গ্রামান্তরে বিলীন হ'য়ে যাচ্ছে। সামনের প্রকাণ্ড জারুল গাছটার ঝাঁকড়া মাথায় টুপটাপ বৃষ্টি মাঝে মাঝে হাওয়ার ঝাপটায় ঝুর-ঝুর করে ঝরে পড়ছে। অনেকক্ষণ পর একটা রুগ্ন ভেজা কাক কা-কা করে ডেকে উঠল। সন্ধ্যা ধীরে ধীরে মুখ ফিরিয়ে গভীর কালো চোখে রাতুলের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। রাতুল স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে সন্ধ্যাকে কিছুক্ষণ দেখল, তারপর নরম গলায় বলল, তুমি এখন বাড়ী যাও সন্ধ্যা, রাত হয়েছে।

শতবার্ষিকী স্মরণে

ম্যাক্‌সিম গোর্কী (২)



ভবানী মুখোপাধ্যায়

॥ তিন ॥

এই রুটির কারখানার জীবন আর এক শিক্ষানবিশীর কাল। ডেরেনকভ বিপ্লবের কাজের সাহায্যের জন্য এই রুটির কারখানা খুলেছিল। বিপ্লবের স্বপ্নে পাগল কিছু ছাত্র ডেরেনকভের এই প্রচেষ্টায় সহায়ক। আলেকসীকে ডেরেনকভ তাই সহকারী হিসাবে নিয়ে এল।

পাউরুটির কারখানায় অনেক কাজ. পাউরুটি তৈরী করা থেকে তার বিলি-বন্দোবস্ত। সেই সঙ্গে গোপনে বিপ্লবের প্রচারপত্র এবং পুস্তিকা বিতরণও করতে হয়। এই কাজের সময়েই দেখা গেল নানা জায়গায় দেহবিলাসের বিচিত্র লীলা। ধর্মের আড্ডা, মেয়েদের বোর্ডিং সর্বত্রই সেই এক ধারা। যৌন কামনার পরিতৃপ্তির বিচিত্র প্রয়াসে সবাই মসগুল। পাউরুটির কারখানার যারা কারিগর তারা যায় বেশ্যালয়ে। সেখানে আলেকসীকেও টেনে নিয়ে যায়। পাদ্রী সাহেবের নিস্পৃহ উপস্থিতির মত আলেকসী সেই সব দরিদ্র রমণীর জীবনকথা শোনে শিক্ষিত ছাত্রদের উৎপাতের কথাও জানতে পারে। কারখানার সর্দার কারিগর লুটোনিন একটি মেয়েকে লুকিয়ে পাউরুটি দিত দেহের বিনিময়ে। সেই সময়টা শীতের রাত্রেও আলেকসীকে ঠান্ডায় বসে থাকতে হত ঘরের বাইরে। সবচেয়ে আশ্চর্য লাগত মেয়েটি যখন যাওয়ার সময় মৃদু কণ্ঠে বলত—যাও এইবার ঘরে যাও।

আলেকসী নারী-জীবনের বিচিত্র রহস্যের কথা চিন্তা করে। স্বর্গীয় প্রেম সম্পর্কে অন্তরে সংশয় জাগে, তাহলে কি সব মিথ্যা। সত্য শুধু এই দেহসম্ভোগ। ভালবাসা বলে কি কিছুই নেই।

এরই ফাঁকে ফাঁকে ডেরেনকভের দোকানের একটি মজুরাণীর মুখ মনে জাগে। মেয়েটিকে ভাল লেগেছিল আলেকসীর। তার তখন ভাল লাগারই বয়স। কিন্তু লঘু চরিত্রের মানুষ নয় বলেই, সব সময়ে এই সব বিচিত্র ধরনের নর-নারীর মধ্যে কাটিয়েও সে বীতস্পৃহ। তার মনে সর্বদাই নতুন প্রশ্ন জাগে—মানুষ কী? মানুষের কি অর্থ! জীবন সত্য না মৃত্যু সত্য। যারা বঞ্চিত, শোষিত, যন্ত্রণাপ্রপীড়িত তারাই আজ থেকে আলেকসীর আত্মার আত্মীয়।

অন্দ্রে ডেরেনকভ আলেকসীর জীবনে এক অবিস্মরণীয় চরিত্র। আলেকসীর ছোট্ট দোকানে ছিল নারদনিক সমাজবাদীদের গুপ্ত আড্ডা। আলেকসী এই প্রথম এমন এক বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে এল যাঁরা কৃষি বিপ্লব এবং তাদের মধ্যে জমি বিতরণের পরিকল্পনা নিয়ে কাজ চালাতে চান। এরাই আবার দু ভাগ হয়ে গেল, যাঁরা আরো উগ্রপন্থী তাঁরা চান প্রতিষ্ঠিত শাসনব্যবস্থার উচ্ছেদ। আলেকসীর ভাল লাগে এদের উদ্দীপনাময় তর্ক-বিতর্ক, স্বদেশানুরাগ এবং জনগণের কল্যাণে আত্মোৎসর্গ করার আকুলতা। তাঁরা আলেকসীকে নানারকম বই পড়তে দেন. আলেকসীও নতুন নেশায় মগ্ন হয়ে আত্মহারা। আবার এর মাঝে জীবিকার জন্য কখনও বাগানের মালি কখনও কারো বাড়ির চৌকীদারি এই সবও করতে হয়। তার কণ্ঠস্বর ছিল ভারী মধুর তাই অনেক সময় গির্জায় গিয়ে গান করতে হয়। শেষকালে এই রুটির কারখানায় চাকরী জুটল। আর এই সময়েই খবর এল দিদিমার মৃত্যুর। আলেকসীর জীবনে এ এক গভীর শোক।

এর পরই আসে আর একটি শোকের আঘাত। ডেরেনকভের দোকানে পরিচয় হয়েছিল রুবস্টফের সঙ্গে। রুবস্টফের বয়স অনেক বেশী আলেকসীর চেয়ে। কিন্তু তিনি বিপ্লবী এবং সেই মন নিয়ে সমগ্র রাশিয়ার অনেক কাপড়ের কারখানায় তিনি কাজ করেছেন। বিপ্লবের অনেক সংবাদ তিনি আলেকসীকে দিতেন। একদিন পথে দুজনে চলেছেন, হঠাৎ একটা দাঙ্গায় জড়িয়ে পড়লেন দুজনে। সাতান্ন বছর বয়সের রুবস্টফ বললেন—আলেকসী তুমি পালাও। আমি একা এদের মোকাবিলা করি। আলেকসী চলে এসেছিল কিন্তু রুবস্টফকে আর পাওয়া গেল না।

নিদারুণ শোকে আচ্ছন্ন হল আলেকসী। জীবনে এর মধ্যে দু-একটি মেয়ের ছায়া পড়েছে. কিন্তু তারা কোথায়? বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সে আর এক মরীচিকা। কুড়ি বছরের কাছে পৌঁছে জীবনটা শেষ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে আলেকসী একটা রিভালবারের গুলিতে নরদেহের অবসান ঘটানোর চেষ্টা করল। বুকে [illegible] ছিল গুলিটা কিন্তু [illegible] গেল সে।

আবার নতুন জীবনের শুরু। ডেরেনকভের আড্ডায় ইউক্রেইনের [illegible] মাকসিমোভিচ রোমাসের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল আলেকসীর। রোমস সাইবেরীয়ায় নির্বাসন ভোগ করেছে দীর্ঘকাল। বক্ত ভারী বিপ্লবের মদিরা, সে বৃথা তর্কে সময় নষ্ট করে না। চুপ-চাপই থাকে বেশী সময়। আলেকসীকে সে ভারী ভালবাসে। একদিন রোমাস প্রস্তাব দেয় কাজান শহর থেকে প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে ক্রাসনভিডোভো গ্রামে সে দোকান খুলবে, আলেকসীও চলুক সহকারী হয়ে। উদ্দেশ্য সাধারণ মানুষের সেবা, দোকানদারীটা মুখোশমাত্র।

আলেকসীর বেশ ভাল লেগেছিল ভলগা তীরের এই পল্লীজীবন। এ ছাড়া রোমাস তাকে রুশ মনীষীদের রচনা ছাড়া বিদেশের মনীষীদের রচনার সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দিলেন, আর সেই সঙ্গে বললেন, বই পড়ো কিন্তু নিজের দৃষ্টিটাকে যেন আচ্ছন্ন করে তুলো না।

কিন্তু রোমাসের এই দোকান বেশী দিন চলে না। নানা চক্রান্তে লোকে তার দোকানটিকে নষ্ট করে আগুন ধরিয়ে দেয় বার বার। রোমাসকে চলে যেতে হয় গ্রাম

ছেড়ে। আলেকসী কিছুদিন সম্পন্ন চাষীদের ক্ষেত-খামারে কাজ করে দিন চালায়। কিন্তু তারপর আবার যাত্রা শুরু—এবার অভ্যুত্থানের পথে। কিন্তু অভ্যুত্থান যাওয়া তার হয় নি। নানারকমের কাজ করতে করতে একদিন আলেকসী ভলগা অঞ্চলে একটি রেলপথের চৌকীদারী কাজ পেল। রেলের মালগুদামের পাহারাদার। কসাকরা চৌকীদারদের ঘুস দিয়ে আটা চুরি করে, লিওস্কা বলে একজন সুন্দরী কসাক রমণী দেহ পর্যন্ত দান করে। আলেকসী কিন্তু সহজে কোন প্রলোভনে ধরা দেয় না। স্টেশনমাস্টারের বাড়িতে মাঝে মাঝে মাইফেল বসে। সেখানে সুরা ও নারীর অবাধ বাণিজ্য। আলেকসীরও নিমন্ত্রণ হয় গান শোনাবার জন্য। এই পঙ্কিল পরিবেশে কাটল কয়েক মাস। স্টেশনমাস্টারের বাড়িতেও কাজ করতে হত এবং শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে ওপর-ওলাদের কাছে আলেকসী গদ্য এবং পদ্য মিশিয়ে এক বিচিত্র আবেদন পাঠায়। এর ফলে বদলী হল বোরিসোগ্লেবস্ক স্টেশনে। এখানে অনেকগুলি রাজনৈতিক অপরাধী বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে যোগাযোগ ঘটল। এরা রেলপথে মালপত্র চুরি নিরোধ কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করে। কিছুকালের মধ্যে আবার বদলী হওয়ার আদেশ এল। এইবার ক্রুটোয়া স্টেশনে এসে পৌঁছনোর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সংবাদ এল বন্ধু রাজেনভ বিভালবারের গুলীতে আত্মহত্যা করেছে। সে কিন্তু আলেকসীর জন্য দুখানি বই রেখে গেছে স্পেনসার ও ওয়ালেসের

এল।

আলেকসী এবার নিজনীতে ফিরে সেনাবিভাগে যোগ দিয়ে স্বদেশের সেবা করবে এই ভেবে রেলের চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে একদিন প্রাতে বেরিয়ে পড়ল। অনেক পথ পরিক্রমণ করে প্রায় ছ' মাস পরে আলেকসী মস্কো এসে পৌঁছাল। পোশাক পরিচ্ছদ জীর্ণ, পায়ে হাঁটার শক্তি নেই। অনেক কষ্টে রেলের গার্ডকে বলে জবাই করার উদ্দেশ্যে চালানী কয়েকটি বলদের গাড়িতে তার সেই বাল্য ও কৈশোরের জীবনের রঙ্গভূমি নিজনীতে এসে পৌঁছাল।

কোথায় যাবে, কে আর আছে! কাজানে পরিচয় হয়েছিল সোমভের সঙ্গে। তার বাড়িতে এসে উঠল আলেকসী। তার সঙ্গে রাজনৈতিক আসামী প্রাক্তন শিক্ষক চেকিন। সোমভও সাইবেরীয়ায় নির্বাসনে কাটিয়েছেন অনেকদিন। সুতরাং পুলিশের নজর পড়তে দেরী হল না। কিন্তু পুলিশ যখন দুজনকে গ্রেপ্তার করতে এল তখন দুজনেই পলাতক, আলেকসীও ঠিক সেই সময় এসে হাজির। তাকেই তখন জেনারেল পাজনানাসকী নজরবন্দী করে আটক করলেন।

এই জেনারেলও আলেকসীর জীবনে এক শুভগ্রহ। তিনি আলেকসীর কাগজপত্রের মধ্যে কিছু কবিতার সন্ধান পেয়ে তাকে উৎসাহিত করলেন। তিনি উপদেশ দিলেন যে, জেলখানা থেকে বেরিয়েই যেন কারলেংকোর সঙ্গে যোগাযোগ করেন আলেকসী। আলেকসীকে তাঁর ভাল লেগেছিল। তিনি বললেন—বেশ পড়াশোনা করো, আরো লেখো তোমার ভালো হবে।

।। দ্বিতীয় পর্ব ।।

।। এক ।।

কারলেংকোর নাম আগে শোনা ছিল আলেকসীর। কারলেংকোও সাইবেরীয়ায় দণ্ডভোগ করেছেন। রোমাসের সঙ্গে তাঁর জানা-শোনা। নিজনি শহরে তখন কারলেংকোর প্রতিষ্ঠা হয়েছে। 'মাকারের স্বপ্ন' নামক একটি গল্প সেইসময় মুখে মুখে প্রচলিত, কিন্তু আলেকসীর সেই গল্প ভাল লাগে নি। কারাগার থেকে ছাড়া পেয়ে একদিন কারলেংকোকে পথে দেখলেন কিন্তু তিনি সেদিন তাঁর সঙ্গে কথা বলেন নি। সামরিক বাহিনীতে চাকরী হল না, কারণ পুলিশের রিপোর্ট তাঁর বিরুদ্ধে। নিজনি শহরেই মদের দোকানে ও পরে গুদামে কাজ জুটল কিছুদিন।

এই নিদারুণ ক্লেশকর জীবনের মাঝে একদিন একটি কবিতার খাতা হাতে কারলেংকোর সঙ্গে দেখা করলেন তিনি। কারলেংকো রোমাসের কাছে আলেকসীর নাম শুনেছিলেন। তাকে সযত্নে বসিয়ে পড়তে লাগলেন "প্রাচীন ওক গাছের গান"। জীবনের অনেক কথা সেই পাঁচালীতে বর্ণিত, কারলেংকো সহানুভূতি-ভরা কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—তোমার বড় কষ্ট গেছে, না?

কারলেংকো রচনার কয়েকটি ত্রুটির কথা উল্লেখ করে খাতাটি রেখে দিলেন। পরে যখন ফেরৎ দিলেন তখন মাত্র দুটি পাতা রেখে দিলেন। রচনার অনেক ত্রুটি নির্দেশ করলেন। ফলে আলেকসীর লেখক সত্তা আহত হল। কারলেংকোর কাছে আর নয়।

নিজনি শহরে বৈচিত্র্যহীন জীবন কাটে অতি মন্থর গতিতে। দু বছর কেটে গেল এইভাবে। এর মধ্যে কোমিস্ত্রর ছাত্র নিকোলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। ছেলেটি অদ্ভুত। সে নিজে রসায়ন রসিক হলেও আসলে সে দার্শনিক। দর্শনে তার গভীর জ্ঞান। নানারকম রাসায়নিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে গিয়ে তার শরীরটাও খারাপ হয়েছে। বিচিত্র চরিত্রের মানুষ। পরবর্তী জীবনে সে কিয়েভ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হয়েছিল, সেখানে তার আকস্মিক মৃত্যু হয়।

নিকোলের সঙ্গে জটিল দার্শনিক সূত্র আলোচনা হত আলেকসীর। সেই বলেছিল—একমাত্র নির্ভরযোগ্য বস্তু হল মানুষের মস্তিষ্ক। যে যার নিজের মাথার ওপর যদি নির্ভর করে থাকে তাহলে তাকে আর ভাবতে হয় না। এই কথাটি আলেকসীর ভাল লেগেছিল। সেই সময় চারিদিকে নানারকমের বিভ্রান্তিকর মতবাদ, নিজের বুদ্ধি

'রূপা'র বই

॥ উপন্যাস ॥

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
প্রাচীর ও প্রান্তর ৩·০০

অজিতকৃষ্ণ বসু
শেষ বসন্ত ৪·০০

আশাপূর্ণা দেবী
অন্য মাটি অন্য রং ৬·৫০
লঘু ত্রিপদী ৪·০০

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
একই বৃন্ত ৬·০০

জ্যোতিরিন্দ্র রায়
প্রণয় এক প্রাণ-শিল্প ৬·০০

NOVELS

ANAIS NIN
A SPY IN THE HOUSE OF LOVE & UNDER A GLASS BELL and OTHER STORIES Rs. 3.50
CHILDREN OF THE ALBATROSS and THE FOUR-CHAMBERED HEART Rs. 4.50

ANITA DESAI
CRY, THE PEACOCK Rs. 5.00

THOMAS MANN
Nobel Prize Winner
THE TRANSPOSED HEADS and THE BLACK SWAN
(2 novels in one volume) Rs. 3.50

আমাদের পূর্ণ গ্রন্থতালিকার জন্য লিখুন

রূপা

রূপা অ্যান্ড কোম্পানী
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২
Phone : 34-4821 ● 34-6305

অনুসারে তার ভেতর থেকে পথ করে দেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন নিকোলে। ফলে নানারকমের উদ্ভট চিন্তা মাথায় এল, বুদ্ধিবৃত্তির ওপর চাপ পড়ল। নিদারুণ ক্লেশের জীবন তায় এই রকমের গুরুভার চিন্তার ফলে মানসিক বিকার ঘটল আলেকসীর। এই সময় এটর্ণী লানিনের তিনি ছিলেন কেরানী। একদিন তিনি তাঁকে দলিল-দস্তাবেজে জীবনের নানা কথায় রচনা করলেন এক সুদীর্ঘ কবিতা। লানিন বিস্মিত হলেন আলেকসীর এই কাণ্ড দেখে। কিন্তু তিনি সহৃদয়, তিনি তাকে উপদেশ দিলেন ডাক্তারী পরীক্ষার।

একদিন গভীর রাতে ভলগা তীরবর্তী একটি টিলায় বসে আছেন, রাত কত তার হিসাব নেই। নিঃশব্দে তার পাশে এসে বসলেন কারলেংকো। মার্কসীয় দর্শনের কথা হয় দুজনে। তিনিও আলেকসীকে উপদেশ দিলেন, না বুঝে কোন কিছু গ্রহণ করবে না। সেই সূত্রে আলেকসীকে লেখার জন্যও তাগিদ দেন। আলেকসীর মনে কিন্তু সুগভীর হতাশা। তাকে দেখে ডাক্তার বললেন—যৌন অবদমনের ফলে এই বিকার ঘটেছে। মেয়েদের সঙ্গে একটু মেলামেশা করো। দেহের দাহ থেকে নিষ্কৃতি কই?

।। দুই ।।

এর কিছুকাল পরেই দেখা হয়েছিল ওলগা কামিনসকীর সঙ্গে বিচিত্র ঘটনাচক্রে। ওলগাদের স্বামী-স্ত্রীকে নিমন্ত্রণ করতে গিয়েছিল আলেকসী, — পরনে তার উদ্ভট পোশাক। একটা স্টীমার পার্টির আয়োজন হয়েছিল, সেই পার্টিতে পোলিস বোলেশ্লাভ কারসাক ও তাঁর স্ত্রী দুজনকে আমন্ত্রণ জানান হবে স্থির হল। ভার পড়ল আলেকসীর ওপর। আলেকসী ওলগাকে দেখে মুগ্ধ হল। অথচ ওলগা অপরের স্ত্রী এবং বয়সে তার চেয়ে বেশ কিছু বড়, প্রায় দশ বছরের বেশী। ওলগা তা বোঝে—সেও ধরা দেয়। কিন্তু বৃদ্ধ স্বামীকে ছেড়ে তরুণ আলেকসীর কাছে আসতে সাহস হয় না। আবার এক আঘাত এল মনে।

১৮৯১ খৃস্টাব্দে প্রায় পদব্রজে আলেকসী এল ককেসাসের তিফলিস অঞ্চলে। বয়স তখন তেইশ, পরিপূর্ণ যৌবন। এই তিফলিসে পরিচয় হল আলেকজান্ডার কালইউজিনীর সঙ্গে। কালইউজিনীকে সাইবেরিয়ার শাস্তিভোগের পর তিফলিসে নির্বাসিত করা হয়েছিল। তিনি "উইল অব দি পিপল" বা জনমত সম্প্রদায়ের বিপ্লবী। তাঁর নিজস্ব পাঠাগারটি বেশ সমৃদ্ধ। পড়াশোনাও তাঁর যথেষ্ট। তিনি বিশেষ উৎসাহ দিলেন আলেকসীকে পড়াশোনায়। তাঁকে একদিন আলেকসী কথাপ্রসঙ্গে একটা গল্প বলে। কালইউজিনী বললেন, তুমি এই গল্পটা লিখে ফেল। খাসা হবে। এই বলে তাকে একটি ঘরে আটক করে বললেন—নাও লেখ দেখি এইবার গল্পটা।

এই তিফলিস শহর আর জহুরী কালইউজিনী উত্তরকালে যিনি ম্যাকসিম গোর্কী নামে পৃথিবীখ্যাত তাঁর বিকাশের পথে সর্বশ্রেষ্ঠ সহায়ক। অনেক পরে ১৯২৫ খৃস্টাব্দে গোর্কী যখন জগৎপ্রসিদ্ধ লেখক তখন তিনি কালইউজিনীকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন—বিগত ত্রিশ বছর ধরে আমি যে রুশ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে চলেছি তার মূলে প্রেরণা দিয়েছেন আপনি, আপনি আমাকে শিখিয়েছিলেন জীবনকে গভীরভাবে গ্রহণ করতে। আপনি আমার বন্ধু, গুরু ও পথপ্রদর্শক।

গল্প লেখা হল, এই গল্পটির নাম 'মাকার চুদরা'। ১৮৯২ খৃস্টাব্দের সেই উক্ত দিনটি পৃথিবীর সাহিত্য ইতিহাসে স্মরণীয় গোর্কীর এই প্রথম গল্প! বেদিয়া সম্প্রদায়ের গল্প। এই জিপসীদের সর্দারের মুখে লেখক বলেছেন — যারা সভ্য মানুষ তারা স্বাধীনভাবে জীবনটাকে গ্রহণ করতে পারে না, তারা সবাই দাসখত লিখে বসে আছে। আমরা যারা বেদিয়া তারাই জানি অবাধ মুক্তি কাকে বলে, আমাদের মুক্তি আকাশের উদার আশ্রয়ের নীচে। এই স্বাধীনতা-পাগল বৃদ্ধ জিপসী তার স্ত্রীর অধীনতাও সইতে পারে না, তাই একদিন তার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তাকে খুন করতেও দ্বিধা করল না।

এই গল্পটি তিফলিসের দৈনিক সংবাদপত্র 'ককেসাস' প্রকাশ করার জন্য পেশ করলেন আলেকসী। সম্পাদক বললেন—আপনার নামটা লিখে দিন। আলেকসীর মনে পড়ল জীবনের নিদারুণ ক্লেশের দিন, যার মধ্যে এতটুকু মাধুরী নেই, আছে শুধু তিক্ততার বিষবাষ্প, আর সেই বিষ পান করে তিনি নীলকণ্ঠ। আলেকসী ছদ্মনাম ঠিক করলেন ম্যাকসিম গোর্কী — অর্থাৎ ভাগ্যহীন তিক্ত মানুষ। সেই গল্পটি প্রকাশিত হল যথাসময়ে।

আলেকসী অর্থাৎ ম্যাকসিম গোর্কীর অন্তরে কিন্তু তীব্র জ্বালা। শান্তি নেই, স্বস্তি নেই। পথে-প্রান্তরে, মাঠে-মাঠে সর্বত্র তিনি ঘুরেছেন শান্তির সন্ধানে। কিন্তু শান্তির চিহ্ন কোথাও নেই, চারদিকে শুধু অশান্তি।

এই সময়ে তিফলিসেই আবার দেখা হল ওলগার সঙ্গে। সেদিন সেই ঝড়-জলের রাত্রে ওলগাকে প্রেমিক আলেকসী শুনিয়েছিল তার জীবনের করুণ কাহিনী। ওলগা আলেকসীকে ভালবেসেছিল, বুঝেছিল এই মানুষটার অন্তরে কি জ্বালা— আর সেই সঙ্গে আছে ওলগাকে পাওয়ার সুতীব্র কামনা।

সোজাসুজি কথা না দিলেও ওলগা আলেকসীর সঙ্গে এসে ঘর বাঁধবে এমন কথা জানাল। তাই নির্জান থেকে আহ্বান আসতেই গোর্কী সেই এটর্ণী লানিনের একান্তসচিব হয়ে ফিরে এলেন নিজনিতে। আর কিছুদিন পরে এল ওলগা, সঙ্গে রয়েছে তার ছ বছরের মেয়েটি। অতিসামান্য একটা বাসায় ওদের আশ্রয় দিলেন আলেকসী। এতদিন কোনক্রমে কেটেছে, কিন্তু তিনজনের খরচ চালাবার সংগতি আলেকসীর নেই। তাই জীবনটা বড় কষ্টের হয়ে উঠল। ওলগা সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে, অনেক বেশী বিলাস ও স্বাচ্ছন্দ্যের জীবনের সঙ্গে সে পরিচিত। কিন্তু আলেকসীর বাসায় এই দীন পরিবেশে সে অসুখী নয়। সেও পরিশ্রম করে কিছু কিছু রোজগারের চেষ্টা করে। গোর্কীর সম্বল লানিনের কাছে পাওয়া মাইনে আর কখনোসখনো প্রকাশিত গল্পের জন্য দুই কোপেক। বেশীদিন কিন্তু এই সুখও সইল না। জীবনে অনেক উৎসাহ সঞ্চারিত হল। নতুন লেখার প্রেরণ এল, কিন্তু ওলগার চটুল জীবন আলেকসীর মত মানুষের মনে কিঞ্চিৎ পীড়া দেয়। ওলগার বয়স বেশী, সেই কথা তুলে সে বলে তুমি যদি একটু কম বয়সের মেয়ে পেতে তাহলে বোধহয় খুশি হতে।

এদিকে সাহিত্যজগতে ক্রমশ প্রতিষ্ঠ হচ্ছে আলেকসী পিয়েসকভের। কারলেংকো Volgar Vestnik পত্রিকার সম্পাদক রাইনহার্টের কাছে শুনলেন—আলেকসী ম্যাকসিম গোর্কী এই ছদ্মনামের আড়ালে গল্প লিখছেন। কারলেংকো একদিন দেখা করলেন। শুনলেন তাঁর অভিমানভরা উক্তি। কারলেংকোর তখন বিশেষ প্রতিষ্ঠা, এ ছাড়া তিনি 'রুশকোয়ি বোগাটস্টো' নামক বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন সাময়িকের অন্যতম সম্পাদক। আর একজন সম্পাদক মাইখেলভস্কী। তিনি বিখ্যাত গল্প "চেলকাস" সঙ্গে নিয়ে গিয়ে প্রকাশ করলেন (১৮৯৪) এবং সেদিনই তিনি লক্ষ্য করলেন, আলেকসীর শরীরটা ভেঙে পড়েছে। তাঁরও কানে এসেছিল আলেকসীর ঘরের কেলেংকারী ওলগাকে নিয়ে নানারকম রটনা মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি সস্নেহে বললেন—আলেকসী তুমি যদি সামারায় যাও আমি সব ব্যবস্থা করে দেব। তুমি এখানে আর থেকো না। তুমি আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছ। একি! তোমার যে এখন অনেক কাজ।

এইবার আলেকসীর দেহে যক্ষ্মারোগের লক্ষণ দেখা গেল। মনে পড়ল কারলেংকোর কথা। ওলগাকে বললেন। ওলগাকে আলেকসী সব মন দিয়ে ভালবেসেছিল, চপলা ওলগাও তাকে ভালবাসতেন। দুজনে বাঁধা রইলেন নিবিড় বাহুপাশে অনেকক্ষণ। তারপর ওলগা একটা থিয়েটারে অভিনেত্রী হিসাবে যোগ দিলেন, আর অসুস্থ আলেকসী গেলেন সামারায়।

।। তিন ।।

এই সামারা শহরে দুখানি পত্রিকা ছিল 'সামারা গেজেট' আর 'সামারা ভেস্টনিক'। আলেকসী কাজ নিয়েছিলেন গেজেটে।

সেখানে 'ইহুদী খেরুমিদা' এই ছদ্মনামের আড়ালে আলেকসী স্থানীয় ঘটনার ওপর সুকঠোর মন্তব্য শুরু করলেন। সামারা ভেসতনিক এই আক্রমণে বিব্রত হয়ে আলেকসীর পূর্বজীবনের সংবাদ সংগ্রহ করে মজাদার কেচ্ছা হিসাবে প্রকাশ করতে থাকে।

এই সামারায় প্রায় কুড়িটি বিখ্যাত গল্প লিখেছেন আলেকসী। তার মধ্যে 'ঝড়ো পাখির গান' 'শরৎকালের রাত্রি' প্রভৃতি। এদিকে প্রতিদ্বন্দ্বী 'ভেস্টনিকে'র গালাগালিতে কৌতূহলী হয়ে কিছু তরুণ বুদ্ধিজীবী এসে হাজির হলেন পরিচয় করবার জন্য। তাঁরা আশ্চর্য হলেন আলেকসীর পড়াশোনার পরিচয় পেয়ে আর অপূর্ব আতিথেয়তায়। এই সূত্রে সামারার বুদ্ধিজীবীদের আড্ডায় অর্থাৎ সেখানকার ইহুদী বিচারক টাইটেলের বাড়িতে নিয়মিত যেতে লাগলেন আলেকসী, আর এইখানেই একদিন 'সামারা গেজেটে'র প্রুফরীডার কর্মচারিণী পাভলোভনার সঙ্গে বিয়ের কথা পাকা হয়ে গেল। ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে পাভলোভনা ও আলেকসী দাম্পত্যসূত্রে বাঁধা পড়লেন। কিন্তু এই বছরের শেষের দিকেই আবার তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। যক্ষ্মারোগ তাঁর ফুসফুস আক্রমণ করেছে। এর আগে গুলির আঘাতে আরেকটি ফুসফুস জীর্ণ হয়েছিল। ডাক্তাররা বললেন কোনো স্বাস্থ্যনিবাসে পাঠাতে হবে অবিলম্বে। কিন্তু টাকা কোথায়।

টাকা কিন্তু এল। একটি বিদগ্ধ ছাত্র ম্যাক্সিম গোর্কীর 'চেলকাস' এবং অন্যান্য গল্প সম্পর্কে বিশেষ প্রশংসা করে একটি প্রবন্ধ লিখলেন আর সেই সঙ্গে একথাও জানালেন যে এমন একটি প্রতিভা অচিরে অকালমৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে। 'ওরাজোভানিজে' পত্রিকায় এই নিবন্ধ পাঠ করে একজন চিকিৎসক এই উক্তি সমর্থন করলেন। সেন্ট পীটার্সবার্গের ছাত্র ভ্লাদিমির পসে তখন তার এক ধনী আত্মীয়ের কাছ থেকে আটশত রুবল সংগ্রহ করে দিলেন, আর 'নোভোয়া সেলোভো' নামক পত্রিকায় একটি গল্প বাবদ সংগ্রহ করা হল আরো দেড়শ রুবল। ক্রিমিয়ায় স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য আলেকসীকে পাঠান হল।

শরীরের উন্নতি হল। এখানেও অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য রচনা লিখলেন তিনি। যখন নিজনীতে ফিরে এলেন তখন অনেক সুস্থ।

সাহিত্যিক হিসাবেও ম্যাক্সিম গোর্কীর নাম তখন যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেছে। কিছু কিছু গল্পের জন্য অর্থ আসছে। আর ভ্লাদিমির পসের আগ্রহেই লেখা হল 'একদিন যারা মানুষ ছিল' নামক বিখ্যাত গল্পটি।

১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে 'নোভোয়া সোলোভো' উঠে গেল, কিন্তু তার সম্পাদকমণ্ডলী গোর্কীর গল্পগুলি ছাপাবার জন্য সচেষ্ট হলেন। ভ্লাদিমির পসের প্রচেষ্টা সার্থক হল না। বড় বড় প্রকাশক এই নতুন লোকের রচনা ছাপতে নারাজ, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুজন মার্কসপন্থী ব্যক্তি গল্পগুলি ছাপতে রাজী হলেন। ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত ম্যাক্সিম গোর্কীর প্রথম গল্পের বই দুটি খণ্ডে। তারপর তৃতীয় খণ্ড। অতি অল্পদিনেই নতুন সংস্করণ, এবং লাখ লাখ বিক্রী। কিন্তু ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের আসামী হিসাবে আলেকসীকে গ্রেপ্তার করে তিফলিসের মেটেখ দুর্গে বন্দী করে রাখা হল। আলেকসীর স্ত্রী এই বিপদে দিশেহারা হয়ে সংবাদ দিলেন ভ্লাদিমিরকে। ভ্লাদিমিরের ওপর মহলে যোগাযোগ ছিল। তার আত্মীয়বর্গের দ্বারা সেইখানে প্রভাব বিস্তার করে আলেকসীকে মুক্ত করা হল। কিন্তু পুলিশ এইবার আর তাঁকে সহজে ছাড়বে না, কোথাও একটা চিঠির টুকরো, কোথায় একটি ফটোগ্রাফ এইসব তারা পেয়েছে, তাই নিজনী শহরে তাকে এনে চোখে চোখে রাখা হল।

॥ চার ॥

আলেকসী পিয়েসকভের নবজন্ম ম্যাক্সিম গোর্কী এই নতুন নামে। তাঁর প্রতিষ্ঠা হল রুশ সাহিত্যে। নতুন জীবনে তিনি মানুষকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচনা করে পরিপূর্ণ উদ্যমে সাহিত্যসাধনায় আত্মনিয়োগ করলেন। যৌবনের সেই মধ্যপর্বে গোর্কীর প্রতিষ্ঠা হয়েছে যথেষ্ট সমগ্র রাশিয়ার বুদ্ধিজীবী গোর্কীর রচনায় মুগ্ধ, তারা তাঁকে সর্বদিক থেকে অনুকরণের চেষ্টা করে। যে মাইখেলভস্কী একদিন গোর্কীর 'সমুদ্রতীর' গল্পটি প্রকাশ করতে চান নি তিনি একদিন গোর্কীকে এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যশিল্পী বলে অভিনন্দিত করলেন। এইভাবে ম্যাক্সিম গোর্কী যখন প্রতিভার পরিচয় দিয়ে সুপ্রতিষ্ঠ তখন তাঁর কয়েকটি গ্রন্থ উপহার পাঠালেন অ্যান্টন চেখভকে। চেখভ সেই গ্রন্থগুলি পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্বীকৃতিদান করে পত্র দিলেন আলেকসীকে। যিনি আর আলেকসী নন, ম্যাক্সিম গোর্কী এই নামে যিনি পরিপূর্ণ রূপে বিকশিত, তিনি বার বার পাঠ করলেন সেই চিঠি—

"আপনি শক্তিধর লেখক। আপনার 'স্টেপস' গল্পটির জন্য আমার ঈর্ষার অবধি নেই। এই গল্প আমি লিখতে পারিনি, এর লেখক অন্যজন।"

নতুন উৎসাহে ভরে উঠল আলেকসীর অন্তর। সাহিত্যগুরু চেখভ লিখেছেন এই চিঠি। সেই ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের জন্মদিনে গোর্কী শ্রদ্ধা নিবেদন করতে ছুটলেন ক্রিমিয়ায় চেখভের কাছে। বয়সে প্রায় আট বছরের ব্যবধান, কিন্তু দুজনেই লেখক, দুজনেই ক্ষয়রোগী, দুজনেই মানব-দরদী। চেখভ মহাসমাদরে তাঁকে গ্রহণ করলেন, অনেক উপদেশও দিলেন।

অন্তরে এক আশার বাণী নিয়ে ফিরে এলেন আলেকসী। এর পর আলেকসী গেলেন টলস্টয়ের কাছে। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের একটি সুন্দর দিনে তিনি মহামতি টলস্টয়ের দর্শনে এলেন। এই প্রথম দর্শন তেমন জমল না। টলস্টয় গোর্কীর "ফোমা গার্দিয়েভ" উপন্যাসটি পছন্দ করেন নি। তবে তিনি বুঝেছিলেন গোর্কীর আসল শক্তি কোথায়। 'ফোমা গার্দিয়েভ' 'দি থ্রি' কিংবা "দি অরলোভস্" প্রভৃতি গ্রন্থাবলী টলস্টয় ছাড়া অন্য সমালোচকদেরও প্রশংসায় ধন্য হয়নি।

'ফোমা গার্দিয়েভে' গোর্কী রাশিয়ার পুঁজিবাদতন্ত্রের উদ্ভবের ইঙ্গিত দিয়েছেন। গোর্কীর এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে। কিন্তু তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'মাদার' লিখিত হয়েছে ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে। বিশের দশকে এই উপন্যাসের বাংলায় অনুবাদ হয়েছে এবং এই উপন্যাসের একাধিক বঙ্গানুবাদ আছে। বেহালার মায়ামঞ্চ নামক একটি সৌখীন সম্প্রদায় 'মাদার' উপন্যাসটির সর্বপ্রথম নাট্যরূপ দিয়ে রংগমঞ্চে অভিনয় করেন। মলিনা দেবী সেই নাটকে 'মা'র ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

বাঙালী সাহিত্যিক, শিল্পী ও বিপ্লবীদের কাছে গোর্কী এক অবিস্মরণীয় পুরুষ। এই প্রবন্ধে গোর্কীর জীবনেতিহাসের কিছু অংশ বর্ণনা করা হল। যে কালে ম্যাক্সিম গোর্কীর পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছে এবং বিশেষ করে লেনিন ও গোর্কীর সঙ্গে যোগাযোগ ও উভয়ের মতান্তর এবং মতৈক্য বিষয়ে কোনো কথা ক্ষুদ্র নিবন্ধে বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

গোর্কী নিজেই লিখে গেছেন তাঁর বিচিত্র জীবনের ইতিহাস। পৃথিবীর বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি পাঠ গ্রহণ করেছেন। একই সঙ্গে ভবঘুরে, লম্পট, ও অত্যাচারিত, মানবাত্মাকে এতখানি ঘনিষ্ঠভাবে আর কেউ আঁকতে পারেন নি, একথা টলস্টয়কেও স্বীকার করতে হয়েছে। গোর্কী তাঁর আত্মচরিতে টলস্টয় এবং চেখভ সম্পর্কে গভীর শ্রদ্ধাভরে আলোচনা করেছেন। আবার এমনই শ্রদ্ধা নিয়ে তাঁর "নোটস্ ফ্রম এ ডায়েরী"তে অনেক সাধারণ মানুষের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। সোভিয়েত সাহিত্যের প্রাণপুরুষ আলেকসী পিয়েসকভ যিনি ম্যাক্সিম গোর্কী নামে সবদেশে পরিচিত তাঁর জন্মশতবার্ষিকী তাই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

ভারতীয় সাহিত্য

গিরীশচন্দ্রের জন্মদিন ॥

মহাকবি গিরীশচন্দ্রের জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানটি এবার বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। কলকাতার মেয়র শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দে গত ৬ মার্চ গিরীশ ভবনে নাট্যাচার্যের মূর্তি স্থাপনের জন্য ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং গিরীশভবনের মধ্যে গিরীশচন্দ্রের মূর্তিতে মাল্যদান করেন। মেয়র তাঁর ভাষণে বলেন, "নাট্যজগতে গিরীশচন্দ্রের দান অবিস্মরণীয়। তিনিই প্রথম স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ স্থাপনের শুভ সূচনা করে যান। পৌর-কমিশনার শ্রীদুলালগোপাল মুখোপাধ্যায় গিরীশ ভবনটিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করবার এক প্রস্তাব দেন। প্রস্তাবের সমর্থনে শ্রীসত্যানন্দ ভট্টাচার্য, শ্রীপান্নালাল দাস প্রমুখ ভাষণ দেন। জন্মদিন উপলক্ষে গিরীশ ভবনটি পত্রে পুষ্পে সজ্জিত করা হয়।

বাংলায় পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্য উপদেষ্টা কমিটি গঠিত ॥

উচ্চতর শিক্ষার বাংলায় পাঠ্যগ্রন্থ রচনার জন্য একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক গঠিত এই কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছেন জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসত্যেন বসু।

শ্রীবসু ছাড়াও আর যাঁরা যাঁরা এই কমিটিতে আছেন, তাঁরা হলেন জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী সহ পশ্চিমবঙ্গের সাতটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের সচিব ডি-পি-আই ও মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি।

কে কোন বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক রচনার ভার নেবেন তা জানতে চেয়ে এর মধ্যেই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে চিঠি পাঠান হয়েছে। তাঁদের কাছ থেকে চিঠির উত্তর পাওয়ার পরেই কমিটি এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, বাংলায় পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এক কোটি টাকা মঞ্জুর করেছেন।

নিখিল ভারত কবি সম্মেলন ॥

গত ৭ মার্চ নিখিল ভারত কবি সম্মেলনের দপ্তরে বাংলা দেশের কবি সাহিত্যিকদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন সম্মেলনের সভাপতি শ্রীসতীকান্ত গুহ। তিনি বিস্তৃতভাবে সম্মেলনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলেন এবং সহযোগিতা প্রার্থনা করেন। সম্পাদক শ্রীআশিস সান্যাল কর্মসূচী ব্যাখ্যা করেন।

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে ভাষণ দেন। অন্যান্যদের মধ্যে মনীন্দ্র রায়, তরুণ সান্যাল, জগন্নাথ চক্রবর্তী, শান্তি লাহিড়ী, মনীষা ভট্টাচার্য, মোহিত লাহিড়ী, যোগব্রত চক্রবর্তী, রাণা চট্টোপাধ্যায়, শ্যামল বসু প্রমুখও ভাষণ দেন।

জানা গেছে এই প্রথম 'সর্বভারতীয় কবি সম্মেলনটি" উদ্বোধন করবেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ত্রিগুণা সেন। আগামী ১২, ১৩, ১৪ এপ্রিল কলকাতার 'রবীন্দ্র সদনে' সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হবে। বিভিন্ন দিনের বিভিন্ন অধিবেশনের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন যথাক্রমে শ্রীউমাশঙ্কর যোশী, শ্রীকা-না সুব্রহ্মণ্যম, শ্রীশচী রাউতরায়, শ্রীগোপাল কুরূপ ও শ্রীপারভেজ শাহেদী। পৌরোহিত্য করছেন যথাক্রমে শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র, শ্রীবুদ্ধদেব বসু, শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়, শ্রীঅমলেন্দু বসু, শ্রীবিষ্ণু দে। উদ্বোধন করবেন শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ।

অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশে শ্রেষ্ঠ স্থান ॥

ইউনেস্কোর সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, বিদেশী ভাষা থেকে অনুবাদ-গ্রন্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের স্থান সর্বাগ্রে রয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় সর্বাধিক অনূদিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে ভি আই লেনিনের রচনাবলী। এই পরিসংখ্যান ইউনেস্কোর সাম্প্রতিক অনুবাদ-গ্রন্থপঞ্জীতে প্রকাশ করা হয়েছে। ১৯৬৬ সালে বিশ্বের ৭০টি দেশে অনূদিত গ্রন্থের মোট সংখ্যা ছিল ৩৯২৬৭টি।

পল চেলানের নতুন কাব্যগ্রন্থ ॥

পশ্চিম জার্মানির কবি পল চেলান ১৯৬০ সালে জার্মান ভাষা ও সাহিত্য আকাদেমি প্রদত্ত বুকনার পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছিলেন। সম্প্রতি 'আতেম ওয়েন্ডে' নামে তাঁর একটি নতুন কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এ এক 'রুদ্ধশ্বাস বিরতিহীন কাব্য। আধুনিক কাব্যের প্রকরণ ও প্রকাশে যে উৎকট অশোভনতা প্রকাশিত সেই অভিযোগের সঙ্গে চেলান নিজেকে যুক্ত করতে চান না। তিনি কবিতাকে 'সর্বাত্মক বিশ্লেষণের দীর্ঘায়িত মনোসংযোগ' এবং 'বস্তুর সঙ্গে আপোষহীন সংলাপ' বিনিময় বলে বর্ণনা করেন। চেলানের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'দের স্যান্ড আউস্ দেন উর্নেন' ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত হয়। ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত হয় 'স্প্র্যাক-ইটার্নি'। এই গ্রন্থে তাঁর কাব্যভাষা অধিকতর সংহত।

কেনিয়ান বিপ্লবী-নেতার আত্মজীবনী : নট ইয়েট উহুরু ॥

কেনিয়ার বিপ্লবী-নেতা জারামোগি ওজিঙ্গা ওডিঙ্গার আত্মজীবনী 'নট ইয়েট উহুরু' সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে নিউ-ইয়র্ক থেকে। তার ভূমিকা লিখেছেন কোয়ামে এনক্রুমা।

'উহুরু' শব্দের অর্থ হোল স্বাধীনতা। ওজিঙ্গা ওডিঙ্গার মতে, তাঁর দেশের জনসাধারণ এখনো প্রকৃত স্বাধীন হয়ে ওঠেনি। অথচ দেশবাসী এতদিন সেই স্বাধীনতার স্বপ্নই দেখে এসেছিল। বর্তমানে দেশবাসী যা পেয়েছে, তা হলো একটি আনুষ্ঠানিক বন্ধনমুক্তির ছাড়পত্র। দেশবাসীর বৈপ্লবিক অভিপ্রায় বিদেশী স্বার্থান্বেষী ও স্বদেশী আত্মসুখপরায়ণ রাজনীতিকদের ষড়যন্ত্রে উপযুক্ত প্রকাশের পথ পায়নি। সেখানে এখনো পূর্ণ স্বাধীনতার সংগ্রাম চলছে। মিঃ ওডিঙ্গা বলেন, রাজনীতিকেরা সুখ, সম্পদ প্রতিপত্তি ও ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্সের মোহ ত্যাগ করতে না পারলে দেশের দুর্গতি কখনো যাবে না। এখনো সেখানকার বড় বড়ো ফার্ম মিল কলকারখানা ও ব্যবসায়ী সংস্থাগুলির মালিক শ্বেতাঙ্গ পুরুষেরা। তারা এখন দেশবাসীর মধ্যে অবক্ষয়ী মানসিকতার অনুপ্রবেশ ঘটাবার ব্যাপারে সচেষ্ট। সেইজন্যেই সাময়িকভাবে চুপচাপ করে আছে।

মিঃ ওডিঙ্গা, তাঁর গ্রন্থে কেনিয়ার বর্তমান দুর্গতি ও পূর্ণ-স্বাধীনতার জন্য প্রচুর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেছেন, "জাতীয় পুনর্গঠনের মনোভাবকে এখানে হত্যা করা হয়েছে।" তিনি এখন কেনিয়ার সরকার-বিরোধী দলের নেতা।

গ্রন্থটির বক্তব্য সম্পর্কে হয়তো সকলে একমত হবেন না। তবু একটি স্বাধীনতাকামী মানুষের হৃদয়বেদনা বুঝতে কারো অসুবিধা হয় না। বরং দেশবাসীর প্রতি তাঁর আন্তরিক আবেদন যে কোন পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করে।

সিংহলের লোকনাট্য বিষয়ক গ্রন্থ ॥

সম্প্রতি সিংহল সরকারের সাংস্কৃতিক দপ্তর অধ্যাপক ই আর শরচ্চন্দ্রের লেখা 'দি ফোক ড্রামা অব সিলোন' নামে একটি মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। সিংহলী সাহিত্য ও নাট্যবিষয়ক গ্রন্থের সংখ্যা খুব বেশি নয়। বিশেষতঃ অধ্যাপক শরচ্চন্দ্রের গ্রন্থটি বাদ দিলে লোকনাট্যবিষয়ক প্রামাণ্য গ্রন্থ আর নেই বললেই চলে। এই গ্রন্থটি লেখা হয়েছিল প্রায় ষোল বছর আগে।

শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহেমচন্দ্র গড় ও শ্রীকল্যাণমল লোচা।

আমন্ত্রিত কবিরা, যাঁরা আসবেন বলে জানিয়েছেন তাঁদের মধ্যে নিসিম ইজি-কিয়েল, ও পি ভকত (ইংরেজি), শ্রীকান্ত ভার্মা, অশোক বাজপেয়ী (হিন্দি) সীতা-কান্ত মহাপাত্র, গোপালচন্দ্র মিশ্র (ওড়িয়া), প্রভাকর মাচওয়ে, দিলীপ চিত্রে (মারাঠি), সুরেশ যোশি, উমা পারেখ (গুজরাটি), নীলমণি ফুকন, পরেশমল্ল বড়ুয়া (অসমিয়া), এইচ আই সদারাঙ্গনী (সিন্ধি), মাখদুম মহীউদ্দীন, সুলেমান আরীব (উর্দু), 'শ্রী শ্রী', 'নাগনামুনি' (তেলুগু), দেশিনি, বাণীদশন (তামিল), গোপালন নায়ার পিল্লাই, গোপাল কুরুপ (মালয়ালম), নরস্বামী কে এস, শ্রীআদিগ (কানাড়া), মোহন সিং, ওয়াঙ্গারা বেদী (পাঞ্জাবী), শ্রীনাগার্জুন (মৈথিলি), মহম্মদ আমীন (কাশ্মীরী)। এছাড়াও আরও কয়েকজন কবি এখনও তাঁদের অনুমতিপত্র পাঠান নি।

সম্মেলনে চারটি 'সেমিনারে'র আয়োজন করা হয়েছে। বিষয় হল (ক) অনুবাদের সমস্যা (খ) জাতীয় সংহতি এবং লেখক-দের ভূমিকা, (গ) ভারতে লেখকদের সমস্যা, (ঘ) কবিতায় রূপকল্প।

যে সমস্ত অ-ভারতীয় লেখক ও সমালোচক এই সম্মেলনে যোগ দেবেন বলে জানিয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন ডঃ এ্যালেন ওয়ানট, মার্সিয়া টেরজো, টি ইতো, এ আরউল, ডঃ জর্জ লেসনার প্রমুখ। এই সম্মেলনের প্রতিদিনই সাংস্কৃতিক অনু-ষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। বাংলা দেশের বিখ্যাত শিল্পীরা এতে যোগদান করবেন।

সম্মেলন উপলক্ষে একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশিত হবে। এছাড়াও 'বেঙ্গলি লিটা-রেচার' পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হবে। এই বিশেষ সংখ্যাটি হবে আধুনিক বাংলা কবিতা সম্পর্কে রবীন্দ্র-নাথ থেকে আরম্ভ করে অতি-আধুনিক কবিদের নির্বাচিত কবিতার অনুবাদ এতে সংকলিত হবে।

গল্প বলার প্রতিযোগিতা ॥

গল্প বলার এবং শোনার উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত 'কথাসরিৎসাগর' সম্প্রতি তার দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উৎসব উদযাপন করেছে। কয়েকদিন আগে এই উৎসবকে নিয়েই এঁরা একটি গল্প প্রতিযোগিতা আহবান করেছিলেন। কেবলমাত্র স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আয়োজিত এই প্রতি-যোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে ইন্দিরা লাহিড়ি।

গত ৭ই মার্চ 'রবীন্দ্রসদনে' এঁদের বার্ষিক উৎসব উদযাপিত হয়। এই উৎসবে পৌরোহিত্য করেন শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন—"ছোটদের গল্প বলতে শেখাবার কাজে কথাসরিৎ-সাগরের এই প্রচেষ্টা অভিনন্দনযোগ্য। তাঁরা সাফল্যলাভ করুক, এই তাঁর কামনা।" অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ থেকে শ্রীমতী ইলা পালচৌধুরী সকলকে স্বাগত জানান। শ্রীবিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য এই সংগঠনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে ভাষণ দেন। উৎসবে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছিল।

বিধায়ক ভট্টাচার্য পুরস্কৃত ॥

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৬৭ সালের জন্য 'সুধাংশুবালা পুরস্কার'টি লাভ করেছেন বাংলার অন্যতম প্রখ্যাত নাট্যকার শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য। 'এন্টনী কবিয়াল' নামক নাটকের জন্য তিনি এই পুরস্কার লাভ করেছেন। বাংলায় লিখিত নাটকের মধ্যে এই নাটকটিই বছরের সেরা নাটকরূপে বিবেচিত হয়েছে।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

তারপর পুনর্মুদ্রণের অভাবে সাধারণ পাঠক এর কথা ভুলতে বসেছিলেন। সিংহল সরকারের সাংস্কৃতিক দপ্তরের সময়োপ-যোগী হস্তক্ষেপে সেই অভাব দূর হলো।

একশ আশি পৃষ্ঠার এই গ্রন্থের অন্যতম আকর্ষণ উনচাল্লিশটি একরঙা ও বহুরঙা ছবি। একে সিংহলের লোক-জগতে বিচরণের একটি সুন্দর উদ্যান বলা যায়। ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে ভারতের সঙ্গে জড়িত এই দ্বীপময় রাষ্ট্রটির সাহিত্য-সংস্কৃতির সংবাদ পৃথিবীর বহু দেশের মানুষই জানেন না। পশ্চিমী দুনিয়ার মানুষের কাছে এই দেশটি আজও তার নাট্যমানচিত্রের বহির্ভূত একটি অনাদৃত দেশ। অধ্যাপক শরচ্চন্দ্র গভীর পরিশ্রম ও নিষ্ঠায় এবং বিষয়গত গৌরবে গ্রন্থটিকে অসামান্য করে তুলেছেন।

বইটি আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত। এই সকল অধ্যায়ে লেখক সিংহলের সংগীত ও দানব-নৃত্য, মুখোশ-নাট্য ও রোমান ক্যাথলিক ভাবাবেগ, ধর্ম ও পেশাগত গ্রামীন শিকারি নাটকের মনোজ্ঞ বিবরণ দিয়েছেন। এই সঙ্গে রয়েছে—হাস্য ও বিদ্রূপাত্মক নাটক ও গান, পুতুল নাচ, গ্রাম্য-অপেরা, পালাগান ও আধুনিক নাটকের পরিচয়। আবিষ্কারকের দৃষ্টিকোণ থেকে লেখক আলোচ্য বিষয়ের বিশ্লেষণ করেছেন। এর জন্য তাঁকে পরিশ্রমও করতে হয়েছে প্রচুর। শহর থেকে অনেক দূরের গ্রামে তিনি গিয়েছেন এবং যেখানে যা পেয়েছেন—তা সংগ্রহ করে এ গ্রন্থের পাঠকদের উপহার দিয়েছেন। এছাড়াও তিনি পাহাড়ীগ্রামে যে সকল অনুষ্ঠান ও নাট্যাভিনয় দেখেছেন, তার পরিচয় দিতে লেখক সর্বদাই অনাবশ্যক বিস্তৃতি ও জটিলতার পথকে বর্জন করেছেন। বইটি পড়তে পড়তে মনে হয় পাঠক যেন কোন সিংহলী-পরিবেশে পাখির গান শুনছেন কিংবা কোন অনুষ্ঠানে নৃত্য দেখছেন। এই ছোট্ট দেশটির অরণ্যময় পাহাড়ী-এলাকা, তার আবেগময় মানুষ, রৌদ্র ও বৃষ্টিপতনের

বিদেশী সাহিত্য

সংবাদ, গভীরতম অন্তরঙ্গতায় পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করে। উজ্জ্বল রঙের কিছু ছবি, এবং নাট্যাভিনয়ের কয়েকটি দৃশ্য, যা বিদেশী পর্যটকেরা কোনদিন দেখতে পাবেন না এবং অপ্রচলিত কিছু গানের উদাহরণ, শুধু সিংহলের নয়—দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্মৃতিকেও পুনরায় মনে করিয়ে দেয়।

পোলিশ গল্পকারের অনূদিত গল্পগ্রন্থ ॥

প্রখ্যাত পোলিশ গল্পকার তাদেউজ বরোস্কির গল্পগ্রন্থ 'দিস ওয়ে ফর দি গ্যাস ঃ লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলমেন' সম্প্রতি ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। গল্পগুলি লিরিক মেজাজের আবরণে বিদ্রূপাত্মক রচনা। প্রতিটি গল্প যেন এক-একটি যন্ত্রণা ও নিষ্ঠুরতার শিল্পসম্মত উপহার। লেখক নিজের জীবন-অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই নাকি এসব গল্প লিখেছেন। অনেক সময় মনে হয়, এ গ্রন্থের পাঠক যেন একটি ভয়াবহতা ও পাগলামির মধ্যে বাস করছেন।

বরোস্কি ১৯৪৩ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত জেলে বন্দী ছিলেন। ১৯৫১ সালে গ্যাস গ্রহণ করে আত্মহত্যা করেন

নতুন বই

নানান দেশের নানান সমাজ :

ডঃ দিলীপ মালাকার। প্রকাশ ভবন : ১৫ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট কলকাতা-**১২। দাম : চার টাকা।**

দিলীপ মালাকার প্রখ্যাত সংবাদিক। বিভিন্ন সময়ে তিনি পৃথিবীর নানা দেশ ঘুরেছেন চোখ মেলে কখনও অবাক বিস্ময়ে কখনও সকৌতুকে সে-সব জায়গার মানুষ দেখেছেন কান পেতে তাদের হৃদ-স্পন্দন অনুভব করতে চেষ্টা করেছেন। সেই দেখা-শোনা এবং জানার অনুপম ফসল 'নানান দেশের নানান সমাজ'।

'নানান দেশের নানান সমাজে'র পাতায় পাতায় উজ্জ্বল মণিখণ্ডের মত অসংখ্য সমাজ-ভাবনা জড়িয়ে আছে। এই গ্রন্থে মালাকার নানা দিকের কয়েকটি জানলা খুলে দিয়েছেন। তার ভেতর দিয়ে ইওরোপের জিপসি সামাজিক যেমন দেখা যায় তেমনি মার্কিন পরিবার ফরাসী বিয়ে, রুশীদের জীবনযাত্রা, নারীপ্রগতি, বিভিন্ন দেশের জন্ম-নিয়ন্ত্রণ, পূর্ব পাকিস্তানের পার্বত্য জাতিদের জীবনকথা—কত বিচিত্র প্রসঙ্গের মেলাই না সাজান।

দেশ-বিদেশ নিয়েই মগ্ন থাকেন নি গ্রন্থকার; ঘুরে ঘুরে বার বার নাড়ির টানেই বুঝি স্বদেশের দিকে তাঁকে চোখ ফেরাতে হয়েছে। তাই বাঙলা দেশের অগণিত সমস্যাও এ গ্রন্থের কয়েকটি আলোচনায় ছায়াপাত করেছে।

নানান দেশের নানা মানুষের বহু বিচিত্র কথা কখনও আমাদের মুগ্ধ কখনও চমৎকৃত, কখনও বা বিষণ্ণ করে তোলে। এ গ্রন্থটির মধ্য দিয়ে মোটামুটিভাবে পৃথিবী-প্রদক্ষিণের আস্বাদ পাওয়া যায়।

লেখকের ভাষা ঝরঝরে। বর্ণনাভঙ্গি উজ্জ্বল; তার সঙ্গে সরস কৌতুকের একটু সোনালী আভা যেন মেশানো। গ্রন্থের নানা প্রসঙ্গ এমনভাবে সাজান যাতে নীরসতার অবকাশ নেই; দিলীপ মালাকার শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পাঠকের কৌতূহল জাগ্রত রাখতে পেরেছেন। 'নানান দেশের নানান সমাজ' নিঃসন্দেহে আদৃত হবে। ছাপা, বাঁধাই এবং প্রচ্ছদ রুচিশোভন।

প্রফুল্ল রায়

গৌড় ও পাণ্ডুয়া (ইতিহাস)—কালীপদ

লাহিড়ী। মালদহ সমবায় মুদ্রণী লিঃ, মালদহ থেকে প্রকাশিত। দাম : চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

বঙ্কিমচন্দ্র একসময় বলেছিলেন : "সাহেবরা যদি পাখী মারিতে যান, তাহারও ইতিহাস লিখিত হয় কিন্তু বাঙ্গালার ইতিহাস নাই। গ্রীনলণ্ডের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে, মাওরি জাতির ইতিহাসও আছে। কিন্তু যেদেশে গৌড়, তাম্রলিপ্ত, সপ্তগ্রামাদি নগর ছিল, যেখানে বৈষ্ণবচরিত ও গীতগোবিন্দ লিখিত হইয়াছে, যে দেশ উদয়নাচার্য, রঘুনাথ শিরোমণি ও চৈতন্যদেবের জন্মভূমি সে দেশের ইতিহাস নাই। মার্শম্যান, স্টুয়ার্ট প্রভৃতি প্রণীত পুস্তকগুলিকে আমরা ইতিহাস বলি, সে কেবল সাধপূরণ মাত্র।"

এ আক্ষেপ স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে অনেকখানি দূর হইয়াছে। হুগলী, মেদিনীপুর, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলার ইতিহাস এবং বাংলা ও বাঙালীর ইতিহাসও কয়েকখানি রচিত হয়েছে। তবে এইসব রচনাকে কখনও স্বয়ংসম্পূর্ণ বলা যায় না। প্রতিদিনই কিছু কিছু নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হচ্ছে। সেইসঙ্গে ইতিহাসকে নতুন করে লেখবার প্রয়োজনও দেখা দিচ্ছে।

শ্রীকালীপদ লাহিড়ীর 'গৌড় ও পাণ্ডুয়া' গ্রন্থখানির দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। একসময়ে বাংলার রাজধানী ছিল গৌড় পাণ্ডুয়া। আর গৌড় ছিল পূর্ব-বাঙলা বাদে অধিকাংশ বাঙলা দেশ। নানান উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে এই অঞ্চল বিভিন্ন নামে বিভিন্ন রূপে আজও বর্তমান। সেন এবং পাল রাজত্বের সময়ে বিশেষ করে পাল রাজত্বে গৌড়ের অভূতপূর্ব উন্নতি হয়। বহু প্রাচীন মন্দির মসজিদ এবং পুরাকীর্তির নিদর্শন রয়েছে গৌড়ভূমিতে। প্রাচীন গৌড়ের অভ্যুদয় সমৃদ্ধি এবং পতনের কাহিনী নিয়ে রচিত হয়েছে বর্তমান গ্রন্থখানি।

পাণ্ডুয়ার ইতিহাস বহু প্রাচীন। ঋগ্বেদেও এর উল্লেখ রয়েছে। গ্রন্থকার পাণ্ডুয়ার ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডুয়ার প্রাচীন ভগ্নাবশেষ সেলামি দরজা সোনা মসজিদ, আদিনা মসজিদ প্রভৃতি সম্পর্কে পরম নিষ্ঠার সঙ্গে আলোচনা করেছেন।

তারপর গৌড়ের ভৌগোলিক অবস্থান উৎপত্তি, বাণিজ্য, ক্রীড়া, পাল সেন ইত্যাদি বিভিন্ন রাজবংশ, বৈষ্ণব, শৈব বৌদ্ধ জৈন ব্রাহ্মণ্য বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়, মুসলমান আক্রমণ, গৌড়ে মুসলমান অধিকার প্রাচীন গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ প্রভৃতি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। এইসঙ্গে আছে প্রাচীন মালদহের কথা। মালদহে ব্যবসা-বাণিজ্যের অগ্রগতি যেমন ছিল গৌরবের তেমনি বিভিন্ন সময়ে এখানকার সামাজিক এবং রাজনৈতিক ইতিহাসও ছিল বেশ আকর্ষণীয়।

গ্রন্থকার লক্ষ্মণ সেন সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাতে নতুন আলোকপাত করেছেন। রাজা লক্ষ্মণ সেন বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে নবদ্বীপ ত্যাগ করে পূর্ব-বঙ্গে গমন করেন, এ সিদ্ধান্ত কতদূর অলীক কল্পনা, শ্রীলাহিড়ী প্রমাণসহ তা ব্যাখ্যা করেছেন।

তাছাড়া লেখক প্রাচীন কাহিনী বা কিংবদন্তীকে ইতিহাসের তথ্যের ভিত্তিতে বিচার করেছেন। সেকালের সামাজিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের পূর্ণাঙ্গ রূপকে তুলে ধরবার জন্য তাঁর প্রয়াস নিঃসন্দেহে ধন্যবাদার্হ। প্রাচীনকালের লুপ্ত ইতিহাসকে তুলে ধরে একালের জাতীয় চেতনার সঙ্গে সংযোগসূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তা বিদগ্ধ পাঠকমাত্রেই জানেন। বহু জ্ঞাতব্য তথ্য ও চিত্র গ্রন্থখানির মূল্যবৃদ্ধি করেছে। বাংলাদেশ এবং বাঙালী সম্পর্কে যাঁরা আগ্রহী তাঁদের কাছে এই গ্রন্থখানি অপরিহার্য মনে হবে।

গ্রন্থশেষে একটি সুদীর্ঘ তালিকায় মুসলমান বিজয়ের পর থেকে আকবর বাদশা কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের সময় পর্যন্ত বাংলার শাসনকর্তাদের নাম ও রাজত্বকালের তালিকা দেওয়া হয়েছে।

পত্র-পত্রিকা

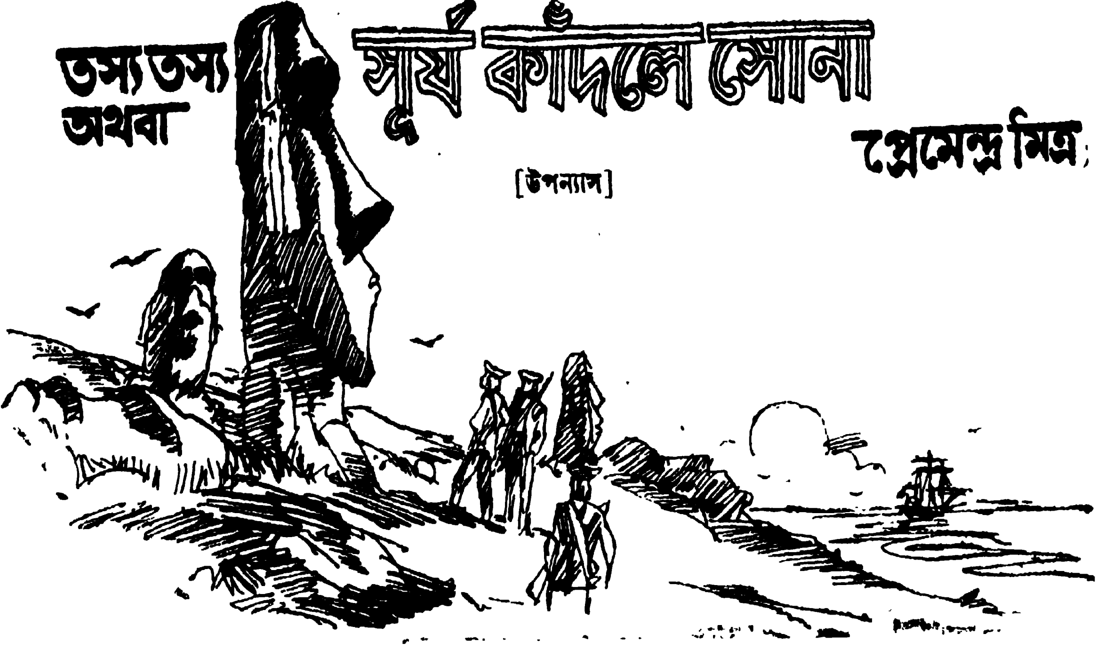
মধুপর্ণী : সুধীর করণ সম্পাদিত এবং আলোক মজুমদার কর্তৃক পশ্চিম দিনাজপুর সাহিত্য-সংস্কৃতি পরিষদের পক্ষে প্রকাশিত। দাম : ১.২৫

মধুপর্ণীর বসন্ত সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। নানা কারণেই বর্তমান সংকলনটি উল্লেখযোগ্য। এ সংখ্যায় প্রবন্ধ লিখেছেন সরোজ আচার্য মিহিরকুমার মুখোপাধ্যায়, রাধামোহন মহান্ত; কবিতা লিখেছেন বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশির মজুমদার, পূর্ণজিৎ দেব, মফিজুদ্দীন, গোবিন্দ হালদার এবং গল্প লিখেছেন শিশির সরকার, শিবানী দাস, মলয় রায়। মধুপর্ণীর এই সংখ্যাটি বেশ পরিচ্ছন্ন রুচির পরিচয় বহন করছে।

●

প্রবাহিনী : জয়ন্ত গোস্বামী। প্রবাহিনী পরিষদ (অযোধ্যাহাট, বেনাপুকুর হাওড়া) কর্তৃক প্রকাশিত।

প্রবাহিনীর বর্তমান সংখ্যায় কবিতা লিখেছেন কৃষ্ণ ধর, গণেশ বসু, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, গল্প ও প্রবন্ধ লিখেছেন মদনমোহন কাব্যরত্ন, গুণধর প্রামাণিক, জাহানারা বেগম। প্রবাহিনীর কিশোর বিভাগ বিশেষ আকর্ষণীয় হয়েছে।



তস্য তস্য অথবা সূর্য কাঁদলে সোনা

[উপন্যাস]

প্রেমেন্দ্র মিত্র

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ইংরেজদের কাছেও কূটনীতির যে নব-কৌটিলের নাম পৌঁছোয়নি, তা তখনই শুনেছিলেন শুধু আপনার সেই গানাদো!

শিবপদবাবুর বিস্মিত মন্তব্যে বিদ্রূপের খোঁচা নিশ্চয় একটু ছিল, কিন্তু দাসমশাই-এর নির্বিকার প্রশান্তি তা ভেদ করতে পারল না।

বরং এরকম একটা উপযুক্ত প্রশ্নে যেন খুশি হয়ে তিনি ব্যাখ্যা করে বোঝালেন—হ্যাঁ ঘনরাম তা শুনেছিলেন আর শোনা খুব একটা আশ্চর্য কিছুও নয়। নিককলো দি বের্ণাদো মাকিয়াভেলী মাত্র পাঁচ বৎসর আগে ইটালীর ফ্লোরেন্সে মারা গেছেন। ইটালী আর স্পেনের দূরত্ব এমন কিছু নয় আর ইংরেজরা না জানলেও লাটিন দেশগুলিতে সে-যুগে জ্ঞান বিদ্যা রাজনীতির চর্চা যাঁরা করতেন ইতালীর এই অসামান্য মানুষটির খবর তাঁরা অনেকেই রাখতেন—বিশেষ করে গনজালো ফার্নানডেজ দে ওভিয়েডো ঈ ভালডেজ-এর মত স্বনামধন্য মানুষ ত বটেই। তিনি রাজনীতির পণ্ডিত শুধু ছিলেন না, এক সময়ে ইটালী গিয়ে নেপল্‌সের রাজা ফার্ডিন্যাণ্ডের অধীনে কাজও করেছেন। গানাদো বলে যাঁর পরিচয়, এককালে এই ওভিয়েডোর কাছেই তিনি ক্রীতদাস ছিলেন। লেখাপড়া শেখবার সুযোগও পেয়েছিলেন সেইখানেই। মাকিয়াভেল্লীর নাম সুতরাং তাঁর অজানা থাকাটাই অস্বাভাবিক।

সব ত বুঝলাম!—শিবপদবাবু আর বোধহয় নীরব থাকতে পারলেন না—কিন্তু আসলে ব্যাপারটা হল কি। পিজারোর গোপন মন্ত্রণাসভায় হেরাদা চুরি-করা বিদ্যে জাহির করে কি বলেছিল কি? যা বলেছিল তার সঙ্গে মাকিয়াভেল্লীর কি এমন সম্পর্ক যে, সে-নামটা শোনালেই মুখে নুন-দেওয়া জোঁকের মত সে জব্দ হবে ভেবেছিলেন আপনার গানাদো?

হেরাদার কাছে মাকিয়াভেল্লী নামটা কেন জোঁকের মুখে নুনের মত জিজ্ঞাসা করছেন?—পরম ধৈর্য আর অনুকম্পার সঙ্গে বললেন, দাসমশাই,—তাহলে হেরাদা মন্ত্রণাসভায় যা বলেছিল, সেইটে একটু বিশদভাবে আগে শোনা দরকার। হেরাদা সিসিলি দ্বীপের অ্যাগাথক্লিস-এর নাম করে তার উপায় নিতে বলেছিল। উপায়টা কি আর অ্যাগাথক্লিস-ই বা কে? অ্যাগাথক্লিস বড় ঘরের ছেলে নয়, একেবারে অতি সাধারণ দীন দরিদ্র এক কুমোরের ছেলে। বেপরোয়া সাহস আর বদমায়েসী বুদ্ধির জোরে সে সিরাকুস নগরের প্রধান পর্যন্ত হয়। তারপর সিরাকুস-এর শাসন-পরিষদের সমস্ত নগরপ্রধানদের সে একদিন সকালে ডেকে পাঠিয়ে জড় করে তার নিজের সেনাদের দিয়ে অতর্কিতে নির্মমভাবে হত্যা করায়। হোমরা-চোমরাদের একজনও এ-মরণফাঁদ থেকে রেহাই পায় না। এইভাবে পথের সব কাঁটা সরিয়ে অ্যাগাথক্লিস সিসিলির রাজদণ্ড অনায়াসে শুধু নীচ নৃশংসতার জোরেই অধিকার করে।

হুঁ,—শিবপদবাবুর মুখে এবার একটু গর্বের হাসি ফুটল,—এসব ত মাকিয়াভেল্লীর 'দ্য প্রিন্স' মানে রাজপুত্র বই-এ আছে। তাই থেকে নেওয়া।

না।—দাসমশাই গম্ভীর প্রতিবাদে শিবপদবাবুকে নীরব করে পাণ্ডিত্যের শিলাবৃষ্টি করলেন,—মাকিয়াভেল্লী বিখ্যাত হয়ে আছেন, অবশ্য যাকে 'দ্য প্রিন্স' বা রাজপুত্র বলছেন সেই 'ইল প্রিনসিপে' বইটির জন্যে। এ-বইটি পের কুসসিনা গ্রামের উপান্তে তাঁর বিশ্রামাবাস থেকে ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে মাকিয়াভেল্লী শেষ করেন। 'ইল প্রিনসিপে' বইটি আসলে কিন্তু আরো একটি বড় বই। 'ডিসকোরসি সোপ্রা লা প্রাইমা দেকা দি টিটো লিভিয়া'-র একটি অংশ মাত্র। এই বড় বইটি লেখা শুরু হয় 'রাজপুত্র'-এর আগে, শেষও হয় অনেক পরে। মাকিয়াভেল্লী ছিলেন প্রাচীন রোমক ঐতিহাসিক লিভি অর্থাৎ টাইটস লিভিয়স-এর দারুণ ভক্ত। ওই বড় বইটির লম্বা নামটার বাংলা মানে হল: 'লিভির দশকগুলি সম্বন্ধে আলোচনা'। 'লিভি'-র বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে ইউরোপের মধ্যযুগের নব-কৌটিল্য মাকিয়াভেল্লী তাঁর বিচক্ষণ কূটনীতির পুরো পরিচয় ওই বড় বইটিতে রেখে গেছেন। হেরাদার সেই বইটি কোনরকমে পড়া ছিল। তাই বেমালুম গাপ করে সে পিজারোর মন্ত্রণাসভায় নিজের বলে চালিয়ে বাহাদুরী দেখিয়েছে...

আর গানাদো মানে ঘনরাম তা ধরে ফেলেছেন!—এতক্ষণ আচ্ছন্ন অভিভূত থাকার পর শিবপদবাবুর স্বরে একটু ঝাঁজ ফুটে উঠল,—কিন্তু তাতে হল কি!

যা হল তা বড় সাংঘাতিক!—দাসমশাই সকলকে যেন তৈরী হবার সুযোগ দিতে একটু থেমে হঠাৎ নাটকের যবনিকা তুললেন,—চার শ' বছরের প্রাচীন দোর্দণ্ডপ্রতাপ ইংকা রাজশক্তি কর্ডিলিয়েরার তুষার-ঢাকা পার্বত্য সাম্রাজ্য থেকে কুয়াশার মত চিরকালের জন্যে মিলিয়ে গেল।

মিলিয়ে গেল!—উদরদেশ যাঁর কুম্ভের মত স্ফীত, ভোজনবিলাসী সেই রামশরণ-

বাবুর কণ্ঠ থেকে বিমূঢ় আক্ষেপ শোনা গেল,—কেমন করে?

যেমন করে মিলিয়ে গেল তা প্রায় অবিশ্বাস্য।—দাসমশাই বলে চললেন,—মাত্র বাষট্টি জন সওয়ার আর একশ' ছ'জন পদাতিক যাঁর সম্বল, ইংকা সম্রাটের নিজের দুর্গনগরে অগণন বিপক্ষবাহিনীর মধ্যে যিনি একরকম বন্দী, সেই পিজারো এক কল্পনাতীত স্পর্ধা দেখিয়ে এ অসম্ভব সম্ভব করে তুললেন।

একটি বিশেষ দুঃখের কথা এই যে, ঘনরাম সম্পূর্ণভাবে এই ব্যাপারটার প্রত্যক্ষ-দর্শী হবার সুযোগ পাননি।

যে-রাত্রে দে সটোর কাছে মন্ত্রণাসভার বিবরণ তিনি শোনেন, তারপরের দিন সকালে কাক্সামালকার পাহাড়-ঘেরা উপত্যকাটির অন্ধিসন্ধি ভালো করে একটু জানবার জন্যে একা একাই তিনি একটু বেরিয়েছিলেন।

তারিখটা ষোলই নভেম্বর, ১৫৩২, শনিবার।

ইংকা আতাহুয়ালপা সেইদিনই পাল্টা লৌকিকতা করতে সদলে পিজারোকে দর্শন দিতে আসবেন এরকম একটা কথা ঘনরাম শুনেছিলেন। কিন্তু আতাহুয়ালপা এত তাড়াতাড়ি সে-অনুগ্রহ করবেন, ঘনরাম তা বিশ্বাস করতে পারেননি।

সেইখানেই তাঁর সর্বনাশা ভুল।

এ-ভুল না করলে ইংকা সাম্রাজ্যের ইতিহাস কি ভিন্ন হ'ত?

তা হয়ত হত না, কিন্তু পিজারো আর তাঁর বাহিনীকে ইচ্ছাপূরণের জন্যে আর একটু বেশী দাম দিতে হ'ত নিশ্চয়।

ঘনরাম নিশ্চিন্ত নিরুদ্বিগ্ন মন নিয়েই সকালবেলা একটি ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়েছিলেন। ডিম্বাকৃতি কাক্সামালকা উপত্যকার চারিধারে কঠিন আকাশছোঁয়া পর্বতপ্রাচীর। সেই পর্বতপ্রাচীর সত্যিই কতখানি দুর্ভেদ্য, তা জেনে আসা ঘনরামের প্রয়োজন মনে হয়েছিল।

বেলা দুপুর পর্যন্ত দূরে পাহাড়ের কোলে কোলে কাটিয়ে ঘনরাম ফিরে এসে শহরে ঢুকতে গিয়ে অবাক হয়েছেন। শহরের চেহারাই বদলে গিয়েছে। চারিদিকে উৎসবমত্ত জনতার উত্তেজিত আনন্দ কোলাহল। তার ভেতর দিয়ে ইংকা নরেশ আতাহুয়ালপা সদলবলে পিজারোকে দর্শন দিতে আসছেন।

শোভাযাত্রার সামনে আসছে অসংখ্য অনুচর। ইংকা নরেশের যাত্রাপথে এতটুকু আবর্জনা কোথাও যাতে না থাকে তার জন্যে তারা আগে আগে পথ পরিষ্কার করতে করতে চলেছে। তার পরে আসছে অভিজাত ইংকা প্রধানরা সারিবদ্ধ হয়ে। তাদের মধ্যে যারা মানে সবচেয়ে বড় ইংকা সম্রাটকে তাঁর শিবিকায় তারা কাঁধে করে বয়ে নিয়ে আসছে।

ইংকা নরেশের অভিজাত সব সেবকের সারা অঙ্গে বিচিত্র সব সোনার অলঙ্কার। বিকেলের রোদে সেই সব স্বর্ণালঙ্কার যেন আগুনের মত জ্বলছে।

অভিজাত অনুচর আর সেবক ছাড়া ইংকা নরেশের শোভাযাত্রায় আছে অগণন সৈন্যসামন্ত। রাজপথে তাদের সকলকে কুলোয় নি। বেশীর ভাগ পথের ধারের প্রান্তরে যতদূর দৃষ্টি যায় ছড়িয়ে পড়েছে।

ঘনরাম তাঁর ঘোড়াটি এক জায়গায় বেঁধে রেখে এসে কাক্সামালকার নাগরিকদের সঙ্গে মিশে এ দৃশ্য দেখছিলেন।

দেখতে দেখতে মনে তাঁর একটু আশঙ্কাই জেগেছে। ইংকা আতাহুয়ালপা এত সমারোহ করে পিজারোকে দেখা দিতে আসছেন শুধু কি নিজের ঐশ্বর্যের পরিচয় দিয়ে এসপানিওলদের চমকে দিতে? না এই দেখা দিতে যাওয়ার মধ্যে ভয়ানক কোনো উদ্দেশ্য সত্যিই আছে?

ইংকা নরেশের অনুচরদের ভালো করে লক্ষ্য করে সেরকম সন্দেহের কারণ আছে বলে কিন্তু মনে হয় নি। তাদের ভাবভঙ্গি চালচলনে উৎসবের আনন্দমত্ততার লক্ষণই দেখা গেছে। মনে মনে অন্য অভিসন্ধি থাকলে দু' একজনের পক্ষে তা হয়ত গোপন করা সম্ভব কিন্তু এত বড় বিশাল বাহিনীর সকলেই অমন নিপুণ অভিনেতা নিশ্চয় হতে পারে না।

ইংকা নরেশের এটা কপট মিছিল নয় বোঝবার পরও কেন যে মনটা তাঁর সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়নি, ঘনরাম সত্যিই তখন ভেবে পান নি।

আতাহুয়ালপার একটি সিদ্ধান্তে ঘনরাম কিছুটা তবু আশ্বস্ত হয়েছেন। পিজারো আর তাঁর বাহিনী নগরের যে অতিথি মহল্লা অধিকার করে আছে তার আধমাইলটাক দূরে এসে শোভা-যাত্রা থেমে গেছে। থেমে গেছে আতাহুয়াল-পারই আদেশে।

চারিদিকের মাঠে শিবির পাতবার আয়োজন দেখে ঘনরাম বুঝেছেন ইংকা নরেশ সে রাত্রের মত তাঁর বাহিনী নিয়ে সেখানেই কাটাতে চান।

ঘনরাম এবার নাগরিকদের ভিড় ঠেলে নিজেদের আস্তানার দিকেই এগিয়েছেন। কিন্তু বেশীদূর যাবার সুযোগ তাঁর হয় নি। রাজপথ মুক্ত রাখবার জন্যে আবার নাগরিক-দের পথের পাশে সরিয়ে দিয়েছে ইংকা নরেশের সেবকবাহিনী।

জানা গেছে যে আতাহুয়ালপা তাঁর মত পরিবর্তন করেছেন পিজারোর খাতিরে। ইংকা নরেশকে রাত্রের মত অতিথিপল্লী থেকে দূরে মুক্ত প্রান্তরে বিশ্রামের আয়োজন করতে দেখে পিজারো দূত পাঠিয়ে তাঁকে এ সংকল্প ত্যাগ করবার অনুরোধ জানিয়েছেন। অনুরোধের কারণ বলা হয়েছে এই, যে পিজারো সেই রাত্রেই মহামান্য ইংকা অধীশ্বরের অভ্যর্থনার আয়োজন করে সেই সঙ্গে ভোজন-সভার সব ব্যবস্থা করেছেন। ইংকা নরেশ তাঁদের অনুগ্রহ না করলে সমস্ত আয়োজনই শুধু পণ্ড হবে না মনে মনে পিজারোর বাহিনীর সকলে অত্যন্ত দুঃখ পাবে।

পিজারোর অনুরোধ রক্ষা করতে আতাহুয়ালপার রাজকীয় শোভাযাত্রা আবার অগ্রসর হয়েছে।

এবার আগের চেয়ে কাছে দাঁড়িয়ে ঘনরাম ইংকা নরেশ আর তাঁর বাহক-সেবকদের শোভাযাত্রা দেখবার সুযোগ পেয়েছেন।

আতাহুয়ালপার অনুচরদের বেশভূষা অত্যন্ত বিচিত্র ত বটেই, তাঁর নিজের পোশাকপরিচ্ছদ অলঙ্কারও অপূর্ব।

যে শিবিকায় তাঁকে বয়ে নিয়ে আসা হচ্ছে তা সোনা রুপোর পাত দিয়ে মোড়া আর নানা বিচিত্র রংবেরংয়ের পাখির পালক দিয়ে অপূর্ব শোভায় সাজানো। এই শিবিকার ওপর নিরেট সোনার তৈরী একটি সিংহাসনে আতাহুয়ালপা বসে আছেন। আগের রাত উপবাসের দিনের সঙ্গে আতাহুয়ালপার এদিনের সাজসজ্জার অনেক তফাৎ। রাজচক্রবর্তীর নিদর্শনস্বরূপ কপাল ঢাকা রাঙা 'বোর্লাটি' তাঁর মাথায় আগের দিনের মতই আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে গলায় যে অসাধারণ পান্নার মালাটি দেখা যাচ্ছে তা পিজারোর নিজের দেশের যে কোনো জহুরীর চোখ ধাঁধিয়ে দেবার মত।



বি. সরকার এণ্ড সন্স
সন অব লেট এম. বি. সরকার
১২৪, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২, ফোনঃ ৩৪-৯২০৩


প্রস্তুতকারক :
কিং এণ্ড কোং কলিকাতা

কিং কোং'র
আর্ণিকা
হেয়ার অয়েল
একমাত্র পরিবেশক :
আর. ডি. এম এণ্ড কোং
২১৭, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬
ফোন : ৩৪-৩৮৩৬

সাজপোশাক অলঙ্কারের চেয়ে আতাহুয়ালপার চেহারা ও মুখের ভাবই ফনরাম বেশী করে লক্ষ্য করেছেন।

সত্যিই বেশ একটু সশঙ্ক সম্ভ্রম জানাবার মত চেহারা। চার শ' বছরের মহিমান্বিত ইংকা রক্তের ধারা তাঁর মুখে অনায়াস অসামান্য আভিজাত্য ফুটিয়ে তুলেছে।

ইংকা নরেশের শিবিকা বহন করে বিরাট শোভাযাত্রা ধীরে ধীরে এবার অতিথি পল্লীর প্রশস্ত চত্বরে প্রবেশ করেছে।

রাজশিবিকাকে পথ করে দেবার জন্যে ইংকা নরেশের নিজের বাহিনীর লোকেরা দুধারে সরে গিয়েছে। সমস্ত ব্যবস্থা সুশৃঙ্খল। কোথাও একটু বিভ্রান্তি কি গোলযোগ নেই। ইংকা নরেশের হাজার পাঁচেক সেবক অনুচর তখন অতিথিভবন বেষ্টিত মহাচত্বরে সমবেত।

নিঃশব্দে আতাহুয়ালপার শিবিকা চত্বর পার হয়ে সামনের মহামণ্ডপের প্রায় কাছাকাছি গিয়ে হঠাৎ থেমেছে। থামবার আদেশ আতাহুয়ালপা নিজেই দিয়েছেন। তাঁর প্রশান্ত গম্ভীর মুখে এবার একটু সন্দিগ্ধ ভ্রুকুটি দেখা গেছে। সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

যাদের তিনি দর্শন দিতে এসেছেন সেই এসপানিওলরা কোথায়? সমস্ত চত্বরে পিজারোর বাহিনীর একটি লোককেও ত দেখা যাচ্ছে না।

কিছু দূরে দাঁড়িয়ে ফনরামও তখন এই ব্যাপারে বেশ বিস্মিত হয়েছেন। ইংকা নরেশকে অভ্যর্থনা করবার এ কি রকম লক্ষণ? ব্যবস্থায় কোথাও কোন গুরুতর ভুল হয়েছে কি।

না তা বোধহয় হয় নি। সেই মুহূর্তে পিজারোর বাহিনীর ডোমিনিসিয়ান পাদ্রী ফ্রে [illegible] দে ভালভের্দেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গিয়েছে। তাঁর এক হাতে একটি ক্রুশ-প্রতীক আর এক হাতে একটি বাইবেল।

আতাহুয়ালপা একটু অপ্রসন্নভাবে পাদ্রী-বাবার দিকে তাকিয়েছেন। অভ্যর্থনার এ অভিনব রীতিটা তিনি ঠিক পছন্দ করতে পারেন নি।

তবু রাজকীয় ধৈর্য তাঁর যথেষ্ট বলতে হবে। পাদ্রীসাহেব ইংকা নরেশের সামনে এসে দাঁড়িয়েই এক নিঃশ্বাসে কি যেন বলতে শুরু করেছেন। আতাহুয়ালপা মুখে একটু বিরক্তি প্রকাশ করা ছাড়া সে দীর্ঘ বক্তৃতায় বাধা দেন নি।

শুধু পাদ্রীসাহেবের ভাষণের অর্থ যখন তাঁকে অনুবাদ করে শোনানো হয়েছে তখনই তাঁর মুখ কঠিন হয়ে উঠেছে ধীরে ধীরে।

দোভাষী পাদ্রীসাহেবের বক্তৃতার যথাযথ অনুবাদ নিশ্চয়ই করতে পারেনি। তার অক্ষম অনুবাদ থেকে এইটুকু কিন্তু বোঝা গেছে যে পাদ্রীসাহেব পেরু সাম্রাজ্যের অধীশ্বরকে তাঁর নিজের অপবিত্র মিথ্যা ধর্ম ছেড়ে নবাগত এসপানিওলদের সত্য ধর্ম গ্রহণ করে ধন্য হতে বলছেন।

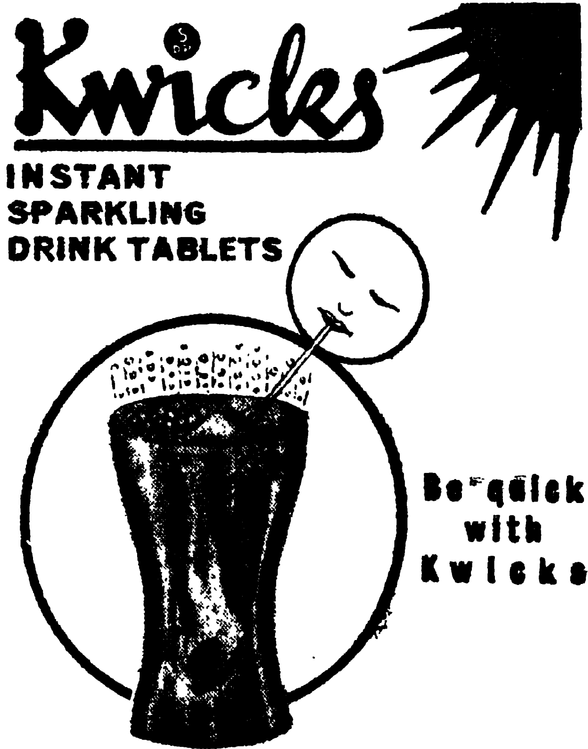
নতুন ধর্মের মাহাত্ম্য ও সুখ-সমৃদ্ধি বোঝাতে পাদ্রী সাহেব কুশবিদ্ধ যীশুর জীবনী থেকে শুরু করে রোমের পোপের মহিমা আর স্পেনের সম্রাটের অসামান্য প্রতাপ প্রতিপত্তি সব কিছুই সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেছেন।

দোভাষীর কাঁচা অনুবাদ থেকেও আতাহুয়ালপা কতখানি যে বুঝেছেন তা তাঁর জবাবেই এবার বোঝা গেছে।

আমি পৃথিবীর যে কোন অধীশ্বরের চেয়ে বড়।—জ্বলন্ত স্বরে তিনি বলেছেন,—কারুর অধীন আমি হব না। তোমাদের সম্রাট মস্ত কেউ হতে পারেন। এতদূরে সমুদ্র পারে তোমাদের যখন তিনি পাঠাতে পেরেছেন তখন তাঁর অসাধারণত্ব আমি স্বীকার করি। তাঁর সঙ্গে তাই আমি বন্ধুত্ব পাতাতে চাই। আর যে পোপের কথা তুমি বলছ তাঁর ত মাথা খারাপ বলে আমার মনে হয়। নইলে যা তাঁর নয় সে দেশ তিনি দান করেন কি হিসেবে? আমার ধর্ম আমি ছাড়ব না জেনে রাখো। তুমি নিজেই বলছ তোমাদের ঈশ্বরকে তাঁর তৈরী মানুষই হত্যা করেছে। আর চেয়ে দেখো, আমার ঈশ্বর এখনো নিজের দেবলোক থেকে তাঁর সন্তানদের দিকে করুণার দৃষ্টি মেলে আছেন।

পশ্চিম আকাশে কাক্সামালকার পর্বত-প্রাচীরের আড়ালে রক্তিম সূর্য তখন অস্ত যাচ্ছে। সূর্যপ্রভব ইংকাবংশের শেষ সম্রাট আতাহুয়ালপাকে সেই দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে তাঁর আরাধ্য ঈশ্বরকে যে দেখাতে হয়েছিল তার মধ্যেই নির্মম নিয়তির ইঙ্গিত কি ছিল না?

(ক্রমশঃ)



এই ধরনের জিনিস ভারতে এই প্রথম

এক গ্লাস জলে ঠিক একটি
ট্যাবলেট ফেলুন, সরবত তৈরি।
সদ্য সদ্য তাজা উপাদেয় সরবত
পাবেন; আপনার নিজস্ব রুচিমাফিক
ট্যাবলেট পাওয়া যায়: অরেঞ্জ, লেমন, পাইন-
অ্যাপল, খস, রাসপবেরি, কুইকসো ইত্যাদি সুগন্ধী

তৈরি করছেন

স্পট ড্রিংক প্রোডাক্টস্

কুইকসনগর, ভৈলি (পঃ রেল), বরোদা

দেশে বিদেশে

মধ্যবর্তী নির্বাচন

পশ্চিমবঙ্গে একটি রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার অবসান হয়েছে। ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ঘোষণা করেছেন যে, আগামী ৩ কিংবা ১০ নভেম্বর এই রাজ্যে মধ্যবর্তীকালীন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

বিধানসভা ভেঙে দিয়ে এই রাজ্যের শাসনভার রাষ্ট্রপতি নিজের হাতে গ্রহণ করায় মধ্যবর্তী নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে এ-সম্পর্কে আলোচনার জন্যে শ্রীসেনবর্মা কলকাতায় আসেন। গত ১২ মার্চ তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে অধিকাংশেরই অভিমত ছিল আগামী জুনে কিংবা নভেম্বরে নির্বাচনের সময় ধার্য করার। জুনের মধ্যে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি শেষ করা সম্ভব হয়ে উঠবে না, এই কারণে নভেম্বরকেই বেছে নেওয়া হয়েছে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি অনিশ্চয়তার চিন্তা ক্রমেই বড় হয়ে দেখা দিতে বাধ্য। ১৯৬৭র ফেব্রুয়ারীর সাধারণ নির্বাচন এই রাজ্যে স্থিতিশীলতা আনতে পারেনি। ১৯৬৮র নভেম্বরের নির্বাচন কি ঐ স্থিতিশীলতা আনতে পারবে? গত নির্বাচনের প্রধান দুর্বলতাই ছিল এইখানে যে, কোন রাজনৈতিক দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি, এবং যুক্তফ্রন্টের মিলিত সংখ্যাগরিষ্ঠতাও নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য ছিল না। আগামী নির্বাচনে কি এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে?

এই প্রশ্নের উত্তর অনেকখানি নির্ভর করছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল কোন্ কৌশল অবলম্বন করবে এবং নিজেদের মধ্যে আসনের বণ্টন কিভাবে করবে তার ওপর। এখন পর্যন্ত কংগ্রেস ও বামপন্থী যুক্তফ্রন্ট গত নির্বাচনের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই এগিয়ে চলেছে। যদি শেষ পর্যন্ত তা-ই থাকে তাহলে আরেকটি নির্বাচনের পরেও রাজনৈতিক পরিস্থিতি কতটা সংশয়মুক্ত হবে তা বলা মুশকিল।

বাংলার ছায়া পাঞ্জাবে

পাঞ্জাব বিধানসভার স্পীকার শ্রীযোগীন্দ্র সিং মান গত ৭ মার্চ হঠাৎ সভার অধিবেশন দু' মাসের জন্যে স্থগিত করে দেওয়ায় যে সাংবিধানিক সঙ্কটের সৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ছায়া প্রতিফলিত।

শ্রীমান আগের দিন তাঁর বিরুদ্ধে আনা একটি অনাস্থা প্রস্তাব আলোচনার জন্যে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ৭ মার্চ আলোচনা আরম্ভের আগেই বিরোধী দলের নেতা শ্রীগুরনাম সিং ঐ প্রস্তাব সম্পর্কে একটি বৈধতার প্রশ্ন তুলে বলেন এই প্রস্তাব "অবৈধ, সংবিধানবিরুদ্ধ ও অকেজো।" কারণ, এক, এই ধরনের প্রস্তাব বিবেচনা করতে হলে ১৪ দিনের নোটিশ দরকার, এবং দুই, সংবিধানে কেবল স্পীকারের অপসারণেরই ব্যবস্থা আছে, তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনার কোন সুযোগ নেই।

এই নিয়ে যে গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয় তারই ফলে স্পীকার দু' মাসের জন্যে অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, সভা অনির্দিষ্টকালের জন্যে স্থগিত রাখা হয়নি, কাজেই রাজ্যপাল এই অধিবেশন খতম ঘোষণা করে নতুন অধিবেশন ডাকতে পারবেন না। তাঁকে হয় বিধানসভা সাময়িকভাবে সাসপেন্ড রাখতে হবে, না হয় একেবারেই বাতিল করতে হবে।

এই সঙ্কট সঙ্গে সঙ্গে গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি করে, কারণ আগামী ৩১ মার্চের মধ্যে বাজেট পাশ না হলে সরকারের কাজকর্মই অচল হয়ে পড়বে। সুতরাং ঐ তারিখের আগেই সঙ্কটমুক্তির উপায় খুঁজে বার করা দরকার।

চারদিন পর সঙ্কটের সমাধানের জন্য রাজ্যপাল ডাঃ ডি সি পাবাতে ঠিক সেই ব্যবস্থাই নিলেন যা শ্রীমানের ধারণা ছিল তিনি নিতে পারবেন না। ১২ মার্চ তিনি সংবিধানের ১৭৪(২ক) ধারা অনুযায়ী বিধানসভার বর্তমান অধিবেশন খতম বলে ঘোষণা করলেন।

পরে অবশ্য এক বিবৃতিতে শ্রীমান স্বীকার করেন যে, অধিবেশন খতম করার অধিকার রাজ্যপালের আছে।

পরের দিন রাজ্যপাল আরও একটি ব্যবস্থা নেন। একটি অর্ডিন্যান্স জারী করে তিনি বিধানসভার চালু অধিবেশন স্থগিত রাখার স্পীকারের ক্ষমতা হরণ করে নেন। অর্ডিন্যান্সে বলা হয় যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য অনুমোদন না করা পর্যন্ত কোন অধিবেশন স্থগিত রাখা যাবে না। সেই সঙ্গে আরো বলা হয় যে, সভার সামনে যদি কোন আর্থিক বিষয় থাকে তাহলে সভার নেতা একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তার আলোচনা শেষ করার জন্যে প্রস্তাব আনতে পারেন এবং প্রস্তাব গৃহীত হলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আলোচনা শেষ করতেই হবে। যদি ইতিমধ্যে সভা খতম হয়ে যায় তাহলে সভা আবার মিলিত হলে বিষয়টি নতুন করে তোলার দরকার হবে না।

এইভাবে প্রস্তুত হয়ে রাজ্যপাল ১৮ মার্চ আবার বিধানসভার অধিবেশন আহ্বান করেন।

যেভাবে অর্ডিন্যান্স জারী করে স্পীকারের ক্ষমতা খর্ব করা হয়েছে তা গভীর বিতর্ক সৃষ্টি করতে বাধ্য। স্পীকার ক্ষুদ্র দলীয় স্বার্থরক্ষার জন্যে নিজের ক্ষমতা ব্যবহার করবেন এটা যেমন দুর্ভাগ্যের কথা, তেমনি স্পীকারের ক্ষমতাও যখন ও যেভাবে খুশি খর্ব করা যাবে, এটাও দুর্লক্ষণ। স্পীকারের ক্ষমতার অপব্যবহার ও সংকোচন দুটিই গণতন্ত্রের পক্ষে সমান বিপজ্জনক। কাজেই খেয়াল-খুশি মতো এই সমস্যার সমাধান করা উচিত নয়। স্পীকার ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের এক সম্মেলন ডেকে বিষয়টি খোলাখুলি আলোচনা করা দরকার।

মরিশাস স্বাধীন

দীর্ঘ ১৫৮ বছরের বৃটিশ শাসনের পর দ্বীপরাষ্ট্র মরিশাস গত ১২ মার্চ স্বাধীন হয়েছে। মোট ৭ লক্ষ ৭৩ হাজার অধিবাসীর এই দেশ এখন কমনওয়েলথের ২৭তম রাষ্ট্র হিসেবে আসন গ্রহণ করল। স্বাধীন মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী হলেন স্যার সিউসাগর রামগুলাম।

কন্যাকুমারীর উপকূল থেকে দু হাজার মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত এই দ্বীপটি ৩৮ মাইল লম্বা ও ২৯ মাইল চওড়া। অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৬৮ জনই ভারতীয় বংশোদ্ভূত। এদের মধ্যে আবার শতকরা ৫১ জন হিন্দু এবং ১৭জন মুসলমান। বাকী অধিবাসীদের মধ্যে রয়েছে চীনা, ফরাসী, ফরাসী বংশোদ্ভূত ক্রিওল ও আফ্রিকান। ভারতের সঙ্গে মরিশাসের আত্মিক সংযোগ তাই খুবই ঘনিষ্ঠ। ভারত মহাসাগরের বুকে এই দ্বীপ একটি দ্বিতীয় ভারত যেন।

মরিশাসের সরকারী ভাষা ইংরেজী; তবে সাধারণভাবে ফরাসীও এখানে কথ্য ভাষা। জনগণের ভাষা হল ক্রিওল যা ফরাসী আর বান্টুর সংমিশ্রণ।

ইক্ষু শিল্পের ওপরেই দ্বীপের অর্থনীতি নির্ভরশীল। তুলা ও নীলের চাষও কিছু কিছু হয়। কিন্তু অর্থনৈতিক অবস্থা মোটেই ভালো নয়। জনসাধারণ খুবই দরিদ্র, বেকার সমস্যা দিন দিনই বেড়ে চলেছে। তাছাড়া আছে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সমস্যা। সবচেয়ে জরুরী সমস্যা হল বর্ণসমস্যা। বৃটেনের কৃপায় এই সমস্যা ইতিমধ্যেই একটা জটিল আকার ধারণ করেছে। গত জানুয়ারী মাসে মুসলমান ও ক্রিওলদের মধ্যে ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়ে গেছে। তার জের এখনো শেষ হয়নি।

বৈষয়িক প্রসঙ্গ

স্বর্ণমৃগয়া ও তার পর

"সোনা চাই, আরও সোনা চাই। ডলার নাও, সোনা দাও"—সারা পৃথিবীর বাজার জুড়ে এই এক রব। লণ্ডন, প্যারিস, ফ্রাংকফুট, জুরিখ, হংকং, সর্বত্র এই এক আওয়াজ। আর এই আওয়াজ মার্কিন অর্থ দপ্তরের ঘুম ছুটে যাচ্ছে, স্বর্ণসূত্রে বাঁধা ইউরোপ ও আমেরিকার সাতটি দেশের প্রতিনিধিরা জরুরী বৈঠকে মিলিত হচ্ছেন, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে একেবারে তোলপাড় ঘটে যাচ্ছে। কেন এই বিশ্বব্যাপী স্বর্ণ-মৃগয়া, কেন এই আতঙ্কিত প্রতিক্রিয়া এবং কোন অনির্দেশ্য ভবিতব্য সারা দুনিয়ার অর্থনীতির জন্য অপেক্ষমান, সেসব কথা বুঝবার আগে আজকের দিনের আন্তর্জাতিক অর্থনীতির কয়েকটি মোটা কথা বোঝা প্রয়োজন।

এই কথাগুলি হচ্ছে—

(১) আন্তর্জাতিক লেন-দেনের ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে গত কয়েক বছর যাবৎ ক্রমাগত ঘাটতি দিতে হচ্ছে। যদি শুধু আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্যের হিসাব নেওয়া হয়, তাহলে অবশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যথেষ্ট উদ্বৃত্ত থাকার কথা। কেননা তার রপ্তানীর পরিমাণ আমদানীর পরিমাণ থেকে অনেক কম। কিন্তু সামরিক ব্যয়, বৈদেশিক সাহায্য, বিদেশে আমেরিকান মূলধন রপ্তানী, বিদেশে আমেরিকান পর্যটকদের খরচ বাবদ যে পরিমাণ ডলার বিদেশে চলে যায় সেটা হিসাব করলে এই উদ্বৃত্ত সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হয়ে ঘাটতি দাঁড়ায়। আজকে বিদেশীদের হাতে যে পরিমাণ ডলার আছে তার মোট অংক হচ্ছে ৩৩০০ কোটি ডলার। টাকার অঙ্কে হিসাব করলে এটা প্রায় ভারতবর্ষের মোট জাতীয় উৎপাদনের সমান।

(২) বিদেশীদের আয়ও এই ৩৩০০ কোটি ডলারের প্রতিটি ডলারের বিনিময়ে একটা নির্দিষ্ট দরে সোনা দেওয়ার জন্য আমেরিকা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সেই দর হচ্ছে প্রতি আউন্স ৩৫ ডলার অর্থাৎ প্রতি দশ গ্রাম ৯২-৬০ টাকা (ভারতবর্ষে সোনার নির্ধিবদ্ধ মূল্য প্রতি দশ গ্রাম ৫৩-৫৮ টাকা যদিও ১৯৬৬ সালে টাকার বাট্টা হার হ্রাসের পর ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্কে মজুত সোনার দাম হিসাব করা হয় প্রতি দশ গ্রাম ৮৪-৩৯ টাকা হিসাবে এবং খোলা বাজারে সোনার দাম তার প্রায় দ্বিগুণ।) অথচ আসলে বিদেশে স্থানান্তরিত এই ৩৩০০ কোটি ডলারের এই দায় মেটাবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে মজুত আছে মাত্র ১২০০ কোটি ডলারের কিছু বেশী মূল্যের সোনা। (ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্কে যে পরিমাণ সোনা আছে তার প্রায় পাঁচ গুণ।) এই কিঞ্চিদধিক ১২০০ কোটি ডলারের মধ্যেও আবার ১১০০ কোটি ডলারের কিছু বেশী পরিমাণ সোনা সেদিন পর্যন্ত অন্য উদ্দেশ্যে সরানো ছিল। সেই উদ্দেশ্য হচ্ছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার যে পরিমাণ ডলারের নোট ছাপেন তার প্রতি ডলার পিছু ২৫ সেন্ট অর্থাৎ এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ মূল্যের সোনা ফেডারেল রিজার্ভ ব্যুরোর হাতে মজুত রাখা। প্রতি ডলার নোটের জন্য ২৫ সেন্ট পরিমাণ সোনা মজুত থাকা চাই, এটা আমেরিকান আইনে বিধিবদ্ধ ছিল। এই বাবদ সরিয়ে রাখা সোনা বিদেশের ডলারধারীদের কাছে বিক্রী করা নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু সম্প্রতি আমেরিকার সোনার উপর যে চাপ পড়েছে সেটা সামলাবার জন্য প্রেসিডেন্ট জনসনের প্রস্তাবক্রমে মার্কিন কংগ্রেস আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনে সোনা মজুত রাখার ঐ বাধ্য-বাধকতা তুলে দিয়েছেন। কিন্তু এটা স্পষ্ট যে, "ডলার চাই না, সোনা চাই" আওয়াজ



যদি চলতে থাকে তাহলে এই বাড়তি ৯৯০ কোটি টাকারও বেশী সোনা পাওয়া সত্ত্বেও আমেরিকা প্রতি দশ গ্রাম সোনা ৩৫ ডলার দামে কেনাবেচা করার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারবে না।

(৩) বিশ্ব অর্থনীতির উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব বিরাট। বিশ্ব বাণিজ্যের এক-চতুর্থাংশের অংশীদার হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। বেসরকারী বিদেশী মূলধনের প্রায় আধা-আধি হচ্ছে আমেরিকান। সমস্ত আন্তর্জাতিক লেনদেনের মোটামুটি অর্ধেক হয় ডলারের হিসাবে। আমেরিকান ডলারের এই বিশ্বব্যাপী আধিপত্যের দরুনই আন্তর্জাতিক বিনিময়ের মুদ্রা হিসাবে ডলারের স্থান অপ্রতিহত ছিল। অন্তত এত দিন পর্যন্ত তাই ছিল। পশ্চিমী দেশগুলির কেন্দ্রীয় ব্যাংক, দুনিয়াজোড়া যাদের ব্যবসা এমন বড় বড় পেট্রোল কোম্পানী-গুলিতে, তেলের রয়্যালটি বাবদ পশ্চিম এশিয়ার যেসব গভর্ণমেন্ট ও রাষ্ট্রপ্রধান প্রচুর অর্থ পান তাঁদের কাছে ও আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের ন্যায় আন্তর্জাতিক অর্থ প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রভূত পরিমাণ ডলার রয়েছে।

আজকের পৃথিবীতে সোনা কেনার যে হিড়িক পড়েছে তার মধ্য দিয়ে মূলত সারা পৃথিবীর এই ডলারধারীদের অনাস্থার মনোভাব প্রকাশ পাচ্ছে। "ডলার হচ্ছে সোনার চেয়েও দামী জিনিস" এই মনোভাব যত দিন চালু ছিল তত দিন কোন অসুবিধা ছিল না। পৃথিবীর আর যে কোন মুদ্রারই মূল্যক্ষয় হোক, মার্কিন ডলার ঠিক আছে, আর যে কোন অর্থনীতিই বিপর্যস্ত হোক, ডলারের অর্থনীতি ঠিক আছে—এই মনোভাব যত দিন ছিল, ততদিন ডলারের সঞ্চয় নিয়ে দুনিয়ার কারবারীদের কোন উদ্বেগ ছিল না। যে কোন সময়েই ডলারের বিনিময়ে সোনা পাওয়া যাবে—এই আশ্বাস ডলারের উপর আস্থা বজায় রাখতে সাহায্য করেছে। প্রকৃতপক্ষে ডলারের উপর এই আস্থা, যতদিন ছিল ততদিন সোনার চেয়েও ডলারের প্রতি আন্তর্জাতিক লেন-দেনের কারবারীদের বেশী আকর্ষণ ছিল। কেননা, ডলার খাটিয়ে সুদ উপার্জন করা যায়, আর সোনা সেই তুলনায় বন্ধ্যা ধাতুমাত্র।

কিন্তু দেবতার আসনও টলে, ভূমি-কম্পে সবচেয়ে মজবুত বাড়ীর ভিত্তিমূলেও মাটি কাঁপে। তেমনিভাবেই আজ ডলার টলছে। আর আতঙ্কিত ডলারধারীরা যে যত বেগে পারেন ছুটছেন ডলারের বোঝা হাল্কা করে সোনা সংগ্রহ করার জন্য।' সঙ্গে সঙ্গে সোনার দাম বাড়ার প্রত্যাশায় যাঁদের ডলার নেই এমন সঞ্চয়কারীরাও সোনা কিনে রাখছেন। এই সব স্বর্ণ-সন্ধানীর হিসাব হচ্ছে দুটি : (ক) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিছুতেই তার তিন শতাংশ হারের মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা বন্ধ করতে পারবে না। ভিয়েতনাম যুদ্ধের খরচ [illegible] কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না, বরং এই খরচ বৃদ্ধিই অনিবার্য হয়ে উঠেছে, যার অর্থ হচ্ছে আন্তর্জাতিক লেনদেনে আমেরিকার ঘাটতি বাড়বে, কমবে না। গত নভেম্বর মাসে বৃটিশ পাউন্ড স্টার্লিং-এর বাট্টাহার হ্রাসের পর ডলারের আস্থা আরও দুর্বল হয়ে পড়েছে। ডলারের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস ও আন্তর্জাতিক লেনদেনে তার ক্রমবর্ধমান ঘাটতি আমেরিকাকে আজ হোক, কাল হোক ডলারের বিনিময়মূল্য হ্রাস করতে বাধ্য করবে—(খ) যার অন্য অর্থ হচ্ছে সোনার আন্তর্জাতিক দাম চড়বে। দু'দিন বাদে যদি সোনার দাম চড়েই যায়, আর সোনার হিসাবে ডলারের দাম পড়ে যায় তাহলে কোন্ বোকা ডলার ধরে রেখে লোকসান গুনতে চাইবে? আর কে না চাইবে এখনই ডলারকে সোনায় পরিবর্তন করে নিয়ে পরে ভবিষ্যতে কিছু মুনাফা করে নিতে?

এই অবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কি করবে? সহজ বুদ্ধিতে বলে, সোনার দাম বাড়িয়ে দেওয়াই হচ্ছে সোজা রাস্তা। সোনার দাম বাড়ালে সোনা কেনার হিড়িক থামবে, নির্দিষ্ট মূল্যে সোনা বিক্রী করার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা আমেরিকার পক্ষে অধিকতর সহজসাধ্য হবে, যে কোন সময় ডলারের বিনিময়ে সোনা পাওয়া যাবে, এই নিশ্চয়তা ডলারের প্রতি আস্থা ফিরিয়ে আনবে। কিন্তু এই সোজা রাস্তায় হাঁটা আমেরিকার পক্ষে এখন কয়েকটি কারণে কঠিন। প্রথমত, সোনার দর বাড়ান মানে ডলারের বহির্মূল্য স্থির রাখতে ব্যর্থতা।

প্রেসিডেন্ট জনসনের সরকার আজ এই সিদ্ধান্ত নিলে আগামী নভেম্বরের নির্বাচনে তাঁকে সেজন্য গুরুতর শাস্তি পেতে হবে। দ্বিতীয়ত, আমেরিকা সোনার দাম বাড়ালে তার দুই প্রবল প্রতিপক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী তার থেকে দারুন সুবিধা পাবে। একটি হচ্ছে সোভিয়েট রাশিয়া। সারা পৃথিবীতে যত সোনা উৎপন্ন হয় তার অর্ধেকেরও বেশী আসে দক্ষিণ আফ্রিকার সোনার খনি থেকে। আর দক্ষিণ আফ্রিকার পরেই যেখান থেকে দুনিয়ার বাজারে সব চেয়ে বেশী সোনা আসে সেটা হচ্ছে সাইবেরিয়ার সোনার খনি। সাইবেরিয়ার সোনার খনির উৎপাদন হচ্ছে পৃথিবীর মোট সোনা উৎপাদনের এক অষ্টমাংশ। সোনার দাম বাড়ান মানে সোভিয়েট রাশিয়ার সুবিধা করে দেওয়া। আর সুবিধা করে দেওয়া ফ্রান্সের—যে ফ্রান্স, বিশেষ করে তার নেতা দ্য গল ইদানীংকালে আমেরিকান ডলারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য জেহাদ ঘোষণা করেছেন। ফ্রান্সের বহি-র্বাণিজ্যে বিরাট উদ্বৃত্ত হয়। এই উদ্বৃত্ত বাণিজ্য তার হাতে গত কয়েক বছরে বিপুল স্বর্ণভাণ্ডার এনে দিয়েছে। সোনার দাম বৃদ্ধিতে ফ্রান্সের আগ্রহ থাকবে এটা স্বাভাবিক। তৃতীয়ত, আজ সোনার দাম বাড়ালে আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলগুলিতে মজুত ডলারের দরুন যে লোকসান হবে তার খেসারত দেওয়ার জন্য আমেরিকার উপর দারুন চাপ আসবে এটা অবধারিত। অথচ এই খেসারত দিতে হলে মার্কিন অর্থনীতির উপর অসহনীয় চাপ পড়বে।

এইসব কারণেই মার্কিন অর্থ দপ্তর ও ফেডারেল রিজার্ভ বারো বারবার ঘোষণা করেছেন যে, ডলারের বিনিময়মূল্য কমান হবে না, সোনার দাম বাড়ান হবে না, যত সোনা চাই দেব, কিন্তু ডলারকে ডুবতে দেব না। এই উদ্দেশ্যেই কয়েক দিন আগে সুইজারল্যান্ডের বাজেল শহরে মিলিত হয়ে যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, পশ্চিম জার্মানী, সুইজারল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড ও ইটালীর প্রতিনিধিরা ঘোষণা করেছিলেন যে, সোনার দাম স্থির রাখতে তাঁরা দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। এই সব দেশের মুদ্রাও মার্কিন ডলারের মত সোনার সঙ্গে বাঁধা। ডলারের পতন হলে, এই সব দেশের মুদ্রার উপরও আঘাত আসবে। তাই তারাও ডলারের স্থিতির জন্য আমেরিকার মতই উদ্‌গ্রীব।

ডলারের প্রতি আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য দ্বিতীয় যে রাস্তাটি আমেরিকার সামনে খোলা আছে সেটাও কঠিন, তবে আমেরিকার পক্ষে কম বিপজ্জনক। আমেরিকা এখন সেই পথেই যাচ্ছে। সেটা হচ্ছে আমেরিকার ভিতরে মুদ্রাস্ফীতির চাপ ও আন্তর্জাতিক লেন-দেনে ঘাটতি কমিয়ে ডলারের মূল্যক্ষয় রোধ করার পথ। দুটি ভাংগাবার ঘাটার হার বাড়ান হয়েছে, প্রেসিডেন্ট জনসন আয়করের উপর শতকরা দশ ভাগ সারচার্জ আদায় প্রস্তাব করেছেন, বিদেশে আমেরিকান মূলধন রপ্তানী, আমেরিকান নাগরিকদের পর্যটনের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে এবং আমেরিকায় বিদেশী মালের আমদানীতে উৎসাহ দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে।

এই নীতির অনিবার্য ফল হচ্ছে বিদেশে মার্কিন অর্থসাহায্য কমবে, দেশের ভিতরে ব্যবসা-বাণিজ্য ঢিলা পড়বে, বিদেশ থেকে পণ্য আমদানীর উপর কড়াকড়ি হবে। অর্থাৎ এই সব ব্যবসায় শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীদের জীবনের মান অবনত হবে না ভারতের মত দুর্বল অর্থনীতির দেশগুলোতেও ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে।

ডলারের ডুবন্ত জাহাজ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে সোনার লাইফবেল্ট অবলম্বন করে আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থার তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্র পার হবার জন্য বিশ্বের ধনপতিরা যখন হুড়োহুড়ি করছেন এবং সেই হুড়োহুড়িতে যখন ডুবন্ত ডলার-জাহাজ আরও ডুবছে তখন সারা পৃথিবী "ডলার-বনাম-সোনা"র মর্যাদার লড়াইয়ে এই ধরনের একটা উভয় সংকটের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

কলকাতা

কলকাতা

কলকাতা

উপরে আকাশ যেখানে সীমা, সেখানে সীমা শুধু কথা মাত্র। মহাশূন্যে মানুষের অভিযান গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে অসীমের দিকে, সেই অধ্যায়ের শুরুতেই এখনই অ্যাডভেঞ্চারের এ পর্যন্ত প্রাপ্ত অর্থ প্রায় নিষ্প্রভ।

কিন্তু গভীরে মানুষের অভিযান সীমিত গভীরতম সমুদ্রের তলাতে তার শেষ। মহাশূন্যের জীবনের সঙ্গে তার তুলনা কোন দিন হবে না। তবুও জলের তলায় যার জীবিকা তার জীবন, আমরা যাদের ঘোরাফেরা ডাঙাতেই শেষ, তাদের কাছে উপন্যাসের মত।

আজিজসাহেব অবশ্য আশা করতে পারেন নি "আখবার"এর লোকেরা তার কথা প্রকাশ করতে উৎসাহী হবেন। তিনি ফিল্মি দুনিয়ার মানুষ বা ক্রিকেটার নন, রাজনৈতিক রুই-কাৎলাও নন। "তবে ওটা না বললেন তা সত্যি বটে—আমাদের পেশা বিচিত্র, হয়ত এমন বিচিত্র পেশা খুব বেশি নেই, আর এর অ্যাডভেঞ্চারের কথা তো সবারই জানা আছে—পদে পদে বিপদ আর জীবনের খতরা।"

এর জবাবে জানানো হল, সেসব কথা পুঁথিপত্রে আছে, কিছু ফিলমেও দেখা আছে, তবে ওরকম জীবনের যার দৈনিক প্রত্যক্ষ পরিচয় তার মুখ থেকে দুটো অভিজ্ঞতার কথা শুনতে আমাদের অবশ্যই ভাল লাগবে। অতএব আজিজসাহেব বলতে রাজী হলেন।

কলকাতা পোর্ট কমিশনার্স সংস্থায় আজিজসাহেব প্রথম ভারতীয় ডুবুরী। এখানে প্রায় পঁচিশ বছর তাঁর চাকরী, এবং বর্তমানে তিনি প্রধান ডুবুরীর পদে বহাল আছেন।

একটা চাকতির মত দেখতে পদার্থ দেখিয়ে সেটা তুলতে বললেন। তুলতে গিয়ে কিন্তু বেজায় লজ্জায় পড়তে হল। "ওটা সীসে ওজন আধমন। এমন দুটো আধমনী চাকতি, একটা বুকে একটা পিঠে ঝুলিয়ে তবে জলে ঝাঁপ দিই। ডুবুরীর পোশাক এ-দুটো ছাড়াও এমনিতেই অসম্ভব ভারী—তার উপর এই দুটো ওজন, আর জুতোর সঙ্গে আটকানো সীসের গোলা এক একটা দশ সের—এ না হলে জলের অত তলায় মাথা উপরে রেখে দাঁড়ানো অসম্ভব। একবার চিৎ হয়ে পড়লে আর সোজা হয় কার সাধ্য। এ পোশাক পরে ডাঙায় কিছুক্ষণ থাকলে হাড়গোড় গুঁড়িয়ে যাবার জোগাড় হয়।"

এ থেকেই আন্দাজ করা যায় কী পরিমাণ ট্রেনিং প্রয়োজন ডুবুরীর। আজিজসাহেব ট্রেনিং নিয়েছেন করাচীতে। প্রথমে ছমাস প্রাথমিক ট্রেনিং, তারপর সমুদ্রে দেড়বছর অভ্যাস। দুশো পঁচাত্তর ফিট পর্যন্ত জলের তলায় কাজ করবার অভিজ্ঞতা তাঁর আছে। তবে ষাট ফুট গভীরেই জলের যে চাপ তাতেই রক্ত চলাচল যথেষ্ট বাধা পায়। ফলে জল থেকে টেনে তোলবার সময় খুব সাবধানে একটু একটু করে ওপরে ওঠাতে হয়। একটানে তুললে অবধারিত মৃত্যু!

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আজিজসাহেব আরব-সাগর ও বঙ্গোপসাগরে অনেক নিমগ্ন জাহাজ ভাসিয়ে তুলেছেন। হুগলীতে ১৯৫৪ সালে ওলন্দাজ জাহাজ 'স্যাঙ্গোলা' ডুবে যায়—আজিজসাহেব তাকেও ভাসিয়েছেন। এছাড়া প্রায় পাঁচশো জলেডোবা মানুষের দেহ হুগলীর তলা থেকে উদ্ধার করেছেন। বর্তমানে হুগলীতে একটি জাহাজ ভাসিয়ে তোলার কাজে আছেন।

জলের তলায় ডুবুরীর কত বিপদ। কত ডুবুরী হাঙরের খাদ্য হয়ে গিয়েছেন তার হিসাব কে রাখে। অবশ্য বিনা-পোশাকে যাঁরা জলে ঝাঁপ দেন তাঁদেরই হাঙরের পেটে যাবার ভয়। ডুবুরীর পোশাকে ডুবুরীকে দেখলে বরং হাঙরেরাই ভয়ে দূরে থাকে—গোল হেলমেট থেকে হাতীর শুঁড়ের মত নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের নল, আর তা থেকে অনবরতঃ বুদ্বুদ উঠছে, দেখে হিংস্র জলজন্তুরা হিংস্রতর কোন জলজন্তুর কল্পনা করে আতঙ্কিত হয়।

যাই হোক হাঙর ছাড়া আর বেশীর ভাগ জলজন্তুই নিরীহ, ওটাই ভরসার কথা। দিনের বেলাতে ওপরের আলো সমুদ্রের তলাতে বহুদূর পর্যন্ত প্রবেশ করে, সে আলোতে চারদিক বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। এই আলোতে কাজ করতে করতে জলের তলাকার অপরূপ শোভা ডুবুরীকে দেয় কাজের প্রেরণা। "সে এক জগৎ—রূপকথার জগৎ কি অত যাদুতে ভরা। আপনারা বলতে পারেন। ছবিতে দেখে থাকবেন [illegible] কিন্তু ছবিতে তার

কতটুকু দেখানো সম্ভব? কত রং, কত আকৃতি। মাছের ঝাঁক, জলের তলাকার গাছ, অ্যানিমোন, সি-কিউকম্বার (সমুদ্র-শশা বলতে পারেন) অত নাম কি জানি, শুধু দেখা আর দেখে চোখ জুড়ানো।"

হুগলীর ঘোলা জলে অবশ্য এ দৃশ্য নেই। সেখানে আলো আদৌ প্রবেশ করে না, সামান্য গভীরেই রাত্রির অন্ধকার। আলো জ্বালিয়েও বিশেষ সুবিধা হয় না। তাতে দেখতে আরও অসুবিধা হয়।

রাত্রিতে ওই ঘোলা জলের তলাতেই আবার আর এক রূপের জগৎ। তখন অসংখ্য জীবন্ত তারকার কণার মত 'জোনাকী' মাছেরা কখনও ঝাঁক বেঁধে কখনও একা এদিক ওদিক ছুটে বেড়ায়। "দেখে দেখে এখন শুধু আলো থেকেই চিনতে পারি কোনটা কোন মাছ।"

হাঙর ছাড়া এসব দিকে আর একটা ভয় কুমীরের—তবে কুড়ি ফুটের বেশী গভীরে কুমীর শক্তিহীন, আর ডুবুরীর কাজও কুড়ি ফুটের অনেক তলায়।

হাঙর কুমীর তুচ্ছ আর একটি ভয়ের কাছে, আজিজসাহেবের মুখে সে গল্প রহস্য-রোমাঞ্চ উপন্যাসের মতই লাগছিল। এ ভয়টি মানুষের তৈরী—এবং এর একটি মজার ইতিহাস আছে। মহাযুদ্ধের সময় এটা জার্মানদের একটি বিশেষ রণ-কৌশলের অঙ্গীভূত ছিল।

"যেখানে যেখানে জলের তলায় আমাদের নামতে হ'ত, জলমগ্ন জাহাজের খোঁজে বা মাইন সরাতে, সেসব জায়গায় জার্মানরা লম্বা লোহার শেকলে বেঁধে নামিয়ে দিত নরকঙ্কালের বাহিনী। হাঁ, নরকঙ্কাল। মনে করুন, দুশো ফুট জলের তলায়, জলের চাপে যেখানে ফুসফুস ফেটে যেতে পারে, সেখানে জল-ফুসফুস যন্ত্রের দাক্ষিণ্যে যতটুকু নিশ্বাসের বাতাস পাওয়া যায় তার উপর নির্ভর করে নেমে গেছি। চারিদিকে জল, উপরে জল, পৃথিবী, শুকনো মাটির সঙ্গে যোগাযোগ শুধু পিঠের সঙ্গে বাঁধা লাইফ লাইন দিয়ে, ছিঁড়ে গেলেই হল, যদিও ছিঁড়ে যাওয়াটা প্রায় অসম্ভব। ওই অবস্থায় নিঃসঙ্গ—একা-একা—হঠাৎ দাঁত বার করে হাসছে চোখের সামনে শাদা জ্যান্তভূতের মত একটি কঙ্কাল! ওই অবস্থায় চমকে উঠবে না এমন বীরপুরুষ কে আছে বলুন? ওটা শত্রুপক্ষের চাতুরী ছাড়া আর কিছু নয়, এই জ্ঞান কি খুব বেশী সাহায্য করবে? বুদ্ধি দিয়ে ওর ব্যাখ্যা করা যায়, কিন্তু মনের উপর ওর প্রভাব একবার কল্পনা করতে চেষ্টা করুন।" অনেক সময় পিঠের সঙ্গে আটকানো লাইফলাইন জলমগ্ন জাহাজের দড়ি-দড়ার সঙ্গে জড়িয়ে যায়। তখন সত্যি সত্যি প্রাণসংশয় হয়ে পড়ে।

গভীর সমুদ্রের ডুবুরীদের আর একটা বিচিত্র পরিস্থিতির কথা আজিজসাহেব বলেছিলেন, যেটা তাঁর নিজের হয় নি। শতশত ফিট গভীরে যাঁরা কাজ করেন, তাঁদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সুবিধার জন্য দেওয়া থাকে সর্বাধুনিক "একোয়া লাঙ" বা জল-ফুসফুস। অনেকটা গ্যাস-মুখোশের মত দেখতে, এর ভেতর খুব উচ্চ চাপে পোরা থাকে বাতাস—সেই বাতাসে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ জলের তলায় স্বাভাবিক ভাবেই চলে, কিন্তু বিপদ হয় বাতাসের নাইট্রোজেন নিয়ে। সাধারণত নাইট্রোজেন নিশ্বাসের সঙ্গে ফুসফুসে গেলে কোন ক্ষতির কারণ হয় না—কিন্তু অত চাপের নাইট্রোজেনের এক অদ্ভূত প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। হঠাৎ মহাস্ফূর্তির একটা ঝোঁক শরীর মনকে পেয়ে বসে। তখন একটা মাছ দেখলে মনে হয় জল-ফুসফুটা খুলে মাছকে খানিকটা হাওয়া দিয়ে দিই। বাস খুললেই হল। আনন্দের আতিশয্যে পাতাল থেকে একেবারে এক লাফে স্বর্গে।

*

কলকাতায় একটা শখের ডুবুরীক্লাবের প্রস্তাব নিয়ে অনেক যুবক আজিজ-সাহেবের কাছে আসেন। এ রকম ক্লাব পাশ্চাত্ত্য দেশে অনেক আছে। হবি হিসাবে স্কিন ডাইভিং যে শরীর মন গঠনে বিশেষ উপযোগীকে হবে সে বিষয়ে তাঁর সন্দেহ নেই। —সেবতী





(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। ১৯ ।।

রাজাবাবু যা বলেছেন, যা বলে গেছেন সে প্রস্তাব যে একেবারেই অবাস্তব অচল, তা সুরবালার থেকে বেশী কেউ জানে না। মাসিক পাঁচশ কেন, সাতশ টাকার জন্যেও যদি সে বাইরের গাওনা ছেড়ে দেয় তো সেটা তার লোকসানই। সব মাসে যে পাঁচ ছশ' টাকা আয় হয় তা নয়—কিন্তু তেমনি কোন কোন মাসে বেশীও হয়। আরও বেশী হবে। নামডাক ছড়াচ্ছে। আগে পঞ্চাশ ষাট টাকাতেও বায়না নিয়েছে—এখন একশ টাকার কম বড় একটা নেয় না। নিহাৎ কেউ এসে কাকুতি-মিনতি করলে, কোন পুরনো ঘর এসে ধরলে দশ বিশ কমায়। পঞ্চাশ ষাট টাকা এখন কেউ বলতে সাহসই করে না তাকে। ওদিকে দেড়শ দুশো টাকার বায়নাও আসে। বড়লোক মক্কেল দেখলে দালালরাই ওর হয়ে মোটা টাকা হেঁকে বসে, দু' একবার গাইগুঁই করে রাজীও হয়ে যান তাঁরা। তাছাড়া, এটা তো বাঁধাবরাদ্দ যেটা—পেলার হিসেব ধরলে অনেক বেশী আয় হয়। বিশেষ শ্রাদ্ধ বাড়িতে, বাঁধা মজুরীর ডবল তেডবল উঠে যায় পেলা থেকে।

আরও আছে। সাধনার কথা আছে। শিক্ষার কথা আছে। এতদিনের সাধনা তার, এতদিনের চেষ্টা। আজ বলতে গেলে সিদ্ধি তার করায়ত্ত। এখনই সে যে-কোন পুরুষ কীর্তনীয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গাইতে পারে। তাকে আর ঢপউলী বলে নাক সিঁটকোতে সাহস করে না কেউ। বড় বড় আসরে তার নাম উল্লেখ হয়—নানু নিজে শুনে এসেছে। এখন গান ছেড়ে দেওয়া মানে আত্মহত্যাই করা একরকম।

আর, এ তো শুধু বৃত্তি হিসেবেই নেওয়া নয়—এ যে তার প্রাণের জিনিস। মনেই পড়ে না—কোন্ শৈশবে মতির কীর্তন শুনে আত্মহারা বিভোল হয়ে যেত সে। শত শাসনেও তাকে বেঁধে রাখা যায়নি—নিবৃত্ত করা যায় নি এই বিশেষ সঙ্গীতের আকর্ষণ থেকে। এ গান ছেড়ে দিলে কি বাঁচবে সে? মনে তো হয় না।

অথচ—রাজাবাবুকেই কি আজ বিদায় দেওয়া সম্ভব?

ভাবতেই যে বুকের মধ্যেটা টনটন করে ওঠে! এই যে সারাদিন দেখে না, এমনও হয় পর পর দুদিনও দেখা হয় না—নিহাৎ এক-আধটা মুজরো না নিলে মা সন্দিগ্ধ হয় বলে নিতে হয়—সে সময়টা প্রত্যাসন্ন মিলনের স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকে বলেই সহ্য হয়। সন্ধ্যাটা কাটে চর্বিত-চর্বণে, প্রভাতটা কাটে কল্পনায়।... বলে গেছেন সাতদিন পরে আসবেন, মনে করতেও যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে। মনে হচ্ছে এই কদিন তার কাটবে কি করে, কেমন করে বেঁচে থাকবে সে! এখনই—উদ্দাম উন্মাদ চিন্তা তার কল্পনা করছে—কোন ছুতোয় গিয়ে দূর থেকে দেখে আসা যায় কি না! প্রৌঢ়? বৃদ্ধ? বয়স্ক? তা সুরো জানে না। অত ভেবে দেখে নি। 'নয়নে লাগল রূপ হামারি'—এই শুধু জানে। ওঁকে দেখলে মনে যে আনন্দ হয়, প্রাণে যে শান্তি অনুভব করে, রক্তে যে উন্মাদনা জাগে—সমস্ত সত্তা যে পরিপূর্ণতা বোধ করে—এমন আর কাউকে দেখে করে না, কখনও করে নি—এইটুকুই শুধু জানে। এতদিন ভাবে নি, ভাবার দরকার হয় নি—ভাবার কথাও ভাবে নি—আজ বুঝছে যে ওঁকে তার 'না' বলা সম্ভব নয়, ওঁর জন্যে চরম স্বার্থ ত্যাগ করেই তৃপ্তি।...

না, নানুদা ঠিকই বলেছে। বহুদূর এগিয়ে গেছে সে, আর ফেরার উপায় নেই।...

তবু কথাটা মনে মনে তোলাপাড়া করে কদিন। কিছুতেই কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে না। কী উত্তর পাবে জেনেও একদিন মতির কাছে তোলে কথাটা। মতি চমকে ওঠে, বলে, 'তুই কি পাগল? এই কথা চুপ করে শুনে গেছিস আবার মনে মনে জিগোচ্ছিস? .. পাগল ছাড়া একথা কেউ পাড়েও না, কেউ তা বসে শোনেও না। তুই এখন বায়না ছাড়বি কি? কোন সত্যিকারের রাজা বা রাজপুত্তুর এসে বে করতে চাইলেও আমি তোকে বারণ করতুম। তোর এই উঠতিকাল, এই তো উন্নতির সময়। সত্যি কথা বলতে কি তোর বয়সে আমাদের এত নামডাক হয়নি—তোর য' হয়েছে। আমাদের বয়সে তুই দিনে মজুরী পেলা মিলিয়ে হাজার টাকা গুনে নিতে পারবি—এই বলে দিলুম।... আমার কাছে পষ্ট কথা—ঐ মিনসেকেই যদি তোর এত পছন্দ হয়ে থাকে ওকে তুই শখের পতি কর—বাড়িতে বাবু বসা, আর তাই তো কথাটা দাঁড়াচ্ছেও। পাঁচশ' টাকা মাইনে দিয়ে যে বাঁধা রাখবে সে কি আর বেশী দিন শুধু আধঘণ্টা বসে দুখানা গান শুনে ছেড়ে দেবে?...ওলো নেকী, আমরাও ধানের চেলের ভাত খাই, বয়স তিন কুড়ি পেরিয়ে গেল—যে যতই বলুক, সূর্যি যা পুবে ওঠবার ঠিকই উঠবে। সে কখনও পশ্চিমে উঠতে পারে না। ঘি আর আগুন পাশাপাশি থাকলে ঘি ঠিকই গলবে, আরও কাছে এলে পুড়েও যাবে। অত আর [illegible]

নেই—পছন্দ হয়ে থাকে, পয়সা দিতে চায়, দুয়ে নে—এক কাজে দু' কাজ হবে। তা বলে গান ছাড়িসনি খবরদার। আমাদের তো বিদেয়ের সময় হল। এবার তো তোদেরই রামরাজত্বি।...এতকাল চেলাগিরি করে মলি—গুরুগিরি করবিনি?

পছন্দ হয় না কথাটা বলা বাহুল্য। মতিকেই একদিন সুরো ন্যাবার উপমা দিয়েছিল। আজ ওরও চোখ এক বিশেষ রঙে আচ্ছন্ন হয়ে না থাকলে বুঝত, এই সমাধানই সবচেয়ে সরল। সে যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে, এছাড়া কোনদিকে ফেরার উপায় নেই। কিন্তু সেই সোজাপথ সহজভাবে দেখার মতো অবস্থা তার নয়। আবারও সে অকারণেই মতির ওপর বিরূপ হয়ে উঠল, মতির এই যথার্থ হিতোপদেশের বিপরীত অর্থ করল মনে মনে। শখের পাতি করে ওদের খাতায় নাম না লেখানো পর্যন্ত মাসির যেন মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হচ্ছে না! মাসি সেই 'খানকী' শব্দের জ্বালাটা এখনও ভুলতে পারেনি।...

আরও একটা দিন চুপ করে বসে ভেবেও যখন কূলকিনারা পায় না—তখন মায়ের কাছেও কথাটা পাড়ে।

নিস্তারিণী তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে একেবারে। উদ্দেশে রাজাবাবুর মুখে নুড়ো জ্বেলে তাঁর ঊর্ধ্বতন যত পুরুষের হিসেব শাটকেয় আসে—মানে নিস্তারিণী যত সংখ্যা পর্যন্ত সহজে গুনতে পারে—তাদের অখাদ্য খাইয়ে নরকে পাঠিয়ে বলে, 'ইস্, তা আর নয়। তার কমে নেশা জমবে কেন! আমার ছেলেমানুষ বোকা মেয়েটাকে পেয়ে ভুচুং-ভাচুং দিয়ে এইসব দুর্বুদ্ধি যে মাথায় ঢোকাচ্ছে—তার সব্বনাশ হবে না!...এই নামডাক, তোকে নিয়ে যাবার জন্যে লোকে পয়সা দিয়ে সাধাসাধি করছে—এখন গান ছাড়বি! তোর বয়সে ঐ মতি কেত্তনউলী পাঁচিশ-তিরিশ টাকায় গেয়ে আসত—তাই আজ ওর অতগুলো বাড়ি, আঙুলের পাবে গুণে শেষ করা যায় না। ডালিম, পান্না এদের, একেকজনের টাকায় দেখ্‌গে যা ছ্যাৎলা পড়ছে। তোর যখন ঐ বয়স হবে দোরে হাতী বাঁধা থাকবে তোর। তুই এখন ওর ভোচ্‌কানিতে ভুলে গান ছাড়বি কি! পাঁচশ' টাকা! পাঁচশ' টাকা মাইনে দিয়ে কেদাত্ত করবেন একেবারে।...তোর যা রূপ—তুই মাইনে নিয়ে বাঁধা মেয়েমানুষ হয়ে থাকবি জানলে এই গলির মোড়ে গাড়ির গাদি লেগে যাবে। তোকে গান ছাড়তে হবে কেন সেজন্যে। কথাটা খারাপ লাগছে শুনতে কিন্তু ও-বুড়ো যা বলেছে, তা বাঁধা রাঁড় রাখা ছাড়া কি? সাজিয়ে কাজিয়ে গান শুনতে আসছি বলে নাকটা ঘুরিয়ে ধরছে—এই তো! খবরদার বলে দিলুম ওসব মতলব করতে যাসনি, অনত্থ করব তাহলে আমি। ঐ মিনসের বাপের চোদ্দপুরুষের নাম ভুলিয়ে ছেড়ে দোব। আমি নিস্তার বামনী, তোর মতো বেহদ্দ আকাট বোকা নই।'

সুরবালা আরও বিপদে পড়ে, কাঠ হয়ে থাকে। তার অবস্থাটা সত্যি সত্যিই এবার দাঁড়ায় ফাঁদে-পড়া হরিণের মতো। বোকা! বোকা! আগাগোড়াই বোকার মতো কাজ করেছে সে, করছেও। ঐ লোকটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করাই উচিত হয়নি তার। ও-ই তার মূর্তিমান সর্বনাশ। আর—আরও বোকামি হল এদের বলা। যা করত সে নিজেই করত। নিজেই বলেকয়ে বুঝিয়ে পায়ে ধরে নিবৃত্ত করত—কিম্বা তাঁর আসাটার ব্যবধান দীর্ঘতর করাত। সে ঢের ভাল ছিল। এ একেবারেই চারিদিকে ঢিটিক্কার পড়ে গেল, সবাই জেনে গেল—অথচ সম্পূর্ণ অকারণে। তার কোন উপকার এতে হল না।

ভয় হতে লাগল, মা সত্যি সত্যিই অপমান করে বসবে না তো? মা সব পারে। মানমর্যাদা জ্ঞান নেই একটুও। হে ঠাকুর, যেদিন আবার রাজাবাবু আসবেন—সেদিন যেন মা বাড়ি না থাকে সে-সময়ে—কিম্বা ঘুমিয়ে থাকে। সে-ই যা হয় করে বলে বুঝিয়ে ফিরিয়ে দেবে। হে ঠাকুর!...এক-একবার ভাবে একটা চিঠি লেখে। কিন্তু কি ঠিকানা, কেমনভাবে ওসব লোককে চিঠি লিখতে হয়, কিছুই জানে না। কেমন যেন ভয় ভয় করে। আরও ভয় হয় যদি চিঠি তাঁর হাতে না পড়ে! অতবড় বাড়ি, অতবড় সেরেস্তা—অত লোকজন—সব তো নিজেই দেখে এসেছে। টপ্ করে কি আর কোন চিঠি সোজা তাঁর হাতে পোঁছবে? তাছাড়া বাড়িতে মেয়েরা আছে, তাদের কারও হাতে পড়লে ভদ্রলোক হয়ত আরও অপমানিত হবেন। তাদের এ-ঘনিষ্ঠতা বা তার দুঃসাহস—কেউই প্রীতির চোখে দেখবে না, নানা কদর্থ করবে। নানুদাটাও যদি এসে পড়ত এর মধ্যে—তার হাতে-পায়ে ধরে পাঠাত একবার—সাবধান করে দিতে। সেও তো সেই যা গেছে—এর মধ্যে এক-দিনও আসেনি। অগত্যা ঠাকুরকেই ডাকতে হয়—হে ঠাকুর বাঁচাও। মামীর মান রাখো।

কিন্তু ঠাকুর দেখা যায়—এক-এক সময় সত্যিই পাষাণ হয়ে যান, আর্তজনের কোন প্রার্থনাই কানে পোঁছয় না। অথবা পোঁছলেও মৃদু স্মিত কৌতুকহাস্যে অন্য আর্জিতে মন দেন—কেন যে এটা শুনলেন না, তা তিনি ছাড়া কেউ বুঝতেও পারে না।

এবারও তাই হল। নিস্তারিণী যে ঘুমের ভান করে পড়ে থাকতে লাগল—তা সুরবালা বুঝতে পারল না। তাই দু-একদিন দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে রইল। গাড়ির আওয়াজ পেলে সে-ই নেমে গিয়ে দরজার কাছে দেখা করে বুঝিয়ে বলবে। একবে, এ-বন্দোবস্ত সম্ভব নয়। তার চেয়ে তাঁর ইচ্ছা হলে তিনি যেন পনেরো-বিশ দিন অন্তর দারোয়ান পাঠিয়ে খবর নিয়ে এমনিই ঘুরে যান। এখনকার মতো—দু-একখানা গান শুনে চলে যান।...

কিন্তু সে-সব কিছুই করা গেল না। এমনই অদৃষ্ট, যেদিন রাজাবাবু সত্যিই এলেন—সেইদিনই আবার একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল একেবারে শেষমুহূর্তে—বেলা তেই সাড়ে তিনটে বাজছে। ঘুমটা যখন ভাঙল, তখন শুনল নিচে একেবারে রৈরৈকার পড়ে গেছে, মার গলা সপ্তমে উঠেছে, মনে হচ্ছে দশাসই চণ্ডী হয়ে নাচছে সে দস্তুরমতো।

ছুটতে ছুটতে নিচে নেমে এল সে—কিন্তু তখন—ততক্ষণে রোগ প্রতিকারের বাইরে চলে গেছে। ভাগ্যিস তবু গাড়ি থেকে নেমে চলনটায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন রাজা-বাবু, আর সইসটাও বুদ্ধি করে সদর দরজাটা বাইরে থেকে ভেজিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে—নইলে কেলেঙ্কারীর আর কিছু শেষ থাকত না। রাস্তার লোক তো এতক্ষণে জড়ো হয়ে গিয়েইছে—মার যা গলা, তাতে এপাড়া কেন, ওপাড়ার লোকও শুনতে পাবে—সকলের সামনে বেইজ্জত হতেন ভদ্রলোক।

'বুড়ো মিনসে, তিনকাল গিয়ে এক-কালে ঠেকেছে, গঙ্গা পানে পা হয়েছে, নাতিপুতিতে ঘর ভরে গেল—এখনও এইসব বজ্জাতি ঘুচল না! আমার গুয়ের গোবলা কাঁচ মেয়েটার মাথা খাবার জন্যে তার সব্বনাশ করার জন্যে ফন্দী আটছে! সব্বনাশ হবে, সব্বনাশ হবে—বসে বসে ছেলে-নাতির মিত্যু দেখবে আর বুক চাপড়াবে—এই বলে দিলুম। বোকা মেয়েটা বিশ্বাস করে বাড়িতে আসতে দেয়—এমনিতেই তো সেই দুন্নামে পাড়ায় কান পাতা যায় না—তার ওপর আবার এহকাল পরকাল খাবার ফন্দী। গান গেয়ে রোজগার করে, স্বাধীন রোজগার—সেটা ঘুচিয়ে বাতে তোমার হাততোলার ওপর নির্ভর করে—সেই মতলব তোমার।...কেন, নইলে আর কোথাও জুটছে না বুঝি, কাঁচ মেয়েটার মাথা না খেলে চলছে না?...ওকে উনি এসেছেন বাঁধা রাখতে পাঁচশ' টাকায়। কেন, ওর এমন কি দুনিয়াদশা হয়েছে তাই শুনি! বাবু বসাবে মনে করলে দুপায়ে জড়ো করতে পারত—তেমন মেয়ে আমার নয়। কলকাতা শহর ঝেঁটিয়ে রাজা-মহারাজারা সায়েবসুবোরা পর্যন্ত ছুটে আসত। কী ভেবেছ কি, সস্তায় কিস্তিমাৎ করবে? তাই এত মিষ্টি মিষ্টি বুলি, আমি গান বড্ড ভালবাসি, গান শুনতে আসি। বজ্জাতির আর জায়গা পাওনি! কেন বাজারে বুড়ি রাঁড়ের এত অভাব?...নেকালো বলছি। নিকাল যাও আমার সামনে থেকে। অভি নেকালো। গোপ্টে হেল! ভেবেছ মরে গেছি, না সেখানায় মুড়ি খ্যাংরা জুটবে না এক-গাছা!...ফের যদি কোনদিন এই গলির ত্রিসীমানায় তোমায় দেখি বাছা, রাজাই হও আর মহারাজাই হও, আঁশবটি দিয়ে তোমার নাক-কান কেটে ছেড়ে দোব বলে রাখছি। কোন বাবা তোমায় রক্ষে করতে পারবে না!'

ততক্ষণে সুরবালা মার পায়ে মাথা খুঁড়ছে, 'মা, ওমা—কাকে কি বলছ! তোমার পায়ে পড়ি, তুমি চুপ করো। এরপর যে আমার গলায় দড়ি দেওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না। ও'র কি দোষ!'

'মা, দোষ ও'র কেন হবে—দোষ আমাদের। আমার। বলি কাজিয়ে সাজিয়ে মেওয়াভাতীপামা কথা করে টাকা ঘুষ দিতে কে এনেছিলে? [illegible] [illegible] ওকে

সাধতে?...আগাগোড়া বলছি তোকে ওর মতলব ভাল নয়।'

এতক্ষণে যেন—এই প্রথম কথা বলার সুযোগ পান রাজাবাবু। তাঁর মুখের দিকে সুরবালা চেয়ে দেখেননি, দেখতে পারেননি—নইলে দেখত তাঁর গৌরবর্ণ মুখ অপমানে প্রথমে কেমন করে টকটকে লাল হয়ে এখন কালো হয়ে উঠেছে। গলার কাছেপ জামাটা এইবার পাঁচ মিনিটেই ভিজে ন্যাতা হয়ে গেছে। কিন্তু তবু, কথা যখন বললেন, আশ্চর্য শান্ত শোনাল তাঁর গলা, এত শান্ত যে নিস্তারিণী পর্যন্ত চমকে উঠল। বললেন, 'না, দোষ আমারই হয়েছে সুরো। অপরাধ আমার হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। মনের অগোচর পাপ নয়—তুমি ছেলেমানুষ, আমারই বোঝা উচিত ছিল। তোমার ভবিষ্যৎ আছে, তোমার গোটা বয়সটাই পড়ে আছে। তোমার মা ঠিকই বলেছেন। তুমি দুঃখ করো না, এ-অপমানও আমার পাওনা ছিল—এই আমার প্রায়শ্চিত্ত। আমি চললুম, আর কখনও বিরক্ত করব না তোমাকে। তবে পালে-পার্বনে যদি কখনও বায়না দিয়ে পাঠাই—তখন যেয়ো—এই অপরাধে তখন যাওয়া বন্ধ করো না।'

এই বলে, আর দাঁড়ান না তিনি, আস্তে আস্তে কপাট খুলে বেরিয়ে যান। রাস্তায় সত্যিই ভিড় জমে গিয়েছিল ইতিমধ্যে, হাসাহাসিও শুরু হয়েছিল। রাজাবাবুকে বেরোতে দেখে দু'-একজন টিটকারিও দিল কিছু কিছু—তবে তা যে তাঁর কানে



সার্ফে আপনার বাড়ীতে কাচা সব কাপড়চোপড়ই কি ঝলমলে সাদা, কি চমৎকার পরিষ্কার হয়! সার্ফে পরিষ্কার করার এই আশ্চর্য্য অতিরিক্ত শক্তি আছে। দেদার ফেনা হয় আর আপনার সব কাপড় অনায়াসে নিখুঁৎ পরিষ্কার ধোয়া হ'য়ে যায়। ছেলেমেয়েদের জামাকাপড়, ধুতি পাঞ্জাবী, সার্ট, শাড়ী ব্লাউজ, সবই সবচেয়ে ফর্সা ঝলমলে আর পরিষ্কার হয় সার্ফে কাচলে। বাড়িতে অনায়াসে সার্ফেই কাচুন।

সার্ফে কাচা সবচেয়ে ফরসা!

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

পৌঁচেছে বা সে-সম্বন্ধে তিনি বিন্দুমাত্রও সচেতন—তাঁর মুখ দেখে তা মনে হল না। বড়লোকের বাড়ির সইস-কোচোয়ানও এরকম বহু নাটকে অভ্যস্ত, তাদের চোখ বা কান থাকলে, অথবা ও-দুটো ইন্দ্রিয় থাকার অস্তিত্ব জানতে দিলে চাকরি থাকে না, চাকরিতে উন্নতি হয় না। সইস প্রশান্তমুখে—যেন এসব কিছুই সে দেখে নি বা কানে যায় নি—আশপাশে কোন লোক কৌতুক-মুখর হয়ে ওঠে নি এইভাবে—এদের দরজাটা দ্রুত টেনে ভেজিয়ে দিয়ে গাড়ির পিছনে উঠে পড়ল, কোচোয়ানও একবার চাবুকটা শূন্যেই আস্ফালন করে নিয়ে ঘণ্টা দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল। উপস্থিত জনতা নিজেদের প্রাণ বাঁচাতেই চারিদিকে সরে পথ করে দিল—তামাসাটা জমবার সময় হল না।

নিস্তারিণীদের নিচের তলার ভাড়াটে বো বাইরে ভিড় আর ভেতরে এই রণ-রঙ্গিণী কাণ্ড দেখে আগেই নিজের ঘরে ঢুকে খিল এঁটে দিয়েছিল, সুতরাং রণাঙ্গন একেবারেই খালি হয়ে গেল। শুধু সুরোই তখনও মাথা কুটছে, 'কী করলে মা, কী করলে! কাকে কি বললে! এরপর ওঁর কাছে আমি মুখ দেখাব কি করে?'

'আবার মুখ দেখাবি কি! মুখ যাতে আর না দেখাতে হয়, সেই ব্যবস্থাই তো করলুম। মুখ দেখা! এই তোকে বলে রাখছি সুরো, ঐ মিনসে যদি ফের কোন-দিন এমুখো হয়, ওকে খুন করে তবে ছাড়ব। তার জন্যে আমার ফাঁসি হয় হবে।'

সত্যি সত্যিই নিস্তারিণী কড়া পাহারা বসাল এবার। ভোরবেলা গঙ্গাস্নান করতে যাওয়া দীর্ঘদিনের অভ্যাস, তাও ছেড়ে দিল; যদিও অত ভোরে কলকাতার কোন খনেদী বড়লোক কারও সঙ্গে দেখা করতে আসবে, এ-কল্পনাটাই হাস্যকর। কেউ বায়না দিতে এলেও, কোথাকার লোক তারা, কার বাড়ি গান হবে—তাদের সঙ্গে নিজে কথা কয়ে তবে ছাড়ত। এমনকি পাড়ায় দত্তদের বাড়ি চণ্ডীর গান শুরু হতেও তার কোন উৎসাহ দেখা গেল না শুনতে যাওয়ার, যদিও এর আগে এই চণ্ডীর গান শুনতে অন্য পাড়া পর্যন্ত হেঁটে গেছে সে। এ-গান তার বড় প্রিয়। যেখানেই হয় শুনতে যায়, যেদিন যা দেবার তাও দিতে ভুল হয় না। বিশেষ খুল্লনার সাধের দিন শাড়ি-সিঁদুর তার বাঁধা। তার মানসিকও আছে গণেশ যদি কোনদিন এখানে ফিরে এসে সংসার পাতে—সে পুরো খরচ করে চণ্ডীর গান দেবে একমাস, ছাদে মেরাপ বাঁধতে হয় বাঁধবে।

সুরবালা ঐ ঘটনার পর দুদিন মুখে জল দেয়নি, ওঠেনি। তাতেও নিস্তারিণীকে নরম হতে দেখা গেল না বিন্দুমাত্র। উল্টে ভাড়াটে বৌকে উপলক্ষ করে চেঁচিয়েই বলল, 'যে রোগের যা ওষুধ। পুরনো ব্যামো হলে কড়া ওষুধ চাই বৈকি। দু-একদিন উপোস দেওয়া ভাল, শরীর ভাল হয় মায়ে-মন্যে উপোস দিলে, মাথাও ঠাণ্ডা হয়।'

এমনকি মেয়ে যখন একটা মোটা টাকার বায়নাও প্রত্যাখ্যান করল 'মন ভাল নেই' এই অজুহাতে তখনও নিস্তারিণীকে খুব একটা বিচলিত দেখা গেল না। সে এবার কড়া হাতে রাশ ধরেছে—এসপার-ওসপার দেখে নেবে। মেয়েকে অনেকদিন ভয় করে এসেছে—আর নয়। এবার ছোটখাটো ভয়-গুলোকে দমন করতে পেরেছে অনায়াসে!

একটু একটু করে অগত্যা সুর-বালাকেই উঠতে হয়। ভাতও মুখে তুলতে হয়—বায়নাও নিতে হয় আবার। যদিও মনে হয় বুকের একটা দিক অসাড় হয়ে গেছে তার চিরদিনের জন্যে। আনন্দ শান্তি সুখ তৃপ্তি—এসব কথাগুলোর আর কোন অর্থই বুঝি কোনদিন খুঁজে পাবে না। মার সঙ্গে কথা কয় না সে: কারও সঙ্গেই কয় না—ভাড়াটে বৌয়ের সঙ্গেও না। গাড়ি এলে কোনমতে মাথা নিচু করে গাড়িতে গিয়ে ওঠে। ওর বিশ্বাস, সেদিনের সেই ঘটনার পর থেকে সকলেই তাকে বিদ্রূপের চোখে দেখছে, টিটকিরি দিচ্ছে।...

মাসখানেক পরে একটি ভদ্রলোক এলেন দমদম থেকে। তাঁদের বাড়িতে উপ-নয়ন উপলক্ষে কীর্তন দেবেন তাঁরা, সকালে সুবিধে হবে না, সন্ধ্যায় গাইতে যেতে হবে।

সুরবালা বলল, 'অতদূরে সন্ধ্যেবেলা গাইতে গেলে ফিরব কখন? অজ পাড়াগাঁ শুনেছি ওদিকটা। যদি বিকেলবেলা হত তাহলেও না-হয় কথা ছিল।'

'দেখুন, সে আপনার যা অভিরুচি।' বেশ শুদ্ধ বাংলা বললেন ভদ্রলোক, 'আমরা বাড়ির গাড়ি, ঝি-দারোয়ান পাঠাতে পারি আপনার জন্যে। তারা নিয়ে যাবে আবার পৌঁছে দিয়ে যাবে। দোয়ার-বাজনদারদের যাওয়া-আসার গাড়ি ভাড়া দোব: ফেরার সময়ও গাড়ি ঢের পাওয়া যাবে, সে আমরা ডেকে দোব। যতটা অজ পাড়াগাঁ ভাবছেন ততটা নয়—আমাদের ওখান থেকে শ্যাম-বাজার সেই রাত দশটা পর্যন্ত শেয়ারে গাড়ি চলাচল করে। আপনি নটার মধ্যে গান ভেঙে দেবেন, তাতে আপত্তি নেই। আমাদের বাবুর আপিস থেকে সায়েবসুবো আসবে—তাদের বিকেলে আসার সুবিধে হবে না। তাছাড়া রাত্তির বেলা থিয়েটার দেওয়া আছে—তারা রাত দশটার আগে শুরু করতে রাজী নয়। সন্ধ্যের আগে গান ভাঙলে অত-গুলো লোককে আমরা রাত দশটা পর্যন্ত কোথায় বসিয়ে রাখব বলুন?'

সাফ সাফ কাটাকাটা কথা। অর্থাৎ তুমি যদি রাজী না হও তো আমরা অন্য ব্যবস্থা করব—কিন্তু সময় পালটাবে না।

যদিও কথাবার্তা নেই, তবু কেউ বায়না দিতে এলে নিস্তারিণী আজকাল সামনে এসে দাঁড়ায়। আজও দাঁড়িয়ে ছিল। সুর-বালা মার মুখের দিকে তাকাল একবার। নিস্তারিণী বলল, 'অসময়ে অতদূরে গাইতে যাওয়া—টাকা কিন্তু বেশী পড়বে।'

'টাকার কথা তো এখনও ওঠেনি। বেশী-কমের কথা তুলছেন কেন?' ভদ্র-লোকের ... মৃদু তিরস্কার, 'আমাদের বাবু একটু ঠিক করে দিয়েছেন, তার মধ্যে হলে আমিই ঠিক করে যাব—নয়তো সে-কথা গিয়ে তাঁকে জানাতে হবে।...কত নেবেন বলুন।'

'দেড়শো টাকা পড়বে।' নিস্তারিণী গলায় জোর দিয়ে বলে।

'বাবু অবিশ্যি সওয়াশো পর্যন্ত উঠতে বলেছিলেন, ঘণ্টা দুই-আড়াইয়ের ব্যাপার—তা পঁচিশ টাকার জন্যে আটকাবে বলে মনে হয় না। তাই হবে, আমি এই পঁচিশ টাকাই বায়না দিয়ে যাচ্ছি। পরশু পাঁচটায় গাড়ি আসবে, ঝি দারোয়ান থাকবে গাড়ির সঙ্গে। ছোট গাড়ি, বেশী লোক নেওয়া যাবে না। ঐ গাড়ির চালেই মিষ্টি যাবে বাগবাজার থেকে। বাজনদারদের দুখানা গাড়ি করতে বলবেন, ওদের সঙ্গেও লোক দেব, পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে। ঠিক সময়ে যেন তৈরী থাকে—দেরি হলে আমাদের চলবে না, সায়েব-সুবোর ব্যাপার, টাইম-বাঁধা কাজ।'

পঁচিশ টাকা গুণে দিয়ে রসিদ নিয়ে চলে গেলেন ভদ্রলোক। বাজনদাররা মতির ওখান থেকে উঠবে—সে ঠিকানা দিয়ে দিল সুরো। তার ছোট বাড়ি—যন্ত্র রাখবার জায়গা নেই, অতগুলো লোক জড়ো হলেই বিপদ বাধে। নিজে সে অনেক যন্ত্র কিনেছে বটে খোল বেহালা ইত্যাদি—কিন্তু সেগুলোও মতির ওখানেই থাকে। নতুন যন্ত্র ব্যবহারও হয় না বিশেষ। যারা বাজায় তারা পুরনো যন্ত্রই বাজাতে চায়, মতির আছেও প্রায় সব যন্ত্রই দু-তিন দফা করে—কাজেই কোন অসুবিধা হয় না।

নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে গাড়ি এল। নিস্তারিণী উঁকি মেরে দেখল ওপর থেকে। দেখল সুরবালাও। ছোট ব্রুহাম গাড়ি। ঝকঝকে নতুন। ব্রুহাম দেখে নিস্তারিণী একবার ভ্রূ কুঁচকেছিল বটে কিন্তু সইস কোচোয়ান কোন মুখটাই চেনা নয় দেখে একটু নিশ্চিন্ত হল। যে ঝি-টি নিতে এসেছিল, তারও চালচলন ভাল, বেশ বিনত। এসেই দূর থেকে দণ্ডবৎ করে প্রণাম করল নিস্তারিণীকে, সে যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানটায় আঁচল বুলিয়ে মাথায় ঠেকাল—না ছুঁয়ে পায়ের ধুলো নেওয়া হল। ঝিয়ের সহবৎ দেখে খুশি হল নিস্তারিণী। সে প্রায়ই বলে, 'ঝি-চাকরের চালচলন দেখে বুঝবে মনিবরা কী ধরনের লোক। আঁস্তাকুড়ে আনাজের খোসা আর মাছের আঁশ দেখে বুঝবে কেমন খায়, কী কাপড় শুকোচ্ছে দেখে বুঝবে মেয়েদের নজর কেমন!' দারোয়ান বুড়ো, তার ভারিক্কি চাল—কিন্তু কথাবার্তা তারও ভাল।

সুরবালা সেদিনের পর থেকে মায়ের সঙ্গে একটা কথাও বলেনি, কে জানে তারই বা কি মতি হল—একটু ইতস্তত করে যাবার আগে ওদিককার দেওয়ালের দিকে চেয়ে বলল, "আমি আসছি তাহলে।'

এতেই বিগলিত হয়ে গেল নিস্তারিণী। প্রথম দিনেই এর চেয়ে বেশী উত্তাপ আশা করা যায় না। 'এসো মা, এসো। দুর্গা, দুর্গা।

সকাল করে এসো। রাত হয়ে গেলে আজ আর মতির ওখেনে যাওয়ার দরকার নেই।'

সঙ্গে, সঙ্গে সদর দরজা পর্যন্ত এসে গাড়িতে তুলে দিয়ে গেল সে।

কাঁদনের অসহ দুঃখের পর সত্যিই অনেকটা যেন শান্ত হয়ে এসেছে সুরো। অনেকদিন পরে আজ বড় আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়েছিল, মুখচোখের কি হাল হয়েছে দেখে নিজেই শিউরে উঠেছিল যেন। তারপর ভাই ভাল করে স্নান করেছে—চুলের জট ছাড়িয়ে তেল দিয়েছে। গায়েও তেল বেসম সাবান উঠেছে। খাওয়ার পর ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়েছেও। বেশ গাঢ়, নিশ্চিন্ত ঘুম। ঘুম থেকে উঠে আবার আয়নায় মুখ দেখেছে। অনেকটা মানুষের মতো মনে হয়েছে নিজেকেই।... একদৃষ্টে আয়নার দিকে চেয়ে কি ভাবছে অত, নিস্তারিণী একটু অবাক হয়েই দেখে গেছে বার দুই—বাইরে থেকে। তবে মেয়েকে ভাবনের দিকে মন দিতে দেখে একটু নিশ্চিন্তও হয়েছে। ওষুধের ফল ফলেছে দেখে খুশীও। এ জানত নিস্তারিণী, কাঁচা বয়সে কোন দুঃখই পাঁচ সাত দিনের বেশী থাকে না। তার পরই ভুলে যায়, আবার ঝেড়ে উঠে দাঁড়ায়—জীবন স্বাভাবিকভাবে চলতে থাকে।

আজ সুরোও যেন সেই সব দুঃখ ঝেড়ে ফেলে দিয়েই উঠেছে। পরিপাটি করে চুল বেঁধেছে। আবারও অনেকক্ষণ ধরে গা ধুয়েছে—প্রসাধনও করেছে বেশ সময় নিয়ে—অনেকক্ষণ ধরে। সাজসজ্জাতেও মন গেছে, ভাল দামী বেনারসী শাড়ি পরেছে একখান, নতুন কেনা মুক্তোর কণ্ঠী বার করে গলায় দিয়েছে। তবে সোনার গয়না খুব বেশী একটা পরেনি—সে জন্যে নিস্তারিণী মনে একটু ক্ষুণ্ন। কথা নেই তখনও—এইসব নতুন মানতাসাটা পরতে বলত, আর বাজু। কোমরের গয়না মুখপোড়া মেয়ে তো পরলে না সাতজন্মে, কত শখ করে ওর জন্যে ছোট আর চন্দ্রহার গড়িয়েছিল নিস্তারিণী, আনকোরা পড়ে রইল, মেয়ে একবার অঙ্গে ঠেকাল না বলতে গেলে।... থাকগে, মেয়ের যে আবার ভাবনে মন এসেছে—এই ভাল। কালই আনন্দময়ীতলায় পুজো দিয়ে আসবে সে।......

রাস্তায় পড়েও খুব ভাল লাগল সুরোর। মনে আজ একটা আশ্চর্য শান্তি ফিরে পেয়েছে—একটা আশ্চর্য স্থৈর্য। ভাল লাগছে আরও হয়ত সেই জন্যেই। গাড়ির দরজার ফাঁক দিয়ে দুদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। পুরনো পাড়া। বলতে গেলে জন্মাবধিই দেখছে। যে মাটির ঘরে ওরা ছিল মতির বাড়ির পেছনে—তার কাছেই এ বাড়ি। এই পাড়া, এসব রাস্তাঘাট বহু পরিচিত। তবু, মনে হল অনেকদিন যেন তাকিয়ে দেখা হয়নি। কত নতুন বাড়ি হয়েছে, কত দোকান-পাট। ঐ বেগুনির দোকানটা শুধু সেই আছে এক, সেই নটবর বসে ঝাঁটার উলটো দিক ধরে মুড়ি ভাজছে। বোসেদের বাইরের গাঁথা বেঞ্চি দুটো আরও খানিকটা ভেঙে গেছে। মাগো, কত বড় একটা পেল্লায় মুদির দোকান হয়েছে ঐ ঘরটায়! ঐখানে এক বামুন দিনকতক পাঁউরুটির দোকান করেছিল না? বামুনের রুটি বলে খুব চল হয়েছিল প্রথম প্রথম। সেটা বুঝি উঠে গেল তাহলে?...

দুঃখেকষ্টে যখন দিন গেছে তখন তো বেরনোর প্রশ্নই ছিল না। থিয়েটারে গিছল যে কমাস, গাড়ির দরজা বন্ধ করে যেত, ঘাড় হেঁট করে বসত। ইদানীং বাইরে মুজরো করতে যাওয়া আসার সময়ও অত যেন কোনদিকে তাকাবার কথা মনে পড়ত না; নিজের চিন্তা—কি গান গাইবে, যা গাইল তার মধ্যে কোন গানটা শ্রোতারা 'নিল' বেশী—এসব তো থাকতই—বাড়ির ভাবনাও থাকত, বাবা ভাই মা, ঘর-বাড়ি, ভবিষ্যৎ। চেয়ে থেকেছে, হয়ত বাইরের দিকে, চোখেও পড়েছে সব কিন্তু নজরে পড়েনি। আজ যেন নতুন করে শহরটা নজরে পড়ছে—বহুকাল পরে। থিয়েটারের প্লাকার্ডগুলোও আজ পড়ে দেখতে লাগল। নানুদার নামও আজকাল বেশ বড় হরফে ছাপা হচ্ছে তো! বাবা, নানুদার এত নাম হয়েছে! বলে নি তো' কী চাপা লোক দ্যাখো! এ বইটা খুব চলছে বটে। অপেরা—শুধু নাচগানের বই—মোটে সাড়ে তিনঘণ্টা হয় নাকি—তবু বিক্রী খুব। ভাড়াটে বৌটি দেখতে গিয়েছিল, সেই এসে গল্প করছিল। তবে নানুদারই যে জয়-জয়কার তাতে—তা বলে নি। আশ্চর্য! কত কী কাণ্ড হয়ে যাচ্ছে, সে কোন খবরই রাখে না।...

গাড়ি শ্যামবাজার ছাড়িয়ে সোজা উত্তর দিকে চলল। জনবিরল গৃহবিরল রাস্তা। পথে গাড়ি ঘোড়া চলছে বটে—তার অধিকাংশই ভাড়াটে ছ্যাকরা গাড়ি—কেরায়া ভাড়া নিয়ে যাতায়াত করছে। বড় বড় বাগান মধ্যে মধ্যে—নইলে জলা আর জঙ্গল, এ ছাড়া কিছু নজরে পড়ে না। বস্তি আছে—গোলপাতার চালা নয়ত খোলার ঘর। তাও সেও খুব বেশী নয়। জঙ্গলই বেশী।

দেখতে দেখতে সে জঙ্গল যেন আরও নিবিড় হয়ে এল দুপাশে—বসতি আরও বিরল!

সবাই জানে সুরবালা। দমদমে দু-একদিন গেয়ে এসেছে সে এই হালেই। সকালের দিকেই গেয়েছে—দুপুরে ফিরেছে, মোটা-মুটি দু'একটা চৌরাস্তার মোড় সে জানে দেখলে চিনতে পারবে। এ সে রাস্তা নয়। এত দূরও নয় দমদম। গ্রীষ্মের অপরাহ্ণও ম্লান হয়ে এল, গাড়ি চলছে তো চলছেই—পথ আর ফুরোচ্ছে না। এমন কিছু আস্তেও চলছে না ঘোড়া, একভাবে ছুটছে। ঠুনকো গাড়ি বটে—ছোট ঘোড়ার জুড়ি, কিন্তু দামী মজবুত ঘোড়া, একভাবেই চলছে, এতক্ষণ বহুদূর এসে পড়ার কথা।

গাড়ি ক্রমশ কাঁচা রাস্তায় পড়ল। অন্ধকার তো বটেই—সংকীর্ণও হয়ে এল পথ। মনে হতে লাগল দু পাশের ঘন জঙ্গল যেন মুষ্টি বন্ধ করছে আস্তে আস্তে, এখনই একেবারে টিপে ধরবে। ফাঁদে পড়ার মতো মনে হতে লাগল।

ভয় হবারই কথা। চেঁচামেচি করার কথা। গাড়ি থামতে বলার কথা। নিজের লোক কেউ নেই সঙ্গে। দোয়ার বাজনদার কত দূরে, কোন গাড়িতে তা কে জানে। এই-দিকেই আসছে কিনা তারই বা ঠিক কি। এইভাবে অপরিচিত লোকের সঙ্গে অজানা জায়গায় আসতে রাজী হওয়াই ভুল হয়েছে। মস্ত বড় ভুল। মা এত সতর্ক, সাবধানী—অথচ তারও একবার মনে পড়ল না কথাটা। রূপসী অল্পবয়সী মেয়ে, গায়ে একগা গহনা। কে গাড়ি পাঠিয়েছে, কারা নিতে এসেছে, সঙ্গে নিজের কোন লোক দেওয়া দরকার এসব প্রশ্নই তার মনে জাগল না। একেই তবে নিয়তি বলে? বাবা বলতেন, অদৃষ্টে যেদিন বিপদ থাকে সেদিন ভাগ্য এসে মানুষের চোখ বন্ধ করে দেয়, সোজা সহজ তথ্যগুলোও তার চোখে পড়ে না।

খুবই ভয় হবার কথা—তেমন ভয় হয় না সুরবালার। বরং সে যেন বেশ ঠাণ্ডা মাথায় শান্ত হয়ে কথাগুলো ভাবে। কী কী ভুল হয়েছে তাদের, আর কি নজরে পড়া উচিত ছিল; বাইরে অচেনা বাড়িতে যাকে মুজরো করতে যেতে হয় তার সঙ্গে নিজের দারোয়ান থাকা দরকার; মতি দারোয়ান বা চাকর ছাড়া কোন অপরিচিত জায়গায় যায় না—বাগবাজার বৌবাজারেও না; ওরও একজন দারোয়ান রাখা উচিত ছিল। চেনা বিশ্বাসী দারোয়ান; আজও অন্তত দুজন পুরুষ দোয়ার বা বাজনদারের সঙ্গে ছাড়া আসতে রাজী হওয়া উচিত হয়নি। সন্ধ্যের পর এ রাস্তায় আসা বা এ পাড়ায় মুজরো নেওয়াই উচিত হয়নি কোনমতে।...

দোলে ফাল্গুন-চৈত্রব্যাপী
১৫% কমিশন
ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথ-কৃত
শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
৬ খণ্ড . ৪র্থ সংস্করণ . ১২৫ মূল্যে ১০৩.০০
শ্রীচৈতন্যভাগবত
৭ খণ্ড . প্রথম প্রকাশ . ১৮ মূল্যে ৮০.০০
মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ
১০ মূল্যে ৩৫.০০
রাজমোহন নাথ-কৃত
রাথপথের প্রাচীন পুঁথি ৬.৫০
RIGVEDA SUMMARY 8.00
KESHOBKANTO'S
MESSAGE OF THE GITA 12.00
সাধনা প্রকাশনী
৬১ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট। কলি-৯
ফোন :

বেশ শান্ত হয়েই ভাবে সুরো—হিসেব করে করে। যেন এসব ভাবার মতো অবসর প্রচুর—চিন্তাটাও বিলাস মাত্র। তার যেন একটু কৌতুকও অনুভব হয়। সে কৌতুকের একটা ক্ষীণ চিহ্ন হাসির ভঙ্গীতে লেগে থাকে দুই ওষ্ঠপ্রান্তে। সামনের আসনে ওদের যে ঝি বসেছিল সে একটু অবাক হয়েই তাকিয়ে থাকে তার দিকে। এতক্ষণে চেঁচামেচি শুরু করবে, কান্নাকাটি করবে সুরো—এইটেই সে আশা করেছিল বোধহয়। তার এই শান্ত নিরুদ্বিগ্ন ভাবে—এই ভাগ্যের কাছে আত্ম-সমর্পণের ভঙ্গীতে সে যেন কেমন হকচাকিয়ে যায়। ঠিক বুঝতে পারে না ব্যাপারটা।...

শেষ পর্যন্ত গাড়িটা একটা বড় ফটক পেরিয়ে একটা বাগানে ঢুকল। প্রায় অন্ধকারই হয়ে এসেছে তখন, তবুও কিছু কিছু নজর চলে। বেশ বড় বাগান। বাগানের ভেতরের পথ সরকারী রাস্তার চেয়ে ঢের বেশী চওড়া। পথের দুদিকে দুটো বড় পুকুর। নানান ফল ফুলের গাছ, ফুলের কেয়ারী। মধ্যে মধ্যে বোধহয় কিছু আনাজের চাষও আছে, সেটা বোঝা গেল না এতদূরে থেকে। তবে বাগান যত বড়ই হোক—কোন ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠান যে এখানে নেই তা ঢুকেই বোঝা যায়। কর্মবাড়ির প্রধান লক্ষণ আলোকসজ্জা—তার কোন চিহ্নমাত্র নেই। বেশ খানিকটা বাগান ভেঙে ভেতরে দোতলা বাড়ি—বড়লোকের বাগানবাড়ি যেমন হয় তেমনিই—হয়ত মাঝের ঘরটা নাচঘর হবে—গাড়িবারান্দা সবই ঠিক—কিন্তু না আছে লোকজন না আছে আলো। গাড়িবারান্দার মাথায় একটা তেলের আলো ঝুলছে মিটমিট করে; তার ভেতর দিয়ে হলঘরের ঝেটুকু দেখা যাচ্ছে—ঝাড় জ্বলছে বটে, সম্ভবত একটিই ছোট ঝাড়, তাতে এমনিতেই যথেষ্ট আলো হয়নি। ওপরের ঘরে ঘরে আলো জ্বলছে, তবে সেও সাধারণ আলো—প্রতিদিন তাদের ঘরে যা জ্বলে তেমনি। আর লোক তো একেবারেই নেই, কোথাও একটা দারোয়ান মালী পর্যন্ত চোখে পড়ল না। যে দারোয়ান সঙ্গে এসেছিল সে কোচোয়ানের পাশে বসে ছিল এতক্ষণ, সে-ই লাফিয়ে নিচে নেমে ফটক খুলে দিল, আবার গাড়ি বাগানে ঢুকলে বন্ধ করল। তারপর সেও অদৃশ্য হয়ে গেল।

গাড়িবারান্দায় গাড়ি থামতে প্রায় অন্ধকারের মধ্যে থেকে এগিয়ে এলেন যে মানুষটি—তাঁকে অন্ধকারেও চিনতে পারত সুরবালা—রাজাবাবু। নিজে গাড়ির দরজা খুলে হাত ধরে সুরবালাকে নামালেন।

'খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলে, না?' ভেতরে যেতে যেতে মৃদুস্বরে প্রশ্ন করেন—রাজাবাবু। সুরবালার মুখে চোখে কোন বিস্ময় বা অপ্রত্যাশিতের চমক লাগল কিনা সেই ক্ষীণ আলোতেই লক্ষ্য করার চেষ্টা করেন।

'কে, না তো।' সহজভাবেই উত্তর দেয় সুরো।

'ভয় পাওনি? সে কি! আমি ভেবে-ছিলুম খুবই ভয় পাবে। ঝিয়ের কাছে চিঠি দেওয়া ছিল আমার। চেঁচামেচি করলে বার করে দেখাবে—বলা ছিল।'

পিছন দিকে ফিরে ঈষৎ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকান ঝিয়ের দিকে।

ঝি আঁচলে বাঁধা চিঠিটা তুলে দেখিয়ে বলে, 'দরকারই হল নি যে! দিদি সব জানে বলে মনে হল তো আমার। একটা রাও কাড়লে নি,—ঠায় চুপ করে বসে অইল ব্যাতটা পথ।'

'আশ্চর্য তো! কিসে বুঝলে?' রাজাবাবু প্রশ্ন করেন সুরোকে।

'ঠিক যে কোন লক্ষণে বুঝেছি তা নয়। হঠাৎই মনে হল। এমনিই ভাবছিলুম, ঠাকুরকে ডাকছিলুম তুমি যেন জোর করে তোমার কাছে টেনে নাও, নিতে পারো।.. সেদিন কেমন মনে হল ঠাকুরই শুনতে পেয়েছেন। সেদিন মানে—ঐ লোকটা যেদিন বায়না দিতে গেল।...মন অন্তর্যামী বলে—তাই হবে বোধহয়। তখন থেকেই মনটা আশ্চর্য শান্ত হয়ে গেল। দুঃখ দুশ্চিন্তা কিছুই রইল না। কী করব—একদিকে তুমি আর একদিকে আমার গান, আমার নাম যশ প্রতিপত্তি টাকা, মা ভাই—বড় সাংঘাতিক দোটানায় পড়েছিলুম, কিছুই ঠিক করতে পারছিলুম না। মনে হচ্ছিল তুমিই আমার হয়ে যা ভাল হয় ঠিক করবে। সেদিন মনে হল ঠিক করেছ। আশ্চর্য একটা শান্তি পেলুম মনে, আমার আর কোন দায়দায়িত্ব রইল না—যেন বেঁচে গেলুম।'

খুব আস্তে আস্তে বলছিল সুরবালা ছেলেমানুষের মতোই। থেমে থেমে যেন কতকটা আধো আধো কথার মতো। রাজাবাবুর হাত ধরে, তাঁর হাতে ভর দিয়ে সিঁড়িতে উঠতে উঠতে। রাজাবাবুও আবিষ্ট হয়ে শুনছিলেন। এ তাঁর কাছে কল্পনাতীত সৌভাগ্য, সুদূর আশাতীত সুখ। এতটা ভাবতে পর্যন্ত যেন সাহস করেন নি—যখন এই চক্রান্ত করেছিলেন, যথেষ্ট ভয়ে ভয়েই করেছিলেন, চরম দুঃসাহসের কাজ করছেন বুঝেই। এখন মনে হচ্ছে কথা নয়, খুব—খু-ব মিষ্টি কোন গান শুনছেন। এত বিস্ময় এত আনন্দ তার কখনও বোধ হয় নি। কোন বিস্ময়, কোন অভাবনীয়ত্বে যে এত আনন্দ থাকতে পারে তাও তিনি জানতেন না।

ওপরে পৌঁছে হলঘর পেরিয়ে পূর্ব-দিকের ঘরে ঢুকল ওরা। বড় খাটে শুভ্র সুন্দর শয্যা। খাটের বাজুতে বাজুতে ফুল। ফুলের থোড়েমালা জড়ানো। সুরবালা যা ভালবাসে—জুঁই বেল মল্লিকার গোড়ে। সেই প্রথম দিনের—মানে ওদের দেখা যেদিন প্রথম—আসরের মতো গোড়ে মালারই ঝালর ঝুলছে চারদিকে, খাটের ছত্রিতে ছত্রিতে। দেওয়ালের গায়েও। খাটের পাশে শাদা পাথরের উঁচু চৌকীতে ঝকঝকে দুটি রুপোর চুমকী ঘটিতে খাবার জল। একটা জলচৌকীতে গড়গড়া। মেঝেতে নরম জাজিমের মতো কি পাতা। খাটের ওপরে টানা পাখা—তাতেও ফুলের সমারোহ। একটিমাত্র ঝাড়—তাতে চার পাঁচটা রেড়ির তেলের শেজ জ্বলছে, সেটুকু আলোও লতাপাতায় আবছা অস্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

মিনিট কয়েক স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন রাজাবাবু। সুরো কোন প্রশ্ন করল না, কেন দাঁড়াচ্ছে তাও বুঝতে চাইল না। রাজাবাবুর হাতটা শক্ত করে ধরেছে—সেই তার পরম নির্ভর, পরম নির্ভর। আর কিছুই জানতে চায় না সে, ভাবতে চায় না।

খানিকটা সেখানে থেকে ঈষৎ একটু আকর্ষণ করে পাশের ঘরে নিয়ে এলেন রাজাবাবু।

এ ঘরের সম্পূর্ণ ভিন্ন সজ্জা। প্রথমটা মনে হয় বুঝি কোন পুজোর আয়োজন করা হয়েছে। ঘরের মাঝখানে একটা বিরাট সিংহাসনে রাধাকৃষ্ণের বড় যুগল মূর্তির পট, ফুলেমালায় সাজানো। তার সামনে আলপনা দেওয়া জায়গায় আম্রপল্লব দেওয়া পূর্ণ ঘট। পাশে একটি বড় থালায় দুটি মালা, রুপোর বাটিতে চন্দন।

'আমি সকাল থেকে উপবাস করে আছি সুরো। বাইরের অনুষ্ঠান তো সম্ভব নয় তুমি বামুন, আমি বেনে—কিন্তু তোমার ঠাকুর, প্রেমের ঠাকুরের কাছে তো সব সমান তাঁর কাছে প্রেমই বড়। তাঁর সামনে তাঁকে সাক্ষী রেখে আমরা আজ মালা বদল করব। আমাদের বিয়ে হবে।'

সুরো গলায় আঁচল দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে সেই পটমূর্তির সামনে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করল, তারপর ফিরে রাজাবাবুকেও। তারপর উঠে সে নিজেই এবার তাঁর হাত ধরে আকর্ষণ করল, 'চলো ও ঘরে যাই।'

'এ ঘরে—এ ঘরের কাজটা করবে না?'

'না। ওতে আর দরকার নেই। আমার ঠাকুরের কথা বলছিলে না—আমার এই গানের ঠাকুর, প্রেমের ঠাকুর? উনিই শিখিয়েছেন ভালবাসার লোকের কাছে নিজেকে সঁপে দিতে হলে সব বিসর্জন দিতে হয়।... মেয়েদের কাছে লজ্জা অনেক বড়, বস্ত্রহরণ করে তিনি গোপিনীদের লজ্জা পর্যন্ত বিসর্জন দিইয়েছিলেন। মাসী কথাটা বারবার বলেছে আমাকে, এই সেদিনও বলেছে। দ্যাখো, যশ আর টাকা—মানুষের কাছে সবচেয়ে লোভের বস্তু, আকিঞ্চের বস্তু—চিরদিনের মতো ছেড়ে তোমার কাছে এসেছি, নিজেকে তোমার হাতে তুলে দিতে, সঁপে দিতে—সেখানে ঐ তুচ্ছ মালাবদলের অহঙ্কারটুকুই বা রাখব কেন? তুমি আমাকে দাসীর মতোই পায়ে ঠাঁই দাও, বাঁধা মেয়ে-মানুষের মতো করেই নাও, তুমি আমাকে বেশ্যার চোখে দ্যাখো—যা খুশি। ও নিয়ে আর আমি মাথা ঘামাবো না। কোন কথাই ভাবব না।...তোমার পায়ে সঁপে দিলুম আমাকে—এইটুকুই শুধু জানব, এর বেশী নয়। কোন অহঙ্কার কোন ভরসা কোথাও না থাকে। আজ থেকে যা ভাববার যা করবার তুমি ভাববে, তুমি করবে। যদি কোনদিন তাড়িয়ে দাও সেদিনও ঝগড়া করব না, কপাল চাপড়াব না। বলব না যে আমার কি হল। এইটুকু কদিনে বুঝেছি—তুমিই আমার সেই ঠাকুর, তোমাকে পাবার জন্যেই এতদিন এত গান গেয়েছি, এত কেঁদেছি।'

(ক্রমশঃ)

বসন্তের উৎসব

তারাপদ মাইতি

ভারতের গণ-উৎসব এবং সর্বপ্রধান বসন্তোৎসব দোল। ফাল্গুনী পূর্ণিমার অনেক আগে থেকেই এ উৎসবের শুরু। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের দেহে ও মনে এ সময় হোলির রঙ ধরে, হোলির রঙে তারা রঞ্জিত হয়ে ওঠেন। সর্বত্র আবির-কুমকুমের ছড়াছড়ি—সমস্ত দেশ যেন বৃন্দাবন হয়ে ওঠে—

"অরুণ তরুণ তরু অরুণহি ধরণী।
স্থল জলচর ভেল সবে এক বরণী।।
অরুণহি নীরে অরুণ অরবিন্দ।
অরুণ হৃদয় ভেল দাস গোবিন্দ।।"

এই হোলি বা দোলোৎসবের উৎপত্তি বিবর্তন ও ইতিহাস খুবই বিচিত্র ও কৌতূহলোদ্দীপক। নানা মুনির নানা মতের মধ্যে এর সৃষ্টিরহস্য নিহিত; বিভিন্ন বাহ্যউপকরণের সংমিশ্রণ এর বিবর্তন ইতিহাসকে করেছে জটিল; অতীতের অন্যান্য বসন্তোৎসবকে গ্রাস করে হোলি বর্তমান বসন্তোৎসবের একচ্ছত্র আসনটিতে সমাসীন।

বর্তমানে হোলি ও দোলোৎসব একার্থ ও একীভূত হলেও আদিতে এ দুটি ছিল পৃথক উৎসব, এবং এখনও কোন কোন অঞ্চলে এ দুটিকে স্বতন্ত্র উৎসব বলে ধরা হয়। বঙ্গ, উড়িষ্যা ও মাদ্রাজে এ উৎসবের নাম দোল, উত্তর পশ্চিম ও মধ্যভারতে হোলি নামে পরিচিত। বাংলাদেশের এ উৎসবে ফাল্গুনী শুক্লাপক্ষের চতুর্দশীতে বিষ্ণু (বা কৃষ্ণ) মন্দিরে কিংবা গৃহপ্রাঙ্গণে মানুষের একটি কুশপুত্তলিকা স্থাপন করা হয়। ঠিক তার নীচে নির্মিত হয় ছোট্ট একটি কুঁড়েঘর। সন্ধ্যাকালে মন্দিরে ব্রাহ্মণ পুরোহিত দ্বারা পূজা ও হোমাদি করার পর বিগ্রহকে প্রাঙ্গণে কুশপুত্তলিকার কাছে নিয়ে আসা হয়। সেখানেও পূজার্চনার পর কুশপুত্তলিকাতে আগুন দেওয়া হয়। আগুনের চারপাশে বিগ্রহটিকে শোভাযাত্রা করে সাতবার প্রদক্ষিণ করানর নিয়ম। পরদিন প্রত্যুষে বিগ্রহকে মন্দিরে সুসজ্জিত দোলায় স্থাপন করা হয় এবং পুরোহিত সকাল, দুপুর এবং সন্ধ্যায় পুনর্বার যথাবিহিত পূজাদি করার পর তিনবার দোল দেন। উপস্থিত সকলে বিগ্রহের উপর আবির ছড়িয়ে দিলে পুরোহিত বিগ্রহ-স্পর্শ-আবির সকলের কপালে স্পর্শ করান। অতঃপর নিজেদের মধ্যে আবির ও রঙখেলা শুরু হয়। দোলের সময় নরনারী উভয়ের সম্পর্কের কিছুটা শিথিলতা দেখা যায়; বড় ভ্রাতৃবধূ, শ্যালিকা কিংবা হাসি-ঠাট্টার সম্পর্ক আছে এমন নরনারীর মধ্যে রঙ ও আবির খেলার ঘটা পড়ে যায়। স্থানবিশেষে অশ্লীল গানও গাওয়া হয়। দোলের তিনচার দিন পরে উত্তর ও পূর্ববঙ্গে একজনকে 'মূর্খ রাজা' সাজিয়ে ঘোড়ায় চড়িয়ে মজা ও তামাসা করতে দেখা যায়। সাজিয়ে গুছিয়ে মিথ্যা কথা বলে লোক ঠকান (কতকটা 'এপ্রিল ফুল' এর মত) কোন কোন জায়গায় রেওয়াজ।

উড়িষ্যায় মানুষের পরিবর্তে ভেড়ার কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। কোথাও কোথাও জীবন্ত ভেড়াকে পোড়ান হয়। উড়িষ্যায় অবশ্য 'মূর্খ রাজা'র দেখা মেলে না। বিহারে ফাল্গুনী চতুর্দশীর পরিবর্তে পূর্ণিমাতে এই বহ্ন্যুৎসব উদ্‌যাপিত হয় এবং সেখানে এই বহ্ন্যুৎসবই মূলতঃ অসল উৎসব। গমের মঞ্জরী, ছোলা গাছ এবং ভোগ আহুতি দেওয়া হয়। পরে সেগুলিকে প্রসাদ হিসেবে সকলে ভক্ষণ করে। বিহারে কোন বিগ্রহকে দোলান হয় না। মূর্খরাজা কেবল হাজারিবাগ অঞ্চলেই রাজত্ব করেন। প্রায় একইভাবে উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, রাজপুতনা, গুজরাট, মহারাষ্ট্রে হোলি উদ্‌যাপিত হয়। উত্তরপ্রদেশের কোন কোন অঞ্চলে রামসীতাকে দোলায় আরোহণ করান হয়। বহ্ন্যুৎসবে একটি সুপারী, একটি তামার পয়সা ও এক টুকরো হলুদ অর্পণ করা হয়। সাহারান-পুরে কোন কোন আখড়ায় পল্লীকবির মধ্যে কবিতা রচনার প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে। রাজপুতনায় দুই দল অশ্বারোহীর মধ্যে এক দ্বন্দ্বযুদ্ধের প্রহসন হয়, পরস্পরের প্রতি আবিরের গোলা নিক্ষেপ করে। ইন্দোরে বেনিয়ারা সুরকি প্রভৃতি দিয়ে একটি নগ্ন মূর্তি গড়ে হোলির সময় তা ভেঙে ফেলে। এ সময় তারা প্রজনন দেবতা নাথুরামেরও পূজা দেয়। গুজরাটে কুমারীরা বহ্ন্যুৎসবের ভস্ম দ্বারা গৌরীর মূর্তি গড়ে পূজা করে। সেখানে মানুষের কুশপুত্তলিকার সঙ্গে একটি লিঙ্গ মূর্তিও দাহ করা হয়। মহারাষ্ট্রে যেসব 'বীর' যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণবিসর্জন দিয়েছেন তাঁদের উত্তরপুরুষেরা অগ্নিকুণ্ডের চতুর্দিকে নৃত্য করতে থাকে, যে পর্যন্ত না তাদের মধ্যে বীরদের আত্মা 'ভর' করে। মাদ্রাজ অঞ্চলে হোলির সময় যে উৎসব হয় তার নাম 'কামদহনম্', মদন ও রতির প্রতিকৃতি দাহ করা হয়। সেখানে দোলযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় একমাস পরে চৈত্র মাসে। বিহার, উত্তর-প্রদেশ, রাজপুতনা, গোয়ালিয়র প্রভৃতি অঞ্চলে হোলির সময় যৌনলীলাময় নৃত্য-গীত ও অশ্লীল অঙ্গভঙ্গির যে শোভাযাত্রা বের হত সে সময় পথেঘাটে মেয়েদের বের হওয়াই অসম্ভব ছিল। যৌনক্রিয়ারত মাটির পুতুল ও যৌনাঙ্গসমন্বিত বৃহদাকার প্রতিমূর্তি এ সকল শোভাযাত্রার অঙ্গ ছিল।

আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি দোলোৎসবকে নববর্ষোৎসব বলেছেন। অতি প্রাচীনকালে সূর্যের উত্তরায়ণ আরম্ভ দিন থেকে নতুন বৎসর গোনা হত। দোলযাত্রা সেই সংবৎসরারম্ভের দিন। ('যাত্রা' শব্দের অর্থ গমন, পরে অর্থ হয়েছে দেবতার উৎসব। 'দোল' শব্দের অর্থ দোলন, ঋতু-পথে বা বৃত্তপথে এদিক ওদিক যাতায়াতের নাম দোলন। জগদম্বার পালনীশক্তিস্বরূপ বিষ্ণুরূপী সূর্য এভাবে দোলেন। অর্থাৎ বর্ষচক্রে ভ্রমণের সময় তাঁর উত্তর ও দক্ষিণ-গতিই হচ্ছে এই দোলন।) সারা শীতকাল জীব, প্রাণী ও উদ্ভিদ জড়তার মধ্যে যেন আচ্ছন্ন থাকে। উত্তরায়ণ আরম্ভের সময় থেকে সূর্যের তাপ ও আলোক বাড়তে থাকে, জীবকুলের জড়তার অবসান হয়, প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে কর্মপ্রচেষ্টা ও সজীবতা প্রকাশ পেতে থাকে। চারিদিকে তখন আনন্দের সাড়া পড়ে যায়। উৎসবের এই উপযুক্ত সময়! এইরূপে রবির উত্তরায়ণ আরম্ভের এক এক সময় আমরা এক একটি উৎসব পেয়েছি; চৈত্রে মদনোৎসব (বর্তমানে লুপ্ত), ফাল্গুনে দোলোৎসব, পৌষে মকর-সংক্রান্তি, শরতে শারদোৎসব। বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁর অত্যাশ্চর্য জ্যোতিষীগণনার দ্বারা দেখিয়েছেন যে প্রায় ছয় হাজার বৎসর পূর্বে ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিনে সূর্যের উত্তরায়ণ আরম্ভ হত। বর্তমান দোলোৎসব সেই নববর্ষারম্ভেরই স্মৃতি।

চতুর্দশীতে বহ্ন্যুৎসব বা চাঁচরে যে গৃহ ভস্মীভূত হয় আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে সে গৃহ ভাদ্রপদানক্ষত্রের প্রতিরূপক। ঋগ্বেদের কালে এই ভাদ্রপদার নাম অজ-একপাদ (একপাদবিশিষ্ট ছাগ) ছিল। বহ্ন্যুৎসবে যে মেষ বা মেড়া (বা তার প্রতিকৃতি) দগ্ধ করা হয়, সে এই অদ্ভুত ছাগেরই প্রতিরূপ। এখানে মেড়াকে অসুর কল্পনা করা হয়েছে, যেন কোন অসুর সূর্যকে উত্তরায়ণ স্থানে আসতে বাধা দিচ্ছে। সে ভস্মীভূত বা বিনষ্ট হলেই রৌদ্র বাড়বে, দিবামান বৃদ্ধি পাবে। বর্তমানে ভেড়া বা তার কুশপুত্তলিকা দগ্ধ করার মধ্যে ঐ আপদ দগ্ধেরই প্রতিরূপ লক্ষিত হয়। দোলের সময় লাল ফাগ (ফল্গু) দিয়ে শালগ্রামরূপী সবিতা (বা বিগ্রহরূপী শ্রীকৃষ্ণ)র অঙ্গ ভূষিত হয়। ঋগ্বেদে সবিতার হিরণ্যদ্যুতি, হিরণ্যপাণি। শীত-কালে বালরবি লোহিতবর্ণ দেখায়। এই লোহিতচূর্ণ দিয়ে তা জ্ঞাপন করা হয়। এভাবেই দোলোৎসবের আর এক নাম 'ফল্গ্যুৎসব' হয়েছে। দোলের সময় স্থানে স্থানে যে অশ্লীল গান ও অঙ্গভঙ্গী করা হয় তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিদ্যানিধি মহাশয় বলেছেন, সেকালে সাধারণের

বিশ্বাস ছিল যে নববর্ষের প্রথমদিনে চক্ষু, কর্ণ, কিংবা দেহ অশুচি করলে সে বৎসর যমদূত স্পর্শ করতে পারে না। এখনও মহারাষ্ট্রে ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণ নববর্ষের দিনে অন্ত্যজ স্পর্শ দ্বারা দেহ অশুচি করে, পরে স্নান করে শুদ্ধ হয়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে হোলি আর্য-পূর্ব জাতিদের উৎসব ছিল। আর এ তথ্য সংস্কৃতিগত জনতত্ত্ব-বিশারদদের দ্বারাও আজ স্বীকৃত। আধুনিক ঐতিহাসিক হোলি উৎসবকে নব্যপ্রস্তর যুগের সীমানার মধ্যে টেনে নিয়ে যেতে চান। তাঁর মতে

> "Large mesolithic deposits of ashes, with a few animal bonfires (from the sacrifices) and rain-compacted strata prove annual or periodic recurrence in the same locality of sacrifice associated with gigantic holi bonfires' (Kosambi)

আরও জানা গেছে আদিতে হোলি ছিল কৃষি সমাজের পূজা; সুশস্য উৎপাদন কামনায় নরবলি ও যৌনলীলাময় নৃত্যগীত ছিল তার প্রধান অংগ। উপরে হোলির যে প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে, তার সংগে আর্যপূর্ব দ্রাবিড়দের উৎসবাদির আশ্চর্য রকমের মিল দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য ভারতের মাটিতে কৃষির প্রবর্তন করেন অব্যবহিত দ্রাবিড়-পূর্ব জাতি—প্রোটো-অস্ট্রোলয়েড। আর্যসভ্যতা ও সংস্কৃতির ষোল আনার মধ্যে বারো আনা দানই এই প্রোটো-অস্ট্রোলয়েড ও দ্রাবিড়দের। এ'দের অনেক দেবদেবী আর্যদের মধ্য দিয়ে হিন্দু ধর্মে প্রবেশ করেছেন। গোন্দ, কোল প্রভৃতির দেবতা গণশ্যাম দেও কৃষ্ণরূপে, ভ'ইরো কালভৈরব ও হনুমন্ত (তামিল আন-মন্তি, অর্থ পুরুষ বাঁদর) হনুমান হয়ে বসে আছেন। নৃতাত্ত্বিকদের মতে এর কারণ,

> The spirit of Hinduism has always been Catholic, and it has always been ready to give shelter to foreign beliefs, provided it was permitted to assimilate them in its own fashion" (Hastings)

দ্রাবিড়দের উৎসবাদিকে দু' শ্রেণীতে ভাগ করা যায় : (১) কৃষিকার্যের সংগে জড়িত যেমন জমিতে লাঙল দেওয়া, বীজ বপন ও শষ্য কর্তনের সময়কার উৎসব; এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল জমির উর্বরাশক্তি বৃদ্ধি করে বেশী ফসল উৎপাদন করা; আর (২) সমাজের ক্ষতিকারক অপদেবতা বিতাড়নের জন্য সাময়িক আচার অনুষ্ঠান ও যাদু-মন্ত্রাদি প্রয়োগ করা। এখানে উল্লেখ্য যে ফুল, ফল, রান্না করা খাদ্যাদি, পোশাক, অলংকার প্রভৃতি দিয়ে (যেন কোন মানুষকে উৎসর্গ করা হচ্ছে) মূর্তিপূজা দ্রাবিড়-দেরই উদ্ভাবনা। এ জিনিস বৈদিক যাগ-যজ্ঞাদির হোতা আর্যদের অজানা ছিল। ভাষাতত্ত্ববিদ পণ্ডিতদের মতে সংস্কৃত 'পূজ' ধাতু দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠি থেকে আগত। এছাড়া অনেক সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহারও দ্রাবিড়দের থেকে আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছি। এদের মধ্যে দেবর ভাজের মধ্যে হৃদ্যতার ভাব, ভাসুর-ভাদ্রবৌয়ের মধ্যে পিতসুলভ সম্পর্ক, এবং বিবাহাদি শুভ কাজে সিন্দুর ও হরিদ্রার ব্যবহার উল্লেখ করা যেতে পারে। নরবলি প্রথাও দ্রাবিড়দের মধ্যে সুপ্রচলিত ছিল। দ্রাবিড় জাতিরই উত্তরাধিকারী কাঁধ ও গোন্দদের কৃষি উৎসবের উপাদানগুলিও (যেমন, নরবলি, মেষ দগ্ধ করা, শস্যের ফলন বৃদ্ধির জন্য জমিতে বহ্ন্যুৎসবের ভস্ম ছড়ান, মদ্যপান ও যৌন-উচ্ছৃংখলতা) সংগে হোলির প্রকৃতির কোন পার্থক্য নেই। মুণ্ডাদের মাঘ পরবেও এই পানোন্মত্ততা ও যৌনোচ্ছৃংখলতা দেখা যায়। এ প্রসংগে পি, টমাসের উক্তি উল্লেখ করা যেতে পারে—

> "Holi is a fertility festival which has its origin in the aboriginal orgies of some powerful tribes and even now retain many of the characteristics of the fertility festivals of savages"

বৈদিক যুগে সমন নামে সারারাত্রব্যাপী একটি জনপ্রিয় উৎসবের সাক্ষাৎ পাই। এটি সম্ভবতঃ শীতকালে অনুষ্ঠিত হত, কেননা সারারাত্রব্যাপী অগ্নি প্রজ্জ্বলনের উল্লেখ দেখি। স্বৈরিণীরা স্বেচ্ছাচারিতার জন্য, অবিবাহিতা কন্যারা স্বামী সন্ধানে, দেহোপজীবিনীরা জীবিকা নির্বাহ করতে, কবি যশোলাভের আকাঙ্ক্ষায়, তীরন্দাজ ও অশ্বারোহী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পুরস্কারের লোভে এ উৎসবে যোগ দিত। (পূর্বো-ল্লিখিত সাহারানপুর ও রাজপুতনার হোলি খেলা এ প্রসংগে স্মর্তব্য) বৈদিক যুগে সম্বৎসরব্যাপী সত্রের পর অশ্লীল ক্রীড়াকৌতুকেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। উত্তরভারতে হোলির দিনে যে ভাঙ চলে তা বৈদিক যুগের সোমরসকে স্মরণ করিয়ে দেয়। অবশ্য এসবের সংগে উল্লিখিত দ্রাবিড় উৎসবের কোন যোগ আছে কিনা বলতে পারি না। তবে ডব্লু জি উইলকিনস্ দোলযাত্রা বা হোলির উৎপত্তি সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন তা স্মরণ করা যেতে পারে—

> "It is a festival, with modern innovations, that was held in Vedic times to celebrate the return of Spring"

এই একই কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন আল্' অফ্ রোনাল্ডসেও।

বৌদ্ধযুগে যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকর্ম নিষিদ্ধ করার যে একটা প্রবণতা দেখা গিয়েছিল প্রিয়দর্শী অশোকের সময় তা সম্পূর্ণ হয়। প্রিয়দর্শী অশোক দেশে প্রাণীহত্যা নিষিদ্ধ করে দেন। এমন কি রাজপ্রাসাদের জন্য যে হাজার হাজার পশু বধ করা হত তা শেষ পর্যন্ত তিনটি প্রাণীতে এসে ঠেকে—দুটি ময়ূর ও একটি হরিণ। অবশেষে তাও বন্ধ করা হবে বলে শিলালিপিতে (প্রথম শিঃ লিঃ) বলা হয়েছে।" সমস্ত 'সমাজ' বা উৎসবও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, কেননা অশোক এসব উৎসবের মধ্যে পশুবধ ও অন্যান্য অসংবৃত্তি লক্ষ্য করেছিলেন। বৌদ্ধযুগের এই 'সমাজ' বা উৎসবের সংগে উপরোক্ত দ্রাবিড় বা আর্য-উৎসব কিংবা পরবর্তীকালের হোলির কোন সম্পর্ক আছে কিনা তাও পুরাতাত্ত্বিকের গবেষণার বিষয়।

তবে ঐতিহাসিকভাবে দোলোৎসব (বা ঝুলন, দুয়েরই অর্থ এক) এর প্রথম উল্লেখ পাই রামগড় গুহার এক লিপিতে (খৃঃ পূঃ ৩য়-২য় শতক)। বাসন্তী পূর্ণিমার অনুষ্ঠিত এ উৎসবে নরনারী যূঁইপুষ্পে সজ্জিত হয়ে যোগ দিতেন। অবশ্য দোলনায় শ্রীকৃষ্ণ কিংবা অন্য কোন দেবতা দুলতেন কিনা, জানা যায় না। সংস্কৃত সাহিত্যে হোলির প্রথম উল্লেখ দেখা যায় জৈমিনীর পূর্বমীমাংসার সবরভাষ্যে। কারো কারো মতে জৈমিনী খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকের লোক ছিলেন এবং সবরভাষ্য রচিত হয়েছিল খৃঃ পূঃ প্রথম শতকে। (যদিও এ কাল নিরূপণ সম্পর্কে মতান্তর বর্তমান) সেখানে প্রাচ্যবাসীদের 'হোলাকা' উৎসব যাপনের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় শ্রীকৃষ্ণলীলার আকরভূমি ভাগবত পুরাণে (৬ষ্ঠ শতক) শ্রীকৃষ্ণের দোললীলার কোন উল্লেখ দেখি না। পদ্ম পুরাণের পাতাল খণ্ডে (ডঃ হাজরার মতে রচনাকাল ৯০০—১৪০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে) কলিযুগে দোলোৎসব সকল উৎসবের মধ্যে প্রধান বলা হয়েছে। একাদশী থেকে আরম্ভ করে তিন বা পাঁচদিনের এই উৎসবে চতুর্দশীর অন্তযামে বা প্রতিপৎ সন্ধিকালে যথাবিধি ভক্তিপূর্বক সিত, রক্ত, গৌর ও পীত এই চতুর্বিধ ফল্গুচূর্ণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করার বিধান এতে দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণাভিমুখে শ্রীকৃষ্ণকে দোলযানে স্থাপন করার কথাও এ পুরাণে উল্লেখ আছে। তবে দশম শতাব্দীর মধ্যে দোলোৎসব যে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল তার প্রমাণ আছে। উচ্চবংশসম্ভূত মহিলারা এ উৎসব উপলক্ষ্যে উদ্যানবৃক্ষে টাঙানো দোলায় দোল খেতেন। [illegible] [illegible] [illegible] একটা

সকল ঋতুতে অপরিবর্তিত ও অপরিহার্য পানীয়

চা

কেনবার সময় 'অলকানন্দার' এই সব বিক্রয় কেন্দ্রে আসবেন

অলকানন্দা টি হাউস

৭, পোলক স্ট্রীট কলিকাতা-১

২, লালবাজার স্ট্রীট কলিকাতা-১

৫৬, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১২

॥ পাইকারী ও খুচরা ক্রেতাদের অন্যতম বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান ॥

উপভোগ্য বস্তু ছিল, প্রায় ধনীদের গৃহাঙ্গনে একটি করে দোলা থাকত। বাৎস্যায়নেও (খৃঃ ৩য়—৪র্থ শতক) এর উল্লেখ আছে। এখনও গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চলে ধনীদের গৃহে দোলনা টাঙান থাকে। একাদশ শতাব্দীর পূর্বে রচিত বলে কথিত ভবিষ্যোত্তর পুরাণে দোলোৎসবের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। সেখানে দুন্ধা রাক্ষসীকে বিনষ্ট করার জন্য অগ্নি প্রজ্জ্বলন, তিনবার অগ্নি প্রদক্ষিণ, যাদুমন্ত্রোচ্চারণ, হাততালি, উচ্চহাস্য এবং অশ্লীল গান ও অঙ্গভঙ্গি করার ইঙ্গিত দেখতে পাই। আলোচ্য পুরাণে বলা হয়েছে দুন্ধাকে বধ করার পর থেকে নরলোকে 'হোলাকা' উৎসবের শুরু। সন্ধ্যায় আনন্দানুষ্ঠান ও প্রতিবেশী বিশেষ করে শিশুদের নিমন্ত্রণ করে ভোজে আপ্যায়িত করার কথাও এ গ্রন্থে বলা হয়েছে। একাদশ শতাব্দীতে অল-বেরুণী ফাল্গুনী পূর্ণিমায় যে দোলের উল্লেখ করেছেন তা মেয়েদেরই উৎসব বলে তিনি মনে করেছেন। এস্থলে অগ্নিপ্রজ্জ্বলনের কথাও বলা হয়েছে। কিন্তু ১১ই চৈত্র হিন্দোল উৎসবের যে উল্লেখ অলবেরুণী করেছেন তাতে 'দেবগৃহে' বাসুদেব (শ্রীকৃষ্ণ)কে দোলায় আরোহণের কথা উল্লেখ আছে। মাতা যশোদা যেভাবে শ্রীকৃষ্ণকে বাল্যকালে দোল দিতেন, দেবমন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রাকে অলবেরুণীর সেইরূপই মনে হয়েছে। মন্দির ছাড়া লোকে ঘরে ঘরে অনুরূপভাবে শ্রীকৃষ্ণের দোলোৎসব উদযাপন করতেন। দ্বাদশ শতকে জীমূতবাহন 'হোলাকা' উৎসব প্রাচ্যবাসীদের অবশ্য কর্তব্য বলে নির্দেশ দিয়েছিলেন। ত্রয়োদশ শতকের পূর্বে রচিত স্কন্দ পুরাণের "পুরুষোত্তমক্ষেত্র মাহাত্ম্যে" (বঙ্গ সংস্করণে "উৎকল খণ্ড") রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্ন প্রথমে দোলোৎসব করেন বলা হয়েছে। গৃহের পূর্বদিকে ১৬টি স্তম্ভ প্রোথিত করে দোলমঞ্চ নির্মাণ ও চতুর্দশীর নিশামুখে দোলমণ্ডপের পূর্বভাগে বহ্ন্যুৎসব করার বিধান আছে।

পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্ধে ইতালীয় পর্যটক নিকোলো কন্তির সময় (১৪২০ খৃঃ) বিজয়নগর রাজ্যে তিনদিনব্যাপী হোলি খেলা চলত। রাস্তাঘাটে পথচারী অধিবাসীরা রঙ খেলায় মেতে উঠতেন। বিজয়নগরের রাজারাণীও এ উৎসবে যোগ দিতেন। ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দের ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শ্রীচৈতন্য বাঙলার মাটিতে জন্ম নিলেন। জীবিতকালের মধ্যেই তিনি অবতাররূপে পরিগণিত হয়েছিলেন। দোল পূর্ণিমার দিনে তাঁর জন্মদিন হওয়ায় পরবর্তীকালে বৈষ্ণব সমাজে বেশ করে দোলযাত্রার সমাদর ও সমারোহ বেড়ে যায়। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের (১৫৭৯ খৃঃ) নিম্নোদ্ধৃত চরণ কটির মধ্যে ষোড়শ শতকের বাঙলাদেশে দোল খেলার এক প্রেমকোমল ও আনন্দঘন ছবি দেখতে পাই—

"ফাল্গুনে ফুটিবে ফুল মোর উপবনে।
তথি দোলমঞ্চ নাথ করিবে নির্মাণে।।
* * *
হরিদ্রা কুমকুমে নাথ দিবে পিচকারী।।

আকবরের (১৫৫৬—১৬০৫ খৃঃ) উদার ধর্মনীতির ফলে হিন্দু-মুসলমান উভয়ে সুখে শান্তিতে বাস করতে থাকেন, এবং নির্বিঘ্নে স্ব স্ব ধর্মাচরণে কোন অসুবিধা বোধ করেন নি। উপরন্তু আকবর হিন্দুদের তীর্থকর 'জিজিয়া' তুলে দেন এবং দেশের মধ্যে সূর্য ও অগ্নিপূজার নির্দেশ জারি করেন। আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরীতে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় হোলি শূদ্রদের এক প্রধান উৎসব বলে বর্ণিত হয়েছে। ত্রয়োদশী থেকে আরম্ভ করে এই উৎসব পাঁচদিন ধরে চলত। বহ্ন্যুৎসবে নানা উপকরণের নৈবেদ্য, পরস্পরের প্রতি ফল্গুচূর্ণ নিক্ষেপ এবং এতদুপলক্ষ্যে নানাপ্রকার আমোদপ্রমোদের কথাও আবুল ফজল বলে গেছেন। হোলি উৎসব ক্রমশঃ মুসলমানদের মধ্যেও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং মুসলমান রাজা-ওমরাহ এবং হারেমের মহিলারা হোলি উৎসবের খুব বড় পৃষ্ঠপোষক হয়ে পড়েন। এবং বলা বাহুল্য, পরবর্তীকালে পরম হিন্দু-বিদ্বেষী আওরংগজেব (১৬৫৮-১৭০৭ খৃঃ) হোলির আমোদ-অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেন। ভেনিসের পর্যটক নিকোলো মানুচি (১৬৫৩-১৭০৮ খৃঃ) তৎকালীন হোলিখেলার এক চমকপ্রদ বিবরণ রেখে গেছেন। সেকালে সাধারণ লোকেরা পরস্পরের প্রতি সুগন্ধ তেল ছিটোত; সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের গায়ে সুগন্ধিচূর্ণ নিক্ষেপ করত; আর নিম্ন শ্রেণীর লোকদের গায়ে ছুঁড়ত নোংরা ও দুর্গন্ধ কাদা ইত্যাদি। চীৎকার, হৈ-হুল্লোড় ও অশ্লীল গান ইত্যাদি গেয়ে লোকে উন্মাদের ন্যায় ছুটোছুটি করত। হিন্দুস্থানের এই হোলির সঙ্গে মানুচি স্বদেশের 'কার্ণিভাল' উৎসবের সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন।

তৃতীয়-চতুর্থ শতক থেকে আরম্ভ করে ষোড়শ শতক পর্যন্ত উত্তর ভারতের সর্বত্রই

দ্বিবিধ গুণসম্পন্ন
আয়ুর্বেদীয় সুরভিত
মহাভৃঙ্গরাজ
কেশ তৈল





চিঠি লিখলে ভৃঙ্গল-এর বিস্তৃত বিবরণ সম্বলিত পুস্তিকা পাঠান হয়।

● মাথা ঠাণ্ডা রাখে
● স্বাস্থ্যোজ্জ্বল কেশ বর্দ্ধনে সাহায্য করে

ছোট শিশির জন্যই আপাততঃ এই নতুন বাক্স। ছোট ও বড় দুই রকম শিশিতেই এখনও পুরানো লেবেল চলবে। পরে আসবে নতুন লেবেল।

ক্যালকাটা কেমিকেল কর্তৃক প্রস্তুত

বসন্তোৎসব, বা মদনোৎসব কিংবা কাম-মহোৎসব নামে উৎসবের প্রচলন ছিল। বাৎস্যায়নের কামসূত্রে (৩য়-৪র্থ শতক), শ্রীহর্ষের রত্নাবলী ও কুমারিল ভট্টের তন্ত্র-বার্তিকা (৭ম শতক), ভবভূতির মালতী-মাধব (৮ম শতক)। অলবেরুনী (১১শ শতক), রঘুনন্দন (১৬শ শতক) এবং মধ্যযুগের বৈষ্ণবপদাবলী রচয়িতারা—সকলেই এ উৎসবের কথা বলে গেছেন। রত্নাবলীতে 'মদনোৎসবের' ওপর একটি 'অঙ্ক'ই লেখা হয়েছে। বসন্তকালে অনুষ্ঠিত এই উৎসবে নাগরিকরা পাটবাস কুঙ্কুম-চন্দনে সুরচিত করে পরস্পরের প্রতি নিক্ষেপ ও ভৃঙ্গার ভবে জল নিয়ে পরস্পরকে নিষিক্ত করত। তন্ত্রবার্তিকার ব্যাখ্যায় 'ময়ূর-মালিকা' বলেছে—"ফাল্গুন প্রতিপাদে ক্রিয়মানঃ পরস্পরজলসেকঃ বসন্তোৎসবঃ।" অলবেরুণীর সাক্ষ্যে মনে হয় চৈত্রী পূর্ণিমার বসন্তোৎসব প্রধানতঃ মেয়েদেরই উৎসব ছিল। নানা অলংকারে ভূষিত হয়ে উপহারের জন্য তারা স্বামীদের উত্যক্ত করে তুলতেন। আল-বেরুণীর গ্রন্থে কামোৎসব নামে একটি উৎসবের যেন আভাস পাচ্ছি। জ্ঞানদাসের (ষোড়শ শতক) দুটি ছত্রে মদনোৎসবের নাম দেখি—

"তরুকুল মুকুলিত অলিকুল ধাব।
মদন মহোৎসব পিককুল রাব।।"

ঐতিহাসিকের মতে ষোড়শ শতকের পর কোন সময় এই বসন্ত বা মদন বা কামোৎসব ফাল্গুনী হোলি উৎসবের সঙ্গে মিলে-মিশে এক হয়ে যায়। তার উপর মুসলমান রাজা-ওমরাহ ও হারেমের মহিলাদের পৃষ্ঠপোষকতায় হোলি ঐ সব উৎসবকে গ্রাস করে নিজের একচ্ছত্র আসনটি অধিকার করে ফেলে।

এপর্যন্ত আলোচনায় আমরা 'মূর্খ-রাজা' বা হোলি উপলক্ষ্যে লোক-ঠকান বা লোককে বোকা বানানোর কোন বিবরণ সেকালের সংস্কৃত সাহিত্যে দেখিনি। পরবর্তীকালে বিদেশী পর্যটকের বিবরণে ও সমসাময়িক গ্রন্থে এর উল্লেখ পাই। এতে মনে হয় আমাদের হোলির সঙ্গে এগুলির যোগ (সংযোজন?) হয়ত পরবর্তীকালের।

হাওড়া কুষ্ঠ কুটির

৭২ বৎসরের প্রাচীন এই চিকিৎসাকেন্দ্রে সব-প্রকার চর্মরোগ, বাতরক্ত, অসাড়তা, ফুলা, একজিমা, সোরাইসিস, দূষিত ক্ষতাদি আরোগ্যের জন্য সাক্ষাতে অথবা পত্রে ব্যবস্থা লউন। প্রতিষ্ঠাতা : পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা কবিরাজ, ১নং মাধব ঘোষ লেন খুরুট, হাওড়া। শাখা : ৩৬, মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা—৯। ফোন : ৬৭-২৩৫৯

হোলি উৎসবের সময় ছত্রপুরের রাজার কাছ থেকে ফরাসী পর্যটক Roussellett বালির তৈরী একথালা তেতো মিষ্টি উপহার পেয়েছিলেন। সিরাজদ্দৌলা, মীর-জাফর ও তাঁদের বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের কাছে এই খেলা খুবই প্রিয় ছিল. অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত মুতাক্ষেরিণে 'মূর্খ রাজার' এক মজার বর্ণনা আছে।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও আমাদের হোলি বা দোলের অনুরূপ কয়েকটি উৎসব আছে। শ্যামদেশের ব্যাঙ্কক-এ যে দোলোৎসব অনুষ্ঠিত হয়, তা ভারতীয় ঔপনিবেশিকদের দ্বারা সেখানে পৌঁছেছিল। চার ব্যক্তি বিশেষ পোশাকে সজ্জিত হয়ে দোলায় আরোহণ করে এবং তাদের ঘিরে নানারকম আচার-অনুষ্ঠান করা হয়। রাজপরিবারের লোকেরাও এতে যোগদান করেন। যদিও শীতকালে এ-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, তৎসত্ত্বেও প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে একে বসন্তোৎসব বলা হয়েছে। হোলির সমসাময়িক কালে অনুষ্ঠিত রোমানদের কয়েকটি উৎসবও আমাদের হোলি উৎসবের অনুরূপ। Lupercalia উৎসবে যুবক ও বিবাহিতা স্ত্রীলোকেরা নগ্ন হয়ে উন্মাদের মত রাস্তায় ছুটোছুটি করত। Matronalia Festa উৎসবটি প্রজনন-সংক্রান্ত ও বসন্তাবির্ভাবের উৎসবরূপেই উদযাপন করা হয়। ১৫ মার্চ অনুষ্ঠিত উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে গ্রামলোকের খেলাধুলো, মদ্যপান, নৃত্যগান এবং ইতর ও জঘন্য রসিকতা Anna Perenna-র প্রধান অঙ্গ। ১৭ মার্চ-এর Liberalia উৎসবে আসব-দেবতা Bacchus-এর উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য ও আহুতি প্রদান করা হয়। ইতালীয় কবি ওভিদ (৪৩ খৃঃ পূর্বাব্দ—১৭ খৃঃ) তার 'ফাস্তী' (Fasti) কাব্যে উল্লেখ করেছেন যে, ব্যাকাসের প্রাচ্য ও ভারতবর্ষ জয় করার পর থেকে রোমে দেবতার উদ্দেশ্যে এই নৈবেদ্য ও আহুতি দান প্রথার সুরু। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই ফাস্তী কাব্যের বিষয়বস্তু হচ্ছে পাল-পার্বণ, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, ঐতিহাসিক গল্প ও পুরাণ কাহিনী। জার্মানি ও ইতালির কার্ণিভালও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। সমগ্র জার্মানি এ উৎসবে এমনভাবে মেতে ওঠে যেন সেদিনই হচ্ছে পৃথিবীর শেষ দিন। মুখোসের আড়ালে অথবা সারা মুখে ও দেহে লাল-কাল রঙ মেখে নগ্ন হয়ে যে উন্মত্তবৎ আচরণে তারা লিপ্ত হত, তার তুলনা মেলা ভার। ইতালিতে উল্লিখিত আচরণের সঙ্গে 'নকল মিষ্টি' আদান-প্রদান ও পরস্পরের গায়ে আবির (?) ও জল দেওয়ার রীতি দেখি। পর্তুগীজদের মধ্যেও অনুরূপ একটি অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে। বর্তমানকালেও ইতালি, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, জার্মানি এবং গ্রীসে মানুষের কুশপুত্তলিকা ('কার্ণিভাল ফুল' নামে পরিচিত) শোভাযাত্রা সহকারে সারা শহর প্রদক্ষিণ করে অতঃপর আগুনে পোড়ান হয়; ক্ষেত্রবিশেষে গুলী বা শিরশ্ছেদও করা হয়। কোথাও কোথাও উক্ত বহ্ন্যুৎসবে চারাগাছের পল্লবাদি অর্পণ করা হয়। অবাধে মদ্যপান ও অশ্লীল আমোদ-প্রমোদ এ উৎসবের অন্যতম উপাদান। নৃতত্ত্ববিদের মতে

"The resemblance of this festival with the Holi is so great that we are led to the conclusion that it is a form of the Holi which has dropped one or two elements in course of time of transmission" (N. K. Bose)

'মূর্খ রাজার' অনুরূপ দৃশ্য ভারতের বাইরেও দেখা যায়। প্রাচীন পারস্যে এক নগ্ন অলীক রাজাকে ঘোড়ায় চড়িয়ে রাস্তায় ঘোরান হত। শীত ঋতু চলে যাবার সময় এই 'খেলা' অনুষ্ঠিত হত। রাজার হাতে একটি পাখা থাকত এবং দারুণ গ্রীষ্মে তিনি খুবই কষ্ট পাচ্ছেন—এই ভাব করতেন। লোকেরা ঢিল ছুঁড়ত। তিনি প্রত্যেকের কাছে পয়সা চাইতেন। কেউ না দিলে তার গায়ে রঙ ঢেলে দিতেন। এই অনুষ্ঠান বসন্ত কালেও হত। পুরাতন বৎসরাবসানে প্রাচীন ব্যাবিলনেও পারস্যের অনুরূপ 'অলীক রাজা' বেরোতেন। ব্যাবিলনের এই অলীক রাজার আবির্ভাবকাল ১৭০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দ বলে মনে করা হয়। বিভিন্ন দেশের উৎসবের সঙ্গে আমাদের হোলি উৎসবের সাদৃশ্য খুবই সাধারণ ও প্রাথমিক পর্যায়ের এবং যথাযথও নয়। কিন্তু এর সঙ্গে আমরা বলতে পারি,

"In joining the scattered fragments that survive the mutilation of ancient customs we must be forgiven if all the parts are not found closely to agree. Little of the means of information have been transmitted to us, and that little can only be eked out by conjecture."

উপরে হোলি উৎসবের যে আলোচনা করা হল তাতে দেখা যায় যে আমাদের হোলি বা দোলোৎসবের সঙ্গে দেশে-বিদেশের কত উৎসব প্রচ্ছন্নভাবে জড়িয়ে আছে। কোন একটিমাত্র উৎসবের কোন একক উপাদান আমাদের বর্তমান হোলিকে গড়ে তোলেনি, বিভিন্ন উৎসবের, বিভিন্ন প্রাচীন জাতি-উপজাতির আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি ও ধর্মবিশ্বাসের কণা সকল আহরণ করে আলোচ্য উৎসবটি বর্তমান পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। বহ্ন্যুৎসব ও তার তথ্যাদির মধ্যে কোন ঐন্দ্রজালিক শক্তি, কুশপুত্তলিকা দাহের মধ্যে কোন কোন প্রাচীন জাতি-উপজাতির নরবলি প্রথা, ফলমূল ও ভোগাহুতির মধ্যে জাতির ধর্মীয় বিশ্বাস, যৌন-উচ্ছৃঙ্খলতা প্রভৃতির মধ্যে লিঙ্গপুজা কিংবা আলোচ্য উৎসবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রত্যক্ষ কোন যৌনাচার জড়িত বলে মনে করা হয়। তাই নৃতত্ত্ববিদের মতে,—

"The Holi, therefore, appears to be a conglomerate of festivities, with its origin in the astronomical equinok and the agricultural harvests, its evolution in the nomadic habits of the first immigrants, the ancestral worship of heroes, the leisurely adoption of a tribal festival ......, and finally in the embellishment of the puranas".



শ্রীমতী আন আক্কেলো

নগর প্রশাসনে নারী

অংগনা

প্রমীলা

আমেরিকার হার্টফোর্ড শহরে ১৯[illegible] সালের নির্বাচন একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর মেয়র নির্বাচিত হলেন শ্রীমতী আন আক্কেলো। নয়জন সদস্যবিশিষ্ট সিটি কাউন্সিলে তিনিই প্রথম মহিলা মেয়র।

এবার নির্বাচনের শুরুতেই তোড়-জোড়ের অন্ত ছিল না। সর্বসমেত প্রার্থী ছিল সতেরজন। এদের মধ্যে একজন ছিলেন ভারার্পিত মেয়র। শেষোক্ত ব্যক্তির বাবা এবং ভাইয়েরা শহরের এই সম্মানজনক পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাই তার দাবী মোটেই উপেক্ষিত হবার মত নয়। আবার এদিকে শ্রীমতী আনও তৃতীয়বারের জন্য সিটি কাউন্সিলে নির্বাচনপ্রার্থী। ফলাফলও হলো অপ্রত্যাশিত। সকলকে পেছনে ফেলে শ্রীমতী আন সর্বাধিক ভোটে নির্বাচিত হলেন। ভোটের এই ফলাফলেই মেয়র পদের নির্বাচন হয়ে গেল—হার্টফোর্ডের ইতিহাসে নতুন অধ্যায় সংযোজনা শ্রীমতী আন মেয়র হলেন।

হার্টফোর্ড শহরের লোকসংখ্যা একলক্ষ ষাট হাজার। এহেন শহরে মেয়র পদের আনুষ্ঠানিক মর্যাদা যথেষ্ট। আসলে শহরের কাজকর্ম পরিচালনা করেন সিটি ম্যানেজার। তাহলেও সাম্প্রতিক শহরের চরিত্রে এই পরিবর্তন থেকে একটা বড় রকমের পরিবর্তন আশা করা যায়। শ্রীমতী আন মেয়রের পদে যথেষ্ট মর্যাদা আরোপ করতে পারবেন। আর এই সর্বপ্রথম মেয়রের পদাধিকারীকে অর্থ-ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। মেয়রের ক্ষমতাবৃদ্ধি এবং শহর পরিচালনা সংক্রান্ত কাজকর্মে তার গুরুত্ব স্বীকার করে নেওয়া—এর দ্বারা স্পষ্ট হলো।

শ্রীমতী আনের গভীর কালো চোখ দুটিতে অনেক স্বপ্নের ভিড়। মনে মনে তিনি শহর উন্নয়নের এক বিরাট কর্মসূচী ছকে ফেলেছেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন, শহরকে কেন্দ্র করে আমার চিন্তাধারা সম্পূর্ণ সফল হবে কিনা জানি না. কিন্তু একটা কথা জোর দিয়েই বলতে পারি যে, সবাই অন্তত বুঝতে পারবেন শহর পরিচালনায় কিছু নতুন আবহাওয়া আমদানির আমি চেষ্টা করছি। স্থানীয় সংবাদপত্র-গুলিও তাঁর কাজের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছে এবং আশা প্রকাশ করেছে যে, শ্রীমতী আন অসাধারণ বুদ্ধিমত্তায় সিদ্ধান্তে পৌঁছতে এবং কঠোর পরিশ্রমে কর্তব্য সম্পাদনে অতুলনীয়।

শ্রীমতী আন আমেরিকার বসবাসকারী একটি ইতালীয় পরিবারের সন্তান। পাঁচ বোনের মধ্যে তিনি দ্বিতীয়। তিনি মা-বাবা এবং দুই বোন একসঙ্গে থাকেন। তাঁর বাবার ছিল জুতো সারানোর দোকান। সম্পূর্ণ মধ্যবিত্ত এবং ছিমছাম একটি বাড়িতে তাদের সুখের সংসার। সংসারের কাজকর্মে শ্রীমতী আন প্রায়ই মা ও বোনেদের সাহায্য করে। অল্প কাজ তিনি বেশি পছন্দ করেন। এজন্য মেয়ে হয়ে রান্নাঘর ধোয়ামোছার দায়িত্ব তিনি নিজে নিয়েছেন।

শিক্ষাজীবনেও তিনি বিশেষ কৃতী। স্কুল এবং কলেজ—দু জায়গাতেই এব্যাপারে তিনি সম্মান কুড়িয়েছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং ইতিহাসে তিনি স্নাতক। গ্রাজুয়েশনের পর তিনি একটি স্কুলে শিক্ষকতার চাকরী নিলেন। কিন্তু এই জীবিকা তাঁর ভাল লাগেনি। তাই স্কুল মিস্ট্রেসের চাকরী ছেড়ে দিয়ে বাড়ির কাছাকাছি একটি ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে চাকরী নিলেন। এ প্রায় বাইশ বছর আগেকার কথা। এখন তিনি অনেক ধাপ ডিঙিয়ে একটি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডিপার্টমেন্টের ম্যানেজার। এখানেই তাঁর সহকর্মীরা সিটি কাউন্সিলের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার উৎসাহ জোগান। সারাদিনই তিনি প্রায় সিটি হলে কাটান। তাই এখানে আসার ফুরসত পান না।

হার্টফোর্ডের নতুন মেয়র জীবনী-উপন্যাস পড়তে ভালবাসেন। ভাল ছুঁচের কাজ জানেন এবং নানারকম বস্তু জোগাড় করা তার অভ্যাস। কিন্তু সময়ের অভাবে এসব অভ্যাস ছাড়তে হয়েছে।

১৯৬৭ সালে শহরে যখন বর্ণবিদ্বেষ প্রবল হয়ে ওঠে তখন মেয়র মহোদয়া একটি পাইলট প্রোজেক্টের কথা ঘোষণা করে বেশ প্রশংসা পেয়েছেন। তিনি সিটি কাউন্সিল এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে সবাইকে বাড়ি কিনতে উৎসাহ জোগান। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, স্থায়ী বাসিন্দারা কোন-রকম ঝামেলায় যেতে চায় না। তাই তিনি মনোযোগ দিয়েছেন উন্নত গৃহব্যবস্থার দিকে। অবহেলিত পল্লীগুলিতেই তিনি তাঁর কর্ম-সূচীকে জোরদার করেছেন সবচেয়ে বেশি। সেই সঙ্গে তার অন্যতম লক্ষ্য হলো 'জব-ট্রেনিং প্রোগ্রাম' বাড়ানো। বৃদ্ধদের জন্য নানা সুযোগ-সুবিধা এবং পুলিশ সার্ভিসের উন্নতির জন্য তাঁর চিন্তা নতুন মুক্তির পথ খুঁজছে। ১৯৬৭ সালে 'ইনকো-মোবাইল' নামক একটি কর্মসূচীর জন্য তিনি জাতীয় সম্মান অর্জন করেন। এই কর্মসূচীর অঙ্গ ছিল কর্মহীনদের মধ্যে কাজের খবর পৌঁছে দেওয়ার। এই পরি-কল্পনা ঘোষণার এক সপ্তাহের মধ্যে, সিটি ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট এবং লেবার ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তারা বেরিয়ে পড়লেন। পূর্বাহ্নেই সব ব্যবস্থা অবশ্য পাকা করে রেখেছিলেন শ্রীমতী আন। বাস কোম্পানীর সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা ঠিক হয়েছিল। সবাই বেরিয়ে পড়লেন গ্রামে গ্রামে কাজের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার কাজে।

লেবার ডিপার্টমেন্ট অনেকের চাকরীর ব্যবস্থা করে দিয়েছে। শহরের কাজের জন্য সিটি হলে জনসাধারণের অবাধ যোগাযোগের অধিকার দেওয়া হলো। এই পরিকল্পনা এখনও চলছে।

শ্রীমতী আন মেয়েদের সম্পর্কে বেশ প্রগতিশীল চিন্তাধারার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি মনে করেন মেয়েদের প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশ নেওয়া একান্ত প্রয়োজন। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথি হওয়ার যোগ্যতা তাদের যথেষ্ট আছে।

মেয়েদের গোড়া থেকেই শুরু করা ভাল বলে তিনি মনে করেন এবং তাই শহরকে কেন্দ্র করেই প্রতিবেশী, সমাজ ও শহর সম্পর্কে নানা বিষয়ে তাঁরা উৎসাহ দেখাতে পারেন। রাজনীতিতে তাঁরা কতটা উন্নতি করবেন, সেটা অবশ্য নির্ভর করবে তাঁদের আকাঙ্ক্ষার এবং যোগ্যতার সহাবস্থানের উপর।

তাঁর নিজস্ব নির্বাচন পরিচালনা পদ্ধতি ক্রমশ অধিক লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। তিনি নিজে ব্যক্তিগতভাবে নির্বাচনী সংগ্রামে নেমেছেন। স্ট্রীট-কর্নার, সুপার-মার্কেট এবং নানা জায়গায় তিনি জনসাধারণের কাছে দাঁড়িয়েছেন, নিজের বক্তব্য রেখেছেন। তিনি বলেছেন নিজের সম্বন্ধে এবং প্রচার করেছেন নির্বাচনী প্রচার-পুস্তিকা। আমি ছাড়া আমার চার বোন আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। তারা নিয়মিত প্রচার অভিযানে অংশ নিয়েছে। এরপর নানা প্রতিষ্ঠানের অবদান তো আছেই। সকলের প্রয়াসেই আমি এই সম্মানজনক পদে নির্বাচিত হতে পেরেছি।

১৯৬৩ সাল থেকে তিনি সিটি কাউন্সিলের নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন। বন্ধুবান্ধবদের উৎসাহে 'নিউ রিপাবলিকান' পার্টি গঠন করে তিনি নির্বাচনে নেমে পড়েন। নয়জন নির্বাচিত সদস্যের মধ্যে সেবার তাঁর স্থান ছিল সপ্তম। ১৯৬৫ সালে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলো। এবার তিনি ক্রমপর্যায়ে চতুর্থ স্থান অধিকার করলেন। তারপর এলো ১৯৬৭ সালের নির্বাচন। ইতিহাস নতুন কথা কইলো। শ্রীমতী আন সর্বোচ্চ স্থান পেয়ে মেয়র নির্বাচিত হলেন।

মেয়র এবং কাউন্সিলের সদস্য হিসাবে শ্রীমতী আন তাঁর রাজনৈতিক চেতনাকে এবং কর্মসূচীকে সংহত করার চেষ্টা করে চলেছেন। ডেমোক্রাট প্রধান শহরে একজন রিপাবলিকানের এ ধরনের সাফল্যে মনে হয়, তাঁর রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশে আরো অনেক সাফল্য অপেক্ষা করে আছে। নিজে রাজনীতিতে অংশ নিয়ে তিনি মেয়েদেরও এব্যাপারে উৎসাহী হতে বলছেন, কিন্তু নিজের আরো রাজনৈতিক সাফল্য সম্পর্কে তিনি একদম নীরব।

এই বিজয়ের নীরবতায় মনে হয়, আরো অনেক সাফল্যের ইংগিত লুকিয়ে আছে। এর উত্তর দেবে আগামীকাল।

সোভিয়েত ইউনিয়নের ভোম্কভ গ্রামে শ্রীমতী লিডিয়া য়োগভ একসঙ্গে চারটি কন্যার জননী হন। জননী এবং শিশুরা বেশ সুস্থই আছে।



নমবাহার

তাড়াহুড়োতে যেখানে এসে দাঁড়ালাম সেটা মোটেই উলের দোকান নয়।

কলকাতা থেকে এসেছি মাত্র একবেলার জন্য দিল্লী মহানগরীতে। রাত সাতটা দশে আবার ট্রেন ধরতে হবে। হাতে আছে ঘণ্টা ছ'য়েক সময়। এ সময়টাতে আকাঙ্খিত সমস্ত বস্তুর সন্ধান না মিললেও, কিছু দ্রব্য অবশ্যই সংগ্রহ করা অসম্ভব নয়।

ও'কে বললাম, দেখ যেমন করেই হোক আঠারো নম্বর বাসটা ধরো। আমার সেখানে না গেলেই নয়। কোন জবাবের অপেক্ষা না রেখেই পাশের অপরিচিত ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসাবাদ করে কোথায় দাঁড়ালে গন্তব্য স্থানের বাস পাব আমরা ততক্ষণে শুধু জানাই হয়নি, বাসে ওঠার লাইনে দাঁড়িয়েও পড়েছি। ভিড়ে দুখানা ঐ নম্বরের ছাড়ার পরও আঠারো নম্বর আর একখানা এসে হাজির। কিন্তু পথের ওপরে তখনো আমরা দাঁড়িয়ে। এদিক ওদিক উঁকি ঝুঁকি মেরে বুঝলাম লাইনের দৌলতে কিছুই হবার জো নেই। সহসা লাইন ছেড়ে একেবারে পাদানির প্রান্তে দাঁড়িয়ে বললুম 'ভাইয়া, প্লীজ হেল্প আস। উই হ্যাভ কাম ফ্রম ক্যালকাটা, প্লীজ হেল্প আস।' ভিন্ন সহ-রের বাসিন্দার বেলাইনে যাওয়ার অজুহাত অবশ্য মার্জনীয়। আরোহীকুল সহানুভূতি-পরায়ণ। সুতরাং বাসের ভিতরে ঢুকে যাবার রাস্তাটা অক্লেশেই হয়ে গেল। পুত্র ও কর্তা আমার পেছনে। সহসা পেছনের চাপে আক্রান্ত হয়ে ভেতরের দিকে চলে গেলাম। খানিক পরে সীট একটা পেয়েও গেলাম। হাতের থলি সামলে বসতে না বসতেই পার্শ্ববর্তিনী পাঞ্জাবী ভদ্রমহিলা বললেন 'উঠে পড়ুন, আপনাদের স্টপেজ এসে গেছে।'

নেমে পড়লাম আবার হুড়মুড় করে একেবারে একটা লোক-গিজ্‌গিজ্‌ মোড়ের মাথায়। শুনলাম সেটাই আমাদের উল কিনবার বাজার। আজমল খাঁর বাজার।

বাস স্টপ থেকে বাঁয়ে মোড় নিলাম, কিন্তু এগোবার উপায় নেই। তখন সন্ধ্যা সাড়ে ছটা হবে।

সামনে বিরাট এক দোকান, ডজন দুই নিয়ন লাইটের লম্বা লম্বা লাঠি একেবারে চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দিচ্ছে। যেন বিয়ে বাড়ি। আর তার সামনে পুরুষ ব্যক্তিদের ভিড়। বয়স ষোল থেকে সত্তর। ভাবলাম শীতকাল—হয়ত বা এ দেশের মেয়েদের

নিত্য-প্রয়োজনীয় পশম কেনার তাগিদেই এই ভিড়। তাতে সেটা আবার রবিবার।

এ হেন পরিস্থিতিতে, কর্তাকে বললাম 'তুমি সামনে এগোও, আমরা তোমার পেছনেই আছি। না হলে দোকানের দরজায় পৌঁছানো আজ আর সম্ভব নয়।' হলোও তাই, যেই কর্তাকে উপদেশ দেওয়া, তৎক্ষণাৎ আদেশ মান্য করে উনি অবতীর্ণ হলেন, 'রণং দেহি' বলে। আমিও ঠিক পেছনে ও'কে আঁকড়ে ধরে পুত্রসমেত ঠিক এসে গেছি সামনের ইঞ্চি দশেক ফাঁকা ঐ চিলতেটুকুতে। সেখানে সিঁড়ির ধাপ। কর্তা সামনে, আমি পেছনে। দোকানের কাচের শো কেসে নজর ফেলতে পারছি না। ও'কে বলছি 'সরো না, এবার আমি দেখি কেমন উল আছে।' কর্তা নিরুত্তর, সেই কাচের খাঁচায় অপলকনেত্র হয়ে দাঁড়িয়ে। ঝাঁকুনি দিতেই ওর নজর সরে তক্ষুনি, আবার বাঁ দিকে আটকে গেল। উনি তখনও আড়াল করে আছেন আমার নজর। অসহ্য। এবার ওকে ধাক্কা দিয়েই নিজে এসে প্রায় কাচের গায়েই হুমড়ি খেয়ে পড়লাম।

কিন্তু একি! এত ভিড়ে মোহাবিষ্ট নয়নে উনি আমায় দেখছেন আবার পরমুহূর্তেই কাচের খাঁচায় ওর নজর ঠিকরে পড়ছে। মুখ থেকে ওর একটি মাত্র কথা বেড়িয়ে এলো 'রসো না একটু'।

পাশ থেকে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক বলে উঠলেন 'সুন্দর'।

আমিও ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলাম, 'হ্যাঁ সুন্দর।'

কিন্তু, কি সুন্দর?

আজমলখাঁর বিখ্যাত বাজারে এ কিসের পণ্য। কিসের বিকিকিনি।

দোকানের সদর দরজাটি দু পাশের আটটি কাচের খাঁচাকে দ্বিধা বিভক্ত করেছে। বহু ব্যাপারী সিঁড়ির ধাপ চারটি অনায়াসে পার হয়ে, অভ্যন্তরে যাতায়াত করছে। প্রথমে ফুট-পাথ থেকে সতৃষ্ণ নয়নে পরখ করে নিচ্ছে, কোন খাঁচার পণ্যদ্রব্য তাকে মুগ্ধ করেছে। তৎক্ষণাৎ অভ্যন্তরে প্রবেশ করে জিজ্ঞাসাবাদ, আগাম টাকা দিয়ে রসিদ নিয়ে আগামী দিনের আশায় উৎফুল্ল চিত্তে প্রত্যাগমন। বাড়ি ফেরার পথে, বাইরের ভিড়ের মধ্যে আবার একবার দেখে নেওয়া, এক ঝলক, এইটিই ত পছন্দ' ডেলিভারী নিতে হবে ডিজাইন মিলিয়ে।

আমার চোখেও লাগে ধাঁধা লাগেনি একথা অস্বীকার করা অর্থাৎ অসত্য প্রচার করা।

এই যে কাচের খাচায় আটটি কন্যার মডেল, তারা আমাদের দেশের ষোড়শী



কলকাতায় জাপানী পুষ্প-প্রদর্শনীর যে আয়োজন করা হয়, তাদের মধ্যে ছিলেন শ্রীমতী তোমাকো নাকায়ামা এবং শ্রীমতী ইয়োকো কোনিশী

কন্যাদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সাদৃশ্যে এক। কেউ বা গোরা, কেউবা শ্যামাঙ্গী, উচ্ছল যৌবন। দীপ্তিতে টলমল।

তবে?

কেশ বিন্যাস বিচিত্র। আর অঙ্গ সৌষ্ঠব! অবশ্যই অপরিমেয়। এদের প্রতিটি অঙ্গই অনাবৃত, শুধু কণ্ঠে কয়েকটি সুদৃশ্য কন্ঠাভরণ কন্ঠীরূপে অথবা সাতলহরী সীতাহার রূপে কিম্বা কোন বৃক্ষচ্যুত ফুলের গুটি মালারূপে বিরাজমান, কোথাও বা সুউন্নত উরোজ প্রদেশ পার হয়ে নাভিস্থলের উর্ধভাগে দোদুল্যমান।

অঙ্গবাস অবশ্যই আছে। তাকে বলাচলে বস্ত্রাবরণের আক্ষেপমাত্র।

বক্ষস্থলে কোথাও সুপ্রাচীন যুগের কাঁচলী বন্ধন, অথবা গ্রীবাদেশ থেকে অতি সূক্ষ্ম সূত্র সংলগ্ন দুটি স্বচ্ছ স্বল্প পরিসর উরুস্ত্রানমাত্র। এর কাছে নগ্ন দেহ হয়ত বা অধিক শালীনতার উদ্বোধক। সুমসৃণ পদ-যুগল কোথাও বা নুপুরের বন্ধনে শিঞ্জিত। আবার কোথাও বা স্ট্র্যাপবিহীন নাইলনের খড়মের আকর্ষণে সাবলীল, আবার কোথাও সেই রোমীয় যুগের যোদ্ধাদের বহুল বন্ধনীযুক্ত পদাভরণে তেজদৃপ্ত।

কটিদেশে নাভিস্থলের নিম্নে গ্রন্থি বন্ধনে ধরা পড়েছে সুচিক্কণ মসলিন, নাইলন অথবা স্বর্ণ-খচিত স্বচ্ছ বস্ত্রাবরণ, দৈর্ঘ্যে তা যতই হোক না কেন প্রস্থে তা চতুর্দশ-ইঞ্চির বেশি নয়।

এই মৃন্ময় কন্যাদের পাদমূল থেকে সুগোল জঙ্ঘার শীর্ষদেশ পর্যন্ত আবরণহীন উন্মুক্ত। কটিদেশ, নাভিস্থল ও বক্ষমূল সম্পূর্ণ অনাবৃত থাকায় সৃষ্টি করেছে

অপরিমেয় আকর্ষণ। যুবা, বৃদ্ধ, অপ্রাপ্ত বয়স্ক নির্বিশেষে এ রূপ রচনা করেছে অপূর্ব মোহজাল।

এ নিতম্বিনী কন্যারা পরিধান করেছেন 'মিনি-শাড়ী', এ হলো আগামী সালের জন্য প্রস্তুতি! 'এড্‌ভারটাইজমেন্ট আর্ট', বিজ্ঞাপন-কলা। ১৯৬৮ ও ৭০-রের নারীর বস্ত্রাবরণ। নবতম ফ্যাশান।

পিছনে হটে এলাম, থাক, আর উল খুঁজতে হবে না। স্বামীকে খুঁজে নিজের পুত্রের সন্ধানে মোড় ঘুরতেই নজরে পড়লো; বিস্ময়-বিস্ফারিত তার নয়ন-যুগল ঐ স্ফটিক আধারে চুম্বক-আকর্ষণে ধরা পড়েছে। কিশোর পুত্র আমার, এখনো বয়ঃসন্ধি পার হয়নি। তারই পাশে, একটু নিজেকে আড়ালে রেখে আর একটি কিশোর. হয়ত দিল্লীর উপকণ্ঠে তার বাস। দেহাতী ছেলে—নয়ন তারো বিস্ময়-বিহ্বল। বয়ানে লজ্জার রেখা।

এই যে নগ্ন বাহার! এর উদ্দেশ্য কি? পঙ্কিল মোহজালে Kaleidoscopic রূপ-সৃষ্টির এই কি পথ! 'মিনি' শাড়ী পরে অর্থাৎ শুধুমাত্র নিতম্ব ও কটিদেশ আচ্ছাদন করেই কি ভারতীয় কন্যারা আজ সহরের রাস্তায় রাস্তায় জনাকীর্ণ পথে জীবিকার্জন করতে ছুটবে—ছুটবে ছুটন্ত বাসের হাতল ধরতে?

হবেও বা! এ ফ্যাশান, হালের ফ্যাশান ফিরতে হয়েছে আবার। কলকাতার মহানগরীতে। বিহ্বলতার ঘোর কেটে গেছে দিল্লীর বাউন্ডারী পার হবার সঙ্গে সঙ্গেই।

আমাকেও ছুটতে হয় রাজপথে, কর্ম-ব্যপদেশে, বাড়ীতে ফিরতে হয় বাস ট্রাম ধরে।

রেহাই নেই সেই বিজ্ঞাপনের। রেডিও বিক্রির বিজ্ঞাপন, বিজ্ঞাপন ওষুধের, বিজ্ঞাপন প্রসাধন বিক্রির, বিজ্ঞাপন বিশ্ব-ভ্রমণের।

বিজ্ঞাপনে একটি সুসজ্জিত গৃহাভ্যন্তর, একটি সুন্দর রেডিও-সেট—তারই পাশে একটি মহিলা—পরণে অতি-আঁটসাট একটি প্যান্ট আর ঢিলে ব্লাউজ, চুল ছোট করে ছাঁটা, অতি-আধুনিকা এক নারী। এই বাংলা দেশের, এই ভারতের অধিবাসীর মনোহরণের জন্যই হয়ত এই পরিচর্যা। কিন্তু পোষাকে ইয়াঙ্কি।

আর একটু এগুলেই চলচ্চিত্র-গৃহের পাড়ায় এলাম। এপাড়ায় ওপাড়ায়, লাইট পোস্টের গায়ে, বৃক্ষশাখায়, গৃহগাত্রে, অট্টালিকার আষ্টেপৃষ্ঠে বিজ্ঞাপন, রীতি এক! নগ্ননারীদেহের প্রদর্শনী। সর্বত্র বস্ত্রাবরণ বলতে শুধুমাত্র কৌপিন আর ক্ষুদ্র দুটুকরো বক্ষাবরণ।

আবার এগুলেই—শৈলাবাসে অথবা সাগর-সৈকতে ভ্রমণ করুন, বিজ্ঞাপন আপনাকে আকর্ষণ করছে। অর্ধশায়িত কন্যা আরাম-কেদারায়, ঊর্ধ্বে উন্মুক্ত বাহু-যুগল, নিম্নে পদযুগল থেকে কটিদেশ পর্যন্ত বস্ত্রের আভাসবিহীন। এ মূর্তি কার উদ্দেশে। নগ্ন কন্যার সুবর্ণস্নানই কি একমাত্র আকর্ষণ! হয়তো অন্য কোন বক্তব্য থাকা অসম্ভব সেই গিরিপ্রদেশ আর সমুদ্র-শোভার সপক্ষে।

আর একটু এগুই। ঐ ত বিজ্ঞাপন। ধূম্রসেবন। সে ত যথাসম্ভব পুরুষেরই বিলাস! নারীর স্খলিত অঞ্চলের বিস্ফারিত বর্ণাঢ্য-সমাহার কি সে বিজ্ঞাপনে সাফল্য আহরণের পথে নিতান্তই অপরিহার্য? যুবক ধূমপানে রত, পার্শ্ববর্তিনী একটি নাই বা থাকলো! কিন্তু বিজ্ঞাপন-কলার অন্য রূপচিন্তা সম্ভবত অভাবনীয়।

শতসহস্র অট্টালিকা উঠছে আকাশ চুম্বন করে। রং বেচতে হবে। দোকানদারের খ্যাতির অঙ্ক অনেক ঊর্ধ্বে। তারও কি ঐ একই কথা! নানা বর্ণের বেলুন হস্তে নিয়ে নারীর দেহের বিশেষ কোন অংশের সিম্বল রং-বিক্রেতার অপরিহার্য অস্ত্র।

চৌরঙ্গীর মাথায় চলচ্চিত্র নগর।

লাল, নীল, সবুজ, হলুদ টিউব লাইটের ঝলমলাত গড়ে তুলে, ভজন ভজন কন্যার বিশাল নিরাবরণ জঙ্ঘা, উন্মুক্ত উরস, কৌপিন পরিহিতা নারীর হস্তে আগ্নেয়াস্ত্র, তীক্ষ্মধার অসি, যুবকের বিরাট মাথার টুপির ওপরে নিরাবরণদেহ কন্যার শায়িত শরীর। এই কি একমাত্র যুব-মানস আক্রমণের প্রশস্ত পথ! বিশ্বভ্রমণ-প্রয়াসী মানবমন কি একমাত্র নারীদেহ বিশ্লেষণ বিলাসী! জাপানে যাবেন, টিকিট ঘরে জাপানী নারীর বহুরূপী মূর্তি যেখানে যেতে চান ঐ পোস্টার, বিজ্ঞাপনে দেখুন নারী-দেহের নগ্নভঙ্গিমা।

ঐসব দেশের একমাত্র আকর্ষণ কি ঐ নারী, সে দেশের শোভা, শিল্পকলা, স্থাপত্য শিশু, ফুল-ফল বিদ্যালয় বা মানুষের কিছু কি ভ্রমণকারীর মনোহরণ করার পক্ষে বড়ই অপ্রতুল! নারীদেহের প্রদর্শনীই কি জাতির ঐতিহ্য ও সৌন্দর্যের প্রতীক?

মাখান রং আপনার দেহবর্ণে। উজ্জ্বলতা চান? বিজ্ঞাপন দেখুন, কত শত। চোখের পলক ফেলতেই ধাঁধা লাগিয়ে দেবে। আপনি যে পাজলড হয়ে গেছেন। গালে রুজ মাখবেন, না বেসক্রীম? দেখুন না ঐ একচক্ষু কন্যা, দোকানের শো কেস থেকে একচক্ষু দৃষ্টি হানছে। আপনার প্রেয়সীর জন্য নিতে চান, না আপনার প্রিয়তমাকে ঐরূপে পেতে চান?

যদি না আপনার রুচিতে বাধে, ঐ একচক্ষু নারীর দৃষ্টিবিদ্ধ হতে, তবে বিংশ শতাব্দীর আটষট্টির (৬৮) বিজ্ঞাপনদাতারা সফল হয়েছেন সন্দেহ নাই। পণ্য তার চলচ্চিত্র নয়, পণ্য তার শৈলাবাসের হোটেল নয়, পণ্য তার কোন খিচুড়িপানা চিত্র নয়। আজ পণ্য নারীর দেহসুষমা।

—ঊষা ভট্টাচার্য





নীল দরিয়ায় (২)

অজিত চট্টোপাধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্র দেবীচৌধুরাণীকে রূপ দিয়েছেন, ডাকাতদের রাণী তিনি। বজরায় করে নদীপথে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে ভেসে বেড়ান।

কিন্তু এ তো গেল উপন্যাসের কথা। আধুনিককালে চম্বলের বেহড়ে ডাকাতদের রাণী হয়েছেন পুতলীবাঈ। দুঃসাহসী পুতলীবাঈয়ের নানা কীর্তিকাহিনী আমাদের সকলেরই জানা।

আঠার শতকে আধুনিককালের অবস্থা ছিল না। মেয়েদের থাকতে হত ঘরের কোণে। রান্নাঘর ছিল তাদের কর্মস্থল। উড়িয়ে চলা কই মাছের মত মেয়েরা তখন অফিস আদালতের দিকে হাঁটতে শুরু করেনি। সেই আঠার শতকে গৃহকোণ ছেড়ে নীলসমুদ্রের বুকে জলদস্যুবৃত্তি নেওয়া যে কোনো মেয়ের কাছেই ছিল অভাবনীয় ব্যাপার। এবং সমুদ্রের বুকে মেয়ে জলদস্যুর কাছে মার খেয়ে পালিয়ে আসা কিংবা তার হাতে প্রাণ হারান ছিল যে কোনো পুরুষের কাছেই রীতিমত অসম্মানের কথা—।

তবু দুটি সাহসিনী নারী গৃহের নিশ্চিত আশ্রয় পরিত্যাগ করে অন্তহীন সমুদ্রবক্ষে ঘর বেঁধেছিলেন। দুজনেই জলদস্যু। একাধিক হানাহানি মারামারি পূর্ণ দস্যু আক্রমণের অংশীদার। এদের একজনের নাম অ্যান বনি, অপরজন হলেন মেরী রীড।

অ্যান বনি আইরিশ মেয়ে। অল্পবয়সে পিতার সঙ্গে অ্যান চলে এলেন ক্যারোলিনায়। সেখানেই বড় হয়ে উঠতে লাগলেন অ্যান। ছোটবেলায় তো রীতিমত দুর্দান্ত অনেকটা ছেলেদের মত ডানপিটে। এদিকে বেজায় বদমেজাজী। বনিকে নিয়ে তার পিতা বেশ চিন্তিত। ক্যারোলিনায় ছোট বয়সেই এক কাণ্ড করে বসলেন অ্যান। বাড়ীর ঝি মেয়েটার সঙ্গে কি একটা ব্যাপারে কথা কাটাকাটি হল। অমনি রক্ত চড়ে উঠল মাথায়। বাস, অ্যান ঝাঁপিয়ে পড়লেন তার উপর। মোক্ষম এক ছুরির আঘাত। কিন্তু শুধু বদমেজাজী ছিলেন না অ্যান বনি। বাপকে খুব ভালবাসতেন তিনি। কর্তব্যে কোনো ত্রুটি ছিল না তার।

মোটামুটি সুন্দরী অ্যান। একনজরে দেখলেই পছন্দ হবার কথা। পুরোপুরি যুবতী হবার আগেই তার প্রেম শুরু হয়েছিল। অবশ্য কোনোটাই বেশীদিন গড়ায় নি। অ্যান বনিকে দেখে নতুন কোনো যুবক এগিয়ে এলেই অ্যান তার প্রতি অনুরক্তি প্রকাশ করতেন। কিন্তু প্রেম তো মেঘের প্রাসাদ নয়। যখন যেমন ইচ্ছে তাকে বেশী দিন ভাঙাগড়া চলে না। অ্যান বনি একদিন তা বুঝলেন। ইতিমধ্যে এক নাবিকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল তার। শুধু পরিচয় বললে ভুল বলা হবে। পরিচয় থেকে প্রেম—এবং মাখামাখি ব্যাপার। বাপের কাছে সমস্ত কিছু চেপে গেলেন অ্যান বনি। গান্ধর্বমতে বিয়েটা সেরে ফেললেন নাবিকের সঙ্গে। কিন্তু বাপের কানে সে কাহিনী যথাসময়ে পৌঁছল। শ্বশুর রাগে ক্ষেপে উঠলেন জামাইয়ের উপর। মজার কথা। শ্বশুরের রক্তচক্ষু দেখে জামাই সেই যে পলাতক হলেন তার আর কোনো খোঁজ নেই। সকলের ডাঙা ছেড়ে জামাই গিয়ে পড়লেন জলে। নাবিক জামাই,—নীলসমুদ্রে ভেসে পড়ে শ্বশুরের রক্তচক্ষুর হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করলেন।

কিন্তু অ্যান বনিকে বেশীদিন বিরহে কাটাতে হল না। তাকে দেখে আর একজন আকর্ষণ অনুভব করলেন। ইনি কিন্তু নাবিক-টাবিক নন। পুরোপুরি এক জলদস্যু। নাম ক্যাপ্টেন জন রেকাম। উপকূলের লোকেরা তার নাম দিয়েছিল ক্যালিকো জ্যাক।

জ্যাকের কাছে একটি মেয়ে এবং একটি সদাগরী তরী একই বস্তু। যদি শিকার বলে মনে হয় তবে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ছিনিয়ে নিতে হবে। এই ক্যালিকো জ্যাকের দস্তুর।

ক্যাপ্টেন জ্যাককে দেখে অ্যান বনি মজে গেলেন। জলদস্যুর সঙ্গে পালিয়ে গেলেন অ্যান। ঘর বাঁধলেন নীল সমুদ্রের বুকে। মধুচন্দ্রিমার রাতগুলি কাটল ক্যালিকো জ্যাকের নানা রোমহর্ষক অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী শুনতে শুনতে। কিছুদিন পর ক্যাপ্টেন জ্যাক অ্যানকে রেখে এলেন কিউবাতে। উপকূলের খুব কাছে একটা ঘর ছিল তার। বন্ধুরা বলল অ্যানকে তারা যথাসম্ভব দেখাশুনো করবে। জ্যাকের চিন্তা করবার কোনো কারণ নেই। অ্যান বনি কিন্তু বেশীদিন রইলেন না ডাঙায়। ডানপিটে মেয়ে অ্যান। আর অমন দুর্ধর্ষ স্বামী তার। অ্যান বনি পালিয়ে এলেন জ্যাকের জাহাজে। এবার পুরোপুরি জলদস্যু। বাঁকা তরবারি এবং ঢাল নিয়ে যোদ্ধার বেশে সাজলেন অ্যান বনি।

কিন্তু অ্যানের সুখের দিনগুলি বড় সংক্ষিপ্ত। ১৭২০ খৃস্টাব্দের অক্টোবর মাসে জলদস্যুর দল জামাইকার কাছে টহল দিয়ে ফিরছিল। খুঁজছিল তাদের শিকার। কোনো সদাগরী জাহাজ পেলেই তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। হঠাৎ জাহাজ একটা দেখা গেল দূরে। ক্যালিকো জ্যাক আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। সাজ-সাজ রব পড়ল জলদস্যুর দলে। প্রথম আয়াসেই শিকারকে

আনড় করে দিতে হবে। তাহলেই লুঠপাট করবার সুবিধে।

জাহাজটি নিকটে আসতেই ক্যাপ্টেন জ্যাক চমকে উঠলেন। সদাগরী তরী নয়,— এ এক যুদ্ধজাহাজ। জলদস্যুর দলের সাধ্য কি যে এর সংগে এঁটে ওঠে। কিন্তু তবু যুদ্ধ শুরু হল। কারণ তখন আর ফেরবার পথ নেই। বলা বাহুল্য জ্যাক হারতে শুরু করলেন। জলদস্যুর দল পালিয়ে গিয়ে আত্মগোপন করল ডেকের পিছনে। কিন্তু অ্যান বনি এবং তার এক বন্ধু জলদস্যু মেরী রীড (ইনিও মহিলা) প্রাণপণে লড়লেন। ক্যালিকো জ্যাক দলবল নিয়ে ধরা পড়লেন। তাদের সংগে অ্যান বনি এবং মেরী রীড উভয়েই বন্দী হলেন।

জলদস্যুর দলকে নিয়ে আসা হল জামাইকাতে। বিচার শুরু হল সেন্ট জ্যাগো দ্য লা ভেগাতে। ২০ নভেম্বর, ১৭২০ খৃস্টাব্দ। রায় বেরুল। সকলের ফাঁসীর হুকুম দিয়েছেন বিচারক। অ্যান বনিরও ফাঁসী হবে। কিন্তু অসুস্থতার জন্য আবেদন করলেন অ্যান তার ফাঁসীর দিন পিছিয়ে দিতে। জানা গেছে যে অ্যান বনির আর ফাঁসী হয়নি। কিন্তু কি হয়েছিল তার, এ কথাও অন্ধকারে ঢাকা। সম্ভবত পীড়িত অবস্থায় মারা যান অ্যান বনি। কিংবা অন্য কোনো দুর্ঘটনায়, ইতিহাসে যা লেখা হয়নি।

ক্যালিকো জ্যাকের ফাঁসীর দিন তাকে আনা হয়েছিল অ্যানের কাছে। জ্যাক মৃত্যুর পূর্বে তার শেষ ইচ্ছায় স্ত্রীর সংগে শেষবারের মত দেখা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অ্যান বনি স্বামীর সংগে ভালো করে কথা বলেন নি। রাগে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন অ্যান। ক্যালিকো জ্যাক স্ত্রীর কাছে বিদায় চাইলেন—শেষ-বিদায়। অ্যান বনি উত্তরে বললেন,—স্বামীকে দেখে তার দুঃখ জাগছে মনে। সম্মুখ সমরে প্রাণ বিসর্জন করলে আজ তাকে এমন কুকুরের মত দড়িতে ঝুলতে হত না।

অ্যান বনির সংগে আর একজন নারী জলদস্যুরও ফাঁসীর হুকুম হয়েছিল। এর নাম মেরী রীড। অ্যান বনির চেয়েও মেরী রীডের প্রথম জীবন অনেক বেশী রোম্যান্টিক, অনেক বেশী বৈচিত্র্যপূর্ণ। মেরী রীডের সমস্ত জীবনটা একটা উপন্যাসের মত।

ছোটবেলায় মেরী রীডকে নিয়ে তার মা বিধবা হয়েছিলেন। ভারী সুন্দর দেখতে ছিলেন মেরীর মা। অবশ্য মেরী রীডও কিছু কম ছিলেন না। ছোটবেলায় তাকে ছেলের মত মানুষ করতে চেয়েছিলেন মেরীর মা। ছেলেদের জামা-প্যান্ট পরে মেরী রীড পথ হাটতেন। দৃপ্ত ভঙ্গী। সবাই দেখে বলত, —বাঃ। বেশ সেনাপতি-সেনাপতি ভাব ছেলেটির। ছেলে সেজেই মেরী রীড এক ফরাসী ভদ্রমহিলার কাছে চাকরী নিলেন। ফাই ফরমাস খাটবার চাকর। কিন্তু এই চিপাট ভালোমানুষী চাকরী ভালো লাগল না মেরীর। পুরুষের বেশেই মেরী চাকরী নিলেন এক রণপোতে। সেখানেও ভালো লাগল না। মেরী রীড চলে এলেন



মেরী রীড

সৈন্যদলে। ফ্ল্যান্ডার্সের এক পদাতিক সৈন্য হলেন তিনি। মোহিনী নারী নন মেরী। ছদ্মবেশী এক পুরুষ সৈন্য। কিন্তু পদাতিক বাহিনীতে মন টিকল না মেরীর। পায়ে হেঁটে বেড়াতে হবে। যুদ্ধ করতে হবে মাটিতে দাঁড়িয়ে। তাই মেরী রীড হলেন অশ্বারোহী সৈন্য। বিদ্যুৎগতিতে ছুটে বেড়াবেন অশ্বচালনা করে। এই না হলে মন ভরে?

সৈন্যদলে একজনকে দেখে ভালো লাগল মেরীর। হাজার হলেও নারী মেরী রীড। চিত্রাংগদার মত ধনুর্বাণ হাতে নিলেই কি মনটাকেও ধনুকের মত বাঁকানো যায়? প্রেমের অঞ্জন লাগল মেরীর চোখে। এবং একদিন এক অসতর্ক দুর্বল মুহূর্তে মেরী তার কাছে নিজের পরিচয় দিলেন। বললেন তার ভালোলাগার কাহিনী। সৈন্য ভদ্রলোক মেরীকে বললেন নারীর পোষাক পরতে। মেরী রীডকে বিয়ে করবেন তিনি। সলজ্জ বধূবেশ পরবেন মেরী, অশ্বারোহী সৈন্যের ঢাল-তলোয়ার ছেড়ে।

সৈন্যদলে সে এক হৈ-চৈ। আজব ব্যাপার। এমন কথা কেউ কোনোদিন শোনেনি। দুই সৈন্যের বিয়ে হবে। মেরী রীডকে দেখবার জন্য সকলে ভীড় করল। যাই হোক মেরীকে সেনাবাহিনীর চাকুরী থেকে ছুটি দেওয়া হলো। বিয়ে করে মেরী রীড স্বামীকে নিয়ে বাসা বাঁধল।

কিন্তু বিধাতা করুণ। কিছুদিনের মধ্যেই স্বামী বেচারার মৃত্যু হল। মেরী রীড নারীর বসন ফেলে আবার পুরুষ সাজলেন। হল্যান্ডের এক সৈন্যদলে চাকরী হল তার। কিন্তু নানা কারণে সৈন্যবাহিনীর নিয়মানুবর্তিতা সহ্য হল না মেরী রীডের। মনের মধ্যে বড় তুলল স্বামীর স্মৃতি। তাছাড়া এই কিছু সময় গৃহে কাটিয়ে মেরী একটু আয়েসী হয়ে উঠেছিলেন। তাই সৈন্যদল ছেড়ে মেরী রীড গেলেন নাবিকের কাজে। তার জাহাজ যাচ্ছিল পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের দিকে। কিন্তু পথিমধ্যে ক্যাপ্টেন জন রেকাম জলদস্যুর দল নিয়ে জাহাজের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আরো অনেকের সংগে মেরী রীড বন্দী হলেন জলদস্যুর হাতে। কিন্তু রেকামের তখন লোক দরকার ছিল তার দলে। মেরী রীড বন্ধুবান্ধবের সংগে যোগ দিলেন জন রেকামের দলে। জলদস্যুবৃত্তিকে গ্রহণ করলেন মেরী।

কিন্তু হয়ত তার এই জলদস্যু জীবনের শেষ হত। কারণ বাহামার সরকার জলদস্যুদের ক্ষমা করতে স্বীকৃত হলেন যদি জলদস্যুরা সভ্য সমাজে ফিরে এসে নাগরিক জীবন যাপন করতে রাজী হয়। ক্যাপ্টেন রেকাম রাজী হলেন এই প্রস্তাবে। জলদস্যুর দল নীলসমুদ্র ছেড়ে উঠল ডাঙগায়। রেকামের সংগে মেরী রীডও ছিলেন।

কিন্তু ক্যাপ্টেন রেকাম বেশীদিন থাকতে পারলেন না। একঘেঁয়ে নাগরিক-জীবন তার কাছে রীতিমত কষ্টকর মনে হল, সম্ভবত সংগী জলদস্যুর দল জলের মাছের মত ডাঙগায় উঠে দম বন্ধ হয়ে মারা যেতে বসেছিল। সুতরাং সাংগোপাংগদের নিয়ে জলদস্যু রেকাম আবার জলে নামলেন। নীল সমুদ্রের হাতছানি উপেক্ষা করে থাকা মেরী রীডেরও অসম্ভব মনে হয়েছিল।

বেশ কয়েকটি জাহাজ দখল করে নিল জলদস্যুরা। অধিকাংশই জামাইকার। দখলের পর কয়েকজন বন্দী যোগ দিল জলদস্যুর দলে। এদের মধ্যে এক যুবক এলেন রেকামের দলে নাম লেখাতে। মেরী রীডের ভালো লাগল ওকে দেখে। বেশ সুন্দর দেখতে ভদ্রলোক, কিন্তু মেরী তার কাছে নিজের পরিচয় ভাংগলেন না।

ইতিমধ্যে সেই নতুন যুবকের সংগে এক জলদস্যুর বিবাদ উপস্থিত হয়েছে। নিয়মানুযায়ী দুজনকে উঠতে হবে ডাঙগায় এবং সেখানে উভয়ের মধ্যে লড়াইয়ের নিষ্পত্তি হবে। ঘটনা শুনে মেরী রীডের বুকটা উঠল কেঁপে। সুন্দর যুবক যদি দ্বন্দ্বযুদ্ধে অসমর্থ হয় জলদস্যুকে হারাতে? প্রেমের অন্তর উদ্বেল হয়ে উঠল ভয়ভাবনায়।

মেরী রীড আর কালবিলম্ব করলেন না। প্রতিপক্ষ সেই জলদস্যুর সংগে নিজেই একটা বিবাদ বাধিয়ে বসলেন। তখনই দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহবান জানিয়ে ফেললেন মেরী। অব্যর্থ তার লক্ষ্য। পিস্তলের এক গুলিতে জলদস্যু তার হাতে প্রাণ হারাল।

জয়ী হয়ে মেরী রীড এলেন প্রেমিকের কাছে। অন্তরের প্রেম নিবেদন করলেন মেরী। এবং জানালেন যে পুরুষের বেশে তিনি এক প্রেমিকা নারী। দুজনে স্বীকার করে নিলেন দুজনকে। মেরী রীড একেই বিবাহের বন্ধন বলে স্বীকার করলেন।

দ্য লা ভেগাতে বিচার হয়েছিল মেরী রীডের। বিচারকরা তাকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন। সুন্দরী এই রমণীকে ফাঁসীকাঠে ঝোলাতে প্রাণ চায়নি তাদের। কিন্তু সাক্ষ্যদানকালের একটিমাত্র উক্তিতে বিচারকদের মত পাল্টে যায়। তাদের কোমল মন মুহূর্তে কঠোর এবং দৃঢ় হয়ে উঠেছিল।

একদা জন রেকাম প্রশ্ন করেছেন মেরীকে—রমণী হয়ে এমন বিপদসংকুল জীবন ও মৃত্যুর মুখোমুখি কাটিয়ে কি আনন্দ পায় মেরী রীড? উত্তরে মেরী বললেন—মৃত্যুকে তার ভয় নেই। ফাঁসীকাঠে ঝুলতে তার হৃদয় কাঁপে না। আর এমন না হলে কাপুরুষের দল সমুদ্রের দস্যু হয়ে বেড়াত, ফলে সাহসী মানুষগুলিকে শুকিয়ে মরতে হত পৃথিবীতে।

সাক্ষীর মুখ থেকে একথা শোনার পর বিচারকরা আর নারী পুরুষের মধ্যে শাস্তির কোনো পার্থক্য করা প্রয়োজন মনে করেন নি।

অ্যান বনি এবং মেরী রীডকে কেন ছেলেদের পোষাক পরিয়ে বড় করে তোলা হয়েছিল সে কাহিনী চার্লস জনসন লিপিবদ্ধ করেছেন। জামাইকার লোকেরা আদালতে এই ঘটনা জলদস্যুবৃত্তির অভিযোগে অভিযুক্ত অ্যান বনি এবং মেরী রীডের নিজেদের মুখ থেকেই শুনেছে। তাদের জলদস্যু-জীবন যদি গল্প উপন্যাসের মত রোমাঞ্চকর, ঘটনাবহুল এবং নাটকীয় মনে হয় তবে সেই উপন্যাস বা নাটকের অংকুরোদ্গম হয়েছিল তাদেরই বাল্যজীবনে। পড়তে পড়তে নিশ্চয়ই মনে হবে পৃথিবীটা কি আশ্চর্যময় দেশ! এখানে বুঝি সবই সম্ভব—!

অ্যান বনির বাবা ছিলেন আয়র্ল্যাণ্ডের এক আইনজীবী। কর্ক শহরে বনি থানের জন্ম। ভদ্রলোকের স্ত্রী (বনির মা নন) বড্ড রুগ্ন। ডাক্তাররা তাকে উপদেশ দিলেন হাওয়া বদল করতে। অনেক ভেবে-চিন্তে ভদ্রমহিলা মাইল কয়েক দূরের এক স্বাস্থ্যকর স্থানে যেতে রাজী হলেন। মাইল কয়েক দূরে সেই আইনজীবী ভদ্রলোকের মা থাকতেন। ভদ্রমহিলা গেলেন শাশুড়ীর কাছে স্বাস্থ্য উদ্ধারের মানসে।

বাড়ীতে রইলেন অ্যানের বাবা। ঘর-কন্নার ভার পড়ল এক যুবতী পরিচারিকার উপর। এই মেয়েটির কাছে এক চামড়া-ব্যবসায়ী যুবক মাঝে-মাঝে আসত। উদ্দেশ্য আর কিছু নয়। মেয়েটির ভালবাসা ও সঙ্গ-লাভের ইচ্ছা। বাড়ীতে দুপুরবেলায় কেউ থাকত না। মেয়েটি যদি হাসিমুখে দুটো কথা বলে তবে পাওনা হিসেবে পরে আরো কিছু আশা করা যেতে পারে। একদিন দুপুরবেলায় সেই চর্মব্যবসায়ী যুবক কিন্তু এক কান্ড করে বসল। রুপোর কয়েকটি চামচে দেখে সে আর লোভ সামলাতে পারে নি। ফাঁক পেয়ে সেগুলিকে নিজের পকেটস্থ করল। পরিচারিকাটি ঘরে এসে দেখল, তাজ্জব ব্যাপার। টেবিলের উপরে রাখা রুপোর চামচেগুলি লোপাট হয়ে গেছে। কিন্তু ঘরে তো ইতিমধ্যে কেউ আসেনি। সে এবং ঐ যুবক ছাড়া আর কেউ ঘরে প্রবেশ করেনি। তবে? বলা বাহুল্য পরিচারিকার সন্দেহ ঘনীভূত হল। সরাসরি প্রেমাকাঙ্ক্ষীকে সে বলল চামচগুলি বের করে দিতে। ঠাট্টা নয়। যদি সে রাজী না হয় তাহলে পুলিশকে বাড়ীতে এনে সব খবর দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। যুবকটি পড়ল মহা ফাঁপরে। এই অবস্থায় কি চোরাই মাল চট করে বের করা যায়? তাছাড়া চুরি করা যত সহজ, প্রেমিকার কাছে চুরি স্বীকার করা কি তার চেয়ে ঢের বেশী কঠিন নয়? আর মেয়েটাই বা কি ভাববে? চট করে একটা ফন্দি এল তার মাথায়। রুপোর চামচেগুলি খুঁজে বের করবার ভান করে সে ওগুলিকে লুকিয়ে রাখল পরিচারিকার বিছানার তলায়। তারপর যেন খুঁজে বের করতে অসমর্থ হয়ে নিজের সততা নানা উপায়ে প্রতিষ্ঠিত করে মেয়েটির কাছ থেকে সে বিদায় নিল।

ঘটনার কয়েকদিন পরেই বাড়ীর গিন্নি এলেন ফিরে। পরিচারিকা তাকে রুপোর চামচে হারানোর কাহিনী এবং সেই যুবকটির আসাযাওয়া সবকিছু আদ্যোপান্ত শোনাল। এদিকে সেই প্রেমিক যুবকটি মনে মনে অনুতপ্ত হয়ে উঠেছে। তার মনে হল যে রুপোর চামচেগুলি খোয়া যাবার জন্য মেয়েটিকে কত না কথা শুনতে হচ্ছে। একদিন সে নিজেই এল বাড়ীর গৃহিণীর কাছে। কুশল বিনিময়ের পর সে বলল যে চামচগুলি পরিচারিকার বিছানার নীচে লুকোনো রয়েছে। এ কাজ তার। মেয়েটিকে একটু জব্দ করবার জন্য সে এই মজা করেছে। গৃহিণী যেন মেয়েটিকে দোষী না ভাবেন।

ভদ্রমহিলা সব শুনলেন। কিন্তু বিশ্বাস করলেন না। তার মনে হল ব্যাপারটা আগাগোড়া ধাপ্পা,—বানানো গল্প। বিছানার নীচে অবশ্য চামচেগুলি পাওয়া গেল। কিন্তু যুবকটির এই গল্প তার কাছে উদ্ভট মনে হল। আসলে তার সন্দেহ হল মেয়েটির উপর। রুপোর চামচেগুলি ওর ঘরে কেমন করে গেল? তবে কি তার অনুপস্থিতিতে স্বামী মেয়েটির ঘরে যাওয়া-আসা করতেন?

এই চিন্তা বিদ্যুৎগতিতে সমস্ত মনে ছড়িয়ে পড়ল। অনেক কথা ভাবলেন তিনি। পরিচারিকা এবং তার স্বামীর সম্পর্ক এবং আচরণ নিয়ে নিজের মনে প্রায় গবেষণা শুরু করলেন। সন্দেহ একবার শুরু হলে তার ইতি নেই। বিশেষ করে মেয়েদের সন্দেহ এবং স্ত্রীর স্বামীকে সন্দেহ হলে তার পরিণতি তো ভয়াবহ। কি মনে হতে ভদ্রমহিলা পরিচারিকাকে কাছে ডাকলেন। তাকে বললেন যে রাত্রে তিনি পরিচারিকার ঘরেই ঘুমোবেন। সে যেন রান্নাঘরে কিংবা অন্য কোথাও শোবার ব্যবস্থা করে নেয়।

তার নিজের ঘরে গৃহিণীর বিছানা পাততে এসে পরিচারিকা তো অবাক। গৃহিণীর জন্য নিজের সব বিছানা তুলতে গিয়ে সে হল হতভম্ব। রুপোর চামচেগুলি তার বিছানা থেকে গড়িয়ে পড়ল মেঝেতে! পরিচারিকা কি করবে ভেবে পেল না। তখনকার মত চামচেগুলি সে নিজের বাক্সে লুকিয়ে রাখল। পরে ব্যাপারটা তলিয়ে দেখলেই হবে।

পরিচারিকার ঘরে শুয়ে ভদ্রমহিলা নানা কথা চিন্তা করছিলেন। সত্যিই কি তার স্বামী মেয়েটির প্রতি আসক্ত? এমন সময় হঠাৎ কে যেন ঘরে ঢুকল। ফিসফিস করে বলল,—'তুমি কি জেগে আছ?' মিষ্টি, আবেগভরা কন্ঠ—।

ভদ্রমহিলা প্রথমটা ভয় পেয়েছিলেন। পরে কিন্তু আত্মস্থ হলেন। গলার স্বরটা যে তার খুব চেনা। অন্য কেউ নয়।

॥ সম্প্রতি প্রকাশিত হ'য়েছে ॥

বাংলা ভাষায় সাংবাদিকতা বিষয়ে প্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ

সাংবাদিকতার গোড়ার কথা

ফ্রেজার বণ্ড ॥ অনুবাদক : সন্তোষকুমার দে

আধুনিক সাংবাদিকতার সকল দিক সম্পর্কে ২৪টি সুদীর্ঘ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা। বাংলা ভাষায় প্রচার বিজ্ঞানের প্রথম গ্রন্থের রচয়িতা, 'দি ভয়েস' এবং "রেকর্ড-সঙ্গীত' পত্রিকাদ্বয়ের সম্পাদক, খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও সাংবাদিক সন্তোষকুমার দে সযত্ন নিষ্ঠায় ফ্রেজার বন্ডের বিখ্যাত গ্রন্থ "অ্যান ইনট্রোডাকশান টু জার্নালিজম" হতে পরিচ্ছন্ন ভাষায় অনুবাদ করেছেন। বহু চিত্র, তথ্য ও চার্ট সংবলিত। ডিমাই ৪৬৩ পৃষ্ঠা। দাম : ৪·৫০।

প্রতিটি পাঠাগার, সাংবাদিকতার ছাত্র, সংবাদপত্রসেবী, বিজ্ঞাপনদাতা ও বিজ্ঞাপন এজেন্সী এবং জনসংযোগ কর্মীর অবশ্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থ।

এম. সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড

১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট; কলিকাতা-১২

তার স্বামী পরিচারিকার নাম ধরে কথা

অন্ধকারে স্বামী এসে বসলেন স্ত্রীর কাছে। ভদ্রমহিলার নিজেকে অপমানিত মনে হল। কি উত্তাপভরা, গাঢ় কণ্ঠস্বর তার স্বামীর! কি সুন্দর প্রেমিকের মত আহ্বান। তবে এই আহ্বান তো তাকে নয়। সেই নির্লজ্জ মেয়েটাকে উদ্দেশ্য করে। মনে হল ঝরঝর করে কেঁদে ফেলবেন তিনি। শরীর না থাকলে মেয়েদের স্বামীও কি পর হয়ে যায়?

খুব ভোরে শয্যাত্যাগ করে চলে গেলেন ভদ্রমহিলা শাশুড়ীর কাছে। ছেলের কীর্তির কথা একটুও গোপন করলেন না মাকে। কিছুক্ষণ পরে সেই ঘরে ফিরে এসে দেখলেন স্বামী বেরিয়ে গিয়েছেন। কোথায় গেছেন কাউকে বলে যান নি।

তার সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল পরিচারিকার উপর। তখনই পুলিশ ডাকিয়ে এনে রুপোর চামচে চুরি যাবার ঘটনা তিনি বিবৃত করলেন। তল্লাসী করে পুলিশ পরিচারিকার ঘর থেকে চোরাই মাল বের করল। তারা অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেল মেয়েটিকে।

আপাতত ওর স্থান হল কারাগারে—। মেয়েটি এখন বিচারাধীন আসামী।

এদিকে দুপুরবেলায় স্বামী ভদ্রলোক বাড়ীতে ফিরে সব ঘটনা শুনলেন। তার অনুপস্থিতিতে মেয়েটিকে জেলে পাঠানো হয়েছে শুনে তিনি ক্ষেপে উঠলেন। কিন্তু স্ত্রী এবং নিজের মা তার বিপক্ষে। তিনজনে তীব্র বাদানুবাদ। রাগ করে মা আর বউ তখনই বাড়ী ছেড়ে চলে গেলেন। আর কোনোদিন তারা এই বাড়ীতে ফিরে আসেন নি।

এদিকে পরিচারিকাটিকে কারাগার-কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা করে দেখলেন, সে অন্তঃসত্ত্বা। যাই হোক বিচারে মেয়েটির বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ হল না। সাক্ষ্যপ্রমাণ তেমন নেই। কাজেই বেকসুর খালাস। ছাড়া পাবার কিছুদিন পরেই পরিচারিকার একটি মেয়ে হল। তারই নাম অ্যান বনি—। পরবর্তী-



অ্যান বনি

কালের দুর্ধর্ষ নারী জলদস্যু। স্ত্রী ঘর ছেড়ে চলে যাবার বেশ কিছুদিন পর স্বামী শুনলেন যে সে আসন্নপ্রসবা। বলাবাহুল্য সঙ্গে সঙ্গে স্বামীও হলেন সন্দেহের আগুনের শিকার। অসুস্থ হবার পর কতদিন তো তিনি স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হন নি। তবে কি এ ঘটনা কোনো ব্যভিচারের ফল? স্বামীর মনের আকাশে সন্দেহের মেঘ স্থায়ী হয়ে রইল।

যথাসময়ে খবর এল তার কাছে যে স্ত্রী যমজ সন্তানের মা হয়েছেন। একটি ছেলে, অন্যটি মেয়ে। বলাবাহুল্য ভদ্রলোক ছেলে-মেয়ের মুখ দেখতে একদিনও গেলেন না। মনকে হয়ত বোঝালেন, ও সন্তান তার নয়। অন্য কারো।

ইতিমধ্যে মৃত্যুশয্যায় মা স্মরণ করলেন ছেলেকে। অনুরোধ করলেন, সে যেন ঝগড়া বিবাদ মিটিয়ে নেয়। স্বামী-স্ত্রীর মান-অভিমান কখনও বাসি হতে দিতে নেই। বাসি হলেই বিপত্তি। এমনিতেই অনেক দেরী হয়ে গেছে। আর দেরী হলে ফেরার পথ থাকবে না। কিন্তু ছেলের মন মায়ের কথাতেও গলল না। মারা যাবার আগে মা তার সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে গেলেন পুত্র-বধূকে,—ছেলেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করে।

ভদ্রলোক ততদিনে অ্যান বনিকে নিয়ে এসেছেন নিজের কাছে। পরিচারিকার মেয়ে হয়েছে একথা সবাই জানত। তাই অ্যানকে তিনি ছেলেদের পোষাক পরাতে শুরু করলেন। পাড়ার লোকেদের বললেন ছেলেটি তার এক আত্মীয়ের। তিনি মানুষ করবেন বলে ভেবেছেন।

স্ত্রী কিন্তু স্বামীকে তার মায়ের সম্পত্তির আয় থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করলেন না। একটা মাসোহারা তিনি পাঠাতেন স্বামীকে। হঠাৎ তার কানে এল খবরটা। স্বামীর কাছে কে একটি বাচ্চা ছেলে রয়েছে। শুনে পর্যন্ত তার ভীষণ কৌতূহল হল। তখনই লোক লাগালেন তিনি। ছেলেটির সঙ্গে পরিচয় জানবার উদ্দেশ্যে। যথাসময়ে খবরটা জানাজানি হল। ছেলেটি আসলে মেয়ে। পরিচারিকার গর্ভের অবৈধ সন্তান।

কর্ক শহরে আর থাকা গেল না। এমন দুশ্চরিত্র লোকের কাছে আইনের পরামর্শ নিতে কে আসবে? সামান্য পসারটুকুও মাটি। নিজের যা কিছু ছিল বিক্রি করে দিয়ে ভদ্রলোক ক্যারোলিনা চলে যেতে সিদ্ধান্ত করলেন।

বাবার সঙ্গে অ্যান বনিও ক্যারোলিনা গেল। অবশ্যই মেয়ে হয়ে নয়। আগের মতই পুরুষের পোষাকে। পুরুষের সাজপোষাক সে ত্যাগ করেনি।

মেরী রীডের কাহিনীটা এত দীর্ঘ নয়। এর চেয়ে সংক্ষিপ্ত। মেরীর জন্মও অবৈধ সংসর্গের ফল। তবে এ ব্যাপারে তার মা দায়ী। পিতার কোনো দোষ ছিল কিনা তা বিচার করবার কোনো সুযোগই পায়নি মেরী রীড। কারণ বাবাকে সে কোনোদিন দেখেনি। তার পরিচয় জানতে পারেনি। বাবা তার কাছে কল্পনার এক মূর্তির মত চিরদিন থেকেছেন।

মেরী রীডের মায়ের বিয়ে হয়েছিল এক নাবিকের সঙ্গে। মানুষটিকে প্রায়ই সমুদ্রে যেতে হত। মেরীর মা ছিলেন গোলগাল মোটাসোটা, ভাবী সুন্দরী মহিলা। সমুদ্রে যাবার সময় নিশ্চয়ই স্ত্রীকে ছেড়ে যেতে খুব কষ্ট হত লোকটির। একবার নাবিক যখন সমুদ্রে বেরুল তখন মেরীর মায়ের কোলে অল্প কয়েকমাসের এক শিশুপুত্র। সেই সমুদ্রযাত্রাই কাল হল নাবিকের। সমুদ্র থেকে মেরীর মায়ের স্বামী আর কোনোদিন ফিরলেন না।

মেরীর মা জানলেন যে তিনি বিধবা হয়েছেন। ছোট্ট এক শিশুপুত্রকে নিয়ে এই সংসারে কি উপায়ে তিনি বাঁচবেন? সুন্দরী বিধবা যুবতীর সমস্যাও অনেক। হঠাৎ একটা দুর্ঘটনা ঘটল। মেরীর মা সহসা একদিন আবিষ্কার করলেন যে তিনি আবার মা হতে চলেছেন। বলাবাহুল্য ব্যাপারটা আনন্দের এবং রোমাঞ্চের নয়। নিদারুণ লজ্জার। বিধবার সন্তান হবে এর চেয়ে কেলেঙ্কারী আর কি হতে পারে?

লজ্জা ঢাকতে মেরীর মা শহর থেকে চললেন নির্জন গ্রামে। স্বামীর আত্মীয়দের জানালেন যে কিছুদিনের জন্য তিনি বন্ধুদের কাছে থাকবেন। শহর এবং আত্মীয়স্বজনের মধ্যে থেকে বহুদূরের এক অপরিচিত গ্রামে এসে উঠলেন মেরীর মা। এখানে যথাসময়ে একটি মেয়ে হল তার। আদর করে ওর নাম রাখলেন মেরী। মেরী রীড—। কিছুদিন পরে ভদ্রমহিলার সেই শিশুপুত্রটি মারা গেল। দুঃখে শোকে মেরীর মা আবার আত্মীয়স্বজনের মধ্যে ফিরে যেতে ঠিক করলেন। কিন্তু মেয়ের কি পরিচয় দেবেন? লোকে জানতে চাইলে কি বলবেন এর কথা?

হঠাৎ একটা বুদ্ধি এল তার মাথায়। মেয়েকে ওর দাদার জামা-প্যাণ্টগুলো পরিয়ে দেখলেন। তেমন কিছু বেমানান হয় না। ওকে ছেলে বলে চালিয়ে দিলে কি ক্ষতি হবে? মেরীর মা মেয়েকে নিয়ে শহরে ফিরলেন। এখন আর মেরী রীড মেয়ে নয়।

বিনা অস্ত্রোপচারে
অর্শ থেকে
আরাম পাবার
জন্য
হ্যাডেনসা
ব্যবহার করুন!
DGL-227 BEN

ছেলেদের জামা-প্যান্ট পরে সে ছেলেদের মতই দুরন্ত।—

কিন্তু শহরের খরচ চালানো নিয়ে হল সমস্যা। শাশুড়ীর অবস্থা বেশ ভালো। মেরীর মা একদিন মেরীকে নিয়ে গেলেন শাশুড়ীর কাছে। নাতিকে যদি তিনি কিছু দেন তবে ছেলেটা মানুষ হয়। ছেলে মারা গেছে। নাতি মানেই শিবরাত্রির সলতে। ভদ্রমহিলা রাজী হলেন সাহায্য করতে। সপ্তাহে এক ক্রাউন তিনি দেবেন। নাতিকে মানুষ করবার জন্য এই সাহায্য দিতে রাজী।

খুশী হয়ে মেরীর মা ফিরে এলেন। সমস্যার খানিকটা মিটল। কিন্তু কতদিন? কয়েক বৎসর পরেই শ্বাশুড়ী মারা গেলেন। সপ্তাহের সেই ক্রাউন কড়িটির আসা বন্ধ হয়ে গেল। ততদিন ছেলেদের সাজপোষাক পরে মেরী রীড নিজেকে প্রায় পুরুষ বলেই ভাবতে শুরু করেছে। ছোটখাটো কাজে নিযুক্ত হল মেরী রীড। বাড়ীর বয়,...... দোকানের সাহায্যকারী ইত্যাদি কাজ। তার পরের কাহিনী? কিন্তু সে কাহিনী তো ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে।

কিন্তু নারী জলদস্যুদের মধ্যে শ্রীমতী চিংয়ের স্থান সবলের উপরে। রমণী হয়েও বিভিন্ন অভিযানে তিনি যে নেতৃত্ব দিয়েছেন, ইতিহাসে তার অন্য নজীর নেই। দস্যু-বৃত্তিতে চীনারা যে পারদর্শী এ ধারণা ছোটবেলায় রোমাঞ্চকর সিরিজের নানা কাহিনী পড়তে পড়তে আমাদের মনে বদ্ধ-মূল হয়েছে। দস্যুবৃত্তিতে শ্রীমতী চিংয়ের পারংগমতা আমাদের সেই বাল্যকালের স্মৃতিকথাকে মনে করিয়ে দেবে।

অবশ্য আশ্চর্য হতে হয়। যে হাতে সোনার কাঁকনের রিনিঠিনি শব্দের ঝংকার তোলার কথা, সে হাতে কঠিন কঠোর শাণিত অসি উজ্জ্বল রৌদ্রে কিংবা তারা-ভরা আকাশের নীচে অমিতবিক্রমে আঘাত হানতে উদ্যত। কিন্তু চীন সাগরের বুকে এবং কোচিন-চীন ও আনামের সমুদ্র উপ-কূলে বারবার তাই সংঘটিত হয়েছে। জল-দস্যুদের উন্মত্ত চীৎকারে আকাশ-বাতাস কেঁপে কেঁপে উঠেছে, এবং অত্যাচারিতের রক্তে জল হয়েছে লাল। ক্রন্দনরোলে ধরিত্রী বার বার শিউরে উঠেছে।

এই দস্যুরমণীর আসল নাম আমাদের জানা নেই। স্বামী দুর্ধর্ষ জলদস্যু মিঃ চিং। দুটি-চারটি জলযান নিয়ে চিংসাহেব দস্যুবৃত্তিতে নামেন নি। তার অধীনে ছিল রীতিমত ছটি নৌবহর। এক-একটি নৌ-বহরের সংগে শতাধিক ক্ষিপ্র জাহাজ। হঠাৎ একটা দুর্ঘটনায় দস্যু চিং মারা গেলেন। সমুদ্র উপকূলের লোকেরা ভাবল এবার তারা অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পাবে। কিন্তু নতুন নেতা নির্বাচন করতে দস্যুরা দেরী করল না। তবে এবার নেতা নয়, তারা নির্বাচন করল দলনেত্রী। শ্রীমতী চিংকে তারা দস্যুপতির শূন্যস্থানে অভি-ষিক্ত করল।

ছটি নৌবহরকে ভালো করে সাজালেন শ্রীমতী চিং। বিভিন্ন নাম দিলেন তাদের, —কোনোটির নাম কৃষ্ণ নৌবহর, কোনোটির নাম পূর্ব সাগরের বিভীষিকা, একটির নাম—নৌবহরের মণি-মুক্তা। অপর একটিকে অভিহিত করা হল মন্দোদরের আহার্য নামে। প্রত্যেকটি নৌবহরের জন্য একটি বিশেষ রঙের পতাকাও ঠিক করলেন তিনি। কোনোটির জন্য নির্দিষ্ট হল রক্তপতাকা, কোনোটি ব্যবহার করবে কৃষ্ণপতাকা। কোনোটি নীল, কোনোটি সবুজ,—কোনো-টির বুকে শোভা পাবে শ্বেতপতাকার সারি। এছাড়া দলের জন্য কয়েকটি নিয়ম স্থির করলেন তিনি। যদি কোনো দস্যু বিনা অনুমতিতে তীরে যায় তবে তার শাস্তি হবে। সে দণ্ড হল সকলের সামনে দুটি কানের বিভিন্ন স্থানে ফুটো করে দেওয়া। পুনরাবৃত্তি হলে শাস্তি হবে মৃত্যু। লুণ্ঠিত কোনো দ্রব্যে হস্তক্ষেপ অমার্জনীয়। লুণ্ঠিত দ্রব্যের উপর লুণ্ঠন-কারীর অধিকার বিশ ভাগ। বাকী আশী ভাগ জমা হবে সাধারণ তহবিলে। এই অপরাধের শাস্তিও মৃত্যু। বন্দী রমণীর সংগে অবৈধ সংসর্গ স্থাপনের চেষ্টার শাস্তিও হবে মৃত্যু। অবশ্য অনুমতি নিয়ে বন্দী রমণীর সংগে সময় কাটানো চলতে পারে।

দলনেত্রী হয়ে শ্রীমতী চিং দেখলেন, উপকূলের কিছু লোকের সংগে সদ্ভাব রাখা নিতান্ত প্রয়োজন। কারণ, রসদপত্র এবং বারুদের যোগান পেতে হলে উপকূল-বাসীদের সাহচর্য অপরিহার্য হয়ে উঠবে। তিনি নিয়ম করলেন যে, উপকূলের যে কোনো গ্রাম থেকে জিনিসপত্র দাম দিয়ে যেন গ্রহণ করা হয়। এর ফলে দস্যুরা গ্রামবাসীদের কাছে খানিকটা প্রিয়পাত্র হয়ে উঠল।

শ্রীমতী চিং চীনসমুদ্রে টহল দিয়ে বেড়াতে লাগলেন। তার ছটি নৌবহর নানা দেশের বাণিজ্যপোত এবং যাত্রীবাহী জাহাজের উপর আক্রমণ শুরু করল। কথাটা পৌঁছল চীনাসম্রাটের কানে। নতুন এই দস্যু রমণীর প্রায় অবিশ্বাস্য কাহিনী তাকে বিব্রত করে তুলল। ১৮০৮ খৃস্টাব্দে এক রাজকীয় নৌবহর বেরিয়ে পড়ল শ্রীমতী চিংয়ের সন্ধানে। সম্রাটের আদেশ, দস্যু-রমণীকে বন্দী করে তার চরণতলে এনে ফেলা চাই। নৌবহরটির সেনাপতি হলেন এ্যাডমিরাল কো লাং। সম্রাটের আশীর্বাদ পুষ্ট এই নৌবহর শ্রীমতী চিংকে আবিষ্কার করল। দূর থেকে শ্রীমতী দেখলেন রাজ-কীয় নৌবহর এগিয়ে আসছে তাকে ধ্বংস করতে। শ্রীমতী চিং অবিলম্বে মনস্থির করলেন। সমুদ্রযুদ্ধের একটা প্ল্যান তৈরী হয়ে গেল তার মাথায়। তার সংগের কিছু জাহাজকে শ্রীমতী পাঠালেন রাজকীয় নৌবহরের পিছনে। অগ্রগামী নৌবহরকে আক্রমণ করে বসলেন শ্রীমতী চিং। পিছন দিক থেকে তার অন্য জাহাজগুলি ঘিরে ধরল রাজকীয় নৌবহরকে। তুমুল যুদ্ধ শুরু হল সমুদ্রের বুকে। চাতুর্যের দ্বারা বেড়াজালে ঘিরে ধরলেন শ্রীমতী চিং রাজ-কীয় নৌবহরকে।

যুদ্ধে কো লাং সম্পূর্ণ পরাস্ত হলেন। রাজকীয় নৌবহর ধ্বংসপ্রায়। অপমানিত লাঞ্ছিত কো লাং আত্মহত্যা করলেন। তার নিষ্প্রাণ মৃতদেহ পড়ে রইল শ্রীমতী চিংয়ের পদতলে। ভগ্নদূত কে একজন পৌঁছে সংবাদ দিল সম্রাটের দরবারে। একটি তুচ্ছ রমণীর দুঃসাহসে জ্বলে উঠলেন তিনি। ডাক পড়ল লিন ফার। এখনি চীনাসাগরে বেরিয়ে পড়তে হবে তাকে। জলদস্যুদের রাণী শ্রীমতী চিংকে পর্যুদস্ত করে বন্দী করা চাই। লিন ফা চললেন। রাজকীয় নৌবহর ভেসে চলেছে। এখন প্রতীক্ষার পালা। কোথায় হঠাৎ দেখা হবে জলদস্যুর জলযানগুলির সংগে। অবশেষে লিন ফা দেখা পেলেন। শ্রীমতীর জলযানগুলির সংখ্যা দূর থেকে আন্দাজ করে তার বুক ভয়ে কেঁপে উঠল। লিন ফা আদেশ দিলেন নৌবাহিনীর মুখ ফেরাতে। কিন্তু লিন ফা পালিয়ে যেতে চাইলেও শ্রীমতী চিং তাকে পালিয়ে যেতে দেবেন কেন? জলদস্যুর দল পিছু পিছু ধাওয়া করল লিন ফার। ওলাং পাতে দেখা হল দুই দলের। তখন বাতাস গিয়েছে থেমে। নৌবাহিনী নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু জলদস্যুর দল তাতেও দমল না। দস্যুরাণীর আদেশে তারা লাফিয়ে পড়ল জলে। দুহাতে সাঁতার আর দাঁতে কামড়ে রইল ছুরি। রাজকীয় নৌবহরে উঠে তারা এক অবর্ণনীয় সংগ্রাম শুরু করে দিল। সমস্ত নৌবহর শ্রীমতী চিংয়ের দখলে এল। লিন ফা দস্যুদের হাতে মারা পড়লেন।

পরবর্তী বৎসরে চীনা সম্রাট আর একটি অভিযান পাঠালেন শ্রীমতী চিংয়ের বিরুদ্ধে। এবার অধিনায়ক হলেন এ্যাড-মিরাল সুয়েন মো সান। পর-পর দুটি অভিযান ব্যর্থ হয়েছে। এবার তৈরী হল জলরাজের নৌবহর। একশতটি জাহাজ দিয়ে সম্পূর্ণ। যুদ্ধে বিপর্যয় হল শ্রীমতী চিংয়ের। গোলার আঘাতে তার জাহাজের পালে লাগল আগুন। এবং তার মাস্তুলের দড়িতে তা ছড়িয়ে পড়ল। শ্রীমতী চিং নৌবহরকে আদেশ দিলেন—পশ্চাদপসরণ করতে। কিন্তু রাজসৈন্যরা প্রচণ্ড শক্তিতে গোলা ছুঁড়ে যেতে লাগল। ফল হল, শ্রীমতী চিংয়ের প্রায় পরাজয়। অসংখ্য জল-দস্যু প্রাণ হারাল লড়াইয়ে। কোনমতে অল্প কয়েকটি জাহাজ নিয়ে পালিয়ে বাঁচলেন চিং। কিন্তু প্রতিহিংসার আগুন তার অন্তরে অল্প অল্প জ্বলছিল। শ্রীমতী চিং কিছু সময়ের মধ্যেই যোগাযোগ স্থাপন করলেন তার অধীনস্থ অন্য নৌ-বহরগুলির সংগে। সুয়েন মো সান তখনও ফিরে যান নি। পথিমধ্যে শ্রীমতী চিং তাকে আবার আক্রমণ করলেন। এ্যাডমিরাল ঠিক প্রস্তুত ছিলেন না। ফলে দ্বিতীয় ধাক্কাতে জলদস্যুরা প্রবল বিক্রমে কাড়ে চলল। রাজ-কীয় নৌবহর প্রায় বিধ্বস্ত হয়ে ফিরে গেল সম্রাটের কাছে। শ্রীমতী চিংই বিজয়িনী রয়ে গেলেন। সম্রাটের সেনা-বাহিনী তাকে পরাস্ত করতে সক্ষম হয় নি।

সম্রাট দেখলেন জলদস্যুর দলকে দমন করা খুবই কঠিন। অথচ প্রজাদের সকরুণ মিনতি শুনতে শুনতে নিজেকে আর ঠিক রাখা যায় না। ইতিমধ্যে একজন জং পা

কেওতে শক্তির পরীক্ষা হয়ে গেছে। নৌ-বহরের মণিমুক্তা শ্রীমতী চিংয়ের নেতৃত্বে রাজকীয় নৌবহরকে কদলী প্রদর্শন করে ভেসে গিয়েছে মাঝ-দরিয়ায়। সম্রাট এ্যাডমিরাল টিং ক্যুয়ে হুকে ডাকলেন। যেভাবে হোক দস্যুরমণীকে সাবাড় করা চাই। নইলে প্রজারা তো বিদ্রোহী হতে পারে। ক্যুয়ে হু বেরিয়ে পড়লেন সেই কঠিন অভিযানে। তখন চীনদেশে বর্ষাকাল। ক'দিন ধরে প্রবল বর্ষণ হচ্ছিল। ক্যুয়ে হু ভাবলেন এই বর্ষায় শ্রীমতী চিং নিশ্চয়ই মাঝ-দরিয়ায় যাবেন না। সেনাপতি তখন নিজের নৌবহরটিকে ঠিক সাজিয়ে নিচ্ছিলেন। হঠাৎ ঈশান কোণের মেঘের মত শ্রীমতী চিং দেখা দিলেন এবং আক্রমণের পূর্বে ক্যুয়ে হু প্রায় প্রস্তুতই হতে পারলেন না। তার জাহাজগুলির তখনও সব নোঙর তোলা হয় নি। জাহাজের পালগুলি অবিন্যস্ত এবং মেলা হয় নি। তবু প্রাণপণে লড়ে চলল রাজসৈন্যরা। কিন্তু দুইশত ক্ষিপ্রগতি দস্যু জাহাজের কাছে তাদের কতটুকু সামর্থ্য। টিং ক্যুয়ে হু আত্মহত্যা করলেন এবং পঁচিশটি যুদ্ধজাহাজ শ্রীমতী চিংয়ের দখলে এল।

চীনা সম্রাট পাত্রমিত্রদের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করলেন। এই দস্যুনেত্রী প্রায় অপরাজেয়। কিন্তু কি করা যায়? প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশার কাহিনী শুনতে শুনতে চণ্ডুর মৌতাত যে বারবার কেটে যাচ্ছে। দীর্ঘবেণী সম্রাট সিংহাসনে বসে দোলেন আর চিন্তা করেন। অবশেষে ঠিক হল। লোভ দেখিয়ে সখ্যতা করতে হবে দস্যুদের সঙ্গে। সম্রাট অনন্যোপায়।

কৃষ্ণ নৌবহরের ও পো তের কাছ থেকে প্রথম সাড়া এল। তার দলে আট হাজার জলদস্যু। একশত ষাটটি জলদস্যুর জলযান এবং পাঁচশতেরও অধিক কামান-বন্দুক। ছোরা-ছুরির তো কথাই নেই। ক্ষমা লাভ করে ও পো তে ডাঙ্গায় উঠে এল। সম্রাট তাকে দুটি শহর দান করলেন। দলবল নিয়ে সে সেখানে বাস করুক। ও পো তে সম্মানজনক রাজপদেরও অধিকারী হল।

কিন্তু বারবার আক্রান্ত হয়ে শ্রীমতী চিং ভয়ংকরী নারীতে রূপান্তরিত হয়েছেন। তখন তার বিনাশিনী রূপ। উপকূলের প্রায় প্রতিটি গ্রাম এবং ছোট শহর জলদস্যুদের হাতে নিগৃহীত হল। যেখানে গ্রামবাসী বাধা দিয়েছে সেখানে শ্রীমতী চিং আদেশ দিয়েছেন অকথ্য অত্যাচারের। মেয়ে-পুরুষ বন্দী করে তোলা হল জাহাজে। আক্রান্ত হবার পরদিন ভোরে গ্রামে একটি মোরগের ডাকও শোনা যেত না। সন্ধ্যের গ্রামের কুকুর ভয়ে চীৎকার করে ডাকা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছে। একবার গ্রামের মেয়েরা শ্রীমতী চিংয়ের আক্রমণের সংবাদ পেয়ে অদূরবর্তী ধানক্ষেতের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। হয়ত সে যাত্রা তারা রক্ষা পেত। কিন্তু কোলের একটি শিশু কি কারণে চীৎকার করে কান্না শুরু করে দেয়। জানতে পেরে জলদস্যুরা ছুটে এসে তন্ন-তন্ন করে ধানক্ষেত খুঁজে বেড়ায়। প্রতিটি মেয়েকে তারা ধরে নিয়ে যায় তাদের সঙ্গে। কাউকে রেহাই দেয় নি।



শ্রীমতী চিং রাজকীয় সৈন্যদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত

ও পো তে ধরা দেবার পর শ্রীমতী চিং মনে মনে দুর্বল হয়ে পড়লেন, একদা চীনা সম্রাটের কাছ থেকে তার কাছেও দূত এল। ম্যাকাও'য়ের ডাক্তার মিঃ চ্যাং। দৌত্য করবার দায়িত্ব নিলেন তিনি। শ্রীমতী বললেন, তার অধীনস্থ প্রত্যেক দস্যুকে কিছু টাকা দিতে হবে সম্রাটকে। এছাড়া শূকর এবং মদ। তাহলে তিনি জল ছেড়ে ডাঙ্গায় উঠতে রাজী। চীনাসম্রাট শুনে বললেন—তথাস্তু।

শ্রীমতী চিংয়ের পর সরকারকে বিশেষ বেগ পেতে হল না। পূর্বসাগরের বিভীষিকা সহজেই আত্মসমর্পণ করল। পালিয়ে গেল মন্দোদরের খাদ্য। ম্যানিলায় সে দস্যুবৃত্তি করতে লাগল।

শ্রীমতী চিং ডাঙ্গায় উঠে এক চোরা-চালানকারীদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়লেন। স্মাগলার দলের তিনিই মক্ষিরাণী। দিন যায়। ধীরে ধীরে বার্ধক্য ছড়িয়ে পড়ল তার শরীরে। দৃষ্টি হয়ে এল ক্ষীণ। অস্ত-সূর্যের রক্তরশ্মির দিকে চেয়ে বিগত জীবনের কথা ভাবেন শ্রীমতী চিং। উজ্জ্বল রৌদ্রে ঝলসিত অসি। তারাভরা আকাশের নীচে সহসা আক্রান্ত হয়ে যাত্রী-বাহী জাহাজের অসংখ্য নরনারীর কাতর আর্তনাদ। ক্রন্দনের রোলে ভরে উঠেছে আকাশ-বাতাস। গোলা-বারুদের গন্ধে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। সমুদ্রের কালো জল রক্তে লাল হয়ে উঠেছে। আর তিনি মাস্তুলের নীচে দাঁড়িয়ে তরবারি উঁচিয়ে আদেশ দিচ্ছেন। শিকার দখল করো,—খতম করো।

চোখ বুজলে ভাবেন এই ত সেদিন। শুধু চোখ খুললেই কই?

চীনদেশের এই দুর্ধর্ষ রমণীর কথা প্রথম বিশ্বজগতে জানান চার্লস নিউম্যান। ১৮৩১ খৃস্টাব্দে সমসাময়িক এক চীনা-লেখকের রচনা তিনি অনুবাদ করেন। এতেই শ্রীমতী চিংয়ের কাহিনী বিস্তারিত-ভাবে লিখিত হয়েছে।

আধুনিককালে আরো একজন চীনা-রমণী জলদস্যু হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। এই মহিলাটির নাম শ্রীমতী হন চো লো। শ্রীমতী চিংয়ের মতই তিনি বিধবা। শ্রীমতী লো স্বামীর মৃত্যুর পর তার জলদস্যু বাহিনীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বেশী দিন নয়। উনিশ'শ একুশ সালের কথা। শ্রীমতী লো'র অধ্যুষিত অঞ্চল ছিল পাকহোইয়ের আশেপাশের গ্রাম শহর। তার অধীনে ষাটটি দস্যু জলযান সর্বদাই প্রস্তুত থাকত। এই সময় চীনে যে বিপ্লব হয়েছিল শ্রীমতী লো তাতে দলবল নিয়ে অংশ গ্রহণ করেন। জেনারেল যুং-মিং-টাংয়ের সঙ্গে এই মহিলা কাজ করেছেন এবং একজন কর্ণেলের সমান মর্যাদা পেয়েছিলেন।

যুদ্ধ শেষ হলে শ্রীমতী লো আবার শুরু করলেন জলদস্যুর উপদ্রব। তবে বেশী নয়। একটি-দুটি গ্রাম আক্রমণ করে পঞ্চাশ-ষাটটি তরুণীকে বন্দী করে নিয়ে যেত তার দস্যুদল। বলাবাহুল্য এ মেয়েগুলিকে অন্যত্র বিক্রী করে শ্রীমতীর লাভ কম হয় নি।

শুধু সাহসের অধিকারিণী ছিলেন না শ্রীমতী লো। দেখতে তিনি ছিলেন চমৎকার সুন্দরী। এমন সৌন্দর্যের রাণী হয়েও এতগুলি দুর্দান্ত দস্যুকে শাসনে রাখা কম কৃতিত্বের কথা নয়। অন্তত দস্যু-রাণীকে কেন্দ্র করে কোন্দল-বিবাদের কথা কোন দলে শোনা যায় নি।

১৯২২ খৃস্টাব্দের অক্টোবরে শ্রীমতী লো হঠাৎ মারা যান।

গৌরাঙ্গ পরিজন

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

(৭১)

রূপ গোস্বামী

খ

রামানন্দ আর সার্বভৌমের কাছে প্রভু রূপের গুণবর্ণন করলেন। তোমরাও বিচার করো রূপ কেমন লিখেছে। ভাবে ছন্দে রসে কাব্যে কেমন উতরেছে তার রচনা।

ঈশ্বরের বোধকরি এই রকমই রীতি। ভক্তের কোনো ত্রুটিই গায়ে মাখেন না। নেন না কোনো অপরাধ। অল্প সেবাকেই বহু বলে মানেন। ভক্তের কাছে হারেন। ভক্তের হাতে দান করে দেন নিজেকে।

রূপ তার নাটক শোনাতে বসল। প্রথমে বিদগ্ধ-মাধব, পরে ললিত-মাধব।

রামানন্দ বললে, তবে এবার নান্দী শ্লোক পড়ো।

রূপ পড়তে লাগল : হরিলীলাকথা তোমার সমস্ত তৃষ্ণা, সমস্ত ভোগবাসনা হরণ করুক। কী রকম সে কথা? যেন চিনিপাতা দই। তাতে ব্রজসুন্দরীদের প্রণয়-কর্পূর মেশানো। তাতেই সুগন্ধি করা। এমন যে সুধা যা চন্দ্রসুধার মাধুর্যগর্বকে ম্লান করেছে। সে স্নিগ্ধ ও সুস্বাদু পানীয় সংসারপথশ্রান্ত সন্তপ্ত প্রাণীদের তৃষ্ণা দূর করে। দুর্বিষয়ের তৃষ্ণা।

রামানন্দ বললে, এবার ইষ্টদেবের বর্ণন করো।

প্রভু সামনে বসে, কী করে পড়ে? রূপ কুণ্ঠিত হয়ে রইল।

সে কি, সংকোচ কিসের? প্রভু আশ্বাস দিলেন : গ্রন্থের ফল সমস্ত বৈষ্ণবসমাজকে শোনাও।

রূপ পড়ল : পুরটসুন্দরদ্যুতি শচী-নন্দন হরি সকলের হৃদয়কন্দরে স্ফুরিত হোন। যিনি উন্নত-উজ্জ্বল রসাশ্রিতা ভক্তিশ্রী করুণা করে বিতরণ করতে অবতীর্ণ হয়েছেন—যে শ্রী বহুদিন ধরে সংসারে অনুপস্থিত।

সকলে বলে উঠল : এই শ্লোক শুনে কৃতার্থ হলাম। রূপ, তুমি এই শ্লোক শুনিয়ে সকলকে কৃতার্থ করলে।

তারপর শ্রোতাদের প্রশংসা করে লেখক তার দৈন্য জানাচ্ছে।

মনে হয় আমার মত অভাজনেরও কিছু পুণ্যফল ছিল। হে বুধমণ্ডলী, আমি ক্ষুদ্র হলেও আমার কথা তুচ্ছ হবে না। কেননা সেকথা হরিগুণময়ী কথা, হরির গুণ বর্ণনায় পরিপূর্ণ। সে কথাই সিদ্ধার্থবিধাত্রী। আমি লঘু হতে পারি কিন্তু আমার বিষয় লঘু নয়। আমি হীন হতে পারি কিন্তু আমার বিষয় গুণ-গরীয়ান।

তারপর রূপ প্রেমোৎপত্তির কারণ কী কী বর্ণনা করলে। কাকে বলে পূর্বরাগ, কাকে বলে চেষ্টা। কী বা কামলেখন?

রাধার হৃদয়বেদনা সুদুঃসাধ্য। এর চিকিৎসা শুধু চিকিৎসকের নিন্দা। এই ব্যাধিই পূর্বরাগ। শরীরচাঞ্চল্যই চেষ্টা। প্রেমপত্রই কামলেখন।

কৃষ্ণের কাছে পত্র পাঠাল রাধা : তুমি চিত্রপটরূপ ধারণ করে আমার মন্দিরে বাস করছ। তোমাকে দেখলেই আমার চিত্ত-বিকার ঘটে, ভয়ে আমি পালিয়ে যাই, কিন্তু কোথায় যাব, যেখানে যাই সেখানেই তোমার ছবি দেখি। সর্বত্রই তুমি এসে আমার পথরোধ করে দাঁড়াও। সর্বত্রই তোমার স্ফূর্তি, তোমার উদ্দীপন।

রাধিকার দুঃখে বিশাখা কাঁদছে। তুমি কেন কাঁদছ? রাধিকা বিশাখাকে বলছে : কৃষ্ণ যদি আমার প্রতি অকরুণ তাতে তোমার কী অপরাধ? আমিই মরব। আমার মৃতদেহকে তমালের ডালে এমনি করে বেঁধে দিও যেন আমি তাকে ভুজবল্লরী দিয়ে আলিঙ্গন করে আছি। আমার এই মিলনেচ্ছাকে বৃন্দাবনে অবিনশ্বর করে রেখো।

রামানন্দ বললে, এবার তবে প্রেমের স্বভাব কী বলো।

প্রেমের যে পরিমাণে সুখ সেই পরিমাণে দুঃখ। বিষ আর অমৃত একসঙ্গে।

এই প্রেমের আস্বাদন তপ্ত ইক্ষু চর্বণ
মুখ জ্বলে, না যায় ত্যজন।

সেই প্রেম যার মনে তার বিক্রম সেই জানে
বিষামৃতে একত্র মিলন।

কৃষ্ণের উৎসঙ্গ-সুখের আশায় গুরু-লজ্জা শিথিল করে দিলাম, রাধিকা সখীদের কাছে বিলাপ করছে, তোমরা প্রাণের চেয়েও সুহৃত্তম, তোমাদেরই বা কত ক্লেশ দিলাম, সাধ্বীসেবিত মহান পাতিব্রত্য-ধর্মেরও সম্মান রাখলাম না, তবুও কৃষ্ণ আমাকে উপেক্ষা করল। রাধিকা বলছে, তারপরেও পাপীয়সী আমি বেঁচে আছি। আমার ধৈর্যকে ধিক।

ললিতা বলছে, অন্তরক্লেশে কলঙ্কিত হয়ে যমপুরীতে চললাম, আর উনি এখনো প্রবঞ্চকের হাসি হাসছেন! হে মেধাবিনী রাধিকে, এই একটা গভীরকপট আভীর-পল্লীর ধূর্তের সঙ্গে তোমার কী করে প্রেম হল?

দেবী পৌর্ণমাসী কৃষ্ণকে বললে, কৃষ্ণ, তুমি সমুদ্র আর রাধিকা বাহিনী, নদী। সে ধর্মসেতু ভেঙে দিয়ে এসেছে। বেদধর্ম, লোকধর্ম, আর্যপথ স্বজন-ভবন সব সে বিসর্জন দিয়েছে। শুধু তোমাতে মিলিত হবার জন্যে। ছেড়েছে ধব-তরু বা পতি-চ্ছায়ার সান্নিধ্য, লঙ্ঘন করেছে সমস্ত গুরু-পর্বত। আর তুমি কিনা কপট বাক-চাতুরীতে তার প্রতি বিমুখতা দেখাচ্ছ!

সকলে একবাক্যে বলে উঠল : চমৎকার।

রামানন্দ প্রশ্ন করল : বৃন্দাবনের কেমন বর্ণনা করলে? মুরলীধ্বনির? আর কৃষ্ণ-রাধিকাকেই বা কী রকম চিত্রিত করলে?

কৃষ্ণ মধুমঙ্গলকে বলছে, মধুমঙ্গল, দেখ আম্র-মুকুল থেকে মকরন্দ ক্ষরিত হচ্ছে। তার সুগন্ধে আকৃষ্ট হয়ে ভ্রমর এসে বন্দীকৃত হচ্ছে, চন্দনগিরির মন্দানিলে আন্দোলিত বৃন্দাবন, আমার অতুল আনন্দের আস্পদ। আমার ইন্দ্রিয়ের আনন্দ-বর্ধন। ভ্রমরীর গান কানের তৃপ্তি, শীতল বায়ুর স্পর্শ ত্বকের, লতানুত্য চোখের, মল্লিকাগন্ধ নাকের আর দাড়িম্ব জিহ্বার!

মুরলীকে সম্বোধন করে রাধিকা বলছে, হে মুরলি, তুমি তো জাতিতে সরল, বাঁশ-বংশে জন্ম বলে তোমার তো কুটিলতা থাকার কথা নয়, আছও তো পুরুষোত্তমের হাতে, তবে কার কাছে গোপাঙ্গনাদের বিমোহনের বিষমন্ত্রদীক্ষা নিলে, কোন গুরুর কাছে?

হে সখি মুরলি, তুমি ছিদ্রজালে পূর্ণ, তুমি লঘু, অতি কঠিন। নীরসা গ্রন্থিলা, তবু কোন পুণ্যের ফলে কৃষ্ণকরের আলিঙ্গন ও কৃষ্ণাধরের চুম্বন পাচ্ছ? আমার কি সেই পুণ্য হয় না?

হায় কৃষ্ণের বাঁশি। এই বাঁশির ধ্বনিতে মেঘের গতি স্তম্ভিত হয়, তুম্বুরু ঋষি যিনি স্বরনাদ-বিশারদ, গায়কশ্রেষ্ঠ, তিনিও বিস্ময়ে চমকে ওঠেন। যারা ব্রহ্মাসক্ত, ব্রহ্মানন্দে মগ্ন, সেইসব সনক-সনন্দনের ধ্যান ভেঙে যায়, স্বয়ং ব্রহ্মা তার সৃষ্টি-কার্য ভোলে, গাম্ভীর্যের প্রতিমূর্তি বলিও চঞ্চল হয় আর অনন্তদেব যিনি পৃথিবীকে মাথায় ধরে আছেন, পারেন না নির্বিচল থাকতে। সে-ধ্বনি ব্রহ্মাণ্ডকটাহ ভেদ করে চলে যায় ঊর্ধ্বলোকে, লোক-লোকান্তরে।

দেখ কৃষ্ণকে দেখ। তার নয়নচ্ছটায় পুণ্ডরীকের প্রভা তিরস্কৃত, তার পীতাম্বরে নবকুঙ্কুমের শোভা পরাভূত,

তার আরণ্য অলংকারে মণিরত্নের আভরণ বিড়ম্বিত। সেই উজ্জ্বলাঙ্গ হরিকে দেখ, তার কান্তি হরিণ্মণিমনোহর। বামজঙ্ঘার মধ্যতটে দক্ষিণ চরণটি ন্যস্ত হয়ে দেহের তিনস্থান ঈষৎ বাঁকা করে রাখা, স্কন্ধ বক্রভাবে স্তম্ভিত, নেত্রপ্রান্ত বক্রভাবে সঞ্চারিত, সংকুচিত অধরে লোলাঙ্গুলি-সঙ্গত বাঁশি, নীলকমলের উপর ভ্রমরের মত নয়নের উপরে যার ভ্রূ নৃত্য করছে সেই পরমানন্দ পুরুষকে অঙ্গীকার করো।

আর রাধিকা?

যার নয়নশোভায় নবকুবলয় পরাজিত, যার মুখোল্লাসে ফুল্ল কমলবন উল্লঙ্ঘিত, যার আঙ্গিকরুচিতে স্বর্ণকান্তি লাঞ্ছিত, রাধার সেই অনির্বচনীয় বিচিত্ররূপ স্ফুরণ করছে।

মধুমঙ্গলকে কৃষ্ণ বলছে, চন্দ্র দিবা-ভাগে বিরূপ হয়ে যায়, শতপত্র পদ্ম শর্বরীমুখে সন্ধ্যাকালেই ম্লান হয়, আমার প্রেয়সীর প্রিয়োজ্জ্বল মুখের সঙ্গে কার তুলনা করব? আনন্দরসতরঙ্গে কপোল যার ঈষৎ হাস্যযুক্ত, যার কন্দর্পধনু ভ্রূলতা নৃত্যচঞ্চল, ঘনসন্নিবিষ্ট পক্ষ্মযুক্ত যার চক্ষু, তারই কটাক্ষ আমাকে নিরন্তর দংশন করছে।

রামানন্দ বললে, তোমার কবিত্ব অমৃতনির্ঝরি। এবার তবে দ্বিতীয় নাটক ললিতমাধবের কথা বলো।

তুমি সূর্য আর আমি খদ্যোত। বললে রূপ, তোমার কাছে কিন্তু ব্যাখ্যা-বর্ণনা করা আমার ধৃষ্টতামাত্র।

না, না, পড়ো নান্দীশ্লোক।

রূপ পড়ল : চকোর চন্দ্রের সুধাপান করে বলে চন্দ্রোদয়ে তার অসীম আনন্দ। তেমনি কৃষ্ণের দর্শনে কৃষ্ণের লীলাকথা-শ্রবণে সুহৃদ ও ভক্তদের আনন্দ। তাই কৃষ্ণের যশঃশশী অখিলসুহৃৎ-চকোরনন্দ।

তারপর দ্বিতীয় নান্দী বলো যাতে ইষ্টদেবের বন্দনা।

রূপ আবার সঙ্কুচিত হল। তবু পড়ল থেমে থেমে : যিনি ক্ষিতিতলে উদিত হয়ে স্বীয় প্রেমসুধা অকাতরে বিতরণ করছেন, যিনি দ্বিজকুলের অধিরাজ, যিনি অজ্ঞান-তিমির নাশ করেছেন, যিনি বশীকৃতজগন্মনা, জগজ্জনের মন যাঁর বশীভূত, সেই শচীসুতশশী দিকে-দিকে আনন্দ চাঁদুন।

অন্তরে উল্লসিত হলেও বাইরে কৃত্রিম রোষ প্রকাশ করলেন প্রভু : কৃষ্ণরসকাব্য-সুধাসিন্ধুর মধ্যে আমার মিথ্যাস্তুতির ক্ষার-বিন্দু মিশিয়েছ কেন? তাতে অমৃতের স্বাদ নষ্ট হয়ে গেল।

রামানন্দ বললে, অমৃতের সঙ্গে কর্পূর মিশল। তাতে আনন্দচমৎকারিতা আরো বেড়ে গেল।

তোমার এতে উল্লাস হচ্ছে? শুনতে লজ্জা করে, লোকে উপহাস করবে।

কী বলো, এ শুনে লোকের আনন্দ বাড়বে। বললে রামানন্দ, অভীষ্টদেবের স্মৃতি চিরজাগরূক থাকবে। তাকাল রূপের দিকে : ললিতমাধবের কী বিষয়বস্তু?

কৃষ্ণ বিজাতরাজ কংসকে নিধন করবে ও রাধাকে বিবাহ করবে। বললে রূপ, সমৃদ্ধিমান সম্ভোগের পূর্তির জন্য রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের বিবাহের প্রয়োজন।

আরো শ্লোক শোনাও।

রজ আর তম দুইই কৃষ্ণের সঙ্গে মিলন ঘটায় বৃন্দাবনে। রজ মানে গো-ধূলি আর তম মানে সন্ধ্যার অন্ধকার। সাধারণত রজ আর তমগুণে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় না। কিন্তু বৃন্দাবনে বিপরীত। এখানে রজ আর তমঃ কৃষ্ণমিলনের সহায়ক। তাই ব্রজাঙ্গনার ভজন-কৌশল বেদেরও অপ্রকট।

হে সহচরি, যে নবজলধরকান্তি, মদমত্ত মাতঙ্গের মত যার বিলাস, সেই নির্ভীক নিরাতঙ্ক যুবক কে? কোথা থেকে এসেছে ব্রজমন্ডলে? হায়, তার কটাক্ষদস্যু আমার চিত্তধনাগার থেকে ধৈর্যধন লুণ্ঠন করে নিয়ে যাচ্ছে।

আর কৃষ্ণ বলছে রাধিকার উদ্দেশে : যে আমার চিত্তকরীন্দ্রের বিহারমন্দাকিনী যে আমার নয়নচকোরের শারদীয় চন্দ্রপ্রভা যে আমার হৃদয়াকাশের চঞ্চলা বহুকালব্যাপী উৎকণ্ঠার ফলে তাকে আজ পেয়েছি।

রামানন্দ সহস্রমুখে রূপের কবিত্বের প্রশংসা করতে লাগল। সেই কাব্য কাব্য-রচনায় প্রয়োজন কী যদি তা অন্যের হৃদয়ে লগ্ন হয়ে আনন্দে না তাকে অভিভূত করে? সেই ধনুর্ধারীর বাণনিক্ষেপেই বা কী প্রয়োজন যদি তা অন্যের হৃদয়ে লগ্ন হয়ে তার মূর্ছা না ঘটায়?

প্রভুকে উদ্দেশ করে বললে, তোমার শক্তিতেই এই কাব্যশক্তি সম্ভব হয়েছে।

প্রয়াগে এর সঙ্গে দেখা। এর বড় ভাই । প্রভু রামানন্দকে লক্ষ্য করে বললেন, তারও বিষয়ত্যাগ তোমার মতই। এ দু' ভাইকে আমি বৃন্দাবনে পাঠালাম, ভক্তিশাস্ত্র প্রবর্তন করবার জন্যে শক্তি-সঞ্চার করে দিলাম। দেখ গ্রন্থ কেমন মধুর প্রসন্ন ও সালংকার হয়েছে। কবিত্ব থাকলেই তো রসপ্রচার হবে।

সব তোমার ইচ্ছায়। বললে রামানন্দ, তুমি ইচ্ছে করলে কাঠের পুতুল নাচাতে পারো। গোদাবরীতীরে আমার মুখে যেসব রসতত্ত্ব বলালে সব আবার এই রূপের

হাঁপানি কাইলোজিয়া, এক-শিরা, রসবাত বাতাশিরা, কম্পজ্বর ও অন্যান্য যাবতীয় দুরারোগ্য ব্যাধির স্থায়ী আরোগ্যের জন্য আধুনিক বিজ্ঞানানুমোদিত চিকিৎসার নিশ্চিত ফল গ্রহণ করুন। পত্র লিখে বা সাক্ষাতে ব্যবস্থা লউন। নিরাশ রোগীর একমাত্র নির্ভরযোগ্য চিকিৎসাকেন্দ্র
হিন্দ রিসার্চ হোম
১৬, শিবতলা লেন শিবপুর, হাওড়া
ফোন : ৬৭-২৭৫৫

সকল প্রকার অফিস স্টেশনারী কাগজ ড্রয়িং ও ইঞ্জিনীয়ারিং সরঞ্জাম মজুত থাকে।
কুইন স্টেশনারী স্টোর্স
প্রাঃ লিঃ
৬৩-ই, রাধাবাজার স্ট্রীট কলিকাতা-১
ফোন : অফিস—২২-৮৫৮৮ (২ লাইন)
২২-৬০০২
কারখানা—৬৭-৪৬৬৪ (২ লাইন)

লেখায় স্থাপিত হয়েছে। ভক্তের প্রতি কৃপায় ব্রজরস প্রচার করতে চাও, যাকে দিয়ে তুমি করাবে সেই করবে, সমস্ত জগৎ তোমার বশংবদ।

রূপকে প্রভু আলিঙ্গন করলেন। আর রূপকে দিয়ে সকল ভক্তের চরণবন্দনা করালেন। সকলে চলে গেলে হরিদাস একান্তে এসে আলিঙ্গন করল রূপকে। বললে, তোমার কী ভাগ্য, কে বলবে তোমার রচনার কী মহিমা!

আমি কিছুই জানি না। প্রভু যেমন বলিয়েছেন তেমনি বলেছি।

প্রভুর ভক্ত গোঁসায়েরা চার মাস থেকে গৌড়ে ফিরল। রূপ থেকে গেল নীলাচলে: দোলযাত্রার পরে প্রভু রূপকে বৃন্দাবনে যেতে বললেন। বললেন, বৃন্দাবনে গিয়ে শাস্ত্রদৃষ্টে লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার করো, কৃষ্ণসেবা রসভক্তি প্রচার করো।

রূপ প্রভুকে প্রণাম করে বৃন্দাবনে যাবার উদ্দেশে গৌড়ে এল। গৌড় থেকে চলে গেল বৃন্দাবন।

প্রভুর নির্দেশিত কাজে আত্মনিয়োগ করলে।

রঘুনাথ দাসগোস্বামী বৃন্দাবনে এল। তাকে প্রভু স্বরূপের হাতে দিয়ে গিয়েছিলেন। স্বরূপের অন্তর্ধান হতে রঘুনাথের অসহ্য হল। ঠিক করল বৃন্দাবনে গিয়ে রূপ-সনাতনের চরণবন্দন করে গোবর্ধন হতে লাফিয়ে পড়ে প্রাণত্যাগ করবে।

রূপ-সনাতন তাকে তৃতীয় ভাইয়ের মত করে কাছে-কাছে রাখল, তার আর মরা হল না। রূপের ললিতমাধব নাটক পড়ে রঘুনাথ আত্মহারা হয়ে গেল। গ্রন্থকে বুকে ধরে অহোরাত্র কাঁদতে লাগল। পাণ্ডুলিপির সংশোধন দরকার, রূপ চাইলেও রঘুনাথ গ্রন্থ ছাড়ল না। তখন রূপ নতুন গ্রন্থ 'দানকেলিকৌমুদী' লিখলে। লিখে তা রঘুনাথকে দিয়ে ললিতমাধব ফেরত নিল।

শ্রীজীব গোস্বামী অনুপমের ছেলে, রূপের ভাইপো, প্রাণপ্রতিম। শুধু ভাই নয় রূপের মন্ত্রশিষ্য।

একদিন এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত বৃন্দাবনে এসে হাজির। রূপকে লক্ষ্য করে বললে, তোমার সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা করতে এসেছি। বিচারে নির্ণীত হবে কে জয়ী, কে পরাজিত।

রূপ তার সঙ্গে বিতণ্ডা করতে চাইল না। বিনাযুদ্ধেই পরাজয় স্বীকার করে তাকে জয়পত্র লিখে দিল।

দিগ্বিজয়ীর জয়োল্লাসে বৃন্দাবন মুখরিত হয়ে উঠল।

যমুনা থেকে স্নান করে ফিরছিল জীব গোস্বামী। কী ব্যাপার, এত হৈ-চৈ কেন?

শাস্ত্রবিচারে রূপ গোস্বামীকে পরাজিত করেছি।

বিশ্বাস করি না।

তুমি কে হে যে বিশ্বাস করো না।

আমি তাঁর নগণ্য শিষ্যমাত্র। বিশ্বাস করি না পাণ্ডিত্যে কেউ তাঁকে পরাস্ত করতে পারে।

কিন্তু এই দেখ জয়পত্র। রূপ গোস্বামী নিজের হাতে স্বাক্ষর করে দিয়েছেন।

জয়পত্র দেখে বেদনায় জীবের হৃদয় বিদীর্ণ হল। সে বলে উঠল : না, বিশ্বাস করি না। আমাকে পরাস্ত করুন তো দেখি।

দিগ্বিজয়ী তখনই শাস্ত্রযুদ্ধে উদ্যত হল।

কিন্তু যে প্রশ্ন করে জীব তারই যথোচিত উত্তর দেয়। যথার্থ তো বটেই, গৌরবগুণান্বিত। আবার প্রশ্ন আবার উত্তর। পর্যাপ্ত পরিমিত, সমীচীন। জীবের যেমন বিদ্যা তেমনি ধী তেমনি ধারণা।

দিগ্বিজয়ীর আর প্রশ্ন নেই। সে নিরুত্তর।

তার হাত থেকে জয়পত্র কেড়ে নিল জীব। যাও বিদায় আর জাঁক করতে হবে না।

রূপ একথা জানতে পেরে জীবকে ডেকে পাঠাল।

একখানা জয়পত্র পেয়ে পণ্ডিতের কত আনন্দ হয়েছিল, তুমি তাকে সেই আনন্দ থেকে বঞ্চিত করলে কেন? রূপ জীবকে তিরস্কার করল : তোমার কেন এই অভিমান, এই অসহিষ্ণুতা?

শুধু তিরস্কার নয়, রূপ তাকে বিতাড়িত করল। তুমি বেরিয়ে যাও আমার সমুখ থেকে, আমি আর তোমার মুখ দেখব না।

সেই আদেশ শিরোধার্য করে জীব বনে বনে ঘুরে বেড়াতে লাগল। অনশনে দেহ ক্ষয় করে দেবে এই তার সংকল্প হল।

সনাতনের কাছে খবর পৌঁছুল। সে এসে মিলন ঘটাল।

বলো রূপ-সনাতনের কেমন বৈরাগ্য?

তারা অনিকেত, গৃহহীন। তাদের করতলভিক্ষা তরুতলবাস। যে গাছের নিচে থাকে সে গাছও নির্দিষ্ট নয়। আজ যে গাছের নিচে শোবে কাল আর সেখানে নয়, কাল অন্য গাছের নিচে। যে যা দেবে তাই নেবে, স্থূলভিক্ষার জন্যে চেষ্টা করে না। তরকারি ছাড়া শুকনো রুটি বা ছোলাতেই তাদের তৃপ্তি। করঙ্গ আর কাঁথাই তাদের সম্বল। তাদের একমাত্র উল্লাস কৃষ্ণকথা কৃষ্ণনাম। দিবারাত্রির মধ্যে চারদণ্ড মোটে শয়ন করে, কিন্তু যেদিন নামসংকীর্তনে প্রেমোন্মত্ত হয় সেদিন ঐটুকু সময়ও ঘুমোয় না। সর্বক্ষণই তাদের কৃষ্ণভজন।

সনাতনের অপ্রকটের সাতাশ দিন পরে বৃন্দাবনে রাধাদামোদরের মন্দিরে রূপ অপ্রকট হল।

নরোত্তম বলছে :

শ্রীরূপমঞ্জরীপদ সেই মোর সম্পদ
সেই মোর ভজন-পূজন
সেই মোর প্রাণধন সেই মোর আভরণ
সেই মোর জীবন-জীবন।।
তুয়া অদর্শন-অহি গরলে জারল দেহী
চিরদিন তাপিত জীবন
হা হা প্রভু কর দয়া দেহ মোরে পদছায়া
নরোত্তম লইল শরণ।।

রবীন্দ্রভারতী প্রকাশনা

INDIAN CLASSICAL DANCES
শ্রীবালকৃষ্ণ মেনন
নৃত্যকলার শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা ও প্রয়োগকলা নির্দেশিত। বহু চিত্রভূষিত। ২৫·০০

The House of the Tagores
শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবার ও পরিজনের পরিচয়বাহী গ্রন্থ। ২·০০

Tagore on Literature and Aesthetics
ডক্টর প্রবাসজীবন চৌধুরী ৮·৫০

Studies In Aesthetics
ডক্টর প্রবাসজীবন চৌধুরী ১০·০০

A Critique of the Theories of Viparyaya
ডক্টর ননীলাল সেন ১৫·০০

Studies in Artistic Creativity
ডক্টর মানস রায়চৌধুরী ১৫·০০

রবীন্দ্র-সম্ভাষিত
রবীন্দ্ররচনার উদ্ধৃতিসম্ভার ১২·০০

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যু
ডক্টর ধীরেন্দ্র দেবনাথ ৬·০০

পদাবলীর তত্ত্বসৌন্দর্য ও কবি রবীন্দ্রনাথ
ডক্টর শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য ৫·০০

গান্ধীমানস
রতনমণি চট্টোপাধ্যায়, প্রিয়রঞ্জন সেন, নির্মলকুমার বসু লিখিত। ৩·০০

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
৬।৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭
পরিবেশক । 'জিজ্ঞাসা'
৩৩ কলেজ রো, ১৩৩এ রাসবিহারী এভিন্যু, কলিকাতা

[illegible]



ফোট্‌গ্রাফিক আর্ট

প্রদ্যোৎ মিত্র

"ফো-ট্‌-গ্রাফিক আর্ট", কথাটি বলেছিলেন শিল্পী ডেভিড অক্‌টাভাস হিল তাঁর নিজের তোলা ফোটোগ্রাফ দেখে। এবং তাঁর অনেক বন্ধু-বান্ধবও এই আলোকচিত্রের গুণাগুণে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। সুতরাং এতে আমাদের এমন কিছু আশ্চর্য হবার নেই। আলোক-চিত্রের মধ্যেও শিল্পের সবক'টি গুণ আমরা পেতে পারি, যদি সেই আলোক-চিত্রীর শিল্পগত প্রতিভা থাকে। শিল্পী হিলের তোলা আলোকচিত্রটি শিল্পোৎকর্ষের চরমে ওঠায় তাঁর ধারণা হয়েছিল যে, পরবর্তী যুগে আলোকচিত্র গ্রাফিক আর্টের প্রতিদ্বন্দ্বী না হয়ে দাঁড়ায়? সে-যুগে এমনি অনেক খ্যাতনামা চিত্রশিল্পীদের মধ্যেও আলোড়ন পড়ে গিয়েছিল। তাঁদের মধ্যে অনেকে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন এর আবির্ভাবে। আবার কোন কোন শিল্পী অবজ্ঞার সঙ্গে ভাবতেন যে, যন্ত্রের মাধ্যমে কোন ছবি শিল্পের পর্যায়ে আসতেই পারে না। এখানে আমরা দেখতে পাব যে, ফোটোগ্রাফী, গ্রাফিক আর্ট বা চিত্রশিল্পের 'ফো' বা শত্রু না হয়ে মিতালী পাতিয়ে আর্টের পর্যায়ে উন্নীত হতে-পেরেছে—এবং তা কতখানি সার্থক?

ফোটোগ্রাফী বলতে সাধারণত যা ধারণা হয়, তা হল ক্যামেরার মধ্যে ফিল্ম ভর্তি করে যা চোখে ভাল লাগে তাই তোলা। সত্যিই ত এর মধ্যে আবার শিল্প-নৈপুণ্য বা দক্ষতা কোথায়? কথাটা বলার মধ্যে কিন্তু কিছুটা অজ্ঞতার আভাস রয়ে গেল। তার ঢেউ শেষপর্যন্ত গিয়ে পড়ল শিক্ষিত লোকেরও মনে। জ্ঞানী-গুণীরা একটু না ভেবেই এ-বিষয়ে এমন মন্তব্য করে বসেন যা অমার্জনীয় বলে মনে হয়। এখন একটি কথা মনে করবার বিষয় হল—কেন লোকে এই অমার্জনীয় মন্তব্য করে বসে? প্রথমত আলোকচিত্র তুলতে গেলেই প্রয়োজন হয় ক্যামেরার। ক্যামেরার বিষয় বলতে গেলেই এসে পড়তে হয় বিজ্ঞানের আঙিনায়। সুতরাং তার আঙিনায় যা-কিছু ফলে, সে যন্ত্র নামেই অভিহিত হয়। এখন এরকম যে-যন্ত্র, প্রথম যুগে তার উদ্দেশ্য ছিল ফিল্মে বা প্লেট জাতীয় কোন কিছুর ওপর বিষয়-বস্তুর হুবহু ছাপ ফুটিয়ে তোলা। তখন সেটা ছিল উদ্দেশ্যমূলক যন্ত্র। সুতরাং বিজ্ঞানের মাপকাঠিতে মেপে সাধারণ লোক বলে ক্যামেরায় তোলা ছবি, ছবি নয় প্রতিচ্ছবি বা বোতাম টিপে ছবি তোলা সহজ। ভারত ছাড়া সব উন্নত দেশই ফোটোগ্রাফীর প্রাথমিক যুগ পেরিয়ে পিক্‌-টোরিয়াল ফোটোগ্রাফীর নতুন নতুন পথ খোঁজাতেই ব্যস্ত। তাই তারা আর একে ক্রাফ্‌ট্‌ হিসেবে ধরে না। শিল্পের অন্য হাতিয়ারের সঙ্গে স্থান দিয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ, আর্টিস্ট বা পেন্টারের সঙ্গে ফোটোগ্রাফারের (এখানে কেবল পিক্‌-টোরিয়াল ফোটোগ্রাফারকে উল্লেখ করছি) তফাৎটা সাধারণের চোখে সহজেই ধরা পড়ে কারণ আর্টিস্ট ব্যবহার করেন রং ও তুলি আর ফোটোগ্রাফার তুলে নেন কেবল ক্যামেরা ও ফিল্ম। কিন্তু এই সহজবোধ্য পার্থক্য-টুকু সাধারণকে আর একটি মূল্যবান বিষয়ে নির্বোধ করেছে, সেটি হল উভয়ের শিল্পীমন। শিল্পীর ক্ষেত্রে যেমন রং, তুলি ও টেকনিক ছাড়াও মননশীল মনের ছোঁয়াচ দরকার হয়, ফোটোগ্রাফারের তেমনি ক্যামেরা ও যান্ত্রিক কলা-কৌশল ছাড়া প্রয়োজন হয় শিল্পীমন। উভয়ের ক্ষেত্রে ওই একটি জিনিসের অভাব শিল্পকে করে তোলে প্রাণহীন, রসহীন। সুতরাং উভয়ের ক্ষেত্রেই বড় কথা হল উদ্দেশ্যহীন রসিক মনের উপস্থিতি। উদ্দেশ্যহীন এই অর্থে, কেননা উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন থাকলে সেটার মধ্যে আর আর্টিস্টিকতার স্পর্শ থাকে না। কিন্তু এই স্থূল তুলনা সাধারণ ব্যক্তিকে যত না প্রভাবিত করে, তার চেয়ে বেশী করে রস-বেত্তা ও বিদগ্ধজনকে।

তাঁদের ফোটোগ্রাফিক আর্ট বোঝাতে গেলে তর্কের তুফান ওঠে। এমন অনেক শিল্পরসিক মানুষ আছেন, যাঁরা যুক্তি দেখাবেন যে, 'ফ্যাকচুয়াল রিপ্রোডাকসনের মধ্যে কল্পনার স্থান কোথায়? কেউবা বলবেন, একজন চিত্রশিল্পীর আঁকা ছবিতে যতখানি সৃজনীশক্তির প্রয়োগ দেখা যায়, ততখানি কি ফোটো-শিল্পীর তোলা ছবিতে পাওয়া যায়? সাধারণত কোন বিষয়ের চিন্তা বা ধারণা দানা বাঁধবার আগেই শিল্পীর মানসপটে তার একটা অস্পষ্ট আভাস দেখা দেয়। তারই উপর ভিত্তি করে শিল্পী রং ও রেখার সাহায্যে কল্পিত রূপকে, ভাবকে ক্যানভাসে বা কাগজের উপর ফুটিয়ে তোলেন, ফোটো-শিল্পীও কি তার মনের পর্দায় আভাসিত রূপকে ফুটিয়ে তুলতে পারেন ক্যামেরার সাহায্যে? তর্কাতর্কি বা বিরোধী যুক্তিকে আড়ালে রেখে বা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখলে 'পিকটোরিয়াল ফোটোগ্রাফ'-এর মধ্যে কল্পনাশক্তি, সৃজনীশক্তির প্রকাশ সহজেই অনুভব করা যায়। অনুভব বা উপলব্ধি কি চিত্র-শিল্প, কি ফোটো-শিল্প, প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই প্রয়োজন, তা না হলে তার সাড়া পাওয়া দর্শকের ক্ষেত্রে মুস্কিল। ফোটো-শিল্পীরা তাদের শিল্পকর্মকে কিভাবে আর্টের পর্যায়ে আনেন, তার এক-আধটা কথা তুলে ধরছি। কোনো ছবি তোলবার আগে তাদেরও মনের কোণে সেই ছবির অস্পষ্ট ছাপ রেখাপাত করে, তারপর সেই-ভাবকে কিভাবে, কোন্‌ স্থানে গেলে ফুটিয়ে তোলা যায়, সেই চিন্তায় বিভোর হয়ে

David Octavus Hill—অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী। ক্যামেরা নিয়ে পরীক্ষা-নীরিক্ষা করতেন। **Photographic art—Foe-to-graphic art** (ব্যঙ্গচ্ছলে)

থাকে না। কিন্তু তার কল্পনা ও বাস্তবের মিলিত সৌন্দর্য ফুটে ওঠে কাগজে কেবলমাত্র প্রতিভা ও অভিজ্ঞতার স্পর্শে। শিল্পী যেমন সামান্য বস্তুর মধ্যে তাঁর আভ্যন্তরীণ দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে এস্থেটিক কোয়ালিটি খুঁজে বার করেন ও প্রতিভার পরশ দিয়ে জাগতিক সম্পদে পরিণত করেন, তেমনি ফোটো-শিল্পীও তাঁর ছবি তুলে, তার মধ্যে ড্রামাটিক এফেক্ট দেখিয়ে, আলোছায়ার মায়ায় রাঙিয়ে কাগজের ওপর অপার্থিব সৌন্দর্য দান করেন। কথাপ্রসঙ্গে আমার মনে পড়ছে প্রতিভাবান ফোটো-শিল্পী জে এন উনওয়ালার কথা। কোন এক ব্যক্তি বা ফোটোগ্রাফার এই মত প্রকাশ করেন যে, ফোটো-শিল্পী উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে ছবিতে শিল্প-সৃষ্টি বা ছবিকে রস-ঘন চিত্রে রূপায়িত করতে পারেন না। (শিল্পীর ক্ষেত্রে অবশ্য বাস্তবের সাহায্য ব্যতীত কল্পনা, রং ও রেখা দিয়ে সবই করা সম্ভব —বলা বাহুল্য) কিন্তু উনওয়ালা তার প্রতিবাদ করে বলেন, প্রতিভাবান ফোটো-শিল্পীর পক্ষে সবই সম্ভব। তিনি যেদিকে তাকান, তার মধ্যে একটা সৌন্দর্যের উৎস দেখতে পান, আর তারই দ্যোতনা তাঁকে সেই রূপ ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করে। প্রমাণ করার জন্য মিঃ উনওয়ালাকে সত্য সত্যই বাস্তব পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হয়। সেই ফোটোগ্রাফার বন্ধুটি কয়েক গজ পরিমিত বন্ধ্যা জমিতে কেবল কয়েকটি শুকনো ও সবুজপাতা ভর্তি একটি গাছের ডালের সাহায্য নিয়ে আর্টিস্টিক ছবি তুলতে তাঁকে অনুরোধ করেন। এবং আশ্চর্যের বিষয় মিঃ উনওয়ালা এই কয়েকটি সামান্য শুকনো ও সবুজ পাতা কিছুটা আলোছায়া, আর তাঁর শিল্প দৃষ্টিভঙ্গী ও কল্পনা দিয়ে এমন এক ছবি গড়ে তোলেন, যা রসজ্ঞ ব্যক্তিকে ভাবাবিষ্ট করে তোলে। অবশ্য এ-কথা বলছি না যে, সেটি বিখ্যাত শিল্পী ডিউরবের 'দি গ্রেট পিচ অফ টার্ফ' নামক চিত্রের সমপর্যায়ভুক্ত হয়। তবে এই পরিকল্পিত ছবিটি কোন বিশিষ্ট আলোক-চিত্র প্রদর্শনীতে প্রথম স্থান অধিকার করে তার সে-কথার তাৎপর্য প্রমাণ করে। সুতরাং শিল্পীর মন থাকলে বিশেষ কোন আলোয়, বিশেষ কোন এক কোণ থেকে, কল্পিত বিশেষ কোন এক আবেষ্টনীর মধ্য দিয়ে সব বিষয়েই কিছু সৃষ্টি করা যায়, তা যে-কোন মাধ্যম হোক না কেন। যে-চিত্রকর বা ফোটো-শিল্পী প্রাকৃতিক সাবজেক্টের তল্লাসে ঘুরে ঘুরে হয়রান হয়েছেন, তিনিই এ-কথার যথার্থতা মানবেন।'

শিল্পরাজ্যে আর একটু পা বাড়ালেই আবার কয়েকটি বিষয় চোখের সামনে ধরা দেয়, যেগুলি উল্লেখ না করলে সবটা পরিষ্কার করে বলা যায় না। শিল্পী যা চোখে দেখেন সবটাই কি ফুটিয়ে তোলেন? —না। তিনি যেটুকু দেখেন বাস্তবে তা থেকে কিছু নেন, আর মনের কিছু কল্পনা ও ভাবের যুক্ত রূপকে যোগ দেন তার সঙ্গে। তবেই তো তার শিল্প হয়ে ওঠে সৃষ্টিমূলক অবদান। ফোটো-শিল্পীও যখন ক্রিয়েটিভ কিছু করেন কাগজে, তখন শুধু ক্যামেরায় তোলার ওপর সন্তুষ্ট থাকেন না, ফ্যাকচুয়াল রিপ্রোডাকসন বা ফোটোগ্রাফিক ইমেজের কিছু পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করেন বিভিন্ন ফোটোগ্রাফিক প্রসেসিঙের সাহায্য নিয়ে। বিভিন্ন নেগেটিভের সাহায্য নিয়ে শিল্পী তাঁর কল্পনাকে কাগজের ওপর এমনভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারেন যা আমরা কল্পনাই করতে পারি না। এ-ধরনের পদ্ধতিকে বলা হয় কম্বিনেশন প্রিন্টিং। এই পদ্ধতিতে রাজল্যান্ডার সাহেব 'টু ওয়েজ অফ লাইফ' নামে এক বিরাট তৈলচিত্রের মত আলোকচিত্র তৈরি করেন, যেটি দেখলে রেনেসাঁ যুগের ছবির কথা মনে পড়ে। এই ছবিটি ত্রিশটি পৃথক পৃথক নেগেটিভ থেকেই তোলা। সুদক্ষ শিল্পীকে স্মরণ করেই সেই বিখ্যাত আলোকচিত্রটি নিজস্ব অধিকারে রাখেন রাণী ভিকটোরিয়া। আবার ক্যামেরায় তোলা ছবিকে ফোটো-শিল্পী একটু-আধটু পরিবর্তন করেন 'ব্রোমঅয়েল' এবং 'ব্রোমঅয়েল ট্রান্সফার' পদ্ধতি প্রয়োগ করে। এর ফলে ছবির যে পরিবর্তন ঘটে তার ফলে শিল্পীর কল্পিত রূপ ও ভাব রূপায়িত হয়ে ওঠে অপূর্বভাবে। অবশ্য তখন ছবিটিকে আর ক্যামেরায় তোলা ছবি বলে মনে হয় না, কারণ কালি-তুলির স্পর্শ প্রাধান্য লাভ করে বলে। আর সেইজন্য বহু শিল্প-সমালোচক এই পদ্ধতিকে ক্যামেরার কাজ বলে স্বীকার করেন না। যাই হোক, এর সাহায্য নিয়ে বা অনেক বিভিন্ন প্রক্রিয়া (যেমন solarisation, Bas-relief, montage, forced reticulation ইত্যাদি) অবলম্বনে ফোটোশিল্পী যদি এক্সপ্রেশান ফুটিয়ে তুলতে পারেন, সেখানেই তার সার্থকতা সেখানেই তার আর্ট, ফোটোগ্রাফিক আর্ট। তাই আধুনিক শিল্পী পল নাস এঁদের আর্টিস্ট বলে স্বীকার করেই বলেছেন, "there are certainly artists in the medium of photography."

সুতরাং আজকের যুগে ফোটো-আর্টিস্ট যেমন চিত্র-শিল্পীদের মত শিল্পী হিসাবে সমাদৃত হয়েছেন তেমনি তাঁদের তোলা ছবি আর্ট-এর পর্যায়ভুক্ত হয়েছে নিঃসন্দেহে বলা যায়।

এবার আমরা বুঝতে পারছি যে, ক্যামেরায় তোলা ছবিও উঁচুদরের শিল্প সৃষ্টি করতে পারে যদি তার পেছনে শিল্পী ও বিজ্ঞানী মনের স্পর্শ থাকে। অবশ্য একথা ঠিক সব ফোটোগ্রাফার মাত্রেই ত শিল্পী নয়। যার মধ্যে শিল্প-প্রতিভা বা শিল্পীমন আছে, তার নিত্যকার অভ্যাস, সাধনা ও অনুরাগের ফল তার সৃষ্টিকে করে তুলবে এক অপূর্ব সম্পদ যা হয়ে উঠবে জাতীয় গৌরবের বিষয়। আর এরাই হল চিত্র-শিল্পীর মত ফোটো-শিল্পী। এঁদের সংখ্যা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দিনে দিনে বেড়ে চলেছে। এই সব আলোক-চিত্র শিল্পীদের তোলা ছবি পিকটোরিয়াল ফোটোগ্রাফী নামে পরিচিত। পৃথিবীর সেরা সেরা ফোটো-শিল্পীদের ছবির প্রতি তাকালেই এক অভূতপূর্ব আনন্দ ও রসের সঞ্চার হয় আমাদের মনে। সত্যিই তাঁরা ভুলিয়ে দিতে পারেন মানুষের পুঞ্জীভূত পার্থিব বেদনাকে। এবং এখানেই কি একে শিল্প-সৃষ্টি বলব না? বর্তমানে আলোক-চিত্রের শিল্পলোকের দুয়ারে নতুন আত্মপ্রকাশ নয় — একথা বোধহয় আমাদের দেশ ছাড়া আর কোন দেশে অজানা নয়। বিশুদ্ধ আনন্দদানের ক্ষমতা এরও মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। আলোকচিত্র আজ যান্ত্রিক কলাকৌশলের সীমা অতিক্রম করে শিল্পোৎকর্ষের চরম যাত্রাপথে যে পা বাড়িয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। শিল্পীর কল্পনায় যে রূপ, ছন্দ ধরা পড়ে তা যেমন মূর্ত হয়ে ওঠে তার রেখায়, তুলির টানে টানে তেমনি সেই ছন্দকে ফোটো-শিল্পীও রূপ দেন যন্ত্রের মাধ্যমে, নিপুণ হাতে ও বুদ্ধি-দীপ্ত প্রতিভার স্পর্শে। আমরা যদি মাঝে মাঝে বিভিন্ন উচ্চাঙ্গের আন্তর্জাতিক আলোক-চিত্র প্রদর্শনীতে দর্শকের স্থান নিই তাহলে একথার অর্থ উপলব্ধি করতে পারব। তাই আমরা আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর মত ব্যক্তিকে বলতে শুনি 'চিত্রশিল্পীর হাতুড়ির মধ্যে থাকে রঙ আর রূপের অপার স্বাধীনতা, তাই সে নিজের কল্পনাকে সার্থক করবার সুযোগ গ্রহণ করতে পারে যথেষ্ট। কিন্তু আলোক-চিত্রীর মনের কথা প্রকাশ করা অত সহজ নয়। একটি যন্ত্রের মধ্যস্থতাকে অতিক্রম করে তবে না তার রূপশিল্প রচিত হচ্ছে। সার্থক আলোক-চিত্রীকে বিনা দ্বিধায় একাধারে যন্ত্রী এবং শিল্পী বলা যায়।'

মিঃ জে এন উনওয়ালা। বিখ্যাত প্রতিভাবান পিকটোরিয়াল ফোটোগ্রাফার। তিনি চল্লিশ বছর ছবির জগতের শিল্পী হয়ে প্রায় ছয়শত আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করে ফোটো-শিল্পী সমাজের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন।

পল নাস বিখ্যাত বৃটিশ আধুনিক শিল্পী যিনি চলাফেরার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে ক্যামেরার সাহায্য নিয়ে আঁকা-জোকা করতেন।

এখন এই যে শিল্পী হিসাবে স্বীকৃতি এ হল মুখ্য দশকের স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকৃতি। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকজন আন্তর্জাতিক খ্যাতনামা আলোক-চিত্রীর ছবির কথা বললেই একথার সার্থকতা সহজেই প্রমাণ পাবে বলে আশা করি। যেমন এন্বের উন-ওয়ালা রচিত 'ফ্যামিলি গ্রুপ'। প্রাকৃতিক পরিবেশে তোলা একটি ল্যান্ডস্কেপ (দৃশ্য-চিত্র)। কয়েকটি গাছ রাস্তার দুধারে মনোরমভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি আর একটিকে শাখা-প্রশাখা দিয়ে ছুঁয়ে। আবছা আলোয় তাদের রূপটি ফুটে উঠেছে অপূর্ব-ভাবে। প্রকৃতির রাজ্যে সংসার বিছিয়ে ওরাই যেন চিরসুখী। উনওয়ালা সামান্য এই কয়েকটি গাছের সাহায্যে এমন সুন্দর ভাবের মূর্ছনা তুলেছেন যে ভুলে যেতে হয় ক্যামেরায় তোলা ছবির কথা। মনে হয় শিল্পীর রঙ ও তুলি দিয়ে যেন আঁকা।

আলো-ছায়ার খেলাই ছবির প্রধান বা মূল উপাদান যার সাহায্যে ছবি হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত ও আকর্ষণীয় কিন্তু তাকে যখন রচনা-বিন্যাস (কম্পোজিশান) ফুটিয়ে তোলায় নিয়োগ না করে ছবির বিষয়বস্তু করে তোলা হয় তখন সে শিল্পীর বাণী প্রকাশ করে। সে রকম বাণীই প্রকাশ করেছেন অস্ট্রেলিয়ার যশস্বী শিল্পী ই রবার্ট-সন 'এ মাস্টার অফ দি আর্টস' চিত্রে। এর মধ্যে তিনি দেখিয়েছেন একজন শিল্পী প্যাকেট থেকে রঙ তুলে নিচ্ছেন তুলির ডগায় আর তাঁর দৃষ্টিকে পাঠিয়ে দিয়েছেন আলোর কেন্দ্রস্থলের দিকে যার প্রদীপ্ত শিখায় একাধারে শিল্পীর ভাবাবেগ ও আলোক-চিত্রীর বাণী প্রকাশ পেয়েছে। সমস্ত ছবিটি ছায়া আবরণে মোড়া কিন্তু আলোকের দিকে ফেরান মুখের একাংশ আলোকে উদ্ভাসিত। অপূর্ব তার প্রকাশ-ভঙ্গী ও সিমপ্লিসিটি যা উপলব্ধি ছাড়া ভাষায় বোঝান অসম্ভব। এই একই কথা প্রযোজ্য হাঙ্গেরীর চারলস গিংকের ছবিতে আর মেক্সিকোর ম্যানুয়েল এ্যামপুডিয়ার ক্ষেত্রে।

আবার কোন কোন শিল্পী তাঁর ছবির মধ্যে মানুষের ব্যক্তিত্ব বা চরিত্র ফোটাবার জন্য অন্যসব ধারাবাহিক ফোটোগ্রাফিক টেকনিককে আড়াল করেছেন। পৃথিবীর সেরা পোর্ট্রেট শিল্পী ইউসুফ কার্শ, 'জর্জ বার্নার্ড শ', 'উইনস্টন চার্চিল' প্রভৃতি চিত্রে এই নিদর্শন দেখিয়ে খ্যাতিলাভ করেছেন। আজকের যুগে তার এই ছবিগুলি মাস্টার-পিস হিসাবে এতদূর স্বীকৃতি লাভ করেছে যে যা সারা পৃথিবীর গৌরবের বিষয়। তার মত একই পংক্তিতে ফেলা যায় ক্যালিফোর্ণিয়ার বরেস দবরো, হাঙ্গেরীর ডঃ জে সোলিক ও ভারতের কে এল কোঠারী প্রভৃতিকে।

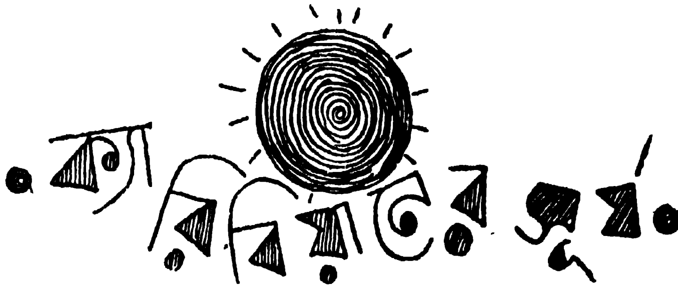
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কি ইংলন্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মানী, ইটালিতে এই রকম আলোক-চিত্রীরা স্টীল লাইফ, পোর্ট্রেট ফোটোগ্রাফী, ফ্লাওয়ার স্টাডি, ল্যান্ডস্কেপ, সিস্কেপ, বাস-রিলিফ, নেচার ফটোগ্রাফী প্রভৃতিতে স্ব স্ব দক্ষতা দেখিয়ে প্রমাণ করেছেন তাঁদের শিল্পগত প্রতিভা ও বৈশিষ্ট্য। এ সকল বিষয়ের বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যা প্রবন্ধের বিষয়বস্তুকে নিরস ও ভারাক্রান্ত করে তুলবে। শুধু এইটুকু বলতে সাহস করি যে, চোখ বুজে বসে বা বই পড়ে বিষয়বস্তুকে বোঝার থেকে বিশেষ বিশেষ আলোক-চিত্র প্রদর্শনীতে উপস্থিত হলে এ বিষয়ে খানিকটা বোঝাও যাবে বা রস উপলব্ধি করা যাবে।

একথা সত্য যে, প্রত্যেক দেশের শিল্পের উপর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, নিজস্ব রুচি দেখা যায়। শিল্পী বা ভাস্কর যখন কিছু সৃষ্টি করেন তখন সেই শিল্পকর্মের মধ্যে সে দেশের জাতীয় চরিত্রের ছাপ দেখা দেবেই। ভারতীয় চিত্র-শিল্পীর চিত্রে যতই বিদেশী টেকনিকের স্পর্শ থাক না, তার মধ্যে এদেশের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফোটা স্বাভাবিক। যেমন একটি ভারতীয় ছোট মেয়েকে জাপানী পোশাকে সাজালেই কি তাকে পুরোপুরি জাপানী বলে মনে হয়? মনে হয় না। তার হাব-ভাব, কথা-বার্তার টান-টোন ভারতীয়ানার পরিচয় দেবে নিশ্চয় নিঃসন্দেহে বলা যায়। সুতরাং আলোক-চিত্রী বা ফটো-শিল্পী যখন বাংলা দেশের নিসর্গ চিত্রে বা কিছু ফোটাতে চেষ্টা করেন না তা এদেশীয় না হয়ে যায় না, যদিও লাইট অ্যান্ড সেড বা অন্যান্য পদ্ধতি পাশ্চাত্য শিল্পের অনুকরণে প্রভাবিত হয়। আলোক-চিত্রের মধ্যেও ভারতীয় রুচির পরিচয় দেয় এদৃষ্টান্ত বহু বিশিষ্ট আলোক-চিত্রীর ছবিতে পাওয়া গেছে। চীন, জাপানের আলোক-চিত্রের মধ্যে আমরা পাই তাদের স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য। চীনা বা জাপানী ফটো-শিল্পীরা চীনা বা জাপানী চিত্র-শিল্প রীতির বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলেন তাঁদের পিকটোরিয়াল ফটোগ্রাফিতে। এক-খানা চীনা ল্যান্ডস্কেপ পেইনটিঙের দিকে তাকালেই আমরা দেখতে পাব যে, তার পিছনের দৃশ্যাদি (ব্যাকগ্রাউন্ড) ওয়াশ পদ্ধতির সাহায্যে মোলায়েমভাবে আংশিক মিলিয়ে দেওয়া হয় আর সেই সঙ্গে সামনের বিষয়বস্তুকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়। ওয়াশের ছবিতে চাপা হাই-লাইটের ভাব প্রকাশ পায় সাধারণত। চীনা ও জাপানী ফটো-শিল্পীদেরও আলোক-চিত্রে দূরের সব পাহাড়, গাছপালা ও পরিবেশ অদ্ভুতভাবে হাই-কি-এর সাহায্যে অস্পষ্টভাবে মিলিয়ে দেওয়া হয়। দেখা মাত্রই মনে হয় এটা চীনা বা জাপানী চিত্র। এছাড়া চীনা ফটো-শিল্পীরা কয়েকটি ঘাস, কয়েকটি বাঁশ গাছের পাতাসমেত শাখা-প্রশাখা বা কতগুলো হাঁস বা নৌকা দিয়ে এমন সব সুন্দর সুন্দর ছবি তোলেন যা অদ্ভুতভাবে আমাদের মোহিত করে। ওরা জাতশিল্পী বলেই সাধারণ বিষয়ের মধ্যে সহজেই সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলেন। ওরা আবার ছবিতে বিশেষ আলো-ছায়ার প্রচুর্য পছন্দ করেন না। এ তো চীন-জাপানের কথা! এশিয়ার অন্যান্য দেশে শিল্প-সংস্কৃতি ও রুচি প্রাচীন হলেও সে সব দেশে ফটো-শিল্প এখনও উচ্চাঙ্গের শিল্পে উন্নীত হতে পারে নি নানা কারণে।

পাশ্চাত্য দেশের মধ্যে ইউরোপীয় দেশগুলির ভিতর ফটো-শিল্পে ভাবাবেগ বা কল্পনা ও কিছুটা বাস্তবমুখীতার প্রভাব দেখা যায়। সুদূর আমেরিকার ছবিতে সাধারণত কল্পনা বা ভাবের স্পর্শ কম বরং বাস্তব ও যান্ত্রিক মনের প্রভাব সুস্পষ্ট। ইটালী, ফ্রান্স, জার্মানী ও স্পেন দেশের ফটো-শিল্পীদের আলোকচিত্র ভাব কল্পনায়, রচনা-বিন্যাসে ও আলোছায়া ও আঙ্গিকে রসোত্তীর্ণ ও ছন্দোময়। এছাড়া পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলিও একই ভাবে সুর দিয়ে শিল্পী মনের পরিচয় দেন একথা বলা বাহুল্য। আবার রুশীয় ফটো-শিল্পে বাস্তবতার ছোঁয়াচ বেশী। শিল্পদৃষ্টি তাদের মধ্যে নেই বলা ভুল। আর্টের কথা ধরতে গেলে ওদের বাদ দেওয়া যায় না। (প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ওদের সিনেমাটোগ্রাফিক জগতে বিখ্যাত কয়েকজন ফিল্ম-ডিরেক্টর সিনেমাটো-গ্রাফিক আর্টের নতুন নতুন দিকের উন্মেষ দিয়ে পৃথিবীতে বিখ্যাত হয়েছেন।) তারা (ফটো-শিল্পীরা) পার্থিব বিষয়বস্তুকে তাদের ভালবাসা, হাসি-কান্না ও চলতি জীবনযাত্রাকে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী দিয়েই দেখেন আর তার মধ্য দিয়েই সৌন্দর্য প্রকাশ করেন। তাই ওঁদের রুচি, ওঁদের স্বভাব ও সংস্কৃতি সেইভাবেই দেখা দেয় ওঁদের ছবিতে।

ফটো-শিল্পীদেরও মধ্যে ইসমের অল্প অল্প আভাস দেখা দিয়েছে। তাই আজ আধুনিক বিদেশীয় ফটো-শিল্পীদেরও ছবিতে ইম্প্রেসানিস্টিক ভাব বা কিউবিক স্টাইলের প্রাধান্য দেখা দিচ্ছে। এখনকার যুগে কালার ফটোগ্রাফীর উন্নতি হওয়ায় অনেকের পক্ষে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সেই সঙ্গে রঙ-এর খেলা দেখাবার সুযোগ বেড়ে গিয়েছে।

হাই-কি—সাধারণভাবে বলতে গেলে যে ছবিতে আলোর প্রাধান্য বেশী।



ব্রজমাধব ভট্টাচার্য

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সির্জু আম্মাথাড্ডু আমাকে বসালো তার অংগনের বাদামগাছের তলায়। ছাতার মত গাছটা অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছায়া ফেলছে।

ওদের বাড়ীতে জোর তাসা বাজছিলো: শিঙে এবং মাঝে মাঝে শাঁখ। ঘন্টা বাজাচ্ছিলেন পুরুৎ, এবং পেটা ঘন্টা বাজাচ্ছিলো পাড়ার একটি যুবক। গায়ে নতুন গেঞ্জী; পরণে ধোয়া পুরোনো খাকী লম্বা প্যান্ট। ওদের বাড়ীতে মহাবীর ঝান্ডী চড়লো। আমি যখন পৌঁছেছি তখন পুজো ওদের প্রায় শেষ।

আমাকে পেয়ে ওরা ভারী খুশী। আমি যদি কথা দিতে পারতাম তবে দু-দশ দিনের মধ্যে ওদের মাতৃরা-গাঁয়ে আরও পাঁচ দশটা পুজো লাগাতো কেবল আনকোরা হিন্দোস্তানী কোনো ভাইকে উৎসবের অঙ্গ না সাবক হিসেবে পেতে।

এ খুশীর ভাষা নেই। এ খুশী সারা ত্রিবায়ান হিন্দুস্তানী সমাজে স্বভাবের মতো গভীর; হাসি-কান্নার মতো স্বতঃস্ফূর্ত; উলঙ্গ শিশুর মতো অনাবিল। এর মধ্যে যাঁরা আধুনিক বনে গেছেন, যাঁরা একটু কেতা-দুরস্ত,—তাদের অবস্থা বেশ কিছুটা দৃষ্টিকটু। তাদের ভ্রু ওপরে ওঠে; হঠাৎ ঘাড়টা শক্ত হয়ে যায় যে স্থলে সম্ভব সে স্থলে চিবুকের ওর দু-তিন থাক বেড়ে যায়। ঘন ঘন টাইয়ে হাত পড়তে থাকে, রুমাল সামলানো চলে; এবং অত্যন্ত মনোযোগসহকারে অমনোযোগিতার-অন্যমনস্কতার খেলা চলে।

এইসব 'কালা সায়েবরা' এ ধরনের স্বতঃস্ফূর্ত খুশী দেখানোকে স্রেফ 'কুলিজম্' বলে থাকেন। তাঁরা স্টেটাস-সন্ধাবক, প্রেস্টিজ-শিকারী ঘোৎ মারা বেড়াল।

সির্জু আম্মথাড্ডুর অতি-সুস্থ ভাবী কানহাড়া হাসি হেসে আমাকে বসার জন্য একটা টুল এনে দিলেন। যে ছেলেটাকে থাবড়া মেরে টুল থেকে তুলে দিলেন সে ঠোঁট ফোলাতে ফোলাতে বোধকরি দিদির কোলে মুখ লুকালো।

পন্ডিতমশাই নিজেও কাগজেকলমে আখই কাটেন। তফাৎ এই যে যজমানরাই কেটে দেয়। নৈলে ওদের ক্রিয়াকর্ম হয় না। পন্ডিতমশায়ের খুব খাতির। সে খাতিরের চাপ বহুদূর এবং বহুভাবে বিস্তৃত। গল্-এর যুদ্ধ সেরে সীজার যখন রোমে ফেরে তখন বহু গল্‌বাসিনী গর্বভরে নিজের সন্তানকে সীজারের সন্তান বলে ঘোষণা করেছে। ফলে সামাজিক পদবৃদ্ধি হয়েছেই; নৈলে এতো বাগ্‌বিন্যাসই বা কেন। বহু জননীর মধ্যেই একটি দুটি ব্রাহ্মণ-সন্তান আছে:—বলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলি,—আত্মবলি দিয়েও ধর্মরক্ষা করে এ সমাজ পঞ্চকন্যা সমাজকে ডিঙিয়ে গেছে ক্যাঙগারুর লাফে।

পন্ডিতমশাই যা বলেন তাই শাস্ত্র; যা করেন তাই কর্ম, যজন আগুন জেবলে দিলেই হবন; আগুনে ফেললেই হবি। এমন উদারাচার অনুষ্ঠান কুত্রাপি সম্ভব নয়। আছে হলুদ, সিঁদুর, সুপুরি, চাল-ছিটুনো; বাঁশের ডগায় লাল-ঝান্ডী, শাঁখে ফুঁ, ঘন্টাবাদন এবং সংকল্প 'জম্মুদ্বীপে শ্বেতবরাহকল্পে অমুক গোত্র, অমুক মাস, অমুক তিথি"! সেই 'অমুক' অমুকই থাকে। শামুক হলেও ক্ষতি হোতো না। 'অমুক' শব্দের অর্থ জানে না। কাজেই অমুককে অমুক বলেই চলে। এবং সমস্ত মন্ত্রই স্নানকালে।

বোঝা যায় এদের পূর্বপুরুষ মাঝে মাঝে তীর্থস্থান করতে গিয়ে যা শুনেছে, দেখেছে, করেছে,—তারই একটা ভাসা ভাসা ব্যাপার আটকে রেখেছে।

রাম-রহিমের জুদাই নেই। সকলে মাথায় ঠেকিয়ে সত্যনারায়ণের প্রসাদ 'মোহন-ভোগ' নামক ময়দার ল্যাপ্‌সী, টফী এবং ললিপাপ খেলো। তারপর দাল-রোটী-ভাজি।

মেয়েরা লম্বা গাউন পরে বিচিত্র একটা 'কাট্'এর। সেমিজ বড়ো হলে যা হোতো। দামী-দামী কাপড়। মাথায় 'ওড়নী' নামক এক রুমাল। সেই জড়িয়ে বেঁধেছে; সেই স্পানিশ মেয়েদের মতো মাথা ঢেকে লাস্যময় দিয়েছে: কেউ কোমরের বেল্টে এক কোণা গুঁজে অন্য দিকটা ফিরিয়ে মাথায় দিয়েছে।

আমিও রুটি-ডাল খেলুম। লঙ্কা আর রসুনে সত্যনারায়ণ প্রীত হলেও আমার মরার জো। হালি হালি ব্রেডফ্রুটভাজা এবং স্যাটাইন্ নামক কাঁঠালজাতীয় কিন্তু ব্রেডফ্রুট আকারের ফলের তরকারী। দহি পেলাম; অবিকল গাঁয়ের দহি, সেই গন্ধটি আছে, সেই লালিম রংটি। আর প্রচুর চিনি।

ফিরবো। পোতিৎবুর্গে গিয়ে এবার ফিরে যাবার ব্যবস্থা করতে হবে। পথে নীক্ পাইপার যে কটা পার্লার পেয়েছে সবকটায় রাম্ গিলেছে। এখন শেষ কামড় দিচ্ছে। আমাকে দেখে একজন পার্লার-সেবক বললেন, "নীক পাইপার যখন আপনার সঙ্গে তখন আপনিই মঁশিয়ে বাতাশারিয়া।"

আমি নমস্কার জানিয়ে বললাম,—"আপনি আমার নাম জানলেন কোথা থেকে।"

"ম্যাক-বার্নি বোধকরি দুশো লোক লেলিয়েছে আপনার পেছনে। ভোর হতে না হতে পালিয়েছেন; অথচ আপনার জন্যে ও এক জাঁদরেল মহলে ডিনার বাগিয়ে বসে আছে।"

আমি চেয়ে দেখি পাইপার-এর দিকে। অর্ধ-সমাপিত গ্লাসটি তুলে পাইপার বললে, "আপনি এগোন। আমার যেতে বিলম্ব হবে।"—একটু হেসে বলে, "এবং বিলম্ব হবার পরে যেতে যে পারবো বোধ হয় না। ......গাড়ী আপনিই নিয়ে যান। আমি হারাবো না।'

"কিন্তু পাইপার, কাল ভোরেই আমি চলে যাবো। তখন কি তোমার—"

শেষ করতে দেয় না আমায়। "ও সময়ে পাইপার কখনও ওঠে না। কয়ামতের দিনে প্রভু জগদীশ্বর যদি ছটায় পাইপারকে ডাকে, প্রভুকে নিরাশ হতে হবে।"

আমি পাইপারকে আনকোরা এক বোতল রাম এবং এক টীন সিগারেট দিতেই ও বলে উঠলো,—"ব্যস্, এখন আপনি যান আর থাকুন পাইপারের কিস্‌সু যায় আসে না। তবে কর্তা একটি কথা বলবো। লেকা-পড়া শিখেছেন: বেশ করেছেন; শিখে যখন ফেলেছেনই আপশোষ করে কী আর হবে। কিন্তু সময় এখনও আছে। এই রাম-পানটা শিখে ফেলুন। নৈলে আপনাকে মাঝে মাঝে ভারী বুদ্ধু বেরসিক দেখায়।"

হাত ঝাড়াঝাড়ি করে হাসির মধ্যে বিদায় নিলুম।

•

কিন্তু সন্ধ্যার সময়ে যেখানে, যে-পাড়ার, যাদের মধ্যে এলুম, মনে হোলো যেন অন্য জগত। গ্যুয়েদাল্যুপেও এমন জায়গা আছে। এ'রা নিজেদের বলেন ঔপনিবেশিক বনেদীয়ানার চাঁই; রক্ষণশীল সমাজের অভিজাত; দেশের শান-পালিশ!

সাঁ-ক্রুদ প্রখ্যাত বনেদী পালিশ-পাড়া। সব দেশে, সব শহরে এ ধরনের পাড়া আছে। নয়াদিল্লীতে আছে চাণক্যপুরী, জোরবাগ, বোম্বাইতে মেরিন ড্রাইভ, কোলকাতায়—না, সারা কোলকাতাটাই নাকি সারা ইস্টের সেরা স্লাম হয়ে গেছে। কলকাতার আর নাগরিত্ব নেই, কলকাতা শুধু নগরী।

সাচ্চা ক্রিওল মিসেস পাত্রিশিয়া বোকাঁস। প্রচুর বয়স; কিন্তু ম্যাক-বার্নি আগে থেকেই সাবধান করে দিয়েছিলো যে বয়স বা স্বাস্থ্য নিয়ে যেন মাদাম পাত্রি-শিয়াকে কিছু না বলি। একমাত্র মেয়ে জোয়ন ল্যাফায়েল্, বিবাহ করেছেন অপর

এক ধনকুবের রেনোয়া ল্যাফারেলকে। ওঁদের ব্যবসার মণ্ডল অতলান্তিকের এপার ওপার ছাড়িয়ে ভূমধ্য সাগর এবং ব্রাজিলেও ছাড়িয়ে আছে। কিন্তু এই ক্যারিবিয়ানের সূর্য ওদের প্রাণবহা নাড়ীতে কী যে দুরন্ত নেশা জাগায়,—রেনোয়াকে নিয়ে জোয়ান্ তার মার কাছে মার বাড়ীতেই থাকে।

আমি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জমাট আসর গেড়েছিলাম। প্রথমের দিকেই মহাবাক্য স্মরণ করি। মাদামকে বলেছিলাম, "সেকি আপনারা দুজনে বোন্ নন? কী আশ্চর্য একরকম দেখতে!"

মাদামের উজ্জ্বলবর্ণ কণ্ঠের অনেক নীচে পর্যন্ত লালে লাল। চোখে পাঁচিশ বছর আগেকার নীল আভা। বলেন,—কী যে বলেন! জোয়ন আমার 'ওনলি' সন্তান। বসুন বসুন। হাউ চার্মিং এ ম্যান্!"

ম্যাকবার্নির বাঁকা চোখে কথাভরা আভা। আমাকে শাসিয়ে বা তাতিয়ে যেন বললো,—"খান্ বাচ্চা যা হোক্!"

থাক্; ম্যাকবার্নির ফাঁড়া কাটলো।

আমাদের দেশের টংশ-বংশাবতংশ আংশিক য়োরোপীয়েরাই যেমন উদগ্র সাহেব, তেমনি উদগ্র মেম এই জোয়ান্।

সেই একটোরে নাকিসুরে "আমরা অন্য সমাজের" ঠাঁইমারা সংলাপ-বিন্যাস। মর্মহীন, প্রাণহীন, রক্তহীন আলাপচারী। সমস্ত পরিবেশটা যেন রক্তাল্পতায় ধুঁকছে. বিকৃত যকৃতের প্রকোপে তমোময়। অথচ বাহ্যিক কেতাদুরস্ত। সেই থেমে থেমে কথা। সেই হঠাৎ আই ওরন্ডর্! আই ওরন্ডর! সেই প্রশ্নমুখী মন্তব্য! "আপনার কি মনে হয় না যে :" "...কী, আপনি নিশ্চয় মানবেন?" ইত্যাদি চিরাভ্যস্ত ন্যাকামি। সেই মাঝে মাঝে ভূয়োদর্শন: মাঝে মাঝে আবহাওয়ার কথা; মাঝে মাঝে "উই হ্যাভ আওয়ার লিট্‌ল কম্ফর্টস্ অর .....।" এবং সেই একই ধরনে অত্যাবশ্যকভাবে ঝটপট আলোচনা বলে যাওয়া।

কম্যুনিজম্ পৃথিবীর সর্বনাশ। বোম্বেটের সর্দার এই ক্যাস্ট্রো; পুওর হুইংলো ওরাজ বিট্রেড; আমেরিকান ডলারের কাছে ইংরেজ, এ্যাটম বোমার কাছে উড়ন তুবড়ী; সত্যিকার ক্যাথলিসজমই পৃথিবীর আদর্শ ধর্ম; ভারতবর্ষ, আহা, যেমন না খেয়ে ইহকাল নষ্ট করলো, তেমনি পুতুল পুজো করে পরকালটাও অন্ধকার করে রাখলো; আচ্ছা, ভিয়েৎনামটা জনসন স্রেফ উড়িয়ে দিচ্ছে না কেন!......

কিন্তু যেই উঠলো দ্য-গলের কথা অমনি সব চুপ। পেত্যাঁর পর সে ফ্রান্সও নেই. বেপরোয়া দেশটা থেকে সভ্যতাও নির্বাসিত। ফ্রান্স ভোট পাকাচ্ছে বাজারটাকে হাট করার তালে. আলজিরিয়ার কী সর্বনাশটাই দ্য-গল করলো।

"আর গবর্নর! উপস্থিত মিস্-মার সামনে তো নাম করলুই 'ক্ল' নেই। ব্লাডপ্রেসার বেড়ে যায়। রাস্তাঘাট তো দেখছেনই। না তো আর আফ্রিকাসয়াল তিনি মানা-ই না।"

"বাবো কি! সেবার দ্য গাল এলেন। সেই অনারে পার্টিতে গেছি। আপনাকে কী বলবো, দ্য গালের চারপাশে উৎকট ভিড়।"

আমি বলি "তবু তো উনি খুব ঢোঙ্গা।"

"তা আইফেল টাওয়ারের দেশের মানুষ বটে! কিন্তু গবর্নর নিজে তাঁর সেই পুরনো ডিনার-স্যুট পরেছেন; আর গবর্নর-গিন্নী.. ও ম্যাই...জোয়ান হেল্প্ মী!"

আমি তাড়াতাড়ি ব্রান্ডীর গ্লাস এগিয়ে দিই।

"হবে কি। এখন সব মাল আসছে দ্য গাল যাদের বাছছেন। কস্মিন কালেও রক্তে যাদের শাসন নেই, কেবল আফিসের সুপারিশেই কী গবর্নরের পদ দেওয়া যায়? ...কেলেংকারী অনেক আছে। এখনকার গবর্নর? আমি তো যাই-ই না ওখানে।"

"মিছে কথা বোলো না জোয়ান, তুমি গত শনিবারে গবর্নরের পার্টিতে গিয়েছিলে!"

জোয়ান বললো, "নিশ্চয় যাইনি। আমাকে কেবল রেণোয়ার ব্যবসায়ের খাতিরে হাজিরি দিতে যেতে হয়েছিলো।..."

রেণোয়া বলেন, 'জোয়ান সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাংক অব ফ্রান্সের ম্যানেজারের সঙ্গে বেরিয়ে গিয়েছিলো।'

"দ্যাট ওয়াজ মোর সেন্সিবল্ দ্যান মেনি থিংস্ এলস্!..." আমার কানের কাছে মুখ এনে বলেন,—"এই গবর্নরটি সিগ্‌ল!"

মেয়ে বলে,—"কখ্খনো না। ফ্রেঞ্চম্যান এণ্ড সিংগল! দ্যাটস্ নো পয়েন্ট। বেটার সে হী ইজ প্লুর‍্যাল।"

সকলেই হাসে। "...আসল কথা কি জানেন বাতাশারিয়া—শুনেছি ও নাকি ওর পত্নীকে ডিভোর্স করেছে। ইম্যাজিন! ক্যাথলিক গবর্নর এণ্ড ডিভোর্স!"

"দিস ইজ দ্য গাল এণ্ড মডার্ন ফ্রান্স।"

"আপনি বুঝি দ্য গালের পলিসি মানেন না?" আমি জিজ্ঞাসা করি।

সঙ্গে সঙ্গে ম্যাকবার্নি বিষম খায়।

আমি ঘাবড়ে যাই।

"পলিসি?.. পলিসি তার হয় মঁশিয়ে বাতাশারিয়া যার মধ্যে দৃঢ়তা আছে, সামর্থ্য আছে। ভিড়কে প্রশ্রয় দিয়ে, কুলি-কামিনকে মাথায় চড়িয়ে যারা শাসন করার আশা রাখে তারা ক্লীব। রাস্তাঘাট তো দেখলেন? এসব কার কীর্তি? আমাদের সময়ে এই কালো-কামিনগুলোকে কি আমরা এক গির্জের বসতে দিতুম? শাসন বলতে সেই যুগে ছিলো। এখন কিস্সু নেই...।

"মা, তুমি উত্তেজিত হয়ে পড়ছো।"

"তা পড়ছি। একটু কন্যাক দাও তো। ও ম্যাই ফোন করতে ভুলো না ডাক্তারকে।.. অবশ্য মঁশিয়ে বাতাশারিয়া আমার স্বাস্থ্য এখনও অটুট। কিন্তু হায় পৃথিবীর সর্বনাশ...এ যেন দেখা যায় না। দাসের অবেগে হয়েছে পৃথিবী।"

ধীরে ধীরে মঁশিয়ে ল্যাফারেল বলেন —"পেত্যাঁর পর থেকে ঐ যে বামপন্থী ধারায় ফ্রান্স চললো এটাতেই হোলো সভ্যতার সংকট। আমেরিকা কেন এতো দ্রুত এগিয়ে চলেছে। ওরা ঘোরতরভাবে দক্ষিণপন্থী। শাসন কাকে বলে আইসেনহাউয়ার থেকে জনসন পর্যন্ত দেখে যান।"

আমি বলি, "কিন্তু আমেরিকার চেয়েও ঢের কম সময়ে কোনো কোনো দেশ অদ্ভুত বল-বীর্য-বিদ্যা-জ্ঞানের শিখরে উঠেছে এমন নিদর্শন পৃথিবীতে আছে।"

ম্যাকবার্নির যেন কী হয়েছে আবার বিষম খেলো।

ওর হাত থেকে কাঁটাটা ছিটকে পড়ে গেলো।

তাড়াতাড়ি কালো-মেড অন্য কাঁটা ডিশে রেখে এনে দিলো।

আমি যখন সেই ডিনার শেষ করে ম্যাকবার্নির কোটরে প্রবেশ করে হাঁফ ছেড়ে হয়েছি, তখন ম্যাকবার্নি বললো,—"তুমি তো কাল সকালে চললে। আমাকে যে ওদের নিয়ে ঘর করতে হয়। গায়েদালুপে চিড়িয়াখানা নেই বলেই তোমাকে ওখানে নিয়ে গিয়েছিলুম।"

গায়েদালুপে থেকে যখন বর হলো তখন ম্যাকবার্নিকে বললাম,—"ভাই তুমি যখন আছো, তখন হয়তো গায়েদালুপে আবার আসতে পারবো। ওদের কথা আমল নাই বা ভাবলাম।...ওরা ইঁদুরের জাত কাটে, চুরি করে, জমা করে; মানুষে যেন ঈগলের মতো। ইঁদুরের শত্রুই নয় শুধু, আকাশের একচ্ছত্র। পৃথিবীর বুকে দেখো দিয়ে বাসা বাঁধে।"

ম্যাকবার্নি বলে,—"আবার বিনে... ভাওয়াবে নাকি হে!"

লাউডস্পীকারে নাম ঘোষিত হলো বিদায় গায়েদালুপে।

দোমিনিকা

প্রকৃতির ক্যাক্কপাত ছাড়া ...সুষমা কুড়িয়ে পেতো না, এ-দেশ তা দেখতে না গেলে হৃদয়ঙ্গম হয় না। প্রকৃতি বাদ সাধলে সাধ্য আর কিছুর হয় না।

ছোট্টো দ্বীপ। ৬৫,০০০ লোকের বাস। ২৯ - ৬ মাইল আয়তন। কিন্তু বৃষ্টিতে চেরাপুঞ্জির সোদর-ভাই; বছরে তিনশো ইঞ্চি। তাও নয় হোলো; কিন্তু এ ছ' মাইলের মধ্যেই পাহাড় আর পাহাড় আর পাহাড়! নদী-নালার অন্ত নেই। দু'-পা এগুতে না এগুতেই সাঁকো নালা পুল-কিছু না কিছু লেগেই আছে। ব্যাঙ্‌-এর ছড়াছড়ি। সবচেয়ে উঁচু পাহাড় ডায়াবলোটীন ৪৭৪৭ ফুট। এবং কাছাকাছি আশেপাশে শিখরের পর শিখর। সুতরাং এবার বুঝে নেওয়া যাক ডোমিনিকা কী! ৬ মাইল পাশের একটা দোড, ২৯ মাইল উত্তরে-দক্ষিণে। মাঝে একটা পাহাড়ী শিরদাঁড়া; তার খাড়াই ৩ থেকে পাঁচ হাজার মাইল। এধার-ওধার তিন মাইল জুড়ে সেই তিন-চার হাজার ফুট হুড়মুড় করে নেমে ঝাঁপ দিচ্ছে সমুদ্রে। তার মাথায় যদি বছরে ৩০০ ইঞ্চি অর্থাৎ রোজই প্রায় এক ইঞ্চি বৃষ্টি হতে থাকে, তখন অবস্থাটা কেমন হয়?

ফলে খাঁড়ির পর খাঁড়ি, খড়ের পর খড়। বুনো গাছের ভিড় সত্ত্বেও পাহাড়কে আঁকড়ে ধরে আছে বিশাল বিশাল শিকড় আঁকড়ানো মেহগনী, সীডার, সাদা [illegible], শিমুল। কার সাধ্য ঐ খাড়াই, খাঁড়ি, খড়, জঙ্গল ভেদ করে এগোয়! আর কেনই বা এমন কোন মূল্যবান বস্তু ওতে পোঁতা। পথ-ঘাট যা গড়া থাক না কেন এক বছরের বৃষ্টিতেই ধুয়ে সাফ। বাড়ীঘরদোর বসনাস সবই যেন ছাতায় ঢাকা। হ্যাঁ, ছাদ বলতে কিছু নেই; কেবল ছাতা। ঢল খাওয়ানো, পালতোলা, তাড়াতাড়ি নেমে আসা ছাতাই সবে থাকে। প্রত্যেকে যেন বাড়ী গড়েছে আজ বা কাল চলে যাবে বলে।

সেটা ছিল ১৯৯৩ খৃষ্টাব্দের একটি [illegible] রবিবার। সে-দিনিবারটায় বৃষ্টি ছিলো, [illegible]। কলম্বাস তার সান্তামারিয়া থামলেন [illegible] পোর্টসমাউথ বন্দর থেকে সাইটটাক [illegible]। আজও জাহাজ সেই নাইটটাক [illegible]। পাহাড়ের গা-ধোয়া মাটির ঢল [illegible] বুকে নেমে নেমে এসেছে অনেকদূর পর্যন্ত ধীরে ধীরে। ফলে [illegible] আজও হতে পারেনি ডোমিনিকার। [illegible] [illegible]।

[illegible]

সেন্ট-[illegible]

[illegible] পাহাড়ের মাথায় আছে 'ক্যারিব-রিজার্ভ'। [illegible] এমনি। [illegible] 'রিজার্ভ' আছে। আমাদের দেশেও [illegible] এবং [illegible] এলাকায়, নীলগিরি এবং [illegible] এলাকায় এবম্বিধ 'রিজার্ভ' আছে। আদি-বাসীদের স্বতন্ত্র ও স্বচ্ছন্দ জীবনধারাকে অব্যাহত রাখার আশাতেই সরকার এই ধরনের বন্দোবস্ত করে থাকেন। আমেরিকা ও কানাডিয়ান সরকারের 'রেড ইণ্ডিয়া' 'রিজার্ভ' আছে, অষ্ট্রেলিয়ায় আছে [illegible], [illegible], এটিঙ্গা রিজার্ভ'। [illegible] আছে মাওরী রিজার্ভ।

সত্যি কথা বলতে কি—এইসব 'রিজার্ভ'-কথা নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করলেই দেখা যায়, সভ্যতার [illegible] [illegible] ইউরোপীয় [illegible] দস্যুরা তাদের [illegible] সরকার ও রাজাদের সহায়তায় [illegible] পরিমাণ অ-সভ্য তো বটেই—অ-মানুষিক অত্যাচার করেছে। পৃথিবীতে সভ্যদেরই বাঁচার অধিকার আছে, অসভ্যদের নেই—এমন মতবাদ খাড়া করা অসম্ভব নয়। অসভ্যকে সভ্য করার দায়-দিলাশা সভ্য মানুষ ত্যাগ করতে পারে না,—এমন কথাও [illegible] হতে পারে। আর্য-বিস্তৃতির কালে অনার্যরা কেমন ব্যবহার পেয়েছিলো অনুমান করা যেতে পারে। যেকালে ভারতীয় বিশেষ করে ভারতীয় দ্রাবিড় সভ্যতা, মাদাগাস্কার, আবিসিনিয়া, সিংহল, ব্রহ্ম, শ্যাম, কাম্বোজ, বাহ্লিদ্বীপ, সুমাত্রা দ্বীপ, যবদ্বীপ, শৈলবাসদ্বীপে বিস্তৃতি লাভ করেছিলো সেকালে তখন তারাও যে [illegible] [illegible]-বাছাগিরি ফলিয়েই অসভ্যকে সভ্য করেছিলো এমন কথা বলছিনে। কিন্তু 'রিজার্ভ'ও করেনি এবং 'জিনোসাইড' অর্থাৎ নেমাজুম, বেকসুর বে-ইন্তেজা কেতোল-ও করেনি তা বোঝা যায়। বোঝা যায় এই কারণে যে, এসব দেশে দেশবাসীরা আজও বর্তমান: তাদের রঙে, রসে, রূপে, আচারে-ব্যবহারেই তা মালুম হয়। 'রিজার্ভ' বা 'ঘেটো' রচনা করে তাদের 'দুরমপসর' করে রাখা হয়নি। 'অন্ত্যেবাসী' বলে একটা [illegible] বরাবরই আর্যদের সমাজে স্থান [illegible]। কিন্তু 'রিজার্ভ' রচনা করে তাদের অস্তিত্বের 'শো-পীস' অর্থাৎ [illegible] আজব-ঘরের চিহ্নিত এবং দ্রষ্টব্য [illegible] করেও রাখা হয়নি; 'ঘেটো' রচনা করেও তাদের ঘৃণা অপাংক্তেয় করে রাখা হয়নি। অশুচিতম, অস্পৃশ্য ও অন্ত্য সমাজের [illegible] হিসেবেই সমাজে আশ্রয় পেয়েছে।

কিন্তু 'রিজার্ভ'গুলো যেন [illegible] ওপর মানুষের চিরন্তন অনন্ত ধিক্কার। এই 'রিজার্ভ' রচনার তত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ করলে দেখা যায়, দয়া-করুণাকে মানুষ অহংকার ও [illegible] এবং ধর্মকে জুলুমবাজীর বাহন [illegible]। ইংরেজদের ভারতে নীলগিরির 'টোডা' জাতটা তো লুপ্ত হতে বসেছিলো। সম্প্রতি স্বাধীন ভারতে তাদের ধারাকে অব্যাহত রাখার চেষ্টা চলছে। কিন্তু সেই চেষ্টায় এবং এইসব 'রিজার্ভ' রচনায় [illegible] [illegible]।

ডোমিনিকার [illegible] রিজার্ভ [illegible] [illegible] এখন শ-দুয়েকের বেশী ক্যারীব নেই। [illegible] ডোমিনিকাতেই ক্যারীব ছিল [illegible] ত্রিশ হাজার। এদের নিঃশেষিত না করে আজও যাঁরা দয়া করে বাঁচিয়ে রেখেছেন—তাঁদের নাম মহানুভব ইংরেজ। দাস-ব্যবসার [illegible] আলোচনার ক্ষেত্র এটা নয়। 'ভ্রমণ' [illegible] 'বৃত্তান্ত' শোনার জন্যই যাঁরা বই [illegible], ভ্রমণের ছিলিম ভরে আনন্দ [illegible] তাঁদের নেশা যে মরাই যায়!

কিন্তু [illegible] খবর রাখেন? ১৪৪২ খৃষ্টাব্দে পর্তুগীজ রাজা হেনরী 'দি-[illegible]'-এর [illegible] খুশ করে [illegible] তাঁর অফিসার কিছু মুর সৈন্যকে বন্দী করে আনেন। রাজা হেনরী তৎক্ষণাৎ [illegible] মুরদের মুক্তি দেন এবং উক্ত [illegible] অফিসারকে আদেশ দেন মুরদের স্বরাজ্য [illegible] নিয়ে আসতে। সেই ফিরিয়ে [illegible] [illegible] সর্বনাশ হোলো। মুরদের রাজা খুশী হয়ে সোনা দিলেন, দিলেন [illegible] নিগ্রো-দাস। এবং তার বিনিময়ে [illegible] কাছ থেকে পাওয়া গেলো টাকা। ব্যস,—চললো টাকার বিনিময়ে নিগ্রোদের জোগান-দারী। এক হেইতী আর জ্যামাইকাতেই লক্ষাধিক ক্রীতদাস পাচার করা হোলো।

মহামতি কলম্বস চেয়েছিলেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দ্বীপের নিরীহ 'ইণ্ডিয়ান'দের এরা ক্যাভিল-এ বিক্রী করেন। কিন্তু রাণী ইসাবেলা দয়াপরবশ হয়ে তা নিষিদ্ধ করে দেন। দিলে কী হবে, নতুন দেশের খনিতে [illegible] করানো লোকাভাব। 'ইণ্ডিয়ান'রা তখনও কোনোদিন কোনো কাজ করেনি। তাদের তখন খনিতে ঢোকানো হোলো, তারা মরতে লাগলো প্লেগের মৌসুমে ইঁদুরের [illegible]। এবং হ্যাভানা, হিস্পানিওলা, জ্যামাইকার জাঁদরেল সব জমিদার-গিন্নীরা চাকরের অভাবে মুহ্যমান।

বার্থলমি-দা-লাস-কাসাস, চিয়াপার বদান্য বিশপ, তখন নিষ্পাপ হৃদয়ে স্পেনের রাজাকে জানান, শাদা জমিদারদের আওতায় কালা নিগ্রো চাকর থাকলে কোনো ক্ষতি কারুর নেই। সেই চালান' আরম্ভ। পরে লাস-কাসাস হায় হায় করেছিলেন। এই মহানুভব পাদ্রী সারাজীবন ধরে [illegible] নির্যাতন ভোগ করেছেন স্পানিশ অপরাধ[illegible] [illegible] হাত থেকে সরল, অমায়িক, নিরীহ এই 'ভারতীয়'দের রক্ষা করতে। তা তিনি পারেননি। চোখের ওপর হাজার হাজার হত্যা তিনি দেখেছেন। পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে নিগ্রো বর্সতির পরিকল্পনা ছিলো তাঁরই। সত্য কথা। কিন্তু তিনি ভেবেছিলেন খনির কাজে যে-কালে হাজারে হাজারে 'ভারতীয়' মরছে, সেক্ষেত্রে নিগ্রো-দের এ-কাজে লাগালে তারা হয়তো সে-পরিশ্রম সইতে পারবে। তিনি যদি জানতেন ইণ্ডিয়ানরা তো মরবেই, নিগ্রো-দাস প্রথায় [illegible] লক্ষ নিগ্রো জাহাজেই প্রাণ হারাবে—কখনই তিনি এ-বন্দিশ শাদা জমিদারদের দিতেন না।

> "His (Las Casas) advice was unfortunately adopted Charles (says Robertson) granted a patent to one of his Flemish favourites, containing an exclusive right of supplying 4000 Negroes annually to Haiti, Cuba, Jamaica and Porto Rico. The favourite sold his patent to some Genoese merchants for 25,000 ducats, these merchants obtained the slaves from the Portuguese; and thus was first systematised the slave trade between Africa and America."

(রবার্টস লাগোত-এর প্রবন্ধ এনসাইক্লো-পিডিয়া ব্রিটানিকা—চতুর্দশ সংস্করণ।)

এইসব 'রিজার্ভ' যখনই [illegible], যে-দেশেই [illegible], গায়ানায়, কানাডায়, ওয়েস্ট ইণ্ডিজে, ফরাসী গায়ানায়—এই ক্রীতদাস ব্যবসায়ের কথার চেয়েও গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে, শুধু এই প্রশ্ন "নিজ বাসভূমে আজ এরা পরবাসী কেন?" আমি [illegible] দেখতে পারি না এদের এই রিজার্ভ-বন্দী অবস্থা।

(ক্রমশঃ)

শব্দের গাছ ।। জগন্নাথ চক্রবর্তী

ইজিচেয়ারে গা শুইয়ে
মন বসিয়েছিলাম কিছুনা-য়,
চোখ তুলতেই গেট, গেটের পাশেই আমগাছ,
গাছের অবিচ্ছিন্ন অবয়ব দৃষ্টিকে ডেকে নেবেই—
গাছের কিংবা তার প্রাচীরস্পর্শী ছায়ার—
একই কথা।

এখন কী মাস?
পাট-খড়ের ঘ্রাণ বলে দিচ্ছে হেমন্ত,
বেশ তাই।
এমন সন্দেহী ছায়া, এমন ইজেল-যোগ্য প্রশাখা
চোখ ভ'রে দ্যাখ,
পারো তো মনের মধ্যে এঁকে নাও।

দ্যাখ,
দেয়াল পার ক'রে রোদকে আরো অবনতিয়ে
দিনমান ডিউটি বদল কোরলো,
এল দুপুরের জায়গায় বিকেল, তারপর
বিকেলের পিঠের ওপর উঠলো সন্ধ্যা
ছাইরঙের ওভারকোট গায়।
এখন সারা সংসারে ট্রাফিকের চেহারাই আলাদা—
ঘরমুখো।

আবার ইজিচেয়ারে গা, ক্যানভাসে মাথা,
মাথার মধ্যে বিজবিজ ঘুম,
আর ঘুমের মধ্যে গেট,
গেটের পাশেই আমগাছ
(থাক, স্থিরুত্তানোর কী দরকার?)
গাছের অবিচ্ছিন্ন অবয়ব স্বপ্নকে ডেকে দেবেই—
গাছের কিংবা তার প্রাচীরস্পর্শী ছায়ার—
একই কথা।

একটা শীতশীত আমেজ,
পউষানোর আর বাকি কতো? ভাবছিলাম।
হঠাৎ গেট, গাছ, ছায়া, স্বপ্ন সব ডুবিয়ে
পাখি, পাখি, আর পাখি—
আসলে পাখি নয়, পাতাও নয়,
শুধু কিচিরমিচির, কিচিরমিচির, কিচিরমিচির।
কূজন্ত সবাক আমগাছ, অবাক শ্রুতিমধুর সন্ধ্যা,
শোনো।
গাছের শব্দ? না তা নয়,
ঝুরিনামা পরিপূর্ণ এক শব্দের গাছ।

প্রস্থান ।। মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

চাঁদ ঘুরে যায়—পৃথিবী কেন্দ্রে থাকে,
পৃথিবীও করে সূর্য পরিক্রমা,
ভেবোনা নিয়ত তোমারি চতুর্দিকে
আমি ঘুরে যাব প্রতিদিন প্রিয়তমা।

আগ্রহ ছিল যদিও সিন্ধবসে—
ভাঙব না আমি পুরোনো দেউলটিকে,
তবু সমুদ্রে জোয়ারে জলোচ্ছ্বাসে
সব ডুবে যায় কৃষ্ণাতিথির ভিড়ে।

যদি ফুল তুলে প্রতিদিন সাজি ভরে
টেবিলে রাখতে—জয়পুরী ফুলদানী
পূর্ণতা নিয়ে নিশ্চিত খুশী হতো
কত অসহায় অমর্ত্য রাজধানী।

আজ বিকেলের নিরালা অবাঞ্ছিত
আমার পৃথিবী সহসা কেন্দ্রচ্যুত
আমি ঘুরে যাই অন্য কিছুর টানে
আমার হৃদয় বেদনায় আপ্লুত।

জানলে না তুমি ভূকম্পনের ফলে
আমি সরে গেছি অন্য ভূমণ্ডলে।

মেমসাহেব

নিমাই ভট্টাচার্য

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ওয়েস্টার্ন কোর্ট
জনপথ
নিউদিল্লী

(৬)

মাই ডিয়ার দোলাবৌদি,

লোকের ভীড়ের মধ্যে আর কথা হলো না। এই দু'এক মিনিটের মধ্যেই কিছু কিছু কলারসিক বেশ এক ঝলক আমাদের দেখে নিলেন।

পাশের হলটা চটপট ঘুরে দেখে নিয়ে আমরা দুজনেই একসঙ্গে বেরিয়ে এলাম।

এখন রাত প্রায় দেড়টা বাজে। তাই আজ আর লিখছি না। কালকে সকাল সকাল উঠতে হবে। দশটার সময় প্রাইম-মিনিস্টারের মান্থলি প্রেস কনফারেন্স। [illegible] বেশ বুঝতে পারছ [illegible]

[illegible] তোমাদের দুজনেরই ছুটি। [illegible] বেশ কল্পনা করতে পারছি খোকনদা তোমার কোলের পর মাথা দিয়ে শুয়ে আছে আর তুমি তোমার ঐ বিখ্যাত বেসুরো গলায় ওকে একটা পুরোন গান শোনাচ্ছ। তাই না?

তুমি যেদিন প্রথম খোকনদার দেখা পেয়েছিলে, সেদিন খোকনদা তোমাকে কি বলে সম্বোধন করেছিল, কি ভাষায় কথা বলেছিল, কি সে বলেছিল, আমি সেসব কিছুই জানি না। সেদিন তুমি কিভাবে ওকে গ্রহণ করেছিলে, তাও জানি না। তবে বেশ কল্পনা করে নিতে পারি তুমিই আগে খোকনদার মাথাটা খেয়েছ। কিছু কবচ-মাদুলী ধারণ করেছিলে কিনা জানি না; তবে কিছু না কিছু একটা নিশ্চয়ই করেছিলে। নয়ত খোকনদার মত ছেলে...

তুমি রাগ করছ? রাগ করো না। তবে তোমাদের ব্যাপারটার ঐ রহস্যভরা অদিপর্বটা জানা থাকলে আমার অনেক সুবিধে হতো। তাইতো সেদিন আর্ট ইন ইন্ডাস্ট্রি থেকে বেরুবার পর কি বলব, কি করব, কোথায় যাব, কিছুই ভেবে পাচ্ছিলাম না। পার্ক স্ট্রীট ছেড়ে চৌরঙ্গী ধরে এসপ্ল্যানেডের দিকে এগুতে এগুতে শুধু বলেছিলাম, আমি জানতাম আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবে।

'সত্যি?'

'সত্যি।'

'আজই দেখা হবে, একথা জানতেন?'

'না, তা জানতাম না। তবে জানতাম দেখা হবেই।'

মেমসাহেব থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ঘাড় বেঁকিয়ে আমার দিকে ফিরে বেশ একটু আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করল, কি করে জানতেন যে আমাদের দেখা হবেই?

আমি সরাসরি উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করি, আপনার বাবা কি লিগ্যাল প্র্যাকটিশনার?

'হঠাৎ একথা জিজ্ঞাসা করছেন?' সন্দেহের রেখা ফুটে উঠল মেমসাহেবের কপালে।

'ভয় পাবেন না, আমি দস্যু মোহন বা ডিটেকটিভ কিরীটি রায় নই।'

কিছু স্ট্রীট পার হলাম। বেশ বুঝতে পারলাম মেমসাহেবের মন থেকে সন্দেহের মেঘ কেটে যায়নি। তাইতো বললাম, 'আপনি যে ল' পড়েন নি, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে যেভাবে জেরা করতে শুরু করেছিলেন, তাতেই মনে হলো, আপনি বোধহয় ল-ইয়ারের মেয়ে।'

মেমসাহেব এবার হেসে ফেললো। বোধহয় মনটাও একটু হালকা হলো।

মিনিট কয়েক দুজনেই চুপচাপ। মিউজিয়াম পার হয়ে এলাম। ওয়াই-এম-সি-এ পিছনে ফেললাম। লিন্ডসে স্ট্রীটের মোড়ে এসে পড়লাম। আরো এগিয়ে গেলাম। ফিরপো পার হয়ে আর সোজা না গিয়ে রঞ্জীর দিকে ঘুরলাম। মৌনতা ভাঙলাম আমি, চা খাবেন?

'চা? বিশেষ খাই না। তবে চলুন খাওয়া যাক।'

পাশের রেস্তোরাঁর একটা কেবিনে বসলাম। বেয়ারা এলো। হাতের তোয়ালে দিয়ে পরিষ্কার টেবিলটা আর একবার মুছে দিল। নোংরা মেনু কার্ডটা আমার সামনে দিয়ে এক নজর দেখে নিল মেমসাহেবকে।

'দুটো ফিস ফ্রাই, দু'টো চা।'

বেয়ারা বিদায় নিল। কিছু বলব বলব ভাবতেই ক' মিনিট কেটে গেল। ইতিমধ্যে বেয়ারা দুটো ফর্ক আর দুটো ছুরি এনে আমাদের দুজনের সামনে সাজিয়ে দিয়ে চলে গেল। আবার ভাবছি কিছু বলব। কিন্তু বলা হলো না। বেয়ারাটা আবার এলো। এক শিশি সস্ আর দু' গেলাস জল দিয়ে গেল। বুঝলাম বেয়ারাটা বুঝেছে নতুন জুড়ী এবং সেজন্য ইনস্টলমেন্টে কাজ করছে। ফিস ফ্রাই'এর প্লেট দুটো নিয়ে বেয়ারাটা আসবার আগেই জিজ্ঞাসা করলাম, কিছু ভাবছেন?

আঁচলটা টেনে নিয়ে মেমসাহেব বলল, 'না, তেমন কিছু না।'

'তেমন কিছু না হলেও কিছু তো ভাবছেন।'

ফিস ফ্রাই এসে গেল। আমি একটা টুকরো মুখে পুরলাম কিন্তু ফর্কটা হাতে নিয়ে মেমসাহেব কি যেন ভাবছিল। জিজ্ঞাসা করলাম, কিছু বলবেন?

'একটা কথা বলবেন?'

'নিশ্চয়ই।'

'আমাদের দেখা হবে, একথা আপনি জানলেন কি করে?'

'কি করে জানলাম তা জানি না, তবে মনের মধ্যে স্থির বিশ্বাস ছিল যে আপনার সঙ্গে দেখা হবেই।'

'শুধু মনের বিশ্বাস?'

'হ্যাঁ।'

সেদিন একে প্রথম সাক্ষাৎকার তারপর ঐ ছোকরা বেয়ারাটার অতিরিক্ত কর্তব্য-পরায়ণতার জন্য আর বিশেষ কথা হলো না। তবে ঐ কেবিন থেকে বেরুবার আগে আমার নোটবই-এর একটা পাতা ছিঁড়ে অফিসের টেলিফোন নম্বরটা লিখে দিলাম। শুধু বলেছিলাম, সম্ভব হলে টেলিফোন করবেন।

কিছুটা লজ্জায় আর কিছুটা ইচ্ছা করেই আমি ওর নাম-ধাম-ঠিকানা কিছুই জানতে চাইলাম না। মনে মনে অনেক কিছু ইচ্ছা করছিল। ইচ্ছা করছিল বলি, 'তুম মুখাতিব ভী হো, করিব ভী হো, তুমকো দেখু, কী তুমসে বাত করু।'

আবার ভাবছিলাম, না, না। তার চাইতে বরং প্রশ্ন করি, আঁখো মে হি রহে হো, দিলসে নেহি গ্যায়ে হে, হাবরাম হু এ মফী আই তুমে কাঁহাসে?

সত্যি বলছি দোলাবৌদি, ওকে কাছে পেয়ে, পাশে দেখে বেশ অনুভব করছিলাম, এ তো সেই, যাঁর দেখা পাবার জন্য আমি এত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছি, এত দীর্ঘ-দিন সংগ্রাম করেছি। মনে মনে বেশ অনুভব করছিলাম, এবার আমার দিন আগত ঐ।

আরো অনেক অনেক কিছু ভেবে-ছিলাম। সেসব কথা আজ আর লিখে এই চিঠি অযথা দীর্ঘ করব না। তবে শুধু তোমার বাবা, মেমসাহেব এক এবং অদ্বিতীয়া। এই পৃথিবীতে আরো অসংখ্য কোটি কোটি মেয়ে আছেন, তাঁদের প্রেম-ভালবাসায় কোটি কোটি পুরুষের জীবন ধন্য হয়েছে, তাঁদের স্পর্শে অনেকেরই ঘুম ভেঙেছে। আমি তাঁদের সবার উদ্দেশে আমার শ্রদ্ধা জানাই, কৃতজ্ঞতা জানাই। আমি জানি আমার কালো মেমসাহেবের চাইতে অনেক মেয়েই সুন্দরী, অনেকেই ওর চাইতে অনেক বেশী শিক্ষিতা। তবে একথাও জানি আমার জন্য এই পৃথিবীতে একটিমাত্র মেয়েই এসেছে এবং সে আমার ঐ মেমসাহেব। মেমসাহেব ছাড়া আর কেউ পারত না আমাকে এমন করে গড়ে তুলতে। মাটি দিয়ে তো সব শিল্পীই পুতুল গড়ে। কিন্তু সব শিল্পীর শিল্প-নৈপুণ্য কি সমান? মেমসাহেব আমার সেই অনন্য জীবন-শিল্পী যে কাদা-মাটি দিয়ে আমাকে আজ একটা প্রাণবন্ত পুতুল গড়ে তুলেছে।

তুমি শুনলে অবাক হবে, আমি সেদিন ওর বাসে পর্যন্ত ওঠার অপেক্ষা করলাম না। আমি আগেই একটা বাসে চড়ে অফিসে চলে এলাম। মনে মনে ভাবলাম, আমি তো ওর জন্য অনেক ভেবেছি, ভাবছি। এবার না-হয় রেকর্ডের উল্টো-দিকটা দেখা যাক। দেখা যাক না ও আমার জন্য ভাবে কিনা!

রাত্রে অফিসে ফিরেই দেখি বেশ চঞ্চলা। সন্ধ্যার পরই টেলিপ্রিণ্টারে নিউজ এজেন্সীর খবর এসেছে পূর্ব পাকিস্থানের বাগেরহাটে খুব গণ্ডগোল হয়েছে। কি ধরনের গণ্ডগোল হলো এবং কলকাতায় কি প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, সেই চিন্তায় সবাই উৎকণ্ঠিত। পরের দিন আমার ডিউটি পড়ল শিয়ালদহ স্টেশনে। পূর্ব-পাকিস্থানের ট্রেনের যাত্রীদের সঙ্গে দেখা করে সেখানকার পরিস্থিতি জানতে হবে। রিপোর্ট করতে হবে। পরের দিন খুলনার ট্রেনটি এসেছিল অনেক দেরী করে। প্ল্যাটফর্ম থেকে ঝাঁকে-ঝাঁকে লোক আগে থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিছু সরকারী কর্মচারীও উপস্থিত ছিলেন। বাগেরহাটের পরিস্থিতি জানবার পর ওরা সবাই আগত যাত্রীদের হুঁসিয়ার করে দিলেন, অসত্য বা মিথ্যা গুজব ছড়াবেন না।

যাত্রীদের কথাবার্তা শুনে বেশ বুঝতে পারলাম অবস্থা বেশ গুরুতর। কোথা থেকে কিভাবে যে গণ্ডগোল শুরু হলো, সেকথা কেউ বলতে পারলেন না। তবে খালাপুরের এক ভদ্রলোক জানালেন যে, বাগেরহাটের এক জনসভায় পশ্চিম-পাকিস্থানের এক নেতা বক্তৃতা দেবার পরই ওখানে প্রথমে কিছু লুটপাট শুরু হয়। দু'-তিন দিন পরে ছুরির খেলা শুরু হলো। গুণ্ডাদের হাতে প্রথম দিনেই প্রাণ দিলেন লুৎফর রহমান।

শিয়ালদহ স্টেশনের বুকিং অফিসের সামনে দুটো ট্রাঙ্কের পর বসে, আমরা দুজনে কথা বলছিলাম। কথা বলছিলাম নয়, কথা শুনছিলাম। ভদ্রলোক আগে একটা ছোট্ট স্কুলে মাস্টারী করতেন। অনেকদিন মাস্টারী করেছেন ঐ একই স্কুলে। বাগেরহাটের সবাই ওঁকে চিনতেন, ভালবাসতেন। অধিকাংশ ছাত্রই মুসলমান ছিল কিন্তু তা হোক। ওরাও ওকে বেশ শ্রদ্ধা করত। লুৎফর সাহেব যখন ঐ স্কুলের সেক্রেটারী ছিলেন, তখন স্কুলবাড়ী দোতলা হলো, ছেলেদের ভলিবল খেলার ব্যবস্থা হলো, দশ-পনের টাকা করে মাস্টার মশাইদের মাইনেও বাড়ল। কি জানি কি কারণে পরের বছর সরকার স্কুল-কমিটি বাতিল করে দিলেন। ক' মাসে স্কুলের তহবিল তছ-রূপের অভিযোগে লুৎফর সাহেবকে গ্রেপ্তার করা হয়, কিন্তু কোর্টে সেসব কিছুই প্রমাণিত হলো না।

ইতিমধ্যে স্কুলের নতুন কর্তৃপক্ষ ভদ্রলোকের চাকরি খতম করে দিলেন অযোগ্যতার অভিযোগে। অনন্যোপায় হয়ে একটা দোকান খুললেন। প্রথম প্রথম বিক্রী লাগত দোকানদারী করতে। কিন্তু কি করবেন? পরে অবশ্য মন লেগেছিল ব্যবসায়ে। ব্যবসাটাও বেশ জমে উঠেছিল। পোড়া কপালে তাও টিকল না। এবারের গণ্ডগোলে দোকানটা পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

এসব কাহিনী আমার না জানলেও চলত, কিন্তু কি করব। আর এমন কোন যাত্রী পেলাম না যার কথায় ভরসা করে রিপোর্ট লেখা যায়। তাই চুপচাপ বসে শুনছিলাম। তবে এতক্ষণ ধৈর্য ধরে এই কথা শোনার পুরস্কার পেলাম পরে।

লুৎফর সাহেব ছাত্রজীবনে খুব কংগ্রেসে ছিলেন। পরে ওকালতি করার সময় রাজনীতি প্রায় ছেড়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু পূর্ব পাকিস্থানের রাজনৈতিক আবহাওয়া জটিল হবার সঙ্গে সঙ্গে লুৎফর সাহেব আবার রাজনীতি শুরু করলেন। সারা খুলনা জেলা লুৎফর সাহেবের কথায় উঠত, বসত। সারা জেলার মধ্যে কোন অন্যায় অবিচারের কথা শুনলেই গর্জে উঠতেন। খুলনা ডকের কয়েক হাজার বাঙালী মুসলমান শ্রমিক অনেক দিনের অনেক অত্যাচার আর অপমানের বিরুদ্ধে প্রথম গর্জে উঠেছিল লুৎফর সাহেবেরই নেতৃত্বে।

পূর্ব পাকিস্থানের মসনদ থেকে ফজলুল হক সাহেবকে অপসারিত করে ইস্কান্দার মির্জা পূর্ব বাংলাকে শায়েস্তা করবার জন্য ঢাকায় আসার কিছুকালের মধ্যেই লুৎফর সাহেবকে ডেকে পাঠান। লুৎফর সাহেব লাটসাহেবের নেমন্তন্ন খেতে ঢাকা গিয়েছিলেন, তবে একবেলা বুড়ীগঙ্গার ইলিশ খাইয়েই সে নেমন্তন্ন খাওয়া শেষ হয়নি। দুটি বছর ঢাকা সেণ্ট্রাল জেলে বিশ্রাম নেবার পর লুৎফর সাহেব খুলনা আসার অনুমতি পান।

খুলনা ফেরার পর লুৎফর সাহেব আরো বেশী রুখে দাঁড়ালেন।

আমার অফিসে ফিরে রিপোর্ট লিখতে হবে। এত দীর্ঘ কাহিনী শোনার অবসর ছিল না। তাই ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলাম, লুৎফর সাহেব আজকাল কি করেন?

—লুৎফর সাহেব আর নেই। এ দাঙ্গায় বাগেরহাটের প্রথম বলি হলেন লুৎফর সাহেব।

'সে কি বলছেন?'

'আমাদেরও তো ঐ একই প্রশ্ন।

তবুও কি মনে হয়?'

বাগেরহাটের [illegible] অনেকদিন ধরেই শ্রমিক ধর্মঘট [illegible] লুৎফর সাহেব ওদের নেতা। কিছু [illegible] ধরেই আমরা শুনছিলাম লুৎফর সা[illegible] শায়েস্তা করার জন্য শহরে নাকি [illegible] অনেক গুণ্ডা এসেছে। আমরা [illegible] বিশ্বাস করিনি, কারণ—[illegible] লুৎফর সাহেবের গায়ে হাত দেবার [illegible] স্বয়ং ইস্কান্দার মির্জারও হয়নি। [illegible] এরই মধ্যে সর্বনাশ [illegible] বন্ধুর [illegible] থেকে বাইরে যাইনি। [illegible] দোকানটা [illegible] শেষ।

আমি [illegible] সাহেবকে [illegible] অধীর হয়েছে। [illegible] স্বাভাবিক [illegible] লুৎফর সাহেবকে [illegible] কথা হয় না।

অফিসে ফিরে [illegible] বেশ রাত [illegible] কাহিনী লিখে ফেললাম।

[illegible] ঠিক সময় পেলাম না।

পরের দিন [illegible] অফিসে গেলাম না। [illegible] পরের দিন [illegible] টেলিফোন ডিউটি ছিল। তাই একটু দেরী করেই অফিসে গেলাম।

এখনকার মত তখন ডায়াল ঘুরালে নম্বর পাওয়া যেত না। অপারেটরের ওপর নির্ভর করতে হতো। খবরের কাগজের রিপোর্টারের নাইট-টেলিফোন ডিউটি একটা বিচিত্র ব্যাপার। পুলিশ হাসপাতাল, অ্যাম্বুলেন্স, ডক, রেল-পুলিশ রেল স্টেশন, দমদম এয়ারপোর্ট ইত্যাদি জায়গায় থেকে দৈনন্দিন টুকটাক 'লোকাল' নিউজ পাবার জন্যে প্রায় শতখানেক টেলিফোন করতে হতো। আমাদের কাগজের পাড়ায় এবং একই টেলিফোন এক্সচেঞ্জে আরো চার পাঁচটি কাগজের অফিস ছিল। এক্সচেঞ্জের অপারেটর প্রতি রাত্রে এই লাইন দিতে

দিতে প্রায় রিপোর্টার হয়ে উঠেছিলেন। নাম্বার বলবার প্রয়োজনও হতো না; শুধু বললেই হতো, রিভার পুলিশ দেবেন নাকি?

উত্তর আসত, রিভার পুলিশ এনগেজ। টাইমস অফ ইন্ডিয়া কথা বলছে।

এখনকার মত তখন এয়ারপোর্ট রিপোর্টার বলে কিছু ছিল না। তাই সাধারণ ছোট-খাট খবরের জন্য এয়ারপোর্ট পুলিশ-সিকিউরিটিতে রোজ রাত্তিরে ফোন করতে হতো। তাইতো রিভার পুলিশ না পেয়ে বলতাম, এয়ারপোর্ট দিন।

অপারেটর সংগে সংগে জানিয়ে দিতেন, সিকিমের মহারাজার এ্যারাইভাল ছাড়া আজ আর কিছু নেই।

সংগে সংগেই আবার হয়ত বলতেন, এবার নীলরতনের সংগে কথা বলুন। কি একটা সিরিয়াস অ্যাক্‌সিডেন্টের খবর আছে।

সব অপারেটরই যে এইরকম সাহায্য করতেন, তা নয়। তবে অধিকাংশ মেয়েই খুব সহযোগিতা করতেন। রাত্রে টেলিফোন ডিউটি করতে করতে বহু অপারেটরের সংগে অনেক রিপোর্টারেরই বেশ মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। নানা অবস্থায় রিপোর্টাররাও যেন অপারেটরদের সাহায্য করতেন, তেমনি অপারেটররাও রিপোর্টার-দের যথেষ্ট উপকার করতেন।

কোন কোনদিন খবরের চাপ বিশেষ না থাকলে অনেক সময় আমরা নিজেদের সুখ-দুঃখের কথা বলতাম। এইরকম কথা-বার্তা বলতে বলতেই আমরা টেলিফোন এক্সচেঞ্জের অনেক কাহিনী শুনেছিলাম। জানতে পেরেছিলাম অনেক অফিসারের 'আনটোল্ড স্টোরি'। কিছু কিছু কাগজে ছাপিয়ে ফাঁস করেও দেওয়া হয়েছিল। অপারেটরদের উপর অনেক অফিসারের খাম-খেয়ালীপনা বন্ধ হয়েছিল।

অপারেটররাও আমাদের কম উপকার করতেন না। কৈলাশনাথ কাটজু তখন পশ্চিম বাংলার গভর্ণর আর ডাঃ রায় মুখ্যমন্ত্রী। কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে দুজনের মধ্যে তীব্র মত-বিরোধ দেখা দিয়েছে বলে নানা মহলে গুজব শোনা গিয়েছিল, কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও মত-বিরোধের সঠিক কারণগুলো কেউই জানতে পারছিলাম না। শেষে একদিন অকস্মাৎ এক টেলিফোন অপারেটর জানালেন, জানেন, আজ একটু আগে টেলিফোনে গভর্ণরের সংগে চীফ মিনি-স্টারের খুব একচোট...

দুদিন বাদে এই ঝগড়ার কাহিনীই আমাদের কাগজের ব্যানার স্টোরি হলো। মোটা মোটা অক্ষরে চার-কলম সামারিতে লেখা হলো, রাজভবনের সহিত সংশ্লিষ্ট নির্ভরযোগ্য মহলের নিকট হইতে জানা গিয়াছে যে রাজ্য পরিচালনার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে রাজ্যপালের সহিত মুখ্যমন্ত্রীর মত-বিরোধ দেখা দিয়াছে।...

শুধু বাংলা দেশের জনসাধারণ বা রাইটার্স বিল্ডিংস-এর কিছু অফিসার নয়, স্বয়ং ডাঃ রায় ও কাটজু সাহেব পর্যন্ত চমকে গিয়েছিলেন এই খবরে। অনেক তদন্ত করেও ও'রা জানতে পারেন নি কি করে এই চরম গোপনীয় খবর ফাঁস হয়ে গেল।

আমরা অফিসে বসে শুধু হেসেছিলাম ইচ্ছা করলে আরো কত কি ছাপতে পারতাম কিন্তু ছাপিনি!

এইরকম আরো অনেক চমকপ্রদ খবর পেতাম আমাদের অপারেটর বান্ধবীদের মারফত ও মাঝে মাঝেই বাজার গরম করে তোলা হতো। মন্ত্রী আর অফিসারের দল কানামাছি ভোঁ-ভোঁ করে মিছেই হাতড়ে বেড়াতেন, আর আমরা মুচকি হাসতে হাসতে ঐ মন্ত্রী ও অফিসারদের ঘরে বসে ওদের পয়সায় কফি খেয়ে বেড়াতাম।

সেদিন রাত্রে অফিসে এসে যথারীতি টেলিফোনটা তুলে জিজ্ঞাসা করলাম, কে কথা বলছেন?

কণ্ঠস্বর অপরিচিত নয়। তাই উত্তর আসে, আমি গার্গী।

এক মুহূর্ত পরেই আমাকে প্রশ্ন করেন মিস গার্গী চক্রবর্তী, অনেকদিন পর আজ আপনার টেলিফোন ডিউটি পড়ল, তাই না?

উত্তর দিই, না অনেকদিন কোথায়.....

গার্গী মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে জানতে চায়, কাল আর পরশু আপনি অফিসে আসেননি?

'কেন বলুন তো।'

'আগে বলুন না কোথায় ছিলেন দুদিন।'

'কোথায় আবার থাকব, কোলকাতাতেই ছিলাম। তবে কালকে আমার অফ ছিল। আর পরশু অনেক রাত্রে অফিসে এসেছিলাম।'

'তাই বুঝি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

গার্গী চক্রবর্তী টেলিফোন ছাড়ে না। ইনিয়ে-বিনিয়ে দু'চারটে আলতু-ফালতু কথার পর জিজ্ঞাসা করল, তারপর আপনি কেমন আছেন?

'হঠাৎ আজ পঞ্চাশ টাকা মাইনের রিপোর্টারের এত খবর নিচ্ছেন, কি ব্যাপার?'

'যাস্ট এ মিনিট' বলে গার্গী অন্য কাউকে লাইন দিতে গেল। আমি টেলিফোন ধরে রইলাম। একটু পরেই ফিরে এলো আমার লাইনে। বলল, কাল-পরশু আপনার অনেক টেলিফোন এসেছিল।

আমি গার্গীকে দেখতে পাই না কিন্তু বেশ অনুভব করতে পারছিলাম ওর হাসি-খুশী ভরা মুখখানা। আমি এবার একটু ঠাট্টা করে বললাম, 'আমি তো মিস গার্গী চক্রবর্তী নই যে আমার অনেক টেলিফোন আসবে!'

'তাই বুঝি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

গলার স্বরে একটু অভিনবত্ব এনে গার্গী বলে, 'অনেকে না হোক, একজনও তো অনেকবার টেলিফোন করতে পারে...... যাস্ট এ মিনিট......'

গার্গী আবার লাইন দিতে চলে যায়।

আমি ভাবি কে আমাকে অনেকবার টেলিফোন করতে পারে। মেমসাহেব হয়ত একবার টেলিফোন করতে পারে কিন্তু অনেকবার কে করল?

গার্গী এবার ফিরে এসে বলল, সত্যি বলছি একজন আপনাকে অনেকবার......

'কিন্তু তাতে আপনার এত ইন্টারেস্ট?'

'কিছুই না। তবে এতদিন আপনার এই ধরনের টেলিফোন আসত না বলেই আর কি......'

এবার আমার মনে সন্দেহ দেখা দিল। তবে কি মেমসাহেবই?

গার্গী বলল, ধরুন, আমি তাঁর সংগে কানেকশন করে দিচ্ছি।

'আপনি বুঝি নাম্বারটাও জেনে নিয়েছেন?'

ওদিক থেকে গার্গীর গলার স্বর শুনতে পেলাম না। একটু পরেই বলল, নিন, স্পীক হিয়ার।

আমি বেশ সংযত হয়ে শুধু সম্বোধন করলাম, নমস্কার।

'নমস্কার।'

'কি খবর বলুন।'

'কি আর খবর! আপনারই তো দুদিন পাত্তা নেই।'

মেমসাহেব দুদিন ধরে আমাকে খোঁজ করেছে জেনে বেশ সুখী হলাম। তবুও ন্যাকামি করে প্রশ্ন করলাম, আপনি কি টেলিফোন করেছিলেন?

'কি আশ্চর্য! আপনাকে কেউ বলেন নি?'

আমাদের অফিস আর হরি ঘোষের গোয়ালের মধ্যে যে কোন পার্থক্য নেই সেকথা মেমসাহেবকে কি করে বোঝাই। তাই বললাম, খবরের কাগজের অফিসে এত টেলিফোন আসে যে কারুর পক্ষেই মনে রাখা সম্ভব নয়। তাছাড়া রোজই তো ডিউটি বদলে যাচ্ছে।

মেমসাহেব সঙ্গে সঙ্গে বলল, কেন ঐ অপারেটর ভদ্রমহিলা আপনাকে বললেন না?'

গার্গী হঠাৎ আমাদের দুজনের লাইনে এসে বলে গেল, বলেছি।

মেমসাহেব চমকে গেল। আমি কিন্তু [illegible] গার্গী আমাদের লাইন ছেড়ে [illegible] জন।

[illegible]সাহেব আমাকে প্রশ্ন করল, কে [illegible]?

উনি গার্গী চক্রবর্তী।'

হাজার হোক মেয়ে তো! গার্গীর নাম শুনেই মেমসাহেবের মনটা সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে। হয়ত বা ঈর্ষাও। তাই হেয়ালী করে জানতে চায়, আপনার সঙ্গে বুঝি মিস চক্রবর্তীর বিশেষ পরিচয় আছে?

আমি আপন মনেই একটু হেসে নিই। আর বলি, অধিকাংশ অপারেটরের সঙ্গেই আমাদের প্রায় সব রিপোর্টারদেরই যথেষ্ট পরিচয় আছে।

আমি আবার টিপ্পনী কেটে জিজ্ঞাসা করি, কোন ছোট প্রেমের গল্পের প্লট এলো নাকি আপনার মাথায়?

খোধকরি মেমসাহেব বুঝেছিল, গার্গীর বিষয়ে আর প্রশ্ন করার প্রয়োজন নেই। 'কালকে আপনার সঙ্গে দেখা করে প্লটটা ঠিক করব।'

আমি সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করি, কখন দেখা হচ্ছে?

'বিকেলের দিকে হতে পারে।'

'বিকেল পাঁচটায় লিণ্ডসে স্ট্রীটের মোড়ে আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করব। আসবেন।'

'হ্যাঁ, আসব।'

দোলাবৌদি, তুমি তো জান কলকাতার শহরে মধ্যবিত্ত ছেলেমেয়েদের একটু প্রেম করা কি দুরূহ ব্যাপার। প্রেম করা তো দূরের কথা, একটা গোপন কথা কইবার পর্যন্ত জায়গা নেই কলকাতায়। আমাদের শৈশবে লেকে গিয়ে প্রেম করার প্রথা চালু ছিল, কিন্তু পরে লেকের জলে এতগুলো ব্যর্থ প্রেমিক-প্রেমিকা আত্মহত্যা করল যে লেকে গিয়ে প্রেম করা তো দূরের কথা, একটু বেড়ানও অসম্ভব হলো।

এমন একটা আশ্চর্য শহর তুমি দুনিয়াতে কোথাও পাবে না। শুধু কলকাতা বাদ দিয়ে পৃথিবীর সমস্ত শহরে-নগরে কত সুন্দর সুন্দর বেড়াবার জায়গা আছে। নিত্যনতুন আরো সুন্দর সুন্দর বেড়াবার জায়গা তৈরী হচ্ছে কিন্তু আমাদের কলকাতা? সেই জব চার্নক আর ক্লাইভ সাহেবের ওভারসিয়ারবাবুরা যা করে গেছেন, আমাদের আমলে তাও টিকল না। কলকাতার মানুষগুলোকে যেন একটা অন্ধকূপের মধ্যে ভরে দিয়ে চাবুক লাগান হচ্ছে অথচ তাদের চোখের জল ফেলবার একটু সুযোগ বা অবকাশ নেই।

সমস্ত যুগে সমস্ত দেশের মানুষই যৌবনে প্রেম করেছে ও করবে। যৌবনের সেই রঙীন দিনগুলোতে তারা একটু দূরে থাকবে, একটু আড়াল দিয়ে চলবে। কিন্তু কলকাতায় তা কি সম্ভব? নতুন বিয়ে করার পর স্বামী-স্ত্রীতে একটু নিভৃতে মনের কথা কইবার জায়গা কোথায়? মাতৃহারা শিশু বা সন্তানহারা পিতামাতা গলা ফাটিয়ে প্রাণ ছেড়ে কাঁদতে পারে না কলকাতায়। এর চাইতে আর কি বড় ট্রাজেডী থাকতে পারে মানুষের জীবনে?

কেতাবে পড়েছি ও নেতাদের বক্তৃতায় শুনেছি বাঙালী নাকি সৌন্দর্যের পূজারী, কালচারের ম্যানেজিং এজেন্টস। রুচিবোধ নাকি শুধু বাঙালীরই আছে। কিন্তু হলপ করে বলতে পারি কোন নিরপেক্ষ বিচারক কলকাতা শহর দেখে বাঙালীকে এ অপবাদ নিশ্চয়ই দেবেন না। রবীন্দ্রনাথ যে কিভাবে চিৎপুর-জোড়াসাঁকোয় বসে কাব্য লিখলেন, তা ভেবে কূলকিনারা পাই না। শেক্সপিয়র বা বায়রন বা আধুনিকালের টি এস ইলিয়টকে চিৎপুরে ছেড়ে দিলে কাব্য করা তো দূরের কথা একটা পোস্টকার্ড লিখতে পারতেন না।

আশ্চর্য তবুও বাঙালীর ছেলেমেয়েরা আজো প্রেম করে, কাব্যচর্চা করে, শিল্প-সাধনা করে। যেখানে একটা কৃষ্ণচূড়ার গাছ নেই, যেখানে একটা কোকিলের ডাক শোনা যায় না, দিগন্তের দিকে তাকালে যেখানে শুধু পাটকলের চিমনি আর ধোঁয়া চোখে পড়ে, সেই বিশ্বকর্মার তীর্থক্ষেত্রে আমি আর মেমসাহেবও নতুন জীবন শুরু করলাম।

তোমাদের বাচ্চু





রাজস্থানের পুতুলনাচ

প্রদর্শনী পরিক্রমা

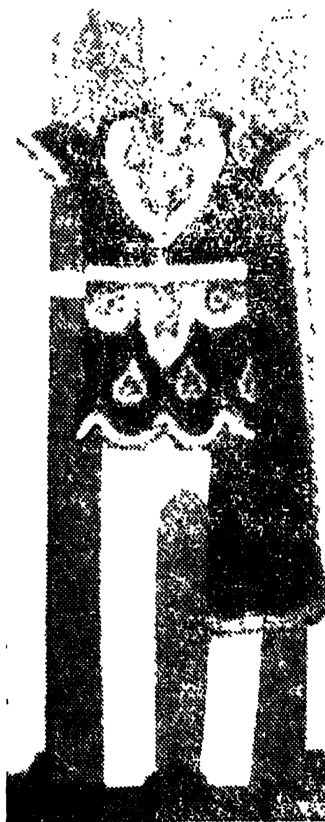
ভারতের লোকরঞ্জন শিল্প

সেসব দিন আর নেই। সেই মনটাও যেন হারিয়ে গিয়েছে। পুতুলনাচে রাম-রাবণের যুদ্ধ, শূর্পনখার নাক-কান কাটা দেখে যে রোমাঞ্চ হত, সেই রোমাঞ্চ আর খুঁজে পাওয়া যায় না। দুঃখের কথা বাংলাদেশে সেই পুতুলনাচও আর দেখা যায় না। বংশানুক্রমে যারা পুতুলনাচ দেখাত, জীবিকার সন্ধানে তাদের অন্য ক্ষেত্রে যেতে হচ্ছে। মানুষের রুচিও বদলে গিয়েছে; সেটাও হয়ত একটা কারণ। সাবেকী রীতিতে পুরনো কাহিনীর পরিবেশন আজকের শিশুদের মনে কতটা আনন্দ দেয় কি দেয় না তা অনুসন্ধানের বিষয়।

তবে শহরের মানুষের মন বদলে গেলেও গ্রামীণ-ভারতবর্ষে সাবেকী লোক-রঞ্জনের মাধ্যমগুলি এখনো মরে যায়নি। এই মাধ্যমগুলিতে ব্যবহৃত জিনিস, পোষাক আসাক, পুতুল, মুখোশ ইত্যাদির বিচিত্র গঠন, রূপ আর দুঃসাহসিক মৌলিক রঙের সংযোগে সৃষ্ট বর্ণ-সমারোহ নাগরিক সভ্যতা-পুষ্ট মানুষের মনেও একটা অন্য জগতের সন্ধান দেবার সামর্থ্য রাখে।

ভারতবর্ষে দীর্ঘকাল প্রচলিত নৃত্য, নাট্য, পুতুল-নাচ ইত্যাদি লোকরঞ্জন শিল্পের মধ্যে বাংলা দেশের যাত্রা, উত্তর প্রদেশের রামলীলা, মণিপুরের রাসলীলা, দক্ষিণ ভারতের কথাকলি, ভাগবতমেলা নাটকম্ ইত্যাদির খ্যাতি আজকের দিনে ভারতের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছে। এইসব অভিনয়ে যে-সব সাজ-সজ্জা ব্যবহার করা হয়ে থাকে, তার একটি সুন্দর প্রদর্শনী ১০ থেকে ১৬ মার্চ অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে হয়ে গেল।

ভারতের আধুনিক নাগরিক জীবনে বড় রঙের অভাব। কিন্তু এইসব লোকরঞ্জন শিল্পে ব্যবহৃত জিনিসগুলির বর্ণ-সমারোহ দেখলে যারা ভারতের মাটির কাছাকাছি থাকে, তাদের সহজাত সৌন্দর্যবোধে বিস্ময় জাগে। কথাকলি নৃত্যে শূর্পণখা, হনুমান, রাবণ প্রভৃতি চরিত্রের মুখোশ আর সাজ-সজ্জায় লাল, সাদা, সবুজ, কালো,



শাকী নাচ

সোনালির সমারোহ। রামলীলার রাম, সীতা ও রাবণের পোশাকের কমলা, নীল আর বেগুনির ওপর রূপোলি জরির ঝলমলে রং, বাংলাদেশের যাত্রার রাজার শাদা পাজামা, কোর্তা, আর নীলের ওপর জরির কাবা-জাতের পোশাক আর পাগড়ি, উত্তর প্রদেশের রামায়েতের মুখোশের বিচিত্র জরির সেলাই, মহারাষ্ট্রের নাটকের রাজার চরিত্রের কোমল রঙের বাহার, হায়দ্রাবাদের লম্বাডি মেয়েদের ঘাঘরা আর কাঁচুলিতে হলদে, কমলা, নীল রঙের সংগে টুকরো টুকরো কাঁচের আয়না বসিয়ে বিশেষ রূপের সৃষ্টি বা মহীশূরের রাবণের মুখোশের বিচিত্র গঠন আর রাজস্থান, উড়িষ্যা, অন্ধ্র, বিহার প্রভৃতি জায়গার বিচিত্র গঠন ও বিচিত্র মাপের উজ্জ্বল বর্ণের সাজের পুতুলের সমারোহে আমাদের লোকশিল্পের একটা একান্ত বৈশিষ্ট্যের চেহারা দেখা যায়।

তারপরে আছে মুখোশ। কত রকমের আর কত বিচিত্র জিনিষ দিয়েই না তৈরী। কাঠ, সোলা, কাগজের মণ্ড, কাঁসা বা রূপোর বৈচিত্র্যময় গঠনে তৈরী এই সব বর্ণাঢ্য মুখোশের মধ্যে, শিব-দুর্গা, হনুমান, ডাকিনী যোগিনী, রাধা-কৃষ্ণ প্রভৃতি সমস্ত চরিত্রের রূপ ফোটানো হয়েছে। এছাড়া রয়েছে গহনা। ভারতীয় গহনার গঠনবৈচিত্র্য আর সূক্ষ্ম কারুকার্যের একটা চেহারা এখানে পাওয়া যায়। সবই কাঠ বা অল্পমূল্যের ধাতু এবং পাথর বসিয়ে তৈরী। কিন্তু রূপের বাহারে অতি-আধুনিকাদেরও মনোহরণ করতে পারে। অভিনয়ে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র ও অস্ত্রশস্ত্রের নমুনাগুলিও প্রদর্শনীতে সুন্দরভাবে সাজানো ছিল। চারশোর ওপর নিদর্শনের এই বড় প্রদর্শনীতে অবশ্য ভারতের সমস্ত রাজ্যের লোকরঞ্জন শিল্পের নিদর্শন রাখা সম্ভব হয়নি। কিন্তু যেটুকু রাখা হয়েছিল তাও দেখবার সুযোগ আমাদের সচরাচর হয় না। নিখিল ভারত হস্তশিল্প সংস্থা ইতিপূর্বে এই ধরনের অনেকগুলি ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনী করেছেন এবং ভবিষ্যতেও করবেন। এতে আমাদের চোখ খুলবে। শহুরে হয়ে পড়ায় দেশের বেশীর ভাগ দরিদ্র

মানুষ যেখানে বাস করে তাদের রুচিবোধ সম্পর্কে আমরা অনেক সময় একটা পিঠ-চাপড়ানো উন্নাসিক ভাব প্রকাশ করে থাকি। এই অজ্ঞতা দূর করতে, তাদের রূপসৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধা আনতে, আর তাদের সঙ্গে একাত্মবোধ জাগাতে, তাদের সৃষ্টির সঙ্গে পরিচিত হওয়া আমাদের নিজেকে খুঁজে পাওয়ার জন্যেই একান্ত প্রয়োজন। পার্থিব বৈভবে আমরা অধিকাংশ এখনো দরিদ্র। কিন্তু এই দারিদ্র্যের মধ্যে এই রূপ আর রঙের সমারোহের উৎসটা খুঁজে বার করতে পারলে আমাদের অনেকখানি পাওয়া হবে।

●

ফটোগ্রাফিক অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল কলকাতা তথ্যকেন্দ্রে ২৪শে ফেব্রুয়ারী থেকে ৯ই মার্চ তাঁদের বার্ষিক প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করলেন। এঁদের সভ্যবৃন্দ এবং সর্বভারতীয় প্রতিযোগীদের পাঠানো ছবি নিয়ে ৬০।৭০ খানির মত একবর্ণ আর ৩০খানির ওপর রঙীন স্লাইডের পরিচ্ছন্ন প্রদর্শনীতে অনেকগুলি সুন্দর ফটোগ্রাফ দেখা গেল। কিছুদিন ধরে যেসব ট্রিক ফটোগ্রাফির একটা ঢেউ দেখা গিয়েছিল, বর্তমান প্রদর্শনীতে সেগুলি সযত্নে পরিহার করা হয়েছিল। সোজা সাদা-সিধে ছবি, যেখানে টোন, আলো আর কম্পোজিসনের দিকে দৃষ্টি রেখে রূপ আর আবহাওয়া সৃষ্টির দিকে মনোযোগ দেওয়া হয়েছে, সে-ধরনের কাজেরই বাহুল্য দেখা গেল। সর্বভারতীয় বিভাগে বাদলচন্দ্র দাস ও অরুণকুমার গাঙ্গুলীর তোলা দৃশ্যগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কে এন মালে, দীপক মিত্র, অরুণাংশু মুখার্জি ও প শর্মার প্রতিকৃতিগুলি বেশ উঁচু দরের। সভ্যদের মধ্যে সুব্রত চ্যাটার্জি, সমর ব্যানার্জি চমৎকার কাজ করেছিলেন। সারা প্রদর্শনীর ছবির নির্বাচন এবং নিম্নতম মানরক্ষার চেষ্টা প্রশংসনীয়।

গোপাল সান্যাল আর্টস্ অ্যান্ড প্রিন্টস্-এ ২৭শে ফেব্রুয়ারী থেকে ৮ই মার্চ পর্যন্ত ১৩খানি অয়েল এবং ড্রয়িং-এর প্রদর্শনী করলেন। শ্রীসান্যালের ইতি-পূর্বে যে-ছবি দেখেছিলাম, বর্তমান প্রদর্শনীতে তাঁর পূর্বরীতির পরিবর্তন বিশেষ কিছু ঘটেনি। কেবল কয়েকখানি ছবিতে প্রকাশ কর্মকারের রীতিক ছাপ অনেকখানি পড়েছে, যেমন 'টুয়ার্ডস হেভন' বা 'ক্রাইস্ট বোর্ণ ডাউন ফ্রম দি ক্রস' ছবির নাম করা যেতে পারে। অধিকাংশ ছবিতেই দুঃখভারপ্রপীড়িত মানুষের বড় বড় চোখে স্তিমিত দৃষ্টি (এমন কি শিল্পীর জীব-জন্তু নিয়ে আঁকা কম্পোজিশনেও সেই একই দৃষ্টি দেখা যায়) যা দর্শকের অনু-ভূতিকেও স্তিমিত করে আনে। এছাড়া তিনি খৃস্টমূর্তিকেও তাঁর চিত্রের অন্যতম বিষয়-বস্তু করেছেন।

আধুনিক তরুণ শিল্পীদের অনেকের কাজে আজকাল খৃস্টমূর্তি এবং গীর্জা নিয়ে প্রচুর পরীক্ষা দেখা যাচ্ছে। তবে এগুলি প্রকৃতপক্ষে তাদের বা দর্শকদের মনে কতখানি মূল প্রোথিত করতে পারে, তা অনুমানসাপেক্ষ। ইউরোপের শিল্প-কলার এই মূর্তি দীর্ঘকাল ধরে শিল্পীর এবং সমাজজীবনের মধ্যে অনুপ্রেরণা স্বাভাবিক কারণেই যুগিয়ে এসেছে। আমাদের শিল্পীরা একে হঠাৎ কোন একটা রেডিমেড কম্পোজিশন হিসেবে গ্রহণ করে বসছেন না তো?

●

এস্প্লানেডের রেফুজি হ্যাণ্ডিক্রাফ্টের 'প্রদর্শিনী' গ্যালারীতে গীতাঞ্জলি আলাগ, নীনা ভারমা এবং বীণা চন্দক—এই তিন মহিলা বারোখানি অয়েল পেণ্টিং ৪ঠা থেকে ১১ই মার্চ পর্যন্ত প্রদর্শন করলেন। এঁদের সকলের কাজই অ্যামেচারিশ, তবে সাদাসিধে ধরনের। বেশীর ভাগ ছবিই হয় কোন নিসর্গ দৃশ্য নয়ত দৈনন্দিন জীবনের কর্মরতা নারী বা কোন মহিলার প্রতিকৃতি। নীনা ভার্মার একটি স্টিল লাইফ এবং গীতাঞ্জলি আলাগের একটি অয়েল স্কেচ উল্লেখযোগ্য।

●

দীর্ঘকাল পরে কেমৃড-গ্যালারীতে অরুণ বোসের ড্রয়িং ও পেণ্টিং-এর একটি প্রদর্শনী করা হল। ২রা থেকে ১১ই মার্চ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এই প্রদর্শনীতে সর্বসমেত ১১খানি ছবি শ্রীবোস উপস্থিত করেন। ইতিপূর্বে এক যৌথ প্রদর্শনীতে তাঁর এই জাতের কিছু ছবির নিদর্শন দেখা গিয়েছিল। প্রদর্শনীর অধিকাংশ ছবিতেই কতকটা মুখোসের মত কতকগুলি মুখ-বিকৃতি দেখা যায়, যার মধ্যে দিয়ে হয়ত বর্তমান জীবনের বিভিন্ন ধরনে নিপীড়নের মধ্যে বিভ্রান্ত মানুষের প্রতিকৃতির সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। "ক্রুয়েল ইনোসেন্স" "টুইস্টেড ক্রাই", "এলিয়েন চাইল্ড" প্রভৃতি ছবির মধ্যে এই ধরনটা পরিস্ফুট। অন্যান্য ছবিতে তাঁর ব্যক্তিগত প্রতীকের প্রয়োগ সুস্পষ্ট। গ্রাফিক শিল্পী হিসেবে শ্রীবোসের এই ছবিগুলির রং এবং রেখার মধ্যে হয়ত গ্রাফিকধর্মীতা একটু বেশীভাবে দেখা যাবে। কিন্তু কেবল সেইজন্যেই ছবির বিরুদ্ধ সমালোচনা হওয়া উচিত নয়। ডিজাইন, কম্পোজিশন এবং ডেকরেশনের দিকে যে মনোযোগ দেওয়া হয়েছে সেখানে কোন দ্বিধাসঙ্কুচিত ভাব নেই।

—চিত্ররসিক

হংস (কেরালা)





বিদেশ প্রত্যাগত রবিশংকর

'আমি ঐতিহ্যচ্যুত-শিল্পী নই, হিপি-বিট্‌লদের নায়কও নই, একান্তই ঐতিহ্যমন্ডিত ভারতীয় সংগীতের সেবক।'

- রবিশংকর।

তেরমাসব্যাপী দীর্ঘ বিদেশ-সফর প্রত্যাগত পন্ডিত রবিশংকর এক মনোজ্ঞ ঘরোয়া বৈঠকে সাংবাদিকবৃন্দের সঙ্গে মিলিত হয়ে অনেক বিতর্কমূলক প্রশ্নের জবাব দিলেন। সর্বশ্রী জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, অদ্রিজা মুখোপাধ্যায়, ভূদেবশংকর, জগদীশ চট্টোপাধ্যায় এবং বিমান ঘোষ আয়োজিত সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে সজ্জিত এই সভার আকর্ষণীয় পত্রপুষ্প আল্পনা ইত্যাদির ভারতীয় সৌন্দর্য মিঃ হফম্যান ও সম্প্রদায়কে (যাঁরা রবিশংকরজীকে কেন্দ্র করে একটি ডকু-মেন্টারী চিত্র-গ্রহণ করছেন এবং এই সভা সেই চিত্রের এক বিশেষ অংশ) মুগ্ধ করেছে।

অদ্রিজা মুখোপাধ্যায় ও জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ সভার উদ্বোধন ভাষণে বলেন, স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় আধ্যাত্মিক সম্পদ সম্বন্ধে বিশ্ববাসীকে সচেতন করেছিলেন, কবিগুরু ভারতের কাব্য ও সাহিত্যকে বিশ্বের রসিকসমাজের দরবারে সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, এবং ভারতীয় সংগীতের অপরিমেয় ও বিস্ময়কর সৌন্দর্য-লোকের প্রতি বিদেশীর মুগ্ধদৃষ্টিকে আকর্ষণ করেছেন—স্বয়ং রবিশংকর ও আলি আকবর। আজ বিদেশীরা শুধু এ সংগীত শুনেই তৃপ্ত নয়, শিখতেও চান, এবং সেই কারণেই পন্ডিতজী ও আলি আকবর খাঁ সাহেবকে অধিকাংশ সময় ওদেশেই কাটাতে হয়। এ গৌরব সারা ভারতবাসীর—এবং এ গৌরব অর্জনকারী দুইজনেই বাঙালী—এ সত্য বারবার স্মরণ করবার মতো।

অন্যান্যবারের সাংবাদিক সম্মেলনের সঙ্গে এবারের তফাৎ হলো এই যে, এবার পন্ডিতজী বিদেশীদের চিত্তবিজয়-কাহিনী সবিস্তারে দেশবাসীর গোচরে আনবার জন্য এই সম্মেলন আহবান করেননি। সাংবাদিকবৃন্দ আহূত হয়েছিলেন,—তাঁদের জিজ্ঞাস্য এবং বিভ্রান্তকারী বহুল প্রচারিত মতবাদের সত্যাসত্য বিষয়ে অবগত হবার জন্য।

আমাদের প্রশ্ন ছিল বিটল-হিপি এবং 'টিন-এজার' সমাজের নায়কত্ব প্রাপ্তিই তাঁর আন্তর্জাতিক খ্যাতির মানদন্ড কিনা? ওদেশের সত্যিকারের গুণী ও সংগীতজ্ঞ মহলকে ভারতীয় সংগীত কতটা আকর্ষণ করতে পেরেছে? ওদেশের ভারতীয় সংগীত-শিক্ষার্থীদের পক্ষে এই বিদ্যা আয়ত্ত করে, এর মেজাজ ও বৈশিষ্ট্য পরিবেশন করা

সম্ভব কিনা? ক্রমাগত বিদেশী-শ্রোতাদের বাজনা শোনাতে গিয়ে ভারতীয় সঙ্গীতের আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্য থেকে তিনি ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছেন বলে একটা অসন্তোষপূর্ণ অভিযোগ শোনা যাচ্ছে এ সম্বন্ধেই বা তাঁর বক্তব্য কি? ইত্যাদি।

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে পন্ডিতজী বললেন, ওখানের সমস্ত বড় বড় হলের বিরাট শ্রোতৃমন্ডলী-দের কিছু অংশে হয়ত হিপি ও 'বিটল' থাকতেন। পন্ডিতজী বাজনার আগে ভারতীয় পরিবেশিতব্য রাগ তার মেজাজ ইত্যাদির বিষয় সংক্ষেপে বোঝাতে গিয়ে হিপি-বিটল-শ্রোতাদের প্রতি ঔদাসীন্য না দেখিয়ে তাদের মত করেও কিছু বলতেন যাতে সকল শ্রেণীর শ্রোতাই আপনাপন গ্রাহকতা অনুসারে সংগীতের রসগ্রহণে সমর্থ হয়। কিন্তু এসব অনুষ্ঠানের খবর দিতে গিয়ে ওদেশের সাংবাদিক মহল—তাঁর বক্তব্যের অন্যান্য সকল অংশ বাদ দিয়ে—হয়ত বিশেষ করে হিপি-বিটল ও তরুণ সম্প্রদায়ের ওপরই বেশি জোর দিয়ে ক্যাপসন তৈরী করেছেন।

এজন্য ওদেশ এবং এদেশ উভয় দেশেই এমন সব বিভ্রান্তকর মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে যার জন্য রবিশংকর দায়ী নন। হিপিদের সম্বন্ধে তাঁর মত হলো এই যে, হিপি-সমাজে তাঁর সুবিপুল জনপ্রিয়তা মাত্র সম্প্রতিকালের ঘটনা। কিন্তু ইহুদি-মেনুইন প্রমুখ ইউরোপের গুণী-সমাজে তাঁর সমাদরের আসন এ ঘটনার বহু আগেই সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁর প্রতি হিপিদের আকর্ষণের ব্যাপারটা খুব আলোড়ন সৃষ্টি করেছে এবং তার সপল্লবিত প্রচার ঘটেছে বলেই এটাকে এতখানি প্রাধান্য দেবার কোনো কারণ নেই। কারণ এর জন্য মূলে পন্ডিতজীর দায়িত্ব ততখানি নয়, যতখানি দায়ী হুজুগপ্রিয় এক শ্রেণীর বিদেশী সাংবাদিক।

ব্যক্তিগতভাবে হিপিদের গুণকে তিনি যতখানি শ্রদ্ধা করেন ঠিক ততখানি অশ্রদ্ধা করেন তাদের উচ্ছৃংখল জীবন-পদ্ধতিকে। যেমন সকল রকম মাদকদ্রব্যের প্রতি তাদের প্রবল আসক্তি এবং ভারতীয় সংগীতের সঙ্গে তাকে জড়িত করার প্রচেষ্টা। 'আমি বাজনার আগে স্পষ্ট এবং প্রাঞ্জল ভাষায় ঘোষণা করতাম, কোনোরকম নেশাগ্রস্ত-ব্যক্তি ঢুলু-ঢুলু নেত্রে আমার বাজনার আসরে এলে বাজানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ভারতীয় সঙ্গীত সাধনার বস্তু। মানুষের মনকে বাস্তবজগৎ থেকে ছিন্ন করে ভাবলোকে পৌঁছে দেবার সম্মোহনকারী শক্তি এ সঙ্গীতের মধ্যেই নিহিত। তার জন্য বাইরের কোনো উত্তেজক নিষ্প্রয়োজন। শিল্পী শ্রোতা উভয়কেই ধ্যাননিবিষ্ট চিত্তে এ বস্তু গ্রহণ করতে হয়।'

আবার 'হিপি'দের মধ্যে প্রশংসাযোগ্য গুণ হোলো তাদের 'জাগতিক' সুখে জলাঞ্জলি দিয়ে বৈরাগ্যপন্থী হবার আত্মিক শক্তি, শান্তি ও প্রেমের জন্য ব্যাকুলতা, যুদ্ধের প্রতি আন্তরিক বিতৃষ্ণা।

বিটল-প্রসঙ্গে রবিশঙ্করজী বললেন, জর্জ আমার শিষ্য, আমার সঙ্গে ভারতে এসেছে, নিষ্ঠাভরে শিখছে—এ ছাড়া বিটলদের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। জর্জ যখন প্রথম আমার কাছে এসেছিল শিষ্যত্ব করার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে, আমি তেমন আমল দিইনি। ভেবেছিলাম এটা নতুনত্বের প্রতি মোহগ্রস্ত হুজুগ ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু তার সত্যিকারের শেখবার তাগিদ, ভারতীয় সঙ্গীত ও দর্শনের প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ এবং একাগ্রতা ও নম্র-মধুর স্বভাব আমায় মুগ্ধ করেছে। তার মানে এ নয়, বিটলসমাজের প্রতি আমি আসক্ত বা তাদের সঙ্গে জড়িত। ইহুদি মেনুইন ছাড়াও ইউরোপীয় সঙ্গীতজ্ঞ ও শিল্পীমহলের পেডেরেস্কি, টোকানিনি, ফিজ্ ক্রেইস্‌লার এবং পিউবিল ক্যাসল-এর মূল্যবান বন্ধুত্বলাভে ধন্য হয়েছি। মেনুইন নিজেই আগ্রহী হয়ে ভারতীয় রাগের ওপর একটি লং প্লেয়িং রেকর্ড করেছেন আমারই পরিচালনায়। সেই রেকর্ডেরই রেকর্ড-সেল হওয়ায় ওরা আগেকার হিজ-মাস্টার-এর মডেলের একটি স্বর্ণনির্মিত রেপ্লিকা আমায় উপহার দিয়েছেন। —(সুন্দর সেই বস্তুটি আমরা দেখলামও!)—চিন্তাশীল সঙ্গীতমহলকে আকৃষ্ট করতে পেরেছি কিনা এইটেই তার যথেষ্ট প্রমাণ বলে আমি মনে করি। ওদেশের তরুণ-সম্প্রদায় আগ্রহী, জিজ্ঞাসু, সৌন্দর্যানুরাগী—এবং সরল। সত্যিকারের শিক্ষা পাওয়ার সুযোগ পেলে পরিণত শিল্পী হয়ে ওঠা তাদের পক্ষে অসম্ভব নয়। ওরা শিখছে। আমরা প্রাথমিক ভিত্তি তৈরী করে দিচ্ছি—। ভারতীয় সঙ্গীত সত্যিকার শিখতে হলে প্রচুর সময়ের প্রয়োজন। সে সময় দেবার এখনও অবধি ওদের অবকাশ হলো কই? যদি সে সুযোগ হয় পারবে না এমন কথা বলা যায় না। মিঃ হিগিনস্ দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীতে যে বিস্ময়কর কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, উদাহরণ হিসেবে সেইটাই যথেষ্ট।

ভারতীয় সংগীতের 'ট্রাডিশন' ভাঙার অভিযোগের উত্তরে পন্ডিতজী আবেগভরা কন্ঠে বললেন—'সঙ্গীত আমার ধর্ম। আলাউদ্দিন খাঁর মত ভারতীয় সঙ্গীতে ঈশ্বরসদৃশ গুরু পাবার সৌভাগ্য আমার ঘটেছে বলে আমি শুধু গর্ববোধই করি না, প্রতি মুহূর্তে সে কথা স্মরণে রাখি। তানসেনের বিরাট সঙ্গীত-সংস্কৃতি ও বীণকারের শুদ্ধতা ও শুচিতাসমৃদ্ধ যে শিক্ষা গুরুর কাছে পেয়েছি তা থেকে কখনও বিচ্যুত হইনি। শিল্পী হিসাবে আমার দুটি সত্তা—একটি সত্তা সেতার শোনায় এবং তা করে সে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতেই। অপর সত্তা স্রষ্টার কাজে উৎসাহী হয়ে চিত্রসঙ্গীত, অর্কেস্ট্রা, ব্যালে রেকর্ডিং ইত্যাদি নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যাপৃত হয়। স্রষ্টা হিসেবে আমার সকল এক্সপেরিমেন্ট সমান সমাদর লাভ করবে একথা আমি বলতে পারি না। তবে বাজাবার সময় বিশেষ করে বিদেশী শ্রোতার আসরে আমি ভারতীয় পদ্ধতির দৃঢ়নিবদ্ধ শৃঙ্খলা থেকে এতটুকুও সরে যাই না। তবে ওদেশের লোকদের 'ফাস্ট'-জীবন, সময় তাদের অল্প; তাছাড়া বাজাবার সময় দরজা বন্ধ হলে শেষ না হওয়া অবধি খোলাও হয় না। সেজন্যে এবং ভারতীয় সঙ্গীতে ওদের কান এখনো অনভ্যস্ত—এসব কথা চিন্তা করে প্রথম প্রথম বাজনার সময়কে সংক্ষিপ্ত করে ভাগ করে নিতাম। প্রথমে দ্রুত গৎ, তান, ঝালা—পরে বিলম্বিত শেষে আলাপ। ভারতীয় সঙ্গীতকে জনপ্রিয় করতে হলে এটুকু উগ্রতা না কমিয়ে উপায় নেই। তবে দীর্ঘদিন চেষ্টার ফলে এখন ওদের কান তৈরী হয়ে উঠেছে। আমাদের এখানকার শ্রোতাদের মতই দেড় ঘন্টাব্যাপী আলাপ শোনার পিপাসাই শুধু এখন ওদের প্রবল নয়। আলাপ শুনে ওদের চোখে জলও আসে। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার হলিউড বোল্-এ প্রায় আধমণ ধূপ পুড়িয়ে, উড়িষ্যার মন্ডপ আনিয়ে মঞ্চ তৈরী করে খোলা আকাশের নীচে ভারতীয় পদ্ধতিতে যে সঙ্গীতসভা হয়েছিল (তাতে ছিল, কর্নাটিক মিউজিক, আমার, আলি আকবর ও বিসমিল্লার বাজনা) ওরা সারারাত ধরে সে চালিয়ে যেতে চেয়েছিল; কিন্তু ব্যবস্থা করা যায়নি বলে তা চালানো হয়েছিল রাত দুটো পর্যন্ত। তাছাড়া ওদের মতো পঞ্চম সোয়ারী, ধামার, চৌতাল ইত্যাদি কঠিন তালের সঙ্গে নির্ভুলভাবে তাল দিয়ে শোনা দক্ষিণ ভারত ছাড়া এদেশেও দুর্লভ। এই আগ্রহ সঞ্চারের মূলে আমি ছাড়াও আলি আকবর, বিসমিল্লা এবং অন্যান্য শিল্পীদের অবদান অনস্বীকার্য।

সেদিন সাক্ষাৎকারের শেষে মনে হল, আজ উভয় দেশের মধ্যে সাংগীতিক মেলবন্ধন গড়ে ওঠার মূলে আছে ওদের জানবার অদম্য আগ্রহ, গ্রহণশীল মন, সঙ্গীতের প্রাথমিক বনেদ (তা ক্ল্যাসিকাল হোক) এবং পন্ডিতজীর বাজনার বাদে ছাড়াও বিশ্লেষণী-শক্তি, ইংরেজী, জার্মান, ফরাসী প্রভৃতি নানা ভাষার ওপর দখল এবং ওদেশের বাখ, মোজার্ট প্রমুখ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত থেকে শুরু করে পপ অবধি সকল শ্রেণীর সঙ্গীতের সম্বন্ধে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার প্রাচুর্য। এর জন্য রবিশঙ্করের কাছে আমাদের ঋণের অবধি নেই।

এই অভিনন্দন অনুষ্ঠানটির জন্যে শুভেচ্ছাবাদী [illegible] মুখোপাধ্যায় ধন্যবাদার্হ।

—[illegible]

ক্যাটাবালু ঃ লি মারভিন



প্রেক্ষাগৃহ

আমেরিকায় নতুন ঢেউ

আগের

ওয়াজ মাই ভ্যালী', 'অল দি কিংস ম্যান' 'অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট' 'গন উইথ দি উইন্ড', 'দি লস্ট উইক এণ্ড' এর মত চোখধাঁধানো। তথাকথিত তারকাখচিত ব্যয়বহুল 'স্পেক্টাকুল্যার' ছবি তৈরী হয়েছে, আর এখনও যে হচ্ছে না তা নয়। এই তো সেদিনও ডেভিড লীন 'ডঃ জিভাগো'র মত ছবি করলেন। কলাম্বিয়া পিকচার্সের পতাকাতলে স্যাম স্পিগেল ও 'নেপোলিয়ান অ্যাণ্ড অ্যালেকজান্দ্রা' -র জন্যে কয়েক কোটি ডলার ব্যয়ে তার আনকোরা ছবির পরিকল্পনা করেছেন। হলিউডের এই বিলাসবহুল প্রযোজনার পাশাপাশি চিত্র চরিত্রের বিপরীত প্রথায়, বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের নতুনত্বে, অল্প খরচে অপেশাদারী অভিনেতাদের নিয়ে এক ধরনের ছবি উঠছে। যদিও এই নতুন চিত্র প্রযোজনা সাধারণ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে সমালোচক ও দর্শকদের কিন্তু এই নতুন চিত্র তৈরীর শুরু হয়েছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের রক্তক্ষয়ী দিনে। বিশেষভাবে বুদ্ধিজীবী যুবসমাজ এই ভেবে অনুপ্রাণিত হয়েছিল যে চলচ্চিত্র শুধুমাত্র প্রমোদমাধ্যমই নয়, আত্মপ্রকাশেরও অন্যতম আধুনিক মাধ্যম। তারা করল কি, না গ্রিফিথ, স্ট্রোহাইম, ফ্লাহার্টি, ফোর্ড প্রভৃতি চিত্রবিদদের কাজকর্ম, ছবি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে নিজেদেরকে গড়ে তুললো। আমেরিকার আর্ট থিয়েটারগুলো ভর্তি হয়ে গেলো এঁদের ছোট ছোট ছবি দিয়ে। তার অপরিহার্যভাবেই এই নতুনরা প্রকাশিত হতে শুরু করল হলিউডের চিত্রজগতে। আগেকার দিনে যেমন চ্যাপলিন বা ম্যাক সেনেট তাদের নিজেদের ছবির কাহিনী রচনা, পরিচালনা এমন কি অভিনয় পর্যন্ত নিজেরাই করতেন এঁরাও তেমনি নিজের ছবির প্রায় সব দায়িত্বই নিজেরা নিলেন। এরা চিত্রের প্রকাশভঙ্গিতে নতুন বৈচিত্র্য, অধিকতর সূক্ষ্ম চিন্তার অনুপ্রবেশ করালেন এবং তথাকথিত ব্যবসায়িক ছবির প্রতি এঁদের প্রচণ্ড অনীহা ঝরে পড়তে লাগল এঁদের প্রতিটি ছবিতে।

১৯৫০ সালে যখন চিত্র নির্মাণ ক্ষেত্রে স্বাধীন প্রযোজনার ক্ষেত্র প্রসারিত হল তখন তার বেশীর ভাগ অংশীদারই হোল নিউইয়র্কের 'গ্রীনউইচ' গ্রামের সামাজিক বোহেমিয়ান গোষ্ঠী। চিরাচরিত মানবিক কনভেনশন-এর প্রতি অবজ্ঞা বা বিশ্বাসহীনতার দৃষ্টি দিয়ে স্বল্প খরচে তোলা এসব ছবির প্রদর্শন হত সাধারণের আড়ালে 'রুদ্ধকক্ষে'। তাই অনেকে এ সব ছবিকে বলতো 'আণ্ডারগ্রাউণ্ড ফিল্ম'। এখন যে সব ছবি তৈরী হচ্ছে তাতে আর লুকোন-ছাপানর কোন ব্যাপার নেই, প্রকৃতিকদু সংলাপ থেকে শুরু করে অস্বাভাবিক যৌনদৃশ্য কোন কিছুই দেখাতে ছাড়ছেন না এই পরিচালকেরা। সমালোচকদের কেউ এদের ছবিকে 'পর্নোগ্রাফি', 'ট্র্যাশ' বলে ছুড়ে দিচ্ছেন আবার কেউ এদের মধ্যে শৃঙ্খলার অভাব দেখে বিলাপ করছেন সহানুভূতির দৃষ্টিতে।

এ ব্যাপারে সবচাইতে তীক্ষ্ম সমালোচনার মুখোমুখি যিনি হয়েছেন নাম তার অ্যাণ্ডি ওয়ারহল। ওর 'স্লিপ' ছবিতে একনাগাড়ে ছ ঘণ্টা ঘুমোনোর একটি দৃশ্যকে দেখানো হয়েছে। ঘুমন্ত অবস্থায় চরিত্রের মানসিক পরিবর্তন ও পরিচালকের অবসাদ ও চেতনাই ছবির মূল কথা। 'দি চেলসী গার্লস' ছবিতেও নিউইয়র্কের এক ছোট হোটেলের জীবনযাত্রাকে সাড়ে তিন ঘণ্টা ধরে দেখানো হয়েছে। হোটেল জীবনের দুঃখ, ব্যবস্থা, হাসি কান্না সব কিছুই আছে ছবিতে আর তা সবই বড় নগ্ন: কিন্তু এদের এই স্বেচ্ছা খেয়ালীপনা, মানবিক ভ্রষ্টতা সত্ত্বেও এদের ছবিই, এদের চিন্তাই আমেরিকার নতুন পরিচালকদের প্রভাবিত করছে চিরাচরিত প্রথা ছেড়ে নতুন পথে পা বাড়াতে। ১৯৬০ এর গোড়ার দিকে স্বাধীন চিত্রপ্রযোজকরা অনেকেই নতুন স্টাইলের কথা চিন্তা করছিলেন। এবং তাদের সেই চিন্তার ফলশ্রুতিস্বরূপ জন কাসাভেটস এর 'স্যাডো', (নিউইয়র্কের পটভূমিকায় এক নিগ্রো পরিবারের বিভিন্ন সমস্যার চিত্রায়ন) এলিনর পেরীর 'ডেভিড অ্যাণ্ড লিজা' (দুটি যৌবনোন্মুখ মানবিক বিকারগ্রস্ত ছেলে মেয়ের কাহিনী) ছবি দুটো পেয়েছিলাম।

পরবর্তীকালে আমেরিকার পশ্চিম দিকটা এ ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার তীর্থস্থান হয়ে উঠল। সান ফ্রান্সিস্কোর জন কর্টি, এক অসুখী দম্পতিকে নিয়ে তুললেন 'ক্র্যাজি কুইল্ট' (১৯৬৬), পরের বছর তুললেন জনৈক কৌতুকাভিনেতার সাফল্য ও ব্যর্থতার ওপর ভিত্তি করে 'ফ্যানিব্যাঙ্ক'। এদিকে জনৈক ব্রুস ব্রাউন তার 'দি

এঞ্জেলেস্ সামার' তুলে অনেকেরই চোখ ধাঁধিয়ে দিলেন।

এতো গেল ওপরের কথা। আমেরিকার চিত্রজগতে যে নতুনের ঢেউ জাগছিল তার অন্যতম উৎস ছিল চোরা বানের মত বিলাস-মহল স্টুডিওর অন্ধকার কোণগুলো। একদিকে যখন টি-ভির সঙ্গে প্রতিযোগিতা, অপরদিকে দর্শকচেতনা দুয়ের চাপে পড়ে চিত্রনির্মাণক্ষেত্র ধীরে ধীরে সংকুচিত হচ্ছিল তখনই এই নতুনেরা তাদের নতুন চিন্তাধারা ও স্বকীয় চেতনায় চিন্তিত হয়ে নতুন ছবির কাজ শুরু করলেন। এদের মধ্যে অনেকেই আগে টি-ভিতে কাজ করতেন। যেমন সিডনী লুমেৎ, মার্টিন রিট্, জন ফ্র্যাঙ্কহাইমার। এদের 'পনব্রোকার', 'হাড্', 'দি মাঞ্চুরিয়ান ক্যান্ডিডেট্' উল্লেখযোগ্য ছবি। এ তিনজনের পরেই প্রথমেই যার নাম মনে আসে তিনি হলেন আর্থার পেন। হেলেন কেলারের বাধিরতা ও অন্ধতার ওপর জয়ের কাহিনী নিয়ে 'দি মিরাকল্ ওয়ার্কার' 'দি চেজ্' ও সাম্প্রতিক বহু আলোচিত 'বনি এ্যান্ড ক্লাইড' ছবির পরিচালক এই পেন্ (প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য 'বনি এ্যান্ড ক্লাইড' বিভিন্ন দশটি বিভাগে অস্কার প্রতিযোগিতার জন্য মনোনীত)। কানাডার নর্মান জুইসন্ও এ আন্দোলনের দলী। ইংল্যান্ড, নিউইয়র্কে বিভিন্ন কাজে অভিজ্ঞতার পর হলিউডে এসে করলেন 'দি রাশিয়ানস্ আর কামিং'। গত বছরে তোলা ওর 'ইন দি হিট্ অফ দি নাইট্' আমেরিকার সাদা কালোর বিবাদের ওপর এক তথ্যনিষ্ঠ মানবিক দলিল চিত্র। আর্ভিং ক্রেশনার 'দি ফুডলাম্ প্রাইস্ট' দিয়ে আমেরিকার এই নতুন চিত্র আন্দোলনে যেভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন ওর নতুন ছবি 'দি ফ্লিম ফ্লাম ম্যান' বোধহয় সে জায়গা থেকে তাকে কিছু দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে। কনিষ্ঠতম না হলেও কনিষ্ঠদের মধ্যে একজন

ইউ আর এ বিগ বয় নাউ : চিত্রের একটি একটি আকর্ষণীয় দৃশ্য। একজন সহ-লাইব্রেরীয়ান চরিত্রে পিটার কার্স্টনার



হলেন উইলিয়াম ফ্রেডরিক্। টি-ভিতে কিছুদিন কাজ করবার পর 'গুড টাইমস্' নামে প্রথম একখানা ছবি করলেন উনি। ইতিমধ্যে ছবিটা সমালোচকদের সুদৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়েছে। এর পর আছেন ফ্রান্সিস ফোর্ড কোপ্পলা; ইনি লস্ এঞ্জেলস্ ফিল্ম স্কুলের গ্রাজুয়েট। স্বল্প ব্যয়ে ছবি তৈরীর কাজে সহকারী হিসাবে তিনি আগে কিছুদিন কাজ করেছেন, এখন নিজেই লেখক চিত্রনাট্যকার পরিচালক হিসাবে 'ইউ আর এ বিগ বয় নাউ' ছবিতে আত্মপ্রকাশ করলেন; দর্শক সমালোচকরা ওর মধ্যে প্রতিভার ইঙ্গিত পেয়েছেন। এছাড়া আরও অনেকে আছেন—যেমন জ্যাক স্মিথ ('হার্পার'), এলিয়ট সিলভার স্টিন্ ('ক্যাট বাল্লু')।

আজকের দর্শকদের অনেকেই শুধুমাত্র ছবি দেখতেই যান না, তারা ছবি ছাড়াও তার ভেতরে আর অন্য একটা কিছু দেখার প্রত্যাশা করেন, আরও জোর দিয়ে বলা যায় দেখবার দাবী করেন। সুতরাং শুধুমাত্র চোখ ধাঁধানো, মন ভোলানো জাঁকজমকপূর্ণ রঙীন দৃশ্যাবলী, আর অতিনাটকীয়তার চড়া রঙ আজকের দর্শককে আর আকর্ষণ করে না। সুতরাং আমেরিকায় যে এই নতুন জোয়ার এল তা কি পুরোন সব জঞ্জাল ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারবে, না কি শুধু একটা পলির আস্তরণ ফেলে দু'একগাছি লতাগুল্মের জন্ম দিয়েই আবার পায়ে পায়ে পুরোন জঙ্গলে হারিয়ে যাবে।



সিডনি পয়টার (বাম দিকে)) এবং রড স্টিগার

দেশী ছবির খবর

দেশী ছবির খবরে যে নতুন বাংলা ছবিটির মহরৎ গত ১৩ মার্চ নিউ থিয়েটার্স দ্বনম্বর স্টুডিওয় স্নসম্পন্ন হল তার নাম '**মেঘ ও রৌদ্র**'। রবীন্দ্রনাথের কাহিনী অবলম্বনে এটির চিত্ররূপ দিচ্ছেন অভিনেত্রী পরিচালিকা অরুন্ধতী দেবী। এ ছবির নায়ক চরিত্রে মনোনীত হয়েছেন নবাগত স্বরূপ দত্ত। ছবিটির প্রযোজনা করছেন কে এল প্রোডাকসন্স।

সত্যজিৎ রায় তাঁর নতুন ছবি '**গুপী গায়েন বাঘা বায়েন**'-এর বহিদৃশ্য গ্রহণ রাজস্থান অঞ্চলে শুরু করেছেন। এ মাসের শেষ অবধি এখানে ছবির চিত্রগ্রহণ চলবে। ঐতিহাসিক পটভূমিকায় ছবির কয়েকটি যুদ্ধদৃশ্য গৃহীত হচ্ছে। অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছেন তপেন চট্টোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, জহর রায়, হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, সন্তোষ দত্ত, শান্তি চট্টোপাধ্যায়, গোবিন্দ চক্রবর্তী, অশোক মিত্র, রতন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজকুমার লাহিড়ী, সাধু মুখোপাধ্যায় ও শংকর বন্দ্যোপাধ্যায়। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী রচিত এ কাহিনীর চিত্ররূপ প্রযোজনায় রয়েছেন নেপাল দত্ত এবং অসীম দত্ত।

বোম্বাইয়ে যে নতুন ছবিগুলোর কাজ শুরু হয়ে গেছে তার মধ্যে আর এস প্রোডাকসন্সের রঙিন হিন্দী ছবি '**প্যায়ার হি প্যায়ার**' উল্লেখযোগ্য। রাজকমল স্টুডিওয় ছবির কয়েকটি দৃশ্য গৃহীত হয়েছে। কে এ নারায়ণ রচিত এ কাহিনীর প্রধান চরিত্রগুলোতে রূপদান করেছেন বৈজয়ন্তীমালা, ধর্মেন্দ্র, রাজমেহরা, প্রাণ, সাপ্রু, মেহমুদ, মদনপুরী ধুমল, মনমোহন, হেলেন, সুলচনা এবং সুলচনা চ্যাটার্জী। ভাপ্পি সোনি ছবিটির পরিচালক। সঙ্গীত পরিচালনায় রয়েছেন শংকর-জয়কিষণ।

নাসির হুসেন ফিল্মসের ৭ নং প্রোডাকসনের নতুন রঙিন ছবির প্রাথমিক কাজ সম্প্রতি মেহবুব স্টুডিওয় শেষ হয়েছে। ছবিটি পরিচালনা করছেন প্রযোজক-পরিচালক নাসির হুসেন। ছবিতে অভিনয় করছেন শশিকাপুর, আশা পারেখ, লক্ষ্মীছায়া, রাজেন্দ্রনাথ এবং নিরূপা রায়। রাহুলদেব বর্মন ছবিটির সুরকার।

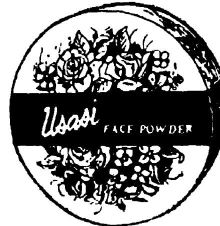
পরিচালক মণি চ্যাটার্জী তাঁর নতুন ছবি 'বাজী'-র বহিদৃশ্যগ্রহণ গোয়া অঞ্চলে সম্প্রতি শুরু করেছেন। ধ্রুব চ্যাটার্জী রচিত এ কাহিনীর মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করছেন ওয়াহিদা রেহমন, ধর্মেন্দ্র, জনি ওয়াকর, জগদীশ রাজ ও আনোয়ারা হুসেন। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন কল্যাণজী আনন্দজী

অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত 'এই করেছো ভালো' ছবির স্যুটিং জোর কদমেই এগিয়ে চলেছে ১নং নিউ থিয়েটার্সে। বিধায়ক ভট্টাচার্যের জনপ্রিয় নাটক 'তাইতো' অবলম্বনে ছবিটির কাহিনী। অনুপকুমার এবং জহর রায় দুটি প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করছেন। অন্যান্য ভূমিকায় রয়েছেন লিলি চক্রবর্তী, শমিতা বিশ্বাস, যুঁই বন্দ্যোপাধ্যায়, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, নবাগত সমরজিত, অম্বুজ মল্লিক এবং আরো অনেকে।

আর ডি বনশাল অ্যান্ড কোম্পানীর পতাকাতলে ছবিটি মুক্তি পাবে।

বম্বের জনপ্রিয় নায়িকা তনুজা বাংলা ভাষাটা বেশ ভালই আয়ত্ত করেছেন। বাংলাদেশের নায়িকা হিসেবে শ্রীমতী বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত বলা যায়। তনুজা এখন যে বাংলা ছবিটির নায়িকা চরিত্রে অভিনয় করছেন তার নাম 'তিন ভুবনের পারে'। সমরেশ বসু রচিত এ কাহিনীর চিত্ররূপ দিচ্ছেন পরিচালক আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়। এ ছবির নায়ক চরিত্রে রয়েছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। অন্যান্য চরিত্রে অংশগ্রহণ করেছেন কমল মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য, তরুণকুমার, রবি ঘোষ, পদ্মা দেবী, অপর্ণা দেবী, যমুনা সিংহ ও সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়। রমা ফিল্ম পরিবেশিত সতীর্থ প্রোডাকসন্সের এ ছবিতে সুরসৃষ্টি করেছেন সুধীন দাশগুপ্ত। ছবিটির চিত্রগ্রহণ সমাপ্তপ্রায়।

পরিচালক সুধীর মুখোপাধ্যায় যে নতুন ছবিটির কাজ প্রায় শেষ করে এনেছেন তার নাম হল 'আঁধার সূর্য'। গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু রচিত এ কাহিনীর মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করছেন রীণা ঘোষ, মৃণাল মুখোপাধ্যায়, কমল মিত্র, জহর রায়, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, দীপ্তি রায়, ছায়া দেবী এবং মন্দিরা দে। আর ডি বনশাল পরিবেশিত এ ছবির সুরকার হলেন রবীন চট্টোপাধ্যায়।



পাফ-এর স্পর্শে

তিন রকম আকর্ষণীয় রঙে পাওয়া যায়

বেঙ্গল কেমিক্যালের উষসী



দীর্ঘস্থায়ী মধুর গন্ধযুক্ত

ট্যালকম পাউডার



সুরভিত, ঠাণ্ডা এবং

প্রফুল্ল ও সজীব রাখবে। এই পাউডার ঘামাচি দূর ক'রে

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা, বোম্বাই, কানপুর, দিল্লী

মঞ্চাভিনয়

দাদু : ভানু চট্টোপাধ্যায় ও বিকাশ রায়



সম্রাট

আজ বাংলাদেশে নাট্যানুশীলনে যে নতুনতর চিন্তা ও প্রয়াসের ধারা লক্ষ্য করা যাচ্ছে তাতে রূপক নাটক ও তার প্রযোজনার এক বিশেষ ভূমিকা আছে বলে মনে হয়। রতন ঘোষের 'সম্রাট' সুগভীর অর্থসমৃদ্ধ একটি রূপক নাটক যার মধ্য দিয়ে নাট্যকার প্রাণতরঙ্গকে উচ্ছলিত করে দিয়েছেন, কালো পাথরের দেওয়াল ভেঙ্গে সে ছুটে গেছে সূর্যস্নাত জীবনের আলোয়, চির-কালীন মানুষকে সে ডাক দিয়েছে। নাটকের প্রতিটি চরিত্রই জীবনের এক একটি বৃত্তের আভাস এনেছে এবং সুষ্ঠু সমন্বয়ে জীবনের এক সত্যসমৃদ্ধ ভাস্বর রূপ ভাষা পেয়েছে এ নাটকে। রূপক নাটকের যে গভীরতর ব্যঞ্জনা তা যেমন এ নাটকে আছে, তেমনই আছে নাটকীয় ঘাতপ্রতিঘাত, চরিত্রগত সংঘাত যা 'সম্রাট'কে এক দুর্বার গতিবেগসমৃদ্ধ নাট্যসৃষ্টির মর্যাদা দিতে পেরেছে। সংলাপ রচনায় lyric এর আমেজ আছে এবং মাঝে মাঝে প্রাণপ্রতিম 'তরঙ্গের' কথা রক্তকরবীর 'নন্দিনীর' কথা মনে করিয়ে দেয়। তাই বলে 'তরঙ্গ' 'নন্দিনী'র অনুসরণে রচিত নয়, প্রাণের বন্যাধারায় ওরা দুজনে সংস্কারের অন্ধকার মুছে দিয়েছে। উচ্ছল জীবনের ঝর্ণাধারা আনার ব্যাপারেই 'তরঙ্গে'র সংগে 'নন্দিনী'র সহমর্মিতা। দক্ষিণ কলকাতার প্রখ্যাত নাট্য-সংস্থা 'রূপদক্ষ' এই দুরূহ নাটকটি সম্প্রতি মুক্ত অঙ্গনে অভিনয় করে নাট্যানুশীলনে তাঁদের বলিষ্ঠ চিন্তার স্বাক্ষর রেখেছেন।

রূপক নাটকের মঞ্চরূপায়ণে যে স্বতন্ত্র শিল্পাঙ্গিক ও অভিনয় রীতির প্রয়োজন হয় 'রূপদক্ষে'র শিল্পীদের প্রয়াসে তার মোটামুটি উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে, কিন্তু সর্বত্র স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ থাকেনি। মঞ্চের মাঝখানে একটি বড় কালো পাথর, 'দেবতা' ও 'শয়তানে'র সীমানা নির্দেশের জন্য দুটি ভিন্ন রকমের প্রতীক, একটি বেদী যেখানে সমতলের মানুষেরা আসছে। এই সেটেই সমস্ত নাটক চলেছে, মঞ্চ-পরিকল্পনায় নিশ্চয় একটা mystic effect আনতে পেরেছেন নির্দেশক তড়িৎ চৌধুরী এবং সেই lyric আরো প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে সুষ্ঠু আলোকসম্পাতে। কিন্তু মঞ্চপরিকল্পনার এই অভিনব আবেগধর্মী ব্যঞ্জনা অভিনয়ে মূর্ত হয়ে ওঠেনি। অপূর্ব এক রহস্যের আলো-আঁধারে ঘেরা এই মঞ্চে প্রতিটি শিল্পীর যে অভিনয় রীতি দেখেছি তাতে মনে হয়েছে মঞ্চপরিকল্পনার সাথে অভিনয়ধারার সমন্বয় গড়ে উঠছে না, এবং সেই বিরোধের সূত্র ধরেই সমস্ত নাটকের effect সুর কেটে গেছে।

অভিনয়ের দিক থেকে মোটামুটি উজ্জ্বল প্রাণধর্মী অভিনয় করেছেন শিপ্রা চক্রবর্তী 'তরঙ্গে'র ভূমিকায়। প্রতিটি মুহূর্তে তাঁর নিষ্ঠা মঞ্চে সজীবতা এনেছে, এনেছে কিছুটা সুরের আমেজ। এঁর সংগে তাল মিলিয়ে চলতে চেষ্টা করেছেন 'মানব' চরিত্রের রূপদাতা পঙ্কজ চক্রবর্তী। কিন্তু সব জায়গায় চরিত্রের আবেগ উপলব্ধিতে শিল্পীর সচেতনতা মুখর হয়ে ওঠেনি। 'দেবতা'কে মঞ্চে দৃশ্যমান করানো হয়নি, কিন্তু গৌতম ভট্টাচার্যের কণ্ঠে এই চরিত্রের মাধুর্য, গভীরতা একটুকু স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারেনি। নিশাচরের ভূমিকায় কমল ঘোষ দস্তিদারের অভিনয় চরিত্রের একেবারে বিপরীত রূপকে উপস্থিত করেছে, মঞ্চে তাঁর দাঁড়াবার ভঙ্গীটি অদ্ভুতরকমের হাস্যকর মনে হয়েছে। নির্দেশক তড়িৎ চৌধুরী 'শয়তানে'র ভূমিকায় নতুনতর সৌন্দর্য আরোপ করতে পেরেছেন, কিন্তু তাঁর অভিনয়ে সব সময়ে গতি থাকেনি। অন্যান্য ভূমিকায় রূপ দেন—নিখিল চক্রবর্তী (প্রবীণ), কৃষ্ণকুমার রায়-চৌধুরী (উল্লাস), কুনাল বসু (শিলাল), নবীন সেনগুপ্ত (বৃদ্ধ), দুলাল বসু (১ম), রমেন দত্ত (২য়), অলোক ভট্টাচার্য (৩য়)। নাটকের মূল বক্তব্যকে মঞ্চে শিল্পসম্মতরূপে পরিস্ফুট করে তুলতে আবহসঙ্গীত সৃষ্টির দিক থেকে দীপক চৌধুরী ও নিতাই চৌধুরীর নিষ্ঠা অভিনন্দনযোগ্য। নাটকের মাঝে মাঝে 'নবীনে'র বাঁশীটি বেজেছে প্রত্যাশিত সুরে, ছন্দে।



[illegible] ও [illegible] [illegible] দত্ত এবং [illegible] চক্রবর্তী [illegible] ফটো : অমৃত

দীপান্বিতা

'রাজ্য [illegible] শিল্পীবৃন্দ সম্প্রতি [illegible] অঙ্গনে প্রবীর মুখোপাধ্যায়ের 'দীপান্বিতা'



দুরন্ত চড়াই : মাধবী মুখোপাধ্যায়, সোমেন চক্রবর্তী, দিলীপ রায় এবং সবিতা চট্টোপাধ্যায়।

নাটকটি মঞ্চস্থ করেছেন। অবসরপ্রাপ্ত, রণক্লান্ত এক কর্নেল যিনি যুদ্ধকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করেন তাকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে এ নাটকের কাহিনী। যুদ্ধের ভয়াবহ পরিবেশ থেকে নিজের সন্তানদের ও বন্ধুবান্ধবদের তিনি সব সময়েই বাইরে রাখতে চান। কিন্তু তবু যুদ্ধ এসে তাকে ঘিরে ফেলতে চায় নানাদিক থেকে, রণক্ষেত্রের সীমা ছাড়িয়ে সমাজের পরিবেষ্টনীতে এসে প্রভাব বিস্তার করতে চায়। পরিশ্রান্ত কর্নেল রণবীর মুখার্জি 'দীপান্বিতা'র অসংখ্য প্রদীপের আবছা আলোয় ক্লান্তির চোখ মেলে সেদিকে তাকিয়ে থাকেন, ধীরে ধীরে তাঁর মনে নেমে আসে স্তিমিত মন্থরতা, তার রেশ বুঝি আজো কাটেনি।

একটিমাত্র দৃশ্যপটে অভিনীত এ নাটকের নির্দেশনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন নাট্যকার প্রবীর মুখোপাধ্যায়। কয়েকটি নাট্যমুহূর্ত সৃষ্টির ব্যাপারে তাঁর সূক্ষ্ম রসবোধ আর আন্তরিকতা সত্যি প্রশংসনীয়। প্রথমেই দর্শকের মন কেড়ে নেয় পর্দা সরতেই যখন দেখা যায় সারা মঞ্চ-জুড়ে শুধু অন্ধকার, শুধু দূরে জ্বলছে দীপান্বিতার বিন্দু বিন্দু আলো, আর একটি মেয়ে বাগানে 'একা মোর গানের তরী' গান গেয়ে গেয়ে প্রদীপ জ্বালাচ্ছে। দৃশ্যপটটিও একটি রেলিং, সত্যিই যেন ছিমছাম একটি বাগান। মাঝে মাঝে আলোকসম্পাতে সুশীল দাস অপ্রত্যাশিত সৌন্দর্য এনেছেন।

সংঘবদ্ধ অভিনয়ে শিল্পীরা খুব একটা নৈপুণ্যের পরিচয় রাখতে পারেননি। ব্যক্তিগতভাবে দু'একজন উচ্চাঙ্গের অভিনয় প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন কিন্তু সবার সাথে মিলিত হয়ে তা সামগ্রিকভাবে একটি সুষ্ঠু পরিণতিতে পৌঁছতে পারেনি। কর্নেলরূপী প্রভাত ভট্টাচার্য কিছু করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু পারেননি, অসীম ব্যক্তিত্বের অধিকারী এই চরিত্রের গভীরতা তাঁর অভিনয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারেনি। তাঁর রূপসজ্জাও বোধহয় চরিত্রের বিপরীত কথা বলেছে। খিলীন দাস ও দিপালী ঘোষ 'মেজর' ও 'বিজয়া' চরিত্রের বৈশিষ্ট্যকে রূপ দিতে পারেননি। শিশির দাস (তাপস), দুর্গাদাস মুখার্জি (তমাল), রূপ ভট্টাচার্যের (তিলক) অভিনয় সত্যি অভিনন্দনযোগ্য। 'তনিমা' চরিত্রে অসাধারণ নৈপুণ্যের সঙ্গে অভিনয় করেছেন কল্পনা ভট্টাচার্য। 'গৌরময়' চরিত্রের অভিনয়ে শিবব্রত মজুমদার এনেছেন অদ্ভুত একটি ভঙ্গিমা, সংলাপহীন একটি অপ্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন নাট্যকার স্বয়ং। অন্যান্য কয়েকটি ভূমিকায় রূপ দেন—প্রভাত চক্রবর্তী, অম্বর ঘোষ, পূর্ণিমা

মেঘভাঙা রোদ

সম্প্রতি 'ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাংক স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাবে'র শিল্পীবৃন্দ সপ্তম বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে 'বিশ্বরূপা' রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করলেন 'মেঘ ভাঙা রোদ' নাটক। সুমথনাথ ঘোষ রচিত এই কাহিনীর নাট্যরূপ দিয়েছেন মণি দত্ত, নাট্যনির্দেশনার দায়িত্বও তিনি নিয়েছিলেন। মূল কাহিনীর মধ্যে যে রহস্যের সংকেত আছে নাট্যরূপে তা সুস্পষ্টভাবে মূর্ত হয়ে উঠতে পারেনি। নাটকটির উপস্থাপনায়ও সূক্ষ্ম শিল্পচেতনার অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। কয়েকটি শিল্পীর কৃত্রিম অভিনয় সামগ্রিক নাট্যপ্রযোজনাকে প্রত্যাশিত সার্থকতা দিতে পারেনি। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন সুনীল বসু, সুরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, বিদ্যুৎ বসু, মনোতোষ মজুমদার, অনন্ত হাজরা, বিজয় কুণ্ডু, শিশির দে, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, বিশ্বনাথ ধাড়া, রমেন চৌধুরী, কাজল বর্ধন, রবীন অধিকারী, বাসুদেব মোদক, শম্ভু আইচ, রবি বসু, প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়, দেবপ্রসাদ রায়, গোপাল ঘোষ, বিমান মিত্র, শ্যামাদাস রায়, বারিদ নন্দী, অঞ্জলি গঙ্গোপাধ্যায়, দীপিকা দাস, নীরা

বিবিধ সংবাদ

আই আই টি-তে বসন্ত উৎসব

ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, খড়গপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমতুল্য এই স্বনামধন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি "আই-আই-টি" নামেই সুপরিচিত। কারিগরী, যন্ত্রবিদ্যা ও ফলিত বিজ্ঞান—প্রধানত এই বিষয়গুলো আই-আই-টি-তে শিক্ষাদান হয়, গবেষণা চলে। হিউম্যানিটিজ ও সমাজবিজ্ঞানেরও যথেষ্ট চর্চা আছে। এখানে ডিগ্রি দেওয়া হয় নানারকম— B. Tech., M. Tech., B.Sc (Hons), M.Sc., DIIT, MRP M.C.P., Ph.D. ইত্যাদি। প্রায় হাজার তিনেক ছাত্রছাত্রী ও গবেষণাকারী শ'পাঁচেক অধ্যাপক এবং অন্যান্য কারিগর, বৈজ্ঞানিক ও যন্ত্রবিদদের কর্ম-মুখর কলগুঞ্জনে আর ব্যস্ততায় আই-আই-টি'র দিন যায়।

কিন্তু আই-আই-টি'র এই বিপুল কর্মমঞ্চ সাময়িকভাবে থমকে দাঁড়ায় যখন বসন্ত আসে। সুরু হয় বসন্ত উৎসব। স্প্রিং ফেস্টিভেল। এবারকার এই পক্ষকাল-ব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ২২ ফেব্রুয়ারী আরম্ভ হয়েছিল, আর শেষ হল ৬ মার্চ সুপরিচিত বাংলা নাটক "শেষ থেকে সুরু" অভিনয়ের পর।

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এবং আই-আই-টি'র প্রথম ডিরেক্টর স্যার জে সি ঘোষের নামাঙ্কিত "জ্ঞান ঘোষ স্টেডিয়াম"-এর প্রশস্ত প্রাঙ্গণ জমজমাট ছিল এই ক'টা দিন। প্রতি সন্ধ্যায় নাচে, গানে, অভিনয়ে, বিতর্ক প্রতিযোগিতায় এবং অন্যান্য বহুবিধ সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানে মুখর হয়ে থাকত। উজ্জ্বল ও রঙীন আলোয় উদ্ভাসিত, বিচিত্র বর্ণে সজ্জিত স্টেডিয়ামে এসে প্রতি সন্ধ্যায় জমায়েত হতেন হাজার-হাজার ছাত্রছাত্রী ও ক্যাম্পাসের নরনারী শিশু। বসন্ত উৎসবের মেজাজ সারা আই-আই-টি'কে পেয়ে বসেছিল। আর এই বর্ণাঢ্য বসন্ত উৎসব হচ্ছে আই-আই-টি ছাত্র-ছাত্রীদের সাংস্কৃতিক ক্রিয়া-কলাপের প্রাণকেন্দ্র।



প্রতি রবিবার

৩টে ও ৬॥টায়

রবীন্দ্র সরোবর

(লেক) মঞ্চে

কবি কাহিনী। রচনা ও নির্দেশনায় মদন সরকার। টিকিট ২ থেকে ৭, হলে প্রতি রবিবার বেলা ৯॥টা থেকে, এবং 'মধুক্ষরা'য় (৮৬এ, রাঃ বিঃ এভি) প্রতিদিন। প্রযোজনায়—

শতাব্দী

হীরের প্রজাপতি: সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, সাধনা রায় চৌধুরী এবং সুচিতা রায়



এবারকার বসন্ত উৎসবে কী বিপুল আয়োজনটাই না হয়েছিল! 'ইন্টার কলেজিয়েট' সংগীত, নাটক, বিতর্ক ও 'কুইজ' প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছিল দেশের বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। কলকাতা থেকে এসেছিল প্রেসিডেন্সী কলেজ, সেন্ট জেভিয়ার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, লরেটো হাউস, ল' কলেজ, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট ও বি ই কলেজ। এছাড়াও এসেছিল বিশ্বভারতী, পিলানী বিশ্ববিদ্যালয় বি-আই-টি রাঁচী, বি-আই-টি সিন্দ্রি, বি-ই-টি মাদ্রাজ, আই-আই টি কানপুর।

'ইন্টার হল' প্রতিযোগিতা বসন্ত উৎসবের একটি প্রধান অংগ। হল মানে হল অফ রেসিডেন্স —আই-আই-টি'তে ছাত্রাবাসগুলোকে 'হল' বলা হয়। আই-আই-টি'র সর্বমোট হাজার তিনেক ছাত্র-ছাত্রী ও গবেষণাকারী এই আবাসিক শিক্ষায়তনের মোট এগারোটি বিপুলায়তন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ 'হল'-এ বাস করেন। খেলাধুলোর, শরীরচর্চার এবং সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক ক্রিয়াকলাপের সর্ববিধ ব্যবস্থা ও সুবিধে এই 'হল'গুলোতে রয়েছে। সুস্থ প্রতিযোগিতার ভেতর দিয়ে যাতে ছেলেমেয়েদের শারীরিক শক্তি বৃদ্ধি হয় এবং তাদের প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ ঘটে তার জন্য ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষের চেষ্টার অবধি নেই। তাই অন্যবারের মত এবারেও হয়েছে 'ইন্টার হল' প্রতিযোগিতা—বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন 'হল'-এর মধ্যে চলেছে লড়াই নানা বিষয়ে। দীর্ঘদিন ধরে চলেছে নানান প্রতিযোগিতা—ইংরেজী নাটকে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংগীতে, বিতর্ক-সভায়, আবৃত্তিতে, ছবি অংকনে এবং আরো কত কিছুতে। ছাত্র ইউ-নিয়ন—যা এখানে 'জিমখানা' বলে খ্যাত—'হল'গুলোর মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব গড়ে তুলতে সহায়তা করেন, নেতৃত্ব দেন। তাই আঞ্চলিক 'হল' আর কেন্দ্রীয় 'জিমখানা'—এই দুয়ের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার বন্ধনে আই-আই-টি'র প্রতিটি ছাত্র-ছাত্র আবদ্ধ।

'ইন্টার কলেজিয়েট' প্রতিযোগিতায় বাইরে থেকে যাঁরা এসেছিলেন তার মধ্যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, পিলানী বিশ্ব-বিদ্যালয় এবং কানপুর আই-আই-টি ইংলিশ নাটক অভিনয়ে অপূর্ব কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। বিতর্ক প্রতিযোগিতায় যাদব-পুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম স্থান অধিকার করেছেন।

বিদেশে ভারতবর্ষের টেস্ট ক্রিকেট

ক্ষেত্রনাথ রায়

১৯৩২ সালের ২৫শে জুন তারিখে ঐতিহাসিক **লর্ডস** মাঠে ভারতবর্ষ এবং **ইংল্যান্ডের মধ্যে সরকারী** টেস্ট ক্রিকেট **খেলার উদ্বোধন হয় এবং** সেই সূত্রেই **আন্তর্জাতিক সরকারী** টেস্ট ক্রিকেট খেলার আসরে ভারতবর্ষের প্রথম আবির্ভাব। ভারতবর্ষের এই প্রথম সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলাটির দুটি কারণে বিশেষ ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে—প্রথমতঃ এই খেলায় ভারতবর্ষের প্রতিপক্ষ ছিল—আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট খেলার পথপ্রদর্শক এবং আধুনিক কালের ক্রিকেট খেলার জনক ইংল্যান্ড এবং এই খেলার আসর বসেছিল ক্রিকেট খেলোয়াড়দের শ্রেষ্ঠ তীর্থ-স্থান লর্ডস মাঠে—যার প্রতিটি ধূলিকণা এবং তৃণখণ্ড ঐতিহ্য-মণ্ডিত এবং ক্রিকেট খেলোয়াড়দের কাছে পরম পবিত্র। ঘটনাচক্রে আবার ইংল্যান্ডের মাটিতেই ভারতবর্ষ তার সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনের শততম টেস্ট ম্যাচ খেলতে নামে ১৯৬৭ সালের ১৩ই জুলাই এজবাস্টন মাঠে (ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১৯৬৭ সালের শেষ ৩য় টেস্ট)। দীর্ঘ ৩৬ বছর (১৯৩২-৬৭) ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৩৭, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ২৩, অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৬, পাকিস্থানের বিপক্ষে ১৫ এবং নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ৯টি সরকারী টেস্ট খেলার সূত্রে ভারতবর্ষের শততম টেস্ট খেলা পূর্ণ হয়। পৃথিবীর মাত্র ৭টি দেশ—ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারতবর্ষ এবং পাকিস্থান পরস্পর সরকারী টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ খেলে থাকে। তবে দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে ভারতবর্ষ, ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং পাকিস্থানের আজ পর্যন্ত কোন টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ হয়নি।

বিদেশের মাটিতে ভারতবর্ষ এপর্যন্ত বিভিন্ন দেশের সঙ্গে যে **১২টি** টেস্ট ক্রিকেট সিরিজ খেলেছে তার ফলাফল দাঁড়িয়েছে : ভারতবর্ষের 'রাবার জয়' ১, পরাজয় ১০ এবং সিরিজ ড্র ১। বিদেশের মাটিতে ভারতবর্ষের একমাত্র 'রাবার' জয়—নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে—১৯৬৮ সালের সদ্য সমাপ্ত টেস্ট সিরিজে ৩—১ খেলায়। **১৯৫৪-৫৫ সালে** ভারতবর্ষ-পাকিস্থানের **৫টি** টেস্ট খেলাই অমীমাংসিত থাকে ফলে এই টেস্ট সিরিজে জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়নি। এই **১২টি** টেস্ট সিরিজের ৪৭টি টেস্ট খেলার ফলাফল : ভারতবর্ষের জয় ৩, পরাজয় ৩০ এবং খেলা ড্র ১৪।

সিরিজে শোচনীয় ব্যর্থতা

বিদেশের মাটিতে ভারতবর্ষ যে পাঁচটি দেশের সঙ্গে এপর্যন্ত ১২টি টেস্ট সিরিজ খেলেছে তার মধ্যে চারটি টেস্ট সিরিজের সমস্ত খেলায় পরাজিত হয়ে শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে : ১৯৫৯ সালে ইংল্যান্ডের কাছে ০—৫ খেলায়, ১৯৬২ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে ০—৫ খেলায়, ১৯৬৭ সালে ইংল্যান্ডের কাছে ০—৩ খেলায় এবং ১৯৬৭-৬৮ সালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ০-৪ খেলায় ভারতবর্ষ পরাজিত হয়। ১৯৫৪-৫৫ সালে পাকিস্থানের বিপক্ষে পাঁচটি টেস্ট খেলাই ড্র যায়—এ ফলাফল ভারতবর্ষের পক্ষে নিঃসন্দেহে শোচনীয় ব্যর্থতারই পরিচয়।

ভারতবর্ষ এপর্যন্ত পাঁচটি দেশের বিপক্ষে ২৬টি সরকারী টেস্ট ক্রিকেট সিরিজ খেলে (স্বদেশে ১৪ ও বিদেশে ১২) মাত্র **৫টি** সিরিজে রাবার জয়ী হয়েছে—নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে **৩টি,** ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১টি (১৯৬১-৬২ সাল) এবং পাকিস্থানের বিপক্ষে ১টি (১৯৫২-৫৩)। অস্ট্রেলিয়া এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে এখনও আমরা রাবার জয় করতে পারিনি। আমাদের আরও আক্ষেপের কারণ যে, আমরা ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলকে টেস্ট খেলাতেই হারাতে পারিনি।

বিদেশে ভারতবর্ষের টেস্ট খেলার ফলাফল

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে

		ভারতবর্ষের	খেলা	
সাল	খেলা	জয়	পরাজয়	ড্র
১৯৩২	১	০	১	০
১৯৩৬	৩	০	২	১
১৯৪৬	৩	০	১	২
১৯৫২	৪	০	৩	১
১৯৫৯	৫	০	৫	০
১৯৬৭	৩	০	৩	০
মোট :	১৯	০	১৫	৪

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে

		ভারতবর্ষের	খেলা	
সাল	খেলা	জয়	পরাজয়	ড্র
১৯৪৭-৪৮	৫	০	৪	১
১৯৬৭-৬৮	৪	০	৪	০
মোট :	৯	০	৮	১

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে

		ভারতবর্ষের	খেলা	
সাল	খেলা	জয়	পরাজয়	ড্র
১৯৫২-৫৩	৫	০	১	৪
১৯৬১-৬২	৫	০	৫	০
মোট :	১০	০	৬	৪

পাকিস্তানের বিপক্ষে

		ভারতবর্ষের	খেলা	
সাল	খেলা	জয়	পরাজয়	ড্র
১৯৫৪-৫৫	৫	০	০	৫
মোট :	৫	০	০	৫

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে

		ভারতবর্ষের	খেলা	
সাল	খেলা	জয়	পরাজয়	ড্র
১৯৬৮	৪	৩	১	০
মোট :	৪	৩	১	০

একনজরে ফলাফল

		ভারতবর্ষের	খেলা	
বিপক্ষে	খেলা	জয়	পরাজয়	ড্র
ইংল্যান্ড	১৯	০	১৫	৪
অস্ট্রেলিয়া	৯	০	৮	১
ওয়েস্ট ইন্ডিজ	১০	০	৬	৪
পাকিস্তান	৫	০	০	৫
নিউজিল্যান্ড	৪	৩	১	০
মোট :	৪৭	৩	৩০	১৪

টেস্টের মোট ফলাফল

		ভারতবর্ষের	খেলা	
স্থান	খেলা	জয়	পরাজয়	ড্র
স্বদেশ	৬১	১০	১৫	৩৬
বিদেশ	৪৭	৩	৩০	১৪
মোট :	১০৮	১৩	৪৫	৫০

টেস্ট সিরিজের ফলাফল

বিদেশের মাটিতে

		ভারতবর্ষের		
বিপক্ষে	সিরিজ	জয়	পরাঃ	ড্র
ইংল্যান্ড	৬	০	৬	০
অস্ট্রেলিয়া	২	০	২	০
ওয়েস্টইন্ডিজ	২	০	২	০
পাকিস্তান	১	০	০	১
নিউজিল্যান্ড	১	১	০	০
মোট :	১২	১	১০	১

টেস্ট সিরিজের মোট ফলাফল

স্বদেশ ও বিদেশ

		ভারতবর্ষের		
স্থান	সিরিজ	জয়	পরাঃ	ড্র
ভারতবর্ষ	১৪	৪	৬	৪
বিদেশ	১২	১	১০	১
মোট :	২৬	৫	১৬	৫

ভারতবর্ষের জয়-পরাজয়ের হিসাব

ভারতবর্ষের জয় ৩

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে :

১৯৬৮ : ৫ উইকেটে (১ম টেস্ট, ডুনেডিন)
৮ উইকেটে (৩য় টেস্ট, ওয়েলিংটন)
২৭২ রানে **(৪র্থ টেস্ট, অকল্যান্ড)**

ভারতবর্ষের পরাজয় ৩০

ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ১৫ :

১৯৩২ : ১৫৮ রানে (১ম টেস্ট, লর্ডস)
১৯৩৬ : ৯ উইকেটে (১ম টেস্ট, লর্ডস)
: ৯ উইকেটে (৩য় টেস্ট, ওভাল)
১৯৪৬ : ১০ উইকেটে (১ম টেস্ট, লর্ডস)
১৯৫২ : ৭ উইকেটে (১ম টেস্ট, লিডস)
৮ উইকেটে (২য় টেস্ট, লর্ডস)
এক ইনিংস ও ২০৭ রানে (৩য় টেস্ট, ম্যাঞ্চেস্টার)
১৯৫৯ : এক ইনিংস ও ৫৯ রানে (১ম টেস্ট, নটিংহাম)
৮ উইকেটে (২য় টেস্ট, লর্ডস)
এক ইনিংস ও ১৭৩ রানে (৩য় টেস্ট, লিডস)
: ১৭১ রানে (৪র্থ টেস্ট, ম্যাঞ্চেস্টার)
: এক ইনিংস ও ২৭ রানে (৫ম টেস্ট, ওভাল)
১৯৬৭ : ৬ উইকেটে (১ম টেস্ট, লিডস)
: এক ইনিংস ও ১২৪ রানে (২য় টেস্ট, লর্ডস)
: ১৩২ রানে (৩য় টেস্ট, এজবাস্টন)

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৮ :

১৯৪৭-৪৮ : এক ইনিংস ও ২২৬ রানে (১ম টেস্ট, ব্রিসবেন)
: ২৩৩ রানে (৩য় টেস্ট, মেলবোর্ন)
: এক ইনিংস ও ১৬ রানে (৪র্থ টেস্ট, এডিলেড)
: এক ইনিংস ও ১৭৭ রানে (৫ম টেস্ট, মেলবোর্ন)
১৯৬৭-৬৮ : ১৪৬ রানে (১ম টেস্ট, এডিলেড)
: এক ইনিংস ও ৪ রানে (২য় টেস্ট, মেলবোর্ন)
: ৩৯ রানে (৩য় টেস্ট, ব্রিসবেন)



ডন ব্র্যাডম্যান

: ১৪৪ রানে (৪র্থ টেস্ট, সিডনী)

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে ৬ :

১৯৫২-৫৩ : ১৪২ রানে (২য় টেস্ট বার্বাডোজ)
১৯৬১-৬২ : ১০ উইকেটে (১ম টেস্ট, ত্রিনিদাদ)
: এক ইনিংস ও ১৮ রানে (২য় টেস্ট, কিংস্টন)
: এক ইনিংস ও ৩০ রানে (৩য় টেস্ট, বার্বাডোজ)
: ৭ উইকেটে (৪র্থ টেস্ট, ত্রিনিদাদ)
: ১২৩ রানে (৫ম টেস্ট, কিংস্টন)

নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে ১ :

১৯৬৮ : ৬ উইকেটে (২য় টেস্ট ক্রাইস্ট চার্চ)



ফ্র্যাংক ওরেল

বিদেশের মাটিতে ভারতবর্ষের টেস্ট খেলার উদ্বোধন

বিপক্ষ দল	তারিখ	স্থান
ইংল্যান্ড	২৫ জুন, ১৯৩২	লর্ডস
অস্ট্রেলিয়া	২৮ নভেম্বর, ১৯৪৭	ব্রিসবেন
ওঃ ইন্ডিজ	২১ জানুয়ারী, ১৯৫৩	পোর্ট অব স্পেন
পাকিস্তান	১ জানুয়ারী, ১৯৫৫	ঢাকা
নিউজিল্যান্ড	১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৮	ডুনেডিন

এক ইনিংসে দলগত সর্বাধিক রান

ভারতবর্ষের পক্ষে

বিপক্ষে	রান	স্থান	বছর
ইংল্যান্ড	৫১০	লিডস	১৯৬৭
ওঃ ইন্ডিজ	৪৪৪	কিংস্টন	১৯৫২-৫৩
অস্ট্রেলিয়া	৩৮১	এডিলেড	১৯৪৭-৪৮
নিউজিল্যান্ড	৩৫৯	ডুনেডিন	১৯৬৮
পাকিস্তান	২৫১	লাহোর	১৯৫৪-৫৫

ভারতবর্ষের বিপক্ষে

এক ইনিংসে দলগত সর্বাধিক রান

বিপক্ষ দল	রান	স্থান	বছর
অস্ট্রেলিয়া	৬৭৪	এডিলেড	১৯৪৭-৪৮
ওঃ ইন্ডিজ	৬৩১ (৮ উইঃ ডিক্লেঃ),	কিংস্টন	১৯৬১-৬২
ইংল্যান্ড	৫৭১ (৮ উইঃ ডিক্লেঃ),	ম্যাঞ্চেস্টার	১৯৩৬
নিউজিল্যান্ড	৫০২	ক্রাইস্ট চার্চ	১৯৬৮
পাকিস্তান	৩২৮	লাহোর	১৯৫৪-৫৫

এক ইনিংসে দলগত সর্বনিম্ন রান

(পুরো ইনিংসের খেলায়)

ভারতবর্ষের পক্ষে

বিপক্ষে	রান	স্থান	বছর
অস্ট্রেলিয়া	৫৮	ব্রিসবেন	১৯৪৭-৪৮
ইংল্যান্ড	৫৮	ম্যাঞ্চেস্টার	১৯৫২
ওঃ ইন্ডিজ	৯৮	ত্রিনিদাদ	১৯৬১-৬২
পাকিস্তান	১৪৫	করাচি	১৯৫৪-৫৫
নিউজিল্যান্ড	২৫২	অকল্যান্ড	১৯৬৮



জিওফ বয়কট



ভিনু মানকাদ

এক ইনিংসে দলগত সর্বনিম্ন রান

ভারতবর্ষের বিপক্ষে

বিপক্ষ দল	রান	স্থান	বছর
নিউজিল্যান্ড	১০১	অকল্যান্ড	১৯৬৮
অস্ট্রেলিয়া	১০৭	সিডনি	১৯৪৭-৪৮
ইংল্যান্ড	১৩৪	লর্ডস	১৯৩৬
পাকিস্তান	১৫৮	ঢাকা	১৯৫৪-৫৫
ওঃ ইন্ডিজ	২২৮	বার্বাদোজ	১৯৫২-৫৩

এক ইনিংসে ৫০০ রান

ভারতবর্ষের পক্ষে—১বার

৫১০ বিপক্ষে ইংল্যান্ড, লিডস, ১৯৬৭

ভারতবর্ষের বিপক্ষে

ইংল্যান্ড—৩বার

৫৭১ (৮ উইঃ ডিক্লেঃ), ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯৩৬
৫৫০ (৪ উইঃ ডিক্লে), লিডস, ১৯৬৭
৫৩৭ লর্ডস, ১৯৫২

ওয়েস্ট ইন্ডিজ—২বার

৬৩১ (৮ উইঃ ডিক্লেঃ), কিংস্টন, ১৯৬১-৬২
৫৭৬—কিংস্টন, ১৯৫২-৫৩

অস্ট্রেলিয়া—৩বার

৬৭৪—এডিলেড, ১৯৪৭-৪৮
৫৭৫—(৮ উইঃ ডিক্লে), মেলবোর্ণ ১৯৪৭-৪৮
৫২৯—মেলবোর্ণ, ১৯৬৭-৬৮

নিউজিল্যান্ড—১বার

৫০২—ক্রাইস্ট চার্চ, ১৯৬৮

একটি খেলার উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী

ভারতবর্ষের পক্ষে

১১৬ ও ১৪৫ রান—বিজয় হাজারে (বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া), এডিলেড, ১৯৪৭-৪৮

ভারতবর্ষের বিপক্ষে

১৩২ ও ১২৭* রান—ডন ব্র্যাডম্যান (অস্ট্রেলিয়া), মেলবোর্ণ, ১৯৪৭-৪৮

এক ইনিংসে ডাবল সেঞ্চুরী

ভারতবর্ষের পক্ষে শূন্য

বিদেশের মাটিতে আয়োজিত সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ভারতবর্ষের কোন খেলোয়াড় এক ইনিংসের খেলায় ডাবল সেঞ্চুরী করতে সক্ষম হননি। এক ইনিংসের খেলায় ভারতবর্ষের পক্ষে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড : ১৮৪—ভিনু মানকাদ (ইংল্যান্ডের বিপক্ষে), লর্ডস, ১৯৫২।

ভারতবর্ষের বিপক্ষে—৭টি

ইংল্যান্ড (৩টি) : ২১৭ রান—ওয়াল্টার হ্যামন্ড (ওভাল, ১৯৩৬); ২০৫—নট আউট—জে হার্ডস্টাফ (জুনিয়র), লর্ডস, ১৯৪৬; ২৪৬ নট আউট—জিওফ বয়কট, লিডস, ১৯৬৭।

অস্ট্রেলিয়া (১টি) : ২০১—ডন ব্র্যাডম্যান, এডিলেড, ১৯৪৭-৪৮।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ (২টি) : ২৩৭—ফ্র্যাঙ্ক ওরেল, কিংস্টন, ১৯৫২-৫৩; ২০৭—এভার্টন উইকস, পোর্ট অব স্পেন, ১৯৫৩।

নিউজিল্যান্ড (১টি) : ২৩৯ রান—গ্রাহাম ডাউলিং, ক্রাইস্ট চার্চ, ১৯৬৮।

এক সিরিজে সর্বাধিক মোট রান

পক্ষে : ৫৬০ রান (গড় ৬২·২২)—পলি উমরীগড় (বিপক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ১৯৫২-৫৩)।

বিপক্ষে : ৭১৬ রান (গড় ১০২·২৮)—এভার্টন উইকস (ওয়েস্ট ইন্ডিজ), ১৯৫২-৫৩। ৭১৫ রান (গড় ১৭৮·৭৫)—ডন ব্র্যাডম্যান (অস্ট্রেলিয়া), ১৯৪৭-৪৮।

এক সিরিজে সর্বাধিক মোট উইকেট

পক্ষে : ২৭টি (৭৮৯ রানে)—সুভাষ গুপ্তে (বিপক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ১৯৫৩)।

বিপক্ষে : ২৯টি (৩৮৬ রানে)—ফ্রেড ট্রুম্যান (ইংল্যান্ড), ১৯৫২।

এক ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান

ভারতবর্ষের পক্ষে

বিপক্ষে	রান	খেলোয়াড়	স্থান	বছর
ইংল্যান্ড	১৮৪	ভিনু মানকাদ	লর্ডস	১৯৫২
ওয়েস্ট ইন্ডিজ	১৭২*	পলি উমরীগড়	ত্রিনিদাদ	১৯৬১-৬২
অস্ট্রেলিয়া	১৪৫	বিজয় হাজারে	এডিলেড	১৯৪৭-৪৮
নিউজিল্যান্ড	১৪৩	অজিত ওয়াদেকার	ওয়েলিংটন	১৯৬৮
পাকিস্তান	১০৮	পলি উমরীগড়	পেশোয়ার	১৯৫৪-৫৫

ভারতবর্ষের বিপক্ষে

বিপক্ষ দল	রান	খেলোয়াড়	স্থান	বছর
ইংল্যান্ড	২৪৬*	জিওফ বয়কট	লিডস	১৯৬৭
ওয়েস্ট ইন্ডিজ	২৩৭	ফ্র্যাঙ্ক ওরেল	জামাইকা	১৯৫৩
নিউজিল্যান্ড	২৩৯	গ্রাহাম ডাউলিং	ক্রাইস্ট চার্চ	১৯৬৮
অস্ট্রেলিয়া	২০১	ডন ব্র্যাডম্যান	এডিলেড	১৯৪৭-৪৮
পাকিস্তান	১৬২	হানিফ মহম্মদ	ভাওয়ালপুর	১৯৫৪-৫৫

খেলাধুলা

দর্শক

ভারতবর্ষ বনাম নিউজিল্যান্ড

চতুর্থ টেস্ট খেলা

ভারতবর্ষ : ২৫২ রান (পতৌদি ৫১, ইঞ্জিনিয়ার ৪৫ এবং সোরদে ৪১ রান। মত্ত ৫১ রানে ৪ এবং বার্টলেট ৬৬ রানে ৩ উইকেট।)

ও ২৬১ রান (৫ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। সার্দি ৯৯, বোরদে নট-আউট ৬৫ এবং ইঞ্জিনিয়ার ৪৮ রান। টেলর ৬০ রানে ২ উইকেট)

নিউজিল্যান্ডঃ ১৪০ রান (কংডন ২৭ রান। প্রসন্ন ৪৪ রানে ৪, বেদী ২১ রানে ২ এবং সার্দি ৩২ রানে ২ উইকেট)

ও ১০১ রান (ডাউলিং ৩৭ রান। প্রসন্ন ৪০ রানে ৪, বেদী ১৪ রানে ৩ এবং সার্দি ৩০ রানে ২ উইকেট)

প্রথমদিন (মার্চ ৭) :

ভারতবর্ষ প্রথম ইনিংসের দু'টো [illegible]

বৃষ্টির দরুণ এইদিন পুরো সময় খেলা হয়নি—মাত্র ৭৫ মিনিট খেলা হয়।

দ্বিতীয়দিন (মার্চ ৮) :

ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসের রান দাঁড়ায় ১৩০ (৪ উইকেটে)। বৃষ্টির জন্যে ১ ঘণ্টা দেরীতে খেলা আরম্ভ হয় এবং চা-পানের পর আর খেলা হয়নি।

তৃতীয়দিন (মার্চ ৯) :

ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস ২৫২ রানের মাথায় শেষ হলে নিউজিল্যান্ড প্রথম ইনিংসের ৬টা উইকেট খুইয়ে ১০১ রান সংগ্রহ করে।

চতুর্থদিন (মার্চ ১১) :

নিউজিল্যান্ডের প্রথম ইনিংস ১৪০ রানের মাথায় শেষ হলে ভারতবর্ষ প্রথম ইনিংসের খেলায় ১১২ রানে অগ্রগামী হয়ে দ্বিতীয় ইনিংসের ৪ উইকেট খুইয়ে ২১৬ রান করে। ফলে ভারতবর্ষ ৩২৮ রানে এগিয়ে যায় এবং হাতে ৬টা উইকেট জমা থাকে।

পঞ্চমদিন (মার্চ ১২) :

ভারতবর্ষ দ্বিতীয় ইনিংসের ২৬১ রানের (৫ উইকেটে) [illegible] খেলার সমাপ্তি [illegible]

মাথায় দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হলে ভারতবর্ষ ২৭২ রানে জয়ী হয়।

অকল্যান্ডের ইডেন পার্কে আয়োজিত শেষ চতুর্থ টেস্টে ভারতবর্ষ ২৭২ রানে নিউজিল্যান্ডকে পরাজিত করে তাদের বিপক্ষে ১৯৬৮ সালের টেস্ট সিরিজে ৩—১ খেলায় 'রাবার' জয়ী হয়েছে এবং সেই সূত্রে বিদেশের মাটিতে সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলায় প্রথম 'রাবার' জয়ের গৌরব লাভ করেছে। ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট-ইন্ডিজ, নিউজিল্যান্ড এবং পাকিস্তান—এই পাঁচটি দেশের মাটিতে ভারতবর্ষ এ পর্যন্ত যে ১২টি টেস্ট সিরিজ খেলেছে, তার ফলাফল দাঁড়িয়েছে : ভারতবর্ষের 'রাবার' জয় ১, পরাজয় ১০ এবং ড্র ১। এই ১২টি টেস্ট সিরিজের ৪৭টি খেলার ফলাফল : ভারতবর্ষের জয় ৩, পরাজয় ৩০ এবং ড্র ১৪।

এখানে উল্লেখ্য, ভারতবর্ষ বনাম নিউজিল্যান্ডের মোট তিনটি টেস্ট ক্রিকেট সিরিজেই ভারতবর্ষ 'রাবার' জয়ী হয়েছে—ভারতবর্ষ ১৯৫৫-৫৬ সালে ২—০ খেলায় (ড্র ৩), ১৯৬৫ সালে ১—০ খেলায় (ড্র ৩) এবং ১৯৬৮ সালে ৩—১ খেলায় [illegible]

নিউজিল্যান্ডের অধিনায়ক গ্রাহাম ডাউলিং টসে জয়ী হয়ে ভেজা মাঠে ভারতবর্ষকে ব্যাট করতে পাঠান। বৃষ্টি এবং আলোর অভাবের দরুণ প্রথম দিনে মাত্র ৭৫ মিনিট খেলা সম্ভব হয়েছিল। লাঞ্চ এবং চা-পানের মধ্যে ১ ঘন্টা খেলা হয়। চা-পানের পর আম্পায়াররা মাঠ পরীক্ষা করে ঐদিনের মত খেলা পরিত্যক্ত ঘোষণা করেন। প্রথম দিনের ৭৫ মিনিটের খেলায় ভারতবর্ষ ২টো উইকেট খুইয়ে ৬১ রান সংগ্রহ করেছিল।

দ্বিতীয় দিনেও বৃষ্টির দরুণ খেলার অনেক সময় নষ্ট হয়। প্রথমত এক ঘন্টা দেরীতে খেলা আরম্ভ হয় এবং চা-পানের পর আর খেলা হয়নি। দ্বিতীয় দিনে ভারতবর্ষ আরও দুটো উইকেট খুইয়ে ৮৯ রান যোগ করে। ভারতবর্ষের রান দাঁড়ায় ১৫০ (৪ উইকেটে)। পতৌদি ৩৭ এবং বোরদে ৮ রান করে খেলায় অপরাজিত ছিলেন।

তৃতীয় দিনে পুরো সময় খেলা হয়েছিল। ভারতবর্ষের ২৫২ রানের মাথায় প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ হয়। ভারতবর্ষ এইদিন তার বাকি ৬টা উইকেটের বিনিময়ে ১০২ রান সংগ্রহ করে। দ্বিতীয় দিনের খেলায় ফাস্ট-বোলার বার্টলেটের বলে অধিনায়ক পতৌদি ঠোঁটে খুব জোর আঘাত পেয়েছিলেন। তৃতীয় দিনে তিনি মুখে মোটা রকমের ব্যান্ডেজ বেঁধে খেলতে নামেন এবং দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৫১ রান করেন। লাঞ্চের অল্প পরেই ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ হলে নিউজিল্যান্ড খেলার বাকি সময়ে প্রথম ইনিংসের ৬টা উইকেট খুইয়ে মাত্র ১০১ রান সংগ্রহ করেছিল। দুই স্পিন বোলার প্রসন্ন (১৮ রানে ২ উইকেট) এবং সুর্তি (৩২ রানে ২ উইকেট) নিউজিল্যান্ডকে নাজেহাল করে নিজ দলের প্রাধান্য বিস্তারে সহযোগিতা করেন। চা-পানের সময় নিউজিল্যান্ডের দুটো উইকেট পড়ে ৪৪ রান ছিল। চা-পানের পরবর্তী খেলায় আরও ৪টে উইকেট পড়ে গিয়ে মাত্র ৫৭ রান উঠেছিল।

চতুর্থ দিনে নিউজিল্যান্ডের প্রথম ইনিংস ১৪০ রানের মাথায় শেষ হয়। এই দিন তাদের বাকি ৪ উইকেটে মাত্র ৩৯ রান উঠেছিল। ফলে নিউজিল্যান্ড প্রথম ইনিংসের খেলায় ভারতবর্ষের থেকে ১১২ রানের পিছনে পড়ে। চতুর্থ দিনের বাকি সময়ের খেলায় ভারতবর্ষ দ্বিতীয় ইনিংসের ৪ উইকেট খুইয়ে ২১৬ রান সংগ্রহ করে ৩২৮ রানে এগিয়ে যায়। সুর্তি ৮১ রান এবং বোরদে ৪০ রান করে অপরাজিত থাকেন। সুর্তি ২১৬ মিনিটে তাঁর ৮১ রান তুলেছিলেন। ৫ম উইকেটের অপরাজিত জুটি সুর্তি এবং বোরদে ১১৬ মিনিটে দলের পক্ষে ৮১ রান সংগ্রহ করেন।

পঞ্চম অর্থাৎ খেলার শেষ দিনে অধিনায়ক পতৌদি দলের ২৬১ রানের (৫ উইকেটে) মাথায় দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। এই সময় ভারতবর্ষ ৩৭৩ রানে অগ্রগামী ছিল এবং ৩০০ মিনিট খেলার সময় ছিল। ভারতবর্ষ ৩৫০ মিনিট খেলে দ্বিতীয় ইনিংসের এই ২৬১ রান (৫ উইকেটে) সংগ্রহ করেছিল। টেস্ট ক্রিকেটে সুর্তিকে তাঁর প্রথম শতরান করার সুযোগ দিতে গিয়ে পতৌদি দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করতে দেরী করেছিলেন। সুর্তির দুর্ভাগ্য যে, তাঁর শতরান পূর্ণ হয়নি—তিনি ৯৯ রানের মাথায় আউট হন। সুর্তি শেষ পর্যন্ত নিজের ওপর আস্থা রেখে খেলতে পারেননি। তিনি তাঁর ১৮ রানের মাথায় গ্যারী বার্টলেটের বল খেলে সেকেন্ড স্লিপে মার্ক বার্জেসের হাতে এক সহজ ক্যাচ তুলে দেন। বার্জেস সে ক্যাচ মাটিতে ফেলে দিলে তিনি সে যাত্রা খুব বেঁচে যান। কিন্তু বার্টলেটের পরবর্তী ওভারে সুর্তি তাঁর ৯৯ রানের মাথায় পুনরায় যে 'ক্যাচ' তুলেন তা শেষ পর্যন্ত মার্ক বার্জেসই ধরেন। সুর্তি ২৬৮ মিনিটের খেলায় ৯টা বাউন্ডারী সহ ৯৯ রান করেন। ৫ম উইকেটের জুটিতে সুর্তি এবং বোরদে দলের অতি মূল্যবান ১২৬ রান তুলেছিলেন। বোরদে শেষপর্যন্ত ৬৫ রান করে অপরাজিত থাকেন।

নিউজিল্যান্ড ৩০০ মিনিটের খেলার সময় হাতে নিয়ে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে। এদিকে খেলায় জয়লাভের জন্যে তাদের ৩৭৪ রানের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু চা-পানের কিছু পরেই মাত্র ১০১ রানের মাথায় নিউজিল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শেষ হয়ে যায়। প্রসন্ন (৪০ রানে ৪ উইকেট), বেদী (১৪ রানে ৩ উইকেট) এবং সুর্তির (৩০ রানে ২ উইকেট) বোলিংয়ের সাফল্যের দরুণই নিউজিল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা ১০১ রানে শেষ হয়েছিল। ব্যাটিং এবং বোলিংয়ে সমান কৃতিত্বের পরিচয় দেন সুর্তি—মোট ১২৭ রান (২৮ ও ৯৯) এবং ৬২ রানে ৪টে উইকেট (৩২ রানে ২ ও ৩০ রানে ২ উইকেট)।

ব্যাটিং-বোলিংয়ের গড়

ভারতবর্ষ বনাম নিউজিল্যান্ডের ১৯৬৮ সালের টেস্ট সিরিজে উভয় দলের পক্ষে নিউজিল্যান্ডের গ্রাহাম ডাউলিং সর্বাধিক মোট রান করেছেন এবং ব্যাটিংয়ের তালিকায় শীর্ষস্থান লাভ করেছেন—খেলা ৪, ইনিংস ৮, নটআউট ০, মোট রান ৪৭১, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ২৩৯ এবং গড় ৫৮·৮৭। ভারতবর্ষের পক্ষে সর্বাধিক মোট রান এবং ব্যাটিংয়ের তালিকায় উভয় দলের পক্ষে ২য় স্থান পেয়েছেন অজিত ওয়াদেকার—খেলা ৪, ইনিংস ৮, নটআউট ১ বার, মোট রান ৩৩০, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১৪৩ এবং গড় ৪৭·১৪। উভয় দলের পক্ষে ব্যাটিংয়ের গড়পড়তা তালিকায় উল্লেখযোগ্য স্থান লাভ করেছেন যথাক্রমে ভারতবর্ষের তিনজন খেলোয়াড়—৩য় স্থান রুসী সুর্তি (মোট রান ৩২১ ও গড় ৪৫·৮৫), ৪র্থ স্থান চান্দু বোরদে (মোট রান ২৪২ ও গড় ৪০·৩৩) এবং ৫ম স্থান ফারুক ইঞ্জিনীয়ার (মোট রান ৩২১ ও গড় ৪০·১২)। ভারতবর্ষের অধিনায়ক পতৌদির মোট রান ২২১ ও গড় ৩১·৫৭।

বোলিংয়ে উভয় দলের পক্ষে শীর্ষস্থান পেয়েছেন বাপু নাদকার্নী (২৫১ রানে ১৪ উইকেট ও গড় ১৭·৯২)। নিউজিল্যান্ডের পক্ষে প্রথম স্থান পান গ্যারী বার্টলেট (১৯৬ রানে ১০ উইকেট এবং গড় ১৯·৬০)। উভয় দলের পক্ষে সর্বাধিক উইকেট পেয়েছেন ইরাপল্লী প্রসন্ন—৪৫১ রানে ২৪টি উইকেট (গড় ১৮·৭৯)। নিউজিল্যান্ডের ডিক মজ নিজ দলের পক্ষে সর্বাধিক উইকেট পান—৪০৩ রানে ১৫টি উইকেট (গড় ২৬·৮৬)।

টেস্ট সেঞ্চুরী :

নিউজিল্যান্ড (২) : গ্রাহাম ডাউলিং (২)—১৪৩ রান (১ম টেস্ট, ডুনেদিন) এবং ২৩৯ রান (২য় টেস্ট, ক্রাইস্ট চার্চ)

ভারতবর্ষ (১) : অজিত ওয়াদেকার—১৪৩ রান (৩য় টেস্ট, ওয়েলিংটন)

ভারতবর্ষ বনাম নিউজিল্যান্ড

টেস্ট খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল

টেস্টের সূচনা—নভেম্বর ২০, ১৯৫৫ (হায়দরাবাদ) : শেষ খেলা মার্চ ১২, ১৯৬৮ (অকল্যান্ড)

স্থান	ভারতবর্ষ জয়ী	নিউজিল্যান্ড জয়ী	খেলা ড্র	মোট খেলা
ভারতবর্ষ	৩	০	৬	৯
নিউজিল্যান্ড	৩	১	০	৪
মোট :	৬	১	৬	১৩

সিম্পসনের টেস্ট সেঞ্চুরী

ভারতবর্ষের বিপক্ষে ১৯৬৭-৬৮ সালের টেস্ট সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার ববি সিম্পসন ২টি সেঞ্চুরী করেছিলেন—এডিলেডের ১ম টেস্টের ২য় ইনিংসে ১০৩ রান এবং মেলবোর্ণের ২য় টেস্টের ১ম ইনিংসে ১০৯ রান। কিন্তু ৪র্থ টেস্টের শেষে সিডনী থেকে বিশ্বখ্যাত সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান এ পি. পি টি আই এবং ইউ এন আই টেস্ট সিরিজের আলোচনা প্রসঙ্গে সেঞ্চুরী রানের যে হিসাব দেয় তার মধ্যে সিম্পসনের ১ম টেস্টের ২য় ইনিংসের সেঞ্চুরীর (১০৩ রান) উল্লেখ ছিল না (১লা এবং ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখের স্টেটসম্যান, অমৃতবাজার পত্রিকা, যুগান্তর প্রভৃতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ দ্রষ্টব্য)। ফলে বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই ভুল তথ্য অনেককেই বিভ্রান্ত করেছে।

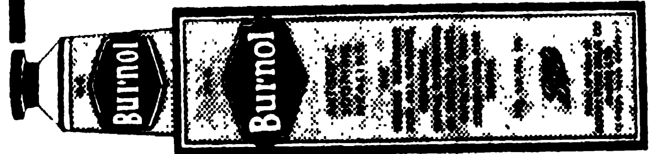
কয়েকজন পাঠক এই ভুল তথ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে ক্রিকেট খেলায় তাঁদের নিষ্ঠা এবং অনুসন্ধিৎসার পরিচয় দিয়েছেন।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

জ্বালাধরা ওষুধে
ওর যন্ত্রণা আরও
বেড়েই যাবে !



শান্তির প্রলেপ বার্নল লাগান। ওর জখমের জায়গায় একটুও জ্বালা ধরবেনা ঘা-ও দ্রুত শুকিয়ে তুলবে।



যাতে শুধু জ্বালাই বাড়ায়—এরকম ওষুধ লাগিয়ে ওকে যন্ত্রণায় কাঁদাবেন না। ওর কাটা জায়গায় বার্নল লাগান। শান্তির এই স্নিগ্ধ প্রলেপ ও সঙ্গে সঙ্গে আরাম পাবে। অনেক কারণের মধ্যে এর জন্যেও বার্নল বাচ্চাদের পক্ষে চমৎকার। বার্নল যে এত দ্রুত সারিয়ে তোলে তার কারণ একেবারে ওপরের স্তর অর্থাৎ "বহির্ভাগে ক্রিয়াশীল" (চিত্র দেখুন) শক্তিশালী উপাদান। এর সংস্পর্শে আসামাত্রই জীবাণু মরে যায়। বার্নল খুব তাড়াতাড়ি প্রাকৃতিক নিয়মেই জখম শুকিয়ে তুলতে সাহায্য করে। পোড়া, কাটাছড়া, ঘষড়ানো, ঘা আর ফোঁড়া-যন্ত্রণাকর এরকম সব অবস্থায় বার্নল আপনার চমৎকার সহায়। সবসময় ঘরে বার্নল রাখুন।

অন্যান্য মলমে এন্টিসেপটিক উপাদান একটি তৈলাক্ত স্তরের ভেতরে আবদ্ধ থাকে। তাতে বাইরের থেকে ঘায়ে সংক্রমণের ও ভয় থাকে।

বার্নলের এন্টিসেপটিক উপাদান ঠিক উপরের স্তরে থাকে বলেই এটি জীবাণু মারার কাজ ঠিকই শুরু করে দেয় আর শুকোবার কাজও দ্রুততর করে তোলে।



বুটস পিওর ড্রাগ কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ।

পোড়াঘায়ে আর কাটাছড়ায় বার্নল আপনার পরম সহায়

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

বার্ষিক	টাকা ২০-০০	টাকা ২২-০০
ষাণ্মাষিক	টাকা ১০-০০	টাকা ১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫-০০	টাকা ৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,

কলিকাতা—৩

ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

॥ প্রকাশিত হলো ॥

রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধসংস্কৃতি

শ্রীসুধাংশুবিমল বড়ুয়া, এম-এ, ডি-ফিল,
অধ্যাপক, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, কলকাতা প্রণীত।

ভূমিকা লিখিয়াছেন প্রখ্যাত পণ্ডিতপ্রবর অধ্যাপক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন।
বইটিতে আলোচিত হয়েছে : বাংলায় বৌদ্ধধর্মের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, রবীন্দ্রচেতনায় বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির কালানুক্রমিক সংক্ষিপ্ত বিবরণ, রবীন্দ্রদৃষ্টিতে বুদ্ধদেব ও অশোক, রবীন্দ্রদৃষ্টিতে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি, রবীন্দ্রনাথের ধর্মাদর্শ ও বৌদ্ধধর্ম এবং রবীন্দ্রসাহিত্যে বুদ্ধপ্রসঙ্গ।
রবীন্দ্র অনুরাগী পাঠকের পক্ষে একটি অনন্য গ্রন্থ।
লাইনো টাইপে ঝরঝরে ছাপা, চারটি আর্টপ্লেট, মনোরম প্রচ্ছদ, শোভন সংস্করণ।

মূল্য : দশ টাকা মাত্র

সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড : : কলকাতা - ৯

পাঠাগারে রাখুন ও উপহার দিন

দারোগার জবানবন্দী	॥ চিরঞ্জীব সেন ॥	৪·৫০
মানুষ যখন পশু হয়	॥ বীরু চট্টোপাধ্যায় ॥	৪·৫০
মারলিন পার্কের রাত্রি	॥ দেবদূত ॥	৩·৫০
সুয়েজ পেরিয়ে (২য় খণ্ড)	॥ সুজাতা ॥	৫·০০

সন্তোষকুমার অধিকারীর

রক্তকমল ২·৫০

এই নাতিবৃহৎ উপন্যাসখানি পড়ে ভাল লাগল। ঘটনার বুনানি জমাট, বুদ্ধিদীপ্ত আধুনিক নরনারীর সংলাপ ও চরিত্রাঙ্কনও নিপুণ।
—যুগান্তর

শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়ের

সমর্পিতা ৩·০০

সুধাংশুরঞ্জন ঘোষের

রামায়ণী প্রেমকথা ৫·০০

অগ্নিগন্ধা ১০·০০

দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশ পথে
শ্রীনবকুমারের ঐতিহাসিক উপন্যাস

শোভনাবতী ২·০০

প্রফুল্ল গ্রন্থাগার : ৫।১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা—৯

৭ম বর্ষ
৪র্থ খণ্ড

অমৃত

৪৭শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday 29th March, 1968 শুক্রবার, ১৫ই চৈত্র, ১৩৭৪ 40 Paise.

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীরবীন্দ্রনাথ দত্ত

'রূপা'র বই

॥ উপন্যাস ॥

ডাঃ বিশ্বনাথ রায়
বিহঙ্গের গান ৬·০০

দিলীপকুমার রায়
অঘটনের শোভাযাত্রা
একত্রে তিনখানি উপন্যাস ১০·০০

প্রেমেন্দ্র মিত্র
অন্য এক নাম ৪·০০

দীপক চৌধুরী
এক যে ছিল রাজা ৫·০০

দেবব্রত রেজ
স্বপ্নলোকের চাবি ৩·৫০

প্রাণ-পাথেয় ৭·৫০

নির্মলা দেবী
স্বপন মধুর ৩·৫০

NOVELS

KNUT HAMSUN
(Nobel Prize Winner)

GROWTH OF THE SOIL	5.00
HUNGER	3.50
PAN	2.50
VAGABONDS	8.00
WILL DURANT TRANSITION	4.75

আমাদের পূর্ণ গ্রন্থতালিকার জন্য লিখুন

রূপা

রূপা অ্যান্ড কোম্পানী
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট কলকাতা-১২
Phone 34-4821 · 34-8305

উত্তর-চল্লিশের চিন্তা প্রসঙ্গে

পঁয়তাল্লিশ সংখ্যায় বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'উত্তর চল্লিশের চিন্তা' পড়ে ইতিমধ্যেই এই বেশ ভরা যৌবনেই কেমন হাবুডুবু খাচ্ছি। দিনে দিনে এই বয়সটার কাছাকাছি পৌঁছুচ্ছি, তাই ভাবনাটা ক্রমে জোরদার হচ্ছে। উত্তর-চল্লিশের চিন্তা সত্যি বড় মারাত্মক। পৃথিবীর এত রস, আনন্দ এই বয়সে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন মিইয়ে যায়। কোনমতেই সেই ফেলে-আসা দিনের স্বাদ আর তাতে পাওয়া যায় না। সে-উৎসাহ এবং উদ্যমও সম্পূর্ণ 'ফর্ম' হারিয়ে ফেলে। যে-কাজ কয়েকদিন আগেও হাসিমুখে করা যেত, এই মুহূর্তে আর তা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এসব কথা ভেবেই বুঝি পাশ্চাত্যের অধিবাসীরা উত্তর-চল্লিশে পৌঁছে পুরোপুরি আত্মনির্ভর হয়ে চটুল জীবন থেকে বিদায় নেবার চেষ্টা করেন। এসব কথা ভেবেই হয়তো আমাদের দেশে নির্দেশ ছিল—পঞ্চাশোর্ধে বনং ব্রজেৎ। আজকাল আর এ-নিয়ম মেনে চলার কোন প্রয়োজন কেউ বোধ করেন না এবং সেরকম সুযোগ-সুবিধারও অভাব।

কিন্তু উত্তর-চল্লিশের চিন্তা আজো আছে। ও-দেশে যেমন এ-দেশেও তেমনি। সবাই মোটামুটি এ-সময়ের মধ্যে নিজেকে গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করেন। কিন্তু আজকের আর্থিক সমস্যার দিনে চল্লিশের সবকিছু ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। অথচ উত্তর-চল্লিশের চিন্তার বোঝা ঘাড়ে ভূতের মত চেপে বসে আছে।

বিনয় সান্যাল
কলকাতা-২৫

বাঙরেজ কালচার প্রসঙ্গে

অমৃত পত্রিকার ছেচল্লিশ সংখ্যায় সুবল চক্রবর্তী মশায়ের 'বাঙরেজ কালচার' পড়ে যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হলাম। বাঙালীদের একটি অংশ যে কিভাবে দিনের পর দিন ইংরেজি রুচির প্রতি আসক্ত হয়ে ক্রমশ বিকৃতরুচিসম্পন্ন হয়ে যাচ্ছে, এই লেখাটি পড়ে তা বেশ উপলব্ধি করা যায়।

দীর্ঘদিন ইংরেজ আমাদের দেশ থেকে বিদায় নিয়েছে। কিন্তু ইংরেজী আদব-কায়দা আজো আমরা ছাড়তে পারিনি। বরং মজ্জায় মজ্জায় তার অনুপ্রবেশ আমাদের ন্যস্ত করে তুলেছে। ইংরেজি আদব-কায়দা এক বস্তু, আর তার অন্ধ অনুকরণ অন্য জিনিস। আমাদের মধ্যে একটি বিশেষ শ্রেণী আছেন যাঁরা চলনে-বলনে, বেশভূষায় পুরোপুরি ইংরেজ সাজতে চান। এঁদের অনেকের কাছেই ইংল্যান্ড দেশটার সঙ্গে পরিচয় নেহাতই ভূগোলের মাধ্যমে। আজ বরাত জোরে কারো ভাগ্যে হয়তো শিকে ছিঁড়েছে। এই ভাগ্যবানের দল খুব বেশি হলে মাস ছয়েকের জন্য বিলেতে কাটিয়ে এসেছেন। বেশিদিন থাকলে খুব একটা অসুবিধা হতো না, কিন্তু এই কদিনে ইংরেজিয়ানা রপ্ত করতে গিয়ে একেবারে ইংরেজি কালচারের বিজ্ঞাপন সেজে দেশে ফিরে আসেন, নিজের স্বজাতীয়ত্ব সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে। তিনি যে এককালের বাঙালী কুলোদ্ভবেরই একজন, তা বুঝতে বেশ কষ্ট হয়। আর কষ্ট হওয়ার মানেই তো তিনি সাহেবিয়ানার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন।

এ-রকম সাহেবদের মেজাজ এবং আচার-ব্যবহার ঠিক কোন পাঁজি-পুঁথি ধরে চলে না। এদেশের সঙ্গে ঠিক কোন সমাজেরই মিল নেই। ইংরেজ অনুকরণে গড়ে উঠছেন এই পরগাছার দল। এঁরা নিজেরাই নিজেদের সামাজিক নিয়মকানুন তৈরি করেছেন এবং সেভাবেই সমাজের বুকে চলাফেরা করেন।

এঁরা নিজেরাও জানেন না যে, ইংরেজি আদব-কায়দায় তাঁরা বিকৃত ফসিল এবং দেশীয় সংস্কৃতির পক্ষে তাঁরা নিতান্ত জঞ্জালস্বরূপ। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, দেশে এঁরাই সর্বাপেক্ষা সম্মানের আসনে অধিষ্ঠান করেন। আর তাঁদের চারপাশে ভক্তবৃন্দেরও অবধি থাকে না। বাংলাদেশে এই সব ইংরেজি কালচারের উচ্ছিষ্ট সেবীরা নিজেদের সীমিত বিদ্যাবুদ্ধি নিয়ে দেশীয় সংস্কৃতির পক্ষে লম্বা-চওড়া বুলি ঝাড়েন। যা বলেন তার শতকরা নিরানব্বুইটি কথাই অর্থহীন প্রলাপের মত শোনায়।

'বাঙরেজ কালচার' নিবন্ধটি ইংরেজি ভাবাপন্ন বাঙালীদের চৈতন্যোদয়ে কিছুটা সাহায্য করবে বলে আশা করা যায়।

—অমিত দত্ত, হাওড়া—১।

পাখি প্রসঙ্গে

'অমৃত' পত্রিকার ৪৫ সংখ্যায় শ্রীউমা রায় লিখিত চিঠির জবাবে জানাই, শুধু খাদ্যের তাড়নাতেই পশ্চিম এবং হিমালয়ের অপর পারে সাইবেরিয়ার তুষার অঞ্চল থেকে আমাদের দেশে পাখি আসে না। পাখি দেশান্তরী বা পরিযায়ী হওয়া নিয়ে নানা মতবাদ আছে। কেবল শীতের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে নয়, শ্রীউমা রায়ের অনুমানমতো খাদ্যসংগ্রহের সঙ্গে অবশ্যই কিছুটা যোগ আছে।

উত্তর গোলার্ধের অনেক পাখি কিন্তু খাদ্যাভাব ঘটবার আগে থেকেই সরতে আরম্ভ করে। গ্রীষ্মকালীন দেশেও পাখি দেশান্তরী হয়, যদিও তার দূরত্ব খুব বেশি নয়। তা হয় সে-অঞ্চলে তখন কতকগুলি ফসলের ফলন বেশি হয় বলে।

উত্তর গোলার্ধের পাখি বেশি পরিযায়ী হয় বলে অনেকে মনে করেন; প্রাতিনূতন (প্লিসটোসিন) যুগের হিমবাহই এর কারণ। হিমবাহর শুরুতে পাখিরা বাধ্য হয়েছিল দক্ষিণে সরে আসতে এবং বরফ সরে গেলে ফিরেছিল। প্রতি শীতে তারা মনে করে আবার বুঝি শীতযুগ এল। পূর্বপুরুষদের এই অভ্যাস এখনও তারা ছাড়ে নি।

প্রশ্ন জাগে আভ্যন্তরীণ কোন ঘড়ি বা কি এমন জিনিস তাদের প্রণোদিত করে ঠিক একইভাবে প্রতি বছর দেশান্তরী হতে? আমরা জানি এনডোক্রাইন গ্রন্থির স্ফুরণের জন্যে পুরুষপাখি গান গায়, স্ত্রীপাখী ডিম পাড়ে এবং বাসা বাঁধবার সময় তাদের আভ্যন্তরিক অনেক কিছু বদলায়। সেসময় পার হয়ে গেলেও অন্যান্য বহু অদলবদল হয়। ঠিক এই সময়ে সাধারণত প্রায় সব পাখিই দেশান্তরী হয়। এর মধ্যে আলোর বদল একটা কারণ। বসন্তে ও গ্রীষ্মে আলোর জোর বাড়ে, কিন্তু হেমন্তে কমে। ঠিক সময় যখন আসে পাখি তখন তা কেন এবং তার হেতু কি তা বোঝে না, তবুও নিজ দেশ ত্যাগ করে দূরে লক্ষ্য অভিমুখে যাত্রা করে। এমনও দেখা গেছে প্রতি বছর একই দিনে একই সময়ে তারা এসে পৌঁছেছে।

পাখির দেশান্তরী বা পরিযায়ী হওয়া নিয়ে বিদেশে অনেক গবেষণা হচ্ছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত সঠিক কারণ নির্ণয় হয়নি।

নমস্কারান্তে
অজয় হোম
কলকাতা ঃ ১৭

অমৃত

সম্পাদকীয়

তরুণ সমাজ নিয়ে উদ্বেগ

তরুণদের ওপর আমরা বেশি আশা রাখি বলেই তাদের নিয়ে উদ্বেগও আমাদের বেশি। সমাজের সব স্তরেই আজ নানা কারণে বিক্ষোভের দেখা মেলে। দারিদ্র্য, বেকারীত্ব এবং আশাভঙ্গের বেদনা থেকেই মূলত এই বিক্ষোভের সৃষ্টি। তরুণ, বিশেষত ছাত্রসমাজের মধ্যে বিশৃংখলা বা বিক্ষোভকে আমাদের একটু অন্যভাবে বিচার করতে হবে। কারণ, ছাত্রজীবনে শৃংখলা-বোধ না থাকলে জীবনের পরবর্তীকালে সুসংবদ্ধভাবে কোনো কিছু করা সম্ভব নয়। ভারতবর্ষের ছাত্রসমাজ নিয়ে সেই কারণেই শিক্ষাবিদ, রাষ্ট্রনীতিবিদ ও সমাজ-হিতৈষীদের মনে গভীর উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। আমরা বর্তমান সংখ্যায় তরুণ সমাজের এই সমস্যা নিয়ে নানাদিক থেকে আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি। পাঠকসাধারণ তা থেকে সমস্যাটির একটি চিত্র পাবেন আশা করি।

প্রকৃতপক্ষে ভারতের যত সমস্যা আছে ছাত্রসমাজের মধ্যে শৃংখলাহীনতা ও বিক্ষোভ তার মধ্যে অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, কোনো একটি বিশেষ রাজ্যে বা বিশেষ বিশ্ববিদ্যালয়েই এই সমস্যা সীমাবদ্ধ নয়। ভারতের প্রধান প্রধান প্রায় সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ই এই সমস্যার দ্বারা আক্রান্ত। স্বাধীনতার আগেও ছাত্রসমাজ নানাবিধ আন্দোলন করেছে এ কথা সত্য। কিন্তু তখন নিজেদের বিদ্যায়তনের শৃংখলা রক্ষায় তাদের আগ্রহের অভাব দেখা যায়নি। আজ দুঃখের সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করছি যে, ছাত্রসমাজকে যে-কোনো দল যে-কোনো শ্লোগান দিয়ে রাস্তায় নিয়ে আসতে পারে। তাতে বিদ্যায়তনের শৃংখলা ক্ষুণ্ণ হলেও ছাত্রসমাজের মধ্যে বিশেষ কোনো প্রতিবাদ ওঠে না।

কলেজের অধ্যক্ষ, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, শিক্ষাবিভাগের কর্তাব্যক্তি কেউই বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের হাত থেকে আজকাল নিস্তার পান না। ছাত্রদের দাবী ন্যায্য হলে তা সব সময়েই কর্তৃপক্ষের উচিত সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করা। কিন্তু ছাত্ররা দলবদ্ধ হয়ে অধ্যক্ষ বা উপাচার্যকে ঘেরাও করে যে-ভাবে দাবী আদায়ের পদ্ধতি অনুসরণ করছে তা কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। এর ফলে বিদ্যায়তনের শৃংখলা নষ্ট হচ্ছে এবং ছাত্র-সমাজ সম্পর্কেও সমাজে দেখা দিচ্ছে হতাশা।

পরীক্ষার তারিখ পেছনোর দাবী তো আজকাল ছাত্রসমাজের মৌলিক অধিকারের অঙ্গীভূত হয়ে গেছে মনে হয়। এই দলবদ্ধতার চাপে পড়ে বহু আগ্রহী ও মেধাবী ছাত্র নীরবে ক্ষতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়। তার কোনো প্রতিবাদ চোখে পড়ে না। এইভাবে গোটা ছাত্রসমাজেই শৃংখলাহীনতা সংক্রামিত হচ্ছে।

রাজনীতির সঙ্গে ছাত্রদের সম্পর্ক থাকবে কিনা এ নিয়ে বিতর্ক আছে। বলা হয়ে থাকে যে, স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে তো ছাত্রদের রাজনীতিতে ডাক দেওয়া হত। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না যে, সেটা ছিল দেশের মুক্তি-আন্দোলন। স্বাধীন দেশে ছাত্রদের দায়িত্ব অনাধরনের, ঠিক প্রতিদিনের রাজনীতির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক কি খুবই অপরিহার্য? জানি এ প্রশ্ন করলেই তুমুল বিতর্ক উঠবে। পক্ষে এবং বিপক্ষে উকীলেরও অভাব হবে না। কিন্তু আমরা মনে করি, এদেশে ছাত্রমহলে বড় বেশি রাজনীতি চর্চা হচ্ছে। এর জন্য অবশ্য একা ছাত্ররা দায়ী নয়। শিক্ষামন্ত্রণালয় থেকে শুরু করে বিদ্যায়তন পর্যন্ত সর্বত্রই রাজনৈতিক তর্ক-বিতর্ক। এতে ছাত্ররা নিরাসক্ত সুশীল সুবোধ বালক হয়ে দূরে থাকবে এটা আশা করা অযৌক্তিক। সুতরাং ছাত্রদের রাজনীতি থেকে দূরে রাখার দায়িত্ব বড়দেরও। নইলে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও আদর্শের সংঘাত ছাত্রসমাজের ঐক্য ও শৃংখলাকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিতে বাধ্য।

আমরা জানি এই শৃংখলাহীনতার মূলে রয়েছে সামগ্রিকভাবে গোটা সমাজের দৈন্য। সম্প্রতি কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তনের সময়ে ছাত্ররা 'ডিগ্রী চাই না, চাকরী চাই' বলে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। বিষয়টি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এবং রাষ্ট্রনেতা ও শিক্ষাবিদদের এ সম্পর্কে অবশ্যই অবহিত হতে হবে। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, কেতাবী শিক্ষার সঙ্গে বাস্তব অবস্থার ব্যবধান আজ দুস্তর। ডিগ্রী-ভিত্তিক শিক্ষার চেয়ে কর্ম-ভিত্তিক শিক্ষা-ব্যবস্থা ভারতের বাস্তব প্রয়োজনের সঙ্গে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ। ছাত্রসমাজের মন থেকে হতাশা দূর করতে না পারলে তাদের মধ্যে বিক্ষোভ বাড়বে এবং এই বিক্ষোভ থেকেই জন্ম নেয় শৃংখলাহীনতা। এর জন্য ক্ষতি শুধু ছাত্রসমাজের নয়, ছাত্রদের দিকে যাঁরা তাকিয়ে আছেন আশা নিয়ে, তাঁদেরও।

ছাত্রসমাজকে তাই চিন্তা করে দেখতে হবে যে, রাস্তায় বিক্ষোভ দেখিয়ে, পরীক্ষার হলে গোলমাল করে, অধ্যক্ষ-উপাচার্যকে ঘেরাও করে তাদের শিক্ষার লক্ষ্য পূর্ণ হবে কিনা। সমাজে যে সর্বাঙ্গীণ হতাশা তা থেকে দেশের মানুষকে রক্ষা করতে পারে তরুণ সমাজ। তারাই ভবিষ্যতের আলোকবর্তিকা নিয়ে দূর করতে পারে এই অন্ধকার। সুতরাং তারা নিজেরা সংযত ও একাগ্রচিত্ত না হলে গোটা সমাজেরই ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ দেখা দেবে। দেশের সকলকেই বিষয়টি চিন্তা করে দেখতে হবে।



কেন এই ছাত্র অসন্তোষ

দিলীপ মালাকার

ঠিক মহামারী নয় কিন্তু ছোটখাটো সংক্রামক রোগ এক মহাদেশের ছোট বন্দর থেকে আরেক মহাদেশের কোনো শহরে অভিযান চালায় নিয়মিত। ইউরোপ-আমেরিকার সংক্রামক রোগও আজকাল ছড়ায় এশিয়া বা আফ্রিকার প্রান্তরে। সব সংক্রামক রোগের বাহক আজকাল দ্রুতগতি-সম্পন্ন যানবাহন। রোগের মতন সৎ ও কু চিন্তার সংক্রামক রোগও আজকাল নিমেষের মধ্যে এক দেশ থেকে আরেক দেশে ছড়িয়ে পড়ে। সংক্রামক রোগ যাতে না ছড়িয়ে পড়ে তার জন্যে প্রতিটি দেশের বন্দরে বন্দরে স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রখর পাহারার ব্যবস্থা রয়েছে। হেলথ্ সার্টিফিকেট না দেখালে বন্দর দিয়ে দেশে প্রবেশ নিষেধ।

মানুষের মনের ও চিন্তাধারার সংক্রামক রোগকে বাধা দেবার কোনো হেলথ্ অফিসার বা সার্টিফিকেটের তেমন ব্যবস্থা নেই। অবশ্য অনেক দেশে সেসব নিয়ন্ত্রণের অনেক ব্যবস্থা আছে। সবাইকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। তাদের চিন্তাধারা যাচাই করে 'ভিসা' দেওয়া হয়ে থাকে। তা সত্ত্বেও কিন্তু অনেকে প্রহরীদের চোখে ধুলো দিয়ে এদেশ সেদেশ করে থাকে। এই করে তারা চিন্তাধারার সংক্রামক ছড়িয়ে দেয়।

ছাত্র-আন্দোলন, ছাত্র-অসন্তোষ ও ছাত্র-বিক্ষোভের সংক্রামক রোগ আজ আর কোনো একটি রাষ্ট্রের বা একটি দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এশিয়া, আমেরিকা, ইউরোপের প্রতিটি দেশেই চলেছে ছাত্র অসন্তোষ ও বিক্ষোভ। তবে এক এক দেশে এক এক ভাবে রোগের প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। সব দেশে উপসর্গ এক নয়। সামাজিক ও রাষ্ট্রিক পরিবেশ এবং কাঠামো অনুযায়ী তার প্রকাশ। ভারতবর্ষই তার প্রকৃষ্ট নমুনা। ভারতের এক এক রাজ্যে ছাত্র-অসন্তোষ এক এক রকমের। সব রাজ্যে ছাত্র-সমস্যা এক নয়। বাংলা দেশের ছাত্র অসন্তোষ ও বিক্ষোভ ভিন্ন ধরনের। তবে এদের মূল উদ্দেশ্য ও আদর্শ একই। স্থান কাল পাত্র হিসেবে তার প্রকারভেদ হয়েছে ও হচ্ছে। তবে একটি কথা ঠিকই যে, ছাত্র-অসন্তোষ ও বিক্ষোভ দিন দিন বৃদ্ধির দিকেই। কেন বাড়ছে তার সদুত্তর দিতে পারবে ছাত্ররা নিজেরাই। অন্যদের মুখে তার বিশ্লেষণ শুনে সময় নষ্ট করার বিশেষ প্রয়োজন নেই। কিছু ছাত্রদরদী মহান শিক্ষক আছেন যাঁদের মতামত সর্বাগ্রে গ্রহণীয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁদের সংখ্যা অতি অল্প।

কলকাতার বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনা করার আগে তথাকথিত ছাত্র-বিশেষজ্ঞ আমায় বারবার বলছিলেন, ছাত্রদের সঙ্গে খুব বেশী আলোচনা করো না, বিপাকে পড়ার সম্ভাবনা আছে। একটু সাবধানে থেমে কথাবার্তা বলো। এই বলে তাঁরা আমায় সাবধান করে দিয়েছিলেন। আমি এদেশেও ছাত্র ছিলাম এবং বিদেশেও। ছাত্র আন্দোলন এদেশে ও ইউরোপে দেখেছি। কিন্তু ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বিপদে পড়ার কথা কোনোদিন চিন্তা করিনি। ছাত্র-বিশেষজ্ঞদের কথায় বুঝলাম যে, তাঁরা জলাতঙ্কের মতনই ছাত্রাতঙ্কে ভুগছেন। তাঁদের মতন আরও অনেকে। রাজনৈতিক নেতারা সুদ্ধ।

প্রথম যেদিন যাই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ইউনিয়নে ছাত্র-নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করতে সেদিন শুনেছিলাম কারুর মুখে চাপা আওয়াজ যে এই আলোচনা চালাবার চেষ্টা বিদেশী প্রচেষ্টায় প্ররোচিত। ইদানীং ছাত্র-অসন্তোষ সম্পর্কে অনেক [illegible] ছাত্রদের যেমন স্বাভাবিক [illegible] উঠেছে তেমনি ছাত্রদের কিছু কিছু নেতাও বৈদেশিক আতঙ্কে ভুগছে। এই ভাবনার [illegible]। এর প্রধান কারণ হল এই যে দুই দশকেই স্বাধীনভাবে চিন্তা করাও ভুলে গেছেন। পরাধীন ও একবার চিন্তা, গোষ্ঠীর খপ্পরে পড়ে তাঁরা তাঁদের স্বাধীন ভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা হারিয়েছেন। ঠিক এরই জন্যে ছাত্রদের মধ্যে দলাদলি হয়েছে। ছাত্রেরা সবাই বিপ্লবী, সমাজবাদী, আদর্শবাদী ও দেশপ্রেমিক। কিন্তু ছাত্রদের সুখ-সুবিধা, ছাত্রদের প্রকৃত অভাব-অভিযোগ যেমন, শিক্ষাব্যবস্থা, সস্তায় খাদ্য ও বাসস্থান চিকিৎসা ও খেলাধুলোর প্রতি কোনো সংগঠনমূলক কাজ হচ্ছে বলে আমি কোনো তেমন প্রচেষ্টা দেখিনি। আমাদের সমাজের ও রাষ্ট্র-নেতারাও দল নির্বিশেষে এবিষয়ে নির্বিকার। তাঁরা বছরে কয়েক লক্ষ ঘণ্টা বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান, কিন্তু ছাত্রদের এই প্রশ্ন সমাধানে কোনো দিন এগিয়ে আসেন না। এবং তাঁদের খপ্পরে পড়ে কিছু ছাত্র শুধু রাজনৈতিক বুলিই কপচান কিন্তু আসল কাজ থেকে দূরে সরে দাঁড়ান। এই গোঁজামিলের সমাধান না হলে ছাত্র-অসন্তোষ ও বিক্ষোভ থামা অসম্ভব। গোঁজামিল কতদিন আর চলতে পারে?

কেন এই অসন্তোষ? এই প্রশ্নের উত্তরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল ছাত্র-নেতা আমায় জানান যে, এর প্রধান কারণ হল দারিদ্র্য, সমাজে ও রাষ্ট্রে অসামঞ্জস্য ও অব্যবস্থা। জীবিকার্জনে পর্বতপ্রমাণ বাধা দেখে ছাত্ররা নিরাশবাদী হতে বাধ্য হচ্ছেন।

এই সবের মূল কারণ রাজনৈতিক অব্যবস্থা। তার সমাধানকল্পেই তাঁরা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে চলতে বাধ্য হয়েছেন। রাজনৈতিক পরিবর্তন না হলে ছাত্র-অসন্তোষ ও বিক্ষোভ থামা সম্ভব নয়। কিন্তু একদল ছাত্র যাঁরা রাজনীতির চেয়ে পড়াশোনায় ব্যস্ত থাকেন তাঁরা এইসব আন্দোলনে জড়িয়ে পড়াশোনার সর্বনাশ ডাকতে চান না। এঁদের সংখ্যাও নগণ্য নয়। বারেবারে পরীক্ষার তারিখ পিছিয়ে দেওয়ার ফলে পড়ুয়া ছাত্ররা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন বলে আমায় জানিয়েছেন। তবে অপর পক্ষ একথাও বলেছে যে, ১৯৬৬ ও ১৯৬৭ সালে কেরোসিন অভাব, খাদ্যাভাব আন্দোলনে বহুবার ধর্মঘট হয় এবং ফলে লেখাপড়া ও ক্লাশ কম হয়। সেই কারণে পরীক্ষার তারিখ পিছিয়ে দেবার পক্ষে তাঁরা আন্দোলন করেন। এইসব ব্যাপারে নাকি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ এবং উপাচার্য ছাত্র-নেতাদের সঙ্গে প্রায়ই পরামর্শ করে থাকেন। ছাত্র-নেতাদের মতে তাঁদের সঙ্গে উপাচার্যের সম্পর্ক খুবই মধুর।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-নেতাদের কথায় এই বুঝেছি যে, তাঁরা প্রথমে রাজনৈতিক আন্দোলনকে অগ্রাধিকার দিতে চান, তারপর হল ছাত্রদের স্বার্থে ছাত্র-আন্দোলন। যেমন স্কলারশিপ, চিকিৎসা, আহার ও বাসস্থান, খেলাধুলো ও আমোদপ্রমোদ। এখানেই তফাৎ ইউরোপের পুঁজিবাদী দেশের ও সমাজবাদী দেশের ছাত্রসংস্থার সঙ্গে।

ইউরোপের সোস্যালিস্ট দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-সংস্থার সংস্পর্শে আমি বহুবার এসেছি। সোস্যালিস্ট দেশেই দেখেছি তাঁদের ছাত্রসংস্থা ছাত্রদের মুখ্য সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত, যেমন স্কলারশিপ, চিকিৎসা, আহার ও বাসস্থান, খেলাধুলো ও আমোদপ্রমোদ। তবে সুখের বিষয় ওঁদের ছাত্র-সংস্থা তাঁদের সরকারের কাছ থেকে সর্ববিষয়ে সহযোগিতা ও সাহায্য পেয়ে থাকে। এবং উপরোক্ত সমস্যায় সরকার আগে এগিয়ে আসে। রাজনৈতিক আন্দোলন নিয়ে আমি সোস্যালিস্ট দেশের ছাত্রদের মাথা ঘামাতে দেখিনি। তার মানে এই নয় যে, তাঁরা রাজনীতি বোঝেন না।

পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংস্থাগুলো ভিন্নধরনের। তারা আরও স্বাধীন। রাজনীতির অনেক দূরে তারা। তাদের ছাত্র-সংস্থার প্রথম ও প্রধান কাজ হল ছাত্রদের স্কলারশিপের সংখ্যা যাতে আরও বাড়ে, পড়বার জায়গা ও হলঘরের সংখ্যা ও অধ্যাপকের সংখ্যা যাতে আরও বাড়ে তার জন্যে আন্দোলন। তারা নিজেরা সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বসে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করে; চিকিৎসা হয় বিনামূল্যে, খেলাধুলো আমোদপ্রমোদের কোনো ত্রুটি করে না তারা। সেদিকে তাদের সজাগ দৃষ্টি। ফ্রান্স ও ইতালীতে বামপন্থী দলের জয়জয়াকার। সেখানে তাদের দল বেশ শক্তিশালী। তাই বলে কিন্তু ছাত্র-নেতারা তাঁদের নিজেদের সমস্যার কথা না ভেবে বা আন্দোলন না চালিয়ে অনর্থক রাজনৈতিক আন্দোলনে বা ধর্মঘটে যোগদান করেন না। আমি তো তাই দেখেছি। আমি অনেকবার দেখেছি যে, কোনো রাজনৈতিক বিক্ষোভের সময় ছাত্র-ইউনিয়ন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছে, কিন্তু ক্লাস বাদ দিয়ে ধর্মঘট করেনি। বরং ক্লাসের শেষে তাঁরা জমায়েৎ হয়ে শোভাযাত্রা করে প্রদক্ষিণ করে কোনো হলে মিলিত হয়ে বক্তৃতায় প্রতিবাদ-সভা ডেকেছেন।

রাজনৈতিক আন্দোলনের নামে ক্লাস কামাই বা পরীক্ষার প্রস্তুতি স্থগিত রাখতে আমি কোনোদিন শুনিনি। রাজনৈতিক বা অন্য কোনো কারণে খুব বেশী ধর্মঘট করতে দেখিনি। প্রয়োজন হলে তাঁরাও ধর্মঘট ডাকতেন। তবে প্রতিদিন নয়।

কলকাতায় বিভিন্ন ছাত্রসংস্থার সংগঠনমূলক কাজের নমুনা দেখে বিস্মিত হয়েছি। এক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে রয়েছে এক লাখ সত্তর হাজার ছাত্র-ছাত্রী। ছাত্র-সংস্থার পরিচালিত চিকিৎসাকেন্দ্রে রয়েছে মাত্র ডজনখানেক 'বেড'। সেখানে থাকা উচিত ছিল তিন হাজার 'বেড'। অন্তত তা না হলেও তিনশ বেড থাকা উচিত ছিল। সে সম্বন্ধে কোনো প্রচেষ্টা চলেছে বলে আমার জানা নেই। তাছাড়া সস্তায় মধ্যাহ্ন বা সান্ধ্যভোজের কোনো ব্যবস্থা আছে বলেও আমার জানা নেই। তবে ছাত্রনেতাদের কাছে শুনলাম যে তাঁদের গ্রামাঞ্চলে ছাত্রদের জন্যে বাসের ভাড়া কমাবার আন্দোলনে সার্থক হয়েছেন। বাস-ট্রাম-ট্রেনে ছাত্রদের জন্যে সস্তায় বিশেষ ব্যবস্থা থাকা উচিত বলে মনে করি।

দোলে ফাল্গুন-চৈত্রব্যাপী
১৫% কমিশন
ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথ-কৃত
চৈতন্যচরিতামৃত
শ্রীচৈতন্যভাগবত
মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ
রাজমোহন নাথ-কৃত
নাথপন্থের প্রাচীন পুঁথি ৬.৫০
RIGVEDA SUMMARY 8.00
KESHOBKANTO'S
MESSAGE OF THE GITA 12.00
সাধনা প্রকাশনী

সুন্দর ও মজবুত
ছাতা
2525
TRADE MARK
K.C.PAUL & SONS
CALCUTTA
REGD.NO 234676
কে. সি. পাল এণ্ড সন্স্
৮২, পণ্ডিত পুরুষোত্তম রায় স্ট্রীট
কলিকাতা-৭ ... ফোন: ৩৩-৭১০৪



স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা গ্রহণের প্রথম দিনে ছাত্ররা উত্তরপত্রগুলিকে ছিঁড়ে রাস্তায় ফেলে দেয়।

কলকাতায় ছাত্রদের মধ্যে রাজনীতিই মুখ্য এই জন্যে যে, এক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ইউনিয়নে এগারটি বামপন্থী রাজনৈতিক দল সুপ্রতিষ্ঠিত। যেমন, স্টুডেন্টস ফেডারেশন (বাম ও দক্ষিণপন্থী কম্যুনিস্ট দল পরিচালিত), ডেমোক্র্যাটিক স্টুডেন্ট অর্গানিজেশন (এস-ইউ-সি), প্রগ্রেসিভ স্টুডেন্ট ইউনিয়ন (আর এস পি), ফেডারেশন অব রিভল্যুশনারি স্টুডেন্টস্ (ওয়ার্কার্স পার্টি অব ইন্ডিয়া), স্টুডেন্টস ব্লক (ফরোয়ার্ড ব্লক), সমাজবাদী ছাত্র সংগঠন (পি-এস-পি), সমাজবাদী ছাত্র সমাজ (এস-এস-পি), ছাত্র কল্যাণ পরিষদ (বাঙলা কংগ্রেস), ছাত্রসভা (বলশেভিক পার্টি), রিভল্যুশনারি স্টুডেন্টস্ ফেডারেশান (নকসালবাড়ী দল)। কংগ্রেস দলের রয়েছে ছাত্র-পরিষদ। জনসংঘের রয়েছে বিদ্যার্থী পরিষদ। ছাত্র পরিষদকে একেবারে উড়িয়ে দেয় না বামপন্থী ছাত্ররা। কারণ প্রয়োজন ও সুযোগ এলেই ছাত্রপরিষদও মিছিল বার করে। সংঘর্ষও বাধে। ছাত্র-নেতাদের মতে বিজ্ঞান বিভাগে বেশীরভাগই ছাত্র, ছাত্রী কম, আর ছাত্ররা প্রায় সকলেই আন্দোলনে যোগদান করে। কিন্তু আর্টস ও হিউম্যানিটিজ বিভাগে ছাত্রীদের সংখ্যা শতকরা সত্তর, তাই সেখানে বাকী ছাত্ররা যেমন পুরোপুরি আন্দোলনে এগিয়ে আসে ঠিক সেই পরিমাণে ছাত্রীরা সাড়া দেয় না।

এই প্রসঙ্গে শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতীর কথা মনে পড়ে গেল। বিশ্বভারতীর ছাত্রসংখ্যা পাঁচ হাজারের কিছু বেশী। তার আশীভাগই ছাত্রী। সেখানেও ই এক ব্যাপার। সব দেশেই ছাত্রীরা রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে একটু দূরে থাকেন। নানা অসুবিধা স্বীকার করেও তাঁরা কোনো আন্দোলনে যোগ দিতে চান না। তবে শান্তিনিকেতনে ছাত্রের সংখ্যা যতই বাড়বে ততই সেখানে আন্দোলন জোরদার হবে বলে মনে হয়। শান্তিনিকেতন বাঙলা দেশের বাইরে নয়। যদি সমগ্র বাংলা দেশে অশান্তির আগুন জ্বলে তখন কি শান্তিনিকেতনে শান্তি অব্যাহত থাকবে? এ প্রশ্ন অনেকেই করেছেন। বছর দুয়েকের মধ্যেই অশান্তির আভাস দেখা দিতে পারে সেখানেও।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পর আমি যাই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করতে। কলকাতা ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-নেতাদের মুখে প্রায় একই ধরনের অনুযোগ শুনি। ছাত্র-অসন্তোষের মূল কারণ সম্বন্ধে তাঁদের প্রায় একই মত। এই সম্বন্ধে আমি একদিন অধ্যাপক সত্যেন বসুর সঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করেছিলাম। অধ্যাপক সত্যেন বসু শুধু বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীই নন, তিনি উপরন্তু ছাত্র-দরদী। বহুকাল ছাত্রদের নিয়ে দিন কাটিয়েছেন। এখনও তাঁর বাড়ী গেলে ছাত্রের ভীড় দেখা যাবে। বর্তমান ছাত্র-অসন্তোষ সম্পর্কে তিনি গভীরভাবে ভাবেন। তাঁর মতে ছাত্র-অসন্তোষ ও বিক্ষোভের মূল কারণ হল অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা। প্রচুর ছাত্র পাশ করে বেকার হয়ে বসে আছে। জীবিকার্জনের পথ তাদের কাছে অন্ধকারপ্রায়। আর্থিক-সংকট থেকেই তারা নিরাশবাদী বনে গেছে। তারা বিক্ষুব্ধ। সমাজ ও রাষ্ট্রের কাছ থেকে তারা পূর্ণ সহযোগিতা ও সাহায্য পাচ্ছে না বলে তাদের বিক্ষোভ আরও বাড়ছে। উদাহরণস্বরূপ তিনি আমায় আরও বলেছেন, যেসব ছেলে বিদেশে গিয়েছিল উচ্চশিক্ষার্থে বা গবেষণা-কাজে তাদের অনেকে দেশের টানে ফিরে আসে দেশে, কিন্তু দেশের নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি, কর্তৃপক্ষের বৈমাত্রেয়সূচক মনোভাবের ফলে অনেক ছাত্র-গবেষক দেশপ্রেমের কথা ভুলে যেতে বাধ্য হন। এবং তাঁরা অন্নসংস্থানের সুরাহা না করতে পেরে আবার বিদেশে চলে যেতে বাধ্য হন। পিছিয়ে পড়া অনুন্নত দেশ ভারতবর্ষের উন্নতির জন্যেই প্রয়োজন অসংখ্য বৈজ্ঞানিক। কিন্তু আমাদের তরুণ বৈজ্ঞানিকেরা দেশ ছেড়ে বিদেশে গিয়ে বিদেশী রাষ্ট্রের উন্নতিতে খাটতে বাধ্য হচ্ছেন। এরচেয়ে পরিতাপের আর কী থাকতে পারে। এইসব মিলিয়েই ছাত্র-অসন্তোষ ও বিক্ষোভ আরও দানা বাঁধছে। তবে তিনি একথাও বলেন যে, আগের মতন আর এখন ছাত্র-শিক্ষকের মধুর সম্পর্ক নেই। দিনে দিনে সে সম্পর্ক ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে।

আজকাল ইস্কুলের পরীক্ষাহলের আশেপাশে পুলিশ মোতায়েন করতে হয়। প্রায়ই দাঙ্গা হয়ে যায়। এ সম্পর্কে এক স্কুলশিক্ষক বলেছেন যে, উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রের সংখ্যা বাড়ছে। তারা টুকে পরীক্ষা দিতে চায়। টোকার ব্যাপারে বাধা দিলেই দাঙ্গা বেঁধে যায়। পরীক্ষা ভন্ডুল হয়। কেউকেউ মনে করেন যে এ ব্যাপারে কখনো কখনো রাজনৈতিক দলের উস্কানি ও পৃষ্ঠ-

পোষকর্তাও থাকে। তাছাড়া আজকাল স্কুলে ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক কখনো কখনো বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গড়ে উঠছে। শিক্ষার আদর্শে নয়।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই দল ছাত্র-নেতা গোড়া থেকেই বলেছেন যে, ছাত্র-অসন্তোষের মূল কারণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক। পাশ করার পর চাকরীর পথ খোলা থাকছে না বলে তাদের দুর্ভাবনা। তাই তাদের এত নৈরাশ্য। এবং এই নৈরাশ্য থেকেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র অসন্তোষ ও বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। অতীতের ইতিহাসে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রবিক্ষোভ অজানা ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো এক উচ্চ কর্তৃপক্ষ আমায় বলেছিলেন যে, যাদবপুরে কোনোদিন ধর্মঘট হত না, কিন্তু ১৯৬৬ সালের শেষের দিকে যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রেসিডেন্সী কলেজে বিক্ষোভ চলছিল তখন কলকাতার ছাত্রদল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-সংস্থার কাছে এক জোড়া লালপেড়ে শাড়ী ও শাঁখা পাঠিয়ে দেয়। অর্থাৎ তারা যেন ওসব পরিধান করে ঘরে বসে থাকে। তার পরের দিন থেকেই নাকি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে চাপা গুঞ্জন শোনা যায়। তার পরবর্তী ধারা হল জোরদার ইউনিয়ন গঠন ও আন্দোলন।

যাদবপুরের একদল ছাত্রনেতা আমায় বলেছেন যে, ছাত্রদের ভবিষ্যৎ আজ অন্ধকার। তাদের সামনে কোনো আশা নেই। অন্নসংস্থানের কোনো পরিকল্পনা বা শুভ প্রচেষ্টা নেই। এর জন্যে দায়ী সমাজ ও রাষ্ট্র। সুতরাং এই সমস্যা সমাধানে হাত গুটিয়ে বসে থাকা নিরর্থক। রাজনীতিই হল একমাত্র হাতিয়ার। একালে রাজনীতি থেকে দূরে বসে সমস্যা সমাধানের চিন্তা হতে পারে না। এর জন্যে তাঁদের দোষারোপ করা হয়ে থকে। যার কোনো ভিত্তি নেই। রাজনৈতিক রং সেখানে এসেছে এবং আসতে বাধ্য।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনলজি ছাত্ররা আজ চিন্তিত তাঁদের ভবিষ্যৎ নিয়ে। এবিষয়ে সব দলই সমান চিন্তা করে এবং যাঁরা রাজনীতি পছন্দ করে না তাঁরাও একমত। তাই তাঁরা আন্দোলনে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হচ্ছেন। আর্টস ও হিউম্যানিটিজ বিভাগে ছাত্রের চেয়ে ছাত্রীর সংখ্যা বেশী থাকায় সেখানে সক্রিয় আন্দোলন অপেক্ষাকৃত কম। তবে ছাত্রীরা আন্দোলনে যোগ না দিলেও বিভিন্ন কাজে মাঝে মাঝে সহযোগিতা করে থাকে। যেমন প্রদর্শনীতে খাটা ও তদারক করা ইত্যাদি। যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনোদিন ছাত্রধর্মঘট বা বিক্ষোভ দেখা যেত না সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ কলকাতার সংক্রামক রোগের ছোঁয়াচ লেগেছে। কলকাতার মতনই আজ তার হাল। এর জন্যে দায়ী কে?

প্রেসিডেন্সী কলেজের আবহাওয়া একটু ভিন্নধরনের। অতীতে প্রেসিডেন্সি কলেজে ধর্মঘট বা বিক্ষোভ দেখা দিত না। ভাল ছেলেদের আস্তানা বলে 'স্নবারি' ছিল এবং এখনও আছে। অর্থহীন এই 'স্নবারি' থেকে মুক্ত নয় একালের ছাত্র-ছাত্রীরা। কিন্তু একালের প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা পার্থিব জগৎ ও রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন নয়। থাকাও বোধহয় সম্ভব নয়। একদল ছাত্র আমায় জানান যে, ১৯৬৬ সালে একদল ছাত্রকে কলেজ থেকে তাড়ানর পরেই ছাত্র-ধর্মঘট দেখা দেয়। আরেকদল ছাত্র আমায় বলেন, যেসব ছাত্রদের কলেজ থেকে বিতাড়িত করা হয়, তাদের কোন্ কারণে বা অজুহাতে তাড়ান হয় কৈফিয়ৎ তারা চাইলে কোনো সদুত্তর না পাওয়ায় ধর্মঘট দীর্ঘকাল চলতে বাধ্য হয়। রাজনৈতিক প্রভাব ও বিশৃংখলা দুই তরফ থেকেই দেখা দিয়েছিল। এবং দুই দলই ছিল অনমনীয়। একদল ছাত্র বলে যে, ছাত্রদের বক্তব্য কখনো কখনো উপেক্ষিত হয়, ফলে সম্পর্ক আরও তিক্ততর হয়। এবং এইসব কারণেই আজ প্রেসিডেন্সী কলেজে ছাত্র-আন্দোলনে চরম বামপন্থী এমনকি নকসালবাড়ীপন্থীরা আড্ডা জমাতে আরও বেশী সুযোগ পেয়েছে।

উপরোক্ত তিনটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের সংগে আলোচনা করে দেখেছি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা একটু রুক্ষ। তাঁরা অন্যবিষয়ে আলোচনার চেয়ে কট্টর রাজনীতিই বেশী পছন্দ করেন। যাদবপুরের ছাত্ররা অনেকখানি ধীর-স্থির। তাঁরা ঠান্ডা মাথায় নানাবিষয়ে আলোচনা করেন বলে খুশি হয়েছি। এবং তাঁরা বেশ গভীর চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা বেশ পরিমাণে গভীর। তাঁদের সংগে নানান বিষয়ে আলোচনা করা চলে। আরও লক্ষ্য করলাম একালের ছাত্রীরা ছাত্রদের চেয়ে কোনো অংশে পিছিয়ে নেই চিন্তার ক্ষেত্রে। তাঁরা বেশ 'সিরিয়াস'। এটি দেশের পক্ষে শুভ-চিহ্ন।



ছাত্রীদের শোভাযাত্রা

বেকার ইঞ্জিনীয়ার : সংকট ও সমাধান

কল্যাণ বসু

বিপ্লব রায়, কমল চৌধুরী প্রমুখের কথা বলছি। অনেকটা পথ ছুটে এসে এরা থমকে দাঁড়িয়েছে। যে প্রতিশ্রুত সম্ভাবনার দিকে লক্ষ্য রেখে নিজেদের সব সংকল্প এরা রক্ষা করে এসেছে, হঠাৎ চোখের সামনে থেকে সেই সম্ভাবনা মুছে গেল। পেছনে ফেরা—এদের স্বপ্নে নেই। অথচ মুখোমুখি সব কটি দরজা, সব কটি জানালা নির্দয়ভাবে চোখ বুজে রয়েছে।

হিসেবের খাতার হিসেবে এরাও সমাজের বোঝা। অন্য হাজারো বেকারের মত এরাও আজ বেকার। বেকার ইঞ্জিনীয়ার। বাপ-মা এবং সংসারের আর যারা অজস্র ত্যাগে দিনের পর দিন এদের সাহস জুগিয়েছে, প্রেরণা দিয়েছে, তাদের মুখে হাসি ফোটাতে এরা অক্ষম। অথচ, এ অবস্থার জন্য বিপ্লব, কমলদের দায়ী করা চলে না। অসংখ্য হাতুড়ীর ঘায়ে নিজেদের এরা প্রস্তুত করেছে। কিন্তু সমাজ এদের হাতে দেশ গড়ার হাতিয়ার তুলে দেয় নি। সমাজকে জেরা করলে সে দেখাবে সরকারকে, সরকার পরিকল্পনাকে এবং সব শেষে হয়ত শোনা যাবে বিদেশী আক্রমণ, দারিদ্র্য ইত্যাদি।

স্বাধীনতার পর থেকেই শিক্ষার প্রসার এবং শিক্ষিত দেশবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধির কথা বলা হতে থাকে। এবং পণ্ডিত নেহরু প্রমুখ বিশিষ্ট নেতারাও এ ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দেন। নতুন নতুন স্কুল, কলেজ তৈরী শুরু হয়ে যায়। সেই একই সঙ্গে দেশের কর্ণধাররা শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রয়োজনভিত্তিক করে তোলার কথা ভাবতে থাকেন। শিক্ষা কমিশন নিয়োগ করা হল। কলেজ পর্যায়ে অধিকাংশ ছাত্রকে বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার সুপারিশ এল। সেই থেকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষাসহ বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় শিক্ষাকেন্দ্র বেড়েই চলেছে। কিন্তু তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্যে পৌঁছবার আগেই ইঞ্জিনীয়ারদের কর্মসংস্থানের সমস্যা দেখা দিয়েছে। এ সমস্যা আরও প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে জীববিজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার ছাত্রদের বেলায়। এখন অনেকে প্রশ্ন তুলছেন, এ অবস্থায় শিক্ষার সুযোগ কেন ছাঁটিয়ে নেয়া হচ্ছে না। অর্থাৎ এঁরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কমাতে বলছেন, ছাত্র ভর্তির সংখ্যা কমাতে বলছেন। ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজগুলোতে ছাত্র ভর্তির সংখ্যা কমাবার প্রস্তাবও উঠেছে। কিন্তু এ ধরনের প্রস্তাব মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। অর্থনীতির সাময়িক চাহিদার মাপকাঠির বিচারে শিক্ষার সুযোগ গুটিয়ে নেওয়া অবাস্তব। এ পথে সমস্যার সমাধান তো সম্ভব নয়ই, বরঞ্চ ভবিষ্যতে সমস্যা জটিলতর হবে এবং প্রচুর অর্থের অপচয় হবে। কেউ কেউ উচ্চশিক্ষার সুযোগ নিয়ন্ত্রণের কথা বলছেন। এ প্রস্তাবে যৌক্তিকতা থাকলেও জোর করে কিছু চাপিয়ে দেওয়া যায় না। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ভবঘুরের সংখ্যা কমাতে হলে স্কুল পর্যায়ের শিক্ষা সমাপ্তির পর ছাত্রদের সামনে চাকুরী, বিশেষ ট্রেণিং ব্যবস্থার সুযোগ তুলে ধরা দরকার।

বিশ বছরে ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রায় ৭ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। একটি পরিসংখ্যান থেকে এ সত্যের কিনারা করা যায়। ১৯৪৭ সালে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ছাত্র সংখ্যা ছিল তিন লক্ষ। আজ সে সংখ্যা দাঁড়িয়েছে বিশ লক্ষ। কিন্তু দেশের শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি করার পেছনে কোন সুচিন্তিত পরিকল্পনা ছিল বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন না। 'ইঞ্জিনীয়াররা শৌখিন, গৃহিণীদের মতই শৌখিন'—কোন কোন রাষ্ট্রনায়কের এ ধরনের মন্তব্যের প্রতিবাদে ইঞ্জিনীয়াররা বলেন, নিজেদের গাফিলতি ঢাকবার জন্যেই রাষ্ট্রনায়কদের এ ধরনের কথা বলতে শোনা যায়। ক্ষুব্ধ একজন ইঞ্জিনীয়ার বললেন, "তাঁরা কি চান আমরা রাস্তায় রাস্তায় মোট বইব। দায়িত্বপূর্ণ কাজ করার জন্যই আমরা নিজেদের তৈরী করেছি। কাজ না পেয়ে প্রয়োজনের তাগাদায় ও চাহিদায় অনেকে নেমেও এসেছেন। নিজেদের পরিচয় গোপন করে আমাদের অনেকে প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতাও করছেন।"

অথচ, একজন ইঞ্জিনীয়ার তৈরী করতে কি বিরাট খরচ ভাবতে পারেন? একজন ছাত্রের জন্য পাঁচ বছরে একটি পরিবারকে হাজার দশেক টাকা খরচ করতে হয়। খড়্গপুর ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটুট অব টেকনোলজিতে এক-একজন ছাত্রের পেছনে পাঁচ বছরে সরকারের খরচ উনিশ হাজার টাকার মত। খড়্গপুরের মত না হলেও অন্যান্য ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষা কেন্দ্রেও সরকারের বিরাট খরচ হয়ে থাকে। এত টাকার বিনিময়ে যে লোকশক্তি তৈরী হচ্ছে তা সুযোগের অভাবের অজুহাতে অনুৎপাদক করে রাখার কোন যৌক্তিকতা আছে কি?

পশ্চিম বাংলার ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজগুলো থেকে বছরে প্রায় ১৪০০ ইঞ্জিনীয়ার ডিগ্রী পেয়ে থাকেন। একটি কেন্দ্রের হিসেব বর্তমান সমস্যার কিছুটা ধারণা দেবে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৭ সালে বিভিন্ন বিভাগে মোট ৩৭০ ইঞ্জিনীয়ার ডিগ্রী পান। এদের মধ্যে যাঁরা চাকরী পেয়েছেন বলে হিসেব পাওয়া গিয়েছে, তাঁদের সংখ্যা মাত্র ১৩৬। সরকারের রিজিওন্যাল ট্রেণিং, উচ্চশিক্ষা, বিদেশ সফর ইত্যাদি ব্যাপারে মোট ১২৪ জন নিয়োজিত আছেন। বাকী একশ' ছয়জনের খবর পাওয়া যায় নি।

ইঞ্জিনীয়ারিং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েই ইঞ্জিনীয়ারদের আরো কঠিন পরীক্ষায় বসতে হয়। ধৈর্যের পরীক্ষা। অ্যাপ্লিকেশনের পর অ্যাপ্লিকেশন। কোথাও কোথাও থেকে 'রিগ্রেট' পত্র আসে, কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে তাও নয়। সুবিধের কথা, বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে আবেদনপত্র পাঠাতে বিশেষ 'ফী'র প্রয়োজন হয় না। কিন্তু হিন্দুস্থান স্টীল, হরিদ্বারের ভারত হেভী ইলেকট্রিক্যাল, এফ-সি-আই প্রভৃতি সরকারী সংস্থায় আবেদনপত্র পাঠাতেই পাঁচ থেকে দশ টাকার পোস্টাল অর্ডার দিতে হয়। জনৈক বেকার ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে কথা বলছিলাম। দু' বছর আগে তিনি ফাস্ট' ক্লাস পেয়ে পাশ করেছেন। চাকরীর আশায় দু' বছরে তিনি যত অ্যাপ্লিকেশন ছেড়েছেন তার সংখ্যা শ'-আড়াই। যখন কথা বলছিলাম তখনও তাঁর হাতে ছিল একটি অ্যাপ্লিকেশন। ডাকে ফেলতে চলেছেন। গোটা পঞ্চাশেক ইন্টারভিউ পেয়েছেন। যে ক'টিতে গিয়েছেন, কোনটিই লাগে নি। প্রথম যেদিন ইন্টারভিউ দিতে যান, মনে ছিল, চাকরী তো হাতের মুঠোয়। কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে, ততই মনে হচ্ছে ইন্টারভিউ ব্যাপারটা একেবারে 'ধোঁকাবাজী'। দিনে টুইশন করে রাতের পর রাত জেগে কি কষ্ট করে ডিগ্রী আদায় করতে হয়েছে, ভদ্রলোক সে কাহিনী বলছিলেন। চাকরীর বিজ্ঞাপনের কথা উঠল। তিনি বললেন, খবরের কাগজে ইঞ্জিনীয়ারদের চাকরীর যেসব বিজ্ঞাপন বেরোয় সে সবে প্রধান শর্ত 'পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা আবশ্যক', কি 'ছ' বছরের অভিজ্ঞতা আবশ্যক'। কিন্তু সুযোগ না থাকলে অভিজ্ঞতা অর্জন কি করে সম্ভব? শিক্ষা ব্যবস্থার গলতি প্রসঙ্গে জনৈক অধ্যাপক বললেন, 'ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষায় প্রাকটিক্যাল ট্রেণিং-এর দিকটায় আরও বেশী গুরুত্ব দেওয়া উচিত ছিল। দেশের স্বার্থে এ ব্যাপারে সরকারী এবং বেসরকারী সংস্থাগুলোর আরো উদ্যোগী হওয়া উচিত।' বে-সরকারী শিল্প সংস্থানগুলো ইঞ্জিনীয়ার ছাত্রদের ট্রেণিং-এর যে সুযোগ দিতেন তা ক্রমশই কমিয়ে আনছেন। ডিগ্রীপ্রাপ্ত ছাত্রদের জন্য সরকারের যে এক বছরের রিজিওন্যাল ট্রেণিং-এর ব্যবস্থা আছে তাও প্রয়োজনের তুলনায় কিছুই নয়। শিবপুর বি-ই কলেজের গত বছরের ৩৩৫ জন ডিগ্রীপ্রাপ্তের মধ্যে মাত্র ১২০ জন এবং যাদবপুরের ৩৭০

জনের মধ্যে ১০০ জন ঐ ট্রেণিং-এর সুযোগ পেয়েছেন। শিবপুর বি-ই কলেজ থেকে অবশ্য বিশেষ চেষ্টা করে আরও শ দুয়েক ছাত্রের ট্রেণিং-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। যাঁরা সরকারের স্কীমে ট্রেণিং পাচ্ছেন তাঁরা একটা ভাতা পেয়ে থাকেন, এবং লাভের ব্যাপার হচ্ছে চাকরীদাতাদের অভিজ্ঞতা সম্পর্কিত দাবী এতে কিছুটা মেটান সম্ভব। চাকরী সন্ধানে সুবিধের জন্য বেকার ইঞ্জিনীয়াররা যাদবপুরে একটি সমিতি গঠন করেছেন। প্রায় সব কটি বিশ্ব-বিদ্যালয়েই একটি এমপ্লয়মেণ্ট বিভাগ আছে। এসব প্রচেষ্টায় কিছু কিছু ফল পাওয়া গেলেও বিরাট এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। এবং তা করতে সমস্যার মূল খুঁজে বার করা দরকার।

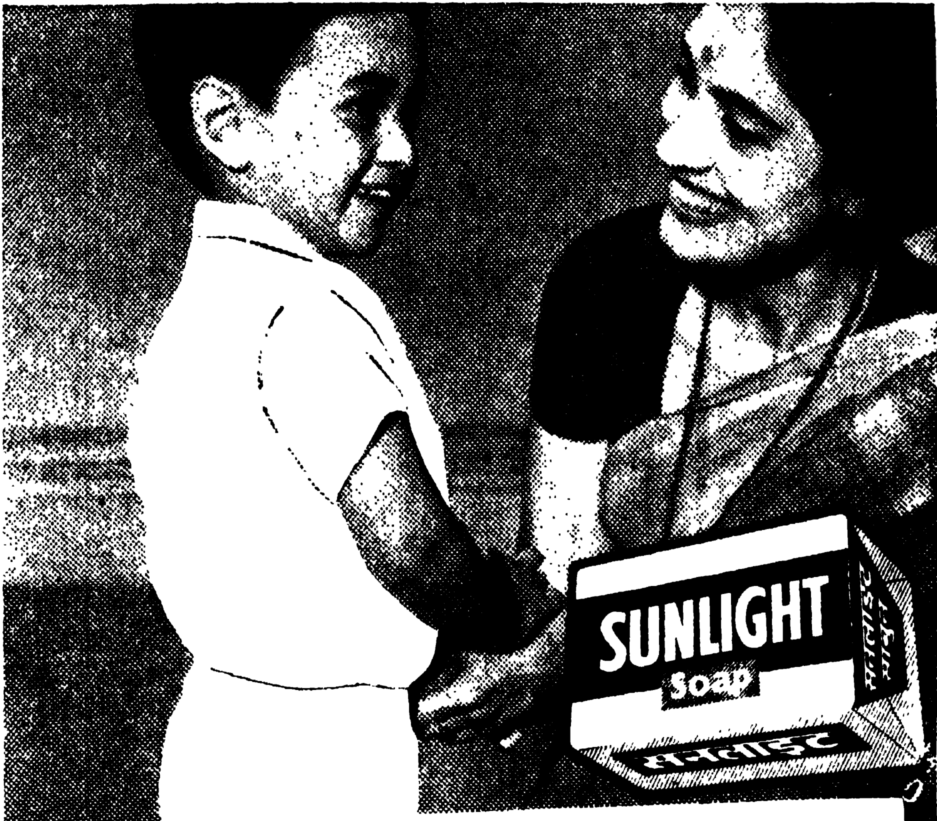
আমাদের পরিকল্পনায় গুরুত্বের বিচারে কৃষিকে প্রথমেই স্থান দেওনা হয়েছে। কৃষিপ্রধান দেশ ভারতে কৃষির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা নিশ্চয়ই সমীচীন। সাধারণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধিতে কৃষি উৎপাদন বাড়ানোরও যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। কিন্তু যে দেশে প্রতি বছর এক কোটিরও বেশী নতুন মুখের অন্ন সংস্থান করতে হয় সে দেশের অর্থনীতিকে শুধু-মাত্র কৃষি-নির্ভর করে রাখা বাস্তব বুদ্ধির পরিচায়ক নয়। লক্ষ লক্ষ মানুষের অন্ন, বস্ত্র ও চাকরীর চাহিদা মেটানো কৃষির পক্ষে সম্ভব নয়। এর কারণ জমির ওপর চাপ ভারতে বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। তাই কৃষির

সানলাইটে

প্রতিবার

আপনার জামাকাপড়

আরো ঝলমলে ক'রে কাচে



সানলাইট সাবান একবার নিজেই ব্যবহার ক'রে দেখুন...কী চমৎকার ঝলমলে হয় কাপড়চোপড়। দেখবেন, প্রতিবার কাচার সঙ্গে সঙ্গে আপনার জামাকাপড় কেমন আরো বেশী উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। অল্প একটু ঘষলেই অজস্র ফেনা হবে, আর সেই ফেনা কাপড়চোপড় অনায়াসে সুন্দর পরিষ্কার ঝলমলে ক'রে দেবে। বাড়ীতে সব কাপড়চোপড়ই সানলাইটে কাচুন।

সানলাইটে আপনার
প্রতিদিনের সব জামাকাপড় কাচুন

লিনটাস-S. 62-140 BG (R)

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

সঙ্গে সঙ্গে শিল্প-প্রসারও সমানভাবে প্রয়োজন। কিন্তু গত ছ' বছরের হিসেব দেখলে বোঝা যাবে ক্রমশ ভারতে শিল্প-প্রসার কিভাবে শ্লথ হয়ে পড়ছে। সে কারণেই ক্রমশ অর্থনৈতিক সংকট দেশ ছেয়ে ফেলছে। ছোট ছোট শিল্পপতিরা নতুন কোন 'ঝুঁকিপূর্ণ' বিনিয়োগ করতে চাইছেন না। এর ফলে মূল্যমানের প্রতিযোগিতায় টিঁকতে না পেরে ভারতীয় উৎপাদন দ্রব্যের রপ্তানী কমছে এবং দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগও কমছে। কিন্তু সরকার সমস্যাটাকে অন্যভাবে দেখছেন। আগামী দিনের দুশ্চিন্তায় তাঁরা নিজেদের ক্লান্ত করতে চাইছেন না। বিশিষ্ট শিল্পপতি শ্রী জি ডি বিড়লা একটি হিসেবে দেখিয়েছেন ভারতে শিল্পের প্রসার প্রতি বছর কিভাবে কমছে। এক এক বছরের এই শতকরা হিসেব তার আগের বছরের অনুপাতে তৈরী।

১৯৬১	+	৮·৪
১৯৬২	+	৮·৭
১৯৬৩	+	৮·২
১৯৬৪	+	৭·০
১৯৬৫	+	৫·৪
১৯৬৬	+	২·৫
জানুয়ারী থেকে মার্চ ১৯৬৭	+	০·২

(১৯৬৬ সালের আগস্ট-ডিসেম্বরের তুলনায়)

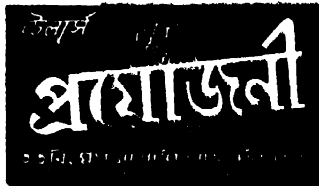
ভারী শিল্প প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট শিল্পও দেশে বাড়তে থাকবে এবং এভাবে রপ্তানী, কর্মসংস্থান, সরকারী আয় এবং সার্বিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি সম্ভব।

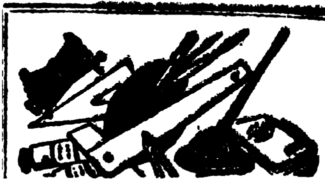
ইঞ্জিনীয়ারদের কর্মসংস্থান সমস্যা সমাধানে নানান ধরনের প্রস্তাব আসছে। একটি প্রস্তাবে 'ওয়ান মিলিয়ন জব ফাউণ্ডেশনের' কথা বলা হয়েছে। এই ফাউণ্ডেশন নতুন ইঞ্জিনীয়ারদের দশ বছরের মেয়াদে ঋণ দেবেন ছোট ছোট শিল্প গড়ে তুলতে। এর আগে এদের শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনা সম্পর্কে ট্রেণিং দিয়ে নেওয়া হবে। তারপর শুধু ঋণ দিয়ে সাহায্যই নয়। প্রথম কয়েকটি বছর সরকারী ও প্রতিষ্ঠিত বে-সরকারী সংস্থাগুলোকে এদের জন্য অর্ডার সংগ্রহ করে দিতে হবে এবং এদের উৎপাদন বাজারে চালু করার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। কেন্দ্রীয় নেতারাও অনেকে এখন এ ধরনের প্রস্তাবে সায় দিচ্ছেন। এই পরিকল্পনা কার্যকর করতে গেলে বৃহৎ শিল্পের সংখ্যা আগে বাড়াতে হবে।

আলোচনায় ইঞ্জিনীয়ারদের কর্মসংস্থানের প্রধান কয়েকটি সমস্যা তুলে ধরা হয়েছে। কয়েকজন ইঞ্জিনীয়ার অবশ্য আরও একটি কারণের কথা বলছিলেন। তাঁদের ধারণা বহু শিল্প-সংস্থা এল-সি ডিপ্লোমা-প্রাপ্তদের দিয়ে ইঞ্জিনীয়ারদের কাজ চালিয়ে নিচ্ছেন। কারণ, তুলনায় এদের কম বেতন দিতে হয়। ডিপ্লোমাপ্রাপ্তদের দিয়ে কাজ চালিয়ে নিয়ে ইঞ্জিনীয়ারদের বঞ্চিত করা নিশ্চয়ই অন্যায়। কাজ না পেয়ে যাঁরা বসে আছেন, এমন কয়েকজনকে দেখেছি টুকটাক প্রাইভেট কাজ করতে। কিন্তু এ ধরনের সুযোগ খুব কম। আর্কিটেকচারাল, সিভিল ইত্যাদি কয়েকটি বিভাগের ইঞ্জিনীয়ার ছাড়া খুচরো কাজ অন্যদের পক্ষে পাওয়া কষ্ট। জনৈক আর্কিটেক্ট জানালেন, বাংলা দেশে এখনও আর্কিটেক্টদের প্রয়োজন সম্পর্কে বিশেষ ধারণা তৈরী হয় নি। দিল্লী, পাঞ্জাব, আমেদাবাদ প্রভৃতি রাজ্যে আর্কিটেক্টদের যেভাবে 'প্রটেকশন' দেওয়া হয়েছে পঃ বঃ সরকার তার কিছুই করেন নি। এখানে বাড়ীর প্ল্যান করার ব্যাপারে বিশেষ নিয়মকানুন নেই। অন্যায়ভাবে অনেকেই আর্কিটেক্টদের প্রাপ্য সুযোগ নিচ্ছেন। বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের দোকান ও ছোট ছোট লেদ কারখানা বিপুল সংখ্যায় বৃদ্ধি পাওয়ায় ইলেকট্রিক্যাল ও মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারদের টুকটাক কাজ করার সুযোগ একেবারেই কমে গিয়েছে।

আলোচনায় দাঁড়ি টানার আগে ছোট্ট একটি কথা মনে পড়ছে।

ছাত্র জীবনের প্রথম থেকে অর্থাৎ স্কুলে ভর্তি হওয়ার সময় থেকে সুযোগের প্রত্যাশায় হোঁচট খেয়ে যখনই ওপরের কারোর দিকে তাকান হয়, তখন শুধু সেই পুরনো উত্তর—দেশের দারিদ্রের কথা কানে আসে। অক্লান্ত পরিশ্রম, কঠিন সাধনা ও প্রচুর অর্থব্যয়ে ছাত্রজীবনের 'হার্ডল রেস' জিতে এসে চাকরীর সন্ধানে বেরিয়ে যখন শুধু 'না-না-না' শুনতে হয় তখন নিজেদের যেমন অবাঞ্ছিত মনে হয় তেমনি পৃথিবী সম্পর্কে মনে অশ্রদ্ধা দেখা দেয়। অন্য বেকারদের মত ইঞ্জিনীয়ার বেকারদেরও আজ একই অবস্থা। তবে স্বস্তির কথা চাকদরদী ভারতের বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ত্রিগুণা সেন সম্প্রতি দেশের চাল্লিশ হাজার বেকার ইঞ্জিনীয়ারদের কর্মসংস্থানের সম্ভাবনার কথা ঘোষণা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীও জানিয়েছেন, আগামী দু-এক সপ্তাহের মধ্যে বেকার ইঞ্জিনীয়ারদের কর্মসংস্থানের জন্য প্ল্যানিং কমিশন তাঁদের পরিকল্পনা পেশ করবেন। প্রতিরক্ষা, স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড এবং অন্যান্য জায়গায় সরকারের চাপে বর্তমান বেকারদের কাজ দিয়ে এই সমস্যা আপাততঃ মিটবে। কিন্তু এভাবে ভবিষ্যতের সমস্যা মিটবে কি? আগামী বছরগুলোতে যাঁরা ডিগ্রী নিয়ে বেরোবেন তাঁদের কর্মসংস্থান? এর জন্যে চাই সুদূরপ্রসারী চিন্তা বা পরিকল্পনা। প্রয়োজন গাড়ীর সামনে ঘোড়াকে টেনে আনা অর্থাৎ মূল সমস্যার সমাধান অর্থাৎ শিল্প প্রসারের গতি দ্রুত করা।





সকল প্রকার অফিস স্টেশনারী কাগজ সার্ভেইং ড্রইং ও ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্যাদির সুলভ প্রতিষ্ঠান।

কুইন স্টেশনারী স্টোর্স প্রাঃ লিঃ

৬৩-বি, রাধাবাজার স্ট্রীট কলিকাতা-১
ফোন : অফিস—২২-৮৬৮৮ (২ লাইন)
২২-৩৩৩২
ওয়ার্কসপ—৬৭-৩৩৩৪ (২ লাইন)



আয়ুর্বেদীয় উপাদানে প্রস্তুত

বলডেক্স

চুল ওঠা বন্ধ করে
নতুন চুল গজায়

বেষ্ট কেমিক্যাল কর্পোরেশন·কলিকাতা-৩৭



রোমে বিক্ষুব্ধ বামপন্থী ছাত্ররা পুলিশের গাড়ী লক্ষ্য করে ছুটে চলেছে

দেশে দেশে ছাত্র অসন্তোষ

কলকাতার দুটি কলেজের দু'জন অধ্যক্ষ সম্প্রতি দিল্লী গিয়েছিলেন। তাঁদের এই দিল্লী মিশনের উদ্দেশ্য ছিল ক্রমবর্ধমান ছাত্র-উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতিবিধান সম্পর্কে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা। অধ্যক্ষদ্বয় কলকাতায় ছাত্র-আন্দোলনের সর্বশেষ পরিস্থিতি নেতৃবৃন্দকে জানান এবং ছাত্রসমাজ দাবী আদায়ের জন্য যেভাবে দিনে দিনে মারমুখী হয়ে উঠছে সে সম্পর্কেও তাঁদের অবহিত করান। উভয়ের আলোচনায় গভীর উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ প্রকাশ পায়। আলোচনাকালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পুলিশের অনুপ্রবেশ এবং ছাত্র-বিক্ষোভ বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে। কিন্তু উভয় পক্ষকে উদ্বিগ্ন করে তোলে বর্তমান ছাত্র-বিক্ষোভের গতিপ্রকৃতি। বিক্ষোভ আজকাল প্রায়ই প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে রূপান্তরিত হয়। আর সেই সংঘর্ষে ইট-পাটকেল ছোড়া থেকে শুরু করে ছুরি চালানো এবং বোমার অবাধ ব্যবহার চলে। তারপর নানা অছিলায় অধ্যক্ষদের আটক রাখার ঘটনা তো আছেই। এসব কারণে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ বিশেষ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। তাঁরা এই ভেবে নিশ্চিন্ত যে, ছাত্রদের এই ঝোঁক অত্যন্ত বিপজ্জনক। এর ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে স্থায়ী অচল অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কাও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আবার শিক্ষাব্যবস্থা একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে পড়াও বিচিত্র নয়। তাই কেন্দ্রীয় নেতৃবর্গ পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষ করে কলকাতায় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন এবং তাঁরা আরও মতপ্রকাশ করেছেন যে, ছাত্র-বিক্ষোভ হিংসাত্মক আকার ধারণ করলেই কলেজ কর্তৃপক্ষ যেন পুলিশের সাহায্য চান। আলোচনা এই পর্যন্ত এগিয়েছে। অধ্যক্ষদ্বয় কলকাতা ফিরে এসে সহকর্মীদের সঙ্গে এ সম্পর্কে আলোচনা করে যাহোক সিদ্ধান্ত নেবেন।

ছাত্র-বিক্ষোভ আজ এক বিরাট সমস্যা। শুধু আমরাই নই, পৃথিবীর অনেক দেশই এই জটিলতায় ভুগছে। দেশে দেশে নানা ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছাত্র-বিক্ষোভ আত্মপ্রকাশ করছে।

এই তো কিছুদিন আগেই পোল্যান্ডে ছাত্র-আন্দোলন চরম বিশৃঙ্খল রূপ ধারণ করেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর একটি নাটকের অভিনয় উপলক্ষ করে এই হাঙ্গামার সূত্রপাত। নাটকে 'রাশিয়ার বিরোধিতা থাকায় এর অভিনয় বন্ধ করে দেওয়া হয়। আর সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রসমাজ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। বিক্ষোভের সূচনা করেন ওয়ারশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা। ছাত্রদের সঙ্গে যোগ দেয় শ্রমিকদের কতকাংশ। বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের সঙ্গে শান্তি-রক্ষী মিলিশিয়া বাহিনীর বারবার সংঘর্ষ ঘটে। ক্রমে এই হাঙ্গামার বিস্তৃতি ঘটে। ওয়ারশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রতি সহানুভূতিতে এই বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করেন ক্রাকাও, লুবলিন এবং পোজনানের ছাত্ররা। ন্যায়বিচারের দাবী তুলে তারা শহর প্রদক্ষিণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্র ও পোস্টারের বহ্যুৎসব করেন। অবস্থা গুরুতর আকার ধারণ করে। কিন্তু অচিরেই এই ছাত্র-বিক্ষোভ প্রশমিত করা হয়।

শ্রমিকশ্রেণী এবং ইউনিয়ন অব ফাইটার্স ফর ফ্রিডম অ্যান্ড ডিমোক্রাসী সঙ্ঘবদ্ধভাবে এই ছাত্র-উচ্ছৃঙ্খলতার নিন্দা করেন এবং দাবী জানান যাঁরা ছাত্রদের প্ররোচিত করার জন্যে দায়ী তাঁদের পদ-মর্যাদার কথা বিবেচনা না করে শাস্তি-বিধান করা হোক। ওয়ারশর সংবাদপত্র-গুলিতে হাঙ্গামার নিন্দা করে বলা

হয়েছিল, জনসাভেক লেখক ছাত্রদের প্ররোচিত করেছে। আবার কেউ কেউ মনে করেন, আন্তর্জাতিক ইহুদী সংস্থা নাকি এই ছাত্র-বিক্ষোভে প্ররোচনা জুগিয়েছিল। কারণ বিগত মিশর-ইস্রায়েল যুদ্ধে পোল্যান্ড ইস্রায়েলের বিরোধিতা করায় তারা হয়তো এর সুযোগ নিয়েছিল। এই সংস্থা ওয়ারশর ইহুদী ছাত্রদের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ স্থাপন করেছিল এবং এসব ছাত্রই সাম্প্রতিক গোলযোগে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। এই সন্দেহ আরো প্রবল হচ্ছে এজন্য যে, হাঙ্গামার সঙ্গে জড়িত ছাত্রদের অধিকাংশই হচ্ছে ইহুদী। আবার স্বল্পস্থায়ী এই ছাত্র-হাঙ্গামা হয়তো বড়রকমের কোন শঙ্কার সংকেত। সে যাই হোক এর পিছনে বাইরের প্ররোচনা ও চক্রান্ত আছে না আরো বেশি গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবীতে দেশের ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীরা এই শক্তিকে পুষ্ট করেছে তা এখনও স্পষ্ট নয়।

ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে হাল্কে পোল্যান্ডের ছাত্র-হাঙ্গামা সর্বাপেক্ষা তীব্র আকার ধারণ করে। ছাত্রদের এরকম ঝটিকা আন্দোলন ইউরোপে, বিশেষ করে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে আর দেখা যায় না। কিন্তু ছাত্র-বিক্ষোভের দিক থেকে কেউ বাদ যায় না। সব দেশের ছাত্ররাই নিজের নিজের দাবী নিয়ে আজ আন্দোলনের পথে নেমে পড়ছেন। দেশে দেশে বিক্ষোভের কারণ সঙ্গতভাবেই স্বতন্ত্র। পূর্ব-ইউরোপের কথা বাদ দিলে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিও একইভাবে ছাত্র আন্দোলনের শিকার হচ্ছে। এই ছাত্র-আন্দোলনের হাত থেকে আমেরিকারও রেহাই নেই। এদেশের রাজ্যে রাজ্যেও লেগে আছে অবিরাম ছাত্র-বিক্ষোভ এবং অশান্তি। বিশ্বে প্রবহমান ঘটনাস্রোতের দিকে তাকিয়ে এই ছাত্র-বিক্ষোভের মূল খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। তাই একটা প্রচন্ড অসহায়তার মনোভাব ফুটে উঠেছে ছাত্র-বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে।

আজকের সভ্য দুনিয়ার সর্বাধিক নিন্দিত বর্ণবৈষম্য নিয়ে আমেরিকার ছাত্রদের মাথাব্যথার অন্ত নেই। ছাত্রদের একটা বিরাট অংশ বর্ণবৈষম্য সমর্থন করে চলেছে এবং সম্প্রতি যখন আইনের সাহায্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিগ্রো ছাত্রদের প্রবেশের সুযোগ করে দেওয়া হয় তখন আমেরিকার অনেক রাজ্যেই ছাত্র-বিক্ষোভ তীব্র আকার ধারণ করেছিল। এই বিক্ষোভ এখনো প্রশমিত হয়েছে বলা চলে না। বরং তুষের আগুনের মতো তা ধিকি ধিকি জ্বলছে এবং সময়ে সময়ে হঠাৎ দপ করে জ্বলে উঠছে। বর্ণবিদ্বেষী ছাত্রসমাজ এদেশে এভাবেই বিক্ষোভের মাধ্যমে অশান্তির সৃষ্টি করে চলেছে।

সম্প্রতি এই আন্দোলনের জের হিসেবে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে। প্রায় এক হাজার ছাত্র আকস্মিকভাবে হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে পড়েন। তাঁরা কর্তৃপক্ষকে সরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় জবরদখল করেন এবং নিগ্রো প্রাধান্যযুক্ত অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিং-এর বারান্দায় বসে পড়ে বিক্ষোভ জানাতে থাকেন।

নব-কলেবরে এই আন্দোলনের সূচনা হয় কয়েকদিন আগে। অশিষ্ট আচরণের দায়ে সাঁইত্রিশজন ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অভিযুক্ত করেন। বিক্ষোভকারী ছাত্রদের দাবী সমস্ত অভিযোগের দায় থেকে এই ছাত্রদের অব্যাহতি দিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের এই দাবী মেনে নিতে পারেননি। তাই বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের দখল নিজেদের হাতে নিয়েছেন। নিরুপায় কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্ট কালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এজন্য ছাত্রদের হঠকারিতাকে দায়ী করেছেন এবং এক ঘোষণায় স্পষ্টই বলেছেন যে জবরদখল বিশ্ববিদ্যালয় দখল করে নিয়ে ছাত্ররাই বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিয়েছেন। ছাত্ররা পাল্টা ঘোষণা করেছেন যে দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত তারা আন্দোলনে অটল থাকবেন।

কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজের সামনে ছাত্রবিক্ষোভ



জাকার্তায় বেয়নেটধারী ইন্দোনেশীয় সৈন্যরা অবিলম্বে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবীতে বিক্ষোভকারী ছাত্রদের ছত্র-ভংগ ক'রে দিচ্ছে। পার্লামেণ্ট ভবনের দিকে অভিযানকারী ছাত্রদের ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সৈন্যরা ৫ শো রাউণ্ড ফাঁকা আওয়াজ করে। ছাত্রদের অভিযোগ, নির্বাচন ছাড়াই সাময়িক প্রেসিডেণ্ট জেনারেল সুহার্তোকে স্থায়ী প্রেসিডেণ্টরূপে ঘোষণা করা অ-গণতান্ত্রিক।



প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ছাত্রদের অবস্থান ধর্মঘট এখনো চলছে।

কয়েকদিন মাত্র আগে রোম বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রাংগণে ছাত্র-বিক্ষোভ এক নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করে। অন্যান্য বিক্ষোভের তুলনায় এটা ছিল কিছুটা ভিন্ন। বামপন্থী এবং দক্ষিণপন্থী ছাত্রদের বিরোধ থেকে এর সূচনা। দক্ষিণপন্থী ছাত্রদের অভিযোগ যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অব লিটারেচার বিভাগে চীনাপন্থী ছাত্রদের প্রাধান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। ফ্যাকাল্টি ভবনকে এই প্রভাব থেকে মুক্ত করে পুনরায় নিজেদের প্রতি-পত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বামপন্থী ছাত্রদের শায়েস্তা করা প্রয়োজন। দক্ষিণপন্থী ছাত্ররা আর মুখ বুজে থাকতে পারলেন না। তাঁরা চড়াও হলেন বামপন্থী ছাত্রদের উপর। প্রতিপক্ষও পিছিয়ে থাকবার পাত্র নয়। দু'পক্ষই প্রকাশ্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন। এইভাবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থী ছাত্রদের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী লাঠালাঠি অনুষ্ঠিত হয়। এই লাঠিযুদ্ধে ছাত্রদের কোন পক্ষ জয়ী হন তা অবশ্য আমাদের জানা নেই। কিন্তু বিশ্ব-বিদ্যালয় ভবনের ভিতরে দু'দল ছাত্রের মধ্যে এরকম প্রকাশ্য রণং দেহি ভাবের আত্মপ্রকাশ অভিনব সন্দেহ নেই।

সাম্প্রতিক ছাত্র-আন্দোলনের গতি-প্রকৃতির আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহের পক্ষে ও বিপক্ষে ছাত্রদের বিক্ষোভ প্রদর্শন। রোডেশিয়ায় প্রথমে তিনজন এবং পরে দু'জন আফ্রি-কানের ফাঁসির ঘটনাকে কেন্দ্র করে দেশে দেশে ছাত্রসমাজ বিক্ষোভ প্রকাশ করেন। এই বিক্ষোভ সবচেয়ে জোরদার হয় মিশরে। লণ্ডনের ছাত্ররাও চুপ করে ছিলেন না। অন্যান্য দেশের ছাত্রদের সঙ্গে আমাদের দেশের ছাত্ররাও এই বর্বরতার প্রতিবাদ করেছিলেন।

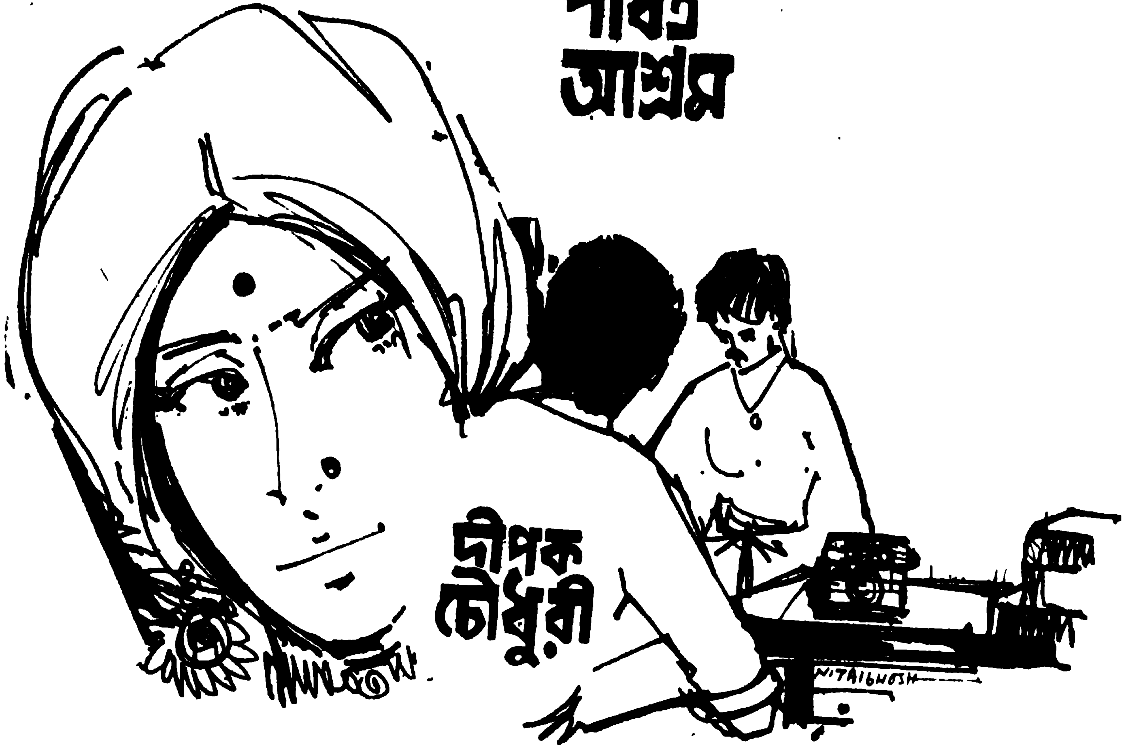
ভিয়েৎনাম যুদ্ধ নিয়ে সারা পৃথিবীর ছাত্র-সমাজ আজ উত্তাল। খোদ আমে-রিকাতেই ছাত্রদের মধ্যে এ নিয়ে বেশ মত-পার্থক্য রয়ে গিয়েছে এবং মতদ্বৈধতা ক্রমেই স্পষ্ট হচ্ছে। আমাদের দেশের ছাত্র-সমাজও এক্ষেত্রে বেশ সরব। সম্প্রতি লণ্ডনের ভিয়েতনাম যুদ্ধবিরোধী যুব-ছাত্রদের এক জমায়েত হয় গ্রভেনর স্কোয়ারে। সেখানে ভিয়েৎনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছিলেন। এমন সময় হঠাৎ পুলিশের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ বেধে যায়। পুলিশের আঘাতে জনৈকা তরুণী মাটিতে পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উভয়পক্ষে শুরু হয়ে যায় জোর লড়াই। ফলে উভয়পক্ষেই আহতদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

ছাত্র-অস্থিরতা নিঃসন্দেহে আজকের দিনের এক বিষম চিন্তার কারণ।

—ক্রান্তদর্শী



বি. সরকার এণ্ড সন্স
সন অব লেট এম. বি. সরকার
১২৪, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলিকাতা-১২, ফোন: ৩৪-৯২০৩



প্রায় দশ বছর আগে হোটেলটা খুলেছিলেন পবিত্রবাবু। নাম দিয়েছিলেন পবিত্র আশ্রম। শিলিগুড়ি রেল স্টেশনের পুব দিকে একটা দোতলা বাড়ির ছাদের ওপরে সাইনবোর্ডটা আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন। বেশ বড় সাইনবোর্ড। সকলেরই চোখে পড়ে। রাত্রিবেলা সাইনবোর্ডের চার কোণায় চারটে আলো জ্বলে। এমনভাবে জ্বলে যেন আলোগুলো যাত্রীদের হাতছানি দিয়ে ডাকতে থাকে। অনেকেই হয়তো আপনারা পবিত্র আশ্রমে দু-এক রাত্রি বাস করেছেন। পবিত্র আশ্রমের মালিক পবিত্র চাটুজ্জের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। বড় ভাল লোক। সবার সঙ্গেই হেসে হেসে কথা বলেন। প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করতে চান। কার কি অসুবিধে হচ্ছে তার খোঁজ-খবর রাখেন। রান্নাবান্না পছন্দ হচ্ছে কিনা সে সম্বন্ধেও সকলের মতামত জানতে চান। বলেন, 'সকলের মুখের স্বাদ তো একরকম নয়। বলবেন, অসুবিধে হলে বলবেন।' তার ফলে প্রতিদিনই স্থায়ী বাসিন্দারা বলতেও আরম্ভ করল। এক নম্বর ঘরের শৈলেশবাবু প্রতিদিনই বলে পাঠান যে, পোনা মাছ খেলে তাঁর বদহজম হয়। কই কিংবা মাগুর মাছের ঝোল খেলে তিনি সুস্থ থাকেন। নিয়মিত অফিসে গিয়ে সরকারী কাজ-কর্ম করতে পারেন। কামাই করতে হয় না। তিন নম্বর ঘরের কল্যাণ মিত্র তেল কোম্পানীর কেরানী। অল্প বয়স। সে ছোট পোনা খেতে পারে না। তেল সম্পর্কে প্রতিদিনই তাকে ফাইল ঘাঁটতে হয়। তেলওয়ালা পাকা, পোনা না খেলে তার গা গুলোয়। পাঁচ নম্বর ঘরের তারিণী পণ্ডিত ঠাকুরের ভক্ত। তিনি বলেন, 'মাছ-মাংস খাওয়া ছেড়ে দিচ্ছি মশাই। দুবেলা দু-গেলাস করে খাঁটি দুধ দেবেন।' গত পাঁচ বছর থেকে একই কথা বলে যাচ্ছেন তিনি। মাছ-মাংস ছাড়েন নি। দু-গেলাস করে নিয়মিত দুধ পান করে যাচ্ছেন। তার জন্য বেশি টাকা তিনি দেন না। সকলেই সুখ্যাতি করেন পবিত্রবাবুর। তাঁর মতো সৎ লোক পৃথিবীতে আজকাল আর খুঁজে পাওয়া যায় না। হোটেলের মালিকদের মধ্যে তিনি অদ্বিতীয়।

তারিণী পণ্ডিত বলেন, 'ওসব হচ্ছে ব্যবসার কৌশল। আমরা তাঁর স্থায়ী বাসিন্দে। হোটেলের আসল সাইনবোর্ড হচ্ছি আমরা। এখানে আমরা দীর্ঘদিন ধরে বাস করছি বলেই তো লোকজন বিশ্বাস করে এখানে আসে। মাছ-মাংস ছেড়ে দিচ্ছি মশাই। দু-গেলাস দুধের সঙ্গে পোয়াটেক ছানাও দেবেন। কেন দেবেন না? আমরা তাঁর বিজ্ঞাপন। এটা বিজ্ঞাপনের যুগ। লাখ লাখ টাকা খরচ করেন ব্যবসায়ীরা। কিন্তু পবিত্র চাটুজ্জে আমাদের জন্য ক পয়সা খরচ করছেন?'

দশ বছর আগে হোটেলটা খুলেছিলেন পবিত্রবাবু। তখন তাঁর বয়স ছিল বাইশ। এখন বত্রিশ। তখন ছিলেন রোগা, ছিপছিপে ধরনের মানুষ। এখন তাঁর দেহটা ফুলে-ফেঁপে প্রায় পৌনে তিন মণ হয়েছে। হাত-পা নাড়তে কষ্ট হয়। চলাফেরা করতে পারেন না। সেইজন্য একতলাতে নেমে এসেছেন। সেখানেই অফিস, সেখানেই শোবার ঘর।

মানুষটি বড় অদ্ভুত। শিলিগুড়ি রেল স্টেশনের দিকে চেয়ে চেয়ে সময় কাটান, দিন কাটান এবং আজ তো দশটা বছরই কাটিয়ে দিলেন। ঐ দিকে চেয়ে থাকেন আর কি যেন ভাবেন। ভাবছেন গত দশ বছর থেকে। ঐ শিলিগুড়ি রেল স্টেশন থেকেই মিনতি পালিয়ে গিয়েছিল।

তখন তার বয়স ছিল বাইশ। অটুট স্বাস্থ্য। মালদা থেকে এসেছিলেন পরেশ মুখার্জি'র মেয়েটিকে বিয়ে করতে। সামাজিক বিয়ে। দানসামগ্রী ছাড়াও নগদ তিন হাজার টাকা হাতে পেয়েছিলেন। পরেশবাবু একজন শিলিগুড়ির নামকরা উকিল। দিতে তাঁর কষ্টও হয় নি। জামাই হিসেবে পবিত্র চাটুজ্জের দাম ছিল বাজারে। পিতার একমাত্র সন্তান। ছেলেবেলা থেকে পিতৃহীন। সংসারে শুধু মা রয়েছেন। তার

ওপরে মালদা শহরে তিন বিঘের ওপর দোতলা বাড়ি। বিরাট একটা আম-বাগানও রেখে গিয়েছিলেন তাঁর বাবা। তাতে ফজলী আম ছাড়াও ল্যাংড়া আমও জন্মায়। বছরে খরচ-খরচা বাদ দিয়ে প্রায় ষোল হাজার টাকা আয় হয়। পবিত্রবাবু নিজেও বি-এ পাশ। ছেলেবেলায় বাড়িতে মাস্টার রেখে রবীন্দ্রসংগীত শিখেছিলেন। একবার শিখলে রবীন্দ্রসংগীত আর সহজে ভোলা যায় না। দশ বছর চর্চা করেন নি, তবু অফিস ঘরের চেয়ারে বসে তিনি মাঝে মাঝে গুন-গুন করে গান করেন। পাশের ঘরের বাসিন্দেরা মনে করে, তারা বুঝি কলকাতার বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত রবীন্দ্রসংগীত শুনছে।

শিলিগুড়ির পরেশবাবুর মেয়েকে বিয়ে করতে এসেই সবকিছু ওলোট-পালট হয়ে গেল। অন্তরের সংগীত বাইরে প্রকাশ করতে আর ইচ্ছে হয় না। চেম্বারে বসে পশ্চিমের জানালা দিয়ে চেয়ে থাকেন স্টেশনের দিকে। বিয়ে করতে এসে আর তিনি মালদা শহরে ফিরে গেলেন না। ইতি-মধ্যে মাও মারা গেলেন। এখন শুধু পলাতকা মিনতির জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকা ছাড়া তার আর কোনো কাজ নেই।

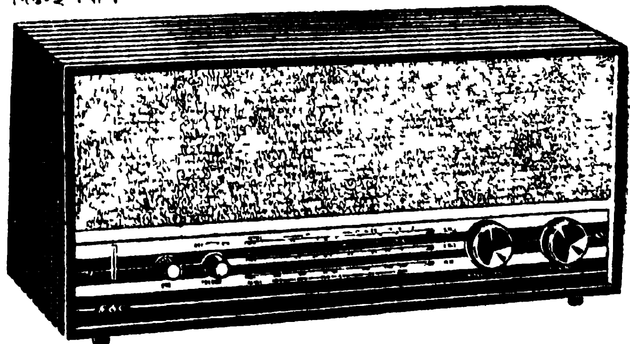
শ্বশুরবাড়ির লোকদের সঙ্গেও তাঁর দেখা-সাক্ষাৎ হয় না। গোড়ার দিকে বড় শালক প্রণবকুমার মাঝে মাঝে আসত। একটি বামপন্থী দলের হয়ে কাজ-কর্ম করছিল বলে ছেলেটি স্পষ্টভাষী। সে

G.E.C.

নতুন অবদান

অভিনব এক ধ্বনি বৈচিত্র্য!

অনবদ্য ৬ ভালভ সেট'এর সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখে জিইসি এবারে আপনাকে উপহার দিচ্ছে বিসি ৫৩৫৮। এই জি ই সি'র কাছ থেকেই আপনি পেয়েছিলেন বিসি ৫১৫১, বিসি ৫৩৫৬। এবারের অতিরিক্ত আকর্ষণ "অবিচল ধ্বনি প্রবাহ।" এই অপূর্ব বৈশিষ্ট্যের জন্যে জিইসি রেডিও মাত্রই এখন বাজারের সেরা।



জিইসি সেট থেকেই "অবিচল ধ্বনি প্রবাহ" পাওয়া যায়, কারণ এই নতুন রেডিওর প্রতিটি উপাদান সযত্নে নির্বাচিত, এবং এর ভিতরকার সারকিট রেডিও-ইঞ্জিনিয়াররা এমনভাবে ডিজাইন করেছেন যাতে বছরের পর বছর এর আওয়াজ যেমন পরিষ্কার তেমনি স্বাভাবিক থাকে। সূক্ষ্মধ্বনি গ্রাহক ইলিপ্টিকাল ১৫ সেঃমিঃ×১০ সেঃমিঃ স্পীকার ও অব্যাহত ধ্বনি-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা সমেত এই ৬ ভালভ ৩ ব্যাণ্ড এ সি রিসিভারটি মনোরম লো-লাইন কাঠের কেবিনেটে স্থাপিত। ইলেকট্রনিক টিউনিং ইণ্ডিকেটর সংবলিত। এক্সটারন্যাল স্পীকার ও হাইইম্পিডেন্স পিকআপ লাগানোর ব্যবস্থা আছে। মূল্য ৬৭৫৲ (উৎপাদন শুল্ক সমেত—স্থানীয় কর অতিরিক্ত)।

G.E.C.

আপনার শ্রুতিমাধুর্যের বাহক

দি জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানী অফ ইণ্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড।

TRADE MARK - PERMITTED USER
THE GENERAL ELECTRIC COMPANY OF INDIA PRIVATE LIMITED

বলেছিল, 'দিদি তার প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছে। যখন ক্লাস এইটে পড়ে তখন থেকেই তারাকুমার মজুমদারের সঙ্গে দিদি প্রেম করত। জামাইবাবু, আপনি থানায় গিয়ে এজাহার দিন। পুলিশ ওদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসবে। বাবা বলেছেন, আপনার হয়ে তিনি আদালতে মকদ্দমা লড়বেন।'

'না ভাই, জোর করে কাউকে আমি ঘরে নিয়ে আসতে পারি না।'

'তা হলে অন্য কোনো মেয়েকে বিয়ে করে ফেলুন। আগে থেকে প্রেমে পড়েনি তেমন মেয়ের সংখ্যা কি এখানে কম? আপনি বি-এ পাশ, মালদায় আপনার প্রকাণ্ড বড় আমবাগান রয়েছে। দিদির চিন্তায় সময় নষ্ট করছেন কেন? ধরুন পেশোক রোডের মোড় থেকে আমাদের বাড়ি পর্যন্ত অন্তত একশো পঁচিশটি মেয়ে আছে যারা আপনাকে পেলে বর্তে যাবে। সরলা বলে একটি মেয়ে তো প্রায়ই আমাকে আপনার কথা জিজ্ঞাসা করে—আই-এ পাশ করেছে, দেখতেও ভাল—আর এখনো কারো প্রেমে পড়ে নি। আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি।'

'এসব ব্যাপারে ভাই গ্যারান্টি কেউ দিতে পারে না।'

'আমি পারি। সরলাদিকে আমি চিনি। আম খেতে খুব ভালবাসে। আপনার অতো বড় একটা আমবাগান। আমের লোভে সরলাদি রাজপুত্রদেরও পাত্তা দেবে না। বোশেখ মাস থেকে সরলাদি শুধু আম খায়, আর কিছু খায় না। বলেছে, পবিত্রবাবুকে আমাদের বাড়িতে একদিন নিয়ে আসিস প্রণব। চলুন না, জামাইবাবু?'

'আমবাগানটা বেচে দিয়েছি।'
'বেচে দিয়েছেন? কেন?'
'এই হোটেলটা খুলতে হল।'

'বাবা যে আপনাকে তিন হাজার টাকা নগদ দিয়েছিলেন?'

'তোমার বাবাকে ফেরত দিয়ে দিয়েছি।'

'কেন দিলেন?' আশ্চর্য হল প্রণবকুমার, 'রীতিমত মন্ত্র পড়ে দিদিকে আপনি বিয়ে করেছিলেন। পণের টাকা ফেরত নেওয়ার বাবার কোনো অধিকার ছিল না। দরকার হয় আপনি মকদ্দমা লড়ুন। আমরা আপনার হয়ে সাক্ষী দেব। আমাদের তরুণ সঙ্ঘের সকলেই সাক্ষী দেবে। মকদ্দমায় হেরে যাবেন বাবা। টাকা তাঁকে ফেরৎ দিতে হবে।'

'আমি চাই না। আচ্ছা প্রণব, তারা মজুমদার কি কাজ করে?'

'রকবাজি ছাড়া আর কিছু করত না। গুণ্ডা—লোফার।'

'তা হলে দিদি কেন তার সঙ্গে পালিয়ে গেল?'

'বললাম যে ক্লাস এইট থেকেই প্রেমে পড়েছিল।'

'আহা টাকার অভাবে কত না কষ্ট পাচ্ছে দিদি। গয়না বেচে আর কতদিন চলতে পারে।' পবিত্র চাটুজ্জের কথা শুনে প্রণবকুমারের মনে হয়েছিল, ওদের ঠিকানা জানলে জামাইবাবু বোধহয় মনিঅর্ডার করে মাসে মাসে টাকা পাঠাতেন। বেচারী জামাইবাবু!

তারপর কয়েকটা বছর প্রণবকুমার আর আসে নি। ইতিমধ্যে পবিত্রবাবু হোটেলটাকে গড়ে তুললেন। একতলা বাড়িটা দুতলা হল। অনেকগুলো ঘর। খালি থাকে না কখনো। দশ বছরের মধ্যে শিলিগুড়ি শহরের চেহারা বদলে গেল। হু-হু করে জমির দাম বাড়তে লাগল। বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হল, তেল-কোম্পানী অফিস খুলল, মোটর মেরামতের বড় বড় কারখানা গজিয়ে উঠল। এগুলো ছাড়াও আরো নানারকমের শিল্প কারখানা গজিয়ে উঠতে লাগল। দেখতে দেখতে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ থেকে বহু লোক এসে উপস্থিত হল এখানে। সংখ্যার দিক থেকে বাঙালীরাই বেশি কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অ-বাঙালীরাই প্রাধান্য লাভ করল।

পবিত্র চাটুজ্জের হোটেলটাই শুধু ব্যতিক্রম। প্রতিদিনই এর উন্নতি হচ্ছে। পবিত্রবাবু যত্ন নেন, পরিশ্রম করেন, সকলকে সন্তুষ্ট করবার চেষ্টা করেন। নিজে গিয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ঘোরাঘুরি করতেন। যাত্রী ধরে নিয়ে আসতেন। মাঝখানের প্ল্যাটফর্মেই মেইন ট্রেনগুলো আসে। মাঝখানের প্ল্যাটফর্ম থেকেই পালিয়ে গিয়েছিল মিনতি।

এখন আর নিজে যান না। মাইনে-করা গাইড রয়েছে। ইচ্ছে থাকলেও নিজে আর যেতে পারেন না। কষ্ট হয়। পৌনে তিন মণ দেহ নিয়ে পথে বেরুলেই সকলে চেয়ে চেয়ে তাঁকে দেখে। তাঁকে কেন্দ্র করে একটা কৌতুকের সৃষ্টি হয়। ডবল ভাড়া দিতে চাইলেও রিক্সাওয়ালারা সওয়ারীকে গাড়িতে তোলে না। মুখ টিপে হাসতে হাসতে সরে যায় দূরে। অতএব চেয়ারে বসে তিনি খোলা জানালা দিয়ে চেয়ে থাকেন শিলিগুড়ি স্টেশনের দিকে। গাড়ি আসবার সময়গুলো তাঁর জানা আছে। আওয়াজ পেলেই সচকিত হয়ে ওঠেন। ভাবেন, নতুন যাত্রী ধরে নিয়ে আসছে গাইড।

টেবিলের ধারেই টেলিফোন। মুগুরের মতো হাত দুটোর ওজন আছে, সামর্থ্য নেই। টেলিফোন বাজতে আরম্ভ করলেই পুরনো ভৃত্য নবকেষ্ট ছুটে আসে অফিস ঘরে। তিনি নিজে হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা তুলে নিতে পারেন না। নবকেষ্ট তাঁর কানের কাছে রিসিভারটা ধরে রাখে। টেলিফোনে শুধু কথা বলে যান পবিত্রবাবু। অফিস ঘরের সংলগ্ন শোবার ঘর। তবু তিনি যখন এঘর থেকে ওঘরে যাওয়া-আসা করেন তখন নবকেষ্ট তাঁর কাছাকাছিই থাকে। কখনো কখনো তাঁকে ধরে নিয়ে যেতেও হয়।

মিনতি পালিয়ে যাওয়ার পর দশটা বছর কেটে গিয়েছে। একটি বেকার যুবকের সংগে কি করে যে ওর সময় কাটছে ভেবে আশ্চর্য হয়ে যান পবিত্রবাবু। পয়সার অভাব ঘটলে প্রেমের অভাব ঘটাও স্বাভাবিক। একদিন হয়তো তারা মজুমদার মিনতিকে পথের ধারে ফেলে দিয়ে সরে পড়বে। তখন মিনতির কি অবস্থা হবে? দু-একটি পরিত্যক্তা মেয়ের অবস্থা তিনি স্বচক্ষেই দেখেছেন। বছর খানিক আগের কথা। একদিন ভোরবেলা কলকাতা থেকে একটি ছেলে আর একটি মেয়ে এসে উপস্থিত হয়েছিল পবিত্র আশ্রমে। স্টেশন থেকে গাইডই তাদের সংগে করে নিয়ে এসেছিল। দোতলায় সাত নম্বর ঘরটাই সবচেয়ে ভাল। ঐ লাইনের সবচেয়ে শেষের ঘর বলে বেশ খানিকটা গোপনতা রক্ষা করে চলে যায়। স্বামী-স্ত্রী পরিচয় দিয়েই ওরা এসে উঠেছিল এখানে। সাতদিনের জন্য ঘরটা ভাড়া করেছিল ওরা। অনেক দেখেছেন বলেই পবিত্রবাবু বুঝতে পেরেছিলেন যে, ওরা স্বামী-স্ত্রী নয়। মেয়েটিকে ভাগিয়ে নিয়ে এসেছে ছোঁড়াটা। সিঁথির সিঁদুর ভুয়ো। ওদের দেখবার সংগে সংগেই পবিত্রবাবু বলেছিলেন, 'ওবে নবকেষ্ট, দেখিস চিড়িয়া যেন বাকী বকেয়া রেখে একদিন ফুড়ুৎ করে পালিয়ে না যায়। সাত দিনের পুরো টাকা আগাম নিয়ে নিস।'

'তুমি বড় খুঁতখুঁতে মানুষ বাবু। কেউ কাচ্চাবাচ্চা সংগে না নিয়ে এলেই তুমি তাদের সন্দেহ করো। বাতিক তোমার।'

'অনেক দেখেছি কি না।'

'নিজে ধাক্কা খেয়েছ বলে কেউ আর তোমার কাছে স্বামী-স্ত্রী নয়। দাও, রসিদ কেটে দাও।'

'রসিদ?'

'হ্যাঁ। সাত দিনের টাকাই আগাম দিয়ে দিয়েছে।'

রসিদ কাটতে কাটতে মৃদু হেসে পবিত্রবাবু বলেছিলেন, 'সাত নম্বর ঘরে যারা থাকে তারা সাধারণত গোলমেলে স্বামী-স্ত্রী। সেই জন্যই সারা বছর ওখানে ফুলশয্যা পেতে রাখি।'

রসিদটা হাতে নিয়ে নবকেষ্ট বলেছিল, 'নিজের ফুলশয্যা তো কোনোদিন পাতা হয় নি—ঘোল খেয়ে দুধের স্বাদ মেটাচ্ছ তুমি। প্যাসেঞ্জাররা কেউ বিছানার ওপর ফুল চায় না, বাবু। ঘরে ঢুকে অনেকেই বিরক্ত বোধ করে। তারা হোটেলে আসে রাত্রিবাস করতে।'

সাত নম্বর ঘরের বিছানাটা ফুল দিয়ে সাজিয়ে রাখবার হুকুম দিয়েছেন পবিত্রবাবু। গত কয়েক বছর থেকেই এই নিয়মটা বলবৎ রেখেছেন তিনি। নিজের জীবনে কোনোদিন ফুলশয্যা পাতা হয় নি বলেই বোধহয় পৃথিবীর সকলের জন্য তিনি

সাত নম্বর ঘরের বিছানাটা সুন্দর করে সাজিয়ে রাখেন। মনে মনে আনন্দ উপভোগ করেন। তাঁর পেছনে পেছনে চাকরবাকররা হাসাহাসি করে। ব্যবসা করতে এসে অনাবশ্যক টাকা নষ্ট করছেন পবিত্র আশ্রমের মালিক। মনস্তত্ত্বের জটিলতা বুঝতে পারে না ওরা।

সাত দিনের জায়গায় পনরো দিন থেকে গিয়েছিল ওরা। তারপর নবকেষ্টই ছুটে এসে বলেছিল, 'বাবু, তোমার কথা মিথ্যে নয়। মেয়েটাকে ফেলে ছোঁড়াটা পালিয়েছে। কাল রাত্রে আর ফিরে আসে নি। বোধহয় কাল রাত্রে কলকাতার গাড়ি ধরে পালিয়েছে। মেয়েটা এখন বসে বসে কাঁদছে।'

সাত দিনের টাকা মারা গেল" বলে ছিলেন পবিত্রবাবু।

'এখন আবার ট্রেনের টিকিট কেটে দিতে হবে তোমায়। ছোঁড়াটা একটা পয়সাও রেখে যায় নি। যা করবার তাড়াতাড়ি করো। টিকিটের টাকা দিয়ে বিদেয় করো। এরপর আবার পুলিশের হাঙ্গামা হতে পারে।'

ভাড়ার ওপর আরো দশটা টাকা বেশি দিয়ে মেয়েটিকে গাড়িতে তুলে দিয়েছিলেন পবিত্রবাবু। মিনতি পালিয়ে গিয়েছিল বলে এই সব পলাতক আর পলাতকাদের প্রতি ওঁর বিদ্বেষ কিছু নেই, বরং সহানুভূতি রয়েছে। এই কারণে হোটেলের স্থায়ী বাসিন্দেরা তাঁকে ঠাট্টা করে। তারিণী পণ্ডিত বলেন, 'সাইকোলজির দিক থেকে এটাকে আমি মনের বিকার ছাড়া আর কিছু বলতে পারি না। মশাই, এটার নাম দিয়েছেন পবিত্র আশ্রম। অথচ যত সব অপবিত্র কাজ চলেছে এখানে! আপনি এদের জন্য ফুলশয্যা পেতে রেখেছেন। টাকা দিয়ে সাহায্যও করছেন। আপনি কি ভাবছেন মিনতিকে নিয়ে তারা মজুমদার একদিন সাত নম্বর ঘরে এসে আশ্রয় নেবে? বিকার, মশাই বিকার। আর এলেই বা আপনার কি লাভ? ঐ দেহটা দিয়ে আর কি কাজ করবেন? শুধু রসিদ কাটা ছাড়া আপনার ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই। মাছ-মাংস ছেড়ে দিচ্ছি মশাই, এবার থেকে রাত্রিবেলা দু-গেলাস করে দুধ পাঠাবেন। আপনি বিকারগ্রস্ত—আমরা অন্য হোটেলে উঠে যাব।'

তেল-কোম্পানীর ছোকরা কেরানী কল্যাণ গাঙ্গুলী বলে, 'দাদাকে আপনি চেনেন না। বাইরে থেকে দাদাকে হোঁতকা দেখায় বটে, কিন্তু ভেতরে-ভেতরে প্রচণ্ড শক্তি রাখেন। তিন ইঞ্চি চওড়া একটা ভোজালী বালিশের তলায় রেখে দিয়েছেন, দশ বছর ধরে পড়ে রয়েছে ওখানে। শিলিগুড়ির সকলেই জানে, তারা মজুমদারের বুকে ঐ ভোজালীটা তিনি বসিয়ে দেবেন। দাদার কী সাংঘাতিক সাহস!'

'বসিয়ে দেওয়ার আগে তুমি তাঁর সাহসের পরিচয় পেলে কি করে? যদি সত্যি-সত্যি তিনি তারা মজুমদারের বুকে ভোজালীটা চালাতে পারেন তাহলে বুঝবে পবিত্রবাবু শুধু একটি মানুষ নন, পুরুষ-মানুষও। পারেন তো আজ থেকেই রাত্রে দু-গেলাস করে দুধ পাঠাবেন মশাই।'

পরের কথায় কান দেন না পবিত্র চাটার্জি। বসে বসে শুধু মিনতির কথাই ভাবেন। কারো কাছে কোনো অপরাধ তিনি করেন নি। বিয়ের পরের দিন মিনতিকে নিয়ে রাত নটার সময় চলে এসেছিলেন শিলিগুড়ি স্টেশনে। সঙ্গে বরযাত্রীরাও ছিল। রাত দশটায় গাড়ি ছাড়বে। সকলেই গাড়িতে উঠে বসেছিল। মাঝখানের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ছিল গাড়িটা। একটা প্রথম শ্রেণীর ছোট কামরায় জায়গা পেয়েছিলেন পবিত্রবাবু। জড়োসড়ো হয়ে এক কোণায় বসে ছিল মিনতি। ভারী সুন্দর লাগছিল ওকে। সরল, সুন্দর মুখ। কোনো রকম পাপের চিহ্ন তিনি দেখতে পান নি। এই মেয়েটিকে নিয়েই সংসার গড়তে চলেছেন। পণের টাকা দিয়ে আরো একটা আম বাগান কিনে ফেলবেন। ব্যবসা বড় হবে। পুরনো বাগানটায় ল্যাংড়া আমের শ-দুই কলম পোঁতা হয়েছে। মিনতি পাশে থাকলে আরো শত শত কলম পুঁতবেন তিনি। বিয়ের রাত্রি থেকেই ভবিষ্যতের কর্মচাঞ্চল্য অনুভব করছিলেন পবিত্রবাবু। শিলিগুড়ির একজন নামকরা উকিলের মেয়ে। মিনতিকে লেখাপড়া শেখাতে কোনো কার্পণ্য করেন নি উকিলবাবু। বি-এ পড়তে পড়তে বিয়ে হয়ে গেল মিনতির। পবিত্রবাবু কথা দিয়েছিলেন, মালদা-কলেজে ওকে ভর্তি করে দেবেন। একটা বছরও নষ্ট হতে দেবেন না।

কামরায় কোণা চেপে বসেছিল মিনতি। গাড়ি ছাড়বার আর বোধহয় মিনিট পাঁচেক বাকী ছিল। উকিলবাবু বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। বরযাত্রীরাও উঠে বসেছে গাড়িতে। হঠাৎ পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে পবিত্রবাবু বললেন, 'এই রে, সিগারেট নেই! তুমি বসো, প্ল্যাটফর্ম থেকে এক প্যাকেট সিগারেট কিনে নিয়ে আসি।'

ভারী মিষ্টি সুরে মিনতি বলেছিল, দেখো, গাড়ি ফেল করো না।'

একটু দূরেই একটা ফেরীওয়ালা পান-সিগারেট বিক্রি করছিল। তাড়াতাড়ি এক প্যাকেট সিগারেট কিনে ফেললেন পবিত্র-বাবু। মিনতি সতর্ক করেছে গাড়ি যেন তিনি ফেল না করেন। খুচরো পয়সা কটা ফেরৎ নেওয়ার ঝুঁকি নিলেন না পবিত্র-বাবু। গাড়িটা চলতে আরম্ভ করেছিল। লাফিয়ে উঠে পড়লেন গাড়িতে। কামরার দরজাটা খুলে রেখে গিয়েছিলেন। কামরায় উঠে দেখলেন, ওপাশের দরজাটাও খুলে রেখে গিয়েছে মিনতি। ভেতরে সে নেই।' স্নানঘরের মধ্যে উঁকি দিলেন। না, মিনতি সেখানেও নেই। মাত্র মিনিট তিনেকের মধ্যে কোথায় গেল? কতদূর গেল? নিজে থেকেই সরে গেল, না কি কেউ গুম করল ওকে? গাড়িটা চলতে আরম্ভ করেছিল। অসহায় বোধ করতে লাগলেন তিনি। মুহূর্তের মধ্যে পুরো দৃশ্যপট বদলে গেল। হাসবেন, না কাঁদবেন বুঝতে পারছিলেন না। বোকা বনে গেলেন। গাড়িটা চলতে আরম্ভ করেছিল। প্রায় প্ল্যাটফর্ম থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। বাইশ বছরের যুবক। পুরুষত্বে আঘাত লাগল তাঁর। বাংলাদেশের কোনো যুবকের চেয়ে তিনি নিকৃষ্ট নন। মালদা শহরে দোতলা বাড়ি রয়েছে। মস্ত বড় একটা আমবাগান রয়েছে। বছরে প্রায় ষোল হাজার টাকা আয়। বিয়ের মন্ত্র পড়া শেষ হওয়ার পর থেকে নতুন একটা জগতের মালিক হয়েছিলেন তিনি। মিনতিকে কেন্দ্র করে সুন্দর একটা স্বপ্ন রচনা করেছিলেন। কোথাও কোনো খুঁত ছিল না। এক মুহূর্তের মধ্যেই সব কিছু বদলে গেল। বোকা বানিয়ে দিয়ে গেল মিনতি! সীটের ওপর এক টুকরো কাগজ পড়ে ছিল। এতক্ষণ সেটা তিনি দেখতে পান নি। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল। গাড়িটা প্রায় প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে এসেছিল। লাফিয়ে নেমে পড়লেন পবিত্রবাবু। বহুবার ট্রেনে যাতায়াত করেছেন। কোনোদিন তাঁকে লাফিয়ে নেমে পড়তে হয় নি। আর যেখানে লাফ মেরে নেমে পড়লেন সেখানে আলো ছিল না। চারদিকে গভীর অন্ধকার। অন্তহীন অন্ধকার। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে লাঞ্ছনা আর অপমানের খোঁচা খেতে লাগলেন তিনি। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হচ্ছে। কিভাবে প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন? একদিন না এক-দিন দেখা হবেই। ভোজালী চালাবেন, না কি ক্ষমার অস্ত্র ব্যবহার করবেন? ওখানে দাঁড়িয়েই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হল তাঁকে। মিনতি লিখে গিয়েছে, তিনি যেন ওর খোঁজ না করেন। না, খোঁজ করতে তিনি যাবেন না। সংসারের কারো সাহায্য তিনি নেবেন না। এই প্ল্যাটফর্ম থেকে মিনতি পালিয়েছে, আবার এই প্ল্যাটফর্মেই তাকে ফিরে আসতে হবে।

সেই আশাতেই দশটা বছর কেটে গেল! •

রাত নটা বেজে গিয়েছে। জলপাইগুড়ি থেকে একটা গাড়ি আসবে। গাইড গিয়ে স্টেশনে অপেক্ষা করছে। এটাই শেষ গাড়ি। এই গাড়ির ফলাফলটা জেনে ঘুমতে যান পবিত্রবাবু। আজো তিনি অফিস ঘরে বসে অপেক্ষা করছিলেন। সাত নম্বর ঘরটা ক'দিন থেকে খালি পড়ে রয়েছে। লোকসান হচ্ছে। ঐ ঘরটার চার্জ অন্য ঘরগুলোর চেয়ে বেশি। ওটা খালি পড়ে থাকলে শুধু পয়সার লোকসান হয় না, পবিত্রবাবু অস্বস্তি বোধ করেন। কেমন যেন ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকে। সাত নম্বর ঘরটার মধ্যে মন পড়ে থাকে তাঁর। প্রতিদিন ঘরটাকে সাজানো হয়। বাসী ফুল ফেলে দিয়ে নতুন ফুল দেওয়া হয়। আজ ক'দিন থেকে ঘরটা খালি পড়ে রয়েছে। সত্যিকার স্বামী স্ত্রীও কেউ আসে নি। দখল করে নি ঘর।

একলাই বসে ছিলেন পবিত্রবাবু। জল-পাইগুড়ির গাড়িটা এখনো আসে নি। লেট

...। আওয়াজ পান নি। আজ রাতের শেষ গাড়ি। এরপর বাইরের যাত্রী আর পাওয়া যাবে না। গত পনরো দিন থেকে ... একটু খারাপ চলেছে। সারা বাংলা-...সা-বাণিজ্যের অবস্থাই খারাপ। চৌদিকে বিক্ষোভ আর আন্দোলন। মার খাচ্ছেন পবিত্রবাবু।

নবকেষ্ট এসে বলল 'দশ নম্বর ঘরের কানাইবাবু বাইরে থেকে খেয়ে এসেছেন। একটা মীল বেশি হল।'

'এখানে নিয়ে আয়।'

'না বাবু, তুমি আর খেয়ো না। গায়ে-গতরে চর্বি জমেছে।'

গত দশ বছর থেকে প্রতিদিনই দু-একটা মীল বেশি হয়। পবিত্রবাবু নিজের মীলের সঙ্গে সেগুলোও খেয়ে নেন। শুধু কয়েক মাস থেকে আর খাচ্ছিলেন না। ডাক্তার ঘটক তাঁকে সতর্ক করেছেন। বার বার সাবধান করেছেন। ভাত খাওয়া ছেড়ে দিতে বলেছেন।

টেলিফোনটা বেজে উঠতেই পবিত্রবাবু বললেন, 'আমার হাতটা টেবিলের ওপর তুলে দে, নবকেষ্ট।'

'আবার কষ্ট করে হাত তোলা কেন? এই ধরো টেলিফোন।'

রিসিভারটা ওঁর কানের কাছে ধরে রাখল নবকেষ্ট। স্টেশন থেকে গাইড কথা বলছিল, 'হ্যালো—আমি সনাতন।'

'কি, নতুন খদ্দের না কি? সাত নম্বর খালি আছে।'

সকল ঋতুতে অপরিবর্তিত ও অপরিহার্য পানীয়

চা

কেনবার সময় 'অলকানন্দার' এই সব বিক্রয় কেন্দ্রে আসবেন

অলকানন্দা টি হাউস

৭, পোলক স্ট্রীট কলিকাতা-১

২, লালবাজার স্ট্রীট কলিকাতা-১

৫৬, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ কলিকাতা-১২

॥ পাইকারী ও খুচরা ক্রেতাদের অন্যতম বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান ॥

'ইনি একজন মহিলা। খুব অসুস্থ।'

'তা হলে হাসপাতালে পাঠিয়ে দাও।'

'ইনি বলছেন পবিত্র আশ্রমে গেলে সুস্থ হয়ে উঠবেন।'

'সঙ্গে কোনো পুরুষমানুষ নেই? হ্যালো—'

'ছিলেন। মাঝপথ থেকে কোথায় যেন সরে পড়েছেন।'

'সঙ্গে টাকা কড়ি আছে কি না জিজ্ঞেস করো। প্লাটফর্ম থেকেই আগাম নিয়ে নাও। তাঁকে বলো এটা দাতব্য চিকিৎসালয় নয়। এটা হোটেল।'

'ইনি বলছেন আপনাকে চেনেন।'

'কোনো স্ত্রীলোকের সঙ্গে আমার চেনা নেই।'

'হ্যালো, সার—প্রায় তিন ডিগ্রী জ্বর এখন। দেখতে-শুনতে মন্দ নয়—বলছেন, এক সময়ে আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। হ্যালো, আপনার কাছে কি থার্মোমিটার আছে?'

'কেন?'

'জ্বর মাপতে চাইছেন। বলছেন যে, বোধহয় একশো পাঁচ ডিগ্রী হল। কি করব, সার?'

'হাসপাতালে যেতে বলো।'

'তা হলে আপনি ওঁর সঙ্গে কথা বলুন। থর-থর করে কাঁপছেন—দাঁড়াতে পারছেন না। হয়তো অজ্ঞান হয়ে যেতে পারেন। ভদ্রলোকের মেয়ে, লেখাপড়া জানেন। মাঝে মাঝে নিজের মনেই বলছেন: ওগো, আমায় তুমি ক্ষমা করো। হ্যালো, কি করব?'

'প্লাটফর্মের ওপাশের রাস্তায় একটা ডার্স্টবিন আছে। সেখানে জমা রেখে তুমি চলে এসো। দেরি করলে তোমার আজ খাওয়া জুটবে না। উপোষ থাকতে হবে। চটপট চলে এসো। কাল আবার সাত নম্বর ঘরটার জন্য খদ্দের ধরবার চেষ্টা করো।'

'উনি বলছেন পবিত্র আশ্রমের পবিত্রবাবুর শোবার ঘরে ছাড়া অন্য কোনো ঘরে তিনি শোবেন না।'

'মাইরী আর কি!' ক্ষেপে উঠে পবিত্রবাবুই বললেন, 'আমার শয্যায় মিনতি ছাড়া আর কারো শোবার অধিকার নেই। জানি, দুনিয়ার লোক আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করে। তুমিও করো—হ্যালো, কি হল?'

'উনি নিজেই রিক্সা ধরতে গেলেন।'

'পাঁচ ডিগ্রী জ্বর নিয়ে?'

'বললেন যে, পবিত্র আশ্রমে আশ্রয় না পেলে রোগ তাঁর সারবে না। এ যে বড় ঝামেলার খদ্দের জুটেছে, সার?'

'তোমার চাকরি গেল। নবকেষ্ট, দে, টেলিফোন কেটে দে।'

রিসিভারটা নামিয়ে রাখল নবকেষ্ট। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'সনাতনকে এসব কি বলছিলে?'

'বাইরের গেটে তালা লাগিয়ে দে। শিগগীর যা। গায়ে একশো পাঁচ ডিগ্রী জ্বর নিয়ে একটি মেয়ে এখানে রিক্সায় চেপে আসছে। এটা হাসপাতাল নয়, আশ্রমও নয়। এটা হোটেল।' উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন পবিত্রবাবু। চেয়ার থেকে উঠে পড়বার চেষ্টা করলেন বার কয়েক। শেষ পর্যন্ত উঠে পড়লেন। বিরাট ওজনের দেহটা যেন একটা গাধাবোট। নিজে থেকে চলতে পারে না। নবকেষ্ট তাঁকে ধরতে যাচ্ছিল। বললেন, 'দরকার নেই। আজ আমার শক্তি ফিরে এসেছে। প্রতিশোধ নেব, প্রতিশোধ নেব।' বলতে বলতে শোবার ঘরে ঢুকে পড়লেন তিনি। বালিশটাকে উল্টে দিলেন। তোয়ালেটাকে থাবা মেরে তুলে নিলেন হাতে। তারপর বুকের ওপর চেপে ধরে হু-হু করে কাঁদতে লাগলেন। তোয়ালের মুখে ঘাম নেই, শুধু কোমলতা অনুভব করতে লাগলেন তিনি। মুহূর্তটা বিলম্বিত হতে লাগল। স্টেশন থেকে রিক্সা আসছে। পবিত্র আশ্রমে পবিত্রবাবুর ঘরে মেয়েটি আশ্রয় নিতে চায়।

নবকেষ্ট অবাক হয়ে বাবুকে দেখছিল। বাবুর চোখে প্রতিহিংসার আগুন নেই। থলথলে দেহ থেকে চর্বিও যেন কমে গিয়েছে। মুগুরের মতো হাত দুটোতে সামর্থ্য ফিরে এসেছে। ওপাশের খোলা জানালা দিয়ে তোয়ালেটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে বদলে গেলেন বাবু।

বাইরের গেটে রিক্সাটা এসে থামল। শুনতে পেলেন পবিত্রবাবু। মেয়েটি একশো পাঁচ ডিগ্রী জ্বর নিয়ে ছুটে এসেছে পবিত্র আশ্রমে। পৃথিবীর অন্য কোথাও জায়গা পায় নি। জায়গা দেয় নি কেউ। উঠোন পার হচ্ছে মেয়েটি। পায়ের শব্দ পাচ্ছেন তিনি। মুহূর্তটা বিলম্বিত হচ্ছে। শয্যার আলোয় মুহূর্তটা উজ্জ্বলতর হচ্ছে। তোয়ালের মুখে আলো ছিল না। ছিল শুধু প্লাটফর্মের সেই অন্ধকারটুকু।

ঘরে দাঁড়ালেন পবিত্রবাবু। বলিষ্ঠ হাত দুটো দিয়ে মেয়েটিকে আলিঙ্গন করলেন তিনি।

দশ বছর পর তাঁরই আশ্রমে ফিরে এসেছে মিনতি।

জীবন-যন্ত্রণা

এ যুগের সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী লেখিকা শ্রীমতী সীমোঁ দ্য বুভোয়া লিখেছেন—

"All men must die, but for every man his death is an accident and, even if he knows it and consents to it, an unjustifiable violation."

শারীরিক মৃত্যু সম্পর্কে উদ্ধৃত কথা-যথ সন্দেহ নেই। হয়ত এই চিন্তার ফলেই এমিল জোলা এবং তাঁর স্ত্রী রাতের পর রাত বিনিদ্র কাটাতেন আসন্ন বিচ্ছেদের আশংকায়। কি বিশ্রী আতংকিত সেই মুহূর্তগুলি।

কিন্তু মরারও একটা নির্দিষ্ট সময় আছে, যেমন আছে বাঁচার। জীবনের সবচেয়ে নিদারুণ ট্র্যাজেডি মৃত্যু নয়, বেঁচে থাকাটাই সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি, বিশেষ করে যেখানে জীবনটা সুদীর্ঘ। যে জীবন শীত-কালের রাত্রির মত সহজে অবসান হতে চায় না।

ফ্রান্সের এককালের প্রধানমন্ত্রী পল রেঁনোয়ার মৃত্যু এমনই নিঃশব্দে ঘটে ১৯৬৬তে। অথচ ১৯৩৯-এ তিনি যখন ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী তখন পৃথিবীতে তাঁর নাম আন্দোলিত হয়েছে। পরে, ফ্রান্স যখন আত্মসমর্পণ করে এবং তারপর যা সব ঘটে, তার ফলে মঁসিয়ে রেঁনোয়া বিস্মৃতির অতলে পৌঁছন। উইনস্টন চার্চিলের অদৃষ্টটা ভালো। তাঁর মৃত্যুটা পৃথিবীর মানুষ লক্ষ্য করেছে। স্মরণ করেছে তাঁর কীর্তি। চার্চিলকে স্মরণ করেছে পৃথিবী তাঁর যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত, বিপর্যয়ের মুখে বিচিত্র সাহস দেখে।

মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু যেন ছকবাঁধা উপন্যাসের শেষ-পরিচ্ছেদ। জওহরলালের মৃত্যু ঘটতে আর একটু দেরী হলে, অন্ততঃ নির্বাচনের পর ঘটলে কি হত কে জানে। কিন্তু লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যু' এমন নাটকীয় মৃত্যু কে কোথায় দেখেছে? আমাদের স্মৃতিপটে এই মৃত্যু অনেককাল অক্ষয় হয়ে থাকবে।

রাশিয়া আণবিক শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মুহূর্তে যদি স্তালিনের মৃত্যু ঘটত তাহলে কি ক্রুশ্চেভের পক্ষে গোপন বক্তৃতা দিয়ে কম্যুনিজমের বিশ্বাসভঙ্গ করে অবমূল্যায়ন করা সম্ভব হত!

যে লেখক সারা বিশ্বকে পারসিক কবি ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াৎ উপহার দিয়েছেন, সেই এডওয়ার্ড ফিট্জিরালড সম্পর্কে বার্ধক্যগ্রস্ত বৃদ্ধের যে ছবি একালের মহাকবি টি এস এলিঅট তাঁর বিখ্যাত কবিতা "Gerontion" -এ এঁকেছেন তা কি কল্পনা করা যায়। কল্পনা করুন ভ্যাপসা ভাদ্র মাসে বৃদ্ধ ফিট্জিরালড্ বৃষ্টি আসার আশায় বসে আছেন, আর একটা বালক সংবাদপত্র পাঠ করে তাঁকে শোনাচ্ছে—

"—an old man in a dry mouth
waiting for rain.
being read to by a boy—".

আমাদের কৈশোর-যৌবনের বিখ্যাত ফিলম্ ডাইরেকটার ডি ডবল্যু গ্রিফিথসকে সিনেমার জনক বলা হয়। সেই গ্রিফিথকে কল্পনা করুন টাকমাথায় সস্তাদরের মদের দোকানে ছেঁড়া ট্রাউজার পরে ঘুরছেন, আর নির্বোধ চকচকে মুখসর্বস্ব অভিনেতা-অভিনেত্রীদল বিরাট বিরাট গাড়ি হাঁকিয়ে, ইনকাম ট্যাক্স কর্তাদের চোখে ধুলো দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সীমোঁ দ্য বুভোয়ার বিরুদ্ধে এই শেষের অবস্থা একটা অকাট্য যুক্তি।

আমাদের দেশের একজন সম্মানিত নেতার গাড়ির ঘোড়াগুলিকে খুলে নিয়ে ভক্ত জনগণ নিজেই সেই গাড়িতে তাঁকে বহন করেছে আবার সেই মহান নেতার পরিণত-বয়সে সেই জনগণ তাঁর গলায় জুতোর মালা পরিয়ে দেয়।

বিসর্জন হিসাবে মৃত্যু একটা আঘাত সন্দেহ নেই, কিন্তু বিশেষ বিশেষ অবস্থার মৃত্যু বিশেষভাবে শান্তিময় এবং সেই মুহূর্তেই মৃত্যুকে অতিশয় সম্মানিত অতিথি বলে মনে হয়েছে।

প্রাচীন হিন্দুদের প্রজ্ঞা ছিল উত্তম। পুরুষার্থ অনুসারে জীবন একটা প্রাঙ-মতবাদী ব্যবস্থা মাত্র—যার ফলে মৃত্যু একটা অবধারিত অতি-প্রত্যাশিত পরিণতি। এর মধ্যে কোনো ক্ষোভ, কোনো দীর্ঘশ্বাস নেই। আমাদের কবিরা তাই বলতে চেয়েছেন—"ওহে মৃত্যু তুমি মোরে কি দেখাও ভয়, ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়।"

হিন্দুশাস্ত্রের জীবনের চারটি পর্ব। পড়াশোনার সুদীর্ঘ কালটি অতিক্রমণ করার পরই সংসার-আশ্রম। গৃহস্বামীর চিন্তা, ভাবনা, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠার কাল।

ছেলেরা যেই পায়ের ওপর পা দিয়ে দাঁড়ায়, মেয়েদের বিবাহ হয়, তারা শ্বশুর-গৃহে যায়, তখন পিতৃদেবের হল বানপ্রস্থ অবলম্বন করা। পঞ্চাশের পর বনে যাবার ব্যবস্থা ছিল। আর এই পঞ্চাশের পর পেন-সনভোগী কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিলেন তাঁর বিখ্যাত রস-রচনা 'পঞ্চাশের পর' হাতে নিয়ে।

বানপ্রস্থ ব্যবস্থাটি মন্দ নয়। সাংসারিক সকল ব্যবস্থা থেকে অবসর গ্রহণ। বয়োবৃদ্ধের জন্য অনড়ত্বের পথে পৌঁছানোর জন্য এই বানপ্রস্থ নয়, আরো কিছু বড়ো কর্মের জন্য এই ব্যবস্থা। সেই সক্রিয়তার নাম সন্ন্যাস।

সন্ন্যাসের অর্থ জীবনের অর্থ সন্ধান করা, শারীরিক কর্ম পরিহার করে মানসিক চিন্তার জগতে অগ্রসর হওয়া। বিরাম-বিহীন মানসিক অনুশীলনের ফলে বৃহত্তর সম্ভাবনাময় সিদ্ধান্তের প্রকাশ সম্ভব হয়।

এই প্রক্রিয়ার ফলে মানুষ অনড়ত্বের গর্ত থেকে নিষ্কৃতি পায়, অথর্ব হয়ে পড়ে না। একঘেয়েমি যখন মনকে আচ্ছন্ন করে তখন মানুষ 'বোর' হয়ে ওঠে। যে 'দুর্বিষহ' এবং কিম্ভূত ইংরাজীতে তার নাম 'বোর'। এই 'বোর' উল্টোপাল্টা কথা বলে, যেখানে যা বলা উচিত নয় তাই বলে, অতীতে যে কথা বা ঘটনায় সে উত্তেজিত হয়েছে, বর্তমানে তার কথা বলে বেফাঁস উক্তি করে। পুরুষার্থ প্রক্রিয়ায় এই 'বোরডম' বা একঘেয়েমিত্ব কাটানো যায়। কারণ জীবনের প্রতিটি পর্বে বিশিষ্ট কর্মকান্ড আছে। সেই চিন্তায় মনকে ভরে রাখা যায়।

ইতিহাসে 'হিরো' হয়ে থাকতে হলে একটা জায়গায় থামতে হয়। শরৎচন্দ্র একদা এক বিখ্যাত ওস্তাদ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন—"ওস্তাদ গায় ত' ভালো, কিন্তু থামে ত'?"

উপযুক্ত সময়ে থামাটা একটা আর্ট। তাই গল্প-উপন্যাস সব কিছুতেই এক জায়গায় থামতে হয়, এবং ঠিক ঠিকানায় পৌঁছাতে হয়। একটি উপন্যাস ত' এই বক্তব্য নিয়েই লেখা সম্ভব, আর তার নাম দেওয়া যায় জীবন-যন্ত্রণা। সুদীর্ঘ জীবনের যন্ত্রণা এক আশ্চর্য উপন্যাসের বিষয়বস্তু।

—অভয়ঙ্কর

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

ভারতীয় সাহিত্য

বঙ্গ সাহিত্য পরিষদের উদ্বোধন অনুষ্ঠান ॥

নতুন দিল্লীর কালিবাড়ির আশুতোষ হলে 'বঙ্গ সাহিত্য পরিষদের' (দিল্লী) উদ্বোধন অনুষ্ঠান সম্প্রতি সম্পন্ন হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্র-অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ বিশি। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, 'সাহিত্যের উন্মেষে সাহিত্য-আলোচনী সংস্থাগুলির একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। সাহিত্যের অগ্রগতির জন্য এই সংস্থাগুলির প্রয়োজনীয়তা তাই অস্বীকার করা যায় না।' এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন ডঃ রবীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। তিনি একটি রূপক রচনা পাঠ করেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন শুক্লা গঙ্গোপাধ্যায়, ভারতী বসু এবং সন্ধ্যা চৌধুরী।

'অল ফেইথ' সংস্থার উদ্বোধন ॥

ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্থার মধ্যে সমন্বয় স্থাপনের উদ্দেশ্যে কলকাতায় 'অল ফেইথ' নামে একটি সংস্থার উদ্বোধন অনুষ্ঠান গত ২০ মার্চ, বুধবার সদর স্ট্রিটের 'কস্ট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস' হলে অনুষ্ঠিত হয়। এরা সাহিত্য এবং সংস্কৃতির মাধ্যমেই এই কাজে অগ্রণী হয়েছেন। বিভিন্ন ভাষার লেখকদের মাঝে মাঝে এরা সমবেত করবেন এবং তাদের সাহিত্য আলোচনার ব্যবস্থা করবেন। উদ্বোধনী ভাষণে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীডি এন সিংহ বলেন, "দুঃখের হলেও স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, স্বাধীনতালাভের দীর্ঘ ২০ বৎসর পরেও ভারতে ক্রমাগত বিচ্ছিন্নতাবোধ দেখা দিচ্ছে। ভারতের ইতিহাসে এ ঘোর দুর্দিন। রাজনীতি এই সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। একমাত্র লেখক, কবি, সাংস্কৃতিক শিল্পী এবং চিন্তাবিদেরাই আবার ভারতকে এই সংকট থেকে উদ্ধার করতে পারবেন। সংস্থার সম্পাদক শ্রী বি স্বরূপ সংস্থার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন ও সকলের সহযোগিতা প্রার্থনা করেন। এছাড়াও শ্রীগিমি, তরুণ উর্দুকবি সামসুজ্জামান ও আরও অনেকে ভাষণ দেন। কবিতা পাঠ করেন উর্দু কবি শ্রীমতী এস এ সায়িদা বেগম 'ইমরাত', হিন্দি কবি শ্রীমতী কিরণ জৈন এবং শ্রীআশিস সান্যাল। উদ্বোধনসঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী দীপ্তি লাহিড়ি।

একজন উর্দু কবি ॥

বলরাজ কোমাল আধুনিক উর্দু কাব্য সাহিত্যের একটি পরিচিত নাম। সম্প্রতি 'মেরি নাজমে" নামে তার একটি কবিতা-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থটি উর্দু সাহিত্যিকদের কাছ থেকে তেমন অভিনন্দন লাভ করে নি। এর কারণ, বোধ হয় এই যে, উর্দু-সাহিত্য পাঠকরা এখনও আধুনিক কাব্য পাঠের উপযোগী মনোভাব তৈরী করতে পারেন নি। এখনও তাঁরা মুশায়ারা জাতীয় কবিতা শুনতে অভ্যস্ত। যাই হোক, তবু অল্প হলেও এক শ্রেণীর সমালোচক আছেন, যারা আধুনিক চিন্তাধারায় ভাবিত।

কাব্যকলা সম্বন্ধেও তার একটি বিশেষ ধারণা আছে। গ্রন্থটির ভূমিকায় তিনি লিখেছেন—

"কবিতার অবয়ব তার ভাবের সঙ্গে জড়িত। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যেমন ভাবের বিবর্তন ঘটে, তেমনি তার অবয়বেরও বিবর্তন ঘটে। কোন সাহিত্য সৃষ্টিই কোনও মুহূর্তের প্রকাশ নয়। এর পেছনে আছে একটা দীর্ঘদিনের ঘাত-প্রতিঘাতের প্রতিক্রিয়া।"

এই অনুভব থেকেই কোমাল তার কাব্য রচনা করেন। তিনি তার এই ধারণা থেকে কখনই বিচ্যুত হন নি। তিনি কখনই তার কবিতাকে রাজনৈতিক বা মনস্তত্ত্ব-মূলক করে তোলেন নি। তার কবিতার পরিবেশ রচনা করেছে অতিচেনা পরিবেশ-এর সাধারণ মানুষ। এই সাধারণ জীবনের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি সহজ ও সরল শব্দই ব্যবহার করেছেন। কিন্তু তা ছাড়াও কোমালের অনুভূতির মধ্যে কোনও জড়তা নেই। কোমালের পরীক্ষা-নিরীক্ষা আধুনিক উর্দু-সাহিত্যকে সমৃদ্ধতর করবে বলেই আশা করি।

সর্বভারতীয় কবি সম্মেলন ॥

আগামী ১২, ১৩ ও ১৪ এপ্রিল কলকাতার রবীন্দ্রসদনে 'সর্ব ভারতীয় কবি সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলনকে সফল করে তোলার জন্য কলকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এক আবেদন প্রচার করেছেন। এই আবেদনে তাঁরা বলেছেন—

"আমরা জেনে খুশি হলাম যে, প্রথম "সর্ব ভারতীয় কবি সম্মেলন"এর উদ্যোগ বাংলাদেশ থেকেই হয়েছে। এই সম্মেলন জাতীয় সংহতিকে দৃঢ়তর করবে বলে আমাদের বিশ্বাস। এছাড়া ভারতীয় সাহিত্যের অগ্রগতির জন্যও এই সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। আমরা সম্মেলনকে সফল করে তোলার জন্য সকলকে আবেদন জানাই।"

বিবৃতিতে স্বাক্ষর দিয়েছেন সর্বশ্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, প্রেমেন্দ্র মিত্র, রাধারাণী দেবী, অন্নদাশঙ্কর রায়, উদয় শঙ্কর, সতীকান্ত গুহ, সত্যজিৎ রায়, অমলাশঙ্কর, গোবিন্দ দে (মেয়র), দক্ষিণারঞ্জন বসু, অমিতাভ চৌধুরী, এস বি চ্যাটার্জি, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, বসন্ত চৌধুরী, মঞ্জু দে, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন, সবিতাব্রত দত্ত, কাজী সব্যসাচী, হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র গুহ, সরোজ আচার্য, শিউকুমার যোশি, কল্যাণমল লোধা, পি এন ত্যাগরাজন (তামিল লেখক সংঘ), পারভেজ শাহেদী, সামসুজ্জামান, এস এ সায়েদা বেগম ইসরাত, বি স্বরূপ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও আরো অনেকে।

দিগম্বর কভুল ॥

অন্ধ্রের তরুণ কবিদের একটি বিশেষ গোষ্ঠী 'দিগম্বর কভুলু'। এঁদের সম্বন্ধে এর আগে 'অমৃতে'র পাতায় সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে। এঁদের তৃতীয় গ্রন্থটি আগামী ৬ই এপ্রিল বিজয়ওয়াড়ায় রাত বারোটায় প্রকাশিত হবে। গ্রন্থের উদ্বোধন করবেন একজন রিক্সাচালক।

বাংলা গল্পের ইংরেজি সংকলন ॥

রবীন্দ্রনাথের বাংলা গল্পের একটি ইংরেজি অনুবাদ সংকলন সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। অনুবাদ করেছেন যূথিকা ঘোষ ও অরুণ সোম। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এরকম একটি সংকলন যে রকম নিষ্ঠার সঙ্গে করা উচিত ছিল, তা সম্পাদকদ্বয় পুরোপুরি পালন করতে পারেন নি বলেই মনে হল। তাছাড়া অনুবাদেও কিছু কিছু দুর্বলতা রয়েছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বরণীয় লেখকদের পাশাপাশি মতি নন্দী, বরেন গঙ্গোপাধ্যায় বা দিব্যেন্দু পালিতের গল্পও আছে। 'ভারতীয় বিদ্যাভবন' থেকে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে।

পত্র-পত্রিকার প্রদর্শনী ॥

হাইলাকান্দির 'অর্ঘ্য' গোষ্ঠীর উদ্যোগে গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী থেকে চারদিনব্যাপী পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার সাম্প্রতিক পত্র-পত্রিকার এক প্রদর্শনী আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য। সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ দিগিন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।

এই প্রদর্শনী উপলক্ষে কয়েকটি আলোচনা-সভা এবং কবিতা পাঠের আসর অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বাংলা, ইংরেজি, অসমীয়া, ফরাসী এবং আরো অনেক ভাষা থেকে কবিতা পাঠ করেন কাছাড়ের বিশিষ্ট কবিরা।

বিদেশী সাহিত্য

জাপান ও পূর্ব-এশিয়ার লোকসংস্কৃতি-বিষয়ক প্রবন্ধ সংকলন ॥

সম্প্রতি জাপানী লেখক মনুমেন্টা নিপ্পোনিকা মনোগ্রাফস-এর সম্পাদনায় টোকিওর সোফিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে জাপান ও পূর্ব-এশিয়ার সংস্কৃতি বিষয়ে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে জাপানী ভাষায়। এই সংকলনের কয়েকটি প্রবন্ধে প্রাথমিকভাবে জাতীয় এবং উপজাতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অধিকাংশ প্রবন্ধেই বিশ্লেষিত হয়েছে জাপানী লোকসংস্কৃতির রীতি ও বিশ্বাস-গত জটিলতার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য। র্যুকু দ্বীপপুঞ্জ, তাইওয়ান এবং দক্ষিণ-চীনের ধর্ম বিষয়েও বিশেষ আলোচনা স্থান পেয়েছে।

এই গ্রন্থের অধিকাংশ প্রবন্ধই সাম্প্রতিককালে রচিত। নোগুচি ও মাবুচি লিখিত প্রবন্ধ দুটি বেশ কিছুকাল আগে লেখা। মাবুচি লিখিত প্রবন্ধটি জাপানী ভাষায় প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪১ সালে। প্রবন্ধকারদের মধ্যে আছেন—ওবেয়াশি, ভারিয়ো, নোগুচি, তাকেনরি, ইতো, মিকিহারো, কামাতা, হিসাকো, সাসো, মাইবেল, মাবুচি, শিরাতুরি, জশিরো।

ওবেয়াশি তাঁর প্রবন্ধে জন্ম ও মৃত্যু সম্পর্কিত বিশ্বাসের উৎপত্তি বিষয়ে দুটি জাপানী উপকথা এবং এশিয়া ও উত্তর-দক্ষিণ আমেরিকার আদিম জাতিসমূহের লোকায়ত বিশ্বাসের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, জাপানী উপকথাসমূহ মূলতঃ চীন এবং পূর্ব-এশিয়ার লোকবিশ্বাসের দ্বারা প্রভাবিত।

এই সংকলনের সবচাইতে মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছেন নোগুচি। আধুনিক দৃষ্টি-কোণ থেকে প্রবন্ধটি রচিত। মাবুচির প্রবন্ধটি দীর্ঘ। অনেকগুলি চার্ট ও উপ-জাতীয় অঞ্চলের কয়েকটি মানচিত্র প্রবন্ধটির মর্যাদাবৃদ্ধির পরিচায়ক। বিশেষতঃ মাবুচির প্রবন্ধটিতে ফরমোসার আদিম পার্বত্য অধিবাসীদের সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য তথ্য পরিবেশিত হয়েছে।

একটি বহু আলোচিত উপন্যাস ॥

ফরাসী ঔপন্যাসিক সিমন দ্য বোভায়ার 'লে বেলেস ইমেজেস' নামে একটি উপন্যাস বেরিয়েছে সম্প্রতি। এ-গ্রন্থের প্রধান সম্বল হলো মানুষের আদিম প্রবৃত্তি। লেখিকা খানিকটা উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়ে, এ-যুগের এক বিপথগামী মহিলার ওপরে তাঁর ঠান্ডা অস্তিত্ববাদী দৃষ্টিপাত করেছেন। শৈল্পিক উৎকর্ষের বিচারে উপন্যাসটি নিকৃষ্ট শ্রেণীর হলেও তার বিক্রয়সংখ্যা বর্তমানে এক লক্ষ অতিক্রম করে গেছে।

উপন্যাসটির ঘটনাকাল সংক্ষিপ্ত। একটি দিনের মধ্যাহ্নভোজ থেকে সন্ধ্যাকালীন ককটেল পার্টি পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে লেখিকা যথেষ্ট উত্তেজক ঘটনা সরবরাহ করেছেন। আধুনিক নগরজীবন, প্রেম, ভালোবাসা, বিবাহ, আর সর্বব্যাপী জটিলতা ও সিনিসিজম এ-উপন্যাসের কেন্দ্রীয় উদ্দীপক। নায়িকা লরেন্স একজন অত্যাধুনিক উচ্চাভিলাষী মহিলা। তার দুটি সুন্দর ফুটফুটে মেয়ে আর একজন কৃতী স্থপতি স্বামী আছে। তবু তার প্রেমিক একজন দ্বিতীয় পুরুষ, যে-ব্যক্তি তারই অফিসের একজন কর্মচারী মাত্র। জীবনযাপনের অলীক আভিজাত্য, সামাজিক ভণ্ডামি আর বস্তুতান্ত্রিকতার সমুদ্রে তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে, যেন কোথাও কোন নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেই; চতুর্দিকে দুঃখ আর বিষাদ। তার সমগ্র কথোপকথনে আত্মপ্রতারণার উগ্রতা পরিস্ফুট। স্বামীর প্রতিপত্তি বৃদ্ধিতে সে কোনো সুখের সন্ধান পায় না, বরং সে তার স্বামীকে একটি অবাঞ্ছিত প্রাণী ও নিয়ত পরিবর্তনশীল অন্তর-জীবনের একটি অংশ বলে মনে করে। এইভাবে দিনের পর দিন, সে স্বকৃত ব্যভিচারে লিপ্ত এবং প্রায়শঃ আত্মকরুণা-প্রার্থী।

লরেন্সের জটিলতা শুধু এখানেই নয় তার অস্থিরতা আরও গভীরে। মা হিসেবে তার সাফল্যই তাকে প্রেমিকা হিসেবে ব্যর্থ করে দিয়েছে। সেজন্যেই একজন উনিশ বছরের তরুণীর সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে সে তার উনষাট বছরের বয়স্ক প্রেমিককে হারায়। অন্যপক্ষে, তার স্বামী একজন ঐতিহাস-সচেতন গ্রন্থকীট, যিনি জীবনে সাফল্য ও অর্থের ওপরে পারিবারিক সংহতিকেই মুখ্য বলে ভাবেন।

রিড গ্রাচভে-এর গল্প-সংকলন ॥

লেনিনগ্রাদের তরুণ লেখক রিড গ্রাচভ-এর নতুন গল্প-সংকলন 'হোয়েয়ার ইজ ইওর হোম' সম্প্রতি রুশ ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। লেখক তাঁর প্রাক্তন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই সংকলনের গল্পগুলি লিখেছেন। যুদ্ধের সময়ে যে-সকল শিশু পরিবার-বিচ্ছিন্ন কিংবা যাদের পিতামাতা মৃত বা নিহত হয়েছে, তাদের সমস্যাই এইসব গল্পের আলোচ্য বিষয়। গ্রাচভ অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে একটি যুগের সমস্যাকে বিশ্লেষণ করেছেন। এই সংকলনের তিনটি উল্লেখযোগ্য গল্প—'দলত্যাগে', 'সন্দেহ' ও 'কারো ভাই নয়'। তাঁর পরবর্তী গ্রন্থেও অনুরূপ আরও কিছু বলিষ্ঠ চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যাবে। গ্রাচভের প্রিয়তম নায়ক এখনও যুদ্ধকালের একটি তরুণ বালক যে নানা প্রতিকূল অসহায়তার মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে, তবু ভেতরে ভেতরে নেকড়ের মতই সে আক্রমণের জন্য উদ্যত।

অভিজ্ঞতা সংগ্রহে দুই বিদেশী লেখক ॥

বাঙ্গালোরে আন্তর্জাতিক জুরিদের এক সম্মেলন হয়ে গেল কয়েকদিন আগে। এই সম্মেলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন মিঃ ম্যাকলাউড এবং অস্ট্রেলিয়া থেকে মিসেস গ্রোগান। নবজাগ্রত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও তার প্রাচীন সংস্কৃতি তাঁদের গভীরভাবে আকৃষ্ট করে। বর্তমানে তাঁরা যুক্তভাবে ভারত সিকিম ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সম্পর্কে একটি গ্রন্থ রচনায় উদ্যোগী।

সিকিম পরিভ্রমণের পর মিসেস গ্রোগান সাংবাদিকদের কাছে বলেন, "আমার ভাবতে দুঃখ হয় যে, আমার দেশের লোকেরা সিকিমের মত এমন একটি রূপসী রমণীর নির্জন আবাসভূমির সন্ধান রাখে না। মেঘ, রোদ, পাহাড়, বৃষ্টি, কুয়াসা, শান্ত জনপদ, বৌদ্ধ অফিসার ও উৎসবের সঙ্গীত সিকিমকে বিদেশীদের কাছে লোভনীয় করে তুলেছে।" মিঃ ম্যাকলাউড এই নিয়ে তিন-বার ভারতবর্ষে এলেন। দক্ষিণ ভারতে অবস্থানকালে তাঁরা হায়দরাবাদের নিজাম ও মহীশূরের রাজার ব্যক্তিগত অতিথি ছিলেন।

কবি হর্স্ট বিনেক-এর জাকোবি পুরস্কার লাভ ॥

পশ্চিম জার্মানীর কবি হর্স্ট বিনেক সম্প্রতি জুরিখ-এ তাঁর সর্বাধুনিক কাব্য-গ্রন্থ 'ওয়াজ ওয়ার, ওয়াজ ইস্ট'-এর জন্যে হুগো জাকোবি পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। এই পুরস্কারটি জার্মানীর তরুণ লেখকদিগকে দেওয়া হয়ে থাকে। এর নগদ মূল্য দু' হাজার সুইস ফ্রাঙ্ক। পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে ডঃ জুরগেন পেটারসেন বিনেকের কবিতা সম্পর্কে একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। বিনেক একটি প্রগতিশীল সাহিত্যপত্রের সম্পাদক। তাঁর জন্ম হয় ১৯৩০ সালে।

ফোক মিউজিক অ্যাণ্ড ফোকলোর গ্রন্থের প্রচ্ছদে ব্যবহৃত চিত্র

নতুন বই

Folk Music And Folklore: An Anthology, No. 1 Chief Editor Hemango Biswas Published by Folkmusic and Folklore Research Institute 2/1A North Range Calcutta-17, India Price 10.00

লোকসঙ্গীত ও লোকসাহিত্যের গবেষণা সংগ্রহের কাজ করলেই উল্লেখযোগ্য এক সময় এই বিষয়টি ছিল উপেক্ষিত। কিছু উৎসাহী ব্যক্তিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তীকালে লোকসঙ্গীত ও সাহিত্য নিয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হচ্ছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমে এর ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বহু গ্রন্থাদিও প্রকাশিত হচ্ছে। [illegible] বর্তমান সংকলনটি দেশী-বিদেশী, লোক সাহিত্য-প্রেমিকদের অনেকখানি চাহিদা মেটাবে।

বর্তমান গ্রন্থখানি সুসম্পাদিত। প্রথমেই লোকসাহিত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত মতামতকে নির্বাচিত করে স্থান দেওয়া হয়েছে। তারপর আছে বিখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক গ্রীয়ারসন সাহেবের বিহারী লোকসঙ্গীত সম্পর্কে একটি রচনার পুনর্মুদ্রণ। পূর্ব ভারতীয় ভাষার ওপর তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য এক সময়ে এদেশের সুধী সমাজে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিল। [illegible] পুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক [illegible] [illegible] প্রবন্ধে উত্তরপূর্বী লোকসঙ্গীত ও [illegible] নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। উত্তর প্রদেশের লোকসাহিত্য ও সঙ্গীত নিয়ে [illegible] আলোচনাটি থেকে উত্থানভীর না হলেও [illegible] এ বিষয়ে বিশেষ কিছু জানা নেই তাঁরা উপকৃত হবেন। মানিকলাল সিংহ এবং [illegible] আলোচনা করেছেন যথাক্রমে [illegible] মেদিনীপুরের লোক [illegible] কথা। সনৎকুমার বসুর বাংলার বাউল সঙ্গীত প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ ভিন্ন [illegible]। ব্যবহৃত স্টাফ নোটেশান [illegible] স্বরলিপির জন্য সঙ্গীতসাধকদের [illegible] প্রয়োজন মেটাবে এই নিবন্ধটি। নলিনীকুমার বাহার আদিবাসীদের সঙ্গীত [illegible] আলোচনায় বহু লোকসঙ্গীত সংগ্রহ করা হয়েছে এবং সঙ্গে একটি [illegible] [illegible]। আলোচনাটি যথেষ্ট উপভোগ্য। [illegible] জীবন এবং লোকসঙ্গীত, [illegible] লোকসঙ্গীত, অসমীয়া [illegible] সঙ্গীত, খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড় [illegible] লোকসঙ্গীত নিয়ে আলোচনা করেছেন যথাক্রমে চারুচন্দ্র সান্যাল, এম এস গুরুং, প্রফুল্ল দত্ত গোস্বামী, [illegible] [illegible]। এই আলোচনাগুলি মোটামুটিভাবে পরিচিতিমূলক। শ্রীমতী নীহার বড়ুয়া নতুন বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। ভুটানের পার্বত্য অঞ্চলে মাহুতদের হাতী শিকারের [illegible] নিয়ে [illegible] [illegible] লোকসঙ্গীতের সংগ্রহ [illegible] এবং [illegible] নিয়ে [illegible] করেছিল [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পূর্ববঙ্গবাসী কবি [illegible] একটি প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। [illegible] [illegible] লোকের [illegible] [illegible] আলোচনা করা হয়েছে [illegible] সঙ্গে সঙ্গে লোকসঙ্গীত শ্রোতাদের [illegible] পরিবর্তন হয়, তেমনি সঙ্গীত ও সাহিত্যেরও বিবর্তন ঘটে থাকে। [illegible] লোকসঙ্গীতের [illegible] আন্তর্জাতিক লোকসঙ্গীতের [illegible] ওপর [illegible] করেছেন। [illegible] [illegible] লোকসঙ্গীত ও সাহিত্যে [illegible] চিন্তাধারার প্রাধান্যের দিকটা তুলে ধরেছেন। প্রধান সম্পাদক হেমাঙ্গ বিশ্বাস তাঁর আলোচনায় লোকসঙ্গীতের মধ্যে অত্যাচারী [illegible] বিরুদ্ধে প্রতিরোধ [illegible] [illegible] তুলে ধরেছেন। এবং তিনি [illegible] লোকসঙ্গীত ও সাহিত্য কেবলমাত্র প্রেমবিরহ বা সমাজের তুচ্ছ প্রাত্যহিক জীবনের ঘটনা অবলম্বী নয়।

শ্রীবিশ্বাসের সহযোগী হিসাবে কাজ করেছেন খালেদ চৌধুরী, গগন দত্ত, সনৎকুমার বসু, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, [illegible]

সিংহ ও অবনী রায়। লোকসংগীতের সংগে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রের রেখাচিত্র এঁকেছেন খালেদ চৌধুরী। তিনি একজন সুপরিচিত শিল্পী। তাঁর শিল্পপ্রতিভার সুস্পষ্ট পরিচয় রয়েছে গ্রন্থের সুন্দর অঙ্গসজ্জায়। তাছাড়া এই গ্রন্থে ব্যবহৃত গানের সুরের স্টাফ নোটেশানও করেছেন তিনিই। এ কৃতিত্ব কম নয়।

এই সুসম্পাদিত গ্রন্থখানির জন্য শ্রীবিশ্বাস সুধীবৃন্দের প্রশংসা লাভ করবেন।

নির্বাপিত সূর্যের সাধনা (আলোচনা)—জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়। ক্লাসিক প্রেস। ৩।১এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা—১২। দাম : সাত টাকা।

শ্রীজ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়ের 'নির্বাপিত সূর্যের সাধনা' বাঙলা সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। গ্রন্থখানিকে বলা যায় বিপদাপন্ন মানব সভ্যতার ইতিহাস। সভ্যতাকে ধ্বংসের মুখে নিয়ে যাওয়ায় বিদেশী ওপেনহাইমারের ভূমিকা সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন গ্রন্থকার। তাছাড়া এর মধ্যে আছে অসংখ্য ঘটনা; ইতিহাসের আনন্দঘন এবং বেদনাময় মুহূর্তের বহু নিপুণ আলেখ্য। এ ধরনের বই বাঙলা ভাষায় এর আগে কেউ লিখেছেন বলে জানা নেই।

হিটলারের অত্যাচারে জার্মানীর খ্যাতিমান দেশপ্রেমিক বিজ্ঞানীরা দেশ ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন আমেরিকায়। আর দেশপ্রেমিক জার্মান পদার্থবিজ্ঞানী যাঁরা দেশের মাটি আঁকড়ে পড়েছিলেন, তাঁরা রণশ্রেষ্ঠর সংগে এক আশ্চর্য অভিনয় চালিয়েছিলেন সমস্ত বিপদকে উপেক্ষা করে। তাঁরা চেয়েছিলেন হিটলার কোনক্রমেই যেন আটম বোমা হস্তগত না করতে পারে। আর অন্যদিকে আমেরিকায় আশ্রয়প্রাপ্ত বিদেশী বিজ্ঞানী এবং মার্কিনী বিজ্ঞানীরা মিলিতভাবে অ্যাটম বোমা আবিষ্কারের প্রাণান্তকর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁদের লক্ষ্য ছিল জার্মানীর আগে এই অস্ত্রটি হস্তগত করা। এজন্য সেখানে কয়েকটি আণবিক গবেষণা কেন্দ্র গড়ে ওঠে। এদের নেতা ছিলেন অ্যাটম বোমার জনক ওপেন হাইমার। এর ফলশ্রুতিস্বরূপ ধ্বংস হয় হিরোশিমা নাগাসাকি। তাতে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী এক তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবীরা সরকারী তরফের এই আচরণে ধিক্কার জানাতে থাকেন। কিন্তু ফল হল এই যে, তাতে ওপেন হাইমারই মার্কিনী কার্যকলাপের অভিযোগে সরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে অপসারিত হন।

এ বইতে আছে এমন আরো অসংখ্য কাহিনী। আছে আইনস্টাইন, নীলসবোরের, অটোহান, হাইজেনবার্গ, লিও জিলার্ড এবং আরও অসংখ্য বিজ্ঞানী যাঁরা কোন-না কোন ভাবে পৃথিবীকে আণবিক অস্ত্রের ধ্বংস থেকে মুক্ত দেখতে চেয়েছিলেন তাঁদের কথা বিশেষ করে উল্লেখ করা হয়েছে। আন্তরিক প্রয়াসের প্রসংগ একজন বিদেশী হয়েও আমেরিকায় যেভাবে তিনি কাজ করেছিলেন, তা বিস্ময়করই বলতে হবে। তবুও হিরোশিমা নাগাসাকির বীভৎসতা থেকে তাঁরা পৃথিবীকে রক্ষা করতে পারেন নি। এর ফলে কেবল ওপেন হাইমারই অন্তর্দ্বন্দ্ব আর শান্তিতে বিক্ষত হন নি আরও অনেকেই বঞ্চিত হয়েছিলেন নানাভাবে, কেউ কেউ উন্মাদ পর্যন্ত হয়েছিলেন।

শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের বর্ণনা যেমন অভিনব তেমনি হৃদয়গ্রাহী। গ্রন্থখানি নিঃসন্দেহে সমাদর পাবে।

দ্বাদশ সূর্য (আলোচনা)—সল কে প্যাডোভার। অনুবাদ : অজিতকৃষ্ণ বসু। রূপা অ্যান্ড কোম্পানী। ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট। কলকাতা—১২। দাম—চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

ডক্টর সল কুশেল প্যাডোভার নানাবিধ গবেষণামূলক গ্রন্থের লেখক। টমাস জেফার সনের রাজনৈতিক চিন্তাধারা নিয়ে তিনি কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেছেন। বিভিন্ন বিষয়ের অগাধ পাণ্ডিত্য একালের মার্কিন লেখকদের মধ্যে তাঁকে বিশিষ্টতায় চিহ্নিত করেছে। 'দি জিনিয়াস অফ আমেরিকা'ও তাঁর একখানি বহুল প্রচারিত গ্রন্থ। জর্জ ওয়াশিংটন, টমাস জেফারসন, এব্রাহাম লিংকন, রালফ ওয়াল্ডো এমার্সন, হেনরি ডেভিড থোরো ওয়াল্ট হুইটম্যান, উইলিয়াম জেমস, অলিভার ওয়েন্ডেল হোমস, জন ডিউই, থিওডোর রুজভেল্ট, উড্রো উইলসন এবং ফ্রাংকলিন ডেলানো রুজভেল্ট—এই বারজন চিন্তানায়কের চিন্তাধারা ও মতাদর্শের বিশ্লেষণ করা হয়েছে এই বইটিতে। এইসব রাষ্ট্রনায়ক, দার্শনিক, রাজনীতিবিদ, সমাজতাত্ত্বিক, বিচারক, প্রভৃতির জীবনচিত্রের মধ্য দিয়ে আমেরিকার রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসের একটি সজীব রূপ গ্রন্থকার তুলে ধরেছেন। এই সুদৃশ্য গ্রন্থখানি বারটি পূর্ণপৃষ্ঠা চিত্রে শোভিত।

ফলের চাষের ক খ গ (আলোচনা)—দেবেন্দ্রনাথ মিত্র। মেরিট পাবলিশার্স, ৫১ বিধান সরণী। কলকাতা—৬। দাম—২·৭৫।

ফল ও ফলের দেশ বাঙলা। অথচ এর ওপর আমাদের অবহেলার অন্ত নেই। উপযুক্ত চাষের অভাবে অনেক ফল এবং ফল লোপ পেয়েছে। কতকগুলি লোপ পাওয়ার মুখে। অনেকগুলি আবার কোনক্রমে টিকে রয়েছে। এই অবক্ষয় রোধের জন্য সরকারী এবং বেসরকারী প্রচেষ্টা দেখা যায়; কিন্তু তা সকল ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য নয়। তার কারণ সাধারণ মানুষের মধ্যে যথার্থ জ্ঞানের অভাব। সেই উদ্দেশ্যে স্বল্পমূল্যের গ্রন্থ বা পুস্তিকা প্রচারের প্রয়োজন। প্রাক্তন ডেপুটি এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট কমিশনার শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্রের 'ফলের চাষের ক খ গ' এ বিষয়ে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

দীর্ঘদিন পূর্বে এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমান সংস্করণে অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়েছে। আমাদের দেশে ক্রমবর্ধমান খাদ্যাভাব দূর করতে ফল যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে শ্রীমিত্র তার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

বিশাখা : তপন দাশ কর্তৃক সম্পাদিত এবং ৩৫, দেশপ্রাণ শাসমল রোড, হাওড়া-১ থেকে প্রকাশিত। দাম—·৫০ পয়সা।

কবিতা-সঙ্কলন 'বিশাখা'র দ্বিতীয় সংখ্যা অভিনন্দনযোগ্য। বর্তমানের অধিকাংশ কবিই এতে অংশ নিয়েছেন এবং সেই সংগে কিছু তরুণতর কবি। এই উদ্যম প্রশংসনীয়। এবার লিখেছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, আলোক সরকার, শান্তি লাহিড়ী, মঞ্জু মিত্র, প্রদোষ দত্ত, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, সামসুল হক এবং আরো অনেকে।

বিচিত্রা : জীবন ভৌমিক সম্পাদিত এবং ৬৫, তর্কসিদ্ধান্ত লেন, বালি, হাওড়া থেকে প্রকাশিত। দাম—১·০০।

'বিচিত্রা'র মুখ্য আকর্ষণ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিনলিপি। যথারীতি তা এই সংখ্যার স্বাদ বাড়িয়েছে। দীপক বসুর (কবিতা : তিনটি স্বর, মর্ম ও সুর,) চিন্মোহন সেহানবীশের (রুশ বিপ্লব প্রসঙ্গে) এবং সিদ্ধার্থ দাশগুপ্তের (সোভিয়েত চলচ্চিত্র : বিগত পঞ্চাশ বছর) প্রবন্ধ তিনটি বেশ সুচিন্তিত। কবিতা লিখেছেন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, জগন্নাথ চক্রবর্তী, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, রঞ্জিত সিংহ এবং কিছু অনুবাদ কবিতাও এ সংখ্যার মূল্য বাড়িয়েছে।

দুটি গল্প লিখেছেন শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ও জীবন ভৌমিক।



(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অস্তাচলের রাঙা সূর্যকে ইংকা সাম্রাজ্যের একেশ্বর দেবতা হিসাবে দেখিয়ে প্রায় তেমনি রক্তনেত্রে ইংকা-নরেশ আতাহুয়ালপা পাদ্রীবাবা ভালভের্দে-র দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন কঠিনস্বরে—আমায় এইমাত্র যা শুনিয়েছ সেসব কথা বলবার অধিকার কে তোমায় দিয়েছে? কার হুকুমে তুমি আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছ?

এরপর যা ঘটেছে তার কোন বিবরণ সম্পূর্ণ সঠিক তা বলা শক্ত। প্রত্যক্ষদর্শী হয়েও একটু দূরে থাকার দরুণ ঘনরামও তখনকার বিশৃংখল উত্তেজনার মধ্যে ঘটনার ধারা ঠিকমত অনুসরণ করতে পারেন নি।

আতাহুয়ালপার ক্রুদ্ধ কণ্ঠ শোনবার পরই তাঁর অনুচর বাহক ও প্রহরীরা অস্থির চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

আতাহুয়ালপার রক্তচক্ষু দেখে আর জ্বলন্ত স্বর শুনে পাদ্রীবাবা ভালভের্দেও তখন বেশ ভড়কে গিয়েছেন নিশ্চয়। তিনি নাকি তাঁর হাতের একটি বই আতাহুয়ালপার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলেছেন,—হুকুম আমি পেয়েছি এইটি থেকে!

আতাহুয়ালপা বইটি হাতে নিয়ে দু-একটা পাতা উল্টেই নাকি রাগে ফেটে পড়েছেন। বইটি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বজ্রস্বরে পাদ্রীসাহেবকে শাসিয়ে বলেছেন, —তোমার সঙ্গীদের গিয়ে বলো যে তারা এপর্যন্ত যা যা অন্যায় করেছে সবকিছুর জবাবদিহি না নিয়ে আমি যাব না।

এই বই ছুঁড়ে ফেলাই নাকি বারুদের গাদায় আগুনের ফুলকির কাজ করেছে, কারণ বইটি ছিল নাকি 'বাইবেল'।

পাদ্রীবাবা ভালভের্দে এরপর বাইবেলটি কুড়িয়ে নিয়ে অতিথিশালার ভেতরে পিজারোর কাছে ছুটে ফিরে গিয়েছেন। আর তার কয়েকমুহূর্ত বাদেই যা শুরু হয়েছে তা ঘনরামের কাছেও অবিশ্বাস্য দুঃস্বপ্ন বলে মনে হয়েছে।

ভিড়ের মধ্যে যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন সেখান থেকে 'বাইবেল' ছুঁড়ে ফেলার মত কোনো ব্যাপার ঘনরাম দেখতে পান নি। আতাহুয়ালপাকে ঘিরে জনতার একটা ক্রুদ্ধ উত্তেজিত আলোড়নই শুধু লক্ষ্য করেছেন। পাদ্রীবাবা ভালভের্দে-র ব্যস্ত হয়ে অতিথিশালার ভেতরে ছুটে যাওয়াটা অবশ্য তাঁর নজর এড়ায় নি।

কিছু একটা অপ্রত্যাশিত যে ঘটতে যাচ্ছে এটুকু তিনি ঠিকই অনুমান করেছেন। শুধু অপ্রত্যাশিত ঘটনাটা যে কি হতে পারে তা কল্পনাও করতে পারেন নি।

আতাহুয়ালপার অভ্যর্থনার ব্যাপারটা এমন বিশৃংখল হয়ে যাবার কারণ ভালো করে বোঝবার জন্যে ঘনরাম অতিথিশালার দিকেই তখন এগুতে শুরু করেছিলেন। হঠাৎ তাঁকে চমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়েছে।

চমকে দাঁড়িয়ে পড়েছেন তিনি অকস্মাৎ কামানের গর্জনে।

এই সময়ে কামান গর্জে উঠল কি করে কোথা থেকে?

বিস্মিত বিহ্বলভাবে চারদিকে চেয়ে ঘনরাম এবার কোথা থেকে কামান ছোঁড়া হচ্ছে দেখতে পেয়েছেন। অতিথিমহল্লার প্রবেশদ্বারের দুর্গ থেকেই কামান ছোঁড়া হচ্ছে ইংকা-বাহিনীর ওপর। ছুঁড়ছে পিজারোরই সৈনিকরা। সুকৌশলে কামান ঢেকে রেখে এতক্ষণ তারা ভেতরে লুকিয়ে ছিল।

লুকিয়ে থাকা এসপানিওল সৈন্য চারিদিকের সমস্ত অতিথিশালা থেকেই এবার পিলপিল করে বেরিয়ে এসেছে। নেতা হিসেবে তাদের চালনা করছেন স্বয়ং ফ্রানসিসকো পিজারো। 'জয় সন্ত যাগো-র! মেরে শেষ করো ওদের' এই চিৎকারধ্বনি তুলে নিজের 'রিসালা' নিয়ে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছেন ইংকা-বাহিনীর ওপর।

সম্পূর্ণ অতর্কিত অন্যায় এ আক্রমণ। এর চেয়ে নীচ জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতা আর কিছু হতে পারে না।

কিন্তু এ পৈশাচিক শঠতায় লাভ কিছু হবে কি? এ'ত শুধু অন্ধ মূঢ়তায় সাধ করে সর্বনাশ ডেকে আনা। ইংকা নরেশের হাজার হাজার প্রহরী অনুচর আর সৈন্যবাহিনীর মধ্যে ওই কটি এসপানিওল যোদ্ধা ত দেখতে দেখতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

তা কিন্তু হয় না।

অতিথিমহল্লার বিরাট চত্বরে আতাহুয়ালপার সঙ্গে কমপক্ষে হাজার ছয়েক সৈন্য তখন উপস্থিত। কামানবন্দুক যাই থাক পিজারোর হয়ে লড়বার লোক ত বাষট্টিজন ঘোড়সওয়ার আর একশ ছয় পদাতিক নিয়ে সবশুদ্ধ একশ আটষট্টিজন মাত্র।

ইংকা নরেশের বাহিনী যদি একবার শুধু দৃঢ়সংকল্প নিয়ে রুখে দাঁড়াত কামানবন্দুক আর সওয়ারী ঘোড়া নিয়েও পিজারোর দল কতক্ষণ পারত যুঝতে! তাদের সব গোলাবারুদ কখন যেত ফুরিয়ে, আর সেই সঙ্গে ছ' হাজার ইংকা সেনার পায়ের চাপেই তারা দলে পিষে যেত।

তার পরিবর্তে যা অসম্ভব কল্পনাতীত তাই ঘটেছে এবার। পিজারোর সওয়ার সৈনিকরা খোলা তলোয়ার এলোপাথাড়ি চালাতে চালাতে ছুটে গেছে জনতার ভেতর দিয়ে। বন্দুক কামানের গুলিগোলা আর তীরন্দাজদের তীর এই জনতার ওপর বর্ষিত হয়েছে ঝাঁকে ঝাঁকে। নিহত আহত হয়েছে অসংখ্য ইংকা নরেশের সৈন্য। যারা তা হয়নি, তারা গুলিগোলার ভয়ংকর ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে আর তার অজানা উৎকট গন্ধ-মিশ্রিত ধোঁয়ার আতঙ্কে দিশাহারা হয়ে এ মরণফাঁদ থেকে পালাবার চেষ্টাতেই নিজেদের গুরুতরভাবে দলিত পিষ্ট করে গেছে। পিজারোর মুষ্টিমেয় ক'জন সৈনিক সওয়ার ঘোড়া চালিয়ে আর কামান-বন্দুক ছুঁড়ে যা পারেনি ভয়ে জ্ঞানশূন্য হয়ে ইংকাবাহিনী নিজেরাই নিজেদের সে দারুণ সর্বনাশ করেছে। চত্বরে ঢোকবার ও তা থেকে বাইরে যাবার একটিমাত্র পথই ছিল খোলা। সে পথ পালাবার জন্যে ব্যাকুল ইংকা সেনাদের উন্মত্ত ঠেলাঠেলিতেই যারা নিহত তাদের স্তূপীকৃত শবে রুদ্ধ হয়ে গেছে। শেষ-পর্যন্ত শুধু মানুষের প্রচণ্ড চাপেই চত্বর প্রাকারের একটি মাটি ও পাথরে গাঁথা অংশ ধসে পড়েছে আর সেই ফাঁক দিয়ে ইংকাবাহিনীর যারা পেরেছে তারাই ছুটে পালিয়েছে নগর ছাড়িয়ে যতদূর সম্ভব বাইরের মুক্তপ্রান্তরে।

সেখানে গিয়েও তারা রক্ষা পায়নি। হত্যার আনন্দে এসপানিওল সওয়ার

LIFEBUOY
for health
LIFEBUOY SOAP

লাইফবয়
যেখানে
স্বাস্থ্যও সেখানে

লাইফবয় মেখে স্নান করলেই তাজা ঝরঝরে হবেন।
এই মেহকার সুস্থ পরিচ্ছন্ন ভাব থেকেই বুঝবেন ভাল সাবানের সবকিছু
গুণ তো আছেই লাইফবয়ে, তারচেয়েও বেশী কি যেন আছে।

লাইফবয় ধুলোময়লার রোগবীজাণু ধুয়ে দেয়

লিনটাস- L. 52-140 BG
হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

সৈনিকরা তখন উন্মত্ত। তারা অসহায় আতঙ্কবিহ্বল পলাতকদের ভেতর সবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে অবাধে তাদের দেহ ছিন্নভিন্ন করেছে ডাইনে-বাঁয়ে তলোয়ার চালিয়ে।

ইংকা নরেশ আতাহুয়ালপার তখন কি হয়েছে? তিনিও কি এই আকস্মিক পৈশাচিক আক্রমণের শিকার হয়ে প্রাণ দিয়েছেন?

না প্রাণ তাঁকে দিতে হয়নি। দেওয়াই যদিও তাঁর পক্ষে আর ইংকা সাম্রাজ্যের ইতিহাসের পক্ষে গৌরবের হত।

আতাহুয়ালপা তখন পিজারোর হাতে বন্দী হয়েছেন। প্রাণে মারা নয় এই বন্দী করাই ছিল পিজারোর অভিপ্রায়। আতাহুয়ালপাকে জীবন্ত অবস্থায় বন্দী করবার জন্যে শেষপর্যন্ত পিজারো বেশ একটু আহতও হয়েছিলেন ইংকা নরেশের ওপর এসপানিওল এক সৈনিকের নিক্ষিপ্ত অস্ত্র ঠেকাতে।

সে এসপানিওল সৈনিক অধৈর্য হয়েই নিশ্চয় ইংকা নরেশকে মারবার জন্যে অস্ত্র ছুঁড়েছিল। অধৈর্য হবার কারণ আতাহুয়ালপাকে কিছুতেই অক্ষত অবস্থায় বন্দী করবার মত বাগে না পাওয়া।

আতাহুয়ালপার সঙ্গে যারা ছিল সেই বাহক-সেবক অনুচরেরা সবাই নিরস্ত্র। পিজারোর সৈনিকদের অতর্কিত ভয়ঙ্কর আক্রমণের পর আর সকলের মত তারা কিন্তু পালাবার জন্যে ব্যাকুল হয়নি। তারা সকলে অভিজাত বংশের বীর। এই কল্পনাতীত বিভীষিকার মধ্যেও তারা তাদের অধীশ্বরকে রক্ষা করবার জন্যে নিরস্ত্র অবস্থাতেই মরণপণ করে যুঝেছে।

পিজারোর আদেশ ছিল আতাহুয়ালপাকে বিন্দুমাত্র আহত না করে বন্দী করতে হবে। অতর্কিত আক্রমণের গোড়া থেকেই এসপানিওল সওয়ার সৈনিকরা সেই চেষ্টা করেও কিন্তু সফল হয়নি। সওয়ার সৈনিকরা ঘোড়ার ওপর থেকে খোলা তলোয়ার চালিয়েছে আর নিরস্ত্র নিরুপায় ইংকাবীরেরা তাদের বাধা দেবার চেষ্টা করেছে জীবন তুচ্ছ করে সে ঘোড়ার লাগাম ধরে ঝুলে পড়ে। একের পর এক বীর কাটা পড়ছে কিন্তু তার জায়গা নেবার লোকের অভাব হয়নি।

এদিকে সূর্য অস্ত গিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমে গাঢ় হয়ে আসছে। পিজারোর সৈনিকদের ভয় হয়েছে শেষ পর্যন্ত সেই অন্ধকার বিশৃঙ্খলার মধ্যে ইংকা নরেশ তাদের খপ্পর থেকে না পালাবার সুযোগ পায়। অসহিষ্ণু এক সৈনিক তখনই আতাহুয়ালপাকে লক্ষ্য করে বল্লম ছুঁড়ে মেরেছে আর নিজে আহত হয়ে সে বল্লম ঠেকিয়েছেন স্বয়ং পিজারো।

সে সন্ধ্যার একতরফা হত্যাতাণ্ডবে এসপানিওলদের নিজেদের ক্ষতির পরিমাণ নাকি ওইটুকুই! পিজারো ছাড়া তাঁর সৈন্যসামন্তদের একজনও নাকি বিন্দুমাত্র আহত হয়নি।

পিজারোর ওই আঘাতটুকু নেওয়া অবশ্য সার্থক হয়েছে পুরোমাত্রায়। কিছুক্ষণ বাদেই শিবিকাবাহী বীরদের প্রায় সবাই একে একে প্রাণ দেবার পর আতাহুয়ালপার শিবিকাই ভেঙে পড়েছে মাটিতে। পিজারো আর তাঁর কয়েকজন সঙ্গী ইংকা নরেশকে সেই অবস্থাতেই বন্দী করে নিয়ে গেছেন অতিথিশালার একটি পাহারা দেওয়া কামরায়। আতাহুয়ালপার মাথায় রাজচক্রবর্তীর প্রতীক-চিহ্ন রক্তিম 'বোর্লা' তখন আর নেই। তাঁর শিবিকা ভেঙে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সাধারণ এক সৈনিক তা ছিনিয়ে নিয়েছে।

এই বোর্লা ছিনিয়ে নেওয়ার দৃশ্যটুকু ঘনরাম নিজের চোখেই দেখেছেন। অবিশ্বাস্য এ হত্যাতাণ্ডব শুরু হবার পর প্রথমটা বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেও তারপর তিনি আতাহুয়ালপার শিবিকা ঘিরে যেখানে উন্মত্ত সংগ্রাম চলেছে সেইদিকেই অগ্রসর হবার চেষ্টা করেছেন।

অগ্রসর হওয়া অবশ্য সহজ হয়নি। মানুষের উন্মত্ত বন্যাস্রোত ঠেলে কাছাকাছি যখন গিয়ে পৌঁছোতে পেরেছেন তখন সেখানকার নিষ্ঠুর করুণ নাটক শেষ হয়ে এসেছে। রক্তাক্ত বাহকরা ধরাশায়ী হবার সঙ্গে সঙ্গে ইংকা নরেশের টলমল শিবিকা মাটিতে ভেঙে পড়েছে এবার, আর ঘনরামের চোখের ওপরেই মিগুয়েল এসতেতে নামে এক সাধারণ সৈনিক আতাহুয়ালপার মাথার বোর্লা খুলে নিয়েছে টান মেরে।

ঘনরামের ডান হাতটা আপনা থেকেই তাঁর কোমরে বাঁধা তলোয়ারের হাতলের ওপর গিয়ে একবার পড়েছিল। তৎক্ষণাৎ নিজেকে তিনি কিন্ত সামলে নিয়েছেন। বুঝেছেন যে নীরব নিস্পন্দ দর্শকমাত্র হওয়া ছাড়া তাঁর করণীয় আর কিছু নেই।

করণীয় সত্যিই কি কিছু তাঁর ছিল?

করণীয় কিছু আছে মনে করেই কি তিনি এতক্ষণ তাহলে প্রাণপণে আতাহুয়ালপার শিবিকার কাছে পৌঁছোবার চেষ্টা করেছিলেন?

কিই বা তাঁর পক্ষে করা সম্ভব ছিল? কি তিনি চেয়েছিলেন করতে?

কাক্সামালকা নগরের কয়েকটি অদ্ভুত পরবর্তী ঘটনায় তার আভাস পরে হয়ত পাওয়া যেতে পারে।

সেই মুহূর্তে ঘনরাম কিন্ত নির্লিপ্ত দর্শকের মতই সবকিছু দেখেছেন, তারপর নিঃশব্দে একসময়ে অতিথিমহল্লার চত্বর ছেড়েই বেরিয়ে গেছেন রাতের গাঢ় অন্ধকারে। আতাহুয়ালপার সম্মানে আয়োজিত পিজারোর ভোজসভায় সে রাত্রে তাঁকে দেখা যায় নি।

হ্যাঁ, পিজারো তাঁর কথার মর্যাদা রেখে সত্যিই সেই রাত্রে ইংকা নরেশকে ভোজ দিয়েছেন। কয়েক ঘন্টা আগে যেখানে ইংকাবাহিনীর রক্তবন্যা বয়ে গেছে কাক্সামালকার অতিথিমহলের তেমনি একটি বিরাট হলে ভোজসভার আয়োজন হয়েছে। পিজারো আতাহুয়ালপাকে সসম্মানে নিজের পাশের আসনে বসিয়ে আপ্যায়িত করেছেন।

সেই ভোজসভায় উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য যাদের হয়েছিল তারা আতাহুয়ালপাকে দেখে বেশ একটু বিস্মিতই হয়েছে। কল্পনাতীত এই আকস্মিক ভয়ঙ্কর ভাগ্যবিপর্যয়ের পর ইংকা নরেশ বিমূঢ় বিহ্বলতায় বিবশ হয়ে পড়লে অবাক হবার কিছু ছিল না। ভেতরে ভেতরে তাঁর মনের মধ্যে যে আলোড়নই চলুক আতাহুয়ালপার বাইরের চেহারায় তার বিন্দুমাত্র আভাস কিন্তু কেউ দেখতে পায় নি। সম্রাটোচিত প্রশান্তিই প্রকাশ পেয়েছে তাঁর মুখের ভাবে। তিনি যেন নিজের ঔদার্যে অনুগ্রহ করে এই অজানা বিদেশীদের ভোজসভা অলঙ্কৃত করতে এসেছেন মনে হয়েছে তাঁর আলাপে আচরণে।

পিজারোর এই পৈশাচিক শঠতা সম্বন্ধেও আতাহুয়ালপা প্রশংসাসূচক মন্তব্য করেছেন বলে এই ভোজসভার একজন নিমন্ত্রিত প্রত্যক্ষদর্শী বিবরণ রেখে গেছেন।

আতাহুয়ালপা কি সত্যিই তাঁর বন্দীত্বের সম্পূর্ণ ভয়াবহ তাৎপর্য তখনও বোঝেন নি? না, এতবড় বিরাট সাম্রাজ্যের বুকের একটি কোণে মুষ্টিমেয় ক'জন বিদেশী শত্রুর উন্মত্ত বাতুল স্পর্ধার উপযুক্ত জবাব দিতে ইংকা রাজশক্তির দেরী হবে না, নিশ্চিৎ নিশ্চিন্ত এই বিশ্বাসে পিজারো আর তাঁর সঙ্গীদের একটু প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ করেছেন।

আতাহুয়ালপা যখন পিজারোর ভোজসভায় আপ্যায়িত হচ্ছেন ঘনরাম তখন কাক্সামালকা নগরের বাইরে উষ্ণ প্রস্রবণের কাছে ইংকা নরেশের নিজের বিশ্রাম-শিবিরের একটি বেদীর ওপর একলা বসে আছেন।

এই জায়গাটিতে এসে বসবার আগে বহুক্ষণ নগরের বাইরের প্রান্তরে তিনি প্রায় অপ্রকৃতিস্থের মত ঘুরে বেড়িয়েছেন। পিজারোর এই পৈশাচিক শঠতায় তাঁর সমস্ত শরীর মন তখন আগুনের মত জ্বলছে। কাক্সামালকা শহরে কিছুক্ষণ আগে যে হত্যাতাণ্ডব হয়ে গেল তাতে তাঁর বিন্দুমাত্র হাত নেই। কিন্তু প্রত্যক্ষ যোগ না থাকলেও এই অবিশ্বাস্য পরিণামের নিমিত্তমাত্র হিসাবেও তাঁর কিছুটা দায়িত্বও অস্বীকার করবার নয়। 'সূর্য কাঁদলে সোনা'-র দেশের অভিযান সফল করবার জন্যে চেষ্টার ত্রুটি ত সত্যিই তাঁর ছিল না।

সে সাফল্যের এই চেহারা শুধু যদি তিনি কল্পনা করতে পারতেন। নির্মম পৈশাচিকতায় এই সোনার দেশে রক্তগঙ্গা বহাবার তিনি সহায় হবেন জানলে কাপিতান সানসেদোর গণনা সফল করবার জন্য এমন ব্যাকুল তিনি নিশ্চয় হতেন না। কাপিতান সানসেদোর গণনায় এত কিছু ধরা পড়া সত্ত্বেও এই ভয়ঙ্কর নিয়তির কোনো আভাস কেন পাওয়া যায় নি?

এই নিয়তি ঘটনার স্রোতকে কোন অমোঘ সর্বনাশের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে তা তিনি জানেন না। জানতেও তা চান না। ফল যাই হোক তাঁর জীবনের একমাত্র কাজ এখন এই নিয়তির গতিতে বাধা দেওয়া।

(ক্রমশঃ)

কলকাতা

কাটলেট

কলকাতা

বাইরে কালবৈশাখী, ভিতরে চায়ের পেয়ালায় ঝড়। এক একটা টেবিল এক একটা দ্বীপ, কোনোটা যেন আটলান্টিকে কোনোটা যেন প্রশান্ত মহাসাগরে—ঝড়ের প্রকৃতিও টেবিলভেদে কোথাও টাইফুন কোথাও হারিকেন।

দমকা কালবৈশাখীর ঝাপটা কখনও দরজা ঠেলে আসতে চায়। রাস্তার ট্রাম-গাড়ীর ঘণ্টাগুলো শোনায় পাগলা ঘণ্টির মত। বৃষ্টির তীক্ষ্ণ চাবুকের তাড়নায় মাঝে মাঝে এক একজন বিভ্রান্ত পথিক ভেজা চুল আর কপাল বেয়ে নেমে আসা জলের ধারা মুছতে মুছতে ওদিকে তাকায়।

বাঁ পাশের টেবিলটাতে ঝড়ের কারণ বোঝা যাচ্ছে। কাটলেট। 'রাখতো ভাই—' বীরের মত একজন জোরগলায় বলে ওঠেন, 'বিলেতে আমেরিকায় কি খেয়েছ না খেয়েছ ওসব গপ্পো বাড়ীর জন্য থাক, এই আমাদের কাটলেট। একেই আমরা কাটলেট বলব, আর খেয়ে আনন্দ পাব।' এর পরের অ্যাকশন অবশ্যই কাটলেটে কামড়।

কতকাল ধরে 'চপ' বা 'কাটলেট'-কে বাঙালী খাদক-সাধারণ যাকে ইতরজনের ভাষায় 'সাহেবী খানা' বলে তাই মনে করে খেয়ে তুরীয় আনন্দ লাভ করে গেছেন তা জানা নেই। যাদের ভাষার শব্দ এ দুটি, তাদের 'চপ' বা 'কাটলেট' অন্য বস্তু এ তথ্যও বাসি হয়ে গেছে। (প্রসঙ্গত বলে রাখি 'কাটলেট' বলে কলকাতার 'রেস্টুরেন্ট'এ যা পরিবেশিত হয়, অক্সফোর্ড ইংরাজী অভিধানের 'কাটলেট'এর একটি সংজ্ঞার সঙ্গে তার মিল আছে, তফাৎ অবশ্য আছে, সেটুকু শুধু ঝাল-মশলার)।

কিন্তু শুধু কি ভাষাতত্ত্বের প্রশ্ন? ইংরেজ বা ইউরোপীয়ের 'চপ' বা 'কাটলেট' তাদের খাদ্য মাত্র, বাঙালীর কাছে কি বাঙালীর 'চপ' বা 'কাটলেট' খাদ্য মাত্র? 'মাত্র'র কথা পরে হবে, আদৌ বাঙালীর খাদ্য ওদুটির একটিও নয়। এমন কি আজকের বহু-আলোচিত 'বিকল্প' খাদ্যও নয়, যা না খেলে বাঙালীর দিন অচল হবে।

এ নিয়ে গবেষণা এখন থাক্। কিছু পরিবেশের অবতারণা করে কলকাতায় কাটলেটের বিশেষ তাৎপর্য উপলব্ধি করবার চেষ্টা করা যেতে পারে।

এইরকম একটি টেবিলে, যেখানে বসে আজ কালবৈশাখী বিদায়ের ক্ষণ ডেকে আনবার জন্য চায়ের পেয়ালায় বিলম্বিত চুমুক দিয়ে চলছি, একদিন এসে বসেছিলাম, অনেক, অনেকদিন আগে। তা পঁচিশ বছর হবে। যে দূরে গ্রাম থেকে সেই প্রথম কলকাতায় এসেছিলাম, সে গ্রামের বয়স্কদের বৈঠকে মুগ্ধ হয়ে কলকাতা নামে এক রূপকথার যাদুপুরীর গল্প শুনতাম। সে অনেক দূরের গ্রাম। সেখান থেকে পুজোর সময় কোনো কোনো সম্পত্তিপন্ন লোক বাজার করতে কলকাতায় আসতেন। বাজারের ফাঁকে ফাঁকে যা অবশ্য কর্তব্য ছিল তার মধ্যে ছিল শিশির ভাদুড়ীর 'প্লে' দেখা এবং 'রেস্টুরেন্ট'এ খাওয়া। তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ওর উপরে উঠতে পারত না সে কথা বলা বাহুল্য।

সে প্রভাব মনের উপর ছিল স্বীকার করতে বাধা নেই। তাই কলেজবৃত্তির তাগিদের বাইরেও বোধকরি কৌতূহলের প্রেরণাতেই ভীরু পদক্ষেপে একদিন ঢুকে পড়েছিলাম এখানে।

তখনও সন্ধ্যা হয়নি। ঘরের ভিতর আলো জ্বলছিল, উজ্জ্বল নয়। কেমন একটা ধূলি-ধূসর আলো। প্রায় কালো রঙের ভারী কাঠের আসবাব, টেবিলের উপর শ্বেতপাথর। অদ্ভুত নিস্তব্ধ ভেতরটা। যেখানে বসেছিলাম সেখান থেকে সোজা তাকালে একটা দেয়ালে দৃষ্টি আটকে যায়। দেয়ালের গায়ে একটা খোলা দরজার ভিতর দিয়ে আর একটা ঘর দেখা যায়—আরও অন্ধকার, ধোঁয়ার ঝাপসা পর্দার আড়ালে অস্পষ্ট মানুষের মূর্তিরা এদিকে ওদিকে চলাফেরা করছে বোঝা যায়। সেই মুহূর্তের জন্য আমার কল্পনার রহস্যনগরী কলকাতা একটি সম্পূর্ণ ও মূর্ত প্রতীকের মত লেগেছিল এই দোকানের ভিতরটাকে। পুরোনো, বনেদী, ওজনে ভারী এবং নিরঙ্কুশ ইজ্জতের অধিকারী। ইংরাজীতে যাকে বলে কোয়ালিটি। দরজার কাছে একটা চেয়ারে গেঞ্জী গায়ে একজন লোক সামনের একটা ছোট টেবিলে ক্যাশবাক্স ও খাতাপত্র নিয়ে বসেছিলেন, তাঁর মুখে কোন কথা ছিল না।

ছোকরামতন একজন কী চাই জিজ্ঞাসা করতে ভয়ে ভয়ে বলেছিলাম "কাটলেট।" তার পর আবার চুপচাপ। সহসা ক্যাশ-বাক্সের কাছ থেকে একটা আদেশদৃপ্ত আওয়াজ। 'সতেরখানা কাটলেট ভাজো।' আবার চুপচাপ।

এইবার সেই দরজার ফাঁক দিয়ে ধোঁয়ায় আবছা ওদিককার ঘরটায় চোখ পড়ল। একটা অস্পষ্ট মানুষের মূর্তি এদিক থেকে ওদিকে এল মনে হল। ওর হাতে একটি— হাঁ মুরগীই তো। মুরগীটা ওদিকে বেঁধে আবার ছায়ামূর্তিটি এদিকে এল।

ক্ষীণ আলোতে ওর হাতের কাছে কি একটা চকচক করে উঠল। হঠাৎ বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। না, ছুরি দেখে নয়। ওর ছুরি ধরা দেখে। দুচোখ ভাল করে রগড়ে নিলাম না, ভুল দেখিনি। ওর দুটো হাতেরই কব্জি থেকে নীচের অংশ অদৃশ্য।

চমকে উঠলাম আর একটা হাঁক শুনে ওই ক্যাশবাক্সের কাছ থেকে—'পঁচিশখানা কাটলেট ভাজো।'

কিন্তু আমার মন তখন কোথাও নেই শুধু ওই দরজার ফাঁকে ওধারে। তারপর দেখলাম, বলে যাচ্ছি। আমার বুকের ভিতর তখন রেলগাড়ী চলছে। ওই মানুষটি

মেন্দু, তার হাতে একটা ফ্রাইংপ্যান। হাতে নয়, দুহাতে। কড়াই থেকে কেটে বাদ দেওয়া দুহাতে একত্র করে চেপে ধরা প্যানের হাতল। উনুনের উপর রেখে আবার এদিকে এল। একটা মিটসেফ আলমারী থেকে বার করে এনে টেবিলে রাখল—অমনি দুই পাতা-বিহীন হাতে। অমনি করে তৈরী করা কাঁচা কাটলেট ফ্রাইং প্যানে দিল। ভাজার শব্দ আসতে লাগল। অমনি করে চেপে ধরে খুন্তি দিয়ে কাটলেট উলটে দিল। অমনি করে চেপে ধরে ফ্রাইং প্যান নামাল, তারপর ভাজা কাটলেট একটা ডিশে রাখল।

কালক্রমে সেই ডিশ আমার সামনে টেবিলে এল ছুরি ও কাঁটাসমেত। যন্ত্র-চালিতের মত ছুরি দিয়ে কেটে কাঁটা দিয়ে কাটলেট মুখে দিলাম।

হাঁ, তারপর পঁচিশ বছর কেটে গেছে। আজও মনে পড়ে না, অমন স্বর্গীয় খাদ্যের সঙ্গে রসনা সংযোগ আর কোথাও করেছি কিনা। না করি নি। না এদেশে, না বিদেশে।

দাম দিয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মত বেরিয়ে এসেছিলাম। বাড়ী এসে, যাঁর অতিথি হয়েছিলাম, এক নিঃশ্বাসে তাঁকে ঘটনাটা বললাম। শুনে তিনি গড়গড়ার নলে লম্বা একটা টান দিয়ে হা-হা করে হেসে উঠে বললেন, 'ওরে খোকা; তুই জানতিস না—তুই নুলোর কাটলেট খেয়ে এসেছিস। তোর জীবন ধন্য হয়ে গিয়েছে।' খানিকটা যে বুঝিনি তা নয়—কানে তখনও ভাসছিল—'সতেরখানা কাটলেট ভাজো', 'পঁচিশখানা কাটলেট ভাজো।'

ক্রমশ শুনেছিলাম, নুলো নামে খ্যাত সেই কারিগর, ঠুঁটো দুই হাতে পারত না এমন কাজ ছিল না। বিশেষ করে ওই কাটলেটের ব্যাপারে ও যাদুকর-বিশেষ ছিল। ওই হাতে মুরগী বানানো থেকে মশলা তৈরী করা, মেশানো, কাটলেটের আকার দেওয়া এবং শেষ পর্যন্ত ভাজা—সব নিজে হাতে। আর কী বিদ্যা যে ওর জানা ছিল, যাতে সেই কাটলেট হয়ে উঠত অমৃত। কলকাতার বনেদী ভাগ্যবানদেরই অধিকার ছিল তার স্বাদগ্রহণের অভিজ্ঞতায়, তবে আমাদের মত ইতরজনও সময়মত দোকানে গিয়ে বসতে পারলে ছিটেফোঁটা প্রসাদ থেকে বঞ্চিত হত না।

হাঁ, একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। সেই আবছা আলোয় প্রথম মুরগী হাতে নুলোর (মাপ করবেন, ওর আসল নামটা আজও জানা হয় নি বলেই অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওই নামটি ব্যবহার করতে হচ্ছে) প্রবেশ দেখে আঁৎকে উঠলেও বারংবার মনের মধ্যে একটা চাপা প্রশ্ন ঘা দিয়ে চলেছিল। একে কোথায় দেখেছি, কোথায় দেখেছি। সে প্রশ্নেরও সমাধান আমার দাদার কাছেই পেয়েছিলাম। খুব ছোটবেলায় একটা ভ্রাম্যমাণ বায়োস্কোপ গ্রামে এসেছিল, একটি মাত্র নির্বাক ছবি নিয়ে। চার দিন দেখানো হয়েছিল সেই ছবি। চার দিনই অবাক বিস্ময়ে জীবনের প্রথম সেই সিনেমার ছবি দেখেছিলাম। শুধু একটি অভিনয়ের জন্য—সে ওই নুলোর অভিনয়।

বাইরের কালবৈশাখী প্রায় থেমে এসেছে। চায়ের টেবিলের ঝড়ও। কিন্তু আমার বিশ্বাস তেমনি দৃঢ় আছে—কলকাতার রেস্টুরেন্ট শুধু খাবার জায়গা নয়, কাটলেটও শুধু বা খাদ্যমাত্র নয়। বাঙালীর গতানুগতিক জীবনের প্রাত্যহিকতা থেকে ক্ষণিক মুক্তির তীর্থস্থান কলকাতার 'রেস্টুরেন্ট'—অবশ্য জীবনের দৈহিক ব্যাখ্যায়।

—সেবতী



দেশে বিদেশে

পূর্ব ইউরোপে আলোড়ন

১৯৫৬ সালের হাঙ্গারীর ঘটনা কি আবার পূর্ব ইউরোপের একাধিক কম্যুনিস্ট-শাসিত দেশে ঘটতে চলেছে? সম্প্রতি চেকোশ্লোভাকিয়া ও পোল্যান্ড থেকে ঐ দুই দেশের ছাত্র, লেখক ও অন্যান্য বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে আলোড়নের যেসব সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে সেগুলি থেকে এই প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে।

চেকোশ্লোভাকিয়ার ঘটনা এতদূর গড়িয়েছে যে, সেখানে প্রেসিডেন্ট নভোৎনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। তার আগে সেখানকার সেনাবাহিনীর একজন মেজর-জেনারেল দেশত্যাগ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক আশ্রয় নিয়েছেন, একজন উপমন্ত্রী নিজের মাথায় গুলী করে আত্মহত্যা করেছেন, দুজন উচ্চ পদাধিকারীকে বরখাস্ত করা হয়েছে। পোল্যান্ডে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা প্রকাশ্য বিদ্রোহ করছে, তাদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হচ্ছে। ১৯৫৬ সালে যে গোমুলকা ছাত্রদের জয়ধ্বনির মধ্যে পোল্যান্ডের প্রেসিডেন্টের পদে বসেছিলেন সেই ভ্ল্যাদিস্লাভ গোমুলকার নিজের অবস্থাই আজ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

দুই দেশেই আন্দোলনকারীদের দাবী হচ্ছে, গণতান্ত্রিক সংস্কার চাই, সেন্সর-প্রথা রহিত করতে হবে, লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের স্বাধীন মতপ্রকাশের আরও বেশী অধিকার দিতে হবে, পার্টির ও সরকারের আমলাদের কর্তৃত্ব খর্ব করতে হবে, পার্টির মধ্যে যাঁরা এইসব রাজনৈতিক সংস্কারের বিরোধিতা করছেন তাঁদের সরিয়ে দিতে হবে ইত্যাদি। এই আন্দোলন কতদূর গড়াবে, ১৯৫৬ সালের হাঙ্গারীর মত এবারও এই আন্দোলন পূর্ব ইউরোপের এই দুটি দেশকে ওয়ারশ চুক্তির বাইরে নিয়ে গিয়ে তাদের পররাষ্ট্রনীতির নিরপেক্ষতা ঘোষণা করতে বাধ্য করবে কিনা তার উপর এইসব সাম্প্রতিক ঘটনার পরিণাম নির্ভর করছে।

চেকোশ্লোভাকিয়ায় যা ঘটছে তার ব্যাখ্যা দিয়ে কোন কোন মহল থেকে বলা হয়েছে যে, সেখানে কম্যুনিস্ট পার্টির ভিতরে স্ট্যালিনপন্থী ও স্ট্যালিনবিরোধীদের মধ্যে সংঘাত তীব্র হয়ে উঠেছে এবং বুদ্ধিজীবীদের আলোড়ন তারই প্রতিফলন। কিছুকাল ধরেই চেক কম্যুনিস্ট পার্টির ভিতরে এই লড়াই চলছিল। দ্বিতীয় যুদ্ধের পর যে হাজার হাজার নাৎসী-বিরোধী দেশপ্রেমিককে পার্টি-বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল, পার্টি থেকে যাঁদের তাড়ান হয়েছিল, "অবাঞ্ছিত"দের বিরুদ্ধে যেসব মামলা দায়ের করা হয়েছিল সেই সবকিছুর পুনর্বিবেচনা দাবী করা হচ্ছিল। অর্থনৈতিক সংস্কারের জন্যও দাবী জানান হচ্ছিল। গত জানুয়ারী মাসে চেক কম্যুনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশনের সময় পার্টির এই অন্তর্দ্বন্দ্ব তীব্রভাবে প্রকাশ পায়। সে সময়ে প্রেসিডেন্ট অ্যান্টোনিন নভোৎনি পার্টির ফার্স্ট সেক্রেটারির পদটি হারান। তাঁর জায়গায় ফার্স্ট সেক্রেটারি হন আলেকজান্দার দুবচেক। সংস্কারপন্থী দুবচেকের কাছে রক্ষণশীল নভোৎনির পরাজয় চেকোশ্লোভাকিয়ায় নতুন হাওয়া বইতে সাহায্য করে। হাওয়া যে কতদূর বদলেছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় যখন গত ৮ মার্চ একদল ছাত্র প্রাগ শহরের অল্প দূরে ল্যানি নামক একটি জায়গায় চেকোশ্লোভাকিয়ার এক কালের পরম সম্মানিত নেতা ও প্রেসিডেন্ট ইয়ান মাসারিকের সমাধিক্ষেত্রে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করতে যান। মাসারিক ছিলেন সমাজতন্ত্রী নেতা। যুদ্ধোত্তরকালে তিনি কম্যুনিস্টদের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগ করে চেকোশ্লোভাকিয়ার নেতৃত্ব করার চেষ্টা করেছিলেন। একটা রহস্যজনক পরিস্থিতিতে বাড়ীর জানলা থেকে পড়ে গিয়ে তাঁর মৃত্যু ঘটে। গত ৮ মার্চ ছিল তাঁর সেই মৃত্যুর বিংশ বার্ষিকী। মাসারিকের মৃত্যুর পর চেকোশ্লোভাকিয়ায় কম্যুনিস্ট পার্টি পুরোপুরি ক্ষমতা দখল করে। তার পর থেকে চেক সরকার ইয়ান মাসারিকের নাম দেশের লোকের স্মৃতি থেকে মুছে ফেলার জন্য চেষ্টা করেছেন। তাঁর মৃত্যুদিনে তাঁর সমাধিতে মাল্যদান করার জন্য দীর্ঘ কুড়ি বছর কাউকে দেখা যায় নি। কিন্তু দুবচেকের নেতৃত্বে চেকোশ্লোভাকিয়ায় যে উদারনৈতিক আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে তাতে উৎসাহিত হয়ে সে দেশের ছাত্র ও তরুণরা এখন ধ্বনি তুলছেন, "মাসারিকের মত নেতাই আমাদের চাই।"

এই নতুন হাওয়ায় পার্টি ও সরকারের অতীত কার্যকলাপ সম্পর্কে প্রকাশ্যে প্রশ্ন তোলা হতে থাকে। গত জানুয়ারী মাসে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভার সময় প্রাগের কাছে একটি ট্যাঙ্ক বহর মোতায়েন করা হয়েছিল কার আদেশে ও কি উদ্দেশ্যে? এই প্রশ্ন যখন আলোচিত হচ্ছিল তারই মধ্যে মেজর-জেনারেল ইয়ান সেইনা দেশত্যাগ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। এর ফলে দেশব্যাপী প্রচন্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি হল। সংস্কারপন্থীরা প্রশ্ন তুলতে থাকলেন, মেজর-জেনারেল সেইনার মুরুব্বী কারা? কারা তাঁকে দেশত্যাগ করে চলে যেতে পিছন থেকে সাহায্য করেছেন? প্রেসিডেন্ট নভোৎনি, প্রতিরক্ষামন্ত্রী বহুমির লোমস্কি প্রভৃতিকে উদ্দেশ্য করে এইসব প্রশ্ন তোলা হতে থাকল। প্রায় প্রকাশ্যেই এই অভিযোগ করা হতে থাকল যে, এই স্ট্যালিনপন্থী নেতারাই কেন্দ্রীয় কমিটির সভার সময় সংস্কারপন্থীদের কাছে পরাজয়ের সম্ভাবনায় বিচলিত হয়ে কমিটির নির্বাচনকে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে প্রাগ শহরের কাছে ট্যাঙ্ক মোতায়েন করেছিলেন। সেই নেতারাই এখন পিছনে থেকে মেজর-জেনারেল সেইনাকে দেশের বাইরে পাচার করে দিয়েছেন। সেইনার দেশত্যাগের ব্যাপার নিয়ে দেশরক্ষা বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কৈফিয়ৎ তলব করা হচ্ছে। টেলিভিশনের পর্দার সামনে দাঁড় করিয়ে তাঁদের জবাবদিহি নেওয়া হচ্ছে। এইরকম একটা জবাবদিহির তলব পেয়েই দেশরক্ষা বিভাগের উপমন্ত্রী ভ্লাদিমির ইয়ঙ্কা নিজের মাথায় গুলী করে আত্মহত্যা করেছেন। পার্টির সংস্কারপন্থীদের চাপে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কুদ্রনা ও অ্যাটর্নি-জেনারেল বাতুস্কা অপসারিত হয়েছেন। শেষ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট নভোৎনিও স্বয়ং পদত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে একজন মন্ত্রী ও পার্টির কয়েকজন পদাধিকারীও ইস্তফা দিয়েছেন।

দুবচেক ও তাঁর অনুগামীরা কতদূর যাবেন তা এখনও বোঝা যাচ্ছে না। তাঁদের উদারনীতিতে উৎসাহিত হয়ে চেকোশ্লোভাকিয়ার যে বুদ্ধিজীবীরা নতুন স্বাধীনতা ভোগ করছেন তাঁরা শেষ পর্যন্ত সংস্কারপন্থীদের আয়ত্তে থাকবে কিনা তাও এখন নিশ্চিত করে বলা যায় না। কিন্তু যদি এই নতুন নীতি চেকোশ্লোভাকিয়ার সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়ার বন্ধন ক্ষুন্ন করে তাহলে রাশিয়া চুপ করে বসে থাকবে কি? সেক্ষেত্রে দুবচেকের জন্য হাঙ্গারির ইম্রে নজের ভাগ্য অপেক্ষা কর থাকবে, এটাই স্বাভাবিক বলে মনে হয়। ১৯৫৬ সালে হাঙ্গারিতে রাশিয়ান সৈন বাহিনী মোতায়েন ছিল। আজ চেকোশ্লোভাকিয়ায় তা নেই। কিন্তু পার্শ্ববর্তী পূর্ব জার্মানীতেই সোভিয়েট সৈন্য রয়েছে। এখন পর্যন্ত চেকোশ্লোভাকিয়ার ঘটনা রাশিয়া নীরব রয়েছে। ১৯৫৬ সালে অবস্থাও আজ আর নাই। ইতিমধ সোভিয়েট রাশিয়া মেনে নিয়েছে যে বিভিন্ন দেশের কম্যুনিস্ট পার্টির অধিকার আছে তাঁদের নিজস্ব নীতিতে দেশকে গ তোলার। কিন্তু ঘটনা যদি বেশী দ গড়ায় এবং ১৯৫৬ সালের হাঙ্গারির ম

আজকের চেকোশ্লোভাকিয়া যদি পররাষ্ট্র-নীতিতে নিরপেক্ষতা ঘোষণা করে তাহলে সোভিয়েট রাশিয়া হাত গুটিয়ে থাকতে পারবে বলে মনে হয় না।

পোল্যাণ্ডের ঘটনা অংশত পার্শ্ববর্তী চেকোশ্লোভাকিয়ার বুদ্ধিজীবীদের এই আলোড়নেরই ফল। কিন্তু দুই দেশের সাম্প্রতিক ঘটনাগুলির মধ্যে প্রধান পার্থক্য এই যে, চেকোশ্লোভাকিয়ায় সংস্কারের প্রধান প্রেরণা আসছে কম্যুনিস্ট পার্টির ভিতরেরই একটি অংশ থেকে আর পোল্যাণ্ডে বুদ্ধিজীবীরা লড়াই করছেন কম্যুনিস্ট পার্টির এমন একটা নেতৃত্বের বিরুদ্ধে যাঁরা নিজেরাই এক সময়ে উদার নীতির পরিপোষক বলে অভিনন্দিত হয়েছিলেন।

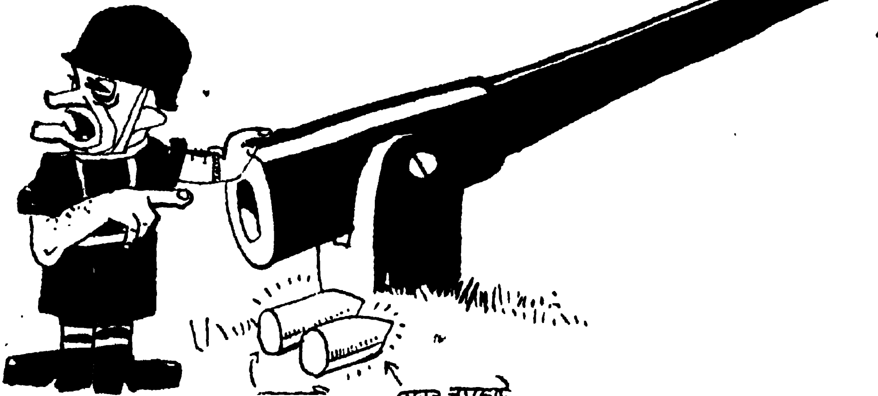
পোল্যাণ্ডের ঘটনার সূত্রপাত হয় একটি পুরনো পোলিশ নাটকের অভিনয় নিয়ে। নাটকটির নাম "জিয়াডি" (Dziady) । নাট্যকার পোল্যাণ্ডের একজন সুপরিচিত কবি, নাম অ্যাডাম মিকিভিৎস্। নাটকটিতে জারের আমলের রাশিয়া সম্পর্কে কতকগুলি কটাক্ষ ছিল। ওয়ারস শহরে এই নাটকের অভিনয়ের সময় যখন এইসব রুশবিরোধী সংলাপ বলা হচ্ছিল তখন শ্রোতারা হর্ষধ্বনি করে তাঁদের অনুমোদন জানান। কর্তৃপক্ষ ভয় পেয়ে নাটকটির অভিনয় বন্ধ করে দিলেন। এতেই ছাত্ররা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। তাঁরা নাটকটি অভিনয় হতে দেওয়ার দাবী জানালেন। তাঁরা মিছিল নিয়ে আসতে গেলে পুলিশের সঙ্গে তাঁদের সংঘর্ষ হল। একদল লেখকও ছাত্রদের সমর্থন করলেন। পোল্যাণ্ডের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জেনারেল মোৎসার বললেন যে, এই আন্দোলনের পিছনে আন্তর্জাতিক ইহুদী সংগঠন রয়েছে। তিনি এই "আদরের দুলাল তরুণ"দের প্রতিরোধ করার জন্য শ্রমিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। "ছাত্ররা লেখাপড়া করুক" এই ধ্বনি তুলে শ্রমিকরা পাল্টা মিছিল করেছেন। এখন ছাত্ররা জেনারেল মোৎসারের অপসারণ দাবী করছেন, তাঁদের আন্দোলন ওয়ারস থেকে ক্র্যাকাউ ও অন্যান্য স্থানে ছড়িয়েছে।

বিহারে নতুন মন্ত্রিসভা

পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট যা পারেন নি, বিহারে সংযুক্ত বিধায়ক দল তা পেরেছেন—অন্তত আপাতত। বিহারে সংযুক্ত বিধায়ক দল দলত্যাগী কংগ্রেসীদের সাহায্য নিয়ে কংগ্রেস-সমর্থিত শোষিত দল মন্ত্রিসভার পতন ঘটিয়েছেন এবং একজন দলত্যাগী কংগ্রেসীর নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন।

শেষ মুহূর্তে কংগ্রেসের এই অন্তর্বিদ্রোহের মীমাংসা করার জন্য দিল্লী থেকে ডাঃ রামসুভগ সিং পাটনায় ছুটে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর চেষ্টা ব্যর্থ হল। ১৮ মার্চ তারিখে বিহার বিধানসভায় যখন শ্রীবিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ মণ্ডলের কংগ্রেস-সমর্থিত মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এল তখন দেখা গেল, কংগ্রেসের ১৫ জন সদস্য যুক্তফ্রন্টের সদস্যদের সঙ্গে একযোগে বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদের মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে ভোট দিলেন। যাঁরা এইভাবে দলের হুইপ অমান্য করলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিনোদানন্দ ঝা, প্রাক্তন স্পীকার শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ সুধাংশু, প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীভোলা পাসোয়ান শাস্ত্রী, প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীহরিনাথ মিশ্র ইত্যাদি। এই পার্শ্ব-পরিবর্তনের ফল হল এই যে, শোষিত দলের মাত্র ৪৭ দিনের মন্ত্রিত্বের অবসান হল। ভোটের ফল ১৬৫—১৪৮। বিদ্রোহী ১৫ জন কংগ্রেস সদস্য কংগ্রেস বিধায়ক দল থেকে বহিষ্কৃত হলেন। তাঁরা লোকতান্ত্রিক কংগ্রেস দল নামে নতুন দল গঠন করলেন। এই দলের শ্রীভোলা পাসোয়ান শাস্ত্রী শ্রীমহামায়া প্রসাদ সিংহের স্থলে সংযুক্ত বিধায়ক দলের নতুন নেতা নির্বাচিত হলেন। রাজ্যপাল শ্রীনিত্যানন্দ কানুনগো শ্রীবিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ মণ্ডলের পদত্যাগ গ্রহণ করলেন এবং শ্রীশাস্ত্রীকে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করতে আহ্বান জানালেন। গত ২২ মার্চ তারিখে শ্রীশাস্ত্রী ও দুজন মন্ত্রী শপথ গ্রহণ করলেন। ঐ দুজন হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণকান্ত সিংহ ও শ্রীরামেশ্বর প্রসাদ সিংহ। তাঁরা দুজনই লোকতান্ত্রিক কংগ্রেস দলের সদস্য।

এইভাবে ৫৭ বছর বয়সের প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী শ্রীভোলা পাসোয়ান শাস্ত্রী সাধারণ নির্বাচনের পর বিহারের চতুর্থ মুখ্যমন্ত্রী হলেন। শপথ গ্রহণের পর তিনি সাংবাদিকদের বললেন, জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। কোন মানুষ যাতে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়-



বিচার থেকে বঞ্চিত না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে তিনি যত্নবান হবেন।

শাস্ত্রীজীর এই নতুন মন্ত্রিসভার গঠন সম্পূর্ণ হতে না হতেই অবশ্য সংযুক্ত বিধায়ক দলের ভিতরে কিছু কিছু মতভেদের কথা শোনা যাচ্ছে। এস এস পি, পি এস পি, দক্ষিণপন্থী কম্যুনিস্ট পার্টি ও ভারতীয় ক্রান্তি দল এই মন্ত্রিসভায় যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত এখনও নেন নি; তাঁরা নিজ নিজ দলের সর্বভারতীয় স্তরের সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করছেন। শ্রীমহামায়া প্রসাদ সিংহকে যুক্তফ্রন্টের নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে যেভাবে একজন কংগ্রেস-দলত্যাগীকে স্থান করে দেওয়া হয়েছে তাতে ভারতীয় ক্রান্তি দলের একাংশ খুশী নন বলে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীমহামায়া প্রসাদ সিংহকে সংযুক্ত বিধায়ক দলের সমন্বয় কমিটির সভাপতিত্ব দিতে চাওয়া হয়েছে; কিন্তু সেই প্রস্তাব গ্রহণ করতে তিনি এখনও সম্মতি জানান নি। এদিকে শাস্ত্রীজীর মন্ত্রিসভায় যোগদানের ব্যাপার নিয়ে রামগড়ের রাজা কামাখ্যা নারায়ণ সিংহের সঙ্গে শ্রীমহামায়া প্রসাদ সিংহের মতভেদের লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে। শ্রীমহামায়া প্রসাদ সিংহ নাকি শাস্ত্রীর মন্ত্রিসভায় যোগ দেওয়ার ব্যাপারে দলের সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করতে চান আর রামগড়ের রাজা চান অবিলম্বে মন্ত্রিসভায় যোগ দিতে। ফলে এমন সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে যে, রাজা কামাখ্যা নারায়ণ সিংহ তাঁর অনুগামীদের নিয়ে ভারতীয় ক্রান্তি দল থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন। সংবাদপত্রে এইসব সংবাদ যখন প্রকাশিত হয় তখন শ্রীমহামায়া প্রসাদ সিংহ কলকাতায় ছিলেন। সেখানে তিনি বলেছেন যে, টেলিফোনে রামগড়ের রাজা তাঁকে জানিয়েছেন, এসব সংবাদ সত্য নয়। এই অবস্থায় শাস্ত্রীর মন্ত্রিসভা টিকবে কিনা, আগামী ৩১ মার্চের মধ্যে তাঁদের পক্ষে বিধানসভার সম্মুখীন হয়ে বাজেট পাশ করিয়ে নিয়ে আসা সম্ভব হবে কিনা তার উপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। লক্ষণীয় যে, শ্রীমহামায়া প্রসাদ সিংহ ইতিমধ্যেই বলেছেন যে, বিহারেও অন্তর্বর্তী নির্বাচনের সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায় না। অন্তর্বর্তী নির্বাচনই দলত্যাগ বন্ধ করার পথ।

বৈষয়িক প্রসঙ্গ

স্বর্ণ সংকটের সমাধান

মার্কিন ডলার বদলে সোনা কেনার যে হিড়িক সম্প্রতি লণ্ডনের সোনার বাজারে পড়েছিল, তা আপাতত কমেছে।

এই হিড়িক মার্কিন ডলারকে গুরুতর রকমে বিপন্ন করে তুলেছিল। এমন একটা সময় এসেছিল যখন মনে হয়েছিল ডলারের অবমূল্যায়ন বুঝি রোধ করা যাবে না।

যদি এই অবমূল্যায়ন হত তাহলে তার প্রতিকূল প্রভাব পড়ত গোটা পৃথিবীর অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ওপর। কারণ পৃথিবীর ব্যবসা-বাণিজ্য প্রধানত ডলার এবং বৃটিশ পাউণ্ডের মাধ্যমেই হয়ে থাকে।

সোনা কেনার হিড়িক যখন চরমে ওঠে তখন লণ্ডন স্বর্ণ ক্লাবের সাতটি সদস্য-রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলির প্রতিনিধিরা ওয়াশিংটনে জরুরী বৈঠকে মিলিত হন। এই দেশগুলি হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সুইজারল্যাণ্ড, নেদারল্যাণ্ড, ইটালী, জার্মানী ও বেলজিয়াম। ডলার ও পাউণ্ড যাতে কখনও প্রয়োজনীয় সোনার সমর্থনের অভাবে বিপন্ন হয়ে না পড়ে তা দেখাই এই স্বর্ণ ক্লাবের উদ্দেশ্য।

১৬ ও ১৭ মার্চ এই দুদিন ক্লাব সদস্যদের বৈঠক হয়। বৈঠকের শেষে প্রচারিত এক বিজ্ঞপ্তিতে মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান মিঃ উইলিয়াম ম্যাকচের্সনি মার্টিন সংকট ত্রাণের জন্যে কয়েকটি সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন।

সিদ্ধান্তগুলি এই :

(১) এখন থেকে সোনার জন্যে দুরকম বাজার চালু করা হবে। একটি সরকারী, অন্যটি বে-সরকারী। সরকারী বাজারে সোনা আগের মতই প্রতি আউন্স ৩৫ ডলার হিসেবে কেনাবেচা হবে, অর্থাৎ ঐ দামের হিসেবেই আন্তর্জাতিক সরকারী লেন-দেনের ফয়সালা হবে। বে-সরকারী বাজারের দাম নির্ধারিত হবে চাহিদা ও যোগানের ভিত্তিতে। এই বাজার ফাটকাবাজদের স্বর্ণ-লালসা পরিতৃপ্ত করবে।

(২) যদি কোন সদস্য-রাষ্ট্র নিজের সরকারী সোনা বেশী দাম পাবার লোভে বে-সরকারী বাজারে বিক্রি করে, তাহলে ক্লাবের অন্যান্য সদস্য-রাষ্ট্র তার স্বর্ণ-ভাণ্ডার ঠিক রাখার জন্যে তাকে আর সোনা বিক্রি করবে না। এর ফলে আশা করা যাচ্ছে, সদস্য-রাষ্ট্রগুলি সোনার দায়িত্বহীন কারবার থেকে বিরত হবে আর তার ফলে মার্কিন স্বর্ণ-ভাণ্ডারের ওপর চাপ কমায় ডলারের ওপরেও চাপ কমবে।

(৩) স্বর্ণ ক্লাবের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি লণ্ডন বা অন্য কোন দেশের সোনার বাজারে সোনা সরবরাহ করবে না।

আশা করা যাচ্ছে, এই সব ব্যবস্থার ফলে ফাটকাবাজীর দ্বারা আর্থিক কাঠামো বিপন্ন হবার সম্ভাবনা কমবে।

সেই সঙ্গে বিবৃতিতে এই কথাও জানানো হয়েছে যে, ক্লাবের হাতে এখন যে পরিমাণ সোনা মজুত আছে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাবার পক্ষে তা যথেষ্ট।

এই ব্যবস্থাগুলি মার্কিন কর্তৃপক্ষকে তাদের আশু বিপদ থেকে উদ্ধার করবে সন্দেহ নেই। কিন্তু হাঁফ ছাড়ার যে সময় তাঁরা পেলেন তা নিতান্তই সাময়িক। কারণ বে-সরকারী সোনার দর যদি খুব চড়া থাকে, তাহলে সরকারী দর অন্যান্য দেশ, বিশেষ করে ছোটখাটো দেশগুলি কতদিন নিয়ন্ত্রিত রাখতে পারবে তা সন্দেহের বিষয়।

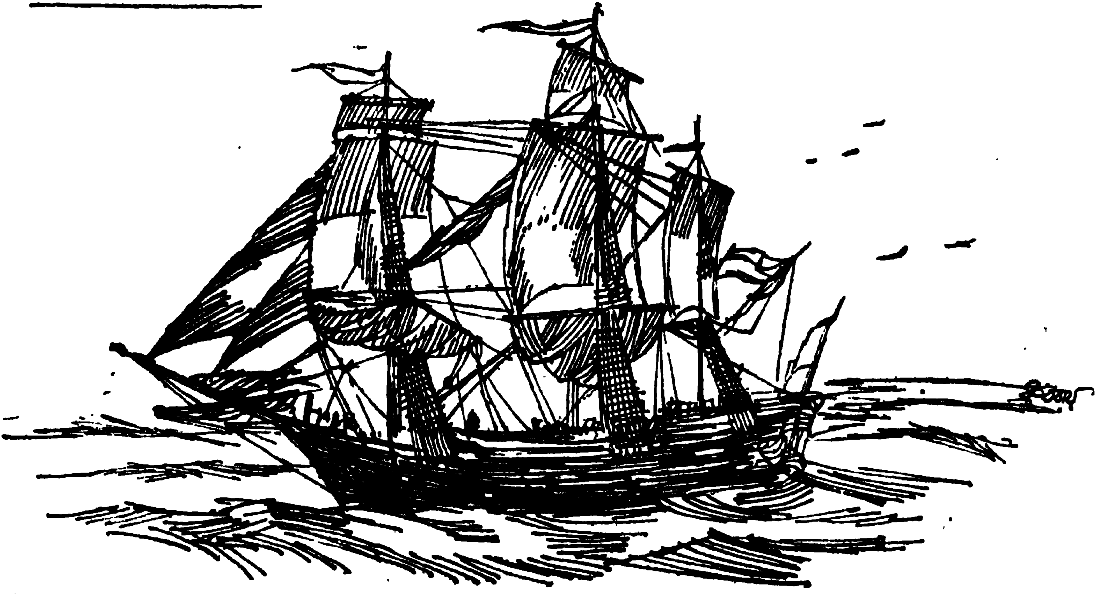
দ্বিতীয়ত, সরকারী সোনার মজুত এখন হয়ত পর্যাপ্ত আছে কিন্তু বৈদেশিক দায়-দায়িত্ব যত বাড়বে, এই মজুতের পরিমাণ ততই কমবে। স্বর্ণ ক্লাবের সদস্যরা এখন বলতে পারেন যে, বাজার থেকে সোনা কেনার দরকার তাঁদের নেই। কিন্তু তখনও কেনার দরকার হবে না একথা তাঁরা বলতে পারেন না। তখন তাঁরা সোনা পাবেন কোথায়? বে-সরকারী বাজার চালু থাকায় স্বর্ণ উৎপাদক দেশগুলি বে-সরকারী বাজারে চড়া দামে সোনা বিক্রি করতে বেশী আগ্রহী হবে।

কাজেই মার্কিন অর্থনীতির যে অব্যবস্থা থেকে বর্তমান সংকটের উৎপত্তি তা যদি দ্রুত দূর করা না যায়, তাহলে সংকট অদূর ভবিষ্যতে আবার দেখা দিতে বাধ্য। স্বর্ণ ক্লাবের সিদ্ধান্ত মার্কিন কর্তৃপক্ষকে হাঁফ ছাড়ার একটা সুযোগ দিয়েছে। এই সুযোগে নিজেদের ঘর গোছাবার জন্যে তাঁদের নজর দিতেই হবে।

এর জন্যে ব্যাপক তৎপরতা দরকার। প্রেসিডেন্ট জনসন অবশ্য কোমর বাঁধবার জন্যে উঠে-পড়ে লাগার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি দশ শতাংশ কর বাড়িয়ে মুদ্রাস্ফীতি রোধের প্রস্তাব করেছেন। বাজেট থেকে তিন-চারশ কোটি ডলার ছেঁটে ফেলাতেও রাজী হয়েছেন। ব্যাংকের সুদের হার বাড়ানো হয়েছে। বৈদেশিক সাহায্য ও বিনিয়োগও সংকুচিত করা হচ্ছে।

কিন্তু সমস্যার গভীরতার তুলনায় এই ব্যবস্থাগুলি কিছুই নয়। আইন অনুযায়ী আমেরিকাকে সাড়ে ১০ বিলিয়ন ডলার মূল্যের সোনা মজুত রাখতেই হবে। নইলে গোটা আর্থিক কাঠামোই ভেঙে পড়বে। অথচ ভাণ্ডারে এখন রয়েছে মাত্র কিছু বেশী ১১ বিলিয়ন ডলার মূল্যের সোনা। সে তুলনায় বিদেশের কাছে আমেরিকার দায়ের পরিমাণ এই মুহূর্তে ৩০ বিলিয়ন ডলার। ভাণ্ডারে সোনা কম অথচ বৈদেশিক দায় বেড়ে চলেছে, এই থেকেই সোনা কেনার হিড়িক সৃষ্টি হয়েছিল। কারণ আমেরিকার পাওনাদারদের এই সন্দেহ ছিল যে, তাদের পাওনা মেটাবার ক্ষমতা আমেরিকা দ্রুত হারিয়ে ফেলছে।

আমেরিকার আর্থিক দায় এত বিপজ্জনকভাবে বাড়বার প্রধান কারণই হল ভিয়েৎনামের যুদ্ধ পরিচালনার জন্যে প্রতিরক্ষা ব্যয়ের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি। সুতরাং এই প্রতিরক্ষা ব্যয় না কমানো পর্যন্ত মার্কিন আর্থিক ব্যবস্থায় কিছুতেই স্থিতিশীলতা আসবে না।



অজিত চট্টোপাধ্যায়

জল থেকে ডাঙায়



জলদস্যু হিসেবে জীবন শুরু করে পরবর্তীকালে রাজপুরুষের উচ্চপদ লাভ করেছেন, এ রকম লোক নিশ্চয়ই খুব কম। স্যার হেনরী মেইনওয়ারিং সেই বিরল সৌভাগ্যবানদের একজন। কারো কারো মতে এলিজাবেথের আমলে জন্মগ্রহণ করলে মেইনওয়ারিং নিজের জীবনে ড্রেক এবং র‍্যালের মত নৌযুদ্ধে অসীম পারদর্শিতা ও বুদ্ধিমত্তা দেখাতে পারতেন, কিন্তু তার দুর্ভাগ্য। মেইনওয়ারিং যখন যুবক হয়ে ভাগ্য অন্বেষণ করতে মনস্থ করলেন, ইংলণ্ডের সিংহাসনে তখন প্রথম জেমস আরোহণ করেছেন।

প্রথম জেমস শান্তিতে কাল কাটাতে চেয়েছিলেন। স্পেনের সঙ্গে যে দীর্ঘ বৈরীতা চলছিল তা বন্ধুত্বে পর্যবসিত হয়েছে। দেশে শান্তি নেমে এল তাঁর আমলে। যুদ্ধজাহাজগুলি দূর সমুদ্র ছেড়ে ফিরে এল বন্দরে, উপকূলে। যোদ্ধা নাবিকের দলকে সামরিক শৃংখল থেকে মুক্তি দেওয়া হল। ফলে দেশে বেকারের সংখ্যা বাড়ল। অসংখ্য নাবিকের দলের ছোট্ট একটি অংশ ছাড়া সদাগরী জাহাজে বাকীদের কর্মসংস্থান হল না।

ফলে পুনরায় নাবিকের দল জলদস্যু-বৃত্তি গ্রহণ করতে প্রলুব্ধ হল। এ সম্বন্ধে ক্যাপ্টেন জন স্মিথ তার Travels and Adventures গ্রন্থে লিখছেন,

......"After the death of our most gracious Queen Elizabeth, ...King James who from his infancy had reigned in peace with all nations, had no employment for those men of war so that those that were rich rested with what they had; those that were poor and had nothing but from hand to mouth turned pirates; some because they became sighted of those for whom they had got much wealth, some, for that they could not get their due; some, that had lived bravely, would not abuse themselves to poverty; some vainly only to get a name; others for revenge, covetousness or as ill".

যাই হোক, স্যার হেনরী মেইনওয়ারিং-এর জীবনটা ভারী অদ্ভুত এবং রোমাঞ্চকর। তিনি জন্মেছিলেন শ্রপশায়ারের এক বনেদী পরিবারে। পড়াশুনো করলেন অক্সফোর্ডের ব্রেসনোজ কলেজে। দ্বাদশ বৎসরে ম্যাট্রি-কুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন হেনরী। এবং পনের ষোল বৎসর বয়সে গ্র্যাজুয়েট হলেন। সময়টা ১৬০২ খৃষ্টাব্দ। সেই বৎসরই বি-এ পাশ করেছেন হেনরী মেইনওয়ারিং।

স্নাতক হবার পর নানারকম জীবিকা গ্রহণ করবার চেষ্টা করলেন হেনরী। তবে কেরাণীগিরি তাকে আকর্ষণ করেনি। তিনি প্রথমে হলেন উকীল। ওকালতী

করবেন ভাবলেন। কিন্তু খুব শীঘ্র তার মোহভঙ্গ হল। উকীল হবার বাসনা তিনি ত্যাগ করলেন। ওকালতী ছেড়ে হেনরী হলেন সৈন্য।...তারপর নাবিকের কাজ গ্রহণ করলেন। দূর ছাই বলে সে কাজও একদিন দিলেন ছেড়ে ছুড়ে। হেনরী মেইন-ওয়ারিং এবার মনোমত কাজ খুঁজে পেয়েছেন। জলদস্যু হবেন তিনি। সেই হবে তার পেশা বা বৃত্তি।

একশত ষাট টনের একটি ছোট্ট জাহাজ কিনে ফেললেন হেনরী। এর নাম The Resistance,' ভারী সুন্দর জাহাজটি। দ্রুতগামী এবং অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে ভালো করে সাজানো। একদল দক্ষ নাবিককে নিয়ে জাহাজে উঠলেন হেনরী। মনের বাসনা তখনও তিনি প্রকাশ করেন নি কারো কাছে। সবাই জানল হেনরী চলেছেন ভাগ্য-অন্বেষণে, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের পথে। জিব্রাল্টারের কাছাকাছি এসে হেনরী তার মনোবাসনা প্রকাশ করলেন সকলের কাছে। স্পেনের জাহাজগুলিকে জলপথে তিনি আক্রমণ করতে চান, এই হবে তার প্রচেষ্টা বা আভিযান।

মেইনওয়ারিং স্থির করলেন যে, বারবারি উপকূলে মারমোরা হবে তার ঘাটি। একটা ঘাঁটি না থাকলে দূর সমুদ্রে শুধু জাহাজ নিয়ে ভেসে বেড়ালেই চলে না। জলদস্যুদের জন্য বারবারি উপকূলে নিশ্চিন্ত আশ্রয়। মারমোরায় এসে উঠলেন হেনরী। এবং জায়গাটা তার ভাগ্যের প্রতি অনুকূল হলো। এখান থেকে বেরিয়ে পর পর অনেকগুলি স্পেনীয় জাহাজ শিকার করলেন তিনি। একটি মাত্র জাহাজ নিয়ে বেরিয়েছিলেন। এখন তাঁর পতাকা-তলে অনেকগুলি পোত। জলদস্যু হেনরী মেইনওয়ারিং-এর অনুগামী হিসাবে তারা নীল সাগরের বুক চিরে ছুটে যাবে অন্তহীন সমুদ্রের অন্য একদিকে। হেনরী কিন্তু কোনো ইংরেজদের জাহাজের উপর আক্রমণ চালান নি। এবং তার এভাবে ব্যাবস্থা ছিল যে, মারমোরার অন্য কোন জলদস্যু ইংলন্ডের পোতের উপর আক্রমণ চালাতে সাহসী হয় নি।

অল্প দিনের মধ্যে হেনরী মেইন-ওয়ারিং-এর নাম জানল লোকে। মস্ত বড় জলদস্যু হেনরী। অনেক তার অর্থসম্পদ। সঙ্গে তার বেশ কিছু রত্নসম্ভার। উত্তর আয়ারল্যান্ডের লোকেদের কাছে তিনি রীতিমত একজন রূপকথার ছবি হয়ে রইলেন।

স্পেনের রাজা চেষ্টা করলেন এই জলদস্যুকে বিনাশ করতে। না করে উপায় নেই। হেনরীর হাতে স্পেনের জাহাজগুলো বড় বেশী শিকার হচ্ছিল। স্পেনের রাজা প্রথমে রক্তচক্ষু দেখালেন। তারপর সামনে রাখলেন লোভের বস্তুটি। মোটা টাকা তিনি দেবেন হেনরীকে। এবং সৈন্যদলে একটি উচ্চপদ। কিন্তু হেনরী মেইনওয়ারিং স্পেনের রাজার উপঢৌকনকে তুচ্ছ মনে করে নিজের দস্যুবৃত্তিতে মন দিলেন। টিউ-নিসের ডে তাকে প্রলুব্ধ করতে চেষ্টা করেছিলেন। ইচ্ছে করলে তার সমান অংশী-দার হতে পারেন মেইনওয়ারিং। অবশ্য খৃস্টধর্ম তাকে পরিত্যাগ করতে হবে।

তখন রংরুট, জলদস্যু নেবার উপযুক্ত স্থান ছিল নিউফাউন্ডল্যান্ড। একদিন মেইন-ওয়ারিং মনস্থ করলেন নিউফাউন্ডল্যান্ড যেতে। দলে অনেক লোক চাই তার। ১৬১৪ খৃস্টাব্দের ৪ঠা জুন তিনি এসে পৌঁছলেন নিউফাউন্ডল্যান্ডে। তার সঙ্গে আটটি জাহাজ। এখানে এসে রসদপত্র সংগ্রহ করলেন হেনরী। মদ, মাছ এবং গোলাবারুদ সর্বকিছু তার জাহাজের ভাঁড়ারে উঠতে লাগল। অনেক নতুন লোক দলে নিলেন মেইনওয়ারিং। প্রায় সাড়ে তিন মাস নিউ-ফাউন্ডল্যান্ডে কাটিয়ে মেইনওয়ারিং ফিরে চললেন। অতলান্তিকের উপর দিয়ে তার জাহাজগুলি এগিয়ে চলল বারবারির মার-মোরা নামক স্থানে। কিন্তু মেইনওয়ারিং এসে দেখলেন যে, তার পুরাতন আস্তানা বেদখল হয়ে গেছে। স্পেনের লোকজন সেখানে গ্যাঁট হয়ে বসেছে। তাদের উৎখাত করা কিছুটা অসম্ভব।

অগত্যা অন্য কোনোখানে। হেনরী মেইনওয়ারিং এলেন স্যাভয়ের একটি জায়গায়। জায়গাটার নাম ভিলিফ্রেঞ্চ। আর একজন ইংরেজ জলদস্যু এখানে তার সঙ্গে হাত মেলাল। তার নাম ওয়ালসিন্ডাম।

দুজনে মিলে সমুদ্রটা যেন তোলপাড় করে ফেললেন। ছ সপ্তাহের মধ্যে অনেক-গুলি স্পেনের জাহাজ তাদের শিকার হল। এবং পাঁচ লক্ষ স্পেনীয় মুদ্রা জলদস্যুদের হাতে এল। হেনরী মেইনওয়ারিং উত্তেজনায় এবং আনন্দে খাপখোলা তরবারির মত একবার বেরিয়ে আসেন সকলের কাছে, আবার ছুটে যান অন্যত্র মুহূর্তের মধ্যে। ব্যাপারটা এমন দাঁড়াল যে, বন্দর ছেড়ে স্পেনের জাহাজগুলি আর বেরোতেই সাহস পেল না।

স্পেনের সম্রাট উত্তেজিত হয়ে পাঁচটি রণতরী পাঠালেন হেনরী মেইনওয়ারিংকে ধ্বংস করতে। নিজের দেশবাসীকে তিনি ঢালাও অনুমতি দিয়ে বললেন, সমুদ্রপথে তারা ইংরেজদের জাহাজ বিনষ্ট করুক বেসরকারী প্রচেষ্টায়।

ক্যাডিজ বন্দর ত্যাগ করে স্পেনের সম্রাটের তিনটি রণতরী হেনরী মেইন-ওয়ারিংএর সাক্ষাৎ পেল। ভীষণ জলযুদ্ধ শুরু হল উভয়ের মধ্যে। দিন শেষ হয়ে অন্ধকার রাত নামলে স্প্যানিয়ার্ডরা পালিয়ে প্রাণ বাঁচাল, লিসবন বন্দরে এসে উঠল জাহাজগুলি। সেখান থেকেই স্বদেশের পথে যাত্রা করবে।

আবার সন্ধির প্রস্তাব পাঠালেন স্পেনের সম্রাট হেনরী মেইনওয়ারিং-এর কাছে ক্ষমা তো পাবেনই হেনরী। এছাড়া ফি বছর বিশ হাজার ডুকাট (স্পেনীয় মুদ্রা)। ইচ্ছে করলে স্পেনের একটি নৌবহর তিনিই পরিচালনা করবেন। কিন্তু জলদস্যু হেনরী সম্রাটের এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বসলেন। ভাবটা এই যে, আগে কহো আর।

তখন স্পেনের এবং ফ্রান্সের রাজদূত দেখা করলেন প্রথম জেমসের সঙ্গে। মেইনওয়ারিং জলপথে রীতিমত ত্রাসের সঞ্চার করেছে। অতিষ্ঠ করে তুলেছে ব্যবসা বাণিজ্যের পথকে। তারা বললেন যে প্রথম জেমস যদি উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন তাহলে সমুদ্রের জল বিপর্যয়ের সৃষ্টি করবে।

জেমসের কাছে শান্তির চেয়ে আর কিছু বেশী কাম্য ছিল না। মেইনওয়ারিংএর কাছে লোক গেল জেমসের। জলদস্যুবৃত্তি ছেড়ে দিলে রাজা তাকে ক্ষমা করবেন। অন্যথায় ইংরেজ নৌবহর আসবে ছুটে, জলদস্যু হেনরীকে অতলান্তিকের বুকে শেষ শয্যায় শুইয়ে দিতে।

হেনরী মেইনওয়ারিং এবার নরম হলেন। জল থেকে ডাঙাতেই ফিরে যেতে চাইলেন তিনি। ১৬১৬ খৃষ্টাব্দের ৯ই জুন প্রথম জেমস সই করলেন আদেশপত্রে। হাস্যকর একটি কথা লেখা হল তাতে। মেইনওয়ারিং খুব একটা অন্যায় কিছু করেননি। অতএব রাজা তাকে ক্ষমা করছেন। হেনরীর সাঙ্গো-পাঙ্গরাও ক্ষমা লাভ করল। দলবল নিয়ে হেনরী ডাঙায় উঠলেন।

কিন্তু হেনরী মেইনওয়ারিং সাত্তাকার বিশ্বস্ততা দেখালেন। তখনই সমুদ্রপথে বেরিয়ে পড়লেন তিনি। জলদস্যুর দলকে ইংলিশ চ্যানেল থেকে বিতাড়িত করতে কিংবা তাদের ধরে আনতে। হেনরী সফল হলেন তার প্রচেষ্টায়। ইংলিশ চ্যানেলে অনেকগুলি জলদস্যু জাহাজ তার হাতে ধরা পড়ল, বহু জলদস্যু এবং ইংরেজ বন্দীকে নিয়ে এলেন মেইনওয়ারিং। বন্দী ইংরেজদের তখনই মুক্ত করে দেওয়া হল।

প্রথম জেমস শুনলেন ব্যাপারটা। হেনরী যে এমন উদ্যম দেখাবেন তা যেন বিশ্বাস করতে পারেন নি তিনি। জলদস্যুকে সভাসদ করলেন প্রথম জেমস। এবং নাবিকের পরামর্শ প্রয়োজন হলেই তিনি মেইনওয়ারিংএর শরণাপন্ন হতেন।

কিন্তু সভাসদের ক্লান্তিকর জীবন ভালো লাগছিল না হেনরীর। মাঝে মাঝে নীল সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ বুকের মধ্যে অদ্ভুত আলোড়ন সৃষ্টি করে। প্রথম জেমস হয়ত কিছুটা আন্দাজ করেছিলেন। হেনরীকে তিনি নতুন পদ দিলেন। •

'Lieutenant of Dover Castle and Deputy Warden of the Cinque forts'.

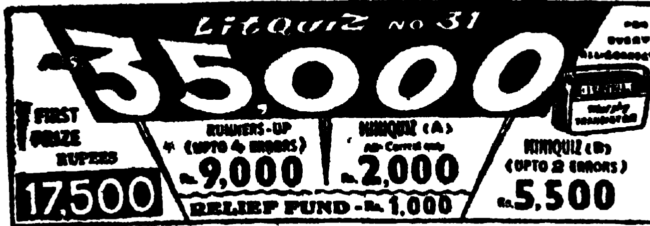
চার বৎসর পর অর্থাৎ ১৬২৩ খৃষ্টাব্দে ডোভার থেকেই পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হলেন হেনরী মেইনওয়ারিং।

কেল্লা ও বন্দরের উন্নতিসাধনে সচেষ্ট হয়েছিলেন তিনি। গোলাবারুদ এবং অস্ত্র-শস্ত্র সুসজ্জিত করলেন সমুদ্রতীরের কেল্লা। তিনি আবিষ্কার করলেন যে বারুদের পরিবর্তে ছাই এবং বালি, এক অসৎ এবং অপদার্থ আমলা জমা করে রেখে আছে। হেনরী মেইনওয়ারিং সব কিছু খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে নিশ্চিন্ত হতেন।

কিন্তু শুধু কাজ নয়। কাজের ফাঁকে ফাঁকে এবং অবসর মুহূর্তগুলিতে হেনরী একটি বই লিখতেন। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে বইটির পাণ্ডুলিপি রয়েছে। আটচল্লিশ পৃষ্ঠায় সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা এই বইটিতে

শ্রী অরিন্দ কে মজুমদার, মনরবাড়ী, আলোল (গুজরাট) লিটকুইজ নং ২৯-তে ২৬,০০০ টাকা জিতেছেন। লিটকুইজ ১৪টি ভাষায় প্রকাশিত হয়, এর ১০০ জনেরও অধিক এজেন্ট আছে এবং বিভিন্ন ভাষায় ১০০টিরও বেশী সংবাদপত্রে এর বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।

মার্কি ট্রানজিস্টর এবং ৩টি পুরস্কার !



বক্সের শেষ তারিখ ডাকে প্রেরিত
সকল প্রবেশপত্র : ৩-৪-৬৮

আনন্দবাজারে সমাধান : ৯-৪-৬৮

আপনি আপনার প্রবেশপত্র পাঠাইতে পারেন বুধবার ২-৪-৬৮ তারিখে কিন্তু উহা এক্সপ্রেস ডেলিভারীতে পাঠান।

সমাধান ফেরৎ পাইবার জন্য আপনার প্রবেশপত্রসহ নিজ ঠিকানা লিখিত ৬ পয়সার পোস্টকার্ড পাঠান।

১' টাকা পাঠান এবং লিটকুইজ ট্রীকলির ৫টি সংখ্যা লাভ করুন।

স্থানীয় এজেন্ট

নিম্নবর্ণিত এজেন্টের নিকট থেকে এনট্রি ফরম ও ক্যাশ রসিদ পাবেন :

পি, সি, অ্যান্ড কোং, ফ্ল্যাট নং ৬, ব্লক 'ই', ১৫, বেচুলাল রোড, কলিকাতা—১৪

৩১, লিট্‌কুইজের সরকারী ভর্তি ফর্ম

ADDRESS :—LITQUIZ NO. 31, ALANKAR, BALARAM ST., BOMBAY-7

দ্রষ্টব্য :—(১) প্রত্যেক কলমে, আপনার বাতিল করা শব্দটি কালি দিয়ে কেটে দিন; (২) আপনি যদি সবকয়টি কুপন না পাঠান, তাহলে বাকী কুপনগুলি বাতিল করে দিন; (৩) আপনি যদি মানি অর্ডারযোগে প্রবেশমূল্য পাঠান, তাহলে এই এনট্রি ফর্মের সঙ্গে, ডাকঘর থেকে পাওয়া মানি অর্ডার রসিদটি অবশ্যই পাঠাবেন। মানি অর্ডার রসিদ ছাড়া এনট্রি বাতিল করা হবে; (৪) আই-পি-ও ক্রস করবেন না। লিট্‌কুইজ নং ৩১ - বোম্বাই - ৭-এর অনুকূলে টাকা পাঠান।

1		Re. 1	2		Re. 1	3		Re. 1	4		Re. 1
1	BEAUTY	REALITY	1	BEAUTY	REALITY	1	BEAUTY	REALITY	1	BEAUTY	REALITY
2	CHARITY	SINCERITY	2	CHARITY	SINCERITY	2	CHARITY	SINCERITY	2	CHARITY	SINCERITY
3	CLASSICS	HISTRIONICS	3	CLASSICS	HISTRIONICS	3	CLASSICS	HISTRIONICS	3	CLASSICS	HISTRIONICS
4	CULTURAL	SPIRITUAL	4	CULTURAL	SPIRITUAL	4	CULTURAL	SPIRITUAL	4	CULTURAL	SPIRITUAL
5	DEFECTS	DOUBTS	5	DEFECTS	DOUBTS	5	DEFECTS	DOUBTS	5	DEFECTS	DOUBTS
6	DYNAMIC	TRAGIC	6	DYNAMIC	TRAGIC	6	DYNAMIC	TRAGIC	6	DYNAMIC	TRAGIC
7	EMOTIONAL	PHILOSOPHICAL	7	EMOTIONAL	PHILOSOPHICAL	7	EMOTIONAL	PHILOSOPHICAL	7	EMOTIONAL	PHILOSOPHICAL
8	FORGETFUL	FRETFUL	8	FORGETFUL	FRETFUL	8	FORGETFUL	FRETFUL	8	FORGETFUL	FRETFUL
9	HUMAN	MORAL	9	HUMAN	MORAL	9	HUMAN	MORAL	9	HUMAN	MORAL
10	JOY	UNITY	10	JOY	UNITY	10	JOY	UNITY	10	JOY	UNITY
11	KNOWING	LOVING	11	KNOWING	LOVING	11	KNOWING	LOVING	11	KNOWING	LOVING
12	MEANINGFUL	PURPOSEFUL	12	MEANINGFUL	PURPOSEFUL	12	MEANINGFUL	PURPOSEFUL	12	MEANINGFUL	PURPOSEFUL
13	MORALITY	RESPONSIBILITY	13	MORALITY	RESPONSIBILITY	13	MORALITY	RESPONSIBILITY	13	MORALITY	RESPONSIBILITY
14	NATION	RELIGION	14	NATION	RELIGION	14	NATION	RELIGION	14	NATION	RELIGION
15	RARE	RATIONAL	15	RARE	RATIONAL	15	RARE	RATIONAL	15	RARE	RATIONAL
16	REASON	RELIGION	16	REASON	RELIGION	16	REASON	RELIGION	16	REASON	RELIGION
17	SANITY	SUPERIORITY	17	SANITY	SUPERIORITY	17	SANITY	SUPERIORITY	17	SANITY	SUPERIORITY
18	SILENT	SIMPLE	18	SILENT	SIMPLE	18	SILENT	SIMPLE	18	SILENT	SIMPLE

SEND FIRST TWO COUPONS & ENTER MINIQUIZ (A) FREE — No. 31 — SEND FOUR COUPONS & ENTER BOTH MINIQUIZ (A+B) FREE

MiniQuiz (A) — 6 CLUES FREE COUPON

BEAUTY	REALITY
CHARITY	SINCERITY
CLASSICS	HISTRIONICS
CULTURAL	SPIRITUAL
DEFECTS	DOUBTS
DYNAMIC	TRAGIC

MiniQuiz (B) — 12 CLUES FREE COUPON

EMOTIONAL	PHILOSOPHICAL	MORALITY	RESPONSIBILITY
FORGETFUL	FRETFUL	NATION	RELIGION
HUMAN	MORAL	RARE	RATIONAL
JOY	UNITY	REASON	RELIGION
KNOWING	LOVING	SANITY	SUPERIORITY
MEANINGFUL	PURPOSEFUL	SILENT	SIMPLE

৩১ (অমৃত)

এই কুইজে যোগদান করবার জন্য আমি নিয়ম ও সর্তাবলী পালন করতে রাজী এবং প্রতিযোগিতা সম্পাদকের বিচার চূড়ান্তভাবে ও আইনতঃ বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ করলাম। প্রত্যেক কুপনের জন্য প্রবেশ মূল্য : ১, টাকা, সম্পূর্ণ ফরমটির (৪টি কুপন) প্রবেশ মূল্য ৪, টাকা। আমি এম-ও রসিদ/আই-পি-ও/লিট্‌কুইজ ক্যাশ রসিদ/প্রাইজ কার্ড ও তার নম্বর .... পাঠাইলাম।

CAPITAL LETTERS

NAME ______________________________

ADDRESS ______________________________

____

এখানে কাটুন ও এই পুরো ফর্মটি পাঠান

উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য

লিটকুইজ প্রতিযোগিতা নিঃসন্দেহে একটি সাহিত্যিক ও কুশলী প্রতিযোগিতা লিটকুইজের উত্তর পূর্বনির্দিষ্ট। আমাদের সংকলন সেগুলো ঠিক করেননি। তিনি এগুলো বদলাতেও পারেন না। এগুলো ঠিক করার জন্য কোন অ্যাডজুডিকেশন কমিটিও নেই। উদ্ধৃতিতে রচয়িতা যে শব্দটি ব্যবহার করেছেন সেটিই প্রত্যেকটি সমাধানের সঠিক উত্তর। কাজেই লিটকুইজে সাফল্য দৈব বা ভাগ্যলিপির উপর নির্ভর করে না। দক্ষতা, জ্ঞান, সৎচেষ্টা ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগান, নিশ্চয় সফল হবেন।

LITQUIZ PVT. LTD.
NO. 31 : 18 CLUES

(1) **A poem** signifies beyond a **definite set of thoughts and images, a flash of Beauty|Reality** to which poetic intuition points.

(2) **In our** knowledge of others **there should be sympathy**: our **Charity|Sincerity** should have **the root of affection.**

(3) **There is a timeless and spaceless quality** about great **Classics|Histrionics.**

(4) **India's Cultural|Spiritual heritage and glory far transcend the vastness of its area and the immensity** of its population.

(5) **A knowledge of the Defects|Doubts** of great men acts as an **incentive to virtue**, by **showing us how they tried to overcome them.**

(6) **There** is something **Dynamic|Tragic** about the lives of the **truly great.**

(7) **Sentimental** and **Emotional Philosophical** by nature, we **have basked** for long in the **reflected glory** of our predecessors.

(8) Public opinion always-and more so in India than in other more sophisticated places — is easily **grateful as well as forgetful|Fretful.**

(9) The only way to prevent wars **is to abjure violence, restrain greed** and **respect the supremacy of Human|Moral** values.

(10) **Joy|Unity is the fulfilment** of one's nature as a human being.

(11) **It is the** soul and not the **body which is worth Knowing|Loving**, and he must be a **poor admirer** who loves the **graces of the body**, and not the beauty of the soul.

(12) Indian philosophy has all along been live, virile and **Meaningful|Purposeful.**

(13) It is one of the tragedies of our Indian system that low public standards are often blended curiously enough **with a high sense of private Morality|Responsibility.**

(14) **An** outstanding fact of **human history** is that no one **Nation|Religion** has ever been **able to extend its sway over the whole**, or even a majority, of the human race

(15) **Men with the gift of** full **spiritual** and intellectual vision **are Rare|Rational.**

(16) **Science** and **Reason|Religion are great** things in life.

(17) **Science, if it proves** anything, **proves the Sanity|Superiority of the human mind, its capacity to rise above** material **temptations.**

(18 **Great love can afford to be Silent|Simple.**

দ্রষ্টব্য :—উপরের ধাঁধাগুলি বিভিন্ন ভারতীয় লেখকদের লেখা থেকে নেওয়া কয়েকটি প্রশ্ন। এগুলি সব সম্পূর্ণ বাক্য ও বিজ্ঞপ্ত সম্পূর্ণ ও অর্থ বহন করে।

লেখক/প্রবন্ধকারের নাম ও তাঁহাদের রচনার নাম সরকারীভাবে সমাধানের সঙ্গে লিট্‌কুইজ উইকলিতে প্রকাশ করা হবে।

১। কবিতা কতকগুলি নির্দিষ্ট চিন্তাধারা এবং প্রতিবিম্বের বাইরে **সৌন্দর্য/বাস্তবতা**-র দীপ্তিকে বুঝায়, যার দ্বারা কাব্যিক অনুভূতির প্রকাশ পায়।

২। অন্যের প্রতি আমাদের বোধ সহানুভূতিশীল হওয়া উচিত; আমাদের **বদান্যতা/অকপটতা**-র মূলে অনুরাগ থাকা চাই।

৩। মহান **রচনাগ্রন্থ/নাট্য-গ্রন্থসমূহে** রয়েছে অনন্ত কাল ও অসীমের স্বাক্ষর।

৪। ভারতের **সাংস্কৃতিক/আধ্যাত্মিক** ঐতিহ্য এবং গৌরব তার ক্ষেত্রের বিশালতা এবং জনবসতির ঘনত্বের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

৫। মহাপুরুষদের **ত্রুটি/আশঙ্কা**-র সম্পর্কে জ্ঞান সদাচারের প্রেরণা হিসেবে কাজ করে—আমাদের দেখিয়ে দেয় তাঁরা কিভাবে তা দূর করতে চেষ্টা করেছিলেন।

৬। সত্যিকারের মহাপুরুষদের জীবনে কিছু **গতিশীলতা/বিষাদ** আছে।

৭। ভাবপ্রবণ এবং **ভাবাবেগপূর্ণ/দার্শনিক** আমরা স্বভাবতই: তাই আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রতিবিম্বিত গৌরবকে বহুদিন আঁকড়িয়ে ধরে আছি।

৮। **জনমত সব সময়ে**—এবং বিশেষ করে অন্য যে কোন আড়ম্বরপূর্ণ স্থান অপেক্ষা ভারতেই বেশী করে সহজেই কৃতজ্ঞতা বহন করে এবং সঙ্গে সঙ্গে তা **বিস্মৃতিশীল/খিটখিটে**-ও হয়।

৯। যুদ্ধকে থামানোর একমাত্র উপায় হল হিংসা পরিত্যাগ, লোভ সম্বরণ এবং **মানবিক/নৈতিক** মূল্যের শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান।

১০। মানুষ হিসেবে তার স্বভাবের সিদ্ধিই হল **আনন্দ/ঐক্য**।

১১। শরীর নয়, আত্মাই **জানার/ভালবাসার** যোগ্য এবং যিনি শরীরের রূপ-লাবণ্যকে ভালবাসেন, আত্মার সৌন্দর্যকে ভালবাসেন না, তিনি অবশ্যই একজন নীচু স্তরের প্রশংসাকারী।

১২। ভারতীয় দর্শন সদা সজীব পুষ্ট ও **অর্থপূর্ণ/উদ্দেশ্যপূর্ণ** ছিল।

১৩। আমাদের ভারতীয় ব্যবস্থার একটি দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে এই যে কখনো কখনো উঁচু স্তরের ব্যক্তিগত **নৈতিকতা/দায়িত্ব**-র সঙ্গে নীচু স্তরের জন-মানস আশ্চর্যভাবে মিল দেওয়া হয়।

১৪। মানব ইতিহাসের এক অদ্বিতীয় ঘটনা হল এই যে কোন একটি **রাষ্ট্র/ধর্ম** কখনও সমস্ত, বা অধিকাংশ মানব জাতির ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারেনি।

১৫। পূর্ণ আধ্যাত্মিক এবং বুদ্ধিদীপ্ত দৃষ্টিসম্পন্ন লোক **বিরল/বিবেকী**।

১৬। বিজ্ঞান এবং **বিচার শক্তি/ধর্ম** জীবনের মহান সম্পদ।

১৭। বিজ্ঞান, যদি সত্যি কিছু প্রমাণিত করে, সেটি হল মানব মনের **সুস্থতা/সর্বোচ্চতা-তার** বস্তুতান্ত্রিক প্রলোভনের ঊর্ধ্বে ওঠার ক্ষমতা।

১৮। মহান প্রেম **মূক/সহজ** হতে পারে।

রয়েছে জলদস্যুদের ইতিহাস। কেন মানুষ জলদস্যুবৃত্তি গ্রহণ করে? এই প্রশ্ন তুলেছেন হেনরী। কিভাবে জলদস্যুবৃত্তি পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করা যায়, সে সম্বন্ধেও আলোকপাত করেছেন তিনি।

নিজের জলদস্যু জীবনের কথাও লিখেছেন হেনরী মেইনওয়ারিং। তার মতে আয়র্ল্যাণ্ড জলদস্যুদের শৈশবস্থল এবং আবাসভূমি। বইটির এক পরিচ্ছেদে তিনি জলদস্যুদের আক্রমণের কৌশল সম্বন্ধে লিখেছেন। কায়দা করে প্রথমটা পালিয়ে যাবার ভান করে জলদস্যুরা। শিকার তাড়া করে এগিয়ে এলে তাকে সুবিধেমত জায়গায় ঘিরে ধরে।

হেনরী মেইনওয়ারিং লিখেছেন বিভিন্ন জলদস্যু অধ্যুষিত স্থানগুলির কথা। আয়র্ল্যাণ্ডের কয়েকটি বন্দর, উত্তর আফ্রিকা, ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জ, আজোরেস, পশ্চিম আফ্রিকা ও নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড। মনে হবে যেন অটোমোবাইল অ্যাসোসিয়েশনের মুদ্রিত কোনো বই দেখছেন। কোথায় ভালো হোটেল বা মোটর গ্যারেজ রয়েছে তেমনি গোছের সংবাদ। জলদস্যুদের নানা অন্ধিসন্ধির খবর।

ধৃত জলদস্যুকে করুণা করে ক্ষমা করা কিংবা তাকে ফাঁসীকাষ্ঠে ঝোলানো, কোনোটাই অভিপ্রেত নয় হেনরীর। তার মতে এই সব দুর্ধর্ষ নাবিকের উপর সমুদ্রের উপকূল রক্ষার ভার দেওয়া উচিত। কিংবা এই ধরনের অন্য কোনো কাজ, যাতে রাষ্ট্র উপকৃত হতে পারে।

হেনরী মেইনওয়ারিং লিখেছেন যে প্রথম জেমসের রাজত্বকালে জলদস্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। তার মতে রাণী এলিজাবেথের আমলের চেয়েও জলদস্যুরা সংখ্যায় দশগুণ বেড়ে ওঠে। এই তথ্য প্রায় অসমর্থিত। তবু সংখ্যা যে যথেষ্ট বেশী হয়েছিল এটা বেসরকারী সূত্রে স্বীকৃত হয়েছে। এর কারণ আইরিশরা। দুর্ধর্ষ আইরিশরা ছিল নিপীড়িত এবং অসন্তোষ তাদের মনে দানা বেঁধে ওঠে। মেইনওয়ারিং লিখেছেন—

–'Ireland which I hold the most material of all, being that this is as the great earth for foxes, which being stopped they are easily hounded to death'.

জল থেকে ডাঙায় উঠে মেইনওয়ারিং হয়েছিলেন রাজপুরুষ। কিন্তু জলদস্যুর বৃত্তি ত্যাগ করে খোদ সম্রাটের পদ অধিকার করেছেন এমন কাহিনী নিশ্চয়ই আরো চাঞ্চল্যকর। ইংলণ্ডের মাটিতে জন্মগ্রহণ করে নানা ঘাটের জল খেয়ে অবশেষে আরবের এক শেখ রাজ্যের অধিপতি হওয়ার কাহিনী হয়ত আরব্যোপন্যাসেরই কাছ-ঘেঁষা বলে সন্দেহ হবে। কিন্তু এ আদপেই উপন্যাস নয়,—নিছক ঘটনা মাত্র।

অলক্ষ্যে বসে ভাগ্য কারো কারো দিকে চেয়ে হাসে। অদৃশ্য ভাগ্যদেবীকে আমরা দেখতে পাইনে, এই রক্ষে। নইলে তার বাঁকা হাসি দেখলে সেই অবস্থায় নিশ্চয়ই আমাদের গা জ্বলে উঠত। স্যাণ্ডগেটের

দরজীর দোকানে বসে টমাস হর্টন যখন জামার বোতামের ঘর সেলাই করতেন এবং মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে নিজের সংচবিদ্ধ আঙুলের অগ্রভাগের দিকে সন্দেহে চাইতেন, তখন ভাগ্যদেবতা টমাসকে দেখে ফিক ফিক করে হাসতেন, তিনি জানতেন লোকটা পরে হবে একটা রাজ্যের অধীশ্বর। অবশ্য তার আগে অনেক বাঁকা চোরা পথে ওকে হাঁটতে হবে নিজের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য—।

টমাস হর্টন নিজের মনকে শায়েস্তা করেছিলেন। প্রবাদ আছে যে স্বকার্য সাধনের জন্য বোকা পাঁঠার পায়েও জল ঢেলে দিতে হয়। কিন্তু হর্টনের মতে,—এহ বাহ্য, আগে কহো আর। অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য সব কিছু করতে হবে। চুরি, জালিয়াতি, বিশ্বাসঘাতকতা এবং নরহত্যা,—জীবনে কিছুই বাদ দেননি টমাস হর্টন। নীতির বালাই কোনোদিন তার মনকে পীড়ন করেনি।

সত্যি, টমাস হর্টন একটি আশ্চর্য চরিত্র। ভদ্রলোকের জন্ম হয় ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে, নিউক্যাসল অন টাইন'এ। বাড়ীর অবস্থা ভালো নয়। বারো বছর বয়সে টমকে পাঠানো হল স্যান্ডগেটের দরজীর দোকানে। শিক্ষানবিশ থাকবে বলে। পুরো পাঁচ বৎসর কাজকর্ম শিখলেন টমাস হর্টন। তারপর একদিন 'দূরে ছাই' বলে উঠে দাঁড়ালেন। তার মনে হল ভালো জামা কাপড় তৈরী করবার কি মানে হয়? যদি সেই পরিধেয় কোনোদিন পরবার সম্ভাতি না জোটে। সুযোগ একটা অপ্রত্যাশিতভাবে এসে গেল। মালিক বললেন ব্যাংকে যেতে। ছ' পাউন্ডের একটা চেক ভাঙিয়ে আনতে হবে। চেকটা হাতে নিয়ে সামান্য একটু কারচুপী করলেন হর্টন। ছয়ের পরে একটা শূন্য বসালেন এবং এক অক্ষরটির পরে আরো দুটি অক্ষর যোগ—টি এবং ওয়াই: ব্যাংক থেকে ষাট পাউন্ড নিয়ে ফিরলেন টমাস। মালিককে তার প্রাপ্য ছ' পাউন্ড দিয়ে চুয়ান্ন পাউন্ড পকেটস্থ করলেন তিনি। ব্যস্, দোকান থেকে বেরিয়ে পড়লেন টমাস। এবার ভাগ্য অন্বেষণে। পৃথিবীর কোন প্রান্তে ভাগ্য লুকিয়ে আছে, তাকে কঠিন দুই বাহুতে ছিন্ন ভিন্ন করে খুঁজে আনবেন তিনি।

কয়লাবাহী একটা জাহাজ যাচ্ছিল স্টকহলমে। টমাস হর্টন উঠে পড়লেন তাতে। দূরে ইংলন্ডের মাটি, ধোঁয়া ধোঁয়া উপকূল রেখা......অপসৃয়মান জন্মভূমির দেশটা। টমাস হর্টন রুমালে চোখ মুছলেন। হয়ত আর কোনোদিন ফেরা হবে না। বিদায় ইংলন্ড—বিদায়। গুডবাই মাদারল্যান্ড।

কিন্তু চুয়ান্ন পাউন্ডে আর কতদিন চলে? সুইডেনে বেড়াতে বেড়াতে টমাস হর্টন আবিষ্কার করলেন পকেট প্রায় খালি হয়ে এসেছে। কাজেই আবার চাকুরি নিতে হয়। এবার সৈন্যবাহিনীতে ঢুকলেন হর্টন। সাধারণ সৈনিক হিসেবে। কিন্তু তাতে কি? অল্পদিনের মধ্যেই টমাস হর্টন ক্যাপ্টেনের প্রিয় পাত্র হয়ে উঠলেন। আসলে ঠিক ক্যাপ্টেনের নয়। তার সুন্দরী স্ত্রী এই তরুণ ইংরেজকে খুব পছন্দ করে ফেললেন। আর স্ত্রীর পছন্দ হলেই তো স্বামীর পছন্দ হবে। এই তো চিরকালের নীতি। নইলে সে ভদ্রলোক স্বামী হয়েছে কেন?

কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই একটা দুর্ঘটনা হল। ক্যাপ্টেন মারা গেলেন। তার বিধবা পত্নী বিয়ে করলেন এই তরুণ ইংরেজকে। সুন্দরী স্ত্রীর সহায়তায় প্রমোশন হল হর্টনের। সাধারণ সৈনিক থেকে লেফটেনান্ট। কিন্তু কানাঘুষো শুরু হল। ক্যাপ্টেনের মৃত্যুটা নাকি আকস্মিক নয়। ওটা দুর্ঘটনা বলে চালানো হয়েছে। আসলে ওটা তার পত্নী এবং প্রেমিকের যোগসাজসে ঘটেছে।

টমাস হর্টন কাজে ইস্তফা দিলেন। সুন্দরী বউকে নিয়ে তিনি আবার ভেসে পড়লেন, আর সুইডেনে নয়। বড় বেশী কথা হয় এদেশে। হর্টন এলেন দক্ষিণ রাশিয়ায়। ভল্গার তীরে একটি হোটেল ফেঁদে বসলেন তিনি। শুধু হোটেলের খাদ্যদ্রব্য যোগান কাজ নয়, সীমান্তের এই স্থানটিতে বসে নানারকম নিষিদ্ধ দ্রব্য গোপনে পাচার করা কাজ হল তার। অল্প সময়েই ধনে মানে স্ফীত হয়ে উঠলেন টমাস হর্টন।

কিন্তু বিধবা মেয়েকে বিয়ে করে টমাস হর্টনের ঠিক মন ভরে নি। কোথায় সেই নববধূর সলজ্জ চাহনি? কোথায় সেই প্রথম সম্ভাষণের রোমাঞ্চ এবং রোমাঞ্চভরা দুটি আয়ত চোখের প্রেমময় দৃষ্টি? তাছাড়া, যে নিষিদ্ধ প্রেমের স্বাদ একবার পেয়েছেন হর্টন, মন বারবার তাই পেতে চায়। পরস্ত্রীর সলজ্জ সান্নিধ্য ক্ষণে ক্ষণে তাকে উন্মনা করে তোলে। হায়! বিয়ের আগে যে মেয়েকে দেখে চঞ্চল হয়ে উঠতো, বিয়ের পর তাকে দেখেই কেন এই অবসাদ আসে?

টমাস হর্টন প্রণয়িনীর সন্ধান করছিলেন। কোনো রাশিয়ান রমণী,—কিংবা অন্য কেউ। শুধু একটি নতুন প্রেমিকা। বৈশাখের রৌদ্রজ্জ্বল তামাটে আকাশের বুকে একখণ্ড কালো মেঘের মত যে হবে লণ্ডভণ্ডকারী কালবোশেখীর অগ্রদূত। কিন্তু শ্রীমতী হর্টন স্বামীর এই খেয়াল ধরে ফেললেন। পোড় খাওয়া মেয়ে। দুটি স্বামীর অভিজ্ঞতা হয়েছে। প্রথম বিয়ের পরই মেয়েরা সেয়ানা,—দ্বিতীয়বার বিয়ে করলে তো রীতিমত ঘুঘু ব্যক্তি হয়ে ওঠে। স্বামীকে সরাসরি সাবধান করে দিলেন মিসেস হর্টন। বেচাল দেখলে সব ফাঁস করে দেবেন কিন্তু। ক্যাপ্টেনের মৃত্যুরহস্য তার তো অজ্ঞাত নয়। দরকার হলে পুলিশকেই গ্রেপ্তার করে এ্যারেস্ট করবে।

পরদিন সকালেই শ্রীমতী হর্টনকে আর দেখা গেল না। টমাস বললেন রাগারাগি করে উনি কাল রাত্রেই সুইডেনে ফিরে গেছেন। বড্ড রাগী সুইডেনের মেয়েরা। এরকম একটা মন্তব্য করে হেসেছিলেন হর্টন।

হয়ত লোকে ধীরে ধীরে তাই মেনে নিত। কিন্তু বাদ সাধলেন স্বয়ং বিধাতা। তিনদিন পরে নদীতে ধীবরের জালে একটি লাশ উঠল। তাতে শ্রীমতীর মৃতদেহ। পুলিশ এসে এ্যারেস্ট করল হর্টনকে। বিচারে দণ্ড হল—ফাঁসী।

কিন্তু টমাস হর্টন একটি দুঃসাহসী চরিত্র। মৃত্যুর কাছে এভাবে হার স্বীকার করা পুরুষোচিত নয়। জেলে বসে হর্টন মনঃস্থির করলেন। মোটা ঘুষ দিয়ে জেলের লোকদের হাত করলেন হর্টন। তারপর একদিন চম্পট। পালিয়ে এলেন ক্রিমিয়ায়। সেখানে একদল তাতার দস্যুর সঙ্গে আলাপ হল। সেই দলে যোগদান করলেন হর্টন। সামান্য কিছুদিনের জন্য।

অবশেষে টমাস হর্টন রাশিয়া ত্যাগ করলেন। গোলাপের দেশ বসরা তাকে হাতছানি দিল। গোলাপের দেশ তো বটেই। আরবী মেয়েগুলোকে গোলাপ ছাড়া কি বলা যায়? মুসলমান বণিকের বেশ নিলেন টমাস। মক্কাশরীফ করে এসেছেন বলে হাজীর টুপী। পারস্য উপসাগরের মুখে এসে দাঁড়ালেন টমাস হর্টন।

কিন্তু বসরাতে শাসকের সঙ্গে বনল না। টমাস হর্টন একদিন উত্তেজিত অবস্থায় খুন করলেন বসরার শাসককে। তাড়া খেয়ে পালাতে হল টমাসকে। অবশেষে এলেন কিসমাহে। আরবের এক শেখ রাজ্য। কিসমাহের শেখ আশ্রয় দিলেন টমাসকে। দোস্ত বলে স্বীকার করলেন।

কিসমাহে বসবাস শুরু করলেন টমাস। ক্রীতদাস ক্রীতদাসী কিনলেন। সাতখানি জাহাজ বানিয়ে ফেললেন। অতঃপর পারস্য উপসাগরে শুরু হল তার জলদস্যুবৃত্তি। বহু বাণিজ্যপোত লুণ্ঠন করলেন হর্টন। অল্প সময়ের মধ্যে বেশ মোটা টাকার মালিক হয়ে উঠলেন। কিসমাহের শেখ তাকে নৌবাহিনীর সর্বাধিনায়ক পদে অভিষিক্ত করলেন। এ ভাগ্যই হল হর্টনের। ঐ দস্যুর কাজে কিছু দিনের মধ্যেই একজন নামজাদা লোক হলেন তিনি। পারস্য উপসাগরে তিনি আতংক ছড়িয়ে ফেললেন।

কিন্তু টমাস হর্টনের মন তখনও খুশী হয়নি। বন্ধু শেখের বৈভব তাকে নিত্য পীড়া দিত। হারেমে অতগুলি আরবী মেয়ে আর আস্তাবলে অতগুলি আরবী ঘোড়া। টমাস হর্টনের অন্তরে রীতিমত অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হল। অবশেষে মনকে স্থির করলেন তিনি। দোস্ত শেখকে গলা টিপে মেরে ফেললেন সুযোগ পেয়ে। তারপরই রাজ্যের দেওয়ানকে আদেশ দিলেন তাকে শেখ পদে বরণ করতে। নচেৎ—

অবশ্য আর বলতে হয়নি। কিসমাহের দেওয়ানের ভয়ডর বস্তুটা ছিল। টমাস হর্টন শেখ হয়ে রাজ্যশাসনে মন দিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই সুশাসক হিসেবে তার নাম ছড়িয়ে পড়ল। প্রজারা অনুরক্ত হয়ে উঠল তার। ততদিনে টমাস হর্টন বন্ধু শেখের বিধবা বেগমদের যথারীতি শাদী করে নিয়েছেন। আস্তাবলের আরবী ঘোড়াগুলোরও মালিক এখন তিনি। কুড়ি বৎসরেরও বেশী রাজ্য শাসন করেছেন টমাস হর্টন। যখন মারা গেলেন তখন তার শয্যার

পাশে একরাশ বেগম ও রক্ষিতার দল। কিন্তু একটিও সন্তান হয়নি।

হর্টনের এই কাহিনী সম্ভবত বিশ্ব-জগতে অজানাই থাকত। কারণ টমাস হর্টন বসরাতে পৌঁছেই মনে প্রাণে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। ইংরেজী ভাষা তিনি কখনও মুখে আনতেন না। কোরাণের প্রতিটি অনুশাসন তিনি মেনে চলতেন। হর্টনের উপাখ্যান সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে বিশ্ব-জগতে ছড়িয়ে পড়ল। ১৮১৮ খৃস্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যুদ্ধ জাহাজ হোপকে পাঠান হল পারস্য উপসাগরে। উদ্দেশ্য যে কোম্পানীর বাণিজ্য জাহাজগুলিকে সে যথাসম্ভব জলদস্যুর অত্যাচার থেকে রক্ষা করবে। হোপ জাহাজের ক্যাপ্টেনকে বলা ছিল যে জলপথে যাবার সময় কিসমাহের শেখকে যেন তার প্রাপ্য নজরাণা দেওয়া হয়। আসলে নজরাণা নয়, এটি উৎকোচ। কিসমাহের শেখের নৌ-সৈন্যেরা যেন এদিকে না নেকনজর রাখে। হঠাৎ নিমজ্জিত শৈলে ধাক্কা খেয়ে হোপ জাহাজটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এবং জাহাজটি সারাবার জন্য তীরে আসা অনিবার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু কিসমাহের আরবী সৈন্যেরা ক্যাপ্টেনকে বাধা দেন। শেখের লিখিত অনুমতি ব্যতীত এ রাজ্যে বিদেশীর প্রবেশ নিষেধ। দরখাস্ত পাঠালেন ক্যাপ্টেন এবং তিনদিন পরে তার জবাব এল। শেখ নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছেন ইংরেজদের। আতিথ্য গ্রহণ করলে খুশী হবেন।

দোভাষীর সাহায্যে টমাস হর্টন কথা বললেন ইংরেজদের সঙ্গে। যাবার আগে ইংরেজদের একটি উপহার দিলেন শেখ। অদ্ভুত উপহার। ইংরেজরা সংখ্যায় একশ কুড়িজন শুনে একশ কুড়িটি সুন্দরী ক্রীতদাসী দান করলেন তাদের। সমুদ্রে বেড়াতে গিয়ে মন মেজাজ ভাল রাখা দরকার। তাই এই উপহার।

প্রত্যাখ্যান করবার সাহস নেই ক্যাপ্টেনের। এদেশে শেখের মুখের কথাই আইন। একশ কুড়িটি সুন্দরী রমণী নিয়ে হোপ ভেসে চলল। বোম্বাইয়ে পৌঁছে ক্যাপ্টেন এদের ছেড়ে দিয়ে বাঁচলেন। একটি রমণীই বিপর্যয় আনার পক্ষে যথেষ্ট। একশ কুড়িটি দক্ষযজ্ঞ বাধিয়ে বসবে।

ইংলণ্ডে ফিরে কিসমাহের সেই দোভাষীর কথা মনে পড়ল ক্যাপ্টেনের। সে বলেছিল শেখ আসলে একজন ইংলিশম্যান। অনেক খুঁজে পেতে কিসমাহের শেখকে চিহ্নিত করলেন ক্যাপ্টেন। লোকটা আর কেউ নয়। জালিয়াত, খুনে, লম্পট টমাস হর্টন। একাধিক দেশে যার শাস্তির আদেশ হয়েছে কিন্তু পালিত হয়নি।

কিন্তু তাতে কি? কিসমাহের শেখের কেশাগ্র স্পর্শ করবার দুঃসাহস তখন ইংরেজের কল্পনাতেও আসত না।

জলদস্যু ধরতে গিয়ে নিজে জলদস্যু হয়েছেন এমন কাহিনীও আছে। এ যেন সেই চোর ধরতে গিয়ে চোর সাজা। এই কাহিনীর নায়ক ক্যাপ্টেন কীড। পুরো নাম



বন্ধু শেখের বিধবা বেগমদের যথারীতি শাদী করে গিয়েছেন

উইলিয়াম কীড। ১৬৪৫ খৃস্টাব্দে গ্রীণকে কীডের জন্ম। তার বাবা বেশ হোমরা-চোমরা ব্যক্তি। ছেলেকে মোটামুটি লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন কীডের বাবা। বড় হয়ে কীড অনেকবার সমুদ্রে গিয়েছেন। ধীরে ধীরে সমুদ্রের সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠলেন উইলিয়াম কীড। নিউইয়র্কে কীডের বাড়ী ততদিনে সম্পূর্ণ হয়েছে। অবস্থাও বেশ ভাল। নিউইয়র্কের বাড়ীতে ছেলে আর বৌ তার সমুদ্র থেকে ফিরে আসবার দিনগুলির প্রতীক্ষা করত। অনেকগুলি বাণিজ্য জাহাজের মালিক কীড সাহেব। আয়পত্রও বেশ সুন্দর।

১৬৯৫ খৃস্টাব্দে মাসাচুসেটসের গভর্নর আর্ল অফ বেলেমন্ট ইংলণ্ডের সম্রাটের কাছ থেকে একটি নির্দেশ পেলেন। উপকূলে জলদস্যুর উপদ্রব খুব বেশী বেড়েছে। উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করে ওদের দমন করতে হবে। গভর্নর তখনই আদেশ পালনে তৎপর হলেন। জলদস্যুদের বিরুদ্ধে একটি অভিযানকারী দল গঠিত হল। অভিজ্ঞ কীডকে করা হল এই অভিযানের দলপতি বা ক্যাপ্টেন।

অভিযানকারী দলটি কিন্তু সরকারী সাহায্য পেল না। এই ব্যাপারটি হল ভারী অদ্ভুত। অ্যাডভেঞ্চার নামক যে জাহাজটি অভিযানকারীদের দেওয়া হল সেটি একটি কোম্পানীর অর্থে নির্মিত হয়েছে। কোম্পানীতে অনেকের শেয়ার। স্বয়ং লর্ড বেলেমন্ট তো আছেনই। আর রয়েছেন অন্যান্য পদস্থ হোমরা-চোমরার দল। এবং ক্যাপ্টেন কীড নিজেও ছিলেন এই কোম্পানীর এক অংশীদার।

অভিযানকারী দলবলের নির্দিষ্ট কোন মাইনে-পত্র নেই। জলদস্যুদের জাহাজ লুন্ঠন করে যা পাওয়া যাবে তাই ভাগাভাগি করে নেবে ক্যাপ্টেন এবং নাবিকের দল। আর ক্যাপ্টেন কীডের তো জাহাজ কোম্পানীর এক-পঞ্চমাংশ শেয়ার কেনাই ছিল।

১৬৯৬ খৃস্টাব্দে অ্যাডভেঞ্চারে বেরিয়ে পড়ল সেই দুঃসাহসিকরা। তখন সেপ্টেম্বর মাস...শীত আসতে আরো কিছুদিন দেরী। আকাশ বেশ পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। বেশ কিছুদিন ধরে ক্যাপ্টেন কীড এবং অ্যাডভেঞ্চারের কোন খোঁজ-খবর পাওয়া যায় নি। একশত পঞ্চাশজন নাবিক এবং ক্যাপ্টেন

কীডকে লোকেরা প্রায় ভুলে যেতে শুরু করল। কিন্তু তারপরই হঠাৎ ম্যাসাচুসেটসে গুজব রটতে আরম্ভ হল। কে বা কারা এ খবর সংগ্রহ করেছে তা ঠিক জানা গেল না। তবে লোকে জানল ক্যাপ্টেন কীড নিজেই নাকি নীল দরিয়ার দুশমন হয়ে উঠেছেন। রক্ষকের বেশে গিয়ে কীডই এখন ভক্ষক। ভারত মহাসাগরের বুকে তার দু-একটি কুকীর্তির কাহিনী লোকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেছে। ইংলন্ড থেকে আদেশ এল গভর্নরের কাছে। ক্যাপ্টেন কীডকে যেন অ্যারেস্ট করা হয়।

নিউইয়র্ক ছেড়ে কীড কোথায় গিয়েছিলেন? এ সংবাদ পাওয়া গেল অনেক পরে। অ্যাডভেঞ্চার প্রথম পৌঁছল ম্যাদেইরায় —ফল এবং মদ সংগ্রহ করতে। সেখান থেকে রওনা হয়ে থেমেছিল কেপ ভার্দ দ্বীপপুঞ্জে জল নিতে। ক্যাপ্টেন কীড উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে যখন লোহিত সাগরের বুকে এলেন তখন প্রায় বছর ঘুরে এসেছে।

ক্যাপ্টেন কীডের প্রথম শিকার একটি মুরদের জাহাজ। সেটিতে প্রচুর কফি এবং মরিচ বোঝাই ছিল। অ্যাডভেঞ্চার জাহাজটি এবার ভেসে চলল কারওয়ার উপকূল ধরে। কিন্তু অনেকদিন কোন শিকারের দেখা পাওয়া গেল না। এইখানে একটা ব্যাপার ঘটে। জাহাজের গোলা-বারুদের যে কর্তা তার সঙ্গে খটাখটি লাগল ক্যাপ্টেন সায়েবের। রাগের মাথায় কীড একদিন তাকে সম্বোধন করলেন পোকা খাওয়া কুকুর বলে। সে ব্যক্তিও ছেড়ে কথা কইবার পাত্র নয়। কীডকে সে বলল, দলের লোকের এবং তার এই অবস্থার জন্য স্বয়ং ক্যাপ্টেনই দায়ী। কীড উঠলেন চটে। হাতের কাছে একটা লোহার বালতি ছিল। সেটাই বসিয়ে দিলেন তার মাথায়। লোকটা গেল মরে। ক্যাপ্টেন কীড আপদ গেছে চুকে মনে করে মৃতদেহটা সমুদ্রে ভাসিয়ে দিলেন।

আপদ অবশ্য পরে তার ঘাড়ে চেপেছিল। কিন্তু সে কাহিনী এখনও দূরে। লোকটাকে খুন করে উইলিয়াম কীড খাঁটি জলদস্যুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। নভেম্বর মাসে 'মেইডেন' নামক জাহাজটি তার কাছে শিকার হল। তারপরই একটা



অ্যাডভেঞ্চারে বেরিয়ে পড়ল সেই দুঃসাহসিকরা

পাঁচশত টনের বাণিজ্যপোত। বাংলা দেশ থেকে সুরাটে চলেছিল জাহাজটি। মালাবার উপকূলে কীড তাকে লুণ্ঠন করলেন। এতে অনেক মালপত্র—সিল্ক, মসলিন, চিনি এবং খানিকটা সোনা।

ছোট জাহাজ কুমারী, বড় জাহাজ মার্চেন্ট এবং আরো অনেক ছোটখাট জাহাজ শিকার করে ক্যাপ্টেন কীডের মনে হল এবার দেশে ফেরা যাক। নীল সমুদ্রের বুকে ভাসতে ভাসতে অ্যাডভেঞ্চার এল মাদাগাস্কারে। লুণ্ঠিত মালপত্র এখানে বিক্রী করে দিলেন কীড সাহেব। নাবিকদের মধ্যে ভাগাভাগি করে দেওয়া হল টাকাকড়ি। ক্যাপ্টেন কীড নিলেন শতকরা চল্লিশ ভাগ। এখানে কলিফোর্ড নামক এক জলদস্যুর সঙ্গে আলাপ হল কীডের। দুজনেই এক অপরের স্বাস্থ্য কামনা করে শরবত খেলেন। ততদিনে কীড নিজেই জলদস্যু। কাজেই কলিফোর্ডকে হাতের কাছে পেয়েও কীড ছেড়ে দিলেন।

অবশেষে আর এক সেপ্টেম্বর মাসে ক্যাপ্টেন কীড চললেন মাদাগাস্কার ছেড়ে। প্রথম যেখানে জাহাজ এল, সেটি পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপু[illegible] দ্বীপ। [illegible] নাম অ্যাংগুইলা। যারা তীরে গিয়েছিল ফিরে এসে উইলিয়াম কীডের কানে তারা একটি দুঃসংবাদ দিল। তাদের দস্যুবৃত্তির খবর সুদূর পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জেও ছড়িয়ে পড়েছে। এখানের সবাই জানে ক্যাপ্টেন কীড দস্যু ধরতে গিয়ে নিজেই দস্যু সেজেছেন—

উইলিয়াম কীডকে চিন্তিত মনে হল! এখন কি কর্তব্য? সত্বর জাহাজ ছাড়তে আদেশ দিলেন কীড। শিকার করা সেই বড় জাহাজটি পড়ে রইল হিসপ্যানিওলাতে। একটি ছোট জাহাজে করে ক্যাপ্টেন কীড চললেন নিউইয়র্কের দিকে।

১৬৯৯ খৃস্টাব্দে তিনি ফিরলেন আবার। ঠিক চার বৎসর পর। বোস্টনের মাটিতে প্রথম পা দিলেন উইলিয়াম কীড। কিন্তু আশ্চর্য! এখানের মাটিতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে গভর্নর বেলেমন্টের লোকেরা এগিয়ে এল তার দিকে। বলাবাহুল্য উইলিয়াম কীডকে অভ্যর্থনা করতে নয়। জলদস্যুবৃত্তির অভিযোগে কীড বন্দী হলেন।

নিউইয়র্ক থেকে আবার জাহাজ ছাড়ল। যুদ্ধ জাহাজ অ্যাডভাইস। এবারও উইলিয়াম কীড আরোহী। তবে ক্যাপ্টেন হয়ে নয়—শৃংখলিত কীডকে নিয়ে জাহাজ চলল ইংলণ্ডের দিকে। সুন্দরী স্ত্রীর ছলছল চোখ, ছেলের করুণ বিষাদ মূর্তি সব ধীরে ধীরে ঝাপসা হয়ে পরে মিলিয়ে গেল।

ওল্ড বেইলিতে উইলিয়াম কীডের বিচার। সমস্ত শহরে সোরগোল, হৈ-চৈ। দুটি অভিযোগ কীডের বিরুদ্ধে। তিনি জলদস্যু সেজে বহু জাহাজ শিকার করেছেন এবং দ্বিতীয়ত সেই গোলা-বারুদের কর্তা লোকটাকে রড দিয়ে আঘাত করে মারার অভিযোগ। উইলিয়াম মুরকে খুন করেছেন ক্যাপ্টেন কীড। তিনি জলদস্যু এবং খুনী,—দুই-ই।

১৭০১ খৃস্টাব্দ। বিচারের রায় বেরুল। ক্যাপ্টেন কীডের ফাঁসির হুকুম হয়েছে। ২৩ মে সেই দণ্ড সম্পন্ন হল।

উইলিয়াম কীডকে নিয়ে অনেক ছোট ছোট কবিতা লেখা হয়েছিল ইংলণ্ডে। ছোট লোকগাথা। ক্যাপ্টেন কীডের দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনী, তার জলদস্যু বৃত্তি এবং উইলিয়াম মুরকে খুন করবার বৃত্তান্ত তাতে আবেগময় ভাষায় লিখিত হয়েছে।

সম্ভবত কীড ভেবেছিলেন যে, ম্যাসাচুসেটসের গভর্নর বেলেমন্টকে তিনি বোঝাতে পারবেন এবং সরকারের কাছ থেকে ক্ষমা লাভ করা তাঁর পক্ষে কঠিন হবে না। এই আশা নিয়েই তিনি দ্রুত ফিরে এসেছিলেন এবং পা দিয়েছিলেন বোস্টনের মাটিতে। কিন্তু কত আশাই তো কুয়াশা—। একটু রোদ উঠলেই সব বেপাত্তা।

উইলিয়াম কীডের স্বপ্ন এবং প্রত্যাশা সফল হয় নি।

ব্রণ
দূর করবার জন্য
লিচেনসা



● ১০৮ টি দেশে ডাক্তাররা প্রশংসাপত্র দিয়েছেন।
● যে কোন নামকরা ওষুধের দোকানেই পাওয়া যায়।



(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

॥ ২০ ॥

রাত দশটার পর থেকেই নিস্তারিণীর প্রশান্তি নষ্ট হয়েছে। এগারোটা বাজতে চেঁচামেচি বিলাপ শুরু করে দিয়েছে সে। আরও রাত হতে আর স্থির থাকতে পারল না। ঘরেদোরে তালা লাগিয়ে, ভাড়াটেদের একটু নজর রাখতে বলে ঝিকে সঙ্গে করে বেরিয়ে পড়ল মতির বাড়ির উদ্দেশে।

মতিরা তখন সব শুয়ে পড়েছে। কোথাও গানের বায়না না থাকলে মতি নটার মধ্যে শুয়ে পড়ে। রাত্রে আজকাল একটু দুধ—বড়জোর তার সঙ্গে একটা আম কি মিষ্টি খায়। তার জন্যে রাত অবধি বসে থাকার দরকার হয় না। ক্ষিদে হল কিনা অত ভাবে না।

ঝি-চাকর দারোয়ানদের অবশ্য একটু দেরি হয়, খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে বাড়িতে চাবি দিয়ে শুতে। কিন্তু সে-সময়ও পেরিয়ে গেছে। বাজনদাররা সাধারণত কোথাও যন্ত্র নিয়ে গেলে আবার এখানে এসে জমা করে রেখে যায়। কিন্তু সেটারও কোন বাঁধাধরা আইন নেই। খুব রাত হয়ে গেলে, এমন হয়ও—গান শেষ হলেও খেতে ছাঁদা বাঁধতে দেরি হয়ে যায়, যন্ত্রপাতি যে-যার বাড়িতে নিয়ে যায়—সকালে এসে আবার এখানে জমা করে। এরা সেই সময় পর্যন্ত দেখে আজ শুয়ে পড়েছে। এগারোটা বেজে গেছে, আর কখন ফিরবে?

নিস্তারিণীর কান্নাকাটি চেঁচামেচিতে দারোয়ান উঠল। নিস্তারিণীকে সে দেখেছে এর আগে, চেনে। খবর শুনে গিয়ে গিরি-ঝিকে ডাকল। গিরি-ঝি মতিকে ডাকবে কিনা ইতস্তত করছিল—নিচে চেঁচামেচি [illegible] মিলাই উঠে-[illegible]

'সেকি! সুরো এখনও ফেরেনি! কোথায় গেছে কোথায়? দমদম? ঠিকানা কি? কার বাড়ি?...হ্যাঁ রে শিউশরণ—এরা ফেরেনি এখনও? সেকি কথা! ওমা—আমার আবার পেটটা মুচড়ে উঠল দ্যাখো—'

মতির এ দীর্ঘদিনের রোগ। কোন বিপদ বা দুঃসংবাদ শুনলেই পেট মুচড়ে ওঠে। গিরি ওর মধ্যেই চোখ টিপে হেসে অভয় দিল নিস্তারিণীকে, 'ভয় নেই, দু' মিনিট। এ বরং ভালই হল, মাথা ঠাণ্ডা হয়ে আসবে, বুদ্ধি খেলবে মাথায়।'

হলও তাই। মতি এসেই গিরিকে প্রশ্ন করল, 'কে কে গেছে রে আজ ওর সঙ্গে জানিস? ওর ব্যায়লাদারের তো অশৌচ, সে যাবে না। আমার হারানচন্দর গেছে কি? গেছে? সে তো এই মোড়ের মাথাতেই থাকে। শিউনন্দন যা বাবা যা—ছুটে যা একবার, খবরটা নিয়ে আয়।'

কিন্তু শিউনন্দন যা খবর আনল তাতে দুশ্চিন্তা বাড়ল বই কমল না। হারান এখনও ফেরেনি। তার বৌ ভাবছে। হারানের অবশ্য একটু নেশাভাঙ করা অভ্যাস আছে, হাতে পয়সা পেলে আর বাগবাজার পথে পড়লে একবার নামে সাধারণত—কিন্তু যন্তর সুদ্ধ কখনও যায় না। গাড়ি গেলে গাড়িতে তুলে দেয়, না হলে অন্য কারও হাত দিয়ে পাঠিয়ে দেয়। কেউ ফেরেনি, যন্তরও আসেনি শুনে নাকি হারানের বৌ এখন পা ছড়িয়ে কাঁদতে শুরু করেছে।

খবর আরও দু-তিনজনের কাছে নিতে পাঠানো হল। সর্বত্র সেই একই বার্তা—কেউ এখনও ফেরেনি, যন্ত্রও আসেনি।

এবার মতির মুখও অন্ধকার হয়ে উঠল দুশ্চিন্তায়, সে নিস্তারিণীর ওপরই ঝেঁঝে উঠল, 'অতদূর—কেউ চেনা নেই শুনো নেই—বাজনদার দোয়াররা একদলে যাবে, সুরো আর একদলে যাবে পেরথকভাবে—না দিদি, তোমার এ পাঠানো একদম ঠিক হয়নি। এ আমি একটুও ভাল বুঝছি না। ঠিকানা পর্যন্ত রাখোনি। আশ্চর্য! তারা বললে ঝি-দারোয়ান পাঠাবে আর তুমি মেয়ে ছেড়ে দিলে! সোমত্ত সোন্দর মেয়ে। ই কি কথা!...বেশ করেছ, এখন থানায় যাও!'

'থানায় যাবো! আমি যাবো!'

'ওমা, তা যেতে হবে না! তোমার মেয়ে। তাছাড়া কী বলে গেছে, কোথায় বায়না কী বিত্তান্ত—তোমাকেই তো জেরা করবে তারা, সব না জানলে কি করবে বলো!...আমি বরং কোচোয়ানকে গাড়ি বার করতে বলি, শিউনন্দন সঙ্গে যাক—থানায় গিয়ে লিখিয়ে এসো।'

নিস্তারিণী এবার পা ছড়িয়ে হাহাকার করে কেঁদে ওঠে। শিউনন্দন ঘড়ি দেখে বলে, 'মা, রাত তো চারঠো বাজিয়ে গেল—আর আধাঘণ্টা যাইতে দেন, সোকাল হোক—এখন গেলে কোউনো থানাদার কেস লিখাবে না।'

কথাটা যুক্তিযুক্ত। এমনিই পূর্বদিক ফরসা হয়ে এসেছে। আর আধঘণ্টা না হোক, একঘণ্টার মধ্যে বেশ সকাল হয়ে যাবে। এর মধ্যে একবার সুরোদের বাড়িও লোক পাঠিয়ে খবর নেওয়া যাবে—এল কিনা।

কিন্তু তার আগেই হৈ-হৈ করতে করতে দোয়ার-বাজনদারের দল এসে পড়ল। যন্ত্র-পাতি কারও সঙ্গেই কিছু নেই; জামা-

কাপড় ছে'ড়া, চেহারাও তথৈবচ, মারধোর খাওয়ার চিহ্ন সুস্পষ্ট।

এদের ঐ অবস্থা দেখে কোন প্রশ্ন করার কথাও মনে এল না নিস্তারিণীর, আর একদফা চিৎকার করে কে'দে উঠল সে। মতিই প্রশ্ন করল, ওরা কিছু বলার আগেই বলে উঠল, 'সুরো, সুরো কৈ?'

'জানি না। কিছু জানি না।' হারান মুখ গোঁজ করে উত্তর দেয়, 'তার জন্যেই তো এই হাল! কোথায় কি কেউ জানে না—যমের দক্ষিণ দোর না উত্তর দোর, ধাধ্ধাড়া গোবিন্দপুর—বায়না নিয়ে বসল। সেও এমনি মার খায় তো আমাদের শান্তি, আমাদের দুর্গতির শোধ ওঠে।'

'আচ্ছা হয়েছে, হয়েছে! কী খবর কি না— কিছু শুনলুম না, মনিা কাটতে বসল। বলি কি হয়েছেটা কি?' ধমক দিয়ে ওঠে মতি।

খবরটা ছিদাম খোলবাজিয়ের কাছ থেকেই পুরো পাওয়া গেল। সে বুড়ো-মানুষ তবু সেই এদের মধ্যে মাথাঠান্ডা লোক, গুছিয়ে বললও সে। যে পথ দেখাবে বলে এসেছিল ওদের নিতে, সে শ্যামবাজারের মোড়ে গিয়ে একটা কাগজে ঠিকানা লিখে হারানের হাতে দিয়ে নেমে যায়, বলে তার মন্টি না কি নিয়ে যাবার কথা, সেখানে বাবুরা থাকবেন, ওরা গেলেই ভাড়া চুকিয়ে দেবে, কোন অসুবিধা হবে না।...সেই মতো গয়েও ছিল ওরা, কিন্তু অনেকদূরে যাবার পরও যে-ঠিকানা লিখে দিয়েছিল, সে-নামের কোন বাড়ি কি রাস্তা খুঁজে পাওয়া গল না। এ বলে বোধহয় ঐদিকে—সেদিকে গলে বলে না, এখানে ও নামে কেউ নেই। অমুক জায়গায় দ্যাখো, থাকলে সেদিকেই থাকবে। খুঁজতে খুঁজতে যখন সন্ধ্যে হয়ে গেল, একটা জঙ্গলপানা জায়গায় গিয়ে গাড়োয়ানরা গাড়ি থামিয়ে বলে—মিছিমিছি তারা ঢের হয়রান হয়েছে, তাদের ভাড়া চুকিয়ে দেওয়া হোক; আরও বলে, যে-ভাড়া ঠিক হয়েছিল, স-ভাড়া তারা নেবে না, বেশী ভাড়া চাই। আর যদি ফিরতে হয়—সেও আগাম ভাড়া হাতে পেলে তবে গাড়ি ছাড়বে তারা।

এরা তো একেবারে অগাধ জলে পড়ল। ঠিক সকলেরই ট্যাঁক-ট্যাঁক। টাকা রোজগার করতে যাচ্ছে, খরচ করতে তো যাচ্ছে না, সঙ্গে নেবেই বা কেন? 'ঠেঙ্গে' যা আছে—সকলের সব পয়সা জড়ো করলেও পুরো একটা টাকা হবে কিনা সন্দেহ। এরকম কোন অভিজ্ঞতাও তো নেই, এমন কান্ড কখনও হয়নি তাদের জানাশুনোর মধ্যেও। যারা নিয়ে যায় সমাদর করে নিয়ে যায়, তারা নিজেদের গাড়ি পাঠায়, নয় তো তারাই গাড়ি ভাড়া করে, কত ভাড়া সে-খবরেও রাখে না এরা অনেক সময়। দৈবাৎ যদি বা চেনাশুনো জায়গায় এদের ভাড়া দিয়ে যেতে বলে, দরজার কাছেই সরকার দাঁড়িয়ে থাকে, যাওয়া মাত্র ভাড়া চুকিয়ে দেয়।

এরা সেই কথাই বুঝিয়ে বলতে গিয়েছিল, 'বাপু, আমাদের তো ভাড়া দেবার কথা ছিল না, আমরা কেউই টাকা নিয়ে বেরুইনি। তা যা হবার তা হয়ে গেছে—এখন যেখানকার লোক সেখানে পে'ছি দাও—ভাড়া যা হয় পাই-পয়সা চুকিয়ে দোব।'

তারা সে-কথা কানে করেনি। মারমুখো হয়ে উঠেছিল। তাই নিয়ে তর্কাতর্কি, ঝগড়া। দেখতে দেখতে কোথা থেকে সেই জঙ্গলের মধ্যেই গুন্ডাগোছের গোটাকতক লোক এসে জড়ো হল, এক রকম ঘিরেই ধরল ওদের। কে জানে আগে থাকতেই কোন ষড় ছিল কিনা—দেখেশুনে তো সুরোকে আলাদা করে নিয়ে গেছে সেই কারণেই; এতক্ষণে হয়ত পগার পার করে দিল, মগেদের হাতে কিম্বা পাঠান মুলুকে, সেসব দেশে নাকি বাঙ্গালীর মেয়ের খুব কদর, সুন্দরী মেয়ে হলে তো কথাই নেই—চার-পাঁচ হাজারে বিক্রী হয়ে যাবে। পাঠানরা নাকি কিনে আরও পশ্চিমদিকে চালান দেয়, সেখানে একো-একো সুলতানের দু' হাজার আড়াই হাজার করে বাঁদী আছে—তারা পনেরো-বিশ হাজারে লুফে নেবে।

তা সে যা-ই হোক মোদ্দা কথা দেখা গেল সেই গুন্ডাগুলো সব ঐ গাড়োয়ানের দিকে, সবকটার এক রা, তোমাদেরই অন্যায় হয়েছে, গরীব বেচারাদের হয়রান করেছ—এখন ভাড়া চুকিয়ে দাও, দুখানা গাড়ির পাঁচ টাকা, আর যদি ফিরে যেতে হয় তো আরও অন্তত তিন টাকা, নইলে সহজে ছাড়া হবে না। যাদের একটা পুরো টাকারই সংস্থান নেই—তারা দশটা টকা কোথায় পাবে? ফলে আরও খানিকটা তক-রারের পর ওদের মারধোর করে যন্তর-গুলো কেড়ে নিয়ে সেই দুখানা গাড়িতে চেপেই চলে গেল। ওরা সেই সেখান থেকে সারাটা পথ হে'টে লোককে জিজ্ঞেস করতে করতে ফিরছে। তাই কি সোজা, আশপাশে না আছে বাড়িঘর, না আছে কোন লোকালয়—কাকে পথ জিজ্ঞাসা করবে? সঙ্গে একটা আলো পর্যন্ত নেই কারও যে, চাকার দাগ দেখতে দেখতে ফিরবে। আন্দাজে এ-পথ ও-পথ করে অনর্থক কত যে ঘুরেছে তার ইয়ত্তা নেই। পরে তো আরও মুশকিল, রাত হয়ে গেছে, যদি বা কোন বাড়ি পাওয়া যায়, তারা অতগুলো লোকের গলার আওয়াজ পেয়ে ডাকাতের দল ভেবে সাড়া দেয় না, আলো নিভিয়ে ভেতরে বসে দুর্গা নাম জপ করে। এই করে এক সময় যদি বা শ্যামবাজারের মোড়ে পে'ছেছে, গাড়ির আড্ডায় গিয়ে গাড়ি ভাড়া করতে যাবে—ওদের ঐ চেহারা আর জামা-কাপড়ের অবস্থা দেখে মাতাল মনে করে কেউ গাড়িতে চড়ায়নি, আগাম ভাড়ার চেহারাটা দেখতে চেয়েছে। ফলে এপর্যন্ত হে'টেই ফিরতে হয়েছে ওদের। ক্ষিধে, মার খাওয়া—তার ওপর এতটা হাঁটা—আধমরারও বেশী হয়ে গেছে ওরা, প্রাণটা ঠোঁটের কাছে এসে ধুক ধুক করছে—এখনই কিছু খেতে না পেলে বাঁচবে না।

এই বলে আর একদফা নিস্তারিণীর সামনেই সুরবালার অবিমৃষ্যকারিতার জন্যে তার পিতৃমাতৃ উচ্ছন্ন করে—তাদের বিবরণ শেষ করল।

তা হোক—ওরা যখন ফিরেছে, ওদের জন্যে চিন্তা নেই—যন্ত্রও আবার হতে পারবে কিন্তু সুরবালার কি হবে?

নিস্তারিণী পাঠান নয় তো মগের কাছে বিক্রীর কথা শুনে পর্যন্ত মাথাখুঁড়ে কপাল চাপড়ে পাগলের মতো কান্ডকারখানা বাধিয়েছিল। এখন বলল, 'তাহলে তোমার কাউকে দাও দিদি, আমি এখুনি থানাতে চলে যাই।'

থানায় যাওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায়ও কারও মনে পড়ল না। হারান বলল, 'যা হয়েছে না হতে আছে, চলো এক গেলাস করে জল খেয়ে নিয়ে আমরাও যাই এক-সঙ্গে 'থানায়—মামলাটা লিখিয়ে আসি। একসঙ্গেই লেখানো ভাল। জোর হবে।'

মতি অনেকক্ষণ চুপ করে ছিল। সে এবার বলল, 'দিদি, তার আগে কিন্তু আর একটা কাজ করলে ভাল হত ভাই। কে তোমার নানু না কে ছেলে আছে—তার ঠিকানা তো জানো—তাকে একটুকুন খবর দিলে হত। ঐ আহিরীটোলার রাজাবাবুর সঙ্গে দেখা করে তাকে একটু জিজ্ঞেসবাদ করে আসত। তারই হাত নেই তো এর মধ্যে? তুমি নাকি এর মধ্যে একদিন অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিলে? আমার ঝি বলছেল, তোমার ঝিয়ের কাছে শুনে এসেছে?...এরা গেলে তো পাত্তাই পাবে না, নানু শুনেছি সাত হাটের কানাকড়ি—সে ঠিকই খোঁজটা আনতে পারত।'

নিস্তারিণীর মাথায় এতক্ষণ কথাটা যায়নি, সে চোখের জলের মধ্যেই যেন তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল। বললে, 'তাহলে তো আরও থানায় যাব, ওর হাতে দড়ি পরিয়ে তবে ছাড়ব। রাজা! অমন অনেক রাজা দেখিছি। কোমরে দড়ি হাতে হাতকড়ি পরাব। এ মহারাণীর রাজত্ব কোম্পানীর রাজত্ব—ওসব রাজাগিরি খাটবে না।'

মতি আর বাধা দিল না। ঘরে মিঠে অভ্যেস পড়ে থাকে—দোয়ার-বাজনদারের দল এক-একটা মুখে দিয়ে একঘটি করে জল খেয়ে দল বেঁধে থানায় গেল নিস্তারিণীকে নিয়ে। নিস্তারিণীই শুধু মুখে একবিন্দু জল দিল না।

থানায় দারোগাবাবু মন দিয়ে সব শুনলেন। সুরবালার কথাও। নিস্তারিণীর এজাহারও লিখে নিলেন। এদেরই কার মুখে রাজাবাবুর নামটা বেরিয়ে পড়েছিল—তাও শুনলেন। জেরা ক'রে সে বিবরণও জেনে নিলেন নিস্তারিণীর মুখ থেকে—ব্যাপারটা কি, কতদূর গড়িয়েছিল সবটা নিস্তারিণী বলল না, বলতে পারল না। যতটা জানে বলল। সব বলে বলল, 'তুমি বাবা লক্ষেশ্বর হবে, রাজরাজেশ্বর হবে—দেই বাবা, মেয়েটাকে আমার এনে দাও!'

দারোগা বয়স্ক লোক, নেহাৎ ছেলে-মানুষ নয়। সিপাই থেকে দারোগা হয়েছেন। তিনি এক ধরনের শুষ্ক হাসির সঙ্গে

বললেন, 'দেখুন বৌমা, মেয়ে আপনার ডাকসাইটে মেয়েছেলে। অনেকেই একডাকে চিনবে। তাকে চুরি ক'রে নিয়ে গিয়ে বেচে দেবে—এত সোজা নয়। এ-সে আগেকার নবাবী আমল নয়, বর্গীর আমলও নয়। এ ইংরেজ রাজত্ব। তাছাড়া এ যা শুনছি, মেয়ের আপনার সায় না থাকলে এ ধরনের ধারনা সে নিত না। একেবারে অজানা-অচেনা বাড়ি অত দূরে, সঙ্গে নিজের লোক একজনও থাকবে না—এতে খুব ছেলে-মানুষও রাজী হয় না। দেখুন, তার কে ভাবসাবের লোক নিয়ে গেছে, সবটাই সাজানো। জেনেশুনে স্বেচ্ছায় গেছে।'

'তা ভাবলে তার প্রতিকার হবে না' নিস্তারিণী রুখে ওঠে, 'এ তোমাদের কেমন আইন?'

'প্রতিকার হবে না কেন? মেয়ে আপনার নাবালক হ'লে হ'ত। মেয়ের কি আপনার একুশ বছর বয়স হয় নি? সে যদি বলে আমি নিজের ইচ্ছেয় এসেছি?'

'যদি বলি একুশ বছর হয়নি?'

'আপনি বললে তো হবে না—প্রমাণ করতে হবে। ওসব ছাড়ুন। আপনি দেখুন তার কে ভাবসাবী আছে—আপনাদের ঠিকই মনে পড়বে—সেখানে খোঁজ করুন। তার যদি মনে করেন আপনার মেয়ে নাবালেক প্রমাণ করতে পারেন তো খবরটা এনে দেবেন, আমরা গিয়ে মেয়েকে ছাড়িয়ে আনব।...কিন্তু পারবেন কি? ভেবে দেখুন। আপনার মেয়ে এত নামকরা

চিত্রতারকা আশা পারেখ বলেন:

'আমাকে সুন্দর ক'রে রাখার দায়িত্ব নিয়েছে লাক্স'



একই যত্নে পরিচর্যায় আপনার ত্বকও সুন্দর রাখা চাই বই কি··
এ কাজে বিশুদ্ধ কোমল লাক্স টয়লেট সাবানই সেরা।

আশা পারেখ বলেন, "সাদা আর চার রকম রঙে কেবল লাক্সই পাবেন। আর এর গন্ধও কী সুন্দর।"

লাক্স টয়লেট সাবান

চিত্রতারকাদের সৌন্দর্যসাবান
হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী



হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

লিন্টাস-LTS. 213-140 BG

থিয়েটারে এতদিন ধরে গাইছে, তার এখনও একুশ বছর বয়স হয়নি—এ শুধু মুখের কথায় হাকিমকে বিশ্বাস করাতে পারবেন না। তাহ'লে আবার ডাক্তারি একজামিন করাতে হবে। সে বড় ঝঞ্ঝাট। তখন যদি প্রমাণ হয় মেয়ে সাবালক—ইচ্ছে ক'রে গেছে, তখন ঐ হাতকড়া উল্টে আপনার হাতেই পড়তে পারে। মহা কেলেঙ্কার হবে—কাগজে লেখালেখি। ভেবে দেখুন!'

খাতা মুড়িয়ে রেখে দারোগাবাবু উঠে দাঁড়ালেন। অর্থাৎ এদের আর সময় দিতে চান না।

বাইরে বেরিয়ে এসে হুকড়ি লাফাতে লাগল, 'ঐ ঘুষ খেয়েছে মাসিমা, বলতে পারি দারোগা শালা নির্ঘাৎ ঘুষ খেয়েছে। ঐ যে সেই বলছেন, রাজা বাহাদুর না কে—সে-ই ঘুষ খাইয়েছে নির্ঘাৎ!'

'নে নে, থাম বাপু! খুব হ'ল থানায় এসে, পয়সা পয়জার গুনোগার!'

মুখে শস্তু দোয়ার বলে, 'ঘুষ খাওয়ার তো প্রমাণ নেই, কী করবি তার? মাঝখান থেকে বাড়িতে এখনও পর্যন্ত একটা খবর দেওয়া হ'ল না—বৌ বোধহয় হাতের নোয়া খুলেই ফেললে এতক্ষণে!'

'তাতেই হ'ল, হাড়-কখানা জুড়োল তার। ঐ নোয়া ছাড়া তো কিছু রাখিসনি হাতে! ওগুলো ফেলাই ভাল।' পিছন থেকে হারান টিপ্পনি কাটল!

নিস্তারিণী বাড়িতে ফিরে এসেও রাঁধল না, খেল না। আগের রাতের বাসি ভাত পচে উঠেছিল। দুটি তরকারি যা ছিল ঝিকে ধরে দিল। তারপর ভাড়াটে ছেলেটিকে হাতে পায়ে ধরে পাঠাল থিয়েটারে নান্দুর খোঁজে। কিরণের ঠিকানাটা মনে পড়ল না যে এখানে আছে কিনা খবর নেবে। নান্দুরও বাড়ির ঠিকানা জানে না। এক জ্বালা—মনে মনে ঠাকুর ঠাকুর করতে লাগল—থিয়েটারে যদি ধরা যায়।

ভাগ্যক্রমে থিয়েটারেই ছিল নান্দু। নিস্তারিণী ডাকছে শুনে ছুটতে ছুটতেই এল। কিন্তু সব শুনে তার মুখও কালো হয়ে উঠল, বললে, 'ও তুমি খরচের খাতায় লিখে রাখো জননী, যে মেয়ে পীরিতে পড়ে তার অসাধ্যি কিছু নেই। সে ঠিকই গেছে ঐখেনে। খবরও দেবে, ভেবো না। তবে মেয়েকে আর হাতে পাবে না এখন কিছুদিন। হোমড়ো সাফ করার আগে ও আর ফেরৎ দিচ্ছে না। বুড়ো লোক, ঢের মেয়ের সব্বনাশ করেছে এমন। সব জানে।... তুমি আর উপোস দিয়ে কি করবে মিছি-মিছি? মুখে মাথায় জল দাও, উনুনে জ্বালো। যতক্ষণ শরীরটা আছে, পেটে দিতে হবে তো। ছেলেমেয়ে মরে গেলেও উঠতে হয়, রাঁধতে হয়, খেতে হয়। সেসব কিছু নয়, ভালই আছে, এখন দিনকতক সুখেও থাকবে। খবরও পাঠাবে, খরচও দেবে তোমায় মাতা, ভয় নেই। তবে সেসব আসতে সময় লাগবে। এত অধৈর্য হ'লে চলবে না। আমিও দেখছি, শুনেছি ঐ বেলঘোরের দিকে কি বাগানবাড়িটাড়ি আছে ওর—খবর নিচ্ছি। তবে তাড়াতাড়ি কিছু তো হচ্ছে না—সময় দরকার। কাঁহাতক আর তুমি এমন ক'রে শুকিয়ে পড়ে থাকবে? আর এ-তো দিব্যি পরিষ্কার। এর মধ্যে তো কোন ভাবনার কারণই দেখছি না আমি।'

কথাটা সকলের কাছেই পরিষ্কার হয়ে গেছে হয়ত—নিস্তারিণীর কাছে ছাড়া। তার তখনও অমঙ্গলের ভয়টাই বেশী। সে পড়েই থাকে উপোষ ক'রে। শেষে ভাড়াটে বৌটি একবাটি সরবৎ তৈরী ক'রে একেবারে সামনে এনে ধরতে আর ছেলে-মেয়েদের অকল্যাণের প্রশ্ন তুলতেই উঠে সেটা মুখে দিয়েছিল। রান্না-খাওয়া করা কি উনুনে আঁচ দেওয়ার কথা সে বৌটিও মুখে তুলতে পারেনি।, সেও ছেলের মা। এ-ব্যথা কতকটা বুঝতে পারে। বাপুরে, তার মাদু যদি অমনি হারিয়ে যায় কোনদিন সে কি মুখে জল দিতে পারবে?...ঝিকে বলে দিয়েছে রাত্রে তার কাছে খেতে, নিস্তারিণী তার হাতে ভাত খাবে না জানা কথাই—অন্য কিছু লুচি-পরোটা ক'রে দেবে কিনা—তাও ভরসা ক'রে জিজ্ঞাসা করতে পারেনি।...

খবর অবশ্য সেইদিনই পাওয়া গেল।

নান্দু নয়, খবর নিয়ে এল ওপক্ষেরই কোন এক ব্যক্তি, দাসী বা ঐ ধরনের একটি স্ত্রীলোক।

লম্বা-চওড়া মিলিটারী গোরার মতো চেহারা, তেমনি কঠিন বাজখাঁই ধরনের গলার আওয়াজ। শুধু হাত, ওপরের এক হাতে একগাছা তাগা। বোধহয় অনেক বেছে বেছেই একে পাঠানো হয়েছে।

কটকট ক'রে কড়া নাড়তে নিস্তারিণীই ব্যস্তেব্যস্তে উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল। দুর্ভাবনায়, উপবাসে, রাত্রি জাগরণে মাথা ঘুরছে তার—তবুও সে-ই ছুটে এল আগে।

'কে গা বাছা তুমি? তোমাকে তো চিনতে পারছি না—? কাকে চাও তুমি?' নিস্তারিণীই প্রশ্ন করল আগে। বোধহয় আগন্তুকের চেহারা দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিল প্রথমটা।

'আমি আপনার মেয়ের কাছ থেকে আসছি। আপনিই নিস্তার দেবী তো?... যদি বিশ্বাস না করো বলে এই দু-কলম পত্তরও লিখে দেছে', ঠিক কোন মানুষের মুখের দিকে না চেয়ে—নিস্তারিণী, ওদের ঝি আর ভাড়াটে বৌয়ের মাথার ওপর দিয়ে দেওয়ালে চোখ রেখে গড়-গড় ক'রে বলে গেল সে, মুখস্থর মতো, 'সে ভাল আছে, সুখে আছে, তার জন্যে তোমরা কোন ভাবনা ক'রো নি। এখন কিছুদিন সে বাড়ি আসবে না—তবে তোমায় খরচ-পত্তর ঠিক ঠিক পাঠাবে, খবরও দেবে সময় সময়। ঝি রাখবার দরকার নেই—নয় খরচই সে চালাবে। সময় মতো এসে দেখাও ক'রে যাবে—বলে দেছে।'

বক্তব্য শেষ করে আঁচল থেকে এক-টুকরো কাগজ বার করে ধরল, সম্ভবত সুরোর লেখা সেই দু'কলম চিঠি। বলল, 'আপনি তো লেকা পড়তে পারবেনি—আর কাউকে দেখিয়ে নিতে বলেছে, তেনার হাতের লেকা কিনা—'

অকস্মাৎ বোমার মতো ফেটে পড়ল নিস্তারিণী। রাজাবাবুর নাম করেই তাঁর চোদ্দপুরুষ নরকস্থ করাল, অখাদ্য কুখাদ্য খাওয়াল তাঁর পিতৃপুরুষকে, তারপর বলল, 'এসব শেকানো কথা, মেয়েকে দিয়ে জোর করে লেখানো। তাকে লুটে নিয়ে গেছে, চুরি করে জুলুম করে আটকে রেখেছে। সে-মেয়ে আমার নয় যে, আমাকে না বলে বেরিয়ে যাবে বুড়ো জোচ্চার সঙ্গে।... আমিও সহজে ছাড়ব না এই বলে রাখলুম। ...থানায় ডাইরী করানো হয়েছে, বলো গে যাও তোমার গুণ্ডো মনিবকে, আমার দুধের মেয়ে ফুসলে নিয়ে যাবার শোধ তুলে তবে আমি ছাড়ব। ঐ বুড়োর কোমরে দড়ি আর হাতে হাতকড়ি পরিয়ে যদি না নিয়ে যেতে পারি তো—'

সেই খাণ্ডারণী ঝিয়ের গলা তার ওপরও চড়ে। বলে, 'সে-কথার জবাবও দিয়ে দেছে তোমার মেয়ে রাম না হতে রামায়ণ। বলেছে যে, সে এখন সাবালক, নিজের ইচ্ছেয় যেখেনে খুশি যেতে পারে, কারও এক্তারীতে আর নেই সে। তুমি যদি থানা-পুলিশ করো—মামলা টিকবে না, উল্টে সে তোমার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ঘুচিয়ে দেবে। এক পয়সা খরচও দেবে না—তুমি আইনেও কিছু আদায় করতে পারবে না। সে তোমার পেটের মেয়ে নয়। আর এসব যা-কিছু দেখছ তার নিজের রোজ-গার এতে তোমার জোর কিছু নেই।'

এই বলে—সম্ভবত যেটুকু তাকে মুখস্থ করানো হয়েছিল সেইটুকু বলা শেষ করে—আর একমুহূর্তও দাঁড়াল না, কোন কুশল প্রশ্ন বা বিদায় সম্ভাষণেরও চেষ্টা করল না—চিঠিখানা কেউ তার হাত থেকে না নেওয়াতে সেই চলনেই মেঝের ওপর ফেলে রেখে দ্রুত বেরিয়ে গেল। সেও স্ত্রীলোক, পয়সার জন্যেই এ-কাজ করতে এসেছে। এই আঘাতের প্রতিক্রিয়া দেখার তার প্রয়োজন বা রুচি কোনটাই ছিল না।...

নিস্তারিণী আর একটি কথাও বলল না। তার এতক্ষণের সমস্ত দাপাদাপি চেঁচামেচি যেন কোন্ মন্ত্রবলে নীরব হয়ে গেল। একটা সামান্য কথা,—গুটি চার-পাঁচ মাত্র শব্দের যে এতখানি ক্ষমতা, এমনভাবে যে সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করে নিতে পারে, তা এর আগে নিস্তারিণী কখনও অনুভব করেনি। [illegible] কখনও কখনও

প্রদীপের শিখা যখন দপ্ করে নিভে যায়, তখনও দু-এক মুহূর্ত তার সলতের আগুনের শেষ একটু চিহ্ন লেগে থাকে. নিস্তারিণীর পূর্ব শক্তির সেটুকুও বোধ করি অবশিষ্ট ছিল না। সে যেন এক নিমেষে কোন্ তপস্বীর অভিশাপে বা কোন ডাকিনীর যাদুমন্ত্রে পাথর হয়ে গিয়েছিল। তেমনি নিশ্চল, তেমনি নীরব। শুধু পাথরের মূর্তিরও যে শক্তি থাকে, তার পাদুটোর যে বহন-ক্ষমতা—সেটা ছিল না। প্রথম দু-তিন মিনিটের স্তম্ভিত অবস্থা কাটতেই পাদুটো কাঁপতে শুরু করল। চন্দনের আলো-আঁধারিতে ঝি অতটা লক্ষ্য করেনি, ভাড়াটে বৌটি দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি জড়িয়ে ধরল। নইলে পাথর বা কাঠের মতোই আছড়ে পড়ত।

কিন্তু ততক্ষণে একেবারেই অশক্ত হয়ে গেছে নিস্তারিণীর পায়ের পেশী, সম্পূর্ণ অসাড় হয়ে গেছে তার স্নায়ু ও মন—পাথরের মতোই ভারী হয়ে উঠেছে দেহটা। বৌটি ক্ষীণজীবী মানুষ, তার পক্ষেও সে-বোঝা সামলানো সম্ভব নয়। দুজনেই পড়ে যেত জড়াজড়ি করে হয়ত—'ও ঝি ধরো ধরো, করে চেঁচিয়ে উঠতে, ঝিও ওদিক থেকে ধরে ফেলে কোনমতে আস্তে আস্তে সেইখানেই শুইয়ে দিল। ধরাধরি করে ভেতরে নিয়ে যাওয়া বা বিছানায় শোওয়ানো সম্ভব হল না—কারণ নিস্তারিণী ততক্ষণে মূর্ছিত হয়ে পড়েছে।

[সুরোদি তাঁর কাহিনীর এই অংশে এসে লজ্জিত হয়ে পড়েছিলেন খুব। আমার পায়ে হাত বুলোতে বুলোতে অপ্রতিভ কণ্ঠে বলেছিলেন, 'কাজটা ভাল করিনি। আজ বুঝি। এতবড় আঘাত দেওয়া উচিত হয়নি মাকে—বিনা অপরাধে। আমার মা গর্ভধারিণীর বেশী ছিলেন, আরও বেশী ঋণী আমি তাঁর কাছে; যমের মুখ থেকে ছিনিয়ে এনে বাঁচিয়ে ছিলেন।'

. তারপর নিঃশব্দে খানিকটা মালা জপ করার পর ঈষৎ কেঁপে-যাওয়া গলায় বলেছিলেন, 'ঠিক আমি এসব বলতে বলিওনি। শিখিয়েও দিইনি। উনিই গড়েপিটে তৈরী করে পাঠিয়েছিলেন। রাজাবাবু। আসলে কি জানিস, উনি তো পাকা লোক, থানাটানা সব জায়গায় আটঘাট বেঁধে কাজ করেছিলেন। ওদের থানায় যাওয়ার খবর সকালেই পেঁছে গিয়েছিল। আর কিছু নয়, মাসীও ছিল তো ঐদিকে, একটা উকিল খাড়া করে থানা-পুলিশ টানাটানি করা খুব আশ্চর্য ছিল না। তেমন চাপ দিলে পুলিশ কিছু চুপ করে থাকতে পারত না—একটা কিছু করতে হতই শেষ অবধি। অবিশ্যি হত না কিছুই. তবু একটা জানাজানি চিটিক্কার পড়ে যেত তো। হয়ত খবরের কাগজেও লিখে দিত। ও'র খুব শখ ছিল সরকারের কাছ থেকে সত্যিকারের রাজাবাহাদুর খেতাব পাবার—যদি ইংরিজী কাগজে লেখালেখি হয়, এই-রকম কেচ্ছা খিটকেলের খবর বেরোয়, তো আর সে-আশা থাকবে না। এই ভেবেই উনি আরও ভয় দেখাবার জন্যেই বলেছিলেন কথাটা—আঘাতটা কতখানি লাগবে, অত বোঝেননি।'

প্রশ্ন করেছিলুম সুরোদিকে, 'তা আপনার জন্মবৃত্তান্ত ওরই মধ্যে উনি জানলেন কি করে?'

'এই দ্যাখো বোকারাম! তার আগে যে নিত্যি গিয়ে দেড়ঘণ্টা দুঘণ্টা ধরে গপ্প করতেন—কী এত কথা হত বল। এই সবই বলেছি।... হ্যাঁ, সেদিক দিয়ে আমার দায় ছিল খানিকটা। আমিই আসল দুষী তাতে আর সন্দ কি! আমি যদি ওসব বলতে বারণ করতুম, তাহলে আর অতটা লাগত না। থানা পুলিশ কিছু একদিনেই হত না, তেমন দেখলে নিজে গিয়েও বুঝিয়ে বলতে পারতুম, হাতে পায়ে ধরে থামিয়ে দিতে পারতুম। তখন অতটা মাথায় যায় নি।... আহা, মা নাকি জ্ঞান হবার পর ঐ কথাই সবপ্রথম বলেছিল, তখনও নাকি ঠিক হুঁশ হয় নি—কে বসে আছে কে বাতাস করছে কিছু জানেও না। নানুদা এসে গিয়েছিল। নানুদাই নাকি স্মেলিং সল্ট্ না কি নাকের কাছে ধরে, মাথায় মুখে জল দিয়ে বাতাস করে জ্ঞান ফিরিয়েছিল—নানুদার কাছে আমার অনেক দেনা—তা ওর কাছেই শুনেছি, তখনও চোখ বোজা—প্রথম সহজ নিঃশ্বাস পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই, যেন চুপি চুপি বলেছিল. 'আমি তোর মা নই, তুই আমার পেটের মেয়ে নোস! আমি যে—আমি যে যমের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে এসে তোকে মানুষ করেছি রে! পেটের ছেলেকে অত করিনি—যত তোকে করেছি। তুই বললি এই কথা! বলতে পারলি!'

তারপর. আরও খানিকটা চুপ করে থেকে সুরোদি বলেছিল, 'ঠিক এমনি ধারা করেছিল আর একজন—খুব বড় অ্যাকট্রেস। এখনও বেঁচে আছে. তার নাম বলব না—এক ডাকে বাংলাদেশের লোক চিনবে, তখনও নাবালক,—পীরিতের বাবুর সঙ্গে পালিয়ে গেছল মাকে ফেলে—চাকরি ফেলে, মনিবদের ডুবিয়ে। মা নালিশ করেছিল সেই বাবুর নামে—তা মেয়ে নাকি এমন সাক্ষী দিয়েছিল যে মার হাতে দড়ি পড়ার জো।... শুনেছি, সত্যি মিথ্যে জানি না—মা শাপ দিয়েছিল, "হে ভগবান—ওর মেয়ে দাও, ওর মেয়ে হোক, বুঝুক আমার কি জ্বালা!" তা মেয়ে নাকি হয়েও ছিল, বুঝেও ছিল। ..কিন্তু আমার মা আমাকে কোন শাপমন্যি দেয় নি—একটা কথাও বলে নি আর। এমনও বলে নি যে ভগবান এর বিচার করবেন। সেই জন্যেই তো আরও কষ্ট হয় এখন—যখন ভাবি তখন নিজের গালে মুখে চড়াতে ইচ্ছে করে।'

আমি আস্তে আস্তে বলেছিলুম, 'কিন্তু শাপমন্যি কি সব সময় মুখ ফুটেই দেয় মানুষ? মা বলেন যে মুনির শাপ আর মনস্তাপ দুই-ই সমান। মনের কষ্ট যা তা ঠিকই বাজে, কিছু বলুক না বলুক!'

'বাজেই তো, ঠিকই বলেছিস।' সুরোদিও সায় দিয়েছিলেন, 'মারও কি কম বেজেছিল। মার মতো লোক একেবারে চুপ হয়ে গিয়েছিল কি আর যে-সে আঘাতে,—যার এতটুকুতেই চেঁচিয়ে সোরগোল তুলে হাট বাধিয়ে তোলা অভ্যেস।'

সুরোদি সেই আধো-অন্ধকারেও যেন মাথা তুলতে পারছিলেন না লজ্জায়। খানিক পরে গাঢ় কণ্ঠে বললেন, 'নানুদা আমার অনেক করেছে, মিছে কেন বলব—সে শুনতে আসছে না তার ধম্ম শুনছে।... ঐ খবরটা দেবার খোঁটাটাও মার খুব লেগেছিল। ভাল করে জ্ঞান হবার পর যখন সব আবার মনে পড়েছিল—মা নাকি ওখানে আর জলবিন্দু স্পর্শ করতে চায় নি। নানুদাই বুঝিয়ে বলেছিল, জননী বলত তো, বলেছিল, "জননী, কুপুত্র যদ্যাপি হয়, কুমাতা কদাচ নয়।... কার ওপর রাগ করছ বেটি, ওসব কি সে বলেছে? পীরিতে পাগল হয়ে যায় শোন নি? পাগল না হলে কেউ এ কাজ করে? তুমি যদি ওর ওপর রাগ কর মা, ওর যে সব্বনাশ হয়ে যাবে। এ কাজ করো না—তোমারও এ অভিমান থাকবে না, ও তোমার বুক জুড়ে আছে, গণেশের বুড়া, তা কি আর আমি জানি না! ...ছিঃ! ও পাগল হয়েছে বলে তুমিও পাগল হবে! ওঠো, রাঁধো খাও। সে ঠিক আবার এসে একদিন পায়ে পড়বে। তখন কিছু ঠেলতেও পারবে না। মিছিমিছি এ মন্যিতে যদি তার অনিষ্ট হয় সে আরও বাজবে।" ...তা নানুদার কথাতেই কাজ হয়েছিল, নানুদা নিজে খাবে বলে বাজার করে দিয়ে জোর করে রাঁধিয়েছিল।... অবিশ্যি তার পর এসে আমাকেও যাচ্ছেতাই করেছিল খুব, ও'র সামনেই। উনি জানতেন তো ওকে, আমার মুখে শুনেছিলেন ওর সব কথাই—তাই রাগ করেন নি, বরং মাপই চেয়েছিলেন।.. নানুদা মহাপ্রাণ লোক।... মনে হয় এমনি দুনিয়ার কল্যেণ করবে বলেই অমন ধারা আধপাগলার মতো ঘুরে বেড়াত'...

বলতে বলতে সুরোদির চোখে জল এসে গিয়েছিল। সেদিন আর কিছু বলতেও পারেন নি। আমিও আর কথা বাড়াই নি। বুঝেছিলুম, উনি সেই সুদূর অতীতে চলে গিয়েছেন, স্মৃতির অতলে ডুব দিয়ে সেদিনের সেই সুখদুঃখের আস্বাদ করছেন আবার নতুন করে। এ এক ধ্যান-মূর্তি ও'র। এখন ব্যাঘাত করা ঠিক হবে না।]

(ক্রমশঃ)

এখনো কবিতা কেন

লোকনাথ ভট্টাচার্য

একটা যুদ্ধ শেষ হ'ল, আরো অনেক আছে—আরো পথ, মরু,
হোঁচট খাওয়া, রক্ত ঝরা, আর কাঁধে বোঝা, আর তৃষা—
নাগিনীর নিশ্বাস তো আছেই।

ভেবে শংকিত নই—আমার গানও অফুরন্ত, অনন্ত পান্থশালার
জন্য। আবার যাত্রার আগে দু দণ্ড পা ছড়িয়ে বসা, একে অন্যকে
একটু ভাই ব'লে ডাকা, পান সঞ্জীবনীর।

ও নেহাৎই বোকার মত হাসা—হাসি, কারণ আসলে বাঁচতেই
আসি পৃথিবীতে, বাঁচবও, যুদ্ধ তো শেষ হবেই একদিন—
সকলের অবান্তর কলরব কখনো বা সহসা, গান।

আবার ঘর বাঁধার ডাক যেদিন পড়বে—পড়বেই—সন্ধ্যাতারার
আলোয় যেন ধরি চিবুক মনের মানুষের, যেন তখন কথা না
ভুলে যাই। জীইয়ে রাখতে চাই কথার চাহিদাটাকে—চলার
বলার সময় নেই।
তুমি জানতে চাওনি জানি, আমি বলছিলাম শুধু নিজেরই
একটা প্রশ্নের উত্তরে : এখনো কবিতা কেন।

চলো, বোঝা নাও কাঁধে সৈনিক, উঠে পড়ার সময় হ'ল।

তুমি

গণেশ বসু

কপালে তোমার বিদায়ের কুঙ্কুম
সহসা মেটালো সঞ্চিত আত্মকৃতি,
দুচোখে তোমার জ্যোৎস্নার মরসুম
জ্বলে পুড়ে যায় এদিকে অমরাবতী

কতো সহস্র স্বপ্নালু অভিমান
ফুলে উঠেছিলো ছন্দে সগৌরবে
সেদিন হাওয়ার শত সুরের গান
ভুলেছিলো বুঝি অনাদরে অনুভবে :
কোনো কিছুতেই হারাবার নেই ডর
চারিদিক থেকে এমন প্রতিশ্রুতি
ভিড় করেছিলো উল্লাসে দুর্জয়
অন্ধ প্রাচীরও অনায়াসে পায় দ্যুতি।

হাঁ-মুখ শাঁতের চৌচির প্রান্তর
কেন নিয়ে এলে তবে এই করতলে
বাঁকানো ফণার মেঘবিদ্যুৎঝড়
তছনছ করে নিলে কেন কৌশলে,
চরাচর ব্যেপে দুঃসহ বিদ্রূপ
অবশেষে দেখি এনেছে বিপর্যয়
তাকালে এখন ঘৃণা শতঘ্নী রূপ
হু হু করে জ্বলে নির্বাক পরাজয়।

দূরভাষী আজ বিদেশিনী তবু বলো
প্রবাসে প্রবল হবে কি বিস্মরণ,
হৃদয় এদিকে স্মৃতিভারে টলোমলো
[illegible] [illegible] লিখিত [illegible]।



অঙ্গনা

প্রমীলা

মাকে ফিরিয়ে দাও

ছোট্ট শিশুর দল হয়ত সমবেত কণ্ঠে একদিন দাবী জানিয়ে বসবে, ফিরিয়ে দাও আমার মাকে। কিন্তু মায়ের পক্ষে ফিরে আসা সম্ভব নয়। তিনিও চান শিশুসন্তানের কাছাকাছি থাকতে তবু পারেন না। সংসারের প্রয়োজন তাঁকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে শিশুর কাছ থেকে দূরে। তিনি দশটা-পাঁচটার মূল্যবান সময়টুকু কাটিয়ে আসেন অফিসে। শিশুর কাছে এ সময় মায়ের অনুপস্থিতি বড় বেদনাদায়ক। মায়ের পক্ষেও হয়ত তাই। দুয়েরই চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসার মত করুণ অবস্থা। শিশু কিছুই বোঝে না কিন্তু মায়ের অভাব খুব বোঝে। আর মা সারাদিন শিশুর চিন্তায় তন্ময় হয়ে রইলেন—তাঁকে দিয়ে সেই মুহূর্তে অফিসের কাজ খুব বেশি একটা এগোয় না। অথচ এরকম গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সহানুভূতি পাওয়া যায় নি প্রায় কোন তরফ থেকেই। শিশুকে প্রায় অনিশ্চিতের হাতে সমর্পণ করে মা চলে আসছেন সংসার চালানোর তাগিদে। মায়ের চাকরি করার কি দরকার? একথার জবাবে তিনি গম্ভীর হয়ে উত্তর দেন, ওঁর একার রোজগারে সংসার চালান সম্ভব নয়। বাধ্য হয়ে তাই আমাকে আয় বাড়ানোর ফিকির করতে হয়েছে — চাকরি নিয়ে সংসার থেকে প্রায় নির্বাসিত হয়ে বসেছি। সকলের কথা ভাবি, সব চিন্তা করি এবং নিতান্ত অসহায়ের মত কারও জন্য কিছু করে উঠতে পারি না। অফিস আমাকে সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করে ফেলেছে—সংসারের কথা তাই বেশি ভাবতে পারি না। একটা বাউন্ডুলেপনা আমাকে আশ্রয় করেছে। তবু সন্তানের কথা না ভেবে পারি না। মা হয়ে এই চিন্তাটা স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে। আর তখনই সব গোলমাল হয়ে যায়। এমনিভাবে অনিশ্চিত পথ ধরে এই শিশু ভবিষ্যতে দাঁড়াবে কোথায়! অথবা ভেসে যাবে গড্ডলিকাপ্রবাহে। মায়ের চিন্তা দুর্বার হয়। তিনি তখন বলেন, তার চেয়ে শিশুর দল একবার চেঁচিয়ে উঠুক, ফিরিয়ে দাও আমার মাকে।

মায়েরাও শিশুকে নিজের তত্ত্বাবধানে মানুষ করার জন্য এমনি সোচ্চার হয়ে উঠুক না। শিশুদের আধ আধ কণ্ঠে যা অস্পষ্ট শোনাবে তা স্পষ্ট এবং মুখর হয়ে উঠবে মায়েদের কণ্ঠে। মায়ের ব্যাকুলতা এবং শিশুর আকুলতা যুক্ত হলে তখন একটা পথ পাওয়া যাবেই। আর এ ব্যাপারে দায়িত্ব তো সকলেরই রয়েছে। নিষ্কৃতি কারও নেই।

দেশের পক্ষে প্রতিটি নতুন আগন্তুকই সাদর আমন্ত্রণের পাত্র: তাই মায়ের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ এবং রাষ্ট্র কেউ তা এড়িয়ে যেতে পারে না। দেশে দেশে এজন্য কত না আয়োজন। আগন্তুকের অভ্যর্থনার অন্ত নেই। আর তাছাড়া মায়েদের কাজ করা প্রতিটি দেশের পক্ষে অপরিহার্য। এ সত্য স্বীকার করে নিয়ে সবাই তাই সজাগ হয়েছেন। কর্মী মায়ের সন্তানের পরিচর্যা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সে সব দেশে গড়ে উঠেছে বেবী ক্রেশ। মায়ের অনুপস্থিতিতে সন্তান সেখানে থাকে এবং তার উপযুক্ত যত্ন নেবার ব্যবস্থাও আছে। সোভিয়েতে বিভিন্ন শিল্পসংস্থা ও জেলা কর্তৃপক্ষ শিশুদের ক্রেশ চালিয়ে ব্যাপকভাবে এই বিষয়ে ব্যবস্থা করেন। মায়ের বাইরের কাজের সময়টুকুতে এবং শিশুর যত্ন নেবার ব্যবস্থা করে মাকে সমস্যামুক্ত করে। এর ফলে মাও নিশ্চিন্তমনে কাজ করতে পারেন।

ক্রেশের ব্যবস্থা বেশ সুন্দর। কাজে বেরোনোর মুখে মা তার শিশুকে ক্রেশে দিয়ে যান। এখানে শিক্ষণপ্রাপ্ত নার্সের

হাতে থাকে শিশুর দায়িত্ব। কাজের অবসরে সন্তানকে নিজে পরিচর্যা করার কিছুটা সময়ও মা পান। এই সময় মা তার শিশুকে দেখতে আসেন। তারপর কাজের শেষে তাকে বাড়ি নিয়ে যান।

অবশ্য প্রয়োজনবোধে শিশুদের সারা সপ্তাহব্যাপী রেখে রাখার মত ক্রেশও রয়েছে। সপ্তাহান্তে তাকে সেখান থেকে নিয়ে আসা যায়। বহু সন্তানের জননী বা স্বামীহীনা জননীদের সুবিধার জন্য এ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। যদিও ক্রেশ পরিবারের কোন বিকল্প নয় তথাপি মা-বাবা এতে অনেকটা স্বস্তিবোধ করেন।

সর্বাধুনিক জ্ঞান ও কর্মপ্রণালী এবং উচ্চতর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই ক্রেশে শিশু পরিচর্যার পদ্ধতি গড়ে উঠেছে এবং প্রত্যেকটি ক্রেশ ও কিন্ডারগার্টেনকে তা মেনে চলতে হয়।

প্রাক-বিদ্যালয় বয়সের শিশুদের জন্য প্রতিষ্ঠানগুলিতে শুধু যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদেরই নিযুক্ত করা হয়। প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের মধ্যে একজন করে মেডিক্যাল পরিদর্শক থাকেন। তিনি রোগ প্রতিরোধের জন্য ও অন্যান্য ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বনের জন্য প্রতিটি শিশুকে পরীক্ষা করেন।

যদি কোন শিশু অসুস্থ হয়ে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে মাকে কাজ থেকে ডেকে পাঠান হয় এবং শিশুটিকে অবস্থা বুঝে হয় বাড়িতে না হয় হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সারা দিন-রাত ধরে যে সমস্ত ক্রেশ চলে সেখানে রুগ্ন শিশুদের আলাদা ওয়ার্ডে রাখা হয় এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।

• দু মাস থেকে তিন বছর বয়স্ক শিশুদের ক্রেশে নেওয়া হয়। তাদের মায়েদের ক্রেশের রুটিন সম্পর্কে যথাযথ অবহিত করান হয় এবং যাতে বাড়িতেও শিশুর পরিচর্যা সেই রুটিন অনুযায়ী চলে সেজন্য তাদের সবকিছু বুঝিয়ে দেওয়া হয়। নতুন যুগের ব্যবস্থাদি সম্পর্কে শিশুকে অভ্যস্ত করাবার ব্যাপারে এবং তার বিকাশের জন্য যতদূর সম্ভব সুব্যবস্থার জন্য এটা অবশ্য কর্তব্য।

ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে কাজের অবসরে কিছুক্ষণের জন্য মাকে ছুটি দেওয়া হয় সন্তানের সঙ্গে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে। এই সময় মা নিজে সন্তানের পরিচর্যা করেন। শিশুদের খাদ্যের ব্যবস্থা ক্রেশে থেকেই করা হয়।

শিশুদের যথোপযুক্ত বিকাশ ও লা.েনর জন্য সমস্ত প্রকার সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থাদিসহ উপযুক্ত মানের নক্সা অনুযায়ী ক্রেশ ও কিন্ডারগার্টেনের বাড়ি-ঘর তৈরী করা হয়। যথোপযুক্ত মানের পরিকল্পনায় বড় শোবার ঘর, শিশু ও মায়ের মিলনের জন্য আলাদা ঘর এবং হামাগুড়ি দেয়, উঠে দাঁড়ায় ও হাঁটে তাদের জন্য বিশেষ জায়গার ব্যবস্থা করা হয়। যারা নতুন হাঁটতে শেখে তাদের জন্য প্রচুর খেলনাসহ খেলার জায়গা, স্বাস্থ্যকর খেলাধুলার ও সঙ্গীতশিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। এখানে শিক্ষকরা তাদের পিয়ানো বাজিয়ে শোনান, ছড়া বলতে শেখান, গান গেয়ে শোনান।

প্রতি গ্রীষ্মকালে শহরের ক্রেশগুলি সারা মরশুমের জন্য তাদের শিশুদের গ্রামাঞ্চলে নিয়ে যায়। খুব ছোট শিশুরা ও যারা নতুন হাঁটতে শেখে তারা বেশির ভাগ সময় খোলা জায়গায় কাটায়। আবহাওয়া অনুকূল থাকলে খোলা জায়গায়ই ঘুমায়।

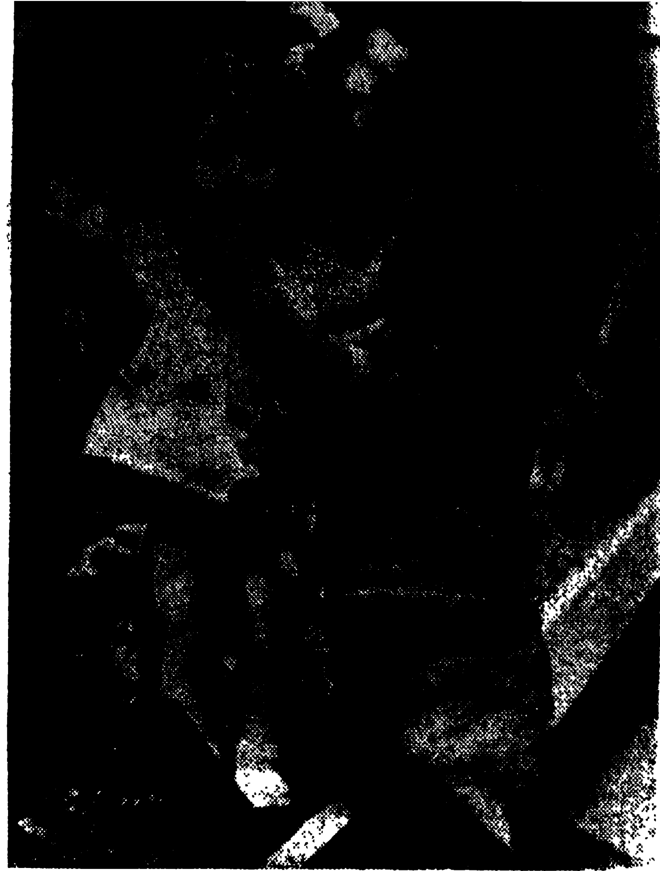
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এ রকম সুযোগ শিশুকে দেওয়া প্রত্যেক পরিবারের পক্ষে সম্ভব নয়। অথচ শিশুর উপযুক্ত বিকাশের জন্য এ রকম ব্যবস্থার দরকার।

তিন বৎসরের শিশুকে সাধারণত কিন্ডারগার্টেনে পাঠানো হয়। অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্রেশের সঙ্গেই কিন্ডারগার্টেন থাকে এবং এ-ক্ষেত্রে সাত বছর বয়সে তার স্কুল যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত শিশুকে দেখাশোনা করা হয়।

শিশুর ক্রেশে থাকার ব্যয়ভারের এক-পঞ্চমাংশ বহন করেন মা-বাবা। পরিবারের পোষ্য সংখ্যা বেশি হলে অনেক সময় দেয় অর্থের পরিমাণ হ্রাস করা হয়, অনেক সময় মকুবও করা হয়। অবশ্য স্বামীহীনা জননীকে কিছু দিতে হয় না।

তাছাড়া মাঠে বেশি কাজের সময় মরশুমী ক্রেশের ব্যবস্থা আছে। যৌথ-খামারের কৃষকদের সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে এগুলি খোলা হয়, খামার থেকেই তার ব্যয়ভার বহন করা হয়।

এইভাবে শিশুদের ভবিষ্যতের সুনাগরিক করে গড়ে তোলা হয়। সন্তানের জন্য মাকে ভাবতে হয় না। কিন্তু আমাদের মায়েরা সাংসারিক প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে চাকরি করেন আর এদিকে শিশুর ভাবনায় অস্থির হন। এ দোটানায় পড়ে তাঁরা হাসফাঁস করেন। আমাদের দেশে এরকম ক্রেশের ব্যবস্থা করলে মা শিশুর জন্য নিশ্চিন্ত হয়ে শান্তমনে চাকরি করতে পারবেন। কিন্তু সেদিন কতদূরে?



ছোট্ট শিশু। কিন্তু মাকে ছেড়ে মোটেই নিঃসঙ্গ নয়

নারী শিক্ষা সমিতি



একটা প্রায় নির্জন গলির প্রান্তে শেষে অবস্থিত সেই বাড়ীটা খুঁজে পেতে একটু কষ্ট হলো। ভিতরে ঢুকে গেলাম। এ হলো কলকাতার সবচেয়ে পুরোন সমাজসেবা প্রতিষ্ঠান। লেডি অবলা বসুর যুগ যেন আটকা পড়ে গেছে এই 'বিদ্যাসাগর বাণী ভবনের' প্রতিটি রন্ধ্রে-রন্ধ্রে।

"এই সযত্নে লালিতা মানসকন্যাটি ৫৮ বছরে পদার্পণ করেছেন"—বললেন শ্রীমতী অমিয়া দেবী ... 'নারী শিক্ষা সমিতি'র সবচেয়ে প্রৌঢ়া সদস্য। "সে আজ কতদিন হল, লেডী অবলা বসু যখন এ'র সৃষ্টি করলেন। এ'র সঙ্গে সঙ্গে আমিও দেখলাম কত কালের বিবর্তন, সমাজ ও রাজনীতির ক্ষেত্রে কত পরিবর্তন!"

প্রধানত, অসহায় ও নিরাশ্রয় বিধবাদের কথা চিন্তা করেই লেডি অবলা বসু এটি স্থাপন করেন। স্ত্রী শিক্ষা প্রচার ছিল তাঁর কাছে আরেকটি অতি অবশ্য পালনীয় সামাজিক কর্তব্য।

কাজেই 'নারী শিক্ষা সমিতির' আশু কর্তব্য হলো বাংলাদেশে, বিশেষ করে বাংলার পল্লীগ্রামে এমন শিক্ষার ব্যবস্থা করা যাতে কুমারী মেয়েরা বিয়ের পর নিজেদের পরিবারবর্গকে সুখী ও নিশ্চিন্ত করতে পারে। এইভাবে নিজেদের সংসারে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারলে তাদের বিবাহিত জীবন অনেক বেশী সাফল্যমণ্ডিত হবে। বিবাহিতা মহিলা ছাড়া বিধবারাও এই শিক্ষার দ্বারা নিজেদের চারপাশে এক-একটি শান্তির নীড় রচনা করতে পারবেন। আর্থিক সংকটের স্রোতে তাঁদের আর খড়কুটোর মত ভেসে যেতে হবে না। শিক্ষয়িত্রী, ধাত্রী, শিল্পী, যাঁর যেমন যোগ্যতা ও অভিরুচি, তিনি সেইভাবে জীবিকা অর্জন করে আর্থিক স্বচ্ছলতা লাভ করতে পারবেন। সমাজে মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারবেন।

এই আদর্শকে বাস্তবে রূপ দিতে সমিতির প্রয়াস তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়, শিক্ষা বিস্তার, শিক্ষয়িত্রী গড়ে তোলা এবং আর্থিক বিপর্যয় দূর করে বৈষয়িক উন্নতিসাধন।

সেই অনুসারে সমিতির সর্বপ্রথম কাজ ছিল শহরে ও গ্রামে, বিশেষ করে গ্রামে, প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা। এই বিদ্যালয়ের বর্তমান সংখ্যা বড় কম নয়। এছাড়া রয়েছে 'বাণী ভবন জুনিয়র হাই স্কুল'। কলকাতা 'বাণী ভবনে' এই দুটি মিলিয়েই হচ্ছে 'লেডী অবলা বসু উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়'। এখানে প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার ব্যবস্থা আছে।

'বাণী ভবন প্রি-বেসিক নার্সরী স্কুলে দু'বছর থেকে ছ'বছর পর্যন্ত শিশুদের নেওয়া হয়। ঝাড়গ্রামেও অনুরূপ শিশু-শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে।

ঝাড়গ্রামে অবস্থিত 'বাণী ভবনের' আরও কয়েকটি বিভাগ রয়েছে। 'শিল্প বিভাগে নানা প্রকারের সূচীশিল্প, এমব্রয়ডারী, টেলারিং ও কাটিং, পুতুল তৈরী এবং তাঁতের কাজ প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়। অন্য অনেক সমাজ সেবা প্রতিষ্ঠানের মত এখানেও 'লেডী ব্রাবোর্ণ ডিপ্লোমার' প্রস্তুতি কোর্স আছে। 'ক্রাফ্ট সেন্টারে' বাটিক, চামড়ার কাজ, অয়েল পেন্টিং ও উপরিউক্ত অন্যান্য বিষয়গুলি শেখান হয়। বয়স্কা নিরক্ষরদের জন্য রয়েছে 'বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র', যেখানে অক্ষর পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা শেখেন ভূগোল, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি। অন্যান্য জেলার গ্রামে গ্রামেও এ রকম বয়স্ক শিক্ষা-কেন্দ্র আছে। সুতাকাটা, সূচীশিল্প, নিত্য ব্যবহারের পোষাক-পরিচ্ছদ তৈরী করতে

শেখা, এসবও বাদ যায় না। শিক্ষিকা শিক্ষণেরও ব্যবস্থা রয়েছে এখানে।

বিধবাদের শিক্ষাদানে প্রেরণা জোগাবার জন্যই এই প্রতিষ্ঠানের সূচনা হয়। কিন্তু এখন কুমারী ও সধবারাও এতে যোগদান করতে পারেন। আছেনও অনেকে।

কলকাতার 'বাণী ভবনে'ও রয়েছে অনুরূপ একটি 'শিল্প ভবন', যেখানে সূক্ষ্ম ও রুচিসম্পন্ন নানারকম শিল্পকর্ম শেখান হয়। এখানেও ছাত্রীকে সংসারের দৈনিক প্রয়োজনীয়তা মেটাবার উপযোগী করে তোলা হয় এবং পঞ্চম শ্রেণী অবধি সাধারণ শিক্ষা দেওয়া হয়।

দোতলার একটি বিরাট হলঘরে দেখলাম প্রায় একশোটি মেয়ে কয়েকটি ভাগে ভাগ হয়ে বসে আছেন। প্রত্যেকের হাতেই কিছু না কিছু হাতে তৈরীর কাজ। এ'দের মধ্যেই রয়েছেন অমিয়া দেবী। কয়েকজন খুব মন দিয়ে লেডি ব্রাবোর্ণ ডিপ্লোমার জন্য তৈরী হচ্ছেন।

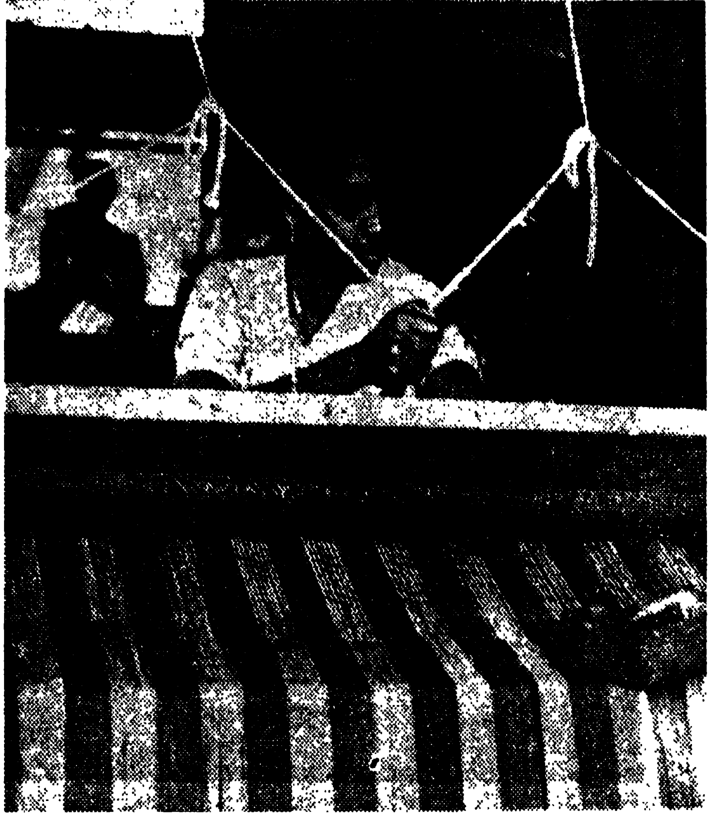
বিরাট বাড়িটির চারধারে ঘুরে ঘুরে দেখলাম। ছোট্ট একটা বাগানও রয়েছে, ফুলের সম্ভার নিয়ে। অনেক দালান ও বারান্দা পেরিয়ে গেলাম নীচের তলায়। সেখানে একটি ঘরে প্রায় ১৫।২০টি তাঁত একটানা বুনে চলেছে স্বিধারা সুতো দিয়ে রং-বেরংয়ের ডিজাইন।

অয়েল পেন্টিং শেখানোর প্রচেষ্টা এত ব্যাপকভাবে চলেছে যে ভাবিষ্যৎ শিক্ষায়ত্রীরা তাঁদের টিন ও বোতল নিয়ে ভীষণভাবে কাজে ব্যস্ত। ঘরে তাঁদের অনেকেরই স্থানাভাব ঘটেছে। আলমারীগুলি বোঝাই হয়ে রয়েছে এইসব কাজের নিদর্শনে। ছেঁড়া কাগজের পুতুল, মাটির ফল, খোদাই-করা ডিজাইনসহ চামড়ার ব্যাগ, সুদৃশ্য ফুলতোলা কাজ করা টেবিলক্লথ, সবই আমার কাছে নিখুঁত বলে মনে হল।

প্রতি বছর ৩০।৩৫ জন ছাত্রী ট্রেণিং পাশ করে চাকুরীতে নিযুক্ত হয়, এই সব কেন্দ্র থেকে। গড়ে ৭।৮টি ছাত্রী ডিপ্লোমা পাশ করে উপার্জনক্ষম হয়। কলকাতার 'সিনিয়র ট্রেণিং কলেজে'ও শিক্ষকতাব কার্যে 'বাণী ভবনে'র ছাত্রীদের বিশেষভাবে উপযুক্ত করে তোলা হয়।

নিম্ন বুনিয়াদী ও প্রাক বুনিয়াদী স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের, শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ

কর্মরত জনৈক নারী



হবার পরে, উচ্চশিক্ষার জন্য উৎসাহিত করা হয়।

"যথাসাধ্য তো আমরা করছি, দেখতেই পাচ্ছেন", বললেন শ্রীমতী অমিয়া দেবী, তবে আগের মত সাফল্য আর অর্জন করতে পারছি না। অবলা বসুর সময় আরও কত সহজ ও সুন্দরভাবে আমাদের প্রতিটি বিভাগ চলত। এখন সরকারী সাহায্য আগের মতন পাই না। আমাদের নিজেদের তৈরী জিনিস বিক্রী করে সমিতির যে লাভ থাকে তাই আমাদের প্রধান সম্বল হয়ে দাঁড়িয়েছে। আয়ের আর বিশেষ কোন পথ খোলা নেই। এতগুলি কেন্দ্র চালনার পক্ষে এ অতি সামান্য। টাকার অভাবে জিনিসও তেমন তৈরী করতে পারি না। অর্ডারও তেমন আসে না। সরকার যদি আগের মত আমাদের দিকে একটু দৃষ্টি দিতেন তবে সব ব্যাপারে খুব সুবিধা হতো।"

আরেকটি বিষয় নিয়ে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করলেন, বর্তমানে টিচার্স ট্রেণিং পরীক্ষা শুধু গ্র্যাজুয়েটদের জন্য অথচ আমাদের ছাত্রো বেশীর ভাগ আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েট। উচ্চশিক্ষা লাভের আর্থিক সংস্থান তাদের নেই। তাই সরকারকে অনুরোধ করেছিলাম ঐ নিয়ম কিঞ্চিৎ শিথিল করতে। কিন্তু কিছুই লাভ হল না।"

'নারী শিক্ষা সমিতির' সমাজ-সেবা, তার নানা বিষয়ে সাফল্য ও আত্মত্যাগ, তার কর্মনিষ্ঠা ও সমস্যার কথা ভাবতে ভাবতে বাড়ির পথ ধরলাম।

রত্না চক্রবর্তী



কন্যা রবিবারের সূর্য

ব্রজমাধব ভট্টাচার্য

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সত্য কথা যে, মদের বোতল, টাকা এবং কিছু কিছু সৌখিন ঘুষ পেলে এরা এগিয়ে আসে, হাসে, কথা বলে, সামাজিকতায় তৎপর হয়। তখন ছবি তোলা চলে; সঙ্গে বসে খাওয়া-দাওয়া, প্রয়োজনমতো আরো অনেক কিছু চলে। কিন্তু তবু তোলেও সত্য কথা যে, এরা যেন কিছুতেই আত্মীয় হয়ে উঠতে পারে না। এদের যেন [illegible] আত্মাই নেই।

যখনই গেছি এইসব [illegible] পৌঁছবার অনেক আগে থেকেই এরা খবর পেয়ে গেছে। খবর পেয়ে 'সাবধান' হয়ে গেছে; হয়ে গেছে অস্বাভাবিক, শক্ত, কঠোর। দুর্দম একটা মনোভাবে নৃশংস হয়ে উঠেছে যেন আকাশ-বাতাস। [illegible] মানুষ নেই; মানুষ আছে মন নেই; [illegible] আছে সরল-সহজ আত্মীয়তাবোধটি নেই।

ওদের কেবল লোকে 'দেখে' আর দেখে। ব্যবস্থার ভেতরে, সরঞ্জামের ভেতরে, পরিদৃষ্ট, নির্দেশিত, নিয়মিত [illegible] মধ্যে সীমিত একটা 'দৃশ্য' দেখে। [illegible] বাধ্য, বড়ো করুণ সেই বিধ্বস্ত-কথা দেখা। 'রজার্স' দেখা আমার ভালো লাগেনি।

ডোমিনিকায় সত্যি বলতে 'দেখার' কিছু নেই। ওখানে থাকার সময় লিজি [illegible] আসছেন) একজন ডাক্তারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। যুদ্ধের সময় ফ্রন্টে ডাক্তারী করতেন। বন্দী ছিলেন। তখন নার্ভ ঢিলে হয়ে গিয়েছিলো। এদিকে নার্ভ [illegible] এসে রয়ে গেছেন। পড়াশুনা করেন ডাক্তার বার্জে। উনিই একদিন বলেছিলেন,—'লেডি না থাকলে, এ-দেশে স্বর্গীয় সুষমা দেখতে আসার কথা স্রেফ একটা ধাপ্পা। আসলে ঐ টিন, কোকো, মশলা আর খনির জন্য সব আসে। দু-চার দিনের জন্য এসে মজা লুটে চলে যায়। তাই এতো ট্রপিকস্ আর ট্রপিকস্। যাদের জমিদারী নেই [illegible] তো আর মানুষকে পোকামাকড় ভেবে নতজাবরী করার যুগ নেই। তাই এটা আজও স্বর্গ। যেদিন ঈশ্বর স্বর্গে লুসিফারকে রাজত্বে রেখেছিলেন, স্বর্গ স্বর্গই ছিলো। ওরা যখন দলকে দল বিদ্রোহ করে চলে গেলো অন্যত্র সমস্ত গণ্ডগোল, সমস্ত পাপগুলো—ব্যস, স্বর্গ হয়ে গেলো দু টুকরো। একটার নাম স্বর্গ, অন্যটার নাম নরক।...নিশ্চয় বিশ্বাস করবেন নরকের পপুলারিটিই বেশী।...এই সেই ট্রপিকের পপুলারিটি। ভিজে, স্যাঁৎসেঁতে, নোংরা। যেখানে সেখানে ছাত, ফাঙ্গাস, প্যারা-সাইটস্। মগজে ছাতা পড়ে যায়। আর ঘাস, বন, বাদাড়, ক্যাকটাস, কাঁটা। কী বলবো মশায়। দাড়ি না চেঁছে এক বছর চালানো যায়। এখানে জঙ্গল না চাঁছলে জঙ্গলই চেঁছে ছাড়বে। নিয়মিত কাটো আর কাটো। বৃষ্টি! ওঃ মশায়, তার কী কোনো দিনক্ষণ নেই? কী নেই বলুন। ভূমিকম্প তো লেগেই আছে। যত্রতত্র আগ্নেয়গিরি ধূম্রসেবন করছেন। ফুঁ নামলেই হোলো। জি-ও-ডি বলার আগে একমুঠো ছাই হয়ে যাবেন।...আর বজ্রপাত, ঝড়, টর্নাডো, হ্যারিকেন—এ-সবেরই সদর দরজা তো এই ক্যারিবিয়ান।...এই তো ১৯৬৪-তে আপনাদের গ্রিনিদাদের ওপর দিয়ে হ্যারিকেন ফ্লোরা ঝাড়ু বুলিয়ে চলে গেলেন। তোবাগো দ্বীপটায় খাড়া গাছ নেই। অর্ধেক মানুষ নেই। বেবাক ঝাঁট সাফ হয়ে গেছে। ফ্লোরা কুবাকে সাতদিন ধরে নাকিভাই-নাকভাই করলো। চলে গেলো। ও মা, আবার ফিরে এল দু'দিন না তিন-দিন। সাধের জন্য কেউ এ-অঞ্চলটি আসে [illegible] মাথা খারাপ'"

লিজি না থাকলে ডাক্তার বার্জের মনের [illegible] হয়তো আরও হতো। লিজিরা ডোমিনিকার প্রাচীন বংশ। ওরা স্কচ। এলিজাবেথ ক্যামেরন। অষ্টাদশ শতাব্দীর স্বার্থে ওরা এসেছিলো; সম্পত্তি নিয়েই। আরও প্রচুর। ডমিনিকায় বর্ণ-বৈষম্য নিয়ে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। [illegible] দশেক পরিবার শাদা। তারাই স্থায়ী বাসিন্দা। বাকী ব্যাঙ্ক, সওদাগার, ইঞ্জি-নীয়ার ইত্যাদি সত্রে শাদারা আসেন যান। বাকি চৌষট্টি হাজার বাসিন্দাদের সবাই নিগ্রো, সবাই ক্যাথলিক, সবাই ইংরেজী বলে। অবশ্য নিজস্ব-এর 'বুলোবা' ছাড়া।

ওরা ঝুড়ি বোনে। জঙ্গল কাটে। মাদুর চাটাই বোনে। বিক্রী করে যা টাকা পায়, [illegible] দিয়ে মদ কিনে খায়। টাকা দিয়ে ওরা আর কিছু করতে জানে না। নিজেরা চাষ-বাস যা দরকার করে। নৌকো মাছ ধরে; নৌকা গড়ে গাছের গুঁড়ি কুঁদে। জাল বোনে জঙ্গলের আঁশে। ওদের জীবনযাত্রাকে ওরা ধরে রেখেছে প্রাক-পঞ্চদশ শতাব্দীর নিত্য আনন্দময়তার গভীরে। যুদ্ধের ভয় বা বিশ্বমৈত্রীর আবদার ওদের নেই।

ওদের পাশে লিজির বাড়ী অদ্ভুত। বলেছি যে ডমিনিকা মানে জঙ্গল, ঘন জঙ্গল, আগ্নেয়গিরি, পাহাড়ের পর পাহাড়, নদীর পর নদী, খাঁড়ির পর খাঁড়ি, [illegible] জলের উপসাগর; গভীর, গহন, ভীষণ, সংকুল—নতোন্নত পদাতিক পথ। যারা কেবল দুর্গমের পিয়াসী, তারাই যায় ডোমিনিকাতে। কিন্তু সেই ডোমি-নিকাতে লিজির বাড়ী একটা অপূর্ব স্বপ্নপুরী।

আমি দ্বীপে দ্বীপে ঘুরেছি এই নীল সাগরের বুকে। নীলের বুকে শ্যামল দ্বীপ দেখে দেখে চোখ জুড়িয়ে উঠেছে; মন ভরে উঠেছে। কতো পরিবারে গেছি; কতো কাবারেতে, লাইব্রেরিতে, হোটেলে গেছি। ধনী, দরিদ্র, শিক্ষক, পাদ্রী, জেলে, ভিখিরী, বণিক, নাবিক—কতো জনের অতিথি হয়েছি। কিন্তু লিজির বাড়ীর মতো আমি বাড়ী দেখিনি।

পর্যটক-পুস্তিকাতে লিজির বাড়ী [illegible]। যারা পর্যটক, তারা কী-ই বা দেখে!

এস-পি-সিকে [illegible] খ্রিস্টানী প্রতিষ্ঠান। সারা খৃস্টীয় বিশেষতঃ এংলো-স্যাক্সন জগতে এই খৃস্টান-পুস্তক প্রতিষ্ঠানের সার্বজনীন প্রতিপত্তি। ত্রিনিদাদের এস-পি-সিকে দোকানে লিজির সঙ্গে আমার আলাপ। সেদিনটা দুরন্ত বর্ষার দিন। আমিও আটকে পড়েছি; লিজিও। এরও গাড়ী নেই; আমারও নেই। তখনই জানতাম আমি ডমিনিকায় যাবো। লিজির নিমন্ত্রণ রক্ষা করবো।

কিন্তু তখন কি জানতাম এই অপূর্ব [illegible] সেই মিতালী এমন সম্পূর্ণতা লাভ করবে। জীবনের [illegible] উপকরণ [illegible] এতো কাছাকাছি পাবো। আতিশয্য এবং বিলাসকে সতর্ক নিয়মে সীমিত রেখে সুখসামঞ্জস্য এই [illegible] ধ্যান—জীবনে এই আমার প্রথম ও শেষ।

এখনই তোমাকে লিখে বলেছিলাম, [illegible] জীবন দেখার আছে প্রীতি, চলে এসো। আমরা আদিবাসী না হলেও [illegible] বাসী। এখন [illegible] ঐ নেজির [illegible] থাকে কাছে। ঐতিহাসিক বলতে যা বোঝা যায়, তাও [illegible]। যদি প্রাগৈতিহাসিক চাও চলে এসো। [illegible]

সে কেবলই জঙ্গল। পায়ে পায়ে জঙ্গল। পাহাড়ী পথ। পায়ে চলা ছাড়া [illegible], গাধা বা খচ্চর। Sure [illegible] as a mule obstinate as a mule, তাই খচ্চরই নিলাম। শরুখাকে নিতো [illegible] খনখনে হয়ে উঠতো। পাহাড় [illegible] কি!

গাছের তলায় আলো ছায়ার ঝিলিমিলি মধুর লাগতে লাগলো। সব চেয়ে দুর্বহ, দুরারোগ্য, দুঃসাধ্য ঘাম। বাতাসে জল, আকাশে জল, মাটীতে জল, রোদের তাতে পাথর মাটী, গাছ, পাতা তো ঘামছেই, ডোবা, নালা, খাঁড়ী,—থেকে বাষ্প উঠছে। তার ভেতরে সাড়ে তিন হাতের শরীরখানা আলুর দম হবার জো। একেবারে নাগা-ফকীর হওয়ায় আইনে বাধে। সেদিক থেকে খচ্চরটাকে দেখে হিংসে হচ্ছিলো। সঙ্গের ভাড়াটে সঙ্গীর ইংরিজীকেও ইংরিজি বলতে হয়, কেননা তবু ওটাই যা একটু বুঝতে পারি। সপ্তদশ শতাব্দীব্যেপে ডোমিনিকা কখনও ইংরেজ-অঙ্কে কখনও ফরাসী-অঙ্কের নাগরদোলায় দোলায়মানা ছিলো। ফরাসীর মিষ্ট মধুর স্বাদে ইংরিজীর 'এক্সেন্ট' নামক কোৎকা এবং হোঁচট তো নেই। কাজেই 'এক্সেন্ট'বিহীন আফ্রিকানভাষীরা ফরাসী শব্দ এবং ফরাসী ধরণ-ধারণকেই বেশী আমল দিয়েছে। ফলে ডোমিনিকান ইংরেজী এক বিপজ্জনক কুল-কুণ্ডলিনী। চাগিয়েও চাগায় না; মারলেও মরে না। বাস করছে মহাসুষুপ্তিতে: চৈতন্যচন্দ্রোদয় না হওয়া পর্যন্ত ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই পথ চলে।

যেমন খচ্চরটা। খাড়াই উঠছে আর উঠছে। ভাবছিলাম লিজি অর্থাৎ এলিজা-বেথ ক্যামেরনকে হঠাৎ অবাক করে দেবো। এখন এই ঝামেলায় পড়ে মনে হচ্ছিলো আদিবাসীর নিকুচি। রোজিও (অথবা রুসো)র চেরি লজ্-ই ভালো ছিলো। আসলে একা একা যেন দম বন্ধ হচ্ছিলো। আকাশের দেখা নেই; বাতাসের দম বন্ধ; মাটি সেদ্ধ হচ্ছে; পাথর তেতে আগুন। সারা গা দিয়ে দর-দর ঘাম।

অথচ সঙ্গীটিকে যেই পোর্টস মাথ্-এর কাছে পাকড়েছিলাম ও দিব্য স্ফূর্তিতে বলেছিলো "ক্যামেরণ কোঠী?......ওঃ চন্দ্র-সূর্য চেনার সঙ্গে চেনা?...কে? লুজী ক্যামেরণ? ওকে তো পুঁচকী দেখেছি।...... চলো চলো। রোজ্ লাইম্জুস্ পৃথিবী-বিখ্যাত। তারই তো মালিক ওরা!"...... ওঃ, সে কতো আত্মীয়তা। এখন নাও ঠেলা! না এগুনো, না পেছুনো। মনে পড়ছিলো পর্যটন-পর্যায়ের ব্যাসীকৃত ব্যাকরণে.— অর্থাৎ টুরিস্ট-গাইডে পড়া গিয়েছিলো "This is the type of place you will certainly get attached to" ইংরিজী ভাষায় attached to মানে যে গঁদের আঠার মতো লেপ্টে যাওয়া একথা স্মরণে আসেনি। গা-হাত-পা (মগজও কি?) চিট্চিটে হয়ে উঠলো।

এই পাহাড়ই ক্রমশঃ চড়ে গিয়েছে মর্ন ডায়াব্লোটিন শিখরে (৪৭৪৭)। বর্ষা ঝরে বছরে তিনশ' ইঞ্চি। পাহাড়ে পাহাড়ে গা জড়িয়ে গাছের পর গাছের ধবজা ওড়ানোর ফলে আকাশ দেখাই যায় না। কেবল মার্চ-এপ্রিলটায় তবু বৃষ্টিহীন দিন পাওয়া যায়। রবারের গাছ ডোমিনিকার বিশেষত্ব। রবার বন পার হয়ে গ্রাম পেলাম বাস্তালী। তারপর গ্রাম 'ম্যাসাকার'—অর্থাৎ 'মহামারী কোতোল'। নামটা অবশ্যই ঐতিহাসিক। এই নামটার তত্ত্ব নেবার আশাতেই মাসাক্রু গাঁয়ের পাদ্রীর সঙ্গে দেখা করলাম। বৃদ্ধ নিগ্রো। জ্বল জ্বল করছে দুটি চোখ। মাথা-ভরতি চকচকে টাক। শাদা পোষাকে অপূর্ব দেখাচ্ছিলো। চার্চের সংলগ্ন জমিতে বিশাল এক লেবু বাগান। এতো বড়ো বড়ো এতো প্রচুর লেবু ওয়েস্ট ইন্ডিজে আর দেখিনি।

ফাদার মাতিস্ বললেন,—"ডোমিনিকার লেবু প্রখ্যাত। তাই এখানে 'রোজ' লাইম-জুস্;—পৃথিবীর বিখ্যাত লাইমজুস্।"

সেই লেবুর রসে স্নিগ্ধ সুবাসিত চিনির সরবৎ খেতে খেতে গল্প করি।

"হ্যাঁ, মাসাকার মানে হত্যা। নৃশংস হত্যা। সেই যে কালে স্পানিশরা কারীবদের হত্যা করে সেকালেই এই গাঁয়েরই প্রায় সাত হাজার কারীবকে একদিনে হত্যা করা হয়। তাদের মৃতদেহ পড়েই থাকে। বহুকাল পরে এই জমি চাষ করে পর্তুগীজরা যখন লেবুর ক্ষেত লাগায় তখন ফসল দেখে ওরা বলে-ছিলো ক্যারীবের মাংসের সারের মতো সার নাকি হয় না। শোনা কথা,—একজন পর্তু-গীজ গবর্নর বলেছিলো মাত্র সার হিসেবে ব্যবহার করার জন্যই কারীবদের শেষ করা উচিত নয়। জানেন বোধহয় পর্তুগীজ এবং স্পানিশরা কারীব পুষতো মাংস কেটে তাদের কুকুরদের খাওয়াবার জন্য!"

বুঝিনা ফাদার মাতিসের চোখে জল চক্চক্ করছে, না আগুন ঠিকরে পড়ছে। হতে পারে তরল আগুন।

১৭৮৯তে ফ্রান্সে ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলী বিদ্রোহ করলো; রাইটস্ অব ম্যান স্থাপনা করলো। এখানেও সাড়া জাগলো। মার্টি-নিকে, গুয়েদালুপে নিগ্রোরা সাদাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো। ভয়ে বহু সাদারা ফরাসী দ্বীপগুলো ছেড়ে ত্রিনিদাদে আশ্রয় নিলো। সেন্ট লুসিয়াতে সৈন্যরা বিদ্রোহ করলো। সারা ফরাসী দুনিয়া তখন কেঁপে গেছে।

সেন্ট ডোমিনিগ্ (বর্তমান ডমিনিকান রিপাব্লিক এবং হাইতির মিলিত নাম)— অর্থাৎ হিস্পানিওলারই বিদ্রোহ হলো চরম। আলস্যে, জড়তায়, প্রাচুর্য্যের অন্তঃ-সারশূন্যতায় সাদারা তখন নির্জীবতার এবং কাপুরুষতার চরমে উপস্থিত। গোটা জাতই ক্লীব হয়ে গেছে। ত্রিশ হাজার সাদা এবং পঁচাত্তর হাজার অসাদা। তবু সাদা-দের অহমিকা, অত্যাচার, নৃশংসতার তুলনা ছিল না। নিগ্রোরা বিদ্রোহ করলো। নিগ্রো-দের মধ্যেও স্বাধীন ভূম্যাধিকারী ছিলো। তাদের কোনো নাগরিক মান-সম্মান ছিলো না। তাদের ভদ্র পোষাক পরার অধিকারও ছিলো না। বিদ্রোহের নায়ককে পরে এরা ঘুরন্ত চাকায় বেঁধে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলেছিলো। সেদিন এখানে সাতশো দেহ তচনচ হয়।

"তারও আগে কারীবরা। তিনশো বছর ধরে ফরাসী, ইংরেজ, স্পানিশ এবং পর্তু-গীজের মিলিত সংগ্রামের বিপক্ষে এই জাতটা ভীষণ বিক্রমে যুদ্ধ চালায়। আরা-ওয়াকরা ছিলো অপেক্ষাকৃত নিরীহ জাত। পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই তাদের খতম করা গিয়েছিলো। এরা তিনশো বছর ধরে সংগ্রাম চালিয়েছিলো। এ-লা-শ্যাপেলের (১৭৪৮) সন্ধিতে ফরাসী এবং ইংরেজ মেনে নেয় যে ডোমিনিকা, সেন্ট লুশিয়া, সেন্ট ভিনসেন্ট এবং তোবাগোতে কারীবদের আর ঘাঁটানোই হবে না। কিন্তু শকুন কি মড়া ছাড়তে পারে? ওরা যুগে যুগে এই কারীবদের খুবলে খুবলে খেলো। মাসাকার গ্রামে বলি দেওয়া হয়েছে সাত হাজার কারীব।"

হঠাৎ খানিক থেমে ফাদার মাতিস বললেন,—"বলবেন কাকে? আজকের আমে-রিকানকে লোক দেখতে পারে না; কেন? লোভ, বিশ্বগ্রাসের লোভের জন্য। লোভীকে কেউ ভালোবাসে না। এবং বরাবরই এরা এই। সাদামাত্রেই এই। ব্যবসায়ে ফাঁপবে, তাতে যে থাকে থাকুক; যে মরে মরুক। এদের মূলকথা—মানবতা, দয়া, ধর্ম, দাক্ষিণ্য, —সব, সব, সবই ভালো। এসব করা যাবে। কেবল যদি সাদা এবং আমিরী জমঘট জমাট থাকে। জর্জ ওয়াশিংটন তো আমে-রিকার দেবতা। ১৭৯১-এর ডিসেম্বরে তিনি এক চিঠিতে লিখেছেন, "হৃদয়বিদারক! কালো আদমীদের মধ্যেও এমন বিপ্লবী স্ফূর্তি দেখতে হোলো হে!" কাকে কী বলবেন? আঁচড়ালেই সব ভক্তির রং এক।

কিন্তু এ গাঁয়ের নাম মাসাকার হোলো ১৬৭৪-এর একটা ঘটনায়। ঘটনাটা আপনাকে খুলে বলি।

"১৬৭২। ক্যারীবরা তখনও প্রবল। ওদের নামে হৃৎকম্প লাগতো। ওরা জেনে গিয়েছিলো যে-সাদাদের ওরা দেবতা ভেবে-ছিলো তারা শয়তানের চেয়েও নীচ। কাজেই নিদারুণ নৃশংসতা ছাড়া ওরা শাদাদের কিছু দিতো না। কালোরা যেহেতু সাদাদের হয়ে খাটতো, সেইহেতু কালোরাও সম-পর্যায়িক শত্রুই, ওদের কাছে। ওরা যদি জানতো কালোদের মর্মকথা! জানতো না। এন্টিগা-র গবর্ণর ছিলেন স্যর টমাস ওয়ার্নার। তাঁর ছিলো ঘাটে ঘাটে রাণী। কিন্তু একটি ক্যারিব রমণী। তাঁকে স্যর টমাস ভালো-বাসতেন। বিয়ে করেন। কারণ অবিবাহিতা ক্যারীব-সুন্দরী স্যর টমাসের শয্যাসঙ্গিনী হতে একেবারেই নারাজ। এই বিবাহের ফলে এক ছেলে হয়। তার নাম হয় টমাস ওয়ার্নার। ক্যারেবিয়ান ইতিহাসে দুটি পাদ্রীর নাম অমর হয়ে থাকবে। একজন লাস-কাসাস্, এবং অপরটি ফাদার লাবাৎ। লাবাৎ তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন,—তিনি সেই ক্যারীব সুন্দরীকে বৃদ্ধাবস্থায় দেখেও তাঁর রূপে মুগ্ধ, তাঁর স্বভাবে চমৎকৃত, তাঁর দুঃখে অভিভূত হয়েছিলেন। মাদার ওড়্নার্ড্-কে (ওয়ার্নারেরই অপভ্রংশ) প্রত্যেক কারীব এবং প্রত্যেক নিগ্রো শেষ-পর্যন্ত প্রভূত সম্মান দেখিয়েছে।...যাক্, পরে স্যর ওয়ার্নার ফেঁসে যান অ্যানী নামক এক সাদা মেয়ের সঙ্গে। মাদাম ওড়্নার্ড সেই থেকে আর স্যর ওয়ার্নারের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখেন নি।"

"বলেন কি? কারীবদের যৌন-শুচিতা কি এতোটা সূক্ষ্ম ছিলো?"

হেসে জবাব দিলেন ফাদার মাতিস্,—"যারা বদ্লো তারা সংক্ষম হতে পারে কখনও? ওটা আমি বাড়িয়ে বলেছি। ইতিহাসে বাড়িয়ে বলাটাই কায়দা। যাক্,—ফলে স্যার ওয়ার্নার দুই ওয়ার্নার ছেড়ে গেলেন। এক টম্ ওয়ার্নার, কালো ওয়ার্নার, আর দুই ফিলিপ ওয়ার্নার, সাদা ওয়ার্নার। ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধ চলছে। টম ওয়ার্নার লড়াই শুরু করে। ফরাসীদের হাতে বন্দী হয়। যখন ফয়সালা হলো, তখন সব সাদা বন্দী মুক্তি পেলো। টম ওয়ার্নার পেলো না। অজুহাত,—সে 'সাদা' নয়। ইতিমধ্যে ফরাসীদের সঙ্গে থেকে টম ওয়ার্নার বদলে গেছে। সে কালোদের, মল্যাটোদের হয়ে তুমুল যুদ্ধে নামলো সাদাদের বিরুদ্ধে।—ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্কাল। সকলেই স্বাধীনতা চায়। পর পর ইংরেজ-বাহিনী টম ওয়ার্নারকে আক্রমণ করে। পর পর হেরে যায়। অবশেষে তারা পাঠায় বৃহৎ বাহিনী ফিলিপ ওয়ার্নারের অধীনে। ভাইয়ের বিপক্ষে ভাই। ফিলিপের মা অ্যানী ছেলেকে তাতায়। টমের রক্ত চাই-ই চাই।

"টম্ পারেনি ফিলিপকে মারতে। তবে যুদ্ধে তারই জয় হয়েছে। সে ভাইকে সন্ধির জন্য ডেকেছে। এই ম্যাসাকার গাঁয়ে সেই বিরাট ভোজের ব্যবস্থা হয়। ভোজের মধ্যপথে ফিলিপ তার সাঙ্গো-পাঙ্গো নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে টমের ওপর। টমকে এবং তার অনুচরদের হত্যা করে। তারপর পুরো সপ্তাহ ধরে চললো এই গাঁয়ে হত্যা আর হত্যা। জমি লাল হয়ে গেলো। দুর্গন্ধে থাকা যায় না। তাই সব কারীব ধ্বংস হবার আগেই ফিলিপকে ফিরে যেতে হয়েছিলো।

"গবর্ণর স্টেপলটন ইংরেজ। ইংরেজের একটা গুণ, কাজ হাঁসিল হবার পরেও নৈতিক ভণ্ডামী সে ছাড়ে না। তাই তার এতো নাম। স্যার জোনাথান অ্যাট্‌কিন্স ছিলেন লী-ওয়ার্ড দ্বীপপুঞ্জের সর্বেসর্বা। লর্ড উইলোবীর অনুবর্তী। তিনি স্টেপলটনের আচরণকে শুভদৃষ্টি দিয়ে দেখেন নি। স্টেপলটনই ফিলিপকে যুদ্ধে নিয়োগ করেছে, অথচ অ্যাটকিন্স্ কিছু জানেন না। কাজেই মামলা গেলো বিলেতে। মামলায় ফিলিপ বেকসুর খালাস হোলো। সে নাকি দুর্ধর্ষ এবং গুন্ডা কারীবদেরই দমন করতে যায়। এবং টম ওয়ার্নার নাকি স্যার টমাস ওয়ার্নারের ক্রীতদাস ছিলো। টমকে তার ভাই খুন করলো। ইংরেজ রাজত্ব পেলো। টমের অবশ্য চাকরি গেলো। কিন্তু টম পেলো বিশাল জায়গীর। শুনলেন তো ম্যাসাকার গাঁয়ের পাঁচালী। আরও শুনতে চান, যাচ্ছেন তো ক্যামেরনদের বাড়ী। বই আছে ঢের। পড়ে দেখবেন।......"

শুধু বই ছিলো না। অনেক কিছু ছিলো।

জঙ্গলের ওপারে পাহাড়ের গায়ে ছবির মতো একখানা বাড়ী। ঠিক নীচে ঝাঁপিয়ে পড়ছে সমুদ্রের আছাড়ি-পিছাড়ি তরঙ্গ। পাহাড়ের গা-ভরতি ক্যাকটাস আর গুল্মের রাশি। পথ নামছে তখন। নীচে বিস্তীর্ণ একটি সমতল। ফলের বাগানে ভরতি। কলা, ক্যাসু, কফি, কোকো, লেবু। চারধারের পাহাড়ের গায়ে গায়ে যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল নারকোল আর নারকোল। পাহাড়ী গলির মধ্যে মধ্যে রবারের গাছ। এতো ঐশ্বর্য। মাইলের পর মাইলব্যাপী অতুল ঐশ্বর্য। সভ্যতার কোলাহল থেকে বহু বহু দূরে এক রাজকুমারী তার পাখার আড়ালে ঢেকে রেখেছে কুবেরের ধনভান্ডার। নিস্তব্ধ আরাম, অফুরন্ত বিশ্রাম, শুধুই শান্তি। প্রতি ক্ষেতে লক্ষ্য করলে দেখা যায় নীরবে যারা কাজ করছে তারা এই জমিকে, এই পরিবারকে, এই সমুদ্র ভূমিভাগকে ভালোবাসে। এতো বিদ্রোহ, এতো হত্যা, এতো রক্তপাত সত্ত্বেও ক্যামেরণ বংশ সেই সপ্তদশ শতাব্দী থেকে আজও অবিচ্ছিন্নভাবে একই জায়গায় একই সম্মানের সঙ্গে বসবাস করছে।

তাদের শত শত নামের মধ্যে একটি নাম লিজি।

দেখেই বোঝা যায় ক্যামেরন পরিবারে সাদা-কালো ছুঁচিবাই নেই। লিজি বলে, এই দুর্গম নিরালায় চিরকাল বসবাস করার ফলেই নাকি ওদের বাড়ীতে এই ধরনের সরলতা বজায় আছে। গোঁড়ামী, বিপক্ষতা, অবিচারিত-প্রতিবাদ এগুলো কালক্রমে বর্ষীয়ান থেকে শিশুতে বর্তায়। যেহেতু লিজি এ থেকে মুক্ত, ভাবা যেতে পারে লিজির পূর্বসুরীরাও এ থেকে মুক্ত ছিলেন। স্কটিশ প্রেসবিটেরিয়ানরা বহুলাংশে সভ্যতর সামাজিক। ওদের বাড়ীতে আমি ওর খুড়ীকে দেখেছি, ডমিনিকার রাষ্ট্র-সংসদে বহুকাল সভ্যা ছিলেন। এখন বয়সের দরুণ সংসদে যান না বটে, কিন্তু পড়াশুনাও যেমন করেন, কাগজে লেখেনও তেমনি। সদাজাগ্রত মন।

বসার ঘরের সংলগ্ন খুড়ীর অফিসঘর। তার পাশে লাইব্রেরি। কী সুন্দর লাইব্রেরি। থরে থরে সাজানো। তা বলে সাজানো বই নয়। বোঝা যায় বহু ব্যবহৃত এবং সুনির্বাচিত বই। সমাজ-রাষ্ট্র-ইতিহাস-সাহিত্য-ধর্ম-দর্শন এছাড়া ফার্মিং, গার্ডেনিং, এগ্রিকালচার, সেরিকালচার, হর্টিকালচার, ফলের এবং সব্জীর বাগান করার ওপর বহু বই।

আন্টি ক্লারা বলেন,—গত তিন পুরুষের টেস্ট পাবে এই লাইব্রেরিতে। পারিবারিক লাইব্রেরির স্বাদই আলাদা।...আমি তো লাইব্রেরি-ছাড়া হয়ে যাবো সেই ভয়ে বিয়েই করলাম না। তোমাদের মতো যুবক দেখলে তাই ছাড়তে মন সরে না।

নিজেকে নিয়ে আন্টি ক্লারা এমনি খুব রসিকতা করতেন। সকলেই জানে একটি পাগল ভাই পর পর দুটো খুন করে। তার ফলে আন্টি ক্লারা সেই ভাইয়ের তত্ত্বাবধানের জন্যই বিয়ে করেন নি। সেই ভাই মারা গেছে কিছুদিন আগে।

(ক্রমশঃ)

নিত্য
নতুন
বই পড়ুন

বিশ্ববিধানের সন্ধানে
রিচার্ড এস গার্ডনার
অনুবাদ ॥ অনিলরঞ্জন গুহ
৩·০০

মানব ইতিহাসের সন্ধানে
কার্লটন এস কুন
অনুবাদ ॥ রবীন্দ্রনাথ সরকার
প্রথম পর্ব ৬·০০
দ্বিতীয় পর্ব ৬·০০

ভারত ও পাশ্চাত্ত্য
বারবারা ওয়ার্ড
অনুবাদ
নিরঞ্জন হালদার ও অমলিন গুপ্ত
৫·০০

চীনের সামাজিক রূপান্তর
চু চাই ও উইনবার্গ চাই
অনুবাদ ॥ রবীন্দ্রনাথ সরকার
৫·০০

ভিয়েৎনামের যুদ্ধ : কেন?
এম শিবরাম
অনুবাদ ॥ নীপ গঙ্গোপাধ্যায়
২·০০

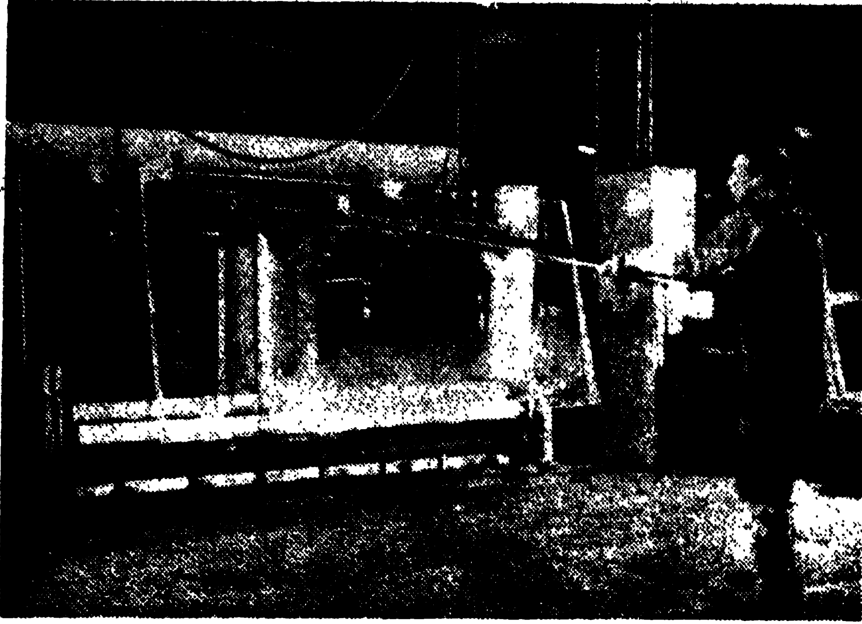
আত্মকাহিনী
ইজিনর রুজভেল্ট
অনুবাদ ॥ পশুপতি চট্টোপাধ্যায়
২·৫০

সাম্যবাদ
বিষয়বস্তু ও কার্যপদ্ধতি
ইনা শ্লোজিঙ্গার ও জোনা র‍্যান্টেইন
অনুবাদ ॥ অমরনাথ দত্ত

একত্রে দশ টাকার অর্ডার দিলে এবং টাকা অগ্রিম পাঠালে ডাকখরচ লাগবে না। পূর্ণাঙ্গ তালিকার জন্য লিখুন।

এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি
কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা—১২ ॥ ফোন : ৩৪-২০৮৬

আধুনিক যান্ত্রিক উপায়ে কাচের চাদর তৈরী হচ্ছে



বিজ্ঞানের কথা

কাচের ভবিষ্যৎ

শুভঙ্কর

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কাচ একটি অপরিহার্য জিনিস বললে অত্যুক্তি হয় না। ঘরের জানালা থেকে শুরু করে জলের গেলাস, ওষুধের শিশি-বোতল, তৈজসপত্র কত কিছুতেই না কাচ ব্যবহৃত হয়। আজকাল প্লাস্টিক আবিষ্কারের ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কাচের চাহিদা কমেছে বটে, কিন্তু কাচ ব্যবহারের নতুন ক্ষেত্রও সম্প্রসারিত হচ্ছে। কাচের তৈরী ইঁট, টালি ও পাতের সাহায্যে বসতবাটী ও কারখানা তৈরী করা হচ্ছে। আবার কাচের সূক্ষ্ম সুতোর তৈরী রঙীন বস্ত্রাদিও প্রচলিত হয়েছে, যা আগুনে পোড়ে না এবং সহজে ময়লা হয় না। কাচের তৈরী পাম্পের সাহায্যে ক্ষারী তরল পদার্থ উত্তোলন করা অনেক সহজসাধ্য হয়েছে। তাছাড়া নানারকম যন্ত্রের অংশ হিসাবেও কঠোর কাচ ব্যবহার করা হচ্ছে। কাজেই মানুষের ব্যবহারিক জীবনে কাচের অপরিহার্যতা চিরদিনই থাকবে।

সাধারণ মানুষের কাছে কাচ হচ্ছে একটি স্বচ্ছ ও কঠিন পদার্থ, যা সহজেই ভেঙে যায়। কিন্তু বিজ্ঞানীদের মতে কাচ এমন একটি তরল পদার্থ বা দ্রব, যা কেলাসিত হতে পারে নি। উষ্ণতা হ্রাস পাওয়ার সংগে সংগে এই অতি শীতলীকৃত তরল পদার্থটির সান্দ্রতা এত বৃদ্ধি পায় যে শেষপর্যন্ত এটি কঠিন পদার্থের সমগোত্রীয় হয়ে ওঠে।

কাচের এই বিশেষ ধর্মের সুযোগ গ্রহণ করে ফাঁপা-নলে গলিত কাচে ফুঁ দিয়ে ইচ্ছা মত জিনিসের রূপ দেওয়া যায়। অবশ্য আজকাল কাচের পাত থেকে শুরু করে বোতল, জার, নল, দন্ড বা বিজলবাতির বাল্ব, টেলিভিশন টিউব সমস্ত জিনিসই যন্ত্রে তৈরী করা হয়ে থাকে।

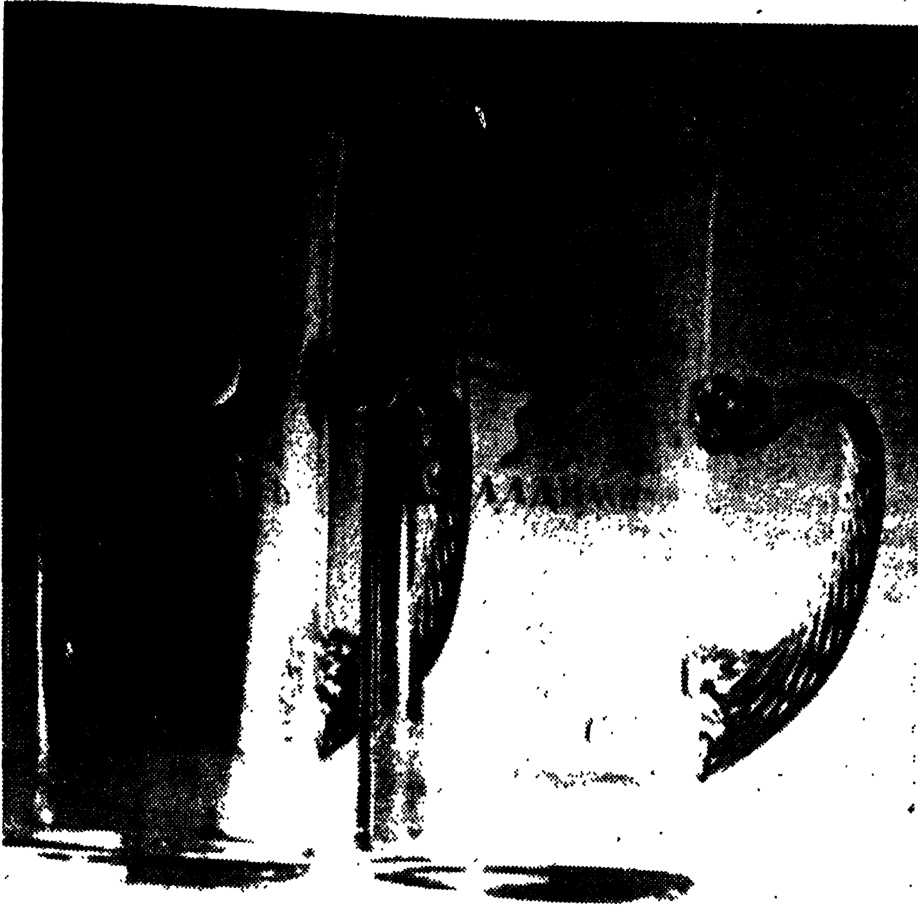
সাধারণ কাচ তৈরীর প্রধান উপাদান হচ্ছে বালি, চুন ও সোডা। আধুনিক বোতল তৈরীর কারখানায় এই উপাদানগুলি স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় ওজন করা ও সঠিক অনুপাতে মেশানো এবং তারপর চুল্লীতে ঢালা হয়। চুল্লী থেকে গলিত কাচ যন্ত্রের সাহায্যে বাহিত হয়ে নির্দিষ্ট ছাঁচে রূপ পায়। কাচের চাদর বা পাত প্রস্তুতের ক্ষেত্রে উপাদানগুলি অনুরূপভাবে মেশানো ও গলানো হয়, তবে এক্ষেত্রে চুল্লী হয় অনেক বড় আকারের। গলিত কাচ অ্যাসবেসটস রোলারের মধ্য দিয়ে টেনে তাকে চাদরে পরিণত করা হয়।

বিগত ৫০ বছরে আধুনিক কাচশিল্প গড়ে উঠেছে। কাচশিল্পের এই উন্নতি সম্ভব হয়েছে বৃহদাকার চুল্লী উদ্ভাবনের ফলে। এই চুল্লীকে ইস্পাত প্রস্তুতের 'ওপেন হার্থ' বা খোলা মাথার চুল্লীর একটি সংস্করণ বলা যায়। গত কয়েক দশকে উন্নতধরনের দুর্গলন উপকরণ উদ্ভাবিত হওয়ার ফলে চুল্লীর প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। আজকাল বৈদ্যুতিক চুল্লীর প্রচলন হয়েছে। এই চুল্লীতে কাচের মধ্য দিয়ে বৈদ্যুতিক প্রবাহ চালিত হয়।

বোতল ও জানালার কাচ সস্তা উপকরণ দিয়ে তৈরী করা হয়ে থাকে। এই কাচ যেমন স্বচ্ছ ও দীর্ঘস্থায়ী, তেমনি [illegible]। গত ৫০ বছরে উপকরণ-মিশ্রণে পরিবর্তন সামান্যই হয়েছে বটে, কিন্তু তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। চুল্লীর উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে সোডার আনুপাতিক হার কমে গেছে এবং বালি ও চুনাপাথরের পরিমাণ বেড়েছে এবং সেই সংগে অল্প পরিমাণ অ্যালুমিনা বা অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড দেওয়া হচ্ছে। এইভাবে যে কাচ প্রস্তুত হয় তা আবহাওয়ার আক্রমণ আরও ভালোভাবে ঠেকাতে পারে এবং যন্ত্রাদিও এর ফলে দ্রুততর কাজ করে।

সবরকম কাচের জিনিসের সংযুতি একই রকম নয়। বিভিন্ন জিনিসের কাচের রাসায়নিক সংযুতি বিভিন্ন রকম। পারদ ও সোডিয়াম বাষ্প দিয়ে রাস্তার যে আলো-বাতি প্রস্তুত হয় তাতে বিশেষ ধরনের কাচ ব্যবহৃত হয়। পারদের আলো-বাতির কাচে সোডা ব্যবহার করা হয় না। আর সোডিয়াম আলো-বাতির কাচে বালি থাকে না, তার পরিবর্তে বোরিক অক্সাইড ব্যবহৃত হয়।

কাচের চাদর বা পাত প্রস্তুতের ক্ষেত্রেও সম্প্রতি যুগান্তর ঘটেছে। এতদিন দুটি রোলারের মধ্য দিয়ে গলিত কাচ চালিত



কাচের পাত্রের গায়ে অপূর্ব শিল্প-নিদর্শন

করে কাচের পাত তৈরী করা হত। এইভাবে কাচের যে পাত বা চাদর তৈরী হত তার পৃষ্ঠতল হত অমসৃণ। পরে ঘষে ও পালিশ করে তা মসৃণ করা হত। এর ফলে কাচের পৃষ্ঠতলের শতকরা প্রায় ২০ ভাগ নষ্ট হত। বর্তমানে যে 'ফ্লোট' বা 'ভাসমান পদ্ধতি' উদ্ভাবিত হয়েছে তাতে কাচের পাত ঘষামাজার আর দরকার হয় না। এই পদ্ধতিতে গলিত কাচের পাত গলিত টিনের একটি পাত্রে ভাসিয়ে রাখা হয়। গলিত টিনের পাত্রের মধ্য দিয়ে যাবার সময় কাচের পাতের পৃষ্ঠতল মসৃণ হয়ে যায়।

কাচের সম্পূর্ণ নতুন ধরনের ব্যবহার এখন দেখা যাচ্ছে। কাচতন্তুর শিল্পে বহু নতুন ব্যবহার আশা করা যেতে পারে। ১৯৩০ সালে কাচতন্তু প্রথম দেখা দেয়। এর প্রধান ব্যবহার হচ্ছে তাপ-অন্তরয়ণে এবং প্লাস্টিকের তন্তু দৃঢ়ীকরণে।

কাচের পাত্র, কাচের পাত এবং কাচের তন্তুশিল্পে টন-টন কাচ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে বহু ক্ষেত্র আছে যেখানে বিশেষ উন্নত ধরনের কাচ অল্প পরিমাণ ব্যবহৃত হয়। 'অপ্‌টিক্যাল গ্লাস' হচ্ছে এমন একটি শিল্প। চশমার লেনস্‌ তৈরী হয় এই অপ্‌টিক্যাল গ্লাস থেকে।

কাচের একটি নতুন উল্লেখযোগ্য ব্যবহার হচ্ছে 'ফাইবার অপটিকস্‌' বা তন্তু-আলোকবিদ্যায়। এর মূল কথা হল একাধিক আন্তঃ-প্রতিফলন প্রণালীতে একটি তন্তু-বরাবর আলোর সঞ্চালন। আন্তঃ-প্রতিফলন বাড়াবার জন্যে কাচতন্তুতে অপেক্ষাকৃত নিম্ন প্রতিসরণাঙ্কের আর একটি কাচের প্রলেপ দেওয়া হয়। এই ধরনের শত শত তন্তু জুড়ে নমনীয় রজ্জু বা কেবল্‌ তৈরী করা যায় এবং কেবল্‌-এর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে আলো সঞ্চালিত করা যেতে পারে। গুচ্ছগুলিকে এমনভাবে সাজানো যেতে পারে যাতে সকল তন্তুর শেষ ভাগ কেবল্‌-এর প্রত্যেক প্রান্তে যথাযথ স্থানে এসে মিলিত হয়। এই ধরনের 'সংসক্ত' কাচতন্তুগুচ্ছের মধ্য দিয়ে প্রতিবিম্ব প্রেরণ করা যায়। আর 'অসংসক্ত' গুচ্ছের মধ্য দিয়ে আলোর দীপ্তি সঞ্চালিত হয়। এই দুটি ব্যবস্থার সমন্বয় সাধন করে একটি ক্ষুদ্রাকার আলোক-উৎস এবং প্রতি-বিম্ব-প্রেরক গড়ে তোলা যায়, যার সাহায্যে অদৃশ্য স্থানগুলিও দেখা যায়। সম্প্রতি সমন্বিত কাচতন্তুর কেবল্‌-এর মাধ্যমে টেলিফোন-বার্তা প্রেরণের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে চিন্তা করা হচ্ছে। এই দূরভাষ-বার্তা কেবল্‌ বরাবর চলমান লেসার-রশ্মির ওপর আরোপিত করে প্রেরণ করা হবে। এই বাহন-তরঙ্গের অতিউচ্চ কম্পাঙ্কের দরুন একই কেবল্‌-এ বহু শত টেলিফোন কথাবার্তা একই সঙ্গে প্রেরণ করা যাবে। তবে এই কাজের জন্যে বিশেষ ধরনের কাচ প্রস্তুত করতে হবে, যার লোহার পরিমাণ ১০ লক্ষ ভাগে এক ভাগেরও কম হবে (সাধারণ কাচের তুলনায় অনেক কম)।

বৈদ্যুতিক এবং ইলেকট্রনিক শিল্পের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কাচের ব্যবহার ক্রমশ বেড়েই চলেছে। শতকরা ৫ ভাগ নিওডিনিয়াম অক্‌সাইড মিশ্রিত কাচ লেসার-রশ্মি নির্মাণে ব্যবহৃত হতে পারে। কাচের এই নতুন নতুন প্রয়োগে কিছু বিশেষ সমস্যা আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অতি উচ্চমানের কাচ প্রয়োজন হয় এবং লেসারের ক্ষেত্রে কাচের বিশুদ্ধতাও অপরিহার্য। সাধারণ উষ্ণতায় কাচ খুব ভালো অন্তরক অর্থাৎ কাচের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ যায় না। কিন্তু উচ্চ উষ্ণতায় কাচ বিদ্যুৎপ্রবাহ পরি-বহন করতে পারে, কারণ তখন কাচের সোডিয়াম আয়নগুলি জলীয় দ্রব্যে সোডিয়াম অণুর মতোই আচরণ করে। বর্তমানে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের কাচ প্রস্তুত হচ্ছে আর্সেনিক, জার্মেনিয়াম, সিলিকন ইত্যাদি মৌলের সালফাইড ও সেলিনাইড একসঙ্গে গলিয়ে। এই ধরনের কাচ ইলেকট্রনের মাধ্যমে বিদ্যুৎপ্রবাহ পরিবহন



করে। এই বিশেষ ধরনের কাচ সম্পর্কে বর্তমানে ব্যাপক গবেষণা চলছে।

আগেই বলা হয়েছে, কাচ হচ্ছে অতি-শীতলীকৃত তরল পদার্থ বা দ্রব, যা কেলাসিত হয় নি। কাচকে কিভাবে কেলাসিত করা যায় তার পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্যে বিজ্ঞানীরা এখন বিশেষভাবে চিন্তা করছেন। ওপেল কাচে শতকরা ৫ ভাগ কেলাসিত উপাদান থাকে। দীর্ঘকাল থেকে এই কাচ প্রস্তুত হয়ে আসছে। স্বর্ণলোহিত কাচে শতকরা দশমিক একভাগ অধঃক্ষিপ্ত সোনার কেলাস থাকে এবং তার দরুন এই কাচের রং গাঢ় লাল হয়।

কাচের উপাদানকে কেলাসিত রূপ দিতে হলে তার সংযুতির এমনভাবে সামঞ্জস্য করতে হবে, যাতে যথোপযুক্ত আকার ও আকৃতির কেলাস গড়ে ওঠে। যখন এই সমস্যার সম্যক সমাধান করা যাবে, তখন শতকরা ৯৯ ভাগ কেলাসিত কাচ প্রস্তুত করা সম্ভব হবে। এই ধরনের কাচের প্রসারাঙ্ক হবে প্রায় শূন্য এবং তার ফলে উষ্ণতার আকস্মিক তারতম্যে এতে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে না। এই কাচ কেলাসে পরিবর্তিত হওয়ায় অতি উচ্চ উষ্ণতাতেও এর আকৃতি অপরিবর্তিত থাকবে এবং দার্ঢ্য হ্রাস পাবে না। এছাড়া, কেলাসনের পরিমাণ সতর্কভাবে নিয়ন্ত্রণ করে এমন কাচ প্রস্তুত করা যেতে পারে, যা সাধারণ বিকিরণে হবে স্বচ্ছ অথচ আকাঙ্ক্ষিত তাপীয় ধর্মবিশিষ্ট (যেমন নিম্ন প্রসারাঙ্ক-বিশিষ্ট)।

কাচে বিশেষ ধরনের কিছু কেলাস অধঃক্ষিপ্ত করে নতুনরকম উপাদান প্রস্তুতের চেষ্টা এখন চলছে। এভাবে কাচে সিলভার ক্লোরাইডের কেলাস অধঃক্ষিপ্ত করে আলোকচিত্রের ধর্ম সন্নিবিষ্ট করা সম্ভব হয়েছে। এই ধরনের কাচকে বলা হয় ফটোক্রোমিক গ্লাস। এই ফটোক্রোমিক কাচের বিশেষ ধর্ম হল তীব্র আলোকে কালো হয়ে যায় এবং আলোর তীব্রতা কমলে আবার তা পরিষ্কার হয়ে যায়। আমরা এখন এমন জানালার কথা ভাবতে পারি, যার কাচ বহিরাগত তীব্র আলোকে কালো হয়ে ঘরের ভেতরে আগেকার মতোই আলোর মাত্রা বজায় রাখবে।

কাচ ব্যবহারের একটা বড় সমস্যা হচ্ছে তার ভঙ্গুরতা। বিশেষ পন্থা অবলম্বন করে কাচের দার্ঢ্য কিভাবে শতগুণ বাড়ানো যায় তা বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে এই জ্ঞান এখনও পর্যন্ত কাজে লাগানো হয় নি। গলিত উপাদান থেকে কাচের দণ্ড প্রস্তুতের সময় [illegible] সতর্কতা যদি অবলম্বন করা হয় যে কোনোকিছু তার পৃষ্ঠতলকে স্পর্শ না করে তা হলে ইস্পাতের চেয়েও দৃঢ় কাচ প্রস্তুত করা যায়। সাধারণ কাচের দার্ঢ্য কম হওয়ার মূলে আছে তার পৃষ্ঠতলের বিশেষ অবস্থা। আমরা জানি কাচের পৃষ্ঠ-টান সব সময়েই কম হয়। গলানো কাচ যখন ঠান্ডা হয়, তখন তার পৃষ্ঠতল দ্রুত ঠান্ডা হলেও ভেতরের অংশ নরম থেকে যায়। এ কারণে ঠান্ডা অবস্থায় আমরা যে কাচ পাই তার পৃষ্ঠতল থাকে অত্যন্ত সংনমিত অবস্থায় কিন্তু অভ্যন্তর ভাগ থাকে টান অবস্থায়। দ্রুত শীতলী-করণের দ্বারা কাচের পৃষ্ঠতলের সংনমন সুবিধাজনকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে কাচের ভঙ্গুরতা অনেকখানি রোধ করা যায়।

বর্তমানে একটি নতুন পদ্ধতিতে কোনো এক গলিত দ্রবণের সঙ্গে বিক্রিয়ার মাধ্যমে কাচের পৃষ্ঠতলের রাসায়নিক প্রকৃতি এমন-ভাবে পরিবর্তিত করা গেছে যাতে পৃষ্ঠ-তলের সংযুতি পরিবর্তন করে অতি অল্প পরিমাণে কেলাসন সম্ভব হয়েছে। এইভাবে পরিবর্তিত কাচের পৃষ্ঠতলের প্রসারাঙ্ক অভ্যন্তরভাগের তুলনায় খুবই কম হয়। এ কারণে এরপর শীতলীকরণের সময় পৃষ্ঠতল খুবই সংনমিত অবস্থায় থেকে যায়। এইভাবে প্রস্তুত কাচের পাত সহজেই বেঁকানো যায়। এই ধরনের কাচের পাত দিয়ে মোটরগাড়ির পিছন দিকের জানালা তৈরী করলে গাড়ির হুড সহজেই মুড়ে পিছনে রাখা হয়। ইংলন্ডে এই ধরনের মোটরগাড়ির হুড সত্যসত্যই নির্মাণ করা হয়েছে।

এই সমস্ত সম্ভাবনার দিক থেকে বিচার করলে বলা যায়, কাচের এক নব-যুগের সূচনা হয়েছে। এমন দিন হয়তো শীঘ্রই আসছে যখন আমাদের রান্নার বাসনপত্রও কাচ দিয়ে তৈরী হবে এবং আমাদের ঘরবাড়ি তৈরীর কাজেও কাচের ইঁট ও পাতের ব্যবহার হবে। ইতিমধ্যেই কোনো কোনো দেশে কাচের এই ধরনের ব্যবহার শুরু হয়েছে। পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নে প্রভূত উন্নতির ফলে কাচ সম্পর্কিত গবেষণায় বর্তমানে বিরাট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। আমাদের দেশে যাদবপুরে কেন্দ্রীয় কাচ ও মৃৎশিল্প গবেষণাগার এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এখানে উদ্ভাবিত অপটিক্যাল গ্লাস ও ফোম-গ্লাস সারা বিশ্বে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছে।

গৌরাঙ্গ পরিজন

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

(৭২)

কমলাকান্ত বিশ্বাস

অদ্বৈত আচার্যের কিংকর। এর উপরেই অদ্বৈতের সংসার-তদারকের ভার। জমা-খরচও সেই রাখে, সেই দেখাশোনা করে।

অদ্বৈতের সঙ্গে সেও নীলাচলে গিয়েছে। হিসেব খতিয়ে দেখল অদ্বৈতের ঋণ হয়েছে। তখন, অদ্বৈতকে না জানিয়েই, সে রাজা প্রতাপরুদ্রকে চিঠি লিখল।

লিখল: অদ্বৈত আচার্য ঈশ্বরতত্ত্ব। তবু দৈবাৎ তার কিছু ঋণ হয়েছে। যদি তিনশো টাকা দেন, ঋণ শোধ হয়।

দৈবাৎ সে চিঠি রাজার হাতে না পড়ে প্রভুর হাতে পড়ল।

চিঠি পড়ে প্রভু দুঃখিত হলেন। অদ্বৈতকে ঈশ্বর বলা হয়েছে এটা কিছু দোষের নয় কিন্তু ঈশ্বর দরিদ্র, ঈশ্বর ঋণী, একথা বলা কী করে? এ সব বলে যে ঈশ্বরকে খর্ব করা হয়েছে। ভগবান কোন কালে রাজার কাছে গিয়ে টাকা চাইবেন?

প্রভু ক্রুদ্ধ হলেন। গোবিন্দকে বললেন, আজ থেকে কমলাকান্তকে আমার এখানে আসতে দেবে না।

কমলাকান্তের আনাগোনা বন্ধ হয়ে গেল।

কমলাকান্ত কাঁদতে বসল। কিন্তু [illegible] অদ্বৈত-আচার্য [illegible] বললেন, কমলা, আজ তোমার সৌভাগ্য। প্রভু তোমাকে দণ্ড দিয়েছেন।

ভাগ্যি? [illegible] জন্য [illegible] চাইবে?

নিশ্চয় [illegible] প্রভু তোমাকে [illegible] করেছেন। যাকে প্রভু [illegible] করেন, তাকে [illegible] করে দণ্ড দেন।

কমলাকান্তকে সঙ্গে নিয়ে আচার্য নিজে প্রভুর কাছে গেলেন। বললেন, প্রভু, তোমার লীলা বোঝা ভার। তুমি যে-কৃপা আমাকেও করলে না, তাই তুমি আমার কিংকরকে করলে। আমি কী অপরাধ করেছি যে তোমার দণ্ড-প্রসাদ থেকে বঞ্চিত হলাম?

প্রভু হাসতে লাগলেন। গোবিন্দকে বললেন, কমলাকান্তকে ডাকো।

না, ওকে আবার [illegible] দেবে? অদ্বৈত আবার অনুযোগ করল: দুভাবে আমাকে তুমি বিড়ম্বিত করলে। [illegible] বেলাতেও কিংকর দণ্ডের বেলায়ও সে।

প্রভু বুঝলেন অদ্বৈতের মর্মকথা। এ তো সাধারণ অভিযোগ নয়, এ প্রণয়কোপ।

কমলাকান্ত প্রভুর সামনে দাঁড়াল নতশিরে।

প্রভু বললেন, যাতে আচার্যের লজ্জা-ধর্মের হানি হয় এমন কাজ কখনো কোরো না। রাজধন কখনো যাচঞা করে নেবে না। বিষয়ীর অন্ন খেলে মন দুষ্ট হয়, দুষ্ট মনে কৃষ্ণের স্মরণ হয় না। আর যদি কৃষ্ণস্মরণই না হয় তাহলে জীবনে আর ফল কী? যাও, আর কখনো এমন কাজ কোরো না।

কমলাকান্ত দণ্ডমুক্ত হয়ে গেল।

(৭৩)

গোবিন্দ ঘোষ

কাটোয়ার অদূরে অজয়ের পারে কুলাই গ্রামে গোবিন্দ ঘোষের আবির্ভাব। গোবিন্দও তার আর দুই ভাই বাসুদেব আর মাধবের মত গোরাঙ্গের পদকর্তা। সুকণ্ঠ গায়ক। নীলাচলে রথযাত্রায় প্রভুর নৃত্যে তিনজনই কীর্তন করেছে।

দলবল নিয়ে প্রভু চলেছেন গৌড়ে রামকেলির অভিমুখে। যত এগোচ্ছেন জনতা বৃহৎ থেকে বৃহত্তর হচ্ছে। যেন বিস্ফারিণী নদী বেগে-বলে বাড়তে বাড়তে চলেছে সমুদ্রের দিকে।

এত বড় দলের খাওয়া জোটাবে কে?

আর কে? ভগবান জোটাবেন। যে গ্রামে যখন মধ্যাহ্ন পড়বে সেই গ্রামের লোকেরাই ভগবৎপ্রেরিত হবে। নিয়ে আসবে খাদ্য পান।

সেদিন ভিক্ষান্তে হঠাৎ মুখশুদ্ধির জন্যে হাত বাড়ালেন প্রভু।

গোবিন্দ ঘোষ কাছে ছিল, সে ছুটল গ্রামের দিকে। কোত্থেকে একটা হরীতকী জোগাড় করে আনল। তার থেকে এক খণ্ড দিল প্রভুকে।

পরদিন দল অগ্রদ্বীপে এসে পৌঁচেছে। ভিক্ষান্তে প্রভু আবার মুখশুদ্ধির জন্যে গোবিন্দের দিকে হাত বাড়ালেন।

গোবিন্দ তখুনি [illegible] হরীতকী দিল।

প্রভু বিস্মিত হলেন। কাল জোগাড় করতে কত দেরি করেছিল আর আজ চাইবামাত্রই পেয়ে গেলাম?

কাল যে হরীতকীটা পেয়েছিলাম তার থেকে কিছুটা আপনাকে দিয়ে বাকিটা রেখে দিয়েছিলাম। সরলমুখে বললে গোবিন্দ, সেই বাকিটার থেকেই দিলাম আজ।

তুমি তা হলে সঞ্চয় করেছিলে? প্রভু গম্ভীর হলেন।

গোবিন্দের মুখ শুকিয়ে গেল।

তোমার সঞ্চয়ের স্পৃহা যায়নি এখনো। ঈশ্বরে আসেনি তোমার সমগ্র নির্ভর। সুতরাং, প্রভু কঠোর হলেন, আমার সঙ্গ ছাড়ো। তোমার পথ ত্যাগের নয়, সঞ্চয়ের, সংসারের। গোবিন্দ, তুমি গৃহস্থ হও।

গোবিন্দ কাঁদতে লাগল। কিন্তু প্রভু তাকে সঙ্গে নিলেন না। রেখে গেলেন অগ্রদ্বীপে। প্রভু বললেন তুমি কেঁদো না তোমাকে দিয়ে অসাধ্যসাধন করাব। দেখাব ভগবানের ভক্তবাৎসল্যের পরাকাষ্ঠা।

গঙ্গায় রোজ স্নান করছে কী একটা কালো মতন জিনিস ভাসতে ভাসতে এসে গোবিন্দের পায়ে ঠেকল। [illegible] পোড়া কাঠ বোধ হয়। স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে [illegible] নামধ্যানে তন্ময় হল গোবিন্দ।

তার হৃদয়ে গৌরহরি উদয় হলেন। বললেন, ওটা পোড়া কাঠ নয়। ওটাকে ধরো, ওটাকে ঘরে নিয়ে যাও।

ধরে ঘরে নিয়ে গেল গোবিন্দ। দেখল, সত্যিই তো, কাঠ নয়, কালো একখানি পাথর।

সদলে এলেন একদিন প্রভু। জিজ্ঞেস করলেন, কি, পেয়েছ যা পাঠিয়েছিলাম?

পেয়েছি।

ঐ পাথর দিয়ে বিগ্রহ স্থাপন করব।

ভাস্কর এল। নির্মিত হল শ্রীমূর্তি। গোবিন্দের কুটিরে প্রভু নিজহাতে তাকে স্থাপন করলেন। নাম দিলেন গোপীনাথ। অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ।

গোবিন্দ তুমি সংসারে থাকো আর গোপীনাথের সেবা করো। চলে গেলেন প্রভু।

গোবিন্দ বিয়ে করল। একটি ছেলে রেখে স্ত্রী মারা গেল। একা গোপীনাথের সেবা করছিল, এবার আবার শিশুর সেবার ভার পড়ল। দুজনকে সমানে সেবা করতে অসুবিধে হতে লাগল। কখনো গোপীনাথকে দুঃখ দিয়ে ছেলের সেবা করে, কখনো ছেলেকে দুঃখ দিয়ে গোপীনাথের সেবা করে। কে গোপীনাথ কে ছেলে বুঝে উঠতে পারে না।

পাঁচ বছরের হয়েছে ছেলেটি মারা গেল।

শোকে পাগল হয়ে গেল গোবিন্দ। গোপীনাথ ঠাকুরের সেবা করি, তার এই প্রতিফল! এ জীবন রাখব না। বিগ্রহের কাছে হত্যা দিয়ে পড়ে রইল। ঠাকুরের সেবা নেই, স্নানাহার নেই, কিছু নেই। থাক উপোস করে। দেখি কে ওকে খেতে দেয়!

গোবিন্দ, বাবা, তেষ্টায় গলা শুকিয়ে গেল, এক ফোঁটা জল দেবে না? বিগ্রহ কথা কয়ে উঠল।

অনড় হয়ে পড়ে রইল গোবিন্দ।

তোমার কি দয়ামায়া নেই? বললে আবার গোপীনাথ একটা নিরীহ ছেলেকে [illegible] না খাইয়ে রাখবে?

ছেলে? আমার ছেলে কোথায়? উঠে বসল গোবিন্দ।

দৈবে একটা ছেলে মরে গেলে আরেকটা ছেলেকে নিজের হাতে মেরে ফেলতে হয়?

তুমি আমার ছেলে? তুমি আমার ছেলে হয়ে? আমাকে পুত্রশোক দিলে? বুকে থেকে [illegible] নিয়ে গেলে ছিনিয়ে?

শোনো, তোমাকে একটা গোপন কথা বলি। বললে গোপীনাথ, যে বাপের দুই ছেলে সেখানে আমি থাকতে পারি না পুরো হয়ে। এক ছেলে ছিলাম, বেশ ছিলাম। তোমার যখন আরেক ছেলে হল, ভাবলাম ছেড়ে চলে যাই—

না, না, যেও না, তুমি—

আমি যদি যেতাম তবে তুমি তোমার দুই ছেলেই হারাতে। আমাকেও পেতে না, তাই তোমার ছেলেকেও মারা হল। এখন [illegible] ছেলে গেছে, আমি আছি—তবে [illegible]

তোমার সেবাতেও আছে। বললে গোপীনাথ।

সে আছে? সে থাকলে আমার কত কাজ করত। তুমি করবে? গোবিন্দ আর্তনাদ করে উঠল।

বলো কী কাজ?

তুমি আমার শ্রাদ্ধ করবে?

বাবা বলছ নিশ্চয়ই করব। তুমি আমার বাবা, তোমার আদেশ আমি অমান্য করব না। গোপীনাথ আশ্বাস দিল।

গোবিন্দ দেহত্যাগ করলে বিগ্রহের পদ্মচক্ষু দিয়ে বিন্দু-বিন্দু অশ্রু ঝরতে লাগল। পিতার মৃত্যুতে ছেলে শোকার্ত হবে না? ছেলে কি পাষাণ?

নতুন সেবায়েতকে স্বপ্ন দেখাল গোপীনাথ।

গোবিন্দ ঘোষ আমার পিতা। আমি এক মাস অশৌচ পালন করব আর হবিষ্যান্ন খাব। আমাকে স্নান করিয়ে কাচা পরিয়ে দাও। আমি আমার পিতার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছি, আমি তার শ্রাদ্ধ করব, পিণ্ড দেব নিজ হাতে। সব বন্দোবস্ত করো।

স্বপ্ন কথা সকলকে বললে সেবায়েত।

গোবিন্দের শ্রাদ্ধবাসরে সে কী ভিড়! গোপীনাথকে কাচা পরিয়ে আনা হল সভায়। আনন্দের কোলাহল পড়ে গেল চারদিকে। নিজ হাতে গোপীনাথ গোবিন্দ ঘোষের পিণ্ড দিল।

একেই বলে ভগবানের ভক্তবাৎসল্যের পরাকাষ্ঠা দেখানো।

নিজের ছেলে বেঁচে থাকলে সে আর ক বছর শ্রাদ্ধ করত? গোপীনাথের মতন যে ছেলে সে আবহমানকাল রাখতে পারে প্রতিশ্রুতি।

প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের কৃষ্ণা একাদশীতে গোপীনাথ অগ্রদ্বীপে গোবিন্দের শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান করে আসছে।

(৭৪)

কালিদাস

গৌড়ভক্তদের সঙ্গে কালিদাসও এসেছে নীলাচলে।

কে কালিদাস?

রঘুনাথদাস গোস্বামীর জ্ঞাতি-খুড়ো—বয়োবৃদ্ধ—সরল, উদার, মহাভাগবত। কৃষ্ণনাম ছাড়া আর কিছু বলে না। কাউকে যদি ডাকতে হয়, হরেকৃষ্ণ বলে শব্দ করে, কাকে ডাকছে সম্বোধিত লোক বুঝতে পারে চকিতে। কী চাই, কী করতে হবে তাও ঐ হরেকৃষ্ণ শব্দ থেকেই বোঝা যায়। তার সমস্ত ব্যবহারের কৃষ্ণনামই একমাত্র সংকেত।

এমন কি যখন পাশা-খেলায় দান ফেলে তখনো কালিদাস বলে ওঠে হরেকৃষ্ণ।

আর কী করে?

ছোট-বড় বিচার না করে পরিচিত সকল বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করে। এই তার আরাধ্য সাধন।

কিছু খাদ্যদ্রব্য নিয়ে সে বৈষ্ণব বাড়িতে যায়, গিয়ে বলে, উচ্ছিষ্ট করে দিন, আমি তাই খাব তৃপ্তি করে। যদি কেউ উচ্ছিষ্ট না দেয়, কালিদাস লুকিয়ে-লুকিয়ে দেখে কোথায় এ বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট ফেলা হয়। তারপর সেই আবর্জনা থেকে উচ্ছিষ্ট কুড়িয়ে এনে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে খায়।

ঝড়ুঠাকুর বৈষ্ণব, কিন্তু জাতিতে ভুঁই-মালি। তার বাড়িতে কতগুলো আম নিয়ে একদিন হাজির হল কালিদাস। ঝড়ুঠাকুরও তার স্ত্রীকে আম দিয়ে প্রণাম করল। কতক্ষণ বলল কৃষ্ণকথা।

ঝড়ুঠাকুর বললে, আমি নীচ জাতি আর তুমি সৎকুলোদ্ভব অতিথি—বলো কী দিয়ে তোমার সেবা করব? আদেশ করো কোনো ব্রাহ্মণের ঘরে তোমার আহারের ব্যবস্থা করি। তুমি যদি প্রসাদ না পাও, অভুক্ত চলে যাও, তাহলে আমি বাঁচব না।

কালিদাস বললে, ঠাকুর, আমি পতিত, আমি পামর, তোমাকে দর্শন করে পবিত্র হতে এসেছি। তোমার কাছে আমার শুধু এক প্রার্থনা, তোমার পদরজ দাও, আমার মাথায় তোমার শ্রীচরণ রাখো।

ঝড়ুঠাকুর অস্থির হয়ে উঠল। বললে, ছি-ছি, ও কী কথা, ওকথা বলতে নেই। আমি নীচ জাতি আর তুমি সুসজ্জন, তুমি অমন অসঙ্গত প্রার্থনা করো না।

কিন্তু শাস্ত্রে কী বলেছে? শ্লোক আবৃত্তি করে শোনাল কালিদাস: চতুর্বেদী ব্রাহ্মণও যদি ভক্তিশূন্য হয় সে আমার প্রিয় নয় আর চণ্ডালও যদি আমাতে ভক্তিমান হয় সে আমার প্রিয় হয়। সুতরাং ভক্ত চণ্ডালকেই সৎপাত্র জ্ঞান করে দান করবে আর তার কাছ থেকেই প্রতিগ্রহ করবে। সে যে আমারই মত পূজ্য। আবার শোনো। কৃষ্ণচরণে ভক্তি নেই এমন দ্বাদশগুণযুক্ত ব্রাহ্মণের চেয়ে কৃষ্ণচরণে মন বাক্য চেষ্টা অর্থ ও প্রাণ অর্পণ করেছেন এমন চণ্ডালকেও শ্রেষ্ঠ মনে করি। যেহেতু সেই চণ্ডাল নিজের কুলকে পবিত্র করতে পারেন কিন্তু সেই বহুগর্বিত ভূমিমান ব্রাহ্মণ তা পারে না।

ঝড়ুঠাকুর বললে, হাঁ, শাস্ত্রে তা বলেছে বটে কিন্তু আমার সেই ভক্তি কই? আমি শুধু হেয়কুলেই জন্মেছি, কৃষ্ণভক্তির কানাকড়িও আমাতে নেই।

কালিদাস আর কী করে, ফিরে চলল। ঝড়ুঠাকুর কয়েক পা এগিয়ে দিল কালিদাসকে।

ঝড়ুঠাকুর চলে গেলে ফিরে দাঁড়াল কালিদাস। দেখল পথের ধুলোয় ঝড়ুঠাকুরের পায়ের চিহ্ন পড়ে আছে। সেই ধুলো তুলে নিয়ে মাখতে লাগল সর্বাঙ্গে।

তারপর ঝোপঝাড়ের আড়ালে লুকিয়ে রইল।

ঝড়ুঠাকুর ঘরে ফিরে এসে সেই আম মানসেই কৃষ্ণচন্দ্রকে নিবেদন করল। তারপর স্বামী-স্ত্রীতে আম খেয়ে আঁঠি আর খোসা ফেলে দিল আস্তাকুড়ে। কালিদাস তা দেখল, পরে চুপি-চুপি সেখান থেকে সেই আঁঠি কুড়িয়ে নিয়ে চুষতে লাগল। আস্বাদনে প্রেমোল্লাস হল।

প্রভু জগন্নাথদর্শনে মন্দিরে যান, জলকরঙ্গ নিয়ে সঙ্গে যায় গোবিন্দ। সিংহদ্বারের উত্তরে বাইশ সিঁড়ির কপাটের আড়ালে একটা গর্ত আছে, সেখানে প্রভু প্রত্যহ পা ধোন। পা ধুয়ে পরে সিঁড়ি ভেঙে যান ঈশ্বরদর্শনে। গোবিন্দকে বলে দিয়েছেন, দেখো, আমার পাদোদক যেন কেউ না নেয়।

মন্দিরে যাবার আগে প্রভু সেদিন পা ধুচ্ছেন কালিদাস হাত পেতে এসে দাঁড়াল। একে-একে তিন অঞ্জলি জল নিয়ে সে পান করল। তারপর প্রভু তাকে বারণ করলেন, বললেন, আর নয়, তোমার বাসনা এতেই পূর্ণ হয়েছে।

প্রভু জানেন কালিদাসের বৈষ্ণবশ্রদ্ধা, তাই যে প্রসাদ অন্যের পক্ষে দুর্লভ তাই পাইয়ে দিলেন তাকে। বুঝিয়ে দিলেন, শুধু বৈষ্ণবনিষ্ঠায়ই ভগবানের মহৎ কৃপা লাভ করা যায়।

দর্শনান্তে প্রভু ঘরে এসে আহার করছেন, দেখলেন বহির্দ্বারে কালিদাস প্রত্যাশা করে বসে আছে। প্রভু গোবিন্দকে ইঙ্গিত করলেন, গোবিন্দ কালিদাসকে প্রভুর ভুক্তাবশেষ খেতে দিল।

যে ঘৃণা লজ্জা ছেড়ে বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট খেতে পারে সেই চূড়ান্ত কৃপার অধিকারী হয়। কৃষ্ণের উচ্ছিষ্টের নাম মহাপ্রসাদ আর ভক্ত-বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টের নাম মহা-মহাপ্রসাদ।

ভক্ত-পদধূলি আর ভক্ত-পাদজল।

ভক্ত-ভুক্ত-অবশেষ—তিন মহাবল।।

এই তিনের সেবা থেকেই কৃষ্ণপ্রেমের উল্লাস। ভক্তপদধূলিতে অভিষিক্ত না হওয়া পর্যন্ত শুধু যাগযজ্ঞ তপস্যা বা বেদপাঠ দ্বারা ভগবৎতত্ত্বের জ্ঞানোদয় হয় না। সাধুদের চরণধূলির মধ্য দিয়েই পাওয়া যায় ভগবানের পদস্পর্শ।

কালিদাসই তার সাক্ষী।

(৭৫)

ভাগবত আচার্য

আসল নাম রঘুনাথ, উপাধি ভাগবতাচার্য। উপাধি প্রভুর দেওয়া।

গৌড়ে এসে আবার নীলাচলে ফিরে যাচ্ছেন প্রভু, পথে বরাহনগরে এক মহাভাগ্যবান ব্রাহ্মণের ঘরে এসে উঠলেন। সে ব্রাহ্মণ রঘুনাথ। তার একমাত্র গুণ—সে ভাগবত-পাঠে সুশিক্ষিত।

প্রভুকে পদার্পণ করতে দেখেই রঘুনাথ ভাগবত-পাঠ করতে শুরু করল।

সম্বর্ধনার সবচেয়ে বড় আয়োজন—ভাগবত-পাঠ।

প্রেমাবিষ্ট হয়ে প্রভু নৃত্য করতে লাগলেন। নৃত্যের সঙ্গে কখনো-কখনো হুঙ্কার-গর্জন। কখনো বা আকুল অশ্রুধারা। বাহ্যস্মৃতি হারিয়ে রাত্রির তিন প্রহর পর্যন্ত চলল এই নৃত্যাবেশ। পরিশেষে একটু সুস্থির হলে রঘুনাথকে আলিঙ্গন করলেন। বললেন, কারু মুখে এমন ভাগবত পড়া শুনিনি। আজ থেকে তোমার নাম হল ভাগবতাচার্য। ভাগবত পড়া ছাড়া আর তোমার কোনো কাজ নেই।

শুধু গ্রন্থপাঠেই কৃষ্ণপ্রেম।

ভাগবতাচার্য গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য। শ্রীপাট বরাহনগরে।

(ক্রমশঃ)

মেমসাহেব

নিমাই ভট্টাচার্য

(৭)

দোলাবৌদি

আমি ভাবছি চিঠিগুলো বড্ড বড় হয়ে যাচ্ছে। আর তুমি লিখেছ আরো অনেক বড় করে লিখতে। অথবা কদিন ছুটি নিয়ে কলকাতায় গিয়ে মুখোমুখি সব কিছু বলতে প্রস্তাব করেছ। প্রথম কথা, এখন পার্লামেন্টের বাজেট সেসন চলছে। ছুটি নিয়ে কলকাতা যাবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া নিজের মুখে তোমাকে এ কাহিনী আমি শোনাতে পারব না। মেমসাহেব আমাকে কত ভালবাসত, কত আদর করত, কত রকম করে আদর করত, কেমন করে দুজনে রাত জেগেছি, সে সব কথা তোমাকে বলব কেমন করে? লজ্জায় আমার গলা দিয়ে স্বর বেরুবে না। ভগবান সবাইকে কণ্ঠস্বর দিয়েছেন কিন্তু সবার কণ্ঠেই কি সুর আছে? আছে মিষ্টত্ব? নেই। কণ্ঠ থাকলেই কি সব কথা বলা যায়? সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনার সব অনুভূতিই কি বলা যায়? হয়ত অন্যেরা বলতে পারে কিন্তু আমার সে ক্ষমতা নেই। তুমি আমাকে ক্ষমা করো।

সময় থাকলে হয়ত চিঠিগুলো আরো দীর্ঘ হতো। তাছাড়া চিঠি লিখতে বসেও কলম থেমে যায় মাঝে মাঝেই। আমাকে ফাঁকি দিয়ে মনটা কখন যে অতীত দিনের স্মরণীয় স্মৃতির অরণ্যে লুকিয়ে পড়ে, বুঝতে পারি না। অনেকক্ষণ ধরে খোঁজা-খুঁজির পরে দেখি মেমসাহেবের আঁচলের তলায় মন লুকিয়ে আছে। তোমাকে এই চিঠিগুলো লিখতে বসে বার বার মনে পড়ে সেসব দিনের স্মৃতি। আপন মনে কখনো হাসি, কখনো লজ্জা পাই। কখনো আবার মনে হয় মেমসাহেব গান গাইছে এবং বেসুরো গলায় আমি কোরাস গাইতে চেষ্টা করছি। এই চিঠি লিখতে বসেই আবার আবার মনের রিভলবিং স্টেজ ঘুরে যায়, দৃশ্য বদলে যায়। আমার চোখটা ঝাপসা হয়ে ওঠে। কলমটা থেমে যায়। একটু পরে দু'চোখ বেয়ে জল নেমে আসে।

দোলাবৌদি, তোমাকে চিঠি লিখতে বসে এমনি করে প্রতি পদক্ষেপে নিজেকে হারিয়ে ফেলি। নিজেকেই নিজে হারিয়ে ফেলি। কিন্তু তবুও অনেক কষ্টে ফিরে যাই অতীতে এবং আবার তোমাকে চিঠি লিখতে বসি।

আগে থেকে তোমাকে দুঃখ দেবার ইচ্ছা আমার নেই। যথাসময়ে তুমি আমার চোখের জলের ইতিহাস জানবে। তবে জেনে রেখো, আজ সোজা হয়ে দাঁড়াবার ক্ষমতাটুকু পর্যন্ত আমার নেই। হাঁটবার সাহস নেই. কোনমতে যেন হামাগুড়ি দিয়ে গড়িয়ে চলেছি।

তোমার নিশ্চয়ই এসব পড়তে ভাল লাগছে না। মনটা ছটফট করছে আমাদের প্রথম অ্যাপয়েণ্টমেণ্টের কথা শুনতে। তাই না? শুধু প্রথম দিনের কথাই নয়, আরো অনেক কিছুই তোমাকে বলব। তবে অনেক দিন হয়ে গেল। কিছু কথা, কিছু স্মৃতি অস্পষ্ট হয়ে গেছে।

সেদিন দুপুরের দিকে অফিসে গিয়ে কিছুক্ষণ কাজ করে জরুরী কাজের অছিলায় বাসায় চলে এলাম। ভাল করে সাবান দিয়ে স্নান করলাম। ধোপাবাড়ীর কাচানো ধুতি-পাঞ্জাবি পরলাম। বোধহয় মুখে একটু পাউডারও বুলিয়েছিলাম। তারপর মা কালীর ফটোয় বার কয়েক প্রণাম করে বেরিয়ে পড়লাম। দেরী হয়ে যাবার ভয়ে আগে আগেই বেরিয়ে পড়লাম।

সাড়ে পাঁচটার মধ্যেই এসপ্ল্যানেড পৌঁছে গেলাম। অফিস ছুটির সময়! অনেক পরিচিত মানুষের সঙ্গে দেখা হবার সম্ভাবনা। তাই চৌরঙ্গী ছেড়ে লক্ষ্মী সিনেমার পাশ দিয়ে ঘুরে ফিরে নিউ মার্কেটে চলে গেলাম। মার্কেটের সামনের কিছু স্টলের সামনে কয়েক মিনিট ঘোরাঘুরি করে এলাম লিণ্ডসে স্ট্রীটের মোড়ে।

দেরী করতে হলো না। মেমসাহেবও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এলো। একঝলক দেখে নিলাম। চমৎকার লাগল। বড় পবিত্র মনে হলো আমার মেমসাহেবকে। খুব সাধারণ সাজ-গোছ করে এসেছিল। ঐ বিরাট গোছা-ভরা চুলগুলোকে দিয়ে নিছকই একটা সাধারণ খোঁপা বেঁধেছিল। মুখে কোথাও প্রসাধনের ছোঁওয়া ছিল না। পরনে শাদা খোলের একটা মাঝারি ধরনের তাঁতের শাড়ী। গায়ে একটা লক্ষ্ণৌ চিকনের ব্লাউজ। ডান হাতে একটা কঙ্কন, বাঁ হাতে স্টেনলেস স্টিলের ব্যাণ্ড দিয়ে বাঁধা একটা ঘড়ি। হাতে দুটো-একটা খাতা বই আর ছোট্ট একটা পার্স।

প্রথমে কে কথা বলেছিল, তা আর আজ মনে নেই। ঠিক কি কথা হয়েছিল, তাও মনে নেই। তবে মনে আছে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, চা খাবেন?

মেমসাহেব বলেছিল, না, চা আর খাব না। তার চাইতে একটু বসা যাক।

রাস্তা পার হয়ে ময়দানের দিকে এলাম। তারপর কিছুদূর হেঁটে ময়দানের এক কোণায় বসলাম দুজনে। বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকলাম দুজনেই। মাঝে মাঝে একবার ওর দিকে তাকিয়েছি আর তৃপ্তিতে ভরে গেছে মন। মেমসাহেবও মাঝে মাঝে আমাকে দেখছিল। কয়েকবার দুজনের দৃষ্টিতে ধাক্কা লেগেছে। হেসেছি দুজনেই।

এক সেকেণ্ড পরে আবার আমি তাকিয়েছি মেমসাহেবের দিকে। এবার আর মেমসাহেব চুপ করে থাকতে পারে না। প্রশ্ন করে, 'কি দেখছেন?'

প্রথমে আমি উত্তর দিতে পারিনি। লজ্জা করেছে, দ্বিধা এসেছে।

মেমসাহেব একটু পরে আবার প্রশ্ন করে, 'কি হলো? উত্তর দিচ্ছেন না যে!'

'সব সময় কি সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায়, না দেবার ক্ষমতা থাকে?'

'আমার প্রশ্নটা কি খুব কঠিন?'

'কদিন বাদে হয়ত এ প্রশ্ন কঠিন থাকবে না, তবে আজ বেশ কঠিন মনে হচ্ছে।'

দুজনের দৃষ্টিই চারপাশ ঘুরে যায়। আমি আবার চুরি করে মেমসাহেবকে দেখে নিই। ধরা পড়লাম না। কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারলাম না, ধরা পড়ে গেলাম।

একটু হাসতে হাসতে মেমসাহেব আবার জানতে চায়, 'অমন করে কি দেখছেন?'

আমি কয়েকবার আজেবাজে অপ্রয়োজনীয় কথা বলে ওর প্রশ্নটা এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করলাম, পারলাম না।

আমি বললাম, 'আপনি জানেন না আমি কি দেখছি?'

'না।'

'সত্যি?'

মেমসাহেব আবার হাসে। বলে, 'প্রথম দিনেই কিভাবে বুঝলেন আমি মিথ্যা কথা বলি।'

'না, তা ঠিক না।'

'তবে বলুন কি দেখছেন।' মেমসাহেব যেন দাবী জানাল।

আমি আর দেরী করি না। মেমসাহেবকে দেখতে দেখতেই বললাম, 'আপনার চোখ দুটি বড় সুন্দর......

ঠোঁটটা কামড়াতে কামড়াতে মুখ ঘুরিয়ে নেয় মেমসাহেব। একটু নীচু গলায় বলল, 'ঘোড়ার ডিম সুন্দর!'

আবার কয়েক মুহূর্ত দুজনেই চুপচাপ থাকি। তারপর মেমসাহেব আবার বলে, 'আমি কালো কুচ্ছিৎ বলে আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করছেন?'

জান দোলাবৌদি, কোন কারণ ছিল না কিন্তু তবুও দুজনে মুচকি হাসতে হাসতে বেশ কিছুক্ষণ তর্ক করলাম। প্রথম প্রথম প্রেমে পড়লে এমন অকারণ অনেক কিছুই করতে হয়, তাই না? তবে শেষে আমি বলেছিলাম, 'সত্যি আপনার চোখ দুটো বড় সুন্দর।'

পরে বিদায় নেবার আগে বলেছিলাম, 'প্রথম পরিচয়ের দিনই আপনার সৌন্দর্য

নিয়ে আলোচনার জন্য যদি কোন অন্যায় হয়ে থাকে তো মাপ করবেন।'

'তুমি তো মেমসাহেবকে দেখেছ। সত্যি করে বল তো, ওর চোখ দুটো সুন্দর কিনা। অত কালো টানা টানা ঘন গভীর বুদ্ধিদীপ্ত চোখ আমি তো জীবনে কোথাও দেখিনি। ঐ চোখ দুটো আমাকে চুম্বকের মত টেনে নিয়েছিল। সেই সেদিন দানাপুর প্যাসেঞ্জারের কামরায় মেমসাহেবের প্রথম দেখা পাবার সঙ্গে সঙ্গে আমি বেশ উপলব্ধি করেছিলাম আমার নিঃসঙ্গ জীবনের শেষ হতে চলেছে। ময়দানে মেমসাহেবের পাশে বসে আমার সে উপলব্ধি আরো দৃঢ় হলো। বেশ বুঝতে পারলাম জীবনদেবতা আমাকে জনারণ্যের মধ্যে হারিয়ে যেতে দেবেন না। নিঃশব্দে নিভৃতে তিনি আমার কাছে মেমসাহেবকে পাঠিয়েছেন আমার জীবনযুদ্ধের সেনাপতিরূপে।

আমার নতুন সেনাপতিও বোধহয় বুঝতে পেরেছিল যে বিধাতাপুরুষ শুধু একটু হাসি, একটু গান, একটু সখ, একটু আনন্দ, একটু ভাললাগার জন্য তাকে আমার কাছে টেনে আনেননি।

দু'চারদিন আরো দেখাশোনা হবার পর একদিন সন্ধ্যায় পার্কসার্কাস ময়দানের এক কোণায় বসে মেমসাহেবকে আমার জীবন-কাহিনী শোনালাম। সব কিছু শুনে মেমসাহেব বলেছিল, 'ধাতুটা' ভাল তবে খাদ মিশে গেছে। গহনা গড়বার জন্য একটু বেশী পোড়াতে হবে, একটু বেশী পেটাতে হবে।'

'কাকে পোড়াবেন? কাকে পেটাবেন?'

'বুঝতে পারছেন না?'

'বুদ্ধি থাকলে তো বুঝব।'

এবার একটু হেসে, একটু জোর গলায় বললো, 'আপনাকে।'

আমি অবাক হয়ে বলি, 'সেকি সর্বনাশের কথা!'

প্রায় ভোষামোদ করে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি আমাকে পোড়াবেন, পেটাবেন?'

মেমসাহেব গাম্ভীর্য আনার ব্যর্থ চেষ্টা করতে করতে বলল, 'তবে কি আপনাকে পুজো করব?'

একটু পরে বলেছিল, 'দেখবেন, আপনাকে কেমন জব্দ করি, কেমন শাসন করি।'

'সত্যি?'

'নিশ্চয়ই।'

'পারবেন?'

'নিশ্চয়ই।' বেশ আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে মেমসাহেব জবাব দেয়।

'পাছে হেরে যান, সেই ভয়ে মা পর্যন্ত আগে আগেই পালিয়েছেন। সুতরাং আপনি কি......!'

আরো কয়েক সপ্তাহ কেটে গেল। ইতিমধ্যে মেমসাহেব নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিল আমি পরীক্ষা দিয়ে কোনমতে পাশ করেছি কিন্তু ঠিক লেখাপড়া নিশ্চয়ই কিছু করিনি। তাই বলল, রোজ একটু পড়াশুনা করবেন।'

'সে কি? এই বুড়ো বয়সে আবার পড়াশুনা করব?'

সোজা জবাব আসে, 'বাজে তর্ক করবেন না। নিশ্চয়ই রোজ একটু পড়াশুনা করবেন।'

'ডজন খানেক খবরের কাগজ আর ডজন খানেক জার্নাল তো রেগুলার পড়ি।'

'খবরের কাগজে কাজ করতে হলে শুধু খবরের কাগজ পড়লে চলে না, আরো কিছু পড়া দরকার।'

আমি চুপ করে থাকি। বসে বসে ভাবি মেমসাহেবের কথা।

মেমসাহেব বলে, এ'কটা কথা বলবেন?'

'বলব।'

'আপনি আমার কথায় বিরক্ত হচ্ছেন, তাই না?'

'না, না, বিরক্ত হবো কেন?'

'তবে এত গম্ভীর হয়ে ভাবছেন কি?'

দৃষ্টিটা উদাস হয়ে যায়। মনটা উড়ে বেড়ায় অতীত-বর্তমানের সমস্ত আকাশ জুড়ে। শুধু বলি, একটুও বিরক্ত হচ্ছি না। শুধু ভাবছি কেউ তো আমাকে এসব কথা আগে বলেনি......!'

'তাতে কি হলো?'

এমনি করে এগিয়ে চলে আমাদের কথা। শেষে মেমসাহেব বলে, 'চিরকালই কি আপনি একটা অর্ডিনারী রিপোর্টার থাকবেন?'

'মাত্র একশ' পঁচিশ টাকা মাইনের সেই রিপোর্টার হবার সুযোগই আজ পর্যন্ত পেলাম না; সুতরাং কল্পনা করে আর কতদূর যাব?'

স্পষ্ট জানিয়ে দেয় মেমসাহেব, 'ওসব কথা বাদ দিন। অতীত আর বর্তমান নিয়েই তো জীবন নয়, ভবিষ্যতই জীবন।'

'অতীত আর বর্তমানের ক্ষয়রোগে ভুগতে ভুগতে মেরুদণ্ডটা ভেঙে গেছে। তাই ভবিষ্যতে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারব বলে ভরসা পাই না।'

'কথাটা ঠিক হলো না। অতীত-বর্তমান হচ্ছে ক্যানভাস আর ব্যাকগ্রাউণ্ড মাত্র, ছবিটা এখনও আঁকা বাকি।'

যাইহোক শেষে মেমসাহেব বলল, অতীত-বর্তমান নিয়ে অত মাথা ঘামাবেন না, ভবিষ্যতের জন্য নিজেকে তৈরী করুন। ক্লাসিকস্ পড়ুন, ভাল ভাল লিটারেচার পড়ুন।

সাধারণত ছেলেমেয়েরা ছাত্রজীবনে পড়াশুনা করে। প্রথম কথা, আমাকে গাইড করার কেউ ছিল না। দ্বিতীয়ত ছাত্রজীবনে সে সুযোগ বা অবসরও পাইনি। পরীক্ষায় পাশ করবার জন্য কিছু ইংরেজি-বাংলা সাহিত্য পড়তে বাধ্য হয়েছি। তাছাড়া বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র ইত্যাদি কোন না কোন কারণে বা উপলক্ষে পড়েছি। কদাচিৎ কখনও কোন দুর্ঘটনার জন্য জনসন বা টি এস ইলিয়টও হয়ত পড়েছি। কিন্তু ঠিক পড়াশুনা বলতে যা বোঝায়, তা আর করতে পারিনি। মেমসাহেবের পাল্লায় পড়ে এবার আমি সত্যি সত্যিই একটু পড়াশুনা করা শুরু করলাম।

কোনদিন নিজেদের বাড়ী থেকে, কোনদিন আবার ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরী থেকে মেমসাহেব আমার জন্য বই আনা শুরু করল। আমিও ধীরে ধীরে পড়াশুনা শুরু করলাম। ইংরেজি-বাংলা দুইই পড়লাম। বিদ্যাসাগর, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, মাইকেল আবার পড়লাম। রমেশচন্দ্র, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতিও বাদ পড়লেন না। তারপর মোহিতলাল থেকে জীবনানন্দও মেমসাহেব প্রেসক্রিপসন করল। ওদিকে ডরোথি পার্কারকে পড়লাম, পড়লাম রবার্ট ফ্রস্ট—টি এস ইলিয়ট—এজরা পাউণ্ডের কবিতা। আমার মন ছটফট করে ওঠে। মেমসাহেবকে বললাম, 'মেমসাহেব, এবার তোমার পাঠশালা বন্ধ কর।'

মেমসাহেব কি বলল জান? বলল, 'বাজে বকো না। কিছু লেখাপড়া না করে জার্নালিজম করতে তোমার লজ্জা করে না?'

'লজ্জা? জার্নালিস্টদের লজ্জা! তুমি হাসালে মেমসাহেব!'

মেমসাহেবের দাবড় খেয়ে হাক্সলে, হেনরি গ্রীন, হেমিংওয়ে, লরেন্স ডুরেল, অ্যানি পর্টার, মেরী ম্যাকার্থির এক গাদা বই পড়লাম।

এর পর একদিন আমাকে গীতবিতান প্রেজেন্ট করল। আমি অবাক হয়ে গেলাম। ভাবলাম, মেমসাহেব কি এবার আমাকে গানের স্কুলে ভর্তি করবে? জিজ্ঞাসা করলাম, 'তানপুরা পাব না?'

মেমসাহেব রেগে গেল। 'আমার মুণ্ডু পাবে।'

পরে বলেছিল, যখন হাতে কাজ থাকবে না, চুপচাপ গীতবিতানের পাতা উল্টিয়ে যেও। খুব ভাল লাগবে। দেখবে তুমি অনেক কিছু ভাবতে পারছ কল্পনা করতে পারছ।

ইতিমধ্যে এম এ পাশ করে মেমসাহেব একটা গার্লস কলেজে অধ্যাপনা শুরু করে দিয়েছে। ইতিমধ্যে আরো অনেক কিছু হয়ে গেছে। মেমসাহেব উপলব্ধি করল আমার অন্তরের শূন্যতা, জীবনের ব্যর্থতা, ভবিষ্যতের আশঙ্কা। উপলব্ধি করল আমার জীবন-যজ্ঞে তার অনন্য প্রয়োজনীয়তা। আমি নিজেই একদিন বললাম, জান মেমসাহেব, প্রথমে শুধু বাঁচতে চেয়েছিলাম কিন্তু পরে এক দুর্বল মুহূর্তে স্বপ্ন দেখলাম আমি এগিয়ে চলেছি। দশজনের মধ্যে একজন হবার স্বপ্ন দেখলাম। সেই স্বপ্নের ঘোরে বেশ কিছুকাল কেটে গেল। যখন সম্বিত ফিরে পেলাম, তখন নিজের দুরবস্থা দেখে নিজেই চমকে গেলাম, ঘাবড়ে গেলাম হতাশ হলাম।

একটু থামি।

আবার বলি, সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-সাধনা বিসর্জন দিয়ে নিজেকে তুলে দিলাম অদৃষ্টের হাতে। কিন্তু তোমাকে দেখে আমার সব হিসাব-নিকাশ ওলট-পালট হয়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যে আবার সমস্ত স্বপ্ন উড়ে এসে জুড়ে হলো মনের আকাশে।

মেমসাহেবের হাতটা চেপে ধরে বললাম, ভগবানের নামে শপথ করে বলছি, মেমসাহেব। তোমাকে দেখেই যেন মনে

হলো তুমি তো আমারই। এই অন্ধকূপ থেকে আমাকে মুক্তি দেবার জন্যই যেন ভগবান তোমাকে পাঠিয়েছেন।

আমার মত মেমসাহেব কোনদিনই বেশী কথা বলত না। শুধু বলল, হয়ত তাই। তা না হলে তোমার সঙ্গে অমন অপ্রত্যাশিতভাবে পরের দিনই আবার দেখা হবে কেন?

অদৃষ্টের ইঙ্গিত, নিয়তির নির্দেশ মেমসাহেবও বুঝতে পেরেছিল। আমি অনেক কথা বলার পরই দু'হাত তুলে মেমসাহেবের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলাম। মেমসাহেবের অনুষ্ঠান অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হয়েছিল।

প্রতিদিনের মত সেদিন বেলা দেড়টা-দুটোর সময় অফিস গিয়েছিলাম। টেলিপ্রিণ্টারের কয়েকটা লোক্যাল কপি দেখতে দেখতেই টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলে অভ্যাস মত বললাম, রিপোর্টার্স!

'কখন অফিসে এলে?'

'এইত একটু আগে।'

'একটা কথা বলব?'

'বলো।'

'নিশ্চয়ই।'

'চলো না একটু বেড়িয়ে আসি।'

আমি একটু অবাক হয়ে জানতে চাই, 'এখন?'

'হ্যাঁ।'

'কি ব্যাপার বল তো।'

'বল না যাবে কিনা?'

চীফ রিপোর্টার বা নিউজ এডিটর এখনও অফিসে আসেননি। কি করব, ভাবছিলাম। মেমসাহেব টেলিফোন ধরে থাকল। আমি ডায়েরীতে দেখে নিলাম দুটো প্রেস কনফারেন্স ছাড়া আর কিছু নেই। একটা চারটের সময় আর দ্বিতীয়টা সন্ধ্যা সাতটায়।

মেমসাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'সাতটার মধ্যে ফিরতে পারব?'

'সাতটা? বোধহয় না।'

'কখন ফিরবে?'

'আটটা—সাড়ে আটটার মধ্যে নিশ্চয়ই ফিরব।'

চীফ রিপোর্টারকে একটা শিলপ লিখে রেখে গেলাম, একটা জরুরী নিউজের লোভে বেরিয়ে যাচ্ছি। বারে ফিরে টেলিফোন ডিউটি দেব।

অফিস থেকে বেরিয়ে পড়লাম। এসপ্লানেডের মোড়ে দুজনে মীট করে সোজা চলে গেলাম দক্ষিণেশ্বর। মন্দিরের দরজা বন্ধ ছিল। তাই এদিক-ওদিক ঘুরে পঞ্চবটী ছাড়িয়ে আরো খানিকটা দক্ষিণে গঙ্গার ধারে একটা গাছের ছায়ায় বসলাম দুজনে।

মেমসাহেব বলল, চোখ বন্ধ কর।

'কেন?'

'আঃ! সব সময় কেন কেন করো না। বলছি চোখ বন্ধ কর।'

'পুরোটা না অর্ধেকটা বন্ধ করব?'

'তুমি বড্ড তর্ক কর।' মেমসাহেব এবার কড়া হুকুম দেয়, 'আই সে, ক্লোজ ইওর আইজ।'

সত্যি সত্যিই চোখ বন্ধ করলাম। মুহূর্তের মধ্যে অনুভব করলাম মেমসাহেব আমার দুটি পায় হাত দিয়ে প্রণাম করছে। চমকে গিয়ে চোখ খুলে প্রশ্ন করলাম, 'একি ব্যাপার?'

দেখি মেমসাহেবের মুখে অনির্বাণ আনন্দের বন্যা, দুটি চোখে পরম তৃপ্তির দীপশিখা জ্বলছে। দুটি হাত দিয়ে মেমসাহেবের মুখটা তুলে ধরে আবার প্রশ্ন করলাম, 'হঠাৎ প্রণাম করলে কেন মেমসাহেব?'

কোন উত্তর দিল না মেমসাহেব। আত্মসমর্পণের ভাষায় চাইল আমার দিকে। আমিও ওর দিকে চেয়ে রইলাম অনেকক্ষণ। তারপর আবার জানতে চাইলাম, 'বল না, প্রণাম করলে কেন?'

এবার মেমসাহেব কথা বলে, 'আমি তোমাকে প্রণাম করলাম, তুমি আমাকে আশীর্বাদ করবে না?'

আমি অবাক হয়ে যাই। নিজের দৈন্য এত স্পষ্ট হলো যে নিজেকে বেশ ছোট মনে হলো। মেমসাহেব প্রণাম করার পর কৈফিয়ত তলব না করে আমার আশীর্বাদ করা প্রথম কাজ ছিল। যাইহোক তাড়াতাড়ি মেমসাহেবকে কাছে টেনে নিলাম। দুটি হাত দিয়ে ওর মুখখানা তুলে ধরে বললাম, ভগবান যেন তোমাকে সুখী করেন।

মেমসাহেব হঠাৎ মাথাটা ছাড়িয়ে নিয়ে দু'হাত দিয়ে আমাকে চেপে ধরে বলল 'ভগবান কি করবেন, তা ভগবানই জানেন কিন্তু তুমি কি আমাকে সুখী করবে?'

'কি মনে হয়?'

'মনে মনে তো ভয়ই হয়।'

'কিসের ভয়?'

কানে কানে ফিস ফিস করে মেমসাহেব বলল, 'হাজার হোক খবরের কাগজের রিপোর্টার। কবে কখন, কোথায় হয়ত কোন সুন্দরী এসে তোমাকে ঝড়ের বেগে উড়িয়ে নিয়ে যাবে.....।'

'তাই নাকি?'

'তবে আবার কি। পুরুষদের বিশ্বাস নেই.....।'

'জান মেমসাহেব, তোমাকে নিয়ে আমারও অনেক ভয়।'

আমার বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে আঙুল দিয়ে নিজেকে দেখিয়ে মেমসাহেব অবাক হয়ে বলল, 'আমাকে নিয়ে তোমার ভয়?'

'জি, মেমসাহাব।'

'বাজে বকো না।'

'বাজে না মেমসাহেব। জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত কোন মানুষের আমন্ত্রণ এলে পঞ্চাশ টাকার এই রিপোর্টারকে নিশ্চয়ই তোমার ভুলে যেতে কষ্ট হবে না।'

দপ করে জ্বলে উঠল মেমসাহেব, 'সব সময় তুমি পঞ্চাশ টাকার রিপোর্টার, পঞ্চাশ টাকার রিপোর্টার বলবে না তো। সারা জীবনই কি তুমি পঞ্চাশ টাকার রিপোর্টার থাকবে?

'থাকব না?'

'না, না, না।'

'তাহলে কি হবো?'

'কি আবার হবে? জীবনে মানুষ হবে, বড় হবে, মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে।'

'পারব?'

'একশ'বার পারবে। তাছাড়া আমি আছি না!'

মেমসাহেব আমাকে একটু কাছে টেনে নেয়। একটু আদর করে। মাথার চুলগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করে। আবার বলে, 'তুমি ভয় কেন যে তুমি হেরে গেছ?'

'কি করব বল মেমসাহেব? অকূল সমুদ্রে জাহাজ ভেসে বেড়ায়, কিন্তু লাইট হাউসের ঐ ছোট্ট একটা আলোর ইঙ্গিত না পেলে তো সে বন্দরে ভিড়তে পারে না।'

'আমি তো এসেছি, আর ভয় কি? কিন্তু কথা দিতে পার আমার বন্দর ছেড়ে তুমি তোমার জাহাজ নিয়ে অন্য বন্দরে বন্দরে ঘুরে বেড়াবে না?'

আচ্ছা দোলাবৌদি, সব মেয়েদের মনেই ঐ এক ভয়, এক সন্দেহ কেন বলতে পার? পৃথিবীর ইতিহাস কি শুধু পুরুষদের বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনীতেই ভরা? যাইহোক মেমসাহেবের কথা আমার বেশ লাগত। অন্তত এই ভেবে আমি তৃপ্তি পেতাম যে সে আমাকে সম্পূর্ণভাবে কামনা করে।

সেদিন কথায় কথায় সন্ধ্যা নেমে এলো। মন্দিরের 'মঙ্গলদীপের' আলোর প্রতিবিম্ব পড়ল গঙ্গায়। স্রোতস্বিনী গঙ্গা সে আলো ভাসিয়ে নিয়ে গেল দূরদূরান্তরে, শহরে, নগরে, জনপদে আর অসংখ্য মানুষের মনের অন্ধকার গহন অরণ্যে।

মেমসাহেব শেষকালে প্রশ্ন করল, 'কই তুমি তো জানতে চাইলে না তোমাকে আজ এখানে নিয়ে এলাম কেন? তুমি তো জানতে চাইলে না তোমাকে প্রণাম করে আশীর্বাদ চাইলাম কেন?'

'কোন বিশেষ কারণ আছে নাকি?'

'তবে কি', এই বলে মেমসাহেব ব্যাগ থেকে একটা কাগজ বের করে আমাকে পড়তে দিল।

পড়ে দেখি হাওড়া গার্লস কলেজের অ্যাপয়েন্টমেণ্ট লেটার। মেমসাহেবের দুটি হাত ধরে বললাম, 'কনগ্র্যাচুলেশনস। এইত্ত আরম্ভ, আনন্দে, ঐশ্বর্যে ভগবান নিশ্চয়ই তোমাকে ভরিয়ে তুলবেন।'

একটু থেমে প্রশ্ন করি, 'মাসে দুশ আড়াইশ' টাকা দিয়ে কি করবে মেমসাহেব?'

'কেন? দুজনে মিলেও ওড়াতে পারব না?'

দুজনেই হেসে উঠি।

মেমসাহেব অধ্যাপনা করা শুরু করায় গর্বে আমার বুকটা ভরে উঠল। কদিন পরে অফিস থেকে পঁচিশটা টাকা অ্যাডভান্স

নিলাম। চিত্তরঞ্জন এভিন্যুর সেলস এম্পোরিয়াম থেকে আঠারো টাকা দিয়ে একটা তাঁতের শাড়ী কিনলাম। বিকেল-বেলায় মেমসাহেবকে প্যাকেটটা দিয়ে বললাম, এই শাড়ীটা পরে কালকে কলেজে যেও।

পরের দিন ঐ শাড়ীটা পরে কলেজে গিয়েছিল, কিন্তু তারপর আর পরত না। একদিন জিজ্ঞাসা করলাম, 'শাড়ীটা বুঝি তোমার পছন্দ হয়নি?'

'খুব পছন্দ হয়েছে।'

'সেইজন্যই বুঝি পরতে লজ্জা করে?'

কানে কানে বলল, 'না, গো, না। ওটা তোমার প্রথম প্রেজেনটেশন। যখন তখন পরে নষ্ট করব নাকি?'

প্রথম মাসে মাইনে পাবার পর মেম-সাহেব আমাকে কি দিয়েছিল জান? একটা গরদের পাঞ্জাবি আর একটা চমৎকার তাঁতের ধুতি।

ধুতিটা কেনার সময় ভারী মজা হয়েছিল।

মেমসাহেব জিজ্ঞাসা করল, জরি পাড় নেবে? নাকি প্লেন পাড় নেবে?

দোকানের আর কেউ শুনতে না পাবে তাই মেমসাহেবের কানে কানে ফিস ফিস করে বললাম, যদি টোপরটাও কিনে দাও তাহলে জড়িপাড় ধুতি কেন; আর যদি এখন টোপর না কিনতে চাও তবে প্লেন পাড়ই...।'

'অসভ্য কোথাকার।'

ধুতি কিনে দোকান থেকে বেরুতে বেরুতে মেমসাহেব বলল, 'তুমি ভারী অসভ্য।'

'কি আশ্চর্য! তোমার সঙ্গেও ফ্রাঙ্কলি কথা বলব না?'

'এই তোমার ফ্র্যাঙ্কলি বলার ঢং?'

সেসব দিনের কথা আজ তোমাকে লিখতে বসে আমি নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছি। কি কারণে ও কেমন করে আমরা দুজনে এত দ্রুততালে এগিয়ে চলেছিলাম, তা আমি জানি না। কোন যুক্তি তর্ক দিয়ে এসব বোঝা সম্ভব নয়। মানুষের মন লজিকের প্রফেসর বা বিচারকদের পরামর্শ বা উপদেশ মেনে চলে না। মুক্ত বিহঙ্গের মত সে আপন গতিতে উড়ে বেড়ায়, ঘুরে বেড়ায়। মানুষের মন যদি বিচার-বিবেচনা মেনে চলতে জানত তাহলে শুধু আমার বা মেমসাহেবের কাহিনী নয়, পৃথিবীর ইতিহাসও একেবারে অন্যরকম হতো।

মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকেই মানুষ একজনকে অবলম্বন করে বড় হয়, ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে চলে। একটি মুখের হাসি, দুটি চোখের জলের জন্য মানুষ কত কি করে! আমি বড় হয়েছি, ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে গেছি নিতান্তই প্রকৃতির নিয়মে। মায়ের মুখের হাসি বা প্রিয়জনের চোখের জলের কোন ভূমিকা ছিল না আমার জীবনে। তাইতো আমি মেম-সাহেবকে সমস্ত মন, প্রাণ, সত্ত্বা দিয়ে চেয়েছিলাম। এই চাওয়ার মধ্যে একটুও ফাঁকি ছিল না। তাই তো মেমসাহেবকেও পাওয়ার মধ্যেও কোন ফাঁকি থাকতে পারে নি। স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটি'র বাইশটি বসন্ত অতিক্রম করতে মেমসাহেবের জীবনে নিশ্চয়ই কিছু কিছু মাছি বা মৌমাছি ভন্-ভন্ করেছে চারপাশে। হয়ত বা কারুর গুঞ্জন মনে একটু রং লাগিয়েছে কিন্তু ঠিক আমার মত কেউ সমস্ত জীবনের দাবী নিয়ে এগিয়ে আসতে পারে নি। তাইতো মেমসাহেবের জীবনের সব বাঁধন খুলে গিয়েছিল, সংযম আর সংস্কার ভেসে গিয়েছিল।

আমার মত মেমসাহেবের জীবনেও অনেক অনেক পরিবর্তন এলো। আমার পছন্দ-অপছন্দ মতামত ছাড়া কোনকিছুই করতে পারত না। আমি সঙ্গে গিয়ে পছন্দ না করলে শাড়ী-ব্লাউজ পর্যন্ত কেনা হতো না। আমি জিজ্ঞাসা করতাম, 'এত দিন কার পছন্দ মত কিনতে?'

'মা বা দিদির...।'

'এখন কি ও'দের রুচি খারাপ হয়ে গেছে?'

'না তা হবে কেন? তাই বলে কি ওরা চিরকালই পছন্দ করবে?'

'তা তো বটেই!'

মেমসাহেব অভিমান করত। 'বেশ ত আমার সঙ্গে দোকানে যেতে অপমান হলে যেও না।'

আমি কথার মোড় ঘুরিয়ে দিই। 'না জানি এরপর আরো কত কি কিনে দিতে বলবে।'

মেমসাহেব আমার ইঙ্গিত বোঝে। প্রথমে বলে, 'আবার অসভ্যতা করছ!'

একটু পরে, একটু কাছে এসে, একটু আস্তে বলে, 'দরকার হলে নিশ্চয়ই কিনবে। তুমি ছাড়া কে কিনে দেবে বল'।'

দোলাবৌদি, ভাবতে পারছ আমাদের অবস্থা?

নিত্য কর্মপদ্ধতির বাইরে এক ধাপ নড়তে-চড়তে গেলেই মেমসাহেব আমার কাছে আবেদনপত্র নিয়ে হাজির হতো।

'জান, রবিবার কলেজের একদল প্রফে-সর শান্তিনিকেতন যাচ্ছেন। আমাকেও ভীষণ ধরেছেন। কি করি বলতো?'

'কি আবার করবে, যাবে।' তারপর জেনে নিই, 'কবে ফিরবে?'

'সোমবার রাত্রেই। মঙ্গলবার তো কলেজ আছে।'

কোন দিন আবার দেখা হবার সঙ্গে সঙ্গেই বলতো, 'দেখ, কালকে ভ্রমরের জন্মদিন। কি দেব বলতো।'

আমি মেমসাহেবের কথা শুনে মনে-মনে হাসতাম। ভ্রমর ওর বাল্যবন্ধু। স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটি একসঙ্গে পার হয়েছে। প্রতিবছরই জন্মদিনে যেতে হয়েছে, কিছু না কিছু প্রেজেনটেশনও দিয়েছে! আজ এই সামান্য ব্যাপারটা এত বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিল যে, মেমসাহেব নিজের বুদ্ধি দিয়ে কোন কূলকিনারা পেল না। ডাক পড়ল আমার।

আমার ওপর মেমসাহেবের নির্ভরতার খবর আমাদের আশেপাশের সবাই জানত। মেমসাহেবের মেজদি হয়ত সিনেমার টিকিট কেটেছে কিন্তু তবুও ছোটবোনের সঙ্গে মজা করবার জন্য জিজ্ঞাসা করত, 'হ্যাঁরে, রিপোর্টারকে জিজ্ঞাসা করিস তুই রবিবার ম্যাটিনীতে সিনেমা যেতে পারবি কিনা।'

মেমসাহেব দৌড়ে গিয়ে মেজদির মুখটা চেপে ধরে বলত, 'ভাল হচ্ছে না কিন্তু!'

মুচকি হাসি লুকোবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে করতে মেজদি বলত, 'আচ্ছা ঠিক আছে। আমিই রিপোর্টারকে ফোন করে জেনে নেব।'

মেমসাহেব হুঙ্কার দিত, 'মা' মেজদি কি করছে!'

কোনদিন আবার মেজদি মেমসাহেবকে বলত, 'হ্যাঁরে, রিপোর্টারকে একবার ফোন করবি?'

'কেন?'

'জিজ্ঞাসা কর ত তুই আজকে মাছের ঝোল খাবি না ঝাল খাবি।'

মেমসাহেব মেজদিকে ধরতে যেত আর মেজদি দৌড়ে পালিয়ে যেত।

অনেক রাত হয়ে গেছে। কত রাত জান? পৌনে তিনটে বাজে। চারপাশের সব বাড়ীর সবাই সারাদিন কাজকর্ম করে কত নিশ্চিন্তে, কত শান্তিতে এখন ঘুমোচ্ছে। আর আমি?

মখমুর দেহলভির একটা 'শের' মনে পড়ছে—

মহব্বত জিসকো দেতে হ্যায়,
উসে ফির কুচ নেই দেতে,
উসে সব কুচ দিয়া হ্যায়,
জিসকো ইস্ কাবিল নেহি সমঝা।

তোমাদের জীবনে নয়, কিন্তু আমার জীবনে কথাটা বর্ণে বর্ণে মিলে গেছে।

চিঠি দিও।

ভালবাসা নিও।

তোমাদের বাচ্চু

(ক্রমশঃ)

হাওড়া কুষ্ঠ কুটির

৭২ বৎসরের প্রাচীন এই চিকিৎসাকেন্দ্রে সর্ব-প্রকার চর্মরোগ বাতরক্ত, অসাড়তা, ফুলা, একজিমা, সোরাইসিস, দূষিত ক্ষতাদি আরোগ্যের জন্য সাক্ষাতে অথবা পত্রে ব্যবস্থা লউন। প্রতিষ্ঠাতা : পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা কবিরাজ, ১নং মাধব ঘোষ লেন খুরুট, হাওড়া। শাখা : ৩৬, মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা—৯। ফোন : ৬৭-২৩৫৯

প্রদর্শনী পরিক্রমা

চিত্ররসিক

কন্ট্রোভার্সিয়াল। শিল্পী : অমিতাভ সেনগুপ্ত।



গ্রীষ্মকাল পড়ল। তবে কলকাতায় এখন আর কোন বিশেষ কালকে আর প্রদর্শনীর মরশুম বলা যায় না। সব সময়েই প্রদর্শনী হচ্ছে এবং প্রচুর পরিমাণে হচ্ছে। ভাল মন্দ মাঝারি সবরকমের কাজই অবাধে প্রদর্শিত হয়ে চলেছে; বিনা বাছবিচারে এতরকমের ছবির প্রদর্শনী আগে এত দেখা যেত না। আর এসব প্রদর্শনী সবচাইতে বেশী হচ্ছে অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে।

জগদীশ ধর কলকাতা থেকে শিল্পশিক্ষা সমাপ্ত করে বর্তমানে বোম্বাইয়ে কর্মসূত্রে বাস করছেন। ৪ঠা থেকে ১০ই মার্চ অ্যাকাডেমির দক্ষিণের গ্যালারীতে তাঁর যে ২১ খানি অয়েল প্রদর্শিত হল তাতে তাঁর রঙের হাতের বাহাদুরী দেখা গেল বটে তবে এখনো তিনি কোন পথে যাবেন তার কোন নিশ্চয়তা পাওয়া গেল না। অ্যাবস্ট্র্যাক্ট ও ফিগারেটিভ এই দুইয়ের মধ্যে তিনি এখনো ঘোরাফেরা করছেন। এর মধ্যে নগরের বস্তি, চাঁদ, হিরার অর নো হোয়্যার এই জাতের ছবি যেখানে অ্যাবস্ট্র্যাকশন ও মূর্তিধর্মীতার মধ্যে একটা মধ্যপন্থা খোঁজার চেষ্টা হয়েছে সেখানে একটা মাধুর্য খুঁজে পাওয়া যায়। তবে যেখানে শুধু মূর্তি—যেমন গ্রীণ নুড বা কতকগুলি নিছক বিমূর্ত কাজ করা হয়েছে সেখানে ঠিক শিল্পীকে খুব একটা আশ্বস্তভাবে কাজ করতে দেখা গেল না।

●

বিজয়কুমার সেনগুপ্তের কাজ ইতিপূর্বে আমরা অ্যাকাডেমিতে দেখেছি। ১১ থেকে ১৭ মার্চ তিনি ৩০ খানি ছবির যে প্রদর্শনী করলেন তাতে পূর্বপ্রদর্শিত অনেকগুলি ছবিই ছিল এবং নতুন যেগুলি দেখানো হয় তার মধ্যেও বিশেষত্ব কিছু দেখা গেল না। শ্রীসেনগুপ্তের কাজেও রঙের বাহারটাই মুখ্য এবং রঙের একটা মিষ্টত্ব সৃষ্টির চেষ্টাটাই প্রধান। তবে এই চিনিমাখানো ছবিগুলির মধ্যে ক্যালেন্ডারের ছবির ভাবটাই প্রধান। কালিদাস, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি কবিদের কয়েকটি কাব্য থেকে যে শিল্প তিনি সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে আদিরসের প্রভাবটাই বড় বেশী করে চোখে পড়ল। অ্যাবস্ট্র্যাক্টগুলি অতিসাধারণ।

●

রাষ্ট্রীয় পরিবহনের কর্মী এবং শিল্পী রাখাল দাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিতাই দাস, ৬০।৭০ খানি প্যাস্টেলের প্রদর্শনী করলেন। প্রদর্শনী ১০ থেকে ১৬ তারিখ পর্যন্ত অ্যাকাডেমির দক্ষিণের একটি গ্যালারীতে অনুষ্ঠিত হয়। দেবদেবীর মূর্তি (যেমন ফুটপাথে আঁকা ছবিতে দেখা যায়) এবং নিসর্গ দৃশ্যই (কতকটা রাখাল দাসের ধরণে) তাঁর কাজের প্রধান বিষয়। আমার মনে হয় এত তাড়াতাড়ি প্রদর্শনী না করে কিছুদিন অপেক্ষা করলে তিনি অনেকখানি সমাদর পেতেন।

●

অনেকদিন বাদে মহিম রুদ্র অ্যাকাডেমিতে তাঁর ১৯।২০ খানি অয়েল ও একখানি ড্রয়িং-এর প্রদর্শনী করলেন (১০ থেকে ১৬ মার্চ)। তাঁর মতে তাঁর অ্যাবস্ট্র্যাকশনগুলি দিয়েই তিনি ঈশ্বরের পূজা করে থাকেন। বিমূর্ত কাজগুলির মধ্যে তিনি কতকগুলি রেখা ও রঙীন আয়তনের সাহায্যে ক্যানভাসগুলি ভাগ করেছেন। রঙ এবং গঠনের পারস্পরিক সম্পর্ক থেকে যেটুকু তৃপ্তি পাওয়া যায় তাই দিয়েই একে বিচার করতে হবে। তাঁর মধ্যেত নীল রঙের ছবিগুলি আমার কাছে অনেকখানি নিরেস মনে হয়েছে। বরং হলদে, সোনালী, কমলা, সবুজ প্রভৃতি রঙে যে ক্যানভাসগুলি সাজানো হয়েছে তাদের পরিপাটি মন্দ লাগেনি। শুধু হলুদ আর সবুজের সমারোহে করা ১৭ নম্বর ছবিটি এবং

২, ৯, ৮ ও ১৩ সংখ্যক ছবিগুলি ভাল লাগল।

●

পূর্ণ দাস রোডের ছোট ছেলেমেয়েদের শিল্প শিক্ষালয় আর্ট এরাণ্ড গত ১৭ই মার্চ বালীগঞ্জ শিক্ষা সদনে ৫ থেকে ১৫ বছরের ছেলেমেয়েদের একটি মুক্তাঙ্গন শিল্প প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিলেন। প্রায় দুশ্বইটির মত প্রতিযোগী এতে অংশগ্রহণ করে। ছেলেমেয়েরা ছবির বিষয়বস্তু নিজেরাই নির্বাচিত করে। নানা ধরনের নিসর্গ দৃশ্য ও নগরের বিভিন্ন রূপ নিয়ে বেশ কিছু ছেলেমেয়েদের ছবি আঁকতে দেখা গেল। এটি এই সংস্থার দ্বিতীয় বার্ষিক প্রতিযোগিতা। কলকাতায় এ ধরনের প্রতিযোগিতা বোধহয় এই প্রথম। ছবিগুলি পরে একটি বিচারকমণ্ডলীর সামনে উপস্থিত করা হবে এবং তাঁদের বিচার অনুযায়ী কতকগুলি শিশুশিল্পীকে পুরস্কৃত করা হবে। বিচারকমণ্ডলীতে আছেন সর্বশ্রী চিন্তামণি কর, নীরদ মজুমদার, পরিতোষ সেন, সুনীলমাধব সেন ও মকুল মজুমদার।

●

৯ থেকে ১৬ মার্চ মোনালিসা গ্যালারীতে দুজন মহিলা শিল্পী হেলো দাস ও নীলিমা সেন একটি যৌথ প্রদর্শনী করলেন। এঁদের মধ্যে প্রথমজন ইংলণ্ডে শিল্পশিক্ষা লাভ করেছেন এবং দ্বিতীয় জনের কোনো শিল্পশিক্ষার পটভূমিকা নেই সুতরাং এঁদের কাজের তফাৎ হতেই পারে। নীলিমা সেন কতকগুলি পেন্সিলে আঁকা প্রতিকৃতি ও কিছুটা নিষ্প্রভ অয়েল বা টেম্পারার করা গাছপালা, ফুল, নৃত্য ইত্যাদি নিয়ে ছবি এঁকেছেন, তবে কোনটিই তেমন জমে ওঠেনি।

হেলো দাস ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইজরায়েল ও বাংলাদেশের পথঘাট, মানুষ ও নিসর্গ রূপের জলরঙ বা ম্যাজিক ইঙ্কে আঁকা অনেকগুলি ছোট ছোট ছবি দিয়েছিলেন। এগুলির মধ্যে কিছুটা ছাত্রসুলভ দৃষ্টিভঙ্গী থাকলেও কতকগুলির মধ্যে একটা বিশেষ মাধুর্য ছিল—যেমন ইংলণ্ডের সমুদ্রতীরে নিঃসঙ্গ মহিলা বা ইজরায়েলের জেরুজালেম কি ফ্রান্সের সূর্যালোকিত পাথের ওপরকার কাফে ইত্যাদি। বীরভূমের দৃশ্যও একটা বিশিষ্ট চেহারা নিয়েছিল। অনেকগুলি টুকরো টুকরো ভ্রমণবৃত্ত-এর স্কেচে সজ্জিত প্রদর্শনী কতকটা ভ্রমণের ডায়েরীর মত রূপ নিয়েছিল।

●

বিড়লা অ্যাকাডেমিতে ১৫ থেকে ১৯শে মার্চ পিলানীর দুজন তরুণ রাজস্থানী শিল্পীর ৫০ খানির ওপর ছবির প্রদর্শনী হয়ে গেল। এঁরা দুজনে বিভিন্ন রীতির চর্চা করেন। কেশব দেও প্রধানত রিয়্যালিস্টিক কাজের ভক্ত এবং জি পি শারদা অ্যাবস্ট্র্যাক্ট কাজের অনুরাগী: তবে কোন রীতিই এঁদের দুজনের কাজে এখনো দানা বাঁধেনি। প্রথমোক্তজন রাজস্থান ও ভারতের অন্যান্য জায়গার বর্ণনাময় নিসর্গ দৃশ্য, গ্রাম, পাহাড় ও মানুষের ছবি এঁকেছেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি বিভিন্ন ধরনের ডিজাইন ও ফর্ম নিয়ে পরীক্ষা করেছেন। তবে স্কুলের ছাত্রসুলভ দৃষ্টিভঙ্গীর দরুণ এখনো এঁদের কাজ খুব গভীরভাবে গ্রহণ করার প্রয়োজন অনুভূত হল না।

●

দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনের রবীন্দ্র-ভারতীতে পশ্চিমবঙ্গের নাটক, সঙ্গীত ও চারুকলা আকাদমির উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের সমকালীন শিল্পকলার দ্বিতীয় বার্ষিক প্রদর্শনী ১৬ থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এবারে পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পীদের সম্মানপত্র ও অর্থ দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে; এই ব্যবস্থাটি ভাল। বর্তমান প্রদর্শনীতে ৬৫ খানির মত চিত্র ও ভাস্কর্য রাখা হয়েছে। এগুলির ২০০-র ওপর শিল্পবস্তু থেকে বাছাই করতে হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের অনেক খ্যাতনামা শিল্পীকেই এখানে অংশগ্রহণ করতে দেখা গেল না।

এবারে পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পীদের মধ্যে আছেন এ এন চাকলাদার (ভারতীয় চিত্রকলা), গণেশ পাইন (আধুনিক চিত্রকলা), নিরাময় রায় (গ্রাফিকস্) এবং মানিক তালুকদার (ভাস্কর্য)। প্রদর্শনীতে সকলেই যে নতুন ছবি দিয়েছেন তা নয়। অনেকগুলি পূর্বদৃষ্ট ছবি থাকায় প্রদর্শনীর আকর্ষণ কিছুটা কম লাগল। উল্লেখযোগ্য ছবির মধ্যে গণেশ পাইন, শ্যামল দত্তরায়, অনিল সাহা, বিকাশ ভট্টাচার্য, কাত্যায়ন শাকলাভ,



রমকিঙ্কর
শিল্পী : সুবেশ ঘোষ

প্রিমিটিভ কার্ড
শিল্পী : সুনীলমাধব সেন



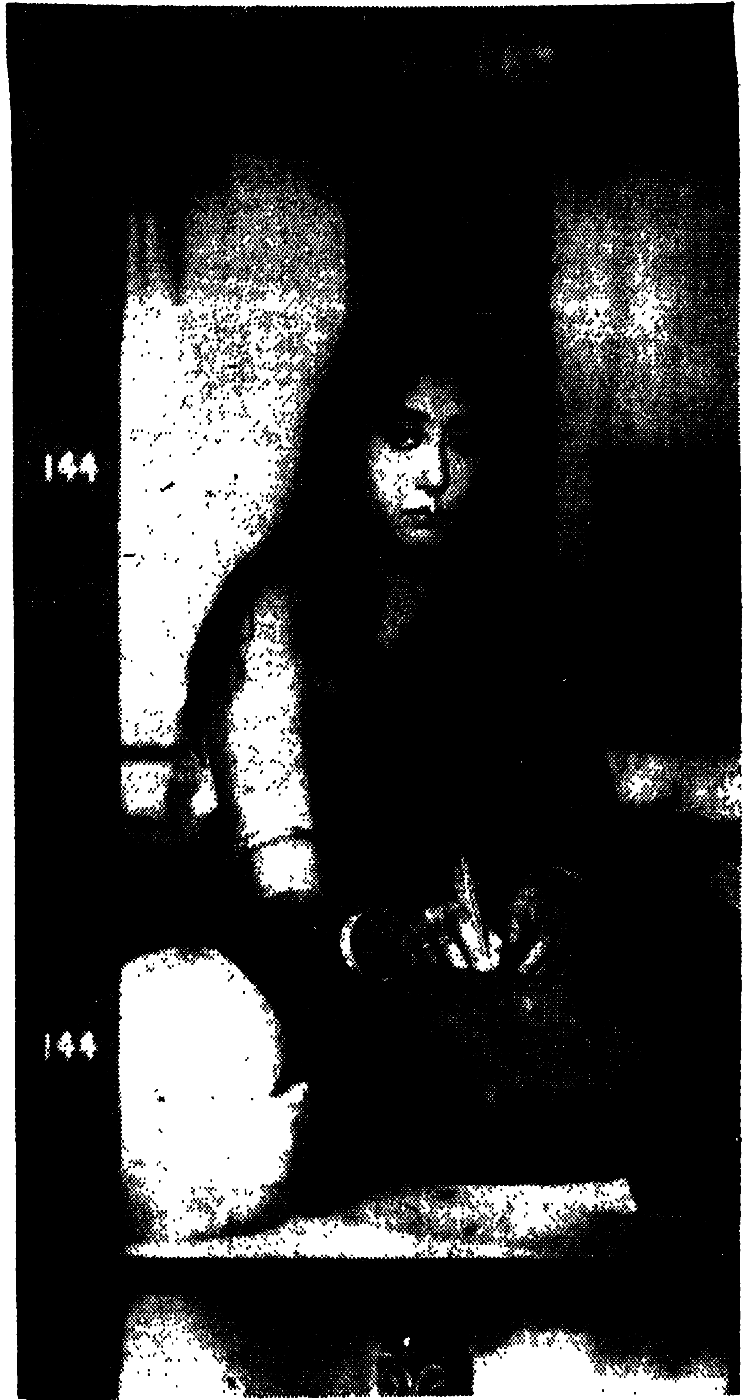
সমর ভৌমিক প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। ভাস্কর্য বিভাগ অনেকটা নিষ্প্রভ।

●

কেমল্ড গ্যালারীতে ১৯ থেকে ২৬ মার্চ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত সুনীলমাধব সেনের ১৯ খানি বড় ও মাঝারি ছবির প্রদর্শনী এ মাসের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য চিত্রপ্রদর্শনী। সুনীলমাধব সেন প্রবীণ বয়সেও নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অগ্রসর থাকতে চান। কিন্তু নিছক নতুনত্বের মোহে উদ্ভট কিছু সৃষ্টি করবার প্রবৃত্তি তাঁকে পেয়ে বসেনি। একান্তভাবে আধুনিক হলেও দেশের মাটির সঙ্গে একটা যোগাযোগ রাখার সচেতন প্রয়াস তাঁর নতুন কাজগুলিতে দেখা গেল। বর্তমান প্রদর্শনীতে একটা বোর্ডের নিরেট ক্ষেত্র [illegible] ওপর রঙের প্রলেপ দিয়ে যে রিলিফ পেন্টিংগুলি তিনি তৈরী করেছেন তার মধ্যে কোথাও পোড়ামাটির ছাঁচের আদল, কোথাও বা একটা ধাতব কাঠিন্যের নক্সা পরিস্ফুট দেখা যায়। ক্ষেত্রবিশেষে তিনি রঙীন কাঁচের মোজাইক পেন্টিংও করেছেন। মোটিফ হিসেবে ভারতের প্রাগৈতিহাসিক পোড়ামাটির পুতুল থেকে মধ্যযুগের মন্দিরভাস্কর্য বা আদিবাসী শিল্পের নমুনা পর্যন্ত সবই তিনি অত্যন্ত সুচতুরভাবে ব্যবহার করেছেন। রঙের ক্ষেত্রে অনেকখানি সংযম এবং গভীরতা লক্ষ্য করা গেল। বেশীর ভাগ ছবিতেই একটি রঙের প্রাধান্য এবং প্রতিটি ছবিরই ডেকরেটিভ গুণ অনস্বীকার্য। তাছাড়া অধিকাংশ ছবিই সুনির্বাচিত। বিশেষভাবে ভাল লাগল "বাঘ ও পাল্কী", "ধনুর্ধরী" দুটি বেড়ালের প্যানেল এবং নীল জমির ওপর বুদ্ধমূর্তি।

প্রেক্ষাগৃহ

স্বদেশ সরকার পরিচালিত শান্তি চিত্রে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। ফটো : অমৃত



শুভ মহরৎ

টালিগঞ্জপাড়ার ফিল্ম স্টুডিওতে কোনো ছবির নিয়মিত শ্যুটিং আরম্ভ হবার আগে পাঁজিপুঁথিতে দিনক্ষণ দেখে ঐ ছবির শুভ মহরৎ অনুষ্ঠান করবার রেওয়াজ চলে আসছে বহুদিন যাবৎ। এই শুভ মহরৎ অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণপত্র পেয়ে যাঁরা এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন, তাঁরা যথাসময়ে নির্দিষ্ট স্টুডিওতে হাজির হয়ে দেখতে পান, তাঁদেরই মতো আমন্ত্রিত হয়ে বহু লোক ঐ স্টুডিওটিতে জমায়েত হয়েছেন। তাঁরা আরও দেখেন যে, জড়ো-হওয়া ভদ্র-মহোদয় ও মহাদয়াদের মধ্যে অনেকটা আলগোছে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বিভিন্ন ছবিতে দেখা ও সেই কারণে চেনা-মুখ জনকয়েক পুরুষ ও মহিলা-শিল্পী। স্টুডিওর যে-বৃহৎ ছাউনীটির বা ফ্লোর-এর মধ্যে মহরৎ অনুষ্ঠিত হবে, সেখানে সাজানো রয়েছে কয়েক সারি ফোল্ডিং চেয়ার, দু'পাশে রাখা দু'টি বা চারটি পেডেস্টাল পাখা অতিথি-দের উত্তাপ অপনোদনে ব্যস্ত। চেয়ারের প্রথম সারি থেকে কিছু—বেশ কিছুটা-দূরে একটি বা সমকোণের আকারে দু'টি দেওয়াল—সত্যি ইঁট-চুন-সুরকি-সিমেন্ট-বালির দেওয়াল নয়, কাঠের ফ্রেমে কাপড়ের ওপর আঁকা দেওয়াল, যেমন দেওয়াল থিয়েটারের স্টেজের ওপর দেখতে পাওয়া যায়, অনেকটা সেইরকম। সেই দেওয়ালের গা ঘেঁষে, হয়ত' কিছু আসবাবপত্র, দেওয়ালে টাঙানো রয়েছে হয়ত কোনো ছবি। আর ঐ দেওয়াল থেকে কিছু দূরে অর্থাৎ দেওয়াল ও চেয়ারের প্রথম সারির মাঝামাঝি জায়গায় রাখা রয়েছে ক্যামেরা নামক সেই কৃষ্ণবর্ণের বিশেষ যন্ত্রটি, যার সাহায্যে ছবি তোলা হয়ে থাকে। ক্যামেরাটিতে জড়ানো রয়েছে একটি জবা ফুলের মালা—কালী-ঘাটের মা-কালীর প্রসাদী মালা। ক্যামেরার দু'পাশে দাঁড় করানো আছে গোটা কয়েক আলো, আর ক্যামেরার সামনে উঁচুতে, একটা আড়করা লোহার নলের মুখ থেকে ঝুলছে মাইক্রোফোন। এই মাইক্রোফোন মারফত শিল্পীর সংলাপে ইলেকট্রিক তারু বাহিত হয়ে শব্দধারক যন্ত্রের সাহায্যে আলোক-রশ্মিরূপে ফিল্মের বুকে দাগ কাটবে। এই মাইক্রোফোনকে ঘিরেও ঝুলতে দেখা যায় প্রসাদী জবার মালা। নির্ধারিত সময়ে কোনো নির্দিষ্ট শিল্পী এসে দাঁড়ান ক্যামেরার সামনে এবং ছবির পরি চালকের নির্দেশ অনুযায়ী যথারীতি ভাব-ভঙ্গী সহকারে কোনো একটি পূর্ব-নির্ধারিত সংলাপ বলার অনুশীলন শুরু ক'রে দেন। এদিকে তখন নিমন্ত্রিত অভ্যাগতবৃন্দের কপালে কালীঘাটে পুজো দেওয়া ডালা থেকে সিঁদুরের টিপ পরানোর সঙ্গে সঙ্গে পেঁড়া-প্রসাদ বন্টন চলতে থাকে। ওদিকে কিছুটা অনুশীলন হয়ে যাবার পরে পরিচালকের নির্দেশে ফ্লোরের দরজাগুলিকে বন্ধ করে দেওয়া হয়, ইলেকট্রিক পাখা ও ফ্লোর-লাইটগুলিকেও নিভিয়ে দেওয়া হয়, পরিচালকের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে ওঠে—সাইলেন্স প্লিজ! মুহূর্তে ফ্লোরের মধ্যে অখণ্ড নীরবতা বিরাজ করতে থাকে। আবার শোনা যায় পরিচালকের কণ্ঠ : মনিটার! (অর্থাৎ থিয়েটারী ভাষায় যাকে বলে রিহার্সাল)। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বেজে ওঠে ক্রীং, ক্রীং ধ্বনি, এর দ্বারা শব্দযন্ত্রী জানিয়ে দিলেন, তিনি প্রস্তুত। ক্যামেরার দু'পাশে দাঁড় করানো আলোগুলি জ্বলে উঠল, পিছনে খাড়া করা দেওয়ালের উপর থেকেও আলো ফেলা হ'ল শিল্পীর ওপর। তিনি যখন পরিচালকের নির্দেশ মতো অঙ্গসঞ্চালনা ও ভাবভঙ্গীসহ তাঁর সংলাপটি বললেন, তখন ক্যামেরাম্যান সেটি তাঁর ক্যামেরার ভিতর

দিয়ে নিরীক্ষণ করে দেখে নিলেন (এই প্রথাকে লুক-থ্রু করা বলে)। আবার বেজে উঠল : ক্লীং, ক্লীং অর্থাৎ ও-কে যার বাঙলা অর্থ 'সংলাপটি' ঠিক বলা হয়েছে। শিল্পী যদি ঠিকমতো বলতে অসমর্থ হতেন, তাহ'লে বাজত : ক্লীং। (একবার), অর্থাৎ আবার বলুন। এই মনিটার এক বা একাধিকবার দেওয়া হয়, যতক্ষণ না সংলাপ ও ভঙ্গী একযোগে (অ্যাক্‌শান ও ডায়ালোগ) সর্বাঙ্গসুন্দর ব'লে প্রতীয়মান হয়। এরপরে উপস্থিত অভ্যাগতদের অনুমতি নিয়ে 'মহরৎ শট'টি নেবার ব্যবস্থা হয়। শেষবারের মতো শিল্পীর মেক্‌-আপটি ঠিক ক'রে দেবার পরে ক্যামেরা-ম্যানের চিত্রগ্রহণের জন্যে প্রয়োজনীয় আলোগুলি আবার জ্বলে ওঠে (এগুলিকে মনিটার গ্রহণের পরে নিভিয়ে দেওয়া হয়েছিল)। পরিচালকের অনুরোধক্রমে জনৈক বিশিষ্ট অভ্যাগত—সাধারণত কোনো প্রথিত-যশা প্রযোজক বিগত যুগের পরিচালক বা শিল্পী—এগিয়ে যান ক্ল্যাপ-স্টিক দিতে। ক্ল্যাপস্টিক হচ্ছে কালো রঙের ইঞ্চি দুয়েক চওড়া ও ফুট দেড়-দুই লম্বা একজোড়া কাঠ একটি কব্জা দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করা এবং একটির ওপরের বা বাইরের পিঠে শাদা রঙে লেখা : অমুক প্রোডাকসান, অমুক ছবি এবং কয়েকটি ঘর কাটা, যাদের ওপরে লেখা এস-সি, এস-টি, টি-কে ও ডেট বা তারিখ। এস-সির তলায় খালি জায়গাটিতে খড়ি দিয়ে ইংরেজীতে লেখা ৩রা ১৭ বা অন্য কোনো নম্বর, ঐ রকমই কোনো নম্বর লেখা রয়েছে এস-টির নীচে কিংবা ঘর দু'টি জুড়ে লেখা রয়েছে 'মহরৎ শট'। যাই হোক, পরিচালক 'স্টার্ট সাউন্ড' বলবার পরে যখন বেজে উঠল : ক্রীং কিংবা কানে শোনা গেল দূরাগত আওয়াজ : 'রাণিং', তখন ক্যামেরার সুইচ অন্ করলেন অর্থাৎ ক্যামেরা চালু করলেন অপর কোনো বিশিষ্ট অভ্যাগত এবং তারপরে পরিচালকের ইঙ্গিত পেয়ে ক্ল্যাপস্টিক দাতা প্রথমে ক্ল্যাপস্টিকের কাঠজোড়াকে ক্যামেরার সামনে ওপর-নীচে থাকবার মতো অবস্থায় রেখে একটু ফাঁক করে ধরে ওপরের তুলে ধরা কাঠটিকে নীচেরটির সঙ্গে লেগে যাবার জন্যে ছেড়ে দেন (এই ছেড়ে দেবার ফলে দুই কাষ্ঠখণ্ডের সংঘর্ষে যে আওয়াজ হয়, তা শব্দধারকের যন্ত্রের সহায়তায় শব্দধারক ফিল্মের বুকে লিখিত হয়ে যায়)। এরপরে তিনি ক্ল্যাপস্টিকের লেখা দিকটি আড়াআড়িভাবে তুলে ধরেন ক্যামেরার সামনে এবং মুখে বলেন—অমুক ছবি, অমুক দৃশ্য, অমুক শট বা অমুক ছবির মহরৎ শট। এইখানেই ক্ল্যাপস্টিক-দাতার কর্তব্য শেষ হয়ে যায় এবং তিনি পরিচালকের নির্দেশ অনুসারে ক্যামেরার সামনে থেকে সরে এসে পাশের দিকে কোথাও দাঁড়িয়ে পড়েন। এরপরে শিল্পী 'মনিটার' মতো ভাবভঙ্গীসহযোগে তাঁর সংলাপ বলা শেষ করলে পরিচালকের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় : কাট্। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই স্ক্রীং স্ক্রীং বাজিয়ে শব্দযন্ত্রী জানিয়ে দেন : ও-কে অর্থাৎ ঠিক হয়েছে। ব্যস, মহরৎ শট্ নেওয়ার শুভকাজের সমাপ্তি। এরপরে একদিকে শুরু হয় শিল্পী, পরি-চালক ও কলাকুশলীদের এবং অনেক সময়ে বিশিষ্ট অভ্যাগতদের ছবি নেবার পর্ব, অপরদিকে হাল্কা জলখাবারের সঙ্গে মিষ্টি জল অর্থাৎ কোকা-কোলা, অরেঞ্জ, পাইন-অ্যাপল জাতীয় পানীয় বিতরণের হিড়িক। গ্রীষ্মকালে কোনো কোনো মহরৎ অনুষ্ঠানে আইসক্রীমও দেখা যায়। এ-ছাড়া ফুলের বোকে ও পান-সিগারেটের ব্যবস্থাও থাকে বহু ক্ষেত্রেই। —এইভাবেই টালিগঞ্জ পাড়ার ফিল্ম স্টুডিওতে একখানি নতুন ছবির শুভ মহরৎ অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

কিন্তু এই যে মহরৎ অনুষ্ঠান, এতো সন্ধ্যার মঙ্গলপ্রদীপ জ্বালা। প্রদীপটি জ্বালতে হ'লে যেমন প্রদীপ ও পিলসুজ কেনা বা বাড়ীতে থাকলে সেগুলিকে মেজে পরিষ্কার করা, তেল বা ঘি ও দেশলাইয়ের জোগাড় করা এবং সলতে পাকানোর প্রয়োজন আছে, ঠিক তেমনই এই মহরৎ অনুষ্ঠানটিকে সম্ভব করবার জন্যে বহু কাঠখড় পোড়াতে হয়—বিশেষ ক'রে বর্তমান যুগে। একদিন ছিল, যখন নিউ থিয়েটার্স, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী, কালী ফিল্মস্, রাধা ফিল্মস্, ভারতলক্ষ্মী পিকচার্স, দেবদত্ত ফিল্মস, এম-পি প্রোডাকসন্স প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান নিজেরাই স্টুডিওর মালিক ছিলেন এবং এ'দের ছিল মাস-মাইনে পাওয়া বাঁধা শিল্পী, পরিচালক কলাকুশলী প্রভৃতি। কাজেই এ'রা এ'দের প্রতিষ্ঠানগুলিকে চালু রাখবার জন্যে নিজে-দের তাগিদেই নিজেদের ছবি তৈরী করতেন। কিন্তু বর্তমানে স্টুডিও-মালিকেরা নিজেরা ছবি তৈরী করার পরিবর্তে প্রযোজকদের স্টুডিও ভাড়া দেন। এই স্টুডিও ভাড়া দেওয়ার অর্থ হচ্ছে স্টুডিওর ফ্লোর ও যন্ত্রপাতি এবং শব্দযন্ত্রী, ইলেকট্রিসিয়ান, সেট নির্মাণকর্মী প্রভৃতির কাজ ভাড়া দেওয়া। প্রযোজককে আলাদা-ভাবে নিযুক্ত করতে হয়, সহকারী সমেত উপযুক্ত পরিচালক, চিত্রনাট্যকার, সঙ্গীতপরি-চালক, গানরচয়িতা, ক্যামেরাম্যান শিল্প-নির্দেশক, সম্পাদক পটশিল্পী মেক-আপ-ম্যান ব্যবস্থাপক প্রোডাকশান-বয় এবং অভিনেতা-অভিনেত্রী। অবশ্য এর আগেই তাকে কিনতে হয় কোনো চিত্রোপযোগী কাহিনীর চিত্র-স্বত্ব। কিন্তু প্রযোজনার কাজে নিয়মিতভাবে ব্রতী বা কয়েকজন পরিবেশক-প্রযোজক ছাড়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে চিত্র-

চৌরঙ্গী চিত্রে সুপ্রিয়া দেবী



প্রযোজনা ব্যবসায়ে এগিয়ে আসেন, এমন মহানুভব ব্যক্তি আজ বাঙলাদেশে ক'জন আছেন? আজকাল ত দেখি, ছবির পরি-চালক ও কলাকুশলীরা একযোগে খুঁজে বেড়ান কোথায় লুকিয়ে রয়েছেন, সেই হবু প্রযোজকটি তারই সন্ধান। টালিগঞ্জী ভাষায় বলে, কাকে ফাঁসানো যায়, তারই চেষ্টায়। কাজেই স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, আজকের দিনে কোনো নতুন ছবির মহরৎ অনুষ্ঠান হচ্ছে রীতিমত একটি প্রচুর কাঠখড় পোড়ানোর ব্যাপার। এবং এই বিরাট কাঠখড় পোড়ানোর মহৎ ব্যাপারটি সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হবার পরেও সখেদে প্রায়ই আবিষ্কার করা যায় যে, ঐ সাড়ম্বর অনুষ্ঠানটিই ঐ বিশেষ ছবি সম্পর্কে প্রথম এবং শেষ অনুষ্ঠান। অর্থাৎ ঐ অনুষ্ঠানটি যাতে ঘটতে পায়, তার জন্যে যাঁর যা প্রাপ্তিযোগ ঘটেছে, ঐ পর্যন্তই এগিয়ে সেই 'সাত-রাজার-ধন-মানিক' প্রযোজকটি থ'কে গেছেন, তাঁর আর এক পাও এগোবার সামর্থ নেই। এরূপ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কলাকুশলী প্রভৃতি তাঁদের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিয়ে নিজেদের এই বলে সান্ত্বনা দেন যে, চোরের রাত্রিবাসই লাভ।

—নান্দীকর



প্রতি রবিবার

৩টে ও ৬॥টায়

রবীন্দ্র সরোবর

(লেক) মঞ্চে

কবি কাহিনী। রচনা ও নির্দেশনায় বাদল সরকার। টিকিট ২্ থেকে ৭্, হলে প্রতি রবিবার বেলা ৯॥টা থেকে, এবং "মধুক্ষরা"য় (৮৬এ, রাঃ বিঃ এভি) প্রতিদিন। প্রযোজনায়—

শতাব্দী

দেশী ছবির খবর

'মহাবিপ্লবী অরবিন্দ' চিত্রের শেষ দৃশ্যগ্রহণ সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হল পণ্ডিচেরীর শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে। শ্রীঅরবিন্দর জীবনী অবলম্বনে রচিত এ চিত্রে অগ্নিযুগের একটি ঐতিহাসিক-চিত্র বিধৃত হয়েছে। এ কে বি ফিল্মসের এ চিত্রটি পরিচালনা করেছেন দীপক গুপ্ত। ছবিটির সম্পূর্ণ চিত্রগ্রহণ সম্প্রতি শেষ হয়েছে। রূপদান করেছেন দিলীপ রায়, নির্মল ঘোষ, তমাল লাহিড়ী, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শেখর চট্টোপাধ্যায়, এন বিশ্বনাথন, জহর রায়, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, শমিতা বিশ্বাস ও পদ্মাদেবী। এ ছবির সংগীত পরিচালনা করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

আশাপূর্ণা দেবীর কাহিনী অবলম্বনে 'বালুচরী' ছবিটি বর্তমানে মুক্তি প্রতীক্ষিত। অজিত গাঙ্গুলী পরিচালিত এ ছবির প্রধান চরিত্রাবলীতে রূপদান করেছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, অনুপকুমার, পাহাড়ী সান্যাল, অজয় গাঙ্গুলী, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, জহর রায়, দিলীপ চক্রবর্তী, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, মলিনা দেবী, গীতা দে ও রেণুকা রায়। কার্তিক বর্মন প্রযোজিত রাধারাণী পিকচার্সের এ ছবিটির সুরকার হলেন রাজেন সরকার।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত উপন্যাস 'আরোগ্য নিকেতন'-এর চলচ্চিত্রায়ন বর্তমানে শেষ করেছেন পরিচালক বিজয় বসু। অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন প্রযোজিত ও পরিবেশিত এ চিত্রের বিশিষ্ট চরিত্রে অভিনয় করেছেন বিকাশ রায়, ছায়া দেবী, সন্ধ্যা রায়, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, রুমা গুহঠাকুরতা, দিলীপ রায়, রবি ঘোষ, জহর গাঙ্গুলী, বঙ্কিম ঘোষ ও কালী সরকার। এই মুক্তি প্রতীক্ষিত ছবিটির সুরকার হলেন রবীন চট্টোপাধ্যায়।

জীবন ও জীবন জিজ্ঞাসার প্রশ্ন নিয়ে রচিত সমরেশ বসুর 'দুরন্ত চড়াই' কাহিনীটির চিত্ররূপ প্রায় শেষ করে ফেলেছেন পরিচালক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। কাহিনীর কয়েকটি বিশেষ চরিত্রে রূপ দিয়েছেন মাধবী মুখোপাধ্যায়, অনুপকুমার, বিকাশ রায়, দিলীপ রায়, জহর রায়, সৌমেন চক্রবর্তী, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, পদ্মা দেবী এবং সবিতা চ্যাটার্জী। শ্যামল মিত্র সুরারোপিত এ ছবিটির পরিবেশক প্রতিমা চিত্র মন্দির।

বোম্বাইয়ের কারদার স্টুডিওয় পরিচালক নরিন্দর বেদী যে নতুন ছবিটির চিত্রগ্রহণ সুরু করেছেন তার নাম 'বন্ধন'। ছবিটির মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করছেন রাজেশ খান্না, মমতাজ, অঞ্জু মহেন্দ্র, জীবন, কনহাইলাল, অচলা সচদেব, সুন্দর, ও মোহন ছোটি। কল্যাণজী-আনন্দজী ছবিটির সুরকার।

পরিচালক রাজ খোসলা বর্তমানে যে ছবিটি পরিচালনা করছেন তার নাম 'চিরাগ'। এ ছবির উল্লেখযোগ্য চরিত্রে রূপদান করছেন আশা পারেখ, সুনীল দত্ত, ওম প্রকাশ, ললিতা পাওয়ার, কনহৈয়ালাল, সুলোচনা এবং আশা নাদকার্নী। সংগীত পরিচালনায় রয়েছেন মদন মোহন।

বিদেশী ছবির খবর

এবারের বার্লিন চলচ্চিত্রোৎসব শুরু হচ্ছে ২১শে জুন, চলবে ২রা জুলাই পর্যন্ত। গতবারের মত এবারেও উৎসবের ছবিগুলোকে তিনটি বিভাগে দেখান হবে। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হল 'ইনফরমেশন শো'। উৎসবের বিশেষ প্রদর্শনীতে এবার থাকছে নির্বাক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফরাসী পরিচালক অ্যাবেল গান্স-এর ছবি (গতবারে এ পর্যায়ে দেখানো হয়েছিল আর্ণস্ট লুবিসৎ-এর ছবি) এবং আমেরিকান কৌতুকাভিনেতা মিঃ ফিল্ডস-এর কিছু ছবি। উৎসবের ছবি নির্বাচনের ব্যাপারে ইতিমধ্যে যে নির্বাচনী কমিটি গঠিত হয়েছে তার মধ্যে আছেন চিত্র-সমালোচক এর্লাভিরা রিৎজ, জর্জ হাংসবার্গ পিটার লোভিগাস, উলফার্ম স্কুৎ, ডেটার স্যানৎস আর আছেন জার্মান চিত্রজগতের দুজন বিশিষ্ট প্রতিনিধি, বার্লিন সেনেটের ও ফেডারেল মিনিস্ট্রির একজন করে প্রতিনিধি এবং আছেন বার্লিন উৎসবের অন্যতম উদ্যোক্তা ও পরিচালক মিঃ আলফ্রেড বুয়ের। বিভিন্ন দেশে নিমন্ত্রণপত্র পাঠান হয়েছে। ইতিমধ্যে চব্বিশটি দেশ নিমন্ত্রণ গ্রহণও করেছে। ছবি পাঠাবার শেষ তারিখ ১লা মে।

চেকোশ্লোভাক ফিল্ম এক্সপোর্ট বর্তমানে একসঙ্গে চারটি রঙিন ছবির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। রিফর্ম স্কুল থেকে ফেরা একটি মেয়ে আর প্রৌঢ় একজন লোকের কাহিনী নিয়ে কার্ল কচারেন্‌ক পরিচালনায় 'ক্রিশমাস্ উইথ এলিজাবেথ' মোরাভিয়ার পল্লীর আউটডোরে ভোজতেক জাসনীর 'অলগাড়ক প্লুম্যান' যোশেফ জাখার-এর 'দেয়ার ইজ নো অ্যাদার ওয়ে' এবং হাইনেক বোখানের 'মন্দিশনার স্লোয়ার এণ্ড মেস' হচ্ছে সেই চারটে ছবি।

পশ্চিম জার্মানীর উলরিখ শিমুলী জার্মানী চিত্রকে বিশ্বের দরবারে স্থান করে দিয়েছেন। বর্তমানের পরিচালকগণও বর্তমান সামাজিক সমস্যার চিত্রায়ণের দ্বারা নিজেদের সেই স্থানকে দৃঢ় করে নিতে প্রস্তুত। জোহান্স স্কাফের নতুন ছবি 'টাট্টু' তার অন্যতম উদাহরণ। পারিপার্শ্বিক পরিবেশ কেমন করে এক ছাত্র কিশোরের ভাগ্যে নতুন দরজা খুলে দিল—এইটাই ছবির বিষয়বস্তু, তবে উপস্থাপনার ভঙ্গীতেও বিশেষত্ব আছে। প্রধান চরিত্রগুলিতে আছেন হেলগা এণ্ডার্স, রোজম্যারি ফেণ্ডেল, আলেকজাণ্ডার মে।

আমাদের দেশের রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের কেলেঙ্কারীর মত আমেরিকার অস্কার প্রতিযোগিতাতেও কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি কম হয় না। এবার শ্রেষ্ঠ অভিনেতা অভিনেত্রী হিসাবে প্রতিযোগিতা করার জন্য যাঁরা মনোনীত হয়েছেন তাঁদের সম্পর্কে কোন বিরূপ মন্তব্য না করেও বলা যায় অন্যতম জনপ্রিয় নিগ্রো অভিনেতা সিডনী পোইটিয়েরের-এর মনোনয়ন পাওয়া উচিত ছিল। 'দি গ্রাজুয়েট' ছবিতে ডাস্টিন হফম্যান বা 'দি ডিনার'এ স্পেন্সার ট্র্যাসি যে অভিনয়প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন, পোইটিয়েরের 'টু স্যার উইথ লভ' বা 'ইন দি হিট অফ দি নাইট' ছবি কি অনুল্লেখ্য ছিল কোন অংশে চরিত্রচিত্রণের দিক থেকে?

আপনার প্রিয় মাসিক পত্রিকা

নবকল্প

চৈত্র সংখ্যা প্রকাশিত হলো

● ২টি উপন্যাস ●
আশা দেবী ● পরেশ ভট্টাচার্য (ধারাবাহিক)
● ৩টি বিস্ময়কর বড় গল্প ●
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ● অমিত গুপ্ত
চিত্ত ঘোষাল
১টি অনুবাদ গল্প ● ১টি নাটক
বরুণ সেন ॥ ইন্দুনাথ উপাধ্যায় ॥
১টি রহস্য বড়গল্প ● ১টি বিশেষ রম্য
জিপিকার ॥ বীরেন মিত্র ॥
অগ্নিযুগের কাহিনী ●
লোকেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত
আকাশবাণী খ্যাত৷ বেলা দে'র রূপ চর্চা ॥
২টি বিশেষ প্রবন্ধ ●
শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ উজ্জ্বল রায়
মনের আয়নায় ● সমর বন্দ্যোপাধ্যায়
আলোচন নায়ক ● চিরঞ্জীব ॥ পাঁচন কথা
বিভূতিভূষণ ● নারায়ণ বন্দ্যোঃ ॥
স্মরলিপি ● রবিন ঘোষ ॥ আটে
আদালতে ● কমলেশ মিত্র ॥ কিশোরদের
পাতা ● নাট্য সংবাদ ● গোপাল পাল ॥
কত অজানা ● হারাধন চক্রবর্তী ॥ চিত্র
স্থান ● রূপ সেনগুপ্ত ॥ প্রশ্ন উত্তর ●
উত্তরাধিকারী ॥ চেতন আনন্দ ● অপরাজ
বার ॥ অজস্র ছবি ॥ দুই, জোনাকীর বিজ্ঞাপন।

আপনার স্টলে বা হকারের কাছে পাবেন।
এজেন্সীর জন্য লিখুন—
দি ক্যালকাটা ম্যাগাজিনস
১১২সি, বসন্ত স্ট্রীট, কলি-৪, ৫৫-২৩৮৫

[illegible] থেকে

মিড-ক্লোজ শট। দাদু বিছানায় বসে একখানা চিঠি বেশ আগ্রহ সহকারে পড়ছেন। ক্যামেরা ব্যাক ট্রাক করে রেখা আর মামিকে কম্পোজিট শটে ধরে।

মামি—পড়লেন তো! রেখা বাঁদরের নাচই নাচুক আর যাই করুক, এসব অসভ্যতা করে না!

দাদু জিজ্ঞাসাদৃষ্টিতে রেখার দিকে তাকান।

দাদু—রেখা!

রেখা—দাদু!

দাদু—ছেলেটি কে জান?

মামি—এ শিক্ষাই ঐ মায়েদের বিশ্বাস। নইলে দিনরাত্তির ভটভটি চড়ে আমাদের বাড়ীর চারপাশে ঘোরে কেন? এক মস্তরের মধ্যেই হেসে—

রেখা চোখ নামায়। ক্লোজ শট। দাদু।

দাদু—উহুঁ, একালে ছেলেরা বাপ-মায়ের ওপর বিয়ের ভার ছেড়ে দেয় না বৌমা। রেখা, তুমি [illegible] ছেলেটি কে?

কম্পোজিট শট। রেখা ক্যামেরার ফোকাসে, দাদু আউট অফ ফোকাস।

রেখা—আমি ঠিক জানি না দাদু।

কম্পোজিট শট। দাদু ক্যামেরার ফোকাসে, রেখা আউট অফ ফোকাস।

দাদু—[illegible] চেষ্টা কর ...[illegible]

কম্পোজিট শট। দাদু, মামি ও রেখা।

রেখা—[illegible]...না জানলে কি করে বলব?

দাদু—তোমা! কাগজের খোলে হাত ঢুকিয়ে লোকে চিঠি বার করতে পারে—আর কে লিখেছে সেটা জান না, তা কি হয়?

মামি—জানলে তো বলবে না!

দাদু—[illegible] বল্—বল্—[illegible]

ক্লোজ শট। রেখা।

রেখা—আমার মনে হচ্ছে...মনে হচ্ছে এ-চিঠি মনোজদা...আসে...মনোজ ডাক্তারের...

ক্লোজ শট। মামি।

মামি—[illegible] কিসে? ওরা যে ভয়ঙ্কর বড়লোক! সেইজন্যই এমন কথা বলে চিঠি লিখেছে তো—।

মিড শট। রেখা, মামি ও দাদু।

দাদু—তাহলে মনোজ, তোমার মনে হল। [illegible] মনে হল বলত?

রেখা—আমার...[illegible] দেখেছি—।

ক্লোজ শট। দাদু।

দাদু—কি দেখেছ?

ক্লোজ শট। রেখা।

রেখা—আরতি ওর সঙ্গে ভাব করবার চেষ্টা। [illegible] পাত্তাই দেয় না।

মিড শট। মামি।

মামি—[illegible] পাত্তা?...ও কি ওর [illegible]?

দাদু মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করে রেখাকে। রেখা মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে।

মামি—বলিহারী সাহস। মুখপুড়ী, ঘুঁটে-কুড়ুনী হয়ে কিনা রাজরাণী হবার স্বপ্ন দেখছে!

দাদু বিরক্ত হন, থামিয়ে দেন মামিকে।

দাদু—বৌমা! (একটু নীরবতার পর)

দাদু—তোমরা যাও, যা করবার আমি করছি।

মামি অপমানিত বোধ করে, বিস্মিত হয় দাদুর কথায়।

মামি—আর রেখা!

ওদের সঙ্গে ক্যামেরাও প্যান করে ঘুরতেই দেখা যায় আরতী দরজার আড়ালে ভেজাচোখে দাঁড়িয়ে আছে। ক্যামেরা ধীরে ধীরে চার্জ করে ওকে। আরতী কান্নায় ভেঙে পড়ে, দাদুর দিকে ফিরে তাকায়।

মিড ক্লোজ শট। দাদু চিঠির দিকে তাকিয়ে। আরতীর কান্নার শব্দ শুনে ওদিকে ফিরে তাকিয়ে তাকে ডাকেন।

দাদু—দিদি, এদিকে শোন্! (অফ ভয়েস)

মিড ক্লোজ শট। আরতী।

দাদু—আয় (অফ ভয়েস)

আরতী কাঁদতে কাঁদতে দাদুর গায়ে পড়ে যায়। কম্পোজিট শট। দাদু ও আরতী।

আরতী—দাদু আমি আত্মহত্যা করব!

দাদু—দূর বোকা মেয়ে! লক্ষ্মীর পাঁচালীতে পড়িসনি—

নারায়ণী বলেন—আমার বচন।
আত্মহত্যা মহাপাপ নরকে গমন।।

আরতী (কাঁদতে কাঁদতে)—কিন্তু দাদু, এভাবে...না না...তার চেয়ে তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও...আমি..

দাদু—তুমি—নির্দোষ।

কম্পোজিট শট। আরতি ক্যামেরার ফোকাসে। দাদু আউট অফ ফোকাসে। আরতি জলভরা চোখে তাকায়, তার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল।

কম্পোজিট শট। দাদু ক্যামেরার ফোকাসে। আরতি আউট অফ ফোকাস। দাদু অতীতে ফিরে গেছেন।

দাদু—হ্যাঁ, বেকসুর খালাস...ওরে একটানা পঁয়ত্রিশ বছর ফৌজদারী আদালতে ওকালতি করছি, আসামী কখনও আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারে?

কম্পোজিট শট। আরতি ক্যামেরার ফোকাসে। কৃতজ্ঞতা, ভালবাসার চোখ তার ভরে ওঠে।

আরতি (মৃদুস্বরে)—দাদু!

মিড ক্লোজ শট। দাদু কথা বলতে বলতে দাঁড়িয়ে পড়েন।

দাদু—ইয়েস—ইয়েস, ইট'জ এ কেস অফ ফলস্ এ্যান্ড ম্যালিসাস প্রসিকিউশন। (উত্তেজিত হয়ে পড়েন, পুরোনো স্মৃতি মনে আসে) ইওর অনার! এতগুলি সাক্ষ্য-প্রমাণের পর আজ আর বলতে বাধা নেই যে, আসামী লোকটি সম্পূর্ণই তার শত্রুর [illegible] করে [illegible] যার [illegible] অপবাদ চাপাবার চেষ্টা করেছিল। না, ট্রুথ হ্যাজ প্রিভেইলড। সত্যের বিচারে ন্যায়ের দরবারে তার এই পাপ [illegible] এই পাপ আজ

আরতি—দাদু!

দাদু—অ্যাঁ (সম্বিত ফিরে পান।)

আরতি—তুমি অমন করছ কেন দাদু কি হয়েছে?

দাদু—খুব ভাল হয়েছে রে দিদি খুব ভাল হয়েছে। দ্যাখ না, এবার তুইও বাঁচবি। আমিও বাঁচব আমিও বাঁচব।

দাদু এগিয়ে যান দরজার দিকে।

আরতি—দাদু, কোথায় যাচ্ছ তুমি?

দাদু—শুভকাজে যাচ্ছি, পিছু ডাকিস না।

কম্পোজিট শট। দাদু ও রেখা।

দাদু বেরিয়ে যান। রেখা ভয়বিহ্বল চিত্তে তাকিয়ে থাকে বাইরের দিকে।

ওপরের অংশটা রঞ্জিৎ পিকচার্সের মুক্তি-প্রতীক্ষিত ছবি 'দাদু'-র চিত্রনাট্য থেকে নেওয়া। ছবির পরিচালক অজিত গাঙ্গুলী। চরিত্র কটিতে আছেন দাদু—বিকাশ রায়, রেখা—সবিতা চ্যাটার্জি, মামি—অমৃতা গুপ্তা, আরতি—সন্ধ্যা রায় ও অন্যান্য চরিত্রে আছেন অনুপকুমার, অজয় গাঙ্গুলী, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়।

তিন অধ্যায় চিত্রে উত্তমকুমার

মঞ্চাভিনয়

নহবত-এর কয়েকটি বিশেষ মুহূর্তে আরতি ভট্টাচার্য, জহর রায়, মিন্টু চক্রবর্তী, নির্মল চট্টোপাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অমিতাভ মাইতি। ফটো : অমৃত







রঙমহলে "নহবত" :

বিবাহ উপলক্ষে নহবত বাজানোর প্রথা বাঙালী ধনীগৃহে আজও চালু আছে। রঙমহলে অভিনীত ও নট-নাট্যকার-পরিচালক সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত "নহবত" নাটকও একটি বাঙালী-গৃহের নহবত মুখরিত বিবাহকে উপলক্ষ্য করেই গড়ে উঠেছে। দরবারী-কানাড়ায় সানাই বাজলেও তার ভিতরে একটি বিষাদের সুর ধ্বনিত হয় কিনা জানি না, কিন্তু নাট্যকার সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নাটকের অন্যতম মুখ্য চরিত্র বরের মিলিটারী জেঠামশাইকে দিয়ে এই মতই প্রকাশ করিয়েছেন এবং কারণ স্বরূপ বলিয়েছেন, বাঙালীবাড়ীর অধিকাংশ বিবাহেরই আনন্দোৎসবের অন্তরালে একটি-না-একটি বিষাদের ফল্গুধারা অবশ্যই প্রবাহিত হয়ে থাকে। তাই দেখি, অক্ষয়বাবুর ছোট মেয়ে রমার বিবাহে প্রথম বিষাদের সুর বেজে ওঠে বরপণের স্বীকৃত পাঁচ হাজার টাকা থেকে এক হাজার টাকা কম পড়ায় এবং সেই উপলক্ষ্যে বরের মিলিটারী মেজাজের জেঠার সঙ্গে কন্যাপক্ষের বহু রকম বাদ-বিসংবাদ ঘটায়। দ্বিতীয় বিষাদের সুর ধ্বনিত হয়, যখন জানা যায়, বিয়ের কনে রমার কুমারী-জীবনে সব্যসাচী নামে একটি সৎ যুবকের আবির্ভাব ঘটেছিল এবং সে সহসা গলরোগাক্রান্ত হওয়ায় তার সঙ্গে ওর বিবাহের প্রস্তাবটি নাকচ হয়ে যায়। বিবাহ-রাত্রে বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হয়ে ক্যান্সার রোগাক্রান্ত সব্যসাচী তার সাধের বেহালা হাতে এসে উপস্থিত হয় এবং একান্তে রমার কাছ থেকে সে চিরবিদায় নিয়ে যখন চলে যেতে উদ্যত হয়, তখন রমার সঙ্গে সদ্যবিবাহিত কল্যাণ তাদের এই একান্ত কথাবার্তা শুনে অভিভূত হয়ে সব্যসাচীর চিকিৎসার ব্যয়ভার গ্রহণের প্রস্তাব করে নিজের মহানুভবতার পরিচয় দেয়। তৃতীয় একটি বিষাদের সুর কিছুটা পরোক্ষভাবে আরোপিত হলেও তার অনুরণন তীব্রভাবে অনুভূত হয়। সেটি হচ্ছে, এই বিবাহ-রাত্রের আনন্দোচ্ছলতা। প্রাণকেন্দ্র কেয়া বা কাসুন্দী নামনী আধুনিকা সুন্দরী তরুণীর বিষাদময় অতীতের উদ্ঘাটন। যে সুন্দরী মেয়েটি কুমারী বেশে দুই বখাটে যুবক—শিবু ও শম্ভুকে তার ছলাকলায় রীতিমত নাকানি-চোবানি খাইয়ে ছাড়ছিল, প্রায় শেষ রজনীতে প্রকাশিত হল বিবাহিত হবার এক মাসের মধ্যে সে বিধবা হয়ে জীবনের সর্বসুখ থেকে বঞ্চিত অবস্থায় দিনযাপন করে চলেছে। এছাড়াও ছোটখাট বিষাদের সুর জেগেছে, অনাহূতের উপর নির্দয়প্রহার ও পরে তার প্রতি কেয়ার সহানুভূতিসূচক আচরণে, এবং বরের মিলিটারী জেঠার স্বহস্তে বরের পিতাকে গুলিবিদ্ধ করে হত্যা করার সংবাদে।

প্রায় আড়াই ঘণ্টাব্যাপী দুই দৃশ্যে সম্পূর্ণ নাটকখানিতে অন্তত ষোল-সতেরোটি বিভিন্নধর্মী উল্লেখ্য চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়ে হাসি-কান্নার টানাপোড়েনের সমন্বয়ে নাট্যকার সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় যে উপভোগ্য নাটকটি আমাদের উপহার দিয়েছেন, তাতে দ্বিতীয় দৃশ্যের গোড়ার দিকের খানিকটা আলগা অংশ ছাড়া বাকী সবটাই ঠাসবুনন। অবশ্য সাবেকী ও ধ্রুপদী নাট্যাদর্শের অনুরাগীরা "নহবত"কে হয়ত একখানি নাটক বলেই মেনে নিতে চাইবেন না। এতে কোনো একটি বিশেষ চরিত্রের বিবর্তন ও পরিণতির কথা বলা হয়নি। এতে আছে, কোনো একটি সামাজিক বিবাহকে উপলক্ষ্য করে বর আসার পূর্ব মুহূর্ত থেকে শুরু করে পরদিন বর-কন্যা বিদায়ের ক্ষণ পর্যন্ত বহু ছোট-বড় ঘটনার মাধ্যমে কয়েকটি চরিত্রের অবশ্যম্ভাবী ঘাত-

প্রতিঘাত ও তারই ফলে উদগত হাসি এবং অশ্রুর ভিতর দিয়ে সেই চরিত্রগুলির উদ্ঘাটিত রূপের সংগে আমাদের পরিচয় স্থাপনের একান্ত প্রয়াস। বলতে বাধা নেই, আমরা এই সুডৌল নাট্যচিত্রটি দেখে অত্যন্ত তৃপ্তিলাভ করেছি এবং বিশ্বাস করি, বর্তমান যুগের নাট্যরসিক সুধিবৃন্দ রংমহলের এই নবনাট্য নিবেদন দেখে আমাদেরই মতো সন্তোষলাভ করবেন।

রঙমহলের শিল্পিগোষ্ঠীকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই তাঁদের সামগ্রিক অভিনয়-সাফল্যের জন্যে। সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশনার প্রতিটি শিল্পী এমন ঐকান্তিক নিষ্ঠার সংগে সকলের সংগে সুর মিলিয়ে তাঁর গৃহীত চরিত্রটির রূপদান করেছেন যে, বহু চরিত্রের ভীড়ে কেউই হারিয়ে যাননি, প্রত্যেকেই নিজের স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্যের গুণে প্রোজ্জ্বল হয়ে আছেন। এমন কি, যে, প্রৌঢ় কন্যাযাত্রীটি ফার্স্ট ব্যাচে বসে পরিতৃপ্তির সংগে খেয়ে একরাশ পান-সিগারেট ও নতুন জুতোজোড়া সংগ্রহ করে নাটকের গোড়ার দিকেই প্রস্থান করেন, তাঁকেও দর্শকরা কোনোদিনই ভুলতে পারবেন না। সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় (বরের মিলিটারী জেঠামশাই), হরিধন মুখোপাধ্যায় (কনের বাবা অক্ষরবাবু), মৃণাল মুখোপাধ্যায় (ট্রেণে পুঁটলি ফেলে আসা পল্লীগ্রামের চাকর রামু), অজিত চট্টোপাধ্যায় (বরের পুরুত), জহর রায় (একটু অতিরিক্ত কমিক-করা বড় জামাই হরি), মিন্টু চক্রবর্তী (দুঃস্থ অনাহুত আগন্তুক), কার্তিক সরকার (কাশীদাদু), লক্ষ্মী-জনার্দন (বরেন), সরযূবালা (অক্ষয়ের বড় মেয়ে) মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (মাসিমা)

রঙমহল
ফোন
৫৫১৬১৯
দর্শক-সমালোচক উচ্চ প্রশংসিত
বৃহ ও শনি
৬॥
রবিবার ও
ছুটির দিন
৩-৬॥
নহবত
○ প্রযোজনা : রঙমহল শিল্পীগোষ্ঠী
○ নাটক ও পরিচালনা : সত্য বন্দ্যোঃ
○ অগ্রিম আসন সংগ্রহ করুন

প্রভৃতি স্বনামধন্য শিল্পী যে নিজ নিজ গৃহীত ভূমিকাকে দর্শকদের সামনে যোগ্যতার সংগে তুলে ধরতে পেরেছেন, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু আমাদের রীতিমত বিস্মিত করেছেন নবাগতেরা। এবং ও'দের মধ্যে যিনি হচ্ছেন সর্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বস্তু তাঁর নাম আরতি ভট্টাচার্য। কেয়া বা কাসুন্দীর ভূমিকাভিনেত্রী এই সুন্দরী তরুণীটি যে আশ্চর্য সাবলীলভাবে তাঁর গৃহীত চরিত্রটিকে জীবন্ত করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন, তাতে মনে হয় অভিনয়প্রতিভা তাঁর সহজাত সম্পদ। আমরা আশা করব, নাট্যাভিনয়কে নিষ্ঠার সংগে গ্রহণ করে দৃঢ় পদক্ষেপে তিনি নিজেকে বঙ্গবংগমঞ্চের অন্যতমা শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী রূপে প্রতিষ্ঠিত করবার পথে অগ্রসর হবেন। জ্ঞান চৌধুরীর ভূমিকাভিনেতা অমরনাথ মুখোপাধ্যায়কেও স্বাগত জানাই। সুন্দর দেহসৌষ্ঠব ও সুকণ্ঠের অধিকারী তিনি; গৃহীত চরিত্রটিকে তিনি ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। কেয়ার প্রেমাকাঙ্ক্ষী যুবকদ্বয় বেশে মানস ঘোষ এবং ইন্দ্রজিৎ, ব্যর্থ-প্রেমিক ও ক্যান্সার ব্যাধিগ্রস্ত সব্যসাচীরূপে নির্মল চট্টোপাধ্যায়, বর কল্যাণের ভূমিকাভিনেতা গৌতম রায়, বধূ রমারূপিণী ইন্দিরা দে, মেজ জামাই বেশে বাসুদেব পাল, আদুরে ছেলে ঘেণ্টুরূপে সুজিত দাস—এ'দের মধ্যে অনেককেই নতুন মুখ বলে আমাদের মনে হয়েছে; কিন্তু আগেই বলেছি, এ'রা এবং শিল্পীদের মধ্যে সকলেই কৃতিত্বের সংগে সাফল্যলাভ করেছেন।

একটি মাত্র সেটে এই নাটকের বিভিন্ন ঘটনা ঘটানোর মধ্যে যথেষ্ট মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন নাট্যকার পরিচালক ও মঞ্চপরিকল্পনাকারী যুগ্মভাবে। 'সব্যসাচীর বেহালাতে 'এ মণিহার আমায় নাহি সাজে' এবং 'আমার জীবননদীর ওপারে' সংগীতের ব্যবহার অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। ওরই ফাঁকে বিপরীত লঘুরস সৃষ্টিকারী হিসেবে জহর রায়ের মুখে 'হাত ধরে তুমি নিয়ে চল সখা' গান চমৎকার উপভোগ্য। ঘটনা অনুযায়ী নেপথ্য থেকে সানাই বাজনাও অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টির সহায়ক হয়েছে।

'রঙমহল'-এর নবতম নিবেদন, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ও পরিচালিত 'নহবত' একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী নাট্যাভিনয় রূপে চিহ্নিত হবে।

মেঘে ঢাকা তারা

এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক (শ্যামবাজার) কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের শিল্পীগোষ্ঠী গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী স্টার রঙ্গগৃহে প্রথম মঞ্চাবতরণ করেন। প্রথম অনুষ্ঠান হিসাবে প্রযোজনা করেন শক্তিপদ রাজগুরুর মেঘে ঢাকা তারা। এ নাটকের অভিনয় দর্শকদের প্রশংসামুখর হতে পেরেছে। উপস্থাপনা, প্রয়োগ সুচিন্তিত।

এলাহাবাদ ব্যাঙ্কেরই বড়বাজার শাখার কর্মী শ্রীঅজিত চট্টোপাধ্যায় নির্দেশিত এব কয়েকটি নাট্যমুহূর্ত রচনা বুঝি তার তুলনা হয় না।

শিল্পীদের দলগত অভিনয় যদিও নাটকের প্রধান তবুও কয়েকটি চরিত্র ভোলবার নয়।

বিশেষ করে মাধব মাস্টারের ভূমিকায় শ্রীভূপতি ভাটিয়ার অভিনয়। দারিদ্র্যজর্জরিত স্কুল মাস্টারের রূপ তিনি অতি নিখুঁত-ভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। গীতার চরিত্রে গীতা দের মর্মস্পর্শী অভিনয় দর্শকদের বহুদিন মনে থাকবে।

সংগীতপাগল উচ্চাভিমানী শংকরের চরিত্রকার শচীন অধিকারীর অভিনয়ে নৈপুণ্য লক্ষ্য করবার মতন।

মণ্টু, গীতা ও মা'র ভূমিকায় যথাক্রমে সোমনাথ বসু, নীতিকা দাসগুপ্ত ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দর্শকদের প্রচুর প্রশংসা পেয়েছেন। এ ছাড়া রঞ্জন মিত্রের 'ফল্স ডিরেক্টর, দীপক ভট্টাচার্যের 'মধু', মুরারী গোস্বামীর 'মদন ডাক্তার' মনতোষ পালের 'বংশী', প্রেম কাপুরের 'পরেশ' প্রত্যেকটি স্বকীয়তায় উজ্জ্বল।

'নিহত নিয়তি' ও 'বিভাব'

'অনুভব' নাট্যসংস্থার শিল্পীবৃন্দ সম্প্রতি বেহালার অহীন্দ্র মঞ্চে দুটি একাংকিকার সার্থক অভিনয় পরিবেশন করলেন। নাটক দুটির নাম হোল 'নিহত নিয়তি' ও 'বিভাব', বিষয়বস্তু ও পরিবেশনের ধারায় নতুনত্বের ইংগিত নাট্যানুরাগীদের মুগ্ধ করেছে। অভিনয়ে স্মরণীয় নাট্য-প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন অসীম ভাদুড়ী, সত্যপ্রিয় ঘোষ, শান্তিজিৎ সেনগুপ্ত, তাপস দত্তগুপ্ত, মোহন চৌধুরী, মিহির গাংগুলী, মায়া ঘোষ।

মধুরেন সমাপয়েৎ

সম্প্রতি 'দি ফেণ্ডস' সংস্থার সদস্যরা হাবড়ার সমাজ মিলন কেন্দ্রের মঞ্চে দীপ্তি-কুমার শীল রচিত হাসির নাটক 'মধুরেন সমাপয়েৎ' অভিনয় করেন। নাট্যনির্দেশনায় ছিলেন শিবদাস মুখোপাধ্যায়। নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দেন নকুলেশ্বর চক্রবর্তী, মদনমোহন মজুমদার, শংকর চট্টোপাধ্যায়, পূর্ণেন্দু দাশগুপ্ত, অমল চক্রবর্তী, সমীর চক্রবর্তী, পুলক রায়, শিবদাস মুখোপাধ্যায়

ডেণ্টল
(টুথ-এক ড্রপস)
দাঁত ও মাঢীর ব্যথায় দ্রুত আরাম দেয় এবং দাঁতের গোড়া ও মাঢীর ফোলা দূর করে।
বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা . বোম্বাই . কানপুর . দিল্লী

বিবিধ সংবাদ

রুশ ও ফরাসী ছবির প্রদর্শনী

'সিনে সেণ্ট্রাল, ক্যালকাটা' সরলা রায় মেমোরিয়াল কমিউনিটি হলে ২৩শে থেকে ২৭শে মার্চ চারটি বিখ্যাত সোভিয়েত চলচ্চিত্র 'চ্যাপায়েভ' (ভ্যাসিলিয়েভ ভ্রাতৃদ্বয়), 'আর্থ' (ডভ্‌ঝেঙ্কো, 'উই ফ্রম ক্রনস্টাড্‌ট' (জিগান) ও 'মাই ইউনিভার্সিটিজ' (ডনস্কয়), প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে। এছাড়া সংস্থার উদোগে আগামী ১৬ই থেকে ২১শে এপ্রিল একই প্রেক্ষাগৃহে চারটি ফরাসী চলচ্চিত্র—'আদিউ ফিলিপিন' (জাক রোজিয়ে), 'ক্রোনিক দানেতে' (এদ্‌গার মোরা ও জাঁ রুশ), 'মাদাম দ্য' (ম্যাক্স ওপ্‌হুই) ও 'হিরোশিমা মনামুর' (আল্যাঁ রেনে) প্রদর্শিত হবে।

শ্যাম স্কোয়ার সান্ধ্য মিলনীর বিচিত্রানুষ্ঠান

গত ১১ই মার্চ সন্ধ্যায় শ্যাম স্কোয়ার সান্ধ্য মিলনীর উদ্যোগে বাগবাজার রামকান্ত বসু স্ট্রীটে এক বিরাট বিচিত্রানুষ্ঠান হয়ে গেল। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন পৌর-সদস্য শ্রীস্নেহেশ সুর। চিত্রসাংবাদিক শ্রীপঞ্চানন দত্ত পরিচালিত এই বিচিত্রানুষ্ঠানে যাঁরা উপস্থিত দর্শক ও শ্রোতৃবৃন্দকে বিস্মিত করেন তাঁরা হলেন—উদ্বোধনী সংগীতে কল্যাণী দত্ত, কাজী সব্যসাচী, মৃণাল চক্রবর্তী, শক্রোভারতী পালিত, পিণ্টু ভট্টাচার্য, অনিল দত্ত, শীতল ব্যানার্জি, ছায়া সাহা, ছবি দত্ত, হিমাংশু বিশ্বাস ও সম্প্রদায়, হবি রিদম্ অর্কেস্ট্রা, বাহার অর্কেস্ট্রা ও নর্থ ক্যালকাটা মিউজিক ক্লাব। অনুষ্ঠানসূচী ঘোষণায় ছিলেন—অভিনেতা সুনীলেশ ভট্টাচার্য।

'সব-পেয়েছি আসর'এর পালা-পার্বণ

সব-পেয়েছির আসরের ২২তম বার্ষিক উৎসবে গেল ১৪ই মার্চ সন্ধ্যায় স্বপনবুড়োর নৃত্যনাট্য 'পালা-পার্বণ' মহাজাতি সদনের পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে ছোটদের সোল্লাস-ধ্বনির মধ্যে সম্পন্ন হয়।

নৃত্যের মাধুরিমায়, সংগীতের মূর্ছনায়, আলোকসম্পাতের রঙীন স্বপ্নে, সাজ-সজ্জার বাহারে এবং অভিনয়ের উৎকর্ষমানে 'পালা-পার্বণ' একটি প্রথম শ্রেণীর নৃত্যনাট্যে উন্নীত হয়েছে।

বৈশাখ মাস থেকে চৈত্র মাস পর্যন্ত বাংলাদেশে যে-সব 'পালা-পার্বণ' অনুষ্ঠিত হয়, তাকে ভিত্তি করেই এই নৃত্যনাট্য রচিত হয়েছে।

সব-পেয়েছির আসরের মেয়েরা অতি-নিপুণতার সঙ্গে এই পালা-পর্বণগুলি নৃত্যের মাধ্যমে রূপদান করেছে। সুধীর সিংহের নৃত্য-পরিকল্পনা, সুনীল সাহার সুরদান, শেলী সরকারের ব্যঞ্জনা এবং শিবনাথ বন্দ্যোর আলোকনিয়ন্ত্রণ অতি উচ্চাঙ্গের স্বাক্ষর রেখেছে।

পরলোকে চিত্র-পরিচালক

শ্রীগুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঁকুড়া জেলা নিবাসী বিশিষ্ট চিত্র-পরিচালক শ্রীগুণময় বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বেলুড়ের বাসভবনে ১১ই মার্চ, '৬৮ দেহত্যাগ করেন। কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে তাঁর শেষ-কৃত্য সম্পন্ন করা হয়। মৃত্যুকালে তাঁর ৬৬ বৎসর বয়স হয়েছিল। শ্রীগুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনাধীনে প্রায় ১৫-২০ খানি বাংলা বই চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে। তাঁর প্রথম বই "শশীনাথ" (১৯৩৭) এবং আর আর উল্লেখযোগ্য ছবি "মাতৃহারা", 'জীবন-সঙ্গিনী', 'নিরক্ষর', 'বিশ বছর আগে', 'মা ও ছেলে', 'নীলাঙ্গুরীয়', 'রাজপথ' 'গৃহলক্ষ্মী', 'মীরাবাঈ' ইত্যাদি। তিনিই বাংলা চিত্র-জগতে প্রথম কার্টুন ছবি তৈয়ারী করেছিলেন। অবসর সময় প্রচুর ছবিও এঁকে গেছেন। চিরকাল তাঁর ধর্ম-জীবনের প্রতি আগ্রহ ছিল, শেষ বয়সে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

স্বপনবুড়ো এই 'পালা-পার্বণ' রচনা ও পরিচালনা করেছেন।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র কলেজের বার্ষিক উৎসব

গত ১৫ই ও ১৬ই মার্চ দু'দিনব্যাপী ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র কলেজের বার্ষিক উৎসব কলেজের নিজস্ব প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়।

প্রথম দিনে যে-তিনটি নাটক মঞ্চস্থ হয়, সেগুলি হল 'পতঙ্গ রঙ্গ', 'চলচিত্ত-চঞ্চরী' ও 'তাহার নামটি রঞ্জনা'।

প্রথম নাটক রবীন্দ্র ভট্টাচার্যের 'পতঙ্গ রঙ্গ' কলেজের ছাত্রীদের দ্বারা অভিনীত হয়। চরিত্রানুগ অভিনয়ে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন গৌরী দাশগুপ্ত, অপর্ণা কৃষ্ণগামী, মন্দিরা চৌধুরী, পূরবী গুহঠাকুরতা, অপর্ণা দাস, নীলা বিশ্বাস, মমতা রায়, লীলা দাস, হসন্তিকা চক্রবর্তী ও মন্দিরা দাশগুপ্ত। নির্দেশনায় ছিলেন রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত।

দ্বিতীয় নাটক সুকুমার রায়ের 'চলচিত্তচঞ্চরী'। কলেজের ছাত্রবৃন্দ কর্তৃক অভিনীত এই নাটকটি দর্শকদের প্রচুর হাসির খোরাক জুগিয়েছে। বিভিন্ন ভূমিকায় উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেন তড়িৎ বিশ্বাস, গৌতম দাশগুপ্ত, সুভাষময় ঘোষ, সুধাংশু ঘোষাল, প্রভাত ঢোল, কমল বসু, শান্তি-রঞ্জন রায়, সলিল বসু, অলোক মুখার্জি, প্রবীর দাস ও অমিতাভ ভট্টাচার্য। পরিচালনা করেন অধ্যাপক রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঐ দিনের তৃতীয় এবং শেষ নাটক বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'তাহার নামটি রঞ্জনা' সেদিনের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রযোজনা। কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্র-ছাত্রীদের বলিষ্ঠ দলগত অভিনয় দর্শকদের মনে প্রচুর রেখাপাত করে। কৌশিক ও রঞ্জনার ভূমিকায় অধ্যাপক রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত ও কাজল বক্সীর অভিনয় আকর্ষণীয়। চরিত্রানুগ অভিনয়ে দক্ষতা দেখিয়েছেন অধ্যাপক কালিদাস ঘোষ। রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত ছিলেন এই নাটকটির প্রয়োগ-নির্দেশক।

দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে রমা গুহ-ঠাকুরতা, কল্যাণ মুখোপাধ্যায়, রবীন ব্যানার্জি, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেশ দত্ত, কাজী অনিরুদ্ধ প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন।

চেলিয়ামা ব্লক রিক্রিয়েশন ক্লাবের নাট্যাভিনয়

ঐতিহাসিক নাটকের আবেদন যে অভিনেতা ও দর্শক উভয়ের কাছে সমভাবে বিদ্যমান, তা চেলিয়ামা ব্লক রিক্রিয়েশন ক্লাবের দুটি নাট্যানুষ্ঠান থেকে বোঝা গেল। এই সংস্থার সদস্য-সদস্যারা গত ১৪ এবং ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে যথাক্রমে রমেশ গোস্বামী রচিত 'কেদার রায়' এবং শচীন সেনগুপ্ত রচিত 'গৈরিক পতাকা' নাটক দুটি মঞ্চস্থ করেন।

'কেদার রায়' নাটকের অভিনয়ে চলনে-বলনে কার্ভালোর ভূমিকাকে প্রাণবন্ত করে তোলেন পরিচালক শংকরনাথ দাস। শ্রীমন্ত চরিত্রের কখনো পাগলামি, কখনো রহস্য-ময়তা, কখনো বেদনার প্রকাশ সার্থক ভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন প্রদ্যোৎ চৌধুরী। ঈশা খাঁ-র আশা ও হতাশার রূপটি সুনীল দত্তের অভিনয়ে প্রকাশ পায়। প্রশংসা পাবেন সোনার ভূমিকাভিনেত্রী সুস্মিতা ভট্টাচার্য। তাঁর অভিনয়ের সাবলীল অথচ সংযত ভংগী এবং বিভিন্ন অভিব্যক্তির প্রকাশ সহজেই দর্শকদের মনোরঞ্জনে সমর্থ হয়। এছাড়া অন্যান্য ভূমিকায় যাঁরা দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তাঁরা হলেন সর্বশ্রী কানাই চৌধুরী, দিলীপ মুখার্জি, ফণীন্দ্র ভট্টাচার্য, চিন্ময় ভট্টাচার্য, সদানন্দ চক্রবর্তী, মিলন চৌধুরী, প্রণতি ভট্টাচার্য ও সবিতা ঘোষ। মানসিংহের ভূমিকাভিনেতার কথায় ও অভিনয়ে জড়তা থেকে গেছে।

১৫ই ফেব্রুয়ারী মঞ্চস্থ করেন শচীন সেনগুপ্তের 'গৈরিক পতাকা'। তুলনামূলক ভাবে এই নাটকের অভিনয় অধিকতর সার্থক। শিবাজী চরিত্রের দেশপ্রেম, আশা, ত্যাগ সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলেন প্রদ্যোৎ চৌধুরী। এরপরেই উল্লেখ করতে হয় বীরবল ও শম্ভুজীর ভূমিকায় রতন চক্রবর্তী ও মধুস্মিতা ভট্টাচার্যের কথা। হাসি, গানে, অভিনয়ে উভয়েই উভয় চরিত্রকে সার্থকভাবে রূপদানে সমর্থ হন। প্রশংসা জিজাবাঈ-এর ভূমিকাভিনেত্রী সবিতা ভট্টাচার্যেরও প্রাপ্য। অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয় করে প্রশংসা লাভ করেন দিলীপ বক্সী, চিত্ত দৈবজ্ঞ, চণ্ডী ঘোষ, শ্যামাপদ চক্রবর্তী, শক্রা দাস, রেণু পাল, মিতা চক্রবর্তী, জীবন গাংগুলী এবং ভৈরব সিং।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শংকরনাথ দাস।

জলসা

রবিশংকরের উল্লেখযোগ্য সেতার অনুষ্ঠান

এবারের গৌরবময় বিদেশ সফরের পর পণ্ডিত রবিশংকরের বাজনা প্রথম শোনা যায় রবিশংকর সম্বর্ধনা-সভা-আয়োজিত রবীন্দ্রসদনের এক সান্ধ্যসভায়।

প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার তরফ থেকে দোষত্রুটি অবশ্যই ছিল। সাংবাদিক মহলের ক্ষুব্ধ হওয়ার যথেষ্ট কারণ ঘটেছে। তবু উল্লেখযোগ্য এই কারণে এখানে আমরা সাংবাদিক মহলে রবিশংকরের উক্তির সার্থক প্রমাণ পেলাম। উক্তিটি ছিল : "বিশ্বাস করুন গুরুর কাছে তানসেন ঘরানার বীণকার ঐতিহ্যসমৃদ্ধ যে শিক্ষা আমি পেয়েছি, তা থেকে আমি এতটুকুও বিচ্যুত হইনি।"

সত্যিই হননি। সেদিনের আলাপ শুরু "শ্রী" রাগ দিয়ে। ঐ রাগেই ১১ মাত্রার তালের একটি গৎ বাজিয়ে, চলে গেলেন "দেশ" রাগে। শেষকালে ধুনের অংগে পরিবেশিত রাগমালার বিচিত্র সমন্বয়। আলাপের বিলম্বিত অংগে বারবার তার নেমে যাওয়া বা যে কোন কারণেই হোক পণ্ডিতজীকে কিছু বিব্রত দেখা গেল। হয়ত সেইজনাই জমে উঠতে কিছু দেরী হয়। কিন্তু জমে যখন উঠল (বিশেষ জোড়ের অংশে) তখন পণ্ডিত রবিশংকরের বাজনা বলে চিনতে ভুল হয়নি। 'শ্রী' শুদ্ধ এবং বিশাল রাগ অন্যতম ঠাটও বটে। সরপ, মপগসা এই আরোহী বজায় রেখে—এই রাগ পরিবেশন করা অনেক শীর্ষস্থানীয় শিল্পীর পক্ষেও সম্ভব হয় না এবং 'পুরিয়া ধ্যানেশ্রী'র সংগে এই রাগকে এক করে ফেলেন। কিন্তু শাস্ত্রসম্মত আরোহী, অবরোহী অব্যাহত রেখে রাগের অন্তর্নিহিত বৈরাগ্য ও শান্তির ভাব যেভাবে সঞ্চারিত করেছেন তা তাঁর মত শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব। পূর্বাংগ প্রধান এই রাগের মন্দ্র ও মধ্য সপ্তকে সুরের বিস্তারে বেরার অলংকারের পাণ্ডিত্য ও সৌন্দর্যের সমন্বয় বিশেষ অবরোহী গমকের সুগম্ভীর নাদধ্বনি ভোলবার নয়। ১১ মাত্রার গতের ছন্দবৈভবেও রাগের ভাবে চাঞ্চল্য লাগেনি।

তবু বলব এই রাগে বুদ্ধিদীপ্ত যতখানি আবেগের আবেদন ততটা নয়। এ ক্ষতিপূরণ ঘটেছে "দেশ"-এ।

তিনটি রাগই খেয়ালের সংগে। কিন্তু একঘেয়েমো বা পুনরাবৃত্তিমূলক নয়। গানের আস্থায়ী, সঞ্চারী আভোগের মত খেয়ালেরও ধ্রুপদ, কলাবন্তী ও ঠুংরি এই তিনটি অংগে তিন রাগে পরিবেশিত। "শ্রী" রাগে ধ্রুপদাঙ্গের "ডিরিডিরি" "দেশ" এ কখন যে "সপাট"এর 'ভারা ভারা' হয়ে গেল টেরই পাওয়া গেল না। তারপর দাদরা ছন্দের দুন থেকে অতিদ্রুত পরধুনের ক্লাইমেক্সে পৌছে আবার তিনতালে গৎ ধরা এমন এক রোমাঞ্চের সৃষ্টি করেছে—যার মধ্যে আল্লারাখার মত তবলচির অবদান কম নয়। দ্রুততম গতিতেও ঠেকর স্পষ্টতার মজা ভোলবার নয়।

ডোভার লেন মিউজিক সম্মেলনী

ডোভার লেনের ছোট্ট জলসায় শিল্পী শ্রীকমলেশ মিত্রের 'তবলাতরংগ'কে উপস্থিত করা হয় এমন সময়, যখন শ্রোতারা সব এসে পৌছুতে পারেননি। "তবলাতরংগ" উদয়শংকরের প্রাক্তন সংগীতপরিচালক শ্রীবিষ্ণুদাস সিরালীর পরে এমন সুসংবদ্ধ ও উপভোগ্য করে বাজাতে কোনো শিল্পীকেই শোনা যায়নি। এই পদ্ধতির অনেক ক্ষীণতম সংস্করণ যা অনেকটা অনুকরণেরই সামিল হয়ত বা কেউ বাজিয়ে থাকেন, তবে তার মধ্যে সত্যিকারের শিল্প, প্রতিভা অথবা আঙ্গিক-শৈলীর কোনো স্বাক্ষরই থাকে না। দ্বিতীয়তঃ "তবলাতরংগ" বলতে কি বোঝায় অনেকেই তা জানেন না যেমন জানেন না এই বিরল প্রতিভাধর যন্ত্রীকে। তাছাড়া উদয়শংকরের সংগে বিদেশ সফর-কালে শ্রীমিত্র ওদেশের বিদগ্ধ সংগীতজ্ঞ মহলের উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন লাভ করেন। যে ক'জন শ্রোতা সেদিন তবলাতরংগে তাঁর "চিরবাণী" রাগ শুনেছেন তাঁরা শুধু মুগ্ধই হননি। তাঁদেরই বিশেষ অনুরোধে পণ্ডিত মণিরামের সংগীতানুষ্ঠানের পর শ্রীমিত্রকে আবার আসরে বসতে হয়েছে। দ্বিতীয়বারে ইনি শোনালেন "সোহিনী" এবং শ্রোতাদের বিশেষ আগ্রহে রামপ্রসাদী সুর বাজিয়ে সহর্ষ করতালির মধ্যে অনুষ্ঠান সমাপ্ত করেন।

যন্ত্রসংগীতে ওস্তাদ বিলায়েত খাঁর সেতার তাঁর অগণিত ভক্তকে খুশী করলেও পণ্ডিতমহলের প্রশংসার ভাগটা যেন বেশী। কারণ তানের দাপট, মীড়ের প্রাণকাড়া সৌন্দর্য ছাড়াও যে বস্তু—তাঁর বাজনায় একটা নতুন ওজন সৃষ্টি করেছে—সে হোল তাঁর রাগশুদ্ধতার গাম্ভীর্য।

নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় রাগাবয়ব প্রতিষ্ঠা, বিস্তারের ঔজ্জ্বল্য, অলংকার লয়কারী সকল দিক বিচারেই তাঁর সুনামে সুপ্রতিষ্ঠিত।

শ্রীমতী হীরাবাঈ বরোদেকার পরিবেশিত "দরবারী কানাড়া" তাঁর কণ্ঠের অনুকূল নয়। কিন্তু বিস্তারপদ্ধতির শান্ত চলন ও গায়কীয় আভিজাত্য শোনবার মত।

শ্রীমতী মালবিকা কাননের "বিভাস" পরিচ্ছন্ন, সুন্দর। এ, কাননের আভোগী ও যোগশেষ যথাযোগ্য মানে পরিবেশিত। বেগম আখতারের ঠুংরি, দাদরা ও গজল হাসির আলোয় মেজাজের সংগতে এখনও যেন যাদু বিস্তার করে।

রোশনকুমারীকে বহুদিন বাদে আবার কলকাতার আসরে দেখে সবাই আনন্দিত। তাঁর লয় ও ছন্দ কুশলতা যেন আরও রেওয়াজী ও পরিমার্জিত।

সাতরঙ সংগীত সম্মেলন

সাতরঙ সংগীত সম্মেলনের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন হয় মহাজাতি সদনে।

বহু তরুণ শিল্পীকে এবার দেখা গেছে যেমন—জয়তী গুহ, অভিজিত চক্রবর্তী এবং অনেক প্রতিষ্ঠিত তরুণ শিল্পীকে আশ মিটিয়ে শোনবার সুযোগ দিয়েছেন কর্তৃপক্ষ। যেমন শিশিরকণা ধরচৌধুরী। সংগীতপ্রেমী বাংলাদেশের বিশেষ কোনো আসরেই এবার এ'র ঠাঁই হয়নি। এখানে এ'র বাজনা দুদিন শোনবার সুযোগ পাওয়া গেল। প্রথম দিন ইনি বাজালেন "মোহন কোষ"। সুবিস্তৃত আলাপের অংগে কখনও বীণ, কখনও আমীর খাঁর মধ্যলয়ের গায়কীর শান্তভাব কখনও দক্ষিণ ভারতীয় "নাদেশ্বরম"এর ধ্বনিগাম্ভীর্য — আবার তানের সঙ্গে আলি আকবরের ছন্দবৈচিত্র্য ইত্যাদির আভাস সত্ত্বেও এমন একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের ছাপ আছে যা একান্তই তাঁর নিজের। যুগলবন্দীর একটি আসরে ইনি মণিলাল নাগের সংগে বাজালেন "নটভৈরব"।

কণ্ঠসংগীতের আসরে ওস্তাদ আমিনুদ্দিন দাগারের শুদ্ধ বেষ৬ চন্দ্রকোষ ও বাগেশ্রী রাগে পরিবেশিত ধ্রুপদ ও ধামার এক সুগম্ভীর সাংগীতিক পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। খেয়ালে আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান নিঃসন্দেহে শ্রীমতী সুনন্দা পটুনায়কের। ইনি গাইলেন "আহিরী ভৈরো"। উদাত্ত কণ্ঠলালিত্যে এই প্রাণস্পর্শী রাগ নিমেষেই শ্রোতাদের চিত্তজয় করে নিয়েছে। পণ্ডিত বিনায়ক রাও পটুবর্ধনের ওজস এবং 'ওংকারনাথজীর কাব্যধর্মী সৌন্দর্যের সংগে নিজস্ব আবেগ সঞ্চারিত তাঁর গায়নশৈলী সকল শ্রেণীর শ্রোতাকেই মুগ্ধ করবার শক্তি রাখে। বিশেষ অনুরোধে গাইলেন "যোগিয়া" রাগের একটি ভজন "মমতা তু ন গই"। সুব্রত রায়চৌধুরীর সেতার আর এক উপভোগ্য অনুষ্ঠান। পুরিয়া-কল্যাণের আলাপ ও গৎ উভয় অংগেই তাঁর পরিশীলিত শিক্ষা ও রেওয়াজ বিদ্যমান।

বালকশিল্পী অভিজিৎ চক্রবর্তীর তবলালহরা গৎ রেলা ঠেকা ও লয়দক্ষতায় বিস্ময়কর। রেওয়াজ যদি শিথিল না হয়—পরিণত বয়সে অবশ্যই ইনি বাংলাদেশের প্রথম শ্রেণীর তবলাবাদকের স্থান পূর্ণ করবেন। —চিত্রাঙ্গদা।



বিষণ্ণ নায়ক

অজয় বসু

পরণে আটোসাঁটো ট্রাউজার, বুকের বোতাম খোলা সার্ট। মাথা ভর্তি চুল, ঘাড় ঝুলপি বেয়ে নীচের দিকে নামছে। যাঁরা চেনেন না তাঁরা দেখে ও'কে বিট্‌ল-দের একজন বলে ভুল করতে পারেন। কিন্তু যাঁরা চেনেন, তাঁদের সে ভুল হবে কেন?

তাঁরা চেনেন এবং জানেন যে উনিই ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক স্বনামধন্য পাতৌদি।

জন্মলগ্নে ভাগ্য ও'র মুখে রূপার চামচ তুলে দিয়েছিল। তাই গোঁফের রেখা ওঠার সংগে সংগেই তিনি জাতীয় দলের নেতৃত্ব করার অধিকার পান। কম বয়সেই তিনি বিদেশের মাঠে ভারতকে সর্বপ্রথম টেস্ট খেলায় জিতিয়েছেন। বিদেশে বারবারও পাইয়েছেন। কাজেই নাম-ডাক আগের অনুপাতে আরও বেড়েছে। তাই দীর্ঘ সফর অন্তে স্বদেশে ফিরতেই বোম্বাইয়ের সাংবাদিকেরা তাঁকে ছেঁকে ধরেছিলেন।

শ্রোতা অনেকে। কথক একা পাতৌদি। সফরের অভিজ্ঞতা, শিক্ষা, দোষ-গুণের সবিস্তার বর্ণনায় পাতৌদি একেবারে আত্মনিমগ্ন। এই ভাবটি যদি ক্রিকেট মাঠে সর্বক্ষণ তিনি ধরে রাখতে পারতেন তাহলে সে দৃষ্টান্ত ভারতীয় ক্রিকেটের পক্ষে কি কল্যাণকরই না হোতো! কিন্তু থাক সেকথা। সেদিন পাতৌদি রীতিমতো সিরিয়াস। কণ্ঠে বিষণ্ণতার আমেজ। পুরানো আক্ষেপেই তিনি সোচ্চার 'আমাদের ফাস্ট বোলার নেই। ফাস্ট বোলার না থাকতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আশাও নেই!'

কথাটা অনেকবার শুনেছি। দীর্ঘদিন ধরে শুনে আসছি। পাতৌদি নিজেও এর আগে একই কথা প্রকাশ্যে উচ্চারণ করেছিলেন ইংলন্ড থেকে ফিরেই। শুনতে শুনতে কানে ঝালাপালা ধরে গেল। কিন্তু তবু এই যন্ত্রণার অবসান ঘটাতে আজও কেউ এগিয়ে এলেন না!

ফাস্ট বোলার নেই কেন? একদিন এই ভারতেই গণ্ডায় গণ্ডায় যাঁদের সন্ধান মিলতো তাঁদের বংশ নির্বংশ হলো কেন? জবাবটা আমরা জানি। কিন্তু তবু শুনতে চাই ও'দের জবানীতে যাঁদের হাতেই আজ ভারতীয় ক্রিকেটের লালন-পালনের ভার। যাঁরা শুধু জাতীয় দলের সফরের আয়োজন করতে অথবা বিদেশীদের এদেশে স্বাগত জানাতে ব্যস্ত।

এমন নিরর্থক সফরের ব্যবস্থা করে লাভই বা কি, যদি যোগ্যের সংগে সমান তালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তোলা না যায়? যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী নিউজিল্যান্ড নয়, অস্ট্রেলিয়া। হৃতবীর্য অস্ট্রেলিয়াকে তার নিজের মাঠে এবারেই অসহায় ভূমিকায় পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু তাতেও ভারতের ভালে জয়তিলক আঁকা সম্ভবপর হয়নি। সত্যিই, কতো বড় সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে! পাতৌদির আফশোষ হওয়ারই কথা।

কিন্তু এই আফশোষে আরও বৃহত্তর পক্ষের ভাগ থাকবে না কেন? কেন তাঁরা সফর বন্ধ করে সত্যিকারের ফাস্ট বোলার খোঁজায় ও গড়ায় অহোরাত্র চেষ্টা ও চিন্তা করবেন না? চেষ্টায় ও চিন্তায় পাবের কড়ি জোগাড় হয় না এমন আজগুবী কথাকেই বা কে অভ্রান্ত সত্য বলে মেনে নেবে?

কিন্তু শুধু ফাস্ট বোলিংয়ের দৈনাই কি অস্ট্রেলিয়া সফরে ভারতীয় দলের বিপর্যয় ডেকে এনেছিল? আরও ঘাটতি কি ছিল না? মস্তো ঘাটতি ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের অক্ষমতা ঘিরে। তাঁদের মূল ব্যর্থতা ব্যাটিংয়ে সমমানের ধারা ধরে রাখায় এবং প্রয়োজনীয় মুহূর্তে সংযমের পরিচয় দেওয়ায়। পাতৌদি নিজে বলেছেন, 'সময় বিশেষে আমরা বড্ড তাড়াতাড়ি ব্যাট চালাবার চেষ্টা করেছি। আর সেই চেষ্টাতেই নিজেদের বিপদ ডেকেছি নিজেরাই।'

ত্রুটি বিচ্যুতির স্বীকারোক্তিতেও পাতৌদি বিষণ্ণ। কিন্তু আমার প্রশ্ন, দলের ব্যাটসম্যানদের এমন আত্মঘাতী নীতির ছায়া থেকে সরিয়ে আনতে দলনায়ক পারলেন না কেন? দলের নীতি নির্ধারণে প্রবলতম পক্ষ তো তিনিই। দ্রুতগতিতে ছোটায় বিপদ যে অবশ্যম্ভাবী তা জেনেও তিনি কিছু করতে পারলেন না, এইটেই পরমাশ্চর্য।

ক্রিকেটে দ্রুতগামিতার মতো সমঝে, বুঝে খেলারও প্রয়োজনীয়তা আছে। সংযমী না হতে পারলে বড় আসরে টি'কে থাকা যায় না। আক্রমণের সঙ্গে আত্মরক্ষার মূল নীতির সমন্বয় ঘটানোই ক্রিকেটের সার্থক ক্রীড়ারীতি। তাই যে ব্যাটসম্যান মেরে মেরে মাঠে ঘাসে উত্তাপ ছড়ান তাঁকেও যেমন আদর করি, তেমনি যে খেলোয়াড় প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দাঁতে দাঁত কষে মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে জানেন তাঁকেও আমরা নির্ভেজাল শ্রদ্ধা জানাই।

সেই শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন পূর্বসূরী বিজয়েরা—মার্চেন্ট, হাজারে ও মনজরেকার। টেস্ট খেলার মাঠে তাঁদের ভূমিকা মন্থর হলেও মস্তো। পাতৌদির দলে তিনি নিজে ছাড়া আর কেউই এই ভূমিকার মাহাত্ম্য অনুধাবন করতে চান নি। ভারত বছর প'য়ত্রিশেরও বেশি টেস্ট ক্রিকেট খেলছে। এখনও যদি সত্যোপলব্ধিতে বিলম্ব ঘটে যেতে থাকে তাহলে আমাদের ক্রিকেট মানসে কবে সুস্থ চেতনা উঁকি দেবে?

ফাস্ট বোলারের ঘাটতি রূঢ় বাস্তব সন্দেহ নেই। তবুও বলি যে শুধুমাত্র সেই ঘাটতির উল্লেখ রাখলে কিন্তু অন্য ঘাটতির দিকগুলো আড়ালে থেকে যেতে পারে। ঘাটতি ছিল আরও নানা দিকে।

ফিল্ডিংয়ে ত্রুটি বিচ্যুতি তো বটেই। তার ওপর বিপক্ষের বলের পেস বা গতির আন্দাজ পাওয়ায় অক্ষমতা। পাতৌদি নিজে বলেছেন যে অস্ট্রেলিয়ার ফাস্ট বোলারেরাও খাঁটি পেসম্যেন নন। কিন্তু অস্ট্রেলীয় উইকেটের গতি প্রকৃতিতে প্রাণ ছিল। সেখানে বল পড়ে আরও জোরে ছুটেছে এবং কিপিং উঁচুতে লাফিয়েছেও। ভারতীয় ব্যাটসম্যানেরা এই উইকেটের নাড়ীর খবর পান নি।

পান নি সত্যি। কিন্তু পেতে চেয়েছিলেন কি?

ভারতের প্রথম সারির ব্যাটসম্যানেরা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস খেলেও যদি এক ধরনের পিচের প্রকৃতি জেনে নিতে না পারেন তাহলে বুঝতে হবে যে ত্রুটিটা পিচের নয়। দোষ-ত্রুটি, সবই তাঁদের যাঁরা মস্তিষ্ককে বাদ রেখে শুধু দেহ দিয়েই ক্রিকেট খেলার চেষ্টা করেছেন।

মাঠের খেলাতেও শরীরের ভূমিকা যেমন আছে, তেমনি আছে মস্তিষ্কের প্রয়োজনীয়তা। মাথাই তো দেহকে চালায়। অথচ মাথা বা মনের দরজায় খিল এঁটে পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা না করলে যা ঘটা স্বাভাবিক, অস্ট্রেলিয়ায় ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের ক্ষেত্রে ঠিক তাই ঘটে গিয়েছে। এতো নামডাকওয়ালা খেলোয়াড় সব, পিচের পেস ও বাউন্স বুঝতেই হিমসিম খেয়ে গেলেন। ভাবতেই কেমন আশ্চর্য লাগছে।

পিচের খবর নেওয়ার জন্যে মাঠে নেমে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার উপদেশ তো সব ক্রিকেটারের ভাগ্যে জোটে। নীচের থেকে ওপরের মহলের, সর্বস্তরের ব্যাটসম্যানই তাঁদের জীবনে হয় গুরু, না হয় সিনিয়ার সঙ্গীকে এ বিষয়ে উপদেশটা পান। অস্ট্রেলিয়ায় যাঁরা গিয়েছিলেন তাঁরাও পেয়েছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু আজ বোঝা যাচ্ছে সে সব কথায় কান পাতায় ও'দের আগ্রহ ছিল না। থাকলে অতি সাধারণ ভুলের ফাঁদে ও'রা বার বার পা বাড়িয়ে দেবেন কেন?

পাতৌদির বিলাপ শুনে মনে হয় যে অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে ভারতীয় ব্যাটসম্যানেরা কি খেলেছেন, আত্মসমীক্ষায় তাঁরা যদি তা উপলব্ধি করতে পারেন তাহলেই হয়তো ভবিষ্যতে কাজের কাজ করে তুলতে পারবেন ও'রাই। কিন্তু আয়নার সামনে নিজেদের দাঁড় করাতে যদি আগের মতোই কুণ্ঠাই থেকে যায় তাহলে অস্ট্রেলিয়া সফরের শিক্ষা ভারতীয় ক্রিকেটের কোনো কল্যাণেই লাগতে পারবে না। যেমন পারে নি ইংলণ্ড সফরে প্রাপ্ত শিক্ষা কোনো কাজে আসতে।

কিন্তু ভারতীয় দলের অস্ট্রেলিয়া সফরের সমস্ত বৃত্তান্তই কি হা-হুতাশে ওড়ানো? পাতৌদির খেদ সঙ্গত, যুক্তিযুক্ত; তবু মনে হয় যে হারতে হারতেও ভারতীয় দলের কেউ কেউ বুঝি আশার ক্ষীণ আলোকবর্তিকা জ্বালাতে পেরেছিলেন। দূর থেকে আমরা যদি ঠাওর না পেয়েও থাকি তাহলে শরণ নিই ক্রিকেটে বিদগ্ধজন জ্যাক ফিঙ্গলটনের অভিমতের। অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন টেস্ট খেলোয়াড় এবং স্বনামখ্যাত সমালোচক ফিঙ্গলটন লিখছেন,

'প্রসন্নের মতো বোলার যদি অস্ট্রেলিয়া দলে থাকতো! তিনি স্পিনে ও ফ্লাইটে বৈচিত্র্য এনেছেন। চারটি টেস্টে পঁচিশটি উইকেট পাওয়া এক কীর্তি, সন্দেহ নেই। তিনিই ভারতীয় দলের সেরা বোলার। ব্যক্তিগত সাফল্যের নিরিখে সফরকারী দলে পাতৌদির নাম সবার আগে স্মরণ করে আমি প্রসন্নকে দ্বিতীয় আসন দিতে চাই।

'ব্যাটসম্যান হিসেবে ওয়াদেকারের সম্ভাবনা বিপুল। তবে ব্যাট করার সময় বলের প্রতীক্ষায় তিনি বোলারের মুখোমুখি দাঁড়ান কেন, কেন সোজাসুজি দু চোখ মেলে দেখতে চান তা আমি বুঝতে পারি না। অতোটা বুক খুলে আড়াআড়ি না দাঁড়িয়ে পাশ ফিরে দাঁড়ালে তিনি নিশ্চয়ই সুফল পাবেন।

'মেলবোর্নে পাতৌদির ব্যাটিং এ পর্যায়ের খেলায় নূতন স্বাদ এনে দিয়েছিল। দু দলের আর কেউই এমন উঁচু জাতের খেলা দেখাতে পারেন নি। মেলবোর্নে অনেক অবিস্মরণীয় ব্যাটসম্যান এর আগে খেলেছেন। পাতৌদির দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা সেই সব দিকপাল ব্যাটসম্যানদের স্মরণীয় কীর্তির পাশে সহজেই নিজের জায়গা করে নিতে পারে। এই ইনিংসের পরিচয়ে পাতৌদি মেলবোর্নের দর্শককুলের মনে নিজের নাম চিরদিনের জন্যে খোদাই করে দিতে পেরেছেন।

ব্যাটে, বলে, ফিল্ডিংয়ে, সবেতেই সুর্তির সাফল্যের স্বাক্ষর প্রত্যক্ষ। তবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস থাকাতে মাঝে মাঝে তিনি এমন কিছু করেছেন যা সেই মুহূর্তে তাঁর কাছে কেউ আশা করতে পারেন নি। আমার মনে হয় না যে পাতৌদি একজন কড়া ক্যাপ্টেন। সুর্তি সম্পর্কে তিনি সুতো আলগা করে রেখেছিলেন। রাশ টেনে ধরতে পারলে আরও ভাল ফল পাওয়া যেতো।

'আর এক সম্ভাবনাময় ব্যাটসম্যান হলেন আবিদ আলি। আবিদের পর্যবেক্ষণ শক্তি আছে। তিনি খাটতে ভালবাসেন এবং হাত খুলে মারতেও ভয় পান না। এবং মার মারার সময় বল লাগে ব্যাটের মাঝখানেই। যে ব্যাটসম্যান বল পিটোন ব্যাটের মাঝখানটি দিয়ে তাঁর সাফল্য অনিবার্য। তবে আবিদকে সংযমের নির্দেশ মানতেই হবে। যেহেতু ডন ব্র্যাডম্যানের মতো ব্যাটসম্যানও এই নির্দেশ মাথা পেতে নিতেন।

'ইঞ্জিনীয়ার ব্যাটসম্যান হিসেবে পুরোপুরি আক্রমণাত্মক। নতুন বলকে তাঁর মতো অশ্রদ্ধা আর কেউ দেখাতে পারেন না। তবে ইঞ্জিনীয়ার মূলতঃ উইকেটরক্ষক। তাই ফিল্ডিং শেষ করেই তাঁর পক্ষে দলের ইনিংসের গোড়াপত্তন করতে মাঠে না নামাই ভাল। বিশ্রাম অন্তে পরে এলে দলের প্রয়োজন তিনি আরও ভাল করে মেটাতে পারেন।'

সব মিলিয়ে ফিঙ্গলটনের উপলব্ধি, ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের নিজেদের সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করা দরকার। আগে কিছু না ভেবেই ব্যাট হাতে মাঠে নামা নিরর্থক। ব্যাটিং অর্ডারটিকেও পালটাতে হবে, পাতৌদির আগে আসা দরকার, যেমন প্রয়োজন ইঞ্জিনীয়ারের পরে নামা।

খাঁটি কথা বলেছেন ফিঙ্গলটন, ভাবা দরকার। যা নেই তার জন্যে আক্ষেপ না করে যা আছে সেই সম্পদকে কিভাবে দলের প্রয়োজনে কাজে লাগানো যায় সে সম্বন্ধে পরিণত চিন্তার প্রয়োজন।

আর একটি প্রস্তাব আমার রয়েছে। পুরোনো প্রস্তাব, নতুন করে আবার বলছি যে ব্যাটসম্যান হিসেবে পাতৌদিকে দলে রেখে দল পরিচালনার দায়িত্ব অন্যের কাঁধে অর্পণ করা যায় না? ফিঙ্গলটনের এবং প্রত্যক্ষদর্শী সবাকারই মতে, পাতৌদি কড়া মানুষ নন। অথচ উঠতি বয়সের ডজনখানেক তরুণের সামনে আচরণবিধির আদর্শ নমুনা রাখতে দলপতিকে সময় সময় কড়া হতেই হয়। কিন্তু যে মানুষ নিজের সম্বন্ধেই নরম, তিনি অন্যের ওপর জোর ফলাবেন কি করে? তাই বলছি, পাতৌদির নেতৃত্বের প্রভাব থেকে ভারতীয় ক্রিকেট দলকে মুক্তি দেওয়া হোক। পাতৌদি দলে থাকুন ব্যাটসম্যান, ফিল্ডসম্যান হিসেবে! নেতারূপে নন।

খেলাধুলা

দর্শক

ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলকে পরাজিত করে ১৯৬৮ সালের টেস্ট সিরিজে ১—০ খেলায় অগ্রগামী হয়েছে। বর্তমান সিরিজের প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় টেস্ট খেলা ড্র গেছে। সিরিজের শেষ পঞ্চম টেস্ট খেলা আরম্ভ হবে জর্জটাউনে, ২৯ মার্চ থেকে। ইংল্যান্ড যদি এই পঞ্চম টেস্ট খেলাটি ড্র রাখতেও পারে, তাহলে তারা ১৯৬৮ সালের টেস্ট সিরিজে 'রাবার' জয়ী হবে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ইংল্যান্ড শেষ 'রাবার' জয়ী হয়েছে ১৯৫৯-৬০ সালের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে। তারপর এই দুই দেশের মধ্যে যে



কলিন কাউড্রে

অধিনায়ক—ইংল্যান্ড

দুটি টেস্ট সিরিজ খেলা হয়েছে, তাতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ উপর্যুপরি দু'বারই 'রাবার' জয়ী হয়েছে—১৯৬৩ সালে ফ্রাঙ্ক ওরেলের নেতৃত্বে ৩—১ খেলায় এবং ১৯৬৬ সালে গ্যারী সোবার্সের নেতৃত্বে ৩—১ খেলায় (দু'বারই ইংল্যান্ডের মাটিতে)।

চলতি ১৯৬৮ সালের টেস্ট সিরিজের আগে ইংল্যান্ড এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের মধ্যে যে ১২টি টেস্ট ক্রিকেট সিরিজ খেলা হয়েছে, তার ফলাফল : ইংল্যান্ডের 'রাবার' জয় ৫ বার ওয়েস্ট ইন্ডিজের 'রাবার' জয় ৫ বার এবং সিরিজ অমীমাংসিত ২ বার। এই ১২টি সিরিজের ৫০টি টেস্ট খেলার ফলাফল দাঁড়িয়েছে : ইংল্যান্ডের জয় ১৭ বার, ওয়েস্ট ইন্ডিজের জয় ১৬ বার এবং খেলা ড্র ১৭ বার। অর্থাৎ ইংল্যান্ড এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ সমান ৫ বার করে 'রাবার' জয়ী হলেও ওয়েস্ট ইন্ডিজের থেকে ইংল্যান্ড একটা বেশী টেস্ট খেলায় জয়ী হয়েছে।

আলোচ্য চতুর্থ টেস্টে ইংল্যান্ডের ৭ উইকেটে জয়—ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ইংল্যান্ডের ১৮-তম জয় এবং টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে নিঃসন্দেহে এক ঐতিহাসিক জয়। এক বিরাট উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে দিয়ে বর্তমান সময়ের টেস্ট ক্রিকেটের বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ান ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলকে পরাজিত করে ইংল্যান্ড যথেষ্ট দৃঢ়তা এবং সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের অধিনায়ক গ্যারফিল্ড সোবার্সের চ্যালেঞ্জের যোগ্য-উত্তর দিয়েছেন ইংল্যান্ডের অধিনায়ক কলিন কাউড্রে। এখানে বিশেষ উল্লেখ্য, সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে এই নিয়ে মাত্র ৪ বার এই তিনটি দল তাদের দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে শেষ পর্যন্ত খেলায় পরাজিত হয়েছে : (১) ১৯৩৪-৩৫ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৪ উইকেটে (২) ১৯৪৮ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ইংল্যান্ড ৭ উইকেটে, (৩) ১৯৪৮-৪৯ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকা ৩ উইকেটে এবং (৪) ১৯৬৮ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৭ উইকেটে পরাজিত হয়েছে। অর্থাৎ ওয়েস্ট ইন্ডিজ ২ বার, ইংল্যান্ড ১ বার এবং দক্ষিণ আফ্রিকা ১ বার দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়।

প্রথম দিন বৃষ্টির দরুণ দু' ঘণ্টার মত খেলা বাতিল হয়ে যায়। প্রথম দিনের খেলায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ দুই উইকেটের বিনিময়ে ১৬৮ রান সংগ্রহ করে। প্রথম উইকেটের জুটিতে স্টেভ ক্যামাচো এবং কার্যু দলের ১১৯ রান সংগ্রহ করেন। মাঠের ১৮,০০০ দর্শক ইংল্যান্ডের ৩৮ বছরের ন্যাট গিফ্‌স বোলার টনি লকের স্বভাবসিদ্ধ অঙ্গভঙ্গীতে যথেষ্ট আনন্দ উপভোগ করেছিলেন। দীর্ঘ ৫ বছর পর টনি লক অপ্রত্যাশিতভাবে ইংল্যান্ডের টেস্ট ক্রিকেট দলে স্থান পেয়েছেন।

দ্বিতীয় দিন ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের প্রথম ইনিংসের রান দাঁড়ায় ৪৭৯ (৪ উইকেট)। এই দিনের খেলায় তারা আরও দুটো উইকেট খুইয়ে পূর্ব-দিনের ১৬৮ রানের (২ উইকেট) সঙ্গে ৩১১ রান যোগ করে। চা-পানের পরবর্তী ৭০ মিনিটের খেলায় তারা ১০৪ রান যোগ করেছিল। ৩য় উইকেটের জুটিতে রোহন কানহাই এবং সেমুর নার্স ২৯৩ মিনিটে দলের ২৭৩ রান যোগ করে খেলার ভিত সুদৃঢ় করেন। কানহাই ব্যক্তিগত ১৫৩ রান করেন—টেস্ট ক্রিকেটে তাঁর এই ১১তম সেঞ্চুরী। সরকারী টেস্ট ক্রিকেটের এক ইনিংসের খেলায় কানহাইয়ের সর্বোচ্চ রান সংখ্যা ২৫৬ (ভারতবর্ষের বিপক্ষে কলকাতা ১৯৫৮-৫৯)। কানহাইয়ের ৩য় উইকেটের জুটি সেমুর নার্স ১৩৬ রান করে আউট হন—টেস্ট ক্রিকেটে নার্স এই নিয়ে ৩টে সেঞ্চুরী করলেন, টেস্টের এক ইনিংসে তাঁর সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড—২০১ (বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, ব্রিজটাউন, ৪র্থ টেস্ট, ১৯৬৫)।

তৃতীয় দিনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৫২৬ রানের (৭ উইকেট) মাথায় প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। এই দিন তারা অবশিষ্ট তিনটে উইকেট খুইয়ে মাত্র ৫৭ রান যোগ করে তারা।

ইংল্যান্ড বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ

চতুর্থ টেস্ট ক্রিকেট খেলা

ওয়েস্ট ইন্ডিজ : ৫২৬ রান (৭ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। রোহন কানহাই ১৫৩, সেমুর নার্স ১৩৬ এবং স্টেভ ক্যামাচো ৮৭ রান। ডেভিড ব্রাউন ১০৭ রানে ৩ উইকেট)

ও ৯২ রান (২ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। ক্যামাচো ৩১ এবং এম সি কার্যু ৪০ নট আউট)

ইংল্যান্ড : ৪০৪ রান (কলিন কাউড্রে ১৪৮, এ্যালান নট ৬৯ নট-আউট এবং জিওফ বয়কট ৬২ রান। বেসিল বুচার ৩৪ রানে ৫ এবং চার্লি গ্রিফিথ ১৪৫ রানে ৩ উইকেট)

ও ২১৫ (৩ উইকেটে। বয়কট নট-আউট ৮০ এবং কাউড্রে ৭১ রান। গিবস ৭৬ রানে ২ উইকেট)।

প্রথম দিন (মার্চ ১৪) :

ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল প্রথম ইনিংসের দুই উইকেট খুইয়ে ১৬৮ রান সংগ্রহ করে। প্রথম দিনের খেলায় অপরাজিত থাকেন নার্স (১৬ রান) এবং কানহাই (২৩ রান)।

দ্বিতীয় দিন (মার্চ ১৫) :

ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের প্রথম ইনিংসের রান দাঁড়ায় ৪৭৯ (৪ উইকেটে)। এই দিনের খেলায় অপরাজিত থাকেন লয়েড (২৭ রান) এবং সোবার্স (২৯ রান)।

তৃতীয় দিন (মার্চ ১৬) :

ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল তাদের ৫২৬ রানের (৭ উইকেটে) মাথায় প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। ইংল্যান্ড এই দিনের বাকি সময়ের খেলায় প্রথম ইনিংসের ২ উইকেট খুইয়ে ২০৪ রান সংগ্রহ করেছিল। ইংল্যান্ডের অধিনায়ক কলিন কাউড্রে (৬১ রান) এবং কেন ব্যারিংটন (২৮ রান) অপরাজিত থাকেন।

চতুর্থ দিন (মার্চ ১৮) :

ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস ৪০৪ রানের মাথায় শেষ হলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম ইনিংসের খেলায় ১২২ রানে অগ্রগামী হয়ে দ্বিতীয় ইনিংসের কোন উইকেট না-খুইয়ে ৬ রান সংগ্রহ করেছিল।

পঞ্চম দিন (মার্চ ১৯) :

ওয়েস্ট ইন্ডিজ দুই উইকেটের বিনিময়ে ৯২ রান সংগ্রহ করে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। খেলা শেষ হতে তখনও ১৬৫ মিনিট সময় বাকি ছিল। ইংল্যান্ড খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ের ঠিক ৩ মিনিট আগে দ্বিতীয় ইনিংসের ৩ উইকেটের বিনিময়ে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ২১৫ রান তুলে দিয়ে ৭ উইকেটে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলকে পরাজিত করে।

পোর্ট অব স্পেনে (ট্রিনিদাদ) আয়োজিত চতুর্থ টেস্ট খেলায় ইংল্যান্ড ৭ উইকেটে

পঞ্চম উইকেটের জুটিতে লয়েড এবং সোবার্স ৬৭ মিনিটে ৮৫ রান করেন। তাঁরা অল্প সময়ের ব্যবধানে খেলা থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। তৃতীয় দিনের খেলার বাকি সময়ে ইংল্যান্ড প্রথম ইনিংসের দুই উইকেট খুইয়ে ২০৪ রান সংগ্রহ করেছিল। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের স্পিন বোলারদের আক্রমণে ইংল্যান্ডের খেলোয়াড়দের বেশ বেগ পেতে হয়েছিল।

চতুর্থ দিনে ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস ৪০৪ রানের মাথায় শেষ হলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম ইনিংসের খেলায় ১২২ রানে এগিয়ে যায়—বর্তমান টেস্ট সিরিজে প্রথম ইনিংসের খেলায় ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের এই প্রথম বেশী রান করার নজির। ইংল্যান্ডের ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটি অধিনায়ক কলিন কাউড্রে এবং এ্যালান নট দলের পরিত্রাতার ভূমিকা গ্রহণ করেন। তাঁরা ৯৬ মিনিটে দলের ১১৩ রান তুলে দিয়ে দলকে 'ফলো অন' করার অপমান থেকে রক্ষা করেন। লাঞ্চের সময় ইংল্যান্ডের রান ছিল ৩০৩ (৫ উইকেটে)। 'ফলো অন' ঠেকাতে ইংল্যান্ডের ৩২৭ রান করার প্রয়োজন ছিল। খেলার এক সময়ে স্কোর বোর্ডে দেখা গেল—ইংল্যান্ডের রান দাঁড়িয়েছে ৩৭৩ (৫ উইকেটে)। তখন অনেকেই ভেবেছিলেন ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের রান-সংখ্যা ওয়েস্ট ইন্ডিজের নাগাল পাবে। কিন্তু ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের লেগ-স্পিনার বেসিল বুচার বোলিংয়ে অভাবনীয় সাফল্যের পরিচয় দিলেন। মাত্র ৩ ওভার বল দিয়ে ৫ রানের বিনিময়ে বুচার ৪টে উইকেট পেলেন। অধিনায়ক কলিন কাউড্রে (৬ষ্ঠ উইকেট) দলের ৩৭৩ রানের মাথায় বুচারের বলে মারের হাতে 'ক্যাচ' তুলে দিয়ে খেলা থেকে বিদায় নেন।

কলিন কাউড্রে ৫ ঘণ্টার খেলায় তাঁর ১৪৮ রানে ২১টা বাউন্ডারী করেন। বর্তমানে কলিন কাউড্রের ৯৬টি টেস্ট ম্যাচে এই নিয়ে ১৯টি সেঞ্চুরী হল। ইংল্যান্ডের ২১ বছরের উইকেটকিপার এ্যালান নট ৬৯ রান করে নট-আউট থেকে যান। বুচারের ভয়াবহ বোলিংয়ের মুখে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে যান, কোনরকম বিচলিত হননি। উইলি রডরিকের উপর্যুপরি বলে টম গ্রেভনী এবং বেসিল ডি'-ওলিভিয়েরা আউট হলে নট খেলতে নেমে রডরিকের 'হ্যাটট্রিক' করার আশা নির্মূল করে দেন। নট ১৪৩ মিনিটে তাঁর নট-আউট ৬৯ রানে ৭টা বাউন্ডারী করেন।

চতুর্থ দিনের বাকি সময়ের খেলায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বিতীয় ইনিংসের সমস্ত উইকেট জমা রেখে ৬ রান সংগ্রহ করে।

পঞ্চম দিনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল ৯২ রানের (২ উইকেটে) মাথায় দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। এই অবস্থায় খেলা শেষ হতে ১৬৫ মিনিট বাকি ছিল এবং ইংল্যান্ডের পক্ষে খেলায় জয়লাভের জন্যে ২১৫ রানের প্রয়োজন ছিল। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ২১৪ রানে অগ্রগামী, খেলা শেষ হতে ১৬৫ মিনিট বাকি এবং দ্রুত রান সংগ্রহের পক্ষে পীচ মোটেই সাহায্য করছে না—এই সমস্ত দিক বিচার করেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের সুদক্ষ অধিনায়ক গ্যারী সোবার্স দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন খেলার ১৬৫ মিনিট সময়ে ইংল্যান্ডের জয়লাভের প্রয়োজনীয় ২১৫ রান সংগ্রহ করা মোটেই সম্ভব নয় বরং খেলা ভাঙার নির্দিষ্ট সময়ের আগেই তিনি ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংস ফেলে দিয়ে দলকে জয়যুক্ত করবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বেকুব প্রতিপন্ন হলেন তিনি। খেলা ভাঙার নির্দিষ্ট সময়ের তিন মিনিট আগে অর্থাৎ ১৬২ মিনিটে তিন উইকেটের বিনিময়ে ২১৫ রান তুলে ইংল্যান্ড ৭ উইকেটে জয়ী হল।

ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের ৫৫ রানের মাথায় ১ম উইকেট (এড্রিচ ২১ রান) পড়ে যায়। দ্বিতীয় উইকেটের জুটি বয়কট এবং কাউড্রে দলের ১১৮ রান তুলে জয়লাভের পথ পরিষ্কার করে দেন। দলের ১৭৩ রানের মাথায় কাউড্রে ব্যক্তিগত ৭১ রান (বাউন্ডারী ১০) করে যখন আউট হন, তখন ইংল্যান্ডের জয়লাভের জন্যে আরও ৪২ রানের প্রয়োজন এবং খেলা ভাঙতে ৩৫ মিনিট বাকি ছিল। ইংল্যান্ডের জয়-সূচক রানটি করেন ডি' ওলিভিয়েরা। বয়কট শেষপর্যন্ত ৮০ রানে অপরাজিত থাকেন।

সোবার্সের দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা—শেষপর্যন্ত ইংল্যান্ডের কাছে মহৎ দান হয়ে দাঁড়ায়। এই চতুর্থ টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রখ্যাত ফাস্ট বোলার ওয়েসলি হল দলভুক্ত হননি। অপর ফাস্ট বোলার চার্লি গ্রিফিথ পায়ের মাংসপেশীর টানে খেলা থেকে অবসর নেন—তিনি প্রথম ইনিংসে মাত্র ৩ ওভার বল দিয়েছিলেন।

ফুটবল খেলোয়াড়দের দল বদল

সরকারীভাবে আই এফ এ-র অধীনে ১৯৬৮ সালের ফুটবল মরসুমের আরম্ভ হতে দেরী আছে। তবে অতি উৎসাহী ফুটবল অনুরাগীরা অনেক আগেই ফুটবল মরসুমের আগমনবার্তা পেয়ে গেছেন, তাঁদের আশা-উদ্দীপনা এবং উত্তেজনা মাথা-চাড়া দিয়ে উঠেছে। ফুটবল মরসুমের মুখ-বন্ধ হল, খেলোয়াড়দের দল বদলের পালা। সে-পর্বও শেষ হয়েছে। ১৯৬৮ সালের ফুটবল মরসুমে রেকর্ড সংখ্যক ফুটবল খেলোয়াড় (মোট ৬৪০ জন) দল বদলের উদ্দেশ্যে আই এফ এ অফিসে ছাড়পত্রে সই-সাবুদ করেছিলেন। তবে এই ৬৪০ জনের মধ্যে বেশ কয়েকজন নামকরা খেলোয়াড় পুনরায় আগের দলে ফিরে এসেছেন। পুরো একমাস ধরে (১৫ ফেব্রুয়ারী থেকে ১৫ মার্চ) খেলোয়াড়দের দল পরিবর্তন উপলক্ষ করে বিভিন্ন ক্লাবের কর্মকর্তা এবং সমর্থকদের মধ্যে উত্তেজনা, উদ্দীপনা এবং দুর্ভাবনার অবধি ছিল না। তবে উত্তেজনার বেশীর ভাগই কলকাতার কয়েকটি নামকরা ক্লাবকে নিয়েই। খেলোয়াড়দের দল বদলের শেষ দিনে আই এফ এ অফিসের সামনে ফুটবল অনুরাগীরা বিরাট জটলার সৃষ্টি করেন। তাঁদের তর্ক-বিতর্ক এবং জয়-ধ্বনিতে সারা অঞ্চলটা সরগরম হয়ে উঠেছিল।

১৯৬৮ সালের মরসুমে নামকরা খেলোয়াড়দের দল বদলের ফলে বড় বড় ক্লাবগুলির লাভ-ক্ষতির পরিমাণ কি দাঁড়াল, তার একটা সংক্ষিপ্ত হিসাব নীচে দেওয়া হল। গত বছর এইসব খেলোয়াড়রা যে-সব ক্লাবে খেলেছিলেন, তার নাম বন্ধনীর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে।

মহমেডান স্পোর্টিং : ১৯৬৭ সালের প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ চ্যাম্পিয়ান মহমেডান স্পোর্টিং দলের নবাগত খেলোয়াড় : বি উচিল (ইস্টবেঙ্গল), এস ধর (বাটা), সি চ্যাটার্জি এবং এস মৌলিক (হাওড়া ইউনিয়ন) এবং শুভাশীষ গুহ (রাজস্থান)।

ইস্টবেঙ্গল : গত বছরের প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগের রানার্স-আপ, রোভার্স এবং ডুরান্ড কাপ বিজয়ী ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের নবাগত খেলোয়াড় : এস এন্টনী ও পি মজুমদার (বি এন আর), সুকুমার সমাজপতি এবং এম কর্মকার (মোহনবাগান), এন গাঙ্গুলী (ইস্টার্ন রেল), দিলীপ পাল (এরিয়ান), এন পাল (রাজস্থান) এবং অশোক ব্যানার্জি (বালী প্রতিভা)।

মোহনবাগান : ১৯৬৭ সালের প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় ৩য় স্থান অধিকারী মোহনবাগান দলের এ মরসুমের নতুন খেলোয়াড় : নঈম এবং হবিব (ইস্টবেঙ্গল); বলাই দে এবং কপূর ব্যানার্জি (এরিয়ান) এবং কল্যাণ সাহা (বি এন আর)।

এরিয়ান : কানাই সরকার এবং বিমান লাহিড়ী (মোহনবাগান)।

বাটা স্পোর্টস : দুলাল মন্ডল, সন্তোষ চ্যাটার্জি, পি সরকার, এস ব্যানার্জি এবং সঞ্জীব বসু (ইস্টবেঙ্গল); নীলেশ সরকার (বালী প্রতিভা) এবং বিমল চক্রবর্তী (মোহনবাগান)।

বি এন আর : মোহন সিং (এরিয়ান), সুকুমার সেন (মহমেডান স্পোর্টিং) এবং সমীর দাস (কালীঘাট)।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩
হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

অমৃত

ত্রৈমাসিক সূচীপত্র

৭ম বর্ষ : ২য় খণ্ড

শুক্রবার, ১৮ই শ্রাবণ, ১৩৭৪ — শুক্রবার, ৯ই কার্তিক, ১৩৭৪

Friday, 24th August, 1967 — Friday, 27th October, 1967

লেখক		বিষয় ও পৃষ্ঠা
॥ র ॥		
শ্রীরঞ্জিত বন্দ্যোপাধ্যায়	...	পারমাণবিক শক্তি (আলোচনা) ২২৭, ৩১০;
শ্রীরণজিতকুমার সেন	...	জাপানী চিত্রশিল্প (আলোচনা) ৫০৮;
শ্রীরাসবিহারী রায়	...	বিচিত্র ক্লাব ঃ বিচিত্র কাহিনী (আলোচনা)
শ্রীরূপচাঁদ পক্ষী	...	সড়কসোধ কানাগলি ১৪;
॥ শ ॥		
শ্রীশক্তি ঘোষ	...	কলকাতায় লটারী খেলা (আলোচনা) ৬৩৩;
শ্রীশক্তি চট্টোপাধ্যায়	...	এখন তার হাতেই সব (কবিতা) ২৪৮;
শ্রীশঙ্করবিজয় মিত্র	...	কেন এই পশ্চাদগামিতা (আলোচনা) ১২৫; অতল জলের আহ্বান (আলোচনা) ৪৪৯; কলকাতার ফুটবল লীগের কথা (আলোচনা) ৬৮৭;
শ্রীশচীন্দ্রলাল বসু	...	মঙ্গলগ্রহের প্রাণী (আলোচনা) ৮৭৯;
শ্রীশান্তনু দাস	...	সম্রাট (কবিতা) ২৪৮;
শ্রীশিশির নিয়োগী	...	মহামারীর কবলে (আলোচনা) ৫৭৫;
শ্রীশুভঙ্কর	...	বিজ্ঞানের কথা ১৩৯, ২৭০, ৪৫৪, ৬২৭, ৭৮১, ৯১৭;
শ্রীশৈল চক্রবর্তী	...	হাসুন হেসে বাঁচুন (আলোচনা) ৩৮৬; পত্রপুষ্পের মুখোমুখি (আলোচনা) ৮৭৭;
শ্রীশৈলেশ সেন	...	নর্থ ব্রিটেনের নায়ক (আলোচনা) ৩৩০;
শ্রীশ্রীমন্তকুমার জানা	...	শিল্প ও নৈতিকতার পারস্পরিক সম্পর্ক (আলোচনা) ৩৮৭;
॥ স ॥		
শ্রীসঞ্জীবকুমার বসু	...	বর্ষার রূপ (আলোচনা) ৬৭;
শ্রীসত্যব্রত দে	...	মারণাস্ত্রের ব্যবসা (আলোচনা) ৬৬;
শ্রীসমর পাল	...	মরণ আমার মরণ (আলোচনা) ১৫৫;
শ্রীসমরেন্দ্র সেনগুপ্ত	...	তুমি দেবতা ছিলে না (কবিতা) ৪৮৮;
শ্রীসমরেন্দ্র ভট্টাচার্য	...	আমি এবং ছায়া (কবিতা) ৮;
		সম্পাদকীয় ৫, ৮৫, ১৬৫,২৪৫, ৩২৫, ৪০৫,৪৮৫, ৫৬৫, ৬৪৫, ৭২৫, ৮০৫, ৮৮৫;
শ্রীসুজিত মুখোপাধ্যায়	...	একজন বিস্মৃত বাঙালী (আলোচনা) ২৬৬;
শ্রীসুধা বসু	...	গগনেন্দ্রনাথ ও চতুষ্কোণবাদ (আলোচনা) ৪৮৯;
শ্রীসুধাংশু ঘোষ	...	ঢেউগুলি (গল্প) ২৫৩;
শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	...	অবিস্মরণীয় প্রেম (আলোচনা) ৮৬৫;
শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার	...	আমার কাল আমার দেশ (স্মৃতিচারণ) ৯, ১৩৭, ২২৫, ২৯৭, ৩৭৫ ৪৬৭, ৫৩০, ৬১৭, ৭১১, ৭৭৭, ৮৪৫ ৯৩৯;
শ্রীসুধীর করণ	...	উপেক্ষিতা হেলেন (আলোচনা) ৪৭৩;
শ্রীসুভাষ সিংহ	...	অক্টোপাশ (গল্প) ৬৫৫;
শ্রীসুমথনাথ ঘোষ	...	প্রকৃতিপাগল বিভূতিভূষণ (আলোচনা) ৬৩৪;
শ্রীসুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়	...	প্রেম (গল্প) ৩৭৯;
শ্রীসৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ	...	দখল (গল্প) ৮৩১;
শ্রীসৌমেন দত্ত	...	মৃত্যুর আলোয় (আলোচনা) ৩৯১;
শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ সরকার	...	স্বাদেশিকতার প্রথম প্রত্যূষ (আলোচনা) ৯৩৫;
॥ হ ॥		
শ্রীহরেন্দ্রনাথ সিংহ	...	চিরসুন্দরের সাধনায় (কবিতা) ৮৮;
শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	...	মহাপুরুষ মহারাজ (আলোচনা) ১৫; নীলের বিদায় (আলোচনা) ৬৪৯;
॥ ক্ষ ॥		
শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়	...	লর্ডসে স্মরণীয় টেস্ট ক্রিকেট (আলোচনা) ২১০; ইউনিভার্সিয়াড গেমস (আলোচনা) ৫২৫; আন্তর্জাতিক সাঁতার পরিক্রমা (আলোচনা) ৭৬৬;